২২ বর্ষ
সংখ্যা ১

দেশ

শনিবার
২০ কার্তিক, ১৩৬১

DESH

SATURDAY, 6th NOVEMBER 1954

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

আমাদের নববর্ষ

'দেশ' একবিংশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। কালচক্রের বহু বৈচিত্র্যপূর্ণ বিবর্তনের ভিতর দিয়া আমাদিগকে গতিপথ নির্ধারণ করিতে হইয়াছে। পরাধীনতার দুর্যোগপূর্ণ প্রতিবেশের মধ্যে 'দেশের' প্রতিষ্ঠা ঘটে। রাজরোষের বিদ্যুৎ আমাদের দিক-চক্রবালে তখন ঘনঘন চমকাইয়াছে এবং ভৈরব সেই বজ্র-গর্জন আমাদের গতি স্তব্ধ করিতে চেষ্টা করিয়াছে; কিন্তু বাতি নিভে নাই। আমাদের প্রাণের যেটুকু শক্তি তাহাকে সম্বল করিয়াই আমরা পথ চলিতে চেষ্টা করিয়াছি। দেশবাসীদের সহানুভূতি এবং সহযোগিতা আমাদিগকে শক্তি দিয়াছে। তাঁহারা আমাদের অন্তরে সাহস সঞ্চার করিয়াছেন। দেশবাসীরা 'দেশ'কে ভালবাসিয়াছেন। তাঁহারা আমাদিগকে আপনার করিয়া লইয়াছেন। তাঁহাদেরই আনুকূল্যে বাঙলার সংস্কৃতি এবং সাধনার সকল ক্ষেত্রে, 'দেশ' আজ সকলের সম্মান লাভের যোগ্যতা অর্জন করিয়াছে। নব বর্ষারম্ভে আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত সেই কথাই স্মরণ করিতেছি। 'দেশের' প্রতিষ্ঠার মূলে যাঁহারা পৃষ্ঠপোষক এবং পরি-চালকস্বরূপে আমাদিগকে উৎসাহিত এবং অনুপ্রাণিত করিয়াছেন আজ তাঁহাদের কথা আমাদের মনে জাগিতেছে। আজ মনে পড়িতেছে আমাদের সেইসব সহ-কর্মীর স্মৃতি যাঁহাদের অন্তরের অবদান 'দেশ'কে বর্তমান মর্যাদার অধিকারী হইতে সামর্থ্য দিয়াছে, সাফল্য আনিয়াছে আমাদের সাধনায়। এই সেদিন আমরা আমাদের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা পরিচালক এবং উপদেষ্টা সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয়কে হারাইয়াছি। আমাদের পরম-বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের বিয়োগ-ব্যথায় আমাদের অন্তর এখনও উত্তপ্ত রহিয়াছে। আমাদের পক্ষে এ অভাব খুবই নিদারুণ। কিন্তু আমরা বিচলিত হইব না। তাঁহাদের তীব্রদীপ্ত স্বদেশপ্রেম, উদার তাঁহাদের মানবতা, সর্বোপরি বাঙলার সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বহুমুখী বিকাশের মূলে তাঁহাদের জীবনব্যাপী সাধনার প্রাণপূর্ণ আদর্শ আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে। বুঝি, কর্তব্য আমাদের কঠোর। সেই কর্তব্য সম্পাদনে সহৃদয় দেশবাসীরা এতদিন যেভাবে আমাদিগকে সাহায্য করিয়াছেন তাহা হইতে আমরা বঞ্চিত হইব না, আমাদের ইহাই আশা। সেই ভরসা অন্তরে লইয়া আমরা শ্রদ্ধান্বিতচিত্তে নববর্ষের কর্তব্য ভার গ্রহণ করিতেছি।

প্রধান মন্ত্রীর প্রত্যাবর্তন

পক্ষাধিককাল চীন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া পরিদর্শন সম্পন্ন করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ভারতে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তাঁহাকে পুনরায় নিজেদের মধ্যে পাইয়া আমরা অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিয়াছি এবং চীন পরিদর্শন-ব্যাপারে তাঁহার নবলব্ধ সম্মানে বিশেষ-ভাবে গৌরব বোধ করিতেছি। পিকিন, মুকডেন, সাংহাই, ক্যাণ্টন এবং কাম্বোডিয়া সর্বত্র ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হইয়াছেন। জনসাধারণ পণ্ডিত নেহরুর মুখে নবজাগ্রত এশিয়ার অন্তরের বাণী শুনিয়াছে এবং তাঁহার সান্নিধ্যে বৈদেশিক প্রভুত্বের সর্ববিধ বন্ধন-বিনির্মুক্ত মানুষের আত্মার উদার আদর্শের প্রেরণা অন্তরে উপলব্ধি করিয়াছে। রাজনীতিক মতবাদের জটিল ও কুটিল আবর্তের ঊর্ধ্বে মানবের যে মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, পণ্ডিত নেহরুর চীন পরিদর্শনে তাহার প্রাণপূর্ণ স্পর্শ সম্প্রসারিত হইয়াছে। মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শের প্রভাব তাঁহার প্রিয় শিষ্য পণ্ডিত নেহরুর কর্মসাধনায় আমরা এক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। এশিয়ার রাজনীতির সাময়িক গতি ও রীতিকে এই আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করিবে এবং বিশ্বমানব সংস্কৃতিতে পারস্পরিক মৈত্রীর স্থায়ী ভিত্তি করিয়া তুলিবে। এইভাবে বন্য বর্বরের জিঘাংসা হইতে বিশ্বজগৎ পরিত্রাণ পাইবে, আমরা এই আশা অন্তরে পোষণ করিতেছি। বস্তুত আমাদের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার মূলে সে আদর্শই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলিষ্ঠতার সহিত সেই আদর্শকে রূপ দিয়াছেন। তাঁহার চীন পরিদর্শনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই সত্যই উন্মুক্ত হইয়াছে এবং ভারতের স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

সোভিয়েট নীতি ও ভারত

বৈপ্লবিক প্রতিবাদ সম্প্রসারণের ভিতর দিয়া পররাজ্যে নিজেদের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করিয়া এবং সেই সূত্রে নিজেদের শক্তিগোষ্ঠীর শক্তি[illegible] করিবার নীতি কম্যুনিস্ট রাশিয়া পরিত্যাগ করিতে

প্রস্তুত আছে কি. কম্যুনিস্ট গোষ্ঠীগত চীনে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দর্শনে এই প্রশ্ন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদিত হইয়াছে। পণ্ডিত জওহরলাল কম্যুনিস্ট শক্তি-গোষ্ঠীর সঙ্গে সামরিক চুক্তি সম্পাদনে উদ্যোগী হইয়াছেন, এমন কথাও কেহ কেহ উত্থাপন করিয়াছেন। পণ্ডিতজী দৃঢ়তার সঙ্গে একথা অস্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের নীতি কি চীন এবং অন্যান্য সব শক্তিই অবগত আছে। এরূপ অবস্থায় কোন শক্তির পক্ষ হইতে ঐরূপ প্রস্তাব উত্থাপিতই হইতে পারে না। পণ্ডিতজী জানাইয়াছেন যে, চীন ভারত ব্রহ্ম, থাই-ল্যান্ড কিংবা ইন্দোনেশিয়ার রাষ্ট্রগত ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অত্যন্ত বিরোধী। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গিয়া ভারতের প্রধান-মন্ত্রী দৃঢ়তার সঙ্গে নিজেদের স্বাধীনতায় অপর কোন শক্তির হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রস্তুত থাকিবার জন্য সেখানকার অধি-বাসীদিগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। এরূপ অবস্থায় এই সিদ্ধান্তই স্বভাবত করিতে হয় যে, চীন কম্যুনিস্ট মতবাদের লৌহযবনিকা ভেদ করিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অপরাপর রাষ্ট্রের মর্যাদা রক্ষা করিতে এবং তাহাদের সহিত সখ্যবন্ধ হইবার প্রয়োজন উপলব্ধি করিয়াছে এবং সেই পথে অগ্রসর হইতে চাহিতেছে। বিশ্বশান্তির পক্ষে ইহা সত্যই আশার লক্ষণ। কলিকাতার বিরাট জনসভায় লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর বিপুল সম্বর্ধনার উত্তরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমাদিগকে এই আশার কথাই শুনাইয়াছেন এবং ভারতের রাজনৈতিক আদর্শকে তিনি পরিস্ফুট করিয়া ধরিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে শক্তিগোষ্ঠীর কূটচক্র হইতে জগৎকে যদি রক্ষা পাইতে হয়, তবে ভারতের আদর্শেরই অনুসরণ করিতে হইবে। প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগোষ্ঠীর সামরিক চক্র কাটাইয়া বিশ্বের শান্তিকামী রাষ্ট্রসমূহকে বাহির হইতে হইবে। মতবাদগত বিরোধের দিকটা বড় করিয়া না দেখিয়া পারস্পরিক সৌহার্দ্যের পথই প্রশস্ত করিয়া তোলাই এক্ষেত্রে প্রয়োজন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলিষ্ঠ হস্তে জগতের দুর্যোগঘন অন্ধকার পথে এই আদর্শের আলোক-বর্তিকা ঊর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন। তাঁহার নেতৃত্বে স্বাধীন ভারত বিশ্বমানব-সভ্যতার নব-যুগের উদ্বোধনে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

মর্মান্তিক দুর্ঘটনা

গত ৩০শে অক্টোবর শান্তিপুরের নিকটে যে মোটর দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে, তাহা যেমন মর্মান্তিক তেমনই শোচনীয়। এই দুর্ঘটনার ফলে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীফ্ হুইপ এবং উপমন্ত্রী শ্রীদেবেন দে শান্তিপুর মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীশশী খাঁ, তাঁহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা এবং অপর দুইজন সঙ্গী মৃত্যুমুখে পতিত হন। শ্রীদেবেন দেকে গুরুতর আহত অবস্থায় কলিকাতার প্রেসিডেন্সী হাসপাতালে আনা হয়। সেখানে সোমবার সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনে বিপিন গাঙ্গুলী, সন্তোষ মিত্র, যতীন দাস, সূর্য সেন ইঁহাদের সহকর্মী দেবেন দের দুরন্ত প্রাণবল এবং দুঃসাহসিক বিস্ময়কর কর্মতৎপরতা স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। এমন নির্ভীক, তেজস্বী স্বদেশপ্রেমিকের কর্মোদ্যমদীপ্ত জীবনের এইরূপ মর্মন্তুদ পরিসমাপ্তিতে আমরা স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছি। শ্রীযুত শশী খাঁ সর্বজনপ্রিয় কংগ্রেসকর্মী ছিলেন। ইঁহাদের মর্মান্তিক শোক ব্যক্ত করিবার মত ভাষা আমাদের নাই। ভগবান ইঁহাদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে এই চরম দুঃখ ও বেদনায় সান্ত্বনা দান করুন, ইহাই প্রার্থনা।

ডাঃ খান সাহেবের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ

জরুরী অবস্থা বিঘোষিত পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিমণ্ডলে ডাঃ খান সাহেবের যোগদানে পাকিস্থানের অব্যবস্থিত রাজ-নৈতিক প্রতিবেশে বিশেষ ঔৎসুক্যের সঞ্চার হইয়াছে। ডাঃ খান সাহেব ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম অগ্রণী। তিনি তেজস্বী, নির্ভীক এবং বলিষ্ঠচেতা আদর্শনিষ্ঠ পুরুষ। খান সাহেবকে পাকিস্থানের শাসকগোষ্ঠী কোনদিনই ভাল চোখে দেখেন নাই। তাঁহাকে দীর্ঘদিন অন্তরীণ অবস্থায় থাকিতে হইয়াছে। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফফর খান তো পাকিস্থানের শাসকদের দৃষ্টিতে দস্তুর-মত দাগী অপরাধী। আজ পর্যন্তও তাঁহাকে গতিবিধির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয় নাই এমন অবস্থায় খান সাহেবের পাকিস্থানের মন্ত্রিমণ্ডলে যোগদান বাস্তবিকই অপ্রত্যাশিত ব্যাপার কেহ কেহ মনে করিতেছেন, ইহার ফলে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে নিবিড়তর সম্পর্ক স্থাপিত হইবে। আবদুল গফফর খান নিজেও এইরূপ সম্ভাবনা কিছুটা ব্যক্ত করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উক্তি এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিত নয়। বলা বাহুল্য পাকিস্থানের বর্তমান পরিস্থিতিতে সেখানকার অবস্থার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কোন কথাই নিশ্চিতভাবে বলা চলে না। পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতি অন্ধকারের মধ্যেই পথ হাতড়াইতেছে এবং সে আঁধারে কোন দিক হইতে আলোকের ক্ষীণ রেখাও পরি-লক্ষিত হয় না। মোটের উপর এইটি স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, মোসলেম লীগের আদর্শের উপর ভিত্তি করিয়া পাকিস্থানের বুনিয়াদ গাঁথিয়া তোলা যাইবে না। বস্তুতপক্ষে পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতিক আদর্শের গোড়াতেই গলদ রহিয়াছে। সেখানকার রাষ্ট্র-সাধনা গণতন্ত্রমূলক উদার চেতনাকে সমাজ-জীবন জাগ্রত করিতে পারে নাই, কিংবা পাকিস্থানী নীতি রাষ্ট্রীয় সংহতি ও স্বদেশপ্রেমের পথে দানা বাঁধিয়া তোলে নাই। প্রকৃতপক্ষে পাকিস্থানের রাজনীতি ধর্ম সংস্কারের প্রভাব হইতে যদি মুক্ত হয়, তবেই জাতীয় ঐক্য এবং সংহতির চেতনা সেখানকার রাষ্ট্র সাধনায় সমুন্নত রাষ্ট্রে উজ্জীবিত করিয়া তুলিবে, এমন আশা থাকে। পাকিস্থানের রাষ্ট্র নীতির নিয়ামকগণ বিশেষভাবে গভর্নর-জেনারেল সেই ঝুঁকি লইতে সাহসী হইবেন কিনা, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে যথেষ্টই সন্দেহ রহিয়াছে। যদি আমাদের এই সন্দেহ সত্য হয়, তবে সামরিক প্রভুত্বের সাহায্য সেখানকার সঙ্কট চাপা দিবার চেষ্টা হইবে এবং ঘটনার গতি যদি সেই দিকেই ঘোরে, তবে ডাঃ খান সাহেবের পক্ষে পাকিস্থানের মন্ত্রিমণ্ডলে থাকা সম্ভব হইবে না বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বস্তুত ডাঃ খান সাহেবের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সাফল্য সম্বন্ধে আমরা আশাশীলতার এখনও কারণ দেখিতেছি না।

"সিংহলে সেই দেখেছিলেম
ক্যান্ডীদলের নাচ,
শিকল-ছেঁড়া বেরিয়ে এল
যেন শালের গাছ।"
—রবীন্দ্রনাথ

স্কেচ
শ্রীনন্দলাল বসু

কৃষ্ণ বলরাম
শিল্পী শ্রীনন্দলাল বসু
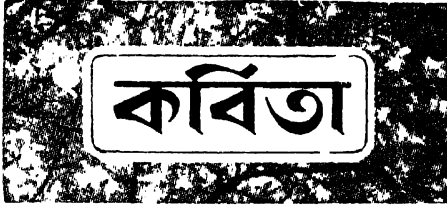
চিরন্তন 'না'

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

পুরুষ কহিল, চুমিব তোমার চরণতল,
রমণী কহিল, না।
আকাশের বুক বিদ্ধ করিয়া
ডেকে গেল পাপিয়া।

পুরুষ কহিল, পরাবো তোমারে যূথীর মালা
স্বপন-ঢালা,
রমণী কহিল, না।
দখিন বাতাস ফিরে চলে গেল
কোন্ কথা চাপিয়া।

পুরুষ কহিল, বাঁধিব তোমারে বাহুর ডোরে
নিবিড় ক'রে,
রমণী কহিল, না।
আকাশ কাঁদিল আপনার মনে
মেঘে মুখ ঝাঁপিয়া।

পুরুষ কহিল আজি মোর প্রেম মধুরতর
গ্রহণ করো,
রমণী কহিল, না।
ডুবে গেল চাঁদ অস্তাচলে যে
সারা নিশি যাপিয়া।

পুরুষ কহিল, দাও তব প্রেম হৃদয় ভরি
গ্রহণ করি,
রমণী কহিল, না।
ভোরের তিমির উঠিল কেন যে
অকারণে কাঁদিয়া।

পুরুষ কহিল, রহিব এমনি দিবস রাতি
হস্ত পাতি,
রমণী কহিল, না
ভোরের আলোয় ওঠে চাচখী
কি তরাসে কাঁপিয়া।

পুরুষ কহিল, চলিলাম তবে এবার ফিরে
অশ্রুনীরে,
রমণী কহিল, না
কাঁদে চখী ধীরে, কাঁদে খা একা—
হা প্রিয়া,
হায় হায় হায় হা প্রিয়া।

ভাগবতী তনু

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

খড়দা আর [illegible] মাঝখানে পেনেটি। [illegible] ছাতুবাবুর বাগানবাড়িতে এসেছে [illegible]নাথ। বালক রবীন্দ্রনাথ।

এসেছে ডেঙ্গুজ্বরের [illegible]। ডেঙ্গুজ্বরের মড়ক লেগেছে [illegible]তায়।

এই প্রথম বাইরে [illegible]। ইট-কাঠ-পাথরের বাইরে ম[illegible] [illegible]কে সম্ভাষণ করা।

গঙ্গাতীরেই [illegible]। বারান্দার সামনে পেয়ারাবন। [illegible] গাছের ফাঁক দিয়ে গঙ্গার দিকে [illegible] বসে থাকে রবীন্দ্রনাথ। নৌকো [illegible] দাঁড় টেনে পাল তুলে ভেসে [illegible] নৌকো, কোন নাম-না-জানা বিস্[illegible] [illegible]রে। মানচিত্রের সীমানা না [illegible] [illegible]গোলের গণ্ডি পেরিয়ে, চিরন্তন [illegible]।

এই রহস্যটিই [illegible]নে। [illegible]র আমার দুই চোখে শিশুর [illegible]ময়।

দেখি আর [illegible] দুই [illegible]ক হয়ে দেখি, প্রকাশের ভাষা নেই। ভাষার শেষ আছে অভিধানে, কিন্তু অনুভবের অভিধান কোথায়?

মনে মনে রবীন্দ্রনাথও বেরিয়ে পড়ে। সেই সব নৌকোর বিনে-ভাড়ার সোয়ারী হয়ে। কল্পনার অমরাবতীকে ছুঁয়ে আসে। সৌধচূড়ের একটি সোনার প্রদীপ ডাকে তাকে হাতছানি দিয়ে।

কি জানি কেন, কিসের টানে বেরিয়ে পড়ে রবীন্দ্রনাথ। বেরিয়ে এসে দেখে, পায়ে শেকল আঁটা।

আগে আগে যাচ্ছেন দুজন অভিভাবক। পিছনে কে, তাঁরা টের পেয়েছেন।

'এ কি, তুমি যাচ্ছ কোথায়'

ম্লানমুখে থমকে দাঁড়াল রবীন্দ্রনাথ। ধরা পড়ার মানে কি যেন বুঝতে পেরেছে এক নিমেষে।

'ছি ছি, এ তোমার কি পোশাক! যাও যাও এখুনি ফিরে যাও।'

পোশাকের কোথায় ত্রুটি বুঝতে দেরি হলো না। রবীন্দ্রনাথের গায়ে জামা থাকলেও চাদর নেই, আর পা জুতোপরা থাকলেও মোজাছাড়া।

ফিরে এল বাড়িতে। বসল এসে বারান্দায়। অম্লান চোখে দেখতে লাগল গঙ্গাকে।

ত্রুটি সংশোধন করবার উপায় নেই। যার মোজাও নেই চাদরও নেই তার কলঙ্কমোচন হয় কি করে?

কিন্তু গঙ্গা সমস্ত নিষ্কলঙ্ক নির্বন্ধন করে দিল। মনকে ছুটি দিল জলস্রোতে। স্রোতে ভাসতে মনের সাজসজ্জা লাগে না। আর কারু সাধ্য নেই, মনের পায়ে শিকলি এঁটে খাঁচায় পুরে বন্দী করে।

যেখানে বেগ সেইখানেই মুক্তি। যেখানে স্রোত সেখানেই স্বচ্ছতা। একটি মুক্তিবিস্তারিণী আনন্দময়ী নদী সেই কবে থেকেই রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে ঠাঁই নিয়েছে।

জল পড়ে, পাতা নড়ে—বর্ণপরিচয়ের ঐ অল্প কটি কথা প্রকাণ্ড সাড়া তুলেছে বালকের মনে। পড়া-নড়ার একটা ছন্দ দেখছে চারদিকে। একটা কিছু পড়ছে অমনি আরেকটা কিছু নড়ছে। শিশির পড়ছে, অমনি চোখ মেলছে ফুল। চারদিকে শুধু ছোঁয়া আর ফোটার স্পন্দন। ধ্বনি আর প্রতিধ্বনির ঢেউ। ঝরছে আনন্দ, জাগছে ভালোবাসা।

প্রত্যেকটি দিন যেন একখানি সোনালী-পাড়-দেওয়া নতুন চিঠির মতো রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে পড়ছে। কী যে তার ভাষা বালক তা স্পষ্ট বুঝতে পারে না, কিন্তু প্রাণে চাঞ্চল্য জাগে। দূরের বাণীর পরশ-মানিকের ছোঁয়া লেগে একটি দীপ জ্বলে ওঠে মনের মধ্যে। যে অজানার আহ্বানটি আসে রোজ চিঠিতে ভরে সেই দীপশিখায় তাকে সম্ভাষণ জানায়।

তোমার চিঠির সমুচিত উত্তর দেব। এত চিঠি লিখছ তুমি চারদিকে, আমি চুপ করে বসে থাকব না। তোমার সৌন্দর্য আমার আনন্দ। তোমার আনন্দ আমার সৌন্দর্য।

কলির মধ্যে ফুল যেমন ফুটি-ফুটি করে, তেমনি সমস্ত কথার মধ্যে কবিতা যেন বলি-বলি করে উঠেছে।

পাকা আমটির মতো দেখতে, বুড়ো শ্রীকণ্ঠবাবুর সঙ্গে সকলের ভাব। শুধু দেবেন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে ছোট্ট রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। বাঁ পাশে একটি গুড়গুড়ি কোলের উপর একটি সেতার আর কণ্ঠে বিরামহারা গীতস্রোত। বয়স মিলিয়ে চলতে পারেন সকলের সঙ্গে। প্রত্যেকে তাঁকে পেয়ে খুশী। তিনি তো আপন খুশীতেই ভরপুর

কি কবিতা লিখেছ আজ? দেখি দেখি। উৎসাহে উছলে উঠলেন শ্রীকণ্ঠবাবু।

কবিতা শোনাবার এমন শ্রোতা আর নেই। বুড়োকে রবীন্দ্রনাথের তাই দারুণ পছন্দ। স্থির মনোযোগে শুনবেন তো

[illegible] "ভাগবতী তনু" প্র[illegible] দুটি অধ্যায় [illegible]ক রবীন্দ্রনাথ" [illegible] "কিশো[illegible]রবীন্দ্রনাথ"-ও [illegible] যথাক্রমে "[illegible]ন্দ" [illegible] "ইন্দ্রধনু"তে ম[illegible] হয়েছিল। [illegible]রচনা[illegible]রা অব্যাহত [illegible]নোই [illegible] অধ্যা[illegible] প[illegible]দ্রিত [illegible] করা [illegible]

এই নতুন পোশাক তৈ হলো রবীন্দ্রনাথের জন্যে। শুধু পরা পোশাক নয়, মাথার জন্যে জরির কাজ গোল একটি মখমলের টুপি।

নেড়া মাথায় টুপি পরা করে। মনে মনে প্রবল মাথা নেড়ে আপত্তি জানাতে চাইল রবীন্দ্রনাথ। মুখ ফুটে কিছু বলবার আগেই দেবেন্দ্রনাথ শান্ত স্বরে বললেন, 'মাথায় দাও।'

আর কথা নেই। বলেছেন। তৎক্ষণাৎ নেড়া মাথায় মখমলের টুপি পরল রবীন্দ্রনাথ।

হিমালয়ে বেরুবার আগে দিন বোলপুরে থাকবার কথা। ঘুম আর বুনো জাম খেজুর গাছের বেড়। আর চারদিকে উধাওপাওয়া মাঠ।

ব্রাহ্মধর্ম প্রচার করে বেড়ান দেবেন্দ্রনাথ। বাংলার নানা জায়গায় ঘুরেন। একবার এমনি বোলপুরে থেকে যাচ্ছেন রায়পুর, সুরুলের পথ দিয়ে। পালকি চড়ে। চারদিকে শুধু—সীমাহীন প্রান্তর, মাঝে মাঝে ছত্রাকৃতি সপ্তপর্ণ ছাতিম গাছ, আর, আহা, কি সুন্দরই শ্যামল জলের দীঘিটি কি নাম এদিককার? ভুবনসাগর, চলতি কথায় ভুবনডাঙার বাঁধ। যেখানে ভুবনকে এনে যায় একত্র করে। দেবেন্দ্রনাথ উদ্ভাসিত হলেন, অনবরুদ্ধ মাঠের সে উল্লাস। গোটা রায়পুরের জমিদারদের—এক শত কুড়ি বিঘে জমি কিনে ফেললেন দেবেন্দ্রনাথ। তৈরি করলেন ছোট একটি একতলা গৃহ। নির্জনের কাছে নিঃশব্দ উপাসনার জন্যে।

কাছে নিয়ে বসাই উপাসনা। হে নিঃশব্দ, তোমার কাছে এলাম এসে বিরলে। হে গভীর গম্ভীর তুমি শোন আমার অন্তরের মৌন।

সমুদ্রের পারে যেমন আলোকস্তম্ভ, তেমনি সংসারের পারে প্রার্থনার দীপজ্যোতি।

রবীন্দ্রনাথ তখন দু বছরের শিশু যখন প্রথম এই জমি নিয়ে বাড়ি বানান দেবেন্দ্রনাথ। আরো ন বছর পরে এই তার প্রথম আসা। প্রথম ট্রেনে চড়ে তরুশ্রেণীর ও মেঘশ্রেণীর সবুজ-নীল পাড় দেওয়া মাঠের মধ্য দিয়ে ছুটে চলা।

কিন্তু মাথার গোল টুপিটাই বড় গোল বাধিয়েছে। বাবার দিকে কি চোখে চেয়ে মাঝে মাঝে সেটা নামিয়ে রাখতে চায় রবীন্দ্রনাথ, তক্ষুনি বাবার চোখের সঙ্গে ঠোকাঠুকি হয়ে যায়। নিরস্ত হতে হয় তক্ষুনি। নেড়া মাথাটাকে আর হাওয়া খাওয়ানো যায় না।

তার শ্যামাঞ্চল ছড়িয়ে মুক্ত প্রকৃতি কুড়িয়ে নিল রবীন্দ্রনাথকে। অবাধ একটা ছুটির ঘণ্টা বাজিয়ে দিলে মনের মধ্যে। আকাশ অফুরন্ত আলো আর হাওয়ার সঙ্গে অপরিমাণ প্রাণ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল।

অগাধ শান্তির মত সন্ধ্যা নামে। বাগানের সামনে বারান্দায় এসে বসেন দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথকে ডাকেন গান গাইতে। বালক গান ধরে বেহাগেঃ

"তুমি বিনা কে প্রভু
সংকট নিবারে,
কে সহায় ভব অন্ধকারে।
রয়েছি বন্দীসম মোহের আগারে।"

বড়দাদা দ্বিজেন ঠাকুরের লেখা। জ্যোতিদাদার লেখা আরো একটা গান বড় ভালো লাগে বাবার। 'শঙ্করশিব সংকটহারী, নিস্তারো প্রভো, জয় দেবদেব।' এইটে পৈতের সময় সুধাকণ্ঠ ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গেয়েছিল রবীন্দ্রনাথ। সেই সঙ্গে বিষ্ণুরাম চাটুজ্জের সেই গান। 'জয় জগজীবন জগত-পাতা হে, জয় দীনশরণ শুভদাতা হে।'

নতশিরে তন্ময় হয়ে গান শোনেন দেবেন্দ্রনাথ। দুটি হাত কোলের উপর জোড় করা। নিজের সমস্ত শক্তিকে সংহৃত করে এনে নিঃশব্দ আনন্দে নিঃশেষে সমর্পণ করে দিয়েছেন—ভঙ্গিটির তাই যেন অর্থ। একটি নীরব নমস্কারে সমস্ত জীবন যেন পর্যাপ্ত হয়ে নিবেদনের সুগন্ধে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

এ কার কাছে নিবেদন? এ নমস্কার কাকে?

যিনি ব্রহ্মাণ্ডকে অখণ্ড করে রয়েছেন তাঁকে। অন্তরে বাহিরে যিনি নিরন্তর, তাঁকে।

যিনি পিতা, ত্রাতা, নিয়ন্তা, তাঁকে।

পিতার সেই মহৎ রূপটি নিজে নত হয়ে যেন রবীন্দ্রনাথের কাছে উদ্ঘাটিত করেন দেবেন্দ্রনাথ। কিছু পাব বলে প্রণাম নয়, নয় কিছু দেব বলে। ভয়ে নয়, নয় বা পীড়নে। এ প্রণাম আনন্দে, গরিমায়, উপলব্ধিতে। তুমি আমার পিতা, আমার আপন, এ আনন্দ। আমি তোমার সন্তান, তোমার আপন, এ গৌরব।

তোমার শাসনের মধ্যে কল্যাণ, বিধানের মধ্যে ক্ষমা, বঞ্চনার মধ্যে নিষ্কৃতি।

সকালবেলা ছেলেকে নিয়ে বেড়াতে বেরোন দেবেন্দ্রনাথ। ভিক্ষুক দেখলে বলেন, ভিক্ষে দাও। দীনদরিদ্রের দিকে দেখ। এ সত্যিকার কে তার খোঁজ নাও। তার হাত ধরো।

অনেক জায়গা ঘুরে এসেছেন অমৃতসরে। সরোবরের মাঝখানে শিখদের গুরুদ্বার। সেখানে পিতাপুত্রে যান প্রায়ই সকালবেলা। চলছে অখণ্ড পাঠ আর নামকীর্তন। সেই শব্দসুধাস্রোতে স্নান করেন দুজনে।

একদিন তো ওদের ভজনে কণ্ঠ

মেলালেন দেবেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তো অবাক, তার চেয়ে বেশি অবাক, শিখেরা। বিদেশীর গলায় এ কি সুর, এ কি ভাষা!

ব্যাকুলতাই সুর, ভাষাই ভক্তি।

চোখ-কান খোলা রেখে সব দেখে আর শোনে রবীন্দ্রনাথ। সমস্ত ইন্দ্রিয়ের উপরেও যে ইন্দ্রজাল তাকে দেখে। তাকে শোনে।

এবার চলো হিমালয়ের দিকে।

গায়ত্রী থেকে হিমালয়। হিমালয়ই তো ভারতবর্ষের গায়ত্রী।

প্রভাতের মন্ত্র নিয়ে দাঁড়াও এবার উদয়শিখরে। ঘোষণা করো। তাকে আমি দেখেছি, তাকে আমি জেনেছি। সমস্ত অন্ধকারের পরপারে জাগ্রত সে শাশ্বত সূর্য।

দিকে দিকে রাষ্ট্র করে দাও এই নব-প্রভাতের জয়ধ্বনি।

বন্ধনের মুক্তি, বিরোধের মুক্তি, অন্ধকারপীড়িত অগণন মানবাত্মার উন্মোচন।

(২)

হিমালয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথ।

আকাশের দিকে তাকাও। পর্বত-শিখরের স্বচ্ছ আকাশ। অম্লান অক্ষরে জ্বলছে কেমন তারাগুলো!

গ্রহ-তারার পরিচয় নাও। চলে এস জ্যোতিষ্কমণ্ডলে।

ছোট ছেলেকে নিজের হাতে শেখান দেবেন্দ্রনাথ। যে আকাশে রাজত্ব করছে রবি হয়ে তার খোঁজ নাও। সূর্যই তো গ্রহরাজ। আর 'গগন নহিলে তোমারে ধরিবে কেবা!'

আকাশের খোঁজ নেওয়া মানে বিকাশের খোঁজ নেওয়া। আকাশ দেখলেই মনে মনে সংকল্প করবে আমিও প্রকাশিত হব। আলোকিত হব। অন্ধকারে আচ্ছন্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে থাকব না।

একেবারে একটা পাশের ঘরে শোয় রবীন্দ্রনাথ। প্রায় পাহাড়ের কাছাকাছি। কাচের জানলা দিয়ে শেষ রাত্রের পাহাড় দেখে। ভোর হয়নি, তারাগুলোও যাই যাই করছে, সেই ধূসর আবছায়ার মধ্যে। পাহাড়ের চূড়ায় স্বপ্নপুরীর ঐশ্বর্যের মত বরফ জমে। অন্ধকারেই ঝলমল করে, ঝলমল করে।

সেই দুঃসহ শীতে উঠেছেন দেবেন্দ্রনাথ। গায়ে একখানি লাল রঙের শাল। হাতে মোমবাতি নিয়ে চলেছেন বারান্দায়। বাইরের বারান্দায়, কাচের দেয়াল দিয়ে ঘেরা। চলেছেন নিঃশব্দে, কারু যেন না ঘুম ভাঙে। কোথায় চলেছেন উনি? বাতি দিয়ে কি করবেন?

বাতিটি নিবিয়ে দেবেন। বারান্দায় পৌঁছে বসবেন তিনি তাঁর নির্দিষ্ট আসনে। বসবেন উপাসনায়। ঈশ্বরের কাছে এসে বসবার নামই উপাসনা।

চোখ চেয়ে চেয়ে সব দেখছে রবীন্দ্রনাথ। একদিকে উন্নতগম্ভীর হিমালয় আরেকদিকে প্রশান্তগম্ভীর পিতৃদেব। ধীরে ধীরে সূর্যোদয় হবে শুধু আকাশে নয়, জীবনের উদার ও অগাধ অনুভবে। সূর্যোদয়ের জন্যে এই প্রতীক্ষা এই প্রস্তুতির নামই উপাসনা।

সমস্ত ছবিটি রবীন্দ্রনাথের মনের মধ্যে গাঁথা হয়ে যায়। অমনি একটি নিঃশব্দ ও নিগূঢ় নিবেদনের জন্যে মন উৎসুক হয়ে ওঠে।

ভোর হলে ছেলেকে পাশে ডেকে নেন দেবেন্দ্রনাথ। ছেলের সঙ্গে আরেকবার উপাসনা করেন। উপনিষদের মন্ত্র পড়িয়ে শোনান।

যা কিছু দেখছ চোখের সামনে, যা কিছু বা দেখছনা, যা নড়ছে চলছে হচ্ছে সরে যাচ্ছে সবই ঈশ্বর দিয়ে আবৃত, ঈশ্বর দিয়ে আচ্ছন্ন। তিনি অণুর অণু, মহানের মহান। তাঁর দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তিমান, তাঁর প্রভাবেই সকলে প্রভান্বিত। তাঁর ক্ষয়-বৃদ্ধি নেই, উৎপত্তি-বিনাশ নেই, অপচয়-উপচয় নেই।

মুগ্ধের মত শোনে রবীন্দ্রনাথ। অর্থ সব বোঝেনা কিন্তু ধ্বনিটি আনন্দময় লাগে। আনন্দময় লাগে সেই মন্ত্রমুখর নিস্তব্ধতা।

চারদিকে এত যে সব ধ্বনি, পাতার মর্মর, নদীর কলস্বন, ভ্রমরের গুঞ্জন, বিহঙ্গের কাকলী—কি এদের অর্থ? শুধু একটি আনন্দের বিজ্ঞাপন। জলে স্থলে আকাশে একজন আনন্দময় বিরাজ করছেন তারই স্বীকৃতি।

তাঁকে দেখ। তাঁকে অনুভব করো। কই বা কিছুমাত্র শরীরচেষ্টা প্রাণচেষ্টা করত যদি আকাশে বাতাসে তিনি আ[illegible]ন্দ-ময় হয়ে না থাকতেন!

হিমালয় থেকে ফিরে এসে সেণ্ট-জেবিয়ার্সে ভর্তি হল রবীন্দ্রনাথ। যদি এবার খোদ সাহেবি ইস্কুলে কিছু ফল হয়। মন যায় পড়াশোনায়।

সবাই প্রায় হাল ছেড়ে দিয়েছে। আক্ষেপ করছেন বড়দিদি, বড় হলে রবি একটা মানুষের মতো হবে এই সবাই আশা করেছিলাম। কিন্তু কি দুর্দৈব, সেই আশাই কিনা নষ্ট হল সমূলে।

তবু ইট-কাঠ-দেয়ালের ইস্কুল আকর্ষণ করতে পারল না। তার চেয়ে দেখ এই আরেক বিদ্যালয়। অমিত জীবন আর সৌন্দর্যের বিদ্যালয়। সেই ইস্কুলে গিয়ে ভর্তি হই। সেখানে শুধু একজন শিক্ষক। শুধু শিক্ষক নন, সখা। সমবয়সী। সব সময়ে সহবাসী।

সেণ্টজেবিয়ার্সে একটি মহৎ হৃদয়ের স্পর্শ পেল রবীন্দ্রনাথ। সাময়িকভাবে বদলি খাটতে এসেছেন এক অধ্যাপক, নাম ডি পেনেরাণ্ডা, স্পেন দেশে বাড়ি। স্পেন দেশে বাড়ি বলে ইংরিজি উচ্চারণে একটু বাধো-বাধো। সেই কারণে ছেলেরা বিশেষ শান্ত থাকে না ক্লাশে। যেটুকু সম্ভ্রম তাঁর শিক্ষক হিসাবে প্রাপ্য তার চেয়ে যেন কম পান। মুখখানি বিমর্ষ হয়ে থাকে। তার জন্যে শাস্তি দেওয়ার কথা ভাবা দূরের কথা, কারু কাছে নালিশ পর্যন্ত করেন না। নম্র হয়ে সহ্য করেন প্রতিদিনের অপ্রসাদ। যেন আশা করেন কেউ একদিন বুঝবে তাঁর গ্লানিহীন ম্লানিমাকে।

মুখশ্রী সুন্দর নয় কিন্তু বেদনার নির্মলতা কেমন একটি লাবণ্য ঢেলে দিয়েছে। সেইটিই কিশোর রবীন্দ্রনাথকে আকর্ষণ করে। মনে হয় বাবাকে যেমন উপাসনা করতে দেখেছে হিমালয়ে, সেই ভাবটিই যেন নিবিড় করে আঁকা তার চোখ দুটিতে। অন্তরে যেন সেই বিশ্বাস আর সমর্পণের স্তব্ধতা। অন্তরের চিন্তাটি যদি মহৎ হয় আননের শ্রীটিও পবিত্র হয়ে উঠবে।

কি একটা লিখতে দিয়েছেন ছেলেদের। নিজে ঘুরে ঘুরে দেখছেন কে কি রকম লিখছে। একদম কলম চলছে না রবীন্দ্রনাথের। মাথা উঁচু করে কলম হাতে কি সব ভাবছে সে এলোমেলো। কখ-

তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছেন পেনেরান্ডা। লিখছে না বলে কোথায় ধমক দেবেন, তা নয়, পিঠের উপর হাত রেখেছেন সস্নেহে। নুয়ে পড়ে জিগগেস করছেন মধুরস্বরে, তোমার কি শরীর ভালো নেই?

ছোট্ট একটি কথা, কিন্তু যেন সুধা-সমুদ্রের ঢেউ। মন বড় হলেই যেন হাত ও হাতের সঙ্গে হাতের স্পর্শ অত বড় হয়। নতভক্তির প্রীতিস্পর্শটিই ঈশ্বর-স্পর্শ।

তেরো-চৌদ্দ বছর বয়স, প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে সাক্ষাৎকার হল রবীন্দ্রনাথের। হঠাৎ শেষ রাত্রে বাড়ির পুরোনো দাসী আর্তনাদ করে উঠল। ঘুম ছেড়ে উঠে বসল রবীন্দ্রনাথ, তবে কি মা আর নেই? অনেকদিন ধরে ভুগছেন, আছেন অন্তঃপুরের তেতলায়। বোটে করে গঙ্গায় ছিলেন কিছুকাল, বিশেষ উপকার হয়নি। তবে আজ কি সব শেষ হয়ে গেল? তবে আর কান্নাকাটি নেই কেন? দাসীর মুখ কে চাপা দিলে?

মিট্‌মিটে বাতির আলোয় স্পষ্ট কিছু বুঝতে পারছে না রবীন্দ্রনাথ।

সকাল হতে বুঝল। শুনল মা মারা গেছেন।

কাকে বলে মৃত্যু, সে যেন কী ঘোর-দন্ত মহাকায়, কী অসহদর্শন ভয়ংকর। বিষন্ন হল রবীন্দ্রনাথ। কি করে তাকাবে তার মার দিকে?

দাঁড়াতে পারবে তো কাছে গিয়ে?

আহা, ঐ দেখ, বাইরে উঠোনে মাকে আনা হয়েছে, শুয়ে আছেন খাটের উপর। ভোরের আলোটি ঈশ্বরের ভালোবাসার মত গায়ে এসে পড়েছে। এই মৃত্যু? এ তো শান্তি, এ তো সুখসুপ্তি। এ তো ক্ষমার মত স্নিগ্ধ, মার্জনার মত মনোহর।

কোনো কিছু একটা নিশ্চিহ্ন হয়ে উচ্ছিন্ন হয়ে গেল এ তার ছবি নয়। একটা কক্ষ ছেড়ে চলেছে আরেক কক্ষে, এক অধ্যায় থেকে আরেক অধ্যায়ে সেই চির-যাত্রার ছবি।

এই সেদিনও মাকে বাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়ে শুনিয়েছে। কৃত্তিবাসের চলতি বাংলা রামায়ণ নয়, অনুষ্টুভ ছন্দের সংস্কৃত রামায়ণ। হিমালয়ের আশ্রয়ে এনে দেবেন্দ্রনাথ ছেলেকে দিয়েছেন সেই মহা-কবির উদার স্পর্শ। গায়ত্রী-গীতা-উপনিষদের পর এই বাল্মীকির রামায়ণ। মা কত খুশী হয়েছেন। সন্তানগর্বে সুখ এক বক্ষাঞ্চলে ধরেনি। লোক ডেকে এনে বিতরণ করেছেন অকাতরে। দেখ, দেখ, কোথা থেকে আমার রবি তার দীক্ষা নিয়ে এসেছে, কোন্ উদয়তীর্থের উত্তুঙ্গ গিরিচূড়া থেকে।

সেই মা কি আর কথা কইবেন না? এই যে চুপ করে আছেন এ কি আরেক-রকম কথা কওয়া নয়? এই যাকে শেষ বলছি এই কি অশেষ নয়? অন্তই কি নয় অনন্তের দুয়ার?

অশ্রুধৌত মুখে রবীন্দ্রনাথ ফিরল শ্মশান থেকে। গলির মোড়ে এসে তেতলায় বাবার ঘরের দিকে দৃষ্টি পড়ল। বেলা অনেক হয়েছে তবু বাবা ওঠেননি আসন থেকে। উপাসনায় নিনিশ্চল হয়ে আছেন।

শোকের সরোবরে ফুটে উঠেছে একটি সান্ত্বনার শতদল। বেদনা বিশ্রাম পেয়েছে নিবেদনে। সমস্ত আক্ষেপ-বিক্ষেপ নিবৃত্তি পেয়েছে স্বীকৃতিতে, শরণাগতিতে।

মা আগে সীমাবদ্ধ ছিলেন এখন পরিব্যাপ্ত হয়েছেন। তাঁর আঙুলের আগায় যে সুন্দর স্পর্শটি ছিল তাই এখন চলে এসেছে ফুলের পাপড়িতে, তাঁর চোখে ছিল যে কোমল আশীর্বাদ তাই এখন ফুটে রয়েছে তারার বিন্দুতে, শিশিরবিন্দুতে, তাঁর অঙ্গভরা যে ভাল-বাসা তাই এখন ছড়িয়ে রয়েছে দিনের আলোয় রাতের অন্ধকারে।

কবিতা লিখে ফেলল রবীন্দ্রনাথ। সেই যে হিমালয় দেখে এসেছিল তার কবিতাঃ

হিমাদ্রিশিখরে শিলাসনপরি
গান ব্যাস ঋষি বীণা হাতে করি—
কাঁপায়ে পর্বত শিখর কানন
কাঁপায়ে নীহার শীতল বায়!

খুব একটা উঁচু সুরে তার বেঁধে নিল। কবিনেত্র উন্মোচন করেই দেখল প্রথম হিমাদ্রিশিখরকে আর মহাকবি ব্যাসকে। যেন প্রথম দৃষ্টিপাতেই সমীচীন দিগদর্শন হল। ভারতবর্ষের শৃঙ্খলমুক্ত জাগরণের জন্যেই সেই কবিতা—প্রথম কবিতা। ঠিক-ঠিক দেখলে সেই ভারত-বর্ষের চেহারা। তার পরিবেশ, তার পটভূমি। ব্যাস আর হিমালয়।

প্রথম কবিতার বই 'বনফুল'। যে বনের ছবি আঁকল রবীন্দ্রনাথ সেটিও হিমালয়ের পদমূলে।

প্রদীপ্ত তুষারচয়
হিমাদ্রি-শিখর-দেশে পাইছে প্রকাশ।
অসংখ্য শিখরমালা বিশাল মহান।
ঝর্ঝরে নির্ঝর ছুটে শৃঙ্গ হতে শৃঙ্গ উঠে
দিগন্ত সীমায় গিয়া যেন অবসান॥

তেরো-চৌদ্দ বছরের ছেলে। একবার তাকালো অনেক উঁচুতে, অভ্রস্পর্শী চূড়ার দিকে, আরেকবার তাকালো অনেক দূরে, অভ্রস্পর্শী দিগন্তরেখায়। উঁচু আর দূর, দূর আর উঁচু, বৃহৎ আর মহৎ, মহৎ আর বৃহৎ—তুমি ভারতবর্ষের কবি, তুমি অমিতবর্ষ বসুন্ধরার কবি।

উচ্চ হতে উচ্চ গিরি
জলদে মস্তক ঘিরি'
দেবতার সিংহাসন করিছে লোকন।

দেবতার সিংহাসনটি দেখ। কোথায় সেই সিংহাসন? আর কোথায়! তোমারই মনের মধ্যে। সেখানে সোনা কোথায়? কোথায় মণিমাণিক্য? ভালোবাসাই সোনা, অশ্রুকণাই মণিমাণিক্য।

সেদিন একলা বসে আপনমনে গান গাইছিলাম। জলে-স্থলে শুনছিল কে কান পেতে বুঝিনি। হঠাৎ চেয়ে দেখি, হে মহারাজ, তুমি তোমার সিংহাসন থেকে নেমে এসেছ। নেমে এসেছ আমারই দীনহীন ঘরের দুয়ারে। নির্জন দেখেই আসতে সাহস পেলে। আর কোনো সুর তোমার কানে যায় না, শুধু কান্নার সুর-টুকুই তোমার কানে যায়। কী বিরাট তোমার সভা, কত তাতে জ্ঞানী-গুণী, তবু এই গুণহীনের গান তোমার কানে গেল। তুমি তোমার দুটি বাহুর ব[illegible]মালা নিয়ে কাছে এসে দাঁড়ালে। কত গান তুমি শুনছ দিন-রাত, কিন্তু তোমাকে ভালো-বেসে তোমার জন্যে কেউ কাঁদছে এমন গান তুমি আর কোথাও শোনোনি। শুনলে, আর অমনি ফেলে এলে সিংহাসন। মহা-রাজ ছিলে, ভিখিরি হয়ে গেলে।

ষোলবছর বয়স, 'কবিকাহিনী' লিখল রবীন্দ্রনাথ। লিখতে-লিখতে বিশাল এক রাজত্বের মধ্যে চলে এল। অন্তহীন দিগন্তহীন মহাদেশ। তার নাম কি? তার নাম মানব-হৃদয়।

মানুষের মন চায় মানুষেরি মন
গম্ভীর সে নিশীথিনী সুন্দর সে ঊষাকাল
বিষণ্ণ সে সায়াহ্নের ম্লান মুখচ্ছবি,
বিস্তৃত সে অম্বুনিধি সমুচ্চ সে গিরিবর
আঁধার সে পর্ব্বতের গহ্বর বিশাল
পারেনা পূরিতে তারা বিশাল মানুষ-হৃদি,
মানুষের মন চায় মানুষেরি মন॥

মানুষের মনের মতন বড় আর কি আছে? কত বড় পৃথিবী, তার চেয়ে কত বড় সমুদ্র, তার চেয়ে আরো কত বড় আকাশ। ঈশ্বর সকলের চেয়ে বড়। সেই ঈশ্বর মানুষের মনের মধ্যে।

কিন্তু মৃত্যুর পরে আর কি কিছুই নেই? কিছুই থাকবে না?

কালের সমুদ্রে এক বিম্বের মতন
উঠিল আবার গেল মিশায়ে তাহাতে?
একটি পার্থিব ক্ষুদ্র নিশ্বাসের সাথে
মুহূর্তে হবে কি তাহা অনন্তে বিলীন?

বড়ো হয়ে মাকে একদিন স্বপ্ন দেখলেন রবীন্দ্রনাথ। দেখলেন তিনি যেন সেই ছোট বালক আর মা যেমন থাকেন বাড়িতে তেমনি আছেন। আছেন তো আছেন, সব সময়েই তো তা নিয়ে সচেতন থাকা চলেনা বাস্তবতার সংসারে। তাই যেমন আগে মায়ের ঘরের পাশ দিয়ে চলে যেত, তেমনি উদাসীন ভাবে চলে গেল রবীন্দ্রনাথ। বারান্দায় গিয়ে হঠাৎ মনে হল, ও কি, ঘরের মধ্যে ঐ মা বসে আছেন না? তাড়াতাড়ি তাঁর ঘরে গিয়ে প্রণাম করল পা ছুঁয়ে। মা রবীন্দ্রনাথের হাত ধরলেন, কাছে টেনে এনে বললেন, তুমি এসেছ?•

যদি মায়ের ঐ স্পর্শটি পেতে চাও

ঐ স্ফুটি শুনতে চাও, ছুটে যাও মায়ের কাছে। তাঁর পায়ের ধুলো মেখে তোমার ললাট নির্মল করো।

সংসারে মা বিরাজ করছেন সর্বময়ী কর্ত্রীর মত। যদি তাঁর কাছে তুমি না-ও যাও তোমার অন্নবস্ত্রের অভাব হবে না, তাঁর সেবাস্নেহ অকৃপণই থাকবে। তুমি অবাধ্য হও অযোগ্য হও, কিছু এসে যাবে না—তাঁর ভাণ্ডার অখণ্ড। তেমনি ঐ মায়ের মতই ঈশ্বর। তাঁকে না মানো না জানো, ভুলেও একবার তাঁর দিকে না তাকাও, তোমাকে তিনি তাই বলে ঠকাবেন না, ফেলে দেবেন না। অন্নজল তোমাকে ঠিকই পরিবেশন করবেন, প্রয়োজনে ঠিকই পরিপূর্ণ রাখবেন তোমাকে। কিন্তু তা দিয়েই কি তোমার মন ভরবে? তোমার মন কেঁদে-কেঁদে উঠবে, সেই স্বরটি কোথায়, সেই স্পর্শটি কোথায়? মা রয়েছেন বসে, তুমি তাঁর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছ, পেলেনা তাঁর হাতের ছোঁয়া, শুনলেনা তাঁর গলার স্বর, তোমার মত অসম্পূর্ণ আর কে আছে?

তাই বলি ও ভোলোনা নিজেকে। মায়ের ঘরের পাশ কাটিয়ে চলে যেওনা। ছুটে এসে মায়ের পায়ের কাছটিতে এসে পৌঁছও। মাকে ধরো। নাও তাঁর স্পর্শের অমিয়। শোনো তাঁর কণ্ঠের মাধুরী।

মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমেদাবাদের জজ। থাকেন শাহীবাগে, বাদশাহি আমলের প্রাসাদে। নিচে দিয়ে ক্ষীণকায়া সাবরমতী নদী বালির বিছানায় শুয়ে আছে। প্রকাণ্ড অদ্ভুত বাড়ি, দুপুরের নির্জনে একা-একা ঘুরে বেড়ায় রবীন্দ্রনাথ আর ভরা গলার কপোতকূজন শোনে। কত বই কত ছবি, কত সব রহস্যপুরীর ছোট-ছোট বাতায়ন। সব ফেলে সংস্কৃত বইগুলি নিয়ে বসে। সাধ্য নেই মানে বোঝে। কিন্তু সবই তো বোঝবার জন্যে নয়, কিছু-কিছু আবার বাজবার জন্যে। সংস্কৃত কথার ধ্বনি আর ছন্দ তন্ময় করে রাখে। যেন মৃদঙ্গে গম্ভীর ঘা পড়ছে আর তালে-তালে মনেও উঠছে সেই বাজনার ঢেউ। যার ধ্বনি এত সুন্দর তার অর্থ যেন কত গভীর!

তেতলার ছোট ঘরে রাত্রে শোয় রবীন্দ্রনাথ। শোয় আর কখন, ঘরের সামনেকার প্রকাণ্ড ছাদে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুরে বেড়ায়। উপরে জ্যোৎস্না-ঢালা পারহারা আকাশ আর সামনে বালির প্রান্তর, তার গা ঘেঁষে সুদূরের সংকেত-ময়ী সাবরমতী—হঠাৎ একরাত্রে রবীন্দ্র-নাথের কাছে গান চলে এল ভাসতে-ভাসতে।

যেন এক মুক্ত গগনের পাখি! মুক্ত পবনের সুগন্ধ!

ছুটি, ছুটি, গৃহাগৃহ থেকে নির্ঝরিণী ছুটি পেয়েছে। মৃত্তিকার গৃহ থেকে মুক্তি পেয়েছে সহজ তৃণাঙ্কুর।

কথা এল। নিজেই সুর দিল গুন গুন করে। গেয়ে উঠল তারপর।

> নীরব রজনী দেখ মগ্ন জোছনায়
> ধীরে ধীরে অতি ধীরে গাও গো!
> ঘুমঘোরভরা গান বিভাবরী গায়,
> রজনীর কণ্ঠসাথে সুকণ্ঠ মিলাও গো।

রহস্যময়ী রাত্রি কথা কইছে তার আকাশ-মৃত্তিকাব্যাপী অব্যাহত স্তব্ধতায়। সে কথাটি শোনো কান পেতে। তারপর নিজের স্তব্ধতার সুরটি সেই কথার সঙ্গে মিলিয়ে দাও। যখন রাত্রির অন্তরের কথাটির সঙ্গে তোমার অন্তরের কথাটি যুক্ত হবে—একটি সম্মিলিত স্তব্ধতা—তখন, তখনই তার নাম হবে উপাসনা।

তুমিই আমার গভীর-গোপন, তুমিই আমার পরম আপন! তুমি এই নিশীথ-রাত্রে যে শান্তির বাণীটি মেলে দিয়েছ তাই আমি আমার জীবনে গেঁথে নেব। যে দীপ জ্বেলেছ এই নক্ষত্রদ্যুতিতে তাই আমারও অন্তরের অন্ধকার আকাশে জ্বলবে অনির্বাণ। সহস্র-চক্ষু তুমি, ঐ নক্ষত্রদ্যুতি তোমারই নয়নদ্যুতি। অম্বরেও যেমন অন্তরেও তেমনি।

৩

সহসা হৃদয় নতুন সুরে কেঁদে উঠল। কে যেন বসন্তের বাতাসটুকুর মত চলে গেল প্রাণের প্রান্ত ছুঁয়ে। ষোলো বছরে পা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ। ব্যাকুলতার একটি অস্ফুট বংশীধ্বনি যেন ধূসর রেখায় আঁকা হল দিগন্তে।

ওগো বন্ধু, আমার হৃদয়ে এস। মিঠি-মিঠি হাসো, মৃদু-মৃদু কথা কও, আমার মুখের উপর রাখো তোমার চোখ-দুটি। বন্ধু, তুমি কে?

কো তুঁহু বোলবি মোয়! ভানু-সিংহের পদাবলীতে জাগল প্রথম জিজ্ঞাসা, নতুন জিজ্ঞাসা।

তোমার বংশীরবের অমিয় বিষ মনে হচ্ছে। হৃদয় দীর্ণ হচ্ছে অথচ দীর্ণতাই মধুস্বাদু। আকুল কাকলীতে ভুবন ভরে গেল কিন্তু এ আমার আর্তনাদ ছাড়া আর কি। কাঁদাও অথচ মাতাও, তুমি কে।

অশ্রুভরা চোখ মুছছে সকলে অথচ ক্ষণে-ক্ষণে জিগগেস করছে, হে সুন্দর, তুমি কে! কোথায়!

গোপবধূজনের যৌবন বিকশিত হল—উপবন মুকুলিত, যমুনা পুলকিত, নীল নীরে খেলা করছে ধীর সমীর—বন্ধু, তুমি কে? আমার চোখের সামনে রয়েছ স্থির হয়ে, চোখ বুজলে জাগছ আবার হৃদয়ের অন্ধকারে, তবু, হে অশেষ

হে অনিমেষ, তোমাকে জানি না, চিনি না, বলে দাও তুমি কে।

এই প্রথম জিজ্ঞাসায় রবীন্দ্রনাথের যাত্রারম্ভ।

কে গো অন্তরতর সে!

"কে সে। জানিনা কে।
চিনি নাই তারে।
শুধু এইটুকু জানি,
তারি লাগি রাত্রি-অন্ধকারে
চলেছে মানবযাত্রী যুগ হতে
যুগান্তর-পানে
ঝড়ঝঞ্ঝা বজ্রপাতে,
জ্বালায়ে ধরিয়া সাবধানে
অন্তর-প্রদীপখানি।"

প্রথম বয়সের অস্ফুট চেতনার মধ্যেই আভাসে যেন একটা উত্তর এল। তুমি আমার শ্যাম, তুমি আমার মৃত্যু, তুমি আমার শেষ পরিপূর্ণতা।

মরণ রে, তুঁহু মম শ্যাম সমান।

হে অবধারিত হে অনিবার্য, তুমি এসো। আমাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করো। তোমার প্রগাঢ় স্পর্শের সৌরভে আমার দুচোখ আচ্ছন্ন হয়ে আসবে, কাঁদতে কাঁদতে তোমার কোলের উপর ঘুমিয়ে পড়ব। কি আশ্চর্য, তুমি আমাকে ভোলো না, তুমি আমাকে ছাড়ো না, অনুক্ষণ তুমি আমাকে বসে আছ বুকে করে। বুকের মধ্যে বাসা বেঁধেও তুমি কত দূরে। দূরে থেকে তুমি বাঁশি বাজিয়ে আমাকে ডাকছ, রাধা, রাধা, রাধা। আর আমি দেয়ালে মাথা ঠুকে প্রতিধ্বনি করছি, বাধা, বাধা, বাধা।

এবার সকল বাধা আমি দূর করব উল্লঙ্ঘন করে। হোক আকাশ ঘনঘটায় ঘোরতর, দিশদিগন্ত তিমিরময়, পড়ুক বাজ, ঝলুক বিদ্যুৎ, তবু বিজন পথ ধরে যাব আমি একাকিনী। যাব তোমার অভিসারে। তুমি যার প্রিয় তার আবার ভয় কি। ভয়ই তোমার অভয়মূর্তি। বাধাই তোমার বাহুবন্ধন।

আমি না গেলেও তুমি আমাকে ছাড়বে কেন? সব কেড়ে নিয়েও যে ছাড়বে না। তোমার যে আঘাত সেই তো তোমার ভালোবাসা। তাই তো নিবিড় বেদনাতেও ধারে আনন্দের ঢেউ। পথে-পথে পায়ে-পায়ে ব্যথা, তবু তোমার অভিসারে যাব সেই দুর্গমের দুর্গচূড়ে।

"তোমার অভিসারে
যাব অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক
ব্যথা পায়ে—"

বুকের মধ্যে যার বাসা তারই জন্য এই অভিসার। "যে আছে বুকের কাছে কাছে চলেছি তাহারি অভিসারে।"

শুধু কি আমি চলেছি, তুমি চলো নি? আমি ব্যাকুল হলে তুমি ব্যাকুল না হয়ে পারো? চন্দ্র পরিপূর্ণ না হলে কি সমুদ্র উত্তরঙ্গ হয়? এই ঝড়ের রাতে কি তোমারও অভিসার নয়? গহন কোন বনের ধারে সুদূর কোন নদী তুমিও পার হচ্ছ অন্ধকারে। তাই তো নিদ্রাহারা চোখে বসে আছি দুয়ার খুলে। বাতায়নে বসিনি, বসেছি মুক্ত দুয়ারের শূন্যতায়।

রবীন্দ্রনাথের এই প্রথম শ্যামদর্শন। ব্যথা আর শান্তি, প্রেম আর বিলুপ্তি —তারই পরিপূর্ণতার স্বপ্ন।

"ওগো আমার এই জীবনের
শেষ পরিপূর্ণতা
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা।"

সেখানেও মৃত্যু বররূপে বরণীয়। তোমার জন্যে দিনরাত্রি জেগে আছি, তোমার জন্যে বয়ে বেড়াচ্ছি দুঃখসুখের মঞ্জুষা। তুমি এস, কথা কও। আমার যা কিছু পাওয়া আর হওয়া, যা কিছু আশা আর ভালোবাসা, সব তোমার দিকে প্রধাবিত। একটি নিবিড় দৃষ্টিপাতে তোমার সঙ্গে আমার মিলন হবে সে মুখ-চন্দ্রিকার জন্যে বসে আছি। তুমি এস, কথা কও।

"বরণমালা গাঁথা আছে
আমার চিত্তমাঝে
কবে নীরব হাস্যমুখে
আসবে বরের সাজে।
সেদিন আমার রবেনা ঘর
কেই বা আপন কেই বা অপর
বিজন রাতে পতির সাথে
মিলবে পতিব্রতা।
মরণ, আমার মরণ, তুমি
কও আমারে কথা॥"

আমাকে বাহুপাশে আবদ্ধ করো মরণের কাছে, শ্যামসুন্দরের কাছে, এই যে পিপাসিনী বিরহিনী রাধার আকূতি এ আবার ভাষা পেয়েছেঃ

"ওগো মৃত্যু, সেই লগ্নে নির্জন শয়ন প্রান্তে
এসো বরবেশে
আমার পরাণ-বধূ ক্লান্ত হস্ত প্রসারিয়া
বহু ভালোবেসে
ধরিবে তোমার বাহু; তখন তাহারে তুমি
মন্ত্র পড়ি' নিয়ো,—
রক্তিম অধর তার নিবিড় চুম্বন দানে
পান্ডু করি দিয়ো।"

শুধু শ্যামশোভন নয় ভয়াল করালকেও রবীন্দ্রনাথ দেখেছে সেই সূচনাতেই। শুধু শ্যাম নয়, শিব। শুধু মধুর নয়, রুদ্র। মঙ্গল করেন বলে শিব। আর রোদন করান বলে রুদ্র।

"প্রলয় পিনাক তুলি
করে ধরিলেন শূলী
পদতলে জগৎ চাপিয়া
জগতের আদি অন্ত
থরথর থরথর
একবার উঠিল কাঁপিয়া।...
অনন্ত আকাশগ্রাসী
অনল সমুদ্র মাঝে
মহাদেব মুদি ত্রিনয়ান
করিতে লাগিল মহাধ্যান।"

ভীষণসুন্দর, সেই রুদ্ররুচিরের সঙ্গে করে সেই প্রথম বয়সেই সাক্ষাৎ রবীন্দ্রনাথের। একদিকে সেই উদ্যতবজ্র মহদ্ভয়, আবার অন্যদিকে নয়নানন্দী রসপূর্ণিমা। কোথায় পাহাড় বিদীর্ণ করে গলিত আগুন বেরুচ্ছে, উড়ে-পুড়ে যাচ্ছে জনপদ, তুষারের ঝড় উঠেছে কোথাও, জল আর হাওয়ার মিলিত উৎসাহে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে মৃত্তিকা, কত সে প্রলয়ংকর নৃত্য— আবার চেয়ে দেখ, ধানের শিষের উপর শিশিরবিন্দুটি ঝলমল করছে, শরতের সকালে একটি পাখি গান করছে গাছে বসে, শ্লেটে প্রথম খড়ির বিন্দুটির মত সন্ধ্যার অফুটন্ত তারা। যে নির্দয় সেই আবার হৃদ্য। যে শক্ত সেই আবার সুকোভ-পেলব। যা নিয়ম তাই ছন্দ। যা শাসন তাই শৃঙ্খলা।

কালাভ্র শ্যামলাঙ্গী কালীমূর্তিও

[illegible]ছে রবীন্দ্রনাথ। সেই উগ্রপ্রভা আদ্যাশক্তিকে। বাল্মীকি-প্রতিভায় স্তব করছে বাল্মীকিঃ

"রাঙা-পদ-পদ্মযুগে প্রণমি গো ভবদারা।
আজি এ ঘোর নিশীথে পূজিব
তোমারে তারা।
সুরনর থরহর—ব্রহ্মাণ্ড বিপ্লব করো,
রণরঙ্গে মাতো মা গো, ঘোর
উন্মাদিনী পারা।
ঝলসিয়ে দিশি দিশি, ঘুরাও তড়িৎ অসি,
ছুটাও শোণিতস্রোত ভাসাও বিপুলধরা।
উরো কালী কপালিনী, মহাকাল-
সীমন্তিনী,
লহো জবাপুষ্পাঞ্জলি মহাদেবী
পরাৎপরা।"

যিনি করালী কালী তিনিই আবার কোমলা মা। কারুণ্যাপাঙ্গেক্ষণা। দংষ্ট্রা-করালবদনা হয়ে তন্মুহূর্তেই আবার লক্ষ্মী লজ্জা বিদ্যা শ্রদ্ধা তুষ্টি পুষ্টি। নয়নে স্নেহের হাসি কিন্তু ললাটনেত্র অগ্নিবর্ণ। মুক্ত কেশের পুঞ্জমেঘের মধ্যে অশনি মুখ লুকিয়ে আছে। রৌদ্রবসনের অঞ্চলখানি রিক্ত প্রান্তরে বিসর্পিত। মা গো, সোনার মন্দিরের খুলে গেছে দরজা। তোমাকে কী মূর্তিতেই আজ দেখছি। তোমার এক হাতে খড়্গ, আরেক হাতে অভয়। তোমাকে দেখে চক্ষু আর ফেরে না।

৪

"জীবনযাত্রার মাঝে-মাঝে জগতের অচেনা মহল থেকে আসে আপন-মানুষের দূতী, হৃদয়ের দখলের সীমানা বড়ো করে দিয়ে যায়। না ডাকতেই আসে, শেষকালে একদিন ডেকে আর পাওয়া যায় না।"

সেই আপন-মানুষের দূতীটির নাম আন্না তরখড়। ডাক-নাম নলিনী।

আমেদাবাদ থেকে বোম্বাইয়ে এসেছে রবীন্দ্রনাথ। মেজদাদা সত্যেন্দ্রনাথই পাঠিয়ে দিয়েছেন। পাঠিয়ে দিয়েছেন দাদোবা পাণ্ডুরঙ্গের বাড়ি। পাণ্ডুরঙ্গ সত্যেন্দ্রনাথের বন্ধু। ইংরেজিয়ানায় ঝিলিক-মারা। তারই মেয়ে আন্না, বিলেত-ফেরতা, বিদেশী পালিশে ঝকঝকে করে মাজা। রবীন্দ্রনাথকে সেখানে পাঠানো দরকার যদি ওদের সংস্পর্শে এসে কিছুটা তার চেকনাই ফোটে। বিলেত যাবার কথা হচ্ছে তার।

মেয়েটিকে গান গেয়ে শোনায় রবীন্দ্রনাথ।

'আহা, কি গান! তোমার গান শুনলে আমি বোধ হয় আমার মৃত্যুর দিনেও প্রাণ পেয়ে জেগে উঠি।' আন্না বললে আনন্দিত মুখেঃ 'আমার তুমি একটা ডাক-নাম রাখো না, আর সেটাকে গেঁথে দাও না তোমার কবিতায়।'

রবীন্দ্রনাথ নাম রাখল, নলিনী। কাব্যের গাঁথুনিতে বেঁধে দিল নামটা। ভোরবেলাকার ভৈরবীর সুরে শুনিয়ে দিল গান গেয়ে। 'শুন নলিনী, খোলো গো আঁখি, এখনো ঘুম ভাঙিল নাকি।'

নলিনী, নলিনী। একটি অনুরাগের মন্ত্র জাগল অনুভবের মন্দিরে। লাজমাখা নলিনী, সুকোমলা নলিনী, নলিনী লো নলিনী! সেই ধ্বনি নতুন দিগন্ত রচনা করল, বড় করে দিল হৃদয়বোধের বেষ্টনী একটি প্রিয় নামের মধ্যে কাঁপতে লাগল নতুন চোখ-মেলা আকাশের নীল।

সতেরো বছরে পা দিয়েছে রবীন্দ্রনাথ, চলল ইউরোপ। মেজদাদার সঙ্গে। সেই প্রথম নিবিড়-সমুদ্র-সঙ্গ। তার বারো বছর পর আরো একবার। তীরে বসে সমুদ্রকে দেখা এক, আর সমুদ্রের পরিবৃতির মধ্যে এসে সমুদ্রকে দেখা আরেক। কল্পনার সমুদ্র যেন বেশি বড়ো, দুষ্পারতরো। যদি এই দিগন্তের যবনিকা ওঠাতে পারি, পারে বসে আগে-আগে রবীন্দ্রনাথের মনে হত, যেন আরেক অকূল সমুদ্র উন্মোচিত হবে। দিগন্তের পরেও যে আরেক দিগন্ত আছে একথা কে বলবে। এখন জাহাজে চড়ে সমুদ্রের মাঝখানে এসে মনে হল সমুদ্র নিতান্ত মুষ্টিমেয়, একটিমাত্র দিগন্ত দিয়ে ধরা। এক আঁচড়ে টেনে দেওয়া একটুখানি একটা ছবি।

যে সমুদ্র সেদিন হাতছানি দিয়ে ডাকল প্রথম রবীন্দ্রনাথকে সে সমুদ্রের বাসা মনশ্চিত্রে, মানচিত্রে নয়।

সমুদ্রের সমস্ত উত্তালতার অন্তরালে যে একটি অতলস্পর্শ সুগম্ভীর মৌন আছে সেটি সেদিন নাড়া দিল রবীন্দ্রনাথকে। অনন্তকাল অবিশ্রাম যে চাঞ্চল্য চলেছে, যে তরঙ্গ-উদ্বেলতা, সমুদ্র যেন তারই প্রশান্ত পরিণাম, প্রগাঢ় বিরতি। নির্বাণই যে পরম সুখ সমুদ্র যেন তারই উচ্চারণ। উপরে আকাশের নীল নীরব নির্নিমেষ নেত্রপাত আর নীচে সমুদ্রের অতলস্পর্শ স্নেহদৃষ্টি। ব্যাপ্তির সঙ্গে গভীরতর রাখীবন্ধন।

তারপর সন্ধ্যা এল জ্যোৎস্নাময়ী। মনে হল রাত্রি যেন রাত্রি নয়, অলৌকিক বৃন্তে একটি রজনীগন্ধা ফুটে উঠেছে। শান্ত, শুভ্র, সুহাসিত। এসব কার রচনা! এত শোভা এত সুখ—হৃদয়ে এত মহত্ত্বের অনুভব—এত অকথিত ব্যথা! কোথায় এর আরম্ভ কোথায় বা সমাপ্তি! একটি অব্যক্ত জিজ্ঞাসা যেন জেগে আছে দূরে থেকে সুদূরে।

আরোহী খৃষ্টানরা উপাসনা করছে নিচের ডেকে। মামুলি রোববারের সকাল। মুখস্তকরা মন্ত্র পড়ে যাচ্ছে সকলে, সন্দেহ নেই, কল-টেপা অভ্যেস, কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে স্পর্শ করল অগোচরে অকূল-অপার সমুদ্রের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কতগুলো মানুষ কোন একটা মহা-অজানার অভিমুখে তাদের প্রণতি পাঠাচ্ছে, তাদের প্রতীতি, তাদের শরণাগতি স্থির নম্র সর্বস্বীকার

সর্বসমর্পণের ভঙ্গি। তুমি কত বড় আর আমরা কত অকিঞ্চিৎ। তবু শোনো এই হৃদয়সমুদ্রের শঙ্খনাদ। তুমি অজানা এ কে না জানে তবু এইটুকু জানি, তুমিই আমার আপনজন।

"তুমি আমার আপন, তুমি আছ
আমার কাছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।
তোমার মাঝে মোর জীবনের সব
আনন্দ আছে,
এই কথাটি বলতে দাও হে বলতে দাও।"

মাটির প্রতি মানুষের মমতার বিস্তার দেখছে চারদিকে। পর্বতের কোলে, নদীর ধারে, হ্রদের তীর ঘেঁষে-ঘেঁষে। আর সেই মমতার বিনিময়ে প্রকৃতি মানুষকে দিচ্ছে তার অন্তরের মাধুরী, ফলশস্যশ্যামলতা। ভালোবাসার উত্তরে দ্বিগুণতরো ভালোবাসা। কি ফল ফলাতে পারে মানুষের প্রেম, মানুষের ক্ষমতা তারই জয়ধ্বনি শস্পেপুষ্পে লেখা হয়ে আছে। কে সে অদৃশ্য শক্তি যে অল্পের বিনিময়ে দিতে পারে অপরিমেয়, তুচ্ছের প্রতিদানে আনতে পারে অনুপমকে, অসামান্যকে।

যদি মাটি খুঁড়ে এত পাওয়া যায় দেখা যায় না এই মানব জমিন আবাদ করে। যদি [illegible] আগাছা উপড়ে ফেলে মিলতে পারে এত প্রাচুর্য, একবার এই অন্তরগহনকে নিষ্কণ্টক করি, নির্ভয় করি, নিরাপদ করি।

প্যারিসে একটা ছোটখাটো এক্‌জিবিসন দেখতে গিয়েছে রবীন্দ্রনাথ। বিখ্যাত চিত্রকরের আঁকা একটি বসনহীনা মানবীর ছবি তার চোখে পড়ল। বিকার-লেশশূন্য স্নিগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল তার দিকে।

অমরসুন্দর মানবাত্মার মন্দিরই তো শরীর, ঈশ্বরের অসীমসুন্দর সৃষ্টি—সেইক্ষণে স্পষ্ট অনুভব করল রবীন্দ্রনাথ। মর্ত্যের চরম সৌন্দর্যের পবিত্রতম পুষ্পোচ্ছ্বাস। এ কি শুধু দেহ, এ আত্মার দীপাধার। আত্মা যদি সুর হয় দেহ হচ্ছে বাঁশরী। যিনি কাননকান্তার শৈলস্রষ্টা সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন সূর্যচন্দ্র, লক্ষলহর নক্ষত্রের রত্নহার, ফুল পাখি লতাপাতা এ তো তাঁরই রচনা। সুন্দর শরীরের চেয়ে বড় সৌন্দর্য আর কী আছে! দেহের এই যে লাবণ্য আর কোমলতা, এই যে নির্মাণনৈপুণ্য—এ যেন সেই বিশ্বকর্মার সযত্ন আঙুলের সদ্য-স্পর্শ। যেন এ দেহ ছুঁলেই, এ দেহ যাঁর জীবন্ত প্রতীক, সেই ঈশ্বরকেই ছোঁয়া হবে। ঈশ্বরেরই ভালোবাসা যদি কোথাও উদ্ভাসিত হয় তবে এই দেহে। আদ্য-অন্ত এই শরীরে, বাইরে কোথাও নাই।

কি আশ্চর্য, উলঙ্গ নারীচিত্র দেখে ঈশ্বরকে স্মরণ করল! শুধু স্মরণ নয়, যেন সাক্ষাৎকার হল ঈশ্বরের সঙ্গে। দেহের স্ফটিক-বাতায়ন থেকে সেই সাক্ষাৎকার।

এই যে আমার দেহ এই তো সেই মহাস্রষ্টার উদ্দেশে সমুচ্ছ্বসিত স্তব। এই সোনার ঘটেই তো তার অভিষেক। এই দেহের বৃন্তেই তো পূজার পুষ্প-বিকাশ সানন্দ সূর্যোদয়।

"আমার এই দেহখানি
তুলে ধরো,
তোমার ঐ দেবালয়ের
প্রদীপ করো।"

"সন্ধ্যাসংগীতের" উৎসর্গপত্রে একটি গান গেঁথে দিল রবীন্দ্রনাথ। "ও মুখখানি সদা মনে জাগিতেছে সংগোপনে, আঁধার হৃদয়মাঝে দেবীর প্রতিমাপারা।" উৎসর্গ একটি অনামধেয়া শ্রীমতীকে। তোমাকেই আমি আমার জীবনের ধ্রুবতারা করেছি, আর আমি সংসারসমুদ্রে পথহারা হব না। সে গানটিই রূপান্তরিত হল ব্রহ্ম-সঙ্গীতে। এই দুটি ছত্রের সামান্য রকমফেরে। যা ছিল ভালোবাসা তাই হয়ে উঠল ভগবান। যে মুখে ভালো-বাসার আলো সেই মুখেই অমিতসুন্দর ঈশ্বরের আভা।

বদলে লাইন দুটি দাঁড়াল:

"তব মুখ সদা মনে জাগিতেছে
সংগোপনে
তিলেক অন্তর হলে না হেরি
কূলকিনারা॥"

হে সুন্দরী, অবাধপ্রসারিণী, তুমিই অনন্তের বাণী, তুমিই মৃত্যুহীন আনন্দের লিপিকা।

"অথবা শিথিল কলেবরে
এস তুমি, বসো মোর পাশে,
মরণ যেমন করে আসে
শিশির যেমন করে ঝরে;
পশ্চিমের আঁধার সাগরে
তারাটি যেমন করে যায়।"

যদি সত্যি তুমি তেমনি করে আস, বসো আমার পাশটিতে, তখন তোমাকে কি আর তোমার মধ্যে খুঁজে পাব? তোমার কথা-হারা চকিত চোখের আকাশে তখন পাবো না কি আরেক কথাভরা নতুন আকাশের ঠিকানা?

এল অসহ্য ভালোবাসার দুর্দান্ত আনন্দ। শিরার শৃঙ্খল-ছেঁড়া ক্রন্দন-ঝঙ্কার। "ভালোবাসা স্বাধীন মহান, ভালোবাসা পর্বত-সমান।" সূর্য যেমন পৃথিবীকে ভালোবাসে। উজ্জ্বল করবার জন্যে ভালোবাসে, উর্বর করবার জন্যে ভালোবাসে। আমিও তেমনি ভালোবাসি। "গান আসে বলে গান গাই, ভালোবাসি বলে ভালোবাসি।"

প্রবৃত্তিই গতি। এই প্রবৃত্তিই নদীকে টেনে নিয়ে চলেছে দীর্ঘ মরুপথ দিয়ে। টেনে নিয়ে চলেছে পরমনির্বৃতি সমুদ্রের দিকে। সসীম প্রেম তাই নিয়ে চলেছে পরমপ্রেমের সান্নিধানে।

রমেশ দত্তের মেয়ের বিয়েতে এসেছেন বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁর গলায় মালা পরাতে যাচ্ছেন রমেশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ এসে উপস্থিত। একুশ বছরের যুবক। মালা আর গলায় নিলেন না বঙ্কিম, হাতে নিয়ে পরিয়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথের গলায়। রমেশচন্দ্রকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এ মালা এ'র প্রাপ্য। তুমি পড়েছ এ'র সন্ধ্যা-সঙ্গীত?'

এর বছর ছয়েক আগে, রবীন্দ্রনাথের বয়েস যখন পনেরো, তখন তাঁকে 'ন্যাশনাল মেলা'র মাঠে দেখেছিলেন নবীন সেন। দেখেছিলেন যেন বৃক্ষতলে স্বর্ণমূর্তি।

(ক্রমশ)

* এই প্রবন্ধের শিরোনামায় ব্যবহৃত রবীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিটি শিল্পী শ্রীঅতুল বসু কর্তৃক অঙ্কিত।

এক রাজার ছয় রাণী
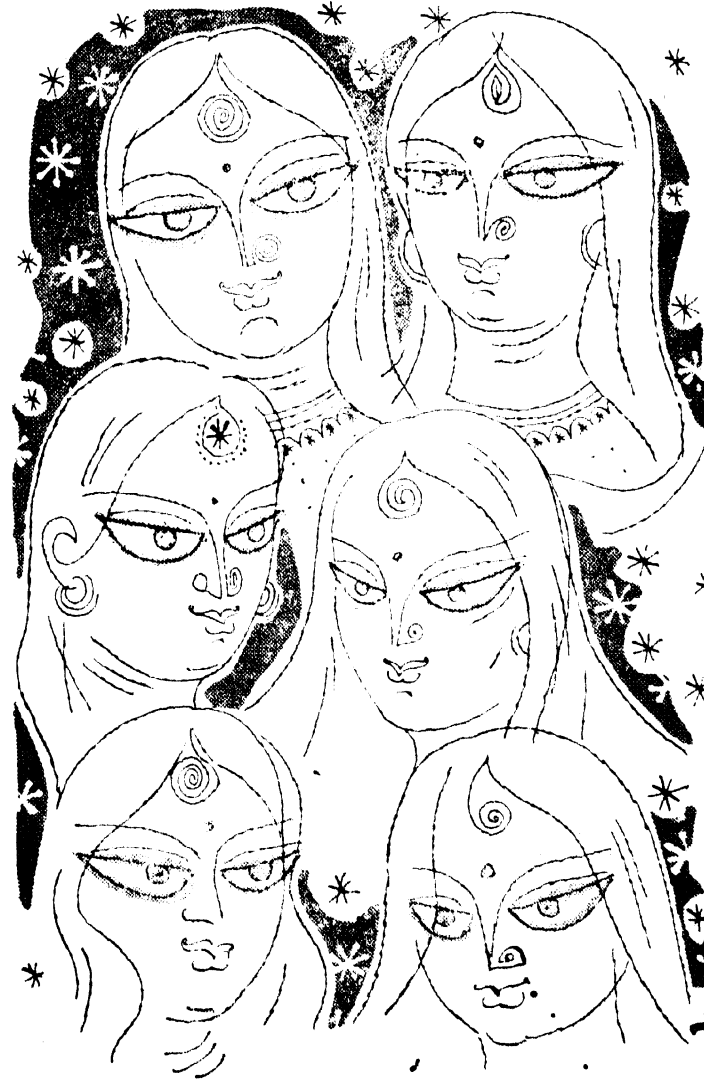
ভেবেছিলাম গল্পের নাম দেব 'এক দেহের ছয় রিপু', কিন্তু ভেবে দেখলাম রিপু আর রাণী, ও একই জিনিস, একই তাদের আকর্ষণ। বিশেষ করে রায়গড়ের ঠাকুর সাহেবের ছোট-রাণীর আকর্ষণ! ছোটরাণীর চিঠি কি কম আকর্ষণ করেছিল দামোদর পাঁড়েকে? নইলে ছোটরাণীর আকর্ষণে......

কিন্তু গল্পটা আগে থেকেই বা বলি কেন?

আনন্দী বাঈ-এর গল্পটা তো আগেই বলেছি। সেট আমেদাবাদের পথে মিস্টার রামানুজম্-এর কাছে শুনেছিলাম। এটা শুনলাম, আজমীরের বাঙালী ধর্ম-শালার ম্যানেজার অনন্তরাম উপাধ্যায়ের কাছে। আজমীর থেকে আর দু'দিন আগে ফিরলেই দামোদর পাঁড়েকে দেখা বাদ পড়ে যেত আমার।

যাত্রার আগে আমার এক জ্যোতিষী বন্ধু বলেছিল 'মংগল এখন মকরে, আপনার জীবনে সংঘাত আর সম্পদ দুই-ই অনিবার্য, একটু সাবধানে যাবেন।'

সংঘাতের ব্যাপারটা ঠিক জানি না। সংঘাত এড়াতে পারবো, এমন দুরাশাও আমার নেই। কতবার সংঘাতের পর সংঘাত এসেছে জীবনে। সে-সংঘাত কখনও কখনও ভূমিসাৎও করে দিয়েছে আমাকে। তারপর আবার উঠেও দাঁড়িয়েছি এক সময়ে। আর সম্পদ! সম্পদ আমি

বিমল মিত্র

সহজেই পাই। সহজে আনন্দ পেতে জানি বলেই তো প্রতি মুহূর্তে আমি বিত্তবান। অতি দুঃখের মধ্যেও আমি যে সম্পদের স্পর্শ পেয়েছি। ক্ষতির ক্ষয়ের মধ্যেও আমি যে আশ্বাসের শক্তি আহরণ করি, সেই-ই তো আমার পরম সম্পদ! জীবনে তার বেশি আর কী সম্পদ চাই!

পুষ্করের দামোদর পাণ্ডে বলেছিল—ভোজনের মধ্যে দিয়েই আমি পরমেশ্বরকে পূজন করি বাবুসাহেব—আপনারা তীর্থ করেন, কত রুপেয়া খরচ করে দেশভ্রমণ করেন, পুণ্য হয় আপনাদের, আমি ভোজন করেই পুণ্য করি, আমি ভোজন করি সেই পরমেশ্বরেরই নামে,—পরমাত্মা তুষ্ট হলেই যে পরমেশ্বর তুষ্ট হয়—

আজমীর, দ্বারকা, পুষ্কর, প্রয়াগ, মথুরা বৃন্দাবন গিয়ে কী পুণ্য সঞ্চয় করেছি তার হিসেব বোধহয় পরমেশ্বরের জাব্দা-খাতায় আছে। সে-আমার আখেরের হিসেব। পেলেও পাবো, না-পেলেও অভিযোগ নেই। কিন্তু তীর্থ-যাত্রার পথে, ঘাটে, ট্রেনে, টাঙগায় ওয়েটিং-রুমের কথা অখ্যাত, অবজ্ঞাত, অনাদৃত সেই মানুষগুলো! তাদের দর্শনে যে পুণ্য আছে তা আমি নিঃসংকোচে বলতে পারি আজ। তাদের নিয়েই আমার শিল্পকর্ম, আমার সৃষ্টির পুঁজি যে তারাই।

তখন দরগাহ্ শরীফ দেখেছি, পৃথিরাজের আড়াই দিনের ঝোপড়া দেখেছি, তারাগড় দেখেছি, মিউজিয়ম দৌলতবাগ, আন্নাসাগর কিছু দেখার আর তখন বাকি নেই। ভেবেছি বুঝি সব দেখা হয়ে গেছে। কিন্তু বেরোবার দিনই বাধা পড়লো।

পাণ্ডা মহারাজ ডি এন কালে বললে—তীর্থস্থানে এসে ব্রাহ্মণ-ভোজন করালেন না বাবুজী—

কথাটা ভাববার মত। অনুষ্ঠানের তো কিছুই ত্রুটি রাখিনি। পুষ্করে গিয়ে পুজো দিয়েছি, সাবিত্রী পাহাড়ে উঠে দেবী-দর্শনও করেছি, কচ্ছপকে ছোলাভাজা খাইয়েছি, অনেক বেলা পর্যন্ত উপোস করে দান ধ্যান, পুজো, গো-দান, ভুজ্যি উৎসর্গ যা কিছু ... শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান সবই করেছি। শুধু বেলা হয়ে যাচ্ছিল বলে ব্রাহ্মণ-ভোজনটা আর করানো হয়নি। ভেবে-ছিলাম পরে টাকা ধরে দিলেই চলবে। কিম্বা আজমীরে ফিরে গিয়েই একটা ব্যবস্থা করা যাবে। সেখানেও তো ব্রাহ্মণ আছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত আর হয়ে ওঠেনি সেটা।

পাণ্ডা মহারাজের কথায় চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

জিজ্ঞেস করলাম—কত খরচ পড়বে?

ডি এন কালে বললে—পাঁচটি ব্রাহ্মণ ভোজন করাতে আপনার......

উপাধ্যায় এতক্ষণ শুনছিলেন আমাদের কথাবার্তা। বললেন—পাঁচটা কেন, একজন ব্রাহ্মণ ভোজন করালেই যথেষ্ট—

পাণ্ডা মহারাজ চলে যাবার পর উপাধ্যায় বললেন—ওসব পাণ্ডাদের কথা শুনবেন না আপনি, কোথা থেকে সব বাজে বামুন হাজির করবে আর মাঝখান থেকে শুধু মোটা কমিশন মারবে—মাথা-পিছু যা দক্ষিণে দেবেন তারও অর্ধেক নেবে ও—তার চেয়ে বরং আমি দামোদর পাঁড়েকে ডেকে দেব, খাঁটি ভোজপুরী ব্রাহ্মণ, সৎ লোক, পাঁচজনের খাওয়া একলাই খেতে পারবে সে, একজনকে খাইয়ে পাঁচজন বামুন খাওয়ানোর কাজ বিলকুল হয়ে যাবে আপনার—

বললাম—সেই ব্যবস্থাই করুন তা হলে—

সামান্য একজন ব্রাহ্মণ খাবে। তার জন্যে ভাবনার কিছু নেই। পুরী, অযোধ্যা, বৃন্দাবন, মথুরা, প্রয়াগধাম সব জায়গাতেই সে-ব্যাপার করা গেছে। পাণ্ডারাই সে দায়িত্ব নিয়েছে। আমি শুধু টাকা দিয়েই বরাবর খালাস। কিন্তু আজমীরে এসে এই প্রথম এ-ব্যাপারে গল্প পেয়ে গেলাম। কোনওদিন খাইয়ে বামুনদের জীবন-চরিতের দিকটা ভাবিনি আমি। আজমীরে গিয়েও ভাবতাম না। কারণ উপাধ্যায়ই সমস্ত ভার নেবে সেইরকম ঠিক ছিল।

পরদিন ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠতেই দেখি ফুলহাতা বেনিয়ান পরে সিং-দরজার পাশের বাঁধানো বেঞ্চিতে কে যেন বসে আছে—

আমাকে দেখেই লোকটা উঠে দাঁড়িয়ে বললে—আপনি ভোজন কো লিয়ে ব্রাহ্মণের কথা বলেছিলেন বাবুজী, আমার নাম দামোদর পাণ্ডে—আ[illegible] ভোজন করি—

ঠিক এ-অবস্থার জন্যে প্রস্তুত ছিল না আমি।

কিন্তু পাঁড়েজী নিজেই আর[illegible] করলে—এই পৈতে দেখুন বাবুজী আমা[illegible] আমি কনৌজের ব্রাহ্মণ, এখানক[illegible] পাণ্ডাজীদের কমিশন দিই না ব[illegible] আমাকে ওরা বরবাদ করে দিয়েছে, কি[illegible] বাঙগালী বাবুরা যারা আসেন এখানে, স[illegible] আমাকেই ভোজন করান—উপাধ্যায়জী সব মালুম আছে—

বললাম—আপনি করেন কী এখানে

পাঁড়েজী কথাটা যেন বুঝতে পারে[illegible] না। আমার দিকে বিমূঢ়ের মত ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে রইল।

বুঝিয়ে বললাম—আপনি এখানে চাকরি-বাকরি করেন, না আর কিছু করেন—আপনার পেশা কি!

পাঁড়েজী বললে—না বাবুজী, আমি স্রেফ ভোজন করি—পুষ্করজীর কিরপায় ভোজনই আমার পেশা—

কথাটা বলে পেশা-কৌলীন্যের গর্বে নিজেই যেন গর্বিত হয়ে উঠলো দামোদর পাণ্ডে।

তারপর বললে—নন্দকিশোরবাবুকে চেনেন? কলকাতার নন্দকিশোরবাবু?

চিনতে পারলাম না।

পাঁড়েজী বললে—সেকি বাবুজী, কলকাতার অত বড় শেঠ, চেনেন না? বড়বাজারে গদী আছে,—এখানে এসে ভোজন করিয়ে গেলেন। ব্রাহ্মণের ওপর ভারি ভক্তি ও'র আওরাতের, পাঁচ সের দহি, আধ মণ আটার পুরি, লাড্ডু, দহিবড়া, ভোজন দেখে তারিফ করলেন খুব, শেষে দশ টাকা ভোজন-দক্ষিণা......

লম্বা ফিরিস্তি দিচ্ছিল হয়ত পাঁড়েজী। বাধা দিয়ে বললাম—আচ্ছা উপাধ্যায় মশাই আসুক, তাঁকে সব ব্যবস্থা করতে বলেছি।—

রাত্তির বেলা উপাধ্যায় বললেন—পাঁড়ে এসেছিল নাকি সকালে?

ধর্মশালার ম্যানেজার উপাধ্যায় তখন খাটিয়ায় শোবার উদ্যোগ করছিলেন। বললেন—তাহলে কালই ব্যবস্থা করে দেব সব—কি বলেন?

বললাম—কাল সন্ধ্যেবেলা যে চিতোর যাচ্ছি—

উপাধ্যায় বললেন—গাড়ি তো রাত্তিরে, সকালেই ভোজন হয়ে যাবে। বেলা বারোটার সময় যদি করেন তো আড়াইটার মধ্যে পাতা চেটে পুটে সাফ করে দেবে দেখবেন—আজ বলে রেখেছি যেন সমস্ত দিনটা উপোস দেয়—

অবাক হয়ে গেলাম। উপোস? কাল খাবে, তার জন্যে আজ থেকে উপোস?

—আজ্ঞে উপোস না দিলে কাল পাঁচ জনের খাওয়া খাবে কি করে। মানুষের পেট তো বটে, সব দিন কি সমান ক্ষিদে থাকে? আর আজকাল তো সব ভেজালের খাবার, এই আজমীরেই আমরা সেকালে চার আনা সের খাঁটি ভয়সা ঘি কিনেছি। বড় বড় বোম্বাই আঁবের মত লাড্ডু এক পয়সায় এক গণ্ডা, কত খাবেন খান, এখন দাহিবড়াতে পর্যন্ত ভেজাল শুরু হয়েছে। অসুবিধে হয়েছে পাঁড়ের মত লোক-দেরই, তেমন ভোজনের ভেল্কিবাজী দেখাতে পারে না, খেয়ে উঠে এখন ছোট্টু-লালের হজমী বড়ি খেতে হয়। বড় বিপদে পড়েছে হুজুর ওরা।

বললাম—তা এত পেশা থাকতে খাওয়ার পেশাই বা ধরলে কেন পাঁড়েজী?

বাঙালী ধর্মশালার অন্য সব ঘর খালি পড়েই ছিল। অল্পস্বল্প শীত পড়েছে। সন্ধ্যে থেকেই চারদিক নিস্তব্ধ নিঝুম হয়ে যায়। উপাধ্যায়েরও বিশেষ কোনও কাজ থাকে না। ক'দিন ধরে অনেক গল্প হয়েছে উপাধ্যায়ের সঙ্গে। উপাধ্যায় বললেন—আপনি খাটিয়াটায় বসুন বাবুসাহেব, আপনাকে বলি—

আজো মনে আছে সেই সুদূরে রাজপুতানার একটি ধর্মশালার সেই রাতটার কথা। গল্প শুনতে শুনতে অনেক রাত হয়ে গিয়েছিল সেদিন। দূরে যোধপুরের পাহাড়ের সীমারেখাটা পশ্চিম দিকের আকাশটা আড়াল করে আছে। আর দক্ষিণ দিকের তারাগড়ের উঁচু বসতির মাথায় একটা একটা করে সব আলো নিভে গিয়েছে। আজমীর জংশনে শেষ রাত্রের কয়েকটা ট্রেন রাত্রির স্তব্ধতা চিরে খান খান করে দেয়। কিন্তু আমি তখন সেখান থেকে অনেক দূরে চলে গেছি। ভোজপুরে, কোথায়, কোথায় কনৌজ কিছুই আমার ঠিক নেই। পশ্চিম জনপদের কোন্ গ্রামে বুঝি রায়গড়ের রাজা ঠাকুর সাহেব এসেছে। শিকারে ঠাকুর সাহেবের ভারি শখ। ছাউনি পড়েছে নর্মদা নদীর তীরে। সেই ছাউনি থেকে বন্ধু-বান্ধব ইয়ারবক্সী নিয়ে দুটো বাঘ মেরে নিয়ে এসেছেন কাছারি বাড়িতে। উৎসব চলছে তারই। যারা ঢাক-ঢোল ক্যানেস্তারা পিটিয়ে বাঘকে ঘিরে বন্দুকের নাগালের মধ্যে এনে দিয়েছিল তাদেরই খাওয়ানো হচ্ছিল। তা প্রায় শ' দুই তিন লোক হবে। পোলাও, লাড্ডু, ভাজি, দহি, গুলজামুন কিছু আর বাকি নেই। সব লোক উপোসী ছারপোকার মত চেটে-পুটে খাচ্ছে। নর্মদাপ্রসাদ হুকুম দিয়েছেন —যার যত খুশী পেট ভরে খাও—যে যত চাইবে তাকে তত দাও—

সবাই খাচ্ছে। কোনও দিকে চেয়ে দেখবার ফুরসৎ নেই কারো। শেষকালে পেট ভরে এল। ভাঁড়ার খালি হয়ে এল। উদ্গার তুলতে তুলতে সবাই সেলাম করে গেল ঠাকুর সাহেবকে।

কিন্তু একজন তখনও ওঠেনি। আরও দাও কিছু। লাড্ডু কি গুলজামুন কি পেড়া কি দহি।

আর তো কিছু নেই। কোথায় পাবো আর। সব তো নিঃশেষ হয়ে গেছে।

খবর গেল ঠাকুর সাহেবের কাছে। একজন এখনও অতৃপ্ত রয়েছে।

—কে সে?

—হুজুর, বিটের লোক, এই মহল্লাতেই বাড়ি, হুজুরের প্রজা!

দেখতে হচ্ছে কেমন প্রজা, কেমন তাজ্জব খাইয়ে। সব খেয়ে উজাড় করে দেয়!

সামনে এসে হান্টার ঘোরাতে ঘোরাতে নর্মদাপ্রসাদ বললেন—কৌন্ হ্যায় তুম? তুমি কে? নাম কি তোমার?

হুজুরের প্রজাটি তখন শূন্য পাতা সামনে রেখে চুপ করে বসেছিল।

বললে—হুজুর, আমি দামোদর পাণ্ডে, ব্রাহ্মণ।

হুঁ। নর্মদাপ্রসাদ ভাবলেন খানিক-ক্ষণ। বললেন—পেট ভরেনি তোমার?

—হুজুর, না।

—আরো খেতে পারো?

—জি, হাঁ।

—আর কত খেতে পারো?

—হুজুর যত দেবেন!

হুজুর আবার ভাবলেন। অজ পল্লীগ্রামের ভেতর কাছারিবাড়ি। হালুয়াই-এর দোকান কাছাকাছি কোথাও নেই। শহর তিরিশ ক্রোশ দূরে। মোসাহেব বন্ধু ইয়ারবক্সী—সবাই পাশেই দাঁড়িয়েছিল। তারাও সব শুনছিল।

হুজুর বললেন—আমার সঙ্গে রাজ-বাড়িতে যাবে? চাকরি করবে?

দামোদর পাণ্ডে তখন পর্যন্ত বেকার। শুধু নিজের পেটের ভাবনাতেই অস্থির। দুবেলা খেতে পায় না। কিন্তু বিশ্বগ্রাসী ক্ষিধে। এমন লোককে চাকরির লোভ দেখানো। এ যেন সেই 'ছুলো খাবি, না আঁচাবো কোথা'—সেই অবস্থা।

একবার শুধু দামোদর বললে—কী কাজ করতে হবে হুজুর? আমি তো লেখা-পড়া জানি না—নাম সই করতেও পারি না—

ঠাকুর সাহেব বললেন,—লেখা-পড়া নয়, শুধু ভোজন করতে হবে—

ভোজন! সেটা আবার একটা কাজ!

দামোদর দল-বলের সঙ্গেই রওনা দিলে। তিরিশ ক্রোশ দূরে রায়গড়ে ঠাকুর সাহেবের রাজবাড়ি। রাজবাড়ি তো রাজবাড়িই। এলাহি কাণ্ড। ঠাকুর সাহেব কাঁচা বয়েসের লোক। দেদার পয়সা, দেদার প্রতিপত্তি। মোসায়েব, ইয়ারবক্সীর দল বসে বসে খায়। আর ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে ইয়ারকি দেয়। তাই-ই তাদের কাজ। গান গাইবার, বাজনা বাজাবার লোক আছে। দরকার হলে মুজরো দিয়ে বাঈজী আনানো হয়। নাচ হয়। গান হয়। আর মাঝে মাঝে শিকার। ঠাকুর সাহেবের হাতি আছে, কুকুরের দল আছে, হরিণ আছে, বাঘ, সিংহ, পাখী আছে। বন্দুক, রাইফেল, মটরগাড়ি, পাল্কী, সাইকেল সব আছে। সবই ছিল, সবই আছে। ছিল না শুধু একটি জিনিস। একটি জিনিসেরই শুধু অভাব ছিল। তা-ও এল। এল দামোদর পাণ্ডে। করে কী? না ভোজন করে।

সকালবেলা ঘুম থেকে [illegible] করে ওঠেন ঠাকুর সাহেব। দেওয়ানজীই সব কাজ করেন। বাকি দু'একটা কাজ-

কারবার যা-কিছু করবার তা ঠিক যোগাড়-যন্ত্র করে দিতে হবে ঠাকুর সাহেবের মুখের কাছে। কোথায় সই করতে হবে তা-ও আঙুল বসিয়ে দেখিয়ে দিতে হবে। কাজে দেরি হলে আড্ডার মেজাজই নষ্ট হয়ে যাবে তাঁর। ফূর্তি আর জমবে না। তারপর এসে বসবেন আড্ডা-ঘরে। এটা রাজবাড়ি থেকে আলাদা। অনেকগুলো ঘর ওপরে-নিচেয়। সাহেব-ঠিকেদার অনেক টাকা নিয়ে বানিয়ে দিয়েছে এ-বাড়ি।

প্রথম দিনই পরখ হয়ে গেল। মনে পড়লো দমোদর পাণ্ডের কথা। ডাক পড়লো তার। আজব লোক এসেছে রাজবাড়িতে। অকর্মা লোকের ভীড়ে ভরে গেল ঘর-বাড়ি। পেকাটি চেহারার মানুষটা এমন কী খেতে পারবে!

ঠাকুর সাহেব নর্মদাপ্রসাদ তাকিয়া হেলান দিয়ে বসেছিলেন। পান-কিমামের হরির লুট চলছে।

দামোদর পাণ্ডে গিয়ে হাজির হলো। যথারীতি সেলাম করে দাঁড়ালো।

নর্মদাপ্রসাদ বললেন—বিশ সের জেলেবী খেতে পারবে পাঁড়ে?

—জী হাঁ—

করজোরে দাঁড়িয়ে ছিল দামোদর। অনেক দিন জিলেবী খাওয়া হয়নি। লোভও হলো।

সবার চোখ কপালে উঠলো। আধ মণ জিলেবি খাবে!

তবে বলে এসো হালুয়াইকে। পাকি বিশ সের জিলেবি। রস বাদ দিয়ে। ঠাকুর সাহেবের লোকের সামনে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে মাপ হবে মশলা। হিসেবে কোথাও গোলমাল না থাকে। বিকেলবেলা আসর বসবে রাজবাড়িতে। সেখানেই দামোদর খেলা দেখাবে!

বিকেলবেলা উঠোনে চাঁদোয়া পড়লো। কৃষাণ, মজুর, চাকর, বাবু, মোসায়েব সকলে এসে ভীড় করেছে। লোকের ভীড়। বাবু নর্মদাপ্রসাদ পায়ের ওপর পা তুলে বসে আছেন। পান-কিমাম চলছে হরদম। দামোদর পাণ্ডে এসে বসলো মধ্যেখানে। তারপর জিলেবির হাঁড়া এসে বসলো। দামোদর সকলের দিকে একবার চেয়ে নিলে। ঠাকুর সাহেবকে সেলাম করলে। অসংখ্য চোখ উদগ্রীব হয়ে আছে। তারপর শুরু হলো খেলা।

এক-একটা জিলেবি মুখে পোরে দামোদর আর মুখের মধ্যে মিলিয়ে যায় নিঃশব্দে। নরম সোনালী রংয়ের জিলেবি। আধ-গরম। চিবোতেও হয় না, কামড়াতেও হয় না। শুধু খেয়ে যাও।

খাওয়া চলতে লাগলো নিঃশব্দে। সবাই উদগ্রীব হয়ে দেখছে। হাতে তুলে জিলেবি মুখে পোরে দামোদর আর সকলের চোখও তালে তালে ওঠে আর নামে। বিশ সের জিলেবি। মোটা
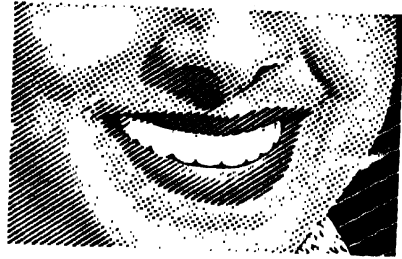
মোটা সাইজ। গড়ে সের-এ তিরিশখানা। সর্বশুদ্ধ ছশো জিলেবি। বিকেল তিনটের সময় শুরু হয়েছে আর শেষ হতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। শেষ জিলেবিটা মুখে পুরতেই ঠাকুর সাহেব বললেন—সাবাস ওস্তাদ সাবাস—জীতা রহো—

মাথা নিচু করে আর একবার সেলাম করলে দামোদর।

ঠাকুর সাহেব হুকুম দিলেন ইনাম পাবে দামোদর। সিল্কের দামী পাগড়ি পরিয়ে দিলেন ঠাকুর সাহেব। আর শহর থেকে আসবে বাদামী রং-এর নাগরা জুতো।

সভার সমস্ত লোক তাজ্জব হয়ে গেল।

রাত্রিবেলা ঠাকুর সাহেব একবার ডেকে পাঠালেন। বললেন—কিছু হজমী গুলীটুলি খাবে নাকি পাঁড়ে—আছে আমার কাছে—

দামোদর বললে—দরকার হবে না হুজুর—

অনেক রাত্রে রসুইখানা থেকে লোক এল। বললে—আজ খানা খাবে নাকি পাঁড়েজী?

দামোদর বললে—খানা খাবো না তো কি উপোস করবো?

এর পর দামোদরের নাম রটে গেল চারদিকে। নর্মদাপ্রসাদেরও নাম হলো। সবাই বলে—বাবু বটে বাবু নর্মদা-প্রসাদ। সবাই দেখতে চায় দামোদরকে। জেলার হাকিম সাহেব মাঝে মাঝে আসতেন এখানে। সরেজমিনে তদন্ত করবার দরকার হয় তাঁর।

শুনে বলেন—ভারি তাজ্জব তো! আধ মণ জিলেপি? দেখাতে পারেন?

বাবু নর্মদাপ্রসাদ বলেন—যে-দিন স্যারের খুশী, দেখাবো—

ডাক পড়লো দামোদরের। বোলাও পাঁড়েজীকে। দামোদর এসে সেলাম করলো দু'জনকেই। পেকাটির মত চেহারা। সাহেব আপাদমস্তক দেখলো। বললে—লুকস্ লাইক্ এ পিগ্‌মি—

ইংরেজি বুঝলো না দামোদর।

বাবু নর্মদাপ্রসাদ বললে—খাবে কিন্তু রাক্ষসের মত স্যার—

রাক্ষস! নর্মদাপ্রসাদ ঐশ্বর্যগর্বে হাসতে লাগলেন।

সাহেব বললে—ভাত-ডাল খায়?

—আজ্ঞে স্যার ভাত-ডালই তো খায়, কিন্তু দরকার হলে পেটটাকে একেবারে জালা বানিয়ে নিতে পারে! কোত্থেকে যে এত খেতে পারে, সব গব্ গব্ করে পেটের মধ্যে সেঁধিয়ে দেয়, আর সঙ্গে সঙ্গে উধাও—

—কোত্থেকে পেলে একে বাবু?

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব দেখতে চাইলেন। এবার জিলেবি নয়। লাড্ডু। লাড্ডু খেতে হবে আধ মণ। খেতে পারলে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব বখ্‌শিস দেবেন পাঁচ টাকা।

তা আয়োজন হলো আবার। হালুয়াই ডেকে ফরমাজ হলো। বিকেল বেলাই বানিয়ে দিতে হবে। সামনে ওজন করে নেওয়া হলো মাল। আবার লোকের ভিড় জমে গেল চারদিকে। মুখে দিয়ে চিবিয়ে খেতে হলো এবার। বেশ শক্ত ব্যাপার। তা দামোদর পাণ্ডে পেছ-পা নয়, পারলে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ইনাম দিলে পাঁচ টাকা। ধন্য ধন্য পড়ে গেল রাজ্যময়।

এমনি কি একবার? আজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব, কাল ঠাকুরসাহেবের ভাতিজা, পরশু পাশের গাঁয়ের জমীদার। যে শোনে সেই একবার দেখতে চায়। তাকেই খেলা দেখাতে হয়। ইনাম আসে। খাতির বাড়ে।

একদিন এ-বাড়িতে যখন প্রথম মটর গাড়ি এসেছিল, সেদিনও এমনি তারিফ হয়েছিল। মটর গাড়ি দেখতে লোকে লোকারণ্য হয়ে গিয়েছিল। ভোঁ শব্দ শুনলেই ছেলে মেয়ে বুড়ো মদ্দ দাঁড়াতো এসে রাস্তায়। বাঘ মেরে আনলেও এমনি ভীড় হয়। এমনি তারিফ হয়। ঠাকুর সাহেবের চিড়িয়াখানায় যখন প্রথম সিংহ এল জুনাগড়ের জঙ্গল থেকে সেদিনও ঠেলে ভীড় রাখতে হয়েছিল। দামোদর পাণ্ডেও তাদের মতন একজন। ঠাকুর সাহেবের দুদিনের খেয়াল, প্রথম প্রথম খুব খাতির খুব তারিফ। দামোদরকে নিয়ে মাথায় তুলে রাখলেন নর্মদাপ্রসাদ। দামোদরের খাওয়া-থাকার যেন ত্রুটি না হয়। তদ্বির-তরিবতের কোনও ফাঁক না থাকে।......

এমনি সময় এক কাণ্ড ঘটলো। লালাবাবুর জীবনে এমনি একটা ঘটনা ঘটেছিল। যারা পরে মহা-পুরুষ হবে বাবুজী, তাদের সকলের জীবনে এমন ঘটনাই ঘটে থাকে। ও তুলসীদাসই বলুন আর সুরদাসই বলুন আর ভক্ত কবীর কি রামদাসই বলুন, ভগবান যে কখন কোন্ ভক্তকে কিরূপ কিরপা করেন কে বলতে পারে। ভগবানেরই আর এক নাম তো জনার্দন! তাই তো শাস্ত্রে লিখেছে—ভোজনে চ জনার্দনঃ—

উপাধ্যায় থামলেন। বললেন—রাত কত হলো?

মনে আছে আজমীর জংশনের শেষ ট্রেনটা তখন হুস্ হুস্ করতে করতে চলে গেল। সদর রাস্তায় সিন্ধিদের পাঁউরুটির দোকানে তখন ঝাঁপ বন্ধ হয়ে গেল শেষবারের মত।

উপাধ্যায় বললেন—আপনি পাঁড়েকে দেখলেন তো আজ সকালে। ওকে দেখলে মনে হবে সাধারণ পেটুক বামুন একটা, খাওয়ার জন্যে খুব নোলা, কিন্তু......

উপাধ্যায় আবার বললেন—পাঁড়ের কাছ থেকেই এ-সব শোনা, তখনো তো ওর সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়নি আমার। যখন আলাপ হলো, তখন দামোদরের বয়েস হয়েছে, চুলে পাক ধরেছে একটু একটু, আবুপাহাড়ে অচলগড়ের ওপর স্বামী তুরীয়ানন্দর আখড়া, দেখি সেই-খানে গাঁজা খাচ্ছে, শংখিয়া খাচ্ছে আর ছাইভস্ম মেখে ধুনির সামনে পড়ে আছে ওই পাঁড়ে—

বললাম—শংখিয়া কী?

উপাধ্যায় বললেন—একরকম শাঁখ আর কি, পুড়িয়ে ছাই করে, সেই ছাই খায় সাধুরা, সে খেলে মাঘ মাসের শীতে পুষ্করতীর্থে স্নান করলেও ঘাম মরবে না গায়ের, এমনি গরম তার—তা ধরুন তখন ক্ষিধে কমাবার তপস্যা করছে দামোদর—

বললাম—কেন?

উপাধ্যায় বললেন—তা হলে আপনাকে গোড়া থেকেই বলি বাবুজি—আমিও তো তাজ্জব হয়ে গিয়েছিলাম কিনা, আখড়ায় যারা আসে তারা ভগবান পেতেই আসে, মুক্তি পেতেই আসে, ভজন পুজন করতে

আসে, ভবসংসারকে ত্যাগ করে বিশ্ব-সংসারকে পেতে চায়, কিন্তু এই প্রথম দেখলাম হুজুর, এ আর কিছু চায় না, শুধু ভুখ্ ভুলতে চায়, আগুনের মত ভুখ্ তার, বিশ্বগ্রাসী ভুখার নেশায় তার অশান্তির যেন একশেষ!

আমিও তো সাধু হবো বলেই আখড়ায় গিয়েছিলাম। গিয়ে পাঁড়েকে দেখে তো অবাক! এমন সমস্যাও আছে দুনিয়ায়! ভাবলাম দিন-দুনিয়ার মালিকের এ কী খেলা! একদিন জিজ্ঞেস করলাম—! পাঁড়েকে তিন ছিলম্ গাঁজা আর শংখিয়া খাইয়ে সেদিন চেপে ধরলাম—ব্যাপারটা বলতেই হবে পাঁড়েজি!

সেইদিনই পাঁড়ের গল্পটা শুনলাম হুজুর।

তাই তো বলছিলাম, পুষ্করজী কোন্ ভক্তকে কী কির্‌পা করেন তার মহিমা কে বুঝতে পারে বাবুজী! সেই সময়ে ঠাকুর সাহেবের বাড়িতে তো আছে পাঁড়ে। খেয়ে খেয়ে মহা ফুর্তিতে আছে তখন। আজ জিলেবী, কাল লাড্ডু, পরশু পেঁড়া, তারপরদিন গুলেজামুন, কালাকান্দ্—এমনি রোজ হরবখ্‌ত্। কেবল খাও। খেয়ে হজম্ করতে পারলেই চাকরি রইল।

গাঁজায় দম্ দিয়ে পাঁড়ে বললে—কিন্তু একদিন এক কাণ্ড বাঁধলো। একেবারে খাস রাণীমহল থেকে ডাক এল। রাণী নিজের মহালে বসে খাওয়াবে। সামনে বসে খেলা দেখাতে হবে। রাণীর শখ!

ঠাকুর সাহেব তো হুকুম দিলেন। কিন্তু বিপদ হলো আমার। বিকেল তখন তিনটে। ঠাকুর সাহেবের লোক এল ডাকতে। এসে পুরু দু'পাট কাপড় দিয়ে চোখ বেঁধে ডেকে নিয়ে গেল ভেতরে। অন্দরমহলের গোড়ায় এসে বারমহলের লোক বাঁদীর হাতে আমাকে জিম্মা করে দিলে। তারপর সেই বাঁদীর হাত ধরে অন্ধকার হাতড়াতে হাতড়াতে যাওয়া কোনও দিকে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। শুধু শব্দ কানে শুনতে পাই। তা-ও আমি কাছে যেতেই সব চুপ। তারপর এক জায়গায় এসে মনে হলো এতক্ষণে যেন রাণীমহলে এসে পড়েছি। কী গলার শব্দ। যেন বাঁশি বাজছে। গলার শব্দ শুনে বয়েস ঠাহর করে নিতে হয়। নর্মদাপ্রসাদ শৌখিন লোক। শখের তাঁর শেষ নেই। হাজারো শখ। বাঘের শখ, সিংহের শখ, শিকারের শখ, টাকা, নওকর, দৌলত শুধু নয়, আওরাতেরও শখ। শখের ঝোঁকে অনেক সাদী করেছেন। সুন্দরী সুন্দরী আওরাত। কেউ তাদের কখনও দেখেনি। দেখা তাদের যায় না। তাদের দেখতে নেই। দেখলে ইজ্জত চলে যায়। চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা কেউ দেখবে না। পুরুষ মানুষের দেখা পাপ! দেখবে শুধু একজন পুরুষ। সে তাদের মালিক। মালিক ঠাকুর সাহেব নর্মদাপ্রসাদ। রাত দশটার পর একমাত্র নর্মদাপ্রসাদই রাণী-মহলে ঢুকবেন। ছয় রাণী নিয়ে তার রাণীমহল।

শুনেছিলাম ছয় রাণীর ছটা মহল নাকি আলাদা আলাদা। এক-এক রাণীর দুটো করে বাঁদী আর একটা করে নোক্‌রাণী।

নর্মদাপ্রসাদের শোবার ঘর ছিল আলাদা মহলে। সেখানে সব ব্যবস্থা আলাদা। এক এক রাণী পালা করে দু' মাস তার সঙ্গে কাটাবে। দু' মাস ফুরিয়ে গেলে আর এক রাণী গিয়ে উঠবে ঠাকুর সাহেবের মহলে। এমনি করে বছর কাটবে। কিন্তু সেই দু' মাস আরামের একেবারে অফুরন্ত বন্দোবস্ত। গোলাপ জলে স্নান করে রাজার সঙ্গে বিহার করবে। পানের সঙ্গে কস্তুরী, রুপোর থালায় ভাত, হাতীর দাঁতের পালঙ্কে শয়ন। ছ'টা বাঁদী, চারটে নোক্‌রানী,—কত আর বলবো, সব কি দেখেছি! শোনা কথা হুজুর—শোনা কথা সব। তারপর দু' মাস এমনি কাটবার পর আবার নামতে হবে নিজের মহলে। তখন অন্য রাণীর পালা। তখন আবার কুয়োর জলে স্নান, কাঁসার থালায় ভাত খাওয়া, পানের সঙ্গে কিমাম্—যে-কে-সেই!

তা আমার ডাক যে কোন্ রাণীর কাছে পড়েছে কে জানে!

যাচ্ছি তো বাঁদীর সঙ্গে। যাচ্ছি তো যাচ্ছিই। কোন্ সিঁড়ি পেরিয়ে কোন্ সিঁড়িতে উঠছি কিছুই টের পাচ্ছি না। চোখ তো আমার দু'পাট কাপড় দিয়ে বাঁধা। শেষে একটা মহলে এসে আমায় থামতে হলো! সেখানে গোলাপের গন্ধ বাতাসে। রেডিও বাজছিল ঘরে। সিল্কের শাড়ির খস্ খস্ শব্দ হলো। চুড়ি, বাজু, তাগার ঝম্ ঝম্ শব্দ। কে যেন নড়ছে। মনে হলো রাণীসাহেব যেন আমার সামনেই দাঁড়িয়ে। রাণীর খাস বাঁদী আমাকে বললে—খা লেও—গুলেজামুন খা লেও—আধা মণ গুলে-জামুনকা খেল্ দেখাও—

আমি সামনে হাতড়ে দেখলাম গামলায় ভর্তি গুলেজামুন। একটা-একটা করে খেতে লাগলুম। খেতে আর কী কষ্ট। আর খাওয়াই তো চাকরি আমার। খেতেই হবে। না খেতে পারলে ঠাকুর সাহেবের অপমান। জান্ দিয়েও খেতে হবে আমাকে। না খেলে ছাড়ছে কে!

তা খেলুম আধ মণ গুলেজামুন।

হাত ধোবার জল এল। তারিফ করবার লোক কেবল একজন। তারপর এক সময়ে আমি খাওয়া শেষ করে আবার ফিরে এলুম। বাঁদী আমার হাত ধরে আবার পৌঁছে দিয়ে গেল বারমহলে। সেখানে বারমহলের চাকর এসে বাইরে এনে চোখের কাপড় খুলে দিলে। কোথা দিয়ে গেলুম, কোথা দিয়ে এলুম, কাকে খেলা দেখালুম, কী রকম দেখতে তাকে, কিছুই মালুম হলো না।

ঠাকুর সাহেব আবার একদিন বললেন—পাঁড়ে, মেজরাণী ধরেছেন, আবার একদিন খাওয়া দেখবে, গুলেজামুন তিনিও খাওয়াবেন তোমাকে, তবে বিশ সের নয়, একুশ সের, এবার এক সের বেশি—পারবে তো পাঁড়ে?

রাজি হতে হলো। রাজি না হলে উপায়ও নেই।

তা সেদিনও তেমনি। তেমনি করে দু'পাট করে কাপড় চোখে বেঁধে গেলুম বাঁদীর হাত ধরে রাণীমহলে। এবার আর ঠাকুর সাহেবের মহল নয়। এবার তেমন সুগন্ধ নেই বাতাসে। তেমন নিঃশব্দ আবহাওয়া নয়। এবারও কোনও কথা নেই, কোনও উচ্চবাচ্য নেই। একুশ সের গুলেজামুন খেয়ে নিঃশব্দে চলে এলুম। চাকরি বজায় রইল।

এমনি করে আবার একবার ডাক পড়লো রাণীমহলে। এবার সেজরাণীর

উড়ে। সেবার বাইশ সের গুলজামুন। আরো এক সের বেশি। কেউ কারো কাছে হারবে না। না-হারুক, আমিও খেয়ে এলুম নিঃশব্দে। আমার কাছে আধ মণও যা, বাইশ সেরও তাই।

এমনি করে পাঁচ জন রাণীর কাছে খাওয়ার পর ছোটরাণীর পালা।

পাঁড়ে বললে—এই ছোটরাণীর বেলাতেই সেই কাণ্ডটা ঘটলো। ছোটরাণী খাওয়ালেন পঁচিশ সের গুলজামুন। খেয়ে দেয়ে হাত ধুয়ে যখন উঠছি হঠাৎ মনে হলো—ছোটরাণী কথা বললেন—

—পান লিজিয়ে বাবু—

আহা, কান যেন জুড়িয়ে গেল। ভারি মিষ্টি গলা। কোনও রাণীর গলাই শুনিনি। কিন্তু তবু যেন মনে হলো—ছোটরাণীকেই দেখতে বুঝি সবচেয়ে সুন্দরী। শব্দের মধ্যে দিয়ে যেন দেখতে পেলাম তাকে।

পানের খিলিটা হাতে নিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছিলাম।

কিন্তু ছোটরাণী বললেন—বাহার যা কর্‌ খুল কর্‌ দেখিয়ে গা বাবুজী—

বলেই তিনি চলে গেলেন। তারপর বাঁদীকে ডেকে আমায় বাইরে নিয়ে যেতে বললেন।

বাইরে চোখের কাপড় খুলে নিজের ঘরে এসে পানের খিলিটা খুললাম। খিলির ভেতর একটা কাগজ। আমি তো অবাক। ভাঁজে ভাঁজে কাগজটা ভেতরে পোরা ছিল। ভাঁজ খুলে দেখলাম—কি যেন তাতে লেখা রয়েছে। কিছুই বুঝতে পারলাম না হুজুর। নিজের নামটা সই করতে পারি না, লেখা-পড়া তো দূরের কথা। কাকে দিয়ে পড়িয়ে নেব! কি এতে লেখা আছে! যদি কোনও গোপন কথা হয়! কাগজটা ভাঁজ করে ফতুয়ার পকেটে রেখে দিলাম হুজুর। কি জানি, যদি কেউ দেখে ফেলে।

ঠাকুর সাহেব সেদিনও জিজ্ঞেস করলো—খেতে পেরেছ পাঁড়ে?

বললাম—জী হাঁ!

ঠাকুর সাহেব খুশী হলেন। বললেন—সাবাস ওস্তাদ, জীতা রহো—

কিন্তু রাত্রে ঘরে এসে আবার সেই চিঠিটা খুললুম। কালিতে লেখা কয়েকটা অক্ষর। আমার কাছে তার কোনও অর্থই নেই। আমি হুজুর, সেই-ই প্রথম কাঁদলুম। কাঁদলুম এই ভেবে যে, কেন আমি লেখা-পড়া শিখিনি! আমি এ-চিঠির কী উত্তর দেব! উত্তর যদি দিতেই হয় তো লিখবো কী করে! চিঠিটা পকেটে নিয়েই ঘুমিয়ে পড়লাম। তারপর দিনও সমস্ত দিন ভাবতে লাগলাম। সমস্ত দিনটাই ভেবে ভেবে কেটে গেল। ভেবে কিছু কূল-কিনারা করতে পারলাম না। শুধু ভাবি! একবার মনে হয়, কিসের চিঠি হতে পারে! ব্যাপার যে গোপনীয় তা বুঝতে পেরেছিলাম। রাজ-বাড়ির রাণী পানের মধ্যে পুরে চিঠি দিয়েছে—এ সামান্য ব্যাপার হতে পারে না। কিন্তু কে জানিয়ে দেবে, কি লেখা আছে এতে! আকাশ-পাতাল ভাবনা। ভাবতে ভাবতে মাথা ধরে এল আমার। দিন যায় আর ভাবনা বাড়ে। মনে হয় যদি আবার কখনও চিঠি আসে আর একটা! কি বলবো! কাকে জানাই। আমার তো ভেবে ভেবে খাওয়া কমে এল হুজুর। তেমন পেট চন্‌ চন্‌-করা ক্ষিধে আর লাগে না। মেজাজ, তবিয়ৎ, শির সব খারাপ হয়ে গেল।

ঠাকুর সাহেব চেহারা দেখে জিজ্ঞেস করলেন—তবিয়ৎ ঠিক আছে তো পাঁড়ে?

ঠাকুর সাহেবের মুন্সীর কাছে গিয়ে একদিন বললাম—আমাকে লেখা-পড়া শিখিয়ে দেবে মুন্সীজী?

মুন্সীজী হাসলে। বললে—লেখা-পড়া শিখে কি করবে পাঁড়েজী, তোমার যা বিদ্যে তাই আমাকে শিখিয়ে দিতে পারতে যদি!

কী করি। নিজেই একদিন হিন্দীর পহেলী-কেতাব কিনে আনলাম। অনেক করে শেখবার চেষ্টা করলাম হুজুর। বড় শক্ত কাম। দেখলাম ও নিজে নিজে শেখবার কাম নয়। তবু চিঠির অক্ষরের সঙ্গে পহেলী-কেতাবের অক্ষরগুলো মিলিয়ে দেখি যদি বুঝতে পারি। কিন্তু কিছু ফয়দা হলো না। দিনরাত সেই চিঠিটা বুকে করে ভগবানকে ডাকতে লাগলাম। ভগবানের নাম কখনও আগে মুখে আনিনি। ঈশ্বরের নাম সেই প্রথম করলাম জীবনে হুজুর। ভগবান কি সোজা মানুষ। বাঁকা পথে আসেন যে। সোজা পথে এলে যে তাকে সহজে পাওয়া হয়। যা সহজে পাই তা যে শিগগির হারাই। রাতের বেলা শহরের সবাই যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, সব শব্দ যখন থেমে গেছে, তখন শুধু আমি জেগে থাকি। আমার ঘরের ছোট জানালাটা খুলে আকাশটার দিকে চেয়ে দেখি ভগবানকে দেখা যায় কি না। ভগবান অত সহজে যদি দেখা দিত, তবে আর ভাবনা ছিল না। আর এত লোক থাকতে আমাকে দেখা দেবেন তাই-ই বা কেমন করে হয়। আমার আর কী পুণ্য আছে। জানি আমি কি! কোনও গুণই তো নেই আমার! টাকা-কড়ি নেই, রূপ-যৌবন নেই, বাড়ি-গাড়ি কিছুই নেই। লেখা-পড়াটাও জানি না। 'ক' বলতে জিব বেরিয়ে আসে। ঠিক পেল্লাদের উল্টো! পেল্লাদকে চেনেন তো! হিরণ্য-কশিপুর ছেলে। সে 'ক' বলতে কেস্ট বলতো। আর আমার 'ক' বলতে মাথায় বাজ পড়ে!

যাক, সেই রাত্তিরে জানলা দিয়ে আকাশের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ নজরে পড়লো ঠাকুর সাহেবের মহলটা। আকাশের গায়ে ঝাপ্‌সা-ঝাপ্‌সা চেহারা। ঠাকুর সাহেবের খাস-মহলে আলো নিভতো একটু বেশি রাত্তিরে। খাসরাণী তখন যে ছিল তারই সৌভাগ্য। সেই বরাদ্দ দু'টি মাসের জন্যে। আর-আর রাণীদের মহল তখন অন্ধকার। আমি দূর থেকে চেয়ে দেখতাম—অত বড় রাজপ্রাসাদের কোন্‌ ঘরের, কোন্‌ প্রাণীটি চিঠির উত্তরের প্রত্যাশা করছে। মনে হতো যদি আকাশের তারায় তারায় সে-চিঠির অক্ষরগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতো। মানে বোঝা যেতো চিঠির। কিন্তু মাথাটা ঝিম্‌ ঝিম্‌ করে আসতো। নর্মদাপ্রসাদ যেতেন শিকারে, যেতেন বন-ভোজনে। আমরা সবাই যেতাম সঙ্গে। আমরা ইয়ার-বক্সীর দল মহারাজের অবসরটুকু ভরিয়ে দিতাম বৈচিত্র্য দিয়ে। জীবন একঘেয়ে লাগলেই আমরা আছি। বাঘ, সিংহ, হরিণ, বন্ধু, মোসায়েব, ইয়ার-বক্সী, ছয় রা[illegible] আর আমি।

সেবার কুম্ভমেলা হবে হরিদ্বারে। সবাই গেলাম। নর্মদাপ্রসাদের তাঁবু

পড়লো। দলের সঙ্গে আমিও। লোক-লস্কর চাকর, নোওকর, খানা-পিনা, খানসামা, বাবুর্চি। বাবুরা ঠাকুর সাহেবকে ঘিরে গান-বাজনা নিয়ে ব্যস্ত। হারমোনিয়ম, রেডিও, বাঁয়া-তবলা, সেতার, সারেঙ্গি আরো কত কি! আমিও আছি সঙ্গে। সব কাজের মধ্যেই থাকি, কিন্তু সেই চিঠিটার কথা ভুলতে পারি না। ফতুয়ার পকেটে চিঠিটা আছে সঙ্গে। সেটা হাত দিয়ে মাঝে মাঝে দেখি। লোক খুঁজে বেড়াই—কাকে পড়াবো, কাকে গোপন কথা বলা যাবে! কে তেমন বিশ্বাসী লোক। কাকে মনের সব কথা বলা যায়।

চারদিকে সাধুর আড্ডা। সারা দেশ থেকে সাধুরা এসেছে। নাগা সাধু, মেয়ে নাগা, মৌনী বাবা, পুরী, বন্, ভারতী কত সম্প্রদায়। ধুনী জ্বালে, লেট্টি বানায়। একধারে বড় বড় রেডিওতে গীতা পাঠ হয়, গ্রামোফোনে ভজন হয়—

"ভজ হে মন হরে নাম
গৌরীশঙ্কর সীতারাম"

ফেরিওয়ালা গরম গরম জিলেবি ভাজছে, ঘিয়ে ভাজা পুরি গোছা-গোছা উড়ছে। জিলেবিওয়ালা বলছে—

জিলেবি কা বাবা জেলেবা
সের ভর্ খরিদ কর্ লে বাবা

এদিকে আমের পাহাড় নিয়ে বসে আমওয়ালা চিৎকার করছে—

আমে আম ভাই আমে আম
রামে রাম ভাই রামে রাম—

সব ছড়া। ছড়া দিয়ে গান দিয়ে সুর দিয়ে সবাই ভোলাতে চাইছে। একটা সাধুকে কয়েকজন চেলা ঘিরে বসে গাঁজা খাচ্ছে। ছাই মেখে বসে আছে সাধু। দেখে বড় ভক্তি হলো হুজুর। মনে হলো এমনি যদি সাধু হতে পারতাম এদের মতন। সব ত্যাগ করতে পারতাম। মিছি মিছি পেটের জন্যে ঠাকুর সাহেবের দাসত্ব করছি। জিলেবি খাওয়াবে ঠাকুরসাহেব, লাড্ডু খাওয়াবে তাই জন্যেই পড়ে আছি চাকরের মত। সামান্য পোকা-পতঙ্গ তারাও স্বাধীন। কারো তাঁবে থাকে না তারা। নিজের ওপর। ঘেন্না হতে লাগলো সব দেখে। অথচ এরা কারোর তোয়াক্কা করে না। এদের জামা-কাপড় লাগে না, তেল মাখবার দরকার হয় না, কারো মুখ চেয়ে এরা চলে না। খেতে পেলে খায়, নয় তো খেলেই না। আর আমি খাবার জন্যে হাঁ করে থাকি। পেট আমার সহজে ভরে না।

সাধুর দলে গিয়ে বসতেই সবাই হাঁ হাঁ করে চিমটে নিয়ে তেড়ে এল। বলে—ভাগ্ বেটা—ভাগ্—ভাগ্ যা—

সরে এলাম কিন্তু দমে গেলাম না।

রোজই যেতে লাগলাম সাধুর কাছে। সকালে সন্ধ্যায় বিকেলে রাত্তিরে। হাতে কিছু না কিছু খাবার নিয়ে যাই। মালাই কি দহি কি আটা যা হোক কিছু একটা। ভোগ দিয়ে আসি কিন্তু আমলই দেয় না কেউ। ভজন গায় যখন, আমি হাত তালি দিই। তালে তালে মাথা নাড়াই। তাদের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গাই—

"কাহে উমতলা হে তৈলক নাথ
নিত উগারিঅ নিত ভশম সাথ।"

হে ত্রৈলোক্য নাথ, তুমি কেন উন্মত্ত-ভাবে সর্বদা ভস্ম মেখে উলঙ্গ হয়ে থাকো? কেন থাকো, কে বলে দেবে! তোমার কোনও আকর্ষণ নেই। তোমার রাগ নেই বিরাগ নেই। তোমার আকর্ষণ নেই বিকর্ষণ নেই। তুমি ভোলানাথ। ওই সাধুজীও তোমার মত সব মায়া ভুলতে পেরেছে! আমি গান গাইতে গাইতে মেতে উঠি। কেউ আর আমায় লক্ষ্য করে না। তারপর একসময়ে চুপি চুপি ফিরে এসে ঠাকুরসাহেবের তাঁবুতে গিয়ে ঢুকে পড়ি। তাঁবুতে তখন ঠাকুরসাহেব ইয়ার-বন্ধু নিয়ে গান-বাজনা খানা-পিনায় ব্যস্ত। সবার চোখ লাল হয়ে আছে। কেউ আমায় দেখতে পেলে না।

সেদিন সকলের আড়ালে রাত্তির বেলা তাঁবু থেকে বেরুলাম। রাত তখন অনেক। বোধহয় দ্বিতীয় প্রহর। একা একা হাঁটতে হাঁটতে গিয়ে সাধুর আড্ডায় হাজির। সবাই তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। একা সাধুজী তখন আগুনের সামনে বসে বসে ভাগবত গীতা পাঠ করছে—

"সর্ব্বধর্ম্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো
মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ"

তারপর আমাকে দেখেই সাধু বললে—কৌন্ হো তুম?

বললাম—আমি দামোদর পাণ্ডে বাবা, —ব্রাহ্মণ—

সাধুবাবা ধুনি থেকে একচিমটি ছাই নিয়ে হাতে দিয়ে বললে—লে, ভাগ্—

তবু বসে আছি দেখে সাধুবাবা আবার জিজ্ঞেস করলে—কুছ্ মাঙ্তে হো তুম্?

বললাম—একটু কির্পা চাই বাবা—

সাধুবাবার দয়া হলো যেন। বললে —বোল্ জলদি বোল—

তখন বললাম—একটা খত্ পড়ে দিতে হবে বাবা, আমি লেখা-পড়ি জানিনা, নিরক্ষর মানুষ—

সাধুবাবা বললে—কেয়া খত্, কিস্কা খত্? লে আ—

পকেট থেকে চিঠিটা বার করতে গেলাম। কিন্তু খুঁজে পেলাম না। বুক পকেট, পাশের পকেট কোথাও নেই। আঁতি পাঁতি করে খুঁজতে লাগলাম। উল্টে-পাল্টে দেখলাম। মিথ্যে চেষ্টা। গেল কোথায়। মাথা গরম হয়ে গেল। অমন অমূল্য সম্পদ, দিন রাত কাছে নিয়ে, বুকে নিয়ে থেকেছি, এখন দরকারের সময়ে পাওয়া গেল না! আকাশ-পাতাল ভাবতে লাগলাম। জামা যখন সাবান দিয়ে পরিস্কার করেছি, তখন চিঠিটা রেখেছি ট্যাঁকে। আবার যখন জামা পরেছি তখন পকেটে তুলে রেখে দিয়েছি। তবে গেল কোথায়! এখন করি কী! তাঁবুতে কি ফেলে এলাম। রাত্রে তাঁবুতে ফিরে এসে সব জায়গা খুঁজলাম। অন্ধকারে কেউ না জেগে ওঠে। কেউ কি চুরি করলে। তবে কি কেউ পড়ে ফেলেছে! কী লেখা ছিল জেনে ফেলেছে! কোথায় গেল। সারা রাত চিঠির ভাবনায় আমার ঘুম এল না হুজুর। আমি কাঁদতে লাগলাম। নিজে পড়তে জানলে আর এমন হতো না। কান্নায় আমার বুক ফেটে জেরবার হয়ে গেল!

উপাধ্যায় থেমে বললেন—এমনি করে তো পাঁড়ে সে-চিঠি হারিয়েই ফেললে মশাই। তারপর কী তার মনে হলো কে জানে, যখন সাধুরা চলে যাচ্ছে আস্তে আস্তে পাঁড়েও কাউকে না বলে কয়ে সাধুদের পেছু নিলে। রাজবাড়িতে ফিরে গিয়ে আর কী হবে! নিজের জীবনের ওপরেই

তার অশ্রদ্ধা এসে গেল। মনে মনে ঠিক করলে ঠাকুরসাহেবের তাঁবুতে আর ফিরে যাবে না সে। সেখানে গিয়ে তো সেই কেবল তোষামুদি আর মোসায়েবি করা! তার চেয়ে কিছুর জন্যে তোষামুদি যদি করতেই হয় তো ভগমানের তোষামুদি করাই ভালো। যাতে লেখা-পড়া, জ্ঞান-ধর্ম হয়। দেখুন বাবুজি, এমনি করেই মহা-পুরুষদের জীবনে পরিবর্তন আসে। তুলসীদাসেরও একদিন এমনি হয়েছিল। তা সাধুর দলের সংগে ভিড়ে তো পড়লো পাঁড়ে। কিন্তু চেলারা ওকে দলে নেবে কেন? চিমটে দিয়ে তাড়া করতে আসে। তবু পেছু ছাড়ে না ও। তারা ট্রেনে উঠলো, দামোদরও ট্রেনে উঠলো। ট্রেনের এক কোণে বসে রইল। কেউ নজর করেনি। দামোদর কেবল ভাবছে সাধুর দলের সংগে গিয়ে সাধুদের আখড়ায় গিয়েই শেষ জীবনটা ধর্ম-চর্চায় কাটিয়ে দেবে! এমনি করেই চলছে। কত স্টেশনের পর কত স্টেশন চলে গেল। সাধুরা গাঁজা খাচ্ছে। নানা-লোক নানা-রকম খাবার দিয়ে যাচ্ছে, সব খাচ্ছে তারা। দামোদরের খুব ক্ষিদে পেল বাবুজি। দামোদরের ক্ষিদে আর তো যে-সে ক্ষিদে নয়। একেবারে হুতাশনের ক্ষিদে। চোখের সামনে দিয়ে ফেরিওয়ালার খণ্ডি চলে যায়, চোখ দুটো যেন দাউ দাউ করে ওঠে। জিবটা লক্ লক্ করে ফণা বিস্তার করতে চায়। কিন্তু কোমরের কাপড়টা দিয়ে কষে পেটটাকে বেঁধে ক্ষিদে চাপতে চেষ্টা করলে। কিন্তু ভোলা কি যায়? ওর নাম যে দামোদর হুজুর, উদরের কথা কি ভুলতে পারে ও? প্রহ্লাদ কি হরির নাম ভুলতে পেরেছিল? তার বাপ তো কত চেষ্টা করলে—বলুন।

তা এমনি করেই সাধুর দলের সংগে হয়ত দামোদর কেদার-বদরী কি নেপাল তিব্বতে কোথাও চলে যেত কিন্তু আজমীর স্টেশনে এসেই ধরা পড়ে গেল। চেলাদের নজরে পড়লো বাজে লোক তাদের সংগে চলেছে। সবাই মিলে জোর করে দিলে নামিয়ে এই আজমীর জংশনে। ভগবানের মহিমা বোঝে দিন-দুনিয়ায় কার এমন সাধ্য আছে বাবুজি!

অচেনা-অজানা জায়গা। তারপরে হাঁটতে হাঁটতে তীর্থযাত্রীদের সংগে একদিন পুষ্করজীর পায়ের তলায় গিয়ে হাজির। আবার যে-কে সেই। সেই পেটের ভাবনা। পেটের জ্বালায় ছট্‌ফট্ করতে লাগলো। পুষ্করজীর গো-ঘাটে গিয়ে আঁজলা-আঁজলা জল খেলে। তার-পর ঘুমোবার চেষ্টা করলে। ঘাটের ধারেই শুয়ে ছিল। কে যেন কাছে এসে বললে—এখানে শুয়ে আছো কেন, কচ্ছপে কামড়াবে, কুমীরে খাবে, তখন উঠে রাস্তায় এল।

কিন্তু পুষ্করতীর্থ আপনার পৃথিবীর মধ্যে তো শ্রেষ্ঠ তীর্থ। আপনি লেখা-পড়া জানা লোক সমস্তই জানেন। পাঞ্জাবী, সিন্ধী, গুজরাটি, মারহাট্টি, বাঙালী সব জাতের লোক ওখানে আসে রোজ। এসে পুজো দেয়, পিন্ড দেয়, ভুজ্যি উৎসর্গ করে, ব্রাহ্মণকে বস্ত্র দেয়, খাবার দেয়, গোদান করে। তীর্থযাত্রীর অভাব হয় না পুষ্করজীর। হাজার হাজার লোক মাসে মাসে 'জয় পুষ্করজী জয়' বলে আসে স্নান করতে, ব্রহ্মার মন্দির দেখতে, সাবিত্রী পাহাড়ে দেবীজীকে দর্শন করতে। দামোদর পাঁড়ে সেই তীর্থযাত্রী-দের পেছনেই লেগে রইল। ভোর হলেই বাসের আর টাঙ্গার আড্ডায় গিয়ে হাজ্‌রে দেয়। পান্ডাদের সংগে বন্দোবস্ত করলে। দক্ষিণা যা পাবে টাকা পিছু আট আনা তাদের। আধা-আধি বখ্‌রা।

রাস্তায় গিয়ে দাঁড়ায় আর সকলের মত সুর করে বলে—বেরাহ্মণ ছে হুজুর, বেরাহ্মণ কো কুছ্ ভোজন কো ওয়াস্তে দিজিয়ে হুজুর—

দেখুন ভগবানের কী লীলা। ভক্তকে নিয়ে যুগে যুগে ভগবান কত পরীক্ষাই না করেন। তারপর এমনি করে কত মাস কাটলো, কত বছর কাটলো। হিসেব তার রাখেনি দামোদর। কোনও জমিদার হয়ত এসেছে তীর্থ করতে ওমুনি পান্ডা মহারাজ খবর পাঠিয়েছে—কাল ধর্ম-শালায় হাজির হবি পাঁড়ে, ব্রাহ্মণ ভোজন হবে—

যথাসময়ে দামোদর পাঁড়ে সেই ঠাকুরসাহেবের দেওয়া নাগরা জুতো আর সিল্কের পাগড়ি পরে গিয়ে হাজির হয়েছে ধর্মশালায়। পুরী খেয়েছে, লাড্ডু খেয়েছে, মালাই খেয়েছে, ভাজি খেয়েছে—আবার তারপর ভোজন-দক্ষিণা নিয়ে পান্ডাকে আধা বখ্‌রা দিয়ে বাড়ি চলে এসেছে। এমনি করেই কাটছিল। এমন সময় আবার একটা কান্ড ঘটলো। তা না হলে আর ভগবানের লীলা কেন বলছি বাবুজি!

বলে উপাধ্যায় থামলেন!

উপাধ্যায় বললেন—রাত ক'টা হলো! আপনার ঘুমোতে দেরি হলো বাবুজি—

বললাম—না বলুন আপনি—

উপাধ্যায় তো জানেন না তীর্থ করতে আমি আসিনি এতদূরে, এসেছি আসলে গল্প শুনে পুণ্যসঞ্চয় করতে। রাজ-পুতানার অলিতে গলিতে নতুন চরিত্র দেখতে পাবো বলেই তো এত কষ্ট করা। আমার জ্যোতিষী বন্ধুর কথা তাচ্ছিল্য করে সংঘাতের আশঙ্কা আছে জেনেও সম্পদের লোভ ত্যাগ করতে পারিনি।

উপাধ্যায় বললেন—তবে শুনুন—পাঁড়ের মুখ থেকে যেমন শুনেছি আমি তেমনি বলি।

গাঁজায় আর এক দম দিয়ে পাঁড়ে তারপর আরম্ভ করলে।

পাঁড়ে বললে—সেদিন পান্ডা মহা-রাজ এসে খবর দিয়ে গেল রায়গড়ের ঠাকুরসাহেব এসেছে ধর্মশালায়, ব্রাহ্মণ-ভোজন করাবে—যেয়ো ঠিক—

মনটা চন্ চন্ করে উঠলো। সেই
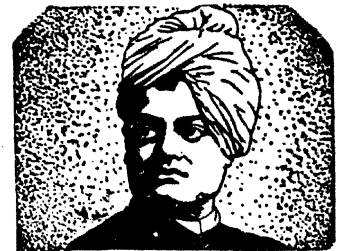
রায়গড়ের ঠাকুরসাহেব নর্মদাপ্রসাদ। তিনি এসেছেন পুষ্করতীর্থে! ঠাকুর সাহেবের দেওয়া সেই নাগরাজুতো, সিল্কের পাগড়ি পরে গিয়ে হাজির হলাম। পুষ্কর-তীর্থের কোনও ব্রাহ্মণ আর বাকি নেই। সবাইকে নেমন্তন্ন করা হয়েছে। মহা সোরগোল পড়ে গিয়েছে ধর্মশালায়। পাঁচশো ব্রাহ্মণ জড় হয়েছে। মহাভোজের আয়োজন। যে-যত পারবে খাবে। সমস্ত ধর্মশালাটা ঠাকুর-সাহেবের লোকে ভর্তি। বাইরের লোক কেউ নেই। একপাশে গিয়ে তো বসলাম আমি। খাবার ডাক পড়লো। কেবল ভয় হচ্ছিল ঠাকুরসাহেবের সঙ্গে দেখা হলে কী বলবো!

খেতে বসলাম। সেই মালাই, পেড়া, গুলজামুন, মালপো, ভাজি পুরি। একেবারে এলাহি কাণ্ড। সবাই পেট পুরে খাচ্ছে। কিন্তু ঠাকুরসাহেব নর্মদাপ্রসাদের দেখা নেই। কেবল মনে হচ্ছিল সঙ্গে কি রাণীসাহেবরা এসেছে! সেই ছোট রাণী-সাহেব!

সবাই খেয়ে উঠে গেল। আমি তখনও খাচ্ছি। আমার আর পেটই ভরে না। অনেকদিন পরে এমন খাওয়া খাচ্ছি!

মনে হচ্ছিল এখনি হয়ত নর্মদাপ্রসাদ বেরিয়ে আসবেন। বলবেন—এ কি পাঁড়েজি না? দামোদর পাণ্ডে! কিন্তু কিছুই হলো না। খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে পাণ্ডামহারাজই। ঠাকুরসাহেব এলেন না। একসময়ে খাওয়া সেরে উঠলুম। তবু কিন্তু তখনি বাড়ি গেলাম না।

দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ দেখা মুন্সীজির সঙ্গে—আরে পাঁড়েজি!

বললাম—মুন্সিজী, ঠাকুরসাহেব আসেননি?

• মুন্সীজি বললে—না, তিনি তো মারা গেছেন, তাঁর ছেলেরা এসেছে—আর বিধবা রাণীজিরা এসেছেন?

তবু যেন তৃপ্তি হলো না। আরো যেন কিছু শুনতে চাই।

বললাম—সব রাণীজী এসেছেন?

মুন্সীজি বললে—মহারাণজী এসেছেন আর পাঁচ রাণীজিও এসেছেন—

পাঁচ কেন? রাণী তো ছ'জন?

—[illegible] এক রাণী তো মারা গেছেন, ছোট রাণী! জানো না?

—কোন্ রাণী?

—ছোট রাণী, আত্মহত্যা করে মারা গেছেন—সে তো অনেকদিন হলো, আজ সাত বরিষ হয়ে গেল। সে কি আজকের কথা। আর গেল বরিষে ঠাকুরসাহেব মারা গেলেন শীকার করতে গিয়ে জঙ্গলে—

সাত বছর। হিসেব করে দেখলাম প্রায় সাত বছরই হলো পুষ্করে এসেছি।

তখনই চলে এলাম হুজুর। আবার নিজের ওপর ঘেন্না ধরে গেল। সেদিন আর বাড়ি ফিরিনি আজ্ঞে। পুষ্কর থেকে হাঁটিতে হাঁটিতে আজমীর চলে এলাম। তারপর সারারাত স্টেশনের মুশাফির-খানায় থেকে ট্রেনে উঠে বসলাম। তারপর এলাম এই আবুপাহাড়ে। শুনেছিলাম এখানে অচ্ছলগড়ে অনেক সাধুর আড্ডা। ভাবলাম জীবনে কিছুই কিছু নয়। সব মায়া সব মিথ্যে! সব ত্যাগ করতে হবে। ক্ষিধে, তেষ্টা, লোভ, সব সব! সমস্ত অনর্থের মূল।

বললাম—তারপর?

উপাধ্যায় বললেন—তারপর তুরীয়া-নন্দজীর আখড়ায় দেখি ওই দামোদর পাঁড়ে কেবল গাঁজা খাচ্ছে আর শংখিয়া খাচ্ছে—ক্ষিদে ভুলবে ও। পেটের ক্ষিদে ভুলে এমন জিনিস পেতে চায় যা পেলে আর কোনও ক্ষিদে থাকে না। আপনাদের বাঙলাদেশের লাটু মহারাজের নাম শোনেন্ নি! স্বয়ং জগন্নাথ মহাপ্রভু তাকে দেখা দিয়েছিলেন। লাটুমহারাজেরও বড্ড ক্ষিদে ছিল। মহাপ্রভু বর দিয়েছিলেন—তুই যা পাবি তা-ই খাবি, সব হজম হয়ে যাবে তোর—। আমাদের ধর্মশালায় একজন সাধু এসেছিল একবার, সিদ্ধ-পুরুষ। বলতো—

"মেরা নাম হ্যায় গোবিন্দ্
ভোজনমে মিলে আনন্দ্"

তুরীয়ানন্দজী সব দেখে একদিন ডাকলেন দামোদরকে। বললেন—কী চাস তুই বেটা—

পাঁড়ে বললে—প্রভু, ক্ষিদের জ্বালায় বড় জ্বলে মরি, আমায় ক্ষিদে ভুলিয়ে দিন—

তুরীয়ানন্দ বললেন—যা বেটা তুই খেয়ে বেড়াগে যা, লোকে পুজো করে, উপাসনা করে, তোর খেলেই পুজো করা হবে, ভোজনই তোর ভজন—যা, বেটা যা—তুই পেয়ে গেছিস্—

পাঁড়ে কী বুঝলো কে জানে। আমি যখন এই ধর্মশালায় ম্যানে-জারের চাকরি নিলাম, ওকে নিয়ে চলে এলাম হুজুর এখানে। এখন কিছুই করে না ও। শুধু ভোজন করে। ওর ভজন-পুজন ওইতেই হয়। ছ'টা রাণীর মোহ কি কম মোহ মশাই, ছ'টা রিপুকে যে বধ করতে পেরেছে তার তো সব মিলে গেছে! তাই তো আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, ভোজনে চ জনার্দন—যান, এবার শুতে যান, অনেক রাত হলো, ক'টা বেজেছে কে জানে!

বললাম—আর সেই চিঠিটা? ছোট-রাণীর চিঠি......

উপাধ্যায় বললেন—সে চিঠি তো উপলক্ষ্য বাবুজী. যে ভগবান পেয়ে গেল, তার কাছে ও চিঠি তো তুচ্ছ, লালাবাবু যেদিন গোবিন্দজীকে পেলেন, সেদিন তো তার রাজ্য, আওরাত্, লেড়কা সব বিলকুল ঝুট হয়ে গেল, লাটু-মহারাজ যেদিন......

পরদিন সকালে যথারীতি দামোদর পাঁড়ে খেতে এল। ভালো করে লক্ষ্য করলাম, চেহারাটা যেন যৌবনে এককালে সুন্দরই ছিল। ছ' ফুট লম্বা, ফরসা রং, সুন্দর গড়ন। দামোদর পাঁড়েকে যেন নতুন চোখ দিয়ে আবার দেখলাম। বেশ পরিপাটি করে খেলে সব। যেন খাওয়ায় তার শুচিশুভ্র নিষ্ঠা। পুজারী যেমন করে দেবতার প্রসাদ গ্রহণ করে, সে-ও যেন তেমনি। তেমনি অবিচল ভক্তি, তেমনি পরিপূর্ণ বিশ্বাস।

খাবার সময় দামোদর পাঁড়ে বললে—পরমেশ্বর বড় তুষ্ট হলেন বাবুজী, আপনার কল্যাণ হবে—

কিন্তু আমার জ্যোতিষী বন্ধুর কথা আমি ভুলিনি। মঙ্গল এখন মকরে জেনেও যাত্রা করেছি। কী সম্পদ যে পেলাম আমি, তা উপ্যাধ্যায়ও জানলেন না দামোদর পাঁড়েও জানলে না। আর সংঘাত? সংঘাতের গল্প পরের বারে বলবো।

চিত্রে বন্দেমাতরম্

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বাংলা সাহিত্যে ভারতবর্ষের মাতৃরূপ কল্পনা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কাব্যেই প্রথম। সিপাহী বিদ্রোহের দশ বৎসর পূর্বে "সংবাদ প্রভাকরে" প্রকাশিত এক কবিতায় তিনি লিখিলেনঃ

জননী ভারত ভূমি আর কেন থাক তুমি,
ধর্মরূপ ভূষাহীন হয়ে?
তোমার কুমার যত, সকলেই জ্ঞানহত
মিছে কেন মর ভার বয়ে?

বাস্তবিকপক্ষে গুপ্ত কবির জন্মভূমির কথা মায়ের কথা।

জাননা কি জীব তুমি জননী জনমভূমি,
যে তোমারে হৃদয়ে রেখেছে।
থাকিয়া মায়ের কোলে, সন্তানে জননী ভোলে,
কে কোথায় এমন দেখেছে?

গুপ্ত কবিই বাংলা সাহিত্যে স্বদেশপ্রীতির প্রথম কবি। তাঁহার "স্বদেশ", "ভারতের ভাগ্যবিপ্লব", "ভারতের অবস্থা", "ভারতভূমির দুর্দশা", "ভারত সন্তানের প্রতি" প্রভৃতি কবিতাই একথার প্রমাণ।

ইহার ষোল বৎসর পরে স্বদেশের মাতৃরূপ আবার দেখি হেমচন্দ্রের বীরবাহু কাব্যে ঃ

রত্নগর্ভা ভূমি তুমি জগতের সার।
কত নদ হ্রদ গিরি তব অলংকার॥
উচ্চ হিমগিরি-চূড়া হিমানী-মণ্ডিত।
গর্ব করি স্থির বায়ু করিছে খণ্ডিত॥
অরুণের রথ-রোধকারী বিন্ধ্যগিরি।
অগস্ত্য ঋষিরে শিরে নোয়াইছে ধীরি॥
গোমুখী বাহিনী গঙ্গা যমুনাতে মেলি।
দিবারাতি কলনাদে করিতেছে কেলি॥
নর-অংশে জন্ম সেই রাম-নারায়ণ।
তোমারে জননীভাবে করিলা পালন॥

এর কয়েক বৎসর পরে শুনি সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের

ফলবতী বসুমতী, স্রোতস্বতী পুণ্যবতী
শতখনি রত্নের নিধান।
হোক ভারতের জয়, ইত্যাদি

এই স্বদেশ-সংগীতটি সম্বন্ধেই বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেনঃ "এই মহাগীত ভারতের সর্বত্র গীত হউক। হিমালয় কন্দরে প্রতিধ্বনিত হউক! গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু, নর্মদা, গোদাবরীতটে বৃক্ষে বৃক্ষে মর্মরিত হউক! এই বিংশতি কোটি ভারতবাসী! হৃদয়যন্ত্র ইহার সঙ্গে বাজিতে থাকুক।"

ভারতজননী লইয়া প্রথম নাটক কিরণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ভারতমাতা" নামে গীতিনাটিকাটি। ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে যখন এটি ন্যাশনাল থিয়েটারে অভিনীত হয় তখন শিক্ষিত বাঙালী ইহাকে একটি অভিনব দৃশ্যকাব্য বলিয়া গ্রহণ করেন। প্রথম দিনের অভিনয় দেখিয়া অমৃতবাজার পত্রিকা লিখিয়াছিলেন, "শ্রোতৃগণের দীর্ঘনিঃশ্বাস ও রোদনধ্বনিতে কেবল মধ্যে মধ্যে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইতেছিল।" এই দেশমাতৃকার ভাবটি সে যুগে বাঙালীকে কতদূর মাতাইয়াছিল তাহা বিপিনচন্দ্র পালও লিখিয়াছেন ঃ

"It was this stage that first proclaimed the gospel of the religion of the motherland in an opera now completely forgotten, called Bharat Mata or "Mother India." I forget

বন্দে মাতরম্
হরিশ্চন্দ্র হালদার অঙ্কিত

the details of the play, but the name indicates the nature of the theme and the religious idealization which must have inspired it."

এই নাটকেই দেখি মুকুন্দ দাসের স্বদেশী যাত্রার পূর্বসূচনা। "ভারতমাতা" গীতি-নাটিকার যে ভাব "মাতৃপূজা" যাত্রারও সেই ভাব।

উপন্যাসে দেশমাতৃকার কথা আনন্দ-মঠেই প্রথম এবং এই গ্রন্থেই এই ভাবের পরিপূর্ণ প্রকাশ। আনন্দমঠ বাংলা সাহিত্যে দেশাত্মবোধের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

যে ভাব বাঙালীর কাব্য, নাটক ও উপন্যাসে ফুটিয়া উঠিয়াছে সে ভাব চিত্রকলাতেও ফুটিয়াছে। অবশ্য আধুনিক বাংলা চিত্রকলা আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কনিষ্ঠ বলিয়া চিত্রে এই ভাবটি কিছু পরে আসিয়াছে। বঙ্কিম যখন আনন্দমঠ রচনা করেন তখনও বাংলা চিত্রশিল্পের নতুন যুগের আরম্ভ হয় নাই। তখন বাঙালীর ঘরে ঘরে বিদেশীর আঁকা বিদেশী চিত্র। দেশী চিত্রকরের আঁকার ধরনেও তখন বিদেশী প্রভাব। তবে সেই যুগেও দেখি বাঙালী স্বদেশের মাতৃমূর্তি কল্পনা করিয়া ছবি আঁকিতেছিলেন। এইরূপ একখানি চিত্রের কথাই এই প্রবন্ধের বিষয়। সম্প্রতি আনন্দবাজার পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় "ভারতবর্ষের জাতীয় সংগীত" নামে এক প্রবন্ধে অধ্যাপক প্রবোধচন্দ্র সেন এই চিত্রখানির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। হরিশ্চন্দ্র হালদার অঙ্কিত এই ছবিখানির উল্লেখ করিয়া তিনি ইহার পুনর্মুদ্রণের কথাও বলিয়াছেন। প্রবোধবাবুর এই লেখা পড়িয়াই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর কাছে এই চিত্রখানির ফটো চাহিয়া পত্র লিখি। ইহা জ্ঞানদানন্দিনী সম্পাদিত "বালক" পত্রিকার প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় (১২৯২—জ্যৈষ্ঠ—খৃঃ ১৮৮৫) প্রকাশিত হইয়াছিল। নির্মলবাবু পরিষদে রক্ষিত "বালকে"র ঐ সংখ্যা হইতে চিত্রখানির একটি ফটো তুলিয়া আমাকে পাঠাইয়াছেন। সেইটিই এই প্রবন্ধের সঙ্গে মুদ্রিত হইল।

হরিশ্চন্দ্র হালদারের নাম আমাদের অনেকের কাছেই অপরিচিত। তবে তাঁহার কীর্তি অমর না হইলেও রবীন্দ্র-নাথ একাধিক স্থানে তাঁহার উল্লেখ করিয়া তাঁহাকে এক রকম অমর করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। কারণ, ইনিই "গল্প-সল্পে"র ম্যাজিশিয়ান গল্পের হ, চ, হ এবং 'মুক্তকুন্তলা' গল্পের ম্যাজিক-ওয়ালা হরিশ হালদার। তাঁহার সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। তবে তিনি যে এক মজার মানুষ এবং বিশেষ গুণী লোক ছিলেন তাহা রবীন্দ্রনাথের কথায় বুঝি। "মুক্তকুন্তলা" গল্পে তিনি লিখিয়াছেন, "শুধু তাঁর ম্যাজিকে হাত ছিল না, সাহিত্যেও কলম চলত। আমাদের কাছে সেও ছিল ম্যাজিক-বিশেষ। আজও মনে আছে একটা ঝুলঝুলে খাতায় লেখা তাঁর নাটকটা, নাম ছিল 'মুক্তকুন্তলা'।" এই নাটক কোনদিন মুদ্রিত হয় নাই। হ চ হ রচিত মাত্র দুখানি নাটক মুদ্রিত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়—"কালাপাহাড়" (১৮৮১) এবং "বেদবতী বা পতিপ্রাণা" (১৮৮৩)। 'মুক্তকুন্তলা' যে একখানি বীররস প্রধান দেশাত্মবোধমূলক নাটক হিসাবেই রচিত হইয়াছিল তাহা রবীন্দ্র-নাথের গল্পটি পড়িয়া অনুমান করিতে পারি: "তারপর তার মধ্যে যা সব লম্বাচালের কথাবার্তা, তার বুলিগুলো শুনে মনে হয়েছিল, এ কালিদাসের ছাপ-মারা মাল। বীরাঙ্গনার দাপট কী? আর দেশ-উদ্ধারের তাল ঠোকা!" এমন নাট্যকার যদি আবার চিত্রকর হন তাহা হইলে তিনি যে দেশমাতৃকার একখানা ছবি আঁকিবেন তাহা স্বাভাবিক।

হরিশ্চন্দ্র নানা গুণের আধার। 'মুক্তকুন্তলার' গল্পের নাট্যকারই আবার 'ম্যাজিশিয়ান' গল্পের প্রোফেসার হরিশ হালদার—"তাঁর ছিল ম্যাজিক দেখান হাত" এবং মঞ্চসজ্জায়ও তাঁহার বিশেষ নৈপুণ্য। এইক্ষেত্রে তাঁহার কৃতিত্বের উল্লেখ পাই অবনীন্দ্রনাথের ঘরোয়া গ্রন্থে। বিসর্জন নাটকের অভিনয় প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন, "হ চ হ'র উপর ভার পড়ল স্টেজ সাজাবার, সিন আঁকবার"। হ চ হ যে একজন বিদগ্ধ শ্রেণীর লোক ছিলেন তাহার আর প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের "দর্প-হরণ" নামে গল্পটি। সাহিত্যযশাকাঙ্ক্ষী দম্পতির প্রতিযোগিতা লইয়া লিখিত এই আখ্যানের নায়ক হরিশ্চন্দ্র হালদার।

হরিশ্চন্দ্র হালদারের এই চিত্রখানি "বালক" পত্রিকায় প্রতিভাসুন্দরী দেবী লিখিত "গান অভ্যাস" বিভাগে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'বালকে'র এই সংখ্যায় 'গান অভ্যাস' বিভাগে বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরমের প্রথম অংশ স্বরলিপি সহ মুদ্রিত হয়। এই প্রসঙ্গে প্রতিভাসুন্দরী দেবী লেখেন, "বঙ্কিমবাবু রচিত 'বন্দে মাতরং' নামক বিখ্যাত গানটি সমস্তটা দেওয়া গেল না, কারণ উক্ত গানের সুর অত্যন্ত কঠিন, সমস্তটা দিলে পাঠকের সহজে আয়ত্ত হইবে না।" এখানে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, গানটির যে অংশ স্বরলিপিতে বাদ দেওয়া হইয়াছে সে অংশ চিত্রেও বাদ দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ হরিশ্চন্দ্রের এই মাতৃমূর্তি দশপ্রহরণ-ধারিণী দুর্গার মূর্তি নয়। ইহার ভাব—

> সুজলাং সুফলাং মলয়জ শীতলাং
> শস্য শ্যামলাং মাতরং।

এখানে জননী

> "ফুল্ল কুসুমিত দ্রুমদল শোভিনীং",
> সুহাসিনীং সুমধুর ভাষিণীং
> সুখদাং বরদাং মাতরম্॥

চিত্রখানি প্রকাশিত হয় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে অর্থাৎ আনন্দমঠ বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হইবার পাঁচ বৎসর ও গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইবার তিন বৎসর পরে এবং প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনের মাত্র কয়েক মাস পূর্বে। তখন বন্দে মাতরম্ গানটির বয়স মাত্র তিন বৎসর হইলেও

ইহা যে তখন বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়া বহুকণ্ঠে গীত হইতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই। এবং গানের ভাবটিও তখন বাঙালী চিত্তে বেশ গভীর হইয়া উঠিয়াছে। ঈশ্বর গুপ্তের কবিতায় যে ভাবের প্রথম সূচনা, হেমচন্দ্রের কাব্যে ও সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের গানে যাহার পুষ্টি বঙ্কিমচন্দ্রের বন্দে মাতরমে তাহার সুন্দরতম ও পরিপূর্ণ প্রকাশ। ভাবটির এই চরম স্ফূর্তির ক্ষণে এক চিত্রশিল্পীও ইহাকে চিত্রে ফুটাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। এবং হরিশ্চন্দ্রের এই চিত্রে কিছুটা বিদেশী স্টাইলের ছায়া থাকিলেও এবং ইহাতে দশপ্রহরণধারিণী রূপটি বর্জ্জিত হইলেও এই চেষ্টাকে অসার্থক বলি না।

এই চিত্রে বিদেশী স্টাইলের প্রভাব লক্ষ্য করিবার সময় মনে রাখিতে হইবে যে, ইহা হ্যাভেল, অবনীন্দ্রনাথ ও ওকাকুরার যুগের চিত্র নয় এবং ইহা আঁকা হয় Indian Art Society প্রতিষ্ঠিত হইবার বিশ বৎসর পূর্বে। এবং এই বিদেশী ধরনটি চিত্রের প্রধান ভাবটিকে ক্ষুণ্ণ করিয়াছে এমন কথা বলিতে পারি না।

চিত্রে দশপ্রহরণধারিণী দেবীমূর্তি ফুটিয়া ওঠে নাই সত্য, কিন্তু এখানে মনে রাখিতে হইবে যে, সেই দেবীভাব ফুটাইয়া তোলার অভিপ্রায় শিল্পীরও ছিল না। আমরা দেখিয়াছি, স্বরলিপিতে গানের দ্বিতীয় অংশ বাদ দেওয়া হইয়াছে। এবং এই বর্জ্জিত অংশেই বঙ্গজননী দশপ্রহরণধারিণী দুর্গারূপে কল্পিত। প্রবোধবাবু তাঁহার প্রবন্ধে আমাদের জানিয়েছেন যে, সরলা দেবীর "শতগান" পুস্তকেও (১ম সংস্করণ—১৩০৭) "সুখদাং বরদাং মাতরম্" পর্যন্তই স্বরলিপি দেওয়া হইয়াছে। এবং আরও মনে রাখিতে হইবে যে, ১৯৩৭ সালে যখন রবীন্দ্রনাথ 'বন্দে মাতরম্' সংগীতটি জাতীয় সংগীতরূপে গ্রহণ করিবার পক্ষে মত প্রকাশ করেন তখন তিনিও এই দশপ্রহরণধারিণী অংশ বর্জন করিবার কথা বলিয়াছিলেন।

এসব কথা বাদ দিলেও দেখি, বাঙালীর চিত্তে বঙ্গজননীর যে মূর্তি এই চিত্রেও সেই মূর্তি। সে মূর্তি বহুআয়ুধধারিণী ভীষণ মূর্তি নয়।
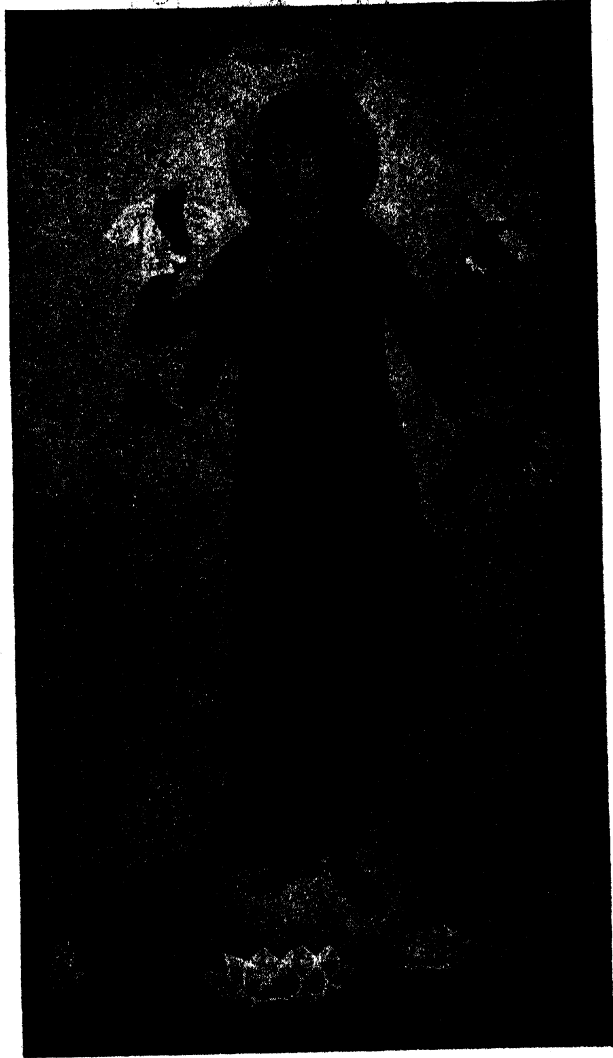
ভারতমাতা
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর অঙ্কিত

সে মূর্তি স্মিতহাসিনী বরাভয় দায়িনীর মূর্তি। এমন কি, তন্ত্রশাস্ত্রের মহামায়াকেও বাঙালী মাটির মা বানাইয়া ঘরে বসাইয়াছে। 'আনন্দমঠে' জাতিবৈর ও শত্রুনিধনের আখ্যান আছে বলিয়া যিনি সুহাসিনী ও সুমধুরভাষিণী তিনিই আবার বহুবলধারিণী এবং রিপুদলবারিণী। তথাপি বলতে পারি, বন্দে মাতরমের প্রধান ভাব—

শ্যামলাম সরলাম্
সুস্মিতাং ভূষিতাম
ধরণীং ভরণীং মাতরম্।

এবং এই ভাবটিই হরিশ্চন্দ্রের চিত্রের ভাব। এই চিত্রে চারিদিক ফুলে ফলে শোভিত, ইহাতে বহু শিশুর আনন্দমেলা, মধ্যে শিশুক্রোড়ে বঙ্গজননীর মূর্তি। রেখা-বিন্যাসের ধরনটি সুন্দর হইলেও চিত্রটি যে উচ্চাঙ্গের এমন কথা বলি না। তবে ইহাতে মাতৃমূর্তির রুদ্র রূপটি ফুটিয়া উঠে নাই বলিয়া ইহার অপ্রশংসা করি না। কারণ এ ভাবটি তখন আমাদের দেশমাতৃকার কল্পনায় প্রবেশ করে নাই। বঙ্কিমের কল্পনায়ও বঙ্গজননীর এই রূপই দেখিতে পাই তাঁহার 'কমলাকান্তের দপ্তরে': "আর বঙ্গভূমি! তুমিই বা কেন মণিমাণিক্য হইলে না, তোমায় কেন আমি হার করিয়া কণ্ঠে পরিতে পারিলাম না"। এবং আনন্দমঠেও জন্মভূমিই জননী এবং ইহাই ভবানন্দের কথা —"আমাদের কাছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জ-সমীরণ-শীতলা শস্য-শ্যামলা—" বস্তুত 'বন্দে মাতরং' দুর্গা-স্তব নয় যদিও দেখি এখানে দেশ, জননী ও দেবী একাকার হইয়া আছে। যে ভুল বিদেশী পণ্ডিত করিয়াছেন সে ভুল আমরা করিব না। ডাঃ গ্রীয়র্সনের মতে এ গান কোন এক হিন্দু দেবীর স্তব এবং তাঁহার ধারণা সেই দেবী কালী। এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকারও এই কথা। স্বদেশ যে কিভাবে জননী হয় এবং সেই জননী যে আবার কিভাবে দেবী বলিয়া পূজিত হইতে পারে একথা বিদেশী পণ্ডিত বুঝিতে নাও পারেন। অবশ্য উদ্ভ্রফের ন্যায় বিদেশী পণ্ডিতের কথা বলিতেছি না। তিনি বন্দে মাতরম্ সংগীতের মর্ম বুঝিয়াছেন। তিনি তাঁহার "শক্তি ও শাক্ত" নামে ইংরাজী গ্রন্থে এই সংগীতের যে ভাষ্য লিখিয়াছেন তাহাই ইহার যথার্থ ভাষ্য।

অবশ্য বন্দে মাতরম্ রচনার পঁচিশ-ত্রিশ বৎসর পরে অর্থাৎ সন্ত্রাসবাদের যুগে এই যে, ইংরাজ ভারতমাতার মস্তক ছেদন কল্পিত হয়। রবার্ট পেন সাহেব তাঁহার গ্রন্থে লিখিয়াছেন যে, তিনি এক ছিন্নমস্তার চিত্র দেখিয়াছেন যাহার অর্থ এই যে, ইংরাজ ভারতমাতার মস্তক ছেদন করিয়াছেন এবং তিনি নিজের রক্ত পান করিয়া বাঁচিয়া আছেন। এ বিকট মূর্তি দেখি নাই; কিন্তু ইহা যে বাঙালীর মাতৃকল্পনার সার্থক নিদর্শন নয় তাহা বলিতে পারি। কারণ আমাদের মাতৃ-সাধনায় শাক্তের শক্তিসাধনার সংগে বৈষ্ণবের প্রেমতত্ত্ব মিশিয়া আছে। কমলাকান্তের "একটি গীতে"রও এই ভাব। শ্রীঅরবিন্দও "ভবানী মন্দির" প্রবন্ধে এই ভাবের কথাই বলিয়াছেন

"The Infinite Energy is Bhawani. She is also Durga. She is Kali, she is Radha the Beloved, she is Lakshmi, she is our Mother and creatress of us all".

ব্রাহ্ম কেশবচন্দ্রেরও সেই কথা।"

"I began religion with fear and trembling, but are now emmersed in joy. First hardness, afterwards tenderness, the Father first, the Mother afterwards".

অবনীন্দ্রনাথের ভারতমাতা চিত্রেও এই বরাভয়দায়িনী স্নেহশীলা মাতৃমূর্তি। এখানে মায়ের চারি হাতের কোন হাতে কোন আয়ুধ নাই এবং মূর্তি প্রশান্ত ও করুণায় উজ্জ্বল। এ চিত্র স্বদেশী আন্দোলনের কিছু পূর্বেকার, ১৯০৩ কি ১৯০৪ সালের। কল্পশক্তিতে এবং কলানৈপুণ্যে ইহার সহিত বন্দে মাতরম্ চিত্রের তুলনা করি না। তবে ভাবের দিক দিয়া দুই চিত্র সমগোত্রীয়। এবং হরিশ্চন্দ্রের চিত্রখানি বন্দে মাতরমের প্রথম চিত্র বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও কম নয়। কারণ ইহাই আমাদের চিত্র-শিল্পে বঙ্গজননীর প্রথম ছবি।

বারো ঘর একটি উঠোন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

২৩

ঘটনাটা অপ্রত্যাশিত না।
সকালবেলা মদন ঘোষ এসে অমলকে ডেকে বলে গেল যেন সে ও তার পরিবার সব জিনিসপত্র নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

বেরিয়ে এসে বৌকে নিয়ে সে উঠোনে দাঁড়াতে বা অন্যঘরে আশ্রয় নিতে পারবে কিনা সেকথা যদিও উল্লেখ করল না বাড়িওলার সরকার।

'এটা সরকারের মুখের ভদ্রতা, বুঝলেন না, আসলে যখন জিনিসপত্র নিয়ে ঘর থেকে বেরোবে তখন সোজা আঙুল দেখিয়ে বলবে রাস্তায় নেমে যাও। অর্থাৎ তখন আর এক চোট অপমান করার সুযোগ হাতে রেখে মদন ব্যাটা এই বজ্জাতিটুকু করে গেল।'

মন্তব্যটা ঠিক কে করল বোঝা গেল না। দেখা গেল বেশ ভিড় জমেছে বাড়ির প্রত্যেকটা ঘরের দরজায় বারান্দায়। গলা বাড়িয়ে মুখ বাড়িয়ে সব। নিজেদের ঘরের সামনের লাগোয়া উঠোনে নেমে এসে অপেক্ষা করছিল কেউ কেউ।

মদন ঘোষ বলে গেছে যদি জিনিসপত্র বাঁধাছাদা না হয়ে থাকে তবে সে দারোয়ানকে দিয়ে দু'টো কুলি পাঠিয়ে দেবে।

হাত চালিয়ে ওরা সব ঠিক করে দেবেঃ 'অর্থাৎ অমলকে তাড়াতাড়ি ঘরখানা ছেড়ে দিতে সাহায্য করতে মদন দারোয়ান পাঠাচ্ছে।'

একজন কি মন্তব্য করল এবং মন্তব্য শেষ না হতে হন্ হন্ করে দু'টো কুলিকে সঙ্গে নিয়ে দারোয়ান ছুটে এলো।

দারোয়ান যে দেখতে একটা খুব ভীষণ দর্শন তা না। বরং কপালে তুলসীর মাটির ছিটা, সিঁদুরের ফোঁটা, রাম নাম মুখে, খড়ম পায়ে, আটা দুধ খাওয়া রামসিং-এর ঠাণ্ডা মিঠে চেহারা দেখলে কথা বলতে ইচ্ছা করে। এ বাড়ির ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলো পর্যন্ত এমনি রাস্তায় দেখা হলেই রামসিং-এর সঙ্গে কথা কয়। কিন্তু এখন দেখা গেল রামসিং-এর হাতে লাঠি গায়ে খাকি উর্দি পায়ে নাগরা। অর্থাৎ এখন সে কেবল দারোয়ান না, জমিদারের পাইক। পরোয়ানা নিয়ে এসেছে অবাঞ্ছিত বাসিন্দাকে বস্তি থেকে উৎখাত করতে।

অবশ্য খুব একটা হাঁক ডাক করল না সে। মনে হল বিড়বিড় ক'রে এখনও সীতা-রাম আওড়াচ্ছে। আঙুল দিয়ে আট নম্বর ঘরটা কুলিদের দেখিয়ে দিয়ে রামসিং চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

বাড়ির সবগুলো মানুষের চোখেমুখে কৌতূহল বিস্ময়। কেননা জেদী একরোখা বোকা বেকার অমল মদন ঘোষের কথামত তখনো জিনিসপত্র ঘর থেকে বার করেনি। যেন তার বার করবার ইচ্ছা নেই। দরজার পাল্লা ভেজানো।

খোট্টা কুলি দু'টো বারান্দায় উঠে 'বাবু,' 'বাবু' ক'রে দু'বার হাঁকল। ভিতর থেকে সাড়া না পেয়ে তারা কড়া ধরে নাড়া দিতে অমল দরজা খুলল।

অমলের চেহারা দেখে সকলের বুক টিপ্‌টিপ্ করছিল।

উস্কোখুস্কো চুল। চোখ দুটো লাল। গায়ে একটা ছেঁড়া গেঞ্জি এবং বৌয়ের একটা ছেঁড়া শাড়ি লুঙ্গি ক'রে পরা। সকলে অবাক হয়ে দেখল একটা লাঠি হাতে নিয়ে সে ঘুরের দরজা আগলাচ্ছে। অমল যে প্রকৃতিস্থ না হাবেভাবে সেটা খুব বেশি প্রকাশ পাচ্ছিল। সত্যি সে বেপরোয়া হয়ে দরজার পাল্লা আটকাবার কাঠটাকে অবলম্বন করে ঘর সামলাতে রুখে দাঁড়াবে কেউ কল্পনা করতে পারেনি। 'সাহস রাখে।' বাড়ির লোকদের মধ্যে একটা গুঞ্জন উঠল। 'মরদ'। কেউ কেউ বলল।

'তা না করে করবে কি। ঘরে বিয়ে করা বৌ আছে। উপোস থাকুক আর যা-ই করুক বৌয়ের সম্মান বাঁচাতে লোকের মাথায় বাড়ি দিতে অমল পিছপা হবে না, আমরা জানতাম।'

মন্তব্য শুনে আর একজন হেসে ঘাড় নাড়ল। 'মদন ঘোষ সেজন্যেই দারোয়ান আর কুলি পাঠিয়েছে। আমাদের তো ইচ্ছা ওর মাথায় যদি অমল দু'ঘা বসিয়ে দিত কাজের মতন কাজ হ'ত।'

'কে কাকে ঘা বসায় মশাই, আগে দেখুন, ওখানে কি কাণ্ডকারখানা হচ্ছে।'

'এই শালা তোদের মাথা ভেঙ্গে দেব যদি আমার ঘড়াটা ভাঙ্গে। রাসমণির বাজার থেকে আট আনা পয়সা দিয়ে আমি নতুন ঘড়া কিনেছি।'

সবাই চোখ তুলে দেখলে কুলিরা ইতিমধ্যে ঘরে ঢুকে জিনিসপত্র টেনে টেনে এনে বারান্দায় রাখছে। অমল তেমনি কাঠটা উঁচিয়ে আছে। লাফাচ্ছে চিৎকার করছে কিন্তু ঘা বসাতে পারছে না।

'দিক না বসিয়ে একটা খোট্টার মাথায়।' একজন বলতে আর একজন রীতিমত ভেংচি কেটে উত্তর করলঃ 'তা কি করে পারবে মশাই, আপনারা কি ওকে সাপোর্ট করবেন। আপনারা দূর থেকে দাঁড়িয়ে ঠাট্টাই করতে পারবেন। দিন না সকলে দু'টো করে টাকা। আপনারা কিছু চাঁদা দিলে ওর প্রায় দু'মাসের ঘর ভাড়া হবে। এখনকার মত তো লোকটা অপমানের হাত থেকে বাঁচুক। বাকি টাকা সে আস্তে আস্তে দিয়ে যাবে। বাড়িওলাকে জানালেই চলবে।'

'আমাদের কারোর একটা পয়সা দেবার ক্ষমতা নেই। আমাদের সংসার-খরচ আছে, ঘরভাড়া দিতে হয়, খেটে খাই, কেউ বসে খাই না। পারেন তো আপনিই সবটা দিয়ে দিন না। আপনার মোটর গাড়ি আছে, সোনার বেল্ড ঘড়িতে, জামায় সোনার বোতাম। নিশ্চয়ই বিত্তশালী।'

সকলেই চারু রায়ের মুখের দিকে তাকাল।

অর্থাৎ অমলকে বাড়িওলা দারোয়ান পাঠিয়ে বাড়ি থেকে উঠিয়ে দিচ্ছে এই দৃশ্য দেখতে মুদি বনমালী, কে গুপ্ত এবং তার বন্ধু চারু রায় বাড়ির ভিতর ছুটে এসেছে। চারু রায়ের হাতে একটা ক্যামেরা। ফিতে বাধা কালো চশমা চোখে, যা অন্যসময় দেখা যায় না।

বিধু মাস্টার, ডাক্তার, পাঁচু, রমেশ রায়, ক্ষিতীশ এমন কি লাঠিতে ভর দিয়ে রুগ্ন ভুবন পর্যন্ত ঘর থেকে বেরিয়ে বাইরে এসেছে।

চারু রায় পরামর্শ দিতে সবাই একসংগে প্রতিবাদ করছিল। 'ভাড়াবন্ধ হলে আমাদের উঠতে হবে তখন আপনি এসে আমাদের সাহায্য করবেন কি না জানি না।'

বেশ সরস গলায় রমেশ রায় বলল, 'এক মাস দিলুম। তারপর? তারপর যদি ওর চাকরি না হয় তখন কে চালাবে। আবার আসবেন আপনি? মশাই অনেক হিতোপদেশ দেয়া যায় দূর থেকে। একবার এবাড়িতে এসে থেকে দেখুন না। মশাই অনেক জটিলতাময় আমাদের বস্তি-বাসীর জীবন। পরোপকার করা এত সোজা না।'

'আপনারা কি কোনোদিন ওর উপকার করতে চেয়েছেন। উপদেশ দিয়েছেন অথচ শোনেনি এমন হয়েছে কি যে জিনিসটাকে খুব বাঁকা করে ধরে নিচ্ছেন?'

'নিশ্চয় করেছি। আলবৎ ওকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। ওর বৌ আমাদের স্থানীয় কলে ফ্যাক্টরীতে কাজ পায়। আমরা স্থানীয় লোক। পাঁচজন গিয়ে মালিকদের বললেই হয়। কিন্তু তা সে করবে না। প্রতিজ্ঞা করেছে কিছুতেই বৌকে চাকরি করতে দেবে না। এই করে করে নিজে তো মরেছেই কচি মেয়েটাকে পর্যন্ত মারতে বসেছে। খাওয়া নেই দু'জনের কদিন একবার জিজ্ঞেস করুন না।'

সকলেই আবার অমলের ঘরের দিকে তাকাল। আধ-পোড়া সিগারেটটা ঠোঁট থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কে গুপ্ত, বনমালী এবং চারু রায় অমল ও তার পাশে কিরণকে দেখতে পেল।

কিরণ আর ঘরের ভিতর ছিল না। সব জিনিস ওরা ঘর থেকে টেনে বার করার আগে সে বেরিয়ে এসে স্বামীর পাশে দাঁড়িয়েছিল্। আজকালকার মেয়ে তাই ঘোমটা বলতে নাক পর্যন্ত ঢাকা কাপড় না। কিরণের সুন্দর কপাল দেখা যাচ্ছিল টিকালো নাক আর ভ্রমরের পাখার মত পাত্‌লা মিশমিশে কালো ভুরু ঘেরা চোখ।

যেন বাড়ির সবগুলো পুরুষ একসংগে ঢোক গিলল।

'তা যদি সে না চায় বৌকে ফ্যাক্টরিতে পাঠাতে তো সেটাও আমি দোষের দেখি না। কেন চাইবে, ও পুরুষ, ডার্লিং-কে এ বয়সে ঘরের বাইরে যেতে দিতে কষ্ট পায়। পাওয়া উচিত।'

কেউ একথার উত্তর দিল না। চুপ করে সব চারু রায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে কাণ্ডটা দেখতে লাগল। চারু রায় পকেট থেকে মণিব্যাগ বার করল। তারপর একটা লাফ দিয়ে অমলের সামনে গিয়ে বলল, 'আমি তো এসব জানি না, আমার ফ্রেন্ড কে গুপ্তর মুখে শুনলাম। তা দেখুন মশাই, এই টাকাটা এখন নিন, দারোয়ানের হাতে দিয়ে বলুন আপনার জিনিসপত্র ছেড়ে দিক।'

চারুর হাতে নতুন করকরে নোট।

অমল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে যেমন চারু রায়কে দেখছিল তেমনি মাথার কাপড়টা ঠেলে খোঁপা পর্যন্ত সরিয়ে দিয়ে অবাক উৎসুক চোখে কিরণ টাইসুট পরা পরিচ্ছন্ন কালো ফিতে-আঁটা চশমা পরা উপকারী ভদ্রলোকটিকে দেখছিল।

চারু রায় কিরণের দিকে আর একবারও তাকাচ্ছিল না। অমলের দিক মুখ ফেরানো।

'আপনি এখন এই ঘর ছেড়ে দিন। খুঁজলে আরো সস্তামতন ঘর পাওয়া যায় এদিক-ওদিক। সেখানে চলে যান। তারপর দেখা যাক। আজ আমি কলকাতায় ফিরে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের রিং করে জিজ্ঞেস করব। আপনার নাম তো জানাই রইল। একটা চাকরি আপনাকে জুটিয়ে না দেওয়াতক্ নিশ্চিন্ত হতে পারছি না।'

অমল কথা বলল না। কিরণ মাটির দিকে তাকিয়ে। ভ্রূ দু'টি স্তব্ধ। চুপ করে যেন কি ভাবছে বোঝা গেল।

চারু অমলের হাতে নোট ক'খানা গুঁজে দিল। দিয়ে একটা নতুন সিগারেট ধরায়। কে গুপ্তর দিকে তাকিয়ে কি বলে বোঝা যায় না; অত্যন্ত নিচু গলা। গণ্ডগোল হচ্ছে শুনে বাড়ির সরকার মদন ঘোষ ইতিমধ্যেই ছুটে এসেছিল।

সরকারের হাতে দু'মাসের ভাড়া তুলে দেওয়া মাত্র কুলিরা অমলের জিনিসপত্র ছেড়ে দিল।

যেন কোথায় ঘর ঠিক করা ছিল। টাকা পেতে এখানকার ঘরভাড়া চুকিয়ে এই পরিবেশ পরিত্যাগ করতে অমলও এক সেকেণ্ড দেরি করল না। একটা লোক ডেকে জিনিসপত্র তার মাথায় চাপিয়ে দিয়ে বৌয়ের হাত ধরে সে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। কে গুপ্ত এবং বনমালীকে সংগে নিয়ে চারু রায়ও উঠোন ছেড়ে চুপচাপ রাস্তায় নেমে গেল।

'তোমাদের সকলের মুখে কে গুপ্তের ফ্রেণ্ড জুতো মেরে গেল।'

চুপ ক'রে সবাই দাঁড়িয়ে আছে দেখে বিধু মাস্টার মন্তব্য করল। মুখটা বিকৃত ক'রে শেখর ডাক্তার বলল, 'শুনেছি ছাত্র পিটিয়ে মাস্টারগুলো ক'দিন পর গাধা বনে যায়। তোমার কথা শুনে এখন তাই

পরিষ্কার চোখে দেখছি।' বলে ডাক্তার মাস্টারের দিকে না তাকিয়ে শিবনাথের দিকে তাকায়।

'কি বলেন মশাই, আমরা কে, আমাদের সঙ্গে অমলের সম্পর্ক কি। বরং বলা চলে বাড়িওলার মুখের উপর ইয়ে মারা হ'ল। দারোয়ান কুলি পাঠিয়ে জাঁক ক'রে অমলকে রাস্তায় নামানোর প্ল্যান ভেস্তে গেল।'

শিবনাথ মৃদু হেসে মাথা নাড়ল।

'কিন্তু এই পরোপকারীটি কে। হঠাৎ অমলের জন্যে তাঁর প্রাণ কেঁদে ওঠার কারণটা কি।' রমেশ রায় উত্তরের আশায় সকলের মুখের দিকে তাকায়। পাঁচু মুখ ঘুরিয়ে কাটা ঠোঁট বাঁকা করে কি ভেবে যেন হাসে, লক্ষ্য ক'রে রমেশ আরো উত্তেজিত হয়ে উঠল।

'তা যেখানেই চাঁদ যাক, আমি আমার রেস্টুরেন্টের পাওনা টাকা আদায় না ক'রে ছাড়ছি না। ইচ্ছে ছিল আজই এখনই লেংটা করিয়ে হারামজাদার পরনের কাপড়খানা খুলে রেখে দিই। জিনিস-পত্র ছাই কি আছে চোখে তো দেখলাম। ভাঙ্গা কড়াই আর ফুটো ঘটি একটা। ইস্ এতগুলো টাকা আমার, রাগে দুঃখে রমেশ দাঁত কিড়মিড় করছিল।

কিন্তু দেখা গেল তার দুঃখে সহানুভূতি জানাতে সেখানে বড় কেউ দাঁড়িয়ে নেই। পাঁচু সকলের আগে সরে পড়েছে। বিধু, যেন এসব কথায় কান নেই, শেখরের উক্তি শুনে অত্যন্ত অপমানবোধ ক'রে আকাশের দিকে তাকিয়ে বিড় বিড় করতে করতে নিজের ঘরের দিকে চলে গেছে। অমল চলে যাওয়ার পর ভুবন লাঠি ভর দিয়ে কষ্ট করে আর দরজায় দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজনবোধ করেনি। রমেশের মন্তব্য শুনে হুঁ-হাঁ কিছু না বলে শেখর ডাক্তারও রুগীর বাড়ি যাবার তাড়া আছে জানিয়ে সরে পড়ল। রমেশের পাশে বলাই এবং শিবনাথ ছাড়া আর কেউ রইল না।

উঠোনের আর একদিকে দাঁড়িয়ে মেয়েরা জটলা করছিল। আট নম্বর ঘরের লোকেরা এভাবে রক্ষা পাবে তারা একটু আগেও ভাবতে পারেনি। ঘরের দরজা এখনো খোলা পড়ে আছে। হয়তো ঝাঁটফাঁট দিয়ে পরিষ্কার করিয়ে পরে মদন ঘোষ এসে দরজায় তালা দেবে। নতুন ভাড়াটে আসছে কি না কবে আসছে কখন আসছে এবং ভাড়াটেরা কোথা থেকে আসবে ইত্যাদি আলোচনা এখনো আরম্ভ হয়নি। সেটা পরে হবে। অমল, তার বৌ কিরণ, অমল ও কিরণের উদ্ধার-কর্তা চারু রায়, এমন কি কে গুপ্তকে নিয়ে তাদের কথা হাসি টিপ্পনি ও রসিকতা শেষ হচ্ছিল না। 'মাতালের বন্ধু মাতাল ছাড়া আর কিছু হবে না তুমি খোঁজ নিয়ে দেখগে', ঝগড়াঝাটি ভুলে গিয়ে সুনীতির মা বীথির মাকে বোঝাচ্ছিল, 'হুট ক'রে পকেট থেকে এতগুলো টাকা বার করে দিলে বলি বিষয়খানা কি।'

'অমলকে চাকরি দেবে শুনিয়ে গেল তো।'

'চাকরি গাছের ফল না দিদি।' মল্লিকা মাথা নেড়ে বলছিল, 'আমার বলাটা ঠিক না, কিন্তু না বলে পারলাম না, কিরণের কপালে অনেক দুঃখু আছে। তোমরা দেখো।'

'আহা, আমি তো আর কিছু ভাবছি না,' প্রমথর দিদিমা হাত নেড়ে পাশে দাঁড়ানো হিরুর মাকে বোঝায়, 'যেখানে গেছে যদি সুখে থাকে থাকুক, কথায় বলে কুকুর বিড়ালটা বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে বুকটা খালি খালি ঠেকে, আট নম্বরের দিকে যেন তাকাতে পারছি না। এমন কষ্ট হচ্ছে।'

সকলেই অমলের ছেড়ে যাওয়া শূন্য ঘরের দিকে আর একবার চোখ ফেরায়।

'মারধর করত, তা হলেও বৌটাকে খুব ভালবাসত ছোঁড়া।' বর্ষিয়সী মন্তব্য করল।

'ওই ভালবাসাই তো হতভাগার মরণ হ'ল গো।' হেসে লক্ষ্মীমণি প্রমথর দিদিমাকে বোঝায়ঃ 'আর মুখপুড়ির রূপও দিদি! আমাদের মেয়েদেরই দেখলে গা ছম্ছম্ করে। চব্বিশ-পঁচিশ বছর বয়স খুব হবে। দেখলে আঠারোর বেশি মনে হয় না। উঠতি বয়স। আজও সেই উঠতি বয়সের লকলকে এক একটা আগুনের শিখা যেন ছুঁড়ির হাত পা আঙুল, ঘাড়, গলা, কোন্‌টা না।'

'ছোঁড়ার কেবল ভয় ওর বৌকে কে বুঝি ছিনিয়ে নেয়।' প্রমথর দিদিমা দন্ত-হীন মাড়ি বার করে হাসল। 'সেদিন ফিরিওলার হাতের সঙ্গে কিরণের হাত ঠেকেছিল কি? আহা কী মার না মারল বৌটাকে ধরে!'

'এ দু'দিন মারধর বন্ধ ছিল।'

'দু'দিন কি ও ওর মধ্যে ছিল। ঘর ছাড়তে হবে নোটিশ পাবার পর মুখখানা শুকিয়ে আমসী হয়ে গেছল।'

'দিদি বলছেন ভাল।' মল্লিকার কথায় লক্ষ্মীমণি সায় দিতে পারল না। 'ছোঁড়া গাছতলায় গিয়ে দাঁড়ালেও যখন মারবার বৌকে ধরে মারবে। তা না। মুখ কালো করার অন্য কারণ আপনাদের তো জানায়নি। শনিবার রাত্রে কিরণ আমাকে কথাটা বলল।'

'কি কি শুনি?'

কৌতূহলী মুখগুলি লক্ষ্মীমণিকে দেখছিল।

'ছেলেপিলে হবে কিরণের।' লক্ষ্মী-মণি ফিক্ ক'রে হাসল।

ভুরু দু'টো কপালে তুলে দিয়ে প্রভাতকণা আর্তনাদ ক'রে উঠল। 'বলেন কি দিদি! এই বেকার অবস্থায়। ভাল হাতেই মরতে বসেছে দু'টিতে।'

'আহা, সুনীতির মার কথা শুনলে রাগ ধরে! ঈশ্বর দিলে করবে কি। মানুষের হাত আছে নাকি।' রাগ প্রকাশ না করে লক্ষ্মীমণি খিলখিল হেসে উঠল। হাসতে হাসতে প্রায় গড়িয়ে পড়ে। পড়ল না। জঠরে তারও সন্তানের ভার ছিল।

'হুঁ', রমেশগিন্নী মানে মল্লিকা টিপ্পনি কাটলঃ 'দিদির জানবার কথা বটে। ফি বছর হাসপাতালে যাচ্ছে আর ফিরে এসে ঈশ্বরের সঙ্গে কোঁদল করছে কি না।'

কিন্তু লক্ষ্মীমণি তখনো হাসি থামায়নি। ঠোঁটের অদ্ভুত একটা ইঙ্গিত ক'রে প্রভাতকণার নাদুসনুদুস হাতের মাংসে আঙুলের গুঁতো বসিয়ে বলছিল,

'ঈশ্বরের ইচ্ছা দিদি,—ঈশ্বরের ইচ্ছা, হি-হি।'

এই লক্ষ্মীমণি আগের রাত্রে অম্বল না কিসের অসহ্য বেদনায় অস্থির হয়ে ছট্‌ফট্‌ করছিল। এখন দেখলে বিশ্বাস হয় না, কেউ করবে না বিশ্বাস। বলাই ও রমেশ রায় একসঙ্গে উঠোন থেকে বেরিয়ে যাবার পরও একমিনিট একলা উঠোনে দাঁড়িয়ে শিবনাথ লক্ষ্মীমণির কথাবার্তা শুনে ঠোঁট টিপে হাসল। লক্ষ্মীমণি ও আরও কয়েকটি বর্ষীয়সী কথা বলছিল, মার পাশে দাঁড়িয়ে মুখে কাপড় গুঁজে সুনীতি। যেন গভীর মনোযোগ দিয়ে উঠোনের মাটি দেখছিল। পূর্ণযৌবনা কুমারী। হাসি গোপন করে মা ও মাসিদের (এবাড়িতে কুমারী ছাড়া মার বয়সের প্রত্যেক স্ত্রীলোককে মাসি ডাকা হয়) সন্তান হওয়ার তত্ত্বালোচনা শুনছে। কাজে বেরিয়ে গেছে বলে কমলা, প্রীতি, বীথি এবং রুচিকে দেখা গেল না। এসব আলোচনা শুনলে ওরা কি বলত চিন্তা করতে করতে শিবনাথ নিজের কাজে রাস্তায় চলে এল।

(ক্রমশ)

বাংলা শিশু গ্রন্থসজ্জার একশ বছর

নিখিল সরকার

শিশু সাহিত্যের অঙ্গসজ্জার ইতিহাস খুব বেশী দিনের নয়। কারণ সপ্তদশ শতকের আগে আমাদের দেশ কেন, পৃথিবীর কোন দেশেই কোন চিত্রিত শিশুপুস্তক ছিল না। এর আগে গ্রন্থসজ্জা বা পুস্তকে চিত্র অলংকরণ বলতে বড়দের বইকেই বোঝাত। গ্রন্থসজ্জার আরম্ভ সেখানেই। এমন কি, এই সেদিন পর্যন্তও এজাতীয় অলংকরণ সীমাবদ্ধ ছিল শুধু মাত্র বড়দের গল্প, উপন্যাস এবং কাব্য পুস্তকাদিতেই। কিন্তু আজকের অবস্থা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত। চিত্রালংকরণের স্থান এখন ছোটদের বইয়েই সর্বাগ্রে। আজকাল বড়দের বইএ তার স্থান খুবই সীমাবদ্ধ। এবং বলতে গেলে ক্রমে সংকুচিত হতে হতে এখন কোনমতে মলাটখানাকে আশ্রয় করে টিকে আছে মাত্র। অথচ অন্যদিকে ছোটদের বই—ছবির রাজ্য, ছবি ছাড়া আজকে তা কল্পনাও করা যায় না।

বলা বাহুল্য, এই পরিবর্তনের পেছনে বিন্দুমাত্র আকস্মিকতা নেই। দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা এবং অনুসন্ধানে শিশুতত্ত্ববিদ, শিল্পী সাহিত্যিকরা জেনেছেন, illustration বা অলংকরণের প্রয়োজন শিশুর কাছেই সর্বাধিক। বড়দের ক্ষেত্রে এর প্রয়োজনীয়তা না আছে এমন নয়, তবে শিশুর কাছে এর মূল্য অপরিসীম। বড়দের বই-এ ইহা দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য-সম্পন্ন কলা এবং নিঃসন্দেহে তা কখনও কখনও অতি উপাদেয়। বিষয়বস্তুর সঙ্গে ভিন্ন আবেদন যোজনা করে—বয়স্ক পাঠককেও নবরসলোকে উত্তীর্ণ করার ক্ষমতা এর অনস্বীকার্য। (যেমন যতীন সেনের আঁকা পরশুরামের গড্ডলিকা এবং কজ্জলীর ছবিগুলো) কিন্তু তবুও বলতে হবে সাহিত্য পাঠে এ উপরি পাওনা। এ পাওনা লাভের বটে, কিন্তু শিশুর কাছে এই লাভ ছাড়াও গ্রন্থসজ্জার আরও প্রয়োজন আছে। বলা বাহুল্য, চিত্র ছাড়াও বয়স্ক পাঠকের পক্ষে পরশুরামের 'গড্ডলিকা' বা 'কজ্জলীর' রস উপভোগ কষ্টকর হতো না এই উপরি পাওনা থেকে বঞ্চিত হওয়া ছাড়া। কিন্তু 'Alice in wonderland'এ Teniel যদি তাঁর অপূর্ব ছবিগুলো যোগ না করতেন তাহ'লে এই অপূর্ব রোমাঞ্চ কাহিনীর রস বলতে গেলে প্রায় সবটুকুই থেকে যেত কিশোর পাঠক পাঠিকার নাগালের বাইরে। তাই বলতে হয় শিশুর কাছে illustration শুধু উপাদেয় নয়, রসোপলব্ধির পথে তার কাছে এটা অপরিহার্য।

তাছাড়া শিশুশিক্ষায়ও এর স্থান অতি গুরুত্বপূর্ণ। Coleridge বলেছিলেন, 'A whole essay might be written on the danger of thinking without images.' শুধু কবি সাহিত্যিক নয়—শিশুর কাছে বাস্তবিকই এ এক গুরুতর বিপদের কারণ। শিশুর জানা পৃথিবীর পরিধি অতি ছোট। আর অজানার প্রতি স্বাভাবিক আগ্রহও তার অতি প্রবল। এই আগ্রহকে শুধু মাত্র মুখে বলে বা বই-এ লিখে তৃপ্ত করা সহজ নয়, সম্ভবও নয়। কারণ তখন মন বা কানের চেয়ে বেশী কার্যকরী থাকে তার চোখ। তাছাড়া শুনে শেখা এবং দেখে জানার পার্থক্যও আছে। অপরিচিতের অবলম্বনকে আশ্রয় করে গড়ে ওঠা জ্ঞান স্বভাবতই দুর্বল হতে বাধ্য। তাই মনস্তত্ত্ববিদ এবং শিক্ষা-ব্রতীদের মতে বক্তব্যকে পরিস্ফুট করার জন্য তো বটেই, কৌতূহলকে বাড়ানোর জন্যেও শিশুর বই-এ ছবি অপরিহার্য। তাছাড়া উপযুক্ত ছবি শিশুর কল্পনাকে প্রসারিত করবে যেমন তাকে আনন্দও দেবে প্রচুর।

শিশু-মনের গড়ন এবং তার প্রয়োজন সম্বন্ধে এ জাতীয় ধারণা থেকেই শিশু শিক্ষা, শিশু-সাহিত্যে গেল দুই শতকে নানা যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটেছে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। অঙ্গসজ্জার পরিবর্তনও বহুলাংশে তাকেই অনুসরণ

"ডাক পাড়ে ও ঐ
ভাত আনো বড়ো বৌ।"
সহজপাঠ ১ ॥ রবীন্দ্রনাথ

"মালাচন্দন তৈরি রাখা চাই।"
সহজপাঠ ২॥ রবীন্দ্রনাথ

করছে মাত্র। তবে শিশুসাহিত্যের অঙ্গসজ্জায় বর্তমানে যে বিস্ময়কর উন্নতি সাধিত হয়েছে তার পেছনে অন্য কারণও আছে। তার মধ্যে প্রধানতম হচ্ছে ছাপাখানায় পরিবর্তন। ছাপাখানা যেভাবে দ্রুত উন্নতিলাভ করছে তার জন্যেই সম্ভব হয়েছে শিশুগ্রন্থের চিত্রের আঙ্গিকগত পরিবর্তন এবং রূপকলার নব নব ভাবের সার্থক রূপায়ন।

আমাদের দেশের শিশুপুস্তকের অলংকরণে শিশুসাহিত্য এবং শিক্ষাদর্শের আধুনিক ভাবধারা কতখানি সার্থকতার সঙ্গে অঙ্গীভূত হয়েছে এবং এক্ষেত্রে আমাদের অগ্রগতি কতদূর সম্ভব হয়েছে ইতিমধ্যে তা আলোচনা করতে গেলে একটু তুলনামূলক আলোচনা প্রয়োজন। যদিও গ্রন্থসজ্জার ঐতিহ্য আমাদের বহুদিনের প্রাচীন তবুও আমাদের আধুনিক শিশুসাহিত্যের সজ্জায় ইউরোপীয় শিশুসাহিত্যের অলংকরণকেই গ্রহণ করা হয়েছে আদর্শ হিসাবে। সুতরাং তার কথাই সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক্।

"পান্ত ভূতের জ্যান্ত ছানা।"
আবোল-তাবোল ॥ সুকুমার রায়

English Emblem Book (সপ্তদশ শতক)—ইংরেজী শিশুসাহিত্যের প্রথম চিত্রিত পুস্তক। অবশ্য এই বইগুলো শিশুদের জন্য রচিত হয়নি—তবুও আকারে প্রকারে এগুলোই ছিল ছোটদের পাঠযোগ্য একমাত্র বই। এই কালেই ইংরেজী শিশুসাহিত্যে পরবর্তী উল্লেখযোগ্য যোজনা—Chap Book এবং Bwick-এর New Lottery Book of Birds and Beasts. এগুলোর মধ্যে একমাত্র সাময়িক খ্যাতি অর্জন করেছিল Chap Bookগুলো। Chap Bookএর উপাখ্যানাংশে থাকতো — Robinson Crusoe, Robinhood এবং Jack the Giant Killer ইত্যাদি রোমাঞ্চ কাহিনী। রঙগীন চিত্র তখনও আবির্ভূত হয়নি—তাই এইসব বইয়ের পাতায় পাতায় দেওয়া হতো উড্ ব্লকের ছোট ছোট ছবি। সে সব ছবি অধিকাংশ স্থলেই ছিল স্থূল। তাদের আদিমতা এবং রক্তলোলুপতা শিশুমনের ক্ষতি সাধন করতে পারে এই আশঙ্কায় Chap Book ত্যজ্য হলো, অতি অল্পকাল মধ্যেই। এর স্থান দখল করলো তখন—আবার Emblem Book। তবে এবারকার Emblem Bookগুলো ছিল পূর্বাপেক্ষা ভিন্ন—অনেক সংস্কৃত। উপাদেয় নীতিমূলক গল্প ছিল তার বিষয়বস্তু এবং চিত্রাদিও ছিল পূর্বেকার চেয়ে অনেক উন্নত। তাছাড়া এতকাল ইংরেজী শিশুসাহিত্যে গল্পের স্থানই ছিল মুখ্য—এবার থেকে চিত্রকেও প্রাধান্য দেওয়া হলো সেখানে।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সূচনা—রঙগীন পুস্তকের আবির্ভাবে। Roseoe'র The Butterfly's Ball (১৮০৭) ইংলণ্ডের প্রথম রঙগীন Toy Book. এই Toy Bookএর আবির্ভাব এক যুগান্তকারী ঘটনা। কারণ রঙগীন চিত্রের আবেদন যে শিশুমনে কতখানি—এই প্রথম শিশুগ্রন্থের রচয়িতা এবং প্রকাশকরা তা বুঝতে পেলেন। ফলে তখন থেকেই শুরু হলো ব্যাপকভাবে রঙগীন চিত্র প্রকাশের চেষ্টা। কারণ Roseoe'র বই-এর ছবিতে তখনকার অন্যান্য ইংরেজী রঙগীন চিত্রের বই-এর মতই রং লাগানো হতো হাতে। এবং একাজে নিযুক্ত শ্রমিকরা ছিল শিশু!

Toy Book-এর কিছুদিন মধ্যেই উদ্ভাবিত হয় উড্ ব্লকেই রঙগীন চিত্র প্রকাশের পন্থা। (Edmund Evans নামক এক ব্যক্তি এই পদ্ধতির আবিষ্কর্তা)। এর পর ছোট বড় আরও অনেক পরিবর্তন ঘটেছে ইংরেজী শিশু-সাহিত্য-জগতে। তবে তাদের অধিকাংশই ছিল ছবি প্রকাশের ব্যবস্থা সম্পর্কিত। সাহিত্যের ক্ষেত্রে ভিক্টোরীয় নৈতিকতা দীর্ঘতর হওয়া ছাড়া দীর্ঘদিন অন্য কোন পরিবর্তন লক্ষিত হয়নি। বিষয়বস্তুর ক্ষেত্রে নূতনতর পথের সন্ধান দেয় সর্বপ্রথম জার্মানীর Brothers Qrimm (১৮২৪) এবং Struwwelpeter (১৮৪৮)। নীতিকথার পীড়ন থেকে মুক্তি পেল ইউরোপীয় শিশুরা। কল্পনাকে তৃপ্ত করার আকাঙ্ক্ষা এতদিনে পূর্ণ হলো পরী আর স্বপনরাজ্যে যদৃচ্ছ বিহারের সুযোগ পেয়ে।

পরবর্তীকালে এই ধারায় ইংলণ্ডের বিশিষ্ট দান—Alice in wonderland (১৮৬৯)। বিষয়বস্তুর মত চিত্রসজ্জায়ও শিশুকে নূতন রূপজগতের সন্ধান দেওয়া হয় উল্লেখিত বইগুলোতে। বিষয়বস্তু এবং চিত্রের সার্থক সমন্বয়ের আজও প্রকৃষ্ট উদাহরণ—এই যুগের ইংরেজী শিশু পুস্তক। মুদ্রণকলার ক্ষেত্রে Cromolithography'র উদ্ভাবন এই উনিশ শতকের আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আজ পর্যন্ত শিশুগ্রন্থে রঙগীন চিত্র প্রকাশে এই প্রক্রিয়াকেই অনুসরণ করা হয়ে থাকে অধিকাংশ দেশে।

আধুনিককালে শিশুসাহিত্য-জগতে পরিবর্তন যা ঘটেছে মুখ্যত তা শিশু পুস্তকের বিষয়বস্তু এবং সজ্জা পরিকল্পনার আদর্শে। পরিবেশনগত পরিবর্তন তার তুলনায় নগণ্য। উনবিংশ শতকের নবলব্ধ শিশুদর্শন আজ আরও ব্যাপকভাবে অনুসৃত হচ্ছে শিশু সাহিত্যের রচনায়। নিত্য নতুন গবেষণাও চলছে বিভিন্ন দেশে। বিচিত্র পরিকল্পনায় রং বেরং-এর পুস্তক প্রকাশিত হচ্ছে প্রতিনিয়ত। একাজে আজ এক-যোগে হাত লাগিয়েছেন—মনোবৈজ্ঞানিক সাহিত্যিক শিল্পী এবং প্রকাশক। সুতরাং স্বভাবতই বিগত শতকের তুলনায় আজকের শিশু সাহিত্য অনেক উন্নত। মুদ্রণকলা সম্পর্কিত বর্তমান উল্লেখযোগ্য ঘটনা ত্রিবর্ণ হাফটোন, অফসেট এবং রঙগীন লিথোর উদ্ভাবন এবং প্রয়োগ। ইংরেজী শিশু সাহিত্যে ত্রিবর্ণ চিত্র-শোভিত প্রথম শিশু পুস্তক—The tale of Peter Rabbit. শুধু এই বইখানিই নয় Beatrex Potter-এর সম্পূর্ণ সিরিজটিই (১৯০২—৩০) যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল গোটা ইউরোপে। এছাড়াও রঙগীন চিত্রের অন্যান্য অনেক বই শিশু - সাহিত্যে প্রকাশিত হয়েছে এবং অদ্যাবধি হচ্ছে। শুধু চিত্র নয় উৎকৃষ্ট চিত্র এবং রঙগীন চিত্র বর্তমান শিশুজগতের চাহিদা। বিস্ময়কর উপায়ে এবং বিচিত্র পরি-

আগডোম বাগডোম

বাল্যশিক্ষা

...হেসেছে এবং ...তাই আমাদের শিশু ...। ...তাবোলে'র কবির দায়িত্ব ...রূপ সদা সতর্ক, সচেতন। ...ার দায়িত্ব নিয়েছিলেন—বাংলা

বর্ণপরিচয়।

অ অজগর।

আ আনারস।

ই ইঁদুর।

ঈ ঈগল।

উ উট।

ঊ ঊর্দ্ধবাহু।
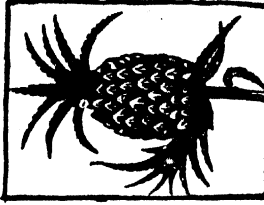
বর্ণপরিচয় । ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

দেশের হুঁকোমুখো হ্যাংলা—যাদের সর্ব অবস্থাতেই হাসতে মানা, তাদের তিনি হাসাবেন। কবিতায় তিনি তাতে সমর্থ হয়েছেন—এমনকি, ছবিতেও। আবোল তাবোল-এ ছবির সঙ্গে কথার যোগ কবির কথাতেই স্পষ্ট। ট্যাস গরুর বর্ণনাক্লান্ত কবি অবশেষে বলছেন—'বর্ণিতে রূপ গুণ সাধ্য কি কবিতার, চেহারার কি বাহার ঐ দেখ ছবি তার।' সত্যিই এই রূপ—এমন জ্যান্তভাবে বর্ণনা করা কবিতার সাধ্য নয়। শুধু এই একখানা ছবি নয়—খাপছাড়া অসম্ভবের, আবোল তাবোলে যে রূপ রাজ্যের সৃষ্টি কবি এই বইখানাতে করেছেন—তার অর্ধেক রূপই তার ছবিগুলোতে। ছবিগুলো যথার্থই এই বইয়ের অলঙ্কার। বার বার মনে হয়, ছবির উদ্দেশ্য বোধ হয়. এমনভাবে সার্থক হতো না, যদি সুকুমার রায়ের মত শিল্পী নিজেই তুলি হাতে না নিতেন। কবি নিজেই যদি তাঁর মানসমূর্তিদের এমনভাবে রেখাবন্ধ না করতেন—তাহলে কি হতো জানি না, তবে 'খুড়োর কলের' শুধু পরিকল্পনা (Plan) অনুযায়ী কল নির্মাণ বা 'ভয় পেয়ো না' কবিতার চরিত্রটির মত চরিত্র চিত্রণ বোধ হয় অন্যভাবে হতো না। সুকুমার রায়ের এই বহুরেখ চিত্রগুলোর আর একটি গুণ ব্যঙ্গাত্মক হাস্যরস। কোন কোন ছবি পাঞ্চের (Punch) বিখ্যাত ব্যঙ্গচিত্রীদের স্মরণে আনে। তবে পার্থক্য এই, আবোল তাবোলের এই হাস্যরস আড়াই বছরের শিশুর চোখও এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

উল্লেখিত পুস্তকগুলো ছাড়া আধুনিকতম কালে বিভিন্ন আঙ্গিকে এবং বিভিন্ন হাতে আমাদের শিশু-সাহিত্যের রূপসজ্জা আরও সমৃদ্ধতর হচ্ছে। অন্তত আঙ্গিকের দিক থেকে বর্তমানে আমরা অনেকখানি এগিয়েছি, তাদের সকলের কথা আলোচনা করার অবকাশ এখানে নেই। তবে দু-একটি বিশেষ ঘটনার উল্লেখ না করলে এই আলোচনা অসমাপ্ত থেকে যাবে।

সমসাময়িক কালে শিশু গ্রন্থের বিশেষ চিত্রনের কথা বলতে প্রথমেই আসে শিল্পাচার্য নন্দলালের আঁকা রবীন্দ্রনাথের সহজ পাঠ (১৩৩৭) প্রথম ও দ্বিতীয়বারের ছবিগুলোর কথা। বলতে গেলে আমাদের শিশু-সাহিত্যে নানা দিক থেকে এগুলো উজ্জ্বলতম অলঙ্করণ। আঙ্গিকের দিক থেকে এগুলো অবশ্য নূতন নয়—কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী এবং চিত্র হিসাবে এগুলো পূর্বেকার সমস্ত চিত্র থেকে ভিন্ন, প্রথম ভাগের ছবিগুলো উড্‌কাটে সাদায় কালোয় অঙ্কিত, অনাড়ম্বর, সহজ, স্পষ্ট এবং স্থির চিত্র, কখনও কখনও একটু নক্সাধর্মী। প্রাত্যহিক অতি পরিচিত বস্তু এবং মানুষের এ এক অপরূপ মিছিল। রবীন্দ্রনাথের গদ্যের যে অনাড়ম্বর, সহজ সুর ধ্বনিত হয়েছে বইখানিতে—ছবিগুলো অতি অপূর্বভাবে সঙ্গতি স্থাপন করেছে তার সঙ্গে। তাছাড়া বই-এর বিষয়বস্তুর নিছক চিত্রগত বিবৃতি এগুলো নয়, শিশু পড়ছে এক কথা, আর চোখ মেলে তাকিয়ে দেখছে ভিন্ন চিত্র। বাহ্যত ভিন্ন, কিন্তু ভাবে উভয়েই এক, শুধু মাত্র কল্পনার একটুখানি

অবকাশ, লেখা আছে "চ ছ জ ঝ দলে দলে, বোঝা নিয়ে হাটে চলে।" উপরে তাকিয়ে ছবি দেখা গেল—সারি সারি ছোট বড় বড় তালগাছ দূরে মাঠের পারে দাঁড়িয়ে—চলমান মানুষের সংগে এই স্থবির গাছের পার্থক্য দৃশ্যতও কিছু আছে বটে—কিন্তু শিশুর কল্পনার কাছে এ এক অভিনব অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতা নন্দলালের চিত্রের ভাববস্তুকে অবলম্বন করে—যে কেমন করে নবরূপালোক সৃষ্টিতে সক্ষম—'ছড়ার ছবি' রচনায় কবিগুরু তা দেখিয়েছেন। বাস্তবিক পাঠ্যবস্তুকে সহজভাবে উপলব্ধি করবার এবং সেই সংগে শিশু কল্পনার প্রসারের পক্ষে নন্দলাল যে চিত্রগুলো উপস্থিত করেছেন, তা যে কোন দেশের শিশু-শিক্ষায় নব আদর্শ বলে বিবেচিত হবে। দ্বিতীয় ভাগের ছবিগুলো আবার একটু ভিন্ন রকমের। এগুলো রেখাশ্রয়ী এবং প্রথম ভাগের স্থির ভাগ এখানে ভংগীযুক্ত, কখনও কখনও ঘটনার সালংকার বিবৃতিও এখানে রয়েছে। তবে অপেক্ষাকৃত স্বল্প রেখায় অংকিত বলে—তাতে শিশুর পক্ষে রসগ্রহণে অসুবিধা হওয়ার কারণ নেই। ছবিগুলোর এই পরিকল্পনা ছোটদের রং লাগানোর সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে করা হয়েছে বলে জানান হয়েছে ভূমিকায়। এদিক থেকেও বইখানায় ছবি অভিনব। মহৎ শিল্পীর রেখার বেষ্টনী রং-এ ভরতে ভরতে আনন্দের সংগে ভাবের যদি সামান্য স্পর্শও পায় কোন শিশু, তাহলে এই রং-এর খেলা সার্থক হবে তার জীবনে—এইটুকু বলেই নন্দলালের কথা শেষ করছি। কবিগুরুর লেখার সংগে শিল্পাচার্যের এই রেখার সংগত যে ঐকতানের সৃষ্টি করেছে, এই বইগুলোতে লিখে বোঝানো তা অসম্ভব। তবে এই-টুকু বলতে পারি, সাম্প্রতিক কালে বাংলা ভাষায় এমন সার্থক শিশু-পুস্তক আর রচিত হয়নি।

বাংলা শিশু-পুস্তকের আর একটি দিক রংগীন চিত্রের দিক। রংগীন চিত্রের ব্যাপারে আমরা এখনও অন্য দেশের তুলনায় অতি পশ্চাদবর্তী। তবে গত কয়েক বছরে লিথো, হাফটোন, অফসেট প্রভৃতি আধুনিক প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু দ্বিবর্ণ, ত্রিবর্ণ, এমনকি, বহুবর্ণ পুস্তকও

শিশুপাঠ্য গ্রন্থাবলী ॥ যোগীন্দ্রনাথ সরকার

রচিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। এমনকি, শুধু রংগীন শিশু-পুস্তকের প্রকাশার্থে সম্প্রতি কয়েকটি প্রকাশনালয়ও আবির্ভূত হয়েছে আমাদের দেশে। হাট্টিমা টিম, আগডুম বাগডুম প্রভৃতি ছড়ার বইএ শিল্পী গোপাল ঘোষের অংকিত রংগীন চিত্রগুলো আমাদের শিশু-সাহিত্যে রংগীন চিত্র রচনায় নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করতে পারে। প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়ের অংকিত চিত্রাদিও অনুরূপ প্রশংসা পাবার যোগ্য। তবে বর্ণের ঔজ্জ্বল্যে, বিষয়-বস্তুর সংক্ষিপ্ততায় এবং চিত্রের বলিষ্ঠতায় গোপাল ঘোষের প্রচেষ্টা বোধ হয় শিশু-মনের অধিকতর নিকটবর্তী। যাহোক উভয়ে স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে যোগ্যতার পরিচয় দিয়েছেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দনযোগ্য। অন্যান্য আধুনিক শিশু গ্রন্থের

ঠাকুরমার ঝুলি ॥ দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

আলঙ্কারিক হিসাবে অনেক শিল্পীই যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন।

পরিশেষে একটা কথা বলেই এই আলোচনার উপসংহার করছি। দেশে শিল্প শিক্ষার উন্নতি, আংগিকগত নব নব পরীক্ষা ও পরিবেশন ব্যাপারে বিবিধ উদ্ভাবনের ফলে বাংলা শিশু-সাহিত্যের অংগসজ্জা আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে, তার চেয়ে উন্নততর দিনের সম্ভাবনার লক্ষণ অতি স্পষ্ট। বিখ্যাত সাহিত্যিকদের অকৃপণ দানে এবং শিল্পী-দের মমতাময় সহযোগিতায় যে ঐতিহ্য ইতিমধ্যেই গড়ে উঠেছে—তার এখানেই শেষ মনে করার কোন সংগত কারণ নেই। তবুও এ বিষয়ে সতর্ক হওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে। কারণ এতক্ষণ বাংলা শিশু-সাহিত্যের আলোর দিকটাই শুধু আলোচিত হয়েছে, এর উল্টো দিকও আছে। সাধারণ গল্পপুস্তক কিংবা প্রাথমিক, মাধ্যমিক বইয়ের পাতা উল্টালেই দেখা যাবে—তার নজীর কম নয়। সাধারণ কমার্শিয়াল চিত্রকরের হাতে পড়ে সস্তায় আমোদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে জঘন্য চিত্রও শিশু-পুস্তকের অলঙ্করণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, এমনকি, পাঠ্য-পুস্তকেও এ-জাতীয় শিল্পীদের হাতে পড়ে আকবর বা বুদ্ধ সম্পূর্ণ ভিন্ন চরিত্রে পরিণত হয়েছেন, এমন দৃষ্টান্তও আছে।

• সাময়িক আনন্দ দান করা ছাড়াও শিশুর বই-এর চিত্র যেখানে তার শিক্ষা তথা জীবন গঠনের সংগে যুক্ত সেখানে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলেরই আরও যত্নবান হওয়া উচিত।

চন্দ্রদত্ত

মোটর, বাস, লরী প্রভৃতির আলোগুলি খারাপ হয়ে গেলে বিশেষ অসুবিধা ঘটে। বিশেষত পিছন দিকের আলো খারাপ হয়ে গেলে অনেক সময়ে ড্রাইভার জানতেও পারে না। এই সব কারণে ড্যাশ বোর্ডের ব্যবস্থাটা খুবই সুবিধাজনক, এটি ড্রাইভারকে সময়মত সতর্ক করে দেয়। যখন সমস্ত আলো ঠিক থাকবে তখন একটি লাল আলোর ঝলকানি দেখা যাবে। যদি একটির বেশী আলো খারাপ হয়ে যায় কিংবা কোথাও শর্ট সার্কিট থাকে তাহলে লাল এবং হলদে আলো দেখা যাবে এবং মোটরের তলায় খুব জোরাল লাল আলোও দেখা
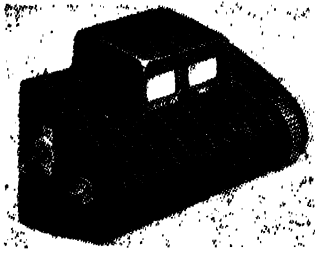
ড্যাশ বোর্ড

যাবে। কুয়াসাচ্ছন্ন দিনে একটা সুইচ টিপলেই তীব্র লাল আলো জ্বলে ওঠে। আরও একটি সুইচ আছে এবং পিছনে অন্য কোনও গাড়ী এসে পড়লে সেটাকে পাশ কাটিয়ে যেতে দেওয়ার জন্য একটি আলোর নির্দেশ দেওয়া হয়।

*

সমুদ্র তীরে বসে বসে ঝিনুক সংগ্রহ করার বাতিক শুধু মাত্র শিশুদের মধ্যে দেখা যায় না অনেক প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তিকেও ঝিনুক সংগ্রহ করতে দেখা যায়। এই ঝিনুক অবশ্য শুধু মাত্র খেলার বস্তু নয়। এরাও সৃষ্টির একটি অদ্ভুত জীব। বৈজ্ঞানিকরা এদের নিয়ে নানাবিধ গবেষণা করে থাকেন। এ'রা বলেন যে, এক বছরে একটি ঝিনুক ১০,০০০০০০০০০ ডিম ছাড়ে। হিসাব করে দেখা গেছে যে, এই সমস্ত ডিমযদি ঝিনুকে পরিণত হয় তাহলে ক্রমান্বয়ে পাঁচ পুরুষ ধরে সমুদয় ঝিনুকের ওজন যত হবে সেটা আটটি পৃথিবীর ওজনের সমান। অবশ্য ঠিক এতটা সম্ভব হচ্ছে না কারণ এদের মধ্যের ছোট ছোট ডিম ও ছোট ঝিনুকগুলি জলের মধ্যের অন্য প্রাণীরা খেয়ে নষ্ট করে ফেলছে। ঝিনুকদের জীবনযাত্রা প্রণালীও বড় অদ্ভুত। এদের মধ্যে কতক জলে সাঁতরায়, কতক গাছের ওপরে বাস করে কতক মাটির মধ্যে গর্ত করে বাসা করে আর কতকগুলি সরু সিল্কের মত সুতোয় ঝুলে থাকে। চার ফুট লম্বা ও ওজনে ৫০০ পাউণ্ড থেকে আরম্ভ করে একটি ছোট্ট আলপিনের মাথার মত ঝিনুকও দেখা যায়। এদের মধ্যে আবার কেউ কেউ চার্বাক মুনির উপদেশ সম্যক উপলব্ধি করতে পেরেছে—তারা জীবনের অধিকাংশ সময় খেয়ে কাটায়। কতকগুলি বাইরে থেকে জল নিয়ে কানকোর সাহায্যে শরীরের মধ্যে চালনা করতে থাকে এতেই ওদের খাদ্যের সংস্থান হয়। এইভাবে তারা বছরে প্রায় ১০ হাজার গ্যালন জল ছাঁকতে পারে। সাধারণভাবে আমাদের ধারণা যে, ঝিনুক কিছুটা স্থবির। বস্তুত এদের মধ্যে অনেকেই জলে খুব তাড়াতাড়ি সাঁতার দিতে পারে এমন কি দরকার হলে লাফিয়ে যেতে পারে। অনেক সময় দেখা গেছে যে, কোনও ঝিনুককে মাটির মধ্যে থেকে বার করে এনে জলে ছেড়ে দিলে জেটের মত খুব জোরে জোরে জল কেটে কেটে চলে।

*

সরীসৃপ জাতীয় জীবকে চিড়িয়াখানায় এনে খাঁচার মধ্যে সুস্থ শরীরে রাখা একটি সমস্যার বিষয়। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এরা এই রকম অস্বাভাবিক পরিস্থিতির মধ্যে এসে, বেশ অসুস্থতা বোধ করে। নিউইয়র্কের একটি চিড়িয়াখানা সরীসৃপদের সুস্থ শরীরে রাখার জন্য একটি নতুন ব্যবস্থা করেছেন। এই ব্যবস্থামত একটি সরীসৃপ-গৃহ করেছেন; এখানে ৫০টি সরীসৃপ রেখেছেন। এ'রা বলেন যে, যে রকম আবহাওয়া এবং পরিস্থিতির মধ্যে এরা স্বাভাবিক অবস্থায় বাস করে চিড়িয়াখানায় এনে সেই সমস্ত ব্যবস্থা কৃত্রিম উপায়ে করতে পারলেই এদের সুস্থ রাখা যায়। এদের খাদ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না রাখলেও চলে। যে সব জীবকে সমুদ্র থেকে আনা হয় তাদের জন্য সবুজ রংএর খাঁচার ব্যবস্থা, মরু জাতীয় জীবেদের জন্য হলদে বা ধূসর বর্ণের খাঁচা থাকে। শুষ্ক আবহাওয়া থেকে যাদের আনা হয় তাদের জন্য খাঁচার মধ্যে শুষ্ক হাওয়ার ব্যবস্থা করতে হয়, যারা খুব বেশী সূর্যতাপে থাকতে অভ্যস্থ তাদের জন্য আলাদা করে ইনফ্রা-রে অথবা আলট্রা ভায়োলেট-রে দেওয়ার বন্দোবস্ত থাকে। এ ছাড়া সমস্ত খাঁচার মধ্যে তাপের সমতা বজায় রাখার জন্য বিশেষভাবে বৈদ্যুতিক তাপের বন্দোবস্ত করতে হয়। সংগে সংগে লক্ষ্য রাখা দরকার হয় যে, খাঁচাগুলির মধ্যে যেন যথেষ্টভাবে আলো বাতাস সরবরাহ হয়।

*

ঘুমিয়ে নাক ডাকা আমরা একটা রোগ বলেই জানি। ডাঃ ডথ্ওয়েট কিন্তু নাক ডাকার অন্য কারণ বলেন। তিনি বলেন যে, পুরুষরা মেয়েদের চেয়ে বেশী নাক ডাকায়। আর এই নাক ডাকার অভ্যাস পুরুষরা আদিম যুগের মানুষের কাছ থেকে পেয়েছে। সেই সময় পুরুষরা নাক ডাকানোর শব্দে তাদের বাসস্থান গুহার কাছে রাত্রিতে কোন লোককে আসতে দিত না। সেই আদিম যুগের অভ্যাস আজও মানুষের অবচেতন মনে আছে বলা যায়। ডাঃ ডথ্ওয়েট বলেন যে, যদি পুরুষ তার স্ত্রীকে নাক ডাকানোটা গভীর ভালবাসার নিদর্শন বলে বোঝান তাহ'লে স্ত্রী সেটা মেনে নিতে পারেন। কিন্তু এতে স্ত্রী সত্যিকার নাক ডাকানোর অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পাবেন না। সেইজন্য ডাক্তারের মত হচ্ছে স্বামী স্ত্রী আলাদা ঘরে শোয়া ভাল। আর যাতে স্বামী আলাদা ঘরে শোয়ার জন্যে মনে মনে দুঃখিত না হন তার জন্যে সব দোষটা ডাক্তারের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে পারেন। স্ত্রী স্বামীকে বোঝাতে পারেন যে, ডাক্তার বলেছে যে, আলাদা ঘরে শুলে নাক ডাকা রোগটা সেরে যেতে পারে।

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

ব্যক্তিগত জীবনকে লোকচক্ষুর আড়ালেই রাখতে চেয়েছেন চার্লি, কিন্তু সে-চেষ্টা তাঁর সফল হয়নি। তার কারণ, শুধু অভিনেতা-চার্লিরই নয়, ব্যক্তি-চার্লির পরিচয় লাভের জন্যও দর্শকদের কিছু কম আগ্রহ ছিল না। চার্লির আরও কাছাকাছি আসতে চেয়েছে তারা, আরও নিবিড়ভাবে তাঁকে জানতে চেয়েছে। চার্লির তাতে কোনদিনই উৎসাহ ছিল না, এখনও নেই। নিজেকে একটু দূরে সরিয়ে রাখতেই তিনি ভালবাসেন। কোথায় তাঁর জন্ম, কী পরিবেশে তাঁর জীবনের প্রথমাংশ অতিবাহিত হয়েছে, এসব নিয়ে তো বটেই, তাঁর পরবর্তী জীবনের কার্যকলাপ সম্পর্কেও সাধারণ মানুষের গবেষণার অন্ত নেই। কত কথাই তো তাঁর সম্পর্কে রটেছে। কিন্তু সেসব সত্য কি না, জিজ্ঞেস করেও চার্লির কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া যায়নি। নিতান্ত নিরুপায় অবস্থায় না পড়লে, তাঁর কাছ থেকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কোনও তথ্য সংগ্রহ করা প্রায় অসম্ভব বললেও চলে।

প্রথম যৌবনেও দূরে সরে রইলেন তিনি—তাঁর চিন্তা, তাঁর স্বপ্ন—যা তাঁর নিজস্ব, তার মধ্যেই মগ্ন হয়ে রইলেন। সেই তন্ময়, আত্মমগ্ন শিশুটি, এতদিনেও তাঁর কোনও পরিবর্তন ঘটল না। খুব ঘনিষ্ঠ, অন্তরঙ্গ কয়েকজন বন্ধুবান্ধব ছাড়া আর প্রায় কেউই কখনও তাঁকে চেনেনি, কারো কাছেই তিনি ধরা দেননি। বলাই বাহুল্য, আজ পর্যন্ত যে ক'জন তাঁকে চিনেছেন, সীডনি তাঁদের অন্যতম।

এ যখনকার কথা বলছি, চার্লি তখন রীতিমত বিখ্যাত মানুষ। তাছাড়া তাঁর বিত্তও তখন দিনে দিনে আরও বেড়ে চলেছে। সুখের কথা, খ্যাতি আর ঐশ্বর্যের সিংহদুয়ারে পৌঁছনর পরেও তাঁর দৃষ্টি-ভঙ্গীর কোন পরিবর্তন ঘটল না, তাঁর শিল্প-বুদ্ধির একাগ্রতাও অবিকৃত রইল। নির্জনতাকে ভালবাসতেন চার্লি, কিন্তু শৈশবের সেই প্রাণোচ্ছলতাও তিনি হারান নি। নানান রকমের যন্ত্রসঙ্গীতে তখনও তাঁর সমান আগ্রহ। বেহালা আর চেলো, এ দুটি তিনি সুন্দর আয়ত্ত করেছিলেন; পিয়ানোতেও তিনি অপটু ছিলেন না। বহির্জগতের জীবনস্রোতের থেকেও নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখেন নি চার্লি, কোনও দিনই না। তবে হ্যাঁ, বহির্জগৎ বলতে শুধু গোটাকয়েক দেশকেই তিনি বুঝতেন না,—বুঝতেন সেই নিপীড়িত অগণ্য অসংখ্য মানুষকে, জীবন-সংগ্রামের তাড়নায় যারা অস্থির হয়ে উঠেছে, ক্ষুধায় আর রোগে যারা জীবন্মৃত, সেই অবর্ণনীয় দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের কোনও উপায়ই যাদের নেই। বুঝতেন, কেননা এ-অবস্থা তাঁরও একদিন ছিল।

পৃথিবীর একটা বিরাট অংশ জুড়ে তখন প্রথম মহাযুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠেছে। তাঁর স্বদেশও তখন যুধ্যমান। সেই সংকটকালে চার্লিও স্থির থাকতে পারেননি। কীভাবে তিনি স্বদেশের সেবা করতে পারেন, জানতে চেয়ে ওয়াশিংটনের ব্রিটিশ দূতাবাসে তিনি একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। উত্তরে তাঁকে পরামর্শ দেওয়া হয়, তিনি যেন শুধু ছবিই তুলে যান, তাতেই তাঁর দেশকে সেবা করা হবে। সরাসরি তাঁকে যুদ্ধক্ষেত্রে পাঠিয়ে কোনও লাভ নেই, তাঁর চাইতে তিনি যদি খানকয়েক ভাল ছবি তুলতে পারেন তো সে-ছবি দেখে সৈন্যদের মনোবল আরও বৃদ্ধি পাবে। তাতেই কাজ হবে বেশী। পরামর্শ না চেয়ে সরাসরি গিয়ে যুদ্ধে নাম লেখাতে পারতেন চার্লি। খুবই সত্যি কথা। কিন্তু তার চাইতেও বড় সত্য এই যে, সেই সময়ে যে-সব ছবি তিনি তুলেছেন

"কারমেন" চিত্রের একটি দৃশ্য

"দী ফায়ারম্যান" চিত্রে চার্লি

তা দেখবার জন্য রণক্লান্ত লক্ষ লক্ষ ফরাসী আর ইংরেজ সৈন্য এসে তখন লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকত। চার্লিকে দেখতে আসত তারা। দেখত আর হাসত। সমস্ত অবসাদ কেটে যেত তাদের। নতুন উদ্যমে আবার গিয়ে তারা রণক্ষেত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ত। চার্লি যদি যুদ্ধে যেতেন, এমন কিছুই শক্তি-বৃদ্ধি হত না ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর; না গিয়েই ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর শক্তি তিনি আরও বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। সেই নিদারুণ সংকটের মধ্যে সৈন্যদের মুখেই শুধু নয়, হাসপাতালের অসংখ্য রোগী আর আতংকগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর মুখে যে অপরূপ হাস্যচ্ছটা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন, তার মূল্যও যে অসামান্য।

হ্যারি লডারও সেই সময়ে সৈন্যদের জন্য প্রমোদানুষ্ঠানের আয়োজন করবার কাজ নিয়েছিলেন। পরে তাঁকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়। যুদ্ধ শুরু হবার কিছুদিন বাদে তিনি হলিউডে আসেন। চার্লির অনুরোধে তখন তিনি তাঁর একটি ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। আহত সৈন্যদের সাহায্যার্থে কিছু অর্থসংগ্রহের জন্যই এ-ছবি তোলা হয়।

চার্লির প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষান্বিত হয়ে কিছু-কিছু লোক যে তাঁর ক্ষতিসাধনের চেষ্টা করবে, এটা খুবই স্বাভাবিক। তাঁর সম্পর্কে তারা এই সময় নানান রকমের কুৎসা রটিয়ে বেড়াতে লাগল। কেউ কেউ বলল, তিনি ভীরু, যুদ্ধে যাবার সাহস তাঁর নেই। কেউ কেউ আবার ভয় দেখিয়ে চিঠি লিখল কয়েকখানা। কেউ বা তাঁর কাছে অর্থ দাবি করল,—কেউ দাবি জানাল, চার্লির ছবিতে তাকে কাজ দিতে হবে, তা নইলে তাঁর সমূহ বিপদ ঘটতে পারে। সৈনিকরা কিন্তু সত্যিই ভালবেসেছিল চার্লিকে, বুঝেছিল যে, চার্লস চ্যাপলিন তাদের একজন অকৃত্রিম বন্ধু। চার্লিকে নিয়ে গানও বেঁধেছিল কয়েকখানা। রণাংগনে মার্চ করতে করতে তারা গাইত—

"For the moon shines bright on
Charlie Chaplin
His shoes are cracking
For want of blacking
And his little baggy tronsers will
want mendin'
Before they send him
To the Dardanelles."

শুধু সৈন্যরাই নয়, ইংল্যান্ডে আর অ্যামেরিকায় লক্ষ লক্ষ শিশু তখন ছড়া কাটত—

"One, two, three, four,
Charlie Chaplin went to war.
He taught the nurses how to
dance,
And this is what he taught them:
Heel, toe, over we go.
Heel, toe, over we go;
Salute to the King
And bow to the Queen
And turn your back on the
Kaiserine."

দেয়ালের গায়ে বল ছুঁড়ে দিয়ে তারা গাইত—

One, two, three O'Lairy
My ball's down' the airey,
Don't forget to give it to Mary
And not to Charlie Chaplin."

চার্লস চ্যাপলিনের খ্যাতি যে তখন কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, ছোট্ট একটি ঘটনার থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। লস এঞ্জেলসের এক প্রেক্ষাগৃহে তখন নাইংসিনস্কি-সম্প্রদায়ের নৃত্যানুষ্ঠান চলছে। নাইংসিনস্কির হঠাৎ চোখে পড়ল, দর্শকদের মধ্যে চার্লস চ্যাপলিনও বসে আছেন। তৎক্ষণাৎ নৃত্যানুষ্ঠান বন্ধ করে দিলেন তিনি, চুপি-চুপি চ্যাপলিনকে অনুরোধ করে পাঠালেন, অনুগ্রহ করে তিনি যেন একবার সাজ-ঘরে এসে তাঁর সংগে দেখা করেন। এমনিতেই চার্লি একটু লাজুক প্রকৃতির মানুষ, এইরকমের বাড়াবাড়িতে তিনি যে আরও বিব্রত হয়ে পড়বেন সে-কথা বলাই বাহুল্য। সে যাই হোক, সাজ-ঘরে এসে দেখেন, তুমুল কাণ্ড। তাঁকে শুধু একবার দেখবার জন্য নাইংসিনস্কি-সম্প্রদায়ের সবাই যেন পাগল হয়ে উঠেছে। এক-একজন করে তাঁর কাছে আসে, আর তাঁকে আলিংগন করে যায়। আলিংগনের পর্ব শেষ হতে প্রায় আধ ঘণ্টা লাগল। দর্শকরা ওদিকে এর বিন্দুবিসর্গও জানে না। কেন যে হঠাৎ অনুষ্ঠান বন্ধ করে দেওয়া হল, ভেবে ভেবে তাদের প্রায় মাথা খারাপ হবার উপক্রম।

চার্লস চ্যাপলিনের সাফল্যে বিভ্রান্ত হয়ে তখনকার দিনের অনেক নামজাদা অভিনেতাও যে তাঁকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করবেন, এতে বিস্ময়বোধের কোনও কারণ নেই। এঁদের মধ্যে সর্বাগ্রে নামোল্লেখ করতে হয় বীলি ওয়েস্টের। ওয়েস্ট শুধু তাঁর পোশাক, হাঁটার কায়দা আর হাঁসিটুকুকেই নকল করে ক্ষান্ত ছিলেন না, তাঁর প্রত্যেকটি অংগভংগি তিনি নকল করতেন। বীলি রীচিও চার্লির একজন প্রসিদ্ধ অনুকারক। আগে ইনি কার্নো-সম্প্রদায়ে চার্লিরই সংগে অভিনয় করতেন। মেক্সিকোর এক অভিনেতা—নাম অ্যামাডর — চার্লির নামটাকে পর্যন্ত নকল করে নিজের নতুন নামকরণ করলেন চার্লি অ্যাপলিন। কিন্তু সবকিছুকে নকল করা গেলেও ব্যক্তিত্বকে কখনও নকল করা যায় না। যায় না বলেই এঁরা ব্যর্থ হয়েছেন।

চার্লির অভিনয়-শিল্পের সেই সূক্ষ্মতা, সেই প্রগাঢ় প্রাণৈশ্বর্যকে এ'রা আয়ত্ত করতে পারেননি। দর্শক-সমাজ প্রথম-প্রথম এ'দের অভিনয় দেখে অল্পবিস্তর হাততালি দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু কিছুদিন বাদেই বুঝতে পারা গেল যে, চার্লিকেই তাঁরা চান, অন্য আর কাউকেই না।

(১২)

মীউচুয়ালে এসে প্রথম যে বই তোলেন চার্লি, তার নাম "দী ফ্লোর-ওয়াকার"। এ বই আরম্ভ করবার আগে তিনি বেশ কিছুদিন সময় নিয়েছিলেন। নতুন কোনও একটা বিষয়বস্তু খুঁজে নিতে চাইছিলেন তিনি, অথচ কোনও রকমেই তার নাগাল পাচ্ছিলেন না। আকস্মিকভাবেই হঠাৎ একদিন তিনি তার সন্ধান পেয়ে গেলেন। সকালবেলা, কী একটা জিনিস কিনতে চার্লি একটা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে এসে ঢুকেছেন। এসকেলেটরের উপরে হঠাৎ একটি মানুষের উপরে তাঁর চোখ পড়ল। ছোটখাটো মানুষটি, আগে কখনও বোধ হয় এসকেলেটরে ওঠেনি, চোখে-মুখে নিদারুণ একটা আতংক ফুটে উঠেছে। চার্লি বুঝতে পারলেন, ছোট্ট এই দৃশ্যটির মধ্যেই হাস্যরসের এক অফুরন্ত উৎস নিহিত হয়ে রয়েছে। তবে হ্যাঁ, ঠিকমত একে কাজে লাগানো চাই। লাগিয়েও-ছিলেন। "দী ফ্লোরওয়াকার" ছবিখানি যাঁরা দেখেছেন, এসকেলেটরের উপরে অপরাধীর পিছনে পুলিশ-বাহিনীর সেই দৌড়োদৌড়ির দৃশ্যগুলি তাঁরা কখনোই বোধ হয় ভুলতে পারবেন না। এ-বইয়েও প্রভূত পরিমাণে স্ল্যাপস্টীকের আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল। সত্যি বলতে কি, মীউচুয়ালের হয়ে তৃতীয় যে-বইখানি তিনি তোলেন, তার আগে পর্যন্ত স্ল্যাপস্টিকের আশ্রয় তিনি ছাড়তে পারেননি। এরিক ক্যাম্বেলের নাম সবাই শুনেছেন। এই বইয়েই চার্লির সঙ্গে তাঁর প্রথম চিত্রাবতরণ। লম্বায় ছ ফুট চার ইঞ্চি, ওজনে কুড়ি স্টোনেরও কিছু বেশী। চার্লিকে তাঁর পাশে এতই অসহায় দেখত যে, সে আর বলবার নয়। এবং, পার্শ্বচরিত্রে অভিনয় করবার জন্য, এইরকমের একটি দৈত্যসদৃশ মানুষই তিনি চাইছিলেন। এরিকের জন্ম স্কটল্যাণ্ডে, বছর কয়েক কার্নো-সম্প্রদায়ে তিনি অভিনয় করেছিলেন, চিত্রাভিনয়ের হাতেখড়ি হয়েছিল লণ্ডনে। ১৯১৭ সালে এক মোটর-দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন। মৃত্যুকাল পর্যন্ত চার্লির কাছেই তিনি ছিলেন। এরিকের জায়গায় চার্লি এরপর যাঁকে নিয়ে এলেন, তাঁর নাম ম্যাক সোয়েন। দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে এবং

"দী ভ্যাগাবণ্ড" চিত্রে চ্যাপলিন

ওজনে এরিকের সঙ্গে তাঁর খুব বেশী পার্থক্য ছিল না।

"দী ফ্লোরওয়াকার"-এর পরবর্তী বইয়ের নাম "দী ফায়ারম্যান"। এ-বই-খানার মধ্যে ভারী সুন্দর কয়েকটি দৃশ্য আছে। এক জায়গায় দেখা যায়, চার্লির উপরওয়ালা (বলাই বাহুল্য, তিনি এরিক ক্যাম্বেল) এসে জঘন্যভাবে তাঁকে গালা-গালি করছেন। খানিক বাদে সেই দুর্ব্যবহারের জন্য অনুতপ্ত হয়ে চার্লির কাছে তিনি ক্ষমা চাইতে এলেন। রেগে আগুন হয়ে ছিলেন চার্লি। এরিক তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতে আসতেই এরিকের মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চার্লি তাঁকে একটি লাথি কষিয়ে দিলেন। নিরীহ চার্লি যে হঠাৎ এইভাবে খেপে যাবেন, এরিক তা বোধ হয় ভাবতেও পারেননি। লাথির চোটে তিনি একটা জলের গামলার মধ্যে গিয়ে ছিটকে পড়লেন। ব্যাপার দেখে চার্লির তো চক্ষুস্থির। তিনি বুঝলেন যে, এরিকের কাছে এবারে আর তাঁর নিস্তার নেই। পাশেই ছিল একটা খুঁটি। প্রাণভয়ে তরতর করে খুঁটি বেয়ে তিনি উপরে উঠে গেলেন। এরিক ততক্ষণে গামলা থেকে উঠে খুঁটির নীচে এসে দাঁড়িয়েছেন, চার্লিকে তিনি উচিত শিক্ষা দিয়ে ছাড়বেন। চার্লি বুঝলেন, প্রাণ বাঁচাবার কোনও উপায়ই আর নেই। তখন আর কী করেন, চোখ বুজে ঈশ্বরকে ডাকতে লাগলেন চার্লি। সে-ডাক ঈশ্বরের কাছে গিয়ে পেঁছিল বোধ হয়, কেননা খানিক বাদেই দেখা গেল, এরিকের কাছে তাঁর প্রণয়িনী (এডনা পারভিয়াস) এসে দাঁড়িয়েছে। প্রণয়িনীকে দেখে চার্লিকে শাস্তি দেবার কথা ভুলে গেলেন এরিক এবং চার্লিও রক্ষা পেয়ে গেলেন।

বইখানা খুব উপভোগ্য হয়েছিল বটে, কিন্তু চার্লি-প্রতিভার নতুন কোনও পরিচয় এখানে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেল এর পরবর্তী ছবিতে, "দী ভ্যাগাবণ্ড"-এ। পুরাতন সমস্ত চিন্তা-ধারাকে বিসর্জন দিয়ে এখানে তিনি এক নতুন চিন্তাধারার পথে অগ্রসর হয়েছেন। পরবর্তীকালে এই বইয়েরই ভাবনা-বিন্যাসকে অনুসরণ করে আরও দুখানি বই তিনি তুলেছিলেন,—"দী কীড" আর "দী সার্কাস"। প্রথম জীবনে যে কখানি ছবি তৈরি করেছেন চার্লস চ্যাপলিন, তার মধ্যে "দী ভ্যাগাবণ্ড"ই বোধ হয় সবচাইতে উল্লেখযোগ্য। এবং সবচাইতে তাৎপর্যময়।

প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, একটা ভাটি-খানার সামনে বসে তন্ময় হয়ে চার্লি তাঁর বেহালা বাজিয়ে যাচ্ছেন। কিন্তু

পাশেই এত জোরে এক জার্মান পার্টির ব্যাণ্ড বাজছে যে, চার্লির বাজনা একেবারে শুনতেই পাওয়া যাচ্ছে না। নিরুপায় হয়ে চার্লি গিয়ে খাবার টেবিলের সামনে একটা চেয়ার টেনে বসলেন। বৃদ্ধ এক ইহুদী সেখানে স্যাডউইচ খেতে বসেছেন। স্যাডউইচের উপরকার কাগজের মোড়কটি খুলে দিয়ে তাঁকে সাহায্য করলেন চার্লি। তারপর কিছু অর্থলাভের আশায় টুপিটা খুলে তাঁর সামনে এগিয়ে দিলেন। জার্মান ব্যাণ্ড-পার্টির কর্তা তো রেগে আগুন। তারা ওদিকে ব্যাণ্ড বাজিয়ে মরছে, আর কোত্থেকে এক বাউণ্ডুলে এসে খদ্দেরদের কাছ থেকে ভিক্ষে নিয়ে যাবে, এ তাঁর সহ্য হল না। চার্লিকে তিনি তাড়িয়ে দিলেন। দৃশ্যটি দেখলেই আমার চার্লির ছেলেবেলাকার একটি ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তখন নাচ দেখাতেন শিশু চার্লি। তাঁর কাছেই আর-এক ভিক্ষুক বসে ব্যারেল অর্গ্যান বাজাত। অর্গ্যানের তালে তালে নাচ দেখিয়ে দর্শকদের কাছ থেকে পয়সা রোজগার করেন চার্লি, সেই ভিক্ষুকের তা পছন্দ নয়। চার্লিকে দেখলেই সে তাই তাঁকে তেড়ে মারতে যেত।

"দী ভ্যাগাবণ্ড" বইয়ে এর পর দেখা যায়, শহর ছেড়ে চার্লি গ্রামাঞ্চলে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ঘুরতে ঘুরতে একটি যাযাবর-কন্যার (এডনা) সঙ্গে দেখা হল তাঁর। দরিদ্র মেয়ে, কাপড় কাচতে কাচতে সে কাঁদছিল। বেহালা শুনিয়ে চার্লি তাকে চাঙ্গা করে তুললেন। তার ফলে ঘটল আর-এক বিপদ। খুশির চোটে মেয়েটি তখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। তার হাতের ঠেলা লেগে উলটে পড়ল সাবান-জলের বালতি, চারদিকে জল গড়িয়ে পড়ল। শব্দ শুনে যাযাবরদের সর্দার সেখানে এসে উপস্থিত। চার্লিকে তো সে তাড়িয়ে দিলই, মেয়েটিকেও খুব একচোট ধমকে দিল।

চার্লি ওদিকে এক গাছে উঠে আত্ম-গোপন করেছেন। সুযোগ বুঝে সেখান থেকে নেমে এসে যাযাবরদের তিনি একে-একে ধরাশায়ী করে ফেললেন। তারপর যাযাবরদেরই গাড়িতে উঠে মেয়েটিকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন তিনি। পরের দৃশ্যগুলি খুব মজার। হাতুড়ি দিয়ে চার্লি ডিম ভাঙবার চেষ্টা করছেন, মেয়েটির চুলে সাবান মাখিয়ে দিচ্ছেন, এইরকমের কয়েকটি দৃশ্য এরপর আছে।

দিনকয়েক বাদে এক শিল্পী এসে উপস্থিত। তার খুব ইচ্ছে, মেয়েটির সে একটি ছবি আঁকবে। চার্লি দেখলেন, ছবি আঁকার অছিলায় মেয়েটির সঙ্গে সে খুব ভাব জমিয়ে তুলেছে। তিনি নিজেও তখন ছবি-আঁকার চেষ্টায় লেগে গেলেন। তা নইলে যে মেয়েটির মন পাওয়া যায় না। এ-দৃশ্যটি দেখে হাসি তো পায়ই, সেই সঙ্গে মনের কোন্ অলক্ষ্য কোনায় একটু বেদনার বাষ্পও যেন ছলছল করে ওঠে। ছবি আঁকতে গিয়ে ব্যর্থ হলেন চার্লি, এবং বুঝলেন, শিল্পীর কাছ থেকে মেয়েটিকে ফিরিয়ে আনা তাঁর পক্ষে আর সম্ভব হবে না। শিল্পী ইতিমধ্যে মেয়েটির ছবি এঁকে এক প্রদর্শনীতে পাঠিয়ে দিয়েছে। সেখানে এক ধনী মহিলা ছবি দেখতে এসে আবিষ্কার করলেন যে, এ-ছবি তাঁর হারানো মেয়ের। বেদেরা তাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল।

"দী ভ্যাগাবণ্ড"-এর শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, বিরাট একটি গাড়িতে করে মেয়েটি তার মায়ের সঙ্গে চলে যাচ্ছে, পাশে বসে রয়েছে সেই শিল্পী। আর চার্লি? বিষণ্ণ মুখে তিনি যাযাবরদের সেই গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। মেয়েটি চার্লির দিকে ফিরে তাকাল, তারপরেই চার্লিকে একরকম জোর করেই তাদের গাড়ির মধ্যে টেনে নিল সে। আনন্দ আর বেদনা, পরস্পরবিরোধী এই দুটি অনুভূতিকে চার্লি এমন অঙ্গাঙ্গি-ভাবে তাঁর এই বইখানির মধ্যে মিশিয়ে দিয়েছেন যে, দেখে বিস্ময় না মেনে উপায় থাকে না।

শিল্পবোধ এবং অভিনয়ের বিচারে এর পরের বইখানাকে চার্লস চ্যাপলিনের একটি বিশিষ্ট অবদান বলে গণ্য করা যেতে পারে। বইখানার নাম "ওয়ান এ. এম."। গোড়ার দিকে এক ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে একবার দেখা যায়। তাঁর কথা ছেড়ে দিলে, বইয়ের বাকী অংশে একমাত্র চার্লি ছাড়া দ্বিতীয় কোনও অভিনেতা নেই বললেই চলে। কুড়ি মিনিটের এই বইয়ে তিনি একাই অভিনয় করে গিয়েছেন।

এ-বইয়ে তাঁর বেশভূষা আদৌ অগোছালো নয়, বেশ ধোপদুরস্ত। মাথায় সিল্কের টুপি। রাত করে তিনি বাড়ি ফিরেছেন। বাড়ির মধ্যে সাজানো রয়েছে নানান রকমের জীবজন্তুর মৃতদেহ। ঢুকেই আছাড় খেয়ে পড়লেন চার্লি। তারপর যে-দিকেই তাকান, চোখের সামনে ভয়াবহ সেই জন্তুগুলির মুখচ্ছবি ভেসে ওঠে। দেখতে দেখতে ভয় পেয়ে গেলেন চার্লি, এমন কি, দেয়ালের দিকে তাকাতেও তাঁর ভয় করতে লাগল। অনেক কষ্টে ভূমিশয্যা থেকে উঠে সিঁড়ি বেয়ে টলতে টলতে তিনি উপরে চললেন। সিঁড়ির মাথায় মস্ত একটা ঘড়ি। যেই না চার্লি উপরে গিয়ে পৌঁছেছেন, মাথার উপরে খটাস্ করে পেণ্ডুলামের ধাক্কা লাগল। সেই অতর্কিত আঘাতে সিঁড়ি বেয়ে তিনি নীচে গড়িয়ে পড়লেন আবার। কার্নো-সম্প্রদায়ে থাকতে দৌড়ঝাঁপের বিদ্যাটাকে বেশ উত্তমরূপে আয়ত্ত করে-ছিলেন তিনি, এ-বইয়ে সে-বিদ্যা বেশ কাজে লেগে গিয়েছিল। কিন্তু একটা কথা এখানে বলা দরকার। দৌড়ঝাঁপের কসরত দেখাতে গিয়ে কোনওখানেই তিনি মাত্রা হারাননি, সব-সময়েই সুন্দর একটি সংযম বজায় রেখেছেন। সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত অনেক কষ্টে তো তিনি তাঁর শয়ন-কক্ষে গিয়ে পৌঁছলেন। সেখানে পৌঁছে আর-এক বিপদ। বোতাম টিপে বিছানাটাকে খুলে নিতে হয়। কিন্তু যতই বোতাম টেপেন চার্লি, বিছানা আর খুলতেই চায় না। অনেক ধস্তাধস্তির পর খুলল বটে, তবে পুরোটা নয়। কিন্তু যেই না চার্লি তার মধ্যে গিয়ে শুয়েছেন, অমনি সেটা গুটিয়ে গেল আবার। দৃশ্যটা দেখে হাসতে হাসতে বেদম হয়ে পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত চার্লি করলেন কি, সর্বনাশা সেই বিছানার কবল থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে চৌবাচ্চার মধ্যে গিয়ে শুয়ে পড়লেন।

(ক্রমশ)

নখদর্পণ

উত্তমপুরুষ

আজ বৈঠকের প্রথম দিন, শুরুতেই দু' একটা কথা খোলাখুলি বলে নিই। ইংরাজিতে যাকে টার্মস্ অব্ রেফারেন্স বলে, সম্পাদক মশাই সে-রকম ছক এঁকে দেননি। অল্প কথায় এদেশ-ওদেশের সাহিত্যের ধারা এবং সাহিত্যিকদের সম্পর্কে ছোটখাটো খবর আপনাদের পৌঁছে দিতে হবে, তাঁর ফরমাশ মোটামুটি এই। সাহিত্যের নানা সমস্যা নিয়ে বৈঠকী ধরনে আলোচনাও চলতে পারে। এক কথায় নখদর্পণে দুনিয়া দেখাতে হবে। কিন্তু গান যদি একাকী গায়কের না হয়, বৈঠকও শুধুমাত্র আড্ডাধারীর নয়, সুতরাং বলাই বাহুল্য, আমি পাঠকের সক্রিয় সহায়তা প্রত্যাশা করব। উপহাস্যতা লাভের ভয় কালিদাসের মত আমারও আছে।

* * *

রবর্ট গ্রেভ্‌স রোমক সাম্রাজ্যের ইতিহাসের এক অধ্যায় নায়কের জবানীতে উপন্যাসের মত চিত্তাকর্ষক করে লিখেছেন। প্রথম পংক্তিতেই নায়ক এইভাবে কথারম্ভ করেছে : I, Claudius Nero Tiberius Germanicus... ইত্যাদি। এই অহং-কার পাঠকেরা নিশ্চয় এই লেখকের ছদ্মনামেও লক্ষ্য করে ভ্রূকুঞ্চন করেছেন। উত্তমপুরুষ কথাটির মধ্যে বিনয় একেবারে নেই (বস্তুত যে-বস্তুটি বিনয় দেয়, সেই বিদ্যাই আমার নেই)। উত্তমপুরুষ অর্থ, আমি। যে-বৈয়াকরণ এটিকে উদ্ভাবন করেছিলেন, সন্দেহ নেই তিনিও প্রচণ্ড রকমের অহংবাদী। আমি উত্তম, আর তুমি, নেহাৎ সামনে আছ, তাই মধ্যম। এরই চরম রূপ 'সোঽহং'-য়ে; রাষ্ট্রিক বিকার ফরাসী রাজার 'l'etat c'est moi' বাচনে। আমি অবশ্য 'ইগো'-র কাছে এখনও দাসখৎ লিখে দিইনি। বক্তা হিসেবেই 'উত্তমপুরুষ' ছদ্মনামটি নিয়েছি।

* * *

কাগজ কলম মন, এই তিনে মিলে যে দ্রব্যটি তৈরী হয়, তার নাম, কথা (ছবিও হতে পারে, কিন্তু আমরা এখানে শুধু সাহিত্যের আলোচনাই করছি)। কথা অর্থ এখানে শব্দব্রহ্ম নয়, লাখ কথার এক কথাও নয়, কাহিনী। দৃষ্টান্ত : 'বৃহৎকথা', 'কথাসরিৎসাগর'। 'কথা-শিল্পী' শব্দটিও আমরা অধুনা এই অর্থেই ব্যবহার করে থাকি। ইংরেজরা বলে 'কল্পনা'—fiction কবিতাও কল্পনালতা, তবু তাকে fiction কেন বলে না জানিনে। বলতে কি, কবি যত নিরঙ্কুশ, গদ্যকথাকার ততটা নন, তাঁর ঘুড়ির সুতোয় ঢিলে পড়লেও নাটাই শক্তহাতেই ধরা থাকে, তার নাম বাস্তবতা-বোধ। ট্রুথ্ ফিকসনের চেয়ে শুধু স্ট্রেঞ্জার নয়, স্ট্রংগারও বটে। ব্যতিক্রম অবশ্য আছে, ওয়াণ্ডারল্যাণ্ডের গল্পে, ওয়েলসের ফ্যাণ্টাসীতে, হক্সলীর 'নবীন বিশ্বের' কল্পনায়। আধুনিককালে মঙ্গলগ্রহবাসীদের পৃথিবী আক্রমণ নিয়ে অনেক রোমাঞ্চক কাহিনী রচিত হচ্ছে, যে-কোন বিদেশী পত্রিকার পাতা ওল্টালেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অস্বীকার করবার উপায় নেই, পুরোবর্তী লেখকদের মধ্যে অনেকেই এখনও সত্য-সন্ধ, সমালোচকদের পরিভাষায় যাঁদের বলা হয় Realist. কিন্তু রচনা শুধু 'যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং' হলেই চলে না, তাকে শিল্পের কোঠায় উত্তীর্ণও হতে হয়। (দোহাই আপনাদের, কিসে শিল্প হয়, আর কিসে শিল্প হয় না, এই গোলমেলে প্রশ্নটা তুলবেন না, স্বয়ং সাহিত্যদর্পণকার থেকে অস্কার ওয়াইল্ড্ পর্যন্ত কেউ এই সমস্যাটা সম্পর্কে সন্তোষজনক পাঁতি দিতে পারেননি)।

তা-ছাড়া, দৃষ্টবস্তুমাত্রই সত্য নয়, এ-কথা শুধু বেদান্ত বলে না, পৃথিবীর যে-সব দেশে রাষ্ট্রের ফরমাশে সাহিত্য রচিত হয়ে থাকে, সে-সব দেশেও এই মায়াবাদেরই একটা নতুন সংস্করণ দেখা দিয়েছে। আমরা প্রচলিত অর্থে যাকে রিয়ালিজম্ বলি, সেটা আসলে নাকি 'বুর্জোয়া ফর্মালিজম্'—অন্তত রাষ্ট্রহিতগতপ্রাণ নব্য দার্শনিকেরা তাই বলেন। এর বৈজ্ঞানিক বিকল্প হল, 'সোভিয়েট রিয়ালিজম্'। একটি গল্প বললে দুটি বস্তুর তফাৎ পরিষ্কার হবে।

* * *

উরালের পিছনে ইস্পাতের কারখানা তৈরী হচ্ছে। এক লেখকের ইচ্ছা হল তিনি, এই পটভূমিকায় একটি উপন্যাস রচনা করবেন। কর্তৃপক্ষের সম্মতি নিয়ে তিনি সেই অঞ্চলে বাস করতে এলেন। উদ্দেশ্য, স্বচক্ষে সব কিছু দেখবেন আর লিখবেন। লিখলেনও। যথাকালে আট-ন'শো পৃষ্ঠার একটি সুদীর্ঘ উপন্যাস প্রকাশিত হল—হাজার হাজার ঘর্মাক্ত মানুষের সমবায় শ্রমে একটি বিরাট সৃষ্টির কাহিনী। রাষ্ট্রশক্তি প্রীত, সুতরাং বহু মিলিয়ন কপি বই বিক্রী

হল, লেখক সম্ভবত 'হীরো অব কালচার' কিম্বা অনুরূপ কোন খেতাব পেলেন।

মাস কয়েক পরে লেখকের ডাক পড়ল পুলিস অফিসে, লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীতে গোপন নির্দেশ গেল, এই বইয়ের প্রচার বন্ধ করে দাও। লেখক পুলিস অফিস থেকে বেরিয়ে এলেন, মুখ শুকনো, বেরিয়েই বললেন, ভওবা। তিনি ভুল করেছেন, তাঁর অন্তর এখন অনুতাপ-বাণে বিদ্ধ। কেউ হয়ত বললে, ভুল করবেন কেন, আপনি তো জনগণের জয়ধ্বনিই দিয়েছেন। লেখক আমতা আমতা করে বললেন, দিয়েছি বটে; কিন্তু সেই সংগে একথাও যে লিখেছি, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে শ্রমিকেরা কারখানায় এসেছে, ভাল রাস্তাঘাট নেই, ওরা তীব্র শীতে জর্জর হয়েছে।

তাঁকে বলা হল, তাতে কী। এত অসুবিধা সত্ত্বেও এত বড় জিনিস গড়ে উঠেছে, এতে সর্বদুঃখজয়ী মানুষের কথাই তো বলা হল। তা-ছাড়া, ওদের দুর্দশার কথাও তো সত্যি, আপনি নিজ চক্ষে দেখেছেন।

লেখক গদগদ গলায় বললেন, তখন আমার দৃষ্টি 'বুর্জোয়া ফর্মালিজমে' আচ্ছন্ন ছিল। যা দেখেছি তাই লিখেছি, কিন্তু বুঝিনি বইটি লেখা শেষ হতেই অন্তত ছ'মাস কাটবে, সরকারি অনুমোদন পেতে আরও ছ'মাস। ছাপা হয়ে বইটি বেরুতে বেরুতে সবশুদ্ধ অন্তত বছর দেড়েক কেটেছে। এতদিনে রাস্তাঘাটের নিশ্চয়ই উন্নতি হয়েছে, মজুরদের কোয়ার্টারেও শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত কি আর হয়নি। জেনে-শুনে আমি পাঠকদের ঠকিয়েছি, আমার নরকেও স্থান নেই। যথার্থ দিব্যদৃষ্টি আমার যদি থাকত, তবে আমি পূর্বেই সব অনুমান করে ঠিক ঠিক লিখতে পারতুম।

এই 'দিব্যদৃষ্টির'ই অন্য নাম নব্য রিয়ালিজম্।

নোবেল পুরস্কার

সাহিত্যে এ বছর নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আর্নেস্ট হেমিংওয়ে। খবরটা তাঁকে যখন পোঁছে দেওয়া হ'ল, তখন তিনি হাভানায়। সাংবাদিক সবিনয়ে তাঁর কাছে একটি 'বাণী' চাইলেন। হেমিংওয়ে বললেন, বাণী আর কী দেব, তবে মার্কিন লেখকেরাই কেন যে বারম্বার এই পুরস্কারটি পায় ভেবে পাইনে।

সন্দেহ নেই, হেমিংওয়ে কিছু অত্যুক্তি করেছেন। বারবার নয়, যতদূর জানি তাঁর আগে আমেরিকার চারজন মাত্র সাহিত্যিকের ভাগ্যে এই পুরস্কার জুটেছে—সিনক্লেয়ার লুইস, ইউজীন ও'নীল, পার্ল বাক এবং উইলিয়ম ফকনার। হেমিংওয়ের খ্যাতি বা প্রতিষ্ঠা এ'দের কারুর চেয়েই কম নয়, একথা শুধু পুস্তক-অনুরাগীরা নয়, সিনেমা-রসিকেরাও জানেন। For whom the Bell tolls, Farewell to arms প্রভৃতি এদেশেও রূপালী পর্দায় বারবার দেখা গেছে; 'Big Hemingway way' সিনেমা-বিজ্ঞাপনের একটি বাঁধা বুলি। পুরস্কারের শিকে ও তাঁর কপালে এই প্রথম জুটল, ইতিপূর্বেই তিনি আমেরিকার 'পুলিটজার প্রাইজ' পেয়েছেন।

কিন্তু নোবেল কমিটির মেম্বররা তাঁর প্রতিভা স্বীকৃতির যোগ্য মনে করলেন এই প্রথম। এতদিন তাঁদের ধারণা ছিল লোকটা বুঝি কেবল 'Bull, Bitterness আর Bravery'র গল্পই লিখতে জানে, মানবজীবনের গূঢ়তর, মহত্তর রহস্যের খবর রাখে না, কিন্তু কিছুকাল আগে প্রকাশিত "The old Man and the Sea" পড়ে তাঁদের সে ভুল ভেঙেছে। এ বইটি স্বাদে, পরিবেশে, চরিত্র-চিত্রণে হেমিংওয়ের অন্যান্য সব রচনা থেকে পৃথক। এর পটভূমি হাভানার তটভূমি, কুশীলব বলতে মাত্র তিনজন, একটি বালক, এক বৃদ্ধ আর একটি মাছ। এই তিন-জনকে নিয়ে লেখক অসামান্য অনুভূতি ও নৈপুণ্যের সংগে একটি করুণ কাহিনী রচনা করেছেন।

সারাজীবন ধরে বহু অর্থ রোজগার করেও হেমিংওয়ে নাকি এখন দেনায় ডুবু ডুবু, বাজারে ধারের পরিমাণ প্রায় আট হাজার ডলার। পুরস্কারের খবর পেয়ে তিনি এক-গাল হেসে বলেছেন, 'বাঁচা গেল, এবার ধারটারগুলো শোধ দেওয়া যাবে।' মার্কিন মুলুকে একজন যশস্বী লেখকেরই আর্থিক অবস্থা যদি এমন, তবে গত শতকে দাতব্য চিকিৎসালয়ে আমাদের একজন মহাকবির মৃত্যু ঘটেছিল বলে আমাদের গ্লানি কেন!

বঙ্কিম-রবীন্দ্রের দৃষ্টিতে বাংলার অতীত

প্রবোধচন্দ্র সেন

বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে লক্ষ্য করবার মতো একটি পার্থক্য এই যে, বঙ্কিমচন্দ্র ছিলেন একান্তভাবে বঙ্গমাতার ভক্ত সন্তান আর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারত-ভাগ্য-বিধাতার উপাসক। বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় ভারতীয় আদর্শ, ভারতীয় সাধনা নাই, একথা সত্য নয়: প্রচুর পরিমাণেই আছে। কিন্তু একথাও সত্য যে, তাঁর ধ্যানে ও চিন্তায় বাঙলার গৌরব ও বাঙলার গ্লানি, বাঙলার আনন্দ ও বাঙলার বেদনা, বাঙলার আশা ও বাঙলার স্বপ্নের কথাই প্রকাশ পেয়েছে অধিকতর পরিমাণে। রবীন্দ্রনাথের হৃদয়ে বাঙলার সুখ-দুঃখ এবং আশা ও স্বপ্নের কথা তুচ্ছ ছিল না, বরং অতি গভীরভাবেই তাঁর মর্মস্থানকে অধিকার করে ছিল।

উঠ বঙ্গ কবি মায়ের ভাষায়
মুমূর্ষেরে দাও প্রাণ—
জগতের লোক সুধার আশায়
সে ভাষা করিবে পান।
বিশ্বের মাঝারে ঠাঁই নাই বলে
কাঁদিতেছে বঙ্গভূমি,
গান গেয়ে কবি জগতের তলে
স্থান কিনে দাও তুমি।

আহ্বান গীতি (১২৯২) কড়ি ও কোমল

অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সের এই আকাঙ্ক্ষাতেই বোঝা যায়, বাঙলার সুখ-দুঃখ আশা-ভাবনার কথা তাঁর হৃদয়কে কত গভীরভাবে আলোড়িত করে তুলেছিল। আরও পরবর্তীকালে বঙ্গমাতাকে সম্বোধন করে কবি যে উক্তি করেছেন, তাও উল্লেখ করা যাক।

হে নিত্য কল্যাণী লক্ষ্মী, হে বঙ্গজননী,
আপন সহস্র কাজ করিছ আপনি
অহর্নিশি হাস্যমুখে। এ বিশ্বসমাজে
তোমার পুত্রের হাত নাহি কোন কাজে
নাহি জান সে বারতা। রয়েছ মা ভুলি
তোমার শ্রীঅঙ্গ হতে একে একে খুলি
সৌভাগ্য ভূষণ তব, হাতের কঙ্কণ,
তোমার ললাটশোভা সীমন্তরতন,
তোমার গৌরব, তারা বাঁধা রাখিয়াছে
বহুদূর বিদেশের বণিকের কাছে।
নিত্য কর্মেরত শুধু, অয়ি মাতৃভূমি,
প্রত্যুষে পূজার ফুল ফুটাইছ তুমি।...
হেরি সেই স্নেহপ্লুত আত্মবিস্মরণ,
মধুর 'মঙ্গলচ্ছবি মৌন অবিচল,
নতশির কবিচক্ষে ভরি আসে জল।

—বঙ্গলক্ষ্মী, কল্পনা

কুসন্তানের হীন আচরণের ফলে বঙ্গজননীর দুঃখ ও লজ্জায় অবনত-শির মাতৃভক্ত কবিপুত্রের এই অশ্রুজল তাঁর অন্য রচনাকেও অভিষিক্ত করেছে। যথা—

কাহার সুধাময়ী বাণী
মিলায় অনাদর মানি।
কাহার ভাষা হায়
ভুলিতে সবে চায়
সে যে আমার জননী রে।
ক্ষণেক স্নেহকোল ছাড়ি'
চিনিতে আর নাহি পারি।
আপন সন্তান
করিছে অপমান,
সে যে আমার জননীরে।

—সে আমার জননী, কল্পনা

আপন সন্তান কর্তৃক অপমানিত বঙ্গজননীর এই বরপুত্রটির জীবনের চরম আকাঙ্ক্ষাই ছিল মায়ের চিরন্তন সন্তান বলে স্বীকৃতি লাভ।

এ জীবন-সূর্য যবে অস্তে গেল চলি,
হে বঙ্গ-জননী মোর, 'আয় বৎস' বলি
খুলি দিলে অন্তঃপুরে প্রবেশ দুয়ার
ললাটে চুম্বন দিলে,......শুভ্র মাল্য গাঁথি
গলায় পরায়ে দিয়ে লইলে বরিয়া
মোরে তব চিরন্তন সন্তান করিয়া।
অশ্রুতে ভরিয়া উঠি খুলিল নয়ন;
সহসা জাগিয়া দেখি—এ শুধু স্বপন।

—আশা, কল্পনা

আরও পরবর্তীকালে যিনি

বাংলার মাটি বাংলার জল
বাংলার বায়ু বাংলার ফল
পুণ্য হউক পুণ্য হউক পুণ্য হউক
হে ভগবান্।

দেশপ্রেমের এই ঋক্‌মন্ত্র রচনা করেছিলেন, তাঁর হৃদয়ে বঙ্গজননীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা কত গভীর ছিল, তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না।

কিন্তু তা সত্ত্বেও একথা সত্য যে, রবীন্দ্রনাথ বঙ্কিমচন্দ্রের ন্যায় একান্তভাবে বাংলার পথের পথিক ছিলেন না, তিনি ছিলেন আসলে ভারতপথের পথিক। বস্তুত তিনি বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে কখনও স্বতন্ত্র মর্যাদা দেন নি; বাংলা দেশকে ভারতপথের পথিক হবার প্রবর্তনাই তিনি দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাংলার সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা আছে, কিন্তু তার ঐতিহ্যগৌরবের কথা বড় দেখা যায় না। তাঁর কাছে বাংলার ইতিহাস কোন বিশিষ্ট রকমের বাণী বা ইঙ্গিত বহন করেছিল বলে মনে হয় না। রবীন্দ্র-সাহিত্যে বাংলার ইতিহাসের প্রভাব প্রায় নেই বললেই হয়। পক্ষান্তরে বঙ্কিম-সাহিত্য অনেকাংশেই প্রতিষ্ঠিত ছিল বাংলার ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপরে। বাংলার দৃষ্টিই ছিল বঙ্কিমের দৃষ্টি, 'বঙ্গদর্শন' নামেই তার পরিচয়। বাংলা দেশের প্রতি বাঙ্গালীর দৃষ্টি ফেরানোই ছিল বঙ্কিমচন্দ্রের ব্রত। তাঁর উপন্যাস-গুলির মধ্যে যেগুলি নিছক সামাজিক নয়, একমাত্র রাজসিংহ ব্যতীত সেগুলি সবই বাংলা দেশেরই কোনো ঐতিহাসিক ভূমিকার উপরে প্রতিষ্ঠিত। মৃণালিনী, কপালকুণ্ডলা, দুর্গেশনন্দিনী, চন্দ্রশেখর, সীতারাম, দেবী চৌধুরাণী, আনন্দমঠ প্রভৃতির নাম স্মরণ করলেই এ কথার সার্থকতা বোঝা যাবে। বন্দে মাতরম্‌ গানে যে দেশজননীর বন্দনা করা হয়েছে তিনি সাত কোটি সন্তানের জননী বঙ্গভূমি, ভারতভূমি নয়। কমলাকান্ত সপ্তমী পূজার দিনে নেশার ঝোঁকে দিব্যনেত্রে যে মাতৃপ্রতিমার দর্শনলাভ করেছিলেন, যে প্রতিমার পদতলে পুষ্পাঞ্জলি দিয়েছিলেন, সেও তো এই বঙ্গজননীরই 'নবস্বপ্নদর্শিনী'-রূপের প্রতিমা। কমলাকান্তের একমাত্র দুঃখ, একমাত্র সন্তাপ ছিল। সে দুঃখ সন্তাপের অবসানের জন্যই তিনি দিন গণনা করতেন। যেদিন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করেছিল সেদিন থেকে দিন গণনা করতেন।

বাঙালীর মনুষ্যত্ব, বাঙালীর এক-জাতীয়ত্বের জন্য কমলাকান্তের ব্যাকুলতার সীমা ছিল না। "বিবিধ প্রবন্ধ" পুস্তকের বাঙালীর বাহুবল, বঙ্গে ব্রাহ্মণাধিকার, বাঙলার ইতিহাস, বাঙলার কলঙ্ক, বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে কয়েকটি কথা, বাঙলার ইতিহাসের ভগ্নাংশ, বাঙালীর উৎপত্তি প্রভৃতি রচনায় দেখি বঙ্কিমচন্দ্র কি গভীর নিষ্ঠা ও অনুরাগের সহিত বাঙলার ঐতিহ্য আলোচনায়, তার নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধারের আশায়, তার ইতিহাস চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। বস্তুত বঙ্কিমচন্দ্র এক সময়ে বাঙলার ঐতিহাসিক তত্ত্বের অনুসন্ধান করে একখানি বাঙলার ইতিহাস লিখতেই ইচ্ছুক হয়েছিলেন। পরে নানা কারণে সে অভিপ্রায় ত্যাগ করতে বাধ্য হন। কিন্তু অন্যকে সে পথে প্রবৃত্ত করবার জন্যে বঙ্গদর্শনে বাঙলার ইতিহাস সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধগুলি লিখেছিলেন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন, "যেমন কুলি মজুররা পথ খুলে দিলে অগম্য কাননমধ্যে সেনাপতি সেনা নিয়ে প্রবেশ করতে পারেন, বাংলার ইতিহাস সম্বন্ধে এই প্রবন্ধগুলি তাঁর সেই মজুরদারির ফল। মৃত্যুর অল্পকাল পূর্বেও তিনি দুঃখ করে বলেছেন, "কিন্তু কৈ, আমি তো কুলি-মজুরের কাজ করিয়াছি—এ পথে সেনা লইয়া কোনো সেনাপতির আগমনবার্তা তো শুনিলাম না।" বস্তুত বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রকে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ বলে বর্ণনা করলে অন্যায় হয় না।

ইউরোপের ইতিহাসে দেখি, পেত্রার্কা প্রভৃতি মনীষীরা এক সময়ে রোমের অতীত গৌরবের নিদর্শনসমূহের প্রতি দেশবাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাদের ঐতিহ্যকল্পনাকে স্মৃতির শিখাস্পর্শে উদ্দীপ্ত করে তুলেছিলেন। এই উদ্দীপনার ফলে ইতালিতে যে জীবন-চাঞ্চল্য দেখা দেয়, তার ফলে ইউরোপের পুনরুজ্জীবনের অনেকখানি সহায়তা হয়। ঠিক তেমনি বঙ্কিমচন্দ্র বাঙালীর মনে অতীত গৌরবের স্মৃতি জাগিয়ে তার কল্পনাকে লুপ্ত মহিমার আভায় প্রদীপ্ত করে এবং তার ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে এই আলোকে উদ্ভাসিত করে বাংলাদেশে যে নবজাগরণের সূচনা করেন তার ঐতিহাসিক মূল্য অপরিসীম। "আমার এই বঙ্গদেশের সুখের স্মৃতি আছে,—নিদর্শন কই? দেবপাল দেব, লক্ষ্মণ সেন, জয়দেব, শ্রীহর্ষ—প্রয়াগ পর্যন্ত রাজ্য, ভারতের অধীশ্বর নাম, গৌড়ী রীতি, এ সকলের স্মৃতি আছে, কিন্তু নিদর্শন কই? সুখ মনে পড়িল, কিন্তু চাহিব কোন্ দিকে? ইত্যাদি উক্তি তৎকালীন বাংলার মনে যে আলোড়ন জাগিয়েছিল তার তুলনা নেই। রবীন্দ্র-সাহিত্যে এই জাতীয় উক্তি দেখি না, বাংলার অতীত গৌরবের দিকে বাঙালীর চিত্তকে উন্মুখ করে তোলবার কোনো প্রয়াস দেখি না। অথচ ভারতবর্ষের প্রাচীন গৌরব স্মৃতিকে পুনরুজ্জীবিত করে তোলবার সাধনায় তাঁর ক্লান্তি নেই। উপনিষদের যুগ এবং তার তপোবনের রূপ তাঁর রচনায় যেন দ্বিতীয় বিগ্রহ ধরে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়েছে। বুদ্ধদেব ও তাঁর সমকালীন ভারতবর্ষের চিত্রকেও তিনি আমাদের চোখে দেদীপ্যমান করে তুলেছেন। অবশ্য তার কল্পনার আলোকে সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে প্রকাশিত হয়েছে কালিদাসের যুগের ভারতবর্ষ। 'আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে' কিংবা

"দূরে বহু দূরে
স্বপ্নলোকে উজ্জয়িনী পুরে
খুঁজিতে গেছিনু যবে শিপ্রানদী পারে
মোর পূর্ব জনমের প্রথমা প্রিয়ারে।"

ইত্যাদি রচনা প্রত্যেক পাঠকের কাছে অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিককালের শিখ মারাঠা ও রাজপুতদের বহু গৌরবগাথাকে তিনি আমাদের কাছে উজ্জ্বল বর্ণে সমুপস্থিত করেছেন। শিবাজি ও গুরু গোবিন্দের ঐতিহাসিক মহিমা রবীন্দ্রপ্রতিভার স্পর্শে আমাদের মন যে অপূর্ব কল্পনার আভায় উদ্ভাসিত হয়েছে তার তুলনা কোথায়? রামানন্দ, কবীর, নানক, রামদাস, তুলসীদাস প্রভৃতি ধর্মনেতাদের মহত্ত্বকেও তিনি আমাদের চিত্তে চিরকালের জন্য মুদ্রিত করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয়। তরু সিং, রতনরাও, হারাবংশী, বীর কুম্ভ, দুর্গেশ দুমরাজ প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত অখ্যাত চরিত্রগুলিও তাদের ত্যাগ, নিষ্ঠা, বীরত্ব প্রভৃতি চরিত্রগুণের গৌরবে রবীন্দ্রনাথের অঞ্জলি পেয়ে অমরত্ব লাভ করেছে। সিপাহি-বিপ্লব কালের ঝাঁসির রাণী লক্ষ্মী বাঈ, অযোধ্যার তালুকদার কুমার সিংহও রবীন্দ্রনাথের হৃদয় শ্রদ্ধার আসনের অধিকারী হয়েছেন।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বাংলার ইতিহাসের প্রায় কোনো চরিত্রই বিপুল রবীন্দ্রসাহিত্যে শ্রদ্ধার্ঘ্য লাভের যোগ্য বলে বিবেচিত হয় নি। বস্তুত উক্ত সাহিত্য থেকে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের ধারণা ছিল যে, বাংলার ইতিহাসে যথার্থ গৌরবের বস্তু অর্থাৎ বাঙালীর জাতীয় জীবনকে প্রেরণা দেবার মতো আদর্শ উপাদান বিশেষ কিছু নেই। বাংলার সমগ্র ইতিহাসের মধ্যে একমাত্র চৈতন্যদেবের মধ্যেই এমন শক্তির স্ফুরণ ঘটেছিল যা এক সময়ে বাঙালীর জাতীয় জীবনে নবচেতনার সঞ্চার করতে পেরেছিল এবং যা আমাদের ভাবীকালের যাত্রাপথকেও আশার আলোকে উজ্জ্বল করে তুলতে পারে, এই ছিল তাঁর ধারণা। অবশ্য রামমোহন থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত আধুনিক কালকে উক্ত পর্যালোচনায় গণনা করা হয়নি। আধুনিক যুগে বাংলা দেশে যে বৃহৎ ভাবের ও নূতন প্রাণের বেগ দেখা দিয়েছে, জাতীয় জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে মহৎ চরিত্রের আবির্ভাব ঘটেছে সে বিষয়ে কোনো সংশয় থাকতে পারে না। এ বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের উক্তিই উদ্ধৃত করা যাক।—

বিপুল মানবশক্তি বাংলা সমাজের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়াছে ইহা আমি দেখিতে পাইতেছি। ইহার প্রভাব অতিক্রম করিতে কে পারে? এ আমাদের সংকীর্ণতা আমাদের আলস্য ঘুচাইয়া তবে ছাড়িবে। আমাদের মধ্যে বৃহৎ প্রাণ সঞ্চার করিয়া সেই প্রাণ পৃথিবীর সহিত যোগ করিয়া দিবে।...আমার মনে নিশ্চয় প্রতীতি হইতেছে, বাঙালীদের একটা কাজ আছেই। আমরা নিতান্ত পৃথিবীর অন্ন ধ্বংস করিতে আসি নাই। আমাদের লজ্জা একদিন দূর হইবে। ইহা আমরা হৃদয়ের ভিতর হইতে অনুভব করিতেছি। আমাদের আশ্বাসের কারণও আছে। আমাদের বাঙালীর মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন।

—রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৫২৭-২৮

বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মতে বাঙালীর সঙ্কীর্ণতা ও আলস্যই তার

নিষ্প্রাণতার কারণ এবং বৃহৎ পৃথিবীর সহিত যোগস্থাপনের অন্তরায়; এটাই আমাদের প্রধান লজ্জার কথা। কিন্তু আধুনিক কালে এ লজ্জা দূর হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এ বিশ্বাস যে নেহাৎ অমূলক নয় তার ঐতিহাসিক প্রমাণ হিসাবে তিনি চৈতন্যের মহৎ চরিত্রের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন। আমাদের পক্ষে লক্ষণীয় এই যে, বাঙালীর ভবিষ্যৎ মহত্ত্বলাভের সম্ভাবনায় ঐতিহাসিক ভূমির সন্ধান করতে গিয়ে তিনি একমাত্র চৈতন্যদেবের কথাই উল্লেখ করেছেন। অনুরূপ ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কখনই একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে নিরস্ত হতেন না। বাঙালীর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে তিনিও আশান্বিত ছিলেন। সে আশার ভিত্তি হিসাবেই তিনি বাংলার বহু অতীত কীর্তির কথা আমাদের শুনিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাঁর দু' একটি মাত্র উক্তি উদ্ধৃত করলেই উক্ত মন্তব্যের সার্থকতা প্রমাণিত হবে।—

যে জাতি মিথিলা, মগধ, কাশী, প্রয়াগ, উৎকলাদি জয় করিয়াছিল, যাহার জয় পতাকা হিমালয় মূলে, যমুনা তটে, উৎকলের সাগরোপকূলে, সিংহলে, যবদ্বীপে এবং বালি দ্বীপে উড়িত, সে জাতি কখন ক্ষুদ্র ছিল না।...

পাঠান শাসনকালে বাঙালীর মানসিক দীপ্তি অধিকতর উজ্জ্বল হইয়াছিল। বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আবির্ভূত; এই সময়েই অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক, ন্যায়শাস্ত্রের নূতন সৃষ্টিকর্তা রঘুনাথ শিরোমণি; এই সময়ে স্মার্ততিলক রঘুনন্দন; এই সময়েই চৈতন্যদেব; এই সময়েই বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের অপূর্ব গ্রন্থাবলী; চৈতন্যদেবের পরগামী অপূর্ব বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও ষোড়শ খৃষ্টি শতাব্দীর মধ্যেই ইঁহাদিগের সকলেরই আবির্ভাব। এই দুই শতাব্দীতে বাঙালীর মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার যেরূপ মুখোজ্জ্বল হইয়াছিল, সেরূপ তৎপূর্বে বা তৎপরে আর কখনও হয় নাই।

—বাঙলার ইতিহাস, বিবিধ প্রবন্ধ ২য় ভাগ

বঙ্কিমচন্দ্রের উক্তির ঐতিহাসিক সত্যতা আমাদের বিচার্য নয়। বাংলার অতীতকে কি দৃষ্টিতে তিনি দেখতেন তাই আমাদের আলোচনার বিষয়। বাংলার ভবিষ্যৎকে তিনি বিগত কালের যে ব্যাপক পটভূমির উপরে স্থাপন করতেন, রবীন্দ্রসাহিত্যে তা দেখা যায় না। একমাত্র চৈতন্যের চরিত্রমহিমাই রবীন্দ্রনাথের চিত্তকে মুগ্ধ করেছিল বলে মনে হয়; বাংলার ইতিহাসের অন্য কোনো গৌরবের কথাই তাঁর মনকে প্রভাবিত করতে পারে নি।

যা হোক্, চৈতন্যের চারিত্রপ্রভাবকে রবীন্দ্রনাথ যে দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তার মধ্যে খুবই বিশিষ্টতা আছে। সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর উক্তি একটু সবিস্তারে উদ্ধৃত করা অনুচিত হবে না।—

আমাদের বাঙালীর মধ্য হইতেই তো চৈতন্য জন্মিয়াছিলেন। তিনি তো বিঘা কাঠার মধ্যেই বাস করিতেন না, তিনি তো সমস্ত মানবকে আপনার করিয়াছিলেন। তিনি বিস্তৃত মানব প্রেমে বঙ্গভূমিকে জ্যোতির্ময়ী করিয়া তুলিয়াছিলেন।...আপন আপন বাঁশ বাগানের পার্শ্বস্থ ভদ্রাসন বাটীর মনসা সিজের বেড়া ডিঙাইয়া পৃথিবীর মাঝখানে আসিতে কে আহ্বান করিল, এবং সে আহ্বানে সকলে সাড়া দিল কি করিয়া? একদিন তো বাঙলা দেশে ইহাও সম্ভব হইয়াছিল। একজন বাঙালী আসিয়া একদিন বাঙলা দেশকে তো পথে বাহির করিয়াছিল। একজন বাঙালী তো একদিন সমস্ত পৃথিবীকে পাগল করিবার জন্য ষড়যন্ত্র করিয়াছিল এবং বাঙালীরা সেই ষড়যন্ত্রে তো যোগ দিয়াছিল। বাংলার সেই এক গৌরবের দিন। তখন বাংলা স্বাধীনই থাকুক আর অধীনই থাকুক, মুসলমান নবাবের হাতেই থাকুক আর স্বদেশীয় রাজার হাতেই থাকুক, তাহার পক্ষে সে একই কথা। সে আপন তেজে আপনি তেজস্বী হইয়া উঠিয়াছিল।

আসল কথা বাঙলায় সেই একদিন সমস্ত একাকার হইবার জো হইয়াছিল।...দেখিতে দেখিতে একাকার হইল যে, জাতি রহিল না, কুল রহিল না, হিন্দু মুসলমানেও প্রভেদ রহিল না।...

চৈতন্য যখন পথে বাহির হইলেন তখন বাঙলা দেশের গানের সুর পর্যন্ত ফিরিয়া গেল। তখন এক কণ্ঠবিহারী বৈঠকি সুরগুলো কোথায় ভাসিয়া গেল। তখন সহস্র হৃদয়ের তরঙ্গ হিল্লোল সহস্র কণ্ঠ উচ্ছ্বসিত করিয়া নূতন সুরে আকাশে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল। তখন রাগরাগিণী ঘর ছাড়িয়া পথে বাহির হইল, একজনকে ছাড়িয়া সহস্রজনকে বরণ করিল। বিশ্বকে পাগল করিবার জন্য কীর্তন বলিয়া এক নূতন কীর্তন উঠিল। যেমন ভাব তেমনি তাহার কণ্ঠস্বর —অশ্রু জলে ভাসাইয়া সমস্ত একাকার করিবার ক্রন্দন ধ্বনি। বিজন কক্ষে বসিয়া বিনাইয়া বিনাইয়া একটি মাত্র বৈঠকি কান্না নয়, প্রেমে আকুল হইয়া নীলাকাশের তলে দাঁড়াইয়া সমস্ত বিশ্বজগতের ক্রন্দনধ্বনি।

এই আশা হইতেছে, আর একদিন হয়তো আমরা এই মত্ততায় পাগল হইয়া সহসা এক জাতি হইয়া উঠিতে পারি। বৈঠকখানার আসবাব ছাড়িয়া সকলে মিলিয়া রাজপথে বাহির হইতে পারিব।

রবীন্দ্র রচনাবলী, ২য় খণ্ড পৃঃ ৫২৮—২৯

রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলার অধুনাপূর্ব যুগের ইতিহাসের একটানা কীর্তিহীনতা ও চারিত্রদৈন্যের মধ্যে চৈতন্যদেবই যে একমাত্র ব্যতিক্রম, একথা মনে করবার পক্ষে আরও নিদর্শন আছে। তিনি এক সময়ে পরম দুঃখের সহিত বঙ্গমাতাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন—

পুণ্যে পাপে দুঃখে সুখে পতনে উত্থানে
মানুষ হইতে দাও তোমার সন্তানে...
শীর্ণ শান্ত সাধু তব পুত্রদের ধরে
দাও সবে গৃহ ছাড়া লক্ষ্মী ছাড়া করে।
সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী,
রেখেছ বাঙালী করে, মানুষ করনি।

চৈতালী, বঙ্গমাতা ১৩০২, চৈত্র ২৬

শুধু তদানীন্তন কালকে লক্ষ্য করেই এই উক্তি করা হয়নি, পরন্তু বাংলার ইতিহাসের চিরন্তনকাল সম্পর্কেই

এই উক্তি কবির অভিপ্রেত—এ কথা মনে করবার কারণ আছে বঙ্গমাতা কবিতার কয়েক মাস পূর্বে রচিত বিদ্যাসাগরচরিত প্রবন্ধ (১৩০২ শ্রাবণ ১৩) থেকে দু' একটি অংশ উদ্ধৃত করছি।—

বিদ্যাসাগর এই অকৃত কীর্তি অকিঞ্চিৎকর বঙ্গসমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা বাঙলার ইতিহাসে বিরল।...

মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালী নির্মাণ করিতেছিলেন, সেখানে হঠাৎ দুই-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন। কী নিয়মে বড়োলোকের অভ্যুত্থান হয় তাহা সকল দেশেই রহস্যময়, আমাদের এই ক্ষুদ্রকর্মা ভীরু হৃদয়ের দেশে সে রহস্য দ্বিগুণতর দুর্ভেদ্য। বিদ্যাসাগরের চরিত্র সৃষ্টিও রহস্যাবৃত।

এই রহস্যের প্রসঙ্গেই অন্যত্র বলা হয়েছে—

"আমাদের এই অবমানিত দেশে ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে এমন অখণ্ড পৌরুষের আদর্শ কেমন করিয়া জন্মগ্রহণ করিল, আমরা বলিতে পারি না। কাকের বাসায় কোকিলে ডিম পাড়িয়া যায়—মানব ইতিহাসের বিধাতা সেইরূপ গোপনে কৌশলে বঙ্গভূমির প্রতি বিদ্যাসাগরকে মানুষ করিবার ভার দিয়াছিলেন।

এই প্রবন্ধেরই আর এক স্থানে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

নিরীহ বাঙলা দেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নাই। এই ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনী লেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙালী জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাশ করিয়া ভালো চাকরি-বাকরি ও বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়। বহুকাল পূর্বে একদা নবদ্বীপের শচীমাতার এক প্রবল দুরন্ত ছেলে এই আশা পূর্ণ করিয়াছিলেন।

বাংলা দেশ ও বাঙালী জাতির সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ যে বিশেষণগুলি (অকৃতকীর্তি, অকিঞ্চিৎকর, ক্ষুদ্রকর্মা, ভীরু হৃদয়, নিরীহ, ক্ষীণতেজ, শীর্ণ-চরিত্র, সুবোধ) প্রয়োগ করেছেন তাতে 'অন্নপায়ী বঙ্গবাসী স্তন্যপায়ী জীব', 'তৈলঢালা স্নিগ্ধ তনু নিদ্রারসে ভরা', 'মাথায় ছোট বহরে বড় বাঙালী সন্তান' প্রভৃতি আরও অনেক কঠোর উক্তির কথাই স্মরণ হয়। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মতে বাংলার ইতিহাসে গৌরবের বস্তু বিশেষ কিছু নেই, বঙ্গমাতা তার চার কোটি (বা সাত কোটি) সন্তানকে 'বাঙালী' করেই রেখেছেন, 'মানুষ' করে তুলতে পারেন নি, যথার্থ মানুষের আবির্ভাব 'বাংলার ইতিহাসে বিরল'; বহুকাল পরে চৈতন্যদেব বা বিদ্যাসাগরের মতো মানুষের আবির্ভাব বাংলার ইতিহাসের পক্ষে স্বাভাবিক নয়, কাকের বাসায় কোকিলছানার মতো স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম মাত্র। বলা বাহুল্য, এসব উক্তির দ্বারা বাঙালী জাতি ও তার অতীত ইতিহাসের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা প্রকাশ পাচ্ছে না এবং এই মনোভাব বঙ্কিমচন্দ্রের মনোভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। হয়তো ঈশ্বরচন্দ্রের চারিত্রিক বলিষ্ঠতা দেখাবার এবং স্বজাতিকে ওই আদর্শের প্রতি প্রণোদনা দেবার আগ্রহাতিশয্যেই তাঁর অজ্ঞাতসারেই বাঙালী-চরিত্রের দুর্বলতার বর্ণনা এরকম অতিমাত্র হয়ে পড়েছে। কিন্তু তাতে যে সত্যের সীমাও অলক্ষ্যেই অতিক্রান্ত হয়েছে সে কথাও স্বীকার না করে উপায় নেই। রবীন্দ্রনাথ নিজেই অন্যত্র বলেছেন,—

প্রায়ই জাতীর অভ্যুত্থানের মূলে এক বা একাধিক মহাপুরুষকে আমরা দেখিতে পাই। কিন্তু এ কথা মনে রাখিতে হইবে, সেই সকল মহাপুরুষ আপন মহাশক্তিকে প্রকাশ করিতেই পারিতেন না, যদি দেশের মধ্যে মহদ্‌ভাবের ব্যাপ্তি না হইত। চারিদিকে আয়োজন অনেকদিন হইতেই হয়; সেই আয়োজনে ছোট বড় অনেকেরই যোগ থাকে; অবশেষে শক্তিশালী লোক উঠিয়া সেই আয়োজনকে ব্যবহারে প্রয়োগ করেন। মারাঠার ইতিহাসে আমরা শিবাজীকেই বড় করিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু শিবাজী বড় হইয়া উঠিতে পারিতেন না, যদি সমস্ত মারাঠা জাতি তাহাকে বড় করিয়া না তুলিত।

—শরৎকুমার রায় প্রণীত 'শিবাজী ও মারাঠা জাতি' গ্রন্থের ভূমিকা

এই ঐতিহাসিক সত্য চৈতন্যদেব এবং বিদ্যাসাগরের অভ্যুদয় সম্পর্কেও স্বীকার্য। অন্যান্য মহাপুরুষের ন্যায় এই দুইজনের অভ্যুদয়ও নিশ্চয়ই আকস্মিক নয়। দেশের মধ্যে নিঃসন্দেহেই দীর্ঘকাল ধরে নিঃশব্দে তাঁদের আবির্ভাবের যোগ্য ভূমিকা রচিত হচ্ছিল, নতুবা তাঁদের জীবনাদর্শের উদ্ভব ও বিকাশ কখনই সম্ভবপর হত না। আসল কথা এই যে, বাঙালী জাতির চরিত্রশক্তি ও তার অতীত ইতিহাসের প্রতি গভীর আস্থা ও শ্রদ্ধা ছিল না বলেই তিনি চৈতন্যদেব বা বিদ্যাসাগরের আবির্ভাবকে বাংলার ইতিহাসে অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করতে পেরেছিলেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে, রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাবান কোনো ইংরেজ লেখক বাঙালী জাতির মধ্যে তাঁর আবির্ভাবকেই কাকের বাসায় কোকিলছানার মতো স্বভাবনিয়মের ব্যতিক্রম বলে বর্ণনা করেছিলেন। বাঙালী জাতি ও তার ইতিহাস সম্বন্ধে শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের অভাব ছিল বলেই তাঁর পক্ষে ওরকম মন্তব্য প্রকাশ সম্ভব হয়েছে।

পূর্বে দেখেছি বাংলা দেশের প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর ভালবাসা ছিল এবং তার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও তিনি প্রচুর আশা পোষণ করতেন। কিন্তু বাঙালী জাতির স্বাভাবিক চরিত্র সম্বন্ধে তাঁর মনে গভীর শ্রদ্ধা ছিল না, আর বাঙালী জাতির ভবিষ্যৎকালীন গৌরবযাত্রার পাথেয়স্বরূপ তার অতীত ইতিহাসের দিকে তাকিয়েও একমাত্র চৈতন্যচরিত্র ছাড়া অন্য কোনো মহত্ত্বের সন্ধান পাননি।

চিত্রপ্রিয়

কয়েকদিন পূর্বে নয়াদিল্লীতে দুইটি চিত্রপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। প্রথমটি স্থানীয় শিল্পী শ্রীঅজিত গুপ্তের ব্যক্তিগত প্রদর্শনী, ইহা নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতিতে অনুষ্ঠিত হয় ও ভারত সরকারের সংবাদ ও বেতার বিভাগের মন্ত্রী ডাঃ বি ভি

মাছধরা (টেম্পারা)
—অজিত গুপ্ত

কেশকার ইহার উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয়টি শ্রীদশরথ প্যাটেলের ব্যক্তিগত প্রদর্শনী-ইহাও ঐ একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয় ও লোকসভার স্পীকার শ্রী জি ভি মাভালংকার ইহার উদ্বোধন করেন।

অজিত গুপ্ত সর্বসমেত ৩৬ খানি চিত্র পেশ করেন। আজকালকার অধিকাংশ শিল্পীদের মতো ইঁনিও তৈল, জল রং ও টেম্পারাকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। বিষয়বস্তুর মধ্যেও সাধারণ গ্রামবাসীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একাংশ হইতে আরম্ভ করিয়া কাশ্মীরের কয়েকটি প্রাকৃতিক দৃশ্যও তিনি অঙ্কিত করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত মিশর দেশের প্রাচীন ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করিয়া ঐ দেশীয় রীতিতে তিনি কয়েকটি চিত্র রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে এদেশের লোকশিল্পরীতির অনুকরণে অন্যান্য কয়েকটি চিত্রও অঙ্কিত করিয়াছেন। সুতরাং এক হিসাবে বলিতে গেলে চিত্র সমষ্টির মধ্যে বিশিষ্ট কোনো রীতি, মাধ্যম অথবা নিজস্ব কোনও অবদানের পরিচয় পাওয়া যায় না। তথাপি প্রদর্শনীর মধ্যে কয়েকখানি চিত্র চোখে পড়ে এবং তাহার একমাত্র কারণ শিল্পীর পরিচ্ছন্ন বর্ণ ব্যবহার প্রণালী। এই চিত্রগুলি দেখিলেই মনে হয় যে, যেখানে যে বর্ণ যতটুকু প্রয়োজন, সংযম ও পরিচ্ছন্নতার সহিত শিল্পী ততটুকু বর্ণই ব্যবহার করিয়াছেন। অপ্রয়োজনীয় বর্ণচাতুর্যের মোহজালে তিনি কোনটিকেই অযথা জড়াইয়া ফেলিবার চেষ্টা করেন নাই। প্রথমেই "মাছধরা" চিত্রখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দূরে গ্রামে দুই একটি কুটীর দেখা যাইতেছে, নদীবুকে ডিঙির উপর বসিয়া জেলের দল আপন মনে মাছ ধরিয়া চলিয়াছে ও তাহারই সম্মুখে নদীতীরে তাহাদেরই মধ্যে কেহ বা ডিঙি হইতে মাছ নামাইতেছে আবার কেহ বা বসিয়া ভাগ করিতেছে। ভারতীয় লোক-শিল্প ও আধুনিক অঙ্কনরীতির সংমিশ্রণ দ্বারা দেশের এই পরিচিত দৃশ্যটুকু শিল্পী চিত্রের মধ্য দিয়া প্রকাশিত করিয়া আপনার কল্পনাধারা ও রচনাবিন্যাসের পরিচয় দিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, এই চিত্রখানির বর্ধিত সংস্করণই সম্প্রতি ভারত সরকার অনুষ্ঠিত বাসস্থান প্রদর্শনীতে ভিত্তিচিত্র হিসাবে সকলের প্রশংসা অর্জন করিয়াছিল। ইহার পরেই "বিবাহ" চিত্রখানি চোখে পড়ে। বিবাহোপলক্ষে বাঙলা দেশের ঘরে ঘরে মধুর ও বিচিত্র ছন্দে যে রাগিণী সহস্রঝঙ্কারে বাজিয়া উঠিয়া সারা গ্রাম আনন্দ মুখরিত করিয়া তোলে শিল্পী সেই একান্ত শুভ অনুষ্ঠানটির বিভিন্ন অধ্যায়গুলির নিজস্ব একটি সমগ্র রূপ বাঙলা দেশের আপন শিল্পধারার মধ্য দিয়া অতিশয় কৌশলের সহিত রূপায়িত করিয়াছেন। বর্ণচাতুর্য ও রচনার দিক দিয়া মিশরীয় পদ্ধতি অনুপ্রাণিত "পরপারে যাত্রা" ও "কম্পোজিশান"-এর নাম করা যায়। নৈসর্গিক চিত্রের মধ্যে "নাগিন হইতে" ও "শ্যামল শোভা" উল্লেখ-যোগ্য। জলরঙে অঙ্কিত এই দুইখানি চিত্র কাশ্মীরের স্বাভাবিক সৌন্দর্য ও বিচিত্র বর্ণচ্ছটার মহিমায় উজ্জ্বল হইয়া

বিবাহ (টেম্পারা) —অজিত গুপ্ত

বৃষ্টির পরে (তৈল) —দশরথ প্যাটেল

উঠিয়াছে। দুঃখে বিষয় অপর চিত্রগুলি ঠিক রসোত্তীর্ণ হয় নাই।

* * *

দশরথ প্যাটেল বয়সে তরুণ—ইঁহার বয়স মাত্র ২৭। ইনি প্রথমে শ্রীরসিকলাল প্যারেখ ও শ্রীরবিশংকর রাওয়ালের নিকট প্রাথমিক শিল্প শিক্ষা করেন এবং পরে মাদ্রাজ আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ সুবিখ্যাত ভাস্কর-শিল্পী শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়-চৌধুরীর নিকট শিক্ষা সমাপন করেন। ইতিপূর্বে ১৯৫২ সালে প্যাটেল এখানে প্রথম প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন।

বর্তমানে প্রদর্শনীতে তিনি সর্বসমেত ১১২টি চিত্র পেশ করেন। বিভিন্ন রীতি ও মাধ্যমে অঙ্কিত বিভিন্ন আকারের এই চিত্রগুলি দেখিলে সত্যই বিস্মিত হইতে হয়। কারণ দুইটি কথা বিশেষভাবে মনে জাগে—প্রথমত শিল্পীর প্রতিভা, দ্বিতীয়ত তাঁহার অঙ্কন প্রেরণা। স্কেচ হইতে আরম্ভ করিয়া জলরঙ, তৈল ও টেম্পারা মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয়বস্তু বিষয়ে তিনি বহুচিত্র রচনা করিয়াছেন—নানা-প্রকার অঙ্কন রীতির নমুনা দেখিলেই বুঝা যায় যে, তিনি যেন অতি অল্প আয়াসেই এই সকল রীতির মধ্য দিয়া বিষয়বস্তুগুলিকে রূপায়িত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও নিজ রুচি ও নিজস্ব পথটুকু যেন তিনি এখনও খুঁজিয়া বাহির করিতে পারেন নাই। অর্থাৎ গিরিমুক্ত নির্ঝরিণী যেন নানা শৈলখণ্ডের মধ্য দিয়া শতধারায় ছুটিয়া চলিয়াছে, কিন্তু নিজস্ব নির্দিষ্ট ও সাবলীল গন্তব্য পথ রেখাটুকুর সন্ধান এখনও পায় নাই। তদুপরি তাঁহার চিত্র-রচনা করিবার প্রেরণা। চিত্রগুলি দেখিলেই বুঝা যায় যে, এক অদম্য উৎসাহ ও উদ্দীপনায় যেন শিল্পী অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন—দিনের পর দিন অক্লান্তভাবে তিনি চিত্রের পর চিত্র রচনা করিয়া চলিয়াছেন অথচ অন্তর্নিহিত যে ভাবটুকু প্রকাশ করিতে চাহেন সেটি যেন ব্যক্ত করিতে পারিতেছেন না। তথাপি একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্যাটেল প্রতিভাবান শিল্পী। নিজস্ব পথ ও রচনা পদ্ধতির সন্ধানে তিনি এখনও পরীক্ষা করিয়া চলিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে বহির্জগতের স্থানু ও গতিশীল প্রত্যেকটি দ্রষ্টব্য বিষয়ই তিনি বিশেষভাবে পর্যবেক্ষণ করিতেছেন।

প্যাটেলের চিত্রগুলি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যায় যে, তিনি লঘু বর্ণের পক্ষ-পাতী। রীতি বা বিষয়বস্তু যাহাই হউক না কেন, প্রত্যেক জল রং বা তৈল চিত্রেই তিনি সর্বদাই লঘু বর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন—ফলে এহেন অধিকাংশ চিত্রের মধ্যেই যেন অলক্ষ্যে এক প্রতিলিপিই বার বার ভাসিয়া উঠে। অর্থাৎ বর্ণ আলিম্পনের মধ্য দিয়া বিভিন্ন গভীরতা ফুটাইবার প্রকৃত ক্ষমতা তাঁহার চিত্রাদির মধ্যে দেখা যায় না। বিশেষভাবে বিচার করিলে মনে হয় প্যাটেল তৈল মাধ্যমেই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। সাধারণ প্রথায় ব্রাশ বা ছুরি ব্যবহার না করিয়া তিনি ইমপ্যাস্টো (impasto) রীতিতে ইম্প্রেশানিস্টিক ধারায় বিভিন্ন বিষয়বস্তু-মূলক চিত্র রচনা করিয়াছেন। সম্পূর্ণ পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হইলেও তীক্ষ্ম-পর্য-বেক্ষণ শক্তি, অঙ্কন নিপুণতা ও তদুপরি এই বিশিষ্ট ও কঠিন রীতির জন্য কয়েক-খানি চিত্র দেখিতে ভালই লাগে। বিশেষ করিয়া "বৃষ্টির পরে" চিত্রখানি সকলেরই চোখে পড়ে। সবেমাত্র এক পশলা বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে—দূরে পৃষ্ঠভূমিতে আকাশের বুকে শুভ্রবলাকাসদৃশ মেঘদল লঘুপক্ষ মেলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহারই নিম্নে বারিসিক্ত শ্যামল তরুশ্রেণী যেন সদ্যস্নাতা রমণীর মতো লজ্জায় অধোবদন হইয়া নীরবে দাঁড়াইয়া আছে এবং তাহারই পাদভূমিতে কয়েকজন পথিক অতি সন্তর্পণে জলসিক্ত পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। স্তব্ধ বনানী শ্রেণী, অপসৃয়মান ধীরগতি পথিকের দল এবং সর্বোপরি বর্ষণ ক্লান্ত স্নিগ্ধ-শ্যামল প্রান্তরের করুণ-কোমল রূপটুকু শিল্পী সত্যই অতিশয় মুনশীয়ানার সহিত ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। এই রীতিতে অঙ্কিত দুই একটি স্টিল লাইফ স্টাডিও উল্লেখযোগ্য। অন্যান্য চিত্রের মধ্যে "ব্লেজিং সাউথ", "বৃক্ষহীন পর্বত শ্রেণী", "মায়াবিনী রাত্রি" ও "নারিকেল বৃক্ষতলে"র উল্লেখ করা যাইতে পারে। রঙিন কাগজের উপর অঙ্কিত স্কেচের মধ্যে "বাজার" ও "রেশ এনক্লোজার"-এর নাম করা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া গুজরাট ও রাজস্থানের লোক শিল্পের আধারে

অঙ্কিত কয়েকটি নমুনার নিদর্শন প্রদর্শনীতে ছিল।

উপসংহারে কয়েকটি কথা বলিলে বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। বিভিন্ন ধারা রীতি ও মাধ্যমে অঙ্কিত ভিন্ন ভিন্ন শিল্পীদের রচিত চিত্রাদির সহিত দেশের জনসাধারণের সহিত পরিচয় করিয়া দেওয়াই চিত্রপ্রদর্শনীর একমাত্র উদ্দেশ্য। সেই জন্য যে কোনো সংঘবদ্ধ প্রদর্শনীতে আমরা দেশের বহু শিল্পীর বহু রচনা দেখিবার সুযোগ লাভ করি। এতদ্ব্যতীত নিজস্ব শিল্প রচনা বা চিন্তাধারার বৈশিষ্ট্য প্রচার করিবার জন্য অনেক শিল্পী ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন এবং কয়েকক্ষেত্রে কয়েকটি শিল্পীর কার্যধারা দেখিয়া সত্যই যে এহেন ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর যথার্থ প্রয়োজন আছে সে বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিবার অবকাশ থাকে না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়াছে যে, কেবলমাত্র নিজ নাম প্রচারের জন্য কয়েকজন শিল্পী প্রায় প্রতি বৎসরই ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ইঁহাদের মধ্যে অনেকেই ভুলিয়া যান যে, যথার্থ উচ্চাঙ্গের সঙ্গীতশিল্পী না হইলে কোনও গায়ক বা গায়িকা একাকী কোনোও সঙ্গীতের আসরে আনন্দ পরিবেশন করিতে পারেন না। সুতরাং যতদিন পর্যন্ত না কোনো শিল্পী তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া নিজস্ব কোনোও বিশিষ্ট চিন্তাধারা বা অঙ্কন রীতির পরিচয় না দিতে পারেন ততদিন পর্যন্ত তাঁহার পক্ষে ব্যক্তিগত চিত্রপ্রদর্শনীর কথা চিন্তা করা উচিত নহে। কিন্তু আজকাল সত্যই এহেন প্রদর্শনী যেন একটি ফ্যাশান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। অবশ্য ব্যক্তিগত প্রদর্শনীতে চিত্রাদি বিক্রয় হইবার যে সুবিধা আছে সে কথা স্বীকার করি। কিন্তু সকলেই জানেন যে উচ্চাঙ্গের চিত্র হইলেই যে চিত্রামোদী তাহা ক্রয় করেন তাহা নহে। নাম করিতে চাহি না—প্রতিষ্ঠাবান কয়েকজন শিল্পীকে দেখিয়াছি, দিনের পর দিন বেদনাভারাক্রান্ত হৃদয়ে প্রদর্শনীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত তাঁহারা আপন আপন রচনাদির প্রতি স্থিরদৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া সকলের অগোচরে অতি কষ্টে দীর্ঘশ্বাস দমন করিয়াছেন। পক্ষান্তরে অতি সাধারণ শিল্পী প্রচারকার্য ও বাকচাতুর্য দ্বারা বহু চিত্র বিক্রয় করিয়াছেন তাহাও দেখিয়াছি। ব্যক্তিগতভাবে বিশেষ কোনোও শিল্পী সম্বন্ধে আমি কোনো কথা বলিতেছি না। কোন স্তরে পৌঁছাইলে কোনো শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা উচিত তাহার আভাসমাত্র দিলাম। আশা করি প্রকৃত শিল্পী ও শিল্পরসিকগণ আমার বক্তব্য-টুকু বুঝিতে পারিবেন।

মহানির্বাণ

(জীবনানন্দকে)

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সে ওই রথের শীর্ষে সমাসীন, রথচক্রমূলে
ধরিত্রী রয়েছে বসে কার্তিকের শেফালিকা ফুলে
শিশিরকণার আর্ত শীর্ণতোয়া কারুকার্য আঁকা,
আরতি হবার সাধ মুছে ফেলে শুধু ব'সে থাকা,
এছাড়া সান্ত্বনা নেই তীব্র এই শোকের অকূলে।

রথের নায়ক যেন কঠিন মৃত্যুকে
কোমল হাঁসের মতো তুলে নিয়ে বুকে
এইমাত্র চলে গেছে। রথের নায়িকা
দোলাবে রাতের কণ্ঠে আরো এক রাত্রির মালিকাঃ
যে মালা কেবলি ছিন্ন ফুলের স্মারক,
সে-ফুলে উৎকীর্ণ তবু স্মরণের হাঁসের পালক—
দীপালী দিয়েছে ওই অমল পাখার শুভ্রশিখা।

ধরিত্রী, তুমি কি তার সহমৃতা হ'লে
তাকে হারাবে না আর? তবে কি তোমার সঙ্গে যাবে
এই পথ প্রান্তরের কবিতাও তোমারি আঁচলে?
তারপর মানব ফুরাবে!

তাহলে যেয়ো না তুমি, মানব না-যদি অফুরান
বৃথাই যে এসেছিলো, এঁকেছিলো গান;
আবার ডেকো না তাকে আমাদের বেসুরো সভায়—

গোক্ষুর রেণুর রৌদ্রে গোধূলির শিল্পী অস্ত যায়।

ট্রামে-বাসে

জনাব মহম্মদ আলি তাঁর বেতার বক্তৃতায় স্বীকার করিয়াছেন যে, পাক্-সংবিধান সভা "ফেল" করিয়াছে।—"শুনেছি অনেকেই নাকি তাই কম্পার্ট-মেন্টাল্ পরীক্ষার জন্য আরজি পেশ

করেছেন"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *
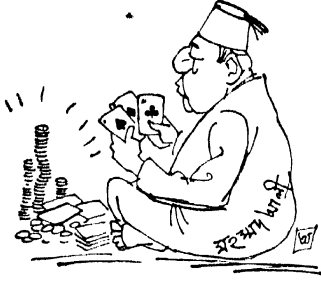
পরবর্তী সংবাদ—পাক্-মন্ত্রিসভার "রিশাফল্" চলিতেছে।—"শাফ্‌লিং ভালো জানা থাকলে টেক্কার ট্রায়ো নিজের হাতে রাখতে কোন অসুবিধেই হয় না"—বলে শ্যামলাল।

* * *

পাকিস্তানের চল্‌তি ঘটনাবলীর কথা উল্লেখ করিয়া জনাব সুরাবর্দী মন্তব্য করিয়াছেন যে, এইরকম পরিস্থিতির যে উদ্ভব হইবে তাহা তিনি বহু আগেই দিব্যদৃষ্টিতে দেখিতে পাইয়াছিলেন।—"দিব্যদৃষ্ট দিয়ে ময়দানে টিপ্‌স্ ছাড়তে পারলে সুরাবর্দী সাহেব আগামী মরসুমে একটা কাজের কাজ করে যেতে পারবেন"—মন্তব্য করিলেন আমাদের জনৈক ঘোড়দৌড়রসিক সহযাত্রী।

* * *

কিন্তু এই সমস্তের চেয়েও বড় খবর আমরা পাকিস্তান হইতে

পাইয়াছি। শুনিলাম সেখানে মহিলারা নাকি একটি "এন্টি হাস্‌বেন্ড ফ্রন্ট" সংগঠন করিয়াছেন। স্বামীদের মদ্যপান প্রভৃতিতে বাজে অপব্যয় করা, রাত করিয়া বাড়ি ফেরা প্রভৃতি ব্যাপারে উক্ত "ফ্রন্ট" নাকি কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। —"এইবারে পাক্-মালেকরা টের পাবেন, এটা যুক্ত ফ্রন্ট্ নয় যে, বেয়োনেট্ আর আটক দিয়ে আটকাবেন। তার চেয়ে বড়ো অস্ত্র যে তালাক্ তা হয়ত ইস্কিন্দার মির্জা সাহেবও স্বীকার করবেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

আমেরিকা জনাব মহম্মদ আলিকে আমেরিকান ট্রাইবেল্‌দের একটি শিরস্ত্রাণ উপহার দিয়াছেন, আমরা আলি সাহেবের সেই শিরস্ত্রাণ-পরা ফটো সংবাদ-পত্রে দেখিয়াছি। আমাদের জনৈক সহ-যাত্রী হঠাৎ গান ধরিলেন—"মোরে ট্রাইবেল সাজায়ে কি রঙ্গ তুমি করিলে"!!

* * *

সংবাদ পাঠ করিলাম—চীন তার গবাক্ষ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে। —"যারা বিপুল মেদভারে জানলা টপ্‌কে ঢুকতে পারবেন না বলে ভয় খাচ্ছেন, তাঁরা দরজা খোলার মন্ত্র—চী-চীন-(চীঙ্)-ফাঁক্—শিখে নিন" — বলেন খুড়ো।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু কোন ব্যবসাবুদ্ধি নিয়া কেনাবেচার উদ্দেশ্যে চীন পরিভ্রমণে যান নাই, তিনি গিয়াছেন শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে।—"শুনেছি আমেরিকাও নাকি শান্তির আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা করছে কিন্তু সেটা অনেকটা আমাদের কৃত্রিম বারি-পাতের ব্যবস্থার মতোই, কোথায় যেন কলকব্জা ঢিলে ঢালা রয়ে গেছে"—বলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী

* * *

চীনের ছেলে-মেয়েরা জওহরলাল-জীকে ঘিরিয়া আনন্দে নৃত্য করিয়াছে এবং তাঁহাকে সম্বোধন করিয়াছে "কুন্ কুন্" অর্থাৎ দাদু বলিয়া।—"দাদু-নাতি সম্বন্ধটা কাকার চেয়ে মধুর, —শামু চাচা কী বলেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

চীন পরিভ্রমণের প্রাক্কালে জওহর-লালজী নিজের কর্মক্লান্তির কথা উল্লেখ করিয়া মন্ত্রিত্ব ত্যাগের ইঙ্গিত দিয়াছিলেন তারপরই শুরু হইল প্রশ্ন —নেহরুর পর কে?—"কিন্তু এর উত্তর নেহরুজী নিজেও দিতে পারবেন না, কেননা তিনি নিজেই নাকি বলেছেন, আমাদের দেশে তো "প্রতিভার" অভাব নেই। কিন্তু আমরা বলি এর একমাত্র উপায় একটি পাটহাতী ছেড়ে দেওয়া"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

শ্রীযুক্ত মোরারজী মন্তব্য করিয়াছেন —নারীশিক্ষা রোজগারের জন্য নয়।—"নারীরা এ মন্তব্যে দুঃখ করবেন না, পুরুষের শিক্ষাও রোজগারের জন্যে নয়। লেখাপড়া অনেকেই শেখেন কিন্তু মন্ত্রিত্ব দূরের কথা, কেরানিগিরিও অনেকেরই জোটে না"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

লেস্টারশায়ারের জনৈক ব্যক্তি নাকি অনবরত কথা বলার প্রতি-যোগিতায় কৃতিত্ব অর্জনের জন্য বদ্ধ-

পরিকর হইয়াছেন।—"কিন্তু তার চেয়ে, ভদ্রলোক যদি বিবাহিত হয়ে থাকেন তাহলে শুধু অনবরত কথা শুনে যাওয়ার কৃতিত্বের চেষ্টা করুন, তবে তো বুঝবো বাহাদুর"!!

চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের নাম সাহিত্য-রসিকের নিকট পরিচিতির অপেক্ষা রাখে না। নোবেল পুরস্কার অনেক সাহিত্যিককে প্রথম পরিচিত করেছে। ইংরেজী ভিন্ন অন্য সাহিত্যের লেখকদের সম্বন্ধে এটা হয়তো খানিকটা স্বাভাবিক। নোবেল কমিটি কোনো অখ্যাত এক লেখকের মধ্যে সাহিত্য-প্রতিভা আবিষ্কার করবার পর তাঁর বই ইংরেজীতে অনুবাদ হয়ে পৃথিবীর সকল দেশের পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এঁদের বেলায় আগে নোবেল পুরস্কার, তারপর আসে খ্যাতি। কিন্তু হেমিংওয়ে আগেই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। সমসাময়িক ইংরেজী সাহিত্যের দু'জন সবচেয়ে জনপ্রিয় ঔপন্যাসিকের মধ্যে হেমিংওয়ে একজন। প্রিয় লেখকের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তি হেমিংওয়ের অগণিত পাঠককে আনন্দ দেবে এবং তাদের ক্ষোভের সঙ্গে মনে হবে যে স্বল্প-পঠিত ফকনারের পূর্বেই তাঁর এ পুরস্কার প্রাপ্য ছিল।

হেমিংওয়ে আমেরিকান হলেও তাঁর অধিকাংশ কাহিনী বিদেশী পটভূমিকায় রচিত। আমেরিকার বর্তমান সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি সুযোগ পেলেই আঘাত করেছেন। এর প্রতিশোধ হিসেবে আমেরিকার সমালোচকরা দীর্ঘকাল তাঁকে স্বীকৃতি দেয়নি। হেমিংওয়ের রচনা অশ্লীল, নিরাশাবাদী ও মানবতাবিরোধী বলে একদল সমালোচক প্রচার করেছে; কিন্তু সমালোচকের তিক্ততা সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে তাঁর রচনার মাধুর্য ঢেকে রাখতে পারেনি। হেমিংওয়ের উপন্যাসে সত্যিকার গল্প ও সংঘাত আছে,—যা একালের অনেক লেখকের রচনায় থাকে না। তিনি ওস্তাদ গল্পকার এবং ভাষার যাদুকর; তাঁর জীবন দর্শনে আছে নতুনত্বের মোহ। আমেরিকান কথা সাহিত্যের বৈচিত্র্যহীন একঘেয়েমির মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যগুলি সহজেই পাঠকদের মন আকৃষ্ট করল। ১৯৪৪ সালে বিখ্যাত সাহিত্যপত্র 'স্যাটারডে রিভিউ অব লিটারেচার' আমেরিকার ঔপন্যাসিকদের জনপ্রিয়তা যাচাই করবার জন্য ভোটের ব্যবস্থা করেছিলেন। তার ফলে দেখা গেল যে, হেমিংওয়ে পেয়েছেন সবচেয়ে বেশি ভোট। প্রকৃতপক্ষে ১৯৪০ সালে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ফর হুম দি বেল টলস্' প্রকাশিত হবার পর সমালোচকের বিরূপতা প্রায় স্তব্ধ হয়ে গেছে। ইংরেজী উপন্যাসের ধারা যখন প্রায় রুদ্ধ হয়ে আসছিল তখন হেমিংওয়ে এনে দিয়েছেন নতুন গতি। আমেরিকার নবীন সাহিত্যিক-দের তাঁর রচনা যেরূপ গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে, অন্য কারো সাহিত্যাদর্শ তা পারেনি।

হেমিংওয়ের রচনা তাঁর জীবনের সুস্পষ্ট প্রতিফলন। শুধু মানসিক জীবনের প্রতিফলন নয়; সে তো সকল সাহিত্যিকের পক্ষেই সত্য। ব্যবহারিক জীবনের অভিজ্ঞতাই তাঁর সাহিত্যসৃষ্টির কাঠামো। আর কত বিচিত্র সেই অভিজ্ঞতা! নানা দেশ, নানা ঘটনা, নতুন নতুন পরিস্থিতি, জীবনের বিভিন্ন স্তর থেকে উঠে আসা অসংখ্য চরিত্র! প্রথম মহাযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই হেমিংওয়ে পেয়েছেন তাঁর জীবনদর্শন; এবং আমার মনে হয়, তাঁর সর্বশেষ রচনা

আর্নেস্ট হেমিংওয়ে

The Old man and the Sea ব্যতীত অন্য রচনাবলী এই নির্মম অভিজ্ঞতার ছায়া থেকে মুক্ত নয়।

১৮৯৮ সালের ২১শে জুলাই Ernest Miller Hemingway জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৩০ সাল থেকে হেমিংওয়ে তাঁর নামের 'মিলার' অংশটি বর্জন করেন। প্রথম দিকে প্রকাশিত বইগুলোতে পুরো নামই ব্যবহার করা হয়েছে। হেমিংওয়ের বাবা ছিলেন ডাক্তার ও নামকরা শিকারী। ডাক্তার রোগীর বাড়ী যাবার সময় মাঝে মাঝে শিশু পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে যেতেন। ছেলেবেলার এই অভিজ্ঞতার ছাপ কিছু কিছু দেখা যাবে হেমিংওয়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ In Our Time-এ। বাবা চেয়েছিলেন ছেলে ডাক্তার হবে, মা ছেলেকে করতে চেয়েছিলেন সঙ্গীতশিল্পী। দুজনের আশা ব্যর্থ করে দিয়ে হেমিংওয়ে স্থানীয় বিদ্যালয়ে অতি সাধারণ ছাত্রের মতো যাতায়াত করতে লাগলেন। ওখানে পড়ার উন্নতি হবার আশা নেই দেখে তাঁকে পাঠানো হলো প্যারিসের স্কুলে। সেখানেও সুবিধে হলো না। বাড়ী ফিরিয়ে আনা হলো! যখন পনেরো বছর বয়স তখন হেমিংওয়ে একবার বাড়ী থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন। পাঠ্যপুস্তকের চেয়ে তাঁর ভালো লাগত শিকার। বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন এই গুণটি। ছেলের শিকারপ্রীতি পিতার ভালো লেগেছিল। হেমিংওয়ের বয়স যখন মাত্র দশ, তখন বাবার কাছ থেকে একটি বন্দুক উপহার পেয়েছিলেন। উনিশ বছর বয়সে স্কুলের পড়া শেষ করে হেমিংওয়ে 'কানসাস্ সিটি স্টার' পত্রিকার রিপোর্টারের চাকুরী আরম্ভ করলেন। কয়েক মাস পরেই একাজ ছেড়ে চলে গেলেন ইতালী। প্রথম মহাযুদ্ধে ইতালী তখন বিপর্যস্ত। হেমিংওয়ে ইতালীর পদাতিক বাহিনীতে অ্যাম্বুলেন্স ড্রাইভারের কাজ নিলেন। যুদ্ধে গুরুতররূপে আহত হয়ে তাঁকে দেশে ফিরে আসতে হয়। তার ফলে এখনো প্ল্যাটিনামের জানুস্ত্রাণ (Knee Cap) ব্যতীত চলাফেরা করতে পারেন না। তাঁর দেহের সর্বত্র গুলীর চিহ্নও দেখা যায়। এই যুদ্ধের প্রভাব হেমিংওয়ের জীবন ও রচনাকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছে। Farewell to Arms ইতালীয় যুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত।

১৯১৯ সালে হেমিংওয়ে তাঁর ছেলেবেলার বান্ধবী হ্যাড্‌লি রিচার্ডসনকে বিয়ে করেন। পর বৎসরই তিনি সংবাদপত্রের রিপোর্টারের কাজ নিয়ে তুরস্কে যান। বেশিদিন এ কাজ ভালো না লাগায় ১৯২১ সালে হেমিংওয়ে প্যারিসে স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করেন। সংবাদপত্রের জন্য রিপোর্ট অথবা সাময়িকপত্রের জন্য কয়েকটি গল্প ছাড়া তিনি এ পর্যন্ত আর কিছু লেখেননি। প্যারিসে এজরা পাউন্ড ও গারট্রুড স্টেন্-এর সঙ্গে পরিচয় হবার পর থেকে হেমিংওয়ের জীবনে নতুন দিগন্ত দেখা দেয়। পরবর্তী সময়ে এ'দের সঙ্গে মতবিরোধ ঘটলেও হেমিংওয়ের সাহিত্যিক জীবনের সূচনায় এই দু'জনের প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। ঐ সময় আমেরিকা, ইংল্যান্ড ও অন্যান্য দেশ থেকে একদল তরুণ-তরুণী এসে প্যারিসে আশ্রয় নিয়েছিল। তারা অনেকেই দেশ থেকে বিতাড়িত। যে উচ্চ আদর্শ সামনে রেখে প্রথম মহাযুদ্ধে হাজার হাজার তরুণ প্রাণ দিয়েছে, দুঃখ-কষ্ট সয়েছে, যুদ্ধের পরে দেখা গেল সে আদর্শের কোনো মূল্য নেই। যুদ্ধে জয়লাভ করা সত্ত্বেও সমাজব্যবস্থায় কোনো পরিবর্তন হলো না, জীবনে এলো না শান্তি। বরং আরো খারাপ হলো। চোখের সম্মুখ থেকে আশার নিশানাটা হারিয়ে গেল। যুদ্ধের ক'বছরে যারা যৌবনে পা দিয়েছে তাদের যুদ্ধে প্রাণ দিতে হয়েছে, দেহ পঙ্গু হয়েছে, তাদের ঘর ভেঙেছে, আর ভেঙেছে ভবিষ্যতের সকল স্বপ্ন। এই আঘাতে এরা হয়ে পড়ল জীবন-বিদ্বেষী, উৎকেন্দ্রিক; নীতি ও ধর্মের উপরে আস্থা হারালো। শান্তি খুঁজল নারী ও সুরার মধ্যে। যুদ্ধকালীন এই ছন্নছাড়া তরুণের দলকে স্টেন নাম দিয়েছিলেন 'লস্ট জেনারেশান'। প্যারিসে 'লস্ট জেনারেশানের' ছিল সবচেয়ে বড় আড্ডা। হেমিংওয়ে এই দলে যোগ দিলেন। তাঁর প্রথম চারখানা বই এই দলের চিন্তাধারায় পুষ্ট এবং ভাবাবেগপ্রবণ। হেমিংওয়ের প্রথম সফল উপন্যাস The Sun also Rises 'লস্ট জেনারেশানের' কয়েকজন লেখক ও শিল্পীর আলাপ-আলোচনার উপর ভিত্তি করে রচিত। তবু এই উপন্যাসটি একান্তরূপে দলীয় সংকীর্ণতায় ভারাক্রান্ত নয়। এর মধ্যে সর্বজনীন আবেদনের যোগ্য সাহিত্যরস আছে; তাই 'দি সান অলসো রাইজেস্' প্রকাশিত হবার পর ঔপন্যাসিক হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেন। এই উপন্যাস তাঁকে আকস্মিকভাবে খ্যাতিমান করে তুলল,—তিনি নিজেই এতটা আশা করতে পারেননি।

ছ' বছর পরে হেমিংওয়ে স্বদেশে ফিরে এলেন। প্রথম স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য ঘটায় বিবাহবিচ্ছেদের পর বিয়ে করলেন পলিনকে। এই পলিনের সঙ্গেও বিচ্ছেদ ঘটেছে। মার্কিন লেখিকা মার্থা গেলহর্ন এখন তাঁর তৃতীয় পক্ষের স্ত্রী।

১৯৩৬ সালে স্পেনে গৃহযুদ্ধ আরম্ভ হলো। হেমিংওয়ে সেখানে গেলেন সংবাদপত্রের রিপোর্টার হয়ে। স্পেনে পৌঁছে তিনি শুধু রিপোর্টার রইলেন না। তাঁর মন ডুবে গেল স্পেনের সংস্কৃতি ও সভ্যতার মধ্যে। স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই হেমিংওয়ের জীবনদর্শনের প্রধান ভিত্তি রচনা করেছে। 'দি স্প্যানিশ আর্থ' নামক ফিল্মের ধারাবিবরণী স্পেনে থাকতেই লিখেছেন। স্পেনের তৎকালীন জীবন নিয়ে হেমিংওয়ে তাঁর প্রথম নাটক 'দি ফিফ্‌থ কলাম' রচনা করেছেন দু' বছর পরে। তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'ফর হুম দি বেল টল্‌স্' স্প্যানিশ গৃহযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস্' ইতালীর যুদ্ধের পটভূমিকায় একটি বৃটিশ নার্স ও আমেরিকান সৈন্যের প্রেমের কাহিনী। 'ফর হুম দি বেল টল্‌স্'-এ স্পেনের গৃহযুদ্ধে যোগদানকারী এক আমেরিকান স্বেচ্ছাসৈনিকের মাত্র চারদিনের বিপদসঙ্কুল প্রেম এবং তার পরে মৃত্যুর গল্প বলা হয়েছে। 'Men without women'এ হেমিংওয়ে স্পেনের দস্যু এবং ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াই করা যাদের পেশা তাদের কথা বলেছেন। "Death in the afternoon"এ ষাঁড়ের সঙ্গে লড়াইর কৌশল বর্ণনা করা হয়েছে, আর আছে ষাঁড়ের লড়াইর ইতিহাস। সুতরাং দেখা

যাবে যে, স্পেন হেমিংওয়ের রচনাকে বিশেষরূপে প্রভাবান্বিত করেছে। স্পেনের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ যে কত গভীর তার প্রমাণ পাওয়া যাবে আর একটি ঘটনা থেকে। নোবেল পুরস্কার পাবার সংবাদ পেয়ে হেমিংওয়ে বললেন যে, এ পুরস্কার আমাকে দেওয়া না হলে অন্য তিনজনকে দেওয়া যেতে পারত। এই তিনজনের মধ্যে তাঁর প্রথম সুপারিশই হলো Karen Von Blix নামক স্প্যানিশ লেখকের। ইনি Isaac Dinesen ছদ্ম-নাম নিয়ে ইংরেজীতে Seven Gothic Tales নামে একটি বই লিখেছেন।

যুদ্ধের প্রতি হেমিংওয়ের একটা অনিবার্য আকর্ষণ আছে। তাই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও তিনি রিপোর্টার হিসাবে কাজ করেছেন। এবারকার অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন Across the River and into the Sea. যুদ্ধের বিষ মানুষের জীবনকে যে কিরূপ অসহনীয় করে তোলে তা কর্নেল ক্যান্টওয়েলের কাহিনী থেকে দেখা যাবে। ১৯৫২ সালে হেমিংওয়ে The Oldman and the Sea লিখে পুলিৎজার পুরস্কার পান।

হেমিংওয়ের মতো জীবনবিলাসী লেখক এ যুগে বিরল। শারীরিক শক্তি ও পৌরুষের তিনি পূজারী। মানসিকতার দোহাই দিয়ে দেহকে তিনি কখনো অস্বীকার করেননি। এইজন্যই ষাঁড়ের লড়াই তাঁকে মুগ্ধ করে। এর মধ্যে তিনি দেখতে পান শক্তির বিকাশ। তিনি নিজে সবল ও দীর্ঘকায়: আমেরিকানদের চোখে তাঁর গায়ের রঙ একটু ময়লা। বিপদসঙ্কুল শিকার, মাছ ধরা এবং মুষ্টিযুদ্ধ লড়া হেমিংওয়ের চিত্ত-বিনোদনের প্রিয় পন্থা। কিছুকাল যাবৎ অবশ্য মুষ্টিযুদ্ধের শখ ত্যাগ করতে হয়েছে। হেমিংওয়ের কর্মক্ষমতাও অসাধারণ। 'ফর হুম দি বেল টোল্‌স্‌'র গ্যালি প্রুফ পেয়ে ৯৬ ঘণ্টা ধরে ক্রমান্বয়ে প্রুফ দেখেছেন, ঐ সময়ের মধ্যে নিজের ঘর থেকে একবার বের পর্যন্ত হননি।

হেমিংওয়ে থাকেন একজন ছোটখাটো রাজার হালে। কিউবায় পনেরো অ্যাকার বিস্তৃত জমির উপর তাঁর বাড়ী। সেখানে বাগান, সাঁতার কাটবার পুকুর, টেনিস্ কোর্ট আছে। আর আছে একটি উঁচু টাওয়ার,—তার উপরে হেমিংওয়ের পড়বার ঘর। তাঁর শোবার ঘর ষাট ফুট লম্বা, দু'পাশে নানা ধরনের পশুর মাথা সাজানো। তাঁর বাড়ীতে ভবঘুরে, ভিখিরি, ফিল্ম স্টার, সাহিত্যিক প্রভৃতি নানা শ্রেণীর অতিথি সব সময়ই আছে। তিনি তাদের ডেকে আনেন; কতদিন থাকবে তা কেউ জানে না।

এই জঙ্গী সাহিত্যিককে কেন্দ্র করে আমেরিকার জনসাধারণের কৌতূহলের শেষ নেই। হেমিংওয়ে গম্ভীর প্রকৃতির লোক; ব্যক্তিগত জীবনকে তিনি সর্বদা লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখেন। তাই কৌতূহল তৃপ্ত না হয়ে আরো বাড়ে। ম্যাক্স ঈস্টম্যানের সঙ্গে একটি বইয়ের সমালোচনা নিয়ে হাতাহাতি হয়েছে, হেমিংওয়ের নীরবতার জন্য এই গুজবের সত্যতা নির্ণয় করা যায়নি।

হেমিংওয়ে পৌরুষের পূজারী হলেও কুসংস্কারকে একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারেন না। প্রত্যেক ভালো কাজ আরম্ভ করবার আগে সুলক্ষণ কুলক্ষণ-গুলি তিনি মিলিয়ে দেখেন। কিন্তু এ বছর জানুয়ারী মাসে তাঁর লক্ষণের জাত মেলাতে কিছু ত্রুটি থাকবার ফলে আফ্রিকার গভীর অরণ্যে দু'বার বিমান ভেঙে পড়ে সস্ত্রীক প্রাণ হারাতে বসে-ছিলেন। এর পূর্বেও তিনি আফ্রিকার জঙ্গলে ঘুরে এসে Green Hills of Africa লিখেছেন। আমেরিকার Look ম্যাগাজিনের জন্য কতকগুলি ধারাবাহিক শিকার প্রবন্ধ লেখবার জন্য হেমিংওয়ে আফ্রিকায় গিয়েছিলেন। বিমান দুর্ঘটনার ফলে তাঁর লিভার ও কিড্‌নি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এই আঘাতের জন্য তিনি এখন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে একটু লিখতে পারেন; বসে লেখা এখন আর সম্ভব নয়। কবে সম্ভব হবে তারও ঠিক নেই। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করবার জন্য স্টকহলমে যাওয়াও তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। তবু হেমিংওয়ে নিরাশ হননি। তিনি আরো লিখবেন, আরো বেশি ভালো লিখবেন—পুরস্কার পাবার খবর পেয়ে এই আশ্বাস তাঁর পাঠকদের দিয়েছেন।

প্রথম যৌবনে যুদ্ধের নিষ্ঠুর অভিজ্ঞতা হেমিংওয়ের চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করে' নতুন রূপ দিয়েছে। যুদ্ধের সময় তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের অস্বাভাবিক জীবনযাত্রা, সৈন্য-দের অস্বাভাবিক মৃত্যু এবং স্বাভাবিক আশা-আকাঙ্ক্ষা ও প্রয়োজনকে জোর করে দমন করবার ফলে চরিত্রবিকৃতি। হাজার হাজার তরুণকে অকারণে নিরুপায়ভাবে অস্বাভাবিক মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র ছাড়া য়ুরোপ আমেরিকার দৈনন্দিন জীবনও কৃত্রিমতায় ভারাক্রান্ত। সহজ ও স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা দমন করে সভ্য সমাজে বাস করতে হয়। এই দমিত ঈপ্সার তাড়নায় কেউ সুরা, কেউ বা বিকৃত যৌনবিলাসের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। সহজ, স্বাভাবিক জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়াতেই মানুষের মুক্তি, স্বাভাবিক জীবনের মধ্যেই মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশের সম্ভাবনা। এই বিশ্বাস হেমিংওয়ে ফ্রয়েডের কাছ থেকে পাননি; পেয়েছেন প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে। হেমিংওয়ে নিজে স্বাভাবিক আদিম জীবনের স্বাদ পাবার জন্য মাঝে মাঝে আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে, অথবা অন্য কোনো লোকবিরল অঞ্চলে বেড়াতে যান। তাঁর উপন্যাসের অনেক চরিত্রও হঠাৎ সামাজিক প্রতিষ্ঠা ও ঐশ্বর্য ত্যাগ করে নতুন জীবনের সন্ধানে অরণ্যে বা পর্বতে চলে যায়।

স্বাভাবিক অভীপ্সা পূরণ করবার মতো সামাজিক অবস্থা এলেই মানুষের দুঃখ দূর হবে। কিন্তু সব ইচ্ছাই কি পূরণ করবার অধিকার থাকা সঙ্গত? হেমিংওয়ে তা বলেন না যে ইচ্ছা পূরণ করবার পর মন গ্লানিতে ভরে ওঠে না, সে ইচ্ছাই সঙ্গত! ষাঁড়ের লড়াই দেখবার আকাঙ্ক্ষা সঙ্গত, কারণ দর্শকেরা আনন্দ পায়, মনের কোণে গ্লানি জমে না। সমাজে কোনো নিয়ম-কানুন থাকবে না, একথা হেমিংওয়ে বলেন না। নিয়ম থাকবে; তা হবে একটা ক্লাবের নিয়মের মতো। স্বেচ্ছায় মেনে চলবে, কেউ জোর করে আমার উপর চাপিয়ে দেবে না।

হেমিংওয়ের সকল রচনাই মৃত্যুর ছায়ায় ম্লান। পাঠক প্রথম থেকেই সচেতন হন মৃত্যু অনিবার্য গতিতে

আসছে এগিয়ে। মৃত্যুর সঙ্গে রক্তাক্ত সংগ্রাম করে টিকে থাকার নামই জীবন। এজন্য চাই পৌরুষ, চাই বীর্য। তাই হেমিংওয়ে দেহের শক্তিকে বড় করে দেখেছেন। স্পেনের ষাঁড়ের লড়াই তাঁর কাছে জীবনের প্রতীক। ক্রুদ্ধ ষাঁড় শিং বাঁকিয়ে মৃত্যুর মতো এগিয়ে আসে আঘাত করতে; ম্যাটাডোর (ষাঁড়ের সঙ্গে যে যুদ্ধ করে) প্রাণপণ শক্তিতে তাকে বাধা দিয়ে জয়ী হতে চায়। ম্যাটাডোর যে সাহস নিয়ে লড়াই করে আমাদেরও মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে সেই সাহসের পরিচয় দিতে হবে।

অনেকে বলেছেন, হেমিংওয়ে নারী-বিদ্বেষী। কিন্তু বিচার করলে দেখা যাবে তাঁর বিদ্বেষ প্রধানত আমেরিকান নারীদের বিরুদ্ধে। এর প্রধান কারণ হয়তো এই যে, মার্কিন পুরুষদের নিবীর্য করে সেখানকার নারীরা পুরুষের স্থান ধীরে ধীরে অধিকার করছে। আর একটি কারণ এদের চরম কৃত্রিম জীবন যাপন। 'দি ফিফ্‌থ কলামের' মুর বালিকা এ্যানিটা বলছে, Put the paint in the body, instead of blood. What you get? American woman.' রক্তের বদলে কিছু প্রসাধন সামগ্রী দেহে ইনজেকশান করে দিলেই মার্কিন নারী পাওয়া যাবে।

হেমিংওয়ের বিশেষ কোন রাজনৈতিক মতবাদ নেই। কেননা রাজনীতির চেয়ে মানুষ তাঁর কাছে বড়। একনায়কত্ব এবং গণতন্ত্রের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ তিনি দেখতে পাননি। কারণ যে মানুষের দেহ ও মন উপবাসী, একটা নিছক রাজনৈতিক আদর্শ তাকে আকৃষ্ট করতে পারে না। সাধারণ মানুষ কঠোর আঘাত না পেলে রাজনীতির সঙ্গে কখনো তার জীবনকে জড়াতে চায় না। হেমিংওয়ের রাজনৈতিক মতবাদ নিয়ে সমালোচকদের মধ্যে তর্ক উঠেছে। কিন্তু তাঁর সাহিত্যে রাজনীতি কখনো প্রাধান্য লাভ করেনি। To have and have not তাঁর একমাত্র বই, যেখানে হয়তো রাজনীতির খানিকটা ছোঁয়া লেগেছে।

হেমিংওয়ে সহজ, সরল, স্বাভাবিক জীবনের সমর্থক। এই আদর্শের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর ভাষাও হয়েছে আশ্চর্য-রূপে সরল ও স্পষ্ট; তবু জোরালো ও বেগবান। তর্ তর্ করে' সে ভাষা বয়ে চলে। 'সবুজপত্রের' ভাষা বাঙলা সাহিত্যে যে বিপ্লব এনেছিল, হেমিংওয়ের ভাষা আমেরিকার সাহিত্যে তেমনি আলোড়ন এনেছে। হেমিংওয়ের নিজের কথা থেকে রচনাশৈলী সম্বন্ধে তাঁর আদর্শ কি, তা বোঝা যাবে:

If a man writes clearly enough anyone can see if he fakes. If he mystifies to avoid a straight statement, which is very different from breaking so-called rules of syntax or grammar to make an effect which can be obtained in no other way, the writer takes a longer time to be known as a fake and other writers who are afflicted by the same necessity will praise him in their own defence. (Death in the Afternoon).

এ উক্তি প্রত্যেক লেখকেরই প্রণিধান-যোগ্য। হেমিংওয়ের ভাষা তাঁকে জনপ্রিয় করতে সাহায্য করেছে। তাঁর ভাষা উপন্যাস, ছোট গল্প ও প্রবন্ধের পক্ষে সমান উপযোগী। হেমিংওয়ে অনেকগুলি প্রথম শ্রেণীর গল্প লিখেছেন। The Snows of kilimanjaro এবং The Undefeated এ যুগের দুটি অবিস্মরণীয় ছোট গল্প।

হেমিংওয়ের সবগুলি উপন্যাসই এক সূত্রে গাঁথা। পরবর্তী কাহিনী ও চরিত্র-গুলি পূর্ববর্তী কাহিনী ও চরিত্রের পূর্ণতর বিকাশ। কোন কাহিনী বা চরিত্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে একা দাঁড়িয়ে নেই। কিন্তু তাঁর সর্বশেষ উপন্যাস The Old Man and the Sea স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। এই উপন্যাসটি হেমিংওয়ের সাহিত্য-জীবনে নতুন অধ্যায় সংযোজনের ইঙ্গিত।

এক বৃদ্ধ জেলে বিরাট আকৃতির মার্লিন মাছ ধরেছে। সমুদ্রের জল থেকে তাকে টেনে তোলা সহজ কথা নয়। তিন দিন ধরে সংগ্রাম চলল। এই তিন দিনের কথাই গল্পের বিষয়বস্তু। বৃদ্ধ হলেও জেলের মধ্যে শক্তির বিকাশ আছে, এই শক্তি দিয়েই শেষ পর্যন্ত মাছটাকে পরাভূত করা হলো। কিন্তু পূর্বের মতো হেমিংওয়ে এখানে মানুষের দৈহিক শক্তির গর্ব প্রকাশ করেননি। তিনদিন ক্রমাগত মাছটার সঙ্গে সংগ্রাম করে জেলে মাছটাকে ভালোবেসে ফেলল। ঐ মার্লিন মাছটা প্রকৃতির ও প্রাণীজগতের সব কিছু মহত্ব ও সৌন্দর্যের প্রতীক। বৃদ্ধ জেলে প্রকৃতির পশু-পাখীর সঙ্গে একটা অখণ্ড যোগসূত্র অনুভব করল। ভালোবেসেছে বলেই সে মাছটাকে মেরেছে। কারণ, 'If you love him it is not a sin to kill him.' মৃত্যুটা ভালোবাসার সম্পর্ককে চিরস্থায়ী করতে পারে। হেমিংওয়ের মৃত্যু এখানে ভয়ঙ্কর রূপ নিয়ে দেখা দেয়নি। মৃত্যু এখানে বিশ্ব-প্রকৃতির সঙ্গে ঐক্যানুভূতির দ্বার স্বরূপ।

মাছটার সঙ্গে লড়াই করে করে বৃদ্ধ জেলে একবারও হতাশ হয়ে পড়েনি। লেখক বলছেন,—(man is not made for defeat. A man can be destroyed but not defeated......It is silly not to hope, he thought. Besides I believe it is a sin.)

এই আশার বাণী হেমিংওয়ের সাহিত্যে এনেছে নতুন বাঁক। তিনি হতাশা ও মৃত্যুর কালো ছায়া থেকে এসে দাঁড়িয়েছেন আশার সূর্যালোকে। এই বইটি প্রমাণ করেছে হেমিংওয়ের মন এখনো সৃষ্টিধর্মী। তাঁর কাছ থেকে আমরা আরো নতুন কিছু আশা করি।

নোবেল পুরস্কার ঘোষণা করবার পর হেমিংওয়ে নিজেই সে আশ্বাস আমাদের দিয়েছেন।

গ্রন্থপঞ্জী:

Three Stories and Ten Poems (1923); In Our Time (1924); The Torrents of Spring (1926); Today is Friday (1926); The Sun also Rises; বৃটিশ সংস্করণের নাম Fiesta (1926); Men without Women (1927); A Farewell to Arms (1929); Death in the Afternoon (1932); Winner takes nothing (1933); Green Hills of Africa (1935); To Have and Have Not (1937); The Spanish Earth (1938); The Ffth Column and the First Forty-nine Stories (1938); For whom the Bell Tolls (1940); Across the River and Into the Trees (1950); The Old Man of the Sea (1952).

হেমিংওয়ের ঠিকানা:

San Francisco de Paula, Cuba.

রম্যরচনা

কথায় কথায়। রূপদর্শী। বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলিকাতা—১২। দাম ৩্ টাকা।

'নক্সা' এবং 'সার্কাসে'র পর রূপদর্শীর নতুন বই 'কথায় কথায়'। এই তিনটি স্বতন্ত্র বই বোধ করি প্রকাশিত হয়েছে আড়াই কি তিন বছরের মধ্যে। এত অল্প সময়ের মধ্যে কোনও লেখকের তিনটি বই প্রকাশিত হওয়ায় তাঁর জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কিন্তু বর্তমান সমালোচকের আলোচ্য বিষয়, রূপদর্শীর জনপ্রিয়তা নিরূপণ করা নয়, তাঁর লেখার বৈচিত্র্য অন্বেষণ করা। বাস্তবিক পক্ষে কোনও লেখকের অতি অল্প সময়ের মধ্যে প্রকাশিত এই তিনটি বইয়ের বিষয়বস্তু, ভাব ও ভাষার মধ্যে প্রকৃতিগত মেরু-সমান বৈপরীত্য থাকতে পারে তা জানা ছিল না। 'নক্সা', 'সার্কাস' থেকে এবং 'কথায় কথায়ে'র সুর আলাদা। 'নক্সা' এবং সার্কাসে'র মধ্যে চরিত্রগত সাদৃশ্য অবশ্যই ছিল। কিন্তু 'নক্সা'য় লেখকের তথ্য-প্রিয়তাই ছিল প্রধান আকর্ষণীয় গুণ (ভাষার সরসতা বাদ দিয়েই বলছি)। 'সার্কাসে' তথ্য অপেক্ষা ভাব ও সহানুভূতি নিবিড় হয়েছে। শিল্পকর্মের দিক থেকে দ্বিতীয়টি অনেক বেশি সফল এবং নিঃসন্দেহে উৎকৃষ্ট। 'কথায় কথায়' গ্রন্থে রূপদর্শী পূর্বের কীর্তিকে সম্পূর্ণ বর্জন করে নতুন ইমারৎ তৈরি করেছেন। এর ছক আলাদা, মালমশলা আলাদা—রূপ ও রূপসৃষ্টি দুই স্বতন্ত্র।

'কথায় কথায়'কে কি সংজ্ঞা দেওয়া যেতে পারে সাহিত্য-বিচারে সেটা অবশ্য দুরূহ সমস্যা। যাঁরা সাহিত্য-ব্যাকরণের অনুশাসন মেনে রস গ্রহণ করতে না-চান তাঁরা 'কথায় কথায়'কে লেখকের স্কেচ-বুক ধরনের একটি অভিজ্ঞতা-কাহিনীর গ্রন্থ হিসাবে ধরতে পারেন। অন্তত আমার তাই মনে হয়েছে। কথায় কথায়ের কুড়িটি কাহিনীই গল্পধর্মী—যদিও সবকটিকে ছোট গল্পের আওতায় ফেলা যায় না। অনেকগুলি কাহিনী আবার ছোট গল্পই। যেমন বিভূতিদার প্রেম, সুনু ঠাকুরপোর বৌদি, ম্যাজিসিয়ান, বড়ুয়া মাসি, তেরেজা বৌদি ইত্যাদিকে ছোট গল্প বলতে আমার আপত্তি নেই; আবার চিল্কার সেই শিল্পীর কাহিনীটি, লালবাজারের সেই পুলিস হেফাজতের ছোকরা ইত্যাদি কাহিনী-গুলিকে পুরোপুরি গল্প বলতে বাধে। কাজেই পাঠকের পক্ষে 'কথায় কথায়'কে লেখকের বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার রসোত্তীর্ণ বিবরণ বলে ধরে নেওয়াই সবচেয়ে সহজ হবে।

লেখক মাত্রেই জীবনের অভিজ্ঞতার নুড়ি কুড়িয়ে তাই দিয়ে ঘষে মেজে মনোমতন করে সাজিয়ে গুজিয়ে রসের নারায়ণ গড়ে থাকেন। এটা নতুন কিছু নয়। রূপদর্শীও কথায় কথায় বইয়ে তাই করেছেন। তবে এখানে তফাৎ এইটুকু যে, অন্য লেখকরা একটি ক্ষুদ্র অভিজ্ঞতাকে ছোট গল্পের ছকে ফেলার জন্যে যে বিশেষ কারু-পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকেন—রূপদর্শী বহুক্ষেত্রে তা করেন নি। বলা বাহুল্য, এটা তাঁর অক্ষমতার দরুণ নয়, লেখার চরিত্র-রক্ষার দরুণ। উদাহরণ স্বরূপে ধরা যেতে পারে জানকীরামের সেই কালো মেয়ের কাহিনী। এই কাহিনীটি কাব্যমাধুর্য-মণ্ডিত একটি ছোটগল্পের অমূল্য সম্পদ। রূপদর্শী এমন কাহিনীকে গল্প করেন নি—শুধু মাত্র নিজের স্মৃতি-সৌরভের সঙ্গী হিসাবে গোপনে ধরে রেখেছেন। এমন কথা হয়ত বলা চলে, কথায় কথায় লেখক সব কিছুকে যত বেশি পার্সন্যাল করে রেখেছেন—এতটা না রাখলে এগুলি ছোটগল্পের বিষয়বস্তু। কিন্তু আগেই বলেছি, লেখক এই অভিজ্ঞতাগুলিকে নিতান্ত ব্যক্তিগত করেই রাখতে চান, হয়ত এ জন্যেই যে, পাঁকের পদ্মকে পুকুর পাড়েই তোমায় দেখাবো, শো-কেসের চিনেমাটির টবে সাজিয়ে নয়। প্রকৃত আনন্দ সঞ্চার করানোর জন্যেই সম্ভবত লেখকের এ প্রচেষ্টা বলেই আমার ধারণা। কথায় কথায় তারই উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।
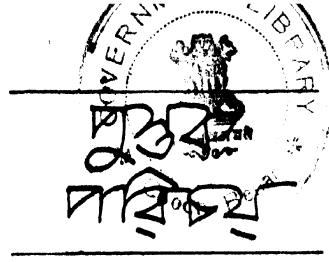
কথায় কথায়ের বিষয়বস্তুতেই রূপদর্শী নতুন হননি তাঁর পূর্বকৃতি অন্যত্র সরিয়ে রেখে, ভাষাতেও তিনি নতুন হয়েছেন। হাস্য-শ্লেষ-বক্রোক্তি এবং লঘু ও বিদেশী মিশ্র-ভাষার যে ব্যবহার ইতিপূর্বে তাঁর স্বকীয় ভাষা সজ্জার অন্যতম কৌশল ছিল কথায় কথায় তা সম্পূর্ণভাবে বর্জিত। কথায় কথায়ের ভাষা সহজ, সরল, সাবলীল এবং শুদ্ধ বাংলা ভাষা। এ ভাষায় উন্মাদনা নেই—স্নিগ্ধতার ব্যঞ্জনা আছে। রূপদর্শী স্বীয় শিল্পকর্মে যেন আরেক দফা ভাষা-দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন।

সর্বশেষে একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন। কথায় কথায়ে'র সব কাহিনী-গুলিই যে রসবিচারে সার্থক বা উত্তীর্ণ এমন নয়। আবার এমন কাহিনীও একাধিক আছে যা নিঃসংশয়ে অবিস্মরণীয়। যেমন, সুনু ঠাকুরপো অথবা তেরেজা বৌদির কাহিনী। গভীর সহানুভূতি রূপদর্শীর রচনা-চরিত্রের অন্যতম প্রধান গুণ। এই গ্রন্থে তার পরিচয় সর্বত্র। হয়ত এই কারণেই কথায় কথায়ের কোন কোন চরিত্র পাঠক-মনকে একটি অনাস্বাদিত জীবন-রহস্যের সন্ধান দিয়ে বহু রাত্রি নিঃসঙ্গ সখ্যতা দিয়ে যায়। ২৮৫।৫৪

উপন্যাস

মেঘমালা : রেণুকা দেবী; **প্রকাশক**—গ্রন্থজগৎ, ৭ জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা—২৯। মূল্য আড়াই টাকা।

বিভিন্ন সময়ে হিমালয়ের প্রধান শৃঙ্গ এভারেস্টএর চূড়ায় আরোহণের কাহিনীকে ভিত্তি করে রচিত একখানি উপন্যাস। তথ্য হিসাবে অভিযান কাহিনীগুলির মূল্য থাকলেও উপন্যাস হিসাবে আলোচ্য বইখানি সাধারণ শ্রেণীর। ভাষার শ্লথতা ও বিন্যাসের দুর্বলতার জন্য স্বচ্ছন্দ গতিতে পড়াও যায় না। সংলাপ রচনাতেও লেখিকার অপটু হাতের ছাপ বিদ্যমান। তবে কাহিনীর পটভূমিকা রচনায় বৈচিত্র্য আছে। ছাপায় কয়েকটি ভুল চোখে পড়ল। প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই চলনসই।

৩৬১।৫৪

পণ্যা : কুমারেশ ঘোষ; পরিবেশক—গ্রন্থজগৎ, ৭ জে, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা। মূল্য তিন টাকা।

বর্তমান বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রে বিষয়-বৈচিত্র্যের আমদানী খুব একটা চোখে পড়ে না। ইদানীং কালে কয়েকখানি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তার কিছুটা ব্যতিক্রম দেখা গেছে। আলোচ্য উপন্যাসখানিও সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। শিলংএর পটভূমিকায় এটি রচিত। পরিবেশ ও আবহাওয়ার মধ্যে অনেকটা নতুনত্ব আছে এবং অভিনবত্ব আছে মনিলালের রক্ষিতা প্রে'র (যাকে মনিলাল দ্বিতীয় পত্নী হিসাবে মর্যাদা দিতেও অনেক সময় কুণ্ঠিত নয়) চরিত্র-চিত্রণে। বস্তুত খাসিয়া মেয়ে এই প্রে'র আত্মসমর্থনের ইঙ্গিতে উপন্যাসের নামকরণ। লেখকের দৃষ্টিভঙ্গীতে মধ্যবিত্ত সমাজের তুচ্ছতম ও খুঁটিনাটি বিষয়গুলিও ধরা পড়েছে ও বলতেও তিনি পেরেছেন রসিয়ে। কিন্তু 'পণ্যা' উপন্যাসখানি আরও অধিক আকর্ষণীয় হত যদি উত্তম পুরুষে লেখা লেখকের চরিত্রটির মধ্যে উন্নাসিকতার ভাবটা না থাকত। মরালিস্টসুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে মাস্টারী করা চলে, উপন্যাস রচনায় ত্রুটি থেকে যায়। কাহিনীর মধ্যে লেখক নিজেকে ধরা না দেওয়ায় ও নীতিগত দিকটা প্রাধান্য লাভ করায় রচনা সাধারণ শ্রেণীতে পর্যবসিত হবার পথ সুগম করেছে। লেখক উপরদিক থেকেই সব কিছু অবলোকন করেছেন, হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করতে পারেননি। তবে শিলংএর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ভরপুর দৃশ্যগুলি, বাংলা অনুবাদ সহ খাসিয়া কথাগুলির দোলা ও দুটি কয়েক চরিত্রকে সহজে ভোলা যায় না।
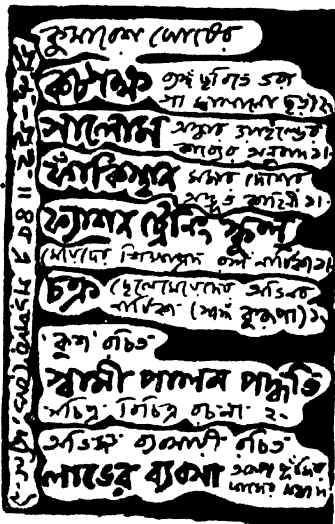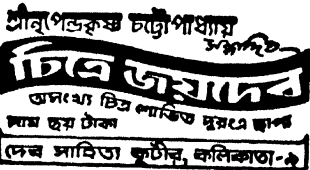
৩৬২।৫৪

নাটক

প্রবাহ : গিরিশঙ্কর; প্রকাশক—ছাত্র শিক্ষা নিকেতন, ১৭৩—৩, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম—॥০।

শ্রমিক আন্দোলনকে ভিত্তি করে লেখা একখানি ক্ষুদ্র নাটিকা। এতে প্রচারটাই প্রকট হয়ে ওঠায় নাট্যরস জমে নি।

২৩৯।৫৪

সংগ্রাম : নীলাপদ ভট্টাচার্য, প্রাপ্তিস্থান প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম দশ আনা।

স্ত্রী-ভূমিকা বর্জিত ত্রি-অঙ্কের ছোট্ট নাটক। পরিচিত গণ্ডীর বিষয়বস্তু ও সহজ সংলাপ নিয়ে মোটামুটি উতরে গেলেও প্রায় প্রতিটি দৃশ্যে গান সংযোজিত হওয়ায় যাত্রার পালা কীর্তন হয়ে পড়েছে।

২৩৮।৫৪

বাস্তুভিটা : দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়; প্রকাশক—পুস্তকালয়, দেশবন্ধুনগর, ২৪ পরগণা। মূল্য পাঁচসিকা।

পাকিস্তানের সৃষ্টি হবার পর পূর্ব বাঙলার গ্রাম্য স্কুল মাস্টার মহেন্দ্র স্ত্রী-কন্যা সহ নানা রকম প্রতিকূল অবস্থা ও অপমান সহ্য করেও পিতৃপুরুষের বসত ভিটা কীভাবে দৃঢ় করে আঁকড়ে ধরে রইল তাই শেষ পর্যন্ত হিন্দু-মুসলমানের মিলিত শক্তির জয় ঘোষণার মধ্য দিয়ে দেখান হয়েছে। কিন্তু বিষয়বস্তু বেশিমাত্রায় বাস্তবধর্মী হওয়ায় নাট্যরস ক্ষুণ্ণ হয়েছে। গ্রাম্য জীবনের পটভূমিকায় রচিত হলেও নাটকে রাজনীতি বাদে লোক সংস্কৃতির সহজ দিকটার পরিচয় তেমন নেই। চরিত্রগুলি মোটামুটি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য নিয়েই ফুটে উঠেছে।

মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা চলন সই।

৩৬৩।৫৪

অনুবাদ সাহিত্য

শ্রীমতী ফিফি : মোপাসাঁ; অনুবাদ—বিমল রায়; প্রাপ্তিস্থান—ইণ্ডিয়ানা লিমিটেড, ২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দেড় টাকা।

বিখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক গী দ্য মোপাসাঁর চারটি ছোট গল্পের বাংলা অনুবাদ এবং প্রথম গল্পের নাম অনুসারে (যে প্রকৃতই পুরুষ, শ্রীমতী ফিফি নামকরণ করেছিল দলের লোকেরা) বইয়ের নাম। মোপাসাঁর মানসভঙ্গী ও লিখনশৈলী অনুবাদে অটুট আছে দেখে আনন্দ হল—ভাষাও হয়েছে স্বচ্ছন্দ। এর মধ্যেকার 'নিষ্ফলা' গল্পটি মোপাসাঁর একটি বিশিষ্ট রচনা। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপটটি বেশ আকর্ষণীয় হয়েছে। ৩৬৫।৫৪

সোনার ফসল : পি, পাভলেংকো, অনুবাদ—সরোজকুমার দত্ত; **প্রকাশক**—বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, ৮, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

রাশিয়ায় কিশোর-কিশোরীদের **ফসল** কাটার কার্যে অংশ গ্রহণকে কেন্দ্র করে রচিত উপন্যাস। পুস্তকটিতে সোভিয়েট ছেলে-মেয়েদের কর্মদক্ষতা, প্রাণ-প্রাচুর্য ও উক্ত দেশের কৃষিক্ষেত্রের একটা স্পষ্ট ছবি ফুটে উঠেছে। অনুবাদ মন্দ হয়নি। ছাপা ও বাঁধাই উত্তম। ৩৬৮।৫৪

কিশোর সাহিত্য

অ্যাডভেঞ্চার অব টার্জান—নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, প্রকাশক—দেব সাহিত্য কুটীর, ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য এক টাকা।

কোনো এক মানব শিশু বনমানুষ বা গেরিলাদের দ্বারা অপহৃত হয়ে লালিত-পালিত হয় বন্য আবহাওয়ায় ও তার নাম হল টার্জন। শিকারী মানুষ দলের সঙ্গে এই টার্জন ও গেরিলা দলের সংঘর্ষ বাঁধলে টার্জনের বীরত্ব ও সাহস ইত্যাদির পরিচয়

পাওয়া গেল। শিকারী দলের প্রধানের কন্যার সঙ্গে টার্জানের ঘনিষ্ঠতার কথাও আছে। কিশোরদের কাছে এ ধরনের কাহিনীর আকর্ষণ নেই এবং এ পড়ে তাদের উপকার বা আনন্দ লাভও কিছু হবে বলে মনে হয় না। মুদ্রণ সৌষ্ঠব ও প্রচ্ছদপট উত্তম। ২৭৩।৫৪

গুরুচরণ : সরলরঞ্জন দাশগুপ্ত; প্রকাশক—দাশগুপ্ত ব্রাদার্স, পি, ৩—শশী-ভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম পাঁচসিকা।

গুরুচরণ নামে কোন এক গ্রামবাসী ঘটনাচক্রে কীভাবে বালুকা চরে আটকা পড়ে চৌদ্দদিন অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিল এবং কীভাবেই বা মেঘনা পাড়ি দিয়ে লোকালয়ে এসে তার কাহিনীর সত্যা-সত্য প্রমাণিত করল তারই রোমাঞ্চকর কাহিনী এই বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। এতে বাঙালীর অতীত জীবনের বীরত্ব, শক্তি, আত্মত্যাগ, ধর্মজ্ঞান ইত্যাদির পরিচয় আছে। রচনা দুর্বল ও সাধারণ শ্রেণীর—তবে কিশোরদের পড়তে মন্দ লাগবে না। ৩৬৭।৫৪

কবিতা

নে তে তেরি তোম্—হাস্যরসাত্মক কবিতা পুস্তক; লেখক—অ-কৃ-ব; প্রকাশক—সোয়ান বুকস্, ২৭, হরিশ নিয়োগী রোড, কলিকাতা—৪। দাম—দু টাকা।

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু নিজের নাম সংক্ষিপ্ত করিয়া অ-কৃ-ব রাখিয়াছিলেন। এক্ষণে অ-কৃ-ব কে পাঠকসমাজকে তাহা জানাইবার জন্য মলাটের অন্তরালে আসল নামটি সবিস্তারে প্রকাশ করিতে হইতেছে। নে তে তেরি তোম্ কাব্যগ্রন্থটি পড়িতে বসিয়া এইটাই প্রথমে চোখে ঠেকিল। হয়ত প্রকাশকের আগ্রহাতিশয্যেই এইরূপ ঘটিয়া থাকিবে, কিন্তু ভরসা করিয়া কিছুই বলা যায় না; কারণ, আলোচ্য পুস্তকখানি হাস্য-রসাত্মক, হাস্যকর সকল কিছুরই ইহার ভিতর অল্পাধিক সার্থকতা থাকিতে পারে। লেখকের নাম যাহাই হউক, নে তে তেরি তোম্ পুস্তকখানি বাংলা সাহিত্যে হাসির কাব্য হিসাবে নিঃসন্দেহে একটি বিশিষ্ট স্থান পাইবার যোগ্য এবং ইহা প্রকাশিত হইবার পর "পাগলা গারদের কবিতা"র লেখক অ-কৃ-ব রসিকসভায় এই নামটিই সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। হাস্য রসের রচনায় যাঁহার বহু-মুখী প্রতিভা সর্বজনস্বীকৃত সেই প্র-না-বি পুস্তকখানির পরিচয়পত্রে লিখিয়াছেন "এই শ্রেণীর হাসির কাব্যের সংখ্যা বেশি নয়। আপাতত দ্বিজেন্দ্রলাল, বনফুল ও সজনী-কান্তের গ্রন্থের নাম মনে পড়িতেছে, তাঁহাদের সঙ্গে অ-কৃ-ব নামটি যুক্ত হইল।"

অ-কৃ-ব'র রচনায় বাহাদুরি তাঁহার বক্তব্যে নয়, বাহার তাঁহার বলার ভঙ্গীতে। অত্যন্ত মার্জিতরুচি কোনও সুদক্ষ অভিনেতা যদি বিদূষকের ভূমিকায় অভিনয় করিতে নামেন, তাহা হইলে দর্শক তাঁহার কাছে যে ধরনের রসাভিব্যক্তি প্রত্যাশা করেন, নে তে তেরি তোম্-এ অ-কৃ-ব পাঠকদের নিকট তাহাই পরিবেশন করিয়াছেন। বিচিত্র ছন্দসম্ভারে, সুষ্ঠু শব্দচয়নে ও প্রকাশের স্বচ্ছতায় প্রতিটি রচনাই সুখপাঠ্য হইয়া তাহাদের অন্তর্নিহিত হাসির ফোয়ারাগুলি খুলিয়া দিয়াছে। কয়েকটি রচনায় হাসির সঙ্গে সঙ্গে অনুক্ত একটি বেদনার আভাস থাকায় সেগুলি হাস্যরসের সীমানা ছাড়াইয়া প্রকৃত কাব্যের শ্রেণীতে পড়িবার যোগ্য। রসজ্ঞ পাঠক পুস্তকখানি পাঠ করিয়া হাসিয়া আনন্দ পাইবেন, এ কথা নিঃসংশয়ে বলা চলে। ৪৫২।৫৪

জীবনী

কে এই মা?—পশুপতি। শ্রীঅরবিন্দ পাঠ-মন্দির, ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২। আড়াই টাকা।

শ্রীঅরবিন্দ এবং তাঁর পণ্ডিচেরী আশ্রমের সঙ্গে একটি বিদেশী মহিলার নাম অঙ্গাঙ্গি-ভাবে জড়িত। এই অলৌকিক শক্তিসম্পন্না বিদেশী মহিলাই 'শ্রীমা'। তাঁর অধ্যাত্ম জীবন সম্বন্ধে সাধারণ মানুষের কৌতূহল থাকা স্বাভাবিক। অনেকটা কৌতূহলবশেই একদা লেখক তাঁর পরিচয় লাভে আগ্রহান্বিত হন। 'শ্রীমা'য়ের সঙ্গে তাঁর চাক্ষুষ পরিচয়ের সুযোগ কোনদিন ঘটেনি। কিন্তু আন্তরিক বিশ্বাস এবং গভীর উপলব্ধির মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর ধ্যান ধারণাকে প্রত্যক্ষ করতে পেরেছেন বলেই সামান্য কিছু চিঠিপত্র আর 'শ্রীমা'য়ের কয়েকটি দিনের 'প্রার্থনা'কে (দিন লিপি) সম্বল করে এমন একখানি গ্রন্থ রচনা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে, সম্ভব হয়েছে তাঁকে পাঠক সাধারণের কাছে এমন ঘনিষ্ঠ-ভাবে পরিচিত করা। শুধু অধ্যাত্ম মার্গই নয়, আশ্রম সংক্রান্ত গঠনমূলক কাজেও 'শ্রীমা'য়ের দানের তুলনা হয় না। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম সম্বন্ধে যাঁদের বিন্দুমাত্র আগ্রহ আছে, এ বই পড়ে তাঁরা এক নতুন জগতের সন্ধান পাবেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। পরিশেষে 'শ্রীমা'য়ের কয়েকটি অমূল্য বাণী সংযোজনার ফলে বইখানি অধিকতর সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। ৪৫৯।৫৪

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

ভাঙ্গা বেহালা—শ্রীলক্ষ্মণকুমার বিশ্বাস।

প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য—শ্রীসতী ঘোষ।

টি বি সহজবোধ্য ও সহজসাধ্য—ডাক্তার নরেশচন্দ্র দাশগুপ্ত।

পতিতা—গী দ্য মোপাসাঁ—অনুবাদক—বিমল রায়।

রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ—অনুবাদক—সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

সাতটা থেকে দশটা—শ্রীশম্ভুনাথ ভদ্র।

সেই পুরাতন কথা—নীলিমা দেবী।

রিক্তের বেদন—বিধুভূষণ দত্ত।

রিক্তের বেদন—শ্রীকৃষ্ণগোপাল বসাক।

একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা প্রকাশ্যে মিশরের মিলিটারী-করায়ত্ত সরকারের বিরোধিতা করছিল সে হচ্ছে "মুসলিম ব্রাদারহুড"। নসের গভর্নমেণ্ট এইবার মুসলিম ব্রাদারহুডের উচ্ছেদ-সাধন করার একটা মওকা পেয়েছেন। গত মঙ্গলবার আলেকজান্দ্রিয়ায় একটা সভায় প্রধানমন্ত্রী নসের ও অন্যান্য নেতা যখন উপস্থিত ছিলেন তখন এক ব্যক্তি মঞ্চের দিকে পিস্তল চালায়। লোকটিকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং সে নাকি স্বীকার করেছে যে, তার উদ্দেশ্য ছিল প্রধানমন্ত্রী নসেরকে হত্যা করা এবং মুসলিম ব্রাদারহুডই তাকে এই কার্যে নিযুক্ত করেছিল। বলা বাহুল্য, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়ে যায় এবং মুসলিম ব্রাদারহুড বে-আইনী ঘোষিত এবং তার দপ্তর, টাকাকড়ি ইত্যাদি বাজেয়াপ্ত করা হয়। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে কারো কারো স্বীকারোক্তি থেকে নাকি জানা গেছে যে, ব্রাদারহুডের "গুপ্ত বিভাগ" বর্তমান সরকারের সমস্ত নেতার —কেবল প্রেসিডেণ্ট নজীব ছাড়া—অর্থাৎ "রিভল্যুশন কম্যাণ্ড কাউন্সিলে"র সমস্ত সদস্যদের এবং আরো ১৬০ জন সামরিক অফিসারের হত্যাসাধনের ষড়যন্ত্র করছিল।

একথা কতখানি সত্য কে জানে। তবে প্রেসিডেণ্ট নজীবকে বাদ দিয়ে অন্য সকলকে মারার ষড়যন্ত্রের কথা যেভাবে প্রচারিত হচ্ছে সেটা একটু তাৎপর্যপূর্ণ। মনে হয়, নজীব-নসের দ্বন্দ্বের একটা নূতন—এবং বোধ হয় নজীবের পক্ষে মারাত্মক অঙ্ক আসন্ন। সরকারী প্রচার-কার্যের রকম থেকে বোধ হয় যে, তার উদ্দেশ্য সাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি করা যে, মুসলিম ব্রাদারহুডের এই সমস্ত ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে প্রেসিডেণ্ট নজীবের কোনো একটা সূক্ষ্ম যোগ আছে, অন্ততপক্ষে ব্রাদারহুড নজীবের প্রতি অপ্রসন্ন নয়। প্রকৃত ব্যাপার যাই হোক না কেন, সরকারী মুখপাত্রদের কথা থেকে বুঝা যাচ্ছে যে, মুসলিম ব্রাদারহুডের সঙ্গে কেবল নয়, নজীবের সঙ্গেও নসের দলের একটা শেষ বুঝাপড়ার ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রেসিডেণ্ট নজীবের সঙ্গে নসের গভর্নমেণ্টের সম্পর্ক যে সম্প্রতি বেশি খারাপ হয়েছে তার একটা প্রমাণ কেউ কেউ মনে করেন এই যে, সুয়েজ ঘাটি সম্পর্কিত চুক্তি এবং নসেরের কৃতিত্বের প্রশংসায় প্রেসিডেণ্ট নজীব এখন পর্যন্ত একটি কথাও বলেননি। প্রেসিডেণ্ট নজীবের এই নীরবতা লক্ষ্য করার বিষয় সন্দেহ নেই। কে জানে, বৃটেনের সঙ্গে সুয়েজ-সম্পর্কিত চুক্তির সর্ত প্রেসিডেণ্ট নজীবের পছন্দ হয়নি অথবা তিনি এ বিষয়ে কিছু বলে নসেরের খ্যাতি বৃদ্ধি করতে চান না অথবা তাঁর নীরবতার পিছনে এই উভয় কারণই রয়েছে। তবে মোটের উপর মনে হচ্ছে, নজীবকে সরাবার চেষ্টা চলছে এবং তার জন্য জনসাধারণের মনকে প্রস্তুত করা হচ্ছে।

রাজাকে তাড়িয়ে সামরিক নায়কত্ব-মূলক শাসন প্রবর্তনের নেতা ছিলেন জেনারেল নজীব। তাঁর পিছনে যে অফিসারের দল ছিল তারা পরে নসেরের হস্তেই দলপতির ক্ষমতা অর্পণ করে। তখন নজীব প্রেসিডেণ্ট এবং প্রধানমন্ত্রী উভয় পদ থেকেই অপসারিত হন এবং সাময়িকভাবে বন্দি-দশা পর্যন্ত প্রাপ্ত হন। কিন্তু সেনাবাহিনীর মধ্যে তখনও নজীবের অনেক সমর্থক ছিল; তাঁর অপসারণের বিরুদ্ধে একদল অফিসার তীব্র আপত্তি করে এবং তার জন্য অনেককে গ্রেপ্তারও করা হয়। অবস্থা-দৃষ্টে বুঝা যায় যে, নজীবকে একেবারে সরালে সৈন্যবাহিনীর একতা নষ্ট হয়ে যাবে। তাছাড়া, যে-নজীবকে এতদিন জনসাধারণের সামনে দেশের ত্রাণকর্তারূপে চিত্রিত করা হয়েছে হঠাৎ তাঁকে একেবারে সরিয়ে দিলে জনসাধারণ আশ্চর্য ও ক্ষুব্ধ হবে, এ আশঙ্কাও ছিল। সুতরাং একটা আপসের মতো হয়। নজীবকে আবার প্রেসিডেণ্ট করা হয় কিন্তু আসল কর্তৃত্ব প্রধানমন্ত্রী এবং গভর্নমেণ্টের চালক হিসাবে নসেরের হাতেই আসে। তবে বলা বাহুল্য, ভিতরে ভিতরে ঝগড়ার রেশ থেকে যায়। এইবার হয়ত তার একটা শেষ নিষ্পত্তির আয়োজন হয়েছে। তবে যদি নজীবকে তাড়ানোর ব্যবস্থা স্থির হয়ে থাকে তাহলে তার সঙ্গে সঙ্গে সৈন্যবাহিনীর ভিতর থেকেও বেশ কিছু-সংখ্যক অফিসারের অপসারণও সুনিশ্চিত ধরে নেয়া যায়, কারণ কিছুসংখ্যক অফিসার নজীবের সমর্থক অবশ্যই আছে, নজীবকে সরাতে হলে সঙ্গে সঙ্গে তাদের সরানোও আবশ্যক হবে।

* *

বৃটেনের সঙ্গে সুয়েজ ঘাটি সম্পর্কে মিশরের যে-চুক্তি হয়েছে তার জন্য নসের-গভর্নমেণ্টকে খুব বাহবা দেওয়া হচ্ছে। অনেকেই বলছে যে, চার্চিল গভর্নমেণ্ট যদি গোঁ ধরে বসে না থাকতেন তবে দেড় বছর পূর্বে এর চেয়ে (বৃটিশ গভর্নমেণ্টের দিক থেকে) ভালো শর্তে চুক্তি করতে পারতেন। কথাটা হয়ত ঠিক কিন্তু এ ব্যাপারে মিশরের জনসাধারণের যেরূপ মনোভাব তা'তে এর চেয়ে বৃটেনের পক্ষে সুবিধাজনক চুক্তি করলেই যে তা রক্ষা হোত তা কে বলতে পারে? বর্তমান চুক্তির মেয়াদ সাত বছর, এই সাত বছরের

মধ্যে উভয়পক্ষের যে-সমস্ত করণীয় নির্দিষ্ট হয়েছে সেগুলো নিয়েই যে কোনো গোলমাল বাঁধবে না তারই বা কী নিশ্চয়তা আছে?

সে যাই হোক, বর্তমান চুক্তির দ্বারা পশ্চিমা শক্তিদের একটা উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে। চুক্তির একটা শর্ত হচ্ছে এই যে, যদি ভবিষ্যতে কোনো দিক থেকে কোনো আরব রাষ্ট্র অথবা টার্কীর উপর আক্রমণ হয় তবে বৃটিশ সৈন্য আবার সুয়েজ ঘাটিতে ফিরে আসতে পারবে। টার্কী পশ্চিমা শক্তিদের আরক্ষা-ব্যবস্থার অন্তর্গত। মিশর যদিও সেই ব্যবস্থায় সরাসরি যোগ দিতে এখনো রাজী হয়নি কিন্তু বর্তমান চুক্তির দ্বারা পরোক্ষভাবে সে তার সংগে যুক্ত হোল। এই চুক্তির পরে ইংগ-মার্কিন ও সোভিয়েট এই দুই ব্লকের মধ্যে মিশর নিরপেক্ষ—একথা মুখে বলাও মিশর গভর্নমেণ্টের পক্ষে শোভন হবে না।

*   *   *

ডক্টর খানসাহেব পাকিস্তানের "নব-সংস্কৃত" মন্ত্রিমণ্ডলে যোগ দিয়েছেন বলে কেউ কেউ বলছেন যে, এর ফলে ভারত ও পাকিস্তান সরকারের সম্পর্কের উন্নতি হবে। পাকিস্তানের বর্তমান পরিস্থিতিতে পাকিস্তান গভর্নমেণ্ট ভারত বা অন্য দেশের সংগে ঝগড়ার কথা কিছুদিন একটু কম বলতে পারেন কিন্তু তার সংগে ডক্টর খানসাহেবের পাকিস্তান গভর্নমেণ্টে যোগ দেওয়ার সংগে বিশেষ কোনো সম্পর্ক আছে বা থাকবে এরূপ মনে করার কারণ দেখি না। ডক্টর খানসাহেবের পাকিস্তান গভর্নমেণ্টে যোগ দেওয়ার বিশেষ তাৎপর্য যদি কিছু থাকে সে অন্য দিক থেকে। ডক্টর খানসাহেবের পাকিস্তান গভর্নমেণ্টে যোগদান থেকে এটা মনে হয় যে, পাকতুনিস্থান-কামী পাঠানদের সংগে পাকিস্তানী নেতাদের একটা আপসের সম্ভাবনা হয়েছে। এই সম্পর্কে এটাও লক্ষ্য করার বিষয় যে, পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে পরস্পরের প্রতি দোষারোপ-বিনিময় কিছুদিন থেকে বন্ধ রয়েছে।

১।১১।৫৪

চলচ্চিত্রের নব পর্যায় 'গৃহ প্রবেশ'

—পথিক।

বাংলার চলচ্চিত্র শিল্পে কিছুদিন হলো একটা প্রচণ্ড রকমের নাড়া লেগেছে। মৃত্যুঞ্জয় সঞ্জীবন মন্ত্রে মুমূর্ষু শিল্পের পুনরুজ্জীবন এই দশকের একটি স্মরণীয় ঘটনা।

বেশীদিনের কথা নয়, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের দূরবস্থা দেখে বড় হতাশ হয়েছিলাম। দুই চক্ষু বিস্ফারিত করেও দুর্ভেদ্য অন্ধকারে এতটুকু আলোর নিশানা দেখিনি। ভেবেছিলাম, এই মহান ঐতিহ্যের বুঝি এইখানেই পরিসমাপ্তি ঘটলো। বাংলা শিল্পের যাঁরা ধারক ও বাহক—তাঁদের অনেকেই তখন বোম্বাইয়ে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য বিমল রায় ও অজয় কর এর নাম।

তারপর হঠাৎ নাড়া লাগলো। হতাশার মুহ্যমান জড়তাকে ঝাড়া দিয়ে বাংলা চলচ্চিত্র শিল্প মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। সেই অবস্থার চরম পরিণতি ঘটলো যখন বাংলার অজয় কর আবার বাংলা দেশে ফিরে এলেন।

বাংলার শিল্পে চলচ্চিত্র শিল্পী অজয় করের, পরিচালক অজয় কর রূপে আবির্ভাব এক বিরাট বিস্ময়। এর একমাত্র তুলনা মেলে বিমল রায়ের ক্ষেত্রে। অজয় করের 'অনন্যা' তাঁর অনন্য সৃষ্টি, 'বামুনের মেয়ে' তাঁর প্রতিভার জ্বলন্ত স্বাক্ষর। 'মেজদিদি'র অসামান্য সাফল্য আজও রূপকথার মতো দর্শকসমাজের মুখে মুখে। কিন্তু তা' আমাদের এতটুকুও বিস্মিত করেনি। অসামান্য হলেও অজয় কর স্বচ্ছন্দে সেই অসামন্যতা অর্জন করেছেন। কিন্তু অজয় করের 'জিঘাংসা' বাংলা তাবত্ ভারতীয় চিত্রজগতকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। সুধীজন একবাক্যে স্বীকার করে নিলেন 'জিঘাংসা' ভারতীয় চিত্রশিল্পের নিরিখ। সেই 'জিঘাংসা'র স্রষ্টা অজয় কর আবার বাংলা দেশে ফিরে এসেছেন। নব চিত্রভারতীর 'গৃহ প্রবেশ' তাঁর নব পর্যায়ের নব অবদান।

এ কথা মানতেই হবে—কাহিনী, কলা-কৌশল এবং অভিনয়ের সুষ্ঠু সমন্বয় 'গৃহ প্রবেশ' কথাচিত্রে সাধিত হয়েছে। অন্ততঃ চিত্রখানি দেখলে সন্দেহের বাষ্পটুকুও থাকে না। সুরু থেকে নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ থাকে না। উৎকর্ণ হয়ে রুদ্ধশ্বাসে শেষ পর্যন্ত দেখতে হয়।

মনে হচ্ছে 'গৃহ প্রবেশ'এর সাফল্য নিরঙ্কুশ এবং অবধারিত।

সমালোচকের দৃষ্টিতে প্রধান তিনটি কারণ ধরা পড়ে। প্রথম কাহিনীর সৌষ্ঠব; দ্বিতীয় পরিচালনা এবং কলাকৌশল; আর তৃতীয় অভিনয় সম্পদ। আখ্যান-ভাগে কোথাও কোন ফাঁক নেই। জম্জমাট্—হৃদয়াবেগে টইটম্বুর। নাটকের গতি-স্বাচ্ছন্দ বিশেষ লক্ষণীয়। অকারণ ও অস্বাভাবিক পরিস্থিতি কোথাও মনকে পীড়া দেয় না। কাহিনীকার কানাই বসুর রসজ্ঞান অনস্বীকার্য। তেমনি অপূর্ব অজয় করের গল্প বলার মুন্সীয়ানা। অজয় কর এই চিত্রের পরিচালক, এটাই পরিচালনা প্রসঙ্গে প্রথম ও শেষ কথা। অপরাপর মন্তব্য বাহুল্যমাত্র। চিত্রশিল্পী বিমল মুখোপাধ্যায়ের চিত্রগ্রহণ-কৌশল ও পদ্ধতি, তাঁর শিক্ষক অজয় করেরই অনুগামী। পর্দার ওপর ছবি পড়লে মনটা খুসীতে ঝল্মল্ করে ওঠে। তেমনি প্রশংসনীয় বাণী দত্তের শব্দগ্রহণ, কার্তিক বসুর শিল্প-নির্দেশ ও দুলাল দত্তের সম্পাদনা।

মুকুল রায় এই চিত্রের সুরকার। বোম্বাই প্রদেশে তিনি লব্ধ-প্রতিষ্ঠ। বাংলা দেশে নতুন হ'লেও তাঁর সুরসংযোজনা দেখে মনে হচ্ছে বাংলা দেশ থেকে যদি রাইবড়াল, দেববর্মণ এঁরা বোম্বাইতে গিয়ে আস্তানা গাড়তে পারেন, তবে আমরাইবা বোম্বাইয়ের মুকুল রায়কে বাংলা দেশে ধরে রাখবো না কেন?

ভারত বিখ্যাত গীতা রায় ও 'পরিণীতা' "চল রাধে রাণী"-খ্যাত মান্না দে, তাঁদের কণ্ঠ সংগীতে চিত্রটিকে এমন এ... পর্যায়ে তুলে নিয়ে গেছেন, যে নিছক ভাষায় সেটা ব্যক্ত কর... সম্ভব নয়।

এই চিত্রের অন্যতম্ শ্রেষ্ঠ সম্পদ শিল্পী গোষ্ঠীর সমাবেশ। সুচিত্রা সেন, উত্তম কুমার, মঞ্জু দে, বিকাশ রায়, পাহাড়ী সান্যাল, মলিনা দেবী, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোঃ, অপর্ণা, তুলসী চক্রঃ, হরিমোহন বসু, নৃপতি, আশা দেবী—বাংলা ছবিতে এত বিরাট শিল্পী সমাবেশ সচরাচর দেখা যায় না। প্রতিটি চরিত্র পর্দায় এমন নিখুঁতভাবে প্রতিফলিত হ'য়েছে, যে শিল্পীর অভিনয় প্রতিভার সঙ্গে পরিচালকের পরিচালন সংযমের সমন্বয় ন... ঘটলে এমন রসোত্তীর্ণ শিল্প সৃষ্টি হয় না। এই সঙ্গে পরিচালক অজয় কর দু'টি নতুন শিশু শিল্পী আমদানী করেছেন—স্বাধ... চতুর্থ বর্ষীয় মিঠু ও সপ্তম বর্ষীয়া জলী...

এ চিত্রের পরিবেশক কিনেমা এক্সচেঞ্জ-বাংলা চিত্রের পরিবেশন ক্ষেত্রে এঁদের সুনা... অনেকেরই ঈর্ষার বস্তু। অজয় করে... 'জিঘাংসা'ও এঁরাই পরিবেশন করেছিলেন এঁদের ধন্যবাদ জানিয়ে এবারকার মত বক্ত... শেষ করছি। বারান্তরে এই চিত্রের সম্বন্ধে আরও কিছু বলার ইচ্ছে রইলো।

অজয় কর পরিচালিত নব চিত্রভারতীর 'গৃহ প্রবেশ' কথাচিত্রের একটি রোমান্টিক দৃশ্যে সুচিত্রা সেন ও উত্তম কুমার।

(বিজ্ঞাপন)

—শৌভিক—

রসহীন নিষ্প্রাণ ছবি

এক রকমের মনোভাবাপন্ন চিত্র-নির্মাতা আছেন যাঁদের বোধ হয় ধারণা দুঃখ-দুর্দশার ব্যাপার পরিবেশন করলে লোকে তা লুফে নেবেই। তাই মাঝে মাঝে পাওয়া যায় "রিফিউজী"-র মতো দীন-জীবনের করুণ প্রতিচ্ছবি। তাও যদি নাটকীয় রসপুষ্ট হয়ে শিল্প-সৃষ্টির পর্যায়ে পড়বার মতো ছবি হয়, তো সে ছবিকে খুশী মনে গ্রহণ করার সায় হয়তো পাওয়া যাবে না, কিন্তু এড়িয়ে যদি চলতে চায় কেউ তো শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করেই লোকে এড়িয়ে যাবে। "রিফিউজী" সে যোগ্যতা তো অর্জন করতে পারেই না, বরং ছবিখানি আকারে প্রকারে এমন দীন ও শীর্ণ যা বাঙলা ছবির নাম ও মান দুয়েরেই পক্ষে হানিকর। মনে হয় যেন সত্যিকারের উদ্বাস্তুদের তাদের স্বস্থানে একেবারে আসল চেহারায় দেখাবার ইচ্ছেতেই এই ছবির প্রচেষ্টা; অনেকটা সংবাদ-চিত্রের মতো। কিন্তু এমনি আনাড়ীর মতো দৃশ্যগুলি তোলা এবং এতো বিলম্বিত গতি, তদোপরি অসাড় ও অসার ঘটনা যে মনের ওপর কোনও রকম ভাবের ছাপ পড়া তো দূরের কথা, উলটে কেবল বিরক্তির পর বিরক্তি জমতে জমতে হাই উঠতে থাকে। আর কোন নতুন কথাও নেই। সেই পূর্ববঙ্গে ভিটেজমি ছেড়ে চলে আসা মধ্যবিত্ত পরিবার; আসবার সময় মুসলমান প্রতিনিধির হা-হুতাশ; কলকাতায় এসে অশেষ দুরবস্থার মধ্যে পড়া, তার ওপর যতো সব সহানুভূতিহীন নির্দয় ও স্বার্থান্বেষী পশ্চিমবঙ্গবাসীর জঘন্য আচরণ। এ বিষয়ে আগে উদ্বাস্তুদের নিয়ে যেসব ছবি দেখানো হয়েছে তাদের সঙ্গে বিষয়বস্তুর তফাৎ কিছুই নেই, তবে এইমাত্র সান্ত্বনা যে, আগের ছবিগুলিতে পশ্চিমবঙ্গবাসীর সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ তথা কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্ট ও দেশনায়কদেরও অবিচারি সহানুভূতিহীন বলে যে রকম মন্তব্য করা হয়েছে, "রিফিউজী"-তে শুধু সেইটেই হয়নি। এখানে গভর্নমেণ্টকে উদ্বাস্তুদের প্রতি সচেতন ও সাহায্যে সক্রিয় দেখানোর চেষ্টা হয়েছে এবং গভর্নমেণ্টের ব্যবস্থা মতো চলার প্রতি নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাও অতি জলো ব্যাপার। বস্তুত ছবিখানি কোনদিকের এবং কোনজনেরই কোন প্রয়োজনে আসতে পেরেছে বলে মনে করা যায় না।

*   *   *

গল্প বলে যদি কিছু ধরতেই হয় তো শেষ পর্যন্ত বসে থাকতে পারলে যা

অনুরূপা দেবীর জনপ্রিয় কাহিনী 'মন্ত্রশক্তি'র চিত্ররূপে মলিনা দেবী, মঞ্জু দে, উত্তমকুমার, সন্ধ্যারাণী প্রভৃতি

পাওয়া যায় তা হচ্ছেঃ বৃদ্ধ নিবারণ অনূঢ়া কন্যা গোপা ও নাবালক পুত্র মানিককে নিয়ে গ্রাম ছেড়ে কলকাতার পথে যাত্রা করলেন। বাসে চড়বার সময় এক মুসলমান যুবককে নিবারণদের জন্য যেরকম শোকাভিভূত হতে দেখা গেল তা'তে নিবারণরা কেন যে বাস্তু ছেড়ে চলে আসতে বাধ্য হলো তার কোন স্পষ্ট আভাস-ইঙ্গিত নেই। কলকাতায় ওরা বলা বাহুল্য প্রথমেই পড়লো শিয়ালদহ স্টেশনের উদ্বাস্তুদের ভিড়ের গাদাতে। সেখানে থাকতে না পেরে নিবারণ ছেলে ও মেয়ের হাত ধরে পথে পথে ক'দিন ঘুরে শেষে "গান্ধী কলোনী"-তে এক সহৃদয়া উদ্বাস্তু প্রৌঢ়ার দয়ায় একটা ছাউনী পেলে। নিবারণ মুড়ি বেচে যা পায় তাতেই কোনরকমে চালায়। মানিককে স্কুলে দেওয়া হলো। কলোনীর একটি তরুণ গোপার সঙ্গ নেবার চেষ্টা করলে। নিবারণ ছেলেটির বাবার কাছে গিয়ে গোপার সঙ্গে বিয়ের কথা পাড়লে। সে ভদ্দরলোক উদ্বাস্তু নয়; যুদ্ধের সময় সামরিক বিভাগে কাজ নিয়ে সেই থেকে জায়গা দখল করে উদ্বাস্তুদের দলে ভিড়ে গিয়েছে। সে কেন তার ছেলের সঙ্গে গোপার বিয়ে দিতে যাবে। রোষের আবেগে নিবারণ তার পূর্বাবস্থা জানিয়ে দিলে যে, এক সময়ে সে গ্রামে পাঁচজনকে পাত পেড়ে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াতে পারতো; আর তার বড় ছেলে লবণ-আইন ভঙ্গ করতে তথা স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রাণ বিসর্জন দেয়। সুতরাং নিবারণকে রিফিউজী বলাটা অপমানজনক! এরপর নিবারণ অসুখে পড়ে মারা গেল। গোপা ও মানিক একা থাকে। একদিন ওদের চালায় আগুন লাগালো। আবার শিয়াল-দহ স্টেশন হলো আশ্রয়। মানিক ভিক্ষে করে যা কিছু পায় তাতেও চলে না। মানিক তার দিদির ক'দিন খাওয়া হয়নি দেখে অশ্বত্থতলায় উৎসর্গকৃত নৈবেদ্য থেকে ফল চুরি করায় মার খেয়ে ফিরলো। নববর্ষের রাত্রে ওরা বিলিতি হোটেলের ডাস্টবিন থেকে এ'টো কুড়িয়ে খেলে। এক বিলাসী যুবক গোপার যৌবনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তাকে বাড়িতে নিয়ে গিয়ে টাকা ও রুটির বদলে ভোগের সামগ্রী করতে চাইলে। প্রথমে গোপা

বিমল কর রচিত মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী "হ্রদ"-এর একটি দৃশ্যে সন্ধ্যারাণী, শিশির মিত্র, অসিতবরণ ও উত্তমকুমার

পালিয়ে আসে তার কাছ থেকে, কিন্তু ফিরে এসে মানিককে ক্ষুধার যাতনায় ছটফট করতে দেখে টাকা ও রুটির জন্যেই ফিরে গেলো। কিন্তু ফিরে এসে দেখলে মানিকের প্রাণ নেই। টাকা-রুটি ফেলে দিয়ে গোপা ছুটলো পথ ধরে। "শেষ কোথায়?" এই বলেই ছবির শেষ।

*　　　*　　　*

বিন্যাসের মুখে এই অস্পষ্ট কাহিনীর সাহায্যেও লোকের মনকে একটুও অন্তত করুণ করে তোলা যেতো যদি পরিচালকের সামান্য একটুও নাট্যজ্ঞান বা দৃশ্য সাজিয়ে উপস্থিত করার জ্ঞান থাকতো। অধিকাংশ দৃশ্যই পথে ঘাটে তোলা কিন্তু সর্বত্রই ক্যামেরার দিকে ভিড়ের সটান চাউনী দৃশ্যের সমস্ত আকর্ষণ মাটি করে দিয়েছে; তার ওপর আলোকচিত্রে আলোর অসমতা। প্রায় কুৎসিতই দেখায়। স্টুডিওতে তোলা দৃশ্যের অবস্থাও তথৈবচ। অভিনয়ে চেনাশোনাদের মধ্যে আছেন তুলসী লাহিড়ী, নৃপতি, বাণী-বাবু, বেচু সিংহ, রবিমোহন, অশোক সরকার, শ্যামল, কবিতা রায়, বাণী গাঙ্গুলী, আশা দেবী প্রভৃতি—কিন্তু কারুর অভিনয়ের কথা উল্লেখ করার মতো নয়। ছবিখানির গঠনশিল্পীদের মধ্যে আছেন আলোকচিত্র গ্রহণেঃ সুবোধ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অনিল বন্দ্যোপাধ্যায়; শব্দগ্রহণেঃ জে ডি ইরাণী; সুরযোজনায়ঃ বীরেন্দ্র ভট্টাচার্য; শিল্পনির্দেশেঃ তারক বসু এবং কাহিনী রচনায় ও পরিচালনায় শান্তিপ্রিয় মুখোপাধ্যায়। কেন যে এ'রা ছবিখানি তুলেছিলেন তা এ'রা নিজেরাই বলতে পারেন।

সহজব্যক্ত আবেগময় কাহিনী

অন্তরের কোমল জায়গাটিতে আবেগ সৃষ্টি করে তোলার মতো একটি কাহিনী এবং সে-কাহিনীকে অবিকৃতভাবে সরল ও সহজগম্য পথে ব্যক্ত করার মতো নিষ্ঠার যোগাযোগে নভেলটি ফিল্মসকৃত "ষোড়শী" দর্শনযোগ্য ছবির পর্যায়ভুক্ত হতে পেরেছে। পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় মূল রচনাকে যতদূর সম্ভব অনুসরণ করেই গিয়েছেন এবং নিজস্ব কল্পনাপ্রসূত কোনরকম অলংকার যোগ না করে গল্পটিকে সরাসরি পরিবেশন করেছেন। ফলে ছবিখানির বিন্যাসের কোনখানে কোনরকম অসাধারণ চমক ও জেল্লা না থাকা সত্ত্বেও গল্পটাই আমূল উপভোগ করা যায়। এখানে অবশ্য একটা অসুবিধেকে পরিচালক তথা বিন্যাস-কারীকে মানিয়ে নিয়ে চলতে হয়েছে, সেটা হচ্ছে এর আখ্যানবস্তুটি। "ষোড়শী"র পরিকল্পনা যে আমলের, সে আমল অনেককাল ঘুচেই গিয়েছে। যদিও-বা তার সামান্য একটু স্মৃতি থেকে থাকে তো গ্রাম্য প্রাচীন মনেই হয়তো রয়েছে, নতুবা এখনকার এবং বিশেষ করে শহুরে চিন্তাধারাকে উদ্বুদ্ধ বা উদ্বেলিত করে তোলার মতো রূপ ও মতি এ গল্পে নেই—এখন আর নেই বললেই চলে। এর যেটুকু আবেদন রয়েছে বিষয়বস্তুতে একটা আকুতিভরা প্রেমিকমন আর একটা দীপ্ত নারীত্ব। কিন্তু তাও প্রচ্ছন্ন, ঘটনার ওপরকার চেহারায় এখনকার লোকের মনে ধরবার মতো বৈশিষ্ট্য নেই। এ সত্ত্বেও ছবিখানি যে পাঙক্তেয় হয়ে উঠতে পেরেছে, সে কৃতিত্বটাই পরিচালকের প্রাপ্য।

*　　　*　　　*

মামার সম্পত্তির হঠাৎ উত্তরাধিকারী লম্পট জীবানন্দ চৌধুরী সেরেস্তায় এসে বসা থেকেই প্রজাকুলের জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। সবাই জীবানন্দের পীড়নের কাছে আত্মসমর্পণ করলো, কিন্তু বেঁকে দাঁড়ালো চণ্ডী-মন্দিরের ভৈরবী ষোড়শী। বালিকা থেকেই এই ছাব্বিশ বছর বয়স পর্যন্ত এখানকার সে ভৈরবী। পুরোহিত তারানাথ ষোড়শীর পিতা লোকে এই জানে। মন্দিরের অন্তর্ভুক্ত জমি দেবোত্তর, ভৈরবী তার অভিভাবিকা; জীবানন্দকে খাজনা দিতে সে অস্বীকার করলে। জীবানন্দ এখানে আসা থেকে প্রতিরোধ পায়নি, ষোড়শীকে সে ডেকে পাঠালে। ষোড়শী তা-ও অবজ্ঞা করলে। কাজেই জীবানন্দের পাইক-বরকন্দাজ গেলো তাকে ধরে আনতে। তবে ঠিক ধরে আনতে হলো না, জীবানন্দের লোক চণ্ডী-মন্দিরে ছাগবলি দিতে আসায় ষোড়শী তার প্রতিবাদ জানাতে জীবানন্দের সামনে

হাজির হলো। ষোড়শী জীবানন্দকে চিনতে পারলে—এগারো বছর বয়সে জীবানন্দের সংগে কলকাতায় তার বিয়ে হয়েছিল এবং বিয়ের রাত থেকেই জীবানন্দ পলাতক। বিয়ের জন্য জীবানন্দ ষোড়শীর মা'র কাছ থেকে টাকাও নিয়েছিল। সেই থেকে জীবানন্দের ওপরে ষোড়শীর দারুণ ঘৃণা। জীবানন্দ এতদিন পর ষোড়শীকে দেখে প্রথমে চিনতে পারেনি, তারপর নিজের কাহিনী ব্যক্ত করতে গিয়ে কথায় কথায় পরিচয় প্রকাশ হয়ে পড়লো। হঠাৎ মদ্যপ জীবানন্দ কথা বলতে বলতে অন্ত্রযাতনায় আক্রান্ত হয়ে পড়লো; তারই নির্দেশে ষোড়শী তাকে ওষুধ খাওয়ালে। ষোড়শী সে রাত বন্দিনী হয়ে রইলো। এদিকে তারানাথ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে জীবানন্দের নামে ষোড়শীকে পাইক দিয়ে জোর করে ধরে নিয়ে গিয়ে আটক করে রাখার নালিশ জানালে। সকালে ম্যাজিস্ট্রেট এলো। এই ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসেই জীবানন্দকে চুরির দায়ে জেলে যেতে হয়েছে। তার আশংকা হলো ষোড়শীকে বন্দিনী করার জন্য এবারও ম্যাজিস্ট্রেট তাকে রেহাই দেবে না। কিন্তু ষোড়শীই তাকে বাঁচালে ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এই এজাহার দিয়ে যে, সে স্বেচ্ছায় জীবানন্দের কাছে এসেছে এবং জীবানন্দ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় রাত্রে সেখানে থেকে যেতে বাধ্য হয়েছে। ম্যাজিস্ট্রেট চলে যেতে তারানাথ ষোড়শীর ওপরে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। গ্রামে মাতব্বরদের কাছে রটালে যে, ষোড়শী নষ্টচরিত্রা এবং মন্দিরে তালাবন্ধ করে নিজের আত্মীয়া-কন্যাকে ভৈরবীপদে অধিষ্ঠিতা করার জন্য বেরিয়ে গেল। ষোড়শীর সহায় হলো তার পিতৃতুল্য ফকির সাহেব। ফকির সাহেবই ষোড়শীর মনে এই বলে শক্তির সঞ্চার করলে যে, মন্দিরে তালা লাগাবার অধিকার তারানাথের বা অন্য কারুরই নেই। ষোড়শীর ভক্ত ডোমের দল লাঠি দিয়ে তালা ভেঙে ফেললে। রায় মহাশয়ের বাড়িতে পঞ্চায়েতে ষোড়শীর ডাক পড়লো। ষোড়শীর হয়ে ফকির সাহেবই ষোড়শীর অধিকারের কথাটা ওদের বুঝিয়ে দিলে। গ্রামের মাতব্বররা এবার ষোড়শীকে উৎখাত করার চেষ্টা করতে লাগলো এবং তাদের সহায় হলো জীবানন্দ স্বয়ং। ষোড়শীর সহায়ক হলো গ্রামের প্রধান মাতব্বর রায় মহাশয়ের কন্যা হৈমবতী এবং তার ব্যারিস্টার স্বামী নির্মল। কিন্তু জীবানন্দ এর মধ্যে আছে জেনে ষোড়শী প্রত্যক্ষ সংগ্রাম থেকে সরে দাঁড়ালো। এরই মাঝে মাঝে জীবানন্দ একান্তে ষোড়শীর সংগে দেখা করেছে এবং তার অসহায়ত্বের কথা জানিয়েছে; ষোড়শীকে সে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে আবার সংসার-ধর্মে ফিরে আসার জন্য আকুল অনুনয় জানিয়েছে; কিন্তু ষোড়শীর মন টললেও, আদর্শকে টলাতে পারলো না। একদিন ষোড়শী স্বেচ্ছায় মন্দিরের চাবি পঞ্চায়েতের হাতে তুলে

"রিফিউজী"তে কবিতা রায়

দিয়ে সম্পত্তির হিসেব আর সিন্দুকের চাবি জীবানন্দের হাতে সমর্পণ করে জীবানন্দের আকুল অনুনয়ে নিজেকে ধরা না দিয়ে গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। জীবানন্দের জীবনে এলো পরিবর্তন। মদ খাওয়া ছাড়লে সে; ষোড়শীর প্রভাব তাকে অন্য মানুষ করে তুললে; গ্রামের সেবায় সে আত্মনিয়োগ করলে। রায় মহাশয় শিরোমণি প্রমুখ মাতব্বররা ষোড়শী চলে যাওয়ায় খুসী হলো, কিন্তু ফ্যাসাদে পড়লো মন্দিরের দেবোত্তর জমি বিক্রী করে দেবার মামলায় জড়িয়ে পড়ে। জীবানন্দের কাছে ওরা পরামর্শ চাইলে, কিন্তু জীবানন্দ জানালে যা সত্যি, সে তাই ব্যক্ত করবে। তাতে সর্বনাশ অবশ্যম্ভাবী দেখে রায় মহাশয় ভাড়াটে লেঠেল লাগিয়ে জীবানন্দকে হত্যার ব্যবস্থা করলে। লাঠির আঘাতে জীবানন্দ আহত হলো; খবর পেয়ে ষোড়শী এলো। জীবানন্দ তাকে পাশ ডেকে বসালে। মৃত্যুর আগে জীবানন্দ সমস্ত জমিদারী ষোড়শীর নামে লিখে তার দেনা শোধ করলে এবং সকলকে বিস্মিত করে জানিয়ে দিয়ে গেল, ষোড়শী তার বিবাহিতা স্ত্রী অলকা।

* * *

স্পষ্টতই উপলব্ধি করা যায়, এ কাহিনীতে যে ধরনের সব ঘটনা রয়েছে, তার অনেকই মনের ওপরে কোন গভীর দাগ টেনে দেবার মতো নয়। কাহিনীটির ওপরে মন নিবদ্ধ থাকে বাইরের ঘটনাগুলির জন্যে নয়, জীবানন্দ ও ষোড়শীর মধ্যে প্রেমের অন্তর্দ্বন্দ্বের জন্য। জীবানন্দের বহিঃপ্রতাপ ও উচ্ছৃংখলতার মধ্যেও অসহায়তা, আর ষোড়শীকে অলকারূপে ফিরে পাবার জন্য আকুলতা; আর সেই সঙ্গে ষোড়শীর অন্তর্দ্বন্দ্ব জমিদার ও অত্যাচারী জীবানন্দের কাছে পরাজয় স্বীকার করা একদিকে, আর একদিকে সতী নারী অলকার পতির প্রতি কর্তব্য। এই দিক থেকেই দর্শক-মনে আবেগের সঞ্চার হয় এবং শেষে জীবানন্দের মৃত্যু ওর ওপরে একটু অনুকম্পার উদ্রেক করে দেয়। অতি সাদাসিধে দীর্ঘায়িত বিন্যাস। মাঝে বেশ খানিকটা অংশ একঘেয়ে। সংলাপপ্রধান এবং জীবানন্দ ও ষোড়শীর পরস্পরের সংলাপ বিশেষ উপভোগ্য। অভিনয়ের দিকটা মাঝামাঝি ধাপের ওপরে উঠতে পারেনি। জীবানন্দের চরিত্রে ছবি বিশ্বাস এবং ষোড়শীর চরিত্রে দীপ্তি রায় উভয়ের ক্ষেত্রেই একথা প্রযোজ্য। ছবি বিশ্বাস লম্পট দুরাচারী জীবানন্দের চেয়ে অনুশোচনা-দগ্ধ ও ষোড়শীকে পাবার জন্য আকুলহৃদয় জীবানন্দকেই ভালো ফুটিয়েছেন; তেমনি দীপ্তি রায় অলকার কোমলতাই শুধু ব্যক্ত করে গিয়েছেন গোড়া থেকেই, ভৈরবী ষোড়শীকে দীপ্ত করে তুলতে পারেননি কোথাও। জীবানন্দের সহচর ধূর্ত এককড়ি নন্দীকে কিন্তু গঙ্গাপদ বসু মঞ্চে এ চরিত্রটিতে নানা জনের দ্বারা যে ধরনের অভিনয় সচরাচর দেখা যায়, তার চেয়ে একটু ভিন্ন ধরনের করেছেন এবং বেশ একটা বৈশিষ্ট্য আনার কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। হৈমবতীর চরিত্রে অরুন্ধতী অভিব্যক্তিতে ভালো, কিন্তু সেই কেটে কেটে কথা বলা। তার স্বামী নির্মলের চরিত্রে বাস্তব জীবনেরও স্বামী প্রভাত মুখোপাধ্যায়কে বরং বেশী ভালো লাগবে। তবে লক্ষ্য করার বিষয়,
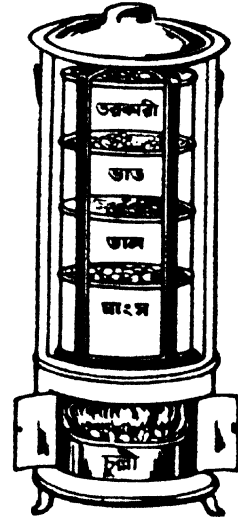
আগতপ্রায় আকর্ষণ "মেহবুবা"তে নলিনী জয়ন্ত ও শম্মী কাপুর

এ'দের দুজনেরই ক্ষেত্রে কথাগুলো অতি স্পষ্ট করে বলার একটা চাঁচাছোলা ভাব। মাতব্বর রায় মহাশয় এবং শিরোমণির ভূমিকায় যথাক্রমে কমল মিত্র ও তুলসী লাহিড়ী কাজ চালিয়ে গিয়েছেন। ফকির সাহেবের চরিত্রে অজিতপ্রকাশের কৃত্রিম

দাড়ী কট কট করে চোখের সামনে বাধার সৃষ্টি না করলে অভিনয় ভালো লাগবে। আর অভিনয়ে আছেন বিজন ভট্টাচার্য, সুধী প্রধান, বিপিন মুখোপাধ্যায়, নরেশ বসু, রেখা চট্টোপাধ্যায়, আশা প্রভৃতি। বল্লভ ডাক্তারের বিদ্ঘুটে আচরণে মণি শ্রীমানী হাসির উপভোগের সুযোগ দেন। ম্যাজিস্ট্রেটের চরিত্রে গর্ডন সোয়েন হাস্যস্কর। তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, রঞ্জিত রায়, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন একবার মাত্র গাজনকালে নাচ-গানের হুল্লোড় সৃষ্টি করতে। গাজনটা কিন্তু কমিকভাবে পরিবেশন করার জিনিস নয়।

* * *

আঙ্গিক পারিপাট্য বিষয়ে দেওজী ভাইয়ের আলোকচিত্র গ্রহণের কাজই সবচেয়ে উজ্জ্বল। মূল রচনার বর্ণনানুসারে বাঁকুড়া জেলায় গিয়ে সমূহ বহির্দৃশ্য তোলা হয়েছে। কাহিনীর পরিবেশ তাতে খুলেছে ভালো। তবে বেশীরভাগই নৈশ-দৃশ্য। তাতে হয়তে বহির্দৃশ্যের সংগে স্টুডিওতে তোল দৃশ্যের আলোছায়ার মিল ভালোভাবে রাখা সম্ভব হয়েছে। কয়েকটি দৃশে বাতি সরলেও আলোর আভা নড়ে না ব তারতম্য হয় না, এমন ত্রুটি দেওজীভায়ের কাজে থাকা ঠিক নয়। শব্দগ্রহণ করেছে নৃপেন পাল এবং শিল্পনির্দেশ কার্তিব বসুর। সুরযোজনায় অনিল বাগচ কোন বৈশিষ্ট্য আনতে পারেননি। গান গুলি যদিও-বা গাওয়া হয়েছে সুন্দর কিন্তু বহির্দৃশ্য আর আভ্যন্তরী দৃশ্যের রেশের পার্থক্য নেই। কেমন যেন অসংলগ্ন লাগে। আবহ-সংগীতেরও অনেকক্ষেত্রে তাই ঘটেছে। তবুও "চির মধুর মিলন-তিথি" গানখানি গাওয়া গুণে খুবই ভালো লাগবে।

খেলার মাঠে

একলব্য

এক মাইল দৌড়ের বিস্ময় সৃষ্টিকারী এ্যাথলীট ডাঃ রজার ব্যানিস্টার এ বছর ইংলণ্ডের "Sportsman of the year" অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হয়েছেন। ব্যানিস্টারের পরে যিনি ক্রীড়াবিদদের বাছাই তালিকায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন তিনিও ইংলণ্ডের কৃতি এ্যাথলীট। দূর-পাল্লার দৌড়বীর ক্রিশ চ্যাটওয়ে। ডাঃ ব্যানিস্টার এবং এক মাইলের রেকর্ড সৃষ্টি-কারী অস্ট্রেলিয়ার এ্যাথলীট জন ল্যাণ্ডির ঐতিহাসিক দৌড়ে অসামান্য সাফল্যের মূলে চ্যাটওয়ের দানও কম ছিল না। ব্যানিস্টার এবং ল্যাণ্ডি দু'জনের সঙ্গেই পৃথক পৃথক-ভাবে দৌড়ে চ্যাটওয়ে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন। কিছুদিন আগে লণ্ডন-মস্কো এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় চ্যাটওয়ে ৫০০০ মিটার দৌড়ে মস্কোর ভ্লাডিমির কুজের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে নূতন বিশ্বরেকর্ড করেছিলেন, অবশ্য দশ দিন যেতে না যেতে প্রাগে চেকোশ্লোভেকিয়া-সোভিয়েট এ্যাথ-লেটিক প্রতিযোগিতায় কুজ বিশ্বের বিস্ময় এমিল জেটোপেককে হারিয়ে ৫০০০ মিটারে তাঁর বিশ্ব রেকর্ডের পুনরুদ্ধার করেছেন। এতে চ্যাটওয়ের মর্যাদা কিছু ক্ষুণ্ণ হয়নি। তিনি যে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীটদের অন্যতম এ কথা অবিসম্বাদিতভাবে সত্য। এ্যাথলেটিক বিশ্বে রেকর্ড ভাঙা-গড়ার যে তীব্র প্রতিযোগিতা চলছে তাতে কারো পক্ষেই বেশিদিন কোন রেকর্ড ধরে রাখা সম্ভব নয়। হয়তো ক' সপ্তাহের মধ্যে দেখা যাবে চ্যাটওয়ে আবার নূতন রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। যাই হোক, ইংলণ্ডের ক্রীড়াবিদ বাছাই তালিকায় তৃতীয় স্থান অধিকার করেছেন মুষ্টিযোদ্ধা ডন ককেল। ইনি হেভি ওয়েটে ব্রিটিশ ও এম্পায়ার চ্যাম্পিয়ন।

* * *

শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ বাছাইয়ের রেওয়াজ ইংলণ্ডের ক্রীড়া ইতিহাসের উল্লেখযোগ্য ঘটনা। প্রতি বছরই ক্রীড়া সাংবাদিকদের ব্যালট ভোটে এই নির্বাচন হয়ে থাকে। ক্রীড়াক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে অসামান্য কৃতিত্বের অধিকারী খেলোয়াড়, মুষ্টিযোদ্ধা বা এ্যাথলীট এই সম্মানের অধিকারী হন। বিগত ৬ই মে অক্সফোর্ড এমেচার এ্যাথলেটিক
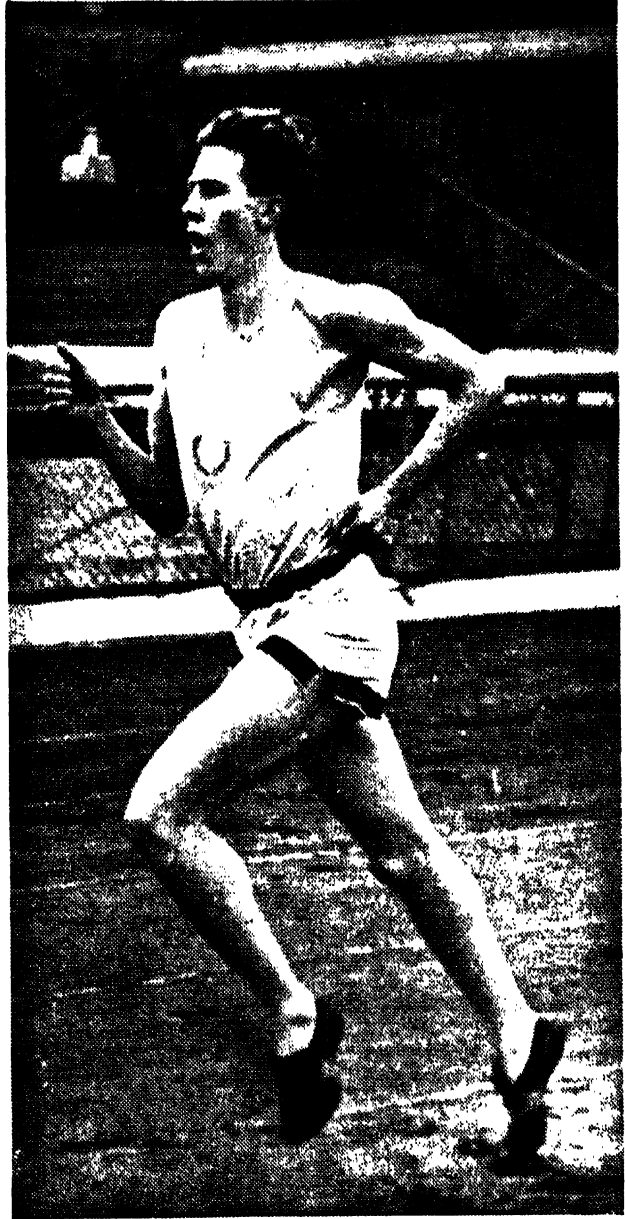
বছরের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ্। ইংলণ্ডের ক্রীড়া সাংবাদিক সংস্থার ব্যালট ভোটে ডাঃ রজার ব্যানিস্টার "Sportsman of the year" অর্থাৎ বছরের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ্ নির্বাচিত হইয়াছেন

৫০০০ মিটারে বিশ্ব রেকর্ড 'ভাংগা-গড়ার' দুই কৃতি এ্যাথলীট ইংলণ্ডের ক্রিশ চ্যাটওয়ে এবং মস্কোর ভ্লাডিমির কুজের দৌড়ের দৃশ্য

এসোসিয়েশন ও অক্সফোর্ডের এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতার এক মাইলে মেডিক্যাল ছাত্র রজার ব্যানিস্টারের ঐতিহাসিক দৌড়ের পর ব্রিটিশ অলিম্পিক এসোসিয়েশনের মুখপত্র 'ওয়ার্লড স্পোর্টস' যখন লিখেছিলেন—"Bannister (3m. 59 4 s.) brings glory to Britain" সেই দিনই বোঝা গিয়েছিল ব্যানিস্টার এ বছর ব্রিটেনের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ হিসেবে পরিগণিত হবেন। হয়েছেনও তাই। এ বছর শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদের সম্মান তারই প্রাপ্য ছিল।

*   *   *

৪ মিনিটের কম সময়ে এক মাইল পথ অতিক্রম করা দেহ-বিজ্ঞানী ডাক্তার এবং এ্যাথলেটিক কোচরা অসম্ভব বলেই মনে করতেন। তাঁদের সুচিন্তিত অভিমত ছিল রক্তমাংসে গড়া কোন মানুষের পক্ষে ৪ মিনিটে এক মাইল পথ দৌড়ানো সম্ভব নয়। ১৯৪৫ সালে সুইডেনের বিশ্বখ্যাত এ্যাথলীট গুন্দার হেগ ৪ মিনিট ১.৪ সেকেণ্ড সময়ে এক মাইল পথ দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তারপর দীর্ঘ ৯ বছর কেটে গেছে। এই সময়ের মধ্যে দেশ-বিদেশের কত এ্যাথলীট হেগের রেকর্ড ভাঙতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই। রজার ব্যানিস্টার নিজে ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাস থেকে এক মাইল দৌড়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে আসছেন। প্রথম যখন তিনি এক মাইলের সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেন তখন তাঁর বয়স ছিল ১৭ বছর ৬ মাস। উত্তরোত্তর কম সময়ে এক মাইল পথ অতিক্রম করতে সমর্থ হলেও ব্যানিস্টার নিজে গুন্দার হেগের রেকর্ড ভাঙবার কল্পনাকে বাতুলতা বলে মনে করতেন। কিন্তু অধ্যবসায় ও সাধনায় কি না হতে পারে। ১৯৫৪ সালের ৬ই মে ব্যানিস্টার দেহবিজ্ঞানী চিকিৎসক ও এ্যাথলেটিক কোচদের বিস্মিত করে ৩ মিনিট ৫৯.৪ সেকেণ্ড সময়ে এক মাইল পথ অতিক্রম করলেন। সমগ্র এ্যাথলেটিক বিশ্ব বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। ব্যানিস্টার এখন মনে করেন বাতাস এবং আবহাওয়া প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করলে আরও কম সময়ে এক মাইল পথ অতিক্রম করা সম্ভব। ৩ মিনিট ৫৫ সেকেণ্ডে মাইল পথ অতিক্রম করা মানুষের [illegible] বলে ব্যানিস্টারের ধারণা।

*   *   *

এ্যাথলেটিক ইতিহাসে ব্যানিস্টারের কীর্তিগাথা যখন উজ্জ্বল অক্ষরে খোদিত, দেশ-বিদেশের ক্রীড়াসভা যখন 'ম্যাজিক মাইলে'র অবিস্মরণীয় কাহিনী আলোচনায় মুখর, তখন অস্ট্রেলিয়া এ্যাথলেটিক সভার এক শান্ত ছেলে জন ল্যাণ্ডি দ্রুততার পরীক্ষায় আর এক কীর্তি স্থাপন করে বসলেন। ২১শে জুন ফিনল্যাণ্ডের 'টুর্কুতে জন ল্যাণ্ডি এক মাইল পথ অতিক্রম করলেন ৩ মিনিট ৫৮ সেকেণ্ডে। ব্যানিস্টারের রেকর্ড ভেঙে গেল। স্বাভাবিকভাবেই ম্লান হয়ে গেল ব্যানিস্টারের 'ম্যাজিক মাইলে'র কীর্তি কাহিনী। সমগ্র এ্যাথলেটিক বিশ্ব ল্যাণ্ডির প্রশংসায় পঞ্চমুখ; তাঁর হোটেল-কক্ষ দেশ-বিদেশের অভিনন্দনবার্তা, পুষ্পে মাল্যে ভরে গেল; ফুলের সৌরভ ক্লান্তি দূর করে দিল ল্যাণ্ডির দেহ-মন থেকে ব্যানিস্টারের অভিনন্দনপত্রও টুর্কুতে ল্যাণ্ডির হাতে এসে পৌঁছল।

তারপর ব্রিটিশ কমনওয়েলথ ও এম্পায়ার গেমের তোড়জোড়। ভ্যাঙ্কুভারে মিলিত হবেন এ্যাথলেটিক ইতিহাসে বিস্ময় সৃষ্টি-কারী বিশ্বের দুই ধুরন্দর দৌড়বীর ব্যানিস্টার ও ল্যাণ্ডি। দুজনেই অনুশীলন করে চলেছেন নিজ নিজ দেশে। ভ্যাঙ্কুভারে এসেও অনুশীলনের বিরাম নেই। ৭ই আগস্ট ভ্যাঙ্কুভারে এম্পায়ার গেমের শেষ দিনের শেষ অনুষ্ঠান,—এক মাইল দৌড়ের প্রতিযোগিতা। দেশ-বিদেশের মাইল দৌড়-বীরদের সঙ্গে লাইনে এসে দাঁড়ালেন মনুষ্য-দেহধারী দুই 'চলমান যান' ব্যানিস্টার ও ল্যাণ্ডি। আগ্রহাকুল দর্শকদের উৎসাহ-উদ্দীপনা চরমে উঠেছে। আরম্ভ হল এক মাইল দৌড়ের প্রতিযোগিতা। সমস্ত প্রতি-যোগীকে পিছনে ফেলে ব্যানিস্টার ও ল্যাণ্ডি এগিয়ে চলেছেন। ল্যাণ্ডি পুরোভাগে ব্যানিস্টার তাঁর পিছনে। বুঝি দু'জনের পৃথক পৃথক কৃতিত্বের প্রতিষ্ঠিত সত্য এ প্রতিযোগিতায়ও প্রতিষ্ঠিত হবে। কিন্তু শেষ ল্যাপের মুখেই ব্যানিস্টার গেলেন এগিয়ে ল্যাণ্ডি পড়লেন তাঁর পিছনে, আর কোন পরিবর্তন হল না। আগে থেকেই ব্যানিস্টার শেষ সীমারেখা অতিক্রম করলেন ব্যানিস্টারের এক মাইল পার হতে এবার সময় লাগলো ৩ মিনিট ৫৮.৮ সেকেণ্ড। ৩ মিনিট ৫৯.৬ সেকেণ্ডে জন ল্যাণ্ডি দূরত্ব অতিক্রম করলেন। তাই অস্ট্রেলিয়ার এ্যাথলীট ল্যাণ্ডি এক মাইল দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হলেও দু'য়ের পাল্লায় ব্যানিস্টার ল্যাণ্ডিকে হারিয়ে বিজয়মাল্য গলে ধারণ করেছেন। সেই হিসাবে ব্যানিস্টারই মাইল দৌড়ের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীট। ব্যানিস্টার কিভাবে

মাইল দৌড়ে [illegible]ত্তরোত্তর সময় লঘু করেছেন নিচে [illegible] এক হিসাব দেওয়া গেল। তিনি [illegible] বছর ৬ মাস বয়স থেকে মাইল দৌড়ের সাধনায় মগ্ন হন, আর ২৫ বছর ১ মাস বয়সে গুন্দার হেগের রেকর্ড ভঙ্গ করেন।

মাস	সাল	সময়
সেপ্টেম্বর	১৯৪৬	সাল—৪ মিঃ ৫৩ সেঃ
মার্চ	১৯৪৭	,, ৪ মিঃ ৩০.৮ সেঃ
জুন	১৯৪৭	,, ৪ মিঃ ২৪.৬ সেঃ
মার্চ	১৯৪৮	,, ৪ মিঃ ২৩.৪ সেঃ
মে	১৯৪৮	,, ৪ মিঃ ২২.৮ সেঃ
জুন	১৯৪৮	,, ৪ মিঃ ১৮.৭ সেঃ
জুলাই	১৯৪৮	,, ৪ মিঃ ১৭.২ সেঃ
মার্চ	১৯৪৯	,, ৪ মিঃ ১৬.২ সেঃ
জুন	১৯৪৯	,, ৪ মিঃ ১১.১ সেঃ
ডিসেম্বর	১৯৫০	,, ৪ মিঃ ৯.৯ সেঃ
এপ্রিল	১৯৫১	,, ৪ মিঃ ৮.৩ সেঃ
জুলাই	১৯৫১	,, ৪ মিঃ ৭.৮ সেঃ
মে	১৯৫৩	,, ৪ মিঃ ৩.৬ সেঃ
জুন	১৯৫৩	,, ৪ মিঃ ২ সেঃ
মে	১৯৫৪	,, ৩ মিঃ ৫৯.৪ সেঃ
আগস্ট	১৯৫৪	,, ৩ মিঃ ৫৮.৮ সেঃ

শ্রীভূপতি মজুমদার হাওড়ার অধিনায়ক এন দত্ত'র হাতে আন্তঃ জেলা ফুটবল প্রতিযোগিতার বিজয়ীর পুরস্কার ও মজুমদার কাপ তুলে দিচ্ছেন

অন্যান্য দেশের মত ভারতের মহিলারাও ক্রমে ক্রিকেটের দিকে ঝুঁকে পড়ছেন। ইউনাইটেড নেশান স্টুডেন্ট ইউনিয়নের উদ্যোগে ছাত্র ও ছাত্রী দলের এক ক্রিকেট খেলা দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। কুমারী ধীরা চ্যাটার্জি ও বালজিৎ ছাত্রী দলের পক্ষে ব্যাটিং করতে যাচ্ছেন

১৯৫৪ সালে ক্রীড়াক্ষেত্রে যাঁরা গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচনা করেছেন তাঁদের সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে বাঙলার জ্ঞানসমৃদ্ধ লব্ধপ্রতিষ্ঠ এক ক্রীড়া-সাংবাদিক বলেছেন—তেনজিংয়ের এভারেস্ট জয় যদি শতাব্দীর সবচেয়ে বড় খবর হয়, তবে ব্যানিস্টার ও ল্যাণ্ডির মাইল পথ বিজয়ের সংবাদও উল্লেখের দাবী রাখে। অবশ্য তেনজিংয়ের এভারেস্ট বিজয় ক্রীড়াক্ষেত্রের গণ্ডীর মধ্যে আসে কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। ক্রীড়াক্ষেত্রের নৈপুণ্যের মত পর্বতারোহণেও দৈহিক পটুতা, অধ্যবসায়, সহিষ্ণুতা, দলগত সংহতি এবং কলাকৌশল সব কিছুর প্রয়োজন। আর প্রয়োজন লক্ষ্যপথে পৌঁছবার স্থির সংকল্প। পর্বতারোহণে ক্রীড়াক্ষেত্রের গুণাবলী অপরিহার্য, তবুও পর্বতারোহণ খেলা নয়,—অভিযান। মাইল-দৌড়ে ব্যানিস্টারের লক্ষ্যপথে পৌঁছবার সংকল্পকেও অভিযানের সঙ্গে তুলনা করা চলে। তাই ইংলণ্ডের ক্রীড়া-সাংবাদিক সংস্থা ব্যানিস্টারকে বৎসরের শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত করে যোগ্যের যোগ্য সম্মান দান করেছেন।

* * *

আমাদের দেশে শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ বাছাইয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। সম্প্রতি দেশের গুণী ও দরদী সংগীত সাধকদের রাজসম্মানে সম্বর্ধিত করার ব্যবস্থা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ পদক দ্বারা সংগীত শিল্পীদের সম্বর্ধনা করেছেন। শিল্পকলা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রেও হয়তো গুণীজনকে এভাবে সম্বর্ধনা জানানো হবে, কিন্তু ক্রীড়াবিদদের সম্মান দেখানোর ব্যাপারে কোন উদ্যোগ দেখি না। ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ গৌরবের অধিকারী যাঁরা এমনভাবে তাঁদেরও কৃতিত্ব স্বীকৃত হওয়া উচিত।

১৯৫২ সালে হেলসিংকি অলিম্পিকের পর আমেরিকার Helms Athletic Foundation কর্তৃক ভারতীয় হকি দলের অধিনায়ক কে ডি সিং (বাবু) এশিয়ার শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। 'হেমস এ্যাথলেটিক ফাউণ্ডেশন' কৃতিত্ব স্বীকৃতির পুরস্কার দ্বারা বাবুকে সম্বর্ধিত করে। কিন্তু বিশ্বের হকি দরবারে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী ভারতীয় দলের খেলোয়াড়গণকে ভারতের তরফ থেকে কোন সম্মান দান করা হয়েছে বলে শোনা যায়নি। প্রকাশ, ভ্যাঙ্কুভারের বৃটিশ কমনওয়েলথ ও এম্পায়ার গেমে এক মাইল দৌড়ের প্রতিযোগিতায় যে ঘড়িটি দ্বারা 'হেমস্ এ্যাথলেটিক ফাউণ্ডেশনে'র দৌড়ের সময় গণনা করা হয়েছিল, সেই ঘড়িটি 'হেমস্ এ্যাথলেটিক ফাউণ্ডেশনে'র

ডুরাণ্ড কাপে নিউ দিল্লী হিরোজ ও জামসেদপুর স্পোর্টিংয়ের খেলায় জামসেদপুর গোলরক্ষকের গোল রক্ষার এক দৃশ্য

কাছে পাঠান হবে। ব্যানিস্টার এক মাইলের শেষ সীমারেখায় পৌঁছলে যে অবস্থায় 'স্টপ ওয়াচ' বন্ধ করা হয়েছিল এখনও সেই অবস্থায় আছে। অর্থাৎ ব্যানিস্টারের এক মাইলের দৌড়ের সময় ৩ মিনিট ৫৮.৮ সেকেন্ড ঘড়ির কাঁটায় নিরূপিত হয়েই রয়েছে। ওয়াশিংটন স্টেট কলেজের ট্রাক ও ফিল্ড কোচ মিঃ জ্যাক মুবারীর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'হেমস্ এ্যাথলেটিক ফাউন্ডেশনের' কাছে ঘড়িটি পাঠাবার ব্যবস্থা হয়েছে। লস এঞ্জেলের 'হেমস্ হলে' একটি সুদৃশ্য আধারে ঘড়িটি রাখা হবে। হেমস্ এ্যাথলেটিক ফাউন্ডেশনের বিচারে বিশ্ব ক্রীড়াক্ষেত্রের সম্মানিত বীরদের তালিকায় ডাঃ রজার ব্যানিস্টারের স্থান কোথায় নিরূপিত হয় তা লক্ষ্য করবার বিষয়।

* * *

এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গুলার বা চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা শেষ পর্যন্ত কলকাতাতেই অনুষ্ঠিত হবে স্থির হয়েছে। কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতার এবার তৃতীয় অনুষ্ঠান। সিংহলের স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে ১৯৫২ সালে কলম্বোতে এই খেলা প্রথম আরম্ভ হয় এবং সিংহল ফুটবল এসোসিয়েশন বিজয়ীর পুরস্কার 'কলম্বো কাপ' দান করে। ভারতবর্ষ, সিংহল, ব্রহ্মদেশ ও পাকিস্থান—এই চারটি দেশ কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলের প্রতিযোগী। সিংহলের কলম্বোতে প্রথম বছরের খে অনুষ্ঠানের পর ঠিক হয় চা... দে পর্যায়ক্রমে খেলা অনুষ্ঠিত হবে। ... অনুযায়ী গতবার ব্রহ্মদেশের ফুট কর্তৃপক্ষ রেঙ্গুনে কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে ব্যবস্থা করেন। এবার ভারতে অনুষ্ঠানে পালা। ভারতের অনুষ্ঠান নিয়ে নি ভারত ফুটবল ফেডারেশনকে বেশ অসুবি পড়তে হয়। এতদিনে তাঁরা কোনমতে খেলার স্থান এবং সময় ঠিক কর পারেননি। শেষ পর্যন্ত ১১ই ডিসে থেকে কলকাতায় খেলা আরম্ভের আয়ো হয়েছে।

কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলে লীগ প্র প্রতি দলকে প্রতি দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বি করতে হয়। সুতরাং খেলার সংখ্যা দা ৬টি। ১৯৫২ সালের অনুষ্ঠানে ভারত পাকিস্থান যুগ্মভাবে চ্যাম্পিয়নশিপ ক করেছিল। গতবার ভারত সমস্ত খে জয়লাভের কৃতিত্বে অপরাজিত চ্যাম্পি আখ্যা লাভ করেছে।

অন্যান্য খেলাধুলার খবরাখবর

রনজি ক্রিকেট—ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ সভাপতি বিজয়নগরের মহারাজকুমার অ রাজ্য বা রনজি ক্রিকেট প্রতিযোগি ১৯৫৪—৫৫ সালের খেলার তালিকা ঘে করেছেন। খেলার স্থান এবং তালিকা ঘোষণা করা হবে। কন্ট্রোল বোর্ডের স রনজি প্রতিযোগিতার পরিবর্তন সম্প নানা জনে নানা রকমের অভিমত প্র করেছিলেন, কিন্তু এ বছর কোন-কিছ পরিবর্তন সম্ভব হয়নি। খেলার তালিক

প্রথম রাউণ্ড

পূর্বাচল :—

(১) বাঙ্গলা : উড়িষ্যা
(২) বিহার : আসাম

উত্তরাঞ্চল :—

(৩) দিল্লী জেলা এসোসিয়েশন : সার্ভিসেস
(৪) ইস্ট পাঞ্জাব : পাতিয়ালা

দক্ষিণাঞ্চল :—

(৫) মাদ্রাজ : ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন
(৬) হায়দরাবাদ : অন্ধ্র
(৭) মহীশূর : ৫নং বিজয়ী

মধ্যাঞ্চল :—

(৮) উত্তরপ্রদেশ : মধ্যপ্রদেশ
(৯) হোলকার : রাজপুতানা

পশ্চিমাঞ্চল :—

(১০) গুজরাট : বরোদা
(১১) সৌরাষ্ট্র : মহারাষ্ট্র
(১২) বোম্বাই : ১০নং বিজয়ী

দ্বিতীয় রাউণ্ড

১নং বিজয়ী : ২নং বিজয়ী
৩নং বিজয়ী : ৪নং বিজয়ী
৬নং বিজয়ী : ৭নং বিজয়ী

৮নং [illegible] : ৯নং বিজয়ী
[illegible]১নং বিজয়ী : ১২নং বিজয়ী

টেনিস ক্রমপর্যায়—জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ন আর কৃষ্ণন ভারতের টেনিস 'ক্রমপর্যায়' প্রথম স্থান লাভ করেছেন। সুমন্ত মিশ্র, নরেশকুমার, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি কৃতী টেনিস খেলোয়াড়েরা হার্ড কোর্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ গ্রহণ না করায় 'ক্রমপর্যায়' স্থান পাননি। নিয়মানুযায়ী 'লন' এবং হার্ড কোর্ট চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ গ্রহণ না করলে 'ক্রমপর্যায়' স্থান লাভ করা যায় না।

মহিলা টেনিস খেলোয়াড়দের 'ক্রমপর্যায়' প্রথম স্থান লাভ করেছেন কুমারী রিতা ডেভার। কুমারী ঊর্মিলা থাপর দ্বিতীয়, মিস এল উডব্রিজ তৃতীয় এবং মিসেস অঞ্জলি দেশাই চতুর্থ স্থান পেয়েছেন।

ওয়াটার পোলো—বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র ওয়াটার পোলো লীগে ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাব চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে। নীচে লীগ তালিকা দেওয়া হল।

	খেঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ	বিঃ	পঃ
ন্যাশনাল	৬	৫	০	১	৩০	১৭	১০
হাটখোলা	৬	৪	০	২	১৫	১৮	৮
সেণ্ট্রাল	৬	৩	০	৩	১৯	২১	৬
কলেজ স্কোয়ার	৬	০	০	৬	৫	১৩	০

এম সি সি-র উপর্যুপরি তৃতীয় জয়লাভ—অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রথম শ্রেণীর খেলায় এম সি সি দল পশ্চিম অস্ট্রেলিয়াকে ৭ উইকেটে এবং সম্মিলিত অস্ট্রেলিয়া দলকে এক ইনিংস ও ৬২ রানে পরাজিত করবার পর তৃতীয় খেলায় দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়াকে ২১ রানে হারিয়ে দিয়ে উপর্যুপরি তিনটি খেলায় জয়লাভ করেছে। ডেনিস কম্পটন এই খেলায় প্রথম অংশ গ্রহণ করেন এবং প্রথম খেলাতেই ১১৩ রান করে ব্যাটিং নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক হাটন মাত্র ২ রানের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারেন নি।

খেলার ফলাফল :—

এম সি সি (১ম ইনিংস)—২৪৬ রান (ডেনিস কম্পটন ১১৩, সিম্পসন ২৯, লেন হাটন ৩৭, টি গ্রেভনী ২৩, উইলসন ৮১ রানে ৫টি, রক্সবী ৮২ রানে ৩টি উইকেট পান।)

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া (১ম ইনিংস)—২৫৪ রান (ফ্যাবেল ৮৪, হ্যারিস ৪৩, ল্যাংলে নট আউট ৩৬; টাইসন ৬২ রানে ৫টি উইকেট পান।)

এম সি সি (২য় ইনিংস)—১৮১ রান (লেন হাটন ৯৮, টি গ্রেভনী ৩৪; ড্রেনাল ৩২ রানে ৩টি, উইলসন ৩২ রানে ৪টি উইকেট পান।)

দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া (২য় ইনিংস)—১৫২ (প্যাভেল ৪৭, জি ল্যাংলে ২৩; এ্যাপলইয়ার্ড ৪৬ রানে ৫ উইকেট)

আন্তর্জাতিক ফুটবল—গত পক্ষকালের মধ্যে অনেকগুলি আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এর মধ্যে বিশ্ব-কাপ বিজয়ী জার্মানী দলের ফ্রান্সের নিকট পরাজয় উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নীচে কয়েকটি খেলার ফলাফল দিচ্ছি।

হাঙ্গেরী (৩) : সুইজারল্যাণ্ড (০)
সুইডেন (৫) : ডেনমার্ক (০)
যুগোশ্লেভিয়া (৫) : তুরস্ক (১)
ফ্রান্স (৩) : জার্মানী (১)
ইনসেণ্ড—হাঙ্গেরী (৫) : ব্রমউইচ—ইংলণ্ড (৩)
হাঙ্গেরী (৪) : চেকোশ্লোভেকিয়া (১)

ভ্রমণে বিশ্বের নূতন রেকর্ড—হাঙ্গেরীর এ্যাথলীট লাসলো সোমাগী ৫০ কিলোমিটার ও ত্রিশ মাইল ভ্রমণে বিশ্বের নূতন রেকর্ড করেছেন। তিনি ৪ ঘণ্টা ১৯ মিনিট ১৩ সেকেণ্ড সময়ে ত্রিশ মাইল পথ অতিক্রম করেন। আর হাঁটাপথে ৫০ কিলোমিটার অতিক্রম করতে তাঁর সময় লাগে ৪ ঘণ্টা ২৮ মিনিট ৪৫ সেকেণ্ড। ১৯৫২ সালে সুইডেনের জে জুনগ্রেন ৪ ঘণ্টা ২১ মিনিট ১১ সেকেণ্ডে ত্রিশ মাইল এবং ৪ ঘণ্টা ২৯ মিনিট ৫৮ সেকেণ্ডে ৫০ কিলোমিটার পথ হেঁটে বিশ্ব রেকর্ড করেছিলেন।

হাইজাম্পে নূতন ভারতীয় রেকর্ড—হাই-জাম্পে ভারতের শ্রেষ্ঠ এ্যাথলীট অজিত সিং আধ ইঞ্চি বেশী লাফিয়ে তাঁর নিজের রেকর্ড অতিক্রম করেছেন। হাই-জাম্পে অজিত সিংয়ের 'রেকর্ড' ছিল ৬ ফিট ৩½ ইঞ্চি। সম্প্রতি জলন্ধরের পুলিশ এ্যাথলেটিক ক্রীড়ানুষ্ঠানে অজিত সিং ৬ ফিট ৪ ইঞ্চি লাফিয়েছেন।

দেশী সংবাদ

২৫শে অক্টোবর—আজ কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ কমিশনের চেয়ারম্যান গৌহাটিতে বলেন যে, ব্রহ্মপুত্রের ভাঙ্গন হইতে ডিব্রুগড়, পলাশবাড়ী ও স্যালঘাটি শহর রক্ষার জন্য ১ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার একটি পরিকল্পনার চূড়ান্ত রূপ দেওয়া হইয়াছে। পরিকল্পনার কাজ শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

পরলোকগত রফি আমেদ কিদোয়াইয়ের স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য আজ নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে, কেন্দ্রীয় সরকারী দপ্তরখানা, সংসদ ভবন এবং সরকারী অফিস ভবনসমূহে পতাকা অর্ধ-নমিত করা হয়। আজ শ্রীযুক্তা কিদোয়াইয়ের নিকট প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর এক মর্মস্পর্শী তারবার্তা আসিয়া পেঁছে। উহাতে তিনি শ্রীকিদোয়াইকে 'ভারতের মুক্তিসংগ্রাম এবং পরে নবভারত গঠন উভয় পর্যায়েই অপরিহার্য' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

২৬শে অক্টোবর—পরলোকগত রফি আমেদ কিদোয়াইয়ের মৃতদেহ আজ লক্ষ্ণৌ হইতে ১৯ মাইল দূরবর্তী বরবাকী জেলার নিজ গ্রাম মাসোলীস্থ তাঁহার পারিবারিক সমাধিক্ষেত্রে তাঁহার পিতার কবরের পার্শ্বে পূর্ণ সামরিক মর্যাদার সহিত সমাহিত করা হয়। সমাধিক্ষেত্রে সমবেত হাজার হাজার নরনারী কবরে অঞ্জলিপূর্ণ মৃত্তিকা অর্পণ করিয়া তাঁহাদের প্রিয় নেতার প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

নয়াদিল্লীতে জানা গিয়াছে যে, পিকিংয়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনার ফলে ভারত ও চীনের মধ্যে বিমান চলাচল সম্পর্কে এক চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। এই চুক্তির শর্ত অনুযায়ী চীন সরকার ভারত পর্যন্ত বিমান চলাচলের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

২৮শে অক্টোবর—অমৃতসর-লাহোর রেল লাইন যাত্রিবহনের জন্য আজ উন্মুক্ত হইয়াছে। ১৯৪৭ সালের পর ভারত ও পশ্চিম পাকিস্থানের মধ্যে প্রথম যাত্রিবাহী ট্রেন লাহোর যাওয়ার জন্য আজ বেলা ১২টা ৩০ মিনিটের সময় আটারীতে সীমান্ত অতিক্রম করে।

২৯শে অক্টোবর—পশ্চিমবঙ্গ উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য ১৯৫৪-৫৫ সালের দ্বিতীয় ত্রৈমাসিককালের জন্য ভারত সরকার এক কোটি ১৫ লক্ষ ৭২ হাজার ১১০৲ টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। শহরে ও গ্রামাঞ্চলে গৃহ নির্মাণ, শহরে ব্যবসায় স্থাপন ও প্রসার, গ্রামে ব্যবসা চালনা ও কৃষিকার্য পরিচালনার উদ্দেশ্যে ঋণ হিসাবে এই টাকাটি বণ্টন করা হইবে।

মধ্যশিক্ষা পর্ষৎ গত স্কুল ফাইনাল

পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণদের জন্য এবার যে বিশেষ অতিরিক্ত স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা (সাপ্লিমেণ্টারী) গ্রহণের ব্যবস্থা করিয়াছেন, উহাতে প্রায় ১৬ হাজার ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষা দিবে বলিয়া আশা করা যায়। ঐ অতিরিক্ত পরীক্ষাটি আগামী ৮ই ডিসেম্বর হইতে আরম্ভ হইবে।

৩০শে অক্টোবর—ভারত সরকার সোভিয়েট বিশ্বকোষে (এনসাইক্লোপিডিয়া) মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কিত অবমাননাসূচক বিবরণের প্রতি নয়াদিল্লীস্থিত সোভিয়েট দূতাবাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। উক্ত বিশ্বকোষে মহাত্মা গান্ধী সম্পর্কে যে প্রবন্ধটি সন্নিবেশিত হইয়াছে, তাহা অবমাননাজনক বিবরণে পূর্ণ বলিয়া জানা গিয়াছে।

গতকল্য কোচবিহার জেলায় রাজাভাত-খাওয়া লেভেল ক্রসিং-এ একটি পাথরবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনের সহিত একটি যাত্রিবাহী বাসের সংঘর্ষে একজন মহিলা ও তাঁহার তিন কন্যা সহ পাঁচ জন মারা গিয়াছেন। ৪৫জন যাত্রী আহত হইয়াছেন, তন্মধ্যে ১৩জনের আঘাত মারাত্মক।

রেলওয়ে বিভাগে দুর্নীতি নিবারণের উপায় উদ্ভাবনকল্পে আজ কলিকাতায় রেলওয়ে দুর্নীতি তদন্ত কমিটির চারি দিন-ব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে।

৩১শে অক্টোবর—শনিবার রাত্রিতে শান্তিপুরের নিকট এক রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং পার হওয়ার সময় এক শোচনীয় মোটর দুর্ঘটনায় শান্তিপুরের বিধান সভা সদস্য ও স্থানীয় মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান শ্রীশশী খাঁ, তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীফণি খাঁ এবং অপর দুইজনের মৃত্যু হইয়াছে।

১লা নবেম্বর—ফরাসী সরকার অদ্য ভারত সরকারের নিকট পণ্ডিচেরী ও ভারতস্থ অন্যান্য তিনটি ফরাসী উপনিবেশের শাসন পরিচালনাভার হস্তান্তরিত করেন। আজ পণ্ডিচেরীতে গভর্নরের প্রাসাদে এই অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। ঐ সময়ে ফ্রান্সের পররাষ্ট্র দপ্তরের অফিসার মঁ পেরিয়ে লাঁদী এবং ভারতের কন্সাল জেনারেল এবং উক্ত অঞ্চলগুলির জন্য নবনিযুক্ত ভারতীয় কমিশনার শ্রীকেবল সিং ভারত ও ফ্রান্সের মধ্যে সম্পাদিত শাসন-ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কিত চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন।

শনিবার রাত্রিতে শান্তিপুরের নিকট মোটর দুর্ঘটনায় গুরুতররূপে ... পশ্চিমবঙ্গের উপমন্ত্রী ও ... সরকারের চীফ হুইপ শ্রীদেবেন্দ্র ... সকালে কলিকাতার প্রেসিডেন্সী জেন... হাসপাতালে ৫০ বৎসর বয়সে পরলোক... করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৬শে অক্টোবর—আজ পিকিংএ সাংবাদিক বৈঠকে শ্রীজওহরলাল নেহরু ... যে, চীনের প্রধান ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিঃ এন লাই-এর সহিত আলাপ-আলো... তাঁহার বহুলাংশে মতৈক্য হইয়াছে। লণ্ড... নিউ ইয়র্কের বিভিন্ন সংবাদপত্রে উ... মধ্যে তীব্র মতভেদের যে সংবাদ ব... হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ব... তিনি ঘোষণা করেন।

২৭শে অক্টোবর—ভারতের প্রধান ... শ্রী নেহরু আজ সকালে পিকিং হইতে ... বেতার ভাষণে বলেন যে, ভারত ও চী... সমস্যা এক রকম না হইলেও এবং সমাধ... পদ্ধতি অনুরূপ না হইলেও উভয় ... নানা দিক দিয়া সহযোগিতা করিতে প... আজ সকালে পিকিং বিমানঘাঁ... শ্রী নেহরুকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা ...

আমেরিকার বিখ্যাত ঔপন্যাসিক ... আর্নেস্ট হেমিংওয়েকে এই বৎসর সাহি... জন্য নোবেল পুরস্কার দেওয়া হইয়াছে।

মিশরের প্রধান মন্ত্রী লেঃ কর্নেল গা... আবদুল নাসেরকে হত্যার ষড়যন্ত্র ... তাঁহার প্রতি গুলী নিক্ষেপ সম্পর্কে আত... মামুদ আবদুল লতিফ এবং অপর ১২ জ... গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

২৮শে অক্টোবর—উত্তর-পশ্চিম সী... প্রদেশের ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ খান সা... পুনর্গঠিত পাকিস্থান মন্ত্রিসভার ... মন্ত্রী হিসাবে গৃহীত হইয়াছেন এবং ... করাচীতে তাঁহার শপথ গ্রহণ অনু... সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ডাঃ খান সাহে... লইয়া পাকিস্থান মন্ত্রিসভার মন্ত্রিসংখ্যা ... জন হইল। করাচীর রাজনৈতিক পর্যবেক্ষ... বলেন যে, বিরোধী দল ইউনাইটেড ... নেতা মিঃ সুরাবর্দীকে করাচীতে প্রত্যাব... এবং প্রধান মন্ত্রী মহম্মদ আলীর স্থলব... হইবার জন্য অনুরোধ করিতে ইতিপ... পূর্ববঙ্গ আওয়ামী লীগের সহকারী ... পতি মিঃ এ রহমান বিমানযোগে সুইজ... ল্যাণ্ড যাত্রা করিয়াছেন।

৩০শে অক্টোবর—চীনে ... বার দিনব্যা... ঐতিহাসিক সফর শেষ করিয়া প্রধান ম... শ্রী নেহরু আজ সকালে ক্যাণ্টন ত্যাগ কর... হানয়ে এক ঘণ্টা অবস্থান করিয়া ... সায়গন অভিমুখে রওনা হন।

প্রতি সংখ্যা—৵৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রী... চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
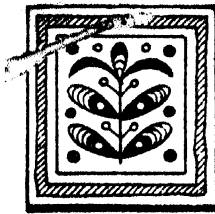
২২ বর্ষ
সংখ্যা ২

শনিবার
২৭ কার্তিক, ১৩৬১

DESH

SATURDAY, 13th NOVEMBER 1954

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহর়ু

আগামী ১৪ই নবেম্বর পণ্ডিত জওহরলাল নেহর়ুর ৬৬তম জন্মতিথি। এই উপলক্ষে আমরা তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। পণ্ডিত জওহরলাল কংগ্রেসের সভাপতি, আমাদের তিনি প্রধানমন্ত্রী। ভারতের তিনি সর্বজনপ্রিয় জননায়ক। কিন্তু এই হিসাবেই তিনি সুমহান্ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষ নহেন, তাঁহার ব্যক্তিত্ব সমগ্র জগতের আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত। মহাত্মা গান্ধীর প্রিয়তম শিষ্যরূপে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে যিনি একদিন অগ্রণীর আসন অধিকার করিয়াছিলেন, স্বাধীন ভারতের মর্যাদা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গান্ধীজীর জীবনাদর্শের মহিমায় মানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে তিনি শান্তি এবং মৈত্রীর আশা উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছেন। হিংসা-বিদ্বেষের ধূমে জটিল আবর্তে আচ্ছন্ন, জগতের দিক্‌চক্রবালে আজ পণ্ডিত নেহর়ুর প্রাণময় সাধনার অভিনব আলোক ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রলয়ংকর মারণাস্ত্রের সংঘাত-সংঘট্ট স্তব্ধ করিয়া পণ্ডিত নেহর়ুর কণ্ঠে ভারতের আত্মার অমৃতময় বাণী আজ দিকে দিকে ঝংকৃত হইতেছে। যাদুকর নেহর়ু। তাঁহার কনকদণ্ড স্পর্শে সুপ্ত এশিয়ার প্রাণশক্তি অপরূপ মহিমায় জাগিয়া উঠিতেছে। নিপীড়িত মানব-সমাজ তাঁহার সাধনার প্রেরণায় নূতন জীবনের সন্ধান পাইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে যুগান্তকারী তাঁহার জীবনের প্রভাব। পণ্ডিত নেহর়ুর প্রচণ্ড প্রাণশক্তি, উদার তাঁহার আত্মভাবনায় বিস্ময়ের সৃষ্টি হয়। সকলকেই সমভাবে অসামান্য তাঁহার চরিত্রবল শ্রদ্ধিত করে। তাঁহার ন্যায় নেতা পাইয়া আমরা সত্যই ধন্য হইয়াছি, কৃতার্থতা লাভ করিয়াছি। ভারত আপনার মনের মানুষ পাইয়াছে। বৃহৎ আদর্শে নিবেদিত এমন যিনি মহাপ্রাণ পুরুষ, তাঁহার আবার অবসাদ কোথায়? পণ্ডিত নেহর়ুর সাধনা অতন্দ্রিত। তরুণ জীবনের অদীন লাবণ্যে দেশ ও জাতির সেবায় তিনি নিত্য অনলস। সুতরাং রাজনীতি ক্ষেত্র হইতে তাঁহার অবসর গ্রহণের কোন প্রশ্নই উঠে না। প্রত্যুত সে সম্বন্ধে আমাদের মনে কোন প্রশ্নই দেখা দেয় নাই, দিতেও পারে না। প্রত্যুত পণ্ডিতজীর কংগ্রেসের সভাপতি-পদ ত্যাগে কংগ্রেসের ওয়ার্কিং কমিটির সম্মতির সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে জনগণের প্রভাব পুনর্জীবিত করিয়া তুলিবার পক্ষে তাঁহার ব্যক্তিত্ব সর্বাধিক মুক্ত প্রতিবেশে স্বচ্ছন্দ এবং সক্রিয়ভাবে প্রেরণা সঞ্চার করিবে। পণ্ডিতজীর কর্মময় জীবনের মহিমা দীপ্ততর হোক। তিনি সুদীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া আমাদের স্বাধীনতাকে মহত্তর করিয়া তুলুন। এই-ভাবে তাঁহার সাধনবীর্যে আত্মপ্রতিষ্ঠ বলিষ্ঠ ভারত জগতের শান্তি সুদৃঢ় করুক এবং বিশ্ববিধ্বংসী বর্বরতা প্রভাবিত বৈষম্য, বিরোধ এবং বিদ্বেষের বিভীষিকা-বিনির্মুক্ত মানবতা সর্বত্র সম্প্রসারিত হোক। তাঁহার শুভ জন্ম-তিথিতে আমাদের এই প্রার্থনা।

হিমালয়ের বাণী

দার্জিলিংয়ে পর্বতারোহণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ভিত্তি স্থাপন করিতে গিয়া ভারতের প্রধান মন্ত্রীর দৃষ্টি তুষারমৌলী কাঞ্চনজঙ্ঘার উত্তুঙ্গ শৃঙ্গরাজীর দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে। তিনি হিমালয়ের বাণী শুনিয়াছেন। তিনি ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির দ্রষ্টা স্বরূপে হিমালয়কে উপলব্ধি করিয়াছেন। দ্রষ্টাই যে স্রষ্টা, একথা স্বীকার করিতে হয়। বস্তুত, হিমালয় ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির উত্থান, পতন এবং বিবর্তনের শুধু দ্রষ্টাই নহেন; দেবতাত্মা এই নগাধিরাজ ভারতীয় সংস্কৃতির সাক্ষাৎ সম্পর্কে স্রষ্টা। তিনি ভারতের গুরু এবং উপদেষ্টা। হিমাদ্রির বিপুল গাম্ভীর্য কিছুদিন হইতে পাশ্চাত্যের পর্বতারোহী-দিগকে আকৃষ্ট করিয়াছে, দুর্গমের সন্ধানে তাহাদের চিত্তকে প্রাণ-রসে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে; কিন্তু ভারতবাসীরাও হিমালয় সম্বন্ধে উদাসীন নয়। হিমালয় ভারতের পরম আশ্রয়। হিমাদ্রির চিৎঘন আপ্যায়ন যুগে যুগে এদেশের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মূলে কিভাবে কাজ করিয়াছে সে চিন্তা করিলে হিমালয় সম্পর্কে আমাদের মনে আত্মভাব ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠে। পর্বতারোহণ-শিক্ষা, উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গে আরোহনে দুর্গমের এই সাধনার মূল্য না আছে আমরা এমন কথা অবশ্যই বলি না। আমাদের শুধু ইহাই বক্তব্য যে, ভারতীয় সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সম্পর্কে হিমালয়ের প্রতি আত্মভাবনা জাগ্রত করার মূল্য আমাদের জাতীয় সংহতির দিক হইতে আরও অনেক বেশী। অধিকন্তু সমগ্রভাবে মনুষ্যত্ব বিকাশের পক্ষে তাহা সহায়ক। দুর্গমের সাধনার পথেই মানুষের বীর্য এবং মহত্ত্ব বিকশিত হইয়া উঠে, তাহার প্রাণধর্ম প্রদীপ্ত হয়। কিন্তু সেই সাধনার মূলীভূত দুরন্ত আগ্রহ যদি মনকে উদার এবং সম্প্রসারিত করে, আত্মবোধকে ব্যাপ্ত করিয়া দেয়, তবেই তাহার সার্থকতা। দার্জিলিংয়ে নব প্রতিষ্ঠিত পর্বতারোহণ

প্রতিষ্ঠানটি গঠিত হওয়ায় ভারতের আত্ম-ধর্ম উজ্জীবনের সহায়ক হইবে। ফলত ভারতের সাধনা অসীমের অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছে, এই হিমালয় হইতে এবং সব সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত উদার ভাবনা ভারতের চিত্তমূলে যুগে যুগে দীপ্ত হইয়াছে, এই হিমালয়েরই ললাটের উজ্জ্বল আলোকের খেলায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, হিমালয়কে আমাদের ভালবাসিতে হইবে। তাহার সঙ্গে আমাদের সখ্যভাব গড়িয়া তুলিতে হইবে। কিন্তু ভালবাসিতে বলিলেই কোন কিছুকে ভালবাসা যায় না, পরন্তু তদুপযোগী মনের প্রতিবেশ গড়িয়া তোলা আবশ্যক হইয়া থাকে। ইট-পাথরকে কেহ ভালবাসিতে পারে না, তেমন ভালবাসায় মনের মহত্ত্বও পরিস্ফূর্ত হয় না। প্রকৃত ভালবাসার মূলে শ্রদ্ধা-বুদ্ধি থাকা দরকার। এভারেস্ট-বিজয়ী তেনজিং এই কথাটাই একটু ভাবের ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। হিমালয়ের জড়ত্বের সম্বন্ধে চেতনা এমন শ্রদ্ধাবুদ্ধি বা ভাবনাকে ব্যাহত করে ইহা বুঝি; কিন্তু হিমালয়কে আশ্রয় করিয়া ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির প্রতি মর্যাদা-বুদ্ধি আমাদের জাতীয় জীবনে বিশেষ-ভাবে তরুণদের মধ্যে যদি বলিষ্ঠ হইয়া উঠে, তবে নবগঠিত এই প্রতিষ্ঠানই ভারতের প্রাণধর্মের প্ররোচক হইবে এবং হিমালয়ের মনোময় রূপ ব্যক্ত করিবে। পশ্চিমবঙ্গে হিমাদ্রি-পূজার পুণ্যপীঠ প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে এই দিক হইতে আমরা বিশেষভাবে গৌরব বোধ করিতেছি।

শিক্ষার আদর্শ—

আসামের রাজ্যপাল শ্রীযুত জয়রাম-দাস দৌলতরাম আসাম মেডিক্যাল কলেজের ছাত্রদিগকে সম্বোধন করিয়া শিক্ষার আদর্শ এবং দেশের রাষ্ট্র ও সমাজ-জীবনের উন্নয়নক্ষেত্রে তাহার প্রয়োজন সম্বন্ধে কয়েকটি মূল্যবান্ কথা বলিয়াছেন। তাঁহার মতে ডিগ্রীর অবশ্য মূল্য আছে; কিন্তু ছাত্রদের চরিত্র, তাহাদের নৈতিক সাহস এবং সেবার প্রবৃত্তি রাষ্ট্র এবং সমাজের উন্নতির দিক হইতে এই-গুলির মূল্য সর্বাধিক। দুঃখের বিষয় এই যে, আসামের রাজ্যপাল শিক্ষার যে আদর্শ তরুণ সমাজের কাছে উপস্থিত করিয়াছেন স্বাধীনতা লাভ করিবার পর তাহা অনেকটা ক্ষুণ্ণ হইতে বসিয়াছে। বৈদেশিক প্রভুত্বের উচ্ছেদ সাধনের প্রেরণায় এদেশের শিক্ষার প্রতিবেশে বলিষ্ঠ মনুষ্যত্বের পথে যে চেতনা জাগিয়াছিল এখন আর তেমন নাই। যে কোনভাবে জীবিকা অর্জনের সুবিধার দিকেই তরুণদের দৃষ্টি গিয়াছে। যুদ্ধোত্তর-ব্যাপক অর্থনীতিক সমস্যাই ইহার মূল কারণ; কিন্তু জীবিকা অর্জনের এই যে সমস্যা ইহার সমাধান করিতে হইলেও চরিত্র-শক্তি আবশ্যক। শ্রীজয়রামদাস দুঃখ করিয়া বলিয়াছেন, প্রতি বৎসর সহস্র সহস্র নরনারী ম্যালেরিয়া এবং কালাজ্বর প্রভৃতি ব্যাধিতে মৃত্যুমুখে পতিত হইতেছে কিন্তু লোকে চিকিৎসার জন্য ডাক্তার পায় না। পশ্চিমবঙ্গের পল্লী অঞ্চলেও এই সমস্যা রহিয়াছে। এই সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে পশ্চিম-বঙ্গ সরকার গ্রামাঞ্চলে থাকিয়া যাহারা চিকিৎসার কাজ করিবেন, সম্প্রতি তাহাদের সরকারী ভাতার ব্যবস্থা করিয়াছেন। ব্যবস্থা ভাল। কিন্তু ইহাতেও সমস্যার কতটা সমাধান হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। কারণ সমস্যার প্রতীকার সাধন করিতে হইলে নৈতিক আদর্শ উজ্জীবিত করিয়া তোলাই আগে দরকার। প্রকৃত-পক্ষে মানবসেবার আদর্শকে শিক্ষার ক্ষেত্রে এবং জীবিকার সংস্থান-সূত্রে সমাজ-জীবনে সম্প্রসারিত করিতে না পারিলে সরকারের গঠনমূলক পরিকল্পনাগুলি সার্থক করিয়া তুলিবার পক্ষে পদে পদে অন্তরায় সৃষ্টি হইবে এবং সেগুলির ভিতর দুর্নীতি ঢুকিয়া সেগুলিকে নষ্ট করিয়া দিবে। তরুণ সমাজই দেশের প্রাণ-স্বরূপ। দেশবাসীর দুঃখকষ্ট এবং দুর্গতি নিরসন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের আন্তরিকতা ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে। সেই শক্তি তাহাদের কর্মজীবনে প্রেরণা জাগাইয়া দেশের সংগঠন পরিকল্পনা সার্থক করিয়া তোলে আমরা ইহাই দেখিতে চাই।

ঐতিহাসিক অবিচার

ভারত সরকার এবং ফোর্ড ফাউণ্ডেশন কমিটির যুক্ত উদ্যোগে ভারতের মাধ্যমিক
শিক্ষার অবস্থা সম্বন্ধে তদন্ত
জন্য ভারত হইতে চারজন, মার্কি
রাষ্ট্রের দুইজন, গ্রেট বৃটেনের
এবং স্ক্যাণ্ডানেভিয়ার একজন
লইয়া গঠিত একটি আন্তর্জাতিক
নিযুক্ত হইয়াছে। ইঁহারা সম্প্রতি
সরকারের নিকট তাঁহাদের
পেশ করিয়াছেন। বিশেষজ্ঞগণ
এই রিপোর্টে এদেশের শিক্ষকদে
ঐতিহাসিক অবিচারের কথা
করিয়াছেন এবং কারণও কিঞ্চিৎ
করিয়াছেন। শিক্ষকদিগকে গুরুর
বা গৌরবের আড়ালে তাঁহাদের
অবিচার ঐতিহাসিক আকার
করিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের বক্তব্য। বি
গণের অভিমত এই যে, শিক্ষ
গুরুদের গৌরবের বড় বড় কথা ব
কিন্তু তাঁহারা যে ব্যবহার পান,
সঙ্গে ঐ মর্যাদার খাপ খায় না। আ
জীবনযাত্রার চাপে পড়িয়া
দের জীবিকার্জনের সমস্যা
স্বার্থের সঙ্গে বিজড়িত হইয়া
দারিদ্র্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে
এরূপ অবস্থায় শিক্ষকগণ এবং তাঁ
পরিবারবর্গের জন্য উপযুক্ত জী
ব্যবস্থা করা সরকারের পক্ষেই ক
গুরুদের মর্যাদার দোহাই দিয়া
দায়িত্ব এড়াইবার চেষ্টা করা সংগত
পারে না। কমিটি তাঁহাদের মন্ত
উপসংহারে বলিয়াছেন, ভারতের শি
দের বেতন অনুচিত রকমেই অতি স
তাঁহাদের এই সুব্যবস্থার প্রতিকার
হইলে ভারতে শিক্ষার সমুন্নতি
সম্ভব হইতে পারে না। বলা বা
বিশেষজ্ঞগণের এই মতে নূতনত্ব কি
নাই। তাঁহারা শিক্ষকদের এই দুর্গ
প্রতীকারকল্পে সুনির্দিষ্ট কোন
কল্পনা দিতে পারেন নাই। সমস
গুরুত্ব সম্বন্ধে ভারত সরকারকে
করিয়া আরও এক দফা অব
করিয়াছেন এই মাত্র। অবস্থা সর
পক্ষের অবিদিত নয়, তথাপি তাঁহা
সম্বন্ধে সমুচিত ব্যবস্থা অবল
উদাসীনই রহিয়াছেন। এখন তাঁহ
এদিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে কি?

স্কেচ ॥ শ্রীনন্দলাল বসু

বৃক্ষ

জীবনানন্দ দাশ

মৃগতৃষ্ণার পিছে ধাবমান হওয়া নয় আর;
ইন্দ্রধনু ধরবার মতো মূঢ় মন;
বিহ্বল আলোর পরে আসে যেই পতিত আঁধার;
কেবলি অন্ন গ্রাস—শাশ্বত গ্রাসাচ্ছাদন;—
আস্তে সরিয়ে রেখে, মুখ থেকে রক্তের ফেনা,
পায়ের নিচের থেকে ক্ষমতা যশের মরুভূমি
ফেলে দিয়ে হে হৃদয়, কখন বসবে
কয়েক মুহূর্ত নীল শ্যামল বৃক্ষের নিচে তুমি।

চারিদিকে ব্রহ্মাণ্ডের উজ্জ্বল আতপঃ
অগ্নির অমৃতভাণ্ড ব'লে মনে হয়;
অকূল আগুনে ম্লান ক'রে বৃক্ষ শান্ত স্নিগ্ধ সিদ্ধার্থ পল্লবঃ
হরিৎ সোনালি নীল সৌম্য তন্ময়।
আকাশকে নিরালম্ব ক'রে দিয়ে বোমারু বিমান
উড়ে যায়—পুনরায় প্রাণসাগরের শত ভাষা
মর্মরিত হ'য়ে ওঠে;—কোন কথা বলে দূর নীল?
আর এই হরিতের কি মহাজিজ্ঞাসা।

রক্তাক্ত নদীর তীরে কালো পৃথিবীর
দাঁড়িয়ে রয়েছে মৌন বৃক্ষের এক মুঠো আলো;
সনাতন শূন্যের অন্বেষণে দিন অনুদিন
যে সঞ্চিত মানবতা আজ প্রায় শূন্যে ফুরালো—
অনুভব ক'রে সব মানুষ তবুও
মৃত্তিকায় মূল রেখে লক্ষ্য রেখে আদি নীলিমায়
শ্যামল গাছের থেকে অবিনাশ ধর্ম শিখবে?
অথবা নশ্বর প্রেম ভালোবেসে বসবে ছায়ায়।

চারিদিকে দ্রুত অন্ধ সাগরের ঝকঝকে হাসি;
অনন্ত প্রবহমান রক্তক্ষরা জল;
জীবনের জয়গান—মরণের যে লাবণ্যরাশি
দুলে ওঠে আকন্যাকুমারী হিমাচলঃ
সে সব অসত্য নয়, সত্য নয়, ফল নয়, নৈষ্ফল্য নয়;
যতদিন র'য়ে গেছে মানুষ ও মানুষের মন—
নিমিত্তের ভাগী হবে মানবের রক্তাক্ত হৃদয়;
হরিতের কাছে এসে শুনবে অক্ষয় গুঞ্জরণ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

৫

'আপনি কি ঈশ্বরকে দেখেছেন স্বচক্ষে?' একটি লোক প্রায়ই জিজ্ঞেস করে রবীন্দ্রনাথকে।

এ রকম একটা প্রশ্নও হয় নাকি?

কি রকম অদ্ভুত, নির্বোধের মতন দেখতে। তার মুখের দিকে তাকায় রবীন্দ্রনাথ। সাফ জবাব দেয়, 'না, দেখিনি'

'আমি দেখেছি।'

'তাই নাকি?' বিদ্রূপের হাসি হাসে রবীন্দ্রনাথ। 'কোথায়?'

'এই যে চোখের সামনে। চারদিকে বিজ বিজ করছে। দেখতে পাচ্ছেন না?' লোকটি চারদিকে তাকায়। হাত দিয়ে দেখায় চারদিক।

পাগল ছাড়া আর কি। রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখায় মন দেয়। পাগলের প্রলাপ শোনবার তার সময় নেই।

কিন্তু সেদিন সহসা সূর্যোদয়ের মুহূর্তে সদর স্ট্রীটের বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে এ কী দেখল রবীন্দ্রনাথ!

চোখের সম্মুখ থেকে যেন উঠে গেল যবনিকা। উড়ে গেল তুচ্ছতার আবরণ! সমস্ত কিছু যেন অনির্বাচ্য মহিমায় সমুজ্জ্বল হয়ে প্রতিভাত হল। এমনটি যেন কেউ ছিল না, যেন কাউকে দেখায় নি। অথচ এইটেই তার আসল সত্তা, তার সুবর্ণসত্তা। এতদিন চোখ দিয়ে দেখেছি বলেই কম করে দেখেছি, ভুল করে দেখেছি। আজ থেকে চৈতন্য দিয়ে দেখা শুরু হল। জানল তৃতীয় নয়ন। আর এই তৃতীয় নয়ন দিয়ে দেখা চৈতন্য দিয়ে দেখাই ঈশ্বরকে দেখা।

রাস্তা দিয়ে মুটে-মজুর চলেছে, মনে হল এরা শুধুই মুটে-মজুর নয়। এরা ছদ্মবেশী। নিখিল সমুদ্রের উপর এরাও তরঙ্গলীলা। বন্ধুর সঙ্গে বন্ধু চলেছে হাসতে হাসতে এও এক মহা-সৌন্দর্য নৃত্যের আনন্দ ছন্দ। একটা গরু আর একটা গরুর পাশে দাঁড়িয়ে তার গা চাটছে, এটির মধ্যেও অন্তহীন অপরিমেয়তার আস্বাদ। স্থূল আচ্ছাদন সরিয়ে ফেল, দূর করো এই দীনতার ছদ্মবেশ। উদ্ঘাটিত করো সেই নিহিত সত্তা, সেই অব্যক্ত সত্তা। আর সেই সত্তাকে দেখাই সত্যকে দেখা।

রবীন্দ্রনাথের সেই সত্য দর্শন। সত্য-দর্শনই ঈশ্বর দর্শন।

'আরে এসো, এসো।' সেই পাগল-মতন লোকটিকে দেখে উথলে উঠল রবীন্দ্রনাথ।

লোকটি তো অবাক। যাকে দেখে চিরদিন আড়ষ্ট ও কুণ্ঠিত হয়েছে রবীন্দ্র-নাথ, তার প্রতি এ কি উদার অভ্যর্থনা।

তোমাকে যে এতদিনে ঠিক-ঠিক চিনতে পেরেছি। চিনতে পেরেছি তোমার আসলকে। তোমার অতলকে। তোমার ভিতরের যে বস্তু মরে না সেই অমৃতকে। দেখি তুমিও যে আমিও সে। কোনো অনৈক্য নেই, বৈষম্য নেই। আমরা একজাত, আমরা আত্মীয়। আমরা অমৃতের সন্তান। আর সব মর্ত পরি-চয় মিথ্যে অবান্তর।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে একটা ওলোট-পালট হয়ে গেল। গুহা গৃহে বন্দী ছিল যে জলকুণ্ডল তার স্বপ্ন গেল ভেঙে। রবিরশ্মিরেখা স্পর্শ করল তাকে। সংকীর্ণ সীমার অস্তিত্বের কারাগার ভেঙে বাইরে বেরিয়ে এল সে বিশ্বপ্লাবনে, বিশ্বানুভূতিতে প্রসারিত হতে। দূর হতে মহাসাগরের ডাক শোনা যাচ্ছে, সেই মহাসাগরই ঈশ্বর। সমস্ত সংসার ভূখণ্ডকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ধুয়ে ধুয়ে বয়ে যেতে হবে, কঙ্কর-

বিলাতে রবীন্দ্রনাথ

প্রস্তর, কোমল-শ্যামল কাউকে উপেক্ষা না করে, সব কিছুকে অঙ্গীকৃত করে এগিয়ে যেতে হবে, মিলতে হবে সেই ঈশ্বরে। গুহা হচ্ছে অহং, সমুদ্র হচ্ছে আত্মা। প্রাণনির্ঝরিণী অহং-এর গুহা থেকে যাত্রা করল আত্মার নিকেতনে।

হে সমুদ্র, তুমিও যে জল আমিও সেই জল। আমিও তোমারই। শুধু আমি আবদ্ধ তুমি অসীম। আমি খণ্ডিত, তুমি অনন্ত ব্যাপ্ত। আমি ঘট তুমি আকাশ। আমি কুণ্ডলীকৃত তুমি সর্বসর্পিত। আমি তুমি দুইভাবে একজন।

সেই তোমাকে ধরতে চলেছি আমি। কোনো কিছুকে এড়িয়ে নয়, সব কিছুকে পেরিয়ে। ধরা না দিয়ে তোমার পথ কোথায়? কেননা তুমি তো শুধু শেষে নও, তুমি সোপানে-সোপানে। তুমি তো পথের ইতিতে নও, পথের রীতিতেও। আমার এই পথ-চলাতেই আনন্দ। তাই তোমার দিকে আমি চলেছি এই আমার অনন্ত সুখ। যাত্রা অনন্ত বলে সুখও মাত্রা-হীন।

এত কথা আছে এত গান আছে
এত প্রাণ আছে মোর,
এত সুখ আছে এত সাধ আছে
প্রাণ হয়ে আছে ভোর।

আমি আবিষ্কার করেছি নিজেকে। প্রাণের মহতী এষণাকে। তাও, হে জগৎ-

সূর্য, সন্দেহ নেই, তোমার কৃপায়। তিমির গুহায় তোমার করুণ করস্পর্শটি পাঠিয়েছিলে বলে। সদর স্ট্রীটের সামনে সেই ফ্রি স্কুলের বাগানের গাছের অন্তরাল থেকে উঠেছিলে বলে। হে পূষণ, তোমার হিরন্ময় পাত্রে সত্যের মুখ আচ্ছন্ন, উন্মুক্ত করো সেই আবরণ। কী অগাধ বাসনা আমার, জেনেছি এত দিনে। আর সে বাসনার বসতি কোথায়, তারও পেয়েছি ঠিকানা। তাই,

যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি
যত কাল আছে বহিতে পারি
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি—

কেন পারব না? এ যে তোমার দিকেই যাওয়া। পথের শেষ কোথায় কে জানে, পথে যখন বেরিয়েছি তখনই পেয়েছি তোমাকে। দুয়ার খুলে যখন চেয়েছি সমুখে, তোমার মুখের দিকেই চেয়েছি। আর আমাকে কে ঠেকায়। সব পথই তোমার পথ। সব যাওয়াই তোমার দিকে যাওয়া। আর ঠকায় কে আমাকে।

পেয়েছি এত প্রাণ যতই করি দান
কিছুতে যেন আর ফুরাতে নারি তারে।

আমিও তোমার মত অফুরন্ত। তোমার রয়েছে অনন্ত অন্তরীক্ষ আমার রয়েছে অনন্ত হৃদয়। তোমার সমস্ত আকাশ সেখানে বাসা বাঁধতে পারে অনায়াসে। খেলা করতে পারে পৃথিবী। কাউকে বাদ দিলে তো তোমার স্বাদ পাব না, তাই ধূলির যে ধূলি তারও মধ্যে তোমারই মুখচ্ছবি।

হৃদয় আজি মোর কেমনে গেল খুলি।
জগৎ আসি সেথা করিছে কোলাকুলি।
ধরায় আছে যত মানুষ শত শত
আসিছে প্রাণে মোর হাসিছে গলাগলি।

ওরে চল, জগৎস্রোতে ভেসে চল। যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ। সব কিছু ভেসে চলেছে, সূর্য চন্দ্র, দিন-রাত্রির পরম্পরা, একটি ঢেউয়ের পর আরেকটি ঢেউ, ঢেউয়ের পর ঢেউ। কান পেতে জগৎ কল-কলরব শোন, শুনতে শুনতে ভেসে চল। নিজের দিকে যাবার আর সময় নেই, সাগরের দিকে চল। সেই সাগরের দিকে চলাই জগতের দিকে চলা। আর সেই দিকই ঈশ্বরের দিক। আর শিশুরে অবোলা মুখে মাঝে মাঝে তাকাই আকাশের দিকে।

জানিস কি রে কত সে সুখ,
আকাশ পানে চাহিলে পরে
আকাশ পানে তুলিলে মুখ!

কোথায় থাকত প্রাণধারণের চেষ্টা যদি আকাশে এত আনন্দ না থাকত। সেই 'সুদূর দূরে, সুনীল নীলে' আজো এতটুকু ক্ষয় বা ক্ষোভের রেখা ফুটল না। অক্ষুণ্ণানন্দ আকাশ। সেই আকাশে হৃদয় চায় তারার মত ফুটতে, শিশিরের মত ঝরতে। আকাশে মাথাটি থুয়ে মেঘের মত ভেসে যেতে। আর, আকাশে যদি না-ই উঠতে পাই, বেশ তো, থাকব এই মাটির নিকেতনে। এই মাটির নিকেতনে ফুল হয়ে ফুটব, আর ফুল হয়ে ফুটে তাকাব সেই আকাশেরই দিকে।

যিনি সকল দিক থেকে জগতের প্রকাশক তিনিই আকাশ।

দুই হাতে আকাশে প্রেম বিলোচ্ছেন তিনি কে? সেই সুধা দেশে-দেশে গড়িয়ে গেল, ছড়িয়ে গেল। গাছেরা সবুজ পাতায় ভরে নিল, ফুলেরা মেখে নিল সকল গায়ে, চোখে-মুখে। পাখিরা পাখায় পাখায় এঁকে নিল, নিল সুরের রেখায়-রেখায়। সে প্রেম মায়ের বুক থেকে কুড়িয়ে নিল ছেলেরা, ছেলের মুখে মায়েরা দেখল সেই প্রেমের প্রতি-লিপি। সে প্রেম দীপ্ত হল দুঃখে, দ্রব হল অশ্রুতে। মৃত্যুর খড়্গের আঘাত মনে হল যেন কার উৎসর্গের মাল্য।

সেই মহাজাগরণের প্রভাতে বিশ্ব-সংসারে, চারদিকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিধ্বনি শুনতে পেল। যেন কোন অব্যক্তের দেশে গান হচ্ছে, আর চারদিকে এই ব্যক্তের দেশে, প্রাণ ও বস্তুর দেশে, উঠেছে তার খণ্ড-খণ্ড প্রতিধ্বনি। সীমার মধ্যে অসীমের প্রতিচ্ছায়া। পাখির গান পাখির গান নয়, আর কোনো গানের প্রত্যুত্তর। নির্ঝরের কলস্বর নয় আর কোনো গানের প্রতিঘাত। সমস্ত শ্রুত শব্দের পরপার থেকে বেজে চলেছে অশরীরী গান, সেইটিই মূল গান, আর এ সব ধ্বনি বিন্দু তারই প্রতিশব্দচ্ছটা। শুধু গান কেন, শোভা তার সৌ প্রতিধ্বনি।

তেমনি আমি-তুমি সকলে। বে সেই মূল গায়েন, আলো-ছায়ার খানে বসে বাঁশি বাজাচ্ছে।

আমরণ চিরদিন কেবলি খুঁজিব (
কখনো কি পাব না সন্ধান।
কেবলি কি রবি দূরে অতি দূর
শুনিব রে ওই আধো গান।
এই বিশ্বজগতের মাঝখানে দাঁড়াইয়
বাজাইবি সৌন্দর্যের বাঁশি,
অনন্ত জীবন পথে খুঁজিয়া চলিব (
প্রাণ মন হইবে উদাসী॥

সেই তো পরশ পাথর। তাকেই খুঁজেছে সেই সন্ন্যাসী। সেই তো কাম্যধন ভূমানন্দ। সংসারের সুখ শ সোনা রূপো, সব সে নস্যাৎ করে এ ধুলো মাখা দীর্ঘজটে খুঁজেছে সে টুকরো পাথর, যার ছোঁয়ায় লোহা (হয়ে যাবে, মর্ত তনু হবে ভাগবতী (খুঁজেছে আর খুঁজেছে। নুড়ির পর কুড়োচ্ছে আর ছুঁড়ে-ছুঁড়ে ফে নেতি, নেতি। এ নয় এ নয়। কহো, আগে বাড়ো, আগে খোঁ অবিশ্রান্ত অন্বেষণ। আগিদন্ত অন্বে কিন্তু সে কোথায়? কোন দূরে জ স্মৃতি বিস্মৃতির অন্ধকারে তাকে এসেছি। কখন তার ক্ষণিক স্প জেগে উঠবে কনক-বিদ্যুৎ!

সেই তো পরশ পাথর। পর পরশমানিক।

এ কী সন্ন্যাসী ঠাকুর, তে কাঁকালে ও সোনার শেকল কিে গাঁয়ের একটি ছেলে জিগ্গেস সন্ন্যাসীকে।

সত্যিই তো, সন্ন্যাসী চমকে উ কাঁকালের লোহার শিকল সোনা উঠেছে! একি চমৎকার, এ কি দুর্বি পথে যত কুড়িয়ে পেয়েছে নুড়ি, অ বশে ঠুকেছে সেই লোহার শিব আবার অভ্যাসবশেই দূরে ফেলে দি ছুঁড়ে। সেই সব পরিত্যক্ত নু মধ্যেই ছিল বুঝি সেই নিধি। কোথায়, কোথায় ফেলেছে তাকে? হায়, হায়, সে নেতির মা প্রেতি ছিল লুকিয়ে। ধূলির মধ্যেই

অসাধ্য...প্রতিদিনের শত তুচ্ছতার ...লে-আড়ালেই রয়েছে তার মুখ-ছবি। অভ্যাসের মধ্যেই সহজ আনন্দ।

খ্যাপা আবার খুঁজতে লাগল। আগে খুঁজছিল সে পরা নিধি, এখন খুঁজছে সে হারানিধি।

৬

ধরা-অধরার দেশে বাস করো, তুমি কে? যখনই তোমাকে চিনি তখনই তোমাকে হারাই। যখনই ধরেছি মনে করি তখনই দেখি রিক্ত মুষ্টি। আবার যখন অন্য মনে থাকি তখনই কমল ফোটে, যখন ঘুমে থাকি তখনই পাশে এসে বস। এমনিতে কত রাত নিদ্রাহারা কাটে কিন্তু যখনই তোমার আসার লগ্নটি লেখা হয় তখনই ঘুমিয়ে পড়ি। ঘুমের অতল অন্ধকারেই তোমার গভীর রাগিণীটি বাজিয়ে যাও, তোমার মালার স্পর্শটি আর বুকে লাগে না। যখন জাগি, উঠে দেখি তুমি নেই। তোমার চলে-যাওয়ার গন্ধে অন্ধকার ভরে রয়েছে। তোমার সেই চলে যাওয়ার গন্ধটিই আমার জীবনে ভরে ওঠার গন্ধ হয়ে উঠুক। নিজের কথা এবার বন্ধ করি। এবার তোমরা তোমাদের কথা বলো। তোমাদের কাহিনী শোনাও। আমি জানি, আমি চুপ করলেই তোমরা কথা কয়ে উঠবে। আমার স্তব্ধতায় শোনা যাবে তোমাদের মর্মের কাকলী।

শঙ্খের মাঝে শুনব সমুদ্রের গান।
পাখির কণ্ঠে প্রভাতের সূর্যোদয়।
শিশিরের চিহ্নে আকাশের চরণপাত।

জেগেছে নূতন প্রাণ বেজেছে নূতন গান
ওই দেখ পোহায়েছে রাতি।
আমারে বুকেতে নেরে কাছে আয়,
আমি যে রে
নিখিলের খেলাবার সাথী॥

কর্ণাটের রাজধানী কারোয়ারে এসেছে রবীন্দ্রনাথ, আবার মেজদাদার কাছে, নতুন কর্মস্থলে। সেখানে একুশ-বাইশ বছর বয়স, রবীন্দ্রনাথ নাটক লিখল, প্রকৃতির প্রতিশোধ। সেই নাটকের যে শেষ কথা তাই বুঝি রবীন্দ্রনাথের মূল কথা। মর্ম কথা।

বিশুদ্ধ অনন্ত বলে কিছু নেই। অনন্ত অন্তরের জিনিস হয়েও আন্তর জিনিস। সে নয় বস্তু নিরপেক্ষ, সে নয় বিশেষবিহীন। রূপের মধ্যেই সে অপরূপ, সীমার মধ্যেই সে সুষমান্বিত। শূন্যতার গুহার মধ্যে সে নেই সে আছে পূর্ণতার গৃহের মধ্যে। গুহার সঙ্গে গৃহকে মেলাও। সন্ন্যাসীর সঙ্গে সৈনিককে। সীমার সঙ্গে অসীমের গাঁটছড়া বাঁধো। অসীম ছাড়া সীমা তুচ্ছ, সীমা ছাড়া অসীম নিঃসঙ্গ। অসীমের অঙ্গনে সীমার বেড়া লাগাও। সীমার বৃন্তে ফুটিয়ে তোলো অসীমের শতদল। হে সুন্দর তুমি এত মধুর কেন? 'সীমার মাঝে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর।' অক্ষর তো সীমা, কাব্যটিই অসীম।

তবে থাক, তবে তুই কাছে আয় মোর
দেখি তোর অতি মৃদু স্পর্শ সুকোমল।
আহা, তোর স্পর্শ মোর ধ্যানের মতন
সীমা হতে নিয়ে যায় অসীমের দ্বারে।

নিয়মের মধ্যে অসীমকে না পাই, হৃদয়ের মধ্যে অসীম অপ্রতিহত। এই নিয়মকেই বা মুক্তিরূপে আস্বাদ করতে পারব না কেন? নিয়ম যখন নিয়ত হবে অর্থাৎ যখন তাকে আপনার করে নিতে পারব, আত্মসাৎ করে নিতে পারব, তখনই সে-নিয়ম মুক্তিতে ফুটে উঠবে, বৈরাগ্য ফুটে উঠবে নিবিড় নিঃসীম অনুরাগে।

সেই প্রথম রবীন্দ্রনাথের সূক্ত তৈরি হল, বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি সে আমার নয়। বন্ধনকে পরিহার করে নয়, বন্ধনকে অবন্ধনরূপে পরিণত করে। কর্মকে পরিহার করে নয় কর্মকে বিরামরূপে পরিণত করে। বিষয়কে পরিহার করে নয় বিষয়ের মধ্যে বিষয়াতীতকে দেখে। যতক্ষণ আসক্ত ততক্ষণই আবন্ধ, যখনই সঙ্গোত্তীর্ণ তখনই মুক্তি।

'অসীম সে চাহে সীমার নিবিড় সঙ্গ, সীমা হতে চায় অসীমের মাঝে হারা।'

মরি লো মরি, আমায় বাঁশিতে ডেকেছে, কে। ভেবেছিলাম ঘরেই থাকব, যাব না কোথাও বাইরে। কিন্তু বাঁশি যখন বেজে উঠল বলো তখন কী করি! তখন কি করে থাকতে পারি আর বন্ধ-ঘরের বাসিন্দে হয়ে! যদি তোরা কেউ পথ জানিস তো বলে দে আমাকে। আমি গিয়ে তার মুখের হাসি দেখে আসি, ফুলের মালা দিয়ে আসি তার গলায় দুলিয়ে। আর কানে-কানে বলে আসি একটি কথা। গোপন কথা, গভীর কথা। সে কথাটি আর কিছুই নয়, তোমার বাঁশি বেজেছে আমার প্রাণের কুহরে, আমার রক্তের প্রবাহচ্ছন্দে। আমি জেগেছি, আমি এসেছি।

বালিকাকে বলছে সন্ন্যাসী, 'আয়, এই অন্ধকার বন্ধ গুহা থেকে বেরিয়ে পড়ি। বসি গিয়ে চাঁদের আলোতে। কী শান্তি সুধা, কী গম্ভীর বিরাম এই প্রকৃতির নিকেতনে। প্রার্থনার মত দাঁড়িয়ে রয়েছে গাছগুলি, পল্লবে মর্মর উঠেছে, বিকীর্ণ করেছে পুষ্পগন্ধ। অনন্তের পারাবারে মেঘময় মায়াদ্বীপগুলি কি সুন্দর! আয় কাছে আয় তোর মুখখানি দেখি। তুই কি দুদণ্ডের ভ্রম? তোর এই সরলতায় লেখা মুখখানি, এ কি মিথ্যে? তোর চোখে আকাশের আলো, স্পর্শে ফুলবাস, ছন্দে স্নিগ্ধ সমীর, তুই কি অনন্তের স্বাক্ষর নিয়ে আসিসনি?

কিন্তু না, এত সহজে হার মানলে চলবে না। মায়াবিনী মরীচিকা, সরে দাঁড়া। এত দিনের দৃঢ় ধ্যান, দগ্ধ জ্ঞান, দীপ্ত, আশা—সব কি নিষ্ফল হবে? ব্যোমবিহারী পাখির মত উড়ে যাব, সাধ্য কি বিদ্ধ করে আমাকে মাটির ব্যাধশর?

'দেখ, দেখ, লতাটিতে কেমন কুঁড়ি ধরেছে।' প্রফুল্ল চোখে বললে সে বালিকা। 'প্রতীক্ষা করছে প্রভাতের। প্রভাতের আলোটি পেলেই ফুটে উঠবে—'

ফুলন্ত লতা ছিঁড়ে ফেলল সন্ন্যাসী। সব মায়া, আলেয়া, মহাকায় জটিলতা। আমার এই আত্মকেন্দ্রিত গুহাবাসই ভালো।

কিন্তু গুহা যে শুধু নৈষ্ফল্যের হাহাকার দিয়ে তৈরি।

সে নির্বাসন থেকে বেরিয়ে এল সন্ন্যাসী। দণ্ড-কমণ্ডলু দূর করে দিল। হে বিশ্ব, মহাতরী, তোমার কোটি-কোটি যাত্রীর মত আমাকেও আশ্রয় দাও, আমাকেও নিয়ে চলো ওদের সঙ্গে। পাখি যখন ওড়ে, ভাবে পৃথিবী ত্যাগ করে এলাম, আরো ওড়ে,

আরো উপরে ওঠে, অথচ কিছুতেই ছাড়তে পারে না পৃথিবী। আবার শ্রান্ত ডানায় ফিরে আসে কুলায়ে। তেমনি যতই নিজেকে মাজা-ঘষা করি, মানুষ হওয়াকে অতিক্রম করব কি করে? গৃহ ছাড়তে পারি কিন্তু দেহ-গেহ ছাড়ব কোথায়? মানুষকে বিলুপ্ত করেই যদি মানুষের মুক্তি তবে মানুষ হতে গেলুম কেন? চিনি খেতেই আমার সুখ, চিনি হয়ে নয়। সুতরাং যে ভূমা খুঁজছি, সে মানবিক ভূমা। ঈশ্বরের যে রোমাঞ্চ খুঁজছি, সেই যে পরশাতীতের হরষ, সে এই নরদেহেই। আমি কি আর ঈশ্বর বলে প্রকাশিত হতে পারব, আমি মানুষ বলে প্রমাণিত হই!

সন্ন্যাসী বেরিয়ে এল লোকালয়ে। আহা, সীমাসুন্দরেরই বা কি সীমা আছে?

ওই ধান কাটে ওই করিষে কর্ষণ
ওই গাভী নিয়ে মাঠে চলেছে গাহিয়া।
ওই যে পূজার তরে তুলিতেছে ফুল
ওই নৌকা লয়ে যাত্রী করিতেছে পার।
কেহ বা করিছে স্নান কেহ তুলে জল
ছেলেরা ধূলায় বসে খেলা করিতেছে—

রবীন্দ্রনাথের কাব্য-রচনার এই একটি-মাত্রই পালা। পালার নাম, সীমা-অসীমের শুভ-মিলন। সীমা বধূ, অসীম বর। কন্যার গৃহেই বিবাহ। সীমার ঘরেই প্রথম শুভদৃষ্টি। পরে অসীমের অনুগমন।

হে অরূপরতন, হে অমিয়রতন, তোমাকে আশা করে আমি ডুবেছি রূপ-সাগরে। আমি আর এই ভাঙা তরী নিয়ে ঘুরতে পারি না ঘাটে-ঘাটে। অনেক দুলেছি অনেক ভুলেছি, ঢেউয়ে-ঢেউয়ে অনেক পড়েছি-উঠেছি। আর নয়। এবার ঠিক করেছি ডুবব, তলিয়ে যাব, মিলিয়ে যাব। তোমার রূপের সমুদ্র তো সুধার সমুদ্র। মরেও কারু মরণ নেই। এক রূপ থেকে আরেক রূপে নবায়িত হব। সেই নবীন হওয়াই তো অমর হওয়া।

এমন গান আছে, যা কানে শোনা যায় না, প্রাণে শোনা যায়। কানের গান থামে, প্রাণের গান অবিচ্ছিন্ন। সেই প্রাণের গান বাজছে যেখানে সেটা অতলের সভা, নিস্তব্ধের সভা। সেই সভায় আমি নিয়ে যাব আমার প্রাণের বীণা। নীরব কান্না দিয়ে সে প্রাণের বীণা তৈরি করেছি। সেই কান্নাই তার চিরজীবনের সুর। কিছুই বলতে পারিনি, কিছুই চাইতে পারিনি, এই তো তার কান্না। হে মহামৌনী, আর কী দিতে পারি তোমাকে? এই নীরব বীণাটিই রাখব তোমার পদপ্রান্তে।

অসীমের আনন্দটি বুঝি কি করে? সীমায়িত নদীরেখায়। গুচ্ছীকৃত কদম্ব-পুঞ্জে। সুহাসিনী শশাঙ্ককলায়। অসীমের মমতাটি বুঝি কি করে। নব-ঘনশ্যাম দূর্বাদলে। তিমিরমেদুর বন বীথিতে। শালমঞ্জরীর সৌরভ।

অরূপ, তোমার বাণীই জ্বলছে তোমার দীপসভায়। আমিও সে সভার এক মৃৎপ্রদীপ, তুমি তাতে তোমার শিখা সঞ্চার করো। সেই দীপ্তিময়ী শিখা যা মৃত্যুর যবনিকা ভেদ করেও জ্বলে অনির্বাণ। সেই শিখাই তোমার ইচ্ছা। তোমার ইচ্ছার বহ্নিতে আমাকে জ্যোতিষ্মান করো। আমিও তোমার ইচ্ছার প্রজ্বলন্ত বাহক হই। তোমার বসন্ত-বায়ু যেমন পুষ্পে-পর্ণে বিচিত্র বর্ণে তোমার গীতলেখা লিখে যায়, তেমনি আমার জীবনেও তোমার স্বাক্ষরমালা ফুটে উঠুক। আমার প্রাণের কেন্দ্রকুহরে তোমার নিশ্বাস পুরে দাও, তোমার গুঞ্জনে গুঞ্জরিত হই।

অসীম ধন থেকেও তো তোমার সাধ মেটে না, আবার আমার কাছে এসে হাত পাতো। আমার কাছ থেকে তুমি কণা কণা করে নেবে, অমার দিন-রাত্রির কণা কণা। আমার মুহূর্ত-প্রজাপতির মৃদু মৃদু কম্পনে। একটু একটু করে খুঁটে-খুঁটে না নিলে যেন তোমার সুখ নেই। ছুটিয়ে টেনে নিয়ে যাবে, তা নয়; তোমার রথ-অশ্ব ছেড়ে আমার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে যেতে চাও। সমস্ত পথটিই তোমার আমার সঙ্গে উপভোগ করা চাই। প্রত্যেকটি কাঁটা, প্রত্যেকটি ধূলি।

জানিলাম এ জগৎ
স্বপ্ন নয়।
রক্তের অক্ষরে দেখিলাম
আপনার রূপ—

কত যুগ-যুগান্তরের পুণ্যে মাটির মানুষ হয়ে জন্মেছি। এই মাটির খেলাঘরে। এই দেহে এত সুধা ছিল বলেই তো বসুধা। সীমার মহিমা দেখা তো আমার আসা, ঠিকানাহীন সীমানা রচনা করব বলে। ফাঁ[illegible] ফানুস যে আমি হইনি, মহা-অব[illegible] বর্ণে ও বাক্যে আমি প্রকাশিত [illegible] এই তো আমি অর্থায়িত করেছি [illegible] এই তো ভারতবর্ষের সাধনা। স্বর্গের প্রতিষ্ঠা। মানবদেহে [illegible] প্রস্ফুরণ।

ধূলির আসনে বসে [illegible] দেখেছি সেই ভূমাকে। রূপের [illegible] করেছি অরূপের মধুপান। অন্তরে শুনেছি সেই অনন্ত [illegible] বাণী। অন্ধকার প্রান্তর শূন্যম[illegible] সেইখানেই অভ্রান্ত জ্যোতির পথ [illegible] আমি কি বিধাতার বৃহৎ প[illegible] আমার সমস্ত ঐশ্বর্যের পরিণ[illegible] কঙ্কাল-কলঙ্ক?

নয়, নয়। আমি অরূপের রূ[illegible] আমি সেই সর্বপ্রকাশকের প্র[illegible] আমি সোঽহং। আমি অপরিমা[illegible] আমি অপরিমাণ প্রেম।

অব্যক্ত থেকে প্রাণ। প্রাণ থে[illegible] মন থেকে বাক্য।

প্রাণের সমারোহ। মনের [illegible] লীলা। বাক্যের দীপালি উৎসব [illegible]

রুক্ষতা-রিক্ততার বিরুদ্ধে [illegible] প্রতিশোধ। হে জটাবল্কলধারী, আমি তোমার ছলনা, নিত্য তুমি চাও সুন্দরের হাতে, পরমপ্রেমীর বসন্তের বন্যাস্রোতেই তোমার স[illegible] অবসান।

শিলাইদহ থেকে চিঠি [illegible] রবীন্দ্রনাথঃ 'পৃথিবী যে সৃষ্টি[illegible] একটা ফাঁকি এবং শয়তানের একট[illegible] তা না মনে করে একে বিশ্বা[illegible] ভালোবেসে, ভালোবাসা পেয়ে, ম[illegible] মতো বেঁচে এবং মানুষের মত[illegible] গেলেই যথেষ্ট—দেবতার মতো হয়ে যাবার চেষ্টা করা আমার কাজ[illegible]

এত দীপ তোমার আকাশে। দেখ আমিও আকাশপ্রদীপ। মাটির প্রদীপ্ত প্রণতি। (

সেকালের এক বাস্তব ঘটনা

সরলাবালা সরকার

অনেক দিন আগের কথা। বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা বিবাহকে আইনত বৈধ বিবাহ করিলেন কাহিনীটি সেই সময়ের।

দেশে তখন হুলস্থুলে পড়িয়া গিয়াছিল। একদিকে দেশব্যাপী শত্রুর দল, আবার অন্যদিকে গুণমুগ্ধ ভক্তের দল। বিধবা বিবাহ লইয়া কত গান বাঁধা হইয়াছিল। শান্তিপুরের তাঁতিরা সেদিন "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর চিরজীবী হয়ে" পাড়ের কাপড় বুনিয়াছিল।

বাংলা দেশের বিধবা, এখনকার দিনে আর তখনকার দিনে অনেক তফাৎ। তখনকার বালবিধবা চার পাঁচ বছরের থেকে ষোড়শী, সপ্তদশী। তখনকার সংস্কার এতই প্রবল ছিল যে, একাদশীর দিনে বালিকা বিধবা জল-পিপাসায় মারা গেলেও স্নেহময়ী জননীও তার মুখে জলবিন্দু দিতে সাহস করিতেন না।

আরও বিশেষ করিয়া এই সংস্কার বদ্ধমূল ছিল উত্তরবঙ্গে বরেন্দ্রভূমে। নাটোরের মহারাণী প্রাতঃস্মরণীয়া শরৎসুন্দরী দেবী,—তিনি বারো বৎসর বয়সে বিধবা হন। তাঁহার বৈধব্য পালনের কঠোরতার তুলনা নাই। একাহার, ভূমিশয্যা বা কম্বলাশন, সকল রকম আরামের উপাদান বর্জন ইহাই ছিল অতুল ঐশ্বর্যশালিনী বালিকা রাণীর জীবনযাপনের আদর্শ, আর সেই আদর্শ মানিয়া লইয়াছিল সমস্ত উত্তরবঙ্গ।

একবার কোনও বিদেশিনী মহিলা বালিকা রাণীকে বলিয়াছিলেন, 'মহারাণী, আপনার ন্যায় বালিকা বিধবার আবার বিবাহ হওয়াই উচিত।" এই পাপ কথা কানে যাওয়ার প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ রাণী শরৎসুন্দরী ত্রিরাত্রি নির্জলা উপবাস করেন।

অন কোন সময়ে চারি সপ্তাহ লঙ্ঘনজ্বরে যখন তিনি পীড়িতা ও মরণাপন্না, তখন একাদশীর দিনে কয়েকজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত রাজবাড়ির কর্মচারিগণের অনুরোধে "আতুরে নিয়মো নাস্তি"—অর্থাৎ এরূপ অবস্থায় একাদশী তিথিতে ডাবের জল বা গঙ্গাজল গ্রহণ করিলে পীড়িতা বিধবার পাপ হইবে না, এইরূপ ব্যবস্থা দেন। রাণী অবশ্য সে ব্যবস্থা গ্রহণীয় মনে করেন নাই এবং সুস্থ হইবার পর সেইসব পণ্ডিতের রাজবাড়িতে প্রবেশ নিষেধ করিয়াছিলেন।

ইহার ফলে রাজসাহী ও নাটোরে কত মুমূর্ষু বৃদ্ধা বিধবা একাদশীর দিন মৃত্যুকালেও শুষ্ককণ্ঠে শীতল বারির স্পর্শ লাভে বঞ্চিত হইয়াছেন। কত শিশু বিধবা,—যাহারা বিবাহ কাহাকে বলে তাহাই জানে না, তাহারাও একাদশী তিথিতে জল পিপাসায় মারা গিয়াছে।

আমার এই কাহিনীটি বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত কুমারখালী নামক স্থানের কাহিনী এবং কাহিনীর পাত্রী পুঁটুরাণী নবম বর্ষেই বিধবা হইয়াছিল।

আড়াই বৎসর বয়সেই পুঁটুরাণীর মা মারা যায়। পুঁটুরাণী ছিল মায়ের অতি আদরের মেয়ে; কি দিনে, কি রাত্রে সে মা ছাড়া এক মিনিটও থাকিতে পারিত না।

মা যখন রান্নাঘরে রান্না করিত, পুঁটুরাণীকে একটি ছোট পিঁড়িতে বসাইয়া রাখিত। রথের মেলায় পুঁটুরাণীর মা তাহার জন্য মাটির হাঁড়ি, কলসী প্রভৃতি যে সকল খেলনা কিনিয়া আনিয়াছিল, সেইগুলি লইয়া মায়ের অনুকরণে সে 'রান্না-বান্না' খেলা করিত।

যে মা ছাড়া পুঁটুরাণী এক দণ্ডও থাকিতে পারিত না, স্নানের সময় পকুরঘাটের সিঁড়িতে বসিয়া পাহারা দিত—কতক্ষণে মা'র স্নান শেষ হইবে, সেই জন্য—সেই মা একদিন হঠাৎ কোথায় যে চলিয়া গেল, আর আসিল না।

• পুঁটুরাণী মায়েরও কথা কাহাকে জিজ্ঞাসা করিত না, সমস্তদিন কেবল ঘরে ঘরে মাকে খুঁজিয়া বেড়াইত। বিছানার স্তূপ সরাইয়া দেখিত তাহার ভিতর কেহ লুকাইয়া আছে কি না। রান্নাঘরের এক কোণে ছিকায় মুড়কি-মোয়া ও ক্ষীরের নাড়ুর হাঁড়ি ঝুলিত, পুঁটু সেই ঝুলন্ত হাঁড়ির পিছনে বার বার উঁকি দিয়া দেখিত, যদি একখানি হাসি মুখ হঠাৎ তাহার আড়াল হইতে বাহির হইয়া তাহাকে "পুঁটুরে, পোঁটন ধনরে" বলিয়া ডাকে। মার সঙ্গে তাহার এইভাবে লুকোচুরি খেলাও হইত। ঘাটের সিঁড়িতে সিঁড়িতে শ্যাওলা আর টোপা-পানার স্তূপ জমিয়া আছে, সেগুলিও সরাইয়া নাড়াইয়া পুঁটু কি যেন খুঁজিত, যদি কেহ জিজ্ঞাসা করিত "ও কি করছিস পুঁটু?" পুঁটু ম্লান মুখে উত্তর দিত "দেখছি ওগুলোর নীচে কি আছে।"

বাড়িতে ছিলেন পুঁটুর বাবা পশুপতি মৈত্রের এক পিসিমা, তিনি সব সময় পুঁটুকে নজরে নজরে রাখিতেন, কে জানে কখন ঘাটে গিয়া মেয়েটা পা পিছলাইয়া জলে ডুবিয়া যায়।

মা যখন চলিয়া গেল, আর আসিল না, তখন পশুপতি মেয়েকে রাত্রে শুইবার সময়ে তাঁহার বিছানায় নিয়া ঘুম পাড়াইতেন। পুঁটু বাবার গলা জড়াইয়া ধরিয়া ঘুমাইত, আবার ঘুমের ঘোরে চমকিয়া চমকিয়া উঠিত, মাঝে মাঝে বিছানায় হাত বুলাইয়া দেখিত বিছানায় আর কেহ চুপি চুপি আসিয়া শুইয়াছে কি না।

কিন্তু সে বিছানাতেও বেশিদিন তাহার স্থান হইল না। তাহার বাবা

একদিন কোথা হইতে এক ঘোমটা দেওয়া বউ নিয়া আসিল, আর পাড়ার সকলে আসিয়া তাহাদের বাড়ি জড় হইল, তাহারা উলু দিল, শাঁখ বাজাইল, আবার পুঁটুকে বলিল, "এই দ্যাখ্ তোর নতুন মা।" কেউ কেউ বলিল, "তোর সেই মাই আবার সগ্‌গো থেকে ফিরে এসেছে।"

পুঁটুর মা! ওই ন্যাকি পুঁটুর মা? পুঁটু বড় শান্ত মেয়ে, তাই কাঠ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল—অন্য কেহ মেয়ে হইলে কি যে করিত—অর্থাৎ পুঁটুরই মনে হইতেছিল কি যে করিবে—যাক্ সে কথা, সেইদিন রাত্রে পুঁটু আর তাহার বাবার বিছানায় ঘুমাইতে পাইল না, বুড়ি ঠাকুরমা তাহাকে ধরিয়া লইয়া গেল নিজের বিছানায়।

পুঁটুর যে দুঃখ, সে দুঃখ পুঁটু ছাড়া আর কে বুঝিবে। তাহার চোখে জল আসিলে দুই হাত দিয়া সে চোখ ঢাকিত, চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে মুখময় কাজল লাগিয়া যাইত, আর তাহার সেই নতুন মা—সে বলিত "দ্যাখ্ দ্যাখ্ মেয়েটা যেন একটা ভূত।" নতুন মা নাকি কনে-বৌ, তবু তার দাপটে বাড়ির সবাই অস্থির, ঠাকুরমা তাহাকে ভয় করিতেন,—পুঁটুরাণীর বাবা,—হ্যাঁ তিনিও ভয় করিতেন, তাইতো আজকাল তিনি আর পুঁটুকে কাছে ডাকেন না, "পুঁটু আমার সোনার মেয়ে, রাজপুত্তুর এনে আমি দেবো পুঁটুর বিয়ে" এই সব শোলোক বলে আদরও করেন না।

পুঁটু শুনিয়াছে, তার বাবাই নাকি নতুন মাকে বিবাহ করিয়া আনিয়াছেন 'শালঘর মধুয়া' থেকে। সকলে সে গ্রামকে বলে "শাল্‌খা মোদো।" সেখানে নাকি কোন সাহেবের মস্ত কুঠীঘর আছে।

নতুন মার নাম মালতী, সে নাকি আগে কুমারখালি মেয়ে ইস্কুলে পড়িত। এ-বাড়ি ও-বাড়ির মেয়েরা গল্প করে, পুঁটু কিছু কিছু বুঝিতে পারে, সে এখন তো বড় হইয়াছে। বাবা তাকে আদর করেন না, কিন্তু নতুন মাকে একদিন আদর করিয়া শোলোক বলিতেছিলেন, "মালতী মালতী মালতী ফুল, মজালে মজালে মজালে কুল।" শোলোকটা বেশ শুনতে, তাই পুঁটু ভুলিয়া যায়নি।

বাস্তবিক, নতুন বৌ মালতী খুব চালাক-চতুর মেয়েই ছিল। তখনকার দিনের কনের চেয়ে তার বয়সও ছিল বেশী। কেননা বিধবা মায়ের মেয়ে, মায়ের অবস্থাও ভাল ছিল না, অনেক জোগাড়-যন্ত্র করে তিনি এই বিয়েটি ঠিক করেছিলেন, তাঁর এক পিসতুতো ভাই ছিল পেস্কার, সেই সম্বন্ধটি ঠিক করে দেয়। একটা সতীন-কাটা আছে তা তাকে বিয়ে দিয়ে বিদায় করে মালতীই হবে বাড়ির সর্বেসর্বা।

ছাদনাতলায় স্ত্রী-আচারের পাড়ার এয়োরো বরকে নাস্তানাবুদ ছাড়িয়াছিল। কেহ-বা একগাছি হাতে নিয়া বরকে জিজ্ঞাসা করিয় "কও দিনি বর, এডারে কি কয়?" উত্তর দিয়াছিল "সুতা।" অমনি চা হইতে কলরব উঠিল "সুতা নয়, নয় হে—কও সুতে।" বশম্বদ বর "সুতে," আর চারিধার হইতে নানা কণ্ঠে ধ্বনি উঠিল, "মালতী তোমার পোতে।" বর একবার নিজের পৈত হাত দিয়া দেখিল, পৈতাটি যথাস্থ আছে কি না।

আবার একখানি সুপারি-কাটা লইয়া একজন প্রশ্ন করিলেন, "ওহে কওতো এডা কি বস্তু?" বর ব "ও তো জাঁতি।" অমনি চারিধারে ধ্বনি উঠিল, "বর তো দেখি কল্‌ক মানুষ। জাঁতি আবার কারে কয়, এ সরতা। কও "সরতা"। বর শব্দ উচ্চারণ করিবামাত্র চারিধারে উঠিল, "মালতী তোমার ঘরের মালতী তোমার ঘরের কত্তা।"

বস্তুত বিয়ের পর অষ্টমঙ্গলা য না যাইতেই প্রকৃতপক্ষে মালতীই ঘরের কত্তা। যিনি এতদিন কত্তা ছি তিনিও স্ত্রীকে প্রতিপদে ভয় ক চলেন, আর বৃদ্ধা পিসির তো কথাই সে বেচারীকে আজকাল হবিষ্য-বাহিরে দেখাই যায় না।

পুঁটু তাই একেবারে নির কখনও বা ঠাকুরমা তাহার হাতে চুপি একটা মোয়া দেন, আর বলেন "কাঁ তলায় গিয়া খাইয়া আয়।,'

পুঁটুরাণীর ক্রমশ পর পর বোন একটি ভাই হইয়াছে। তা আর খেলা করিবার সময় পায় না। সাত বছরের বুড়া মেয়ে, ভাই-বো দেখাশুনা করিবে, না দিনরাত খেলা খেলা—" নতুন-মা পুঁটুকে দি বকুনি দেয়। পুঁটুর সেই রথে খেলনাগুলির একটিও আর আস্ত কোনটি বোন দখল করিয়া নিয়াছে, কে বা ভাই ভাঙিয়া ফেলিয়াছে।

ইহাই পুঁটুর বাল্য-জীবনের ইতিহাস। তাহার পর নয় বৎসর বয়সে বিবাহ ও তাহার দুই মাস পরেই ঘটিল বৈধব্য। যদিও পুঁটু বিবাহ কি আর বৈধব্যই বা কি কিছুই জানে না।

ইতিমধ্যে বাড়িতে আর একটি চোদ্দ পনেরো বছরের ছেলে আসিয়াছে, সে নতুন মার নাকি ভাই হয়।

ছেলেটির নাম হরিপদ। তাহার বাপ-মা নাই। তাহার বাবা পুঁটুর নতুন মার সম্পর্কে কাকা হইতেন; বাবা মারা যাইবার পর ছেলেটিকে খাইতে পরিতে দিবার কেহই নাই। স্কুলে পড়িত, কিন্তু এখন পড়া তো দূরের কথা, খাইতে দিবারই লোক নাই।

তাই মালতী এবার বাপের বাড়ি গিয়া তাহাকে লইয়া আসিয়াছে। পশুপতি তো নাকে-মুখে ভাত গুঁজিয়া রওনা হইয়া যান কুষ্ঠিয়ায়, বাড়িতে বাজার হাটই বা কে করে, আর ফাই-ফরমাসই বা খাটে কে?

আজকাল কাঠ-কাটা আর জল-তোলা ঐ ছেলেটাই সব করে। বাসনমাজার কাজও মাঝে মাঝে তাহাকে করিতে হয় বৈকি। তাছাড়া গরুর রাখালটাকেও ছাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাড়াগাঁয়ের ছেলে এসব কাজ তার সবই জানা আছে।

ইহার মধ্যেও সে প্রতিদিনই বই লইয়া বসে। পুঁটুর ভাল নাম সুশীলা। সে পুঁটুকে ডাকিয়া অক্ষর চেনায়, বলে, 'সুশীলা, এস একটু পড়া-শুনা কর।'

এ সব ব্যাপার মালতীর দুই চক্ষের বিষ, কিন্তু তবুও সে কেন যে বাধা দেয় নাই, তাহা সে-ই জানে।

পুঁটুর বাবা পুঁটুকে শ্বশুরবাড়ি পাঠান নাই, শ্বশুরবাড়ি হইতেও অলক্ষণা বৌকে নিয়া যাইবার তাগিদ দেখা যায় নাই। আর নতুন মা'রও এখন তাহাকে বিদায় করিবার ততটা উৎসাহ দেখা যায় না, কেননা তেরো বছরে পড়িয়াই এক-বেলা রান্নার ভার পুঁটুর উপরেই তিনি দিয়াছেন। বিধবা মেয়ে রান্নার কাজে থাকিলে মন ভাল থাকিবে। তবে মাছটা আলাদা ঘরে তিনিই রান্না করেন, কেননা ব্রাহ্মণ পাড়ায় বাড়ি, আর কুমারখালির ব্রাহ্মণপাড়া, ভাদুড়ি, লাহিড়ি, মজুমদার, আশপাশেই সাত আট ঘর, বিধবাকে মাছের পাকে পাঠানো শুনিলে আর কি রক্ষা থাকিবে?

কিন্তু এত পাহারার মধ্যেও পুঁটু-রাণীর বাবা একাদশীর দিন ছুতো করিয়া আফিস কামাই করিতেন। কোন এক ছুতায় তিনি মেয়েকেও সুযোগ বুঝিয়া নিজের ঘরে ডাকিয়া লইতেন, তখন মালতী হয়তো দিবানিদ্রায় মগ্ন থাকিত অথবা প্রতিবেশীর বাড়ি গ্রাবু খেলার আসরে যোগ দিতে যাইত। ছেলেমেয়ের জন্য তো ভাবনা নাই, পুঁটু আছে, বিশেষ করিয়া একাদশীর দিন তাহার খাওয়া-দাওয়ার কোন হাঙ্গামা নাই।

এইভাবেই দিন চলিতেছিল, কিন্তু মালতীর মনে যেন একটা কাঁটা খচ্ খচ্ করিয়া উঠিত মাঝে মাঝে। যখন পল্লী-বাসিনীগণ তাহারই বাড়িতে তাসের আসর বসাইত, সেদিন তামাক পাতার গুঁড়া ও পান সরবরাহের জন্য পুঁটুরাণীকেও এক একবার সে ঘরে আসতে হইত। হয়তো সে সময় কোন দরদী পিসিমা অথবা কাকিমা তাহার দিকে চাহিয়া যদি বলিতেন, "আহা মেয়ে তো নয়, যেন রূপের ডালি, পোড়া বিধেতা এরই কিনা কপাল পোড়ালেন!" অথবা হয়তো কেহ বলিতেন, "এমন শান্ত আর কাজের মেয়ে, সে কিনা পেলে না ঘর-সংসার!" তখন মালতীর মনটায় যেন কে খোঁচা দিয়াছে এমনি তাহার যন্ত্রণা হইত।,

মালতীর নিজের মেয়ে সুন্দরী নয়, আর সতীনের মেয়ে দিনে দিনে যেন আরও বেশী সুন্দর হইতেছে! বিনা আভরণে অপরূপ রূপসী। লোকে বলে, পুঁটু যেন তার মায়ের ছবিখানি। মালতী

ভাবে, "হায়রে, মরা সতীন মরেও মরলো না, হাড় জ্বালাবার জন্যে রেখে গেল ঐ রাক্ষুসীকে। ওকে দেখলেই তো ওর বাপের মনে পড়ে যাবে ওর মরা মায়ের মুখ।"

মালতীর দুঃখের কি শেষ আছে? ভগবানও যেন তার সঙ্গে বাদে লেগেছেন। ঐ ছোঁড়াটা,—পুঁটুর উপরই ওর যত দরদ। তা না হলে যার খায়, যার পরে তার মেয়েকে ভাল করে না পড়িয়ে সব্বনাশী পুঁটুকেই কেন অত যত্ন করে পড়ায়! না হলে অমনিই কি পুঁটু মাসে একখানা করে বই শেষ করে ফেলছে, আর তার মেয়ের পড়া এগোয় না! আবার সোহাগী মেয়ের জন্য বাপের সোহাগ কত, মাসে মাসে নতুন নতুন বই আসছে, খাতা আসছে লেখার জন্যে। আবার বলেন, 'ঐ নিয়ে যদি ভুলে থাকে তো থাকুক না! আহা, দরদের বালাই নিয়ে মরতে হয়।'

মালতীর মনে হইত সে যেন নিজের পায়ে নিজেই কুড়ুল মারিয়াছে। দরকার কি ছিল এই লেখাপড়ার বায়নায়। তাহার মেয়ে তাহার ছেলে না হয় মুর্খ হইয়াই থাকিত, না হয় তাদের পাঠশালায় পাঠাইয়া দিত—সেখানে যা হয় হইত।

এত বড় ছেলে আর ঐ মেয়ে একত্র পড়াশোনা করে, এটাই কি ভাল? যদিও সব সময়ই তার 'কুকি'ও ঘরে থাকে, তবু সে তো নেহাৎ পোলাপান, সে আর কি বুঝবে।

মালতী বুদ্ধিমতী, মনে মনে একটি উপায় স্থির করিল। তাড়াইতে হইবে। একেবারে দুজনকেই বাড়ি হইতে তাড়াইতে হইবে। না হয় মালতী রাঁধিবার জন্য তাহার জ্ঞাতি জা হেমের মাকেই রাখিবে, ভাত ছড়াইলে কাকের অভাব কি?

রবিবার, সন্ধ্যাবেলা। পশুপতি উপরের ঘরে বসিয়া নথিপত্র খুলিয়া বসিয়াছেন। সোমবারে কোর্টে তাঁহার অনেকগুলি মামলা আছে। পুঁটুরাণী রান্নাঘরের কাজ সারিয়া পড়ার ঘরের দুয়ারে দাঁড়াইয়া হরিপদকে বলিতেছে, "আমারে এই অঙ্কটা বুঝাইয়া দিবেন? বুঝতে পারছি না।"

হরিপদ এবার পরীক্ষা দিবার জন্য তৈরী হইতেছে, তাই তাহার অন্য কোন দিকে মন নাই। ঘরে খুকি সুধারাণী বসিয়াছিল, তাহার হাতে দ্বিতীয়ভাগ। মালতী তাহাকে ডাকিল, "সুধা আয়, মোয়া বানাইছি—খাইয়ে যা।"

সুধা ডাক শুনিয়া দৌড়িয়া বাহির হইয়া গেল।

হঠাৎ কি যে ঘটিল, পুঁটু কিছুই বুঝিতে পারিল না। তাহার পিঠের উপর আচমকা ধাক্কায় সে ঘরের ভিতর উপুড় হইয়া পড়িয়া গেল, সঙ্গে সঙ্গে পড়ার ঘরের দরজায় বাহির হইতে শিকল পড়িল, আর সেই সঙ্গে মালতীর উচ্চ চিৎকার শোনা গেল, "ও দিদি, ও হারুর মা, বলাইয়ের পিসি, আসেন আপনারা আইস্যা নিজের চইক্ষে দ্যাখেন। দ্যাখেন আইস্যা, বাপ-সোয়াগী মেয়ের কীর্ত্তি।"

আশপাশের বাড়ির লোকেরা ছুটিয়া আসিয়া দৃশ্যটি দেখিল বই কি! দেখিল, পুঁটুরাণী উবুড় হইয়া পড়িয়া আছে, আর হরিপদ তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া উঠাইবার চেষ্টা করিতেছে।

সে রাত্রির ঘটনা যেন এক অঘটন ব্যাপার। পশুপতি বাহির হইতে পারেন না, দেখেন তাঁহার ঘরের দরজা বাহির হইতে শিকল বন্ধ। জানালায় গরাদ না থাকিলে তিনি জানালা দিয়া লাফাইয়া পড়িতেন।

লোকজনের ভিড়, হৈ হৈ শব্দ যখন থামিল, পশুপতি তখন দুয়ার খোলা পাইয়া বাহিরে আসিতে পারিলেন। এতক্ষণ তিনি অনবরত দরজায় লাথি মারিয়া মারিয়া দরজা প্রায় ভাঙিয়া ফেলিয়াছেন।

ব্যাপার কি প্রথমটা কিছুই বুঝিতে পারেন নাই, পরে অবশ্য বুঝিলেন টুকরা টুকরা কথা শুনিয়া। "চুলের মুঠা ধরিয়া পিছা মারিয়া খেদাইয়া দিছে" "খাল কাইট্যা কুমীর আনছিল" "ধম্মের সংসারে অধম্ম" "এক্কেরে রওনা কইর‍্যা দিছে বৌঠন" প্রভৃতি শুনিতে শুনিতে যতটা বুঝিলেন তাহাতে বিলম্ব না স্টেসনের অভিমুখে ধাবিত হইলেন

শীতের রাত্রি, দারুণ ত ছুটিতে ছুটিতে কতবার হোঁচট খা স্টেসনে গিয়া দেখিলেন দেরি গিয়াছে, ট্রেন এই মাত্র চলিয়া গিয়া

স্টেসন মাস্টারের কাছে খবর প একটি মেয়ে ও একটি ১৮।১৯ ছেলেকে টিকিট করিয়া গাড়ীতে দেওয়া হইয়াছে। মেয়েটি কাঁদিে বোধ হয় শ্বশুরবাড়ি যাইতেছে।

পশুপতি মৈত্র উকীল ব্যাপারটি বুঝিতে তাঁহার দেরী হই তিনি তৎক্ষণাৎ পরের স্টেসনে টে করিয়া দিলেন, "একটি ছেলে ও যাইতেছে, থার্ড ক্লাসের টিকিট, তা নামাইয়া রাখুন।"

পরদিন সকাল বেলা। বেলা নয়টা। কলিকাতা বিদ্যাসাগর মহ বাস ভবন।

সৌম্যমূর্ত্তি বিদ্যাসাগর মহাশয় আছেন, সম্মুখে ডেস্কের উপর কাগ পশুপতি আসিয়া সেই ঘরে করিলেন। পাগলের মত চেহারা, রক্তবর্ণ, এক হাতে পুঁটুরাণী ও এক হাতে হরিপদের হাত ধরিয়া অ

"আমার মা মরা মেয়ে পুঁট বিধবা মেয়ে" পশুপতি আর বলিতে পারিলেন না, ক্রন্দন বেগে কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

* * *

আট দশ দিন পরে পশুপতি খালিতে ফিরিলেন। এ কয়দিন ঃ কেবল ঘর বাহির করিয়াছে, পাড়া নানা রকম কানাঘুষা করিয়াছে, বে বলিয়াছে 'লোকটা বিবাগী হ'য়ে নাকি?' মক্কেলরা মাথায় হাত বসিয়াছে।

কিন্তু পশুপতি যখন ফি তখন তাঁহার ভাবটা বেশ খুশী হইল। সেদিন অগ্রহায়ণ মাসের সং ইতুপূজা, ঘরে ঘরে শাঁখ বাজিতেছে পড়িতেছে, কিন্তু পশুপতির বাড়িতে বাজে নাই, মালতী তখনও বিছানা উঠে নাই। পশুপতি বাড়ি ঢ মেয়েকে ডাকিয়া বলিল, "কুকিরে, বাড়িতে শাঁখ বাজে না ক্যান।"

২৪

বনমালীর দোকানের সামনে চারু রায় ও কে গুপ্তকে দেখা গেল। শিবনাথের ইচ্ছা ছিল আড্ডাটা এড়িয়ে বে। কিন্তু পারল না। কে গুপ্ত র জামার হাতা চেপে ধরল। 'মশাই, জেগুজে কোথায় বেরোচ্ছেন। বসুন । না হয় আপনারা কাজের লোক মরা অকম্মার ঢেঁকি। কিন্তু লোক হাৎ খারাপ নই। অমলের কত বড় কটা উপকার করে দিলাম। একবার জ্ঞাসা করুন না বনমালীকে। দশ কায় ঘোলপাড়ায় কেমন ঘর পেয়েছে। লেকট্রিক আলো শিগগির আসছে। নের বেড়া, টিনের চাল। গরমের সময় রম বেশি লাগবে। তা লাগলেও জলের ন্দোবস্ত এখানকার চেয়ে ঢের ভাল। র ঘরখানাও ছোটর মধ্যে চমৎকার। নালা মোটে একটা। তাহলেও—

'এসোসিয়েশনটা খারাপ।' চারু রায় কুঞ্চিত করল। শিবনাথ লক্ষ্য করল রু রায়ের কপালে স্বেদবিন্দু। যেন ক্ষণ কি গভীরভাবে চিন্তা করছিল। পর অনেকগুলো সিগারেট খাওয়া য়েছে। জুতোর আশেপাশে ছড়ানো ড়া টুকরোর সংখ্যা দেখে শিবনাথ নুমান করল। এখনও একটা মুখে লছে।

'এসোসিয়েশন বলতে তুমি কি বোঝ মি জানি না রায়।' কে গুপ্ত বিশেষ তুষ্ট নয় চারুর কথা শুনে। 'কেন, টা বস্তি বলে? রিক্সাওলা ঠেলাওলারা শেপাশে আছে এতে আপত্তি?' নাকে করে গুপ্ত হাসল। 'এখানকার নুষগুলো কি শুনি? চোর বেশ্যা ফালিটিক পেশেণ্ট আর আমার মতন চুর মতন মাতাল আর বনমালীর মতন রমেশের মতন খুনি নিয়ে তো এ পাড়ার এসোসিয়েশন, কি বলেন মশাই।' প্রথমে শিবনাথ এবং পরে বনমালীর দিকে তাকায় গুপ্ত। 'কথাটা মিথ্যা বললাম বনমালী?'

'না না খুনিকে খুনি বলবে তাতে রাগ করার আছে কি।' গুপ্তর কথায় রাগ করেনি প্রতিপন্ন করতে বনমালী হেসে মাথাটা দু'বার নেড়ে একজন খদ্দেরকে বিদায় করতে পেঁয়াজ ও লংকা ওজন করা শেষ করে তাড়াতাড়ি বার্লির ডিবি খুলল।

চারু রায় বলল, 'চমৎকার চা তৈরি করে দিলে কিরণ।'

'গুণী মেয়ে বাবা, গুণী মেয়ে।' গুপ্ত বলল, 'অদৃষ্টের বিপাকে পড়ে তো এই দশা হয়েছে। তা এর মধ্যেই জিনিস-পত্র গুছিয়ে বসতে পেরেছে তুমি দেখে এলে?'

চারু মাথা নাড়ল। 'বসতে পেরেছে মানে বসিয়ে দিয়ে এসেছি। বাজারে গিয়ে এটা-ওটা কেনাকাটা করে পর্যন্ত দিয়ে আসতে হ'ল।'

'তুমি মহাত্মা লোক।' মৃদু হাসল গুপ্ত। 'কিন্তু সাবধান রায়, এখনি মোক্ষম কথাটি ছাড়তে যেও না, অমলটা ভীষণ গোঁয়ার।'

'পাগল।' সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে চারু আকাশের দিকে মুখ তুলল। 'আগে অমলের একটা কাজ জুটিয়ে দিই তারপর ধীরে-সুস্থে কথাটা না হয়—'

'তাই।' বনমালী সায় দেয়। 'এখন সিনেমা-টিনেমার কথা বলতে গেলে রাগী লোক কি করতে কি করে বসে বুঝলেন না?'

চারু মাথা নাড়ল। চুপ করে সিগারেট টানল কতক্ষণ। তারপর আড়চোখে শিবনাথের দিকে একবার তাকিয়ে পরে কে গুপ্তকে প্রশ্ন করল, 'আর কার ওপর নোটিশ হয়েছে ঘর ছাড়বার বললে না তো তখন?'

'বলাইর ওপর আমার ওপর।' গুপ্ত হাত বাড়িয়ে বন্ধুর সিগারেটের টিন থেকে সিগারেট তুলল। 'আমাকে রোজই আলটিমেটাম দিয়ে যাচ্ছে পারিজাতের লোক।'

'তা তুমি যে এখনো বড় টিকে আছ।' চারু মৃদু হাসল, 'অন্য রকম বন্দোবস্ত হয়েছে নাকি রায় সাহেবের ছেলের সঙ্গে? যাওয়া-আসা আছে?'

'আমি প্রস্রাব করতেও পারিজাতের কুঠিতে যাব না।' মাটিতে থুথু ফেলল গুপ্ত। 'মদন ঘোষের মুখে শুনেছে কে গুপ্তর একটা এম এ ডিগ্রী আছে। গত মাসে বলে পাঠিয়েছিল বাচ্চাদের জন্যে একজন প্রাইভেট টিউটার পাচ্ছে না। আমাকে দিয়ে হবে কি না।'

'তা নাও না তুমি ওটা।' সোৎসাহে বনমালী মাথা নাড়ল। 'এমনি তো বসে আছ। ঘরভাড়াটা মাপ পাবে, আর তার ওপর মাস মাস নগদ কিছু দেবেও নিশ্চয়। পারিজাতের তো পয়সার অভাব নেই।'

পরামর্শ শুনে কে গুপ্ত হঠাৎ কোন কথা বলল না।

'আমি এখন উঠি গুপ্ত।' চারু উঠে দাঁড়ায়।

'আচ্ছা।' গুপ্ত মাথা নাড়ল। 'আবার কবে আসছ।'

'আসব। কবে কখন তার কিছু ঠিক নেই। হয়তো কালই আবার আসছি। আসতে হবে।' চারুর ঠোঁটে সূক্ষ্ম অর্থব্যঞ্জক হাসি শিবনাথের চোখ এড়াল না।

'চলি মশাই।' শিবনাথের দিকে তাকিয়েও চারু মাথা নাড়ল। শিবনাথ হেসে ঘাড় কাত করল।

অদূরে সুপুরি গাছের গুঁড়ি ঘেঁষে চারুর হলদে টু-সীটার দাঁড়িয়ে। সেদিকে যেতে যেতে চারু শিস দেয়।

'উদ্যোগী পুরুষ।' বন্ধু দূরে সরে যেতে কে গুপ্ত হেসে বনমালীর দিকে তাকায়।

'কাপ্তান লোক।' বনমালী হাসে। 'তা তোমার বন্ধু এমনটি না হয়ে যায়।'

'মায়া মরীচিকা ছবিতে আজকের সিনটাও থাকবে নাকি?' শিবনাথ হঠাৎ প্রশ্ন করতে কে গুপ্ত চমকে উঠল। 'কোন্ সিন্ কিসের সিন্?'

'এই যে অমল আর তার স্ত্রীকে বাড়িওলার লোক এসে অপমান করছিল।' শিবনাথ হাসে।

'হুঁ।' গুপ্ত এবার গলা দিয়ে একটা অদ্ভুত শব্দ বার করল। 'বলেছি তো মশাই আগুন, এপিডেমিক, বলাৎকার, রাহাজানি, খুন, জখম, উচ্ছেদ, উৎপীড়ন বস্তিজীবনের কিছুই বাদ দিচ্ছে না চারু। খাওয়া নেই ঘুম নেই রাতদিন এ পাড়ায় ঘুরঘুর করছে কি ও সাধে। ছবির মালমশলা যোগাড় করছে।'

শিবনাথ প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিলে চুপ করে রইল। কিন্তু গুপ্ত চুপ ছিল না। যেন চারুর সামনে বনমালীর প্রস্তাবের যোগ্য উত্তর দিতে ইতস্তত করছিল। চারু চলে যেতে খুব এক হাত নিলে বনমালীর ওপর।

'আমি বসে আছি কি ঘাস কাটছি তাতে তোর কি? চারু আমার বন্ধু হলেও এখানে সে তৃতীয় ব্যক্তি, কি বলেন আপনি?' চকিতে শিবনাথকে দেখে কে গুপ্ত বনমালীর দিকে ঘাড় ফেরাল। 'আমার ইচ্ছা নেই তাই ওর ছেলেমেয়েদের ভালতে আমি সাহায্য করছি না। কী হবে লেখাপড়া শিখিয়ে শুয়োরের বাচ্চাগুলোকে। গলা পর্যন্ত খায়, খাট-পালঙ্কে ঘুমোয়। বেশ আছে। বাপের টাকায় এখন ঘি-দুধ খাচ্ছে বড় হলে মদ খাবে মেয়েমানুষ পুষবে। সাবেককালে এই করত সব পয়সাওলা ঘরের ছে[illegible] দেশ ঠাণ্ডা থাকত শান্তি ছিল ঘরে এখন শালারা লেখাপড়া শিখেই [illegible] করে রাজনীতি, ইলেকশন ফাইট, ধরে সোস্যাল রিফর্মেশন, সার্ভি[illegible] হিউম্যানিটিজ সেক্।'

'মানে লোকের মাথায় বাড়ি যত ফন্দিফিকির আছে সব শেখে বলছ?' ইংরেজী শব্দগুলো না বু[illegible] বনমালী আন্দাজ করে নেয়।

'আলবৎ।' সংক্ষেপে বন[illegible] প্রশ্নের জবাব দিয়ে কে গুপ্ত ত[illegible] শিবনাথের দিকে তাকায়। '[illegible] ব্রিটিশের আমলে 'ড্রাই-ডে' শুনেছেন কখনো?'

'না।' শিবনাথ কে গুপ্তের [illegible] দেখে হাসে।

'হাসবেন না। আরে আহাম্মক যে রিফর্মেশন বলতেই সকলের মঙ্গলবারটাকে শুকনো ক'রে দিলি লাভ কি হল?'

'ঐ একটা দিন অন্তত তে[illegible] পয়সাটা জলে গেল না এই লাভ, ত[illegible] হপ্তায় একদিন গলা শুকনো আস্তে আস্তে যদি তোমাদের [illegible] পাল্টায়।'

'স্বভাব পাল্টায়!' বনমালীর কথ[illegible] কে গুপ্ত গর্জন করে উঠল। 'খ[illegible] রাখিস কি না। খোঁজ নিয়ে দ্যাখ্ দিনে যে পরিমাণ মদ বিক্রী হয় তা [illegible] গুণ বেশি কাটে ঐ এক ড্রাই-[illegible] রিফর্মেশন!' কথা শেষ করে কে [illegible] শিবনাথের দিকে মুখ ফেরায়। কথা না বলে শিবনাথ মৃদুমন্দ হা[illegible]

'মশাই, এ-তল্লাটে এসে যেদিন নিয়েছি সেদিনই আমি এখানকার বৃত্ত শুনলাম। রায় সাহেবের আনাচে-কানাচে পাঁচ-সাতটী ঘর কমজোরী কেরোসিনের ডিবির মত টিম্ করে জ্বললেও খেয়ে পরে এ[illegible] সুখেই তারা দিন কাটাচ্ছিল, পা[illegible] এসে সবগুলোকে খেদিয়ে দিয়েছে। পাবলিক ওম্যান পাড়ায় থাকলে আপনি খারাপ হয়ে যাব—হা-হা।'

'অত মন খারাপ করছ কেন, পয়সা খরচ করে খেয়া পার হয়ে ওধারে চলে যাও ডজন ডজন [illegible]

্যাখোনি সন্ধ্যাবাতি জ্বলতে তোমার মেনকা রম্ভারা গলির মুখে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানে।'

বনমালীর কথায় কান ছিল না, শিব-নাথের চোখে চোখ রেখে কে গুপ্ত বলল, এখন পারিজাতের বাচ্চারা লেখাপড়া শিখে আবার কোন্ রিফর্মেশনে হাত দেবে সেই ভয়েই মশাই আমি সারা হয়ে যাচ্ছি। আমি করব ওদের টুইশনি—াম! এ যে নিজের পায়ে কুড়োল মারার শামিল হবে, কি বলেন মশায়?'

শিবনাথ কিছু বলল না।

'তোমার মাথা একেবারে খারাপ হয়ে গেছে গুপ্ত।' হিসাবের খাতা থেকে মুখ তুলে বনমালী একটা বিড়ি ধরায়। 'তা নোটিশ যখন হয়ে গেছে; এ মাসে না হোক সামনের মাসে মদন ঘোষ তোমাকে তুলে দেবে ঠিকই। তখন কি করবে,— কি ঘোলপাড়ায় ঘরটর ঠিক করা আছে, করণদের বস্তিতে ঘর খালি আছে খোঁজ নিয়েছ?'

যেন এবারও বনমালীর কথায় কান দেবার বিশেষ ইচ্ছা নেই মুখের এমন ভাব করে কে গুপ্ত ওপরের দিকে তাকাল। 'সে যেদিন মদন লোকজন নিয়ে হাতে আসবে সেদিন ঠিক করা যাবে। আমার শালা পারিজাতের খোয়াড়, ঘোল-পাড়ার ঘর, গাছতলা আর তোর দোকানের সামনের এই ভাঙ্গা বেঞ্চ সব সমান।'

শিবনাথ একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। সূর্য ডুবে গেছে। গাছের মাথাগুলো কালো। ইস্কুল সেরে রুচি এখন বাড়ি ফিরবে। মনে পড়তে শিবনাথ চট্ করে উঠে দাঁড়ায়।

'আহা বসুন না।' গুপ্ত আবার শিবনাথের হাত চেপে ধরল। 'কি এমন দরকারটা কাজ ফেলে এসেছেন যে একটু গল্পসল্প করার সময় হয় না আপনার। কেন, আমার সঙ্গে আড্ডা দিচ্ছেন মহিষী এসে দেখতে পেলে রাগ করবেন? তার কি এখুনি ফেরার সময় হ'ল?'

'না না তা না।' মনে মনে বিরক্ত হলেও শিবনাথ সেটা মুখে প্রকাশ করল না। 'একটু কাজেই বেরোচ্ছি, সন্ধ্যার পর এসে আবার গল্প করা যাবে।'

গুপ্ত শিবনাথের হাত ছেড়ে দেয়।

'তবে শুনুন।' হাত ছেড়ে দিয়ে চোখের ইঙ্গিতে শিবনাথকে তার মুখটা একটু কাছে সরিয়ে নিতে অনুনয় করে। শিবনাথ গুপ্তর মুখের কাছে গলা বাড়িয়ে দেয়। 'বলুন।'

'আনা চার-ছ' পয়সা ধার দিতে পারেন?'

'ছ' আনা হবে না।' শিবনাথ পকেটে হাত ঢোকায়। 'আনা তিনেক দিতে পারি।'

'তাই দিন তাতেই চলবে। খসখসে গলার স্বর কে গুপ্তর। 'কিছু মুড়ি মুড়কি আর এক পেয়ালা চা দিয়ে শালাকে ঠান্ডা করা যাক। সেই সকাল থেকে কিছু পড়েনি আর এমন কাঁইকুঁই করছে।' নিজের পেটের ওপর হাত রেখে কে গুপ্ত এবার গুজ্-গুজ্ করে হাসল: 'দিন তিন আনা, দ্যাটস্ এনাফ। এর বেশি দিতে না পারলে কথা কি।'

শিবনাথ কথা বলল না। কে গুপ্তর প্রসারিত হাতের তেলোয় একটা দু'আনি ও দুটো ডবল ছেড়ে দিয়ে আস্তে আস্তে রাস্তার দিকে পা বাড়াল।

'তা, বুঝলেন মশাই, সন্ধ্যার পর একবার আসুন।' গুপ্ত পিছন থেকে ডাকল, শিবনাথ তাকাল না, ঘাড় কাত করে সামনের দিকে হাঁটতে লাগল।

'তোমার ওই সোনার চারু বন্ধুর কাছ থেকে এক আধটা টাকা ধার চেয়ে নিয়ে এবেলা চারটি ভাতটাত খাওয়ার ব্যবস্থা করলেই পারতে, চিনেবাদাম আর মুড়কি চালাবে কত।'
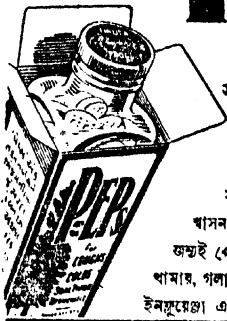
'তুই চুপ কর্‌ তুই থাম গাধা। চারুর কাছে এখন আমি ভাতের পয়সা চাই। কাফে-ডি-রিওতে বসে বারো বছর এক সঙ্গে গ্লাস ঠেনেছি কি না। মুদির আর বুদ্ধি হবে কত—'

বনমালী চুপ করে রইল।

'বন্ধু, কিন্তু তৃতীয় ব্যক্তি কথাটা মনে রাখবি। ওর কাছে দু' আনা চার আনা কি টাকাটা আধুলিটা ধার চাওয়া যায় না।'

'তাও বটে। মোটা কমিশন পাবে অমলের গিন্নী যদি এক আধটা বইয়ে নামে। এখন আর খুচরো ধার-ফার চেয়ে হাত কালো করে লাভ নেই।'

কে গুপ্ত কিছু বলল না।

কেননা, হঠাৎ দূরে রুচিকে দেখা গেছে। এক হাতে একটা ব্যাগ আর এক হাতে মেয়ের হাত ধরা। যে-হাতে ব্যাগ সেই হাতে দু'টো কমলানেবু।

দোকানের সামনে দিয়ে শিবনাথের স্ত্রী যতক্ষণ পর্যন্ত হেঁটে বস্তিটা পার হয় এবং বাড়িতে ঢোকে ততক্ষণ কে গুপ্ত সেদিকে তাকিয়ে থাকে।

'অত তাকিয়ে দেখছ কি, গিলে খাবে নাকি।' বনমালী এক সময় হিসাবের খাতা থেকে মুখ তোলে।

কে গুপ্ত দোকানের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বসল।

'কি বললি?'

'বলছিলাম তুমি তো তাকাও, কিন্তু খুকির মা-টি একদিনও তোমার দিকে চোখ ফেরাল না। সোজা অন্দরে চলে যায়।'

গুপ্ত কথা বলল না।

'বেশি লেখাপড়া জানা মেয়ে কি না তাই অহঙ্কার মনে মনে।' বনমালী বলল, 'আমাদের বিশেষ ভাল দেখেন না। তোমাকে ভাবে একটা মুদির বন্ধু। অর্ডিনারী'

'বেশ তো, আমিও ওর চোখে স্পেশ্যাল হতে চাইনে।' কে গুপ্ত কাছ থেকে বন্ধু চারু রায়ের ফেলে পোড়া সিগারেটের একটা বড় কুড়িয়ে নেয়। সেটা মুখে গুঁজে 'দে দেশলাই।'

'ইস্কুলের মাস্টারনী তার আব দেমাক।' এক গাল ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'আমি মহিলার রূপযৌবন ন করছিলাম আজ চেহারাখানা।'

'কি ব্যাপার।' বনমালী ফিসিয়ে উঠল। 'কিছু হয়েছে ন

'মহাশয়টি বেকার।'

'কে? তার স্বামী? এই যে এতক্ষণ বসে ছিল, শিবনাথবাবুটি

'হ্যাঁ, মহারাজ হ্যাঁ, পরশ কথাটা বেরিয়ে পড়েছে। এতকাল চাপা ছিল। তা বেকারি কে ঢাকতে পেরেছে। পরশু রাত্রে রীতিমত ঝগড়া কথা কাটাকাটি। রাত করে বাড়ি ফিরলে বেবির ম ঘরে ঢোকা বন্ধ করে দেয় জানি পরশু রাত্রে বারান্দায় শুয়ে শ শুনলাম। ওদের ঘরের চৌকাঠে আমার মাথাটা ছিল।'

'কিন্তু ভদ্রলোকের হাবভাব তো মনে হয় না যে উনি ইয়ে হ

'এসব লোক ডেঞ্জারাস, বুঝ গুপ্ত অনেকটা নিজের মনে 'এরা মুখে তা কখনো প্রকাশ ক

'তাই বলো।' বনমালী সা 'আমি বলি এই আদমি খ পারবে। এ্যাঁ, দু'বেলা এখানে বসছে গল্প করছে, মুখ দিয়ে বার করল না যে চাকরিটি নে তুমি তো পারনি। প্রথম দিনই খুলে বললে।'

'বৌ একটাতে লেগে আ তাই ঘা এখনো ঢেকে রাখতে প

'কাল যদি বৌয়ের ওটা যা

কে গুপ্ত মাথা নাড়ল। ভান করবে যায়নি।'

'লাভ কি,' বনমালী বলল, বললে. দু-চার ছ'দিন কি ধরো

রকম-সকম দেখে কারো তো আর বুঝতে বাকি থাকে না?'

তা না থাকলেও মুখ দিয়ে সেটা প্রকাশ না করার মধ্যে একটা বাহাদুরি আছে বলে ওরা মনে করে হা-হা।' গুপ্ত এবার জোরে জোরে হাসল। 'অমল ঢাকতে পারেনি, বলাই পারছে না, আমি শর্মা এক বেলাও পারলাম না, কিন্তু উনি পারবেন ওঁর স্ত্রী পারবেন, এক নম্বর ঘরের, কি নাম হারামজাদীর? কমলা পারবে, ভুবনবাবুর মেয়েরাও হয়তো পারতে পারে,—কিন্তু আজ বিধু মাস্টারের চাকরি যাক দেখবি কাল সকালে পায়খানায় কি নর্দমার পিছনের শ্যাওড়া গাছটায় ওর শরীরটা ঝুলছে।'

'তোমরা সব বলদ কি না, তুমি, অমল, বিধু মাস্টার।' বনমালী দোকানে সন্ধ্যাদীপ দেখায়: 'হরি বোল্ বোল্ হরি, হরি শ্রী প্রেমানন্দে হরি হরি বোল্ হরি।' কাঠের ক্যাশবাক্সের গায়ে মাথাটা তিনবার ঠকাস ঠকাস ঠেকিয়ে ধুপদানীটা হাত থেকে নামিয়ে বনমালী কথাটা শেষ করলে: 'ওরা বেশি সেয়ানা, অতি চালাকের দল, ঠেকতে ঠেকতেও চলে যায়, পড়তে পড়তেও উঠে দাঁড়ায়।'

'যা বলেছিস।' শব্দ না করে কে গুপ্ত হাসল। অন্ধকার। তা হলেও দেখা যাওয়ার মতো একটা দাঁতও গুপ্তর আস্ত ছিল না। স্পিরিটে সবগুলোর মাথা ক্ষয়ে গেছে। মাটিতে থু থু ফেলে বলল, 'আমি বলদের বাড়া। না হলে কি আর একটি বেকারের কাছে চা-মুড়ির পয়সা চাই। যাক্‌গে—তুই যে ধানাই-পানাই নানান কথা শুনিয়ে আমায় ভুলিয়ে রাখছিস, এক আধটা হবে নাকি। আজ সাত দিন বকে বকে গলা শুকিয়ে গেল,—কই তোর তো কোন সাড়া পাচ্ছি না।'

ঝিঁঝি ডাকছিল। তা হলেও বনমালীর গলাটা কম স্পষ্ট ছিল না।

'বাজার মন্দা গুপ্ত, বাজার খারাপ। দেখছো তো বেচাকেনার অবস্থা। আমার আরো একটা টাকা লোকসান হয়েছে অন্য ব্যাপারে। শালা ব্যবসার কারবারের আগা-পিছ কিছু বুঝবে না তবু হাত লাগায়। বখরা পাব আমি। আরে আশ্বিনের আগে পিঁয়াজ পচবে না আমায় তুই শেখাবি। আমি তো জানি তোর বাণিজ্যের অংশীদার হয়ে ঘরের টাকা আমি খালের জলে ফেললাম ধাপার মাঠের বিষ্ঠায়। হাঁসের গুয়ের বুদ্ধি নেই তোর মাথায় তুই কম্মাবি হাঁসের ডিসের কারবার।'

কবে কার সঙ্গে ডিমের ব্যবসায় টাকা ঢেলে বনমালী বড় রকমের মার খেয়েছে সেই সম্পর্কে প্রশ্ন করা নিরর্থক ভেবে গুপ্ত উঠে দাঁড়াল।

'তোমার ইচ্ছা হয় খাওয়াবে না হয় খাওয়াবে না। বললাম। হাতী পা ভেঙে তোমার দুয়ারের সামনে হেঁট হয়ে পড়েছে, দেখতেই তো পাচ্ছ। তাই বলে তো আর......'

অস্পষ্ট এবং বেশির ভাগ ইংরেজী শব্দ ছিল বলে বনমালী শেষের দিকের কথাগুলো বুঝল না। তা ছাড়া শুনলও না আর তেমন কিছু। কে গুপ্ত রাস্তায় নেমে কবিতা আওড়ায়:

Nothing is so beautiful
as spring—
When weeds, in wheels, shoot
long and lovely and lush—

'কে? কে?'

গুপ্তর পিছনে লোক হাঁটছিল।

তারা বলাবলি করছিল, 'নাম কি, কোথায় থাকে?'

'থাকে এখানকার একটা বস্তিতে। ইংরেজীতে ফার্স্ট ক্লাশ এম এ।'

'এই অবস্থা কেন?'

'বেকার।'

'কনসাটাংসা করতে পারছে না বা ট্রাকটাকি অর্ডার সাপ্লায়ের কাজ? মাস্টারি? এ্যাঁ কোটটা একেবারে ছেঁড়া।'

বস্তুত কথাগুলো শুনেও গুপ্ত পিছনের দিকে তাকায় না। খালি পা। দু'দিন এখন খালি পায়েই চলাফিরা করছে। সেদিন ডোমপাড়ার আগুন দেখতে গিয়ে ছেঁড়া চটির একটি খুইয়েছে। বনমালী বলছে যে রমেশ রায়ের কুকুরটা তার এক পাটি চটি মুখে নিয়ে গেছে সে দেখেছে। কিন্তু গুপ্ত বনমালীর কথায় বিশ্বাস করে না। গুপ্তর সন্দেহ জুতোটা কেউ পায়ে দিয়ে সরে পড়েছে। এখানকার সবাই চোর সব ভিক্ষুক। ছেঁড়া জুতোও ওরা সরিয়ে ফেলে ইত্যাদি। পিছনের লোকটি তার সঙ্গীকে বলছিল, 'পুঁথি পড়া বিদ্যা, প্র্যাক্টিক্যাল নলেজ নেই, বাস্তব জগতের সঙ্গে সম্পর্ক হয়তো কোনো-কালেই ছিল না, সুখের চাকরি করত, আজ বেকার হয়ে আর একটা কিছু জোটানোর মত ফন্দিফিকির মাথায় আসছে না, তাই এ-দুরবস্থা।'

লোক দুটিকে এগিয়ে যাবার পথ দিতে কে গুপ্ত সরু রাস্তার একপাশে সরে বাসকের জঙ্গল ঘেঁষে একটু সময় দাঁড়ায়। ঝিঁঝির ডাকের মতন পুরোনো মামুলি একঘেয়ে বচন আওড়াতে আওড়াতে ওরা অন্ধকারে মিলিয়ে যাবার পর জঙ্গল ছেড়ে রাস্তায় নেমে আবার হাঁটতে লাগল। 'ননসেন্স।' গুপ্ত নিজের মনে দুবার বিড়বিড় করে।

(ক্রমশঃ)

অপহরণ

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

দরজা খুলেই প্রিয়নাথ অবাক! এক মুখ খোঁচা খোঁচা দাড়ি, কোটরগত দুটি চোখ, উঁচু চোয়াল, জরাজীর্ণ কাঠামো। চেহারার সংগে পোশাকের মিল। পরনে আধ-ময়লা ধুতি, শত-ছিন্ন পাঞ্জাবী, গলার কাছে ময়লা পৈতার ইশারা। ঝড়-ঝাপটায় কাত হওয়া নৌকার আভাস।

—কাকে চাই?

—প্রিয়নাথকে, প্রিয়নাথ দাস।

প্রিয়নাথ দু' এক মিনিট ভাবলো। ঠোঁট কামড়ে পুরনো দিনের রোমন্থন। সারি সারি মুখ, আত্মীয়-অনাত্মীয়ের। চেনা আধ-চেনা। কিন্তু এমন চেহারার কাউকে মনে করতে পারলো না। অবশ্য চাকরীর সুতো নানা জায়গায় ছড়ানো। এগারো বছরে বাইশবার ঠাঁইনাড়া। মোতিহারিগঞ্জ থেকে কাটিহার, আধা শহর মহিমপুর থেকে আধুনিক শহর ভৈরবপুর। আবার এক শহরে একাধিকবার ছোঁয়াও আছে। জট পাকানো সুতো। গিঁট খুলতে নাজেহাল। তবু প্রিয়নাথের বরাত খারাপ নয়। মুন্সেফের নড়বড়ে চেয়ার থেকে সাব-জজের পাকাপোক্ত আসন। ধাপে ধাপে। খুঁটির জোর নেই, জোর কলমের। নিচু কোর্টের দেওয়া রায়, আইনের ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে হাইকোর্টের দপ্তরে উঠেছে, কালাপানি পার হ'য়ে প্রিভি কাউন্সিল, কিন্তু প্রিয়নাথ দাসের সই করা জাজমেণ্টের রদবদল হয়নি। উকিল ব্যারিস্টার খই ফুটিয়েছে মুখে, অতসী কাচ দিয়ে আইনের ফাঁক খোঁজার চেষ্টা, চিমটি কেটে কেটে প্রিয়নাথের গলদ বের করার প্রয়াস, কিন্তু সব বৃথা। কালো চামড়া প্রিয়নাথ দাসের রায়ে সায় দিয়েছেন লালমুখো ডানকান সায়েব। একটু এদিক ওদিক নয়।

আসামীও প্রিয়নাথ বড়ো কম দেখেনি। ফিটফাট ধোপদোরস্ত চেহারার ছোকরা থেকে বীভৎস গুণ্ডা। দুগ্ধপায়ী থেকে মদ্যপায়ী। অবশ্য সবাইকে মনে রাখবার কথা নয়। কিন্তু ঠিক এমন কাউকে কিছুতেই মনে পড়লো না।

একটু ইতস্তত করলো প্রিয়নাথ, তারপর ঘাড় নেড়ে বললো, আমি, আমিই প্রিয়নাথ। প্রিয়নাথ দাস।

আগন্তুক একগাল হাসলেন। দাড়ি গোঁফের ঝোপের ফাঁকে ঝকঝকে দাঁতের সার। খুব আস্তে বললেন, প্রিয়, আমি জগদীশ ঘোষাল।

জগদীশ ঘোষাল! দরজার পাল্লায় রাখা হাত প্রিয়নাথ মাথায় রাখলো। নিজের মাথায়। চুলের গোছা সামান্যই। সামনেটা একেবারে ফাঁকা। মাথার পিছন দিকে ঝালরের মতন কয়েকটা। বছর দুয়েক, তারপর এ বালাইও থাকবে না। আগাগোড়া মসৃণ। সেই চুলকটাই প্রিয়নাথ আঁকড়ে ধরলো। ঠিক [illegible] মনে পড়ছে না।

কোথায় দেখেছি বলুন আপনাকে? প্রিয়নাথ স্বীকারই ফেললো।

মুখের চেহারার রং বদলালো ফ্যাকাসে থেকে ফ্যাকাসেতর। দু চোখে বিষাদের ছিটে। অপ্রস্তুত ভ[illegible] তারপর লোকটি টান হ'য়ে দাঁ[illegible] বললেন, বেগমপুর স্কুলের জগদ[illegible] ঘোষাল। সেকেণ্ড মাস্টার!

বেগমপুর! মনে আছে বৈকি, খ[illegible] মনে আছে। জীবনের বারোটা ব[illegible] সেখানে কেটেছে। খালের পারে [illegible] নারিকেল ছাওয়া গ্রাম। সোনা[illegible] ধানের ক্ষেত। মাইলের পর মাইল জু[illegible] পাটের সার। এখনও চোখ বন্ধ কর[illegible] স্পষ্ট দেখতে পায় প্রিয়নাথ। ব[illegible] সিভিল সার্জন, বদলির দৌলতে ব[illegible] জায়গা ঘোরা হয়নি। কিন্তু বেগমপুরে[illegible] সংগে আর কারো তুলনা হয় না।

বেগমপুর শিক্ষা নিকেতন। ধল[illegible] নদীর ধারে। আলের ওপর হেঁটে হেঁ[illegible] মাইল দুয়েক পথ। সেকেণ্ড মাস্টা[illegible] জগদীশবাবু। মনে পড়ছে, খুব ম[illegible] পড়ছে। লম্বা চওড়া দৈত্যের আকার গলার আওয়াজে স্কুলের দরজা জানালা গুলোও থরথরিয়ে কাঁপতো। ছাত্রে[illegible]

তা ছার। বাংলা পড়াবেন। গদ্য দ্য নয়, ব্যাকরণ।

কিন্তু তা না হয় হলো। পড়াশোনার াট তো প্রিয়নাথ অনেক দিনই চুকিয়েছে। তদিন পরে আবার সেকেন্ড মাস্টার পছু ধাওয়া করেন যে। শব্দরূপ বাকি াছে কিছু না বিভক্তির বিশ্লেষণ!

হাত জড়ো করে প্রিয়নাথ নমস্কার রলো। দরজা ছেড়ে সরে দাঁড়িয়ে লো, কি খবর মাস্টারমশাই? কি নে করে?

কি মনে করে? জগদীশ ঘোষাল একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ছাত্রের দিকে। ব কথা খুলে বলতে হবে! ইনিয়ে বনিয়ে। কিছু বুঝতে পারছে না প্রয়নাথ? মুখের হিজিবিজি আঁচড়ে, হস্র ছিন্ন পোশাকে, কঙ্কালসার অস্থির াঁজে খাঁজে কিছু লেখা নেই? মর্মন্তুদ বদনার কাহিনী। একমুঠো অন্ন আর াথা গোঁজবার সামান্য আশ্রয়ের জন্য দশ থেকে দেশান্তরে মুখ থুবড়ে পড়ার তিকথা।

জগদীশ ঘোষাল সব বললেন একটু একটু ক'রে। প্রিয়নাথ স্কুলের সেরা াত্র। জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তার কাছে ঃখ জানাবেন না তো কার কাছে জানাবেন! এই অসহায় অবস্থায় কার রজায় এসে দাঁড়াবেন।

কাহিনীর মধ্যে নতুনত্ব কিছু নেই। অন্তত প্রিয়নাথের তো তাই মনে হ'লো। দেশ বিভাগের পরে মানুষ-জনের ছিটকে পড়ার ইতিহাস। ভিটেমাটি সব ছেড়ে, আপনজনকে হারিয়ে নিঃসম্বল অবস্থায় শেয়ালদা পেঁছানোর ব্যাপার। কাগজে পড়েছে প্রিয়নাথ, কোর্টে সাক্ষীদের জবানীতে শুনেছে, চোখের সামনে দেখেওছে অনেকবার। কিন্তু কি চান সেকেন্ড মাস্টার। প্রিয়নাথের সামর্থ্য আর কতটুকু। তালি দেওয়া কাপড় সামনে মেলে ধরলে বড়োজোর কয়েক মুঠো চাল কিংবা কয়েকটা টাকা। এর বেশী তো কিছু নয়। তার চেয়ে সরকারের খোলা ভাণ্ডার রয়েছে। লাইন দিয়ে নাম লিখিয়ে এলেই হ'লো মাসোহারা বন্দোবস্ত। কোন অসুবিধা নেই। চিন্তায় পড়লো প্রিয়নাথ। পড়া শেষ করেছে আজ বারো বছর, স্কুলের পড়া তারো অনেক আগে, অথচ তারই জের টেনে টেনে পুরোনো মানুষ এসে দরজার গোড়ায় দাঁড়াবে, এ কথা স্বপ্নেও ভাবেনি। গুরু-দক্ষিণা তামাদি হবার বুঝি কোন নিয়ম নেই। বারো বছর পরেও হাত পেতে দাঁড়ানো যায়।

দরজায় কড়ার শব্দ হ'তে প্রিয়নাথ ভিতরে গিয়ে ঢুকলো। চৌকাঠের পাশেই মাধবীলতা। প্রিয়নাথের শক্তি। যৌবনের আদিতে হয়তো লতাই ছিলো। কিন্তু বিয়ের বছরের পর থেকেই ধাপে

প্রিয়, আমি জগদীশ ঘোষাল

ধাপে ফুলতে শুরু করেছে। মেদের পলিমাটি দু গালে, কটিদেশে, নিতম্বে। প্রিয়নাথ সোনা দিয়ে আষ্টেপৃষ্টে বেঁধেও সে মেদ বৃদ্ধি থামাতে পারেনি। বছর দুয়েক হ'লো সব আশা ছেড়ে দিয়েছে। এ থামবার নয়। লতা রূপান্তরিত সহকার তরুতে।

ছেলেপুলে তো বটেই, প্রিয়নাথও তটস্থ। মাধবীকে জিজ্ঞাসা না করে কোন কাজ নয়, এমন কি রায় লেখবার আগেও অনুমতি নিয়ে নেয়। যার বরাতে ক'বে খাচ্ছে, তার অমতে কোন কাজ করা উচিত নয়। ধর্মে সইবে কেন!

—কে, ও লোকটা? মাধবী চোখ ঘুরিয়ে দরজার ফাঁকে দেখলো।

—সেকেন্ড মাস্টার! প্রিয়নাথের কথা জড়িয়ে গেলো।

'সেকেন্ড মাস্টার?' মাধবী চোখ দুটো বড় করলো। দু হাত কোমরে ঠেকিয়ে বললো, 'এ বয়সে মাস্টার কেন, গোড়া থেকে শুরু করবে নাকি। তাই অবশ্য তোমার উচিত। দিনে দিনে বুদ্ধি শুদ্ধি যা হচ্ছে, বোধোদয় থেকেই আরম্ভ করো।'

রসিকতা, মর্মান্তিক হ'লেও প্রিয়নাথ পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে হাসলো। কর্ক-স্ক্রু দিয়ে ছিপি খোলার ঢংয়ে। তারপর কষ্টে হাসি থামিয়ে বললো, 'কথা জানো বটে। বাবা, মরা মানুষ পর্যন্ত হেসে উঠবে।'

মাধবী ভোলবার মেয়ে নয়। অত সহজে ভুললে আর হাকিমকে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাতে হ'তো না। গম্ভীর গলায় বললো, ও মিন্সে চায় কি!

চায় তো অনেক কিছুই। বামনের ত্রিপাদ ভূমি চাওয়ার সামিল। কিংবা একলব্যের আঙুল উপঢৌকন। আস্কারা দিলেই মাথায় উঠবে। একেবারে ধুলো পায়ে বিদায়। কবে পড়িয়েছে, সেজন্য তো আর মাথা কিনে রাখেনি। তা ছাড়া বিনা মাইনের মাস্টার তো নয়। এক হাতে করকরে টাকা নিয়েছে, বিদ্যা বিলিয়েছে আর এক হাতে। দেনা-পাওনা শেষ। তার জের টেনে পিছু হ'টে হ'টে আবার এতদূর আসা কেন! যেতে বলে দিই।

উহুঁ, হুঁ, মাধবী ঘাড় নাড়লো। মাথা নিচু করে ভাবলো দু'এক মিনিট। থুতনিতে গোটা তিনেক ভাঁজ। গলার হারের খানিকটা নিশ্চিহ্ন। ভুরু কুঁচকে মুখ তুলে বললো, একটা কাজ করলে হয়।

প্রিয়নাথ কচ্ছপের মতন মুখটা বাড়িয়ে দিলো। মাধবীর মতলবের একটি বর্ণ যেন ফসকে না যায়।

—টুলু-বুলুর জন্য মাস্টার তো একটা দরকার। তোমার বদলির জ্বালায় ছেলে দুটোর তো পড়াশোনাই হ'চ্ছে না। মাস্টারের বাজার তো আগুন। বইয়ের পাতা ওল্টালেই পনেরো, তার ওপর পড়ালে তো বিশ ত্রিশের কম হাঁকবে না। দেখছো তো অবস্থাটা।

দেখছে বই কি। দেখে দু চোখ ঠিকরে বের হ'য়ে যাবার যোগাড়। এর মধ্যে গোটা তিনেক এসেছে। বছর বাইশের

ছোকরা থেকে বাহান্ন বছরের প্রৌঢ়। কিন্তু দরে বনে নি। বারো টাকার একটি পয়সা ওপরে উঠবে না মাধবী। ভারি তো কচি দুটো বাচ্ছা, কি এমন পড়ানো তার ঠিক নেই। দর কষাকষিতে সুতো ছিঁড়েছে। মাস্টাররা তিন রাত্তির টেঁকেনি।

এ যা ব্যাপার, শুধু খাওয়া-পরাতেই বোধ হয় রাজী হয়ে যাবে। কেউ নেই কোন চুলোয়, ভিটেমাটি সব গেছে, একমাত্র ছেলেও। একেবারে ঝাড়া হাত পা। মাস্টারমানুষ। ছেলে দুটোর যদি হিল্লে হয়। চোখ টিপে মাধবী বাকি কথা শেষ করলো।

প্রিয়নাথ বিগলিত। উঃ বুদ্ধি বটে। এমন বুদ্ধি হাকিমের ঘরেই মানায়। শুধু ছেলে পড়ানো, দরকার হলে দোকান বাজারও করতে পারবে, ফাইফরমাশ খাটা। বাড়িতে বাড়তি লোকের মধ্যে সম্বল তুলসী আর নেত্য। তুলসী আর্দালী, বাবুর সঙ্গে সঙ্গে থাকে। এদিক ওদিক কাজ কর্ম। নেত্য মাধবীর বাপের বাড়ির ঝি। বিয়ের সময় সঙ্গে এসেছে, ছাড়বার নাম নেই। কোলের মেয়েটাকে নিয়েই আছে। সংসারের ঝাড়পোঁছ, মাধবীর তদ্বিরৎ, এতেই রাত ভোর। আর কোন দিকে নজর দেবার সময়ই পায় না। টুলে বসে দুবেলা দু মুঠো রাঁধতেই মাধবী হিমসিম। মাসের মধ্যেই দশ দিন বিছানা নেয়। বুক ধড়ফড়ানি। চোখে অন্ধকার। তখন সহায় ওই তুলসী। বামুনের ছেলে। হেঁসেলে ঢুকলে অসুবিধা কিছু নেই।

প্রিয়নাথ আবার বাইরের ঘরে ফিরে এলো। জগদীশ মাস্টার আর তক্তাপোশে নেই, জানালার ধারে উঠে দাঁড়িয়েছেন। দুটো হাত আড়াআড়ি বুকের ওপর। কি দেখছেন চেয়ে চেয়ে।

মাস্টারমশাই। ছাত্রের ডাকে ফিরে দাঁড়ালেন।

কি ঠিক করলেন? প্রিয়নাথ তক্তাপোশ ঘেঁষে দাঁড়ালো। ছুটির দিন। সাত সকালে নেয়ে চোগাচাপকান এঁটে কাছারী যাবার তাড়া নেই। অঢেল সময়। শুয়ে বসে কাটানো যায়। তার আগে অবশ্য মাস্টারমশাইয়ের একটা বন্দোবস্ত করতে হয়।

জগদীশ মাস্টার আবার কি ঠিক করবেন? সব খুইয়ে ভিখারীর পোশাক অঙ্গে জড়িয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন। যা কিছু ঠিক করবার প্রিয়নাথই করবে।

—আমি ভাবছিলাম কি, এ বয়সে কোথায় আর ঘুরে ঘুরে বেড়াবেন। সাত ঘাটের জল খেয়ে। তার চেয়ে এখানেই থেকে যান। আমার ছোট ছোট ছেলে দুটোকে পড়াবেন। মানুষ করবেন তাদের।

জগদীশ মাস্টারের সারা শরীর কেঁপে উঠলো থরথরিয়ে। জল চিক চিক চোখের দু'কোণ। শিরার নক্সাকাটা হাত দিয়ে ময়লা পৈতা জড়িয়ে নিলেন। বিড় বিড় করে মন্ত্র। হয়তো আশীর্বচন, কিংবা তারই স্বগোত্র।

প্রিয়নাথ তাঁর প্রিয়তম ছাত্র। বুকের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে শিখিয়েছিলেন সন্ধি আর সমাস, আর্ষ প্রয়োগের কৌশল আর নিপাতনে সিদ্ধর রহস্য। দেশজ শব্দের স্বরূপ। সে শিক্ষা ব্যর্থ হয়নি। যোগ্য পাত্রেই ন্যস্ত হয়েছিলো। মানুষ চিনতে জগদীশ মাস্টারের ভুল হয়নি। এমন ছাত্রকে ছেড়ে কার আবার দ্বারস্থ হবেন। কোন চৌকাঠে মাথা খুঁড়ে বেড়াবেন।

প্রিয়নাথের ছেলেদের বাপের মতন ক'রে গড়ে তুলবেন। দেশের মাথা। দশজনের একজন।

একেবারে কোণের দিকে বাড়তি ঘর। ভাঙা টেবিল চেয়ার, খবরের কাগজের স্তূপ, ছুটকো ছাটকা জিনিস, সে সব সরিয়ে জগদীশ মাস্টারের আস্তানা। তালা ভাঙা ট্রাঙ্ক তাই সরিয়ে সুরিয়ে কাপড়-চোপড় রাখার বন্দোবস্ত। মাদুর পেতে শোবার ব্যবস্থা। কোন অসুবিধা নেই। আর থাকলই বা একটু অসুবিধা। ছাত্রের কাছে কি নালিশ জানাতে যাবেন। কচুরি-পানার মতন তো ভেসে বেড়াচ্ছিলেন, ঘাট থেকে আঘাটায়। এখানে তবু শিকড় গজানোর ইশারা, মাটির আভাস।

কাজও এমন কিছু বেশী নয়। সকাল বিকাল পড়ানো। ঘণ্টা দুয়েক ক'রে। তবে ছাত্ররা মেধাবী নয় বাপের মতন। প্রিয়নাথ হাঁ করলে কথা বুঝতো। দুবার বলতে হতো না। উদ্দেশ্য আর বিধেয়র প্রকারভেদ। বিভক্তির কাঁটা সরিয়ে শব্দরূপের বর্ণনা। তা হোক। আস্তে আস্তে হবে। হাতের সব আঙুল কি সমান হ

স্কুলের সেরা ছেলে প্রিয়নাথ। বছর ব গাদা গাদা প্রাইজের বই বগলে ব ফিরতো। বেড়া ডিঙিয়ে সকলের প্র ফলও পেয়েছে ঠিক। দশখানা গাঁ দণ্ডমুণ্ডের মালিক। মহকুমার হা কম কথা। সম্পদের বোরখা গায়ে জড় পুরোনো কথা তো মনেই থাকে মানুষের। সবই ভুলে যায়। কিন্তু প্রিয় ভোলেনি। কবেকার বেগমপুর স্কু ব্যাকরণের মাস্টার সব খুইয়ে দরজায় দাঁড়াতে ঠিক হাত বাড়িয়ে টেনে নিয়ে ময়লা কাপড়ের খুঁট দিয়ে চোখ মু মুছতে জগদীশ মাস্টার প্রিয়নাথের উ কামনা করেছেন। সিঁড়ি টপকে ট জজিয়তি। উদ্যোগী পুরুষসিংহের প কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

কাজ অবশ্য একটু একটু ব বাড়লো।

মাদুর বিছিয়ে জগদীশ মা পড়াতে বসেছেন। দুলে দুলে নাম চোদ্দ থেকে কুড়ির ঘর। একটানা মুখ ছাত্রদের ভুল হতে নিজেই তাদের স সুর মিলিয়ে বলছেন। তিন ে বিয়াল্লিশ, চার চোদ্দ—

দরজায় ছায়া। মুখ তোলার আ গলার আওয়াজ। মাস্টারমশাই। কর্তা গিন্নি। শশব্যস্ত জগদীশ মাস্টার দাঁড়ালেন। চৌকাঠ বরাবর গিয়ে দ হাত বুকের মাঝখানে রেখে বলে কি মা?

—টুলু বুলু ততক্ষণ পড়ুক, আ একটা কাজ করুন।

একটা কাজ! জগদীশবাবুর অ কিছু নেই। ভেসে যাওয়া মানুষকে এনে তুলেছে ওরা। ফুরিয়ে যা কাঠামোয় আশার আলো। রঙচটা বি ছবিতে রংয়ের প্রলেপ। একটা কেন, দ কাজ করতেও জগদীশ মাস্টার পিছপা ন

—কি, বলো মা?

—তুলসী ও'র সঙ্গে বাইরে গে বাজারটা একবার করে দিতে হবে।

ওঃ, এই কথা। কোঁচার খুঁটটা গায়ে জড়িয়ে নিলেন। পায়ে তালত চটি। পয়সা আর ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় দিয়েই খেয়াল হলো। কাজ হয়তো এ শক্ত কিছু নয় কোনায় জেলখানার সা

ন্তু হাড় জিরজির অথর্ব জগদীশ স্টারের কাছে দু মাইল দু মাইল চার ইল আসা যাওয়া, ভারি ব্যাগ কাঁধে য়ে এমন চনচনে রোদ্দুরে আবার ফেরা, ম কথা নয়।

নিজের ওপর জগদীশ মাস্টারের ধিক্কার লো। এই মানুষের ধাত। পায়ের তলায় টির নিশানা, মাথার ওপর ঝড় বৃষ্টি টকাবার আস্তরণ, ব্যস মেজাজও বদলে লো। যে ছাত্র এতটা করেছে, তার জন্য মান্য একটা কাজ করতেই ইতস্তত ভাব। ঃ. ছিঃ। জগদীশ মাস্টার শক্ত মুঠোয় গটা আঁকড়ে ধরে জোরে জোরে পা লালেন।

কিন্তু ব্যাপারটা এক দিনেই শেষ হ'লো ।, জের চললো দিনের পর দিন। ভারি তা কাজ। আজকালকার বাজারে একটা য়স্ক লোকের দুবেলা অন্ন যোগানো হজ কথা! দুটো বাচ্চা ছেলেকে নিয়ে সতেই একেবারে হিমসিম। নেহাৎ প্রয়নাথ সময় পায় না আর মাধবী জের শরীর নিয়েই ব্যতিব্যস্ত, নয়তো চি দুটো ছেলের জন্য আবার মাস্টার।

জগদীশ মাস্টার হাঁও নয়, হুঁও নয়। রীরটা একটু অথর্ব হ'য়ে পড়েছে, বেশী টিলে হাঁপ ধরে, কোমরের ব্যথাটা টাটিয়ে ঠে, নয়তো চলতে ফিরতে কোনদিনই ভয় ানিনি। যেদিন হাতের থলিটা ভারি থাকে, দিন গাছতলায় কিংবা চায়ের দোকানের মনে পাতা কাঠের বেঞ্চের ওপর একটু রিয়ে নেন। হাত দিয়ে কপালে জমে ওঠা মের ফোঁটা মুছে ফেলেন। কোঁচার খুঁট লে হাওয়া খেয়ে নেন। কোন রকমে দ আগের শক্তিটুকু ফিরে পেতেন। বুক য়ে পড়তেন প্রিয়নাথের সংসারে। দু'হাতে করতেন। বয়সের চেয়েও অশক্ত হ'য়ে ছেন। দুঃখের তাপে সারা শরীর স গিয়েছে, বুঝি হৃদপিণ্ডটাও। পথে জিরিয়ে নিলে তবু কিছুটা ত দূর হয়। কিন্তু তাতেও কিল।

বাড়ির সামনে এসেই জগদীশ মাস্টার ক দাঁড়ালেন। দরজার গোড়ায় ীলতা, দু-হাত দরজার দু'পাল্লায়।

—আশ্চর্য লোক আপনি মাস্টারমশাই, গ হ'য়ে মরতে চললেন তবু সাধারণ টক হলো না?

দুটো হাত টন টন করছে। থলি দুটো একটু নামিয়ে রাখতে পারলে হ'তো। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যও। কিন্তু উপায় নেই দরজা আগলে দাঁড়িয়েছে মাধবী। শুধু দাঁড়ানো নয়, দেরি করে আসার কৈফিয়ৎ তলব করছে।

একটু অবশ্য দেরিই হ'য়ে গেছে। ঘুরে ঘুরে মাছ কিনতে দেরি হলো একটু তার ওপর আগের দিন থেকে কোমরে একটা ফিক ব্যথার মতন হ'য়েছে। নড়াচড়া করতে কষ্ট। সেইজন্য আসতে সময় নিয়েছে। নয়তো জগদীশ মাস্টার গাছের তলায় বসেছিলেন খুব অল্পক্ষণের জন্য।

—দেশের লোকের সঙ্গে বসে বসে গালগল্প করছিলেন বুঝি? খেয়াল নেই একটা মানুষ ভোরে খেয়ে বেরোবে?

খেয়াল ছিল বইকি জগদীশ মাস্টারের। খুব খেয়াল ছিলো। সেইজন্যই সকালে মাধবীকে বলেছিলেন, আজ অন্য কাউকে যদি বাজারে পাঠাতে মা। আমার শরীরটা তেমন ভালো যাচ্ছে না।

মাধবী মুখ ঝামটা দিয়ে উঠেছিলো, শরীর আর আপনার কবে ভালো যাচ্ছে! একটা না একটা তো লেগেই আছে। দিব্যি ঘুরছেন ফিরছেন, কিন্তু কাজের কথা বললেই নাকে কাঁদুনি শুরু করেন।

দেশের লোক কোন চুলোয় যে গাল-গল্প করবেন তাদের সঙ্গে! আশে পাশে চেনা-জানা লোক ছড়ানো থাকলে আর পথে পথে ঘুরে বেড়াবেন কেন।

—নিন, আর সংয়ের মতন দাঁড়িয়ে থাকবেন না। বাজারের থলিটা রান্নাঘরে নামিয়ে রাখুন।

বাজারের থলি নামিয়ে জগদীশ মাস্টার নিজের কুঠুরিতে ফিরে এলেন। আর ময়লা ফতুয়াটা দড়িতে টাঙিয়ে মাদুরের ওপর টান হয়ে শুয়ে পড়লেন। কোমরের ব্যথা তো রয়েইছে, কিন্তু তার চেয়েও যেন বেশী লাগছে বুকের ব্যথাটা। প্রিয়নাথের সহধর্মিণী একটু কর্কশভাষিণী। রেখে ঢেকে কথা বলতে পারে না, মিষ্টি সুরেও নয়। এ বয়সে একটুতেই চোখে জল আসে। চোখের পাতা ভিজিয়ে গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে। বাধা মানে না।

জোয়ান মদ্দ ছেলে। বাপকা বেটা। চওড়া বুকের ছাতি। শক্ত সবল শরীর। স্টীমার কোম্পানীর অফিসের ...

রোজগার মন্দ নয়, অন্তত বাপ-বেটা দুজনের পক্ষে তো যথেষ্ট। বুক দিয়ে জগদীশ মাস্টার ছেলেকে আগলাতেন। বাড়ি ফিরতে একটু রাত হ'লে লণ্ঠন হাতে এক মাইল পথ ভেঙে নিজে এগিয়ে যেতেন স্টীমারঘাটে। ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে ফিরতেন। কিন্তু এত ক'রেও তো ছেলেকে পারলেন না আটকে রাখতে। কাল-বোশেখীর জলে ভিজে ছেলে বাড়ি ফিরলো। প্রথম প্রথম গা ব্যথা, অল্প সর্দি জ্বর। বাক্স খুলে জগদীশ মাস্টার হোমিওপ্যাথি ওষুধ দিলেন। বই দেখে দেখে। একদিন, দু'দিন, তিন দিনের দিন —ঘুষঘুষে জ্বর দাঁড়ালো, সান্নিপাতিকে। বিকারের ঘোরে আবোল তাবোল অর্থহীন প্রলাপ। জগদীশ মাস্টার প্যাঁটরা খুললেন। ছেঁড়া কাপড়ের রাশ, টোলখাওয়া পুরোনো আমলের ঘটি বাটি, সব সরিয়ে কাপড়-জড়ানো বালাদুটো হাতে তুলে নিলেন। মরে যাওয়া মানুষটার ওইটুকু চিহ্নই ছিলো। জগদীশ মাস্টার ভেবেছিলেন ছেলের বৌয়ের মুখ দেখবেন ওই সোনার

টুকরো দিয়ে। কিন্তু ছেলে বাঁচলে তো ছেলের বৌ। বালাদুটো পেটকাপড়ে জড়িয়ে কামিনী পোদ্দারের দোকানে, সেখান থেকে নীলমনি ডাক্তারকে নিয়ে ফিরেছিলেন মাঝরাত্তিরে। কিন্তু না, রাখতে পারেননি ছেলেকে। ভোরের দিকে সব শেষ। জগদীশ মাস্টারের আশা ভরসা, ভবিষ্যৎ সব কিছু। আঁকড়ে ধরার শেষ খুঁটি।

মাদুর ছেড়ে জগদীশ মাস্টার উঠে দাঁড়ালেন। এবার মাধবী ঘরের মধ্যে এসে ঢুকেছে।

—আচ্ছা মাস্টারমশাই এমন বেগার-ঠেলা কাজ কি না ক'রলেই নয়!

দুহাতে বুকটা চেপে ধ'রে জগদীশ মাস্টার সোজা হ'য়ে দাঁড়ালেন। অসহ্য দাপাদাপি বুকের ঠিক মাঝখানে। অস্থি মজ্জা তোলপাড় ক'রে কি একটা বেরিয়ে আসতে চায়। অনেক দিনের জমানো উত্তাপ, পুঞ্জীভূত বেদনা।

হাতের বেগুন দুটো মাধবী জগদীশ মাস্টারের চোখের সামনে ধরলো, নিজের চোখেই দেখুন একবার। এমন পোকায় খাওয়া বেগুন পয়সা দিয়ে কেউ কেনে? পয়সার শ্রাদ্ধ। না যদি পারেন, স্পষ্ট বললেই হয়। একটা মানুষের মুখ দিয়ে রক্ত ওঠা পরিশ্রমের পয়সাগুলো এভাবে জলে দেবার কোন মানে হয়? কথার সঙ্গে সঙ্গে মাধবী বেগুনদুটো ছুঁড়ে ঘরের

মেঝেয় ফেলে দিলো। বেগুন দুটোই শুধু নয়, জগদীশ মাস্টারের অদৃষ্টটাই পোকায় খাওয়া। সত্যিই তো, পয়সা কি গাছের ফল! সাত হাত মাটি খুঁড়লে একটি পাই হাতে ঠেকে! তবে? অন্যদিন কিন্তু বাছাই করেন জগদীশ মাস্টার। দোকানীর সামনে উঁচু হয়ে বসে চোখ কুঁচকে পরখ করেন। শুধু তরি-তরকারিই নয়, মাছের কানকো তুলে, দাড়িপাল্লার দিকে নজর রেখে যথাসাধ্য চেষ্টা। আজ শরীরটা ভালো না থাকায় সব গোলমাল হ'য়ে গেছে। সুযোগ পেয়ে দোকানীরা যা তা জিনিস থলিতে পুরে দিয়েছে।

নিচু হয়ে জগদীশ মাস্টার বেগুন দুটো কুড়িয়ে নিলেন। চোখের সামনে নিয়ে নখ দিয়ে খুঁটলেন কিছুক্ষণ, তারপর মুখ তুলে মাধবীর দিকে চেয়ে বললেন, সত্যিই তো মা। ব্যাটারা বড্ড ঠকিয়েছে। কিচ্ছু দেখতে পাইনি।

—পরের সংসারে থাকতে হ'লে একটু চোখ খুলে দেখতে হয় মাস্টার-মশাই। উত্তর যেন তৈরী ছিলো মাধবীর। উত্তর দিয়ে আর দাঁড়ালো না। চাবির গোছা ঝনাৎ ক'রে পিঠে ফেলে বাড়ির ভিতর।

হাতের বেগুন দুটো জগদীশ মাস্টার অনেকক্ষণ ধ'রে উল্টে-পাল্টে দেখলেন। একেবারে বোঁটার কাছে কয়েকটা দাগ। এটুকু কেটে বাদ দিয়ে অনায়াসেই রান্না করা চলতো। তা হয় তো চলতো, কিন্তু তা হ'লে তো কথা শোনানো যেতো না এমন ক'রে। জগদীশ মাস্টারের চোখে আঙুল দিয়ে কাজের গাফিলতি দেখানো যেতো না। ঔদাসীন্য আর অবহেলা; পোকার মতনই কুরে কুরে খায় মানুষের জীবন। মেরুদণ্ড ফোঁপরা ক'রে দেয়। মাথা তুলে দাঁড়ানোর সব প্রচেষ্টাকে অঙ্কুরেই বিনাশ। এই নিয়ে জগদীশ মাস্টার ক্লাসে কম চেঁচামেচি করেননি। মিষ্ট কথায় বুঝিয়েছেন প্রথমে, তারপর খিঁচিয়ে উঠেছেন। বোসেদের নন্দ, বাঁড়ুয্যেদের ফটিক, তেলীর বাড়ির কেষ্ট-ধন। পিছনের বেঞ্চে বসতো। কেবল ফাঁকি দেবার চেষ্টা। পড়াশোনায় গা

স্বপ্নেও কল্পনা করেন নি জগ মাস্টার যে, পরিণত বয়সে তাঁকেই অপদস্থ হ'তে হবে কাজে অব জন্য। তাও আবার ছাত্রের পরি কাছে।

প্রথম প্রথম শুধু মাধবীলতা: থেকে চুন খসলেই তেড়ে আসতো। কড়া কথা। এক কথার মানুষ। এক, মুখে আর, সে জাতের মেয়ে ভুল দেখলে রেহাই নেই। ইদানীং প্রিয়নাথও যোগ দিলো।

—ছেলেদুটোকে পড়াচ্ছেন মশাই, না কেবল বই সামনে রেখে গত পাপক্ষয় ক'রে যাচ্ছেন?

দিনগত পাপক্ষয়। একথা অন্য বলে বলুক, প্রিয়নাথ মুখ দিয়ে করলো কি ক'রে। এক আধদি টানা আট বছর। বই খাতা সামনে তাঁকে বৃথা সময় কাটাতে কোনদিন দেখেছে। প্রিয়নাথকে কোলের নিয়ে পড়িয়ে যাননি দিনের পর বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম থেকে ক'রে শব্দরূপের দুরূহ ব্যাখ্যা, দ কারক রহস্য। জগদীশ মাস্টার ফাঁকি দিলে প্রিয়নাথের জীবনেও থেকে যেতো। এমন ভরাট উঠতো না।

জগদীশ মাস্টার আমতা করলেন, না প্রিয়, আমি তো যথ চেষ্টা করি। দু' ঘণ্টা ধ'রে চেষ্টা। তবে কি জানো, তাহ'লে বাপু সত্যি কথাটা, জগদীশ তরল হবার কসরৎ করলেন, ঝিলিক ফোটালেন মুখে, তোমার মেধাবী হয়নি তোমার ছেলেরা। যেমন একটা জিনিস একবার দিলেই বুঝতে, এরা কিন্তু—

—যাক পুরোনো কাসুন্দি আর লাভ নেই। কবে ঘি খে তার গন্ধ শুঁকে কতদিন ক একটু মন দিয়ে পড়ান ছেলে দ জুতো মস মস ক'রে প্রিয়নাথ বেরিয়ে গেলো। বাইরের খোয়ার জুতের মসমসানি। জুতোর চা

হাঁটুর ওপর মুখ রেখে জগদীশ মাস্টার চুপচাপ বসে রইলেন। অনেক-ক্ষণ। সারাটা রাত বিছানায় এপাশ ওপাশ। ঘুম এলেই বিশ্রী সব স্বপ্ন। ধড়মড় ক'রে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লেন। সরে যাওয়া মানুষদের হাত-ছানি। সারা বেগমপুরে সেকেণ্ড মাস্টারের নাম ছিলো। নিজের দাপটে রাজত্ব করেছিলেন। মাথা উঁচু করে। সমস্ত গ্রামের লোক খাতির করতো মাস্টারকে। শুধু যে পড়াতেন শেষ রক্তবিন্দু দিয় তাই নয়, খাঁটি লোক ছিলেন। নির্ভেজাল। বিপদে আপদে ও'র কাছে মতলব নিতে লোকে আসতো। সন্ধিবিচ্ছেদই শুধু নয়, ভ্রাতৃবিচ্ছেদেরও জট ছাড়াতেন। জমিজমার ঐ চুলচেরা ভাগ-বাঁটোয়ারা, ঋণের সালিসী। কিন্তু এতদিন পরে কুঁজো হ'য়ে হ'য়ে দু' হাতে অপমানের কালি বুঝি মুখে মাখবেন। প্রাণঢালা পরিশ্রমের বদলে অখ্যাতি আর অবজ্ঞা।

রাত্রের চিন্তা কিন্তু ভোরেই উধাও। চুয়োতলা থেকে স্নান সেরে জগদীশ মাস্টার পুজোয় বসলেন। পূর্বদিকে মুখ ক'রে জবাকুসুম সঙ্কাশং-এর বন্দনা। শুধু রাত্রির অন্ধকারই নয়, হে সবিতা, মনের অন্ধকারও দূর করো। অপসারিত করো গ্লানি আর বেদনা।

নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। প্রিয়নাথ সাত কাজের মানুষ। ঝামেলা কি কম। বড় বড় মামলা। একটা কলমের আঁচড়ে এদিক ওদিক। দলিল দস্তাবেজ, বেড়াজালের ফাঁক, হাজার রকমের সমস্যা। মন মেজাজ সব সময়ে কি ঠিক থাকে। সব সময়ে ওজন ক'রে কথা বলা এমন মানুষের পক্ষে সম্ভব! তাছাড়া অন্যায়টাই বা কি বলেছে। আজ মাস ছয়েকের ওপর জগদীশ মাস্টার এ বাড়িতে এসেছেন। ছেলেদের ভার নিয়েছেন, কিন্তু সেই অনুপাতে পড়াশোনা কত-টুকু এগিয়েছে। কুড়ির ঘরের নামতাতেই মুখ থুবড়ে পড়ে রয়েছে দুজন, মাস ছয়েকেরও বেশী। কথামালার টক আঙুরের গণ্ডিই আর ছাড়াতে পারলো না। শুরুতেই এই, এর পর ব্যাকরণে পৌঁছোলে কি করবে! শুধু সর্বনামেই হরিনাম জপ করিয়ে ছাড়বে। নিশ্চয় শেখানোর মধ্যে গলদ রয়েছে। মেধাবী ছাত্র হ'লে আর ভাবনা কি। স্টীমলঞ্চের মতন জল কেটে কেটে ঠিক পারে গিয়ে পৌঁছোয়। টানা-হেঁচড়ার বালাই নেই। কিন্তু সব সময় বুদ্ধিমান ছেলেই পড়তে আসবে, তা হ'তে পারে না। ছোট ছেলের হাত ধরে সাবধানে কাদাপার ক'রে দেওয়ার মত সন্তর্পণে শেখাতে হবে তাকে। বেশী সময় নিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে।

পরের দিন থেকে একেবারে নতুন ক'রে শুরু। যতক্ষণ সময়ই লাগুক, পড়া না শেষ ক'র ওঠা চলবে না। ছুতো করে দুই ভাই একবার ভিতরে ঘুরে এলো। এক সঙ্গে নয়, পালা করে। জল খাবার ছল ক'রে। আর একজন পেন্সিল আনবার বায়নায়। কিন্তু আজকের পড়া শেষ করা চাই।

বাঘের গলায় হাড় ফোটার গল্প। পড়তে পড়তে টুলু বুলু মুখের ভাব এমন করলো যে হাড় বাঘের নয়, ওদেরই গলায় ফুটেছে। হাড় বের ক'রতেই দেড় ঘণ্টা কাটলো, তারপরও আবার ব্যাকরণের বিভীষিকা আছে, পঞ্চমাঙ্কে। আজ জগদীশ মাস্টার মরীয়া। স্নান খাওয়া সেরে দুপুরের দিকে আবার বসতে হবে। গাফিলতি চলবে না, একটু ফাঁকি নয়। পাপক্ষয় আর নয়, পুণ্য সঞ্চয়। শিশুদেবতাকে সব কিছু উৎসর্গ।

দশটা বাজতেই স্নান আহারের ছুটি। আবার বারোটার সময় বই নিয়ে

বসবে। পাটিগণিত আর সহজ ব্যাকরণ। অন্তত প্রিয়নাথের বলার কিছু না থাকে। প্রাণপণ চেষ্টা করছেন জগদীশ মাস্টার। এক তিল সময় নষ্ট নয়।

নিজে খাওয়া দাওয়া সেরে জগদীশ মাস্টার মেঝেয় মাদুর পেতে বসলেন। শোবার চেষ্টা করলেই ঘুমে চোখ জড়িয়ে আসবে। তার চেয়ে বসে থাকাই ভালো। ছাত্ররা এলেই পড়ানো আরম্ভ করবেন।

রোদ সরে সরে উঠানে নামলো। পেঁপে গাছের কাছ বরাবর। দূরের লোহার কারখানার পেটা ঘড়িতে একটা বাজলো। জগদীশ মাস্টার চমকে সোজা হ'য়ে বসলেন। একটু ঢুলুনী এসেছিলো। জড়িয়ে গিয়েছিলো চোখের পাতায় পাতায়। কিন্তু এর মধ্যে ছাত্ররা এসে ফিরে যায়নি তো। তা হলেই সর্বনাশ। মাধবীলতা তিলকে তাল করবে। কড়া কথার চাবুকে জন্মের মতন ঘুম ঘুচিয়ে দেবে।

আস্তে আস্তে জগদীশ মাস্টার উঠে পড়লেন। দরজার কাছ বরাবর গিয়ে ছাত্রদের নাম ধরে ডাকতে লাগলেন। প্রথমে নিচু গলায়, তারপর একটু চড়ালেন আওয়াজ।

দরজার কাছেই নেত্যর বিছানা। আঁচল পেতে সবে বেচারী চোখ বোজবার চেষ্টা করছিলো, মাস্টারের ডাকে ধড়মড়িয়ে উঠলো। উঁকি দিয়ে দেখেই চটে লাল, আচ্ছা লোক তো আপনি মাস্টার মশাই। ঠিক দুপুরে বেলা অমন ষাঁড়ের মত চেঁচাচ্ছেন কেন? বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে।

না, ডাকাত পড়বে কেন। জগদীশ মাস্টার আমতা আমতা করলেন। সে সব কিছু নয়। টুলু বুলু দুপুরে বেলা পড়তে আসবে, কিন্তু কই একটা বেজে গেলো, কেউ তো এলো না। প্রিয় বিশেষ করে বলেছে ছেলেদের ভালো ক'রে পড়ানোর জন্য।

নেত্য কিছু বলার আগেই মাধবীর গলার আওয়াজ শোনা গেলো। ঘুম জড়ানো স্বর।

—তোদের আক্কেলটা কি নেত্য। দুপুর বেলা খেটেখুটে মানুষ একটু ঘুমোবে, তাও কি তোদের জ্বালায় হবার উপায় নেই। কিসের এত চেঁচামেচি?

—চেঁচামেচি কি আর সাধে করছি বাছা। সারা সকাল খাটুনির পরে একটু শোবার যোগাড় করছি, বলা নেই, মাস্টার একেবারে ঘাড়ের ওপর। ছাত্র খুঁজতে বেরিয়েছেন।

কথা শেষ হবার আগেই দরজার পাশে মাধবীলতা। কোনরকমে শাড়ির আঁচল মাথায় ঠেকানো। দু চোখে আগুনের ছিটে।

—বলি বুড়ো হ'য়ে আপনার কি ভীমরতি হ'য়েছে। ঠিক দুপুরবেলা, কেউ কোথাও নেই, আপনি একেবারে হুট ক'রে অন্দরমহলে ঢুকেছেন?

কথা নয়, জ্বলন্ত অংগারের টুকরো ছুঁড়ে ফেলা হলো জগদীশ মাস্টারের মুখের ওপর। সারা মুখ পুড়ে ছাই। দগদগে ঘা।

চৌকাঠের ওপাশে সরে গিয়ে বললেন। থেমে থেমে ঢোঁক গিলে।

—টুলু বুলুকে খুঁজতে এসেছিলাম মা। দুপুরবেলা আমার কাছে পড়বার কথা। প্রিয় বলছিলো বড্ড ওরা পিছিয়ে পড়েছে। পড়াশোনা তেমন নাকি এগোচ্ছে না।

—তাই আপনি আদাজল খেয়ে লেগেছেন দুধের বাচ্চাদের পিছনে। ভোর থেকে বেলা দুপুর অবধি এক প্রস্থ, আবার দুপুর থেকে গাজন শুরু হবে। কপাল আমার। দেশে আর মাস্টার ছিলো না। যতো উটকো লোককে ঘরে ঢোকানো। প্রাণ অতিষ্ঠ করে তুলছে। দরকার নেই সোহাগ ক'রে, পুরোনো মাস্টার রেখে। দুষ্টু গরুর চেয়ে আমার শূন্য গোয়াল ভালো।

শেষের কথাগুলো জগদীশ মাস্টারের কানে যায়নি। দু কানে আঙুল দিয়ে তিনি ঘুরে দাঁড়িয়েছিলেন। দুটো পা-ই কাঁপছে। থরথর ক'রে। জোরে হাঁটতে গেলেই ছিটকে পড়ে যাবেন। দরজা জানালা, মেঝে সব দুলছে। খুব আস্তে।

কোন রকমে দেয়াল ধরে ধরে নিজের ঘরে গিয়ে পেঁছোলেন। দুটো হাতে বুক চেপে মেঝেতে টান। নিঃশ্বাস বন্ধ হ'য়ে আসছে। অসহ্য উত্তাপ ব্রহ্মতালুতে কোণে রাখা কুজো থেকে জল গড়িয়ে মুখে চোখে ছিটিয়ে দিলেন। এখনও কথাগুলো কানের কাছে ঘোরাফের করছে। হুল ফোটাচ্ছে সারা গায়ে।

এখনও বুঝি সময় আছে। পিছু হেঁটে হেঁটে এখনও যদি বেগমপুরে ফিরে যাওয়া যায়, পুরোনো পরিবেশে অপমানের কালি ধুয়ে হাতড়ে হাতড়ে পুরোনো ইজ্জত কুড়িয়ে নেওয়া। পাঁজর কাঁপানো দীর্ঘশ্বাস। শুধু জমির দূরত্বই নয়, বেগমপুর সরে গেছে নাগালের বাইরে, অন্য মানুষের এলাকায়। সমস্ত বিষ অঞ্জলি ভ'রে ঢালতে হবে গলায়। নীলকণ্ঠের দুর্বিষহ জীবন। এ ছাড়া আর কোন উপায় নেই।

বিকালের দিকে ছাত্ররা গুটি গুটি ঘরে এসে ঢুকলো। দিন দশেক পড়তে হয়নি। জগদীশ মাস্টার শয্যাগত। বই হাতে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দুজনেই সরে গেছে। যতদিন ছুটি পাওয়া যায়।

বিছানো মাদুরে দুজনে বসলো। সামনে দেয়ালে হেলান দিয়ে জগদীশ মাস্টার। শরীর এখনও দুর্বল। বেশী জোরে কথা বলতে গেলে হাঁপ ধরে। কিন্তু অনেক দিন পড়া কামাই গেছে। এখন থেকে শুরু না করলে অথৈ জলে পড়বে। কূল কিনারা পাবে না।

—আজ তোমরা পড়ো, আমি আর বেশী চেঁচাতে পারবো না। টুলু কবিতার বই বের করো, বুলুকে গোটা কয়েক অংক দিই। জগদীশ মাস্টার হাত বাড়িয়ে শেলট টেনে নিলেন।

টুলু বই খুলেই চেঁচাতে শুরু করলো। সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি। তারপর সারাদিন ভালো হ'য়ে চলার অস্থায়ী প্রতিজ্ঞা। দাসদাসী গুরুজন সকলকে সন্তুষ্ট রাখার প্রতিশ্রুতি। বুলু শেলটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। গরুর কেনাবেচার হিসাব। লাভ-লোকসানের খতিয়ান।

ভেজানো দরজায় ঠুক ঠুক। অসময়ে কে আবার এসে দাঁড়ালো। বাইরে যাবার

ফাই ফরমাশ হলেই তো সর্বনাশ। দাঁড়াতেই কষ্ট হ'চ্ছে জগদীশ মাস্টারের। চলতে গেলেই টলে পড়বেন।

টুলু বুলু ওঠবার আগেই দরজা খুলে গেলো। হাতের ধাক্কায়। নেত্য, কোলে লোটন। তুঁতে রঙা শাড়ি, সাদা ব্লাউজ। টেনে বাঁধা চুল। বয়স হ'লে হবে কি নেত্যর সাজের বাহার আছে। মাদুরের ওপর লোটনকে নামিয়ে দিলো। আঁচল দিয়ে ঠোঁটের পাশে গড়িয়ে আসা পানের রস মুছে নিয়ে বললো, আমরা একটু বেরুচ্ছি। লোটনকে একটু দেখবেন। হামাগুড়ি দিয়ে যেন বাইরে চলে না যায়।

খবরটা ছাত্রদের মুখে জগদীশ মাস্টার আগেই শুনেছিলেন। কাছে পিঠে কোথায় সিনেমা হয়েছে। প্রিয়নাথের পয়সা লাগে না। হাকিমকে খুশী রাখতে কে না চায়। নেত্যও যাবে মনিবগিন্নীর সংগে অবশ্য এ আর শক্ত কাজ কি। একটা মেয়েকে চোখে চোখে রাখা। বাচ্চা মেয়ে। জগদীশ মাস্টার হাত বাড়িয়ে লোটনকে কাছে টেনে নিলেন।

ঘণ্টা দুয়েকের মামলা। নেত্য যখন ফিরলো তখন জগদীশ মাস্টার লোটনকে ঘুম পাড়িয়ে ফেলেছেন। চাপড়ে চাপড়ে। সাবধানে মাদুরের এক পাশে শুইয়ে দিয়েছেন। ছেলেদের পড়াশোনাও শেষ। জগদীশ মাস্টার পুরনো দিনের গল্প শুরু করেছেন। সোনার কল্কা বসানো দামী শাড়ির আঁচলের মতন আলো-ঝলমল দিনগুলোর কথা।

—ওমা, অবেলায় ঘুমিয়ে পড়লো, নেত্য নিচু হ'য়ে ঘুমন্ত লোটনকে কোলে তুলে নিলো, তারপর ছেলেদের দিকে চেয়ে বললো, চলো তোমরা। খেতে টেতে হবে, না হাঁ ক'রে গল্প শুনলেই পেট ভরবে?

ঘর খালি হয়ে যেতে জগদীশ মাস্টার সাবধানে উঠে বিছানা পেতে ফেললেন। একটানা ব'সে থেকে শির-দাঁড়া টন টন করছে। রাত্রে খাওয়ার বালাই নেই। সুবিধা হ'লে, সকলের খাওয়া দাওয়া চুকলে এক বাটি সাবু। নেত্যই দিয়ে যাবে এক সময়ে।

তন্দ্রার ঘোর। তার মধ্যেই জুতোর শব্দ কানে এলো। প্রিয়নাথ বুঝি ফিরলো। এত রাত। কাছারী থেকে অন্য কোথাও গিয়েছিলো বোধ হয়। মাধবীর গলা। প্রিয়নাথের অস্ফুট উত্তর। থালা বাসনের শব্দ। চুড়ির আওয়াজ।

হঠাৎ জগদীশ মাস্টারের ঘোর কেটে গেলো। অনেকগুলো কণ্ঠের সম্মিলিত শব্দ। উঁচু পর্দায়। প্রিয়নাথ আর মাধবীর কথার ফাঁকে ফাঁকে নেত্যর বুকনি। মাঝে মাঝে আর্দালী তুলসীর গলাও কানে এলো। টুলু বুলুর চেঁচামেচি। জগদীশ মাস্টার উঠে বসবার আগেই দরজার কড়া নাড়ার আওয়াজ।

মেঝে পেরিয়ে দরজার কাছে পোঁছবার আগে আরো বার দুয়েক অসহিষ্ণু ধাক্কা।

দরজা খুলেই জগদীশ মাস্টার পিছিয়ে এলেন। প্রথমে মাধবী তারপর প্রিয়নাথ, একেবারে পিছনে নেত্য। কি ব্যাপার? কিসের মিছিল।

মাস্টার মশাই, প্রিয়নাথ রাগে ফেটে পড়লো। আর কিছু বলতেই পারলো না।

যে কথা প্রিয়নাথ বলতে পারলো না, সে কথা বললো মাধবী,—লোটনের হারের লকেট কোথায়?

সব কথাগুলো জগদীশ মাস্টারের কানে গেলো না। দুর্বল শরীর। কানের কাছে অবিশ্রান্ত বোলতার গুঞ্জন। কিন্তু কথার কিছুটা কানে গিয়েছিলো বৈকি।

লকেট? কার লকেট! কিসের লকেট!

ন্যাকামি! কিছু জানেন না। ভাজা মাছ উল্টে খেতেও নয়! ও-সব চালাকি অন্য জায়গায় করবেন।

প্রত্যেকটি কথা মাধবী স্পষ্ট করে উচ্চারণ করলো। ঘুমন্ত মানুষকে ঠেলা দিয়ে জাগানো যায়, কিন্তু জেগে ঘুমোলে কার সাধ্য তোলে তাকে।

—লোটন তো প্রায় সারাক্ষণ আমার কোলেই ছিলো, পড়ে গেলে আমি তো জানতে পারতাম। তবু জায়গাটা একবার দেখা উচিত।

কিন্তু জগদীশ মাস্টার নিচু হবার আগেই নেত্য মাদুর সরিয়ে ফেললো। বিছানার চাদর টান দিয়ে এক পাশে। কুঁজোর পিছনে, ভাঙা আলনার পাশে তন্ন তন্ন করে খুঁজলো।

দু হাত কোমরে দিয়ে মাধবী দাঁড়ালো, কেন মিছিমিছি খেটে মরছিস নেত্য। সোনার জিনিস বাইরে ফেলে রাখবারই লোক কি না। সে হজম হয়ে গেছে এতক্ষণে।

প্রিয়নাথ এগিয়ে এলো। জগদীশ মাস্টারের মুখোমুখি। কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেলো। মাধবীর কথায়।

—নেত্য, ওই প্যাটারাটা খোল। থাকে তো ওর মধ্যেই থাকবে।

ফ্রাঙ্কস মার্টিন নামক ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একজন কর্মচারী ১৬৭৪ খৃষ্টাব্দে এই নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে এই শহর ইংরেজ, ওলন্দাজ এবং ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ১৬৯৩ খৃষ্টাব্দে ইহা ওলন্দাজগণের অধিকারে আসে; কিন্তু ১৬৯৭ সালে 'রিসউইক সন্ধির' শর্ত অনুসারে প্রত্যার্পিত হয়। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সেনাপতি স্যার আয়ার কুটি ফরাসী সেনাপতি মঃ লালির নিকট হইতে এই শহর অধিকার করেন এবং ১৭৬৩ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদের প্রত্যর্পণ করা হয়। ইহার পর ১৭৭৮-১৭৮৩, ১৭৯৩-১৮০২, ১৮০৩-১৮১৬ এই শহর বৃটিশ অধিকারে ছিল। অবশেষে ১৮১৪ সালের ৩০শে মে ইঙ্গ-ফরাসী প্যারিস চুক্তির শর্ত অনুসারে ১৮১৬ খৃষ্টাব্দে এই শহর ফরাসীদের প্রত্যর্পণ করা হয়। এই ভূখণ্ডের মোট পরিমাপ ১১৩ বর্গ-মাইল এবং লোকসংখ্যা ২,০৪,৬৫৩ জন। চাউল, তামাক, তুলা এবং নারিকেল এখানকার প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য। ইহা ছাড়াও কাপড় এবং তৈলবীজ এখান হইতে রপ্তানি হয়। বর্তমান যুগের এক শ্রেষ্ঠ মনীষী ঋষি অরবিন্দের সাধনার ক্ষেত্র এইখানেই এবং এখানকার শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম এক দর্শনীয় বস্তু।

(৩) **কারিকল:** ভারতের পূর্ব উপকূলে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীর এক 'ছিটমহল' হিসাবে এর অবস্থিতি। ১৭৩৮ খৃষ্টাব্দে তাঞ্জোরের রাজা সরফ্জি এই ভূখণ্ড ফরাসীদের হস্তে অর্পণ করিবার এক অঙ্গীকার করেন, কিন্তু এই অঙ্গীকার পালিত না হওয়ায় ১৭৩৯ খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা এই স্থান দখল করে। কাবেরী নদীর মোহনায় অবস্থিত এই শহরটি অতীব মনোহর। ১৮০৩ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইহা বৃটিশের অধিকারে ছিল, পরে ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসীদের প্রত্যর্পণ করা হয়। এখানকার জমি খুব উর্বর এবং প্রচুর চাউল এখানে উৎপন্ন হয়। গভীর সমুদ্র উপকূল কারিকলকে একটি সুন্দর বন্দরে পরিণত করিতে পারিত, কিন্তু উপযুক্ত রক্ষণা-বেক্ষণের অভাব ইহাকে উৎকৃষ্ট বন্দরে উন্নীত করিতে পারে নাই। ইহার আয়তন

ফরাসী-ভারত সোস্যালিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ

ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে আলোচনার পর করমর্দনরত শ্রীবালকৃষ্ণ মেনন ও ম্যঃ মারা

ফরাসী-ভারত প্রতিনিধি পরিষদের সভাপতি শ্রীবালসুব্রামাণ্যম। স্বাধীনতা প্রাপ্তির দিন-ই ইনি পরলোকগমন করেন

১৩৫ বর্গ কিলোমিটার এবং লোকসংখ্যা ৬০,৫৫৫।

(৪) **ইয়ানামঃ** ইয়ানাম ভারতের পূর্ব উপকূলে অবস্থিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হায়দ্রাবাদের নিজাম মুজাফ্ফর জঙ্গের নিকট হইতে এই স্থান ফরাসী অধিকারে আসে এবং কয়েকবার হাতবদলের পর প্যারিস সন্ধি অনুসারে ইহা স্থায়ীভাবে ফরাসী অধিকারে আসে। গত মে মাসে এখানকার অধিবাসীবৃন্দ এই ভূখণ্ডকে ফরাসী অধিকার হইতে মুক্ত করেন।

(৫) **মাহেঃ** এই ভূখণ্ড ভারতের পশ্চিম উপকূলে ১১·৪৩ উত্তর ৭৫·৩৩ পূর্ব অক্ষাংশে মাহে ন মোহনায় অবস্থিত এবং মাদ্রাজের মালা জিলার সহিত সংশ্লিষ্ট। ১৭ খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে 'বাদাগার রাজার নিকট হইতে ফরাসীরা ভূখণ্ড অধিকার করে। গত 'মে' মা এখানকার ফরাসী শাসনকর্তা গ আন্দোলনের নিকট নতি স্বীকার করি জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি হস্তে ইহার শাসনভার অর্পণ করে এই ভূখণ্ডের আয়তন ২৬ বর্গমাইল এ লোকসংখ্যা ১৪,০৯২।

ইহাই হইল মোটামুটিভাবে ভারতে ফরাসী উপনিবেশগুলির ইতিহাস। ১ নবেম্বর হইতে এই উপনিবেশগুলি অবলুপ্তির পর ভারতের বুকে দুষ্টক্ষত মত রহিল তিনটি পর্তুগীজ উপনিবেশ গোয়া, দমন, দিউ। জনমতের চাপে এ উপনিবেশগুলিও অদূরভবিষ্যতে ভারতে সহিত যুক্ত হইবে, ইহা সুনিশ্চিত; যদি বর্তমানে পর্তুগীজ সরকার অমানুষি অত্যাচার চালাইয়া পর্তুগীজ ভারতে অধিবাসীদের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে পদদলি করিবার সর্বপ্রকার চেষ্টা করিতেছেন।

মলুটি গ্রামের কালীপূজো
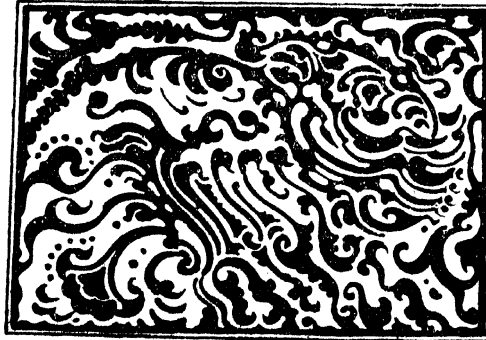
সমরেশ বসু

এই তো ঘরের কোণে। তবু যেন সে রূপকথার দেশ, সাঁওতাল রগণা। এ পরগণারই এক ছোট্ট গ্রাম, ম তার মলুটি। রাজধানীর নাগরিক খে সে রূপকথারই দেশ। কিন্তু টিতে তার কোদালের কোপ পড়লে ন্ খন্ করে বাজে। মাটি নয়, পাথর। াল পাথর। পাথরের মত শক্ত সেই লাল টিতে বলদের খুর বাজে ঠক্ ঠক্ রে। থ্যাবড়া কালো কালো পা চ'লে চ'লে দুরে মাথা সিঁথির মত দিগন্তে রিয়ে গেছে সরু পথের দিশা। কালো বড়ো থেবড়ো কঠিন মুখ আর অবিন্যস্ত করা-চুলো মানুষ। দেখে মনে হয়, ঠিন রূপকথার দেশ।

কাছেই, কিন্তু সে এখন অনেক দূরে। কেলারে বিহার প্রদেশে। আগে ছিল ংলা সীমার আওতায়। নতুন প্রদেশ াগাভাগিতে, সে এখন বঙ্গ-অঙ্গ-ছিন্ন হার প্রদেশিনী। রামপুর হাট থেকে ইল দশেক। দুমকা থেকে ত্রিশ ইলের উপর। বিহার প্রদেশের দক্ষিণ ীমার এক গ্রাম হল মলুটি। মলুটি াপটে রয়েছে বীরভূম জেলার উত্তর য়ে। কিন্তু রামপুরহাট থেকে শুঁড়িচুয়া ংলা অর্থাৎ বীরভূমের মধ্যে।

কালীপুজোর সময় রামপুরহাটে কোন ঙালীকে একা কিংবা সপরিবারে খলেই অনুমান করে নেওয়া যায়, তিনি লুটি যাত্রী। মোটর বাস ক'টি আছে নিনে। কিন্তু টায়ারে মাডগার্ডে আর নটে মাটির রংএ লাল ছোপ ধরা একটি টরবাস গোঁ গোঁ করে গর্জাবে, হি হি র কাঁপবে আর হাঁকবে, 'শুঁড়িচুয়া' ধরে। মলুটি বলে হাঁকবে গরুর ড়ির গাড়োয়ানেরা। এ সময়ে দুদিনের নতুন গাড়োয়ানেরা এসে ভিড় করে ্যান্য কাজ ফেলে। দূর দূরান্তের ুবেরা আসে এ সময়ে মলুটিতে। ভাড়া পাওয়া যাবেই। দু পয়সা বেশী বই কম নয়।

ভিড় এড়াতে হলে ঢুকুস্ ঢুকুস্ গরুর গাড়ি। পাঁজরার হাড় এ'কবে বে'কবে গরুর গাড়ির মতই ক্যাঁক্ ক্যাঁক্ ক্যাঁকোর ক্যাঁকোর। মোটর বাসে গেলেও সেই শুঁড়িচুয়া, বাংলা সীমান্ত। বাস চলে যাবে এক পথে দুমকার দিকে। মলুটি যেতে হবে অন্য পথে, গরুর গাড়িতে নয় তো পায়ে হে'টে।

রামপুর হাটের সীমা পেরিয়ে এসেই চোখের দৃষ্টি চলে যাবে দূর দূরান্তে। উ'চু নীচু তেপান্তর, তারপরে আরও উ'চু। তারপরে শুধু আকাশ। আকাশ অসীম ও অনন্ত। আকাশের নাগাল কাছে আসতে আসতে আবার উৎরাই।
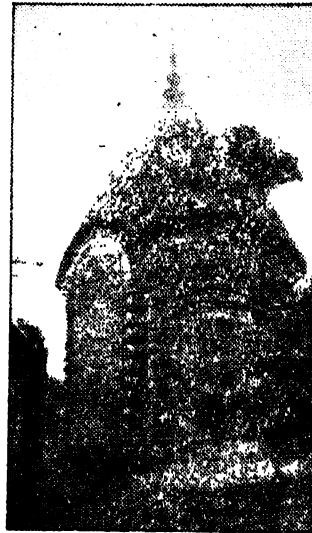
পোড়া ই'টের শিল্পকলা আঁকা এমনি অনেক শিবমন্দির মলুটির পথে পথে রয়েছে।

উৎরাই আর শাল তালের বন। বন মহুয়ার। বন নয় কুঞ্জ। ফাঁকে ফাঁকে, দূরে দূরে, হঠাৎ এক রাশ তালের ছায়া। চড়াই থেকে উৎরাইয়ে নেমে গেছে শাল মহুয়া। আর এখানে সবই অদ্ভূত রকম ঋজু। খাড়া আর সটান। তাই দূরে থেকে সুন্দর ও উদ্ধত।

কুচকুচে কালো আর হলদে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করবে, 'বলছিলাম, কুথা যাবেন গো বাবু?'

—'মলুটি।'

সে বলবে, 'মইলুটি? কোন তরফে?'

তরফ কি, না জানলে চুপ করে থাকতে হবে। গাড়োয়ান বুঝে নেবে, বাবুটে আর কোখুনো আসে নাই। জিজ্ঞেস করবে, 'বলছিলাম, কন্ বাবুর বাড়ি যাবেন?'

কথার সুরে চড়াই উৎরাইয়ের উঠা-নামা। বাবুর নাম কবেন, আর গাড়োয়ান আপনাকে রূপকথার কাহিনী বলতে আরম্ভ করবে।—'উ বাবুটে? উয়োঁ তো রাজার বেটা। তার লাগাত অমুক বাবুর বাড়ি, উয়োঁ রাজার বেটা। তার লাগাত্... সব, সবাই রাজার বেটা আর লাতি। যদি বলেন, তরফটা কিসের? তা' হলে রূপ-কথা জমবে।

রূপকথা নয়, ইতিহাস। ইতিহাস আর কিংবদন্তী মিলে সব রূপকথা হয়ে গেছে। সামনে শুঁড়িচুয়া। গ্রাম নয়, মাঠ নয়। গাছ নয়, বন নয়। বিলকুল ছে'টে দেওয়া এক বিশাল ভূমিখন্ড। প্রায় চার মাইল স্কোয়ার জুড়ে গ্রাম ও ক্ষেতখামার উচ্ছেদ করে দিয়ে তৈরী হয়েছিল এরোড্রাম। এখন পরিত্যক্ত ও ভাঙ্গা। সিমেন্ট আর পীচের বড় বড় সড়ক ভাঙ্গা, কালো পাথর কাঁকরে কণ্টকিত। গরুর গাড়ি পাশের মাটির উপর দিয়ে যায়। নইলে চাকা ও জানোয়ারের খুর দুদিনে ক্ষয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

অনেকগুলি গ্রাম ছিল এক সময়ে। সাঁওতালী গ্রাম। বাঙ্গালীও ছিল কিছু কিছু। কোথায় চলে গেল, কোন্ দূরে। 'উয়ার কি কন' ঠিক ঠিকেনা আছে গ'? সগলার ইজ্জৎ ঢিলা করে দিলে।'

শুঁড়িচুয়া নামটাই তার অর্থবহন

করছে। শৌণ্ডিকের ঘরে কিসের নির্যাস ক্ষরিত হয়, জানেন সকলেই। তার জন্যই শুঁড়িচুয়া। খ্যাতিও ছিল।

তারপরেই দক্ষিণের তাল শালের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেবে মন্দিরের চূড়া।

গাড়োয়ান হাঁকবে, 'ইঃ হা—, শালো বাল্‌ছিস্‌ কুথা র‍্যা? বলদটে মানুষ লয় দেখছি।'

বটেই তো! তারপর মন্দিরের চূড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাটির দেয়াল, টিন অথবা পাতার দোচালা, চারচালা, আটচালা। মল্লুটি গ্রাম। কিন্তু রাজার প্রাসাদ কোথায়? খুঁজলে গোনা গাঁথা কয়েকটি পাকা বাড়ি চোখে পড়বে। আর সবই মাটির দেয়াল। পাথুরে মাটির দেয়াল। ও-ই তো আসল রূপকথা।

গ্রামে ঢুকতে গিয়েই বাধা। সামনে পূব থেকে পশ্চিমে ধাবিত সংকীর্ণ জলধারা। গাড়োয়ান বলে, লদী বটে। গাঁয়ের লোকেও বলে নদী। এর কলকল শব্দের সঙ্গেই কানে আসবে ঢাকের বাজনা। কালীপূজার বাজনা। ভিড়ও চোখে পড়বে। পূজোর ভিড়।

গ্রামে ঘন বসতি। গায়ে গায়ে ঘর। এ বাড়ির খিড়কির দোরের সঙ্গে ও বাড়ির সদর দরজা মুখোমুখি করে আছে। যত ঘর, তত মন্দির। মন্দির তার চেয়েও বেশী। দোমড়ানো, আস্তো, ভাঙ্গা, আর মন্দিরে মন্দিরে বাংলার বিচিত্র পোড়া-ইঁটের কারুকার্য। পৌরাণিক কাহিনী চিত্রের মিছিল। পথের উপরে বসেছে দোকান। মনোহারী, পান-বিড়ি-চা।

এক জলধারা পেরিয়ে সরাসরি দক্ষিণে চলে গেলে আর এক জলধারা। সেও পূব থেকে পশ্চিমে। গাঁয়ের লোকে বলে কাঁদর। এই দুই স্রোতস্বিনী গিয়ে পশ্চিমে একত্র হয়েছে। মল্লুটিকে গড় বেষ্টিত করেছে এই দুই প্রাকৃতিক নদী। দক্ষিণের কাঁদরের ওপারে বীরভূম।

সারা গ্রামে উৎসবের আলোড়ন। কিন্তু রাজবাড়ি কোথায়! তরফ কিসের? তা' হলে ইতিহাস আর কিংবদন্তীর কাহিনী শুনতে হয়। তারপর উৎসবের বিবরণ।

—সি ক—ন্‌ কালের কথা গো! সিদিন নাই, আর আসবে—ক নি।'

তখন পাঠানের রাজত্ব। বীরভূমের কাটি গ্রামে থাকতেন এক ব্রাহ্মণ। সৎ ব্রাহ্মণ। তার ছেলে বসন্ত। ব্রাহ্মণের মৃত্যু হল। বিধবা পরের বাড়ি রাঁধে আর পরের বাড়ির গরু চরায় বসন্ত।

তখন বসন্ত ছোট। গরমের দুপুরে গরু ছেড়ে শুয়েছিল গাছতলায়। ঘুমিয়ে পড়েছিল। সে সময় কমণ্ডলু নিয়ে যাচ্ছিলেন এক ব্রহ্মচারী। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালেন। দেখলেন মস্ত এক

শিবমন্দিরের গায়ে পোড়া-ইঁটের উপর 'বামনাবতার'

সাপ, ফণা মেলে ছায়া ঘিরে রেখেছে বসন্তের মুখে। ব্রহ্মচারী বুঝলেন, এ ছেলে, যে সে ছেলে নয়। ভাল করে চেয়ে দেখলেন রাজচিহ্ন তার সর্বাঙ্গে। ডেকে তুললেন। জানলেন তার সব কথা। তারপর ছেলেকে নিয়ে গেলেন তার মায়ের কাছে। বললেন, 'মা ছেলে তোমার রাজা হবে। কিন্তু ওকে যে দীক্ষা নিতে হবে?

তা' কি করে সম্ভব। ব্রাহ্মণের ছেলে। ন' বছর বয়সেই তার উপনয়ন ও দীক্ষা শেষ হয়েছে। ব্রহ্মচারী বললেন, তা হোক। বসন্তের গুরুমন্ত্র আমি বিল্বপত্রে লিখে দিচ্ছি। সে গিয়ে তা জলে ভাসিয়ে আসুক। তারপর আমি তাকে নতুন মন্ত্রে দীক্ষা দেব।

ভাল। ব্রাহ্মণী তো হেসে কেঁদে ব না। ছেলে তার রাজা হবে। রাঁ বামণীর রাখাল ছেলে রাজা।

' কিন্তু বাদ সাধলেন বসন্তের এসে পড়ে। বৃত্তান্ত শুনে তিনি অভি দিলেন, 'রাজা হবি, কিন্তু ভোগ ক পাবিনি। অল্পায়ু হবি।'

তারপর দিন যায়। বসন্ত গরু চ ব্রাহ্মণী রাঁধেন। এমন সময় এব সন্ধ্যাবেলা, মাঠ থেকে গরু নিয়ে ফি বসন্ত। হুস্‌ করে এক পাখী ঝাঁপিয়ে পড়ল বসন্তের বুকে। প গলায় বাঁধা সোনার শিকল।

ওদিকে পাঠান সম্রাট আলাউ বুক চাপড়াচ্ছেন। মৌরেশ্বরের শি ময়ূরাক্ষীর তীরে। সম্রাট-সোহাগী ি সোনার শিকলশুদ্ধ একেবারে সম্র হাত থেকেই হাওয়া হয়েছে। দিল্লী আসছিলেন বাংলায় গোটা কয়েক বাঁকানো, মাথা উঁচনো সামন্তরা শায়েস্তা করতে। কিন্তু পেয়ারের পা তো আর ছেড়ে আসতে পারন সেই পাখী ফুড়ুৎ। লোক লস্কর, ে সেনাপতি সবাই গেল। পাখীর মিলল না। আশাতীত পুরস্ক ঘোষণা হল।

এদিকে বসন্তের মামা ব্যা জেনে, ভাগনের হাত থেকে প হাতিয়ে নেওয়ার ফিকির করলেন। বসন্ত নারাজ। অগত্যা, নিজে না ভাগ্নেই রাজা হবে, এই ভেবে বস নিয়ে হাজির হলেন শিবির দরবারে।

সম্রাট তো মহাখুশী। হুকুম দি কাল সূর্যোদয়ে ঘোড়া নিয়ে বসন্ত। সূর্যাস্তে ফিরে আসবে জায়গা ঘুরে, সবই তার নিষ্কর ভূমি যাবে।...তাই হল। বসন্ত ভোর ঘুরে সন্ধ্যায় ফিরে এল।

নিষ্কর ভূমির ছাড়পড় নিয়ে গেল আলাউদ্দিনের কাছে। উনি খাচ্ছিলেন। কোথায় দোয়াত কলম। পাঞ্জার ছাপ বসিয়ে দিলেন ছাড় সম্রাটের এঁটো হাতের ছাপ, সইয়ের দামী। খালি মালিকানা নয়, ব 'বসন্ত রাজা। রাজা রাজবসন্ত।' ও সোনাদানা, কারিগর, ভাস্কর, সেনাপতি, সবই দিলেন। রাজা রাজ

খোপাধ্যায়' ছেড়ে 'রায়' উপাধি নিলেন।

কিন্তু সেই পূর্ব গুরুর অভিশাপ? তো ফলবেই। ফললও তাই। রাজ-ন্তের ছেলে হল, রাজা মারা গেল।

ছেলের নাম 'রামসা'। মায়ের আদরের ৷। ছেলের বাপ নেই, ছেলে স্বেচ্ছাচারী উঠল। হাতে মাথা কাটে সকলের। া হয়ে আরও বাড়াবাড়ি আরম্ভ হল। শপাশের রাজ্যেও তার থাবা পড়ল। পেলেই যুদ্ধ।

খবর গেল দিল্লীতে। ছুটে এল শার ফৌজ। রামসা তখন ঘোরতর দ্রাহী। হটিয়ে দিল বাদশার ফৌজকে। র পেয়ে বাদশা তো অগ্নিশর্মা। লেন, 'লাখ সেপাই গিয়ে কাটা মাথা য় আসুক রামসার।'

গুপ্তচরের কাছে খবর পেয়ে রামসা পাকাৎ। মারেন হরি তো রাখেন কে? থ সেপাই। আরে বাপরে। এমন সময় লন বসন্তের মন্ত্রগুরু ব্রহ্মচারী। লেন, সর্বনাশ করেছ, এবার মরো।' বললে কি হয়। গুরুর পায়ে মূর্চ্ছা লেন রামসা। উপায় নেই। আচ্ছা, চ্ছা! শীঘ্র রাজপরিবারের গুষ্টিবর্গকে কানো হল। রামসা ব্রহ্মচারীর সংগে টল দিল্লীতে। দিল্লীতে এসে ব্রহ্মচারী থা করল এক ফকিরের সংগে। বাদশার ছে ফকির বড় সম্মানী মানুষ। ফকির লবেলা ব্রহ্মচারী আর রামসাকে নিয়ে কবারে দরবারে। ফকিরকে অভ্যর্থনা লেন সম্রাট। ফকির বললেন, 'শাহেন বেয়াদপি মাফ্ হয়। এক হিন্দুর জান াই দিতে হবে।

বাদশা বললেন, 'রামসার জান চাইবেন

ফকির বললেন, 'শাহেন শা! রামসা দিল্। যোয়ানীর গরমে একটা তাকি করে ফেলেছে। পাপী মাফ্ লে মাফ করা বাদশাহের ধর্ম। রেহাই ।'

অমনি রাজা—রামসা ছুরি দিয়ে ুল কেটে, রক্তাক্ত হাতে একেবারে া'র সামনে হাজির। রামসার রক্ত। া, তা' হলে বাদশা'ও তৃপ্ত। করুণা ক্ষমা করে দিলেন।

এ ঘটনা হল তুঘলক্ আমলের। া রাজধানী কাটিগ্রামে। তারপর আর করেক পুরুষের দেখা পাওয়া যায় না ইতিহাস অথবা লোকমুখে।

আবার মুঘল যুগ। রাজবসন্তের বংশধর রাজা জয়চন্দ্র তখন কাটিগ্রাম থেকে ডামরায় রাজধানী করেছেন। সুখে রাজত্ব করেছেন আর দেবালয় তৈরী করেছেন। তাঁর তিন ছেলে। রাজচন্দ্র, রামচন্দ্র আর মহাদেব। জয়চন্দ্র মারা

শিবমন্দিরের আশপাশে নারীমূর্তি। ভেঙ্গে গিয়েছে। মনে হয়, দেবদাসী অথবা অন্তঃপুরদ্বাররক্ষিণী

গেলেন। কিন্তু তিন ভাই ভাগাভাগি হলেন না। রাজা হলেন রাজচন্দ্র।

এ সময়ে আলিলাকি খাঁ বলে রাজ-নগরের এক মুসলমান জমিদার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। তার ওই রামসার রোগ। পরের ভুঁই চাই। রাজচন্দ্রের জমিতেও হানা দিল সে। রাজচন্দ্র কড়া চিঠি দিলেন। 'সাবধান! আর নয়।'

কথায় চিঁড়ে ভেজে না। আলিলাকি থামল না। তিন ভাইয়ের সংগে লড়ায়ে নামল সে। লড়ায়ে মার খেয়ে পালাল। বছর না ঘুরতে আবার আক্রমণ। আবার পালাল আলিলাকি।

তারপর তিন বছর চুপচাপ। রাজচন্দ্র ভাবলেন ফাঁড়া কেটেছে। রামচন্দ্র আর মহাদেব বেরিয়ে পড়লেন উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে তীর্থ করতে।

খবর গেল আলিলাকির কানে। অমনি সাজো সাজো রব পড়ল। কিন্তু গোপনে। রাত্রে আলিলাকি আলটপ্কা ঘিরে ধরল রাজধানী ডামরা। ব্যাপার গুরুতর। স্বয়ং রাজচন্দ্র এলেন সকালে, যুদ্ধক্ষেত্রে।

এদিকে পরাজয় অনিবার্য। কিন্তু বীরপুরুষ রাজচন্দ্র পালাবেন, তা তো হয় না। পরাজিত হলেন। আলিলাকি এসে তরবারি দিয়ে রাজচন্দ্রের শির ছিন্ন করে দিল।

কান্নার রোল পড়ে গেল অন্তঃপুরে। সেনাপতি নারায়ণ দলুই আর যুদ্ধ না করে রাজ পরিবারের সবাইকে নিয়ে গা ঢাকা দিলেন। এসে উঠলেন মলুটিতে। নারায়ণ ছাড়া কেউ জানতেন না, ভয়াবহ জঙ্গলাকীর্ণ মলুটিতে রাজচন্দ্রের ছিল এক গুপ্ত আবাস।

রামচন্দ্র আর মহাদেব ফিরে এসে দেখলেন রাজধানী নেই। মহাশ্মশান। কি ব্যাপার। শুনে আছাড়ি পাছাড়ি কান্না। কান্না শেষে গঠন। লুপ্ত রাজ্য উদ্ধার হল। চেষ্টা চলল আলিলাকিকে সবংশে নিধনের। কিন্তু আলিলাকি আরও চতুর। খোদার মার খেয়ে, খারাপ ব্যামোয় তার আগেই জন্মের শোধ চম্পট দিল।

তারপরে শান্তি। সেই থেকে রাজধানী হল মলুটি।

কিন্তু রাজবাড়ি? ওই মাটির দেয়াল আর দোচালা আটচালা-ই রাজবাড়ি।

কোন্‌গুলো রাজবাড়ি? বাউরি, ডোম বাদ দিয়ে সবই। সারা গ্রামটা জুড়ে রাজাদের পৌত্র দৌহিত্রদেরই বাড়ি। দৌহিত্র বংশও ডেরা বেঁধেছেন এখানেই। বাঁধেননি, বাঁধিয়েছেন রাজারা। খালি খালি গ্রাম। তাই কুলীন জামাইয়ের শখ গেল রাজাদের। মেয়েদের বিয়ে দিলেন, যৌতুক দিলেন ভিটা মাটি। এখন খাস রাজবংশ ছাপিয়ে গেছে দৌহিত্রবংশ।

রেওয়াজটা এখনো আছে। ভিটে মাটি যৌতুক নেই বটে। পালাপার্বনে জামাই-বাবুদের মিছিল দেখা যায় মলুটি গ্রামে। অচেনা পুরুষ আর ধোপদুরস্থ জামা-কাপড় হলেই দাদা, কাকা, পিশে নয়, লোকে জিজ্ঞেস করে, কন্ বাড়ির জামাই বটে? গরুর গাড়ির গাড়োয়ানও নিঃসন্দিগ্ধভাবে জিজ্ঞেস করে, 'কাদের জামাইবাবু গো?'

কিন্তু সকলেরই দোচালা আটচালা। বিশ পঞ্চাশ বছরের মধ্যে খান কয়েক পাকাবাড়ি হয়েছে। কেন জিজ্ঞেস করলে সবাই বলে, 'বড় ধার্মিক ছিলেন রাজারা। নিজের মাথায় ছাদ দেননি। দেবতার পাকা ভিটে করেছেন সব মন্দিরের চুড়া তুলে।

মিথ্যে নয়। আধ মাইল স্কোয়ারের সামান্য কিছু বেশী হতে পারে সারা মলুটি গ্রাম। কিন্তু এতটুকু জায়গার মধ্যে এত মন্দিরের ভিড় বাংলার অন্যত্র বোধ হয় নেই। শতাধিক মন্দির ধ্বংস হতে হতে পঞ্চাশের বেশী আছে এখনো। যেদিকে তাকানো যায়, মন্দিরের ছড়াছড়ি। আর তার অধিকাংশই বাঙ্গালী শিল্পীর পোড়াইঁটের (Terracotta) শিল্প ঐশ্বর্যে ভরপুর। টেরাকোট্টার সমারোহ সারা মলুটিতে। বিশেষত্ব হল, পোড়া-ইঁটের কাজ করা প্রায় প্রত্যেকটি মন্দিরের দ্বার-শিরে প্রথমেই রয়েছে, একদিকে বানর সৈনা সহ রামচন্দ্র। অন্যদিকে দশ-স্কন্ধ রাবণ। এটাকে প্রস্তাবনা স্বরূপ বলা চলতে পারে, সারা মন্দিরের গায়ে গ্রথিত রয়েছে হয়তো রামায়ণের কাহিনী। তাও আছে। রাবণের সীতা হরণ, জটায়ু-বধ, সেতুবন্ধন। ভাবলে অবাক হতে হয়, বিগত যুগের বাঙ্গালী শিল্পীরা কী অভূতপূর্ব দক্ষতার সহিত মাটিতে এই ছাপ তুলে গেছেন। প্রতিটি মূর্তি তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। মাটির

সাঁওতালী ঝি বহুড়িরা নাচতে এসেছে। তার আগে এদিকে ওদিকে দেখে নিচ্ছে হালচাল

বুকে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে চরিত্র। রামের বীরত্ব সীতার বিলাপ, রাবণের জিঘাংসা।

কিন্তু শুধু রামায়ণ নয়, মহাভারতের কাহিনীও আছে। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধক্ষেত্রে পঞ্চ পান্ডবের বীরত্ব আর কুরুসভায় দ্রৌপদীর বিলাপ। কৃষ্ণলীলাও আছে। নৌকাবিলাস আর গোপিনীর বস্ত্রহরণ। এছাড়াও আছে, সমসাময়িক জীবনযাত্রার আঞ্চলিক ছবি। বাদশাহী ফৌজের অশ্ব-সওয়ার। কপিকলে জল তুলছে মেয়েরা

সাঁওতাল মেয়ে পুরুষেরা নাচের আসরে নামবার আগে মনোমত কাপড়টি বদলে নিচ্ছে

কুয়ো থেকে। গাই চাটছে বাছুরের আর গোয়ালিনী দোয়াচ্ছে দুধ।

এখন অধিকাংশ মন্দিরই পড়ছে। ফাটল ধরেছে। সর্বনাশী পাতা আলিঙ্গন করেছে মন্দিরে সর্বাঙ্গ। পোড়াইঁট কারুশিল্পে ধরেছে। মাথা চাড়া দিয়েছে বট অ চারা। বিষধর সাপের আস্তানা মন্দিরগুলি

এই ভাঙ্গা মন্দিরের আশ-পাশে কালীপুজার ধুম ঢাকের শব্দে মু গ্রাম। সারা মলুটি লোকে লোক কিন্তু মলুটির বিগত যুগ প্রেতাত্মার মত বিস্মিত বিষণ্ণ তাকিয়ে আছে মন্দির, আর তাল ফাঁকে ফাঁকে।

মন্দিরের কথা প্রথম পাওয়া যায় রাখড়চন্দ্রের আমলে। ইনি রাজা চন্দ্রের বড় ছেলে। ধর্মের ব্যাপারে, অ রাজাদের তুলনায় এঁর নাম-ই বে রাখড়চন্দ্রের স্ত্রীর কথা বলতে মল মানুষ আত্মরোমন্থনে স্বপ্নালু হয়ে বলবে, 'ই বাপ্‌রে! উনি য্যা সা ভগবতী ছিলেন গ'। সোয়ামী বি হয়ে ঘর ছাড়তে চাইলে। উনি তুল তলায় শুয়ে দেহ রেখে গেলেন। হয়েছিল উই উত্তরের লদীপারে। থিকে লদীটার নাম সতীঘাট হয়েছে।

মৌলীক্ষা দেবী হলেন রাজ কুলদেবী। দক্ষিণের তোপান্তরের মন্দিরে এই দেবী অধিষ্ঠিতা। মৌলী মন্দির প্রাঙ্গণে ভেঙ্গে পড়া শিবমা রয়েছে রাখড়চন্দ্রের আমলের। পো ইঁটের কাজ সবই ধ্বংস হয়েছে মন্দি উপরে এখনো যে তারিখ পড়া যায়, ত বাং ১১২৭ সন সুপরিস্ফুট। রাখড়চ মায়ের নামে মন্দিরটি উৎসর্গীকৃত।

রাজা জয়চন্দ্রের আমল থেকে সম্প ভাগাভাগির লক্ষণ দেখা দিয়েছে। কে বংশবৃদ্ধি হয়েছে তাঁর আমলেই। রা চন্দ্রের তরফ হল রাজার তরফ। ছেলেরাই রাজা হবে। নিয়ম অনু বড় ছেলেরই রাজা হবার অধিকার। চন্দ্রের আর রাজচন্দ্রের অন্যান্য বংশধর নিয়ে হয়েছে, মধ্যম তরফ, সিকির তর দ্বিতীয় সিকির তরফ। তার ম

াতীর সিকির তরফের অন্য নাম । তরফ'।

ওই তরফ নিয়েই গ্রামের ভাগাভাগি। া যাবেন গো? না, ছয়ের তরফে। ্গে তরফ, তারপরে বাড়ি।

রাজা রাখড়চন্দ্রের পর আর পাঁচ ুষ পর্যন্ত রাজা পদবী ছিল। তার- র রাজা রাজবসন্তের বংশধরেরা শুধু- 'রায়' পদবী নিয়ে মলুটিতে বিশিষ্ট । আছেন।

এখন রাজা রাজবসন্তের বংশধরদের া পাবেন আপনারা, রেল স্টেশনে, াহৌসী স্কোয়ারে, কলকাতার শহরে, কণ্ঠের স্কুলমাস্টারের আসনে, বার্ণপুর হার কারখানায়। কোর্ট কাছারিতে ালা মাথায়, ডিসপেন্সারিতে স্টেথিস্- প গলায়। নবীনদের দেখা পাবেন, পুরহাট কলেজে, কলকাতা বিশ্ব- ্যালয়ের ক্লাশে। এমন কি বক্তৃতা মঞ্চ ক বিপ্লবী বাহিনীর সঙ্গে পতাকা ত।

কিন্তু সে জীবন মলুটির বাইরে।

এখানে কার্তিক মাসের অমাবস্যার র অন্ধকারের মহানিশায় গুড়গুড় র বেজে ওঠে ঢাক। এখানে সেখানে ল হ্যাজাক বাতি। তার বিচ্ছুরিত লায় মলুটির গৈরিক মাটির পথকে ায় রক্তধারার মত। মৃদু হাওয়ায় দূর- ্তের শাল তাল বন দোলে। সেই বন তর পেরিয়ে, রাতের অন্ধকারে ছায়ার আসতে থাকে সাঁওতাল নরনারী। ্তাল পরগণার বহু দূর দূরান্ত থেকে । আসে। এসে পিল্‌পিল্‌ ক'রে ঢোকে টির ঘনবসতি গ্রামে। ভিড় করে ামণ্ডপের চারধারে। তারাই একমাত্র । মলুটির সবাই যে জমিদার। আর র সব প্রজাই সাঁওতাল। তারা আসে ী আর মাদল নিয়ে।

মহানিশা ছাড়া এখানে পুজো আরম্ভ না। সারা গাঁয়ে আটটি কালীপুজো তরফে তরফে পুজো। মলুটির রা আমূল বদলাতে আরম্ভ করে। ী আর সাঁওতাল, আর ড্যাবা ড্যাবা থ তাকিয়ে থাকে পালে পালে পাঁঠা। র পাঁঠা। বলির মোষগুলি ফোঁস্‌- ্‌ করে সারারাত। আর সাঁওতাল রী ঘুম ও নেশার ঘোরে, শুয়ে পড়ে পথে ঘাটে। বাবুদের বাড়ির আনাচে কানাচে, মন্দির প্রাঙ্গণে অথবা দাওয়ায়।

বোঝা যায় ঘোর তান্ত্রিকতার উন্মেষ হয়েছিল এককালে এখানে। বাতাসে সুরার গন্ধ এখনও পাওয়া যায়। কান পাতলে বিচিত্র বিকট মাতৃধ্বনি শোনা যায়। সেই সঙ্গেই নিকষ কালো কালী-মূর্তির গায়ে ঝকঝকে 'সাজ' যেন কোন শাণিত অস্ত্রের মত চকমক্‌ করে। মহাজন ও জমিদারের মার খাওয়া মানুষ-

সাঁওতাল যুবকের চাঁটি পড়ল মাদলের পিঠে। এবার নাচ শুরু

গুলি নেশায় মাতে। সযত্নে রচিত হাড়ি-কাঠগুলি পিপাসার্ত হয়ে থাকে হা করে।

মলুটির রাজারা সকলেই শঙ্করাচার্যের সৃষ্ট দশনামী সম্প্রদায়ের 'তীর্থ' বিভাগের মোহান্তের শিষ্য। যে ব্রহ্মচারী একদিন রাজা রাজবসন্তকে মন্ত্র দিয়েছিলেন, তিনি 'তীর্থ' শ্রেণীর মোহান্ত। এখনো, তাঁদেরই আশ্রমের মোহান্তরা আসেন কাশী থেকে মলুটিতে, দীক্ষা দেওয়ার জন্য। তারপর দিন আরম্ভ হয় বলি। এক সময়ে তিন চার শ' পাঁঠা বলি হত। এখনো শতাধিক অজাবলি। গোটা আটেক মোষ। সারা গৈরিক মলুটি রক্তমাখা চেলী পরে স্বয়ং রক্তাম্বরী। রক্তে ভেসে যায় প্রতিটি পথ। সকলের কপালে কপালে রক্ততিলক। পুরনো নিয়মের মত, এই বলির জানোয়ার দেয় প্রজারা। এই দেওয়ার জন্যই তাদের ভিটামাটি দান করা আছে জমিদারের পক্ষ থেকে।

বেলা হয়। একটা দোলন শুরু হয় মলুটিতে যেন কিসের তালে তালে গ্রাম নাচতে থাকে। সাঁওতালদের ভিড় বাড়তে থাকে। সাজো-কাচা কাপড় পরে আসতে থাকে সাঁওতাল মেয়েরা। তিন চার হাত লম্বা, তিন চার গাঁটওয়ালা বাঁশের বাঁশী নিয়ে আসে পুরুষেরা। মাদল গলায় ঝুলিয়ে আসে। মেয়েদের প্রসাধনের বাহার অনেক। খোঁপায় গাঁদা ফুল, জংলী ফুলের সুদীর্ঘ রেণু পালকের মত দিয়েছে গুঁজে। চোখে মুখে ঔজ্জ্বল্য দেখা দিতে আরম্ভ করে তাদের। আধ-বোজা হয়ে আসে চোখ। বোঝা যায়, হাল্‌কা নেশা লেগেছে তাদের চোখে।

বড় বড় অবাক চোখ মেলে দল বেঁধে মেয়েরা দুপুরটা ঘুরতে থাকে মনোহারী দোকানের আশেপাশে। ঘাটে আল্‌তা, চিরুণী, গন্ধ তেল। কেনে কম। যে দুচারজনের রুপোর কান ঝাপটা আর হার আছে, তাদের দেখে অন্যান্য মেয়েরা। বছরে এই দিনটি পরস্পরের সঙ্গে দেখা হয় তাদের। দূর দূরান্তের আত্মীয়-স্বজন। একজন দু' হাত প্রসারিত করে নীচু হয়ে দাঁড়ায়, আর একজন হাত বাড়িয়ে ধরে, তারপর দুজনেরই হাত খানিকক্ষণ দোলে। নমস্কারান্তে, কুশল জিজ্ঞাসা। ঘর বরের কথা।

পুরুষেরা দুলতে থাকে বাঁশী মাদল নিয়ে মরদা পায়রার মত গান গেয়ে গেয়ে ঘুরতে থাকে মেয়েদের পাশে। মেয়েরা হাসে খিল্‌ খিল্‌ করে। তাদেরও দোলন লাগে।

ওদিকে বাজে বিসর্জনের ঢাক। বিদায় মাঙ্গলিক শুরু হয়। পথে ঘাটে বেরিয়ে পড়ে সমস্ত মানুষ; অন্তঃপুরের গৃহিণীরা বাদে ছেলেমেয়েরা সকলে। সারা মলুটিতে এক তীব্র উত্তেজনা দেখা দেয়। তারপর বংশানুক্রমিক লেঠেল বেহারারা কালীমূর্তি নিয়ে ছোটে দক্ষিণের সীমান্ত মাঠে। সব প্রতিমা জড়ো হয় সেখানে।

সেখানেও বসেছে দোকান। খাবারের দোকান, পানের দোকান। সাঁওতালরা ভিড় করে মিঠে পান খায়, খাওয়ায়।

প্রতিমা নিয়ে উন্মত্ত গতিতে ছোটে বেহারারা। বাবুরা ছোটেন সঙ্গে সঙ্গে।

কে যে অপ্রকৃতিস্থ আর কে নয়, তা বোঝবার উপায় নেই। আগে যাওয়া নিয়ে তরফে তরফে ঠোকাঠুকির সম্ভাবনাও প্রচুর। উত্তেজনাও সেইরকম। বেহারারা অশ্বগতিতে মৌলাঙ্কা তেপান্তরের চারপাশে পাক দিতে থাকে। সাত পাক দেওয়া নিয়ম।

ইতিমধ্যে দেখা যায়, এই মাতনের মধ্যে মাদল বাঁশী বেজে উঠেছে। মেয়েরা নাচতে আরম্ভ করেছে। প্রথমে শত শত, তারপর বিশাল তেপান্তর জুড়ে হাজার হাজার মেয়েপুরুষের শুধু নাচ। এমন বিরাট স্বাভাবিক নাচের আসর কোথাও দেখা যায় কি না জানিনে।

সব মেয়েরাই জামাহীন দেহ শাড়িতে ঢাকা। দু' একজনকে জামা পরা দেখা যায়। বোঝা যায়, মিশনারীদের কল্যাণে তারা ধর্মান্তরিত হয়েছে, তাদের 'ট্রাইবেল' ঐতিহ্যকে ছাড়াতে চাইছে। তবু এই মাদলের শব্দ তাদেরও রক্তে দোলা দিয়েছে। নাচ, শুধু নাচ। তেপান্তর, সারা গ্রাম জুড়ে নাচ।

মেয়েরা এক ধারে, মাদল বাঁশী-বাহিনী আর একদিকে। মেয়েদের দেহ-লতা বিচিত্র ঢেউ দিয়ে যে মুহূর্তে তার নিম্নাঙ্গ অগ্রসর হয়, সেই মুহূর্তে অপর পাশের পুরুষ বাহিনী এক আদিম ভঙ্গিতে এগিয়ে আসে। শব্দ হয় হিস্ হিস্। ভয় হয় ধাক্কা লাগবে উভয়ের দেহে। কিমাশ্চর্যম! চোখের পলকে তারা দূরে সরে যায় তালে তালে। তাদের নারী-পুরুষের চোখ মুখ কামনার রঙে রাঙা।

মনে হয়, কোন্ এক আদিম যুগের পরিবেশ প্রাণ পেয়েছে এখানে। সেই আদিমতা এর পরে বাস্তব রূপ নিতে থাকে। আমাদের সভ্য চোখে তা বিচিত্র ও ভয়াবহ। রূপ ও অরূপের সে মিলন ভয়াবহ।

অন্ধকার চেপে আসতে থাকে। নাচে ঢিল পড়ে। আর সাঁওতাল মেয়ে পুরুষেরা যুগল সরে পড়তে থাকে এখানে সেখানে। যাকে যার মন চেয়েছে, যাকে যার চোখে লেগেছে। আদিম যুগের তাদের সেই 'ট্রাইবেল' স্বাধীন ও অবারিত দৈবত মিলনের লীলাক্ষেত্র হয়ে ওঠে সারা মলুটি গ্রাম। একদিনের জন্য, একরাত্রির জন্য মলুটিতে সারা সাঁওতাল পরগণা ফিরে যায় শত শত বছরের ফেলে আসা দিনের মধ্যে।

ঢাক থামে, মঙ্গল বাঁশী থামে। শুধু প্রেম ও মিলনের বিচিত্র কণ্ঠধ্বনি, ফিসফিসানি, বিহ্বল আকণ্ঠ আপ্লুত ভাঙ্গা ভাঙ্গা হাসি। আর সারা মলুটি ক্লান্ত, স্তব্ধ। মন্দির আর গাছের অন্ধকার ঝোপেঝাড়ে অদৃশ্য দেহহীনেরা চলাফেরা করে যেন।

তখন হয়তো আপনি শুনতে পাবেন, রাজা রাজবসন্তের কোন বংশধর যুগল সাঁওতালকে অন্ধকারে দেখে চেঁচাচ্ছে, 'এঃ, আর জা'গা পেলিনে র‍্যা বুরা, অ্যা? তুদের লজ্জা টজ্জা নাই কেনে অ্যাঁ?'

কিংবা কোন বংশধর কাউকে বলছেন, 'আর কিছু হবেনি। ইবারটা শেষ। জমিদারী উচ্ছেদ হয়ে গেলে, সব রাত্রি থাকতেই রাজার লোকেরা যে যার কর্মস্থলে [illegible] থাকেন। ছেলেরা ফেরে স্কুল ক[illegible] কদিন ধরে শুধু ফেরার পালা। কলেজ কারখানা ডিসপেন্সারি কাচার[illegible] দিন শেষ হয়ে আসছে। [illegible] প্রদেশে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ অ[illegible] হলেই সব শেষ। সেই বিষ[illegible] বিমর্ষতা সকলের চোখে মুখে। [illegible] সমস্ত উৎসব বন্ধ।

তার চেয়েও বড় ট্র্যাজেডি, বিহা[illegible] বাঙলার সীমান্ত এই ছোট্ট বাঙ[illegible] গ্রামটি, একে দেখবার কেউ নেই। [illegible] বাঙলা দেখে না, আবার সে বিহ[illegible] এক প্রান্তে। উভয়ের অবহে[illegible] অসম্মানের আশঙ্কা তার পদে পদে।

উৎসবের পর নিথর মল[illegible] নিস্তরঙ্গ জীবন নিয়ে সে আবসাদ[illegible] প্রবাস যাত্রী মানুষগুলির দিকে তা[illegible] থাকে। তাকিয়ে থাকে মন্দিরের [illegible] টেরাকোটার রাম-সীতা, পঞ্চপান্ডব দ্রৌপদী কৃষ্ণ রাধিকা। ইতিহাস যুগান্তর তাদের চিরদিনের জন্য [illegible] করে রেখেছে, এঁটে দিয়েছে মন্দি[illegible] গায়ে। তারা শুধু নিষ্পলক চোখে থাকে।

তবু, ইতিহাসের ধ্বনি পৌঁ[illegible] মলুটিতে। পৌঁছুচ্ছে ধীরে ধ[illegible] নতুন যুগের দিকে পা দিয়েছে সে অ[illegible] দিন। অনেকদিন, রাজবসন্তের বংশধ[illegible] সঙ্গে, ফিরে চলা সাঁওতাল নরনার[illegible] পায়ে পায়ে সে এগোচ্ছে।

মন্দির ও মন্দিরের দেহাশ্রিতেরা বলেন না বটে, তবু সজল চোখে জো[illegible] জোড়ায় বিদায় দেন সবাইকে। [illegible] মলুটি থেকে। বলেন, 'আবার [illegible] আসা চাই।'

এক কথা নয়, অনেক কথা মলু[illegible] এবার সামান্য পরিচয় মাত্র। কালী[illegible] উপলক্ষে তার উৎসবের কাহিনী।*

---

* রাজ বংশাবলীর কাহিনী ম[illegible] নিবাসী শ্রীযুক্ত ইন্দ্রনারায়ণ চট্টোপ[illegible] সংকলিত 'মলুটি রাজবংশ' নামক গ্রই[illegible] সংগৃহীত। —লেখক।

প্রতীত কাহিনী

কিংবদন্তীর দেশে—সুবোধ ঘোষ; নিউ জ পাবলিশার্স লিমিটেড, ২২, ক্যানিং স্ট্রীট, লিকাতা—১। মূল্য—পাঁচ টাকা।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীসুবোধ ঘোষ রচিত 'কিংবদন্তীর দেশে" বাংলা সাহিত্যে এক শিল্পপূর্ণ মূল্যবান নূতন সংযোজনা। ক এ-জাতীয় গ্রন্থ বাংলা ভাষায় ইতিপূর্বে চিত হয়েছে কি না সন্দেহ। গ্রন্থটির শিষ্ট্য এইখানে যে, বাংলা দেশের বিভিন্ন ন্তে প্রচলিত প্রসিদ্ধ কিংবদন্তীগুলিকে তে এক অধ্যায়ে সংকলন করা হয়েছে; ল্যবত্তা এই কারণে যে, সংকলিত কিংবদন্তী- লিকে এমন একটি শিল্পরূপ দেওয়া হয়েছে, রূপ শুধু কোন প্রথম শ্রেণীর শক্তিধর থাসাহিত্যিকের লেখনীতেই পরিস্ফুট হওয়া ভব। "কিংবদন্তীর দেশে" পাঠে একইকালে ীকিক ইতিহাসের রহস্য এবং শ্রেষ্ঠ কথা- হিত্যের সৌন্দর্যের মাধুরী লাভ করা যায়। সাহিত্যের উপকরণ পুরাতন, কিন্তু ভাষা প্রকাশভঙ্গী সম্পূর্ণ আধুনিক। সুগভীর তিহ্যনিষ্ঠার সংগে একালীন মন যুক্ত হলে বেই শুধু এ-জাতীয় গ্রন্থ রচনা করা যায়।

"কিংবদন্তী" দুই শ্রেণীর হতে পারে—ৌরাণিক ও ঐতিহাসিক। তবে এর গোত্র- ক্ষণ যাই হোক না কেন, সর্ববিধ কিংবদন্তীর টি সাধারণ লক্ষণ এই যে, কিংবদন্তীর ক্তব্য কোন না কোন নিদর্শনীয় বস্তুতে শ্রিত।" লেখকের মতানুসারে "ঐতিহাসিক থবা প্রাকৃতিক কোন বাস্তব নিদর্শনকে শ্রয় করে যে কাহিনী জনমনের কল্পনায় প গ্রহণ করে, সেই কাহিনীকেই যথার্থ ংবদন্তী বলা যায়।" (গ্রন্থের ভূমিকা ষ্টব্য) এই বাস্তব নিদর্শন কোথাও একটি র্যিকা, কোথাও কটি শিলাখণ্ড, কোথাও সাদের ভগ্নস্তূপ, কোথাও কালজীর্ণ চদীর্ণ কোন মন্দির, কোথাও সমাধি, কোথাও র কিছু। তবে পৌরাণিক আর ঐতিহাসিক ংবদন্তীর পরিকল্পনার মধ্যে এইটুকু র্থক্য যে, পৌরাণিক কিংবদন্তীতে ৌরাণিক কাহিনীর স্মৃতিকে প্রতীতিযোগ্য প দেবার জন্য যে-কোন প্রকারের একটা স্তব নিদর্শন খুঁজে বার করা হয়; অন্য ক ঐতিহাসিক কিংবদন্তীগুলিতে সত্যি- রের কোন বাস্তব নিদর্শনকে আশ্রয় করে তিহাসিক বা অর্ধ-ঐতিহাসিক ঘটনার তিকে কাল্পনিকতার ঐশ্বর্ষে ঐশ্বর্যময় র তোলা হয়। প্রথমটিতে বাস্তব র্শনের উপর পৌরাণিক কল্পনার আরোপ, তীয়টিতে বাস্তব নিদর্শনকে ঘিরে কল্পনার আপ্রকাশ। পৌরাণিক কিংবদন্তীতে ভগ্ন-

স্তূপ বা শিলাখণ্ড যদি হয় পৌরাণিক কাহিনীর মন-গড়া আশ্রয়ভূমি, তবে ঐতিহাসিক কিংবদন্তীতে সেগুলি হলো সত্যিকারের ঘটনার লোককল্পনানুরঞ্জিত যথার্থ প্রামাণিক দলিল। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রেই রূপকথা বা উপকথার রস কিংবদন্তীর রচনাকে মধুর আস্বাদে ভরে রেখেছে।

কিংবদন্তী সাহিত্যের এই পরিপ্রেক্ষিতটি মনে রাখলে বর্তমান বিচারের কাজ সহজতর হবে। লেখক গ্রন্থটিতে বিশেষভাবে ঐতি- হাসিক কিংবদন্তীকেই তাঁর রচনার উপজীব্য- রূপে গ্রহণ করেছেন এবং তাও এমন ঐতিহাসিক কিংবদন্তী, যার আশ্রিত ইতিহাসের বয়স পাঁচ শর্ত বৎসরের সীমা অতিক্রম করবে না। গত পাঁচশো থেকে দু'শো বছরের মধ্যে বাংলা দেশের ইতিহাসে এমন অনেক ঘটনা ঘটেছে, যেগুলি ঐতি- হাসিকের দৃষ্টি এড়িয়ে গেলেও লোকশ্রুতির আকারে আজও জাতির চিত্তে সঞ্জীবিত হয়ে আছে। অকিঞ্চিৎকর জ্ঞানে যে ঘটনার বিবরণ দানে পেশাদার ইতিহাসকার ক্ষান্ত রয়েছেন, কিংবদন্তী লোককল্পনার মধ্যে তাকেই ধরে রাখার চেষ্টা করেছে। বাংলার সমাজ ও রাষ্ট্রনৈতিক ইতিহাসের বহু অনাদৃত মাল- মসল্লা এই সকল কিংবদন্তীর মধ্যে অযত্ন- বিক্ষিপ্ত হয়ে আছে। লেখক এই গ্রন্থে যে সকল কিংবদন্তী সন্নিবিষ্ট করেছেন, তাদের অভিনিবেশের সংগে বিশ্লেষণ করলে তা থেকে বাংলার গত পাঁচ শত বৎসরের রাষ্ট্রিক ও সমাজতান্ত্রিক জীবনের বহু অবজ্ঞাত ঐতিহাসিক সংকেত খুঁজে পাওয়া যাবে বলে মনে করি। এই সব সংকেতসূত্র একত্র গ্রথিত করলে সদাবিগত বাংলার সামাজিক জীবনের একটি উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যেতে পারে। গ্রন্থটির আকর্ষণ এই কারণেই আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। এতে রূপকথার স্বাদগন্ধমণ্ডিত কথা-সাহিত্য পাঠের শ্রেষ্ঠ আনন্দ তো পাওয়া যাবেই, সেই সংগে ইতিহাসকেও জানা যাবে। সাহিত্যের সৌরভ এবং ইতিহাসের আস্বাদ একাধারে বিধৃত হলে যে আকার পরিগৃহীত হওয়া সম্ভব, তাই "কিংবদন্তীর দেশে।"

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে শ্রীসুবোধ ঘোষ বিশেষ একটি কারণে বিশেষ মর্যাদা দাবী করতে পারেন। কারণটি এই যে, তিনি তাঁর রচনাবলীর দ্বারা বিধিবদ্ধভাবে বাঙালী পাঠকসাধারণের চিত্ত ঐতিহ্য সচেতন করে তোলবার চেষ্টা করছেন। বিজাতীয়তার সর্বনাশা মোহে সত্যই আজ আমরা বাংলা দেশের নিজস্ব সাংস্কৃতিক সংস্কারের আশ্রয়- ভূমি থেকে বহু দূরে স্খলিত হয়ে পড়েছি। স্বর্গত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় যে বাঙালীকে 'আত্মবিস্মৃত জাতি' বলেছেন সেটি নিতান্ত কথার কথা নয়। এই আত্মঘাতী আত্ম- বিস্মৃতির প্রক্রিয়াকে রোধ করার জন্যে যে বিরলসংখ্যক আধুনিক সাহিত্যিক বলিষ্ঠ হস্তে লেখনী ধারণ করেছেন শ্রীসুবোধ ঘোষ তাঁদের অন্যতম। "কিংবদন্তীর দেশে"র ছত্রে ছত্রে লেখকের এই বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও স্বজাতিপ্রীতির ছাপ সুস্পষ্ট। সুবোধ ঘোষের অন্যান্য কৃতিত্বের সংগে সংগে তাঁর মানসিকতার এই বৈশিষ্ট্যটিও ভবিষ্যতের সাহিত্যেতিহাস-রচয়িতার দ্বারা চিহ্নিত হতে বাধ্য।

গ্রন্থটিতে ৩১টি কিংবদন্তী-কাহিনী সংকলিত হয়েছে। কোন্‌টিকে ছেড়ে কোন্‌টির

নাম করব। তবু এরই মধ্যে আমাদের বিশেষ ভালো লেগেছে "একটি বুলবুলের শিস্", "পুণ্ড্রবর্ধনের নর্তকী", "দুর্গাকমল", "মধুমঞ্জরীর চোখের জল", "কবি রূপঠাকুর", "শরৎখানার দহ", "সনকা ও মেনকা", "ফুলজানি-নামা", "মহীপালের দীঘি", "লও ফিরে তব পুরস্কার", "ডুমনীতলার মা" ও "গণেশজননীর আবির্ভাব"। একনাগাড়ে সবগুলি কাহিনী পড়লে হয়তো খানিকটা monotonyর সুর আসে; কিন্তু বিচ্ছিন্ন ক্ষণে পঠিত প্রত্যেকটি বিচ্ছিন্ন গল্প অতি উপাদেয় শিল্পরসমণ্ডিত এক-একটি কাহিনী। সাহিত্যামোদী ব্যক্তিমাত্রেরই এই গ্রন্থটি সংগ্রহ করা কর্তব্য।

১৯৬।৫৪

সাহিত্যালোচনা

নানা নিবন্ধ—ডাঃ শ্রীসুশীলকুমার দে; প্রাপ্তিস্থান—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—পাঁচ টাকা আট আনা।

"নানা নিবন্ধ" উনিশটি নিবন্ধের সমষ্টি এবং নিবন্ধগুলি বেশীর ভাগ হইল বাংলার সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা। কয়েকটি প্রবন্ধে সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়ও আলোচিত হইয়াছে। 'জয়দেব ও গীতগোবিন্দ', 'রামনিধি গুপ্ত', 'নাটকে রামনারায়ণ', নাট্যকার 'কালীপ্রসন্ন সিংহ', 'হরপ্রসাদ শাস্ত্রী' ইত্যাদি কয়েকটি নিবন্ধও প্রধানত সাহিত্যবিষয়ক আলোচনা, যদিও নিবন্ধে জীবনবৃত্তান্তের বিশ্লেষণ আছে। 'চৈতন্য সম্প্রদায় ও মাধ্ব সম্প্রদায়', 'শিক্ষা ও সংস্কৃত' এবং 'বৈদিক সাহিত্যে ব্রহ্মবাদিনী' ইত্যাদি কয়েকটি নিবন্ধকে সংস্কৃতি এবং সাংস্কৃতিক ইতিহাসের আলোচনা বলা যায়। এই নিবন্ধগুলিতেও লেখক প্রধানত সাহিত্যগত প্রসঙ্গের আলোচনা করিয়াছেন।

বিষয়ের গৌরবে এবং তথ্যের গুরুত্বে "নানা নিবন্ধ"কে আধুনিক বাংলার প্রবন্ধসাহিত্যেরই একটি বিশিষ্ট ও মহৎ কীর্তির নিদর্শন বলিয়া আমরা অভিনন্দিত করিতে পারি। প্রত্যেকটি নিবন্ধই বিপুল সন্ধিৎসার ও পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। সাহিত্য সম্বন্ধে এবং সাহিত্য-রচয়িতা মনীষীদিগের সম্বন্ধে, বক্তব্যক তথ্যসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করিবার যে পদ্ধতি লেখক অনুসরণ করিয়াছেন, সেই পদ্ধতির গুরুত্ব, মূল্য এবং মর্যাদাও আমরা এই প্রসঙ্গে স্মরণ করিতেছি। বর্তমানে বাংলার সাহিত্যবিষয়ক আলোচনায় তথা সমালোচনা সাহিত্যে এইরূপ তথ্যসম্মত বিচার ও বিশ্লেষণের পদ্ধতি নিতান্তই বিরল হইয়া আসিয়াছে, যাহা বস্তুত বর্তমানের তথাকথিত সমালোচক সমাজের চিন্তাগত দৈন্যের সত্যতাই প্রমাণিত করে। অতি অল্পসংখ্যক যাঁহারা সাহিত্য এবং সাহিত্যের ইতিহাস সম্বন্ধে প্রকৃত অধ্যয়নের দ্বারা অধীত ও অবহিত হইতে পারিয়াছেন, ডাঃ দে সেই স্বল্পসংখ্যক কৃতীদিগেরই অন্যতম। সেই কারণে "নানা নিবন্ধ" বস্তুত আদর্শ সাহিত্যজিজ্ঞাসার একটি সুলিখিত সন্দর্ভ হইয়া উঠিয়াছে, যাহা বর্তমান বাংলার প্রত্যেক প্রকৃত সাহিত্যোৎসাহীর জিজ্ঞাসু মনের সুহৃদ বলিয়া পরিগণিত হইবে।

'রূপ ও রস' এবং 'অক্ষয়কুমার ব[...]
কবিতা' এই দুই নিবন্ধে লেখক [...]
কল্পনা ও অনুভব এবং সৌন্দর্যতত্ত্বে[...]
বিচার করিয়াছেন, তাহাতেও
সুসমালোচনার একটি সুষ্ঠু পদ্ধতির [...]
দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন। "নানা নি[...]
সেই কারণে সাহিত্য বিচারের বিষয়ে [...]
শিক্ষণীয় ও অনুসরণযোগ্য পদ্ধতির দৃ[...]
স্থাপন করিয়া সাহিত্যেরই কল্যাণে স[...]
হইবে, আমরা ইহাই আশা করিব।

"নানা নিবন্ধের" লেখকের সকল অভি[...]
ও সিদ্ধান্তের সহিত সকলেই একমত হই[...]
ইহা আশা করা যায় না। আমরাও [...]
করিয়াছি, লেখকের বক্তব্য অধিকাংশ ক্ষে[...]
তথ্য অনুসরণ করিয়া চলিয়াও স্থানে স্থ[...]
এবং বিষয় বিশেষে যুক্তিচ্যুত হইয়া[...]
দৃষ্টান্ত, শুদ্ধ ভাষা ও চলিত ভাষার উৎ[...]
সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনাটি অং[...]
'সংস্কৃত ও বাংলা' নিবন্ধটি। বাংলাসাহি[...]
সংস্কৃত শব্দবহুল কাব্যিক রচনার কয়ে[...]
উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্তের সঙ্গে চলিত তথা প্রা[...]
বাংলায় রচিত কয়েকটি শব্দগৌরববি[...]
নিকৃষ্ট কাব্যিক রচনার দৃষ্টান্তের তুলনা ক[...]
উচিত নহে। 'সমস্ত আকাশটা ডেকে উঠে[...]
যেন কেশর-ফোলা সিংহ, তার ল্যাজের ঝাপ[...]
ডালপালা আলুথালু করে'—রবীন্দ্রনাথে[...]
রচনার মধ্যে এই পংক্তি দুইটিই প্রাকৃত বাংলা[...]
লিখিত রবীন্দ্র-কবিতার আদর্শ দৃষ্টান্ত নয়[...]
প্রাকৃত বাংলায় লিখিত বহু বহু রবী[...]
কবিতার মধ্যেও অজস্র 'ধ্বনি-মাধু[...]
ও শব্দসম্পদ' আছে এবং কবির সংস্কৃত শব্দ[...]
বহুল বহু রচনার তুলনায় তাঁহার বহু প্রা[...]
বাংলার রচনাগুলির কাব্যিক গৌরব বেশি[...]
প্রাকৃত বাংলার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'ওকালতি'[...]
নিন্দা করিতে গিয়া লেখক সংস্কৃতশব্দবহু[...]
বাংলা ভাষার পক্ষে মাত্রাধিক মোহ প্রকা[...]
করিয়া ফেলিয়াছেন। লেখকের কোন কে[...]
মন্তব্য নিতান্তই বিক্ষোভের মত মনে হইবে[...]
যথা—ইহা যেন স্বদেশী আন্দোলনের ম[...]
বিদেশী আদর্শানুকরণের ছদ্মবেশ'। তি[...]
শতাধিক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই গ্রন্থ বাং[...]
সাহিত্যের পাঠক লেখক গবেষক এ[...]
শিক্ষার্থীর পক্ষে একটি মূল্যবান সম্পদ।

৯৭।৫[...]

সাহিত্য জিজ্ঞাসা—কুমুদনাথ দা[...]
প্রাপ্তিস্থান—এম সি সরকার এণ্ড সন্[...]
১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২
মূল্য—চার টাকা।

বাংলা সাহিত্যের উপর একখানি সম[...]
লোচনা গ্রন্থ। 'মধুসূদন', 'বঙ্কিমচন্দ্র'
'রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধ ত্রয়ে লেখক কোন নতু[...]
আলোকসম্পাত করতে পারেন নি। 'বাং[...]
সাহিত্যের ধারা' প্রবন্ধে বাংলা সাহিত্যে

...মান্নতির পরিচয় সংক্ষিপ্ত করে দেবার চেষ্টা মন্দ নয়। বইখানির মধ্যে একমাত্র সাহিত্যের পথে' অংশতে দেশ-বিদেশের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিশেষ উদ্ধৃতির ...কলনগুলি চিত্তাকর্ষক হয়েছে। কিন্তু ...ব চেয়ে আশ্চর্য হলাম ডবল ক্রাউন সাইজের ...াগজের মলাটযুক্ত ১১৭ পৃষ্ঠার এই ...স্তকটির মূল্য কোন্ হিসাবে চার টাকা ...র্য করা হল? ৩২৩।৫৪

...তিবৃত্ত

পাষাণপুরীর রূপকথা—অসীম গুপ্ত; ...কাশক—গ্রন্থকীট, ১।২, রাসবাগান লেন, ...লিকাতা-১০। মূল্য—আড়াই টাকা।

পাষাণপুরীর অর্থাৎ কলকাতা শহরের রূপকথা। এ শহরের ইতিহাস রূপকথার মতই আকর্ষণীয় আবার তথ্যের দিক থেকে কিছু সত্য ও কিছু প্রচলিত কিম্বদন্তীকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে ইংরেজ রাজত্বের বাহক এই প্রাচীন শহরের বিবর্তনের কাহিনী। কলকাতা শহরের ইতিবৃত্তকে বাদ দিলে বাঙলা তথা ভারতবর্ষের ইতিহাস-স্থান অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। জব চার্নক কর্তৃক কলকাতার ভিত্তি স্থাপনের প্রথম যুগের কাহিনী থেকে কলকাতা নামের উৎপত্তির বিভিন্ন মতবাদ, কেল্লার কথা, মনুমেন্ট, ময়দান, চিড়িয়াখানা, শিবপুরের বাগান যাদুঘর, লালদীঘির ইতিবৃত্ত, স্টারের মায়াকাহিনী ও সর্বশেষে ইংরেজ শাসনের দুর্নীতি, সংবাদপত্রের প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষাক্ষেত্রে ...ব জাগরণের আন্দোলন প্রভৃতি বিভিন্ন তথ্যের সমাবেশ গল্পের টেক্‌নিকে আলোচ্য পুস্তকটিতে করা হয়েছে। ইতিপূর্বে কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত অনেক বিশিষ্ট লেখকরাই লিখেছেন—সেদিক থেকে বর্তমান বইয়ের লেখক বিশেষ কোন নতুন কাহিনীর উদ্ঘাটন করতে পারেন নি সত্য। কিন্তু ...স্তখানির বৈশিষ্ট্য হল যে, খুব স্বল্প পরিসর ...খানের মধ্যে বহু জ্ঞাতব্য বিষয়ের মোটামুটি আলোচনা স্থান লাভ করেছে। ভাষা ও ভঙ্গি ...য়েছে সুললিত ও হৃদয়গ্রাহী। আলোচ্য পুস্তকটিকে বলা চলে কলকাতা শহরের ...ত্তন থেকে বিংশ শতাব্দীর অগ্রগতি পর্যন্ত ...ময়ের একখানি পরিচ্ছন্ন সার সংগ্রহ—তাই ...ঠিক সাধারণ এই বইয়ের সাহায্যে উক্ত বিষয়ে নিজেদের কৌতূহল পরিতৃপ্ত করতে সক্ষম হবেন। কালীঘাটের পট ও কয়েকখানি প্রাচীন তৈলচিত্রের অনুসরণে আঁকা চিত্রগুলি এতে সংযোজিত হওয়ায় আখ্যানভাগের মর্যাদা বেড়েছে। ছাপা ও প্রচ্ছদপটটিও মনোরম। ৪০২।৫৪

অনুবাদ সাহিত্য

জীবন-পিয়াসা: আর্ভিংস্টোন—অনুবাদক: নির্মলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়; অভ্যুদয় প্রকাশ-মন্দির, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২ মূল্য—৫্।

ইংরাজীতে একটা কথা আছে,—'An ounce of conviction is worth a ton of talent' ঊনবিংশ শতকের রেনেসাঁ-যুগের যে শিল্পীরা একযোগে আবির্ভূত হয়েছিলেন ফ্রান্সে, কী সাহিত্যে কী চিত্রশিল্পে,—দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ই ছিল তাঁদের সব কিছু সাফল্যের মূলে। সাহিত্যে ফ্লবেয়ার-জোলা প্রভৃতি, এবং চিত্রে গগ্ লোত্রেক, সিজান, গগ্যা,—এ'রা এ'দের সমস্ত জীবন-মন মথিত করে আর্টের যে নতুন ভাবধারা প্রবর্তন করলেন, তা আজো আর্টপিপাসু বিদগ্ধমণ্ডলীকে চমকিত ও অভিভূত করে। কিন্তু এই সৃষ্টির মূলে অদ্ভুত জীবন সংগ্রামের ইতিহাস আছে, জীবনের সংগে মনের, দেহের সংগে আত্মার এক নিদারুণ দ্বন্দ্ব-কাহিনী বিদ্যমান। 'ভ্যান গগ্'এর নাটকীয় জীবনীকে কেন্দ্র করে আর্ভিংস্টোন গত শতাব্দীর সেই দ্বন্দ্বমুখর যুগটিকেই এ'কেছেন অপূর্ব নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সংগে। প্রতিটি চরিত্রই আত্মমর্যাদায় সুপ্রতিষ্ঠিত, কী পুরুষ, কী নারী! কিন্তু চারিত্রিক আবেদনের দিক থেকে সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে ভ্যান্ গগ্-এর ভাই 'থিয়ো'।

আর্টের সংজ্ঞা কী? ফোটোগ্রাফীর দ্রুত উন্নতির সংগে সংগে চিত্রশিল্পী বুঝতে পারলেন, আর্টের কাজ চরিত্রের যথাযথ প্রতি-ফলন নয়, তার বাহ্যিক রূপের থেকে অন্তর্লীন ভাবৈশ্বর্য প্রকাশই আর্টের প্রধানতম লক্ষ্য। বিগত শতকের চিত্রশিল্পের নব্য আন্দোলনের দান—'ইম্প্রেশানিজ্‌ম্'-এর ওটাই সম্ভবত মূল কথা। এমিল জোলার মুখ দিয়ে সেই শ্লীল-অশ্লীল নিরপেক্ষ সত্য প্রকাশের যুগবাণীই উচ্চারিত করিয়েছেন আর্ভিং,—যা আজকের চিত্র ও সাহিত্য-শিল্পীদেরও প্রেরণা দিতে পারে।

এই বহুপঠিত বহু আলোচিত গ্রন্থখানির অনুবাদ একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এর আগে এর অনুবাদ পরলোকগত তরুণ সাহিত্যিক অশ্বেন্দ মন্নবর্মণ হাতও দিয়েছিলেন, বেরিয়েওছিল সেটা 'দেশ' পত্রিকায়, সেটি গ্রন্থরূপে ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হওয়া উচিত ছিল। অবশ্য নির্মল বাবুর অনুবাদও আমাদের খুশী করেছে। অনুবাদ স্বচ্ছন্দ ও সাবলীল, এবং সবচেয়ে বড়ো কথা, আন্তরিক।

ছাপা-বাঁধাই ভালো; কিন্তু প্রচ্ছদ-পরি-কল্পনা ও পরিবেশনের প্রশংসা করতে পারলাম না। ৪৬৭।৫৪

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

শ্রীশ্রীবালানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের জীবনচরিত—শ্রীআশালতা সিংহ।

জয়দেব—বঙ্কিমচন্দ্র দাশগুপ্ত।

বারাণসী ও সারনাথ—শ্রীহেমচন্দ্র দত্ত।

দুই অধ্যাপক—বিনয় চৌধুরী।

বিনোদিনীর ডায়েরী—শ্রীযতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

পুঁজিবাদের পরিণাম ও সর্বোদয় অর্থ-ব্যবস্থা—গোবিন্দপ্রসাদ মাইতি।

যুগের দাবী—ধীরেন্দ্র মজুমদার—অনু-বাদক—শ্রীশৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বাংলা, হিন্দী, ইংরাজী ত্রিভাষা শব্দ-বোধ—বিধুভূষণ দাশগুপ্ত।

হিন্দী বাংলা কথোপকথন শিক্ষা...বিধু-ভূষণ দাশগুপ্ত।

রাজকন্যা—গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়।

শার্ঙ্গদেব

কলকাতায় এটা উচ্চাঙ্গ রাগ-সংগীতের কাল। পর পর নানা সংগীত সম্মেলনে আমরা রাগ-সংগীতের লীলায়িত বিকাশ প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাব। কলকাতার সংগীত-মহল কয়েক বছর ধরে রাগ-সংগীতের দিকে ঝুঁকেছেন এবং বাঙালী শিল্পীদের মধ্যে রাগ-সংগীত চর্চার একটি উত্তম প্রয়াস দেখা দিয়েছে এটি অত্যন্ত সুখের বিষয়। রাগসংগীতের বনেদ যত পাকা হবে ততই আমরা সংগীতের ক্ষেত্রে এগিয়ে যাব এবং সেই অগ্রসরতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যাবে যখন আমরা দেখব রাগ-সংগীতের এই অভিজ্ঞতা তার বিবিধ বৈচিত্র্য ছড়িয়ে পড়েছে আমাদের সংগীতের অপরাপর শাখায়।

বলা বাহুল্য আমি কাব্যসংগীতের কথা বলছি। রাগসংগীতের কথা মনে হলে আমার স্বতই কাব্যসংগীতের কথা মনে হয় কেননা দেখতে পাচ্ছি, যে কাব্যসংগীত একদা রাগসংগীতের রসে পরিপুষ্ট হয়ে রামনিধি, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদের রচনায় মহাসমৃদ্ধ হয়ে দেখা দিয়েছিল তা আজ ক্রমেই রাগ-সংগীতের সান্নিধ্য থেকে বিলীয়মান হয়ে একান্তভাবে রচয়িতার নিজস্ব ব্যক্তিগত ভঙ্গীর মধ্যে বিকাশলাভ করছে। সে হয়ে উঠছে একান্তভাবে রচয়িতার নিজস্ব সম্পত্তি। শিল্পীর পক্ষে সে গানে রস-সংযোগের কোন সুযোগই রাখা হচ্ছে না। ফলে আমাদের সংগীতের সর্বজনীনতা এবং বৃহত্তর আবেদন ক্রমশই ক্ষীয়মান হয়ে আসছে। কাব্যসংগীত সম্বন্ধে যাঁরা চিন্তা করেন তাঁদের মনে এখন এই প্রশ্নের উদয় হয়েছে কাব্যসংগীতের সমৃদ্ধি কোন্ পথে—আত্মকেন্দ্রিকতায় না যা আমাদের রাগসংগীতের মূল নির্দেশ সেই ব্যাপকতায় বা বিকাশ-ধর্মিতায়।

এইখানে আত্মকেন্দ্রিক বলতে আমি কি বলতে চাইছি সেটি একটু বুঝিয়ে বলা দরকার। ব্যাপকভাবে ধরতে গেলে সব সংগীতই আত্মকেন্দ্রিক অর্থাৎ নিজস্ব সৃষ্টি-স্রষ্টার ব্যক্তিত্ব তার একটা প্রধান অংশ জুড়ে আছে কিন্তু ভারতী সংগীতের বৈশিষ্ট্যই এইখানে যে সে বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে আর একটি বৈশিষ্ট্যে যোগ হয় সেইটি হচ্ছে শিল্পীর বৈশিষ্ট্য এই যে স্রষ্টা এবং রূপদাতা শিল্পী মিলিত বৈশিষ্ট্যে সংগীতের বিকাশ এই খানেই আমাদের সংগীতের শ্রেষ্ঠত্ব। এইটি ক্ষুণ্ণ হলে আমাদের সংগীতের অনেক খানি ক্ষুণ্ণ হল কেননা স্বাভাবি বিকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে গেল। এ বিকাশ আমাদের সংগীতে নানাভাবে প খুঁজে পেয়েছে। প্রকাশের এই উন্মাদ থেকেই আমাদের রাগসংগীত খেয়া ঠুংরি, টপ্পা প্রভৃতি ভঙ্গিতে লীলায় হয়ে উঠেছে আবার কীর্তনে না বিচিত্র আখরে শিল্পী এই মুক্তির প খুঁজে নিয়েছেন। আমাদের সংগী শিল্পীর এই যে স্বাধীন সত্ত্বা এটি কি স্রষ্টার সহায়ক বিশেষ করে কাব্যসংগী কেননা শিল্পী রচয়িতার ব্যক্তিত্বের সং নিজের ব্যক্তিত্ব যোগ করছেন তা ছাড়াতে চেষ্টা করছেন না। যেখা আমাদের গানে শিল্পীর গৌরব স্রষ্টা ছাড়িয়ে উঠছে সেখানে স্রষ্টা দুব নয়তো অপেক্ষাকৃত স্বল্প প্রতিভাসম্প তবে শিল্পীর পক্ষে স্রষ্টার শি নিজস্ব ভঙ্গি এনে একটা পার্থক্য সৃষ্টি প্রয়াস প্রশংসনীয় নয় এবং তার ফল ভাল হয় না কেননা স্বাধীনতারও এক সীমা আছে সেটা লঙ্ঘন করাটা সমীচী নয় কোনক্রমেই।

এই আত্মকেন্দ্রিকতার প্রয়াস কিভ চলেছে সেটি অনুসন্ধান করলে দেখা যা নূতনত্ব সম্পাদনের জন্য পাশ্চা সংগীতের ভঙ্গীমা এবং কতকগু কৃত্রিম কৌশল প্রয়োগ করা হচ্ছে যা স সৃষ্টিকেই একটা যেন কৃত্রিম রূপ প্রদ করছে। আজকালকার গান শুনলে বোঝা যায় এ সৃষ্টি অশেষ চেষ্টাকৃত এ এর গায়নকলাও কণ্ঠস্বরের কৃত্রিমতার দ্ব নিয়ন্ত্রিত। আমাদের সংগীতের যে এক স্বাভাবিক উচ্ছ্বাস আছে, তার পরি আজকাল গানে তেমন মেলে না।

কারণেই কয়েকটি গানে রাগ সাড়া দিলেও প্রাণ সাড়া দেয় না এবং অবশেষে আড়ষ্ট একঘেয়ে লাগতে থাকে। যে গান যত কৃত্রিম হবে সে গান ততই রচয়িতার কড়া শাসনে থাকবে এবং শিল্পী ততই আবৃত্তি-ধর্মী হয়ে পড়বেন। বর্তমান প্রচেষ্টার ফল এইরকমই দাঁড়িয়েছে।

অথচ, এ যুগের পূর্ববর্তী যুগে নূতনত্ব সম্পাদনের প্রয়াস বড় কম ছিল না। বৈচিত্র্যব্যপদেশে রবীন্দ্রনাথ এবং দ্বিজেন্দ্রলাল এযুগের স্রষ্টাদের চেয়েও অসম সাহসিক কাজ করেছেন। এই সেদিন পর্যন্ত নজরুল বহু-বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে তাঁর সাংগীতিক পরীক্ষা চালিয়ে গেছেন। বিগত যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত গ্রামোফোনে য সব রেকর্ড বেরুতো সেগুলি যে উন্মাদনার সৃষ্টি করত আজকের দিনের গানে তেমন আলোড়ন জাগে না।

পূর্ববর্তী যুগের সাফল্যের প্রধান কারণ হচ্ছে সংগীতে এই ধরণের আত্ম-কেন্দ্রিকতা তখনকার দিনের স্রষ্টাদের ছিল না অথচ প্রত্যেকটি গানে তাঁদের স্বকীয়তার ছাপও থাকত সুস্পষ্ট। তাঁরা য মিশ্রণ আনতেন সেটা ভাল করে জেনে নে সংগীতের উন্নতিসাধনের জন্যই আনতেন এবং তাকে আমাদের সংগীতের বিশেষত্ব বজায় রেখে মিলিয়ে দিতে পারতেন। এই প্রতিভার জোরেই রবীন্দ্র-নাথ দ্বিজেন্দ্রলাল ইউরোপীয় গানের বৈশিষ্ট্য চমৎকার ভাবে যোগ করেছেন আমাদের গানে কিন্তু রাগসংগীতের বৈচিত্র্যকে কোনদিনই অস্বীকার করেন নি। তাঁদের সৃষ্টি স্বাভাবিক নিয়মেই হয়েছে অথচ কত নূতনত্বই না তাঁরা সম্পাদিত করেছেন। আজকালকার মিশ্রণ করা হচ্ছে চমক লাগাবার জন্য। অধিকাংশ রচয়িতা ইউরোপীয় সংগীতে দক্ষতা অর্জন করেন নি অথচ হাল্কা ইংরিজি রেকর্ড-এর সুর নকল করে এমন রচনা করছেন যে তাতে আমাদের সংগীতের কোন উৎকর্ষ সাধিত হচ্ছে না বরং রাগসংগীত উপেক্ষিত হচ্ছে।

নূতনত্ব সম্পাদনের প্রয়াসে রাগ-সংগীতকে উপেক্ষা করাটা মস্ত ভুল আর তেমনি ভুল পাশ্চাত্য সংগীতের অপ্রবন্ধ অনুকরণ। প্রধান কথাই হচ্ছে আমাদের সংগীতকে তার নিজের ভিত্তির ওপর দাঁড়াতে হবে এবং সেই রাগসংগীতের ভিত্তি যথেষ্ট দৃঢ়। নতুন কিছু যদি আনতেই হয় তাহলে আমাদের ঐতিহ্য বজায় রেখেই আনতে হবে নতুবা পরধর্ম অবলম্বনে ক্ষতিরই সম্ভাবনা।

বাঙলার কাব্যসংগীতে যাঁরা ভারতীয় রাগসংগীতের বৈচিত্র্য ফোটাতে চেয়েছেন তাঁরাও প্রথমেই নজর দিয়েছেন আমাদের সংগীতের প্রধান বৈশিষ্ট্যের ওপর। উদাহরণস্বরূপ নিধুবাবুর রচনার কথা ধরা যায়। টপ্পার হিন্দী রীতি তিনি হুবহু বাঙলা গানে আনেন নি। বাঙলা গানের বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে তিনি বাঙলা টপ্পা সংগঠন করেছেন। অতুলপ্রসাদ ঠুংরী, গজল প্রভৃতি বহু ঢং তাঁর গানে যোগ করেছেন; কিন্তু সব মিলিয়ে সে পুরোপুরি বাঙলা কাব্যসংগীত। শিল্পী সেখানে নিজের মুক্তি এবং স্বাচ্ছন্দ্য খুঁজে পেয়েছেন। হিমাংশুকুমার দত্তও অনেক বৈচিত্র্য (যার মধ্যে কিছু পাশ্চাত্য ভঙ্গীও বর্তমান) এনেছেন; কিন্তু মিলিয়ে দিয়েছেন তাকে আমাদের কাব্য-সংগীতের মূল বৈশিষ্ট্যের সংগে। বরাবরই আমরা দেখে এসেছি যে যাবতীয় বৈচিত্র্য আমাদের প্রবহমান সংগীতধারার সংগে মিলে মিশে চলেছে কিন্তু এর ব্যতিক্রম দেখা যায় এই কয়েক বৎসরের সৃষ্টিতে।

অবশ্য সব গানই যে পুরোপুরি রাগ-প্রধান হবে বা খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরী হয়ে উঠবে এরকম বলাটা আমার উদ্দেশ্য নয়, অথবা সংগীতের দিক থেকে চূড়ান্ত রক্ষণশীল হতে হবে এমনটাও আমি বলছি না, কিন্তু নবসৃষ্ট কাব্যসংগীতের একটা মান তো নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। কিসের ওপর চলেছে এই সৃষ্টি এবং কোন স্তরের মনে ক্রিয়াশীল হচ্ছে এর আবেদন? অপেক্ষাকৃত অপরিণত তরুণতর সম্প্রদায়ের ওপরের স্তরে আধুনিক কাব্যসংগীত রেখাপাত করছে না। সব জায়গা থেকে একই কথা শুনি —এ আধুনিক গান ভাল লাগে না এর ভিতর সত্যিকারের কোন বস্তু নেই।

নালিশটা মিথ্যে নয় কেননা একালের গান আবৃত্তিধর্মী হয়ে পড়েছে, অনেক-ক্ষেত্রে একটু সুর করে কাব্যপাঠ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই ওপরের সুরটুকুর মধ্যেও আবার প্রায় ক্ষেত্রেই এতটুকু রাগ-সংগীতের স্পর্শ থাকে না। আমাদের কাব্যসংগীত এত লঘুস্তরে আর কখনো

আসে নি। নূতনত্বের প্রয়োগ মানে লঘুতা সম্পাদন নয় অথবা বাইরে থেকে কতকগুলো' হাল্কা কায়দা কানুন জুড়ে দিলেও নূতনত্ব হয় না।

সঙ্গীতে এই আবৃত্তিধর্মিতা আর কেবলমাত্র সুরকারের ছককাটা পথে পা মেপে মেপে পরিভ্রমণ করাটা আমাদের সাঙ্গীতিক আদর্শের একান্ত বিরোধী। এই মনোবৃত্তি সর্বথা বর্জন করতে না পারলে সঙ্গীতে মুক্তি নেই। এই কারণেই কাব্যসঙ্গীতে রাগসঙ্গীতে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না কেন না রাগ-সঙ্গীতের মধ্যে আমাদের সঞ্চরণ ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে। যে সঙ্গীত রাগসঙ্গীতের প্রসাদে পুষ্ট তা কোনক্রমেই আবৃত্তিধর্মী হতে পারে না। উদাহরণস্বরূপ এক যুগ পূর্বের গানগুলি ধরুন, সেইসব পুরোনো রেকর্ড বাজিয়ে দেখুন। সেসব গানে সত্যিকারের একটা প্রচেষ্টা আছে, মুনশীয়ানা আছে, বহু পরিশ্রমে শিক্ষার পরিচয় আছে এবং বৈচিত্র্যেরও অবধি নেই। তার কাছে আজকের মেকি বৈচিত্র্য নিতান্ত অসার বলেই প্রতীয়মান হবে। অতএব এই ঐতিহ্যকে বর্জন করে আমরা কোন দিকে লাভবান হচ্ছি? সঙ্গীতকে আমরা আবৃত্তির পর্যায়ে নিয়ে এসেছি। কণ্ঠস্বরে একটা কৃত্রিম অস্ফুটভাব ফুটিয়ে তুলছি এবং এমন কতকগুলি ভঙ্গী নিয়ে আসছি যার মধ্যে প্রকৃত সৌন্দর্যের পরিচয় খুব কমই পাওয়া যায়। রাগ-সঙ্গীত থেকে দূরে সরে গিয়ে আমাদের গানের চেহারা এইরকম দুর্বল হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই কারণেই বলছি রাগসঙ্গীতের মাধ্যমে আমাদের গানে বৈচিত্র্য সম্পাদনের চেষ্টা করাটা আশু কর্তব্য। সঙ্গীতে মুক্তিই হল সবচেয়ে বড় কথা এবং রাগ-সঙ্গীতকে উপেক্ষা করে এই মুক্তির আস্বাদ পাওয়া সম্ভব নয়। যত রকম বৈচিত্র্য যেখান থেকেই আনা হোক না কেন রাগসঙ্গীতের সুদৃঢ় ভিত্তি থেকে আমাদের কাব্যসঙ্গীতকে উৎপাটিত করলে সেই প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হতে বাধ্য। রাগসঙ্গীতের বৈচিত্র্যের অবধি নেই এবং সেই বৈচিত্র্যের সঙ্গে আরও নানা বৈচিত্র্য মিশিয়ে দিলে আমাদের কাব্যসঙ্গীত রঙে রসে ভরপুর হয়ে উঠবে।

কলকাতায় বিবিধ সঙ্গীত সম্মেলন আমাদের রাগসঙ্গীতের যে প্রেরণা দিচ্ছে তার সম্পূর্ণ সুবিধা গ্রহণ করে আমরা যদি তার বিবিধ বৈচিত্র্য আমাদের কাব্য-সঙ্গীতে বিকশিত করে তুলতে পারি নতুন ঢঙে নূতনত্বের রঙীন তুলি বুলিয়ে তবেই আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক হবে। অবশ্য এ প্রচেষ্টা করতে হবে সংরক্ষণ-শীল প্রাচীন মনোবৃত্তি নিয়ে নয় প্রগতি-শীল আধুনিক স্রষ্টার মনোভাব নিয়ে।

আলোচনা

সবিনয় নিবেদন,

"গানের আসর" বিভাগে "শার্ঙ্গদেব" লিখিত "সদারঙ্গ মিউজিক কনফারেন্সের" আলোচনা পড়ে খুবই আনন্দিত হয়েছি। তবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অনুষ্ঠানে তাঁর কয়েকটি মন্তব্য কিন্তু ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করেছে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের কনফারেন্স ও রেডিও, রেকর্ড, ফিল্ম গানের অনুষ্ঠান বা ঘরোয়া গা[...] আসর-এর পার্থক্য আছে নিশ্চয়ই। রেক[...] ফিল্ম বা ঘরোয়া গানের অনুষ্ঠা[...] পাণ্ডিত্য বা বৈচিত্র্যের স্থান নেই, শিল্প[...] লক্ষ্য থাকে মাধুর্য, মনোহারিত্ব [...] মনোরঞ্জনের প্রতি; কনফারেন্সে থা[...] পাণ্ডিত্য, বৈচিত্র্য ও উচ্চাঙ্গ কারুকাযে[...] প্রতি লক্ষ্য। প্রত্যেক বিভাগের শিল্[...] আপন আপন ক্ষেত্রে তাঁর পাণ্ডিত্য [...] বৈশিষ্ট্যের প্রতি মনোযোগী থাকে[...] একাধিক খ্যাতনামা শিল্পী যদি এক[...] অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন এ[...] প্রত্যেকেই তাঁর ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার [...] করে যদি সাধারণভাবে বাজিয়ে মাধুয[...] সৃষ্টি করেন তবে শ্রোতাদের নিকট হ[...] অভিযোগের অন্ত থাকে না। শ্রোতাদে[...] হয়ত এই ধারণা হয় যে, শিল্প[...] অনভ্যাসের ফলে কঠিন কারুকাযে[...] বদলে শ্রুতি মাধুর্যের প্রতি ঝোঁক এসে[...] শিল্পী কনফারেন্সের অনুপযোগী। গ[...] বাজনার আসরে যন্ত্রী ও সঙ্গতের স[...] কখনো হয় অনুরাগের মিলন, কখনো [...] বিদ্যার প্রতিযোগিতা। বিদ্যার প্রতি[...]যোগিতা অর্থে দাপাদাপি বা ঝনাৎক[...] নয়, জ্ঞানের উচ্চতম ক্ষেত্রে সহজ [...] স্বচ্ছন্দ বিচরণ। বিভিন্ন লয়ের ছ[...] যন্ত্রী ও তবলীয়ার যখন সঙ্গত চ[...] তখন হয় ছন্দের বৈচিত্র্য, এই বৈচিত্র্য[...] সুষ্ঠুরূপে প্রকাশের জন্যই প্রয়োজন [...] জোরে বাজানোর। একে লড়াই [...] দাপাদাপি বলা ন্যায়সঙ্গত নয়। তব[...] সৃষ্টির ইতিহাসে দেখা যায়, পাখোয়া[...] থেকেই এর উৎপত্তি। পাখোয়াজই [...] পূর্ব-পুরুষ সুতরাং সহজ ভা[...] পাখোয়াজের বোল, পরণ ইত্যাদি তবল[...] বোলের ভিতর মিশে রয়েছে। য[...] ছন্দে বৈচিত্র্য আনতে হবে, পাখোয়া[...] বোলের সাহায্য ততই নিতে হ[...] পাখোয়াজের বোল দ্রুত ও বিচিত্র ছ[...] বাজলে কিছুটা উচ্চশব্দ হবেই, তা[...] দাপাদাপি বলার অর্থ ছন্দের বৈচিত্র্য[...] বিসর্জন। সারাজীবন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত[...] সাধনায় লিপ্ত থেকে বর্তমানের চাহি[...] অনুযায়ী একে কি করে ত্যাগ করি[...]

শান্তাপ্রসাদ মিশ্র,

কবিরচৌরা, বেনার[...]

* হিন্দী হইতে অনূদিত।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক পার্টির অংশে জয়ের ভাগ বেশি পড়েছে। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইনসভায় রিপাবলিকান পার্টি মাইনরিটিতে পরিণত হয়েছে। অথচ গভর্নমেণ্ট আরো দু বছর, অর্থাৎ আগামী প্রেসিডেণ্ট নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত রিপাবলিকান পার্টিই থাকবে। সুতরাং প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারকে তাঁর কার্যকালের বাকী দু বছর ডেমোক্র্যাট পার্টির প্রাধান্যযুক্ত কংগ্রেসকে নিয়ে চলতে হবে।

তবে ব্যাপারটা শুনতে যতটা মুশকিলের বলে মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ততটা নয়। এরকম বা এরকমের কাছাকাছি অবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে মাঝে মাঝে হয়ে থাকে। অনেক সময়ে আবার এমনও হয় যে, প্রেসিডেণ্টকে কোন কোন নীতির পক্ষে কংগ্রেসের সমর্থন লাভের জন্য সেনেট বা হাউস অব রিপ্রেজে-ণ্টেটিভসে নিজের পার্টির লোকদের সংগেও ধস্তাধস্তি করতে হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে প্রেসিডেণ্টকে বিরুদ্ধ পার্টির সমর্থনের উপর নির্ভর করতে হয়।

জেনারেল আইজেনহাওয়ার যদিও রিপাবলিক্যান পার্টির প্রার্থী হিসাবে
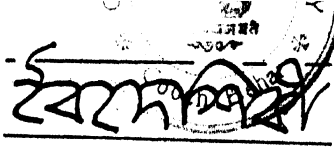
প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হয়েছেন, কিন্তু রিপাবলিকান পার্টির চাঁইরা যে সকলে আইজেনহাওয়ারকে বা তাঁর সব মতামত পছন্দ করেন তা নয়। অন্য কাউকে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী হিসাবে দাঁড় করালে জয়লাভের সম্ভাবনা ছিল না বলেই অনেক রিপাবলিকান পার্টির চাঁই জেনারেল আইজেনহাওয়ারের মনোনয়ন বাধ্য হয়ে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জেনারেল আইজেনহাওয়ারের ব্যক্তিগত জনপ্রিয়তাই তাঁর জয়ের প্রধান কারণ ছিল। অনেক ডেমোক্র্যাটও তাঁকে ভোট দিয়েছে। রিপাবলিকান পার্টির একাংশ এখনও আইজেনহাওয়ারকে পছন্দ করে না এবং আইজেনহাওয়ারের সব নীতি তাদের মনঃপূত নয়। অন্য পক্ষে আইজেনহাওয়ার অনেক ক্ষেত্রে ডেমোক্রাট-দের সমর্থন পান।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে অবশ্য এমনিতেই বিবাদ বিশেষ কিছু নেই। রিপাবলিকান প্রেসিডেণ্ট আইজেন-হাওয়ারের আমলে ডেমোক্রাটিক প্রেসিডেণ্ট ট্রুম্যানের নীতিরই অনুসরণ ও ক্রমবিকাশ চলছে। ট্রুম্যানের বৈদেশিক নীতি যেমন মোটের উপর রিপাবলিকান পার্টির দ্বারাও সমর্থিত ছিল, তেমনি আইজেনহাওয়ারের বৈদেশিক নীতির পরিচালনাও মোটের উপর ডেমোক্রাটিক পার্টির সমর্থন পেয়ে আসছে ও পাবে। সুতরাং কংগ্রেসে ডেমোক্রাটিক পার্টির প্রাধান্য লাভের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে কোনপ্রকার নূতন দৃষ্টিভংগীর প্রকাশ বা মৌলিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। টানাটানি যেটুকু বাড়বে সে কোন কোন অভ্যন্তর বৈষয়িক নীতির ক্ষেত্রে।

* * *

প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু চীন ভ্রমণ করে ফিরে এসেছেন। চীনাদের মধ্যে পণ্ডিত নেহরু যে একতা ও শৃঙ্খলা-পরায়ণতা দেখেছেন, দেশে ফিরে তিনি তার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং এ বিষয়ে ভারতীয়দের চৈনিক দৃষ্টান্ত অনুসরণ করার উপদেশ দিয়েছেন। তবে বর্তমানে চীন ও ভারতের আভ্যন্তর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা যে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের, পণ্ডিত নেহরু সেকথাও বলেছেন। তিনি বলেছেন যে, ভারতে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আছে। এখানে অনেক কাগজ প্রায়শই গভর্নমেণ্টের সমালোচনা করে থাকে। কিন্তু চীনের অবস্থা অন্যরূপ। সেখানে বর্তমানে কোন বিরুদ্ধবাদী সংবাদপত্র নেই। তাছাড়া চীনের সংবাদ-

পত্র পড়ে পৃথিবীর অন্যত্র কি হচ্ছে, তা বুঝবার উপায় নেই।

পণ্ডিত নেহরু অবশ্য বার বার করে বলেছেন, তিনি চীনের সমালোচনা করতে চান না কারণ একদেশের পক্ষে অন্য-দেশের অভ্যন্তর নীতির সমালোচনা করা ঠিক নয়। তবে পণ্ডিত নেহরু যা বলেছেন তাথেকে বুঝা যায় যে, বাইরের কোনো দেশ সম্বন্ধে চীনের গভর্নমেণ্ট যে-সংবাদ যে-ভাবে এবং যতটুকু লোককে জানাতে চান চীনের সংবাদপত্রগুলি সেই সংবাদ সেইভাবে ততটুকুই প্রকাশ করতে পারে, সেজন্য অন্য দেশের বাস্তব চিত্র চীনের সংবাদপত্রগুলির মারফৎ চীনা জনসাধারণ পেতে পারে না।

এই যদি প্রকৃত অবস্থা হয়, তবে চীনে পণ্ডিত নেহরু ভারতের প্রতিনিধি হিসাবে যে আদর ও অভ্যর্থনা লাভ করেছেন তার প্রকৃত মূল্য নিরূপণ করা একটু কঠিন হয়। চীনা জনসাধারণ পণ্ডিত নেহরুকে যে অভ্যর্থনা জানিয়েছে তার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। পণ্ডিত নেহরু এবং তাঁর নীতি চীনের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন একথা বিশ্বাস করেই চীনের জনসাধারণ পণ্ডিত নেহরুকে যাবার আদর অভ্যর্থনা জানিয়েছে। কিন্তু তাদের এই বিশ্বাসের ভিত্তি ভারত সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে লব্ধ জ্ঞান নয়, তার ভিত্তি হল চীন সরকার যা বুঝিয়েছেন তাই। কোনো কারণে ভবিষ্যতে যদি ভারত এবং পণ্ডিত নেহরু সম্পর্কে চীন সরকারের নীতির পরিবর্তন হয় তখন চীন সরকার চীনা জনসাধারণকে অন্যরূপ বুঝাতে পারেন এবং তখন তারা অন্যরূপ বুঝবে।

অদূর অতীতে পিকিং গভর্নমেণ্টের নেতাদের পণ্ডিত নেহরু ও তাঁর গভর্ন-মেণ্ট সম্বন্ধে কটূক্তি করতে শুনা গেছে। তিব্বতে যখন চীন সৈন্য ঢোকে তখন পণ্ডিত নেহরুর প্রতিবাদের উত্তরে চীনা সরকারী নেতারা কী বলেন তা আমরা সকলেই জানি। তারপর অবশ্য ভারত-গভর্নমেণ্ট সম্পূর্ণ অন্য সুর ধরেন এব ক্রমশ চীন সরকারের ভারত সম্পর্কে উক্তির ভাষারও পরিবর্তন হতে থাকে দুই দেশের গভর্নমেণ্টের মধ্যে বর্তমা যে বন্ধুভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার স্থায়ি অবশ্যই কাম্য কিন্তু এর ভিত্তি তখন দৃঢ় হবে যখন উভয় দেশের সাধার লোক একে অপরের দেশ সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে জানবার এবং মত পোষ করার সুযোগ পাবে।

* * *

কেনিয়াতে বৃটিশ কর্তৃক 'মাউ মা দমন অর্থাৎ বিদ্রোহী কিকিয়ু জাতিকে শায়েস্তা করার যুদ্ধ দু'বছরের বে হল চলছে। "কেনিয়া ওয়ার কাউন্সিলে' একটি সাম্প্রতিক রিপোর্ট থেকে জা যায় যে, এই দুবছরে বিশ হাজ (২০,০০০) 'মাউ মাউ' দলভুক্ত কিকু হত হয়েছে এবং বর্তমানে ছেচল্লিশ হাজ (৪৬,০০০) কিকুয়ু কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পে বন্দী আছে। কিন্তু 'এমারজেন্সি (Emergency) অবসান হতে এখন অনেক বাকী। বৃটিশ কর্তৃপক্ষের হিস অনুসারে সাতহাজার 'সন্ত্রাসবাদীর' এক 'শক্ত শাঁস' এখনও অটুট রয়েছে সেটিকে নষ্ট করতে হবে। তার মা কেনিয়ায় মনুষ্যশিকার চলতে থাকবে কবে এর শেষ হবে কে জানে। কিকু জাতির সমগ্র লোকসংখ্যার সঙ্গে তাদে বলির পরিমাণ তুলনা করলে, মানুষে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে কিকু জাতির এই মরণপণ সংগ্রামের স্থান অ উচ্চে হওয়া উচিত। যে-কমনওয়েল ভারতবর্ষ আছে, কেনিয়া সেই কম ওয়েলথেরই ভিতর।

৮।১১।৫৪

ট্রামে-বাসে

শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে জানাইয়াছেন যে, চীন অবস্থানের কয়েকটি দিন তিনি কোন সংবাদপত্র পাঠ করেন নাই এবং সেই জন্য পৃথিবীর কোন সাম্প্রতিক সংবাদই তিনি অবগত নহেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"নেহরুজী কতকদিন আগে নিজেই বলেছিলেন যে, জ্ঞানী
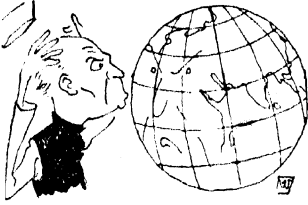
[ব্য]ক্তিরা সংবাদপত্র বেশী পড়েন না; সেই [হি]সেবে তিনি নিজে অন্তত বারোদিনের [জ]ন্যে তাঁর পাণ্ডিত্যকে নিশ্চয়ই আরো [স]মৃদ্ধ করেছেন!"

* * *

বিশুখুড়োর মন্তব্যের পর আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—জওহরলালজীকে শোনাবার মতো সংবাদ [এ]কটিই আছে;—তেরো তারিখ থেকে কলকাতাতে ঘোড়দৌড় শুরু হবে। আর খবর-টবর যা জানা গেছে, তাতে [শু]নলুম "আওয়ার-আও-এন্" নাকি [চ]ারবারের চেয়েও ফিট।"

* * *

আমাদের অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"আর নেহরুজী নিজে [স]চেয়ে যে জোর খবর শুনিয়েছেন, তা [হ]লো এই যে, রাজনীতি থেকে অবসর [গ্রহ]ণের কোন ইচ্ছেই তাঁর নেই। যাঁরা [ম]নে মনে লংকা-ভাগ করছিলেন, তাঁরা

জওহরলালজীর খবরটি টুকে রাখলে উপকৃত হবেন!

* * *

কলিকাতা ময়দানের বক্তৃতায় জওহরলালজী তাঁর শ্রোতাদের জানাইয়াছেন যে, যুদ্ধ দ্বারা কোন সমস্যারই সমাধান হয় না। —"কিন্তু তাঁর কথাটা সাদাবাজারীরা মেনে নিলেও, কালোবাজারীরা মানবেন না। নিজেদের সমস্যার সমাধান ক'রে কত রামা যুদ্ধের কল্যাণে রাতারাতি রামমানিকবাবুতে উন্নীত হয়েছেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

জওহরলালজী ভারতের সঙ্গে চীনের সরাসরি টেলিফোন সংযোগের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতায় জানা গেল, চীন নাকি এই প্রস্তাব সানন্দে গ্রহণ করিয়াছে। —"কিন্তু নেহরুকে ফোন করতে গিয়ে যখন নরুদ্দিনের লাইন পাবেন, তখন বুঝবেন এ প্রস্তাবে রাজী না হলেই হতো ভালো"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

চীন সম্বন্ধে নেহরুজী বলিয়াছেন যে, তিনি দেখিয়া আসিয়াছেন একটি মস্তবড় জাতি,—মস্তবড় শুধু আকারেই নয়, মস্তবড় গুণে এবং spiritএ। আমাদের জনৈক সহযাত্রী spirit-এর নামে যেন একবারে শ্যাম নামে প্রাণ পাইয়া গেলেন। বলিলেন—"তাইতো বলি, বড় হতে হলে শুধু টমাটোর রসে হয় না!"

* * *

হরিণঘাটায় বিড়লা কৃষি কলেজের উদ্বোধনী বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত জওহরলাল বলিয়াছেন যে, সাম্প্রতিক গো-হত্যা নিবারণ আন্দোলনের পিছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া কিছুই নাই। —"একথা অবশ্যি সবাই বুঝে নিয়েছেন।

কিন্তু নেহরুজীর উচিত ছিল এই আন্দোলনের খঞ্জ, পঙ্গু শিশুদের বি সি রায় অপাঙ্গ হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরামর্শ দেওয়া"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

শ্রীযুক্ত মেহেরচাঁদ খান্না উদ্বাস্তুদের দাবী সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"আশ্বাস অবশ্যি আমরা অনেকবারই পেয়েছি। কিন্তু এ পর্যন্ত ভাগ্যে যা মিলেছে, তাতে যদিবা নাহি আসে, তবু বৃথা আশ্বাসে দিন কাটাতে ভরসা হয় না।" তার কথার উপর টিপ্পনী কাটিয়া অন্য এক সহযাত্রী বলিলেন—"ভরসা আর কী করেই বা হবে, তিনি নিজেই যে খান না (খান্না)"!!

* * *

জনাব মহম্মদ আলি নাকি বলিয়াছেন যে, কাশ্মীর বেয়োনেটের ছায়ার তলে অবস্থান করিতেছে। আমাদের শ্যামলাল স্বর্গত

কবি সুকুমার রায়ের "ছায়াবাজি" কবিতার দুইটি লাইন আবৃত্তি করিলেন—আজগুবি নয়, আজগুবি নয় সত্যিকারের কথা; ছায়ার সাথে কুস্তি করে গাত্রে হলো ব্যথা। আমরা বলি কি, পালোয়ান আলি যত Dawn কুস্তিই করুন, ছায়াকে কাৎ করা শক্ত।"

* * *

হায়দরাবাদ পুলিস উপর্যুপরি পাঁচবার রোভার্স কাপ বিজয়ের কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। —"হায়দরাবাদ পুলিস এক্শানের চেয়ে এটা কম কৃতিত্বের কথা নয়"—মন্তব্য করিলেন আমাদের জনৈক ফুটবল-রসিক সহযাত্রী।

—শৌভিক—

যুগান্তকারী প্রমোদ-মাধ্যম
উদয়শঙ্করের ছায়ানৃত্য

উদয়শঙ্করের ছায়ানৃত্য সম্পর্কে সপ্তাহ দুই আগে যা লেখা হয়েছিল, প্রকৃত তা বদ্ধ স্থানে আংশিক দেখা একটা প্রাথমিক প্রদর্শনী দেখে। ছায়া-নৃত্যটির উদ্ভাবন মুখ্যত খোলা জায়গায় বহুশত দর্শকের সামনে দেখাবার উদ্দেশ্য নিয়ে। কাজেই ফাঁকা মাঠে এর সাফল্যের ওপরে সবকিছু নির্ভর করছিল। গত শনিবার সন্ধ্যায় ইডেন গার্ডেনের রণজি স্টেডিয়ামে সাধারণ্যে প্রথম প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এবং তাঁর সঙ্গে কয়েকজন বিদেশী এবং তাছাড়া আরও হাজার আস্টেক দর্শক জমা হয়, যার মধ্যে বেশির ভাগই ছিলেন স্বল্পবিত্ত দর্শক এবং প্রদর্শনীর আগে উদয়শঙ্কর এই দর্শক শ্রেণীকে লক্ষ্য করে জানিয়েও দেন যে, ছায়ানৃত্যটির পরিকল্পনা ব্যাপারে তাঁদের সাধ্যের কথাও তিনি বিবেচনা করেছেন। বলতে গেলে এক ময়দানের খেলাধুলো ছাড়া বোধ হয় এমনভাবে এক স্থানে সমবেত হয়ে হাজার হাজার দর্শক একত্রে বসে প্রমোদ উপভোগ করার এমন ব্যবস্থা ভারতে আর কখনও কোথাও হয়েছে বলে জানা নেই। উত্তর ভারতে দশহরার সময়ে বিরাটকায় কুশপুত্তলি সহযোগে রামলীলা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু সে অনেকটা মিছিল গোছের জিনিস। কিন্তু উদয়শঙ্করের 'রামলীলা' সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপ বিস্ময়কর। চমকপ্রদ। সম্ভাবনাপ্র এমন একটা মাধ্যম উদয়শঙ্করের প্র উদ্ভাবনে সক্ষম হয়েছে, যার মধ্যে একা মঞ্চ ও চলচ্চিত্র, উভয়েরই জোর র অথচ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চেহারা 'রামলীলা' এমন একটা নিজস্ব বৈ নিয়ে হাজির হতে পেরেছে, যা মানু মোহকে অতি অনায়াসেই আয়ত্তে ফেলে। ছেলেবয়সে দেয়ালের গায়ে দেখে কৌতূহলী হয়ে ওঠার সেই সম রয়েছে এই টেকনিকের মনস্তত্বে। তে সহজ ও নিশ্চিত আবেদন—চলচ্চি চেয়েও বেশি আকর্ষণীয় এবং নাট্যাভিন চেয়েও অভিব্যক্তিময়।

• • •

পালাটি পর্দায় প্রতিফলিত হবার অ

কমল মিত্রের ভক্তিমূলক ঐতিহাসিক কাহিনী "মদনমোহন"-এর একটি দৃশ্যে শ্যামলী চক্রবর্তী, সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও মলিনা দেবী

শিল্পিবৃন্দ যার যা চরিত্রের সাজ-পোশাক মুখোস পরে দর্শকদের সামনে দিয়ে ঘুরে যান। সব মিলিয়ে প্রায় শতজন শিল্পী। এইভাবে আগে দর্শকদের সামনে চেহারা দেখিয়ে যাওয়ার ভালো দিক আছে। দর্শক ও চরিত্রগুলির সান্নিধ্যটা কাছাকাছি এসে পড়ে, মণ্ডাভিনয়ের মতো সামনাসামনি থাকার ভাব। এরাই পর্দার পিছনে গিয়ে নিজেদের ছায়া প্রতিফলিত করে তেজী আলোর সামনে দাঁড়িয়ে। তুলসীদাসের 'রামচরিত মানস' থেকে বাছা বাছা পাঁয়ত্রিশটি ঘটনায় গাঁথা এই পালা। দৃশ্য পাঁয়ত্রিশটি হচ্ছে এইঃ রাম-সীতা ও লক্ষ্মণ অযোধ্যা ত্যাগ করে নৌকায় চড়লেন; নৌকা থেকে এক স্থানে অবতরণ করলেন, গুহর্ক বিদায় নিল। পঞ্চবটি বনে সূর্পণখার আবির্ভাব। সূর্পণখার সামনে এসে পড়লেন ও'রা তিনজন। লক্ষ্মণের হাতে সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন। খর-দূষণের কাছে সূর্পণখার নালিশ। রামের হাতে খরের পতন। পঞ্চবটিতে সোনার হরিণের প্রতি সীতার আকর্ষণ এবং তা ধরার জন্য রামের যাত্রা ও পরে রামের আর্তনাদ শুনে লক্ষ্মণের সেই দিকে অনুসরণ। বৃদ্ধ ভিখারীর বেশে সীতার সামনে রাবণের আবির্ভাব এবং ছলে সীতাকে হরণ। রাম ও লক্ষ্মণের প্রত্যাবর্তন এবং সীতার জন্য বিলাপ। সীতার অন্বেষণ এবং পথে কবন্ধ নিধন। সীতাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার সময় জটায়ু কর্তৃক বাধাপ্রাপ্তি এবং জটায়ুকে আহত করা। জটায়ুর সঙ্গে রামের সাক্ষাৎ এবং সীতার সংবাদ জানানোর পর জটায়ুর মৃত্যু। পর্বতের ওপরে হনুমান ও সুগ্রীব। রাম ও লক্ষ্মণ সেখানে আগমন। কিস্কিন্ধ্যার বানরদের সঙ্গে রাম ও লক্ষ্মণের পরিচয় এবং অগ্নি সাক্ষ্য করে রামের হয়ে রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বানরদের শপথ গ্রহণ। সিংহাসন নিয়ে বালি ও সুগ্রীবের দ্বন্দ্ব এবং রামের হাতে বালির মৃত্যু। সীতার সন্ধানে সুগ্রীব দিকে দিকে বানরদের পাঠালেন। রাম হনুমানকে পাঠালেন লঙ্কায়। হনুমান এক লাফে সমুদ্র পার হয়ে লঙ্কায় উপস্থিত। অশোক বনে চেরীপরিবেষ্টিতা সীতা। রাবণের প্রণয় জ্ঞাপন এবং পরে সীতা কর্তৃক প্রত্যাখ্যান। রাক্ষস প্রহরীদের নিদ্রা

যাওয়া। সীতার সম্মুখে হনুমানের আবির্ভাব এবং রামের দেওয়া পরিচয়-অঙ্গুরীয় প্রদর্শন। হনুমান অশোকবন নষ্ট করতে যাওয়ায় রাক্ষসদের নিদ্রাভঙ্গ এবং মেঘনাদ কর্তৃক হনুমান বন্দী হয়ে রাবণের সামনে নীত হবার পর ওর লেজে আগুন লাগিয়ে দেওয়ায় লঙ্কা দাহন করে হনুমানের প্রস্থান এবং রামের কাছে উপস্থিত হয়ে সীতার অলঙ্কার প্রদর্শন। বানর সেনাদের নিয়ে লঙ্কা আক্রমণের প্রস্তুতি। সেতুবন্ধন এবং সমুদ্র অতিক্রমণ। রাবণের দরবারে বিরাটকায় অঙ্গদের উপস্থিতি এবং তার পা নড়াবার জন্য রাক্ষসকুলকে আহ্বান, কিন্তু রাক্ষসরা এক তিলও নড়াতে অক্ষম হওয়ায় স্বয়ং রাবণ এগিয়ে আসতেই অঙ্গদ তাঁকে অনুনয় করলে তার পা না ধরে রাবণ যেন রামের পা ধরেন এবং তাতে তার অভিশাপ থেকে মুক্তিলাভ ঘটবে। রাবণের যুদ্ধযাত্রা। লক্ষ্মণের শক্তিশেলে রামের বিলাপ এবং হনুমান কর্তৃক গন্ধমাদন পর্বত আনার পর লক্ষ্মণের পুনর্জীবন লাভ। কুম্ভকর্ণের নিদ্রাভঙ্গ এবং রামের হাতে নিধন। লক্ষ্মণের হাতে মেঘনাদ বধ। রাম কর্তৃক রাবণ নিহত। মন্দোদরীর বিলাপ। সীতার অগ্নিপরীক্ষা। হনুমান কর্তৃক ভরতকে রামের প্রত্যাবর্তন সংবাদ দান; ভরত কর্তৃক রাম-বন্দনা এবং অযোধ্যায় যাত্রা। অযোধ্যার সিংহাসনে রামের অধিরোহন।

* * *

কোন ফাঁক না রেখে পর পর দৃশ্য-গুলি প্রতিফলিত হয়ে যায়। চরিত্রগুলির অভিব্যক্তির মধ্যে ভারতীয় নৃত্যধারার সবগুলিরই কিছু কিছু পাওয়া যায়। বেশ স্পষ্ট অভিব্যক্তি; ছায়ায় প্রতিফলিত হয়ে একটা অভিনব রূপ খুলেছে তার। চরিত্রানুযায়ী ক্ষুদ্র ও বিরাট অবয়ব। কোথাও দিগন্তব্যাপী প্রান্তর ও কোথাও বন-জঙ্গল বা পর্বত, সমুদ্রের আভাস। কোন কোন পটভূমি রঙীন। তার সঙ্গে রয়েছে নানা রকমের বাদ্য। সব মিলে সামনে একটা অদ্ভুত স্বপ্নমায়া এনে হাজির করে দেয়। মাঝে মাঝে রয়েছে তুলসীদাসের দোঁহা গান। একটা মোহের মধ্যে আবিষ্ট করে রেখে দেয় সমগ্র দর্শক-মন সারাক্ষণ ধরে। একটা অত্যদ্ভুত কিছু দেখার কৌতূহল কানায় কানায় ভরে থাকে।

এক একটা দৃশ্যের চমৎকারিত্বে দর্শকরা প্রশংসা সামলে রাখতে না পেরে হাত-তালিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। আর সবচেয়ে মনে গেঁথে রেখে যায় এই

ভাবটা যে, এর সবটুকুই খাঁটি দিশ[illegible] জিনিস, বাইরে থেকে ধার করে আ[illegible] কিছু নেই। দিশী নাচ, একশো পনে[illegible] রকমের দিশী বাজনা; নিজেদের হা[illegible]

বিশ্বভারতী প্রডাকসন্সের "মিনার"-এর প্রণয়ীযুগল চরিত্রে ভারতভূষণ ও বীণা রায়

তৈরি সাজ-পোশাক, মুখোস; সর্বাঙ্গে দিশী ভঙ্গী এবং সমগ্রভাবে দিশী পরিকল্পনা। মাধ্যম হিসেবে প্রভূত সম্ভাবনাময় এক অনবদ্য উদ্ভাবন। আরম্ভতে যেমন সাজ-পোশাক-পরা শিল্পীদের দর্শকদের মাঝ দিয়ে ঘুরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়, তেমনি আবার একেবারে শেষে রামের সিংহাসন আরোহণের পর পর্দা সরিয়ে সীতা, লক্ষ্মণ ও পারিষদবর্গ পরিবিষ্ট রাজা রামকে দেখিয়ে দেওয়া হয়—গোড়ায় এবং শেষে শিল্পীদের এই-ভাবে প্রত্যক্ষ করানোর মধ্যে একটা অতিরিক্ত সান্নিধ্যবোধ জাগে। তাছাড়া শেষও হয় 'রঘুপতি রাঘব রাজারাম' গান দিয়ে যার সঙ্গে খুবই স্বাভাবিক দর্শকরাও কণ্ঠ যোগ করে দেওয়ায় উদ্বুদ্ধ হবে।

* * *

মাধ্যমরূপে অনবদ্য 'রামলীলা'র আখ্যানভাগ আরও একটু ভালোভাবে সাজানো দরকার। পঁয়ত্রিশটি ঘটনা নিয়ে দৃশ্যগুলির পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র একেবারে আলাদা। এমনভাবে সাজানো যে, রামায়ণের গল্প ভালো করে জানা না থাকলে গল্পাংশ অনুসরণ করা মুশকিল হয়। মাঝে মাঝে আবহ বিবৃতি বা আবৃত্তি প্রয়োগ করলে এই যোগসূত্রটা হয়তো গড়ে তোলা সম্ভব হতে পারে। আর একটা অভাব দেখা গেলো আবেগ সৃষ্টি করে তোলার দিক থেকে। লোকে বিস্মিত ও চমৎকৃত হচ্ছে কিন্তু ঠিক সেই পরিমাণ আবেগে

সঙ্গীত পরিচালক রামচন্দ্র পাল—"রিয়াসৎ"-এর একটি প্রধান চরিত্রে অবতরণ করেছেন

আকুল হয়ে ওঠার পরিচয় পাওয়া যায় না। ঘটনাবলীর বা অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনায় সে নাটকীয়তা নেই। গল্পের বাঁধুনিটাই ঠিক হয়নি।

* * *

বলা বাহুল্য এই 'রামলীলা'-র সমস্ত কৃতিত্বই একা উদয়শঙ্করেরই। তবুও তার সঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ে যারা সহযোগিতা করেছেন তাদেরও নামগুলো লিপিবন্ধ হয়ে থাকা উচিত। এরা হচ্ছেনঃ সুর রচনায় লালমণি মিত্র, সঙ্গীত পরিচালক ও প্রধান ঢুলি কমলেশ কুমার; অন্যান্য বাদক রবীন দাস; বি ভৈরবন ও অমিয় সেনগুপ্ত; গানে গীতশ্রী ইভা দত্ত, সুনীল চট্টোপাধ্যয়, শিবানী ধর ও অমিয় দেব-বর্ম্মণ; নৃত্যে রাঘবন, শঙ্করণ, কৃষ্ণা, অশোক, শান্তি, রাজম, অচ্যুৎ, অর্চনা, ঝর্ণা, মীনা, গায়ত্রী, কবিতা, সুস্মিতা, হেনা, অসিত, হীরেন্দ্র, ভানু, প্রণব, রাজ-কুমার, মিহির, শিশির এবং অতিরিক্ত পঞ্চাশজন। মঞ্চ তত্ত্বাবধান ও আলোকপাত চিরঞ্জীলাল শা। একটি যুগান্তকারি মাধ্যমের প্রবর্তক হিসেবে উদয়শ[ঙ্করের] সঙ্গে এরাও স্মরণীয় হয়ে থাকবে[ন]

* * *

পরিচ্ছন্ন প্রমোদের সাহায্যে সাধারণের মনোরঞ্জন ব্যবস্থায় মাধ্যমটি ব্যাপকভাবে কাজে ল[াগানো] যায়। সমাজ উন্নয়ন পরিকল্পনা গভর্নমেণ্ট থেকে যে একটা মা[ধ্যমের] তল্লাস চলছিলো উদয়শঙ্কর প্র[বর্তিত] এই ছায়ানৃত্য টেকনিক অভাবটা মিটিয়ে দিতে সক্ষম হবে। পৌরাণিক বিষয়বস্তুই নয়, এই টে[কনিকে] ঐতিহাসিক এবং সামাজিক বিষ[য়ও] অত্যন্ত দীপ্তভাবে পরিবেশন করা স[ম্ভব]। এখন নির্ভর করছে গভর্নমেণ্টের ওপরে। সেদিন 'রামলীলা'-র উ[দ্বোধন] প্রসঙ্গে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কথা [থেকে] বোঝা গেল উদয়শঙ্করের এই স[ৃষ্টির] পিছনে পশ্চিমবঙ্গ গভর্নমেণ্টেরও তাগিদ ছিল। এখন উদ্ভাবনটি সফল হতে পেরেছে তখন পশ্চি[মবঙ্গ] গভর্নমেণ্ট তো বটেই, আন্যান্য গভর্নমেণ্ট ও কেন্দ্রীয় গভর্নমে[ণ্টের] উচিত এই মাধ্যমটিকে ব্যাপকভাবে লাগানো। তাতে ভারতের নিজস্ব ঐ[তিহ্যে] দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার সঙ্গে [সঙ্গে] বহু শিল্পীকেও কাজে লাগানো পারবে।

একলব্য

উপর্যুপরি পাঁচবার রোভার্স কাপ লাভ
র হায়দরাবাদ পুলিশ দল যে কৃতিত্ব অর্জন
রেছে, ভারতীয় ফুটবলের দীর্ঘ ইতিহাসে
ন্য কোন সামরিক বা বে-সামরিক ফুটবল
লের পক্ষে সে কৃতিত্ব লাভ করা সম্ভব
নি। আই এফ এ শীল্ড, রোভার্স কাপ
ং ডুরান্ড কাপ—ভারতের এই তিনটি
ান ফুটবল প্রতিযোগিতায় একাদিক্রমে
ন বছর বিজয়ীর সম্মান লাভের ঘটনা
ল নয়। কিন্তু কি মিলিটারী কি সিভিল
ান টীমই একাদিক্রমে ৪ বছর কোন প্রতি-
গিতায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে
রেনি। উপর্যুপরি ৪বার রোভার্স কাপ
জয়ী হয়ে হায়দরাবাদ পুলিশ দল গতবারই
তন রেকর্ড সৃষ্টি করেছিল, এবারও তারা
ভার্স কাপ ঘরে তুলে ফুটবল ইতিহাসে
 অবিস্মরণীয় অধ্যায় রচনা করল।

হায়দরাবাদ পুলিশের এই কৃতিত্বপূর্ণ
ফল্যের সংগে আর একটি ক্লাবের সাফল্যের
না করা যেতে পারে। এই ক্লাবটি হচ্ছে
কাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। মহ-
ডান দল তাদের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ে
র্যুপরি পাঁচবার লীগ চ্যাম্পিয়নশিপ
ভ করে যে রেকর্ড করে রেখেছে, অন্য
ন ক্লাব আজ পর্যন্ত লীগের সে রেকর্ড
গতে পারেনি। তবে লীগ আর নক
উটের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য। লীগ স্থানীয়
তযোগিতা। অন্তর্ভুক্ত কয়েকটি ক্লাব ছাড়া
র কোন ক্লাবের তাতে যোগ দেবার অধিকার
ই। কিন্তু নক আউট সবার জন্যই উন্মুক্ত।
ত ভারতের সমস্ত দলের যোগদানের
ধকার তো আছেই, বাইরের দলের যোগ-
নের পক্ষেও কোন বাধানিষেধ নেই। তাই
দরাবাদের কৃতিত্ব অধিকতর নৈপুণ্যে
বর।

* * *

কলকাতার লীগ ও শীল্ড বিজয়ী
হনবাগান ক্লাবকে সেমি ফাইন্যালে করাচীর
মারী ইউনিয়নের কাছে পরাজয় স্বীকার
র রোভার্স কাপ হতে বিদায় গ্রহণ করতে
য়েছে। একটানা প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে
লোয়াড়দের পায়ের চোট এবং রোভার্স
পের খেলায় পরাজয়জনিত নৈরাশ্য গত-
রের ডুরান্ড বিজয়ী মোহনবাগান দলের এ
র ডুরান্ডে অংশ গ্রহণের পথে অন্তরায়
ষ্টি করে। ফলে তাদের এবার 'ট্রিপল
উন' অর্থাৎ তিনটি শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতায়
লাভের সম্ভাবনা বিলীন হয়ে গেল।
ফলস' লাভের পর অনেকেই আশা করে-
ছিন রোভার্স অথবা ডুরান্ড একটি প্রতি-
যোগিতায় বিজয়ী হয়ে মোহনবাগান ক্লাবের
ক এবার 'ট্রিপল ক্রাউন' লাভ করা বিশেষ
সাধ্য হবে না। এই জনপ্রিয় দলের গোঁড়া
র্কদের মনে রোভার্স এবং ডুরান্ড দুইটি
যোগিতার বিজয়ী হবার রঙীন আশাও
দানা বেঁধেছিল। কিন্তু সবই ওলটপালট হয়ে
গেল। মোহনবাগানের দলগত শক্তি এবার
মোটেই কম ছিল না। শক্তিশালী হায়দরা-
বাদকে ফাইন্যালে হারিয়েই তারা আই এফ এ
শীল্ড লাভ করে। রোভার্সেও মোহনবাগানের
খেলা মন্দ হয়নি। কিন্তু দুর্ভাগ্যই তাদের
সাফল্যের পথে প্রধান অন্তরায় হয়। ভাল
খেলে, বেশী আক্রমণ করেও তারা কীমারীর
বিরুদ্ধে কোন গোল করতে পারলো না:
কীমারী তাদের বিরুদ্ধে যে গোলটি করেছিল,
তা শোধ দেবারও সুযোগ পেল, কিন্তু শেষ
পর্যন্ত পেনাল্টি কিকের অপব্যবহার করে
দুর্ভাগ্যকে মাথা পেতে বরণ করে নিল
মোহনবাগান। মোহনবাগানের পেনাল্টি
কিকের অপব্যবহারের ঘটনা নুতন নয়।
ইতিপূর্বে বহু ক্ষেত্রে তাদের এই বৈশিষ্ট্য-
পূর্ণ ত্রুটি প্রত্যক্ষ করা গেছে। তাই
আশ্চর্যের কিছুই নেই। যাই হোক গতবারের
বিজয়ী মোহনবাগান ডুরান্ডে অংশ গ্রহণ না
করায় ডুরান্ডের আকর্ষণ অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ
হয়েছে, একথা বলাই বাহুল্য।

* * *

২০০ মিটার বুক সাঁতারে নুতন ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবের সভ্য বি পাণ্ডে। বি পাণ্ডে ৩ মিনিট ৫ সেকেণ্ডে ২০০ মিটার অতিক্রম করেছেন

রোভার্সের খেলার জন্য কলকাতার আর একটি শক্তিশালী দল—রাজস্থান ক্লাবও ডুরান্ড থেকে নাম প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়। অবশ্য রাজস্থান ক্লাব রোভার্সে অংশ গ্রহণ করেনি। মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে কয়েকজন খেলোয়াড় ধার দিয়েছিল। কথা ছিল, ডুরান্ডেও তারা মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কয়েকজনের সাহায্য পাবে। কিন্তু বোম্বাইতে
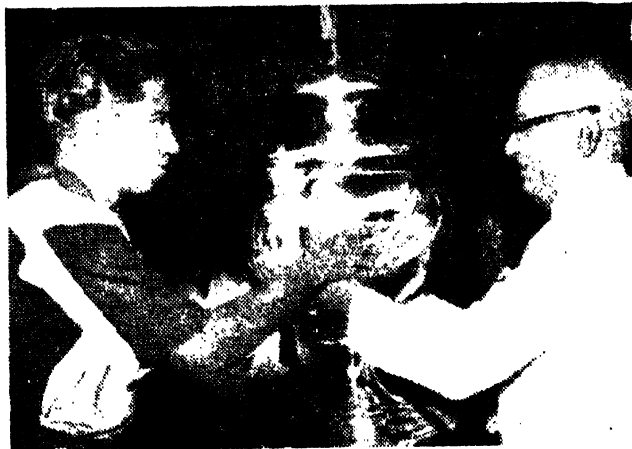
উপর্যুপরি পাঁচ বছরের রোভার্স কাপ বিজয়ী হায়দরাবাদ পুলিস দলের অধিনায়ক মঈনের হাতে বোম্বাইয়ের পুলিস কমিশনার কুমার প্রবীণ সিংজী রোভার্স কাপ তুলে দিচ্ছেন

বার্না দম্পতি — টেবিল টেনিসের গুরুজী ভিক্টর বার্না রাজকুমারী অমৃত কাউরের শিক্ষা পরিকল্পনা অনুযায়ী ভারতের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের উন্নত নৈপুণ্য শেখাবার জন্য তাঁর সহধর্মিণী সহ ভারতে এসে পেঁাছেছেন

মহমেডান দলের খেলা পর পর 'ড্র' হতে থাকায় রাজস্থান দলের সময়মত দিল্লীতে পেঁাছানোর অসুবিধা ঘটে। ফলে তারা ডুরাণ্ড থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে বাধ্য হয়। আবার ডুরাণ্ডের খেলায় অংশ গ্রহণের জন্য ব্যাংগালোরের হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্‌ট দলকে রোভার্স খেলা ছেড়ে দিয়ে বোম্বাই থেকে উড়ে যেতে হয় দিল্লীতে। এইভাবে ডুরাণ্ড ও রোভার্স খেলার তারিখের সংঘর্ষ উভয় প্রতিযোগিতারই আকর্ষণ ক্ষুন্ন করেছে। প্রতিযোগিতার পরিচালক এবং ক্লাব কর্তৃপক্ষকেও হতে হয়েছে নানা সমস্যার সম্মুখীন। কোন খেলাতেও তেমন নৈপুণ্যগত উৎকর্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়নি।

* * *

অবশ্য খেলায় নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের অভাবের প্রধান কারণ খেলোয়াড়দের অবসাদ। মানুষের পক্ষে একটানা কতদিন কঠিন শ্রমসাধ্য ফুটবল খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা সম্ভব? অসুখ আছে বিসুখ আছে। আছে শারীরিক পটুতার প্রশ্ন। হাতে পায়ের চোট ফুটবল খেলার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি। প্রতি দিন ফুটবল খেলায় অবসাদ আসতে বাধ্য। সারা বছর অনুশীলন এক কথা আর প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা ভিন্ন কথা। প্রতিদ্বন্দ্বিতার খেলায় স্নায়ুর উপর যে চাপ পড়ে, অনুশীলনে তা পড়বার কথা নয়। ভারতের ফুটবল মরসুম আরম্ভ হয়েছে গত মে মাস থেকে। এখনো খেলা চলেছে। এর পর আবার আছে কলকাতায় সুইডিশ দলের খেলা আর এশিয়ান কোয়াড্রাংগুলার প্রতিযোগিতা। খেলোয়াড়রা তো আর মেসিন নয় যে, তাদের ক্রীড়াধারায় একই রকম নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে। তাই রোভার্সের খেলাও তেমন জমেনি। ডুরাণ্ডের খেলাও জমছে না।

এবছরের রোভার্স কাপের খেলায় আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা করাচীর কীমারী ইউনিয়নের খেলোয়াড়দের খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তির পরিচয় দান। মালাবার ডিস্ট্রিক্ট ফুটবল এসোসিয়েশনের সংগে কীমারী দলের খেলার শেষে কীমারীর খেলোয়াড় কাসিম অখেলোয়াড়ী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়ে মালাবারের একজন খেলোয়াড়ের নাকে ইচ্ছে করেই এক মুষ্টাঘাত করেন। এই অপরাধের জন্য পশ্চিম ভারত ফুটবল এসোসিয়েশন কাসিমকে 'সাসপেণ্ড' করতে কসুর করে কিন্তু কীমারী দলের ম্যানেজার সাংবা দের কাছে বলেন এ শাস্তি ছাড়াও কা অমার্জনীয় অপরাধের জন্য তারা পাকি তাদের নিজেদের এসোসিয়েশনের কাসিমের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিম ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য সুপারিশ কর কীমারী দলের ম্যানেজার শুধু একথা ব চুপ করে বসে থাকেননি। দলবল নিয়ে বোম্বাই রেল স্টেশনে উপস্থিত হন স্ব গামী মালাবার দলের কাছে ক্ষমা প্রাথ জন্য। এই খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃ সন্তুষ্ট হয়ে মালাবারের খেলোয়াড় কীমা খেলোয়াড়দের সংগে করমর্দন করেন। গ চলবার মুখে 'মালাবার খেলোয়াড়দের জয়ধ 'কীমারী জিন্দাবাদে' স্টেশন মুখরিত ওঠে। ভুলচুক সবারই হতে পারে, কিন্তু ভুল স্বীকার করবার মধ্যে যে প্রবৃ পরিচয় পাওয়া যায়, সেইটাই প্র খেলোয়াড়সুলভ প্রবৃত্তি। কীমারী দ ম্যানেজার ও খেলোয়াড়েরা এই প্রবৃত্তি পরিচয় দিয়েছেন।

* * *

রোভার্স কাপের আলোচনা প্রস ভারতের প্রধান তিনটি প্রতিযোগিতার অন্য এই ফুটবল প্রতিযোগিতার সংক্ষি ইতিহাস অপ্রাসংগিক হবে না। রোভ কাপের সৃষ্টি আই এফ এ শীল্ডে পূর্বে। ১৮৯১ সালে বোম্বাইয়ের রোভ ক্লাবের উৎসাহ এবং চেষ্টাতেই 'রোভ কাপের' খেলা আরম্ভ হয়। রোভার্স ক্লা মত আসল রোভার্স কাপের অস্তিত্বও অ দিন আগে লোপ পেয়েছে। এখনকার রোভা কাপটি পার্শী ব্র্যাডলী নামক জনৈক ক্রী মোদীর পরিকল্পনায় প্রস্তুত। ৪ ফুট উ এবং ১৮ ইঞ্চি ব্যাসের এই কাপটিকে কে করে বোম্বাইয়ের ফুটবল মরসুম সরগ হয়ে ওঠে। রোভার্স পশ্চিম ভারতের প্র ফুটবল প্রতিযোগিতা। প্রথমদিকে শুধু সামরিক দলগুলির মধ্যে রোভার্স সীমাব ছিল। ১৯২৩ সালে সর্বপ্রথম বাইরের দ গুলিকে রোভার্সে খেলবার জন্য আমন্ত্র জানান হয়। মোহনবাগান ক্লাব এই আবেদ সাড়া দিয়ে খেলায় অংশ গ্রহণ করে এ ফাইন্যালে ডারহামস দলের কাছে হেরে যায় এর পরেও বহুদিন রোভার্স সামরিক দ গুলির অধিকারে রইল। ১৯৩৭ সালে শক্তি শালী ব্যাংগালোর মুসলিম দল ফাইন্যা বিজয়ী হয়ে রোভার্সকে করলো জাতিভ্রষ্ট তাই ব্যাংগালোর মুসলিম দলের রোভার্স জ ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। হায়দরাবাদ পুলিশ উপর্যু পরি পাঁচবার কাপ লাভ করে আর এ স্মরণীয় অধ্যায় রচনা করেছে। নীচে হায়দরা বাদের পাঁচবারের সাফল্যের খতিয়ান ও

বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন পরিচালিত সিনিয়র ওয়াটারপোলো লীগ প্রতিযোগিতার অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশন টীম

রোভার্স কাপ বিজয়ীদের তালিকা দেওয়া হল—

১৯৫০ **সাল**—কাপ্পটির রব্বানি ক্লাবকে ৪—১ গোলে; বোম্বাইয়ের বার্মাশেলকে ২—২ ও ৩—১ গোলে; লাহোর রোডার্সকে ১—১ ও ৫—০ গোলে এবং কলকাতার এরিয়ান ক্লাবকে ফাইন্যালে ১—০ গোলে পরাজিত করে।

১৯৫১ **সাল**—বোম্বাইয়ের এ্যাস্‌বেস্‌টস সিমেণ্ট দলকে ২—০ গোলে; কলকাতার রাজস্থান ক্লাবকে ৫—০ গোলে; বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়া কালচার লীগকে ২—০ গোলে এবং ফাইন্যালে মাদ্রাজের উইমকো স্পোর্টস ক্লাবকে ২—০ গোলে পরাজিত করে।

১৯৫২ **সাল**—কানপুর ডি এস একে ৩—০ গোলে; বোম্বে ডায়নামোসকে ২—০ গোলে; সেণ্ট্রাল রেলওয়েকে ১—১ ও ২—০ গোলে এবং ফাইন্যালে বোম্বে এমেচারসকে ০—০ ও ১—০ গোলে পরাজিত করে।

১৯৫৩ **সাল**—কানপুর ডি এস একে ৫—০ গোলে; ইণ্ডিয়ান নেভিকে ৩—০ গোলে; মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে ০—০, ০—০, ০—০ ও ১—০ গোলে ও বাঙ্গালোর মুসলিমকে ফাইন্যালে ২—০ গোলে পরাজিত করে।

১৯৫৪ **সাল**—দিল্লী ইয়ংসকে ১—০ গোলে; ওয়েস্টার্ন রেলকে ৪—০ গোলে; মালাবার ডি এফ একে ৩—২ গোলে ও ফাইন্যালে করাচী কীমারী ইউনিয়নকে ২—১ গোলে পরাজিত করে।

রোভার্স কাপের পূর্ববর্তী বিজয়ী দল

১৮৯২ — উরস্টার্স; ১৮৯৩—ল্যাংকাসায়ারস ফুসিলিয়ারস; ১৮৯৪—রয়েল স্কটস; ১৮৯৫—রয়েল স্কটস; ১৮৯৬—ডারহামস, লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি; ১৮৯৭—মিডলসেক্স; ১৮৯৮—এইচ এল আই; ১৮৯৯—আর আই ফুসিলিয়রস; ১৯০০—৪২তম রয়েল হাইল্যাণ্ডার্স; ১৯০১—রয়েল আইরিস; ১৯০২—০৪ চেসায়ার; ১৯০৫—সিফোর্থ; ১৯০৬—রয়েল ফুসিলিয়ারস; ১৯০৭—ইস্ট ল্যাংকাসায়ার; ১৯০৮—উরস্টার; ১৯০৯-১০ — লিস্টারসায়ার; ১৯১১—রয়েল ওয়ার উইকসায়ার; ১৯১২—ডরসেট; ১৯১৩—রয়েল স্কটিস ফুসিলিয়ারস; ১৯১৪-২০ খেলা হয় নাই; ১৯২১—ডি সি এল আই; ১৯২২-২৩—ডারহাম লাইট ইনৃ; ১৯২৪-২৬—মিডলসেক্স; ১৯২৭—চেসায়ার; ১৯২৮-২৯—ওয়ারউইকসায়ার; ১৯৩০—কে ও সি বি; ১৯৩১—রয়েল ওয়েস্ট কেণ্ট; ১৯৩২—রয়েল আইরিস ফুসিঃ; ১৯৩৩—কিংস লিভারপুল; ১৯৩৪—শেরউড ফরেস্টার; ১৯৩৫-৩৬—কিংস লিভারপুল; ১৯৩৭—বাঙ্গালোর মুসলিম; ১৯৩৮—বাঙ্গালোর মুসলিম; ১৯৩৯—২৮তম ফিল্ড রেজিঃ; ১৯৪০—মহমেডান স্পোর্টিং; ১৯৪১—ওয়েলচ রেজিঃ; ১৯৪২—বাটা স্পোর্টস-কলিকাতা; ১৯৪৩—আর এ এফ; ১৯৪৪—বি বি আর ক্যাম্প; ১৯৪৫—সম্মিলিত মিলিটারী পুলিশ; ১৯৪৬—বি বি আর ক্যাম্প; ১৯৪৭—প্রতিযোগিতা অসমাপ্ত; ১৯৪৮—বাঙ্গালোর মুসলিম; ১৯৪৯—ইস্টবেঙ্গল; ১৯৫০-৫৪ — হায়দরাবাদ পুলিশ।

ভারতীয় ক্রিকেট দলের পাকিস্থান সফরের যে দিন-তালিকা প্রস্তুত হয়েছে, তাতে ভারতীয় দলকে আগামী ২৮শে ডিসেম্বর থেকে চট্টগ্রামে খেলা আরম্ভ করতে হবে। এর আগে কলকাতার 'ইডেন উদ্যানে' ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে তিন দিনব্যাপী এক প্রদর্শনী খেলা অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে। এই সম্বন্ধে পাকিস্থান ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের মতামত এখন পর্যন্ত পাওয়া যায়নি। তবে যে মহৎ উদ্দেশ্যে খেলাটি অনুষ্ঠানের আয়োজন চলছে, তাতে পাকিস্থান বোর্ডের আপত্তি না হবারই কথা। এই খেলায় সংগৃহীত অর্থের শতকরা ৫০ ভাগ পূর্ব পাকিস্থান বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে এবং বাকি ৫০ ভাগ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে প্রেরণ করা হবে। ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর কলকাতায় খেলাটি অনুষ্ঠিত হতে পারে বলে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক এক বিবৃতি প্রকাশ করেছেন। সুতরাং কলকাতায় সুইডিশ ফুটবল দলের তিনটি প্রদর্শনী খেলার পর এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা পাক-ভারত ক্রিকেট আসর জমাবার আশা করতে পারি। এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল বর্তমান ব্যবস্থানুযায়ী ১৮ই ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ হয়ে ২৬শে ডিসেম্বর শেষ হবার কথা।

৪ দিনব্যাপী পাঁচটি টেস্ট খেলা নিয়ে ভারতকে পাকিস্থানে ১৪টি ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করতে হবে। পাকিস্থানে ভারতকে কাটাতে হবে ৯ সপ্তাহ। ঢাকা, ভাওয়ালপুর, লাহোর, পেশোয়ার ও করাচীতে ৫টি টেস্ট খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। নীচে সফর তালিকা ও খেলার তারিখ দেওয়া হল—

২৮শে, ২৯শে ও ৩০শে ডিসেম্বর—ইস্টবেঙ্গল স্পোর্টস এসোসিয়েশন (চট্টগ্রাম)।

১লা জানুয়ারী হইতে ৪ঠা জানুয়ারী—প্রথম টেস্ট (ঢাকা)।

৮ই, ৯ই ও ১০ই জানুয়ারী—করাচী ক্রিকেট এসোসিয়েশন (করাচী)।

১১ই, ১২ই ও ১৩ই জানুয়ারী—সিন্ধু ক্রিকেট এসোসিয়েশন (হায়দরাবাদ—সিন্ধু)।

১৫ই জানুয়ারী থেকে ১৮ই জানুয়ারী—দ্বিতীয় টেস্ট (ভাওয়ালপুর রাজ্য)।

২০শে জানুয়ারী থেকে ২৩শে জানুয়ারী—সেণ্ট্রাল জোন (মণ্টগোমারী)।

২৫শে, ২৬শে ও ২৭শে জানুয়ারী—সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় (লাহোর)।

২৮শে থেকে ৩১শে জানুয়ারী—তৃতীয় টেস্ট (লাহোর)।

৩রা, ৫ই ও ৬ই ফেব্রুয়ারী—পাঞ্জাব ক্রিকেট এসোসিয়েশন (শিয়ালকোট)।

৮ই, ৯ই ও ১০ই ফেব্রুয়ারী—পাকিস্থান সার্ভিস একাদশ (রাওয়ালপিণ্ডি)।

১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে ১৫ই ফেব্রুয়ারী—চতুর্থ টেস্ট (পেশোয়ার)।

১৭ই, ১৯শে ও ২০শে ফেব্রুয়ারী—উত্তরাঞ্চল (লায়ালপুর)।

২২শে, ২৩শে ও ২৪শে ফেব্রুয়ারী—সম্মিলিত স্কুল দল (করাচী)।

২৬শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১লা মার্চ—পঞ্চম ও শেষ টেস্ট (করাচী)।

জাতীয় টেবিল টেনিস

বরোদার রাজপ্রাসাদে টেবিল টেনিসের আন্তঃ রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপ এবং ভারতের ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিযোগিতার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। আন্তঃ রাজ্য চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে গতবারের বিজয়ী বোম্বাই দল ৫—২ খেলায় বাঙলাকে হারিয়ে দিয়ে এবারও 'বার্নাবেলাক' কাপ লাভ করেছে। মহিলা বিভাগে জয়লক্ষ্মী কাপ লাভ করেছে মহারাষ্ট্র বোম্বাইকে শেষ নিষ্পত্তির খেলায় ৩—১ খেলায় হারিয়ে দিয়ে। জুনিয়র বিভাগে দিল্লী ৩—২ খেলায় মহারাষ্ট্রকে হারিয়ে রামানুজ কাপ লাভ করতে সমর্থ হয়।

ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় বোম্বাই-এর খ্যাতনামা ন্যাটা খেলোয়াড় উত্তম চন্দ্রানা বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছেন। চন্দ্রানার এ সম্মান লাভ নূতন নয়। ইতিপূর্বেও তিনি কয়েকবার চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। সম্প্রতি কয়েক বছর তিনি ভাল খেলতে পারেন নি। আবার নিজের নৈপুণ্য ফিরে পেয়েছেন। এবারকার প্রতিযোগিতায় বাঙলার খেলোয়াড়দের ব্যর্থতা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। হায়দরাবাদের খ্যাতনাম্নী সৈয়দ সুলতানার সঙ্গে খেলে বাঙলার চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় আর ভাণ্ডারী কেবলমাত্র মিক্সড ডাবলসে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। এ ছাড়া বাঙলার কোন খেলোয়াড়ই কোন পুরস্কার পাননি। অবশ্য প্রবীণদের সিঙ্গলস ফাইনালে এ মুখার্জির সাফল্যকে 'কনসোলেশন প্রাইজ' বলা যেতে পারে। প্রতিযোগিতার শেষে ভারতের টেবিল টেনিস খেলোয়াড়দের যে ক্রমপর্যায় রচিত হয়েছে, তাতেও বাঙলার কোন খেলোয়াড় স্থান পাননি বলা চলে। এখানেও আর ভাণ্ডারী যুগ্মভাবে অষ্টম স্থানের অধিকারী হয়েছেন। ক্রমপর্যায়ে বোম্বাইয়েরই খেলোয়াড় রয়েছেন পাঁচজন। টেবিল টেনিসে বোম্বাই উত্তরোত্তর এগিয়ে চলেছে একথা খেলার ফলাফল থেকে নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে। নীচে জাতীয়

...প্রতিযোগিতার ফলাফল ও 'ক্রমপর্যায়' দেওয়া ...ল।

পুরুষদের সিংগলস—ফাইনাল

উত্তম চন্দ্রানা (বোম্বাই) ২১-১৭, ...২১—১১, ২১—২৩, ২১—১৩ পয়েন্টে শ্যাম ...তিয়ালাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের সিংগলস ফাইনাল

মীনা পনরাণ্ডে (মহারাষ্ট্র) ২১—১৮, ...২১—১৭, ২১—১৯ পয়েন্টে সৈয়দ ...লতানাকে (হায়দরাবাদ) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ডাবলস ফাইনাল

এফ এইচ ইরাসী ও এম এম এল

আসমাই (মিশর) ১৩—২১, ২১—১৬, ১৪—২১, ২১—১৪, ২১—১২ পয়েন্টে আর ভাণ্ডারী ও কল্যাণ জয়ন্তকে (বাংলা) পরাজিত করেন।

জুনিয়ারদের—ফাইনাল

ভি ডি পার্কার (বোম্বাই) ২১—১৭, ২১—১৮, ২১—৮ পয়েন্টে জে সি ভোরাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মিক্সড ডাবলস—ফাইনাল

আর ভাণ্ডারী (বাংলা) ও সৈয়দ সুলতানা (হায়দরাবাদ) ১৮—২১, ২১—১৩, ১৯—২১, ২১—১২, ২১—১৬ পয়েন্টে উত্তম চন্দ্রানা ও মিসেস গুল নাসিক-ওয়ালাকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

মহিলাদের ডাবলস—ফাইনাল

সৈয়দ সুলতানা (হায়দরাবাদ) ও বি কে নালনী (হায়দরাবাদ) ১৮—২১, ২১—৭, ২১—১২, ২১—১০ পয়েন্টে মিসেস গুল নাসিকওয়ালা ও এনিড বোকারোকে (বোম্বাই) পরাজিত করেন।

প্রবীণদের সিংগলস—ফাইনাল

এ মুখার্জি (বাংলা) ২১—১২, ২০—২২, ২২—২৪, ২১—১০ ও পি এম এস অরুলানন্দমকে (সিংহল) পরাজিত করেন।

পুরুষদের ক্রমপর্যায়

১ম—ইউ চন্দ্রানা (বোম্বাই); ২য়—ভি এস ব্যাস (বোম্বাই), ৩য়—কে আর চন্দোর-কার (মহারাষ্ট্র), ৪র্থ—দিলীপ সম্পৎ (বোম্বাই), ৫ম—এম এস সাবরাওয়াল (দিল্লী), ৬ষ্ঠ—ভি নাগরাজ (মহীশূর), ৭ম—পি সোমায়া (বোম্বাই), ৮ম—এস এম মতিওয়ালা (বোম্বাই), আর ভাণ্ডারী (বাংগলা) ও আর রামকৃষ্ণ (হায়দরাবাদ)।

মহিলাদের ক্রমপর্যায়

১ম—মীনা পরাণ্ডে (মহারাষ্ট্র), ২য়—সৈয়দ সুলতানা (হায়দরাবাদ), ৩য়—আর জন (মাদ্রাজ), ৪র্থ—মিসেস গুল নাসিকওয়ালা (বোম্বাই) ও মিসেস সি কে পিল্লাই (মাদ্রাজ); ৫ম—বি কে নলিনী (হায়দরাবাদ), ৬ষ্ঠ—প্রিসকা নানস (বোম্বাই), ৭ম—জে তারাপোর (মহীশূর), বোকারো (বোম্বাই), বি উইরেফুন (সিংহল)।

বুক সাঁতারের নূতন রেকর্ড

গত সপ্তাহে বুক সাঁতারের দুইটি বিষয়ে দুইজন সাঁতারু নূতন ভারতীয় রেকর্ড করতে সমর্থ হয়েছেন। আজাদ হিন্দ বাগে ন্যাশনাল সুইমিং এসোসিয়েশনের বার্ষিক জলক্রীড়ায় ভুবনেশ্বর পাণ্ডে ২০০ মিটার বুক সাঁতারে এবং আন্তঃ সার্ভিস সাঁতার প্রতিযোগিতায় রঘুপৎ সিং ১০০ মিটারে নূতন ভারতীয় রেকর্ড করেছেন। ২০০ মিটারে ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন বৌবাজার ক্লাবের বিখ্যাত সাঁতারু প্রফুল্ল মল্লিক। তিনি ১৯৪৮ সালে ৩ মিনিট ৫.২ সেকেণ্ডে ২০০ মিটার অতিক্রম করে নূতন রেকর্ড করেন। ন্যাশনাল সুইমিং ক্লাবের বি পাণ্ডে ৩ মিনিট ৫ সেকেণ্ডে ২০০ মিটার অতিক্রম করেছেন। ১০০ মিটারে রঘুপৎ সিং তাঁর নিজের রেকর্ডের উন্নতি করেন। রঘুপৎ সিংয়ের পূর্বের রেকর্ড ছিল ১ মিনিট ২২.৮ সেকেণ্ড, এইবার তিনি ১ মিনিট ২১.৫ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করতে সমর্থ হন।

দেশী সংবাদ

২রা নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁহার ঐতিহাসিক চীন সফর শেষ করিয়া বিমানযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। কলিকাতার ময়দানে লক্ষ লক্ষ লোকের এক বিপুল সমাবেশে বক্তৃতাকালে তিনি ঘোষণা করেন যে, ভারত এবং মহাচীন শান্তি নীতির পক্ষপাতী। মহাচীনে পৃথিবীর এক-তৃতীয়াংশ এবং ভারতে পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ লোক বাস করে। সুতরাং চীন ও ভারত এই দুই দেশ যদি তাহাদের এই শান্তির নীতি চালাইয়া যাইতে পারে। তবে তাহার প্রভাব শুধু সারা এশিয়ায় নহে, সারা বিশ্বের উপর বিস্তার করিবে।

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী আর কে নেহরু আজ পন্ডিচেরীতে সাংবাদিকদের বলেন যে, গোয়া সম্পর্কে পর্তুগীজদের সহিত যে বিরোধ চলিতেছে, উহার শান্তিপূর্ণ সমাধান প্রচেষ্টা ভারত সরকার চালাইয়া যাইবেন।

৩রা নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ কলিকাতার বেলিয়াঘাটায় বিকলাঙ্গ শিশুদের চিকিৎসার জন্য বি সি রায় অপাঙ্গ হাসপাতাল এবং হরিণঘাটায় বিড়লা কৃষি কলেজের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন। তিনি বরানগরে ইণ্ডিয়ান স্ট্যাটিস্টিক্যাল ইনস্টিটিউট ভবনও পরিদর্শন করেন।

'নিখিল ভারত প্রতিবাদ দিবস' উদ্‌যাপন উপলক্ষে আজ কলিকাতার ব্যাংক কর্মচারীদিগের এক সভায় একটি সর্বসম্মত প্রস্তাবে আগামী ১০ই ডিসেম্বর হইতে সারা ভারতে ব্যাংক কর্মচারিগণের ধর্মঘট করিবার প্রস্তাব সমর্থন করা হয়।

৪ঠা নবেম্বর—প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ দার্জিলিংয়ে হিমালয় পর্বতারোহণ বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থিগণকে পর্বতারোহণ শিক্ষা দিয়া বহু নূতন তেনজিং সৃষ্টি করিবে।

ভারত সরকারের ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রী এন ভি গ্যাডগিল আজ কলিকাতা ওয়েলিংটন স্কোয়ারে পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের কর্মচারিগণের এক সভায় বক্তৃতা কালে বলেন যে, ভারতে প্রত্যেক কর্মক্ষম ব্যক্তির জন্য কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা গবর্নমেন্টের আইনগত দায়িত্ব হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। তিনি আরও বলেন যে, বেকারদের সাহায্যের জন্য কর্মপ্রাপ্ত প্রত্যেকের নিকট হইতে তাহার রোজগারের কিয়দংশ করিয়া বেকার শুল্ক হিসাবে সংগ্রহ করিবার ব্যবস্থাও করা উচিত।

আজ নয়াদিল্লীতে সরকারীভাবে বলা হইয়াছে যে, আগামী ৩১শে জানুয়ারী লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধানমন্ত্রীদের যে সম্মেলন হইবে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু তাহাতে যোগদান করিবেন।

৫ই নবেম্বর—কলিকাতায় পুনর্গঠিত পুনর্বাসন আর্থিক সংস্থার (রিহ্যাবিলিটেশন ফাইন্যান্স এডমিনিস্ট্রেশন) দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়। শিল্প ও ব্যবসায় ব্যাপারে সহায়তার জন্য উদ্বাস্তুদের নিকট হইতে প্রাপ্ত প্রায় ৮৪৭খানি ঋণের দরখাস্ত সম্বন্ধে উক্ত সংস্থা বিবেচনা করিবেন। অধিবেশনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় অর্থ দপ্তরের উপমন্ত্রী শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুগণের সমস্যার প্রায় সমাধান হওয়ায় কর্তৃপক্ষ এখন হইতে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণের বিষয়গুলিকেই অগ্রাধিকার দান করিবেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ঐতিহাসিক চীন সফরের পর আজ নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

৬ই নবেম্বর—অন্ধ্র বিধানসভায় মাদক বর্জন নীতি সম্পর্কে এক অনাস্থা প্রস্তাবে ৬৯—৬৮ ভোটে পরাজিত হইবার পর আজ প্রকাশম মন্ত্রিসভা রাজ্যপাল শ্রী সি এম ত্রিবেদীর নিকট পদত্যাগপত্র পেশ করিয়াছেন। ভূতপূর্ব মন্ত্রী শ্রী জি লচ্ছন (কে এল পি) এই অনাস্থা প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন।

রাজস্থানের রাজস্ব মন্ত্রী শ্রীমোহনলাল সুখাদিয়া মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজয়নারায়ণ ব্যাসকে ৫৯—৫১ ভোটে পরাজিত করিয়া পরিষদের কংগ্রেস দলের নেতা নির্বাচিত হইয়াছেন।

জানা গিয়াছে যে, মধ্যবিত্ত পরিবারসমূহের বাসস্থানের অভাব লাঘব করার উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কল্যাণীতে ৫০০টি ক্ষুদ্রায়তন গৃহ নির্মাণের সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

ডাক্তাররা যাহাতে পল্লী অঞ্চলে যাইতে উৎসাহ বোধ করেন, তজ্জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার সরকারী কার্যে নিযুক্ত ডাক্তারদের পল্লী ভাতা দিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

৭ই নবেম্বর—স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস প্রণয়নের জন্য গঠিত বিভিন্ন রাজ্য কমিটির প্রতিনিধিদের প্রথম সম্মেলন আজ নয়াদিল্লীতে শুরু হয়। সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ বলেন, স্বাধীনতা আন্দোলনের সময় কংগ্রে নেতৃবৃন্দের বৈপ্লবিক কার্যকলাপ সংক্রা প্রায় সমস্ত মূল্যবান দলিলপত্রই ভার সরকারের পলিটিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট ১৯৪ সালে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

অন্ধ্রের রাজ্যপাল শ্রী সি এম ত্রিবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রী টি প্রকাশমকে জানাইয়াছে যে, তিনি এখনই মন্ত্রিসভার পদত্যাগ গ্রহণ করিতে পারেন না; কারণ অবস্ সম্পর্কে বিবেচনা করিতে তাঁহার কিছু সম প্রয়োজন।

বিদেশী সংবাদ

৩রা নবেম্বর—মার্কিন কংগ্রেসের মধ বর্তী কালীন নির্বাচনে প্রেসিডেণ্ট আ সেনহাওয়ারের রিপাবলিকান দল প্রতিনি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাইয়াছে প্রতিনিধি পরিষদ নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা ডেমো ক্রাটদের হাতে চলিয়া যাওয়ায় প্রেসিডে আইসেনহাওয়ার মর্মাহত হইয়াছেন।

৪ঠা নবেম্বর—গত মঙ্গলবার অনুষ্ঠি মার্কিন কংগ্রেসের নির্বাচনে ডেমোক্রাট দ কংগ্রেসের উভয় সভায়ই প্রাধান্য অর্জ করিয়াছে। প্রতিনিধি পরিষদে ডেমোক্রাট দ ২৯ জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবং সেনেটে এ জনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে বলি ঘোষণা করা হইয়াছে।

পূর্ব আলজিরিয়ায় অনুমান এক সহ বিদ্রোহী আগ্নেয়াস্ত্রের সাহায্যে পর্বতমা পরিবেষ্টিত একটি শহরের উপর তিন দি যাবৎ প্রবল আক্রমণ শুরু করিয়াছে। শহরে সম্মুখবর্তী টিলার উপর সন্ত্রাসবাদীরা ঘা করিয়াছে এবং ফরাসী নিরাপত্তা বাহিনী আক্রমণ উপেক্ষা করিতেছে।

৫ই নবেম্বর—পূর্ব আলজিরিয়া 'বিদ্রোহীদের' দমন করিবার উদ্দেশ্যে ফরাস বৈদেশিক বাহিনীর সৈন্যগণ অদ্য সিদি বে আব্বেস দুর্গ হইতে আলজিরিয়ার মধ্য দি যাত্রা করিয়াছে।

৬ই নবেম্বর—ফরাসী সরকার অদ্য গণ তান্ত্রিক স্বাধীনতা লাভের উদ্দেশ্যে আল জিরিয়ান জাতীয়তাবাদীদের আন্দোলন তৎসংশিলষ্ট সংস্থাসমূহ বেআইনী ঘোষ করিয়াছেন। পুলিশ অদ্য আলজিরিয় জাতীয়তাবাদীদের আন্দোলনের সহি সংশিলষ্ট ব্যক্তিদের সন্ধানে ব্যাপক তল্লাসী ধরপাকড় চালায়।

কল্যাণকর কার্যে আণবিক শ নিয়োগের উদ্দেশ্যে আগামী আগস্ট মাসে মধ্যে বিশ্ব সম্মেলন অনুষ্ঠানের আহ্ব জানাইয়া ৭টি রাষ্ট্রের পক্ষ হইতে আজ রাষ্ট পুঞ্জ সমীপে এক খসড়া প্রস্তাব পেশ ক হয়।

প্রতি সংখ্যা—।৴০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
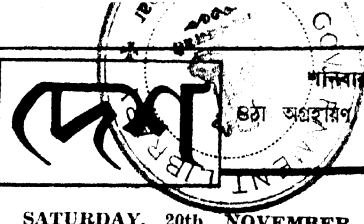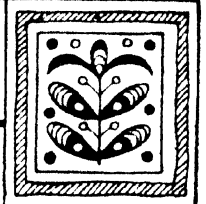
সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

ভারতের প্রাণশক্তির উৎস

ভগবৎ-ভাব, ভক্তি, বিশ্বাস যাহার উপর ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠিত, আদর্শ ধর্মজীবনের সেই সব কথা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মুখে আমরা বড় শুনিতে পাই না, পরন্তু তিনি যেন এগুলি এড়াইয়াই চলেন। সম্প্রতি গুরু নানকের জন্মতিথি উৎসব অনুষ্ঠান সম্পর্কে আহূত দিল্লীর জনসভায় পণ্ডিতজীর বক্তৃতায় ভারতীয় সংস্কৃতির মূল সেই সুরটি বাজিয়া উঠিয়াছে। রাজনীতিক জওহরলালের দার্শনিকতায় এখানে আধ্যাত্মিকতার সম্বন্ধে ছন্দ খেলিয়াছে এবং ভারতের মর্মগত সার্বভৌম উদার ধর্মের স্পর্শ আমরা তাহাতে পাইয়াছি। এদেশের ঐতিহ্যের প্রসংগ অবতারণা করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতে বহু নরপতি এবং সমরকুশলী যোদ্ধা জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন; কিন্তু স্মরণাতীতকাল হইতে এদেশের অধিবাসীরা সাধু-মহাত্মাদের প্রতিই অন্তরের শ্রদ্ধা এবং প্রীতির অর্ঘ্য নিবেদন করিয়া আসিতেছে। যাঁহাদের জীবন-সাধনায় প্রেম, মৈত্রী এবং দুর্গত মানব-সমাজের প্রতি বেদনা জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে তাঁহারাই ভারতবাসীর অন্তরে অমর মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পণ্ডিতজী এই কয়েকটি কথার ভিতর দিয়া ভারতের শক্তির উৎস সম্বন্ধেই এতদিন পরে আমাদিগকে সচেতন করিয়া দিয়াছেন এবং নানা মতবাদের বিভ্রম হইতে তিনি ভারতের বৈশিষ্ট্যকে স্পষ্ট করিয়া দিয়াছেন। বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি ও সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্যই তাহার আত্মধর্ম এবং প্রকৃতপক্ষে ইহার উপরই তাহার স্বাধীনতা বা স্বাতন্ত্র্য মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত। পরধর্ম বা পরকীয় সভ্যতার প্রভাবে জাতির এই আত্মধর্ম অভিভূত হইলে তাহার উন্নতির পথ রুদ্ধ হইয়া যায়। মননশীল মানুষে পরের আওতায় বাড়িতে পারে না; পরন্তু পরের অনুগ্রহও তাহার পক্ষে নিগ্রহস্বরূপে পরিণত হয়। প্রত্যুত সে বস্তু মানুষের জীবনীশক্তি আড়ষ্ট করিয়া তাহাকে পশুতে পরিণত করে। ভারতের অধ্যাত্মদর্শী সাধু এবং মহাত্মাগণ মানুষের এই আত্মধর্মের মহিমা যুগে যুগে কীর্তন করিয়াছেন। তাঁহারা মুক্তির বাণী মানুষকে শুনাইয়াছেন। তাঁহাদের নির্দেশিত এই মুক্তিকে বিশ্বব্যতিরিক্ত অবাস্তব বস্তু বলিয়া উপেক্ষা করিবার প্রবৃত্তি আজকাল শিক্ষিত সমাজে দেখা দিয়াছে এবং সেই নেশা অনেককে পাইয়া বসিতেছে, অধিকন্তু এই মোহ দস্তুর মত একটা মনীষামূলক মর্যাদাও দাবী করিতেছে। জাতি হিসাবে যদি আমাদের প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে হয় তবে এই মানসিক ব্যাধি হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে। বস্তুত ভারত যদি উন্নতি লাভ করিয়া থাকে, এদেশের ত্যাগব্রতী সাধু-মহাত্মাদের আদর্শের প্রেরণাই তাহার মূলে কাজ করিয়াছে। আমরা আজ যে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি তাহাও তাঁহাদের সেই আদর্শেরই জোরে—পরানুকরণ কিংবা পরানুগ্রহে নয়। পণ্ডিত নেহরু এবার জোর দিয়াই সে সত্য ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, গুরু নানক, মহাত্মা গান্ধী ইঁহারাই আমাদের আদর্শ। ভারত তাঁহাদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়াই আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভের পথে অগ্রসর হইতেছে এবং জগতের বিভিন্ন শক্তির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত হইতে নিজকে দূরে রাখিয়াছে। পরন্তু ভারতের পথই যে ঠিক পথ জগতের বিভিন্ন শক্তি ধীরে ধীরে তাহা উপলব্ধি করিতেছে। ভারতের অবলম্বিত নীতির সাফল্য সম্বন্ধে যাহারা এতদিন সন্দেহ পোষণ করিয়াছিলেন তাঁহাদেরও মনের সে ভাব কাটিয়া যাইতেছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তিতে যে সত্য ব্যক্ত হইয়াছে, তাঁহার কর্ম সাধনায় তাহা উত্তরোত্তর উজ্জ্বল হইয়া উঠিলে তাহার প্রভাব বিশ্বের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইবে এবং তাঁহার ভিতরেই আমরা মহাত্মা গান্ধীকে নূতন করিয়া পাইব। সেদিন ভারতের নব জাতীয়তার ব্যাপ্ত জ্যোতি ও দ্যুতিতে জগতের আঁধার কাটিয়া যাইবে—এদেশের সাধকবর্গের যুগ যুগের তপস্যা সেদিন হইবে সার্থক।

সমাজ কল্যাণ প্রচেষ্টা

সম্প্রতি দিল্লীতে রাজ্য সমাজকল্যাণ উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতিদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতের ২৭টি রাজ্যের উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতিগণ এবং কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ বোর্ডের সদস্য এবং সমাজসেবকগণ এই সম্মেলনে যোগদান করেন। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসংগে সমাজসেবা সম্পর্কিত সমস্যার

আলোচনা করিয়া বলেন, সমাজ কল্যাণ সাধনের ব্যাপার অনেক ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক প্রশ্নে গিয়া দাঁড়ায়। এমন ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ করিতে যাওয়াতে বিপদ আছে। সরকারের এতৎ সম্পর্কিত প্রচেষ্টা কতকটা নৈর্ব্যক্তিক হইতে বাধ্য; অথচ সমাজসেবা এমন একটি ব্যাপার যাহাতে ব্যক্তিগত সহৃদয়তা থাকা একান্তই প্রয়োজন। স্বেচ্ছামূলক সেবা-প্রবৃত্তি-প্রণোদিত কর্মীদের দ্বারাই শুধু এই প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে। রাষ্ট্রপতির এই উক্তিতে প্রশ্ন উঠে এই যে, সরকারের বেতনভোগী হইলেই যে মানুষের সঙ্গে পারিবারিক প্রতিবেশোচিত হৃদ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করা যাইবে না এমন নহে, সহৃদয়তা থাকিলেই উহা সম্ভব হইতে পারে। আবার তরুণদিগকে সমাজ-সেবার ক্ষেত্রে আহ্বান করিলেই যে তাহারা ছুটিয়া আসিবে, ইহাও নয়। কারণ, তরুণেরা দেখিতেছে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে ভিড়িলে সস্তায় স্বদেশপ্রেমিক হওয়ার সুবিধা আছে, অধিকন্তু কাজ বাগাইতে জানিলে সেইসঙ্গে পদমান, প্রতিষ্ঠা এবং দুই পয়সা রোজগারও করা যায়। সুতরাং সমাজ সেবকের রিক্ত জীবন বরণ করা বোকামী ছাড়া আর কিছুই নয়। এ সমস্যা সাধনের উপায় কি? শ্রীযুক্তা ইন্দিরা গান্ধী তাঁহার চীন ভ্রমণ সম্পর্কিত অভিজ্ঞতা বলিতে গিয়া সমাজ-উন্নয়নের কাজে সেখানকার তরুণদের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যুবকেরা গ্রামে গ্রামে গিয়া উৎসাহ সহকারে কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে। সরকারি কর্মচারীদের চেয়ে এক্ষেত্রে যুবকদের প্রচেষ্টাই বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। সরকার নানাভাবে যুবকদের এই গঠনমূলক প্রচেষ্টায় উৎসাহ দিতেছেন। যুবকদের কর্মোদ্যম গঠনমূলক কাজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তিতে বিকশিত হইয়া উঠিতেছে। চীনে যাহা সম্ভব হইতেছে, এদেশে তাহা দেখা যাইতেছে না, ইহার কারণ কি? এদেশের তরুণদের মধ্যে সমাজ-কল্যাণ সাধনে উৎসাহ উদ্যম এবং আন্তরিকতার অভাব আছে, আমরা ইহা মনে করি না। বাঙলা দেশের ঐতিহ্যের দিকে তাকাইয়া অন্তত তেমন কথা বলা যায় না। প্রকৃতপক্ষে আমাদের বর্তমান রাজনীতিক এবং শাসক-প্রতিবেশে সেবার আদর্শ জীবন্ত হইয়া উঠিতেছে না। এক্ষেত্রে সরকারের কর্তব্য রহিয়াছে। শাসন-প্রতিবেশটিকে জনসেবার আদর্শে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলা তাহাদের পক্ষে প্রয়োজন এবং সমাজকল্যাণ মূলক প্রতিষ্ঠানসমূহের আর্থিক সাহায্য-দানে মুক্ত হস্তে অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

সিপাহী বিদ্রোহ ও রাজস্থান

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ঐতিহাসিক উপাদান বিলুপ্ত করিবার জন্য শেষ পর্যন্ত কিরূপ নির্বিবেক দুষ্প্রবৃত্তি পোষণ করিয়াছে, ভারতের শিক্ষাসচিব মৌলানা আজাদ সম্প্রতি তাহার স্বরূপ কিয়ৎ পরিমাণে ব্যক্ত করিয়াছেন। আগস্ট বিপ্লব এবং তাহার অব্যবহিতকালের পূর্ববর্তী আন্দোলনে নেতৃগণের কর্ম-তৎপরতা এবং এতৎসম্পর্কে সরকারি ব্যবস্থার কোন দলিলপত্র কেন্দ্রীয় সরকারের দপ্তরে রাখা হয় নাই। লর্ড ওয়াভেলের আমলেই এই ব্যাপার ঘটিয়াছে। এ-সংস্কার বৈদেশিক প্রভুদের সহজাত বলিতে হয়। ব্রিটিশ ঐতি-হাসিকরাও এবিষয়ে সত্যের মর্যাদা লঙ্ঘন করিতে কিছুমাত্র দ্বিধা বোধ করেন নাই। অনেক ঘটনাকেই তাঁহারা বিকৃতরূপে উপস্থিত করিয়াছেন। স্বাধীনতা আন্দোলনের ধারকগণকে তাঁহারা সাধারণভাবে দস্যু বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহের নেতৃবর্গের চরিত্র মসিবর্ণে লিপ্ত করিবার চেষ্টা নানারকমে হইয়াছে। কয়েকজন ঐতিহাসিক সত্যের মর্যাদা রক্ষা করিতে গিয়া এই বিদ্রোহের স্বরূপ কতকটা উন্মুক্ত করিলেও অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত তথ্য চাপা রহিয়া গিয়াছে। সম্প্রতি রাজস্থান গভর্নমেণ্টের তথ্যানুসন্ধান বিভাগ সিপাহী বিদ্রোহে রাজস্থানের অবদান সম্পর্কে অনেক তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে রাজপুতগণ শৌর্য-বীর্য ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছে, অথচ দুঃখের বিষয় এই যে, বিদেশী প্রভুত্বের বিরুদ্ধে ভারতবাসীদের প্রথম অভ্যুত্থান —যে সিপাহী বিদ্রোহ, সেই বিদ্রোহে রাজপুতনার স্বদেশপ্রেমিক সন্তানদের অবদান সম্পর্কে ইতিহাসে কোন যোগস খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ইহার ফ সাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস জন্মিয়া যে, রাজপুতানার লোকেরা এই বিদ্রোহে সম্পর্ক বর্জন করিয়াছিল। রাজপুতানা তৎকালীন রাজারা সাধারণভাবে নৈতি বীর্যবল হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন এব তাঁহারা ব্রিটিশ প্রভুদিগকেই সমর্থ করিয়াছিলেন, একথা হয়ত সত্য; প্রকৃত পক্ষে অন্যান্য স্থানের রাজন্যবর্গের মতি গতিও তদনুরূপ ছিল। ফলত সিপাহী বিদ্রোহ রাজন্যবর্গের দ্বারা চালিত হ নাই। সে বিদ্রোহের মূলে শক্তি সঞ্চা করিয়াছে জনগণ। স্বদেশপ্রেমের প্রাণবীর্যে প্রভাবিত রাজপুতানা বৈদেশিক প্রভুত্বের সেই উচ্ছেদ প্রচেষ্টায় যে নির্লিপ্ত ছিল, একথা বিশ্বাস করিয়া ওঠা সত্যই কঠিন। নবাবিষ্কৃত তথ্যরাজী এই ভ্রান্তি নিরসন করিবে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। এইসব তথ্যের মধ্যে বিদ্রোহের সমর্থক এবং উদ্দীপনামূলক গাথা ও লোকগীতি পাওয়া গিয়াছে। এইগুলি যথাসম্ভব সত্বর প্রকাশিত হওয়া উচিত। তাহার ফলে আমাদের রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের পূর্ণাঙ্গতা সাধিত হইবে এবং রাজপুতে শৌর্যের প্রভাব আমাদের রাষ্ট্রীয় চেতনাকে সমধিক সংহত করিয়া তুলিবে।

ছাত্রদের চিকিৎসা বিধান

স্টুডেণ্টস্ হেলথ্ হোম সম্প্রতি শহরের ছাত্রসমাজের চিকিৎসা বিধানের যে কার্যপ্রণালী উপস্থিত করিয়াছেন, আমরা সর্বান্তঃকরণে তাহার সমর্থন করিতেছি। এই কার্যপ্রণালী অনুসারে হোমের সদস্য-স্বরূপে বার্ষিক ১৲ টাকা মাত্র চাঁদা দিলেই ছাত্রেরা বিশিষ্ট চিকিৎসকদের দ্বারা চিকিৎসিত হইবার সুযোগ লাভ করিবে। বলা বাহুল্য, শহরের বিশিষ্ট চিকিৎসক-দের সহযোগিতা লাভ করিবার ফলে এইরূপ কর্মপ্রণালী নির্ধারণ করা সম্ভব হইয়াছে। নগরের প্রধান প্রধান শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক এবং অধ্যাপকবর্গ এই উদ্যম আগ্রহের সঙ্গে সমর্থন করিয়াছেন। কলিকাতা শহরের ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৫৬ জনই কোন-না-কোন ব্যাধিতে রুগ্ন, অথচ ইহাদের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষার উপযুক্ত ব্যবস্থা কিছুই নাই।

উত্তমাশা

বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়

ছলনার মেঘ নিচু হ'য়ে আসে
—আজীবনই তাই হয়
লুব্ধ জাহাজ এগোয় আবার
লক্ষ্য আমার মনে হ'লো দূর নয়।
মেঘ নেমে এসে ছুঁলো মাস্তুল
বললো—মুগ্ধ কোরো নাকো ভুল
পূর্বদিক ভেঙে আসবে যে-দিন
ছুটবে আবার ফোয়ারা রঙিন
দশদিকময় ঘোষিত হ'বে সে জয়
হ'য়ো না হ'য়ো না অল্পে অধীর
ঘাসের গন্ধ পলিমাটি তীর
এও কি দুরাশা হয়?

চাকা ঘোরে, ঘোরে চাকা
পথ কাটে সোজা, বাঁকা
প্রোপেলার ঢেউ তোলে দারুণ ফেনিল
তাল রেখে সমতালে
চলে যান্ত্রিক চালে
জীবনের যে-যন্ত্র অতিচাক্রিল!

লেঙরের দিন বুঝি দেখা গেলো
জেটিতে কারা যে রুমাল ওড়ালো
মায়াহাতে যেন হাতছানি দিলো
উত্তমাশার তীর।
দু'চোখে সাহস কে দিলো মাখিয়ে
ধ্রুবতারকার দিকেই তাকিয়ে
শক্তির পায়ে আনমনে বাঁধি
ঝঞ্ঝার মঞ্জীর!

মায়াতটরেখা মেলালো যে দূরে
হাওয়া ধমকালো ফের রূঢ় সুরে
মায়াতটে ছায়া জেটির স্বপ্ন
কোথা ডুবুরির ধ্যানের রত্ন
মগ্নশৈলে জাহাজ এবার
হয় বুঝি চৌচির!
সাম্‌লালো তরী দিলো ক্রমে দেখা
এ কোন্ কুমারী মৃত্তির রেখা
দেখা গেলো দূরে; তপ্ত দুপুরে
গতি হ'য়ে এলো ধীর!

কোন নব কোণ্ মেলেছে লোভানি
পুরোনো ধরিত্রীর!

মন মাঝি বলে—চাসনে ওধারে পেরিয়ে চল
প্রোপেলার হাঁকে—মেপে নে নীলিমা ছলাৎ-ছল
নীলের ঢলের ওপারে যে শ্যাম
সে ছোটো ফাঁকা
পাড়ির পিপাসা সেখানে কী ক'রে যাবে রে রাখা?
তাহ'লে এখন সোজা-সিধে ঐ
একাকার-হওয়া দিগন্তর
গলা ছেড়ে ডাকে চোখের সামনে
অজানা আকাশ আহ্বান আনে
দিশারী তারার অশ্রুত গানে
প্রাণে টান দেয় নিরন্তর।
আবার হালের ঘোরাই চাকা!

চাকা ঘোরে, ঘোরে চাকা
পথ কাটে সোজা, বাঁকা
প্রোপেলার ঢেউ তোলে সুনীল ফেনিল—
তাল রেখে সমতালে
চলে যান্ত্রিক চালে
জীবনের যে যন্ত্র অতিচাক্রিল।

বাসিত বাতাস স্বাগত জানায়
মশলা গন্ধ দ্বীপ আসে যায়
ছোটো লক্ষ্যের ছোটো ছোটো তট
সহজ-লভ্য তীর;
কতো গেলো তবু রেখেছি লক্ষ্য স্থির!
সৈনিক হ'বো মহৎ আহবে
বড়ো কিছু ধন লুটে নিতে হবে
এ বীরভোগ্যা স্বৈরিণী উর্বীর!
নাহ'লে রইলো এই পারাবার
অশেষ ইসারা যতো অজানার
অনলস হ'য়ে কেবলি শোনার
আ-মৃত্যু মঞ্জীর!

ট্রামে-বাসে

শ্রীযুক্ত জহরলাল নেহেরু তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, কাজের মধ্য দিয়াই আমরা বড় হইয়া উঠিব এবং সকলের জন্যই কাজ রহিয়াছে।—"সকলের জন্যে কাজ রয়েছে একথা জহরলালজী বিশ্বাস করতে পারেন, কিন্তু যাঁরা এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে দরখাস্ত দিয়ে, পরে পায়ের পাতা ক্ষয়ে ফেলেছেন, তাঁরা বিশ্বাস করবেন না,—আপনি বিশ্বাস করুন চাই না-ই করুন" মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

নেহেরুজী স্বীকার করিয়াছেন যে, ভুল আমরা কখনও কখনও করিয়াছি এবং সেই সব ভুলের জন্য "পেনাল্টি"ও দিয়াছি।—"কিন্তু পেনাল্টি
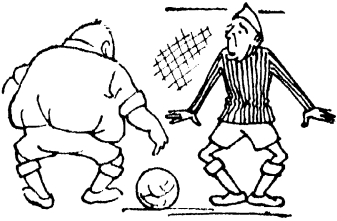
দিলেই শুধু ভুলের সংশোধন হয় না, হয় শুধু প্রতিপক্ষের পেনাল্টির সুযোগ নিতে পারলে। মোহনবাগানের রোভার্স কাপের খেলা মনে করে দেখলেই বুঝতে পারবেন"—ভীড়ের মধ্য হইতে কে যেন মন্তব্য করিলেন।

* * *

আফ্রিকার আকাশে কী নাকি একটি অদ্ভুত বস্তু পরিলক্ষিত হইয়াছে।—"শুধু আকাশে কেন, আফ্রিকার মাটিতেও "ঘোটো", "মালান" নামক অদ্ভুত বস্তু অনেকদিন থেকেই দেখা যাচ্ছে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

করাচীর সংবাদে জানা গেল, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ইস্কিন্দার মির্জা সাহেব নাকি একটি প্রাদেশিক প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন আহ্বান করিয়াছেন। সম্মেলন আহ্বানের কাজটা আগে প্রধান মন্ত্রী-ই করিতেন। বর্তমানে তিনি যবনিকার অন্তরালেই অবস্থান করিতেছেন।—"মালেকরা হয়ত বুঝে নিয়েছেন যে, পড়িলে ভেড়ার শৃঙ্গে ভাঙে চাকুর ধার" —বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

পূর্ব পাকিস্তানের অন্য এক সংবাদে প্রকাশ যে, সেখানে নাকি ছয়শত পুলিশ কনেস্টবলকে কর্মচ্যুত করা হইয়াছে।—"এতে বিস্ময়ের কিছু নেই, সেখানে কাজ ফুরুলে কাজীরা বরাবরই পাজি বলে গণ্য হন"—মন্তব্য করেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের সমস্ত প্রয়োজনীয় দলিলপত্র লর্ড ওয়াভেলের আমলে নষ্ট করিয়া দেওয়া হইয়াছে।—"কাজটা খুবই অন্যায় হয়েছে একথা সবাই স্বীকার করবেন। কিন্তু সেই সঙ্গে লর্ড ওয়াভেলের একথাও মনে রাখা উচিত ছিল যে, স্বাধীনতা আন্দোলন শুধু দলিলপত্রের সাহায্যেই গড়ে ওঠে না। টিট্টিভ পাখি শুনেছি নিজের ঘাড়ে পড়বে ভয়ে ওপর দিকে ঠ্যাং তুলে ঘুমোয়—লর্ড ওয়াভেল সে রকম কিছু একটা করতেন কিনা জানিনে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

আফ্রিকার একটি মহিলা শুনিলাম একসঙ্গে তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছেন। সেই তিনটি সন্তানের প্রত্যেকেই নাকি দাঁত নিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে।—"কিন্তু শুধু দাঁত থাকলেই

হয় না, আজকালকার পৃথিবীতে কামড়া-কামড়ির বাজারে বিষ দাঁত অন্য কোন দাঁতের মূল্য কাণাক[ড়িও] নয়। বদসিবদি কিঞ্চিদর্পি দন্ত কৌমুদির দিন এখন আর নেই"—ব[লেন] দন্তহীন খুড়ো।

* * *

শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডি[ত] হারানো কোট লইয়া ক[...] সংবাদপত্রে খুব হৈচৈ করা হইয়[াছে।] আমাদের জনৈক সহযাত্রী স্বর্গত [...] ওয়ালা মুকুন্দ দাসের গানের একটি [...] গাহিয়া শুনাইলেন—"শ্যামা যাবেন [...] দিল্লী, রামা যাবেন কাছাড়, আর কু[...] কুমারী নাচবেন স্টারে আমরি খ[...] বাহার!!"

* *

শ্রীযুক্ত নেহেরু সম্প্রতি ম[...] করিয়াছেন যে, রাজনৈতিক [...] হওয়ার জন্য কোন রকম ট্রেণিংএর দ[...]

হয় না।—"তা হয় না, শুধু মি[...] কাপড়া আর গান্ধীটুপি চাপাতে পা[...] হলো"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যাম[লাল।]

* * *

সাহিত্যে হেমিংওয়ের নো[বেল] পুরস্কার প্রাপ্তির স[...] প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পু[...] বিক্রেতারা নাকি বহু কষ্টে হেমিং[ওয়ে] রচিত কয়েকখানি গ্রন্থ সংগ্রহ ক[...] রাখে। কিন্তু সেই সব বইয়ের এ[...] ক্রেতা পাওয়া যায় না।।—"অথচ ব[ই] ছাড়ার মাত্র দুদিন পরে গিয়েও [...] "ফোনিতারার" রেসিং গাইড একখ[ানাও] পান নি"—মন্তব্য করিলেন বিশুখু[ড়ো।]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

॥ ৭ ॥

কী শান্তি, তোমাকে জানতে দিয়েছি। দিয়েছি বুঝতে। ক খালি করে দিয়েছি। রক্তের প্রচ্ছন্ন ক্ষরে যে কথা লেখা তা পড়িয়েছি মাকে। প্রাঞ্জল করেছি অশ্রুজলে।

শান্তি নয় শুধু, মুক্তি। যে মুক্তির রেক নাম রিক্ততা। যে মৌন গুহার মধ্যে গড়ে হয়েছিল তাকে শব্দের মধ্যে শেষ করতে পেরেছি, নিরর্গল করতে রেছি। এই তো মুক্তি। দুর্বার, দুর্ধর। তো শূন্যতা নয়, শূন্যায়িততা। আমি তোমার জন্যে পিপাসিত এ নোতেই আমার পিপাসামোচন। আমি আর্তনাদ করতে পেরেছি এই আমার ন্দ।

আমি তোমাকে পাইনা। আমি মাকে চাই। পাওয়ার চেয়েও তপ্ততরো ততরো সুখ এই চাওয়া। পেলেই তো গেল। ফুরিয়ে গেল। 'হস্তে পেলে তলে ফেলে চলে যায়।' কিছু একটা হয় বলেই আলো ফোটে। আমিও নি দগ্ধ হয়ে আলো দেব। সে আলোর ই পিপাসা প্রলয়ংকরী।

আমি তোমাকে চাই অথচ তুমি তা নও জানলেনা, আড়াল দিয়ে চলে ল পাশ কাটিয়ে, এ আর হবার উপায় । সকলের সামনে জড়িয়ে ধরেছি মাকে, রাহু যেমন গ্রাস করে সূর্যকে। তবু ছেড়ে দেয়, আমি ছাড়বনা। ড়ে থাকব, কাঁটার মতন বিঁধে থাকব মূলে। একবার যখন তোমাকে দেখেছি ন আর কি করে তুমি আমাকে এড়িয়ে ? তুমি আমাকে চাও কি না চাও এসে যায় না। আমাকে খোঁজো কি খোঁজো কে খোঁজ করে? তোমার থ্যান পর্যন্ত কে বসে বসে প্রতীক্ষা ব? তোমার পায়ে পায়ে ফিরব, মিশে থাকব গায়ে-গায়ে। আমি তোমার ছায়া। তোমার অনন্তকালের দিনরাত্রির সংগী।

তোমাকে ছেড়ে দেবনা। এক মুহূর্তেও দেবনা ভুলতে। তোমার কানের কাছে আমার এক নামই অনর্গল জপ করব। কেবল সাধব কেবল কাঁদব। সেধে-কেঁদে না পারি বাঁধব তোমাকে শৃংখলে, আমার প্রাণ যদি পাষাণ হয় সেই পাষাণ-শৃংখলে। ভাবছ, গভীর নিশীথে বিরলে বসে বিশ্রাম করবে একা-একা। অসম্ভব। দেখবে আমি তোমার পাশটিতে। উপায় নেই। সে অনন্ত বিভাবরী আমার সংগে তোমার যাপন করতে হবে। যদি অকূল সমুদ্রে জগৎ-তরী ডুবেও যায়, যদি তুমি ঝাঁপ দিয়েও পড়ো, দেখবে আমিও তোমার বাহু আঁকড়ে ধরে ভাসছি। দেখবে সেই অতলেও আমি তোমার হাত-ধরা। ডুবি আর ভাসি, উঠি আর পড়ি, তোমাকে ছাড়িনি।

কি আনন্দ, তোমাকে বিষাক্ত সাপের মত জড়িয়েছি। তনুর তন্তুতে-তন্তুতে ঢুকেছি রোগের মত। লোকে রোগে কাতর হয় শোকে কাতর হয় তুমি আমাতে কাতর হবে। এই নিদারুণ আলিংগন, এই সরীসৃপ-আলিংগন থেকে তোমার মুক্তি নেই। যেমন গাছকে ঘিরে লতা তেমনি তোমার রূপকে ঘিরে জেগে থাকবে আমার ক্ষুধা। আশাকে ঘিরে ভয়। প্রেমকে ঘিরে মৃত্যু। যখন একবার তুমি আমার চোখে পড়েছ, তখন একথা ভেবোনা যে চোখ বন্ধ করলেই তুমি অদৃশ্য হবে অন্ধকারে। এই মরুময় তৃষাময় অন্ধকার দিয়েই তৈরি করব চিরজ্যোৎস্নার রজতরাত্রি।

এই 'রাহুর প্রেম'। বাইশ বছর বয়সের লেখা।

প্রথমে চাই এই নীরন্ধ্র ব্যাকুলতা। অবারণ বাসনার বহ্নিশিখা। আসক্তি না

রবীন্দ্রনাথ ১৮৮১ঃ স্কেচ ॥ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ

থাকলে শক্তি আসবে কি করে? তারপর সেই শক্তি শিবে প্রতিষ্ঠিত হবে। নিজের ইচ্ছার বাতায়ন দিয়ে দেখবে নিখিলের ইচ্ছাকে। সে ইচ্ছা শুভের ইচ্ছা, ধ্রুবের ইচ্ছা। সে ইচ্ছার সংগে নিজের ইচ্ছা তখন স্বচ্ছন্দ হবে। কামনা তখন দাঁড়াবে এসে কল্যাণে। আর উন্মাদনা নেই, প্রসাদ মধু। উদ্বেলতা নেই উৎপূর্ণতা।

কিন্তু উন্মাদনা ছিল বলেই এই নিস্তারিণী শান্তি। দাঁতে-নখে ভয়ংকর ঝড় ছিল বলেই এই নিঃসংগানন্দ আকাশের নির্মলতা। সমস্ত চাঞ্চল্যের গভীরে একটি পরিপূর্ণ অক্ষোভ।

তখন, আমি নিশিদিন তোমায় ভালোবাসি তুমি অবসরমতো বাসিয়ো।

তখন আবার কান্না, তুমি কোথায়? শরীরের মধ্যে অশরীরী, তুমি কোথায়? তোমাকে যে পেয়েও পাওয়া হয়না, ধরা দিয়েও তুমি অধরা। তোমার এত সৌন্দর্য, কোথায় তোমার সে সুন্দরের প্রাণমূর্তি? এত লাবণ্যপুঞ্জ, কোথায় সে কান্তির সুধাসত্তা, কোথায় সে রূপশক্তি? তোমাকে কোথায় ধরি, কোথায় দেখি?

তোমার এই প্রদীপ্ত প্রাণস্পর্ধার উৎস কোথায়? তুমি কোথায়?

> দুটি হাতে হাত দিয়ে ক্ষুধার্ত নয়নে
> চেয়ে আছি দুটি আঁখিমাঝে।
> খুঁজিতেছি, কোথা তুমি,
> কোথা তুমি।
> যে অমৃত লুকানো তোমার
> সে কোথায়?

তুমি তো শুধু বল্কল-পল্লব নও, নও মঞ্জরী-বল্লরী, তুমি গন্ধসুধা। তুমি তো দেহ নও তুমি আত্মার রহস্যশিখা। সে দীপ্তিময়ী তৃপ্তিময়ী শিখাকে ছুঁই কি করে? আর সে শিখা না পেলে শুধু মৃৎ-ভাণ্ডে আমার কী হবে? তোমার চোখের কালো তো শুধু কালো নয়, ও কালোর আলো, যে আলো আরেক কোন আকাশ থেকে উৎসারিত। সে অপরিচিত আকাশকে ধরব কি করে হাতের মুঠোয়? তুমি কি আমারই প্রয়োজনের সংসারে প্রসাধন হতে এসেছ? আমার হাতের মুঠোয় নিষ্পিষ্ট হতে?

> বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে
> শতদল উঠিতেছে ফুটি
> সুতীক্ষ্ম বাসনা ছুরি দিয়ে
> তুমি তাহা চাও ছিঁড়ে নিতে?

হায়, ছিঁড়ে নিলেই কি পাবে? ফুলের পাপড়ির থেকে ছিঁড়ে নিতে পারবে তার কোমলতা? ত্বকের থেকে তার প্রাণলাবণ্য? প্রকৃতি আর আত্মা একসঙ্গে জড়িয়ে আছে। শুধু কামনা দ্বারা আত্মাকে কি করে পাবে? আর আত্মাকে না পেলে সেই জ্যোতিষ্মতী শিখাকে না-পেলে পেলে কী?

> ভালোবাসো, প্রেমে হও বলী
> চেয়ো না তাহারে।
> আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের।

সুতরাং নয়নের নীরে বাসনাবহ্নি নির্বাপিত করো। সুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে সত্যকে দেখ। মঙ্গলকে দেখ। প্রকৃতির সঙ্গে আত্মাকে মেলাও। প্রকৃতি হচ্ছে বাঁশের টুকরোটা, আত্মা হচ্ছে তার রন্ধ্র, দুয়ে মিলে বাঁশি। প্রকৃতি হচ্ছে জিনিস, আত্মা হচ্ছে জায়গা। জিনিস দিয়ে জায়গা মেরোনা, আবার জায়গাকেও করে তুলোনা শূন্যতার হাহাকার। কর্মকে আনন্দময়, ব্রহ্মময় করে তোলো, আবার ব্রহ্মকে নির্বাসিত কোরো না নৈষ্কর্ম্যে। কর্ম আর ধর্ম দুইকে মিলিয়ে দিয়ে আনন্দময় সংসার কুরো। কর্ম লিপ্ত ধর্ম আর ধর্মধৌত কর্ম। কর্মসঙ্গীতে বাজুক শুধু ঈশ্বরের নাম।

যতই উপকরণে আকীর্ণ হোক সংসার, দু হাত যতই ধনরত্নে ভরে উঠুক, আমি যে কিছুই পাইনি এ যেন এক মুহূর্তের জন্যেও না ভুলি। তোমাকে না পাওয়ার দুঃখ যেন শয়নে স্বপনে লেগে থাকে, লেগে থেকে, বিঁধে থাকে। শুধু শয়নে স্বপনে নয়, নিশ্বাসে-নিশ্বাসে এক-এক করে প্রতিটি মুহূর্তের চলে যাওয়ায়। ভেসে-যাওয়ায়।

> যতই উঠে হাসি
> ঘরে যতই বাজে বাঁশি
> ওগো যতই গৃহ সাজাই আয়োজনে,
> যেন তোমায় ঘরে হয়নি আনা
> সে কথা রয় মনে।
> যেন ভুলে না যাই, বেদনা পাই
> শয়নে স্বপনে॥

তোমার চন্দ্রসূর্যের মত যদি আর কিছু থাকে অনির্বাণ, সে আমার এই ঊর্ধ্বশিখার উন্মুক্ত বেদনা, উজ্জ্বল বেদনা ঃ তোমাকে পাইনি তোমাকে পাইনি।

ঘর ছাড়ব কেন? ঘরে বসেই সকল কর্মকে ঈশ্বরের পরিচর্যা বলে জানব। যামিনী অতিবাহিত করব ঈশ্বরের কথা-প্রসঙ্গে। সে গৃহ বন্ধন নয় সে গৃহ তীর্থীভূত। সেই গৃহেই তাঁর নব-নব আবির্ভাব। "গৃহেষ্বাবিশতাঞ্চাপি পুংসাং-কুশলকর্মণাম্‌। মদ্বার্তাঘাতযামানাং ন বন্ধায় গৃহামতাঃ॥"

ওরে, তোরা তারে কেউ চিনলি না রে, সে যে দীনহীন পাগলের বেশে ফিরছে জীবের ঘরে-ঘরে। 'ছবি ও গানে' সেই পাগলকে দেখল রবীন্দ্রনাথ।

আপনমনে সে গান গেয়ে বেড়ায়, কিন্তু চোখ রাখে জগতের দিকে, সর্বচক্ষু হয়ে সকলের দিকে। কেউ শোনে কেউ শোনেনা। কেউ দেখে কেউ বা চোখ বুজে থাকে। সে কি আপনাকেও জানে? কে বলবে? শুধু আপনাতেই মেতে বেড়ায় আপনি। তৃণের মতো তারার মতো। দিকে-দিকে প্রাণস্রোতের মতো। যেখান দিয়ে চলে যায়, গলে যায় পথের পাথর, বলে যায় চলি-চলি। শ্যামল দে[...] মাটি শিউরে ওঠে, লতার প্রার্থনা ফু[...] ফুলে ফুটি-ফুটি করে।

> আকাশ বলে এস এস, কানন বলে বস ব[...]
> সবাই যেন নাম ধরে তার ডাকে।

যখন গান গায় বনের হরিণ ক[...] এসে দাঁড়ায়, মেঘপংক্তি নেমে আসতে [...] মাটিতে। একে একে সাঁঝের তারা [...] সকলকে ডেকে আনে, আসর জাঁ[...] বসে সেই গান শুনতে। নিজের [...] নিজে তো মাতেই যে শোনে তা[...] মাতায়। যে শুনবেনা,শুনবেনা বলেও [...] ফিরিয়ে নিতে চায়, ফিরিয়ে নিতে-নি[...] সে ঘুরে দাঁড়ায়, ফিরে আসে। এক [...] কুড়িয়ে পেলেই পেতে চায় সে [...] সমুদ্র। একটি অসতর্ক ফাঁক যদি খ[...] রাখে জানলায়, ভুবনভাসানো জ্যো[...] তারই ভিতর দিয়ে ঢুকে পড়[...] এতটুকু একটু সংকেত পেলেই পা[...] আকাশপ্রসারী সম্ভাষণ।

> তোরাই শুধু শুনলি নে রে,
> কোথায় বসে রইলে যে[...]
> দ্বারের কাছে গেল গেয়ে গেয়ে,
> কেউ তাহারে দেখলি নে তো চেয়ে[...]
> গাইতে-গাইতে চলে গেল,
> কত দূরে সে চলে[...]
> গানগুলি তার হারিয়ে গেল বনে,
> দুয়ার দেওয়া তোদের পাষাণ মনে।

দুয়ার খুলে দে এবার। দুয়ার [...] বেরিয়ে যা তার সঙ্গী হয়ে। যদি এব[...] তার মুখের দিকে তাকাতে পারিস [...] থাকতে পারবিনে ঘরের মধ্যে। ঘ[...] বাহির আর বাহিরকে ঘর করে তু[...] যে পথের পথিক সেই তোর প্র[...] অতিথি। তার সুরের সঙ্গে সুর মে[...] তার ভরা নদীর অমল-উচ্ছল জল, [...] খেতের কাঁচা সোনার ঢেউ আর [...] বুকের উজাড়-করা আনন্দ। [...] করে দে। তার আশ্চর্য আনন্দের [...] তোর আশ্চর্য আনন্দ।

> যে এসেছে তাহার মুখে
> দেখ রে চেয়ে গভীর সুখে,
> দুয়ার খুলে তাহার সাথে
> বাহির হয়ে যা রে।

কারোয়ারে কাল্লানদী পে[...] আসবার সময় একটি অপূর্ব জ্যো[...] রাত্রি দেখল রবীন্দ্রনাথ। উদার শ[...]

আর নিবিড় স্তব্ধতা দিয়ে তৈরি। শব্দ-হীন স্পর্শহীন স্পন্দহীন গভীরতা যেন ধ্যানমগ্ন হয়ে বসে আছে চন্দ্রলোকে। সেই যোগজাদুমন্ত্র কানে এসে লাগল। জ্যোৎস্না-স্নানে সর্বাঙ্গ পুলকনিশ্চল হয়ে গেল। দেখলাম অগণন যাত্রী নিয়ে বিশ্ব ভেসে চলেছে সুনীল শূন্যে। অসীম শূন্যে। দূরে থেকে শোনা যাচ্ছে বুঝি বা নাবিকের গান। কিন্তু আমি কোথায়, আমাকে নিয়ে যাচ্ছে না কেন? সেই নিস্তরঙ্গ নিশীথে অনুভব করলাম আমার মহান একাকীত্ব। কিন্তু আমিও যাব , আমিও বসে থাকবনা। আমিও অনন্তের যাত্রী, ডুবে যাব নিয়ে যাব মিশে যাব অনন্তে। হে অনন্ত পথের অদ্বিতীয় বন্ধু, আমাকে কোথায় ফেলে যাবে?

অনন্ত রজনী শুধু ডুবে যাই, নিবে যাই,
মরে যাই অসীম মধুরে—
বিন্দু হতে বিন্দু হয়ে মিলায়ে মিশায়ে যাই
অনন্তের সুদূর সুদূরে।

॥ ৮ ॥

'সুখের লাগি চাহে প্রেম, প্রেম মেলে না—'

কাকে যে ভালোবাসি কে জানে, আর কেনই যে ভালোবাসি তা কে বলবে? আর, কোথায়ই বা যে তাকে ধরব!'

মায়ার তরণী বেয়ে তুমি চলেছ মায়াপুরীর দিকে, স্বপ্নে ঢল-ঢল বিবশ-বিভল দুটি চোখ মেলে। মনে হয় আমার পরাণ যা চায় তুমি তাই, তুমি তাই। তোমার সুধাস্বরে জগতের গান বাজছে। আকাশে যে প্রভাতটি ঝলমল করছে সেটি তোমার চোখে লেখা। যে লাবণ্য অরণ্যে ঢেউ দিয়েছে সেটি লেখা তোমার শরীরে। তোমাকে ভালোবাসি। তোমার দশদিগন্ত, আদ্যোপান্ত ভালোবাসি। তোমার ঐ খেলা, তোমার ঐ গান, তোমার ঐ হাসির মধুরিমা। সীমার বাঁধনে বাঁধা অথচ তোমার সীমা কোথায়? কেন দূরে দাঁড়িয়ে আছ? কেন আসছ না কাছে? তুমি কি শুধু ভুবনে আছ, তুমি কি আমার মনে নেই? আমার মন কি ভুবন ছাড়া? আমার এই ব্যাকুলতা কি বৃথা যাবে? তোমাকে ডেকে আনতে পারবে না, টেনে আনতে পারবেনা?

কিন্তু তোমার কাছে কী চাই, তোমাতে আমার কিসের প্রয়োজন? সারা দেহ-মন ঘর-উঠোন সর্বকিছু বলছে সুখ চাই। সুখের তরীতে ভাসতে চাই সুখের সরোবরে। তুলতে চাই সুখের শতদল। হায়, সুখ কথাটুকু বলতে-বলতেই ফুরিয়ে যায় তার পরমায়ু। সংসারের রোদটুকু লাগল কি না-লাগল নিমেষে শুকিয়ে গেল সুখের সে শিশিরকণা। সে শিহর-শিশিরকণা। এরই জন্যে কি ভালো-বেসেছিলাম? এরই জন্যে? সুখের সঙ্গে সঙ্গে তোমাকেও হারাতে!

ভালোবেসে দুখ সেও সুখ,
সুখ নাহি আপনাতে
আনো সজল বিমল প্রেম
ছল ছল নলিন নয়নপাতে ॥

সজলবিমল প্রেম চাই, সুখ চাইনে। সুখ নেইই তো, চাইব কি। 'মন চেয়োনা শুধু চেয়ে থাকো।' যদি কিছু থাকে সে হচ্ছে অনন্ত সুখ, শুধু-সুখ নয়। সে অনন্ত সুখের নাম হচ্ছে ভূমা। যা গভীরতম দুঃখের গহনতম আনন্দ দিয়ে তৈরি। যা একাধারে বিশুদ্ধতম আলো, আবার নির্মলতম অন্ধকার। যা চেয়ে পাওয়া যায় না, চেয়ে-থেকে পাওয়া যায়। 'মন চেয়োনা, শুধু চেয়ে থাকো।' যা নিয়ে পাওয়া যায়না, দিয়ে পাওয়া যায়।

এরই নাম প্রেম। সজলবিমল প্রেম। সোজা কথায় অকারণ, অবারণ ভালো-বাসা। তোমার অহেতুক কৃপার উত্তরে এই ভালোবাসাও অহেতুক, অকৈতব।

তোমায় কিছু দেব বলে চায় যে আমার মন,
নাই-বা তোমার থাকল প্রয়োজন ॥

জনহীন বনের পথ দিয়ে যাচ্ছিলে, একা-একা, আপন সুরে আপনি নিমগ্ন হয়ে, দেখতে পেলুম তোমাকে। তোমার কোনো প্রয়োজন ছিলনা, তবু তোমার পথের ধারে একটি বাতি জ্বালিয়ে দিলুম। সেই মৃদুকম্পিত আলোটুকু ভালোবাসা। কত লোক ভিড় করে আসছে তোমার দুয়ারে, কত কিছু ভিক্ষা চাইছে কত-কিছু প্রসাদ। তোমার কোনো প্রয়োজন ছিলনা, তবু বিনা-পণে দিয়ে দিলুম নিজেকে। দিয়ে দিলুম তোমার পায়ে। কিছু চাইব কিছু তুমি দেবে সে লজ্জা পাবার অবকাশ নিলুম না, ঢেলে দিলুম। 'আমি কিছুই চাইব না তো,

রইব চেয়ে।' 'মন চেয়োনা, শুধু চেয়ে থাকো।'

সুখ অনুসন্ধান না করার নামই সুখ।

এই ভাগবতের অমলা ভক্তি। 'সর্বলাভার্পণ'।

ভিক্ষুক হৃদয়ের অক্ষয় প্রত্যাশা আর বইতে পারিনা, সইতে পারিনা। যত পাই তত চাই। পেয়ে-পেয়ে চেয়ে-চেয়ে আমার ক্লান্তি বেড়ে গেছে, লজ্জা বেড়ে গেছে। শূন্য পিপাসায় গড়া মাটির পেয়ালা। এবার ধুলোয় ফেলে দেবে ছুঁড়ে। রিক্ত হয়ে মুক্ত হব। নিঃস্ব হয়ে শুচি হব। অন্তহীন অনাকাঙ্ক্ষার নির্মল আলোতে স্নান করে উঠব। অনেক নিয়েছি তোমার থেকে, এবার দেব। আমিও যে দিতে পারি নিঃশেষ করে এবার দেখাব তোমাকে। কী দেব বলো দেখি? নিজেকে দেব। কম্পিত আলোর প্রতীক্ষার দীপ জ্বালিয়ে বসে ছিলুম এতদিন, বারে-বারে উগ্র করেছি তার বাসনার শিখা। এবার নৈরাশ্যনিশীথের বাতাসে সে আলো নিবিয়ে দেব। উত্তীর্ণ হব অমল অন্ধকারে। তুমি জানতেও পাবেনা, আমার কণ্ঠের মালা পরিয়ে দেব তোমাকে। আমার সেই আত্মদানই তো তোমার আরতি। আরতি তো আর কিছু নয়। দেবতাকে উজ্জ্বল করা। 'তাঁরে আরতি করে চন্দ্রতপন, দেব-মানব বন্দে চরণ—'আমি তেমনি নিজেকে উৎসর্গ করে তোমাকে উজ্জ্বল করব।

> বাহিরের এই ভিক্ষাভরা থালি
> এবার যেন নিঃশেষে হয় খালি,
> অন্তর মোর গোপনে যায় ভরে
> প্রভু, তোমার দানে তোমার দানে
> তোমার দানে।

কিন্তু ঈশ্বর তো স্বর্গের কোনো নিভৃত প্রকোষ্ঠে বন্দী হয়ে নেই। সংসারের সঙ্গে অনুস্যূত হয়ে আছেন। তাই সংসারকে ছেড়ে গেলে সুন্দরের সঙ্গে সাক্ষাৎকার হবে কি করে? যে জাহাজে করে চলেছি যাত্রী হয়ে সে জাহাজ থেকে লাফ দিয়ে পড়ে জল সাঁতরে কি বন্দরের দেখা পাব? এই জাহাজে করেই যেতে হবে ভাসতে-ভাসতে, আর সকলের সুখদুঃখের সরিক হয়ে, খণ্ডের মধ্যে অনন্তকে দেখে-ছুঁয়ে। সে অনন্ত বাসা নিয়েছে মানুষের অন্তরে, তার আনন্দ খেলা করছে মানুষের মত তনুতে। 'ও তার অন্ত নাই গো নাই আনন্দে গড়া আমার অঙ্গ।' মানু[ষের] মুখই ঈশ্বরের প্রতিলিপি, মানু[ষের] অঙ্গই তাঁর রঙ্গলীলা। তাই কি ক[রে] মানুষের হাত ছেড়ে দেব, সরে যাব প[াশ] কাটিয়ে? মানুষকে ছুঁয়েই তো ঈশ্বর ছোঁয়া। মানুষকে ভালোবেসেই [তো] ঈশ্বরকে আস্বাদ করা। নিজের অন্তরে[র] মধ্যে অনন্তকে অনুভব করি কি করে[?] শুধু মানুষকে ভালোবেসে। অন্তরের মা[ঝে] অনন্তের অনুভবের নামই ভালোবাসা।

ধর্ম? শুধু ধর্ম? ধর্ম তো নিশ্চয়[ই]। কিন্তু শুধু-ধর্ম নয়, মানুষের ধ[র্ম]। মানুষ শুধু জীবযন্ত্র নয়, নয় শু[ধু] একটা তরল তামাসা। মানুষ ঈশ্বরে[র] প্রতিভূ, ঈশ্বরের প্রতিভাস। এই ভাব দেহে মনে ধারণ করা ও জীবনে উদ্ধ[ৃত] করে দেখানোর নামই ধর্ম।

তাই 'কড়ি-কোমলে' এসে রবীন্দ্রন[াথ] ঘোষণা করলেন, মানবের মাঝে আ[মি] বাঁচিবারে চাই। মানুষকে বাদ দি[য়ে] কেটে-ছেঁটে, ছোট করে বাঁচতে পারব ন[া]। সে বাঁচায় সুখ নেই, সম্পূর্ণতা নে[ই]। আর, আমার সুখ বা সম্পূর্ণতা কিসে[?] মানুষ যেখানে অমর সেখানে বেঁচে। অ[মর] কোথায় মানুষ মৃত্যুহীন? মানুষ মৃ[ত্যু]হীন ঈশ্বরে। সেই সর্বলোকের মহামা[নব] যে ঈশ্বর তাতেই মানুষকে বিধৌত হ[তে] হবে বিভাসিত হতে হবে। প্রমাণিত হ[তে] হবে। প্রকাশিত হতে হবে। সেই প্রকা[শের] বাসগৃহেই থাকব আমি মানু[ষের] প্রতিবেশী হয়ে।

বিধাতার বৃহৎ পরিহাস হয়ে ন[য়], বিধাতার বিরাট প্রতিশ্রুতি হয়ে। [সেই] প্রতিশ্রুতিকে পরিপালন করে যা[ব], নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে যাব অমরত্বে।

তারই জন্যেই তো এই ঘোষণ[া]: মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে।

ব্যক্তিক অর্থেই বা কেন আমি চাই মরতে? যিনি এই ভুবনকে সুন্দর ক[রে] রচনা করেছেন তাকে যদি ত্যাগ করি ত[া] তো সেই ভুবনসুন্দরকেই ত্যাগ করা হবে। দুটি চক্ষু মেলে অপরূপকেই তো দেখ[তে] এসেছি রূপে-রূপে। কেন সাধ করে চো[খ] বুজব, মুখ ফিরিয়ে নেব? কেন বিরা[গে]

রামে বঞ্চিত করব নিজেকে? প্রকৃতির াবণ্যলেখায় তাঁরই পত্রটি উদ্ঘাটিত। কেন ামি সে পত্রটি ছত্রে-ছত্রে পড়ে নেবনা? ামার প্রতিদিনের চলার মধ্যে কেন খুঁজে াবনা সেই শাশ্বতী গতির আনন্দ। ণিকের মুঠির মধ্যে কেন পাবনা অনন্তের বনী? পত্র যদি পড়তে নাও পারি তবু ুধু পত্র পাবার আনন্দেই কেন স্পন্দিত-ম্পিত হবনা? এ পত্র যে আমি পেয়েছি ই আমার যথেষ্ট, এই আমার অশেষ।

বিশ্বজীবনের কাছে ক্ষুদ্রজীবনের াত্মসমর্পণ। কিংবা বিশ্বজীবনে প্রসারণ ্যক্তিজীবনের। সেই সমর্পণটি প্রেমে, সারণ সৌন্দর্যে। কোনো দায় নেই াধ্যতা নেই, সুন্দর হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন ামনে, না-ভালোবেসে থাকবে কি করে, াবে কোথায়? যদি মহাজন হয়ে খাজনা াদায় করতে আসতেন, হয়তো পালাবার ষ্টা করতুম। কিন্তু এ যে মহামানব হয়ে প্রম আদায় করতে এসেছেন সুন্দরের ালায়। ধরা না দিয়ে করি কি। ধরা না দলে তো আমিই ঠকব, পাবনা ধরতে। সই ঠকাই তো মৃত্যু। আমার দিন-রাত্রির কল নিমেষে যে অশেষের ধনে ভরা আছে ই অনুভবটি যদি না আসে সেই তো ন্য। আর সে দীনতাই তো মৃত্যু।

আমি মরবনা, চাইনা মরতে। যদি রি-ও, পরমপ্রকাশরূপে আসুক সে ৃত্যু। প্রকাশের মন্ত্র আর কিছুই নয়, মি মরেও মরিনা। দেহাতীত দেহ হয়ে ম্লান আলোক-শিখায় জ্বলি অত্যুচ্চের াধচূড়ে। সৌন্দর্যের স্বর্ণপ্রদীপ হয়ে।

'সংসার জীবনময়, নাহি হেথা রণের স্থান।'

তুমি চিরনূতন, নিত্যনূতন। তোমার স পুরানো প্রাচীন ধরণী হয়েছে শ্যামল-রণী।' আশ্চর্য, কত যুগ-যুগ ধরে আছ, থচ এতটুকু পুরোনো হওনি। শ্মশান-তার ধূলিতে ফোটাচ্ছ অতসী-আকন্দ। তদিনকার আকাশ মনে হয় আজকের তরি, এই এক্ষুনি ঘষা-মাজা শেষ হল। সই কবে একটি তারার কণা জ্বলিয়ে খেছ এককোণে, আজও অম্লান চোখে য়ে আছে। নীলকান্তমণির পেয়ালাটি পূড় করে কত সুধা ঢাললে, কত সোনার াদ আর কত রূপোর জ্যোৎস্না, এতটুকু ম পড়ল না হিসেবে, টান পড়লনা ভাঁড়ারে। ঝরা পাতার শব্দের দেশে চলে এল নবপল্লবের কোলাহল। কোথা থেকে শ্যামল সঘন মেঘ করে এল, ভেজা কেতকীর সুবাসে স্নান করে কঠিন মন উড়ে চলল বিস্মৃত বিরহের চিহ্ন খুঁজতে। কিছুই মরেনা, শুধু নতুনের রূপ ধরে আসে, নতুনের রূপ ধরে চেয়ে থাকে। তুমি তো পুরোনোকে বিদায় দাও না, তার প্রাণের মধ্যে তোমার বাঁশিটি বাজিয়ে দাও নতুন করে। তেমনি আমাকেও তুমি নতুন করো, নতুন রাখো। আমার পুরোনো দেহের কুহরে ভরে দাও তোমার নবনবীনের নিশ্বাস তোমার প্রাণের প্রত্যন্ত সুরে। সাহসের সুরে। বীর্যময় মাধুর্যের সুরে। হে লোচনলোভন, আমাকেও তোমার মত সহজ শোভন করো।

নতুন হবার সাধনাই তোমাকে পাবার সাধনা। তুমি যেমন অক্ষয় আমিও তেমনি ক্ষণে-ক্ষণে জন্ম লাভ করে অক্ষয় হব।

(ক্রমশ)

এস্কিমো শিল্পীদের খোদাই-কাজ

হর্ষদেব

ওআলরাসের মাথায় মাছ হাতে মানুষ

এস্কিমো বলতে সাধারণত আমাদের চোখের সামনে যে ছবি ভেসে ওঠে তা খুব একটা প্রীতিকর নয়। ছেলেবেলার ভুগোলের জ্ঞানটাই এক্ষেত্রে সম্বল। কাজেই এস্কিমো বললেই মনে হয় পশুর মোটা মোটা চামড়ার পোশাকে আপাদমস্তক আবৃত কতকগুলো অদ্ভুত চেহারার মানুষ, বাস করে উত্তরমেরুর কাছাকাছি অঞ্চলে, সেখানে শুধু বরফ আর বরফ, বল্গা হরিণ, শ্লেজ গাড়ি, বরফের বাড়ি। জীবন বলতে ওদের কিছু নেই—কোন-রকমে পশু শিকার করে ক্ষুধা নিবারণ করা আর ঘুম। শিক্ষাদীক্ষার বালাই নেই, সংস্কৃতি সম্বন্ধে মাথা ব্যথা নেই তাদের এক বিন্দুও। অর্থাৎ চলতি কথায় যাকে বলি সভ্যতা, সেই সভ্যতার আলো যে এস্কিমোদের দেশে ছিটেফোঁটাও পড়ে নি সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ।

এস্কিমোদের সম্পর্কে এই প্রচলিত ধারণা ভয়ানক রকমের ভুল ধারণা। বরফের দেশের লোক তারা এটা যদিও ঠিক কিন্তু এস্কিমো মাত্রেরই বরফের বাড়ি তৈরি করে থাকার কথাটা বাড়াবাড়ি। এস্কিমোদের মোট জনসংখ্যার তিনভাগই নাকি কস্মিনকালে বরফের বাড়িই দেখে নি। তেমনি শুধু উদরপূর্তি আর নিদ্রা সাধনাই ওদের জীবন নয়। এস্কিমোদের মধ্যে, আধুনিক অর্থে সভ্যতার চিহ্ন থাক বা না-থাক, শিল্প এবং সৌন্দর্যবোধের অভাব নেই। বরং শিল্প তাদের ব্যক্তিগত কী সমষ্টিগত উভয় জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কানাডার পূর্বাঞ্চলীয় উত্তর মহা-সাগরের ধার ঘেঁষে যে সব এস্কিমোদের বসবাস তাদের শিল্প-প্রিয়তা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এদের যে কোনও একজনকে যদি প্রশ্ন করা হয়, 'হ্যাঁগো পরদেশী ভাই, তুমি কি খোদাই করে মূর্তিটুর্তি তৈরি করতে জানো?' সঙ্গে স[ঙ্গে] জবাব দেবে, 'নিশ্চই, নিশ্চই, এ[...] জানব না।'

খাদ্যের অন্বেষণে

শিল্পের আওতায় পড়ে এম[...] কিছুকে এরা এদের ভাষায় 'সিনাওরাক্'। সিনাওরাকের খোদাই কাজটাই এস্কিমোদের [...] বহুলভাবে প্রচলিত। প্রতিটি প[...] এ কাজে দক্ষ। এর কারণ খুঁজলে[...] যাবে, অর্ধ-যাযাবর এই জাতি, উদর[...] জন্যে পশুশিকারই যাদের জীবনের

কৃষ্ণ পেচক

কাজ, তারা সংখ্যায় যদি স্বল্প হ[...] জীবনধারণের উপযোগী খাদ্যসং[...] পরও প্রচুর অবসর পায় তাহ'লে [...] বিশেষ নয়, প্রায় সকলেই অব[...] অন্য কাজে ব্যয় করতে পারে। [...] কারণ হচ্ছে এই যে, এস্কিমো পরি[...] তাদের জীবনযাত্রার উপযোগী সব [...] স্বহস্তে তৈরি করে নিতে হয়—সে [...] হারপুন, পোশাক যাই হোক না [...] ফলে সব কিছুই শেখার অবকাশ[...] প্রচুর। যে কুমোর হাঁড়ি, সরা গড়তে[...] তার পক্ষে পুতুল গড়তে শেখা ক[...] নয়, অসম্ভবও নয়।

এস্কিমোদের শিল্পকর্ম বলতে [...] করা কাজই বোঝায়। অন্য কোন [...] শিল্পকর্মে তাদের পটুতা উল্লে[...] নয়। কেননা এমন একটা প্রাকৃতিক [...] হাওয়ায় তারা মানুষ যেখানে রঙ, [...] কাগজ কি কাপড় নিয়ে কাজ করার স[...] নেই। কাজেই ওদের শিল্প প্র[...]

ক্রুদ্ধ ভল্লুকের মাথা

...ন্ত বৈশিষ্টটুকু ফুটে উঠেছে খোদাই-...জর মধ্যে।

এস্কিমোদের এই খোদাই-কাজগুলি ...লে অত্যন্ত অমনোযোগী দর্শকেরও ...খে দুটি বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট ধরা পড়বে। ...ত এদের বিষয়বস্তু, দ্বিতীয়ত ...টিভঙ্গী। বিষয়বস্তুর দিক থেকে দেখা ... এস্কিমোদের শিল্প-কর্মের প্রধান ...লম্বন পশুপাখি। একমাত্র অবলম্বনও ... যায়। আর দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য ... আদিমতা। অবশ্য কল্পনাপ্রবণতার ... কোন কোন শিল্পী একটি বেদনা-...র কমনীয়তাও তাঁদের কোন কোন কাজে ...র্বভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। এস্কিমো ...ল্প-কর্মের এই দুই বৈশিষ্ট্যের কারণ ...নুসন্ধান করলে দেখা যাবে এরা যে ...াকৃতিক পরিবেশে বাস করে এবং যে ...াজে তার প্রভাব এদের মনন এবং ...ল্পকে গ্রাস করে রেখেছে। এটাই ...ভাবিক। তুষারাচ্ছন্ন দিক দিগন্ত, ...স্তত বিক্ষিপ্ত প্রতিবেশীদের তাঁবু, ...দ্র, বরাহ, সাপ, আর পাখি, ...র সীমাহীন আকাশ। প্রাণধারণের ... শিকার করতে হবে, পোশাকের ...ন্য চাই পশুর চামড়া, বাতি ...লাবার, আগুন ধরাবার জন্যে প্রয়োজন ...পাখির চর্বি। যাদের জীবনটাই ...ূর্ণভাবে পশুর প্রতি নির্ভর তাদের ...ষ্টসীমা যে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে পশু-জীবনের বিচিত্র লীলায় তা বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে ওদের দৃষ্টি এবং মন গোপনে এই পশুকুলের হিংস্রতা, দৈহিক রূঢ়তা শারীরিক সুসাম্য এবং সৌন্দর্যকে আবিষ্কার করতে চেয়েছে। শিল্পে তারই প্রতিফলন। পশু জীবনের এমন ঘনিষ্ঠ পরিচয় অন্য কোথাও বিরল। পরন্তু এস্কিমো জীবনের সঙ্গে পশুকুলের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের জন্য এদেশীয় শিল্পী-দের হাতে যে সব খোদাই কাজ পাওয়া যায় তার অধিকাংশ কেবল পশুদেহই নয়--পশু চরিত্রের বিভিন্ন রূপ এবং তাদের দেহের যথার্থ শারীরিক অঙ্গসংস্থানও বটে।

এস্কিমো শিল্পের রূপটা আদিম। অন্তত আদিমতার লক্ষণযুক্ত। অনেকে তাই এগুলিকে ঠিক আদিম না বলে প্রাকৃত (নেটিভ) বলতে চাইবেন। সে যাই হোক --এস্কিমো জীবনের যে পরিবেশ তাতে শোভনতা অপেক্ষা সরলতার প্রতি তাদের দৃষ্টি থাকাই স্বাভাবিক। এমন এক সমাজে তারা বাস করে যার মধ্যে স্থায়ী অধিকারের সূত্রটা একরকম নগণ্য। অর্ধ-যাযাবর নরনারী--বর্তমান সভ্যতার মেকি শালীনতা ও ব্যাধি দ্বারা কলঙ্কিত নয়। প্রকৃতি তাদের এখনো রক্ষা করছে দুস্তর ব্যবধানে। ওদের চিন্তা আর কাজে এ যুগের পরিশুদ্ধ নীতি-তথ্য-তত্ত্বের নিগড় নেই। কাজেই, ওদের ভালো-লাগাটা যতটুকু খাঁটি, ভাল-লাগানোর চেষ্টাটাও ততটুকু খাঁটি এবং সরল। এই সরল পদ্ধতিই এস্কিমো শিল্পের আদিম লক্ষণ বা প্রাকৃত লক্ষণ।

শিল্পের বৈশিষ্ট্য পশুপ্রীতি আর সরলতা এবং শিল্পীদের বৈশিষ্ট্য তারা সরল সতেজপ্রাণ। এমন একটি স্নিগ্ধতা এদের মনে বর্তমান যা সভ্যজগতের লোক জানেই না। মনপ্রাণের এই মগ্নতার দরুণ এস্কিমোরা তাদের বন্য পরিবেশের মধ্যেও একটি শিল্পবোধকে সযত্নে লালন করছে। অসহ ঠান্ডায় যখন মাসের পর মাস তাকে ঘরে বন্দী হয়ে থাকতে হয়—তখন একাগ্রমনে একটি মূর্তি খোদাইয়ের যে অবসর ও আনন্দ ওদের করতলগত তা আর কারই বা আছে।

আর একটি কথা—খোদাইয়ের কাজে এস্কিমোরা যে সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তার সবই তাদের স্ব-উদ্ভাবিত। স্থূলে এবং সূক্ষ্ম উভয় কাজের জন্য শিল্পীরা মনোমত যন্ত্র ব্যবহার করে থাকে। একটি

স্ত্রীলোক এবং একটি কুকুর

খোদাইয়ের কাজ মোটামুটি শেষ হওয়ার পর সেটিকে মসৃণ করার জন্যে খসখসে অসমতল পাথর ব্যবহার করা এবং পাথরের রং কালচে হয়ে যাওয়ার জন্যে সিলমাছের তেলে দিনের পর দিন ডুবিয়ে রাখা ওদের বিশেষ রীতি। একটা আশ্চর্য সবুজ আভা এবং লালচে আভাও কোন কোন পাথর থেকে এইভাবে বের করা হয়। খোদাই কাজের শেষ পর্যায় পাথরের গুঁড়ো এবং হাতপালিশ দিয়ে শিল্পকর্মটিকে উজ্জ্বল চিক্কণ করে তোলা হয়।

মূর্তি তৈরি করেই সঙ্গে সঙ্গে তা দেখিয়ে বেড়ানোর অভ্যাস এদের নয়। কাজ

গাছের শাখায় পাখি

শেষ হলেই ভাল করে সেটিকে মুড়ে রেখে দেয় এরা। কখনো কেউ দেখতে চাইলে বের করে দেখায়। আর সবচেয়ে মজা হচ্ছে এই যে, কোনও এস্কিমোই কখনো অপরের শিল্প-কাজের খুঁত ধরে না। বরং যে শিল্পী যত বেশি দক্ষ সেই শিল্পী নিজের প্রতিটি কাজ সম্পর্কে নিজেই তত বেশি খুঁতখুঁতে, অসন্তুষ্ট। তার মুখে নিজের কাজ সম্বন্ধে খালি শোনা যাবে, কিছু হয়নি তার, একদম বাজে হয়েছে। সুন্দর থেকে সুন্দরতর কাজ করার প্রেরণা এরা এমনি করেই পেয়ে থাকে।

নীড় ও পাখি

এস্কিমো শিল্পীদের কয়েকটি খোদাই করা কাজের নমুনা এখানে দেখান হচ্ছে। একটু লক্ষ্য করে দেখলেই শিল্পগুলির বৈশিষ্ট্য, বৈচিত্র্য ও চমৎকারিত্ব চোখে পড়বে।

প্রথম মূর্তিটি হচ্ছে ওআলরাস নামক একপ্রকার উত্তর মহাসাগরীয় জন্তুর মাথার ওপর মাছ হাতে একটি মানুষের মুখ। হাডসন উপসাগরের পূর্ব উপকূলভাগের জনৈক শিল্পীর এই কাজটি হাস্যমধুর শিশুসুলভ চাঞ্চল্যের এবং খেলনার একটি সুন্দর উদাহরণ।

'খাদ্যের অন্বেষণে'—এই খোদাই কাজটির মধ্যে এস্কিমো জীবনের ঘনিষ্ট রূপটি ধরা পড়েছে। মৃগয়ারত শিকারীর

তুষার হংসী

চেহারার মধ্যে শিকারের উত্তেজনা এ অব্যর্থ লক্ষ্যের একাগ্রতা বিশেষভা উল্লেখযোগ্য।

কোপিকিলঅক একজন নামক এস্কিমো শিল্পী। শিকারের অন্বেষ একটি পেচকের নীড়ের সামনে গি দাঁড়ালে ক্রুদ্ধ পেচকের যে ভয়ানক ভঙ্গি দেখা যায়—কোপিকিলঅক তাই উৎকী করেছেন। 'ক্রুদ্ধ পেচক' এস্কিমে শিল্পীদের শিল্পদক্ষতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

পশু জীবনের অতি ঘনিষ্টতম পরি যাদের আছে তারাই কেবল ক্রুদ্ধ ভল্লুকে মুখাবয়বের প্রতিটি ভঙ্গি অতি দক্ষত সঙ্গে ফুটিয়ে তুলতে পারে। 'ক্রু ভল্লুকের মাথা' এই খোদাই কাজ পাশবিক ভাব এবং পশু অঙ্গের নিখ অ্যানাটমির প্রশংসনীয় কীর্তি।

পোর্ট হ্যারিসনের জনৈক শিল্প তৈরী 'স্ত্রীলোক এবং একটি কুকু এস্কিমোদের গার্হস্থ্য জীবনের এক সুন্দর আলেখ্য।

ক্যানাডার পূর্বাঞ্চলীয় উত্তর মহা সাগরীয় এলাকায় গাছ জন্মায় না। পা নেই, ফুল নেই। পাখিও থাকে না স বছর। তবু সেখানকার কল্পনাকুশ শিল্পীর মনে গাছ আর পাখির স্ব জাগে। "গাছের শাখায় পাখি" এমনই এ স্বপ্নের ছবি। এই কাজটি বেদনাম রমনীয়তা এবং শিল্পীজনোচিত সৌন্দ বোধের আশ্চর্য সুন্দর উদাহরণ।

আরও দুটি স্নিগ্ধ ও কমনীয় শিল্প কীর্তি লক্ষ্য করা যাবে 'নীড় ও পা' এবং 'তুষার হংসী' নামক খোদাইয়ের ক দুটিতে।

এস্কিমোদের জীবনের পরি সংকীর্ণ। প্রকৃতি সেখানে অনুদার। ব গলে যাওয়ার সময় এলে নানারকম পাখি হাওয়া বদলাতে নতুন দেশে আ অল্প কিছু সময়। তবু শিল্পীর চে সেই বৈচিত্র্যগুলি ধরা থাকে—অবক আত্মমগ্ন ভাস্কর তার রূপ ফুটিয়ে তে সুদূর থেকে আহৃত পাথরে পাথরে।
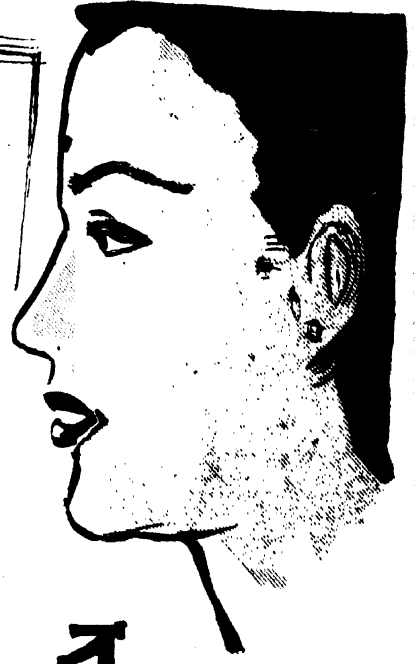
পরদার

প্রভাত দেব সরকার

মাথা গলিয়ে জামাটা খুলে আলনায় টাঙাতে টাঙাতে সুকুমার চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করলে "ঘর থেকে কে ন বেরিয়ে গেল! কে গো?"

বিভারাণীও বেরোবার উদ্যোগ করেল; ঘরে চৌকাঠের ওপর দাঁড়িয়ে গতপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে চেয়ে লে, "কেন, দেখনি আগে?"

কই না? সুকুমার খাটের ওপর বসে র দিকে চাইলে।

কেমন একটা কৌতুকে বিভারাণীর টা হঠাৎ বড় উজ্জ্বল দেখায়। মারের প্রশ্নে এমন কি রহস্যের ান পেয়েছে বিভারাণী! একটু বুঝি স্তুত বোধ করে সুকুমার। ত্রস্ত, চকিত স্রিয়মানা, অপরিচিতার পরিচয় জানতে য়া তার উচিত হয়নি এভাবে!

বিভারাণীর মুখের হাসিটা তখনো ায়নি। আবার কেমন এক রকম ভঙ্গী বললে, "দেখনি কি গো! -যাও—"

শুধু শুধু মিথ্যে বলার কি আছে! সুকুমার ভেবে পায় না, তার প্রশ্নে কি ভেবেছে বিভা যে, অকারণ অবিশ্বাস করছে!

সুকুমারের মুখটা কঠিন হ'য়ে ওঠে, স্বরটাও বিকৃত শোনায়, "দেখলে আবার জিজ্ঞেস করবো কেন! নেকামি করবার মত সময় নেই!"

বিভার হাসি হাসি মুখটা নিভে যায়। কম কটু শোনায় না উত্তরটা, "জেনেশুনে অনেকে অমন করে কি না! তুমি নেকামি করতে যাবে কেন।"

তারপর সবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে যেতে বিভা বললে, "যত নেকামি আমরাই করি তো!"

ইচ্ছে থাকলেও সুকুমার বিভাকে ডেকে ফেরায় না। বলতে পারে না, এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে শুধু শুধু রাগ করবার কোন কারণ নেই—ঘরে কে এল, কে গেল তা নিয়ে মিথ্যে নিজেদের মধ্যে মনোমালিন্য সৃষ্টি করা! ফুরিয়ে যেত পরিচয়টা বলে ফেললেই, যখন বলছে তখন মেনে নিলেই হ'তো—সুকুমার সত্যিই জানে না বিভার নতুন আলাপিতাকে। দেখেওনি আগে কোনদিন।

কিন্তু সত্যিই? সামনে আয়নায় স্থির নিজের মূর্তিটার দিকে চেয়ে সুকুমারের ঠোঁটের কোণে ক্রুর হাসি ফুটে ওঠে, মনকে আঁখি ঠারার মত।

আর কোনদিন কি ভদ্রমহিলাকে সে দেখেনি খেয়াল করে? একটা সামান্য প্রশ্ন নিয়ে অমন সন্দেহ প্রকাশ করা উচিতই হয়নি বিভার! মিথ্যে অস্বীকার করবার কোনই হেতু ছিল না সুকুমারের!

আয়নার স্থির মূর্তিটা বুঝি অস্থির,

চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। সত্যি-মিথ্যের লৌকিক সংজ্ঞাটা যেন কেমন গোলমেলে ঠেকে। পরপুরুষের পায়ের শব্দে পরস্ত্রীর চকিত পলায়ন পরিচয়ের কোন্ সূত্র অনুসরণ করে কে জানে।

বিভার মত না হোক, নিজের মত করে সুকুমার মহিলাটির পরিচয় জানতো—এক উঠানের সামনের বাড়ির ভাড়াটে ও'রা। হাজার মাথা নিচু করে' এদিক-ওদিক দৃষ্টির স্পর্শ বাঁচিয়ে আভিজাত্য রক্ষা করতে সুকুমার চেষ্টা করুক, উঠান পেরিয়ে আসা যাওয়া করবার সময় ক'দিন মহিলাটিকে সে লক্ষ্য করেছে। অকারণে মন খুশীও হয়েছে। বিভারাণীর মতই একটি বউ, কিন্তু কত পরিপূর্ণ স্বাস্থ্য, প্রাণবন্ত!

তারপরও কতবার দেখেছে কিন্তু কোনদিন মুখ ফুটে তা নিয়ে বিভার সঙ্গে আলাপ করেনি সুকুমার। কি জানি কেন মনে হ'য়েছে তার এই ঔৎসুক্য বিভার পছন্দ হ'বে না, অযথা মনো-মালিন্যের সৃষ্টি করবে হয়তো। পরস্ত্রী সম্বন্ধে আগ্রহ স্ত্রীর কাছে শোভা পায় না পরপুরুষের। তাছাড়া দরকারই বা কি!

'এর আগে দেখিনি কোনদিন' বলাটা সুকুমারের মিথ্যে কথা। সৎ-সাহসের অভাব, অহেতুক ভয় ছাড়া আর কিছু নয়। আমি দেখেছি, আমি জানি বলতে তা হ'লে সুকুমারের বাধল কেন? অকারণ এই গোপনতার আশ্রয় নেওয়া মনো-বিকারের লক্ষণ!

এই নিয়ে বিভার মনে যদি কোন সন্দেহ বিদ্রূপ কটাক্ষের মত জেগে থাকে সুকুমার দোষ দিতে পারে না! রহস্য বিভা ক'রতে পারে, নেকামি বলে' স্বামীকে অভিযোগও সেই সঙ্গে।

ছি, ছি, কেন যে সুকুমার এমন ক'রলে! মনোভাবের একি জটিলতা সৃষ্টি করলে অকারণে! দেখেও না দেখার ভান করার ইচ্ছেটা তার হ'লো কেন? যদি কিছু জিজ্ঞেস না করতো এভাবে হয়তো ধরা পড়তো না। গোপন করার আগ্রহটা হঠাৎ বড় প্রকট হ'য়ে পড়েছে আজ। কি লজ্জা!

হয়তো এ লুকোচুরির অপরাধ অমার্জনীয়। সুকুমার বোঝে।

আয়নাতে ছায়া পড়ল। সুকুমার চমকে উঠলো। সেই গোপনপদচারিণী, মনের খুশী যেন কাছাকাছি কোথায় এসে দাঁড়িয়েছে। যাকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই তো! অদ্ভুত উত্তেজনায় সারা দেহ অবশ হ'য়ে বুকটা কেমন করে সুকুমারের।

কিন্তু না, একেবারে সম্পূর্ণ নতুন মানুষ বিভা। এতটুকু যদি রেশ থাকে এই একটু আগের মনোমালিন্যের। কে বলবে কোন সন্দেহ আছে এ মেয়ের মনে স্বামীকে নিয়ে। অকপটে সামনে এসে বিভা জিজ্ঞেস করলে, "এখনো বসে আছ! হাত-মুখ ধোবে না? চা করবো?"

সুকুমারের চেতনা হঠাৎ যেন ফিরে আসে। শূন্য দৃষ্টিতে বিভার মুখের দিকে চেয়ে বলে, "আঁ—চা, এই যে! কর না—"

স্বামীর অন্যমনস্কতা বিভা লক্ষ্য করে, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারে না তার প্রকৃত কারণটা এখনো, পাশের বাড়ির বউটির পরিচয় না পাওয়ার জন্যে কি না।

স্বামীর ছেলেমানুষী মন-ভারিতে বিভা মনে মনে হাসে। পুরুষগুলো যেন কি, সব জিনিস খোলাখুলি না জানা পর্যন্ত সন্তুষ্ট হ'বে না, শান্তি পাবে না! তুচ্ছ ব্যাপারে অভিমান, রাগ কথায় কথায়!

হঠাৎ বিভা শব্দ করে হেসে উঠলো।

সুকুমার জিজ্ঞেস করলে, "হাসচো যে!"

"তোমাকে দেখে!" তেমনি কৌতুক-মিশ্রিত কণ্ঠে বিভা বললে।

"তার মানে?" হাসতে গিয়ে মুখটা সুকুমারের নিষ্করুণ হ'য়ে ওঠে বুঝি আবার।

আর ভয় পায় না বিভা। হেসে বললে, "ডেকে আনবো তাকে যে তোমাকে দেখে সরে গেল, আর আমাকে গেল জ্বালিয়ে?" সত্যিসত্যি ডাকতেই বুঝি বিভা চৌকাঠ পেরোয়। "ও ভাই শুনচো!"

আঃ, কি হ'চ্ছে! সুকুমার স্ত্রীকে ফেরায়।

বিভা যেন মজা পেয়েছে, হেসে কুটিপাটি, "ও ভাই মিলন!"

সুকুমার গুম হ'য়ে যায়। আর কি বলে রাগ দেখাবে ভেবে পায় না। পাগল নাকি অমন করছে কেন! আচ্ছা মুশকিলে পড়া গেছে।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে মুখে অনুর[illegible] গাম্ভীর্য এনে বিভা স্বামীর হাত ধ[illegible] আকর্ষণ করে' বললে, "রাগ করেচো? ঘ[illegible] মানচি!"

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঘর থেকে বেরি[illegible] যেতে যেতে সুকুমার বললে, "কে বলে রাগ করেছি! রাগের কি আছে!"

নিজেকে বিভা সামলাতে পারে ন[illegible] স্বামীর উদ্দেশ্যে খেঁকিয়ে বলে ওঠে, "[illegible] আর বলবে...কেউ তো ঘাস খায় ন[illegible] কিছু না থাকলেই ভাল!"

সুকুমার হয়তো শুনতে পায় ন[illegible] পেলেও আর বাড়াতে চায় না।

চুপ করে' বিভা খানিক ঘরের ম[illegible] দাঁড়িয়ে আকাশ-পাতাল ভাবে। চ[illegible] ঘোরাতে মনে হয় কাপড়ের আলমারীর আয়নাতে একটা ছায়া যেন উঁকি দি[illegible] সুট করে সরে গেল। অপলক দৃষ্টি প্রতিফলিত নিজের মূর্তির দিকে চ[illegible] চেয়ে বিভা কিছুতে ভেবে পায় না, ছায়[illegible] তার নিজের, না আর কারো—আর [illegible] চমকে উঠলো কেন? ঘরেতে সে ছাড়া [illegible] কেউ নেই! থাকবারও কথা নয় এ সম[illegible]

উঠানে শব্দ করে ছেলেমেয়েগু[illegible] বাইরে থেকে বেড়িয়ে ফিরল। কখন স[illegible] হ'য়ে গেছে বিভার খেয়ালই ছিল [illegible] ওবাড়ির বৌটির সঙ্গে গল্প ক'র[illegible] ক'রতে কত সময় কেটে গেছে। [illegible] কদিনই এমনি হ'চ্ছে, নতুন ভাব হ[illegible] থেকে বৌটি প্রায়ই আসছে। বৌ[illegible] কথার শেষ নেই, স্বামী-স্ত্রীর সংস[illegible] কাজের চেয়ে বুঝি কথাই বেশি!

রোজ রোজ তা বলে তো বিভার [illegible] না! তার কত কাজ, চারটি ছেলেমে[illegible] সংসার স্বামী, লোক-কুটুম!—গল্প [illegible] সময় কাটাবার অবসর কই! আপিস [illegible] ফিরে স্বামী আজ এখনো চা পেল [illegible] ছেলেগুলো ফিরলো, ওদেরও খাবা[illegible] ব্যবস্থা এখনো হ'লো না—নিজের চু[illegible] পর্যন্ত আজ বাঁধবার সময় পায়নি [illegible] সান্ধ্য বেশবাস, প্রসাধনও শেষ করে[illegible] তার ওপর এই—

আবার বুঝি মনে পড়ে যায় কু[illegible] সন্দেহটার কথা! অথচ কেন যে স[illegible] কি যে সন্দেহ বুঝতে পারে না [illegible] স্পষ্ট করে'। সুকুমার তার কাছে [illegible] অচেনার কথাটা লুকতে চায়! ব[illegible]

গলে এক বাড়ি এক দোর, সুকুমার দখেনি চোখ চেয়ে বৌটিকে, বিশ্বাস হয় খনো? অন্ধ তো নয়!

সুকুমার লুকলেই বা, ন্যাকা সাজলেই া, কি তার আসে যায়! নিজে থেকে সেই া ছোট হয় কেন জিজ্ঞেস করে'। এই ুকোচুরি মনোবৃত্তি কি তার ক্ষতি করতে ারে! মিছিমিছি একটা অশান্তির সৃষ্টি।

না, বৌটির ওপরই রাগ ধরে বিভার। কেবারে যার নাম কর্মনাশা! যেদিন থেকে আলাপ হ'য়েছে সেদিন থেকে কেমন জানি ার সংসারে গোলমাল দেখা দিয়েছে। বামানুষের অমন লোকের বাড়ি যখন-খন আসা কেন, অত গল্পই বা কিসের! বার এলে বলবে—

না, বৌটির মুখে অদ্ভুত একটা ভাব াছে। কে বলবে তার বয়েসী, খুব বেশী লেও উনিশ-কুড়ি! যেন কাল সবে বিয়ে য়েছে, ফুল্লকুসুম, নবোদ্গত যৌবন। শ্রীই বৌটি!

এতদিন যা মনে হয়নি আজ তাই বদনার সঙ্গে মনে হ'লো বিভার, নতুন আলাপিতার রূপের তুলনা হয় না—মিলন র বেশী সুন্দরী তার চেয়ে। যে দেখবে সই বলবে। নিজে কেমন বুড়িয়ে গেছে বভা, অকাল বার্ধক্য এসে গেছে! সবে শ বছর তার বিয়ে হ'য়েছে, এই তো দিন!

আরো রাগ হয় ছেলেমেয়েগুলোর পর। ক'রবে কি, কিছু করতে দেবে রা, না কিছু করবার উপায় আছে ওদের নো, রাতদিন ওদেরই পরিচর্যা কর, নজের দিকে তাকাবার একটু যদি সময় াওয়া যায়! কি যে মাথামুণ্ডু, পিণ্ডি টকাচ্ছে নিজের রাতদিন! শত্তুরদের বালায় যদি কিছু করবার উপায় াছে!

আবার বুঝি বৌটি এল জ্বালাতে! ানে বিভার স্বামী ফিরেছেন, তাই রান্না-রের ওদিকে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় ডাকছে, ও দিদি শুনছেন! এদিকে একবারটি াসুন না—

যখন-তখন আসবার অত সময় নেই বভার! অত কিসের আলাপ, অত কিসের াতির! না যাবে না বিভা, আজই বলে দবে মুখের ওপর সময় নেই—আর যেন াকে না ডাকে, আর যেন না আসে—

না, না-আসার কথাটা বলা উচিত হবে না। হাজার হোক পড়শী—ঘরে এলে আসন পেতে বসতে না দিক, তাড়িয়ে দিতে পারে না তা বলে! ছি ছি, কি যা-তা ভাবছে!

বৌটি আবার ডাকলে, "কই দিদি, আসুন না একবারটি! ও দিদি, ও দিদি!"

শক্ত হয়ে খাট ধরে কাঠের মত দাঁড়িয়ে থাকে বিভা।

ছেলেমেয়েগুলো বুঝি একবার উঁকি মেরেছিল। মাকে ঘরের মাঝখানে অমন-ভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঢুকতে সাহস করেনি। সব ছোটটা বুঝি আসতে চেয়েছিল মার কাছে, সব বড়টা সরিয়ে নিয়ে গেছে—ওঘরে চল, মা বকবে!

বেড়াল ছানার মত বোনটিকে আঁকড়ে ধরে' সরিয়ে নিয়ে গেছে চিনু মার চোখের ওপর থেকে। স্পষ্টই মা রেগে আছেন!

খানিক পরে সুকুমার ঘরে ফিরে এল। বললে, "তোমাকে ডাকচেন!"

"তা কি করবেন!" বিভা অকারণে ঝাঁঝিয়ে ওঠে। "ডাকচেন! কেন?" সুকুমার টিপ্পনী কাটে, "করাকরির আমি কি জানি, সে তুমি বোঝ!"

"অত বুঝে দরকার নেই! রাগটা এবার কণ্ঠের বিকারে বিসদৃশ দেখায় বিভার, "তুমি বোঝ গে!"

"বোঝাবুঝির সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি! ডাকচে তোমাকে, যাবে যাও, কার কি!" একটু যেন কৌতুক প্রকাশ পায় সুকুমারের কথায়।

মুখে কটু বলতে গিয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে বিভা বজ্রাহতের মত স্তব্ধ হয়ে যায়। স্বামীর মুখচোখে কত যেন পরিচয়ের ছাপ। কোন লাভ নেই বৃথা চিৎকার করে—অভিযোগ করে।

সুকুমার বললে, "যাও—ওঃ! কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন উনি!"

আহ্বানকারিণীর জন্যে স্বামীর কণ্ঠ-স্বরের এই উদ্বেগও বুঝি বিভার সহ্য হয় না 'কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবেন!' কি আমার মহামানী লোক এসেছেন!

বিভা বললে, "তাতে তোমার কি! থাকলেই বা দাঁড়িয়ে...ইস্-স্, ওনার বুঝি সহ্য হচ্ছে না!"

সুকুমার হাসতে গিয়ে মুখ কাল করে' বললে, "তার মানে? কি বলতে চাও তুমি!"

"কিচ্ছু নয়। ঘরে কে এল, কে গেল দেখেও যখন দেখতে পাও না, চোখ বুজিয়ে থাক, তখন তোমার মনে করবার কি আছে! ইস্-স্!"

বিভা এই সুযোগের জন্যে যেন অপেক্ষা করছিল, চিমটি কাটার মত বললে।

সুকুমার উত্তরে রূঢ় কিছু উচ্চারণ করবার আগেই অদূরে বৌটির গলার আওয়াজ পাওয়া গেল, "ও দিদি, একবারটি এদিকে আসুন না, বাবা, বাবা, ডেকে ডেকে আর পারি না।"

বাধ্য হ'য়ে 'যাই' বলে বিভা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। জ্বালাতন!

একদিন রাত্রে বিভা স্বামীকে বললে, ঐ অনিলবাবু লোকটা কেমন বলতো? ভদ্রলোককে দেখলে কেমন-কেমন মনে হয়!

অনিলবাবু অর্থাৎ বৌটির স্বামী, এক উঠান এক দোরের পড়শী। স্ত্রীর প্রশ্নে সুকুমার একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করে, "কেন? খুবই সজ্জন, বেশ আলাপী! কালই তো ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল! কিছু তো মনে হলো না।"

"না, তাই জিজ্ঞেস করচি!" বিভা প্রশ্নটা ঘুরিয়ে নিতে চায়।

সুকুমার বললে, "কি মনে হয় তোমার বললে না তো!"

"না, কিছু না এমনি বলছিলুম। যাই বল, বৌটির সঙ্গে মানায় না। মনে

হয়, কত ছোট-বড় ওরা!" বিভা পরিহাস করে' বললে।

"আমাদের বুঝি খুব মানায়?" সুকুমার কৌতুক করলে। "ভদ্রলোকের চেয়ে আমি তো ঢের বড়, পাঁচ-সাত বছরের কম করে!"

বিভা তর্ক করে, "তা আর বলতে হয় না। আমি বাজি রাখতে পারি, ভদ্রলোক তোমার চেয়ে ঢের বড়!"

"কি করে বুঝলে?" সুকুমার হেসে বললে।

"কি করে আবার, দেখে! দেখলে বুঝি বোঝা যায় না, কি যে বল!" বেশ গাম্ভীর্য রেখে বিভা বললে।

"কিন্তু যা দেখা যায় তাতে কি সব সময় বোঝা যায়! আমার চারটি, ভদ্রলোকের একটিও না, আর ও'র স্ত্রীও তো তোমার চেয়ে ছোট—" কথাটা শেষ করে' সুকুমার স্ত্রীর মুখের দিকে চেয়ে থেমে যায়। হঠাৎ বিভার মুখটা কেমন বিকৃত হ'য়ে ওঠে।

"তোমার কানে কানে বলে গেছে ছোট! আমাকে তো তুমি চিরকালই বুড়ি দেখ!" শুধু ক্ষুব্ধ নয়, কেমন যেন অভিযোগের মত শোনায় বিভার কণ্ঠস্বর।

"কি মুশকিল! আমি কি তাই বলচি! তুমি বললে তাই বললুম। রাগ করবো কেন?" সুকুমার স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে।

"সব কথা আগে আমিই তো বলি! আমি বুড়ি, আমি কুৎসিত, আমাকে তোমার পছন্দ হয় না, রাতদিন কত কি বলচো বুঝতে পারি না!" বিভা কান্নার সুরে রুদ্ধ নিঃশ্বাস হ'য়ে ওঠে।

এ অভিযোগের জন্যে সুকুমার মোটেই প্রস্তুত ছিল না—অপ্রস্তুতের মত বিভার বিকৃত মুখটার দিকে চেয়ে থাকে। ভেবে পায় না কি বলবে। কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে সাপ বেরোন!

সুকুমার খানিক চুপ করে' থেকে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার উপক্রম ক'রতে বিভা বলে উঠলো, "ভদ্রলোককে এদিকে চাইতে বারণ করো, বলে দিও কিছু মধু নেই এদিকে!"

যেন বিভা নয় আর কেউ তাকেই বলছে, মনে মনে সুকুমার চমকে ওঠে।

"ঘরে যার অমন অল্প বয়েসী বৌ
র এদিক-ওদিক নজর কেন!" বিভা
ষ করে।

ঘরে দাঁড়িয়ে সুকুমার বললে, "তুমিই
ন' দিও যখন চাইবেন তোমার দিকে
পর।"

"পাগল নাকি, তা কেউ বলে"—বিভা
ন্ খিল্ করে' হেসে ওঠে। "তা হলেই
য়েচে। ভদ্রলোকের জন্যে রাতদিন
জেগুজে চোখ পেতে থাকবো নাকি
ালায়! তোমার ঠিক মাথা খারাপ
চে, কি যে বল!"

"ঠিক বলি, অত যদি সন্দেহ, নিজে
ফুটে বললেই পার।" গম্ভীর কণ্ঠে
মার বললে। স্ত্রীর বক্তব্য বুঝতে
এতটুকু বিলম্ব হয় না আর।

"বলতে গেলে তো মুখ ফুটে অমন
ক কথাই বলা যায়। তা কেউ কখনো
না, বলতে পারে, না, বলা উচিত।
াপু, তুমিই বলে দিও! দেখচো বুড়ি
তো আর কিছু নয়!" আবার বিভা
ওঠে।

সুকুমার আর কথা বাড়ালে না। মুখ
ীর করে ঘর থেকে বেরিয়ে এল।
নে এসে চোখ তুলতে দেখলে পাশের
র বৌটি থতমত খেয়ে পাশ কাটাবার
করছে। কে জানে উনি এখানে কি
লেন। তাদের স্বামী-স্ত্রীর আলাপ
পেতে শুনছিল না তো?

এত বাঁকা কথায় স্ত্রীর সামনে এতক্ষণ
ারের যা মনে হয়নি এখন বৌটির
লজ্জা রাখবার যেন সুকুমারের
া থাকে না। ছি ছি, তার সম্বন্ধে
কি ভাবলে! এমনি একটা ছোট-
ইতরের সংগে সখী পাতিয়েছে

সুকুমার অবাক হয়। বৌটি সপ্রতিভ
জিজ্ঞেস করলে, "দিদি কোথায়?"

সুকুমার উত্তর দিতে পারলে না। মাথা
পা পর্যন্ত কি যেন এক অনুভূতিতে
দেহ অবশ হয়ে গেল। পা'টা কাঁপতে
।

বু বৌটির কথা নিয়ে প্রায়ই বিভা
র সংগে আলাপ করতে ছাড়ে না।
এতে পায় সে সে-ই জানে!
নাটা প্রায়ই একতরফা হয়। সুকুমার
পারতপক্ষে নীরবই থাকে। একটু সাবধানে
চলবার চেষ্টা করে।

সেদিন বিভা শোবার আগে স্বামীকে
সজাগ করে বললে, "ঘুমোচ্ছ নাকি!
শুনচো?"

সুকুমার উত্তর দিলে, "উ'-উ!"

"সাত সকালে কি যে ঘুমোও রোজ
বুঝতে পারি না! তোমার কেবল ঘুম,
যা হোক কুম্ভকর্ণ হ'চ্চো আজকাল! আগে
তবু—" বিভা স্বামীর শিয়রে এসে মাথার
চুলের মধ্যে আঙুল চালিয়ে দিলে।

'আঃ' বলে' সুকুমার পাশ ফিরলে।

খাটের ওপর উঠে বসে' বিভা বললে,
"একটা মজার কথা শুনচো!"

জড়িত কণ্ঠে সুকুমার সাড়া দিলে,
"কি?"

"ওঠ, বলচি।" বিভা স্বামীকে
ঠেললে। "ভারি মজা!"

"আর উঠতে পারি না, বল না কি
বলবে!" শুয়ে শুয়ে সুকুমার বললে।

আলোটা পট করে নিভিয়ে দিয়ে
সুকুমারের পাশে শুয়ে পড়ে আধ-আধ
স্বরে বিভা বললে, "মিলনের স্বামী বই
লেখে বলে নাকি ওদের ছেলে হয় না।"

ঘর অন্ধকার হ'লেও স্ত্রীর মুখের
কৌতুকাবহ ভাবটা সুকুমার দেখতে পায়।
এত কৌতুক যেন বিভা আর কখনো বোধ
করেনি। বই-লেখা স্বামীর জন্যে সখীর
মনোকষ্টে এতটুকু সমবেদনা যদি থাকে
বিভার! সুকুমার চুপ করে' রইল।

বিভা তেমনি জিজ্ঞেস করলে, হ্যাঁগো
সত্যি? অনিলবাবু বই লেখে বলে মিলনের
ছেলে হয়নি!

শরীরের মধ্যে কেমন যেন একটা
সুড়সুড়ি বোধ করে সুকুমার। অনিলবাবু
স্ত্রীকে তাই বুঝিয়েছেন নাকি!

হেসে স্বামীর কণ্ঠলগ্ন হয়ে বিভা
বললে, "তুমি যদি বই লিখতে কত ভাল
হতো বল দিকি! অনিলবাবুদের কোনো
ছেলেপুলে নেই—দুজনে কেমন আছে
দেখ না! কোন ঝক্কি নেই, জ্বালা নেই,
যে-যার মতন আছে!"

"তুমি অমন থাকতে চাও নাকি?"
সুকুমার স্ত্রীকে গাঢ় করে আকর্ষণ করে
বললে।

"চাই-ই তো! বছর বছর তোমার
জ্বালায় অস্থির!" স্বামীর দেহে
নিজেকে মিশিয়ে দিয়ে বিভা বললে।

খানিকক্ষণ আর কোন সাড়া-শব্দ
পাওয়া যায় না।

কোলের ছেলেটা হঠাৎ কেঁদে উঠলো।
বিভা উসখুস করলে। স্বামীকে ঠেলে
বললে, "দেখ না উঠে লক্ষ্মীটি! ঘুমে
চোখ জুড়িয়ে এসেছে, ঠিক এই
সময় উঠবে, তুক আছে ছেলের!
জ্বালাতন।"

সুকুমার ঘাপটি মেরে পড়ে রইল।
ছেলেটার কান্না ক্রমে উচ্চ হয়ে উঠল। বিরক্ত
হয়ে উঠতে উঠতে বিভা বললে, "গলা
টিপে দিতে হয় ছেলের, যত সব আপদ
বালাই!"

তারপর আলো জেলে মুতের কাঁথা
বদলে ছেলেকে শান্ত করে বিভা বললে,
"বেশ যা হোক, স্বার্থপর পুরুষ! এত করে
বললুম উঠতে পারলে না—সেই আমাকে
উঠতে হলো!"

সুকুমার নাক ডাকাতে লাগল।
বিভা স্বামীর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে
পাগলের মত হাতপা ছুঁড়ে বললে, "না না,
কিছুতে তোমাকে আজ ঘুমতে দেব না!
কেন, কেন আমি সব ঝক্কি পোহাব, আমার
একার দায় নাকি!

সুকুমারের কপট নাক ডাকা থেমে
যায়। রাগ দেখিয়ে বিভাকে ঠেলে দিয়ে
বললে, "রাত দুপুরে কি হচ্ছে ছোট-
লোকমী, চুপ কর!"

বিভা আরো চেঁচামেচি করে।
সুকুমার ভয় দেখায়, "বেশি যদি গোলমাল
কর ঘর থেকে বেরিয়ে যাব! সেইটে
ভাল হবে?"

"যাও অমন স্বামীতে দরকার নেই।
কেবল নিজের স্বার্থটি বোঝেন!"

সুকুমার পাশ বালিশটা জড়িয়ে
বালিশে মুখ গুঁজে থাকে। দিন দিন
বিভার মেজাজটা তার কাছে দুর্বোধ্য হয়ে
উঠছে। কি যে বোঝে, কি যে বলতে যায়,
কিছুই বোঝা যায় না। এই সহজ মানুষ,
এই কেমন হয়ে যায় কথায় কথায়! কি
যে কারণ!

সবচেয়ে মুশকিল হয় এরপরও মিলন
যখন বিভার সামনেই সুকুমারের সংগে
আলাপ করবার চেষ্টা করে। পরস্ত্রীর
এতটুকু সংকোচ যখন তার থাকে না। মুখ

ফ্‌টে কিছ্‌ বলাও যায় না, আবার ম্‌খ ব্‌জে ম্‌খোম্‌খি দাঁড়িয়ে থাকতে কত সঙ্কোচ! আড়ালে বিভা যাই মনে কর্‌ক, আকারে ইঙ্গিতে যাই বল্‌ক বৌটির সামনে কিন্তু সহনশীলা, স্নেহশীলা বড়দিদির মতই ব্যবহার করে। মনে যদি এতট্‌কু বিকার থাকে।

সেদিন অমনি বিভা অকপটে বললে, ঘর থেকে স্‌কুমার স্পষ্ট শ্‌নলে—"দেখ না ভাই ওকি চায়! আপিস থেকে এল!"

বোধ হয় মিলন উঠতে চায়নি। বিভা তাড়া দিলে, "যা না, দেখ না...বাঘ ভাল্‌ক নাকি! লজ্জাবতী লতা—"

মিলন ঘরে এসেছিল। বিভার চোখের ওপর দিয়ে, মনে হয়েছিল, চোরের মত, কত যেন অপরাধ করেছে! তারপর চোখে চোখ পড়তে মিলনের ম্‌খের নিঃশব্দ হাসিটা লক্ষ্য করে স্‌কুমার শিউরে উঠেছিল—বিশ্বাসঘাতিনী!

অনেকক্ষণ স্‌কুমার কথা কইতে পারেনি। বিভা একি ব্যবহার করছে তার সঙ্গে। একজন পরস্ত্রীকে তার পরিচর্যায় পাঠিয়েছে।

খানিক টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে থেকে মাথা নীচু করে মিলন বললে, "দিদি জিজ্ঞেস করলেন আপনার কি চাই! আপিস থেকে এলেন—"

ব্‌ড়ো বয়সে কি ভিমরতি হয়? স্‌কুমার মিলনের হাতের ওপর নিজের হাতটা রেখে চাপ দিয়ে অস্ফ্‌টে বললে, "তুমি ব্‌ঝি কিছ্‌ জিজ্ঞেস করচো না!"

হাতটা মিলন সরিয়ে নেয় না। মাথাটা কিন্তু তুলতে পারে না। খ্‌ব নিচু স্‌রে বললে, হাত-ম্‌খ ধ্‌য়ে নিন, দিদি বললেন।

পশ্চিমের জানালা দিয়ে তখন অস্তরাগের শেষ রশ্মিট্‌কু উভয়ের মাঝখানে এসে পড়েছে। আশ্চর্য বর্ণশোভায় বেলতলার এই অপরিসর গলির একখানি ঘর বড় উজ্জ্বল দেখাচ্ছে। দিনান্তের আকাশ-আলোর গোপন চুম্বনে নিঃশব্দ ল্‌কোচুরির খেলাটা যেন প্রত্যক্ষ করা যায় উভয়ের মাঝখানে।

অনেক সময় আবার অনেক ব্যাপারে মিলনকেই বিভা সাক্ষী মেনে বসে। "কি যে জ্বালাতনে পড়েছি ওকে নিয়ে, কি বলবো ভাই! তুই বল, আমার দোষটা কি! সেদিন বললে কি জানিস—"

মিলন উৎকর্ণ হয়ে থাকে। বিভা বললে, "সাজগোছ করতে কার না সাধ যায়! ব্‌ঝি, বাইরে থেকে খেটেখ্‌টে এসে প্‌র্‌ষেরা তাই চায়, কিন্তু যার তিন-চারটি ছেলেমেয়ে, সে কখন কি করবে বলতো! দেখচিস তো তোরা দ্‌দণ্ড রেহাই আছে! এই খাওয়া-দাওয়া, ঘরকন্নার কাজ চুকতে না চুকতে আবার রান্নাবাড়া! বিবি সাজবার সময় কোথায়?"

মিলন উপযাচক হয়ে বিভার কোলের ছেলেটাকে টেনে নিয়ে দ্‌ধ খাওয়াতে লাগল্‌। বিভা বাধা দিলে না। যেন হাতের দোসর—সে চাইছিল হাঁফ ফেলবার।

উঠে খানিকটা ঘ্‌রে এসে ম্‌খে এক খামচা স্নো মেখে পাউডার ঘষে বললে, "এতক্ষণ লক্ষ্যই করিনি, কাপড়টা বেশ তো! নতুন কিনলি ব্‌ঝি?"

মিলন অবাক হয়ে বিভার প্রসাধনক্লিষ্ট ম্‌খের দিকে চাইলে, কোন উত্তর করলে না। পাগল না মাথা কোথাও কিছ্‌ নেই এক থাবড়া ঘষে এসেছে অসময়ে—যেন রেগে ম্‌খ রগড়েছে!

বিভা বললে, "আমাকে একখান দিস তো, টাকা দোব! ওর কি যে যত রাজ্যের সাদা খোল আর চওড় ছাড়া শাড়ি ওর চোখেই পড়ে না! বাব্‌র পছন্দ আছে!"

মিলন মনে মনে হাসলে কপাল, বিভার তব্‌ যাহোক পছন্দ লোক আছে! তার? অনি পছন্দ, তবেই হয়েছে! স্‌কুমা ভাগ্যে এখানে এসেছিলেন!

বিভা বললে, "ও কি বলে বেশী রঙচঙ-এ নাকি আমাকে মান সত্যি কি আমার এত বয়েস হ আমার বয়েসী কত লোকে পরে বেলা ওর চোখ যায় না, আমার যত। মানায় না, দেখতে খারাপ, মান্‌ষি! অনিলবাব্‌ নিশ্চয় তোকে কিছ্‌ বলেন না! বেশ আছিস খাচ্চিস্‌ পরছিস, বেড়াচ্ছিস! জ্বালা নেই!"

কপট সমবেদনায় ক্রোধ প্রকা মিলন বললে, "এটা কিন্তু স্‌কুমা ভারি অন্যায়, উনি পছন্দ করেন তোমাকে পরতে দেবেন না! দিও টাকা, কিনে দেব পছন্দ করে। সতি কি এমন তোমার বয়েস হয়েছে!"

"তোর বরের কথা আলাদা, মান্‌ষ! প্‌র্‌ষগ্‌লো স্বার্থপর! ট্‌কুই খালি বোঝে! দেখছিস তে বোঝ!" মিলনের কাছ থেকে কোলে নিতে নিতে বিভা অ স্‌রে বললে, "তার ওপর এইস জন্মেছে। সত্যি বলছি আর বাঁচে করে না।"

কথাগ্‌লো যেন ওকেই লক্ষ্য ক হচ্ছে, মিলন অপরাধীর মত চু থাকে। কে জানে তাদের গোপন স ফল গিয়ে কোথায় দাঁড়াবে! কেন তার প্রতি এমন পক্ষপাতিত্ব দেখা

সহজ হতে মিলন বললে, তো কাজ নেই, দরকার হলে দে দিদি ছোট বোনটির মত! ছেলে আমার ওখানে পাঠিয়ে দিও—"
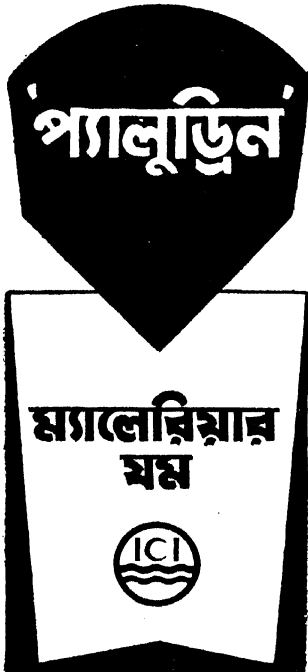
"সেই ছেলে সব পেয়েচিস, মার
ন পেছন ঘুরবে তবু যদি চারদণ্ড
ব কোথাও! যেমন উনি কুনো, ছেলে-
না তেমনি হয়েছে! জ্বালিয়ে মারলে!"
া অকারণে ছেলের মুখটা মাই-এ
জ দিয়ে বললে।

মিলন তো অবাক! দু'মিনিট হয়নি
নকে সে একপেট দুধ খাইয়ে দিয়েছে.
মধ্যে—

চোখে চোখ পড়তে বিভা বুঝতে
া। বললে, রাতদিনই হাঁই হাঁই করবে
এখুনি ষাঁড়ের মত চেঁচাবে! কিছু
রেখেচে ওতে!

সতৃষ্ণ নয়নে মিলনের আঁট-সাট
র দিকে বিভা চেয়ে থাকে। ওর
থলের ঋজু কাঠিন্যে নিজের বিলোল,
ী বুকটা বুঝি মাথা কোটে। কি
থ্য বৌটির! হবে না কেন, ছেলেপুলে
ন, দিব্যি ঝাড়া হাত-পা!

মিলন হাসলো। গর্বের নয়, করুণায়।
হঠাৎ দোরের কাছে শব্দ হতে
নই চকিত হয়ে উঠলো। সুকুমার
ল বুঝি বাজার থেকে।

মিলন চলে যাচ্ছিল. বিভা ডাকলে.
যদি করলি আর একটু দাঁড়ানা
। তোর তো এখন কোন কাজ নেই ওর
াটা হয়ে যাক। ছেলেটা আবার বায়না
চ !"

বিভা যত সহজ ক'রে বললে ঠিক অত
ক'রে মিলন কথাটা নিতে পারলে না।
ভাবে তার সম্বন্ধে বিভা! যখন তখন
। বলে কি তাকে দিয়ে ঝি-চাকরের
করিয়ে নেবে সুবিধে মত!

তবু মিলন যেতে পারে না।
ারের জন্যে তাকে থাকতে হয়!
ীর লজ্জাসঙ্কোচ সে ত্যাগ করে।
যদি ন্যাকা হন তার কি!

সুকুমার অফিস বেরিয়ে যেতে বিভা
কে বললে, "ভাগ্যে তুই ছিলি আজ
কিছু বললে না! না হলে দেরি
র জন্যে আজ আমার মুণ্ডু নিতো!
কি সাধ ক'রে করি, তুই তো দেখলি
গুলোর ঝক্কি কম নাকি! ও'দের
পাত পেতে বললেন লে আও ভাত!
মি মর আর তর!"

মিলন মনে মনে হাসলে। সত্যি কি
ন উনি! ঘর সংসার কি তার নেই.
নাকি তার স্বামীকে দেখতে হয় না—
ক্ষুধার অন্ন, বিশ্রামের শয্যা রচনা করতে
হয় না তাকে? কি ভাবে বিভা?

সুকুমার ভালবাসে ব'লে এখনি সব
ভাসিয়ে দিতে পারে না সে! সুকুমারও
সব ছেড়ে ছুড়ে দিতে পারে না তার প্রতি
অনুরক্ত ব'লে। উভয়ের এই সান্নিধ্য
যেমন কাম্য, তেমনি আবার সদা সশঙ্কিত!
নেকা-বোকা লোকটাকেই ভয় বেশী, কি
বলে, কি বোঝে!

মিলন বললে "খবর দিও অসুবিধে
হ'লে, আসবো।"

কি ভেবে বিভা হেসে উঠলো, "কি
আমার দূরের কুটুম্বরে......খবর দিলে
উনি আসবেন! তোর এসে কাজ নেই!"

একদিন সন্ধ্যেবেলা অপিস থেকে
ফিরে ঘরে ঢুকতে গিয়ে সুকুমার দেখলে
দোরে তালাচাবি দেওয়া। ব্যাপার কি?
ছেলেপুলে নিয়ে বিভা না-বলে-কয়ে গেল
কোথায়? এমন তো করে না কখনো!

বন্ধ দোরের সামনে দাঁড়িয়ে সুকুমার
খানিক ইতস্তত করলে। একটু দাঁড়িয়ে
অপেক্ষা করলে ওরা এখনি এসে পড়বে—
সেই করে করে'। কাছে-পিঠে বেরিয়েছে

হয়তো! তাই বলবার দরকার করেনি আগে।

না, ফেরবার কোন লক্ষণই নেই। অনেক কাল দরজায় তালা লাগিয়ে একেবারে কেউ বাড়িটা ছেড়ে যায়নি; কেমন অদ্ভুত লাগছে এখন দেখতে বাড়িটাকে। পোড়ো বাড়ির মত ভূতুড়ে। অন্ধকার মুড়ি দিয়ে কেমন যেন আশ-পাশের বাড়িগুলোর সঙ্গে বেমানান। চুপিসাড়ে অপকর্ম করার মত। সব জানালা-দরজা বিভা বন্ধ করে' দিয়ে গেছে।

ফিরে যাবে কিনা ভাবতে ভাবতে সুকুমার সবে পিছন ফিরছে, কলতলা দিয়ে ঘুরে সামনে এসে মিলন বললে, "কোথায় যাচ্ছেন? এই নিন চাবি!"

এরা সব গেল কোথায়? হাত পেতে চাবিটা নিয়ে সুকুমার জিজ্ঞেস করলে।

"দুপুরবেলা হঠাৎ খবর পেয়ে দিদি শ্যামবাজারে গেচেন......মার নাকি খুব বাড়াবাড়ি অসুখ! আপনাকেও যেতে বলে গেচেন। আপনার ছোট শালা এসে-ছিলেন।" মিলন ফিরলো।

মুখে বিরক্তি টেনে সুকুমার বললে, "বয়ে গেচে আমার যেতে! অপিস থেকে এসে এখন ঐ করি! একলা গেলে হ'বে না, পাঁচজনকে সঙ্গে যেতে হ'বে! হুকুম করে' গেচেন!"

মিলন চুপ করে' দাঁড়িয়ে রইল। সুকুমারের রাগ দেখে মনে মনে হাসলে বুঝি।

সুকুমার দোর খুলে ঘরে ঢুকলো। খানিক পরে নিঃশব্দ পায়ে ঘরে এসে মিলন দেখলে, দিব্যি খাটের ওপর টান-টান হ'য়ে শুয়ে সুকুমার কড়িকাঠ গুণছে।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে মিলন সাড়া করলে। সুকুমার চেয়ে দেখলে। অনুপস্থিত স্ত্রীর ওপর রাগ করেই বুঝি হেসে ফেললে।

কাছে এসে মিলন বললে, "ওকি, শুয়ে পড়েচেন যে বড়! খাবেন-দাবেন না?"

হেসে সুকুমার বললে, "সেই কথাই তো শুয়ে শুয়ে ভাবচি—আজ কোন্ হাঁড়িতে অন্ন মাপা আছে! গিন্নী যখন নেই, তখন এখানের ভাঁড়ার বন্ধ! এখন শ্বশুরবাড়ি যদি যাই সমস্যা মিটতে পারে, কিন্তু এত রাত্রে আর ওদিকে নয়—এতে খিদে মেটে মিটুক, আমি নাচার!"

"তা বলে' সারারাত উপোস যাবেন!" মিলন আর্তস্বরে বললে।

"উপায় কি! উঠে-হেঁটে আর কিছু করবার ক্ষমতা আমার নেই। আজ বড্ড পরিশ্রম হ'য়েছে অপিসে!"

মিলন আর দাঁড়ালে না। সুকুমার কড়িকাঠে দৃষ্টি নিবন্ধ করলে, ঘরের আলোটা ঠায় জ্বলতে লাগল।

রাত তখন কত কে জানে, মিলন এসে ডাকলে, "ওঠ।"

আচ্ছন্ন স্বরে সুকুমার বললে, "কে?"

"আমি!" মিলন হাতের অন্নব্যঞ্জনের থালাটা নামিয়ে রেখে আসন পাত্‌তে পাত্‌তে বললে।

"কে তুমি?" তখনো সুকুমারের ঘুমের ঘোর কাটেনি। "কে, বিভা? এত দেরি!"

"না, আমি মিলন।" সুকুমারের মাথার কাছে দাঁড়িয়ে মিলন বললে, "ওঠ, জায়গা হ'য়েচে, খাবার দিয়েচি।"

সুকুমার উঠে বসে চোখ রগড়ে দেখলে। আশ্চর্য, গলার স্বরটাও চিনতে পারেনি মিলনের। বয়ে গেছে তার ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বিভার স্বপ্ন দেখতে! কি মনে করলে মিলন, একটা স্ত্রৈণ!

মিলন আবার বললে, "কি দেখচো অমন করে'? রাত অনেক হয়েচে যা খাবার খেয়ে নাও, পরে ভেবো সারা রাত!"

"কি ভাববো?" সুকুমার কুপিত কণ্ঠে বললে।

"কিচ্ছু না; এখন ওঠ, খেয়ে নাও।" মিলন বললে।

খেতে বসে মিলনকে অন্যমনস্ক দেখে সুকুমার প্রশ্ন করলে, "কি দেখচো ত[illegible] করে বার বার?"

মিলন চমকে উঠলো, "কই, আবার বাঃ, ঐ বলে' সব ফেলে রাখ[illegible] ভাল হ'বে না বলচি খেয়ে নাও!"

সুকুমার পরিতৃপ্ত কণ্ঠে বল[illegible] "অনিলবাবুর খাওয়া হয়ে গেচে, না তাঁর ভাগ থেকে এনে আমা[illegible] খাওয়াচ্ছো?"

মিলন চুপ করে' রইল। উত্তর দি[illegible] না। দুধে হাত দিয়ে সুকুমার আ[illegible] জিজ্ঞেস করলে, "তোমাদের দু'জ[illegible] সংসারে এত আয়োজন কখন কর[illegible] অনিলবাবু জানেন আজ আমি খাব!"

একটু যেন বিরক্ত হ'য়ে মিলন বল[illegible] "অত খবরে তোমার দরকার কি! অনি[illegible] বাবুর খবর অনিলবাবু নেবেন। না, [illegible] ও মিষ্টিটা ফেল না—ঘরে করেচি।"

"আমার জন্যে?" মুখে তুলতে তুল[illegible] সুকুমার জিজ্ঞেস করলে।

রাগত কণ্ঠে মিলন বললে, "[illegible] ওর জন্যে!"

মুখ থেকে মিষ্টিটা বার ক[illegible] সুকুমার বললে, "তা হ'লে অনিলবাব[illegible] খাবেন, পরের জিনিসে লোভ করা উচি[illegible] নয়।"

চোখ পাকিয়ে মিলন বললে, "[illegible] আমার সাধু পুরুষ! ভাল হ'বে না বল[illegible] না-খেলে!"

তারপর যেন একান্ত বাধ্য হ'[illegible] মিষ্টিটা সুকুমার গলাধঃকরণ করল[illegible] উপরোধে ঢেঁকি গিললে।

মশারি ফেলে চলে আসার সম[illegible] সুকুমার বাধা দেয়। রাগ দেখিয়ে বল[illegible] মিলন, কি হচ্ছে, এমন করলে লোক ডাকব[illegible]

"তাতে তোমার নাম বাড়বে! লো[illegible] দেখবে রাত দুপুরে কে কার ঘরে ব[illegible] চীৎকার করচে!"

দোর গোড়ায় এসে মিলন বল[illegible] "তাতো বলবেই এখন পেট ভরেচে যে এমন জানলে কে আসতো! ঠিক হ'[illegible] উপোস করে' পড়ে থাকলে!"

মশারির ভেতর সুকুমার হেসে উঠল[illegible] অবিশ্বাসের সুরে। মুখে বললেও পর স্ত্রীর পক্ষে সেটা নাকি একেবারে[illegible] অসম্ভব।

সুকুমার ডাকলে, মশারিটা ভাল করে' গুঁজে দিয়ে যাও...মশা ঢুকবে যে, ঘুম না হ'লে এত খাওয়া বদহজম হ'বে!

বাইরে এসে দরজার শিকল তুলে দিয়ে মিলন বললে, "ঢুকুক! তোমার মত লোককে মশায় খাওয়াই উচিত! থাক বন্দী হ'য়ে যেমন কে তেমন!"

ঘরের ভেতর অসহায় আক্রোশে সুকুমার নিষ্ফল চীৎকার করলে, "ভাল হ'বে না বলছি, দরজায় শিকল দিও না! চোর! চোর! চোর!"

চোর তাড়াতে আর কারো সাড়া পাওয়া গেল না সে রাত্রে।......

তিনদিন পরে বিভা ফিরে এল। ঘরে পা দিয়েই কুরুক্ষেত্র বাঁধিয়ে তুললে। যত না সুকুমার জামাই-এর কর্তব্য পালন করেনি বলে' তার হাজার গুণ মিলনদের বাড়ি অন্নগ্রহণ করার জন্যে। কার হুকুমে সে ঐ বেহায়া বৌটার হাতে খেয়েছে—এত সাহস সুকুমারের হ'লো কোত্থেকে! ওদের সঙ্গে এত পিরিত বা কিসের! অত মাখামাখি কিসের জন্যে!

শান্তস্বরে বার কয়েক সুকুমার বোঝাবার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু সে বৃথাই। কোন কথাই বিভা শুনতে রাজী হয়নি। গালাগালিতে ভূত ভাগালে।

চেঁচামেচি শুনে মিলন বুঝি চুপিসাড়ে এসে রান্নাঘরের দোর গোড়ায় দাঁড়িয়েছিল। বিভার কথা শুনে রাগে-অভিমানে দুঃখে তার মাথা ঝিম্ ঝিম্ করছিল, কিন্তু সাহস করে' সামনে এগিয়ে আসতে পারেনি। স্বপক্ষে কিছু বলবার থাকলেও তার মুখে ছিল না। সব দোষ এখন তারই, সুকুমারকে সে-ই তো যেতে দেয়নি শ্বশুরবাড়ি! ঠাকুর আদর করে' খাইয়েছে।

কাউকে বাদ দেয়নি বিভা। হ'লেই বা ভদ্রলোকের স্ত্রী, পরের ঘরে এত আদিখ্যেতা কেন! সুকুমার না পারে বিভা ডেকে বলে দেবে, অনিলবাবু যেন তার স্ত্রীটিকে সামলে রাখেন। এসব কি!

মিলন আস্তে আস্তে সরে এসেছিল। সত্যিই বড় অন্যায় করেছে সে। এমন করে' একজনের বিশ্বাস নষ্ট করা তার উচিত হয়নি। যা খুশী বলতে পারেন বিভাদি! সুকুমার তারও কম সর্বনাশ করেনি। ছি, ছি।

অবেলায় অনেকক্ষণ বালিশে মুখ গুঁজে মিলন নিজের ঘরে বিছানায় পড়ে কাঁদলে। একবার মনে হ'লো বিভাদির মুখের সামনে দাঁড়িয়ে যাতা বলে আসে, পরক্ষণেই আবার মনে হল, কোন লাভ হবে না তাতে। বরং নোংরামি বাড়বে। কোন্ অধিকারে সে বিভার সঙ্গে বোঝা-পড়া করবে? কই, সুকুমারবাবু তো কোন প্রতিবাদ করলেন না! সব দোষই তো স্বীকার করে' নিলেন মুখ বুজে। সে কুলটা, তার জন্যেই সুকুমার কলঙ্কিত।

না না, এ সে কিছুতে সহ্য করতে পারবে না, কি তার অপরাধ! সব কথা প্রকাশ করে দেবে! কেন, ভয় কিসের! স্বামীকে সে বুঝিয়ে বলবে। উনি মিথ্যে চেঁচামেচি করছেন! নিজের স্বামীকে আগে সাবধান করুন।

চোখ চাইতে মিলন দেখলে, অনিল ঘরের মাঝখানে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে। আশপাশে আরো কে কে যেন। ঐ তো সুকুমারবাবুই তো! বিভাদিও তো ঐ পাশে দাঁড়িয়ে!

হঠাৎ ও'রা এখানে ভিড় করছেন কেন? কি হলো তাদের সংসারে? মাথায় কাপড়টা মিলন টেনে দিলে।

অনিলবাবু বললেন, "যান এবার আপনারা......জ্ঞান হয়েচে মনে হচ্চে! যা কাণ্ড করে তুলেছিল একটা ফিটের মত হয়েছিল......এই প্রথম! আর কখনো হয়নি।"

বিভা এসে মাথার কাছে বসলে। ফিসফিস করে বললে, "কিরে কি ব্যাপার?......তোর কর্তা তো ভয়েই জড়-সড়, না জানি কি! আমি জানি এতে ভয়ের কিছু নেই।"

সুকুমার শূন্য দৃষ্টিতে অনিলবাবুর দিকে চাইলে। বিভার কথার কোন অর্থ করতে পারছে না সে। কি বলতে চায় বিভা? এত বিতৃষ্ণা, এত ঘৃণা যার প্রতি, তার বিপদের সংবাদ শুনে স্থির থাকতে পারলো না কেন! আবার রহস্যালাপ করছে!

অনিলবাবু ডাকলেন, "আসুন আমরা বাইরে যাই। ওরা আলাপ করুন।"

ক'দিন সুকুমার চোখ তুলে বিভার দিকে চাইতে পারলে না। নিষ্ঠুর সন্দেহের সূতীক্ষ্ণ একটা খোঁচা তাকে বারবার আত্মমুখী করে রাখলে। ধিক্কারে সমস্ত অন্তর ভরে গেল। কোন ভয় নেই, তবু যেন ভয়ের বিভীষিকার আর শেষ নেই। মিলনের হঠাৎ 'ফিটের' অর্থ বিভা কি করলে আর অনিলবাবুও সেদিন কি মেনে নিলেন।

আসল ঘটনাটা যে কি জানবারও উপায় নেই। মিলন আর তাদের বাড়ি আসে না। কে জানে এ নিয়ে তার কোন লজ্জা আছে কিনা! বিভার ওপর তার রাগ পড়েনি হয়তো! জানাজানি হয়ে যাওয়ার ভয় কিছু! নিজের আচরণে মিলন আরো সন্দেহ জাগাচ্ছে শুধু শুধু!

একদিন কলতলায় চান করতে করতে সুকুমারের মাথার উপর একটা কাগজের দলাপাকান কি যেন পড়ল। সুকুমার বস্তুটা কুড়িয়ে নিয়ে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে। ওপরের জানালায় ম্লান চোখে মিলন এইদিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ক'দিনে চেহারাটা এত খারাপ হয়ে গেছে, চিনতে পারা যায় না। আর 'ফিট-টিট' হয়েছিল নাকি? অসুখ-বিসুখ কিছু করেছে?

আবার চেয়ে দেখতে জানালায় মিলনকে দেখা গেল না। কখন সরে গেছে।

স্নান সেরে ঘরে এসে দরজা বন্ধ করে সুকুমার দলাপাকান কাগজখানা খুললে। উত্তেজনায় তার হাতটা কাঁপতে লাগল। প্রথমটা কিছু সে দেখতে পেল না, ভাঁজে ভাঁজে কাগজটা ছিঁড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, তার ওপর জলে ভিজে অক্ষরগুলো প্রায় ধুয়ে যাবার যোগাড়, চোখের জলে কাজল ধোয়ার মত।

মিলনের লেখা কাগজটা সামনে ধরে সুকুমার অনেকক্ষণ স্থির হয়ে বসে রইল। বারবার চোখের সামনে মিলনের মলিন মুখটা ভেসে উঠলো। নিজেকে বড় অপরাধী মনে হলো তার। এখন দরজা খুলে বাইরে যাবার পর্যন্ত তার মুখ নেই।

ধোয়া অক্ষর পাঠোদ্ধার করে যেটুকু বোঝা যায় তাতে মিলন লিখেছে, বোধ হয় তার স্বামীও ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছে, বিভাদি তো অনেক আগে...এখন শরীরের

যা অবস্থা কোথাও চলে যেতে ইচ্ছে করে ...স্বামীকে রাজী করিয়েছি এ বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্যে...দূরে চলে গেলে যদি মন শান্ত হয়। সেদিন বিভাদির চেঁচামেচি শুনে অমন করে ছুটে না গেলে হয়তো এমন হতো না......ভালই হয়েচে ধরা পড়ে গেছি ঘরে বাইরে!......তুমি ধরা না পড়লে এখন বাঁচি। সাবধানে থেকো।......

সুকুমারের ত চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে আসে। চিঠিটা বারবার পড়ে আশ মেটে না। কি অন্যায় করেছে তারা? কে বলসে অন্যায়! মিলনকে তার ভাল লাগে, মিলনকে সে ভালবাসে! কোন বাধা সে মানে না......কারো কথা সে গ্রাহ্য করে না। বিভা চেঁচামেচি করলে গলা টিপে বন্ধ ক'রে দেবে......না, না, দিনের আলোর মত তাদের ভালবাসা স্পষ্ট হয়ে উঠুক, লুকোচুরির লজ্জা থেকে তারা রেহাই পাক! কিছুতেই মিলনকে এবাড়ি ছেড়ে যেতে দেবে না সে, যত অপমান, যত কথা হোক তাদের নিয়ে।

দরজায় ধাক্কা পড়তে সুকুমার চমকে ওঠে। হঠাৎ ভূমিকম্পের মত মনে হয়। বাড়িটা যেন দুলছে।

বিভা ডাকলে, দরজা খোল। খিল দিয়ে ঘরে কি করচো?

স্বামীর মূর্তি দেখে বিভা ভয় পেয়ে যায়। একি! কি হয়েছে তোমার?

কিচ্ছু না! পাগলের মত ছুটে সুকুমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

এরপর দিনগুলো এমনভাবে কাটে যেন কোন কিছুই হয়নি। সুকুমার অপিসে যায়, বাজার করে, রাতে ঘুমোয়, দিনে জাগে; বিভা ছেলেপুলেদের নিয়ে সংসারে 'ঘেন্নাধরার' কাঁদুনি গায়। মিলন সম্পর্কে কোন কথাই ওঠে না আর, মিলন বলে তাদের পরিচিত কেউ ছিল মনেও হয় না। দেখাও যায় না বৌটিকে আর! এদের স্মৃতি থেকে মিলন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বুঝি।

এ ভোলাটা ইচ্ছে করে না, সহজ ভাবে বোঝা যায় না। অন্তত বিভাকে দেখলে তাই মনে হবে। স্বামীর দিক থেকে সে বোধ হয় পরম নিশ্চিন্ত আছে।

মাঝে একদিন মিলনের সঙ্গে সুকুমারের দেখা হয়েছিল। শ্যাওলা ধরা সাধারণ উঠানটার দিকে চেয়ে নিজের বাড়ির দোরগোড়ায় সে দাঁড়িয়ে ছিল। সুকুমার স্পষ্ট করে লক্ষ্য করবার আগেই মিলন তাকে দেখে সরে গেল। কত যেন বিরক্তি মুখে! কিন্তু কেন? মিলন কি তাকে ঘৃণা করতে শুরু করেছে! আকাশ-পাতাল ভেবে সুকুমার মিলনের এ মনো-ভাবের অর্থ করতে পারলে না। তা হলে চিঠিটা সে লিখেছিল কেন?

ক'দিন পরে আবার একদিন দেখা হয়েছিল। মিলন এমন মুখ লুকিয়ে নিলে সুকুমার অপ্রস্তুতের একশেষ। ভাগ্যে উঠোনে তখন অন্ধকার নেমেছে—আশ-পাশেও কেউ ছিল না! ছি, ছি!

এদিকে সুকুমার ভেবেছিল, গোপনে একদিন সাক্ষাৎ করে মিলনকে সান্ত্বনা দেবে। বলবে, তাদের ভালোবাসায় কোন কলঙ্কই পড়ে নি। যা হয়েছে, তার জন্যে মনের মধ্যে কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ রাখবার হেতু নেই। তারা যা করেছে, দোষের নয়। বরং তাদের সন্দেহ যারা করে, তারাই দোষ করেছে। মিলন যেন শক্ত থাকে, ভেঙে না পড়ে। কি হয়েছে!

কিন্তু এর পর আর কি বলবে, আর কি করবে সুকুমার! শুধু নিজের মুখ নয়, তার মুখও মিলন পোড়ালে। এমন করে তাকে এড়িয়ে যাওয়ার কি মানে হয়। এতদিন পরে মিলন কি ভেবেছে কে জানে। আশ্চর্য, মেয়েছেলে! সুকুমারও ঘৃণা করবে, উপেক্ষা করবে।

কিছুদিন খুব মানসিক অশান্তিতে কাটে। একি করলে মিলন, একি ভাবলে মিলন এতদিন পরে! এমন করে তাকে অপরাধী করছে কেন? এতে কি তার নিজের অপরাধ স্খালন হবে? বিভার মনোগত সন্দেহ কি ভঞ্জন করা যাবে? নারী চরিত্রের এ রহস্য সুকুমার অনুধাবন ক'রতে পারে না।

বেশি ভয় সুকুমারের ইদানীং অনিলবাবুকে। ভদ্রলোকের কাছে যেন কত অপরাধ সে করেছে।

রাস্তায় দেখা হতে একদিন তো অনিলবাবু ঠাট্টাই করলেন, "কি মশাই, চিনতেই পারেন না আজকাল! কি অপরাধ করলুম?"

সুকুমার থতমত খেয়ে বললে, "না, না। ভাল আছেন?"

তারপর অনিলবাবু তার মুখের ও' চেয়ে এমনভাবে হাসতে লাগলেন যে সুকুমারের এড়িয়ে চলার কারণটা তি জানেন! লুকোলে কি হবে!

অনিলবাবু বললেন, "না থাকবার ে কোন কারণ নেই। আপনি কেম আছেন?"

সুকুমার আমতা আমতা করে সে-ও ভাল আছে। সহজ হবার চেষ্টা ক বললে, "আপনার নতুন বইটই কিছ বেরুল আর?"

অনিলবাবু হাসলেন, "আর বই লেখা ছেড়ে দিয়েছি যে!"

সুকুমার বিশ্বাস করলে না। হত বিস্ময়ে অনিলবাবুর মুখের দিকে চে রইল।......

হেসে অনিলবাবু বললেন, "একদি আসুন, বই দেখাব!"

সুকুমারের মুখটা ফ্যাকাশে হয়ে গেল

খুট করে আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বিভ কিসের অপেক্ষায় যেন খানিক দাঁড়ি রইল। খাটের ওপর থেকে কোন সাড়া শব্দ এলো না।

আলোটা বিভা আবার জ্বালালে মুখের বইটাকে সরিয়ে রেখে সুকুমা পাশ ফিরেছে। কি যে ছেলেমানুষিতে আজ বিভাকে পেয়েছে, আলোটা বার কয়েক জ্বাললে নেভালে! সুকুমার সাড় করলে না, কি খেয়াল হয়েছে বুড়ো বয়ে রাতদুপুরে মসকরা!

খানিকক্ষণ চুপচাপ থাকে। মনে হয় ও কিছু নয়—আলোটা ঠিক আছে কি ন বিভা শোবার আগে দেখে নিচ্ছে দরকারের সময় যদি আবার না জ্বলে রাতভিতে! ঐ তো শয্যাসঙ্গী, নিজের আরাম ছাড়া আর কিছু জানে না!

অন্ধকারে সুকুমার চেয়ে দেখে। বিভ এখনো খাটের ওপর উঠে আসেনি। ঘরের মধ্যে অস্পষ্ট ছায়ায় কিসব মূর্তি যেন এদিক-ওদিক করছে।

খাটটা নড়ে উঠলো। বিভা বুঝি এতক্ষণে এল। সুকুমার নিঃশ্বাস রুদ্ধ করলে। পিঠে সুড়সুড়ি দিয়ে বিভা বললে, "ঘুমোচ্চ বুঝি খুব?"

সুকুমার সাড়া করলে না, নিঃশ্বাস ছেড়ে দিলে। রাত দুপুরে জ্বালাবে!

উত্তরের অপেক্ষা না করেই বিভা বললে, "আর শুনেচো অনিলবাবুরা বাড়ি ছেড়ে দিয়েচেন।"

আগে থেকে খবরটা না শুনলেও সুকুমার কৌতূহল প্রকাশ করে না। ওদের সম্পর্কে নাকি তার কোন আগ্রহ নেই!

মনে হলো ঠোঁট টিপে বিভা বললে, "কেন জান? বৌ-এর নাকি খুব অসুখ, চেঞ্জে যাবে! লোকটা যেন কি!"

"কে বললে?" না জিজ্ঞেস করলেও সুকুমার পারত, তবু কেন জানি না জিজ্ঞেস করলে।

"কে আর বলবে, ওদের ঝিটাই বলছিল! চাকরির জন্যে এসেছিল আমার কাছে—"অকারণে বিভা হাসে—চোখ-মুখ যেন কৌতুকে ফেটে পড়ছে।

সুকুমার চুপ করে রইল। হঠাৎ বিভা স্বামীর কাছে ঘেঁষে এসে কৌতুক করে বললে, "সব তাতে বাড়াবাড়ি! বুড়ো বয়সে কীর্তি করলে বটে—"

স্ত্রীর হাতটা কাঁধের ওপর থেকে সরিয়ে দিয়ে বিকৃত কণ্ঠে সুকুমার বললে, "কি! কি!"

হেসে বিভা স্বামীকে গভীরভাবে জড়িয়ে ধরে বললে, কিছু না!

তারপর আপন মনে অনেকক্ষণ হাসতে লাগল।

অনেক রাতে নভোচরী, নিশাচরী, সঙ্গীহারা কোন বলাকার ডাকে সুকুমারের ঘুম ভেঙে যায়। অকারণে বুকটা মোচড় দিয়ে ওঠে, মন হু-হু করে। বিছানায় উঠে বসে। মনে হয়, নিস্তব্ধ সুদূরের বুক ভেদ করে' ক্লান্ত একটা ডানার ক্ষীণ শব্দ তার কানে বাজছে এখনো। পাখি উড়ে গেলে শূন্য পটে কতটুকু অনুরণন থাকে—কতক্ষণ বা?

হয়তো কিছু না। আস্তে আস্তে দরজা খুলে সুকুমার বাইরে আসে। শোবার আগে বিভার বার বার ছেলে-মানুষের মত আলো জ্বালার কথাটা মনে পড়ে! ইদানীং বিভা যেন একটু বেশি-রকম ছেলেমানুষ হয়ে উঠেছে! দারুণ দুঃখে সুকুমারের হাসি পেল।

নিঃশব্দে বাইরের রোয়াকে এসে দাঁড়ালো সুকুমার। চেয়ে দেখলে মূক আকাশটার দিকে। কত তারায় কত বেদনা যেন পাথর হয়ে গেছে—মরা জোনাকিরা জড় হয়ে আছে শূন্যে

চোখ নামিয়ে আশপাশ চেয়ে দেখলে সুকুমার। হঠাৎ চোখটা আটকে গেল। উঠানের একদিকে অনিলবাবুদের বাড়িটায় একটা তালা লাগান।

মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যে বেলায়—নিজের বাড়িতে এমনি তালা লাগান ছিল, মায়ের অসুখের হঠাৎ খবর পেয়ে বিভা চলে গিয়েছিল! কখন মিলন এসে সে-বন্ধ দুয়ার খুলে দিয়েছিল। বিশ্বাস করে' বিভা ওর কাছেই চাবি জিম্মা রেখে গিয়েছিল।

আজ নিজের অসুখে বিচলিত হয়ে মিলনরা চলে গেছে—ঘরে তালাচাবি দিয়ে গেছে। কিন্তু পরিচিত কেউ এসে পাছে ফিরে না যায়, তার জন্যে চাবিটা পর্যন্ত রেখে যায়নি।

হঠাৎ পায়ের শব্দে সুকুমার ফিরে তাকালে। কখন বিভা উঠে এসে তার পিছনে দাঁড়িয়েছে।

ওর হাতটা নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বিচলিত কণ্ঠে সুকুমার বললে, "আমাকে তুমি বিশ্বাস কর বিভা! আমি কোন দোষ করিনি, কোন অপরাধ—"

অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে চেয়ে কি ভাবলে বিভা, বললে, "ঘরে এস! বাইরে হিম পড়ছে।"

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

যে স্বাধীনতা চেয়েছিলেন চার্লি, সেই স্বাধীনতারই এবারে সূত্রপাত হল। এখন আর তিনি পরিচালকমাত্র নন, প্রযোজকও। গড়ে উঠল তাঁর আপন প্রযোজনা-প্রতিষ্ঠান, চার্লস চ্যাপলিন ফীল্ম কর্পোরেশন। দিন কয়েকের জন্যে হাওয়াই দ্বীপে গিয়ে বিশ্রাম নিয়ে এসেই পূর্ণোদ্যমে তিনি আর সীডনি কাজে লেগে গেলেন। ছবি তুলবার জন্য নিজস্ব একটা স্টুডিয়ো চাই। হলিউডের ঠিক কেন্দ্রস্থলে লা ব্রো অ্যাভেনুর সামনেই বুলেভার্দের এক কোনায় পাঁচ একর জমি কিনে ফেলা হল। প্রতিষ্ঠিত হল তাঁর স্টুডিয়ো। এর পর থেকে চার্লি তাঁর সমস্ত বই এইখানেই তুলেছেন। তাঁর সর্বশেষ ছবি 'লাইমলাইট'ও তোলা হয়েছে এইখানেই।

ইংল্যাণ্ডকে ছেড়ে এসেও ইংল্যাণ্ডকে ভুলতে পারেননি চার্লি। স্টুডিয়োর সামনের অংশটা তিনি এমনভাবে তৈরি করালেন যে, দেখলে পরেই ইংল্যাণ্ডের টীউডর কটেজ বলে মনে হয়। হলিউডের সেই ব্যস্ত আবহাওয়ার মধ্যেই তিনি ইংল্যাণ্ডের পল্লী-অঞ্চলের শান্ত একটু সুর ছুঁইয়ে দিলেন। তার পাশেই দোতলা একটি বাড়ি। বাড়ির সামনে মস্ত বড় বাগান। সীডনিকে তো আগেই ম্যানেজার করে দেওয়া হয়েছিল। স্টুডিয়োর মধ্যে এই বাড়িটিতেই বছর কয়েক তিনি ছিলেন।

চার্লি এবারে স্থির করলেন, তাঁর ভবঘুরে চরিত্রটিকে তিনি আরও পূর্ণাঙ্গ করে তুলবেন। আর শুধু এই চরিত্রটিই বা কেন, সবগুলি চরিত্রই যাতে একটি সর্বাঙ্গীণ সামঞ্জস্যের সুষ্ঠুতা পায়, সে-দিকেও নজর রাখা দরকার। সৃষ্টিকলাকে নিখুঁত করে তুলতে চান চার্লি, তার জন্য এক-একটি ছবির পিছনে যদি আরও অনেক সময় দিতে হয়, বেশ তো, তা-ই তিনি দেবেন। কোনও ব্যাপারেই আর কোনও কার্পণ্য তিনি করবেন না। মোট কথা, ছবিগুলি সুন্দর হওয়া চাই। শুধু সুন্দর নয়, সর্বাঙ্গ-সুন্দর। পরবর্তী আঠারো মাসে তাঁর আটখানি ছবি তুলবার কথা ছিল; কিন্তু তিনখানির বেশী তিনি তোলেন নি।

তিনখানি মাত্র ছবি। কিন্তু আগের তুলনায় তিনখানি ছবিরই দৈর্ঘ্য অনেক বেশী, এবং তিনখানি ছবির মধ্যেই চার্লি তাঁর দুঃসাহসী শিল্প-কল্পনাকে পরি-পূর্ণভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন। একার পক্ষে এ-কাজ সম্ভব নয়, চার্লি তাই একজন সহকারী নিয়োগ করলেন। ভদ্র-লোকের নাম চাক রীজ্নার। চার্লির সঙ্গে কীস্টোন স্টুডিয়োতে কিছুদিন তিনি কাজ করেছিলেন। ফিল্মের জন্য তাঁকে সেখানে গল্প লিখতে হত। চার্লির সঙ্গে এসে যোগ দেবার পর তাঁর কয়েকটি ছবিতে তিনি অভিনয়ও করেছেন।

চিত্তবৃত্তির স্বাধীনতাকে চার্লি কখনও নষ্ট হতে দেননি। রুটিন বেঁধে একটা ছক-কাটা চৌহদ্দির মধ্যে কাজ করতে হবে, এ-কথা কল্পনা করতেও তাঁর অন্তরাত্মা বিদ্রোহী হয়ে উঠত। মন যখন কাজ করতে চাইছে না, তখনও আর-একজনের হুকুম অনুযায়ী কাজ করতে হবে, এ তিনি ভাবতেও পারতেন না। মনের যদি সায় থাকে, তবেই কাজ করবেন, নয় তো নয়। ছেলেবেলায়—দারিদ্র্যের তাড়নায়—অনেক জনের অনেক হুকুমই তাঁকে তামিল করতে হয়েছে। তখনই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দারিদ্র্যের যদি অবসান না ঘটে, তাঁর পরাধীনতারও কখনও অবসান ঘটবে না। অনেক কষ্ট স্বীকার করেও যে এতদিন তিনি অর্থ সঞ্চয় করে এসেছেন, সে তো এই জন্যই। ব্যাঙ্কে এখন তাঁর অনেক টাকা, তাছাড়া দু হাতে তিনি এখন অর্থোপার্জন করে চলেছেন। এই অর্থই তাঁকে স্বাধীনতা এনে দিল। নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী তিনি এখন কাজ করতে পারেন। চার্লি বলতেন, সমস্ত উদ্যম যখন ফুরিয়ে যায়, তখনই আমরা অবসন্ন বোধ করি। কাজের চাইতে বিশ্রামের গুরুত্ব কিছু কম নয়। ঠিক সময়ে যে বিশ্রাম নিতে জানে, তার কর্মোদ্যমেরও কখনও অবসান হয় না। কাজ করতে করতে পরিশ্রান্ত হয়ে পড়লেই ছুটি নিতেন চার্লি। একদিন, দু দিন, তিন দিন। ছুটি শেষ করে আবার যখন তিনি স্টুডিয়োতে ফিরে আসতেন, তখন তাঁর উদ্যম আর উৎসাহ দেখে সবাই অবাক হয়ে যেত। মাঝে মাঝে এমন হত নতুন কোনও একটা রূপ-কল্পনাকে যখন ধরি-ধরি করেও তিনি ধরতে পারতেন না চিন্তাবুদ্ধির গ্রন্থিগুলি যখন শিথিল হয়ে আসত, ঠিক তখনই ছুটি নিতেন চার্লি। স্টুডিয়ো থেকে বিদায় নিয়ে দু-একটা দিন স্রেফ টেনিস খেলে কিংবা মাছ ধরে কাটিয়ে দিতেন। ওদিকে হয়তো ব্যগ্র হয়ে স্টুডিয়োতে বসে সবাই প্রতীক্ষা করছে ক্যামেরাম্যান হয়তো উৎকর্ণ হয়ে রয়েছেন চার্লির তবু ভ্রূক্ষেপ নেই সেদিকে। যত ক্ষণ না তাঁর অবসাদ কাটছে, স্টুডিয়োতে তিনি ফিরবেন না। অনেক সময় অনেক অর্থদণ্ড হয়েছে এর জন্য এবং অর্থের এই অপচয়কে সীডনি যে খুব সুনজরে দেখতেন এমনও নয়। কিন্তু চার্লিকে এ নিয়ে কিছু বলতে গেলেই তিনি স্পষ্ট জবাব দিতেন, "আজ যদি শুটিং হয়ও তাতেও তোমার পয়সা বাঁচবে না, কেনন কালই আবার দৃশ্যগুলিকে আমার নতুন করে তুলতে হবে। তার চাইতে আজ বরং একটু জিরিয়ে নিই। মন-মেজাজ যদি ভাল থাকে, কালকে বরং স্টুডিয়োতে যাব। মোট কথা, যে-কাজই করি না কেন ভালভাবে সেটা করা দরকার।"

সকালবেলা কিছুক্ষণ হয়তো স্টুডিয়োতে কাটিয়ে গিয়েছেন চার্লি তারপরেই আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। কোথায় গেলেন চার্লি? কোথায়

াবার, স্টুডিয়োর পিছনে ঘাসে-ছাওয়া রৌদ্রোজ্জ্বল এক টুকরো জমি, সেইখানেই তিনি শুয়ে আছেন। প্রায়ই তাঁকে খুঁজতে বেরোতেন সীডনি এবং প্রায়ই গিয়ে দেখতেন, চোখ দুটি বুজে চুপচাপ তিনি বিশ্রাম নিচ্ছেন; আর নয়তো সামনেই যে পিঁপড়ের সারি চলেছে, অপলক দৃষ্টিতে সেই দিকে তাকিয়ে আছেন।

দাদাকে দেখে ধ্যানভঙ্গ হত চার্লির। বলতেন, "দ্যাখো, দ্যাখো, ওই পিঁপড়ের সারির সামনে আমি এক ড্যালা চিনি রেখে দিয়েছিলাম। সবাই মিলে কেমন ওটাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। সবাই মিলে কত সহজে কত দুঃসাধ্য কাজও সম্পন্ন করা যায়। দ্যাখো দাদা, দেখে শিখে নাও।"

"তা তো হল," সীডনি বলতেন, "কিন্তু সবাই যে ওদিকে অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। তুমি কি আর আজ স্টুডিয়োতে যাবে না নাকি?" উত্তর নেই। চার্লি ততক্ষণে আবার তাঁর চিন্তার মধ্যে ডুবে গিয়েছেন।

স্টুডিয়োর মধ্যে ছোট্ট একটি কাঠের ঘর, চার্লি সেটাকে তাঁর সাজ-ঘর হিসেবে ব্যবহার করতেন। সেইখানে —তাঁর হাতের কাছে—বিরাট একখানা ইংরেজী ডিকশনারি থাকত। ছেলেবেলায় আর-সব ছেলেমেয়েরা যখন ইস্কুলে গিয়ে লেখাপড়া শেখে, পয়সা রোজগারের ধান্ধায় চার্লিকে তখন রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে হয়েছে। এ-জন্য তাঁর দুঃখের অন্ত ছিল না। এ যখনকার কথা বলছি, তখন তাঁর প্রতিষ্ঠার অন্ত নেই, দু হাতে তখন তিনি টাকা রোজগার করছেন। কিন্তু এত প্রতিষ্ঠা, এত বৈভবের মধ্যেও বিদ্যার্জনের স্পৃহা তাঁকে পরিত্যাগ করেনি। স্টুডিয়োতে কারো মুখে অপরিচিত নতুন কোনও কথা শুনলেই হল, অমনি চার্লি তাঁর সাজ-ঘরে চলে আসতেন, এসে ডিকশনারি খুলে সেই নতুন কথাটির অর্থ দেখে নিতেন।

একদিন বিকেলবেলা, কথায়-কথায় চাক রীজনার তাঁকে বললেন, "মুশকিলটা কি হয়েছে জান, আসলে তুমি মস্ত বড় একটি কুইডনাঙ্ক।"

কুইডনাঙ্ক! জীবনে কখনও চার্লি এ-রকম কোনও শব্দ শোনেননি। শুনে তিনি ঘাবড়ে গেলেন প্রথমটায়। কিন্তু যেন কিছুই হয়নি, মুখে-চোখে এই-রকমের একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে বললেন, "তা বাপু কুইডনাঙ্কই হই, আর যা-ই হই, যেমনভাবে দৃশ্যটাকে আমি তুলতে বলেছি, ঠিক সেইভাবেই তোমাদের তুলতে হবে।"

বললেন বটে, কিন্তু শব্দটা শুনবার পর মনের মধ্যে যে একটা অস্বস্তির সৃষ্টি হয়েছিল, কিছুতেই সেটা গেল না। খানিক বাদেই চাক রীজনারকে তিনি বললেন, "একটু দাঁড়াও বাপু, একটা জরুরী কাজ আছে আমার। সেটা সেরে আসি।" বলেই তিনি সাজ-ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

ডিকশনারি খুলে তো তিনি স্তম্ভিত। "কুইডনাঙ্ক" শব্দটাকে কে যেন লাল পেনসিল দিয়ে আন্ডারলাইন করে রেখেছে। মার্জিনে লেখা রয়েছে, "এক্ষুনি এসে যে তুমি ডিকশনারি খুলবে, তা আমরা আগেই জানতুম।"

চটে-মটে ঘর থেকে তিনি বেরিয়ে আসছেন, ফিরে দাঁড়াতেই চোখে পড়ল, জানালার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন সীডনি চ্যাপলিন আর চাক রীজনার। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে তাঁরা হাসছেন। শব্দটার আসল মানেটা যে কী, তাঁরাও হয়তো সেটা জানতেন না। শুধু একটু মজা করবার জন্যই শব্দটা তাঁরা ব্যবহার করেছিলেন। এর পর যাঁর সঙ্গেই কথা বলেন চার্লি, "কুইডনাঙ্ক" শব্দটাকে ব্যবহার করতে তিনি ভোলেন না। "অ্যাপ্রপস" শব্দটার অর্থও এই সময়েই তিনি শিখেছিলেন। শেখার পর মাস-কয়েক খুব "অ্যাপ্রপস" "অ্যাপ্রপস" করতে লাগলেন।

চার্লি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা। স্বাধীনতা বলতে তিনি বুঝতেন, কখনও কোনও ব্যাপারে পূর্বনির্দিষ্ট কোনও সর্তে তাঁকে আবদ্ধ থাকতে হবে না, কাজকর্ম ফেলে রেখে কারো সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হবে না, অবাঞ্ছনীয় কোনও ব্যাপারে কখনও জড়িয়ে পড়তে হবে না, রাজনীতির আওতা থেকে তিনি দূরে থাকতে পারবেন (কখনও কোনও রাজনৈতিক দলে তিনি যোগ দিতে চাননি), নিজের ইচ্ছে এবং রুচি অনুযায়ী পোশাক পরতে পারবেন এবং সময় নষ্ট করে বন্ধুত্ব রক্ষা করতে হবে না। শিল্পকে ভালবাসতেন' বলে, শিল্পচিন্তায় মগ্ন হয়ে থাকতে চাইতেন বলেই এই সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা তিনি চেয়েছিলেন। সবকিছুই তিনি ভালবাসেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন তাঁর শিল্পকে। সেই শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা যেন কোনওমতেই কোথাও ব্যাহত না হয়।

তার জন্য অর্থ চাই। প্রয়োজনীয় পরিমাণ অর্থ যদি থাকে, তবেই এই স্বাধীনতাকে অক্ষুন্ন রাখতে পারবেন। যে-অর্থ তিনি সঞ্চয় করেছিলেন, চিত্র-

(বাঁ থেকে ডাইনে) **ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস, মেরি পীকফোর্ড, চার্লস চ্যাপলিন, ডী ডব্লু গ্রীফিথ**

"শোলডার আর্মস"-এর একটি দৃশ্য। চার্লির ঠিক পিছনেই সীডনি চ্যাপলিন

শিল্পে তাকে ব্যয় করতেও তিনি কোনও কার্পণ্য করেননি। দু হাতে টাকা রোজগার করেছিলেন চার্লি, দু হাতে আবার ঢেলে দিলেন। তখন তাঁর দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না। ছবিটা ভাল হবে কি না, তা নিয়ে ততটা নয়; টাকাটা আবার ফিরে আসবে কি না, আসলে তাই নিয়েই তাঁর চিন্তা। হাতে যদি টাকা না থাকে, শিল্পী হিসেবে তাঁর স্বাধীনতাও তাহলে থাকবে না। স্বাধীনতা হারাবার ভয়ে চার্লি তখন প্রায় অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। "সীটি লাইটস" ছবিতে তাঁকে দশ লক্ষ ডলার ব্যয় করতে হল। বন্ধুরা বললেন, "তা এতে ভয় পাবার কী আছে? এখনও তো ব্যাংকে আরও দশ লক্ষ ডলার রইল।" চার্লি বললেন, "দশ লাখে হবে না, কুড়ি লাখ চাই। পরের ছবিতে দশ লাখ ঢালতে হবে, তখন যে আর কিছুই থাকবে না। কম পয়সা খরচ করে যদি ছবি বানাতে যাই, নিজের ভাবনাগুলিকে আমি ঠিক-মতো ফুটিয়ে তুলতে পারব না। আর সব পয়সা যদি খরচ করে বসি, আবার আমাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে।" কথাগুলি বলবার সময় তাঁর মুখেচোখে যে নিদারুণ আতংকের ছায়া পড়েছিল, তার থেকে কারো বুঝতে কষ্ট হয়নি যে, অন্যের অধীনে চাকরি করবার ভয়ে, অন্যের হুকুমমত চলবার ভয়ে, চার্লি তখন পাগল হয়ে উঠেছেন।

চার্লি বলেন, "কাউকে যেন কারো হুকুমমত না চলতে হয়।" যারা দুঃস্থ, যারা অসহায়, তাদের প্রতি এক অন্তহীন মমতাই চার্লির এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। যে ভবঘুরে চরিত্রটির তিনি স্রষ্টা, সব সময়েই তাকে অন্যের জুলুম সহ্য করতে হয়। এবং এটা যে কতখানি অবাঞ্ছনীয়, কতখানি অমানবিক, সেই-টেকেই চার্লি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। দর্শকরা তাকে দেখে, দেখে দুঃখিত হয়। দুঃখের মধ্যেও তারা হাসে। দুঃখ আর আনন্দের এই সংমিশ্রণ ঘটাতেই চার্লি চেয়েছিলেন, যেন সেই দুঃখের মধ্যে কোনও তিক্ততা না থাকে। তিনি নিজেই যে সেই ভবঘুরে, চার্লি কি তা জানেন না? হয়তো জানেন, কিন্তু স্বীকার করতে চান না। এ-ব্যাপারে তাঁর দৃষ্টি বড় নৈর্ব্যক্তিক। চরিত্রটির সম্পর্কে কোনও কিছু বলতে হলে তিনি তাকে "সে" বলে উল্লেখ করেন, কখনও বলেন না, "আমি"।

এই অধ্যায়ের প্রথম ছবির নাম "এ ডগ'স লাইফ"। অনেকের মতে এইটিই তাঁর প্রথম মহৎ চিত্র। চলচ্চিত্র-শিল্পে তাঁর অভিজ্ঞতা তখন মাত্র চার বছরের। চার বছর আগেও এ সম্পর্কে তিনি সম্পূর্ণই অনভিজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যেই চিত্র-শিল্পের আঙ্গিককে তিনি কতখানি আয়ত্ত করতে পেরেছিলেন, "এ ডগ'স লাইফ" ছবিটি দেখলেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। চরিত্রগুলি এখানে আরও বেশী বাস্তব, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপেরও কোথাও বিন্দুমাত্র বাড়াবাড়ি নেই। দরিদ্র জন সাধারণের প্রতি তাঁর অন্তহীন মমতার কথা সকলেই জানেন। এরই জন্য অনেকে শিল্পী হিসেবে তাঁকে ডীকেন্সের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন। কিন্তু এ-বইয়ে তাঁর সেই মমতাময় হৃদয়ের অভিব্যক্তি যেন আরও বেশী আবেদনময় হয়ে উঠেছে। বইখানির কাহিনীর মধ্যে দার্শনিক ভাবনা বুদ্ধিরও খানিকটা স্পর্শ পাওয়া যায়। প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে যেভাবে তিনি বিদ্রূপ করেছেন, তার কথাও এখানে উল্লেখযোগ্য। বইখানি মুক্তিলাভের পর অনেকে এটিকে প্রথম সর্বাঙ্গীণ চলচ্চিত্র বলে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন।

প্রথম দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায় অপরিচ্ছন্ন এক টুকরো পোড়ো জমির উপরে চার্লি শুয়ে আছেন। পাশেই একটা শতচ্ছিদ্র ভাঙা বেড়া, তাতে হাওয়া আটকাচ্ছে না। বাতাসের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্যে বেড়ার ছিদ্রের মধ্যে চার্লি তাঁর রুমালখানা গুঁজে দিয়েছেন। কাছেই রয়েছে তাঁর পোষা কুকুর, স্ক্যাপস। ডাস্টবিনের পাশে একটা ঝুড়ির মধ্যে সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে।

কিছুক্ষণ বাদেই গোটাকতক কুকুর খানিকটা খাবার সঙ্গে নিয়ে এসে সেই বেড়ার আড়ালে মারামারি করতে লেগে গেল। চার্লি দেখলেন, এ-সুযোগ হাত-ছাড়া করাটা ঠিক নয়, বেড়ার ফুটোর মধ্য দিয়ে তিনি খানিকটা খাবার এদিকে তুলে নিয়ে এলেন। প্রাতঃরাশ তো সমাধা হল, এবারে একটা চাকরি-বাকরি খুঁজে নেওয়া দরকার। স্ক্যাপসকে সঙ্গে নিয়ে তিনি এমপ্লয়মেণ্ট ব্যুরোর দিকে চললেন। গিয়ে দেখেন, ব্যুরোর বাইরে মস্ত বড় একটা নোটিশ ঝুলছে। তাতে লেখা রয়েছে যে, মদ-চোলাইয়ের কারখানায় কাজ করবার জন্য জনকয়েক লোক নেওয়া হবে। এই তো চাইছিলেন চার্লি, দৌড়ে গিয়ে একটা বেঞ্চের উপরে তিনি বসে পড়লেন। কিন্তু খানিক বাদেই অন্যান্য প্রার্থীরা এসে ধাক্কাধাক্কি করে তাঁকে উঠিয়ে দিল। ব্যুরোর জানলা খুলতে আবার একবার সামনে এগিয়ে গেলেন তিনি, কিন্তু আগের মতই আবার তাঁকে হটিয়ে দেওয়া হল।

।-জানলা থেকে ও-জানলায় তিনি ঘুরে বড়াতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত যখন ।কটা জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, ভতর থেকে তাঁকে জানিয়ে দেওয়া হল ণ, আর লোক নেওয়া হবে না।

স্ক্যাপসকে সঙ্গে নিয়ে ভগ্নহৃদয়ে াবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন চার্লি। াস্তার ঠিক মাঝখানে কে যেন এক টুকরো াড় ফেলে দিয়ে গিয়েছে, দেখেই তো ্যাপস সেদিকে ছুটে চলল। কিন্তু ন্যান্য দিক থেকে আরও কয়েকটা কুকুর তক্ষণে সেই অস্থিখণ্ডের লোভে ছুটে সেছে। এসেই তারা চার্লির কুকুরের ঙ্গে মারামারি বাধিয়ে দিল। চার্লি খলেন, স্ক্যাপসকে এরা কামড়ে ছিঁড়ে লবে। পাগলা কুকুরদের কবল থেকে াঁচাবার জন্য স্ক্যাপসকে কোলে তুলে লেন তিনি। কুকুরগুলো যখন বুঝল া, শিকার হাতছাড়া হয়েছে, ক্রোধান্ধ য়ে তারা একযোগে চার্লিকেই আক্রমণ রল। চার্লিকে তাড়িয়ে নিয়ে চলল তারা। কটা কুকুর তো তাঁর গায়ের উপরে াপিয়ে পড়ে ট্রাউজারটাকে কামড়ে ছিঁড়ে লল। দুর্বলের পক্ষ নিলে যে কী ষণ শাস্তি পেতে হয়, এ-বইয়ে চার্লি রই একটা স্পষ্ট আভাস দিয়েছেন। রবর্তীকালে দুর্বল জনসাধারণের পক্ষ বলম্বনের অপরাধেই তাঁকে মার্কিন ক্তরাষ্ট্র থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।

সে যাই হোক, পাগলা কুকুরদের হাত কে উদ্ধার পেয়ে একটা বাড়ির দোর-াড়ায় গিয়ে বসলেন চার্লি। বসে নিকক্ষণ তিনি জিরিয়ে নিলেন। হঠাৎ খেন, দরজার ঠিক সামনেই আধ-বোতল ধ। স্ক্যাপসের ইচ্ছে একটু দুধ খায়, ন্তু বোতলের মধ্যে মুখ না ঢোকায় সে শেষ সুবিধে করে উঠতে পারছে না। র্লি করলেন কি, স্ক্যাপসের লেজটাকে ই বোতলের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বেশ র দুধে ভিজিয়ে নিলেন। তারপর জটাকে টেনে বার করে এনে আবার াপসের মুখের সামনে এগিয়ে ধরলেন। রটা বসে বসে চুক-চুক করে তার জেরই লেজ চুষে চুষে দুধ খেতে গল।

একটু বাদে দুজনে এক খাবারের কানের সামনে গিয়ে হাজির। সীডনি

"শোলডার আর্মস"-এর আর একটি দৃশ্য

সেজেছিলেন দোকানওয়ালা। চার্লি তাঁকে কথাবার্তায় ভুলিয়ে রাখছেন, আর স্ক্যাপস ওদিকে একটার পর একটা সসেজ খেয়ে চলেছে। সেদিকে চোখ পড়তেই কুকুরটাকে তেড়ে মারতে গেলেন সীডনি, আর চার্লি ইত্যবসরে একটার পর একটা কেক তুলে নিয়ে মুখে পুরতে লাগলেন। পরস্পরের সহযোগিতায় চার্লি আর তাঁর কুকুরের এই ভোজনপর্বটি বেশ উপভোগ্য। শেষ কেকটি তুলে নিয়েই চার্লি বুঝতে পারলেন যে, আড়াল থেকে একটি কনস্টেবল তাঁর ক্রিয়াকর্ম লক্ষ্য করে যাচ্ছে। তৎক্ষণাৎ কেকটিকে স্বস্থানে রেখে দিলেন তিনি। ছেলেবেলায় কেনিংটনেও নিশ্চয়ই একাধিকবার তাঁকে এই রকমের বিপদে পড়তে হয়েছে। কেকটিকে আবার যথাস্থানে রেখে দিতে গিয়েই সীডনির কাছে ধরা পড়ে গেলেন তিনি এবং তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে সরে পড়লেন। সীডনি ওদিকে তাঁকে লক্ষ্য করে বিরাট একখণ্ড সসেজ ছুঁড়ে মেরেছে, লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেই সসেজ-খণ্ড আড়ালে দণ্ডায়মান কনস্টেবলের মুখের উপরে গিয়ে আছড়ে পড়ল। সীডনি এ-বইয়ে খুব সুন্দর অভিনয় করেছিলেন। একখানা কাগজে মন্তব্য করা হয়েছিল, "চার্লির চাইতে তাঁর অভিনয় কোনও অংশেই খারাপ হয়নি।"

খাবারের দোকানে সুবিধে হল না। সন্ধ্যা নাগাদ চার্লি গিয়ে এক কাফের মধ্যে ঢুকলেন। কাফের নাচ-ঘরে এডনার সঙ্গে নাচতে-নাচতে হঠাৎ এক টুকরো চৌউয়িং-গামে পা আটকে গেল তাঁর। অতঃপর কোনও রকমে তিনি বার-এর কাছে গিয়ে পেঁছিলেন। দুই গুণ্ডা ইতিমধ্যে তাঁর পিছু নিয়েছিল। আত্মরক্ষার জন্য একটা পর্দার আড়ালে গিয়ে আশ্রয় নিলেন চার্লি। তারপর গুণ্ডাদের একজন পর্দার কাছে একটু এগিয়ে আসতেই আড়াল থেকে চার্লি তার মাথায় নিঃশব্দে একটা হাতুড়ি বসিয়ে দিলেন। মূর্ছিত হয়ে টলে পড়ছিল সে, পিছন থেকে চার্লিই তাকে ঠেলেঠুলে দাঁড় করিয়ে রাখলেন। তারপর পিছন থেকেই হাত বাড়িয়ে সেই গুণ্ডাটার সামনে রাখা মদের গ্লাসটাকে তুলে নিলেন তিনি। গুণ্ডাটার গোঁফে এমনভাবে হাত বুলিয়ে নিলেন যেন সবাই মনে করে যে, গুণ্ডাটা নিজেই তার গোঁফে তা দিচ্ছে। সে যে মূর্ছিত, জ্ঞানশূন্য, কেউই তা বুঝতে পারল না। তার শূন্য গ্লাসে আবার মদ ঢেলে দেওয়া হল। এবং আড়াল থেকে চার্লিই সেই মদ্য পান করতে লাগলেন। দৃশ্যগুলিতে চার্লির কল্পনাশক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে বিস্ময় না মেনে উপায় থাকে না। মূর্ছিত সেই গুণ্ডাটার জ্ঞান ফিরে আসে, আর সঙ্গে সঙ্গেই
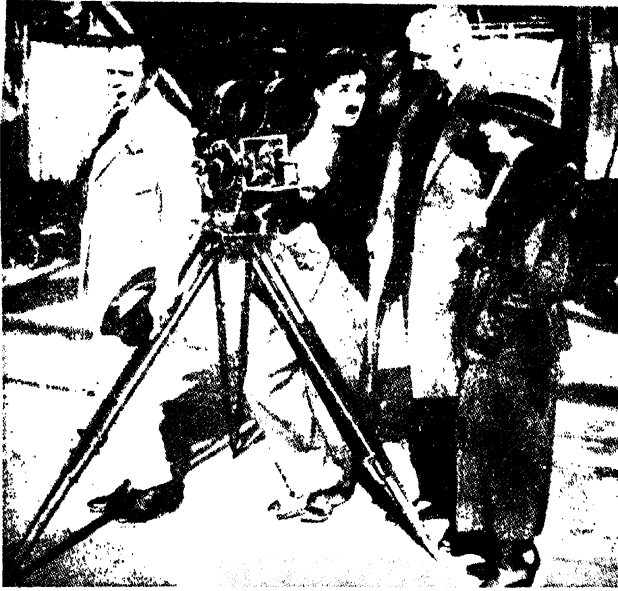
স্টুডিয়োর অভ্যন্তরে ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস ও মেরি পীক-ফোর্ডের সঙ্গে চার্লি

চার্লি তার মাথায় একটা হাতুড়ি বসিয়ে দেন। দেখতে দেখতে হেসে গড়িয়ে পড়ে সবাই।

বইখানির শেষ দৃশ্যটি বেশ মধুর। গুণ্ডাদলের কাছ থেকে টাকার থলি ছিনিয়ে নিয়ে চার্লি আর এডনা একটি কুটিরে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। কুটির তো নয়, তাঁদের স্বপ্ন-নীড়। এডনাকে সঙ্গে নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের কাছে একটা ঝুড়ির পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন চার্লি। পরস্পরকে চুম্বন করলেন তাঁরা, তারপর সেই ঝুড়ির দিকে তাকালেন। ঝুড়ির মধ্যে একগাদা বাচ্চা কোলে নিয়ে পরম শান্তিতে স্ক্যাপস কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে রয়েছে।

চৌদ্দ

অ্যামেরিকা ইতিমধ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। দেশের সর্বত্র তখন যুদ্ধোদ্যমের সাহায্যকল্পে 'লীবার্টি লোন' তহবিলে অর্থ সংগ্রহ করা হচ্ছিল। স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে এলেন চার্লি, অর্থ সংগ্রহের কাজে লেগে গেলেন। এই সময়ে ওয়াল স্ট্রীটের সাব-ট্রেজারি বিল্ডিংয়ের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে তিরিশ হাজার মানুষের এক সভায় তিনি একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সঙ্গে ছিলেন মেরি পীকফোর্ড আর ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস। বক্তৃতা শেষ হবার পর উৎসাহের আধিক্যে চার্লিকে কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস, জনসাধারণ যাতে ভালভাবে তাদের প্রিয়তম অভিনেতার চেহারাটা একবার দেখে নিতে পারে। ওয়াশিংটনে ষাট হাজার লোকের এক সভায় মেরি ড্রেসলারের সঙ্গে নাচ দেখালেন চার্লি। দর্শকদের আনন্দ-ধ্বনিতে সভাস্থল মুখর হয়ে উঠল। প্রচুর লোক সেদিন লীবার্টি বণ্ড কিনে বাড়ি ফিরেছিল।

চার্লি এর পর দক্ষিণাঞ্চলে গিয়ে বক্তৃতা করে বেড়াতে লাগলেন। প্রথমে গেলেন ডীক্সিতে। ডীক্সির পর নীউ অরলিনস। এই নীউ অরলিনসেই কুৎসিত ব্যাপার ঘটল একটা। চার্লি এবং ট্রেজারি বিভাগীয় জনৈক প্রাক্তন সেক্রেটারির সেদিন একই সভায় বক্তৃতা দেবার কথা। সেক্রেটারি মশাই হঠাৎ বেঁকে বসলেন। বললেন যে, তাঁকে যদি আগে বক্তৃতা দিতে না দেওয়া হয় তো ওই 'অশিক্ষিত অভিনেতা'র সঙ্গে একই সভায় তিনি উপস্থিত থাকতে পারবেন না। আলাদা আলাদা সভার ব্যবস্থা করা হল। চ্যাপলিনের সভায় সেদিন চল্লিশ হাজার লোক হয়েছিল, সেক্রেটারির সভায় চারশো লোকও হয়নি।

দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু সামরিক শিক্ষাশিবিরও চার্লি এই সময় পরিদর্শন করেছেন। সৈন্যবাহিনীর লোকদের সঙ্গে সাক্ষাৎ যোগাযোগের পর তিনি হলিউডে ফিরে এসে ছোট্ট একটি ছবি তুলেছিলেন। ছবিখানির নাম 'দী বণ্ড'। কাহিনী এবং পরিচালনা দুই-ই চ্যাপলিনের। এবং এ-বইয়েও তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। 'দী বণ্ড' বইখানি মুক্তিলাভের পর লীবার্টি বণ্ডের বিক্রি আরও বেড়ে গিয়েছিল।

ছবিটির গোড়ায় ছোট্ট একটি ঘোষণা আছে। তাতে বলা হয়, "বন্ধন নানা রকমের আছে। মৈত্রীবন্ধন, প্রেমের বন্ধন, বিবাহ-বন্ধন, সব রকমের বন্ধনের সঙ্গেই পরিচয় আছে আমাদের। তাদের মধ্যে মুক্তি-বন্ধনই হল সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ।" ছোট্ট এক-একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে এক-এক ধরনের বন্ধনের দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছিলেন চার্লি, সব ক'টি দৃষ্টান্তই খুব সুন্দর হয়েছিল। নায়িকার ভূমিকায় নেমেছিলেন এডনা। একটি কাহিনীতে দেখা যায়, চার্লিকে তিনি উপাসনা-বেদীর দিকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। আর একটি কাহিনীতে তাঁকে স্ট্যাচু অব লীবার্টি হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছিল

যুদ্ধোদ্যমের সাহায্যকল্পে এছাড়া হ্যারি লডারের সঙ্গেও তিনি একটি ছবি তুলেছিলেন এবং এতেই তাঁর কৃতিত্বের পরিসমাপ্তি ঘটেনি। ঠিক এই সময়েই তিনি তাঁর বিখ্যাত চিত্র 'শোলডার আর্মস'-এর শুটিং আরম্ভ করেন। নিজের টাকায় এর আগে আর চার্লি এত দীর্ঘ কোনও বই তোলেন নি। পুরো বইখানি দেখাতে প্রায় আধ ঘণ্টা সময় লাগে। তিক্ততার লেশমাত্রও এ-বইয়ে নেই। সৈনিক-জীবনের কঠোরতা, সৈনিকদের গৃহ-

কাতর মনোভাব এবং আরও কয়েকটি বিষয়কে এ-বইয়ে চমৎকার ফুটিয়ে তোলা হয়েছিল।

চার্লি এখানে যুদ্ধ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ এক রিক্রুটের ভূমিকায় নেমেছেন। পরনে ইউনিফর্ম, নাকের নীচে বেঁটে মিশকালো গোঁফ, পায়ে বুট জুতো। কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁর কোনও বিদ্রোহ-ভাব নেই। তবে তাঁর উপরে যারা জবরদস্তি করতে আসে, নানান রকমের কৌশল খাটিয়ে তিনি তাদের ঠান্ডা করে দেন। জুলুমবাজদের একজন হলেন সীডনি। তিনি নেমেছিলেন এক সার্জেন্টের ভূমিকায়। বাড়ি থেকে আসবার সময় নানান রকমের জিনিসপত্র নিয়ে এসেছেন চার্লি, এই নিয়ে সেই সার্জেন্টের বিদ্রূপের অন্ত নেই। চার্লি করলেন কি, তাঁকে সায়েস্তা করবার জন্যে একটা ইঁদুর-কল পেতে রাখলেন। এবং যথাসময়ে সেই ইঁদুর-কলে হাত আটকা পড়ে গেল সীডনির। বাড়ি থেকে চার্লি একটা জাঁতাও নিয়ে এসেছেন। সেই জাঁতাটিকে দেয়ালে ঝুলিয়ে রেখেছেন তিনি। তাতে পিঠ ঘষে চমৎকার পিঠ-চুলকোবার কাজ চলে যাচ্ছে।

চার্লির সৃষ্ট চরিত্রগুলি প্রায়ই একটু নিঃসঙ্গ, নির্বান্ধব গোছের হয়। এ-বইয়েও তাঁর ব্যতিক্রম ঘটেনি। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রত্যেকের নামেই বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়-পরিজনের কাছ থেকে কিছু-না-কিছু চিঠি আসে, চার্লির নামেই শুধু আসে না। এ নিয়ে প্রথম-প্রথম তাঁর খুব দুঃখ হত, এখন আর হয় না। অন্যের আনন্দ থেকেই তিনি এখন আনন্দ আহরণের চেষ্টা করেন। 'শোলডার আর্মস' চিত্রে এই নিয়ে খুব সুন্দর একটি দৃশ্য আছে। যুদ্ধ-ক্ষেত্রে বসে একজন সৈন্য বাড়ি-থেকে-আসা তার চিঠি পড়ছে, তার কাঁধের উপর দিয়ে উঁকি মেরে চার্লিও পড়ছেন সেই চিঠি। তার আনন্দে আনন্দিত হয়ে উঠছেন চার্লি, তার দুঃখে দুঃখিত। চিঠির এক জায়গায় সৈন্যটিকে জানানো হয়েছে যে, তার একটি ছেলে হয়েছে। এই অংশটি পড়ে এতই উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন চার্লি যে, তখন তাঁর মুখ-চোখের ভাবভঙ্গী দেখে মনে হয়, তিনিই যেন একটি পুত্র-লাভ করেছেন।

দুঃখ-যন্ত্রণা, বাধাবিঘ্ন তো আছেই, কিন্তু তা নিয়ে মুষড়ে পড়বার মানুষ নন তিনি। দুঃখকে আনন্দে, বিঘ্নকে সুবিধায় রূপান্তরিত করাতেই তাঁর উৎসাহ। ট্রেঞ্চের মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছেন তিনি, মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে শত্রুপক্ষের বুলেট ছুটে যাচ্ছে। চার্লির এদিকে ভীষণ তেষ্টা পেয়েছে, কিন্তু বীয়ারের বোতলের ছিপিটাকে তিনি কিছুতেই খুলতে পারছেন না। তিনি তখন করলেন কি, বোতলটাকে ট্রেঞ্চের উপরে একটু উঁচিয়ে ধরলেন,

সঙ্গে সঙ্গেই শত্রুপক্ষের বুলেট লেগে বোতলের মুণ্ডু উড়ে গেল। দৃশ্যটির মধ্যে যে অভিনবত্বের স্পর্শ রয়েছে, এইখানেই তার বৈশিষ্ট্য। ট্রেঞ্চ জলে ভেসে গিয়েছে, তবুও তিনি হতোদ্যম হননি। হাতড়ে হাতড়ে বালিশটাকে তিনি বার করে নিলেন, তারপর বালিশটাকে একটা চুমু খেয়ে নিশ্চিন্ত চিত্তে শুয়ে পড়লেন সেইখানে। একটু বাদেই জলে ডুবে গেলেন চার্লি। কিন্তু তখনও তাঁর বুদ্ধিভ্রংশ হয়নি। হাতড়ে হাতড়ে ফনোগ্রাফের একটা নল খুঁজে নিয়ে, সেই নলের মধ্য দিয়ে তিনি নিঃশ্বাস নিতে লাগলেন।

খানিক বাদে দেখা যায়, চার্লি একাই গিয়ে জনকয়েক জার্মান সৈন্য আর তাদের ক্ষুদে অফিসারটিকে পাকড়ে এনেছেন। অফিসারটিকে কোলে তুলে নিয়ে, ছোট ছেলেদের যেভাবে মার লাগানো হয়, ঠিক সেইভাবেই তাকে ঘা কতক বসিয়ে দিলেন চার্লি। একার চেষ্টায় এতজনকে গ্রেপ্তার করে আনা তো সহজ ব্যাপার নয়। কীভাবে তিনি এই অসাধ্য সাধন করলেন, জিজ্ঞেস করতেই এক গাল হেসে তিনি উত্তর দিলেন, "আমি গিয়ে করলাম কি, একাই চারদিক থেকে ওদের ঘিরে দাঁড়ালাম।"

স্বেচ্ছাসৈন্যদের ডাক পড়েছে। ডাক শুনেই এগিয়ে গেলেন চার্লি। কিন্তু যখন তাঁকে বলা হল যে, মাত্র জনকয়েক সৈন্যকে গিয়ে শত্রুপক্ষের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে এবং এ-সংঘর্ষ থেকে কেউ হয়তো না-ও ফিরে আসতে পারে, তৎক্ষণাৎ আর একজনকে সামনে এগিয়ে দিয়ে পিছিয়ে এলেন চার্লি। কিন্তু সার্জেণ্ট বললেন, চার্লিকেই এগিয়ে যেতে হবে। অগত্যা, কী আর করেন, সর্বাঙ্গ গাছ-লতাপাতা দিয়ে ঢেকে একটি বৃক্ষের ছদ্মবেশে চার্লি তো গিয়ে শত্রুব্যূহের মধ্যে প্রবেশ করলেন। তারই মধ্যে এক-আধবার গাছের এক-একটা ডাল দিয়ে তিনি পিঠ চুলকে নেন। জ্বালানির অভাব পড়ায় একজন জার্মান সৈন্য ওদিকে গাছ কাটতে বেরিয়েছে। চার্লিকে একটা গাছ মনে করে যেই-না সে তাঁর উপরে কুড়ুল চালাতে যাবে, চার্লি করলেন কি, গাছের একটা ডাল দিয়ে তাকে একটা চড় কষিয়ে দিলেন। তারপর আবার এগিয়ে চললেন তিনি। দৃশ্যটা ভারী মজার। রণাঙ্গনের মধ্য দিয়ে একটা গাছ হাঁটাচলা করে বেড়াচ্ছে, এই কিম্ভূত দৃশ্য দেখে হাসতে হাসতে দম আটকে যায়। বৃক্ষের ছদ্মবেশেই চার্লি গিয়ে সেই জুলুমবাজ সার্জেণ্টের প্রাণরক্ষা করলেন, ডালপালা দিয়ে শত্রু-সৈন্যদের খুব খানিকটা পিটিয়ে নিলেন, তারপর আবার এগিয়ে চললেন তিনি। সর্বশেষ দেখা যায়, কাইজারকে তিনি বন্দী করে এনেছেন। কাইজারের ভূমিকাতেও সীডনিকে নামানো হয়েছিল।

'শোলডার আর্মস'-এর মধ্যে উদ্ভট রসের ঈষৎ স্পর্শ রয়েছে বটে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও এর অনেকখানি অংশই বাস্তব-ঘেঁষা। এ-বইয়ে চার্লি-প্রতিভার এক সম্পূর্ণই অনাবিষ্কৃত দিকের সন্ধান পাওয়া গেল। তাঁর শিল্পবুদ্ধি যে এত বলিষ্ঠ, আগে তা কেউ কল্পনা করতে পারেনি। জনপ্রিয়তার দিক থেকে চার্লির পূর্ব অধ্যায়ের সমস্ত ছবিকেই ছাড়িয়ে গেল 'শোলডার আর্মস'। বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক ও নাট্যকার জাঁ ককতু বলেছিলেন, "দুর্বার এর গতিবেগ।"

এ সাফল্য অভূতপূর্ব। মাস কয়েক ধরে এই একটিমাত্র বই সম্পর্কেই আলোচনা চলতে লাগল। সেই সময়কার অনেক বইয়ের উপরেই 'শোলডার আর্মস'-এর স্পষ্ট প্রভাব পড়েছে। এ-বইয়ের কয়েকটি দৃশ্য ধার নিয়ে অন্যান্য বইয়ের সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। বছর কয়েক বাদে তোলা হল 'বীগ প্যারেড'। এই সম্পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ-চিত্রটিতে 'শোলডার আর্মস'-এর একটি দৃশ্যকে পুরোপুরি ব্যবহার করা হয়। রণাঙ্গনে পত্রপাঠের সেই অবিস্মরণীয় দৃশ্যটি।

(ক্রমশ)

কবি করুণানিধান

বিনায়ক সান্যাল

কবি করুণানিধান জীবিত কবিদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ; সর্বশ্রেষ্ঠ কি না, সে সম্বন্ধে অবশ্যই মতভেদের অবকাশ আছে। কাব্য-সমালোচনা প্রসঙ্গে কোন কবির আপেক্ষিক স্থান নিরূপণের চেষ্টা শুধু নিরর্থক নহে, কতকটা অবান্তরও বটে। অতএব বর্তমান আলোচনায় আমরা সে চেষ্টা করিব না। সমালোচনার প্রকৃত উদ্দেশ্য, প্রস্তুত বস্তুর রূপায়ণে যাহা স্বাদু ও সুন্দর, অনুভূতি ও অভিব্যক্তির চমৎকারিতায় যাহা মনে দোলা দিয়াছে, সেই আবেশের সুষমাটিকে অন্য মনে সঞ্চারিত করা। এক কথায়, কবি-কল্পনা হইতে লব্ধ যে প্রেরণা আমার প্রসুপ্ত শিল্প-চেতনাকে প্রবুদ্ধ করিয়াছে, তাহাকেই সহৃদয় সামাজিক জনের সম্মুখে তুলিয়া ধরা। কবির কাব্যের মধ্যেই আমরা আমাদের মনের যথার্থ রূপটি খুঁজিয়া পাই এবং না-বলা বাণীর ধ্বনিটিকে প্রসারিত করিয়া তাহার অভ্যন্তরে নিজের অর্থটি যোজনা করি। এই অর্থ একান্ত ব্যক্তিগত। কবির কাব্যে যাহা গূঢ়ভাবে নিহিত আছে, তাহাকে সুস্পষ্ট সম্পূর্ণতার দিকে লইয়া যাওয়াই আমার মতে প্রকৃত সমালোচনা।

করুণানিধানের কাব্যের মধুচক্রে আমার মন যে সুধারসের সন্ধান পাইয়াছে, তাহা সত্যই অপূর্ব। আবেগের অন্তর্মুখিতায় তাহা গাঢ় ও গভীর—প্রকাশের প্রত্যগ্রতায় বিচিত্র ও রমণীয়। বিশ্লেষণের দ্বারা সেই আস্বাদটিকে অন্য মনে সঞ্চারিত করা যায় না, কারণ কাব্য তা কেবল কায়া নহে—কবি-মনের অলক্ষ্য মায়াই রূপকে অপরূপ করিয়া তোলে। এই মায়া বস্তুটি আবার এমন যে কোন বিশ্লেষণেই ইহা ধরা পড়ে না। ফুলকে যেমন গন্ধ হইতে পৃথক করিয়া দেখানো যায় না—মাধুরী হইতে পৃথক করিয়া যেমন মধুকে পাওয়া যায় না, তেমনি কবি-মায়া হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া কাব্যকেও জানা সম্ভব নহে। তবুও একথা সত্য যে, যে-প্রকাশ-রূপের ভিতর দিয়া কবির অন্তরাবেগ মুক্তিলাভ করিয়াছে, তাহারও একটি বিশেষ মূল্য আছে। ভাব-রস-নির্বিশেষ বলিয়াই বিশেষ আধারে আরোপিত না হইলে রস-রূপ লাভ করে না। তাই কোন কাব্যকেই তাহার প্রকাশ-শরীর হইতে বিশ্লিষ্ট করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ধারণা করা যায় না, বিশেষ করিয়া করুণানিধানের মত কবির কাব্যকে, বাগর্থের সৌষম্যই যাহার শক্তি ও সৌন্দর্যের নিদান।

অর্থ ছাড়াও, শব্দের একটি স্বতন্ত্র ধ্বনি-সৌন্দর্য আছে, যাহাকে শব্দের দীপ্তি অথবা উদ্‌ভাস বলা যাইতে পারে। শব্দরাজির সুত্রণ নৈপুণ্যে দেহাতীত সেই লাবণ্যটি—রূপাতীত সেই রূপটি ফুটিয়া উঠে। ভাবের ভ্রূণ-সঞ্চার হইতে কাব্য-প্রসবের লগ্ন পর্যন্ত সমগ্র ক্রমটি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায়, অভিব্যক্তির আমুখে আবেগ-বেগ অর্থনিরপেক্ষ ধ্বনি-তরঙ্গের রূপে আত্মপ্রকাশ করে এবং উহাই বিবিক্ত হইয়া ক্রমে অর্থবন্ধ,

কবি করুণানিধান

জন্ম : ৫ অগ্রহায়ণ ১২৮৪ খ্রী, ১৯ নবেম্বর ১৮৭৭

বর্ণরাগদীপ্ত, শব্দময় ছন্দের আকারে রূপায়িত হয়। কবি করুণানিধানের চোখে আছে স্বপ্নের অঞ্জন—হাতে আছে ধ্বনি-সুন্দর ছন্দের ইন্দ্রজাল। শুধু শব্দের নহে, প্রতিটি অক্ষরের স্ফোট, অর্থাৎ ধ্বনি-তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি অবহিত ও অভিজ্ঞ, তাই শব্দধৃত ছন্দঃ-স্পন্দের মধ্য দিয়া অস্ফুট ভাব-স্পন্দগুলির প্রস্ফুরণ ও প্রস্রবণ সম্ভব হইয়াছে। শাব্দী ব্যঞ্জনার সুর যে কতদূর পর্যন্ত যাইতে পারে, তাঁহার রচিত প্রত্যেকটি কবিতার ধ্বনি-দীপ্তি হইতে তাহা বিশেষভাবে অনুভব করা যায়। ঐন্দ্রজালিক কবি তাঁহার মায়াযষ্ঠির স্পর্শে শব্দগুলিকে ছন্দঃ-সৌন্দর্যে লীলায়িত করিয়া যে আবেশ সৃষ্টি করেন, তাহার রেশটি মন হইতে সহজে মিলায় না। সঙ্গীতের ক্ষেত্রে এই ধ্বনিতরঙ্গ অব্যাকৃত ও অবিচ্ছিন্ন; ইহারই অন্য নাম সুর। কাব্যের ক্ষেত্রে কিন্তু ইহা বিবিক্ত, বিশিষ্ট ও অর্থবন্ধ। সঙ্গীতে অর্থের প্রসঙ্গই আসে না: প্রত্যুত কাব্যে এই অর্থযুক্ত বিবিক্ত-ধ্বনি বা শব্দ-সমষ্টিই ছন্দোরূপের মধ্য দিয়া অমূর্ত অনুভূতিকে প্রমূর্ত করে। মহামুনি ভরত যাহাকে 'বর্ণালঙ্কার-সমৃদ্ধি' বলিয়াছেন—অন্য নামে যাহাকে 'রঞ্জনা' বলা যাইতে পারে—কাব্যের পরিপূর্ণ পরিবাহনের দিক হইতে তাহার মূল্য অল্প নহে। রঞ্জনা ব্যতীত ব্যঞ্জনা সম্ভব হয় না। আর এই ব্যঞ্জনাই তো কাব্যের প্রাণ; 'ব্যঞ্জকত্বং তু মুখ্যতয়ৈব শব্দস্য ব্যাপারঃ'। কবির সার্থক সৃষ্টিগুলির প্রত্যেকটি এই সূক্তির স্বাক্ষর বহন করিতেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটি কবিতার কয়েক পংক্তি করিয়া উদ্ধৃত করি—

১। বহিছে প্রসন্ন হাওয়া, পাখীর কীর্তন-
গাওয়া নয়ন গলায়—
চাষীর আনন্দ-বাঁশী, শিশুর সরল
হাসি বটের তলায়!
অদূরে শারদ মেঘে জলধনু আছে লেগে,
দীপ্ত গিরি-চূড়া—
হের দূরে দিগ্‌বলয়ে র'য়েছে ধূমেল হ'য়ে
নীলাঞ্জন-গুঁড়া!
এ মোহন মঞ্জু ছবি আঁকে কোন্ আদি
কবি যুগ যুগ ধ'রে—
ছায়া-রৌদ্রে হিল্লোলিত নীলারণ্য মর্মরিত
পল্লবের স্তরে!
এসেছি পরমক্ষণে এই বনে পদ্মাসনে
বসিব পূজায়—
এ মংগল-নিকেতনে উপাসিব শান্ত মনে
ইষ্ট-দেবতায়!
(পঞ্চকোটে)

২। ফাল্‌গুন-রজনীমুখে গুঞ্জরে তোমার
বুকে অমরী-মঞ্জীর,
মানসরঞ্জন হাস্য ভাসে গো কমল-আস্যে
নিসর্গ-লক্ষ্মীর;
ইন্দ্রনীল রথচূড়ে চন্দ্রিকা-কেতন উড়ে
অন্তরীক্ষ-পথে,—
হেন স্বপ্ন-লীলাভূমি অবহেলি' ধাও
তুমি দুর্নিবার স্রোতে।
কার আলিংগন-আশে অনুরাগ-রসোল্লাসে,
হে বরবর্ণিনি,
ধাও রংগে কলস্বরা পারাবার-স্বয়ংবরা
বিন্ধ্যের নন্দিনী?
(রেবা)

৩। কম্‌লাফুলী ঘোম্‌টা খুলি'
এলিয়ে দিয়ে চুল,
এক্‌লা ঘরে বাদ্‌শাজাদী
ছিঁড়্‌তেছিল 'গুল্'।
আচম্‌কা সে ফিরিয়ে গ্রীবা
ঝর্‌কাপানে চায়,
সুর্‌কি-রাঙা রাস্তা থেকে
দেখ্‌লে যুবা তায়!
কি সুন্দরী সেই তরুণী
ইরান্-নারী-কবি!
অরুণ-রথে আবীর্-খেলা
ক'র্‌লে সুরু রবি।
(বাদ্‌শাজাদী)

পংক্তিগুলিতে লীলার সহিত অবলীলা সর্বত্র পরিস্ফুট, শিল্প-চেষ্টা অকুণ্ঠ ও অক্লিষ্ট। ধ্বনি-বিতান কখন উদাত্ত-গম্ভীর, কখন বা ললিত-লীলায়িত। বাণ-প্রোক্ত গৌড়ী রীতির বৈশিষ্ট্য 'অক্ষর-ডম্বর' ইহা নহে। রূপায়ণে আভার সহিত আভাস এমন অনায়াসে মিশিয়া গিয়াছে যে, প্রয়াসের কোন চিহ্নই চোখে পড়ে না, অথচ শব্দকুশল কবি ছন্দঃ-স্ফোট সম্বন্ধে একান্ত সচেতন। ভাব-প্রতিমাটিকে ধ্বনি-আভরণে নিখুঁত করিয়া সাজাইবার আগ্রহ তাঁহার এত উদগ্র যে, আভরণ যে আবরণে পরিণত হয় নাই, ইহাই আশ্চর্য। এই বাক্-পরিমিতি—উদ্দাম উচ্ছ্বাসের মুখেও আবেগ-তুরঙ্গকে রশ্মি টানিয়া সংযত করিয়া রাখা, সত্যই বিস্ময়কর। মোহিতলাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, করুণানিধান সম্বন্ধেও তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি, "ক্লাসিক ঠাটে রোম্যান্টিক কল্পনার এই প্রকাশ সত্যই অভিনব।"

কবিশেখর কালিদাস রায় করুণানিধানের কাব্য-রূপায়ণের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "স্বপ্ন-দৃষ্টির একমাত্র কবি করুণানিধান। স্বপ্ন-রস বলিয়া কোন রস নাই। এই কবি স্বপ্নকেও একপ্রকার রসে পরিণত করিয়াছেন।" কথাগুলি প্রণিধানযোগ্য। কিন্তু 'স্বপ্ন' সংজ্ঞাটি ঠিক স্পষ্ট নহে এবং অনেক সময়েই অলস ভাবালুতা অর্থে ইহা প্রযুক্ত হয়। কিন্তু কবি-স্বপ্ন তো ভাবালুতা বা খেয়ালী কল্পনার খেলা নহে, অথবা জীবনের দুঃখ-বেদনাকে পাশ কাটাইয়া অলভ্য অবস্তুর মৃগয়াও ইহা নহে। কল্পনা, বেদনা ও চিন্তার একীভূত, আত্মীকৃত রূপকেই স্বপ্ন-নামে অভিহিত করা যায়। কর্পূরের সুবাসের মত ইহা উদ্‌বায়ী নহে, কস্তুরী সুগন্ধের মত স্থির। ইহাকে অলীক, ক্ষণিক অথবা মায়িক মনে করিলে ভুল হইবে। রজ্জুতে সর্প দর্শনের মত ইহা প্রতিভাসমাত্র

হে, অন্তর্বেদনার চিরন্তন উৎস হইতেই
হার উদ্ভব। এই ধ্যান-স্বপ্ন, মুগ্ধ মনের
ই চকিত দৃষ্টিপাত সৃষ্টি মহিমার
ম্মুখে বিগলিত অন্তরের এই বিস্মিত
ণতি, ইহার চেয়ে বড় সত্য জীবনে আর
ক আছে? ক্ষণ-দর্শনের এই বিরল-
ণগুলিকেই তো কবি চিরন্তনের মণি-
ালিকায় গাঁথিয়া তোলেন। যুক্তির পথে
াহা প্রমা—প্রাণের পথে তাহাই প্রেম।
এই প্রেম 'চিদ্দীপ-দীপনঃ', ইহার দীপ্র
শিখায় রূপের অলক্ষ্য অরূপ সৌন্দর্যটি
উদ্ভাসিত হয়, কবি-সৃষ্টির 'বাসক-
াসরে' জগৎ ও জীবনের সহিত আমাদের
ূতন করিয়া 'শুভ-দৃষ্টি' ঘটে! অমৃত-
নাত অন্তরের এই উদ্বেল আনন্দ, এই
বপ্ন কখন সুরসুষমায়, কখন বা ছন্দো-
ভঙ্গিমায় আপনাকে মুক্ত ও মূর্ত করে।
রুণানিধানের কাব্য-শ্রীর সর্বাঙ্গ এই
বপ্ন-চন্দনে অনুলিপ্ত। অলংকার শাস্ত্রে
ৃঙ্গারাদি নবরসের মধ্যে স্বপ্ন-রস
র্মটি নাই সত্য, কিন্তু ভাব-রসের সহিত
ই স্বপ্ন-রসের মর্মগত পার্থক্য
াথায়? "লৌকিক শোক-হর্ষাদি কাব্য-
ংশ্রয়ে অলৌকিকত্ব প্রাপ্ত হইলে তবেই
স-রূপতা লাভ করে। লৌকিকের
লৌকিকে উদ্গতিই কাব্য; ইহা দূষণ
হে—কাব্যের ভূষণস্বরূপ।" সাহিত্য-
র্পণের এই কাব্য-লক্ষণটিকে অঙ্গীকার
রিয়া লইলে বলিতে হয়, রসমাত্রই
প্নরস, ইহাকে নবরসের সমবায়-সংজ্ঞা
সোবে গ্রহণ করিলে আপ্তবাক্য লঙ্ঘনের
পরাধ হয় না। কবির কাব্যে আছে
াবের এই উদ্গতি, যে 'ঝাপ্সা
য়াশাতে দূরের গিরি কাছে দেখায়',
ইই মায়া-দর্পণ, জীবনকেই উহা
ীবন্ত ও সুন্দরতর করিয়া তুলিয়াছে।
ামেলী-যূঁই-মল্লী-বেলায় বরণডালা পূর্ণ
রিয়া' কবি আবাহন করিয়াছেন, তাঁহার
ানস-সুন্দরীকে—

জার তারায় খচিত যার তুষার-কাঁচলিতে
থ হারালো জ্যোৎস্না-কণা অকূল আঁচিহ্নতে,
র্গে এসে পৌঁছিল সে, সুপ্ত লোকান্তরে,
ঠছে মৃদু-গভীর বাণী, ডাকছে
সুদূরস্বরে!
(মোহিনী)

হারই পাশে পাশে আবার দেখি—
কন্তরে যাদের সাথে ফলসা-বনে ঢুকে
ল-মধু ফলের লোভে জল সরিত মুখে;

গাছের তলে গ্রামের মেয়ে
আঁচল মেলে দেখ্‌ত চেয়ে
লোহিত-কালো ফলের থোলো ডালের
ভরাবুকে।
(অতীত)

ইহাকে কি উৎকল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দিবার উপায় আছে? পংক্তিগুলিতে জীবন-রসটি কী নিটোল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে! অন্তঃস্রুত ভাব-রসকে কল্পনার তাপে গাঢ় করিয়া ভাষার স্ফটিক-পাত্রে এমন করিয়া আর কয়জন কবি পরিবেষণ করিতে পারিয়াছেন? বস্তুত, কবির কাব্য-চিত্রশালায় জীবনের ছবি আদৌ বিরল নহে, যদিও তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ও মূল্যমান স্বতন্ত্র। তাঁহার কাব্যে হাল-আমলের জীবনবোধ খুঁজিতে গেলে নিরাশ হইতে হইবে। আধুনিক সাহিত্যে জীবনের প্রত্যক্ষ স্থূল রূপটির উপরই বিশেষ করিয়া জোর দেওয়া হইতেছে। জীবনের অব্যবহিত সমস্যাগুলিই তাহার প্রধান, এমন কি একমাত্র উপজীব্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সমস্যাগুলির সমাধানের উপায়-চিন্তা অবশ্যই করিতে হইবে এবং জনসাধারণের সম্মুখে উহাদের তুলিয়া ধরিতেও হইবে। সবই সত্য; কিন্তু ইহা তো নিবন্ধের আকারে লোক-গোচর করা আরও সহজ ও সংগত; ইহার জন্য কাব্য-মাধ্যমের প্রয়োজন কি? জৈব ও যৌন প্রয়োজনের উপর অযথা জোর দিতে গিয়া আধুনিক কাব্যের শ্রীলতা ও শ্লীলতা যথেষ্ট ক্ষুণ্ণ হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। বলা বাহুল্য, আধুনিক কাব্যের মধ্যে যেগুলি সত্যই রসোত্তীর্ণ, যাহাদের উপর বিদগ্ধ মনের স্বীকৃতির স্বাক্ষর অঙ্কিত, সেগুলি আমাদের আলোচনার বাহিরে। শিল্পশৈলীর কুশলতায় তথ্য-ভার হইতে মুক্ত হইয়া কাব্য, সেখানে রসঘন হইয়া উঠিয়াছে। হইতে পারে, বিগত যুগের মন লইয়া আমরা নূতনকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া লইতে পারিতেছি না। কিন্তু এ-কথা ঠিক যে, একটি বিশেষ 'পক্ষপাত' আধুনিক সাহিত্যকে পাইয়া বসিয়াছে। এই 'আবেশন' (obsession) হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে সাহিত্যেরও মুক্তি নাই। ইন্দ্রিয়-জীবনই তো মানুষের এক-মাত্র জীবন নহে; স্বপ্ন-পিপাসা মানুষের জন্মসিদ্ধ। তাই যদি কোন কবির কাব্যে কর্ম-জীবন অপেক্ষা নর্ম-জীবনই বিশেষ করিয়া ফুটিয়া উঠিয়া থাকে, তাহাতে ক্ষুব্ধ হইবার কারণ কি? ইন্দ্রিয়-জীবনের বুদ্ধিমূলক ব্যাখ্যা, আর যাহাই হউক, কাব্য নহে। ব্যক্তকে অতি-ব্যক্ত করা কাব্যের ধর্ম নহে, অব্যক্তকে অভিব্যক্তি-দানই তাহার মুখ্য লক্ষ্য,—নির্মাণ নহে, 'নির্মিতি'—প্রতিবিম্বন নহে, উন্মোচন ও উজ্জীবন। করুণানিধানের কাব্যে অন্তরের সেই নিভৃত আনন্দলোক উদ্ঘাটিত হইয়াছে, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

সুখদুঃখবিচিত্র জীবনের পান-পাত্র হইতে কবি, হংসের মত, কেবল সুখের ভাগই ছাঁকিয়া লইয়াছেন। তাঁহার কবি-সত্তা সমসাময়িক জীবন-সমস্যাগুলির দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় নাই। কিন্তু জীবনের প্রতি অনীহাই ইহার হেতু নহ—

মানস-প্রকৃতির বিশিষ্টতাই ইহার কারণ। কবি তাঁহার কাব্যের উপকরণ সন্ধান করিয়াছেন অতীতের স্মৃতি-সম্পুটে—তাঁহার প্রেরণা আসিয়াছে প্রধানত ইতিহাস-পুরাণাদি প্রত্ন-উৎস হইতে। প্রায় প্রত্যেকটি কবিতার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়ে। যাযাবর কবি, জীবনের বিভিন্ন সময়ে, ভারতের বহু প্রথিত তীর্থ পরিভ্রমণ করিয়াছেন; যেখানেই গিয়াছেন সেখানকার নিসর্গ-চিত্রই সর্বপ্রথম তাঁহাকে আকৃষ্ট করিয়াছে এবং প্রতিমার সম্মুখে, বিমুগ্ধ ভক্তের মত, কবি তাঁহার অন্তরের সমস্ত পুজারতি উজাড় করিয়া দিয়াছেন। এমন একান্ত করিয়া প্রকৃতিকে বোধ হয় আর কেহ দেখে নাই—এমন করিয়া আর কেহ তাহার কনক-কণিকাগুলি খুঁটিয়া খুঁটিয়া এমন অপরূপ কণ্ঠহার রচনা করে নাই। বিদ্রুত অন্তরের নিয়ত-উদ্‌গত এই যে একাকার-বৃত্তি—সাধ্য ও সাধকের এই যে একাত্ম অন্তরঙ্গতা, ইহারই নাম ভক্তি। রূপ-বিহ্বল কবি ভক্তিস্নাত অন্তরে ইন্দ্রিয়ের পঞ্চদীপে প্রকৃতির আরতি করিয়াছেন। প্রকৃতির বহিঃসৌন্দর্যই প্রধানত তাঁহাকে মুগ্ধ করিয়াছে এবং প্রাগ্‌-রাফাএল্‌ চিত্রকরগণের মতই, চিত্রকর্মা কবি বিক্ষিপ্ত চিত্রনিবহকে সমাহিত করিয়া ভাবের রঙ দিয়া রসের প্রতিমাগুলি নির্মাণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আধ্যাত্মিকতার উগ্র গন্ধ নাই—রবীন্দ্রনাথের মত ভূমা-দর্শনের গভীরতা অথবা অতীন্দ্রিয়তার অস্ফুটতা নাই; ইহারা রসোল্লাসে উচ্ছল, রঙে-রেখায় উজ্জ্বল, কারুকর্মের বিলসনে বিশিষ্ট ও বিরল। ছবি হইলেও এগুলি ভাবচ্ছবি, কীট্‌স-এর 'A thing of beauty'—এ সৌন্দর্যের উৎস কখন শুকায় না, 'The poetry of earth is never dead." দৃষ্টান্ত লওয়া যাউক:

১। গাছের ফাঁকে টুকরো আকাশ,
মউল-শালের সবুজ ভিড়,
উঠেছে দূর মঠের কোণে
ময়ূরকণ্ঠ 'ত্রিকূট'-শির;
পটে আঁকা তরুর শিরে
চূর্ণ কিরণ-পিচ্‌কিরি,
কানন-ছাওয়া মিঠে আওয়াজ—
লাখ' পাখীর গিটকিরি।
সামনে জরির ফিতায় বোনা
জলের ফণা ফেনিয়ে ধায়
তটিনীটির নর্ম-নটন ঊর্মি-নূপুর
তটের ছায়!
জমাট মসীর খণ্ডতলে ফলে ভরা
পিয়াল-বন,
টিলার উপর ছায়া-আলোক—
উধাও ছুট্‌ত বালক-মন।
(দেওঘরে)

২। মেঘ-মন্থর জল ঝরঝরে
যত কেয়া-ঝাড় ফুলে গেছে ভ'রে,
বেধেছে সমর ভ্রমরে ভ্রমরে
মধু-লুণ্ঠন লাগি'।

এতদিন ধরি' বলি-বলি করি'
যে কামনা বুকে র'য়েছে গুমরি'
আজি সমাদরে অধরে অধরে
তাহা কি জানাতে পারি?
(বর্ষায়)

উদ্ধৃত পংক্তিগুলি হইতে কবির প্রকৃতি-দৃষ্টির বৈশিষ্ট্যটি কতকটা ধরা পড়িবে। রূপের অতলে তলাইবার, আবার উপরে ভাসিবার নৈপুণ্য তাঁহার অসামান্য। রূপ হইতে ভাবে এবং ভাব হইতে রূপে এই স্বৈর-বিহার তাঁহার কাব্যে একটি অনির্ণেয় লাবণ্য সঞ্চার করিয়াছে। শব্দার্থকে ঘিরিয়া অর্থাতিগ একটি উপচ্ছায়া (penumbra) আছে। অর্থের কাজ কোন-কিছুকে সুস্পষ্টরূপে বুঝাইয়া দেওয়া, উপচ্ছায়ার কাজ রসাবেশের অনুকূল একটি মানস-অবস্থার সৃষ্টি। দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক:

১। মাধবী-লতার ফাঁকে বকুলের তলে
কে তরুণী মুঠি ভরি' ধরে চন্দ্রালোক!
(কানে কানে)

And radiant raindrops crouching
in cool flower
Dreaming of moths that drink them
under the moon.
(Great Lover: R. Brooke)

অর্থের স্ফুটতাই এখানে প্রধান প্রণিধেয় নহে; 'ধ্বনি'-ধন্য শব্দের সমবায়ে একটি বাতাবরণ সৃজন করাই ইহার মূল কথা। অলঙ্কারশাস্ত্রে কাব্য-রীতি প্রসঙ্গে 'জাতি' অর্থাৎ চিত্রণের যথাযথতা কথা বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু এই জাতি যে 'অগ্রাম্য' হওয়া চাই সেকথাও বারবার বলা হইয়াছে। 'অপল্লব', অব্যংগ্য বাক কাব্য পদবাচ্য নহে। গ্রাম্যতা-পরিহার ও ব্যঞ্জনা-সঞ্চারের জন্য প্রয়োজন বাগ্‌-রীতিতে বক্রতার উপযোজন—উপমা-রূপকাদি বিবিধ 'অংগহারে' চিত্রকে বিচিত্র করিয়া তোলা। জাতির অগ্রাম্যতায়, অর্থের অভিনবতা ও প্রসাদ রম্যতায় কবির অঙ্কিত আলেখ্যগুলি সত্যই অনুত্তম। শ্রেষ্ঠ কাব্যের গুণলক্ষণসমূহের এরূপ সমাবেশ অন্যত্র সুলভ নহে। ইংরেজিতে ধ্বনি ও রেখার "timbre" বলিতে যাহা বুঝায় মোটামুটি আমরা তাহাকে "আস্বাদ" আখ্যা দিতে পারি। করুণানিধানের চিত্রলেখগুলির অন্তর্লীন আস্বাদটিকে এককথায় অপূর্ব বলা যাইতে পারে।

এইবার আমরা কবি-প্রতিভার আর একটি দিকের পরিচয় দিব। এই বৈশিষ্ট্যটি 'রোমান্‌টিসিজ্‌ম্‌'-এর মূল-কথা। এই প্রসঙ্গে আলেখ্যের বর্ণাঢ্যতা, ভাব-কল্পনার অভিনবতা অথবা ইচ্ছাকৃত অস্পষ্টতা, আবেগের উদগ্রতা, আংগিকের বিচিত্রতা ও চমৎকারিতা প্রভৃতি বহু প্রসঙ্গেরই অবতারণা করা যাইতে পারে। বর্ণানুরঞ্জন ও স্বর-প্রস্রবণের কথা পূর্বেই আলোচিত হইয়াছে। রোম্যান্‌টিক্‌ কাব্যের এই সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অনেকগুলিই আলোচ্য কাব্যেও পাওয়া যাইবে সন্দেহ নাই; কিন্তু কবির কাব্য-পরিপ্রেক্ষায় এগুলির স্থান কতকটা গৌণ, সুতরাং আমরা সংক্ষেপে শুধু তাঁহার মূল সুরটিরই আলোচনা করিব। এই লক্ষণটিকে কবির নিজের কথায় আমরা 'সুদূর-বিধুরতা' বলিতে পারি। যাহা প্রত্যক্ষ ও নিকট, যাহা একান্ত অব্যবহিত, কীট্‌স্‌-এর মত, করুণানিধানও তাহার মধ্যে প্রেরণার উৎসটি খুঁজিয়া পান নাই। সাম্প্রতিক সমস্যাগুলি তাই তাঁহার প্রসঙ্গ-পরিধি হইতে অনিবার্য-রূপেই বাদ পড়িয়াছে। অথচ এই যুগ-ও জীবন-সমস্যা কবিবন্ধু সত্যেন্দ্রনাথের কাব্য-কক্ষার অনেকখানি স্থানই জুড়িয়া আছে। কবির মানস-প্রকৃতির গঠনই এমন যে একটা কিছু উপলক্ষ্য পাইলেই তাঁহার

কল্পনা অতীতের অভিমুখে উজানে বহিয়া যায়—কবির ভাষায় 'বুকের ভিতর রসের উজান ফল্গু চলে'—যাহা-আছে তাহাকে ফেলিয়া যাহা-নাই তাহারই পিছনে তাঁহার মন আবিষ্টের মত ঘুরিয়া বেড়ায়। অতীত ভারতের ঐতিহ্য-পূত স্থানগুলি দেখিতে দেখিতে বিস্মৃত-দিনের স্মৃতি-সৌরভে তাঁহার মন ভরিয়া যায় এবং প্রত্যক্ষদর্শীর প্রত্যয় লইয়া তিনি একটির পর একটি ছায়া-ছবি আঁকিয়া যান, অতীত তাহার সমস্ত মায়া-মাধুরী লইয়া সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। নিকট হইতে দূরে সরিয়া যান সত্য, কিন্তু সেই দূরকে আবার কুহক-কৌশলে এমন নিকটে টানিয়া আনেন যে মনে হয় যেন ঘটনা-গুলি চোখের সম্মুখেই ঘটিতেছে,—দ্রষ্টা ও দৃশ্যের মধ্যে কোন ব্যবধান নাই। অতীতের অস্তরাগ-দীপ্তিটি দৃষ্টি-দিগন্তে ফুটাইয়া তোলা—নিকটকে আড়াল করিয়া দূরের কস্তুরী-সুগন্ধটি ঘ্রাণ-সীমায় ঘনাইয়া আনা—রোম্যান্টিক্ দৃষ্টিভঙ্গীর একটি বিশিষ্ট আঙ্গিক। মনোবেগ তীব্র হইলেও ভাষার মধ্যে কিন্তু দ্রুত সঞ্চরণের কোন চিহ্ন নাই;—ছন্দো-লয়ে উল্লাস আছে, কিন্তু উল্লোলতা নাই। এই দিক দিয়া ইংরেজ কবি রসেটির সহিত তাঁহার সহধর্মিতা ও সমমর্মিতার কথা সহজেই মনে আসে। দৃষ্টান্ত দেখুন:

হোথা বংশীবটচ্ছায়ে ব্রজেশ্বর মদন-মোহন
আলিংগিয়া শ্রীরাধারে শিখাতেন মুরলী-বাদন;
ভাণ্ডিত অশোক-মূলে বিলাসিনী
কেলির কুংকুম,
ফুটিত রাতুল পদে রাধা-পদ্ম গোকুল-কুসুম।
শাঙনের ঝরা-মেঘে জলধনু এপার-ওপার।
কালিন্দীর নীল নীরে শিহরিত প্রতিবিম্ব তার
কোন্ ঘাটে ভরা তরী ভিড়াতেন
পারের কাণ্ডারী?
বন-ফুলে কানু-ধনে সাজাইত ব্রজের কুমারী।

শরতে মালতী-বাসে আমোদিত ঝুলন-রজনী,
ধূসর গগনে ইন্দু; রসরাজ শ্রীহরি আপনি
মণিবন্ধে রাধিকার বাঁধিতেন পুষ্পময়ী রাখী;
হাসিতেন সোহাগিনী কদম্বের
শুভ্রধূলি মাখি'!
(শ্রীবৃন্দাবনে)

গোচর ও অগোচরের সঙ্গম-সীমায় দাঁড়াইয়া কবি দূরকে যেন প্রত্যক্ষের মতই স্পষ্ট দেখিতেছেন এবং কারু-কুহকে উজ্জীবিত করিয়া পাঠকের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন। রসাভিব্যক্তিতে অলঙ্কারগুলি আর বহিরঙ্গ নাই; 'শরীরীকৃত' হইয়া কাব্য-শোভার সহিত একীভূত হইয়া গিয়াছে।

বহু কবিতায়, বিশেষ করিয়া তীর্থ-কবিতাগুলিতে, কবির আত্মদর্শনের পরি-চয় পরিস্ফুট। সংসারচক্রে নিষ্পেষিত হইয়া অহরহ যে মর্মজ্বালা তিনি অনুভব করিতেছেন, আর্ত ক্রন্দনের মতই, তাহা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কবে তিনি সংসার-'কারাগার' হইতে নিষ্ক্রমণের পথ খুঁজিয়া পাইবেন, কবে তাঁহার 'মোহ-ধ্বান্ত' বিদূরিত হইবে সেই ভাবী শুভ-দিনের পথ চাহিয়া তাঁহার দিন কাটিতেছে। 'রূপে ও রূপার লালসার বিষে বিপন্ন' কবি তাই প্রপন্ন অন্তরে সেই 'চিন্তামণি'র শরণ লইয়াছেন। বিষয়-বিপণিতে বিকিকিনি করিয়াই যে কাল কাটিল, কাজের কাজ যে কিছুই হইল না —এমনি একটি নির্বেদের সুর ইহাদের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে অনুস্যূত। জীবনের কল্পিত অতিচারের জন্য প্রৌঢ় কবির এই আত্ম-শোচনা বড়ই মর্মস্পর্শী—তদ্গত ভক্তের প্রেমাশ্রুধারায় ইহা মেধ্য ও মেদুর। এই নির্বেদের অবসান হইয়াছে নিবেদনে, ইহারই মধ্যে কবি-চিত্তের স্থিতি। দর্শনের জ্ঞান এবং জ্ঞানের দর্শন কবিতাগুলিতে এমন অঙ্গাঙ্গীভাবে মিশিয়া আছে—জীবন-জিজ্ঞাসা এমন অপূর্ব কবিত্বময়ী স্ফূর্তি লাভ করিয়াছে যে দার্শনিকতার এই অবলেপ কাব্যদ্যুতিকে বিন্দুমাত্রও ম্লান করিতে পারে নাই। দার্শনিক চিন্তার মধ্যেও যে এমন কবিত্ব-মাধুরী সঞ্চার করা যায়—বর্তমানের প্রেক্ষামঞ্চ হইতে ব্রজলীলার অভিনয় যে আবেশের চোখে এমন রঙীন ও নবীন করিয়া দেখা ও দেখান যায় তাহা কে জানিত?

সীমাহীন তুমি মূরতি ধরিয়া ছিলে
ভুবনের নয়ন-আলো,
মানুষ না হ'লে কেমন করিয়া
মানুষে তোমায় বাসিবে ভালো?
খেতে ননী-সর মুছিতে শ্রীকর
তমালের কালো পাতার পিঠে,
মুখে তুলে দিত সখারা তোমার
এ'টো ফল যদি লাগিত মিঠে।
ছিলে দুরন্ত নন্দ-দুলাল,
লুকাতে সহসা পাইলে ছাড়া,
শ্যাম-কুঞ্জের পথ-সন্ধিতে
নূপুর কুড়ায়ে পেয়েছে কারা?
(পুরীতে)

এই দর্শন ও চিত্রণের কি তুলনা আছে? অসীম রূপের সীমায় ধরা দিয়া-ছেন, লীলায় নর-বিগ্রহ ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু সেই মায়া-মানব তাঁহার ঐশ্বর্য-রূপে ব্রজ-পরিজনদের বিস্মায়িত করেন নাই, মাধুর্য-রূপে তাহাদের মন ভুলাইয়া-ছেন; কাছে আসিয়াছেন, ভালো বাসিয়া-ছেন, 'মমতা'-অমৃতে অঞ্জলি ভরিয়া মুখের সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছেন; সখারাও 'এ'টো ফলটি'ও মিষ্ট লাগিলে শ্রীমুখে তুলিয়া দিতে দ্বিধা করে নাই। 'পদ'-কাব্যের সৌন্দর্য-সন্ধিগুলির এরূপ সংকেত—রসাবেশের এরূপ অপরূপ উন্মেষ কদাচিৎ চোখে পড়ে। চিন্তার সহিত চেতনার এই মেল-বন্ধন কিন্তু সর্বত্র সমান সার্থক হয় নাই। এই প্রসঙ্গে 'হৃষীকেশে' কবিতার দর্শন-চিন্তাগুলির (নমঃ সহস্র' হইতে শেষ পর্যন্ত) উল্লেখ করা যাইতে পারে। কাব্য এখানে কীট্‌স্-এর ভাষায় 'cold philosophy' অথবা শুষ্ক দর্শনে পরিণত হইয়াছে। মূলত, দর্শনের সহিত কাব্যের কোন বিরোধ নাই —হাত ধরাধরি করিয়া উভয়ে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতে পারে। চিন্তার সহিত আবেগ-স্পন্দ যুক্ত হইয়া যখন তাহাকে ছন্দিত করিয়া তোলে—ভাব যখন কবির

ভাষায় অভিব্যক্ত হইয়া রস-রূপে নিস্যন্দিত হয়, তখন দর্শনও কাব্য হইয়া যায়। দর্শন 'abstract'—অমূর্ত অনুভূতির রসময় বাণীমূর্তিই কাব্য। উভয়ের মধ্যে ভেদ-রেখাটি খুব সূক্ষ্ম ও অস্পষ্ট বলিয়া অসতর্ক মুহূর্তে একের অধিকার-সীমায় অপরের অচ্ছন্দ অনধিকার-প্রবেশ সহজেই ঘটিতে পারে।

কবির 'পূর্বরংগ'-ভূমি বহু-বিস্তৃত নহে। ঐকতানে ধ্বনি-সন্নিবেশের তনুতা সহজেই লক্ষ্য-গোচর হয়, কিন্তু যে দু'-একটি তান তিনি তাহাতে তুলিয়াছেন তাহা যেমন রসোচ্ছল, তেমনি বর্ণোজ্জ্বল। স্বক্ষেত্রে তিনি আজও অপরাজিত।

২৫

রমেশ রায়ের সই করা চিঠির ওপর দ্রুত চোখ বুলিয়ে পারিজাত মুখ তুলল। শিবনাথের বুক দুরদুর করছিল। সুশ্রী সুবেশ পরিচ্ছন্ন এবং অতিরিক্তরকম মার্জিত এই লোকটির সামনে ব'সে শিবনাথ রীতিমত ভয় করছিল পাছে না সে কোনরকম অসৌজন্যতা, অভদ্রতা, নোংরামি কি কথার উত্তর দিতে গিয়ে নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে।

আর শিবনাথ তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল পারিজাতের ড্রইংরুম।

অতিরিক্তরকম আধুনিক। পরিচ্ছন্ন এবং সুসজ্জিত তো বটেই।

একটা শোফার ওপর শিবনাথ মেরু-দাঁড়া বেঁকিয়ে বসেছিল। আর পারিজাত তার সুন্দর বাঘছাল চটি পায়ে পায়চারি করছিল। টিন থেকে সিগারেট তুলে পারিজাত মুখে গুঁজল এবং দেশলাই জেলে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। শিবনাথকে সিগারেট অফার করা হ'ল না।

'মশাই আপনারা বি এ এম এ পাশ করেছেন কিন্তু আপনাদের শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতি ভাল না।'

'কি রকম?' প্রশ্ন করতে গিয়ে শিব-নাথ করল না। কেন না পারিজাতের বক্তব্য তখনো শেষ হয়নি।

'আপনি কি আট নম্বর বস্তিতে থাকেন?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'নতুন এসেছেন?'

শিবনাথ মাথা নাড়ল।

'আপনি আর কিছু করেন কি?'

'আমি আপাতত কিছু করছি না। তবে একটু ব্যবসাটেবসা করব ইচ্ছা আছে।'

পারিজাত অল্প শব্দ ক'রে হাসল।

'ব্যবসা করবেন কিছু টাকা সংগ্রহ হয়েছে বুঝি?'

'ঠিক তা না।' শিবনাথ বলল, 'আমার ওয়াইফও গ্র্যাজুয়েট। তিনি কমলাক্ষী গার্লস হাই স্কুলের টিচার। আমার টুইশানির টাকাটা জমিয়ে আমি ছোট-খাট কিছু স্টার্ট দিতে চাই।'

'গুড্ আইডিয়া।'

পারিজাত একসঙ্গে প্রচুর ধোঁয়া উদ্গিরণ করে শিবনাথের চোখের দিকে এতক্ষণ পর তাকাল। রমেশের সই করা চিঠিটা ছিঁড়ে দু'টুকরো করে ফেলল।

'না, বলছিলাম আপনাদের বস্তির আর এক ভদ্রলোক সেদিন এসেছিলেন। এম এ পাশ। উঃ, আমার সাত আট বছরের দু'টো বাচ্চাকে পড়াতে বসে তিনি আধ ঘণ্টার মধ্যে আশীটা ইংরেজী শব্দ বলে ফেললেন। আমি ওদের পড়ার ঘরেই তখন ছিলাম।'

'কি পড়াচ্ছিলেন?' শিবনাথের হাসি পেল।

'প্রাথমিক স্বাস্থ্য-বিজ্ঞান।' পারি-জাত এখন আর হাসছিল না। 'বাংলা শব্দগুলোর বাংলা মানে তিনি ভুলে গেছেন বলে মনে হ'ল। অপরিচ্ছন্ন বোঝাতে ডার্টি, বাষ্প বোঝাতে ভেপার, বীজাণু বোঝাতে ব্যাক্টেরিয়া ইত্যাদি আমদানী করলেন। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে আমার ছেলে দু'টি। একবার চিন্তা করুন।'

শিবনাথ চুপ ক'রে রইল।

'কি নাম ভদ্রলোকের, হ্যাঁ, কে গুপ্ত। এককালে তিনি কোন অফিসের ভয়ানক বড় অফিসার ছিলেন শুনেছি।' পারিজাত এবার মৃদু হাসল।

'তারপর!' কৌতূহল দমন করতে না পেরে শিবনাথ বলে ফেলল, 'তাই বলুন।'

'তারপর আর তাকে আমি আসতে নিষেধ করলাম।' পারিজাত বলল, 'আমার ছেলেরা বাঙ্গালী, সাত থেকে আট বছর ওদের বয়েস। পড়াতে বসে যিনি কথাটা ভুলে যান তাকে আমি শিক্ষক বলি না।'

শিবনাথের হাসি পেল এবং দুঃখও হ'ল। তখন রায় সাহেবের নাতিদের পড়ানোর প্রস্তাবে বনমালীর ওপর কে গুপ্তর ক্ষিপ্ত হওয়ার দৃশ্যটা মনে পড়তে শিবনাথ লোকটিকে মনে মনে করুণা না ক'রে পারল না।

'কাজেই বুঝতে পারছেন—' পারিজাত এর অধিক কিছু বলল না।

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'ভাল কথা, আপনি পড়াতে চাইছেন, আমার আপত্তি নেই। আপনি ওদের মার সঙ্গে কথা বলুন। এই ডিপার্ট-মেণ্ট শ্রীমতীর। হাজার কাজে আমায় এত বেশি এনগেজ্ড থাকতে হয় যে, এদিকে আর—' বাক্য শেষ না ক'রে পারি-জাত স্ত্রীর নাম ধ'রে ডাকলেন। পর্দা সরিয়ে মহিষী ড্রইংরুমে এসে ঢুকলেন। যেন পর্দার ওপারে দীপ্তি অপেক্ষা করছিলেন। হয়তো এতক্ষণ দু'জনের কথাবার্তাও শুনেছেন।

শিবনাথ হাত তুলে নমস্কার করল। প্রতিনমস্কার জানিয়ে তিনি স্বামীর পাশে দাঁড়ান।

'আপনি আমাদের আট নম্বর বস্তিতে থাকেন?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল। 'আমরা নতুন এসেছি।'

'তা জানি।' দীপ্তি মাত্র একবার শিবনাথের আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে তারপর আর সেদিকে তাকালেন না। টেবিলের ফুলদানিটা একদিক থেকে সরিয়ে আর একদিকে রাখেন। একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থেকে শিবনাথ অন্য প্রশ্নের উত্তর দিতে প্রস্তুত হয়।

'এ'র স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট। একটা ইস্কুলে আছেন।' পারিজাত স্ত্রীকে বলল। কিন্তু দীপ্তি তাতে বিশেষ মনোযোগ দিলেন না। কথাটা তিনি আদৌ শুনলেন

কিনা বুঝতে না পেরে শিবনাথ একটু অস্বস্তিবোধই করল। সিগারেট মুখে রেখে পারিজাত কথা বলে।

'চলতি কথায় প্রাইভেট টিউটর বলতে যা বোঝায় আমি আমার ছেলেদের জন্যে সেরকম কিছু চাইছি না।' দীপ্তি এবার মুখ ফেরান। 'আমি জানি, জানতাম এসব জায়গায় এসে বাস করলে আর যা-ই হোক বাচ্চাদের লেখাপড়া হবে না।'

ক্ষুব্ধ কণ্ঠস্বর, শিবনাথের বুঝতে কষ্ট হ'ল না।

'কেন, সেই যে, কি নাম? এদের নামগুলো আমি যখন তখন ভুলে যাই,— বুড়ো মাস্টারটাকে তোমার পছন্দ হ'ল না? ভেটারেন স্কুল মাস্টার শুনছি।'

স্বামীর দিকে না তাকিয়ে দীপ্তি শিবনাথকে বললেন, 'আপনাদের বাড়ির বিধুমাস্টারের কথা বলছে ও। আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়েছে নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ, পরিচয় মানে একদিন দু' একটা কথা হয়েছে, এই পর্যন্ত।' মহিলার কণ্ঠস্বরে তাচ্ছিল্যের ভাব লক্ষ্য ক'রে শিবনাথ সতর্ক হ'য়ে উঠল। 'এদের কারোর সঙ্গে আমার তেমন—'

'তা তো হবেই, তা তো বটেই।' পারিজাত বলল, 'এদের মধ্যে যারা অশিক্ষিত তারা তো বটেই, লেখাপড়া জানা লোকগুলোও কেমন আন্‌কালচার্ড রাস্টিক, চলাফেরায় কথাবার্তায় এমন একটা—'

'ব্রুট্ ব্রুট্।' দীপ্তি একটা শোফার বসে পড়লেন। কণ্ঠস্বরে তাচ্ছিল্যের চেয়ে ঘৃণা বেশি, বিরক্তির চেয়ে রাগ। ভ্রমরকৃষ্ণ ভ্রূযুগলের কুঞ্চন প্রসারণ লক্ষ্য করতে গিয়ে একটু বেশি সময় শিবনাথ মহিলার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

'বিধুকে ডাকিয়ে একদিন ট্রায়াল দিয়েছিলাম। উঃ—' দীপ্তি সুন্দর মুখখানা আবার বিকৃত করলেন। 'একে এমন নোংরা বেশভূষা, পড়াতে বসে একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে লাগল, থুতু ফেলল জানালার গরাদে, সেই কাঠি আবার কানে গুঁজে নোংরা হাতটা ছেলেদের বই খাতার ওপর রাখল, আপনি কল্পনা করতে পারেন? দাঁড়িয়ে আমি দৃশ্যটা দেখলাম। আমার মাথা ঘুরছিল। অ্যাঁ, এই লোক আমাদের ছেলেদের মানুষ করবে!'

'তারপর?' শিবনাথও ঘৃণায় মুখ কুঞ্চিত করল। 'আমি স্কামটার সঙ্গে কথাই বলি না। মুখে দুর্গন্ধ।'

'বস্তির লোক। এর চেয়ে ওর কাছ থেকে আর কি ভাল আশা করতে পার।' পারিজাত শব্দ ক'রে হাসল। 'সেদিনই মাস্টারকে জানিয়ে দিতে হ'ল আমাদের ছেলেদের পড়াতে হবে না।' পারিজাত শিবনাথের দিকে তাকায়।

শিবনাথের দুই কান লাল হয়ে গেল। কিন্তু মুখের হাসি নিভতে দিল না। 'আমার ধারণা ছিল এখানে,—অবশ্য কম থাক বেশি থাক সেটা বড় কথা নয়,— চলাফেরায়, কথাবার্তায় অন্তত এরা সভ্য, সুশ্রী হবে, কিন্তু এখন দেখছি অন্যরকম।' শিবনাথ পারিজাতকে বোঝাতে চেষ্টা করল। 'শহরে ঘর একরকম পাওয়াই যাচ্ছে না। ফাইন্ডিং নো আদার অলটারনেটিভ, বুঝলেন না, নিরুপায় হয়ে আজ এখানে আমি আছি—অন্যত্র সুবিধামতন ঘর পেলেই—'

পারিজাতের আগে দীপ্তি শিবনাথের দুঃখটা বুঝলেন। 'অবশ্য সবাই যে বিধুমাস্টারের মতন আমি তা বলব না। ভদ্রসমাজে মিশতে পারে এমন লোকও দু' একজন আছে, এই ধরুন আপনাদের রমেশ। আমার তো বেশ পছন্দ হয় লোকটিকে।'

'ও রমেশ! হি ইজ ওয়াণ্ডারফুল।' পারিজাত মাথা নাড়ল। 'অথচ দেখুন লেখাপড়া একরকম জানে না বললেই চলে। তবু কত সভ্য মার্জিত।'

'তা ছাড়া যাকে বলে সেল্‌ফ-মেড্ ম্যান। ভয়ানক গরিব ছিল যখন এখানে আসে। আমি শ্বশুর মশায়ের কাছে শুনেছি। কিন্তু মাথা খেলিয়ে এটা ওটা করতে করতে এখন বেশ দু'টো পয়সা ক'রে ফেলেছে।'

'আমি শুনেছি, আমায় বলেছেন সব রমেশবাবু।' শিবনাথ গর্বিতভাবে দীপ্তির চোখে চোখ রাখল। 'অবসর সময়টা আমি তাঁর চায়ের দোকানেই বসে কাটাই।'

'আমি তাই ভাবি।' পারিজাত বলল, 'শুনি লোকে উপোস থাকছে, বাড়িভাড়ার-টাকা জোগাড় করতে পারে না, স্ত্রীপুত্রকন্যার পরনে কাপড় জামা নেই,—কিন্তু কেন এমন হয়, নিশ্চয়ই তাদের বুদ্ধির দোষে এমন হচ্ছে।'

'আরো কারণ আছে।' দীপ্তি একটু বক্তৃতার সুরে বললেন, 'অলসতা, কর্ম-বিমুখতাও দারিদ্র্যের লক্ষণ। না হলে ধরুন, এই অমল, তেমন লেখাপড়াও জানে না, বেশ তো চাকরি ছিল না; তুমি ফিরি ক'রে এটা-ওটা, যেমন লজঞ্চুস বিস্কুট কি তেল সাবান বিক্রি ক'রে দুটো পয়সা রোজগার করতে পারতে, নিশ্চয়ই তাতে তোমার সম্মান ক্ষয়ে যেতো না।'

পারিজাত বলল, 'যোয়ান ছেলে রিক্সা টানতে পার, মোট বয়ে পেট চালাতে তোমার মত লোকের আপত্তি করা উচিত না, কি বলেন?'

ক্ষীণ হেসে শিবনাথ বলল, 'এসব ওদের বোঝায় কে বলুন—'

বাধা দিয়ে উত্তেজিত স্বরে পারিজাত বলল, 'বোঝাতে যাওয়া বিপজ্জনক, সদুপদেশ কেউ দিতে গেলে তারা তার অন্য রকম অর্থ ধরে নেয়। নিয়েছে। এ্যাজ ফর ইন্‌স্টেন্‌স, রমেশ বুঝি বলছিল তার স্ত্রীকে না হয় আমাদের গেঞ্জির কলে কাজ নিতে, এণ্ড দ্যাট্ বাগার ওয়েণ্ট আপ টু কিল্ হিম, অমলকে নাকি ইন্‌সাল্ট করা হয়েছে একথা বলার দরুণ,—বুঝুন। মারতে চেয়েছিল সে রমেশকে।'

'শুধু তাই?' শিবনাথ লক্ষ্য করল দীপ্তিও কম উত্তেজিত হন নি। চোখের ইঙ্গিতে স্বামীকে দেখিয়ে বললেন, 'পর্যন্ত ও'র সম্পর্কেও নানারকম কথা বলতে অমল ভ্রূক্ষেপ করেনি,—মোজার কলে গেঞ্জির কলে মেয়েদের ঢোকানো হচ্ছে এটা কিছুতেই অমল আর তার দলের লোকেরা ভাল চোখে দেখছে না—'

'মূর্খ'।' অস্ফুটে বলল শিবনাথ।

'এরকম সমস্ত ব্যাপার।' পারিজাত উত্তেজনাটা একটু প্রশমিত করে সিগা-রেটের পরিবর্তে এবার পাইপ ধরায়। তারপর আস্তে আস্তে পায়চারি করে বলে, 'এদের ভাল করতে যাওয়া উচিত না, ভাল করতে গেলে তাতে মন্দের অংশ কতটা দাড়িপাল্লা নিয়ে ওজন করতে বসে, উপকার করতে গেলে তাতে কী পরিমাণ ত্রুটি আছে খুঁজতে আরম্ভ করে। ঘরের

অভাব, শহর শহরতলিতে লোকের সংখ্যা বেড়ে গেছে, জঙ্গল কেটে খানা ডোবা বুজিয়ে খরচপত্র করে টিনটালি দিয়ে আস্তানা তৈরী করে মানুষকে থাকতে দেওয়া হল, অমনি নিন্দা আরম্ভ হ'ল বস্তি বসানো হয়েছে গরিবদের এক্সপ্লয়েট করতে,—কেপিটেলিস্ট রায় সাহেব আর তার ছেলের আর পাঁচটা কারবারের মত এটাও বড় রকমের একটা বিজনেস।'

পারিজাত চুপ করতে দীপ্তি বললেন, 'এ্যাজ ফর ইনস্টেন্স, এখানে মেয়েদের একটি সমিতি আছে, সমিতি মানে পাঁচটি মেয়ে একত্র হয়ে আমাদের বাড়ির পিছনের জমিতে কানামাছি খেলত, এসে দেখেছি, তারপর আমি টাকা দিলাম, বই এল পাঁচরকমের খেলাধুলোর সরঞ্জাম এল, মেয়েরা নাচ গান, সূচের কাজ, রান্না, রুগীর সেবা শিখতে পারে তার সবরকম ব্যবস্থাই করে দিলাম। কিন্তু অন্যদিক থেকে আরম্ভ হ'ল এডভার্স ক্রিটিসিজম, কি, না—' কথা অসমাপ্ত রেখে দীপ্তি স্বামীর দিকে তাকান। মুখে থেকে পাইপ সরিয়ে পারিজাত শিবনাথের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে কথাটা শেষ করলঃ 'বড়লোক গরিবদের শোষণ করছে, কিন্তু বড়লোকের গিন্নী সমিতি টমিতি ক'রে সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার দেখাচ্ছেন। মানে ইলেক্শান আসছে কিনা, স্ত্রী মারফং পারিজাত ভোটের অঙ্ক বাড়াবার ফিকিরে আছে।—বুঝুন।'

শিবনাথ মৃদু হাসল।

'কাজেই আমিও ঠিক করেছি, ওদের ভাল আর করব না।' প্রায় দাঁতে দাঁত ঘ'ষে পারিজাত বলল, 'ইচ্ছা ছিল আপনাদের বাড়ির সামনের রাস্তাটা পাকা ক'রে দেব, কিন্তু দিলে হবে কি, বলবে বস্তির লোকের সুবিধার জন্যে কি আর পারিজাত এটা করছে, জলকাদায় নিজের গাড়ি চালাবার অসুবিধা হয় দেখে এদিকে নজর পড়েছে।'

'তুমি অতি সহজেই ডিসহার্টেণ্ড হয়ে পড়ো।' স্বামীর কথা শুনে দীপ্তি রুষ্ট হন। কুঞ্চিত ভ্রূযুগল। 'শ্বশুর মশায় অসুস্থ। নিজে এসে দেখাশোনা করতে পারেন না। কিন্তু তাই বলে তুমি যদি হাল ছেড়ে দাও তবে কিছুই থাকবে না। বস্তি এখানে বড় কথা না। ব্যবসা বাণিজ্য ছড়িয়ে আছে সেগুলো দেখতে হবে। যদি বোঝ বেশি বাড়াবাড়ি করছে আস্তানা ভেঙ্গে দাও, দরকার নেই আমার বেকার বাউণ্ডুলে সব ভাড়াটে বসিয়ে, ফি মাসে ঘরভাড়া আদায়ের হাঙ্গামা পোহানো।'

'না না, তা হবে না।' পারিজাত আবার ধীরে ধীরে পায়চারি করছিল। 'আই হ্যাভ ডিসাইডেড—' স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'আঠারো টাকা ভাড়া দেবার সামর্থ্য নেই, কিন্তু চল্লিশ টাকা ভাড়া গুণতে পারে এমন লোকেরও অভাব হবে না। বাবার সঙ্গে কনসাল্ট করতে পারছি না কর্পোরেশনের সঙ্গে হাঙ্গামাটা চুকছে না তাই। আরো কিছু টাকা ঢালতে হবে হয়তো। ড্রেনের মামলাটা চুকে গেলে আমি ওখানে পাকা বাড়ি তুলব। বেকার বাউণ্ডুলের বস্তি আর রাখছি না।'

'তাই কর, তাই করা উচিত।' দীপ্তি স্বামীর দিকে না শিবনাথের দিকে তাকান। 'কুৎসিত কদর্য ওয়ান পাইস ফাদার-মাদারদের বাড়ির কাছে রেখে জায়গাটাকে নরক করে রেখো না, কি বলেন? সুন্দর অধরোষ্ঠের বঙ্কিম ভঙ্গিমা শিবনাথকে মুগ্ধ করল। 'নিশ্চয়ই।' মাথা নাড়ল সে। দীপ্তি আলস্যভঙ্গের হাই তুলে বললেন, 'যাকগে, এখন কাজের কথায় আসা যাক, রমেশ পাঠিয়েছে, তুমি কি এই ভদ্রলোককে ছেলেদের টিউটার রাখবে ঠিক করলে?'

'হ্যাঁ, সেজন্যেই তো এত কথাবার্তা।' পারিজাত স্ত্রীর দিকে তাকাল। 'তুমি কি আজই এ'কে ট্রায়াল দিয়ে দেখতে চাও?'

'আজ, ও বাবা, ভীষণ টায়ার্ড আমি। তা ছাড়া, ওরা এখন পর্যন্ত ফিরলই না। আসবে, বিশ্রাম করবে, পোশাক বদলাবে, দুধ খাবে—পড়া আরম্ভ করতেই অনেক রাত। ওরা আজ পড়বে না, তা ছাড়া, অতক্ষণ কি উনি বসে থাকবেন?

চারদিকে তাকিয়ে যেন অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার মতন শিবনাথ প্রশ্ন করলঃ 'বাচ্চারা বুঝি এখনো বেড়িয়ে ফেরেনি?'

'হ্যাঁ, ওদের জন্যে নতুন গাড়ি কেনা হয়েছে আজ। খুব বেড়াচ্ছে, সারাদিন বেড়িয়েছে, একটু আগে সরকারকে সঙ্গে দিয়ে শহরে পাঠালুম। আমার ওষুধও আনা হবে, ওদেরও বেড়ানো হবে।'

কি ওষুধ, খাওয়ার কি লাগাবার, অসুখটা কোথায় ইত্যাদি জানবার জন্যে শিবনাথ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত কৌতূহলবোধ করল কেননা, শোফার ওপর ঈষৎ হেলে বসা পারিজাত গিন্নীর পেঁয়াজ রঙের একটা ওভারকোটে গলা পর্যন্ত ঢাকা নাতিবৃহৎ তনু, শঙ্খের মত গ্রীবা, আপেলমসৃণ লালাভ গালের কোথাও অসুখ থাকতে পারে শিবনাথ চিন্তা করতে পারল না। বাঁ হাতের অনামিকায় একটা হীরের আঙটি। উজ্জ্বল কালো চোখের তারা। চোখেরও কোন অসুখ নেই এ সম্পর্কে শিবনাথ নিশ্চিন্ত ছিল। একবারও চোখের পাতা একত্র না ক'রে শিবনাথ তাঁর দুধে-আলতা রং আঙুলের নখগুলি দেখতে লাগল। প্রসারিত বাঁ হাতটা দীপ্তি একটা হাঁটুর ওপর রেখে পা-টা একটু একটু নাড়ছিলেন।

'আমরাও এই সবে বেড়ানো শেষ করে ঘরে ফিরলাম।' পারিজাত বলল।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' রমেশের চিঠি নিয়ে শিবনাথ বিকেল থেকে এখানে অপেক্ষা করছিল। বাইরে বারান্দায় ব'সে ছিল। তাঁরা বাড়ি ফিরে তাকে ড্রইংরুমে এনে বসিয়েছে।

'আজ দুজন একলা বেড়াতে বেরিয়ে আমরাও অনেকদূর গিয়েছিলাম।' দীপ্তি বললেন, 'তা আপনি কাল একবার আসুন।'

'কখন, সকালে না কি—' শিবনাথ মেরুদাঁড়া সোজা করল।

'ও, বাবা, সকালে হবে না, মেয়ের গানের মাস্টার আসে, আমাকেও থাকতে হয়—'

'বেশ তো,, না হয় বিকেলে, মানে সন্ধ্যার পর এমন সময়—'ইতস্তত করছিল শিবনাথ।

'আসুন।'

শিবনাথ উঠে দাঁড়াবে এমন সময় বাইরে কলরব শোনা গেল। গাড়ি এসে দাঁড়িয়েছে দরজায় বোঝা গেল।

'ওরা এসেছে।' পারিজাত ভুরু তুলল।

'এ্যাঁ, বেড়ানো হয়ে গেল!' দীপ্তি তড়াক্ করে সোফা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। 'বাবলু—মোনা—চন্দন—কেয়া—রেবা—রঞ্জু—শোভন, ওকি এর মধ্যেই তোমাদের হয়ে গেল। সরকার মশায় কোথায়।'

দরজায় দাঁড়িয়ে দীপ্তি রীতিমত হাঁপাতে থাকেন আর সব ভিড় করে মাকে ঘিরে দাঁড়ায়।

বড় বড় চোখ, কালো কোঁকড়া চুল, পাকা ডালিমদানার মতন গায়ের রং। ছেলেগুলো সুন্দর কি মেয়েগুলো বলা শক্ত। শিবনাথ হা করে তাকিয়ে দেখল। দেখে, যেমন সেদিন খালপাড়ে বিস্মিত অভিভূত হয়েছিল এখনও তার মনের অবস্থা তাই হল। দীপ্তির দিক থেকে শিবনাথ চোখ ফেরাতে পারছিল না। গর্ভধারিণী! যেন বিশ্বাস হয় না, বিশ্বাস করতে বাধছিল শিবনাথের। হঠাৎ তার খেয়াল হয় সবাই তার দিকে তাকিয়ে মনোযোগ দিয়ে দেখছে। শিবনাথ লজ্জা পায়।

'কে মা, ইনি কি—'

'তোমাদের নতুন মাস্টার মশায়—'

'এখনো হয়নি, কাল ঠিক হবে।' পারিজাতের দিকে রুষ্ট ভ্রূভঙ্গি হেনে দীপ্তি বাচ্চাদের বললেন, 'আট নম্বর বাড়িতে থাকেন।'

'ও, সেই বস্তিতে, ধেৎ!' বড় ছেলেটি তৎক্ষণাৎ আপত্তিসূচক মাথা নাড়ল।

বড় মেয়েটি গাল ফোলাবার মতন চেহারা করে বাবার দিকে তাকায়। 'ইস্, মণ্টুদার মতন মাস্টার এখানে পাব না বাবা, উনি কি আমার অঙ্ক বোঝাতে পারবেন।'

মেজ ছেলেটি বড় ছেলেটির কাঁধ ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'আপনি কি ফুটবল খেলা দেখেন, বলুন তো এবার ইস্টবেঙ্গল মোহন-বাগানের কাছে এত মার খেল কেন?'

শিবনাথ অবাক হ'ল এবং খুশীও হ'ল শিশু প্রশ্নকর্তাদের গম্ভীর চেহারা দেখে।

মেজ মেয়েটি বলল, 'আমি জানি, এবার নিউ এম্পায়ারে যে গীটার বাজনা হয়ে গেল আপনি দেখতে যাননি। লম্বা মেয়েটার দেশ কোথায় আপনি জানেন? জানেন না। নরওয়ে। নরওয়েজিয়ান গার্ল। নাম মিস রুবেলা।'

'আঃ এত কঠিন প্রশ্নের দরকার কি।' বড় ছেলেটি বোনকে ধমক দেয়। 'তুই চুপ কর কেয়া, আমি একটা সহজ প্রশ্নে ভদ্দরলোককে কাবু করে দিচ্ছি। আচ্ছা, বলুন তো একটা পার্টিতে আপনি উপস্থিত আছেন। এক গ্লাস গেলার পর আপনি আর ড্রিংক করতে চাইছেন না। তখন কি করবেন?'

চোখ বড় করে শিবনাথ পারিজাতের বড় ছেলেকে দেখছিল। প্রশ্ন করে ছেলেটি হাতের ঘড়ি দেখছে। আট বছরের ছেলের হাতে সুন্দর রিস্ট-ওআচটি দেখে শিবনাথ যত না পুলকিত হয় তার চেয়ে বেশি হয় তার ঘড়ি দেখার ভঙ্গি দেখে। এক দুই। দু' মিনিট পার হবার পরও শিবনাথ প্রশ্নের জবাব দিতে পারল না দেখে ছেলেটি মুখ তুলে মার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল। 'কিস্সু না, বোগাস। জেনারেল নলেজে পণ্ডিত।'

দীপ্তির মুখে এতবড় একটা সিল্কের রুমাল।

অর্থাৎ শিবনাথ বাচ্চাদের হাতে ভীষণ ঘায়েল হচ্ছে দেখে তিনি হাসি লুকোন। পারিজাত পাইপের তামাক পাল্টায়।

'বাবলু, তোমরা ভুলে যাচ্ছ ইনি ব্যারিস্টার হয়ে বিলাত থেকে আসেননি। সাধারণ মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। তা হলেও একজন গ্র্যাজুয়েট। তাঁর স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট। আট নম্বর বস্তিতে আছেন এরা কাজেই আমাদের প্রজা বলা চলে। সুতরাং বিলাতী কালচার জানা না থাকলেও আমাদের প্রজা হিসাবে এ'দের যতটা সম্ভব সুযোগ সুবিধা দেওয়াই আমাদের উচিত। আজ আর সময় হবে না। কাল তোমার মা টেস্ট ক'রে যদি বোঝেন রাখা চলে তবে আপাতত এ'কেই তোমাদের প্রাইভেট-টিউটার হিসাবে এপয়েণ্টমেণ্ট দেয়া হবে আমরা ঠিক করেছি। এতক্ষণ এই নিয়ে কথা হচ্ছিল।'

বাবলু অর্থাৎ বড় ছেলেটি বাবার কথা শুনে বিষণ্ণ মুখে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল।

দীপ্তি মুখের রুমাল সরিয়ে শিব-নাথকে বলেন, 'শ্বশুর মশায় বেশি অসুস্থ ছিলেন বলে গত বছর আট ন' মাস আমাকে বাচ্চাদের নিয়ে বালিগঞ্জের বাড়িতে থাকতে হয়েছিল। সেখানে মণ্টু ব্যানার্জি ওদের মাস্টার ছিল। ব্যারিস্টারি পাশ করে পসার জমাতে পারছিল না বললে ওর ওপর অবিচার করা হয়, আমি বলি পসারের দিকে ওর মন ছিল না, নেই। বাচ্চা পড়িয়ে বেড়ানো হবি। তা-ও কি খুব একটা বেশি টাকা নিত, একশ টাকা। আমার তো মনে হয় সে-টাকায় ওর মাসের সিগারেটের খরচ উঠত না।'

'তিনি এখন কোথায়?' মুখ দিয়ে হঠাৎ বেরিয়ে পড়ল শিবনাথের।

অত্যন্ত করুণ চেহারা ক'রে দীপ্তি বললেন, 'তিনি কি আর বেলেঘাটা চিংড়ি-ঘাটায় আসবেন আমার ছেলেমেয়েদের পড়াতে। তাই তো বলি, এখানে জমিদারী ব্যবসা ফেঁদে সবচেয়ে ক্ষতি হ'ল আমারই, আমার ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার সুবিধা হচ্ছে না।'

'তুমি একটুতেই ডিস্হার্টেন্ড হয়ে পড় দীপ। শিগ্‌গিরই সবগুলো ইংরেজী বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন ছাড়া হবে। এখানেও অনেক লেখাপড়া জানা লোক আছে। আগে এদের চান্স দেবার কারণ টাকার ডিমাণ্ড এরা খুব একটা করবে না। মণ্টু ব্যানার্জির মত প্রাইভেটদের এখানে আনিয়ে পড়াতে গেলে আড়াই শো হাঁকবে।' পারিজাত পাইপে আগুন দিল।

'তাই তো বলি, টাকা—সন্তানের চেয়েও টাকার মমতা বেশি তোমার, আমি একথা প্রথম থেকে বলে আসছি।' অভিমানাহত কণ্ঠস্বর স্ত্রীর।

'এরকম ধারণা করা তোমার অন্যায়

দীপ।' পারিজাত শক্ত ভঙ্গিতে একটা দেয়াল মুখ করে দাঁড়াল। সেখানে একটা বড় চওড়া ফ্রেম বাঁধানো আর্শি টাঙ্গানো। পারিজাত নিজের চেহারা দেখতে দেখতে বলল, 'ছেলেমেয়েদের জন্যে আমি কী করছি, কতটা করছি তোমার চেয়ে বেশি আর কারো তা জানবার কথা নয়। আমার কথা হচ্ছে, মণ্টু ব্যানার্জি তো হাতে আছেই। এরা গরিব।' আয়নার মধ্য দিয়ে শিবনাথের দিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করল পারিজাত। 'প্রজাদের মধ্যে যদি শিক্ষিত লোক থাকে আর আমি তাদের সুযোগ-সুবিধা না দিই তো ল্যান্ডলর্ড হিসাবে আমার নামে কি বদনাম উঠবে তা তুমি জান।'

'পাক্কা কম্যুনিস্ট বনে গেলেই পার!' হাতের রুমালটা দিয়ে দীপ্তি কপাল মোছেন।

গলাবন্ধ ওভারকোটের দরুণ এবং পারিজাতের কথার দরুণ বিরক্ত হয়ে ঘেমে উঠেছেন তিনি। ঘন নিশ্বাস ফেলছেন। বক্ষস্পন্দন দেখেই শিবনাথ অনুমান করল।

'এদিনে একটু ডেমোক্রেটিক আইডিয়া নিয়ে চলতে হয় বৈকি। তাছাড়া সামনে ইলেক্‌শন। সর্বদিক বুঝে শুনে না চললে বিপদ আছে। স্থানীয় লোক-দের সাপোর্ট আমার খুব বেশি দরকার।'

'যা বোঝ তা-ই তুমি করো।' যেন এই নিয়ে বাক্যব্যয় করে দীপ্তি আর ক্লান্ত হতে নারাজ। ছেলেমেয়েদের হাতে ধরে তিনি পাশের ঘরে চলে যান।

তিনি চলে যাবার পরও দরজার ঘন নীল ভারি পর্দাটা কাঁপতে থাকে। সেদিকে কতক্ষণ তাকিয়ে থেকে পারিজাত পরে এদিকে ঘাড় ফেরায়। শিবনাথের দিকে তাকায়। 'দেখছেন মশাই, আপনারা তো আমাদের—বড়লোকদের মানে ক্যাপি-টেলিস্টদের উঠতে বসতে বাপান্ত করছেন। শালারা সমাজের মাথায় বসে কেবল সুখ লুঠছে। স্বর্গের সুখ। কিন্তু এখানেও পাতালের দুঃখ, অগাধ অন্ধকার। একবার নিজের চোখে দেখে যান ভিতরটা।'

বলে পারিজাত শিবনাথের চোখে চোখ রেখে দার্শনিকের মত হাসল ও ক্লান্ত নিশ্বাস ফেলল। শিবনাথ কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে আস্তে বুদ্ধিমানের মত বলল, 'বালিগঞ্জ ছেড়ে এখানে এসে তাঁর অসুবিধা হচ্ছে,—থাকতে।'

'তা তো হবেই। মশাই ব্যারিস্টার মাস্টার রেখে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখাবার মেজাজ তৈরী করে দিয়েছেন দীপ্তির বাপ মেয়ের। এখানে এলেই তাঁর খুঁত খুঁত আরম্ভ হয়। মানে, শ্বশুরের ওখানে ওটা মিথ্যা কথা, থাকেন তিনি সেখানে তাঁর বাপের বাড়িতেই। বালিগঞ্জে তাঁরও বাপের বাসা। হুঁ আমার বাবার চেয়ে ওর বাবার পয়সা বেশি। আর ওবাড়ির সঙ্গেই মণ্টু ব্যানার্জির ঘনিষ্ঠতা।'

শিবনাথ অধোবদন হয়ে শুনল।

পারিজাত, বোঝা গেল, স্ত্রীর ওপর ভয়ংকর ক্রুদ্ধ আছে কোনো ব্যাপারে। গম্ভীরভাবে ঘরময় পায়চারি করতে লাগল। একটু পর শিবনাথ মনে সাহস সঞ্চয় ক'রে বলল, 'আচ্ছা স্যার, আজ চলি, কাল একবার দেখা করব।'

'আসবেন। মহিষী তো জানিয়ে দিয়েছেন। আমি বলেছি তো আপনাকে এসব আমার ডিপার্টমেণ্টে না। কাল এসে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করুন। তাঁকে প্লিজ করুন। বহাল হয়ে যাবেন। অ—আ কোনোদিন শিখতে পারবে না যে-সব বখাটে ছেলেমেয়ে তাদের শিক্ষাদীক্ষা সম্পর্কে ভেবে সময় ব্যয় না করে আমাকে অন্য অনেক কিছু করতে হয়।'

পারিজাত আবার দ্রুতভঙ্গিতে পাইপে তামাক পুরল তারপর তাতে অগ্নি-সংযোগ করে এবং এক সেকেণ্ডও আর অপেক্ষা না করে ছুটে বাইরে গিয়ে 'গাড়ি, গাড়ি', বলে চিৎকার করে উঠল।

যেন গ্যারেজ থেকে গাড়ি বেরিয়ে এল। পারিজাত গিয়ে গাড়িতে উঠল। শিবনাথ শব্দ শুনে আন্দাজ করল। আরো একটু সময় বসে কান পেতে থেকে পরে পারিজাতের ড্রয়িং-রুম থেকে বেরিয়ে শিবনাথ যখন রাস্তায় নামল তখন শুনতে পেল বাড়িতে কে পিয়ানো বাজাচ্ছে। এ-বাড়িতে দীপ্তি ছাড়া আর কে পিয়ানো বাজাতে পারে কল্পনা করতে করতে শিবনাথ রাস্তায় নেমে এল। 'আমরাও মশাই শ্রেণী-সংগ্রামের অসহ্য যাতনা ভোগ করছি। আমার বাবার চেয়ে দীপ্তির বাবা বেশি বড়লোক এই গরমে স্ত্রী স্বামীর জীবন অহরহ পুড়িয়ে মারছে নিষ্ঠুরা দীপ্তিকে একবার আপনারা চোখে দেখুন।'

রাস্তায় চলতে চলতে পারিজাতের করুণ হা-হুতাশ মাখা চোখ দু'টোর অর্থ শিবনাথ এখন বেশ বুঝতে পারল। বুঝতে পেরে নিজের মনে ঠোঁট টিপে হাসলো।

কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা—'ওকে প্লিজ করুন, বহাল হয়ে যাবেন।' পারিজাতের সুন্দর উক্তিটা শিবনাথের কানে পাকা হয়ে রইল। (ক্রমশ)

হিমালয় পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র

গোপাল ভৌমিক

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁর সাম্প্রতিক চীন সফরকে ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ আখ্যা দিয়েছেন। সাম্প্রতিক চীন সফর শেষে ভারতের মাটিতে ফিরেই গত ৪ঠা নবেম্বর তিনি দার্জিলিং-এর বার্চহিলে নব-সংগঠিত হিমালয় পর্বতারোহণ শিক্ষা-কেন্দ্রের স্থায়ী ভবনের যে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন আজ না হলেও ভবিষ্যতে তা একটি ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলেই বিবেচিত হবে। বস্তুত বিচার করে দেখতে গেলে হিমালয় পর্বতারোহণ শিক্ষা-কেন্দ্র সংগঠন ভারতের নবলব্ধ স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদাবোধেরই দ্যোতক। আমাদের দেশ যদি স্বাধীন হত তবে এই জাতীয় একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠনের প্রয়োজন হত আমাদের অনেক বৎসর আগেই। কিন্তু বিদেশী শাসনের নাগপাশে আমরা এতদিন এমনই জর্জরিত ছিলাম যে, একমাত্র স্বাধীনতা লাভ ছাড়া জাতীয় জীবনের অন্যদিকের অভাব অভিযোগের দিকে মনোযোগ দেবার সুযোগই আমাদের ছিল না। তা ছাড়া এ বিষয়ে আমাদের যে কিছু করণীয় আছে, বিদেশী শাসকগণ তাও আমাদের বুঝতে দেননি। বিদেশী শাসকরা এবং তাঁদেরই জাত-ভাই একাধিক শ্বেতাঙ্গ জাতির পর্বতারোহণকারী দল হিমালয়ের দুরারোহ গিরিশিখরগুলিতে বার বার অভিযান চালিয়েছেন আমাদেরই দেশের পর্বত-শিশু দুর্ধর্ষ শেরপাদের সহায়তায়। কিন্তু ঘুণাক্ষরেও তাঁরা আমাদের বুঝতে দেননি যে এ ব্যাপারে আমাদের কিছু করবার আছে। পর্বতারোহণে যে শেরপাদের সহজাত নৈপুণ্যের সহায়তা ছাড়া তাঁদের অধিকাংশ অভিযানই চরম বিপর্যয়ের সম্মুখীন হত, বিদেশী পর্বতারোহণ-কারীর দল তাঁদের কখনও সমমর্যাদা তো দেনইনি—তাঁদের বেতনভুক কুলি ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেও পারেননি। তাঁদের এ ভুল ধারণা প্রথম ভাঙল স্বাধীন ভারতে ১৯৫৩ সালের ২৯শে শুক্রবার যেদিন এমনই একটি বিদেশী পর্বতারোহণকারী দলের সহায়করূপে ভারতীয় বীর শেরপা তেনজিং নোরকে নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসী হিলারির সঙ্গে হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেস্ট
হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউণ্ট এভারেস্ট
পক্ষে সে এক গৌরবময় দিন। বিদেশী পর্বতারোহণকারীদের মত পর্বতারোহণ বিদ্যায় শিক্ষিত না হয়েও নিজের সহজাত নৈপুণ্যে তেনজিং যে ইতিহাস সৃষ্টি করলেন তার আলোকে আমরা নতুন করে নিজেদের চিনতে শুরু করলাম। আমরা বুঝতে পারলাম যে শেরপাদের এই সহজাত পর্বতারোহণ নৈপুণ্যের সঙ্গে যদি আমরা অধীত বিদ্যার যোগাযোগ ঘটিয়ে দিতে পারি, তবে ভারতীয় পর্বতারোহণকারী দল বিদেশের যে কোন পর্বতারোহণকারী দলের চেয়েই কোন অংশে ন্যূন হবে না। এই আত্মোপলব্ধির থেকেই জন্ম নিয়েছে হিমালয় পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র।

দার্জিলিং-এ পর্বতারোহণ শিক্ষা-কেন্দ্রের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনকালে বক্তৃতা-প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু বলেছেন যে, এটি মূলত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কল্পনাপ্রসূত এবং তিনি তেনজিং-এর মাউণ্ট এভারেস্ট বিজয়কে স্মরণীয় করে রাখার জন্যই এই শিক্ষাকেন্দ্র সংগঠনের ব্যবস্থা করেছেন। প্রধান মন্ত্রীর এই উক্তির মধ্যে আদৌ কোন অতিরঞ্জন নেই। পশ্চিম-বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্রকেই এই পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের প্রধান উদ্যোক্তা বলা চলে। এভারেস্ট বিজয়ী তেনজিং নোরকে ও তাঁর সমব্যবসায়ী শেরপাদের অধিকাংশ পশ্চিমবঙ্গের দার্জিলিং-এর অধিবাসী এই ভেবে গৌরব বোধ করেই তিনি নিশ্চেষ্ট থাকেন নি। পর্বতশিশু এই দুর্ধর্ষ শেরপাকুলের দুঃখদুর্দশা তিনি জানেন। বৎসরের যে সময়টা বিদেশী অভিযানকারীর দল আসে সে সময় এরা কাজ পায়—বৎসরের বাকি সময়টা এদের বসে থাকতে হয় বেকার। তাঁর স্বাভাবিক বুদ্ধিতে তিনি এটাও বুঝতে পারেন যে, তেনজিং নোরকের মত দুর্ধর্ষ শেরপাদের সহজাত নৈপুণ্যের সঙ্গে যদি পর্বতারোহণ বিষয়ক বিদ্যার যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া যায় তা হলে এরা অসাধ্য সাধন করতে পারবে। শেরপা সম্প্রদায় তথা ভারতীয় যুবশক্তির মধ্যে পর্বতারোহণ বিষয়ে
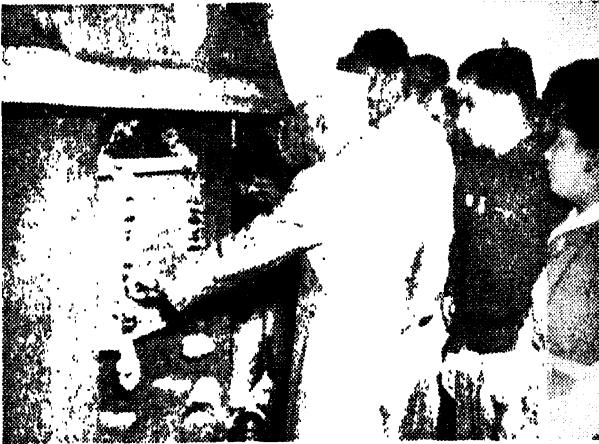
শ্রী নেহরু দার্জিলিঙে হিমালয় পর্বতারোহণ শিক্ষালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিতেছেন

াধুনিক বিজ্ঞানসম্মত বিদ্যার বিস্তার রা এবং সম্ভবমতো শেরপাসম্প্রদায়ের ঃখ দুর্দশা লাঘব করা এই দ্বিবিধ দেশ্যে ডাঃ রায় দার্জিলিং-এর হিমালয় র্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র গড়ে তোলার বস্থা করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-ন্ত্রীর চরিত্রের আর একটি বড় বৈশিষ্ট্য ই যে তিনি যদি কোন কিছুকে জাতির ক্ষে কল্যাণজনক বলে নিঃসন্দেহ হন বে তা যত আয়াসসাধ্য ও ব্যয়বহুলই াক না কেন, তিনি তাকে বাস্তবে পায়িত করে তুলতে আদৌ বিলম্ব রেন না। পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র থাপনের ব্যাপারেও তার ব্যতিক্রম টেনি। মাত্র এক বৎসর সময়ের মধ্যে তনি এই ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠান শুধু ড়েই তোলেন নি—এই প্রতিষ্ঠানের ায়ী ভবন নির্মাণের আগেই বার্চহিলের াড়া করা বাড়ি রায় ভিলায় এই প্রতিষ্ঠানের ক্ষাদান কার্যও আরম্ভ হয়েছে। ভারতের ধ্যে এ জাতীয় প্রতিষ্ঠান তো আর নেই-ই মগ্র এশিয়ার মধ্যে একমাত্র জাপান ছাড়া ার কোন দেশে পর্বতারোহণ বিদ্যা-শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান নেই। সুতরাং াঃ রায়ের এ কীর্তি ভারতের ইতিহাসে মরণীয় হয়ে থাকবে। তা ছাড়া এই প্রতিষ্ঠান সংগঠন করে এবং সেখানে ভারেস্ট বিজয়ী শ্রী তেনজিং নোরকেকে র্বতারোহণ শিক্ষার পরিচালকরূপে বরণ রে জাতিকে একটা সম্ভাব্য অসম্মানের াত থেকেও বাঁচিয়েছেন। এভারেস্ট বজয়ের পর বিশ্বের দরবারে তেনজিং-এর াতি ও প্রতিপত্তি যেভাবে বেড়ে গেছে াতে এইভাবে তাঁর কৃতিত্বের সুযোগ নতে না পারলে পর্বতারোহণ বিদ্যায় নুরাগী কোন পাশ্চাত্য দেশ হয়তো এই বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হিমালয় অভিযানকারীর বাস্তব জ্ঞানকে নিজেদের াজে লাগাত। একাধিক ইউরোপীয় দেশ থকে লোভনীয় শর্তে চাকুরীর প্রস্তাবও এসেছিল তাঁর কাছে। আমাদের নিজেদের দশে পর্বতারোহণ বিদ্যার প্রসারে তনজিং-এর অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানের য়োগে যদি আমরা বঞ্চিত হতাম, তার চয়ে দুর্ভাগ্যের বিষয় আর কি হতে ারত?

তেনজিং নোরকে পর্বতারোহণকারী শিক্ষার্থীকে জুতা পরিধানের উপায় দেখাইয়া দিতেছেন

পর্বতের রহস্য মানুষকে চিরদিনই দুর্নিবার আকর্ষণে টেনে এনেছে। ইতিহাস পুরাণ ঘাটলে যোগবলে পর্বত লঙ্ঘনের বহু কাহিনী পাওয়া যায়। কিন্তু সভ্য মানুষ যোগের উপর নির্ভর করে না—নির্ভর করে জ্ঞান বিজ্ঞানের উপরে। জ্ঞান বিজ্ঞানের যত উন্নতি হচ্ছে, মানুষের প্রাকৃতিক শক্তিকে জয় করবার স্পৃহাও যাচ্ছে তত বেড়ে। প্রকৃতপক্ষে, মানুষ এ পর্যন্ত বহু প্রাকৃতিক বাধাবিপত্তি লঙ্ঘন করে, প্রাকৃতিক শক্তির উপর জয়ী হয়েই সভ্যতার পথে এতদূর এগিয়ে এসেছে। যা কিছু অজ্ঞাত, যা কিছু রহস্যময় তারই তত্ত্ব উদ্ঘাটন করতে চায় আজকের বিজ্ঞানমুখী মানুষের মন। এই মানুষের মনের কাছে ভারতের উত্তর সীমান্তবর্তী ১৫০০ মাইলব্যাপী দুর্ভেদ্য তুষারমণ্ডিত হিমালয় গিরিশ্রেণী রহস্যের আকর্ষণ সৃষ্টি করবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই সুদীর্ঘ গিরিরাজির সঙ্গে আবার উচ্চ কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীও সংশ্লিষ্ট। পশ্চিম থেকে পূর্বে হিমালয়ের উচ্চতম গিরিশৃঙ্গগুলির মধ্যে আছে নাঙ্গা পর্বত (২৬,৬২৯ ফিট), কামেট-বদ্রিনাথ (২১,৫০০—২৫,৫০০ ফিট), নন্দাদেবী—ত্রিশূল (২৪,০০০—২৬,০০০ ফিট), ধবলগিরি (২৬,৭৯৫ ফিট), এভারেস্ট (২৯,০০২ ফিট), মাকালু (২৭,৭৯০ ফিট), কাঞ্চনজঙ্ঘা (২৮,১৪৬ ফিট) ও নামচা বারওয়া (২৫,৪৪৫ ফিট)। পৃথিবীর এই উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গগুলি দীর্ঘদিন পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও এই অঞ্চল সম্বন্ধে ধারাবাহিক জ্ঞানার্জনের প্রথম প্রয়াস হয়েছে উনিশ শতকের শেষে। তার আগের ইতিহাসে আমরা অবশ্য দেখি যে, দুর্ভেদ্য হিমালয়ের প্রাকার পেরিয়ে ভারত থেকে তিব্বতে চলেছে জ্ঞানবিজ্ঞানের আদান-প্রদান। কিন্তু সেটা ঘটেছিল সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রে এবং সমগ্র হিমালয় অঞ্চল সম্বন্ধে খুব একটা সুস্পষ্ট জ্ঞান আমাদের ছিল না। ইদানীংকালে প্রধানত আমাদের বৃটিশ শাসকের উৎসাহেই এ অঞ্চল সম্বন্ধে প্রকৃত তথ্য নিরূপণের প্রয়াস দেখা যায়। হিমালয়ের এমন বহু অঞ্চল আছে যা আজও আমাদের অজ্ঞাত। ইদানীংকালে পর্বতারোহণ বিদ্যায় অবশ্য পাশ্চাত্ত্য দেশবাসীরাই হয়ে উঠেছে অগ্রণী। তাদের কাছে পর্বতারোহণ নিছক খেলা নয়। এর মধ্যে একাধারে আছে খেলা, শিল্প ও বিজ্ঞান। এই তিনের সার্থক সংমিশ্রণ

তেনজিং নোরকে ও তাঁর দলবল পর্বতারোহণ কৌশল প্রদর্শন করিতেছেন

ঘটাতে না পারলে কোন পর্বতারোহণের অভিযানই পূর্ণমাত্রায় সফল হতে পারে না। পর্বতারোহণ বিদ্যার প্রকৃত চর্চা আরম্ভ হয় প্রথমে ইউরোপে অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে যখন প্রসিদ্ধ আল্পস্ পর্বতের শৃঙ্গগুলি বিজয়ের নিয়মিত প্রয়াস চলে। পরবর্তী শতকের মাঝামাঝি সময়ে ইউরোপে পর্বতারোহণ বিদ্যা বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তিতে গঠিত হয়। আল্পস্ পর্বতে অভিযান থেকে এর সূত্রপাত বলে পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের নামই হয়ে দাঁড়ায় আল্পাইন ইন্স্টিটিউট। বৃটেন, ফ্রান্স, সুইট্জার্লান্ড, জার্মানী, আমেরিকা, জাপান প্রভৃতি দেশের নিজস্ব আল্পাইন ইন্স্টিটিউট আছে এবং তাদেরই উদ্যোগে এতদিন হিমালয়ের বুকে বহুবিধ অভিযান চলে এসেছে। এসব অভিযানে ভারতীয়দের অংশ ছিল নিতান্তই গৌণ। হিমালয়ের অলিগলি যাদের নখদর্পণে সেইসব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ভারতীয় শেরপাকে সঙ্গে না নিলে নিজেদের অভিযান ব্যর্থ হবার আশঙ্কা থাকত বলেই বিদেশী পর্বতারোহণকারী দল অর্থের বিনিময়ে তাদের সহায়তা গ্রহণ করত। কিন্তু মুহূর্তের জন্যেও তাদের সমমর্যাদা দিত না। দেশ স্বাধীন হবার পর এবং বিশেষ করে তেনজিং-এর বিস্ময়কর সাফল্যের পর আর এ অবস্থা চলতে দেওয়া উচিত নয়। এই অস্বাভাবিক অবস্থার অবসানকল্পেই দার্জিলিং-এ হিমালয় পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

দার্জিলিং-এ পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত করার পর এ বিষয়ে একটি পরিকল্পনা প্রণয়নের জন্যে সুইস্ ফাউণ্ডেশন ফর আল্পাইন রিসার্চের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। এই প্রসঙ্গে রোসেলানির সুইস্ মাউণ্টেনিয়ারিং স্কুলের মিঃ আর্নল্ড্ গ্ল্যাথার্ড দার্জিলিং পরিদর্শন করেন এবং তেনজিং নোরকে ও ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা দপ্তরের মেজর এন্ ডি জয়ালের সহযোগিতায় দার্জিলিং ও সিকিমের পার্বত্যাঞ্চলে এই ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপনের সম্ভাবনা পরীক্ষা করে দেখেন। অতঃপর সুইস্ ফাউণ্ডেশন যে সুপারিশ পেশ করেন তাতে দেখা যায় যে, তাঁরা পশ্চিমবঙ্গে পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র সংগঠনের প্রস্তাব শুধু সর্বান্তঃকরণে সমর্থনই করেন নি—জাতীয় চরিত্রের উন্নতি, শেরপা সম্প্রদায়ের উন্নতি ও হিমালয় এবং কারাকোরাম পর্বতশ্রেণীর আবিষ্কার কার্যে সহায়তাকল্পে এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান সংগঠনের অপরিহার্য আবশ্যকতা তাঁরা স্বীকার করেছেন। তখন দার্জিলিং-এর বার্চ্হিলে এই পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র সংগঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং ভারত সরকার, পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও সহৃদয় জনসাধারণের অর্থানুকূল্যে অবিলম্বে এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের ব্যবস্থা অবলম্বিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের যে গঠনবিধি রচিত হয়েছে তদনুযায়ী কার্যকরী সংসদ গঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনার জন্যে নিম্নোক্তরূপে একটি অস্থায়ী বোর্ড গঠিত হয়েছে ঃ

সভাপতিঃ শ্রীজওহরলাল নেহর,; **সহ-সভাপতিঃ** ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়; **সম্পাদকঃ** পর্বতারোহণ কেন্দ্রের রেজিস্ট্রার **ও সদস্যগণঃ** (১) ভারত সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা-বিভাগের একজন প্রতিনিধি; (২) ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের একজন প্রতিনিধি; (৩) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষা বিভাগের একজন প্রতিনিধি; (৪) সভাপতি কর্তৃক মনোনীত পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র সম্বন্ধে উৎসাহী চারজন বেসরকারী খ্যাতিমান ব্যক্তি (৫) পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ এবং (৬) পর্বতারোহণ শিক্ষার পরিচালক শ্রীতেনজিং নোরকে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা বিভাগের মেজর এন ডি জয়ালকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম অধ্যক্ষ ও শ্রীতেনজিং নোরকেকে পর্বতারোহণ শিক্ষার পরিচালক নিযুক্ত করা হয়েছে। বোর্ডকে প্রতিষ্ঠানের কার্য পরিচালনায় সহায়তা করার জন্যে নিম্নোক্তরূপে একটি স্থানীয় উপদেষ্টা কমিটিও গড়ে তোলা হয়েছেঃ সভাপতিঃ দার্জিলিং-এর ডেপুটি কমিশনার; পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের অধ্যক্ষ; পর্বতারোহণ শিক্ষার পরিচালক; দার্জিলিং-এর নির্বাহী বাস্তুকার; স্থানীয় গভর্নমেণ্ট কলেজের অধ্যক্ষ এবং সহ-সভাপতি কর্তৃক মনোনীত দার্জিলিং-এর একজন স্থানীয় অধিবাসী।

পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের যাঁরা সদস্য হবেন তাঁদের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে নিম্নোক্তরূপেঃ (ক) বার্ষিক ৫০ টাকা যাঁরা দেবেন তারা হবেন সাধারণ সদস্য; (খ) যাঁরা একযোগে বা একাধিক কিস্তিতে এক হাজার টাকা দান করবেন তাঁরা হবেন আজীবন সদস্য। যাঁরা দশ হাজার টাকা বা তদূর্ধ্বে দান করবেন তাঁরা অপর কোন ব্যক্তিকে আজীবন সদস্য মনোনীত করার অধিকার পাবেন। (গ) কার্যকরী সংসদ ইচ্ছা করলে প্রতিষ্ঠাবান ব্যক্তিদের অবৈতনিক সদস্যরূপে গ্রহণ করতে পারেন এবং (ঘ) অবৈতনিক আজীবন সদস্যের পর্যায়ে থাকবেন শুধু ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহর, ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। শেষোক্ত দুইজন যতদিন ইচ্ছা করেন এবং যতদিন পর্যন্ত তাঁরা স্বেচ্ছায় পদত্যাগ না করেন ততদিন তাঁরা যথাক্রমে পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের সভাপতি ও সহ-সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন। সাধারণভাবে ভারতের যুব-শক্তির মধ্যে পর্বতারোহণ বিদ্যার বিস্তার করা ও পেশাদার শেরপা সম্প্রদায়ের আর্থিক, সামাজিক ও পেশাগত উন্নতি-সাধন এই পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র সংগঠনের উদ্দেশ্য। এই শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভের সুযোগ পেয়ে ভারতীয় যুব-সমাজ হিমালয় ও কারাকোরামের অজেয় পর্বতশৃংগগুলিতে অভিযান পরিচালনায় অধিকতর উৎসাহ পাবে বলে আশা করা যায়। শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাসূচীর মধ্যে আছে ভূগোল, ভূতত্ত্ব, দেহবিজ্ঞান, আবহাওয়া তত্ত্বাদি সম্বন্ধে শিক্ষাদান। মানচিত্র তৈয়ার করা ও ব্যবহার করা, পর্বতারোহণের উপযোগী পোশাকপত্র ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়া, পুষ্টিকর খাদ্যাদি সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন ও প্রাথমিক চিকিৎসা শিক্ষাও পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত। হাতেকলমে পর্বতারোহণ সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের পর শিক্ষাসূচী সমাপ্ত হবে। শেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের শিক্ষিত শেরপা গাইডদের তত্ত্বাবধানে দুর্গম পর্বতাঞ্চলে পাহাড়ে ওঠানামা, তুষারের মধ্যে পথ চলা প্রভৃতি হাতে-কলমে শেখানো হবে। এই পাঠক্রমের স্থায়িত্ব হবে প্রায় ৩৫ দিন। বৎসরে দুই দফায় এই শিক্ষাদানের কাজ করা হবে। প্রথম দফায় ক্লাস আরম্ভ হবে ১২ই সেপ্টেম্বর, শেষ হবে ১৫ই অক্টোবর এবং দ্বিতীয় দফায় ক্লাস আরম্ভ হবে ২৪শে অক্টোবর এবং শেষ হবে ২৭শে নভেম্বর। ৩৫ দিনের পাঠক্রম ভাগ করা হবে নিম্নোক্তরূপেঃ—শিক্ষাকেন্দ্রে পুঁথিগত শিক্ষা—৬ দিন; শিক্ষাশিবির থেকে এবং শিক্ষাশিবির পর্যন্ত পদব্রজে যাতায়াত—১৫ দিন; পাহাড় ও তুষারে ব্যবহারিক শিক্ষাদান—১২ দিন এবং পরীক্ষাদির দরুণ ২ দিন। প্রতি দফায় ছাত্রছাত্রী নেওয়া হবে ২০ থেকে ২৪ জন। তবে খাঁটি পর্বতারোহণের শিক্ষা যখন নেওয়া হবে তখন এক একজন শেরপা শিক্ষকের অধীনে ৩।৪ জনের বেশি ছাত্রছাত্রী রাখা চলবে না। শিক্ষা মূলত ইংরেজী ভাষাতেই দেওয়া হবে। পর্বতারোহণে যাদের আগের অভিজ্ঞতা আছে শিক্ষার্থীরূপে তাদের দাবী অগ্রগণ্য হলেও উপযুক্তবোধে সাধারণ শিক্ষার্থীদিগকেও গ্রহণ করা হবে। পুঁথিগত বিষয়ে শিক্ষাদানের জন্যে অধ্যক্ষ ছাড়াও দুইজন সহকারী অধ্যাপক থাকবেন। পর্বতারোহণ বিষয়ক ব্যবহারিক শিক্ষাদানের জন্যে আছেন পরিচালকরূপে শ্রীতেনজিং নোরকে। তাঁকে এই কাজে সহায়তা করবেন ৬ জন শিক্ষাদাতা গাইড অর্থাৎ বিশেষভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত শেরপা।

হিমালয় পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্রের ব্যয় যুগ্মভাবে ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার বহন করবেন। তবে শিক্ষার্থীদের বেতন থেকেও কিছুটা আয় হবে এবং দেশবাসীর অর্থানুকূল্যও পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। প্রথম থেকেই এই শিক্ষাকেন্দ্রের শিক্ষাদান পদ্ধতি একটা উচ্চ মানে যাতে পৌঁছাতে পারে তদুদ্দেশ্যে ইতিমধ্যেই অধ্যক্ষ মেজর জয়াল, পর্বতারোহণ শিক্ষার পরিচালক শ্রীতেনজিং নোরকে ও ৬ জন শেরপা শিক্ষাদাতাকে সুইট্জারল্যাণ্ডের সুইস্ ফাউণ্ডেসান ফর আল্পাইন রিসার্চ থেকে শিক্ষা দিয়ে নিয়ে আসা হয়েছে। ডাঃ ওয়্যাথার্ডের সহায়তায় শিক্ষাকেন্দ্রের জন্যে ৩০ হাজার টাকা মূল্যের পর্বতারোহণ বিষয়ক পোশাক পরিচ্ছদ ও যন্ত্রপাতি কেনা হয়েছে। প্রয়োজনবোধে ডাঃ ওয়্যাথার্ডের সাহায্য ও সহযোগিতা পাবার একটা ব্যবস্থাও করা হয়েছে সুইস্ ফাউণ্ডেশনের সংগে। মোটামুটি এই হল হিমালয় পর্বতারোহণে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের ইতিহাস। এই যুগান্তকারী শিক্ষাকেন্দ্র শুধু যে স্থায়ী হবে তা নয়—এর আদর্শে ভারতের অন্যত্র এবং এশিয়ার অন্যান্য দেশে আরও এই জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে বলে আশা করা যায়।

বিজ্ঞান বৈচিত্র্য

চক্রদত্ত

শুধু মাত্র বক্তৃতা দেওয়ার চেয়ে ম্যাজিক লণ্ঠনের সাহায্যে যদি বক্তব্য বিষয়টি বেশ সুপরিস্ফুট করে শ্রোতার সামনে তুলে ধরা যায় তাহলে সমস্ত বিষয়টি আরও ভাল লাগে। এক্ষেত্রে বক্তার পক্ষে একা সমস্ত কাজটি গুছিয়ে করা একটু মুশকিলের হয়ে পড়ে। বক্তৃতা দেওয়াটা তারই কাজ এবং স্লাইডের সাহায্যে ছবি দেখানও তার কাজ তবে স্লাইডগুলি বেছে বেছে হাতে তুলে
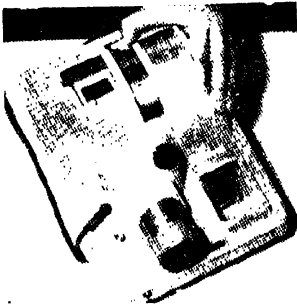
নতুন রকম স্লাইড্ প্রোজেক্টর

দেওয়ার জন্য দ্বিতীয় ব্যক্তির সাহায্যের দরকার হয়। নতুন ধরনের যে স্লাইড্ প্রোজেক্টর বার হয়েছে তাতে এত অসুবিধা হয় না। এই প্রোজেক্টরের মধ্যে একসঙ্গে চারখানি করে স্লাইড্ ভরে নেওয়া যায়। এক একখানা স্লাইড্ ইচ্ছামত পেছনদিকে বা সামনের দিকে ঠেলে দেওয়া যায়। স্লাইড্গুলো যার মধ্যে ভরা থাকে তার ওপর একটা স্বচ্ছ কাঁচ পরান থাকার দরুণ ওপর থেকে সহজেই দেখা যায় যে, পরে কোন্ ছবিখানা আসবে। এইভাবে কাঁচের, প্লাস্টিকের অথবা কাগজের যে কোনও রকম স্লাইডেই কাজ চলে। বক্তা এইভাবে চারখানি স্লাইড্ দেখাতে দেখাতে অপর চারখানি স্লাইড্ সাজিয়ে নিতে পারেন।

*

কি দৈনিক সাপ্তাহিক কি মাসিক এমন কি পাঁজির পাতা ওল্টালেও 'পাগলের মহৌষধের' বিজ্ঞাপন চোখে পড়ে। সত্য-সত্যই এই সব ওষুধে রোগ সারে কি না জানা নেই। তবে ডাক্তারেরা বলেন যে, 'সারপাসিল' নামে যে নতুন ওষুধটি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে নাকি বহু রোগীই আরোগ্যলাভ করেছে। ক্যালিফোর্নিয়ার মেডেস্টা হাসপাতালে এই ওষুধটি ব্যবহার করে দেখা হয়েছে। এখানে ৭৩ জন রোগীর মধ্যে আটজন সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে হাস-পাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন আর বিশ-জন রোগীর রোগের লক্ষণগুলি দূরীভূত হয়েছে। এঁরা বলেন যে, সারপাসিলে যে কোনও রকমের রোগী, অল্প স্বল্প মানসিক অসুস্থতা থেকে শুরু করে একেবারে মস্তিষ্ক-বিকৃত রোগীও নিরাময় হয়। এই ওষুধটি জোলাপের মতন। ভারতীয় কোনও গাছের শিকড় থেকেই এটা তৈরী হয়েছে। সব প্রথমে এটি কোনও মানসিক রোগে পরীক্ষা করা হয় না। এর মধ্যে মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারী গুণ থাকায় ব্লাড্প্রেসার রোগীর ওষুধ হিসাবেই ব্যবহার করা হতো। এর থেকেই দেখা যায় যে, হাস-পাতালের যে সব রোগীর মধ্যে খুব অস্থিরতা লক্ষ্য করা হতো তাদের ওপর এই ওষুধ বিশেষ ফলপ্রদ বলেই মনে হয়েছে।

*

'ছিদ্রান্বেষী' কথাটি আমরা অপবাদ হিসাবেই ব্যবহার করে থাকি তাই স্বভাবত যারা এই ছিদ্র অন্বেষণ করতে পারেন না তাদের বিজ্ঞানের সাহায্যও নিতে হয়। আণবিক শক্তি ব্যবহারের জন্য যে সব যন্ত্রপাতি দরকার হয় সেগুলি বিলক্ষণ বায়ুশূন্য হওয়ার দরকার। এখানে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্রপথও ক্ষতিকারক। সেই কারণে এইসব অদৃশ্য ছিদ্রগুলি ধরার জন্য একটি নতুন বৈজ্ঞানিক পন্থা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই উপায়ে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র যাতে করে সারা বৎসরে হয়তো একবিন্দুমাত্র জল পড়তে পারে এমন ছিদ্রও ধরা পড়ে। একটি পাত্রে হিলিয়াম গ্যাস ভরে এই পন্থাটি পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। দেখা গেছে যে, দু'লক্ষ ভাগ বাতাসের সঙ্গে একাংশ হিলিয়াম মিশে গেলেও এই স্পেকট্রো-মিটারের সাহায্যে অনায়াসেই ধরা পড়ে।

*

যন্ত্রপাতিমাত্রেই ঠিকমত চালু রাখতে হলে সময় সময় তৈলাক্ত করতে হয়। অনেকক্ষেত্রে খুব বেশী ঠাণ্ডায় এই তৈল জমে গেলে খুবই মুশকিল হয়। বিশেষত ঘড়ি, ক্যামেরা ইত্যাদি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির জন্য বেশী সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়। একরকম নতুন তেল আবিষ্কার করা হয়েছে। শূন্য ডিগ্রী তাপের ১০০ ডিগ্রীরও কম অবস্থার মধ্যেও এই নবাবিষ্কৃত তেল জমে যায় না। কয়েকটি বস্তুর সংমিশ্রণে এই তেল তৈরী হয়েছে। এখন ক্যামেরা ঘড়ি ইত্যাদি সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতির জন্য এই তেল ব্যবহার করা হয়। একটি ঘড়িতে এই তেল ব্যবহার করা শূন্য ডিগ্রী তাপের ১৫০ ডিগ্রী নিম্ন তাপেও বেশ সুন্দরভাবে চলতে থাকে।

*

জেট প্লেন বাষ্পের ঘাতের (thrust) সাহায্যে বেশ দ্রুতগতিতে চলে। এর গতি এত দ্রুত যে, দরকার মত হঠাৎ থামান যায় না। অস্কার লুণ্ডবার্গ নামক একজন সুইডিস ভদ্রলোক একটি নতুন পদ্ধতিতে জেট প্লেনকে সহজে থামানোর ব্যবস্থা বার করেছেন। জেট প্লেনকে যখন থামানোর দরকার হবে, তখন পেছন দিক ঘাত বন্ধ করে দিয়ে সামনের দিকে ঘাত দেওয়ার বন্দোবস্ত করা হবে। সামনের ঘাতের ফলে আগের গতি প্রতিরুদ্ধ হয়ে আস্তে আস্তে থেমে যায়।

নখদর্পণ

উত্তমপুরুষ

[কে ও কী]

এবারকার 'নখদর্পণ' লিখতে বসেছি, আমার সমুখে ছড়ান আছে র-পাঁচ ভল্যুম হেমিংওয়ে-সাহিত্য। হেমিংওয়ে-সম্পর্কিত সাহিত্য, তাঁর নিজের চনা নয়। এই পুরস্কৃত মার্কিন লেখকের বিষয়ে কিছু খুঁটিনাটি জেনে নেব ইচ্ছে য়েছিল। সামান্য চেষ্টাতেই এই ক'খণ্ড াওয়া গেছে, বিশেষ প্রযত্ন করলে আমার ছোট লেখার টেবিলটিতে সম্ভবত ধরত ।। Hemingway—The man and is work সংকলনটি সম্পাদনা করেছেন ন ম্যাকাফ্রী; ম্যাক্স ঈস্টম্যান প্রমুখ ঝা বাঘা লোক এর লেখক। Heming-ay, the writer as artist বইটির চয়িতা কার্লোস বেকার, প্রিন্সটন বিশ্ব-দ্যালয় একে শুধু হেমিংওয়েকে নিয়ে বেষণা করবার জন্যেই একটি বৃত্তি য়েছিলেন। হেমিংওয়ের কম বয়সের িহবাচর্চার বৃত্তান্ত পাওয়া যাবে চার্লস ন্টনের অল্পকাল পূর্বে প্রকাশিত ইটিতে।

এই বই ক'টি পাঠান্তে হেমিংওয়ে ানুষটি সম্পর্কে আমার জানতে কিছু াকি নেই। তাঁর সাংবাদিকতার হাতে ড়ি, প্যারিসের পানশালায় ঘোরাঘুরি, ত্রানীর রণক্ষেত্রে জখম হওয়া, শিগক্রীড ইনে আসর জমানোর কাহিনী, সব িস্তারে জেনেছি। তাঁকে অন্তরঙ্গ এলে বলে 'মিস্টার পাপা'; তিনি তাঁর ছোট গিন্নীকে এখনও আদর করে ডাকেন মিস্ মেরী' বলে, এ-সব তথ্যও গোচরে এসেছে। গারট্রুড স্টাইন তাঁকে প্যারিসে বে কী পরামর্শ দিয়েছিলেন, স্কট ফিটজেরাল্ড তাঁর হয়ে প্রকাশকদের কাছে কী সুপারিশ করেছিলেন, পাউণ্ড একদা 'মানুষ' দেখাবেন বলে জন পীল বিশপকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন তখনো-অখ্যাত-মা হেমিংওয়ের কাছে—সব তথ্যই পরিশ্রমী গবেষকরা সংগ্রহ করেছেন। এও জেনেছি, এই শালপ্রাংশু মহাভুজটি একজন 'aficionado', ষাঁড়ের লড়াইয়ের খানু সমজদার। আবার পাকা শিকারীও; মৎস্য মেরে যেমন সুখে খেয়েছেন, তেমনি সিংগীর মামা ভোম্বলদাসও মেরেছেন ঢের।

স্মরণ রাখিতে হবে এ-সব ভারি ওজনের বই হেমিংওয়ের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির পূর্বেই লেখা হয়েছে এবং হেমিংওয়ের বয়স এখন পঞ্চান্ন, অর্থাৎ বাংলা দেশের কল্লোলযুগীয় অনেক লেখকেরই তিনি সমবয়সী। অথচ হেমিংওয়েকে নিয়ে ও-দেশে সুশৃংখল এবং সুপরিকল্পিতভাবে যত গবেষণা হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র সম্পর্কে আমাদের দেশে তার সিকিও হয়নি। এর একটা কারণ সম্ভবত আমরা জাত হিসেবে এ্যামেচারিশ; আরেকটা, ইতিহাস-উদাসীন।

* * *

কতকটা এইজন্যেই সাহিত্য আকা-দেমির উদ্যোগে ভারতীয় গ্রন্থকারদের একখানি প্রামাণিক 'কে ও কী' (Who's Who) প্রকাশিত হবে জেনে আশান্বিত হয়েছি। পরিকল্পনাটি সার্থক হলে আমাদের একটা বনেদি অভাব দূর হবে। বাঙালী তথা ভারতীয় লেখকদের সাধারণ খবর ও টুকিটাকি আমরা জানিনে বললেই হয়, অতিখ্যাতদের নামমাত্র জানি, তাঁদের কলাকৃতির রূপ ও রেখা সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতার সীমা নেই। অবশ্য হবুচন্দ্র রাজার গবুচন্দ্র উপমন্ত্রী, ফুটবল-বলরাম বা ফুটবল সীতারাদের মত কপাল নিয়ে সাহিত্যিকেরা আসেননি, তবু পরশুরামের অধুনাতন বইটির খবর পাওয়া যাবে শুধু বাংলা মাসিক আর সাপ্তাহিকের বিজ্ঞাপনের পৃষ্ঠায়, এই বা কেমন কথা। এই প্রবীণ লেখক এখন কোন গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত আছেন কিম্বা, সে-খবর পাঠককে জানাবার উৎসাহ সম্পাদক বা প্রকাশক কারুরই দেখিনে। রাষ্ট্রভাষার ব্যাপারীরা বরং বাংলা সাহিত্যের অনেক খবর রাখেন; তার কতটা নিছক জ্ঞানলাভের স্পৃহায়, কতটা 'না বলিয়া পরের দ্রব্য' আত্মসাৎ করার উৎসাহে, বলা কঠিন।

* * *

বছর দুয়েক আগে কেরলের ডক্টর পানিক্করকে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরেট

দিয়ে সম্মানিত করেন। তিনি তখন খুশী হয়ে বলেছিলেন, 'এতদিনে উত্তর-ভারত দক্ষিণদেশের একজন সাহিত্যিককে মূল্য দিলেন।' ডাঃ পানিক্কড় প্রথমে কূট-নীতিবিদ্, পরে ঐতিহাসিক, সবার শেষে সাহিত্যিক। তাঁর খাতির যতটা রাজ-নৈতিক সাফল্যের জন্যে, সাহিত্যকৃতির জন্যে ততটা নয়। বৃটিশ আমলে লিখিয়ে-দের মধ্যে 'থীসিস' না লিখে ডক্টরেট' বড় কেউ পাননি—রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র বা দীনেশচন্দ্র সেন ব্যতিক্রম। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয় কর্তৃক শরৎচন্দ্রের সম্মাননা বিশেষ উল্লেখযোগ্য, কেননা এটা খাঁটি সাহিত্যপ্রীতি-প্রণোদিত। কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় এখনও এ-ব্যাপারে অতিমাত্রায় রক্ষণশীল, নইলে অন্তত দু'জন প্রবীণ সাহিত্যিক ও পণ্ডিত অনেক আগেই অর্ঘ্য পেতেন। তা যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বা শ্রীরাজশেখর বসু ডক্টরেট পেয়ে ধন্য হবেন এমন নয়, বিশ্ববিদ্যালয়ই নিজের একটি ত্রুটি সংশোধন করবেন। জীবিত-কালে আমরা যোগ্যকে সম্মান দিইনে, মরলে চিতায় মঠ তুলি, এ-অপবাদ আমাদের আছে। কোথায় যেন পড়েছিলাম আমাদের জীবনে ফুলের প্রয়োজন হয় দু'বার, একবার বিয়ের সময়, একবার মরলে। আমাদের দেশে সাহিত্যিকদের নামও খবরের কাগজে ছাপা হয় দু'বার, কোন পুরস্কারপ্রাপ্তি ঘটলে বা ভবলীলা সাঙ্গ হলে। তাও শুধু তিনি যে-ভাষায় সাহিত্য রচনা করেছেন সেই ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রে। কবি জীবনানন্দ দাশের তিরোধানের পর বোম্বাই-দিল্লীর একটি প্রধান ইংরাজী পত্রিকা সম্পাদকীয় কলমে শোক প্রকাশ করেছে, এটা রীতিমত অভাবনীয়, কিন্তু ব্যতিক্রম মাত্র, নিয়মকেই প্রমাণ করেছে।

* * *

সাহিত্যে শুচিবাই

আমেরিকার রাজনীতিক্ষেত্রে 'লাল জুজুর' ভয়, সেনেটর ম্যাকার্থীর প্রসাদে এ-খবরটা অনেকেই রাখেন! বৃটেনের সাহিত্যক্ষেত্রে আরেক ধরনের জুজু দেখা দিয়েছে; আমাদের দেশেও সেটি একেবারে অপরিচিত নয়, তার নাম অশ্লীলতা। গত কয়েক মাসে রচনায় তথাকথিত অশ্লীলতার দায়ে বহু ইংরাজ লেখককে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। এই 'উইচ্-হাণ্টের' প্রথম পর্বে লেখকেরা চুপচাপ ছিলেন, কিন্তু বাড়াবাড়িটা শেষ পুর্যন্ত তাঁরাও বরদাস্ত করতে পারেননি। সাহিত্যে শুচিবাই বাতিকের বিরুদ্ধে লণ্ডনের 'টাইমস্' পত্রিকায় কিছুদিন আগে ও-দেশের সেরা লেখকদের স্বাক্ষরিত একটি প্রতিবাদপত্র বেরিয়েছে। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন সমারসেট ম্যম, বার্ট্রাণ্ড রাসেল, জে বি প্রীস্টলি। এঁরা বলছেন—

"It would be disastrous for English literature if authors had to write under the shadow of the Old Bailey if they failed to produce works suitable for the teen-ager

(অসার্থ: 'খোকাখুকুদের উপযুক্ত বই লিখতে অপারগ হলেই লেখকদের যদি আদালতের আওতায় আসতে হয়, তবে ইংরাজী সাহিত্যের সর্বনাশ হবে')। প্রবীণ লেখকদের সঙ্গে সুর মিলিয়েছেন স্যার এ্যালান হারবার্ট। 'সণ্ডে গ্রাফিক' পত্রিকার তাঁর চমৎকার একটি ছড়া বেরিয়েছে। ছড়াটির সম্পূর্ণ উদ্ধৃতি সম্ভব নয় মোটামুটি মর্মার্থ তুলে দিচ্ছি।

রাশভারি উকিল দীর্ঘ বক্তৃতায় একটি তথাকথিত অশ্লীল বইয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ করে গম্ভীর গলায় জুরিকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'ভদ্রমহোদয়গণ, এমন বই কি আপনারা আপনাদের প্রাপ্তবয়সী কন্যার হাতে তুলে দিতে পারেন?' একজন জুরি জবাবে বলছেন, 'বলা শক্ত। বাদ যদি দিতেই হয়, তবে তো হোলী বাইবেলেরও সবটা শিশুর পথ্য নয়, শেক্সপীয়রের নাটকেরও অনেক পৃষ্ঠা ছিঁড়ে তবে আমার মেয়েকে দিতে হয়।' (ভদ্রলোক জানেন না। আমাদের দেশ হলে কালিদাসের নামটাও যোগ করে দিতুম)। জুরি মহোদয় অতঃপর সহাস্যে বললেন:

'She's not an infant or an elf
I let her choose her books herself!

উকিলবাবু কী জবাব দিয়েছিলেন স্যার এ্যালান লেখেননি।

চিত্রপ্রিয়

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে দুইটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য চিত্রপ্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রথমটি প্রাচীন ও সমসাময়িক বৃটিশ চিত্রসম্ভারের প্রতিলিপি প্রদর্শনী—ইহা বৃটিশ কাউন্সিলের পৃষ্ঠপোষকতায় ও নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতি হলে অনুষ্ঠিত হয় এবং শ্রীউষানাথ সেন ইহার উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয়টি আমেরিকান জল রঙ চিত্রপ্রদর্শনী—আমেরিকার আর্ট ফেডারেশনের পৃষ্ঠপোষকতায় ও নিখিল ভারত চারুকলা সমিতির উদ্যোগে ইহাও ঐ একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয় এবং ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীঅনিল চন্দ ইহার উদ্বোধন করেন। দুইটি প্রদর্শনীতেই প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল।

একাধিক কারণে বৃটিশ চিত্রপ্রতিলিপি প্রদর্শনী উল্লেখযোগ্য। প্রথমত এদেশের যে সকল উগ্রপন্থী শিল্পী পুরাতন চিত্র বা প্রথাকে আদৌ আমল দিতে চাহেন না তাঁহারা এই প্রদর্শনীতে প্রাচীন ও পুরাতনপন্থী বহু খ্যাতনামা শিল্পীর চিত্রের প্রতিলিপি দেখিতে পাইবেন। অর্থাৎ আধুনিকতম অংকন ধারায় প্রভাবান্বিত হইয়া যে দেশের বহু শিল্পী অতি আধুনিক ও ব্যক্তিগত চিত্র রচনা করিয়াছেন সেই দেশই যে এ হেন রচনার সহিত প্রাচীন ও পুরাতনপন্থী চিত্রকরদের রচনাকেও এখনও পর্যন্ত যথাযোগ্য স্থান দিয়াছেন তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন। দ্বিতীয়ত, ইংলণ্ডের মুদ্রণ শিল্প ও ব্লক তৈয়ারী করিবার প্রণালী। সূক্ষ্মতম রেখার প্রকাশভঙ্গিমা হইতে আরম্ভ করিয়া অতিশয় লঘু বর্ণপ্রলেপের সহজ আভাসটুকু পর্যন্ত প্রত্যেক চিত্রে এত সজীব দেখায় যে সবগুলিই মৌলিক রচনা বলিয়া ভ্রম হয়। এমন কি কয়েকটি প্রতিলিপি বার বার দেখিবার পরেও মনে সংশয় জাগে—কে জানে, হয়ত বা এইগুলি সত্যই শিল্পীর মৌলিক রচনা।

প্রাচীনকাল হইতে সমসাময়িক যুগ পর্যন্ত ইংলণ্ডে চিত্রধারা কিভাবে অগ্রসর হইয়াছে তাহা বুঝাইবার জন্য প্রদর্শনীতে প্রাচীনকাল হইতে আরম্ভ করিয়া আধুনিক যুগের প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীদেরও রচনা-নমুনার প্রতিলিপি ছিল। প্রাচীন শিল্পীদের মধ্যে উইলিয়ম ব্লেক, স্যামুয়েল প্যামার, টিসাম গেন্‌স্‌বরো, জন কনস্টেবল, জে এম টার্নার, জে এম হুইস্টলার ও স্যার যশুয়া রেনল্ডস্‌ এবং সমসাময়িক কালের আগাস্টাস জন, হেনরী মুর, বেন নিকলসন, গ্রেহাম সাদারল্যাণ্ড, পল ন্যাশ, ক্রিস্টফার উড, সেরি রিচার্ড ও উইলিয়ম স্কট প্রভৃতির রচনা-নমুনার প্রতিলিপি প্রদর্শনীতে ছিল। বিভিন্ন প্রচলিত অংকন মাধ্যমের মধ্যে জলরঙে চিত্র রচনা করা যে কিরূপ দুরূহ তাহা সকলেই জানেন। কিন্তু পুরাতন যুগের মনীষিগণ যে কি অপরূপ কৌশলে এই ম্যাধমের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন তাহা না দেখিলে বুঝা যায় না। বিশেষ করিয়া টার্নার অংকিত 'অগ্নিগর্ভে পার্লামেণ্ট' চিত্রখানি বর্ণচাতুর্য ও অংকন প্রতিভার দিক দিয়া সত্যই অপূর্ব। লক্ষ লক্ষ ক্ষুধাতুর লেলিহান অগ্নিশিখা সারা পার্লামেণ্ট ভবনটিকে গ্রাস করিয়াছে, তীব্র রক্তরাগে চতুর্দিক এক ভয়াবহ রূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে ও তাহারই মধ্যে মাত্র কয়েকজন অল্পবারিসিঞ্চনে এই ক্রোধবহ্নি নিবারণ করিবার চেষ্টা করিতেছে—বিরাট ধ্বংসলীলার এক বীভৎস করালরূপ চিত্রের মধ্যে যেন সজীব হইয়া উঠিয়াছে। ইহার পরেই গেনস্‌বরোর 'পল্লীপথে গরুর-গাড়ী' বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জলরঙের মাধ্যমে কিরূপ অগাধ পরিশ্রম ও শিল্পকুশলতা বলে কোনো চিত্র নিখুঁত, স্বাভাবিক ও সর্বাঙ্গসুন্দর হইতে পারে এই রচনাটি দেখিলে তাহা স্পষ্ট বুঝা যায়। তৈলচিত্রের মধ্যে হুইস্টলারের 'কারলাইল', কালিকলমে অংকিত পামারের 'উজ্জ্বল মেঘ' লরেন্সের 'বালক' ও যোশুয়া রেনল্ডসের 'নারীর প্রতিলিপি' অংকন প্রতিভা, বর্ণকারুকার্য ও প্রকাশভঙ্গিমার দিক দিয়া সত্যই অনবদ্য।
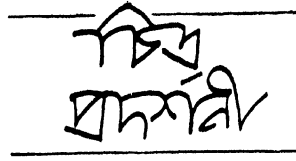
সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে হেনরী মুর খ্যাতনামা ও প্রতিষ্ঠাবান ভাস্কর ইঁহার বয়স ৫৬ বৎসর। মুর লীডস আর্ট স্কুল ও রয়াল আর্ট কলেজে শিক্ষালাভ করেন ও ১৯২৫ সালে ট্রাভেলিং ফেলোশিপ লাভ করিয়া ফ্রান্স ও ইতালী পরিভ্রমণ করেন। ১৯৪০-৪২ সালে তিনি সমর বিভাগের শিল্পী হিসাবে কাজ করেন এবং ১৯৪১—৪৮ সাল পর্যন্ত সুবিখ্যাত টেট গ্যালারীর ট্রাস্টী নিযুক্ত থাকেন। মুর ১৯৪৮ সালে ভেনিস বাই-এনেল-এ আন্তর্জাতিক ভাস্কর্যের পুরস্কার লাভ করেন এবং গত বৎসরেও সাও পলো বাইএনেল-এও পুরস্কার পান। ভাস্কর্য মাধ্যমে বিভিন্ন আকারের রূপ দিবার পূর্বে শিল্পীর মনোজগতে নিবিড় অনুভূতি, কল্পনা ও চিন্তাধারার যে আলোড়ন প্রকাশ পায় তাহারই কয়েকটি চিত্র রেখার মধ্য দিয়া তিনি প্রকাশ করিয়াছেন। ভাববৈচিত্র্যে ও প্রকাশভঙ্গিমার বলিষ্ঠতায় এই নিদর্শনগুলির তুলনা মিলে না। গ্রেহাম সাদারল্যাণ্ড অংকিত লিথোগ্রাফের তিনটি নমুনা প্রদর্শনীতে ছিল। সাদারল্যাণ্ডও সমসাময়িক শিল্পীদের মধ্যে অন্যতম। তিনি শিল্পী ও খোদাইকার (engraver) সাদারল্যাণ্ডও সমর বিভাগের শিল্পী ছিলেন এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে বোমাবিধ্বস্ত বিভিন্ন স্থানের রুক্ষ ও বীভৎস চিত্রাদি অংকন করিয়া সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অন্যান্য প্রতিলিপির মধ্যে পল ন্যাশের 'অরণ্য উপত্যকা', উইনিফ্রেড নিকলসনের 'স্টিল লাইফ', জন পাইপারের 'পর্বতশ্রেণী', উইলিয়ম স্কটের বর্ণবহুল লিথোগ্রাফ 'মৎস্য' এবং আগস্টাস জনের 'বালকের প্রতিকৃতি' বার বার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তবে একথা মনে রাখিতে হইবে যে, ইঁহাদের মধ্যে অধিকাংশই আধুনিক চিত্রধারায় প্রভাবান্বিত; সুতরাং এই সকল শিল্পীর রচনার রস গ্রহণ করিতে হইলে ইঁহাদের চিত্রাদি ধৈর্য ও যত্নসহকারে লক্ষ্য করিতে হইবে।

কারণ আকারের মধ্য দিয়াই বহির্জগতের প্রত্যেক বস্তুর সহিত আমরা পরিচিত—তাই মনুষ্য, জীবজন্তু এমন কি, প্রাকৃতিক দৃশ্যও আমরা তাহাদের যথার্থ আকারের মধ্য দিয়াই দেখিতে চাই এবং কোনও চিত্রে ইহার কোনো প্রকার ব্যতিক্রম দেখিলেই আমরা তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাই—কারণ আমরা এহেন চিত্রের রস বা মাধুর্য উপভোগ করিতে পারি না। কিন্তু ধৈর্যের সহিত খ্যাতনামা শিল্পীদের অঙ্কিত চিত্রাদি যদি আমরা নিয়মিত দেখি এবং দেখিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে বুঝা যাইবে যে বহির্জগতের সীমাবদ্ধ দ্রষ্টব্য বস্তুর সহিত আকারের দিক দিয়া সঠিক মিল না থাকিলেও সমস্ত রচনাটির মধ্যে একটি সামঞ্জস্য ও সুললিত ছন্দ নিহিত আছে। শিল্পী তাঁহার তীক্ষ্ণ ও অনুসন্ধানী চক্ষুর দ্বারা বহির্জগতের প্রত্যেকটি বস্তু পর্যবেক্ষণ করেন ও তাঁহার মনোজগতে তাহার প্রতিক্রিয়া হয় এবং সেই প্রতিক্রিয়াটিই বিভিন্ন রেখা ছন্দ ও বর্ণের মধ্য দিয়া তাঁহার রচনায় আত্মপ্রকাশ করে।

যাহা হউক, স্বনামধন্য শিল্পীদের বিভিন্ন রীতি ও বিভিন্ন মাধ্যমে অঙ্কিত বহু চিত্রের প্রতিলিপি দেখাইবার সুযোগ দিয়া বৃটিশ কাউন্সিল তথা নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতি সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন, সন্দেহ নাই।

আমেরিকা

আমেরিকার নিম্নলিখিত সাত জন বিশিষ্ট শিল্পীর চিত্রসম্ভার লইয়া আমেরিকান জলরঙ চিত্র প্রদর্শনীটি গঠিত হয়। যথা,—উইনস্লো হোমার, মরিস প্রেন্ডারগাস্ট, জন মারিন, চার্লস ডিমুথ, এডওয়ার্ড হপার, চার্লস বার্চফিল্ড ও এন্ড্রু উইথ। ইঁহাদের প্রত্যেকেই আমেরিকার প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী। আমেরিকার আর্ট ফেডারেশন বিভিন্ন মিউজিয়াম ও গ্যালারী হইতে ইঁহাদের রচনা মনোনীত করিয়া এদেশে প্রেরণ করিয়াছেন।

আমেরিকার জলরঙ চিত্রপ্রদর্শনী দেখিয়া সর্বপ্রথমেই ঐ দেশের ও এদেশের মাধ্যম ব্যবহার করিবার সুনির্দিষ্ট পৃথক রীতিটুকু চোখে পড়ে। আমেরিকার বিখ্যাত চীন শিল্পী ডং কিংম্যানের ন্যায় এই সাত জন শিল্পীর রচনাতেও অতি স্বাভাবিক এক পরিচ্ছন্ন রূপ লক্ষ্য করা যায়। প্রত্যেকেই আপন আপন রীতিতে কাজ করিয়া গিয়াছেন তথাপি কাহারও রচনা অযথা বর্ণচাপে ভারাক্রান্ত হইয়া উঠে নাই। দ্বিতীয়ত, প্রত্যেকেই অতিরিক্ত মোটা কাগজ (হোয়াটম্যান) ব্যবহার করিয়াছেন; ফলে যিনি যেখানেই যে বর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন তিনিই একটি স্বাভাবিক টোন পাইয়াছেন—সুতরাং অনেক ক্ষেত্রেই ব্রাশের লঘু আলিম্পনের সঙ্গে সঙ্গেই অলক্ষ্যে একটি স্বাভাবিক পৃষ্ঠভূমির সৃষ্টি হইয়াছে। শিল্পী মাত্রেই জানেন যে জলরঙ মাধ্যমে অঙ্কিত চিত্রে যথার্থ রূপ দান করিতে হইলে এহেন অতি স্বাভাবিক পৃষ্ঠভূমির মূল্য নিতান্ত কম নহে। তৃতীয়ত, কয়েকটি চিত্র ব্যতীত অধিকাংশ রচনাগুলিই যেন কিঞ্চিৎ কৃত্রিমতাদোষে দুষ্ট। অর্থাৎ এই রচনাগুলিতে বর্ণনাভঙ্গি আছে, প্রকাশভঙ্গিমাও আছে, কিন্তু তথাপি যেন মনে হয় যে কঠিন নিয়ম ও শৃঙ্খলের মধ্যে পড়িয়া রচনাগুলি আড়ষ্ট হইয়া গিয়াছে। অধিকাংশ চিত্রেই স্বাধীনতা ও প্রাণচঞ্চলতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য, দেশের আবহাওয়া ও ঐতিহ্যের উপর ভিত্তি করিয়াই যে সে স্থানের চিত্রধারা গড়িয়া উঠে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুতরাং সেই দিক দিয়া বিচার করিলে হয়ত আমাদের কিছুই বলিবার নাই। তথাপি কয়েকটি ব্যতীত অন্যান্য রচনাগুলি দেখিলেই ধারণা হয় যে সবই আছে—বিষয়বস্তুর নূতনত্ব আছে, রীতির পার্থক্য আছে, এমন কি আপন আপন বিশিষ্ট ব্যাখ্যাভঙ্গিও আছে। কিন্তু তথাপি যেন চিত্রগুলির মধ্যে ছন্দের সেই স্বাভাবিক ও সুমধুর ঝংকারের রেশ নাই। এক কথায়, অধিকাংশ রচনা দেখিয়া মনে হয় ইহা যেন কষ্টকল্পিত ও সযত্নরচিত বিভিন্ন বর্ণবহুল মৌসুমী পুষ্পের বিচিত্র এক উদ্যান বিশেষ—সন্ধ্যাসমাগমে পল্লীগ্রামের নিভৃত প্রান্তে অনাদর ও অযত্নবর্ধিত হেনা বা চামেলী যে সৌরভ বিতরণ করে তাহা এখানে মিলিবে না।

আমেরিকার সমসাময়িক শিল্পিদের মধ্যে উইনস্লো হোমারই জলরঙ মাধ্যমকে পুনর্জীবিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। হোমার ১৮৩৬ সালে বোস্টন শহরে জন্মগ্রহণ করেন। কোনো বিশে[ষ] স্কুলে তিনি শিক্ষালাভ করেন নাই প্রকৃতিকে তিনি ভালবাসেন, এমন কি পূজা করেন। প্রৌঢ়কালে তিনি নিউ ইংলণ্ডের একটি নির্জন স্থানে বসবাস করিতে আরম্ভ করেন এবং সমুদ্রের তীরে বসিয়া তিনি নিঃসঙ্গ জীবন অতিবাহিত করেন। দিগন্তব্যাপী মহাসমুদ্রের বিরাট ও বিচিত্র রূপ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করে। ফলে, তাঁহার রচনার মধ্য দিয়া অরণ্য, সমুদ্র, নাবিক ও ধীবরের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়গুলি এক অনির্বচনীয় মাধুর্য লইয়া ফুটিয়া উঠে। পরিপ্রেক্ষিত, পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও বর্ণসমতার জন্য তাই 'নিউ ইংলণ্ডের পর্বতশ্রেণী' চিত্রখানি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এন্ড্রুউয়েথ ১৯১৭ সালে চ্যাড্‌স্‌ফোর্ড (পেন্সিলভেনিয়া)-এ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা এন সি উয়েথ আমেরিকার পরিচিত শিল্পী সুতরাং তিনি তাঁহার পিতার নিকটেই প্রাথমিক শিক্ষালাভ করেন। কোনো বিশেষ বিষয়বস্তুর প্রতি তাঁহার আকর্ষণ নাই—অর্থাৎ শিল্পীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া উয়েথ সমাজ ও জীবনের সর্বক্ষেত্র হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া দেশের সাধারণ লোকের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা, নগণ্য পুরাতন পল্লীর একাংশ অথবা কৃষকের কর্মধারা বা তাহার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি কিছুই তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় না। সুতরাং তাঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য—তাঁহার একান্ত নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী। তাই 'মেইন প্রাকৃতিক দৃশ্য'খানি সর্বপ্রথমে চোখে পড়ে। তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণ শক্তি, দৃঢ় ব্রাশের টান ও সর্বোপরি সংক্ষিপ্ত বর্ণ আলিম্পনের জন্য এই রচনাটি একটি বিশিষ্ট রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে।

জন মারিন ১৮৭০ সালে রাদারফোর্ডে (নিউ জার্সি) জন্মগ্রহণ করেন। আর্কিটেক্ট হিসাবে শিক্ষালাভ করিয়া তিনি পরে ফিলাডেলফিয়া ও নিউইয়র্কে অংকনবিদ্যা শিক্ষা করেন ও ১৯০৫-১১ সাল ইউরোপে যাপন করেন। দেশে ফিরিয়া তিনি আলফ্রেড স্টিগ্‌লিজের প্রভাবে পড়িয়া আধুনিক চিত্রধারায় দীক্ষিত হন। জীবনের অধিকাংশ কালই
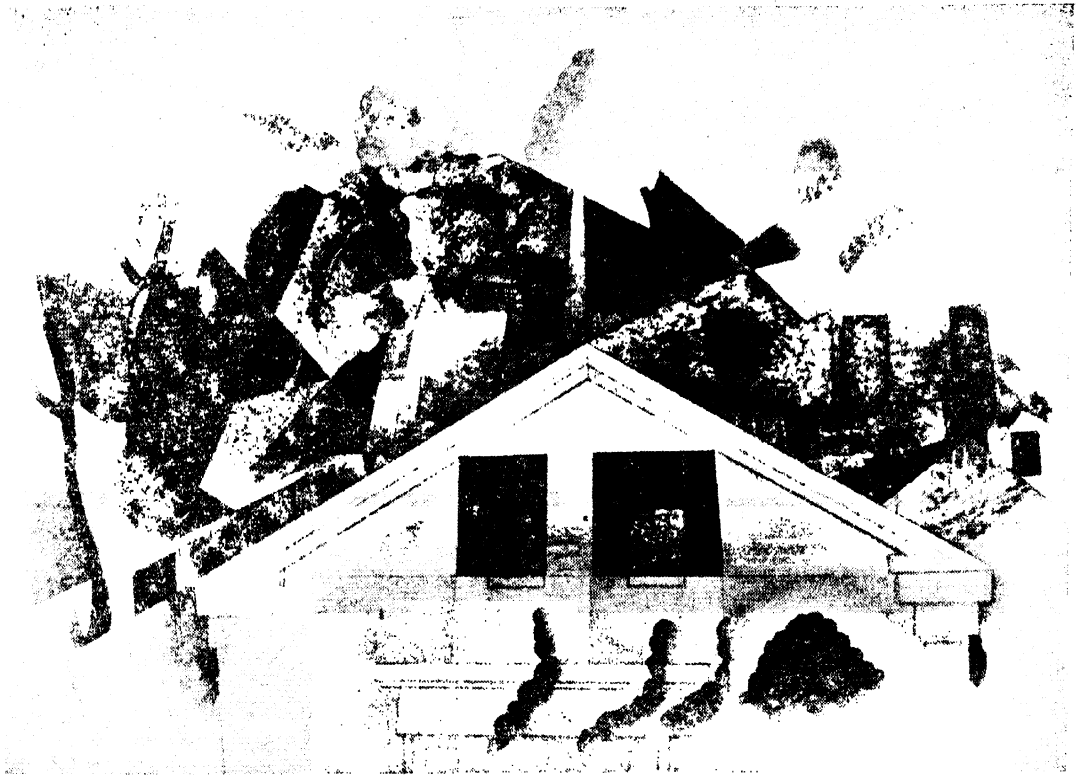
গৃহের উপরিভাগ —চার্লস ডিমুথ

তিনি মেইনএ কাটাইয়া মাত্র গত বৎসর পরলোকগমন করেন। আমেরিকায় যাঁহারা আধুনিক শিল্পধারার প্রবর্তন করেন মারিন তাঁহাদের অন্যতম। বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার পর নিউইয়র্ক শহর তাঁহার মানসিক জগতে এক বিক্ষোভের সৃষ্টি করে। নিউইয়র্কের গগনচুম্বী ইমারত শ্রেণী, সুদীর্ঘ সেতুপথ, বিপুল জনাকীর্ণ, কোলাহলমুখরিত দীর্ঘ রাস্তা অথবা বিচিত্র আলোকমালাসজ্জিত কর্মব্যস্ত বিরাট নগরীর নৈশরূপ তাঁহার মনের উপরে বিশেষভাবে রেখাপাত করে। তদুপরি মেইনের অরণ্য ও দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের সুনীল জলরেখাও তাঁহাকে কম মুগ্ধ করে নাই। তাই একদিকে যেমন তিনি কর্মবহুল বিরাট নগরীগুলির বিচিত্র রূপটুকু ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন অন্যদিকে তেমনি মনের আবেগে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দৃশ্যও প্রতিফলিত করিতে ভুলেন নাই। বহির্জগতের রূপটুকু তিনি শুধু দেখিতেন না, হৃদয় দিয়া অনুভব করিতেন এবং সেই অনুভূতিকেই রেখা ও বর্ণ সহযোগে রূপায়িত করিতেন। সেই-জন্য তাঁহার রচনায় তরুশ্রেণীর প্রতিটি পত্র যেন বায়ুবেগে মর্মরিয়া উঠে ও সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ যেন সত্যই আর্তনাদ করিয়া সমগ্র তীরভূমিকে আলোড়িত করিয়া তুলে। 'শহরের দৃশ্য, মানহাটান' ও 'মেইন' সমুদ্র ও নৌকা' তাই বার বার দেখিতে ইচ্ছা করে। চার্লস ডিমুথ ১৮৮৩ সালে ল্যাঙকাস্টারে (পেন্সিলভেনিয়া) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ফিলাডেলফিয়াতে শিক্ষালাভ করেন ও পরে অধিকাংশ কাল প্যারিসে যাপন করিয়া আধুনিক চিত্রধারাভাবাপন্ন হন। তিনি ১৯৩৫ সালে পরলোকগমন করেন। ডিমুথের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে স্থাপত্য-শিল্পের বিভিন্ন আকারের উপর ভিত্তি করিয়া তিনিই আমেরিকাতে সর্বপ্রথম চিত্রাঙ্কন শুরু করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর নানা গীর্জা হইতে আরম্ভ করিয়া বিংশ শতাব্দীর বিভিন্ন ফ্যাক্টরীসৌধের মধ্যে তিনি ভিন্ন ভিন্ন আকার-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করেন ও সেইগুলি নিজস্ব চিন্তাধারার মধ্য দিয়া নিজ রচনায় প্রকাশ করেন। গ্রামের বিভিন্ন গৃহ ও তাহাদের ছাদের একাংশ তিনি পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন ও তাহাদের বাস্তব আকারের সহিত জ্যামিতির রেখাবৈচিত্র্যে মিলাইয়া তিনি সংঘবদ্ধ একটি পরিপূর্ণ রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্টিল

লাইফ স্টাডির মধ্য দিয়াও তাঁহার প্রতিভা ফুটিয়া উঠিয়াছে। 'গৃহের উপরিভাগ' বা 'ফল' দেখিলেই তাঁহার নিজস্ব অঙ্কন-ধারাটুকু বুঝা যায়। চার্লস বার্চফিল্ড ১৮৯৩ সালে আস্টাবুলা বন্দরে (ওহিও) জন্মগ্রহণ করেন তিনি ক্লীভল্যান্ড আর্ট স্কুলে শিক্ষালাভ করেন ও জীবনের প্রথমভাগে তিনি শৈশবকালের নানা-রঙে-রঙগীন সুমধুর ঘটনাগুলিকেই চিত্রে রূপায়িত করেন। পরে অবশ্য ইনি বাস্তব-পন্থা অবলম্বন করেন। নগণ্য গ্রামের পরিচিত, অপরিচিত ছোট ছোট পথ, ফ্যাক্টরীর চতুর্দিকস্থ কোয়ার্টারশ্রেণী অথবা অর্ধভগ্ন কৃষকের কুটিরের একাংশ তাঁহাকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে—অর্থাৎ জীবনের কঠোর সংগ্রামে যাহারা পরাজিত হইয়াছে তাহাদের প্রতিই তাঁহার অধিক সহানুভূতি এবং এই সহানুভূতিই এক বিশিষ্ট আকারের মধ্য দিয়া তাঁহার রচনায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। 'সোজা রাস্তা' চিত্রখানি দেখিলেই শিল্পীর বিশিষ্ট ও সহানুভূতিশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়।

এডওয়ার্ড হপার ১৮৮২ সালে ন্যাক-এ (নিউ ইয়র্ক) জন্মগ্রহণ করেন ও সেখানেই চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ইঁহার প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে উন্নতি লাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমেরিকার মানবসমাজ চতুর্দিকে যে সকল সৌধশ্রেণী ফ্যাক্টরী, টেলিফোন সুদীর্ঘ রেল ও সেতুপথ ইত্যাদি গড়িয়া তুলিয়াছে তিনি তাহাদের মধ্য হইতেও প্রেরণা লাভ করেন। হপার স্বাভাবিক রীতির পক্ষপাতী এবং অনেক ক্ষেত্রে হোমারের রচনার সহিত ইঁহার সাদৃশ্য চোখে পড়ে। ইঁহার 'বক্র পথরেখা' দ্রষ্টব্য।

মরিস প্রেন্ডারগাস্টের জন্ম তারিখ বা স্থান সম্বন্ধে সঠিক কিছু জানা যায় না; তবে তিনি বোস্টন শহরে প্রতিপালিত হন। ১৮৮৭ সালে তিনি ইউরোপ গমন করেন ও ১৮৯২ হইতে ১৮৯৬ সাল পর্যন্ত প্যারিসে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ১৮৯৮ সালে তিনি ইতালী গমন করেন ও ১৯০৯-১০ সাল ফ্রান্সে যাপন করিয়া ১৯১১-১২ সালে পুনরায় ইতালী যান এবং ১৯১৪ সালে নিউইয়র্কে বসবাস আরম্ভ করেন। প্রেন্ডারগাস্ট ১৯২৪ সালে পরলোকগমন করেন। এই শিল্পীও ফরাসী চিত্রধারায় প্রভাবান্বিত ছিলেন। বিখ্যাত ফরাসী চিত্রকর সিজানের রচনা হইতে প্রেরণা লাভ করিলেও তিনি ঠিক তাঁহার মত আকারের উপর প্রাধান্য দিতেন না। তাঁহার অঙ্কণরীতির মূলে ছিল এক অতি সূক্ষ্ম অভিব্যক্তি ও কাব্যের সুললিত ছন্দ।

আমেরিকার খ্যাতনামা শিল্পীদের রচনা ও রচনাপদ্ধতি দেখাইবার সুযোগ দিয়া আমেরিকার আর্ট ফেডারেশন ও নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতি সকলের ধন্যবাদ দাবী করিতে পারেন। এই প্রদর্শনী বর্তমানে কলিকাতায় চলিতেছে। পরে ইহা বোম্বাই ও মাদ্রাজ শহরেও অনুষ্ঠিত হইবে।

আলোচনা

'শান্তি বর্ধনের পুতুল নাচ'

শ্রদ্ধেয় "দেশ" পত্রিকা সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু,

মাননীয়েষু,

২৯শে আশ্বিনের "দেশ" সংখ্যাটিতে "শান্তি বর্ধনের পুতুল নাচ" প্রবন্ধটি পড়ে যুগপৎ দুঃখ ও আনন্দ লাভ করেছি। দুঃখ এই যে, শান্তি বর্ধনের মত একজন প্রকৃত শিল্পীকে আমরা অকালে হারিয়েছি। আনন্দের কারণ এই যে, একজন উপযুক্ত শিল্পী আমাদের দেশের একটি প্রাচীন লোক-শিল্পের ধারাকে নিজের প্রতিভায় একটি সুন্দর রূপ দিয়ে সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থাপিত ক'রে মৃতপ্রায় শিল্পটিকে পুনরুজ্জীবিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন এবং নিজের প্রাণ দিয়েও তিনি তাতে সার্থক ও সফল হয়েছিল।

বছরখানেক আগে বাঁকুড়ায় রামকৃষ্ণ মঠের আশ্রমে এই ধরনের এক নৃত্যোৎসব দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল। সমাজের নিম্নস্তরের লোকদের নিয়ে গঠিত একটি দল রামায়ণের কাহিনীর কয়েকটি দৃশ্য নৃত্যের মাধ্যমে প্রকাশ করে। ঐ আসরের দৃশ্যপট বিশেষ কিছুই ছিল না; পোশাক ও মুখোশ অবশ্য শান্তি বর্ধনের নাচের দলের তুলনায় অনেক নিম্নস্তরের। চামড়ার বাদ্যই ছিল প্রধান বাদ্যযন্ত্র। অতি সাধারণ পরিবেশ, সাজসজ্জা ও বাদ্যযন্ত্রের সহযোগিতায় ঐ দল যেরূপ সুন্দর নৃত্যভঙ্গীতে কাহিনীগুলি প্রকাশ করেছিল, তা দেখে আমর মনে হচ্ছিল, যে এই জিনিসই যদি উপযুক্ত শিল্পীদল উপযুক্ত সাজসজ্জা, দৃশ্যপট ও আরও উৎকৃষ্ট পরিবেশে পরিবেশিত হত, তবে এই নৃত্যই আরও কত মনোহর ও মোহময় হয়ে উঠতে পারতো।

সমাজের উচ্চস্তরের লোকদের আকর্ষণীয় আমোদ-প্রমোদগুলি গ্রামীন সভ্যতার সাধারণ সুন্দর সহজ প্রয়াসকে অনাদর ও অবহেলা করে এড়িয়ে চলে বলেই আমদের দেশের সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য ক্রমশই স্বকীয়তা হারিয়ে ফেলেছে। মাটির পুতুল, পটুয়ার পট, ঢাকাই তাঁত-বস্ত্র এই রকম আরও অসংখ্য শিল্পধারা শহর সভ্যতার অনাদরে ও অবহেলায় ক্রমশ বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু যামিনী রায়, নন্দলাল বসু, উদয় শঙ্কর, শান্তি বর্ধনের মত দেশের ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবান শিল্পীর জন্যই ঐ সব শিল্পধারার কিছু পরিমাণে পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছে ও হচ্ছে।

বাঁকুড়ায় ঐ উৎসব দেখতে দেখতে আমার দুঃখ হচ্ছিল যে, আমাদের দেশের কোন গুণী শিল্পী যদি এই নৃত্যপদ্ধতিটি পরিমার্জিত করে সর্বসাধারণের সম্মুখে উপস্থিত করেন, তবে উহা রসিক সমাজের মনোরঞ্জনের উপযুক্ত হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা কি কোন দিন সম্ভব হবে!

আমার সে অনুমান যে মিথ্যা নয়, তার প্রমাণ পেলাম, উল্লিখিত প্রবন্ধটি পড়ে এবং জানতে পারলাম যে, শ্রী নেহরু এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে, রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করে রচিত এই পুতুল নাচের বিষয়বস্তু নৃত্যপদ্ধতি।

শান্তি বর্ধনের মত প্রতিভাবান শিল্পী কালের নিষ্ঠুর বিধানে এই ধরণীর ধূলি হতে অকালেই চলে গেলেন, এটা আমাদের পক্ষে খুবই দুঃখের বিষয়; কিন্তু তাঁর প্রচেষ্টা তাঁর দলের অন্যান্য শিল্পীদের সাধনায় আরও প্রসারিত হচ্ছে, এই দেখতে পেলে—তাঁর সাধনা ও তাঁর প্রাণপাত বিফল হয় নাই, দেখতে পেলে আনন্দিত হব।

শচী বন্দ্যোপাধ্যায়। ৩১-বি মহারাজা ঠাকুর রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা।

মিশরের প্রেসিডেণ্ট নজীব পদচ্যুত য়েছেন। এরূপ যে ঘটবে, তা দু স্তাহ পূর্বেই বৈদেশিকীতে আন্দাজ রা হয়েছিল। এরূপ নাকি জানা গেছে া, নসের গভর্নমেণ্টকে সরাবার জন্য ুসেলিম ব্রাদারহুডের', ষড়যন্ত্রের সঙ্গে জীব যুক্ত ছিলেন। যথাসময়ে যে এরূপ ানা যাবে' তা গত মাসে আলেক-াণ্ড্রিয়াতে কর্নেল নসেরকে হত্যা করার ষ্টার পরবর্তী সংবাদ প্রচারের ধরন কেই বুঝা গিয়েছিল। 'মুসলিম ব্রাদার-ুডের' ষড়যন্ত্রের ভিতরের ব্যাপার কি, ার সঙ্গে নজীবের কোনো যোগাযোগ ল কিনা ইত্যাদি বিষয়ে প্রকৃত এবং ূর্ণ সত্য আবিষ্কার করা বর্তমানে সম্ভব। তবে নজীবের দিন যে ুরিয়েছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তাঁকে াণে না মারলেও তাঁর দীর্ঘ বন্দিদশা নিবার্য বলে মনে হয়। ইরাণে জাহেদী বর্নমেণ্ট ডক্টর মুসাদেকের সঙ্গীসাথী নেককে কতল করেছেন, কিন্তু ডক্টর সাদেকের প্রাণ নিতে সাহস করেননি। রণ তাতে জনসাধারণ অতিমাত্রায় ক্ষুব্ধ ত। ১৯৫২ সালের জুলাই মাসে মিশরে সামরিক অফিসারদের 'রিভলাশেন উন্সিল' যখন রাজাকে তাড়িয়ে শাসন-ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেয়, তখন নজীব ছিলেন তাদের নেতা, নজীবকে মিশরের ত্রাণকর্তারূপে তখন জনসাধারণের কাছে চিত্রিত করা হয়। গত ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত এই চিত্র জনসাধারণের সামনে ছিল এবং নজীব প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রী উভয় পদই অধিকার করেছিলেন। গত ফেব্রুয়ারী মাসে 'রিভল্যুশন কাউন্সিলের' অন্তর্দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে, নজীবকে পদচ্যুত করে কর্নেল নসের প্রেসিডেণ্ট ও প্রধানমন্ত্রীর স্থান গ্রহণ করেন। কিন্তু এতে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে একদল বিক্ষুব্ধ হয়ে বিদ্রোহের ভয় দেখায়। তাদের চাপে নজীবকে প্রেসিডেণ্ট পদে পুনরায় বহাল করা হয়, কিন্তু সেটা দৃষ্টিশোভা মাত্র। আসল ক্ষমতা প্রধান-মন্ত্রী হিসাবে সম্পূর্ণভাবে নসেরেরই হাতে থাকে। তবে নজীব যে এই অবস্থায় সন্তুষ্ট ছিলেন বা থাকতে পারেন, তা মনে করার কোনো কারণ নেই। সুতরাং ভিতরে গোলমাল কিছু ছিলই। নসের এবার সেটা শেষ করার সুযোগ পেয়েছেন। ফেব্রুয়ারী মাসে সৈন্য বাহিনীর মধ্যে নজীবের হয়ে দাঁড়াবার যে-দল ছিল, তারা এখনো আছে কিনা বা থাকলেও এবার কিছু করতে পারবে কিনা সন্দেহ। আলেকজাণ্ড্রিয়ার ঘটনা, 'মুসলিম ব্রাদারহুডের' সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ ইত্যাদি মিলে এমন একটা অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যাতে নজীবের অপসারণের বিরুদ্ধে কোনো প্রকার উত্থান আপাতত সম্ভব নয়। তবে নসের গভর্নমেণ্ট নজীবের প্রাণ পর্যন্ত হরণ করতে সাহসী হবেন বলে বোধ হয় না। সামরিক বিচার এবং দীর্ঘ কারাবাসের দণ্ড দান পর্যন্তই বোধ হয় হবে।

নজীবের ভাগ্যে যাই থাক, আপাতত মিশরে নসের গবর্নমেণ্ট সমস্ত রকম বিরোধী শক্তির প্রকাশ্য অভিব্যক্তির পথ রুদ্ধ করলেন। অন্য রাজনৈতিক দলগুলির বৈধ অস্তিত্ব পূর্বেই নষ্ট করা হয়েছিল। বাকি ছিল 'মুসলিম ব্রাদারহুড', তারও বৈধ অস্তিত্বের অবসান হলো। 'মুসলিম ব্রাদারহুডের' রীতিনীতি সম্বন্ধে আপত্তি করার অনেক কিছু ছিল সন্দেহ নেই। 'মুসলিম ব্রাদারহুডের' হিংসাত্মক কার্যা-বলী সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু যেখানে সাধারণ রাজনৈতিক দলগুলিকে বেআইনী ঘোষিত করে সরকার নিজেই শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের সমস্ত পথ রুদ্ধ করে দিয়েছেন, সেখানে প্রতিবাদ যে হিংসাত্মক পথে আত্মপ্রকাশের চেষ্টা করবে এটাতো স্বাভাবিক। অন্য রাজ-নৈতিক দলগুলি নিষিদ্ধ হবার পরে 'মুসলিম ব্রাদারহুডের' ভিতর দিয়ে ঠিক-ভাবে হোক বা ভুলভাবে হোক, খানিকটা সমালোচনা প্রকাশের পথ ছিল। সেটাও বন্ধ হলো। এ অবস্থা মিশরের পক্ষে,

এমনকি নসের গবর্নমেণ্টের পক্ষেও শুভ নয়। গবর্নমেণ্টের সমালোচনা করার একটা বৈধ ব্যবস্থা থাকা উচিত। রাজনৈতিক দলগুলিকে আবার কাজ করতে দিতে এবং আর বেশি দেরি না করে ইলেকশন করাতে নাকি নজীবের ইচ্ছা ছিল। নসেরকে তো অনির্দিষ্ট কাল ধরে ডিক্টেটরশিপ চালাবার পক্ষপাতী বলে মনে হয়। কিন্তু তার দ্বারা মিশরে কি শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে?

* * *

জাপানে যোশিদা গবর্নমেণ্টের টিকে থাকা মুশকিল মনে হচ্ছে। সামনে যে অনাস্থা প্রস্তাব আসছে, সেটা পাকা হয়ে থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। মিঃ যোশিদার নিজের দলের একটা অংশ তাঁর বিরুদ্ধে গেছে। তারা সোস্যালিস্টদের সংগে গবর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে ভোট দেবে। সুতরাং বিদেশ ভ্রমণ থেকে ফিরেই মিঃ যোশিদাকে একটা সংকটের সম্মুখীন হতে হবে।

জাপানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও খুব কঠিন। এবিষয়ে মিঃ যোশিদার বিদেশ ভ্রমণ বিশেষ কিছু ফলপ্রসব করবে কিনা বুঝা যাচ্ছে না। আমেরিকা যে-পরিমাণ সাহায্য দিতে পারে বা দিতে প্রস্তুত, তাতে জাপানের কুলচ্ছে না। বর্তমানের তুলনায় ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আরো অনেক বেশি সুবিধা সুযোগ না পেলে জাপানের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি সম্ভব নয়। অথচ এ ব্যাপারে আমেরিকা এবং বিশেষ করে বৃটেন জাপানকে এমন বেশি বাড়তে দিতে চায় না, যাতে জাপানী প্রতিদ্বন্দ্বিতা তাদের নিজেদের পক্ষে অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে। অথচ জাপানকে দলেও রাখা চাই, কেবল দলে রাখা নয়, কিঞ্চিৎ সবল করাও চাই। কারণ পংগু করে দলে রাখলে তাতে বিপদ আরো বেশি।

এই সুযোগে রুশ-চীন পক্ষ একটি মন্দ চাল চালেনি। তারা তাদের সংগে জাপানের ব্যবসাবাণিজ্যের সম্বন্ধকে স্বাভাবিক করার জন্য আগ্রহ জানিয়েছে। এরূপ প্রস্তাবের আকর্ষণ জাপানের পক্ষে প্রবল না হয়ে পারে না। চীনের সংগে বাণিজ্যের পূর্ণ সুযোগ পেলে জাপানের অর্থনৈতিক সমস্যা বেশ কিছুটা লঘু হয়ে যেতে পারে। অবশ্য ব্যবসা বাণিজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা বলতে রাশিয়া বা চীন সরকার ঠিক কী ভাবছেন, তা বলা কঠিন। কম্যুনিস্ট চীন সরকার নিজেদে[র] সুখসুবিধার দিকে দৃষ্টি রেখেই জাপনে[র] সংগে কাজকারবার করবেন, পূর্বের অ[পেক্ষা] কোনো বিদেশীর পক্ষে বিশাল চীনে[র] 'বাজারের' সুযোগ নেওয়ার সম্ভাব[না] আর নেই। তাহলেও জাপান আকৃষ্ট হ[তে] এবং জাপান আবার ওদিকে বেশি ঢ[লে] না পড়ে, তার জন্য আমেরিকার উদ্বে[গ] বাড়বে।

* * *

ফরমোজা সম্পর্কে আমেরিকা চিয়া[ং] কাইশেকের সংগে একটি নূতন প্যাক্টে[র] আলোচনা করছে বলে শুনা যাচ্ছে। এ[ই] প্যাক্ট অনুসারে আমেরিকা ফরমোজা[কে] কম্যুনিস্ট চীনের আক্রমণ থেকে রক্ষা করতে প্রতিশ্রুত থাকবে এবং সেই সংগে ফরমোজার ন্যাশনালিস্ট চীন গভর্নমেণ্ট[ও] এই প্রতিশ্রুতি দেবেন যে, তারা চীন[া] ভূভাগ আক্রমণ করবেন না। এরূ[প] চুক্তি পিকিং সরকারের খুবই বিরাগে[র] কারণ হবে সন্দেহ নেই, যেহেতু এই চুক্তি[র] উদ্দেশ্য হচ্ছে, পাকাপাকিভাবে ফ[র]মোজাকে কম্যুনিস্ট চীনের নাগালে[র] বাইরে রাখা।

পিকিং আমেরিকার এই উদ্যো[গে] যতটা বিরক্ত হবে তার চেয়ে বেশি উদ্বিগ্ন হবে এই কারণে যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নাকি এই প্যাক্ট সমর্থন করবেন। শ[ুনা] যাচ্ছে, বৃটিশ এতদিন ফরমোজা সম্বন্ধে কোনো বাঁধাবাঁধির মধ্যে যায়নি। তার ফ[লে] আমেরিকাও ফরমোজা সম্বন্ধে আইনে[র] দৃষ্টিতে কোনো পাকাপাকি বন্দোবস্ত করতে এতদিন অসুবিধা বোধ করছিল। তবে ফরমোজা সম্বন্ধে আমেরিকা য[দি] চিয়াং কাইশেকের সংগে একটা সন্ধি ক[রে] এবং সেই সন্ধি অনুসারে ফরমোজা থে[কে] চীনভূভাগ আক্রমণ করা যদি নিষিদ্ধ হ[য়] তবে আমেরিকার কম্যুনিস্ট চীন[কে] স্বীকার না করার আর কোনো অজুহা[ত] থাকবে না। হয়ত মার্কিন নী[তি] কম্যুনিস্ট চীন এবং চিয়াং কাইশেকে[র] ফরমোজা উভয়কেই যুগপৎ স্বীকৃ[তি] দানের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। কি[ন্তু] কম্যুনিস্ট চীনের নিকট মার্কি[ন] স্বীকৃতির চেয়ে ফরমোজার অধিক[ার] অধিকতর কাম্য সন্দেহ নেই।

১৫।১১।

কথাসাহিত্য

কন্যাপক্ষ—বিমল মিত্র। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দাম ২৸০ আনা।

কন্যাপক্ষের অন্তর্ভুক্ত একাধিক রচনা মিষ্টিদিদি, মিছরিবৌদি, সোনাদি প্রভৃতি স্বতন্ত্র গল্প হিসেবে পড়বার সৌভাগ্য সম্ভবত বহু পাঠকেরই হয়েছে। বর্তমান গ্রন্থে এই গল্পগুলির একত্র সন্নিবেশ। তথাপি 'কন্যাপক্ষ' ছোটগল্পের সংকলন নয়। লেখক বইটির সম্পর্কে বলেছেন, 'কন্যাপক্ষ উপন্যাস নয়।......ছোটগল্পের বইও নয় এ। জীবনের বিভিন্ন সময়ে কিছু বিচিত্র চরিত্রের সন্ধান পেয়েছিলাম আমি। সচেতন ভাবে চিত্র-শিল্পীদের মত তার কিছু স্কেচ করে রেখে-ছিলাম তখন।......ইতিমধ্যে একদিন তার ভিতরে ঐক্য, সামঞ্জস্য আর ক্রম পরিণতির এক আভাস লক্ষ্য করেছি। তাই সেগুলির কিছু অংশ একত্র করে গ্রন্থাকারে রূপ দিলাম।' বলা বাহুল্য কন্যাপক্ষের অন্তর্গত কাহিনীগুলি স্বতন্ত্র হলেও গ্রন্থটি যে একটি সামগ্রিক আবেদন বহন করছে এ বিষয়ে পাঠক নিঃসন্দেহ হতে পারেন।

বিমল মিত্র মহাশয়ের লেখার নিজস্ব একটি রীতি ও নীতি আছে। এই গ্রন্থের কোনও এক জায়গায় লেখক এ সম্পর্কে তাঁর মনোভাব কিছু আভাসে ব্যক্ত করেছেন। সেই মনোভাব এই: বিকৃতিটাই তো মানুষের প্রকৃতি নয়। বিকৃতি হল প্রকৃতির বিকার। লেখকদের যখন দৃষ্টি খণ্ডিত থাকে তখনই সে এই রকম বিকৃতি নিয়ে মাথা ঘামায়। লেখকদের মধ্যে দু'রকমের জাত আছে। তুই (লেখকের প্রতি উপদেশ) বীর সাধক হবার চেষ্টা কর। তবেই নাম হবে।......বিমল বাবু, বলা বাহুল্য, তাঁর লেখায় এই কারণেই যত-দূরে সম্ভব সহজ প্রকৃতির নরনারী নিয়ে একটি মধুর কাহিনী রচনার চেষ্টা করে থাকেন। তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির বৈচিত্র্য প্রায়শই প্রকৃতিগত, বিকৃতিগত নয়। যদিচ অতি সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে এই দুয়ের মধ্যে পার্থক্য মনুষ্য-চরিত্র-ব্যবহার সম্পর্কে তত্ত্বান্বেষণকারীরা স্বীকার করবেন না। শুধু এই কারণেই কালোজামদিদির করুণ কাহিনীকে বিকৃতিগত বৈচিত্র্যের কাহিনী বলতে অনেকেরই হয়ত বাধবে। এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে লেখকের গভীর অনুভূতি বোধ এবং প্রকাশ ক্ষমতার ওপর। একের বিকৃতি যে বহুর সুপ্ত প্রকৃতিতে গুপ্ত—সেই বোধ শিল্পীজনোচিত উপায়ে ব্যক্ত করার দৃষ্টান্তও বিরল নয়। সুধা সেন কি কালোজামদিদি এঁরা লেখকের কলমে যদি বিকৃত না হয়ে থাকেন তবেই লেখা সার্থক—তাঁরাও সার্থক —কী এল গেল অন্য কথায়। অন্তত লেখকের মনে এ প্রত্যয় থাকা ত উচিতই। নতুবা পাঠকের পক্ষে কন্যাপক্ষের কয়েক-জনকেই ভয়ে ভয়ে বাতিল করতে হয়।

অনাড়ম্বর বাচনভঙ্গী, অনায়াস গতি এবং কাহিনীর সরল আকর্ষণীয় বয়ন—বিমল মিত্রের রচনার সর্বশ্রেষ্ঠ গুণ। এ বিষয়ে তাঁর সমকক্ষতা দাবী করতে পারে—এমন লেখক ইদানীংকালে আর ক'জনই বা আছেন! বস্তুত এই কারণেই কন্যাপক্ষের প্রত্যেকটি কাহিনীই পাঠকের মনোহরণ করবে।

কন্যাপক্ষের অন্তর্ভুক্ত সকল নারী চরিত্র-গুলিই যে খুব ঘরোয়া এবং সাধারণ এ হয়ত লেখক দাবী করবেন না। আবার সুধা সেন, অলকা পাল, কালোজামদিদি—প্রভৃতি চরিত্রগুলি শুধুই কল্পনাপ্রসূত নয়। সব কটি চরিত্রই মাটির ছোঁয়া মাখানো, ঘরোয়া জীবনের গন্ধ মাখানো। এর ফলে চরিত্রগুলি নির্বিচারে আমাদের সহানু-ভূতি আকর্ষণ করে নেয়। 'কন্যাপক্ষ' আগা-গোড়া পড়ার পর সম্ভবত, পাঠকের এই ধারণাই বদ্ধমূল হবে যে, নারী-চরিত্রে সুপ্ত ও প্রকাশ্য যে একাধিক রহস্য বর্তমান থাকতে পারে লেখক তাদের অনেকগুলিকে একযোগে যেন ধরবার চেষ্টা করেছেন। বিভিন্ন ফুলের গাছ দিয়ে যেন একটি ফুলের বাগান সাজিয়েছেন তিনি। বোধ করি 'কন্যাপক্ষে'র প্রকৃতিগত ঐক্য এখানেই।

'কন্যাপক্ষ' বাঙালী পাঠকের ভাল লাগবে এ আশা করতে পারি। বিস্ময়, ব্যথা, মাধুর্য এবং করুণা বিবিধ প্রকার রসানুভূতিতে এ গ্রন্থের পাঠক সিক্ত হবেন—এমন প্রস্তাব করতেও দ্বিধা বোধ করব না।

গ্রন্থের প্রচ্ছদপট, ছাপা সুন্দর।

৩৮৫।৫৪

সাহিত্যালোচনা

বাংলার লোক-সাহিত্য—শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য প্রণীত। ক্যালকাটা বুক হাউস, ১।১, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃঃ ৫১২, মূল্য—১০্।

আলোচ্য গ্রন্থের লেখক দীর্ঘকালযাবৎ বাংলার প্রাচীন সাহিত্য সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। একাধিক গ্রন্থে তিনি তাঁহার দীর্ঘকালের সাধনালব্ধ জ্ঞানের যে পরিচয় দিয়াছেন তাহার জন্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস পাঠকরা তাঁহার নিকট নানাভাবে কৃতজ্ঞ। বাংলার লোকসাহিত্য সম্বন্ধে সদ্যপ্রকাশিত সুবৃহৎ গ্রন্থখানি তাঁহার অনুসন্ধিৎসা, নিষ্ঠা, শ্রম ও গবেষণার পরিচায়ক। তিনি এই গ্রন্থে বাংলার লোকসাহিত্যের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি, ছড়া, গীতি, গীতিকা, কথা, ধাঁধা, প্রবাদ ও পুরাকাহিনী সম্বন্ধে বিভিন্ন অধ্যায়ে ব্যাপক-

ভাবে আলোচনা করিয়াছেন এবং এই আলোচনা বহু উদ্ধৃতির দ্বারা মনোজ্ঞ ও ঐতিহাসিক প্রমাণযুক্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টে শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী লিখিত বাংলা লোক-গীতির সুরবিচার সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনাটি সঙ্গীতের ক্ষেত্রে লোক-সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্যটুকু পরিস্ফুটনে সহায়তা করিবে। বাংলার লোক-সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট রূপ আছে এবং মূল্যও আছে, যাহার প্রতি রবীন্দ্রনাথ বহুকাল পূর্বে তাঁহার 'ছেলে ভুলানো ছড়া' প্রবন্ধে সাহিত্যানুরাগীদের সর্বপ্রথম সচেতন করিয়া দিয়াছিলেন। তাহার পর বাংলা সাহিত্যের একাধিক ইতিহাস-রচয়িতা লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন, লোক-সাহিত্যের কিছু সংগ্রহও প্রকাশ করিয়াছেন; কিন্তু লোক-সাহিত্য সম্বন্ধে আধুনিকতম বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বনে ব্যাপক আলোচনা ইতি-পূর্বে হইয়াছে বলিয়া আমাদের জানা নাই। লেখকের অধ্যবসায় আছে, তথ্যনিষ্ঠা প্রশংসনীয়। বুদ্ধিজাত যুক্তি-তর্ক দ্বারা লোক-সাহিত্যের রসবিচার তিনি করিয়াছেন। সেই কারণেই গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের এক স্বল্প আবিষ্কৃত ক্ষেত্রে অনেকখানি আলোক-সম্পাত করিয়াছে।

রম্যরচনা

বিচিত্র কাহিনী : শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ। প্রকাশক—এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম দু' টাকা।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ প্রধানতঃ অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক হিসেবে বাংলা দেশের পাঠক মহলের কাছে সুপরিচিত হ'লেও, 'মৌচাক', 'যুগান্তর', এবং 'বসুমতী' পত্রিকায় তিনি আলোচ্য গ্রন্থের গল্পগুলি যখন লিখেছিলেন, তখনই তাঁর একটি বিশিষ্ট সাহিত্যিক পরিচয়ও পাঠকমহলের কাছে স্বীকৃত হয়েছিল। একটি গল্পের মধ্যেই তিনি 'বিচিত্র কাহিনী' বইটির বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন: "আমি যে সব গল্প বলি বা লিখি সে সবই সত্যি। অর্থাৎ কিনা আমার নিজের জীবনের সত্য ঘটনাকে গল্পের ছলে বলা। তাতে একটু আধটু রং ফলানও হয় তো থাকে, তার বেশী নয়।" আলোচ্য গ্রন্থের কাহিনীগুলি সে-কারণে ছোট গল্প অপেক্ষাও বেশি উপভোগ্য। গ্রন্থকারের গল্পে কোথাও অসাধারণত্ব নেই, জীবনের অত্যন্ত সাধারণ ঘটনাকেও তিনি এক বিচিত্র কথকতার ঢঙে এমন ভাবে পরিবেষণ করেছেন, পড়তে পড়তে মনে হয় যেন তাঁর সামনে বসে তাঁর মুখ থেকেই গল্প শুনছি। এই সহজ প্রাঞ্জল ভাষার কোথাও কোথাও কৌতুকের ছিটেফোঁটা এমন অঙ্গাঙ্গী হয়ে মিশে আছে যা সাহিত্যের ক্ষেত্রে দুর্লভ। গ্রন্থের পনেরোটি গ[ল্প] চিত্রে অলংকৃত করেছেন খ্যাতনামা শি[ল্পী] শ্রীকালীকিংকর ঘোষ দস্তিদার। 'মা[স্টার] মশায়' গল্পটি একদিকে যেমন কৌতুক তেমনি বিগত যুগের এক শ্রেণীর শিক্ষক ছবিও তুলে ধরে। সব প্রশ্নের যথাযথ উ[ত্তর] দেয়ার পুরস্কার হিসেবে শিক্ষকের কাছে এমন চড় খেতে হ'ল ছাত্রকে, যা সারাজী[বন] তার মনে থাকবে! এবং তারপর যেদিন ... তৈরী হবে না, সেদিনকার শাস্তি সম্ব[ন্ধে] সাবধান-বাণী। 'টেলিফোন বিভ্রাট' গল্পটি উপভোগ্য। কিন্তু কৌতুকরসের সৃষ্টি ক[রে] অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে 'সভাপতির বিপদ' কিন্তু কৌতুককর গল্পের চেয়ে শিকার কাহিনীতে লেখক সিদ্ধহস্ত আপাতঃদৃষ্টিতে যে সব পাখি পশু শিকারে কোন বিভীষিকাময় পরিবেশ নেই তেমন তুচ্ছ শিকারের মধ্যেও যে এতখানি আকর্ষণ থাকতে পারে গল্পগুলি না পড়লে বিশ্বাস হবার নয়। 'মৃতের সহিত সাক্ষাৎ' গল্পটিও ভালো গল্প। 'বিচিত্র কাহিনী'র গল্পগুলি গল্প হিসেবে সার্থক হ'লেও লেখকের ব্যক্তিগত ছাপ, বাস্তব পরিবেশ এবং সহজ সরল ভাষার বৈশিষ্ট্যের জন্য গ্রন্থটিকে রম্যরচনার ক্ষেত্রে বিশেষ সংযোজন হিসেবেও স্বীকার করা যায়। বইটি ছোটদের কাছেও উপভোগ্য। ৪৭৫।...

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচন[ার্থ] আসিয়াছে।

মুক্তির আহ্বানে—ভিক্টর ক্রেভশেভ[...] অনুবাদক—অমলেন্দু দাশগুপ্ত

এরা কোথায়—সমীরকুমার দাস ও ভ[...] দাশগুপ্ত

কৃষকের রক্তে লাল চীন— সীতার[াম] গোয়েল

ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি—ডাঃ ভূপেন্দ্রন[াথ] দত্ত

নানা লেখা—ম্যাকসিম গর্কি অনুবাদ সরোজকুমার দত্ত

কৃষক সমস্যা—মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ

অসবর্ণা—নরেন্দ্রনাথ মিত্র

শ্বেত কমল—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

পিনোশিয়ো—শ্রীমনোরম গুহঠাকুরতা

পুরাণ-ভারত—সুধা দেবজা

থ্রী মাসকেটিয়ার্স— শ্রীসৌরীন্দ্রমোহ[ন] মুখোপাধ্যায়

রহস্যময়ী শিখা—শ্রীপ্রভাবতী দেব[ী] সরস্বতী

বাগানবাড়ি—শ্রীস্বপনকুমার

ফসল—১ম খণ্ড—গালিনা নিকোলাে[ভা] অনুবাদক—রণজিৎ রায়

—শৌভিক—

যদিও কার্যত মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের প্রদর্শক-দের পথ অনুসরণ করে আর কোন রাজ্যের কোন প্রদর্শক ফিল্মস্ ডিভিসন পরিবেশিত "অনুমোদিত ছবি" দেখানো বন্ধ করেনি, তবে শেষ পর্যন্ত এদের মতিগতি কি দাঁড়াবে বলা যাচ্ছে না।

* * *

রায় প্রকাশিত হবার পর ফিল্ম ফেডারেশন অফ ইণ্ডিয়ার সভাপতি শ্রী এস এস ভাসান "অনুমোদিত ছবি" দেখানোয় বাধ্য করা নিয়ে বেশ কড়া করে কিছু মন্তব্য করার এই সুযোগটা হেলায় যেতে দেননি। এক বিবৃতিতে তিনি এই অন্যায় আইন চাপিয়ে যাওয়ার কথা তো বলেছেনই, সেই সঙ্গে ফিল্মস ডিভিসন একচেটিয়াভাবে যে কিরকম যদেচ্ছাচারিতার পরিচয় দিচ্ছে তার উল্লেখ করেন। তাঁর মতে জোর করে যা খুশী ছবি দেখাবার জন্য দেওয়া হয় যার নির্বাচন ব্যাপারে প্রদর্শকদের কোনই মতামত নেওয়া হয় না। জোর করে দেখাতে বাধ্য করাই শুধু নয়, দেখানোর জন্যে ফিল্মস ডিভিসনের যদেচ্ছ নির্ধারিত ভাড়াও পর্যন্ত দিতে হয়। ছবির পরিবেশন ব্যাপারেও ফিল্মস ডিভিসনের অব্যবস্থার কথাও শ্রী ভাসান বলেছেন। তিনি বলেছেন, অনেক সময় জনসাধারণকে একই পুরনো ছবি বার বার করে দেখতে হয়। তাছাড়া, তার বিবৃতিতে প্রদর্শকদের সঙ্গে ফিল্মস ডিভিসনের অসৌজন্য আচরণ প্রভৃতির কথাও উল্লেখ করেছেন। শ্রী ভাসানের এবম্প্রকার বিবৃতির এক উত্তর দিয়েছেন বেতার ও তথ্য মন্ত্রণালয়ের এক মুখপাত্র। ফিল্মস ডিভিসন এই মন্ত্রণালয়েরই একটি বিভাগ। উক্ত মুখপাত্র গভর্নমেণ্ট কর্তৃক সংবাদ-চিত্র ও ডকুমেণ্টারির ব্যবসা একচেটিয়া করে রাখার অভিযোগ অস্বীকার করে বলেছেন, ভারতের যে কোন চিত্রনির্মাতাই ডকুমেণ্টারি ছবি তুলতে পারে এবং ফিল্মস ডিভিসনের মারফৎ তা পরিবেশন করাতে পারে। বস্তুত মুখপাত্র বলেন, ফিল্মস্ ডিভিসন বে-সরকারী নির্মাতার অনেক ছবি কিনে পরিবেশন করেছে। তবে এ ব্যাপারে একমাত্র ধর্তব্যের বিষয় হচ্ছে যে-কোন ছবিকেই ফিল্ম এডভাইসরি বোর্ডকে দিয়ে "অনুমোদন" করিয়ে নিতেই হবে, তা এমন কি ফিল্মস্ ডিভিসনের তোলা হলেও। তাছাড়া, বাধ্যতামূলক আইনে দু' হাজার ফিট করে "অনুমোদিত" ছবি দেখানোর জায়গায় হাজার ফিট পরিসর গভর্নমেণ্ট ছেড়ে দিতে রাজী যাতে বে-সরকারী নির্মাতারা উৎসাহ পায়। কিন্তু কোন বে-সরকারী নির্মাতাই সে সুযোগ গ্রহণ করতে এগিয়ে আসেনি। পুরানো ছবি প্রদর্শিত হওয়ার অভিযোগের উত্তরে মুখপাত্র বলেন যে, কোন চিত্রগৃহেই ফিল্মস্ ডিভিসনের কোন ছবি মাত্র একবার এক সপ্তাহের বেশী দেখানোর জন্যে পাঠানোই হয় না। যদেচ্ছভাবে ভাড়া নির্ধারণের উত্তরে বলা হয়েছে যে, চিত্রগৃহের সাপ্তাহিক অর্থাগমের ওপরে ভাড়ার হার নির্ধারিত হয়। আর প্রদর্শনের জন্য বাধ্যতামূলক আইন প্রয়োগ সম্পর্কে

একটা নির্বোধ অভিসন্ধি

চিত্রগৃহে বাধ্যতামূলকভাবে ফিল্মস ডিভিসনের তোলা সংবাদচিত্র ও ডকুমেণ্টারি দেখানোর আইন ভারতীয় সংবিধানের ১৯(১)(ছ) ধারা অনুসারে স্বাধীনভাবে ব্যবসায় হস্তক্ষেপ বলে মাদ্রাজের তাঞ্জোর জেলার এক চিত্রগৃহের মালিক প্রথমে মাদ্রাজ ন্যায়ালয়ে এবং সেখান থেকে বিচারে হেরে গিয়ে পরে ভারতের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে এক নালিশ দায়ের করেন। ন্যায়াধীশদের পক্ষ থেকে স্বর্গত গোলাম হোসেন যে রায় প্রদান করেন তা'তে মাদ্রাজে প্রযুক্ত ফিল্মস ডিভিসন পরিবেশিত 'অনুমোদিত' ছবি দেখাবার বাধ্যতামূলক আইনটি অচল বলে ব্যাখ্যাত হয়। সঙ্গে সঙ্গেই মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের চিত্র প্রদর্শকরা একজোটে ফিল্ম ডিভিসনের ছবি দেখানো বন্ধ করে দিয়েছে। অন্য আর কোন রাজ্যের চিত্র-প্রদর্শকরা কেউ যদিও এখনো কোন ন্যায়ালয়ে অনুরূপ নালিশ দায়ের করেনি, তবে সকলে ধরে নিয়েছে যে, একই আইন এক রাজ্যে যখন অন্যায় ও অচল বলে সাব্যস্ত হয়েছে, তখন সেই নির্ধারণ সব রাজ্যের ক্ষেত্রেই প্রযুক্ত হতে পারবে।

তিনি বলেন যে, তা না করলে এদেশের প্রদর্শকরা ছোট ছবি দেখাতেই চাইতো না। শ্রী ভাসানের বিবৃতির উত্তরের এই সরকারী প্রত্যুত্তর—অর্থাৎ চলচ্চিত্র শিল্প বনাম কেন্দ্রীয় সরকারের একটা বাদানুবাদের এই ভূমিকা হয়ে গেলো।

* * *

আমাদের দেশে দিশী চিত্রগৃহগুলিতে ছোট ছবি দেখানোর রেওয়াজ আগে ছিল না। লম্বা ষোল-আঠারো-বিশ হাজার ফিটের ছবি দেখাবার সংগে কোন ছোট ছবি দেখানোর সময়েই কুলিয়ে ওঠা যেতো না; বোধহয় খরচে পোষাবার সম্ভাবনা না থাকায় ছোট ছবি তৈরীও হতো না। ক্বচিৎ কখনো, বছরে দু' একখানা দু' এক রীলের কমিক ছবি আসতো যেগুলো তৈরী হতো অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছোট ছবির ওপর মোহের চেয়ে জুনিয়রদের হাত পাকাবার সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে; অথবা কোন অচল বড় ছবির আয়ুষ্কাল বাড়াবার প্রত্যাশায় একটা অতিরিক্ত আকর্ষণরূপে সংগে জুড়ে দেওয়ার জন্যে, একটা ফাউ দেওয়া গোছের। আর ছোট ছবি দেখার মেজাজও তৈরী হয়নি এদেশের লোকের। নিয়মিতভাবে ছোট ছবি দেখানো আরম্ভ হলো গত যুদ্ধের সময়। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যুদ্ধ প্রচারের মাধ্যম হিসেবে ছোট ছবিকে নিয়োগ করে। ছবি তৈরী ও পরিবেশনের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় ইনফরমেশন ফিল্মস্ অফ ইণ্ডিয়া এবং ভারত রক্ষা আইন প্রয়োগ করে ভারতের প্রত্যেক চিত্রগৃহকে সে সব ছবি দেখাতে বাধ্য করা হয়। চলচ্চিত্র শিল্পের পক্ষ থেকে তখন এর প্রতিবাদ হয় তবে ভারত রক্ষা আইনের নিগড়ে ছবিগুলি না দেখিয়েও উপায় ছিল না। নিয়মিতভাবে প্রত্যেক চিত্রগৃহে দেখানো হলেও তৎকালে লোকে মোটেই ইনফরমেশন ফিল্মসের ছবিগুলির ওপরে শ্রদ্ধা বা আগ্রহ প্রকাশ করতো না। অনেক সময়ে দর্শকরা চিত্রগৃহের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতো এবং ভিতরে প্রবেশ করতো ইনফরমেশন ফিল্মসের ছবি দেখানো শেষ হবার পর। অবশ্য সবই নিছক যুদ্ধপ্রচার সংক্রান্ত ছবিই দেখানো হতো না। ভারতের সংগীত, নৃত্য, চিত্রকলা, স্থাপত্য প্রভৃতি বিবিধ ঐতিহ্য বিষয়েও খানকতক ছবি তৈরী হয়েছিল এবং এই ছবিগুলির দ্বারাই জনসাধারণের মনে ছোট ছবি দেখার কৌতূহল সৃষ্টি হতে থাকে। কৌতূহল প্রায় নিয়মিত আগ্রহে পরিণত হবার উপক্রমকালেই যুদ্ধশান্তি হেতু বিভাগটি তুলে দেওয়া হয়। তারপর নিজেদের হাতে শাসন আসতে বল্লভভাই প্যাটেল আবার বিভাগটি পুনরুজ্জীবিত করলেন ফিল্মস ডিভিসন নামে এবং ঠিক আগের মতোই প্রত্যেক চিত্রগৃহকে ছবি দেখাতে বাধ্য করার

আইনও প্রযুক্ত হলো। চলচ্চিত্র শিল্প থেকে প্রচণ্ড আপত্তি উঠলো, কিন্তু তা সত্ত্বেও ফিল্মস্ ডিভিসন চলতে লাগলো নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে ছবি সরবরাহ করে। গোড়ার দিকে ফিল্মস্ ডিভিসনের ছবি বিরক্তিকর সরকারী প্রচার-চিত্র মাত্র হয়েই উপস্থিত হয়ে জনসাধারণের মনে ছোট ছবির জন্য যা একটু আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তা প্রায় লোপ পাবার উপক্রম হয়। এখানে একটা বিষয় উল্লেখযোগ্য হচ্ছে যে, ইনফরমেশন ফিল্মস্ লুপ্ত হওয়া এবং ফিল্মস্ ডিভিসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার মাঝে দীর্ঘকাল অতিবাহিত হয় সে সময়ের মধ্যে চলচ্চিত্রশিল্প থেকে মোটেই কোন চেষ্টা হয়নি ছোট ছবি তোলার বা নিয়মিত দেখাবার কোন ব্যবস্থা করে নেওয়ার। এইটাই চলচ্চিত্র শিল্পের ছোট ছবি সম্পর্কিত মনোভাবের পরিচয়।

* * *

ফিল্মস্ ডিভিসনের ছবি সম্পর্কে অনেক নালিশ করবার আছে। ফিল্মস্ ডিভিসনের কেন্দ্রীয় দপ্তর বম্বেতে অবস্থিত বলে ওটা যেন একা বম্বাই রাজ্যেরই সম্পত্তি। কখনো কখনো সাপ্তাহিক সংবাদ-চিত্রে দেখা যায় যে, যদি মোট বারোটা খবর থাকে তো দেখা যায় তার মধ্যে আটটাই হয়তো এক বম্বাই শহরেরই ঘটনা। অনেক সময় বেশ বোঝা যায় যে, অনেকটা জবরদস্তীভাবেই বম্বেকে প্রচার করার চেষ্টা। নয়তো রামকৃষ্ণ জন্মোৎসবের দক্ষিণেশ্বরের অনুষ্ঠান না দেখিয়ে শুধু বম্বের অনুষ্ঠান পরিবেশন করার কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। বম্বের অনেক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানকে সংবাদ-চিত্রে সহজে এবং বেশী করে সংযোজিত হতে দেখা যায়, অথচ কলকাতা, কি মাদ্রাজ, কি পাটনা অথবা ভারতের অন্যান্য স্থানে তার চেয়ে অনেক জাঁদরেল অনুষ্ঠান বাদ দেওয়া হয়। অবশ্য দিল্লী বাদে। হঠাৎ বাইরের কারুর চোখে পড়লে তার মনে হবে, ভারতে যা কিছু হয় শুধু বম্বেতেই, অন্তত বেশীর ভাগ তো বটেই। ফিল্মস্ ডিভিসনের এ পক্ষপাতীত্বের অর্থ বোঝা ভার। ডকুমেণ্টারি ছবির বিষয়বস্তু সর্বভারতীয় আবেদনযুক্ত হলেও প্রায় সর্বথাই চেহারাটা হয় পুরো বম্বাইদের, অবশ্য বিশেষ কোন স্থান বা বিষয়ের বৃত্তান্তের ক্ষেত্র ছাড়া। এইসব এবং আরও নানাবিধ নালিশ সত্ত্বেও ফিল্মস্ ডিভিসনের ছবি দেখতে দেখতে চিত্রগৃহের নিয়মিত সূচীর অঙ্গ হয়ে উঠেছে। ছোট ছবির প্রয়োজনীয়তা প্রতিষ্ঠিত ও স্বীকৃত হয়ে গিয়েছে। জনসাধারণের সত্যিকারের একটা আগ্রহ জেগেছে; ছোট ছবি না হলে আর চলে না। অল্পশিক্ষিত বা স্বল্পজ্ঞান মানুষকে তথ্য পরিবেশনে এমন স্বল্পায়াসযুক্ত ফলপ্রদ মাধ্যম আর নেই। জাতি গঠনে ডকুমেণ্টারি ছবির একটা স্পষ্ট ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়ে রয়েছে। এ অবস্থায় স্রেফ আইনের নাগাল ধরে চিত্রগৃহ থেকে তা হঠিয়ে দেওয়া শোভনীয়ও নয় আর বাঞ্ছনীয় তো নয়ই। এ বিষয়ে যদি গণভোট নেওয়া যায় তাহলে নিশ্চিত বিপুল আধিক্যে জনসাধারণ ছোট ছবি চালানোর পক্ষেই মত দেবে।

* * *

চলচ্চিত্র শিল্পের মধ্যে এ নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ দেখা যাচ্ছে। ফেডারেশন সভাপতি শ্রী ভাসান মুখে বলছেন যে, জাতির কাজে ডকুমেণ্টারি ছবির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তাঁরা অবহিত, অথচ কার্যত সাউথ ইণ্ডিয়া ফিল্ম চেম্বার অফ কমার্সের কর্ণধাররূপে তিনি মাদ্রাজ ও অন্ধ্রের প্রদর্শকদের ফিল্ম ডিভিসনের ছবি দেখানো বন্ধ করে দেবার নির্দেশ দিয়েছেন এবং সে নির্দেশ পালিতও হয়েছে। তিনি বলেন, ব্যবসায়ে স্বাধীন অধিকার সাব্যস্ত করার জন্য এই নির্দেশ। তাঁর বিবৃতির সারমর্ম এই দাঁড়ায় যে, যদি ১। ফিল্মস্ ডিভিসন প্রদর্শকদের ওপরে ছবি নির্বাচনের ভার ছেড়ে দেন; ২। যদি ছবির ভাড়ার হার নির্ধারণে গভর্নমেণ্ট আরও উদার হন; ৩। যদি পরিবেশন ব্যবস্থা আরও সুপরিচালিত করা যায়; এবং ৪। যদি বাইরের চিত্রনির্মাতাদের ছোট ছবি তোলার আরও সুযোগ করে দেওয়া হয় তাহলে চিত্রশিল্প হয়তো ছোট ছবি দেখানোয় রাজী হতে পারে। শ্রী ভাসানের এইসব প্রস্তাব যে কিভাবে ঘটানো যেতে পারে সে বিষয়ে তিনি নিজেও কোন উপায় সম্পর্কে অবহিত নন। আর একদল আছেন যাঁরা ফিল্ম ডিভিসনের ছবি দেখাতে অরাজী নয়, তবে ভাড়াটা একটু কম হলে ভাল হয়।

* * *

পৃথিবীর গণতান্ত্রিক দেশসমূহের মধ্যে একমাত্র ভারত গভর্নমেণ্টই ব্যাপকভাবে ছোট ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করেছেন। বাধ্যতামূলক আইন প্রয়োগ না করলে যে তা হতে পারতো না সে বিষয়ে আর কোন তর্ক খাটে না। চিত্রশিল্প অতীতে বহু সুযোগ পেয়েছিল ডকুমেণ্টারি ছবি পরিবেশন করার, কিন্তু সে সুযোগ গ্রহণ করতে তারা কোনদিনই এগিয়ে আসেনি। দেশের সেবায় ছোট ছবির প্রয়োজনীয়তাকে তারা কোনদিন মর্যাদা দিতে রাজী হয়নি। ডকুমেণ্টারি ও সংবাদ-চিত্র প্রস্তুত ও পরিবেশনে ফিল্মস্ ডিভিসনের যে একচেটিয়াত্ব এসেছে সে দোষ ফিল্মস্ ডিভিসনের নয়, তার জন্য দায়ী চিত্রশিল্পের এ বিষয়ে চরম নির্লিপ্ততা। আর সত্যি কথা বলতে কি, চিত্রশিল্পের সাধ্যি ছিল না ফিল্মস্ ডিভিসনের মতো একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে এমন দেশময় ব্যাপকভাবে ছোট ছবি দেখাবার ব্যবস্থা করা এবং জনসাধারণের মনে ছোট ছবির নেশা

ধরিয়ে দেবার। কিছুতেই তারা পারতো না এমন প্রত্যেক চিত্রগৃহে নিয়মিত প্রতি সপ্তাহে ছোট ছবি চালু রাখতে। মূল ছবি দৈর্ঘ্যে ছোট হলে সে জায়গা প্রদর্শকরা বরং খানকয়েক ট্রেলার দিয়ে ভরিয়ে দিতো তবু কোন ডকুমেণ্টারি অবশ্যই যে দেখাতো না সে কথা নিশ্চিত। আগেও যেমন চিত্রশিল্পের সাধ্যিতে ছিল না ছোট ছবির এমন ব্যাপক প্রদর্শন ব্যবস্থা করে দেবার, এখনও তার সে সাধ্য নেই। কাজেই ছোট ছবি একান্তই দরকার বলে ফিল্মস্ ডিভিসনের অস্তিত্বও রাখা দরকার। কিভাবে তা সম্ভব সেইটেই এখন ভেবে দেখতে হবে।

* * *

সংবিধানের যে ব্যাখ্যা ধরে ছোট ছবির বাধ্যতামূলক প্রদর্শন আইনটি নাকচ করা হয়েছে তা অন্য কিভাবে আইনসিদ্ধ করা যায় তার উপায় বের করতে হবে। কারণ বাধ্যবাধকতা না থাকলে দেশের বেশীর ভাগ প্রদর্শকই ছোট ছবি দেখানো তাদের সূচী থেকে তুলেই দেবে। আর একচেটিয়াত্বের যে দোষ ফিল্মস্ ডিভিসনের ওপর অর্পিত হয়েছে সেটা কাটানোর একটা উপায় হচ্ছে ফিল্মস্ ডিভিসনকে চিত্রশিল্পের দায়িত্বাধীনে ছেড়ে দেওয়া, অন্তত ডকুমেণ্টারি বিভাগটা। কারণ সংবাদ-চিত্র তুলে বেড়ানোর যা ঝামেলা তা চিত্রশিল্পের পক্ষে বহন করা সম্ভব না হবারই কথা। তার চেয়ে সহজ হয় চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতিনিধি বেশী নিয়ে একটা বে-সরকারী উপদেষ্টামণ্ডলী গঠন করে তার ওপরে ভারটা ন্যস্ত করা। এর দ্বারা অনেক সুবিধেও হবে। এখন যেমন বম্বের ওপর পক্ষপাতিত্বের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে, তখন তা রোধ করা যাবে। বিভিন্ন রাজ্যের প্রচার দপ্তর কর্তৃক গৃহীত রাজ্যের গতি-প্রগতি সম্পর্কিত দৃশ্যাবলী যুক্ত করে বা আলাদাভাবে দেখানোর ব্যবস্থা করা যেতে পারবে। কেন্দ্রীয়ই হউক আর কোন রাজ্য গভর্নমেণ্টই হোক কেউ অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে চাইলে তার জন্যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করতে হবে। অবশ্য তার জন্যে উপদেষ্টামণ্ডলীর দপ্তর এখনকার মতো কেবলমাত্র বম্বেতে না রেখে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বম্বে তিন শহরেই রাখতে হবে যাতে যে অঞ্চলের ছবি তা সেই অঞ্চলেরই উপদেষ্টামণ্ডলীকে দিয়ে ত্বরিতে অনুমোদন করে নেবার সুবিধে হয়। এখন তো বম্বেতে গিয়ে অনুমোদন করিয়ে আনার চিন্তাতেই অনেকে ছোট ছবি তোলায় বিরত হয়। তাছাড়া, দায়িত্ব চলচ্চিত্র শিল্প ও ব্যবসায়ীদের নিজেদের ওপরে থাকলে এখন গভর্নমেণ্টের হাতে থাকায় যে সব অসুবিধের কথা উঠছে তখন তা আর না থাকারই সম্ভাবনা। এই ব্যবস্থার বিকল্পে ফিল্মস্ ডিভিসনকে সিন্ধ্রী সার কারখানার মতো একটা কর্পোরেশনও পরিণত করা যেতে পারে যাতে মূলধন নিয়োগে চলচ্চিত্র শিল্পীকেও অংশ দেওয়া হোক। এইভাবের একটা ব্যবস্থা অতীব আশু প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। তা না হলে ভারতীয় চিত্রগৃহ সমূহ মাদ্রাজ ও অন্ধ্রর প্রদর্শকদের নির্বোধ অভিসন্ধির প্রকোপে পড়ে ছোট ছবি দেখানো বন্ধই হয়তো করে দেবে। তাতে চিত্রশিল্পের ক্ষতি না হোক, জন-সাধারণের ও রাষ্ট্রের ক্ষতি অনিবার্য। বিভিন্ন জাতীয় পরিকল্পনা ও বহুবিধ সমাজ উন্নয়ন কাজে চলচ্চিত্রের তথা ডকুমেণ্টারির সহায়তা অত্যাবশক এবং চিত্রগৃহসমূহে তার চালু অব্যাহত রাখার পাকা ব্যবস্থা অনতিবিলম্বেই করে নেওয়া চাই।

অযথা বম্বাই প্রীতি

কলকাতায় এক শ্রেণীর চিত্রনির্মাণ কুশলী দেখা দিয়েছেন যাঁরা হঠাৎ বম্বাই প্রতিভার প্রতি অতিশয় দরদী হয়ে উঠেছেন। একথা বলার উদ্দেশ্য এই নয় যে, বম্বেতে প্রতিভা বলতে কিছু নেই; বা বম্বে থেকে গ্রহণ করার কিছু নেই। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও অনস্বীকার্য যে, কলকাতায় কোনরকম প্রতিভারই অভাবও নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও যদি বাঙলা ছবিতে বম্বের কাউকে বা কিছু যদি প্রয়োগ করা দরকার মনে হয় তো তা এমন কেউ বা কিছু হওয়া উচিত যার দ্বারা বাঙলা ছবি অতিরিক্ত গুণার্জনে লাভবান হতে পারবে। তার ব্যতিক্রম মানেই অযথা বম্বাই প্রীতি এবং সেই সঙ্গে প্রকাশ পায় কলকাতায় প্রতিভার প্রতি অবজ্ঞা। এই পরিচয়েরই একটি নিদর্শন পাওয়া গেল অন্যথায় বেশ

আমুদে ছবি "গৃহপ্রবেশ" দেখতে দেখতে। সবই এখানকার—কাহিনী রচয়িতা, বিভিন্ন বিভাগের কলাকুশলী এবং শিল্পিবৃন্দ সবই কলকাতার কিন্তু ওরই মধ্যে হঠাৎ কলকাতাকে টপকে বম্বে থেকে আমদানী করে নেওয়া হয়েছে এর সঙ্গীতাংশটুকু। বম্বেতে গিয়ে তুলে নিয়ে আসা হয়েছে মুকুল রায়ের দেওয়া আবহসঙ্গীত এবং একখানি করে গীতা রায় ও মান্না দের গান। আর সে আবহসঙ্গীত বা গান দুখানি এমন কিছু নয় যা কলকাতায় হতে পারতো না স্থানীয় শিল্পীদের দিয়ে, বা এর জন্যে "গৃহপ্রবেশ" এক তিলও অতিরিক্ত গুণ অথবা মর্যাদা নিয়ে হাজির হতে পেরেছে। তা যদি পারতো তাহলে এ প্রচেষ্টাকে বরং স্বাগত করাই যেতো। তবে নির্মাতাদের এই অপপ্রয়াসের কথা ধর্তব্যের বাইরে রেখে সমগ্রতার পরিপ্রেক্ষিতে ছবিখানিকে পরিচ্ছন্ন হাল্কা আমুদে ছবি বলে অভিহিত করা যায়।

* * *

ছবিখানির চেহারায় এবং চরিত্রগুলির আচরণে নির্ভেজাল দিশীয়ানাটাই সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে। নতুন বাড়িতে প্রথম বাস করতে যাওয়ার সামাজিক অনুষ্ঠানের একটা সরস নক্সা। কিন্তু ওরই মধ্যে অনেক রকমের চরিত্র সামনে এনে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে দারিদ্র্যতার বিপর্যয় নিয়ে একটা করুণ সুরও। খুব একটা ওজনদার বা গভীর ভাব সমৃদ্ধ কিছু নয়; তবে দেখার সময় আমোদ উপভোগ করা যায় গোড়া থেকেই এবং শেষ হয়েছে মানুষের স্বাভাবিক মায়া, মমতা ও স্নেহের চেয়ে আইনের শাসনকে বড় বলে মান্য করা হবে কিনা তাই নিয়ে মানবিক আবেদনভরা একটা প্রশ্ন তুলে। সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত মাত্র ঘণ্টা কয়েকের মামলা। প্রসন্ন, তার স্ত্রী, দুটি ছোট ছেলে মেয়ে আর ছোটভাই পৃথ্বীশ—এরা এসে নতুন বাড়িতে প্রবেশ করছেন সেই আনুষ্ঠানিক ব্যাপার নিয়ে যতো ঘটনা। প্রসন্ন ব্যস্তবাগীশ লোক; স্ত্রী সুকুমারী একা পেরে উঠছে না সবদিক সামলাতে; পৃথ্বীশ আড্ডাবাজ ছেলে, গানের সখ আছে এবং সেই সূত্রেই তাদের এই নতুন পাড়ার প্রতিবেশিনী সুরমার সঙ্গে তার আলাপ, হয়তো আকর্ষণও। সুকুমারী একা সবদিক সামলাতে অক্ষম দেখে পৃথ্বীশ গিয়ে সুরমাকে নিয়ে আসতে গেলো, কিন্তু আসতে চাইলে না সুরমা। প্রথমত এই অভিমানে যে, পৃথ্বীশ দীর্ঘদিন উধাও ছিল, আর দ্বিতীয়ত তাদের নিমন্ত্রণ করা হয়নি। পৃথ্বীশ ব্যর্থ হলেও সুকুমারী কিন্তু সুরমাকে নিয়ে আসতে সক্ষম হলো। সুরমা এসেই হেঁসেলের ভার নিলে। ওদিকে এক আশ্রয়হীন বেকার বুভুক্ষু বৃদ্ধ এক ফাঁকে এসে জুটেছে সেবেলার ব্যবস্থাটা করে নিতে। প্রসন্ন তাকে আদর করে বসালে সুকুমারীর কাকাবাবু বলে ভুল করে, আর সুকুমারী তাকে সমাদর করে জলখাবার খাওয়ালে শ্বশুরের বন্ধু পরেশবাবু মনে করে, যার আসবারও কথা ছিল। বৃদ্ধ ঘরে ঢুকতেই সোফার ওপরে একটা চাবির থলো পেয়ে সেটা প্রসন্নের হাতে অর্পণ করলে। সে চাবির খোঁজ পড়লো ব্রাহ্মণদের ভোজন দক্ষিণা দেবার সময়। সে সময়ে এসে পড়েছে প্রসন্নর বোন লক্ষ্মী। সুকুমারী চাবি পাচ্ছে না শুনেই লক্ষ্মী হুলুস্থূলে বাঁধালে। ততক্ষণে ফাঁস হয়ে পড়েছে যে অনিমন্ত্রিত বৃদ্ধটি জানাশোনা কেউ নয়। লক্ষ্মীর বদ্ধমূল ধারণা ঐ বৃদ্ধই চাবি চুরি করেছে এক ফাঁকে সর্বস্ব চুরি করে নিয়ে যাবার মতলবে। লক্ষ্মী তার স্বামী ডেপুটি নিখিলকে ফোন করে দিলে। দল বেঁধে সবাই চললো বৃদ্ধকে পাকড়াও করতে কিন্তু ছেলে মেয়ে সমেত বৃদ্ধ উধাও। নিখিল ছুটলো গাড়ি নিয়ে এবং পথ থেকে ওদের ধরে নিয়ে এলো। বৃদ্ধকে জেরা ও তিরস্কার আরম্ভ হলো। পুলিশের কাছে নিয়ে যাবার উপক্রম, ঠিক সেই মুহূর্তেই চাবি আবিষ্কৃত হলো প্রসন্নর ট্যাঁক থেকে। আর যখন শোনা গেল যে, বৃদ্ধই চাবিটা প্রসন্নর হাতে দিয়েছিল তখন লজ্জার আর সীমা রইলো না সকলের। বৃদ্ধের ওপর অযথা লাঞ্ছনার প্রতিবাদ করে দাঁড়ালো সুরমা। তারপর বৃদ্ধের দুঃখের কাহিনী শুনলে সকলে। সুকুমারী প্রায়শ্চিত্তস্বরূপে বৃদ্ধকে আজীবন তাদের বাড়িতে তার কাকা হয়ে থাকবার জন্যে রেখে দিলে। আর পাকাপাকিভাবে থাকবার ব্যবস্থা হলো পৃথ্বীশের প্রার্থিতা সুরমার।

* * *

সাদাসিধে সাধারণ ঘটনার আশ্রয়েই নক্সাটি ছকে নেওয়া হয়েছে এবং ঘটনাস্রোতও প্রবাহিত হয়েছে সহজ ও সাবলীল গতিতে। বিন্যাসে আর একটা বিশেষ প্রশংসার দিক হচ্ছে হাল্কা হাসির ছবি হওয়া সত্ত্বেও কৃত্রিমতার প্রতি ঝোঁকের প্রায় অনুপস্থিতি। যা কিছু ঘটনা প্রায় সবই এই নতুন বাড়িতেই ক'খানা ঘর, ছাদের একাংশ আর সদরের সামনেটুকু নিয়ে। এই স্বল্পপরিসরের মধ্যেই ঘটনা চরে বেড়িয়েছে নানা বৈচিত্র্য পরিবেশন করে। এর মধ্যে প্রধান বৈচিত্র্য হচ্ছে ভৃত্য জগা। একদিক থেকে ওকেই হাস্যপ্রস্রবণের মূল উৎস বলে ধরা যায়। আর তা না হয়েও পারে না বিশেষ যখন ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন ঐ চরিত্রটিতে। ওকে না হলে যেমন প্রসন্নরও চলে না, সুকুমারীরও চলে না, পৃথ্বীশেরও চলে না—সবায়েরই কেবল জগাকে হাঁকাহাঁকি, তেমনি ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের অভিনয়ে জগা খানিকক্ষণ ছবি চলার পরই হাসির এমন মুদ্রা হয়ে পড়ে যে, দর্শকরাও ওর নাম ধরে হাঁকাহাঁকি করতে থাকে; এবার হয়তো পথেঘাটেও ভানুর কানে 'জগা' ডাকটা আসতে থাকবে। অভিনয়ে অবশ্য সকলেই বেশ একটা স্বাভাবিকতার ভঙ্গী নিয়ে আসতে পেরেছেন—জহর গাঙ্গুলীর প্রসন্ন, মলিনা দেবীর সুকুমারী, মঞ্জু দের লক্ষ্মী, বিকাশ রায়ের নিখিল, এমন কি, খগেন পাঠকের পাচক বামুন বা তুলসী লাহিড়ীর মেছো জেলে বা নৃপতির পেটুক ব্রাহ্মণ কিংবা আফিঙের কৌটো হারিয়ে যাওয়ায় অভিমানক্ষুব্ধ আশা দেবী প্রভৃতি সকলেই একটা বৈশিষ্ট্য নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। পৃথ্বীশের ভূমিকায় উত্তমকুমারের স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি চরিত্রটিকে সহজগ্রাহ্য করেছে। সুরমার চরিত্রে তেমনি সুচিত্রা একটা দীপ্ত চরিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। অভিনয়ে সবাইকে কিন্তু ছাপিয়ে গিয়েছেন অনিমন্ত্রিত বৃদ্ধের ভূমিকায় পাহাড়ী সান্যাল। কম কথা এবং বেশী আঙ্গিক অভিব্যক্তিতে তিনি দারিদ্র্যক্লিষ্ট স্নেহপ্রবণ নিরীহ বৃদ্ধের যে চরিত্রটি ফুটিয়েছেন তা তার শিল্পী জীবনের উজ্জ্বল কৃতিত্ব।

কলকাতার ক্রীড়াক্ষেত্রে চিত্রতারকাদের পুনরাগমনের সংবাদে জনতা কৌতূহলী হয়ে উঠেছে। এবার শুধু বাঙলার চিত্রতারকারাই ক্রীড়াক্ষেত্রে অবতীর্ণ হচ্ছেন না। বোম্বাই ও বাঙলার রূপালী পর্দার ছায়া একসঙ্গে কায়া ধরে ভেসে উঠবে কলকাতা ফুটবল মাঠের সবুজ ঘাসের উপর। একদিনের জন্য 'হলিউডের' মর্যাদা পাবে 'ক্যালকাটা ফুটবল মাঠ।' ছায়াচিত্রের আন্তর্জাতিক উৎসব উপলক্ষে আমরা ইতিপূর্বে মোহনবাগান মাঠে পুরুষ ও মহিলা চিত্রতারকাদের এ্যাথ-লেটিক স্পোর্টস দেখেছি। দেখেছি বোম্বাই ও বাঙলার চিত্রাভিনেতা অভিনেত্রীদের ক্রিকেট খেলা। এই সেদিনও রাজ্যপালের বন্যা সাহায্যভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য চিত্রতারকা ও বর্ষীয়ান ফুটবল খেলোয়াড়-দের এক প্রদর্শনী ফুটবল খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার চিত্রতারকাদের ক্রিকেট খেলার আয়োজন হয়েছে রাজ্যপালের যক্ষ্মা আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ নির্মাণের আংশিক সাহায্যের জন্য। রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জি স্বয়ং এই প্রদর্শনী ক্রীড়ানুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক। চিত্রতারকাদের ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে আসছে রবিবার সারা শহর মেতে উঠবে, একথা বলাই বাহুল্য।

* * *

খেলার মাঠে

একলব্য

চিত্রতারকাদের বার বার ক্রীড়া আসরে অবতরণ খেলার মর্যাদাহানিকর, সাধারণের চোখে দৃষ্টিকটুও বটে। খেলার একটা নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও সৌন্দর্য আছে। অভিনয়, সঙ্গীত, শিল্পকলা সকল ক্ষেত্রেই এই বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। একটা কথা আছে 'ব্যাঘ্র বনে সুন্দর, শিশুরা মাতৃক্রোড়ে।' চিত্র-তারকাদের সৌন্দর্য ও শিল্প প্রতিভা রূপালী পর্দায়। খেলার মাঠের সৌন্দর্য সুনিপুণ খেলোয়াড়। ভাবের দৈন্য এবং বাচনভঙ্গীর ত্রুটি থাকলে অভিনয় যেমন রসোত্তীর্ণ হয় না, শিল্পীর তুলির টানে দরদ মেশানো না থাকলে ছবি যেমন প্রাণহীন হয়ে পড়ে, তেমন খেলাও প্রাণবন্ত হয় না খেলোয়াড়ের নৈপুণ্যে অভাব ঘটলে। বিশেষ করে ক্রিকেট উন্নত বিজ্ঞানসম্মত খেলা। বিজ্ঞানের দুরূহ নিয়মের নানা জটিল সূত্র নিহিত এর বিভিন্ন মারের মধ্যে। ক্রিকেট খেলোয়াড়ের ব্যাট চালনার নিখুঁত ভঙ্গী ক্রীড়া সুষমার মূর্ত প্রকাশ। আনতাপড়ী ব্যাট চালনা ক্রিকেট নয়। একজন যশস্বী খেলোয়াড় হতে হলে অনুশীলন, অধ্যবসায় সাধনা প্রতিভা যেমন সব কিছুরই প্রয়োজন, একজন খ্যাত-নামা অভিনেতা হতে গেলেও তেমন সব কিছুরই প্রয়োজন। তাই অভিনেতা অভি-নেত্রীর উচিত নয় মাঠে এসে খেলার মাধুর্যকে ক্ষুন্ন করা।

* * *

অন্যভাবে চিন্তা করলে একথার যথার্থতা প্রমাণিত হবে। সাধারণের কাছে চিত্রতারকাদের যেমন একটা আকর্ষণ আছে। যশস্বী খেলোয়াড়দেরও দেখবার তেমন আছে আকাঙ্ক্ষা। তবে চিত্রতারকারা পর্দার অন্তরালে থাকেন, তাই তাদের দেখবার আকাঙ্ক্ষা সাধারণের বেশী। আর সাধারণের মধ্যেই খেলোয়াড়দের গতাগতি তাই তাদের দর্শন সহজলভ্য। গানের মধ্যে যেমন 'খেয়াল', খেলার মধ্যে তেমন ক্রিকেট। অশোককুমার, অরুন্ধতি, উত্তমকুমার, বৈজয়ন্তীমালা, রাজ-কাপুর, নার্গিস, অসিতবরণ, নিম্মী, স্বামী কাপুর, শীলা রমানি প্রভৃতি চিত্রতারকার ক্রিকেট খেলা দেখবার জন্য মাঠ হয়তো দর্শকে ভেঙ্গে পড়বে। কিন্তু মাম্না মার্চেণ্ট, আমেদ হাজারে, ফাদকার, উমরিগর, ধ্যানচাঁদ, কৃষ্ণণ, মেরী ডিসুজা, সুলতানা বা রিতা ডেভারের খেয়াল গান শোনবার জন্য কজন শ্রোতা পাওয়া যাবে? খেয়ালের আসরে যারা সমবেত হবে, তারা আসবে খেলোয়াড়দের দেখতে, খেয়াল শুনতে নয়। তেমন ক্যালকাটা মাঠের প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলায় যাদের দেখা যাবে, তাদের মধ্যে সত্যিকারের ক্রিকেট ক্রীড়া-মোদী একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। সবাই আসবে চিত্রতারকাদের দেখতে। খেলাটি এখানে উপলক্ষ্য। আসল উদ্দেশ্যে চিত্রতারকাদের দেখিয়ে অর্থ সংগ্রহ করা।

* * *

আমাদের দেশের জনসাধারণ সৎকার্যে অর্থদান করতে বিমুখ বলে বার বার চিত্র-তারকাদের খেলার মাঠে জড় করে অর্থ সংগ্রহের এই প্রচেষ্টা সমর্থনীয় নয়। চিত্র-তারকাদের গান বা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে অর্থ সংগ্রহের প্রচেষ্টা হলে বলবার বিশেষ কিছু থাকতো না। উদ্যোক্তারা হয়তো ভেবেছেন গান বা অভিনয়ের চেয়ে এভাবে খেলার ব্যবস্থা করে বেশী অর্থ সংগ্রহ করা যাবে। বর্তমানে সাঁতারের মরসুম চলছে। প্রতি সপ্তাহে চলছে সাঁতারের প্রতিযোগিতা। চিত্রতারকাদের মধ্যে সন্তরণ প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করলেও বহু অর্থ সংগ্রহ হতে পারে; কিন্তু সেটা কি কেউ সমর্থন করতে পারেন? যক্ষ্মা আরোগ্যোত্তর উপনিবেশ নির্মাণের প্রতি সম্পূর্ণ সহানুভূতি এবং খেলার উদ্যোক্তাদের সাধু এবং মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি শ্রদ্ধা সত্ত্বেও বলতে চাই চিত্রতারকাদের দিয়ে এধরনের খেলার বেশী ব্যবস্থা ভাল নয়। বিশেষ করে ছাত্রদের বার্ষিক পরীক্ষার মুখে এই আয়োজন মোটেই বিজ্ঞজনোচিত হয়নি। খেলার মাঠেই ছাত্রদের আকর্ষণ বেশী থাকা উচিত। সেখানে যদি মাঝে মাঝে চিত্রতারকা-দের আবির্ভাব ঘটে, তবে নৈতিক দিক দিয়ে ছাত্রসমাজে এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। সর্বোপরি পরম নৈষ্ঠিক শিক্ষাবিদ, সর্বজন-শ্রদ্ধেয় রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জি যে কমিটির পৃষ্ঠপোষক, সেই উদ্যোক্তা কমিটি কোন বুদ্ধিতে বার্ষিক পরীক্ষার মুখে এই ধরনের খেলার আয়োজন করলেন, বুঝে উঠতে পারিনি।

* * *

উপর্যুপরি পাঁচবারের রোভার্স কাপ বিজয়ী হায়দরাবাদ পুলিশ দল ডুরাণ্ড ফাইন্যালেও বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে 'ডাবলস' লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। একাদিক্রমে পাঁচবার রোভার্স বিজয়ী হয়ে হায়দরাবাদ দল ইতিপূর্বেই ভারতীয় ফুটবল ইতিহাসে এক নূতন অধ্যায় সৃষ্টি করে। ডুরাণ্ড কাপ তাদের কৃতিত্বের সাফল্যে আর এক ধাপ এগিয়ে দিল। ডুরাণ্ড ফাইন্যালে হায়দরাবাদ হারিয়েছে ব্যাঙ্গালোরের শক্তি-শালী হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্ট দলকে ১—০

গোলে, দ্বিতীয় দিনের খেলায়। প্রথম দিন দুই দলই একটি করে গোল করায় খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছিল। ডুরাণ্ড বিজয় হায়দরাবাদের পক্ষে কিছু নূতন সম্মান নয়। ইতিপূর্বে ১৯৫০ সালেও তারা রোভার্সের সংগে ডুরাণ্ড কাপ লাভ করে। হায়দরাবাদ ডুরাণ্ড ফাইন্যালে পরাজিতও হয়েছে একবার। গত পাঁচ ছয় বছরের মধ্যে ফুটবলে হায়দরাবাদ যে অনেকখানি এগিয়ে গেছে, একথা বলাই বাহুল্য।

হায়দরাবাদের সাফল্যের মূলে একটি বিষয় লক্ষনীয়। গত পাঁচ ছয় বছর ধরে একই খেলোয়াড় খেলে চলেছেন হায়দরাবাদ টীমের বিভিন্ন স্থানে। দলের মধ্যে বিশেষ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়নি। একসংগে খেলার ফলে পরস্পরের মধ্যে যে বুঝাপড়ার ভাব সৃষ্টি হয়েছে, একে অপরের ক্রীড়াধারার সংগে যেভাবে পরিচিত হয়েছেন, সেই পরিচয় এবং বুঝাপড়ার ভাবই এনে দিয়েছে তাদের বিপুল সাফল্য। কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিংয়ের মধ্যে যখন এই ভাব বিদ্যমান ছিল, তখন তারা হয়েছিল উপর্যুপরি পাঁচবার লীগ চ্যাম্পিয়ন—এই ক্রীড়াধারার গুণে ইস্টবেংগল ক্লাব লাভ করেছিল 'ট্রিপল ক্রাউন'। আজ মহমেডান স্পোর্টিংয়ের খেলায়ও সে সামঞ্জস্য নেই, ইস্টবেংগল ক্লাবও হারিয়ে ফেলেছে পূর্বের যোগাযোগপূর্ণ ক্রীড়াধারা। তাই ইস্টবেংগলকে ডুরাণ্ড সেমি-ফাইন্যালে হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফটের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজয় স্বীকার করে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে।

হায়দরাবাদ দল এবার আই এফ এ শীল্ডেরও রানার্স। আই এফ এ শীল্ড ফাইন্যালে তারা খ্যাতি অনুযায়ী খেলতে পারেনি, তার অন্যতম কারণ দলের মধ্যে সংহতির অভাব ছিল। অর্থাৎ পুরোপুরি হায়দরাবাদ পুলিশ টীম আই এফ এ শীল্ডে খেলেনি। হায়দরাবাদ স্পোর্টিং এবং পুলিশ টীমের বেশীর ভাগ খেলোয়াড় নিয়ে আই এফ এ শীল্ডে হায়দরাবাদ দল গঠিত হয়েছিল এবং দলটির নাম ছিল হায়দরাবাদ স্পোর্টিং এসোসিয়েশন। হায়দরাবাদ স্পোর্টিং আই এফ এ শীল্ড লাভ করলেও হায়দরাবাদ পুলিশের 'ট্রিপল ক্রাউন' লাভে আইনঘটিত বাধার সৃষ্টি হত। আর হায়দরাবাদ পুলিশ টীম আই এফ এ শীল্ডে খেললে ট্রিপল ক্রাউন লাভ করতে পারতো কিনা সে প্রশ্ন এখানে অবান্তর। তবে এবছর ভারতের সমস্ত ক্লাবের শক্তির তুলনায় হায়দরাবাদ পুলিশ টীমের শক্তি যে সবচেয়ে বেশী, একথা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

* * *

অন্যান্য প্রতিযোগিতার মত ডুরাণ্ড কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনা করছি। বর্তমানে ভারতে যে কটি আকর্ষণীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা আছে, ডুরাণ্ড কাপ তার মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ। ১৮৮৮ সাল থেকে ডুরাণ্ড কাপের খেলা আরম্ভ হয়। ডুরাণ্ডের ৩ বছর পরে রোভার্স কাপ এবং ৫ বছর পরে আই এফ এ শীল্ডের সৃষ্টি। হেনরী মার্টিমার ডুরাণ্ড ছিলেন ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী। সামরিক বিভাগে ফুটবলের প্রসার এবং উন্নতির জন্য যে ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা হয়, তিনিই তার বিজয়ীর পুরস্কার 'ডুরাণ্ড কাপ' দান করেন। এই সময়ে মার্টিমার ডুরাণ্ড 'স্যার' খেতাব লাভ করেননি। পরে তিনি 'স্যার' খেতাব লাভ

করেন এবং আরও পরে পারস্য, মাদ্রিদ ও ওয়াশিংটনে বৃটিশের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন।

স্যার ডুরাণ্ড প্রথমে যে কাপটি দিয়েছিলেন, সেটি ছিল 'এবোনি' ধাতু দিয়ে তৈরি দণ্ডের উপর স্থাপিত একটি সুদৃশ্য রৌপ্য বল। ঐ বলের উপর প্রতি বছরের বিজয়ী দলের খেলোয়াড়দের নাম খোদাই করে রাখা হত। প্রতিযোগিতার নিয়ম ছিল—কোন দল উপর্যুপরি ৩ বছর ডুরাণ্ড বিজয়ী হলে কাপটি সেই দলের সম্পত্তিতে পরিণত হবে। ১৮৯৩ থেকে পর পর ৩ বছর হাইল্যাণ্ড লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি দল ডুরাণ্ড বিজয়ী হয়ে কাপটি চিরতরে লাভ করে। ১৮৯৬ সালে স্যার মার্টিমার পূর্বের অনুরূপ আর একটি কাপ দান করেন। কিন্তু এ কাপটিও ডুরাণ্ড কমিটির দখলে রইলো না। ১৮৯৭ সাল থেকে উপর্যুপরি ৩ বছর বিজয়ীর সম্মান অর্জন করায় এবার কাপটি 'ব্ল্যাক ওয়াচের' দখলে গেল। স্যার ডুরাণ্ড আর একটি কাপ দান করে ভারতীয় ফুটবল খেলার ইতিহাসে অমর হয়ে রইলেন। তৃতীয়বার কাপটি দেবার সময় তিনি প্রস্তাব করলেন, এখন থেকে ডুরাণ্ড কাপটি চ্যালেঞ্জ ট্রফি হিসাবে পরিগণিত হবে; তবে উপর্যুপরি ৩বারের বিজয়ীর জন্য একটি স্মারক কাপ দানের ব্যবস্থা রইলো।

১৯৩৪ সালে 'সিমলা ট্রফি' ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতা আকর্ষণ আরও বাড়িয়ে তোলে। ভাত সরকারের সিমলাস্থিত কর্মচারিবৃন্দ এবং সিমলার জনসাধারণ মিলে দেড় হাজার টাকা ব্যয়ে ডুরাণ্ড বিজয়ী অন্যতম পুরস্কার হিসাবে 'সিমলা ট্রফি' ডুরাণ্ড কমিটির হাতে দান করে। উপর্যুপরি ৩ বারের ডুরাণ্ড বিজয়ী অতঃপর 'সিমলা ট্রফি' চিরতরে লাভ করবে বলে ঠিক হয়। ডুরাণ্ড বিজয়ীর অন্যতম পুরস্কার—'রাষ্ট্রপতি কাপ' —রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদের দান। ১৯৫০ সাল থেকে 'রাষ্ট্রপতি' কাপ দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি কাপকে ডুরাণ্ড বিজয়ীর স্মৃতি পুরস্কার বলা যেতে পারে। প্রতি বছরের বিজয়ী দল চিরদিনের মত এই কাপটি লাভ করে থাকে। আঙ্গিক সৌষ্ঠবের দিক দিয়ে ভারতের অন্য কোন ট্রফির সঙ্গে 'সিমলা ট্রফি' ও 'রাষ্ট্রপতি কাপের' তুলনা চলে না। এই দুইটি পুরস্কার যেমন সুদৃশ্য, তেমন কারুকার্যখচিত। ডুরাণ্ড ফাইন্যালে বিজিতের পুরস্কার ডুরাণ্ড 'টুর্নামেণ্ট কমিটি কাপ'। সেমি-ফাইন্যালের পরাজিত দুইটি দলের মধ্যে যে খেলার ব্যবস্থা আছে, তার বিজয়ী দল 'রবার্ট হজ কাপ' লাভ করে।

ডুরাণ্ড কাপ প্রতিযোগিতা শুরু হবার পর থেকে শুধু মাত্র সামরিক দলগুলির প্রতিযোগিতায় যোগদানের অধিকার ছিল। ১৯২৪ সাল ডুরাণ্ড কাপের ইতিহাস দুটি কারণে উল্লেখযোগ্য। এই সালের ৮ই জুন ইংলণ্ডে দেহত্যাগ করেন ডুরাণ্ড ফুটবল প্রতিযোগিতার প্রতিষ্ঠাতা স্যার হেনরী মার্টিমার ডুরাণ্ড এবং এই সালেই সর্বপ্রথম বেসামরিক এবং ভারতীয় ফুটবল দলকে ডুরাণ্ড কাপে অংশ গ্রহণের অধিকার দেওয়া হয়। প্রতিযোগিতার আকর্ষণ বৃদ্ধি এবং মোহনবাগান ক্লাবকে খেলবার সুযোগদানের জন্যই ডুরাণ্ড কমিটি আইনের পরিবর্তন করেন। মোহনবাগান ক্লাব প্রথম বছরেই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে এবং ভারতীয় ক্রীড়ামহলে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে সেমি-ফাইন্যালে 'শেরউড ফরেস্টারের' কাছে হেরে যায়। ১৯৪০ সাল ডুরাণ্ড ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এতদিন সামরিক দলই ডুরাণ্ড কাপ পেয়ে আসছিল। ১৯৪০ সালে কলকাতার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ওয়েলচ রেজিমেণ্টকে হারিয়ে প্রথম বে-সামরিক এবং ভারতীয় দ[...] হিসাবে ডুরাণ্ড কাপ লাভ করলো। ক্ষু[...] হল ডুরাণ্ডের সামরিক মর্যাদা। তারপর সম[...] বিশ্বে বেজে উঠলো রণ-দামামা। ডুরাণ[...] কাপও ডুবে রইলো সামরিক দপ্তরের এব[...] কোণে।

১৯৫০ সাল থেকে রাষ্ট্রপতি ডা[...] রাজেন্দ্রপ্রসাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এব[...] দিল্লীর সামরিক কর্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানে দিল্লীতে ডুরাণ্ড কাপের খেলা অনুষ্ঠি[...] হচ্ছে। ১৮৮৮ সালে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হবার পর থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত সিমলার 'এ্যানানডেল' মাঠে খেলা অনুষ্ঠি[...] হয়েছে। ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতার সুদীর্ঘ ইতিহাসে মোট ১৪বার খেলা অনুষ্ঠি[...] হয়নি। ১৯১৪ থেকে ১৯১৯ সাল এব[...] ১৯৩৯ ও ১৯৪১ থেকে ১৯৪৯ সা[...] পর্যন্ত। নীচে ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতার পূর্ববর্তী বিজয়ী এবং যুদ্ধোত্তর যুগের বিজি[...] দলের তালিকা দেওয়া হল।

পূর্ববর্তী বিজয়ী দল

১৮৮৮—রয়েল স্কট ফুসিলিয়রস ১৮৮৯-৯০—এইচ এল আই; ১৮৯১-৯২—স্কটিশ বার্ডারস; ১৮৯৩-৯৫—এইচ এল আই; ১৮৯৬—সমারসেট লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি ১৮৯৭-৯৯—দি ব্ল্যাক ওয়াক; ১৯০০-১৯০[...] —এস ডবলিউ বর্ডারস; ১৯০২—হ্যাম্প সায়ার রেজিমেণ্ট; ১৯০৩—রয়েল আইরি[...] রাইফেলস; ১৯০৪—নর্থ স্ট্যাফোর্ডসায়ার ১৯০৫—রয়েল ড্রাগনস; ১৯০৬-০৭—ক্যামেরনিয়ান্স; ১৯০৮-০৯—ল্যাংকাসায়ার ফুসিলিয়রস; ১৯১০—রয়েল স্কটস; ১৯১[...] —ব্ল্যাকওয়াচ; ১৯১২—রয়েল স্কটস; ১৯১[...] —ল্যাংকাসায়ার ফুসিলিয়রস; ১৯১৪-১৯—প্রতিযোগিতা হয় না; ১৯২০—ব্ল্যাকওয়াচ ১৯২১—৩য় উরস্টার্স; ১৯২২—ল্যাংকাসায়ার ফুসিলিয়রস; ১৯২৩—বেসায়া[...] রেজিঃ; ১৯২৪—১ম উরস্টার্স; ১৯২৫—সেরউড ফরেস্টার্স; ১৯২৬—ডারহাম লাই[...] ইনফ্যাণ্ট্রি; ১৯২৭—ইয়র্ক এণ্ড ল্যাংকাসায়ার ১৯২৮—সেরউড ফরেস্টার্স; ১৯২৯-৩০—ইয়র্ক এণ্ড ল্যাংকাসায়ার রেজিঃ; ১৯৩১—ডেভনসায়ার রেজিঃ; ১৯৩২-৩৩—কিংসস্প্র[...] সায়ার লাইট ইনফ্যাণ্ট্রি; ১৯৩৪—'বি' কো[...] সিগন্যালস; ১৯৩৫—বর্ডার রেজিঃ; ১৯৩[...] —এ এ্যাণ্ড এস এস হাইল্যাণ্ডার্স ১৯৩৭—বর্ডার রেজিঃ; ১৯৩৮-৩৯—এ[...] ডবলিউ বর্ডার্স; ১৯৪০ — মহমেডা[...] স্পোর্টিং; ১৯৪১-৪৯—খেলা বন্ধ থাকে ১৯৫০—হায়দরাবাদ পুলিশ; ১৯৫১—ইস্ট বেঙ্গল ক্লাব; ১৯৫২—ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ১৯৫৩—মোহনবাগান ক্লাব; ১৯৫৪—হায়দরাবাদ পুলিশ।

যুদ্ধোত্তর প্রতিযোগিতার বিজিত দল

১৯৫০—মোহনবাগান ক্লাব; ১৯৫১—

রাজস্থান ক্লাব; ১৯৫২—হায়দরাবাদ পুলিশ; ১৯৫৩—ন্যাশনাল ডিফেন্স একাডেমী; ১৯৫৪—হিন্দুস্থান এয়ারক্র্যাফ্ট।

* * *

টেনিস নৈপুণ্যের উন্নত কলাকৌশল শেখবার জন্য ভারতের পয়লা নম্বর টেনিস খেলোয়াড় আর কৃষ্ণণ গত ১৫ই নবেম্বর অস্ট্রেলিয়া অভিমুখে যাত্রা করেছেন। সেখানে তিনি তিন মাস অস্ট্রেলিয়ার অফিসিয়াল 'কোচ' হ্যারিহপম্যানের শিক্ষাধীনে থাকবেন। যুদ্ধোত্তর টেনিসে অস্ট্রেলিয়ার সুনিশ্চিত প্রাধান্য সর্ববাদিসম্মত। বারবার ডেভিস কাপকে অধিকারে রাখা তাদের প্রাধান্যের প্রকৃষ্ট সাক্ষ্য। লুই হোড কেন রোজওয়াল, মার্ভিন রোজ, কেন ম্যাগ্রেগার, আর্কিনস্টল প্রভৃতি অস্ট্রেলিয়ার বিশ্বখ্যাত টেনিস খেলোয়াড়রা হপম্যানের হাতের সৃষ্টি। হপম্যান উদীয়মান কৃষ্ণণের খেলা দেখে এই আশা ব্যক্ত করেছিলেন, কিছুদিন নিয়মিত শিক্ষা গ্রহণ করলে কৃষ্ণণের পক্ষে বিশ্বের যে কোন ধুরন্ধর খেলোয়াড়কে পরাজিত করা বিশেষ কষ্টসাধ্য হবে না। গতবার ভারতের জাতীয় প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণণ স্ট্রেট সেটে আর্কিনস্টলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। খেলার শেষে আর্কিনস্টল বলেন—"আমার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের কাছে আমি হেরে গেছি, অস্ট্রেলিয়ায় এমন কোন খেলোয়াড় নেই, যে আমাকে স্ট্রেট সেটে হারাতে পারে।" আর্কিনস্টলের এই উক্তি যে কৃষ্ণণের কতখানি প্রশংসা তা সহজেই অনুমেয়। এবার আর্কিনস্টল নাকি অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপে অংশ গ্রহণ কৃষ্ণণকে হারাবার জন্য। কিন্তু অল ইণ্ডিয়া চ্যাম্পিয়নশিপের সময় কৃষ্ণণ থাকবেন অস্ট্রেলিয়ায়। এই সময়ে অস্ট্রেলিয়ার বিভিন্ন চ্যাম্পিয়নশিপে তার খেলবার কথা। কৃষ্ণণের কোচ হ্যারী হপম্যান মনে করেন, অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় খেললে কৃষ্ণণ নিজের ভুলচুক বুঝতে পারবেন এবং যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবেন, তা তার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথে মস্ত সহায়ক হবে। তবে যদি হপম্যান কৃষ্ণণকে অনুমতি দেন এবং অর্থ যাতায়াতের পক্ষে অন্তরায় না হয়, তবে কৃষ্ণণের জাতীয় প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের সম্ভাবনা আছে। হপম্যান অনুমতি দিলে স্বল্প কালের জন্য কৃষ্ণণের ভারতে আসার পক্ষে অর্থ অন্তরায় না হয়, সেদিকে নিখিল ভারত লন টেনিস এসোসিয়েশনরে দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন। কৃষ্ণণের বর্তমান বয়স মাত্র ১৮ বছর। এত কম বয়সে কোন খেলোয়াড়ই জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ অর্জন করেননি। কৃষ্ণণ এ বছর উইম্বলডেনের জুনিয়ার চ্যাম্পিয়ন।

দেশী সংবাদ

৮ই নবেম্বর—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিনিধিদের নিকট কংগ্রেস সভাপতি হিসাবে সৌরাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ইউ এন ধেবরের নাম সুপারিশ করিবেন বলিয়া সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটি শ্রীনেহরুর কংগ্রেস সভাপতিপদ ত্যাগে সম্মত হন।

৯ই নবেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ নয়াদিল্লীতে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন, "ভবিষ্যৎ ভারতের যে চিত্র আমার মনের সম্মুখে রহিয়াছে, তাহা সুনির্দিষ্ট ও সম্পূর্ণভাবে সমাজতান্ত্রিক সমাজেরই একটি রূপ।"

রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীজয়নারায়ণ ব্যাস আজ রাজপ্রমুখের নিকট তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

লোকসভার উপনির্বাচনে মেদিনীপুর-ঝাড়গ্রাম কেন্দ্র হইতে আদিবাসী আসনে কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীসুবোধ হাঁসদা প্রায় এক লক্ষ ভোটের ব্যবধানে জয়লাভ করিয়াছেন।

১০ই নবেম্বর—যে কোন জোতের প্রথম দুই একর জমির জন্য কোনরূপ রাজস্ব দাবী করা হইবে না, পশ্চিমবঙ্গের প্রস্তাবিত ভূমি সংস্কার ব্যবস্থায় ইহা প্রধান বৈশিষ্ট্য হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে। এতদনুযায়ী রাজ্য সরকারই শুধু জমিদার এবং রায়তরা প্রজা বলিয়া গণ্য হইবে। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে এই পরিকল্পনা বিবৃত করেন।

আগামী সপ্তাহে কলিকাতায় উদ্বাস্তু-দের পুনর্বাসন সংক্রান্ত তিনটি সম্মেলন হইবে। উদ্বাস্তুদের কর্মসংস্থান, তদুদ্দেশ্যে ছোট ও মাঝারি শিল্প স্থাপন এবং কলিকাতা ও তাহার চারিপার্শ্বের জবরদখল কলোনী-গুলির বিষয়ও সম্মেলনে আলোচিত হইবে।

১১ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে বিভিন্ন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ উপদেষ্টা বোর্ডের সভাপতিদের প্রথম সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ বলেন যে, জনকল্যাণের সহিত বহুবিধ প্রশ্ন জড়িত আছে, কিন্তু ব্যক্তিগত ও পারিবারিক সমস্যা হইতে বৃহত্তর জনসমাজের কল্যাণ পর্যন্ত সমুদয় সমস্যা সমাধানের ভার যদি রাষ্ট্রের একচেটিয়া হয়, তবে তাহা বিপজ্জনক।

ভারতের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা অপেক্ষা বহুলাংশে ব্যাপক হইবার সম্ভাবনা। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মোট ব্যয়ের পরিমাণ ৫,৫০০ কোটি টাকা হইতে পারে। পরি-কল্পনা কমিশন জাতীয় উন্নয়ন পরিষদে এই ইঙ্গিত প্রদান করিয়াছেন। জাতীয় উন্নয়ন পরিষদ দেশের বেকার সমস্যা সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি ব্যাপক ব্যবস্থা অবলম্বনের সুপারিশ করিয়াছেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

ভারত সরকার তৃতীয় ডিভিশনের কেরানিগণের মূল বেতন বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।

১২ই নবেম্বর—ভারত সরকার পাঁচ লক্ষ লোক লইয়া একটি নূতন স্বেচ্ছাসৈন্য বাহিনী গঠন করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। ইহার নাম হইবে জাতীয় স্বেচ্ছাসৈন্য বাহিনী। ইহা ১৯৫৩ সালে গঠিত অক্সিলিয়ারী টেরিটোরিয়াল ফোর্সের স্থান গ্রহণ করিবে।

১৩ই নবেম্বর—নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু জানান যে, তিনি সোভিয়েট ইউনিয়ন পরি-দর্শনের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

শ্রীমোহনলাল সুখদিয়ার নেতৃত্বে নূতন রাজস্থান মন্ত্রিসভা আজ শপথ গ্রহণ করেন।

গতকল্য গভীর রাত্রে বেহালা অঞ্চলে পলায়নপর একটি প্রাইভেট মোটর গাড়ীর মধ্যে জনৈকা স্ত্রীলোকের আর্ত চীৎকারে আকৃষ্ট হইয়া স্থানীয় একদল প্রহরারত পুলিশ গাড়ীটিকে থামাইবার চেষ্টা করে; কিন্তু তাহাদের সতর্কবাণী উপেক্ষা করিয়া গাড়ীটি চম্পট দিবার চেষ্টা করিলে পুলিশ গুলী চালায়। ফলে ঐ গাড়ীর চালক নিহত হয়। ঐ গাড়ীর আরোহী দুই ব্যক্তিকে পুলিশ ঘটনাস্থলেই গ্রেপ্তার করে।

১৪ই নবেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু নয়াদিল্লীতে স্বীয় বাসভবনে অনাড়ম্বর ভাবে তাঁহার জন্মদিবস উৎসব সম্পন্ন করেন। আজ শ্রীনেহরুর ৬৫ বৎসর পূর্ণ হইয়াছে।

আজ নদীয়া জেলার অন্তর্গত ধুবুলিয়া স্থায়ী উদ্বাস্তু ক্যাম্পে ধুবুলিয়া দেশবন্ধু উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের নবনির্মিত গৃহের দ্বারোদ্ঘাটন অনুষ্ঠান হয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উক্ত অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন।

পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ পাক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাসহ আজ লক্ষ্ণৌতে পৌঁছেন। সেখানে পাক গভর্নর জেনারেল এইরূপ আশা প্রকাশ করেন যে, ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে যে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও সন্দেহের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা অতি শীঘ্র দূর হইবে।

বিদেশী সংবাদ

৮ই নভেম্বর— সিন্ধু প্রদেশের গভর্নর মামদোতের খান ইফতিকার হোসেন খান আজ সিন্ধু মন্ত্রিসভাকে শাসন পরিচালনায় অব্যবস্থার অভিযোগে পদচ্যুত করিয়াছেন। পীরজাদা আব্দুল সাত্তার এই মন্ত্রিসভার মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন।

৯ই নভেম্বর—মিঃ এম এ খুরো আজ সিন্ধুর মুখ্যমন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন। এই দিন পীর আলী রসিদী এবং হাজী মৌলাবক্স মন্ত্রীরূপে শপথ গ্রহণ করেন।

১০ই নভেম্বর—ইরাণের ভূতপূর্ব পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ হোসেন ফাতেমীর প্রতি প্রদত্ত প্রাণদণ্ডাদেশ আজ কার্যকরী করা হইয়াছে।

১২ই নভেম্বর—পাকিস্থান আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং যুক্তফ্রন্ট দলের নেতা মিঃ সুরাবর্দী আজ লণ্ডনে বলেন যে, পাকিস্থান গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়ায় তিনি গভর্নর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদের কার্য সমর্থন করেন। প্রকাশ মিঃ সুরাবর্দী আগামী ছয় মাসের মধ্যে নূতন গণপরিষদ গঠন করার জন্য চাপ দিবেন।

১৩ই নভেম্বর—ইউরোপের নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনার জন্য রাশিয়া ২৯শে নভেম্বর মস্কো অথবা প্যারিসে একটি সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব করিয়াছে।

১৪ই নভেম্বর—মিশরের বিপ্লব পরিষদ অদ্য মহম্মদ নাগিবকে প্রেসিডেণ্টের পদ হইতে অপসারিত করিয়াছেন। বিপ্লব পরিষদের এক জরুরী বৈঠকে প্রেসিডেণ্টকে পদচ্যুত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
সংখ্যা ৪
দেশ
শনিবার
১১ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬১
DESH
SATURDAY, 27TH NOVEMBER, 1954.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

আত্মরক্ষায় ভারতের শক্তি

ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশনের প্রতিনিধির প্রশ্নের উত্তরে ভারতের প্রধান-মন্ত্রী গত ১৯শে নভেম্বর কথোপকথন-সূত্রে যে বিবৃতি দিয়াছেন তাহাতে তাঁহার চীন পরিদর্শন সংক্রান্ত অনেক প্রশ্নের নিরসন হইয়াছে। ভারত কোন দেশকে ভয় করে না; কিন্তু অন্যান্য অনেক দেশ নানা কারণে পরস্পরকে ভয় করিতেছে। সামরিক দিক হইতে ভারত এমন কিছু শক্তিশালী দেশ নয়, এমন অবস্থায় ভারতের এই নির্ভীকতার মূলে কোন শক্তি কাজ করিতেছে, তাহার নির্ভয়শীলতার ভিত্তি কি? এই প্রশ্নের উত্তরে পণ্ডিত জওহরলাল বলেন, আমাদের নির্ভীকতার প্রথম কারণ হইল আমাদের মানসিক গঠন গান্ধীজীর আদর্শে তৈয়ারী। এই সঙ্গে পণ্ডিতজী ভারতের ভৌগোলিক সংস্থিতির কথাও উল্লেখ করিয়াছেন এবং আত্মরক্ষার উপযোগিতার দিক হইতে ভারত যে দুর্বল নয়, ইহাও জানাইয়াছেন। কিন্তু এই সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরুর প্রথম উক্তিটিকেই আমরা সমধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করি। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বের শক্তিসংঘাতে যে সব প্রলয়কারী মারণাস্ত্র পুঞ্জীভূত হইতেছে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-সঙ্ঘের স্বার্থের কূটচক্র যেভাবে বিরোধ ও বিদ্বেষের আগুনে ধূমায়িত হইতেছে, তাহাতে ভৌগোলিক পরিস্থিতির জন্য কিংবা সামরিক শক্তির দিক হইতে ভারতের নির্ভরশীলতা সুনিশ্চিত হওয়া সুকঠিন। অন্তত সে বিচারের দিক হইতে ভারতের জনচেতনা আত্মরক্ষার সম্বন্ধে আশ্বস্ত হইতে পারে না। ফলত মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শের প্রাণময় অবদান ভারতের আত্মপ্রত্যয় এবং অভয় মনোবৃত্তির মূলে উৎসরূপে কাজ করিতেছে। সব পাপের গোড়ায় থাকে ভয়। নৈতিক শক্তিতে সমুন্নত ভারতের মত একটি বিরাট এবং বিশাল দেশ যদি ভয়কে জয় করিয়া মানুষের মর্যাদায় মাথা তুলিয়া দাঁড়ায় এবং পশুত্বকে নির্জিত করিবার উপযোগী দুর্দমনীয় মনোবলের পরিচয় দিতে পারে, তবে পশুবলগর্বী শক্তি-সমূহের প্রলয়ংকর মারণাস্ত্রে সে ধ্বংস হইবে না, অধিকন্তু মানবতার প্রেরণায় জাগ্রত ভারত জগৎকে প্রলয়াস্ত্রের বিভীষিকা হইতে রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে। বাস্তবিকপক্ষে জগৎ বর্তমানে যে অবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাহাতে মারণাস্ত্রের পরিমাণ মাপিয়া কিংবা সামরিক সমারম্ভে জগৎ রক্ষা পাইবে না। পক্ষান্তরে যাহারা সেই পথে পা দিবে তাহারা আত্মঘাতী পন্থাই উন্মুক্ত করিবে। প্রত্যুত অপর শক্তিকে ধ্বংস করিবার আয়োজনে নিজের ধ্বংসকেই ডাকিয়া আনা হইবে। এক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর প্রদর্শিত নীতিই একমাত্র অবলম্বনীয় এবং তাহার শক্তিই সব চেয়ে বেশী। ফলত বিশ্বশান্তির জন্য রাজনীতিক আলোচনা, গবেষণা এসবই বাস্তবিক পক্ষে পরোক্ষ। মানুষের মানসিক পরিবর্তন সাধনের উপযোগী নৈতিক আদর্শ—রাষ্ট্রীয় সাধনার ভিতর দিয়া জীবন্ত করিয়া তোলাই বর্তমানে বাঁচিবার একমাত্র পন্থা। ভারত যদি সেই প্রাণময় আদর্শে উদ্দীপ্ত থাকে, কোন দিক হইতে তাহার ভয়ের কোন কারণ নাই।

পুনর্বাসনের দায়িত্ব

সম্প্রতি কলিকাতায় পূর্বাঞ্চলীয় রাজ্যসমূহের পুনর্বসতি মন্ত্রী সম্মেলন সমাপ্ত হইয়াছে। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন-ব্যবস্থা যথাযথভাবে প্রযুক্ত হইতেছে না, ব্যবস্থায় ত্রুটি রহিয়াছে সম্মেলনে সরকারিভাবে এই সত্য স্বীকৃত হইয়াছে। বিগত অধিবেশনের এই সিদ্ধান্তই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। এই ত্রুটির জন্য দায়িত্ব কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়ের মধ্যে কাহার কতখানি, এই বিষয়ে প্রশ্ন উঠিয়াছে। পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য ভারত সরকার মুক্তহস্তে অর্থ মঞ্জুর করিয়াছেন, সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারগুলি কর্তৃক প্রেরিত পুনর্বাসন পরিকল্পনা তাঁহারা মঞ্জুর করিয়াছেন; কিন্তু তথাপি পরিকল্পনা কার্যে রূপায়িত হয় নাই, মঞ্জুরীকৃত সব টাকা উদ্বাস্তুদের দুর্গতি দূরীকরণে ব্যয় করা হয় নাই, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন-মন্ত্রী শ্রীযুত অজিতপ্রসাদ জৈন স্পষ্ট ভাষাতে এই অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার উক্তিতে রাজ্যগুলির কর্তব্য প্রতিপালনের ত্রুটির কথাই ব্যক্ত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ হইতে পুনর্বসতি সচিব শ্রীমতী রেণুকা রায় এই অভিযোগ খণ্ডনের যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক মঞ্জুরীকৃত সমস্ত টাকা বিশেষ বিশেষ কতগুলি প্রতিবন্ধকের জন্যই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের

পক্ষে ব্যয় করা সম্ভব হয় নাই। পুনর্বাসন সমস্যাটি আকস্মিকভাবে আজ দেখা দেয় নাই। কয়েক বৎসর এই ব্যাপার লইয়া কাটিয়া গিয়াছে, তথাপি কাজ আশানুরূপভাবে অগ্রসর হয় নাই, সুতরাং গলদ যে কোথায় ঘটিতেছে ইহা উপলব্ধি করিতে মূল্যবান মস্তিষ্কের অপব্যয় করা বিশেষ প্রয়োজন আছে বলিয়া আমরা মনে করি না। গলদ ঘটিয়াছে এবং সেজন্য সহস্র সহস্র নরনারী দুঃখ ভোগ করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে, অথচ তাহার প্রতিকার হয় নাই, ইহাই বিস্ময়ের বিষয়। এজন্য আমরা কেন্দ্রীয় সরকারকেই প্রধানত দায়ী করিব। রাজ্য সরকারের এতৎ-সম্পর্কিত কাজ যদি সন্তোষজনকভাবে পরিসমাপ্ত না হইয়া থাকে, কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিবের দৃষ্টি তৎপ্রতি পূর্বেই আকৃষ্ট হওয়া উচিত ছিল এবং পুনর্বাসনের কাজ যাহাতে সুপরিচালিত হয় তদুপযোগী ব্যবস্থা নির্ধারণ করিয়া রাজ্য সরকারের সহযোগিতার জন্য অগ্রসর হওয়া তাঁহারই কর্তব্য ছিল। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের উপর দোষ চাপাইয়া দিয়া কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ নিজেদের দায়িত্ব এড়াইতে পারেন বলিয়া আমরা মনে করি না। টাকার অভাব নাই, সরকারের সদিচ্ছারও অপ্রতুলতা নাই, তবু সহস্র সহস্র নরনারী দুর্গত অবস্থায় পতিত থাকিয়া দিন দিন মৃত্যুর পথে অগ্রসর হইতেছে এই অবস্থা অত্যন্তই নিদারুণ। অগণিত এই দুর্গত জনশ্রেণীর দুঃখ-দুর্দশা নিরসনে কর্তৃপক্ষের অবলম্বিত ব্যবস্থায় ত্রুটির প্রশ্ন যে দেখা দিয়াছে, ইহাই জাতির পক্ষে লজ্জার কথা, মানবতার দিক হইতে ইহা দুঃখ-দায়ক এবং আমাদের পক্ষে এই বিষয় লইয়া আলোচনাও বিক্ষোভকর ব্যাপার।

বাংলায় সামরিক স্পৃহা

আঞ্চলিক সেনাবাহিনীর ষষ্ঠ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় বাংলার যুবকদিগকে আঞ্চলিক সেনাবাহিনীতে যোগদানের জন্য বিশেষভাবে আহ্বান করিয়াছেন। সামরিক শিক্ষা লাভে বাঙালী যুবকদিগের চিত্তে আগ্রহ ও উৎসাহের অভাব আছে, ইহা বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয় না; অথচ বাস্তব অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে দেখা যায়, আঞ্চলিক বাহিনীতে যুবকেরা অধিক সংখ্যায় যোগদান করে নাই। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির প্রকোপে বাঙালী যুবকেরা সামরিক শিক্ষা হইতে বঞ্চিত থাকিতে বাধ্য হইয়াছে, কিন্তু সে অবস্থায়ও সামরিক শিক্ষালাভের জন্য বাঙালী যুবকদের দুরন্ত রকমের আগ্রহ আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর বাঙালী যুবকদের মধ্যে সামরিক শিক্ষা সম্বন্ধে আগ্রহের এক নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি হইবে, ইহাই আমরা আশা করিয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাড়া মিলিতেছে না। ইহার কারণ কি, এ সম্বন্ধে স্বভাবতই মনে প্রশ্ন জাগে। সামরিক শিক্ষার পশ্চাতে দেশরক্ষার আগ্রহ প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে, দেশরক্ষার আগ্রহ বাঙালী যুবক সমাজের মধ্যে তবে কি স্তিমিত হইয়া গিয়াছে? এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, স্বাধীনতা লাভ করিবার পর এদেশের রাজনীতি স্বদেশের প্রাণকেন্দ্র ছাড়িয়া অনেকটা যেন আন্তর্জাতিক তত্ত্ববিচারের বস্তুতে পরিণত হইয়াছে এবং এদেশের রাজনীতি দেশপ্রেমকে জ্বলন্ত ও জীবন্ত করিয়া তুলিবার ধারা যেন হারাইয়া ফেলিয়াছে। আন্তর্জাতিকতার মূল্য না আছে, এমন কথা আমরা বলি না, জাতির দৃষ্টি বিশ্বমুখীন হয়, ইহাও অবশ্য বা[illegible] কথা। কিন্তু স্বদেশপ্রেমকে ভিত্তি করিয়া যদি ঐ সব মহৎ আদর্শ গড়িয়া না উঠে, তবে সেগুলির স্থায়ী মূল্য কিছুই থাকে না। স্বদেশপ্রেম আশ্রয় করিয়াই জাতির মনুষ্যত্বের বিকাশ হইয়া থাকে এবং সামরিক শিক্ষা এই মনুষ্যত্ব-বোধ বিকাশেরই একটা দিক।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

শ্রীযুত অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় বাধ্য হইয়া 'ভাগবতী তনু' প্রকাশ আপাতত কিছুকাল বন্ধ রাখিতে হইল। এই প্রসঙ্গে লেখক আমাদের নিকট যে পত্র দিয়াছেন, তাহা নিম্নে উধৃত হইল:—

......রোগের কাছে পরাস্ত হয়ে গেলে আর করি কি। জ্বর ও ব্রংকাইটিসে ভুগছি। ডাক্তার দীর্ঘকাল বিশ্রাম নিতে বলছে। "দেশ"এর থেকে কিছুকাল ছুটি চাই। ভগ্নস্বাস্থ্যে প্রতি সপ্তাহে নিয়মিত লিখে উঠতে পারব নিজের উপর আর জোর নেই। অন্তরের প্রীতি গ্রহণ করুন। ইতি—

আপনার
অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

স্বাস্থ্যতত্ত্বে শরীর ও মন

বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের ডিরেক্টার জেনারেল ডাঃ এস সি কানাডো সম্প্রতি দিল্লীর বেতার কেন্দ্র হইতে বেতার বক্তৃতায় স্বাস্থ্যতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার কথায় অবশ্য নূতনত্ব কিছু নাই, তথাপি কথাগুলি বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ডাঃ কানাডো বলেন, দার্শনিকদের মত আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেরও এই সিদ্ধান্ত যে, শরীরের সঙ্গে মনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রহিয়াছে। শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান ব্যতীত মানসিক স্বাস্থ্য প্রকৃতভাবে রক্ষা করা সম্ভব নয়, সেইরূপ মানসিক স্বাস্থ্যের বিপর্যয় হইলে শারীরিক স্বাস্থ্যও ক্ষুণ্ণ হইতে বাধ্য। এরূপ অবস্থায় শারীরিক এবং মানসিক উভয় দিকের স্বাস্থ্যই যাহাতে সমানভাবে বজায় থাকে, সেই দিকেই লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টির গুরুত্ব যে শুধু বিভিন্ন জাতির অর্থ-নীতিক উন্নতি সম্বন্ধেই রহিয়াছে, এরূপ নহে, ইহার সঙ্গে বিশ্বের শান্তি বৃহত্তর সমস্যাও বিজড়িত রহিয়াছে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জগতের উন্নত রাষ্ট্রসমূহে শারীরিক স্বাস্থ্যের উন্নতি সাধন এবং রোগের প্রতীকারের নূতন নূতন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। ডাঃ কানাডো এই সম্পর্কে ভারত সরকারের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যথেষ্টই প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বের বৃহত্তর পরিপ্রেক্ষায় বিষয়টির বিচার করিতে গেলে এই প্রশ্নই স্বভাবতই উঠে যে, খাদ্যের সংস্থানে এবং চিকিৎসা বিজ্ঞানের বলে শারীরিক স্বাস্থ্য বিধান করাই সম্ভব, প্রত্যুত মানসিক স্বাস্থ্য—চিত্তের স্থৈর্য, তিতিক্ষা, কামোপভোগ-প্রবৃত্তির সংযম এগুলি গড়িয়া তোলা যায় না।

স্টীফেন স্পেণ্ডারের কবিতা

[প্রখ্যাত ইংরেজ কবি স্টীফেন স্পেন্ডর সম্প্রতি কলকাতায় এসেছিলেন। এখানকার কয়েকটি আলোচনা-সভায় সাহিত্যের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কিছু-কিছু বক্তৃতাও তিনি দিয়েছেন। পত্রপত্রিকায় তার বিবরণ সবাই পড়ে থাকবেন।

আজ থেকে বছর কুড়ি আগে ইংরেজী কাব্যসাহিত্যে যে-একটি সুস্পষ্ট পরিবর্তন এসেছিল, স্পেন্ডর তার অন্যতম পুরোধা। সেই সময়ে "পরিচয়" পত্রিকায় (বৈশাখ, ১৩৪২) শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী এই পরিবর্তনের মৌল তাৎপর্যটি ধরিয়ে দিয়ে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। প্রবন্ধটির কয়েকটি অংশ এখানে উদ্ধৃত হল। সেই সংগে স্টীফেন স্পেন্ডরের একটি কবিতার বাঙলা অনুবাদ। অনুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তী। গত ১৯শে নবেম্বর পি ই এন ক্লাবের উদ্যোগে এই বিদেশী কবির সম্বর্ধনার্থে কলকাতায় যে সভার আয়োজন করা হয়েছিল, মূল কবিতাটি স্পেণ্ডার সেখানে পাঠ করে শোনান। পর পৃষ্ঠায় কবিতাটিও উদ্ধৃত হল।
—সম্পাদক, দেশ]

আধুনিক য়ুরোপীয় কাব্যে নূতন সুর লেগেছে বলা চলে। সুর নূতন হলেও সংগীত-লোকেই তার মূল, তার বিকাশ, তার বিহার। সুতরাং তার মধ্যে পারম্পর্যের সৃষ্টিতত্ত্ব আছে এত বড়ো স্বতঃসিদ্ধ বাক্যের ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন।......

নূতন সুরের কথা বলেছি কিন্তু এখানে তার বিশ্লেষণ করব না। কেবল নির্দেশ করতে চাই দুটো প্রধান লক্ষ্যের বিষয়। ভাষায় সহজ রিক্ততা, ঋজু দৃঢ় বাহুল্য-বর্জিত বাক্যের স্বচ্ছভংগী বিশেষভাবে আধুনিক। অক্ষর-গোনা প্যারাগ্রাফ, মিনিট-নির্দিষ্ট বক্তৃতা, রেডিও এবং ফিল্মের দিনে লেখনীর লীলা সংহত করতে হয়। কবিতার বাক্য-পরিসর স্বভাবতই সংক্ষিপ্ত কিন্তু সেখানেও কাল-ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট চোখে পড়বে। ছন্দে বোধহয় সবচেয়ে বড়ো পরিবর্তন এনেছেন জেরার্ড হপ্‌কিনস্‌, তাঁর Sprung rhythm-এর অনুবর্তন আজো চলেছে। টেনিসন সুইন্‌বর্নের Running rhythm-এর মধুময় অবলীলতা ব্রাউনিঙের হাতুড়িতে চূর্ণ হয়েছিল।

স্টীফেন স্পেণ্ডর

বেঁচেছিল পাঠকের মন অবিমিশ্র ধ্বনি-প্রবাহিনীর ঘুমপাড়ানি গান থেকে জেগে উঠে। মানুষের সচেতন মন যতি খোঁজে, চলতে চলতে ফিরে দাঁড়ায়, মিলিয়ে নেয়, তার নৃত্যের তালও সমতরঙ্গ নয়। মসৃণ চাকার ঠেলাগাড়িতে গড়িয়ে কাব্যের খেলা জমিয়ে রাখা শক্ত; অভ্যস্ত আরামে দুই চক্ষু মুদে এলে বিছানায় শুয়ে পড়াই ভালো। ব্রাউনিঙের কাজ এগিয়ে আনলেন হপ্‌কিনস্‌; ব্রাউনিঙের সৃষ্টি প্রতিভা তাঁর ছিল না, কিন্তু কবিতার টেক্‌নীকে তাঁর দান অসামান্য। আজো এই পথে সংস্কার চলেছে।

কাব্য-সৃষ্টি স্বাতন্ত্রিক। যুগ-ধর্মের প্রবর্তনা উপস্থিত কোনো সাহিত্যে সন্ধান করলে অধিকতর ভ্রমের সম্ভাবনা ঘটবে। ভাষা ও ছন্দের আলোচনা করা চলে, কিন্তু আধুনিক কাব্যে কোনো সর্ব-সাধারণিক মনস্তত্ত্ব খোঁজা নিরাপদ নয়, অবান্তরও বটে। হয়তো লক্ষ্যের বিষয় এই যে, মানুষের দেহ মন, মানুষের জীবন ঘনিষ্ঠতরভাবে আজ কাব্যের বিষয়ীভূত। দুটো চারটে বিশেষ সদ্‌গুণ, অসদ্‌-বৃত্তিকে মহাপুরুষ বা অধম মানুষের বৃহৎ চিত্রে ফলিয়ে না তুলে আমরা নেমেছি ভালোমন্দে মেশানো দুদশজনকে বন্ধুর দৃষ্টিতে জানবার, জানাবার খোঁজে। গল্পের আসন নিয়েছে বায়োগ্রাফি। সর্ব-প্রকার মানবসম্বন্ধকে তলিয়ে দেখতে চাই বিশ্বপ্রকৃতির, মানবস্বভাবের আত্মীয় যোগে। কাব্যেও দেখি, তুমি আমি আমাদের আরো পাঁচজনকে নিয়ে নিবিড় জানাশোনার আবহাওয়ায় অস্তিত্ব-রহস্যকে একান্ত উপলব্ধি করবার চেষ্টা। মনে হতে পারে, এতে মানুষের বৈচিত্র্য-যোগের উদার দৃষ্টি দলীয় বিশিষ্টতার চর্চায় গিয়ে ঠেকবে। আত্মগত আতিশয্য তীক্ষ্ম বিশ্লেষণে বিশেষকে সাধারণ করতে চাইবে। কোথাও বা তা ঘটেছে। কিন্তু এর বড়ো দিক হচ্ছে এই যে, আজ কোনো মানুষই সাহিত্যের জাতিভেদে বহির্গত নয়, মানবসম্বন্ধের কোনো তত্ত্বই তাঁর উৎসুক চিত্তের দাবী এড়িয়ে যেতে পারবে না। বিজ্ঞান দর্শনের ধন লুঠ করে এনে প্রাণের জগতে সাহিত্য তার অধিকার বাড়িয়ে চলেছে। অনেক সময়ে এই সঞ্চয় চিত্তের বোধনে সঞ্চারিত হয়ে প্রাণকণা হয়ে ওঠেনি। কিন্তু মুক্ত মনের দরজা গিয়েছে খুলে। কম্যুনিজমের প্রেরণা এর মধ্যে আছে। এবং তারই সহোদর ফ্যাসিজম্‌-এর প্রভাব—বিশেষ মানুষের মধ্যে বিচিত্র মানুষের বিবিধ ইচ্ছার অপূর্ব সমন্বয় দেখা, হোক ভালো, হোক মন্দ। হয়তো স্পেণ্ডর, ডে লিউইস্‌ চলেছেন এক পথে; এলিয়ট্‌ দ্বিতীয়ের সন্ধানে।...

আধুনিক রেলগাড়ি বা জাহাজ বিশেষভাবে কবিতার বিষয় বা বিশেষ-ভাবে কাব্যে অপাংক্তেয় এমনতরো বচন বিচারের অগ্রাহ্য। অনুভূতির পরিমণ্ডলে যখনই অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে কোনো বাস্তব ঘটনা, কোনো প্রাত্যহিক জীবন-সামগ্রী, কাব্যে তখন তার প্রবেশ অপ্রতি-হত। দূরগামী জাহাজ নানা কল্পনায় বেদনায় মিশ্রিত হয়ে চিদ্‌-সমুদ্রে তরঙ্গে দুলে ওঠে কখনো দেশের কখনো সুদূর প্রাণ-তটের আহ্বানে—হয়তো আমাদের অনেকের সহজ জীবনের অভিজ্ঞতায় তারি ছবি সত্য গ্রামের খেয়াতরীর চেয়ে। পোড়ো বাড়ি, শ্যাওলা-সবুজ দীঘি, মেলার হাট চেতনায় মিলতে পারে রেলওয়ে স্টেশনের লাল সবুজ আলো-জ্বলা আসন্ন বিদায়ের

বা আগমনীর আলোড়নের ছন্দে। বৃষ্টি-ভেজা শহরের বুকে জ্বলছে দুপুরের রোদ্দুর, থর্ থর্ করছে তার এঞ্জিন, যেন গতি ছাড়া পেতে চায় উধাও দিগন্তের আহ্বানে। সৌন্দর্যের খর ইঙ্গিতে আঁকা হয়ে যাচ্ছে এই রকমের কত ছবি শুধু পশ্চিমে নয়, আমাদেরি বাংলাদেশের ছেলে-মেয়ের মনে প্রতিদিনের কত অনামী অভিজ্ঞতার স্তরে স্তরে। যদি লিখতে গিয়ে কলকাতা শহরের গল্পে এমনতরো দৃশ্য গ্রন্থি বাঁধা পড়ে যায় জীবনের ইতি-হাসে তাহলে তাকে ভালোও বলব না, দোষও দেব না, দেখব ছবি চোখের কাছে মনের কাছে অনিবার্য হয়ে দেখা দিয়েছে কিনা।

এক্সপ্রেস্ ট্রেন

প্রথম সহজ প্রবল ঘোষণার পরে
যন্ত্রের কালো জানানি দিয়েই বিনা দ্বিরুক্তিতে
সম্রাজ্ঞীর মতো গড়িয়ে চলল, স্টেশন ছেড়ে।
নামালো না মাথা, সম্বরিত ঔদাসীন্যে
বিনম্র বাড়ির ভিড় গেল কাটিয়ে,
এবং গ্যাসের কারখানা; শেষে উলটিয়ে গেল ঐ ভারি পৃষ্ঠা
মৃত্যুর সিমেট্রির কবরের পাথরে ছাপানো।
শহরের বাহিরে দেশ রয়েছে খোলা—
গতি বাড়ালো দ্রুততায়, ঘনিত হলো তার রহস্য।
সমুদ্রে-চলা জাহাজের উদ্দীপ্ত আত্মসমাহিতি এখন তার।
এবার আরম্ভ করল তার গান—প্রথমে খুব ধীর শব্দে,
তার পরে জোরে, শেষে একেবারে উন্মত্ত শীৎকারে—
চলার বাঁকে বাঁকে বাজে তার বাঁশির চীৎকার-গান,
বধির-করা শব্দের ঝড় ঝঙ্কৃত হল সুরঙ্গে, যন্ত্রে যন্ত্রে,
অগণ্য কলকব্জার অন্তর্লীন সংঘর্ষে।
আর সব খন হাল্কা, বায়বীয়,
চলেছে আনন্দিত ছন্দ তার চাকার তলায়।
লৌহ ল্যান্ড্স্কেপ পেরিয়ে তার লাইনের পর দিয়ে বাষ্পবেগে
ঝাঁপিয়ে পড়ল এখন সে পাগল নূতন সুখের অধ্যায়ে,
যেখানে গতি ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেল্‌চে নব নব অদ্ভুত আকার, প্রশস্ত বাঁকা রেখা,
সম যুগ্মরেখা বন্দুকের স্টীলের মতো পরিষ্কার।
অবশেষে এডিন্‌ব্রো রোমের চেয়েও দূরে।
পৃথিবীর চূড়ান্ত ছাড়িয়ে, পৌঁছল রাত্রিতে—
যেখানে কেবল মাত্র এক অবনত স্ট্রীম্‌লাইন উজ্জ্বলতা
ফস্‌ফরাস-এ সাদা হয়ে উঠেছে টর্লমল পাহাড়ের 'পরে।
আহা! ধূমকেতুর মতো অগ্নিশিখায় বিমুগ্ধ সে চলেছে এগিয়ে
তুরীয় আপন সংগীতে,—কোনো পাখির গান, না,
মধুভরা কুঁড়িতে ফেটে-যাওয়া কোনো পল্লবও তার কাছে লাগে না॥

আগে ছিল মিশনারীদের স্কুল। দৈর্ঘ্যে প্রস্থে প্রায় সিকি ইলটাক এবড়ো-খেবড়ো জমিতে শিশু ঠাল বট পলাশের ছায়াকুঞ্জে মেটে-লাল ঙের খড় আর খাপরা ছাওয়া বড় বড় টেজ। কোনওটায় বসত পড়ার ক্লাস, কানওটায় তাঁতের, কোনওটায় কার-পেণ্টারির। ছেলেদের স্কুলঘরের দিকে াছগাছড়ার ভিড়টা একটু কম, মেয়েদের াশটায় তার চেয়ে ঘন। এই গাছ-াছালির ছায়ায় ক্লাস বসত কখনো, খনো বা ঘরের ভেতর। টিফিনের ণ্টায় উঁচু ক্লাসের দুষ্টু ছেলেগুলো ত্তর থেকে দক্ষিণে সরে আসত আড়ালে াড়ালে। পেয়ারা গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পয়ারা ছুঁড়ে দিত মেহেদি বেড়ার ফেন্সিংয়ের ওপাশে। বেড়ার ওদিক থেকে স্কুল মেয়েরা হুটোপাটি করে সেই পয়ারা কুড়তো; এ ওর গায়ে পড়ে কাঁচের ড় ভাঙত, হাসত মুখে হাত চাপা দিয়ে। তারপর দক্ষিণ থেকে মেহেদির বেড়া ডিঙিয়ে টুপ টাপ করে চীনে বাদাম ভাজা পড়ত উত্তরে। ছেলেরা লোফালুফি করতে গিয়ে পায়ে পায়ে জড়িয়ে যেত। ঘাসের ওপর ছিটকে পড়ত এ ওর ঘাড়ে। এমন সুখ জমতে-না-জমতেই টিফিন শেষের ঘণ্টা বেজে উঠত। মন ভেঙে যেত দু-দলেরই। তবু সান্ত্বনা—আবার কাল টিফিনের ঘণ্টা বাজবে। বাজতও আবার।

টিফিনের ঘণ্টাও থেমে গেল একদিন। তার বদলে বাজল সাইরেন। শিশু-পলাশের কুঞ্জও অনেক ফাঁকা হয়ে এল। রাতারাতি ব্যারাক উঠে গেল কতকগুলো, মেহেদি বেড়া মিশে গেল লালচে মাটিতে। আর পিছন দিকের জঙ্গলা প্রান্তরটা দেখতে দেখতে মাজাঘষা শ্লেটের মতন ঝকঝকে মসৃণ করে তৈরি হ'ল 'রান-ওয়ে'। সাইরেন বাজলেই এখানে মহড়া দিতে চার পাঁচ—কখনো কখনো ছ'টা ফাইটারই শকুন-গতিতে আকাশের বুকে ঝাঁপিয়ে চারপাশে ছড়িয়ে পড়ে। একটা গুরু গুরু মেঘমন্দ্রিত ধ্বনি। কণ্ট্রোল রুমে আর-টি মেসেজ গম গম করে বাজতে থাকে : রজার্স, রজার্স...টু...টু সেভেন ফাইভ...রজার্স...টু সেভেন......ওভার... ওভার...।

একদিন আর-টিও থেমে যায়। সাইরেন বাজে না। সারা আকাশ লাল করে একটা আগুনের তরঙ্গ ইথার থেকে ছিটকে মাটিতে এসে মুখ গুঁজে পড়ে না আর। তার বদলে ধীরে ধীরে অদ্ভুত এক নীরবতা ফিরে আসতে থাকে। শিশু পলাশের শাখায় শাখায় নতুন প্রশাখা আর পল্লব। পাখিরা ফিরে আসে আবার। নীড় বাঁধে নতুন করে।

মেটে-লাল রঙের কটেজগুলো ধ্বসে পড়তে শুরু করেছে। বুনো তুলসীতে ছেয়ে যাচ্ছে মাঠটা। এমন সময় ও এল—লেফটেনাণ্ট পঙ্কজ বোস। বত্রিশ বছরের

স্মার্ট ছোকরা। না বেঁটে না লম্বা। মাঝারি। পুষ্ট গড়ন। গায়ের রঙ আধ-ফরসা। মাথার চুল ছোট ছোট, কোঁকড়ানো। চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে হাসিতে খুশীতে, ছেলেমানুষীতে। যুদ্ধের সময় নেভিতে ছিল। ডেক পরিষ্কার থেকে ডেপথচার্জ কিছুই তার অজানা নয়। এত জানতে গিয়ে বাঁ-হাতের কনুই থেকে বাকিটা বাদ দিতে হয়েছে। দেখলে অবশ্য সেটা চট্ করে ঠাওর করা মুশকিল।

ওর আর পাঁচজন নেভির বন্ধুর মতন পঙ্কজ বোস যুদ্ধের পর এয়ারে এসে কোনও বড় একটা স্টেশনে যেতে পারত। কিন্তু যায়নি। সে চেষ্টা করেনি। বরং তার অঙ্গহানির ক্ষতিপূরণ যেভাবে দেওয়া হচ্ছে তাতেই সে সুখী। কোন ঝক্কি ঝামেলা নেই এখানে। স্কেলিটান এয়ার স্টেশনটা মরা কচ্ছপের মতন পড়ে আছে। থাকবে এখনও দু' চার বছর! আর ওই স্টোর। ডিসপোজাল হ'তে কত দিন লাগবে কে জানে। ততদিন আগলে বসে থাকো নিজেই নিজের মনিব হয়ে।

নেভির ছ-ছটা বছরের ক্লান্তি যেন এখানে—এই ফাঁকায় শুয়ে বসে বেড়িয়ে গাছগাছালির গন্ধ শুঁকে ভাঙতে চায় পঙ্কজ। কাজেই এখানে এসে সে খুশী। ছোট মতন একটা কটেজ নিয়েছে বেছে। শিশু পলাশের আড়ালে। বারান্দার নিচে কাঠচাঁপা আর করবী।

আসার পর ক'টা দিন বেশ কাটল। অফিসের একটা চাপরাশী বাড়ির টুকটাক কাজকর্মগুলো ক'রে দিত। দু' বেলা খাবার এনে দিত ডলবির কোয়ার্টার থেকে। হঠাৎ এক নোটিশে সেই ডলবিই পাততাড়ি গুটতে লাগল।

যাবার সময় ডলবি বললে, বোস্, তোমার ত কোন রিলিজাস প্রেজুডিস নেই বলেই মনে হয়। একটা পুয়োর সোলকে শেল্টার দিতে পারো। তোমার ঘরদোর দেখবে, কুকিং করে দেবে।

হাতে চাঁদ পাওয়ার মত লাফিয়ে উঠে পঙ্কজ বললে, বলছ কি, শেল্টার কেন--মাথায় করে রাখব।

ডলবি হাসল, বেশ, সে কিন্তু মেয়ে। এণ্ড্ ইউ সি—ইয়াং টু।

পঙ্কজ যতটা উৎফুল্ল হয়েছিল ততটা হতাশ হ'ল। বললে, সে কি—মেয়ে! তাও যুবতী!

—তাতে কি—ডলবি ওর কোটের ওপর থেকে খড়কুটো ঝেড়ে দিতে দিতে হেসে বললে, এসব বাতিক তোমার আছে নাকি—!

—না, না, তা নয়। তবু এখানে যে দু'চারজন আছে—তারা কি ভাববে!

—নাথিং। আর ভাবলেই বা কি! য়ু মাস্ট হ্যাভ্ ফুড্। ঘর বাড়িও দেখা চাই তোমার। ডিসেণ্ট লিভিংয়ের জন্যে তাকে রাখছ তুমি। নাথিং ফর এলস্। একটু থেমে ডলবি আবার বললে, 'যতদূর জানি, মেয়েটা ভাল। এখানকারই ইণ্টি-রিয়ারের মেয়ে। তোমাদের বাঙালী-ই। কৃশ্চান। পুয়োর গার্ল।'

শেষ পর্যন্ত সায় দিল পঙ্কজ। আচ্ছা, দিয়ো পাঠিয়ে।

পরের দিন মেয়েটি এল। পঙ্কজ একটা কাজ সেরে অফিস থেকে ফিরছে বিকেলে। শীতের দিনে রোদ মরে এসেছে তখন। হঠাৎ চোখে পড়ল। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে এক মনে পাতা দেখছে, কী পাখি।

পায়ের শব্দে মুখ ফেরাল মেয়েটি! পঙ্কজও দাঁড়িয়ে পড়ল। ডলবির পুয়োর সোল যে এমন হবে পঙ্কজ বুঝি স্বপ্নেও ভাবেনি। এক ঝাঁকড়া রুক্ষ চুল ঘাড় পর্যন্ত। প্রায় পায়ের কনুই পর্যন্ত নেমে আসা চৌকো ছিটের স্কার্ট। কাঁধে ফার দেওয়া চকলেট্ রঙের পুরনো একটা কোট। পায়ের জুতোটা ব্যবহারের অযোগ্য।

মেয়েটা তাকিয়েছিল পঙ্কজের দিকে এক দৃষ্টে। তার মুখে চোখ রেখে পঙ্কজ এবার মেয়েটার চেহারাটা অনুভব করবার চেষ্টা করছিল। কালো রঙ, মুখটা গোল মতন। কুশ্রী নয়, হৃতশ্রী। চোখ দুটো ডাগর। ছলছল করছে। ঠোঁট দুটি পুরু।

একটু ইতস্তত করে মেয়েটিই বললে প্রথমে, 'বেলা মনডিয়াল। মিসেস ডলবি—।' বাকিটুকু সে উহ্য রাখলে।

পঙ্কজ আর একবার তাকাল চোখে চোখে। মাথা নাড়ল। যার অর্থ, সে বুঝতে পেরেছে সব। কিন্তু কৌতূহলটা সহজে মিটছে না বুঝি পঙ্কজের তাই তাকিয়েই আছে। অদ্ভুত নাম—বেলা মনডিয়াল।

খানিকটা চুপ। তারপর নেহাতই যেন মনে করবার চেষ্টা করছে এমন ভঙ্গিতে 'মনডিয়াল' শব্দটা বার দুয়েক ও আবৃত্তি করলে।

বেলা মনডিয়াল বুঝি বুঝতে পারল পঙ্কজের মনের ভাবটা। আগের মতই কুণ্ঠিত হয়ে বললে, 'নেটিভ কৃশ্চান। নাম বেলা। আমরা মণ্ডল।'

পঙ্কজ হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তা হ'লে মণ্ডলটাই মিশনারী কৃপায় দাঁড়িয়েছে মনডিয়াল। ভাগ্যিস বেলাটা অবিকৃত আছে এখনও।

একটু ভাবল পঙ্কজ। কি যেন মনে মনে ঠিক করলে। এদিক ওদিক তাকাল, আকাশ আর গাছের দিকে আনমনে। বললে তারপর, 'আমি এখানে একলা।'.. একটু ভাববার সময় দিয়ে আবার, 'ডু ইউ লাইক্ টু বি হিয়ার—আই মিন্—এ বাড়িতে যদি—'

পঙ্কজের কথায় বাধা দিয়ে বেলা মনডিয়াল তাড়াতাড়ি বললে, 'থাকব; থাকব। আই এগ্রি। প্লিজ—!'

এবার নেভির সেই অফিসারী কায়দায় মাথাটা একটু হেলিয়ে, অ্যাক্-সেপ্টে ঝোঁক দিয়ে পঙ্কজ বললে—ও—কে!

পঙ্কজ এগিয়ে যাচ্ছিল, শব্দ শুনে পিছু ফিরে দেখে বেলা মনডিয়ালও ধীর পায়ে আসছে।

থমকে দাঁড়াল পঙ্কজ।

—কিছু বলার আছে? এনিথিং—? পঙ্কজ শুধোয়।

—না। মাথা নাড়ে বেলা মনডিয়াল, 'এখন থেকেই থাকব আমি।'

—সে কি, জিনিসপত্র, বিছানা—!

বেলা মনডিয়াল আঙ্গুল দিয়ে করবী ঝোপের তলাটা দেখিয়ে দিল। কী যেন একটা জড়ান মতন পড়ে আছে।

পঙ্কজ কি যেন বলতে যাচ্ছিল। হঠাৎ থেমে গেল বেলা মনডিয়ালের মুখের দিকে তাকিয়ে। ওর মুখে অশেষ মিনতি। যেন বলছে, আর আমায় কিছু বলো না—বলো না। প্লিজ!

সপ্তাহ কাটতে না কাটতেই পঙ্কজ বেলা মনডিয়াল সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা করে নিতে পেরেছে। মেয়েটা ভালই। কাজ কর্মে মতি আছে। রান্না-বান্নায় পটু। ঘরদোর সাফসুফ রাখে। ঠিক সময় ঠিক কাজ; কোন গাফিলতি নেই।

মাস কাটতে ধারণাটা আরও গভীর হল, দৃঢ় হল। ডলবি ঠিকই বলেছিল, মেয়েটা কাজের। সার্ভিস দেয় নিখুঁত। ভাল ঘড়ির কাঁটার মতন। কথা বলে কম। যা বলে তার মধ্যে কোথাও নির্বুদ্ধিতার পরিচয় থাকে না। আশ্চর্য, মেয়েটার পোশাকে আর নামে যে রুচি-বিকৃতি, স্বভাবে কথায়-বার্তায় তার ছিঁটেফোঁটাও নেই। পঙ্কজ মাঝে মাঝে ভাবে। তাকিয়ে তাকিয়ে দেখে ওর হাঁটা কী টেবিল সাফ করার ভঙ্গিগুলো।

মাসের প্রথম। পে-বিলে সই করে টাকাগুলো প্যান্টের পকেটে গুঁজে পঙ্কজ ফিরেছে। তাড়াতাড়ি আছে ওর। চা খেয়ে চটপট পোশাকটা বদলে নিচ্ছে। জিপ নিয়ে টাউনে যাবে ওরা ক'জন—মার্কেটিং করতে। বেলা মনডিয়াল চুপটি করে এসে একটা স্লিপ রেখে দিয়ে যায় টেবিলে। যাবার সময় খেয়াল হতে কাগজটা তুলে নেয় পঙ্কজ। চোখ বুলিয়ে অবাক। সংসারের খুঁটিনাটি কি আনতে হবে কিনে তার ফিরিস্তি। টেবল ক্লথ দুটো, ফুলদানি একটা, বেডশিট একটা, কাঁচের—ফুল ডিস আর কোয়ার্টার ডিস এক জোড়া করে, চা দু পাউন্ড, বাটার, ...স, মায় জামার বোতাম।

স্লিপটা পকেটে গুঁজে বেরিয়ে পড়ল পঙ্কজ। আসার সময় এদিক ওদিক তাকিয়েছিল ও। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে বেলা মনডিয়াল তখন গোলাপ চারার টবে জল দিচ্ছে।

বেশ একটু রাত হয়েছিল ফিরতে পঙ্কজের। বাইরে তখন কনকনে ঠাণ্ডা। কাঁচের শার্সি ভেজিয়ে বেতের মোড়া টেনে চুপ করে বসে ছিল বেলা মনডিয়াল। পঙ্কজকে বারান্দায় উঠতে দেখেই দরজা খুলে দিল।

পঙ্কজের পিছনে বুলচাঁদ। এক রাশ জিনিসপত্র তার হাতে। পঙ্কজের হাতেও সামান্য কিছু।

ইশারা করবার আগেই বেলা হাত বাড়িয়ে বুলচাঁদের কাছ থেকে জিনিস-গুলো নিয়ে নিয়েছে।

খাবার টেবিলে বসে পঙ্কজ বললে, 'শীতটা জোর পড়েছে।'

দু' হাত দূরে বেলা দাঁড়িয়েছিল। ঘরের মধ্যেও শীতে কেমন একটু জড়সড় হয়ে পড়েছে। সুতির জামার ওপর গরম কিছু নেই।

একটু ইতস্তত করে পঙ্কজ বললে, আবার, 'উলেন একটা কিছু গায়ে দাও না কেন! ঠাণ্ডা লেগে অসুখ বাঁধাবে দেখছি।'

—নেই। ছোট্ট জবাব বেলার।

পঙ্কজ যেন কথাটা জানে এমনভাবে মাথা নাড়তে লাগল। তাকাল বেলার দিকে, খাটো গলায় বললে, 'অসুখ হলে এখানে মুশকিলে পড়তে হবে। কে দেখবে তোমায়।' একটু বিরতি, 'আমি একটা কিনে এনেছি। শাদা প্যাকেটটা বোধ হয় ওঘরে চেয়ারে পড়ে আছে। ওয়েল, টেক্ দ্যাট্!'

এমন কিছু কথা নয়। তবু এই কথাটুকু বলতে গিয়ে পঙ্কজ যে কেন এতটা কুণ্ঠিত হল, কে জানে।

দু জনেই চুপ। দুদিকে তাকিয়ে। দুটো ছায়া যেন ঘরের মধ্যে পড়ে আছে।

দেওয়াল থেকে একটা টিকটিকি মাটিতে ছিটকে পড়ল। সেই শব্দে চমকে উঠল দুজনেই। চোখাচোখি হল। পঙ্কজের ঠোঁটের গোড়ায় ফুটল সহজ হাসির আভা; বেলার ছলছল চোখের তারায় খুশী আর কৃতজ্ঞতা।

জামা যদি হয়, শাড়ি নয় কেন! ক'দিন পর আর এক অবসরে পঙ্কজ

বললে, 'একটা কথা ভাবছি—কেমন হয় বলতো?'

চা ঢেলে দিচ্ছিল বেলা। চোখ তুলে তাকাল। আজকাল বেলার আড়ষ্টতা অনেক কেটে গেছে। চেহারার সেই মালিন্য; চুল চোখের সেই নিঃস্বতা, দৈন্য কমেছে। এখন ও পংকজের খাবার টেবিলে একটি চেয়ারের ওপর বসে থাকতে সাহস পেয়েছে। পংকজই সে সাহস জুগিয়েছে।

—তোমার ওই ফিরিঙ্গি বসনটা ছেড়ে ফেল। নামের টাইটেলের মতন ড্রেসটাও বেখাপ্পা' পংকজ উ'চু সুরে হাসল, 'নাম বেলা। বেলার মতন বাঙালী মেয়ে হয়ে পড়!'

—আমি কি অবাঙালী? বেলা পাল্টা প্রশ্ন করলে।

—গুড্ গুড্।। যে মেয়ে সুক্তো আর মাছের ঝাল রাঁধতে পারে সে মেয়ে আবার বাঙালী নয়! পংকজ হো হো করে হেসে ওঠে।

—তবে? বেলাও হাসল ঠোঁটের ফাঁকে।

—আমি তোমায় শাড়ি পরতে সাজেস্ট্ করছিলাম। পংকজ সিগারেটের ধোঁয়া ছেড়ে বললে।

বেলা নিরুত্তর। কথাটা যে ওর কানে গেছে এমন কোন ভাব প্রকাশ পেল না।

একটু অপেক্ষা করে পংকজ বললে, 'শাড়ি কি পরোনি কখনো?'

বেলা মনডিয়াল যেন চমকে উঠল। আনমনা দৃষ্টি। বড় বেশি আনমনা। পংকজের কাছেও ধরা পড়ে যায়।

—শাড়িই ত পরতাম। নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে মৃদু ভারী গলায় আস্তে আস্তে বললে বেলা, 'শাড়িই ত পরতাম। এই সেদিন—এই স্কুলে যখন পড়তাম—তখনও।'

পংকজের ঠোঁটের সিগারেটে আর ধোঁয়া উঠছে না। আগুনটা নিভে গেছে।

—স্কুল—? তুমি স্কুলে পড়তে?

মাথা নাড়ল বেলা আস্তে আস্তে, 'পড়তাম। শেষ ক্লাসেই পড়তাম। আমাদের মেয়েদের হোস্টেল ছিল ওই কুল ঝোপগুলোর পাশে যে বাড়িটা আছে—ওটাই। কী সুন্দর ছিল তখন এই জায়গাটা। গাছ, ফুল, পাখি, বাড়ি—ছেলেমেয়ে।'

বেলা চুপ করে গিয়েছিল তারপর। ওর মুখটা করুণ হয়ে উঠেছিল, কান্নায় যেন থম থম করছিল চোখ দুটো, ভারী হয়ে উঠছিল গলার স্বর আরও।

পংকজও কেমন যেন অসোয়াস্তি বোধ করেছে এ সময়—বেলার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে। সিগারেটের টিনটা হাতে নিয়ে হঠাৎ উঠে পড়েছে সে। কথা বলার যেন কিছু ছিল না। নেই।

খ্রীস্‌মাসের আগের দিন ছুটি চাইল বেলা। বললে, 'কাল আমি সকাল থেকেই ছুটি চাই। পরশু সকালে ফিরবো!'

—সারা দিন রাত! পংকজ ক্রস-ওয়ার্ডের পাতা থেকে চোখ তুলে হাসল, 'যাবে কোথায়?'

বেলা চুপ।

—চার্চে নাকি? পংকজ হেসে আবার প্রশ্ন করে।

—না। মাথা নাড়ে বেলা।

—তবে?

—অন্য জায়গায়। একটু থেমে শাড়ির পাড়ে নখ ঘষতে ঘষতে বেলা বললে আবার, 'আমার মাইনের টাকাটাও নেবো।'

—ও! পংকজ মাথা হেলাল, 'বেশ, যাবার সময় চেয়ে নিয়ো।'

ক্রসওয়ার্ডের পাতায় আবার চোখ নামাল পংকজ। বেলা পাশের ঘরে চলে গেল।

পাজ্‌লে কিন্তু আর মন বসল না পংকজের। বেলা আজকাল মাঝে মাঝেই পংকজের ভাবনাগুলোকে এলোমেলো করে দেয়। এটা উচিত নয়। অনুচিতই বা কেন হবে, পংকজ ভেবে পায় না। মেয়েটা যেন ধুলোয় ঢাকা ফুল। ওর পাপড়িগুলো সত্যিই বিবর্ণ নয় কিন্তু পথের ধুলোয় ধুলোয় রঙ রূপ সব যেন ঢাকা পড়ে গেছে।

যদি বল রূপ—তবে বেলার রূপ বন জংগলের অজানা ফুলের মতন। পাঁচ চোখের ভাল লাগায় অভিজাত নয়। একটি বন্য লালিত্য, সারল্য আর সুষমা তার মধ্যে লুকনো আছে। কেমন এক বনজ গন্ধ।

প্রথম যখন বেলা মনডিয়াল পংকজের কাছে আসে—তখন এতটা বোঝা যায় নি। পংকজও ওকে নেহাতই স্বার্থবশে করু[illegible] করেছিল। কিন্তু দিনে দিনে ও[illegible] স্পষ্ট করে যতই বোঝা যাচ্ছে পংক[illegible] অবাক হচ্ছে, আকর্ষণ অনুভব করছে[illegible] এমনি হয়েছিল পংকজ যখন প্রথম জাহা[illegible] বসে সমুদ্র দেখত। তেমন কিছু ভাল লা[illegible] নি, ভাল লাগার ছিল না। পরে যখ[illegible] সব সয়ে গেল—তখন কোন কোন দি[illegible] পরিশ্রমের পর কোন বিশ্রাম মুহূর্তে যা[illegible] হঠাৎ চোখ পড়েছে আকাশে, একটি অজা[illegible] নক্ষত্রও দৃষ্টি আকর্ষণ করছে পংকজের দীর্ঘ সময় সেই তারাটিই দেখেছে পংকজ মনে হয়েছে শুধু একটি তারাই যে[illegible] ফুটে রয়েছে এখানে, কলকাতায়, ম[illegible] মাথার দিকের জানালার পাশে আকাশে[illegible] বিশ্ব চরাচরময়। আকাশ আর সমুদ্রে[illegible] তখন আশ্চর্য ভাল লাগত পংকজের কোথায় যেন একটা যোগসূত্র খুঁজে পে[illegible] মনটা গলে গলে শিশিরের মতন ঝ[illegible] পড়ত শান্ত সমুদ্রের নীলে। অদ্ভু[illegible] একটা কান্না তখন গলার কাছে ঠে[illegible] উঠতে চাইত।

আজকাল বেলাকে দেখলে পংক[illegible] মাঝে মাঝে বিমনা হয়ে পড়ে। মা বে[illegible] থাকলে হয়ত এ সময় পংকজ একটা চি[illegible] লিখত। লিখত : মা, এখানে একটা মে[illegible] দেখেছি—ঠিক তোমার মতন, সে যে[illegible] আড়ালে আড়ালে সব সময় আমায় দেখছে[illegible]

শব্দ হতেই পংকজের এলোমেলো[illegible] ভাবনাগুলো ছিঁড়ে যায়। চোখ ফিরি[illegible] দেখে বেলা ফুলদানিতে কতকগু[illegible] মেরিগোল্ড রাখছে।

ধবধবে শাদা শাড়ি, গায়ে সেই বাদা[illegible] রঙের উলেন সোয়েটার, হাতে ফুল! এ[illegible] বেলাই যে সেদিনের শিশু গাছের ছা[illegible] দাঁড়ান বেলা মনডিয়াল—এ কথা [illegible] বলবে! পংকজ পাশাপাশি যেন দুজন[illegible] দাঁড় করিয়ে দেখে হঠাৎ হেসে উঠল।

ফিরে তাকাল বেলা।

পংকজ ডাকল, 'শোনো।'

বেলা কাছে এসে দাঁড়াল। কা[illegible] আসতেই পংকজ চুপ। কেন যে ডাক[illegible] কাছে, কি ভেবে—কিছুই ঠাওর কর[illegible] পারল না। বরং এই সান্নিধ্যে হঠা[illegible] কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করছিল পংকজ[illegible] কি ভেবে তাড়াতাড়ি বললে, 'গোলা[illegible] গাছে ফুলটা আজ ফুটে গেছে, না?'

—কুঁড়িটা খুলে গেছে—আজ রাত্রের মধ্যেই ফুটে যাবে।

—গ্র্যান্ড্। কাল খ্রীসমাস ডে। ওই গোলাপটা আমি তোমায় দিলাম। খ্রীসমাস প্রেজেণ্টেশান। কথা শেষ করেই পংকজ ছেলেমানুষীর সেই সরল খুশীতে প্রাণ খোলা হাসি হাসল।

ক'টি মুহূর্ত নীরবে দাঁড়িয়ে থেকে বেলা সরে গেল।

সে রাত্রে গোলাপের কুঁড়িটাই কি শুধু ফুটে উঠল! হয়ত বাইরে শীতের হিমে আর অন্ধকারে কুঁড়িটা ফুটেছে—আর ঘরের মধ্যে একটি মানুষের মনে ফুটেছে, আরও একটি কুঁড়ি। অন্য জন, ফুলটি তোলার অধিকার যে পেয়েছে তারই মন কেবল কাঁটা বেঁধার ভয়ে ছটফট করেছে সারা রাত।

পরের দিন সকালে চায়ের টেবিলেও বেলাকে দেখতে পাওয়া গেল। পংকজ ভেবেছিল, ছুটি নিয়েছে আজ—হয়ত সকাল থেকেই থাকবে না। তারপর মনে হয়েছিল, টাকাটাও ত নেয়নি বেলা।

—কি, গেলে না! চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকিয়ে বললে পংকজ, 'তোমার টাকা টেবিলের ওপরই চাপা দিয়ে রেখে এসেছি।'

সে কথার কোন জবাব না দিয়ে বেলা রুটিতে মাখন মাখিয়ে দিতে লাগল। অভ্যাস মত পংকজ একটা টেকনিক্যাল ম্যাগাজিনের ছবি দেখছে। জানালার শার্সি গুটনো, ঝকমকে মিষ্টি রোদ এসে গায়ে পড়েছে। পায়ের কাছে গুটিয়ে রয়েছে বেড়ালটা।

চা শেষ করে পংকজ উঠল। অফিসের দিকে যাবে এবার। একটু গল্প গুজব। দু একটা চিঠি সই।

রোজকার মতন বেলা কোট আর সিগারেটের টিন দিয়ে গেল।

পংকজ চলে যেতে বেলা খানিকটা সময় চুপচাপ বসে থাকল খাবার টেবিলের সামনে। চেয়ারেই। আজ সকাল থেকে সে ছুটি নিয়েছিল। সারা দিনটাই তার না-থাকার কথা। তবু থেকে গেল। কেন?

লাফ দিয়ে বেড়ালটা টেবিলে উঠেছে। কাপটা পিরিচের গায়ে ঠক্ করে পড়ল। চমকে উঠল বেলা। বেড়ালটার কান ধরে ছুঁড়ে দিল ঘরের এক পাশে। বজ্জাত কোথাকার!

বিরক্ত হওয়ার এমন কি কারণ থাকতে পারে। কেউ ওকে জোর করে আটকে রাখে নি। তুমি ইচ্ছে করলেই এই মুহূর্তে যেতে পার। টেবিলে তোমার মাইনের জমানো টাকা চাপা আছে।

বারান্দায় এসে দাঁড়াল বেলা। মাঠ ভরে শীতের রোদ ছড়িয়ে পড়েছে। শিশু গাছের ভিজে পাতা চিক চিক করছে। করবী ঝোপের তলায় একটা শালিক। ফুল গাছের মাথায় মাথায় প্রজাপতি উড়ে উড়ে বসছে। কী সুন্দর দিন। খ্রীসমাস ডে।

বেলা ফিরে চাইল। টবের গোলাপ কুঁড়িটা সত্যিই ফুটে গেছে। টকটকে লাল। এক মুঠো সিঁদুর যেন মুঠোয় ধরে কেউ হাসছে। নাও, নাও, টেক্ ইট্।

ফুল নয় যেন সাপ। অন্তত সেই রকম ভীত ভঙ্গিতে বেলা তর তর করে মাঠে নেমে পড়ল।

গাছের ছায়ায়, রোদে, চোরা-কাঁটার পথ ভেঙে ভেঙে সেই ভেঙে-পড়া খাপরা ছাওয়া বাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল বেলা। এটাই তাদের হোস্টেল ছিল। পুব দিকের ওই ঘরে, এখন যা ধ্বসে পড়েছে, ফাটাফুটো কাঠে খাপরায় আবর্জনার সামিল—ওইটে ছিল বেলা মনডিয়ালের ঘর। আর থাকত লিলিমণি, আইভি। শীতের দিনে লিলিমণি সাত সকালে জানালা খুলে দিত। আইভি চীৎকার করত রাগে। গালাগাল দিত। বেলা অত সকালেই বই নিয়ে বসত। আর দেখতে দেখতে রোদ—এর চেয়েও বুঝি স্বচ্ছ সুন্দর রোদ এসে ওদের তিনজনকে ভিজিয়ে দিত। প্রেয়ারের ঘণ্টা বেজে গেলেও এই রোদ ছেড়ে উঠতে ইচ্ছে করত না কারও।

তারপর—?

তারপর—বেলা আনমনেই হেঁটে হেঁটে—পেয়ারা-তলায় গিয়ে দাঁড়ায়। এককালে এখানে ছিল মেহেদির ঘন বেড়া। টিফিনের ঘণ্টা বাজলে বেলা মনডিয়াল রোজ কেন আসত এখানে! এখানে নয়, বেড়ার ও-পাশটায়। আর পেয়ারা তলায় কে দাঁড়িয়ে থাকত! সবচেয়ে সবুজ সুস্বাদ পেয়ারাটা কেমন করে তার আঁচলে এসে পড়ত। তার সংগে একটি দুটি চুড়ি কি চকলেট, কাঁচপোকার টিপ। অন্য স্কুলের পরীক্ষার কোশ্চেন পেপার।

স্কুল ভাঙল—সেই কালো ডানপিটে ছেলেটাও উধাও। সুরেন দাশ : ছেলেদের তিন মাইল রোড-রেসে যে ফার্স্ট হত। বড়দিনের ছুটিতে এই স্কুলময় যখন বাতি, ফ্ল্যাগ, সামিয়ানা ঘিরে এক্সিবিশান বসত—স্কুল ভলেণ্টিয়ারের সেই ছিল লিডার। একবার এক্সিবিশানের সময়—রাত্রে শীতে সুরেন তার গায়ের কোটটা খুলে বেলার হাতে দিয়ে দিয়েছিল। সেই কোট নিয়ে বেলার কি লজ্জা, কি ভয়! লিলিমণি জানতে পেরে বলেছিল, বোকা, অত ভয় করলে ভালবাসা যায় না।

ভালবাসা! হ্যাঁ, তাই। পনেরো কি ষোল বছরের বেলা মনডিয়াল ভালবেসে ছিল সতেরো বছরের সুরেন দাসকে। সে ভালবাসা এই শিশু, বট, পলাশ, অশ্বত্থের স্নিগ্ধ ছায়ায়, মায়ায়, আড়ালে আড়ালেই। ক'বারই বা চোখে দেখেছিল তারা পরস্পরকে! দেখবে—একদিন তো দেখবেই চোখ ভরে, দিন ভরে—। বুঝি তারই অপেক্ষায় না-দেখা ভালবাসা চুপি চুপি একটা ছবি তৈরি করছিল।

ছবিটা হঠাৎ ভেঙে চুরে তছনছ হয়ে গেল। স্কুল উঠে গেল শহরের কোন এঁদো গলিতে। হোস্টেল বন্ধ হল। সাগরপারের মিলিটারি বুটে বেয়নেটে এ জায়গাটা গমগম করছে তখন। ছিটকে পড়ল সুরেন দাস কোথায়—কে জানে!

একটা কাঠবেড়ালি পায়ের ওপর লাফিয়ে পড়তেই বেলা চমকে, অর্ধস্ফুট শব্দ করল। ইস্—সে যে কাঁদছে। তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নেয় বেলা। অনেক বেলা হয়ে গেছে। মিঃ বোস এতক্ষণে বুঝি ঘরে ফিরে এসেছেন।

তাড়াতাড়ি ঘাস মাঠ ঝোপ ডিঙিয়ে বেলা ফিরতে থাকে।

দুপুরে সত্যি সত্যিই টাকা নিয়ে বেলা বেরিয়ে পড়ল। যাবার সময় বলে গেল, আজ ও ফিরবে না।

অথচ ফিরল। রাত তখন বুঝি এগারোটা। পঙ্কজ ঘুমিয়ে পড়েছে। দরজায় শব্দ শুনে ছিটকিনি খুলে দিল। দেখে বেলা। চোখ দুটো লালচে, মুখটা একটু ফোলা।

—কি ব্যাপার, এত রাত্রে!

—টাউন থেকে রোড্-বাস পেয়ে গেলাম। বেলা অতি মৃদু সুরে বললে, ঠোঁট প্রায় ফাঁক না করেই।

সেণ্টের উগ্র গন্ধ ভাসছিল। যেন পুরো একটা শিশিই উপুড় করে দিয়েছে বেলা গায়ের জামায়, চুলে।

পঙ্কজ বোস নেভিতে ছ'টা বছর কাটিয়েছে। অনুমানে সে বিচক্ষণ। ক্যালকুলেটিভ। বেলার দিকে তাকিয়ে হেসে বললে, 'ও, তাই নাকি! গুড্। শীতে বাইরে বড় কষ্ট। কাম ইন্।'

দরজা ছেড়ে পঙ্কজ সরে যেতেই বেলা ঘরে ঢুকে প্রথমে কাঠের দরজা তারপর কাঁচের শার্সি বন্ধ করে দিল।

নিজের ঘরে যেতে যেতে পর্দা সরিয়ে পঙ্কজ হেসেই বললে, 'দরকার হলে ডেকো। আই ওন্ট মাইণ্ড।'

বেলার ইচ্ছে হল চীৎকার করে বলে, হোয়াই—সে মি হোয়াই আই উড্! পঙ্কজ ততক্ষণে পর্দার ভেতরে চলে গেছে। পর্দাটা নড়ছে সামান্য।

বিছানায় এসে বেলা লুটিয়ে পড়ল। ওর সমস্ত দেহটা থর থর করছে। অসহ্য বিরাগে। আত্মক্ষোভেও হতে পারে। অথবা অনুশোচনাতেও যদি হয়—আশ্চর্য হবার কিছু নেই।

পরের সকালে চায়ের টেবিলে এসেও যেন এল-না বেলা। পঙ্কজও যেন দেখেও দেখলে না।

বেলায় যখন ফিরল পঙ্কজ—বেলা তখন বাথরুমে স্নান করছে অনেক সাবান মেখে। জানালার পর্দার ওপরের সামান্য ফাঁক দিয়ে রোদ ঢুকেছে। মুখ ভর্তি সাবানের ফেনা বেলার। ঠোঁট ফুলিয়ে গানের একটা কলির সুর তুলতে গিয়ে কটা বুদ্বুদ্ উঠেছিল। হাওয়ায় ভেসে গেল। চোখের সামনে উড়ে উড়ে রোদে রামধনুর একটু বুঝি রঙ নিয়েই মিলিয়ে গেল। ঠিক এমন সময় পঙ্কজের জুতোর শব্দ। পঙ্কজ এসেছে—বেলার মুখের সামনে বুদ্বুদ উঠে উঠে মিলিয়ে যাচ্ছে। তাকিয়ে তাকিয়ে সেই বুদ্বুদ দেখতে দেখতে বেলা যেন হঠাৎ খেলায় মেতে উঠল। খেলা থামলে হাসি। আর শুধু হাসিই কি? না, হাসি-কান্না দুই-ই।

খাবার টেবিলে বসে পঙ্কজ দেখল—বেলা সাজে-সজ্জায় ধবধব করছে। প্রয়োজনের বেশি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একটু যেন চটুলও। তবু ইচ্ছে করেই সব যেন এড়িয়ে গেল পঙ্কজ।

বিকেলে চা খেতে বসলে বেলাই বললে উপযাচিকা হয়ে, 'কাল রাত্রে কষ্ট দিলাম মিছিমিছি।'

—ইয়েস—পঙ্কজ অফিসারী কায়দায় যেন কারুর নিবেদন শোনার জন্যে কান দিল।

—টাউন থেকে বাস পেয়ে গেলাম।

—শুনেছি। বলেছো তুমি আগেই।

—তবে? বেফাঁসভাবে বলে ফেলল বেলা।

—কি? পঙ্কজ চোখ তুলে তাকাল।

কি? সত্যিই ত, কি? কি বলার আছে বেলার। বেলা কথা খুঁজে পেল না।

অল্পক্ষণ নীরবতা। সিগারেট ধরালে পঙ্কজ। রিং করে করে ধোঁয়া ছাড়ল। তারপর হেসে বললে, 'আই নো—ইউ বিকেম বিট্ টিপসি। এনিওয়ে, খ্রীসমাস-ডে'তে একটু ড্রিংক করেছ বলে আমি মাইণ্ড করি নি। কিন্তু—' পঙ্কজ একটু থামল।

বেলা টেবিলের ওপরকার পট্, প্লেটগুলো দেখছে একদৃষ্টে। কান দুটো গরম। নিশ্বাসও। বুকটা ধক্ ধক্ করছে।

—কিন্তু গোলাপ ফুলটা তুমি নাও নি। পঙ্কজ জানালা দিয়ে বাইরের গোধূলির দিকে চোখ ফেরাল।

এর পর আর কি কোন কথা বলা যায়! যায় না। বেলার গলার কাছে শিরাগুলো নীল হয়ে ফুটে ওঠে। জ্বালা করতে থাকে চোখ দুটো—দাঁত দিয়ে প্রাণপণে ঠোঁটটা ধরে। এত জোরে যে, জিবে রক্তের নোনা স্বাদ লাগতে বেলা দাঁত আলগা করে।

রাত্রে পঙ্কজের শোয়ার ঘরে চেয়ারে বসে মুখোমুখি সব কথা বলতে হল। না বলে পারল-না বেলা। সেই স্কুল আর সুরেন দাসের কথা শেষ করেই তার কথা ফুরল না। আরও থাকল। আরও বললে। বাকি কথা যত আছে ঃ

"তারপর আমার বিয়ে হয়েছে। গ্রামে। এখান থেকে তিন মাইল দূরে। স্বামী কোলিয়ারীতে চাকরি করত। ফিটার। বদ্ধ মাতাল। তখন এখানে এই স্কুলবাড়ি মাঠ সোলজারে ভরে উঠেছে। স্বামী কোলিয়ারীর চাকরি ছেড়ে এখানে এল। ইলেকট্রিক সুপার-ভাইজার। এল ত, আর বাড়ি যায় না। আমরা পথ চেয়ে থাকি। রবিন—আমার স্বামীর নাম, ও নাম করতেও আমার ঘেন্না হয়—একদিন আসে, সাতদিন আসে না। ততদিনে একটা ছেলে হয়েছে আমার!"

বেলার হাত দুটো কোলের ওপর আলগা হয়ে পড়েছিল এতক্ষণ। এবার ডান হাতের পাঁচটা আঙুল বাঁ-হাতের আঙুলে গলিয়ে অবরুদ্ধ কোন আবেগকে যেন তালুর মধ্যে ধরে রাখতে চায়। মাথাটা তেমনি নিচু।

'ছ মাসের বাচ্চা। চোখ ফুটেছে, মুখে শব্দ ধরেছে। গা-ময় উঠল বিষ-ফোড়া। ছেলেটা কাঁদে আর কাঁদে। শেষ পর্যন্ত যন্ত্রণায় কান্নাও বুঝি কমে এল। যাব টাউনে, ডাক্তারের কাছে, রবিন আর আসে না। টাকা নেই, সঙ্গী নেই। মরিয়া হয়ে বেরিয়ে পড়লাম ছেলেটাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে, ঢেকে-ঢুকে। এলাম এখানে। এলাকার মধ্যে ঢোকবার উপায় নেই। দূরে তেঁতুলগাছতলায় একটা চা-পানের দোকানে বসে থাকলাম। রবিন কি একবারও বাইরে আসবে না। সারাদিন কেটে গেল মিলিটারী ট্রাকের ধুলো খেয়ে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। এ-জন,

ও-জনকে শুধোই। একজন বললে আর খানিক পরে বিকেলের ছুটি হলে রবিন বাইরে বেরুবে। ঘণ্টাখানেক কেটে গেল। বিকেল শেষ। অন্ধকার হয়ে আসবে এখুনি। কিন্তু কোথায় রবিন। ছেলেটাও যেন বুকের মধ্যে মরে গেছে। একটু কান্না নেই, বুকের দুধ টানে না। ভয় করছিল। আর দেরি করা চলে না। হতাশায়, ক্ষোভে, ঘৃণায় রবিনকে আমি ধিক্কার দিয়েছি।'

বেলা খানিক চুপ করে থাকল। পঙ্কজ বোকার মতন বসে। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। এ বেলা যেন আর কোন-এক বেলা। তার বসায়, কথা বলায় অন্য কোন সুর, অন্য কোন ভঙ্গি।

'বাড়িই ফিরছিলাম। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে। শুনেছিলাম এ পাশের ফাঁকা জায়গাগুলো আজকাল আর ভাল নেই। ভয় ছিল। আল ভেঙে আড়ালে আড়ালে চলেছি। অন্ধকার হয়ে এসেছে। কিছু পথ এগিয়েই ওদের দেখতে পাচ্ছিলাম—: হোইট সোলজারস। আর আমার মতনই সব কালো নেটিভ মেয়ে। আশেপাশে থাকে। এদের জন্যেই মাঠে মাঠে শিষ, দৌড়োদৌড়ি, চীৎকার, হাসা-হাসি।...ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। পা আমার জোর হয়ে উঠেছিল। ক্রমেই সরে সরে দূরে চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু ওরা আমায় যেতে দিল না। দুটো সোলজার কেমন করে যেন দেখতে পেয়ে দু'পাশ থেকে দৌড়তে দৌড়তে এসে ধরে ফেলল। একজন হাত ধরল, আর একজন কোমর। আমি চীৎকার করেছি, কেঁদেছি, মিনতি করেছি, বুকের ছেলেকে দেখিয়েছি। বিদেশী পশু দুটো আমার মুখে থুতু ছিটিয়ে হেসেছে হো হো করে। ছেলেটাকে বুক থেকে টান মেরে ফেলে দিতে যাচ্ছিল আর একটু হলেই। জানতাম—পারবো না, আত্মরক্ষা করতে পারবো না। ছেলেটা রক্ষা পাক। রাজী হয়েছি আমি। বলেছি, চলো।...... ছেলেটাকে চাপাচুপি দিয়ে আলের পাশে শুইয়ে রাখলাম। যীশু ওকে দেখবেন। ......ব্রুট্......দুটো ব্রুট আমায় টেনে-হেঁচড়ে কোথায় যে নিয়ে গেল। শয়তান দুটো আমায় জ্ঞান পর্যন্ত রাখতে দেয় নি। যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম—তখন অনেক রাত। মাঠটা অন্ধকার। থমথম করছে। শিয়াল ডাকছে চারপাশে। তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়েছি। মাঠে, আলে আলে, অন্ধকারে ছেলেটাকে কত খুঁজলাম। পরের দিন সূর্য ওঠার পরও। অনেক বেলায় একটা রক্তমাখা কাপড়ের টুকরোই পেয়েছিলাম শুধু। শিয়ালে মুখে করে নিয়ে গেছে।'

বেলার শরীরটা মুচড়ে মুচড়ে উঠছিল। তার আবেগ আর কান্নাকে আজ আর কারোর চোখের সামনে বড় করে প্রকাশ করার ইচ্ছে যেন নেই তার। কিংবা হয়ত ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই। তবু বেলার মুখ ক্রমশই বুকের তলায় নেমে এসেছে। দুটো হাত তালুতে তালুতে, আঙুলে আঙুলে পিশ্ট হচ্ছে। কেঁপে কেঁপে উঠছিল ও। কান্না রোধের একটি দুটি অস্পষ্ট ফোঁপানি।

পঙ্কজের পক্ষেও এই দৃশ্য অসহ হয়ে উঠছিল। তবু কথা বলার মতন শব্দ কী ভাষা কোনটাই খুঁজে পাচ্ছিল না।

শেষ পর্যন্ত জোর করে উঠে দাঁড়াল পঙ্কজ। একবার ওপাশে ঘরের পর্দা পর্যন্ত গেল। আবার ফিরে এল। বেলার পাশে। একটা হাত বেলার কাঁধে রাখলে আলতো করে। অপেক্ষা করল একটু। বললে, 'সরি।'

বেলা আগের মতনই বসে থাকল। কথাটা ওর কানে গেছে। কিন্তু নিজের কথা এখনও শেষ হয় নি।

'এর পর--?' বেলা ভাঙা গলায় বললে।

—থাক, আর শুনতে ইচ্ছে করছে না। পঙ্কজ বাধা দিল, 'তোমার ঘরে যাও।'

—বলতে ইচ্ছে করছে আমার, বেলা যেন পঙ্কজকে অগ্রাহ্য করেই শুরু করল তার শেষ কথা, 'এরপর রবিনদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক আমার ছিল না। তারা রাখতে চায়নি। আমিও জোর করিনি। জায়গা পেয়েছি মাথা রাখবার সঙ্গে সঙ্গেই। চুল কমিয়েছি ঘাড় পর্যন্ত। পোশাক বদলেছি। শিষ দিতে শিখেছি। সিগারেট আর ওয়াইন খেয়েছি। তিন তিনটে বছর ওই মাঠের আলে, ক্ষেতে, টাউনের সিনেমায় বেলা মনডিয়াল টমি, জন, লেসিলের সঙ্গী ছিল। একটি দিন শুধু ছুটি নিতাম। খ্রীস্‌মাসডের দিন। ছেলেটাকে শেয়ালে টেনে নিয়েছিল যে মাঠ থেকে—সেখানে সারাদিন সারা রাত একা একা ঘুরে বেড়াতাম। সমস্ত মাঠটাই ছিল আমার ছেলের কবর—আমাদের কবর। সে কবর বোধ হয় আরও বড়। এই স্কুল, তিন মাইল দূরে আমাদের গ্রাম সবটাই ছাড়িয়ে সে কবর বোধ হয় পড়ে আছে।'

বেলা চুপ করল। মাথা উঁচু করে তাকাল। একটা অদ্ভুত রকমের হাসি তার ঠোঁটে। যেন এত সহ্যের পর সে জীবনকে অনায়াসে আজ নিতে শিখেছে, সব কিছুকে অবজ্ঞা করে, তাচ্ছিল্য করে। অবিশ্বাস করে। জীবন আজ বেলা মনডিয়ালের কাছে পরম লঘু।

বেলা উঠে পড়েছিল। পঙ্কজ বললে, যেন ওকে সান্ত্বনা দিতেই 'যুদ্ধে তোমার অনেক গেছে। আমরাও মাশুল দিয়েছি, তবে—' নিজের কাটা বাঁ-হাতটা চোখের ইঙ্গিতে দেখাল পঙ্কজ।

বেলা ঠোঁট উল্টে ফুঁ দিয়ে যেন নিজেকেই অস্বীকার করতে চাইল। বললে, 'আমি ও সব মনে রাখতে চাই না। দু পাঁচ দিনের সুখ, দুঃখ এসেছে গেছে।' কথাটা বলতে গিয়ে বেলার সকাল বেলার স্নান ঘরের দৃশ্যটা মনে পড়ল হঠাৎ, সেই সাবান-ফেনার বুদবুদের মিলিয়ে যাওয়া দৃশ্য। বেলা যেন চোখ বুজে একবার তাই দেখল। তারপর তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বললে, 'আমি ও সব কথা ভুলে যেতে চাই, উড়িয়ে দিতে চাই মন থেকে।'

পঙ্কজ বোস বেলা মনডিয়ালকে ক' বছর পরে আরও দুবার দেখেছে। প্রথম দিনের দেখা বেলা মনডিয়ালের মতনই তখন তার বেশ বাস। তার চেয়েও জঘন্য বুঝি। রেস কোর্সের বাইরের মাঠে মেয়েটা লোক জমিয়ে ফেলেছিল। তার হাতে ভাঙা কলাই করা মগ আর ঠোঁটে একটা ফাঁপা কাঠি। বুদবুদ ওড়াচ্ছে, পাঁচ ভাষা মিশিয়ে বলছে—দে আর নাইস্। একটা পয়সা দাও, একটা জলের ফানুষ ধরে দেব।

আর একদিন দেখেছিল পঙ্কজ। সারকুলার রোডের কবরের সামনে। ছেঁড়া টুপি, গলায় বাঁধা কাল রুমাল। হাতে সেই কলাই করা মগ আর ঠোঁটে ফাঁপা কাঠি। বেলা মনডিয়াল একটা কুকুর পাশে নিয়ে বসে বুদবুদ ওড়াচ্ছে কবরের দেওয়ালের বাইরে।

পঙ্কজ তাকে ডাকে নি।

শান্তিনিকেতনে এক রাত

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

অচেতন সারা মন। রাত বাড়ে শান্তিনিকেতনে।
ঝিঁঝির কান্নার সুর পাতার নির্জনে।
আমের সবুজ শাখা, ছাতিমের প্রবীণ হৃদয়ে
শীতের তুহিন নামে শিশিরের জল হয়ে হয়ে।
রাত বাড়ে। ঘুম কাড়ে পরিচয়-বিহীন মাটির
নরম-নরম ঘ্রাণ। সবুজ আকাশ ভরে তারকার ভিড়
দেখি দুই চোখ মেলে, অনুভবে বুঝি কোন্ দূরে
চেতনার ভূমি হতে ভেসে আসে বাতাসের সুর—
যে-বাতাস কবি আর শিল্পীর নৌকায়
ডেকে নিয়ে গিয়ে দূর-দূরান্তের ওপারে হারায়।

শীতের জ্যোৎস্নার আলো কুয়াশার ধূসর হৃদয়ে
বিবর্ণ। হাতের পরে মাথা রাখি ধীরে ধীরে। ভয়ে
কাঁদে রাত-জাগা পাখি। খুলে দিই ঘরের জানলা:
আসুক শীতের হাওয়া জ্যোৎস্নায় বিবর্ণ উতলা।—
রাতভর আম-জাম-ঝাউয়ের বনের মৃদু ঘ্রাণে
জেগে থেকে তারপর কালকের ভোরের আহ্বানে
ফিরে যাবো কলকাতায় জনতার কল-কাকলিতে।

শালবন, লালমাটি, কোপবতী স্মরণের ফিতে
দিয়ে বেঁধে দেবে মন। এরকম আরেক নিশীথে
হয়ত আবার আসা যেতে পারে অলখ সরণি
বেয়ে এই বোলপুর। আমার এ সঞ্চয়ের মণি
রাখবো লুকিয়ে মনে চিরকাল অম্লান জ্যোতিতে।

উড়ন্ত পিরিচ

অরুণ সরকার

তারা আসে;—
অনেক দূরের নীলাকাশে
যেথা এই পৃথিবীর শেষ
তারো দূরে আছে কোন' দেশ
আছে প্রাণী
হয়ত নগর আছে, আছে রাজা, আছে রাজধানী,
প্রেমিক প্রেমিকা আছে,
সেখানেও গাছে গাছে
নিত্য যে কুসুম ফোটে নয়নাভিরাম
হয়ত গোলাপ তারো নাম।

কে জানে? জানে না কেউ। যারা জানে তারা আগন্তুক
তাদের চিনি না মোরা, দেখি নাই তাহাদের মুখ,
তবু ভাবি
অমঙ্গল অবশ্যম্ভাবী,
মোদের আকাশে
ঐ যারা আসে
যাদের অম্বর সাজ আলেয়ার মতন অদ্ভুত
তারা অশুভের দূত।

তিমিরান্তক

দুর্গাদাস সরকার

ফাটা দেওয়ালের ফাঁকে চুপি চুপি ঘরের ভিতরে
একা চাঁদ আলো নিয়ে এসেছিল নাকি ক্ষণতরে!

হারিয়ে সমস্ত আশা ক্লান্ত আমি ছিলাম ঘুমিয়ে,
তাই, চাঁদ ফিরে গেছে; আমাকে সে তোলেনি জাগিয়ে।

হতে পারি রিক্ত আমি : হতে পারে পরিশ্রান্ত মন—
'এখানে আসবে চাঁদ', ভাবতাম তা যদি তখন॥

লালন শাহ

মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন

লালন শাহ বাংলার জনমনের এক অপূর্ব রসঘন মূর্তির পরিচয় দিয়েছেন। সিন্ধু দেশের শাহ্ লতিফ পাঞ্জাবের বুল্লেহ্ শাহ্ এবং পূর্ব বাংলার লালন শাহ্ তিনজনই সুফী সাধক ও মরমীয়া লোক-কবি ছিলেন। পাঞ্জাবের লোক-কবিদের এবং সিন্ধুর লোক-কবিদের সম্পর্কে কিছু কিছু কাজ হয়েছে, কিন্তু বাংলার লোক-কবিদের সম্পর্কে আদৌ কোন গবেষণা হয়নি। লালনের জীবনী সম্পর্কে এই জন্য নানা মুনির নানা মত প্রচলিত হয়ে রয়েছে।

নানাদিক হতে বিচার করে দেখা যায়, ১১৮২ বঙ্গাব্দে (ইংরেজী ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে) কুষ্ঠিয়া জেলার অন্তর্গত কুমারখালী থানার ভাঁড়ারা নামক গ্রামে এক হিন্দু কায়স্থ পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পর তাঁর নাম রাখা হয় লালনচন্দ্র রায়। কথিত আছে তিনি বিবাহের পর মাতৃসঙ্গে নবদ্বীপে গঙ্গাস্নান করতে যান। এই সময় নিদারুণ বসন্ত রোগে তাঁর জীবন সংকটাপন্ন হয়ে পড়ে এবং তাঁর জীবনের আশা আত্মীয়েরা ত্যাগ করেন। নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ পন্ডিতেরা তাঁকে অন্তর্জলি করতে উপদেশ দেন, তাঁর মাতাকে। সেই অনুসারে তাঁকে অজ্ঞান অবস্থায় গঙ্গাজলি করে রাখা হয়। ইতিমধ্যে তাঁর জ্ঞান ফিরে আসে এবং জল খেতে চান। দৈবক্রমে তথায় একজন মুসলিম মহিলা নদী থেকে জল নিতে আসে। লালনের কাতরোক্তি শুনে সে তার মুখে জল দেয় এবং তার স্বামীর সহযোগিতায় তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে যায়। খোদার ফজলে লালনের জীবন রক্ষা পায়, কিন্তু তাঁর চক্ষু দুটি চিরতরে নষ্ট হয়ে যায়। লালনের পালক পিতা একজন ধর্মভীরু মুসলমান ফকির ছিল। লালন অনেকদিন এই পরিবারে বাস করেন এবং এইখানেই তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দুধর্ম বিষয়ে পূর্বে উত্তমরূপে
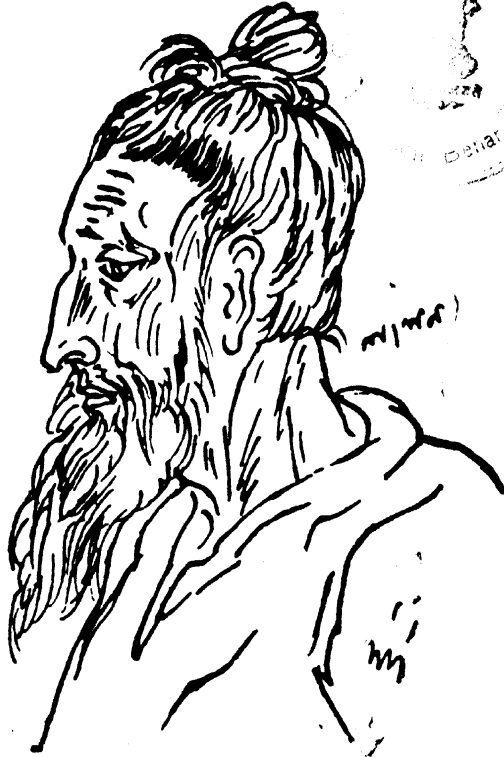
ফকির লালন শাহ্ ॥ স্কেচ শ্রীনন্দলাল বসু

জানতেন। এক্ষণে তিনি ইসলাম ধর্মের আচার পদ্ধতি শিখতে ও পালন করতে লাগলেন। যাহোক ধর্মভীরু মুসলমানের গভীর সংস্পর্শে আসার ফলে তিনি অনতিবিলম্বে সংসার বিবাগী হয়ে পড়লেন। নবদ্বীপ অবস্থানের পর তিনি স্বীয় মাতার দর্শন-লাভ অভিলাষী হন। সুতরাং তাঁর ধর্মপিতার অনুমতিক্রমে স্বীয় গ্রাম ভাঁড়ারায় প্রত্যাবর্তন করেন। যাবার সময় তার ধর্মপিতা তাঁকে বলেছেন: 'বাবা লালন! আমি তোমার পিতা, আমার কাছ থেকে তোমার দীক্ষা নেয়া সমীচীন নয়। তুমি উপযুক্ত গুরুর সন্ধান করে যথাযথরূপে দীক্ষিত হয়ো। অবশ্য আমার যা দেবার তা দিয়েছি, এবং তা সযত্নে রক্ষা করো।'

স্বীয় বাটীতে ফিরে তাঁর মাতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করেন যে, তিনি (স্ত্রী) তাঁর সঙ্গের সঙ্গিনী হবেন কিনা? তাঁর স্ত্রী মুসলমান ধর্মাবলম্বী লালনের সঙ্গে যেতে অসম্মত হওয়ায় তিনি পুনর্বার একাকী বের হয়ে পড়েন। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করা সত্ত্বেও তাঁর মাতা লালনকে বাটীতে রাখতে অনেক পীড়াপীড়ি করেন। কিন্তু সংসার বিরাগীকে কে সংসারে আবদ্ধ রাখতে পারে?

লালন শাহ্ দেশ বিদেশ ভ্রমণ করে হিন্দু, মুসলমান শাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর জ্ঞানলাভ করেন। তারপর তাঁর ধর্মপিতার আদেশবাক্য স্মরণ হওয়ায় সৎগুরুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। অনেক খোঁজা-খুঁজির পর নদীয়া জেলার কুষ্ঠিয়া মহকুমার হরিনারায়ণপুর গ্রামস্থ সিরাজ সাঁই নামক একজন পালকি বাহকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। তাঁর নিকট এক বৎসর অবস্থান করার

পর তিনি ফকিরী মতে শিক্ষা ও দীক্ষা গ্রহণ করেন। জনশ্রুতি এই যে, তিনি এই এক বৎসর স্বীয় গুরু সিরাজ সাঁইকে পালকি বহন করতে দেননি। তিনি তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে কর্ম করতেন। লালন শাহ্ স্বীয় বহু গানে সিরাজ সাঁই ভণিতা ব্যবহার করেছেন।

যাহোক তিনি সিরাজ সাঁইয়ের নিকট উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা গ্রহণ করে লালন শাহ্ ফকির নাম গ্রহণ করে কুষ্ঠিয়া শহরের সন্নিকটস্থ ছেঁওড়িয়া গ্রামের ভিতর যে গভীর বন ছিল, সেই বনের একটি আম্রবৃক্ষের নীচে বসে সাধনায় নিযুক্ত হন। সেই সাধনার সময় নির্জনে একাকী থাকতেন, আদৌ তিনি লোকালয়ে আসতেন না। 'আনমেল' নামক একপ্রকার কচু খেয়ে জীবনধারণ করতেন। পরে গ্রামের লোকেরা সংবাদ পেয়ে ফকিরের অনুমতিক্রমে একটি আস্তানা তৈরি করে দেয়।

কিছুকাল পরে এখানে তিনি একজন মুসলমান বিধবা বয়নকারিনীকে নেকাহ করেন এবং পানের বরোজ করে ব্যবসায় শুরু করেন। ফকিরকে প্রায় দেখা যেত না। শুনা যেত, তিনি নির্জন স্থানে বসে নিজ তত্ত্বে মগ্ন থাকতেন এবং গান রচনা করতেন।

লালন সুদীর্ঘ ১১৬ বৎসর জীবিত ছিলেন, জনশ্রুতি রয়েছে। তিনি ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর পিতার জমিদারীর পরিচালনার ভার নিয়ে স্থায়ীভাবে শিলাইদহে আসেন ১২৯৮ বঙ্গাব্দে (ইংরেজী ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে)। শিলাইদহ কুষ্ঠিয়া শহর হতে প্রায় আট মাইল দূরে গোরাই নদীর তীরে অবস্থিত।

শিলাইদহ হতে অনতিদূরে পদ্মার সুবিশাল চর অবস্থিত। শিলাইদহে অস্থায়ীভাবে রবীন্দ্রনাথ ১২৯৪ বঙ্গাব্দে (ইংরাজী ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে) একবার সপরিবারে বোটে বাস করেন। সম্ভবত এই সময়েই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে লালন ফকিরের সাক্ষাৎ ঘটে।

ঠাকুর স্টেটের কর্মচারী শচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে লালনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎকার সম্পর্কে একটি কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার বর্ণনা করেছেন। লালন রবীন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ মানসে ঠাকুর কাছারিতে আসেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে কোন আবেদন-নিবেদন তিনি না জানিয়ে নীরবেই চলে যান। ভুলক্রমে লালন তাঁর সাপমুখো হাতের লাঠিখানা ফেলে যান। এই লাঠির মালিকের অনুসন্ধান করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ লালনকে পান। এ সঙ্গে প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে, রবীন্দ্রনাথ লোকসঙ্গীতের প্রতি প্রকৃষ্টভাবে পূর্বেই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। লালনের সমসাময়িক গগন বাউলের গান রবীন্দ্রনাথ সংগ্রহ করেন এবং প্রবাসীতে প্রকাশ করেন।

রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতৃবধূ সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পত্নী বলেন যে, তাঁদের শিলাইদহ অবস্থান কালে লালন প্রায়ই তাঁদের বোটে আসতেন এবং প্রায়ই তাঁদের গান শোনাতেন। লালনের সুদীর্ঘ বাবরি ছিল।

'বঙ্গের কবিতা' নামক গ্রন্থের লেখক অনাথকৃষ্ণ দেব বলেন, 'লালন শাহের রচিত পদ শুনলেই বুঝা যায়, লালন যেমনই প্রতিভাশালী, তেমনই উচ্চশ্রেণীর সাধক।'

লালন বেশরা ফকির ছিলেন। এজন্য শরিয়তপন্থী আলেমদের সঙ্গে তাঁর বহু বার বাহাস (বিতর্ক) হয়েছে।

লালন শাহ্ প্রকৃতই একজন দরবেশ ছিলেন। তাঁর আত্মোপলব্ধির বাণী তাঁর বহু গানে বিবৃত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ লালনের প্রসিদ্ধ গানঃ 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কেমনে আসে যায়' ব্যবহার করেছেন তাঁর 'গোরা'য়।

লালনের একটি গভীর গানঃ—

'(আমার) বাড়ীর কাছে আরশি নগর
এক পড়শী বসত করে।
আমি একদিনও না দেখলাম তারে।
পড়শী যদি আমায় ছুঁতো,
আমার যম যাতনা সকল যেতো দূরে।
(আমার) সে আর লালন একখানে রয়
তবু লক্ষ যোজন ফাঁকরে।'

অন্য একটি গানে পাইঃ—

'আছে যার মনের মানুষ মনে সে কি
জপে মালা
অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা।
কাছে রয় ডাকে তারে উচ্চৈস্বরে কোন
পাগলা
ওরে যে যা বোঝে তাই সে বুঝে
থাকবে ভোলা।
যেথা যার ব্যথা নেহাৎ, সেইখানে হাত
ডলামলা
তবে তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে
তোলা।
যে জন দেখে সে রূপ করিয়ে চুপ রয়
নিরালায়।'

বেশরা মারফতি সাধনায় আল্লাতালাকে ফকিরেরা মনের মানুষ বলে গ্রহণ করে। লালন ফকির অসাধারণ প্রতিভাবান লোককবি। তাঁর রচিত পদসমূহ পাঠ করলে স্বতঃই হৃদয়ে আনন্দের সঞ্চার হয়। সহজ সরল ভাষার মধ্যে কি অপরূপভাবে এ সৌন্দর্য প্রকাশ পেয়েছে। তিনি জটিল ও নিগূঢ় অধ্যাত্ম সাধনা অতীব হৃদয়গ্রাহী ও প্রাঞ্জলভাবে সরল ভাষায় প্রকাশ করেছেন। এই লোক-কবির বাণী আজ আমাদের বড়ই প্রয়োজন।

বিজ্ঞান ও বিশ্বশান্তি

প্রিয়দারঞ্জন রায়

বিজ্ঞান নিজে শান্তি আনতে এবং রক্ষা করতে পারে কি না—এ অত্যন্ত বিচারমূলক প্রশ্ন। বর্তমান জগতের একজন বিখ্যাত চিন্তানায়ক মন্তব্য করেছেন, "মানব সমাজের ভাল অবস্থায়—শান্তি, সমৃদ্ধি এবং মুক্তির সমস্ত পথ; যুদ্ধ, যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং যুদ্ধের আতঙ্কে রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে।" এই বিবৃতির ওপর আর তর্ক করা চলে না। নিঃসন্দেহে বলা যায় বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের সহায়তা ব্যতীত ব্যাপকভাবে যুদ্ধ ও যুদ্ধের প্রস্তুতি করা অসম্ভব। প্রায় অর্ধশতাব্দী আগে মহামতি টলস্টয় লিখেছিলেন—"যদি সমাজের কাঠামো হয় খারাপ, সামান্য লোকের হাতে থাকে অসংখ্যকে পীড়ন করবার ক্ষমতা তাহলে প্রকৃতির ওপর মানুষের প্রত্যেক বিজয়ই ব্যবহৃত হবে সেই দমন ও পীড়ন ক্ষমতাকে আরো বৃদ্ধি করার জন্য।" আসলে হচ্ছেও ঠিক তাই। টলস্টয়ের যুগের মতো, বিজ্ঞানের বিভিন্ন অবদান-সমৃদ্ধি বর্তমান ভয়াবহ আণবিক বোমার যুগেও এই উপযুক্ততম কথা। বিজ্ঞানের ব্যবহার যা প্রতিটি মানুষের জীবনকে, সমাজকে বিভিন্ন দিকে, বিভিন্ন রূপে নিয়ন্ত্রিত করছে, সুন্দর করছে, তাই আবার মাত্র কয়েকজনের হাতে দিয়েছে সৃষ্টিনাশকারী প্রচণ্ড ক্ষমতা। মন্দের বীজ সর্বদাই নিহিত আছে শক্তির গহ্বরে, তাই যখন কোন একজন অথবা কয়েকজন মাত্র মানুষ হাতে পায় প্রলয়ঙ্কর ক্ষমতা তখন সে মেতে ওঠে এর ব্যবহারিক আনন্দের উত্তেজনায়। অবাক হবার কিছুই নেই—সমস্ত সভ্যতা তাই আজ আর্তনাদ করছে বিজ্ঞান দস্যুর আণবিক জঠরের প্রচণ্ড শক্তির হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য। অসম্বরণীয় শক্তি ঘটায় বিস্ফোরণ—চতুর্দিক করে ধ্বংস।

তাই আমাদের প্রশ্ন—বিজ্ঞান কি জগতে শান্তি আনতে পারে? পারে বিজ্ঞান মানবকে, মানব সভ্যতাকে নিজের ধ্বংস-লীলার হাত থেকে রক্ষা করতে? বিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নের এক ঢালাও উত্তর দেন। আমাদের বলা হয় বিজ্ঞান সত্যের পূজারী—সংস্কার, ভাবাবেগ ও দম্ভ থেকে সে মুক্ত; যুক্তিহীনতা ও অপরীক্ষিত মতামতকে বিজ্ঞান ঘৃণা করে। মানুষে মানুষে যে কৃত্রিম প্রতিবন্ধক আছে বিজ্ঞান তাকে মানে না—জাতি, ধর্ম, বর্ণনির্বিশেষে তার কাছে সবাই সমান। এককথায় বিজ্ঞানের চরিত্র আন্তর্জাতিক, সীমাকে অতিক্রম না করে বিজ্ঞান চরিত্রের এ একটি অপূর্ব সংজ্ঞা। বিজ্ঞান অনুসন্ধান করে পার্থিব ও বহির্জগতের জ্ঞান, বুঝিয়ে দেয় অনু-মানসূচক যুক্তির সূক্ষ্ম অনুভূতিতে। কিন্তু আমরা যখন আমাদের স্বজাতির প্রতি ব্যবহার করি তখন বিজ্ঞান সাহায্য করতে অসমর্থ হয়। বিজ্ঞানের নিয়মাবলী তো মানুষের জীবনে প্রয়োগ করা চলে না। আমাদের ভুললে চলবে না মানুষ উন্নততর মস্তিষ্কসম্পন্ন প্রাণী—প্রয়োজন তার মাত্র শারীরিক ও মানসিক। সে শারীরিক ও মানসিক উত্তেজনা পারস্পরিক ক্রিয়ার মিশ্রণ ব্যতীত কিছুই নয়। তার শারীরিক উত্তেজনা বিজ্ঞানের সাহায্যে তাকে আত্মতৃপ্ত হতে বাধ্য করে এবং মানসিক আকাঙ্ক্ষা সেই সময়ই তার উচ্চাশা, অহংকার, ক্ষমতা, সম্পদ, যশ, তার ভাবপ্রবণতা, সংস্কার, দৃঢ়প্রত্যয়, সব মিলিয়ে একটি জটিল সমাবেশের আবির্ভাব ঘটায়। আকাঙ্ক্ষাসমূহকে সন্তুষ্ট করার জন্য মানুষ ফলিত ও যন্ত্র-বিজ্ঞানের সহায়তা গ্রহণ করে নিজের কাজে জমা করতে চায় অতুলনীয় শক্তি ও সম্পদ। এর থেকেই আরম্ভ হয় মানুষে মানুষে অথবা সুসংহত গোষ্ঠী ও রাজ্যের প্রধানে প্রধানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। অবশেষে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতাই পরিণত হয় অশান্তি, দ্বন্দ্ব ও যুদ্ধে। বর্তমান জগতের অতুলনীয় সভ্যতার কাঠামোর প্রধান আশ্রয় বিজ্ঞান—এইভাবেই মানুষে মানুষে প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার স্থায়ী কারণে পরিণত হয়েছে। হ্যাঁ—আমরা আমাদের জীবন দিয়ে জানি, এই বিজ্ঞানই ঘটিয়েছে এক প্রলয়ংকর ধ্বংসলীলা—যার সর্বনাশের জগৎজোড়া দাবানলের প্রচণ্ড ঝাপটায় রক্তাক্ত, আহত মানবতা আতঙ্কে কাঁপছে। বিজ্ঞান জন্ম দিয়েছে দুইটি শিশুর—একসঙ্গে তারা সমাজের ভালো ও মন্দ উভয়ই করছে।

কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, বিজ্ঞান আমাদের জীবনের মান উন্নত করেছে, খাদ্য উৎপাদন বর্ধনে সহায়তা করেছে; রেলগাড়ি, জাহাজ ও এরোপ্লেন দিয়ে যানবাহনের ব্যবস্থা উন্নততর করেছে; সাগর পারের সঙ্গে সংযোগ ঘটিয়েছে টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও রেডিওর মাধ্যমে; রোগ জয়ের জন্য দিয়েছে অচিন্তনীয় অস্ত্র—সর্বভাবে, সর্বদিকে মানুষকে দিয়েছে তার জীবন ধারণের সমস্ত সুবিধা, এক কথায় বিজ্ঞান সমস্ত সমাজের স্বাভাবিক ও মানসিক ক্ষেত্রে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। কিন্তু তবু আমরা আতঙ্কে ভুলতে পারি না, যুদ্ধের সেই সব ভয়াবহ মরণাস্ত্রের কথা—আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, বিষাক্ত গ্যাস ও জীবাণু যুদ্ধের কথা, যা প্রতিনিয়তই সমস্ত মানব সমাজের অস্তিত্বকে ভীতি প্রদর্শন করছে।

তাই পৃথিবীর শান্তি রক্ষায় বিজ্ঞানের দান চিন্তা করাও অনেকে অযৌক্তিক মনে করেন। মনের বিজ্ঞানসম্মত গতি এবং ধ্বংসের প্রতি ঘৃণাই বর্তমান সমাজের সমস্ত অনিষ্টের সর্বরোগহর ঔষধ। ভাবালুতা ও সংস্কার পরিত্যাগ করে সত্য ও মুক্তির প্রতি শ্রদ্ধাই বিজ্ঞান-সম্মত মনোভাবের একমাত্র পরিচয়। কিন্তু আবার সেই প্রশ্ন—বিজ্ঞানের শিক্ষা, জনপ্রিয়তা ও ব্যবহার নিজেই কি মানুষের মনের এই পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম? পারে কি বিজ্ঞানের শিক্ষা ও প্রচার—যশ, সম্পদ ও শক্তির মোহ ঘুচিয়ে দিয়ে মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরিহার করতে? বিজ্ঞানের কি ক্ষমতা আছে একজন কৃপণকে দাতা, নির্দয়কে দয়ালু, উচ্চাকাঙ্ক্ষীকে বিনয়ী এবং লোভীকে সমাজের একজন

আত্মত্যাগী মানুষে পরিণত করবার? আমি জানি না, কোনদিন কোন বিজ্ঞানী এইরূপ দাবী করতে পারবেন কি না? যদি কেউ করেন, তাহলে বুঝতে হবে, তাঁরা এখনও ঠিক ধর্মের মতো বিজ্ঞানের গোঁড়ামি ও দম্ভ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি।

যাই হোক, এখানে বিজ্ঞান ও ফলিত বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানী, যন্ত্র-বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান কর্মীদের ভাগ করা দরকার। বিজ্ঞানের ছাত্র অথবা কর্মীদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন, এমনকি, শতকরা একভাগেরও কমকে বিজ্ঞানী শব্দের সঠিক অর্থে বিজ্ঞানী বলা যায়। আর সকলে বিজ্ঞান-কর্মী, যাঁরা নিজের জীবন ধারণের জন্য বিজ্ঞানের কোন একটা বিশেষ বিভাগে শিক্ষালাভ করেছেন। বিজ্ঞানের বিশেষ একটি বিভাগে নিবিষ্ট হওয়ার জন্য অন্য সাধারণ মানুষের মতোই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত অত্যন্ত সংকীর্ণ হয়ে গেছে। দৃঢ়ভাবে কি বলা যায়, বিজ্ঞান কর্মীরা মনুষ্য সমাজের একটি ক্ষমতাসম্পন্ন ভাল অংশ—তাঁরা সত্যবাদী, মার্জিত, শিক্ষিত, দয়ালু, সহানুভূতিশীল এবং অন্য যে কোন অংশের চেয়ে অনেক বেশি শান্তি-কামী? এর জবাব কেবল বিজ্ঞান কর্মীরাই দিতে পারেন। অন্য দিকে বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিজ্ঞানীরাও সাধারণ লোকের ন্যায় দুর্বলতা, অবাস্তব সংস্কার ও ভুল থেকে মুক্ত নন। দম্ভ, গর্ব, উচ্চাশা, ক্ষমতার মোহ, অর্থ, যশ, দেশ-প্রেমের ভাবাবেগ, দ্বেষ, ঈর্ষা, ঘৃণা, সত্যের প্রতি অনাস্থা—মানব সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর লোকের ন্যায় বিজ্ঞান সেবকদের মধ্যেও সাধারণ. টাকা দিয়ে অথবা উচ্চাসনের সম্মান দিয়ে বিজ্ঞানীদের ভাড়া করা যায় এবং তাঁরা তাঁদের দেশের শাসকদের আদেশে নিজের দেশরক্ষার ছদ্মনামের আড়ালে নির্বিবাদে পৈশাচিক ক্ষমতাসম্পন্ন অস্ত্র ও যুদ্ধের বস্তুসমূহ নির্মাণ করে যান। আজকাল বহু পাপ ঢাকবার জন্য 'আত্মরক্ষা' কথাটি ব্যবহার করা হচ্ছে। প্রত্যেক দেশই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এবং ঘোষণা করছে, এ তাদের আত্মরক্ষার প্রস্তুতি। একে আক্রমণাত্মক কৌশল ছাড়া আর কোন আখ্যাই দেওয়া চলে না। সত্যি কথা বলতে কি, একটি নতুন ধরনের বিজ্ঞান সর্বদেশে জন্ম নিয়েছে, যার নাম আত্মরক্ষা বিজ্ঞান এবং এই বিজ্ঞানে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বিজ্ঞান কর্মী ও যান্ত্রিকদের সংগ্রহ করা হচ্ছে। স্বদেশানুরাগজনিত দেশভক্তির আবেগময় ভাবে প্রত্যেক দেশেই স্থল, জল ও বিমান বাহিনীতে বিজ্ঞানী ও যান্ত্রিকেরা সমাজের অন্য যে কোন শ্রেণীর লোকের চেয়ে বেশি যোগ দিচ্ছেন এবং পৃষ্ঠ-পোষকতা করছেন। অস্বীকার করা যায় না, বিজ্ঞানীরাই পৃথিবীব্যাপী যুদ্ধে যে কোন দলের চেয়ে অন্য দেশের বিজ্ঞানীদের জীবন ও সম্পদ ধ্বংস করার জন্য দেখিয়েছেন ব্যস্ততা—করেছেন সব-চেয়ে বেশি চেষ্টা। আমরা আবার এমন কয়েকজন বিজ্ঞানীদের কথাও জানি, যাঁরা যুদ্ধে সহায়তা করতে অস্বীকার করে কারাগারে শাস্তি ভোগ করেছিলেন।

সুতরাং বিজ্ঞানী ও যান্ত্রিকেরা যে সমাজের অন্য যে-কোন শ্রেণীর চেয়ে মানবোচিত প্রবৃত্তিসম্পন্ন, একথা ধরে নেওয়ার পক্ষে কোনই যুক্তি নেই। কিন্তু তাদের একটা মস্ত সুবিধা আছে, তারাই যুদ্ধকে সরিয়ে দিয়ে শান্তি আনতে পারে, যদি তারা একযোগে যে কোন যুদ্ধ-প্রচেষ্টাকে, তা আক্রমণ বা আত্মরক্ষা যে কাজেই হোক না কেন, সহযোগিতা করতে অস্বীকার করে। বিজ্ঞানী ও যান্ত্রিকদের এতখানি মানসিক উন্নতি ঘটা কি সম্ভব? বিজ্ঞানের জ্ঞান আহরণ করা ছেড়ে তাঁদের এই জন্য অন্য বিষয়েও নিজেদের শিক্ষিত করতে হবে। কারণ কেবলমাত্র বহির্জগতের শিক্ষা ও বিজ্ঞানের অবাস্তব চিন্তা মহৎ ভাবের আবির্ভাব ঘটাতে পারে না—পারে না জন্ম দিতে মনের মানবীয় গুণাবলীর সুন্দর, মহৎ যশ লাভ করতে, লক্ষ্যের প্রতি উদার ভাব আনতে, নিজের অভিপ্রায়ে কৃতসংকল্প হতে, বিবেকের

অদম্য শক্তিতে মানবতার জ্বলন্ত ভাল-বাসায় উদ্ভাসিত হতে—বিজ্ঞান কোন উপায়েই মানুষকে সামান্য সাহায্য করতে পারে না।

মানুষের উন্নতি ও তার সমাজ সংস্কারের জন্য দুইটি উপায় সমর্থিত হয়েছে, একটি যথাক্রমে বহিঃস্থ ও অপরটি অভ্যন্তরিক। বহিঃস্থ পদ্ধতির লক্ষ্য মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি সাধন ও তৎসঙ্গে বিভিন্ন ঘটনাবলীর মীমাংসা করা। এটা হল বিজ্ঞান ও যন্ত্রের পদ্ধতি—শৃঙ্খলা দ্বারা নিয়মমাফিক কাজ করা যায়। এর দ্বারা উচ্চ পদের সৃষ্টি হয়, কিন্তু নিরাপত্তা রক্ষাকারী কোনই শক্তির আবির্ভাব হয় না। আভ্যন্তরিক পদ্ধতির লক্ষ্য একই; সে চায় নাড়া দিতে মানুষের মনের নরম কোণকে, উন্নততর করতে চায় চরিত্রের শক্তিকে, প্রকাশ করতে চায় মানুষের যত-কিছু মহৎ ও মানবীয় গুণসকল। এই উভয় পদ্ধতিই অভিনন্দনসূচক এবং সমাজের স্থায়ী ও ফলোপধায়ক উন্নতির জন্য সমান প্রয়োজনীয়। কিন্তু আশ্চর্য ও দুর্ভাগ্যের কথা—তাঁদের পারস্পরিক বিবর্তনশীল মনে করা হয়। বর্তমান জগতের সমস্ত অশান্তি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মূলে আছে এই দুই পদ্ধতির মধ্যে সমতার অভাব।

কেবলমাত্র বিশ্বাসের ভিত্তিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থার উন্নতি কখনই শান্তি দিতে অথবা মানুষের জীবনের উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে পারে না। স্বীকার করতেই হবে, এ কেবল নির্ভর করে মানুষের মনের মহৎ গুণাবলী দেখে। কারণ বীজের অভ্যন্তর নষ্ট হয়ে গেলে পরিচর্যা যতোই ভালো হোক না কেন, সে কোনমতেই বৃক্ষের জন্ম দিতে পারে না। ঠিক সেই রকম একটি গাছের সতেজ বীজও মরুভূমিতে উপযুক্ত মাটি ও জলের অভাবে বৃদ্ধি লাভ করতে পারে না। সুতরাং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে সাথে মানুষের মনের উন্নতি সাধনও একান্ত প্রয়োজনীয়। মানুষের মনের প্রকৃতির উন্নতি তার বুদ্ধির সঙ্গে সমতা রক্ষা করতে এবং তার মানসিক ও শারীরিক উচ্চাশাকে নিবৃত্ত করতে অসমর্থ হয়েছে। মানুষ তাই হারিয়েছে ভারসাম্য ও বিবেচনা এবং জগৎ তার শান্তি ও সমতা। মনে হয়, জাগতিক স্বার্থই যে জীবনের চরম ও পরম কাম্য, এই মতবাদ আজকের পৃথিবীতে সমস্ত মানুষ অবিসংবাদে মেনে নিয়েছে। এই আদর্শের মূলেই জড়ো হচ্ছে বিজ্ঞানের সমস্ত দান, ফলে মানুষে-মানুষে, জাতিতে জাতিতে ক্রমেই বেড়ে চলেছে প্রতি-দ্বন্দ্বিতা। যতদিন পর্যন্ত না মানুষের এই হীন স্বার্থপরতা তার মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির কাছে পরাভূত হবে, ততদিন যে কোন সময়ের জন্যই পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করা অসম্ভব।

এর জন্য বিজ্ঞানের কিছু করবার নেই। পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মানব প্রকৃতির উন্নতি সাধনের জন্য আমাদের মহা-পুরুষদের দৃষ্টান্ত থেকে শিক্ষালাভ করা উচিত। বিজ্ঞানীরা দম্ভের প্রাচীরের আড়াল থেকে এ'দের অবাস্তব মূর্খ মনে করেন। কিন্তু একথা ভুললে চলবে না, ঈশ্বরের মূর্খতা—মানুষের জ্ঞানের চেয়ে অনেক শুভ। সমাজের শান্তি, সমৃদ্ধি ও উন্নতির জন্য বিজ্ঞানী ও যন্ত্রবিদ্‌দের মতোই সাধু ও মহাত্মা লোকেদেরও প্রয়োজন আছে। কারণ আজ পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা কেবলমাত্র ধ্বংসের যজ্ঞই করে গেছেন—শান্তির নিরাপত্তার জন্য তাঁরা কিছুই করেন নি, আর পারবেনও না করতে, যতদিন না পর্যন্ত তাঁদের প্রচেষ্টা মানবতা ও বিশ্বাসের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় মহাপুরুষদের জীবনের দৃষ্টান্তে—যাঁদের পরিণামদর্শিতা যুগকে উর্বর করেছে।

কেবলমাত্র আমাদের পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে, সম্পদ, শক্তি, বিজ্ঞানপ্রসূত সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের উন্নতি সাধন করে, আক্রমণের বিরুদ্ধে আণবিক অথবা হাইড্রোজেন বোমা সঞ্চয় করে শান্তি খোঁজা—অলীক স্বপ্নবিলাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আমরা আমাদের সমাজ ও জীবনকে, নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের একটি দুর্গ বানিয়ে নির্বিবাদে বাস করতে পারি না। শান্তির সমস্যা সমাধানের জন্য এইরূপ যান্ত্রিক প্রচেষ্টা—লুব্ধ প্রবৃত্তি ও তার নিজের অন্যায় দাবীকে আরও উত্তেজিত করে তুলেছে।

সমাজে ন্যায়, সত্য ও শান্তির পথে অগ্রসর হতে, মানুষের প্রকৃতি ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্তনের জন্য আমাদের বহু প্রচেষ্টা করতে হবে। এই উদ্দেশ্যে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের অনুগমন অপর্যাপ্ত; অন্য সকলের সঙ্গে বিজ্ঞানীদেরও তাঁদের মনের মহৎ গুণ-গুলিকে সজীব করতে হবে, বিবেকের অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে, সহানুভূতিকে উত্তেজিত করতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ক্ষমতাকে পালন করতে হবে। যদি তাঁরা পৃথিবীতে শান্তির প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার জন্য কিছু বাস্তব দান করতে চান, তাহলে এইভাবে তাঁদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। বিজ্ঞানের দান, শুধু মাত্র বুদ্ধি ও জ্ঞানের শৃঙ্খলাবোধই নয়—শান্তির জন্য প্রয়োজন হৃদয়বৃত্তির শৃঙ্খলা, যা কেবলমাত্র বিশ্বাসই দিতে পারে।

২৬

বলাই ও রমেশ রায় গভীর কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করছে। তাই শিবনাথ তাদের পাশ কাটিয়ে চলে যেতে পারল। কথায় মত্ত বলে রমেশ রায় শিবনাথকে দেখতে পেল না। তাই আর তাকে ডাকল না। না হলে শিবনাথকে আবার রেস্টুরেন্টে ঢুকে চা খেতে হ'ত এবং এবাড়িতে আর কে ঘর-ভাড়া দিতে পারছে না এবং তার সম্পর্কে শীগ্‌গির কি ব্যবস্থা করা হবে ইত্যাদি গল্প শুনে অনেক সময় নষ্ট করতে হত। কিন্তু শিবনাথ এখন আর সময় নষ্ট না করে তাড়াতাড়ি ঘরে ফিরে রুচিকে খবরটি দিতে চাইছে। একটা সুখবর। হ্যাঁ, এমন ভাল টুইশানিটা তার হয়ে যাচ্ছে। একজন ব্যারিস্টার এই পদের প্রার্থী। খবরটা বেশ রসালো করে রুচিকে শোনাবার জন্যে শিবনাথের জিহ্বা চুলবুল করছিল। হ্যাঁ, আর একটা কথা। টাকা-পয়সা থাকলেই মানুষ দাম্পত্য-জীবনে সুখী হয় না। আজ ক'মাস শিবনাথের চাকরি নেই বলে রুচির রাগারাগি (তার চাকরি আছে। আজো চারবার করে খাওয়া দাওয়া চলছে এ-ঘরে।) আর ওদিকে বালিগঞ্জ থেকে মণ্টু ব্যারিস্টারকে এখানে আমদানি ক'রে বাড়িতে রেখে ছেলেমেয়েদের মাস্টার হিসাবে পুষবার ক্ষমতা পারিজাতের নেই বলে স্বামীর ওপর দীপ্তির ক্রোধ ও মানাভিমানের জাত এক। এ আর তলিয়ে দেখতে হয় না।' রাস্তায় চলতে চলতে শিবনাথ রুচিকে বলল মনে মনে।

'মশাই, শুনুন। আপনাকে ডাকছি।'

পিছন থেকে তারা তাকে গলা বড় করে ডাকল। ঘাড় ফিরিয়ে শিবনাথ বনমালী, কে গুপ্ত ও চারুকে দেখতে পেল।

একটু রাত হয়েছে।

এই মাত্র শিবনাথ ঘরে ফিরেছে। আজ তার মেজাজ ভাল। বাড়িওয়ালার বাড়ির প্রাইভেট টিউটার হবে শুনে রুচি পর্যন্ত গলে গেছে।

বলতে কি রাত্রে আজ মাছ খেতে ইচ্ছা হয়েছে শুনে রুচি তার ব্যাগ খুলে তৎক্ষণাৎ একটা দু'টাকার নোট শিবনাথের হাতে তুলে দিয়েছে। শেয়ালদা থেকে ইলিশ মাছ আর বাঁধা কপি নিয়ে আসুক।

আজ এ-বাড়ির নতুন ভাড়াটেদের ঘরে একটা ভারি খাওয়া দাওয়া হবে রুচি ও শিবনাথের চলাবলা দেখে বাড়ির বাকি ঘরগুলো টের পেল। অধিকাংশ দিনই দু'বার উনান ধরে না। কিন্তু আজ রাতে রুচি রান্না করবে। কাল একটা পাবলিক হলি-ডে তাই ইস্কুল নেই। একটু বেশি রাত জেগে খাওয়া-দাওয়া করলেও ক্ষতি হবে না। কাল বেলায় উঠবে বিছানা থেকে। রুচির গলার স্বরে একটা গড়িমসী প্রকাশ পাচ্ছিল।

তাড়াতাড়ি শেয়ালদা ছুটে গিয়ে আস্ত একটা ইলিশ মাছ ও একটা বড় বাঁধা-কপি কিনে বাড়িতে ফেরে শিবনাথ। বাড়িতে ঢুকবার মুখে বনমালীর দোকানের সামনে তারা তাকে পাকড়াও করল। তিনজন প্রতিবেশীর সম্মিলিত ডাক শিবনাথের উপেক্ষা করবার ক্ষমতা ছিল না। সে দাঁড়াল। 'কি ব্যাপার?'

'মশাই আছেন সুখে।' কে গুপ্ত মুখ থেকে সিগারেট নামিয়ে বলল, 'সন্ধ্যাবেলা যে এ পাড়ায় ভীষণ ঘটনা ঘটল তার খবর রাখেন কিছু?'

কিছুই জানে না শিবনাথ এরূপ চেহারা করতে যাচ্ছিল তারপর তার মনে পড়ে গেল অমলকে। সকালে অমলকে এ-বাড়ি থেকে তুলে দেবার ঘটনা।

ঘটনাটা সে দেখে গিয়েছে চোখের এমন ভাব ক'রে শিবনাথ সেই সবকে বরং আরো নতুন রকম প্রশ্ন করলঃ 'কেন আট নম্বরে মানে অমলের খালি ঘরটায় নতুন ভাড়াটে এসেছে বুঝি, সেই খবর?' বলে সে হাসল।

'আরে ধ্যেৎ মশাই, ভাড়াটে!' গুপ্ত রুষ্ট হয়ে উঠল। 'একরকম খবর কি আর আমাদের এই পার্লামেন্টে ওঠে যে তাই নিয়ে আমরা সারাদিন মাথা ঘামাব? অমলের খবর তো সেই দুপুরের পরই বাসি হয়ে গেছে মশাই। অমল এখন ভিজে তুলতুলে হয়ে আছে। সন্ধ্যাসন্ধ্যি চারু কলকাতা থেকে খবর নিয়ে এসেছে সাত দিনের মধ্যেই অমলের দেড় শ টাকার চাকরি হচ্ছে। সেই সংবাদে যে মশাই আজ সন্ধ্যায় ঘোলপাড়ায় অমলের বাড়িতে আমাদের বড় রকমের ফিস্টি হয়ে গেল। কিরণ রান্না করেছিল। ইলিশ মাছ ভাজা আর খিচুড়ি। দেখুন না চারুর পেটটা কতটা ফুলে উঠেছে। ওকে খাওয়ানো উপলক্ষেই এই অনুষ্ঠান। খরচটা অবশ্য আজকের মতন চারুই চালিয়েছে। এতটা যখন করল আর এইটুকুন বাদ থাকে কেন। সুতরাং—'

শিবনাথ থলের হাত পাল্টায়।

বনমালী চালাক লোক। শিবনাথকে লক্ষ্য ক'রে বলল, 'বাবা গুপ্ত, ভদ্রলোককে যে কথা বলতে ডেকেছ তাই বলে দাও। তোমাদের অমল-কিরণের কেচ্ছা ওকে শুনিয়ে কি হবে!'

'তুই শালা চুপ কর্।' গুপ্ত বনমালীকে ধমক লাগায়। 'তুই মুদি,—লোকের গলায় দা বসাতে এখানে দোকান খুলেছিস। আমাদের, ভদ্রলোকদের চাকরি-সম্বন্ধ শিক্ষিত বাঙ্গালী ছেলেদের দুরবস্থা সম্পর্কে এখানে কথা হচ্ছে। হ্যাঁ, বড় তোদের এখানকার মনিব পারিজাত অপমান করতে চেয়েছিল অমলকে আর তার বৌকে,—এখন ওরা দু'টিতে কেমন কাঁচকলা দেখিয়ে ঘোলপাড়ায় অল্প টাকায় আরো ভাল ঘর পেয়ে বাসা বেঁধেছে, সে

কথাটা ইনিকে শোনাচ্ছিলাম। ধর ইনিরই যদি কাল চাকরি গেল, তখন—'

'ইনির স্ত্রী চাকরি করেন।'

'হ্যাঁ, তা করেন বটে।' বনমালীর যুক্তি তৎক্ষণাৎ কেটে দিলে কে গুপ্ত। 'স্ত্রীর চাকরি যেতে কতক্ষণ। এক চাকরি চির-কাল থাকবে এতবড় দার্শনিক আমরা বা আমাদের স্ত্রীরা কেউ হ'তে পারি নি, কি বলেন মশাই।'

'হ্‌ঁ, তা বটে।' শিবনাথ মৃদু ঘাড় নাড়ল।

'তুই নদি অশিক্ষিত তুই কতটা বুঝবি আমাদের শিক্ষিত লোকের দুর্গতি কত. আজ চারু আছে বলে অমল বেঁচে গেল। কাল যখন মদন ঘোষ আমাকে কি বাড়ির আর কোনো ডিফলটার ভাড়াটেকে তুলে দেবে তখন উপায় হবে কি আমাদের সেই ভাবনা।'

বনমালী আর কথা না বলে হিসাবের খাতার পাতা ওল্টায়।

শিবনাথ আবার হাত পাল্টায় তার থলের। কপি ও মাছে বেশ ভারি হয়েছে থলেটা।

কে গুপ্ত চারুর টিন থেকে আর একটা সিগারেট তুলে মুখে গুঁজে বলল, মশাই, বললে বিশ্বাস করবেন না, সেই বাড়িতে গিয়ে একটা বিকেলের মধ্যে কিরণ কতটা ফ্রি হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমি লক্ষ্য করেছি এ-বাড়ির পেত্নিগুলো, মানে আমাদের কমলা বীথি প্রীতি মাস্টারের মেয়েগুলো কিরণকে দেখলে খামোকা নাক সিঁটকাতো। অপরাধ? পাড়াগাঁ থেকে এসেছে, লেখাপড়া জানে না। আরে তোরা যে কিরণের পায়ের দাসী, তোরা যে ওর আঙুলের নখ ছোঁবারও যুগ্যি নস কেউ, সেই কথাটাই এ-বাড়ির আর একজন বাসিন্দা হিসাবে আমি আপনাকে শোনাচ্ছিলাম। আপনিও চোখে দেখেছেন মশাই অহংকারী পাজী মেয়েগুলোর মধ্যে থেকে কিরণ কতটা অসুখী ছিল। আজ দূরে সরে যেতে বোঝা গেছে কত সুন্দর ভদ্র ফরোয়ার্ড মেয়ে কিরণ।'

চারু রায় হেসে উঠল। 'থাক। কিরণের প্রশংসা আর ও'কে এখন শুনিয়ে লাভ নেই। ও'র স্ত্রী নিশ্চয় কাজ থেকে এবে ঘরে ফিরেছেন। তিনি অপেক্ষা করছেন ইনি বাজার নিয়ে গেলে রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়া হবে। দুজনেই টায়ার্ড। তোমার মতন তো মুক্তপুরুষ সবাই নয়। এ'কে এখন ছেড়ে দাও।'

'হ্যাঁ, ছেড়ে তো দেবই, বৌয়ের হাতের রান্না খাওয়া, তা-ও কপালের ভাগ্যি, আমার তো মশাই বৌ থেকেও সেটি হয় না।' রুক্ষ লম্বা চুলগুলোর মধ্যে হাত ঢুকিয়ে কে গুপ্ত ক্লান্ত ভঙ্গিতে হাসল। কেন হয় না বলল না যদিও।

শিবনাথ একটু অসহিষ্ণু হয়ে বলল, 'কি যেন ঘটনার কথা বলছিলেন বসে ফেলুন।'

'না তেমন কিছু কি' যেন কথাটা বলবে কিনা ভেবে গুপ্ত ইতস্তত করছিল।

বনমালী বলল, 'তা ছাড়া এই ভদ্রলোককে বলেই বা কি হবে। এ-বাড়ির কোনো ভাড়াটেকে এখন বলে কিছু হবে না। যে যার নিজের মাথা আগলাতে ব্যস্ত। তোমার নিজের মামলা এটি। থানায় গিয়ে ডাইরি করাবে কিনা তুমি বুঝে দেখ।' কথা শেষ করে বনমালী একবার শিবনাথকে দেখে পরে আবার কে গুপ্তর দিকে ঘাড় ফেরায়।

চারু রায় শিবনাথের চোখে চোখ রেখে বলল, 'মশাই, এই একটু আগে এখানে রাস্তার ওখানটায় অ্যাকসিডেণ্ট করেছে পারিজাতের গাড়ি। হ্যাঁ, আপনাদের ল্যাণ্ডলর্ড।' কে গুপ্ত থুতনি দিয়ে বাদামতলাটা দেখিয়ে দিল।

শিবনাথ একটু অবাক হয়ে সকলের মুখের দিকে তাকাল।

'আমার ছেলে রুণুকে চেনেন তো? ওই হারামজাদার পায়ের হাড় ভেঙেগেছে। পারিজাতের গাড়ির তলায় চাপা পড়ে মরতে গেছল।'

'মরেনি।' বনমালী বলল, 'তখ্খুনি ব্রেক্ কষতে পেরেছিল পারিজাতের ড্রাইভার। শিখের বাচ্চা হাত ভাল।'

একটু সময়ের জন্য সবাই চুপ।

সিগারেটে শেষ টান দিয়ে চারু রায় বলল, 'হাসপাতালে আছে কে গুপ্তর ছেলে, কেম্বেলে, আমি গাড়ি করে দিয়ে এলাম।'

'আপনিও কি ঘটনার সময় ছিলেন নাকি?' বুদ্ধিমানের মত শিবনাথ প্রশ্ন করল।

'না, আমি ছিলাম ঘোলপাড়ায় কিরণের ওখানে, ওখানে খাওয়া-দাওয়া সেরে কে গুপ্ত আমার আগেই এখানে চলে আসে। এসে ওর মুখে শুনলাম এই ঘটনা।'

'দুর্ঘটনার সময় আপনি ছিলেন কি?'

বনমালী মাথা নাড়ল। 'আমি তো এই সবে কোলকাতা থেকে ফিরেছি। এইমাত্র দোকান খুললাম। সওদা আনতে বড়বাজার যেতে হয়েছিল। রাত হ'ল ফিরতে। এসে শুনলাম। রমেশ রায় নাকি ছিল তখন।'

'আর বলাই।' কে গুপ্ত বলল, 'কিন্তু ওরা বলছে অন্যরকম।'

'কি রকম?' শিবনাথ স্থির হয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। যেন আরো কি একটা ব্যাপার আছে এর মধ্যে।'

'মশাই, সত্যও হতে পারে মিথ্যাও হতে পারে।' কে গুপ্ত তাঁর লম্বা চুলের মধ্যে আঙুল ঢোকাল। 'আমি রিপোর্ট পেলাম, আমার পুত্র শ্রীমান রুণু ও বলাইয়ের মেয়ে ময়না হাত ধরাধরি ক'রে মাঠে হাওয়া খেয়ে বাড়ি ফিরছিল। ওরা যখন বাদাম গাছটার নীচে তখন অ্যাক্সিডেণ্ট হয়। গাড়ির ধাক্কা লেগে রুণুটা মাটিতে পড়ে যায়। ময়না এমনিও ছেলেমানুষ, তার ওপর মেয়েছেলে,—কি আর করে, ছুটে গিয়ে বাড়িতে নাকি খবর দিতে যাচ্ছিল এমন সময় সেখানে রমেশ ও বলাই এসে পড়ল।'

'ও, চাপা পড়েনি, ধাক্কা লেগেছিল?' প্রশ্নটা ক'রে শিবনাথ কে গুপ্তর দিকে তাকাতে কে গুপ্ত ধমক দিয়ে উঠল। 'হ্যাঁ, মশাই হ্যাঁ, কিছু না, মাইনর ইঞ্জুরি, —রমেশও তাই বলছে।' ব'লে কে গুপ্ত বনমালীর দিকে তাকাল। বনমালী বলল, 'এমন সময় সেখানে চারুবাবু এসে পড়েন। এই তো তিনি রুণুকে হাসপাতালে রেখে ফিরছেন।'

শিবনাথ আবার ঘাড় ফিরিয়ে অদূরে বাদামতলাটা দেখতে চেষ্টা করল। জায়গাটা অন্ধকার। ভাল দেখা যায় না। শিবনাথ আবার এদের দিকে মুখ ফেরায়। 'তা রমেশ বলাই কি বলছে?'

বনমালী বলল, 'কি বলছিল এ'কে শুনিয়ে দাও।'

চারু শিবনাথের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'মশাই, রমেশ রায় বলছে অন্যরকম। রুণু ও এ-পাড়ার আরো চার পাঁচটা ছেলে নাকি এ-বাড়ির ভাড়াটে অমলকে তুলে দেয়ার পর থেকেই আজ সারাদিন রাস্তায় মাঠে ঘুরে ঘুরে চেঁচামেচি করছিল। বাড়িওলার জুলুম চলবে না, ঘরভাড়া কমিয়ে দাও,—এইসব। কে গুপ্ত বলছে, রুণুর সঙ্গে তখন বলাইর মেয়ে ছাড়া আর কেউ ছিল না, আমি মেয়েটাকেও দেখিনি অবশ্য। রুণুটা একলা মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে ছিল। রমেশ বলে রুণু ও তার সঙ্গীরা নাকি পারিজাতের গাড়িটা আটকাতে গিছল।'

'কী ভীষণ কথা!' যেন নিজের মনে কথা বলল শিবনাথ।

কে গুপ্ত ও বনমালী চুপ। টিন থেকে চারু রায় আর একটা সিগারেট তুলল। কি একটু ভেবে শিবনাথ পরে প্রশ্ন করল, 'বলাই? বলাই কি বলছে?'

'জানি না।' কে গুপ্ত হঠাৎ আকাশের দিকে মুখ তুলে বলল, 'আমি তো শালা তখন রাস্তার ওধারটায় ছিলাম। এদিকে নজর দিইনি। দেখছিলাম খুব স্টাইল ক'রে নতুন শাড়ি জুতো পরে ভুবনের মেয়ে বীথিটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। আচ্ছা, মশাই, ও কি একটা চাকরি পেয়েছে শুনলাম। আপনি শুনেছেন নাকি কিছু। বড় যে রাতারাতি শ্রীমতীর চেহারা পাল্টে গেল। দেখেছেন?'

শিবনাথ কিছু বলবার আগে বনমালী কে গুপ্তকে ধমক লাগায়।

'কোথায় তোমার ছেলে গাড়ি চাপা পড়েছে, থানায় ডাইরি করানো হবে কিনা কথা হচ্ছে, তা না, তুমি ভুবনের মেয়ের শাড়ি জুতোর ব্যাখ্যা করছ। তোমায় নিয়ে পারা আর গেল না।'

'বেশ হয়েছে, মরে যাক ছেলে।' আকাশ থেকে চোখ নামিয়ে কে গুপ্ত বনমালীর দিকে তাকিয়ে একটু সময় কি ভাবল। চারু রায়ের টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'হারামজাদা শ্লোগান তুলতে গেছল কিনা তাইতে আমি কেস্ করতে গেলে ওরা উল্টো পলিটিক্যাল কেস্ করবে। বাড়িওলার জুলুম চলবে না।'

'না, এভাবে পলিটিক্যাল শ্লোগান তোলা ঠিক হয়নি। এতে কেস্ পারিজাতের ফেভারে যাবে।'—শিবনাথ না ব'লে পারল না।

'বেশ তো ছিলি বাবা, প্রেম করছিলি ময়নার সঙ্গে কপি ক্ষেতে বসে। আমি মশাই সব রিপোর্ট পাই। আমি সংসারের দিকে চোখ রাখতে পারছি না ব'লে ছেলেমেয়ে দুটো একেবারে গোল্লায় যেতে বসেছে।'

বনমালী চুপ করে রইল। চুপ থেকে শিবনাথের চোখে চোখ রাখল।

কে গুপ্ত বলল, 'সেদিন চায়ের দোকানে রমেশ রায়ের ভাই ক্ষিতিশ বেবিটাকে চুলের মুঠি ধরে খুব মেরেছে।

'কেন?' শিবনাথ ইচ্ছা ক'রে ঢোক গিলে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল, 'আপনি ওকে রমেশের দোকানে যেতে এলাউ করেন কেন?'

কে গুপ্ত চোখ বড় করে শিবনাথের দিকে তাকাল। 'কেন, আপনি কি মশাই বলছেন আমি বারণ করলে বেবি সেখানে যাওয়া বন্ধ করবে?'

'হ্যাঁ, করবে, কেন করবে না।' শিবনাথ কণ্ঠস্বর দৃঢ় করল। 'আপনি বাপ, গার্ডিয়ান।'

মাথা নেড়ে বনমালী বলল, 'আপনি মশাই দেখছি পাগলের সঙ্গে কথায় মেতে উঠলেন। যান তো নিজের ঘরে। বৌদিমণি রান্না করবেন বাজারের আশায় ব'সে আছেন। কা'কে আপনি উপদেশ দিচ্ছেন। একবেলা খেতে দিতে পারে না, নিজে উপোস থাকছে বেলার পর বেলা। অর্ডার করলে ছেলেমেয়েরা এখন তা শুনবে কেন। তাছাড়া, যেমন ছেলেটা তেমনি মেয়েটা। বয়স তো আর একটিরও কম হয়নি। যদি আপনারা দশজন মিলেও আজ বেবিকে নিষেধ করেন, দরকার নেই মাগনা চা-চিনি এনে, তোদের সংসারের সব খরচ আমরা চালাব; আর রমেশ রায়ের দোকানে যেয়ে কাজ নেই, তবু যাবে। ক্ষিতীশ যদি এখন জুতোও মারে তবু বেবিকে যেতে হবে দু'বেলা ওই দোকানে। মানে সর্বনাশ যতটুকুন হবার হয়ে গেছে। কাজেই আপনি আমি মুখ ভরিয়ে এখন আর করব কি। চুপ থাকুন।'

শিবনাথ একটু স্বস্তিবোধ করে, ড়র দিকে পা বাড়াবার জন্যে প্রস্তুত।

চারু রায় বলল, 'মশাই, আমার ইচ্ছা ল লালবাজার একটা ফোন করে দিই। মার বন্ধু পুলিশের বড় কর্তা। শুনলে ণি এসে স্টেপ নেয়। কিন্তু দেখলাম গুপ্ত নিজেই সায়লেণ্ট থাকতে ছে। তাছাড়া, তাছাড়া—'

সিগারেটের ছাই জমছিল, সেটা ঝেড়ে লে দিয়ে চারু বলল, 'কিন্তু আমার ক্ষও সেটা সুবিধা বা সম্ভব হয় না। ননা, এই অঞ্চলে আমাকে ঘন ঘন ওয়া-আসা করতে হচ্ছে। এখানে মার নিজের ইণ্টারেস্ট বেশি না। পাবলিকের প্রতি দায়িত্বটাই গুরুতর। লিমিটেড কোম্পানী মাইনে করা চাকর আমি। আজ এখানে ছবির মেটেরিয়েল জোগাড় করতে এসে যদি এখানকার ল্যাণ্ডলর্ডকে ক্ষেপিয়ে তুলি তো আমার আসা সকলের আগে বন্ধ হবে। হেভি লস্ হবে কোম্পানীর। কোম্পানী ডুববে। তার অর্থ আপনাদের মত পাবলিক,—এমনি কয়েকটা নিরীহ লোক মারা যাবে। অর্থাৎ যারা দেশের ফিল্ম ইণ্ডাস্ট্রির উন্নতি হবে ভেবে ব্যাঙ্কের জমানো সর্বস্ব আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে ওদের ঘুমে মারা হবে।'

কথা শেষ করে চারু রায় ঈষৎ হাসতে শিবনাথও হাসল।

'আরে ছি ছি!' কে গুপ্ত দাঁত দিয়ে জিভ কাটল। 'আমিও, রায়, তোমাকে বলব না খামোকা একটা বাজে মামলায় জড়িয়ে শেষটায় তোমাদের কোম্পানী হেভি লস্ খাক। ওই বনমালীই ঠিক বলেছে। আমার সর্বনাশ শুরু যেদিন থেকে পারিজাতের টিনের শেডের তলায় এসে আশ্রয় নিয়েছি। বাস্তবিকই তো, ক'দিক থেকে লোক এসে আমার ছেলেমেয়েদের রক্ষা করবে। আজ পলিটিক্যাল কেস্ থেকে রুণুকে বাঁচাক। কালই পড়বে হারামজাদা রেপ্ কেসে। রাতদিন বলাইর মেয়েটার পিছনে ঘুরছে, আমি লক্ষ্য করছি।'

এবার অবশ্য শিবনাথ আর বলল না, 'এই মেয়ের সঙ্গে আপনার ছেলেকে মিশতে নিষেধ করুন।'

কেননা, তার আগেই কে গুপ্ত মাথার লম্বা চুলগুলোর মধ্যে তার রোমশ শীর্ণ হাতখানা ঢুকিয়ে দিয়ে বলেছে, 'আমি খেতে দিতে পারি না তো ওরা এভাবে না হয় সেভাবে মরবে এটা তো দিনের আলোর মত সবাই পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে। কেন আমি বলব একে-ওকে মশাই, ওদের পিছনে ঝুপ্ করে কিছু টাকা ঢালুন। আমি এই বিপদে পড়েছি।'

চারু আনত চোখে হাতঘড়ির কাঁটা দেখছিল।

শিবনাথ সুযোগ বুঝে বলল, 'আচ্ছা, আমি চলি মশাই, ওদিকে আবার—'

'হ্যাঁ, আপনার গৃহিণী অধীর হয়ে উঠেছেন। জানি। আপনাদের খাওয়া-দাওয়া হবে। সুতরাং আপনাকে আর বেশিক্ষণ ধরে রাখব না, আচ্ছা, আপনি কি জানেন, সন্ধ্যার পর পারিজাত বাড়িতে ছিল না গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল? কিছু খবর রাখেন, কারেক্ট ইন্‌ফরমেশন দিতে পারেন?'

'কেন বলুন তো?' শিবনাথ প্রশ্ন না ক'রে পারল না। কেননা, মদের জিহ্বা ব'লে সব কথাই একটু হিউমার ক'রে বেশ জড়িয়ে জড়িয়ে এতক্ষণ বলছিল কে গুপ্ত। তার এই স্বর শুনেই শিবনাথ অভ্যস্ত। এখন হঠাৎ লোকটির মুখে কড়ারকম ভাষা শুনে শিবনাথ চমকে উঠল। কিন্তু কিছুমাত্র ইতস্তত করল না চট্ ক'রে বলতে, 'আমি কি ক'রে-

বলব। আমি তো এইমাত্র বাজার সেরে ফিরলাম।'

'তাঁর ঘরভাড়া আটকে থাকে না, যে তিনি পারিজাতের খোঁজ রাখবেন। কখন রায়সাহেবের ছেলে এলো, কখন গেল। নাকি পারিজাত এবার নিজেই জমিদারী রাখতে তোমাদের ডিফল্টারদের শায়েস্তা করতে ছুটে এল। মনিবের চলাফেরার দিকে নজর রাখা তোমাদের ডিউটি। তোমার, বলাইর। অমল উঠে গেছে বক্ষা পেয়েছে।' হিসাবের খাতা থেকে মুখ তুলে বনমালী আর একটা ধনক লাগাতে কে গুপ্ত আকাশের দিকে তাকাল।

চারু রায় উঠে দাঁড়াল।

আর একবার হাতের ঘড়ি দেখতে দেখতে বলল, 'আমি আর ওয়েট্ করতে পারছি না গুপ্ত। তোমরা বসে গল্প করো, আমাকে ছুটি দাও। এখান থেকে গাড়ি নিয়েও বাড়ি ফিরতে রাত বারোটা বাজবে।'

'হ্যাঁ, ব্রাদার তুমি চলে যাও। আমরা একটু সিরিয়স টক্ করছি।'

'বাই—বাই!' গুপ্তর হাতে একটু ঝাঁকুনি দিয়ে চারু রায় ক্ষিপ্র পায়ে রাস্তায় নেমে তার টু-সীটারের দিকে ছুটল। গাছের অন্ধকারে গাড়িটা শিবনাথ এতক্ষণ দেখতে পায়নি।

এবার কে গুপ্ত সিরিয়স্ হওয়ার আগে শিবনাথ কড়া সুরে কথা ব'লে উঠল, 'আমায় ছেড়ে দিন মশাই, ঘরে কাজ আছে।' ব'লে শিবনাথ স্পষ্টত বাড়ির দিকে পা বাড়াতে চেষ্টা করল।

'আহা, আমি তো ঠিক আপনাকে আটকাচ্ছি না। মশাই, রমেশ রায়ের গলার সুরটা আমার ভাল লাগল না। জিজ্ঞেস করতেই বলল, পারিজাতের তিনদিন ইনফ্লুয়েঞ্জা। বিছানা থেকেই উঠছে না। সে গাড়ি নিয়ে বেরোবে কি। গাড়িটা রায়সাহেবের ফ্যামিলির হ'তে পারে। তা সরকার বা ড্রাইভার বা পারিজাতের কোনো আত্মীয় বা কোনো কর্মচারি যে চালিয়ে না যাচ্ছিল তখন তা কি ক'রে জানলেন। আর তাছাড়া, আপনি যখন নম্বর রাখেন নি। কাজেই কি ক'রেই বা পুলিসকে বোঝাবেন ওটা পারিজাতের গাড়ি। এ রাস্তায় উটকো অনেক গাড়ি রাতে বেরাতে ছুটোছুটি করে।'

কে গুপ্ত কথা শেষ করতে শিবনাথ বলল, 'তা হবে, আমি জানি না। আমি তো আর রমেশ রায়ের মত রায়সাহেবের বাড়িতে রাতদিন যাওয়া-আসা করছি না। হয়তো ওরা জানে, হয়তো রমেশ যা বলছে তাই ঠিক। আমরা কি ক' কারেক্ট ইন্ফরমেশন দিই।'

ব'লে শিবনাথ লম্বা পা ফে বাজারের থলে হাতে বাড়ির ভিতর ঢুক (ক্র

আঁরি মাতিস

অহিভূষণ মল্লিক

বিখ্যাত ফরাসী শিল্পী আঁরি মাতিস্ গত ৩রা নভেম্বর রা গেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স য়েছিল প'চাশী বছর। খবরটি খুব াত্ত ক'রে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। ন্তু শিল্পী বা শিল্পরসিকদের কাছে টি নিদারুণ সংবাদ। মাতিস্ ছিলেন াধুনিক শিল্পের আলোকস্তম্ভস্বরূপ। র সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব। যাঁদের রণা শিল্পী মাত্রেরই জীবন অসাধারণ বচিত্র্যপূর্ণ তাঁরা অবিশ্যি হতাশ হবেন। ্যারিসে ১৯০৫ সালের স্যালোঁয়ে একদল রুণ শিল্পী তাঁদের কল্পনাসম্ভূত এবং প্রচলিত বর্ণ ব্যবহৃত ছবি প্রদর্শিত রলেন। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ালোচকরা তাঁদের বিদ্রূপ ক'রতে গলেন—বল্লেন, এসব ধাপ্পা—এরা ছবি ঁকতে জানে না, ছবি আঁকতে পারে না। সব অর্থহীন আঁকিবুকিকাটাকে ছবি া কিছুতেই চ'লবে না। একজন সমা-াচক এঁদের নামকরণ করলেন 'লা ফও' র্থাৎ বন্য পশু। বিদ্রোহী শিল্পীগোষ্ঠী ুশিমনে এই 'ফও' কথাটি গ্রহণ করলেন বং তাঁদের আন্দোলনের নাম দিলেন ও-ইজম্। এই ফওদের নেতা ছিলেন াঁরি মাতিস। 'Matisse makes you razy' Matisse does more harm han alcohol—এইসব কথা ম'মার্ত-এর াড়ির দেয়ালে দেয়ালে 'লিখে বেড়াতে াগলো তাঁর বিরুদ্ধ সমসাময়িকরা। কিন্তু এত ক'রেও তারা মাতিসকে আটকাতে পারেনি। তাঁর কাছ থেকে শিল্পজগতের যা পাওনা ছিল তিনি পুরোপুরিই দিয়ে গেলেন।

১৮৬৯ সালে ৩১শে ডিসেম্বর মাতিস জন্মগ্রহণ করেন এক মধ্যবিত্ত পরিবারে। শৈশব কাটে বোহেয়াঁ-এন-ভারমাদোয়া শহরে। পিতার ইচ্ছে আঁরি আইন-বিশারদ হয়ে পৈতৃক ব্যবসা দেখাশোনা করুক। আঁরি প্যারিসে গেলেন আইন শিক্ষা ক'রতে। তারপর গেলেন সেণ্ট কোয়েন্তাঁতে এক আইন অফিসের কেরানী

পোরট্রেট উইথ গ্রীন স্ট্রাইপ (১৮৬৯)

একটি ড্রয়িঙ্ (১৯৪৮)

ন্যুড (১৯৩৫)

হয়ে। কিন্তু কিছুতেই মন বস'ল না। শেষে ইস্তফা দিলেন। বিশ বছর বয়সে অ্যাপেণ্ডিসাইটিসে আক্রান্ত হলেন। ধীরে ধীরে ভাল হ'তে লাগলেন। হাওয়া বদলাতে পাঠান হ'ল বোহেয়াঁতে। সময় কাটানোর জন্যে এক বাক্স রং, তুলি আর কিছু কাগজপত্র কিনে দিলেন তাঁর মা। এ থেকেই শিল্পী-জীবনের সূত্রপাত হ'ল। এর আগে মাতিস কোনদিন কল্পনায়ও ভাবেন নি—একদিন তিনি ছবি আঁকিয়ে হবেন। মাতিসের মা ছিলেন একজন শখের শিল্পী। সংসারের কাজের ফাঁকে যেটুকু সময় পেতেন—বসে যেতেন রং-তুলি নিয়ে। নানা রকম ফুল লতা-পাতা আঁকতেন চীনামাটির বাসনে। মায়ের কাছেই মাতিসের ছবি আঁকার হাতে-খড়ি হয়েছিল। বোহেয়াঁতে থাকতে থাকতেই এক পড়শী তাঁকে ছবি নকল করা শেখালেন। তারপর তাঁর হাতে এলো 'গুপিলে'র লেখা একখানা বই "হাউ টু পেইণ্ট"। ছবি এ'কে আর হাউ টু পেইণ্ট পড়ে' তিনি তাঁর শারীরিক অসুস্থতার কথা সম্পূর্ণ ভুলে গেলেন। তিনি লিখেছেন, I felt transported into a sort of paradise in which I felt gloriously free, at ease and 'on my own,' মনে মনে স্থির ক'রে ফেললেন ছবি আঁকাই হবে তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের উপজীবিকা।

দু'বছর পর মাতিস প্যারিসে ফিরলেন। ছবি আঁকা শিখলেন প্রথমে বো-আর্টসে, তারপর জুলিয়ান আকাদেমীতে এবং শেষে লুভারে। এক বন্ধু জুটলো। বেরিয়ে পড়লেন দুজনে রং তুলি আর ক্যানভাস নিয়ে। মাতিস ছিলেন সারদাঁ এবং গোয়ার ভক্ত। এ'দের প্রভাব পড়ল তাঁর ছবিতে ষোল আনা। লক্ষ্য করলেন তাঁর বন্ধুটির ছবি—এত আলো কোত্থেকে এলো! বন্ধুটি বলল ও সব গোয়াটোয়া ছাড়ো ভায়া, চোখ ঝলসানো ছবি যদি আঁকতে চাও ইম্প্রেশনিস্ট রং ব্যবহার করো। নয়তো উপায় নেই। মাতিস্ ভাবলেন তাইতো! গোঁড়াপন্ধতির সঙ্গে তাঁর এইখানেই সম্পর্ক চুকল।
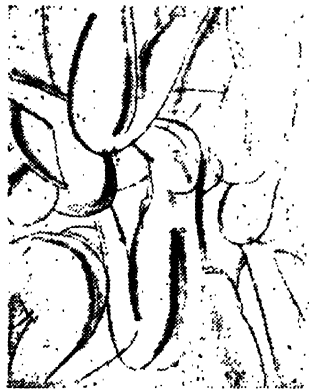
ঢুকলেন এসে উদারমতাবলম্বী গুস্তাভ মোরোর স্টুডিওতে। দোমিয়ের, দেগা, লত্রেক প্রভৃতির ছবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। ইম্প্রেশনিস্ট এবং পয়েণ্টি-লিস্ট মতবাদের ব্যাখ্যা শুনলেন। তারপর চালালেন আঁচড় আর রঙের পরীক্ষা-নীরিক্ষা। অল্প দিনের মধ্যেই একদল অতি উৎসাহী তরুণ শিল্পীর নেতা হয়ে বসলেন। চতুর্দিকে হৈ চৈ পড়ল—শিল্প বুঝি রসাতলে যায়! নিন্দুকেরা এ'দের বলল 'এক্সট্রীমিস্ট'। ১৯০৫ সালের স্যালোঁর পর এ'দের নামকরণ হয়—'ফও'। ভ্যান গগের 'ফোরটিন্থ জুলাই' ছবিটি বলা যেতে পারে এই ফও-ইজমের উৎস। মাতিস ছাড়া এদলে ছিলেন ভ্ল্যামাঁক, রুয়াল্ত, দেরেয়াঁ এবং ব্রাক্। দুফী এবং ফ্রিয়েস্ত্স্ পরে এসে দলে যোগ দিয়েছিলেন। মাতিস একটি নতুন আকাদেমী প্রতিষ্ঠিত করলেন এবং নিজে হলেন তার প্রধান শিক্ষক। এই সময় তাঁর সঙ্গে আলাপ হয় পিকাসোর। যদিও পিকাসো মাতিসকে অনুগমন করেন নি,—এ'দের বন্ধুত্ব থেকে যায় আজীবন।

জেমস জইসের 'ইউলিসিসের' চিত্রসজ্জা (১৯৩৫)

১৮৯৮ সালে মাতিস বিবাহ করেন এবং চার বছরের মধ্যে দুই পুত্র এবং এক কন্যার জনক হন। উপার্জন নেই এক পয়সাও অথচ সংসার বেড়ে চলল। তাঁর স্ত্রী একটি ছোট্ট মনিহারী দোকান খুললেন। তার আয় থেকেই সংসার চলল কোন রকমে। এই সময় তাঁর প্রথম একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হ'ল আমব্রোয়া ভোলার্দের গ্যালারীতে। কিন্তু, ছবি বিক্রী হওয়া দূরে থাক, সে দিকেই কেউ পা বাড়াল না। ১৯০৫ সাল থেকে তাঁর ভাগ্য খুলল। গালাগালীও খেলেন

আবার ছবিও বিক্রী হ'ল। ১৯২০ এর মধ্যে তিনি একজন রীতিমত ধনী বলে সাব্যস্ত হলেন।

ক্রমান্বয় রং মিলিয়ে মিলিয়ে আলো আঁধারী সৃষ্টি ক'রে চিত্রে স্তর-মাত্রিক (থ্রী ডাইমেনশন) রূপ দেওয়ার প্রচলিত রীতি ইম্প্রেশনিস্ট শিল্পীরা পরিত্যাগ করেছিলেন, কারণ আলো-আঁধারের গ্রেডেশন দেখাতে গেলেই রঙের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয়ে ধূসর অথবা কালচে রং ফুটে ওঠে বেশী। তাঁরা আলো আঁধারের গ্রেডেশন না দেখিয়ে জ্বল জ্বলে রঙের মোটা মোটা পোঁচ মেরে ছবি আঁকলেন । সিজানের মন কিন্তু খুঁত খুঁত করতে লাগলো। তাঁর ছবিতে স্তরমাত্রিক গুণ বজায় রাখার জন্যে তিনি এক নতুন পন্থা আবিষ্কার করলেন। প্রত্যেক 'ফর্ম'কে তিনি কয়টি সমপৃষ্ঠ ক্ষেত্রে ভাগ করলেন এবং সেই ক্ষেত্র-গুলিকে ক্রমান্বয় 'উষ্ম' থেকে 'শীতল' রং দিয়ে ভরে দিলেন। উষ্ম রঙ বলতে বোঝায়—লাল, কমলা এবং হলুদ আর শীতল রং হ'ল নীল বেগুনে এবং সবুজ। কিন্তু এই পন্থা ঘনত্ব এবং গভীরত্বকে আরও অস্পষ্ট করে' তুলল। পল গগাঁ এবং ভ্যানগগ দেখলেন রঙের সমতা বজায় রাখতে পারলেই ছবির আকর্ষণী শক্তি বাড়ে এবং ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় না। সুতরাং ড্রইং যতদূর সম্ভব সরল ক'রে রঙের সমতা রাখাই ছিল এঁদের লক্ষ্য।

ইম্প্রেশন-ইজ্‌মের আর এক ধাপ আধুনিক রূপকেই ফও-ইজ্‌ম বলা যেতে পারে। মাতিসের স্টাইলে সিজানের প্রভাব পড়েছে বেশী তবে দেখা যায় গগাঁ বা গগের মতন তিনিও বিশ্বাস করতেন শিল্প সৃষ্টি করতে হলে হুবহু প্রকৃতিকে নকল করার কোন প্রয়োজন নেই। প্রকৃতি ছিল এঁর কাছে অনুপ্রেরণা মাত্র। ঘন এবং হালকা রং বিন্যাসে মাতিস দক্ষতা দেখিয়েছে অসাধারণ রকম। তাঁর স্টাইলই এ পর্যন্ত বলিষ্ঠতম স্টাইল হয়ে রয়েছে। মাতিস কিন্তু প্রকৃতির রূপকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতেন না। সামান্য বাস্তবতার ছাপ তাঁর ছবিতে থেকে গেছে। নগ্ন নারী মূর্তিও তিনি প্রচুর এঁকেছেন, নানান রকম ভঙ্গীমায়, কিন্তু লত্রেক

স্টিল লাইফ উইথ পিংক ওনিয়ন (১৮৬৯)

অথবা রেনোয়া যে চোখে নারীদেব দেখতেন—তা থেকে মাতিসের দৃষ্টি ছিল সম্পূর্ণ অন্য। তাঁর লক্ষ্য ছিল ছন্দ এবং নক্সার দিকে। বেহালা-কেস, চেয়ার অথবা ফলের ঝুড়ী তিনি যে দৃষ্টি নিয়ে এঁকেছেন সুগঠিত নারীদেহও একইভাবে দেখেছেন। চরিত্র ফোটাবার কোন প্রয়াস ছিল না। বলতে দ্বিধা নেই মাতিসের 'ন্যুডই' এ যুগের পবিত্রতম ন্যুড। মাতিসের শিল্প ক্রমান্বয় ঘাত প্রতি-ঘাতের মধ্য দিয়ে অদল বদল হয়ে এসেছে, কখনও একস্থানে দাঁড়িয়ে থাকেনি। কখনও উগ্র আধুনিক রূপ ধারণ করেছে কখনও বা কিছুটা স্তিমিত হয়ে এসেছে। এক জায়গায় মাতিস বলেছেন,

"The work of art should be, for the tired businessman no less than for the artist in literature, a cerebral sedative, rather like a comfortable arm chair.

—এ থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায় তাঁর শিল্পের লক্ষ্য কি ছিল।

১৯১১ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত ভাস্কর্য সাধনা করেছিলেন এসময় কিউবিস্টদের প্রভাব তাঁর ওপর কিছুটা পড়েছিল। তার কয়েকবছর পর 'নিসে' রেনোয়ার সঙ্গে দেখা হয়। তাঁর সেই সময়কার ছবির মধ্যে রেনোয়ার প্রভাব কিছুটা এসে গিয়েছিল।

১৯০৮ থেকে ক্রমশঃ মাতিসের নাম বিদেশে ছড়িয়ে পড়তে লাগল। সারা পৃথিবীর ছবি-ব্যবসায়ীরা ছুটলেন ফ্রান্সে মাতিসের কাছে । আকাশছোঁয়া দামে ছবি বিক্রী হ'ল। একক প্রদর্শনী করা হ'ল প্রথমে লণ্ডনে তারপর বার্লিনে তারপরে নিউ ইয়র্কে। বহু পুরষ্কার পেলেন। এ যায়গায় উল্লেখ করা উচিত তাঁর ছবির প্রথমে ক্রেতা হলেন স্টীন পরিবার। এঁরা মার্কিন হলেও প্যারিসেই থাকতেন। এই স্টীনরাই পিকাসোর ছবিরও প্রথম ক্রেতা। বিদেশে মাতিসকে যতটা মাথায় তোলা হয়েছিল ফরাসীরা ১৯৪৫ পর্যন্ত তাঁকে তেমন আমল দিতো না। শেষে তারাও মেতে গেল। গোড়ায় তাঁর যেসব গুণগ্রাহী ছিলেন তার মধ্যে মারসেল সেমবাতই ছিলেন একমাত্র ফরাসী। জারের আমলে দুজন ধনী 'বদখেয়ালী' রুশীয় কয়েক ডজন ছবি কিনে ফেলে-ছিলেন মাতিসের এবং পিকাসোর। উপস্থিত সেগুলি মস্কোর 'মিউজিয়ম অব মডার্ন ওয়েসটার্ন আর্টে' তালাচাবি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে। এখন সেগুলি দেখলেও পাপ। ১৯২৫ সালে

মাতিসকে 'শেভালিয়র অফ্ দি লিজিয়ন অফ্ অনর' উপাধী দেওয়া হয়। কয়েক বছর পর তিনি আমেরিকা যান সেখানে পেন্সিলভেনিয়ার 'বার্নেস ফাউণ্ডেশন' মিউজিয়মের ম্যুরাল আঁকতে। ডাঃ এলবার্ট বার্নেস মাতিসের একজন মস্ত গুণগ্রাহী ছিলেন। বলতে পারা যায়, আমেরিকায় মাতিসকে তিনিই প্রচার করেছিলেন। মাতিসের বহু ছবিও তিনি সংগ্রহ করেন। তাঁর নামেই ঐ বার্নেস ফাউণ্ডেশন মিউজিয়ম। কয়েকটি ব্যালে সেটের নক্সাও তাঁকে দিয়ে করিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কিছু বিখ্যাত পুস্তকে চিত্র-সজ্জা করেছিলেন। তার মধ্যে জেমস্ জইসের 'ইউলিসিস' অন্যতম। দেশ ভ্রমণ করা তাঁর আর একটি খেয়াল ছিল। গগাঁর স্বর্গ তাহেটীতে বেশ কিছুদিন ছিলেন। এই সব ভিন্নদেশীয় দৃশ্যাবলির ছাপ মনের মধ্যে নিয়ে এসে পরে তা তাঁর চিত্রে ব্যবহার করেছিলেন— বোঝা যায়।

যদিও তাঁর লক্ষ্য ছিল আমাদের পরিশ্রান্ত মস্তিষ্ককে কিছুটা আরাম দান করা—তাঁর রঙের মায়াজাল আমাদের কেবল উৎফুল্লই করে না স্তম্ভিতও করে। শিল্প রসিক মহলে আজ মাতিসের নাম শোনেনি এমন কেউ নেই। পৃথিবীর সব বড় বড় মিউজিয়মেই আজ তাঁর ছবি সযত্নে টাঙানো রয়েছে দেখা যায়; এখন আর কেউ বলে না—

"Matisse does more harm than alcohol."

টেম্পল চেম্বার

শংকর
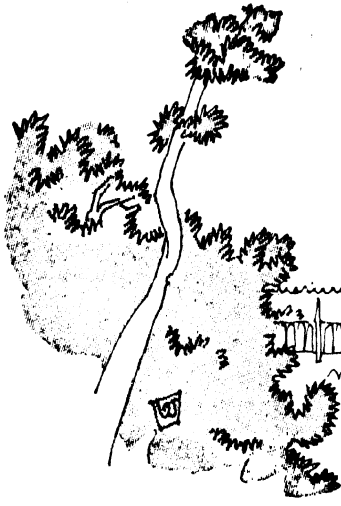
"এর নাম হাইকোর্ট", অবাক হয়ে হাইকোর্টের উঁচু চুড়োর দিকে চেয়ে আমার মনে হল, এর নাম হাইকোর্ট। বিভূতিদার মুখের দিকে চাইলাম। বিভূতিদার হাত ধরেই এখানে এসেছি। চাকরি হবে, যা-তা চাকরি নয়। সায়েব ব্যারিস্টার, তার কাছে চাকরি। এর আগে তো রাস্তায় ছোটখাট জিনিস ফেরি করেছি। আর কিছু না পেয়ে শেষ পর্যন্ত খুরুট রোডের বিবেকানন্দ স্কুলে মাস্টারি। মাস্টার মানে অংক ইংরেজী নয়। মাস্টার সমাজে অংক ও ইংরেজীর মাস্টার মশায়রাই কুলীন। বাকিসব ইতরে জনা। সর্বশাস্ত্রবিদ। ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য, বাংলা, সংস্কৃত কোনটা পড়াতে বাকি রাখিনি।

হাইকোর্টের চুড়োটার দিকে আবার চাইলাম। বর্শার ফলকের মত তীক্ষ্ম শীর্ষদেশ যেন মেঘের আবরণ ভেদ করে আকাশের সঙ্গে মিলিয়ে যেতে চাইছে। বিভূতিদা হেসে বলেছিলেন, 'বাঙালকে হাইকোর্ট দেখান একেই বলে।' রোজ এখানে আসতে হবে, চুড়ো কেন অনেক কিছুই ওই বাড়ীটার ভিতরে আর এই পাড়ায় অহরহ ঘটছে। যাদের অনেক কিছুই ক্রমশ জানতে পারবে এখন চেম্বারে চল।'

এসব অনেক দিন আগেকার কথা, কিন্তু আজ বুঝতে পারছি বিভূতিদা ঠিকই বলেছিলেন। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট ও তার পাশের আকাশচুম্বী লাল প্রাসাদে অহরহ জীবন নাটকের কত মেলা চলেছে। জীবনের কয়েকটা বছর সেখানে কাটিয়ে স্মৃতির খাতার জমার অংক অনেক বেড়ে গেছে। কত বিচিত্র মুখের ছবি সেখানে সাজান। কত বিচিত্র সমস্যা মানুষকে আদালতে টেনে আনে। আপাতত সে আলোচনা স্থগিত রাখা যাক। সে সম্বন্ধে আমি নিজে কিছু বলব না। বলা বোধ করি সম্ভবও নয়। যাদের আমি ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে দেখেছি, জেনেছি, তাদেরই কয়েক জনকে একে একে আপনাদের সামনে হাজির করিয়ে দেব। তারাই বুঝিয়ে দেবে সব কিছু। বিভূতিদা বললেন, 'সায়েব সুবোরা একটু অন্য ধরনের। তবে কোন ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। এসায়েব অন্য মানুষ। একেবারে অন্য মানুষ, ক্রমশ সব ঠিক হয়ে যাবে।''

সায়েবের আগমন প্রতীক্ষায় বসে আছি। সায়েব এখনি আসবেন, বাড়ির নাম টেম্পল চেম্বার। কতকালের পুরোন বাড়ি বলা শক্ত। রাস্তার একপাশে টেম্পল চেম্বার, অন্যপাশে বহু যুগের স্মৃতি-মণ্ডিত হাইকোর্ট। টেম্পল চেম্বার অনেকটা বোলতার চাকের মত। তার এক একটি ঘরে একটি এটর্নি বাসা বেঁধেছে। দিনদুপুরেও তার অনেক ঘরে সূর্যের আলো ঢোকে না। ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাপ্লাই-এর বড় খদ্দের তাঁরা এবং মনের হরষে দিবসে বাতি জ্বালা সত্ত্বেও যাঁদের নিশীথে প্রদীপের অভাব হয় না। টেম্পল চেম্বারে ঢোকার পথে দেওয়ালে অসংখ্য চিঠির বাক্স। তার কোনটি চকচকে সদ্য যৌবনপ্রাপ্ত, কোনটি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যুগ হতে হয়ত বিনা প্রসাধনে পথের পাশে ডাক পিয়নের পথ চেয়ে প্রতীক্ষায় রত।

লিফ্‌টে কেমন এক সোঁদা গন্ধ। চারিদিক ব্ল্যাক আউটের রাত্রির মত। প্রাগ ঐতিহাসিক যুগের লিফ্‌ট। তিনজনের বেশী একসঙ্গে উঠতে চাইলে একেবারে স্বর্গারোহণ হতে পারে। লিফ্‌টম্যান নির্বাক, তার মাথার চুল সব শাদা, কত যুগ ধরে সে টেম্পল চেম্বারের উপরে উঠছে আর নীচেয় নামছে তার হিসেব নেই। লিফ্‌টের অপেক্ষায় অনেক রকম যাত্রী সার দিয়েছেন। কাল কোট পরা এটর্নি। কাল গাউন হাতে ব্যারিস্টার। আধা ময়লা জামা পরা এটর্নি বাড়ির বাবু, ফিনফিনে ধুতি ও মাথায় টুপি পরা দীর্ঘ বপু মারওয়াড়ী, কোন শাঁসাল মক্কেল হবেন। সবার পিছনে গরদের চাদর কাঁধে কোন বাঙালী বিধবা, হাতে হরিনামের

ঝনুলি, নিরাভরণা, কাঁচা সোনার মত রঙ, কোন জমিদার গৃহিণী হবেন। আইনের হেফাজত সামলাতে পূজো ছেড়ে এটর্নি বাড়ি আসতে হয়েছে।

সায়েবের সংগে দেখা হলো। বয়স হয়েছে। তবু সারা শরীর থেকে রক্ত যেন ফেটে পড়তে চায়, সর্বদা হাসিতে ভবা মুখ। অথচ চোখের দৃষ্টি যেন কোন সুদূরে। সারা মাথা জুড়ে টাক। কাজের সময় ভয়ানক গম্ভীর। চোখে চশমা লাগিয়ে যখন বই পড়েন, তখন কোন শব্দ সহ্য করেন না। কাজ ফুরুলে অন্য মানুষ। কাছে ডেকে গল্প করেন। জিজ্ঞাসা করেন, এটা কি জান, ওটা কি জান। যদি বলি না, বোঝাতে শুরু করবেন।

চারিদিকের দেওয়াল র‍্যাকে ঢাকা। তাতে অসংখ্য বই। ওকালতির যন্ত্রপাতি বলা যেতে পারে।

বিভূতিদা বললেন, সায়েবের ছেলে-পুলে নেই। আমরাই সব। সায়েবকে ভাল করে দেখ। আমাকে তো যেতে হবেই, বিভূতিদার চোখে জল।

ষোল বছর আগে বিভূতিদা যখন টেম্পল চেম্বারে এসেছিলেন, তখন তার বয়স কুড়ি বছর। সায়েবের সংগে প্রথমে কাজ করতে ভাল লাগেনি, ভয়ংকর খাটতে হয়। দিন নেই রাত নেই শুধু কাজ। বিভূতিদা একদিন চাকরি ছেড়ে দিল। দুদিন পরে সায়েবের সংগে দেখা। চাকরি ছেড়ে যাবে কোথায়, দুষ্টু ছেলে। বিভূতিদা ফিরে এলেন। এতো প্রভুভৃত্য সম্পর্ক নয়। এ যেন এক সংসারে বাস। ষোল বছর কেটে গেছে। বিভূতিদা সায়েবকে চিনেছে। সায়েব বিভূতিদাকে ভালবেসেছেন। সায়েব বললেন, "বিভূতি তোমার বাড়ি যাব", 'সেকি আমরা বড় নোংরা জায়গায় থাকি', 'উঁহু তবুও যাব'। সায়েব বাড়ি এসেছেন। পরনে ধুতি চাদর, বাঙ্গালীর বাড়ি বাঙ্গালী সাজে যেতে ইচ্ছে হয়েছে সায়েবের। ধুতি পরা সোজা নয়। কাপড়ের গিঁট থাকতে চায় না। তাতে কি, বেল্ট দিয়ে কাপড় পরেছেন সায়েব। শান্তিপুরি ধুতি। গরদের পাঞ্জাবী, গলায় চাদর।

ভারতবর্ষে ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ লোকেরা কোনদিন আসতে চাননি। যখন তারা কোনক্রমে এসে পড়েছেন, তাদের সংগে এখানের বড় সায়েবদের মিল হয়নি। বড় সায়েবরা পয়সা রোজগার করতে এসেছেন। এরা তাতেই সন্তুষ্ট। কিন্তু ওঁরা দেশকে জানতে চান। ভারতবর্ষকে জানতে চান। সেখানের মানুষের সাথে মিতালী পাতাতে চান। পাউণ্ড শিলিং পেন্সের হিসাব রাখতে গিয়ে তাঁরা তাঁদের আত্মাকে হত্যা করতে রাজী নয়।

সায়েবকে আদালতেও নূতন রূপে দেখেছি। আদালত অনেকের কাছে অসৎ কার্যের ঘাঁটি মনে হয়। সেখানে আইনের নামে যত অন্যায় সংঘটিত হয়। উকিলেরা মিথ্যা কথা বলেন। এটর্নিরা সুযোগ পেলে মক্কেলকে শুষতে থাকেন। কলকাতার বহু ধনী জমিদার নাকি ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে এসে সর্বস্বান্ত হয়েছেন। ভায়ে ভায়ে মকদ্দমায় দুজনেই পথে বসেছেন! মাঝখান হতে এটর্নিরা কলকাতায় বাড়ি তুলেছেন। কথাগুলি সব সময় মিথ্যা নয়। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের মাকড়সার জালে পা দিয়ে বার হওয়াও শক্ত। কিন্তু এর মাঝেও অনেক প্রকৃত মানুষ আছেন, সততা যাঁদের জীবনের আদর্শ, মিথ্যার উপর ভর করে কোন ব্যবস্থাই শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে না। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটও চলত না। টেম্পল চেম্বারও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকত না।

কালের গতিতে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সময়ের স্রোতে ব্যাংকশাল স্ট্রীট নতুন রূপ নিয়েছে। লালদীঘির আশেপাশে সব কিছু পালটিয়েছে। কিন্তু ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট চুপচাপ। এটর্নি অফিসে পুরোন কাগজের বাণ্ডিল বেড়েছে। তার কোণে কোণে ধুলো জমেছে। বাবা মারা যাবার আগে ছেলেকে অফিসে বসিয়েছেন। এমনি করে পোনে দুশ বছরের ট্র্যাডিসন গড়ে উঠেছে। সে কোন আদিকালের কথা সুপ্রীম কোর্টের সৃষ্টি হলো রেগুলেটিং এ্যাক্টে। চাঁদপাল ঘাটের কাছে জাহাজ থেকে প্রথম জজেরা নামলেন। তাঁদের

পুরোভাগে স্যার ইলায়জা ইম্পে। রাস্তায় কাতারে কাতারে লোক জমেছে। ইম্পে চমকে উঠলেন। বেশীর ভাগ লোকের খালি গা ও খালি পা। অন্য জজেদের ডেকে বললেন, 'দেখ ভাই, এদেশের লোকের গায়ে কাপড় নেই। পায়ে মোজা পর্যন্ত জোটে না। আমরা কিন্তু শাসনে শৃঙ্খলা এনে দু মাসের মধ্যে প্রত্যেককে জুতো ও মোজা পরাব।'

তারপর কত ছ মাস কেটে গেছে। এদেশের লোকদের মোজা পরাবার কথা ইম্পে সায়েব একেবারে ভুলে গেলেন। মোজা তো দূরের কথা পেটপুরে খাবারের ব্যবস্থাও হল না। ইম্পে সায়েব লোককে মোজা না পরিয়ে পুল বাঁধবার কণ্ট্রাক্টের আশায় হেস্টিংসের পিছনে ছোটাছুটি করছেন। স্যার ইলায়জা ইম্পের নতুন নামকরণ হলো পুলবাঁধা ইম্পে।

নন্দকুমারের বিচারে পুলবাঁধা ইম্পে ইতিহাসে অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করলেন। ইম্পের পিছন পিছন বিলেত থেকে আর একদল লোক এসে হাজির। সুপ্রীম কোর্টের আশেপাশে তাঁরা ঘাঁটি বসালেন। এঁরা এটর্নি। এঁরা ব্যারিস্টার। বিলেতের আইনব্যবস্থাকে এদেশে চালু করার মত কোন মহান উদ্দেশ্য ছিল কিনা জানি না, হয়ত অর্থের আকর্ষণই তাদের বাংলা দেশে টেনে আনে। কিন্তু নিজের অজান্তে ধীরে ধীরে এক গৌরবময় ট্র্যাডিসন গড়ে উঠেছে। কলকাতা বারের গর্বের ইতিহাস।

এটর্নি ও ব্যারিস্টারে দ্বৈত ব্যবস্থা অনেক দিনের পুরোন। আদিম বিভাগে মক্কেলের সঙ্গে এটর্নির প্রথম সম্বন্ধ। মামলা করতে গেলে এটর্নির কাছে যেতেই হবে। এটর্নি কেস তৈরি করে ফাইল করবেন। ব্যারিস্টারকে ব্রীফ পাঠাবেন জজের সামনে মামলা করার জন্য। ব্যারিস্টার মক্কেলের সঙ্গে সোজাসুজি কিছু করতে পারেন না, এটর্নি ছাড়া সাধারণ লোকের কাছ থেকে তাঁরা মামলা নিতে পারেন না। এটর্নি ব্যারিস্টারের এই দ্বৈত ব্যবস্থা আজও চলছে।

ইম্পের যুগে আইনের কাজ আজকের মত সোজা ছিল না। লোকে তখন আদালতকে মান্য করতে শেখেনি। জোর-যার মুলুক তার, এই মন্ত্রই বাজারে চালু। কোর্টে মামলা করেও কোন লাভ নেই। কারণ মামলা জিতলেও অপর পক্ষে আদালতের রায় মানতে রাজি নয়। আইনজ্ঞেরা বললেন, এ চলবে না। আদালতের আদেশ মানতেই হবে। একজন এসে বলল, বিহারের অমুক সায়েব টাকা ধার করেছে বহুদিন। এখন দিতে রাজী নয়। কাগজপত্র সব আছে। কাগজপত্র সব দেখে জজ আদেশ দিলেন, ম্যাকেঞ্জি সায়েবকে টাকা ফেরৎ দিতে হবে। ম্যাকেঞ্জি সায়েব কোর্টের আদেশ মানতে রাজী নন। কোর্টের সেরিফ চললেন বিহারে ডিগ্রী জারি করতে। পথিমধ্যে ছোটখাট যুদ্ধের ব্যবস্থা, ম্যাকেঞ্জি সায়েবের বরকন্দাজরা তীরধনুক, তরওয়াল, বন্দুক নিয়ে প্রস্তুত। কলকাতার সুপ্রিম কোর্টের ইম্পে সায়েব তাকে হুকুম করবেন এ-ধারণা অসহ্য। ম্যাকেঞ্জি সায়েবের অনুচরেরা হারেরে করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সেরিফের দলবল পালাবার পথ পায় না। ইম্পেও পরাজয় মানতে প্রস্তুত নন। এবারে ডিগ্রী জারি করতে সেরিফের সঙ্গে পুরো সৈন্য বাহিনী চলল। জেনারেল উড—তাঁর সৈন্য বাহিনী, প্রয়োজন হলে ম্যাকেঞ্জির সঙ্গে যুদ্ধ করবেন ও রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যের পাওনা টাকা আদায় না হওয়া পর্যন্ত ফিরবেন না।

সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন বেশী দিন হলো না। লোকে বুঝল আদালতকে মান্য করায় লাভ ছাড়া লোকসান নেই। লোকে সম্পত্তির ব্যাপারে হাতাহাতি ছেড়ে কোর্টে আসতে শুরু করল। দেশে

খুন জখমের সংখ্যা অনেক কমল। সৃষ্টি হোল এক নতুন বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, যাঁরা আইনের ব্যাখ্যা করে জীবন ধারণ করে। বিলেত থেকে এই দেড়শ বছরে অসংখ্য জজ, ব্যারিস্টার ও এটর্নি এসে কলকাতার আইন-জগতে যোগ দিলেন। পরে সুপ্রীম কোর্ট ভেঙে হাইকোর্টের সৃষ্টি হলো ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের ধারে।

পুরান ট্র্যাডিশনের স্রোতে বাধা পড়ল না। উড্‌বথ, স্যর গ্রিফিথ ইভানস, উইলিয়াম জ্যাকসনের মত আইনবিদ্‌রা যে কীর্তি রেখে গেছেন আমাদের সায়েব তার শেষ বর্তিকাবাহী। কলকাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরাজ ব্যারিস্টার, অষ্টাদশ শতাব্দীতে যার শুরু বিংশ শতাব্দীর মধ্যাহ্নে তার অবসান।

চেম্বারে বসে সায়েবের কাছে অনেক গল্প শুনেছি। বাঙলায় যাকে বলে, গল্প হলেও সত্যি। চোখের সামনে বহু লোকের জীবনে উত্থান পতনের নাটক দেখেছি। পর্দার অন্তরাল হতে অভিনয় দেখার মত। কোর্টে জজসায়েব যখন মামলা শুনতে আরম্ভ করলেন, তখন তো মনের পর্দা উঠল, কিন্তু নেপথ্যে নাটকের প্রস্তুতি কম আকর্ষণীয় নয়। রোমাঞ্চের কোন অভাব সেখানে হয় না। সেই নাটকে সায়েব গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করেছেন। ফাঁসির মঞ্চ হতে মানুষকে বাঁচাবার দায়িত্ব। দুশ্চরিত্র স্বামীর হাত থেকে স্ত্রীকে রক্ষার দায়িত্ব। লোভী আত্মীয়ের হাত হতে নাবালকের সম্পত্তি রক্ষার দায়িত্ব। বেপরোয়া সরকারী খেয়াল থেকে সাধারণকে রক্ষার দায়িত্ব। এমনকি, কোন বিশেষ দলের বা শ্রেণীর অসৎ অভিসন্ধি থেকে বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থকে রক্ষার দায়িত্ব।

ভারতবর্ষকে মন-প্রাণ দিয়ে সায়েব ভালবেসেছিলেন। এদেশের জল-হাওয়া, বেশবাস, ইতিহাস, লোকজন সবার সাথে তাঁর গভীর মিতালী। কলকাতার বহু সাধারণ সংসারে তিনি বন্ধুত্ব করেছেন, তাদের সাথে মিলেমিশে আনন্দ পেয়েছেন। তাদের দুঃখে ব্যথা পেয়ে সাহায্যের জন্য ছুটে গেছেন। ক্লাইভ স্ট্রীটের বড় সায়েবদের এই মেলামেশা পছন্দ নয়। তাঁদের মনে নানান রকম ভয়, কিন্তু তাঁদের উপদেশে কর্ণপাত না করার সৎসাহস নিয়ে ভারতবর্ষে সায়েব পদার্পণ করেছিলেন।
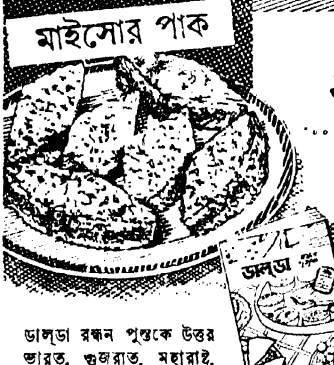
১৯৪৬ সালে রানীক্ষেত ক্লাব কেসে সায়েবের আচরণ ভুলবার নয়। রানীক্ষেত ক্লাব তখন কেবলমাত্র ইংরাজ সভ্যদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ছেচল্লিশ সালে ক্লাবের সভ্য সংখ্যা মাত্র দশ এগারজনে দাঁড়াল। অথচ ক্লাবের সম্পত্তির মূল্য প্রায় লক্ষ টাকার মত। রানীক্ষেতে শুধু শেতাঙ্গ ক্লাব রাখা অসম্ভব দেখে সভ্যরা গোপন পরামর্শে বসলেন। ক্লাব তুলে দিয়ে টাকাকড়ি নিজেদের মধ্যে ভাগ করবার মতলব হলো। সায়েব তখন রানীক্ষেত ক্লাবের একজন সভ্য। খবর পেয়ে চমকে উঠলেন। ক্লাব ভেঙে দিয়ে তার অর্থ আত্মসাৎ করার ষড়যন্ত্রে তিনি নাম লেখাতে রাজী নন। ক্লাবে ভারতীয় সভ্য নেওয়ায় কোন আপত্তি থাকা উচিত নয়। অন্য সভ্যরা সে কথায় কান দিলেন না। ক্লাব বন্ধ করার প্রস্তাব বিপুল ভোটাধিক্যে গৃহীত হলো। সায়েব মামলা দায়ের করলেন। ভারতবর্ষে ইংরেজের কলঙ্কের তালিকা বাড়াতে তিনি প্রস্তুত নন। অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রয়োজন। দীর্ঘদিনের মামলায় নিজে খরচ করলেন ক্লাবকে ভারতবর্ষের জন্য রক্ষা করতে। অবশেষে এলাহাবাদ হাইকোর্ট সায়েবের পক্ষে রায় দিলেন। রানীক্ষেত ক্লাব ভারতীয়দের কাছে উন্মুক্ত হলো। রক্ষা পেল অকাল মৃত্যুর হাত হতে।

আদালতের কথায় ফিরে আসি। পর্দার অন্তরালে যত বিচিত্র ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছি তাদের অনেকের কাছে উপন্যাসও হার মানে। দৈনিক কাগজের আইন ও আদালতের পৃষ্ঠায় তার কতটুকু পরিচয় মেলে।

আমি বিখ্যাত বিচার কাহিনী লিখতে বসিনি। আমি যাদের কথা বলব তাদের কেউই কাগজের হেডলাইনে স্থান পায়নি, তবুও বিখ্যাত বিচার কাহিনীর সাথে ওল্ড পোস্ট অফিসে যারা নীরবে এসে বিদায় নিল, তারাও আমার মনে ভিড় করে রয়েছে।

সময়ের টানে সায়েবও বিদায় নিয়েছেন পৃথিবী থেকে। ঘটনার স্রোতে আমিও ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট হতে বহু দূরে সরে গেছি। তবুও স্মৃতির রোমন্থনে আনন্দ পাই। টেম্পল চেম্বারে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে ও হাইকোর্টে যাদের দেখেছি, তারা মনের মাঝে ভিড় করে দাঁড়ায়। কত বিচিত্র মুখ মনে পড়ে যায়, তাদেরই ক'জনকে পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় পরিচয় করিয়ে দিতে চাই আপনাদের সঙ্গে।

টিপু সুলতান

অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
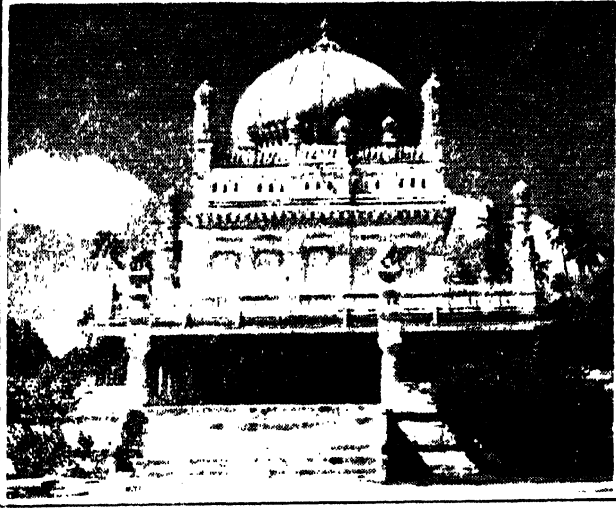
গান্ধীজী যখন ১৯৪২ সালে ইংরেজকে বললেন "কুইট ইন্ডিয়া" তখন আসমুদ্র হিমাচলের অভিপ্রায় মাত্র দু'টি কথায় ব্যক্ত হয়েছিল। গান্ধীজীর কালের দেড়শো দুশো বছর আগে, ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের বনিয়াদ মজবুত হবার সময়ে, মহারাজ রণজিৎ সিং, নানা ফরনবিশ, ঝাঁসির রাণী, হায়দর আলি, টিপু সুলতান প্রমুখ দেশপ্রেমিক এই আগন্তুক-বিদায়ের প্রয়োজনটা যে বিশেষভাবে অনুভব করেছিলেন তার বিস্তৃত ঐতিহাসিক প্রমাণ রয়েছে। দুই শতাব্দীব্যাপী ব্রিটিশ বিতাড়নের এই বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের নাম সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য এইজন্য যে ইংরেজের সঙ্গে পাঞ্জা লড়বার তাকত তাঁদেরই সম্ভবত সবচেয়ে বেশী ছিল এবং এ-ক্ষমতার তাঁরা যথাশক্তি সদ্ব্যবহারও করেছিলেন। আঠারো শতকের শেষার্ধে হায়দরের অশ্বারোহী বাহিনী বা টিপুর বিশাল সামরিক শক্তির সঙ্গে এককভাবে এঁটে উঠতে পারে এমন কোনো প্রতিপক্ষ তৎকালীন ভারতবর্ষে ছিল না; মারাঠারাও না, ইংরেজ ত নয়ই। তবু কৌশলী ইংরেজের কাছে মহীশূরের পরাজয়ে বিস্মিত হবার কিছু নেই এইজন্যে যে, আমাদের চিরকালের ঘরোয়া অনৈক্যের অভিশাপ সমসাময়িক দাক্ষিণাত্যের দুই শ্রেষ্ঠ শক্তি, নিজাম ও মারাঠা, টিপুর বিরুদ্ধে ইংরেজকে সাহায্য করেছিলেন। এরকম না হলে ফলাফল যে অন্য রকম হতে পারত, সেকথা ভেবে আজ আর কোনো লাভ নেই।

হায়দর আলির আগে মহীশূরের খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে এক রাজপাশে কেউ বেঁধে দিতে সক্ষম হয়নি। পঞ্চম থেকে একাদশ শতক অবধি এ অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তে কদম্ব, গঙ্গ ও চালুক্যবংশের প্রতাপের চিহ্ন আজ মুষ্টিমেয় কয়েকটি শিলালিপিতে পর্যবসিত। তারপরে, হয়শালা শক্তির সমৃদ্ধির যুগে, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে নির্মিত হালেবিড়, বেলুড় ও সোমনাথপুরের মন্দিরগুলি কি স্থাপত্যে কি শিল্পকলায় আজও ভারতবর্ষের অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবালয়। এর পরে, বিজয়নগর সাম্রাজ্যের গৌরবের দিনে, আর এক সুবর্ণ যুগ গেছে এ অঞ্চলের। হাম্পি ও বিজয়নগরের ধ্বংশাবশেষের মধ্যে সে সুদিনের বার্তা আজও কেঁদে বেড়ায়। আঠারো শতকের প্রারম্ভে পলেগার ও নায়কবংশীয় হীনবল নরপতিরা মহীশূরের বিভিন্ন অংশ শাসন করে গেছেন; বেদনূর ও চিতলদ্রুগের অধিপতি ছাড়া তাঁদের মধ্যে আর কেউই উল্লেখযোগ্য নন। এ দুজন ছাড়া কালক্রমে আর সকলেই মহীশূরের ওডিয়ার বংশীয় নরপতিদের কছে পরাজিত হন ও ১৭০৪ খৃষ্টাব্দে চিক্ক দেবরাজ ওডিয়ারের মৃত্যু সময়ে তাঁর রাজ্যের আয়তন হয় বর্তমান মহীশূরের প্রায় অর্ধেক। এই শেষোক্ত নরপতির প্রতাপ এতদূর বিস্তৃতিলাভ করে যে স্বয়ং ঔরঙ্গজেব তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবার আয়োজন করেন। কৌশলী চিক্ক দেবরাজ অবিলম্বে মোগল বাদশাহের সঙ্গে মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ হয়ে রাজ্যরক্ষা করেন, কিন্তু তাঁর তরবারি ও বিচক্ষণতার দৌলতে যে বিস্তীর্ণ রাজ্য তিনি সৃষ্টি করেছিলেন, অযোগ্য উত্তরাধিকারীদের হাতে পড়ে তা নষ্ট হতে আরম্ভ করে। মারাঠা ইতিহাসে শিবাজীর ক্ষেত্রেও আমরা এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি দেখতে পাই। চিক্ক দেবরাজের মৃত্যুর পর প্রধান সেনাপতিরাই ক্রমে ক্রমে সর্বেসর্বা হয়ে বসেন ও ১৭৩৩ খৃষ্টাব্দে এ বংশের শেষ নরপতির উত্তরাধিকারীহীন অবস্থায় মৃত্যু হলে, দলবাহী বা প্রধান সেনাপতিই বাস্তবিকপক্ষে রাজা নির্বাচন করতে শুরু করেন। এই বিশৃঙ্খলার সময়ে মহীশূরের ভাগ্যাকাশে যে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কর্মঠ পুরুষটির আবির্ভাব হয়, তাঁর নাম হায়দর আলি। মহীশূরের অশ্বারোহী বাহিনীতে সামান্য সৈনিক হিসাবে জীবন আরম্ভ করে অসাধারণ কর্মকুশলতার গুণে হায়দর আলি প্রধান সেনাপতির পদে উন্নীত হন। অতঃপর মহীশূর রাজ্যের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করতে তাঁকে বেগ পেতে হয়নি। অযোগ্য ওডিয়ার বংশের পূর্বাপর নৃপতিদের নাম আজ আর কারো মনে নেই। কিন্তু হায়দর আলি বা টিপু সুলতানের নাম ভারত-ইতিহাসে চিরকাল সগৌরবে কীর্তিত হবে।

টিপ্রর উপাসনাগৃহ 'মসজিদ-ই-আলা'

মহীশ্রেরর সর্বময় ক্ষমতা করায়ত্ত করবার পর হায়দর আলির রাজ্য-বিস্তারের কাহিনী নিরবিচ্ছিন্ন জয়ের ইতিহাস না হলেও তাঁর মত নিরক্ষর এক সেনাপতির পক্ষে যে বিশেষ গৌরবের তাতে সন্দেহ নেই। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে হায়দরের চমকপ্রদ জীবনী বিস্তৃতভাবে আলোচনা করবার অবকাশ না থাকলেও একথার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, মাত্র বিশ বৎসর বয়সে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দ থেকে তাঁর মৃত্যু সময় ১৭৮২ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, হায়দরের বিজয়ী তরবারি উত্তরে কৃষ্ণা, দক্ষিণে ত্রিবাঙ্কুর-তিনেভেলীর সীমা ও প্র্ব-পশ্চিমে 'বঙ্গোপসাগর ও আরবসাগরকে স্পর্শ করেছিল। স্থানীয় নরপতিদের অধীনে এরকম বিস্তৃত রাজ্যের তুলনা দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে বিরল। মৃত্যুকালে হায়দরের মনে এ সান্ত্বনা নিশ্চয়ই থেকে থাকবে যে, টিপ্র সুলতান বয়সে নবীন হলেও তাঁর কষ্টার্জিত রাজত্বের যোগ্য উত্তরাধিকারীই হবেন। মাত্র দশ বছর বয়স থেকেই টিপ্র সুলতান পিতার অগণিত যুদ্ধযাত্রার নিরন্তর সঙ্গী হবার গৌরবলাভ করেছিলেন এবং বত্রিশ বছর বয়সে মহীশ্রেরর শাসন কর্তৃত্ব যখন তাঁর হাতে আসে, তখন রাজনৈতিক বিচক্ষণতায় বা অকুতোভয় সৈনাপত্যে তিনি যে হায়দর আলির থেকে কোনো অংশে হীন ছিলেন না একথা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকমাত্রই স্বীকার করেছেন।

দাক্ষিণাত্যে ইংরেজের রাজ্য বিস্তারের পথে প্রধান বাধা ছিল হায়দর-টিপ্রর এই সামরিক প্রতাপ। আর এক উপসর্গ যুক্ত হয়েছিল সেই সঙ্গে—মহীশ্রে ও ফরাসী শক্তির মিত্রতা। ব্রিটিশ কূটনীতিকও এ-সম্ভাবের হানি করতে পারেনি কখনও। ফরাসী সেনাপতিদের অধীনে আধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রে সুশিক্ষিত টিপ্রর লক্ষাধিক সৈন্য শুধু দাক্ষিণাত্যে কেন, ভারতের যে কোনো প্রান্তে ইংরেজ রাজত্বের সর্বনাশের কারণ হতে পারে এ-দুশ্চিন্তায় ব্রিটিশ-রাজের চোখে ঘুম ছিল না। অতএব ছলে বলে কৌশলে টিপ্রর সামরিক শক্তিকে খর্ব করবার চেষ্টা শুরু হল।

১৭৬৭-৬৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম মহীশ্রে যুদ্ধের উদ্যোগপর্বে, দাক্ষিণাত্যের দুই শ্রেষ্ঠ শক্তি নিজাম ও মারাঠাদের হাত করে যেরকম এলাহিভাবে ইংরেজ-শিবির সন্নিবিষ্ট হয়েছিল তাতে হায়দর আলি একক যুদ্ধে পেরে উঠতেন কিনা সন্দেহ। কিন্তু নিরক্ষর হায়দর আলির কূটনৈতিক বিচক্ষণতায় আপৎকালে ইংরেজ মিত্র-শক্তির কাছে সামান্য সাহায্যই পেলেন। এদিকে মহীশ্রেরর দুর্ধর্ষ অশ্বারোহী বাহিনী উল্কাগতিতে ইংরেজের প্রধান ঘাঁটি মাদ্রাজ শহরের উপকণ্ঠে এসে উপস্থিত হল। অতিশয় অবমাননাকর শর্তে সন্ধি করে ইংরেজরা সে যাত্রা রক্ষা পেলেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দে ব্রিটিশ সৈন্য মালাবার উপকূলে মাহে দখল করবার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মহীশ্রে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠে। হায়দর এযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করলেও টিপ্রই বিপক্ষের নামজাদা সেনাপতি জেনারেল বেইলী ও জেনারেল ব্রেথওয়েটকে বন্দী করে আনলেন। ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন ব্রিটিশ অধিকৃত বহু অঞ্চল মহীশ্রেরর সৈন্যরা দখল করে নিয়েছে। মহীশ্রেরর হাতে এভাবে বারংবার পরাজিত হয়ে ইংরেজ পক্ষ কূটনীতির আশ্রয় নিলেন। ফলে, ১৭৯১-৯২ সালের তৃতীয় মহীশ্রে যুদ্ধে ব্রিটিশ পক্ষে সক্রিয়ভাবে যোগ দিলেন মারাঠা ও

নজাম। অমিতবিক্রমে যুদ্ধ করেও প্রবলতর াক্তির সামনে টিপু সুলতান পশ্চাদপসরণ রতে বাধ্য হলেন। এক গ্লানিকর সন্ধিতে াজত্বের অর্ধেক গেল বিপক্ষের হাতে। ামিন হিসেবে টিপুর দুটি ছেলেকেও ্রিটিশের কাছে সমর্পণ করতে হল। হীন-ল টিপু সুলতানের উপর ইংরেজ শেষ াঘাত হানলেন ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে। নিজাম সন্যের সহায়তাপুষ্ট শক্তিশালী ব্রিটিশ ফৌজ ৪ঠা মে তারিখে ভয়ংকর যুদ্ধের র রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনের দুর্গ অধিকার রে নিলে। সম্মুখ-যুদ্ধে বীরের মৃত্যু রণ করলেন টিপু।

টিপুর পতনের পর বিজয়ী ইংরেজ বস্তীর্ণ মহীশূর রাজ্যকে এমনভাবে ভেঙেচুরে দিলেন যাতে ভবিষ্যতে অঞ্চলে কোনো দেশীয় শক্তি এককভাবে া বিদেশীর সাহায্যে আর মাথা না তুলতে ারে। অধিকাংশ এলাকা, বিশেষ করে মুদ্রতীরবর্তী প্রদেশগুলি এল ব্রিটিশের াসদখলে। নানাবিধ শর্তের বিনিময়ে শম্বদ নিজাম ও ওডিয়ারেরা সামান্য যে অংশগুলি পেলেন উদ্যত প্রহরীর মত সগুলির চারিদিক ঘিরে রইল ব্রিটিশের াসদখলী এলাকা। সমুদ্রপথে মালাবার উপকূলে এসে ফরাসী সমরোপকরণ একদা অবাধে মহীশূর রাজ্যে প্রবেশ করতে পারত। এ ভুলের যাতে আর পুনরাবৃত্তি না ঘটে, ইংরেজ তার পাকা বন্দোবস্ত করলেন। ইংরেজের মহীশূর বিজয় সমাপ্ত হল।

হায়দর-টিপুর উত্থান-পতনের এই সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। মহীশূর থেকে শ্রীরঙ্গপত্তনগামী বাসের জানালায় মাথা রেখে এ-ইতিহাসেরই রোমন্থন করছিলুম মনে মনে। সহসা সিরাজউদ্দৌলার কথা মনে হওয়াতে হাসি পেল আমার। কী অবান্তর সব চিন্তাই না মাথায় আসে এক এক সময়ে।

টিপু সুলতানের মৃত্যু কাহিনী মনে পড়ল।......শেষ মহীশূর যুদ্ধে শক্তিশালী ব্রিটিশ ফৌজ কাবেরীর দুই জলধারা-বেষ্টিত শ্রীরঙ্গপত্তন দ্বীপে টিপুর দুর্গ অবরোধ করেছেন। তিন সপ্তাহকাল অবিরল গোলাবর্ষণের পরও আক্রমণকারীরা শ্রীরঙ্গপত্তন দ্বীপের সূচ্যগ্র পরিমাণ ভূমিও দখল করতে পারলেন না। ইতি-

রঙ্গনাথ মন্দিরের গোপুরম

মধ্যে মূল ভূখণ্ডে শত্রুশিবিরের পেছন থেকে টিপুর অশ্বারোহী গেরিলাবাহিনী অবিরত আক্রমণ চালিয়ে যেতে লাগল আর অমিতবিক্রমে দুর্গ রক্ষা করতে লাগলেন স্বয়ং টিপু সুলতান। প্রত্যক্ষদর্শী ব্রিটিশ সৈন্যদের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, এ সময়ে কি রাত্রি কি দিন দুর্গপ্রাকারের সর্বত্র সৈন্য পরিচালনা করে ফিরতে দেখা গেছে টিপুকে। অবশেষে ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দের ৩রা মে, সারাদিন একাদিক্রমে গোলাবর্ষণ করে দুর্গের উত্তর-পশ্চিম কোণে অনেকখানি দেওয়াল ভেঙে ফেললে ব্রিটিশ গোলন্দাজরা। ৪ঠা মে, দুপুর একটায়, ওপারের অরণ্য থেকে ভীমবেগে বার হয়ে কাবেরীর অগভীর জলস্রোত অতিক্রম করে হাজার হাজার ব্রিটিশ সৈন্য হুমড়ি খেয়ে পড়ল সেই ফাটলের গোড়ায়। উদ্যত অসি অনেকেরই থেমে গেল মাঝপথে; তাদের রক্তরঞ্জিত মৃতদেহ কাবেরীর নীল স্রোতে ভেসে গেল বহু দূরে। বিপক্ষের মরিয়া পদাতিক বাহিনীকে তবু থামান গেল না। সমস্ত সকাল সৈন্য পরিচালনা করে টিপু তখন প্রাসাদে আহারে বসেছিলেন। অপ্রত্যাশিত আক্রমণের সংবাদে তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে এসে যুদ্ধের কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন। অতি

টিপ্পুর যুদ্ধক্ষত মৃতদেহ এখানে পাওয়া যায়

ভয়ঙ্কর হাতাহাতি যুদ্ধে দু পক্ষেরই সৈন্য ক্ষয় হতে লাগল। অবশেষে ইংরেজ সৈন্য ফাটলের মুখ দখল করে প্রাকার বরাবর দু'দিকে অগ্রসর হতে লাগল। দেহের তিন জায়গায় বুলেট বিদ্ধ হয়েছে টিপ্পুর; তবু ঘোড়া ছুটিয়ে তিনি বিপন্ন প্রাকারের দিকে এসে পৌঁছলেন। কাবেরীর জল-আহরণের জন্য "ওয়াটার গেট" নামে এখানে যে তোরণটি ছিল তার কাছাকাছি এসে পলায়নপর অগণিত সৈন্যের বিশৃঙ্খলায় টিপু আর অগ্রসর হতে পারলেন না। অবিরত রক্তমোক্ষণের ফলে টিপু অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন দেখে দু'একজন দেহরক্ষী যারা সঙ্গে ছিল তাকে ধরাধরি করে এক পালকির ভেতর শুইয়ে দিলে। কিন্তু সেই ঘোর বিশৃঙ্খলায় শিবিকা বহন করে প্রাসাদে নিয়ে যাওয়া আর সম্ভব হল না। ইতি-মধ্যে ইংরেজ সৈন্য চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে লুঠতরাজ শুরু করে দিয়েছে। মৃতপ্রায় টিপ্পুর শিবিকার কাছে এসে দাঁড়াল এক ব্রিটিশ পদাতিক। লোভাতুর হাতে ছিনিয়ে নিতে গেল মহীশূররাজের মণি-মুক্তাখচিত কটিবন্ধ। আহত ব্যাঘ্রের দেহ স্পর্শ করল অশুচি শৃগাল। শিবিকার বাইরে এসে প্রাণপণ শক্তিতে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন টিপু সুলতান; তারপরে বহু রণজয়ী শাণিত তরবারি শেষবারের মত ঝলকিত হল তাঁর মুমূর্ষু হাতে গুরুতরভাবে আহত পদাতিকটি প্রতিশো[ধ] নিতে কার্পণ্য করলে না। দু' গজ দূ[র] থেকে নিক্ষিপ্ত একটি বুলেট টিপ[ু] সুলতানের মস্তিষ্ক ভেদ করে বার হ[য়ে] গেল।......

সেইখানে অগণিত বীরের মৃতদেহে[র] মধ্যে টিপুর শবও পড়ে রইল রা[ত্রি] অবধি। মহীশূর বাহিনীর অসংখ্য সাধার[ণ] সৈনিক আর মহীশূর রাজ্যের সর্বম[য়] অধীশ্বর একই ধূলিশয্যায় একত্রে শে[ষ] নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। সেনাপতির পক্ষে এর চেয়ে কাম্য মৃত্যু আর কি হ[তে] পারে! প্রহার-জর্জরিত কত গৌরবে[র] এই অকুতোভয় মৃত্যু! পলাশীর যুদ্ধে দেশীয় সৈন্যদের যে-কয়জন সিরাজে[র] পক্ষে সত্যিকারের লড়াই করেছিল, তাদে[র] সংখ্যা বোধ করি আঙুলে গোনা যায়। আর শ্রীরঙ্গপত্তনের শেষ যুদ্ধে প্রা[ণ] দিয়েছিল অন্তত আট হাজার মহীশূ[রী] সৈনিক। রণক্ষেত্রে সেনাপতির আদর্শেই সৈন্যদল অনুপ্রাণিত হয়ে থাকে। সেখানেই যখন এই আকাশ-পাতাল তফাৎ, তখন এই দুই যুদ্ধে হতাহতের সংখ্যায় যে তার[তম্য] থাকবে তাতে আর বিচিত্র কি!

গভীর রাত্রে মশালের আলোয় সন্ধান করে করে ব্রিটিশ সৈন্যাধ্যক্ষেরা টিপুর মৃতদেহ আবিষ্কার করলেন। পরদিন সামরিক সম্মানের সঙ্গে হায়দরের কবরের পাশে মহীশূরের শেষ স্বাধীন নৃপতির মৃতদেহ সমাহিত করা হল। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরাও বর্ণনা করেছেন যে, টিপুর শবাধারে প্রণতি জানাবার জন্য ব্যথিত হৃদয় আবালবৃদ্ধবণিতা কাতারে কাতারে সেদিন সমবেত হয়েছিলেন শ্রীরঙ্গপত্তনের রাজপথে। আর শেষকৃত্য সমাপ্ত হবার পরেই এক প্রলয়ঙ্কর ঝড়ে ব্রিটিশ বাহিনীর দুজন সেনানায়ক ও জনকয়েক সৈন্য নাকি বজ্রপাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। বজ্র, বায়ু, অগ্নি, প্লাবন প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনাগুলির সঙ্গে দুর্বল মানুষের আশা নৈরাশ্য দুঃখসুখ অনুরাগ অথবা বিরাগের কোনও দৈব সম্পর্ক রয়েছে, একথা আধুনিক চিন্তা-সম্মত নয়। অরণ্যচারী আদিবাসী কোনো কোনো জাতিই শুধু এখনও এ-ধারণার বশবর্তী। তবু একথা ভাবতে ভাল লাগে

য়, অমিততেজা এই বীরের মৃত্যুতে প্রকৃতিদেবীও বুঝি সেদিন ক্ষুব্ধা হয়েছিলেন।......

বাস কখন এসে যে আমার গন্তব্যস্থানে পৌঁছেচে খেয়ালই করিনি। বাঁহাতি শ্রীরঙ্গপত্তন দুর্গের প্রধান ফটক। তাড়াতাড়ি নেমে এলুম। পূর্ববাহিনী কাবেরীর জলস্রোত দুই পৃথক ধারায় প্রবাহিত ও পুনর্মিলিত হয়ে তিন মাইল দীর্ঘ ও মাইলখানেক প্রস্থ যে দ্বীপটির সৃষ্টি করেছে এখানে তারই পশ্চিমপ্রান্তে সুদৃঢ় রক্ষাব্যূহের অভ্যন্তরে টিপু সুলতানের একদা-বিখ্যাত দুর্গ। পরিখার জল আজ শুকিয়েছে, প্রাকারের ইঁট-পাথর ভেঙে গড়িয়ে পড়ছে চারিদিকে। টিপুর মৃত্যুর পর ইংরেজ এ-দুর্গ ব্যবহার করেনি; তাদের সেনানিবাস স্থাপিত হয়েছিল বাঙ্গালোরে। মাত্র দেড়শো বছরের অবহেলায় দক্ষিণ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সামরিক সৌধ আজ প্রায় পুরাকীর্তির পর্যায়ে এসে পৌঁছেচে।

শ্রীরঙ্গপত্তন দ্বীপের অধিকাংশ এলাকাই দুর্গপ্রাকারের বাইরে। মহাসমৃদ্ধিশালী এক রাজধানীর প্রাণচাঞ্চল্য সমস্ত দ্বীপ জুড়ে একদা ব্যাপ্ত ছিল। আজ দুর্গের ভেতরে সামান্য একটু লোকালয় আর খানকয়েক দোকানপাট ছাড়া বাকি সব শ্মশান হয়ে গেছে। অমন যে হায়দর-টিপুর সুরম্য প্রাসাদ তার চিহ্নমাত্র নেই। দুর্গ অঞ্চলে দ্রষ্টব্যের মধ্যে টিপু সুলতানের বিখ্যাত উপাসনাগৃহ "মসজিদ-ই-আলা" আর রঙ্গনাথ স্বামীর প্রাচীন মন্দির। কিংবদন্তী এই যে, পুরাকালে গৌতম ঋষি ভগবান রঙ্গনাথের আরাধনা করেছিলেন এখানে আর নবম শতকের শেষ দিকে গঙ্গরাজারা নাকি রঙ্গনাথ স্বামীর সাবেক মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। সেই থেকে এ-দ্বীপের নাম হয় শ্রীরঙ্গপুরম যা পরবর্তীকালে সামান্য পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় শ্রীরঙ্গপত্তনে। মন্দিরটির অটুট অবস্থা দেখে এ ধারণা হওয়াই স্বাভাবিক যে, এটি বারংবার সংস্কৃত হয়েছে। অন্তত হায়দর-টিপুর আমলে এটির যে কোনো ক্ষতি করা হয়নি তার প্রমাণ অতিশয় স্পষ্ট। অথচ ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরা হায়দর আলি ও টিপু সুলতানের হিন্দু-বিদ্বেষের বর্ণনা করতে গিয়ে যেসব রোমহর্ষক কাহিনীর অবতারণা করেছেন, তাতে সরলবিশ্বাসী পাঠক হয়ত স্তম্ভিত হবেন। টিপুর লুপ্ত প্রাসাদের অদূরে রঙ্গনাথ-মন্দিরের সুউচ্চ গোপুরমটির দিকে তাকিয়ে আমার মনে হল, এই মিথ্যার বিরুদ্ধে একটা বলিষ্ঠ প্রতিবাদ যেন আকাশে মাথা তুলে সগৌরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

প্রসঙ্গক্রমে, আর এক অপবাদের আলোচনা এখানে করা যেতে পারে। বহুগুণে ভূষিত হলেও হায়দর আলি যে নিরক্ষর ছিলেন তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু সুশিক্ষিত টিপুকেও ইংরেজ ঐতিহাসিকেরা যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তাতে শিক্ষাদীক্ষার সঙ্গে যে তাঁর কিছুমাত্র সম্পর্ক ছিল একথা মনে করাই দুষ্কর। অথচ টিপুর মৃত্যুর পর তাঁর যে গ্রন্থাগার ইংরেজের দখলে আসে তাতে কোরান ও কোরানভাষ্য, ধর্মতত্ত্ব, দর্শন, সুফীবাদ, আইন, গণিত, পদার্থবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, অক্ষরবিদ্যা, ইতিহাস ও কবিতার যে অসংখ্য পুস্তক সংগৃহীত ছিল, এ-তথ্য সমসাময়িক ঐতিহাসিকেরাই লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন।

দুর্গের ভিতরে অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে একেবারে পশ্চিম সীমানায় ব্রিটিশ ফৌজ যেখানে ভগ্ন-প্রাকারের মধ্য দিয়ে প্রবেশ করেছিল সেখানে আছে এক স্মারক-স্তম্ভ; নির্মাণ করিয়ে দিয়েছেন মহীশূরে সরকার। আর আছে অসংখ্য স্মৃতি-বিজড়িত "ওয়াটার গেট" আর নিকটেই টিপুর মৃতদেহ যেখানে পাওয়া গিয়েছিল সে-স্থানটিকে চিহ্নিত করবার জন্য নিরাভরণ এক প্রস্তর-ফলক। হায়দর-টিপুর সমস্ত স্মৃতিচিহ্নের মধ্যে এই শিলালিপিটিই সবচেয়ে অকিঞ্চিৎকর। তবু এর একপাশে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলুম বহুক্ষণ। আমার উদাস দৃষ্টির সামনে দিয়ে ১৭৯৯ খৃস্টাব্দের ৪ঠা মে'র ঘটনাগুলি যেন মিছিলের মত পার হয়ে গেল।.........

দুর্গের বাইরে, পূর্বদিকে, বিস্তৃত এলাকা জুড়ে টিপুর প্রমোদ উদ্যান, দরিয়া-দৌলৎবাগ। গিল্টি ও বহুরঙের কারুকার্যে সুসজ্জিত এই দ্বিতল প্রাসাদটিতে টিপু সারাদিন রাজকার্যে ব্যাপৃত থাকতেন; আর সন্ধ্যার পরে চলে যেতেন দুর্গের ভিতরের সুরক্ষিত প্রাসাদে। বিস্তীর্ণ বাগিচায় যেসব দুষ্প্রাপ্য ফলফুলের গাছ এখনও জীবিত আছে, তারা টিপুর চরিত্রের আর একটি দিকে সম্ভবত আলোকপাত করে। দিল্লী, লাহোর, কাবুল, কান্দাহার থেকেই শুধু নয়, সুদূর তুরস্ক, ইস্পাহান ও ম্যাডাগাস্কর থেকেও গাছপালা এনে রোপণ করা হয়েছিল এখানে।

দরিয়া-দৌলৎ-বাগের গা ঘেঁষে সিধা সড়ক গেছে দু' মাইল দূরে লালবাগে—হায়দর-টিপুর কবরে। প্রবেশপথের দু' ধারে সুদৃশ্য ঝাউগাছের সারি; পথের শেষে সাদা গম্বুজওয়ালা স্মৃতিসৌধ, শ্বেতপাথরে তৈরি বলে ভ্রম হয়। সংলগ্ন বাগানে দুষ্প্রাপ্য বৃক্ষরাজির সমারোহ, আর তাদের শীতল ছায়ায় অসংখ্য সমাধি। টিপুর আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব চির-নিদ্রায় নিদ্রিত রয়েছেন এখানে। স্মৃতি-সৌধের অন্ধকার কক্ষে যখন প্রবেশ করলুম, শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে এল। ঝালর দেওয়া চাঁদোয়ার নীচে মখমলে-ঢাকা পাশাপাশি তিনটি কবর—হায়দর আলি, টিপুর মা ফকরু-উন্নিসা সেদানি বেগম ও টিপু সুলতানের অন্তিম অবশেষ। ভারত-ইতিহাসের এক গ্লানিকর অধ্যায়ে যে দুই প্রাতঃস্মরণীয় বীর আমাদের নির্বীর্য মেরুদণ্ডে কিঞ্চিৎ বল সঞ্চয়ের চেষ্টা করেছিলেন, তাঁদের উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি রেখে নীরবে বার হয়ে এলুম।......

দু' মাইল দূরে বাস-চলাচলের প্রধান সড়কে ফিরে আসছি নতমস্তকে। রাশি রাশি অসংলগ্ন চিন্তা এসে ভিড় করছে। লালবাগের এলাকা ছাড়াতেই হঠাৎ বাঁহাতি নজরে পড়ল কয়েক সারি ছোট ছোট কবর। কোনোটির ক্রুশ-চিহ্ন ভেঙে পড়েছে, কোনোটির বা পড়েনি। মহীশূরে যুদ্ধে নিহত ইংরেজ সৈনিকেরা হায়দর-টিপুর সমাধির গা ঘেঁষে শেষ আশ্রয় পেয়েছে এইখানে। জীবিতকালে পরস্পরের টুঁটি চেপে ধরবার জন্য হানাহানি করেছিল যারা, সহোদর ভাইয়ের মত এখন পাশাপাশি শুয়ে আছে মৃত্তিকা-শয্যায়। কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম। একটি সমাধি ফলকে চার ছত্রের একটু কবিতা।

ভাষান্তরিত করলে এই রকম দাঁড়ায়ঃ

পথিক চরণ! ক্ষণেক বিরতি মাগি,
আজ তুমি যাহা আমিও ছিলাম তাই;
কাল তুমি হবে সম-পরিণতিভাগী,
সময় থাকিতে প্রস্তুত হও ভাই!

মহীশূরের বাস ধরে যখন শ্রীরঙ্গপত্তন ত্যাগ করলুম তখনও এ-কবিতার একটি চরণ থেকে থেকে বাজতে লাগল আমার মনে—কাল তুমি হবে সম-পরিণতি-ভাগী, কাল তুমি হবে সম-পরিণতি-ভাগী।......

কাবেরীর সেতু পার হয়ে সিধা সড়কে বাস মোড় ফিরল। কাবেরীর নীল জ[...] আজ আর এতটুকু রক্তের চিহ্ন নেই। অ[...] দু'ধারের দিগন্তবিস্তৃত মাঠে নতুন ধা[...] শীষ মৃদু হাওয়ায় মাথা দোলাচ্ছে যে[...] দুলিয়েছে আবহমানকাল।......

[আলোকচিত্র লেখক কর্তৃক গৃহীত]

চিত্রগুপ্ত

মাদ্রাজে সম্প্রতি তিনটি চিত্রপ্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়েছে। প্রথমটি প্রগ্রেসিভ পেইণ্টার্স এসোসিয়েশনের উদ্যোগে মাদ্রাজ সরকারি কারুশিল্প বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয় এবং "ইউসিস"-এর পরিচালক জেমস্ ভিনসেণ্ট জয়াস এর উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয়টি ফ্রেণ্ডস্ অ্যালায়েন্সের উদ্যোগে মিউজিয়াম সেণ্টিনারী হলে অনুষ্ঠিত হয় এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি এবং সংগীত নাটক একাডেমির সভাপতি শ্রী পি ভি রাজমান্নার উদ্বোধন করেন। তৃতীয়টি কালু ব্রাদার্স আর্ট গ্যালারীর উদ্যোগে রাজাজী হলে অনুষ্ঠিত হয় এবং মাদ্রাজ রাজ্য সরকারের কৃষিমন্ত্রী শ্রী এম ভক্তবৎসলম্ উদ্বোধন করেন।

মাদ্রাজের প্রখ্যাত শিল্পী ও ছাত্র-শিল্পী সব মিলিয়ে প্রায় একশত জনের অঙ্কিত চিত্র, প্রাচীরচিত্র, প্রচ্ছদপট, ভাস্কর্য প্রভৃতি প্রথম প্রদর্শনীটিতে স্থান পায়। তৈল, জল রং, টেম্পারাকে মাধ্যম হিসাবে শিল্পীরা গ্রহণ করেছেন। বিষয়-বস্তুর মধ্যে স্থানীয় পল্লীজীবনের জীবন-যাত্রা, নদী সমুদ্র, পাহাড় প্রভৃতির প্রাকৃতিক দৃশ্য, পশুপাখী, শহরের জীবনযাত্রা, দেবদেবীর লীলা, শিশুজীবনের নানা খেলা, শ্রমিক ও কৃষকের জীবনযাত্রা, অঞ্চলের নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী প্রভৃতি চিত্রে স্থান পেয়েছে। বেশীর ভাগ চিত্রেই বিদেশীয় অঙ্কন-রীতিপদ্ধতির ধারা এবং নানা ধরনের বিচিত্র পরীক্ষণের প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল। তবে, খুবই আনন্দের বিষয় যে, সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রথায় অঙ্কিত অনেক শিল্পীর চিত্রকেই এখানে স্থান দেওয়া হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে কলকাতা বা মাদ্রাজে কোনও চিত্র-প্রদর্শনীতেই একসঙ্গে অনেক শিল্পীর এত ভারতীয় প্রথায় অঙ্কিত চিত্র স্থান পায়নি। বোম্বাই, কলকাতা ও দিল্লীর আধুনিক চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ভারতীয় প্রথার বিরুদ্ধে একটা চাপা আন্দোলন অনেকদিন হতেই ফল্গুধারার মত প্রবাহিত আছে। এই আন্দোলন হ'তে মাদ্রাজ শিল্পজগৎ অনেকটা মুক্ত এই প্রদর্শনী হ'তে তার কিছুটা প্রমাণ পাওয়া যায়।

সম্মিলিত প্রদর্শনীর সাধারণত যে সব দোষ থাকে তা এখানেও আছে। প্রদর্শিত রচনার আধিক্য এত বেশী যে চিত্রের মাঝে একরকম ফাঁক নেই বললেই চলে এবং উল্লেখযোগ্য চিত্র এমন স্থানে স্থাপিত হয়েছে যে না দেখালে চোখে পড়ার কোনও সম্ভাবনাই নেই। উদ্যোক্তারা একটু সতর্ক হলে দুর্বল রচনা ব'লে অনেক চিত্রই বাদ দিতে পারেন।

ভাস্কর্য বিভাগে খ্যাতনামা ভাস্কর শ্রী এস ধনপালের রচনা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর "মা ও ছেলে", "এস্ রাধাকৃষ্ণণ" এবং "ষণ্ড" শিল্পীর অপূর্ব ভাস্কর্য প্রতিভার নিদর্শন হিসেবে গণ্য হয়। সম্পূর্ণ ভারতীয় রীতিপদ্ধতির মাধ্যমে রচিত হলেও আন্তর্জাতিক রীতি-পদ্ধতির আঙ্গিক আবেদন এতে আছে। শ্রীপদ্মনাভনের "শিশুর মস্তক" বিশেষ উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি। মাত্র কুড়ি বছর বয়স্ক শিল্পী শ্রী সি জে আন্তনি ডসের রচনা-গুলি এ প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ। নিখুঁত ড্রইং এবং হাল্কা রঙের আশ্চর্য দক্ষতার গুণে তাঁর "পুকুরের ধারে" এবং "সব্জী" (স্টিল লাইফ স্টাডি) সার্থক সৃষ্টি। সবচাইতে আনন্দ পাওয়া গেল ভারতীয় লোকশিল্পরীতির অনুকরণে

নদী থেকে প্রত্যাবর্তন **শিল্পী—রোসি নাইডু**

কয়েকটি চিত্র দেখে। শিল্পী কে শ্রীনিভা-সুন্দর "ঘুঘু বিক্রেতা" এবং "কাজের পরে" এই পর্যায়ের অপূর্ব সৃষ্টি। শ্রীযুক্ত যামিনী রায়ের অংকন রীতির প্রভাব এর চিত্রে পাওয়া যায়। কিন্তু তা সত্ত্বেও নিজ পথটুকু তিনি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর তুলির প্রতিটি সাবলীল টানে তাঁর মনের অন্তর্নিহিত ভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ পায়। প্রখ্যাত শিল্পী শ্রীপলরাজের অংকন রীতির প্রভাব কয়েকটি চিত্রে প্রকাশ পেয়েছে। শ্রীপলরাজের ভাই শ্রীআরুল-রাজ ও শ্রীপিচাইরাজের রচনায় পলরাজের প্রত্যক্ষ প্রভাব খুবই বেশী। শ্রী এ পি সান্থনারাজের "জেলেনী" হাল্কা ধূসর রঙের একটি বিরাটকায় চিত্র সকলেরই

মা
শিল্পী—কে সি এস পানিকার

প্রশংসা অর্জন করে। এই তরুণ শিল্পী ভারত সরকারের সাংস্কৃতিক বৃত্তিলাভ করেছেন। শ্রীশান্তি শাহও উক্ত বৃত্তি লাভ করেছেন। এই তরুণ শিল্পীর দশখানি চিত্র স্থান পেয়েছে। এর অংকন নিপুণতা প্রশংসা পায়। শ্রীরামগোপালের "চড়ুইভাতি" অমিশ্রিত তৈল রঙের ব্যবহারে সংবেদনশীল হয়েছে। শ্রী ডি বালসুন্দরমের "ঘাগরি ভরনে" টেম্পারা মাধ্যমে ভারতীয় রীতির চিত্র বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীরোসি নাইডুর জল রঙের মাধ্যমে পাশ্চাত্ত্য রীতির চিত্র "গৃহপথে" চোখে পড়ে। শ্রী কে সি এস পানিকরের তৈলরঙের "যন্ড" এবং "মা" আধুনিক ভারতশিল্পের অনুসৃত ধারায় রচিত হলেও আধুনিক পাশ্চাত্ত্য অংকন রীতির আবেদন

ভরা কলসী কাঁখে
শিল্পী—ডি বালসুন্দরম্

এতে আছে। সর্বশ্রী এল মুনুস্বামী, পি এল এন মূর্তি, জি পি পিল্লাই, আর কৃষ্ণরাজ, জে জ্ঞানায়ত্তম প্রভৃতি শিল্পীর রচনাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ত্রিশজন ফরাসী দেশীয় চিত্রশিল্পীর শ্রেষ্ঠ রচনার রঙীন প্রতিলিপি নিয়ে এই দ্বিতীয় প্রদর্শনীটি। এডওয়ার্ড মানে, আলফ্রেড সিসলী, জুয়ান গ্রিস, পল

ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ
শিল্পী—এস ধনপাল

সিজানে, পিসারো, পিকাসো, রেণোয়া হেনরি রুসো, মরিস আট্রিল্লো দেগা, রাউল ডিউফি, জর্জ রোয়াল্ট পল গগাঁ, বোনার্ত, এলবার্ট মরেকো হেনরি ম্যাতিস, মোনে, চানল প্রভৃতি শিল্পীদের রচনা উল্লেখযোগ্য। মূল চিত্রের আকারের চাইতে প্রায় চিত্রই আকারে অনেক ছোট। কিন্তু প্রতিলিপি এবং আকারে ছোট হওয়ায় কোনও চিত্রেরই নিজস্ব মৌলিকত্ব হারিয়ে যায়নি। মূল চিত্রের এত সুন্দর নিখুঁত প্রতিলিপি মুদ্রণ-শিল্পের শ্রেষ্ঠ কলাকৌশলের গুণেই সম্ভব হয়েছে। বিশেষ ধরনের কাগজে এই সমস্ত চিত্র মুদ্রিত হয়েছে। অনেকগুলি চিত্রই মুদ্রিত না বলে দিলে ধরবার কোনও উপায় নেই। অনেকক্ষণ দেখলেও মনে হয়, ক্যানভাসের ওপর তৈল বা জল রঙ দিয়ে শিল্পিগণ এই চিত্রগুলিই এঁকেছেন। ফরাসী দেশের শ্রেষ্ঠতম শিল্পী ভ্যানগগের মূল চিত্রের একটি প্রতিলিপিও এই প্রদর্শনীতে স্থান না দিয়ে উদ্যোক্তাগণ মস্ত বড় একটি ভুল করেছেন। উদ্যোক্তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ফলে তাঁরা ত্রুটি স্বীকার করেছেন। ভবিষ্যতে তাঁরা এত বড় ভুল আর করবেন না বলেই আমাদের ধারণা।

আধুনিক ফরাসী চিত্র বলে উদ্যোক্তারা এই প্রদর্শনীটির নামকরণ করেছেন। ঊনিশ শতকের প্রায় অর্ধভাগ হ'তে বর্তমানকাল পর্যন্ত একশত বৎসরব্যাপী ফরাসী শিল্পীদের শিল্পের নানা ধরনের পরীক্ষণের স্বাক্ষর এই চিত্রগুলিতে পাওয়া যায়। যে কোনও একটি চিত্রের সামনে দাঁড়ালেই চিত্রের রস আস্বাদন করার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা আপনা হতেই মনে প্রাণে জাগিয়ে ওঠে। অপলক দৃষ্টিতে বহু দর্শককে একই চিত্রের দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। এ হতেই প্রমাণিত হয়, প্রত্যেকটি চিত্রই রসোত্তীর্ণ।

এই প্রদর্শনীটিতে যে কয়বারই গিয়েছি সে কয়বারই লক্ষ্য করেছি যে স্থানীয় শিল্পিগণ এই প্রদর্শিত চিত্রগুলির অংকন কৌশল, রঙের সংযত ব্যবহার, আঙ্গিকগত পরীক্ষণ, গড়নের বিচিত্রতা, ভঙ্গী, ছন্দ, শ্রী, সরলতা, স্বাভাবিকতা, রীতিপদ্ধতি প্রভৃতি বিশেষ মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করছেন ঘণ্টার

পর ঘণ্টা। এই বিদেশী শিল্পীদের চিত্রের প্রতিলিপি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পাওয়ায় স্থানীয় শিল্পিগণ বিশেষভাবে উপকৃত হয়েছেন।

বালু ব্রাদার্স সিনেমার প্রাচীরপত্র এবং সাইনবোর্ড অঙ্কনে পারদর্শী বলেই মাদ্রাজে সুবিদিত। হঠাৎ এই প্রতিষ্ঠান মৃত ও জীবিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সাহিত্যিক, সমাজসংস্কারক সহ গান্ধীজীর বিভিন্ন সময়ের অনেকগুলি প্রতিকৃতি অঙ্কন করে একটি চিত্রপ্রদর্শনীর আয়োজন কেন করলো ঠিক বুঝতে পারা গেল না। মাদ্রাজ শিল্পজগতে এই ঘটনাকে অনধিকার চর্চা বললেও সম্পূর্ণ বলা হয় না।

জল ও তৈল রঙের মাধ্যমে চিত্রগুলি অঙ্কিত হয়েছে। সাধারণের সমক্ষে পেশ করার পূর্বে চিত্রগুলির শতকরা পচাত্তর ভাগই প্রদর্শিত হবার উপযুক্ত কিনা সে বিষয়ে চিন্তা করা উচিত ছিল। নেতৃবৃন্দের ও গান্ধীজীর জনপ্রিয় আলোকচিত্রগুলি সামনে নিয়ে ক্যানভাসে রঙ সাহায্যে রূপ দেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করা হয়েছে প্রায় প্রতিটি চিত্রে। চিত্রগুলির কোনওটিই সত্যিকারের চিত্র হয়নি। প্রত্যেক প্রতিকৃতির নীচে লিখিত বিবরণ থাকার জন্যই বিস্তর আপত্তি সত্ত্বেও স্বীকার করতে হয় যে, চিত্রটি গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ বা নেহরুর। অশিক্ষিত শিল্পী-নামধারী সাইনবোর্ড পেইণ্টার্সগণ আলোকচিত্র নকল না করে তাদের উর্বর মস্তিষ্কের রঙীন কল্পনা আশ্রয় করে নেতৃবৃন্দের জীবন নিয়ে যে সামান্য কয়েকটি চিত্র এঁকেছেন তাতে রুচিবোধের অভাবই সম্পূর্ণ প্রকাশ পেয়েছে।

দু' আনা প্রবেশমূল্য দিয়ে হলে ঢুকে এই উদ্ভট চিত্রের দিকে তাকিয়ে চোখকে পীড়া দেওয়া এবং মনে প্রভূত দুঃখ নিয়ে বিমর্ষ হয়ে ঘরে ফেরা ছাড়া কোনও লাভ নেই এই প্রদর্শনীতে। বালু ব্রাদার্স এতকাল যা করে আসছিল তাই তাঁদের করে যাওয়া উচিত। চিত্রজগতে অনধিকার প্রবেশে তাদের জমি পরিবর্তন করা হয়েছে। এতে করে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়েরও ক্ষতি হয়। এই জাতীয় প্রদর্শনীর আয়োজন নিঃসংশয়েই উদ্যোক্তাদের অপকীর্তি বলে মেনে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। চিত্রপ্রদর্শনীর নামে এই সব ফাজলামো চলতে দিলে মাদ্রাজের চিত্রশিল্পীদের মান কমবে বই বাড়বে না।

এই চিত্রপ্রদর্শনীটি রাজাজী হলে অনুষ্ঠিত হওয়ায় দর্শক সমাগম বেশী হয়। প্রকাশ থাকে যে, প্রদর্শনীর প্রবেশমূল্য বাবদ যে অর্থাগম হয়েছে তা মহাত্মা গান্ধী স্মৃতিভাণ্ডারে প্রদত্ত হবে। এইজন্যই কি এই উদ্ভট চিত্র প্রদর্শনী উদ্বোধন করলেন একজন মন্ত্রী এবং বিনি পয়সায় দেওয়া হ'ল হলটিও। রাজ্য সরকারের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সমর্থন এই জাতীয় অনুষ্ঠান লাভ করায় বড়ই মনে দুঃখ হয়। স্থানীয় শিল্পী মহল এই ঘটনায় বড়ই দুঃখিত হয়েছেন এবং তাঁরা লিখিত প্রতিবাদ পেশ করবেন বলেও জানা গেল।

শার্ঙ্গদেব

এবারও কনফারেন্সের সূত্র ধরেই বাগ্‌বিস্তার করব। অনেক কথা বলেছি, আরও অনেক কথাই বলবার আছে। হয়ত বা পুরাতন কথার কিছু পুনরাবৃত্তি ঘটবে, কিন্তু ঘটুক, কেননা, কনফারেন্সের পর কনফারেন্সে পুরাতন ভুলের পুনরাবৃত্তি ঘটে চলেছে, পুরাতন ভাবধারার পরিবর্তন অল্পই হয়েছে। অতএব পূর্বে যে কথা মনে করিয়ে দিয়েছি, আবার সেই কথা মনে করিয়ে দিতে হবে। এছাড়া তো আর কোন উপায় দেখি না। কনফারেন্সের পরিকল্পনা, পরিচালনা শিল্পীদের প্রতি ব্যবহার, শিল্পীদের মতামত ইত্যাদি বিবিধ ব্যাপারের প্রতি বিবিধভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্চে। সুতরাং কনফারেন্সের শিরোনামায় তাবৎ প্রসঙ্গই আমাদের অবতারণা করতে হবে এবং আলোচনাও করতে হবে বৈকি।

কনফারেন্সের বিষয়ে কিছু বলতে গেলে সর্বাগ্রে এই কথাটাই বলতে হয় যে, আমরা নিজ বাসভূমে পরবাসী হচ্চি। কনফারেন্সের অনুষ্ঠান হচ্চে যে মহানগরীতে, সেই মহানগরী বাংলা-সংস্কৃতির প্রধানতম কেন্দ্র। কিন্তু কোনও কনফারেন্সে বঙ্গীয় সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় কি? সেখানে হিন্দী খেয়াল, ধ্রুপদ, ঠুংরি, উর্দু গজল, টপ্পা, কাওয়ালি, দাদ্‌রা—এই সব শোনা যাবে, কিন্তু শোনা যাবে না বাংলা ভাষায় রচিত খেয়াল, ধ্রুপদ আর বাংলার অনুপম টপ্পা। বিশ্ববিশ্রুত বাংলা ভাষায় রাগসংগীতের উপযোগী খেয়াল, ধ্রুপদ, ঠুংরি রচিত হওয়া সম্ভব নয়, এমন অসম্ভব কথাও অনেকের মুখে শুনে এসেছি, কিন্তু আর কতকাল এসব উক্তিতে আস্থা স্থাপন করতে হবে? বাংলা ভাষায় এযাবৎ রাগসংগীতের যে বিপুল বিকাশ হয়েছে, সেদিকে শিল্পীদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে আর কতদিন লাগবে? রাগসংগীতের সুউচ্চ বেদীতে বাংলা গান স্বকীয় বৈশিষ্ট্য নিয়ে সগৌরবে অধিষ্ঠিত হতে পারে, কিন্তু বাঙালী শিল্পীরা এ বিষয়ে তৎপরতা খুব অল্পই দেখিয়েছেন। এই আত্মলাঘবতা যেমন লজ্জার বিষয়, তেমনি নিন্দার্হ। কাব্যসম্পদে অতিশয় দীন হিন্দী গান যদি শুধু রাগসংগীতের মাহাত্ম্যে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে, তবে কাব্যসম্পদে সমৃদ্ধ বাংলা গান রাগসংগীতের বিপুল সৌন্দর্য নিয়ে মহান গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে উঠতে পারে সেটা স্বতঃই কেন আমাদের শিল্পীদের মনে উদিত হয়নি এটাই আশ্চর্য।

প্রত্যেক গানেরই একটা রীতি আছে। হিন্দী গান ভাষা বা ভাবসম্পদে দরিদ্র, কিন্তু সেই অভাবের পরিপূরণ হয়েছে রাগসংগীতের উচ্চতম বিকাশে। বাংলা গান ভাব এবং ভাষা-সম্পদে সমৃদ্ধ, অতএব রাগসংগীতকে যেমনভাবে হিন্দী গান আঁকড়ে ধরেছে বাংলা গান তেমনভাবে ধরেনি। রাগসংগীতের কিছুটা স্পর্শই তাকে চমৎকার রূপ দিয়েছে এবং আমরা এইখানেই সন্তুষ্ট থেকে গেছি। অতএব আমাদের গানের বিকাশ হয়েছে কাব্যসংগীতের দিকে। কিন্তু আমরা অনায়াসেই হিন্দী গান যেদিকে এগিয়ে গেছে, সেদিকে এগিয়ে যেতে পারি, অর্থাৎ কাব্যরূপকে বজায় রেখেও রাগসংগীতের শিল্পনৈপুণ্য আমদানি করতে পারি। ইতিপূর্বে এই চেষ্টা করেছিলেন লালচাঁদ বড়াল, সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার প্রমুখ স্রষ্টা শিল্পিবৃন্দ। এমনকি, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামীর মত দিগ্‌বিজয়ী ধ্রুপদীও বাংলা গান গাইতেন সানন্দে এবং রাগসংগীতের শিল্পনৈপুণ্য বর্জন না করে। হাল আমলে বাংলায় একেবারে খাঁটি খেয়াল গেয়েছেন জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী। যদি টেকনিকের দিক ধরতে হয়, তবে মধ্যলয় এবং দ্রুত খেয়াল হিসাবে তাঁর গাওয়া গানগুলি যে কোন আসরে গাওয়া যেতে পারে হিন্দী গানের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে। অথচ জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ যেসব বাংলা খেয়াল গেয়েছেন তার কাব্যসম্পদ নেই এমন কথা বলা চলে না এবং অনেক সময় অত ওস্তাদির মাঝখানেও বাংলা গানের বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেই কাব্যসুষমা কখনো আনন্দে, কখনো বেদনায় উদ্বেল হয়ে উঠত।

অতএব এইভাবে উচ্চাঙ্গ সংগীতে যে অভাব আমাদের রয়েছে, তা তো আমরা নিজেরা সৃষ্টি করেই মেটাতে পারি। শুধু দ্রুত খেয়াল কেন, বিলম্বিত খেয়ালও কি বাংলায় রচনা করা যেতে পারে না? আমাদের মনে হয় এ-কাজটিও তেমন কঠিন নয়। প্রয়োজন হলে হিন্দী গানের আদর্শে বা হিন্দী গান ভেঙে বাংলা গান আমাদের গড়তে হবে, যেমন রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন এক সময়। যদি এই প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে ক্রমেই দেখা যাবে ভারতীয় সংগীতে আমরা এক নতুন বৈশিষ্ট্য স্থাপন করতে সক্ষম হচ্চি। বাংলা ভাষার নমনীয়তার সঙ্গে রাগসংগীতের যোগ হলে সংগীতের সব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ বিকাশ সম্ভবপর।

এবম্বিধ প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ নিধুবাবু। হিন্দী, পাঞ্জাবী টপ্পা থেকে যে এমন মনোহর বাংলা গান রচনা করা যায়, এটা সেই অতীতে কি কারুর ধারণায় এসেছিল? কিন্তু নিধুবাবু যখন বাংলা টপ্পা রচনা করলেন, তখন শুধু সরসতায় নয়, শিল্পকৌশলের দিক দিয়েও এই রচনার শ্রেষ্ঠত্ব সমানভাবে বজায় রইল। টপ্পার বেলায় যদি এটা খাটে, তাহলে ধ্রুপদ-খেয়াল-ঠুংরির বেলায় খাটবে না কেন? একটু মাথা খাটালেই বাঙালীর পক্ষে এটা অনায়াসেই সম্ভব।

অতএব প্রত্যেক আসরে বাংলায় অন্তত একটি ধ্রুপদ, খেয়াল, ঠুংরি অথবা টপ্পা গান করা বাঙালী শিল্পীদের অবশ্য কর্তব্য। এতে বাইরের শিল্পীরা আমাদের সম্ভ্রমের চোখে দেখবেন এবং বাংলা গান সম্বন্ধে অনেক শিল্পী যে ভুল ধারণা পোষণ করেন সেটাও ভেঙে যাবে।

আমরা যদি আমাদের গানে কাব্যসুষমা বজায় রেখেই হিন্দুস্থানী রাগসঙ্গীতের শিল্পকৌশল প্রয়োগ করি তাতেই বা ক্ষতি কি? সেটাই হবে আমাদের বিশেষত্ব। আর এটাও তে

চোখের উপর দেখছি যে, কেবলমাত্র কঠোর শুষ্ক ওস্তাদিয়ানার যুগ দ্রুত পার হয়ে যাচ্ছে। এখন আর নিছক কালোয়াতি বা "কণ্ঠবাদন" করে শ্রোতাদের কাছ থেকে তেমন প্রশংসা অর্জন করা যায় না। সংগীত যে একটি সুকুমার ললিত কলা সেটার ওপর আজকালকার শ্রোতারা বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন এবং এই ধরনের নীরস তানকর্তব বা অন্যান্য আঙ্গিকের প্রদর্শনে অসন্তুষ্ট হয়ে অনেককে হাত-তালি দিয়ে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এটাও লক্ষ্য করেছি অনেক ক্ষেত্রে।

এই প্রসঙ্গে তবলা সঙ্গত সম্বন্ধে গত সংখ্যায় প্রকাশিত শান্তাপ্রসাদ মিশ্র মহাশয়ের চিঠিখানির বিষয়ে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করতে হচ্ছে। তবলা সঙ্গতে গান বা বাজনার প্রকাশে সৌকুমার্য 'যথাযথ-ভাবে রক্ষিত হওয়া উচিত, এইটাই স্মরণ করিয়ে দেওয়া আমাদের উদ্দেশ্য ছিল। মিশ্র মহাশয় জানিয়েছেন—"বিভিন্ন লয়ের ছন্দে যন্ত্রী ও তবলীয়ার যখন সঙ্গত চলে তখন হয় ছন্দের বৈচিত্র্য, এই বৈচিত্র্যকে সুষ্ঠুরূপে প্রকাশের জন্যই প্রয়োজন হয় জোরে বাজানোর।"...সম্প্রতি ভারতবিশ্রুত সংগীতজ্ঞ তারাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছিল এই পত্রটির প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে। তিনি এ বিষয়ে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছেন তার গুরুত্বও যথেষ্ট এবং সেটিও সকলকে জানিয়ে রাখা আমাদের কর্তব্য। তিনি বলেন যে, তিনি নিজে তবলা বাদন আরম্ভ করেছেন কিন্তু যে কোন বৈচিত্র্যকে প্রকাশ করবার জন্য অযথা জোরে বাজানোর কোন তাৎপর্য আছে বলে তিনি মনে করেন না। "সঙ্গত" অর্থ হচ্ছে তবলা চলবে গান বা বাজনার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে কিন্তু ব্যতিক্রম হলে মাধুর্য ক্ষুণ্ণ হবেই। সুতরাং তবলা বাদন যাতে সীমা অতিক্রম করে গান বাজনা ছাপিয়ে না ওঠে সেই চেষ্টা করা তবলীয়ার অবশ্য কর্তব্য। ধীরভাবে বাজিয়ে গান-বাজনাকে প্রকাশের সম্পূর্ণ সুযোগ দিয়েও ছন্দ বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে তবলীয়ার পক্ষে স্বীয় ক্ষমতার পূর্ণ বাজাবার সম্পূর্ণ সম্ভব, এটিই হচ্ছে তাঁর অভিমত।

তাই বলছিলাম রাগসংগীতে সৌকুমার্যকে রক্ষা করে যে কোন গান বা বাজনার বিকাশ হলেই সংগীতের শ্রেষ্ঠ এবং সুষ্ঠু বিকাশ হবে। বাংলা গানে এর সম্ভাবনা প্রচুর। এই কারণেই বাঙালী শিল্পীদের বার বার স্মরণ করিয়ে দিই তাঁরা বাঙলায় উচ্চাঙ্গ রাগ-সংগীতের প্রচারকল্পে উৎসাহিত হয়ে উঠুন। আমাদের ভাষা সব দিক দিয়েই মহাসমৃদ্ধ,—অতএব স্বকীয়তা বিসর্জন দিয়ে পরভাষাশ্রয়ী হবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। এই আত্মলাঘবতা অর্থহীন এবং সর্বথা পরিত্যাজ্য।

কনফারেন্সের পরিকল্পনা সম্বন্ধে আমাদের একথাও বার বার মনে হয়েছে যে, শিল্পী নির্বাচন ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় যেন সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাংলা টপ্পাগায়ক যাঁরা আছেন তাঁদের কোনক্রমেই ডাকা হচ্ছে না। উচ্চাঙ্গ-সংগীতে বাংলার একটা বড় অবদান হ'ল টপ্পা এবং অভিজ্ঞ শিল্পীও একাধিক আছেন, তথাপি তাঁদের আহ্বান না জানানোর কি কারণ হতে পারে? খেয়াল, ঠুংরিতে জনকয়েক প্রসিদ্ধ বাঙালী শিল্পীকে এই সব আসরে প্রায়ই দেখা যায় না। উদাহরণস্বরূপ অনুপম ঠুংরি গায়ক শচীনদাস মতিলাল মহাশয়ের নাম করা যেতে পারে। প্রথম শ্রেণীর এই ঠুংরি গায়কটি কি অবহেলিতই রয়ে গেলেন এই সব কনফারেন্সে? আবার এটাও লক্ষ্য করেছি কতিপয় তৃতীয় শ্রেণীর শিল্পীকেই (বিশেষ করে মহিলা শিল্পী) প্রায় কনফারেন্সেই ডাকা হয়ে থাকে। প্রথম শ্রেণীর উৎকৃষ্ট শিল্পীদের বাদ দিয়ে এ'দের অনুষ্ঠান প্রচার করে বাঙালী শিল্পী সবন্ধে বিপরীত ধারণা জাগ্রত করবার অভিপ্রায়টি মোটেই প্রশংসনীয় নয়—এটি স্পষ্ট ভাষায় বল-বার সময় এসেছে। বাইরে থেকে শিল্পী সংগ্রহ করবার যেমন আগ্রহ দেখা যাচ্ছে, বাঙালী শিল্পীদের ভিতর থেকে নির্বাচন করবার চেষ্টা সেই পরিমাণে কিছুই দেখা যায় না। এই কারণেই বহু বিশিষ্ট বাঙালী শিল্পী এই সব কনফারেন্স সম্পর্কে উদাসীন থাকেন। যে ক'জন বাঙালী শিল্পীকে ডাকা হয় তাঁদের প্রতি অনেক সময় অবহেলার অবধি থাকে না। এমন কি তারাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের মত শ্রেষ্ঠ শিল্পীকেও এই অনাদর এবং

তাচ্ছিল্য যথেষ্ট পরিমাণে সহ্য করতে হয়েছে। আমাদের সংগে সাক্ষাৎকারে গত তানসেন সংগীত সম্মেলনে তাঁর প্রতি যে শিষ্টাচারবহির্ভূত ব্যবহার করা হয়েছে সেটি তিনি দুঃখের সংগে ব্যক্ত করেন।

তানসেন সংগীত সম্মেলনে তারাপদ চক্রবর্তী মহাশয় ক্ষুব্ধ চিত্তে ঘোষণা করেছিলেন যে, তাঁর সংগে বাজাবার জন্য কোন তবলীয়ার বন্দোবস্ত রাখা হয় নি। এ সম্বন্ধে আমাদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিষয়টি যেভাবে বিবৃত করনে সেটি প্রকাশিত করছি।

তানসেন সংগীত সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের সংগে চক্রবর্তী মহাশয় যখন চুক্তিতে আবদ্ধ হন তখন এই প্রতিশ্রুতি তাঁকে দেওয়া হয় যে, তাঁর সংগে তবলা বাজাবার জন্য কেরামৎ খাঁ সাহেবকে নিযুক্ত করা হবে। কিন্তু যথাকালে দেখা গেল যে, তাঁরা কেরামতুল্লার সংগে কোন রকম বন্দোবস্ত করেন নি। ফলে তাঁর সংগে বাজাবার জন্য কোন তবলীয়াকেই পাওয়া দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ালো। ইতিমধ্যে চক্রবর্তী মহাশয় সম্মেলনের সেক্রেটারীর সংগে দেখা করতে চান, কিন্তু তিনি দেখা করেন নি এমন কি কর্তৃপক্ষের অপর কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির পর্যন্ত দেখা পাওয়া গেল না। অবশেষে বোধ হয় ভলেণ্টিয়ার শ্রেণীভুক্ত একজন তাঁকে এক অখ্যাত তবলীয়ার নাম করে তার সংগে গাইতে রাজী আছেন কিনা জানতে চান। একটি বিশিষ্ট সম্মেলনে একজন অপরিচিত এবং অশ্রুত ব্যক্তিকে সংগত করতে দিতে স্বভাবতই তিনি অনিচ্ছুক হন। তারপর আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়কে তবলা বাজাতে অনুরোধ করলে তিনি বলেন যে, তাঁর নিজের তবলা না হলে তাঁর পক্ষে বাজানো সম্ভব নয় এবং সেই অনুষ্ঠানে তাঁর বাজাবার কথা না থাকায় তিনি আসরে তবলা নিয়ে আসেন নি। শেষ পর্যন্ত চক্রবর্তী মহাশয়ের শিষ্যেরা রেজায়েল লায়েলকে ডেকে নিয়ে আসেন এবং এঁর সংগতেই কোনক্রমে উক্ত অনুষ্ঠান তাঁকে সমাধা করতে হয়।

বাংলার একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পীর সংগে তানসেন সংগীত সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের এই প্রকার অসংগত আচরণের কারণ কি আমরা বুঝে উঠতে পারি না। এই সব দেখে শুনেই বলতে হয় যে, আমরা নিজ বাসভূমিতেই পরবাসী হচ্ছি।

সদারংগ সংগীত সংসদ

গত ২১শে নভেম্বর সদারংগ সংগীত সংসদের উদ্যোগে ভারতী চিত্রগৃহে একটি মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে।

অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে শ্রীমতী অনুরাধা গুহ কথক নৃত্য প্রদর্শন করেন। ইনি যে সব বোল আবৃত্তি করলেন তবলায় সেগুলি সব সময় বাজানো হয়েছে এমন মনে হল না। তবে মাত্রার সমতা রক্ষা করে, ছন্দ এবং লয় ঠিক রেখে বাজানো হল বলে সমে এসে নৃত্য এবং তবলা মিলে গেল। এই কারণেই চাতুর্যের সংগে বাজানো হলেও তবলা এবং নৃত্যের মধ্যে একটা সুনিবিড় ঐক্য এবং সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়েছে এটা স্বীকার করা গেল না। দুটো বোল যদি না মেলে তবে এ আবৃত্তির উদ্দেশ্য কি বুঝি না। এবং বাঁধা ধরা মুখস্থ বিদ্যার প্রকাশ ছাড়া আর কি বলব? আর যে বোল পাখোয়াজ বা মৃদংগের উপযোগী তা তবলাতেই বা ফোটাবার দরকার কি? উক্ত যন্ত্রদ্বয়ের কোন একটি অবলম্বন করলেই তো ব্যাপারটা সুসংগত হয়। আজকাল কলকাতায় কথক নৃত্য যেভাবে দেখানো হচ্ছে তাতে জিনিসটা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক রকমের নৃত্যে যার মধ্যে ছন্দবোধক পদকর্ম ছাড়া আর কোন আংগিক প্রায় নেই এবং এই পদকর্ম তবলার লহরাকে অনুসরণ করছে মাত্র। কথক নৃত্য সম্বন্ধে এই মন্তব্য করতে বাধ্য হচ্ছি কেননা ক্রমাগতই বড় বড় আসরে দেখছি এই নৃত্যের জন্য আহ্বান করা হচ্ছে এমন শিল্পীদের যাঁরা ছেলে মানুষ এবং স্পষ্টই নৃত্যকলায়ে যাঁদের শিক্ষা এখনও অসম্পূর্ণ। তাঁদের সুযোগ এবং উৎসাহ প্রদান করা অবশ্যই উচিত, কিন্তু এটাও মনে রাখতে হবে যে তাঁদের কাছ থেকে এই নৃত্যের টেকনিকাল বৈশিষ্ট্যের সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা বা প্রকাশ আমরা আশা করতে পারি না। অতএব বিশিষ্ট আসরে এমন শিল্পীকে নিয়োগ করা উচিত যিনি পূর্ণ পারদর্শিতা অর্জন করেছেন এবং যাবতীয় টেকনিকাল ব্যাপার যথাযোগ্য ব্যাখ্যা সমেত কথক নৃত্যে পূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সংগে দর্শকবৃন্দের পরিচয় সাধন করাতে পারেন।

নৃত্যের পর শ্রীমতী মায়া মিত্র বীণ বাজিয়ে শোনান। তারপর ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি দেশী এবং গুর্জরী রাগে খেয়ালে অপূর্ব নৈপুণ্য সহকারে নানা রকমের বৈচিত্র্য প্রদর্শন করেন। এঁর বিবিধ তান কর্তব এবং সর্গম অতিশয় উপভোগ্য হয়েছিল। খেয়ালের পর তিনি একটি ঠুংরী গেয়ে শ্রোতাদের পরিতৃপ্ত করেন। সর্বশেষে ওস্তাদ বিলায়েৎ খাঁ সেতারে মিশ্র সারং রাগে অত্যন্ত মধুর আলাপ এবং গৎ বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। এঁর সংগে সুযোগ্য তবলা সংগত করেন কিষেণ মহারাজ।

অনুষ্ঠানটি বহু গুণীজনের সমাবেশে সার্থক হয়েছে।

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

একবার যদি মনের মধ্যে কোনও অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, কোনও কাজেই চার্লি আর তখন মনোনিবেশ করতে পারেন না। ঘরোয়া জীবনের সমস্ত অস্থিরতাকেই তাই তিনি তাঁর কর্মজীবনের থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে চেয়েছেন। তবে সব সময়ে তা সম্ভব হয়নি। হেটি কেলির সঙ্গে তাঁর সেই প্রথম প্রণয়ের পর আর ও-পথে যাননি চার্লি, শিল্পসাধনার মধ্যেই তিনি তন্ময় হয়ে ছিলেন। এতদিন বাদে আবার তাঁর ব্রতভঙ্গ হল। চার্লি তখন "শোলডার আর্মস" তুলছেন। সেই সময় হঠাৎ একদিন মীলড্রেড হ্যারিসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল তাঁর। এর কিছুদিন আগেই তিনি হেটির বিয়ের খবর পেয়েছেন; শুনেছেন, বিয়ে করে সে সুখী হয়েছে।

মীলড্রেড তখন ষোড়শী বালিকা। মাথার উপরে একরাশ কোঁকড়া সোনালী চুল। দেখে তাঁকে আরও কমবয়সী বলে মনে হত। দশ বছর বয়সে তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের আরম্ভ। এর আগে ডী ডব্লু গ্রীফিথের অনেকয়েক ছবিতে তিনি অভিনয় করেছেন। তাঁর মা-ও একটা স্টুডিয়োতে কাজ করতেন।

মীলড্রেড হ্যারিস

চার্লির সঙ্গে প্রথম আলাপেই মুগ্ধ হলেন মীলড্রেড। সেটা অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু নয়। তার কারণ, চার্লি তখন সবচাইতে খ্যাতনামা অভিনেতা, সবচাইতে ধনীও। চার্লির বয়স তখন উনিশ বছর। সুপুরুষ, সুন্দরকান্তি। ছবিতে তাঁর যে-চেহারা দেখা যায়, তার থেকে তাঁর আসল চেহারা অনুমান করা একটু কঠিন। তাঁকে দেখে, তাঁর কথা শুনে, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলেন মীলড্রেড। পরে তিনি বলেছেন, প্রথম দর্শনেই চার্লিকে তিনি ভালবেসেছিলেন। চার্লি অবশ্য তা অনুমানও করতে পারেননি। শিশুদের তিনি ভালবাসতেন, মীলড্রেডকেও তাঁর ভাল লেগেছিল, এই পর্যন্ত। এর বেশি কিছু নয়। প্রথম আলাপের পর অনেক দিন তাঁদের দেখা হয়নি।

দেখা হল মাস কয়েক পরে, স্টুডিয়োর এক পার্টিতে। মীলড্রেড জানতেন, চার্লি সেখানে আসবেন। কুঞ্চিত কেশদাম তিনি সযত্নে বেঁধে নিলেন; তাতে করে আর কিছু না হোক, বয়স একটু কম দেখাবে। চার্লির সঙ্গে দেখা করবার জন্য তিনি সেদিন প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন, পরে তিনি নিজেই সে-কথা স্বীকার করেছেন। তাঁর কাছেই তাঁর প্রতীক্ষার বর্ণনা আমরা শুনেছি। পরনে সাদা অর্গ্যাণ্ডির ফ্রক, কোমরবন্ধে পুষ্পস্তবক। সেই অপরূপ সন্ধ্যার কোনও কথাই তিনি বিস্মৃত হননি।

কোথায় চার্লি? ব্যগ্র উৎকণ্ঠায় মীলড্রেড তাঁকে খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। কোথায় তিনি? ওই তো। মেরি পীকফোর্ড আর ডগলাস ফেয়ারব্যাংকসের সঙ্গে ঘরের এক কোণে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। মীলড্রেডকে দেখে প্রথমটায় তিনি চিনতেই পারেননি। চিনবার পর বললেন, "তুমি যে দেখছি অনেক বড় হয়ে গিয়েছ!"

চার্লি সেদিন নৃত্যসঙ্গী হয়েছিলেন মীলড্রেডের। নাচের মধ্যেই কথাবার্তা চলতে লাগল। যা কিছু বলেন চার্লি, তা-ই যেন মীলড্রেডের ভাল লাগে। নিজের প্রথম জীবনের দু-একটা গল্প বললেন চার্লি; শুনে মীলড্রেডের চোখে জল এসে গেল। চার্লির হৃদয়েও তৎক্ষণে মীলড্রেডের প্রতি একটি তীব্র আকর্ষণ জেগে উঠেছে। নাচের শেষে চার্লি বললেন, মীলড্রেডের যদি কোনও আপত্তি না থাকে তো তাঁকে তিনি বাড়িতে নিয়ে পোঁছে দিতে পারেন। পার্টি থেকে বেরিয়ে চার্লির গাড়িতে এসে উঠলেন মীলড্রেড। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি কেউ কাউকে ছাড়তে চাইছিলেন না। সাণ্টা মনিকার সমুদ্রতীরে গিয়ে বসে রইলেন তাঁরা। চাঁদ উঠেছে, জ্যোৎস্নায় ভরে গিয়েছে চারদিক। অনেকক্ষণ তাঁরা বসে রইলেন। অনেকক্ষণ তাঁরা গল্প করলেন। মীলড্রেডের ভয় কিন্তু তখনও কাটেনি। চার্লি কি এখনও তাঁকে নিতান্তই একটি শিশু মনে করেন নাকি?

এর পর, এখানে ওখানে, প্রায়ই তাঁদের দেখা যেতে লাগল। মীলড্রেড যেখানে অভিনয় করতেন, প্রায়ই সেখানে স্টুডিয়োর বাইরে গাড়ি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন চার্লি। মীলড্রেডকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে যেতেন। আগেই বলেছি, মীলড্রেডের বয়স তখন মাত্র ষোল বছর। এত অল্প বয়সে তাঁর বিয়ে হয়, তাঁর মার সেটা ভাল লাগেনি। মেয়েকে তিনি সতর্ক করে দিলেন। স্পষ্ট বললেন যে, চার্লির
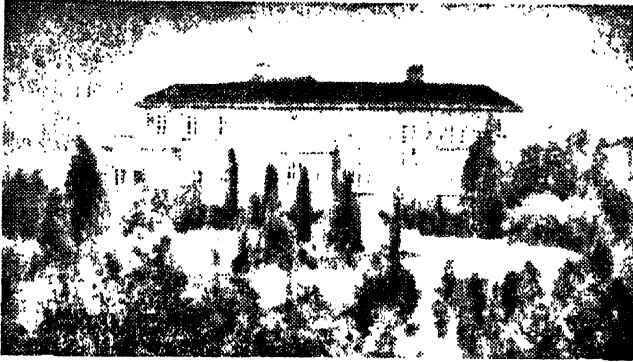
চার্লস চ্যাপলিনের বাড়ি, হলিউড

সঙ্গে মীলড্রেডের এই ঘনিষ্ঠতা তাঁর ভাল লাগছে না। বললেন, "ক্যালিফোর্নিয়া থেকে তোমাকে আমি আর কোথাও নিয়ে যাব।" মীলড্রেড গিয়ে সব খুলে বললেন চার্লিকে। শুনে চার্লি বললেন, "অসম্ভব, এইখানেই থাকতে হবে তোমাকে। তাড়াতাড়ি বরং বিয়ের পর্বটা সেরে ফেলা যাক।"

মীলড্রেড তো এরই জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। চার্লির কথা শুনে তৎক্ষণাৎ তিনি রাজি হয়ে গেলেন। কিন্তু মাকে তো জানান চলবে না, শুনলে তিনি অনর্থ বাধাবেন। স্থির হল, গোপনে কোথাও গিয়ে বিয়ে করবেন তাঁরা। যে কথা সেই কাজ। পরের রবিবার সকালবেলা মীলড্রেডকে গাড়িতে তুলে নিয়ে সান্টা অ্যানায় চলে গেলেন চার্লি, গিয়ে একজন পাদরি খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। অনেক কষ্টে যদি বা একজন পাদরির সন্ধান পাওয়া গেল, তাঁর বাড়িতে গিয়ে শুনলেন, কী একটা জরুরি কাজে দিন কয়েকের জন্য তিনি বাইরে চলে গিয়েছেন। বিয়ে না করেই তাঁরা ফিরে এলেন। মীলড্রেডের মা এদিকে সব টের পেয়ে গিয়েছিলেন। তিনি তো চটে আগুন। কিছুতেই এ-বিয়ে তিনি হতে দেবেন না। অনেক কষ্টে শান্ত করা হল তাঁকে। এবং তাঁর সম্মতি আদায় করা হল।

১৯১৮ সালের ২৩শে অক্টোবর—"শোলডার আর্মস" বইখানি মুক্তিলাভের ঠিক তিনদিন বাদে—মীলড্রেডের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন চার্লি। হলিউড তো স্তম্ভিত। মীলড্রেডের সঙ্গে চার্লির মেলামেশার কথা অবশ্য সবাই জানতেন। কিন্তু ব্যাপারটাকে কেউ তেমন গুরুত্ব দেননি। সবাই ভেবেছিলেন যে, চার্লির চোখে একটু ঘোর লেগেছে, দু'দিন বাদেই আবার সব ঠিক হয়ে যাবে। যে মেয়েকে চারমাস আগেও তিনি চিনতেন না, এমন অকস্মাৎ যে চার্লি তাঁকে বিয়ে করে বসবেন, এ কেউ ভাবতেও পারেননি।

চলচ্চিত্র-জগতের খবরাখবর যাঁরা রাখেন, টমাস ইন্সের নাম তাঁরা সকলেই হয়তো শুনে থাকবেন। হলিউডের আদি চিত্র-প্রযোজকদের তিনি অন্যতম। ছোটবেলায় মীলড্রেড তাঁর স্টুডিয়োতে কিছুদিন কাজ করেছিলেন, মীলড্রেডকে তাই খুব স্নেহ করতেন তিনি। বিয়ের খবর শুনে নবদম্পতিকে তিনি তাঁর প্রমোদ-তরণীখানি দিন কয়েকের জন্যে ছেড়ে দিলেন। মীলড্রেডকে সঙ্গে নিয়ে ক্যাটালিনা দ্বীপে রওনা হলেন চার্লি। দিন কয়েকের জন্য সেখানে মধুচন্দ্র যাপন করে আসবেন। সেইখানে একদিন ছোট্ট একটি ডিঙিতে করে মাছ ধরতে বেরিয়েছেন চার্লি, এমন সময় অকস্মাৎ একটি বিপদ ঘটে বসল। অল্পের জন্য তিনি সেদিন প্রাণে বেঁচে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা খুলে বলি। অনেক চেষ্টার পর চার্লির বঁড়শিতে একটা মাছ বিঁধেছে। খেলিয়ে খেলিয়ে চার্লি সেটাকে উপরে টেনে আনছেন। হঠাৎ দেখা গেল মাছটাই চার্লিকে টানতে শুরু করেছে এবং প্রাণপণ চেষ্টা করেও চার্লি সে-টান সামলাতে পারছেন না। বেশ কিছুক্ষণ এই ভয়াবহ টানাটানি চলবার পর মাছের একটা হ্যাঁচকা টানে চার্লি হঠাৎ জলের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। পাশেই বসে ছিলেন মীলড্রেড। চিৎকার শুনে চার্লির পা দুটি জাপটে ধরলেন তিনি। ধরেই বুঝলেন যে, মাছটা তাঁকে সুদ্ধ টেনে নিয়ে চলেছে। প্রাণপণে তিনি তখন চ্যাঁচাতে শুরু করলেন। ডিঙির মাঝি এসে তখন মীলড্রেডের পা দুটি জাপটে ধরল। এবং তিনজনের সম্মিলিত চেষ্টায় খানিক বাদে বিপুলকলেবর সেই মাছটিকে নৌকোর উপরে টেনে তোলা হল। মাছ তো নয়, বিরাট একটি জল-জন্তুবিশেষ, ১৬৮ পাউন্ড তার ওজন। অল্পের জন্য চার্লি সেদিন রক্ষা পেয়ে গিয়েছিলেন।

বিয়ের পর মাসকয়েক খুব সুখে ছিলেন চার্লি। তিনি ততদিনে হলিউডে তাঁর নিজের বাড়িতে এসে উঠেছেন। মুশকিল বাধল সংসার চালানো নিয়ে। কী করে যে সংসার চালাতে হয়, মীলড্রেড তার কিছুই জানতেন না। তাতে অখুশী হননি চার্লি। ধৈর্য ধরে তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। এখনও মীলড্রেড ছেলেমানুষ। বয়স আর একটু বাড়ুক, ধীরেসুস্থে সব শিখে নেবে। ঘর-সংসারের কাজে মীলড্রেডকে সাহায্য করতে তাঁর নিজেরও কিছু কম আগ্রহ ছিল না। কিন্তু কিছুদিন বাদেই তিনি বুঝতে পারলেন যে, সংসারের কাজে বিন্দুমাত্রও আগ্রহ নেই মীলড্রেডের। তিনি চান অভিনেত্রী হতে; চার্লির ঘরণী, এই পরিচয়ের জোরে চিত্র-জগতে প্রতিষ্ঠালাভেই তাঁর আগ্রহ।

চার্লির সেটা আদৌ মনঃপূত নয়। প্রথম থেকেই মীলড্রেডকে তিনি বাধা দিলেন। বললেন, স্ত্রীকে তিনি স্ত্রী হিসেবেই পেতে চান। ঘর-সংসারকে অবহেলা করে অভিনেত্রী হওয়া চলবে না। এই নিয়েই বাধল কলহ। পরবর্তী কালে মীলড্রেড এ সম্পর্কে লিখেছেন, "চার্লি আমাকে ঠিক কথাই বলেছিল। কিন্তু অতটা অধৈর্য হওয়া তার ঠিক

হয়নি। কতই বা তখন বয়স আমার। আর কিছুদিন যদি সে অপেক্ষা করত, আমি নিজেই হয়তো আমার ভুল বুঝতে পারতাম।"

সে যাই হোক, চার্লির মতামতকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মীলড্রেড একটি চিত্র-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে চুক্তি করে বসলেন। ব্যাপারটা জানবার পর চার্লির ক্রোধের আর অন্ত রইল না। কিন্তু মীলড্রেডেরও সেই এক কথা, অভিনেত্রী-জীবনকেই তিনি আঁকড়ে ধরে থাকবেন। আর একটা ব্যাপারেও চার্লির মতামতকে তিনি অগ্রাহ্য করে চলতেন। প্রায়ই পার্টির আয়োজন করতেন তিনি। নানান রকমের লোক সেখানে আসত। তাদের কোলাহলে চার্লি প্রায় পাগল হয়ে উঠলেন। স্টুডিয়োতে তাঁর কাজের অন্ত ছিল না। কাহিনী-রচনা, পরিচালনা, অভিনয়, দৃশ্য-বিন্যাস—সর্বকিছুই করতে হত তাঁকে। সারাদিন সেই হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে বাড়িতে এসে যে একটু বিশ্রাম নেবেন, তার উপায় নেই। বাড়িকে তো মীলড্রেড প্রায় হাট বানিয়ে ছেড়েছেন। অনেকবার এ নিয়ে অনুযোগ করেছেন চার্লি, মীলড্রেড নির্বিকার। শেষ পর্যন্ত চার্লি ড্রয়িংরুমে যাওয়াই ছেড়ে দিলেন। বাড়িতে ঢুকে সরাসরি তিনি তাঁর শয়ন-কক্ষে চলে আসতেন। তাতেও মীলড্রেডের আপত্তি। আপত্তির থেকে কলহ। মীলড্রেড বলতেন, "ও, আমার বন্ধুরা বুঝি তোমার যোগ্য নয়! যাও, দু'দণ্ড গিয়ে তাদের সঙ্গে একটু গল্প করো, তাতে তোমার জাত যাবে না।" রকম-সকম দেখে তিতিবিরক্ত হয়ে চার্লি শেষ পর্যন্ত বাড়ি আসাই ছেড়ে দিলেন।

তাঁদের এই দাম্পত্য জীবন বছর খানেকের বেশী স্থায়ী হয়নি। বিয়ের পর মাস কয়েক বাদেই হয়তো বিচ্ছেদ ঘটত। ঘটেনি, তার কারণ মীলড্রেড তখন অন্তঃসত্ত্বা। চার্লি সেটা জানতেন না। জেনে তিনি খুবই আনন্দিত হলেন। ভাবলেন, জননী, হলেই মীলড্রেডের সব ছেলেমানুষির অবসান ঘটবে; মীলড্রেড বুঝতে পারবে, গৃহই তার যোগ্য আশ্রয়। পারিবারিক জীবনের তীব্রতম অশান্তির মধ্যে এই একটিমাত্র আশাকে অবলম্বন

"সানিসাইড"-এর একটি দৃশ্য

করে শান্ত চিত্তে চার্লি প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। মীলড্রেডকে সুখী করবার জন্য তখন তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

আর মাত্র কয়েকটি দিন বাকী। মীলড্রেডের গায়ের উপরে সস্নেহে একটি শাল জড়িয়ে দিলেন চার্লি। নিজে গাড়ি চালিয়ে তাঁকে হাসপাতালে পৌঁছে দিলেন। যথাসময়ে একটি ছেলেও হল মীলড্রেডের (চার্লি তো ছেলেই চেয়েছিলেন)। কিন্তু বাঁচল না। তিন দিন পরেই শিশুটির মৃত্যু হল। পুত্রশোকে অস্থির হয়ে উঠলেন চার্লি। কিন্তু স্ত্রীর কথা ভেবে নিজেকে তিনি শান্ত করলেন। এ-শোক তো তাঁর একার নয়, মীলড্রেডেরও। সেই নিদারুণ দুঃখের মধ্যে মীলড্রেড যাতে একটু আনন্দে থাকে, একটু যাতে হাসি ফুটে ওঠে তার রোগ-পাণ্ডুর ওষ্ঠে, তার জন্য চার্লি তখন কোনও চেষ্টারই কোনও ত্রুটি রাখেননি। নিজের অসহ্য বেদনাকে লুকিয়ে রেখে তিনি হাসতেন, রসিকতা করতেন, অন্যের ভাবভঙ্গী নকল করে দেখাতেন, নাচতেন। আর এ-সবই করতেন রুগ্ণা স্ত্রীকে একটু আনন্দদানের জন্য। একদিন তো তিনি তাঁর সেই বিখ্যাত মেক-আপ নিয়েই স্ত্রীকে দেখতে গেলেন। যদি তাঁকে একটু হাসাতে পারেন। মীলড্রেড এ সম্পর্কে লিখেছেন, "তার নিজের হৃদয়ই তখন শোকে মুহ্যমান। কিন্তু সেই অবস্থাতেও তার কাছ থেকে যে মমতাপূর্ণ ব্যবহার আমি পেয়েছি, তার তুলনা হয় না। তার চাইতে অনেক কম পুণ্য করেও অনেকের স্বর্গলাভ হয়েছে।"

হাসপাতাল থেকে ছুটি পেলেন মীলড্রেড। পথে বেরিয়ে এসে দেখেন, নতুন একখানি গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। চার্লি বললেন, "মীলি, এ-গাড়ি তোমার। তোমার জন্যেই কিনেছি।" বাড়িতে এসে মীলড্রেড বললেন, ছেলের জন্যে দু'জনে মিলে যে নার্সারি সাজিয়ে রেখেছিলেন, সেইখানে তাঁকে একবার নিয়ে যেতে হবে। শূন্য ছোট্ট একটি পালঙ্ক, তার পাশে অজস্র খেলনা। ছেলে নিয়ে বাড়ি ফিরবে মীলড্রেড, চার্লি তাই খেলনা কিনে রেখেছেন। সেই শূন্য শয্যার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মীলড্রেড এক-সময়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন। মৃত শিশুটিকে কবর দিয়ে তার সমাধি-ফলকের উপরে ছোট্ট একটি কথা উৎকীর্ণ করে দেওয়া হল, "দী লীটল মাউস"।

দিন কয়েক একটু স্থির হয়ে রইলেন মীলড্রেড, তারপরেই তাঁর পুরনো আকাঙ্ক্ষা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। অভিনেত্রী হতে হবে। বাড়িতে একটার পর-একটা পার্টির আয়োজন করতে লাগলেন তিনি, আর সেই কোলাহলের মধ্যে আবারও চার্লি পাগল হয়ে উঠলেন। তিনি চান শান্তি, চান বিশ্রাম। মীলড্রেড তাঁকে শান্তি দেবেন না। কলহের ঝঞ্ঝায় তাঁকে অস্থির বিপর্যস্ত করে দেবেন। বাড়ি থেকে পালিয়ে পথে-পথে আর

নয়তো সমুদ্রতীরের নির্জন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন চার্লি।

কয়েকদিন বাদে একবার যে তিনি পথে বেরিয়ে এলেন, আর বাড়ি ফিরলেন না। লস এঞ্জেলস অ্যাথলেটিক ক্লাবের সেই পুরনো আস্তানায় গিয়ে উঠলেন। আদালতে বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা না ওঠা পর্যন্ত সেইখানেই তিনি ছিলেন।

(১৬)

দাম্পত্য জীবনের উদ্বেগ আর অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্যে আরও একখানি বই তুলবার চেষ্টা করেছিলেন চার্লি। শিল্প-জীবনের আশ্রয়ে এসে তাঁর যন্ত্রণাকে তিনি ভুলতে চেয়েছিলেন। পরপর দুখানা বই তিনি তুললেন, "সানিসাইড" আর "এ ডে'জ প্লেজার"। এ দুটি বইয়ের কোনওটিতেই তাঁর অভিনয়-প্রতিভার বিশেষ কোনও অগ্রগতি পরিলক্ষিত হয়নি। স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল, সেই একই জায়গায় তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আর এগোতে পারছেন না। পারা সম্ভবও ছিল না। কিন্তু সমালোচকরা তাই বলে তাঁকে ক্ষমা করেননি। কাগজে-কাগজে এ দুটি বইয়ের বিরূপ সমালোচনা প্রকাশিত হল। কেউ কেউ এমন মন্তব্যও করলেন যে, চার্লির কাছে আর নতুন কিছু আশা করবার নেই; তিনি ফুরিয়ে গিয়েছেন। চ্যাপলিন খতম, এবার আমাদের অন্য কোনও রঙ্গাভিনেতাকে খুঁজে বার করতে হবে। হ্যারল্ড লয়েড, বাস্টার কীটেন এবং আর আর যাঁরা আছেন, এবারে বরং তাঁদের কাছে চল, তাঁরাই হয়তো নতুন কোনও সৃষ্টিকলার সন্ধান দিতে পারবেন।

"সানিসাইড" আর "এ ডে'জ প্লেজার", এ দুটি বইয়ে যে চার্লি-প্রতিভার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়নি সে-কথা ঠিক, কিন্তু তাই বলে এত কঠোর ভাষায় এর নিন্দে করবারও কোনও কারণ ছিল না। "সানিসাইড"এর কথাই ধরুন। এ বই-খানি তোলা হয়েছিল পল্লী-অঞ্চলের পটভূমিকায়। শান্ত একটি গ্রাম, এক-পাশে একটি গির্জা। চার্লি নেমেছেন রাখালের ভূমিকায়। অবসর সময়ে গ্রামের হোটেলটিতে গিয়ে তিনি পরি-চারকের কাজ করেন। এই দারিদ্র্যের মধ্যেও তাঁর সুখের অন্ত নেই। তার কারণ এডনা সেখানে রয়েছেন। চার্লি তাঁর সৌন্দর্যে বিমোহিত। কিন্তু তাতেই ঘটল বিপদ। এডনাকে তিনি একদিন চিনির পাত্রটা এগিয়ে দিচ্ছেন, অথচ পাত্রের দিকে লক্ষ্য নেই তাঁর, হাঁ করে এডনার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন তিনি। সমস্ত চিনি এডনার গায়ের উপরে ঢেলে পড়ল। আর একদিন, এডনাকে দেখতে দেখতে সমস্ত কিছুই তিনি বিস্মৃত হয়ে গিয়েছেন। মনে নেই যে, মাঠে গিয়ে গোরুগুলিকে নিয়ে আসতে হবে। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে গেল। তখন মনে পড়ল চার্লির। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে গোরুগুলি ততক্ষণে হারিয়ে গিয়েছে।

গোরু খোঁজার দৃশ্যটি ভারী চমৎকার। প্রথমে তো গোরু মনে করে স্থূলকায় এক ভদ্রলোককে গিয়ে জাপটে ধরলেন চার্লি। তারপর তাঁর কাছে ক্ষমা চেয়ে আর একটু এগিয়েই তিনি হতভম্ব। তাঁর মালিক এক সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছেন, আর একটি গোরু পথ হারিয়ে সেই সভার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়েছে। লাফিয়ে গিয়ে গোরুর পিঠে সওয়ার হলেন চার্লি, সভার থেকে তাকে বাইরে নিয়ে আসবার চেষ্টা করতে লাগলেন। গোরুটা এদিকে প্রাণপণে দৌড়চ্ছে। দৌড়তে দৌড়তে সভা ছাড়িয়ে সে অনেক দূরে এসে পড়ল। তখন আর এক বিপদ! যতই চেষ্টা করেন চার্লি, গোরুর পিঠ থেকে আর নামতে পারেন না।

পরের কয়েকটি দৃশ্য আরও সুন্দর। গ্রামের ঠিক পাশেই একটি নদী। গোরুটা তো খেপে গিয়ে চার্লিকে সেই নদীর মধ্যে নিক্ষেপ করল। ডুবে যেতে যেতে স্বপ্ন দেখতে লাগলেন চার্লি। অপরূপ সেই স্বপ্ন। যেন কয়েকটি জলপরী এসে উদ্ধার করেছে তাঁকে, নদীর তীরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্যানের ভঙ্গীতে তিনি বাঁশি বাজাচ্ছেন। তারপর সেই জলপরীদের সঙ্গে তিনি নাচতে লাগলেন। উদ্দাম উল্লাসময় নৃত্য। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, "সানিসাইড"এর নৃত্য-পরিকল্পনায় তিনি নীৎসিনস্কিকে অনুসরণ করেছিলেন। চার্লির কাছেই শুনেছি, এই দৃশ্যটিতে অভিনয় করে তিনি যতখানি আনন্দ পেয়েছিলেন, তত আনন্দ খুব কম বইয়েই পেয়েছেন। এবং এতখানি ছন্দ-সুষমাও যে খুব কম নাচেই দেখা গিয়েছে, আশা করি "সানিসাইড"এর দর্শকমাত্রেই সেকথা স্বীকার করবেন। বইখানির শেষ দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়, চার্লির মালিক এসে নদীগর্ভ থেকে টেনে তুলে তাঁকে কষে ধমক লাগাচ্ছেন।

"সানিসাইড"এর পর "এ ডে'জ প্লেজার"। ছোট্ট একটি পরিবার ছুটির দিনে মোটরে চড়ে বেড়াতে বেরিয়েছে, এই নিয়েই এই বই। পরিবার বলতে চার্লি, তাঁর স্ত্রী, আর দুটি শিশুসন্তান! একটার পর একটা বিপদের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছেন তাঁরা। দেখতে দেখতে হেসে গড়িয়ে পড়তে হয়। একটি দৃশ্যের কথা বলি। পথের মধ্যে কারা যেন এক পিপে আলকাতরা রেখে গিয়েছে। চার্লির গাড়ি গিয়ে সটান সেই পিপের

গায়ে ধাক্কা মারল। পিপে উল্টে পথের উপরে ছড়িয়ে পড়ল আলকাতরা। কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল দুজন কনস্টেবল। দৌড়ে এসে চার্লিকে তারা আটক করল। তারপর কথা-কাটাকাটি, ধস্তাধস্তি। ওদিকে সকলেই ততক্ষণে আলকাতরার মধ্যে আটকে গিয়েছে। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারো। তারই ভিতরে সমানে ঝগড়া চালিয়ে যাচ্ছে সবাই।

তখনও চার্লি তাঁর "দী কীড" বইখানি তোলেননি। কিন্তু এই চার বছরের মধ্যেই তাঁর প্রতিভার যে পরিচয় পাওয়া গিয়েছে, সকলেই তাতে বিস্মিত, অভিভূত। এতদিন শুধু পেশাদার চিত্র-সমালোচকরাই তাঁর প্রশংসা করে এসেছেন। বহু বিখ্যাত লেখকও এবারে এগিয়ে এলেন। চার্লির প্রতিভা, তাঁর শিল্প-আঙ্গিক আর কর্মপদ্ধতির বিশ্লেষণে যে-উৎসাহ সবাই তখন দেখিয়েছেন, তা কারো পক্ষে বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়। অ্যামেরিকা, ইংল্যান্ড, ফ্রান্স—সর্বত্র তাঁকে নিয়ে তখন বই লেখা হচ্ছে। ফ্রান্সে তিনি অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন। চার্লি বলতে সবাই সেখানে তখন পাগল। ম্যাক্স লীন্ডারের নাম সবাই শুনেছেন। সেকালে তিনিই ছিলেন শ্রেষ্ঠ ফরাসী রঙ্গাভিনেতা। চার্লিকে তিনি শুধু প্রশংসাই করেননি, তাঁকে তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। হলিউড থেকে ফ্রান্সে প্রত্যাবর্তন করে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন ম্যাক্স লীন্ডার। তার একটি অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি।

"চার্লি বলেন, আমি নাকি তাঁর শিক্ষক। আমার তো ধারণা, তাঁরই কাছ থেকে আমি প্রভূত শিক্ষালাভ করেছি। তিনি একজন সত্যিকারের হাস্যরসিক শিল্পী। অত্যন্তই যত্নভরে তাঁর এই শিল্পটিকে তিনি আয়ত্ত করেছেন। কীভাবে, কত অনায়াসে মানুষকে হাসানো যায়, তা তিনি জানেন। অনিশ্চিত দৈবের হাতে কোনও কিছুই তিনি ছেড়ে দেন না। যা কিছু তিনি করেন, সুপরিকল্পিতভাবেই করেন। প্রয়োজন হলে এক একটি দৃশ্যের পিছনে প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন তিনি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত দৃশ্যটি তাঁর সম্পূর্ণ মনোমত হচ্ছে, ততক্ষণ তাঁর শান্তি নেই। প্রতিটি দৃশ্যকেই বারংবার তিনি তোলেন; তুলে বুঝবার চেষ্টা করেন, কোথায় কোন্ খুঁত রয়ে গেল। খুঁত যদি ধরা পড়ে, তৎক্ষণাৎ সেই দৃশ্যটিকে বাতিল করে দেন তিনি, তারপর আবার তোলেন। তাঁর ছবির তাঁর চাইতে কঠোর সমালোচক বোধ হয় আর কেউই নন।

"চার্লির কাজ আমি দেখেছি। দেখে বুঝতে পেরেছি, একটা ছবি তুলতে ক' হাজার ফুট ফিল্ম খরচা হল, সেটা একটা ধর্তব্য ব্যাপার নয়। ছবির কথা উঠলেই আমরা এখানে ফুটের হিসেব কষি। কিন্তু ছবির সঙ্গে যে এই ফুটের মাপের কোনও সম্পর্ক নেই, তা আমরা বুঝি না। ক ফুট ফিল্ম খরচা হল সেটা বড় কথা নয়, ছবি তুলতে গিয়ে কতখানি যত্ন নেওয়া হল সেইটেই বড় কথা। একটা উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা বোধ হয় পরিষ্কার হবে। ১,৮০০ ফুটের একখানি ছবি তৈরি করতে চ্যাপলিন মোট দু মাস সময় নিয়েছিলেন। ছবিখানি পুরোপুরি দেখাতে মিনিট কুড়ি সময় লাগে। অথচ এই ছোট্ট বইখানির জন্যই তাঁর মোট ৩৫,০০০ ফুট ফিল্ম-নেগেটিভ খরচা হয়েছিল। ৩৫,০০০ ফুটের ছবি! দেখাতে মোট ছ' ঘণ্টা সময় লাগবার কথা। সেই বিরাট ছবিকে কেটেছেঁটে চ্যাপলিন মাত্র ১,৮০০ ফুটে দাঁড় করিয়েছেন। এইখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

"প্রযোজক হিসেবে তিনি দৃঢ়চেতা, স্থিরবুদ্ধি। এবং একজন সত্যিকারের গুণী ব্যক্তি। নানান দেশের মানুষ, নানান ধরনের মানুষ তাঁর দর্শক। এই দর্শক-সমাজ এতদিন স্থির চিত্তেই তাঁর প্রতিভার ক্রম-বিবর্তনকে অনুসরণ করে এসেছেন, তাঁর রঙ্গাভিনয়ে মুগ্ধ হয়েছেন। অনেকে আজকাল তাঁকে অনুকরণ করে থাকেন। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি ভাবভঙ্গীকেই তাঁরা নকল করেছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, তিনি যতখানি অনায়াসে আমাদের হাসাতে পারেন, তাঁর অনুকারকরা তা পারেন না। কী করেই বা পারবেন? এই অনুকরণ-স্পৃহা যে তাঁদের হীনম্মন্যতারই পরিচায়ক। চ্যাপলিনের যে নিজস্বতা রয়েছে, তা তাঁদের নেই। তাঁর চেহারা আর ভঙ্গীগুলির সঙ্গেও সবাই সুপরিচিত। তিনি অনন্য। তাঁর সব কিছুতেই হয়তো নকল করা যায়, কিন্তু ব্যক্তিত্বের এই অনন্যতাকে কে নকল করবে!"

ফরাসী লেখক লুই দ্যুলাক আরও স্পষ্ট ভাষায় এই একই অভিমত প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "অভিব্যক্তির ইতিহাসে এক অসামান্য সম্মানের আসনে তিনি প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। তার কারণ, মানুষকে হাসাতে গিয়ে ভাঁড়ামির গতানুগতিক পন্থাকে তিনি অবলম্বন করেননি, তিনি একটি পৃথক পন্থা খুঁজে নিয়েছিলেন।"

খুব কাছাকাছি থেকে যাঁরা এই অসামান্য শিল্পীর কর্মপদ্ধতি অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিলেন, চার্লস চ্যাপলিনের সেক্রেটারি মিস এলসি কড তাঁদের অন্যতম। তিনি বলেছেন, গতানুগতিক

পন্থায় কাজ করতে পছন্দ করেন না চার্লি। ছবির অন্তর্নিহিত রসৈশ্বর্যকে ফুটিয়ে তুলবার ব্যাপারে সব সময়েই তিনি অন্যতর কোনও উপায় উদ্ভাবনের পক্ষপাতী। মিস কডের একটি প্রবন্ধ থেকে খানিকটা অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি।

"নতুন কোনও বিষয়-বস্তু যখন তাঁর চিন্তাকে নাড়া দিয়ে যায়, দিনকয়েকের জন্য তাঁর মেজাজ তখন বড় রুক্ষ হয়ে ওঠে। মনে হয়, কী একটা অশান্তি যেন অষ্টপ্রহর তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। বন্ধুবান্ধবরা তখন এড়িয়ে চলেন তাঁকে। সাধারণত এইসব সময়েই তিনি ছুটি নেন। বোঝা যায়, তিনি একটু নির্জনে থাকতে চাইছেন। ছুটি নিয়ে দিনকয়েকের জন্যে ক্যাটালিনা দ্বীপে চলে যান তিনি। সেখান থেকে যখন ফিরে আসেন, তখন তিনি আর এক মানুষ। যে বিষয়-বস্তুকে তিনি ধরি-ধরি করেও ধরতে পারছিলেন না, তা এবারে তাঁর চিন্তার ক্ষেত্রে একটি সুস্থির দৃষ্টি-গ্রাহ্য অবয়ব গ্রহণ করেছে। স্টুডিয়োতে গিয়ে বন্ধুবান্ধবদের তিনি ডেকে পাঠান, ব্যাপারটা বেশ ভালভাবে তাঁদের বুঝিয়ে দেন। তারপর জিজ্ঞেস করেন, এ সম্পর্কে তাঁদের কারো কিছু বক্তব্য আছে কিনা। বন্ধুবান্ধবদের পরামর্শ যদি মনঃপূত হয়, বিনা দ্বিধায় সে পরামর্শ তিনি গ্রহণ করেন।"

কাহিনী রচনার পালা সাঙ্গ হল, শুরু হল পরিচালনার কাজ। ফ্লোরে গিয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ভূমিকা-লিপি বণ্টন করে দিলেন। "আলাদা-আলাদাভাবে প্রতিটি অভিনেতা এবারে তাঁর কাছে এসে রিহার্স্যাল দিয়ে যাচ্ছেন। এর আগে প্রত্যেকটি ভূমিকা তিনি নিজে একবার রিহার্স্যাল দিয়ে নিয়েছেন। যদি বলি, চ্যাপলিন তাঁর প্রতিটি বইয়ের প্রতিটি ভূমিকাতেই নিজে একবার অভিনয় করেছেন তো কিছুমাত্র বাড়িয়ে বলা হবে না। অনর্গল কথা বলে যাচ্ছে যে মেয়েটি, রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে যে কনস্টেবলটি যানবাহন-চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছে আড়ালের অন্ধকার থেকে যে গুণ্ডাটি যে কোনও মুহূর্তে সামনে এসে অবতীর্ণ হবে বলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সবাই অপেক্ষা করছে, অর্থাৎ যত রকমের মানুষ আছে তাঁর ছবিতে, তাঁর প্রতিজনের চরিত্রই তাঁর নখদর্পণে। আভাসে-ইঙ্গিতে, কিন্তু অত্যন্তই পরিচ্ছন্নভাবে, চরিত্রগুলির তাৎপর্য তাঁর অভিনেতাদের তিনি বুঝিয়ে দেন, যেন কোথাও কিছু না অস্পষ্ট থাকে। তারপর রিহার্স্যাল। রিহার্স্যালের সময় অভিনেতাদের কাছে-কাছে থেকে সারাক্ষণ তিনি তাঁদের উৎসাহ দিয়ে যান। 'দিব্যি হয়েছে, তবে কিনা আর-একটু জোরে আর সামান্য-একটু জোরে তোমাকে হাত-পা ছুঁড়তে হবে। এই তো, বাঃ চমৎকার হয়েছে এইবার।'

"ভীলেনের ভূমিকায় যিনি অভিনয় করবেন, এবারে তাঁর পালা। প্রথমেই তাঁকে গোটাকয়েক উপদেশ দিয়ে নেবেন চার্লি। 'দ্যাখো বাপু, ভীলেন বলতে আর সবাই যা বোঝে, সেই গতানুগতিক ধারণাটাকে তোমার ঝেড়ে ফেলতে হবে। মনে মনে ভেবে নাও যে, তুমি একটি ভীলেন, কিন্তু তাই বলেই তুমি কিছু নিরঙ্কুশ বদ-চরিত্রের মানুষ নও। আসল কথা, কোন্ কাজটা ভাল, আর কোন্‌টা খারাপ, সে সম্পর্কে কোনও ধারণাই নেই তোমার। না না, অমন কটমট করে তাকাবার কোনও দরকার নেই। আর একটা কথা, অভিনয় করতে গিয়ে যেন অভিনয়ই ক'র না।'

"অভিনয় করতে গিয়ে যেন অভিনয়ই ক'র না। কতবার যে কতজনকে তিনি এই উপদেশ দিয়েছেন! অনেকে এতে আশ্চর্য বোধ করতে পারেন। কিন্তু মনে রাখা দরকার, চ্যাপলিনের সাফল্যের অনেকখানি রহস্য এই একটি মাত্র উক্তির মধ্যেই নিহিত রয়েছে। আন্তরিকতা থেকেই আসে আত্মপ্রত্যয়। চ্যাপলিনের এই আত্মপ্রত্যয় ছিল। ছিল বলেই অন্যান্য অভিনেতাদের পিছনে ফেলে এমন অনায়াসে তিনি সামনে এগিয়ে যেতে পেরেছেন। ছিল বলেই তাঁর অভিনয় সম্পর্কে আমাদের মনে তিনি একটি সহজ বিশ্বাসের সৃষ্টি করতে পেরেছেন আর কেউ তা পারেনি।" (ক্রমশ

ছোটগল্প

অসাধারণ—বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। মিত্রালয়, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—তিন টাকা।

জীবিতাবস্থায় বিভূতিভূষণ আজীবন বিশ্বপ্রকৃতির ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। প্রকৃতির মাধুর্যই ছিল তাঁর ভাবজগতের একমাত্র উপাদান। তাঁর সমগ্র সাহিত্যই এই উপাদানে গঠিত।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে ইতস্তত প্রকাশিত কয়েকটি গল্প সংযোজিত হয়েছে। বিভূতি-ভূষণের রচনার বৈশিষ্ট্য মানুষের দৈনন্দিন সুখদুঃখ, ব্যথাবেদনা অনাড়ম্বর ভাষায়, পরিচ্ছন্ন তুলির আঁচড়ে অপরূপ হয়ে ফুটে ওঠে। অতি কথনের দোষ যেমন নেই, তেমনি নেই অল্প ভাষণের অস্পষ্টতা।

ইংরাজী সাহিত্যে Wordsworth ছিলেন Pantheism এর ভক্ত। প্রকৃতির বন্দনার মাধ্যমে ইষ্টদেবতার উপাসনাই ছিল তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য। বিভূতিভূষণও গাছপালা অরণ্যপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে সুন্দরের আরাধনায় ব্যাপৃত ছিলেন আমরণ। তাঁর লেখনীর স্পর্শে বাংলাদেশের পল্লীর অনাদৃত গাছপালা অপূর্ব সজীবতায় উজ্জ্বল। মানুষ এই প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী-ভাবে জড়িত। এককে অপরের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা সম্ভব নয়।

'অসাধারণ' গল্পগ্রন্থে দুর্জ্ঞেয় কয়েকটি চরিত্রের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। 'ঝিটকিপোতার পাশ করা মেয়েটি', পীতাম্বর লেনের শ্যামলী, নেগাঁয়ে নাম লেখা হাজু, তেঁতুলতলা ঘাটের হারু বিভূতিভূষণের দরদী ছোঁয়ায় রক্তমাংসে নিটোলই শুধু নয়, রংয়ে রেখায় নিখুঁত। এইসব চরিত্রের পাশাপাশি মউ-টুসকি পাখী, ঘেঁটুফুল, কটুগন্ধ ঘেঁটুফুল, মসৃণ মাকাললতা, বৈঁচি, ভাট, বনকচু বাংলাদেশের অচেনা অর্ধচেনা প্রকৃতি বর্ণবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল।

কিন্তু নিছক চরিত্র বর্ণনাই বিভূতি-ভূষণের শেষ কথা নয়। প্রত্যেকটি গল্পের একটি নীতিকথা আছে। এ নীতিকথা হিতোপদেশের মত গল্পের শেষে সংযোজিত হয়নি, গল্পের ছত্রে ছত্রে, ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র-পরিস্ফুটনের মধ্যে নিহিত। মানুষের গতিবিধি, গাছপালার হ্রাসবৃদ্ধি সব কিছুর অন্তরালে আর এক অদৃশ্য শক্তির মহান ইঙ্গিত প্রচ্ছন্ন, তাঁরই অঙ্গুলী নির্দেশে সাধারণ মানুষ অসাধারণ হয়ে ওঠে, সাধারণ জীবন মহত্তর।

৩০৮।৫৪

স্বদেশী বৌ—ফণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত। বিশ্ববাণী পাবলিশার্স, ৬ মুরলীধর সেন লেন, কলিকাতা—৭। মূল্য—আড়াই টাকা।

বাংলা সাহিত্যে বিবিধ শাখাপ্রশাখার মধ্যে ছোটগল্পের ঐতিহ্য আর মর্যাদা সম-সাময়িক অন্যান্য ভাষায় রচিত ছোটগল্প অপেক্ষা বহুলাংশে উন্নত, একথা প্রতিবাদের আশঙ্কা না করেই বলা চলে। ভাবগত ও আঙ্গিকগত নৈপুণ্যে বাংলা ছোটগল্প সত্যই বাংলা সাহিত্যের গর্বের বস্তু। আনন্দের কথা, স্বল্পখ্যাত লেখকদের রচনাতেও স্থানে স্থানে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় ভাষার সৌকর্য ও লিপিকুশলতা পরিলক্ষিত হয়।

ঠিক এই কারণেই সমালোচনার জন্য গল্প-সংগ্রহ হাতে এলেই চিন্তা হয় মনের মধ্যে বাংলা গল্পের যে মাপকাঠি রচিত হয়েছে তার অনুপাতে হয়ত গল্পগুলো উল্লেখযোগ্য হবে না।

ফণীন্দ্রবাবু খ্যাতিমান না হলেও বিভিন্ন সাময়িকীতে ছড়ানো ছিটানোভাবে এঁর রচনার সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটেছে। অনাড়ম্বর বর্ণনাভঙ্গী, শান্তস্নিগ্ধ পরিবেশ ও সুষ্ঠু চরিত্রচিত্রণের গুণে অনেকগুলো গল্পই রসোত্তীর্ণ। মধ্যবিত্ত জীবনই ফণীন্দ্র-বাবুর রচনার উপজীব্য, হাসিকান্নার টানা-পোড়েনে সাধারণ সুখ দুঃখের কাহিনী। গল্পগুলি সুখপাঠ্য কিন্তু সাহিত্যের কষ্টি-পাথরে এটাই শেষ কথা নয়। যে অন্তর্দৃষ্টি ও গভীরতাবোধের স্পর্শে গল্প সার্থক গল্পে রূপায়িত হয়, তার অভাব রয়েছে। তবে আশার কথা, লেখক নবীন। পরবর্তী রচনায় উজ্জ্বলতর সাহিত্য সৃষ্টির সন্ধান আমরা পাবো এ বিশ্বাস আমাদের আছে।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদচিত্রণ সাধারণ।

১৬২।৫৪

গল্পসংকলন

নবমঞ্জরী—বনফুল। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য—আড়াই টাকা।

সাহিত্যের মূলকথা বোধ হয় অতৃপ্তি-বোধ। ঠিক সেই কারণেই নানা বিচিত্র আঙ্গিকে বিচিত্রতর রচনাকে সাহিত্যে পরি-বেশন করায় বনফুলের এই অক্লান্ত প্রয়াস। কাব্য, উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক সমস্ত শাখাই বনফুলের প্রতিভাস্পর্শে সমুজ্জ্বল, তাঁর বলিষ্ঠ কল্পনায় মহীয়ান। বাংলা সাহিত্যে রূপকৃৎদের মধ্যে বনফুলের আসন যে প্রথম শ্রেণীতে এ বিষয়ে মতদ্বৈধের অবকাশ নেই।

'নবমঞ্জরী' লেখকের ইতস্তত প্রকাশিত গল্পের একত্র সংকলন। অভিনব চিন্তাধারা ও আশ্চর্য পরিমিতিবোধে প্রায় প্রতিটি গল্পই স্বাতীতারার জলে স্নাত মুক্তার ন্যায় নিটোল। সাধারণ পাঠকের কাছে তাঁর কয়েকটি গল্প অসম্পূর্ণ অথবা অস্বাভাবিক-রূপে হ্রস্ব প্রতীয়মান হওয়া আশ্চর্য নয়। স্থানে স্থানে সত্যই ফর্মের শুষ্ক কাঠামোকে অতি প্রাধান্য দেওয়ার ফলে গল্পের সাবলীলতা ক্ষুণ্ণ হয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বনফুলের সাহিত্যের গোড়ার কথাই তাই। বিবিধ পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্যে তাঁর রচনা

অগ্রসর হয়েছে অনলস ভঙ্গীতে। মানুষকে, সুখদুঃখচেতনাবোধকে তিনি দেখেছেন অদৃষ্টপূর্ব দৃষ্টিকোণ থেকে, বৈজ্ঞানিকের রুক্ষ সাধনার মাধ্যমে।

আলোচ্য গ্রন্থে ত্রিশটি গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। বিচিত্র চরিত্র, বিচিত্রতর কাহিনী শিল্পীসুলভ বিন্যাসে পাঠককে অফুরন্ত রসের সন্ধান দেয়। অম্লমধুর তিক্তরসসিঞ্চিত

অভিজ্ঞতাপ্রসূত মনুষ্য চরিত্রের একটানা মিছিল। অতিশয়োক্তির ভার নয়, স্বল্পোক্তির অস্পষ্টতাও নয়, নিখুঁত ভারসাম্যে প্রতিটি চরিত্র, রক্তমাংসে সজীব, প্রতিটি কাহিনী বাস্তবানুগ। ৩৪৩।৫৪

উপন্যাস

বিজয়লক্ষ্মী—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য—দু' টাকা আট আনা।

শরদিন্দুবাবু জাত সাহিত্যিক। গল্প, উপন্যাস, নাটক, গোয়েন্দা কাহিনী সব কিছুই তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীর স্পর্শে প্রাণবন্ত, রসোত্তীর্ণ। আলোচ্য গ্রন্থটির কাহিনী চিত্র-নাট্যের পদ্ধতিতে রচিত হ'লেও অনুধাবন করতে কিছুমাত্র অসুবিধা হয় না। কাহিনীর সরলতায়, চমকপ্রদ সংলাপে সাবলীল বর্ণনা-ভঙ্গীতে রচনাটি পাঠকদের মনে গভীর রেখাপাত করে।

আলোচ্য গ্রন্থটি যে রসিকসমাজে আদৃত হয়েছে, স্বল্পকালের মধ্যে একাধিক সংস্করণ হওয়াই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ৩৪২।৫৪

সেই পুরাতন কথা: নীলিমা দেবী; পরিবেশক—ক্যালকাটা বুক ক্লাব, ৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য তিন টাকা।

একখানি পারিবারিক উপন্যাস। নাম-করণের মধ্যে লেখিকা যদি কোন চিরন্তন কথা বোঝাতে চেয়ে থাকেন, তবে বলব সে রকম কিছুর পরিচয় এতে অনুপস্থিত। তার চেয়ে বরং গত যুগের একটি মামুলী কাহিনীকে কৃত্রিম চাকচিক্যের মাধ্যমে পরিবেশন করা হয়েছে। আলোচ্য পুস্তকটির উপকাহিনীগুলি মূল কাহিনীর সঙ্গে সঙ্গতি ও যোগাযোগটা তাল মিলিয়ে রক্ষা করতে পারেনি। উচ্চমধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত সংসারের যেটুকু চিত্র ও চরিত্র লেখিকা এ'কেছেন তা শান্ত, স্নিগ্ধ ও আন্তরিকতার স্পর্শে সজীব। তা সত্ত্বেও বলতে হয় রচনা একঘেয়ে ও বাহুল্যদোষে দুষ্ট। কাহিনীর গতি স্থান কালকে ডিঙিয়ে অনেক জায়গায় কল্পনার উপর ভর দিয়ে এগিয়ে চলেছে (উদাহরণ স্বরূপ অমিতাভ ও ঝুমির অনুরাগের অংশটি)। তবে পরিশেষে একটি আদর্শগত প্রেমোপাখ্যানের আমেজ থাকায় পড়তে নেহাৎ খারাপ লাগে না। ইতস্তত অসংখ্য বানান ও ছাপার ভুল দেখা গেল—প্রচ্ছদপটটি ভালই। ৪৫৪।৫৪

(১) **রিক্তের বেদন**—বিধুভূষণ দত্ত; নলেজ হোম, ৫৯, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬ : মূল্য—৩৷৷৹।

(২) **রিক্তের বেদন—কৃষ্ণগোপাল বসাক; প্রকাশক—হরিগোপাল বসাক, ২।২, রতন সরকার গার্ডেন লেন, কলিকাতা** : মূল্য—৩

একটা কথা প্রচলিত আছে,—বঙ্কিমচ পরিহাস করে মাঝে মাঝে বলতেন, 'উপনা লিখব কী? সংগে সংগে তার উপসংহ লিখবার জন্য দামোদর কলম উ'চিয়ে আছে ......১৩৬১ সালে দেখি সেই 'দামোদর' আজও সক্রিয়। বঙ্কিম-যুগের 'দামোদর' ত লিখতে জানতেন, এ যুগের 'দামোদর' লিখতে জানা ত দূরের কথা, ভাব, ভাষা ঘটনাবিন্যাসের প্রাথমিক শিক্ষাও এ'দের নেই

দু'টি বইয়েরই নাম এক—একই সম বেরিয়েছে, লেখক ভিন্ন। প্রথম বইখানিতে 'উদ্বাস্তু-শিবির'এর কথা বলতে গিয়ে অবাঞ্ছিত কোলাহলে মুখর হ'য়েছেন লেখক, ঘটনাবিন্যাস, চরিত্র, বক্তব্য, কিছুই কোনো দ্বিতীয় বইখানি একটি হঠাৎ অন্ধ হয়ে যাওয়া যুবকের কাহিনী, প্রথম বইখানার থেকে যথেষ্ট আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ পর্যন্তই, রচনা একেবারে কাঁচা হাতের।

৪৫৫।৫৪, ৪৫৬।৫৪

ময়নানদী : সুধীররঞ্জন গুহ, জিজ্ঞাসা, ১৩৩এ, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—২৯, মূল্য ৩৲।

একটি ম'জে যাওয়া নদীর পুনরুদ্ধারকে কেন্দ্র করে লেখক তাঁর ঘটনাপ্রবাহের আবর্ত সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু উপযুক্ত ক্ষমতার অভাবে সার্থক হ'তে পারেন নি। ভাষা মোটামুটি ভালো, কিন্তু সংলাপ দুর্বল, কাহিনী বিন্যাস এবং গ্রন্থনেও যথেষ্ট শৈথিল্য আছে, চরিত্রগুলিও আড়ষ্ট এবং অসংগতিপূর্ণ। 'দুলালী' চরিত্রের ক্রম-বিকাশের মধ্যেও কষ্টকল্পনা পরিলক্ষিত হয়।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদচিত্র মোটামুটি ভালো। ৪৪৪।৫৪

ঝড়লেখা : শ্যামল দত্ত, বাতায়ন পাব্লিশিং হাউস, ৮৫, বৌবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২, মূল্য ২৲।

স্বাধীনতা সংগ্রামের খ্যাত ও অখ্যাত সৈনিকদের আত্মত্যাগের বিভিন্ন কাহিনী বারোটি বিভিন্ন ছোট ছোট গল্পের মাধ্যমে পরিবেশিত। বেশ দরদ দিয়ে ছোটদের মতো ক'রে লেখা।

প্রচ্ছদ-চিত্র কাহিনীর দিক দিয়ে বিভ্রান্তিকর, বইয়ের নামটাও উপযুক্ত হ'য়েছে বলে মনে হয় না। ছাপা-বাঁধাই মোটামুটি ভালো। ৪৪২।৫৪

কবিতা

Poems of Basab Tagore: Publisher—Thacker Spink & Co. Ltd., 3, Esplanade East, Calcutta.

ইংরেজী ভাষায় লেখা কতকগুলি কবিতার সংকলন। কবিতাগুলির মধ্যে কবি

মনের সহজ অভিব্যক্তির স্পর্শ না থাকায় কেমন যেন কষ্টকল্পিত মনে হয়। ভাব-সম্পদের দিক থেকেও বিশেষ বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সুদূরে প্রসারিত জীবনের যে অনুভূতি রচনাগুলির মধ্যে ফুটে উঠেছে সেটুকুই যা একটু উল্লেখযোগ্য। বইটির মধ্যে কোনপ্রকার মূল্যের উল্লেখ নেই। মুদ্রণ ও অঙ্গসজ্জা উত্তম। ৩৭৪।৫৪

সাহিত্যালোচনা

আধুনিক বাংলা কাব্য (প্রথম পর্ব)—লেখক শ্রীতারাপদ মুখোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রকাশক শ্রীমহীতোষ বসু, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। ২৩৭ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ টাকা।

শ্রীশ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় পুস্তকটির ভূমিকায় লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধীনে গবেষণারত শ্রীমান তারাপদ মুখোপাধ্যায় পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-পরিচিতি প্রসূত দৃষ্টিভঙ্গী হইতে আধুনিক বাংলা কাব্যের একখানি ইতিহাস রচনা করিয়াছেন। এই ইতিহাস ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত হইতে নবীনচন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত। × × এই যুগের কবি গোষ্ঠীর সহিত মোটামুটি আমাদের সকলেরই পরিচয় আছে। তথাপি ইহাদের সম্বন্ধে সূক্ষ্মতর আলোচনা ও সামগ্রিক যুগ-পরিচয়ে ইহাদের স্থান-নির্ণয়ের যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। তারাপদর গ্রন্থে যুগ-পরিপ্রেক্ষিতে ও কাব্য বিচারের চরম মান-দণ্ডে এইসব সুপরিচিত কবির পুনরালোচনা হইয়াছে। "যাদের বিষয় আলোচনা হয়েছে তাঁরা হচ্ছেন—ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, মধুসূদন দত্ত, বিহারীলাল চক্রবর্তী, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং নবীনচন্দ্র সেন। লেখকের মতে ১৮৩০ থেকে আরম্ভ করে ১৮৯৬ খৃীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঊনবিংশ শতাব্দীর এই লেখকগোষ্ঠী আধুনিক বাঙলা কাব্যের প্রথম পর্ব অধিকার করে আছেন, রবীন্দ্রনাথ থেকে দ্বিতীয় পর্বের সূত্রপাত। ঊনবিংশ শতকের বাঙলা কাব্যের ইতিহাস রচনা এবং কবিদের প্রতিভার স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য নিদ্ধারণ যে জটিল, গুরুত্বপূর্ণ ও কঠিন কাজ সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং তারাপদবাবু এই দুরূহ কাজে যে দুঃসাহস, বুদ্ধিমত্তা, অনুভূতি এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণাত্মক মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যই প্রশংসার যোগ্য। লেখক পুস্তকটির প্রথম অধ্যায়ে 'আধুনিক বাঙলা কাব্যের ভূমিকা'য় লিখেছেন, "এই যুগের কবিদের কাব্য-সাধনাকে ঠিক রস-সাধনা বলা যায় না, ইহা জাতীয় আদর্শের সাধনা।" অন্য স্থলে লিখেছেন, "পাশ্চাত্ত্য সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রভাবে বাংলাকাব্য যখন নূতন গতিপথে অগ্রসর হইতে লাগল তখন সে কাব্যধারা 'মেঘনাদবধ' কাব্যের ন্যায় ক্লাসিক মহাকাব্যের খাতে প্রবাহিত হইবে অথবা বিহারীলালের 'সারদা-মঙ্গলের' ন্যায় রোমান্টিক গীতি-কবিতার খাতে প্রবাহিত হইবে এই পর্বে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলিয়াছে এবং পরিশেষে দেখা গিয়াছে বিহারীলালের কাব্যধারাই জয়ী হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথ তাহার দৃষ্টান্ত।" অর্থাৎ গীতিকবিতা নিয়ে দ্বিতীয় পর্ব শুরু। বাংলা সাহিত্যের প্রতি ছাত্র এবং অনুরাগীর এই সুচিন্তিত এবং সুলিখিত পুস্তকটি অবশ্য পঠিতব্য।

৩৮৫।৫৪

ভারতীয় দর্শন

দর্শনের ইতিবৃত্ত—প্রথম পর্ব (ভারতীয় ও গ্রীক দর্শন)—মনোরঞ্জন রায়; প্রকাশক ঃ নিরঞ্জন রায়, ১।২ জ্যাকসন লেন। প্রাপ্তিস্থান ঃ ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। রয়াল ৪১৬ পৃষ্ঠা। মূল্য ৭৲ টাকা।

ভীতি প্রণোদিত হয়ে আদিম মানুষের প্রকৃতির বস্তুগুলির পূজা থেকে আরম্ভ করে অদ্বৈত ব্রহ্মানুভূতি পর্যন্ত অধ্যাত্ম সাধনার ক্রমবিকাশের প্রতিটি পদক্ষেপ যে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাবিশেষের এবং শাসকগোষ্ঠী ও তাদের অনুগৃহীত পুরোহিত প্রভৃতির দ্বারা পরিচালিত ইহাই গ্রন্থকারের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রীক ও ভারতীয় দার্শনিকদের চিন্তাধারা ও মতবাদের ক্রমবিকাশের বিশ্লেষণাত্মক ইতিবৃত্ত দেখাবার শ্রমসাধ্য প্রয়াস পুস্তকটির সর্বত্র বিদ্যমান।

কিন্তু লেখক মার্ক্সীয় ডায়েলেকটিক দৃষ্টিকোণ থেকেই সব কিছু বিচার করতে যাওয়ায় তাঁর বিচারে পক্ষপাতিত্ব দোষ এসে গেছে। ভাববাদের মূলে তীক্ষ্ণ কুঠারাঘাত করে তিনি বস্তুবাদকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর অনন্যসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রকাশভঙ্গীকে অকপটে স্বীকার করে নিয়েও একথা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিতে বাধ্য হব যে, ভারতের মত ধর্মপ্রধান দেশে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্মপ্রচারকদের হেয় প্রতিপন্ন করায় বিপদ আছে।

কয়েকটা দৃষ্টান্ত দিই। তিনি লিখেছেন, "আমার ধারণা হয় ভারতীয় দার্শনিক চিন্তাধারাকে আধুনিক বুর্জোয়া দার্শনিকেরা বিকৃত রূপে আমাদের সামনে হাজির করেছেন। এই বিকৃতি শুরু হয়েছে গুপ্তযুগের ব্রাহ্মণদের হাতে এবং পরিপূর্ণতা লাভ করেছে—শ্রীঅরবিন্দ ও রাধাকৃষ্ণণের মধ্যে।" অন্য স্থানে বলেছেন, "সহস্র সহস্র গাভীর পরিবর্তে যে মুনিঋষিরা বিদ্যাদান করতেন তা বোধ হয় ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার একটি দৈবী প্রকাশ? আমাদের সাধারণ বুদ্ধির অগম্য, মত্তাবস্থায় বিশেষ স্বজ্ঞা বা প্রজ্ঞার দ্বারাই বোধ হয় তা বোঝা যায়। এই সব মুনিঋষির চিন্তাধারা তৎকালীন কায়েমী স্বার্থের যে অনুকূলে ছিল তা সহজেই বোঝা যায়।" শঙ্করাচার্যের মতবাদ সম্পর্কে অন্য স্থলে লিখেছেন, "মনুষ্যের অবমাননাকারী

বুদ্ধির অমর্যাদাকারী এই দার্শনিক চিন্তা-ধারা কি করে প্রসার লাভ করল, তার কারণ 'মূলধনের প্রাথমিক সঞ্চয়ের' মধ্যে পাওয়া যায়। × × সপ্তম শতাব্দী থেকে দশম শতাব্দী পর্যন্ত ভারতে মূলধনের প্রাথমিক সঞ্চয়ের যুগ চলছিল। × × শঙ্করাচার্য ও বাচস্পতি মিশ্র ছিলেন এই উদীয়মান 'বুর্জোয়া' শ্রেণীরই দার্শনিক প্রতিনিধি।"

আবার কপিল, কনাদ, গৌতম, বুদ্ধদেব, নাগসেন, বুদ্ধঘোষ, বসুমিত্র, কুমারলব্ধ, শুভগুপ্ত, দিগনাগ, যশোমিত্র প্রভৃতি বাস্তব-পন্থীদের প্রশংসা করেছেন। সক্রেটিশ ও প্লেটোকে শ্লেষে জর্জরিত করলেও হেরোক্লিটাস এ্যারিস্টল প্রভৃতি বস্তুবাদীদের প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

পুস্তকটিতে গ্রীক ও ভারতীয় চিন্তা-ধারার বিবর্তনের ক্রমিক ধারার একটি প্রাঞ্জল ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। পক্ষপাত-দুষ্ট অংশ-গুলি বাদ দিলে পুস্তকটি উপভোগ্য ও জ্ঞানগর্ভ। ছাপা, বাঁধাই প্রভৃতি চমৎকার।

৩২৫।৫৪

বিপ্লবীর ইতিবৃত্ত

Two Great Indians in Japan (Rash Behari Bose and Netaji Subhas Chandra Bose) by J. G. Ohsawa, published by Sri K. C. Das for Kusa Publications, 123-1, Upper Circular Road, Cal.-6. Price Rs. 4 pages 100.

১৯১২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে লর্ড হার্ডিঞ্জের উপর বোমা নিক্ষেপের সঙ্গে জড়িত রাসবিহারী বসু পুলিশের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করে জাপানে পালিয়ে গিয়ে এবং সেখানেও ব্রিটিশ দূতাবাসের অনুরোধে জাপান সরকারের কাছ থেকে জাপান ত্যাগের আদেশ পেয়ে কিভাবে জাপানীদের সাহায্যে বহুদিন সেখানে আত্মগোপন করে' থাকতে পেরেছিলেন পুস্তকটি প্রধানত তারই চিত্তাকর্ষক কাহিনী। সামুরাই বংশের নেতা শ্রীযুক্ত তোসামার আদেশে শ্রীযুত এবং শ্রীমতী সোমা তাঁদের গৃহে লুক্কায়িত ভারতীয় রাস-বিহারীকে বিয়ে করতে তাঁদের বিংশবর্ষীয়া সুন্দরী কন্যা তোষিকোকে অনুরোধ করেন, এবং যদিও সামুরাই বংশ জাপানে আমাদের ব্রাহ্মণ বংশের মতই শ্রেষ্ঠ এবং যদিও রাসবিহারী দেখতে সুশ্রী ছিলেন না, তবু মমতাময়ী কুমারী রাজী হয়ে রাসবিহারী বসুকে জাপানী জাতিয়তা দান করে বিপদ-মুক্ত করেন। কিছুদিন পরেই তোষিকোর মৃত্যু হয়, এবং রাসবিহারী জাপানে অসাধারণ প্রতিপত্তি লাভ করেন; কিন্তু তিনি তোষিকোর স্মৃতি চিরদিন মহার্ঘ সম্পদরূপে বহন করেছেন। দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করেন নি। রাসবিহারীবাবুর শাশুড়ীর জাপানী ভাষায় লেখা একটি পুস্তক থেকেই এই পুস্তকের মালমসলা প্রধানত সংগৃহীত হয়েছে। পুস্তকের শেষের দিকে নেতাজীর জাপানে আবির্ভাব এবং তার পরবর্তী ঐতিহাসিক ঘটনাগুলির সংক্ষিপ্ত আলোচনা আছে। বলা আছে তার বিস্তারিত বিবরণ দ্বিতীয় খণ্ডে প্রকাশিত হবে। পুস্তকে অনেকগুলি চিত্র আছে, সস্ত্রীক সপুত্রকন্যা রাসবিহারী বসুর ত বটেই, জাপানে রবীন্দ্র-নাথের, নেতাজীর এবং বহু সম্ভ্রান্ত জাপানীর। জাপান সম্বন্ধে অনেক তথ্যও এই পুস্তকে পাওয়া যাবে। সব চেয়ে তৃপ্তি পাওয়া যায় ভারতীয়দের প্রতি জাপানীদের আন্তরিক আকর্ষণ লক্ষ্য করে। শ্রীঅরবিন্দের একটি পত্রের অনুলিপিও এতে আছে। পুস্তকটির রূপসজ্জা চমৎকার। বইটি সকলেরই ভাল লাগবে এবিষয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই। ভূমিকা লিখেছেন সুপ্রসিদ্ধ সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।

৩৭৮।৫৪

কিশোর সাহিত্য

পিনোশিয়ো—শ্রীমনোরম গুহ ঠাকুরতা। প্রকাশক—আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—৸৹

বিখ্যাত লেখক কার্লো কলোদি'র পিনোশিয়ো নামক পুস্তকটি লেখক ছোটদের উপযোগী করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন। শিশু-দের চরিত্র গঠনের পক্ষে এই ধরনের পুস্তক যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে। কারণ ইহা একাধারে শিক্ষা ও আনন্দ দুই-ই দান করিয়া থাকে। বড় বড় অক্ষরে ছাপা, মজার মজার ছবিভরা বইটি হাতে পাইলে ছেলেমেয়ে যে অত্যন্ত খুশী হইবে, তাহাতে কোন সন্দে নাই। ছাপা ও বাঁধাই প্রকাশকের সুন অক্ষুণ্ণ রাখিবে।

৪৭৮।৫

পুরাণ-ভারত—সুধা দেবজা। প্রকাশক আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫ বঙ্কিম চ্যাটা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ॥৶৹।

বয়স্কদের অর্থাৎ যাঁহাদের সামান্য অক্ষ জ্ঞান আছে, তাঁহাদের পড়িবার উপযু পুস্তকের খুবই অভাব। সেই অভাব দূ করিবার জন্যই প্রকাশকের এই প্রচেষ্ট আলোচ্য পুস্তকে কয়েকটি পৌরাণিক কাহি সহজ ভাষায় লিখিত হইয়াছে। লেখিক ভাষা সহজ এবং গল্প বলিবার ভঙ্গী সুন্দর। যাঁহাদের উদ্দেশ্যে পুস্তকটি রচি হইয়াছে, তাঁহারা যে ইহা পড়িয়া আন পাইবেন, শুধু আনন্দ নয়, আমাদের দেশে পুরাণের কাহিনী জানিতে পারিবেন, তাহা কোন সন্দেহ নাই। ছাপা সুন্দর হইয়াছে।

৪৭৯।৫

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনা আসিয়াছে।

বাংলায় অগ্নি যুগ— শ্রীক্ষীরোদকুম দত্ত

নিগমানন্দ দর্শন—শ্রীমৎ স্বামী সত্যান সরস্বতী

অমিয় স্মৃতি—স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বত

সঙ্ঘবাণী—শ্রীমৎ স্বামী সিদ্ধান সরস্বতী

মহাযোগী—আর আর দিবাকর-অনুবাদক—পশুপতি ভট্টাচার্য

কৃষাণ—মন্মথ রায়

উর্বশী নিরুদ্দেশ—মন্মথ রায়

গুরুচরণ ২য় ভাগ—শ্রীসরলরঞ্জ দাশগুপ্ত

কৃপা-বিন্দু মাতাজী—শ্রীশ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্ম চারিণী

অপমানিতা—মোপাসাঁ ঃ অনুবাদক—রমে চৌধুরী

বাংলাসাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক—রমে চৌধুরী

নানক বাণী—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ

হাসির অন্তরালে—শ্রীনলিনীকান্ত সরক

প্রতিভা বসুর স্ব-নির্বাচিত গল্প-ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কে লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত

বিচিত্র রূপিণী—শিবরাম চক্রবর্তী

ঝিলাম নদীর তীর—যাযাবর

আজাদী সড়ক—হাওয়ার্ড ফাস্ট ঃ অনু বাদক—শ্রীবিমলচন্দ্র পাত্র

চক্রদত্ত

মোটর গাড়ির আর এক নাম হাওয়া গাড়ি। নামটা খুব অমূলক নয়। গাড়ির গতির জন্য কিছুটা হাওয়ার ওপর নির্ভর করতেই হয়। এক একটি টায়ারেই তো প্রচুর হাওয়া ভরা থাকে। শুধু মোটর গাড়ি নয়, সাইকেল ইত্যাদি যে সব যানবাহনের রবারের চাকায় চলতে হয় সেগুলি হাওয়া ভরাই থাকে। সাধারণভাবে এইসব টায়ার ফেটে গেলে কিংবা কোনও কারণে ফুটো হয়ে গেলে কারখানায় নিয়ে গিয়ে সেই ফুটোফাটা জায়গাগুলি সারিয়ে আবার হাওয়া ভরে নিলেই জিনিসগুলো বেশ নতুনের মত কার্যকরী হয়ে যায়। মুশকিল হয় যখন মাঝপথে টায়ার ফেটে গিয়ে গাড়ি অচল হয়ে যায় তখন, নিজেদের হাতে পাম্প করে অত হাওয়া ভরতে হয়। বর্তমানে যে নতুন ব্যবস্থা হয়েছে তা'তে এই মুশকিলের আসান হবে। কয়েকটি বোতলে খুব চাপ দিয়ে বেশ কিছুটা হাওয়া ভরে সঙ্গে রাখতে পারলে তারপর রাস্তার মাঝে যদি টায়ার ফেটে যায় তাহলে ফাটা জায়গাটা একটু সারিয়ে নিয়ে টায়ারের হাওয়া ভরার মুখটায় বোতলের মুখটা লাগিয়ে দিয়ে একটু সঁ'চলো কোনও জিনিস দিয়ে বোতলের মুখটি ফুটো করে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বোতলের মধ্যের সমস্ত হাওয়া টায়ারের মধ্যে ভরে যাবে। এইরকম একটি বোতলের সাহায্যেই টায়ারটা আবার চালু করা যায়। এর পর বোতলগুলি অব্যবহার্য হয়ে যায়।

*

সশস্ত্র পুলিস অথবা সৈন্যদের বন্দুকের কার্তুজ বহন করার জন্য গলায় একটি বেল্ট লাগান থাকে আর এই বেল্টে মালার মত সারি সারি কার্তুজ ভরা থাকে, প্রয়োজন মত এক একটি ব্যবহার করার জন্য। যাঁরা অন্ধকারে ছবি তোলার জন্য ফ্ল্যাশ বাল্‌ব ব্যবহার করেন তাঁরাও ঠিক এই রকম ভাবেই ফ্ল্যাশ বাল্‌বগুলি বহন করতে পারেন। এই ব্যবস্থায় দু'টি হাতই খালি থাকে আর বাল্‌ব ভরা একটি থলে আলাদা করে বোঝার মত বইতে হয় না। প্লাস্টিক কিংবা চামড়ার বেল্টে বাল্‌বগুলি সাজিয়ে, হয় মালার মত গলায় ঝুলিয়ে, না হয় কোমরে বেঁধে নেওয়া যায়। এতে কাঁচের বাল্‌বগুলি পরস্পরে ঠোকাঠুকি লাগার ভয় থাকে না, ফলে ভেঙ্গে যায় না। উপরন্তু হাতটা খালি থাকায় চট্‌পট্‌ ছবি তোলা যায়।

ফ্ল্যাশ বাল্‌ব বহন করার সহজ উপায়

*

নাড়ি জ্ঞান নাহি যার সেই আনাড়ি। সে হিসাবে "পালপাট্রন" যন্ত্রটিকে কোনও মতেই আনাড়ি বলা চলে না। এই যন্ত্রটির সাহায্যে খুব সূক্ষ্মভাবে নাড়ি পরীক্ষা করা চলে। অস্ত্রোপচারের আগে রোগীকে অবশ্য অজ্ঞান করে নেওয়া হয় কিন্তু রোগী যদি খুব দুর্বল হয় তাহলে অস্ত্রোপচারের চেয়ে অজ্ঞান করার ব্যাপারটিই বেশী ভীতিপ্রদ হয়ে পড়ে। এজন্য যে ডাক্তার অজ্ঞান করার জন্য নিযুক্ত থাকেন তাঁকে সব সময়ই রোগীর নাড়ি সম্বন্ধে সচেতন থাকতে হয়। তিনি এক হাতে যেমন রোগীকে অজ্ঞান করার ব্যবস্থা করেন অন্য হাতে তেমনি রোগীর নাড়ি টিপে থাকেন। "পালপাট্রন" ডাক্তারদের এই দায় থেকে মুক্ত করতে পারে। যন্ত্রটি আকারে একটি ছোট্ট রেডিওর মত আর এটি ব্যাটারীর সাহায্যে চলে। জিনিসটি দরকার মত যেখানে সেখানে নিয়ে যাওয়া চলে। রোগীর দেহের যে স্থানের নাড়ি পরীক্ষা করার দরকার হয় সেইখানে এই যন্ত্রটি একটি ফিতে দিয়ে আটকে দেওয়া হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই যন্ত্রের ডায়ালের ওপর নাড়ির গতি প্রতিফলিত হয়, এমন কি, নাড়ি কতটা দুর্বল ও ক্ষীণ হচ্ছে তাও দেখা যায়। অনেক সময় খুব দুর্বল রোগীর নাড়ির গতি যখন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে থাকে তখন ডাক্তাররা হাতে পরীক্ষা করে ঠিকমত বুঝতে পারেন না কিন্তু "পালপাট্রন" নির্ভুলভাবে পরীক্ষা করে দিতে পারে। যন্ত্রটি ব্যবহার করায় যে ডাক্তার অজ্ঞান করেন তাঁর দুটি হাতই মুক্ত থাকে ফলে দরকার হলে রোগীর শুশ্রূষায় লাগাতে পারেন। উপরন্তু অনেক ক্ষেত্রে অজ্ঞান করার জন্য ডাক্তারের বদলে শুধুমাত্র নার্সের সাহায্যেই কাজ চালান যায়।

*

সাধারণ রবারের সঙ্গে সিমেন্ট মিশিয়ে একটি পদার্থ তৈরী হয়েছে। এটার নাম দেওয়া হয়েছে "ল্যাটিক্রিট্"। ল্যাটিক্রিট্ রবারের মতই বাড়ে কমে আর ঘষা লাগে না এবং ক্ষয়ে যায় না। এসব সত্ত্বেও দেখতে এটা সিমেন্টের মতই। ইস্পাতের জিনিসে আস্তরণ দেওয়ার কাজে ল্যাটিক্রিটের ব্যবহার হয়। ভাঙ্গা ফাটা মেজে বা দেওয়াল সারাবার জন্য এই জিনিসটি বিশেষ উপকারী। এছাড়া ফল ইত্যাদি খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের আধারগুলিতে ল্যাটিক্রিটের আস্তরণ দেওয়া থাকলে ভাল হয়। এটা তৈরী করা ও ব্যবহার করার কোনও রকম স্বতন্ত্র পদ্ধতি নেই। এটি যে কোনও রকম ভিজে অথবা শুকনো যায়গায় লাগান যায়। শুধু ল্যাটিক্রিট ব্যবহার করার আগে যে স্থানে লাগান হবে সেই স্থানটি জল ও সাবানের সাহায্যে ভাল করে পরিষ্কার করে নিতে হয়। ইস্পাত, প্ল্যাস্টিক, সিমেন্ট ও চকচকে টালি ইত্যাদি যে কোনও যায়গায় লাগান যায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ন্যাশনালিস্ট চীনা কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ চিয়াং কাইশেক গভর্নমেণ্টের মধ্যে ফরমোজা সম্পর্কে একটি নূতন চুক্তি সম্পাদন নাকি আসন্ন এবং বৃটিশ গভর্ন-মেণ্টও সেই চুক্তি সমর্থন করেন, এরূপ একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। চুক্তির মূল কথা হবে ফরমোজাকে "re-neutralize" করা অর্থাৎ কম্যুনিস্ট চীন ফরমোজার গায়ে হাত দিতে পারবে না, সে চেষ্টা করলে আমেরিকা ফরমোজাকে রক্ষা করবে এবং ফরমোজা থেকে ন্যাশনালিস্ট চীনারাও চীন ভূখণ্ডের উপর উপদ্রব করার চেষ্টা করবে না—এই প্রতিশ্রুতি-বিনিময়ের চুক্তি হবে। প্রকৃতপক্ষে আমেরিকার সাহায্য বিনা ফরমোজা থেকে চিয়াং কাইশেক বাহনীর পক্ষে

বৈদেশিকী

চীন ভূখণ্ডের উপর কোনোরকম উপদ্রব করার চেষ্টাই সম্ভব নয়। আমেরিকা রক্ষা না করলে এতদিন ফরমোজা কম্যুনিস্ট চীন গভর্নমেণ্টের মুঠোর বাইরে থাকত না। সুতরাং নূতন চুক্তির আসল অর্থ হচ্ছে লিখিত-পড়িতভাবে ফরমোজাকে স্থায়ীভাবে কম্যুনিস্ট চীনের নাগালের বাইরে রাখার চেষ্টা।

এতে পিকিং ভীষণ চটবে। পিকিং-এর আরো চটার কারণ হবে যদি বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এই চুক্তি খোলাখুলি এবং সরকারিভাবে সমর্থন করে, কারণ এতদিন পর্যন্ত বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ফরমোজা সম্পর্কে কম্যুনিস্ট চীন সরকারের দাবীর অস্বীকারসূচক কোনো চুক্তির সংগে খোলাখুলি বা আনুষ্ঠানিকভাবে সংযুক্ত হননি। ১৯৪৩ সালে কাইরোতে প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্ট, প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং জেনারেল চিয়াং কাইশেকের যে গোপন বৈঠক হয় তাতে এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয় যে, যুদ্ধে জাপান পরাজিত হলে ফরমোজা চীনকে দেয়া হবে। চীন বলতে অবশ্য তখন চীন ভূখণ্ডের গভর্নমেণ্টকেই ধরে নেয়া হয়েছিল। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এখন পর্যন্ত লিখিত-পড়িতভাবে এমন কিছু বলেন নি যাতে উপরোক্ত প্রতিশ্রুতি একেবারে নাকচ করে দেয়া হয়, অর্থাৎ ফরমোজা চীনের হাতে দেয়া হবে না, এমন কথায় বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এখন পর্যন্ত স্পষ্ট স্বীকৃতি প্রকাশ করেননি। আমেরিকা ও ন্যাশনালিস্ট চীনাদের মধ্যে যে-চুক্তি হবার কথা হচ্ছে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট যদি তাতে সমর্থন জানান তবে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এ ব্যাপারে এতদিন যে-ভাব নিয়ে ছিলেন তার পরিবর্তন সূচিত হবে, বৃটেনের পক্ষ থেকে ১৯৪৩ সালের কাইরো প্রতিশ্রুতি—অন্তত তখনকার অর্থে—নাকচ করে দেয়া হবে।

ফরমোজা এবং চিয়াং কাইশেক সম্বন্ধে মার্কিন গভর্নমেণ্ট এবং বৃটিশ গভর্নমেণ্টের মধ্যে মত ও ভাবের একটা বড়ো পার্থক্য বরাবরই ছিল। ফরমোজ চিয়াং কাইশেকের জন্য বৃটিশ গভর্ন কম্যুনিস্ট চীন সরকারের সংগে বি লিপ্ত হ'তে রাজী ছিলেন না। মা গভর্নমেণ্টের কার্যে বাধা দেবার সাধ্য হয়ত ইচ্ছাও বৃটিশের ছিল না; নিজেরা ফরমোজা সম্বন্ধে এমন কোনো দায়িত্ব নিতে চাননি যাতে কম্যু চীনের সংগে সাক্ষাৎ সংঘর্ষ বাঁধতে পা বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এই মনোভাব নী দিক দিয়ে পিকিং সরকারের পক্ষে কি সহায়ক ছিল। নূতন মার্কিন-ফরমো চুক্তির ফলে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট কম্যু চীন সরকারের হাত থেকে ফরমোজা রক্ষা করার জন্য কোনো দায়িত্ব গ্র করবেন তা বোধ হয় নয়, কিন্তু চুক্তিতে সমর্থন জ্ঞাপনের দ্বারা বৃ গভর্নমেণ্টের ফরমোজা সম্পর্কিত নীতি যেটুকু পরিবর্তন সূচিত হবে তা পিকিং-এর উদ্বেগ ও অসন্তোষ অব বাড়াবে।

একদিক দিয়ে দেখতে গেলে কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্ট এবং ফর ন্যাশনালিস্ট চীনাদের পরস্পর নিরাপদ করে রাখাই বর্তমান অ বোধ হয় চীন কম্যুনিস্ট-ন্যাশনা সমস্যার সবচেয়ে ভালো সমাধান হ বিরাট চীন জাতির একটি সামান্য যদি ফরমোজা দ্বীপে আলাদাভাবে তাতে এমন কী ক্ষতি হতে পারে? লক্ষ চীনা তো বিদেশী রাষ্ট্রেও র ফরমোজা যদি একটি স্বাধীন চীনা নিবেশরূপেই এখন থাকে তবে তাতে কী অন্যায় আছে? ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত করে দুটি রাষ্ট্রের সৃ হয়েছে। কোরিয়ান জাতিও দ্বি হয়ে রয়েছে এবং কতকাল এইভাবে কে জানে। ভাংগা জার্মানী কবে লাগবে কেউ বলতে পারে না। চীনে ভিয়েৎনামকে দু'ভাগ করার ব চলছে। সুতরাং আপাতত ফর যদি চীনা নাশনালিস্টদের শান্তিতে শান্ত হয়ে থাকার ব্যবস্থা করা যায় মানবতার দিক দিয়ে সেটা অকার্য না, কারণ বর্তমান অবস্থায় ফরমো

চীনের কম্যুনিস্ট গভর্নমেন্টের হাতে পড়তে দিলে ন্যাশনালিস্ট পক্ষীয় চীনাদের যে কী অবস্থা হবে তা বলা যায় না।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে ফরমোজার রক্ষক আমেরিকা এবং ফরমোজার দাবীদার কম্যুনিস্ট চীনের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিয়ে। বর্তমান অবস্থায় ফরমোজাকে নিউট্রাল—নিরপেক্ষ মনে করা কম্যুনিস্ট চীন সরকারের পক্ষে অসম্ভব। পিকিং-এর পক্ষে এখন ফরমোজাকে একটি মার্কিন সামরিক ঘাটি ছাড়া অন্য কোনোভাবে দেখাই সম্ভব নয়। বর্তমান কম্যুনিস্ট চীনের প্রতি মার্কিন সরকারের যেরূপ মনোভাব তা'তে ফরমোজা যদি মার্কিন সামরিক ঘাটি হয়ে থাকে তবে সেটা চীনের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করা আদৌ অসংগত হয় না। এক্ষেত্রে ফরমোজা থেকে ন্যাশনালিস্ট চীনারা চীন ভূভাগ আক্রমণ করবে না, আমেরিকার এই প্রতিশ্রুতির কোনো মূল্যই পিকিং-এর কাছে নেই, কারণ পিকিং তো ন্যাশনালিস্ট চীনাদের ভয় করছে না, তার ভয় আমেরিকাকে। সুতরাং পিকিং-এর আসল দাবী হচ্ছে ফরমোজা থেকে মার্কিন শক্তিকে সরে যেতে হবে। ফরমোজা থেকে যদি মার্কিন শক্তি সরে যেত এবং ফরমোজার নিরপেক্ষতার গ্যারাণ্টি যদি কেবলমাত্র মার্কিন গভর্নমেণ্ট (অথবা কেবলমাত্র ইংগ-মার্কিন ব্লকভুক্ত শক্তিগুলি) কর্তৃক প্রদত্ত না হয়ে একটা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক চুক্তির দ্বারা অংগীকৃত হতো তা'হলে পিকিং সরকারের মনোভাবও হয়ত বা অন্যরূপ হতো। মানবতার দিক থেকে এরূপ একটি আন্তর্জাতিক চুক্তি দ্বারাই ফরমোজার সমস্যা সমাধান কাম্য। আমেরিকা যে চুক্তি করতে যাচ্ছে তা'তে উক্তপ্রকার বৃহত্তর আন্তর্জাতিক চুক্তির পথ অধিকতর বাধাগ্রস্ত হবে বলে মনে হয়।

*

পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ এবং আতলান্তিক শক্তিগোষ্ঠীতে তার অন্তর্ভুক্তির আয়োজন ব্যর্থ করার চেষ্টা রাশিয়া শেষ পর্যন্ত করে যাবেই। লণ্ডনে ও পরে প্যারিসে পশ্চিমা শক্তিদের কনফারেন্সে যে-সব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে সেগুলি বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের অনুমোদন-সাপেক্ষ ছিল। এ বিষয়ে ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্মানীর পার্লামেণ্ট ভিন্ন অন্য কোনো পার্লামেন্টের অনুমোদন সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা নেই। কিন্তু অন্য সব দেশের পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হলেও ফরাসী পার্লামেণ্ট বা পশ্চিম জার্মানীর পার্লামেণ্ট যদি আপত্তি করে বসে তবে সবই পণ্ড। E. D. C. পরিকল্পনা তো কেবল ফরাসী পার্লামেণ্টের অনুমোদনের অভাবে ভেস্তে গেল। ফ্রান্সের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী মঃ মেঁদে ফ্রান্স এবারকার প্রস্তাবগুলি পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত করিয়ে নিতে পারবেন বলে আশা করেন। যদি তা না পারেন তবে তিনি মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করবেন, এই ভয়ও ফরাসী পার্লামেণ্টের উপর কিছুটা কাজ করবে কারণ মঃ মেঁদে ফ্রান্স যদি পদত্যাগ করেন তবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ফ্রান্সের মর্যাদা তাঁর আমলে যেটুকু উদ্ধার হয়েছে তা নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু তা'হলেও ফরাসী পার্লামেণ্টের কথা একেবারে নিশ্চিত কিছু বলা যায় না। ফরাসী মনের দোটানার সুযোগ এখনো রাশিয়া নেয়ার চেষ্টা করছে। জার্মানদের মনেও যে দ্বিধা নেই তা নয়, কারণ জার্মানদের ভয় যে, পশ্চিম জার্মানী একবার আতলান্তিক গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে গেলে জার্মানীর ঐক্যসাধনেব সম্ভাবনা আরো কমে যাবে। এ অবস্থায় ২৩টি য়ুরোপীয় শক্তিকে সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট আমন্ত্রণ জানালেন য়ুরোপের নিরাপত্তার বিষয়ে আলোচনা করার জন্য। য়ুরোপের বাইরে নিমন্ত্রণ পেয়েছে চীন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পশ্চিমা শক্তিরা এ নিমন্ত্রণ নেয়নি। তারা বলছে, লণ্ডন ও প্যারিসের সিদ্ধান্তগুলি কার্যকরী করার পূর্বে সোভিয়েটের সংগে কথাবার্তা বলা অসম্ভব। উভয় পক্ষই জানেন যে, ঐ সিদ্ধান্তগুলি যাতে কার্যে রূপান্তরিত না হ'তে পারে তার জন্যই মস্কো এই সময়ে নিমন্ত্রণ পাঠিয়েছেন। মস্কো স্বীয় মনোভাব গোপন করার চেষ্টা করছে না। ২৯শে নভেম্বর মস্কো কনফারেন্সের দিন ঠিক করেছিল। মঃ মলোটভ সম্প্রতি বলেছেন যে, লণ্ডন ও প্যারিস সিদ্ধান্তগুলির পার্লামেণ্টারী অনুমোদন যদি স্থগিত করা হয় তবে মস্কো কনফারেন্সের তারিখ পিছিয়ে দিতে রাশিয়া রাজী আছে। পশ্চিমা শক্তিরা এতে নিশ্চয়ই রাজী হবে না। ২৯শে নভেম্বর তারিখে যদি রাশিয়ার আমন্ত্রিত কনফারেন্স হয় তবে তা'তে রাশিয়ার আওতার ভিতরে পূর্ব য়ুরোপীয় যে দেশগুলি আছে সেইগুলি মাত্র বোধ হয় যোগ দেবে, অবশ্য চীনও নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। পশ্চিমা শক্তিরা সরকারিভাবে মস্কো কনফারেন্স থেকে দূরে থাকলেও পশ্চিমা জনমত এবং বিশেষ করে ফরাসী ও জার্মান জনমতের উপর মস্কোর এই চালের যে কোনো প্রতিক্রিয়াই হবে না তা বলা যায় না। ২২।১১।৫৪

একটি সংবাদে প্রকাশ, ইস্কিন্দার মির্জা সাহেব নাকি অবিলম্বে দিল্লী যাইবেন, কিন্তু তাঁর দিল্লী গমনের কারণ সম্বন্ধে কেহই কিছু জানেন না বলিয়া সংবাদদাতা জানাইয়াছেন। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বলিলেন—"একটি কারণ হলো লাড্ডু ক্রয়, অন্য কোন কারণ অবশ্যি আমিও জানিনে"।

* * *

ইস্কিন্দার মির্জা সাহেব নাকি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে গবর্নরী শাসন সাধারণের কল্যাণের জন্যই বহাল রাখা হইয়াছে।—"সাধারণের জন্যে না হোক, অন্তত অ-সাধারণদের কল্যাণ তো এতে হচ্ছেই"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

জনাব গোলাম মহম্মদ নেহরুজীর উপর তাঁর বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, জওহরলালজী

নিশ্চয় কোন নূতন 'প্যাটার্ন' প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইবেন।—"কিন্তু পাক মালেকদের অনেকেরই কাশ্মীরী শালের দোরোখা প্যাটার্ন পছন্দ নয়, গা নাকি কুটকুট করে"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

একটি সংবাদে জানা গেল, শ্রীযুক্ত জয়প্রকাশ নাকি রাজনীতি হইতে চিরবিদায় নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন। তবে সংবাদদাতা এই কথাও প্রকাশ করিয়াছেন যে, তার পার্টি যদি কোন সময় কোন পরামর্শ প্রার্থনা করেন, তবে তিনি সেই প্রার্থনা পূরণ করিবেন এবং সমাসন্ন দলীয় সম্মেলনেও তিনি যোগদান করিবেন।—"অর্থাৎ তাঁর পার্টিকে অতঃপর ডুড্ এবং টামাক দুয়ের ব্যবস্থাই রাখতে হবে"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

● ● ●

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের ডাইনিং কারে গিয়া খাওয়া-দাওয়া করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।—"প্রকাশ থাকে যে, খাওয়ার বিল চুকিয়ে দেবার কাজটা যাত্রীদেরই করতে হবে"—বলিলেন কোন এক সহযাত্রী।

* * *

শ্রীযুক্ত জওহরলাল নেহরু রাশিয়ার 'নিমন্ত্রণ' গ্রহণ করিয়াছেন।—"এ প্রসঙ্গে একথাও অনেকের মুখেই শুনছি যে, নেহরুজী নাকি লৌকিকতার পরিবর্তে শুধু আশীর্বাদ করেই আসবেন"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

চক্ষু-চিকিৎসা বিভাগের উদ্বোধনী বক্তৃতায় ডাঃ লিন্ডার বলিয়াছেন যে, এদেশে রোগের অন্ত নাই এবং আমাদের যা-কিছু সমস্যা তা আমাদিগকে নিজের মতো করিয়াই সমাধান করিতে হইবে।—"আমাদের দেশের রোগের সমস্যার একমাত্র খাঁটি, অনাদি এবং অকৃত্রিম সমাধান হলো মানৎ;—অবস্থা বিশেষে জোড়া পাঁঠা থেকে পাঁচপয়সার লুট পর্যন্ত সব ব্যবস্থাই আছে"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

শ্রীযুক্ত জওহরলাল প্রসঙ্গে ডাঃ লিন্ডার বলিয়াছেন যে, তিনি একজন মহৎ ব্যক্তি এবং তাঁর হার্ট ঠিক রাইট স্থানেই আছে।—"লেফ্‌ট্‌ওয়ালাদের যতো আপত্তি তো ঐখানেই, হার্ট ঠিক রাইটে আছে বলেই"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম পুরাতন ইন্দ্র-প্রস্থের অবস্থিতি সম্বন্ধে নাকি সঠিক-প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।—"খুবই সু-সংবাদ। এখন কুরুক্ষেত্র বেধে না গেলেই বাঁচি"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

এক সংবাদে জানা গেল স্যার উইনস্টন চার্চিলের ধমনীতে নাকি কিছু পরিমাণ রেড্ ইন্ডিয়ানের রক্ত রহিয়াছে।—"হয়ত ছিল, কিন্তু এখন আর নেই;

যা-ছিল হয়ত ব্লাড্ ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হয়ে গেছে। স্যার উইনস্টন এ সংবাদ পাঠ করে নিশ্চয়ই বলবেন—This is nothing but biological inexactitude !!

● ● ●

ডাঃ কাটজু নাকি বলিয়াছেন যে, শতকরা পাঁচানব্বইটি সংবাদপত্র বিচক্ষণতার পরিচয় দিলেও পাঁচ ভাগ

মন্ত্রীদের গায়ে পর্যন্ত কাদা ছিটাইতে ছাড়ে না। আমাদের জনৈক সহযাত্রী,—তিনি পাঁচ ভাগের দলের সাংবাদিক কিনা জানি না—মন্তব্য করিলেন—"মন্ত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ যখন Hooli-গান ধরেন তখন রঙের সঙ্গে কাদা আপনা থেকেই এসে পড়ে"!!!

এবারে ক্রিকেটবাজী

প্রায় বছরখানেক আগে হয়েছিল হিন্দুস্থান পার্কে একটা বেলেল্লা আমোদবাজী, তার প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়। তারও মাস কতক আগে ডাঃ মুখোপাধ্যায়ই উদ্যোগ করে রাজভবনে তারকা প্রদর্শনীর প্রবর্তন করেন। এবারে গত রবিবার সেই তারকা প্রদর্শনীকেই একটু প্রকার বদলে রাজ্যপাল ডাঃ মুখোপাধ্যায়ই এক ক্রিকেট-বাজী পরিবেশন করেন। চিত্রতারকাদের পর্দা থেকে নামানো হয়েছিল মঞ্চে, এবারে একেবারে ময়দানে। মূলত ডাঃ মুখোপাধ্যায় একটা আমোদবাজীরই পরিকল্পনা করেছিলেন, কিন্তু শিক্ষক ধর্মঘট হেতু তা আর সংঘটিত হতে পারেনি, তারই বদলে এই ক্রিকেটবাজী। এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে হিন্দুস্থান পার্কের আমোদ-বাজীর উদ্যোক্তাদেরও কেউ কেউ এই ক্রিকেটবাজীর অনুষ্ঠানকারীদের মধ্যে আছেন। এটা কিন্তু রাজ্যপালের তারকা-প্রীতির প্রমাণ ব'লে ধরা যায় না, বরং ঠিক তার উলটোটাই মনে হয়। মনে হয়, রাজ্যপাল ডাঃ মুখোপাধ্যায় তারকাদের স্বাভাবিক মানুষ ব'লেই জ্ঞান করেন না। তারকারা তাঁর কাছে এক শ্রেণীর জীবের মতো যাদের কায়া দেখিয়ে মজার আয়োজন করা যায়। সুপণ্ডিত রাজ্যপাল এটাও জানেন যে, এক শ্রেণীর বিকৃতরুচি লোক আছে যারা সুস্থ সহজ ও স্বাভাবিকের চেয়ে বিকৃত কিছুরই অনুরক্ত। এইসব ব্যসনকামবৃত্তিসম্পন্ন লোকদের ক্ষেপিয়ে ও আস্কারা দিয়ে টাকা তোলার সহজ পন্থাটাই রাজ্যপাল বেছে নিয়েছেন তাঁর সবান্নত উদ্‌যাপনের পাথেয় অর্জন করতে। মেদিনীপুরের ডিগ্‌রীতে একটা যক্ষ্মা আরোগ্যোত্তর নিকেতন প্রতিষ্ঠা-কল্পে রাজ্যপাল এই ক্রিকেটবাজীর আয়োজন করেন। দীর্ঘদিন ধরে এই আয়োজনের ঘোষণা বিজ্ঞাপিত করে বেকারবাতিক লোককে উচ্ছৃঙ্খল হবার এই সুযোগের কথাটা জানিয়ে দেওয়া হতে থাকে। মানুষের নিকৃষ্ট প্রবৃত্তিকে উসকে তোলার জন্য দস্তুরমতো উৎসাহ দেওয়া হলো।

* * *

—শৌভিক—

ঠিক হয়, বাঙলা এবং বম্বের চিত্র-তারকাদের নিয়ে ময়দানে নামা হবে। বম্বের একদল শিল্পী এলেন শুক্রবার। সেই থেকেই গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে ভিড় আরম্ভ হয়ে গেল। পুলিশও রাখতে হলো পঞ্চাশজন করে। শনিবার এসে পেঁছিলেন আর একদল। গ্র্যাণ্ড হোটেলের সামনে ভিড়ও বাড়লো। আর সেই সঙ্গে চৌরঙ্গীর সড়কও বিঘ্নিত হলো এবং ভিড় সামলাবার জন্যে পুলিশকে লাঠি চালাতে হলো। ভিড় রইলো শনিবার অনেক রাত পর্যন্ত। রবিবার ভোর থেকেই ভিড়। সামনে দিয়ে যাবার সময় সুস্থ লোকে নিন্দে করে যাচ্ছে এই অনুষ্ঠানের। বস্তুত ক'দিন ধরে একবাক্যে এই অনুষ্ঠানের শুধু নিন্দেই শোনা গিয়েছে লোকের মুখ থেকে। এ ধরনের কায়া-প্রদর্শনীর প্রতি সমর্থন আছে সুধী-সমাজের মধ্যে তেমন একজন মাত্রকেও পাওয়া যায়নি। খেলোয়াড় এবং খেলা-রসিকরা অসন্তুষ্ট হয়েছে ক্রিকেটকে একটা অসভ্য তামাসার পর্যায়ে নামিয়ে খেলার মর্যাদা হানি করে দেবার জন্য।

* * *

ক্যালকাটা মাঠে ভিড় অনেক সকাল থেকেই। স'দশটা থেকে তামাসা আরম্ভ। ভিতরে টিকিট কিনে উপস্থিত প্রায় হাজার দশেক দর্শক। বাইরে ভিড় তার চেয়ে বেশী এবং পুলিশও অনেক। ভিতর ও বাইরের ভিড়ের মধ্যে ১৪।১৫ থেকে বছর প'য়ত্রিশেক বয়সের লোকই প্রায় সব; বেশীর ভাগ বিশ-প'চিশ বছরের। ক্রীড়া সমালোচকদের কাছ থেকে জানা গেল, ভারতের বাছা বাছা সেরা খেলোয়াড়দের খেলার ব্যবস্থা করলে আরও ভিড় হতো এবং অতো উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা যেতো না। মাঠে গিয়ে আশ্চর্য লাগলো স্মারক পত্রিকায় রাষ্ট্রপতি প্রমুখ বিশিষ্ট নেতাদের আশীর্বাণী মুদ্রিত দেখে। পিয়ারসন সুরিটা পরিঘোষক। মাইক মারফৎ তিনি জানালেন, খেলা হবে জহর গাঙ্গুলীর দলের সঙ্গে কানন দেবীর দলের। জহর গাঙ্গুলী এসেছেন, কিন্তু কানন দেবীকে দেখা গেল না, মাইকে শোনা গেল তিনি আসবার জন্য রওয়ানা হয়েছেন বলে ফোন এসেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আর বোধ হয় এসে পেঁছিলেন না। রাজ্যপাল এসে পেঁছিবার পর দুদলের "খেলোয়াড়"-দের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। কি কদর্য, অশ্লীল দেখতে

হয়েছে মেয়েদের আঁটসাঁট ট্রাউজার-পরা চেহারায়। পাশ্চাত্যের লোকেও মেয়েদের ট্রাউজার প'রে বেড়ানোটা অভদ্র বলে মনে করে, কিন্তু এসব তারকারা নির্বিকার। রাজ্যপাল ডাঃ মুখোপাধ্যায়ের নিজের কন্যা থাকলে তিনি কি দিতেন তাকে ট্রাউজার প'রে অমন মাঠভর্তি বেহেড লোকের বেলেল্লাপনার উস্কানি হয়ে দাঁড়াতে? "খেলোয়াড়"রা মার্চ-পাস্ট করে মাঠ ঘুরলে। সে কি শীষ আর ছ্যারারার হুল্লোড় দর্শকদের মধ্যে! রাজ্যপাল তাঁর এই অনুষ্ঠানে যাঁরা যেভাবে সাহায্য করেছেন, তাঁদের নাম উল্লেখ করলেন। শুনে জানা গেল তারকাদের যাতায়াত, খাওয়া-থাকা, খেলার সরঞ্জাম সবই বিনা-পয়সাতেই হয়েছে। তবু ভালো যে, সেবারকার দিল্লীতে অনুষ্ঠিত ক্রিকেট তামাসার মতো আক্কেলসেলামী-দিতে হবে না। দিল্লীতে টাকা উঠেছিল পঞ্চাশ হাজার, ওদিকে খরচ হয়ে যায় বিমান-ভাড়াতেই উনত্রিশ হাজার, আর ছাব্বিশ হাজার হয় খাওয়া-থাকা অনুষ্ঠান ব্যবস্থা ইত্যাদি বাবদ। অর্থাৎ নীট্ পাঁচ হাজার লোকসান। রাজ্যপাল জানালেন তারকাদের সবায়ের সইকরা দু'খানা ব্যাট নীলাম করা হবে এবং খেলা হবে ফাদকারের সই করা দুটো বল নিয়ে। টেন্টের পিছন দিকে ভীষণ হৈ-চৈ; হাজার কতক লোক পুলিসের তাড়া খেয়ে হুটোপাটি করছে......রাজ্যপাল বম্বের ফিল্ম ফাংসন্স কমিটির সভাপতি বি ডি ভারুচা ও দেওয়ান শরারকে এবং কলকাতার অভিনেত্রী সঙ্ঘের সভাপতি অহীন্দ্র চৌধুরী ও সম্পাদক জহর গাঙ্গুলীকে ধন্যবাদ জানালেন তারকাদের ময়দানে জমায়েত করে দেবার জন্য। কলকাতার পুলিসকে ধন্যবাদ জানালেন এবং ধন্যবাদ জানাবার কেউ বাকী আছে কি না পাশের লোকের কাছে জেনে নিয়ে দুটি ঘটনার উল্লেখ করলেন। একটি ঘটনা,—তেইশটি নাতি-নাতনীর দাদু মুর্শিদাবাদের এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সম্পর্কে। ব্রাহ্মণ রাজ্যপালের কাছে এসে তিপ্পান্নটি টাকা দিয়ে বলেন যে, তিনি দরিদ্র হলেও এই টাকা দান করছেন কোন একজন ধনী ব্যক্তিকে দেবার জন্যে, যিনি এই অনুষ্ঠানের টিকিট কিনতে তার অপারগতা জানাবেন। আর দ্বিতীয় ঘটনা বললেন, শনিবার সন্ধ্যায় বালিগঞ্জের ধারে শীলা রমানীর দোপাট্টায় পানের পিচ ফেলার একটা কেলেঙ্কারী। রাজ্যপাল সারা বাঙলার পক্ষ থেকে এই দুষ্কৃতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন (কিন্তু এই দুষ্কার্যে প্ররোচিত হবার সুযোগ এল কোত্থেকে? বারুদে আগুন ধরালে বিস্ফোরণই তো স্বাভাবিক)। এর পর বি ডি ভারুচা বোম্বাই তারকাদের পক্ষ থেকে এই অনুষ্ঠানে যোগদান করতে পারার সুযোগ পাওয়ার জন্য রাজ্যপালের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেন। এই সুযোগে ভারুচা চলচ্চিত্র শিল্পের প্রতি গভর্নমেন্টের ঔদাসীন্য এবং অসহযোগ মনোবৃত্তির কথা তুলে মন্তব্য প্রকাশ করতে ছাড়লেন না। তিনি বললেন, পণ্ডিত নেহরু পার্লামেণ্ট সদস্যদের নিয়ে ক্রিকেট খেলে আমোদ পরিবেশন করেছেন এবং তিনি আশা করেন, সদস্যরা প্রমো পরিবেশনের বৃহত্তম মাধ্যম চলচ্চিত্রে সহায়তায় সচেষ্ট হবেন। বাঙলার পক্ষ থেকে সুশীল মজুমদার ধন্যবাদ জ্ঞাপন করলেন। বম্বের ডেভিডও ইতিমধ্যে পিয়ারসন সুরিটার পাশে এসে বসেছেন পরিঘোষকরূপে। ডেভিড জানালেন আগের দিন নিম্মী আসতে পারেন। এই মাত্র তিনি এসে পৌঁচেছেন। টেন্টে পিছনে তুমুল কোলাহল ও ভীড়ে হুটোপাটি। দলে অংশগ্রহণকারীদের না ঘোষণা করা হলো। জহর গাঙ্গুলী দলে পড়লেন—মতিলাল (ক্যাপ্টেন অনুভা গুপ্তা, অজিত, বিভু, বেগম পার হরি শিবদসানী, যমুনা সিংহ, সুমিত্র ওমপ্রকাশ, মজনু, বিজয়লক্ষ্মী, ধীরাজ দাস, আশা মাথুর, পাহাড়ী সান্যাল প্রভাত মুখোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, মঞ্জু দে অভী ভট্টাচার্য ও নীলিমা দাস। কানন দেবীর দলভুক্ত হলেন—জয়রাজ (ক্যাপ্টেন) শোভা সেন, শম্মি কাপুর, মীনা, অসিত বরণ, আই এস জোহর, দেবযানী, গোপ স্মৃতি বিশ্বাস, জহর রায়, আগা অরুন্ধতী, সাম্মি, উত্তমকুমার, শীল রমানি, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, নিম্মী বসন্ত চৌধুরী, করণ দীওয়ান ও অজি চট্টোপাধ্যায়। এইবার খেলা আরম্ভ।

* * *

ঘড়িতে ঠিক এগারোটা। ডেভিড আর সুরিটা রঙ্গ-পরিহাস করছে ডেভিড বললেন তার মাথায় গোবরভ কানন দেবীর দল মাঠে নেমেছে। উইকে কীপার আগা। আম্পায়ারের দেখা নে জহর রায় নানা অঙ্গভঙ্গীতে মা লোককে হাসাচ্ছেন। পিছনে ভীড় হট্টগোল। ফাদকার ও ভারুচা নামলে আম্পায়ার হয়ে। হট্টগোল বাড় চতুর্দিকেই। ডেভিড-সুরিটা ঠিক কর পারছেন না 'ব্যাটসম্যান বলা হবে, 'ব্যাটস-ওম্যান'! মীনা আর যমু সিংহই শুধু শালোয়ার-পায়জামা-দোপা পরা, আর সব ট্রাউজার, সার্ট—ব কুৎসিত দেখতে হয়েছে! মীনার দোপা লাল। ভানু ও উত্তমকুমার টেন্টের সাম লনে ঘুরছেন। শোভা সেন ও অরুন্ধত পরিঘোষকদের সামনে বসে; ওদের পর সাড়ী। খেলবেন না বোধ হয় ওরা। ধীরা

দাশ ও অভী ব্যাট করতে নামলেন। প্রায় শতখানেক ক্যামেরা ঝলসে উঠলো। এক-সঙ্গে এতো ক্যামেরা পণ্ডিত নেহরুর বেলাতেও জড়ো হয় না। পরিঘোষকরা ফটোগ্রাফারদের মাঠ থেকে সরে যেতে বললেন। কেল্লার দিক থেকে শম্মী কাপুর বল দিলেন ধীরাজ দাশকে। শীলা রমানি বল ধরতে গিয়ে ফসকালো; স্মৃতি ধরলেন। দু রান। শম্মীর বল দেওয়া দেখে ডেভিড বললেন, শম্মী জীবনে অনেক কীর্তিই করেছে। ধীরাজ বাউণ্ডারী মারলেন। ওদিক থেকে জহর রায় বল করছেন। এখনও দর্শক আসছে। আবার শম্মী বল করছেন, ধীরাজ আবার বাউণ্ডারী মারলেন। আবার জহরের বল। ওর ভংগী দেখে ডেভিড বললেন, ওটা মণিপুরী নাচের ভংগী। তার পরের বলটা দিলে স্লো-মোশানে; তারপর নাচতে নাচতে আসা। লোকে হাসিতে লুটোপাটি খাচ্ছে। শম্মীর বল ধীরাজ মারলেন। অজিত চট্টোপাধ্যায় ক্যাচ ফসকালেন। এবার ওভার বাউণ্ডারী। ধীরাজ রিটায়ার করলেন। অভীকে মাঠ থেকে টেনে আনা হলো। ব্যাট নিয়ে নামলেন প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও বেগম পারা। বেগম পারাকে ডেভিড বললেন, 'ব্র্যাডওম্যান' এবং পাছে লোকের কানে 'ব্যাডওম্যান' শোনায়, তাই "ব্র্যাডওম্যান" কথাটা বানান করে বলে দিলেন। গোপ বল করলে, বেগমের এক রান হলো। পরের বলে প্রভাত আউট। তারকাদের কজন বাক্স নিয়ে টাকা তুলতে আরম্ভ করেছে। ব্যাট নিয়ে নামলো মঞ্জু দে; হরি শিবদসানী মঞ্জুর হাত জড়িয়ে মাঠে পৌঁছে দিলে। সুরিটা জহর গাঙ্গুলীকে কিছু মন্তব্য করার জন্যে বললেন; জহরের সলজ্জ অস্বীকৃতি শোনা গেল। গোপ আণ্ডারহ্যাণ্ড বল দিলে বেগমকে। শম্মী মঞ্জুর ব্যাটের সামনে শুয়ে আছে, এবার বসলো বাবু হয়ে। মীনা বল দিলে বেগমকে, বাউণ্ডারী পার। সাড়ে এগারোটা বাজে; তিনজন আউট হয়ে ৩৯ রান। সুশীল মজুমদার একটা ক্যাচ ফসকালেন। স্মৃতি বল করলেন মঞ্জুকে। উইকেটকীপার আগা পিছনে শুয়ে। ডেভিড বললেন, ওটাকে বলে ঢিলেঢালা ভঙ্গী। স্মৃতির বিনুনী নিয়ে ডেভিড-সুরিটার ঠাট্টা। আই এস জোহর পিছনে একটা লাল কাপড়ের ফালি লাগিয়েছে লেজের জায়গায়। ডেভিডরা বললেন, ওটা জোহরের পরিচয়-নিশানা। দেবযানী বল করছেন বেগমকে; আলতোভাবে গড়িয়ে দেওয়া। অনুভা গুপ্তা, বিমল ঘোষ বাক্স নিয়ে টাকা তুলছে গ্যালারীতে এসে। মঞ্জু দে ফিরে এলো; ব্যাট নিয়ে নামলো বম্বের অজিত। অসিতবরণ বল করলে অজিতকে। ডেভিড-সুরিটা চেঁচালে "আনফেয়ার বোলিং" বলে। বেগম পারা অসিতের বল হাঁকড়াচ্ছে। পরিঘোষক বললেনঃ ভারতীয় চিত্রজগতের ব্র্যাডওম্যান! গোপের বপু নিয়ে ঠাট্টা হলো, বললেন কোন লেন্সেই ওকে ধরা যায় না, গোপকে ফিট করে শুধু সিনেমা-স্কোপের চওড়া পর্দায়। গোপ বল করছে বেগমকে। গোপের বলে অজিত আউট। মতিলাল নামলো। ডেভিড-সুরিটা উবাচঃ বেগম পারা অনেককে চরকি-পাক খাইয়েছে। মতিলাল, বলের দিকে দেখ, দর্শক আর ব্যাটসওম্যানদের দিকে চেয়ো না। বেগমকে রিটায়ার করতে বলা হলো, ও রাজী নয়। বীরেন চট্টোপাধ্যায় বল করছে মতিলালকে। ফাদকারকে রিটায়ার করতে বলা হলো। ডেভিড-সুরিটা এর পর আম্পায়ার হবার জন্য হাঁকাহাঁকি আরম্ভ করলে। 'আসুন, কে আম্পায়ার হতে চান, আসুন পাবলিসিটি পাবেন। আগা মাঠ থেকে বাঙলাতেই চেঁচিয়ে উঠলো, "জল দাও হে, জল দাও।" মাঠে জল বিতরণ চললো। মাঠের খেলোয়াড়রা এখানে ওখানে শুয়ে বসে আছে। এক কোণে অজিত চট্টো, অসিত ও শীলা গ্লাস লোফালুফি করছে। শ্যাম জালান নামলো আম্পায়ার হয়ে। ডেভিড-সুরিটাঃ "আসুন, একশো টাকা দিয়ে আম্পায়ার হবেন আসুন। দশ মিনিট আম্পায়ারী করতে পারবেন। আসুন, কে আসতে চান।" জয়রাজ বল করছেন মতিলালকে। জহর রায় নেচেকুঁদে একধারের দর্শকদের মাতিয়ে তুলেছেন। মতিলাল বাউণ্ডারী করলেন। স্মৃতি দর্শকদের কাছে বল আনতে যেতেই হৈ-রৈ। মতিলাল ক্যাপ খুলতেই ডেভিড চেঁচিয়ে বললেন ক্যাপ পরে নিতে, কারণ আর কেউ টাক দেখাবে, ডেভিড তা সহ্য করতে রাজী নন। দর্শকদের দিক থেকে মাঠময় আপেল আর লেবু গড়াচ্ছে (এতোকাল গড়িয়ে এসেছে ইট আর জুতো)। মতিলাল আউট। ভারুচার জায়গায় আম্পায়ার বদল হলো। ব্যাট নিয়ে নামলেন অনুভা। অনুভা

আউট। শিবদসানী ব্যাট করছেন। টাকা তোলার দিকে হৈ-রৈ। জোহর জুতো খুলে বল করছেন। শিবদসানী ওভার-বাউন্ডারী করলেন। বলটা গ্যালারীর লোকে দিতে চায় না; বদলে ছুঁড়ছে লেবু, আপেল। জোহর বল দিতে গিয়ে ছুটে এসেই পেটে হাত দিয়ে বসে পড়লেন। আবার দৌড়ে এসেই মাথায় হাত দিয়ে চক্কর খেতে লাগলেন। ডেভিড বললেন, ক্রনিক এমনেসিয়া। শিবদসানী আবার ওভার করলেন। দর্শক বল দিতে চায় না। ডেভিড বললেন, বলটার মাঝে মাঝে অদৃশ্য হবার ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। শ্যাম জালান ফিরে আসতে আম্পায়ার গেলেন গজু খৈতান। শম্মি বল করছেন বেগমকে। আর এক আম্পায়ার গেলেন বাজোরিয়া। ক্যালকাটা ক্লাবের সেক্রেটারী জর্জিয়ার্ডি আশা মাথুরকে নিয়ে চতুর্দিক ঘুরিয়ে টাকা তুলছেন। সুরিটা মন্তব্য করলেন, "জর্জিয়ার্ডি, আমাদের এক ব্যাটসওম্যানকে আটকে রাখা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু!" ডেভিডঃ "লোক কতো হবে বলুন তো।" সুরিটাঃ "হাজার পনেরো তো বটেই!" পাশের ক্রীড়াসাংবাদিকঃ "হাজার দশেকের বেশী হবে না।" বেগম পারা আগার গলা টিপে ধরেছেন। ডেভিড বললেন, কলকাতার উৎসাহ খুব, বম্বেতে এতো নেই। শিবদসানীর ক্যাচ অজিত ফসকাতেই সুরিটা বললেন, অজিত যেন এসে বলে যায়, কি করে ক্যাচটা মিস করতে পারলে। ডেভিড বললে, অজিতের যে অভ্যেস মিসদের ক্যাচ করা। দুই পরিঘোষককে বেগম পারার বডিলাইন নিয়ে মন্তব্য। আম্পায়ার বদল। শাম্মি অপসৃত আম্পায়ারের গাউন খুলে দিলে এবং ডেভিডের কথা শুনে নতুন আম্পায়ার বালমুকুন্দ বাজোরিয়াকে কোট খুলে গাউন পরিয়ে দিলেন। শম্মী কাপুর বাজোরিয়ার কোট নিয়ে মারলে ছুট। বেগমের পায়ে বল লাগতে আগা হাত বুলিয়ে দিলেন। ডেভিড বললেন, বেগমের পায়ের জোর খুব। সুরিটা পারাকে হোমে ফিরে আসতে বললেন। ডেভিড বললেন, কার 'হোম?' টেণ্টের পিছনে হট্টগোল বাড়ছে। মাঠের মধ্যেও একটানা হট্টরোল, কতক অশ্লীল মন্তব্যও কানে আসছে। পিছনে লনে তারকাদের অনেকে হেসে-খেলে, নেচে-নেচে বেড়াচ্ছে। ক্যামেরা হাতে রয়েছে অনেক লোক, যে কেউ যাকে ইচ্ছে দাঁড় করিয়ে ছবি তুলছে। মাঠের ভিতরেও অজস্র ক্যামেরা। একজন ফটোগ্রাফার দেখালে ১২টা রোল তার শেষ হয়েছে। ১২।২৫ বেজেছে। রান ১০০ হলো শিবদসানীর এক ওভার-বাউন্ডারীতে। জয়রাজ বল করলেন। বেগম ও শিবদসানী চলে এলেন। ওদের আসতে দেখেই ফটোগ্রাফাররা এগিয়ে মাঠের মধ্যে গিয়ে ছবি তুলতে আরম্ভ করলে। ব্যাট নিয়ে নামলেন ওমপ্রকাশ। ডেভিড বললেনঃ এশিয়ার কনিষ্ঠতম কৌতুকরসিক যদিও কেউ কেউ ওমকে বুড়্যা বলে ক্ষেপায়। "ফটোগ্রাফাররা দয়া করে মাঠ ছেড়ে আসুন। পুলিসরা একটু দেখুন না, ফটোগ্রাফাররা যাতে মাঠের মধ্যে ঢুকে না পড়ে।" সুমিত্রা এলেন ব্যাট করতে। অজিত বল করলেন। পরিঘোষকরা বলছেন ফিলমিক ফিল্ডিং। ওমপ্রকাশ ব্যাট করছে, বল করছে অজিত। পরিঘোষক বললেন, এক কৌতুক-রসিক বল করছেন আর একজনকে। "অজিত, কমিক দেখতে চাই আমরা—ভ্যাবাচ্যাকা ব্যাটে ভ্যাবাচ্যাকা বল দাও।" সুশীল মজুমদার বল করছেন সুমিত্রাকে। একটা ছোট মেয়ে মাঠের মধ্যে ঢুকে শীলাকে এক বোতল জল দিয়ে এলো। সুমিত্রা বল মারতেই ডেভিড বললেন, সুমিত্রার ওটা ঝাড়ু-চালনা, ওতেই একটা বাউন্ডারী। অমর ঘোষ গেলেন আম্পায়ার হয়ে। খেলা বলতে কিছুই নয়। ক্রীড়া-সাংবাদিকরা বলছেন, ময়দান এবং ক্রিকেট দুয়েরই ইজ্জৎ গোল্লায় ভাসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তারা তো প্রায় কলম বন্ধ করেই আছেন, মুখে বিরক্তি। ডেভিডঃ "ওমপ্রকাশ খেলায় একটু জেল্লা আনো, নয়তো লোকে বলবে, তুম বুঢ়্‌ঢে হো।" বাইরে আর ভিতরে হট্টরোল অবিরাম। ওম চলে এলেন এবং ব্যাট করতে গেলেন বিজয়-লক্ষ্মী—এতক্ষণ ব্যস্ত ছিলেন চাঁদার বাক্স নিয়ে। অজিত বল করছে। উইকেট পড়েছে মোট এগারোটা। সুমিত্রাকে বল করলেন গোপ; সুমিত্রা আউট। ১২ উইকেট ১১৫ রান। জহর গাঙ্গুলী গেলেন ব্যাট নিয়ে। গোপ বল করলেন, নো-বল। বিজয়লক্ষ্মীকে বল করলেন

অসিতবরণ। সুরিটাঃ "জর্জিয়াডি, আশা মাথুরকে এবারে রেহাই দেবে কি?" আশা টাকা তোলায় মত্ত। সুরিটাঃ "সুলাল, একবার অন্তত বলটা মারো।" খেলার খেলাত্ব আর নেই। মাঠে এদিকে ওদিকে শুয়ে-বসে কাটাচ্ছে অনেকে। বেগম পারা এবারে বাক্স নিয়ে টাকা তুলছে; ওর বাক্সয় টাকা দেবার জন্য হুড়োহুড়ি। এক বিকারবাতিক বললে, খাড়া হয়ে দাঁড়ালে টাকা দোব। ওর অঙ্গে অঙ্গ স্পর্শ করার চেষ্টা করছে অনেকে। পরিঘোষকঃ "নীলিমা দাস প্যাভিলিয়নে আসুন। ব্যাটসম্যান ও ব্যাটসওম্যান দুজনে দয়া করে রিটায়ার করুন।" গোপ বল করলেন বিজয়-লক্ষ্মীকে। পরিঘোষকঃ "ব্যাটসম্যান ও ব্যাটসওম্যানকে পাঠিয়ে দিন।" মজনু নামলেন ব্যাট নিয়ে। পরিঘোষকঃ "লয়লা কৈ?" মাঠময় হাসির রোল। "যমুনা সিংহ এদিকে আসুন।" নীলিমা দাসের যে দেখছি টেকনিকলার পোশাক।" জোহর মজনুকে বল করলেন, তারপর দু' উইকেটের মাঝে এসে নীলিমাকে আলতোভাবে বল করলেন। এদিকে চতুর্দিক থেকে বেগম পারাকে ডাকছে টাকা নিয়ে যাবার জন্যে। কারণ স্বতঃই বোঝা যায়। গোপ বল করলেন মজনুকে। শম্ভু ক্যাচ ফসকালে। নীলিমা গোপের বলে আউট। পরিঘোষকঃ "টেকনিকলার পোষাকের জন্য নীলিমা তোমায় ধন্যবাদ।" পাহাড়ী সান্যাল এবার ব্যাটসম্যান। "মজনু, ক্যাপ্টেন তোমায় চলে আসতে বলছে।" নামলেন যমুনা সিংহ। "আর এক টেকনিকলার পোশাক।" "পাহাড়ী, একটা ওভার মারো ভাই; দেখো, এটা যেন বিলিয়ার্ড টেবিল মনে করে বসো না। পাহাড়ী ভক্ত বিলিয়ার্ড খেলতে আর পান খেতে, তাই নয় পাহাড়ী?" গোপ বল করলেন পাহাড়ীকে। "মারাত্মক গোপ!" পাহাড়ী আউট। নামলো শ্রীমান বিভু। গোপের বল। অসিতবরণ বল করলেন যমুনাকে। "অনড় মিস সিংহ।" বিভূ অসিতের বল মারতেই হৈ-হৈ। পরিঘোষকঃ মিস্টার অমর ঘোষ, ভবিষ্যতের এই খেলোয়াড়টির দিকে লক্ষ্য রেখো।" যমুনা ফিরৎ এলেন, গেলেন শ্যাম লাহা। বিভু গোপের বল পিটতেই হৈ-হৈ। খেলোয়াড়রা শুয়ে বসে কাটাচ্ছে। জয়রাজ বল করলেন হুয়াকে। বিভুও জয়রাজের বলে খেললে। ১-৫ মিনিট। লাঞ্চ।

লাঞ্চের পর রাজ্যপাল এলেন ব্যাট দুখানি নীলাম করতে। ডাক আরম্ভ হলো ৫০, টাকা থেকে, তারপর ১০০, ২০০, ২৫০, ৩০০, ৩২০, ৫০০, টাকায় ডাক শেষ হলো। এবারে নিম্মীকে ডাকা হলো দ্বিতীয় ব্যাটখানি নীলাম করাতে। সব শিল্পীকে বলা হলো নীলামের কাছে এসে দাঁড়াতে। ওপারের গ্যালারী থেকে ভীষণ হট্টরোল। নিম্মীর গলা শোনা গেলঃ "বেহ্‌ত্রিন দোস্তোঁ"......তারপর আর হট্টগোলে বোঝা গেল না। ডাক শোনা গেলঃ ১২০, টাকা। নিম্মী বলে চললেন, "বলিয়ে, বলিয়ে না...ভাইয়োঁ, প্লিজ ভাইয়োঁ... বলিয়ে...প্লিজ প্লিজ বলিয়ে...কীপ মাই রেসপেক্ট প্লিজ (মেরি লাজ রাখিয়ে)...... ৩৫০,...৪০০,...এক হাজার দিজিয়ে, প্লিজ...৪৫০,...প্লিজ, বলিয়ে বলিয়ে...

জল্দি কিজিয়ে না...বলিয়ে, বলিয়ে না... ৫০০,...প্লিজ প্লিজ...কীপ মাই রেসপেক্ট প্লিজ...হাজার রূপেয়া তো কর দিজিয়ে... ৫০১,...নীচে ভীড়ের চাপ, পুলিসের ধাক্‌কা। ওদিকে রাস্তায় পুলিসের ঘোড়া ছুটছে, বেটন চলছে। নীলাম শেষ হলো। ডাঃ মুখোপাধ্যায় এক টাকায় হেরে গেলেন; রাজ্যপাল পদমর্যাদাকে তিনি নামিয়ে দিলেন নিম্মীদেরও নীচে। দর্শন দেবার জন্য নিম্মী গিয়ে দাঁড়ালেন মাঠের মাঝখানে। তারপর মাঠের মাঝখানে সবাইকে দাঁড় করিয়ে তারকাদের হাতে হাতে দেওয়া হলো একটা করে টফির বাক্স, পুরস্কারস্বরূপ। শ্রীযুক্তা মুখোপাধ্যায় তারকাদের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন, এমন কি ডেভিডের টাকের ওপরেও। চতুর্দিকে দর্শকদের হট্টরোল। গ্যালারীর লোক অধীর।

* * *

দু'পঁচিশে অপর দল নামলো খেলতে। আম্পায়ার দেওয়ান শরার ও প্রাণ। জোহর ও অসিতবরণ নামলেন ব্যাট নিয়ে। ওধারের কোণে ওমপ্রকাশ পুলিসের পাগড়ি খুলে নিয়ে মাথায় পরে রঙগ দেখাচ্ছেন—লোকের হৈ হৈ। উইকেট কিপার প্রভাত মুখোপাধ্যায়। বল হরি, শিবদসানীর। জোহর বল মারতে গিয়ে ব্যাট ঘুরিয়ে চক্কর খেয়ে পড়লেন। পরিঘোষকঃ "মাঠে অটোগ্রাফ দেওয়া বন্ধ করুন।" জোহর একটা বাউণ্ডারি করলেন। বিভু বলটা ধরে ছুঁড়ে দিতেই হৈ হৈ চীৎকার। অভী বল করলেন অসিতবরণকে। পরিঘোষক ঃ "অসিত যেন ঘাবড়ে যেও না।" মনে হয় অভী আর অসিতের এককালে বোধ হয় খেলার হাত ছিল। জোহরকে চ্যাঙদোলা করে মাঠের বার করা হলো। জোহর বললেন ঃ "এ লোক চোর হৈ।" ব্যাট নিয়ে নামলেন আগা। বল হাতে অভী। শীলা রমানি আর বসন্ত চৌধুরী এসে বসলেন সাংবাদিকদের মধ্যে। ছোট্ট একটি মেয়ে মাঠে ঢুকে নীলিমাকে জলের বোতল দিয়ে এলো। শিবদসানীর বল। অসিতের পায়ে বল লাগলো। নিম্মী ফিল্ডিং ছেড়ে গ্যালারীতে এসে টাকা তুলতে লাগলেন। ওদিকটায় তাই দর্শকদের মধ্যে হট্টগোল। খেলা একটু জমবার মতো হচ্ছে। অসিত আউট হলেন অভীর বলে। ১৯ রান হয়েছে মোট। মীনা নামলেন লাল-দোপাট্টা কোমরে জড়িয়ে। অভী দিলেন আণ্ডার-হ্যাণ্ড বল। মারতে গিয়ে মীনা চক্কর খেলেন। নিম্মীর হাতের বালতি টাকায় ভরে উঠেছে। ওর হাতে টাকা দিয়ে একটু স্পর্শসুখ উপভোগ করার জন্য বিকারব্যাতিকদের কি হুড়োহুড়ি! এক শেঠ তো দশটা টাকা দিতে গিয়ে একশো টাকাই দিয়ে ফেললেন। নিম্মী জনে জনে গিয়ে আবদার করছেন আর পাঁচ-দশ না নিয়ে ছাড়ছেনও না। এদিকে কারুর খেলায় দিকে মন নেই। বাইরে রাস্তায় হুড়োহুড়ি বেশ। আগা বাউণ্ডারী করলেন। ধীরাজ দাশের হাতে বল। মীনাকে বল করেন বেগম পারা; প্রথম বলেই মীনা আউট। মাঠ থেকে চলে আসার সময় মীনা মতিলালকে পিঠে চড়িয়ে আনলেন। নির্লজ্জ বেলেল্লাপনা কাকে বলে? এবার নামলেন গোপ, বল করলেন বেগম পারা। ধীরাজের বলে আগার বাউণ্ডারী। অভী বল ধরলেন। আগা রিটায়ার করে চলে

আগতপ্রায় সংগীতসম্ভার "যদু ভট্ট"তে রতীন ঠাকুর ও বসন্ত চৌধুরী

গেলেন। ব্যাট করতে গেলেন নিম্মী। লাল দোপাট্টা পেতে টাকা তুলছেন মীনা। দোপাট্টায় টাকা দেবার জন্যে হুড়োহুড়ি। গোপ ধীরাজের বলে আউট। পিছনের লনে অজিত আর আগা গলা জড়িয়ে যাচ্ছেন; জল দেখে আগা বললেন বাংলায় "আমাকে জল দাও।" আশা মাথুরকে নিয়ে জর্জিয়ার্ডি এখনও টাকা তুলছেন। ব্যাট নিয়ে নামলেন শম্মী কাপুর। এতোক্ষণে আশা মাঠে নামলেন। শম্মী ধীরাজের বল মেরে দৌড়লে; নিম্মী ছিল অন্যমনস্ক, হঠাৎ দৌড়। অভীর বল। পরিঘোষক : "শম্মি, বলটা মারছো না কেন?" শম্মি বল মেরে রান করলে তার-পর মাঠের মাঝেই শিরাসন। তারপর হাঁকালে ওভার বাউন্ডারী। মীনার দোপাট্টায় টাকা পড়ছে বেশ। শম্মীর মারের একটা বল বিভু উইকেটের দিকে ছুঁড়তে গিয়ে লাগাল মজনুর মাথায়। মজনু কাৎ, স্ট্রেচারে করে ওকে সরিয়ে নিয়ে যেতে হলো। মীনার তিনপাশে তিন-জন সার্জেন। একটা বল মেরে শম্মি মাঠে গড়াতে লাগলো। মতিলাল নিম্মীকে বল করলেন। নিম্মী রিটায়ার। ব্যাট নিয়ে নামলেন জয়রাজ। মীনার দোপাট্টায় টাকা দেবার হুড়োহুড়ি। জয়রাজ আউট। নামলেন স্মৃতি বিশ্বাস। টেন্টের বাইরে রাস্তার ভীড় উচ্ছৃংখলতর হচ্ছে। অভীর বল শম্মী মারতেই মতিলাল লুফে ফেললেন। নামলেন দেবযানী। অভী আলতোভাবে গড়িয়ে বল দিলেন। রাস্তায় চলেছে ঘোড়ার লাথি আর লাঠির ঘা। মতিলাল স্মৃতিকে বল দিলেন। যমুনা সিংহকে লক্ষ্য করে ঐ কোণে লোকে ফল ছুঁড়ছে। খেলোয়াড়দের বেশীর ভাগই মাঠে বসে। মঞ্জু বল দিলেন দেবযানীকে। স্মৃতি চলে এলেন। ৩-৪০ মিনিট, রান ৮৮। বীরেন চট্টো নামলেন। রান উঠলো ১০০। খেলা দেখার চেয়ে নিম্মী এপাশে আর ওপাশে মীনার টাকা তোলার দিকেই নজর। দেবযানী আউট। শীলা রমানি নামলেন। মাঠের প্রায় মাঝখান পর্যন্ত লোক দাঁড়িয়ে গিয়েছে। মীনার ওড়না টাকা ভর্তি; নিম্মীর হাতের বালতিও। বল দিলে বিভু; সাম্মী আউট। তারপরের বলে করণ দীওয়ান। নামলেন বসন্ত চৌধুরী। শীলা রিটায়ার করে চলে এলেন। নামলেন অজিত চট্টোপাধ্যায়। চারটে বাজলো; খেলা শেষ, ১১৫ রান।

* * * *

গ্যালারীর মাঝখানের তারের বেড়া ডিঙিয়ে হুড়-হুড় করে লোক ছুটে এলো টেন্টের দিকে। বাইরের গোলমাল প্রচন্ড। পুলিস তাড়া করছে; পাঁই পাঁই করে হাজার হাজার লোকের দৌড়। তারকারা বসলেন চায়ে। ভিতর বাহির নিয়ে শত শত পুলিস— যেন সমস্ত লালবাজার ভেঙে পড়েছে। রাস্তা থেকে লোককে তাড়া লাগিয়ে ইডেন গার্ডেন পার করে দিচ্ছে। আমোদের কি চমৎকার মজা। গেটের ধারে রাস্তা প্রায় ফাঁকা করে দেওয়া হয়েছে। বহু দূরে ইডেন গার্ডেনের মধ্যে থেকে লোক উঁকি মারছে। তারকাদের গাড়িতে পাচার করা হলো। একজন পুলিস এলো আঙুলে আঘাত নিয়ে টেন্টের ভিতরে। জন চারেক লোককে রাস্তা থেকে কলার ধরে এনে পোরা হলো। বাইরে তারকাদের গাড়ির সংগে পিলপিল করে লোক চলেছে; সংগে সংগে পুলিসের তাড়া। তারকারা চলে যেতে ভীড় কমলো। সূর্য অস্তমুখে। দূরে আউটরাম ঘাটের ধারে বহু লোক দাঁড়িয়ে। বাইরে মাঠের ওপরে রাস্তায় চতুর্দিকে উচ্চকিত ও উত্তেজিত করে দেওয়া বিকারবাতিকদের জুতো, স্যান্ডাল শিলপার পড়ে রয়েছে ইতঃস্তত। রাজ্যপাল ডাঃ মুখোপাধ্যায় উদ্যোগিত ও পৃষ্ঠপোষিত প্রগলভ আর একটি প্রদর্শনী দেশের সুধী মাত্রেরই মনকে অত্যন্ত কটু করে দিয়ে এইখানেই সমাপ্ত হলো।

খেলার মাঠে

একলব্য

কলকাতার ক্রিকেট মরসুম আরম্ভ হবার পর দু' সপ্তাহ অতীত হয়েছে, কিন্তু এখন পর্যন্ত ক্রিকেট খেলা জমে ওঠেনি। এবার ক্রিকেট মরসুম জমবার আশাও কম। বাইরের কোন টীমের এবার ভারত সফরের পালা নেই। উল্টে ভারতেরই এবার পাকিস্থান সফরের পালা এবং তারও দিন আগত। সুতরাং বড়দিনের ছুটিতে কলকাতার ক্রিকেট মাঠ থাকবে নিস্তব্ধ। সেখানে দেখা যাবে না প্রদর্শনী ক্রিকেট মেলার রঙীন পরিবেশ। তবে পাক-ভারত ক্রিকেট খেলার প্রস্তাব কার্যকরী হলে মরা-গাঙ্গে জোয়ার দেখা দিতে পারে। প্রধান মন্ত্রীর বন্যা সাহায্য ভাণ্ডারে অর্থ সংগ্রহের জন্য ভারতীয় টীমের পাকিস্থান যাত্রার পূর্বে কলকাতায় ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে এক প্রদর্শনী ক্রিকেট খেলার প্রস্তাব করা হয়েছে। এই খেলার অনুষ্ঠান সম্পর্কে বাঙলার ক্রিকেট মহল খুবই আগ্রহী। কিন্তু এই মন্তব্য লেখার সময় পর্যন্ত পাকিস্থান ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সম্মতিসূচক জবাব পাওয়া যায়নি। যদি খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়, তবে বড়দিনের ছুটিতে জমকালো পোশাক-পরিচ্ছদে সজ্জিত হ'য়ে অভিজাত সম্প্রদায়ের যে সব তরুণ-তরুণী ক্রিকেট মাঠে খানাপিনা করতে অভ্যস্ত, তাদের দুধের সাধ ঘোলে মিটবে। কারণ উপর্যুপরি ক' বছর টেস্ট খেলা দেখে দেখে তাদের যে টেস্ট 'টেম্পারামেণ্ট' সৃষ্টি হয়েছে তিন দিনের পাক-ভারত প্রদর্শনী খেলা কি সে 'টেম্পারামেণ্টের' সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে পারবে?

* * * *

টেস্ট খেলার অভিজাত সম্প্রদায়ের দর্শকদের কথা ছেড়ে দিয়ে সাধারণ ক্রিকেট-রসপিপাসুদের কথা আলোচনা করা যাক। সাধারণ দর্শকদের মধ্যে ক্রিকেট খেলা এখনো তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। বিশেষ করে অন্যান্য কয়েকটি প্রদেশের তুলনায় বাঙলার ক্রিকেট বেশ পিছিয়ে আছে। তবু এই বাঙলাতেও বহুসংখ্যক দর্শক আছেন যাঁরা ক্রিকেট খেলার মাধুর্য থেকে রসাস্বাদন করে খেলার প্রতি হয়ে উঠেছেন আগ্রহী। শনি রবিবার তাঁদের প্রাণ আনচান করে। মাঠে যেয়ে ক্রিকেট খেলা না দেখলে ভাল লাগে না। ইডেন উদ্যানে প্রস্তাবিত পাক-ভারত ক্রিকেট খেলার আয়োজন ব্যর্থ হলে এঁরাও দুঃখ পাবেন। তবে ক্রিকেট মরসুমে এঁরা চুপ করেও ঘরে বসে থাকবেন না। রনজি প্রতিযোগিতায় বাঙলাকে প্রথম খেলায় উড়িষ্যার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হচ্ছে। খেলাটি কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে ঠিক ছিল, কিন্তু এখন ঠিক হয়েছে কটকে অনুষ্ঠিত হবে। সুতরাং এদিক দিয়েও বাঙলার ক্রিকেট রসিকরা খেলা দেখার কোন সুযোগ পাচ্ছেন না। উড়িষ্যার বিরুদ্ধে জয়লাভ করলে বাঙলার পরবর্তী খেলা কলকাতায় অনুষ্ঠিত হবে কি না, সে বিষয়েও কোন নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং বাঙলাকে এবার সি এ বি লীগ ও নক আউট, প্রীতি ক্রিকেট, আন্তঃকলেজ ও আন্তঃজেলা ক্রিকেট প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে মরসুম অতিবাহিত করতে হবে। পাক-ভারত ক্রিকেট বাস্তবে রূপায়িত হলে সেটা উপরি পাওনা।

* * * *

সি এ বি লীগের উদ্বোধন দিনে ভারতের চৌকস টেস্ট খেলোয়াড় ডি জি ফাদকার 'ডাবল সেঞ্চুরী' করে ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। ফাদকার গতবার রাজস্থান ক্লাবে ক্রিকেট খেলেছিলেন এবারও সেই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত আছেন। ফাদকারের পর মোহনবাগানের মন্টু সেন এবং ইস্ট-বেঙ্গলের পি সেনের নাম করা যেতে পারে। লীগের খেলায় এঁরা দুজনেই সেঞ্চুরী করেছেন। পি সেন ছিলেন কালীঘাট ক্লাবের খেলোয়াড়। কালীঘাটের সঙ্গে তাঁর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। কিন্তু তিনি এবার খেলছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে। কালীঘাট ক্লাবের আর ক'জন কীর্তিমান খেলোয়াড় ধ্রুব দাস, পি বি দত্ত প্রভৃতি ক্লাবের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন না করলেও খেলছেন এন সি সি-র হয়ে। অথচ এন সি সি বা কালীঘাট কেউই লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। গতবারের 'বি' গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন কালীঘাট লীগ থেকে সরে এসেছে, আর এন সি সি লীগে যোগ-দানের চেষ্টায় আছে। এখন কালীঘাট ক্লাব থেকে ক'জন খেলোয়াড় সরে আসবার ফলে তাদের লীগে না খেলার সিদ্ধান্ত, না, কালীঘাট ক্লাব লীগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় 'না' করায় খেলোয়াড়দের সরে আসা? এ প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবে ক্রীড়ামোদীদের মনে আসতে পারে। গতবার প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই কোন কোন ক্লাব কর্তৃপক্ষ ও নিয়ামক সংস্থার মধ্যে রেষারেষির ভাব প্রত্যক্ষ করা গেছে। এবার দেখা যাচ্ছে দল অদল-বদলের হিড়িক। ফুটবলের যত গলদ সব ক্রিকেটেও সংক্রামিত হবে নাকি?

* * * *

গতবার সি এ বি লীগের প্রথম ডিভিশনের খেলা দেড় দিন করে এবং দ্বিতীয় ডিভিশনের খেলা একদিন করে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার দেড় দিনের বদলে প্রথম ডিভিশনের খেলাও একদিনে শেষ করবার ব্যবস্থা করায় সি এ বি অর্থাৎ ক্রিকেট এসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের কর্ম-কর্তাদের নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। নানা প্রান্ত থেকে কথা উঠেছে একদিনের খেলায় ক্রিকেটের কোন উন্নতি হবে না। সুতরাং যে উদ্দেশ্যে লীগ খেলার প্রবর্তন সে উদ্দেশ্য ব্যর্থ হতে বাধ্য। সাধারণের সমালোচনার উত্তর এবং নিজেদের অসুবিধা এবং উদ্দেশ্য বোঝাবার জন্য সি এ বি-র অবৈতনিক সম্পাদক শ্রী এ এন ঘোষ ক'দিন আগে এক সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। এই সম্মেলনে তিনি যে বিবৃতি দিয়েছেন তা থেকে ক্রিকেট লীগের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে কিছুটা ওয়াকিবহাল হওয়া গেছে।

* * * *

শ্রীযুক্ত ঘোষ পরিষ্কারভাবে বলেন ক্রিকেট লীগের এখন পরীক্ষামূলক অবস্থা। গতবার থেকে তারা লীগ খেলার প্রবর্তন করেছেন। মরসুম শেষে গতবারের খেলার সমস্ত অবস্থা এবং সমস্ত দিক বিবেচনা করে এ বছর নিয়ম-কানুনের কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে। এ বছরের খেলার শেষেও সমস্ত অবস্থা পর্যালোচনা করা হবে। যদি লীগ থেকে প্রকৃত সুফল পাওয়া যায়, তবেই প্রতিযোগিতামূলক লীগ খেলার পাকা-পাকি ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হবে, আর সুফল পাওয়া গেলে ক্লাবের যোগদান বাধ্যতামূলক না করবারই বা কি কারণ থাকতে পারে?

ভারতীয় ক্রিকেট দলের পাকিস্থান সফরে ভারতের নির্বাচিত অধিনায়ক
বিনু মানকড়

দেড় দিনের পরিবর্তে প্রথম ডিভিসন লীগের খেলা একদিনে শেষ করার নূতন নিয়ম সম্পর্কে শ্রী ঘোষ বলেন, গতবার দেড় দিনে সাড়ে সাত ঘণ্টা খেলার সুযোগ ছিল। প্রথম দিন আড়াই ঘণ্টা, দ্বিতীয় দিন পাঁচ ঘণ্টা। কিন্তু হিসেব করে দেখা যায় গতবার গড়ে খেলার স্থায়িত্বকাল ৬ ঘণ্টার বেশী হয়নি। তাই সি এ বি এবার একদিনে ৬ ঘণ্টা খেলার সময় স্থির করেছেন। এই ব্যবস্থা লীগ পরিচালনার পক্ষে বিশেষ সহায়ক বলে সি এ বি কর্তৃপক্ষের ধারণা। কারণ দুইদিন মাঠ পাবার একটা অসুবিধা আছে। তারপর কোন খেলা কোন কারণে স্থগিত হলে দেড় দিনব্যাপী সেই খেলার পুনরায় দিন ঠিক করা অসাধ্য হয়ে পড়ে। ক্রিকেট খেলার উন্নতির জন্যই লীগ খেলার প্রবর্তন হয়েছে। অন্যান্য প্রদেশে যখন লীগ প্রথায় ক্রিকেট খেলা সম্ভব বাঙলায়ই বা তা সম্ভব হবে না কেন? তরুণ খেলোয়াড়দের অনুশীলনের সুযোগ, প্রতিদ্বন্দ্বিতা-ক্ষমতার মানসিক গঠন, শ্রমসহিষ্ণুতা প্রভৃতি ক্রিকেট খেলার অপরিহার্য গুণাবলীর উন্মেষ সাধনের প্রতি লক্ষ্য রেখেই দেড় দিনব্যাপী খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছিল; কিন্তু প্রতিযোগিতা-মূলক ক্রিকেটে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র এরূপ প্রশস্থ হ'য়ে ওঠে যে, গতবার অপেক্ষাকৃত তরুণ খেলোয়াড়েরা বোলিং ও ব্যাটিং করবার খুব কমই সুযোগ পেয়েছেন। যাঁরা বেশী সময় ব্যাটিং বা বোলিং করেছেন তাঁরা অধিকাংশই খ্যাতিমান খেলোয়াড়। অনেক ক্ষেত্রে শক্তিশালী ও দুর্বল টীমের খেলা অল্প সময়ের মধ্যে শেষ হয়ে গেছে। এই অবস্থা ক্রিকেট খেলার উন্নতির পরিপন্থী।

* * * *

বর্তমান ব্যবস্থায় সকাল ১০টায় লীগ খেলা আরম্ভ হয়ে বিকাল সাড়ে ৪টায় শেষ হয়। বেলা ১টা থেকে মধ্যাহ্ন ভোজের জন্য আধ ঘণ্টা সময় নির্দিষ্ট আছে। সুতরাং দুই দলেরই ৩ ঘণ্টা করে ব্যাটিংয়ের সুযোগ। ৩ ঘণ্টার পূর্বে ইনিংস ডিক্লেয়ার করবার পক্ষে কোন বাধা নেই। সি এ বি-র সম্পাদক বিভিন্ন ক্লাবকে প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে এবং ক্রিকেট-মাধুর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে লীগে প্রতিযোগিতা করতে অনুরোধ করেন। ক্রিকেট আইনের উল্লেখ করে তিনি বলেন, একদিনের ক্রিকেট খেলা সম্পর্কে সাধারণের বিভিন্ন ক্লাবের, এমন কি **কোন কোন আম্পায়ারেরও ভ্রান্ত ধারণা আছে।** ক্রিকেট আইন বইয়ের ১৪ নম্বর ধারা হচ্ছে—

"The side which bats first and leads by 150 runs in a match of three days or more, by 100 runs in a two-day match, or by 75 runs in a one-day match, shall have the option of requiring the other side to follow their innings."

অর্থাৎ একদিনের খেলায় যে দল প্রথম ব্যাটিং করবে তারা প্রতিপক্ষের রানের চেয়ে ৭৫ রানে অগ্রগামী থাকলে প্রতি-পক্ষকে 'ফলো-অন' করিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করাতে বাধ্য করতে পারে। এই আইন থেকে বোঝা যায় একদিনের খেলা এক ইনিংসেই শেষ হয়ে যায় না। এই আইন আরও পরিষ্কার হয়েছে ২২ নম্বর আইনের দ্বারা। ২২ নম্বর আইনে খেলার ফলাফল সম্পর্কে বলা হয়েছে।

"A match is won by the side which shall have scored a total of runs in excess of that scored by the opposing side in its two completed innings; one day matches, unless thus played out, shall be decided by the first innings......."

এই আইন থেকে একদিনের খেলাতেও পুরোপুরি দুই ইনিংস খেলার বাধ্যবাধকতা প্রমাণিত হয়। পরিষ্কারভাবেই লেখা আছে একদিনের খেলায় দুই ইনিংস শেষ না হলে প্রথম ইনিংসের ফলাফলে খেলার জয়-পরাজয় মীমাংসিত হবে।

২২ নম্বর আইনের সরকারী 'টিকা' উদ্ধৃত করলে **বক্তব্য আরও পরিষ্কার হ'য়ে** যাবে।

"Neither side can be compelled to continue after a match is finished; a one-day match shall not be regarded as finished on the result of the first innings if the umpires consider there is a prospect of carrying the game to a further issue in the time remaining."

এর অর্থ এই যে, একদিনের খেলায় দুই দলের প্রথম ইনিংস শেষ হবার পর যদি দ্বিতীয় ইনিংস খেলবার সম্ভাবনা থাকে, তবে আম্পায়ার দ্বিতীয় ইনিংস খেলবার নির্দেশ দিবেন। এই অবস্থায় কোন দল খেলতে অস্বীকার করলে আম্পায়ারের কর্তব্য বিষয়টি নিয়ামক সংস্থার গোচরীভূত করা।

সি এ বি-র সম্পাদক শ্রী ঘোষ এই সকল বিষয়ের আলোচনা করে ক্লাবদের আম্পায়ারের সঙ্গেও সহযোগিতা করতে অনুরোধ করেন এবং কোন কারণে আম্পায়ার মাঠে উপস্থিত হতে না পারলে উভয় অধিনায়কের মনোনীত আম্পায়ার দ্বারা খেলা আরম্ভ করে খেলার ফলাফল নির্ধারণ করতেও অনুরোধ জানান। তিনি আরও বলেন ক্রিকেট এবং ফুটবল এক নয়। ফুটবলের উচ্ছৃংখলতা যদি ক্রিকেটে সংক্রামিত হয়, তবে তাঁরা প্রতিযোগিতামূলক ক্রিকেট খেলা বন্ধ করে দিতে কোনই দ্বিধা করবেন না।

সি এ বি লীগের মত এ বছর আন্তঃ- কলেজ ক্রিকেট লীগের আইনেরও কিছু-কিছু অদল-বদল করা হয়েছে। নূতন **নিয়মানুযায়ী দুই কলেজেরই সমান সময়** ব্যাটিং করবার অধিকার আছে। **পুরোপুরি** প্রথম ইনিংসে বা অন্যভাবে খেলার **ফলাফল** নিষ্পত্তি না হলে রানের গড় হিসাবে **খেলার** ফলাফল মীমাংসিত হবে। অর্থাৎ **রান ও** উইকেটের গড় হিসাবই হবে **শ্রেষ্ঠত্ব** যাচাইয়ের মাপকাঠি। একটি **কলেজ ৪** উইকেটে করলো ১০০ রান। অন্য **কলেজ** ৮ উইকেটে ১৭৫ রান করলেও **জয়লাভ** করতে পারবে না! বলা বাহুল্য, এ **নিয়ম** যেমন হাত-গড়া সি এ বি লীগে **সময় ভাগ** করার নিয়মও তেমন হাত-গড়া। **লীগ** প্রতিযোগিতার পরিচালনা সহজতর **করবার**
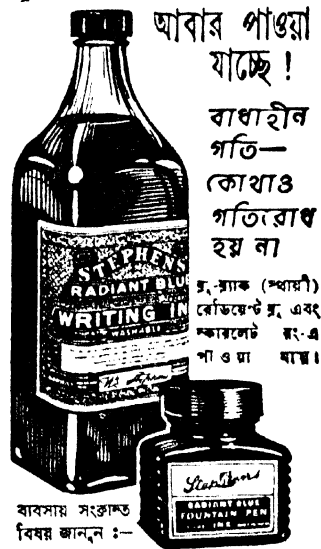
হায়দরাবাদের অধিনায়ক মায়িন ভারতের প্রধান সেনাপতি জেনারেল রাজেন্দ্র সিংজীর হাত থেকে ডুরাণ্ড কাপ গ্রহণ করছেন

জন্যই এই নিয়মের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। এতে ক্রিকেটের উন্নতি হবে কি অবনতি হবে সে প্রশ্ন ভবিষ্যতের মধ্যে নিহিত। সমস্ত লীগ প্রতিযোগিতারই যখন পরীক্ষা-মূলক অবস্থা তখন এ সম্বন্ধে কোন মন্তব্য না করাই ভাল।

ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্টের পূর্বাভাস

অস্ট্রেলিয়ার ব্রিসবেন মাঠে ২৬শে নভেম্বর থেকে আরম্ভ হচ্ছে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা। ক্রিকেট খেলার ইতিহাসে ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া টেস্টের মর্যাদা অনন্য। তাই সমগ্র ক্রিকেট বিশ্বের দৃষ্টি আজ ব্রিসবেনের উপর নিবদ্ধ। ৬ দিনব্যাপী এই টেস্ট খেলা ২রা ডিসেম্বর শেষ হবার কথা। সুতরাং এই সময় জয়-পরাজয় মীমাংসার আশা করা যেতে পারে।

এম সি সি দল এবার অস্ট্রেলিয়া সফরে গিয়ে কোন খেলাতেই এ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করেনি। উপর্যুপরি তিনটি খেলায় জয়লাভ করবার পর দুটি খেলা অমীমাংসিত-ভাবে শেষ করেছে। অবশ্য এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান একাদশের সংগে তাদের ৪ দিনব্যাপী একটি খেলা বৃষ্টির জন্য পরিত্যক্ত হয়ে যায়। তা ছাড়া উদ্বোধনী খেলাটিকে প্রথম শ্রেণীর খেলা নয় বলে হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া কাউণ্টির সঙ্গে দুই দিনের এ খেলাটিও অমীমাংসিত ছিল। নিউ সাউথ ওয়েলস ও কুইন্সল্যাণ্ডের সংগে এম সি সি-র খেলার ফলাফল ছাড়া অন্য সব খেলার ফলাফল ইতিপূর্বে 'দেশ' পত্রিকার প্রকাশ করা হয়েছে। নিউ সাউথ ওয়েলস ও কুইন্সল্যাণ্ডের খেলার ফলাফল এ সংখ্যায় প্রকাশ করা হচ্ছে।

নিউ সাউথ ওয়েলস-এর সংগে এম সি সি-র খেলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ইংলণ্ডের তরুণ খেলোয়াড় কাউড্রের দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী লাভ। এ ছাড়া অধিনায়ক হাটনও সেঞ্চুরী করেছেন। নিউ সাউথ ওয়েলস-এর পক্ষেও ওয়াটসন সেঞ্চুরী করতে সমর্থ হন। এ্যালান ডেভিডসন, কিথ মিলার প্রভৃতি অস্ট্রেলিয়া টেস্ট টীমের খ্যাতনামা বোলারদের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে দুই ইনিংসে সেঞ্চুরী করায় ওপেনিং ব্যাটসম্যান কলিন কাউড্রের ইংলণ্ড টেস্ট টীমে অন্তর্ভুক্তির সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল হয়েছিল। কিন্তু নিউ সাউথ ওয়েলস-এর পরবর্তী খেলায় কাউড্রে মোটেই সুবিধা করতে পারেন নি। কুইন্সল্যাণ্ডের খেলায় তিনি দুই ইনিংসেই কোন রান করবার পূর্বে আউট হয়ে প্যাভেলিয়নে ফিরে গেছেন। টেস্ট খেলার অব্যবহিত পূর্বের এই ব্যর্থতা হয়তো কাউড্রের টেস্ট টীমে নির্বাচিত হবার পক্ষে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করবে। এই মন্তব্য লেখার সময় পর্যন্ত ইংলণ্ড টেস্ট টীমের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম পাওয়া যায়নি। কুইন্সল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে অপর ওপেনিং ব্যাটসম্যান প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরী ও দ্বিতীয় ইনিংসে ৩৮ রান করেছেন। সুতরাং অধিনায়ক হাটনের সঙ্গে সিম্পসন ইংলণ্ডের ইনিংস আরম্ভ করবেন, এটা ধরে নেওয়া যায়। কাউড্রে টেস্ট টীমে স্থান পেলেও তাকে হয়তো পরে ব্যাটি[ং] করতে পাঠান হবে।

ইংলণ্ডের পূর্বতন অধিনায়ক আর্থা[র] গিলিগান ইংলণ্ড-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টে[স্ট] সম্পর্কে যে সমালোচনা করেছেন তা থেকে মনে হয়, প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভে[র] সম্ভাবনা বেশী। গিলিগান বলেছেন—১৯৫[৩] সালের 'ওভাল' টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার যে টীম ইংলণ্ডের কাছে হার স্বীকার করে সেই টীমের ৯ জন খেলোয়াড় অস্ট্রেলিয়া[র] প্রথম টেস্ট টীমে নির্বাচিত হলেও 'ব্রিসবেনে' অস্ট্রেলিয়ারই জয়লাভের সম্ভাবনা বেশী। চৌকশ খেলোয়াড় আয়ান জনসন অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। গিলিগান মনে করেন, কিথ মিলার অথবা আর্থার মরিসের উপর অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কের দায়িত্ব অর্পিত হওয়া উচিত ছিল। কারণ ক্রিকেট খেলার খুঁটিনাটি সম্পর্কে এঁদের অভিজ্ঞতা বেশী। ব্যাটিংয়ের দিক দিয়ে অস্ট্রেলিয়ার শক্তি ইংলণ্ডের তুলনায় বেশী বলেই গিলিগানের ধারণা। অস্ট্রেলিয়ার বোলিংয়েও রকমফের আছে। ফিল্ডিংও ভাল।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিতে হলে অধিনায়ক হাটনকে বোলিং অপেক্ষাকৃত দুর্বল করে ব্যাটিং শক্তিশালী করতে হবে। ইংলণ্ডের শেষ দিকের ব্যাটসম্যানদের উপর মোটেই নির্ভর করা চলে না। উইকেট কিপার ইভান্স এবং কৌশলী বোলার বেডসারের উপর ইংলণ্ডের অনেকখানি আশা। ইভান্সকে গিলিগান বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উইকেট কিপার বলে অভিহিত করেছেন। হাটন, সিম্পসন, কম্পটন, মে প্রভৃতি ব্যাটসম্যানের উপরও ইংলণ্ডের শক্তি অপেক্ষা করছে। অস্ট্রেলিয়ার তরুণ ওপেনিং ব্যাটসম্যান ফেবেলের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে গিলিগান বলেছেন, তিনি বহুকাল অস্ট্রেলিয়ার কোন তরুণ খেলোয়াড়কে এমন নিপুণভাবে ব্যাটিং করতে দেখেন নি। উইকেটের চারদিকে তাঁর মারের হাত। তবে ফেবেলের খেলার একটি ত্রুটি—উইকেটে ভালভাবে জমবার পর ফেবেল খানিকটা অন্যমনস্ক হয়ে ওঠেন। বিশ্বের খ্যাতনামা ফাস্ট বোলার লিণ্ডওয়াল অস্ট্রেলিয়ার প্রধান স্তম্ভ বলে গিলিগান মন্তব্য করেছেন।

ব্রিসবেন মাঠের 'পিচ' সম্বন্ধে গিলিগানের অভিমত, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ দিনে পিচে ক্ষতের চিহ্ন দেখা যেতে পারে এবং এই অবস্থা খেলার ফলাফল মীমাংসারও সহায়ক হতে পারে। ব্রিসবেনের আবহাওয়া অনিশ্চিত। যে কোন সময়ে ঝড়-বৃষ্টির সম্ভাবনা। ১৯৪৬ এবং ১৯৫০ সালের 'ব্রিসবেন' টেস্ট ঝড়-বৃষ্টির জন্যই পণ্ড হয়ে যায়। নীচে অস্ট্রেলিয়া টেস্ট টীমের নির্বাচিত খেলোয়াড়দের নাম এবং এম সি সি-র সঙ্গে নিউ

সাউথ ওয়েলস ও কুইন্সল্যাণ্ডের খেলার ফলাফল দেওয়া হল :—

নিউ সাউথ ওয়েলস : এম সি সি

এম সি সি—১ম ইনিংস—২৫২ (কাউড্রে ১১০, হাটন ১০২; ডেভিডসন ৪১ রানে ৩ উইকেট)

নিউ সাউথ ওয়েলস—১ম ইনিংস—৩৮২ (ওয়াটসন ১৫৫, মিলার ৮৬; টাইসন ৯৮ রানে ৪ উইঃ, বেডসার ১১৭ রানে ৪ উইঃ)

এম সি সি—২য় ইনিংস—৩২৭ (কাউড্রে ১০৩; ক্রফোর্ড ৮০ রানে ৪ উইঃ, ট্রেনর ৯৬ রানে ৪ উইঃ)

নিউ সাউথ ওয়েলস—২য় ইনিংস (২ উইঃ)—৭৮

[খেলা অমীমাংসিত]

কুইন্সল্যাণ্ড : এম সি সি

এম সি সি—১ম ইনিংস—৩০৪ (সিম্পসন ১৩৬, কম্পটন ১১০, বেডসার ৩০; লিণ্ডওয়াল ৬৬ রানে ৪ উইঃ ম্যাকে ৫ রানে ২ উইকেট)

কুইন্সল্যাণ্ড—১ম ইনিংস—২৮৮ (সি হার্ভে ৪৯, ম্যাকে ৩৩, গ্রাউট ৩২; স্ট্যাথাম ৭৪ রানে ৩ উইঃ, বেলী ৭৪ রানে ৩ উইঃ, বেডসার ৫৬ রানে ২ উইঃ)

এম সি সি—২য় ইনিংস—২৮৮ (পিটার মে ৭৭, কম্পটন ৬৯, বেলী ৫১, সিম্পসন ৩৮; আর্চার ৩৪ রানে ২ উইঃ)

কুইন্সল্যাণ্ড—২য় ইনিংস (২ উইঃ)—২৫

[খেলা অমীমাংসিত]

অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট টীম

আয়ান জনসন—অধিনায়ক (ভিক্টোরিয়া), রন আর্চার (কুইন্সল্যাণ্ড), রিকি বিনাউড (নিউ সাউথ ওয়েলস), এ্যালান ডেভেডসন (নিউ সাউথ ওয়েলস), লেস ফেবেল (সাউথ অস্ট্রেলিয়া), নীল হার্ভে (ভিক্টোরিয়া), গ্রেমি হোল (সাউথ অস্ট্রেলিয়া), বিল জনস্টন (ভিক্টোরিয়া), গিল ল্যাংলে (সাউথ অস্ট্রেলিয়া), রে লিণ্ডওয়াল (কুইন্সল্যাণ্ড), কিথ মিলার (নিউ সাউথ ওয়েলস), আর্থার মরিস (নিউ সাউথ ওয়েলস)।

খেলোধ্লোর টুকরো খবর

টমাস কাপ—আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা টমাস কাপের এসিয়ান আঞ্চলিক সেমি-ফাইনালে ভারত ৯—০ খেলায় পাকিস্থানকে হারিয়ে দিয়ে ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এসিয়ান আঞ্চলিক ফাইনালে ভারতকে হংকংয়ের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। ভারত ও পাকিস্থানের সেমি-ফাইনাল খেলা করাচীতে অনুষ্ঠিত হয়।

এসিয়ান চতুর্দলীয় ফুটবল—ডিসেম্বর মাসের ১৮ই তারিখ থেকে কলকাতায় এসিয়ান চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হবে। এই খেলায় ভারতের পক্ষে নিম্নলিখিত খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছেন। কলকাতায় অনুশীলনের পর খেলার পূর্বে চূড়ান্তভাবে দল গঠন করা হবে।

গোল—সঞ্জীব (বোম্বাই), হরদেব (দিল্লী) ও এস শেঠ (বাংলা)।

ব্যাক—আজিজুদ্দিন (হায়দরাবাদ), লতিফ (হায়দরাবাদ), সালাম (হায়দরাবাদ), শৈলেন মান্না (বাংলা)—ক্যাপ্টেন ও সুশীল গুহ (বাংলা)।

হাফ ব্যাক—এ আর গোকুল (বাংলা), চন্দন সিং (বাংলা), প্রকাশ সিং (সার্ভিসেস), পার্কে (সার্ভিসেস), বসীর (মহীশূর), নূর (হায়দরাবাদ) ও গুলাব সিং (বোম্বাই)।

ফরোয়ার্ডস—ভেংকটেস (বাংলা), মৈনুদ্দিন ও লায়েক (হায়দরাবাদ), এ সত্তার (বাংলা), এন ডি'সুজা (বোম্বাই), এণ্টনি (মালাবার), লিংদো (সার্ভিসেস), থানিকাচলন (মাদ্রাজ), পূরাণ বাহাদুর (সার্ভিসেস), আমেদ খাঁ (বাংলা), জগন্নাথন (মহীশূর) ও ইয়ামানি (হায়দরাবাদ)।

খেলার তালিকা :—

১৮ই ডিসেম্বর—পাকিস্থান : সিংহল
১৯শে ডিসেম্বর—ভারত : ব্রহ্মদেশ
২১শে ডিসেম্বর—ভারত : সিংহল
২৩শে ডিসেম্বর—পাকিস্থান : ব্রহ্মদেশ
২৫শে ডিসেম্বর—ব্রহ্মদেশ : সিংহল
২৬শে ডিসেম্বর—ভারত : পাকিস্থান

রাঁচি গভর্নরস শীল্ড—রাঁচিতে গভর্নরস শীল্ডের ফাইনাল খেলায় বিদ্যাসাগর কলেজ ১—০ গোলে আনন্দবাজার পত্রিকা স্পোর্টস ক্লাবকে হারিয়ে শীল্ড লাভ করেছে।

আসাম মেডিক্যাল কলেজের বার্ষিক এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ন কুমারী নিরু দেবী

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল—আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ভলিবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় ১৫—৯, ১৫—৬ ও ১৫—২ পয়েণ্টে অন্ধ্র বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে দিয়ে উপর্যুপরি পাঁচ বছর বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে।

পরলোকে অলিম্পিক এ্যাথলীট—পূর্বতন অলিম্পিক এ্যাথলীট শ্রী পি সি ব্যানার্জি হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ৬১ বছর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। ১৯২০ সালে এণ্টোয়ার্প অলিম্পিকে ভারত সর্বপ্রথম অলিম্পিক দল প্রেরণ করে। পি সি ব্যানার্জি এই দলের এ্যাথলীট হিসাবে মনোনীত হন। ভারতীয় হিসাবে তিনি প্রথম এবং বাঙ্গালী হিসাবেও তিনি প্রথম অলিম্পিক এ্যাথলীটের মর্যাদা পান। এ্যাথলীট ছাড়া অন্যান্য খেলাধূলায়ও তিনি পারদর্শী ছিলেন। তাঁর মৃত্যুতে মোহনবাগান ক্লাব পতাকা অর্ধনমিত রাখা হয়।

সাঁতারে নূতন রেকর্ড—বোম্বাই রাজ্য সন্তরণ প্রতিযোগিতায় ৪০০ মিটার ফ্রি স্টাইলে শ্রীচাঁদ বাজাজ, ১০০ মিটার বুক সাঁতারে রঘুপৎ সিং ও ২০০ মিটার বাটারফ্লাই স্ট্রোকে এস জি লাঠি নূতন ভারতীয় রেকর্ড করেছেন।

দেশী সংবাদ

১৫ই নবেম্বর—অন্ধ্রে রাষ্ট্রপতির শাসন প্রবর্তিত হইয়াছে।

ভারতের বিশিষ্ট শিল্পপতি ডাঃ রামস্বামী মুদালিয়র আজ কলিকাতায় এক সাংবাদিক বৈঠকে সাড়ে সতের কোটি টাকা মূলধন লইয়া শিল্পে ঋণদান ও লগ্নী সম্পর্কে একটি যৌথ কর্পোরেশন গঠনের কথা ঘোষণা করেন।

আজ রাত্রি সওয়া দশটার সময় হাওড়া স্টেশন হইতে ইস্টার্ন রেলওয়ের দিল্লীগামী যে জনতা এক্সপ্রেস ছাড়ে, তাহার সহিত সর্বপ্রথম থার্ড ক্লাস একখানি ঘুমাইবার বগী জুড়িয়া দেওয়া হয়। পরীক্ষামূলকভাবে জনতা এক্সপ্রেসের সহিত ঐরূপ ঘুমাইবার গাড়ী সংযুক্ত করার ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৬ই নবেম্বর—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আজ বরোদায় গান্ধীজীর মর্মরমূর্তির আবরণ উন্মোচন প্রসঙ্গে বলেন, "অস্ত্র নহে, একমাত্র সত্য ও অহিংসাই এই বিশ্বে শান্তি আনিতে পারে।"

দশজন সদস্য লইয়া গঠিত একটি রুশ ইস্পাত বিশেষজ্ঞ দল আজ মস্কো হইতে কলিকাতা আসিয়া পৌঁছে। ভারতে একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপন সম্পর্কে এই বিশেষজ্ঞ দল দুই মাস এই দেশে অবস্থান করিবেন।

১৭ই নবেম্বর—কলিকাতায় ভারতের পূর্বাঞ্চল পুনর্বাসন মন্ত্রীদের সম্মেলন শুরু হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় উদ্বোধনী ভাষণে উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যাপারে যে সকল প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন, প্রধান প্রতিবন্ধক হইতেছে যে, পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের মধ্যে বিলি করার মত পর্যাপ্ত পরিমাণ জমি নাই।

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈন আজ যাদবপুরের পার্শ্ববর্তী বাঘপুরের অন্তর্গত গাঙ্গুলীবাগানে উদ্বাস্তুগণের জন্য পরিকল্পিত গৃহসমষ্টির ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। ঐ স্থানে উদ্বাস্তুদের জন্য ৩৩টি চারিতলা বাড়ী নির্মিত হইবে এবং ঐগুলিতে ১০০০টি স্বয়ংসম্পূর্ণ বাসকক্ষে এক হাজার উদ্বাস্তু পরিবারের বাসস্থানের ব্যবস্থা হইবে।

১৮ই নবেম্বর—ভারতীয় রেলওয়ের উন্নয়নকল্পে ১ কোটি ডলার মূল্যের মার্কিন সাহায্য পরিকল্পনা অনুসারে ভারত প্রায় ৩৭৩০টি আমেরিকান মালবাহী ওয়াগন পাইবে। এই সম্পর্কে আজ নয়াদিল্লীতে ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

বিহার ও উড়িষ্যা প্রত্যাগত উদ্বাস্তুদের

মধ্যে প্রায় এক হাজার নরনারী আজ কলিকাতায় মিডলটন রো'তে ভারত সরকারের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন অফিসে গিয়া পশ্চিমবঙ্গে স্থায়ী পুনর্বাসন সাপেক্ষে চাল-ডালের সাহায্যের দাবীতে ঐ অফিস ঘেরাও করিলে পুলিশ লাঠি চালনা করিয়া তাহাদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া দেয়। উহার ফলে প্রায় ২০ জন উদ্বাস্তু নরনারী আহত হয়।

১৯শে নবেম্বর—আজ লোকসভায় ১৫৪-৩৫ ভোটে অন্ধ্রে রাষ্ট্রপতি শাসন প্রবর্তন অনুমোদিত হয়।

কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী শ্রীখান্দুভাই দেশাই আজ লোকসভায় এক বিবৃতিতে ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, অন্তর্বর্তী সময়ে প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, গ্র্যাচুইটি এবং বোনাস সম্পর্কে কোন ব্যাঙ্ক কর্মচারী কোনরূপ ক্ষতিগ্রস্ত হইলে ঐ ক্ষতি পূরণ করিবার জন্য বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ যে সুপারিশ করিবেন, গভর্নমেণ্ট উহা পূর্ব হইতে কার্যকরী করিবেন।

২০শে নবেম্বর—খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় হইতে শিলংয়ে সংবাদ আসিয়াছে যে, সীমান্ত সংলগ্ন কয়েকটি এলাকায় পাকিস্থানীরা ব্যাপক আক্রমণ চালায়। এই সংবাদ পাওয়ার পর আসাম সরকার অবিলম্বে ঐ সব এলাকায় অতিরিক্ত ফৌজ প্রেরণ করিয়াছেন।

২১শে নবেম্বর—অন্ধ্রের প্রবীণতম নেতা শ্রী টি প্রকাশম পুনরায় কংগ্রেসে যোগদান ও উহার সক্রিয় সদস্য হইবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

হায়দরাবাদের সংবাদে প্রকাশ, ১০ই ডিসেম্বর ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের ধর্মঘট আরম্ভের এক সপ্তাহের মধ্যে সরকার যদি কোন ব্যবস্থা অবলম্বন না করেন, তবে হায়দরাবাদের বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত ৫০ হাজার কর্মী অনির্দিষ্ট কালের জন্য সহানুভূতিসূচক ধর্মঘট আরম্ভ করিবে।

কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী ডাঃ পাঞ্জাবরাও দেশমুখ আজ অমৃতসরে কৃষকদের এক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, জোতের সর্বোচ্চ পরিমাণ নির্ধারণের নীতি হইতে সরকার বিচ্যুত হইতে পারেন না।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই নবেম্বর—মৌলানা ভাসানী পাকিস্থানে প্রত্যাবর্তন করিলে তাঁহাকে গ্রেপ্তা করা হইবে কি না, এই প্রশ্নের উত্তরে ঢাকা পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মেজর জেনারে ইস্কান্দার মীর্জা বলেন যে, তাঁহাকে নিশ্চয় গ্রেপ্তার করা হইবে।

১৬ই নবেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জে নূতন সদস গ্রহণের ব্যাপারে ভারত ও ইন্দোনেশিয় কর্তৃক যুক্তভাবে উত্থাপিত প্রস্তাবটি রাষ্ট্র পুঞ্জের বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে গৃহী হয়। এই ব্যাপারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন পাকিস্থান সহ অধিকাংশ কমনওয়েলথ রাষ্ট ভারতের বিরোধিতা করেন। কিন্তু শে পর্যন্ত ভারত এক ভোটে জয়ী হয়।

১৮ই নবেম্বর—গতকল্য রাত্রিতে মিশ মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্যভার লে কর্নেল গামাল নাসেরের উপর অর্পণে সিদ্ধান্ত করেন।

'ডন' পত্রিকায় প্রকাশিত লণ্ডন সংবাদ দাতার নিকট হইতে প্রাপ্ত একটি সংবাদে বলা হইয়াছে যে, জনাব এইচ এস সুরাবর্দী পুনর্গঠিত পাকিস্থান মন্ত্রিসভায় তাঁহা যোগদানের শর্ত হিসাবে পূর্ববঙ্গে পার্লা মেণ্টারী গভর্নমেণ্ট পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইয়াছেন।

১৯শে নবেম্বর—বোম্বাইয়ে তাপ বিদ্যু উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিশ্বব্যাঙ্ক আজ ভারতকে ১ কোটি ৬২ লক্ষ ডলার ঋ মঞ্জুর করিয়াছেন। বিশ্বব্যাঙ্কের এ ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, এই বিদ্যু কেন্দ্রটি ভারতের সর্বাধুনিক ও সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির অন্যতম হইবে।

বৃটিশ কমন্স সভায় পশ্চিম জার্মানী সার্বভৌমত্ব ও পুনরস্ত্রসজ্জা সংক্রান্ত নব রাষ্ট্র চুক্তি ২৬৪—৪ ভোটে অনুমোদিত হইয়াছে।

২০শে নবেম্বর—বৃহৎ রাষ্ট্রসমূহে মধ্যে ঘরোয়াভাবে নিরস্ত্রীকরণ সমস্যা আলোচনা করিবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ নিরস্ত্রীকরণ কমিশন আজ প্রাথমিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছেন।

মিশর সুয়েজ খাল এলাকা হইতে ৭০ হাজার বৃটিশ সেনা অপসারণ সংক্রান্ত সুয়েজ চুক্তি অনুমোদিত হইয়াছে।

২১শে নবেম্বর—লণ্ডনের প্রকাশ, জেনারেল মীর্জার সাম্প্রতিক উক্তি তীব্র আপত্তি জ্ঞাপন করিয়া মিঃ সুরাব পাক গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ জানাইয়া দিয়াছেন যে, দেশের নেতৃবৃন্দ দায়িত্বহীন উক্তি হইতে বিরত না থাকে তবে তাঁহার পক্ষে মহম্মদ আলী মন্ত্রিসভ যোগদান সম্ভবপর হইবে না।

করাচীর বাণিজ্যিক মহল মনে করেন পাকিস্থানী টাকার মূল্য শীঘ্রই হ্রাস পাই

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের গ্রাম উন্নয়ন

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় পশ্চিমবঙ্গের পল্লী উন্নয়নের জন্য একটি নূতন পরিকল্পনা উপস্থিত করিয়াছেন। আগামী পাঁচ মাসের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে ভূমিসংক্রান্ত ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিবে। এই পরিবর্তন সমাজ-জীবনের উপরও বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিবে সন্দেহ নাই। জমিদারী প্রথার বিলোপ সাধনে এখানে কৃষক শ্রেণীর মধ্যে নূতন চেতনা জাগিবে এবং উৎপাদনের পরিমাণও তাহার ফলে বৃদ্ধি পাইবে, এরূপ সম্ভাবনা রহিয়াছে। কিন্তু ভূমি-ব্যবস্থার এই সংস্কার সাধনের ফলেই পশ্চিমবঙ্গের অর্থনীতিক সমস্যার সমাধান হইয়া যাইবে এবং গ্রামসমূহ সমৃদ্ধ হইয়া উঠিবে, এরূপ আশা করা যায় না। কারণ পশ্চিমবঙ্গে জমির পরিমাণ পর্যাপ্ত নয়। রাজ্যের অধিকাংশই কৃষিজীবী। জমিদারী এবং মধ্যস্বত্ব প্রথার বিলোপ সাধন সত্ত্বেও জমির অভাব এখানে পূরণ হইবে না, অর্থাৎ ভূমিহীন কৃষকদের জীবিকা অর্জনের পক্ষে যথেষ্ট জমি মিলিবে না। পশ্চিমবঙ্গের কৃষকদের মধ্যে বেকার সমস্যা অত্যন্তই প্রবল। এই সমস্যা মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যার পরিস্ফীতিতে বর্তমানে অত্যন্ত জটিল আকার ধারণ করিয়াছে এবং এই রাজ্যের অর্থনীতিক অবস্থা বিপজ্জনক করিয়া তুলিয়াছে। বড় বড় কল-কারখানা বসাইয়া অল্প দিনের মধ্যে দেশের সামাজিক এবং অর্থনীতিক অবস্থার সামঞ্জস্য সাধনের দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করাও এক জটিল ব্যাপার। এরূপ অবস্থায় কুটীর-শিল্পসমূহ সংগঠিত করিবার গুরুত্ব স্বভাবতঃই দেখা দেয়। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী হাস, মুরগী, মৎস্য চাষ প্রভৃতির সম্প্রসারণের উপর জোর দিয়াছেন। বাঙলা দেশ বিভক্ত হইবার পর এই সব দিক হইতে পশ্চিমবঙ্গের প্রয়োজন বিশেষভাবেই বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং এগুলির বাজারও আছে। কিন্তু এই সব ছোট ছোট শিল্পের উজ্জীবন সাধন করিতে হইলে সেগুলির পিছনে সরকারের সুপরিকল্পিত কর্মপ্রণালী থাকা প্রয়োজন। মৎস্য চাষের কথা এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। কয়েক বৎসর হইতে এজন্য চেষ্টা চলিতেছে, এমন কথা আমরা শুনিয়াছি। কিন্তু সে চেষ্টাও যে ফলপ্রসূ হইয়াছে, এ পরিচয় দেশের লোকে কিছুই পায় নাই। সুতরাং পরিকল্পনাই যথেষ্ট নয়, সেগুলি কার্যে পরিণত করিবার জন্য বাস্তব ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া সর্বাগ্রে প্রয়োজন। পশ্চিমবঙ্গে এরূপ অনেক ক্ষুদ্রায়তন শিল্প-প্রতিষ্ঠান রহিয়াছে, যেগুলির উৎপন্ন দ্রব্য উৎকর্ষ ও মূল্যের দিক হইতে বিদেশাগত অনুরূপ শিল্প-পণ্যের তুলনায় হীন নয়; কিন্তু উপযুক্ত সংখ্যক ক্রেতার অভাবে এই সব শিল্প-প্রতিষ্ঠানের কাজ আংশিকভাবে বন্ধ রাখিতে হইতেছে। প্রত্যুত সরকারী প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা দেশের এই ধরনের ছোট ছোট শিল্পগুলির উজ্জীবনে বিশেষ সহায়ক হয় নাই। কুটীর-শিল্পগুলির উন্নয়নেও উক্ত পরিকল্পনা কার্যকর হইয়াছে বলা যায় না। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ কিছুদিন পূর্বে পুণায় খাদি এবং গ্রাম-শিল্প উন্নয়ন বোর্ডের উদ্বোধন করিতে গিয়া স্বয়ং এজন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় এই ত্রুটি কতটা পূর্ণ হয়, দেশবাসী তাহার প্রতীক্ষা করিতেছে। পশ্চিমবঙ্গের দিক হইতে ফরাক্কা বাঁধ পরিকল্পনার কথা এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। পাকিস্থানের দিক হইতে এই সম্পর্কে প্রতিবন্ধকতার আশঙ্কা সম্প্রতি দূর হইয়াছে। সুতরাং দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এই প্রস্তাব কার্যে পরিণত করা হইবে, আমরা ইহাই আশা করি।

পশ্চিমবঙ্গে পুনর্গঠন কমিশন

'নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী' মানভূম রাজনীতিক সম্মেলনে পশ্চিমবঙ্গের দাবীর বিরুদ্ধে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী কংগ্রেসের নির্দেশ নস্যাৎ করিয়া দিয়া সিংহবিক্রমে এই কথা ঘোষণা করিয়াছেন। আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের পশ্চিমবঙ্গে আগমনের সম্ভাবনা আছে। প্রতিবেশী প্রদেশের বাঙলাভাষী অঞ্চলসমূহে যাহাতে বাঙলা ও বাঙ্গালীর দাবী টিকিতে না পারে, তজ্জন্য ইতোমধ্যেই কাজ আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। ঐসব স্থানে সরকার পক্ষ সাক্ষাৎ-সম্পর্কেই এ ব্যাপারের অংশ গ্রহণ করিয়াছেন এবং ছলে বলে কৌশলে ও প্রলোভন দেখাইয়া পশ্চিমবঙ্গের দাবীর বিরুদ্ধে গণ-স্বাক্ষর সংগ্রহ করা হইতেছে। এই চেষ্টা কেবল পশ্চিম বাঙলার বাহিরের বাঙলাভাষাভাষী অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ নয়, বিহার এবং উড়িষ্যা হইতে পশ্চিম বাঙলার কোন কোন অংশে লোক পাঠাইয়া জনসাধারণকে বিভ্রান্ত করিয়া স্বাক্ষর সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। মেদিনীপুর জেলার কোন কোন অংশে এই উদ্দেশ্যে ওড়িয়া ভাষায় ও বাঙলায় প্রচারিত বিভিন্ন প্রাচীরপত্র আমরা দেখিয়াছি। অথচ দুঃখের বিষয়

এই যে, পশ্চিম বাঙলায় এ বিষয়ে এখনও তেমনভাবে উদ্যোগ-আয়োজন পরিলক্ষিত হইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি পুনর্গঠন কমিশনের কাছে স্মারকলিপি পেশ করিয়াই তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। অথচ পশ্চিম বাঙলার বিচ্ছিন্ন অংশগুলি ফিরিয়া পাওয়া পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে বর্তমানে জীবনমরণ সমস্যায় পরিণত হইয়াছে। এই দাবীর সমর্থনে যুক্তির দিক হইতে সর্বতোভাবে সংগতি রহিয়াছে, কিন্তু সেজন্য মনে সন্তুষ্টি লইয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। ফলত জনমতের দিক হইতে এই দাবীকে দৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে এবং সেই পথেই যুক্তিবত্তায় জোর বাঁধিবে, নহিলে স্বার্থসংশ্লিষ্ট দলের তৎপরতার ফলে প্রকৃত সত্য চাপা পড়িবার আশংকা রহিয়াছে। এক্ষেত্রে সর্বপ্রথমে পশ্চিমবঙ্গের দাবী সর্বজনীন এবং সুসংবদ্ধরূপে উপস্থিত করা দরকার এবং সে কাজটি এখনও হয় নাই। বিভিন্ন দলের পক্ষ হইতে যেসব স্মারকলিপি পেশ করা হইয়াছে, সেগুলির বক্তব্য এবং দৃষ্টিভঙ্গী একরূপ নয়; সুতরাং এই সম্পর্কে একটি সম্মিলিত অভিমত স্থির করা দরকার। সেই সঙ্গে যে সকল বাঙলাভাষাভাষী অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত হইতে চায়, সেখানকার অধিবাসীদিগকেও এ সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলা আবশ্যক। অপরপক্ষ এ বিষয়ে খুবই কর্মতৎপর, মানভুমে অনুষ্ঠিত রাজনীতিক সম্মেলনে সে পরিচয় আমরা পাইয়াছি। পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেসেরও এই বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া উচিত। বিভিন্ন সংস্থাকে একত্রিত করিয়া একমতে আনয়ন করা এবং স্থানীয় সরকার যাহাতে সেই অভিমত সমর্থন করেন, তজ্জন্য সরকারের উপর চাপ দেওয়া তাঁহাদের কর্তব্য। এ-কাজ করিতে গেলে তাহা প্রাদেশিকতার পরিচায়ক হইবে; এমন জুজুর ভয় দূর করিয়া কংগ্রেসের সমগ্র শক্তি এ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত করিবার প্রয়োজন একান্তভাবেই দেখা দিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের স্বার্থের সঙ্গে ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ বিজড়িত রহিয়াছে। এ-সত্য বিস্মৃত হইলে মারাত্মক রকমের ভুল করা হইবে বলিয়াই আমরা মনে করি।

পুনর্বাসনের সঙ্কট

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন সচিব শ্রীঅজিত-প্রসাদ জৈন শ্রীরফি আমেদ কিদোয়াইয়ের স্থলে সম্প্রতি খাদ্য ও কৃষিসচিব নিযুক্ত হইয়াছেন। শোনা যাইতেছে, উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সমস্যা বর্তমানে পশ্চিম-বঙ্গের মধ্যে সীমাবদ্ধ হইয়া পড়াতে লোকসভার পশ্চিমবঙ্গের কোন প্রতিনিধির উপর পুনর্বাসন-বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত হইবে। এ সম্বন্ধে আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে, পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সমস্যার সমাধান হওয়াতেই ইহার গুরুত্ব কোন অংশে হ্রাস পায় নাই। পুনর্বাসন সচিবস্বরূপে শ্রীযুত জৈনের প্রচেষ্টা এবং কর্মনীতিতে কোনই সুফল ঘটে নাই, এমন কথা আমরা বলিতেছি না। উদ্বাস্তুদের দুঃখ-দুর্দশায় তাঁহার সহানুভূতি এবং সমবেদনা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। ১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগজনিত বিপর্যয়ে লক্ষ লক্ষ নরনারী অসহায় অবস্থায় পতিত হয়। শ্রীযুত জৈনের প্রচেষ্টায় তাঁহাদের অনেকের আশ্রয় এবং জীবিকার সংস্থান ঘটিয়াছে। তথাপি এক্ষেত্রে এখনও অনেক কিছু কর্তব্য রহিয়া গিয়াছে এবং পুনর্বাসনের সমস্যাকে লঘু করিয়া কেন্দ্রীয় দপ্তরের অন্য কাজের আনুষঙ্গিক পর্যায়ে ফেলিবার মত অবস্থা এখনও আসে নাই। নিখিল আসাম উদ্বাস্তু সমিতির পক্ষ হইতে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন বিভাগের পশ্চিমবঙ্গস্থ উপদেষ্টা শ্রীযুত মেহেরচাঁদ খান্নার নিকট উপস্থাপিত স্মারকলিপিই এক্ষেত্রে অন্যতম প্রমাণ। কিছুদিন পূর্বে কলিকাতায় পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রীদের যে সভা হয়, সেই সভায় সরকারী পুনর্বাসন-ব্যবস্থার অনেক ত্রুটি-বিচ্যুতি ধরা পড়িয়াছে এবং এই বিষয়ে কেন্দ্রীয় এবং পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের ভিতরে সহযোগিতার অভাবও ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। দেখা যাইতেছে, আসামের পক্ষেও সেই অবস্থা পরন্তু অবস্থা সেখানে আরও জটিল। নিখিল আসাম উদ্বাস্তু সমিতির মুখপাত্রগণ বলিয়াছেন যে, কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য বিভাগের দায়িত্ব-বণ্টনে অব্যবস্থার ফলে আসামে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন ব্যবস্থা ব্যর্থতায় পরিণত হইয়াছে। সেখানে সরকারী নীতি নির্ধারণে নানারকমের গলদ ঘটিয়াছে। ইহার ফলে উদ্বাস্তুদের দুর্দশা অবর্ণনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। এরূপ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের ন্যায় আসামের পুনর্বাসন-ব্যবস্থায় অতীতে ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে বিচার করিয়া কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার উভয়ের সম্মিলিত চেষ্টায় অবিলম্বে অবতীর্ণ হওয়া প্রয়োজন।

কল্যাণ না ধ্বংস

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে আণবিক শক্তি সম্মেলনের অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছে। এশিয়ার মধ্যে এমন সম্মেলন এই প্রথম; সুতরাং ঐতিহ্য হিসাবে এই অধিবেশনের গুরুত্ব আছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু সম্মেলনের উদ্বোধনী ভাষণে আণবিক শক্তির মহিমা সম্বন্ধে যে বিবৃতি দিয়াছেন, তাহাতে সাধারণের মনে বিভীষিকারই সঞ্চার হয়। তাঁহার মতে বর্তমানে পৃথিবীতে আণবিক অস্ত্রে যে সকল দেশ বলীয়ান হইয়াছেন, তাঁহাদের যে কোন এক শক্তি দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া তাহার পরের কয়েক ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাদের আক্রমণের সব লক্ষ্য সমূহভাবে ধ্বংস করিতে পারে। কিন্তু সব শক্তির মতই আণবিক শক্তিরও কল্যাণ-জনক একটা দিক্ আছে; আণবিক শক্তিও যথাযথভাবে প্রযুক্ত হইলে জগতের অশেষ কল্যাণ সাধণ করিতে পারে। বিশ্বশক্তি-পুঞ্জের রাজনৈতিক কমিটি কল্যাণাত্মক কার্যে আণবিক শক্তি প্রয়োগের জন্য সর্ব-বাদিসম্মত সিদ্ধান্তে পোঁছিয়াছেন। ইহা আশার কথা সন্দেহ নাই; কিন্তু বিশ্বপণ্ডিতবর্গের এই শুভেচ্ছা সর্বদিক বাঁচাইয়া কতটা সার্থকতা লাভ করিবে, এ সম্বন্ধে সাধারণ জনগণের মনে যথেষ্টই সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। অস্ত্র নিজে অবশ্য কাজ করিতে পারে না; লোক-বিধ্বংসী এই প্রলয়ংকর অস্ত্র প্রয়োগের জন্য কখন কোন শক্তির মস্তিষ্কে উত্তেজনা জাগিবে, নিশ্চয়তা কিছুই নাই। এরূপ অবস্থায় ইহা জগতের বিভিন্ন শক্তিবর্গের মধ্যে পারস্পরিক অনিশ্চয়তার বোধ সর্বদা সজাগ রাখিবে। ইহা ছাড়া কল্যাণকর কার্যে আণবিক শক্তি প্রয়োগের ক্ষেত্রেও মারাত্মক রকমের ঝুঁকি রহিয়াছে।

আমাদের সংগীত

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সংগীত সংঘ থেকে যখন আমাকে অভ্যর্থনা করবার প্রস্তাব এসেছিল, তখন আমি অসংকোচে সম্মত হয়েছিলেম, কেন না সংগীত সংঘের প্রতিষ্ঠাত্রী, নেত্রী এবং ছাত্রী সকলেই আমার কন্যাস্থানীয়া—তাঁদের কাছ থেকে প্রণাম গ্রহণ করবার অধিকার আমার আছে। আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করা হয়েছিল, তাতেও আমি কুণ্ঠিত হইনি। তারপর সহসা যখন সংবাদপত্রে দেখলেম, এ সভায় সর্বসাধারণের নিমন্ত্রণ আছে এবং আমার বক্তৃতার বিষয়টি হবে ভারতীয় সংগীত—তখন আমি মনে মনে বুঝলেম এ আমার পক্ষে একটা সংকট। বাল্যকাল থেকে আমি সকল বিদ্যালয়েরই পলাতক ছাত্র, সংগীত-বিদ্যালয়েও আমার হাজিরা-বই দেখলে দেখা যাবে আমি অধিকাংশ কালই গড়হাজির ছিলেম। এই ব্যাপারে আমার ব্যাকুলতা দেখে উদ্যোগ-কর্তারা কেউ কেউ আমাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, তোমাকে বেশী বলতে হবে না, দুচার কথায় বক্তৃতা সেরে দিয়ো। আমি তাঁদের এই পরামর্শে আশ্বস্ত হইনি। কেননা, যে-লোক খুব বেশী জানে, সেই মানুষই খুব অল্প কথায় কর্তব্য সমাধা করতে পারে—যে কম জানে তাকেই ইনিয়ে বিনিয়ে অনেক কথা বলতে হয়। যাই হোক এখন আমার আর ফেরবার পথ নেই, অতএব "যাবৎ কিঞ্চিৎ ন ভাষতে" এই সদুপদেশ পালন করবার সময় চলে গেছে।

বাল্যকালে স্বভাবদোষে আমি যথারীতি গান শিখিনি বটে, কিন্তু ভাগ্যক্রমে গানের রসে আমার মন রসিয়ে উঠেছিল। তখন আমাদের বাড়িতে গানের চর্চার বিরাম ছিল না। বিষ্ণু চক্রবর্তী ছিলেন সংগীতের আচার্য, হিন্দুস্থানী সংগীতকলায় তিনি ওস্তাদ ছিলেন। অতএব ছেলেবেলায় যে সব গান সর্বদা আমার শোনা অভ্যাস ছিল, সে সখের দলের গান নয়, তাই আমার মনে কালোয়াতি গানের একটা ঠাঁট আপনা-আপনি জমে উঠেছিল। রাগরাগিণীর বিশুদ্ধতা
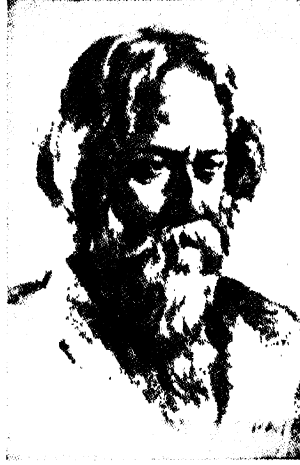
সম্বন্ধে অত্যন্ত যাঁরা শুচিবায়ুগ্রস্ত তাদের সঙ্গে আমার তুলনাই হয় না, অর্থাৎ সুরের সূক্ষ্ম খুঁটিনাটি সম্বন্ধে কিছু কিছু ধারণা থাকা সত্ত্বেও আমার মন তার অভ্যাসে বাঁধা পড়ে নি, কিন্তু কালোয়াতি সংগীতের রূপ এবং রস সম্বন্ধে একটা সাধারণ সংস্কার ভিতরে ভিতরে আমার মনের মধ্যে পাকা হয়ে উঠেছিল।

যাই হোক, গীতরসের যে সঞ্চয় বাল্যকালে আমার চিত্তকে পূর্ণ করেছিল, স্বভাবতই তার গতি হল কোন্ মুখে, তার প্রকাশ হল কোন্ রূপে, সেই কথাটি যখন চিন্তা করে দেখি, তখন তার থেকে বুঝতে পারি সংগীত সম্বন্ধে আমাদের দেশের প্রকৃতি কি। আজ সভায় আমি সেই কথাটির আলোচনা করব।

আমার মনে যে সুর জমেছিল, সে সুর যখন প্রকাশিত হতে চাইলে, তখন কথার সঙ্গে গলাগলি করে সে দেখা দিল। ছেলেবেলা থেকে গানের প্রতি আমার নিবিড় ভালোবাসা যখন আপনাকে ব্যক্ত করতে গেল, তখন অবিমিশ্র সংগীতের রূপ সে রচনা করলে না, সংগীতকে কাব্যের সঙ্গে মিলিয়ে দিলে, কোন্‌টা বড় কোন্‌টা ছোট বোঝা গেল না।

আকাশে মেঘের মধ্যে বাষ্পাকারে যে জলের সঞ্চয় হয়, বিশুদ্ধ জলধারাবর্ষণেই তার প্রকাশ। গাছের ভিতর যে রস গোপনে সঞ্চিত হতে থাকে, তার প্রকাশ পাতার সঙ্গে ফুলের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। সংগীতেরও এই রকম দুই ভাবের প্রকাশ। এক হচ্ছে বিশুদ্ধ সংগীত আকারে, আর হচ্ছে কাব্যের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে। মানুষের মধ্যে প্রকৃতিভেদ আছে, সেই ভেদ অনুসারে সংগীতের এই দুই রকমের অভিব্যক্তি হয়। তার প্রমাণ দেখা যায় হিন্দুস্থানে আর বাংলাদেশে। কোনো সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশে সংগীত কবিতার অনুচর না হোক সহচর বটে। কিন্তু পশ্চিম হিন্দুস্থানে সে স্বরাজে প্রতিষ্ঠিত, বাণী তার "ছায়েবানুগতা"। ভজন-সংগীতের কথা যদি ছেড়ে দিই, তবে দেখতে পাই পশ্চিমে সংগীত যে-বাক্য আশ্রয় করে, তা অতি তুচ্ছ। সংগীত যেখানে স্বতন্ত্র, সে আপনাকেই প্রকাশ করে।

বাংলাদেশে হৃদয়ভাবের স্বাভাবিক প্রকাশ সাহিত্যে। 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি'—সে দেখতে পাচ্ছি সাহিত্যের মধুচক্র থেকে। বাণীর প্রতিই বাঙালীর অন্তরের টান; এইজন্যেই ভারতের মধ্যে এই প্রদেশেই বাণীর সাধনা সব চেয়ে বেশী হয়েচে। কিন্তু একা বাণীর মধ্যে তো মানুষের প্রকাশের পূর্ণতা হয় না—এইজন্যে বাংলাদেশে সংগীতের স্বতন্ত্র পংক্তি নয়, বাণীর পাশেই তার আসন।

এর প্রমাণ দেখ আমাদের কীর্তনে। এই কীর্তনের সংগীত অপরূপ। কিন্তু সংগীত যুগলভাবে গড়া—পদের সঙ্গে মিলন হয়ে তবেই এর সার্থকতা। পদাবলীর সঙ্গেই যেন তার রাসলীলা, স্বাতন্ত্র্য সে সইতেই পারবে না।

সংগীতের স্বাতন্ত্র্য যন্ত্রে সবচেয়ে প্রকাশ পায়। বাংলার আপন কোন যন্ত্র নেই,

এবং প্রাচীনকালেই হোক্ আর আধুনিক-কালেই হোক্, যন্ত্রে যাঁরা ওস্তাদ তাঁরা বাংলার নন্। বীণ্ রবাব শরদ সেতার এস্রাজ সারেঙ্গি প্রভৃতির তুলনায় আমাদের রাখালের বাঁশী বা বৈরাগীর একতারা কিছুই নয়। তা ছাড়া গড়ের বাদ্যের বীভৎস ব্যঙ্গরূপে বাংলা দেশে কন্সার্ট নামক যে যন্ত্রসংগীতের উৎপত্তি হয়েছে তাকে সহ্য করা আমাদের লজ্জা এবং তাতে আনন্দ পাওয়ায় আমাদের অপরাধ।

এই সমস্ত লক্ষণ দেখে আমার বিশ্বাস হয়, বাংলাদেশে কাব্যের সহযোগে সংগীতের যে বিকাশ হচ্ছে, সে একটি অপরূপ জিনিস হয়ে উঠবে। তাতে রাগ-রাগিণীর প্রথাগত বিশুদ্ধতা থাকবে না, যেমন কীর্তনে তা নেই, অর্থাৎ গানের জাত রক্ষা হবে না, নিয়মের স্খলন হতে থাকবে, কেন না তাকে বাণীর দাবী মেনে চলতে হবে। কিন্তু এমনতর পরিণয়ে পরস্পরের মন জোগাবার জন্যে উভয়পক্ষেরই নিজের জিদ কিছু কিছু না ছাড়লে মিলন সুন্দর হয় না। এইজন্যে গানে বাণীকেও সুরের খাতিরে কিছু আপোষ করতে হয়, তাকে সুরের উপযোগী হতে হয়। যাই হোক বাংলাদেশে এই এক জাতের কাব্যকলা ক্রমশ ব্যাপক হয়ে উঠবে বলে আমি মনে করি। অন্ততঃ আমার নিজের কবিত্বের ইতিহাসে দেখতে পাই—গান রচনা অর্থাৎ সংগীতের সংগে বাণীর মিলনসাধনই এখন আমার প্রধান সাধনা হয়ে উঠেছে।

সংগীত যেখানে আপন স্বাতন্ত্র্যে বিরাজ করে, সেখানে তার নিয়ম-সংযমের যে শুচিতা প্রকাশ পায়, বাণীর সহযোগে গানরূপে তার সেই শুচিতা তেমন করে বাঁচিয়ে চলা যায় না বটে, কিন্তু পরম্পরাগত সংগীতরীতিকে আয়ত্ত করলে তবেই নিয়মের ব্যত্যয় সাধনে যথার্থ অধিকার জন্মে। কবিতাতেও ছন্দের রীতি আছে—সে রীতি কোনো বড় কবি নিখুঁতভাবে সাবধানে বাঁচিয়ে চলবার চেষ্টা করেন না—অর্থাৎ তাঁরা নিয়মের উপরেও কর্তৃত্ব করেন—কিন্তু সেই কর্তৃত্ব করতে গেলেও নিয়মকে স্বীকার করা চাই। স্বাতন্ত্র্য যেখানে উচ্ছৃঙ্খলতা, সেখানে কলাবিদ্যার স্থান নেই। এইজন্যে নিজের সৃজন-শক্তিকে ছাড়া দিতে গেলেই, শিক্ষা ও সংযমশক্তির বেশী দরকার হয়।

সংগীতসংঘ আমাদের দেশের সংগীতকে দেশের মেয়েদের কণ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করবার ভার নিয়েচেন। তাঁদের এই সাধনার গভীর সার্থকতা আছে। আমাদের দুই রকমের খাদ্য আছে, একটি প্রয়োজনের আর একটি অপ্রয়োজনের; একটি অন্ন, আরেকটি অমৃত। অন্নের ক্ষুধায় আমরা মর্ত্যলোকের সকল জীবজন্তুর সমান, অমৃতের ক্ষুধায় আমরা সুরলোকের দেবতাদের দলে। সংগীত হচ্ছে অমৃতের নানা ধারার মধ্যে একটি। দেশকে অন্নের পরিবেষণ তো মেয়েদের হাতেই হয়, আর অমৃতের পরিবেষণও কি তাঁদের হাতেই নয়?

এ কথা মনে রাখতে হবে, যা অমৃত, যা প্রয়োজনকে অতিক্রম ক'রে আপনাকে প্রকাশ করে, মনুষ্যত্বের চরম মহিমা তাতেই। যে জাতি পেটুক, সে কেবলমাত্র নিজের প্রতিদিনের গরজ মিটিয়ে চলেচে, মৃত্যুতেই তার একান্ত মৃত্যু। গ্রীস যে আজও অমর হয়ে আছে, সে তার ধনে ধান্যে রাষ্ট্রীয় প্রতাপে নয়, আত্মার আনন্দ-রূপে যা কিছু সে সৃষ্টি করেচে, তাতেই সে চিরদিন বেঁচে আছে। প্রত্যেক জাতির উপরে ভার আছে, সে মর্ত্যলোকে আপন অমরলোকের সৃষ্টি করবে। গ্রীস সেই নিজের অমরাবতীতে আজও বাস করছে।

সংগীত মানবের সেই আনন্দরূপ—
মানবের নিজের অভাব মোচনের অতী
বলেই সর্বমানবের এবং সর্বকালের,—রা
সাম্রাজ্যের ঐশ্বর্য ধ্বংস হয়ে যায়, কি
এই আনন্দরূপ চিরন্তন।

যে সকল ঘোরতর প্রবীণ লোক ওজ
দরে জিনিসের মূল্য বিচার করেন, সারবা
বলতে যারা ভারবান্ বোঝেন, তাঁ
সংগীত প্রভৃতি কলাবিদ্যাকে সৌখীন
বলে অবজ্ঞা করে থাকেন। তাঁরা জানেন
যাদের বীর্য আছে সৌন্দর্য তাঁদেরই
যে শক্তি আপনাকে শক্তিরূপেই প্রকাশ ক
সে হল পালোয়ানি, কিন্তু শক্তির সত্য রূ
হচ্ছে সৌন্দর্য। গাছের পূর্ণ শক্তি তা
ফুলে, তার মোটা গুঁড়িটার মধ্যে
কেবল আপনিই থাকে, কিন্তু তার ফুলে
মধ্যে সে যে ফল ফলায় তারই বীজে
ভিতর ভাবীকালের অরণ্য, অর্থাৎ ত
অমরতা। সাহিত্যে, সংগীতে, সর্বপ্রক
কলাবিদ্যায় প্রাণশক্তি আপন অমরতা
ফলিয়ে তোলে, আপিস আদালতে ক
কারখানায় নয়। উপনিষদ বলেচে
জন্মেচে বলেই সকলে অমর হয় না, যা
অসীমকে উপলব্ধি করেচে অমৃতাস
ভবন্তি। অভাবের উপলব্ধিতে কাপড়ে
কল, পাটের বস্তার কারখানা, —অসীমে
উপলব্ধিতেই সংগীত। অসীমে
উপলব্ধিতেই আমরা সৃষ্টিকর্তা।
সৃষ্টিকর্তা চন্দ্রসূর্যের সিংহাসনে ব
দরবার করচেন, তিনি যে গুণী জাতি
শিরোপা দিয়ে বলেন, সাবাস, আম
সুরের সংগে তোমার সুর মিলচে—সে
ধন্য, সেই বেঁচে যায়, তাঁর অমৃতসভ
পাশে তার চিরকালের আসন পাকা হ
থাকে।

[সংগীত সংঘের বার্ষিক অধিবেশনে উক্ত]
মোসলেম ভারত, আশ্বিন, ১৩২৮

শিক্ষাসমস্যার কয়েকটি কথা

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

শাস্ত্রে অপ্রিয় সত্য বলতে নিষেধ আছে বটে, কিন্তু এমন এক এক ময় আসে, যখন অপ্রিয় সত্য না বললে ত্যবায়গ্রস্ত হতে হয়। বিশেষত যখন াতির স্বার্থের ক্ষতি হতে থাকে, অথচ নপ্রিয়তা' হারাবার ভয়ে নেতারাও কঠোর ত্য উচ্চারণ করতে সাহস করেন না। জে শিক্ষার ক্ষেত্র, বিশেষত বাঙলাদেশের ক্ষার ক্ষেত্র দেখে সেইরকমই মনে চ্ছে।

আমি শিক্ষাবিদ্ নই, শিক্ষণ-শাস্ত্রের ত্ব আমার জানা নেই, কাজেই কমিটি মিশনের মত গুছিয়ে ভাল ভাল কথা খবার বৃথা চেষ্টাও আমার নেই। কিন্তু মি এই কথা ভেবে জোর পাই যে, দেশের ক্ষ লক্ষ সাধারণ নাগরিক এবং অভিভাবক মারই মত অ-বিশেষজ্ঞ এবং আমি ন্তত সেই বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠের দলে রা নিজেরা এককালে বিশ্ববিদ্যালয়ের জা মাড়ালেও এখন দৈনন্দিন সমস্যায় ই পরীক্ষার আগে নোট মুখস্থ করা দ্যে ভুলতে বসেছে এবং যারা ছেলে-য়েদের ইশ্‌কুল কলেজে পাঠায়, এই শায় যে, সেখানে ছেলেমেয়েরা বিদ্যেও ছু শিখবে, ভবিষ্যৎ জীবিকার পথও জে পাবে, আর মোটামুটি তাদের জীবন দর্শ সংস্কৃতিতেও একটা পালিশ ড়বে। সুতরাং আজকাল খবরের গজের শিরোনামা হতে সাধারণত যে নে হয় শিক্ষার ক্ষেত্রটা বুঝি শিক্ষকদের সরকারের দ্বন্দ্ব ও তার উপর কমিটি-শেষজ্ঞদের প্রলেপ লাগাবার চেষ্টা ছাড়া র কিছুই নয়, ব্যাপারটা বস্তুত তা । তার বাইরেও ছাত্রসমাজ আছে, ভিভাবক সমাজ আছে, সবার উপরে শ আছে, জাতি আছে, যারা শিক্ষার ত্রে আরও বড় অংশীদার—হয়তো ধানতম অংশীদার। শেষ পর্যন্ত শিক্ষাই ন, শিক্ষকই বলুন, তাদের সামুহিক াই ঘটে জাতি-গঠনের কষ্টিপাথরেই।

আজ শিক্ষার ক্ষেত্রে যেদিকেই তাকানো যাক, সেদিকেই হতাশ হতে হয়। ঐ কষ্টিপাথরে সোনার দাগ পড়ছে না, এমন কি ক্যারাট গোল্ডেরও নয়। এক এক সময় সন্দেহ হয় পিতলের কস উঠছে না কি! ইশ্‌কুলে কলেজে নিম্নতম শিক্ষার প্রতিযোগিতা চলেছে। ছাত্রের উৎকর্ষ বাড়াবার চেয়ে ছাত্রসংখ্যা বাড়াবার দিকে নজর। কোনও কলেজে শিফ্‌টে শিফ্‌টে যদি পাঁচ হাজার ছাত্র পড়ে, তাহলে সেখানে পড়াশোনার সত্যসত্যই কি কোনও আশা থাকে? শুনেছি, বিশ্ববিদ্যালয়ের নাকি একটি নিয়ম আছে যে, কোনও কলেজেই দেড় হাজারের বেশি ছাত্র থাকতে পারবে না (হয়তো এ নিয়ম এতদিনে উঠে গিয়েছে), কিন্তু ঐসব বিরাট কলেজের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয় এ নিয়ম প্রয়োগ করতে সাহস করেন না, কেননা ঐসব কলেজের অধ্যক্ষ-অধ্যাপকেরাই বেশিরভাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য। ক্লাশে অগুন্তি ছাত্র। প্রোফেসারেরা কি করে বিনা মাইক্রোফোনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা, দিনের পর দিন ঐরকম জনসভায় চেঁচিয়ে যান ভাবলে তাঁদের কণ্ঠশক্তির তারিফ করতে হয় এবং তাঁদের ধৈর্যে বিস্মিত হতে হয়। বহু ছাত্রকে অবসরের ঘণ্টায় স্থানাভাবে কলেজের বাইরে রাস্তায় পাইচারী করতে হয়, তবু শিক্ষা বিস্তারের অজুহাতে ঐ বিপুলসংখ্যক ছাত্র ভর্তি করতেই হবে? এতে কি সত্যিই শিক্ষা-বিস্তার হচ্ছে? ছেলেরা জীবন-সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার উপযুক্ত উপকরণ সংগ্রহ করতে পারছে? এমন কি যেসব বিষয় পড়ছে, সেগুলিতেও অন্তত কি সত্যি-সত্যি পণ্ডিত হচ্ছে? যদি তা না হয়, তাহলে শিক্ষা-বিস্তারের অজুহাত দেওয়া কেন? আর, কলেজগুলিরই অবস্থা এই,—ইশ্‌কুলগুলির প্রসঙ্গ নাই তুললাম। সেখানে উপকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতি সামান্য, পঠন-প্রণালী অনাধুনিক, লাইব্রেরী নিয়মরক্ষা মাত্র, আর শতকরা ত্রিশ পার্সেণ্ট পেলেই খুব সসম্মানে পাশ ও প্রমোশন। তার উপরে আছে গৃহশিক্ষক নামে একটি ব্যাপার। আজকাল কোনও ছাত্রই ইশ্‌কুলের পড়ানোর উপর নির্ভর করে না বা করতে পারে না। ঘরে ঘরে গৃহ-শিক্ষক। প্রায়শঃই তাঁরা সেই ইশ্‌কুলেরই শিক্ষক। এই নিয়ে পরীক্ষায় পক্ষ-পাতিত্বের অভিযোগও সময় সময় ওঠে। কিন্তু সে অভিযোগ সত্য হোক্ আর না-ই হোক, প্রশ্ন হচ্ছে গৃহশিক্ষকের প্রয়োজনই বা হবে কেন? আর গৃহ-শিক্ষকতা করতে করতে শ্রান্ত, ক্লান্ত শিক্ষকেরা ইশ্‌কুলে গিয়ে পড়াবেনই বা কেমন করে? তাঁরা তো যন্ত্র নন, তাঁরা তো মানুষ। আর সকাল থেকে রাত্রি পর্যন্ত যে বালকের বাড়ীতে শিক্ষক ইশ্‌কুলে শিক্ষক তার পাঠ্যকে বটিকা আকারে গিলিয়ে পরীক্ষায় ত্রিশ পার্সেণ্ট রূপ মোক্ষলাভের আশায় তাকে গরু তাড়াচ্ছেন তার সত্যি সত্যিই গরুতে পরিণত হওয়া ছাড়া কি হতে পারে? তার মন নিজের পায়ে দাঁড়াতে শিখবে কি করে? জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন পথে নিজের পায়ে চলবার মত ক্ষমতা হবে কি করে? তার পঙ্গুত্ব ঘুচবে কি করে? তার বদলে ছাত্রেরা যে মাইনে গৃহশিক্ষকদের দেয় সেই মাইনে ইশ্‌কুলের হাতে তুলে দিক্, আর ইশ্‌কুলের কর্তৃপক্ষ সেই টাকা শিক্ষকদের মধ্যে বণ্টন করে শিক্ষকদের বলুন, ইশ্‌কুলের অঙ্গ হিসেবে ইশ্‌কুলেই বাড়তি টিউটোরিয়াল ক্লাশ করতে হবে—এরকম ব্যবস্থা হয় না কেন? তাহলে আব-হাওয়াটা পরিচ্ছন্ন হয়, শিক্ষারও বোধ হয়

উন্নতি হয়। তার উপর সম্প্রতি আরও নতুন বিপদ দেখা যাচ্ছে। অনেক আগে ইশ্‌কুলগুলি ছিল সেক্রেটারীবাবুর প্রবল প্রতাপের ক্ষেত্র। পরে কালক্রমে সে যুগ কেটে গেল, তখন শুরু হল ম্যানেজিং কমিটি ও শিক্ষকদের মধ্যে মনকষাকষি ও দরকষাকষির যুগ। সম্প্রতি তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে রাজনৈতিক মারামারির যুগ। এমনিতেই তো আজকাল সব বিষয়েই রাজ-নীতির হাওয়া চলছে। আমাদের জীবনে রাজনীতিই যেন প্রধানতম বস্তু হয়ে উঠেছে—যদি চ আমরা সত্যি কথা বলতে প্রকৃত রাজনীতি না করে রাজনীতির ফেনিল আবর্তে নাচানাচি করাটাকেই সারবস্তু বলে প্রাণপণে গ্রহণ করেছি। সামান্যতম উপলক্ষ্য হলেই শোভাযাত্রা ইন্‌কিলাব তো আছেই। বোমাও দু'চারটি ক্ষেত্রে চলতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু সে কথাও বলছি না। সাধারণ নাগরিক হিসেবে ভোটাধিকার ছাড়াও শিক্ষকদের শিক্ষক হিসেবেই বিশেষ ভোটাধিকার হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচনে নয়—সেখানে তো শিক্ষকদের ভোটেই সব হওয়া উচিত—তাঁদের বিশেষ ভোট কাউন্‌সিলের নির্বাচনে। সুতরাং সে ভোটাধিকার থাকলে শিক্ষকদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল গড়বার অধিকারও দিতে হবে, ইশ্‌কুলে ইশ্‌কুলে শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে কংগ্রেস কমিউনিস্ট ও আরও পাঁচটা দল থাকবে ও স্বাভাবিকভাবে মারামারি করবে, একদল একদিন শোভাযাত্রা বার করলে আর একদল তার পরদিন পাল্‌টা শোভাযাত্রায় ছেলেদের টানলে আপত্তি করবার কোনও যুক্তিই থাকবে না। তাতে আর যাই হোক্, লেখাপড়া হওয়া সম্ভব কি? যদি কোনও অভিভাবক প্রশ্ন করেন, সাধারণ নাগরিক হিসেবে ছাড়া অভিভাবক হিসেবে তাঁদের ঐরকম বিশেষ ভোট থাকবে না কেন, তাহলে তার জবাব কি? তাঁরাও তো শিক্ষা সম্বন্ধে কম আগ্রহশীল ন'ন! সাবালক ছাত্রসমাজেরই বা থাকবে না কেন? শিক্ষার সমস্যা তো বস্তুত তাদেরই সবচেয়ে জীবনমরণ সমস্যা।

কিন্তু রাজনীতির ধাক্কা এইখানেই থামে নি। ম্যানেজিং কমিটিরও ভোট হয়েছে, সেখানেও এই ব্যাপার। আরও আছে। আজকাল অনেক ইশ্‌কুল রাতারাতি গজিয়ে ওঠে, বিশেষত সরকারের রিলিফ ডিপার্টমেন্টের টাকা পাওয়া গেলে। ধরা যাক্, সে ইস্কুলের কিছু লোক ও ছেলেরা একজন রাজনৈতিক কর্মীর অ্যাসেম্‌ব্লি ইলেকশনে খুব খেটেছে। রাজনৈতিক কর্মীটি তখন ইশ্‌কুলটিকে তাঁর পক্ষপুটে আশ্রয় দিলেন। পর পর ইশ্‌কুলে যত খুশি অনাচার চলতে লাগল, কিন্তু সাত খুন মাপ। শেষে সন্দেহক্রমে একদিন শিক্ষাবিভাগের বড়কর্তারা হঠাৎ দুপুর-বেলায় ইশ্‌কুল দেখতে গিয়ে দেখলেন, না আছে ইশ্‌কুল না আছে এমন কি চেয়ার বেঞ্চি। ইশ্‌কুলের অনুমোদন কেটে দেওয়ার কথা হল। রাজনৈতিক কর্মীটি চটলেন, তাঁর দাদাদের কাছে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। তাঁরা সরাসরি কিছু না বললেও আকারে ইঙ্গিতে হয়তো একটু ইশারা করে দিলেন। ফলে শিক্ষাবিভাগের হাত বন্ধ হল, ইশকুল নেই অথচ তা কাগজে কলমে গড়গড় করে চলতে লাগল। আশপাশের ইশ্‌কুলেরা অবাক্ বিস্ময়ে দেখতে লাগল, ভাবতে লাগল এরকম করেও তাহলে ইশ্‌কুল চালানো যায়। এই আবহাওয়ায় শিক্ষাবিস্তার হবে কেন? আর, আমরা যারা ইশ্‌কুল কলেজ চালাই তারা কোনওরকম সুযুক্তিপূর্ণ ও সুসমঞ্জস ব্যবস্থার চেষ্টা হলেও শিক্ষা সংকোচ হবে বলে দেশময় চিৎকার তুলি, কিন্তু ভেবে দেখি না যে আমরা সত্যিই শিক্ষাবিস্তার করছি কি না। আমাদের দেশে, বিশেষত প্রাইমারি শিক্ষার ক্ষেত্রে, wastage একটা খুব বড় সমস্যা বলে অনেকদিনই পরি-গণিত হয়ে আসছে। অর্থাৎ নীচের ক্লাসে যত ছাত্র ভর্তি হয় উপরের ক্লাসে উঠবার আগে তার অনেকেই পড়া ছেড়ে দেয়। ফলে তাদের অনেকেই আবার নিরক্ষর পর্যন্ত হয়ে পড়ে এ কথা সরকারী রিপোর্টেও বহুদিন থেকে উল্লিখিত হয়ে আসছে। এর কোনও সমাধান হয়েছে? উপরের দিকেই বা কি হচ্ছে? মাত্র ত্রিশ পার্সেন্ট পাশমার্ক সত্ত্বেও এত ছেলে ফেল করে কেন? এত গ্রেস-মার্ক, এত শোভা-যাত্রা, ভাইস-চ্যান্সেলারদের এত ভয় দেখানো সত্ত্বেও তো পর পর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ফেলের কুতবমিনার রচিত হতে থাকে। মেডিক্যাল কলেজ-গুলিতে তো সবচেয়ে বাছাই ছাত্রই নেওয়া হয়—একদম সেরা ছাত্রেরাই সেখানে যায়। তবু শুনি একশো'র মধ্যে সেখানে নাকি পনের কুড়িটার বেশি ছাত্র পাশ হয় না। কিন্তু কেন হয় না? এন্‌জীনিয়ারিং কলেজেও তো ঐরকম বাছাই ছাত্রই নেওয়া হয়, আর সেখানে পাশও করে অনেক বেশি বলে শুনেছি। এ কথা যদি সত্য হয়, তাহলে প্রশ্ন করতেই হয় এন্‌জীনিয়ারিং কলেজগুলি যা পারে মেডিক্যাল কলেজ-গুলি তা পারে না কেন? গলদ কোথায়? এর নাম কি শিক্ষাবিস্তার? না, অভি-ভাবকদের অর্থদণ্ড?

কিন্তু ভাবলে দেখা যাবে, এহ বাহ্য আগে কহ আর। এ সব গলদ তো আছেই। তার উপর সব চেয়ে বড় কথা হল, আমাদের শিক্ষা উদ্দেশ্যবিহীন অবাস্তব শিক্ষা। গোড়ার দিকের শিক্ষার উদ্দেশ্য নিয়ে বেশি তর্ক নেই। সব চেয়ে গোড়ার স্তরে সে শিক্ষা Three R's নিয়েই মাথা ঘামায়। সব দেশেই এই আদর্শ। কিন্তু তার পর? তারপর হতে আমরা নানারকম আজেবাজে জিনিস দিয়ে ছেলেদের ভারা-ক্রান্ত করে তুলি। একজন সাধারণ বাঙালী ছেলের কথা ধরা যাক্। সে প্রথম অনেকগুলো ভাষা শিখতে বাধ্য। বাংলা তো পড়তেই হয়, ইংরেজী পড়তে হয়, হিন্দীও পড়তে হয় বা হবে, সংস্কৃতও পড়ে। সে কি ভাষাতত্ত্ববিদ্ হবে? না সারাজীবন অন্য কাজকর্ম ছেড়ে শুধু এ সব সাহিত্যের রস আস্বাদন করে কাটাবে? সেরকম ক'টা ছেলে পারে? সে যদি বাস্তবজীবনে এসবের চর্চা কোনও দিনই না করে তাহলে এতগুলি ভাষা শিখে তার লাভ কি? আর শেখেই বা সে কত টুকু? সাহিত্য আস্বাদনের মত প্রকৃ ক্ষমতা অর্জন করা দূরে থাক্, ভাষা কাঠামোটাও সে ভাল করে শেখে না ব্যাকরণ চর্চা করে না। ফলে পদে পদে ভুল। পরীক্ষার খাতা দেখলেই দেখা যাবে উঁচু পরীক্ষাতেও ইংরেজি ভাষার আদ্য শ্রাদ্ধই বেশির ভাগ ক্ষেত্রে হয়েছে। ভাষা শিখব, অথচ কার্যকালে ব্যাকরণশু মোটামুটি ভাল ভাষা লিখতে পারব না তাহলে অকালে যৌবনক্ষয় করে, মা ঘামিয়ে, অর্থ নষ্ট করে সে ভাষা শিখে লা কি হল? তার উপর ভাষা ছাড়াও একজ ইশ্‌কুলের ছাত্রকে অঙ্ক শিখতে

বিজ্ঞান শিখতে হয়, ইতিহাস পড়তে হয়, ভূগোল পড়তে হয়—আরও কত কি পড়তে হয়। এককথায়, জ্ঞানবিজ্ঞানের সব শাখা-প্রশাখাতেই তাকে বিচরণ করতে বাধ্য হতে হয়। ফলে গাছের শিকড় গাড়ে না, কেবল পাতার বাহার হয়। তার উপর শিকড়ের রস না থাকায় পরীক্ষার মৌসুমী বায়ু কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই সে পাতা শুকিয়ে যায়। সুতরাং সেগুলি বিদ্যার মহীরুহও নয়, পাতাবাহার গাছও নয়, পরীক্ষার বর্ষার আগাছা। এই সব বিদ্যার পল্লবগ্রহণ করে আমরা ইম্পরটান্ট কোয়েশ্চেনসের তালিকা বাছাই করে করে কোনওরকমে পরীক্ষার খাতায় তা উজাড় করে দিয়ে আসি। শুধু ইশ্কুলেরই বা দোষ দিই কেন? আমার একটি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথাই বলি। অর্থনীতিতে এম-এ পরীক্ষা আসন্ন, একটি বিষয় বিরাট পটভূমিকায় পড়তে হত। বহু দেশের বহু যুগের কথা—মধ্যযুগ হতে একেবারে একালের আগে পর্যন্ত। বিষয়টিতে হাবুডুবু খাচ্ছি, বহু বই সাময়িক পত্রিকা নাড়াচাড়া করছি, এমন সময়ে একজন সহপাঠী একটা সহজ উপায় বাতলে দিল। সে দেখালে, গত পনেরকুড়ি বছর ধরে কতকগুলি প্রশ্নই ফিরে ফিরে আসছে। একবার কতকগুলি, পরের বছর আর কতগুলি, তারপর তৃতীয় বছরে প্রথম বছরের প্রশ্নের পুনরাবৃত্তি হচ্ছে, চতুর্থ বছরে দ্বিতীয় বছরের। এর কখনও ব্যতিক্রম হয় নি। সহপাঠী বলল, এর কারণ আমাদের অধ্যাপকটিই গত পনের বছর পড়িয়েও আসছেন, প্রশ্নও করে আসছেন এবং তিনি তাঁর বাঁধা প্রশ্ন-তালিকার একটুও বাইরে যান না। সুতরাং আগের আগের বছরের প্রশ্ন দেখলেই এ বছরের প্রশ্নের হদিস মিলে যাবে। তখন তার কথা বিশ্বাস করিনি। কার্যক্ষেত্রে দেখলুম তার কথাই ঠিক। অন্য বিষয়ের কথা জানিনে, কিন্তু আমাদের ছাত্রাবস্থায় দেখতুম অর্থনীতির এম্-এ ক্লাশে এ-ও দেখেছি, আধুনিক এবং জীবন্ত ও ক্রম-বর্ধমান কোনও বিষয়েও অধ্যাপক বছরের পর বছরের তাঁর টাইপকরা নোট ছেলেদের দিয়ে ধরে লিখিয়েই তাঁর লেকচার (?) শেষ করেন। ব্যবসাদারেরাও সে কথা জেনে সেই নোটের নকল সংগ্রহ করে পুরোনোটাই সাইক্লোস্টাইল করে বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে-পাশে বিক্রি করে দু'পয়সা কামায়। গুরু-নিন্দা মহাপাপ, তা করছি নে। বস্তুত এমন অনেক অধ্যাপকের সংস্পর্শে এসেছি যাঁদের স্পর্শে শুধু যে লেখাপড়াই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে তাই নয়, জীবনের মলিনতা পর্যন্ত কেটে যায়। তবু দু'চার ক্ষেত্রে যে গলদ দেখেছি তার উল্লেখও নিশ্চয়ই অপরাধ নয়। সুখের বিষয়, আজকাল উন্নতি হয়েছে বলে শুনেছি। কিন্তু মোটামুটি এইরকম আবহাওয়াই যখন চলছে তখন সেখানে পাঠ্যবস্তুকে গভীর-ভাবে গ্রহণ করা হয় কি? যা শিখি তা কি আমার ভবিষ্যতের জ্ঞান ও কর্মের হাতিয়ার হয়েই রইল?

ডাঃ রেনিয়ার (Renier) নামে একজন ড্যানিশ ভদ্রলোকের একটি অনবদ্য বই আছে,—তার নাম The English: Are they human? ইংরেজ জাতের অনেক অদ্ভুতত্ব এবং আপাতবিরোধী চালচলন সম্বন্ধে বইটিতে অনেক পরিহাসদিগ্ধ কৌতুককর কথা আছে। তার এক জায়গায় তিনি লিখেছেন:

I have frequently noticed that the Masters of the world have little geography. I suppose that it matters not where one's possessions are when one knows that there is no corner of the globe where some of them cannot be found. If the gentleman who interpellated me was looking for the River Po in florence, this gap in his mental equipment had not prevented him, as I subsequently learned, from becoming the owner of several large printing works, when proof-reading was done by people whose minds were free from the cares of administration and who had therefore found the time to learn those unimportant details which are stored up in atlases.

আমি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এ কথাটা সম্পূর্ণ সত্য। বিলেতে কোনও ইশ্কুলের ছাত্র বলতে পারবে না ভারতবর্ষে ঔরঙ্গাবাদ, এমন কি এলাহাবাদ কোথায়। কিন্তু যে কোনও ভারতীয় ছাত্র চোখ বেঁধেও মানচিত্রে বার্মিংহাম লিভারপুল, ম্যাঞ্চেস্টার দেখিতে দিতে পারবে। তবু ইংরেজ বড় হয় কেন? তার একমাত্র কারণ যে যা করে সে সেটুকু সত্যি করে শেখে—অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিয়ে মাথা ঘামায় না। এলাহাবাদের খবর রাখুক আই-সি-এস পরীক্ষার্থীর দল,—কিন্তু যে কভেণ্ট্রির সাইকেল ফ্যাক্টরীর এন্জিনীয়ার হবে তার সে খবরে দরকার কি? তাই যেসব বিলেতী আই-সি-এস এদেশে এসেছে তাদের মধ্য হতেই কোলব্রুক হাণ্টার প্রভৃতি গ্রন্থকার আবির্ভূত হয়েছেন, যাঁদের গ্রন্থ ভারতীয় আর্ট, মুদ্রাতত্ত্ব, সমাজবন্ধন, আদিবাসী, ঐতিহাসিক স্মৃতিস্তম্ভ ইত্যাদি নানা বিষয়ে এখনও প্রামাণ্য গ্রন্থ হয়ে রয়েছে। এদেশের আই-সি-এসরা চাকুরী করেছেন, কিন্তু ক'জন বই লিখেছেন ও রকম? অথচ যে সাইকেল ফ্যাক্টরীর এন্জিনীয়ার সে ওসব বিষয়ে মাথা ঘামাতে যাবে কেন? লণ্ডন জেনারেল সার্টিফিকেট (অর্থাৎ লণ্ডন ম্যাট্রিকুলেশন) পরীক্ষার পাঠ্য-তালিকা খুললে দেখা যাবে, তার ভূগোলের পাঠ্যতালিকার মধ্যে আছে
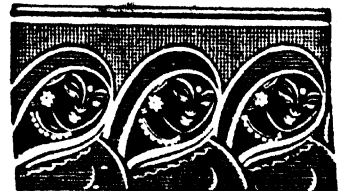
ফিজিক্যাল জিওগ্রাফি; তার মধ্যে স্থানীয় আবহাওয়ার খবর নিতে হয়। আশে-পাশের শহরগুলি ও গ্রামের সম্পর্কও জানতে হয়। তাছাড়া পড়তে হয় বিলেতের ভৌগোলিক বিবরণ, উত্তর-পশ্চিম ইউরোপ, আর তাছাড়া হয় বাকী ইউরোপ অথবা মেক্সিকোর উত্তর পর্যন্ত উত্তর আমেরিকা (অর্থাৎ কানাডা ও যুক্তরাষ্ট্র); তাদের সঙ্গে যাদের কারবার, তারই খবর রাখতে হয়। এর নাম বাস্তবতা। আমরা ভূগোল পড়াবার সময় কি স্থানীয় ভূগোলের দিকে কোনও নজর দিই? অথবা স্টেপী আর প্রেইরির খবর মুখস্থ করতে করতেই প্রাণ বেরিয়ে যায়? আমরা স্বদেশ, চীন ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ভূগোল নিয়েই তুষ্ট থাকি কি? না, টাসমানিয়ার রাজধানী হোবার্ট মুখস্থ না পাওয়া পর্যন্ত আমাদের স্বস্তি থাকে না? তেমনি ইতিহাসের কথা। কোনও সাহেব-বাচ্চা চট্ করে অশোকের নাম বলতে পারবে না, পারবে কিনা একেবারে সে বিষয়েও সন্দেহ আছে—কিন্তু কিং কানিউটের গল্প আমাদের ছেলেদের মুখে মুখে। এটা অবশ্য খানিকটা পরাধীনতার ফল। কিন্তু এখনও সে ধারা চলবে কেন? বাস্তবিক, আমাদের ইতিহাসের পাঠ্য-নির্বাচন ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়। ম্যাট্রিকুলেশনে আমরা অন্যান্য জিনিসের সঙ্গে ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়াই। কিন্তু সে তো অপেক্ষাকৃত ছোট এবং মামুলি। তারপর আই-এ-তে—যেখানে অনেক বেশি ও অনেক বিস্তারিত পড়া হয়—সেখানে আবার ভাল করে ভারত-বর্ষের ইতিহাস পড়ানো উচিত, কিন্তু তা না পড়িয়ে পড়াই কেবলমাত্র গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডের ইতিহাস। সাহেবদের নিজেদের ইতিহাসের সঙ্গে গ্রীস আর রোমের ইতিহাস তো পড়তে হবেই—তাদের সভ্যতার আদিভূমিই তো গ্রীস আর রোম। কিন্তু আমাদের তো তা নয়। পৃথিবীতে বহু সভ্যতা উঠেছে, পড়েছে। তার খবর টয়েনবী দিয়েছেন। গ্রীস ও রোমের সভ্যতা খুব বড় সভ্যতা হলেও আমাদের চোখে তা আরও পাঁচটা সভ্যতার সঙ্গের দুটো সভ্যতা মাত্র। আমাদের কাছে তার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ এশিয়ার সভ্যতা, চীন বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ইতিহাসের কাহিনী। অথচ সে সব দিকে নজর না দিয়ে আমরা গ্রীস, রোম ও ইংলণ্ডেরই জের টানছি। এ কেন? ভরতীয় সাম্রাজ্য জয় হবার পরই বিলেতে ট্রপিক্যাল অসুখ নিয়ে আলোচনা শুরু হল। যেমনই দরকার পড়েছে অমনই ইংরেজ তা চর্চা শুরু করেছে এবং সে চর্চা অত্যন্ত ভালভাবেই করেছে। লক্ষ্য করার দরকার না পড়লে করেনি, যাদের দরকার নেই তারাও করেনি। অথচ আমাদের যা প্রয়োজন সেদিকে নজর না দিয়ে আমরা অন্যদিকে তাকিয়ে আছি। এই কি শিক্ষার বাস্তবতা? আসল কথা, আমরা দেড়শ বছর আগেকার গোলক-ধাঁধাতেই ঘুরে মরছি। দেড়শ বছর আগের আবহাওয়াটা কি ছিল? আমরা তখন ইংরেজি সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের আস্বাদ পেয়েছি। একদিকে তাই সে রস পাবার জন্য তীব্র আকাঙ্ক্ষা জেগেছে। তার মত শিক্ষাব্যবস্থা চাই। অতএব সেকস্‌পীয়র, বার্ক, মিল্টন হতে শুরু করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত শাখার আস্বাদ চাই। এই হল মুষ্টিমেয় ও উপরস্তরচারীদের দাবী। তার ফলে বাঙলার অজস্র মনীষীকে আমরা এই স্তর হতে পেয়েছি—বঙ্কিমচন্দ্র হতে শুরু করে মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসু পর্যন্ত। আর তা ছাড়া দরকার ছিল কেরানী ও ডেপুটির। তখনকার দিনে বিশেষীকরণ খুব কমই ছিল, কাজেই ঐ সাধারণ বিদ্যে হতে কেরানী ডেপুটিও হ'ত। এটা হল নীচুর স্তরের দাবী। দুটোই অবশ্য মধ্যবিত্তের দাবী। তার বাইরে বিপুল জনসাধারণের কথা তখন কে ভাবে? আজ অবস্থা বদলেছে, অথচ চিন্তার ধারা বদলায় নি। এই শিক্ষার ফলে আমরা এখনও মেঘনাদ সাহা, সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে পাচ্ছি বটে, (যদিচ এক বন্ধু বলেন, বাঙলাদেশে যাঁদের কিছুটা খ্যাতি আছে বা হয়েছে, তাঁর সকলেই এনট্রান্স পাশ—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেছেন ও বড় হয়েছেন, এমন নাম একটাও নেই। জানি না সত্য কিনা। অন্তত সুভাষচন্দ্র ম্যাট্রিক দিয়েছিলেন, এনট্রান্স নয়)। কিন্তু মধ্যবিত্তের উপর-স্তরেও সাধারণভাবে আর আগের মত জ্ঞানের বিকশন হচ্ছে না। অন্যদিকে কেরানীত্ব ও ডেপুটিত্বের বাজার দর[illegible] কমেছে, দুর্লভও হয়েছে। মধ্যবি[illegible] সমাজেই এই অবস্থা। তার উপর আ[illegible] বিপুল জনতা জেগেছে। তাদের ক[illegible] না ভাবলে আর চলবে না। তাদে[illegible] প্রয়োজন তো সম্পূর্ণ অন্য। অথচ এ[illegible] সব কথা না ভেবে আমরা দেড়শ' বছ[illegible] আগের অদৃশ্য আস্ফালনকে আজও গায়ে[illegible] জোরে চালাতে চাচ্ছি। কিন্তু তা চ[illegible] সম্ভব নয়। এই দিক দিয়ে গান্ধীজ[illegible] বুনিয়াদি শিক্ষার একটা খুব বড় তাৎপ[illegible] আছে। শিক্ষা শুধু মধ্যবিত্তের ন[illegible] সকলের জন্য এবং সেই কারণেই জীবে[illegible] কাজের সঙ্গে তাকে মেলাতে হবে—[illegible] কথাটা খুব বড় কথা এবং বাস্তব ও ন[illegible] কথা।

কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। দে[illegible] লোক ও শিক্ষাব্রতীদের এসব বি[illegible] গভীরভাবে ভাববার সময় এসেছে। সব সমস্যার সমাধান বাতলে দেও[illegible] চেষ্টা আমি করব না। কেবল সাধা[illegible] ভাবে কয়েকটি প্রস্তাব করতে চাই:—

প্রথম: শিক্ষার উদ্দেশ্য বিনিশ[illegible] সব প্রথমেই ঠিক করতে হবে শি[illegible] উদ্দেশ্য কি হবে। কাকে শেখাতে চা[illegible] এবং কি শেখাতে চাই, তা স্থির হও[illegible] দরকার। এ বিষয়ে চিন্তার ঢিলে[illegible] যথেষ্ট রয়েছে। এ সম্বন্ধে রাধাকৃষ্ণ[illegible] কমিশন সাধারণভাবে অনেক ভাল ক[illegible] বলেছেন, সেগুলিকে কাজের ক্ষেত্রে প্রয়ো[illegible] করতে হবে। আজ যে সমাজজীব[illegible] দেখছি এবং জাতির যে প্রয়োজন অনু[illegible] করছি, তাতে আমার মনে হয় শিক্ষ[illegible] তিনটি ভাগ করতে হবে। প্রথম, উদ[illegible] শিক্ষা এবং শিক্ষার জন্যই শিক্ষা। জ্ঞা[illegible] বিজ্ঞানের সব শাখাই কিছু না কি[illegible] পড়ানো হবে, কতকগুলি শ্রেষ্ঠ মান পর্য[illegible] পড়ানো হবে, শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবান ছাত্রের[illegible] এই সব পড়তে পাবে। কোথায়ও [illegible] সীমা টানা হবে না। তাহলে এই গো[illegible] থেকেই আমরা অর্থনীতিবিৎ, বিজ্ঞানী[illegible] প্রভৃতি মনীষী পেতে থাকব, যা[illegible] মনীষায় জাতীয় চিত্ত উদ্ভাসিত হ[illegible] জাতির যাত্রাপথ আলোকিত হবে, আ[illegible] নতুন নতুন পথ রচনা করতে পা[illegible] ন্যাশনাল ল্যাবরেটরীর কর্মী, বি[illegible] বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, পূর্ত বিভা[illegible]

বড়কর্তা, স্থাপত্যবিদ্যার ডিরেক্টর, আবহ-তত্ত্ববিদ্, রেল-প্লেনের নির্মাতা, নৃতাত্ত্বিক গবেষক, সমাজ-গবেষণা সংস্থার পরিচালক ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মীরা আসবেন এই স্তর থেকে।

দ্বিতীয়, মধ্যবিত্ত সমাজ। আগের কালে দু-চারজন ইংরেজি পড়তেন জ্ঞানের আশায়, কিন্তু অধিকাংশই ইংরেজি পড়তেন ডেপুটিত্ব, অন্তত কেরানীত্বের আশায়। আজ অবস্থা বদলেছে। বি-এ ডিগ্রীর বাজার দর নেই। আজকাল শুধু বি-এ পাশ করে চাকরী তো দূরের কথা, এমন কি হবু শ্বশুরবাড়ি থেকে পণ পর্যন্ত আদায় করা যায় না। সুতরাং প্রথম স্তরের ভঙ্গীতে এই শ্রেণীকে পড়াবার প্রয়োজন নেই। দেখতে হবে, সামাজিক পরিকল্পনা অনুসারে আগামী দশ পনের বা বিশ বছরে আমাদের কোন্ কোন্ দিকে মোটামুটি কি ধরনের লোক দরকার। সেই দরকারের পরিমাপ করে নিয়ে সেই অনুসারে শিক্ষাব্যবস্থা করতে হবে। তা না হলে আজ হঠাৎ যদি প্রতি বছর পঞ্চাশ হাজার গ্রাজুয়েটের বদলে পঞ্চাশ হাজার ফিটার মিস্ত্রি বাঙলাদেশে তৈরী হতে থাকে, তাহলে তাতে বেকার-সমস্যা একটুও ঘুচবে না, কেননা এখন যেমন জীবিকার ক্ষেত্রে পঞ্চাশ হাজার গ্রাজুয়েটের কোনও কর্মসংস্থান নেই, তেমনি পঞ্চাশ হাজার ফিটার-মিস্ত্রীরও নেই, বড় জোর পাঁচ হাজারের আছে। এদের শিক্ষা-প্রণালী হবে বিভিন্ন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রাথমিক জ্ঞান এদের কাছে এনে দিতে হবে, কিন্তু একটু দূরে এগোলেই প্রত্যেকটি ছাত্রের ক্ষমতা অনুযায়ী বিভিন্ন দিকে তাদের স্কুল-পাঠ্য অবস্থাতেই চালিয়ে দিতে হবে। আমেরিকায় বহু much-purpose ইশ্কুল আছে। তার উল্লেখ মুদালিয়র কমিশন রিপোর্টেও আছে, এদেশের মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কার প্রসঙ্গে। ঐসব ইশ্কুলে উপরের দিকে বিভিন্ন বিভাগ আছে,—বিজ্ঞান বিভাগ, টেকনিক্যাল বিভাগ প্রভৃতি। কতকগুলি বিষয় সকলেই পড়ে, আর কতকগুলি বিষয় বিভিন্ন ছাত্র বিভিন্ন বিভাগে পড়ে। তাতে তাদের ক্ষমতার স্বাভাবিক বিকাশের সুযোগ হয়। সে পদ্ধতি এখানে অবলম্বন করা যেতে পারে। কোন্ ছাত্র কোন্ দিকে গেলে ভাল করতে পারবে, তা স্থির করবার জন্য আমেরিকার মত psychiatric test-এরও প্রবর্তন করা যেতে পারে। মোদ্দা কথা, একদিকে সামাজিক প্রয়োজন, আর অন্যদিকে ছাত্রদের ক্ষমতা—এই দুটি দিককে সুন্দরভাবে মিলিয়ে দিতে হবে। এ স্তরে শিক্ষার হবে এই কাজ। সুতরাং এ স্তরে পরিব্যাপ্তি একেবারে না থাকলে চলবে না, কিন্তু একটুখানি পরিব্যাপ্তির পর কয়েকটি দিকে বিশেষীকরণের দিকে নজর দিতে হবে। প্রথম স্তরে extensity ও intensity দুই-ই সীমানাহীন; এ স্তরে extensity প্রয়োজন মত সামান্য, কিন্তু intensity খুব বেশী।

তার পরের স্তর হল জনতার স্তর। এদের পক্ষে extensity আরও কম, intensity বেশি। পরে বলব, এদের অকারণে ভাষাতত্ত্ববিদ করে তোলবার চেষ্টা মোটেই চলবে না। আর বিদ্যাকে পুস্তকস্থা করে রাখলে চলবে না, জীবনের সঙ্গে, কর্মের সঙ্গে মেলাতে হবে।

এই ধরনের সংস্কার হলে তবে শিক্ষাও হবে, জীবিকাও হবে। বেকার-সমস্যাও থাকবে না, দেশের কাজও ভাল হবে।

দ্বিতীয়ঃ পাঠ-তালিকার কার্যক্রম। পূর্বে যা বলেছি, তা হতেই পাঠ-তালিকার কার্যক্রম কোন্ দিকে, কিভাবে বদলান দরকার, তা বোঝা যাবে। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন নেই, সে ক্ষেত্রও এটা নয়। এ বিষয়ে দুই একটা দিকের ইঙ্গিত পূর্বেই করেছি। ইংলণ্ডে ছাত্রদের একটা খুব বড় সুবিধে এই যে, তারা নিজেদের ভাষা আয়ত্ত করলেই সেই ভাষার সাহায্যে আসল পাঠ্যবস্তু—যেমন বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জন শুরু করে দেয়। ভাষার সবচেয়ে প্রাথমিক কর্তব্য হল জ্ঞানলাভের হাতিয়ার হওয়া। যারা সাহিত্য-চর্চা করবে না অথবা ভাষার গঠন ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হবে না, তাদের কাছে ভাষাই ভাষার চরমার্থ নয়, ভাষা কেবলমাত্র জ্ঞান-লাভের হাতিয়ার মাত্র। বাঙলার গ্রামাঞ্চলে যে চাষী চাষ করবে, তার সংস্কৃত হিন্দী বা ইংরেজি কিছু পড়ারই দরকার করে না। রাষ্ট্রভাষা হিন্দী দরকার হবে কোর্টে আদালতে—তা সে কাজ তো সে উকিল-মুহুরী দিয়ে করিয়ে নেবে—তার জন্য তার নিজের সে ভাষা শিক্ষা করবার কোনও প্রয়োজন নেই। তার যা কিছু দরকার, সে সবই বাঙলা ভাষার মাধ্যমে তার কাছে পৌঁছে দিতে হবে—এমন কি, কৃষিবিজ্ঞান ও পশুবিজ্ঞানের কঠিনতম জ্ঞান পর্যন্ত। তার ইশ্কুলের শিক্ষা এই ভবিষ্যৎ জীবনের মত গড়ে দিতে হবে। তেমনি যে তাঁতকলের উইভিং মাস্টার হবে, তাকে আর একটু বেশি পড়তে হবে অবশ্য, কিন্তু তিনিও যাতে বাঙলা ভাষার মাধ্যমেই কাজ চালাতে পারেন, সে ব্যবস্থা করতে হবে। ইংরেজরা কি ল্যাটিন শিখে তবে বাইশম্যান ফোরম্যান হয়? কিন্তু যিনি উকীল হবেন, এমন কি গ্রামের পোস্টমাস্টারও হবেন, তাঁকে বাঙলা ছাড়াও হিন্দী ও ইংরেজি অবশ্য শিখতে হবে, কারণ তা না হলে তাঁর কাজ সুষ্ঠুভাবে

চলতে পারে না। কিন্তু তা বলে গ্রামের সকলকেই যে ঘোড়ার পাতা পর্যন্ত ইংরেজি ফার্স্টবুক পড়তে হবে তার কোনও মানে নেই। এককালে আমাদের একটা অদৃশ্য ইচ্ছা হয়েছিল আমরা ইংরজদের হারিয়ে দেব তাদেরই ভাষার জ্ঞানে, তাদের সাহিত্যের আস্বাদনে, সেই জন্য সকলকেই মাইকেল বা হরিনাথ দে করে তুলবার একটা অদৃশ্য চেষ্টা হয়ে গেছে আমাদের পাঠতালিকায়। কিন্তু তখন 'সকল' বলতে বোঝাত শুধু কয়েকজনকে। আজ তা নয়। সে কারণে সে ইচ্ছা আজ শুধু নিষ্প্রয়োজন নয়, রীতিমত ক্ষতিকর।১ তাতে অযথা শক্তিক্ষয় হয়, মন আসল বিষয়ে প্রবেশ করার বদলে ভাষার পাকে পাকে ঘুরে মরে, শেখেও না আসলে কিছু। তেমনি ইতিহাস ভুগোলের কথা। আমার গ্রাম, শহর, তারপর আমার প্রদেশ, দেশ ও প্রতিবেশী দেশের খবর না জেনে শুধু ইরান-তুরান ওড়ালে কোনও কাজ হয় না। সে শিক্ষা সম্পূর্ণ অবাস্তব এবং অকেজো। এই সব কথা ভেবে পাঠতালিকার চেহারা সম্পূর্ণ বদলে দিতে হবে। আর সবচেয়ে বড় কথা হল, অন্তত তৃতীয় স্তরের লোকদের শিক্ষা পুঁথিগত হলেই চলবে না—তাদের সমাজ, জীবন ও কর্মের সঙ্গে সে বিদ্যাকে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে দিতে হবে। গ্রামের ছেলের পাঠতালিকায় হাইজিন থাকলেই হবে না, কম্পোস্ট তৈরীও থাকবে। বরং বিজ্ঞান শেখানোর অছিলা করে যে সময় ও পরিশ্রম নষ্ট করা হয়, তার বদলে হাতে-কলমে কম্পোস্ট তৈরী শিখিয়ে তার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য ভাল করে বুঝিয়ে দিলে তা অনেক বেশী কার্যকর হবে। স্টেপীর বিশেষজ্ঞ হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা না করে কিভাবে এড়ো বাঁধ দিয়ে আশেপাশের খোয়াই বন্ধ করা যায় ও মাটির তলার জল-সঞ্চয় বৃদ্ধি করা যায়, তা জানলে ঢের বেশি ভাল ভুগোল পড়া হবে।

১। স্বর্গত কিরণশঙ্কর রায় মহাশয়ের নিকট একটি গল্প শুনেছিলুম। ওকাকুরা ভারতবর্ষ ত্যাগ করে যাবার সময় কলকাতায় একটি বিদায়-সভা হয়েছিল। সভাপতি ছিলেন স্বর্গত ভূপেন্দ্রনাথ বসু। তিনি তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ অনবদ্য ইংরেজিতে বিদায় সম্বর্ধনা জানালেন। উত্তর দিতে উঠে ওকাকুরা প্রথমেই বললেন, Me no speak good English; me no compelled to learn English. স্বাধীন বাস্তবানুগ জাত আর পরাধীন অনুকরণপ্রিয় জাতের তফাৎ এইখানে।

তৃতীয়ঃ বিদ্যালয়ের রূপ। এ বিষয়ে লিখতে গেলে বিস্তর লিখতে হয়। তাই সংক্ষেপে দুই একটা কথা বলছি। একশো বছর আগে একটা প্রয়োজনের তাগিদে এই সব বিদ্যালয় এক ধরনের রূপ নিয়েছিল। তার পর এনট্রান্স বদলিয়ে ম্যাট্রিকুলেশন হবার সময় নাকি একটা উদ্দেশ্য বিঘোষিত হয়েছিল, যত সহজে ছেলেরা বেশি পাশ করবে, দেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ততই বেশি হবে; ফলে অসন্তোষ, অশান্তি ও আন্দোলন ততই বাড়বে এবং তাতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসবে। জানি না, এরকম একটা উদ্দেশ্য সচেতনভাবে ছিল কি না, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে যে ব্যাপারটা মোটামুটি সেই ধরনেরই ঘটেছে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার ফলে আর যাই হোক, আমাদের জাতির মাথাটা খাওয়া গেছে, এমন কি রাজনীতির মাথাও। যে জাতে মানুষ নেই, সে জাত কি সত্যি-সত্যিই রাজনীতি করতে পারে? বলিষ্ঠ বাস্তব রাজনীতি? তারা একজন দাদাঠাকুরের ইশারায় মেষপালের মত ঝাণ্ডা ঘাড়ে রাস্তায় বেরোতে পারে, ঘরে আগুন দিতে পারে, ইনকিলাব জিন্দাবাদ চীৎকার করতেও পারে, কিন্তু যখন প্রয়োজন হয় প্রত্যেকটি মানুষ সজ্ঞানে ভালো-মন্দ বিচার-বিবেচনা করবে, রাজ-নীতির ভালো-মন্দ বিবেচনা করতে পারবে,—সে প্রয়োজন মেটাবার মানুষ গড়েছে কৈ? যে বিচারবুদ্ধি ও মোহহীন দূরদর্শিতার ফলে ইংরেজ যুদ্ধ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই চার্চিলকে পর্যন্ত সরিয়ে দিতে এতটুকু ইতস্তত করেনি, সেইরকম বস্তুনিষ্ঠ নির্মোহ বিচারবুদ্ধি না থাকলে তো সত্যকারের রাজনীতি হয় না। কাজেই জাতির স্বার্থে তো বটেই, এমন কি রাজনীতির স্বার্থেই, এ অবস্থার প্রতিকার হওয়া দরকার—বর্তমান ধারার মোড় ফেরা দরকার। কিন্তু সে কথা যাক্। বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ কেমন হওয়া উচিত, সে বিষয়ে খুব দূরদর্শী ও গভীর কথা বলেছেন, আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় তাঁর "বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ" নামক গ্রন্থটিতে। সকলেরই সেই বইটি পড়া উচিত—সেজন্য তাঁর কথার পুনরুল্লেখ এখানে করব না। তাঁর বর্ণিত বিশ্ব-বিদ্যালয়ের রূপ হতে অধস্তন কলেজ-ইশকুলগুলির রূপও খানিকটা বোঝা যায়। পাঠকেরা সে বই পড়ে নেবেন। সংক্ষেপে বলা যায়,—

এক, উপরে উক্ত নতুন আদর্শ ও পাঠতালিকার ভিত্তিতে ইশকুল চালাতে হবে। তার জন্য ইশকুলগুলি যথাসম্ভব আবাসিক হলে ভাল হয়, কলেজগুলিও। যে ছেলে বাড়িতে একরকম আবহাওয়া পায়, ইশকুল থেকেই ছোটে চা, চপ, চিত্রা, চন্ডীদাসের সন্ধানে, তার জীবনকে ইশকুল আর কলেজ কতটুকু প্রভাবান্বিত করবে? উইন্ডসরের অদূরে ইটনের বিদ্যালয়, নিজস্ব ঘেরা মাঠের মধ্যে পুরোনো গম্ভীর চেহারার বাড়িগুলি অটল শান্তির মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যে ছেলে চব্বিশ ঘণ্টা সেই আবহাওয়ায় থাকবে, সে তো লেখাপড়া শিখবেই, উপরন্তু সবচেয়ে বড় কথা তার চরিত্র গঠিত হয়ে যায়। জার্মানিতে যে সব ছাত্র টেকনিক্যাল প্রতিষ্ঠানে পড়ে তাদের সকাল-বিকেল কাজ করতে হয় ফ্যাক্টরী ল্যাবরেটরীতে, দুপুরে থিওরীর ক্লাশ, রাত্রে লাইব্রেরী। গোটা জীবনটাই অধ্যয়ন নামক তপস্যার চারপাশে আবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং তারা স্বভাবতই জ্ঞান-বিজ্ঞানে উন্নতি করছে। আমাদের দেশে মানুষ গড়তে গেলে এইরকম গুরুকুল প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রাচীন ভারতবর্ষেও তো রাজারা ছেলেদের প্রাইভেট টিউটর রেখে পড়াতেন না, গুরুর কাছে তপোবনে পাঠিয়ে দিতেন।

দুই, বর্তমান পরীক্ষা-ব্যবস্থা বদলাতে হবে। ছাত্র প্রতিদিন ক্লাশের খাতায় যে নম্বর পায়, পরীক্ষার সঙ্গে তা-ও সমান-ভাবে বিবেচিত হবে।

তিন, গৃহশিক্ষক পদ্ধতি সম্পূর্ণ তুলে দিতে হবে। পূর্বেই বলেছি, কিভাবে ইশকুলেই টিউটোরিয়ালের ব্যবস্থা করা যায়। তাতে শিক্ষকদের জীবিকাও কমে না অথচ অন্য সব দিকে উন্নতি হয়।

চার, ছাত্রদের কিছু সমাজসেবামূলক কাজ করতে হবে। যেমন ফার্স্ট ক্লাশের ছাত্রেরা বা কলেজের ছাত্রেরা আশেপাশের পল্লীর বা গ্রামের বয়স্ক নিরক্ষরদের সাক্ষর করে তোলার জন্য সন্ধ্যাবেলায় এক ঘণ্টা করে ক্লাশ নিতে পারে। দুজন আজ ক্লাশ নিল, আর দুজন পরের দিন পড়াল—এইভাবে ভাগ করে দিলে এদেরও পড়ার ক্ষতি হবে না।

পাঁচ, যেভাবে ইশ্‌কুল কলেজের পরিচালকবর্গ নির্বাচিত হন, তা বদলাতে হবে। আগে যে সব রায়বাহাদুরেরা অবসর নিয়ে গ্রামে ফিরে গিয়ে স্থানীয় ইশ্‌কুলের সভাপতি বা সম্পাদক হতেন, তাঁরা বড় জোর একটু মুরুব্বিয়ানা করতে চাইতেন, তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী খুব সুদূর-প্রসারী হয়তো ছিল না, ইশ্‌কুলে হয়তো তাঁরা ভক্তিভরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ছবি টাঙিয়ে রাখতেন, আর চাপকান প'রে গিয়ে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মহোদয়কে পুরস্কার বিতরণী সভার সভাপতিত্ব করবার জন্য অনুরোধ করে আসতেন—কিন্তু তাছাড়া অন্যদিকে হাল ধরে রাখবার মত বিদ্যাবুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও অবসর তাঁদের ছিল। আজ এমন কি সে সব রায় বাহাদুরের দলও অদৃশ্য। তার বদলে কমিটি "ক্যাপচার" করবার দলই গড়ে উঠেছে। গত পনের-কুড়ি বছরের মধ্যে ইশকুল কলেজ নিয়ে হাইকোর্ট ও বিভিন্ন কোর্টে অজস্র মামলা হয়েছে। আগে তা হত না। সুতরাং এর প্রতিকার দরকার, যাতে শিক্ষাবিদ্ ও শিক্ষা-ব্যাপারীরাই ইশ্‌কুল কলেজের কর্তা হন তার ব্যবস্থা করতে হবে। শুনেছি, বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন তাঁদের রিপোর্টে এবিষয়ে নতুন পন্থা বাতলিয়েছেন। এবিষয়ে চিন্তা করা বিশেষ প্রয়োজন, কেননা আগের গ্রাম্য দলাদলির সঙ্গে এখন যুক্ত হয়েছে বৃহত্তর দলাদলি। সেই সঙ্গে ব্যবস্থা করতে হবে বিদ্যালয়ের বাড়ীঘর সম্পত্তি যাতে ম্যানেজিং কমিটির হাতে না থেকে ট্রাস্টীর হাতে থাকে। মেদিনীপুরের একটি বিদ্যালয়ের কথা মনে পড়ছে। ম্যানেজিং কমিটি একবার কংগ্রেস একবার পি-এস-পি দখল করছে আর আগের দল যে ঘরবাড়ী তৈরী করছে পরের দল সে ঘরবাড়ী ভাঙছে। এটা খুব চরম নির্দশন হলেও ছোটখাটভাবে এ ধরণের গণ্ডগোল বহু জায়গায় হতে দেখা গিয়েছে। সুতরাং সম্পত্তির ভার এমন কয়েকটি লোকের হাতে দেওয়া উচিত যাঁরা জনসাধারণের কাছে ন্যাসী সম্পত্তির জন্য আইনগতভাবে দায়ী থাকবেন এবং যাঁরা ম্যানেজিং কমিটির দলাদলির ধুলোর ঝড়ে উড়ে যাবেন না।

ছয়, গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়গুলি যেমন পরিকল্পনাবিহীনভাবে ছড়িয়ে আছে তা চলবে না। সুষ্ঠু ব্যবস্থা করতে হবে। খুব কাছাকাছি দুটি বিদ্যালয় মারামারি করতে থাকবে, আর তারপর বহুদূর পর্যন্ত কোনও বিদ্যালয় থাকবে না, এ ব্যবস্থা অচল। সেখানে কাছাকাছি একটি বিদ্যালয়কে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। বিশেষত আবাসিক বিদ্যালয় হলে এ ব্যবস্থা ছাড়া চলতেই পারে না। একে শিক্ষার সংকোচ মনে করবার কোনও কারণ নেই। অবশ্য এতে কিছু ব্যক্তিস্বার্থ বা দলস্বার্থ বা দলাদলির স্বার্থ ক্ষুণ্ন হতে পারে, কিন্তু তা গ্রাহ্য করলে চলবে না। কলেজের বেলায়ও সেই কথা। পাঁচহাজারী আর পঞ্চশতী কলেজে যে বুর্জোয়া-প্রলেটারিয়েট বিভেদ আছে তা চলতে দেওয়া উচিত নয়।

চতুর্থ: শিক্ষা বিভাগের সংস্কার। এই সব সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা সার্থক করতে গেলে শিক্ষা বিভাগের হাতে অনেক ক্ষমতা দিতে হবে। কিন্তু তা দেবার আগে শিক্ষা বিভাগের সংস্কার চাই। আজকাল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলে রয়েছে। তার এক কর্তা শিক্ষা বিভাগ, আর এক কর্তা বিশ্ববিদ্যালয়, আর এক কর্তা মাধ্যমিক বোর্ড। এই সবের মধ্যে একটা সুসমঞ্জস বিধান করতে হবে। বিশেষত আপাতত এরা পরস্পর মারামারি করতে ব্যস্ত। তা বিচিত্র নয়, কারণ এর প্রত্যেকটিই অল্পবিস্তর আইনসভার মত যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। তাতে শিক্ষা হয় না। বাংলার মাধ্যমিক শিক্ষা কমিশন প্রস্তাব করেছেন মধ্যশিক্ষা পর্ষৎকে আরও সরকারী আওতায় আনতে। তার প্রয়োজন আছে, কিন্তু তার আগে প্রয়োজন আছে শিক্ষা বিভাগের সংস্কারের। যাঁরা সরকার পরিচালনা করেন এবং যাঁরা সরকারী চাকরী করেন তাঁরা সকলে সুশিক্ষিত হলেও শিক্ষাবিৎ নন। বিশেষত আজকাল অশিক্ষিতেরও মন্ত্রী হতে বাধা নেই। সুতরাং তাঁদের হাতে শিক্ষা ব্যবস্থার সুষ্ঠু পরিচালনা না-ও হতে পারে। এই

অসুবিধা দূর করার জন্যই প্রগতিশীল দেশে সরকারের মধ্যে বোর্ড ব্যবস্থা আজকাল খুব বেশি হয়ে উঠেছে। আগে মন্ত্রী ও সরকারী কর্মচারীরা প্রত্যক্ষভাবে যা পরিচালনা করতেন এখন তা বিভিন্ন বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা বিভাগের মধ্যে সেইজন্য বিভিন্ন বোর্ড থাকা দরকার। শিক্ষাবিৎদের নিয়ে এই সব বোর্ড গঠিত হবে—অবশ্য সেখানেও দেখতে হবে তার গঠন এমন যেন না হয় যাতে তা অধুনালুপ্ত বাংলার মধ্যশিক্ষা পর্যদের মত দলাদলির কুরুক্ষেত্রেই পর্যবসিত হয়।

পঞ্চম : অর্থব্যবস্থা। এই সব করতে গেলেই টাকা চাই। বিনা পয়সায় আর যাই হোক, শিক্ষাব্যবস্থা হয় না। মাছের তেলে মাছ ভাজা শিক্ষার ক্ষেত্রে সব সময় সম্ভব নয়। বা সম্ভব করতে গেলেই ঐ পাঁচ হাজারী কলেজের বিষবৃত্তে পড়তে হবে। সেইজন্য এই সব সংস্কার কাজে পরিণত করবার জন্য সরকারকে যথোচিত টাকার বরাদ্দ করতে হবে। সাধারণত অর্থাভাবের কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়ে থাকে। কিন্তু সেদিনই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে, এবারই কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা বিভাগের বহু বহু লক্ষ টাকা খরচ করা সম্ভব হয়নি। প্রাদেশিক সরকারেরও বহু বাজেট-বরাদ্দ টাকা বছরের শেষে খরচের অভাবে ফিরে যায়।

ষষ্ঠ : শিক্ষা ও রাজনীতি। পরিশেষে শিক্ষা ও রাজনীতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলেই শেষ করব। আমরা চলতি রাজনীতির আবর্তে শিক্ষক ও ছাত্রদের বহুদিন থেকে টেনে আসছি। ত্রিশ বছর আগে রবীন্দ্রনাথ এর বিরুদ্ধে সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন। সম্প্রতি নেহরুও অনুরূপ দু-চারটি কথা বলেছেন। স্বাধীনতার পূর্বে অবস্থা একরকম ছিল, এখন অবস্থা অন্যরকম হয়েছে। আগে দরকার ছিল সকলে মিলে কোনও রকমে ইংরেজকে সাগরপার করে দিয়ে আসা। সেই ব্যাপারটায় সবাই মিলে আমরা কোমর বেঁধে লেগে গিয়েছিলাম। যুক্তি ছিল এই যে, আমরা তো আর চিরকালের মত সব জিনিস বন্ধ করছি নে, দু-চার বছরের জন্য লেখাপড়া বন্ধ করলে ক্ষতি কি। ঘরে আগুন লাগলে তো সবাইকেই কলসী নিয়ে ছুটতে হয়। কথাটার মধ্যে খানিকটা যুক্তি আছে। কিন্তু তবুও রবীন্দ্রনাথ তার বিরোধিতা করেছিলেন। বলেছিলেন, "আমাকে কেউ কেউ বলেছেন, দেশের চিত্তশক্তিকে আমরা তো চিরদিনের জন্যে সংকীর্ণ করতে চাইনে, কেবল অতি অল্পকালের জন্যে। কেনই বা অল্পকালের জন্যে? যেহেতু এই অল্পকালের মধ্যে এই উপায়ে স্বরাজ পাব? তার যুক্তি কোথায়? স্বরাজ তো কেবল নিজের কাপড় নিজে জোগানো নয়। স্বরাজ তো একমাত্র আমাদের বস্ত্র-সচ্ছলতার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার যথার্থ ভিত্তি আমাদের মনের উপর, সেই মন তার বহুধা শক্তির দ্বারা এবং সেই আত্মশক্তির উপর আস্থা দ্বারা স্বরাজ সৃষ্টি করতে থাকে।" তখনকার যুগে যা-ই হোক, স্বাধীনতার পর তো আমরা সত্যকারের স্বরাজের সম্মুখীন হয়েছি। সেই বহুধাবিচিত্র বিরাট স্বরাজ্য সৃষ্টি করার দায়িত্ব আমাদের উপর ভয়ংকরভাবে এসে পড়েছে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারে ভারতবর্ষের প্রধান মন্ত্রী পর্যন্ত নির্বাচিত হচ্ছেন, গ্রামের শাসনভার পঞ্চায়েতের হাতে, ভূমিব্যবস্থা সমবায়-মূলক হতে চলেছে। কাজেই আমরা না চাইলেও আমরা কেউই আর পলিটিকস্ এবং দেশ গড়ার দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পাব না। তার উপরে আমরা সাবালক হয়েছি, আর ইংরেজের অভিভাবকত্বে নেই। সুতরাং সারা জগতের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় আমাদের অগ্রসর হতে হবে। সেইজন্য রাজনীতিও আর ইংরেজ বিতাড়নের চক্রে ঘুরে মরছে না—এখন তা ভয়ংকর বাস্তব ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। কিন্তু সে রাজনীতি করতে হলে আমাদেরও তৈরী হতে হবে। নাবালকের পক্ষে যে হৈ চৈ শোভা পায়, সাবালকের তা সাজে না। সেইজন্য আমরা যদি নিজেদের মানুষ না করে তুলি, তাহলে এ পলিটিকস্ করতে পারব না। সুতরাং ভবিষ্যতে ভাল করে রাজনীতি করব বলেই গোড়ায় চলতি রাজনীতির আবর্ত হতে দূরে মানুষ গড়ার কাজটা নিশ্চিন্তে ভালভাবে হওয়ার নিদারুণ প্রয়োজন ঘটেছে। যেমন গার্হস্থ্যের আগে বা গার্হস্থ্যের জন্যই ব্রহ্মচর্য। খুব সংকটমুহূর্তে এক আধবার পদস্খলন হয়তো মার্জনীয়, কিন্তু তা প্রাত্যহিক অভ্যাসে পরিণত হলে শক্তিক্ষয় অনিবার্য। আজ পলিটিকস্ পলিটিকস্ করে আমরা উন্মত্ত হয়ে উঠি বটে, কিন্তু বড় বড় রাজনৈতিক দলের লেজুড় হয়ে থাকাই কি ছাত্র রাজনীতির চরমার্থ? তারই নাম কি সত্যকারের সুস্থ ছাত্র-আন্দোলন? কই, ছাত্রদের বাসস্থান, পাঠতালিকা, ক্লাশের ব্যবস্থা—এ নিয়ে তো ব্যাপক ও সুচিন্তিত ছাত্র-আন্দোলন হতে দেখি না? কেবল পরীক্ষার পাশমার্ক কমাবার আন্দোলন এবং প্রশ্নপত্র শক্ত হয়েছে বলে খবরের কাগজে চিঠি লিখে কাঁদুনি গাইলে ছাত্রেরা মানুষ হবে? এমন কি এম-এ পরীক্ষা—যা শেষ পরীক্ষা এবং যাতে সব-কিছুই আসতে পারে—তাতেও ছেলেরা হল ছেড়ে চলে যাবে এবং খবরের কাগজে চিঠি লিখবে? ভবিষ্যতে যে ভয়ংকর দায়িত্ব তাদের উপর এসে পড়ছে তা গ্রহণ করবার মত শক্তি তারা অর্জন করতে পারবে? সেই কারণে মনে রাখা দরকার মানুষ গড়ার কারখানা মানুষ লড়ার কারখানা হলে দুই-ই নষ্ট হয়। খুব গুরুতর উপলক্ষে ব্যতিক্রম হতে পারে, কিন্তু সেটা দৈনন্দিন ব্যাপার ঘটে ওঠা দেশের পক্ষে এবং ভবিষ্যৎ নাগরিক জীবনের পক্ষে হিতকর নয়।

বারো ঘর একটি উঠোন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

২৭

রুচির সঙ্গে এই নিয়ে শিবনাথ খুব বেশি কথা বলল না। এটা তার নিজস্ব চিন্তা। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর কে গুপ্তর প্রশ্নটা আর একবার মাথায় নাড়াচাড়া করে শিবনাথ তার ঘরের অন্ধকার জানালায় বাড়ির উঠোনের দিকে চোখ রেখে সিগারেট টানতে লাগল। বিছানায় মঞ্জু ঘুমিয়েছে। রুচি ঘুমিয়ে পড়েছিল। এইমাত্র জেগে উঠে এক গ্লাস জল খেয়ে আবার শুয়েছে। হয়তো ইতি-মধ্যে আবার ঘুমিয়ে থাকবে।

আর মস্ত বড় উঠোন বুকে নিয়ে বারোটা ঘর রাত্রির জলে সাঁতার কাটছিল।

আজ সব ঘরকে টেক্কা দিয়েছে বীথিদের ঘর। অফিস-ফেরতা বীথির সাজসজ্জার চমক। বীথি একটা নতুন ডিজাইনের ল্যাম্প কিনে এনেছে। কেরোসিনের যদিও। কিন্তু বাড়িটার বিচিত্র গড়ন আর হুবহু ডিমের মত দেখতে চিমনিটার স্বচ্ছতা ও দীপ্তি সন্ধ্যা থেকে বাড়ির লোকগুলোর দৃষ্টি আকর্ষণ করছিল।

বলতে কি, আজ উঠোনে বেশি লোকের চলাফেরা নেই। শব্দও কম।

তাছাড়া বাড়িতে লোকও কমেছে এই কদিনে। অমল নেই, তার স্ত্রী।

কমলা আজও রাত্রে বাড়ি ফিরছে না। ...শের ঘর খাওয়া-দাওয়া ক'রে ঘুমিয়েছে। ডাক্তারের ঘর চুপচাপ। বিধু-মাস্টার এতক্ষণ তার দুই মেয়ের চলাফেরা ও কথাবার্তা সংশোধন ক'রে দিতে দিতে বলছিল, 'কানুর আশা আমি ছেড়ে দিয়েছি। তাছাড়া ও পুরুষ, ধৈর্য কম। ঝুঁকে পড়ে ওরা সহজে। মানে বাজে ঝোঁক আছে আসল কাজে মর্জি নেই। কোনখান থেকে লাখ টাকা রোজগার করে আনবি, আমার জানা আছে। যদি ঘরে কিছু আসে, যদি বুড়ো বাপ-মাকে দুটি খেতে দিতে পারে এদিনে তো সে ছেলেরা না, মেয়েরা। এটা মেয়ের যুগ। এখন আর অত মান-সম্মান, লাজ-লজ্জা নিয়ে বসে থাকলে চলে না। কারোর মেয়েই থাকতে পারছে না। কাজ করতে হবে, বিয়ে যদ্দিন না হচ্ছে। গৌরীদানের যুগ চলে গেছে, কথাটা মনে রাখবি।'

বিধুমাস্টারের স্ত্রী কথা বলছিল না।

তেমনি সংশোধন করা হচ্ছিল আর এক ঘরের মেয়েকে। বড় গলা ক'রে বলাই বলছিল, 'তুই, কথায় বলে সমর্থ মেয়ে আমার ঘরে। হুট্-হাট্ ঘর থেকে বেরিয়ে যাস কোন্ আক্কেলে? কপি, মুলো? কেন ক'বেলা ভাত খাস না যে, লোকের ক্ষেতে চুরি করতে যাস। আমার কি হাতে বাত নেমেছে যে, তুই রোজগার ক'রে আনবি আর তাই পেটে দিয়ে আমার জীবন কাটবে। আজ থেকে ঘরের বাইরে পা বাড়ানো নিষেধ। এইটুকুন বলে রাখলাম। ঘরে থেকে মার কাজে সাহায্য করবি, তবেই আমার চলবে।' যেন চাকা ঘুরে গেছে, উপার্জনের ভাল রাস্তা বলাই খুঁজে পেয়েছে।

শিবনাথ কান পেতে রইল।

যেন ময়না হুস-হুস কাঁদছিল। বলাই আবার বলছিল, 'দিন কারোর সমান যায় না। শনির চক্র যদ্দিন থাকে মানুষকে ঘোরাবেই। আমারও শনির দশা ছিল। নাহলে আর এই টিনের ঘরে মাথা গুঁজব কেন। কিন্তু দশা এবার কাটল।'

শিবনাথ চমকে উঠল।

বলাইকে কাল বাড়ি থেকে তুলে দেবার কথা। সে এমন কি রাতারাতি সুবিধা করে ফেলল যে, আর সে কিছু ভয় করছে না? খচ্ ক'রে কথাটা মনে পড়তে শিবনাথ বেশ কিছুক্ষণ বলাইর ঘরটার দিকে চোখ রেখে অন্ধকারে গলা বাড়িয়ে দিয়ে চুপ ক'রে রইল।

'সব শালা এ-বাড়িতে, এ-পাড়ায়, স্বার্থপর। বনমালী দেখল না, কে গুপ্ত নিজে দেখল না, চারু রায় পরে এসেছে। তবে কে দেখতে পেয়েছে শুনি কে গুপ্তর ছেলের সঙ্গে ময়না ছিল? যে-শালা একথা বলে, আমি তাকে মজা দেখাচ্ছি, আর দুটো দিন সবুর।'

বলাইর গলার স্বরে সারা বাড়িটা গম্ গম্ করছিল। যেন এ-কথার উত্তর দিতে কেউ নেই। সব চুপ।

প্রতিবাদ করতে গেলে ঝগড়ার সৃষ্টি হবে। বস্তি বাড়ির দস্তুর। শিবনাথ ক'দিনে অনেক ঝগড়া দেখেছে। তাই আর কোন ঘরে কথা নেই।

অবশ্য রুনুর, এ-বাড়ির একটি কিশোরের হঠাৎ এই দুরদৃষ্টের সংবাদ
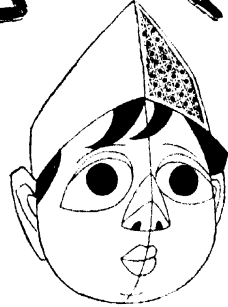
পেয়ে অস্থির হয়ে পড়েছে, এমন লোকও আছে।

আত্মীয় না। অপর লোক। একটা উঠোনের ওপর আজ কতদিন একত্রে আছে এই সম্পর্ক—পরমাত্মীয়ের মতন কে'দে উঠেছিল বর্ষীয়সী। প্রমথর দিদিমা।

প্রমথ রুনুর সমবয়সী, সাথী, সেই সুবাদে রুনুরও দিদিমা। গত আশ্বিন মাসে সব ছেলের মধ্যে অগ্রণী হয়ে রুনু বাড়ন্ত লাউ গাছটা প্রমথদের দরজার ওপরে ঘরের চালায় বাড়িয়ে দিতে সাহায্য করেছিল। সেই স্মৃতি বুড়ির মনে আছে। আজ সন্ধ্যাবেলা রুনুকে ওরা ধরাধরি করে হাসপাতালে নিয়ে গেছে এবং অক্সিজেনের জোরে এখন পর্যন্ত বাঁচিয়ে রেখেছে, সংবাদটা বুড়ির কানে পেণছে গেছল। তারপর থেকে মাঝে মাঝে কে'দে উঠছিল।

কিন্তু ডুকরে বেশিক্ষণ কাঁদতে পারেনি প্রমথর দিদিমা। সেই ঘরের পুরুষ সাবধান করে দিয়েছেঃ 'দরকার নেই অত আত্মীয়তা ফলিয়ে। গেছে অমুক নম্বর ঘরের লোক গেছে, আমাদের কি—শহরে, শহরতলীতে রাতদিন অ্যাকসিডেণ্ট হচ্ছে। যাদের ঘরে আজ হল না, কাল তাদের ঘরে হবে। আফসোসের কিছু নেই। কাজেই এত কাঁদাকাটা করে একদিনে সব ফুরিয়ে লাভ নেই জেঠী। তাছাড়া এসব ক্ষেত্রে পুলিস এনকোয়ারি আছে, জিজ্ঞাসাবাদ আছে, অমুক ঘরের ছেলে, তোমার কে হয়, তুমি কে,—ওদের সংসারে রোজেগেরে নেই, তো দিনের পর দিন খাচ্ছে কি, উপার্জনের রাস্তা কোন্‌টা—'

পুরুষ গলা বড় ক'রে বার বার ঘরের জ্যাঠাইমাকে বোঝাচ্ছিল, প্রতিবেশীর জন্যে এতটা শোকবিহ্বল হতে গেলে ঘরে বিপদ ডেকে আনা হবে। কেননা, রুনুর সমান বয়সের আর একটি ছেলে প্রমথ। এ-ঘরের বাসিন্দা। কাজেই 'বাড়িওলার জুলুম চলবে না'—দলে কে কে ছিল ইত্যাদির এনকোয়ারি শেষটায় এখানে আসবে। সুতরাং চুপ থাকা বুদ্ধিমানের কাজ।

প্রমথর দিদিমা আর কাঁদেনি। অল্প-বিস্তর সব ঘরই রুনু সম্পর্কে এরকম নিস্পৃহ থাকার মনোভাব দেখাচ্ছে, বাড়িতে পা দিয়ে শিবনাথ টের পেয়েছে এবং এতটা রাত অবধি জেগে সে সব শুনছে।

প্রমথদের ঘরই সবচেয়ে স্পষ্ট ও নির্ভীক ভাষায় জানিয়ে দিলেঃ 'না, রুনুর সঙ্গে প্রমথ ছিল না। কোনদিন মেশে না। রুনু ছেলেটা চিরকালই বদ্ এবং শহরের ছেলেদের সঙ্গে ওর আড্ডা। পার্ক সার্কাসের দুটো-একটা বন্ধু এখনো মাঝে মাঝে এখানে আসে আড্ডা দিতে। হয়তো ও ওদের শলাতে পড়ে পারিজাতের গাড়ি আটকে মারতে ছুটেছিল। তাই না এই অনর্থ ঘটল। এখন? ঠ্যালা সামলাও। কে দেখে, কে যায় হাসপাতালে দুবেলা খবর নিতে—খাবার দিতে। এই রকম ছেলে ঘরে না থাকা ভাল। বংশের কুলাঙ্গার। ওদিকে বাপ তো 'বোতল'
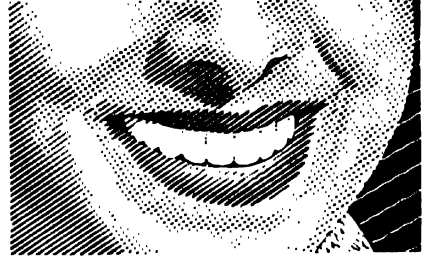
'বোতল' ক'রে রাস্তায় ফ্যা-ফ্যা করে ঘুরছে।'

বলে প্রমথর বাবা সজোরে দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করেছিল। বাড়িটা কাঁপছিল সেই শব্দে।

বলাইর মত প্রমথর বাবাও বড় গলায় বলছিল, 'আমার ছেলে দলে ছিল কেউ বললে আমি ঠ্যাং ভেঙে দেব, দিয়ে বুড়ো বয়সে জেলে যাব'—ইত্যাদি।

তারপর আর কারো ঘরে এ সম্পর্কে কথা শোনা যায়নি।

কেবল প্রমথর বাবার হুঁকো টানার ঘড়াৎ ঘড়াৎ আওয়াজ।

অর্থাৎ এ-বাড়িতে আসার পর যত ঘটনা ঘটেছে, এটাই সবচেয়ে বড় এবং বিশ্রী এবং এর জন্যে প্রত্যেকটা ঘর সতর্ক। ফেরিওয়ালার পয়সা চুরি যাওয়ার পর থেকে উমাপাড়ায় মস্ত বড় আগুন, বৌকে ধরে মঙ্গলের রাত দুপুরে মার, কি রাত চৌয় কলেরা কেস্ সেরে এসে শেখর ডাক্তারের স্ত্রী প্রভাতকণাকে ঘুমিয়ে পড়েছিল বলে অশ্লীল ভাষায় গালি-গালাজ বা অমলকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ার কাহিনী বা হঠাৎ অবিশ্বাস্য রকম বীথির একটা ভাল চাকরি পেয়ে যাওয়ার সংবাদের সঙ্গে এ-ঘটনার একেবারে মিল নেই।

সেসব ঘটনায় এ ওর পক্ষ নিয়েছে এবং আর একদল গেছে বিপক্ষে। কিন্তু আজ প্রায় সবাই নিরপেক্ষ থাকতে চেষ্টা করছে।

আর আর প্রত্যেকটা ঘটনায় ঝগড়া-বিবাদ হয়েছে, কথা কাটাকাটি হয়েছে। প্রভাতকণার মেয়ে সুনীতি সেদিন বাড়ির সকলকে দেখিয়ে সিনেমা দেখে এসেছে, রেস্টুরেণ্টে খেয়ে এসেছে,—ঘটা করে সবিস্তারে মা সব বলছিল—এ-বাড়ির এ একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। সেই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কম ঝগড়া-বিবাদ হয়নি।

অর্থাৎ প্রভাতকণা স্থির করে ফেলেছে সুধীর তার ভাবি জামাতা। কিন্তু, কিন্তু শেখর ডাক্তার বাইরে থেকে একটা 'কারেক্ট ইনফরমেশন' নিয়ে আসে, যেজন্যে সুধীরকে আর কোনমতেই সুনীতির বর করা চলে না। এমনকি, তার সঙ্গে মেয়েকে মিশতে দেওয়াও অনুচিত।

বিকেলে মেয়েকে সিনেমা দেখতে পাঠিয়েছিল প্রভাতকণা সুধীরের সঙ্গে। যে গহনাগুলো সুনীতির বিয়েতে দেবার জন্যে গড়ানো, সেগুলো পরে সুনীতি সুধীরমামার সঙ্গে সিনেমা দেখতে বেরোয়, আর সেই রাত্রে খবর নিয়ে আসে সুনীতির বাবা। শেখর ডাক্তার পামারবাজার রোডে আসে তার বন্ধু উমাপদবাবুর কাছে, জানে সুধীরের সব বৃত্তান্ত। শিলচরের লোক উমাপদ ভট্টাচার্য। ডাক্তার। এলিও-প্যাথ। এখানে কলকাতায় এসে একটা সূত্রে পরিচয় ঘটেছে শেখরের সঙ্গে।

'বুড়ো মানুষ—মিথ্যা কথা বলেন না। আর তা-ছাড়া সুধীরের বাবার সঙ্গে তার শত্রুতাও নাই। দেশে থাকতে সুধীর উমাপদবাবুর কাছে তার অসুখের চিকিৎসা করায়। বড়লোকের ছেলে বেশ পয়সা খরচ করতে পেরেছিল তখন নিজের ব্যাধিটি সারাতে। প্রায় সেরে এসেছিল। বাপের ব্যবসা সংক্রান্ত কাজে হুট্ করে হঠাৎ চলে আসে কলকাতায়। অসুখটি জটিল। সম্পূর্ণরূপে আজও আরোগ্য হয়েছে কি না, উমাপদবাবু ব্লাড এগজামিন না করে বলতে পারেন না। তবে ছেলে বুদ্ধিমান। বাপের সম্পত্তি বাড়াতে না পারলেও কমতে দেবে না, এইটুকুন গ্যারাণ্টি দেয়া যায়। এই হিসাবে পাত্র খারাপ না,—' ইত্যাদি।

'এখন কর্তব্য কি?'

সব বলা শেষ করে শেখর ডাক্তার রাত্রে স্ত্রীকে প্রশ্ন করেছিল। শুনে প্রভাতকণা চুপ করে থাকে।

কিন্তু খবর সেখানেই চাপা থাকে না। কুয়োতলায় যাবার সময় ডাক্তারের ঘরের ভেজানো পাল্লার সামনে একটু সময়ের জন্যে আড়ি পেতে থেকে প্রীতি-বীথির মা সব শুনে ফেলেছে।

ঘরে এসে বলেছে সে মেয়েদের কাছে।

তাই নিয়ে দু'বোন সারা রাত বিছানায় শুয়ে থেকে থেকে হেসে উঠেছে। বেশ জোরে। অর্থাৎ উত্তরের অপেক্ষায় তখন সুনীতির বাবা প্রভাতকণার মুখের দিকে তাকিয়ে:—'এই অবস্থায় সুধীরের হাতে মেয়েকে দেয়া উচিত হবে কি না, তুমিই বল। সুনীতির সর্বনাশ হবে, ভবিষ্যতে ওর গর্ভে যে সন্তানটি আসবে, তারও সর্বনাশ হবে।'

মুখ অন্ধকার করে প্রভাতকণা স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়েছিল।

সেই সময় প্রীতি ও বীথির খলখল হাসি তার কানে যায়।

তখনই একটা কিছু সন্দেহ করেছে। পরদিন সকালে প্রভাতকণার বুঝতে বাকি থাকে না। সুনীতি কুয়োতলায় মুখ ধুচ্ছে, এমন সময় বীথি গিয়ে সেখানে পড়ে। সুনীতিকে দেখে গত রাত্রির কথা মনে পড়তে বীথি খুক্ করে হেসে ওঠে। ঘরে ফিরে বীথি মাকে কথাটা বলতে প্রভাতকণা তৎক্ষণাৎ আঁশবঁটি নিয়ে ছুটে গিয়েছিল বীথিদের ঘরের দরজায়ঃ 'আপিসে নাম লেখাইয়া আসছিস, তুই আমার মাইয়ার সুখ দেইখা হিংসায় মরবি না তো মরবে কে, হারামজাদী—আয় তোর নাক কাটুম, আয় পোড়ারমুখি—'

হাতের বঁটি আন্দোলিত করে রণমূর্তি

প্রভাতকণা আস্ফালন করছিল আর চিৎকারে বারোটা ঘরের চালা কাঁপিয়ে তুলছিল। বীথি ভয় পেয়ে দরজার আড়ালে আশ্রয় নেয়, কিন্তু বড়বোন প্রীতি ছুটে এসে চৌকাঠের বাইরে দাঁড়ায়। 'আমি থানায় খবর দেব, তোমাকে পুলিশে দেব, বজ্জাত মাগি।' প্রীতির গলাও কিছু কম যায় নাঃ 'তোমার মেয়েকে দেখে বীথি হেসেছে বেশ করেছে, আমি হাসব, পাশের ঘরের লক্ষ্মীদি হাসবে, হিরণ বৌদি হাসবে, কমলা হাসবে, রুচিদি হাসবে। সবাই হাসবে। বড় যে মেয়ের বিয়ে বিয়ে করে তরপাচ্ছ, দাও না এখন সুধীরমামার সাথে বিয়ে। সুধীরের কি রোগখানা আছে, এখনো খবর পাওনি বুঝি। আঁশবঁটি নিয়ে ছুটে এসেছে এখানে, কত বড় বুকের পাটা—' প্রীতি দম নিচ্ছিল, আর সেই ফাঁকে প্রভাতকণা বুঝিবা তার ফুসফুস ফেটে যায়, এমন জোরে চিৎকার করে বলছিলঃ 'আয় কুত্তি, আগে তোর গলা কাটি—টেলিফুন আপিসের রোজগার খাইয়্যা গতরে তোর চর্বি জমছে বেশি, আয় চর্বি চাইছা দেই বঁটি দিয়া—' ইত্যাদি—

প্রীতি দরজার কাঠ নিয়ে ছুটে এসেছিল প্রভাতকণাকে মারতে। একটা রক্তারক্তি হত, কিন্তু বিধুমাস্টারের স্ত্রী, রুচি এবং আরো দু-একজন গিয়ে দু পক্ষকে থামিয়ে দেয়।

আজকের ঘটনায় রক্তপাত আছে, কিন্তু এই জন্যেই কি তার গুরুত্ব বেশি। কথাটা চিন্তা করছিল শিবনাথ। রক্তপাত ছাড়াও অন্য জিনিস আছে। রাজনীতি, পুলিসের তদন্ত, মামলা-মোদ্দমা, ক্ষতিপূরণ, কিম্বা জেল? অত্যন্ত বিশ্রী ব্যাপার। শিবনাথ চিরকাল এগুলিকে ঘৃণা করে। তার সাদামাঠা জীবনে এসবের স্থান নেই। চিরকাল সে এসব থেকে দূরে থেকেছে। বোধ করি, বাড়ির বাকি ঘরগুলোর এ সমস্ত ভয় আছে বলেই চুপ করে আছে, এখন বুঝতে কষ্ট হল না তার, আর একটা সিগারেট ধরিয়ে শিবনাথ নিশ্চুপ বসে থেকে তাই লক্ষ্য করছিল। কিন্তু সবচেয়ে অবাক হয়ে সে দেখল, যাদের ছেলেকে নিয়ে এই হাঙ্গামা, তারা যেন সকলের চেয়ে বেশি নীরব। বনমালীর দোকানের সামনে বেঞ্চে বসা কে গুপ্তর চেহারা মনে পড়ে শিবনাথের হাসি পেল এই কারণে যে, না হলে না হয়, জিজ্ঞেস না করলে নিতান্ত খারাপ দেখায় তাই, কে গুপ্ত তাকে তখন উটকো প্রশ্নটা করে বসল। 'মশাই, পারিজাত গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল, আপনি জানেন কিছু?'

প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে রমেশের কথার নড়চড় হতে পারে আশঙ্কা করে যে কে গুপ্ত প্রশ্ন করছিল না, শিবনাথ এ সম্পর্কে নিশ্চিন্ত ছিল।

মোটর অ্যাকসিডেণ্টের প্রসঙ্গটা ওঠার আগে তখন কি নিয়ে গুপ্ত তার চারু বন্ধুর সঙ্গে আলাপে মগ্ন ছিল চিন্তা করে শিবনাথ এখন অন্ধকারে নিজের মনে হাসল। আর ঘাড় ঘুরিয়ে কে গুপ্তর ঘরখানা দেখতে লাগল। এ-বাড়ির সবচেয়ে নীরব ঘর।

ঘরে আলো নেই। কেউ জেগে আছে কি না, তাও বোঝা যায় না। দরজার পাল্লার একটা খোলা, একটা ভেজানো।

যেন এই মাত্র হাঁটু অবধি ধুলো নিয়ে বেবি ঘরে ফিরেছে। হয়তো হাসপাতাল থেকে। কেননা, বাড়িতে ঢুকে শিবনাথ রুচির কাছে জানতে পারে, ছেলের গাড়ি-চাপা পড়ার খবর শুনে রুনুর মা, সুপ্রভা চুপ করে অনেকক্ষণ চৌকাঠ ধরে স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সম্পর্কে কাউকে আর কোন প্রশ্ন করেনি। যেন নিজের মনে চিন্তা করল। তারপর ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েছে। সন্ধ্যার পর ঘর থেকে আর তাকে কেউ বেরোতে দেখেনি। এত রাত অবধি শিবনাথও দেখল না। বেবিকে ক্ষিতীশ দোকান থেকে ছুটি দিয়েছিল রুনুর সঙ্গে হাসপাতালে যেতে। সম্ভবত ও এই হাসপাতাল থেকে এল।

শিবনাথ অনুমান করল, হাসপাতালের খবর তেমন খারাপ হলে ঘরে অন্তত এখন একটা কান্নাকাটি শোনা যাবে। কিন্তু তা শোনা না যাওয়াতে সে নিশ্চিন্ত হল। বেবি পায়ে হেঁটে শেয়ালদার ক্যাম্বেল হাসপাতাল থেকে ঘরে ফিরেছে। তাই পায়ে ধুলো। বীথিদের জানালার আলো বেবিদের বারান্দায় এসে পড়েছিল বলে শিবনাথ ধুলোটা দেখতে পায়। সম্ভবত বাস পাওয়া যায়নি। বাস পেলেও বেবিকে হেঁটে হাসপাতাল থেকে ফিরতে হত কিনা চিন্তা করে শিবনাথের পয়সার প্রশ্নটা ওঠে মনে।

রমেশ বা ক্ষিতীশ এই সময় দু'চার আনা দিয়ে মেয়েটাকে সাহায্য করার মত সদয় ছিল কি না, শিবনাথের সংশয় ছিল।

পারিজাত নিজে সেই গাড়িতে ছিল না—তিন-দিন ইনফ্লুয়েঞ্জায় শয্যাগত

যদি কে গ্নুপ্তকে রমেশ এই মিথ্যা সংবাদটা বলে থাকে তো কেন রমেশ তা করল বুঝতে শিবনাথের খুব বেশি ভাবতে হল না।

পারিজাত রমেশের একদিকে মনিব, অন্যদিকে বন্ধু। বড়লোক বন্ধু হলে রমেশ রায়ের মত 'করে খাওয়ার' লোকেরা আপদে বিপদে পড়েছে দেখলে বন্ধুকে সাহায্য করে। কে গুপ্ত বুঝতে না পারলেও শিবনাথ এ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। হয়তো ইতিমধ্যে বনমালীও এক-আধটা পাইট দিয়ে কে গুপ্তকে একটু ঠান্ডা রাখতে চেষ্টা করবে। কেন বনমালী তা করবে, শিবনাথ তা-ও বেশ বুঝতে পারছিল।

বনমালীর এই দোকান-ঘর এখনি ডবল টাকায় ভাড়া দেওয়া যায়, যদি তাকে এখন তুলে দেওয়া হয়। মুখে সে যতই পারিজাতের নিন্দাবাদ করুক, উচ্ছেদের মামলায় টাকা ঢালাঢালির প্রতিযোগিতায় সে যে কোনমতেই পারিজাতের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারবে না, বনমালী এ সম্পর্কে যথেষ্ট সজাগ। তাই এ ব্যাপারে সে নীরব। নিজের চোখে অ্যাকসিডেন্ট দেখেছে এবং কে রুনুকে গাড়ি চাপা দিলে সত্য কথা পুলিসকে বললে বিপদ হবে চিন্তা করে যে বনমালী 'বড়বাজারে মাল কিনতে গিয়েছিল' মিথ্যা কথা বলেছে শিবনাথের মনে তা-ও ইশারা দিয়ে গেল। আর থাকে চারু রায়। চারু রায় পরিষ্কার খুলেই বলেছে তার ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বার্থ আছে এ-তল্লাটে। সন্ধ্যার দিকে যখন ঝিঁ ঝিঁ ডাকছিল বাদাম গাছের নিচে যে জায়গায় অ্যাকসিডেন্ট হয়েছে শিবনাথ দেখে এসেছে সে জায়গা। বেশ অন্ধকার থাকে তখন ওধারটা। অন্তত কিছুক্ষণের জন্যে। তারপর অবশ্য কর্পোরেশনের লোক গ্যাসের বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে যায়। এবং আলো জ্বলবার পর রাস্তাটা ভাল দেখা যায় বলে আবার লোকজনের চলাফেরা আরম্ভ হয়। বাড়ির অধিকাংশ লোক তখনই ঘরে ফেরে। রুচি ফেরে, প্রীতি ফেরে। কমলা কোনদিন ফেরে, কোনদিন না। রুচি এবং ভুবনবাবুর দুই মেয়ে আজ দুর্ঘটনার আগেই বাড়ি ফিরেছে। কমলা ফেরেনি। আর ফিরলেও যদি সে স্বচক্ষে দুর্ঘটনা দেখত, ঘরে এসে রুনুর মা সুপ্রভাকে এসে ঠিক কি বলতো চিন্তা করল শিবনাথ।

শিবনাথ প্রত্যেকের বিষয়ে আলাদা-ভাবে চিন্তা করল এজন্যে যে, এ-বাড়ির রুনুর গাড়িচাপা পড়া ও পারিজাতের হঠাৎ একটা অ্যাকসিডেণ্টের মামলায় জড়িয়ে পড়ার সঙ্গে শিবনাথের ঠিক কালই ও-বাড়ির টুইশানি পাওয়ার একটা সম্পর্ক আছে। এর জন্যে, এই গোলমালে পড়ে পারিজাত কি তাঁর স্ত্রী হয়তো শিবনাথের সঙ্গে কাল কথাই বলবে না। অর্থাৎ সবটা জিনিস পিছিয়ে যাবে। হয়তো টুইশানিটা সে আর পাবেই না। তার কারণ রমেশ যেখানে বলছে পারিজাত অসুস্থ, তিন দিন শয্যাশায়ী, শিবনাথ বলবে ঘটনার একটু আগে, বিকেলে সে পারিজাতের ছেলেমেয়েদের প্রাইভেট টিউটারের পদপ্রার্থী হয়ে রায় সাহেবের

বাংলোয় যায় এবং তখন দেখে এসেছে, পারিজাত গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে। অর্থাৎ রমেশের রিপোর্ট ভুল। কিন্তু—

আবার এ-ও চিন্তা করল শিবনাথ, সেখান থেকে বেরিয়ে বাড়ি এসে পরে সে বাজারে যায়। হয়তো সে যখন বাজারে ছিল, তখন অ্যাকসিডেণ্ট হয়। কিন্তু সে সময়ে, অর্থাৎ বৌয়ের সঙ্গে রাগ করে গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে মাঝ রাস্তা থেকে আবার যে পারিজাত বৌয়ের মন রাখতে তখনি ঘরে ফিরে যায়নি, তা-ই বা কে জানে। অর্থাৎ একটা পিঁপড়েকেও চাপা না দিয়ে? কিন্তু রমেশের ইনফ্লুয়েঞ্জার বর্ণনাটাই সব গোলমাল করে দিচ্ছিল।

একটা মিথ্যা অনেক মিথ্যাকে টেনে আনে।

বস্তুত, বলতে কি, কে গুপ্তকে হুট্ করে মিথ্যা কথাটা বলে এসে শিবনাথের মন খচ্‌খচ্ করছিল।

করছিল আর যেন কেমন একটু অপরাধীর চোখে সে কে গুপ্তর ঘর দেখছিল।

রাত্রে ওদের খাওয়া-দাওয়া কিছু হয়নি অনুমান করা শক্ত না, কেননা, এখানে এসেছে পর শিবনাথ শুনছে পাশের ঘরে রুনু কিছু শাকসব্জি সংগ্রহ করে আনলে তবে সেটা দিয়ে রাত্রির পর্ব সারা হয়। সিদ্ধ বা অ-সিদ্ধ।

আজ রুনু অনুপস্থিত।

বেবি যে হাসপাতাল যাবার আগে মাকে একটু চা-বিস্কুট খাইয়ে গেছে, সেটাও বিশেষ ভরসা করা যায় না।

সারা বাড়ি নিঝুম।

এক বীথি যদি ওধারের বারান্দায় দাঁড়িয়ে ওর ভিজে তোয়ালের জল ঝাড়তে ফটাস্ করে একটা শব্দ না করত, তো শিবনাথের মনে হত সারাটা বাড়িই বুঝি হাসপাতালে রুনুর অবস্থা এখন কিরকম ভেবে—চিন্তায় বিষণ্ণ মৃতপ্রায়।

কিন্তু তা না, শিবনাথ হৃষ্টমনে ন'নম্বর ঘরে নতুন কিনে-আনা ল্যাম্পটার স্বচ্ছ আলো বিভাসিত আঠারো বসন্ত-ঘেরা একটি যুবতীর বক্ষ দেখে শিউরে উঠল।

এক সেকেণ্ড। এক সেকেণ্ড কাপড়টা বুক থেকে সরিয়ে বীথি আর একবার তোয়ালেটা চেপে ধরে বাকি জলটুকু শুষতে চাইল, কিন্তু অন্ধকারে কেউ তাকিয়ে দেখছে, কোন ঘরের খোলা জানালায় পুরুষ দাঁড়িয়ে, টের পেয়ে যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট বীথি বারান্দা ছেড়ে এক ঝটকায় ঘরের ভিতর অদৃশ্য হল। আলোটা নিভল। কেউ ওদের তাকিয়ে দেখছে টের পেতে সংসারে মেয়েদের জুড়ি নেই। যেন গন্ধে ওরা টের পায়। শিবনাথ নিজের মনে হাসল এবং চাপা রুদ্ধ একটা নিশ্বাস ফেলে তার জানালার পাল্লা দুটোও ভেজিয়ে দিলে। তাছাড়া ঠাণ্ডা পড়ছিল। রাত বেশি হয়েছে। না রাত্রে বিছানায় শুয়ে শিবনাথ এটাকে একটা কিছু অপমান বলে মনে করল না। এবং তার নিজের দিক থেকেও এভাবে চুরি করে বীথিকে দেখাটা অপরাধ বলেই গণ্য করতে পারল না। বরং, যেন শিবনাথের মনে একটা তুলনামূলক সমালোচনা এল। যেমন জীবনের তীব্র ট্র্যাজেডি ভুলতে বড়লোক মোহিত বেশ্যাসক্ত হয়েছে বা জীবনের চরম ব্যর্থতা ভুলতে কে গুপ্ত মদের আশ্রয় নিয়েছে, তেমনি শিবনাথও যেন একটা অস্বস্তিকর অপ্রীতিকর ঘটনা ভুলতে কতক্ষণের জন্যে মনটাকে অন্যদিকে ব্যাপৃত রাখতে চাইল। এই অন্ধকার একটা ঘরে হাতের কাছে সে আর কী নেশা পাচ্ছিল যে, পাশের ঘরের ছেলেটির গাড়িচাপা পড়ার দুঃসংবাদ পেয়ে এবং এই নিয়ে বনমালীর দোকানের সামনে সে নিজেও কিছুক্ষণ কথাবার্তা বলে এসে এখন অনিদ্রার বিশ্রী অবাঞ্ছিত সময়টা কাটাতে পারতো।

এদিক থেকে শিবনাথ দুঃখী বৈকি। রাত্রির এই গাঢ় প্রহরে স্ত্রীর সঙ্গে দুটো কথা বলে মন হাল্কা করার ভাগ্য শিবনাথের নেই। কেননা, রুচিকে ঘুমোতে না দিলে কাল সারাদিন স্কুলে বেরুবার শরীর মেজাজ ভাল থাকবে না। তার ঘুমের দরকার। বস্তুত মিথ্যা হলেও শিবনাথের একটা দুঃখ তো বটেই।

এবং বড় দুঃখ ভুলতে বড় বড় নেশার যেমন দরকার, তেমনি ছোট দুঃখ, একটু আধটু ব্যথা ভুলতে হাত বাড়ালেই অনেক ছোটখাটো এমনি মিছিমিছি দ্রব্য পাওয়া যায় জীবনে, এই অভিজ্ঞতা নতুন না হলেও শিবনাথ আর একবার তার স্বাদ অনুভব করে রোমাঞ্চিত হল। এবং অন্ধকারে অনেকক্ষণ ঘুমোতে চেষ্টা করেও যখন ঘুমের পরিবর্তে বীথির নগ্ন সুডোল কুমারী বুকের ছবিটা চোখের সামনে ভেসে ভেসে উঠতে লাগল, তখন অতি সন্তর্পণে সেই অদ্ভুত জ্বলন্ত নেশা ভুলতে ভয়ে ভয়ে নিজের হাতখানা বাড়িয়ে রুচির তখন মৃতপ্রায় বলা চলে এবং এখানে ওখানে একটু আধটু হাড় বেরকরা কোমরের ওপর সেটা রাখল ও ঘুমোতে চেষ্টা করল।

(ক্রমশ)

উত্তমপুরুষ

[শিল্পীর স্বর্গ]

কোন শ্রদ্ধেয় বন্ধু সম্প্রতি সোভিয়েট দেশ সফর করে ফিরে এসেছেন। সাত-নকলে-আসল-খাস্তা বিবরণ পড়ে অরুচি ধরে গেছে, ওদেশের কিছু হাতে-গরম খবর পাব বলে তাঁর কাছে উবু হয়ে বসলুম। শিল্পীদের প্রতিষ্ঠা আর বৈভবের কথা যা শোনা গেল সেটা এদেশে তো বটেই, য়ুরোপের বহু দেশেও অভাবনীয়। সোভিয়েট দেশ খাতাপত্রে নিঃশ্রেণী, তবু একটা বর্ণচোরা বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা আছেই। রাজনীতিধুরন্ধরেরা যদি ক্ষত্রিয়, শিল্পীরা তবে ব্রাহ্মণ, তাঁদের স্থান সর্বাগ্রে। একটি গল্পের দক্ষিণা আমাদের দেশে উপন্যাসের রয়ালটির প্রায় সমান, আর উপন্যাসে কোন্ না লাখখানেক রুবল পকেটে উঠবে। লেখকদের স্বার্থরক্ষার এবং অধিকার ইত্যাদি নিয়ে লড়বার জন্য ট্রেড্ য়ুনিয়ন পর্যন্ত আছে। শুনে রোমাঞ্চ হয়েছিল, রসনায় রসসঞ্চারও হত, যদি না শ্রদ্ধেয় বন্ধু অতঃপর বলতেন, কিন্তু ভায়া হে, একটা ফুলের দামই তিন রুবল। (বাট্টার হার টাকার প্রায় সমান-সমান)। ফুলের ঘায়েই মূর্ছা যাবার জো, একটা পিরেনের দাম কত জিজ্ঞাসা করে তাঁকে আর বিব্রত করিনি। রাষ্ট্রের খবরদারির কথাটাও না। কেননা, ভেবে দেখেছি নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা কোথাও নেই, এদেশেও না, ওদেশেও না। এদেশে লেখকের ভাগ্যবিধাতা প্রকাশক, সম্পাদক বা সিনেমা প্রযোজক, ওদেশে না হয় রাষ্ট্ররথসারথিরা। তাতে শিল্প কিছু রসাতলে যায় না। ভারতেও তো এক কালে বিক্রমাদিত্যরাই স্থির করতেন, কালিদাস মালা পাবেন, না দিঙ্নাগ।

যাঁর কথা লিখছি, সেই শ্রদ্ধেয় বন্ধু বেতারবক্তৃতা ইত্যাদি দিয়ে সোভিয়েট-সফরকালে কিছু অর্থ উপার্জন করেছিলেন। কিন্তু পরলোকে যেমন কর্মফল ছাড়া কিছু সঙ্গে যায় না, তেমনি সোভিয়েট দর্শনের পুণ্যটুকু ছাড়া ওদেশের বাইরে কিছু আনা চলে না, রুবল তো নয়ই। বিনিময়ের বড় কড়াকড়ি, কেনাকাটা যা-কিছু রুশিয়াতেই সেরে ফিরতে হয়। তাঁর বেলাতেও নগদ বিদায় ঘটেনি, বন্ধুটি সখেদে বললেন।
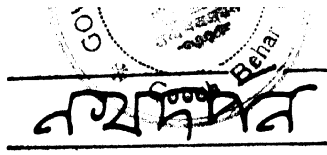
সঙ্গে সঙ্গে আমার কোয়েশলার-কথিত অভিজ্ঞতার কথা মনে পড়ে গেল। যখনকার কথা, তখনও কোয়েশলার পুরোদস্তুর কম্যুনিস্ট। সহজে রেল-টিকিট পেয়েছেন; কামরায় হাত-পা ছড়িয়ে তোফা শোবার বন্দোবস্ত, রেস্তোরাঁয় সেরা খানা। আর, প্রায় সবটাই নিখরচায়। জামাই-আদর পেতে পেতে কোয়েশলার উপনীত হলেন, ধরুন, টিফলিস শহরে। স্থানীয় লেখক সংস্থার সভ্যেরা তাঁকে পেয়ে আত্মহারা, মীটিং ব্যাঙ্কোয়েট প্রভৃতির প্রোগ্রাম তৎক্ষণাৎ ঠিক হয়ে গেল। স্থানীয় একটি সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন, আমার বহুদিনের সাধ আপনার একটি গল্প ছাপব। বিনাবাক্যব্যয়ে কোয়েশলার তাঁর হাতে অল্পকাল পূর্বে জর্মনভাষায় প্রকাশিত একটি গল্পের কপি তুলে দিলেন। সেদিনই হোটেলে ফিরে দেখেন, কী আশ্চর্য, ইতিমধ্যে তাঁর নামে দু' হাজার রুব্লের একটি চেক পৌঁছে গেছে। পরদিন এলেন স্টেট্ পাব্লিশিং হৌসের অধিকর্তা।—'আপনার পরবর্তী বইয়ের জর্জীয় তর্জমা প্রকাশের অনুমতি চাই।' পরবর্তী? কোয়েশলার তখন পর্যন্ত একখানি বইও লেখেননি। তবু ঢোক গিলে বললেন, তথাস্তু। আরও কয়েক হাজার রুব্ল পকেটে এল। এই-ভাবে লেনিনগ্রাদ থেকে তাশকেন্ট পর্যন্ত আট দশটি কাগজে কোয়েশলার একই গল্প বিক্রী করলেন; রুশ, জর্মন, য়ুক্রেনিয়ান, জর্জীয়ান, আর্মেনিয়ান ভাষায় তাঁর অলিখিত গ্রন্থটি অনুবাদের ব্যবস্থাও হল। কেন্দ্রীয় গ্রন্থ-প্রকাশনীর সঙ্গেও তিনি একটি চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। প্রথম সংস্করণে দেড় লক্ষ কপি ছাপা হবে, এইমাত্র শর্ত। পুরো টাকাটাই অগ্রিম পেয়ে কোয়েশলার হস্তগতস্বর্গসুখে ভাবলেন, অহো, য়ুরোপের সবচেয়ে নামজাদা লেখকের রয়ালটিও এর পনেরো ভাগের এক ভাগ বইয়ের উপর নির্ধারিত হয়ে থাকে। (বঙ্গভাষার লেখকেরা হিসেবটা একবার খতিয়ে দেখবেন, তাঁদের বইয়ের মুদ্রণ-সংখ্যা এক সংস্করণে এক হাজার কপি মাত্র, কদাচিৎ দুই।) এত বই এক সঙ্গে ছাপার হেতু আছে বৈকি। রুশ নাগরিক মার্কিন নাগরিকের চেয়ে গড়ে শতকরা ২৩১·৫৭ ভাগ বই বেশি কেনে (দশমিকটা কিছু গোলমেলে, কিন্তু সোভিয়েট পরিসংখ্যানে সবই শতকরা, সবই দশমিক)। এই হার এতদিনে বৃদ্ধি পেতে পেতে নিশ্চয় ৩৬৪·৮৭এ পৌঁচেছে।

এত রুব্ল কোয়েশলার, বলা বাহুল্য, সঙ্গে করে আনতে পারেননি, শেষ পর্যন্ত কয়েকটি উৎকৃষ্ট বোখারা কার্পেট মাত্র সংগ্রহ করে ফিরেছিলেন। বাকী টাকাটা বাজেয়াপ্ত না হয়ে থাকলে এখনও মস্কোর স্টেট্ ব্যাঙ্কে জমা আছে।

• •

ভাষার দেয়াল

নোবেল পুরস্কার য়ুরোপ আর আমেরিকারই একচেটিয়া এশিয়ার ভাগ্যে শিকে প্রায় ছেঁড়েই না, সম্প্রতি কোন আলোচনায় এমন একটি খেদোক্তি পড়েছিলুম। লেখক পরামর্শ দিয়েছেন, পুরস্কারটিকে বিশ্বের সাহিত্যকৃতির চরম সম্মান বলে যদি গণ্য করতেই হয়, তবে আঞ্চলিক বোর্ড গঠন করা হ'ক, এবং চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগে এ'দের সুপারিশ যেন বিবেচনা করা হয়। পরামর্শটি ভালো, কিন্তু ন্যায়বিচারের পক্ষে যথেষ্ট কিনা সন্দেহ। চিত্রশিল্পীরা কতকটা সৌভাগ্যবান, তাঁদের রঙ আর তুলির 'এস্পেরান্টো' আছে, কিন্তু কথাশিল্পীদের ভাষার দেয়ালে মাথা কুটে মরতেই হয়। জর্মন-ফরাসী-ইংরাজী-নরোয়েজীয় ভাষায় পারস্পরিক লেন-দেন বেশি, তবু সেখানেও মূল্যবিচারে

অবিচারের নজীর আছে। বহু নমস্য লেখক পুরস্কার পেয়েছেন শিল্পীজীবনের অন্তর্জলির পরে, অনেকে একেবারেই পাননি, কখনও কখনও রাজনৈতিক কারণে। যথা, আপটন সিনক্লেয়ারের নামে নোবেল কমিটি কানে আঙুল দেন, পুরস্কার তুলে দেন সিনক্লেয়ার ল্যুইসের হাতে। ম্যমের দীর্ঘ সাহিত্যসাধনার চেয়ে চার্চিলের সমর গ্রন্থাবলীর দিকে পাল্লা ঝুঁকে পড়ে।

আঞ্চলিক ভাষা কমিটি তৈরি হবে মেনে নিলুম, কিন্তু ক'টি। চীনা জাপানী আরবী ফার্সি'র খবর রাখি না, এই ভারতেই স্বীকৃত ভাষা আছে মোট চৌদ্দটি। ভারতের জন্যেই চৌদ্দটি কমিটি হবে আশা রাখি না, অথচ আঞ্চলিক বিচার হিন্দীর মাধ্যমে হলে 'নিরালা', 'উজালা' প্রভৃতিরই পোয়াবারো। আবার ইংরাজী তর্জমা দেখে বিচার হলে আঞ্চলিক কমিটি গঠন নিরর্থক। এও দেখি, ভাল অনুবাদ নেই বলে আইসল্যাণ্ডের অখ্যাত লেখকের নামও বিচারিত হয়, তবু যে-দেশ 'গীতাঞ্জলি' দিয়েছে তার কথা নোবেল কমিটির দ্বিতীয়বার মনে পড়ে না। **For whom the Bell Tolls** একটি অসাধারণ উপন্যাস সন্দেহ নেই, কিন্তু এই গ্রন্থের লেখকের কীর্তি এ-কালের শ্রেষ্ঠ বাঙালী কথাশিল্পীদের রচনার চেয়ে মহত্তর, হীনম্মন্যতার বশে এ-কথা কখনও যেন না ভাবি।

অনেকে এই উক্তিতে প্রাদেশিকতার গন্ধ পাবেন। কিন্তু কারণ না থাকলে কথাটা এতটা জোরের সঙ্গে লিখতুম না। ভালো অনুবাদ এবং প্রচারের অভাবে বিদেশে ভারতীয় সাহিত্যের প্রতি কী অবিচার ঘটে আমরা অনেক সময় জানতেও পাই না। **'Best Stories of India and Pakistan'** নামে কিছুকাল আগে মস্কোতে একটি সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। কাদের রচনা সংগৃহীত হয়েছে অনুমান করুন। রবীন্দ্রনাথ? না। শরৎচন্দ্র? না। সংকলনটির লেখক-গোষ্ঠীতে আছেন মুলকরাজ আনন্দ, কিষেণ চন্দর, খাজা আহমদ আব্বাস। একটিমাত্র বাঙালী এই বিদেশী কথা-মালায় স্থান পেয়েছেন, তাঁর নাম ভবানী ভট্টাচার্য। জানিনে মাতৃভাষায় উল্লেখ-যোগ্য কিছু লিখেছেন কিনা।

এবার অবিচারের অন্যরকম নমুনা দিই। মার্কিন মুলুকে সমরসেট ম্যমকে একবার কোন সম্পাদক পৃথিবীর দশটি সেরা উপন্যাসের নাম বলতে অনুরোধ করেন। ম্যম্ ইংরাজী-ফরাসী-রুশ ভাষায় লেখা দশটি বইয়ের নাম অবলীলাক্রমে বলে গেলেন। পরে ম্যম্ লিখেছেন, 'লিস্টি বোধ হয় ঠিক হল না, বিচারটা খামখেয়ালীগোছের হল। আমি অনায়াসেই আরও এমন দশটি বইয়ের নাম বলতে পারতুম।' পারতেন, আমরাও জানি। এও জানি, আরও দশটি কেন, বিশটি বইয়ের নাম বলতে হলেও 'গোরা', 'গৃহদাহ' বা 'গোদানের' কথা ম্যমের মনে পড়ত না।

দুর্গামূর্তির আধুনিক রূপ

শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত

আজিকার দিনে সার্বজনীন দুর্গোৎসবের প্রসারে দুর্গা-মূর্তির বিভিন্ন রূপকল্পনা জনসমূহের মধ্যে সমাদর লাভ করিয়াছে, শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন স্থানে পরিকল্পনার মৌলিকতার জন্য যেন একটা প্রতি-যোগিতার সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। পূর্বে যাহা পূজার ব্যাপার শুধু ছিল, সেস্থানে "আর্ট" নামধেয় এক বস্তু প্রবেশ করিয়া উন্দামতা প্রচণ্ড করিয়া তুলিয়াছে। পূর্বে বাংলার কুম্ভকারেরা একটা বিশেষ চিরাচরিত ধারা অনুসরণ করিয়া মূর্তি গড়িয়াছেন; এখন ভারতের বিভিন্ন প্রাচীন ধারা (গুপ্ত, পাল ও দ্রাবিড়ের—এই তিন শ্রেণীরই চেষ্টা এখনকার দুর্গামূর্তিতে আমি লক্ষ্য করিয়াছি) অনুকরণ করিতে গিয়া বাংলার নিজস্ব মৃৎশিল্পে এক ভীষণ বিপর্যয় সংঘটিত হইয়াছে। বাংলার যে একটা নিজস্ব শিল্পরীতি আছে, তাহা আর্য ভারতীয় (উত্তর ভারতীয়) এবং দ্রাবিড় রীতি (দক্ষিণ ভারতীয়) হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। উহা লুপ্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে এবং তাহার স্থানে যে ক্লাসিক্যাল ইণ্ডিয়ান আর্ট বা প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের চেষ্টা চলিতেছে, তাহা ফলবান হওয়া দূরে থাকুক, তাহা অত্যন্ত অক্ষমতা এবং বিকৃত রুচিরই পরিচয় দিতেছে। যাঁহারা আজিকার দিনে এই নবপ্রচেষ্টায় উদ্দীপনা লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের ভাল মন্দ সুরুচি কুরুচি ভাবিয়া দেখিবার ক্ষমতা নাই, একটা নূতন জিনিস হইলেই যেন ভাল হইল, চটকদার হইলেই যেন ভাল জিনিস হয়! আপনারা মনে রাখিবেন—Novelty is a dangerous thing.

একারণে কারো কারো মনে এই সকল তথাকথিত "আর্ট"-বাদী বা নব্য-নবীনদের বিরুদ্ধে সংশয় জাগিয়াছে; তাঁহারা এই সকল মূর্তির শিল্পনীতি ও সুরুচি সম্বন্ধে প্রশ্ন করিয়াছেন। সাময়িক পত্রে এ বিষয়ে বাদানুবাদ হইয়াছে। আমার মনে হয়, এই সমস্যাটাকে একটা লঘু ব্যাপার মনে করিয়া চুপ করিয়া থাকা উচিত নহে, চিন্তাশীল বাঙ্গালীদের দৃঢ়ভাবে এরূপ মূর্তিনীতি সম্বন্ধে তাঁহাদের মতবাদ জানানো উচিত। কারণ দুর্গাপূজা আগে ছিল একান্ত বাঙ্গালীর ঘরোয়া পূজা, এখন ইহা প্রায় সর্বভারতীয় শ্রেষ্ঠ উৎসব হইতে চলিয়াছে; কাগজে যখন পড়ি, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রবাসী বাঙ্গালীরা মহাসমারোহে দুর্গা-পূজা করিতেছেন এবং অন্য প্রদেশবাসীরা বাঙ্গালীদের সঙ্গে একত্রে পূজার আনন্দ উপভোগ করিতেছেন, এই উৎসব অবলম্বন করিয়া বাঙ্গলার সংস্কৃতি—শিল্প, অভি-নয়, সংগীত, নৃত্য আলোচনা প্রভৃতি অন্যান্য প্রদেশবাসীদের মধ্যে বিস্তৃতিলাভ করিতেছে, তখন সত্যই বড় আনন্দ হয়*।

কাজেই দুর্গামূর্তি শিল্পকে সর্বাঙ্গ-সুন্দর এবং রুচিসম্পন্ন করা উচিত, যাহাতে শুধু উৎসব বিলাস এবং ভোগ-বিলাসের যূপকাষ্ঠে আমাদের ধর্ম, শিল্প ও সংস্কৃতিকে বলি দিতে না হয়। মূর্তি সম্বন্ধে অনেকে বিকৃত রুচির প্রশ্ন তুলিয়াছেন, কথাটা একেবারে মিথ্যা নহে। কোন কোন দুর্গা ও সরস্বতী মূর্তিতে যৌন-আবেদন প্রকট (সেক্স অ্যাপীল), কোন স্থলে উহা "ভালগারিজম্"এর

* ত্রিবাঙ্কুরের এক বাঙ্গালীর মুখে শুনিলাম, এবার ওখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীরা সুন্দর মূর্তি গড়িয়া মহাসমারোহে দুর্গা-পূজা করিয়াছেন। মূর্তি বাংলার ঐতিহ্য অনুযায়ী নির্মিত হইয়াছিল এবং ডাকের সাজে সজ্জিত করা হইয়াছিল, খুব চমৎকার নাকি হইয়াছিল। তদ্দেশীয় অর্থাৎ মালাবারী শিল্পী শ্রী পি হরিহরণ উহার পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, তিনি শান্তিনিকেতনে নন্দলালের কাছে শিক্ষা পাইয়াছেন। তিনি অবাঙ্গালী হইয়াও বাংলার প্রাচীন রীতি অনুসরণ করিয়াছেন।

মহাবলী পুরমের পর্বতগুহায় দুর্গা মূর্তি, পল্লব-রীতি ৮ম শতাব্দী

পর্যায়ে পড়ে। কুরুচি যে শুধু মূর্তি-নির্মাণের মধ্যেই নিবদ্ধ তাহা নহে, মূর্তি-নিরঞ্জনের কালে শোভাযাত্রায় কখনো কখনো মোটর-লরীতে মূর্তির সম্মুখে প্রবল উৎসাহীরা যেরূপ সঙ রাস্তার জনসাধারণকে দেখাইয়া থাকেন, তাহা অত্যন্ত রুচিবিগর্হিত এবং লজ্জাজনক। শুনিয়াছি, এক সময় কলিকাতার জেলেপাড়ার সঙ নাকি বিকৃত আমোদ বিতরণ করিত। আমি জেলেপাড়ার সঙ দেখি নাই। কলিকাতার ফুটপাথে দাঁড়াইয়া একবার স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সরস্বতী পূজার শোভাযাত্রা দেখিতেছি, আমার সংগী ছিলেন একজন কলিকাতার লোক। তিনি বলিলেন, "এ যে জেলেপাড়ার সঙ দেখছি।" ঢাকার জন্মাষ্টমীর মিছিল দেখিয়াছি, তাহাতে ঢাকার কারু-শিল্পীদের নৈপুণ্যের বহু নিদর্শন থাকিলেও, শোভাযাত্রার সঙ কোন সময় রুচির সীমা অতিক্রম করিয়া গিয়াছে, এজন্য ঢাকার তৎকালীন কাগজে এ বিষয়ে নিন্দা দেখিয়াছি। রুচিহীনতার প্রশ্ন যদি কেহ তুলিয়া থাকেন, "আর্ট" উৎসাহীরা তাহা কোন মতেই খণ্ডন করিতে পারেন না।

আজিকার দিনে কেহ কেহ বাঙলার লোকশিল্পের স্থানে ক্লাসিক্যাল আর্ট-এর আমদানী করিতে চান—তাহা বড় কঠিন ব্যাপার, ইহা শিক্ষা-সাপেক্ষ। আমাদের বাঙলার কুম্ভকারেরা, যাঁহারা পিতৃ-পিতামহের শিক্ষা অনুযায়ী যে মূর্তি গড়িয়া আসিতেছেন, উহার স্থানে প্রাচীন ভারতীয় রীতি অনুধাবন করা সম্ভব নহে এবং জনসাধারণের পক্ষেও উহার রুচি, বিশুদ্ধতা, আভিজাত্য, সম্ভ্রমতা বোঝা কঠিন। শিক্ষা, সংস্কৃতি প্রভৃতি বুলি শুধু মুখে আওড়াইলেই তাহা উঠিয়া আসে না, ইহার জন্য প্রকৃত শিক্ষা, অধ্যয়ন এবং অনুশীলনের প্রয়োজন। প্রাচীন শিল্পের কয়েকটা "ফরমুলা" কয়েকটি "মোটিভ" লক্ষ্য করিয়াই মনে করি প্রাচীন ভারতীয় শিল্প হইয়া গেল। কিন্তু কাহারো ভাল-মন্দ বিচার করিয়া এটুকু বুঝিবার চেষ্টা নাই যে, প্রাচীন শিল্প "ফরমুলা" অপেক্ষা গভীরতর; কাজেই অধুনা বাঙলার মূর্তি-শিল্প প্রাচীন শিল্পের পুনরাবৃত্তি না হইয়া উহার ক্যারিকেচার বা হাস্যজনক অনুকৃতির চেষ্টা হইয়াছে। কুম্ভকারদের উপর আমাদের নব্য-মত চাপাইয়া না দিয়া তাঁহাদের যদি স্বাধীনভাবে মূর্তি-নির্মাণ করিতে ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাঁহারা নিশ্চয়ই ইহা অপেক্ষা অধিক মনোহর মূর্তি-নির্মাণ করিতে সক্ষম হইবেন, তাঁহারা ভারতীয় শিল্পের "ক্লাসিজম" আনয়ন করিতে সক্ষম হইবেন না সত্য; কিন্তু তাঁহারা কখনো বিকৃত রুচির পরিচয় দিবেন না এবং শালীনতার অভাব দেখাইবেন না। ইহাও ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, বাঙলার লোক-শিল্পে কি সৌন্দর্যের রুচি নাই? সৌন্দর্য কি শুধু প্রাচীন ভারতীয় শিল্পের মধ্যে সীমাবদ্ধ?

যবদ্বীপের ভাস্কর্যে দুর্গামূর্তি
(১১শ—১৩শ শতাব্দী)

এই প্রসংগে নন্দলালের দুর্গামূর্তির চিত্র সম্বন্ধে উল্লেখ করার প্রয়োজন মনে করি। আমি ইতিপূর্বে (দেশ পূজা সংখ্যা) বাঙলার আধুনিক দুর্গামূর্তিতে তাঁহার প্রভাবের কথা উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাঁহার প্রেরণালব্ধ গুপ্ত বা পাল-রীতির দুই-একখানা উৎকৃষ্ট প্রশংসার্হ মূর্তি দেখিয়াছি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই তাহার উৎকট ব্যাভিচার লক্ষ্য করা গিয়াছে। নন্দলালকে অনুকরণ করিতে গিয়া বাঙলার মৃৎশিল্পে একটা ভয়ানক "ডেকাডেন্স" এবং বিপর্যয় আসিয়া পড়িয়াছে, সেজন্য শিল্পাচার্য দায়ী কি?

নন্দলাল যেভাবে ক্লাসিক্যাল আর্ট বুঝিয়াছেন এবং নিবিষ্টচিত্তে বহুকাল-ব্যাপী অনুশীলন করিয়াছেন ও তাঁহার সাধনা করিয়াছেন, শিক্ষাবিহীন (এই শব্দে আমি ক্লাসিক্যাল ট্রেনিং বুঝাইতেছি প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা শিক্ষাহীন নহেন তাঁহারা বংশানুক্রমে বাঙলার ঐতিহ্যে অভ্যস্ত) গ্রাম্য কুম্ভকারদের সাধারণের ফরমাসমাফিক হঠাৎ রাতারাতি সেই রকম পঞ্চম শতাব্দীর গুপ্ত আদর্শে ফিরিয়া যাওয়া একেবারে অসম্ভব ব্যাপার।

পাটলীপুত্রের ইম্পেরিয়্যাল গুপ্তদের রিফিউজি প্রোব্লেম, বেকার-সমস্যা, শ্রমিক আন্দোলন, আর নিত্য নূতন স্ট্রাইকের ভাবনা ভাবিতে হয় নাই; তাই তাঁহারা তাঁহাদের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা সম্পূর্ণরূপে শিল্পসৃষ্টির জন্য নিয়োজিত করিয়াছিলেন, একদিন গুপ্ত-আদর্শ সারা এশিয়ার শিল্পে প্রাধান্যলাভ করিয়াছিল। "দি ইণ্ডিয়ান নেপোলিয়ান" সমুদ্রগুপ্তের রণহুঙ্কার স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাঁহার বীণার ঝঙ্কার আজো বহু শতাব্দীর পথ বাহিয়া আমাদের হৃৎপিণ্ডে স্পন্দন জাগাইতেছে। আধুনিক যুগের ঐতিহাসিক বিপর্যয়ে আমাদের রাষ্ট্র হইতে এতটা আশা করিতে পারি না এবং উচিতও না, পাটলীপুত্রের দরবার আমাদের কল্পনাতেই থাকুক। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার কাব্যে গুপ্তযুগকে শুধু কল্পনার চক্ষেই দেখিয়েছেন, "আমি যদি জন্ম নিতেম কালিদাসের কালে।"

বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতিতে সেই দেড় হাজার বৎসর পূর্বের শিক্ষা কি ফিরাইয়া আনা সম্ভব? আর একটা কথা টেকনিক এবং মিডিয়ামএর দিক হইতেঃ পাথর, ব্রোঞ্জ, পিতল, মাটি প্রত্যেক পদার্থেরই একটা প্রকাশ-ভঙ্গী আছে। পাথরের বৈশিষ্ট্য পাওয়া যাইবে মিশর ও ভারতীয় ভাস্কর্যে, ব্রোঞ্জ বা পিতলের বৈশিষ্ট্য চোল ও তিব্বতীয় মূর্তিতে এবং মাটির বৈশিষ্ট্য বাঙলার টেরাকোটা (বাঙলা টেরাকোটায় আশ্চর্য-সুন্দর শিল্প-নৈপুণ্য দেখা যায়) ও কাঁচা মাটির মূর্তিতে (অবশ্য চীন-জাপানের প্রসংগ প্রবন্ধ দীর্ঘ হওয়ার ভয়ে তুলিলাম না)। অধুনা ইউরোপের কোন কোন ভাস্কর আছেন, যাঁহারা বিশেষ এক পদার্থের ভাস্কর্যে অন্য পদার্থের অনুকরণ করিয়া থাকেন, কোন কোন সমালোচকের মতে ইহা নিন্দনীয়। তাঁহাদের মতে, যখন যে পদার্থে মূর্তি গঠিত হইবে, সেই পদার্থেরই বৈশিষ্ট্য (ক্যারেক্টর) রক্ষা করা উচিত। এই মতবাদ যদি আমরা সমর্থন করি, বাঙলার মূর্তি-শিল্পে বাঙলার ট্রেডিশনেরই পৃষ্ঠপোষকতা করা উচিত।

দুর্গামূর্তিতে কোথাও পাথরের হুবহু নকল দেখিয়াছি, এমন কি আগাগোড়া শুধু বেলে পাথরের রং, যেন বেলে পাথরে মূর্তি খোদাই। কিন্তু আমাদের দেশে শুধু মাটির মূর্তিতে নহে, পাথরের মূর্তিতেও রং করার বিধি ছিল, কোন কোন প্রাচীন পাথরের মূর্তিতে রংয়ের টুক্‌রা লাগিয়া থাকিতে দেখা যায়। ইহা শুধু ভারতের রীতি নহে, এমন কি ক্লাসিক্যাল গ্রীসে এবং মধ্যযুগের ইউরোপের পাথরের মূর্তিতেও রং লাগান হইত। মাইকেল এঞ্জেলোর আমল হইতে মার্বেল পাথরে রং লাগাইবার রীতি উঠিয়া যায়, কারণ তখন কতগুলি প্রাচীন গ্রীক-মূর্তি আবিষ্কৃত হইয়াছিল, ঐগুলির পূর্বের রং বৃষ্টিতে সম্পূর্ণ ধুইয়া গিয়া মর্মরের শাদা রং বাহির হইয়া পড়িয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্তও ইউরোপে যে রঞ্জিত ভাস্কর্যের বিধি ছিল (ইংরেজিতে ইহাকে বলে পলীক্রমী, অর্থাৎ বহু রঞ্জিত মূর্তি) স্পেনে আজ পর্যন্তও উহা পরিত্যক্ত হয় নাই। জনপ্রিয় ভাস্কর্যে এবং ধর্মীয় মূর্তিতে এরূপ 'পলীক্রমী' পরিত্যক্ত হয় নাই। ফরাসী শিল্প-সমালোচক সোলোমোন রেইনাক আশা করেন, অদূরভবিষ্যতে শুধু এইরূপ 'পলীক্রমী' ভাস্কর্যে চালু হইবে, "Dans ce retour vers la sculpture peinte, qui sera peut-etre, a titre exclusif, celle de demain."*

সিংহলের ভাস্কর্যে দুর্গামূর্তি ঃ পোলানারুয়া (১০ম—১৩শ শতাব্দী)

অমিত-তেজস্বী মহাশিল্পী দৈত্য ১

* Solomon Reinach, Apollo (p317)

১ Titan শব্দের অর্থ দৈত্য, মহাশিল্পী মাইকেল এঞ্জেলোকে এই বিশেষণে ভূষিত করা হইয়া থাকে, কারণ তিনি দৈত্যের মত শক্তিশালী ছিলেন মনে করা হয়।

এবারের পূজায় বাংলার ঐতিহ্যগত রীতি অবলম্বনে দুইটি দুর্গামূর্তি। ইহাই বাংলার মূর্তি-শিল্পীর সাধনালব্ধ মাতৃমূর্তি

মাইকেল এঞ্জেলোকেও গির্জার মধ্যে গর্বোদ্ধত মস্তক "আর্টকে" কিছু খর্ব করিয়া ঈষৎ অবনমিত করিতে হইয়াছে। তিনি গির্জার বিখ্যাত ফ্রেস্কো আঁকিয়াছিলেন "জগতের সৃষ্টি"। বাইবেল বর্ণিত, ভগবান জগৎ সৃষ্টি করিতেছেন, দেবতাকে উলঙ্গ মনুষ্যরূপে অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তিনি হয়ত বিষয়টাকে নিছক আর্ট হিসাবেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু "গড্"কে নগ্নরূপে রূপায়িত করার জন্য আপত্তি উঠিয়াছিল, শেষে এক টুকরা বস্ত্র আঁকিয়া "গড্"এর লজ্জা নিবারণ করিতে হইয়াছে। কাজেই দেখা যাইতেছে, শিল্পের আদর্শ অপেক্ষা (আর্ট ফর আর্টস্ সেক্), পপুলার ইউসেজ—জনসাধারণের রীতি বলবত্তর।

এবার একটি নির্দিষ্ট দুর্গামূর্তি লইয়া আলাচনা করা যাক্, যাহা এবারকার পূজায় আমি দেখিয়াছি। শ্রীশ্রীদুর্গা পুত্রকন্যাগণসহ উদ্দাম নৃত্য করিতেছেন। দুর্গাদেবী সিংহের উপরে শিবের ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান এবং লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ সকলেই মায়ের দেখাদেখি একই ভঙ্গীতে নাচিতেছেন। মহিষাসুর বধকালে শ্রীদুর্গা সিংহে চড়িয়া নৃত্য করিয়াছিলেন কি না, আমার জানা নাই। তবে দক্ষিণ ভারতের "নটরাজের" মূর্তির কাহিনী আমি জানি ২। শিব এক দৈত্য নিধনকালে তাণ্ডব নৃত্য করিয়াছিলেন, এইরূপ পৌরাণিক কাহিনী হইতে চোল ব্রোঞ্জ নটরাজের উৎপত্তি। শিবের নৃত্যপরায়ণ মূর্তির আর পরিচয় দিতে হইবে না। এলোরা, পল্লব, চোল প্রভৃতি ভাস্কর্যে ইহার প্রচুর নিদর্শন আছে। এই দুর্গামূর্তি দর্শনে আমার বিশেষ করিয়া বৃষের উপর নৃত্যপরায়ণ শিবের একটি পাল-যুগের মূর্তির কথা মনে পড়িয়াছিল; কিন্তু কত প্রভেদ।† শ্রীদুর্গার নৃত্যপরায়ণ মূর্তি প্রাচীন শিল্পে দেখি নাই, কিন্তু পার্বতীর একটি অতি সুন্দর নৃত্যপরায়ণ একক মূর্তি আছে (হ্যাভেলের গ্রন্থে উহা ছাপা হইয়াছে, তিনি ইহার

2. Vincent Smith, Fine Art in India and Ceylon.

† লেখকের পারিবারিক সংগ্রহে (আউটসাহী, পাকিস্থান), দ্বাদশ হস্তবিশিষ্ট অতি সুন্দর নৃত্যপরায়ণ একটি পাল মূর্তি আছে; ইহা একটি দুর্লভ পাল ভাস্কর্য বলা যাইতে পারে। এইরূপ নৃত্যপরায়ণ শৈব পালমূর্তি আর দেখি নাই। শিব প্রধান দুই হস্তে বীণা বাজাইতেছেন, অন্য দশ হস্তে নানাপ্রকার আয়ুধ। বৃষের উপর মনোহর নৃত্যের ভঙ্গীতে শিব, বাহন বৃষও নেহাৎ বেরসিক নহেন, তিনি গ্রীবা বক্র করিয়া, মুখ ঊর্ধ্বে তুলিয়া প্রভুর দিকে তাকাইয়া আছেন ও তাঁহার সঙ্গীত শ্রবণে আত্মহারা। শিবের সঙ্গীত ও নৃত্যের তালের সঙ্গে নিজেও পায়ের তাল রাখিয়া চলিয়াছেন (চল্লিশ বৎসরেরও অধিক পূর্বে উহার ফটোগ্রাফ প্রবাসীতে বাহির হইয়াছিল)।

অত্যন্ত প্রশংসা করিয়াছেন); কলম্বোর যাদুঘরে একটি সুন্দর একক অষ্টভুজা দুর্গামূর্তি দেখিয়াছিলাম (১০ম হইতে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যে, ইহা কোন গ্রন্থে ছাপা হয় নাই)। অষ্টভুজা দুর্গা সিংহের পরিবর্তে মহিষের ছিন্ন-মুণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া আছেন, দক্ষিণ পদ স্থির এবং বামপদ শিথিল, ইহা নৃত্যপরায়ণ না হইলেও, দাঁড়াইবার ভংগী মনোরম। আমি প্রাচীন ভাস্কর্যের নৃত্যপরায়ণ বহু মূর্তি দেখিয়াছি, কিন্তু বর্তমানের দুর্গামূর্তি প্রাচীন শিল্পাদর্শ বা "আর্ট" পন্থা অনুসরণ করিতে গিয়া অত্যন্ত হাস্যজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছে। পরিধানে (সম্ভবত চোল ব্রোঞ্জ অথবা অজন্তার অনুকরণ) হাঁটু অবধি সংক্ষিপ্ত বস্ত্র (কাদা-মাটির মূর্তিতে তাহার অনুকরণ অর্থহীন), বক্ষে একটুখানি—সম্ভবত বর্মের আভাস আছে (নন্দলালের নির্মাবৃত দুর্গামূর্তির অনুকরণে কি?): স্তনের উপরের অর্ধভাগ অনাবৃত, নিম্নাংশে একটি স্বর্ণময় আবরণের মত দেখা যাইতেছে, কিন্তু ইহা কোনো প্রাচীন আদর্শ স্মরণ না করাইয়া বরং মেম সাহেবদের ধাতুময় বক্ষধারণকারী "করসেট"কে স্মরণ করাইবে। সংস্কৃত ভাষায় "স্তনপট্ট" নামে একটি শব্দ আছে, অর্থাৎ নারীদের বুকে বাঁধিবার এক টুকরা কাপড়। অজন্তার চিত্রে এরূপ উদাহরণ আছে, এমন কি আজিকার দিনেও মণিপুরের নারীদের পরিচ্ছদ কিছুটা অজন্তার চিত্র স্মরণ করাইবে। ইহা দৃঢ়ভাবেই বলা যায় যে, প্রাচীন ভারতীয় শিল্পকে অনুসরণ করিতে গিয়া দুর্গামূর্তিতে আমরা অনেক বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছি। অজন্তা বা দক্ষিণ ভারতের ব্রোঞ্জে যেটুকু নগ্নতা দৃষ্ট হয়, তাহা মর্যাদাসম্পন্ন। তাহাতে কোনো রুচিবিকার নাই, কিন্তু আজিকার দিনে আমরা তাহাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করিতে যাইতেছি, তাহা অত্যন্ত মর্যাদাহীন।

ক্লাশিক্যাল বনাম বাঙলার লোক-শিল্পকে আর একদিক হইতে বিচার করিতে পারি, তাহা হইল বাঙলার পল্লী সংস্কৃতি। দুর্গাপূজা একান্ত বাঙলার জিনিস, তাহা ভারতের অন্যত্র প্রচলিত নাই। পুরাণের অন্যান্য প্রধান দেবতাকে অতিক্রম করিয়া শ্রীদুর্গা বাঙলায় প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন। বাঙলার সংস্কৃতিতে তিনি আর স্বর্গের অধিবাসী নহেন, সুখ-দুঃখ সমন্বিত এ ধরারই মানুষ যেন। তিনি অসুর নিধন-কারী অপেক্ষা জগজ্জননীরূপে অধিক পূজিতা। বাঙলার আবহাওয়ার গুণে পুত্রকন্যা সমন্বিত দেবী দুর্গার পরিবারে যেন বাঙলার পরিবারের ছায়া প্রতিফলিত হইয়াছে; দেবী দুর্গা বাঙলার বধূর ন্যায় পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে কয়েক দিনের জন্য পিত্রালয়ে আসেন (নন্দলালেরে এ বিষয়ে একটি সুন্দর চিত্র উল্লেখযোগ্য), আবার পিত্রালয়ের পরিজনদের কাঁদাইয়া স্বামী-গৃহে ফিরিয়া যান। কলিকাতার উপকণ্ঠে একবার দশহরার দিনে বাস্তুহারা পল্লীর দুর্গামূর্তি দেখিতে গিয়াছিলাম, দেখিলাম পূর্ব বাঙলার গ্রাম্য বধূগণ শ্রীদুর্গাকে বিদায় দিতেছেন, আঁচল দ্বারা মূর্তির মুখ মুছাইয়া দিয়া বলিলেন, "মা, আবার এসো।" এতো দেবতার পূজা নহে, এ যে মানুষেরই পূজা!

আমাদের বাড়ীর পারিবারিক গৃহ-দেবতা (পাকিস্থান) কাত্যায়নী (দুর্গার অপর এক নাম), অষ্টধাতু নির্মিত সুন্দর

পাল-রীতির অষ্টধাতু নির্মিত কাত্যায়নী মূর্তি :
(আউটসাহী, পাকিস্থান ॥ দুইশত বৎসরের পুরাতন)

প্রাচীন মূর্তি। শুনিয়াছি প্রায় ২ শত বৎসর পূর্বে আমাদের কোনো পূর্বপুরুষ উহা যৌতুকস্বরূপে লাভ করিয়াছিলেন। তদবধি আজ পর্যন্ত কাত্যায়নীর নিত্য-নৈমিত্তিক পূজা চলিয়া আসিতেছে, তাছাড়া বাৎসরিক দুর্গাপূজা তো আছেই। দুর্গার মূর্তিতে মনে হয় কিছু পাল যুগের আমেজ আছে। দুই কি তিন শত বৎসর পূর্বেও অনুমান করিতে পারি কি বিক্রম-পুরের পল্লীতেও ধাতুর ঢালাই কাজ জানা ছিল? যদিও তাহা প্রাচীনের তুলনায় নিকৃষ্ট। পাল যুগে তিব্বতে বাঙলার বৌদ্ধধর্ম এবং পাল শিল্প প্রচারিত হইয়াছিল। আমাদের বাড়ী হইতে তিন মাইল দূরে বৌদ্ধধর্মাচার্য দীপঙ্করের জন্মস্থান বলিয়া বজ্রযোগিনী গ্রাম প্রসিদ্ধ; একাদশ শতাব্দীতে তিব্বতে তিনি বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন এবং তাঁহার সঙ্গে পাল শিল্পও তিব্বতে প্রবেশ করে। অনুমান করিতে বাধা আছে কি, তাঁহার সঙ্গে বিক্রমপুরের শিল্পীরাও তিব্বতে গিয়াছিলেন এবং তথায় ধাতুর ঢালাই কাজ করিয়াছেন।

আমাদের বাড়ীর দুর্গামূর্তি নির্মাণ করিতেন কালু কুমার। অতিশয় নিপুণ কারিগর ছিলেন তিনি। বাল্যকালে আমাদের বাড়ীতে সুন্দর মূর্তি যেমন দেখিয়াছি, সকল মূর্তির গঠন এমন সুন্দর ও লাবণ্যময় ছিল যে, তেমন সুন্দর কাজ কলিকাতায় বহু বিজ্ঞাপিত, বহু-ঘোষিত মূর্তিতে অল্পই দৃষ্ট হয়। গ্রামের মালী বাড়ীর (মালাকার) লোকেরা ডাকের সাজ বা শোলার কাজ, মুকুট, গহনা এবং চালীর লতাপাতার ফুলের অলঙ্করণ করিতেন; তাঁরাও ছিলেন খুব নিপুণ কারিগর। বাঙলার স্বদেশী আন্দোলনের সময় (১৯০৫—৬) শোলার কাজ বয়কট করা হইল, কারণ উহাতে বিলাতী রাংতার ব্যবহার ছিল। কালু কুমার কিন্তু পিছু-পাও হইলেন না, মাটির ছাঁচে পাতলা এমন সুন্দর লতাপাতার অলঙ্করণ এবং গহনা প্রস্তুত করিলেন যে, শোলার কাজের মত সূক্ষ্ম কাজের সমতুল্য। কালু কুমার এখন পরলোকে, কিন্তু তাঁহার বাড়ীর লোকেরা তাঁহার ঐতিহ্য বহন করেন। আমাদের বাড়ীর মূর্তির মূল্য পড়িত ২০, টাকা হইতে ৪০, টাকার ভিতর। উহা কলিকাতার ৫০০, টাকা মূল্যের আধুনিক দুর্গামূর্তি অপেক্ষা কোনো অংশে হীন ছিল না। বৎসর কয়েক পূর্বে অধুনা বালীগঞ্জ নিবাসী আমাদের গ্রামের এক ব্যক্তির গৃহে (সার্বজনীন দুর্গাপূজা নহে) দুর্গামূর্তি দেখিয়া চিনিতে পারিলাম কাহার কাজ। জিজ্ঞাসা করিলাম অমুক কুমার বাড়ীর কাজ? ঠিক উত্তর পাইলাম। মূল্য জানিলাম ৩৫০, টাকা।

আমাদের বাড়ীতে নবমী পূজার দিনে হইত "নবমী গান"। ইহা গাহিতেন নমশূদ্র জাতীয় লোকেরা। পায়ে ঘুঙুর বাঁধিয়া গানের সঙ্গে তালে তালে নাচিয়া বৃত্তাকারে ঘুরিতেন। সকল নবমী গানের রচনাকার ছিল অশিক্ষিত নমশূদ্র, তাহাদের প্রায় নিরক্ষর বলিলেই হয়। কিন্তু সামান্য অক্ষর পরিচয়ের বিদ্যাতেই এই অখ্যাত অজ্ঞাত পল্লীকবিরা গান রচনা করিতে সমর্থ হইতেন। গানের বিষয় পার্বতীর দুঃখ, স্বামীর অযত্ন এবং পিতৃ-গৃহ হইতে আবার শ্বশুড় বাড়ীতে ফিরিয়া যাওয়ার কালে শোক। পার্বতীর দুঃখের সীমা নাই, তাঁহার বিবাহ হইয়াছে একটা নেশাখোরের সঙ্গে, পাগল শিব "শ্মশানে মশানে ঘোরে" এবং "ভাঙ খায়, ধুতুরা খায়, খায়রে ভাঙের নাড়ু।" শিব নিষ্ঠুর স্বামী, পার্বতী বৎসরে একবার করিয়া বাপের বাড়ী আসেন, "ভগবতী নাঈয়র[১] যাইবো গো বাপ ভাইয়ের বাড়ী।" হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠ দেবতা মহাদেব বাঙলার পল্লীতে তাঁহার স্বমহিমা একেবারে হারাইয়া ফেলিয়াছেন, তিনি হিমালয়বাসী মহাযোগী নহেন, শ্মশান-চারী পাগলা ভোলানাথ। নবমী গায়কেরা জন দশেক আসিতেন। বাৎসরিক দক্ষিণা ছিল সর্বসাকুল্যে ১৷৹ এবং পরিতোষ সহকারে মুড়ি চিড়ার মোয়া, নাড়ু, নারিকেলের মিষ্টদ্রব্য ইত্যাদি খাওয়ানো। শুধু এক দল নহে, ভিন্ন ভিন্ন দলও আসিত, তাঁহারা কেহই গ্রামবাসী নহে দূর গ্রাম হইতে আসিতেন। বরিশা নিবাসী অধ্যাপক ডক্টর শশীভূষণ দাশ গুপ্তের মুখে শুনিয়াছি, বরিশালে নবম গান রচনা করিতেন মুসলমান পল্ল কবিরা এবং তাঁহারাই পূজার সময় হিন্দু বাড়ীতে গান গাহিতেন। দুর্গাপূ উপলক্ষে সকল শ্রেণীর লোকদেরই মিলি হইবার সুযোগ হইত এবং উৎসবান উপভোগ করিতেন।

কলিকাতার সার্বজনীন পূজার মরসু শুরু হইবার পূর্বে ব্যক্তিগত গৃ যখন দুর্গাপূজা হইত, তখন হয়ত তাহা সঙ্গে পল্লী সংস্কৃতির যোগাযোগ ছিল আজ সার্বজনীন দুর্গাপূজা নাগরি মর্যাদা ও সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছে, আমা মনে হয় এই পূজা অবলম্বন করি বাঙলার ঐতিহ্য, শিল্প ও আমোদ প্রমোদের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা কর উচিত। কয়েকখানা বাঙলার ঐতি অনুযায়ী দুর্গামূর্তি যে দেখি নাই তা নহে, আমার সেগুলি ভাল লাগিয়া উহাদের কারুনৈপুণ্য অলঙ্কর প্রশংসনীয়। আমাদের চিরাচরিত ধা অনুসারে তাহাতে পিছনে চালী আ এবং সকল মূর্তিগুলি একটা বাঁধাধ মণ্ডলীর (গ্রুপ) মধ্যে সম্মিলিত। আ কাল দেখি প্রত্যেকটা মূর্তি আলাদা, এ আমার ভাল লাগে না। শ্রীদুর্গার পা বারিক রূপ একটা গ্রুপের মধ্যে সীমাব থাকা বোধ হয় বাঞ্ছনীয়: অবশ্য ইহা অন্যথা যে নাই তাহা নহে, নন্দলা বিচ্ছিন্ন করিয়া আঁকিয়াছেন, তবে বাংলা প্রাচীন পটেও চালীবিহীন বিচ্ছিন্ন চি আছে, যেমন একত্র সম্মিলিত চালীযু চিত্র আছে। চিত্রে ইহা আছে বলিয়াই ভাস্কর্যে ইহা সমর্থনযোগ্য তাহা ম করিবার হেতু নাই। চিত্রকর চিত্রাঙ্কন যতটা স্বাধীনতা লইতে পারেন, ভাস্করে ততটা স্বাধীনতা লওয়ার বিধি নাই আমাদের শিল্পশাস্ত্রে এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। গুপ্ত যুগে লিখিত শিল্প-শাস্ত্র "বিষ্ণু ধর্মোত্তর" এ বিষয়ে লিখিতেছে ঃ এই যে সকল শাস্ত্রের কথা বলা হইল, তাহা ভাস্করদের সব মানিয় চলিতে হইবে তাহা নহে। তাঁহার নিজেদের প্রেরণা অনুযায়ী ভাল মূর্তি

---

১ বিক্রমপুরের "নাঈয়র" শব্দ, হিন্দী "নূতন ঘর" হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্ত্রীলোকেরা যখন অন্য বাড়ীতে নিমন্ত্রণ উপলক্ষ্যে যান, তাহাকে "নাঈয়র যাওয়া" বলে, আর স্ত্রীলোকদের বলা হয় "নাঈয়রী", যেমন বিবাহের নাঈয়রী অর্থাৎ বিবাহ বাড়ীর নারী অতিথি।

মানিয়া চলার আরো কম প্রয়োজন, কারণ তাহা হইলে উহা সাধারণের লোচনগ্রাহী হইবে। স্পষ্টত দেখা যাইতেছে আমাদের চিত্রকরদের যতটা স্বাধীনতা দিয়াছেন, ভাস্করদের ততটা দেন নাই। তাঁহাদের কিছু আইন-কানুনের মধ্যে আবদ্ধ থাকিতে হইবে* । অন্যত্র সাবধান করিয়া দেওয়া হইয়াছে, শিল্প শিল্পীর খাম-খেয়ালীর উপর নির্ভর করে না। আধুনিক পরিভাষায় বলা যায়, "ism" করিতে যাইও না, সকলে যাহা বোঝে তাহাই কর। সম্ভবত আমাদের প্রাচীন কালেও কোনো রকম প্রগতিশীল "ইজম্"-ধর্মী শিল্পের উদ্ভব হইয়াছিল এবং তৎকালীন কোনো ভারতীয় টলস্টয়, what is art-এর গ্রন্থকার, শিল্পীদের কিছু সমঝাইয়া চলিতে উপদেশ দিয়াছিলেন।

এই প্রসঙ্গে পূজার আমোদ-প্রমোদের কথাও কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি। শ্রীদুর্গার লাউড স্পীকারের "লারে লাপ্পা" গানের কথা উল্লেখ নাইবা করিলাম, সাময়িক পত্রে একাধিকবার এ বিষয়ে উল্লিখিত হইয়াছে। সিনেমা প্রভৃতি আধুনিক আমোদ-প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে, এসব বোধ হয় না হইলেই ভাল হয়, কারণ সকলেই তো সব সময়ে ও সব দেখিয়া থাকেন; আমার মনে হয় যাত্রা, কবিগান প্রভৃতি লুপ্তপ্রায় বাংলার স্বকীয় আমোদ-প্রমোদের পুনরুজ্জীবনের চেষ্টা করা উচিত। কলিকাতায় "বার মাসে তেরো পার্বণ"—নানা নাগরিক উৎসব তো লাগিয়াই আছে; বৎসরে দুই-চারিটি দিন কি আমরা বাঙলার পল্লীর মর্মস্থলে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিতে পারি না? দুর্গাপূজা শুধু mass art-এর পরিচয় দিবে না, mass culture-এরও পরিচয় দেওয়া উচিত। আমরা বাঙলার প্রাণের স্পর্শ চাই, তাহার হৃদপিণ্ডের স্পন্দন অনুভব করিতে চাই। সম্প্রতি গ্রামকে যেমন "বিদ্যুতিকরণ" প্রভৃতি দ্বারা নাগরিক সভ্যতার পদমর্যাদা দানের চেষ্টা চলিতেছে, তেমনি শহরেও কিছু পল্লীর স্পর্শ থাকা উচিত।

দৈনিক কাগজে বিজ্ঞাপিত কোনো মূর্তির উল্লেখ পাইয়া দেখিতে গেলাম, কিন্তু হতাশ হইলাম। ধনীর পূজার মন্দির, সুপ্রশস্ত সুন্দর অট্টালিকা, মেঝে মার্বেলমণ্ডিত। যে দেবীর সন্ধানে গিয়াছিলাম, তিনি সন্তোষদান না করিলেও আর একজন বিদেশিনী দেবীর সন্ধান মিলিল, নয়ন সার্থক হইল! হিন্দুর দেবদেবী তো দু-চার দিনের জন্য মন্দিরে অবস্থান করিবার অধিকার লাভ করেন, তারপর গঙ্গায় চিরসমাধি পান; কিন্তু মন্দিরে দুই জন চিরস্থায়ী অধিবাসী, মৃন্ময়ী মূর্তির উভয় পার্শ্বে দেখিতে পাইলাম। তাঁহারা হিন্দু নহেন, তাঁহারা ইটালীয়ান মার্বেলের অর্ধনগ্ন গ্রীক দেবী ভেনাস। গ্রীক দেবীর বিজয় গৌরব হেলেনিক সভ্যতার তিরোধানের সঙ্গে চিরতরে নির্বাণ লাভ করিয়াছে, "আসিবে না ফিরে সে গৌরব শশী, অস্তাচল বাহিনী উর্বশী"। ইউরোপে তাহার স্থান এখন শুধু যাদুঘরে। কিন্তু আধুনিক কালের হিন্দু মন্দিরে তাঁহার চিরস্থায়ী অধিষ্ঠান দেখিয়া যুগপৎ পুলক ও শিক্ষা হইল।

---

* প্রাচীন একটি গ্রীক মূর্তি আছে, তাহার নাম "দোরীফোরাস" (শিল্পী পোলীক্লিতাস, পঞ্চম খৃস্ট পূর্বাব্দ), এই গ্রীক শব্দের অর্থ হইল শাস্ত্র, পরিমাপ বা "নিয়ম" (Rule)

মরুর কবি যতীন্দ্রনাথ

শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত

কবিতা জীবন-মন্থন-জাত বিষামৃত। বিষটা সত্য না অমৃত সত্য এ জিজ্ঞাসার স্পষ্ট জবাব নাই। আসল জিনিসটা হইল ঐ মন্থন—কবির সমগ্র সত্তার ভিতরে গভীরতম আলোড়ন। উপরিভাগের ঢেউবিলাসে যে ফেনা ভাসিয়া আসে পাঠক-চিত্তের উপরিভাগ দিয়াই সে অমন করিয়া অবহেলায় ভাসিয়া যায়। তাই চাই আলোড়নের অমোঘতায় অথৈ তল হইতে উদ্ভূত কিছু—সে বিষ হোক—অমৃত হোক—যাহাকে আকণ্ঠ পান করিয়া আর একটি গভীর আলোড়নে সত্তার অতলতম দেশ পর্যন্ত অনুরণিত হইয়া ওঠে। সৌন্দর্য, মাধুর্য, বিশ্বাস, সুখ যেমন জাগাইয়া তুলিতে পারে এই আলোড়ন,—সংশয়, অবিশ্বাস, দুঃখ, বেদনা, অতৃপ্তি তেমনই জাগাইয়া তুলিতে পারে এই জীবন-জোড়া আলোড়ন। এই শেষের অংশটাই সত্য হইয়া উঠিয়াছিল কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের জীবনে। সেই মন্থন—সেই আলোড়ন ছিল দুর্বার—তাই তাঁহার কবি-মানসে যাহা ভাসিয়া উঠিয়াছে তাহার কিছুই ফেন-বুদ্বুদের ন্যায় আমাদের চিত্তের উপরিভাগেই অবজ্ঞায় নিলীন হইয়া যাইতে পারে নাই, আমাদের চৈতন্যকে সে গভীরভাবে নাড়া দিয়া আমাদিগকে সদাজাগ্রত করিয়া তুলিয়াছে। ঝিমাইতে ঝিমাইতে যতীন্দ্রনাথের কবিতা পড়িবার উপায় নাই, হয় তীব্র আঘাতের প্রতিক্রিয়ায় বিক্ষোভের বিরূপতায় তাহাকে সজোরে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে হইবে, নতুবা সদাজাগ্রত চৈতন্য লইয়া দুই হাত ভরিয়া তপ্ত বিষ পান করিয়া নিজে জ্বলিয়া জ্বলিয়া তীব্রানুভূতির শৈব মত্ততাকে উপভোগ করিতে হইবে।

যে পৌরুষের সচেতনতা লইয়া বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথের আবির্ভাব তাহা আমাদের স্বভাবকোমল চিত্তভূমিতে হয়ত প্রথমে কর্কশ অনুভূতিই জাগাইয়া তুলিয়াছিল। কাব্যের চির-প্রচলিত রাজপথ যে তাঁহার নহে কবি তাহা জানিতেন,—রাজপথ পরিত্যাগ করিয়া জীবনের ইঁট-বাহির-করা নটখটে পথে চলিবার গান যে তেমন প্রীতিপদ নাও হইতে পারে কবি এ-বিষয়েও সচেতন ছিলেন। কিন্তু এ বোধ তাঁহার ভিতরে কোনও দোলায়মান দুর্বলতার সৃষ্টি না করিয়া বরং স্বভাবধর্মে তাঁহাকে দৃঢ়তর-রূপে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।—

> বঙ্গবাণীর সাথ
> যেদিন অকস্মাৎ
> কমল-দ্বীপান্তরে হ'য়ে গেল সাক্ষাৎ,
> যেমনি ছুঁয়েছি পা,
> চমকি উঠিল মা;
> কঠিন পরশে মা'র চরণে লাগিল ঘা।
> কমল হ'তেও যার অধিক কোমল পাণি--
> তারাই পূজিছে আর পূজিবে বঙ্গবাণী।
> তা ব'লে কি করবি—
> ওরে হতগর্বী?
> কিছুদিন ধ'রে হাতে লাগা তেল চর্বি।
> পেতে নে রে শয্যা,
> দেখে শেখ্ চারদিকে ঘট্‌তেছে রোজ যা।
> অভাবের লাখো ফুটো বাক্যের ফাঁসে বুনে
> মামুলি প্রেমের নেট্-মশারিটা টাঙিয়ে নে।
> তার মাঝে শু'য়ে বল মশারির নেই আদি—
> অনন্ত, অমধ্য, অভেদ্য ইত্যাদি।
> (মন-কবি, মরীচিকা)

কিন্তু এইখানে কবির বিদ্রোহ। নিজে যাহাকে মিথ্যা দেখিলাম, পরের চোখের ভিতর দিয়া তাহাকেই সত্য বলিয়া অনুভব করিতে হইবে? বেদনার আগুনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া শুধু আনন্দের গান গাহিতে হইবে? খাম-খেয়ালীর সৃষ্টির উলট-পালটের সঙ্গে নিরন্তর প্রাণান্ত পাক খাইয়া গভীর প্রশান্তির নেশায় বুঁদ হইয়া থাকিতে হইবে এবং সব কিছুই আনন্দময় শান্তিময় বলিয়া প্রশস্তি গানে মাতিয়া থাকিতে হইবে? বিষে যখন দেহ-মন ছাইয়া যাইতেছে এবং সেই বিষ-জ্বালার ভিতর দিয়া মৃত্যুকেই যখন একমাত্র সত্য বলিয়া অনুভব করিতেছি তখনও কি চোখ বুজিয়া মনে করিতে হইবে—আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি—শান্তং শিবমদ্বৈতম্? এই আপস-শতে কবি যোগ দিতে পারিলেন না,—ক্ষুব্ধ চিত্তে জাগিয়াছিল তাঁহার কঠোর আত্মজিজ্ঞাসা—

> যদিও এ জগতের কল্‌জেটা জ্বলছে,
> মিথ্যে মিষ্টি কথা সবাই তো বলছে;
> তুইও তাই বল্‌বি,
> বাঁধাপথে চল্‌বি—
> আগে পিছে আগাগোড়া আপনাকে
> ছল্‌বি? (ঐ)

তাহা তিনি পারিলেন না বলিয়াই 'মরীচিকা', 'মরুশিখা', 'মরুমায়া'র পথ তিনি বাছিয়া লইলেন। সেই বলিষ্ঠ একক-বৃত্তি—কাব্যের ক্ষেত্রেও—বৃহত্তর জীবনের ক্ষেত্রেও। কোমল শতদলে তাঁহার বাণী-বন্দনা আর সম্ভব হইল না; কঠিন-কণ্টকদেহ রুদ্রাক্ষের মালা জপ করিয়া তিনি ব্যথার রাজা পাগলা-ভোলারই ভক্ত বনিয়া গেলেন। তাঁহার আদর্শ দেবতা মহাদেবেরও দেব-সমাজে ঠাঁই ছিল না,—একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেন শ্মশানে,—ভক্তেরও তৎকালীন কবি-সমাজের সঙ্গে খুব একটা ব্যাপক অন্তরঙ্গতা ছিল না; আপন গৃহে নিঃসঙ্গ সন্ন্যাস-জীবনে তাঁহার একক সাধনা। নিঃসঙ্গ ভোলানাথ যেমন ভাঙের নেশায় সকল অসহ জ্বালা ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেন, ভক্তও তেমনি ঘুমের নেশায়—চোখ বুজিয়া ভুলের নেশায় মত্ত থাকিবার চেষ্টা করিয়াছেন; আবার অসহ জ্বালায় দেবতা যেমন ডমরুনাদের সঙ্গে ববম্ ববম্ রবে ধ্বনি করিয়া উঠিয়াছেন—ভক্তও আপন চিত্ত-বিলোড়নে যে কাব্যধ্বনি করিয়াছেন তাহার সহিত ক্ষেপা মহাদেবের ডমরুনাদ এবং ববম্-ধ্বনির রেশ রহিয়াছে।

বাঙলা দেশের কবি হইয়া বাঙলার শ্যামল স্নিগ্ধতা যাঁহার চোখে এতটুকুও রঙ ধরাইয়া দিল না এমন কবি এই প্রথম দেখা গেল যতীন্দ্রনাথের মধ্যে—এই সুজলা-সুফলা-মলয়জশীতলা শস্যশ্যামলা বাঙলা মায়ের বুকে বসিয়াও এই কবি শুধু গোবি-সাহারার ভীষণা মরুমূর্তির

ছবি দেখিলেন—বারিহীন দিগন্তবিস্তৃত তপ্তবালুকার অন্তহীন জ্বালা অনুভব করিলেন। তিনি দেখিতেছেন,—

চারিদিকে মোর শ্যামলগন্ধ গীতি,
কত হাসিমুখ কত স্নেহ কত প্রীতি,
আলো-ছায়া সুখ-দুখ;
(কবি নহি, নিশান্তিকা)

কিন্তু ইহার কিছুতেই কবির চোখে নেশা ধরিল না, তাঁহার রিক্ত বুকে তৃপ্তি আসিল না।—

কে আমার বুকে চিরতৃষাজর্জর
চাহে শুধু দূরে সুন্দর মরীচিকা?
বৃথা ডাকে তারে বাপী কূপ সরোবর,
অন্তরে জ্বলে অনির্বাপ্য শিখা।

সে শিখা টলে না দুঃখের কালো ঝড়ে,
তর্জনী তুলি' জ্বলে তা বাসর ঘরে:
কে তারে বুঝিবে বলো?
সূর্যের মত নির্বাক আহ্বানে
শিশিরকণায় কহে সে যে কানে কানে
আমি জ্বলি তুমি জ্বলো।
(ঐ)

'আমি জ্বলি তুমি জ্বলো'—ইহার ভিতর দিয়াই কবির কবিধর্মের পরিচয়—পাঠক-হৃদয়ের কাছে তাঁহার অভিনব আহ্বান।

বাঙলার ছেলে হইয়া যতীন্দ্রনাথ কেন সুদূরের তপনতপ্ত মরুভূমিকে ভালবাসিয়াছিলেন, তাঁহার জীবনে তাহার গভীর তাৎপর্য ছিল। বাঙলা দেশের প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং সেই পরিবেশের মধ্যে পরিবর্ধিত জাতীয় প্রকৃতির মধ্যে যে একটা নিরবচ্ছিন্ন শ্যামলের মৃদুস্পর্শ—মেঘের জল এবং চোখের জলের অবিরল বর্ষণে যে একটা জোলো স্যাঁতস্যাঁতে ভাব রহিয়াছে কবির অন্তঃপ্রকৃতি তাহার সহিত কখনই যোগ দিতে পারে নাই, তাঁহার ভয় হইয়াছে, ইহার সহিত যোগ দিতে গেলে তাঁহার নিজের চিত্তের মধ্যে যে মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ প্রজ্বলিত ছিল সেটুকুও জলের ঝাপটায় নিভিয়া ঠাণ্ডা হিম হইয়া যাইবে।

বন্ধু জানো তো তুমি,—
বাংলার ছেলে ভালবেসেছিনু কেন
আমি মরুভূমি।
শোনো গো বন্ধু, ঐ পশ্চিমে মামুলি
মেঘের ডাক,—
দেহ ভেঙে দিল জোলো দুধ আর
এই জোলো বৈশাখ।
মহাবহ্নির স্ফুলিঙ্গ আজও জ্বলিছে
যা ভাঙা বুকে,
শীকরসিক্ত ঝাপ্‌টা লাগিয়া কখন
সে যায় চুকে।
(চিরবৈশাখ, সায়ং)

তবে কবি কোন্ বৈশাখকে চান? যে-বৈশাখের তিনি তাঁহার কাব্যের মধ্য দিয়া কামনা করিয়াছেন তাহার ভিতর দিয়া তাঁহার ব্যক্তি-প্রকৃতি এবং তৎসঙ্গে তাঁহার কবি-ধর্মের বেশ একটি পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার এই ব্যক্তি-প্রকৃতি এবং কবি-ধর্মের কথা স্মরণ রাখিলে তাঁহার কবিতার শুধু মূল সুর নয়—বিস্তারিত ভাব-বিন্যাসেরও তাৎপর্য বোঝা যাইবে।

মোর অন্তর—প্রান্তরে বসি কাঁকরে
গুনেছি দিন,
কবে আসিবে সে চিরবৈশাখ
কালবৈশাখী-হীন।
যার ঝঞ্ঝার মঞ্জীরে নাই মল্লার সুর-কণা,
অঙ্গ বেড়িয়া প্রতপ্ত মেঘে
ফুঁসে বিদ্যুৎ-ফণা,
জগৎ-কেন্দ্রে প্রাণধারা যার বহিছে
অনল স্রোতে,
যার দুর্বার অগ্নি-বারতা ছুটিছে
আলোক রথে।
আনন্দ যার বহ্ন্যুৎসবে নাচে
উচ্ছ্রিত শিখা,
যার চরণের ঘূর্ণাছন্দে নীহারিকা-
বুকে লিখা।
মহাসূর্যেরা যে-বৈশাখের শঙ্খধ্বনি শুনে,
অন্তরীক্ষ ভরি' নব নব জগতের
বীজ বুনে।
(চিরবৈশাখ, সায়ং)

দেখা যাইতেছে, কবি শুধু একটা ক্ষণ-কালবৈশাখের আরাধনা করিতেছেন না, তিনি তাঁহার অন্তরে বাহিরে চাহেন একটি চিরবৈশাখের অচঞ্চল স্থিতি। এই চিরবৈশাখের ভিতর দিয়া যে বহ্নি-স্তুতি, তাহা শুধুমাত্র একটি দুঃখের আগুনকে বরণ করিয়া লইবার আগ্রহ নয়—এই বহ্নি একটা অনির্বাণ-বীর্যোদীপ্ত জীবনাদর্শ। সুতরাং বার বার নানাভাবে এই বহ্নি-স্তুতির কথা দেখিয়া কবিকে শুধু দুঃখের কবি মনে করা উচিত হইবে না,—কবি চারিদিকের দুঃখের মধ্যে পঞ্চতপা কর্মযোগীর ন্যায় বলিষ্ঠতার—বীর্যবত্তার কবি। কবির কবিতাগুলি সমগ্রভাবে বিচার করিলে দেখিতে পাইব, তিনি 'অপরাজেয়-মানবতাবাদী': এই অপরাজেয় মানবতাবাদ আসিয়াছে বিশ্বাতীত দৈবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে—এই বিদ্রোহই চারিদিকে জ্বালাইয়া রাখিতে চায় অনির্বাণ জ্বালা! কেন? কারণ, কবি তাঁহার অন্তরে বাহিরে যেখানেই চাহিয়া দেখিয়াছেন, সেখানেই দেখিতে পাইয়াছেন, বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শুধু যে একটা দুঃখের বহ্নিজ্বালাই বহন করিতেছে তাহা নহে—সেই বহ্নিজ্বালার ভিতর দিয়াই যেন একটা দাবী চলিতেছে, একটি কল্পিত সত্য—ছন্দোহীন অর্থহীন বিধানহীন বিধিহীন সৃষ্টির পিছনে একটি অলীক স্রষ্টা স্বীকার করিয়া তাহার পরাভব স্বীকার করুক—মানুষ প্রবৃত্তির বশ্যতা হাসিমুখে বরণ করিয়া লউক, শুধু নিজের মহিমায় সে যেন প্রতিষ্ঠা-লাভ করিতে না পারে—

বধির বিধাতা যেথা অনলাক্ষরে
লিখিয়া চলিছে তিমির-ললাট 'পরে
মানুষের দাসখৎ। (ঐ)

কবি তাই শুধু দুঃখের কবি নন, তিনি কবি বিদ্রোহী। বিধাতা-পুরুষ সৃষ্টির পিছনে যদি কেহ থাকিয়া থাকেন তবে তিনি অন্ধ-বধির! তাঁহার যে বিধান তাহা পদে পদে মানুষের অপমান—অথচ তাহা প্রতিবিধানের অতীত। মানুষের সেই চিরন্তন অপমানকে সহ্য করিয়া সেই বিধাতা এবং সেই বিধি-বিধানের জয়গান করা—ইহা তিনি কিছুতেই করিতে পারেন নাই।—

কবি নহি আমি, করিনি ছন্দে গ্রথিত
যে বিধি-বিধান প্রতিবিধানের অতীত।
আমি মহাবন্ধনে ব্যথিত॥
(ঐ)

সুদূর অতীত হইতে প্রণবমন্ত্র বা ওঁ-ধ্বনিকে সৃষ্টির প্রথম নাদ বলা হয়! এই প্রণব-নাদের ভিতর দিয়া বিন্দুরূপ

পরম সত্যের প্রথম প্রকাশ। ওঁ-ধ্বনি তাই সৃষ্টি-প্রবাহের প্রথম স্পন্দন। অন্ধকার মহাশূন্যের ভিতরে প্রথম আলোর স্পন্দনের সহিত সৃষ্টির এই প্রথমধ্বনি ওঁ জাগিয়া উঠিয়াছিল। কবি কান পাতিয়া শুনিয়াছেন, সৃষ্টির এই যে প্রথম ধ্বনিময় স্পন্দন উহা আর কিছুই নয়, উহা সদ্যোজাত বিশ্ব-শিশুর প্রথম ক্রন্দনধ্বনি। অন্ধকারকে বন্দনা করিয়া কবি তাই বলিয়াছেন,—

তোমার নিঃশূন্য গর্ভ হ'তে,
রক্তালোক—স্রোতে
ভরি দিয়া ব্যোম্
যেদিন প্রথম
জন্মমাত্র শিশু-বিশ্ব করিল কন্দন
ওম্ ওম্ ওম্ ;—
... ...
সম্মুখে আলোকে খুঁজে যতটুকু পাই,
পিছনে ছায়ায়,
অনন্তব্যাপিনী তব ঘুমন্ত মায়ায়
দ্বিগুণ হারাই।

জনম-ক্ষণের সেই অশান্ত ক্রন্দন
যুগে যুগে জীবে জীবে হ'ল চিরন্তন।
দিশাহারা বিদেশী সবাই,
কেহ নাই
ঘুচাইতে ভ্রমণের ভ্রম,
যত কাঁদি তত জপি আদি আলোকের
ক্রন্দনের বীজ—ওম্ ওম্ ওম্।
(অন্ধকার, মরুশিখা)

এই সৃষ্টির আদিরূপের ধ্যানে তন্ময় হইয়া রবীন্দ্রনাথ বলিয়াছেন—

The eternal Dream
is borne on the wings of
ageless Light
that rends the veil of the
vague

তাহারই পাশে বসিয়া যতীন্দ্রনাথ বলিতেছেন—

তড়িৎ যেমন মেঘে সঞ্চিত বেদনার শিহরণ,
আলোক যেমন অন্ধ ব্যোমের
হাহাকার-কম্পন,
(জীবন ও মৃত্যু, মরুশিখা।)

মনের 'জমিন' এবং দৃষ্টি কোণের পার্থক্য এইখানেই প্রকট। সৃষ্টির পিছনে চরম সত্যরূপে যদি কেহ থাকিয়া থাকেন তাঁহাকে কবির মনে হইয়াছে শুধুমাত্র একটি কর্মকার যাহাকে কবি সশ্লেষে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন,—

ও ভাই কর্মকার,—
আমারে পুড়িয়ে পিটানো ছাড়া কি
নাহিক কর্ম আর?
(লোহার ব্যথা, মরুশিখা)

সংসারের এই নিরন্তর হাপরের আগুন এবং হাতুড়ির পিটানির ভিতরে কবি নিজের পরাজয় কখনও স্বীকার করেন নাই—

আগুনের তাপে সাঁড়াশির চাপে
আমি চিরনিরুপায়,
তবু সগর্বে ভুলিনি ফিরাতে
প্রতি হাতুড়ির ঘায়।
যাহা অন্যায়, হোক্ না প্রবল,
করিয়াছি প্রতিবাদ;
আমার বুকের কোমল অংশ,
কে বলিল তারে খাদ?
(ঐ)

ইহার পরেই কবির গভীর জিজ্ঞাসা। সৃষ্টি ব্যতীত স্রষ্টা মূল্যহীন—আপনাতে আপনি তিনি অসৎ—তিনি মিথ্যা। সৃষ্টির প্রেরণা তাই স্রষ্টার নিজের আত্মানুভূতির প্রয়োজনে। রবীন্দ্রনাথ এইখানেই জীবনের গভীর অর্থ এবং সেই অর্থের ভিতর দিয়াই গভীর আনন্দ খুঁজিয়া পাইয়াছেন।—

তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর
তুমি তাই এসেছ নিচে।
আমি নইলে ত্রিভুবনেশ্বর,
তোমার প্রেম হ'ত যে মিছে।

আমায় নিয়ে মেলেছে এই মেলা,
আমার হিয়ায় চলেছে রসের খেলা
মোর জীবনে বিচিত্ররূপ ধ'রে
তোমার ইচ্ছা তরঙ্গিছে।

কিন্তু যতীন্দ্রনাথ তাঁহার অন্তরে 'উমা' প্রকাশের ভণিতায় সৃষ্টির অন্ত নির্হিত এই অলীক কর্মকারটিকে প্রশ্ন করিতেছেন,—

ও ভাই কর্মকার!
রাত্রি সাক্ষী, তোমার উপরে দিলাম
ধর্মভার,-
কহ গো বন্ধু কহ কানে কানে,
আপনার প্রাণে বু
আমি না থাকিলে মারা যেত কিনা
তোমার দিনের রুজি
তুমি না থাকিলে আমার বন্ধু
কিবা হ'ত তাহে ক্ষতি
কৃতজ্ঞতা কি পাঠাইছ তাই
হাতুড়ির মারফ
(

বিধাতার আত্মরতির তাগিদে তাঁ এই বিশ্বলীলা,—যে বিশ্বলীলা সম হইয়াছে 'আমা'কে দ্বারা; কিন্তু সে অ রতির লীলা পরিপূর্ণ হইবার সম্ভা নাই এই 'আমি'টি যদি লোহখণ্ডের নিরন্তর সংসারের হাপরে জ্ব জ্বলিয়া হাতুড়ির পিটানি দ্বারা কে 'হইয়া' উঠিতে না থাকে! লীলাম অনাদিলীলার 'শরিক' হইয়া উঠি ইহাই পুরস্কার!

রানী মীরা আদিত্যনারায়ণ

শংকর

সায়েব বছরখানেক এসপ্ল্যানেড অঞ্চলের এক নামকরা হোটেলে থাকতেন। হোটেল নয়ত যেন রাজ-প্রাসাদ। ঘরের সংখ্যাই তিনশর কাছাকাছি। আর তকমা পরা চাকরবাকর—তাদের গুনতে গেলে ছোটখাট সেনসাস অফিস বসাতে হবে। ইংরেজ, ফরাসী, আমেরিকান, চীনা, জাপানী সর্বজাতের লোকের সন্ধান মিলবে এখানে। অংগ, বংগ, কলিংগের প্রতিনিধিরাও আছেন। তবে তাঁরা এখানকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। আমার ধারণা ছিল হোটেল মানে যেখানে খেতে পাওয়া যায় এবং প্রয়োজন হলে থাকার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এখানে থাকা বা খাওয়ার ব্যাপারটা নগণ্য। কোট্ প্যাণ্টের দরকার, টেলারিং ডিপার্টমেণ্টে স্লিপ পাঠিয়ে দিন। সিনেমা? দোতলার হলে চলে যান। সিনেমা দেখে স্নানের আগে চুল কি দাড়িটা ঠিক করে নিতে পারেন। এখানকার নয়, খাস চীন থেকে নাপিত আনা হয়েছে। এখানে লাঞ্চের সময় হাল্কা সুরে বাজনা বাজে, বিকেলে চায়ের সময় বাজনার সুর পরিবর্তন হয়। রাতের ডিনারে কণ্টিনেন্টের প্রখ্যাত সিনেমা, রেডিও ও টি ভি সুন্দরীরা নৃত্যের ছন্দে আগন্তুকদের মুগ্ধ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে মন্ত্রমুগ্ধ করেন। গলির চায়ের দোকানের কেবিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে এখানে এসে মনে হলো একেবারে আবু হোসেনের রাজত্বে হাজির হয়েছি।

গেট পেরিয়ে ভিতরে ঢোকার প্রথম অভিজ্ঞতা শীততাপনিয়ন্ত্রিত যন্ত্রের এক ঝলক হাড় কাঁপান ঠাণ্ডা হাওয়া। এর পরেই চোখ ঝলসানো লাউঞ্জ। পুরু কার্পেটে ঢাকা মেঝের উপর কতকগুলো সোফা। পাশেই ছোট ছোট টিপয়ের উপর একরাশ বিলিতি ছবিওয়ালা ম্যাগাজিন। সন্ধ্যার পর দেওয়ালের মধ্যে লুকনো নীলাভ আলোগুলো জ্বলে উঠে এক অস্পষ্ট স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি করে। আমার দৃষ্টি ইদানীং রোজের লাউঞ্জের কোণের দিকে বসা একটি মেয়ের দিকে পড়ে যেত। ভদ্রমহিলার বেশের পারিপাট্য বিচিত্র ধরনের। প্রসাধনের বৈশিষ্ট্যও অদ্ভুত। মুখটি আড়ালে থাকলে দেহের অবশিষ্ট অংশের দিকে চেয়ে কে বলবে তাঁর বয়স একুশ কিংবা বাইশের বেশী। লণ্ডন ও প্যারিসের প্রসাধন প্রস্তুতকারকদের কিন্তু এক জায়গায় পরাজয় হয়েছে। প্রসাধনের স্বযত্ন প্রলেপও মুখমণ্ডলের চলে-যাওয়া যৌবনের চিহ্নগুলি ঢাকতে পারেনি, ওষ্ঠ-দেশের কুঞ্চিত ত্বক বার বার বলে দিত যে বসন্ত চলে গেছে। তবে সে বসন্তের বিদায় উৎসব দশ কি কুড়ি বছর আগে সম্পাদিত হয়েছে, অনভ্যস্ত চোখ নিয়ে বুঝতে পারিনি।

পিছনের দেওয়ালে অজন্তা স্টাইলে আঁকা শকুন্তলার ছবি। অস্তমিত সূর্যের পটভূমিকায় তপোবনবাসিনী শকুন্তলা মৃগ-শিশুদের সাথে ক্রীড়ামত্ত। আশে-পাশে পিতলের টবে রাখা নানান জাতের ও নানা বর্ণের লতাপাতা। এই ছবির সংগে মেয়েটির উদাস ভংগীতে বসে থাকার দৃশ্যটি মিশে গিয়ে আর একটি স্বতন্ত্র ছবির সৃষ্টি হতো। জনৈক ভদ্র-লোককে একদিন বলতে শুনলাম, লাউঞ্জে সাজানোর জন্য নানান রকম মরসুমী ফুলের মত এঁকেও হোটেল কোম্পানী আমদানি করেছেন। শুধু ফ্রেসকো ছবিতে মন ভরে না।

ভদ্রমহিলাকে এক-একদিন এক এক রঙের শাড়িতে দেখা যেত। কখনও লাল, কখনও সবুজ, কখনও গোলাপী, শৈল-শিখরে সূর্যোদয়ের সময় যেমন বহুবর্ণের খেলা চলে। এক পায়ের উপর আর একটা পা চড়িয়ে, সোফাতে হেলান দিয়ে মেয়েটি সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ত। মেয়েদের মুখে—সে যে-দেশের মেয়েই হোক—সিগারেট আমার কেমন দৃষ্টিকটু ঠেকে। কিন্তু তার থেকে বিশ্রী লাগত মেয়েটির সোনালী রঙের গ্রীশিয়ান জুতোটি নাড়ানর ভংগী। আধুনিক শকুন্তলার ওই-খানেই ছন্দপতন।

কিছুদিন হলো এক যুবককে মেয়েটির

সঙ্গে ঘোরাফেরা করতে দেখছিলাম, ছোকরার বয়স চব্বিশ কিংবা পঁচিশের বেশী নয়। বিরাট হুডখোলা বুইকে ওদের দুজনকে প্রায়ই হোটেল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখেছি, কখনও বা দুজনে লাউঞ্জেতে মৃদু গুঞ্জনে রত। পাশে দুটি পানীয়ের গ্লাস, তাতে কোল্ড ড্রিংক না দ্রাক্ষারস বলতে পারব না। খুব সম্ভবত শেষেরটিই হবে। কেননা, অরেঞ্জ স্কোয়াশ বা লাইম স্কোয়াশ মানুষকে অত ঢুলু ঢুলু করে দিতে পারে মনে হয় না। এরা দুজন ক্রমশ হোটেলের চাকর-বাকরদের নানান রকম রসাল গল্পের নায়ক ও নায়িকা হয়ে দাঁড়াল। রিসেপশনিস্ট শৈলেন বোসের সঙ্গে আমার খানিকটা আলাপ ছিল। সেও একদিন হেসে বলল, 'কপোত কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ চূড়ে' দেখেছেন কি? প্রথমে ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি। বুঝতে পেরে হেসে বললাম, "কিন্তু বৃক্ষচূড়া কোথায় পেলেন? "ওইটুকুই বাকী আছে, তাহলে গাছে তুলে মই কেড়ে নেবার কোন অসুবিধা থাকে না," বোস হেসে উত্তর দিল।

সায়েব বয়স ও আদালতের অভিজ্ঞতা উভয়েতেই প্রবীণ। শুধু তাই নয়, এক-কালে জার্মানীর বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় ইউরোপের এক দেশ থেকে আর এক দেশের গ্রামে গ্রামে মাঠে মাঠে ঘুরেছেন। মানুষও দেখেছেন অনেক রকমের। লাউঞ্জের প্রণয় কাহিনীটি তাঁরও নজর এড়ায়নি। হাইকোর্ট থেকে ফিরে লিফটে উপরে উঠছিলাম একদিন। মুখ কুঁচকে সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, 'লাউঞ্জের বাঘ ভাল্লুক হাতি ঘোড়া মার্কা ছোকরাটিকে দেখেছ?" সায়েবের বর্ণনায় হাসি পেল। ছেলেটি সর্বদাই কিম্ভুত কিমাকার জানোয়ারের ছবিওয়ালা বুশ শার্ট পরে। সায়েব আরও মুখ কুঞ্চিত করে বললেন, "ছেলেটি ভদ্রমহিলাকে দিদিমা না বলুক মা বলতে পারে।"

দুজনের বয়সের অসমতা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু। দুজনের প্রকাশ্য কার্যকলাপও প্রায়ই শালীনতার সীমা অতিক্রম করে। তবুও মনে মনে এই ব্যাপারে কৌতূহল বোধ করিনি অস্বীকার করতে পারি না। তাই সম্ভবত মাঝে মাঝে লাউঞ্জের দিকে দৃষ্টিপাত করে যেতাম।

"মেমসায়েব আপনাকে ডাকছেন," লাউঞ্জ পেরিয়ে লিফটে উঠতে যাচ্ছি, এমন সময় বেয়ারা এসে বলল। খুবই আশ্চর্য লাগল, বললাম, "তুমি হয়ত বুঝতে ভুল করেছ, নিশ্চয়ই আমাকে নয়।'

বেয়ারা ঘাড় নেড়ে বলল, "আজ্ঞে আপনাকেই ডাকছেন।"

বাধ্য হয়ে লাউঞ্জেতে ফিরতে হলো। আমাদের পরিচিত "মেমসায়েবে"র সামনে এসে দাঁড়ালাম। এত নিকটে থেকে কোন দিন তাকে দেখিনি। দূর থেকে যাকে এত উজ্জ্বল দেখায়, কাছে এসে বড় নিষ্প্রভ মনে হলো। ডান হাতের আঙুলের বিশাল আঙটি সমেত সিগারেটটি ছাই-দানিতে ঝাড়লেন। আঙটির লাল পাথরটি জ্বল জ্বল করে উঠল। ভদ্রমহিলা সিগারেটে আর একটা লম্বা টান দিয়ে আমার দিকে দৃষ্টি হানলেন। সায়েবের নাম করে জিজ্ঞাসা করলেন আমি তাঁর কাছে কাজ করি কিনা। তাঁর স্বরে অদ্ভুত মিষ্টতা। অনেক মহিলার মুখে ইংরিজী শুনেছি, কিন্তু স্বরের মধ্যে সুরের উপস্থিতি সচারচর কানে আসে না। যা হোক, উত্তর দিলাম "হ্যাঁ।"

"আপনি কি খুব ব্যস্ত?"

বললাম, "না না, আপনার কোন উপকারে লাগলে আনন্দিত হব।"

সিগারেট ছাইদানে নিক্ষেপ করে ভদ্র-মহিলা সন্ত্রস্তভাবে চারিদিকে চেয়ে নিলেন। যথাসম্ভব আস্তে বললেন, "দেখুন আমি বড় বিপদে পড়েছি, আপনার সায়েবের সঙ্গে দেখা করা বিশেষ প্রয়োজন, কখন তাঁর সঙ্গে দেখা হতে পারে?"

সেদিন দেখা হওয়া কোনক্রমেই সম্ভব ছিল না। অন্য একটি কেসে সায়েব ব্যস্ত থাকবেন তাই পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় দেখার ব্যবস্থা হলো।

শর্টহ্যান্ডের খাতাটি নিয়ে সায়েবের পাশে বসলাম আমি। সামনের চেয়ারে ভদ্রমহিলা মেঝের দিকে ঘাড় নিচু করে তাকিয়ে রইলেন, লজ্জার ভাব বোধ করি কাটিয়ে উঠতে পারছিলেন না। সায়েবের ঠোঁটে এক টুকরো হাসি দেখতে পেলাম। প্রথম দর্শনে কোন মক্কেলই সঙ্কোচের বাধা কাটিয়ে উঠতে পারে না এ দৃশ্য আইন ব্যবসায়ীর সঙ্গে কাজ করার সময় বহুবার দেখেছি।

যথারীতি অভিবাদন জানাবার পর সায়েব বললেন, "দেখুন ডাক্তার আর উকিল, এরা প্রায়ই একই রকমের। এদের কাছে রোগ গোপন করে কোন লাভ নেই।" তারপর আমাকে দেখিয়ে বললেন, "ইনি আমার স্টেনোগ্রাফার, এঁর সামনে নিঃসংকোচে সব কিছু বলতে পারেন।"

ভদ্রমহিলা সত্যই নিঃসংকোচে তাঁর কাহিনী বলতে চেষ্টা করেছিলেন। সেদিন নোট বইয়ের অনেকগুলি পাতা ভরে গেল। মন্ত্রমুগ্ধের মত মেয়েটির গল্প শুনে-ছিলাম। বলতে বলতে কখনও তাঁর গলা কেঁপে উঠল, লজ্জায় দুটো হাত দিয়ে নিজের মুখটা চেপে ধরলেন কখনো, আবার কখনো নিজের আবেগ চেপে রাখতে না পেরে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলেন।

ভারতবর্ষে নয়, লেবাননের এক খৃষ্টান পরিবারের মেরিয়ন স্টুয়ার্টের জন্ম। বাবাকে মনে পড়ে না। খুব ছোট বেলায় তিনি মারা গেছেন, মা-ই সব। মেয়েকে মানুষ করার জন্যই মাকে রোজগার করতে নামতে হয়েছিল এবং বহু ক্ষেত্রেই যা হয় সেই জীবিকা যা কোন সমাজেই কোন সময়েই সম্মানজনক বলে পরিগণিত হয়নি। কিন্তু মেয়েকে তিনি সে পথে আসতে দিতে চাননি কোনদিন। মেয়ে তাঁর দেখতে শুনতে খারাপ নয়, তাই আশা ছিল ভাল জামাই নিশ্চয় জুটে যাবে এবং তিনি ঝাড়া হাত-পা হয়ে বাঁচবেন।

মেরিয়নের মা মেয়ের বর যোগাড়ের কাজ যত সহজ মনে করেছিলেন, আসলে সেটা তত সহজ নয়। মেয়ের সঙ্গে ঘোরবার, সিনেমা বা কাফেতে নিয়ে যাবার ছেলে-ছোকরার অভাব হচ্ছিল না। কিন্তু তাই বলে যে তাদের কেউ থামকা বিয়ের কথা তুলে বসবে, এমন সেন্টি-মেন্টাল লোক ওদেশে জন্মায়নি। মেয়ে এদিকে তেইশ ছাড়িয়ে চব্বিশে পা দিল। স্বজাতি পাত্রের আশা ছেড়ে দিতে হোল শেষ পর্যন্ত। মেরিয়নের মা তখন বাইরের বর জোগাড় করতে মনস্থ করলেন।

ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড নামে বৃটিশ সৈন্য-বাহিনীর এক ছোকরাকে অবশেষে মেরিয়নের মা জামাই করতে পারলেন। বিয়ের পর বছর খানেক মন্দ কাটল না। এ শহর থেকে ও শহর মেরিয়ন হাওয়ার্ড স্বামীর সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড আদর করে বলত, "মেরি, আর্মিতে চাকরি নিয়ে সারা দুনিয়া ঘুরেছি, দুনিয়ার কোন মেয়েই আমার চোখে রঙের পরশ দিতে পারল না। পারবে কি করে? আমার বরাত যে বাঁধা রয়েছে লেবাননের এক ভারি দুষ্টু মেয়ের সঙ্গে।"

দিনগুলি বেশ কেটে যায়। স্বামী-গরবে গরবিনী মেয়েদের দিন কি আর খারাপ কাটে? ডিসেম্বরের মাঝামাঝি দিন ছিল সেটা। সূর্য ডোবার কিছু আগে লনের মধ্যে বসে ওরা দুজন চা খাচ্ছিল। এমন সময় ক্যাপ্টেনের নামে এক টেলিগ্রাম হাজির হলো। খাম ছিঁড়ে, টেলিগ্রামের উপর একবার দৃষ্টিপাত করে সেটিকে পকেটে পুরল হাওয়ার্ড। হাসির ফোয়ারায় বাধা পড়ল। ক্যাপ্টেনকে গম্ভীর দেখে মেরিয়ন জিজ্ঞাসা করল "কি হলো? নিশ্চয় কোন দুঃসংবাদ।"

এক রকম জোর করে মেরিয়ন টেলিগ্রামটা ছিনিয়ে নেয়। বিলেতে বদলির হুকুম এসেছে। মেরিয়ন বলে, "এ তো সুখবর। ইংলণ্ড কিন্তু আমার খুব ভাল লাগবে, তুমি দেখে নিও।"

কিন্তু হাওয়ার্ডের মুখ আরও কালো হয়ে উঠল। দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হাওয়ার্ড কোন উত্তর দিল না। দুশ্চিন্তার কারণ যথাসময়ে মেরিয়ন জানল, হাওয়ার্ডের আসল পরিচয়ও প্রকাশ পেল। মেরিয়নের পাসপোর্ট মিলবে না, সে আইনের চোখে বিবাহিতা স্ত্রী নয়। আসল মিসেস হাওয়ার্ড যে এক গণ্ডা ছেলেপুলে নিয়ে নটিংহামশায়ারে ঘরকন্না করছেন। মিসেস হাওয়ার্ডের সংবাদ পেয়ে মেরিয়ন মুহূর্তের জন্য চমকে উঠল, কিন্তু এই প্রবঞ্চনা সত্ত্বেও হাওয়ার্ডকে সে কিছু বলতে পারল না। বন্ধুবান্ধবরা উপদেশ দিল—জোচ্চোর, মিথ্যাবাদী শয়তানটাকে সহজে ছেড়ে দিও না। ইংরেজের আইনে এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে আর এক বিবাহ দণ্ডনীয় অপরাধ। বাছাধান ভেবেছে কি! ওকে জেলে পাঠিয়ে ছাড় আর সঙ্গে সঙ্গে আদালতে ক্ষতিপূরণের মামলা দায়ের কর। মেরিয়ন কিন্তু রাজী হলো না। যে ক্ষতি তার হলো, স্বয়ং ভগবান তা পূরণ করতে পারবেন না, সুতরাং কোর্টে গিয়ে কি হবে?

ক্যাপ্টেন হাওয়ার্ড মেরিয়নের জীবন-নাট্য থেকে বিদায় নিলেন, কিন্তু সমাজে তাঁকে চিহ্নিত করে রেখে গেলেন। এখন আর অমুক ক্যাপ্টেনের স্ত্রীরূপে তার পরিচয় নেই, লোকেরা আড়ালে তাকে অমুক ক্যাপ্টেনের প্রাক্তন "ইয়ে" বলে ডাকতে শুরু করল।

এদিকে পেট চলা দায় হয়ে উঠেছে। লোকের ধারণা যে, ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে বেশ কিছু হস্তগত না করে ছেড়ে দেবার মত বোকা মেয়ে কেউ হতে পারে না। আসলে কিছুই নেয়নি সে। হাওয়ার্ডের কোন কিছু স্পর্শ করতে ঘৃণা বোধ করেছে মেরিয়ন। বছরখানেক মেরিয়ন কিভাবে পয়সা রোজগার করেছিল সে কাহিনী আমাদের বলেনি, সায়েবও জিজ্ঞাসা করেন নি। সেটা আন্দাজ করতে খুব বড়দরের কল্পনাশক্তির প্রয়োজন হয় না।

আন্তর্জাতিক বিয়ের বাজারের খবর রাখেন এমন একজন হিতৈষী বন্ধু শেষ পর্যন্ত মেরিয়নকে 'ইণ্ডিয়া'তে যেতে উপদেশ দিলেন, ভাগ্য বিমুখ না হলে বোধ হয় সেখানে ঘর বাঁধা খুব শক্ত হবে না।

ভারতবর্ষের ভিসা জোগাড় করা খুব সহজ নয়, অন্তত মেয়েদের পক্ষে ভিসা দেবার আগে দেখা হয় কি ধরনের মেয়ে,

আবেদনকারিণীর স্বামী বহাল তবিয়তে আছে কি না, স্বামী অবর্তমানে জীবন ধারণের সঙ্গতি আছে কি না। কিন্তু যে মেয়ের স্বামী বা সঙ্গতি কোন কিছু নেই ভিসা কর্তৃপক্ষ তাঁকে ভারতবর্ষে স্বাগতম জানাতে উৎসুক নয়। ভিসা কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা থাকলেও কলকাতা, বোম্বাই বা দিল্লীর সিকিউরিটি পুলিস রাজী হন না। কারণ এই ধরনের মেয়েদের উপর নজর রাখতে তাঁদের হিমশিম খেতে হয়। পাস-পোর্ট অফিসের পর্বত ডিঙিয়ে, ভিসা অফিসের সাগর পেরিয়ে, মেরিয়ন কিভাবে শেষ পর্যন্ত বোম্বাইতে এসে হাজির হলো সেটা এখানে না বললেও চলবে। শুধু এইটুকু বলি, বোম্বাইয়ের নতুন আগন্তুকের নাম মেরিয়ন রইল না, তার জীবন শুরু হলো স্টুয়ার্ট নামে। যুদ্ধ তখনো থামেনি, তাই দু' একদিনের অতিথিদের নিয়ে আমাদের মিস আভা স্টুয়ার্ট এত ব্যস্ত রইলেন যে, কয়েক বছর বিয়ে করে ঘর বাঁধার কথা একদম ভুলেই গেলেন।

ছেচল্লিশ সালের কথা। পূর্বভারতের কোন একটি দেশীয় রাজ্যের নবাব বোম্বাইতে এসেছেন বেড়াতে। রাজা-রাজড়ারা কখন একা আসেন না। তাঁদের পাত্র, মিত্র, অমাত্যরা ছায়ার মত সঙ্গে আসেন। উল্লিখিত নবাবের তরুণ এ ডি সি-র সঙ্গে এক পার্টিতে পরিচয় হল আভার। এ ডি সি ভারি আমুদে মানুষ, তাই পরিচয় নিবিড় হতে বেশী সময় লাগল না। তরুণ এ ডি সি হৃদয় দিয়ে ফেললেন লেবাননের এই মেয়েটিকে। বয়সে আভা সামান্য বড়ই হবে, কিন্তু তাতে কি আসে যায়? বাধা আছে, তবে অন্য ধরনের। নিজের নখগুলোর দিকে সযত্ন নজর দিতে দিতে ক্যাপ্টেন মহী-উদ্দীন একদিন বললেন, "আভা, আমরা যে মুসলমান, বাপ-পিতামহের ধর্ম, তা ছাড়া মুসলমানের রাজ্যে চাকরি করি।"

"তাতে কী হয়েছে? পর্বত মহম্মদের কাছে এল না বলে মহম্মদ পর্বতের কাছে যাবে না? তুমি আমার এত আদরের, আর তোমার জন্য খৃষ্টান থেকে মুসলমান হতে পারব না?" আভা আবেগভরা কণ্ঠে বলে উঠলো।

বোম্বাইয়ের এক মসজিদে আভা স্টুয়ার্টের নতুন নামকরণ কি হয়েছিল খাতায় লিখে রাখিনি। জেব উন্নিসা বা মেহের উন্নিসা এই ধরনের কি একটা হবে, ঠিক স্মরণ করতে পারছি না। নবপরিণীতা বধূ নিয়ে এ ডি সি ফিরে এলেন নবাবের রাজধানীতে। এ ডি সি-র বাংলো একটি ছোটখাটো প্রাসাদ, সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো। মহীউদ্দীন মৃদু হেসে বললেন, "এই তোমার রাজত্ব বেগম সাহেবা। এখানের সর্বময় কর্তৃত্ব তোমার।"

নববধূর সলজ্জ হাসিতে মহীউদ্দীন ধন্য মনে করে নিজেকে। নতুন পরিবেশ ভারি ভাল লাগল আভার। ভাল লাগবে না? এ যে তার নিজের সংসার, এতো আর হোটেলের ভাড়া করা ঘর নয় যে, ক'দিন আছি জানি না, নিজের মত করে গুছিয়ে লাভ নেই। সংসারে বিশেষ কিছু করবার নেই। দিনের শেষে স্নান সমাপন করে প্রসাধনে বসে আভা, নিজেকে নানা রূপে সাজিয়ে তনুদেহকে আয়নার সামনে মেলে ধরে। কোনদিন মহীউদ্দীন হঠাৎ এসে পড়লে অবাক হয়ে যায়, মৃদু হেসে বলে, "শাড়ি তোমাদের দেশে তো চলে না, কিন্তু তবু শাড়ি পরলে কত সুন্দর তোমাকে দেখায়।"

কখনো বা প্রসাধন শেষে বাইরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে আভা সময় গোনে, পাশের চেয়ার খালি। নবাবের প্রাসাদ থেকে মহীউদ্দীনের ফিরতে দেরি হয়। দূরের আকাশ একেবারে নির্মল, কোন অজ্ঞাত শিল্পী যেন ছবি আঁকার আগে ক্যানভাস ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে রেখেছে। সেই নির্মেঘ আকাশের পটে ক্রমশ তারারা জেগে উঠতে থাকে, শিল্পী একের পর এক তুলির আঁচড় টেনে যায়। এদিকে নববধূর মনের পটেও চিন্তার তারারা ক্রমশ উঁকি দেয়, এক-আধটা নয় অনেক অনেক চিন্তা। সাজানো-গুছানো নয়, এলোমেলো অবিন্যস্ত। লাইন বেঁধে মার্চ করা সৈন্যদলের মত তারা আসে না, আসে দিবাবসানে ঘরমুখো একঝাঁক পাখির মতো। দুদিন আগে যে পৃথিবীকে নিষ্ফল নিষ্করুণ মনে হয়েছে, আজ তার অন্য রূপ দেখতে পাচ্ছে। জীবনে সে দুঃখ পেয়েছে সত্য। বিশ্বাসের বদলে প্রিয়তম হাওয়ার্ডের কাছে পেয়েছে প্রতারণা, সে-ও সত্য। কিন্তু নববধূভাবে ঘর ভেঙে ভগবান ঘর গড়েও তো দিলেন।

সৃষ্টির ইতিহাস এই ভাঙা-গড়ার ইতিহাস, তবুও সৃষ্টি ও ধ্বংসের ব্যবধানই জীবনের পরম কাম্য।

মহীউদ্দীন নিজের বিবাহের কথা নবাবকে জানান নি, আসলে জানাতে সাহস হয়নি। কিন্তু এ খবর ছড়িয়ে পড়তে বেশী সময় লাগে না, নবাব এ ডি সি-কে ডেকে পাঠালেন।

"দেখ ক্যাপ্টেন সাহেব, বিয়ে যদি করলে খানদানী বংশ দেখে করলে না কেন?" নবাব মহীউদ্দীনকে বলছিলেন, "আমেরিকানদের একটা এঁটোকে বিয়ে করতে তোমার রুচিতে বাধল না? যা হোক, মানুষ মাত্রেরই ভুল হয়। খানদানী বংশের খুবসুরত জেনানার সঙ্গে তোমার সাদির ব্যবস্থা আমি নিজেই করে দেব, ওই ডাইনী স্পাইকে আগে তুমি বিদায় কর।"

মহীউদ্দীন নবাবকে বোঝাবার যথেষ্ট চেষ্টা করল। আমার জেনানা স্পাই নয়, খুব ভাল মেয়ে, বিশ্বাস করুন। নবাব গম্ভীরভাবে বললেন, "তোমাকে বলা হয় নি, আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটির স্টেট ছেড়ে যাবার আদেশে আজ সকালে আমি সই করেছি। যদি চাও তোমার নামও তাতে ঢুকিয়ে দিতে পারি।"

বেচারা ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীন গভীর আঘাত পেলেন। কিন্তু এ জগতে সবাই অষ্টম এডওয়ার্ড বা তাঁর ভাবশিষ্য চারু দত্ত আধারকার নন যে, প্রিয়ার জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করবেন। মহীউদ্দীন ভাবলেন, এক জেনানা গেলে আর এক জেনানা হবে, কিন্তু এক নোকরি গেলে, আর এক নোকরি এ জীবনে নাও মিলতে পারে।

বাড়ি ফিরে মহীউদ্দীন স্ত্রীকে ডেকে বললেন, "ডার্লিং, মনটা ভাল নয়। কত স্বপ্ন দেখেছিলাম তোমাকে নিয়ে ঘর বাঁধব, নবাব কিন্তু সব ভেস্তে দিলেন।"

নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের বিস্তারিত বর্ণনা দিলেন মহীউদ্দীন, "অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলাম কিছু হোল না। ভেবে দেখলাম, নোকরি ছাড়া চলে না।"

একটু থেমে দীর্ঘনিশ্বাস নিয়ে মহী-উদ্দীন বললেন, "ডার্লিং, যাই করি না কেন, তুমি আমার দিল-এ সর্বদা শুক-তারার মত জেগে থাকবে।"

সেদিন রাত্রে মহীউদ্দীন স্টেশন পর্যন্ত আসতেও সাহস করেনি, কিন্তু চাকর মারফৎ দুটি খাম স্টেশনে পাঠিয়েছিলেন। একটিতে একখানি উকিলের চিঠি, "মহাশয়া, এতদ্দ্বারা আপনাকে জানাইতেছি যে, আমার মক্কেল ক্যাপ্টেন মহীউদ্দীন খাঁ দুইজন গণ্যমান্য সাক্ষীর উপস্থিতিতে পবিত্র ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী তিনবার তালাক উচ্চারণ করিয়া আপনাকে তালাক দিয়াছেন। ইতি......"

অন্য খামে পঞ্চাশখানা দশ টাকার নোট, সঙ্গে এক টুকরো কাগজ, তাতে লেখা "পাথেয়রূপে পাঠালাম।"

এবার কেন্দ্র কলকাতা। জীবনের নিষ্ঠুর স্রোতে বাহিত হয়ে লেবাননের একটি মেয়ে কলকাতায় এসে দাঁড়াল। চোখে তার ঘর বাঁধার স্বপ্ন। কলকাতার জীবনের দীর্ঘ পরিচয় দিয়ে লাভ নেই, তবে বর্তমানে একটি বিবাহের প্রস্তাব এসেছে। পাণিপ্রার্থী আর কেউ নয় ঐ জংলা বুশ শার্ট পরা ছোকরাটি। ছোকরার পরিচয় জানা ছিল না, তবে ভেবেছিলাম কোন ধনী ব্যবসায়ীর বিপথগামী পুত্র-সন্তান। জানলাম, উনি একটি বিখ্যাত দেশীয় রাজ্যের রাজপুত্র। ধরুন, রাজ্যটির নাম চন্দ্রগড়।

"যুবরাজ আমাকে বিবাহ করতে চান আর আমিও যুবরাজকে বিবাহ করতে ইচ্ছুক।" আভার গলায় কথাগুলো কেমন বেসুরো মনে হচ্ছিল, কিন্তু সে স্বরে ছিল অদ্ভুত অদম্য আত্মপ্রত্যয়। জীবনের খেলায় বারবার যারা প্রবঞ্চিত ও পরাজিত হয়েছে, বোধ করি ভগবান তাদেরই এত মনোবল দিয়ে থাকেন।

এতক্ষণ এক নিশ্বাসে শুনে যাচ্ছিলাম মেয়েটির কাহিনী। সত্যি বলে বিশ্বাস হয়নি আমার নিজেরই। ভাল করে চেয়ে দেখলাম ওর মুখের দিকে। বাগ্‌দত্তাসুলভ মিষ্টি নম্র আভা ছড়িয়ে রয়েছে সমস্ত মুখটিতে, মেঘের আড়াল হতে সূর্য যেন ক্ষণেক মুহূর্তের জন্য দর্শন দিচ্ছেন।

"আসছে শনিবার ভবানীপুরের এক মিশন আমাকে হিন্দুধর্মে দীক্ষা দেবে, ঐ দিন সন্ধ্যায় আমাদের বিবাহ।"

রোগীর কাতর আর্তনাদে আত্মীয় পরিজনরা অভিভূত হন। কিন্তু চিকিৎসক? তিনি নির্বিকার। যার জন্য শঙ্কাকুল পরিজনরা বিনিদ্র রজনী যাপন করেন, অন্নগ্রহণে বিরত থাকেন, চিকিৎসকের কাছে তিনি একটি পেসেন্ট মাত্র। টাইফয়েড্ কিংবা নিউমোনিয়ার একটি কেস মাত্র আর কিছু নয়। আইনজীবীদেরও অবস্থা অনেকটা একই। ফাঁসির আসামীর পক্ষে তিনি আইনের যুদ্ধ করতে পারেন, জেরা করতে পারেন, কিন্তু আসামীর স্ত্রী বা মায়ের মত অভিভূত হতে পারেন কি? সায়েব বলতেন, "শঙ্কর, কোন ডাক্তারই নিজের সন্তানের উপর অস্ত্রোপচার করতে পারেন না; কোন ব্যারিস্টার বা উকিলই দায়রা আদালতে অভিযুক্ত নিজের সন্তানের মামলা পরিচালনা করতে পারেন না।"

কিন্তু উকিল বা ডাক্তারের এই হিম-শীতল অনুভূতির ব্যতিক্রম হয় না? এপ্রন কিংবা গাউনের অনেক ভিতরে ঢাকা মন কি কখনও সমব্যথায় কাতর হয়ে ওঠে না? নিশ্চয়ই ওঠে।

সেদিনও আপাতদৃষ্টিতে সায়েবের ভিতর কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়নি, কিন্তু তাঁর মনের গহনে কি চলেছে তাঁর চোখে সেটি প্রতিফলিত হয়। সেখানে চাইলাম, লক্ষ্য করলাম, একরাশ স্নেহের মেঘ।

চোখ থেকে চশমা খুলে রাখতে রাখতে সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার কাছে আসার উদ্দেশ্য কি এবার বলুন।"

"যুবরাজের বাবার এই বিবাহে কোন মত নেই। অবশ্য তিনি এখনও জানেন না যে, আসছে শনিবারই আমাদের বিবাহ। কাউকে আজকাল সম্পূর্ণ বিশ্বাস করতে পারি না। কিছুদিন পরে বাবার চাপে যুবরাজ যদি এই বিয়ে অস্বীকার করেন, তখন কি হবে? এখন থেকে তার জন্য কি করতে পারি? আর একটা কথা। যুবরাজ আমাকে খৃষ্টান বলে জানেন। কিন্তু বর্তমানে আমি খৃষ্টান না মুসলমান?" আভা স্টুয়ার্টের স্বর কি রকম অদ্ভুত শোনাল।

আইনজ্ঞের কাছে এগুলি এমন কিছু কঠিন প্রশ্ন নয়, তাই সায়েব বললেন, "প্রথমত বিয়ের পর মিশনের কাছ থেকে সার্টিফিকেট নিতে ভুলবেন না। বিবাহ প্রমাণের জন্য ভবিষ্যতে এইটেই হবে আপনার সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য দলিল আর আপনি যখন হিন্দুধর্ম গ্রহণ করছেন, তখন আসলে আপনি খৃষ্টান না মুসলমান কিছু আসে যায় না। আপাতত এই আমার উপদেশ, ভবিষ্যতে নতুন কিছু ঘটলে আমার সাহায্য সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ থাকতে পারেন।"

আভা স্টুয়ার্ট বেরিয়ে যাবার পরও সায়েব কিছুক্ষণ নির্বাক রইলেন। অভিজ্ঞতার দপ্তরখানায় যে নতুন ঘটনাটি জমা হোল সেটিকে খুব সম্ভবত মনের

ভিতর সাজিয়ে রাখছিলেন। সামান্য হেসে আমার কাঁধে একটা চাপড় দিয়ে বললেন, "শঙ্কর, খুব আশ্চর্য লাগছে তোমার, তাই না?" একটু থেমে আবার বললেন, "শঙ্কর, তোমাদের জীবনের এই তো শুরু, চোখ আর কান দুটিকে একটু সজাগ রেখো, দুনিয়ার আরও কত অদ্ভুত জিনিসের দেখা পাবে।"

হ্যাঁ না, কিছু না বলে স্থির হয়ে বসে রইলাম।

"তোমাদের পরিবারে বিয়ের কয়েক-দিন আগেই মেয়েকে নিয়ে নানান রকম উৎসব পড়ে যায়। না? আমাদের দেশেও তাই"—কি যেন চিন্তা করতে করতে সায়েব কথাগুলি বলে যাচ্ছিলেন। "মেয়ে তখন ভাবে কত ভাগ্যবতী সে। তাকে কেন্দ্র করেই তো যত-কিছু উৎসব, কিন্তু যে মেয়েকে নিজের বিয়ের জোগাড় নিজেকেই করতে হয়, এমন কি তার আগে আইনের পরামর্শ নিতে ছুটতে হয়, সে কি নিজেকে ভাগ্যবতী ভাবতে পারে?"

পরের রবিবার বেশী কাজ থাকায় আমাকে হোটেলে আসতে হয়েছিল। ছুটির দিন সায়েব একটু অন্য ধরনের হয়ে যান। ব্যারিস্টারের কাল গাউনের ভিতর যে সদা-হাস্যময় রসিক মনটা লুকিয়ে থাকত রবিবার সে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসত। সেদিন কাজ যত না করি, তার অনেক বেশী গল্প হয়। ইংরেজের কাছে কাজ আর আড্ডার সম্পর্ক হোল ভাসুর ও ভাদ্দর বৌএর সম্পর্ক। সায়েব রসিকতা করে বলতেন, "ইংরেজ যেখানে অফিস খোলে, তার পাঁচ মাইলের মধ্যে কোন ক্লাবের নামগন্ধ থাকে না। রবিবারে আমি কিন্তু পুরো ফরাসী, ওরা যেখানে অফিস খোলে, সেই ঘরেই আধ-খানা পর্দা টাঙিয়ে আড্ডা জমাবার ব্যবস্থা করে।"

বিকেলে চা খেতে খেতে এইরকম নানান মজার গল্প শুনছিলাম এমন সময় বেয়ারা একটা কার্ড দিয়ে গেল। রানী মীরা আদিত্যনারায়ণ সায়েবের দর্শন-প্রার্থী। এমন অদ্ভুত নাম আমার জানা ছিল না। এদেশের মানুষ না হলেও ভারতীয় নামের কূট-কচালিতে সায়েব অভ্যস্ত। মুখুজ্যে কি ধরনের কুলীন, উত্তর রাঢ়ী ও দক্ষিণ রাঢ়ীর তফাৎ কোথায়, গোয়েল উপাধির উৎপত্তি সিন্ধুদেশ, না রাজপুতানায় এইসব প্রশ্নে প্রয়োজন হলে ডজনখানেক ভট্টাচার্যিকে তিনি কাবু করতে পারেন। কার্ডের অধিকারিণী আমাদের সকল ঔৎসুক্য দূর করে ভিতরে প্রবেশ করলেন, তিনি আর কেউ নন, আমাদের চিরপরিচিত যুবরাজপ্রিয়া। গেরুয়া রঙের সিল্কের সাড়ি তনুদেহকে বেষ্টন করে উঠেছে, সিঁথিতে জ্বল জ্বল করছে সিঁদুরের রেখা। এত স্নিগ্ধ ও সৌম্যরূপে আভা স্টুয়ার্টকে কোনদিন দেখিনি।

"মীরা নামটি আপনার কেমন লাগে?"

"বেশ সুন্দর নাম।" সায়েব ঘাড় নেড়ে উত্তর দিলেন।

"অনেক ভেবে এই নাম পছন্দ করেছি, আর শেষের অংশ আমার স্বামীর বংশগত উপাধি।"

সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "নতুন কোন খবর আছে নাকি রানী-সাহেবা।"

রানী নিস্তব্ধ রইলেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখের প্রশান্তি বিদায় নিল। হঠাৎ রানীকে বড় ক্লান্ত মনে হতে লাগল। আস্তে আস্তে বললেন, "বড়ই চিন্তায় আছি। আপনাকে বলেছিলাম আমার শ্বশুর এই বিয়েতে মত দেননি, এখন তিনি আমাকে ইণ্ডিয়া থেকে বার করে দেবার চেষ্টা করছেন। এখানকার সিকিউরিটি পুলিসকে তিনি হাত করেছেন।"

গম্ভীরভাবে সায়েব বললেন, "হ্যাঁ, তাহলে চিন্তার ব্যাপার। সিকিউরিটি পুলিস ইচ্ছে করলে যে কোন বিদেশীকে এখান থেকে বহিষ্কৃত করতে পারে।"

রানী মীরাকে খুব উদ্বিগ্ন দেখলাম। "তাহলে কি হবে? আপনিই এই বিদেশে আমার একমাত্র বন্ধু।" রানী আর বলতে পারলেন না।

গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন সায়েব। বুঝলাম একটি অসহায় নারীকে সাহায্য করার জন্য আইনের অস্ত্রগুলি পরীক্ষা করে দেখেছেন। রানীর মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে সায়েব চিন্তামগ্ন হলেন। সলিল সমাধি থেকে অসহায় এক নারীকে উদ্ধারের জন্য নিপুণ সাঁতারু জল কেটে যেন এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। একটু পরে সায়েব হেসে বললেন, "না, আইন আপনার দিকেই। আপনি এখন আর বিদেশিনী নন, ভারতীয় নাগরিককে বিয়ে করে আপনিও একজন ভারতীয়। সুতরাং বিয়ের সার্টিফিকেট যতক্ষণ আপনার কাছে আছে, বিশেষ ভয়ের কোন কারণ নেই।"

রানী চমকে উঠলেন। শীতের সন্ধ্যায় তাঁর কপালে ঘামের ফোঁটা দেখা দিল। সার্টিফিকেট নিয়েই যত গোলমাল। মিশনের কর্তারা দুদিক থেকে অর্থ উপার্জন করছেন, শ্বশুর মিশনকে অনেক টাকার লোভ দেখিয়েছেন। মিশন এখন সার্টিফিকেট দিতে চাইছে না।

রানী বললেন, "কাল সারাদিন সেখানে বসেছিলাম, কত অনুনয় বিনয় করলাম, কিছুই হোল না। আর টাকা দেওয়াও আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়, যুবরাজের টাকা ফুরিয়ে এসেছে। আমার শ্বশুর টাকা পাঠান বন্ধ করেছেন।" একটু ইতস্তত করে রানী মীরা বললেন, আমার কাছে সামান্য যা ছিল, তাই দিয়ে কদিন দুজনের খরচ চালাচ্ছি।"

সায়েব বললেন, "কালকে দুপুরের দিকে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে আমার চেম্বারে আসবেন ইতিমধ্যে ভেবে দেখব কি করা যেতে পারে।"

অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে রানী মীরা সেদিনের মত বিদায় নিলেন। রানীর যাত্রাপথে কতক্ষণ চেয়েছিলাম জানি না, সায়েবের কথায় ফিরে চাইলাম। সায়েব বললেন, "তোমাদের দেশের রূপকথার গল্পগুলো কেমন কেমন মনে হচ্ছে।" আমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়া রাজ-পুত্তুরের গল্প মাঝে মাঝে সায়েবকে বলেছি। কিন্তু হঠাৎ সে কথা সায়েব কেন তুললেন, বুঝতে পারলাম না। "রূপকথার রাজপুত্তুরাই শুধু সাত-সমুদ্র তের নদীর পারের কুচবরণ রাজকন্যার খোঁজে বার হয়েছে। পথে নানা কষ্ট পেয়েছে, প্রয়োজন হলে জীবন তুচ্ছজ্ঞান করেছে। আজকের পৃথিবীর কাহিনী নিয়ে যদি রূপকথা লেখা হোত, তাতে রানী মীরার একটু স্থান করে দেবার চেষ্টা করতাম। রাজকন্যা নিজেই নদী, পাহাড়, বাধা, বিপত্তি পেরিয়ে রাজপুত্রের সন্ধানে বেরিয়েছেন।" সায়েব সামান্য হেসে

অন্তঃসলিলা বেদনার সুরকে ঢাকবার চেষ্টা করলেন।

পরের দিন রানীর অপেক্ষায় চেম্বারে অনেকক্ষণ রইলাম। রানী এলেন না। সায়েব একটু চিন্তিত রইলেন। কিন্তু একদিন গেল, দুদিন গেল, এক সপ্তাহ গেল রানীর কোন সংবাদ মিলল না। হোটেলের কর্মচারীরাও কোন হদিশ দিতে পারল না।

আমরা সন্দেহ করলাম সিকিউরিটি পুলিসের লোকেরা রানীকে জোর করে দমদমের কোন উড়োজাহাজে তুলে দিয়েছে। এর আগেও দু-একবার সিকিউরিটি পুলিসকে এইরকম করতে শুনেছি।

কোন কোন অলস অবসরে রানীর ম্লান ছবিখানি আমার চোখের সামনে জেগে উঠেছে। পাষাণপুরীতে বন্দিনী রাজকন্যা দুরন্ত রাক্ষসের চোখ এড়িয়ে দুর্গম গিরি-কান্তার, মরু-দুস্তর-পারাবারে রাজপুত্রের সন্ধান করছেন। কিন্তু কোন বেঙ্গমা-বেঙ্গমী তাঁকে পথ দেখিয়ে দিচ্ছে না।

এক এক সময় মনে হয়েছে, আমাদের দেশের মেয়েদের সঙ্গে রানীর কোন তফাৎ নেই। আমাদের মায়ের মত রানীও কি স্বামী-পুত্র নিয়ে সংসার করতে পারলে সুখী হতেন না? পরের মুহূর্তে অন্য রকম ভেবেছি। চোখের সামনে দেখেছি, রূপের পসরা সাজিয়ে রানী লাউঞ্জেতে বসে আছেন। অশোভনভাবে সিগারেটের ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাচ্ছেন, তাঁর পায়ের সোনালী গ্রীসিয়ান জুতো পুরুষালী ঢঙে নাচছে। তবুও রানীর জীবন-নাটকের পরিসমাপ্তিতে প্রকৃত দুঃখবোধ করেছি।

ক্রমশ রানী মীরার কথা একেবারে বিস্মৃত হলাম। উঁচু গম্বুজওয়ালা হাইকোর্টের ছায়ায় গড়া ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে জীবন-নাট্যের কত অদ্ভুত খেলা অহরহ চলেছে। স্যাকরার দোকানের ধুলো বাছলেও যেমন সোনা পাওয়া যায়, এখানকার এক একটা ছোট্ট খুপরির দেওয়ালের ঝুল ঝাড়লেও বহু চাঞ্চল্যকর উপন্যাসের উপকরণ পাওয়া যেতে পারে। কত বিচিত্র মানুষের আনাগোনা সেখানে, কত বিচিত্র সমস্যা তাদের। কেউ বিয়ে ভাঙতে চায়, কেউ বিয়ে করতে চায়, কেউ নতুন জমিতে বাড়ি তুলতে চায়, কেউ বা পয়সার অভাবে নিজের বাসস্থানটুকু বন্ধক রাখতে চায়। এসবের মধ্যে রানীকে মনে রাখার সময় কোথায়?

বেশ কিছুদিন পরে রানীর কথা মনে পড়ল। আঁকাবাঁকা অক্ষরে ঠিকানা লেখা একটা চিঠি এল। পড়া শেষ করে সায়েব চিঠি এগিয়ে দিলেন আমার দিকে, "শঙ্কর, পড়ে দেখ।"

চিঠিতে লেখা ছিল—

চন্দ্রগড়

প্রিয় মিস্টার '—'

এই চিঠি পেয়ে আপনি হয়ত অবাক হবেন। হয়ত এর আগে ভেবেছেন, আমি হঠাৎ কলকাতা থেকে উঠে গেলাম নাকি! কিন্তু বিশ্বাস করুন নানান ঝঞ্ঝাটে খবর দিয়ে আসতে পারিনি।

একটা কথা লিখতে বসে বার বার মনে জাগছে যে, আমাদের মত মেয়েদের সম্বন্ধে হয়ত অনেক খারাপ ধারণা করেছেন, কিন্তু আমি আর যাই হই না কেন, অকৃতজ্ঞ নই। সেদিন একটি অসহায় মেয়েকে বিনা পারিশ্রমিকে আপনি যে সাহায্য করেছিলেন, কোন দিন তা ভুলব না।

আপনার সঙ্গে শেষ দেখা হওয়ার পর ভেবে দেখলাম, যুবরাজকে আমি কিছুতেই ছাড়তে পারি না। এক ভয়ঙ্কর ঝুঁকি নিলাম। ঠিক করলাম, আমার শ্বশুরের সঙ্গে সামনা-সামনি একটা বোঝাপড়া করতে হবে।

কি করে এই চন্দ্রগড়ে এসে আমার শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করলাম আর তাঁকে সন্তুষ্ট করলাম, সে এক বিরাট কাহিনী। যদি কোন দিন সাক্ষাৎ হয় সব বলব। আপাতত জেনে সুখী হবেন, হারেমে থাকবার অনুমতি পেয়েছি। যুবরাজের ছয় নম্বর স্ত্রী আমি। তাতে কিছু এসে যায় না, জীবনের শেষ কটা দিন এইভাবে একটু শান্তিতে কাটাতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবতী মনে করব। জীবনে কোনদিন খারাপ পথে আসতে হবে বুঝতে পারিনি। আর সবার মত স্বামী পুত্র নিয়ে ঘর করার ইচ্ছে আমারও ছিল, কিন্তু ঈশ্বর তা চাননি। তাই জীবনের পঁয়ত্রিশটা বছর ছন্নছাড়া হয়ে কেটে গেল। যৌবনকে চিরদিন বেঁধে রাখা যায় না, তাই শেষের দিকে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বড়ই দুশ্চিন্তায় কাটিয়েছি। মদের হুল্লোড়, নাচের আসরেও খুঁজে বেড়িয়েছি, যদি এমন কাউকে পাই, যে আমাকে তার ঘরের কোণে ঠাঁই দেবে, একটু স্নেহ দেবে আর তাকে স্বামী বলে ডাকবার অধিকার দেবে।

হিমালয়ের বুকের মধ্যে এই চন্দ্রগড় রাজ্য। বিচিত্র এখানকার আদব-কায়দা। হারেমের আইন-কানুন আরও বিচিত্র। মেয়েরা অসূর্যম্পশ্যা, আমি অবশ্য লক্ষ্মী মেয়ের মত এর সঙ্গে নিজেকে মানাবার চেষ্টা করেছি, না করেও উপায় নেই। গত রবিবারে আমার এক সতীনের সঙ্গে যুবরাজের কথা-কাটাকাটি হয়, পরের দিন থেকে তাকে আর দেখিনি। আমার পরিচারিকার মুখে শুনলাম, তার খবর আর কোন দিন পাওয়া যাবে না।

এখানে চিঠি লেখা একেবারে নিষিদ্ধ। এক বিশ্বস্ত পরিচারিকার হাতে চিঠিটা ফেলতে পাঠাচ্ছি। সুতরাং উত্তর দেবার চেষ্টা করবেন না। ঈশ্বরের ইচ্ছা থাকলে আমাদের আবার দেখা হবে। ইতি—

চিরকৃতজ্ঞা

রানী মীরা আদিত্যনারায়ণ

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

চার্লস চ্যাপলিনের সান্নিধ্যলাভের সুযোগ যাঁদের হয়েছে, নির্দ্বিধায় তাঁরা স্বীকার করবেন, তিনি মমতাবান, সহৃদয় শিল্পী। আর একটা কথা, ধৈর্য ধরে তিনি অপেক্ষা করতে জানেন। অসামান্য তাঁর অন্তর্দৃষ্টি। এক-একটি ঘটনার মধ্য থেকে হাস্যরসের সম্ভব-অসম্ভব সমস্তগুলি উপাদানকে নিঃশেষে নিংড়ে বার করে না নেওয়া পর্যন্ত তাঁর শান্তি নেই। সামান্য একটি কাহিনী, তারই কোন্ অলক্ষ্য মর্মস্তল থেকে হাস্য-রসের কত রকমের উপাদান যে তিনি বার করে নিয়ে আসবেন, আগে থেকে কেউই তা বলতে পারে না। "ওয়ান এ এম" ছবিতেই তার প্রকৃষ্ট পরিচয় আমরা পেয়েছি।

ছবি তো শেষ হল। তারপর? তারপর চার্লি করেন কি, স্টুডিয়োর বুড়ো দারোয়ান, টাইপিস্ট আর অন্য-সব কর্মচারীকে ডেকে নিয়ে এসে ছবিখানি একবার দেখিয়ে দেন। এরাই তাঁর ছবির প্রথম দর্শক। চার্লি এদের কাছ থেকে কখনও কোনও মতামত জানতে চান না; শুধু লক্ষ্য করে যান, ছবি দেখতে-দেখতে তাদের মুখভাবের কখন কী-রকমের পরিবর্তন ঘটছে। কখনও কখনও এক দঙ্গল বাচ্চা ছেলেমেয়ে জুটিয়ে এনেও চার্লি তাদের তাঁর সদ্যোসমাপ্ত ছবি দেখিয়ে দেন। কোনও একটা হাসির দৃশ্যে তারা যদি না হাসে, সঙ্গে সঙ্গেই দৃশ্যটাকে আবার নতুন করে তুলবার ব্যবস্থা করেন চার্লি, প্রয়োজন বুঝে তাকে তিনি আরও একটু সূক্ষ্ম কিংবা আরও একটু সহজ করে দেন।

এ-ব্যাপারে তাঁর একমাত্র অভিমত এই যে, "ব্যক্তিগতভাবে কেউই আমরা মহৎ কিছু নই; অন্যান্য মানুষের সংস্পর্শে এসে তবেই আমরা খানিকটা মহৎ হয়ে উঠি। যা কিছু আমাদের মূল্য, তা শুধু এইখানেই।"

ব্যাপারটাকে আর-একটু বিশদভাবে দেখা যাক। চ্যাপলিনের আচরণ আর কার্যকলাপে এমন কী আছে, যে তাঁকে দেখলেই সকলের হাস্যস্রোত এমন দুর্বার

আলফ রীভস

হয়ে ওঠে? তিনি নিজেই তার জবাব দিয়েছেন।

"আমার দর্শকদের আমি এমন একটি মানুষের সামনে এনে দাঁড় করিয়ে দেই, যে একটা অস্বস্তিজনক হাস্যকর পরিস্থিতির মধ্যে এসে বেসামাল হয়ে পড়েছে। দর্শকদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবার এর চাইতে বড় ওষুধ আর নেই। হাওয়ার ঝাপটে একজনের টুপি উড়ে যাচ্ছে, এ দেখে কেউ হাসে না; কিন্তু যদি দেখানো যায় যে, মানুষটি তার উড়ন্ত টুপির পিছনে বেসামাল হয়ে ছুটে চলেছে, দর্শকদের মুখে অমনি হাসি ফুটে উঠবে। রাস্তা দিয়ে একজন হেঁটে যাচ্ছে, এ দেখে কেউ হাসে না; কিন্তু সেই মানুষটিকেই যখন একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া যায়, হাসতে হাসতে সবাই লুটিয়ে পড়ে। হাস্যরস সৃষ্টির এইটেই হল গোড়ার কথা।

"হাসির ছবিগুলিকে যে প্রথম পর্যায়েই সবাই লুফে নিয়েছিল, তার একটা মস্ত বড় কারণ হল এই যে, সে আমলের অধিকাংশ হাসির ছবিতেই কনস্টেবলদের নিয়ে খুব রঙ্গ-তামাসা করা হ'ত। কেউবা গিয়ে নর্দমার মধ্যে আছাড় খেয়ে পড়ছে, কেউবা চুণগোলা জলের মধ্যে, কেউবা চলন্ত গাড়ি থেকে রাস্তায় ছিটকে পড়ছে, কনস্টেবলদের নিয়ে রঙ্গ-কৌতুকের আর অন্ত ছিল না। দর্শকরা সেটা খুব পছন্দ করতেন। পুলিশ হল ক্ষমতার প্রতীক। সুতরাং তাদের যদি কৌতুকের পাত্র করে তোলা যায়, যদি দেখানো যায় যে, বিপাকে পড়ে তারা নাকানিচোবানি খাচ্ছে, দর্শকরা তাতে দ্বিগুণ খুশী হবেন, তাতে সন্দেহ কি! সাধারণ একজন মানুষকে বিপাকে পড়তে দেখলে যতখানি হাসি পায় তাঁদের, জাঁদরেল এক একটি কনস্টেবলকে বিপাকে পড়তে দেখলে তার চাইতে বেশী হাসিই যে তাঁদের মুখে ফুটে উঠবে, এইটেই স্বাভাবিক।

"এবং তার চাইতেও অনেক বেশী হাসি পায় সেই মানুষটিকে দেখে, বিপাকে পড়েও যে হাল ছাড়তে চাইছে না, নানান ভাবে নাস্তানাবুদ হয়েও প্রাণপণে যে তার মর্যাদা বাঁচিয়ে রাখতে চাইছে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক। মদ খেয়ে কেউ যখন বেসামাল হয়ে পড়ে, তার অসংলগ্ন কথাবার্তা আর টালমাটাল ভঙ্গী দেখেই বুঝতে পারা যায় যে, সে আর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই। কিন্তু সেই বেসামাল অবস্থাতেও সে যখন সবাইকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে, এক ফোঁটা মদও সে খায়নি, তখনই একটা চূড়ান্ত রকমের হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। মদ খেয়ে যে তা গোপন করবার চেষ্টা করে না, তাকে দেখে হাসি পায় না আমাদের; যে ব্যক্তি তা গোপন করবার চেষ্টা করে, তাকে দেখেই আমাদের হাসি পায়।

"ছবির মধ্যে নিজেকে আমি নানান রকমের অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে টেনে নিয়ে যাই। সবাই তা জানেন। তারপর

বেসামাল হয়েও আমি একটা নির্লিপ্ত ভাব বজায় রাখবার চেষ্টা করি। এমন ভাব করি যেন কিছুই হয়নি। রাস্তার মধ্যে হঠাৎ হয়তো হোঁচট খেয়ে পড়লাম,—পর মুহূর্তেই চট করে আমার ছড়িটাকে আমি কুড়িয়ে নেই, টুপিটাকে সোজা করে বসাই, নেকটাইটাকে আবার ঠিকমতো বেঁধে রাখি। দর্শকদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবার এ এক অব্যর্থ উপায়।

"হাস্যরস সৃষ্টির যতগুলি উপকরণ আমার হাতে থাকে, তার কোনওটিরই অপচয় আমার ধাতে সয় না। শুধু তাই নয়। কোনও ঘটনার মধ্যে যদি এমন কোনও উপকরণ থাকে, যার সাহায্যে দু'-দুবার সবাইকে হাসানো সম্ভব, তো সে ক্ষেত্রে সেই উপকরণটিকে আমি পৃথক পৃথক দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে কাজে লাগাবার চেষ্টা করি। 'দী অ্যাডভেঞ্চারার' ছবিটি যাঁরা দেখেছেন, কথাটার তাৎপর্য তাঁরা বুঝতে পারবেন। বইখানির একটি দৃশ্য এইরকম। ব্যালকনিতে জনৈকা তরুণীর পাশে বসে আমি এক পাত্র আইসক্রীম খাচ্ছি। নীচের তলায় বসে আছেন স্থূলাঙ্গী, সুবেশা এক জাঁদরেল ভদ্রমহিলা। আইসক্রীমের পাত্র থেকে হঠাৎ এক টুকরো বরফ আমার ট্রাউজারের মধ্যে সেঁদিয়ে গেল, তারপর সেখান থেকে বেরিয়ে গিয়ে নীচের তলায় সেই ভদ্রমহিলার পোশাকের মধ্যে। দু-দফা হাসির সৃষ্টি হল এখানে। প্রথমে তো আমার অস্বস্তিতে সবাই মজা পেলেন, তারপর জাঁদরেল সেই ভদ্রমহিলার অস্বস্তিতে। দ্বিতীয়বারের হাসি প্রথমবারের হাসিকে ছাপিয়ে গেল। বিপুলা সেই মহিলা যখন অস্বস্তিতে চিৎকার করতে লাগলেন, ঘরময় ছুটোছুটি করতে লাগলেন, হাসতে হাসতে দর্শকরাও তখন অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। হাস্যরস সৃষ্টির একটিইমাত্র উপকরণ এখানে হাতে ছিল আমার, পৃথক পৃথক দুটি ঘটনার মধ্য দিয়ে সেই একটি উপকরণের সাহায্যে দু-দুবার আপনাদের আমি হাসিয়েছি।

"এতে বিস্ময়বোধের কোনও কারণ নেই। মানব-প্রকৃতির দুটি দিকের এখানে পরিচয় পাওয়া গেল। এক, ধনী এবং বিলাসী মানুষদের বিপাকে পড়তে দেখলে আমরা মজা পাই; দুই, মঞ্চ অথবা চলচ্চিত্রের অভিনেতার সঙ্গে একাত্ম হয়ে গিয়ে সব কিছুকে অনুভব করতে চাই আমরা। মঞ্চ-জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমি বলতে পারি, বড়লোকেরা বিপদে পড়েছে, এমনটি দেখতে পেলে অধিকাংশ দর্শকই বেশ খুশী হন। তার কারণ বোঝাটা খুব কঠিন নয়। দর্শকদের মধ্যে শতকরা নব্বইজনই দরিদ্র শ্রেণীর মানুষ। বাকী দশজন ঐশ্বর্যশালী মানুষকে মনে মনে তাঁরা ঈর্ষা করে থাকেন। আমার সেই বরফের টুকরো যদি কোনও দরিদ্র স্ত্রীলোকের ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ত, দর্শকরা তাতে এত মজা পেতেন না। বরং, সেক্ষেত্রে হয়তো একটু সমবেদনাই বোধ করতেন তাঁরা। আর তা ছাড়া গরীব মানুষদের তো আর মর্যাদা নেই বিশেষ, সুতরাং মর্যাদা খোয়ানোর ভয়ও তাদের নেই। গরীব মানুষদের বিপাকে ফেলে তাই দর্শকদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলা যায় না। দর্শকরা চান, বড়লোকরা বিপাকে পড়ুক, তাদের মর্যাদা-নাশ হোক। ধনী সেই ভদ্রমহিলাকে বিপাকে পড়তে দেখে তাই তাঁরা খুশী হয়েছেন। মনে মনে ভেবেছেন, বেশ হয়েছে, উচিত শিক্ষা হয়েছে ঐ দেমাকী মেয়েটার।

"আপনাদের মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলবার আর একটি অমোঘ উপায় আমার হাতে আছে। সে হল আমার ছড়ি। এই
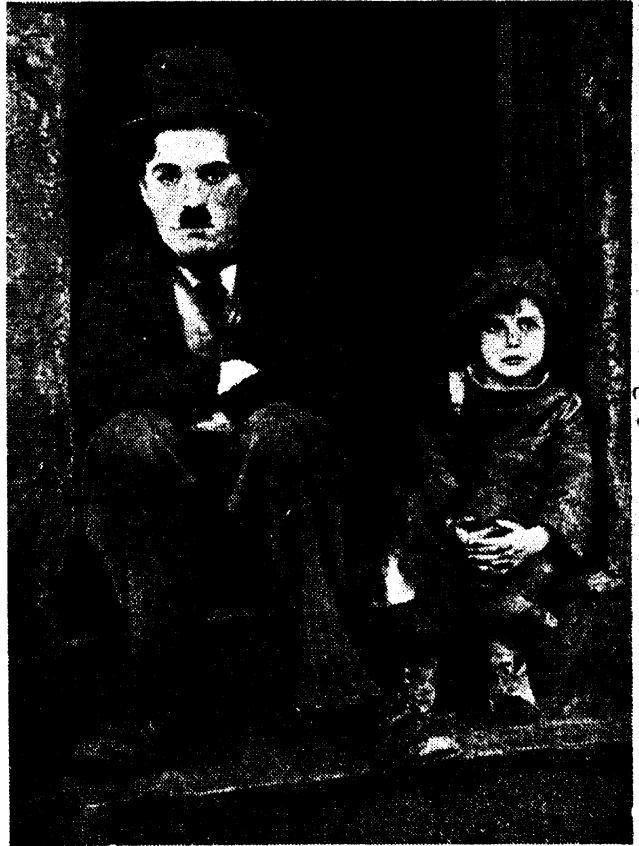
"দী কীড" চিত্রে চার্লস চ্যাপলিন ও জ্যাকি কুগান

ছড়িখানাই এত তাড়াতাড়ি আমাকে খ্যাতিমান করে তুলেছে। কত রকমভাবে, কত বিভিন্ন ভংগীতে যে এই ছড়িখানাকে আমি ব্যবহার করেছি তার ইয়ত্তা নেই। এটি আর এখন একটি নির্জীব বস্তুমাত্র নয়, দর্শকদের কাছে এখন এর একটি নিজস্ব চরিত্র রয়েছে। এই ছড়িখানাকেই সামনে এগিয়ে দিয়ে কখনও কারো পা টেনে ধরি আমি, কখনও কারো গলা। এটা এখন এতই সহজ এবং স্বতঃসিদ্ধ একটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে যে, এরই ফলে যে কী বিচিত্র, কী বিপুল হাস্যরসের সৃষ্টি হয়, অনেক সময় নিজেও আমি তা টের পাই না। ছড়ির মধ্যে এত হাসিব কী আছে, আগে তা আমি বুঝতাম না। এখন বুঝতে পেরেছি। এমন লক্ষ লক্ষ মানুষ আছেন, যাঁদের কাছে ছড়ি জিনিসটা হল অবস্থাপন্ন জীবনের একটা প্রতীক-বিশেষ। ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে যখন আমি কোনও দৃশ্যে এসে প্রবেশ করি, আমার ভাবভংগীতে একটা মেকী বড়লোকী মেজাজ ফুটে ওঠে। এই বিশেষ মেজাজটিকে ফুটিয়ে তোলাই আমার উদ্দেশ্য। সেদিক থেকে ছড়িখানা আমার খুব উপকারে এসেছে।

"আমি যে লম্বা-চওড়া মানুষ নই, নেহাতই ক্ষুদ্রকায় একটি মানুষ, তাতে সুবিধে হয়েছে এই যে, অত্যন্ত সহজেই আমার অবস্থা আর মেজাজের এই বৈপরীত্যটিকে আমি ফুটিয়ে তুলতে পারি। ক্ষুদ্রকায় কোনও মানুষকে যদি বিঘ্ন-বিপদের হাতে নাস্তানাবুদ হতে হয়, সহজেই সে আমাদের সহানুভূতি লাভ করবে। এটা কিছু অস্বাভাবিক ব্যাপার নয়। আমার প্রতি দর্শকদের এই সহানুভূতির কথা আমি জানি। জানি বলেই আমার অসহায় ভাবটাকে আমি নানানভাবে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করি। কখনও শ্রাগ করি, কখনও আমার মুখে-চোখে একটা সুগভীর নৈরাশ্য নেমে আসে, কখনও আবার এমন ভাব দেখাই, যেন আমি ভীষণ ভয় পেয়েছি। এ-সবই আমার মূকাভিনয়-কলার অন্তর্গত। আমার শরীর যদি একটু লম্বা-চওড়া হত, দর্শকদের সহানুভূতি লাভ করা এত সহজ হত না। দর্শকরা সেক্ষেত্রে আমার বিপদে বিন্দুমাত্র বিচলিত বোধ করতেন না, তাঁরা হয়তো ভাবতেন, 'ঠিক আছে, নিজের চেষ্টাতেই ও সামলে নিতে পারবে।' আমার সৌভাগ্য, আমি ক্ষুদ্রকায় মানুষ দর্শকরা আমাকে দেখে হাসেন বটে, কিন্তু সে-হাসি করুণাবিমিশ্র। আমাকে তাঁরা ভালবাসেন, আমার দুঃখে দুঃখবোধ করেন।

"বৈপরীত্যের পাশাপাশি অনেক সম আমি আকস্মিকতার অবতারণা ক থাকি। গোটা ছবির মধ্যে মৌলিক কোন চমক থাকে না বটে, কিন্তু ব্যক্তিগত ভা ভংগীর সাহায্যে দর্শকদের একটু চম লাগাবার সুযোগ পাওয়া গেলে, সে সুযো আমি ছাড়ি না। সব সময়েই নতুন কোন পন্থায় অপ্রত্যাশিত কোনও একটা আবে সৃষ্টি করবার চেষ্টা করি আমি। ম করুন আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলে এবং আমার ভাবভংগী দেখে দর্শকরা ধ নিয়েছেন যে, আরও কিছুক্ষণ আ হাঁটতে থাকব। ব্যস, অমনি আমি এব ট্যাক্সিতে চড়ে বসি। কিংবা মনে করুন, আমার দিকে কারও দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই আমি। দর্শকরা ভাবছেন, আমি তাকে ডাকব কিংবা তার কাঁধে হাত রাখব। তা না করে আমি করি কি, আমার ছড়ি খানাকে সামনে এগিয়ে দিয়ে তার হা

নে ধরি। দর্শকেরা যে রকম আশা রছেন, তার উল্টোরকম কিছু করে ভারি নন্দ হয় আমার।

"কোনও কিছু নিয়ে অতিরিক্ত রকমের ড়াবাড়ি করা আমার ভাল লাগে না। ানও কিছুকেই খুব বেশী ফেনিয়ে ালাটা ঠিক নয়। তাতে করে রসহানি ট, হাস্যরসকে হত্যা করা হয়। আমার টার কায়দা, ভাবভঙ্গী, এর মধ্যে যদি ড়াবাড়িকে প্রশ্রয় দেওয়া হত, আমার ব আপনাদের ভাল লাগত না। এ ষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।

"আসল কথা, সব ব্যাপারেই সংযম ই। সংযমের প্রয়োজনীয়তাই সর্বাধিক। ামার প্রথম জীবনের ছবিগুলি যে আমার াল লাগে না, তার কারণ সেখানে সংযমের ড় অভাব। দর্শকদের হাসাবার জন্য ক-আধবার পচা ডিম ছোঁড়ায় কোনও াপত্তি নেই আমার, কিন্তু বারংবার যদি ই একই ব্যাপারের পুনরাবৃত্তি ঘটতে কে, একটু বাদেই সবাই ক্লান্ত বোধ রবেন।

"আমার এই কর্মপন্থাকে আমি ম্মান করে থাকি। অন্যভাবে হয়তো ারও বেশী হাসানো যেত, কিন্তু তাতে ামার রুচি নেই। বীভৎস অথবা স্থূল কানও পন্থায় কাউকে হাসানো আমার ভিপ্রেত নয়। উপায়টা সূক্ষ্ম, রুচি-ার্জিত হওয়া প্রয়োজন। আমার শিল্প-লায় দুর্জ্ঞেয় কোনও রহস্য নেই। ুও যদি আপনারা প্রশ্ন করেন, কী করে াপনাদের হাসাই আমি, তো তার উত্তরে ামি বলব, আমার চোখ-কান আমি খোলা াখি; কোন্ কোন্ জিনিসকে আমার বির উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করা চলে, স বিষয়ে সব সময়েই সজাগ দৃষ্টি থাকে ামার। এ ছাড়া আর দ্বিতীয় কোনও ত্তর আমার নেই।"

১৭

অনেকদিন থেকেই মনের নিভৃতে দুটি আকাঙ্ক্ষা লালন করছিলেন চার্লি, প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হবার পর সেই আকাঙ্ক্ষা দুটি পূর্ণ হল। প্রথমত, মাকে তিনি ইংল্যান্ড থেকে হলিউডে নিয়ে এলেন। চার্লিকে কাছে রাখতে না পেরে দুঃখের অন্ত ছিল না লীলির। তাঁর অসুখও দিন দিন বেড়েই চলেছিল। যুদ্ধের কয়েকটা বছর একটানা অনেকদিন তাঁকে হাসপাতালে কাটাতে হয়েছে। হলিউডে চাকরি পাবার পর থেকেই চার্লি অবশ্য নিয়মিতভাবে তাঁকে টাকা পাঠাতেন। এবারে, হলিউডের সমুদ্রতীরে তাঁর জন্য সুন্দর একটি বাড়ি ঠিক করলেন চার্লি, সদাসর্বদা তাঁর দেখাশোনা করবার জন্য জনকয়েক লোক রেখে দিলেন। আর রইল একজন নার্স, মায়ের সেবা-শুশ্রূষা করবে। মায়ের জন্য মোটরগাড়িও কিনলেন একখানা। গাড়ি চালাবার জন্য শোফার রাখা হল। মাকে সে রোজ হাওয়া খাইয়ে আনবে। সব ঠিকঠাক করে তারপর মাকে নিয়ে আসবার জন্য নিজের সেক্রেটারীকে তিনি ইংল্যান্ডে পাঠিয়ে দিলেন।

দীর্ঘদিন বাদে মাতাপুত্রের মিলন ঘটল। দুজনেরই আজ আনন্দের অন্ত নেই। মা আজ সুখী, পরিতৃপ্ত। সারাটা জীবন তাঁকে দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে, সেই সংগ্রামের আজ অবসান ঘটল। তাঁর ছেলে আজ বিশ্ববিখ্যাত; সেই ছোট্ট ছেলেটি, সে আজ বড় হয়েছে, তার সম্মানের আজ অন্ত নেই। এত সুখ, এত সৌভাগ্য, মা যেন ঠিক বিশ্বাস করে উঠতে পারছিলেন না। তাঁর ভয় হচ্ছিল, এ হয়তো একটা স্বপ্ন মাত্র, একটু বাদেই এই সুখ-স্বপ্ন হয়তো মিলিয়ে যাবে।

মাকে চার্লি নিজের কয়েকটা ফিল্ম দেখালেন। ছবির মধ্যে চার্লিকে দেখে মা সেদিন খুব খুশী হতে পারেননি। বলেছিলেন, "এত সুন্দর চেহারা তোর, ছবির মধ্যে নিজেকে অমন কুচ্ছিত করে রেখেছিস কেন?" ছেলেকে তিনি রাজা বলে ডাকতেন। বলতেন, "রাজামশাই, আজ কেমন আছ?"

চার্লির প্রথম আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হল। আর একটি আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁর। আলফ রীভসকেও হলিউডে নিয়ে আসবেন। কার্নো সম্প্রদায়ের সঙ্গে দুবার তিনি অ্যামেরিকা সফরে এসেছিলেন, দুবারই তাঁদের দলের ম্যানেজার ছিলেন আলফ রীভস। পাঠকদের সে-কথা মনে থাকতে পারে। কার্নো সম্প্রদায় ত্যাগ করে কীস্টোন স্টুডিয়োতে যোগ দেবেন কি না, এ নিয়ে কিছুতেই যখন চার্লি মনঃস্থির করতে পারছিলেন না, এই আলফ রীভসই তখন তাঁকে উৎসাহ দিয়েছিলেন। চার্লি তাঁকে একখানা চিঠি লিখলেন। জানতে চাইলেন, হলিউডে এসে চার্লির চিত্র-প্রতিষ্ঠানে যোগদান করতে তিনি রাজী আছেন কি না। চিঠি পেয়েই হলিউডে চলে এলেন আলফ রীভস। পরবর্তীকালে তিনি চার্লস চ্যাপলিন ফিল্ম কর্পোরেশনের ভাইস-প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার কিছুদিন বাদে ১৯৪৬ সালে তিনি মারা যান। মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি চার্লির প্রতিষ্ঠানেই ছিলেন।

মাকে হলিউডে নিয়ে আসবার কিছু-কাল পরেই চার্লি তাঁর "দী কীড" ছবিখানায় হাত দেন। এ ছবিতে তাঁর প্রতিভার একটা সার্থক পরিচয় পাওয়া যায়। চার বছর আগে ম্যাক সেনেটের হয়ে "টীলিজ পাংচার্ড রোমান্স" বলে যে বইখানি তিনি তুলেছিলেন, তার পর এই প্রথম আর একখানি পূর্ণ দৈর্ঘ্যের ছবি তিনি তুললেন।

"এ ডে'জ প্লেজার" তুলবার সময় তিনি জ্যাকি কুগানের সন্ধান পান। জ্যাকির বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। "এ ডে'জ প্লেজার"-এ তাকে ছোট্ট একটি ভূমিকা দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই ছোট্ট ভূমিকাতেই সে এমন সুন্দর অভিনয় করল যে, চার্লি তো চমৎকৃত। জ্যাকির চেহারাও ছিল ভারী সুন্দর। দুটি বাদামী, দুষ্টুমী-ভরা। চিত্র
কদাচিৎ এমন বুদ্ধিমান সপ্রতিভ
সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। অ
ব্যাপারে সামান্য কিছু অভিজ্ঞতা
ছিল, চার্লির সঙ্গে দেখা হবার
কিছুকাল সে রঙ্গমঞ্চে অভিনয়
এসেছে। তার বাপ-মাও রঙ্গ
করতেন।

জ্যাকি কুগানের অভিনয়-প
পরিচয় পেয়ে নতুন একটি গল্প
হাত দিলেন চার্লি। গল্পের মূ
একটি শিশু। নিজের শৈশব-
ইংল্যাণ্ডের কেনিংটন অঞ্চলে
যে পরিচয় তিনি পেয়েছিলেন,
অনেকখানি এই গল্পটির মধ্যে ব্যক্ত
বাস্তব অভিজ্ঞতাই এ গল্পের
এবং শুধু এ গল্পটিই বা কেন,
প্রায় সমস্ত গল্পের মালমশলাই সং
হয়েছে বাস্তব জীবন থেকে। তা
ঘটনাবলীর এত সূক্ষ্ম বিশ্লেষ
সমস্ত সম্ভাবনাকে নিঃশেষে নিং
হাস্যরসের উপাদান সংগ্রহ তাঁর
সম্ভব হত না। "দী কীড" তুল
বছরের কিছু বেশী সময় লে
মীলড্রেডের সঙ্গে চার্লির তখন
বিচ্ছেদের মামলা চলছে।

"দী কীড"কে রঙ্গচিত্র না ব
চিত্র বলাই বোধ হয় সঙ্গত।
চরিত্রগুলিকে কোথাও বিকৃত করে
হয়নি, প্রতিটি চরিত্রকেই বাস্তব ব
হয়। "দী কীড"ও হাসির বই
চার্লির পূর্ব পর্যায়ের হাসির ব
সঙ্গে এর একটি পার্থক্য রয়েছে।
এখানে মূলত ঘটনানির্ভর। এর
এত পরিণত, সুন্দর বই আ
তোলেননি।

দেশিকী

ত বৃটিশ প্রধান মন্ত্রী সার
চার্চিল গত মহাযুদ্ধের সময়ের
পন কথা ফাঁস করে দিয়ে
বদেশে একটা বিতর্কের
লছেন। ২৩এ নভেম্বর একটি
চার্চিল সাহেব জার্মানীর
চরণ নীতির সমর্থন করতে
লেন যে, হিটলারের সঙ্গে
দশ বছরের মধ্যে জার্মানীর
চরণ ও জার্মানীকে NATO
ীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া
ভালো না লাগতে পারে, কিন্তু
দায়ী সোভিয়েট-রাশিয়া এবং
রে যুদ্ধ জয়োন্মাদ স্টালিন
ভাবে চলতে লাগলেন যেন তাঁর
য়ছিল যে, সারা পৃথিবীতে
বং কম্যুনিজম্‌এর প্রাধান্য তিনি
করতে পারবেন। এর ফলেই
কালে সোভিয়েট সম্পর্কে বৃটিশ,
ও য়ুরোপীয় মনোভাব উল্টে
এ পর্যন্ত নূতন কথা কিছু নয়,
সম্পর্কে পশ্চিমা শক্তিদের
অভিযোগ যা, এ তাই। এটুকু
র চার্চিল সাহেব নিজের
ার প্রমাণ স্বরূপ যে তথ্যটি
করলেন সেইটি বড়ো চমকপ্রদ।
নে, "যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি,
র্মান সৈন্যেরা লাখে লাখে আত্ম-
রছে এবং আমাদের শহরের
ন জনতার হর্ষধ্বনিতে মুখরিত
ম লর্ড মণ্টগোমেরিকে টেলিগ্রাম
আদেশ করি যে, আত্মসমর্পণ-
র্মানদের অস্ত্রগুলি যেন
জমা করে রাখা হয় যাতে
দরকার হলে আবার জার্মানদের
া যায় কারণ সোভিয়েট বাহিনীর
যদি চলতে থাকে তবে এক
র্মান সৈন্যদের আমাদের দলে
গ করতে হতে পারে।"
ছিঃ লোকটা করল কী? এ
সময়ে একথাটা বলার কী দরকার ছিল।
প্রোপাগাণ্ডা করার এমন একটা সুবর্ণ
সুযোগ এমনি করে কম্যুনিস্টদের হাতে
তুলে দিলে! একেবারে ভীমরতি। বলা
বাহুল্য কম্যুনিস্ট প্রোপাগাণ্ডা বিশারদগণ
আনন্দে উৎফুল্ল। দ্যাখো, দ্যাখো, আমরা
যা বলে আসছি ঠিক কি না। ন্যাটো
ফ্যাটো কিছুই আত্মরক্ষামূলক নয়, সবই
সোভিয়েট-রাশিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক
উদ্দেশ্য নিয়ে গঠিত আর এই ষড়যন্ত্র
চলছে যুদ্ধ শেষ হবার আগে থেকেই
যখন প্রকাশ্যে মিত্রগণ পরস্পরকে ভাই
ভাই বলছে। ওঃ কী বিশ্বাসঘাতকতা!

লর্ড মণ্টগোমেরিকে টেলিগ্রাম করার
কথাটা বলে ফেলে চার্চিল সাহেব পৃথিবীর
একটা অনিচ্ছাকৃত উপকার করেছেন।
তিনি কম্যুনিস্ট-প্রোপাগাণ্ডা বিশারদের
যে সুবিধার উপহার দিয়েছেন তার উপর
বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করার প্রয়োজন
নেই। এই উপহার না পেলেও তাদের
কাজ চলত। চার্চিল সাহেবের ১৯৪৫
সালের টেলিগ্রামের সম্বন্ধে সোভি-
য়েট গভর্নমেণ্ট এতদিন যে সম্পূর্ণ
অজ্ঞ ছিলেন তাইবা ঠিক কে
বলতে পারে। টেলিগ্রামের কথা
ঠিক না জানলেও চার্চিল সাহেবের
মনোভাব সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের নিকট
বোধ হয় অবিদিত ছিল না। যাই হোক
এই নূতন "প্রমাণের" সাহায্য ব্যতিরেকে
সোভিয়েটের বর্তমান প্রোপাগাণ্ডার মূলে
সূত্রগুলি খাড়া হয়েছে, চার্চিল সাহেব
এই নূতন "প্রমাণ" না জোগালেও তার
কিছু এসে যেতো না। অন্য পক্ষে
চার্চিল সাহেবের এই "দূরদর্শিতার"
প্রমাণ পেয়ে যে খুব কেউ একটা ধন্য ধন্য
করবে তাও নয়। রাশিয়ানরা ভালো, না
অন্যেরা ভালো এ প্রশ্নের উপর চার্চিল
সাহেব যে নূতন "আলোকপাত" কিছু
করেছেন তাও নয়। চার্চিল যে উপকার
সাধন করেছেন সে অন্যদিক
থেকে। তিনি আন্তর্জাতিক কূট-
নীতির পর্দা একটু ফাঁক করে
দেখিয়েছেন। ভিতরটা দেখলে সাধারণ-
লোক শিউরে উঠবে—শিউরে উঠবে বলা

হয়ত ঠিক হোল না—বলা উচিত সাধারণ লোকের শিউরে ওঠা উচিত।

বিশ্বাসঘাতকতা তো বটেই, কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতা কেবল এক গভর্নমেণ্টের সঙ্গে আর এক গভর্নমেণ্টের নয় এবং কেবল এক পক্ষেরই নয়। তার চেয়ে ভয়ঙ্কর হচ্ছে গভর্নমেণ্টের বা গভর্নমেণ্টের প্রধান পরিচালকের নিজের দেশের জনসাধারণের বিশ্বাস নিয়ে খেলা যদিও তার জন্যে 'জাতীয় স্বার্থের' দোহাই সব সময়েই দেয়া হয় এবং এই জন্যই আরো বেশি ভয়ঙ্কর—সে দোহাই সত্য মনে করেই দেয়া হয়। হিটলার-স্ট্যালিন প্যাক্ট যখন সম্পাদিত হয় তখন হিটলার ও স্টালিন স্ব স্ব 'জাতীয় স্বার্থ' রক্ষার কথাই ভেবেছিলেন এবং নিজেদের দেশের লোকেদেরও এই বুঝিয়েছিলেন। আবার যখন তাঁরা পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস-ঘাতকতা করলেন তখনও তাঁদের স্ব স্ব দেশের লোকদের বিশ্বাস করতে হোল যে তাও 'জাতীয় স্বার্থে'র জন্যই। চার্চিল সাহেব যুদ্ধ শেষ হবার আগেই মিত্র রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানদের প্রয়োগ করার পরিকল্পনা করে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ যদি করে থাকেন তবে তা বৃটিশ 'জাতীয় স্বার্থে'ই করেছেন বলে তিনি মনে করেছেন এবং আজ এ খবর জানতে পেরে বৃটেনের বেশির ভাগ লোকও তাই মনে করবে অর্থাৎ তারা মনে করবে চার্চিল সাহেবের চিন্তাটা ভালো হোক মন্দ হোক বৃটিশ 'জাতীয় স্বার্থ' ভেবেই তিনি সেটা করেছেন।

আর বড়ো যুদ্ধের মধ্যে এই রকম ব্যাপার মোটেই নূতন নয়। যুদ্ধের মধ্যে যদি দেখা যায় যে এক মিত্র কোনো দিকে এতদূর এগিয়ে যাচ্ছে যার ফলে যুদ্ধের পরে অপর মিত্র বা মিত্রদের তুলনায় সে সর্বেসর্বা হয়ে উঠ্‌তে পারে তখন তাকে ঠেকাবার চেষ্টা হয়ে থাকে এবং তাতে ক্ষেত্র-বিশেষে শত্রুর সাহায্যও নেয়া হয়। গত মহাযুদ্ধে একাধিক শত্রু প্রতিরোধকারী মিত্র স্থানীয়দের নষ্ট করা হয়েছে পাছে তারা কোনো এক মিত্র শক্তির বশ্যতা স্বীকারে সম্মত না হয়। গত মহাযুদ্ধে রাশিয়া এবং তার পশ্চিমা মিত্রেরা উভয়েই একাধিক ক্ষেত্রে করেছে। যারা প্রাণপণে জার্মানদের বিরুদ্ধে লড়েছে এরকম দলকে অনেক দেশেই নষ্ট করা হয়েছে কারণ তারা (ক্ষেত্রবিশেষ) রুশ অথবা বৃটিশ তাঁবেদার হবে না এই আশঙ্কা ছিল। মিত্রের প্রতি এই রকম বহু বিশ্বাসঘাতকতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মধ্যে ক[রা] হয়েছে। একথা উভয় পক্ষেরই জা[না] আছে। সুতরাং মিত্রপক্ষীয়দের মধ্যে এ[ক] গভর্নমেণ্ট অপর গভর্নমেণ্টের প্র[তি] বিশ্বাসঘাতকতা করছে বা বিশ্বাসঘাতকতার চিন্তা করেছে, এটা নূতন কথ[া] কিছু নয়। কিন্তু যা ভয়ঙ্কর সে হচ্ছে এ[ই] —যে একদেশের সাধারণ লোক যখন ম[নে] করছে অমুক দেশের লোক তাদের বন্ধ[ু] তখন হয়ত ভিতরে ভিতরে এক গভর্নমেণ্ট অপর আর এক গভর্নমেণ্টের প্রতি এরূপ ব্যবহার বা নীতির পরিকল্পনা করছে যাতে অচিরে বন্ধু শত্রু হয়ে যা[বে] এবং সেই অনুসারে দেশের লোককে ভাবতে হবে, কাজও করতে হবে অর্থা[ৎ] আজ যাদের বন্ধু বলে আলিঙ্গন করতে চাই কাল তাদের 'জাতীয় স্বার্থে' হত্যা করা কর্তব্য হবে। এই ভীষণ অবস্থা থেকে মানুষের মুক্তি চাই। চার্চিল সাহেবের উক্তি থেকে মানুষের এ অবস্থার ভীষণতা উপলব্ধি করা উচিত। কিন্তু পৃথিবীর বুদ্ধিমান লোকেরা বলছেন এসব কথা চাপা থাকা ভালো। আচ্ছা পৃথিবীতে 'টেনশন' যখন একটু কমে[র] দিকে তখন এসব কথা ফাঁস করা কেন? এতে যে পরস্পরের মধ্যে সন্দেহ বাড়বে[।]

২৯।১১।৫৪

বন্ধ-সাহিত্য

সাহিত্য—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ব-রতী গ্রন্থন বিভাগ, তৃতীয় সংস্করণ, ১৩৬১ াবণ। মূল্য—৩৷৹ মাত্র।

সাহিত্য-সমালোচক বা সহিত্য-তত্ত্বের লোচকগণ সম্বন্ধে একটা কথা প্রচলিত াছে যে, যাঁহারা ব্যর্থ কবি, তাঁহারাই শেষে লে সমালোচক রূপ পরিগ্রহ করেন। কথাটির ধ্যে একটি তাৎপর্য রহিয়াছে। যাঁহারা ার্থক কবি—বিশ্লেষণের পথে তাঁহাদের নের কোনও আনন্দ নাই, তাই সে পথ াঁহারা যতটা সম্ভব এড়াইয়া চলেন। তাঁহারা বিতা করিয়া যান, কবিতা-তত্ত্বে আর তেমন ৎসাহী থাকেন না। যাঁহারা আবার বিশুদ্ধ জ্ঞানমার্গী তাঁহারা কাব্য-কবিতার আলোচনা রিতে গিয়া যে কাজটি সত্য সত্য করেন াহা হইল এই, তাঁহারা কাব্য-কবিতা বা াধারণ শিল্প সম্বন্ধে কতকগুলি কথা তঃসিদ্ধরূপে মানিয়া লন, তাহার পরে সেই সাধারণ সত্যগুলিকে অবলম্বন করিয়া ক্ষুরধার তর্কের সাহায্যে এমন সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাব্যতত্ত্বে া সৌন্দর্যতত্ত্বে গিয়া পেঁাছান, যাহার সঙ্গে যথার্থ সাহিত্যের বা শিল্পের কোনও যোগ থাকে না। সেই জন্য সমালোচক যদি ব্যর্থ কবি বা ব্যর্থশিল্পী হন, তবেই সাহিত্যের সত্যের অন্ততে কাছাকাছি থাকিতে পারেন। তাঁহার সুযোগ থাকে এই যে, তিনি বিচার-তর্কের ক্ষেত্রে প্রবৃত্তি প্রবণতার দ্বারা অতিমাত্রায় ব্যাহত নন, আবার যথার্থ শিল্পকর্ম বা কবিকর্মের রহস্যের সঙ্গেও তাঁহার প্রত্যক্ষ কিছু কিছু পরিচয় রহিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে আমরা একটা বিরল সংযোগ দেখিলাম, তিনি সার্থক শিল্পী—আবার সার্থক কলাতত্ত্ববিদ্। এই দুই গুণের কোনটিই তাঁহার মনের মধ্যে পরস্পর বিরোধী রূপে দেখা না দিয়া পরস্পর পরস্পরের অনুপূরক রূপেই তাঁহার দীর্ঘজীবনে কাজ করিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ যে সাহিত্য-তত্ত্ব আলোচনা করিয়াছেন, সেখানে তাঁহার যুক্তি-তর্ক কোথাও একটা তথ্য-বিয়োজিত তত্ত্বমাত্র রূপে দেখা দেয় নাই, তাঁহার আলোচনা সর্বদাই তাঁহার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়া শিল্পনির্মিতির মূল রহস্যকেই প্রকাশ করিয়াছে। অনেক সময় মনে হয়, যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য সমালোচনার বড় অংশ নয়, বড় অংশ তাঁহার বিচিত্র শিল্প-কর্মের অভিজ্ঞতা, তাঁহার কবি-বিশ্বাস এবং প্রবণতা-সমূহের অননুকরণীয় বিবৃতি। সে বিবৃতির ভিতরেও বাচনভঙ্গি বহুস্থলে এমন একটি নিজস্ব মহিমা লাভ করিয়াছে যে, সমালোচনাও সেখানে সাহিত্য-নির্মিতি হইয়া উঠিয়াছে।

'সাহিত্য' রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য বিষয়ক বহু প্রবন্ধের সমষ্টি। এখানে সাহিত্যের তাৎপর্য, সাহিত্যের সামগ্রী, সাহিত্যের বিচারক, সৌন্দর্যবোধ, বিশ্ব-সাহিত্য, সৌন্দর্য ও সাহিত্য, সাহিত্য সৃষ্টি, বাংলা জাতীয় সাহিত্য, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে বিভিন্ন প্রবন্ধে আলোচনা রহিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের এই সকল লেখা বহুদিন যাবৎ আলোচিত হইতে হইতে এসব লেখায় ব্যাখ্যাত মতগুলি বহুপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। বাঙলা সাহিত্যের সম্বন্ধে আজিও যাঁহারা গভীরভাবে আলোচনা করেন, তাঁহাদের আলোচনার বনিয়াদে যে রবীন্দ্রনাথের এই মতামতগুলি জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে বাসা বাঁধিয়া আছে, তাহা অল্প সন্ধানের দ্বারাই আবিষ্কার করা যায়। কিন্তু আলোচিত এবং গৃহীত হইয়া এখানকার মতামতগুলি এখন পর্যন্তও পুরনো হইয়া যায় নাই,—তাই

আজিকার দিনেও সমভাবেই এগুলির পঠন-পাঠনের প্রয়োজন রহিয়াছে।

আলোচ্য সংস্করণটি আর একটি বিশেষ কারণে অতিশয় মূল্যবান। মূলের প্রবন্ধগুলির সঙ্গে সাহিত্য-বিষয়ক রবীন্দ্রনাথের আরও বহু লেখার একটি সংযোজন ইহার মধ্যে দেওয়া হইয়াছে। এই সংযোজনে গ্রন্থের কলেবরকে দেড় গুণের অধিক বর্ধিত করিয়া দিয়াছে। সংযোজনের লেখাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে প্রধানত খ্যাত-অখ্যাত সাময়িক পত্র-পত্রিকা হইতে। অধুনালুপ্ত এই সকল পত্র-পত্রিকা হইতে এইগুলি আবিষ্কার এবং সংগ্রহের পশ্চাতে যে যত্ন-চেষ্টা এবং অপরিমিত শ্রম রহিয়াছে, তাহা স্মরণ করিয়া আমরা প্রকাশকের নিকটে শ্রদ্ধাবনত হইতেছি। বিশেষ যত্ন এবং শ্রমপূর্বক এগুলির সন্ধান করিয়া এই জাতীয় গ্রন্থের সহিত সংযোজিত করিয়া না দিলে রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-বিষয়ক এতগুলি লেখা পাঠকসমাজের আজানা থাকিয়া যাইত। ইহা যে আমাদের কত বড় ক্ষতি লেখাগুলি আজ এইভাবে প্রকাশিত হইবার পরই সে সম্বন্ধে আমরা সম্যক অবহিত হইয়া উঠিবার সুযোগ পাইতেছি। আশা করি এই সংযোজিত লেখাগুলি গ্রন্থখানির মূল্য এবং মর্যাদা সমধিক বর্ধিত করিবে এবং পাঠক-সমাজের দৃষ্টিও গ্রন্থখানির প্রতি সমধিক আকৃষ্ট হইবে।

৫০৯।৫৪

শশিভূষণ দাসগুপ্ত

রম্যরচনা

চা-বাগানের কাহিনী—চা-কর। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাবলিশার্স, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—দু' টাকা।

চা-বাগান সম্পর্কে সাধারণত আমাদের কৌতূহলের অন্ত নেই, কিন্তু সে-কৌতূহল পরিতৃপ্ত হবার মতো গ্রন্থের অভাব বহুদিন থেকে অনুভূত। আলোচ্য গ্রন্থখানি সে-অভাব পূর্ণ করেছে। এ-গ্রন্থ উত্তোলন করেছে এক রহস্যলোকের যবনিকা, পরিচিত করেছে এক বিচিত্র জগতের ততোধিক বিচিত্র নরনারীর চরিত্র।

লেখকের জীবনের কর্মক্ষেত্রই চা-বাগান। সেই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অলংকারে এই গ্রন্থের প্রতিটি ছত্র সমৃদ্ধ।

প্রায় একশো বছরের আসাম-কাছাড় অঞ্চলের চা-বাগানের কাহিনী' সার্থকভাবে বিবৃত হয়েছে স্বল্পায়তনের মধ্যে। সহজ, সুন্দর ভাষা। স্বতঃস্ফূর্তভাবে একাধিক স্থানে ভাষা হ'য়ে উঠেছে আশ্চর্য কবিত্বময়। একটি দৃষ্টান্তঃ

"চাঁদের একটা পিঠ যেমন জ্যোৎস্নায় ধোয়া, তেমনি অন্য পিঠ থাকে অন্ধকার। চা-বাগানের এই অন্ধকার রহস্যময় পৃথিবীটাকেই তুলে ধরতে চেয়েছি। নির্যাতিতের নীরব কান্নাকে। আর বাগানের কচি কচি সবুজ পাতার গালিচায় যে বসন্ত বাতাস কেঁপে কেঁপে যেত, অত্যাচার অবিশ্বাসের নীচে যে স্নেহ প্রীতি ভালবাসার মধুময় দিনগুলি নানা রঙে উজ্জ্বল হয়ে ছিল তার স্মৃতিটুকু আমার অভিজ্ঞতার ভাণ্ডারে চিত্র-সম্পদ হয়ে থাক।"

গ্রন্থখানির মধ্যে কৌতুককর কাহিনীও বিস্তর আছে। লেখকের সঙ্গে চা-বাগানের আত্মীয়তা বহুকাল থেকে, তাঁর দাদামশায়ের সূত্রে। সেই দাদামশায়ের অফিস-ঘরের একটি কাণ্ড—

"তিন চারজন ইউরোপীয় স্বেচ্ছাসেবক, চেহারার দিক থেকে যাদের দানব বললেও অত্যুক্তি করা হয় না, ঘোর মাতাল অবস্থায় একদিন স্খলিত চরণে বহির্বাটিতে দাদা-মহাশয়ের অফিস ঘরে ঢুকে পড়ে। অন্য এক কামরায় আমাদের এক আত্মীয় তখন শুয়েছিলেন এবং শ্মশ্রুগুম্ফ শোভিত সেই ভদ্রলোককে দেখতে পেয়ে তারা সকলে এক-সঙ্গে তাঁকে গভীর আলিঙ্গনে প্রেমনিবেদন করতে থাকে। ভদ্রলোকের বিকট আর্তনাদে আমরা বাড়ির সকলে পড়ি কি মরি করে আপিস ঘরে সমবেত হলাম। এসে দেখি, সাহেবপুঙ্গবরা সেই ভদ্রলোককে ঘন ঘন 'ডার্লিং' সম্বোধন করছে ও তাঁর গোঁফ দাড়ির উপর অজস্র চুম্বন বর্ষণ করছে।"

কোনো জোর-জবরদস্তি নেই, অনায়াসে কৌতুক পরিবেষণের এই চাতুর্যটুকু সাহিত্য-রসিকের লক্ষণীয়। এমনি অজস্র আছে।

গ্রন্থখানি পাঠান্তে মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায় মাতাল সাহেবের পাগলামি, নিঃশব্দ নদীর বুকে মাঝির দীর্ঘশ্বাসভরা কাহিনী আর শ্রমিক রমণী রাধা। একটি ছোট্ট শিশুকে কোলে নিয়ে চা-বাগান থেকে পালিয়ে এসেছে রাধা; তার আতঙ্কিত চোখে আশ্রয়ের প্রার্থনা।

পরিশিষ্টে লেখক সংযোজন করেছেন চা-বাগানের কয়েকটি গান—যেগুলো সাহিত্যিক অর্থে মূল্যবান। গানগুলোর পদ ভারি সুন্দরঃ

নদীর ধারে নীল বুনিলাম, নীলে সুটি
ধরে না
ঘরে আছে ছোট দেবর নীল পাইড়
বই পড়ে না॥
কিম্বা,
লিখাপড়া শিখতে হবে নইলে বিয়ে হ'বে না
প্রেমিক শুনে মুখ ফিরাবে প্রেমিক কাছে
আসবে না॥

আরেকটি ব্যাপার উল্লেখ করা আবশ্যক। 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিলো এই চা-বাগানের কাহিনী। লক্ষ্য করলাম, সেই রচনা আদ্যন্ত পরিমার্জিত হয়েছে।

মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জা সবিশেষ প্রশংসার্হ।

৫১৩।৫৪

ভাষা-সাহিত্য

আধুনিক ভারতীয় সাহিত্য—লেখক শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। দীপায়ন, ২০, কেশব সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯, রয়াল ২৪৭ পৃষ্ঠা, দাম—ছ' টাকা।

ভারতবর্ষে যতগুলি ভাষায় সাহিত্য রচনা হয়েছে এবং হয়, যথা উর্দু, হিন্দী মৈথিলী, ওরিয়া, অসমীয়া, তামিল, কানাড়ী, তেলেগু, মালায়ালম্, পাঞ্জাবী, সিন্ধী, কাশ্মীরী, গুজরাটি, মারাঠি—সবগুলিরই কাব্য, কথা ও প্রবন্ধ সাহিত্য এবং সেগুলির প্রতিনিধিমূলক সমস্ত লেখকেরই ঐতিহাসিক ও রস-বিচারের পরিপ্রেক্ষিতে লেখক যে আলোচনা করেছেন তা অত্যন্ত শ্রমসাধ্য এবং সর্বতোভাবে প্রশংসার যোগ্য। এছাড়া ভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের এবং পরিশিষ্টে ভারতীয় ইংরেজি কাব্য-সাহিত্য ও পূর্বপাকিস্থানের নতুন সাহিত্য বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে। সমগ্র ভারতের সমস্ত সাহিত্য সম্পর্কে এই ধরনের একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তক প্রকাশিত হওয়ার বিশেষ প্রয়োজন ছিল। সাহিত্যরসিক এবং সাহিত্য-সেবক প্রত্যেকেই যে পুস্তকটিকে সমাদরে গ্রহণ করবেন, একথা নিশ্চিতভাবে বলা চলে। সাহিত্যের ছাত্রদের পক্ষে ত পুস্তকটি অবশ্য পঠনীয়। লেখক প্রত্যেকটি ভাষার জন্মকাল থেকে আরম্ভ করে আধুনিক কাল পর্যন্ত লেখকদের ভাব-ভঙ্গী ও তাঁদের উপর সময়ের প্রভাব সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মাবার চেষ্টা করেছেন। ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং একালে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎ-চন্দ্রের প্রভাব যে তেলেগু, অসমীয়া, মৈথিলী প্রভৃতি বহু ভারতীয় সাহিত্যের লেখকদের উপর পড়েছে একথা লেখক বহু স্থানে দেখিয়েছেন। লেখক নিজে বাস্তবধর্মী এবং আধুনিক সমস্যামূলক সাহিত্যের উপর পক্ষপাতিত্ব থাকলেও সব ভাবধারাকেই তার ন্যায্য মূল্য দিতে কুণ্ঠাবোধ করেননি। পুস্তকটি পড়লে ভারতের সমস্ত সাহিত্য সম্বন্ধে একটি সামগ্রিক ও সুস্পষ্ট ধারণা হবে। ছাপা, কাগজ এবং মলাটের রূপ-সজ্জাও প্রশংসনীয়।

৩৯৮।৫৪

শিক্ষা-সমস্যা
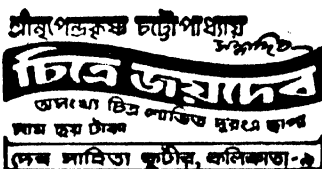
আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতি : সুবোধকুমার সেনগুপ্ত ও রমণীরঞ্জন সেনগুপ্ত : প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী, ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা : মূল্য—ছয় টাকা।

বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের যে ধারায় শিক্ষাদান চলে আসছে, সে গতানুগতিক ধারার যে পরিবর্তন আবশ্যক, এ বিষয়ে দেশের বিদগ্ধমণ্ডলী বিশেষভাবে সচেতন হয়েছেন এবং তদনুসারে শিক্ষক-শিক্ষণ পদ্ধতিতেও নতুন আলোকপাত করবার বিবিধ প্রয়াস চলেছে, এটা অতীব সুখের বিষয়।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে শিক্ষক-শিক্ষণ ও শিক্ষা-সমস্যা সম্পর্কে নানাবিধ আলোচনা স্থান পেয়েছে বিস্তৃতভাবে। সাধারণ পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ শিক্ষাদানের কথাও সন্নিবিষ্ট হয়েছে পাশাপাশি এবং শিক্ষা সম্পর্কিত নতুন ভাবধারার বিশ্লেষণও এতে করা হয়েছে। সব থেকে উল্লেখযোগ্য বিষয় হয়েছে শিল্প ও কর্মের মাধ্যমে যেভাবে Integreted teaching গ্রন্থকারের ভাষায় 'সাঙ্গীকৃত শিক্ষা') সম্ভব, সে সম্বন্ধে গ্রন্থকারদ্বয়ের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সংক্ষিপ্ত বিবরণী।

শিক্ষক-শিক্ষণ বিষয়ে যাঁরা আগ্রহশীল এবং অনুসন্ধিৎসু, এ বই তাঁদের কাজে লাগবে। ছাপা, বাঁধাই ভালো। ৪২৯।৫৪

নার্সারি স্কুলের শিক্ষাপ্রণালী : যূথিকা চট্টোপাধ্যায়; প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স অ্যাণ্ড পাব্লিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

শিশুই জাতির ভবিষ্যৎ উন্নতির মেরুদণ্ড। শিক্ষার উদ্দেশ্য অন্তর্নিহিত মানসিক শক্তির বিকাশ। তাই পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেকটি সভ্য দেশে আজকাল শিশু-শিক্ষার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। আমাদের দেশে এতকাল ধরে 'টোল' বা পাঠশালা' ইত্যাদিতেই শিশুর সাধারণ শিক্ষারম্ভ হয়ে এসেছে; কিন্তু 'নার্সারি স্কুল' বা 'কিন্ডার গার্টেন' একেবারেই হাল আমলের উদ্ভাবন। আলোচ্য পুস্তকটিতে শিশুর তিন বৎসর বয়স থেকে নার্সারি স্কুলের পরিবেশে বিভিন্ন পর্যায়ে মনস্তত্ত্ব-সম্মত শিক্ষাপ্রণালীর গঠনমূলক আলোচনা স্থান লাভ করেছে। পাশ্চাত্য শিক্ষাপদ্ধতির অনুকরণে রচিত হলেও পুস্তকটিতে লিখিত শিশুপালন পদ্ধতির সহজ নির্দেশ ও তথ্যগুলি শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রী তথা জনক-জননীর পক্ষে পালনযোগ্য। লেখিকা নিজে এরকম একটি নার্সারি স্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রীরূপে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন তারই ভিত্তিতে লেখা বলে এ পুস্তকে আলোচিত নিয়মগুলির অনুসরণের দ্বারা আমাদের দেশেও নার্সারি স্কুলের পরিচালনা একেবারে অসম্ভব নয়। আরও কিছু শিক্ষা বিষয়ক আলোকচিত্র সংযোজিত হলে ভাল হত। পুস্তকখানি আদৃত হবে বলেই আশা রাখি। ৩১০।৫৪

অনুবাদ সাহিত্য

থেলমা : মেরি করেল্লি : অনুবাদ কুমারেশ ঘোষ। জ্যোতি প্রকাশালয়—২০৬, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। সাড়ে তিন টাকা।

যেসব প্রসন্নভাগ্য লেখক-লেখিকা জন-চিত্তজয়ের সনদ হাতে নিয়ে কলম ধরেন, মেরি করেলি তাঁহাদেরই একজন। থেলমা তাঁর বহুপঠিত সুখপাঠ্য উপন্যাসের অন্যতম।

'সুখপাঠ্য' এইটিই হয়তো বা তাঁর লেখার একমাত্র বিশেষণ। কিন্তু দুঃখের বিষয় অনুবাদে সে-মেজাজটি খুঁজে পাওয়া গেল না। কেমন যেন কাটা-কাটা ছেঁড়া-ছেঁড়া। একটি মিষ্টি প্রেমের গল্প। কিন্তু সেই মিষ্টি সুরটি যেন কিছুতেই বাজল না। তর্জমার স্বাধীনতাকে তর্জমাকার ঠিকমত কাজে লাগাতে পারেন নি। স্বাভাবিবকতার জন্য ইতরজনের কথাবার্তায় যে প্রাকৃত ভাষা প্রয়োগ করেছেন তা সর্বত্র সুখের হয় নি। 'করেল্লি'-তে লয়ের দ্বিত্ব শ্রুতিকটু। ৪৬৪।৫৪

মাদাম আঁরিয়েৎ : গী, দ্য, মোপাসাঁ : অনুবাদক—প্রফুল্লকুমার বসু। দি বুক এমপোরিঅম লিমিটেড। ২২।১ কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। দেড় টাকা।

সরল হৃদয় স্বামী আর ব্যভিচারিণী স্ত্রী। একমাত্র সন্তানকে ঘিরেই স্বামীর জীবন-পরিক্রমা। স্ত্রী কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীকে তাঁর সন্তানের পিতা বলেই অস্বীকার করে সন্তান নিয়ে প্রণয়ীর সঙ্গে চলে গেল। দীর্ঘদিন পরে স্বামীর প্রতিশোধ নেবার পালা। এতদিন ধরে যে প্রশ্ন তাকে প্রতিনিয়ত উন্মাদ করেছে—সত্যিই সে তার সন্তানের পিতা কি না—যুবক ছেলের কাছে সেই প্রশ্ন খুলে ধরে স্ত্রীর উপর প্রতিশোধ নিল। অনবদ্য শিল্পমাধুর্যে মোপাসাঁর প্রতিনিধিত্বের দাবীদার।

ভাষান্তরে অনুবাদক গল্পটিকে মোটামুটি-ভাবে পরিবেশন করতে পেরেছেন। আপাতত এইটুকু নিয়েই পাঠককে খুশী থাকতে হবে। ৪০৭।৫৪

ছোট গল্প

দুই অধ্যাপক—বিনয় চৌধুরী; প্রকাশক—উদয়-তীর্থ, পূর্ব পুটিয়ারী, কলিকাতা—৩৩। মূল্য দু' টাকা।

চারটি ছোট গল্পের সংকলন। কোনটির মধ্যেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের ছাপ নেই। কোনটি বা হয়েছে প্রাচীন পল্লী কাহিনীর নব-সংস্করণ, কোনটি বা বহুশ্রুত ঘটনার পুনরাবৃত্তি (নেগুয়া)। প্রথম গল্পটি যা

একটু পড়বার মত। মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট বটতলা শ্রেণীর। ৪৬১।৫৪

নাটক

(১) **উর্বশী-নিরুদ্দেশ :** মূল্য ৷৷৹ (২) **কৃষাণ :** মূল্য ২৲ **::** **মন্মথ** রায় **:** প্রকাশক **:** যথাক্রমে রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ৫৭, ইন্দ্র বিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭ এবং গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা।

খ্যাতনামা নাট্যকার মন্মথ রায়কে প্রমথ চৌধুরী 'একাঙ্কিকার প্রবর্তক' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর 'কারাগার', 'চাঁদসদাগর' প্রভৃতি নাট্যকীর্তির প্রসঙ্গ ছেড়ে দিয়ে একথা সহজেই বলা যায়, একাঙ্ক নাটিকা রচনাতেই তাঁর শক্তির স্ফুরণ হয়েছে সবথেকে বেশী। 'উর্বশী নিরুদ্দেশ'কেও একাঙ্কিকা বলা যেতে পারে। রোগগ্রস্ত, জীবনযুদ্ধে বিপর্যস্ত অথচ স্বপ্নালু এক মৃৎশিল্পীর জীবনে দার্জিলিঙের পটভূমিকায় আশ্চর্যজনকভাবে স্বর্গের উর্বশীর আবির্ভাব। কিছুটা স্বপ্ন, কিছুটা বাস্তব, সব মিলে এক অপূর্ব রসের উৎসারণ ঘটেছে নাটিকায়। যে lyrical appeal মন্মথবাবুর সার্থক নাটকগুলির বিশেষত্ব, আলোচ্য নাটিকায় সেই রসস্রোত অব্যাহত দেখে আমরা খুশী হয়েছি।

'কৃষাণ' ঠিক নাটক নয়, চিত্রনাট্য। অর্থাৎ চলচ্চিত্রের কাহিনী সিনারিও-র মতো করে লেখা। ছবিটিকে কোন কোন চিত্র-সমালোচক 'গুড আর্থের মতই সমৃদ্ধ' বলেছিলেন। গ্রাম্য চাষী জীবনের সুখ-দুঃখ-আনন্দ-বেদনা সমস্যা ও সমাধানকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে 'কৃষাণ'-এর কাহিনী। দরদে উদ্বেল,—চরিত্র সৃষ্টিতে উজ্জ্বল,—আন্তরিকতায় সমৃদ্ধ। ৪৯০।৫৪

বিবিধ

বৈদ্যক-বৃত্তান্ত—শ্রীগুরুপদ হালদার প্রণীত। শ্রীভারতীবিকাশ হালদার এম এ, বি এল কর্তৃক ৪৭নং হালদারপাড়া রোড, কালীঘাট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

মুনি-ঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত কালের ভারতীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাধক এবং গবেষকদের নাম ও তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থাদির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। পুস্তকখানি গ্রন্থকারের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। আয়ুর্বেদ সাধনার সঙ্গে সাংখ্য এবং তন্ত্রশাস্ত্রের বিশেষ সম্পর্ক রহিয়াছে। এজন্য আয়ুর্বেদাচার্যগণের অবদান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে গ্রন্থকার সাংখ্যতন্ত্রের তত্ত্বেরও স্থানে স্থানে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সুশ্রুতের শারীর স্থান এনাটমীর সম্পর্কে আলোচনা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থকার সুশ্রুত সূত্রের এই ব্যাখ্যান সংস্কৃত ভাষাতে করিয়াছেন। পুস্তকের উপসংহারভাগে প্রকাশক কর্তৃক গ্রন্থকারের জীবনী এবং তাঁহার রচিত গ্রন্থাদি বিশেষভাবে গ্রন্থকার প্রণীত "সনৎ-সুজাতীয়ং" নামক মহাভারতের উদ্যোগ পর্বের অন্তর্গত সনৎ-সুজাতাধ্যায়ের ভাষ্য এবং ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস সম্পর্কে মনীষিবর্গের প্রশস্তিমূলক পত্রাদি সংযোজিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া পশুবলির সমর্থনে গ্রন্থকারের শাস্ত্র বিচার এবং দুর্গাতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা উল্লেখযোগ্য। পুস্তকখানি হিন্দু চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা এবং গবেষণা সম্প্রসারিত করিবার উদ্দেশ্যে বিনামূল্যে বিতরিত হয়। বৈদ্যক শাস্ত্রে অনুসন্ধিৎসু শাস্ত্রনিষ্ঠ সমাজে পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে। ৪৩১।৫৪

বারাণসী ও সারনাথ : হেমচন্দ্র দত্ত, প্রকাশক—অসীমকুমার দত্ত, ৩২।১এ নন্দন রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা—২৫, দাম আট আনা।

বারাণসী ও সারনাথের তীর্থক্ষেত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি। কাশী তীর্থকে কেন্দ্র ক'রে বহু কিম্বদন্তী ও ইতিহাস গড়ে উঠেছে, তার সম্পূর্ণ পরিচয় এই পুস্তিকার স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভবপর নয়, পুস্তিকাখানি কেবলমাত্র কাশী ভ্রমণের 'গাইড' হিসাবে ব্যবহারের যোগ্য এবং এদিক থেকে খানিকটা সার্থকও বটে। ৪৬০।৫৪

মাছের চাষ : অমরনাথ রায়; প্রকাশক—দি গ্লোব নার্শরী, ২৫, রামধন মিত্র লেন, কলিকাতা—৪। মূল্য তিন টাকা।

মাছের চাষ অর্থ মাছের বংশ বৃদ্ধি। আলোচ্য পুস্তকটিতে বৈজ্ঞানিক প্রথায় মাছের সংরক্ষণ, খাদ্য-প্রদান প্রণালী এবং ব্যবসা হিসাবে যে এটি লাভজনক হতে পারে তা সহ বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা প্রাঞ্জলভাবে করা হয়েছে। কৃষি-পুস্তক হিসাবে সুলিখিত। দাম কিছুটা কম করা যেত। ৩৬৪।৫৪

খেলাধুলোয় সাধারণ জ্ঞান—শ্রীখেলোয়াড়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭; দাম—পাঁচ সিকা। বাঁধাই—দেড় টাকা।

শ্রীখেলোয়াড় এক ক্রীড়া-সাংবাদিকের ছদ্মনাম। লেখক ইতিপূর্বে "জগৎজোড়া খেলার মেলা" এবং "খেলাধুলোয় জ্ঞানের কথা" লিখে যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন। "খেলাধুলোয় সাধারণ জ্ঞান" তাঁর তৃতীয় বই। এ বইখানিতে শ্রীখেলোয়াড় প্রশ্ন ও উত্তরের মাধ্যমে এমন সব বিষয়ের অবতারণা করেছেন, যা নিয়ে ক্রীড়ামোদিমহলে স্বতঃই তর্কের ঝড় ওঠে। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি, ব্যাডমিণ্টন, টেনিস, বাস্কেটবল, ভলিবল, সাঁতার, কুস্তি, বক্সিং, ওয়েটলিফ্‌টিং থেকে আরম্ভ ক'রে বিলিয়ার্ড, রাগ্‌বী, গল্‌ফ, পোলো, এ্যাথলেটিকস্, সুটিং, রোয়িং প্রভৃতি সমস্ত লেখাধুলার খুঁটিনাটি বিষয় বইখানিতে আলোচনা করা হয়েছে। যেমন বিভিন্ন খেলার বলের ওজন, ব্যাট ও র‍্যাকেটের মাপ, মাঠ, গোলপোস্ট, উইকেট, নেট প্রভৃতির মাপজোখ, ভারত ও বিশ্বের বিভিন্ন ক্রীড়া-প্রতিযোগিতার বিজয়ীর তালিকা এবং তরুণ ও ছাত্র সম্প্রদায়ের জিজ্ঞাসু-মনে ক্রীড়াক্ষেত্রের যেসব বিশেষ বিশেষ ঘটনা ঔৎসুক্য সৃষ্টি করে, তার সমস্ত ঘটনা সুন্দরভাবে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় ক্রীড়া-পুস্তকের নিতান্ত অভাব। এ ধরনের বই যত বেশী প্রকাশিত হয়, ততই ভাল। ছাত্রদের মধ্যে প্রচারের জন্য বইখানির দামও করা হয়েছে সস্তা। তরুণদের হাতে তুলে দেবার পক্ষে এবং স্কুলের "প্রাইজ বুক" নির্বাচনে "খেলাধুলোয় সাধারণ জ্ঞান" একখানি উপযুক্ত বই। (৬৫৪।৫৪)

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

উল বোনার প্রাথমিক শিক্ষাপ্রণালী ও বিভিন্ন উলের কাজ—রেখাদেবী বন্দ্যোপাধ্যায়
সাঁওতালী উপকথা—গুরুদাস সরকার
ভূতপূর্ব স্বামী—প্র না বি
মৌনমুখ—কুমুদকান্ত চক্রবর্তী
কলরোল—অনিলকুমার ভট্টাচার্য
মেয়েদের ব্যায়াম, স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য—শ্রীনির্মাণ দাশ
পেনাঙ-এর পাহাড়ে—শ্রীদক্ষিণারঞ্জন বসু
আমি ও আমার মুক্তি—স্বামী শঙ্করানন্দ
শরৎচন্দ্র—শ্রীকানাইলাল ঘোষ
জরির নাগরা—উষা দেবী
West To-Day—Dr. Prafulla Chandra Ghosh.
দি ডেথ অব্ আইভান ইলিচ—লিও টলষ্টয়, অনুবাদক—মনোজ ভট্টাচার্য
সীমান্তহীরা—শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।
আসর—অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়
শ্রীরামদাস—অধ্যাপক শ্রীশিবনাথ বাগচী
শিলানগরের রাণী—দেবকুমার ঘোষ

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যা দেশে পুস্তক পরিচয় বিভাগে 'বড়লেখা' নামক একটি পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশিত হইয়াছে। উক্ত পুস্তকের নাম 'রক্ত লেখা'।

ভারতের আদিবাসীদের ঐতিহ্য

হর্ষদেব

পুঁথিপত্রের হিসেবে তিন কোটি। থচ তিনটি আদিবাসীকেও আমরা াখে দেখেছি কি না সন্দেহ। নেহাত গোলের গা-ঘেঁষাঘেঁষি-প্রতিবেশী না লে ওরা ওরা, আর আমরা আমরা। াগাযোগ নেই আমাদের মধ্যে। ভারতের নচিত্র ছড়িয়ে এই যে তিন কোটি াদিবাসী এদের সঙ্গে আমাদের সংযোগ ত্র কেন যে এত ক্ষীণ তা ভাববার ষয়।

শুনেছি বৃটিশ সরকার যতদিন াজত্ব চালিয়েছেন ততদিন আদিবাসী ম্পর্কে উদাসীন থাকার স্পষ্ট তিনটি রণ ছিল। শাসনকার্য—বিশেষত অরণ্য ধ্যুষিত এলাকায় শাসন পরিচালনার াসাদ ছিল অনেক, তাও আবার এমন কাজ যাতে সরকারের লাভ দূরে ক ক্ষতিই হত—ফলে সরকার এ াপারে নিশ্চেষ্ট থাকতে চাইতেন। ্বতীয় কারণ হল, বৃটিশ সরকারের রাজ-নীতিক দূরদর্শিতা। আদিবাসী সম্প্রদায় যাতে কোনরকমে আমাদের রাজ-নীতির আওতায় এসে পড়তে না-পারে সেজন্যে ওদের দূরান্তরে স্বতন্ত্র করে রাখা হয়েছিল। তৃতীয় কারণটা অবশ্য একটু অন্যরকম। বৃটিশ সরকার নাকি সত্যি সত্যিই মনে করতেন সভ্য জগতের সংস্পর্শের বাইরে থেকে ওরা ভালই আছে, আর বেশ সুখেই আছে।

স্বাধীনতা লাভের পর ভারত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গী বদলেছে। আদিবাসী সম্পর্কে বৃটিশ সরকারের নীতি ছিল 'উদাসীন নীতি'; ভারত সরকারের নীতি হয়েছে 'গ্রহণ নীতি'। অবশ্য এই গ্রহণ নীতির রূপটা একটু অন্য রকমের। যাকে বলে নিজের মধ্যে আত্মসাৎ করা তা নয়, আত্তীকরণ যাকে বলে, অর্থাৎ অঙ্গীভূত করা, তাই।

অথচ স্বাধীনতা লাভের পর মিশনারী সম্প্রদায় এবং হিন্দু সমাজ-সংস্কারকরা

মুরিয়া আদিবাসী যুবক গাছগাছড়ার আঁশ থেকে দড়ি তৈরি করছে। যুবকটির সাজসজ্জা ও গাত্র অলংকরণ দ্রষ্টব্য

যে মনোভাব নিয়ে আদিবাসীদের দু বাহু বাড়ায়ে আলিঙ্গন করতে গিয়েছে তা ঠিক অঙ্গীভূত করা নয়। এরা এমন একটি মনোভাব নিয়ে এগিয়ে এসেছে যাকে বন্ধুর মত আসা বলা যায় না। নিজেদের সভ্যতার গর্ব এবং উৎকৃষ্টতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে যেন আদিবাসীদের আদিম সমাজ, সভ্যতা, তাদের হীন সামাজিক আচার, আচরণ ও ভাবধারাকে পরখ করে দেখে নিজেদের গির্জা অথবা হিন্দু সমাজের তথাকথিত ছাঁচের মধ্যে ফেলতে চেয়েছে। বললে অন্যায় হবে না, ওদের আদিম অভ্যস্ত জীবন, কর্ম ও ঐতিহ্যকে একেবারে নিজেদের মধ্যে গলাধঃকরণ করে ফেলাই ছিল এদের উদ্দেশ্য। মিশনারী চেয়েছে আদিবাসীরা তাদের নকল করুক, হিন্দু সমাজ-সংস্কারকরা চেয়েছে তাদের হিন্দু সমাজের আর একটি প্রতিলিপি তৈরি করতে।

চেষ্টা করেছে দুই পক্ষই। কোথাও এর সাফল্য কোথাও ওর সাফল্য। কোথাও বা উভয় পক্ষেরই শোচনীয় ব্যর্থতা। উদাহরণ স্বরূপ আসামের কথা ধরা যেতে পারে। এখানে লুসাই, খাসিয়া এবং তথাকথিত নাগাদের মধ্যে বহু সংখ্যক আদিবাসী কৃশ্চান হয়ে

বসতার অঞ্চলের আদিবাসী পুরুষ ও নারী

গেছে। কৃশ্চান খাসিয়ারা যদিও তাদের আদিম সামাজিক গঠনটা অবিকৃত রেখেছে—আর লুসাই এবং নাগারা তাদের জীবনের কতক কতক রূপ, তবু বলা বাহুল্য আদিবাসীদের যে লক্ষণীয় স্বাতন্ত্র থাকার কথা এরা তা হারিয়ে ফেলেছে। বর্তমানে এদের সংস্কৃতির চেহারাটা আধা-পাশ্চমী।

বর্তমানে প্রায় সমস্ত রাজ্য সরকারই আদিবাসীদের জন্যে শিক্ষা পরিকল্পনা, অর্থনৈতিক উন্নতি চিন্তা, সামাজিক সুযোগ সুবিধে এবং নানারকম সংস্কারের প্রস্তাব নিয়ে এগিয়ে আসছেন। এর ফলে আদিবাসী সম্প্রদায়ের অতীত ঐতিহ্যের মূল্যমান এবং তাদের জীবনের ভাল মন্দ উভয় দিকেরই বিনাশ ঘটবে। এর কারণ এই যে, আদিবাসীদের উন্নতি চিন্তাটা খুব সত্য হলেও, তাদের ঐতিহ্য সম্পর্কে আকর্ষণ বা অনুরাগ আমাদের নেই।

মিশনারী বা সমাজ-সংস্কারকদের দিয়ে সামান্য কিছু করা অথবা সরকারী-ভাবে অনেক কিছু করা—এই দুই চূড়ান্ত পথ ছাড়া আর একটি পথ আছে আদিবাসীদের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র গেঁথে দিতে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু এই তৃতীয় পথের আভাস দিয়েছেন। আদিবাসীদের সম্পর্কে যত কথা যত বক্তৃতা শোনা গেছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং অনন্যসাধারণ এক ভাষণ হচ্ছে শ্রী নেহরুর। আদিবাসীদের প্রতি নিজের নিবিড় অনুরাগ এবং আকর্ষণের কথা ব্যক্ত করে তিনি বলেছিলেন, ওদের কাছে যাওয়ার সময় তাঁর মনোভাব ছিল বন্ধুর মতন। 'বন্ধুর মনোভাব নিয়েই গিয়েছি, এমনভাবে যাইনি যাতে মনে হতে পারে সম্পর্কহীন কেউ একজন তাদের চোখের দেখা দেখতে এসেছে।' পরীক্ষা করে, দর-দাম বুঝে, লাভ লোকসান খতিয়ে দেখে আদিবাসীদের সম্পর্কে নেহরুজী একটা কিছু মতামত জানাবেন বা ওদের বুঝিয়ে সুঝিয়ে আমাদের মতন জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে পরামর্শ দেবেন—এর কোনটাই তাঁর মাথায় ছিল না, নিজেই তিনি বলেছেন।

'আমার শঙ্কা জাগে—' নেহরুজী বলেছেন, 'যখন দেখি—কেবল এ দেশ

মণিপুরে কাবুইস আদিবাসীদের জল সংগ্রহ ব্যবস্থা। বাঁশের চোঙার মধ্যে জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে মেয়েটি

বলেই নয়, অন্যান্য বড় বড় দেশেও মানুষ কিভাবে নিজের ছাঁচে অপরকে ঢেলে সাজতে চায়, নিজেদেরই নকল-নবীশ বানাতে চায়। আর এরা অন্যের ঘাড়ে নিজেদের জীবন যাপনের রীতি-নীতি চাপিয়ে দিতে ব্যস্ত।' নেহরুজী

উড়িষ্যার জুয়াং আদিবাসী সম্প্রদায়ের সুবেশা নারী। উৎসবের সময় এরা এখনো গাছের পাতার অঙ্গআবরণ ব্যবহার করে

স্পষ্টই বলেছিলেন এরপর, তাঁর নিজেরই সন্দেহ আছে আধুনিক জীবন অথবা আদিবাসীদের জীবনযাত্রার মধ্যে কোন্‌টা ভাল। 'কতক ব্যাপারে আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওদেরটাই ভাল'।

আদিবাসীরা আমাদের মতন হয়ে উঠুক শ্রী নেহরুর সেটা মোটেই ইচ্ছে নয়। তিনি বলেন, ওদেরকে আমাদেরই অবিকল প্রতিলিপি তৈরি করার চেষ্টার কোন মানে হয় না।

আদিবাসীদের আঞ্চলিক ভাষাগুলির পৃষ্ঠপোষকতা করার কথা বলেছেন তিনি। এর ফলে তাদের ভাষা নিশ্চিহ্ন হবে না; বরং দিনে দিনে উন্নত হবে। এ ছাড়া আরও দেখতে হবে বাইরের কোন শক্তি এসে যেন তাদের জীবনে উৎপাত শুরু করতে না পারে—ওদের জমিজমা কেড়ে না নেয়, বনজঙ্গল দখল করে না বসে। আদিবাসীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার প্রয়োজন যে খুবই, নেহরুজী তা বলেছেন। ওদের সংস্পর্শে একমাত্র তারাই যেন আসতে পারে যারা ওদের বন্ধু। শুভবুদ্ধি এবং আদিবাসীদের ঐতিহ্যের প্রতি অনুরাগ নিয়ে যারা যাবে তারাই আদিবাসী সমাজে ঠাঁই পাবে, নচেৎ নয়।

আদিবাসী সম্প্রদায় সম্পর্কে নেহরুর যে ধরনের মনোভাব তার মধ্যে কোথাও স্বার্থবুদ্ধি জড়িত নেই। আমাদের উভয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতে হ'লে এমন মনোভাবই বাঞ্ছনীয়।

প্রসঙ্গত একটা কথা এখানে এসে পড়ে। আমরা কি আদিবাসী সম্প্রদায়কে দূরান্তরে বিচ্ছিন্ন রাখতেই চাই? মোটেই তা নয়। আদিবাসী সম্প্রদায় আমাদের প্রতিবেশী। বিচ্ছিন্ন রাখার মতন মূর্খতা যেন কোনক্রমেই আমাদের না হয়। কল্যাণকর সকল পরিকল্পনার মধ্যে ওদের স্থান দিতে হবে—এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের জীবনের সর্বাঙ্গীন উন্নতিই আমাদের লক্ষ্য। তবে এমন যেন না হয়, নিজেদের প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে রাতারাতি ওরা আমাদের সভ্যজীবনের নকল করতে না শুরু করে। ওদের উন্নত করতে বসে ওদের বিকৃত করার অধিকার আমাদের নেই।

আদিবাসীদের একটি ঐতিহ্য আছে। বলে রাখা ভাল, আমাদের সঙ্গে তুলনা

রে বা আমাদের সভ্যতার অগ্রগতির ঙ্গে সে গতির বিচার করে আদিবাসী-র ঐতিহ্য বোঝা যাবে না। যে পরিবেশ বং সমাজ-কাঠামোয় তাদের জীবনছন্দ াজে চলেছে তারই পরিপ্রেক্ষিতে এই তিহ্যের বিচার। ধর্মবিশ্বাস, সংস্কার, বাহ, শিল্পকলা, সাজসজ্জা, সঙ্গীত ও ত্য—জীবনযাত্রার বিশিষ্ট কয়েকটি ীতিনীতি—এ সব মিলিয়ে মিশিয়ে াদের ঐতিহ্য। আর বলা বাহুল্য এই তিহ্যই তাদের জীবনের স্বাতন্ত্র্য, শিষ্ট্য।

আদিবাসীদের ঐতিহ্যটুকু তাদের ক্ষা করতে দিতে হবে। এর অর্থ এই নয় তারা নগ্নগাত্রে থাকুক, বনজ শিকড় য়ে জীবন ধারণ করুক। অবশ্যই তা তে পারে না। কিন্তু এমন দুর্মতি যেন মাদের না পেয়ে বসে যে শহর থেকে লের বোনা রেশম-সুতো রঙ-চঙে াড়ি ব্লাউজ নিয়ে গিয়ে তাদের গায়ে তুলে দি অথবা আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পায়ে প্রস্তুত টিনের খাবারগুলো ওদের তে না তুলে ধরি। আমরা জানি না ই—নচেৎ দেখতে পেতুম—বস্ত্রবয়নে দের স্বকীয় পটুতা—এবং সৌন্দর্য ষ্টিতে তাদের নিজস্ব রীতিগুলি যত ন্দর—মিলের রেশমী-সুতোর রঙচঙে স্ত্র তার কাছে কিছুই নয়। অঙ্গশোভার হুরে রূপটাকেই আমরা চিনি—তাই সেটিকে উৎকৃষ্ট মনে হয়, কিন্তু আদি-াসীদের শিল্পজ্ঞান যে কত সহজ ন্দর হতে পারে তা আমাদের জানা নেই। বিবাহে, উৎসবে, নৃত্যে—এদের সৌন্দর্য-জ্ঞান বেশবাস, সাজসজ্জা, অলংকরণ ও শিল্পের অন্যান্য কর্মের মধ্য দিয়ে অতি সুন্দরভাবে প্রকাশ পায়।

আদিবাসীদের আঞ্চলিক সংস্কার ও ধর্ম তাদের ঐতিহ্যের অন্তর্গত। আমাদের মতন শহুরে লোকের কাছে সেগুলি নেহাৎই দৃষ্টিকটু এবং বিসদৃশ মনে হতে পারে। হয়ত ভাববো, এগুলি অসভ্য মনের কীর্তি। ওদের ধর্ম ও সংস্কারের শুদ্ধি প্রয়োজন।

সংস্কারকের গর্ব নিয়ে যদি শুদ্ধির কাজে হাত দি তবে সরলমতি আদিবাসী-দের সভ্য করতে খুব বেগ পেতে হবে না। কিন্তু তার ফল দাঁড়াবে ওদের ঐতিহ্যের

উড়িষ্যার এক আদিবাসী সম্প্রদায়ের গ্রাম থেকে এই বিরাট ঢাকটি জুয়াঙ যুবকরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ঢাকটি এই গ্রামেই এতকাল ছিল

নিশ্চিত মৃত্যু। এ সম্পর্কে ডাঃ ভেরিয়ার এলুইনের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করছি— "সভ্যতার অপ্রতিহত গতি আদিবাসী সমাজে—যে কারণেই হোক—বিহ্বলতাব সৃষ্টি করে। পল্লীতে একটি ইস্কুল খুলুন দেখবেন, তাদের কারুকর্ম বন্ধ হয়েছে। একটি উন্নয়ন পরিকল্পনা নিয়ে কাজ আরম্ভ করুন, দেখবেন তারা সুপ্রাচীন ঐতিহ্যময় সাজ-অলংকার ছেড়ে আধুনিক সেজেছে। একটি দোকান খুলুন দেখবেন, তারা নিজের সুন্দর সুন্দর জিনিস ফেলে কার-খানার তৈরী রঙ-চঙ করা স্থূল জিনিস-গুলো ঘরে নিয়ে চলেছে। তাদের রুচি, সৌন্দর্যবোধ খুবই আন্তরিক। কিন্তু তারা যখন আধুনিক সংস্কৃতির (যাকে তারা ভুল করে উন্নত সংস্কৃতি বলে মনে করে) সম্মুখীন হয় তখন তারা নিজস্ব রুচি, সৌন্দর্যবোধ নিঃশেষে হারিয়ে ফেলে। এটা বিস্ময়ের এবং বেদনারও বটে।"

ভারতীয় আদিবাসী বা উপজাতীয়দের সঙ্গে সেতুবন্ধনে আমাদের সর্বপ্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত আদিবাসী ঐতিহ্যকে তার নিজের মতন করে বেড়ে উঠতে দেওয়া। জীবনের যে সকল ক্ষেত্রে তারা স্বতন্ত্র এবং বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সেখানে হস্ত-ক্ষেপ না করাই হবে প্রকৃত শুভবুদ্ধির লক্ষণ। আর আদিবাসী ঐতিহ্যের প্রধান কটি বিষয় হল—তাদের শিল্পকলা, সংগীত ও নৃত্য, বেশভূষা, গাত্র অলংকরণ, ধর্মবিশ্বাস। বলা বাহুল্য আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের আদিবাসীদের ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন যদি সম্ভব হয়ে থাকে—এ দেশেই বা না হবে কেন! সহজ কথা হচ্ছে এই যে, আমরা যদি তাদের ঐতিহ্যকে আত্মসাৎ করে নিজেদের চটকদার সভ্যতার ভূত ওদের ঘাড়ে না চাপাতে চাই তবে আদিবাসীদের সর্বনাশ ঘটবে না। প্রকৃতির সারল্য ও নিষ্পাপ বুদ্ধি দিয়ে যে জীবনগুলি বিকশিত সে জীবনগুলিকে বৈষয়িকভাবে উন্নত করাই হবে আমাদের লক্ষ্য— কিন্তু ঐতিহ্যগত দিক দিয়ে তাদের যেন খর্ব না করি। সেটা হবে পরম ক্ষতি—কী আমাদের কী তাদের উভয়ের পক্ষেই।

ডাঃ ভেরিয়ার এলুইনের প্রবন্ধ অবলম্বনে রচিত।

সাম্প্রতিক ফোটো প্রদর্শনী

দিনকয়েক আগে কলকাতার চারু-কলা প্রদর্শনীর বিখ্যাত আখড়া এক নম্বর চৌরঙ্গী টেরাসে ফোটোগ্রাফিক এ্যাসোসিয়েশন অব বেঙ্গলের সভ্যদের ফটোর মেলা হয়ে গেছে। এবারে ছবির সংখ্যা খুব বেশি ছিল না, কাজেই সাজানো-গোছানোর পারিপাট্য আশানুরূপই হয়েছিল। দর্শকেরা ধীরেসুস্থে ছবি দেখার সুযোগও পেয়েছেন, তার কারণ এই প্রদর্শনীর পূর্বাহ্নিক প্রচার-বিজ্ঞাপন তেমন জোরালো হয়নি—আর এটি কোন আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীও নয়, কাজেই খুব ভিড় হতে পারেনি। তবে এও ঠিক যে, এই মধ্যমাকারের অনাড়ম্বর প্রদর্শনীটি আন্তর্জাতিকতার সম্মান এবং মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। যাঁদের তোলা ছবি এতে স্থান পেয়েছে তাঁদের মধ্যে অনেকেই আন্তর্জাতিক ফটোর মেলাতে ছবি দিয়ে থাকেন। তা ছাড়া বাকী সব ছবির মধ্যেও অনেকগুলিই আন্তর্জাতিক মানের তুলনায় কমতি যায় না। আমার ত মনে হয়, এই ধরনের প্রদর্শনীই সব দিক দিয়ে উৎসাহিত হওয়া উচিত।

যাঁরা বিচার-বিশ্লেষণের দাঁড়িপাল্লা সঙ্গে নিয়ে প্রদর্শনী দেখতে যান, তাঁদের খোরাকও এ প্রদর্শনীতে প্রচুর ছিল। বিশ্ববিখ্যাত ফটোগ্রাফার ফ্রান্সিসকো আজমানের তোলা ষোলখানি বাছাই ছবি বিশেষভাবে প্রদর্শিত হয়েছে। একদিকে

বসুন্ধর

ব্রাজিলের একচ্ছত্র কুশলী ফটোগ্রাফারের সার্থক সৃষ্টি—আর এক দিকে পি-এ-বি'র সাধারণ সভ্যদের প্রচেষ্টা; পাশাপাশি সমন্বিত হওয়ার ফলে বিচারশীল রসিক দর্শকেরা অনায়াসে ওজন করে দেখতে পারেন, কতখানি পার্থক্য সার্থক সৃষ্টিতে আর চেষ্টাপর তরুণতর সাধকদের সৃষ্টিতে। অবশ্য একথা বলা সহজ যে, আজমানের যে কোন একখানি ছবির সঙ্গে 'পি-এ-বি'র সভ্যদের ছবিতে তফাৎ রয়েছে। কিন্তু সেই সঙ্গে এও মনে হয় যে, আকাশ-পাতাল ফারাক সেটা নয়—আরও কিছুদিন চেষ্টা করলে আজমানকে কেউ কেউ ধরে ফেলবেন।

এখানে আর একটা কথা ওঠে। আজমানের ফটোগুলিতে কোন লুকো-চুরির অবকাশ নেই, দেখলেই ছবির বক্তব্য স্পষ্টই বুঝতে পারা যায়—যেন বক্তব্যটুকু বোঝাবার জন্য স্রষ্টা তাঁর সমগ্র শক্তিকে নিঃশেষে প্রয়োগ করেছেন। দর্শক এক বিন্দুও চিন্তা না করেই বলে দিতে পারেন যে, ফটোগ্রাফার কি বলতে চেয়েছেন। এক শ্রেণীর রসিক এই ছবির উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠবেন। কিন্তু এর বাইরেও অন্য ধরনের মানুষও রয়েছেন। তাঁরা শুধু ফটো দেখেই খুশি হতে পারেন না, বিষয়বস্তুর বাহ্যিক পরিবেশনের পিছনে কোন বিশিষ্ট চিন্তার গভীরতা অনুসন্ধান করেন তাঁরা। এই শ্রেণীর রসিকেরা অবশ্যই ভূপেন্দ্রকুমার সান্যালের ছবিতে চিন্তার আশ্রয় খুঁজে পাবেন। গতানুগতিক ফটোগ্রাফীতে শ্রী সান্যাল ইতিপূর্বে নিজের সম্যক কৃতিত্ব প্রদর্শন করে যথেষ্ট খ্যাতি কুড়িয়েছেন। বর্তমানে এঁর বেশিরভাগ ছবিই নিছক ক্যামেরার কারিগরিতে আবদ্ধ থাকছে না। মণ্টাজ এবং সুপারইম্পো-জিশনের সাহায্যে দুই অথবা অধিক-সংখ্যক নেগেটিভের সংযোগমিশ্রণের ফলে নূতনতর ভাবপ্রকাশের চেষ্টায় সান্যাল মশাই ব্রতী হয়েছেন। আলোচ্য প্রদর্শনীতে তাঁর দুখানি ছবির মধ্যে sisters (71) এই প্রচেষ্টার সার্থক সৃষ্টি বলে বিবেচিত হতে পারে। অপর ছবিটি One of '54 (72) খুব স্পষ্ট কোনো চিন্তার অভি-ব্যক্তি বলে প্রমাণিত হচ্ছে না। এই সূত্রে একটি কথা আসে—ফোটোগ্রাফীর রাজ্যেও পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিপ্লব শুরু হয়ে গেছে! যদিচ রক্ষণশীল ফোটো-গ্রাফাররা অনেকেই এই ধরনের অতি আধুনিকতাকে সুনজরে দেখতে চান না তবু একেবারে উপেক্ষা করে উড়িয়ে দেওয়াও যাচ্ছে না ত! কারণ কি এদেশে কি বিদেশে সর্বকালের শিল্পিমন নূতন-তর পথের সন্ধানে রওনা হয়েছে। হয়তো বা প্রথমে ব্যর্থতার বাধা উত্তুঙ্গ আক্রমণে বিফল করেছে—কিন্তু সাধনার সমাপ্তি সেখানে ঘটে নি। চিত্রশিল্পের ইতিহাসেও এই তথ্যই আমরা পেয়েছি—। কাজেই ফোটোগ্রাফীতে নবতর পথসন্ধানীদের দেখে অবাক হবার কিছু নেই। শ্রী সান্যালের ছবির অর্থ অনেকের মতো আমি নিজেও বুঝতে পারি নি (One of '54 প্রসঙ্গে বলছি)। ছবির নামকরণও এমন যে, তা থেকে চিন্তার কোনো সূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। নূতন পথের সন্ধানী হিসাবে
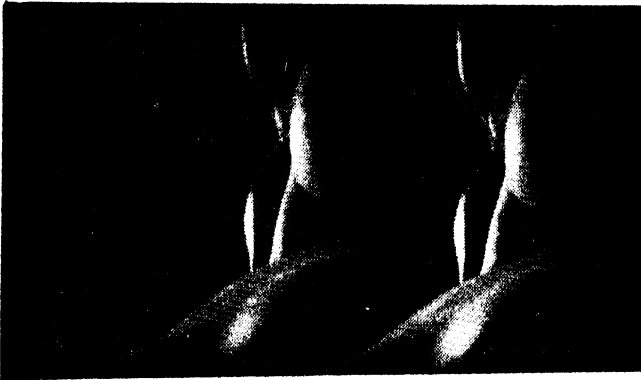
দুই বোন —ভূপেন্দ্রকুমার সান্যাল

ী সান্যাল অগ্রণী বলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করি
—তবুও বলব যে, ছবির মধ্যে থেকে যদি
বশেষ অর্থ খুঁজে পাওয়া না যায় তবে
ুঝতে হবে শিল্পীর ভাবপ্রকাশে দৈন্য
য়ে গিয়েছে। এর আগেও সান্যাল এই
াতীয় কল্পনাদ্যোতক ছবি দর্শকদের
ামনে উপহার দিয়েছেন—সেগুলি এতটা
ুর্বোধ্য ছিল না। আশঙ্কা হতে পারে
য, তিনি বোধগম্যতার মাত্রা অতিক্রম করে
শষকালে না পরিপূর্ণ abstraction-এ
পৌঁছে যাবেন। তাতে তাঁর তৃপ্তি
াকতে পারে, কিন্তু দর্শকরা অন্ধকারে
াতড়ে মরবে—তাতে লাভ কী?

পাঠকেরা হয়তো হাঁপিয়ে উঠেছেন—প্রদর্শনীর প্রসঙ্গ ছাড়িয়ে যাচ্ছি বলে। ়জেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ের দু-খানি ছবিই সুন্দর হয়েছে। কান্তিলাল চৌধুরী আমাদের এবার হতাশ করেছেন। নবাগত-দের মধ্যে সঞ্জিৎ ধর, বরুণ পালিত, সি পি ধাওয়ান, বলাই রায়, স্নেহাংশু সেনের ছবি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কলকাতা বন্দরের একটি সুন্দর চিত্র উপহার দিয়েছেন, তবে এধরনের ছবিতে নূতনত্ব কিছু নেই।

ফটোগ্রাফিক এসোসিয়েশন অব বেঙ্গল পর পর তিনটি প্রদর্শনী খুব অল্পকালের মধ্যে বন্দোবস্ত করেছেন। অক্টোবরের শেষের দিকে দার্জিলিং-এ যে প্রদর্শনীটি দেখানো হয়েছে তাতে স্থানীয় অধিবাসীদের অনেকগুলি ভালো ছবি ছিল। জামসেদপুরের প্রদর্শনীটিও কম চিত্তাকর্ষক হয়নি। এ থেকে বেশ বোঝা যাচ্ছে যে, ফটোগ্রাফীর প্রতি দেশের জন-সাধারণের উৎসাহ সঞ্চারিত হচ্ছে। শুধু সাধারণই নয়, শিল্পীমহলেও একটা সাড়া পড়েছে লক্ষ্য করলাম। আমাদের দেশের শিল্পীরা এর আগে রং-তুলিকেই একমাত্র প্রকাশ মাধাম বলে মানতেন। ইদানীং শিল্পীরা ক্যামেরা নিয়ে ঘোরাফেরা করছেন।

অন্যদিকে ফটোগ্রাফার মহল ফটোর রাজ্যে তুলিকে আত্মসাৎ করতে উদ্যত।
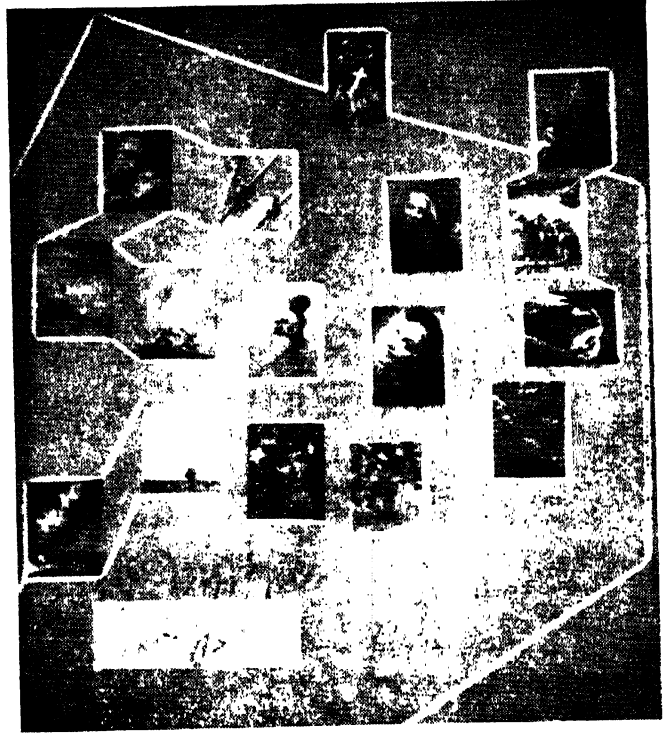
ফ্রান্সিসকো আজমানের চিত্রগুচ্ছ

কুশলী ফোটোগ্রাফারদের মধ্যে অনেকেই তুলির সাহায্যে নেগেটিভের ওপর খোদ-কারি করে থাকেন। হয়তো এমন এক দিন আসবে যখন ফোটোগ্রাফী আর অঙ্কনশিল্পের মধ্যে রাখীবন্ধনটা পাকা-পাকিভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবে। যদি অঙ্কনশিল্পী ক্যামেরার সাহায্য গ্রহণ করেন, আর ফোটোগ্রাফার তুলিকে নিজের কাজে লাগাতে থাকেন তাহলে! আমার এই বেয়াদপিতে অনেকানেক বিশুদ্ধবাদী ক্ষিপ্ত হতে পারেন—তবে কথাটা তলিয়ে ভেবে দেখুন, এই অনুরোধ।

আগামী বছরের ফেব্রুয়ারীতে আবার আন্তর্জাতিক ফোটো প্রদর্শনী হবে শুনছি।—তাতে আরও নতুন নতুন ভালো ছবি আত্মপ্রকাশ করতে পারে। তবে এবার যেন পি এ বি প্রশস্ততর স্থানের ব্যবস্থা করেন, নইলে ছবিগুলির ওপর অযথা অবিচার করা হবে। কেন, তাঁরা কি মিউজিয়মে কিম্বা একাডেমী অব ফাইন আর্টসের সহায়তা দাবী করতে পারেন না? একাডেমীরও এদিকে একটু লক্ষ্য রাখা সমীচীন।

'হিনা-নিনায়ো' ॥ প্রাচীন জাপানের সম্রাট ও সম্রাজ্ঞী

জাপানী পুতুল

চিত্রসেন

গত অক্টোবর মাসে বম্বের জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে "ভারত-জাপান সংস্কৃতি পরিষদ"এর উদ্যোগে "জাপানী পুতুল" প্রদর্শনী হয়ে গেল। সবদিক দিয়েই প্রদর্শনীটির বিশেষত্ব ও মৌলিকত্ব ছিল ও ভারতবর্ষে এই ধরনের প্রদর্শনী বোধ হয় এই প্রথম। প্রদর্শনীর যাবতীয় দ্রষ্টব্য বস্তুই স্থানীয় সংগ্রহ থেকে আনা। পুতুল প্রদর্শনীর সহিত বিভিন্ন প্রকার জাপানী কারুশিল্পের নমুনা, বাঁশের কাজ, চিত্রকলা, উড্‌কাট ছবিও ছিল। কিন্তু এসবের মধ্যে বিভিন্ন রঙের বিচিত্র পুতুলগুলোই ছিল প্রধান আকর্ষণ। শুধু যে ছোট ছেলেমেয়েরাই এইসব পুতুল দেখে আনন্দিত ও মুগ্ধ হয়েছে তা নয়, হাজার হাজার বয়স্ক দর্শকরাও ভিড় করেছে গ্যালারীতে; এরকম দর্শক সমাগম আর্ট গ্যালারীতে সচরাচর হয় না।

পৃথিবীর সব দেশেরই নিজস্ব ধরনের পুতুল আছে; কিন্তু অন্যান্য দেশের চাইতে জাপানের পুতুল-শিল্পের ঐশ্বর্য সবচাইতে বেশী। ছোট ছেলে-মেয়েদের মনোরঞ্জন করার জন্য সাধারণ পুতুল ছাড়াও জাপানে অত্যন্ত মূল্যবান ও সুন্দর পুতুল তৈরী হয়, যা শিল্প-সৃষ্টির দিক দিয়ে সার্থক। জাপানী পুতুল নির্মাতাদের সূক্ষ্ম ও রুচিসম্পন্ন কাজ আজ পৃথিবী-বিখ্যাত এবং সেই-

'ইচিমা নিনগিয়ো' ॥ শিশুদের অতিপ্রিয় পুতুল

জন্যই জাপান "পুতুলের দেশ" বলে অনেকের কাছে পরিচিত। আধুনিক জাপানী পুতুলের ইতিহাস জাপানের শান্তি ও সমৃদ্ধিসম্পন্ন ইয়েডো পর্ব থেকে প্রায় তিনশো বছর আগে। প্রায় আটশ বছরের পুরনো জাপানী সাহিত্যেও পুতুলের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন-কালে ধর্মানুষ্ঠানের জন্যই জাপানে পুতুল নির্মিত হত এবং পরে শিশুদের জন্যও পুতুল গড়া হ'ল। প্রাচীন আমলের পুতুলের আজ আর জাপানে কোন অস্তিত্ব নেই। ইয়েডো পর্বেই জাপানী পুতুলে অলঙ্করণ শুরু হয় এবং পুতুল-শিল্প রীতিমত চারুকলায় পরিণতি লাভ করে। এই সময় দুইটি বিভিন্ন ধরনের পুতুল গড়া হয়—একটি শিশুদের জন্য, অপরটি সাধারণের শিল্পবোধ অনুযায়ী গৃহসজ্জার উপকরণ হিসেবে। এইসব অনবদ্য কারুশিল্পীরা বিচিত্র ধরনের পুতুল নির্মাণে উৎসাহী হয় এবং সকলেই মৌলিকতার পরিচয় দেয়। জাপানে পুতুল-নির্মাণ প্রায় প্রত্যেক ঘরেই হয় এবং সে দেশের মার্চ মাসের "হিনা-মাটসুরি" বা "পুতুল উৎসব" জন-

'বোচা' ॥ জাতীয় পোশাকে জাপানী যুবক

সাধারণকে পুতুল নির্মাণের প্রেরণা জোগায়। তেমনি মে মাসের 'টানগো-নো-সেক্কু" বা "বালক উৎসবে"ও সর্বত্রই পুতুল গড়ে সাজান হয়, যার বিষয়বস্তু হচ্ছে ইতিহাসের বিখ্যাত যোদ্ধারা। আজকাল সাধারণ পুতুল ছাড়াও বহু প্রকারের যান্ত্রিক পুতুল গড়াতেও জাপানীরা পৃথিবীর মধ্যে অগ্রণী এবং তিনশো বছর আগেও যান্ত্রিক পুতুল ওদেশে নির্মিত হ'ত বলে খবর পাওয়া যায়। এসব ছাড়া জাপানের "বুনরাকু" পুতুল-নাচও বিখ্যাত।

উপরোক্ত প্রদর্শনীর ২৫০টি বিভিন্ন দ্রষ্টব্যের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য "রাজা-রাণী" পুতুল ও 'কোকেশি' পুতুল, যার মধ্যে গ্রামের দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় পাওয়া যায়। 'কোকেশি' পুতুলের একটা কমিক দিকও আছে। প্রদর্শনীর প্রত্যেকটি নিদর্শনের মধ্যেই জাপানীদের অসীম সৌন্দর্যবোধ ও সুরুচির পরিচয় পাওয়া যায়। এই প্রদর্শনীতে জাপানের দুটি মহিলা পুতুল নির্মাণ-প্রণালী দর্শকদের দেখান।

সর্বশেষে জাপানের কয়েকটি বিশিষ্ট ধরনের পুতুলের নাম ও পরিচয় উল্লেখ করা গেল।

"গোশো"—জাপানের ইয়েডো পর্বের রাজ-দরবারের পুতুল। শিশুদের ধরন অনুযায়ী নির্মিত হলেও সে যুগের সামন্ত রাজা ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের অত্যন্ত প্রিয়।

"কোকেশি"--জাপানের উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের কাষ্ঠ-নির্মিত অত্যন্ত সরল ও সাধারণ পুতুল। স্থানীয় অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য সম্বলিত।

"ফুশিমি"—১৮১৫ সালে, কিয়োস্টোর ফুসিমি অঞ্চলে এই জাতীয় মাটির পুতুল প্রথম নির্মিত হয়। বিখ্যাত 'কাবুকি' মঞ্চাভিনয়ের সাজপোশাক অনুযায়ী এইগুলি গড়া।

'তোরিয়োই' ॥ ১৬শ শতাব্দীর পোশাকে সজ্জিতা গায়িকা। প্রতি ঋতুতে পাখিদের সংগেই এর আগমন ও নির্গমন। বীণা বাজিয়ে 'সেমাইন' গান গেয়ে দুয়ারে দুয়ারে ভিক্ষে করে বেড়ায়

'ইডো হিকেশি' ॥ নববর্ষের কুচকাওয়াজের পোশাকে সজ্জিত টোকিয়োর দমকলকর্মী

"হারিকো"—সিকোকু অঞ্চলে এই পুতুল নববধূদের উপহারে দেওয়া হয়। পুতুলের বিষয়বস্তু একটি মেয়ে পৃষ্ঠদেশে শিশুকে বহন করছে।

"মিহারু"—প্রথম নির্মিত হয় ১৮১০ সালে। পুতুলের কাঠামোর উপর বহু স্তর জাপানী কাগজ লাগিয়ে পরে বিচিত্র ও বাহারে রঙ করা হয়। ওকাসা ও ফুকুসিমার এই পুতুল বিখ্যাত।

"কামো"—১৭৩৭ সালে এই ধরনের পুতুল কিয়োটোর 'কামো' মন্দিরে প্রথম তৈরী হয়।

"হিনা-নিনায়ো"—"রাজা-রাণী" পুতুল নামে খ্যাত।

চক্রদত্ত

বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই বড় বড় পোস্ট অফিসের সামনে লম্বা লম্বা "কিউ" দেখা যায়। "কিউ" কথার অর্থ আজকাল আর বুঝিয়ে বলতে হয় না। এইসব কিউএ দণ্ডায়মান ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই হয়তো খাম-পোস্টকার্ড অথবা টিকিট কিনতে এসেছেন। পোস্ট-অফিসের কর্মচারী এত লোককে টিকিট জুগিয়ে উঠতে পারছেন না। এক্ষেত্রে নবাবিষ্কৃত "বৈদ্যুতিক টিকিট ভেণ্ডার" বিশেষ
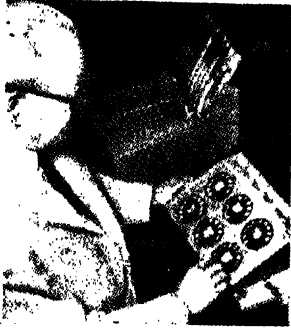
বৈদ্যুতিক টিকিট ভেণ্ডার

কার্যকরী। যন্ত্রটিতে টেলিফোনের ডায়ালের মত একটি চাকা থাকে। ক্রেতা যত দামের টিকিট চান, সেই নম্বরে আঙুল রেখে চাকাটি ঘুরিয়ে দিলেই চাকার সঙ্গে যুক্ত একটি খুপরী থেকে ঐ দামের টিকিট বার হয়ে আসে! তারপর ক্রেতাকে দরকারমত টিকিট ছিঁড়ে নিয়ে যেতে হয়। এইভাবে ছয় রকমের ভিন্ন ভিন্ন টিকিট ডায়াল ঘুরিয়ে নেওয়া যায়।

*

যে যুগ ও যে স্থান সভ্যতার আলোকে সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে, ইতিহাসে সে যুগ ও সে স্থান অবিস্মরণীয় হয়ে আছে। বর্তমান যুগের সভ্যতার চরম নিদর্শন, এ্যাটম বোমা। এ্যাটম বোমার আলোক যে স্থানকে সর্বপ্রথম আলোকিত করেছিল, সেই স্থানটি সযত্নে রক্ষিত হয়। নিউ মেক্সিকোর একটি মরুভূমিতে ১৯৪৫ সালে সর্বপ্রথম পরীক্ষামূলকভাবে এ্যাটমিক বোমার বিস্ফোরণ হয়। একটি ৩৭ ফুট উঁচু তোরণের ওপর থেকে আণবিক বোমা বর্ষণ করা হয় এবং এই বোমা বিস্ফোরণের ফলে আকাশে ৪৫০ মাইলব্যাপী স্থান আলোকিত হয়ে উঠেছিল। শোনা যায়, একটি অন্ধ বালিকার ১২০ মাইল দূরে থেকেও এই আলোর ঝলকের উপলব্ধি হয়েছিল। যেখানে বোমা বর্ষিত হয়, সেখানে একটি বিরাট গর্ত হয়ে গেছে। বর্তমানে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ এই স্থানটি সামরিক কর্তৃপক্ষের অধীনে সুরক্ষিত আছে। সামরিক কর্তৃপক্ষ এই স্থানটি নূতন নূতন যন্ত্রপাতি ও বিমানাদি পরীক্ষার কাজে লাগিয়ে থাকেন। যদি কোনও ভাগ্যবান ব্যক্তি এই সুরক্ষিত স্থানের কাঁটাতারের বেড়া ভেদ করে ঐ স্থানে প্রবেশ করতে পারেন, তাহলে তারা কাঁচের গলিত ছোট ছোট টুকরো পড়ে থাকতে দেখেন। এখনও এগুলো তেজস্ক্রিয় শক্তিসম্পন্ন থাকায় কিছুটা গরমও আছে। যদি সামরিক বিভাগ তাদের কবল থেকে এই স্থানটিকে মুক্তি দেন, তাহলে সরকার এই সর্ব-সভ্যতা বিলোপকারী সভ্য যুগের চরম পরীক্ষা ভূমিটুকুতে সর্বসাধারণের জন্য ন্যাশনাল পার্ক গড়ে তুলবেন বলে মনস্থ করেছেন।

*

কোনও একটি বিশিষ্ট লেবরেটরীতে "সাইনেম্যাটিন" নামে একটি নতুন ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে। টাইফয়েড রোগে ওষুধটি একেবারে ধন্বন্তরী বিশেষ। এটিও একটি এ্যান্টিবাওটিক ওষুধ। বর্তমানে পেনিসিলিন, অরিওমাইসিন প্রভৃতি এ্যান্টিবাওটিক ওষুধ একরকম যাদুমন্ত্রসম্পন্ন বলা চলে; কিন্তু সাইনে-ম্যাটিন এই দুটি ওষুধের চেয়েও কার্যকরী। অবশ্য শুধুমাত্র টাইফয়েড রোগেই ওষুধটি কাজ দেবে। পাঁচ বৎসর ধরে ওষুধটির কার্যকারিতা পরীক্ষা করা হয়েছে। একটি হাসপাতালে ১৬ জন টাইফয়েড রোগীর ওপর ওষুধটি প্রয়োগ করে দেখা গেছে যে, ১৬ জন রোগীই সম্পূর্ণ নিরাময় হয়েছে।

*

ডাক্তারগণ বলেন যে, খুব বেশী পরিমাণ স্নেহপদার্থবহুল খাদ্য খাওয়ার দরুণ দেহের মধ্যের ধমনী শক্ত হয়ে যায়। এঁদের মতে স্নেহপদার্থগুলি থাকার দরুণ শিরা-উপশিরার মধ্য দিয়ে স্বচ্ছন্দে রক্ত চলাচলও পরিস্রুত হতে পারে না। এগুলি ধমনীর আস্তরণে জমে থাকে। এই কারণে যাদের ধমনী শক্ত হয়ে যেতে থাকে, ডাক্তারেরা তাঁদের খাদ্য-তালিকা থেকে স্নেহপদার্থবহুল খাদ্য বাতিল করে দিতে বলেন। যে কোনওরকম খাদ্যই হোক্ না কেন, তার সমগ্র ক্যালোরীর শতকরা ১৫ ভাগ যদি তৈলজাতীয় হয়, তাহলেই বিপজ্জনক। এর ফলে পাকস্থলী ও অন্ত্রে বিপর্যয় ঘটে। অবশ্য হঠাৎ সমস্ত তৈলজাতীয় পদার্থবহুল খাদ্য বর্জন করা খুব সহজসাধ্য নয়, সেই কারণে যতটা সম্ভব অল্প খাওয়াই ভাল।

পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশকে একটি ইউনিটে পরিণত করার সংকল্প ঘোষণা করার পর জনাব আব্দুল গফ্ফুর খাঁ মন্তব্য করিয়াছেন—Time is not ripe for one unit —"কিন্তু তিনি বোধ হয় জানেন না যে, ন্যাংড়ারা পাকার অপেক্ষা রাখে না, কাঁচা, ডাঁশা, দড়কচা—যা হোক একটা নিয়ে মাতামাতি করাই তাদের অভ্যেস"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

জনাব মহম্মদ আলি তাঁর সাম্প্রতিক ঘোষণায় বলিয়াছেন যে, অতঃপর পূর্ববঙ্গকে পূর্ব পাকিস্থান নামে অভিহিত করা হইবে। —"নামে কিছু আসে যায় না, তা আমরা জানি, আর আমরা একথাও জানি যে, ইস্টবেঙ্গল টিম্ কখনো ইস্ট-পাক্ টিম্ হবে না, সুতরাং"............মন্তব্য করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

জনাব ইস্কান্দার মির্জা তাঁর এক মন্তব্যে প্রকাশ করিয়াছেন যে, আমেরিকার সঙ্গে সম্বন্ধ পাকা করিতে হইলে দুই দেশের মধ্যে আরো বেশি বৈবাহিক আদান-প্রদানের প্রয়োজন। - "এ ব্যাপারে আমাদের কিছু বলা সাজে না। তবে পাক্-মালেকরা কিছু মনে না করলে বলতে পারি যে, পণের প্রশ্নে বিয়ে ভেস্তে গেলে বিকল্পে বিবাহের চেয়ে বড়োও চলতে পারে,—এটা আন্-পার্লামেন্টারীও বটে; সুতরাং মির্জা সাহেব হয়তো আপত্তি না-ও করতে পারেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

সরিষার তৈলের মূল্যে বৃদ্ধিতে নগরবাসীরা একটু চিন্তিত হইয়াছেন। মিল-মালিকরা বলিতেছেন, ইহার জন্য সরিষা-বিক্রেতারা দায়ী; উত্তরে বিক্রেতারা বলিতেছেন যে, মূল্য-বৃদ্ধির জন্য মিল-মালিকরাই দায়ী। —"কিন্তু যাঁরা প্রয়োজনের অতিরিক্ত তেল মেখে মেখে নিজেদের পথ মসৃণ করছেন, তাঁরাই শুধু যবনিকার অন্তরালে থেকে হাসছেন"—কথাটা বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

ভারত সরকার প্রিন্টিং প্রেসের কার্যবিভাগ বৃদ্ধি করিবার ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া একটি সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। —"ইতিমধ্যে ছাপাখানার ভূতের কার্যকলাপ বৃদ্ধি না পেলেই হয়"—মন্তব্য করিলেন এক সহযাত্রী।

* * *

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, ভারত সরকার নাকি শুধু ছোটদের জন্য ছায়াছবি প্রযোজনার কথা চিন্তা

করিতেছেন। —"আশা করি, অভিনেতা-অভিনেত্রীরা অন্তত গেলমার গোত্রীয় হবেন, তা নইলে কিন্তু হাউস ফুল"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

চিত্রাভিনেতা ও তারকাদের সাম্প্রতিক ক্রিকেট খেলা কতটা সফল হইয়াছে, এই প্রশ্নের উত্তরে আমাদের শ্যামলাল বলিল—"ইংলণ্ডের অধিনায়ক জার্ডিন সাহেব বডিলাইন বোলিংই শুধু প্রবর্তন করেছিলেন,—আমরা এ খেলায় তারকাদের বডিলাইন ব্যাটিং পর্যন্ত দেখে এলাম। আর এই আশ্বাস নিয়ে এলাম

যে, মানকাদ-রামচাঁদরা ডুবে গেলেও, ভারতের ক্রিকেট কখনো ডুববে না, জয় হিন্দ!!!

* * *

আমেরিকার এক সংবাদে শুনিলাম, সেখানে এক শ্রেণীর বৃক্ষ নাকি দুগ্ধ দান করিতেছে। —"কিন্তু আমরা আমেরিকার মাটিকে দুধের ইতিহাস সৃষ্টির কৃতিত্ব দিতে রাজী নই, ভারতে বহুদিন আগে থেকে হাইড্রেন্ট পর্যন্ত দুগ্ধ দান করে আসছে,—সত্যি বিচিত্র দেশ নয় কি?—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

অন্ধ্র প্রদেশের এক সংবাদে একটি অদ্ভুত তালবৃক্ষের কথা প্রকাশিত হইয়াছে। শুনিলাম, বৃক্ষটি ভোর চারটার সময় হইতে মাটিতে নুইয়া পড়িতে থাকে এবং বিকাল তিনটার সময় প্রায় মাটিতে লুটাইয়া পড়ে। বেলা দ্বিপ্রহরের সময় এই বৃক্ষটি হইতে নাকি কী এক রকম সুগন্ধও বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে। —"এ সংবাদ উড়ন্ত পীরিচের মতো একবারে অলীক নয়। তালবৃক্ষের আত্মরস তাড়ির মাহাত্মকে যাঁরা অস্বীকার করেন, তাঁরা সত্যি নেহাৎ বেতাল!"

* * * *

কলিকাতার ইডেন উদ্যানে আমরা "রামলীলা"র ছায়া অভিনয় দেখিয়া আসিলাম। —"রাম-রাজ্যের

অভিনয় আমরা এতদিন যা দেখে আসছি, তার সবটাই ছায়া; শুধু নেপথ্য সঙ্গীতের ঢাকটাই কায়া ধরে চোখের সামনে ঘুরছে"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

"**র**ক্সি" সিনেমায় রাশিয়ায় তোলা সিনেমার ছবি দেখানো হইতেছে। —"তবু একটু রুচি বদলাবার সুযোগ পাওয়া গেল। মনুমেন্টের তলায় Dubbed version দেখে দেখে..........." শ্যামলাল কথাটা শেষ না করিয়াই ট্রাম হইতে নামিয়া গেল।

—শৌভিক—

ভারতের প্রথম নাট্যোৎসব

দিল্লীর ব্যাপারই দেখা যাচ্ছে আলাদা। রাজধানী হওয়ার প্রকৃতিই নেই যেন ওখানকার ধাতে। নয়তো কতো রকমের সম্মেলন, উৎসবাদি একটার পর একটা হয়েই চলেছে ওখানে অথচ তার সাড়া দেশের আর কোথাও গিয়ে ছোঁয়া লাগাতে পারছে না। হালের নাট্যোৎসব অনুষ্ঠানটিতেই তা বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে। প্রায় মাস ছয়েক আগে দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদেমির সম্পাদিকা নির্মলা যোশী কলকাতায় এসে ভারতের সকল ভাষার নাটক নিয়ে দিল্লীতে নবেম্বর মাসের এই উৎসবের কথা জানিয়ে যান। তারপর দীর্ঘকাল ও তরফ থেকে আর কোন খবরই পাওয়া যায়নি। পুজোর মাঝে একদিন কাগজে দেখা গেল নাট্যোৎসবের জন্য বাঙলা নাটক নির্বাচন করতে অন্নদাশঙ্কর রায়, শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও অহীন্দ্র চৌধুরীকে নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। শোনা গেল এমনি ধারা কমিটি ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্বাচিত হয়েছে। যে যার আঞ্চলিক ভাষায় নাট্যোৎসব অনুষ্ঠান করে তার মধ্যে থেকে দিল্লীর কেন্দ্রীয় নাট্যোৎসবে পাঠাবার উপযোগী নাটক মনোনয়ন করবে। অন্যান্য অঞ্চলে কি পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে জানা যায়নি, তবে বাঙলা দেশে দিল্লী উৎসবে পাঠাবার জন্য কোন নাটক নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়নি। পরে শোনা যায়, একমাত্র বহুরূপী সম্প্রদায়কে দিল্লী থেকে সরাসরি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে একখানি রবীন্দ্রনাথের নাটক অভিনয় করে আসার জন্য। কিন্তু সে ব্যবস্থারও শেষ পর্যন্ত কি হলো তারও কোন খবর নেই, কারণ দিল্লীতে উৎসব উপলক্ষ্যে যে যে ভাষার নাটক অভিনয়ের বিবরণ বিজ্ঞাপিত হয়েছে তার মধ্যে কোন বাঙলা নাটক স্থান পায়নি। ওদিকে গত ২২শে নবেম্বর সাপ্রু হাউসে স্বয়ং রাষ্ট্রপতির সভাপতিত্বে উৎসবের উদ্বোধন সম্পন্ন হয়েছে। উদ্বোধন দিনে অভিনীত হয় কালিদাসের 'শকুন্তলা' মূলে সংস্কৃততেই অভিনয় করেন বম্বের ব্রাহ্মণ সভা। তারপর গত সপ্তাহে আরও তিনখানি নাটক মঞ্চস্থ হয় তিনটি বিভিন্ন ভাষায়। প্রথমে হয় ২৭ তারিখে অসমীয়া ভাষায় 'শোণিত কুমারী'; প্রযোজনা করেন আসাম সঙ্গীত নাটক আকাদেমি। এর পর ২৮ তারিখে মাদ্রাজের শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা এমেচার্স পরিবেশন করেন তামিল ভাষায় 'শিব-কমিইন শপথম'। ২৯ তারিখে হায়দ্রাবাদের আঞ্জুমান তারিখ-ই-উর্দু পরিবেশন করেন 'নই রোশনী'। আরও চারখানি নাটকের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছেঃ ৩রা ডিসেম্বর কটকের জনতা রঙ্গমঞ্চ পরিবেশিত ওড়িয়াতে 'পরকম্ম'; ৪ঠা রয়েছে বম্বের আই এন টি কর্তৃক গুজরাটি ভাষায় 'মাজামবাৎ'; ৫ই বম্বের মারাঠি সাহিত্য সভা কর্তৃক মারাঠিতে 'বহুভণ্ডকী' এবং ৬ তারিখে পুণার মহারাষ্ট্র নাট্য সম্মেলন কর্তৃক আর একখানি মারাঠি নাটক 'শারদা'। এর পর কি হবে না হবে আর কোন বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়নি সে সম্পর্কে। নাট্যোৎসব আরম্ভের পূর্বাহ্ণে প্রকাশিত সরকারি প্রেস নোট থেকে জানা যায় সংস্কৃত, হিন্দী, বাঙলা, অসমীয়া, গুজরাতি, কানাড়ী, উর্দু, মণিপুরি, মারাঠি, ওড়িয়া, তামিল, তেলেগু, মালয়ী এবং পাঞ্জাবী এই চৌদ্দটি ভারতীয় ভাষায় ছাড়া শেষদিনে একখানি ইংরাজি নাটকও পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছে। সব ভাষা মিলিয়ে মোট একুশখানি নাটক মঞ্চস্থ হবে বলে শোনা গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত যে কতদূর কি দাঁড়াবে তার কোন আভাস এখনও পাওয়া যাচ্ছে না।
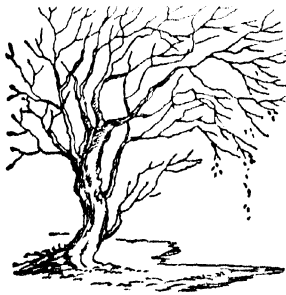
* * *

সঙ্গীত নাটক একাডেমির উদ্যোগে হলেও উৎসব পরিচালনার ভার দিল্লী নাট্য সঙ্ঘের ওপরে তদোপরি উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য জাতীয় নাট্যোৎসব কমিটিও গঠিত হয়েছে যার চেয়ারম্যান তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী শ্রী পি এম লাড। উৎসব উদ্বোধনের

আগের দিন এক সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান যে উৎসবে অভিনীত হবার জন্য মোট ৭১৪টি আবেদন পাওয়া গেছে—যার মধ্যে একা তেলেগু নাটকেরই আবেদন ছিল ২৫২। শ্রী লাড জানান যে সপ্তাহে তিন-চারটি নাটক মঞ্চস্থ হবে এবং উৎসব শেষ হবে ২৫শে ডিসেম্বর। এরই মাঝে ২৮ নবেম্বর থেকে প্রতি রবিবার বসবে নাটকের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা সভা। শ্রেষ্ঠ বলে নির্বাচিত তিনখানি নাটককে পুরস্কৃত করা হবে। টিকিট বিক্রী বাবাদ টাকা থেকে খরচা বাদে যা উদ্বৃত্ত থাকবে তা প্রধানমন্ত্রীর বন্যা সাহায্য ভান্ডারে প্রদান করা হবে। এই প্রসঙ্গে শ্রী লাড স্পষ্ট করেই বলেন প্রতি রাজ্যে একটি করে নির্বাচক মন্ডলী গঠন করে আঞ্চলিক নাট্যোৎসব অনুষ্ঠান দ্বারা কেন্দ্রীয় উৎসবের উপযোগী নাটক নির্বাচন করা হয়। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, অন্তত বাঙলা দেশে কেবলমাত্র নির্বাচকমন্ডলী নিয়োগের কথা কাগজে প্রকাশিত হওয়া ছাড়া নাটক নির্বাচনের জন্য কোন অনুষ্ঠানই হয়নি। হয়তো বাঙলা দেশে নাটক নির্বাচনের জন্য কোন বিশেষ অনুষ্ঠানের দরকার করে না, কারণ এরাজ্যে নাট্যাভিনয় অবিরল লেগেই রয়েছে; বোধহয় পৃথিবীর আর কোন দেশে নাট্যাভিনয়ের এতোটা হিড়িক নেই। কাজেই বাঙলা দেশ থেকে দিল্লীতে পাঠাবার মতো দু'একটি দল মনোনীত করে নেওয়া যায়, যদিও সেটা হয় নেহাৎই অবিচার। হয়তো বহুরূপীর নাম এখানকার নির্বাচকমন্ডলী কর্তৃক ঐরূপে মনোনীত হয়ে দিল্লীতে পেণছেছে। কিন্তু অন্যান্য কোন রাজ্যে নাটক নির্বাচনের জন্য কোন অনুষ্ঠান হওয়ারও তো খবর শোনা যায়নি। মনে হয় সর্ব রাজ্যেই এমনিই স্বেচ্ছা বিচার খাটিয়ে নাটক নির্বাচন করে পাঠানো হয়েছে। সব ব্যাপারটার মধ্যেই কেমন যেন চুপিচুপি ভাব। যার ফলে দিল্লীর বাইরে যারা রয়েছেন তাদের কাছে এই জাতীয় নাট্যোৎসব ওখানকার একটা স্থানীয় ব্যাপারের চেয়ে বেশী কিছু ছাপ ধরিয়ে দিতে পারেনি যদ্যপি উৎসবটি উদ্বোধিত হয় স্বয়ং রাষ্ট্রপতি কর্তৃক। দেশের সাংস্কৃতিক জীবন উন্নয়ন পরিকল্পনার মধ্যে এই নাট্যোৎসবটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু উদ্যোক্তাদেরও ধারণা তাই বলে মনে করা যাচ্ছে না। যদি হতো তাহলে একটা মহান সাংস্কৃতিক আন্দোলনের এই সূচনাকে তারা কেবলমাত্র দিল্লীর আবেষ্টনীর মধ্যেই নিঃসাড়ে সম্পন্ন করতে চাইতেন না।

"জয়দেব" জীবনীচিত্র নয়

বরাবরই দেখা যাচ্ছে যে ভক্তিপ্রবণ কোন চরিত্রকে নিয়ে ছবি তুলতে গেলে তাকে ঘিরে নানা অলৌকিক ঘটনার অবতারণা এবং শেষপর্যন্ত তাকেও অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক দেবজনরূপে হাজির না করে চিত্রনির্মাতারা পারেন না। বাস্তব ইতিহাসেরই মানুষ, মাত্র কয়েকশত বৎসর আগেকার ঘটনা এবং খ'ুজলে যার অনেক স্মারক এখনও পাওয়া অসম্ভব নয় এমন একজন মানুষ অনন্যসাধারণ প্রকৃতির বা অবতার শ্রেণীর ছিলেন বলেই তাকে ঐন্দ্রজালিকের মতো ক্ষমতার অধিকারী বলে দেখাতেই হবে এর ব্যতিক্রমের কথা আমাদের চিত্রনির্মাতারা কল্পনায়ও ঠাঁই দিতে চান না। কোন এক ব্যক্তিত্বের ওপরে মানুষের মনকে শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে আপ্লুত করে তোলার জন্য সেই ব্যক্তিকে নিয়ে এমন সব কিছুর অবতারণার দরকার হয় যা বিশ্বাসের ধাপকে ছাপিয়ে অতীন্দ্রিয়ের পর্যায়ে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু তাই বলে বিশ্বাসকে আহত করার মতো কিছু থাকা বাঞ্ছনীয় নয়, অথচ এইটেই ঘটে আমাদের ছবিতে। এমন সব কান্ড দেখানো হয় যা ভোজবাজির উদ্ভট ব্যাপার বলে মনে হয়, ফলে চিত্রে রূপায়িত মহাপুরুষকে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এক মানবোত্তর অবতাররূপেই লোকে গ্রহণ করে, যে পর্যায়ে পেণছবার কথা মানুষের কল্পনাতীত, এবং মানব হিসেবে গ্রহণ করা সম্ভব হয়না বলেই সেই মহাপুরুষের মানবিক আদর্শ কোন আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না। অবিশ্বাস্যকে দেখার বিস্ময় অথবা বিদ্রূপই শুধু সঞ্চারিত হয়।

* * *

ভক্তিমূলক ছবি তোলা থেকে আমেরিকার মতো দেশ সরে থাকতে পারেনি। ওদের কাছ থেকেও পাওয়া গিয়েছে 'সঙ অফ বার্নাডেট' বা 'দি মিরাকল অফ আওয়ার লেডি অফ ফাতিমা'-র মতো ছবি। এ ছবিগুলিরও মূলে ঐতিহাসিক

বাস্তব এবং ভক্তিমূলক ঘটনা, কিন্তু দর্শক-মনে ভক্তি সঞ্চারিত করার জন্য কল্পনার আশ্রয় নেওয়া হলেও কোন ভোজবাজির অবতারণা করা হয়নি। ফলে দুটি ক্ষেত্রেই বালিকাদুটি সরল বিশ্বাস ও ভক্তির যে আদর্শ তুলে ধরেছে তা চট করেই লোকের মনকে প্রভাবিত করে তোলে। বাস্তব বহির্ভূত ঘটনা বলে মনে করা সহজ হয় না। জয়দেবও ঐতিহাসিক বাস্তব চরিত্র; কিন্তু ঐশ্বরিক ক্ষমতাসম্পন্ন মর্ত্য-বাসী দেবতার চেয়ে তার মানবরূপী মহা-পুরুষের চেহারাটাই মনকে বেশী করে প্রভাবিত করার সম্ভাবনা। অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন সম্প্রতি যে ছবিখানি পরি-বেশন করেছেন এইদিক থেকেই তার যা খামতি ঘটে গিয়েছে।

* * *

অরোরার 'জয়দেব' অনেকাংশেই কল্পনা আশ্রিত চরিত্র। এর আখ্যান-বস্তুটি অবলম্বন করা হয়েছে 'হরিপদ চট্টোপাধ্যায়ের বিপুল জনপ্রিয় নাটকখানি থেকে। এ জয়দেব প্রায় অবতারের অংশ স্বরূপ। গীত-গোবিন্দ রচনার ভূমিকা থেকে ওড়িয়্যারাজের হাতে তা সমর্পণ করে বৃন্দাবন যাত্রা পর্যন্ত কাহিনী। কাহিনী কল্পিত হলেও ছবির চেহারায় ইতিহাসের মিল এনে দিতে পারলেও বাস্তবতার কাছ ঘেঁষে যেতো, কিন্তু লোকের মনে রয়েছে জয়দেব ঐতিহাসিক সত্য বাস্তবের মানুষ বলে অথচ কার্যকলাপে অলৌকিকত্ব. এই বিপরীত ব্যাপারটাই চরিত্রটিকে মনেপ্রাণে স্বীকার করে নেওয়ার অন্তরায় হয়েছে। তা নয়তো অনেক গুণ রয়েছে ছবিখানির। তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে গীত-গোবিন্দের গানগুলি। সেই 'ক্ষিতিরতিবিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে', সেই 'তব কর কমল বরে নখমদ্ভুত শৃঙ্গম', 'ললিতলবঙ্গলতা', 'চন্দনচর্চিত নীলকলেবর পীতবসন বনমালী', 'নিভৃত নিকুঞ্জ গৃহং গাওয়া নিশি রহসি নিলীয় বসন্তং', কিংবা 'রতিসুখ-সারে গতমভিসারে' বা 'বদসি যদি কিঞ্চিদপি দন্তরুচি কৌমুদী', 'যদি হরি স্মরণে সরসংমনো', 'দেহি পদপল্লব মুদারম' প্রভৃতি গানগুলি মনকে বেশ রসাপ্লুত করে তোলে। তাছাড়া মূল নাটকের অন্তর্গত, বালক কৃষ্ণের মুখ-নিসৃত 'কার তরে তুই কাঁদিস মাসী', 'আমার রাধা নামের সাধা বাঁশী', 'আমায় কি দিয়ে সাজাবি মা', 'বামে লয়ে রাই কিশোরী', 'এই বলে নূপুর বাজে' প্রভৃতি একদা সমগ্র বাংলার অতি প্রিয় গানগুলিও নতুনভাবে জনপ্রিয়তা অর্জনের মতো মিষ্টতা নিয়ে সমুপস্থিত হয়েছে ছবি খানিতে। কোন কোন গানে সুরের মুখটু কিছু কিছু পরিবর্তিত হয়েছে, কোথাও নতুন করে অলঙ্কার যোগ করে নেওয়া হয়েছে তৎসত্ত্বেও কিন্তু প্রফুল্লতা অর্জনে ঘাটতি পড়ে না। গানই ছবিখানির প্রধান সম্পদ এবং এমনভাবে তা প্রযুক্ত যে ছবি খানিকে জয়দেবের নামে না হয়ে 'গীত-গোবিন্দ' বলে উল্লেখিত হওয়াই উচিত ছিল বলে মনে হয়।

* * *

অজয়ে স্নান করতে গিয়ে জলগর্ভ থেকে রাধামাধবের যুগল মূর্তি প্রাপ্তি থেকে গল্পের শুরু। গ্রামের শাক্ত ও শৈবরা ঘটনাটা জয়দেবের একটা কারসাজী বলে ধরে নিলে। মন্দির প্রতিষ্ঠার দিন জয়দেবের পিতা মারা গেলেন। শাক্ত ও শৈবদের প্ররোচনায় মহাজন নিরঞ্জন দত্ত এসে জয়দেবকে দিয়ে পাওনার দায়ে ভিটেটা লিখিয়ে নিলে। সেই মুহূর্তে নিরঞ্জনের গৃহে আগুন লাগলো। জয়দেব লেলিহান শিখা অগ্রাহ্য করে আগুনের মধ্যে ঢুকে নিরঞ্জনের কন্যাকে বের করে নিয়ে এলো। নিরঞ্জন অভিভূত হয়ে জয়দেবের অনুরক্ত হলো। পরাশরের আগ্রহে জয়দেব গীত-গোবিন্দ রচনায় নিমগ্ন। একদিন শৈব ও শাক্তের দল জয়দেবকে মারধোর করে রাধামাধবের মূর্তি ফেলে দিলে অজয়ের জলে। আত্মহারা জয়দেবকে পথের সন্ধান দিলে হঠাৎ আবির্ভূত বালকবেশী শ্রীকৃষ্ণ। গীত-গোবিন্দের পুঁথি বুকে করে নিয়ে জয়দেব চললো পুরীর দিকে। ভৃত্য দিগম্বর ও বন্ধু পরাশরও চললো নিরুদ্দিষ্ট জয়দেবের সন্ধানে।

* * *

পুরীতে জয়দেব যখন পৌঁছলো তখন মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ হচ্ছে। পান্ডারা জয়দেবকে কিছুতেই জগন্নাথ দর্শন করতে দিলে না। জয়দেবের আকুল আকুতির প্রত্যুত্তরে পান্ডারা তাকে বেত্রাঘাত করলে। সেই বেত্রাঘাতের দাগ বসলো জগন্নাথ মূর্তির সর্বাঙ্গে। সেই সময়ে মন্দিরের দ্বার খুলে বেরিয়ে আসছিল রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ অন্তে পদ্মাবতী ও তার পিতা সুদেব। পদ্মাবতীর জন্মকালে সুদেব তাকে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে দেবদাসী ক

বার মানৎ করেছিল, সেই সূত্রেই রাজ-র্শনে আসা ওদের। আহত জয়দেবের ভিলাষের কথা শুনে পদ্মাবতী তাকে লে ধরে জগন্নাথ দর্শন করালে এবং রপর মূর্ছিত ও আহত জয়দেবকে হে নিয়ে গিয়ে শুশ্রূষা করতে লাগলো। স্থ হয়ে জয়দেব পদ্মাবতীকে দেখে ধ হলো। তার গীত-গোবিন্দ রচনা র হয় না। আত্মগ্লানিতে জয়দেব মুদ্রে গীত-গোবিন্দ ভাসিয়ে দিলে কিন্তু লকবেশী কৃষ্ণ জলগর্ভ থেকে গীত-গোবিন্দ তুলে এনে জয়দেবের হাতে রিয়ে দিলে। ওদিকে পদ্মাবতীকে ন্দিরে নিয়ে রেখে আসতে গিয়ে সুদেব ত্যাদেশ পেলো পদ্মাবতীকে জয়দেবের তে সমর্পণ করার। পদ্মাবতীকে বিবাহ রে জয়দেব গ্রামে ফিরলো।

* * *

জয়দেব বিরোধীরা তখন ধ্বংস হতে বসেছে। ভৈরবাচার্যের কুষ্ঠদশা; পঙ্গু। জয়দেবের গীত-গোবিন্দ রচনা চললো নতুন উদ্যমে। একদিন কিছুতেই আর পাদপূরণ হয় না। জয়দেব চিন্তা করতে করতে স্নানে চলে গেলো। সেই ফাঁকে বালক কৃষ্ণ জয়দেবের রূপ ধারণ করে পুঁথিতে অসমাপ্ত পদটি লিখে রেখে এলো। ফিরে এসে জয়দেব শ্রীকৃষ্ণের এই চাতুরী বুঝতে পারলো। শ্রীকৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট ভক্ষ্য নিয়ে সে গ্রামে বিতরণ করলে। তারই কিছু খেতেই ভৈরবাচার্যের কুষ্ঠ সঙ্গে সঙ্গে নিরাময় হলো। গীত-গোবিন্দের গান তখন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। লক্ষণ সেন চাইলেন জয়দেবকে সভাকবি করে রাখতে। লক্ষণ সেন রানী তন্দ্রাকে নিয়ে নিজে এলেন জয়দেবকে আমন্ত্রণ জানাতে। জয়দেব প্রথমে সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করলে, কিন্তু অতিথি নারায়ণের অপমানের আশঙ্কায় পদ্মাবতীর কথায় জয়দেব রাজসভায় উপস্থিত হলো। রাজ-মন্ত্রী কিন্তু বিপক্ষে গেলেন। জয়দেবের কাব্যের মধ্যে তিনি পেলেন শুধু আদি রস এবং তাঁর মতে জয়দেবের গান দেশের নৈতিক চরিত্র নষ্ট করে দিচ্ছে। জয়দেবকে তাই পরাস্ত করার জন্য আনা হলো ভারতবিজয়ী গায়ক বুঢ়ন মিশ্রকে। বুঢ়ন তার গানে গাছের পাতা ঝরিয়ে দিলে। জয়দেব দেখালে তার চেয়েও অলৌকিক কান্ড; ঝরা পাতা আবার সে গাছে ফিরিয়ে দিয়ে বুঢ়নকে পরাস্ত করলে। এরপর জয়দেব আর লক্ষণাবতীতে থাকতে চাইলে না। বৃন্দাবনের ডাক তার কানে এসেছে। সে সময়ে উড়িষ্যার রাজা জগন্নাথের প্রত্যাদেশ পেয়ে গীত-গোবিন্দ নিয়ে যাবার জন্য এসে উপস্থিত হল। জয়দেব গীত-গোবিন্দ সমর্পণ করে বৃন্দাবন যাত্রা করলে।

* * *

চিত্রনাট্যে নাটকটাই রেখে দেওয়া হয়েছে প্রায় যথাযথ, তার সঙ্গে অতিরিক্ত কিছু যোগ করা হয়েছে। ইতিহাসের সঙ্গে যোগ রাখার যথেষ্ট সুযোগ ছিল, অন্তত আভরণের দিক থেকে। কিন্তু ওদিকটা প্রায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত; কালের ছাপ ওতে পাওয়া যায় না। তবুও লোকের আবেগকে স্পর্শ করার মতো জোর কাহিনীর বিন্যাস মাঝে মাঝে বেশ অনুভব করা যায়। আরম্ভেই প্রেম ও ভক্তি-পাগল জয়দেবের ওপর শাক্ত ও শৈবদের উৎপীড়ন নিয়ে, কাজেই দর্শক-মনও স্বতঃই জয়দেবের পক্ষ গ্রহণ করে নেয়। তারপর হাল্কাভাবে হলেও পরাশর পত্নী মুখরা বিমলার মধ্যে দিয়ে প্রচ্ছন্ন-ভাবে পতিগতপ্রাণার যে চরিত্র হাজির করা হয়েছে, তাও দর্শক-মন চট করে গ্রহণ করে নেবে। বিমলাকে নিয়ে বালকবেশী কৃষ্ণের ছল-চাতুরিও কম উপভোগ্য নয়। পদ্মাবতীকে দেখার পর জয়দেবের প্রণয়ের দিকও আছে। আর রয়েছে পরাশরের বন্ধুপ্রীতি; দিগম্বর গোয়ালার প্রভুভক্তি; জয়দেবের প্রতি জগন্নাথ দেবের মমতা; মহাজন নিরঞ্জন দত্তের কন্যাকে আগুনের ভিতর থেকে উদ্ধার এবং ভৈরবাচার্যকে কুষ্ঠ থেকে নিরাময় করে শত্রুর প্রতি বদান্যতা প্রদর্শন; স্বামীর অপমান অসহ্য হওয়ায় পদ্মাবতীর ছুটে যাওয়া বুড়ন মিশ্রের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে; পরে গানের মধ্য দিয়ে বুড়ন মিশ্রের সঙ্গে জয়দেবের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রভৃতি যে ধরনের ঘটনা লোকের সহজ মনকে তা বশীভূত করে তোলে, তেমনি ঘটনার যথেষ্ট সমাবেশ আছে ছবিখানিতে। সব ঘটনাই অবশ্য সুষ্ঠু এবং নাটকীয়ভাবে পরিবেশিত হয়নি; পরিচালনায়ও মুগ্ধ হবার মতো কৃতিত্বেরও পরিচয় কিছু নেই। এবং আঙ্গিকের মধ্যেও যথাযথ পারিপাট্য ফোটেনি। কিন্তু সমগ্রভাবে ছবিখানি কোন দর্শককেই অখুশী করবে তো না-ই, বরং গান আর সেই সঙ্গে কয়েকটি চরিত্রের অভিনয় খানিকটা তৃপ্তি উপ-ভোগেরই সুযোগ দেবে। অসিতবরণ, রবীন মজুমদার, নচিকেতা ঘোষ, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, উৎপলা সেন, গায়ত্রী বসু, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি মিষ্টি গলার গাইয়েদের দিয়ে গানগুলি গাওয়ানোতে ছবির সম্পদই গড়ে উঠেছে। অসিতবরণকে ইদানীং বড়ো একটা ছবিতে কেউ গাওয়ায় না, অথচ ছবিতে ওর আগমন গানের জন্যেই এবং তাতে ওর জনপ্রিয়তাও আছে। জয়দেবের নাম ভূমিকায় অভিনয়ের সঙ্গে ভাবগম্ভীর ওর গানগুলি চরিত্রটিকে ভালো ফুটিয়ে তুলেছে। রবীন মজুমদার নেমেছেন পরাশরের চরিত্রে; গানও গেয়ে-ছেন। অভিনয়ে স্ত্রী বিমলার চরিত্রে অনুভা গুপ্তার পাশে পড়ায় নিষ্প্রভ হয়ে পড়লেও গানের দিক থেকে রবীন তাঁর পুরনো খ্যাতির অনেকখানি কাছাকাছি এসে পড়েছেন। অনুভার অভিনয়কে "কবি"র সেই ঠাকুরঝির পর সবচেয়ে মনোজ্ঞ কৃতিত্ব বলে অনায়াসেই আখ্যাত করা যায় এবং এ ছবিতে তার অভিনয়ই শ্রেষ্ঠ। অতঃপর 'ঠাকুরঝি'র বদলে তার "বিমলি বামুনি"র খ্যাতি ছড়িয়ে পড়া অস্বাভাবিক হবে না। বালক কৃষ্ণের চরিত্রে চাতুরির খেলায় শ্রীমান বিভুকে আদর করতে ইচ্ছে করবে। আরো কয়েকটি ভালো অভিনয় পাওয়া যায়। তার মধ্যে ভৈরবাচার্যের চরিত্রে বিজয় বসু ও ভৃত্য দিগম্বরের চরিত্রে তুলসী চক্রবর্তীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। পদ্মাবতীর চরিত্রটিই হয়েছে নির্জীব: দেবযানীকে দেখিয়েছে ভালো, তাছাড়া আর কিছু নয়। কেমন একটা নিস্পৃহ ভাব ওর চাল-চলন কথাবার্তা নাচ সবতাতেই। বিকাশ রায়কে লক্ষ্মণ সেনের চরিত্রে খাপ খায়নি। পুরী মন্দিরের দুই শাস্ত্রীর চরিত্রে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্যাম লাহা এবং এক চটিওয়ালার চরিত্রে জহর রায় ক্ষণিকের জন্য হাসির রোল তুলে যান। আর অভিনয়ে আছেন পাহাড়ী সান্যাল, হরি-ধন, সন্তোষ সিংহ, শশাঙ্ক সোম, শিশির মিত্র, জয়নারায়ণ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, পদ্মা দেবী, রমা দেবী, শ্যামলী চক্রবর্তী প্রভৃতি।

* * *

আঙ্গিক পারিপাট্যের দিক থেকে দেখাবার অনেক সুযোগ ছিল, সে জায়গায় সাধারণ পর্যায়ের বেশী কিছু হয়নি। ক্যামেরার কৌশলী কাজ আছে: ত্রুটি-বিচ্যুতিও চোখে পড়বে। বেশ ভালো কাজ হয়েছে শব্দ গ্রহণের। সঙ্গীতের দিকটায় গান ছাড়া আবহ সঙ্গীতে বিশেষ করে টাইটেলভাগে বেশ কৃতিত্ব পাওয়া যায়। ছবিখানির সংগঠনকারিবৃন্দ হচ্ছেন চিত্র-নাট্য রচনায় মণি বর্মা; পরিচালনায় ফণী বর্মা; আলোকচিত্র গ্রহণে বঙ্কু রায়; শব্দ গ্রহণে সমর বসু; সঙ্গীত পরিচালনায় নচিকেতা ঘোষ এবং শিল্প-নির্দেশে সত্যেন রায় চৌধুরী।

যদু ভট্ট

বাংলার বাহিরে প্রথম দিগ্বিজয়ী বাঙ্গালী গায়ক ও গীতকার

অসাধারণ প্রতিভা ও ধীশক্তিসম্পন্ন ভারত জয়ী গায়ক ও সংগীত রচয়িতা শ্রুতিধর যদু ভট্টের কথা খুব কম বাঙালী, এমন কি সংগীতানুরাগী বাঙালীদের মধ্যেও খুব কম লোকেই জানেন। অথচ তাঁর অভ্যুদয় মাত্র একশো বছরও পার হয়নি।

যদু ভট্ট ছিলেন বিষ্ণুপুর নিবাসী শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্যের পুত্র। আসল নাম শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য, কিন্তু পশ্চিমের লোকের মুখে তাঁর নাম 'যদু ভট' রূপ ধারণ করে এবং এই নামেই তিনি প্রসিদ্ধি লাভ করেন। নিজের দেশের চেয়ে পশ্চিমেই যদু ভটের নাম বেশী প্রচলিত ও আদৃত।

যদু ভটের জীবনীর সংগে বিষ্ণুপুর ঘরাণা সংগীতের পরিচয় অংগাংগীভাবেই জড়িত। কর্ণাটী সংগীত ও উত্তর ভারতের উচ্চাংগ হিন্দুস্থানী সংগীতের সংমিশ্রনে উদ্ভূত এই ঘরাণা। মোঘল-পাঠানের সময় থেকে ইংরেজ রাজত্বের প্রাক্কাল পর্যন্ত বিষ্ণুপুর ভারতের অন্যতম স্বাধীন রাজ্য হিসেবে উচ্চাংগ হিন্দুস্থানী সংগীতের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। মিঞা তানসেনের বংশজাত (পৌত্রের পুত্র) বাহাদুর খাঁ একাদিক্রমে ৩০ বৎসর বিষ্ণুপুর রাজ-দরবারে ছিলেন। তাঁর প্রধান শিষ্য ছিলেন শ্রীগদাধর চক্রবর্তী। গদাধর চক্রবর্তীর প্রধান শিষ্য বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত জমিদার রামশংকর ভট্টাচার্য। এই রামশঙ্করেরই প্রধান শিষ্য ছিলেন যদু ভট্ট, ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী (যিনি মহারাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুরের উৎসাহে ভারতে প্রথম স্বরলিপি প্রস্তুত করেন) এবং অনংগলাল বন্দ্যো-পাধ্যায় (সংগীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যো-পাধ্যায়ের পিতা)।

যদু ভট্টই প্রথম বাংগালী যিনি ঊনবিংশ শতকের মধ্যভাগে তাঁর জীবনের স্বল্প-পরিসর ৪০ বৎসর বয়সের মধ্যে ভারতের উচ্চাংগ সংগীতের আসরে বাংগলার সম্মানের আসন প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছেন। এর জন্যে দিল্লী, লাহোর, গোয়ালিয়র, আগ্রা, কাশী, পঞ্চকোট থেকে ত্রিপুরার রাজদরবার পর্যন্ত প্রতি সংগীত আসরে অতীব প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে তাঁকে ক্রমাগত সংগ্রাম করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে হয়েছিল। আজো সেখানকার গায়ক-সম্প্রদায় তাঁর নাম স্মরণ করেন। তাঁর অদম্য প্রতিভার সমাদরও যা পেয়ে-ছিলেন তা বোধহয় আজ পর্যন্ত খুব অল্পের ভাগ্যেই সম্ভব হয়েছে। ত্রিপুরারাজ তাঁকে 'রঙ্গনাথ' উপাধিতে ভূষিত করেন, পঞ্চকোটের রাজা বাহাদুর তাঁকে দেন 'তানরাজ' উপাধি, কাশীর মহাসংগীত সম্মেলনে তিনি অর্জন করেন 'সুর-সাগর' ও 'সংগীত রত্নাকর' রূপে স্বীকৃতি। সেদিনের শ্রেষ্ঠ 'রবাবী', ত্রিপুরা রাজ দরবারের কাশেম আলি পরাস্ত হয়েও বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে বলে ওঠেন—"তুমি যদু নও, যাদু!"

তৎকালে রাজশক্তি দীর্ঘদিন দিল্লীতে প্রতিষ্ঠিত থাকায় দিল্লীওয়ালাদের হাতের ছাপ যাদের ছিলনা বা যারা উর্দু হিন্দীতে কথা বলতো না, শিল্প সাহিত্য সংগীতের আসরে তারা ছিল অপাংক্তেয়। বাংগালী বলে ওস্তাদেরা যদু ভটকে গান শেখাতে অস্বীকার করেছেন, আসর থেকে উঠিয়ে দিয়েছেন। চুরি করে তাঁকে তাদের বিদ্যা আয়ত্ত করতে হয়েছে। তবু নিজ সংকল্পে অটল, ভগবান দত্ত আশীর্বাদে বলীয়ান, শ্রুতিধর যদু ভট্ট উচ্চাংগ দক্ষিণী হিন্দু-স্থানী সংগীতে নিজের অনস্বীকার্য শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করে বাংগলাকেও যে গৌরব এনে দিয়েছেন—আজকের দিনে ত বহুধা স্মরণীয়।

যদু ভটের জীবনের একটি অতি মরমী দিকও আছে। এই দিগ্বিজয়ী জীবনের প্রেরণাও বোধ হয় নিহিত তাতে। বাল্যে তাঁর গুরুর সংগে একবার তিনি গিয়েছিলেন কাশীর মহাসংগীত সম্মেলনে। সেখানে শুধু বাংগালী বলেই তাঁদের নিগৃহীত, লাঞ্ছিত, বিতাড়িত হতে হয়। যদু ভটের জীবনে এ ঘটনা এক গভীর ক্ষতের সৃষ্টি করে। গংগাজলে দাঁড়িয়ে তিনি গুরুর পা ছুঁয়ে শপথ করেন—নিজগুণে ভারতের সংগীত সমাজে বাংলার আসন সুপ্রতিষ্ঠিত করে তিনি একদিন এর প্রতিশোধ নেবেন। সেইদিন থেকেই সুরু হয় তাঁর অস্থির দুঃসাহসী পরিক্রমা।

আর যেটি যদু ভটের জীবনের গতি নিয়ন্ত্রিত করেছিল,—তার প্রকৃতি। তিনি শুধু অনন্যকুশলী গায়কই ছিলেন না—ছিলেন অতি উচ্চাংগের সংগীত রচয়িতা। মুখে মুখে সুললিত গান রচনা করায় অসম্ভব দক্ষতা ছিল তাঁর। ভাবুক কবি, বিশ্বপ্রকৃতির দরদী পূজারীর সে গান রবীন্দ্রনাথের প্রতিভাকেও প্রভাবান্বিত করেছিল। যদু ভটের এই ভাব জীবনের প্রেরণা জুগিয়েছিল এক দেওয়ানী নারী। ঝিন্নন বাই বলে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রাণহীন, যান্ত্রিক কুশলতায় সংগীতের সমাপ্তি নয়, ভাবরাজোই তার চরম বিকাশ —এ দীক্ষা যদু পেয়েছিলেন এই ঝিন্নন-এর কাছেই। এখানে ঝিন্নন ছিল তার একক গুরু।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনে গানের গুরু ছিলেন যদু ভট্ট। কবিগুরু নিজেই বলেছেন "তাঁর কাছে যে মল্লার শিখেছিলাম তা আমার সমস্ত বর্ষার কবিতাকে আপ্লুত ও স্পন্দিত করেছে।" আর একজন সুবিখ্যাত লোক যাঁকে যদু ভট গান শিখিয়েছিলেন—তিনি শ্রীরাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী। শিষ্য দিয়ে যদি গুরুর পরিচয় হয় তবে যদু ভট শুধু অসাধারণ নন—অনন্যসাধারণ।

একলব্য

'ব্রিসবেনের' প্রথম টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়ার হাতে ইংলন্ডের এক ইনিংস ও ১৫৪ রানে পরাজয়ের ঘটনা টেস্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে। কোন কোন ইংরেজ ক্রিকেট সমালোচক ইংলন্ডের এই পরাজয়কে 'ব্রিসবেনের হত্যাকান্ড' নামে অভিহিত করেছেন এবং টসে জয়লাভ করেও হাটনের প্রথম ব্যাটিং না করবার সিদ্ধান্তকে বলেছেন 'ক্রিকেট খেলায়

আর্থার মরিস আয়ান জনসন

শতাব্দীর সবচেয়ে ক্ষতিকর ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত।' বস্তুতপক্ষে এই টেস্ট খেলা নিয়ে ইংলন্ডের ধুরন্ধর অধিনায়ক হাটনকে যেমন বিরুদ্ধ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে, টেস্ট খেলার ইতিহাসে কোন দেশের কোন অধিনায়ককে এরূপ বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে কি না সন্দেহ। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ক্রিকেট সমালোচকদের মতামত পরে প্রকাশ করবার ইচ্ছে রইলো। তবে সাদা চোখে এবং খেলার বিবরণ থেকে যেটুকু বোঝা গেছে, তাতে মনে হয় হাটনের স্পিন বোলার বাদ দিয়ে দল গঠন করা এবং টসে জিতেও প্রথম ব্যাট না করবার ভুল সিদ্ধান্তই ইংলন্ডের পরাজয়ের সবটুকু কারণ নয়। ভাগ্যদেবীর অদৃশ্য হাত অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের পথও কম সুগম করেনি।

* * *

বর্তমানে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উইকেট কিপার গডফ্রে ইভান্স হলেন অসুস্থ। বিশ্বের অন্যতম ধুরন্ধর খেলোয়াড় ডেনিস কম্পটন—এক মরসুমে যার রানের সংখ্যা আজ পর্যন্ত কেউ অতিক্রম করতে পারেনি, সেই কম্পটন প্রথম দিনের খেলায় হাতে চোট পেয়ে মাঠ ছেড়ে হলেন প্যাভিলিয়নবাসী। বিশ্ববন্দিত হাটন,—টেস্ট খেলায় ব্যক্তিগত রানের কৃতিত্বের তালিকায় যাঁর নাম ব্রাডম্যানেরও উপরে, তিনি দুই ইনিংসেই ব্যর্থতার পরিচয় দিলেন। টেস্ট খেলার বোলিং এভারেজে এখনো যিনি রেকর্ডের অধিকারী, সেই বেডসারের বোলিংও তেমন কার্যকরী হল না। সবই ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাস। তারপর একটি ইনিংসে দশটি ক্যাচ ফেলার ঘটনা ইতিপূর্বে টেস্ট খেলায় প্রত্যক্ষ করা গেছে কি না সন্দেহ। ইংলন্ডের সঙ্গীন অবস্থায় পর্জন্যদেবও অশ্রু সম্বরণ করতে পারলেন না। অশ্রুধারায় ভিজিয়ে দিলেন পঞ্চম দিনের ব্রিসবেন মাঠ। ইংলন্ডের পরাজয় আরও ত্বরান্বিত হল। হাটনের হঠকারিতা আর অদৃষ্টের অদৃশ্য হাত,—দুইয়ে মিলে ইংলন্ডের পরাজয়কে সহজ করে তুললো। পাঁচটি টেস্টের প্রথম লড়াইয়ে অস্ট্রেলিয়া
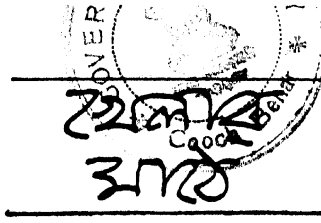
অস্ট্রেলিয়ার চৌখস খেলোয়াড় কিথ মিলারের বল করবার ভঙ্গি

এগিয়ে রইলো। দুই দলে যাঁরা অংশ গ্রহ[ণ] করেছিলেন, তাঁদের নাম ও টেস্টের সংক্ষি[প্ত] স্কোর বোর্ড নীচে দেওয়া হল :—

অস্ট্রেলিয়া—এল ফেভেল, আর্থার মরিস, কিথ মিলার, নীল হার্ভে, জি হোল, আ[র] বিনাউড, কে আর্চার, রে লিন্ডওয়াল, [জি] ল্যাংলে (উইকেট কিপার), আয়ান জনস[ন] (অধিনায়ক) ও জনস্টন।
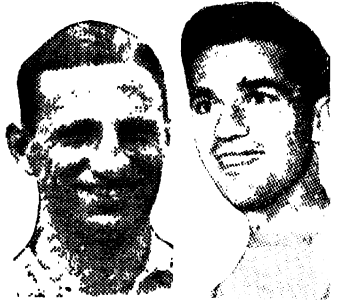
লেন হাটন নীল হার্ভে

ইংলন্ড—লেন হাটন (অধিনায়ক), আ[র] সিম্পসন, ডবলিউ এডরিচ, পিটার মে, এ[ম] কাউড্রে, টি বেলী, এফ টাইসন, এলে[ক] বেডসার, কে এন্ড্রু (উইকেট কিপার), স্ট্যাথাম ও ডেনিস কম্পটন।

স্কোর-বোর্ড

অস্ট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস—(৮ উইঃ ডি[ক্লেঃ]) ৬০১ (নীল হার্ভে ১৬২, আর্থার মরি[স] ১৫৩, রে লিন্ডওয়াল ৬৪, জি হোল ৫৭, কিথ মিলার ৪৯, আর বিনাউড ৩৪, আয়া[ন] জনসন নট আউট ২৪; বেলী ১৪০ রা[নে] ৩ উইঃ, স্ট্যাথাম ১২৩ রানে ২ উইকেট)

ইংলন্ড—প্রথম ইনিংস—১৯০ (ট্রেভ[র] বেলী ৮৮, এম কাউড্রে ৪০; লিন্ডওয়া[ল] ২৭ রানে ৩ উইঃ, আয়ান জনসন ৪৬ রানে ৩ উইঃ, জনস্টন ৪৭ রানে ২ উইকেট)

ইংলন্ড — দ্বিতীয় ইনিংস — ২৫[৭] (এডরিচ ৮৮, পিটার মে ৪৪, টাইসন নঃ আ[উট] ৩৭, বেলী ২৩; বিনাউড ৪৩ রানে ৩ উই[ঃ], জনসন ৩৮ রানে ২ উইঃ, লিন্ডওয়াল ৫[০] রানে ২ উইঃ)

* * *

কলকাতায় সুইডিস দলের প্রদর্শ[নী] ফুটবল খেলার দিন সমাগত। ডিসেম্ব[র] মাসের ৬ থেকে ১০ তারিখের ম[ধ্যে] ক্যালকাটা ফুটবল ক্লাব মাঠে সুইডিস টী[ম] তিনটি প্রদর্শনী খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর[বে] বলে ঠিক আছে। আই এফ এর অন্তর্ভু[ক্ত] ক্লাবকে এই খেলা দেখবার টিকিট সং[গ্রহ] করবার জন্যও বিজ্ঞপ্তি প্রচার করা হয়ে[ছে]। কিন্তু এখন পর্যন্ত সুইডিস টীমের প্র[...]

সুইডেনের আলমান্না ইদ্রটস ক্লুবেন-এর খেলোয়াড়গণ। ডিসেম্বর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সুইডিস টীমকে কলকাতায় তিনটি প্রদর্শনী ফুটবল খেলায় অংশ গ্রহণ করতে দেখা যাবে

দ্বন্দ্বী দলের নামকরণ বা খেলোয়াড় নির্বাচন পর্ব শেষ হয়নি। যতদূর জানা গেছে, সুইডিস দলকে তিনটি খেলার মধ্যে একটি খেলায় মোহনবাগান ক্লাবের সঙ্গে এবং অপর দু'টি খেলায় এ আই এফ এফ দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। চতুর্দলীয় ফুটবলে ভারতীয় দলের অনুশীলনের সুযোগের জন্যই এই ব্যবস্থা। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতাঃ যুযুৎসবা-র মত কলকাতার ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের খেলোয়াড়কুল সমবেত হয়েছেন। এখন যুদ্ধের যা দেরি। সুইডিস টীমের খেলার পরই আরম্ভ হচ্ছে চতুর্দলীয় ফুটবল। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-দ্বন্দ্বের পর এশিয়াটিক ক্রীড়াযুদ্ধ। এশিয়ান চতুর্দলীয় ফুটবলে ভারত, ব্রহ্ম, সিংহল ও পাকিস্থান পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সুতরাং ক্রিকেটের পরিবর্তে অসময়ের ফুটবলই এবার কলকাতার শীতকালীন ক্রীড়া আসরকে সরগরম করে তুলবে। এর সঙ্গে অবশ্য শীতকালীন খেলাধুলার অন্যান্য ক্রীড়ানুষ্ঠানও বাদ যাবে না। ফুটবলের সঙ্গে সঙ্গে ময়দানের এক প্রান্তে আরম্ভ হচ্ছে জাতীয় বাস্কেটবলের মহানুষ্ঠান। তারপর আছে জাতীয় টেনিস, ইস্ট ইণ্ডিয়া ব্যাড-মিণ্টন, গলফ, বিলিয়ার্ড প্রভৃতি খেলাধুলা। তাই সমগ্র ডিসেম্বর মাসটা ক্রীড়ামোদী তথা ক্রীড়া সাংবাদিকদের থাকতে হবে কর্মব্যস্ত।

* * *

কলকাতায় সুইডিস টীমের ফুটবল খেলা কোন নূতন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বে ১৯৪৯ সালে সুইডেনের হেলসিংবর্গ ক্লাব এবং ১৯৫১ সালে সুইডেনের গোটেবর্গ ক্লাব কলকাতায় কয়েকটি প্রদর্শনী ম্যাচ খেলে গেছে। সুইডেন থেকে এবার যে দলটি খেলতে আসছে, এদের নাম 'আলমান্না ইদরটস ক্লাবেন' (Allmanna Idrotts Klubben)। সংক্ষেপে A. I. K.। আলমান্না ক্লাব সম্বন্ধে যে খবর পাওয়া গেছে, তাতে জানা যায়, আলমান্না ক্লাব সুইডেনের প্রথমস্থানীয় ক্লাবগুলির অন্যতম। ১৮৯১ সালে রাজধানী স্টকহলমে ক্লাবের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সুইডিস ফুটবলে আলমান্না ক্লাব ৮বার চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছে। সুইডিস লীগে এবছর তারা দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী ছিল, লীগ শেষ হবার সময় চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছে কিনা জানা যায়নি। হলুদ রংয়ের কলার যুক্ত কালো জার্সি এবং শাদা প্যাণ্ট আলমান্না ক্লাবের খেলোয়াড়দের সরকারী পোশাক। এর উপর ক্লাবের নামের তিনটি আদ্যাক্ষর অর্থাৎ A. I. K. অঙ্কিত আছে। আলমান্না ক্লাব হাঙ্গেরী এবং অস্ট্রিয়ার অনুকরণে নীচুতে বল রেখে এবং সর্ট পাশে খেলতে অভ্যস্ত। সুইডেনের ক্রীড়ামহলে এ আই কে খুবই জনপ্রিয় নাম। তবে এদের খেলা কিছুটা সঙ্গতিবিহীন। কোনদিন খুবই ভাল খেলে, আবার কোনদিন সমর্থকদের হতাশ করে দেয়। অনেকটা মোহনবাগান ক্লাবের মত। আবার মোহনবাগান ক্লাবেরই মত এরা নাকি বিদেশী দলের বিরুদ্ধে খুবই ভাল খেলে। এ আই কে-র বহু গুণী খেলোয়াড় সুইডেনের ফুটবলকে সমৃদ্ধ করেছেন এবং ক্লাবের মধ্যে রয়েছেন কয়েকজন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন খেলোয়াড়। খেলোয়াড়দের সবাই এমেচার। কেউ অফিস ক্লার্ক, কেউ ফটোগ্রাফার, কেউ ইলেকট্রিসিয়ান, কেউ সাংবাদিক, কেউ বা চিত্রশিল্পী। ফুটবল ছাড়া খেলাধুলার আরও সাতটি দিকে আলমান্না ক্লাবের কর্মতৎপরতা বিস্তৃত। সুইডেনের দুই বিশ্বখ্যাত টেনিস খেলোয়াড় লেনার্ট বার্জেলিন ও এস ডেভিডসন এ আই কে-র সভ্য।

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থার উদ্বোধনী সভায় ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ ক্রীড়া সংস্থার উদ্দেশ্য ও কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করছেন

আলমান্না ক্লাবের খেলা আমরা এখনো চোখে দেখিনি, শুধু বাঁশী শুনেছি। হেলসিংবর্গ ও গোটেবর্গ দলও কলকাতায় আসার পূর্বে বাঁশীর এই সুর শুনেছিলাম। সুতরাং এবারকার সুইডিস দলের খেলা সম্বন্ধেও একটি আন্দাজ করে নেওয়া যেতে পারে। পূর্বের দুটি টীমের মধ্যে হেলসিংবর্গের খেলাই কলকাতার দর্শকদের কিছু আনন্দ দান করেছিল। কলকাতার দর্শকরা সম্ভবত এদের কাছে থেকেই সর্বপ্রথম তিন ব্যাক প্রথার খেলা দেখবার সুযোগ পান। হেলসিংবর্গ টীম কয়েকজন কৃতী খেলোয়াড়েও সমৃদ্ধ ছিল। সেণ্টার ব্যাক বা স্টপার এ্যাপলটফ্ট বা রাইট আউট মর্লে মর্টেনসনের মত গুণী খেলোয়াড় পরবর্তী কালের কোন ভ্রমণকারী দলে দেখা যায়নি। কিন্তু ১৯৫১ সালের গোটেবর্গ দলে তেমন কোন গুণী খেলোয়াড় ছিল না বললেই হয়, ফলে গোটেবর্গ দলের খেলা দর্শক মনেও কোন ছাপ রাখতে পারেনি। আলমান্না ক্লাবও ক্রীড়ানৈপুণ্যে কলকাতার দর্শকদের সন্তুষ্ট করতে পারবে বলে আমাদের আশা কম। কারণ বিদেশ ভ্রমণকারী এই সব দলের ক্রীড়ানৈপুণ্য প্রদর্শন মুখ্য উদ্দেশ্য নয়। কোন প্রতিযোগিতামূলক খেলাতে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে আসছে না। এদের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থ সংগ্রহ। প্রায় প্রতি বছরই দেখা যায় ইউরোপীয় মহাদেশের কোন না কোন টীম দূরপ্রাচ্য সফরের পথে কলকাতায় দুতিনটি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে যায়। কণ্টিনেণ্টাল টীমগুলির অর্থ সংগ্রহের যাত্রাপথে কলকাতা যেন সরাইখানা। এখানের পথের শ্রম লাঘব এবং পাথেয় সঞ্চয় দুইই হয়। আমোদ-প্রমোদ উপরি পাওনা। সুতরাং কণ্টিনেণ্টের জোড়াতালি দিয়ে গড়া কোন দলের খেলার মধ্যেই পাওয়া যায় না ফুটবল নৈপুণ্যের উন্নত ক্রীড়াচাতুর্য, কোন দলের খেলাতেই থাকে না আন্তরিকতা। গতবার অস্ট্রিয়ার লিনজ এ্যাথলেটিক ক্লাব, জার্মানীর অফেনব্যাক কিকার্স এবং এবারকার অস্ট্রিয়ান গ্রেজার এ্যাথলেটিক ক্লাবের কাছ থেকেও একই ধরনের খেলার নমুনা পাওয়া গেছে। সরাইখানার যাত্রীদের এ ধরনের খেলায় আর কলকাতার দর্শকদের মন ভরছে না।

* * *

আই এফ এ নিজের প্রচেষ্টায় এ পর্যন্ত বাইরের কোন টীমের খেলার ব্যবস্থা করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। দূরপ্রাচ্য ইউরোপীয় মহাদেশের কয়েকটি অখ্যাত ফুটবল দলের স্বর্ণখনি। দূরপ্রাচ্য সফরের পথে কলকাতায় খেলবার জন্য বহু দলই প্রতি বছর আই এফ এর সঙ্গে পত্রালাপ করে। 'দেনা-পাওনার' সর্তে আই এফ এর সঙ্গে যাদের মতৈক্য হয়, তাদেরই আমরা কলকাতায় খেলতে দেখি। প্রতি বছরই কলকাতার সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় ইউরোপীয় অঞ্চলের বিভিন্ন টীমের আগমন সংবাদ পাওয়া যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত একটি কি দুটি দলের খেলার ব্যবস্থা কার্যকরী হয়। বেশীর ভাগ ভ্রমণ ব্যবস্থাই বাতিল হয়ে যায় 'দেনা-পাওনা' সর্তের মতানৈক্যবশত। এ বছরও যুগোস্লাভ, হাঙ্গেরীয়ান, জার্মান, সুইডিস, রাশিয়ান প্রভৃতি দলের আগমন সংবাদ ঘোষিত হয়েছিল। এর মধ্যে অখ্যাত এবং শক্তিহীন গ্রেজার ক্লাব আই এফ এর সর্তে রাজি হয়ে কলকাতায় খেলে গেছে। সম্প্রতি অস্ট্রিয়ার আর একটি টীম ফুসাল ক্লাব কলকাতায় এবং এলাহাবাদ ও দিল্লীতে খেলবার ইচ্ছে প্রকাশ করে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের কাছে এক পত্র প্রেরণ করেছে। এদেরও উদ্দেশ্য এক। দূরপ্রাচ্য সফরের পথে কলকাতা থেকে কিছু পাথেয় সংগ্রহ করা। বর্তমান অবস্থায় অবশ্য ভারতে এদের সফরের সম্ভাবনা খুবই কম। কারণ ফুটবল মরসুম অতিক্রান্ত হয়েছে। তারপর এই ধরনের অখ্যাত দলের খেলায় ক্রীড়ামোদীর মধ্য হতে কোনই সাড়া পাওয়া যাবে না। এর পর আই এফ এ অথবা নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনকে বাইরের দলের খেলার ব্যবস্থা করতে হলে শক্তিশালী দলকে আহ্বান করতে হবে এবং তাদের খেলা দেখবার জন্য দর্শকেরও কোন অভাব হবে না।

এর্ডরিচ টি বেলী

গভর্নমেণ্টের পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থা গঠন ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অতীতে পরপদানত ভারত খেলাধুলার ক্ষেত্রে যেটুকু অগ্রসর হয়েছে বা কৃতিত্ব অর্জন করেছে, সেটুকু সম্ভব হয়েছে ক্রীড়ামান্য নাগরিকদের ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় এবং ধনী জমিদার ও রাজরাজড়ার অর্থ সাহায্যে। গভর্নমেণ্টের তরফ থেকে খেলাধুলার বিষয়ে তেমন কোন সাহায্য করা হয়নি। তবে খেলাধুলার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ইংরেজ রাজপুরুষেরই নৈতিক সমর্থন ছিল এবং তারা ক্রীড়া সংস্থাকে আর্থিক সাহায্য না করলেও খেলোয়াড়ের বিশেষ সম্মান দিতেন। খেলাধুলা ক্ষেত্রে কোন বিশেষ গুণ সরকারী চাকুরী লাভেরও সহায়ক হতো। I am a sportsman—একথা তৎকালে চাকুরী প্রার্থীদের দরখাস্তের অবশ্য লেখনীয় বিষয়ের অন্তর্গত ছিল। অবশ্য এ ব্যবস্থা এখনো চালু আছে এবং এখনো সরকার খেলোয়াড়দের সম্মান দিয়ে থাকেন। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের পর গভর্নমেণ্ট ও ক্রীড়া সংস্থাগুলির মধ্যে সম্পর্কের কোন উন্নতি হয়নি। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে এবং সময়ে সময়ে কোন কোন সংস্থাকে সরকার কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করেছেন, এই মাত্র। সম্প্রতি গভর্নমেণ্টও খেলাধুলার উন্নতি বিষয়ে যেমন আগ্রহী হয়ে উঠেছেন, ক্রীড়া

সংস্থাগুলিরও তেমন প্রয়োজন হয়েছে সরকারী সাহায্যের। বিভিন্ন ক্রীড়া সংস্থার মধ্যে যোগাযোগ সাধনের জন্য একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠনের প্রয়োজন বহুদিন আগেই স্বীকৃত হয়েছে। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ এই উদ্দেশ্যে কয়েক মাস পূর্বে দিল্লীতে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। সেই সম্মেলনে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থা গঠনের ভিত্তি স্থাপিত হয়। সম্প্রতি দিল্লীতে মৌলানা আজাদের সভাপতিত্বে কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থা গঠনপর্ব সমাধা হয়েছে।

• • •

টাটা কোম্পানীর প্রধান স্তম্ভ এবং হকি ফেডারেশনের সভাপতি মিঃ ন্যাভাল টাটা হয়েছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থার সভাপতি এবং বিচারপতি রাজাধ্যক্ষ হয়েছেন সহ-সভাপতি। ইনি নিখিল ভারত ব্যাডমিণ্টন এসোসিয়েশনের সভাপতি। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রী পি গুপ্ত, ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি বিজয়নগরের মহারাজকুমার, সুইমিং ও এ্যাথলেটিক ফেডারেশনের সভাপতি রাজা ভালিন্দার সিং, বিখ্যাত শিক্ষাবিদ এবং ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্পোর্টস বোর্ডের সভাপতি ডাঃ জাকির হোসেন ও শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সম্পাদক জনাব আসফাক হোসেন, কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থার সদস্য মনোনীত হয়েছেন। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে, কোন কেন্দ্রীয় বা রাজ্য মন্ত্রী এর মধ্যে মাথা গলাননি। খেলাধুলার ক্ষেত্রে সরকারের আগ্রহ দেখে আমাদের ক্রীড়া পরিচালকরা সরকারী হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে এতদিন নানা কথা বলে বেড়িয়েছেন। কিন্তু সরকার ক্রীড়া পরিচালকদের উপরই সব ভার ছেড়ে দিয়েছেন। এর পর উন্নত শিক্ষা ব্যবস্থা, খেলাধুলার স্থান সংগ্রহ, স্টেডিয়াম নির্মাণ, খেলার সাজ-সরঞ্জাম নির্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠান গঠন, ক্রীড়াসামগ্রী আমদানীর জন্য লাইসেন্স প্রদান, খেলাকে আমোদকর থেকে রেহাই দান অথবা খেলা থেকে সংগৃহীত আমোদ কর খেলার প্রয়োজনে বিলি-বণ্টন প্রভৃতি ব্যবস্থা সরকার ও কেন্দ্রীয় ক্রীড়া সংস্থার যোগাযোগে সুচারুভাবে সম্পন্ন হবে বলে আশা করা যেতে পারে। আরও আশা করা যেতে পারে, ক্রীড়া পরিচালকদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান এবং সরকারী সমর্থনে ভারত খেলাধুলার ক্ষেত্রে অচিরেই অনেক দূরে এগিয়ে যাবে। এর পরও এই বিরাট দেশের বিপুল জনশক্তির মধ্য থেকে যদি গুণী ও কৃতী খেলোয়াড় তৈরি করা না যায়, তবে বুঝতে হবে পরিচালন ব্যবস্থার কোথাও না কোথাও গলদ আছে।

• • •

ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি বিজয়নগরের মহারাজকুমার পাকিস্থান সফরের জন্য ভারতের ১৬জন খেলোয়াড়ের মধ্যে ১০জনের নাম ঘোষণা করেছেন। বিনু মানকড় ইতিপূর্বেই অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছিলেন, সুতরাং বোম্বাইয়ের প্রদর্শনী খেলার পর নূতন ৯ জনের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাকি ৬জনের নাম ঘোষণা করা হবে ডিসেম্বর মাসের ১৩ তারিখে। দলের ম্যানেজারের নির্বাচন পর্বও বাকি আছে। পাকিস্থান সফরের জন্য ভারতীয় দল গঠনে এই টালবাহানা কেন বুঝে উঠতে পারি না। বহু পূর্বেই ভারতের দল গঠন করা উচিত ছিল। দলের সমস্ত খেলোয়াড় যদি পরস্পর পরস্পরকে বুঝবার সুযোগ পায়, তবে স্বাভাবিকভাবেই তাদের মধ্যে সহযোগিতার ভাব এবং সমন্বয় গড়ে ওঠে, খেলার ফলাফলও অনুকূলে হয়। দল গঠনের দেরিতে দলগত সংহতি নষ্ট হবার সম্ভাবনা। পাকিস্থান সফরের খেলা আরম্ভ হতেও বেশী দেরি নেই। চট্টগ্রামে ২৮শে ডিসেম্বর থেকে আরম্ভ হচ্ছে ভারতের প্রথম খেলা। তারপরই ঢাকায় প্রথম টেস্ট। সুতরাং দল গঠনে দেরি করা কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। তবে যদি নির্বাচক সমিতি পাকিস্থানের খেলার উপর তেমন গুরুত্ব আরোপ না করেন, যদি মনে করেন ভারতের পাকিস্থান সফর প্রাক দেশবিভাগের রনজি প্রতিযোগিতার বৃহৎ সংস্করণ, তবে পৃথক কথা। কিন্তু স্মরণ রাখতে হবে, ভারত এবং পাকিস্থান এখন দুটি রাষ্ট্র এবং দুই দেশের যাতায়াত পথের মধ্যে কোন প্রাকৃতিক বাধার প্রাচীর না থাকলেও পাসপোর্টের নাগপাশ দুই দেশের মধ্যে সহজ চলাচলের পথ রুদ্ধ করেছে। খেলোয়াড়দের পাসপোর্ট এবং ভিসার ব্যবস্থা করতেও কিছু সময়ের প্রয়োজন হবে। আর খেলোয়াড়দের প্রস্তুত হবার জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। এপর্যন্ত যে দশজন খেলোয়াড়কে মনোনয়ন করা হয়েছে, তাদের নাম—বিনু মানকড় (অধিনায়ক), পলি উমরিগর, গোলাম আমেদ, জি এস রামচাঁদ, পি রায়, এম কে মন্ত্রী, সি ডি গাদকারী, এস পি গুপ্তে, এন এস তামানে ও পি এইচ পাঞ্জাবী।

বাকী ৬ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে আর বি কেনী, ভি এল মঞ্জরেকার, জি সুন্দররাম, সি জি বোর্ডে, ডি জি ফাদকার, পি জি ভাণ্ডারী ও এইচ টি দানীর নাম করা হয়েছে। এঁদের মধ্য থেকে মঞ্জরেকারের বাদ যাবার সম্ভাবনা। ডি জি ফাদকার ট্রেনিং ক্যাম্পে যোগদান না করায় নির্বাচক সমিতি ফাদকারের উপরও অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

বিশ্ব সুটিং প্রতিযোগিতা

ভেনেজুলার ১৫ দিনব্যাপী বিশ্ব সুটিং প্রতিযোগিতায় রাশিয়ার প্রতিযোগিবৃন্দ অধিকাংশ বিষয়ে সাফল্য অর্জন করে সুটিংয়ে শ্রেষ্ঠত্বের পরিচয় দিয়েছেন। তারা সব শুদ্ধ ৪৯টি স্বর্ণপদক লাভ করেন। দলগত প্রতিযোগিতার ৯টি বিষয়ে এবং ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় ৮টি বিষয়ে রাশিয়া বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে। সুইডেন ২টি দলগত বিষয়ে এবং যুক্তরাষ্ট্র, ইণ্টালী ও ফিনল্যাণ্ড দলগত বিষয়ের একটি করে প্রতিযোগিতায় সম্মান অর্জন করে।

৪×১০০ মিটার রিলে সাঁতারে নূতন রেকর্ড—আজাদ হিন্দ বাগে সিটি এ্যাথলেটিক ক্লাবের প্রথম বছরের সাঁতার প্রতিযোগিতায় সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব ৪×১০০ মিটার রিলে সাঁতারে নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এই বিষয়ে বোম্বাই রাজ্য টীমের রেকর্ড ছিল ৪ মিনিট ৩১.৪ সেকেণ্ড। সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাবের সাঁতারুরা ৪ মিনিট ৩১.৩ সেকেণ্ড সময়ে দূরত্ব অতিক্রম করেছেন।

দেশী সংবাদ

২৩শে নবেম্বর—তথ্য ও বেতার মন্ত্রী ডাঃ বি ভি কেশকার লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, বার্তাজীবীদিগকে শিল্প বিরোধ আইনের আওতায় আনিবার জন্য প্রেস কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন, ভারত গবর্ণমেণ্ট ইতিমধ্যেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন।

নিবারক নিরোধ আইনের মেয়াদ আরও তিন বৎসর বৃদ্ধি করিবার উদ্দেশ্যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কাটজু আজ লোকসভায় একটি বিল উত্থাপন করেন।

২৪শে নবেম্বর—ভারত ও পাকিস্থান সরকারের মধ্যে সরাসরি বিভিন্ন সমস্যার আলোচনা আরম্ভ করিবার জন্য ভারতস্থিত পাক হাই কমিশনার মিঃ গজনফর আলি আজ নয়াদিল্লীতে ভারতের পররাষ্ট্র দপ্তরের সিনিয়ার অফিসারদের সহিত প্রাথমিক আলোচনা করেন।

ভারত সরকার চায়ের রপ্তানি শুল্ক দ্বিগুণ বৃদ্ধি করিয়াছেন। এতদনুযায়ী বিদেশে রপ্তানিকৃত প্রতি একশত পাউণ্ড চায়ের উপর ধার্য শুল্কের পরিমাণ দুই টাকা হইতে বাড়িয়া চার টাকা হইবে।

বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে অনুষ্ঠিত এক আলোচনাসভায় কলিকাতা মহানগরীর কোন উপযুক্ত স্থানে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মূর্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ-ভার একটি এডহক কমিটির উপর ন্যস্ত হয়। শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাব সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

২৫শে নবেম্বর—শ্রীঅজিতপ্রসাদ জৈনকে কেন্দ্রীয় সরকারের খাদ্য ও কৃষি দপ্তরের ভার দেওয়া হইয়াছে বলিয়া সরকারিভাবে ঘোষিত হইয়াছে।

নিখিল আসাম উদ্বাস্তু সমিতির সাধারণ সম্পাদক শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ কলিকাতায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে এইরূপ অভিযোগ করেন যে, আসাম সরকার উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের ব্যাপারে উদাসীন এবং অনেক সরকারী কর্মচারির দুর্নীতি ও চূড়ান্ত অবহেলার ফলে ঐ রাজ্যে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুগণ চরম দুর্গতির সম্মুখীন হইয়াছে।

সরকারীভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গত ১৫ই নবেম্বর তারিখে উত্তরপূর্ব সীমান্ত এজেন্সীর তুয়েনসাং বিভাগের পাংসা ও মৈপাং গ্রামবাসীদের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ৫৭জন নিহত হয়।

করিমগঞ্জের সংবাদে প্রকাশ, পাকিস্থান সীমান্তে আবার পাকিস্থান রাইফেল বাহিনী

সমাবেশ করা হইয়াছে। জানা গিয়াছে যে, পাকিস্থানী মিলিটারী সুরমা নদীর অর্ধেক দাবী করিতেছে, যদিও এই নদী সম্পূর্ণভাবে ভারতের।

২৬শে নবেম্বর—হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ সম্পর্কে সংসদ কর্তৃক নিযুক্ত সিলেক্ট কমিটি নারীদের বিবাহের বয়স ১৫ হইতে ১৬ এবং পুরুষদের বিবাহের বয়স ১৮ হইতে ২১ বৎসর করিবার সুপারিশ করিয়াছেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ নয়াদিল্লীতে ভারতে শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে আণবিক শক্তি উৎপাদন বিষয়ে দুই দিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন করিয়া বলেন যে, আণবিক শক্তি উৎপাদন একমাত্র রাষ্ট্রের দায়িত্বে হওয়া উচিত।

ভারতের প্রধান বিচারপতি শ্রীমেহেরচাঁদ মহাজন ২২শে ডিসেম্বর অবসর গ্রহণ করিবেন। বিচারপতি শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁহার স্থলাভিষিক্ত হইবেন।

আজ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, গত ১৫ই আগস্ট হইতে এ পর্যন্ত পর্তুগীজ সরকার সত্যাগ্রহ কিংবা সন্দেহে ৩৯ জন ভারতীয়কে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

২৭শে নবেম্বর—আজ নাগপুরে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের বিশেষ অধিবেশনে দলের নেতা আচার্য জে বি কৃপালনী তাঁহার নিজের ও সর্বভারতীয় কার্যনির্বাহক পরিষদের পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। উক্ত অধিবেশনে ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের প্রজা-সোস্যালিস্ট মন্ত্রি-সভার পদত্যাগের জন্য ডাঃ লোহিয়া ও তাঁহার অনুগামীদের দাবী অগ্রাহ্য করা হইয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীযুক্তা রেণুকা রায় এক বিবৃতিতে বলেন যে, এ পর্যন্ত ১৬॥ লক্ষ উদ্বাস্তুকে পুনর্বাসন সংক্রান্ত সকল প্রকার সাহায্য দেওয়া হইয়াছে।

২৮শে নবেম্বর—আজ দিল্লীতে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় কম্যুনিস্টদের কঠোর ভাষায় সমালোচনা করিয়া বলেন, দলীয় স্বার্থসিদ্ধির জন্য ইহারা দেশের অর্থনৈতিক অবস্থায় বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে চায়।

আজ নাগপুরে প্রজা-সমাজতন্ত্রী দলের বিশেষ সম্মেলনে আচার্য কৃপালনীর পদ-ত্যাগ পত্র গৃহীত হইয়াছে এবং আচার্য নরেন্দ্র দেব সর্বসম্মতিক্রমে দলের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

আজ সিন্ধ্রিতে বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ কোক কয়লা উৎপাদনের একটি কারখানা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন।

বিদেশী সংবাদ

২২শে নবেম্বর—রাষ্ট্রপুঞ্জে সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের নেতা মঃ আঁদ্রে ভিসিনস্কি আজ হৃদরোগে আক্রান্ত হইয়া নিউইয়র্কে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৭১ বৎসর হইয়াছিল।

পাক প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলি ঘোষণা করেন যে, তিনি ও মন্ত্রিসভায় তাঁহার সহকর্মীরা পূর্ববঙ্গকে পূর্ব পাকিস্থান নামে অভিহিত করিবার এবং পশ্চিম পাকিস্থানের সমস্ত প্রদেশকে একটি ইউনিটে পরিণত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

২৩শে নবেম্বর—গণতন্ত্রী চীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে ১৩ জন মার্কিন নাগরিককে বিভিন্ন মেয়াদের কারাদণ্ড (তন্মধ্যে একজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ড) এবং তৎসহ চারজন চীনাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছে।

আজ পাকিস্থানকে প্রদত্ত মার্কিন সামরিক সাহায্যের প্রথম দফার দ্রব্যাদিসহ জাহাজ করাচীতে পৌঁছে।

বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চার্চিল আজ ঘোষণা করেন যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হইবার পূর্বে তিনি রুশবাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে জার্মানীর অস্ত্রশস্ত্র সযত্নে সংগ্রহ করিয়া জমা রাখিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন।

২৫শে নবেম্বর—পাক সরকারের এক প্রেসনোটে প্রকাশ, ফেডারেল কোর্টের বিচারপতি মিঃ সাহাবুদ্দিন পূর্ববঙ্গের গবর্নর নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৬শে নবেম্বর—নিউইয়র্ক বেতার বার্তায় বলা হইয়াছে যে, চীনা কম্যুনিস্টরা জাতীয়তাবাদী চীনাগণ কর্তৃক অধিকৃত উচি দ্বীপ আক্রমণ করিয়াছে।

২৮শে নবেম্বর—জাপ প্রধানমন্ত্রী মিঃ যোশিদা আজ লিবারেল পার্টির লীডারের পদ ত্যাগ করিয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—/৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড [illegible] প্রকাশিত।
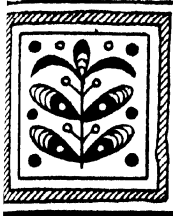
সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

মহত্তের অপভাষণ

সোভিয়েট রাশিয়ার একদল সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি বর্তমানে ভারত-ভ্রমণে ব্যাপৃত আছেন। এই দলের নেতা দলের মুখপাত্র সোভিয়েট রাশিয়ার অন্যতম সাহিত্যিক এবং সাংবাদিক কোর্জেভিনোকভ লক্ষ্ণৌ এবং বেনারসে সোভিয়েট বিশ্বকোষে প্রকাশিত মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কিত মন্তব্যের কথা উল্লেখ করেন। তিনি এই আশ্বাস দেন যে, বিশ্বকোষের পরবর্তী সংস্করণে ঐ মন্তব্যের সংশোধন করা হইবে। সোভিয়েট বিশ্বকোষে প্রকাশিত মন্তব্য যে অসংগত এবং অসমীচীন হইয়াছে, সোভিয়েট প্রতিনিধি সেকথা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারতের মুক্তি-সাধনায় মহাত্মা গান্ধী তাঁহার দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার মত ভারতের সর্বজনশ্রদ্ধেয় নেতার সম্বন্ধে সোভিয়েট বিশ্বকোষে প্রকাশিত মন্তব্য সুস্পষ্টভাবেই অনুচিত হইয়াছে। সোভিয়েট প্রতিনিধি দলের মুখপাত্র মহাশয়ের এই অভিমত তাঁহার ব্যক্তিগত, একথাও তাঁহার মুখেই প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার এই ব্যক্তিগত অভিমতেও যে মহাত্মা গান্ধীর পরিপূর্ণ মর্যাদা স্বীকৃত হইয়াছে, একথা বলা চলে না। বস্তুত মহাত্মা গান্ধীর অবদান তাঁহার স্বদেশের মধ্যেই নিবদ্ধ এবং তিনি তাঁহার দেশবাসীদের শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছেন, তাঁহার গান্ধী প্রশস্তি এই গণ্ডীর মধ্যেই ঘুরিয়াছে। বিশ্বমানব সংস্কৃতি এবং বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর বিরাট অবদান এবং ত্যাগের মহিমায় সমুজ্জ্বল তাঁহার উদার আদর্শ সোভিয়েট প্রতিনিধির অন্তর যে কিছুমাত্র স্পর্শ করিয়াছে, তাঁহার উক্তি হইতে এ পরিচয় পাওয়া যায় না। পীড়িত এবং দুর্গত জনসমাজের জন্য মহাত্মাজীর বেদনার প্রসঙ্গ তিনি এড়াইয়া গিয়াছেন। অথচ ভারত-ভ্রমণের পর এই সত্যটি সহজেই তাঁহার উপলব্ধি করা উচিত ছিল। প্রকৃতপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর অবদান এবং তাঁহার জীবনাদর্শ শুধু ভারতের মধ্যেই নিবদ্ধ নহে, বিশ্বমানব সভ্যতার ক্ষেত্রে তাহা যুগান্তর ঘটাইয়াছে। পারস্পরিক হিংসা দ্বেষ-জর্জরিত মানবসমাজকে গান্ধীজী শান্তির নূতন পথ দেখাইয়াছেন। সুতরাং গান্ধীজী শুধু ভারতের জনগণেরই শ্রদ্ধার আসন অধিকার করেন নাই। প্রত্যুত সমগ্র জগতে গান্ধীজীর শ্রদ্ধার আসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সোভিয়েট রাশিয়া এই সত্য স্বীকার করিতে না চাহিলেও ইহা একান্ত সত্য এবং এই সত্যকে অস্বীকার করিলে মনুষ্যত্ব এবং মানব-সংস্কৃতির অমর্যাদা করা হয়। সোভিয়েট ইউনিয়নের নেতারা গান্ধীজীর জীবন এবং তাঁহার উপদেশাবলীর সম্বন্ধে আরও বিস্তৃতভাবে তথ্যানুসন্ধান করিবেন এবং সোভিয়েট প্রতিনিধিবর্গ এদেশ পরিদর্শনের ফলে গান্ধীজীর সম্বন্ধে যে সব সত্য অবগত হইয়াছেন, তাহার আলোকে গান্ধীজীর সম্পর্কিত মন্তব্য পুনর্বিবেচিত হইবে, প্রতিনিধি দলের মুখপাত্রের মুখে আমরা এই কথা শুনিয়াছি। বাস্তবিকপক্ষে মহাত্মা গান্ধীর সম্পর্কে তাঁহার ব্যক্তিগত অভিমত যাহাই হোক্, সোভিয়েট রাজনীতি প্রভুত্বপর বিশেষ মতবাদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে না পারিলে মহাত্মাজীর প্রকৃত মর্যাদা সেখানে স্বীকৃত হওয়া সুকঠিন, অথচ এই স্বীকৃতির উপরই, বিশ্বশান্তি, বিশেষভাবে, বিশ্বের কল্যাণ-প্রচেষ্টায় সোভিয়েট সংস্কৃতির মর্যাদা নির্ভর করিতেছে। আমরা এই কথাই বলিব, যে সংস্কৃতির মূলে সার্বজনীন কল্যাণবোধ সম্প্রসারিত নাই তাহা সংস্কৃতিই নয়, তাহা ভীতি-স্বরূপ, মানবধর্ম তাহার মূলে নাই, তাহা অধর্ম। সোভিয়েট বিশ্বকোষে গান্ধীজীর ন্যায় মহামানবের সম্পর্কে অপভাষণে এই অধর্মেরই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে।

যোগ্যের মর্যাদা

বিচারপতি শ্রীবিজনকুমার মুখোপাধ্যায় ভারতের প্রধান বিচারপতি নিযুক্ত হইয়াছেন। ভারতের সর্বোচ্চ ধর্মাধিকরণ সুপ্রীম কোর্টে তাঁহার এই নব কার্যভার গ্রহণ উপলক্ষে আমরা তাঁহাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। গত ৪০ বৎসর হইতে বিচারপতি মুখোপাধ্যায় ব্যবহার-ক্ষেত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকিয়া তাঁহার প্রগাঢ় মনস্বিতা এবং বিচারবুদ্ধির প্রভাবে সর্বসাধারণের শ্রদ্ধার আসন অধিকার করিয়াছেন। জীবনের নানা ক্ষেত্রেই তিনি বিশেষ সাফল্য অর্জন করিয়াছেন। ভারতের প্রধান বিচারপতির কর্তব্য পালনে তাঁহার যোগ্যতা সাফল্য

গৌরবে সমুজ্জ্বল হইবে, ইহাই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

ফরক্কার বাঁধ

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ফরক্কার উপর গঙ্গায় বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে বিশেষ উদ্যোগী হইয়াছেন। এই বাঁধ নির্মাণের অনুকূলে পশ্চিমবঙ্গের জনমত কিরূপ প্রবল তাহা প্রদর্শনের জন্য জেলা কংগ্রেস কমিটি, মিউনিসিপ্যালিটি, জেলা বোর্ড, বার লাইব্রেরী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর জন-প্রতিষ্ঠানগুলির মারফতে গণস্বাক্ষর সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছে। এই প্রচেষ্টায় পূর্বেই অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু প্রদেশের স্বার্থ-সংস্রবে জনমতকে জাগ্রত করিবার কাজে পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটি নিজেদের কর্মতৎপরতা প্রদর্শনে এতাবৎকাল তেমন উদ্যোগী হন নাই। তাঁহাদের এই উদ্যমে আমরা সুখী হইয়াছি এবং সর্বান্তঃকরণে ইহার সমর্থন করিতেছি। পশ্চিমবঙ্গ বর্তমানে নানা কারণে সমস্যা-সঙ্কুল রাজ্যে পরিণত হইয়াছে। ফরক্কার উপর গঙ্গার বাঁধ নির্মিত হইলে বহু সমস্যার সমাধানের পথ উন্মুক্ত হইবে, একথা বিশেষ যুক্তি ও তথ্যের দ্বারা ইতঃপূর্বেই প্রমাণিত হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য-মন্ত্রী এ সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টিও বহুদিন হইল আকৃষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, পশ্চিম-বঙ্গের উন্নতির পক্ষে একান্ত প্রয়োজনীয় এই প্রস্তাবটি প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই। দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মধ্যে এই প্রস্তাবকে যে অগ্রগণ্য করা হইবে, এ সম্বন্ধেও কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে এ পর্যন্ত সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি মিলে নাই, শুধু ঐ সম্পর্কে বিবেচনার কথা পর্যন্তই জানা গিয়াছে। জনমতকে যদি সুগঠিত এবং সংহত করিয়া এই দাবী শক্তিশালী করিয়া তোলা যায়, তবে কেন্দ্রীয় সরকার আর ইহা উপেক্ষা না করিয়া দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অন্তত গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবেন, ইহাই আশা করা যায়। বলা বাহুল্য পশ্চিম-বঙ্গের উন্নতির উপর সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ নির্ভর করিতেছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় সরকার সে সম্বন্ধে খুব সচেতন বলিয়া মনে হয় না। এরূপ অবস্থায় পশ্চিমবঙ্গের জনমতকে আত্মপ্রতিষ্ঠায় সমধিক জাগ্রত করিয়া তোলা একান্তই দরকার হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহা প্রাদেশিকতা নয়, বস্তুত পশ্চিমবঙ্গের সেই জনজাগরণের মূলে সমগ্র ভারতের উজ্জীবন-বীর্যই নিহিত রহিয়াছে।

পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সমস্যা

বিহার এসোসিয়েশনের সভাপতি এক-কথায় পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার প্রশ্নটি উড়াইয়া দিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাজ হইল নূতন রাজ্য গঠনের প্রশ্ন লইয়া, সুতরাং দুইটি রাজ্যের পারস্পরিক সীমানা সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনা কমিশনের বিবেচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত নয়। বলা বাহুল্য, তাঁহার এই অভিমত যে ঠিক নয়, সকলেই তাহা বোঝেন, তিনি নিজেও যে না বোঝেন এমন নয়। প্রত্যুত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনে পশ্চিমবঙ্গের সীমানা সম্বন্ধে পুনর্বিবেচনার সম্ভাবনা নাই, এ সম্বন্ধে বিহারের নেতৃবর্গ যদি সুনিশ্চিত হইতেন, তবে পশ্চিমবঙ্গের দাবীর বিরুদ্ধে তর্জন-গর্জনে তাঁহারা প্রবৃত্ত হইতেন না এবং এ সম্বন্ধে এই সেদিনও ধানবাদে এবং পরে পূর্ণিয়ায় তাঁহাদের বীরদর্প প্রদর্শিত হইত না। ফলত বিহারের নেতৃবর্গ এবং বিহার সরকার রাজ্য কমিশনের কাজের সম্বন্ধে যথেষ্টই সজাগ আছেন। ফলত গত কয়েক বৎসর হইতেই পশ্চিমবঙ্গের দাবীর বিরুদ্ধে তাঁহাদের চক্রান্ত আরম্ভ হইয়াছে। কলিকাতার ফলিত পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠান হইতে সম্প্রতি একখানি পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের এই প্রচেষ্টার স্বরূপ কিছুটা উন্মুক্ত করা হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ এবং বিহারের সীমান্তবর্তী অঞ্চল, বিশেষ-ভাবে মানভূমে হিন্দীভাষাভাষীর সংখ্যা বাঙলা ভাষাভাষীদের অপেক্ষা সত্যই অধিক হইতে পারে কি না? উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে প্রকাশিত পুস্তিকায় এই প্রশ্ন গুরুতরভাবেই মনে জাগে এবং ইহা বেশ বোঝা যায় যে, আদম সুমারীতে যে অঞ্চলে বাঙলাভাষাভাষী প্রধান ছিল, সেগুলিকে হিন্দীভাষাভাষী বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার জন্য কয়েক বৎসর হইতে কাজ ক্রমাগত চলিয়াছে। কয়েক বৎসরের মধ্যে হিন্দী-ভাষাভাষীর অবিশ্বাস্য সংখ্যা বৃদ্ধি এবং বাঙলাভাষাভাষীদের সংখ্যা অত্যধিক হ্রাস যে বাঙলাভাষাভাষী প্রধান অঞ্চল, খানিতে উপস্থাপিত পরিসংখ্যানগত আলোচনায় ইহা সহজেই ধরা পড়ে। অথচ বিহারের নেতৃবর্গ আদম সুমারীতে বিকৃতভাবে প্রদত্ত এই হিসাবের উপর নির্ভর করিয়াই পশ্চিমবঙ্গের এই দাবীকে অগ্রাহ্য করিতে দাঁড়াইয়াছেন। মানভূম যে বাঙলা ভাষাভাষী প্রধান অঞ্চল, এতাবৎ কাল পর্যন্ত স্বীকৃত এই সত্যকে তাঁহারা নেহাৎ গায়ের জোরেই চাপিয়া দিবেন, এমনই তাঁহাদের জিদ। আমরা আশা করি, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন বিহারের সাম্প্রতিক আদম সুমারীর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে প্রবৃত্ত হইবেন না। কারণ সে হিসাব যে ভ্রান্ত ইহা সুস্পষ্টভাবেই প্রতিপন্ন হইয়াছে। আমরা প্রাদেশিকতা চাহি না। বাঙলার ঐতিহ্য তাহার বিরোধী; কিন্তু প্রাদেশিক সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তির বশে জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থ ব্যাহত হয়, এমন চেষ্টার বিরুদ্ধতা করা আমরা কর্তব্য বলিয়াই মনে করি এবং বাঙালী যদি সে কর্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হয়, তবে বাঙালীর পক্ষে নিশ্চয়ই তাহা গর্বে হইবে না।

পরলোকে পণ্ডিত গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী

বোম্বাইয়ের রাজ্যপাল পণ্ডি গিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ীর পরলোকগম ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্র হইতে একজ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন পুরুষের অভাব ঘটি বৃটিশ শাসনাধীনকালের সিভিলিয়া রূপে তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন এ কূটনীতিক ক্ষেত্রে তাঁহার বিশেষ কৃতিত্বে পরিচয় পাওয়া যায়। স্বাধীন ভারতে পররাষ্ট্র বিভাগে বিভিন্ন দায়িত্বপূর্ণ কা ভার গ্রহণ করিয়া পণ্ডিত বাজপে আন্তরিকতা ও বিচক্ষণতার সঙ্গে যেভ রাষ্ট্রের সেবা করিয়াছেন, দেশবাসী ত বিস্মৃত হইবে না। আমরা তাঁহার শে সন্তপ্ত পরিবারবর্গের শোকে গ সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

বৃটিশ পার্লামেণ্টে সার উইনস্টন চার্চিল তাঁর উডফোর্ডের ২৩ নবেম্বর তারিখের বক্তৃতার জন্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন। দুঃখ প্রকাশের রকমটা বেশ মজার। চার্চিল সাহেব বলেন—প্রয়োজন হলে রাশিয়ানদের ঠেকাবার জন্য জার্মানদের সহযোগিতা নিতে হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণকারী জার্মানদের অস্ত্রশস্ত্র নষ্ট না করে জমিয়ে রাখা দরকার—এই মর্মে তিনি ১৯৪৫ সালে ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমেরীকে টেলিগ্রাফ করেছিলেন এবং সেই টেলিগ্রাম তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসের ষষ্ঠ খণ্ডে ইতিপূর্বেই প্রকাশিত হয়েছে, উডফোর্ডে বক্তৃতা করার সময়ে তাঁর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল ছিল বলেই তিনি বক্তৃতায় কথাটার উল্লেখ করেন। সার উইনস্টনের বক্তব্য এই যে, তাঁর মনে ঐ ধারণা না থাকলে তিনি উডফোর্ডে ওকথাটা বলতেন না। কিন্তু পরে তিনি দেখেছেন যে, তাঁর বইয়ে ঐ টেলিগ্রামটা প্রকাশিত হয়নি। তিনি বলেন, "আমি অনেক সময়ে অন্যকে এই উপদেশ দিয়েছি—কিছু উদ্ধৃত করার আগে ভালো করে দেখে নিও মূলের সঙ্গে মিল আছে কিনা। এক্ষেত্রে আমি নিজেই এই নিয়ম ভঙ্গ করেছি। তা না হলে ওকথাটা বলতাম না।" তাছাড়া, চার্চিল সাহেব স্বীকার করেন যে, কথাটা এই সময়ে বলা সময়োচিত হয়নি এবং তার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন।

সেই সঙ্গে পার্লামেণ্টকে তিনি আর একটি সংবাদ দেন। সেটি হচ্ছে এই যে, যথাসাধ্য অনুসন্ধান সত্ত্বেও (অনুসন্ধান নাকি এখনও চলছে) তাঁর সেই টেলিগ্রামের পাত্তা সরকারী কাগজপত্রের মধ্যে পাওয়া যায় নি। অর্থাৎ বুঝা যাচ্ছে যে, সেই টেলিগ্রামটিকে প্রকাশ করার বা তার কোনো কথা উদ্ধৃত করার প্রশ্ন এখন আর নেই। কিন্তু টেলিগ্রাম যে করা হয়েছিল তা অস্বীকার করা হচ্ছে না। অস্বীকার করার কথা উঠেও না কারণ ইতিপূর্বে ফিল্ড মার্শাল মণ্টগোমেরীকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি ঐরকম একখানা টেলিগ্রাম পাওয়ার কথা স্বীকার করেন। চার্চিল সাহেব নিজেও টেলিগ্রাম পাঠানোর কথা অস্বীকার করেন নি। ঐরূপ টেলিগ্রাম পাঠানো অন্যায় হয়েছিল, এরূপ কোনো ভাবও তিনি প্রকাশ করেন নি। তিনি কেবল এইটুকু মেনে নিয়েছেন যে, কথাটার এই সময়ে উল্লেখ করা ঠিক হয় নি এবং হয়ত তিনি এটার উল্লেখ করতেন না যদি তাঁর মনে এই ধারণা না থাকত যে ব্যাপারটা তিনি তাঁর বইয়ে পূর্বেই প্রকাশ করে দিয়েছেন।

এ বিষয় নিয়ে বোধহয় আর বেশি কিছু উচ্চবাচ্য হবে না। কারণ ১৯৪৫ সালে চার্চিল সাহেব যা করেছিলেন এবং যে-ভাব থেকে করেছিলেন তার জন্য বৃটেনে আজ বেশি লোক যে তাঁকে বিশেষ দুষছে তা মনে হয় না, তাদের সমালোচনার মুখ্য কথা ছিল—প্রসঙ্গটা এখন তোলা অত্যন্ত বে-হিসেবী কাজ হয়েছে। চার্চিল সাহেবও এখন তা স্বীকার করেছেন। মানবতার দিক থেকে এই বে-হিসাবী কাজটার একটা মূল্য ছিল কারণ তার দ্বারা একটা কঠিন এবং ভয়ংকর প্রশ্নের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল, যদিও সেটা মোটেই চার্চিল সাহেবের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি সেই প্রশ্নের উপর আবার পর্দা টেনে দেয়া হোল।

* *

বর্মার প্রধানমন্ত্রী আমন্ত্রিত হয়ে চীনে গেছেন। উ নু'র একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ধর্মের দিকে ঝোঁক। তিনি বারবার বলেছেন যে যত শীঘ্র সম্ভব তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করে একান্তভাবে ধর্মসাধনায় আত্মনিয়োগ করতে চান।

কম্যুনিস্ট চীনের বর্তমান অগ্রগতি বৌদ্ধ নু'র চোখে এবং মনে কেমন লাগে সেটা একটা কৌতূহলের বিষয়। এ ব্যাপারে পণ্ডিত নেহরু ও উ নু'র দৃষ্টিভঙ্গী অবশ্যই একরকম হবে না কারণ যে-অর্থে ধর্ম উ নু'র নিকট অত্যাবশ্যক সে-অর্থে পণ্ডিত নেহরুর নিকট তার প্রয়োজনীয়তা এমন কি অস্তিত্ব কতটুকু আছে তা বলা কঠিন।

* *

ডক্টর ম্যালান দক্ষিণ আফ্রিকার ন্যাশনালিস্ট পার্টির দলপতির এবং তৎসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর আসন থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এ সংবাদে আনন্দবোধ করার কোনো হেতু নেই। কারণ ডক্টর ম্যালানের জায়গায় যিনি এসেছেন তিনি অশ্বেত বিদ্বেষে ম্যালানের চেয়েও এক কাঠি সরেশ। আগে মনে হয়েছিল যে, ডক্টর ম্যালানের স্থানে মিঃ হ্যাভেঙ্গা দলপতি নির্বাচিত হবেন। ডাঃ ম্যালানও নাকি তাই চেয়েছিলেন। মিঃ হ্যাভেঙ্গা বর্ণবিদ্বেষের ব্যাপারে ডক্টর ম্যালানের মতোই হতেন। এক আধ চুল খাটোও হতে পারেন। কিন্তু মিঃ স্ট্রাইডম (Strydom) যিনি ডক্টর ম্যালানের স্থলাভিষিক্ত হলেন তাঁর বর্ণবিদ্বেষ ও (aperthied) "এ্যাপার্থিড"-প্রীতি ডক্টর ম্যালানেরও উপরে—একেবারে চরম ধরনের। মিঃ স্ট্রাইডমের মতে শ্বেত-জাতিদের বাঁচতে হলে এ্যাপার্থিড-নীতি কেবল দক্ষিণ আফ্রিকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না, দক্ষিণ আফ্রিকার বাইরেও চালাতে হবে।

মিঃ স্ট্রাইডম দক্ষিণ আফ্রিকার বৃটিশ বংশসম্ভূতদেরও ভয়ের উদ্রেক করবেন। বৃটিশ বংশসম্ভূত দক্ষিণ আফ্রিকাবাসীরা সাদা-কালোর ব্যাপারে কার্যত যে ডক্টর ম্যালানের নীতির বিশেষ বিরোধী ছিল বা আছে তা নয়। ন্যাশনালিস্ট পার্টি সম্বন্ধে তাদের আসল ভয় হচ্ছে অন্য কারণে। ন্যাশনালিস্ট পার্টি দক্ষিণ আফ্রিকাকে একটি বুয়োর-রিপাবলিকে পরিণত করতে চায়। বৃটিশ বংশোদ্ভূত-দের ধারণা যে, ন্যাশনালিস্ট পার্টির প্রাধান্য দ্বারা দক্ষিণ আফ্রিকায় ইংরেজী ভাষা, বৃটিশ কালচার ইত্যাদি বিপন্ন। দক্ষিণ আফ্রিকার ডাচ-বংশোদ্ভূতদের বৃটেনের প্রতি বিশেষ অনুরাগ নেই। গত দুই মহাযুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ আফ্রিকাকে স্বপক্ষে যুদ্ধে নাবাতে বৃটেনকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। জেনারেল স্মাট্‌স্ কমনওয়েলথ-এর অনুরাগী ছিলেন এবং বিশেষ করে তাঁর জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকা যুদ্ধে বৃটেনের অনুসরণ করে। তা না হলে দক্ষিণ আফ্রিকা হয়ত যুদ্ধে নিরপেক্ষ থাকত। সে বিদ্বেষের ব্যাপারে কিন্তু ন্যাশনালিস্ট ও জেনারেল স্মাটস্-এর ইউনাইটেড পার্টির মধ্যে মনোভাবের বিশেষ কোনো তারতম্য ছিল না এবং এখনও নেই। তবে দক্ষিণ আফ্রিকা বৃটিশ কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত ডোমিনিয়ন হয়ে থাকুক, স্মাটস্ এটা খুব চাইতেন। সেইজন্যই বৃটিশ জগতে তাঁর অতো খাতির ছিল। ডক্টর ম্যালান দক্ষিণ আফ্রিকার ডোমি-নিয়নত্ব ঘুচিয়ে রিপাবলিক ঘোষণা করতে চান, তবে কমনওয়েলথের সঙ্গে দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বন্ধ ছিন্ন করতে তিনি চান না। দক্ষিণ আফ্রিকা রিপাবলিক হয়ে কমনওয়েলথের ভিতরে থাকলে তাঁর আপত্তি নেই। কিন্তু মিঃ স্ট্রাইডম দক্ষিণ আফ্রিকাকে কেবল রিপাবলিক করতেই চান না, তিনি নাকি কমনওয়েলথের যোগ পর্যন্ত ছিন্ন করতে ইচ্ছুক। মিঃ স্ট্রাইডমের ইচ্ছা আছে বলেই যে তাই হয়ে যাচ্ছে তা নয়, তবে মিঃ স্ট্রাইডমের প্রধান-মন্ত্রী হওয়াতে দক্ষিণ আফ্রিকার বৃটিশ বংশোদ্ভূতদের দুশ্চিন্তা বৃদ্ধির কারণ আছে। আর আদিম আফ্রিকাবাসী এবং এশিয়বংশোদ্ভূতদের কথা? তাদের তো সমুদ্রে শয্যা—।

* *

সোভিয়েট রাশিয়ার আমন্ত্রিত মস্কো কনফারেন্সে পশ্চিমা শক্তিরা কেউ যোগ দেয়নি। কেবল পূর্ব য়ুরোপের সোভিয়েট আওতাভুক্ত রাষ্ট্রগুলির প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। চীনের প্রতিনিধিও ছিলেন। কনফারেন্সে তর্ক বিতর্ক কিছুই হয়নি। সকলে একবাক্যে স্থির করেছেন যে, পশ্চিমা শক্তিরা যেমন জোটবদ্ধ হচ্ছে তেমনি এপক্ষেও হওয়া আবশ্যক। পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের উত্তর পূর্ব জার্মানী দিত। সমস্ত পূর্ব য়ুরোপে সামরিক শক্তির বৃদ্ধির আহবান জানানো হয়েছে। পশ্চিমা শক্তিদের ভাব হচ্ছে- "ওতে আমরা ভুলছি না, আগে লণ্ডন ও প্যারিসের সিদ্ধান্তগুলি পাকা হোক তারপর দেখা যাবে কথাবার্তা কয়ে লাভ আছে কিনা।"

৬।১২।৫

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনার অন্তরালে এরা

শ্রীসংযুক্তা কর

কতদিন কাব্যে পড়েছি, কতদিন গল্পে শুনেছি, কত স্তব্ধ রাতের অন্ধকারে অনন্ত আকাশের দিকে চেয়ে ভেবেছি—সেই সব কথা আর সেই সব কাহিনী! সেই যে—দীর্ঘ তপস্যার শেষে কোন এক সুবর্ণ বেলায় দেবতার হল আবির্ভাব। অঙ্গসৌরভে গন্ধবহ-সমীরণ ছুটে বেড়াল। কান্তির দিব্যপ্রভায় ম্লান হয়ে গেল কুসুমের দল; ঝলসে উঠল দশ দিক; মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে রোমাঞ্চিত হল তাঁর আগমনীর বাণী—'তোরা শুনিস নি কি শুনিস নি তার পায়ের ধ্বনি? সে যে আসে আসে আসে!'

কিন্তু এ কেমনতর আবির্ভাব? দিব্য-কান্তি ব্রাহ্মণকুমার—শুদ্ধাচারী—অতিরিক্ত মাত্রায় নিষ্ঠাচারীও। পরবর্তী কালের জগৎবন্দিত শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব নন—এ ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র গদাধর। কত শঙ্কা, কত সন্দেহ। মাহিষ্য প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে কেমন করে যাব? কেমন করে করব সেখানকার অন্ন গ্রহণ! অগ্রজ যখন অশূদ্রযাজী পিতার সন্তান হয়েও শূদ্র-প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে পূজকের পদ গ্রহণ করলেন তখন কত অভিমান!

কিন্তু আসতে তাঁকে হল। নইলে যে এক মহাসাধনীর বুঝি কত জন্ম-জন্মান্তরের তপস্যা যায় ব্যর্থ হয়ে। কত কুণ্ঠাভরে যে দেবালয় অঙ্গনে তিনি একদা পদার্পণ করেছিলেন—সেই দেবালয়কে কেন্দ্র করেই তিনি পরবর্তী জীবনে বাজিয়ে দিলেন তাঁর বেদান্তের সনাতন ভাষ্যের সেই নবীন ভেরী—যত মত তত পথ। যত্র জীব তত্র শিব। আলোক-মাতাল বাতাসের মতই সে বার্তা জড়বাদে অচৈতন্য জগতের কানে কানে পৌঁছে গেল। আত্মোপলব্ধির গভীর চেতনায় নিজেকে আবিষ্কার করল বিপথগামী সমাজচেতনা। নিজেকেই শুধু চিনল তা নয়, চেনাল জগতকেও। এত বড় মহালগ্ন জাতির জীবনে বুঝি দুবার আসে না।

কোন্ মহীয়সীর জীবন ধন্য করে কোন্ পুণ্য অঙ্গনে ঘটল এর প্রকাশ? কে সে সাধনী?

বোধিসত্ত্ব গৌতমবুদ্ধের যেমন

শ্রীরামকৃষ্ণ

সারনাথ মৃগদাব; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের যেমন নীলাচল আর মায়াপুর শ্রীধাম। শ্রীরামকৃষ্ণের তেমনি দক্ষিণেশ্বর। এরই প্রতিষ্ঠাত্রী পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণি।

শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবন প্রবাহ যদি কলুষতা-মলিন এ যুগের পবিত্র জাহ্নবীধারা হয়, তবে রাণী রাসমণি তার ভগীরথ। তাঁর পবিত্র জীবনবেদের প্রথম উদ্‌গাত্রী। তাঁর প্রথম প্রহরের প্রহরী—নিদ্রিত চিত্তের জড়িমা ভাঙিয়ে যিনি প্রথম বলেছিলেন—ওঠো। জাগো। দেখ—দ্বারে তোমার কে?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার রাণী রাসমণির প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'রাণী রাসমণি অষ্টনায়িকার একজন'। সেই যে একবার রঙ্গ করে তিনি বলেছিলেন—'সব কলমীর দল গো! একদিকে টানলে সব এসে পড়বে!' রাণী রাসমণি এই কলমীদলের একটি প্রান্তভাগ। ফুলটিকে পরিপূর্ণ বৈভবে ফুটিয়ে তোলার জন্য আলোকে বাতাসে জলে স্থলে একটি প্রশস্ত আনন্দ-কল্লোর শিহরণ জাগে। অবতার পুরুষের পুণ্য আবির্ভাবের সহায়কল্পে তেমনি অনুকূল প্রতিবেশ সৃজনের জন্য আসেন একদল অন্তরঙ্গ—পরিচয় যাঁদের বাহ্যরূপে নয়—কাজে।

আদরের ডাক নাম রাণী আর রাসমণি তাঁর ভাল নাম। গরীব ঘরামির মেয়ে—কিন্তু হৃদয়ের অতুলনীয় ঐশ্বর্যের প্রভাব বাইরের ভুবনমোহিনীরূপেও বুঝি প্রকাশ পায়। নিতান্ত অসমঘরের কন্যা হয়েও এই রূপের জনাই তিনি ঘরনী হয়ে এলেন জানবাজারের ধনাঢ্য জমিদার শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র দাসের। বাল্যে মা বাবার দেওয়া রাণী নাম তাঁর সার্থক হল। হৃদয়ের প্রসারতায় ও দাক্ষিণ্যে, বিচক্ষণতায় এবং তেজস্বিতায় যোগ্য স্বামীর তিনি যোগ্যতরা পত্নী।

কিন্তু এ তাঁর বহিরঙ্গ পরিচয়মাত্র—অন্তরঙ্গ পরিচয় তাঁর একটি সেবানম্র ভক্তিপ্লুত নারীরূপে। বিংশশতাব্দীর জড়শিক্ষায় শিক্ষিত সমাজের বুকে, বিলাস নগরী কলিকাতার উপান্তে,—পরীক্ষণে আর নিরীক্ষণে অভ্যস্ত অবিশ্বাসী চোখের সামনে যে দিব্যজীবনলীলা ঘটে গেল—তারই উপযুক্ত আসর রচনার ভার নিয়েই যেন তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। ত্রিসন্ধ্যা জপ, শুদ্ধাচার, দেবদ্বিজে অচলা-ভক্তি—তীর্থে তীর্থে দেবসেবায় অকৃপণ দান—দিন কাটছিল এই নিয়েই। বাসনা জাগল একবার 'বিশ্বেশ্বর দর্শনের। ঘাটে দশখানি বজরা ধনে পরিজনে সাজিয়ে পুণ্যধাম বারাণসীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন বটে, কিন্তু বিধাতার অভিপ্রায় ছিল স্বতন্ত্র। পথিমধ্যে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ পেলেন দেবীকে প্রতিষ্ঠার। সঙ্গের ধনরত্ন বিলিয়ে দিয়ে যাত্রা স্থগিত রইল। অন্বেষণ চলল শক্তিপীঠের। অবশেষে এই কূর্মপৃষ্ঠা-

কৃতি শ্মশানভূমির—যোগ্যতম শক্তিপূজার স্থানের সন্ধান মিলল দক্ষিণেশ্বর গ্রামে। অসংখ্য বাধা—শাস্ত্রীয় ও লোকাচারসম্মত—অসংখ্য বিপত্তিকে জয় করল রাণীর অন্তরের ভক্তির ব্যাকুলতা। অবশেষে ১২৬২ সালের ১৮ই জৈষ্ঠ্য স্নানযাত্রার দিন প্রতিষ্ঠিত হল দেবালয়। অন্তরের ভক্তি-অর্ঘ্য অপূর্ব সে দেবালয়ের নিত্য-মুখরিত শঙ্খঘণ্টাধ্বনিতে, উত্তরবাহিনী গঙ্গার পবিত্র কলোচ্ছ্বাসে, সুরম্য কাননের অপরূপ পুষ্প-সম্ভারে প্রকটিত হল। সঙ্গে সঙ্গে রচিত হল যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণের পূর্ণ প্রকাশের পাদপীঠ। এ বিধি অলক্ষ্য কিন্তু অলঙ্ঘ্য।

দক্ষিণেশ্বরের নূতন শক্তিপীঠ। এক-দিকে তার দ্বাদশ শিবমন্দির, অন্য এক-দিকে বিষ্ণুমন্দির ও কালীমন্দির। বৈষ্ণব, শাক্ত ও শৈব—হিন্দু ধর্মের তিনটি প্রধান পন্থা পরম হৃদ্যতায় যেন গলাগলি করে আছে। যে বিশ্বজনীন উদার ধর্মমহা-সমন্বয়ের ঋত্বিক ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ—তারই অনুকূল একটি মনোজ্ঞ পূর্বাভাস রচনা করে দিলেন রাণী রাসমণি। সেই আভাসে বিশ্বাস সংযোজনা করলেন পরম-হংসদেব। মুগ্ধ জগৎ অবাক বিস্ময়ে লাভ করল নবীন সংজ্ঞা—। যত মত তত পথ রূপ সার্বভৌম মন্ত্রের মূর্তবিগ্রহ ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। কিন্তু তিনি শুধু প্রচারেই ক্ষান্ত থাকেন নি, একে একে সকল পন্থায় সাধনা ও সিদ্ধিলাভ করে সে সত্যের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর এ সাধনায় সহায়ক হয়ে স্বয়মাগত হয়েছিলেন যে অসংখ্য বৈষ্ণব মহাজন, শৈব, শাক্ত, রামায়েৎ প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থার মহাপুরুষ-বৃন্দ তাঁদের শুভ পদার্পণ এ দক্ষিণেশ্বরের তীর্থক্ষেত্রকে উপলক্ষ্য করেই। নীলাচল ও নবদ্বীপধাম যাবার পথে ক্ষণিক বিশ্রাম লাভ তাঁদের আপাত উদ্দেশ্য। কিন্তু সেই আগমন ও সংযোগকে কেন্দ্র করেই অঙ্কুরিত হল এক মহাজীবনের প্রতিশ্রুতি।

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের বিরাট সাধনার প্রসঙ্গে বিমুগ্ধচিত্তে স্বতই মনে পড়ে তাঁর কথা যিনি এই পবিত্র যজ্ঞের সমিধ আহরণের ভার গ্রহণ করেছিলেন। সেই রাণী রাসমণিকে—শবরীর মত তপস্যার প্রতীক্ষায় যিনি হৃদয়ে তাঁর চরণধ্বনি গণেছিলেন। শুধু কি তাই? দিব্য-

সারদা দেবী

প্রেমোন্মাদনায় শ্রীরামকৃষ্ণদেবের যখন কখনো বালকবৎ, কখনো উন্মাদবৎ কখনো বা জড়বৎ আচরণ, যখন বাইরের জগৎ তাঁকে দেখে হেসেছে, উপেক্ষা করেছে—তখন একটি নিবাতনিষ্কম্প ভক্তির উজ্জ্বলশিখা হৃদয়ে জ্বালিয়ে রেখে দু'খানি ভক্তিনম্র হাতের সুনিপুণ সেবা দিয়ে গেছেন রাণী রাসমণি—নিষ্ঠায় বিচলন নেই, অন্তরের ঐকান্তিকতায় নেই কোন স্খলন। দক্ষিণেশ্বরের দেবালয় অঙ্গনে তখন যে পূত ব্রহ্মাগ্নি

রাণী রাসমণি

জ্বলে উঠেছিল—রক্ষা করেছেন তাকে সকল রকমে। এ অগ্নি নিববার নয় তা জানি—কিন্তু তবু একটি অনুকূল প্রতি-বেশের তার প্রয়োজন ছিল না কি?

শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পটভূমিকায় দ্বিতীয় অঙ্কে যে মহীয়সীর সন্ধান আমরা পাই তিনি ভৈরবী যোগেশ্বরী ব্রাহ্মণী।

পূর্ব পরিচয় অস্পষ্ট ও অজ্ঞাত। আবাল্য বিধবা—পূর্ববঙ্গের কোনো অখ্যাত কি প্রখ্যাত গ্রামে তাঁর জন্ম জানা নাই। কঠোর তপশ্চারিণী সিদ্ধকামা। সুদুশ্চর তন্ত্রমতে কঠিন সাধনায় সিদ্ধি-লাভ করলেও বাঞ্ছিত ইষ্টের দর্শন-আকাঙ্ক্ষায় দেশে দেশে তখন তিনি পাগলিনীর মত ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। দর্শন মিলবে তিনি জানেন। কিন্তু কে বলে দেবে তার পথ—কে দেবে তার সন্ধান?

অবশেষে সকল অন্বেষণের শেষ—সেই রৌদ্রকরোজ্জ্বল প্রথম দিনটি এল তাঁর জীবনে—সত্যিই। নিজেরও অজ্ঞাতে তিনি দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড়িতে কোন এক পরম প্রাপ্তির আকর্ষণেই যেন চলে এলেন।

অজ্ঞাতকুলশীলা ভৈরবী আর কাম-কাঞ্চনে নিস্পৃহ উদাসীন শ্রীরামকৃষ্ণ এক অদ্ভুতভাবে উভয়ের সাক্ষাৎকার হল।

তারপর? তারপর সেই দিশাহারা জাহ্নবীর শেষ সঙ্গম-তীর্থ সাগরের সামনে এসে থমকে দাঁড়ালো সকল চাওয়ার শেষে পরম পাওয়ার সন্ধান। ভৈরবীর স্বপ্নে দেখা ইষ্টদেব সত্যই শ্রীরামকৃষ্ণরূপে দর্শন দিলেন।

সর্বশাস্ত্রপারঙ্গমা, মহাবিদুষী, প্রগা[illegible] ভক্তিমতী এবং তন্ত্রমতে সিদ্ধিসম্পন্ন ভৈরবী যোগেশ্বরী প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করলেন এই মরতনুতে কোন্ ভাগবত কায়ার প্রকাশ। শুধু উপলব্ধি করে ক্ষান্ত রইলেন না।—সগর্বে এবং সর[illegible] সকলের কাছে প্রচার করে ফিরে লাগলেন—"এবার নিত্যানন্দের খোলে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব।" শ্রীরামকৃষ্ণ তখন সাধনার উচ্চাবস্থা। দিব্যোন্মাদন এবং রাগাত্মিকা ভক্তির প্রতিটি লক্ষণ ও দিব্যদেহে পূর্ণ প্রকট। ইতরজনে যে লক্ষ[illegible] দেখে ব্যাধির আশঙ্কা করেছে। ব্যাক

করেছে বিবিধ চিকিৎসার ব্যর্থ-আয়োজন—একদৃষ্টিতেই ব্রাহ্মণী তাকে শাস্ত্রোক্ত মহাভাবস্বরূপ বলে বুঝতে পারলেন। শাস্ত্রের নজীর দেখিয়ে তিনি সকলের কাছে প্রমাণ করে ফিরতে লাগলেন—এ ব্যাধি নয়, উন্মাদনা নয়। এ সেই মহাভাব যে মহাভাব একবার হয়েছিল গোকুলে শ্রীমতীর, নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যের। সমস্ত ওষুধের জঞ্জাল দূরে সরিয়ে রেখে তিনি ঈশ্বরবিরহানলে জর্জরিত দেহে স্রক্ চন্দনের প্রলেপ দিলেন—দূর করলেন তাঁর উৎকট অসহ্য গাত্রদাহ।

প্রেম পাগলিনী যশোদার ভাবে মাতোয়ারা ভৈরবী ব্রাহ্মণীই প্রথম হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বিশ্বের প্রয়োজনে স্বয়ং ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণদেহে অবতীর্ণ। শুধু বিশ্বাস নয় এ প্রগাঢ় অনুভূতি এবং উপলব্ধি। যে উপলব্ধির সঙ্গে সায় আছে স্বয়ং শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শন ও স্পর্শনের।

তবু আরো প্রমাণ চাই। দুঃসাধ্য ব্রতে নিয়োগ করলেন ভৈরবী শ্রীরামকৃষ্ণকে। অচিরে ভৈরবীনির্দিষ্ট সেই পন্থায় সিদ্ধিলাভ করে শ্রীরামকৃষ্ণের দেহলাবণ্য কখনো চাঁদের কিরণে উছলে উঠল; কখনো অগ্নিবিভায় ঝলসে উঠল; ছায়া-শূন্য দিব্যকায়ায় পরিণত হল কখনো। দিব্যতনু ব্যতীত যে লক্ষণগুলির প্রকাশ কখনো সম্ভবপর নয়—একে একে প্রত্যেকের করতলগত আমলকের ন্যায় সহজলভ্য হল তারা।

একটি পরম আবিষ্কারের আনন্দে মেতে গেলেন ব্রাহ্মণী। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণদের আহ্বান করলেন। ডাকলেন বৈষ্ণবচরণ, গৌরীপন্ডিত এবং দিগ্বিজয়ী ইন্দেশের পন্ডিতকে। কালিবাড়ির প্রাঙ্গণে বিচার-সভায় বিশ্লেষণের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে মানদণ্ডে তিনি সকলের সামনে প্রমাণ করলেন এবং করালেন যে শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বয়ং অবতার। এতে শাস্ত্রের বিরোধ নেই। বরং পূর্ণ সমর্থন আছে। জগৎ-সভামাঝে এ যুগের অবতার শ্রীরামকৃষ্ণ-দেবের পূর্ণাবির্ভাব হল। মহাভৈরবী ব্রাহ্মণীর প্রগাঢ় প্রজ্ঞারমুকুরে এতদিনে শ্রীরামকৃষ্ণ-পরমহংসদেবের প্রকাশলগ্ন উদ্‌যাপিত হল—একথা বিস্ময়ের নয় কি?

শ্রীরামকৃষ্ণদেব একবার শ্রীশ্রীসারদা-দেবী প্রসঙ্গে বলেছিলেন—'ও যদি এত ভাল না হত তবে জানিনা কি হত।' অর্থাৎ শ্রীরামকৃষ্ণদেবের পরমহংস-স্বরূপের পরিপূরক হচ্ছেন—সারদাদেবী। ব্যতিরিক্ত সত্তা নয় যাঁকে বাদ দিলেও চলে—ঘনিষ্ঠ অন্তরঙ্গ সম্পর্ক। যাঁকে বাদ দিলে পরিচয় অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

বৈষ্ণবকাব্যে আছে শ্রীরাধা যাবেন শ্যাম-অভিসারে। অঙ্গের বরণ তিনি ঢেকেছেন নীলাঞ্চলে। পদমঞ্জীর তিনি বেঁধে নিয়েছেন। চলেছেন ঘন অন্ধকারে দুর্গম ও পিচ্ছিল পথে। যেতে যে তাঁকে হবেই। পরমপুরুষ আহ্বান করেছেন পরমা প্রকৃতিকে। এই দুই-এর মিলনেই লীলার পূর্ণতা। সারদামণি শ্রীরামকৃষ্ণের এই পরমা প্রকৃতি। অগ্নির যেমন দাহিকা-শক্তি। দুঃখের বন্ধুর পথে—দারিদ্রের পিচ্ছিলতায় তাঁর আগমন। বাহ্যাবরণ শ্যামাবরণে আবৃত। কিন্তু অন্তরে সদা-জাগ্রত ব্রহ্মপদ্মের দিব্য সৌরভ। যে সৌরভ শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনকমলে মিলিত হয়ে যে অপার্থিব কাব্য সৃজন করল জগতের ইতিহাসে তার দ্বিতীয় তুলনা নেই। সেবা, অপাপবিদ্ধতা, কায়েন মনসা বাচা অলৌকিক পবিত্রতাস্বরূপিণী সারদামণি যদি সারদামণি না হতেন তবে শ্রীরামকৃষ্ণ শ্রীরামকৃষ্ণ হতেন কি না এ উক্তি স্বয়ং ঠাকুরের। শ্রীরামকৃষ্ণ যখন বলেছেন 'মন ভাবের ঘরে চুরি কোরো না' তখন সারদামণি বলেছেন—'জ্যোস্নারাতে চাঁদের দিকে চেয়ে বলতুম, মা চাঁদেরও কলঙ্ক আছে। আমাকে নিষ্কলঙ্ক কর। নির্মল কর ঐ জ্যোৎস্নার মত।' ভাবগ্রাহিকা পত্নী স্বামীকে লোকোত্তর একটি প্রিয়তম পারে উত্তরণ করায় সম্পূর্ণ সহায়তা করে-ছিলেন।

শ্রীমৎ তোতাপুরীজী বলেছিলেন, 'স্ত্রী সান্নিধ্যেও যাঁর প্রেম, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা সম্পূর্ণ অটুট থাকে তিনিই যথার্থ ব্রহ্মজ্ঞ।' ন বা অরে পতিকামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি। আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ঃ ভবতি। (বৃঃ উঃ)। এ বোধ শুধু শ্রীরামকৃষ্ণেরই নয়। সারদামণি-দেবীরও। পরবর্তী জীবনের প্রত্যেকটি আচরণে তাঁর এই গভীর বোধের স্বাক্ষর আছে।

সন্ন্যাসী স্বামীর সন্ন্যাসিনী পত্নী। উভয়ের যুগ্মজীবনের মিলিত পটভূমিকায় পরস্পরের জীবন পরিপূর্ণ মহিমায় বিকশিত হয়েছে। যুগ্মজীবনের দাম্পত্য ইতিহাসে রচিত হয়েছে সেই সনাতন সত্য—"তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা।" এখানে সারদামণি শ্রীরামকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ লীলা-সহচরী। সারদামণি বিহনে শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন-কাব্য অসম্পূর্ণ। স্বামীকে তিনি একাধারে কান্ত, গুরু ও ইষ্টরূপে লাভ করেছিলেন। কামনা করেছিলেন একমাত্র শরণরূপে। প্রিয়েরে দেবতা করার মরমীয়া সাধনায় ভক্তির বৃন্দাবনে পরিণত তাঁর হৃদয়মনে একমাত্র দেবতা ছিলেন শ্রীরামকৃষ্ণ। এ এক অপূর্ব মধুক্ষর ইতিহাস। যে ইতিহাসের স্বাধিকারের গৌরবে তাপদগ্ধ সংসারে তিনি সুধা

সিঞ্চন করে গেছেন কোন্ সুধাসাগরের তীরে বসে।

যুগে যুগে যখন অবতার পুরুষের ধর্ম্মের গ্লানি মোচনের জন্য আবির্ভাব আসন্ন হয় তখন গন্ধবহ সমীরণের মত, মেঘমুক্ত রৌদ্রস্নাত নীলাকাশের মত প্রয়োজন হয় একটি উদার ব্যাপ্তির, যে ব্যাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে সেই মহামানবের আগমন সুগম হবে। শ্রীরামকৃষ্ণের অবতরণিকার পবিত্র ব্যাপ্তি রচনা করে-ছিলেন সারদামণি, ভৈরবী ও রাণী রাসমণি। জগৎ যখন তাঁকে আবিষ্কার করেনি তখন সেই অপরিচয়ের স্তিমিতা-লোকে তাঁর পূর্ণ প্রকাশের পথ সুগম করার জন্য প্রজ্ঞার প্রদীপ জ্বালিয়ে দিয়ে-ছিলেন এই তিন সাধ্বী মহীয়সী—শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সাধনার পটভূমিকায় তিনটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। সন্ধান দিয়ে-ছিলেন তাঁরা একটি গুপ্ত অমৃতকুম্ভের যার লোভে দলে দলে মধুলোভী ভৃঙ্গ ছুটে এসেছিল। কিন্তু সে অন্য প্রসঙ্গ।

শ্রীঅরবিন্দের বঙ্গপ্রীতি

শ্রীসনৎকুমার মিত্র

সাত বৎসর বয়সে যখন অরবিন্দ ঘোষকে তাঁহার পিতা ডাঃ কৃষ্ণ- ন ঘোষ শিক্ষার জন্য অরবিন্দের দুই গ্রজ বিনয়ভূষণ ঘোষ, মনোমোহন ঘোষ, গিনী সরোজিনী ও তাঁহাদের মাতা মতী স্বর্ণলতাকে লইয়া ইংলণ্ডে যান, খন বাঙ্গলা দেশে উচ্চ-শিক্ষিত ও বলাত-প্রত্যাগত সমাজে দেশীয় সকল কার আচার-ব্যবহার, আহার বিহার ও থাবার্তা পোশাক-পরিচ্ছদ ইংলণ্ডের নুকরণে চলিত। এই সমাজে কথাবার্তাও ংরাজী ভাষায় চলিত। এমনকি পিতা ত্রে, ভ্রাতা ও ভগ্নীর মধ্যেও ইংরাজী ভাষায় কথাবার্তা হইত। ক্বচিৎ হিন্দি ভাষায়ও কথা হইত। কিন্তু কথনই বাঙ্গলা ষা ব্যবহার করা হইত না। আহার- হারেও বিলাতী খাদ্যের অনুকরণে সিদ্ধ ও পোড়া (boiled and roast) চপ, কাটলেট, সুপ, পাঁউরুটি ইত্যাদি। যদিও কেহ কেহ দ্বিপ্রহরের আহারের সময়ে সামান্য পরিমাণ ভাত ঐ সঙ্গে আহার করিতেন। পোশাক-পরিচ্ছদ সম্পূর্ণভাবে বিলাতী ফ্যাসানে ছিল। নিজেদের গৃহে এই সমাজ বাঙ্গলায় কথা বলিতেন না, বিশেষত বাহিরের লোকের সঙ্গে ইংরাজীতে ছাড়া কথা বলিতেন না। তাহাতে অপরপক্ষ বুঝুক বা না-ই বুঝুক। বাঙ্গলা দেশে সাহেবীয়ানার এই অবস্থা দেখিয়া এই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজকে বিদ্রূপ করিয়া দেশভক্ত বিখ্যাত কবি দ্বিজেন্দ্রলাল হাসির গানে এই সমাজের ছবি প্রকাশ করিয়াছিলেন

আমরা বিলেত ফের্তা ক' ভাই
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই

* * *

আমরা বিলাতী ধরনে হাসি
আমরা ফরাসী ধরনে কাসি
পা ফাঁক করে সিগারেট খেতে
বড্ডই ভালবাসি

* * *

রাম, কালিপদ, হরিচরণ
নাম এ সব সেকেলে ধরণ
তাই নিজেদের ডে, রে ও মিটার
করিয়াছি নামকরণ

* * *

আমরা সাহেবের সঙ্গে পটি
আমরা মিষ্টার নামে রটি
সায়েব না বলে যদি 'বাবু' কেহ বলে
মনে মনে ভারী চটি

ইত্যাদি

যাঁহারা বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিতেন তাঁহারা ত সাহেব সাজিতেনই, তাহা ব্যতীত যাঁহারা উচ্চ পদের কর্মচারী, যাঁহারা ধনী তাঁহারাও সাহেব সাজিতেন ও সাহেবিয়ানা করিতেন। তাঁহাদের বাড়িতে বেয়ারা, বাবুর্চি, খানসামা থাকিত; অন্তত একজন মুসলমান ভৃত্যও থাকিত। যেহেতু ইংরাজগণ মুসলমান চাকরই বেশী রাখিতেন। তাঁহাদেরও ঘরে ঘরে পর্দা ঝুলিত। তাঁহারা স্নান করিতেন না—গোসলখানায় যাইতেন; আহার করি- তেন না—খানা খাইতেন। এই ভাবে বাঙ্গালী তখন অশিক্ষিত অথবা দরিদ্রের নিকট হইতে কিছু বেশী মান সম্ভ্রম পাইবে এই ইচ্ছা ও মনোভাব ছিল। বিলাতফেরৎ ও ধনীসকল তাঁহাদের
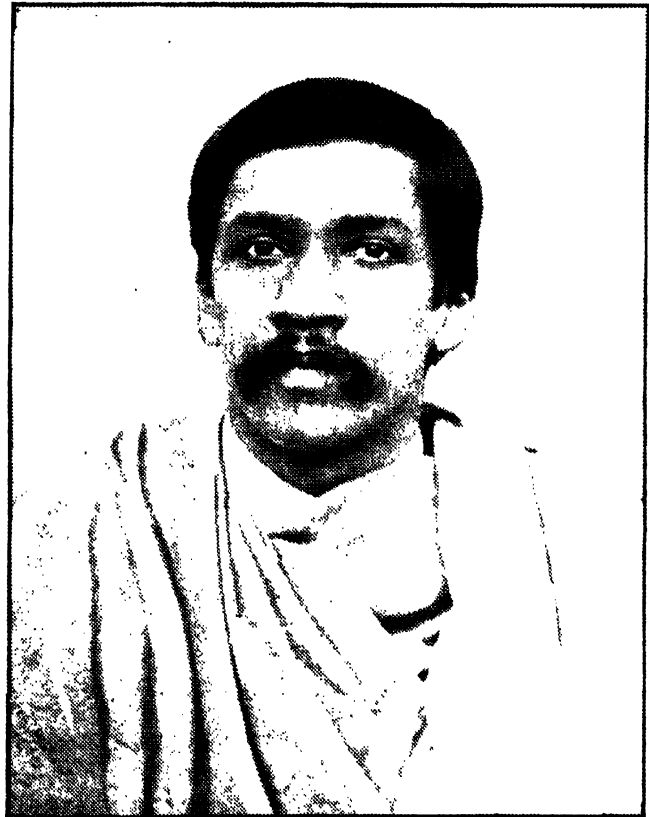
শ্রীঅরবিন্দ

জাতীয়তা ত্যাগ করিতেছিলেন। এই সাহেব-ঘেঁষা ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজ তাঁহাদের নিজগৃহে উৎসব পার্বণে তাঁহাদের মনিব ইংরাজদের নিমন্ত্রণ করিতেন ও এই সকল ইংরাজ তাঁহাদের গৃহে পদার্পণ করিলে তাঁহারা আপনাদিগকে ধন্য মনে করিতেন।

সমাজের যখন এই অবস্থা তখন অরবিন্দের মাতামহ রাজনারায়ণ বসু, স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন দেখিতেছেন, জাতীয় পতাকার কল্পনা করিতেছেন, ভারত যখন ইংলণ্ডকে পদানত করিয়া তথায় রাজত্ব করিবে তখনকার সেদেশের অবস্থা কল্পনা করিয়া লিপিবদ্ধ করিতেছেন। তিনি হিন্দুমেলা চালাইতেছেন ও অন্ধকার ঘরে প্রদীপ জ্বালাইয়া নর-কঙ্কালের সমক্ষে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া মাতৃসেবার জন্য গুপ্ত সমিতি গঠন করিতেছেন।

দেশের মানসিক অবনতি অবলোকন করিয়া রবীন্দ্রনাথও বড় দুঃখে তখন ভারতমাতার মর্মবেদনা প্রকাশ করিলেন—

কে এসে যায় ফিরে ফিরে
আকুল নয়ন নীরে
কে বৃথা আশা ভরে চাহিছে মুখ পরে
সে যে আমার জননী রে।

• • •

কাহার সুধাময়ী বাণী মিলায় অনাদর মানি
কাহার ভাষা হায় ভুলিতে সবে চায়
সে যে আমার জননী রে।
পুণ্যকুটিরে বিষন্ন কে বসি সাজাইয়া অন্ন
সে স্নেহ উপহার রোচে না মুখে আর
সে যে আমার জননী রে।

অরবিন্দের পিতা ডাঃ কে ডি ঘোষ বিলাতী আচার-ব্যবহার পছন্দ করিতেন। তিনি তাঁহার পুত্রদিগকে কলিকাতার দেশীয় স্কুলে না পাঠাইয়া দার্জিলিংয়ে ইংরাজ পরিচালিত সেণ্ট পল'স স্কুলে শিক্ষালাভের জন্য পাঠাইয়া ছিলেন। অরবিন্দের যখন সাত বৎসর বয়স তখন এই ইঙ্গ-বঙ্গ সমাজের পরিবেশের মধ্য হইতে খাস বৃটিশ জাতির মিঃ এ ক্রয়েডের পরিবারে ইংলণ্ডের অন্তর্গত ম্যানচেস্টারে যাইয়া তাঁহার পিতা সপরিবারে বাস করিতে থাকেন।

এই এ ক্রয়েড পরিবারের সহিত ডাঃ ঘোষের বিশেষ বন্ধুতা ছিল। বন্ধুবৎসল ডাঃ কৃষ্ণধন তাঁহার তৃতীয় সন্তানের নাম তাঁহার বন্ধুর নামের সহিত সংযোগ করিয়া নাম দিলেন অরবিন্দ এক্রয়েড ঘোষ। ডাঃ কে ডি ঘোষ একই কারণে তাঁহার অপর এক নিকটতম বন্ধু ও তৎকালীন বিখ্যাত ব্যারিস্টারের নামানুসারে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রের নাম মনমোহন ঘোষ রাখিয়াছিলেন। ম্যানচেস্টারে পাঁচ বৎসরাধিককাল শিক্ষা প্রাপ্তির পর ১৮৮৫ সালে অরবিন্দ লণ্ডনে আসিয়া সেণ্টপলস স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। ইতিমধ্যে কেণ্ট জেলায় তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বারীন্দ্রকুমার জন্মগ্রহণ করে। ঐ দেশের আইনানুসারে নবজাতকের নাম রেজিস্টি করিতে হয়। রেজিস্ট্রি খাতায় তাঁহার নাম হয় ইম্যানুয়েল বারীন্দ্রকুমার ঘোষ। অরবিন্দ ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় প্রশংসার সহিত উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইবার পরে কেম্ব্রিজে কিংস কলেজে দুই বৎসর শিক্ষালাভ করেন। ১৮৯০ সালে আই সি এস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ইহার পরও দুই বৎসর শিক্ষাধীন থাকেন। পরে এদেশে প্রচারিত হয় যে তিনি অশ্বারোহণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন নাই বলিয়া চাকুরী পান নাই। এরূপ প্রকাশ পাইয়াছে যে তিনি নিজেই এই পরীক্ষা দিতে যান নাই। ইহাতে তাঁহার অগ্রজ রুষ্ট হন। এই কলেজে পাঠের সময়ে তাঁহাকে অত্যন্ত অভাব-অনটনের মধ্য দিয়া দিন কাটাইতে হইয়াছে।

তিনি স্বদেশে ফিরিবার কালে তাঁহার জাহাজডুবি হইয়াছে এই সংবাদ তাঁহার পিতা ডাঃ ঘোষের নিকট পৌঁছে। ইহাতে তিনি অত্যন্ত শোকার্ত হন এবং তাহার কিছুকাল পরে ভগ্ন হৃদয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ১৮৯২ সালে বরোদার গাইকোয়াড় ইংলণ্ডে যান। তথায় গাইকোয়াড়ের সহিত অরবিন্দের সাক্ষাৎ হয়। গাইকোয়াড় অরবিন্দকে বরোদা রাজ্যে চাকুরীতে নিযুক্ত করেন। ১৮৯৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অরবিন্দ চৌদ্দ বৎসর ইংলণ্ডে বাস করিবার পরে স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। তাঁহার ভারত আগমনের পূর্বে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিনয়ভূষণ ভারতে আসিয়া কোচবিহারের মহারাজার অধীনে উচ্চ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডে রহিয়া গেলেন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা মনমোহন ঘোষ।

ইংলণ্ডে অবস্থানের সময়ে তি[illegible] পার্লামেণ্টে পার্নেলের নেতৃত্বে আয়া[illegible] ল্যাণ্ডের স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য সং[illegible] লক্ষ্য করেন। সেই ছাত্রাবস্থায় তাঁহা[illegible] স্বদেশের স্বাধীনতার প্রতি মন আকৃ[illegible] হয়। বিজাতীয় পরিবেশে লালিত-পালি[illegible] হইয়া ও বিদেশে দীর্ঘকাল বসবাস করিয়[illegible] অরবিন্দ আপন জন্মভূমির দুরবস্থার ক[illegible] চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং তখন হই[illegible] মনেপ্রাণে ভারতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হ[illegible] কিশোর বয়সেই তিনি ভারতবর্ষ ও ভার[illegible] বাসীর প্রতি আকৃষ্ট হন। তখন হইতে[illegible] ভারতমাতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবা[illegible] জাগে। তিনি যে পরিবেশের মধ্যে গ[illegible] হইয়াছিলেন এবং বাল্যকাল হইতে[illegible] বিদেশে থাকিতে বাধ্য হইয়াছিলে[illegible] ভারতের কৃষ্টির সহিত তাহার কো[illegible] সম্পর্ক ছিল না, তাহার মধ্যে স্বদে[illegible] প্রতি এই আকর্ষণ বিস্ময়ের কথা। তাঁ[illegible] দুই ভ্রাতা দেশে ফিরিয়া আসিয়া ইংলণ্ডে[illegible] দীর্ঘকাল অভ্যস্ত আহার-বিহার পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। কিন্তু অরবিন্দ ভারতে আসিয়া পিরালী পাগড়ী সংগ্রহ করিয়া মাথায় দিতেন; হা[illegible] পরিতেন না। গৃহে মাটিতে আসন পাতিয়া বসিয়া বাঙ্গালীর মত আহার করিতেন।

১৮৯৩ সালে বরোদার মহারাজার চাকুরী গ্রহণ করিয়া তিনি প্রথম রাজস্ব বিভাগে, পরে মহারাজার মহাধিকরণে তাহার পরে বরোদা কলেজে ইংরাজী ভাষার অধ্যাপক ও পরিশেষে তথাকার উপাধ্যক্ষ ছিলেন। এইভাবে বরোদা রাজ্যে ১৩ বৎসর কাল বিভিন্ন উচ্চ পদে নিযু[illegible] ছিলেন। বরোদার মহারাজা অরবিন্দে[illegible] প্রতিভায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাকে রাজস্ব বিভাগ হইতে বদলী করিয়া নিজে[illegible] সেক্রেটারীর কার্যে নিযুক্ত করেন। এ[illegible] সময়ে তিনি গায়কোয়াড়ের সহিত পরাম[illegible] করিয়া একজন বাঙ্গালীকে বরোদা রাজ্যে দেওয়ানরূপে নিযুক্ত করার পরিকল্প[illegible] করেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার মাত[illegible] মহ রাজনারায়ণ বসুকে এক গোপন পত্রে স্বর্গীয় রমেশচন্দ্র দত্তকে বরোদ[illegible] দেওয়ানী পদ গ্রহণ করিবার জন্য রা[illegible] করাইতে বলেন। ইহার ফলে পরে রমে[illegible] চন্দ্র তথাকার দেওয়ান হইয়াছিলেন। এ[illegible] জন বাঙ্গালীকে বরোদা রাজ্যের উচ্চ[illegible]

দে অধিষ্ঠিত করিয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন। এই বরোদা শহরে যতীন্দ্রনাথ সেনা বিভাগে ঢুকিবার জন্য অরবিন্দের সাহায্যপ্রার্থী হন। তিনি যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার জন্যই সেনা বিভাগে প্রবেশ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজের নিয়ম অনুসারে কোনও বাঙ্গালীকে সৈনিক বৃত্তি অবলম্বন করিতে দেওয়া হইত না। কোনও সৈনিকদলে যোগদান করিতে সমর্থ না হইয়া তিনি বরোদা রাজ্যে গমন করিয়া অরবিন্দের পরামর্শ ও সাহায্যে নিজের নাম পরিবর্তন করিয়া যতীন্দর উপাধ্যায় নামে ও উত্তর-পশ্চিম দেশের অধিবাসীরূপে বরোদার সেনা বিভাগে প্রবেশ করেন এবং যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করিতে থাকেন। তাঁহার সামরিক শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশকে দাসত্বমুক্ত করা।

ইংলণ্ডে বাসকালে অরবিন্দ ইংরেজী ভাষা ব্যতীত ল্যাটিন ও গ্রীক ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ম্যাঞ্চেস্টারে অবস্থানের সময়ে ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং নিজের চেষ্টায় জার্মান ও ইটালীয়ান ভাষা শিক্ষা করেন। ট্রাইপসে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় সর্বোচ্চ নম্বর পাইয়াছিলেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া অরবিন্দ বুঝিলেন যে, ভারতের প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা না করিলে ভারতের ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইবে না। অল্পকালের মধ্যে তিনি উহা আয়ত্ত করিলেন। তাহার পরে মারাঠা ও গুজরাটি ভাষা শিক্ষা করেন।

ছুটি পাইলেই তিনি বৈদ্যনাথে দেওঘরে তাঁহার মাতামহ রাজনারায়ণ বসুর নিকট আসিতেন এবং ছুটির অধিকাংশ কাল তথায় অতিবাহিত করিতেন। প্রথম যখন আসিলেন তখন বাঙ্গলা বলিতে পারিতেন না। বাঙ্গলা ভাষা শিখিবার জন্য অসীম আগ্রহ ছিল। নিজ আত্মীয়স্বজনের মধ্যে থাকিয়া সাধারণ কথাবার্তার মধ্যে যেটুকু বাঙ্গলা শিখিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার মাতুল যোগীন্দ্রনাথ বসুকে তাঁহার মনের কথা প্রকাশ করিলেন। তিনি বিশুদ্ধ বাঙ্গলা শিখিবার জন্য স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক দীনেন্দ্রকুমার রায়কে শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পরামর্শ দেন। অরবিন্দ তাঁহাকে বরোদায় লইয়া গিয়া তাঁহার নিকট বাঙ্গলা ভাষা শিখেন। বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিয়া তিনি বাঙ্গলায় সর্বপ্রথম পত্র লেখেন তাঁহার মাসতুতো ভগ্নী—'সঞ্জীবনী' সম্পাদক কৃষ্ণকুমার মিত্রের কনিষ্ঠা কন্যা বাসন্তীকে। ঐ পত্রে অন্যান্য কথার সঙ্গে তিনি লিখিয়াছিলেন—"বাঙ্গলা ভাষা শিখিয়া সর্বাগ্রে আমি তোমাকে চিঠি লিখিলাম।"

বাঙ্গলা দেশ ও বাঙ্গালীর প্রতি তাঁহার গভীর আকর্ষণ ছিল। তিনি তাঁহার মাসীমার (কৃষ্ণকুমার মিত্রের পত্নী) নিকট বাঙ্গালী পাচক চাহিয়াছিলেন। তাঁহার মাসীমার সুপারিশে অধর ঠাকুর নামে এক পাচককে বরোদায় লইয়া যান। অরবিন্দ বিবাহের পর এক বাঙ্গালী পরিচারিকাকেও তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। প্রায় প্রতি বৎসর তিনি কলিকাতায় আসিতেন এবং কলেজ স্কোয়ারে
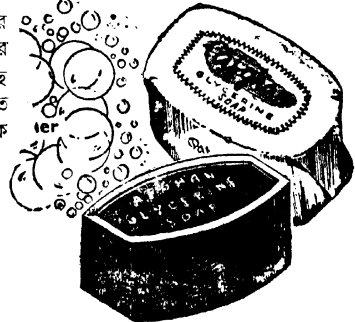
'সঞ্জীবনী' পত্রিকার গৃহে তাঁহার মাসীমার সহিত বাস করিতেন। মাণিকতলার বোমার মামলা হইতে খালাস পাইয়া তিনি আলিপুর জেল হইতে সোজাসুজি ঐ বাড়িতে আসিয়া উঠেন এবং ঐ বাড়ি হইতেই পণ্ডিচেরী গমন করেন।

বরোদার মহারাজা তাঁহাকে প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। বরোদার ঘোড়দৌড়ের মাঠের নিকট অরবিন্দ বাস করিতেন; তথা হইতে কলেজ দূরে থাকায় মহারাজা তাঁহাকে একটি ব্রুহাম গাড়ি দিয়াছিলেন। ঐ গাড়িতে তিনি কলেজে যাতায়াত করিতেন। রাত্রে তাঁহার বাড়ি পাহারা দিবার জন্য মহারাজা লোক পাঠাইতেন। রাজ্যশাসন, শিক্ষা, উন্নততর ব্যবস্থা প্রভৃতির জন্য পরামর্শ করিতে গায়কোয়াড় প্রায়ই অরবিন্দকে ডাকিয়া পাঠাইতেন এবং তাঁহার অভিমতকে উচ্চ স্থান দিতেন। বরোদা কলেজে কাজ করিবার সময় অরবিন্দ লেখাপড়া করিতেন এবং অনেক কবিতা ও প্রবন্ধ লিখিতেন। তন্মধ্যে Songs to Myrtilla নামক কবিতা পুস্তক অন্যতম। উহার এক এক খণ্ড তাঁহার আত্মীয়স্বজনকে উপহার দিয়াছিলেন। এক সময়ে তাঁহার কেম্ব্রিজের অধ্যাপক Prof. Williams ভারতবর্ষে বেড়াইতে আসিয়া ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রাজ্য বরোদায় যান। তথায় অরবিন্দকে খুঁজিয়া বাহির করেন। তাঁহার বাড়িতে কথোপকথনকালে প্রকাশ করেন যে, প্রাচীন ল্যাটিন গ্রীক ভাষায় পরীক্ষার উত্তরপত্র তাঁহার হস্তে পড়িয়াছিল, উহা দেখিয়া আমি সর্বোচ্চ নম্বর না দিয়া পারি নাই।

একবার কলিকাতায় আসিয়া অরবিন্দ কানাই ধর লেনে তৎকালীন 'যুগান্তর' পত্রিকার কার্যালয়ে বাস করেন। তাঁহার সঙ্গে এক গুজরাটি ভৃত্য ছিল। সে প্রতি বেলা মাত্র দুইখানি করিয়া রুটি তাঁহাকে খাইতে দিত। ঐ গৃহের কোন কোন কর্মী এত কম খাইতে দেয় কেন বলিয়া ঐ ভৃত্যকে প্রশ্ন করিলে ভৃত্য বলিল তিনি ঐরূপই আহার করেন। তখন কর্মিগণ তাহার কথায় বিশ্বাস না করিয়া তাঁহার খাদ্য বাড়াইয়া ক্রমে ৫।৬টি রুটি তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করিবার ব্যবস্থা করিল। একজন কর্মী একদিন তাঁহাকে বলিল আপনার ভৃত্য আপনাকে দুইখানি রুটি দিত আমরা তাহার স্থলে ছয়খানি দিতেছি। অরবিন্দ উত্তর দিলেন। 'তাই নাকি।'

১৮৯৯ সালে তিনি ২৭ বৎসর বয়সে বিবাহ করেন। তৎকালে তিনি কলিকাতার মেছুয়া বাজার স্ট্রীটে তাঁহার মেসো ও বিখ্যাত বাগ্মী জননায়ক রামগোপাল ঘোষের বাড়িতে ছিলেন। তথায় থাকা কালেই তাঁহার বিবাহ হয়। তিনি তাঁহার পত্নী ও ভগ্নীকে লইয়া বরোদায় ফিরিয়া যান।

বাঙলা দেশ, বাঙলা ভাষা ও বাঙালী তাঁহার প্রিয় ছিল। এই বাঙলা দেশ যখন দ্বিখণ্ডিত হইল তখন তিনিও বাঙলার জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। ক্রমে সমগ্র বাঙলা দেশের লোক অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদে তীব্র আন্দোলন চালাইতে লাগিল ও জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেশ খণ্ডিত করার প্রতিশোধস্বরূপ ইংলণ্ডীয় দ্রব্য বয়কট করিবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া প্রস্তাবানুসারে কার্য করিতে আরম্ভ করিল, তখন বাঙলার এই দুর্দিনে তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, উচ্চ বেতন ও উচ্চ পদ ত্যাগ করিয়া তিনি বাঙলার তথা দেশের সেবার জন্য কলিকাতায় ছুটিয়া আসিলেন এবং এই আন্দোলনের মধ্যে ডুবিয়া রহিলেন।

ছাত্রগণই এই আন্দোলনের পুরোভাগে ছিল। ইংরাজ গভর্নমেণ্ট ছাত্রগণের উপর কঠোর শাসন চালাইতে লাগিলেন। ছাত্রগণ তখন বিশ্ববিদ্যালয়কে গোলামখানা বলিয়া অভিহিত করিয়া জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য নেতাদের নিকট দাবী করিল। তাহার ফলে জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ও অরবিন্দ উহার প্রথম অধ্যক্ষ হন। ১৯০৭ সালে 'বন্দে মাতরম্' নামে ইংরাজী দৈনিক পত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট হন। ঐ সম্পর্কে তাঁহার বিরুদ্ধে মামলাও হয় এবং মুক্তি পাইলে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক সম্বর্ধিত হন। ১৯০৮ সালে বিখ্যাত মাণিকতলা বোমার মামলায় তিনি অভিযুক্ত হন ও ১৯০৯ সালে মুক্তি পান।

মুক্তি পাইয়া দেখেন বাঙলা দেশের প্রধান প্রধান নেতা ও কর্মী নির্বাসিত কিম্বা কারাগারে আবদ্ধ। তখন তিনি একাকী ভীত ও অবসাদগ্রস্ত জনসাধারণের মধ্যে উৎসাহ ও কর্ম সঞ্চার করিবার জন্য কার্য আরম্ভ করিলেন। ইংরাজীতে 'কর্মযোগীন' ও বাঙলায় 'ধর্ম' নামে দুইটি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া জাতীয়তাবাদ আন্দোলন একাকী চালাইতে মনস্থ করেন। ১৯১০ সালে তিনি পণ্ডিচেরী যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া 'সঞ্জীবনী' কার্যালয়ের সম্মুখে আসিলে লক্ষ্য করিলাম তাঁহার মুখে গম্ভীর ভাব। প্রিয় বাঙলা দেশ ছাড়িয়া যাইতেছেন। যে বাঙলাকে তাঁহার কর্মস্থল বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন, যে বাঙলা তাঁহার স্বপনের রাজ্য ছিল, যাহার উদ্ধারের জন্য মনপ্রাণ সমর্পণ করিয়াছিলেন সেই বাঙলা দেশকে তাঁহার ছাড়িয়া যাইতে হইল! তখন মনে তবু ক্ষীণ আশা ছিল ভবিষ্যতে কোনও দিন তিনি তাঁহার প্রিয় জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিবেন, কিন্তু তাহা আর হইল না।

পুনশ্চ

নরেন্দ্রনাথ মিত্র
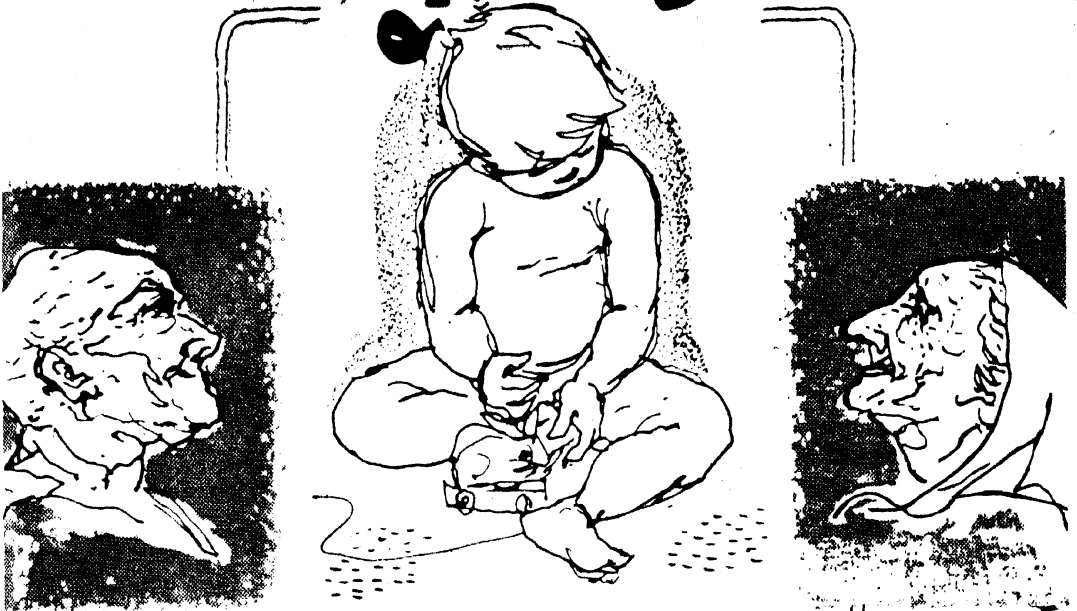
কাশীতে বিশ্বনাথ আর অন্নপূর্ণার মন্দির দর্শনের পর সুধাময়ী বললেন, 'আর ভালো লাগছে না জগু! চল কলকাতায় ফিরে যাই।' জগদীশ বিস্মিত হয়ে বললেন, 'সে কি মা, এখনো তো তোমার ত্রিতীর্থ হল না। এরই মধ্যে ফেরার কথা ভাবছ! কেন এবার সবতীর্থ সেরে যাও না।' সুধাময়ী ছেলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'না বাবা। তীর্থ করবার সাধ আমার মিটেছে। তীর্থে গিয়ে কি দেখব? মন্দিরে মন্দিরে ঠাকুর দেবতা দেখতে যাই, আমার সেই শত্তুরদের মুখ ঠাকুরের মুখকে ঢেকে দেয়। দেবদেবীর মুখ কোথাও তো দেখতে পেলাম না। মিছামিছি তোর একরাশ টাকা নষ্ট হ'ল। আরো নষ্ট ক'রে লাভ কি।'

জগদীশ বিষণ্ণভাবে হাসলেন, 'টাকা রেখেই বা আর লাভ হবে কি মা। টাকা কার জন্যে রাখব! সেকথা যাক। তুমি এখন কি করতে চাও বল। কলকাতায় ফিরে যেতে চাও?' সুধাময়ী বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, আমাকে সেখানেই ফিরিয়ে নিয়ে চল।'

জগদীশ মাথা নেড়ে বললেন, 'আমি যাব না। কাশী থেকে কতলোক রোজ কলকাতায় যাতায়াত করছে। তোমাকে সঙ্গী ধরিয়ে দিচ্ছি, টাকা দিচ্ছি, তুমি তাদের কারো সঙ্গে কলকাতায় চলে যাও, আমি আরো ঘুরব।'

সুধাময়ী যেন ছেলের কথাগুলি প্রথমে ভালো ক'রে বুঝতে পারলেন না, অপলকে তাকিয়ে রইলেন, জগদীশের মুখের দিকে। তারপর ছেলের দু হাত জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠলেন, 'ওরে, তুই কি এমনই নিষ্ঠুর। তুই আমাকে সেই শূন্য পুরীতে একা পাঠিয়ে দিতে চাস? ওরে, তুই সঙ্গে না থাকলে আমি কি ক'রে সেখানে থাকব? এ সংসারে তুই ছাড়া আমার আর কে আছে?'

বাঙ্গালীটোলার ঘিঞ্জি পল্লী। গায়ে গায়ে ঘর। সুধাময়ীর কান্না শুনে ছেলে বুড়ো, নানাবয়সী স্ত্রীপুরুষ এসে জগদীশকে ঘিরে দাঁড়াল। কেউ বা কৌতুকে কেউ বা কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে? উনি অমন ক'রে কাঁদছেন কেন?'

জগদীশ আরো বিরক্ত আরো উত্যক্ত হয়ে উঠলেন, একটু রূঢ় ভাষায় জবাব দিলেন, 'কিছু হয়নি, উনি অমনিই কাঁদছেন। আপনারা আসুন এবার।'

তারপর জোর ক'রে মাকে ঘরের

ভিতরে সরিয়ে নিয়ে গেলেন জগদীশ, চাপা বিরক্তির সংগে বললেন, 'মা, তুমি যদি কথায় কথায় অমন করে কাঁদ, সত্যি বলছি, আমি কোথাও পালিয়ে যাব।'

সুধাময়ী আরও শিউরে উঠলেন ভয় পেয়ে আরও শক্ত করে চেপে ধরলেন ছেলের হাত, 'ওরে জগু, কি বললি, তুইও পালাবি। আমার ভাগ্যে বোধহয় এখন তাই-ই আছে। ওরে শেষে তুইও আমাকে ছেড়ে চলে যাবি।' তারপর আবার ডুকরে কে'দে উঠলেন তিনি।

এর ফলে নরম গলায় মিষ্টি ভাষায় মাকে ফের সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করতে লাগলেন জগদীশ। কিন্তু নিজেই বুঝতে পারলেন সেই ভাষার মধ্যে প্রাণ নেই, আন্তরিকতা নেই। মাতৃবৎসল ছেলের ভূমিকায় নিজেকে বড়ই বেমানান মনে হ'তে লাগল জগদীশের। করুণরসের এমনই তৃতীয় শ্রেণীর অভিনয় যে, নিজের কাছেই তা হাস্যকর মনে হল।

তবু জগদীশ বললেন, 'না মা, কোথায় যাব আমি। তোমাকে ছেড়ে আমি কি কোথাও যেতে পারি। আমি কালই তোমাকে সংগে ক'রে কলকাতায় নিয়ে যাব। দিনরাত কাছে থাকব তোমার।'

সুধাময়ী এবার একটু শান্ত হয়ে ছেলের দিকে তাকালেন, তাঁর চোখের কোলে তখনো দু'ফোঁটা জল টলটল করছে।

মায়ের বয়স চুয়াত্তর, ছেলের বয়স উনষাট। কিন্তু দু'জনকে এখন প্রায় এক-বয়সীই দেখায়। বয়সের তুলনায় সুধাময়ী বরং একটু বেশি শক্ত আছে। মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা? সবই অবশ্য পেকে সাদা হয়ে গেছে। চোখে এখনো চশমা নিতে হয়নি, শুধু মাড়ির দিকের তিন-চারটে দাঁতই পড়ে গেছে কিন্তু সামনের দাঁতগুলি সবই অনড় আছে এখনো। বে'টে ছোটখাট শরীর। তাই এত বার্ধক্যেও সামনের দিকে নুইয়ে পড়েনি। এখনো বেশ খাড়া সোজা হয়ে চলেন সুধাময়ী। গায়ের চামড়া অবশ্য কু'চকে গেছে, তবু যৌবনের রঙের ঔজ্জ্বল্য এখনো টের পাওয়া যায়।

আর উনষাটের তুলনায় জগদীশকে বেশি বয়স্ক মনে হয়। তাঁর শুধু মাথার চুলই পেকে সাদা হয়ে যায়নি, জরার আঘাতে দাঁতগুলিও জখম হয়েছে। সামনের দু' তিনটি দাঁত নেই। বাকি যেগুলি আছে, সেগুলিও নড়বড় করে, মাঝে মাঝে ভারি যন্ত্রণা দেয়। চলা ফেরার বেশ শক্ত থাকলেও হাঁটবার সময় পোনে ছ'ফুট দীর্ঘ দেহ সামনের দিকে একটু ঝু'কে পড়ে জগদীশের।

তাই মা আর ছেলেকে আজকাল সম-বয়সীই দেখায়। সমবয়সী কেন বরং সুধাময়ীর চেয়ে জগদীশের বয়সই দু' চার বছর বেশি বলে মনে হয়। যাঁরা ও'দের প্রকৃত সম্বন্ধ জানে না তারা হঠাৎ দেখলে ভাবে ভাই বোন। কেউ বা অন্যরকমও মনে করে। কিন্তু যে যে রকম সম্বন্ধের কথাই ভাবুক এখন এ'রা পরস্পরের একমাত্র বন্ধন। দু'বছর আগে আসানসোল মোটর দুর্ঘটনায় আর সব শেষ হয়ে গেছে।

সে মোটরে ছিল জগদীশের স্ত্রী শৈলরাণী, ছেলে সুব্রত, মেয়ে সুলেখা, আর ছিল জগদীশের ছোট ভাই পৃথ্বীশ, তার স্ত্রী অনিমা, দুই ছেলে শুভেন্দু আর বিমলেন্দু। ড্রাইভ করে পৃথ্বীশই আসছিল কলকাতার দিকে। কিন্তু এসে আর পৌঁছানো হয়নি।

পৃথ্বীশ জগদীশেরই ছোট ভাই। ছেলেবেলা থেকে একসংগে মানুষ হয়েছেন। একই স্কুলে কলেজে পড়েছেন, শ্যামবাজারের পৈতৃক বাড়িতে বৃদ্ধবয়স পর্যন্ত ছেলেমেয়ে নিয়ে একান্নভুক্তভাবে কাটিয়েছেন। তবু ক্ষতির কথা মনে হলে নিজের স্ত্রীপুত্র কন্যার কথাই আগে মনে পড়ে জগদীশের। আর সুধাময়ী কাঁদবার সময় পৃথ্বীশ আর তার দুই ছেলের নাম ধরেই বেশি কাঁদেন। শুভেন্দু আর বিমলেন্দুর বয়স অল্প ছিল, তারা ঠাকুর-মার কাছে কাছে থাকত হয়ত সেইজন্যেই। তবু জগদীশ এটা লক্ষ্য না করে পারেন না যে এই প্রচণ্ড মৃত্যুশোকও যেন মা আর ছেলের মধ্যে বিভক্ত হয়ে গেছে। যেন দুজনে দুই আত্মীয়গোষ্ঠীকে হারিয়েছেন তাঁরা।

সুধাময়ীর পীড়াপীড়িতে শেষপর্যন্ত জগদীশকে পরদিন কলকাতার দিকেই রওনা হ'তে হ'ল। শ্যামপুকুরের সেই পুরোন দোতলা বাড়িতেই ফিরে এলেন তিনি। ফিরে আসবার তাঁর ইচ্ছা ছিল না। অন্তত বছরখানেক সারা ভারত ঘুরে বেড়াবেন সেই সংকল্প আর সঞ্চয় নিয়েই তিনি বেরিয়েছিলেন। তাঁর তীর্থে বিশ্বাস নেই, দেবদেবীতেও নয়। তিনি বেরিয়েছিলেন শুধু পথের জন্যে, বেরিয়ে-ছিলেন, ঘরে আর থাকতে পারছিলেন না বলে। 'হে ভবেশ! হে শংকর! সবারে দিয়েছ ঘর, আমারে দিয়েছ শুধু পথ।'

কিন্তু সুধাময়ী সেই পথটুকুও কেড়ে নিলেন। তাঁর ঘর না হলে চলে না। কিন্তু সে ঘর তো শূন্যঃ সে ঘর তো শ্মশান। সেই শ্মশানে বসে দু' বছর তো দিনরাত বুক চাপড়ে মা আর ছেলে কে'দেছেন, অনবরত চোখের জল ফেলেছেন, আর কেন।

এমন যে হবে, মা যে তীর্থে গিয়েও শান্তি পাবেন না, দু'দিনেই অতিষ্ঠ হয়ে উঠবেন, অতিষ্ঠ করে তুলবেন তা অবশ্য গোড়াতেই আন্দাজ করেছিলেন জগদীশ। তাই মাকে তিনি সংগে নিতে চাননি। কিন্তু সুধাময়ী ছেলের সংগ ছাড়লেন না। তাঁর কেবল এক কথা, 'আমি একা থাকতে পারব না।'

জগদীশ বলেছিলেন, 'একা থাকবে কেন। রেণুর কাছে গিয়ে থাক না।'

রেণু তাঁর দূর সম্পর্কের পিসতুতো বোন। ভবানীপুরে হালদারদের বাড়িতে বিয়ে হয়েছে।

সুধাময়ী মাথা নাড়ায়, জগদীশ আরো দু'একজন আত্মীয় কুটুম্বের নাম করলেন

তখন সুধাময়ী বলতে শুরু করলেন 'আমি তোকে একা ছেড়ে দিতে পারব না।'

তাই মাকে বাধ্য হয়ে সংগে নিতে হয়েছিল জগদীশের। কিন্তু দ্বিতীয়বা[র] আর এ ভুল করবেন না। এবার যখ[ন] বেরোবেন, না বলে না জানিয়েই বেরোবেন এমন প্রচণ্ড শোকই যখন সুধাময়ী এ[ই] বৃদ্ধবয়সে সহ্য করতে পেরেছে[ন] জগদীশের মাসকয়েকের বিচ্ছেদও ত[া] সইবে।

গলির ভিতরের দিকে সেই দোতল[া] লালচে রঙের বাড়িটা। ঠিক তেমন দাঁড়িয়ে আছে। এখন আর এবাড়িকে বে[উ] পুরোন পুরোন বলতে পারে না। [তি]ি বছর আগে এবাড়িকে ভেঙে প্রায় নত[ুন] ক'রে গড়েছিলেন দু'ভাই। আগে ঘ[রের] সংখ্যা ছিল কম। কিন্তু ছেলেরা বিয়ে-করলে আরো বেশি ঘরের দরকার হ[বে]

সে কথা ভেবে দু'ভাই আরো তিনখানা ঘর বাড়িয়েছিলেন। দু'এক বছর বাদে তিনতলার কাজ শুরু করবারও পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু জল্পনা কল্পনা আসানসোলের রাস্তার ধারের খানার মধ্যে চুরমার হয়ে গেছে।

বাড়ির আর সব ঘর তালাবন্ধ ছিল, তালাবন্ধই রইল। শুধু দোতলায় নিজের পড়বার ঘরখানি খুলে নিলেন জগদীশ। আর একতলায় কোণের দিকে খোলা রইল দ্বিতীয় ঘরখানা। সেখানে সুধাময়ী থাকেন।

আজ নয়, সেই দুর্ঘটনার দিনকয়েক বাদেই এই ব্যবস্থা করেছেন জগদীশ।

সুধাময়ী অনেক আপত্তি করেছিলেন, কেন, তুই তোর বড় ঘরে থাক না। ওখানে তো খাট বিছানা টেবিল আলমারী সবই আছে।'

তা আছে। প্রথমে স্ত্রীর সংগে একই খাটে ঘুমোতেন জগদীশ। কিন্তু ছেলে মেয়ে বড় হওয়ার পর ছোট ছোট দু'খানা আলাদা খাট ক'রে নিয়েছিলেন। কিন্তু গভীর রাত্রে শৈলরাণী যখন চুপি চুপি জগদীশের খাটে উঠে আসতেন তখন স্ত্রীকে আর প্রৌঢ়া বলে মনে হ'ত না। মনে হ'ত আলতাপরা নবোঢ়া কিশোরীই যেন ফুলশয্যার দিকে এগিয়ে আসছে। বড় শোবার ঘরখানায় আজও সেই জোড়া খাট আছে, ড্রেসিং টেবিল, আর দামী শাড়ী ব্লাউজভরা কাঁচের আলমারী রয়েছে, রয়েছে তার হাতের ছোঁয়ালাগা সবগুলি আসবাব, কিন্তু যার জন্যে এই ঘর সাজিয়েছিলেন জগদীশ সে তো আর নেই। ও ঘরে একা একা তিনি কি ক'রে থাকবেন।

ছেলের মনের কথা অনুমান করে সুধাময়ী বলেছিলেন, 'তোর যদি ও ঘরে একা থাকতে ভয় করে বল, আমি এসে থাকি।'

জগদীশ মাথা নেড়েছিলেন, 'না মা, তোমার ও ঘরে থাকতে হবে না, তুমি যেখানে আছ সেখানেই থাক।'

সুধাময়ী ছেলের দিকে একটুকাল তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, 'কিন্তু একা একা নিচের ঘরে থাকতে আমারও তো ভয় করতে পারে।'

জগদীশ মার দিকে চেয়ে অদ্ভুত একটু হেসেছিলেন, 'তোমারও ভয়! তাহলে রেণুর ছোট ছেলেকে এনে তোমার কাছে রাখ।'

সুধাময়ী গভীর অভিমানে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন, 'না, আমার আর কারো ছেলেকেই কাছে এনে দরকার নেই।'

মার সংগে একঘরে থাকবার প্রস্তাবই যে জগদীশ নাকচ করেছিলেন তাই নয়, সুধাময়ী পাশের ঘরে এসে থাকবেন এ ব্যবস্থাও তাঁর মনঃপুত হয়নি।

সুধাময়ী ছেলের এই বিদ্বেষ দেখে অবাক হয়ে ভেবেছিলেন জগু কি সত্যিই বিশ্বাস করে সুধাময়ী বেশিবয়স অবধি বেঁচে রয়েছেন বলে আর সবাই অকালে চলে গেছে। তিনিই সবাইকে খেয়েছেন?

ছেলের এই নিষ্ঠুরতা সহ্য করতে না পেরে সুধাময়ী একদিন এসে সত্যিই কেঁদে পড়লেন, 'ওরে জগু, তাই যদি তোর ধারণা—আমার জন্যেই যদি তোর এই সর্বনাশ হয়ে থাকে, আমাকে মেরে ফেল, আমাকে মেরে ফেল। কিছু আমাকে এনে দে, আমি তাই খেয়ে মরি।'

জগদীশ পরম নির্লিপ্ত শান্তভাবে জবাব দিয়েছিলেন, 'আশ্চর্য, তুমি কি ক্ষেপে গেলে মা তোমার জন্যে কেন হবে? তোমার সংগে সে দুর্ঘটনার কি সম্পর্ক। যাও, ঘরে যাও।'

সুধাময়ী সেখান থেকে চলে গেলে জগদীশ গুনগুন করে গান ধরেছিলেন, 'শ্মশান করেছি হৃদি, সেখানে নাচুক শ্যামা।'

সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পর কিছুদিন ধ'রে আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব অনেকেই এসে সান্ত্বনা দিয়ে গেছেন। দেখা করতে এসেছেন জগদীশের কলেজের সহকর্মী আর ছাত্রের দল। সবাই তাঁকে অনুরোধ করেছে তাঁদের বাড়িতে যেতে, মানুষের সংগে সামাজিক সম্পর্ক রাখতে। কিন্তু জগদীশ কারো কথা কানে তোলেননি। ইচ্ছা করে যে তোলেননি তা নয়। কেন যেন আগ্রহ বোধ করেননি, সাধ্য হয়নি মানুষের সংগে আর সংযোগ রাখবার। কি ক'রে হবে। মৃত্যুর স্পর্শে তাঁর হৃদয় একেবারে পাথর হয়ে গেছে। সেখানে মানুষের সুখ দুঃখ হাসিকান্নার কোন স্পর্শ অনুভূত হয় না।

সরকারী কলেজের অধ্যাপকের কাজ থেকে অবসর নিয়েছেন জগদীশ রায়। না নিয়ে পারেননি। পড়াতে আর ভাল লাগে না। তরুণ ছাত্রদের সঙ্গ দুঃসহ মনে হয়। শুধু ছাত্র নয় মানুষমাত্রকেই মনে হয় হাত পা চোখ কান বিশিষ্ট একটা যন্ত্র। তার ভালোমন্দ সুখ দুঃখে জগদীশের কিছু এসে যায় না। যন্ত্রণাবোধ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্যে আসলে তিনি নিজেই যন্ত্র হয়ে গেছেন। যে দুর্ঘটনায় তাঁর সব গেছে তার কোন ব্যাখ্যা নেই, প্রতিকারের সম্ভাবনা নেই, কারো ওপরই কোন প্রতিশোধ নেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না, তাঁর নিজের ভাইয়ের অনিচ্ছাকৃত অসতর্কতার জন্যে তাঁর সমস্ত প্রিয়জন প্রাণ হারিয়েছে। এটা একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা মাত্র। কিন্তু

ওই শব্দটি উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গেই কি সব শোকের সান্ত্বনা মেলে? কার্যকারণের সব তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়? হয় না বলে নিজের মধ্যেই যেন অসঙ্গতির অনুশীলন করছেন জগদীশ। তাঁর আচরণ চালচলনের মধ্যে কোন যুক্তি নেই। সুধাময়ী বলেছিলেন, 'এতগুলি ঘর দিয়ে কি হবে। বাড়িটা ভাড়া দিয়ে দে, তবু মানুষজন এসে থাকুক।'

জগদীশ বলেছিলেন, 'কেন ভাড়া দেব? টাকার জন্যে? আমার আর টাকার কি দরকার? যা আছে তাতেই বাকি ক'টা দিন চলে যাবে।'

পাড়ার তরুণ সঙ্ঘের ছেলেরা এসে ধরেছিল, 'জ্যেঠামশাই, ঘরগুলি আমাদের সমিতিকে দিন। আমরা একটা নাইট স্কুল আর লাইব্রেরী চালাব। আপনিই প্রেসিডেন্ট থাকবেন।' জগদীশ জবাব দিয়েছিলেন, 'আর দুটো দিন সবুর করো। আমি মরবার আগে উইল করে তোমাদের সব দিয়ে যাব। সে একেবারে পাকাপাকি ব্যবস্থা হবে। ততদিন তোমাদের সমিতি যেখানে আছে সেখানেই থাকুক।'

ছেলেরা আড়ালে গিয়ে গাল দিয়েছিল, 'বুড়োর ভীমরতি ধরেছে।'

বাড়িতে অনেকদিনের পুরোন চাকর ছিল গোবিন্দ। সেও একদিন বিদায় নিল। অকারণে বড় গালমন্দ করতেন, মারতে আসতেন, শুধু সেইজন্যেই নয়। গভীররাত্রে তার ঘরের সমুখ দিয়ে ভূতের পায়ের শব্দ শোনা যেতে লাগল। শুধু তার ঘরের কাছেই নয়, সারা বাড়ি ভরেই সেই ভূতের আনাগোনা।

গোবিন্দ সুধাময়ীর কাছে কাঁদো কাঁদো ভাবে বিদায় নিয়ে বলল, 'আমার যাওয়ার ইচ্ছে ছিল না বুড়ো মা। কিন্তু থাকতে আর সাহস হয় না।'

সুধাময়ী নিশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'তোকে আমি আর থাকতে বলিওনে গোবিন্দ, তুই যা। এই শ্মশানে তোর আর থেকে কাজ নেই।'

তিন মাসের মাইনে বেশি দিয়ে গোবিন্দকে বিদায় করলেন তিনি।

তারপর ছেলের কাছে গিয়ে বললেন, 'হ্যাঁরে জগু, তোর এ কি কাণ্ড, শেষপর্যন্ত ভূত সেজে গোবিন্দকে তাড়ালি তুই।'

জগদীশ বললেন, 'ভূত আমাকে সাজতে হয়নি মা। তাদের সাতজনের ভূত আমার বুকের মধ্যে এসে বাসা বেঁধেছে। আমি নিজে কিছু করিনে। তারাই আমাকে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়।'

জগদীশের ভাবভঙ্গি দেখে বাড়ির রাঁধুনী বালবিধবা সুশীলাও চোখের জল ফেলে বিদায় নিয়ে চলে গেল।

সুধাময়ী বললেন, 'সবাইকে তাড়ালি এবার আমাকেও তাড়িয়ে দে। আমি যে আর টিকতে পারছিনে জগু।'

কিন্তু লোকজন সব বিদায় নিয়ে চলে যাওয়ার পর জগদীশ যেন খানিকটা শান্ত হলেন। খানিকটা স্বাভাবিকতা এল তাঁর মধ্যে। লাইব্রেরী ঘরের বারান্দায় ইজিচেয়ার পেতে বই হাতে আগের মতই এসে বসেন। মাঝে মাঝে পুরোন দু'একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করতেও বেরোন।

আর কাউকে রাখবার চেষ্টা করলেন না সুধাময়ী। নিজেই হেঁসেলের ভার নিলেন। ভারি তো হেঁসেল। একবেলার দু'জনের জন্যে রাঁধতে হয়। অনেকদিন থেকেই রাত্রে ভাত খান না জগদীশ। দুধ খই, মিষ্টি, ফলমূল হলেই চলে।

কলকাতার বাইরে থেকে কিছুদিন ঘুরে আসবার পরেও জগদীশের অভ্যস্ত দিনযাত্রা বদলাল না। লাইব্রেরী ঘরেই ক্যাম্পখাট বিছিয়ে রাত্রে নিজের শোবার ব্যবস্থা করলেন। দিনের বেশির ভাগ সময় কাটে বারান্দার ইজিচেয়ারে। চুপচাপ বসে থাকেন, কখনো বা করিডোর দিয়ে পায়চারি করেন। মাঝে মাঝে রেলিংএ ভর করে নিচের দিকে ঝুঁকে পড়ে বৃদ্ধা মা'র ঘরকন্নার কাজ দেখেন। ঠিকে ঝি অবশ্য একটি আছে। দু'বেলার সব কাজ করে দিয়ে সন্ধ্যার পর নিজের বাসায় চলে যায় মেনকা।

জগদীশ ওপর থেকে লক্ষ্য করেন কখনো কখনো সেই আধবয়সী ঝি মেনকার কাছে বসে কাঁদেন সুধাময়ী। সহানুভূতি জানাবার জন্যে কখনো বা পাড়ার দু'একটি বউও তাঁর কাছে আসে।

তিনি পুরোন দিনের কথা, ছেলে বউ নাতি নাতনীদের কথা বসে বসে বলতে থাকেন। আর আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছেন। দেখে দেখে কেমন যেন একটা বিদ্বেষ বোধ করেন জগদীশ। কই তিনি তো এমন ক'রে পাড়ার পাঁচজনের কাছে শোক প্রকাশ করেন না, চোখের জল ফেলতে পারেন না, চোখের জল মুছতে পারেন না, শুধু বুকের মধ্যে একটা ভারি পাথরের দুঃসহ চাপ অনুভব করেন। মাঝেসাঝে সেই পাথর অগ্নিগোলক হয়ে জ্বলতে থাকে।

তবু নিজের জ্বালা নিয়ে নিজেই বেশ থাকতে পারতেন জগদীশ। কিন্তু সুধাময়ী আবার তাঁকে নতুন করে জ্বালাতে লাগলেন। জগদীশের অপরাধ ঠাণ্ডা লেগে তাঁর একটু সর্দিজ্বর হয়েছিল। দাঁতের যন্ত্রণাটাও বেড়েছিল সেই সঙ্গে। আর রক্ষা নেই। পাড়ার লোকজন আর ডাক্তার ডেকে হৈ চৈ করে সুধাময়ী সারা বাড়ি মাথায় করে তুললেন।

জ্বর অবশ্য দু'তিন দিনের মধ্যেই ছেড়ে গেল, কিন্তু সুধাময়ী ছেলেকে সহজে ছাড়লেন না। তিনি জগদীশকে বলতে লাগলেন, 'শরীরের ওপর অনিয় ক'রেই তুমি এই কাণ্ড ঘটিয়েছ। আ আমি তোমাকে অমন নিজের খেয়াে চলতে দেব না। তুমি সময় মত চান করে খাবে, ঘুমুবে। দেখি তোমার শরী কি ক'রে খারাপ হয়।'

শুধু কথায় শাসন ক'রেই সুধাময় ক্ষান্ত হলেন না। কাজেও জগদীশে সর্বদা খবরদারি করতে শুরু করলেন।

জগদীশ হয়ত দর্শনের ভাববাদ অ বস্তুবাদের তুলনামূলক সমালোচনা পা নিমগ্ন, সুধাময়ী ছোট একটু তেে বাটি হাতে পা টিপে টিপে দোতল তাঁর ঘরের সামনে এসে হাজির হে 'ও জগু, দেখ ঘড়িতে ক'টা বাজল। করবি কখন।'

জগদীশ বই থেকে মুখ তুলে বি হয়ে বললেন, 'এইতো সবে দশটা। অ বারটার আগে কোনদিন নাইতে যাই তুমি আবার কেন কষ্ট ক'রে এখানে এ ডাকলে আমিই তো নিচে যেতে পারত

সুধাময়ী একটু হাসলেন, 'হুঁ, আমার সেই ছেলেই কিনা। ডেকে ে গলা ভেঙে ফেললেও তো একটু ট করিসনে তুই। আয় আমি তোকে মাখিয়ে দিই। তুই অমন ছটফট ক কেন। তুই বসে বসে পড় না। তোর পিঠে তেল দিয়ে দিই।'

জগদীশের পিঠে সুধাময়ী সত্যিই তেল লাগাতে শুরু করে দেন। প্রথমে কেমন একটু সুড়সুড়ি বোধ হয়, তারপর রীতিমত অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন জগদীশ। দু' এক মিনিট যেতে না যেতেই উত্যক্ত হয়ে বলে ওঠেন, 'সরো সরো, তোমাকে আর তেল মালিশ করতে হবে না, যাও এখান থেকে।'

সুধাময়ী একটু অপ্রস্তুত হয়ে বলেন, 'কেন জগু, খারাপ লাগছে তোর!'

জগদীশ চেঁচিয়ে উঠে বলেন, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভয়ানক খারাপ লাগছে। তুমি যাও এখান থেকে।'

সুধাময়ী একটুকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে বললেন, 'কিন্তু বউমা তো তোকে রোজ তেল মাখিয়ে দিত। সে যেদিন পারত না, তোর মেয়ে সুলু এসে বসত তেলের বাটি নিয়ে। তখন তো তুই এমন করতিনে।'

স্ত্রীকন্যার উল্লেখে বুকে যেন নতুন ক'রে ঘা লাগল। তাদের অভাব আবার নতুন ক'রে অনুভব করলেন জগদীশ। অস্থির হয়ে বলে উঠলেন, 'তাদের কথা তুল না মা, তাদের নাম আর মুখে এন না। আশ্চর্য, তারা মরে গিয়েও তোমার হিংসের হাত থেকে রক্ষা পেল না?'

সুধাময়ী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কি, কি বললি। তাদের আমি হিংসে করি, তাদের আমি হিংসে করতাম! ওরে, আমার পরম শত্তুরও যে একথা বলতে পারত না। আর তুই আমার পেটের ছেলে হয়ে এই কথা বললি! ভগবান তুমিই সাক্ষী। এখনো দিনরাত হয়। এখনো আকাশে চাঁদ সূর্য উঠে। ভগবান—'

জগদীশের আর সহ্য হ'ল না। তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে নিচের দিকে তর্জনী বাড়িয়ে বললেন, 'যাও, চলে যাও, নিচে যাও বলছি।'

সুধাময়ী কেঁদে কেঁদে বললেন, 'তাতো যাবই। আজ আমার বাতাস তোর সহ্য হয় না। আজ আমি হাত দিলে তোর গায়ে বিছুটি লাগে। কিন্তু চিরকালই এমন ছিল না, চিরকালই মাগ আর মেয়ের হাতে তুই মানুষ হসনি। এমন দিনও ছিল যখন আমি না নাইয়ে দিলে তোর নাওয়া হ'ত না, আমি না খাইয়ে দিলে তোর পেট ভরত না, আমার বুকের সঙ্গে মিশে থাকতে না পারলে ঘুম আসত না তোর—'

জগদীশ আবেগহীন নিস্পৃহ সুরে বললেন, 'আমার অপরাধ হয়েছে, আমাকে ক্ষমা কর, তুমি তোমার ঘরে যাও মা।'

সুধাময়ী আর দ্বিরুক্তি না ক'রে নিচে নেমে গেলেন। সেখান থেকে তাঁর কান্না শোনা যেতে লাগল, 'ওরে আমার ছোটনরে, তুই আমাকে ফেলে কোথায় গেলিরে বাবা। সবাইকে নিয়ে গেলি যদি, আমাকেও নিলিনে কেন।'

পৃথ্বীশের ডাক নাম ছিল ছোটন।

জগদীশ বই বন্ধ ক'রে ভাবতে লাগলেন একথা সত্যি মায়ের কোলেই প্রথম জন্ম নিয়েছিলেন তিনি। একান্ত ভাবে মায়ের ওপরই নির্ভরশীল ছিলেন। বাবা থাকতেন দূরে দূরে বাইরে বাইরে। জগদীশ আর তার মার মধ্যে দ্বিতীয় আর কেউ ছিল না। কিন্তু সংসারের নিয়মে সেদিনের বদল হল। বাবা চলে গেলেন কিন্তু একে একে অনেকে এল। কত বিচিত্র সম্পর্ক, আর তার বিচিত্র স্বাদে জীবন ভরে উঠল। স্বভাবের নিয়মে মা রইলেন এক পাশে সরে, এক পাশে পড়ে। জগদীশের মনোলোক থেকে চিরনির্বাসন ঘটল তাঁর। আজ আবার সব মুছে গেছে, আজ আবার তাঁদের মাঝখান থেকে সব ব্যবধান নিশ্চিহ্ন হয়েছে। দূরের অবজ্ঞাত কোণ থেকে আজ ফের মা আবার জগদীশের সামনে এসে দাঁড়িয়ে বলছেন, 'চেয়ে দেখ, আমি আছি। আয় আবার আমি তোর সব হই, তুই আমার সব হয়ে ওঠ।'

কিন্তু তাই কি হয়? একমাত্র অতি শৈশব ছাড়া মা কি মানুষের সব হ'তে পারে! ভাই, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা একাধারে সকলের স্থান নেওয়া কি সম্ভব? জগদীশের মনে হয় মা সব হ'তে তো পারেই না, এমন কি পুরোপুরি ছেলেবেলার সেই মা থাকাও আর তার পক্ষে সাধ্য নয়। যেতে যেতে, ভাঙতে ভাঙতে একটুখানি মাত্র থাকে। সেইটুকু হয়েই কেন খুশী থাকেন না সুধাময়ী। কেন আরো বেশি হ'তে চান, আরো বেশি দিতে চান, আরো বেশি পেতে চান? জগদীশ ভাবেন, মা আর তাঁর মাঝখানে যারা এসেছিল তারা তো সত্যিই ব্যবধান হয়ে ছিল না, তারা ছিল সেতু। তারা ছিল জগদীশের বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে যোগসূত্র। মায়ের সঙ্গেও সংযোগের মাধ্যম, মধ্যমণি। সেই সুতো ছিঁড়ে গেছে। কারো সঙ্গেই জগদীশের কোন বন্ধন নেই।

আরো কিছুদিন কাটল। জগদীশ ফের পালাই পালাই করতে লাগলেন। মায়ের এই অতি বাৎসল্যের হাত থেকে মুক্তি নেবেন, অতিরিক্ত দান আর অতিরিক্ত দাবির বন্ধন থেকে অন্তত কিছুদিনের জন্যেও মুক্ত থাকবেন।

দূর সম্পর্কের সেই বোন আর ভাগ্নের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ ক'রে বৈষয়িক ব্যবস্থা ঠিক ক'রে ফেললেন জগদীশ। মাকে না জানিয়েই তিনি এবার বেরিয়ে পড়বেন। এবার আর শুধু ভারত নয়, ভূভারত। সুধাময়ীকে দেখাশোনা করবার জন্যে রেণুর নিঃসন্তান

খুড়শ্বশুর আর খুড়ি শাশুড়ী এ বাড়িতে এসে নিচের একটা ঘর নিয়ে থাকবেন। ব্যাঙ্কের সঙ্গে বন্দোবস্ত শেষ। পোশাক-পরিচ্ছদ বিছানা বালিশের সব আয়োজন সম্পূর্ণ। যাত্রার আর দু'দিন মাত্র বাকি, এই সময় এক কাণ্ড ঘটল। ভোরে উঠে নিচে একটা সোরগোল শুনতে পেলেন জগদীশ।

মেনকা ঝি হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, কর্তাবাবু, দেখুন এসে ব্যাপার।'

জগদীশ নিচে নেমে এসে দেখলেন, তাঁর বাড়ির দোরগোড়ায় একটা রক্তমাখা পুঁটলি পড়ে রয়েছে। প্রথমে ভাবলেন কুকুরে কোন নর্দমার ধার থেকে মাংসের নেকড়া টেকড়া মুখে ক'রে এনে থাকবে। কিন্তু মেনকা একটা কাঠি দিয়ে পুঁটলিটা নাড়তেই সকলের ভুল ভাঙল। রুগ্ন, বিবর্ণ, মৃতপ্রায় সদ্যোজাত এক মানব-শিশুকে কে যেন এই কবরখানায় ফেলে রেখে গেছে।

জগদীশ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'কুকুর নয়, এ নিশ্চয়ই সেই তরুণ সঙ্ঘের কুকুরদের কীর্তি। আমি তাদের ঘর ছেড়ে দিইনি ব'লে তারা আমার ওপর এমন ক'রে শোধ নিয়েছে। কিন্তু আমার নামও জগদীশ রায়। পাজী বদমাস ছাত্র আমি কম চড়াইনি। তাদের কি ক'রে সোজা করতে হয় তা আমি জানি। আমি এক্ষুণি থানায় খবর দিচ্ছি। ওদের সবগুলির নামে ডায়েরি করব।'

সুধাময়ী এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলেন, এবার এগিয়ে এসে শান্তভাবে বললেন, 'জগু, অত চেঁচাসনে। ব্যাপারটা কি দেখতে দে আগে।' ওরে মেনকা ভালো ক'রে দেখ দেখি এখনো বেঁচে আছে না মরে গেছে।'

মেনকা একটু নেড়ে চেড়ে দেখে বলল, 'এখনো বেঁচে আছে বুড়ো মা।'

'আছে?' উল্লসিত হয়ে উঠলেন সুধাময়ী, 'এই শ্মশানের বাতাস লেগেও এতক্ষণ প্রাণ রয়েছে? নিয়ে আয় মেনকা, ওকে কোলে ক'রে তুলে নিয়ে আয়। ও আমার সেই কাশীর বাবা ভোলানাথ, বাবা বিশ্বনাথ। নিয়ে আয় ওকে।'

কিন্তু জগদীশ রুখে দাঁড়ালেন, 'মা, তুমি কি পাগল হয়ে গেছ? এসব ছেলে কোত্থেকে হয়, কিভাবে হয় তা তুমি জান না?'

সুধাময়ী বললেন, 'জানব না কেন। সবই জানি জগু। কিন্তু তা'তে তোরই বা কি, আমারই বা কি। আমরা দুজনেই এখন সমাজ সংসারের বাইরে। আহা দেখ, কিরকম নীল হয়ে গেছে শীতে।'

জগদীশ বললেন, দেখেছি দয়া করতে চাও। আমি টাকা দিচ্ছি, লোক দিচ্ছি একটা অনাথ আশ্রম টাশ্রমের ব্যবস্থা ক'রে দিচ্ছি—।'

সুধাময়ী বাধা দিয়ে বললেন, 'ওরে ক্ষ্যাপা, এই বাড়িও তো এক মস্ত অনাথ আশ্রম। তুই এক অনাথ, আমি এক অনাথ। মেনকা আর দিক করিসনে বাছা, ওকে আমার ঘরে নিয়ে আয়।'

জগদীশ দু'পা এগিয়ে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে ফের বাধা দিয়ে বললেন, 'না। আমি বলছি না। এ বাড়ি আমার। আমার অমতে এ বাড়িতে কিছু করা চলবে না।'

সুধাময়ীও ছেলের দিকে এগিয়ে এলেন, জ্বলন্ত চোখে তাকিয়ে রইলেন একটুকাল, তারপর মুখের বিকৃত ভঙ্গি ক'রে তারস্বরে চেঁচিয়ে বললেন, 'কি বললে জগু রায়, এ বাড়ি একা তোমার? এতে আমার কোন অংশ নেই? কিন্তু এ আমার সোয়ামীর হাতের গড়া বাড়ি, এ আমার সোয়ামীর হাতের পোতা ইঁট। আমি যতক্ষণ আছি আমার জীবনস্বত্ব আছে। যাও উকিলের কাছে যাও, জজ ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে যাও, ছোট আদালত বড় আদালত যা খুশি তাই কর গিয়ে। তারা যদি আমাকে বেদখল করে তখন বলতে এসো।'

জগদীশ একটুকাল গম্ভীর হয়ে থেকে বললেন, 'আমি আর কিছু বলতে চাইনে। তুমি থাক তোমার দখল নিয়ে, আমি চললুম।'

কিন্তু চললুম বললেই কি আর চলা যায়। বেশীদূর যেতে পারলেন না। যেতে যেতে নিজের ঘরে গিয়েই ঢুকলেন জগদীশ। জাত-জন্মের সংস্কার তিনিও মানেন না। এসব ব্যাপারে জগদীশ যথেষ্ট উদার। কিন্তু আর কিছু না মানেন, আর কাউকে না মানেন নিজেকে তো মানেন জগদীশ। সুধাময়ীর আচরণ তাঁর অহংবোধকে বার বার পীড়া দিতে লাগল। তাঁর মতের বিরুদ্ধে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুধাময়ী রাস্তার একটা অবৈধ অবাঞ্ছিত ছেলেকে কুড়িয়ে ঘরে তুলে নিলেন এতে রাগে আর বিদ্বেষে জগদীশের সর্বাঙ্গ জ্বলে যেতে লাগল। অন্য সময় হলে তিনি হয়ত বিস্মিত হতেন। এই ধর্মভীরু, আচারসর্বস্ব স্বল্পাক্ষরা ব্রাহ্মণ বিধবা কি ক'রে এমন কাজ করতে পারলেন, সর্বত্যাগিনী না হ'লে তাঁর পক্ষে এই গ্রহণ সম্ভব ছিল কিনা সে প্রশ্ন জগদীশের অন্তত একবারও মনে পড়ত। কিন্তু এই মুহূর্তে শুধু জ্বালা আর অপমানবোধ ছাড়া সব তাঁর অনুভূতির বাইরে পড়ে রইল।

জগদীশ ভবঘুরে হওয়ার সঙ্কল্প আপাতত ত্যাগ করলেন। এ গলি ও গলি ঘুরে শেষ এসে ঢুকলেন নিজের ঘরে। ব্যাপারটার একটা হেস্তনেস্ত না ক'রে তিনি এখান থেকে নড়বেন না।

কিন্তু কি হেস্তনেস্ত করবেন ভেবে স্থির করতে পারলেন না জগদীশ। নিজেদের পারিবারিক ব্যাপার নিয়ে বাইরের কাউকে সালিশ মানবার অভ্যাস তাঁর কোনদিনই ছিল না। বরং অনাসব আত্মীয় বন্ধু কুটুম্বের বিরোধে তিনি মধ্যস্থতা করেছেন। আর আজ যদি মার সঙ্গে ঝগড়া ক'রে এই ষাট বছর বয়সে তিনি যদি প্রতিবেশীর স্বারস্থ হন তাহ'লে লোকে কি বলবে। না, মস্তিষ্কের অতখানি বিকৃতি তাঁর আজও ঘটেনি। প্রতিকারের অন্য উপায়ের কথা ভাবতে লাগলেন জগদীশ।

এদিকে সুধাময়ী সেই কুড়োন ছেলেকে ঘরে তুলে নিয়েছেন, কোলে তুলে নিয়েছেন, মেনকার সাহায্যে শিশুর খাবারের জন্যে মধু আর মিছরির জলের ব্যবস্থা করেছেন। ঝিনুক-বাটি, কাঁথা-বালিশ আগন্তুকের ভোজন-শয়নের সব উপকরণই একে একে সংগৃহীত হচ্ছে ঝুলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবই টের পেতে লাগলেন জগদীশ, সবই দেখতে লাগলেন। সুধাময়ীর ঘর যেন এক তরুণী মায়ের আঁতুড়ঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। আর সুধাময়ী শুধু নতুন জীবনই পাননি, নতুন যৌবন ফিরে পেয়েছেন। তাঁর চলাফেরা ছুটোছুটি

বিরাম নেই। নানা বয়সী বউ ঝিরা তাঁর ঘরের সামনে ভিড় ক'রে দাঁড়িয়েছে। সুধাময়ী তাদের একজনকে বোঝাচ্ছেন, 'জানো বউ, আমার ছোটনও ঠিক এই-রকমই হয়েছিল। তিনদিনের মধ্যে মাই টানেনি। দেখে কেউ বলেনি যে বাঁচবে।'

শুনতে শুনতে এই বৃদ্ধ বয়সেও এক অদ্ভুত ঈর্ষা বোধ করেন জগদীশ। ছাপ্পান্ন বছর আগে ছোট ভাইকে মায়ের কোল জুড়ে থাকতে দেখে ঈর্ষা হয়েছিল এ যেন সেই ঈর্ষা।

চটি পায়ে জগদীশ নিচে নেমে এসে মায়ের ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আর একবার সেই নতুন আঁতুড়ঘর তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলেন। তারপর বললেন, 'মা, ওকে তাহ'লে তুমি সত্যিই বাইরে কোথাও পাঠাতে দেবে না?'

সুধাময়ী অবাক হয়ে বলেন, 'তুই কি বলছিস জগদু, এ অবস্থায় বাইরে পাঠালে ও বাঁচবে?'

জগদীশ বলেন, 'কেন বাঁচবে না? আমি খুব ভালো হাসপাতাল ঠিক ক'রে দিচ্ছি। সেখানে বেশ যত্ন ক'রে রাখবে।'

সুধাময়ী বললেন, 'অবাক করলি তুই। তোরা কোন্ হাসপাতালের যত্নে বেঁচেছিলি শুনি? বউমাদেরও ছেলে-পুলে যা হয়েছে সব আমার কাছে, না হয় তাদের বাপের বাড়িতে। কেউ কি অযত্নে ছিল?'

জগদীশ এবার রুক্ষ স্বরে বললেন, 'তাহ'লে তুমি আমার কথা শুনবে না মা?'

সুধাময়ী স্পষ্ট জবাব দিলেন, 'না আমি তোমার কোন অন্যায় কথা শুনতে চাইনে বাপু।'

জগদীশ আর কিছু না ব'লে ওপরে চলে গেলেন। যাওয়ার সময় শিশুর ক্ষীণ কান্না তাঁর কানে গেল। কিন্তু প্রাণে গিয়ে পৌঁছল না। এই পরিত্যক্ত কুড়িয়ে পাওয়া শিশু একান্তভাবেই সুধাময়ীর জেদ আর খেয়ালের সামগ্রী। ওর সঙ্গে জগদীশের কোন সম্পর্ক নেই।

পঁচাত্তর বছরের নির্বোধ বৃদ্ধার এই জেদের কি প্রতিকার করা যায় তাই একমাত্র চিন্তার বিষয় হয়ে উঠল জগদীশের। একবার ভাবলেন, মাকে জোর ক'রে এই বাড়ি থেকে বের ক'রে দেবেন। আর একবার ভাবলেন, নিজেই চ'লে যাবেন এখান থেকে। তৃতীয়বার মতলব আঁটলেন, টাকা দিয়ে গুণ্ডা ঠিক করবেন। একদিন গভীর রাত্রে সে ওই ছেলেটাকে অন্য কোথাও ফেলে দিয়ে আসবে। যে অসঙ্গত সুড়ঙ্গপথে ও এসেছিল সেই পথেই ও চলে যাবে।

কিন্তু কোন পরিকল্পনাই শেষ পর্যন্ত কাজে লাগল না জগদীশের। রাত্রের ভাবনা দিনের আলোয় অবাস্তব লাগতে লাগল। সুধাময়ী রাত্রে ছেলেটিকে কোলের কাছে নিয়ে ঘুমোন। আদর ক'রে ডাকেন 'বিশু আমার বিশু। আমার বারাণসীর বিশ্বনাথ।'

মাঝে মাঝে জগদীশকেও ডাকেন সুধাময়ী, 'ও জগু, দেখ এসে কেমন হাসছে। এত দুষ্টু হয়েছে এরই মধ্যে।'

জগদীশ মার ডাকে সাড়া দেন না। সুধাময়ীর সোহাগের বাড়াবাড়ি দেখে রাগে তাঁর গা জ্বলে যায়। মানবশিশুর মুখে এই কি প্রথম হাসি দেখলেন সুধা-ময়ী? জীবনে আর কোনদিন দেখেননি? না কি সব স্মৃতি ইচ্ছা ক'রে ভুলে গিয়েছেন?

সুধাময়ীর জপতপ, ধ্যানধারনা সব গেছে। দিনরাত্রির বেশির ভাগ সময়ই তাঁর এখন বিশুকে নিয়ে কাটে। যতবার মার ঘরের সামনে দিয়ে যাতায়াত করেন জগদীশ, শুনতে পান সুধাময়ী বিশুর সঙ্গে কথা বলছেন, 'ও আমার সোনা, ও আমার মাণিক। বলি এত কান্না কিসের তোমার। হয়েছে হয়েছে আর অত ঠোঁট ফুলিয়ে তোমাকে কাঁদতে হবে না।'

জানলার ফাঁক দিয়ে জগদীশ দেখতে পান, লোল চর্মের ঝুলে পড়া দুটি স্তনের মধ্যে শিশুকে চেপে ধরেছেন সুধাময়ী। জগদীশকে দেখতে পেলে মাঝে মাঝে তিনি কাছে ডাকেন, 'ও জগু, পালাচ্ছিস কেন আয়, আয় না এ ঘরে। লজ্জা কি।'

জগদীশ সাড়া না দিয়ে সরে আসেন।

একদিন বিশুর একটু সর্দি আর জ্বরের মত হ'ল। তার পরিচর্যা নিয়ে সুধাময়ী এমন মেতে রইলেন যে, একটা বেজে গেল জগদীশ ভাত পেলেন না। তাঁর আর সহ্য হ'ল না। সুধাময়ীর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে চেঁচিয়ে বললেন, 'তোমার মতলব আমি বুঝতে পেরেছি মা। তুমি এমনই ক'রে আমাকে জব্দ করতে চাও।'

সুধাময়ী একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, 'ছেলেটার অসুখ তাই রান্না করতে আজ একটু দেরি হয়ে গেছে। তুই পিঁড়ি পেতে বস। আমি এক্ষুণি ভাত বেড়ে দিচ্ছি।'

জগদীশ বললেন, 'না, তোমার আর আমার জন্যে রেঁধেও দরকার নেই, বেড়েও দরকার নেই। তোমার হাতের রান্না খাওয়া এই আমার শেষ।'

রাগ ক'রে জগদীশ সেদিন এক হোটেলে গিয়ে খেয়ে এলেন। পরদিন স্টোভ, হাঁড়ি ডেকচি, রান্নাবান্নার সব সরঞ্জাম কিনে নিয়ে এলেন। আনলেন চাল ডাল তেল কয়লা, ঘি মশলা। তারপর নিজেই রাঁধতে বসে গেলেন।

সুধাময়ী এসে গালে হাত দিয়ে বললেন, 'তোর কি মাথা খারাপ হয়েছে? তুই আমার সঙ্গে পৃথক্ হয়ে খাবি?

জগদীশ জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ, তোমাদের সঙ্গে আমার আর পোষাবে না।'

সুধাময়ী অনেক চেঁচামেচি করলেন, কাঁদাকাটি করলেন। কিন্তু জগদীশ কিছুতেই নিজের গোঁ ছাড়লেন না। মনে মনে ভাবলেন, এইবার ঠিক হয়েছে। এইবার আচ্ছা জব্দ হয়েছে মা। এতদিনে প্রতিকারের মোক্ষম উপায়টি জগদীশ বের করতে পেরেছেন।

তিনদিনের দিনও জগদীশ যখন অনুরোধ শুনলেন না, আলাদাভাবে রান্না ক'রেই খেতে লাগলেন, সুধাময়ী তখন অতি কষ্টে ওপরে উঠে এসে ছেলেকে অভিশাপ দেওয়ার ভঙ্গিতে বললেন, 'বেশ রেঁধে খাও, হোটেলে গিয়ে খাও, তোমার যা খুশি তাই কর। কিন্তু তোমার মত বুড়ো ছেলের অন্যায় আব্দার পালতে গিয়ে আমি ওই দুধের বাচ্চাকে রাস্তায় ফেলে দিতে পারব না। তা তুমি জেনে রেখ।'

জগদীশের মনে হ'ল সুধাময়ী যেন তাঁর মা নন, শরিক মাত্র।

সুধাময়ী ছেলেকে আর খাওয়ার জন্যে দ্বিতীয়বার অনুরোধ করলেন না। মা আর ছেলে আলাদা রান্না ক'রে খেতে লাগলেন।

সেদিন স্ত্রীপুত্রের জন্যে নতুন ক'রে

শোক অনুভব করলেন জগদীশ। ঘরের কোণে বসে দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে সশব্দে কাঁদতে লাগলেন। সব হারাবার পর প্রথম ক'দিন যেভাবে কেঁদেছিলেন ঠিক তেমনি।

মাসের পর মাস কেটে যেতে লাগল। সুধাময়ী অবশ্য আপোষ করবার জন্যে বারকয়েক এগিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু জগদীশ সাড়া দেননি। সাধাসাধির পর সুধাময়ী শেষ পর্যন্ত নিরস্ত হয়েছেন।

জগদীশ আবার ঘর আর বারান্দায় নিজেকে বন্দী করলেন। কাচের আলমারীগুলি খুলে ফেললেন। দেশবিদেশের সাহিত্য দর্শন ইতিহাসের বই ঘরে ঘরে সাজানো। সব পড়েছেন। একাধিকবার পড়েছেন। আরো একবার পড়বার জন্যে প্রিয় দু' একখানা বই টেনে নিলেন। কিন্তু আগের মত পড়ায় আর মন বসে না। আগে এই বই পড়বার জন্যে স্ত্রীর কত খোঁটা সইতে হয়েছে। ছেলেমেয়ের কোলাহলের মধ্যেও বইয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকতে পেরেছেন জগদীশ। কিন্তু আজকাল আর কোন গোলমাল নেই, কোন ব্যাঘাত নেই, শান্ত স্তব্ধ ঘর। তবু পড়ায় মন বসে না জগদীশের। নিচে দু' একবার দিনের মধ্যে যেতেই হয়। যাতায়াতের পথে সুধাময়ীর গলা শুনতে পান, 'ও আমার সোনা, ও আমার মাণিক।

আর হাসির খই ছড়াতে হবে না তোমাকে। আমার ঘর যে ভরে গেল।'

জগদীশ ঘরে ফিরে এসে বই বন্ধ ক'রে নিজের মনে ভাবতে থাকেন, সুধাময়ীর ঘর ভ'রে উঠেছে কিন্তু তাঁর নিজের ঘর শূন্য। বিশুকে পেয়ে সুধাময়ী সব ভুলেছেন, সব পেয়েছেন। মেয়েমানুষ এমন অকৃতজ্ঞ হয়, এমন অল্পেই ভোলে বটে। কিন্তু জগদীশ তেমন নন। তিনি কিছুই ভোলেননি, কাউকে ভোলেননি। ভোলেননি যে নিজের কাছে তার প্রমাণ দেওয়ার জন্যেই যেন তিনি বন্ধ ঘরগুলির তালা খুলে ফেললেন। তাদের শোয়ার ঘর, সুরতের ঘর, সুলেখার ঘর, তাঁর ভাই ভ্রাতৃবধূ আর তাঁর দুই ছেলের ঘর। সবগুলি ঘরে একবার ক'রে যান জগদীশ আর কিছুক্ষণ ধ'রে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকেন। প্রত্যেকটি ঘর যেন এক একখানি যাদুঘর, স্মৃতির সমুদ্র, তাদের ব্যবহারের সব জিনিস, চেয়ার টেবিল খাট আলমারী এমনকি আলনায় ঝুলানো জামাগুলি পর্যন্ত আছে, শুধু তারা নেই। কে বলে যে নেই। জগদীশ তাদের সবাইকে যাদুঘরে বন্দী করে রেখেছেন।

কিন্তু হঠাৎ যেন ধ্যান ভেঙে যায় জগদীশের। নিচে সুধাময়ী কার সঙ্গে কথা বলছেন, 'ও আমার সোনা, ও আমার জাদু—।'

চমকে ওঠেন জগদীশ। সুধাময়ীর গলা কি এত ওপরে এসে পৌঁছায়? না খানিকক্ষণ আগে বাথরুমে যাওয়ার সময় সুধাময়ীকে আদর করতে শুনে এসেছিলেন জগদীশ। মনের দেয়ালে দেয়ালে সেই প্রতিধ্বনিই এখন ধাক্কা খাচ্ছে। কেমন যেন বিমনা হয়ে পড়েন জগদীশ। তাঁর মত সুধাময়ীও তাহ'লে যাদুঘর খুঁজে পেয়েছেন। অনেকগুলি ঘর নয়, একখানি মাত্র ঘর। স্মৃতি সম্বল যাদুঘর নয়, তাঁর সোনাজাদুর ঘর।

হঠাৎ জগদীশ চঞ্চল হয়ে উঠলেন, এক দুঃসহ অস্থিরতা বোধ করলেন শিরায় শিরায়। সুধাময়ী জিতে গেছেন। জগদীশের চেয়ে বেশি বুড়ো হয়েও জগদীশের মত সব হারিয়েও শুধু মেয়েমানুষ হওয়ার ফলে সুধাময়ী আবার সব পেয়েছেন। কিন্তু জগদীশ তাঁকে জিততে দেবেন না। তিনি তাঁর শত্রুকে, তিনি তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীকে গলা টিপে মেরে ফেলে সুধাময়ীকে তাঁরই মত ফের নিঃস্ব রিক্ত ক'রে দেবেন।

ক্ষিপ্তের মত, পানাসক্তের মত সিঁড়ি ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে স্খলিত পায়ে জগদীশ মায়ের ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়ালেন।

সুধাময়ী তাঁর মুখের ভাব লক্ষ্য করলেন না। কারণ তাঁর চোখ ছিল বিশুর ওপর; দশ মাসের শিশু তক্তপোষের ওপর জোড়াসনে বসেছে। সুধাময়ী সেদিকে আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আয় জগু, তোকে আমিই ডাকব ভেবেছিলাম। দেখ, কেমন সুন্দর বসতে শিখেছে বিশু। তুমি কিন্তু ওই বয়সে অমন ক'রে বসতে পারতে না বাপু। তোমার সবই দেরিতে দেরিতে হয়েছিল।'

জগদীশ জবাব না দিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।

সুধাময়ী নিজের মুখে বলে যান, 'জানিস্, এরই মধ্যে তিনটি দাঁত উঠেছে। সোনা, তোমার দাঁতগুলি দেখাও দেখি, দাঁত দেখাও।'

বিশু সঙ্গে সঙ্গে তিন চারটি সাদা ছোট দাঁত বার করে।

জগদীশ কঠিন মুখে গম্ভীর হয়ে থাকেন।

সুধাময়ী বলে চলেন, 'জানিস্, এরই মধ্যে আবার বোলও ফুটেছে। বেশ কথা বলতে পারে শয়তানটা। বিশু, সোনা আমার, মাণিক আমার ডাক দেখি। ডাক, ডাক।'

একটুকাল গম্ভীর হয়ে থাকবার প[র] বিশু সুধাময়ীর অনুরোধ রক্ষা ক'[রে] ডেকে ওঠে, 'মা, মা, মা, মা।'

সুধাময়ী খিল খিল ক'রে হে[সে] ওঠেন, 'দূর বোকা ছেলে। কাল তো[কে] কি শেখালুম। মা নয় রে, বল ঠা[কু]মা। বল বা বা বা বা। ওই যে পাশেই দাঁড়িয়ে রয়েছে। দেখতে পাচ্ছি নে? বল, আবার বল বা বা বা বা।'

বিশু হাসিমুখে কলকণ্ঠে প্রতিধ্ব[নি] ক'রে, 'বা বা, বা বা।'

জগদীশের দু' চোখ বেয়ে জল গড়ি[য়ে] পড়ে। তিনি এগিয়ে এসে সুধাময়ী[র] বুকে চেপে ধরে শিশুর মতই ডে[কে] ওঠেন, 'মা মা।'

বারো ঘর একটি উঠোন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

২৮

এ সম্পর্কে খুব বেশি কৌতূহল কি জিজ্ঞাসাবাদ না করাই বুদ্ধি-নের কাজ হবে চিন্তা করে শিবনাথ দিন প্রায় সারাদিন বাইরে বাইরে টাল। মানে এই নিয়ে দুশ্চিন্তা হ'ত দ সে বাড়িতে বসে থাকত। তার হাতে জ নেই, তা ছাড়া গুপ্তর ঘর তার ঘরের গোয়া, এ-সম্পর্কে একটা দু'টো কথাও র কানে এলে খামোকা মনটা খারাপ তে পারে চিন্তা করে যেন শিবনাথ রুচি রোবার প্রায় পিঠেই পাঞ্জাবি ও একটা পার গায়ে চড়িয়ে অতিরিক্ত দুটো টাকা কেটে পুরে সোজা শেয়ালদার বাসে পল। হ্যাঁ, অনেকদিন পর সে লাইট-উসে একটা ছবি দেখল। ভাল একটা কানে একটু চা খেল এবং হাতে আরো টো একটা টাকা থাকলে সে লাইট-উসের পাশের দোকানের সেই পিতলের পর কাজ করা সুন্দর ফ্লাওয়ার-ভাসটা নতে পারত। কিন্তু টাকার অভাবে নতে না পারলেও বেশ কিছুক্ষণ কানের শো-কেস্-এর সামনে দাঁড়িয়ে না শিল্পীর হাতের তৈরী জিনিসটি খতে অবহেলা করল না। এবং সেটা খতে দেখতে শিবনাথ এইটুকু প্রমাণ রল যে, কোন এক ট্যাংরা-বেলেঘাটার স্তিবাসী হয়েছে বলে তার-শিল্পবোধ শিক্ষিত রুচিসম্মত সুন্দর মনটাকে বসর্জন দেয়নি।

ফুলদানি দেখা শেষ করে সে ঘড়ি খল। সন্ধ্যাসন্ধ্যি সে বাড়ি ফিরতে চায়। মানে এখান থেকে এখন রওনা হলে ক ঘণ্টার মধ্যে সে ওখানে গিয়ে পৌঁছবে। বেড়ানো শেষ করে ইতিমধ্যে রিজাত দীপ্তি ও তাঁদের ছেলেমেয়েরা শ্চয় ঘরে ফিরবেন। শিবনাথ একান্ত-ভাবে আশা করছিল যদি এই টুইশানি হয়ে যায় তবে তার সংসার মোটামুটি স্বচ্ছল হবে। ব্যবসা-বাণিজ্য তার মনের কথা। যদি সেটা সম্ভব না-ও হয় ওবাড়িতে যাওয়া-আসা পারিজাতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার একটা মূল্য আছে বৈকি। চাটে পাট—বড়লোকের সঙ্গে রাখা ভাল। রমেশ রায়ের কথাটা তার মনে আছে।

দোকানের সামনে থেকে সরে এসে শিবনাথ বাস ধরতে বড় রাস্তার দিকে এগোয়। এমন সময় আর একটা দোকান থেকে বেরিয়ে প্রায় লাফিয়ে পেভমেণ্ট-এর ওপর এসে দাঁড়ায়, হ্যাঁ, শিবনাথের সঙ্গে তেমন পরিচয় না থাকলেও ক'দিনে অনেক রকম কথাবার্তা হয়েছে লোকটির সঙ্গে। কে গুপ্তর বন্ধু, চারু রায়।

'আপনি এখানে?'

'হ্যাঁ, এ বইটা দেখবার লোভ সংবরণ করতে পারলাম না।' শিবনাথ আজ চারু রায়কে সিগারেট অফার করল।

'ওয়াণ্ডারফুল!' চারু রায় আড়-চোখে আলোর ফুলকি পরা লাইট-হাউসের আকাশস্পর্শী গম্বুজের দিকে তাকিয়ে ঈষৎ হাসল। 'আমি দেখব—আমার দেখার ইচ্ছা আছে, সময় ক'রে উঠতে পারছি না।'

'এখানে এই দোকানে?'

চারু রায়ের সুন্দর বেশভূষা ও মেয়েলী মুখখানা আবার ভাল ক'রে দেখল শিবনাথ। 'মার্কেটিং?'

'হ্যাঁ, তা,—' পকেট থেকে লাইটার বের করে সেটা সিগারেটের আগায় ঠেকিয়ে চারু রায় মাথা নাড়ল। শিবনাথও পরে সেই আগুন থেকে সিগারেট ধরাল।

'অন্য কিছু না।' মুখ থেকে বাড়তি ধোয়াটা বের করে দিয়ে চারু বলল, 'আমার ক্যামেরা ফিল্ম ফুরিয়েছে তাই কিনতে এসেছিলাম।'

যেন একসঙ্গে অনেক কথা মনে পড়ল শিবনাথের। কিন্তু সেসব সম্পর্কে এখন আর একটিও প্রশ্ন না ক'রে বলল, যে তল্লাটে বাসা নিয়েছি সেখানে ভাল হাউস নেই এবং যে-সব ছবি সে-অঞ্চলে দেখানো হয় তা কোনো রুচিসম্পন্ন লোক বসে দেখতে পারে না।'

'বটেই তো।' চারু ঘাড় নাড়ল। এবং যেন কি ভাবল। তারপর মেয়েদের মত সবগুলো নির্মল পরিচ্ছন্ন দাঁত একসঙ্গে বের ক'রে দিয়ে হাসল। 'তা বড় যে একলা? মানে আমি ও'দের,—আপনার স্ত্রী ছেলেমেয়েদের কথাই বলছিলাম। না কি তিনি আপনার ওয়াইফ বিলাতী ছবি দেখতে ভালবাসেন না?'

'বাসেন না মানে?' শিবনাথ নাক দিয়ে হাসির মৃদুরকম শব্দ বার করল। 'দেশী ছবিতে কিছু থাকে না রাতদিন তো কম্‌প্লেন করে শুনি এবং ছ'মাসের মধ্যে সে কোন বাংলা কি হিন্দী বই দেখেছে বলে আমার মনে পড়ে না। আমিও দেখি না। অন্য আরো দু'টো একটা কাজে আজ আমাকে এদিকে আসতে হয়েছিল। বইটা দেখে ফেললাম। তা ছাড়া স্কুল সেরে এখানে এসে তার সিনেমা দেখা সম্ভব হয় না। বেশ দূর পড়ে যায়। ছুটির দিন ও দেখবে।'

চারু রায় সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। 'প্লিজ এক্সকিউজ মি।' যেন কি মনে ক'রে হাসল। 'আপনি কিছু মনে করবেন না। 'আই হ্যাভ সিন্ সো মেনি পিপ্‌ল। যারা, কেন জানি ফ্যামিলিম্যান হওয়া সত্ত্বেও এমন কি অত্যন্ত সলভেণ্ট যারা তারাও, ভীষণ একলা একলা ছবি দেখতে ভালবাসেন। কেন বলুন তো?'

'মানে একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে স্বার্থপরের মত তাঁরা এই আমোদটি উপ-ভোগ করেন। তখন দারা-পুত্র-পরিবার কেউ না।' শিবনাথও ঘাড় দুলিয়ে হাসল।

'ইয়েস অ্যাক্‌জেটলি সো। কেন এমন হয় বলুন তো? আমি তো, আমার অবশ্য ছবি তোলাই পেশা। কিন্তু যখন বসে দেখি তখন বৌ ছেলেমেয়েরা ডাইনে বাঁয়ে

না থাকলে অত্যন্ত বোরিং মনে হয়,—তা যত ভাল ছবি হোক না—'

'আমিও পারি না আমারও ভাল লাগে না।' হাসিটাকে না নিভিয়ে শিবনাথ বলল, 'টু স্পীক দি ট্রুথ, রোড্ টু হোপ্ দেখতে দেখতে আমি, ওরা আজ সংগে ছিল না বলে নিরাশই হচ্ছিলাম। ছুটির দিন ওদের নিয়ে এসে আবার দেখতে হবে, সকলে মিলে আবার দেখব এ-বই।'

'দি আইডিয়া!' চারু চোখ বুজে যেন স্বগতোক্তি করল। তারপর শিবনাথের মুখের ওপর সবটা দৃষ্টি মেলে ধরে অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে বলল, 'তা যত খুশি এখন দেখুন ইংরেজী ছবি। বাংলা ভাল ছবি যখন আজো তৈরী হ'ল না তো করা কি। কিন্তু বলে রাখছি 'মায়াকানন' যেদিন রিলিজড হবে সেদিন আবার আপনাকে সপরিবারে সে বই দেখতে হবে, —না দেখে শান্তি নেই হা—হা।' কথা শেষ করে চারু শব্দ ক'রে হাসল।

'নিশ্চয় দেখব। এবং আমি আশা করছি দ্যাট্ উইল বি এ গ্রেট পিক্চার। হা হা। আপনি সত্যিকারের একটা বড় জিনিসে হাত দিয়েছেন এ আমি সর্বদাই ভাবছি।' শব্দ করে শিবনাথও হাসল।

দুজনের হাসির শব্দে পথচারীরা ঘাড় ফিরিয়ে এদিকে তাকাল। এক তরুণী মেমসাহেব দুটি বাচ্চার হাত ধরে গুটি গুটি চলে যাচ্ছিল। যেন অবাক চোখে বাঙগালী ভদ্রলোক দুজনকে সাহেবপাড়ায় দাঁড়িয়ে এতটা প্রগলভভাবে কথা বলতে, উচ্চরবে হাসতে দেখে মেয়েটি একটু সময়ের জন্য থমকে দাঁড়াল। এবং তারা যে উচ্চাঙ্গের শিল্প আলোচনা করছে বিদেশিনীর তা-ও বুঝি-বুঝতে কষ্ট হল না অনুমান করে শিবনাথ ভিতরে ভিতরে অত্যন্ত গর্ববোধ করল। চাকা ঘুরে গেছে, শ্রীমতী বুঝুক, কেবল যে দেশ স্বাধীন হয়েছে বলে বাঙগালী ছেলেরা চৌরঙ্গীর ছবিঘরগুলোতে ইংরেজী ছবি দেখতে এসে আজ ভিড় করছে তা না, তাদের সূক্ষ্ম শিল্পবোধ,, ফিল্ম আর্ট সম্পর্কে চিন্তাধারা কতটা অগ্রসর........... শিবনাথের চিন্তায় ছেদ পড়ল।

'আচ্ছা, চলি, নমস্কার।'

'নমস্কার।' শিবনাথ দু'হাত একত্র করল।

আর কোন কথা না ব'লে নীরব মেয়েলী হাসিটা ঠোঁটের আগায় ঝুলিয়ে চারু পেভ্‌মেণ্ট ছেড়ে রাস্তায় নামল এবং এতক্ষণ পর শিবনাথের চোখে পড়ল সেখানে হলদে টু-সীটার দাঁড়িয়ে, হাজারটা গাড়ির ভিড়ের মাঝখান দিয়ে পথ ক'রে ক'রে কেমন আশ্চর্য নিপুণতার সংগে চারু রায় বেরিয়ে গেল চুপ করে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে শিবনাথ দেখল। ছোট্ট হলদে গাড়িটা অদৃশ্য হ'তে সে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কত ভদ্র কত মার্জিত রুচি! মনে মনে বলল শিবনাথ। এত কথা এতটা আলোচনার মধ্যে একবারও যে চারু ট্যাংরা-বেলেঘাটা বস্তি, বনমালীর দোকান, এমন কি কে গুপ্তর প্রসঙ্গ তোলেননি সে জন্যে শিবনাথ মনে মনে শ্রদ্ধা জানাল লোকটিকে। সত্যিই তো, এখানে এই বিলাসী পাড়ায় এমন গমগমে আবহাওয়ায়, যেখানে শুধু হাসি বিলিতি বাজনা বর্ণাঢ্য পোশাকের চমক আর প্রসাধনের মিষ্টি গন্ধে বাতাস ভুরভুর করছে সেখানে হঠাৎ বেকার বাউণ্ডুলে হতভাগ্য কে গুপ্তর কথা কেমন বেমানান ঠেকত। যেন চারুর সংগে একটু সময়ের আলাপের পর তার শরীর মন আরো ঝরঝরে প্রফুল্ল হয়ে গেছে। প্রায় শিস দিয়ে উঠল শিবনাথ এবং বাস ধরতে সামনের দিকে এগোতে লাগল। ফুরফুরে মিষ্টি গন্ধটা কিসের চিন্তা করতে করতে পরে শিবনাথের বুঝতে কষ্ট হয় না হেয়ার অয়েল প্যারিসিয়ান পপি। কে মেখেছে কার মাথায়, ভাবল সে, ভেবে পরে অনুমান করল নিশ্চয় সেই মেয়েটি। বাচ্চা দুটোর হাত ধরে বিদেশিনী তরুণী কেন জানি এবার এই ফুটে এসে শিবনাথের আগে আগে চলেছে। অনেকদিন পর বুক ভরে শিবনাথ প্যারিসিয়ান পপি মাখা চুলের গন্ধ নিল। বিয়ের সময় আরো হাজারটা প্রসাধন সামগ্রীর সংগে দু'শিশি পপি উপহার পেয়েছিল রুচি। সেই থেকে শিবনাথ ওটার প্রেমে পড়ে যায়।

বলতে কি বাস্-এ উঠে আবার একটা অস্বস্তির কাঁটা তার বুকের মধ্যে খচ্-খচ্ করছিল। আবার সেই মুখগুলি—বলাই, পাঁচু, বিধু মাস্টার, শেখর ডাক্তার, কে গুপ্ত, নর্দমা, ময়লা, মোষের গাড়ি, ধোঁয়া ও ধুলোর ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠতে শিবনাথের কেমন যেন মাথা ঝিমঝিম করছিল। সেখানে সে ফিরে যাচ্ছে।

মন খারাপ করে বাসের বাইরে চোখ রেখে চুপ করে বসে রইল শিবনাথ। ধৈর্যধারণ করা ছাড়া এখনি তার করবার কিছু নেই। সুযোগ এবং সময় যতদিন না আসে। না কি আজ সে পারিজাত ও তার স্ত্রীর সংগে দেখা করতে যাচ্ছে এখন থেকেই সুসময়ের আরম্ভ। এই সুযোগে সিগারেট খেতে ভীষণ ইচ্ছা হ'ল শিবনাথের। কিন্তু আইনের কথা মনে পড়তে তৃষ্ণাটা দমন করল। যেন বেলেঘাটায় ফিরে যাওয়ার মত এখন এই ব্যাপারেও সে নিরুপায়। উপমাটা মনে পড়তে শিবনাথ নিজের মনে হাসল, কিন্তু হাসিটা তার তৎক্ষণাৎ থেমে যায়। হ্যাঁ ওটাই ক্যাম্বেল হাসপাতাল। গাড়ি চাপা পড়ে, ঠ্যাং ভেঙে কে গুপ্তর ছেলে ওই লাল বাড়ির কোনও এক কামরায় শুয়ে আছে। ঘটনাটা যত মর্মান্তিক হোক শিবনাথের পক্ষে অপ্রীতিকর, অশুভ। দু'দিন আগে হতে পারত পরে হতে পারত দুর্ঘটনা। আধ মিনিট সময় স্টপেজে বাস দাঁড়ায় আর এই আধ মিনিট সময়ই হাজারটা দুশ্চিন্তায় শিবনাথের মন কালো হয়ে যায়। হাজার দুর্ভাবনা এসে ভিড় করে দাঁড়ায় সামনে

ব্যাপারটা সেখানেই চাপা পড়ে আছে পারিজাতকে নিয়ে টানাটানি হচ্ছে? শ্য বেলা দশটা পর্যন্ত এই নিয়ে সাড়া- া বা উচ্চবাচ্য হয়নি পাড়ায় শিবনাথ খ এসেছে। কিন্তু দুপুরের পর, লো, এখন?

স্টপেজ ছেড়ে বাস হাসপাতাল পিছনে খ চলতে আরম্ভ করার পর তবে নাথ স্বস্তিবোধ করে। কিছুই নি কিছুই হবে না। ভাবতে চেষ্টা করল । তা ছাড়া রমেশ রায় যে আসলে রজাতের হয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিচ্ছে তার াণ কি? ইনফ্লুয়েঞ্জা? গাড়ির ভিতর শটা মুখের দিকে যেন কতক্ষণ হাঁ একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে শিবনাথ য়েঞ্জার লক্ষণ কি, রোগ কতটা প্রবল পীড়িত ব্যক্তি শয্যা নেয়, ঠিক কত কত ঘণ্টা শুয়ে বিশ্রাম নেবার পর ার সে কর্মক্ষম হয়, কথা বলে, হাঁটে, করে এবং নিজের গাড়ি থাকলে তাতে প বেড়াতে বেরোয় ইত্যাদি খুঁটিয়ে টিয়ে শিবনাথ চিন্তা করল বৈ কি।

একটা দু'টো কথা কয়ে শিবনাথ ধ হয়ে গেল। দীপ্তির ব্যবহারে স্মত হ'ল।

চারদিকে তাকিয়ে ঢোক গিলে পরে ক'ভাবে প্রশ্ন করল 'তিনি কি তা'লে জ একেবারেই ফিরছেন না।'

'না'

শিবনাথ চুপ ক'রে রইল।

পারিজাতের বাচ্চারা সামনের প্লনে টোপুটি করে খেলা করছে। অদূরে রেজের সামনে দাঁড়িয়ে মদন ঘোষ রকে দিয়ে গ্যারেজের ভিতরটা সাফ াচ্ছে, তেল মাখা তুলো, কালিভুসো- া ন্যাকড়ার পিণ্ড।

গাড়ি নেই।। গাড়ি নিয়ে পারিজাত ই সকালে আরামবাগ চলে গেছে। সামনে লক্শন। সেখানে তার রাজনৈতিক ুদের সঙ্গে পরামর্শ চলছে রাতদিন।

দীপ্তি তার লাল ফোলা ফোলা চোখ ল বলল, 'আপনারা ভাবেন রায় হবের বাড়ির বৌ দীপ্তিরাণী অগাধ খে ডুব মেরে আছে। এখন সুখটা দেখে ।'

শিবনাথ চোখ নামাল।

'আপনি কি মনে করেন আমিও খুব বেশি ভাবি ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ার জন্যে, একটুও না। যেদিন এ বাড়িতে বিয়ে হয়ে পা দিয়েছি, সেদিন জেনেছি এখানে আমার গর্ভে যে-সব সন্তান জন্মগ্রহণ করে তারা আর যা-ই করুক লেখাপড়া শিখে সাধারণ মানুষের মত থাকতে চাইবে না।

দীপ্তি বারান্দায় পায়চারি করতে থাকেন। এ্যাঁ, আমার বেলায় দোষ, আমি মণ্টু আর মণ্টুর বন্ধুদের নিয়ে ব্যাডমিণ্টন খেলি আর লেকের জলে নৌকা ভাসাই। এখানে এসে তো পর পর আমি অনেক-গুলো রিপোর্ট পেলাম আরামবাগের কুঞ্জে যখন বোতল আর পলিটিক্স চলে তখন ষোল আর সতেরো বছরের দু'টি নাবালিকা এক একটি বুড়ো ধাড়ির মুখের কাটলেট কেড়ে খায়।'

দীপ্তি ঠিক শিবনাথের দিকে তাকায় না, পায়চারি বন্ধ ক'রে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে বারান্দার লাগোয়া একটা স্বর্ণচাঁপার গাছকে লক্ষ্য ক'রে তর্জনী তুলে প্রায় চিৎকার করে বলেন, 'তার চেয়ে একশ-গুণে ভাল মণ্টুরা, আমাদের পাড়ার বড়-লোক ছেলেরা পলিটিক্স-এর মুখোশ পরে রাত্রে প্রস্টিটিউট নিয়ে ফুর্তি করে না। তারা ঘরে থাকে। খাঁটি গৃহস্থের জীবনযাপন ক'রে সংসারের সুখদুঃখ ভালবাসা বিচ্ছেদকে অনুভব করে। তারা অনেক বেশি ভদ্র নিরীহ। তোমাদের মত নারীমাংসলোলুপ কুকুর না! রাতারাতি যারা বড়লোক হয় তারা, তাদের ছেলেরা এই শ্রেণীর আমি কি জানতাম না, আমি কি তখুনি চিন্তা করিনি—'

হঠাৎ এত জোরে দীপ্তি চিৎকার করে উঠল যে শিবনাথ হতভম্ব হয়ে গেল, ভয় পেল।

বাইরে শিশুগুলো খেলা ফেলে ছুটে এসে সিঁড়ির কাছে থমকে দাঁড়াল। গ্যারেজ ঝাঁট দিচ্ছিল ঝাড়ুদার চমকে মুখ তুলে এদিকে তাকাল। আস্তে আস্তে সামনে এসে দাঁড়াল বাড়ির সরকার মদন ঘোষ। 'তা আপনি এদের সামনে এসব বলছেন কেন, এরা বাবুর প্রজা, ভাড়াটে। এতে তো

আপনারও সম্মান যাবে। আপনি ভিতরে গিয়ে এখন একটু বিশ্রাম করুন।'

মদন ঘোষ শিবনাথের দিকে তাকাল। শিবনাথ নীরবে মুখ নামিয়ে হাতের নখ খুটতে লাগল।

দীপ্তি চুপ করলেন। কিন্তু ক্রোধ চাপতে গিয়ে বুকটা একবার পাহাড়ের মত উঁচু হয়ে উঠে তারপর লম্বা একটা নিশ্বাসের সঙ্গে সেটা বেরিয়ে গেল। শিবনাথ লক্ষ্য করল।

যেন মা এক্ষুনি আবার উত্তেজিত হচ্ছে না চেহারা দেখে বুঝতে পেরে বাচ্চারা এবার সাহস করে ঘাস ছেড়ে বারান্দায় উঠে মার হাত ধরে বলল, 'আমরা খাব মা আমাদের খিদে পেয়েছে।'

ওদের হাত ধরে নিঃশব্দে দীপ্তি ভিতরে চলে গেলেন। ফুল ও পাখি আঁকা পর্দাটা শিবনাথের চোখের সামনে দুলতে থাকে।

শিবনাথের স্ত্রী উচ্চশিক্ষিতা ইস্কুলে চাকরি করছেন এই হিসাবে মদন ঘোষ গোড়া থেকেই শিবনাথকেও একটু সমীহ করে আসছে। মদন চোখের ইশারায় শিবনাথকে ডাকতে সে উঠল এবং সরকারের সঙ্গে বেরিয়ে রাস্তায় নেমে এল।

'কি ব্যাপার?'

গলা পরিষ্কার করে শিবনাথ প্রশ্ন করতে মদন ঘোষ অল্প শব্দ করে হাসল।

ব্যাপার তো চোখেই দেখে এলেন। কানে শুনলেন স্যার।'

'কিন্তু আমার সেই ব্যাপারের কিছু যে—'

শিবনাথ চিন্তিত এবং চাপা গলায় সে কথাটা তুলতেই মদন মাথা নাড়ল ও খুক করে কাশবার মতন শব্দ করে হেসে নিকেলের চশমার ফাঁক দিয়ে আড়চোখে আর একবার পারিজাতের বাংলোর দিকে তাকিয়ে নিয়ে শিবনাথের কানের কাছে মুখটা সরিয়ে আনল। 'মশাই, আপনি দেখছি, ওই যে কথায় বলে উনুনে হাঁড়ি চাপিয়ে চাল কিনতে এলাম বাজারে, সবুর সয় না।'

শিবনাথ লজ্জিত হয়ে চুপ করে রইল।

'রাগ করলেন।' মদন নিজেও লজ্জা পেল যেন বেমক্কা কথাটা বলে ফেলে। খাতির দেখাবার জন্যে একটা হাত শিবনাথের কাঁধের ওপর রাখল। শিবনাথ রাগ করল না বা হাতটা সরাল না। টের পেয়ে মদন ঘোষ হেসে বলল,—

—'মশাই বড়লোকের বাড়ির কাজ বুঝতে পারছেন না? আপনাকে তিনি কি বললেন? কর্তা আরামবাগে গেছেন কখন ফিরবেন জানি না—এই তো?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'মশাই, কাল থেকে ভয়ানক হুলস্থূল বাড়িতে। হ্যাঁ, আন্ডাবাচ্চাগুলোর প্রাইভেট মাস্টার রাখা নিয়ে। কর্তা চাইছেন এখানকার লেখাপড়া জানা লোককে দিয়ে কাজ চালাতে, গিন্নীর শখ তাঁর ও-পাড়ার মানে বালিগঞ্জের ছোকরা কেউ এসে পড়াক।'

একটা তিক্ত ঢোক্ গিলে শিবনাথ প্রশ্ন করল, 'তাই নাকি, তা কিছু মীমাংসা হ'ল এর?'

'জানি না,' তেমনি বিরসকণ্ঠে মদন বলল, 'শুনছিলাম সকালে চায়ের টেবিলে বসে দুজনার ঝগড়া। আরে মশাই, আপনি শিক্ষিত মানুষ আমাদের বস্তি-বাড়িতে, আপনাকে বললে কথাটার মানেও ধরতে পারবেন। অর্থাৎ আসলে বড়মানুষ হলে কি হবে। এ'রা আমাদের মতন গরিবলোকের ঘরে যে-সুখ আছে তার ছটাকও পায় না। মশাই বললে বিশ্বাস করবেন, বাচ্চাগুলোর সামনেই, তর্ক-তর্ক করতে করতে দু'জন দু'জনকে মারতে রুখেছিল।'

অধৈর্য হয়ে শিবনাথ বলল, 'তা তো হবেই, এখানে আইডিয়ার প্রশ্ন। দু'জনেই বড় মানুষের সন্তান। কেউ কারো কাছে নিচু হতে চায় না। তারপর, ঝগড়ার শেষে কি স্থির হ'ল? কর্তা রাজী হলেন বালিগঞ্জের মণ্টু ব্যানার্জিকেই আমদানি করতে?'

'ক্ষেপেছেন?' ঝুপ্ করে আবার মাথাটা নীচু ক'রে মদন ফিসফিসিয়ে বলল, 'আপনার হাত ধরে বলছি মশাই, কাউকে যেন কথাটা প্রকাশ করবেন না?'

'ক্ষেপেছেন?' শিবনাথ বলল, 'আমাদের কি, ওরা ঘরে বসে এ-কারণে সে-কারণে রাতদিন ঝগড়া কি মারামারি করুক। আমরা তৃতীয় লোক কেন সেসব প্রকাশ করতে যাব, শুনি কি ব্যাপার?'

'আর, ব্যাপার।' মদন ঘোষ এবার নাকে শব্দ করে হাসল। 'তা আমি অবশ্য বৌদিমণির তেমন দোষও দেখি না, দেখছেন তো, এতগুলো বাচ্চার পরও যৌবন যেন এখনো সারা শরীরে খিলখিল করে হাসছে। তা আরামবাগের আমোদ-ফুর্তির কথাটি জেনেছেন পর থেকে তো আর কথাটিই নেই। তিনিও সুবিধা পেয়েছেন। মণ্টুকে এখানে এনে রাখতে দিতে পারিজাতের যদি আপত্তি তো সে-ও আরামবাগে যাতায়াত বন্ধ রাখুক, গিন্নীর এই শর্ত।'

'এই নিয়ে বুঝি সকালে খুব এক-চোট—'

'হ্যাঁ মশাই হ্যাঁ, প্রায় চুল ছেঁড়াছিঁড়ি। তা উনি জেদ ক'রে করবেন কি। বলে কিনা যার জোরে পারিজাতের জোর, রাজনীতির আসরে গদি পেতে যার তোয়াজ না করলে রায়সাহেবের ছেলে কালই গলা জলে ডুবে যাবে বৌয়ের বায়না সে শুনবে কেন। আরামবাগের শশাঙ্ক বাগচির নাম শোনেন নি? তেরো বার জার্মানীতে আর ন'বার রাশিয়ায় ঘুরে এসেছে? বাপ্

দাপটে এখন এদেশের ঘাটে ঘাটে বাঘে-গরুতে একত্র জল খায়।'

'কি জানি, কাগজে হয়ত দেখে থাকব নাম, আমি তেমন—চিনি না।'

'তা চিনে কাজ নেই আমার-আপনার। এখন কথা হচ্ছে বৌদিমণি যতই রাগারাগি ঝাপাঝাপি করুক, শশাঙ্ক বাগ্‌চির আরামবাগের পার্টিতে গিয়ে দু'চার পাত্র গলায় না ঢেলে একটু ইয়েটিয়ে নিয়ে ফুর্তিটুর্তি না করে পারিজাত এখানে বসে বৌয়ের মান ভাঙাবে সে ছেলেই নয়। আমি তো কর্তার আমল থেকে এবাড়িতে—'

অস্বস্তি বোধ করছিল শিবনাথ কিন্তু মদন ঘোষ তা গ্রাহ্য না ক'রে বলল, 'এটা ভাল, আমি এই জন্য পারিজাতের প্রশংসা করি, মশাই, মেয়েমানুষকে যে-পুরুষ আস্কারা দেয় জীবনে তার উন্নতি নেই—হা-হা। খাওয়া পরা কোন্‌টির অভাব রাখছে পারিজাত যে বৌদিমণির এই আখখুটেপনা?'

'আমাকে তা হলে এখন কি করতে হবে,—কাজের কথাটা যে ভাল করে তোলাই হ'ল না।'

'হবে হবে; তাইতো বলছিলাম মশাই দু'টো দিন যেতে দিন রাগটা একটু পড়ুক। বাচ্চাদের মাস্টার তো রাখতেই হবে। মণ্টু ব্যানার্জি এখানে আসছে না আপনি ধরে রেখে দিন।'

একটা আমগাছের নিচে দাঁড়িয়েছিল দু'জন। অন্ধকার হয়ে গেছে। ঘাড় ফিরিয়ে শিবনাথ একবার রায়সাহেবের বাড়িটা দেখল। সেখানে তেমন ভাল আলোটালো যেন জ্বলছে না আজ।

'কে গুপ্ত এসেছিল তিনি পছন্দ করলেন না, বিধুমাস্টার এসেছিল তিনি পছন্দ করলেন না।'

'আমাকেও তো মনে হয়—' শিবনাথ অস্ফুটস্বরে বলতে যাচ্ছিল, মদন ঘোষ মাথা নাড়ল।

'তা কি আর বারবার এসব চলে, উঁহু, পারিজাত তো মশাই আজ স্পষ্টা-পষ্টি বলে গেল শুনলাম যদি এখানকার কাউকে মাস্টার রাখা হয় ভাল না হয় বাচ্চাদের আর লেখাপড়া শেখাবে না সে, একটু বড় হলে সবগুলোকে কারখানায় ঢুকিয়ে দেবে।' কথা শেষ করে মদন হাসল।

শিনাথ একটা চাপা নিঃশ্বাস ফেলল।

'তাতে আপনার বৌদিমণি কি বললেন?'

'কি আর বলবেন, পারিজাত গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর খুব খানিকটা হৈ-চৈ করলেন, চুল আঁচড়াতে গিয়ে চিরুনি ভাঙলেন, বাচ্চাগুলোকে মারধর করলেন, টেবিলের ফুলদানিটা ভাঙলেন, কাচের গ্লাস ছুঁড়ে মারলেন দু'বার দুটো।'

'খুব অশান্তি এদের মধ্যে,' শিবনাথ বলল, 'মাঝখান থেকে ছেলেমেয়েগুলোর কষ্ট।'

'তাইতো বলছিলাম স্যার,—আমরা খাটো কাপড় পরে শাকভাত খেয়ে এর চেয়ে ঢের বেশি শান্তিতে আছি অনেক বেশি সুখে আছে আমাদের বাচ্চারা।'

'আমি কি পরে আর একবার এ-বাড়িতে এসে দেখা—'

'হ্যাঁ, সেকথাই তো আপনাকে বলতে এখানে ডেকে নিয়ে এলাম স্যার। আপনি এর মধ্যে নিরাশ হয়ে পড়ছেন দেখে অবাক লাগছে। শুনুন শুনুন কথায় বলে বাড়ির গরু ঘাটের ঘাস খায় না, তা খাবে, পারিজাত শক্ত ছেলে, কে গুপ্ত কি বিধুকে পছন্দ হয়নি বলে যে গিন্নীর কাছে নিত্য নতুন মাস্টার এনে হাজির করাবে সে পাত্রই সে নয়। বললাম তো বাড়ি থেকে বেরোবার আগে কি মোক্ষম কথাটাই আজ সে শুনিয়ে গেল গিন্নীকে—হা-হা। তা ছাড়া—' গলার স্বরটাকে হঠাৎ খাদে নামিয়ে মদন বললে, তা ছাড়া আপনাকে যে বৌদিমণির খুব একটা অপছন্দ হয়েছে আমার কিন্তু মনে হয় না।'

'কি রকম?' এই প্রথম আশার আলোকবর্তিকা দেখল যেন শিবনাথ। প্রকাণ্ড একটা ঢোক গিলে মদনের মুখের দিকে হা ক'রে তাকাল।

'বড় চাকরি পেয়ে ভুবনবাবুর মেয়ে বীথি সমিতির সেক্রেটারীর পদ ছেড়ে দিতে চাইছে। দিয়েছে। কাল পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিল এবাড়ি। এখন সেই পদের জন্য লোক খোঁজাখুঁজি হচ্ছে। কাল সন্ধ্যেবেলা বৌদিমণি হঠাৎ আপনার স্ত্রীর কথা আমায় জিজ্ঞেস করলেন, বলছিলেন তাঁকে দীপালি সঙ্ঘের সম্পাদিকার পদটা নিতে অনুরোধ করা যায় কি না, তাঁর কি সময় হবে। যদিও অনাহারী পোস্ট, তা হলেও—'

পর পর দুটো ঢোক গিলে শিবনাথ বলল, 'কি বললেন আপনি?'

'হেঁ হেঁ, আমি তো মশাই কত বড় সার্টিফিকেট দিলাম, তা আপনি যদি তখন কাছে থাকতেন শুনতে পেতেন। আমি বললাম, এইরকম একটা দায়িত্বসম্পন্ন কাজের ভার যারা সত্যিকারের শিক্ষিতা, ভদ্র এবং উন্নতমনা—সেই সব মেয়েদের হাতে ছেড়ে দেয়া উচিত। বললাম, আট নম্বরের বস্তি কেন এ তল্লাটে এমন উপযুক্ত লোক আছে কি না সন্দেহ।'

'কি বললেন তিনি?' রুদ্ধস্বরে শিবনাথ প্রশ্ন করল, 'এ সম্পর্কে কি দীপ্তিরাণী কিছু সেটেল্‌ড করলেন, মানে পাকাপাকি কোন সিদ্ধান্ত?'

'না হয়নি করা, যদ্দুর মনে হল, তারপরই শুরু হ'ল কি না প্রাইভেট টিউটার রাখা নিয়ে ঝগড়া—হবে হয়ে

যাবে, আমি খুব করে বলে দিয়েছি আপনার স্ত্রী সম্পর্কে।'

এতক্ষণ পর শিবনাথ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট তুলল। 'চলবে নাকি একটা সরকার মশাই।' একটা সিগারেট মুখে গুঁজে শিবনাথ প্যাকেটটা মদন ঘোষের দিকে বাড়িয়ে দেয়।

'সিগারেট আবার কেন, আমি তো বিড়িতেই সন্তুষ্ট মশাই। দিশি জিনিস। তা দিন আদরের ধন ঠেলতে নেই।'

সিগারেট ধরিয়ে মদন ঘোষ বলল, 'এই বেলা দামী কথাটা বলছি শুনুন! হাল ছাড়বেন না। চুলে পাক ধরেছে মশাই আমার, তা ছাড়া অনেকদিন তো হয়ে গেল এ বাড়ির চাকরি, হাবভাব, রকমসকম দেখে পারিজাত কি তার গিন্নীর এমন কি বাচ্চাগুলোর চরিত্রও কিছু কিছু বুঝতে শিখেছি। ঠিক হয়ে যাবে আপনার এখানে দেখুন। কাল আপনার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করলেন, আজ আপনি এখানে পা না দিতে কেমন ঝর ঝর কেঁদে ফেলে হৃদয়ের কথাগুলো বলে ফেলল। বড়লোকের বাড়ির মেয়েদের দস্তুরই ওটা যদিও মশাই, তারা, আমি অর্থাৎ বাড়ির সরকার কাছে থাকলে তার কাছে, চাকর-বাকর কি বামুনঠাকুর থাকলে তাদের কাছে আরদালি-পিওন কি বাড়িতে মাস্টার থাকলে তার কাছে, অক্লেশে মনের কান্না বলে যায়। মানে আপন-পর জ্ঞানই কম। পুরুষ হলেই হ'ল। ও কি আপনি মাথা নোয়াচ্ছেন কেন? না না মশাই, এটা যে আমি মনিব-পত্নীর নিন্দা করছি তা না, আপনি ভেবে দেখুন, তারা তোয়াক্কে করে না সুনামের। ধরুন কাল যদি দীপ্তিরাণী এই আস্তানা ছেড়ে বাপের বাড়ি চলে যান তো আর আপনার তেমন সুযোগ আসবেই না। কি, মাইনের কথাও যদি ওঠে আমি বলতে পারি পারিজাত বারো বারো চব্বিশ আর বলে-কয়ে যদি ত্রিশ করা যায় তো ঐ। আর কিছু না। এক বাটি চা না। আর আপনি যদি অন্দরমহল দিয়ে ঢোকেন, হ্যাঁ, বৌদিমণিটির কথা বলছি, তাঁর মন ভিজিয়ে কাজটি বাগিয়ে ফেলতে পারেন তো পঞ্চাশ টাকা মাইনে ঠিক করবেন উনি আপনার। রোজ চা পাবেন, হালুয়া পাবেন। টিফিন—বিকেলে গেলে গরম সিঙ্গাড়া খেতে পারবেন। মশাই চুল-গুলো পেকে গেছে। তা ছাড়া আই-এ, বি-এ পাশ করিনি। বিদ্যে কম। মাস্টার হবার যুগ্যি নই। নয়তো এই সুযোগ আমি হাতছাড়া করতুম নাকি।'

'না, ব্যারিস্টার যেখানে ক্যান্ডিডেট।' শিবনাথ স্বগতোক্তির মত খেদ প্রকাশ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। 'আমার হবে না।'

'আরে ধ্যেৎ মশাই, ব্যারিস্টার, ব্যারিস্টার রাখবার পারিজাতের এখন ক্ষমতা কই।' মদন সরকার আচমকা ধমক দিয়ে উঠল। 'ইলেক্‌শন ইলেকশন করে ও এখন পাগল। জলের মত টাকা ঢালছে শশাঙ্ক বাগচির পায়ে। মদে আর মেয়েমানুষে দুজনে লেপালেপি। আপনি মশাই সুরুৎ করে এই ছিদ্র দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ুন। আপনার কাছে আজ যেমন মনের কথা খুলে বলেছে, এমন আর কারো কাছে বলতে শুনিনি বৌদি-মণিকে। তাই বলছি আপনার হবে। কেন বলছি বুঝতে পারছেন? জমিদার বাড়ির সরকারি করে খাই মশাই, মাথায় বৈষয়িক বুদ্ধি একটু রাখি। কই বার করুন তো আর একটা সিগারেট।' সরকার এবার গুজ গুজ করে হাসল।

শিবনাথ নিঃশব্দে প্যাকেটটা তার হাতে তুলে দিল।

সিগারেট ধরিয়ে মদন ঘোষ বলল, 'কে গুপ্তটা পাগল, বিধুটাকে তো দেখলে এখন জঙ্গল থেকে উঠে এসেছে বলে মনে হয়। এই বড় বড় চুল মাথায় দাড়ির ঝোপ মুখে। আচ্ছা মশাই, আপনাদের বাড়ির বীথিরাণী কি চাকরিটি পেয়েছেন বলতে পারেন? এ্যাঁ, এটি দেখছি পোশাকে-আসাকে আমার এ-বাড়ির বৌদি-মণিকে টেক্‌কা দিতে চলল, কি মশাই, চুপ করে আছেন কেন, কথা বলুন।'

শিবনাথ চুপ থাকলেও মদন চুপ করে রইল না। 'আহা তখন দেখলাম আপনার স্ত্রীকে। একেবারে ছেলেমানুষ। ইস্কুল সেরে বুঝি ফিরছিলেন। সঙ্গে মেয়েটি। না, আপনার মেয়ে মার মতন শরীরের গঠন পায়নি তেমন চেহারাই না। আহা, দেখে কষ্ট হচ্ছিল! আপনার একটা সুবিধাটুবিধা হয়ে যাক। একটা চাকর কি বাঁধা ঝি রাখবার অবস্থা হলে খুকির মার একটু এদিকের কাজের সুবিধা হয়, কি বলেন?' বলে মদন ঘোষ প্যাকেট থেকে পরে খাবে বলে অতিরিক্ত একটা সিগারেট তুলে আস্তে আস্তে বাগুলোর দিকে এগিয়ে চলল। 'কথাটা মনে রাখবেন কিন্তু।' যেতে যেতে দু'বার ঘাড় ফিরিয়ে বলল ঘোষ। শিবনাথ ঘাড় কাত করল।

'আমি বুড়ো হয়ে গেছি, গায়ে ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী নেই।' ঝিঁঝির ডাকের মত দু'কানে কথাগুলো বাজছিল শিবনাথের। আমতলা পার হয়ে সে রাস্তায় নামল। জায়গাটা এখানেও অন্ধকার। পারিজাতের আম-জাম-সুপুরির বাগান এই অবধি চলে এসেছিল বলে গাছের ঘন পাতার আড়ালে রাস্তার গ্যাসের ডোমটা ঢেকে গেছে।

শিবনাথ এখানে এসে আর একবার মন্টু-বিরহিণীর দীর্ঘশ্বাস ছাওয়া অন্ধকার পুরীর দিকে কতক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থেকে পরে সোজা পুবদিকে এগিয়ে চলল। যেন মদন ঘোষের বৈষয়িক বুদ্ধির কথা মনে হতে শিবনাথ এখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে সেদিকে এখন কেবল চোখ থাকলে কাজ অগ্রসর হবে না, চিন্তা ক'রে আপাতত এক কাপ চা খাওয়া ও বিশ্রাম করার উদ্দেশ্যে রমেশের চায়ের দোকানের দিকে লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। চলতে চলতে সে পারিজাতের ছেলেমেয়েদের আজকের দুরবস্থার কথাটাই চিন্তা করল বেশি। আজ বাপমা'র মধ্যে প্রেম জমেনি বলে তাদের কেউ গাড়িতে নিয়ে বেড়াতে বেরোয়নি। বেচারারা অনাথ হয়ে সারাটা বিকেল লনে গড়াগড়ি করছিল। ওদের এক একটি প্রশ্নের ঠেলায় সেদিন শিবনাথ কেমন নাস্তানাবুদ হয়েছিল, তা-ও তার এখন মনে হ'ল। আর মনে হতে নিজের মনে হেসে সিগারেটের শূন্য প্যাকেটটা ছুঁড়ে রাস্তার পাশে ফেলে দিল। মদন শেষ সিগারেটটি তুলে খালি বাক্সটাই শিবনাথের হাতে ফিরিয়ে দিয়েছিল।

—(ক্রমশ)

ব্যারিস্টারের বাবু (১)

শংকর

স্বর্গের দেবতাদের প্রত্যেকের বাহন আছে। কার্তিকের ময়ূর, গণেশের ইঁদুর। দেবতাদের সঙ্গে এই বাহনরাও আমাদের নমস্য ও পূজ্য হয়ে ওঠেন।

উকিল এবং ডাক্তাররাও বাহনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এখানে বাহন অর্থে মোটরগাড়ি বুঝলে চলবে না, এঁদের মুহুরি কিংবা কম্পাউন্ডার বুঝতে হবে। সত্যি কথা বলতে কি, অনেক ক্ষেত্রেই এই মুহুরি ও কম্পাউন্ডাররা এঁদের প্রভুর প্রাইভেট সেক্রেটারি ও প্রধান মন্ত্রণাদাতার কাজ করে থাকেন।

হাইকোর্টের আইনজ্ঞদের কর্মচারীদের দুটি শ্রেণী। উকিলের বাহনের নাম মুহুরি আর ব্যারিস্টারদের সঙ্গে যাঁরা থাকেন, তাঁরা বাবু।

ব্যারিস্টারের বাবু ছোকাদা বলতেন, উকিল ও ব্যারিস্টারে অনেক তফাৎ। আমাদের সায়েবদের বিলেত থেকে পাশ দিয়ে আসতে হয়েছে, আর উকিলবাবুরা আজকাল ল কলেজে রাত্রে ক্লাস করে ব্যারিস্টারদের ডিঙিয়ে যেতে চান।" আসলে ছোকাদা বলতে চাইতেন, উকিল বা এডভোকেটের সঙ্গে ব্যারিস্টারদের যে তফাৎ, মুহুরি ও বাবুদের মধ্যেও সেই তফাৎ।

বার লাইব্রেরীর সামনে যে ক'খানা সরু বেঞ্চি আছে, তারই একটাতে বসে ছোকাদা চিৎকার করে এসব বলতেন। ব্যারিস্টারের বাবুরা এই বেঞ্চি ক'টিতে গাদাগাদি হয়ে বসেন। এ'দের বয়সের পার্থক্য ষাট বছরের বৃদ্ধ থেকে আঠার বছরের যুবক। এ'দের একদল ঘোড়ার আলোচনায় ব্যস্ত। যথা—হ্যান্ডিক্যাপ, পুণা রেস, গভর্নর-জেনারেলস্ প্লেট, ইত্যাদি। অন্য দল হয়ত জজসায়েবদের বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতে ব্যস্ত। আলোচনার মধ্যে বান্ডিলের পর বান্ডিল বিড়ি ধোঁয়া হয়ে উড়ে যায়।

তখন নতুন এসেছি। টেম্পল চেম্বার থেকে হাইকোর্ট বড় একটা যাই না। সমস্ত এলাকাকে নতুন ও অপরিচিত জগৎ বলে মনে হয়। হাইকোর্টে গেলেও সদা সংকোচে থাকি। আমি ব্যারিস্টারের বাবু, কিন্তু এ জগতের কোন আইন-কানুন আমার জানা নেই। একদিন লাইব্রেরীতে যেতে হয়েছিল বই আনতে। হঠাৎ কে যেন বলে উঠল—"এই যে স্যার, এদিকে একটু দেখা দিয়ে যান না স্যার।" প্রথমে বুঝতে না পেরে সলজ্জভাবে বেঞ্চির সামনে দাঁড়ালাম।

"কিছু বলছেন?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার।" রোগামত এক ভদ্রলোক বললেন, "একেই বলে কপাল!"

কথাটি যিনি বললেন, পরে জেনেছি ইনিই ছোকাদা। মাথার চুল সব সাদা হয়ে এসেছে, গায়ে আধময়লা লঙ-ক্লথের পাঞ্জাবী, পায়ে রবারের নিউকাট জুতো, আর গলায় পাকান এক আধময়লা চাদর। ভদ্রলোক মুখের বিড়িতে খুব লম্বা টান দিয়ে বিড়িটা মাটিতে ফেলে জুতো দিয়ে ঘষতে ঘষতে বললেন—

"তুমিই বুঝি বিভূতির জায়গায় সায়েবের নতুন বাবু?"

বললাম, "হ্যাঁ।"

"তোমার কপাল ভাল। এখানকার ক'জন বাবু আর আপিসে বসতে পায়। অমন নইলে সায়েব? বিভূতিকে বড় ভালবাসত। কোথায় ব্যারিস্টারের বাবু, আর না একেবারে মস্ত চাকরি। সায়েব বাড়িতে বড় চাকরি।"

এমন সময় আর এক ভদ্রলোক এসে বেঞ্চির খানিকটা ফাঁকা জায়গা জুড়ে বসতে না বসতেই সমস্বরে সবাই বলে উঠলেন—

"এই যে দাদা, এতক্ষণ কোথায় ছিলে?"

খুব তাচ্ছিল্যের সঙ্গে ভদ্রলোক বললেন, "ছ নম্বরে বাঁড়ুজ্যের কোর্টে ওয়াচ করছিলাম। সায়েব আবার মিত্তিরের কোর্টে ব্যস্ত রয়েছেন, সময়মত খবর দিতে হবে। ব্যাটা এটর্নীর আর কি। ব্রীফ দিয়ে তিনি ঘুম মারতে

গেলেন, আর ছাই আমি তীর্থ-কাকের মত কোর্টে হাঁ করে বসে থাকি।" কথা শেষ না করেই ভদ্রলোক আবার উঠলেন। "যাই; কেদারবাবুকে ধরিগে যাই। বইএর লিস্টি তো অনেকক্ষণ দিয়ে এসেছি।" তারপর তিনি খুব ব্যস্তভাবে বার-লাইব্রেরীর লাইব্রেরীয়ান কেদারবাবুর সন্ধানে বেরিয়ে গেলেন।

"হারুটা আর বাক্‌তাল্লা মারার জায়গা পেলে না, বেটা আমাদের কাছেও রাজা-উজির মারছে।" ছোকাদা বললেন।

"যা বলেছ ছোকাদা," আর একজন ফোড়ন দিল। "হারুটা তো হাজরা সায়েব বলতে অজ্ঞান। কিন্তু বাপু বিজয় হাজরা মাসে কটা অ্যাপিয়ার হচ্ছে, সে কি আর আমরা দেখতে পাচ্ছি না। দুটো ব্রীফ এক সংগে হাতে থাকে কিনা সন্দেহ। তাতেই হারু ধরাকে সরা জ্ঞান করছে।" ভদ্রলোক হাতের একটা কাগজ দিয়ে মাছি তাড়াতে লাগলেন। হাইকোর্টে বাবুদের হাতে একটা ছাপান কাগজ থাকে, নাম ডেলি কজ লিস্ট। কোন্ কোর্টে কি কি মামলা ধরা হবে তারই তালিকা। সকালে এসেই যে যার লিস্টিতে তার সায়েবের মামলায় লাল পেন্সিলে দাগ দিয়ে রাখে।

বাবুদের প্রাণ-মন জুড়ে একটিমাত্র জীব আছেন তিনি ব্যারিস্টার প্রভু, সংক্ষেপে সায়েব। সব ব্যারিস্টারই সায়েব; ঘোষ সায়েব, বোস সায়েব, হাজরা সায়েব। সায়েবদের জোরেই বাবুদের জোর। যে সায়েবের যত পসার, তাঁর বাবুর প্রতিপত্তিও তত বেশী। বাবুদের নিজস্ব কোন পরিচয় নেই। হারুবাবু হারুবাবু নন, তাঁর ডাকনাম ও পরিচয় "হাজরা সায়েবের বাবু।"

আধুনিক বাঙলার অন্য অনেক কিছুর মত আইনব্যবস্থা বিলেত থেকে আমদানী। অনেকে বলেন, হাইকোর্ট ইংরেজ শাসনের সর্বশ্রেষ্ঠ দান, হাইকোর্টের সব কিছু বিলেতের অনুকরণে সৃষ্টি। বিলেতের শিক্ষা, বিলেতের 'ইনের' অনুমতি নিয়েই ব্যারিস্টাররা আসেন কলকাতা, বোম্বাই কিংবা মাদ্রাজে প্র্যাকটিস করতে। ব্যারিস্টাররা বিলেতের বারের সভ্য, তাঁরা তাই সেখানকার আইনকানুন কঠোরভাবে অনুসরণ করেন। বাবুরাও এই বিলিতি ট্র্যাডিশনের অংগ। বিলেতের ব্যারিস্টার-দের ক্লার্ক অপরিহার্য, কলকাতার ব্যারিস্টারদের বাবুরাও তাঁদের সায়েবের কাছে অপরিহার্য।

বাবুরা কি করেন, তাঁদের কাজ কি? সায়েবের জন্য সব কিছু করেন তাঁরা। ব্রীফ নিয়ে সায়েবের পিছনে ছোটেন, বার-লাইব্রেরী থেকে সায়েবের জন্য বই নিয়ে আসেন। সি-ডবলু-এন, অল-ই-আর, এ-আই-আর ইত্যাদি শব্দ বাইরের লোকের কাছে অদ্ভুত ঠেকবে। বাবুরা কিন্তু এসব জানেন। ১৯৩৬এর অল-ই-আর বললেই বাবু জিজ্ঞাসা করবেন ভলুম এক না দুই স্যার? চিনির বলদও তাঁদের বলতে পারেন। মোটা মোটা বই তাঁরা বয়ে নিয়ে যান আবার ফেরত আনেন, সায়েবের নির্দেশমত কোন কোন পাতায় একটু ক'রে কাগজ গুঁজে রাখেন, সায়েবরা একের পর এক সেগুলো দেখে মামলা তৈরী করেন, আইনের নতুন ব্যাখ্যা সৃষ্টি হয়। আইনের বিশেষ কোন ধারা বাতিল হয়ে যায়, বাবুরা অতশত বোঝেন না। বুঝতে তাঁরা চান না, তাঁরা জানতে চান ক'-মোহর মিলবে, এটর্নী কে?

কত মোহর? অনেকে অবাক হতে পারেন! মোহর আবার কি? এ কি আলিবাবার দেশ নাকি যে, মোহর দিয়ে কেনা-বেচা হয়! সবিনয়ে বলব, হাইকোর্টে সব কিছু হিসেব হয় মোহর দিয়ে। ব্যারিস্টারের ফি আপনাকে মোহর হিসেবেই দিতে হবে। আপনি বলবেন, মশায় মোহর পাব কোথায়? আপনার ব্যারিস্টারদের জন্য তো আর টাঁকশালের কর্তারা টাকা তৈরী ছেড়ে মোহর তৈরী করতে বসবেন না।

আমার উত্তর—আজ্ঞে সে আমি জানি। আমরা শুধু হিসেব করি; সোনার মোহর দিয়ে নেবার বেলায় নিই রুপো কিংবা কাগজের টাকা। সতের টাকায় এক মোহর। অর্থাৎ কোন ব্যারিস্টার যখন বলবেন ত্রিশ মোহর নেব, তখন ত্রিশকে সতের দিয়ে গুণ করে যা হয়, অর্থাৎ পাঁচশ দশ টাকা দিলেই খুশি হয়ে যাবেন।

বাবুদের কথায় ফিরে আসি। বাবুরা সায়েবের ব্রীফের জন্য এটর্নীদের অফিসে যান, কখনও বা পথে দেখা হলে নমস্কার জানিয়ে বলেন, "এই যে স্যার, ভাল তো? একটু মনে রাখবেন।" আবার মামলা শেষে এটর্নী অফিসে হাজির হতে হয়। "স্যার, চেকটা হবে নাকি? সায়েব পাঠালেন।" এটর্নী বেশীরভাগ ক্ষেত্রে দার্শনিকের হাসি হাসেন। "আরে একটু নিশ্বাস ফেলতে দাও। ক'দিন যাক। মক্কেলের গলায় তো আর ছুরি লাগাতে পারি না, সবুরে মেওয়া ফলে। বুঝেছ ভজহরি?"

ভজহরি এর জন্যে প্রস্তুত হয়েই আসে। এটর্নী মহাপাত্র সায়েবের হাতে জল গলতে চায় না, তায় চেক! তবু যথাসম্ভব বিনয় প্রকাশ করে বলে, "আজ্ঞে সে কথা তো একশ বার। তা স্যার, তিন মাস তো হলো। সব কিছু তো চালাতে হবে।"

মহাপাত্র যেন শুনতে পেলেন না এমনি ভাব ক'রে টেলিফোন তুলে নম্বর চান। ক্লায়েন্টের সংগে কথাবার্তা শুরু করার আগে বলেন, "আচ্ছা ভাই ভজহরি, আবার দেখা-সাক্ষাৎ হবে। তোমার সায়েবকে ব'লো।"

ভজহরি বিফল মনোরথ হয়ে বেরিয়ে আসে। দশ নম্বরের—(দশ নম্বর ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট, এ পাড়ায় শুধু নম্বর ধরে কথাবার্তা হয়) দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে সে একটা বিড়ি ধরায়। সায়েব রেগে যাবেন। বিশ্বাস করবেন না, বলবেন—"তুমি ভাল করে বলতে পার না। মহাপাত্র নিজে আমাকে বলেছে বাবুকে পাঠালেই চেক মিলবে।"

হাইকোর্টের কাহিনী শুনতে গেলে অন্য কোথাও যাবার দরকার নেই। বার-লাইব্রেরীর সামনের বেঞ্চিতে কিছুক্ষণ বসলেই প্রায় সব কিছু জানা যাবে। কোন্ ব্যারিস্টার কত টাকা রোজগার করে, এড্‌ভোকেট জেনারেল আরও ফি বাড়াবেন কি না, ছোকরা অশোক দাশগুপ্ত কী

় উন্নতি করছে, রোজ দুটো তিনটে পিয়ারেন্স! এই বয়সে এরকম তির কথা বড় শোনা যায় না। রিস্টার শম্ভু চাকলাদার সত্যি জজ ন কি না, বুলু ঘোষ বাবার নাম বেই। জাস্টিস অমুকের সঙ্গে রিস্টার অমুকের হৃদ্যতা সন্দেহজনক না, এসব সংবাদ স্বয়ং চীফ জাস্টিস নন না। এসব একমাত্র বলতে পারেন রা।

আমিও বাবু, ব্যারিস্টারেরই বাবু, কাতা হাইকোর্টের শেষ ইংরেজ রিস্টারের বাবু। ইংরেজ ব্যারিস্টারের কটিসের ধরন একটু অন্য রকম। ীরভাগ ক্ষেত্রে তাঁরা নিজেদের চেম্বার ধন, বিশেষ কোন কারণ ছাড়া ব্রেরীতে আসেন না। বাবুকে শুধু ় বইলেই চলবে না। অফিস দেখতে , টাইপ করতে হবে, শর্টহ্যাণ্ডে ষ্টশন নিতে হবে।

ছোকাদা ডেকে বলতেন, "ওহে করা, ব্যারিস্টারের বাবু হওয়া অত জ নয়। সময় লাগে, বুদ্ধি লাগে, ঝছ? আর লাগে কপাল।"

ছোকাদার তখন বছর পনের বয়েস, র্থ ক্লাস পর্যন্ত বিদ্যে। সেই প্রথম কোর্টে এলেন। ছ'-নম্বরের চোংদার ম্পানী বড় সলিসিটর, তাঁর মামা বাবু সেই অফিসের ম্যানেজিং ক্লার্ক। বললেন, "চল্ রে, হাইকোর্টের বাবু ব। দু'হাতে কাঁচা পয়সা। শুধু টু কপাল-জোর চাই আর কিছু না। রিস্টার সেনের একজন বাবু দরকার।" ডিসেম্বরের গোড়া। গায়ে আলোয়ান য়ে পনের বছরের ছেলে ব্যারিস্টার তে এল। সে কি জিনিস! কাসুন্দের করা বললে, "এ যে-সে ছেলে নয়, লত-ফেরৎ ব্যারিস্টারের সঙ্গে দিন-রাত ় করবে।"

সেন সায়েবের সঙ্গে দেখা হলো। ম দৃষ্টিতে ছোকাদা অবাক, এই রিস্টার! কাঁচা সোনার মত গায়ের রঙ, থ পাইপ। বয়স খুব কম। এ ছেলে র জামাই হবে.........। সেন সায়েব ন এসেছেন। বাঙলাতেই কথা লেন। কাজ হয়ে গেল। হবার ণও আছে। চোংদার কোম্পানীর ম্যানেজিং ক্লার্ক দাশুবাবুর ভাগ্না। দাশুবাবু নিজে কথা দিয়েছেন, জুনিয়র ব্রীফ কিছু কিছু পাঠাবেন।

বাবুদের জীবন অনেকটা জুয়ার মতো। ছোকরা বয়সে ছোকাদা ব্যারিস্টারের হাতে পড়ল। সায়েব যদি উন্নতি করলেন, পশার জমালেন, তাহলে বাবুরও দু'পয়সা হবে। চাইকি কলকাতায় খানকয়েক বাড়িও তুলতে পারে। এটর্নিরা খাতির করবে, দেখা হলে হাত তুলে নমস্কার করবে। কপাল মন্দ হলে যে সায়েব নিজেই ব্রীফের মুখ দেখলেন না, সে সায়েব বার-লাইব্রেরীর ভিতরে টেবিলে মাথা রেখে ঢুলবেন, তাঁর বাবু বাইরের বেঞ্চিতে ঝিমুবে, ওপাশের লোকের কাছে বিড়ি চেয়ে খাবে।

ব্যারিস্টার সেনের সঙ্গে ছোকাদারও সাধনা শুরু হলো। নতুন ব্যারিস্টার এখন তো বেশ কিছুদিন জুনিয়রি করো, এটর্নিদের মন রেখে চলো, সীনিয়রের বাড়ি ডাক পড়লেই হাজির হও। সীনিয়র ব্যস্ত লোক, বেশী কথা বলার সময় নেই। সীনিয়র বলবেন, এই পয়েণ্টে যত মামলা আছে, তার তালিকা প্রস্তুত করো। রাত জেগে সেন সায়েব কাজ ক'রে যান। সীনিয়রের মন জয় করতে হবে। এমনি পরিশ্রম করতে করতে যদি ভাগ্যলক্ষ্মী সদয়া হন।

ছোকাদার এই সময়ের অভিজ্ঞতা কম চিত্তাকর্ষক নয়। কাসুন্দের কানাইলাল ঘোষ সলজ্জ নয়নে ও সভয়ে অন্য বাবুদের পাশে এই বেঞ্চিগুলোর কাছে দাঁড়িয়ে থাকত। বসতে সাহস হয় না, কারণ সায়েবের পরিচয়ে বাবুদের পরিচয়। বড় বড় ব্যারিস্টারের বাবুরা গম্ভীরভাবে আসনে বসেন। সেন সায়েবের মত জুনিয়র ব্যারিস্টারের বাবুর সঙ্গে তাঁরা কথা কইতে পর্যন্ত চান না। হাইকোর্টের বড় বড় ব্যাপারে সে কী বুঝবে এমন একটা ভাব।

বানওয়ারীবাবুকে মনে পড়ছে। কি সুন্দর তার চেহারা, ঠিক যেন বনেদী জমিদার বংশের ছেলে। লাল টুকটুকে রঙ, গাল দুটো যেন রক্তের চাপে ফেটে পড়বে। পরনের আদ্দির পাঞ্জাবি এত ফিনফিনে যে, ভিতরের গেঞ্জি পর্যন্ত দেখা যায়। পাঞ্জাবির হাতা গিলে করা, তার ভিতর থেকে সোনা দিয়ে মোড়া অষ্টধাতুর তাবিজ মাঝে মাঝে উঁকি দেয়। পরিধানে জরিপাড় ফরাসডাঙ্গার নম্বরী ধুতি, পায়ে লাল পাম্প শু, গলায় পাকানো সাদা উড়ুনি। রোজ ধোপ ভাঙ্গা পাঞ্জাবী পরেন বানওয়ারীবাবু। বড় একটা কথা ক'ন না, কথা কইবার সময়ও নেই তাঁর। কত লোক তাঁর সঙ্গে কথা বলে। তবে বেঞ্চিতে বসলেই পকেট থেকে বার হোত এক বিরাট রুপোর ডিবে। মৃদু চাপে খুট্ করে ডিবের মুখ খুলে যেতেই এক জোড়া পান বানওয়ারীবাবু মুখে পুরে দেন।

ডিবের আর এক কোণ থেকে সামান্য একটু চুন আঙ্গুলের ডগায় লাগিয়ে যখন জিবে ঠেকান, তখন তাঁর তিন আঙ্গুলের তিনটি পাথর বসান আঙটি চোখ ঝলসে দেয়। পানের খুশবাই চারিদিক আমোদিত ক'রে তোলে।

আর ওই যে রুপোর ডিবে ওটি যে সে জিনিস নয়। খোদ হ্যামিলটনের বাড়ির তৈরী। হ্যামিলটন কোম্পানী যারা লাট সাহেবের বৌদের গয়না তৈরী করে। রুপোর ডিবের উপর বাঁকা বাঁকা ইংরিজী অক্ষরে লেখা "বানওয়ারী।" চিৎপুরের মল্লিকরা মস্ত জমিদার। তাঁদেরই চুনীবাবু সেবারে পার্টিশন সুটে জিতে বানওয়ারীবাবুকে এই পানের ডিবে উপহার দিয়েছিলেন।

বানওয়ারীবাবুর পশার সবচেয়ে বেশী। কত মামলা তাঁর হাতে। এটর্নিরা এসে ধরে, এই যে বানওয়ারীবাবু, সায়েবকে একটা ব্রীফ পাঠাব একটু দেখবেন। বানওয়ারী গম্ভীরভাবে বলে দেন, "না না মশায়, সায়েবের কড়া হুকুম, ব্রীফ নিতে পারব না। কাজের চাপে সায়েবের নিশ্বাস ফেলার সময় নেই।

এটর্নি হেসে বলে, "না না চিন্তার কিছু নেই। শুধু ব্রীফটা দিয়ে যাব। কেস হিয়ারিং-এ আসতে অনেক দেরি।" বানওয়ারী বাবু তবু অবিচলিত। এটর্নির মুখের দিকে না চেয়েই বলে দেন, "পরে আসবেন, ভেবে দেখব।"

অন্য বাবুরা অবাক হয়ে দেখে। ব্রীফ নিয়ে এটর্নি এলে তারা কত আদর আপ্যায়ন করে, ব্রীফের জন্য এটর্নি বাড়িতে কতবার ধন্না দিতে হয়। এটর্নিরা মুখ বেঁকিয়ে বলে 'দেখা যাবে।' আর বানওয়ারী বাবু এটর্নিদেরই ফিরিয়ে দেন!

বানওয়ারী বাবু বলতেন, "আমি তো নেহাৎ ভাল লোক। এটর্নিদের সঙ্গে যতটা নম্র হওয়া সম্ভব ততটা হই। তোমরা তো কারসন সায়েবের গল্প জান না। স্যর এডওয়ার্ড কারসন, মস্ত ব্যারিস্টার। তাঁর ফীও তেমনি। একবার এক এটর্নি এসে তাঁকে ধরল একটা কেস-এ ফী কমাতে হবে। কারসন সায়েব রাজী নন, এটর্নি তবুও নাছোড় বান্দা। কারসন হঠাৎ এটর্নির হাত ধরে বার লাইব্রেরীর কাছে নিয়ে গেলেন। লাইব্রেরীতে পঞ্চাশ ষাটজন ব্যারিস্টার বসে আছেন। কারসন জিজ্ঞাসা করলেন, "এঁদের দেখতে পাচ্ছেন?" এটর্নি বলল, "হ্যাঁ।" কারসন গম্ভীরভাবে বললেন, "এদের কাউকে কেসটা দিন, অর্ধেক ফী-তে হবে।" এটর্নি হাত কচলাতে কচলাতে বলল, "আজ্ঞে না আপনাকেই আমি ব্রীফ দিতে চাই।" কারসন গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "আপনি যদি এতই বোকা হন, তা হলে আমার পুরো ফী-ই দিতে হবে।"

বানওয়ারী বাবুর সায়েবকে ছোকাদা অবাক হয়ে দেখত। দীর্ঘ দেহ, মোটা চশমার আড়ালে দুটি চিন্তামগ্ন চোখ, মাথায় এক থোক সাদা ও পাকা চুলের বিচিত্র সংমিশ্রণ। পিছনের চুলগুলি খুব ছোট করে ছাঁটা, গায়ে গোলাপী রঙের আভা, সমস্ত শরীরে তীক্ষ্ণতার ছাপ। অথচ কী শান্ত কী সৌম্য রূপ। অমন শরীরে কালো রঙের কোট ভারি ভাল লাগত ছোকাদার।

বানওয়ারী বাবু ছায়ার মত সায়েবকে অনুসরণ করেন। সামনে যেতেন বানওয়ারী বাবু, পিছনে গোটা কয়েক চাপরাসী, কাঁধে তাদের বইএর পাহাড়। লিস্টি দেখে সেগুলো পর পর টেবিলে সাজিয়ে রাখেন তিনি, ছোট ছোট কাগজের স্লিপ ঢুকিয়ে দেন এক এক পাতায়। কিছু পরেই বানওয়ারী বাবুর সায়েব ধীরপদক্ষেপে বারলাইব্রেরী থেকে বার হয়ে কোর্টরুমের দিকে এগিয়ে যান। বানওয়ারী বাবু ছুটে এসে সায়েবকে

াজানুলম্বিত কালো গাউন পরতে াহায্য করেন।

কি সুন্দর ইংরিজি বলেন বানওয়ারী াবুর সায়েব। ছোকাদা তার কিছুই াঝে না তবু বড় ভাল লাগে তাঁর ইংরিজি ুনতে। জজেরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনছেন ানওয়ারী বাবুর সায়েবের বক্তৃতা। তাঁর ুটো চশমা। একটি চশমা টেবিলে, আর ্কটি চোখে। মাঝে মাঝে এক চশমা ুলে অপর চশমাটি চোখে লাগাচ্ছেন, ামনের বইএর সারি হতে একটা মোটা ই টেনে নেন, ফর ফর করে পাতা ুল্টিয়ে যেখানে বানওয়ারী বাবুর স্লিপ াগান সেই পাতা থেকে গড় গড় করে ড়তে শুরু করেন। পর মুহূর্তেই শমাটা নামিয়ে টেবিলের অন্য চশমা টনে নেন। জজ সায়েবের দিকে তাকিয়ে াত মুখ নেড়ে ইংরিজিতে কি সব লেন, ছোকাদা বুঝতে পারে না। তবুও ুব ভাল লাগে, খুব আশ্চর্য লাগে। ্কটা কথা বারবার কানে আসত। 'ওয়েল-লুড' বা ওই ধরনের কিছু একটা ব্দ। সেদিন ছোকাদা বারবার শুনেও ার অর্থ অনুধাবন করতে পারেননি। রে আসল কথা জেনে নিজের ুর্বুদ্ধিতায় নিজেই হেসেছেন। চল্লিশ ছরে লক্ষ লক্ষবার তাঁর কানে এসেছে, ওয়েল মাই লর্ড।"

বানওয়ারী বাবুর সায়েব এক কোর্টে ীর্ঘক্ষণ থাকেন না। বক্তৃতা শেষ করে াতের ব্রীফে কি সব লেখেন, লেখা শেষে ালো রঙের গাউন বাঁহাতে জড়িয়ে ধীরে ীরে তিনি অন্য কোর্টের দিকে এগিয়ে ান। সেখানে বানওয়ারী বাবু আর এক াদা মোটা মোটা বই সাজিয়ে রেখেছেন, াট ছোট কাগজের টুকরোগুলো বইএর ভতর থেকে উঁকি মারতে থাকে। আবার সই দৃশ্য শুরু হয়, বানওয়ারী বাবুর ায়েব এক চশমা খুলে অন্য চশমা পরতে াকেন।

সেই অবসরে বানওয়ারী বাবু বাবু-দের বেঞ্চির কাছে আসেন, সবাই সাগ্রহে াঁর বসার জায়গা করে দেয়। পকেট থেকে ্যামিলটনের বাড়ির রুপোর ডিবে ্যারীতি বার হয়, তিনি এক সঙ্গে দুটো ান মুখে পুরে দেন। চারিদিকে খুশবাই ড়িয়ে পড়ে।

বানওয়ারী বাবু আর তাঁর সায়েবকে নিয়ে কত গল্প হয়। কেউ বলে, ও'র সায়েবের রোজগার কুড়ি হাজার টাকা। আর একজন বলে, "কুড়ি হাজার টাকা ও'র হাতের ময়লা, শুধু অরডিগনাম কোম্পানিই মাসে কুড়ি হাজার টাকা দেন। নিদেন পঞ্চাশ হাজার টাকা রোজগার।" ছোকাদা অবাক হয়ে যায়। মাসে কুড়ি হাজার টাকা, তাও কিনা হাতের ময়লা। মাসে পঞ্চাশ হাজার টাকা!

বানওয়ারী বাবুই পনের বছরের কানাই ঘোষকে দেখে বলছিলেন, "এই দুগ্ধপোষ্য ছোকরাটিকে কে আনল?" ছোকাদার আসল নাম কানাই ঘোষ। বানওয়ারী বাবুই তাঁকে "ছোকরা" বলে ডাকতে শুরু করেন। দেখা দেখি অন্য বাবুরাও ওই নামে ডাকা শুরু করলে, এমনি করে কাসুন্দের কানাই ঘোষ সবার ছোকা বাবু হয়ে দাঁড়াল। তারপর বহুদিন কেটে গেছে, তারই কোন ফাঁকে সবার অলক্ষ্যে ছোকাবাবু ছোকাদাতে পরিণত হয়েছে।

বানওয়ারী বাবুকে ছোকাদা ভয় করত। বানওয়ারী বাবু বেঞ্চিতে বসলে ছোকাদা দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকত, বসতে সাহস হত না। ছোকাদার আদর্শও ছিল বানওয়ারী বাবু। মনে মনে স্বপ্ন দেখেন তিনিও বানওয়ারী বাবুর মত হয়েছেন, এটর্নিরা এসে বলছে, "এই যে ছোকাবাবু, সেন সায়েবকে একটা ব্রীফ পাঠাচ্ছি।" ছোকাদা নিস্পৃহভাবে রুপোর ডিবে থেকে পান বার করে খেতে খেতে বলছেন, "না না, এখন ব্রীফ নিতে পারব না। সায়েব ভয়ঙ্কর ব্যস্ত।"

সেন সায়েব এক কোর্টে কেস শেষ করে অন্য কোর্টে যাচ্ছেন। সেন সায়েবকে ভোর ছটা থেকে কাজ শুরু করতে হয়, চা-খাবার অবসর পর্যন্ত পান না। দিন-রাত শুধু কাজ কাজ আর কাজ। পরিবর্তে টাকা টাকা আর টাকা।

ভবিষ্যতের কল্পনায় ছোকাদার সমস্ত রোমকূপগুলি সজাগ হয়ে ওঠে। কল্পনার রাজ্য হতে ছোকাদাকে আবার ফিরে আসতে হয়। তখন মনে হয় বানওয়ারী বাবু কত ভাগ্যবান।

কিন্তু ভাগ্য কতদিন থাকে? বানওয়ারী বাবুর শেষ পর্যন্ত এই পরিণতি হবে কে জানত?

অন্যদিনের মত বানওয়ারী বাবু সেদিনও সকালে বেঞ্চিতে এসে বসলেন, হ্যামিলটনের বাড়ির রুপোর ডিবে থেকে পান বার করে খেলেন, চারিদিকে খুশবাই ছড়িয়ে পড়ল। তাঁর সায়েব এখনও আসেননি। কেন এত দেরি? মামলা রয়েছে, বড় মামলা। কুমার সত্যনারায়ণ সিংহ মহাপাত্র ভারসাস রাজমাতা অশ্রুলতা। অনেক বই লাগবে, কাল বাড়ি ফেরার আগে সায়েব লিস্টি দিয়ে গেছেন। সমস্ত বইএ স্লিপ লাগিয়ে কোর্টে রেখে এসেছেন বানওয়ারী বাবু, চল্লিশখানা মোটা মোটা বই। বানওয়ারী বাবুর সায়েব এসেই আইনের যুদ্ধ শুরু করবেন। বইগুলো বই নয়, আইন যুদ্ধের গোলা-গুলি। বানওয়ারী বাবুর সায়েব টেবিলের চশমাটা পরে এক একটা বই নিয়ে গড় গড় করে পড়ে যাবেন, রাজমাতা অশ্রুলতার স্বপক্ষে প্রতিটি নজির জজের সামনে অকাট্য হয়ে ফুটে উঠবে।

বানওয়ারী বাবু ডিবে থেকে আবার পান বার করলেন। কিন্তু সায়েব আসছেন না কেন? এত দেরি তো হয় না। এমন সময় বারলাইব্রেরী থেকে দু'একজন হন্ত দন্ত হয়ে বেরিয়ে এলেন।

চিত্রসেন

শিল্পী কে এইচ আরা

বম্বের প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী শ্রী আরা তাঁর বাৎসরিক একক চিত্র-প্রদর্শনী করলেন জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে (২৩-৩০ নবেম্বর)। উদ্বোধন অনুষ্ঠানটি খুবই সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল, শহরের দেশী ও বিদেশী কলারসিক

পোর্ট্রেট

সকলেই উপস্থিত ছিলেন। শ্রী আরা বম্বে শহরের সর্বাধিক জনপ্রিয় ও খ্যাতনামা শিল্পী। তাঁর ছবি অনেকের পছন্দ না হলেও অমায়িক, সদাহাস্য সরল মানুষ আরাটিকে না ভালবেসে উপায় নেই। তাঁর গুণগ্রাহী সকলেই এসেছিলেন এবং ছবিও বিক্রী হয়েছে প্রায় আট হাজার টাকার।

আরার ছবি সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় যে, ভারতীয় আরার শিল্প-সৃষ্টি নিতান্ত অভারতীয়। শিল্পকলার আন্তর্জাতিকতা মেনে নিলেও এটা স্বীকার করতেই হবে প্রত্যেক দেশের একটি বিশেষত্ব থাকে। আরার ছবিতে এই ভারতীয় বিশেষত্বের একান্ত অভাব। শহরের অন্যান্য বহু খ্যাত-নামা শিল্পীর মতই আরাও ভারতীয় শিল্পের ঐতিহ্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন। তাঁর চিত্রকলার প্রধান অনুপ্রেরণা পাশ্চাত্যের শিল্পগুরু মাতিস্, পিকাসো বা মদিগ্লিয়ানীর ছবির 'প্রিণ্ট'। অজন্তা ইলোরা, খাজুরাও, বাহরুৎ, কোনারক বা মহাবলীপুরম এঁদের অনুপ্রাণিত করা ত দূরের কথা, কোনদিনও দেখবারও চেষ্টা করেননি। জীবনকেও এঁরা উপলব্ধি করেছে নিজেদের পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে থেকে, ছবি দেখার সময় এই কথাটাই মনে করিয়ে দেয়।

প্রদর্শনীর ১৪৪টি ঠেসাঠেসি ছবির বেশীরভাগই "স্টিল লাইফ", যার জন্য আরা বিখ্যাত। এতদিন ফুলদানি, ফুল, ফলমূল, শাকসব্জি, মাটির পাত্র টেবিলের উপরেই অধিষ্ঠিত থাকত, কিন্তু এবারকার প্রদর্শনীর অনেক ছবিতে সে সব নেমে এসেছে রাস্তায়, মাঠে ময়দানে, সমুদ্রের ধারে, পাথর ও গর্তের মধ্যে কিম্বা উপরে উঠেছে বাড়ির ছাদে। কোন কোন ছবিতে

ভগ্নালোক

পাশে একটি কি দুটি নারীমূর্তি, অনেক সময় নগ্ন বা অর্ধনগ্ন। এই হল আরার স্টিল লাইফের বিষয়বস্তু। সর্বত্রই ব্যবহৃত হয়েছে জোরালো রঙ। সাদা, কালো, লাল, হলদে, ঘননীল ইত্যাদি। টেকনিক্ বা রেখাঙ্কনের আরা ধার ধারে না। আরার নিকট এই সব প্রাণহীন বস্তু নিতান্ত

ফুলদানি

সজীব। তারাও আশা করে, ভালবাসে, বেদনা পায় মানুষেরই মত এবং অনেক স্থলে সজীব মানুষের প্রতীক হিসেবেও পাত্রগুলিকে ব্যবহার করা হয়েছে, যেমন 'প্রেমিকযুগল' (৪নং) ছবিটিতে। কয়েকটি মাটির পাত্র শিশি-বোতল সমুদ্রের ধারে পাথরের উপর পড়ে আছে ঘেঁষাঘেঁষি, যেন ছেলেমেয়েদের একটি পিকনিকের দল। এরাও হাসে, খেলে, ভালবাসে, এক-জন আরেকজনের কাছাকাছি বসতে চায় এই হল আরার বক্তব্য। কিম্বা "পথের উপর ভাঙা পাত্র" (১৬নং) ছবিটিতে ধুলোয় অবহেলিত মানুষদের প্রতীক করে আঁকা হয়েছে। যাই হোক না কেন, এগুলোকে শিল্প-সৃষ্টির সার্থক রচনা বলে আমার কাছে মনে হল না, যদিও স্থানীয় শিল্প সমালোচকরা প্রশংসায় পঞ্চমুখ। কয়েকটি 'স্টিল লাইফ' জাতীয় ছবির পাশে

নারীমূর্তিকে শাড়ি পরানো হয়েছে, হয়ত কছুটা ভারতীয় ছোঁয়াচ দেবার জন্য। কমন যেন বেখাপ্পা লাগে। 'স্টিল লাইফ' ছবির দু-একটিতে যেখানে আরা সাদা জমির উপর বেশী রঙ ব্যবহার না করে দু-একটি রঙে এ'কেছেন, সেগুলি খুবই সুন্দর হয়েছে, দেখতেও ভাল লাগে। যেমন জাপানী ধরনে আঁকা 'দ্রাক্ষা' (৯৭নং) বা 'নীল ফুল' (৮৮নং)।

এসব ছাড়াও আরও ছবি আছে মনুষ্যাকৃতির ও স্বল্প সংখ্যক নৈসর্গিক দৃশ্যের। মহিলাদের দু-একটি পোর্ট্রেট দেখে মনে হয় যেন মদিগ্লিয়ানীর মেয়েদের শাড়ি পরানোর চেষ্টা হয়েছে (২৯ ও ৩৪নং)। চোখ ধাঁধানো ছবির ওই ঠেলাঠেলি ভিড়ের ও 'স্টিল লাইফ'-এর প্রাচুর্যের মধ্যে তেলরঙে আঁকা 'অন্ধ বালক' (১২০নং) ছোট পোর্ট্রেটটি বিশেষ-ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নীল রঙে অন্ধ ছেলের মুখটি সত্যিই মনকে বিচলিত করে। এ ছাড়া "ভগ্নালোক" ছবিটিও (৮৯নং) উল্লেখযোগ্য। প্রাকৃতিক দৃশ্য-চিত্রে আরা একেবারেই সফল হননি, কি রঙের বিন্যাসে, কি অংকনে। কয়েকটি "চাইল্ড্ আর্ট" বলে চালান যেতে পারে (৮৬, ৮২নং)।

তবুও আরাকে বলতে হবে একজন সফল শিল্পী। কোনপ্রকার শিল্পশিক্ষা ব্যতীত সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় ও অদম্য উৎসাহে আরা যা করেছেন, তা প্রশংসনীয়, কৃতিত্বপূর্ণ। অত্যন্ত দারিদ্র্যের মধ্যে সংগ্রাম করার পর, জীবিকা অর্জনের জন্য অন্যান্য বহুবিধ নগণ্য কাজকর্মের অবসরে, রাত্রে আপন খেয়ালে শিল্পচর্চা করেছেন আরা। আর আজ, এই শহরের তিনি একজন প্রতিষ্ঠাবান শিল্পী।

ভারততীর্থ হরিহর ক্ষেত্র

নীহার ভট্টাচার্য

চলতি কথায় যেটা হরিহর ছত্র, শুদ্ধ ভাষায় সেটা হরিহর ক্ষেত্র। এপারে সোনপুর আর ওপারে হাজীপুর। মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে স্রোতস্বিনী গণ্ডক—কিছুদূর গিয়েই মিশেছে গঙ্গার সাথে। আর তারই কোণ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে হরিহর নাথজীর মন্দির। সেই মন্দির থেকে শুরু করে আশপাশের চার-পাঁচ মাইলের মধ্যেই বিখ্যাত হরিহর ছত্রের মেলা।

ভারতের সবচেয়ে বড় মেলা হবার যোগ্যত্য অবশ্য হরিহর ছত্র একদিনে অর্জন করেনি, লেগেছে বহু যুগ। আর যে সোনপুরের বুকের ওপর এই বিখ্যাত মেলা পুষ্টিলাভ করেছে, সে সোনপুরের মাটিও এর জন্মদাত্রী হবার সৌভাগ্য অর্জন করেনি। কেন, সেটা খুলে বলতে হলে ফিরে যেতে হয় আমাদের পৌরাণিক উপাখ্যানের পাতায়।

শ্বেত দ্বীপের এক সরোবরে একদিন দেওল মুনি জলে দাঁড়িয়ে গাত্রমার্জনা করছেন, এমন সময় স্নানরত এক গন্ধর্ব-কুমার জলের ভেতর ডুব দিয়ে মুনির একটি পা কামড়ে ধরলেন। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে মুনি শাপ দিলেন গন্ধর্বকুমারকে। আর সেই শাপে কুমীর হয়ে তিনি বাস করতে লাগলেন জলে। এমনিভাবে সরোবর থেকে নদী, নদী থেকে সাগরে ঘুরে ফিরে দিন কাটতে লাগল গন্ধর্বের।

এদিকে রাজা ইন্দ্রদমনও তখন অগস্ত্য মুনির শাপে হাতীর রূপ ধরে বাস করছেন গঙ্গা আর গণ্ডক নদীর সঙ্গম-স্থলের কাছে এক বনের মধ্যে। একদিন গজরাজ জল পান করতে নেমেছেন নদীতে, এমন সময় কুমীররূপী সেই গন্ধর্বকুমার অভ্যাসবশে তাঁর পা কামড়ে ধরলেন। রাজা ইন্দ্রদমনের তখন প্রাণ সংশয়; কিছুতেই পা ছাড়াতে পারছেন না। দুজনে ভীষণ যুদ্ধ চলেছে, আর তাঁদের দেখবার জন্যে তীরে সমবেত লোকজন তখনও চিৎকার করে চলেছে, 'কে হারল (কৌন হারা)? কে হারল (কৌন হারা)?' শেষে বহুক্ষণ যুদ্ধের পর নিরুপায় গজরাজ রক্ষাকর্তা ভগবান বিষ্ণুকে স্মরণ করলেন। ভক্তের ডাকে ভগবানের টলল আসন। বিষ্ণু এসে কুমীররূপী গন্ধর্বকে হত্যা করে গজরূপী ইন্দ্রদমনকে রক্ষা করলেন। দেশের লোকজন তখন দেবের মর্ত্যে আগমনের স্থানে স্নান করে অর্জন করলেন পুণ্য। সেই থেকে প্রতি কার্তিক পূর্ণিমার পুণ্য তিথিতে হাজীপুরের কাছে গঙ্গা-গণ্ডকের সঙ্গমস্থলে পুণ্য স্নানের প্রথা চলে আসছে। আর হরিহর ছত্রের মেলার সূত্রপাতও হয়েছে সেই সময় থেকে—হাজীপুরের 'কৌন হারা ঘাটের' আশেপাশে।
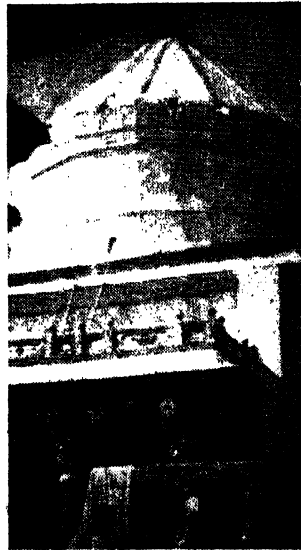
হরিহরজীর মন্দির

কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর মানুষের মন উঠল না বনে-জঙ্গলে-ঘেরা হাজীপুরের ওইটুকু মেলা নিয়ে। গণ্ডক নদীর অপর পারে তখন ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে ভারতের দীর্ঘতম রেল স্টেশন-সোনপুর। নীলকুঠির সায়েবরা সবে সাধের ঘোড়-দৌড়ের মাঠ আর নাচঘর ত্যাগ করেছেন।

এদিকে পাটনার সুবেদার রাজা রামনারায়ণও তখন হরিহরনাথের মন্দিরের যথেষ্ট সংস্কার সাধন করেছেন। কাজেই ওপারের মানুষের তখন স্বভাবতঃই নজর পড়ল এপারের অপেক্ষাকৃত পরিচ্ছন্ন শহরের দিকে। কিন্তু নদী পারাপারের ব্যবস্থা তখনও অসম্পূর্ণ। এক নদীই যেন আঠার ক্রোশ! কাজেই আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরে থাকল মানুষ। অবশেষে ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে যখন হাজীপুর আর সোনপুরের ভেতর বিরাট লৌহ সেতু তৈরি হল—তখন মেলা উঠে এল সোনপুরের দিকে হরিহর নাথজীর মন্দিরের আশে পাশে। কিন্তু যদিও মাতৃভূমির মায়া ত্যাগ করে মেলা পাড়ি জমাল ওপারে, তবু হাজীপুরের ধর্ম-মাহাত্ম্য কমল না একটুও। যাত্রীরা তাই এখনও বিষ্ণুর চরণস্পর্শপূত সেই 'কোন্ হারা ঘাটে' স্নান করে এপারে আসেন মেলা দেখতে।

যাহোক, সোনপুরে এসে যেন নবীন প্রাণরসে সঞ্জীবিত হল মেলা। দেখতে দেখতে পরবর্তী কয়েক বছরের মধ্যেই দূর-দূরান্তরে ছড়িয়ে পড়ল এর নাম। কালপ্রবাহে তা পরিণত হল ভারতবাসীর এক মিলন ক্ষেত্রে। যেন কবিগুরুর মানস-সৃষ্ট ভারতবর্ষ। ধর্মীয় আচরণ আর ব্যবসায়িক লেনদেনের মধ্যে দিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের সুযোগ ঘটল যথেষ্ট।

আজকের দর্শক হয়ত হরিহর ছত্রের মেলায় সেই বিগত দিনের ধর্মীয় ঐতিহ্য খুঁজে পেতে কষ্ট পাবেন। একদিন যে স্থান কথক ঠাকুরের ধর্ম কথায় মুখরিত হয়ে উঠত, আজ হয়ত সেখানে বসেছে ভ্রাম্যমাণ চিড়িয়াখানা, নয়ত ফার্গুসনের ট্রাক্টরের দোকান। তবুও সেই বিগত দিনের ধর্মপ্রবাহ যে একেবারে পরিম্লান হয়ে যায়নি—এটা মনে হয় যখন হরিহরনাথ আর মহাবীরজীর মন্দিরের আশেপাশের আবহাওয়া ছন্দায়িত হয়ে ওঠে সমাগত সাধু-সন্ন্যাসীদের সাম গানে। শুধু কী সাধু-সন্ন্যাসীই! সরল প্রাণ দেহাতীরাও ওদেশের পাঁচালী পড়ার সুরে জায়গায় জায়গায় জটলা পাকিয়ে শ্রীহরিহরনাথের মাহাত্ম্য কীর্তনে রত। শুধু এ থেকেই নয়। আরও দুটি ব্যাপার থেকে কিছুটা উপলব্ধি করা যায় নরনারীর ধর্মবোধ। মন্দির প্রাঙ্গণে মাত্র ক'দিনের মধ্যে যে ফুল-বেলপাতার পাহাড় সৃষ্টি হয়েছে, সেটি একটি প্রমাণ। অন্যটি হচ্ছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা। মন্দিরের ভেতরে নয়, বাইরের চত্বরেই ক্যামেরার কেসটি পর্যন্ত নিয়ে যাবার অনুমতি পাইনি। অনেকে হয়ত এটাকে কুসংস্কার বা গোঁড়ামি বলে আখ্যাত করবেন। হবেও হয়ত তাই। কিন্তু আজকের দিনে সাধারণ মানুষের মানসিক শান্তি যেখানে কল্পিত আকাশকুসুম, সেখানে ও ধরনের গোঁড়ামি বা কুসংস্কারও যদি কিছুমাত্র আনন্দ দিতে পারে, তাদের—তবে সেইটেই বা মন্দ কি। তাছাড়া তীর্থ পরিভ্রমণের অভিজ্ঞতা যাঁদের আছে, তাঁরা বোধ হয় এটা অস্বীকার করবেন না যে, সমাগত যাত্রীদের মধ্যে যে দশভাগ লোক মেলার জলুস বা ভিড়ের দৃশ্য উপভোগ করেন, তাঁরাই তথাকথিত সভ্য শ্রেণীভুক্ত মানুষ। আর বাকী যে নব্বুই ভাগ মন্দির বা তীর্থের মাটি কামড়ে পড়ে থাকে দিনের পর দিন, তারা হচ্ছে 'ইতরে জনা'—অর্থাৎ সাধারণ লোক। মেলা বা তীর্থ চলে এই ধর্মপ্রাণ সাধারণ লোককে নিয়ে—সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত বলে যাঁরা নিজেদের দাবী করেন, তাঁদের নিয়ে নয়। প্রমাণ কুম্ভমেলা। কিন্তু যাক সে প্রসঙ্গ।

নিওন লাইটের নীলাভ আলোয় উদ্ভাসিত হাওড়া বা শেয়ালদা স্টেশন যাঁরা দেখেছেন, তাঁরা যেমন সোনপুর স্টেশনকে প্রাপ্য ভৌগোলিক খ্যাতি দিতে কুণ্ঠিত হবেন, তেমনি কুম্ভমেলার বিরাট জনসমাবেশ যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন, বিশেষ করে গত বছরের, তাঁরাও হরিহর ছত্রের মেলাকে বৃহত্তম মেলা বলে প্রাধান্য দিতে অস্বীকার করবেন। অথচ দুটোই সত্যি। আসবার পথে কাটিহার জংশনে 'ফোর্সফুল ইনঅকুলেশনের' ধাক্কা সয়ে বস্তাবন্দী হয়ে

নানপুরে স্টেশনের পশ্চিম প্রান্তের ল্যাটফর্মে পৌঁছানো গেল কোনক্রমে। ারপর নেমে যাত্রীদের পিছু ধরে চলেছি তা চলেইছি। প্ল্যাটফর্ম যেন শেষ হতে য় না। যাহোক, রাস্তায় এসে যখন মা গেল, তখন মালুম হ'ল যে পনের মনিট লেগেছে শুধু স্টেশনটাই পাড়ি তে। বুঝুন ঠেলাখানা একবার!

গঙ্গাসাগর বা কুম্ভমেলা থেকে হরিহর ত্রের মেলাকে একটু তফাৎ করে দেখতে াই। যাত্রী সমাগম দিয়ে বিচার করলে ম্ভ বা গঙ্গাসাগরই বড় মনে হবে। কিন্তু দুটি স্থানের মাহাত্ম্য শুধু তীর্থ হসেবেই, অন্য কোন কারণে নয়। অথচ রিহর ছত্র একদিকে যেমন তীর্থস্থান, ন্যদিকে তেমনি ব্যবসায়িক আদান-দানের ক্ষেত্রও বটে। যদিও এককালে ছক কার্তিক পূর্ণিমা তিথিতে গঙ্গা-ানের জন্যেই যাত্রী সমাগম ঘটত, তবুও াজকের দিনে যেন সেটা গৌণ উদ্দেশ্য য়ে দাঁড়িয়েছে। মুখ্য হয়েছে মেলা।

ইংরেজী 'ফেয়ার' শব্দটা যে অর্থে বেহৃত হয়, বাংলার মেলা শব্দ বোধ হয় ার উপযুক্ত প্রতিশব্দ নয়। বরং অনেক াপক। অর্থের পার্থক্যটা পরিষ্কার হবে দি 'ব্রিটিশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেয়ারের' পাশে ামাদের কুম্ভ বা গঙ্গাসাগরের মেলাকে নে দাঁড় করানো যায়। কিন্তু 'ফেয়ার' হিসেবে হরিহর ছত্রের মেলাকে গণ্য করলে এরূপ বিশেষণ-বিপত্তি ঘটবার বোধ হয় আর কোন কারণ থাকে না।

হরিহর ছত্রের সমস্ত মেলা পরিভ্রমণ করে যা দেখেছি, তাতে মনে হয়েছে যে, আমাদের কলকাতার বাজারের চাইতে এ-মেলাও কিছু কম নয়। বরং হরিহর ছত্রে এমন অনেক কিছু মেলে, যা কলকাতাতেও চট করে পাবার উপায় নেই। যেমন হাতী আর ঘোড়া। বিস্তীর্ণ পাঁচ মাইল জায়গার ওপর এই পক্ষকাল-ব্যাপী মেলায় যা আছে, সেগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বর্ণনা করা সম্ভব নয়—কারণ রচনার সীমিত পরিধির ভেতর সেটা বাহুল্যের অবতারণা করে। তবু হরিহর ছত্রের মেলা প্রসঙ্গে বলতে গেলে কমপক্ষে যেটুকু বলতে হয়—তা বলছি।

মীনাবাজার, অর্থাৎ মেলার প্রধান বাজার যেটি, সেটিকে প্রথম দর্শনেই ভারত-তীর্থ বলে মনে হয়েছে। ভারতের এমন কোন প্রদেশের লোক বাকী নেই—যে আসেনি। শুধু তাই নয়, কলকাতার সাহেব কোম্পানীগুলো পর্যন্ত দোকান নিয়ে এসেছিল। যেমন রয়েছে বার্মাশেলের স্টল, তেমনি রয়েছে ফার্গুসনের এগ্রিকালচারাল ইমপ্লিমেণ্টসের শো-রুম। আবার ফেরবার পথে স্টীমারের মধ্যে শুনেছিলাম যে, এক ফিরিঙ্গী সাহেবও নাকি কয়েকটি হাতী নিয়ে এসেছিল।

আর দিশী দোকানের স্টলের তো অন্তই নেই। পুরো এক মাইল লম্বা মীনাবাজারের দুপাশে সারি সারি স্টল—মাঝখান দিয়ে রাস্তা। দাদের মলম থেকে শুরু করে বিহার সরকারের কৃষি-প্রদর্শনী পর্যন্ত স্থান পেয়েছে এতে। চিড়িয়াখানাও বাদ নেই অবশ্য। বুক স্টল যেগুলো দেখলাম—সেগুলোতে রাষ্ট্রভাষায় লেখা ধর্মের কেতাবই ষোল আনা। শুধু একটি স্টলে দেখেছি মার্ক্সপন্থী লেখকদের ইংরেজী ভাষায় লেখা নানা রকম বই। আর তার ভেতর বোধ হয় লজ্জায় আত্ম-গোপন করেছিল একখানা বাংলা ভাষায় অনূদিত কাব্যগ্রন্থ,—'নাজিম হিকমতের কবিতা।'

অন্যান্য বাজারের ভেতর হাতী, গরু, ঘোড়া, পাখী প্রভৃতির আলাদা বাজার-গুলো বেশ ভালই হয়েছিল। কিন্তু হলে হবে কি? খরিদ্দার নেই। হাতী কেনেন সাধারণত রাজা-গজা শ্রেণীর লোক। কিন্তু তাঁদের জমিদারী তো সরকার নিয়ে নিচ্ছেন। হাতী পুষবার টাকা আসবে কোথা থেকে? কিন্তু চাষবাসের জন্য মোষ আর বলদের প্রয়োজন সর্বকালের—অন্তত আমাদের দেশে। তাই যাকিছু বেচাকেনা হয়েছে 'বয়েল বাজারে।' আর 'জারার' দৌলতেও কিছু কাটতি হয়েছে শীত বস্ত্রের দোকানগুলোতে।

বিহারের সাধারণ একটা চাষী

হরিহরের মন্দির প্রাঙ্গণে ধর্মপ্রাণ নর-নারীর ভিড়

মীনাবাজারের একটি দৃশ্য

গৃহস্থের অর্থনীতির অ, আ, ক, খ-র জ্ঞান দেখলাম বেশ টনটনে। জিজ্ঞেস করেছিলাম, 'বেচাকেনায় এবার এত মন্দা কেন?'

বলেছিল ভাঙা বাংলায়, 'হোবে না কেন? কণ্টোর উঠল খালি চাউলকে। লেকিন, ঔর সব চীজের দাম বাড়িয়ে গেল। তো বলিয়ে বাবু, চাষী আদ্‌মি কোথাসে কিনে গা?'

কথা অবশ্য মিথ্যে নয়। যে অনুপাতে কৃষিজাত পণ্যের দাম কমেছে, সে অনুপাতে অন্যান্য জিনিসের দামের সমতা আদৌ নেই। চালের দাম তিরিশ টাকা থেকে ষোল টাকা হয়েছে, কিন্তু চিনির দাম আর কাপড়ের দাম কি সেই অনুপাতে কমেছে? আড়াই মণ চাল বিক্রী করলে তবে এক মণ চিনি মেলে!

হরিহর ছত্রের মেলার শুনলাম এবার যথেষ্ট উন্নতি ঘটেছে। অন্তত যাত্রীদের স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যাপারে। এটা অবশ্য কিছুটা প্রত্যক্ষও করেছি। এবার মেলার পরিচালন-ভার নিজ হাতে গ্রহণ করেছিলেন বিহার সরকার। কাজেই মেলার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি কামনা করেছিল সকলে। সেটা সফল হবার জন্য বিহার সরকার অবশ্যই ধন্যবাদার্হ।

মেলায় আর একটি জিনিস লক্ষ্য করা গেল—যেটা ভারতীয় মাত্রেরই গর্বের বিষয়। বিহারে দেখলাম আয়ুর্বেদ প্রীতি রয়েছে যথেষ্ট। কোলকাতার দু-তিনটে বড় বড় আয়ুর্বেদ ভবনের শাখা এই মেলায় এসেছিল এবং স্টলের বিরাটত্ব আর দোকানের সাজসজ্জা দেখে মনে হয়েছিল যে, বিহারীরা নিশ্চয়ই আয়ুর্বেদের কদর জানেন। নইলে পনের দিনের জন্যে এমন ঘটা করে দোকান আর চিকিৎসা বিভাগ বসাবার প্রয়োজন কেন?

ঘরকুনো বলে বাঙালীর একটা অপবাদ আছে। সেটার সত্যতা এই মেলায় এসে কিছুটা উপলব্ধি করা গেল। বাঙালীর কোন স্টল নজরে পড়ল না এই মেলায়। অথচ শুনি যে, ব্যবসায়ে তাঁদের মন্দা চলছে। শুধু কি তাঁরা দশকর্ম ভান্ডারেরই একচেটিয়া ব্যবসা করবেন? কলকাতার দু-একটা দোকান যা এসেছিল, তা অ-বাঙালী প্রতিষ্ঠান বলেই মনে হল। হোক, তবু বাংলা দেশ থেকেই তো এসেছিল।

আবার সব বাঙালীই যে ঘরকুনো নন—এমন পরিচয়ও পেয়েছি। ক্লান্তপদে ফিরে আসছি মেলা দেখে। হঠাৎ কানে এল গুটিকয়েক কথা,—'তোমায় বলে-ছিলাম না মেলা দেখাব, এবার হল তো?'

নিজ ভাষা শুনে তাকালাম পাশে। দেখি ছেলেমেয়ে নিয়ে একটি বাঙালী পরিবার চলেছেন এক্কায় চড়ে। সোনপুর স্টেশনে গিয়ে আবার দেখা হল; জিজ্ঞেস করলাম—'কেমন দেখলেন মেলা?'

পাল্টা প্রশ্ন হল, 'আপনি কি বাইরে থেকে এসেছেন?'

বললাম, 'আজ্ঞে, হ্যাঁ।'

—'তবে জবাবটা দেবেন আপনিই—কেননা, ধরতে গেলে এখন এটাই আমার দেশ।'

অগত্যা জবাব দিই, 'ভালই দেখলাম। তবে সবচাইতে ভাল দেখলাম কী জানেন—আপনাদের। আর তার চাইতেও ভাল লাগল আপনার সঙ্গে এই দু মুহূর্তের আলাপ।'

আর বেশিক্ষণ কথাবার্তা বলতে পারলাম না তাঁদের সঙ্গে, কেননা, ট্রেনের সময় হয়ে এসেছিল। তবে এটুকু জেনে-ছিলাম যে, ভদ্রলোক হাজীপুরের মাইল-বিশেক দূরের কোন্ বর্ধিষ্ণু গ্রামে যেন ডাক্তারী করেন। বাঙালী বলতে সেখানে তিনি একাই। বিহারে আছেন আজ পনের বছর।

ডাঃ চৌধুরী আর তাঁর স্ত্রীকে নমস্কার জানিয়ে ট্রেনে উঠলাম। গাড়িও ছেড়ে দিল। প্ল্যাটফর্মের ওপর ইঞ্জিনটার সদ্য ছেড়ে-যাওয়া কুয়াশার মতো পাতলা ধোঁয়ার পদার্থের ভেতর দিয়ে শেষবারের জন্যে দেখে নিলাম একবার তাঁদের। পথশ্রমের গ্লানি তখন যেন অনেক কমে গিয়েছে বলে মনে হল।

শ্রীমৃত্যুঞ্জয় রায়

স্বাধীন রাজ্য যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল জোশেফ ব্রোজ টিটো আসছেন ভারত পরিদর্শনের জন্য। এ মাসের শেষের দিকে তিনি ভারতের ভূমিতে পদার্পণ করবেন। তাঁর এই আগমনকে স্বাগত জানিয়ে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলেছেন : 'ভারতের জনগণ আগ্রহের সঙ্গে আপনার ভারত পরিদর্শনের জন্য প্রতীক্ষা করছে। আপনার ভারত পরিদর্শনের ফলে উভয় দেশের মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্বের মনোভাব বৃদ্ধি পাবে।' ওদিকে আমাদের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু নয়াদিল্লীতে এক জনসভায় মার্শাল টিটোর আসন্ন ভারত পরিদর্শনের কথা উল্লেখ করে আনন্দ প্রকাশ করেছেন। তিনি বলেছেন যে, আমাদের বিশিষ্ট অতিথিকে আমরা যথাযোগ্য সমাদরের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাব।

রাজনৈতিক কারণ ছাড়াও এই মহান নেতাকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করার কারণ রয়েছে, সে হচ্ছে হিটলারের কবল থেকে তিনিই যুগোশ্লাভিয়ার জনসাধারণকে মুক্ত করেন। তাঁর নেতৃত্বেই যুগোশ্লাভিয়া জার্মান শাসনমুক্ত হতে পেরেছিল। শুধু তাই নয়। স্টালিনের মত শক্ত মানুষের সঙ্গেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সাহস ওঁর হয়েছিল। সাহসী হয়েছিলেন বলেই স্টালিনিজমের নাগপাশে ইনি বাঁধা পড়েন না, দেশকে বাঁধা দেন নি। যদিও তাঁর দেশও কম্যুনিজমের পথ ধরে অগ্রসর হচ্ছে,, কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার কম্যুনিজম আর রাশিয়ার কম্যুনিজম এক জিনিস নয়। টিটো স্টালিনমার্কা কম্যুনিজম গ্রহণ না করে মার্কসইজমকে নিজের দেশের উপযোগী করে দেশে প্রয়োগ করেছেন এবং দেশকে ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর ভারত পরিদর্শন উপলক্ষে পৃথিবীর একজন স্বাধীনতা-সংগ্রামীর জীবনকথা এবং একটি মহান দেশের ইতিহাস সামান্য আলোচনা প্রাসঙ্গিক হবে না।

যুগোশ্লাভিয়া ইউরোপের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিত। এর উত্তরে হচ্ছে অস্ট্রিয়া আর হাঙ্গেরী, পূর্বদিকে রুমানিয়া আর বুলগেরিয়া, দক্ষিণে গ্রীস আর এলবেনিয়া এবং পশ্চিমে ইতালী আর ট্রিয়েস্ট। এর বেশীর ভাগ অংশই বলকান উপদ্বীপের অন্তর্ভুক্ত, সামান্য অংশ মাত্র মধ্য ইউ-রোপের সঙ্গে যুক্ত। এর মোট আয়তন হচ্ছে ৯৫,৫৫৮ বর্গ মাইল।

সার্বিয়া, ক্রোসিয়া, শ্লোভেনিয়া, বোসনিয়া ও হেরৎসিগোভনিয়া, মেসি-ডোনিয়া এবং মণ্টিনিগ্রো—এই ছয়টি ফেডারেল রিপাবলিক নিয়ে যুগোশ্লাভিয়া গঠিত। এর মধ্যে সার্বিয়াই সবচেয়ে বড়; তারপর ক্রোসিয়া, তারপর বোসনা। রাজ-

ধানীগুলির নাম হচ্ছে বিওগ্রাড, জাগ্রেব, লাইবাক্, সারাজেভো, স্কোপাই এবং টিটোগ্রাড।

যুগোশ্লাভিয়া প্রধানত পর্বতময় দেশ। এর মোট ভূমির তিন ভাগই হয় পর্বত নয় উচ্চভূমি আর মাত্র এক ভাগ সমতলভূমি, নদী উপত্যকা বা নিম্নভূমি।

যুগোশ্লাভিয়ায় নদীর সংখ্যা অনেক। সাধারণত এগুলি কৃষ্ণসাগর, এড্রিয়াটিক সাগর ও এজিয়ান সাগরে গিয়ে পড়েছে। প্রধান নদী হচ্ছে দানিউব। নদীটির উৎপত্তিস্থল হল জার্মানী। যুগোশ্লাভিয়ার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীটি কৃষ্ণ সাগরে গিয়ে পড়েছে। যুগোশ্লাভিয়ায় দানিউব নদীর প্রায় ৪০টি প্রধান শাখা-নদী আছে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল সাভা, ড্রাভা, মোরাভা আর তিসা নদী। এড্রিয়াটিক সাগরে যেসব নদী এসে পড়েছে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ড্রিম নদী। এ নদীটি বহু পর্বত ও হ্রদ অতিক্রম করে এবং সুন্দর সুন্দর জলপ্রপাত সৃষ্টি করে সাগরে গিয়ে পড়েছে। ওদিকে এজিয়ান সাগরে যে সব নদী পড়েছে, তার মধ্যে নাম করা যেতে পারে ভারদার্ ও স্ট্রুমিকা নদী।

যুগোশ্লাভিয়া প্রধানত পার্বত্য দেশ বলে বহু সুন্দর সুন্দর হ্রদের সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে বৃহত্তর হচ্ছে স্কাডার। এর আয়তন হচ্ছে ৩৬৯·৭২ বর্গ কিলো-মিটার। তারপর ওরিদ্। এর আয়তনও কম নয়। তা ছাড়া আর যে সব বড় বড় হ্রদ আছে, তাদের নাম হচ্ছে প্রেস্পা, দয়রান, ভ্রানা, প্রোক্লান, পালিচ, বোহিনি, প্লিটভিৎস্ আর ব্লেড। এ ছাড়া ছোট ছোট বহু হ্রদ রয়েছে সারা দেশ জুড়ে। বিভিন্ন পর্বতমালা, ঘনসন্নিবদ্ধ অরণ্যানী, অসংখ্য হ্রদ আর সর্পিলগতি নদীসমূহ মিলে যুগোশ্লাভিয়াকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করে রেখেছে। এই সৌন্দর্যের সঙ্গে তাল রেখে যুগোশ্লাভ নরনারী যখন বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিত হয়, তখন সত্যই অপূর্ব দৃশ্যের সমাবেশ হয় চারিধারে।

যুগোশ্লাভিয়ার মোট জনসংখ্যা হচ্ছে ১,৬৯,২৭,২৭৫। মোট জন-সংখ্যার মধ্যে ৮২,১১,২৮৪ জন পুরুষ আর ৮৭,১৫,৯৯১ জন স্ত্রীলোক। অর্থাৎ পুরুষের চেয়ে যুগোশ্লাভিয়ায় মেয়ের সংখ্যা বেশী। হিসাবে দেখা গেছে, প্রতি হাজার পুরুষে মেয়ের সংখ্যা হচ্ছে ১০৬০ জন (১৯৫৩ সালের জনগণনা অনুসারে)। ১৯৪৮ সালে এই সংখ্যা ছিল ১০০০ : ১০৮০।

সার্ব, ক্রোটস্, শ্লোভানিজ্, মেসিডো-নিয়ান এবং মণ্টিনেগ্রিন্—এই পাঁচ জাতির লোক বাস করে যুগোশ্লাভিয়ায়। এ'দের কথিত ভাষাকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—যথা, সার্বো-ক্রোট, শ্লোভেজ আর মেসিডোনীয়। সার্বিয়া, ক্রোসিয়া, বোসনিয়া ও হারৎসিগোভানিয়া এবং মণ্টিনিগ্রোতে সার্বো-ক্রোট ভাষা; শ্লোভেনিয়াতে শ্লোভেনীয় ভাষা এবং মেসিডোনিয়াতে মেসিডোনীয় ভাষা ব্যবহৃত হয়। এখানে সমস্ত ধর্মই স্বীকৃত। চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের কোন সম্পর্ক নেই।

এবার এ দেশটির শিক্ষার কথা বলা যাক। শিক্ষা ব্যাপারে যুগোশ্লাভ সরকার ছ'টি মূলনীতি অনুসরণ করে থাকেন। যথা, (১) প্রাথমিক হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা পর্যন্ত সমস্ত শিক্ষাই অবৈতনিক এবং সর্বস্তরের লোকের পক্ষেই সমান সুযোগ-সুবিধা বর্তমান; (২) মাতৃভাষার মাধ্যমে সাধারণ শিক্ষা দান; (৩) ৭ থেকে ১৫ বৎসর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক শিক্ষা; (৪) স্কুলসমূহ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন; (৫) চার্চের সংগে শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কহীন; (৬) উচ্চতর শিক্ষার উপযুক্ত সুযোগ সকলের জন্যই উন্মুক্ত।

শিক্ষা সম্বন্ধীয় এই সকল নীতির অধিকাংশই দ্বিতীয় মহাসমরের পর গৃহীত হয়। এর পূর্বে যে শিক্ষানীতি প্রচলিত ছিল, তা অগণতান্ত্রিক। হিসাবে দেখা যায়, ১৯৫২ সালে যুগোশ্লাভিয়ায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ১৩,৬৬১টি, শিক্ষকের সংখ্যা ২৯,৭০০ জন, ছাত্রের সংখ্যা ১,৪২২,০০০ জন। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে শতকরা ৪৬·২ জন। আর উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ৬৮৩টি এবং ছাত্রের সংখ্যা ২,৪৯,০০০ জন। বর্তমানে যুগোশ্লাভিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা হচ্ছে ৫টি, কিন্তু ১৯৩৮—৩৯ সালে ছিল মাত্র তিনটি। এ ছাড়া পঙ্গু ছাত্রদের জন্য স্কুল, শিল্প-শিক্ষা দানের স্কুল, শিক্ষক শিক্ষণ-কেন্দ্র, আর্ট স্কুল, উচ্চতর বিদ্যালয় রয়েছে।

দেশে শিক্ষা বিস্তারের জন্য সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীনে যেমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা রয়েছে জনগণের স্বাস্থ্য রক্ষার্থও সরকার তেমন সুষ্ঠু ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। সমস্ত যুগোশ্লাভিয়ায় মোট হাসপাতালের শয্যার সংখ্যা ১৯৫২ সালে ছিল ৫২,৪০০টি এবং ডাক্তারের সংখ্যা ২,১৮০ জন। তা ছাড়া তাঁদের সহকারী ইত্যাদির সংখ্যা হচ্ছে ২,৬০০ জন। যক্ষ্মা চিকিৎসার জন্য ডাক্তারখানার সংখ্যা হচ্ছে ৪০টি। মেয়েদের ও শিশুদের চিকিৎসার জন্যও সুবন্দোবস্ত রয়েছে। যুগোশ্লাভিয়ায় সামাজিক বীমাব্যবস্থা চালু রয়েছে। প্রত্যেক শ্রমিক, কর্মী, অফিসার, পেন্সনভোগী ব্যক্তি, যুদ্ধ প্রত্যাগত সৈন্য ও তাঁর পরিবারবর্গ এই বীমার সুযোগ গ্রহণ করতে পারেন। হিসাবে দেখা গেছে যুগোশ্লাভিয়ার মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪৫ শতাংশ এ বীমার সুযোগ পাচ্ছে।

এবার যুগোশ্লাভিয়ার প্রাকৃতিক সম্পদ, কৃষি ও শিল্প সম্বন্ধে কিছু পরিচয় দেব।

প্রাকৃতিক সম্পদের দিক থেকে যুগোশ্লাভিয়া ইউরোপের অন্যতম সম্পদশালী দেশ। এখানে ভূগর্ভে প্রচুর কয়লা আছে বলে বিশেষজ্ঞগণের ধারণা। তাছাড়া খনিজ তৈল, অপরিশোধিত লৌহ, ম্যাঙ্গানিজ, ক্রোমিয়াম, নিকেল, কোবাল্ট, টাঙ্গস্টেন, তামা, সিসা, বক্সাইট, এণ্টিমনি, মার্কারি, পাইরাইট, আর্সেনিক প্রভৃতি খনিজ দ্রব্য ছাড়াও সোনা এবং রূপাও যুগোশ্লাভিয়াতে প্রচুর পাওয়া যায়।

যুগোশ্লাভিয়ার জলসম্পদও উল্লেখযোগ্য। এখানে জলবিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ কিলোওয়াট।

এ দেশের বনসম্পদও কোন অংশে কম নয়। এর মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ বনভূমি। এই বনভূমি থেকে বৎসরে প্রচুর কাঠ ছাড়াও অন্য অন্য বনজ সম্পদ আহরিত হয়।

যুগোশ্লাভিয়া আমাদের মত কৃষিপ্রধান দেশ। মোট ২·৫৬ কোটি হেক্টর জমিতে কৃষিকার্য হয়। মোট জনসংখ্যার তিন-চতুর্থাংশ কৃষিকার্যে নিযুক্ত আছে। কিন্তু ক্রমেই এ সংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে। এখানে যদিও প্রতি ১০০ হেক্টর জমিতে ১১৪ জন লোক নিযুক্ত ছিল, কিন্তু জমির উৎপাদন ছিল খুবই কম। এক হেক্টর (১ হেক্টর= ২½ একর) জমিতে উৎপন্ন হত ১ থেকে ১·১ টন গম, ১·৯৮ টন ভুট্টা, ৬·২৭ টন আলু ও ১৯ টন কন্দ জাতীয় জিনিস যা থেকে চিনি পাওয়া যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে ভূমি-ব্যবস্থার সংশোধন করা হয়। তাতে প্রায় ১০।। লক্ষ হেক্টর চাষ জমি সরকার বাজেয়াপ্ত করে দরিদ্র চাষীদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়া হয়। তাতে ২,৪০,০০০ পরিবার প্রায় ৪,৩৯,৬০০ হেক্টর জমি পায়। এর পরে চাষব্যবস্থা সম্বন্ধে এবং সমবায় প্রথায় চাষাবাদ সম্বন্ধে অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

যুগোশ্লাভিয়ার প্রধান উৎপাদন হচ্ছে গম। তারপর ফল, সব্জী আর পশুর খাদ্য। তাছাড়া শন, তুলা, তামাক প্রভৃতিও এখানে উৎপন্ন হয়। পশু-পালন ও মাছ ধরা এখানকার লোকেদের একটি প্রধান উপজীবিকা।

যুদ্ধের ফলে যুগোশ্লাভিয়ার কৃষি ও শিল্পের গুরুতর ক্ষতি হয়। তার রসায়ন শিল্প, বস্ত্র শিল্প, বিদ্যুৎ শিল্প, ফল শিল্প ও ধাতু শিল্প যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তার প্রত্যেকটি খনি বোমার আঘাতে কিছু না কিছু নষ্ট হয়। কৃষির ক্ষেত্রেও তার ক্ষতির পরিমাণ কম নয়। তাছাড়া যুদ্ধে যুগোশ্লাভিয়ার যথেষ্ট লোকজন মারা যায়। কিন্তু জাতির ছিল বাঁচার অদম্য আগ্রহ। তাই, যুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে প্ল্যানড্ ইকনমি অনুসারে দেশ পুনর্গঠনের উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়। লোকসভা দেশের শৈল্পিক ও বিদ্যুতীকরণের জন্য একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা (১৯৪৭—১৯৫১) রচনা করেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে বিভিন্ন বৃহত্তর শিল্পগুলি পুনর্গঠিত হয় ও উৎপাদন বৃদ্ধি পেতে থাকে। লৌহ উৎপাদন ১৯৩৯ সালে যেখানে ছিল ১,০১,০০০ টন ১৯৫১ সালে সেখানে উৎপাদিত হয়

২,৪৮,০০০ টন। ১৯৫২ সালে উৎপাদনের পরিমাণ হচ্ছে ২,৭৩,০০০ টন। লোহের পর ইস্পাতের উৎপাদনও প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৩৯ সালে যেখানে উৎপাদন ছিল ২,৩৫,০০০ টন, ১৯৫২ সালে সেখানে হয়েছে ৪,৪৫,০০০ টন। তাছাড়া মেসিন টুল-শিল্প, ধাতু শিল্প, বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি শিল্প, রসায়ন শিল্প, কয়লা খনি শিল্প, কাষ্ঠ শিল্প, কাগজ শিল্প, বস্ত্র শিল্প, সিমেণ্ট শিল্প, ...ল শিল্প প্রভৃতির প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়েছে। যুগোশ্লাভিয়া ধীরে ধীরে কৃষি প্রধান দেশ থেকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত হচ্ছে।

শিল্পোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে দেশে শ্রমিকদের বঞ্চিত করা ও অধিক মুনাফা আদায়ের চেষ্টা যাতে বৃদ্ধি না পায়, অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ করার পথ যাতে প্রশস্ত না হয়, সেজন্য নূতন অর্থনীতি চালু করা হয়েছে। এই নূতন অর্থনীতির ফলে দেশে উৎপাদন-ক্ষম শক্তির বৃদ্ধি, শ্রমিকের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি, অনুৎপাদক মানবশক্তির লোপ অর্থাৎ সমগ্রভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে।

শিল্পোৎপাদন ও কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি হবার ফলে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যেরও অগ্রগতি হয়েছে। হিসেবে দেখা যায়, ১৯৫০ সালে যুগোশ্লাভিয়ার মোট বৈদেশিক বাণিজ্যের পরিমাণ যেখানে ছিল ১,৪৬,২১০ লক্ষ দিনার (৩০০ দিনার= ১ ডলার) সেখানে উহা বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৫২ সালে হয়েছে ১৮,৫৮,২২০ লক্ষ দিনার। বিদেশে রপ্তানির পরিমাণও ১৯৫০ সাল থেকে প্রায় দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। যুগোশ্লাভিয়া রপ্তানি করে সাধারণত ভুট্টা, অপরিশোধিত ধাতু ও ...নির্মিত দ্রব্যাদি। তাছাড়া খাদ্যদ্রব্য, তামাক, মদ, মাংস, তৈল ইত্যাদিও রপ্তানি করে দেশ থেকে। যুগোশ্লাভিয়া আমদানী করে সাধারণত কাঁচা মাল।

আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্য কেবল মাল উৎপন্ন করলেই চলে না। যোগাযোগব্যবস্থা উন্নততর না হলে বাণিজ্য সম্ভব নয়। সেদিক থেকেও যুগোশ্লাভিয়া পেছিয়ে নেই। তার রেল-পথ, জলপথ ও বায়ুপথ সবই বেশ দীর্ঘ ও প্রথম শ্রেণীর মাল বহনক্ষম। তা-

মার্শাল টিটো

ছাড়া যুগোশ্লাভিয়ার প্রথম শ্রেণীর কয়েকটি বন্দর রয়েছে এবং বাণিজ্য জাহাজও প্রয়োজনানুরূপ রয়েছে। সুতরাং তার বৈদেশিক বাণিজ্য যে উন্নত-তর হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি?

এবার যুগোশ্লাভিয়ার রাজনৈতিক ইতিহাস মোটামুটি বলব।

পূর্বেই বলেছি ছ'টি জাতি যুগো-শ্লাভিয়াতে বসবাস করছে। অবশ্য এই ছ'টি পৃথক জাতিই মূল শ্লাভ বংশোদ্ভব। ষষ্ঠ শতাব্দীতে বহু শ্লাভ কার্পেথিয়ান অতিক্রম করে দানিউব প্রদেশসমূহে ও বলকান উপদ্বীপে বসবাস করতে আসে। এদের মধ্যে যারা কৃষ্ণ সাগর, বাল্‌টিক সাগর ও নীপার এবং ভিস্তুলা নদীর অন্তর্বর্তী অঞ্চলে বসবাস আরম্ভ করে তাদের বলা হত যুগোশ্লাভ। যুগো মানে দক্ষিণ অঞ্চলে বসবাসকারী। তারপরে বহু শতাব্দীর পরিবর্তনের ফলে এরা বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হয়ে পড়ে।

প্রথমত এই অঞ্চলে ছিল বাইজান-টাইন সাম্রাজ্যের অধীন। তারপর এরা আবর নামক এক শ্রেণীর যাযাবর যোদ্ধু সম্প্রদায়ের অধীনে যায়। ৫০ বৎসর তাদের অধীনে থাকবার পর কনস্‌টানটি-নোপল-এর অধীনে যায় এবং রাজা সামো প্রথম শ্লাভ রাজ্য গঠন করেন। তারপর আরও কয়েক হাত ঘোরার পর নবম

শতাব্দীর শেষের দিকে প্রিন্স ভ্লাস্টিমির প্রথম স্বাধীন সার্ব রাষ্ট্র গঠন করেন। পরে ক্রোসিয়ান ও মেসিডোনিয়ান রাষ্ট্রও গঠিত হয়। তারপর আরও কয়েক শতাব্দী কেটে যায় এবং এই অঞ্চলের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক সংগঠনের পরিবর্তন হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে সমস্ত যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রই হয় অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান, অথবা জার্মান অথবা তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। পরের তিন শতাব্দী ধরে চলে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম। দীর্ঘ সংগ্রামের পর ১৮১৩ সালে তুর্কীরা সার্ব রাষ্ট্রের আংশিক স্বাধীনতা স্বীকার করে। মণ্টিনিগ্রো অষ্টাদশ শতাব্দীতেই তার স্বাধীনতা অর্জন করতে সমর্থ হয়।

তারপর বিংশ শতাব্দীর কথা। এ শতাব্দীতে বল্‌কান অঞ্চলে বিশেষ করে শ্লাভ অধ্যুষিত অঞ্চলে যে সব ঘটনা ঘটে, তাতেই প্রথম মহাসমর শুরু হবার পথ প্রশস্ততর হয়। এই অঞ্চলের প্রধান ঘটনা প্রথম বল্‌কান যুদ্ধ। সার্বিয়া, মণ্টিনিগ্রো, গ্রীস ও বুলগেরিয়া যুক্তভাবে তুর্কীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তার কবলমুক্ত হয়। দ্বিতীয় বল্‌কান যুদ্ধে সার্বিয়া বুলগেরিয়াকে হারিয়ে মেসিডোনিয়াকে স্বীয় রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়।

১৯১৪ সালে জনৈক সার্ভিয়ান অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান আর্ক ডিউক ফার্ডিনাণ্ডকে হত্যা করে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরিয়ান সাম্রাজ্য সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং এই যুদ্ধই প্রথম মহাযুদ্ধে পরিণত হয়।

১৯১৮ সালের ১লা ডিসেম্বর সার্ব, ক্রোট প্রভৃতি শ্লাভ জাতিরা মিলে শ্লাভ জাতির রাজ্য অর্থাৎ যুগোশ্লাভিয়া রাজ্য গঠন করে। ভার্সাই চুক্তিতে এই রাজ্যটির গঠন স্বীকৃত হয়।

দ্বিতীয় মহাসমর আরম্ভ হবার আগের ২৩ বছর ধরে যুগোশ্লাভিয়া অন্তর্দ্বন্দ্বে ভয়ানক কাবু হয়ে পড়েছিল। ঝগড়া, বিবাদ, ধর্মঘট ইত্যাদির ফলে আভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। এ সময় ভিয়েনায় জার্মানী ও ইতালী যে ত্রিপক্ষ চুক্তি স্বাক্ষর করে, যুগোশ্লাভিয়াও তাতে যোগ দেয়। কিন্তু চুক্তি স্বাক্ষরের দুদিন পরেই জনগণের চাপে যুগোশ্লাভিয়ার রিজেন্সী শাসনের অবসান হয়।

১৯৪১ সালের ৬ই এপ্রিল জার্মানী যুগোশ্লাভিয়া আক্রমণ করে। ১১ দিন যুদ্ধের পর যুগোশ্লাভিয়া আত্মসমর্পণ করে এবং রাজা ২য় পিটার ইংলণ্ডে পালিয়ে যান। হিটলার যুগোশ্লাভিয়া জয় করেন বটে, কিন্তু প্রতি মুহূর্তে তাকে জাতীয় স্বাধীনতা সৈনিকদের চোরাগুপ্তা আক্রমণে ব্যতিব্যস্ত থাকতে হত। অবশ্য প্রথমেই এই প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করা সম্ভব হয়নি। এই বাহিনী গঠিত হয় বর্তমান প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটোর নেতৃত্বাধীনে। তিনি ছিলেন যুগোশ্লাভ কম্যুনিস্ট পার্টির সদস্য। অপর আরও একটি প্রতিরোধ বাহিনী গঠিত হয়েছিল রাজা দ্বিতীয় পিটারের সমর্থনকারী জেনারেল ড্রাজা মিখাইলোভিচের নেতৃত্বে। এ'দের বলা হত চেট্‌নিকস্‌। পরে টিটোর প্রতিরোধ বাহিনীই শক্তিলাভ করে এবং বৃটিশ ও আমেরিকার কাছ থেকে সাহায্য পেতে থাকে।

এখানে মার্শাল টিটো সম্বন্ধে সামান্য দু'চার কথা বলব। টিটো জাতিতে ক্রোট। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে একটি দরিদ্র চাষী পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। লেখাপড়া শেখার কোন সুবিধা না থাকায় তিনি মেকানিক হন। তিনি যুগোশ্লাভিয়ার বহু ফ্যাক্টরীতে কাজ করেছেন, কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে সে সব জায়গা থেকেই তাঁর চাকুরি গেছে। নির্যাতিতের পক্ষাবলম্বন করায় তাঁকে বহুবার কারারুদ্ধ হতে হয়েছে। ১৯৩৭ সালে যখন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনের নেতৃত্ব তিনি গ্রহণ করেন, তখন থেকেই তিনি খ্যাতি অর্জন করতে থাকেন। তিনি নিজে উপস্থিত থেকে প্রতিরোধ বাহিনীকে পরিচালনা করেন। আজ তিনি রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক।

যা হোক, যুদ্ধাবসানের পর গণভোট দ্বারা গঠিত গণপরিষদ যুগোশ্লাভিয়াকে ফেডারেল পিওপিলস্‌ রিপাবলিক্‌ বলে ঘোষণা করলেন। অবশ্য এর পূর্বে টিটোকে মিখাইলোভিচ তথা লণ্ডনে স্থিত রাজা দ্বিতীয় পিটারের সঙ্গে নানা দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। কিন্তু পরে অন্যান্য শক্তির হস্তক্ষেপের ফলে মিখাইলোভিচ দ্বন্দ্ব হতে অপসৃত হন, রাজা পিটার টিটো যে সাময়িক শাসনব্যবস্থা চালু করেছিলেন, তাই মেনে নিতে বাধ্য হন। ১৯৪৬ সালে ৩১শে জানুয়ারী নূতন গঠনতন্ত্র গ্রহণ করা হয় এবং টিটোকে মন্ত্রিসভা গঠন করার জন্য আহবান করা হয়।

নূতন গঠনতন্ত্র অনুসারে ফেডারেল পিওপিলস এসেমব্লি হচ্ছে সর্বোচ্চ সংস্থা। দুইটি পরিষদ নিয়ে এটি গঠিত। একটি হচ্ছে ফেডারেল কাউন্সিল আর অপরটি কাউন্সিল অব প্রডুসার্স। আইন প্রণয়ন এবং রাষ্ট্রের সর্বপ্রকার কর্ম নিয়মনের দায়িত্ব ফেডারেল এসেমব্লির। রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট ও ফেডারেল এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিল নির্বাচিত হয় ফেডারেল কাউন্সিল আর কাউন্সিল অব প্রডুসার্স দ্বারা। বৈদেশিক ব্যাপারে প্রেসিডেণ্টই সব কিছু করেন এবং সৈন্য বাহিনীর তিনি সর্বাধিনায়ক। তিনি এক্‌জিকিউটিভ কাউন্সিলের সভায় সভাপতিত্ব করেন।

এই সঙ্গে যুগোস্লাভ পিওপিলস আর্মি সম্বন্ধে কিছু বলা যেতে পারে। যুদ্ধের সময় যে প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করা হয়, ১৯৪৫ সালে ১লা মার্চ সেই বাহিনীরই নূতন নামকরণ হয় যুগোস্লাভ আর্মি বলে। তখন সেই আর্মিতে সৈন্য ও অফিসার মিলিয়ে ছিল প্রায় ৮ লক্ষ লোক। তারপর থেকে এই বাহিনীর রিওরিয়েণ্টেশন শুরু হয় এবং সম্পূর্ণভাবে সামরিক শিক্ষাদান করে একে প্রথম শ্রেণীর সৈন্য বাহিনীতে রূপান্তরিত করার চেষ্টা চলতে থাকে। সে কাজটা শুরু হয় ১৯৪৮ সাল থেকে। সে চেষ্টা ব্যর্থ যায়নি। যুগোস্লাভ পিওপিলস বাহিনী যে আজ শক্তিশালী বাহিনীতে পরিণত হয়েছে, নৌ, বিমান ও স্থল বাহিনী মহড়া দেখে তা বোঝা যায়।

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

কাহিনী আর বিষয়বস্তুর বিচারে "দী কীড"-এর মধ্যে বেশ খানিকটা নূতনত্বের সন্ধান পাওয়া গেল। পরিত্যক্ত একটি শিশুকে নিয়ে এই বই। বইখানি শুরু হবার খানিক বাদে দেখতে পাওয়া যায়, দিব্যি খোশমেজাজে চার্লি পথের উপর দিয়ে হেঁটে আসছেন। পথের দুধারে সারি সারি বাড়ি। বাড়ির জানলা দিয়ে রাস্তার উপরে ময়লা-জঞ্জাল ফেলা হচ্ছে। কিছু-কিছু জঞ্জাল যে চার্লির কাছেও এসে ছিটকে না পড়ছে এমন নয়। অতিশয় সন্তর্পণে সেই জঞ্জালের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে তিনি সামনে এগিয়ে আসছেন। হাঁটার কায়দায়, কিংবা মুখের ভাবভঙ্গীতে কিন্তু বিরক্তির লেশ-মাত্র নেই। উৎফুল্ল মেজাজে ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে তিনি হাঁটছেন। হাঁটতে হাঁটতে একসময় দাঁড়িয়ে পড়লেন চার্লি, হাতের শতচ্ছিন্ন দস্তানা দুটি খুলে ফেললেন, তারপর পকেট থেকে বার করলেন তাঁর সিগারেটের কেস। ঠিক সিগারেট কেস নয়, আসলে সেটি একটি পুরনো টিনের কৌটো। আগে তাতে সার্ডিন মাছ থাকত। এখন থাকে সিগারেট। কৌটোর মধ্যে আধপোড়া কয়েকটি সিগারেট রয়েছে। তারই একটি বেছে নিলেন চার্লি। বেশ কায়দা করে বারকয়েক কৌটোর উপরে সেটাকে ঠুকে নিয়ে অতঃপর ঠোঁটে ঝুলিয়ে অগ্নি-সংযোগ করলেন। দস্তানা দুটির দিকে তাকিয়ে হয়তো মনে হল, তাঁর বড়লোকী চালচলনের সঙ্গে শতচ্ছিন্ন দস্তানা দুটি ঠিক মানাচ্ছে না। পাশেই একটা ডাস্টবীন। দস্তানা দুটিকে চার্লি সেই ডাস্টবীনের মধ্যে নিক্ষেপ করলেন।

সঙ্গে সঙ্গেই কে যেন ককিয়ে কেঁদে উঠল। একটি শিশু। ডাস্টবীনের মধ্যে শুয়ে রয়েছে। শিশুটিকে কোলে তুলে নিলেন চার্লি। চুপচাপ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। ঘটনার এই আকস্মিকতায় তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গিয়েছেন। কী করবেন, কার কাছে নিয়ে পৌঁছে দেবেন এই শিশুটিকে, কিছুই তিনি বুঝে উঠতে পারছেন না। ওদিকে এক মহিলা তাঁর বাচ্চাকে পেরাম্বুলেটরে শুইয়ে হাওয়া খাওয়াতে বেরিয়েছেন। অনেক ভেবেচিন্তে চার্লি করলেন কি, ডাস্টবীনের সেই পরিত্যক্ত শিশুটিকে নিয়ে পেরাম্বুলেটরের মধ্যে শুইয়ে দিলেন। গোপনে কাজটি সেরে পালিয়ে আসবেন ভেবেছিলেন, কিন্তু তা সম্ভব হল না। মহিলা তাঁকে হাতেনাতে ধরে ফেললেন, এবং শিশুটিকেও যে চার্লির কাছে ফেরত দিলেন, বলাই বাহুল্য।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে রইলেন চার্লি। ইচ্ছে করলেই শিশুটিকে তিনি ডাস্টবীনে ফেলে রেখে সরে পড়তে পারেন, কিন্তু সে বড় নির্মম ব্যাপার হয়। আবার তিনি ছেলেটিকে সেই পেরাম্বুলেটরের মধ্যে চালান করবার চেষ্টা করলেন এবং আবারও ধরা পড়লেন। এবারে ধরা পড়লেন এক কনস্টেবলের হাতে। কনস্টেবলটি সেখান থেকে চলে যাবার পর চার্লির চোখে পড়ল, জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেখান দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন। ভদ্রলোকটিকে তিনি বললেন, দয়া করে তিনি যদি শিশুটিকে একটু ধরেন তো চার্লি তাঁর জুতোর ফিতেটা বেঁধে নিতে পারেন। যেই না ভদ্রলোক শিশুটিকে কোলে নিয়েছেন, তৎক্ষণাৎ দৌড় লাগালেন চার্লি। দৌড়ে গিয়ে কাছাকাছি একটা ছাউনির নীচে তিনি আশ্রয় নিলেন। বৃদ্ধ ভদ্রলোক তো হতভম্ব। নিরুপায় হয়ে তিনিও অগত্যা শিশুটিকে সেই পেরাম্বুলেটরের মধ্যে রেখে সরে পড়লেন। ভদ্রমহিলা প্রথমটায় সেটা বুঝতে পারেননি। পারার পর চার্লিকে তিনি সেই ছাউনির মধ্য থেকে টেনে বার করে নিয়ে এলেন। প্রথমেই তো চার্লিকে ছাতা দিয়ে ঘা-কতক লাগিয়ে দিলেন তিনি; তারপর পুনর্বার সেই শিশুটিকে তাঁর কোলে তুলে দিলেন।

ছেলে কোলে নিয়ে বোকার মতন চার্লি দাঁড়িয়ে রইলেন। কোথায় এখন একে পৌঁছে দেবেন তিনি, কার কাছে। হঠাৎ নজর পড়ল, শিশুটির গায়ে একটা কাগজ আটকানো রয়েছে। তাতে লেখা
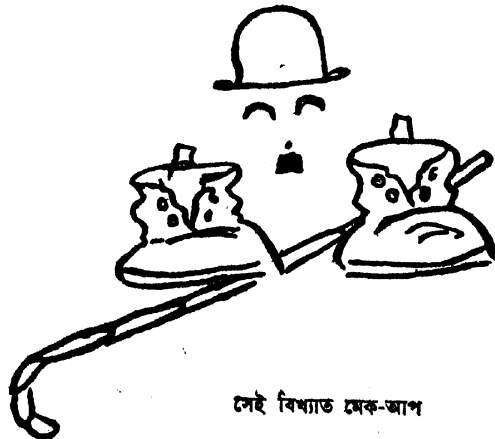
সেই বিখ্যাত মেক-আপ

আছে, "দয়া করে এই হতভাগ্য শিশুটিকে একটু ভালবাসবেন, এর একটু যত্ন নেবেন।" মন ভিজে গেল চার্লির, শিশুটিকে কোলে নিয়ে তিনি তাঁর কুঠরিতে ফিরে এলেন। আপন হাতে একটা দোলনা বানালেন তার জন্য। দোলনায় শুইয়ে দিয়ে তাকে একটু দুধও খাওয়ালেন।

পাঁচ বছর কেটে গিয়েছে তারপর। আবার যখন যবনিকা উঠল, দেখা গেল, ফুটপাথের একপাশে বসে রয়েছে সেই শিশুটি। একটু বাদেই বুঝতে পারা যায় যে, পালক-পিতার ভাবভঙ্গীগুলিকে ইতিমধ্যেই সে বেশ আয়ত্ত করে নিয়েছে। বাচ্চাটিকে সঙ্গে নিয়ে কাজে বেরলেন চার্লি। তিনি এখন জানলা মেরামতের কাজ করেন। খানিক এগিয়েই বাচ্চাটা করল কি, পথের থেকে একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ধাঁই করে পাশের বাড়ির জানলায় সেটা ছুঁড়ে মারল। কাঁচের জানলা। পাথর লাগামাত্রই সেটা ভেঙে চৌচির। ছেলেটি ততক্ষণে হাওয়া হয়ে গিয়েছে। জানলা ভাঙার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, তার পালক-পিতাকে কাজ জুটিয়ে দেওয়া।

জানলা-ভাঙার ব্যাপার নিয়ে এরপর একটি হাসির দৃশ্য আছে। ছোট্ট এই ঘটনাটির মধ্য থেকে যে নিপুণ কৌশলে একটির পর একটি হাসির উপাদান সংগ্রহ করেছেন চার্লি, তাতে বিস্মিত হতে হয়। একটা উদাহরণ দিচ্ছি। জানলা ভাঙার জন্য বাচ্চাটি তো পাথর টিপ করেছে, হাতখানাকে বাঁকিয়ে পিছন দিকে নিয়ে আসতেই সে বুঝতে পারল, নিঃশব্দে কে যেন তার পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে। ফিরে দাঁড়িয়ে দেখে, একজন কনস্টেবল। অম্লান বদনে ছেলেটি তখন পাথরের টুকরোটি নিয়ে লোফালুফি খেলতে শুরু করল। ভাবভঙ্গীতে এমন একটা ঔদাসীন্য যেন, জানালা ভাঙার কোনও উদ্দেশ্যই তার নেই। খানিক বাদে কনস্টেবলটি ফিরে এসে দেখে যে, চার্লি বসে-বসে জানলা মেরামত করছে। কনস্টেবলটি পাছে বাচ্চাটির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগের কথা টের পেয়ে যায়, চার্লি তাই তাঁর মজুরি নিলেন না।

সেখান থেকে সরে পড়বারই ইচ্ছে ছিল তাঁর, কিন্তু বাচ্চাটি ততক্ষণে তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আড়ালে দণ্ডায়মান কনস্টেবলকে সে দেখতে পায়নি। যতই তাকে সরে পড়বার জন্য ইশারা করেন চার্লি, সে বুঝতে পারে না। নিরুপায় হয়েই চার্লি তখন তাকে গোটাকতক লাথি কষিয়ে দিলেন।

বাচ্চাটির কুমারী-মাকেও এ-বইয়ে রাখা হয়েছে। প্রথম দৃশ্যেই তাঁকে দেখতে পাওয়া যায়। ছেলে কোলে নিয়ে হাসপাতাল থেকে তিনি বেরিয়ে এলেন। খানিক এগিয়ে একটি গির্জার কাছাকাছি এসে তাঁর চোখে পড়ল, গির্জা থেকে এক নবদম্পতী বেরিয়ে আসছে। রাস্তার উপরে একটি মোটরগাড়ি। নবদম্পতী এই গাড়িতে এসে উঠবে। কুমারী-মা তাঁর শিশুটিকে নিয়ে গাড়ির পিছনের সীটে শুইয়ে দিলেন, তার জামায় আটকে দিলেন এক টুকরো কাগজ। কাগজে কী লেখা ছিল, পাঠকরা তা জানেন। গাড়িটি কিন্তু চুরি গেল। চোররা যখন দেখল যে, গাড়ির মধ্যে একটি শিশু রয়েছে, পথের মধ্যে গাড়ি থামিয়ে শিশুটিকে একটি ডাস্টবীনের মধ্যে ফেলে রেখে সরে পড়ল তারা। তারপর কী ঘটল, আগেই তা বলা হয়েছে।

কুমারী সেই মা ওদিকে স্থির করেছেন, তিনি আত্মহত্যা করবেন। হাঁটতে হাঁটতে এক নদীর ধারে গিয়ে পৌঁছলেন তিনি। সেতুর উপরে উঠে নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাবেন, এমন সময় কে যেন তাঁর কাপড় ধরে টানল। ফিরে তাকিয়ে দেখেন, ছোট্ট একটি ছেলে। নার্স তাকে নিয়ে নদীর ধারে বেড়াতে এসেছে। ছেলেটিকে দেখে তাঁর আর মরবার ইচ্ছে রইল না। তাঁর হৃদয়ে তখন মাতৃত্বের ক্ষুধা জেগে উঠেছে। ঠিক করলেন, গির্জায় ফিরে গিয়ে গাড়ির মধ্য থেকে নিজের ছেলেটিকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবেন তিনি, তাকে মানুষ করে তুলবেন। কিন্তু ফিরে গিয়ে দেখেন, গাড়িটি সেখানে নেই।

বছরের পর বছর চলে যায়। ছেলেটি এখন চার্লির কাছে আছে, জানলা-ভাঙার বিদ্যায় হাত পাকিয়েছে সে। এদিকে তার মা-ও এখন একজন বিখ্যাত গায়িকা। অপেরা মহলে তাঁর প্রতিষ্ঠার আর এখন অন্ত নেই। ছেলে আর মা, দুজনের জীবন দুই ভিন্ন পথে এগিয়ে চলেছে, কেউই কাউকে চেনে না। মা জানেন, তাঁর সেই হারানো ছেলেকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না। মাঝে-মাঝে বস্তি-অঞ্চলে যান তিনি, সেখানকার দরিদ্র শিশুদের গিয়ে খেলনা দিয়ে আসেন। অজান্তে একদিন গিয়ে নিজের ছেলের হাতেই তিনি একটি খেলনা তুলে দিলেন। ছেলেটিকে দেখে ভারী মায়া হল তাঁর, কিন্তু সে-ছেলে যে তাঁরই, তা জানতে পারলেন না।

এর পর আর একদিন তিনি বস্তিতে এসেছেন; এসে দেখেন, সেই ছেলেটির সঙ্গে আর একটি ছেলের তুমুল মারামারি চলছে। একপাশে দাঁড়িয়ে আছেন চার্লি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ছেলেটিকে উৎসাহ দিচ্ছেন, প্রতিদ্বন্দ্বীর কোথায় কোথায় ঘুঁষি মারতে হবে, ইশারায় বুঝিয়ে দিচ্ছেন। ঠিক এই সময় প্রতিদ্বন্দ্বী ছেলেটির দাদা এসে হাজির। লম্বা চওড়া জোয়ান পুরুষ, ভাবভঙ্গীতে একটা চোয়াড়ে রুক্ষতা (এ-ভূমিকাটিতে নেমেছিলেন চাক রীজনার)। এসেই সে চার্লিকে সাবধান করে দিল, "তোমার ছেলে যদি আমার ভাইকে হারিয়ে দেয় তো তোমাকে আমি মেরে তক্তা বানিয়ে ছাড়ব।" চার্লির পালিত পুত্র তখন তার প্রতিদ্বন্দ্বীকে মেরে প্রায় ঠাণ্ডা করে এনেছে। কিন্তু ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে গেলেন চার্লি। লড়াই থামিয়ে দিয়ে সেই গুণ্ডার ভাইকেই তিনি জয়ী বলে ঘোষণা করলেন।

অতঃপর বাচ্চাটিকে নিয়ে সরে পড়বার তালে আছেন, এমন সময় দশাসই সেই জোয়ান এসে তাঁর পথ আটকে দাঁড়াল। তার ভাইকে জয়ী ঘোষণা করা সত্ত্বেও তার আক্রোশ যায়নি। চার্লির উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। বাচ্চাটির কুমারী-মা এসে তাদের ছাড়িয়ে দিলেন (চার্লি এই সুযোগে ইঁট মেরে তার প্রতিদ্বন্দ্বীর মাথা ফাটিয়ে দিলেন)। তারপর সেই শিশুটিকে কোলে টেনে নিলেন তিনি। মারামারির সময় শিশুটির গা-হাত-পা একটু ছড়ে গিয়েছিল। তার মায়ের নির্দেশমত চার্লি গিয়ে ডাক্তার

ডকে আনলেন। শিশুটির এখন ঠিক-তো শুশ্রূষা হওয়া দরকার।

ডাক্তার এসে শুনলেন, ছেলেটি াসলে চার্লির নয়, চার্লি তাকে কুড়িয়ে পয়েছিলেন মাত্র। বাচ্চাটিকে তখন এক নাথ-আশ্রমে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা ল।

এত দুঃখকষ্টের মধ্যে যাকে মানুষ রে তুলেছেন, এত সহজেই কি তাকে ড়ে দেওয়া যায়। ছেলেটিও প্রাণপণে র্লিকে আঁকড়ে ধরে আছে, কিছুতেই সে াকে ছেড়ে যাবে না। দৃশ্যটি মর্মান্তিক। নাথ-আশ্রম থেকে লোকজন এসে াঁছবে, বাইরে অপেক্ষা করছে তাদের ান। চার্লি আর জ্যাকি কুগান এদিকে ন্তাধস্তি করছেন তাদের সঙ্গে। চ্চাটির হাতে একটা হাতুড়ি, অনাথ-াশ্রমের লোকজনদের মাথায় হাতুড়ি মেরে র্লির সঙ্গে সে পালিয়ে যাবার চেষ্টা রছে। এই যে পরিবেশ, চার্লির বাল্য-বিনের পরিবেশের সঙ্গে কি এর মিল ই? ছেলেবেলায় চার্লিরা থাকতেন নিংটন রোডের কাছাকাছি একটি ন্তায়। ছবির রাস্তার সেটিংয়ের সঙ্গে র আশ্চর্য সাদৃশ্য। সীডনি আর র্লিকে যখন জোর করে হ্যানওয়েলে লে নিয়ে যাওয়া হয়, ঠিক এমনি করেই তাঁরা সেদিন বাধা দেননি? রাস্তায়-ন্তায় আনমনে ঘুরে বেড়াতেন দুই ই, সেই স্বাধীনতা হারাতে তাঁদের দুমাত্রও ইচ্ছে ছিল না। জ্যাকি কুগানের ই তাঁরা সেদিন অনর্থ বাধিয়েছিলেন। ী কিড"-এ দুটি ছেলের মধ্যে মারামারির দৃশ্যটি আছে, আমার তো মনে হয়, াও উপকরণ চার্লি তাঁর নিজের জীবন কেই সংগ্রহ করেছেন।

ছবির কথায় ফিরে আসা যাক। জোর া জ্যাকিকে নিয়ে অনাথ-আশ্রমের নে তোলা হল। রাস্তা দিয়ে ভ্যান ছে, আর সারি সারি বাড়ির ছাদের র দিয়ে চার্লিও তার সঙ্গে দৌড়ে াছেন। পরপর কয়েকটা ছাদ টপকে ার মোড়ের বাড়িটার ছাদের উপরে য় দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলেন র্ণ; তারপর অনাথ-আশ্রমের গাড়িটা না সেখানে এসে মোড় নিচ্ছে, ছাদ ক ভ্যানের উপর তিনি লাফিয়ে পড়লেন। ভ্যানের প্রহরী তাকে বাধা দিতে এল, চার্লি তাকে গাড়ি থেকে রাস্তায় নিক্ষেপ করলেন। তারপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন ড্রাইভারের উপর।

"দী কীড"-এর প্রথম দিকের একটি দৃশ্য

শিশুটিকে তার মা যখন গির্জার সামনে একটি গাড়ির মধ্যে ফেলে রেখে যান, তখন তার জামায় তিনি একটুকরা কাগজ আটকে দিয়েছিলেন, পাঠকের তা মনে থাকতে পারে। চার্লি সেই কাগজটিকে সযত্নে তুলে রেখে দিয়েছিলেন। অনাথ-আশ্রমের ভ্যানে ছেলেটিকে তুলে দেবার পর চার্লির বাসায় ডাক্তার সেই কাগজের টুকরো কুড়িয়ে পান। শিশুর মা'ও তখন সেখানে উপস্থিত ছিলেন। ডাক্তার তাঁকে কাগজের টুকরোটি দেখাবামাত্রই তিনি বুঝতে পারলেন যে, এ-শিশু তাঁরই।

চার্লি ওদিকে শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে অনাথ-আশ্রমের ভ্যান থেকে পালিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গেই কাগজে-কাগজে ঘোষণা করা হল যে, যদি কেউ তাঁদের সন্ধান দিতে পারে তো তাকে মোটারকমের পুরস্কার দেওয়া হবে। শেষ পর্যন্ত এক সরাইখানার মধ্যে ধরা পড়লেন তিনি। শিশুটিকে সঙ্গে নিয়ে একদিন তিনি ঘুমিয়ে আছেন, এমন সময় একটি লোক এসে ঘুমন্ত শিশুটিকে তাঁর পাশ থেকে তুলে নিয়ে থানায় গিয়ে তার মায়ের কাছে জমা দিয়ে এল।

চার্লি জেগে উঠে দেখেন, শিশুটিকে কে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ভগ্নহৃদয়ে তিনি তাঁর বস্তির ঘরে ফিরে এলেন। সেই রাত্রে বিচিত্র একটি স্বপ্ন দেখলেন তিনি। স্বপ্নের দৃশ্যগুলিকে "দী কীড"-এর অন্যতম প্রধান আকর্ষণ বলে গণ্য করা যেতে পারে।

নোংরা সেই বস্তিটি কার জাদুমন্ত্রে যেন হঠাৎ এক স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছে। প্রতিটি বাড়ি পুষ্পশোভিত, প্রতিটি মানুষের পিঠে একজোড়া পাখা। তারা যেন মানুষ নয়, দেবদূত। এমন কি, জোয়ান সেই মানুষটি, চার্লির সঙ্গে যার একদিন খুব মারামারি হয়েছিল, তাকেও যেন আর সেই বদমেজাজী গুন্ডা বলে চেনা যায় না। আপন মনে সে বীণা বাজিয়ে চলেছে। বস্তির কুকুরগুলোর পিঠে একজোড়া করে ডানা গজিয়েছে। সব

মিলিয়ে একটা অপূর্ব আনন্দময় পরিবেশ।

চার্লির পিঠেও একজোড়া ডানা। তিনিও বসে বসে বীণা বাজাচ্ছেন। এই আনন্দময় স্বর্গরাজ্যে হঠাৎ পাপের প্রবেশ ঘটল। দুই শয়তান এসে স্বর্গরাজ্যে ঢুকেছে। একজন সেই গুণ্ডার স্ত্রীকে গিয়ে বোঝালে যে, চার্লিই তার উপযুক্ত প্রণয়ী; আর এক শয়তান এসে চার্লির মনেও লোভ জাগিয়ে তুলল। চার্লি একদিন গুণ্ডার স্ত্রীকে চুমু খাচ্ছে, এমন সময় গুণ্ডাটি এসে হাতেনাতে ধরে ফেলল তাদের। চারদিকে হুলুস্থুল। ডানা ঝাপটে উড়ে যাবার চেষ্টা করলেন চার্লি, কিন্তু পারলেন না। এক কনস্টেবল এসে গুলী চালিয়ে তাঁকে মাটিতে পেড়ে ফেলল। তৎক্ষণাৎ ঘুম ভেঙে গেল তাঁর। জেগে উঠে দেখেন, আরে সর্বনাশ, সত্যিই যে একজন কনস্টেবল তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে আছে। চার্লিকে সে নিয়ে যেতে এসেছে। কোথায়? সেই ছেলেটির কাছে। সে এখন তার মায়ের কাছে আছে। ধনী সেই গায়িকার বাড়িতে নিয়ে আসা হল চার্লিকে। সেখানে তাদের পুনর্মিলন ঘটল।

"দী কীড" তুলতে প্রচুর অর্থব্যয় হয়েছিল চার্লির। পাঠকের নিশ্চয়ই মনে আছে, ফার্স্ট ন্যাশনালের সঙ্গে তাঁর চুক্তির অন্যতম সর্ত ছিল এই যে, তিনি দু রীলের ছবি তুলবেন (এক রীলের ছবি দেখাতে দশ মিনিট সময় লাগে); ছবির দৈর্ঘ্য যদি বেড়ে যায় তাহলে বাড়তি অংশের ব্যয়ভার চার্লিকেই বহন করতে হবে। "দী কীড"-এর ব্যয়ভারের একটা মোটা অংশ তাই চার্লির পকেট থেকেই গেল। পরে (অনেক কষ্টে) ফার্স্ট ন্যাশনালের কাছ থেকে টাকাটা তিনি আদায় করতে পেরেছিলেন। তাঁরা নেহাতই ব্যবসাদার মানুষ, হাসির বই তুলতে নেমেছেন, "দী কীড"ও একখানা হাসির বই, তার যে আবার আলাদা কোন মূল্য থাকতে পারে, অতশত তাঁরা ভেবে দেখতে চাননি। বইখানা থেকে যখন প্রচুর অর্থাগম হল, তখন চোখ খুলল তাঁদের। চ্যাপলিন স্বয়ং যে লভ্যাংশ পেয়েছিলেন তার পরিমাণ দশ লক্ষ ডলারের বেশী।

মীলড্রেডের সঙ্গে ওদিকে তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা চলছে। আদালতের কাছে প্রার্থনা জানালেন মীলড্রেড, "দী কীড" বইখানাকে যেন আটক করা হয়। তার কারণ, এ-বইও চার্লির বিষয়-সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত। বইখানার শুটিং তখন সবেমাত্র শেষ হয়েছে, কাটছাঁট আর সম্পাদনার কাজ তখনও বাকী। চার্লি তো বিপদ গনলেন। এই অসম্পূর্ণ অবস্থায় তাঁর শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তিকে যদি আদালত থেকে আটক করা হয় তো তার পরিণাম যে কী মারাত্মক হয়ে দাঁড়াবে, কল্পনা করতেও তাঁর ভয় হল। টেলিফোনে সীডনির সঙ্গে দু চারটে কথা হল তাঁর। সব শুনে তৎক্ষণাৎ সীডনি স্টুডিয়োতে চলে এলেন। যে করেই হোক, বইখানাকে এখন আদালতের আওতার বাইরে সরিয়ে ফেলা প্রয়োজন। কিন্তু কী করে তা সম্ভব? গোয়েন্দা-পুলিস যে সারাক্ষণ তাঁদের উপরে কড়া-নজর রাখছে, দু জনেই তা জানতেন। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাতেই চোখে পড়ল, স্টুডিয়োর বাইরে তিন-তিনখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। পুলিসের গাড়ি।

তা হলে উপায়? অনেক ভেবেচিন্তে একটা উপায় ঠাওরালেন সীডনি। চ্যাপলিনের গ্যারাজে তিনি ফোন করলেন। কখানা গাড়ি আছে গ্যারাজে? তিনখানা আর আছে একখানা ট্রাক। উত্তম। গ্যারাজের ড্রাইভারদের তিনি নির্দেশ দিলেন, স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে তিনখানা গাড়িকে যেন তিন দিকে ছুটিয়ে দেওয়া হয়। যে কথা সেই কাজ। স্টুডিয়োর বাইরে অপেক্ষা করছিল তিন গোয়েন্দা পুলিশ। অকস্মাৎ তারা দেখল, স্টুডিয়োর মধ্য থেকে তিনখানা গাড়ি বেরিয়ে এসে বিদ্যুৎবেগে তিন দিকে ছুটে বেরিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গেই গাড়ি তিনখানার পশ্চাদ্ধাবন করল তারা। দোতলা থেকে সীডনি সব দেখলেন। ব্যস, আর কোনও ভয় নেই। স্টুডিয়োর গ্যারাজে এখনও একখানা ট্রাক রয়েছে। "দী কীড"-এর রীলগুলিকে দু ভাই সেই ট্রাকের মধ্যে নিয়ে তুললেন। তারপর সোজা চলে গেলেন উটা স্টেটের সল্ট লেক সীটিতে। ক্যালিফর্নিয়ার আইন এখানে চলবে না। এই সল্ট লেক সীটিতেই "দী কীড"কে সম্পূর্ণ করে তোলা হয়। এইখানেই স্থিরীকৃত হয়, এ বই কার দখলে থাকবে। দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি তখন চার্লির এক দুঃসহ উদ্বেগের মধ্যে কেটেছে। মামলায় শেষ পর্যন্ত তিনি জয়লাভ করলেন।

"দী কীড"-এর পর অল্প সময়ের মধ্যে আর একখানি বই তিনি তুলেছিলেন, "দী আইড্‌ল ক্লাস"। তারপরই আমেরিকা থেকে তিনি ইংল্যাণ্ডে রওনা হলেন: দীর্ঘ ন বছর বাদে এই তাঁর প্রথম স্বদেশযাত্রা। "দী আইড্‌ল ক্লাস"-এর পরবর্তী বইয়ের নাম "পে ডে" (এ বইয়ের কাজ আরম্ভ করে দিয়ে তিনি স্বদেশ যাত্রা করেন, সেখান থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত বইখানা অসমাপ্ত অবস্থায় পড়ে ছিল)। তারপর আর ছোট-বই তোলেননি। "দী কীড"-এর সাফল্য থেকে অন্যান্য রঙ্গাভিনেতারাও তখন বড় মাপের হাসির বইয়ে হাত দিয়েছেন। তবে খুব অল্পসংখ্যক অভিনেতাই তাতে সাফল্য লাভ করেছেন। তাঁদের মধ্যে হ্যারল্ড লয়েড আর বাস্টার কীটনের এখানে নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

(১৮)

আগে থেকে কিছুই ঠিক ছিল না। হঠাৎ একদিন চ্যাপলিনের মনে হল, একবার দেশে যাওয়া দরকার। এবং এক্ষুনি। আসল কথা, তাঁর মানসিক ভারসাম্য প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল। কাগজে-কাগজে তাঁর অসুখী দাম্পত্য জীবনের মনগড়া সব খবর ছাপা হচ্ছে। শুধু খবরই নয়, সেই সঙ্গে কুৎসিত সব মন্তব্য। আর এর মূলে রয়েছেন মীলড্রেড। চ্যাপলিনের বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ, তিনি খামখেয়ালী মানুষ, মীলড্রেডের বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তিনি দুর্ব্যবহার করতেন, তিনি হীনচেতা, তিনি কৃপণ। কৃপণ? এর চাইতে ভিত্তিহীন অভিযোগ বোধ হয় আর কিছুই হতে পারে না। আদালতে দলিলপত্র দাখিল করে চার্লি প্রমাণ দিয়েছিলেন, এক বছরের মধ্যে মীলড্রেড তাঁর কাছ থেকে দশ হাজার পাউন্ডেরও বেশী অর্থ নিয়েছেন। একদিকে মীলড্রেডের এই দুর্ব্যবহার, অন্যদিকে ফার্স্ট ন্যাশনালের কর্তৃপক্ষ তাঁকে কথা শোনাচ্ছেন, সর্ত অনুযায়ী সব কখানা ছবি তখনও তোলা হয়নি। তাঁদের সঙ্গে এই মর্মে তাঁর চুক্তি হয়েছিল যে, আঠার মাসে আটখানা ছবি তিনি তুলবেন। এর মধ্যে মাত্র চারখানা ছবি শেষ হয়েছে। পঞ্চম ছবি "দী কীড"। এ-ছবি তুলতে তাঁর এক বছরেরও বেশী সময় লাগল। এর খুব সামান্য সময় তাঁর হাতে আছে, এরই মধ্যে তিনখানা ছবি তুলতে হবে। চার্লির তখন নিঃশ্বাস ফেলবার সময় নেই। রাত্রিদিন পরিশ্রম করে তুললেন "দী আইড্‌ল ক্লাস"। তারপর "পে ডে"। দুখানাই দু রীলের ছবি। "পে ডে"র কাজ শুরু করবার দিন কয়েক বাদে হঠাৎ একদিন তাঁর মনে হল, আর না, আর কাজ করা সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। শরীর আর মন দুই-ই তখন তাঁর ভেঙে পড়েছে। সব কাজ তিনি বন্ধ করে দিলেন।

"পে ডে"র প্রারম্ভিক আয়োজন তখন বেশ কিছুটা এগিয়ে গিয়েছে। তার পরের ব্যাপার তাঁর নিজের মুখেই শোনা যাক,—"কে কোন্ ভূমিকায় অভিনয় করবে, স্থির হয়ে গিয়েছিল। নাট্যলিপি ও সেটিংয়ের কাজও তৈরী। একদিন শুটিংও হল।"

"দী কীড" চিত্রে চার্লি আর জ্যাকি কুগান। পিছনে কনেস্টবল

কিন্তু "আমার তখন ভয়ংকর অবসন্ন লাগছে। শরীর দুর্বল, মন অবসাদগ্রস্ত। তার কিছুদিন আগেই আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়ে গিয়েছে, তখনও তার জের কাটেনি। শরীর আর মনের যে-অবস্থায় সবকিছুই অর্থহীন বলে মনে হয়, 'ধুত্তোর' বলে সরে পড়তে ইচ্ছে করে, ঠিক সেই অবস্থা তখন আমার।......আমি তখন সরে পড়তে চাইছিলাম। হলিউড, সিনেমা কলোনি, সিনারিও, সেলুলয়েডগন্ধী স্টুডিয়ো, চুক্তিপত্র, খবরের কাগজের নোটিস, কাটিং রুম, সাঁতারু সুন্দরী, এমন কি লম্বা জুতো আর বেঁটে গোঁফের সেই মেক-আপ, সবকিছুই অসহ্য লাগছিল আমার। মনে হচ্ছিল, যথেষ্ট হয়েছে, আর নয়, এবারে সরে পড়াই ভাল।"

অভিনেতা আর ক্যামেরা-ম্যানরা সেটা জানতেন না। যথারীতি দ্বিতীয় দিনের শুটিংয়ের জন্য তাঁরা স্টুডিয়োতে এসে সমবেত হয়েছেন। এসে দেখলেন, কী আশ্চর্য, চ্যাপলিনের দেখা নেই। অনেক দেরি করে সেদিন স্টুডিয়োতে এলেন তিনি, কোনওদিকে দৃকপাত না করে সরাসরি নিজের অফিস-কামরায় গিয়ে ঢুকলেন। অতঃপর ডাক পড়ল কার্ল রবিনসনের। কার্ল তাঁর সেক্রেটারি। চার্লি বললেন, কিছুমাত্র দেরি না করে তিনি যেন ইংল্যান্ড যাবার টিকিট কাটেন। পরদিনই চার্লি ইংল্যান্ড রওনা হচ্ছেন, কার্লকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে যাবেন। সীডনির দিকে নীরবে একবার তাকালেন কার্ল। দুজনেই বুঝলেন, চার্লির এই সংকল্পের কোনও নড়চড় হবে না।

নড়চড় হল না। পরদিন নীউ ইয়র্ক রওনা হলেন চার্লি। ক্যালিফর্নিয়ার রেল-স্টেশন সেদিন লোকে লোকারণ্য। খবর রটে গিয়েছে, চার্লি ইংল্যান্ড যাচ্ছেন। সবাই তাই তাদের প্রিয় অভিনেতাকে দেখতে এসেছে। ভিড় ঠেলে সামনে এগিয়ে গেলেন সীডনি, কার্লকে গিয়ে বললেন, "লক্ষ্য রেখো, ইংল্যান্ডে গিয়ে চার্লি যেন আবার একটা বিয়ে করে না বসে।" কথাটা চার্লির মনে আছে এখনও। কথায় কথায় তিনি সেদিন বললেন, "দাদার কথা শুনে সবাই সেদিন খুব হেসেছিল, আমি কিন্তু শিউরে উঠেছিলাম।"

ক্যালিফর্নিয়া থেকে নীউ ইয়র্ক। ট্রেন এসে স্টেশনে ঢুকল। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে

আছেন ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস। ডগলাস আর তাঁর স্ত্রী মেরি পীকফোর্ড তখন নীউ ইয়র্কের রীজ হোটেলে থাকতেন। চার্লিকে তাঁরা সেইখানেই নিয়ে তুললেন। চার্লি আসছেন, প্রেস-রিপোর্টাররা আগে থাকতেই খবর পেয়েছিলেন। দু দণ্ড জিরিয়ে নেবার আগেই চার্লিকে এসে ছেঁকে ধরলেন তাঁরা। হরেক রকমের প্রশ্ন। "আবার কি আপনি বিয়ে করবেন?" (চার্লি বলেছিলেন, "করব"।) "আপনি কি হ্যামলেটের ভূমিকায় নামতে চান?" "আপনি কি বোল-শেভিক?" কম্যুনিস্টদের তখন বোল-শেভিক বলা হত। তৃতীয় প্রশ্নের উত্তরে চার্লি বলেছিলেন, "আমি শিল্পী। জীবন সম্পর্কে আমি আগ্রহশীল। বোলশেভিজ্‌ম হচ্ছে জীবনেরই একটা নূতন অধ্যায়। সুতরাং সে সম্পর্কেও আমার আগ্রহ থাকা স্বাভাবিক।"

ডগলাস ফেয়ারব্যাংকসের ছবি "দী থ্রী মাস্কেটিয়ার্স" আর মেরি পীকফোর্ডের ছবি "লীট্‌ল লর্ড ফণ্ট্‌লরয়"-এর উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন চার্লি। থীয়েটর থেকে বেরিয়ে এসে দেখেন, সারা রাস্তা লোকে লোকারণ্য। উত্তেজিত সেই জনতা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁর উপরে। তাঁকে তাঁরা দেখবে, আরও কাছে থেকে দেখবে। ঠেলাঠেলি, মারামারি, সে-এক বীভৎস ব্যাপার। ভক্তদের কবল থেকে যখন উদ্ধার পেলেন চার্লি, তখন দেখা গেল, তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ ছিঁড়ে ফালিফালি, কলার আর টাই উধাও। বাতিকগ্রস্ত একটি মেয়েও সেই ভিড়ের মধ্যে ছিল। নিপুণ হাতে কাঁচি চালিয়ে কখন যে সে চার্লির ট্রাউজারের পিছন থেকে বেশ খানিকটা কাপড় কেটে নিয়ে সরে পড়েছে, চার্লি তা টেরও পাননি।

কটা দিন নীউ ইয়র্কে কাটিয়ে চার্লি গিয়ে জাহাজে উঠলেন। সাংবাদিকদের হাত থেকে তবু নিস্তার নেই, প্রেস-ফটোগ্রাফাররা গিয়ে ছেঁকে ধরল তাঁকে। তাঁরা প্রস্তাব করেছিলেন, স্ট্যাচু অব লীবার্টির উদ্দেশ্যে চার্লিকে একটি চুমো খেতে হবে। এই অসংগত প্রস্তাবে তিনি রাজী হননি। তাঁর সুরুচিই যে তাঁকে বাধা দিয়েছিল, সাংবাদিকরা তা বুঝতে পারেননি। অ্যামেরিকার বিভিন্ন কাগজে এ নিয়ে অনেক কটু-কাটব্য করা হল। তাঁরা মতপ্রকাশ করলেন, অ্যামেরিকার প্রতি তিনি বিদ্বেষ-পরায়ণ; তা-ই যদি না হবে তো এতদিন এ-দেশে কাটিয়েও ব্রিটিশ নাগরিকত্ব পরিহার করে তিনি মার্কিন নাগরিকত্ব গ্রহণ করলেন না কেন?

এত দুঃখের মধ্যেও একটা সান্ত্বনা ছিল চার্লির। শিশুদের সান্নিধ্য। জাহাজে উঠে দেখেন, অগুন্তি শিশু সেখানে। এক-একজন করে তাঁর কাছে আসে, আর জানিয়ে যায় যে, চলচ্চিত্রে তারা তাঁকে দেখেছে। চার্লি এর একটি সুন্দর বর্ণনা দিয়েছেন, —"হঠাৎ একসময় বুঝতে পারলাম যে, আমার অবসাদ কেটে গিয়েছে, আমি হাসছি, প্রাণ খুলে তাদের সংগে আমি হাসছি। তখন আবার সন্দেহ হল, এ-হাসি হয়তো আন্তরিক নয়। শিশুদের আমি ভালবাসি; কিন্তু সেইসংগে এ-কথাও আমার অজানা নয় যে, প্রাণ খুলে তাদের সংগে মেশা ভারী শক্ত ব্যাপার। শিশুদের কাছে গেলেই নিজেকে কেমন যেন ছোট বলে মনে হয় আমার। কত সপ্রতিভ এরা; কত সহজে অন্যের সংগে এরা মিশতে পারে। তা বলে ভেব না যে, এদের বোধ-শক্তি কিছু কম। একবার যদি এদের সন্দেহ হয় যে, তোমার ব্যবহারে আন্তরিকতার কিছু অভাব আছে, তো তৎক্ষণাৎ এর পালিয়ে যাবে, আর আসবে না।"

দু দণ্ড যে বিশ্রাম নেবেন, তার উপায় নেই। অলক্ষ্যে থেকে সবসময়েই একদল লোক তাঁর পিছন-পিছন ঘুরছে। তাঁর ভক্তমণ্ডলী। ওরেব্বাস, ইনিই নাকি চার্লি! হাঁ করে তাকিয়ে থাকে তারা। একটু যারা সাহসী, অটোগ্রাফ সংগ্রহের আশায় এগিয়ে আসে। ডেক্‌-এর উপর যে নিরিবিলি পায়চারি করবেন একটু, মহাসমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকবেন, তার আর উপায় রইল না। চার্লি ভাবলেন, দূর ছাই, এর চাইতে বরং নীচের তলায় গিয়ে স্টোকার আর ফায়ারম্যানদের মধ্যে ঘুরে বেড়ান অনেক ভাল, তারা তো আর তাঁকে চেনে না। নীচে গিয়ে খানিক বাদেই বুঝতে পারলেন, ফটোগ্রাফাররাও তাঁর পিছন-পিছন এসেছে, এসে ঘুরঘুর করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। বিস্ময়ের আরও কিছুটা বাকী ছিল তখনও। চেয়ে দেখেন, ঢিলেঢালা ট্রাউজার আর বেখাপ্পা বুট পরে, নাকের নীচে বেঁটে মিশকালো একজোড়া গোঁফ লাগিয়ে,

কে একজন যেন চার্লি চ্যাপলিনের ভাব-ভঙ্গীর নকল করে দেখাচ্ছে। কে, না এক-জন খালাসী। দু-এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তার অভিনয় দেখলেন চার্লি, তার-পর নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

আর কিছুক্ষণ। তারপরেই জাহাজ গিয়ে সাউদাম্পটনে পৌঁছবে। আগ্রহে আনন্দে উত্তেজনায় চার্লি তখন উন্মত্তপ্রায়। সারারাত তাঁর ঘুম হয়নি, এক অবর্ণনীয় আবেগে তিনি আচ্ছন্ন হয়ে রয়েছেন। ইংল্যাণ্ড, বিশেষ করে লণ্ডনের কথা বলতে গেলেই আনন্দাবেগে তিনি অভি-ভূত হয়ে পড়তেন। হলিউডে থাকতে কতবার যে তিনি আমাকে লণ্ডনের কথা জিজ্ঞেস করেছেন। কতবার যে লণ্ডনের কত গল্প, কত অভিজ্ঞতার কথা তিনি আমাকে শুনিয়েছেন। ছেলেবেলায় কবে কোন্ অভিনয় দেখতে গিয়েছিলেন, সেই গল্প; ওয়েস্টমীনিস্টার ব্রীজ, ওয়াটার্লু ব্রিজ আর কেনিংটন গেটয়ের গল্প। গল্প আর ফুরোয় না।

জাহাজ এসে সাউদাম্পটনে পৌঁছল। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সঙ্গে নিয়ে শহরের মেয়র তীর থেকে নৌকোয় করে জাহাজে উঠে এসে তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানালেন। চার্লির সেই স্পেন্সার-খুড়ো, ন্যাপহ্যামে যিনি একটি ভাটিখানা চালাতেন, পাঠকরা নিশ্চয়ই তাঁকে মনে রেখেছেন। তাঁর ছেলে অব্রে চ্যাপলিনের কথাও নিশ্চয়ই মনে আছে আপনাদের। বাবার ব্যবসা বাড়িয়ে অব্রে এখন দুটি ভাটিখানা চালাচ্ছেন। সাউদাম্পটনে তিনিও এসে চার্লির সঙ্গে দেখা করলেন। ন বছর বাদে দেখা হল তাঁদের। চার্লি এ সম্পর্কে বলেছেন, "অব্রে দেখলাম রীতিমত ভারিক্কী একটি ভদ্রলোক হয়ে উঠেছে। কিন্তু শত হলেও চ্যাপলিন-বংশের ছেলে তো, দেখেই ওকে আমি চিনতে পেরেছি।"

পরস্পরের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তাঁরা। তার পরের কথা চার্লির মুখেই শোনা যাক। "পরিবর্তন আমারও কিছু কম হয়নি। ভেবেছিলাম একটু গম্ভীর-গম্ভীর ভাব দেখাব। ওকে একটু চমকে দিতে চেয়েছিলাম। না ঠিক চমকে দিতে নয়, আসলে আমার ইচ্ছে ছিল, ওর মনে অল্প-একটু বিস্ময় জাগিয়ে তুলব। দ্যাখো বাপু, যে-চার্লিকে তুমি চিনতে, আমি কিন্তু আর সেই ব্যক্তিটি নই; অনেক বদলে গিয়েছি। ভাবটা অনেকটা এই-রকমের। তা দেখলাম, ও রীতিমত থতমত খেয়ে গিয়েছে।"

আরও অনেকে জাহাজে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আর্থার কেলি, হেটি কেলির ভাই। কেমন আছে হেটি, কানে-কানে আর্থারকে তিনি প্রশ্ন করলেন। হেটি নেই, সপ্তাহ কয়েক আগে সে মারা গিয়েছে। মনে-মনে অনেক আশার একটি প্রদীপ জ্বালিয়ে রেখেছিলেন চার্লি। প্রদীপটি নিভে গেল।

জাহাজ থেকে ট্রেনে। উত্তেজনার আর অন্ত নেই। কতদিন বাদে দেশে ফিরেছেন চার্লি, যা-কিছু তিনি দেখছেন, তাই যেন ভাল লাগছে। "ইংল্যাণ্ডের এই পল্লী-প্রকৃতিকে আমি দু চোখ ভরে দেখে নিতে চাই। কী অত বকবক করছে ওরা, একটুও কি আমাকে শান্তি দেবে না? আমার ওই বন্ধুদের হাত থেকে কিছুক্ষণের জন্য আমি নিষ্কৃতি পেতে চাই। একটু নির্জনতা, একটু নৈঃশব্দ্য, এছাড়া আর কিছুই আমার কাম্য নেই এখন। চুপচাপ বসে বসে জানলার বাইরে তাকিয়ে থাকব, চুপচাপ সব দেখব। ট্রেন চলছে। এত আস্তে চলছে কেন? আর-একটু এগিয়ে বসলাম।...রৌদ্রদগ্ধ প্রান্তর। এ-ইংল্যাণ্ডকে তো আমি চিনি না। আমার ইংল্যাণ্ডের মাঠ তো সবুজ। আগের মত সবুজ আর আজকাল দেখা যায় না। না যাক, এ যে ইংল্যাণ্ড তাতে আর ভুল নেই। আমি এখন ইংল্যাণ্ডে। ভাবছি, আর ভাল লাগছে।"

(ক্রমশ)

শাঙ্গর্দেব

তবলা প্রসঙ্গ

গত ২৭শে কার্তিক প্রকাশিত গানের আসরের আলোচনায় স্বনামধন্য তবলাবাদক শ্রীশান্তাপ্রসাদ মিশ্র জানিয়েছেন—"তবলা সৃষ্টির ইতিহাসে দেখা যায় পাখোয়াজ থেকেই এর উৎপত্তি। পাখোয়াজই এর পূর্বপুরুষ...।" শুধু এ'রই নয় আরও অনেকেরই তবলার উৎপত্তি সম্বন্ধে এবম্বিধ ধারণা আছে। অনেক মুসলমান বাজিয়ে তাঁদের ঘর থেকেই তবলার উৎপত্তি হয়েছে এমন কথা প্রচার করেন। কিন্তু ব্যাপারটা তা নয় এবং ইতিহাসও তা বলে না। বস্তুত মুসলমান প্রদত্ত পাখোয়াজ নামটির বহু পূর্ব থেকে "তবলা" নামটি সংগীতের ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে এবং ইসলামের অভ্যুদয়েরও অনেক আগে ইসলামের জন্মভূমি আরব দেশেই তবলা একটি বিশেষ প্রিয় বাদ্যরূপে ব্যবহৃত হত। অবশ্য সে তবলা আর এ তবলায় তফাৎ আছে খানিকটা—তথাপি তবলা নামের শুরু ঐখান থেকেই। সেই সময় থেকে আজ পর্যন্ত তবলার ইতিবৃত্ত আলোচনা করলে কখনই এমন কথা প্রমাণ করা যায় না যে পাখোয়াজ থেকেই তবলার উৎপত্তি। আর, পাখোয়াজ এবং তবলা,—এ দুটোর আকৃতিগত প্রভেদও অনেকখানি। যদি এমন কথাই বলতে হয়, তবে পাখোয়াজ থেকে তবলার উৎপত্তিই বা বলি কেন? ঢাক, ঢোল কিম্বা খোল যে কোন একটা থেকেই উক্ত বাদ্যের উৎপত্তি হয়েছে বলা যেতে পারে—একই নজির দেখিয়ে। আসলে এই ধারণার পিছনে ইতিহাস নেই আছে জনশ্রুতি এবং যেহেতু পাখোয়াজের বোল বর্তমান তবলায় ওঠানো যায় সেই কারণেই এই জনশ্রুতি প্রচারিত হয়েছে এবং লোকে এটা বিশ্বাসও করে। সংগীতের ক্ষেত্রে আজ পর্যন্ত যত কুসংস্কারাচ্ছন্ন মতবাদ রয়েছে এমনটা আর কোন বিষয়ে নেই। তার কারণ ঐতিহাসিক সুধীজন আমাদের দেশে এখনও এদিকে তেমন মাথা ঘামান নি। অতএব ঐতিহাসিক তথ্য বিবৃত করলে স্পষ্টই বোঝা যাবে যে তবলার উৎপত্তি পাখোয়াজ থেকে,—এটি একটি বড় রকমের কুসংস্কার।

তবলার ঐতিহাসিক প্রসঙ্গে আসবার আগে আর একটি কথা বলা দরকার। সেটি হচ্ছে এই যে পাখোয়াজ অথবা তবলা এই দুটির কোনটিই মুসলমান যুগের পরিকল্পনা নয়। তাঁরা আসবার বহুশত বৎসর পূর্বে থেকে এই ধরনের বাদ্য আমাদের দেশে অন্য নামে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মুরজ বাদ্যের যে কত প্রকার ভেদ ছিল তা নির্ণয় করা কঠিন ব্যাপার। পাখোয়াজ এই মুরজ শ্রেণীরই অন্তর্গত। শত শত বৎসর পূর্বেও আজকের মত একই ধরনের বোল এইসব যন্ত্রে ব্যবহৃত হত। ভরতের নাট্যশাস্ত্রের মত প্রাচীন শাস্ত্রেও এর প্রমাণ মিলবে। আমাদের দেশের মত প্রাচীন পারস্য, আরব এবং মধ্য এশিয়াতেও এই রকম নানা ধরনের চর্মবাদ্য প্রচলিত ছিল। পাঠান, তুর্কী, মোগলরা যখন এদেশে এলেন তখন ইসলাম সভ্যতায় প্রচলিত এই সব বাজনা তাঁরা সংগে করে নিয়ে এলেন। তাছাড়া তাঁদের সভায় ওই সব দেশ থেকে বহু সংগীতজ্ঞ ব্যক্তিও আসতেন প্রায়ই। তাঁরা এসে দেখলেন এদেশেও অনুরূপ বহু বাদ্যযন্ত্র রয়েছে। তখন তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেদের মনের মত করে এসব বাজনার একটু আধটু সংস্কার সাধন করলেন এবং নামকরণও করলেন তাঁদের মনের মত। নইলে আগেও আমাদের দেশে এইসব যন্ত্র ছিল বৈকি। এই বাংলা দেশেই অনেক প্রাচীন ভাস্কর্যে বাঁয়া-তবলার মত যন্ত্র দেখা যায়। ভারতের অপর দেশেও তবলার অনুরূপ যন্ত্রের পাথুরে প্রমাণ আছে প্রাচীন যুগের। সুতরাং তবলা যে পাখোয়াজের পরবর্তী যুগে গঠিত হয় নি এটা নিশ্চয় করেই বলা যায়।

"তবলা" এই নামটা এসেছে প্রাচীন আরব থেকে। আরব দেশে সে যুগে হালকা চামড়ার বাজনার মধ্যে "ডফ্"এর প্রচলন খুব ব্যাপক ছিল। "ডফ্" হচ্ছে Tambourine জাতীয় বাদ্যযন্ত্র। আমাদের দেশেও পথেঘাটে এ বাজনা দেখতে পাওয়া যায়, বিশেষ করে হিন্দুস্থানীদের হাতে। বাজনাটা অনেকটা চালুনীর মত দেখতে, একদিকে চামড়ার ছাউনি। ফ্রেমের মাঝে মাঝে ধাতব চাকতি আছে, যার ফলে, বাজালেই একটা বেশ ধাতব ঝঙ্কার ওঠে। তবলার উৎপত্তি আসলে এই "ডফ্" থেকেই। প্রাচীন আরবে "জুবল" নামক এক সংগীতজ্ঞের পুত্র "তুবল" নাকি "ডফ্" এবং "তবল্" নামক যন্ত্রদ্বয়ের সৃষ্টিকর্তা। তুবল্ থেকেই হয়তো নামটা "তবল্" হয়ে থাকবে। এই "তবল" এবং "ডফ্" সংগীতে তাল রাখবার জন্যই ব্যবহৃত হত।

এই তবলা যন্ত্রটি গোড়ায় ছিল বেশ হালকা ধরনের এবং বিশেষ করে মেয়েদের প্রিয় বাদ্য। মক্কায় মেয়েরা নানা উৎসবে ডফের সংগে "তবল"ও বাজাতেন। তখন যে বাজনাকে তবলা বলা হত সেটি ছিল ডফের মতই গোলাকার তবে খোলটা বেশ খানিকটা লম্বা। একজন ঐতিহাসিক লিখেছেন—"The Tabla or longshelled tambourine is mentioned as being used by ladies at Shaikh Mahmud and elsewhere".

মক্কায় ব্যবহৃত প্রধান চর্মবাদ্যের মধ্যে

বলা এবং ডফ্ জাতীয় বহু বাজনার উল্লেখ পাওয়া যায়। সুপ্রসিদ্ধ আরব্য উপন্যাসেও এই জাতীয় নানা রকম বাজনার উল্লেখ আছে। উদাহরণস্বরূপ গোলাকার চাকতি দেওয়া "তার্" নামক এক শ্রেণীর ডফ্ "অল্-ইয়ামন" নামক স্থানে দ্বাদশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এই "ইয়ামন" ছিল সংগীতের জন্য বিখ্যাত এবং এইখানে প্রচলিত একটি সুর মুসলমানদের প্রভাবে ভারতে এত প্রিয় হয়ে ওঠে অথবা ভারতীয় কোন রাগের সংগে এর এত সাদৃশ্য ছিল যে পরে এটিকে "ইয়মন" বা "ইমন" রাগরূপে আমাদের উচ্চাংগ সংগীতের অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়।

ক্রমে এই "তবল্" শ্রেণীর বাদ্য এত প্রিয় হয়ে উঠল যে "তবল্" বল্লে গোটা চর্মবাদ্যকেই বোঝানো হত। আরব্য সংগীতের একজন সুপণ্ডিত ইংরেজ ঐতিহাসিক লিখেছেন—

"Finally the term table covered the drum family proper"- বড় বড় বহু চর্মবাদ্যের সংগে "তবল্" শব্দটি যুক্ত হতে লাগল—যেমন, তবল্ নাকাড়া, তবল্ অল-মরকব্ (Kettle drum), তবল্ তওইল্ (long drum), তবল্ অল্-মুখান্নাৎ (hour-glass shaped drum) ইত্যাদি। এর মধ্যে "নাকাড়া" তো আমাদের দেশে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। আকবর নাকি "নাকাড়া" বাদ্যে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন।

মুসলমানরা নিশ্চয়ই তাঁদের প্রিয় "তবল্" আমাদের দেশে নিয়ে এসেছিলেন, কিন্তু এসে দেখলেন এখানে "তবল্" শ্রেণী (সংস্কৃতে যাকে অবনদ্ধ শ্রেণী বা চর্মবাদ্য বলা হয়) যথেষ্ট উন্নত। সুতরাং তাঁদের বাজনার সংগে আমাদের বাজনার একটা সামঞ্জস্য সাধন করে তাঁরা একটু নতুন ধরনে তবলার গোড়াপত্তন করলেন। এই হল তবলার ইতিহাস। খুব সম্ভব তুর্কী সুলতানদের আমলেই এই বাদ্যের প্রচলন হয়। পূর্বেই বলেছি আমাদের দেশে মুসলমানরা আসবার অনেক আগে থেকেই বাঁয়া-তবলার মত যন্ত্রের ব্যবহার ছিল। এখানে এসে তাঁরা তবলার সংগে বাঁয়াটিকেও যুক্ত করেন। প্রথম অবস্থায়

প্রাচীন বাংলায় তবলার অনুরূপ বাদ্যের ব্যবহার
—আশুতোষ মিউজিয়মের সৌজন্যে

ভারতের বাইরে "তবল্"-এর সংগে বাঁয়ার মত কোন জুড়ির ব্যবহার ছিল কি না বলা যায় না। তবে বাঁয়া-তবলার সম্মিলিত কাজটা বোধ হয় "ডফ্" এবং "তবল্" এই দুয়ের সংযোগে সমাধা করা হত।

যদিও তবলার ব্যবহার অনেকদিন থেকেই চলে আসছে তথাপি এই বাজনার উল্লেখ আমাদের মধ্যযুগের সাহিত্যে পাওয়া যায় না বল্লেই চলে। পাখোয়াজই আমাদের সাহিত্য জুড়ে আছে। সেকালকার ভারিক্কে চালের দরবারী গানের সংগে পাখোয়াজ গম্ গম্ করত। আকবরের সভায় ব্যবহৃত বাজনার মধ্যে পাখোয়াজ, আওয়াজ, অর্ধাওয়াজ, দুহুল (ঢোল), ঢাড্ডা, ডফ্, খঞ্জরীর উল্লেখ আছে কিন্তু বাঁয়া-তবলার নেই। বোধ হয় এই শ্রেণীর যন্ত্র মিহি-গানের সংগে বাজানো হত বলে দরবারে তার ঠাঁই ছিল না। এইখানে এটাও উল্লেখযোগ্য যে পাখোয়াজ থেকে তবলার উৎপত্তি হলে এরও একটা উল্লেখ নিশ্চয়ই থাকত। পাখোয়াজের সংগে "আওয়াজ" বা "অর্ধ-আওয়াজ" যন্ত্রদ্বয়ের যথেষ্ট মিল ছিল বলে তার উল্লেখ আছে। সুতরাং পাখোয়াজ আর তবলার তেমন একটা ঘনিষ্ট যোগাযোগ ছিল না এইটাই প্রমাণিত হচ্ছে।

কিন্তু তেমন উল্লেখ নেই বলে তবলা খুব হাল আমলের বাজনা এমনটা অনুমান করাও সংগত নয়। অনেক বাজনার উল্লেখ আমাদের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পাওয়া যায়, যার পরিচয় অনেক সময় খুঁজে পাওয়া যায় না। এর থেকে বোঝা যায় যে প্রাচীন কাল থেকে বহু যন্ত্র আমাদের দেশে বহুভাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তার মধ্যে অনেকগুলি কালক্রমে

লুপ্ত হয়েছে আবার অনেকগুলি সুবিধামত সুযোগ পেয়ে প্রাধান্য লাভ করেছে। তবলা এইভাবেই প্রাধান্যলাভ করেছে আমাদের দেশে। আমাদের সংগীত ক্রমশই যখন অনেক পরিমাণে মোলায়েম হয়ে এলো তখনই তবলার প্রচলনও বেড়ে উঠতে লাগল। এখনকার গানে তবলাই আমাদের তাল রাখবার প্রধান অবলম্বন।

আশা করি, এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট বোঝা যাবে যে পাখোয়াজের মর্যাদা ভারতীয় সুলতান-বাদশারা দিলেও কৌলীন্যে তবলাও কোন অংশে হীন নয়। ভারতের মুরজ বাদ্যকে যখন মুসলমানরা "পাখোয়াজ" নামে অভিহিত করছেন তার বহু পূর্বে "তবল্" আরব দেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এবং একটি ব্যাপক সংজ্ঞায় পরিণত হয়েছে। "পাখোয়াজ" নামকরণ হয়েছে ভারতে বড় জোর ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আর "তবল্" নামের সূত্রপাত স্বয়ং হজরৎ মোহম্মদের জন্মেরও অনেক পূর্বে আরব দেশে।

খবরাখবর

নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনী

আগামী ২৪শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট নটি অধিবেশনে রক্সী চিত্রগৃহে নিখিল ভারত সংগীত সম্মিলনীর অনুষ্ঠান হবে। এবারে যাঁরা যোগদান করবেন বলে আশা করা যায় তাঁদের নামের তালিকায় আছেন— পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুর, শ্রীঅনন্তমনোহর যোশী, পণ্ডিত ডি ভি পালুসকর, ওস্তাদ মুজাদ্দিদ নিয়াজী, ওস্তাদ সরাফৎ হোসেন খান, পণ্ডিত বালজী চতুর্বেদী, শ্রীযুক্তা কেশরীবাই কেরকর, শ্রীযুক্তা গাঙ্গুবাই হাঙ্গল, শ্রীমতী কৌশল্যা মঞ্জেশকর, ডাঃ সুমতি মুতাতকর প্রভৃতি। যন্ত্রে ওস্তাদ বিলায়েৎ হোসেন খান, ওস্তাদ ইমরাৎ হোসেন খান, গজানন্দ যোশী, পণ্ডিত ভি জি যোগ, শ্রীআনোখে-লাল মিশ্র, ওস্তাদ হাবিবুদ্দিন খান, ওস্তাদ মজিদ খান, শ্রীযশোবন্ত রাও, শ্রীদত্তারাম, শ্রীমতী সরণ রাণী, মিয়া বিসমিল্লা ও সম্প্রদায় প্রভৃতি। নৃত্যে— তাঞ্জোর ভগিনীবৃন্দ, শ্রীমতী আশাজিকা, শ্রীমতী রোহিণী ভাটে। এছাড়া স্থানীয় বিশিষ্ট শিল্পীও আছেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায় এবং প্রধান অতিথি থাকবেন ডাঃ বি ভি কেশকার এবং উদ্বোধন করবেন বেনারস বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী সি পি রঙ্গস্বামী আয়ার।

আলাউদ্দীন সংগীত সমাজ

আলাউদ্দীন সংগীত সমাজের দ্বিতীয় বার্ষিক সম্মিলনী অনুষ্ঠিত হবে আগামী ১৪ই থেকে ১৭ই জানুয়ারী। এতে অংশ গ্রহণ করবেন ওস্তাদ আলাউদ্দীন খান, ওস্তাদ আলি আকবর খান, পণ্ডিত রবি-শঙ্কর এবং তদীয় পত্নী শ্রীমতী অন্নপূর্ণা দেবী, শ্রীমতী ইন্দ্রাণী রহমান, ওস্তাদ বড়ে গোলাম আলি খান, কণ্ঠে মহারাজ, কিষেণ মহারাজ প্রভৃতি। একটি আসরে ওস্তাদ আলাউদ্দীন সপরিবারে পুত্র, কন্যা এবং জামাতা সহ অংশ গ্রহণ করবেন বলে জানা গেল।

মুরারী-স্মৃতি সংগীত সম্মেলন

চেতলা বয়েজ স্কুলে মুরারী-স্মৃতি সংগীত সম্মেলন চলবে ৩০শে ডিসেম্বর থেকে ৩রা জানুয়ারী পর্যন্ত। ভারতের বহু বিশিষ্ট সংগীতজ্ঞ এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

আলোচনা

মহাশয়,—নিখিল ভারত তানসেন সংগীত সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশনের শেষ বৈঠকে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী মহাশয়ের সহিত তবলা সংগত বিষয়ে তাঁহার যে মতবাদ গত ২৬শে নভেম্বর প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ কল্পে আমি এক্ষণে বিষয়টি ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইতেছি। উহা পত্রিকা মারফত প্রকাশ করিয়া আমার সঙ্ঘকে বিশেষ বাধিত করিবেন। যথা—

১। বৈঠক সম্বন্ধে তারাপদবাবুর সহিত আমার কোনরূপ চুক্তিপত্র হয় নাই। কেবল মৌখিক কথা হইয়াছিল। আমি উক্ত সময়ে 'কেরামত খান সাহেবকে' তাঁহার সহিত সংগতকার দিতে কোনরূপ চুক্তিতে আবদ্ধ হই নাই। নিমন্ত্রণ জানাইবার সময়ে আমি বরং তাঁহাকে জানাইয়াছিলাম যে, 'আল্লারাখা খান সাহেব ও 'কিষণ মহারাজকে' উক্ত দিনের বৈঠকে সংগতকার হিসাবে রাখা হইয়াছে। তিনি তাঁহার ইচ্ছামত যে কোন একজনকে লইতে পারেন।

২। তারাপদবাবু বলিয়াছেন যে, আমাকে আহবান করিয়াও তিনি আমাকে পান নাই; কিন্তু রাত্রি ১২৷৷টায় যখন তিনি 'ভারতী' চিত্রগৃহে প্রবেশ করেন তখন আমি দ্বারদেশে দণ্ডায়মান ছিলাম ও তাঁহাকে যথারীতি অভ্যর্থনাও জানাইয়াছিলাম।

৩। বৈঠকের নিয়মিত তবলা বাদককে তিনি তাঁহার সংগতকার হিসাবে গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হওয়ায়, উক্ত ঘটনা আমার নিকট পৌঁছিবামাত্র আমি লক্ষ্ণৌয়ের তবলাবাদক রোজওয়েল লালকে তাঁহার সহিত সংগত করিবার জন্য বন্দোবস্ত করিয়া দিই। ইতি—শ্রীশৈলেন্দ্র-নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সেক্রেটারী, তানসেন সংগীত সঙ্ঘ।

[**আমাদের বক্তব্য**—শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী উক্ত সম্মেলনে তাঁর অনুষ্ঠান করবার পূর্বেই ঘোষণা করেন যে, তাঁর সঙ্গে সংগতের জন কোন তবলীয়ার বন্দোবস্ত রাখা হয় নি এবং তারপরে শ্রীরোজওয়েল লালকে আসরে অবতীর্ণ হতে দেখা যায়। আশ্চর্যের বিষয় তানসেন সংগীত সঙ্ঘের কর্তৃপক্ষ উক্ত অধিবেশনে তারাপদবাবুর সংগীতানুষ্ঠানের পরে বিষয়টি শ্রোতৃ-সাধারণের সমক্ষে সুষ্ঠুভাবে মিটমাট করে নেওয়া বা তাঁদের কোনরূপ ভ্রান্ত ধারণা হয়ে থাকলে সেটি অপনোদন করা যুক্তি-যুক্ত বিবেচনা করেন নি। সেই সময়েই একাজটি করলে সবচেয়ে ভাল হত। যাই হোক, আমরা আশা করি কোনও সম্মেলনে কর্তৃপক্ষের অব্যবস্থার দরুণ এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না, যাতে বিশিষ্ট শিল্পীদের কারুর কাছ থেকে প্রকাশ্যে অভিযোগ আসতে পারে। এতে তাঁদের সংগীত পরিবেশনে বিঘ্ন ঘটতে পারে, যেটা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নয়।]

স্বামীজীর জীবনাদর্শ

Swami Vivekananda, Patriot & Prophet.
ডাঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত প্রণীত। নবভারত পাবলিশার্স, ১৫৩ এ, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১০৲ টাকা।

বাঙলার বৈপ্লবিক যুগের অন্যতম নেতা লেখক এবং মনস্বী গ্রন্থকারের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। ডক্টর ভূপেন্দ্রনাথ বাঙলা দেশের সমাজ-জীবনে সুপরিচিত। ডাঃ দত্তের লিখিত প্রবন্ধখানিতে স্বামীজীর ঠিক জীবনী বলা চলে না। গ্রন্থখানিতে স্বামীজীর জীবনাদর্শ এবং তাঁহার অবদান নচয়ের বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হইয়াছে এবং মনীষামূলক সেই আলোচনার মাধ্যমে স্বামীজীর বিরাট এবং বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং মহত্ত্বের স্বরূপে উন্মুক্ত করা হইয়াছে। দেশের তৎকালীন ঐতিহাসিক প্রতিবেশে স্বামীজীর অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব কিভাবে সমাজ-জীবনে প্রভুত্বপর বিভিন্ন স্বার্থ-গোষ্ঠীর দ্বন্দ্ব সংঘাতের ভিতর দিয়া প্রাণময় দীপ্তি বিস্তার করিয়াছিল, গ্রন্থকার তাহা দেখাইয়াছেন। প্রতিক্রিয়াপন্থী অর্থনীতিক পরিবেশে প্রপীড়িত দুর্গত জনসমাজের জন্য স্বামীজীর অন্তরের অগ্নিগর্ভ বেদনা এদেশের সমাজ-জীবনে কিরূপে বজ্রবিদ্যুতের স্ফুরণের ঝলক খেলাইয়া চমক জাগায় গ্রন্থকারের আলোচনা তাহা আমাদের দৃষ্টি-পথে উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে। তিনি স্বামীজীর আবির্ভাবকালে বাংলাদেশের সামাজিক প্রতিবেশটি পরিস্ফুট করিয়া তুলিবার উদ্দেশে স্বামীজীর পরিবারের ঐতিহ্য সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থে দিয়াছেন এবং সেই প্রসঙ্গে তৎকালীন বাংলার সামাজিক এবং ধর্ম-সংস্কার সম্পর্কিত আন্দোলনের স্বরূপটি ব্যক্ত করিয়াছেন। ইহার পর স্বামীজীর সন্ন্যাস গ্রহণ এবং তাঁহার জীবনের উপর ঠাকুর রামকৃষ্ণের প্রভাবের কারণ সংক্ষেপে বিশ্লেষণ করিয়া স্বামীজীর বিদেশ ভ্রমণের অবতারণা করা হইয়াছে। আন্তর্জাতিক এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বামীজী ভারত এবং জগতের বিভিন্ন দেশের জন-জাগরণের মূলগত সত্যটি কিভাবে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, অতঃপর আলোচনা সেইদিকে মোড় ঘুরিয়াছে এবং স্বামীজীর জীবনাদর্শে পরাধীন জাতির মুক্তি কামনা এবং নিপীড়িত জনশ্রেণীর দুর্গতির প্রতিকারের বৈপ্লবিক দ্যুতি বিস্তার করিয়াছে। ফলত জনচেতনার বৈপ্লবিক ভিত্তিতে দেশের স্বাধীনতাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার বলিষ্ঠ আদর্শ স্বামীজীর কণ্ঠেই এদেশে প্রথমে উদ্গীত হয়, কার্ল মার্ক্সের মতবাদ জগতের দেশের জনচেতনায় জাগিবার বহু পূর্বেই স্বামীজী রাশিয়া এবং চীনে জন-

জাগরণের সম্ভাবনার সূত্র উপলব্ধি করিয়াছিলেন এবং এদেশের প্রচলিত ধর্মীয় মতবাদকে সর্ববিধ সংস্কার হইতে মুক্ত করিয়া স্বামীজীর নব ভারত গঠনের প্রেরণা সঞ্চার করেন। তিনি দেশের যুবকদিগকে এই প্রয়োজন সাধনে অগ্নিমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

গ্রন্থকারের মত বাংলাদেশের বিপ্লবীরা স্বামীজীর জীবনাদর্শকে সর্বাগ্রে সমাদরের সহিত গ্রহণ করে। বস্তুত ধর্মের নামে স্বার্থপ্রভাবিত দীর্ঘদিনের বহুবিধ জীর্ণ সংস্কারে অভিভূত প্রদেশের শোষক সম্প্রদায় তাঁহার উক্ত বাণীতে শঙ্কিতই হইয়াছে এবং তাঁহার প্রভাবকে প্রতিহত করিবার জন্যই সর্বতোভাবে চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু স্বার্থভীরু ইহাদের সে চেষ্টা সিদ্ধ হয় নাই। নিপীড়িত এবং দুর্গত জনশ্রেণীর মধ্যে আজ সাড়া জাগিয়া উঠিতেছে এবং স্বাধীনতালব্ধ ভারত আত্মপ্রতিষ্ঠার মূলে স্বামীজীর জীবনাদর্শের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতেছে। স্বামীজী হিন্দুর সুপ্ত সমাজ-জীবনে নবীন শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন এবং সমগ্র বিশ্বে ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতিষ্ঠার পথ তিনিই উন্মুক্ত করিয়াছেন।

স্বামীজীর জীবনাদর্শ সম্বন্ধে এই আলোচনা সম্পূর্ণ নূতন ধরনের--গতানুগতিক ধর্ম সংস্কারের সঙ্গে মিল রাখিয়া সে আদর্শকে রূপ দিবার চেষ্টার সাধারণ ক্ষেত্র হইতে দূরে থাকিয়া গ্রন্থকার সামাজিক বাস্তববাদের দিক হইতে এই বিরাট পুরুষের অবদানের বিচার করিয়াছেন এবং মানুষের জন্য জাতির দরিদ্র জনশ্রেণীর অবস্থা এবং সমাজের সর্বাঙ্গীণ বিকাশসূত্রে নব জাতীয়তার প্রতিষ্ঠাকল্পে স্বামীজীর প্রাণময় প্রযত্নের দিকটা তিনি পরিস্ফুট করিয়াছেন। বহু প্রয়োজনীয় তথ্য সন্নিবেশে সম্বদ্ধ গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের মনীষা, পাণ্ডিত্য, তাঁহার অধ্যবসায়, সর্বোপরি মানবতা-প্রেরণায় উদ্দীপিত বলিষ্ঠ সত্যকে প্রকাশ করিবার পক্ষে কঠোর এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টি তাঁহার বিচারশক্তির পরিচায়ক। নবজাগ্রত ভারতের সমাজ-চেতনায় স্বামীজীর জীবনাদর্শের এই আলোকসম্পাতে জাতির অগ্রগতির পথ সমধিক উজ্জ্বল হইবে। এই গ্রন্থ সর্বত্র সমাদৃত হইবে, সন্দেহ নাই। ৫০০।৫৪

পল্লীগীতি সংগ্রহ

পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ—চিত্তরঞ্জন দেব, 'কতকথা', ৬৭।১, মির্জাপুর স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। চার টাকা।

গীতিগাথা গানের দেশ পূর্ববাংলা। এর পূজা পার্বণ আচার অনুষ্ঠানের সঙ্গে অজস্র গান ও ছড়া জড়িয়ে আছে। লেখক সেগুলি সযত্নে সংগ্রহ করে পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। প্রাকৃতজন রচিত এই সব লোক-গীতির রচনারীতি, ধ্বনি ছন্দের ব্যঞ্জনা একদিকে যেমন আমাদের মুগ্ধ করে,

অন্যদিকে তেমনি এদের বিষয়বস্তু থেকে গ্রামজীবনের নানা সামাজিক তথ্য, গ্রামবাসী-দের সুখ দুঃখ আশা আকাঙ্খার স্বরূপ আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়। গ্রামজীবনে জটিলতা কম, কৃত্রিমতার বালাই নাই। তাদের কামনা বাসনার প্রকাশও অনাবৃত, অত্যন্ত স্পষ্ট, সিক্তবসনা কোন মেয়েকে কলসী কাঁখে জল নিয়ে ফিরতে দেখে মুগ্ধ যুবকের কলসীর স্পর্শ পেতে সাধ যায়। তার সেই সাধ অতি সহজেই তার গলায় গান হয়ে ওঠে।

> হায়রে পিতলের কলসী
> তোরে লইয়া যাব যমুনায়।
> যমুনার জল কালো
> পিতলের কলসী ভালো
> (আবার) কাপড় দিয়া যৈবন দেখা যায়।

কোন গানটি কখন কে রচনা করেছে, সে অনুসন্ধান সহজ নয়। প্রত্নতাত্ত্বিকের সে কর্তব্য বর্জন করে বরং ঋতুক্রমের কোন বিশেষ সময়ে কোন গান রচিত হওয়া সম্ভব লেখক তার একটি ধারাবাহিক বিশ্লেষণ দিয়ে গানগুলির সম্পূর্ণ রস গ্রহণের সহায়তা করেছেন বলে মনে হল। শুধু ইতস্তত শুনতে পাওয়া গানগুলিই নয়, রয়ানী সত্য-নারায়ণের পাঁচালী প্রভৃতি পুঁথি থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েও সংকলনটিকে তিনি সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। গীতিগুলির রচনা-স্থান পূর্ববঙ্গ হলেও এ সম্পদ সারা বাংলার। লোক সংগীতের বিলুপ্তপ্রায় একটি ধারাকে সাহিত্যের আসরে উপস্থিত করে লেখক নিঃসন্দেহে রসিকজন মাত্রেরই ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। এ বইয়ের ঐতিহাসিক প্রয়োজনও অস্বীকার করা যায় না। কারণ পূর্ব বাংলাকে পূর্ণাংগভাবে জানতে হলে তার গান আর ছড়ার সংগেও পরিচয় রাখতে হয়। ৪৬৬।৫৩

বিপ্লব কাহিনী

বিপ্লবী জীবন : শ্রীপ্রভাসচন্দ্র লাহিড়ী। নমামি প্রকাশ মন্দির। ৮।২ গোপ লেন, কলিকাতা। দুই টাকা বারো আনা।

বাঙলার বিপ্লবীদের কাহিনী আজ প্রায় রূপকথায় এসে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতাকামী পরাধীন জাতির দুর্নিবার যুবশক্তি যে প্রবল আক্রোশে ফেটে পড়েছিল, তারই ইতিহাস বিধৃত হয়েছে বিপ্লবী জীবন গ্রন্থে। লেখক নিজে এই যুগের একজন প্রধান কর্মী। সেদিক থেকে এ গ্রন্থের প্রামাণিকতায় সন্দেহের অবকাশ কম।

এ গ্রন্থে কেবলমাত্র বিভিন্ন বিপ্লবাত্মক ঘটনার বিবরণ দিয়ে দায়িত্ব শেষ না করে, দেশের তদানীন্তন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিস্তৃততর ভাবে আন্দোলনটিকে দেখতে চেষ্টা করেছেন। আর ছোট বড় নানা ঘটনার পট-ভূমিকায় বিভিন্ন বিপ্লবী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য আশ্চর্যভাবে ফুটে উঠেছে। লেখককে নিজে থেকে বিশেষিত করতে হয়নি। এইটিই বোধ হয় আলোচ্য গ্রন্থের সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য গুণ। ৪০৮।৫৪

কিশোর সাহিত্য

অভিশপ্ত কিশোর : জীবনেশ ঠাকুর; প্রাপ্তিস্থান—ফরোয়ার্ড পাবলিশার্স, ১৪১।১বি, রসা রোড, কলিকাতা—২৬ দাম এক টাকা।

খুনের কথা থাকলেও এটি সাধারণ গোয়েন্দা কাহিনী নয়। ডাঃ সুশোভন চৌধুরী জার্মানীর এক বৈজ্ঞানিকের কাছে পাওয়া সূত্র অনুযায়ী ভারতে এসে গরিলার রক্তের ইনজেকসন পরেশ নামে এক কিশোরের দেহে প্রবেশ করিয়ে কিভাবে উক্ত কিশোরকে বলশালী ও হিংস্র প্রকৃতির করে তুলেছিলেন এবং অবশেষে তার কুফল ফলায় কীভাবে তিনি পরেশকে নিয়ে নিরুদ্দেশ হলেন তারই চমকপ্রদ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। পরি-সমাপ্তিটা কিন্তু অসম্পূর্ণ। রচনার মধ্যে অভিনবত্ব আছে। ৪৪০।৫৪

পিনোশিয়ো—মনোরম গুহঠাকুরতা। আশুতোষ লাইব্রেরী, ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—বার আনা।

কার্লো কলোদির লেখা গল্প লেখক ছোটদের জন্য বেশ সহজ ও সরল ভাষায় অনুবাদ করেছেন। একটি ভূতুড়ে কাঠ দিয়ে জনৈক ছুতোর মিস্ত্রী একটি লম্বা নাকওয়ালা পুতুল তৈরি করে, সংগে সংগে সেই পুতুলটি সজীব হয়ে ওঠে। পুতুলের নাম রাখে সে পিনোশিয়ো। দুষ্ট পুতুল নানাভাবে ঘাত-প্রতিঘাতের পর কি করে যে ভালো ছেলে হয় তারই বর্ণনা।

ছেলে-মেয়েরা বইটি পড়ে শিক্ষা ও আনন্দ দুই-ই লাভ করবে। বড় অক্ষরে ছাপা, সুন্দরপ্রচ্ছদ। ছেলেমেয়েদের উপহার দেবার মত। ৪৭৮।৫৪

গোয়েন্দা কাহিনী

বাগানবাড়ি—শ্রীস্বপনকুমার। বিশ্ব সাহিত্য প্রকাশনী, ৬৮, কলেজ স্ট্রীট কলিকাতা। দাম—আট আনা।

জনৈক কলেজের ছাত্র, তার নিয়মিত অভ্যেস অধিক রাত্রি অবধি পড়া ও শোবার আগে রাস্তায় গিয়ে কিছুক্ষণ পায়চারি করা। এইভাবে একদিন তাকে দুটো লোক রাস্তায় অজ্ঞান করে কাশীপুরে এক বাগানবাড়িতে ছেড়ে আসে। জ্ঞান পাওয়ার পর তার কাছেই এক মৃতা রমণীকে সে দেখে। এবং সেই ঘরের মধ্যে মীরা নামে এক হিন্দুস্থানী তরুণীর সাক্ষাৎ পায়। এই হত্যার দায়ে জড়িত করার জন্যেই যেন এই চেষ্টা। মীরার কাছে সব শুনেই ছেলেটি মীরাকে নিয়ে তার দেশে রওনা হয়। এবং তার স্বামীর কাছে ছেড়ে আসে।

এদিকে খুনের তদন্তের ভার পড়ে গোয়েন্দা দীপকের হাতে। বইয়ের প্রথমেই আসামীকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। শেষে অবশ্য আসামীর কাঠগড়ায় আসামীকে দেখতে পাওয়া যায়।

বইখানির আরম্ভ মোটামুটি। শেষে

যেন টাল সামলাতে না পেরে লেখক কোন-রকম জোড়াতালি দিয়ে কাজ সেরেছেন। সংলাপ ও ঘটনা-বিন্যাসে এত বেশি উচ্ছ্বাস যে, পাঠক মাত্রেই বিরক্তি বোধ করবেন। বিষয়-বস্তু ভাষা ও ভঙ্গীতে কোন দক্ষতার পরিচয় নাই। ৪৮১।৫৪

বয়স্কদের শিক্ষা গ্রন্থ

পুরাণ ভারত—সুধা দেবজা। আশুতোষ লাইব্রেরী ৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য—দশ আনা।

ছোট ছেলেমেয়েকে যে নিয়মে লেখা-পড়া শেখান যায় বয়স্কদের বেলায় সে নিয়ম চলে না। তার কারণ বয়স্করা মন ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে ঢের বেশি অগ্রসর। তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখে বয়স্কদের শিক্ষার জন্য চারিটি কাহিনীকে বেশ বড় অক্ষরে সহজ ও সরল ভাষায় লিখে এ-বইয়ে স্থান দেওয়া হয়েছে।

শকুন্তলা, ঋষ্যশৃঙ্গ, সম্বরণ ও তপতী এবং অর্বাবসু এই চারিটি কাহিনী এই চল্লিশ পৃষ্ঠার বইয়ে আছে। প্রচ্ছদপট ও বাঁধাই সুন্দর। ৪৭৯।৫৪

বিবিধ

নির্মাল্য—ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার; প্রকাশক—দি স্কুপ্‌টে, ৭৫, যতীন দাস রোড, কলিকাতা—৯। দাম দেড় টাকা।

আলোচ্য পুস্তিকাটি সম্প্রতি পর-লোকগত বিশিষ্ট দার্শনিক ও পণ্ডিত ডাঃ মহেন্দ্রনাথ (লাল নয়) সরকারের ছাত্র ও কর্ম-জীবনের বিভিন্ন পর্যায়ে স্ত্রীকে লেখা পত্র-গুচ্ছের সংকলন। এগুলির মধ্য দিয়ে স্ত্রীর তথা নারীজাতির আদর্শ ও কর্তব্য সম্বন্ধে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অনেকগুলির মধ্যে চলিত ও সাধু ভাষার সংমিশ্রণ, ছাপার দোষে, না মূল রচনার অনুযায়ী হয়েছে বুঝলাম না। এ রকম চটি বইয়ের পক্ষে দামটা বেশি নয় কি? প্রচ্ছদপটটি কিন্তু সুন্দর। ৪৪৫।৫৪

যৌন বিদ্যা—রুদ্রেন্দ্রকুমার পাল। শ্রীগুরু লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য—আট টাকা।

কিছুদিন আগে পর্যন্তও যৌনসম্পর্কীয় কোন প্রকার আলোচনা আমাদের দেশে নিষিদ্ধ আলোচনা বলে পরিগণিত হত। ফলে বাজারে চলতি অবৈজ্ঞানিক ও কামোদ্দীপক গ্রন্থের সাহায্যে অপ্রকৃত ও হাস্যকর সিদ্ধান্তের আমদানী হত। আনন্দের কথা, ইদানীং অভিজ্ঞ ব্যক্তিরা "চুপ চুপ" নীতির বেড়াজাল ছিন্ন করে বৈজ্ঞানিক তথ্যমূলক কয়েকটি গ্রন্থ প্রকাশিত করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটি এই জাতীয় একটি শিক্ষাপ্রদ ও সমাজের কল্যাণকামী গ্রন্থ। যৌনমিলন, বংশরক্ষা, প্রেম, কাম, শৃঙ্গার, অস্বাভাবিক যৌনমিলন, যৌন ব্যাধিসমূহ, জন্মশাসন, যৌনশিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা এই গ্রন্থটিকে প্রকৃত বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের মর্যাদা দান করেছে।

বহুদিন পর্যন্ত বিশেষ কারণবশত বিজ্ঞানের এই শাখাটি একপ্রকার অবহেলিতই ছিল, অভিজ্ঞ চিকিৎসক প্রণীত এমন একটি গ্রন্থের বহুল প্রচার সমাজের পক্ষে কল্যাণ-কর এ বিষয়ে আমরা নিঃসন্দেহ। ১৮৭।৫৪

বাংলা বর্ষলিপি : শিশিরকুমার আচার্য চৌধুরী সম্পাদিত : সংস্কৃতি বৈঠক, ১৭, পণ্ডিতিয়া প্লেস, কলিকাতা ২৯ : দাম ২৷৷০

বর্ষলিপি (Yearbook) ইংরাজীতে বহু দিন থেকেই প্রকাশিত হয়ে আসছে; কিন্তু বাংলা ভাষায় এর প্রকাশ সংখ্যায় খুবই কম। আলোচ্য পুস্তকের সম্পাদককে এদিক থেকে পুরোধা বলা যেতে পারে। বাংলার বর্ষলিপির পরিচ্ছন্ন একটি সংকলন প্রকাশ করে নাগরিক জীবনের একটা বড়ো অভাবই তিনি মোচন করছেন। বর্তমান বর্ষের বর্ষলিপিটিও অন্যান্য বছরের মতো নানান জ্ঞাতব্য বিষয়ে সমৃদ্ধ। ৪৪৬।৫৪

হোমিওপ্যাথিক প্রবেশিকা : ডাঃ মণি-মোহন মুখোপাধ্যায়। মূল্য—২৮০

তথাকথিত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক-দের কল্যাণে হোমিওপ্যাথি সম্বন্ধে যেরূপ ভ্রান্ত মত ও প্রমাদপূর্ণ তথ্য বাজারে প্রচলিত, অন্য কোন বিষয়ে বোধ হয় এতটা নাই। অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, ভারতবর্ষের ন্যায় স্বল্পবিত্ত দেশে হোমিওপ্যাথিরই বহুল প্রচার প্রয়োজন। স্বীকার করি যে, সরকারের আনুকূল্য ও সাহায্য ব্যতিরেকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের কোন শাখাই যথেষ্ট পরিপুষ্টলাভ করিতে পারে না, কিন্তু যাহাতে শুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে হোমিও-প্যাথিক তত্ত্ব ও তথ্যের সুস্থ আলোচনা হয়, সেটুকু দেখা দেশের কল্যাণকামী বিশেষজ্ঞনের অবশ্য কর্তব্য।

আশার কথা আলোচ্য গ্রন্থটিতে বাজারে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণার নিরসন ছাড়াও প্রকৃত জ্ঞাতব্য বিষয়বস্তু সন্নিবেশিত হইয়াছে। এ ছাড়া গ্রন্থটির আরো একটি বিশেষত্ব মহাত্মা হ্যানিমানের পরবর্তী মনীষিগণের আবিষ্কার, অবদান ও চিন্তাধারার সহিত পাঠকদের পরিচিত করার প্রয়াস। ক্রম বা শক্তি প্রস্তুতের নিয়ম, সূক্ষ্ম মাত্রার কার্যকারিতা, শারীরতত্ত্ব, রোগনিদান, লক্ষণ-বিচার, ঔষধে ঔষধে সম্বন্ধ প্রভৃতি বিবিধ মনোজ্ঞ অধ্যায় সংযোজিত হইয়া গ্রন্থটিকে প্রামাণ্য গ্রন্থের মর্যাদা দান করিয়াছে।

এইরূপ একটি বিজ্ঞানসম্মত মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত করিয়া ডাক্তার মুখোপাধ্যায় হোমিওপ্যাথিক-অনুসন্ধিৎসু জনসাধারণের ধন্যবাদের পাত্রই হইয়াছেন। পুস্তকটির বহুল প্রচার সমাজের পক্ষে কল্যাণকর। ৫১৯।৫৪

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

নতুন ফৌজ—বরেণ বসু

ছেঁড়াচিঠি—বিভূতিভূষণ নন্দী

হলদে বাড়ি—নরেন্দ্রনাথ মিত্র

নারী জাগরণ—দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

পতিত শূদ্র উদ্ধারে বিপ্লবী শ্রীগৌরাঙ্গ—দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

পাকিস্তানে বাঙ্গালীর জাতীয়তা—এন এন সিংহ

গীত প্রবেশিকা—সঙ্গীত নায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

অকুলকন্যা—প্রভাত দেব সরকার

বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ—রেজাউল করিম

উন্মেষ

রথীন্দ্র ঘটক চৌধুরী

দক্ষিণ হাওয়াঃ মৃদু উত্তাপঃ মুঠো মুঠো সোনা ঝরে—
চেতনা প্রখর রক্তিম অক্ষরে
কৃষ্ণচূড়ার ভাষার তুফান দিকে দিকে উদ্দাম;
আজ লিখে রাখো নাম
উষ্ণমাটিতে, মাঠের জঠরে স্বপ্নের তোলপাড়ে;
ঘাসের সবুজে দিগন্ত-ছোঁয়া ব্যগ্র প্রত্যাশায়ে
বুকে তুলে নাও, দাও দ্বিধাহীন নিশ্চিত স্বাক্ষরঃ
শাদা কুয়াশার পর্দা সরায় সম্ভাবনার ঝড়।
আকাশের চোখে মিলাও তোমার চোখ—
জমাট চেতনা উত্তাপ বেগে গলে চঞ্চল হোক্।
শাখায় শাখায় ঘুম-ভাঙা কচি পাতা
মেলে ধরে আজ নিঃসঙ্কোচে নবজীবনের খাতা,
মাঠের ধেয়ানে দক্ষিণ হাওয়া, হৃদ্পিণ্ডের গানে
সমুদ্র জাগে, পৃথিবীর কানে কানে
প্রতিশ্রুতির ভ্রমর গুঞ্জরণ;
পাখীর ডানায় উড়ে চলে কত মুহূর্ত কত ক্ষণ।
দাও দ্বিধাহীন নিশ্চিত স্বাক্ষর
শাদা কুয়াশার পর্দা সরায় সম্ভাবনার ঝড়।

অমৃত-কামনা

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাকে কাঁদাও তুমি আমাকে কাঁদাও।
যৌবনের দ্বিধাভয় সব ভেঙে দিয়ে
কলুষিত কামনার বোঝা কেড়ে নিয়ে
আমাকে জাগাও তুমি আমাকে জাগাও।
আমাকে কাঁদাও তুমি আমাকে কাঁদাও॥

বৈশাখের দাবদাহ জীবনে জ্বালাও।
যে হৃদয় ঘর বেঁধে আকাশের তলে
চিরকাল শুধু সোহাগের কথা বলে
সে হৃদয় ভেঙে দাও তুমি ভেঙে দাও।
আমাকে কাঁদাও তুমি আমাকে জাগাও॥

পলাশের মালা গেঁথে আমাকে পরাও।
তোমার অভয় গান আমার আকাশে
ঝড় হেনে মেঘ ডেকে দারুণ বাতাসে—
ধ্রুপদে বাজাও তুমি ধ্রুপদে বাজাও।
আমাকে কাঁদাও তুমি আমাকে জাগাও॥

পরেশনাথ সান্যাল

পাখীর পালক থেকে আকাশের রঙ মুছে নিয়ে
আমিও যে হ'য়ে যাই পাখীর মতন।
তখন আমাকে তুমি চিনিতে কি পার—
পাখী হ'য়ে উড়ে যাই আকাশে যখন?

মাটির মমতা জানি বেঁধেছে আমাকেঃ
তুমি তো মাটির মেয়ে,—এত চেনা তাই;
আকাশে যখন উড়ি পাখীদের সাথে—
আমি যে মাটির কেহ ভুলে যেন যাই।

বাঁধনের কোন রেখা সেখানে দেখি নাঃ
আকাশ মমতাহীন; তাইতো সেখানে
পাখীদের দলে ভীড়ে তোমাকে চিনি না।
আকাশ আমাকে শুধু দূরে যেতে টানে।

তবু যেন মনে হয় পথে যেতে যেতে—
একটুকু ছায়া যেন আছে কোনখানে।
অজস্র সোনার দানা ছড়ানো রয়েছে কোন ক্ষেতে
একটি হৃদয় যেন অবিরাম পেছনেই টানে।

আলোচনা

প্রাচীন তাম্রলিপ্তের মৃন্ময় মূর্তি

মহাশয়,

গত ৬ই কার্তিকের 'দেশ'এ শ্রীপরেশ-চন্দ্র দাশগুপ্তের "প্রাচীন তাম্রলিপ্তের মৃন্ময় মূর্তি" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ১ম চিত্র সম্পর্কে লেখক বলিয়াছেন, "সরীসৃপের মুখাবশিষ্ট মাতৃ-মূর্তি।" মূর্তির ছবি কিন্তু অন্য কথা বলে। ছাগলের মুখের সহিতই ইহার মুখের সাদৃশ্য দেখা যায়। তাহা ছাড়া একাধিক শিশুর বিদ্যমানতা হইতে লেখক কিরূপে ইহাকে ষষ্ঠীমূর্তি বলিয়া মনে করিলেন, বুঝিলাম না। প্রাচীন মনসার মূর্তির সহিতও শিশু দেখিতে পাওয়া যায় (History of Bengal—Vol-1, R. C. Mazumdar, Page—460)। সরীসৃপের সহিত সাদৃশ্য অবশ্য লেখকের মতে) অপেক্ষা ইহাকে মনসার মূর্তি বলাই বরং অধিকতর সমীচীন হইত। ষষ্ঠীর মূর্তি হইলে ইহার সহিত বিড়াল থাকিত। বহু প্রাচীন ষষ্ঠী-মূর্তির সহিত বিড়াল পাওয়া গিয়াছে History of Bengal—Vol-1, Page 461)।

চতুর্থ চিত্রের মূর্তিকে অত প্রাচীন ভাবিবার কারণ কি বুঝিলাম না। প্রবন্ধের গুরুত্ব বাড়ানোই কি ইহার উদ্দেশ্য?

—শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা।

শান্তি বর্ধনের পুতুল নাচ ও ছৌ নৃত্য

মহাশয়,

২৯শে আশ্বিনের "দেশ" পত্রিকায় শান্তি বর্ধনের পুতুল নাচ" এবং তৎপরবর্তী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শচী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র যথাক্রমে পড়িলাম। তিনি বাঁকুড়ার "ছৌনৃত্য" সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

"ছৌনৃত্য" বা ছায়ানৃত্য বাঁকুড়া বীরভূমের নিজস্ব সম্পদ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই কবির লড়াই, ঝুমুর গানের মতই পালপার্বণ বা জমিদার বাটীর উৎসব উপলক্ষে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। অধুনা, বাংলার এই প্রাচীন অকৃত্রিম শিল্পগুলির সুযোগ এবং সমর্থনের অভাবে অপমৃত্যু ঘটিতেছে। তথাপি বাংলার এই নিজস্ব শিল্প-ধারাগুলির উপর যথেষ্ট আঘাত-সংঘাত আসা সত্ত্বেও ইহাদের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে নাই। সতর্কতার সহিত ইহার কারণ অনুধাবন করিলে বুঝা যায় শুধু মৌলিকতাই নহে, যথেষ্ট প্রাণ-প্রাচুর্যের জন্যই ইহারা আজও বাঁচিয়া আছে। আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি যে যথাসময়ে জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তিগণ ইহার যথাযথ সমাদর করিবেন এবং এই প্রাচীন শিল্প-গুলিকে যুগের পরিপ্রেক্ষায় নূতন রূপারোপ করিবেন।

উদয়শঙ্করের অধুনা আবিষ্কৃত রাম-লীলার মত ছৌনৃত্য পর্দার 'পরে ছায়ার নৃত্যভঙ্গিমা নয়। শান্তি বর্ধনের "রামায়ণের" মতই মুখোশ-পরা-মানুষ ইহাতে অংশ গ্রহণ করে। নৃত্যের উপকরণ বাংলার নিজস্ব এবং সহজলভ্য দ্রব্যাদি হইতে প্রস্তুত। শোলার তৈরী ডাক—চট—শন—বাঁশ—শর ইত্যাদি নির্মিত মুখোশ এবং মুকুট পরিয়া নটগণ অভিনয় করেন। ঢোল—শানাই এবং কাঁসি ইহার বাদ্য উপকরণ। বাঁকুড়া অপেক্ষা বীর-ভূমের ছৌনাচ উন্নত এবং বীরভূমের গ্রাম অঞ্চলে ইহার বহুল প্রচলন আছে।

ছৌনৃত্যের উপজীব্য বিষয় পৌরাণিক কিম্বদন্তী বা সমসাময়িক কোনও উল্লেখযোগ্য কাহিনী। ছোটবেলায় মায়ের মুখে গল্পাকারে যে সব পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুনিয়াছি পরবর্তীকালে ছৌনৃত্যের মধ্যে তাহাদের অনুপম এবং অপরূপ প্রকাশ দেখিয়াছি।

প্রথমে ঢোল-শানাই এবং কাঁসির বাদ্য-সহকারে এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর কথক আসিয়া সুর করিয়া নৃত্যের বিষয়বস্তু বিবৃত করেন। বাঁকুড়ার ছৌনৃত্যের উপজীব্য বিষয়—গণেশের জন্ম-কাহিনী। ষণ্ডপৃষ্ঠে দেবী দুর্গার আগমন, গণেশের জন্মান্তে আমন্ত্রিত দেবগণের সমাবেশ এবং পরিশেষে শনির দৃষ্টিপাতে গণেশের মুণ্ডলোপ—এই সকলই নির্বাক অঙ্গ ভঙ্গিমার মাধ্যমে অতি অপূর্ব রূপ পরিগ্রহ করে।

দুঃখের বিষয় বাংলার এই অনুপম শিল্পটি সমাজের তথাকথিত নিম্ন স্তরের জনগণের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে। বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশনে যে সমস্ত শিল্পিরা ছৌ-নৃত্যের অভিনয় করিয়াছিল তাহারা জাতে মাল এবং বাঁকুড়ার রামপুর অঞ্চলে ইহারা বসবাস করে।

শ্রীশচী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমরা একমত হইয়া বলিব, পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সমাজ যদি বাংলার এই পুরাতন নৃত্য-পদ্ধতিটি পরিমার্জিত করিয়া রসিকসমাজে উপস্থাপন করেন তবে উহা অবশ্যই রসজ্ঞ দর্শকের মনোরঞ্জন করিবে। —প্রণবকুমার মল্লিক, বাঁকুড়া।

উন্মেষ

রথীন্দ্র ঘটক চৌধুরী

দক্ষিণ হাওয়াঃ মৃদু উত্তাপঃ মুঠো মুঠো সোনা ঝরে—
চেতনা প্রখর রক্তিম অক্ষরে
কৃষ্ণচূড়ার ভাষার তুফান দিকে দিকে উদ্দাম;
আজ লিখে রাখো নাম
উষ্ণমাটিতে, মাঠের জঠরে স্বপ্নের তোলপাড়ে;
ঘাসের সবুজে দিগন্ত-ছোঁয়া ব্যগ্র প্রত্যাশায়ে
বুকে তুলে নাও, দাও দ্বিধাহীন নিশ্চিত স্বাক্ষরঃ
শাদা কুয়াশার পর্দা সরায় সম্ভাবনার ঝড়।
আকাশের চোখে মিলাও তোমার চোখ—
জমাট চেতনা উত্তাপ বেগে গলে চঞ্চল হোক্।
শাখায় শাখায় ঘুম-ভাঙা কচি পাতা
মেলে ধরে আজ নিঃসঙ্কোচে নবজীবনের খাতা,
মাঠের ধেয়ানে দক্ষিণ হাওয়া, হৃদ্‌পিণ্ডের গানে
সমুদ্র জাগে, পৃথিবীর কানে কানে
প্রতিশ্রুতির ভ্রমর গুঞ্জরণ:
পাখীর ডানায় উড়ে চলে কত মুহূর্তে কত ক্ষণ।
দাও দ্বিধাহীন নিশ্চিত স্বাক্ষর
শাদা কুয়াশার পর্দা সরায় সম্ভাবনার ঝড়।

অমৃত-কামনা

অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়

আমাকে কাঁদাও তুমি আমাকে কাঁদাও।
যৌবনের দ্বিধাভয় সব ভেঙে দিয়ে
কলুষিত কামনার বোঝা কেড়ে নিয়ে
আমাকে জাগাও তুমি আমাকে জাগাও।
আমাকে কাঁদাও তুমি আমাকে কাঁদাও॥

বৈশাখের দাবদাহ জীবনে জ্বালাও।
যে হৃদয় ঘর বেঁধে আকাশের তলে
চিরকাল শুধু সোহাগের কথা বলে
সে হৃদয় ভেঙে দাও তুমি ভেঙে দাও।
আমাকে কাঁদাও তুমি আমাকে জাগাও॥

পলাশের মালা গেঁথে আমাকে পরাও।
তোমার অভয় গান আমার আকাশে
ঝড় হেনে মেঘ ডেকে দারুণ বাতাসে—
ধ্রুপদে বাজাও তুমি ধ্রুপদে বাজাও।
আমাকে কাঁদাও তুমি আমাকে জাগাও॥

পরেশনাথ সান্যাল

পাখীর পালক থেকে আকাশের রঙ মুছে নিয়ে
আমিও যে হ'য়ে যাই পাখীর মতন।
তখন আমাকে তুমি চিনিতে কি পার—
পাখী হ'য়ে উড়ে যাই আকাশে যখন?

মাটির মমতা জানি বেঁধেছে আমাকেঃ
তুমি তো মাটির মেয়ে,—এত চেনা তাই;
আকাশে যখন উড়ি পাখীদের সাথে—
আমি যে মাটির কেহ ভুলে যেন যাই।

বাঁধনের কোন রেখা সেখানে দেখি নাঃ
আকাশ মমতাহীন; তাইতো সেখানে,
পাখীদের দলে ভীড়ে তোমাকে চিনি না।
আকাশ আমাকে শুধু দূরে যেতে টানে।

তবু যেন মনে হয় পথে যেতে যেতে—
একটুকু ছায়া যেন আছে কোনখানে।
অজস্র সোনার দানা ছড়ানো রয়েছে কোন ক্ষেতে
একটি হৃদয় যেন অবিরাম পেছনেই টানে।

আলোচনা

প্রাচীন তাম্রলিপ্তের মৃন্ময় মূর্তি

মহাশয়,

গত ৬ই কার্তিকের 'দেশ'এ শ্রীপরেশচন্দ্র দাশগুপ্তের "প্রাচীন তাম্রলিপ্তের মৃন্ময় মূর্তি" শীর্ষক যে প্রবন্ধটি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে ১ম চিত্র সম্পর্কে লেখক বলিয়াছেন, "সরীসৃপের মুখবিশিষ্ট মাতৃমূর্তি।" মূর্তির ছবি কিন্তু অন্য কথা বলে। ছাগলের মুখের সহিতই ইহার মুখের সাদৃশ্য দেখা যায়। তাহা ছাড়া একাধিক শিশুর বিদ্যমানতা হইতে লেখক কিরূপে ইহাকে ষষ্ঠীমূর্তি বলিয়া মনে করিলেন, বুঝিলাম না। প্রাচীন মনসার মূর্তির সহিতও শিশু দেখিতে পাওয়া যায় (History of Bengal—Vol-1, R. C. Mazumdar, Page—460)। সরীসৃপের সহিত সাদৃশ্য অবশ্য লেখকের মতে) অপেক্ষা ইহাকে মনসার মূর্তি বলাই বরং অধিকতর সমীচীন হইত। ষষ্ঠীর মূর্তি হইলে ইহার সহিত বিড়াল থাকিত। বহু প্রাচীন ষষ্ঠীমূর্তির সহিত বিড়াল পাওয়া গিয়াছে History of Bengal—Vol-1, Page -461)।

চতুর্থ চিত্রের মূর্তিকে অত প্রাচীন ভাবিবার কারণ কি বুঝিলাম না। প্রবন্ধের গুরুত্ব বাড়ানোই কি ইহার উদ্দেশ্য?

—শ্রীসত্যনারায়ণ ভট্টাচার্য, কলিকাতা।

শান্তি বর্ধনের পুতুল নাচ ও ছৌ নৃত্য

মহাশয়,

২৯শে আশ্বিনের "দেশ" পত্রিকায় "শান্তি বর্ধনের পুতুল নাচ" এবং তৎপরবর্তী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত শচী বন্দ্যোপাধ্যায়ের পত্র আগ্রহে পড়িলাম। তিনি বাঁকুড়ার "ছৌনৃত্য" সম্বন্ধে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিয়াছেন দেখিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম।

"ছৌনৃত্য" বা ছায়ানৃত্য বাঁকুড়া বীরভূমের নিজস্ব সম্পদ। অতি প্রাচীনকাল হইতেই কবির লড়াই, ঝুমুর গানের মতই পালপার্বণ বা জমিদার বাটীর উৎসব উপলক্ষে ইহা অনুষ্ঠিত হয়। অধুনা, বাংলার এই প্রাচীন অকৃত্রিম শিল্পগুলির সুযোগ এবং সমর্থনের অভাবে অপমৃত্যু ঘটিতেছে। তথাপি বাংলার এই নিজস্ব শিল্পধারাগুলির উপর যথেষ্ট আঘাত-সংঘাত আসা সত্ত্বেও ইহাদের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি ঘটে নাই। সতর্কতার সহিত ইহার কারণ অনুধাবন করিলে বুঝা যায় শুধু মৌলিকতাই নহে, যথেষ্ট প্রাণ-প্রাচুর্যের জন্যই ইহারা আজও বাঁচিয়া আছে। আমরা অবশ্যই আশা করিতে পারি যে যথাসময়ে জ্ঞানী এবং গুণী ব্যক্তিগণ ইহার যথাযথ সমাদর করিবেন এবং এই প্রাচীন শিল্পগুলিকে যুগের প্রারপ্রেক্ষায় নূতন রূপারোপ করিবেন।

উদয়শংকরের অধুনা আবিস্কৃত রামলীলার মত ছৌনৃত্য পর্দার 'পরে ছায়ার নৃত্যভঙ্গিমা নয়। শান্তি বর্ধনের "রামায়ণের" মতই মুখোশ-পরা-মানুষ ইহাতে অংশ গ্রহণ করে। নৃত্যের উপকরণ বাংলার নিজস্ব এবং সহজলভ্য দ্রব্যাদি হইতে প্রস্তুত। শোলার তৈরী ডাক—চট—শন—বাঁশ—শর ইত্যাদি নির্মিত মুখোশ এবং মুকুট পরিয়া নটগণ অভিনয় করেন। ঢোল—শানাই এবং কাঁসি ইহার বাদ্য উপকরণ। বাঁকুড়া অপেক্ষা বীরভূমের ছৌনাচ উন্নত এবং বীরভূমের গ্রাম অঞ্চলে ইহার বহুল প্রচলন আছে।

ছৌনৃত্যের উপজীব্য বিষয় পৌরাণিক কিম্বদন্তী বা সমসাময়িক কোনও উল্লেখযোগ্য কাহিনী। ছোটবেলায় মায়ের মুখে গল্পাকারে যে সব পৌরাণিক আখ্যায়িকা শুনিয়াছি পরবর্তীকালে ছৌনৃত্যের মধ্যে তাহাদের অনুপম এবং অপরূপ প্রকাশ দেখিয়াছি।

প্রথমে ঢোল-শানাই এবং কাঁসির বাদ্যসহকারে এক মনোরম পরিবেশের সৃষ্টি করা হয়। অতঃপর কথক আসিয়া সুর করিয়া নৃত্যের বিষয়বস্তু বিবৃত করেন। বাঁকুড়ার ছৌনৃত্যের উপজীব্য বিষয়—গণেশের জন্মকাহিনী। ষণ্ডপৃষ্ঠে দেবী দুর্গার আগমন, গণেশের জন্মান্তে আমন্ত্রিত দেবগণের সমাবেশ এবং পরিশেষে শনির দৃষ্টিপাতে গণেশের মুণ্ডলোপ—এই সকলই নির্বাক অঙ্গ ভঙ্গিমার মাধ্যমে অতি অপূর্ব রূপে পরিগ্রহ করে।

দুঃখের বিষয় বাংলার এই অনুপম শিল্পটি সমাজের তথাকথিত নিম্ন স্তরের জনগণের মধ্যে নামিয়া আসিয়াছে। বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মিশনে যে সমস্ত শিল্পীরা ছৌনৃত্যের অভিনয় করিয়াছিল তাহারা জাতে মাল এবং বাঁকুড়ার রামপুর অঞ্চলে ইহারা বসবাস করে।

শ্রীশচী বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত আমরা একমত হইয়া বলিব, পশ্চিমবঙ্গের শিল্পসমাজ যদি বাংলার এই পুরাতন নৃত্যপদ্ধতিটি পরিমার্জিত করিয়া রসিকসমাজে উপস্থাপন করেন তবে উহা অবশ্যই রসজ্ঞ দর্শকের মনোরঞ্জন করিবে। —প্রণবকুমার মল্লিক, বাঁকুড়া।

—শৌভিক—

গানের জলসা যদু ভট্ট

দিন সাতেকের একটা প্রায় আস্ত সংগীত সম্মিলনীকেই পোনে তিন ঘণ্টার ছবিতে পুরে নিয়ে হাজির হয়েছে সানরাইজ পিকচার্সের "যদু ভট্ট"। একেবারে খাঁটি রাগ রাগিণীর গানের সঙ্গে আবহ-সংগীতে রয়েছে বীণ, রবাব, সেতার, মৃদঙ্গ, তবলা প্রভৃতি বাজনার সমাবেশ। আর, শিল্পীদের মধ্যেও রয়েছেন পণ্ডিত রবিশংকর, কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, সংগীত রত্নাকর রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, মৈনুদ্দীন ডাগর, সংগীতাচার্য তারাপদ চক্রবর্তী, এ কানন, পণ্ডিত মনিরাম, সুখেন্দু গোস্বামী, বিমলাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, পণ্ডিত জয়রাজ, জনাব কেরামতুল্লা, জনাব সগীরুদ্দীন, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিতোষ শীল, দক্ষিণ্যমোহন ঠাকুর, গীতশ্রী, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, কানাইলাল দত্ত, প্রতাপ মিত্র প্রমুখ গাইয়ে ও বাজিয়ের দল। বলতে গেলে আজ পর্যন্ত কোন ছবিতেই ক্লাসিকাল সংগীতের এতোজনকে নিয়ে এমন আড়ম্বর আর হয়নি। গান আর গান। ভৈরবী, দরবারী, কানাড়া, বাগেশ্রী, আড়ানা, কাম্বোজী, মল্লার, ভীমপলশ্রী, চৈতি, বাহার, শংকরা, ভাটিয়ার, কাফি প্রভৃতি কতো রাগ রাগিণীর একটা জোয়ার গড়িয়ে গিয়েছে সারা ছবিখানি ভরে। পুলকে মন আপ্লুত হয়, রঞ্জিত হয়। এ ছাড়াও, আরো গুণ আছে যা ছবিখানিকে একটি মর্যাদাপূর্ণ চিত্রসৃষ্টি ব'লে পরিগণিত হবার তাকত যোগ করতে পেরেছে। বাঙলার প্রতিভাকে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করার এ একটি সুন্দর প্রচেষ্টা।

* * *

বাঙলার সংগীত প্রতিভাকে অনাদর ও অস্বীকার করার কেমন যেন একটা স্বভাব, একটা অলিখিত রীতি প্রচলিত হয়ে আসছে দীর্ঘকাল ধ'রে। বাঙলার কেউ ওস্তাদ সংগীতজ্ঞ হ'তে পারে এ যেন কেমন একটা অভাবনীয় ব্যাপার তাই কলকাতারই বিভিন্ন সংগীত সম্মিলনীর অনুষ্ঠানগুলিতে দেখা যায়, গাইবার ও বাজাবার জন্য শত শত টাকা ব্যয়ে বাইরে থেকে ওস্তাদদের এনে একদিকে সম্মানিত করা হচ্ছে, আর অপরদিকে ঠিক ততোখানিই অবহেলা প্রকাশ করা হচ্ছে স্থানীয় শিল্পীদের যোগদানের সুযোগ অবরোধ করে রেখে। নেহাৎই যদিও বা স্থানীয় শিল্পীদের কাউকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তো তা যেন অতি দাক্ষিণ্য পরবশ হয়েই। আবার দক্ষিণার বেলাও বাঙলার শিল্পীদের এমন মানও রাখবার ব্যবস্থা থাকে না যা জোর ক'রে তুলে দেওয়া হয় বাইরে থেকে আনা তৃতীয় শ্রেণীরও অনেক শিল্পীর হাতে। "যদু ভট্ট" অন্তত একটুখানিও এই চেতনা ফিরিয়ে আনবে যে, গানের জগতে বাঙলারও ঐতিহ্য আছে, বৈশিষ্ট্যও আছে, যে ধারা ভারতবিজয়ী প্রতিভা অবলম্বন ক'রেই প্রবাহিত। ছবিখানি এ ধারণা গ'ড়ে তোলার সুযোগ এনে দিয়েছে যে, উচ্চাঙ্গ সংগীতে বাঙলার শিল্পীও ভারতে শ্রেষ্ঠত্বের আসন লাভ করার মতো যোগ্যতা নিয়েও জন্মাতে পারে। আর ছবিখানিতে রয়েছে উচ্চাঙ্গ সংগীত পরিবেশন দ্বারা দেশের প্রকৃত ঐতিহ্যের প্রতি দেশবাসীর দরদ ও আদর জাগরূক ক'রে তোলার প্রচেষ্টা। দেশের অতুল সাংস্কৃতিক সম্পদকে মান্য করার বোধশক্তিতে প্রত্যয় ফিরিয়ে নিয়ে আসা।

* * *

উচ্চাঙ্গ সংগীত জগতে বাঙালীর কেন পাত্তা দেওয়া হয় না, বা বাঙালী পাত্তাই পায় না, তার হয়তো ঐতিহাসিক কারণ আছে; এবং হয়তো কেন নিশ্চয় আছে। কিন্তু সে কারণটা এখনও কে বিশ্লেষণ ক'রে দেয়নি, তবে যদু ভট্ট এ ছবিতে যেভাবে পাওয়া যায় তা থেকে এইটেই কারণ ব'লে ধরতে হয় যে, বাইরে ওস্তাদরা বাঙালীর সাধনা প্রতিভাকে ভ করে, যেমন একাধিক ওস্তাদের মুখ থে যদু ভট্টকে শুনতে হয়েছে যে, তা বাঙালীকে গান শেখাতে চান না নিজে তলিয়ে যাবার আশংকায়। কে জা ব্যাপকভাবে এ যুক্তি কতখানি প্রযোজ্য কিন্তু গল্পের এই যদু ভট্ট দেখা যা এই কারণেই দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, গোয়ালিয়র আগ্রা প্রভৃতি স্থানের বিশিষ্ট ঘরা কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। মঞ্জজাগ

'রাণী রাসমণি'-তে শিখারাণী, পাহাড়ী সান্যাল ও নিভাননী

যে মহাসাধক স্বর্গের দেবতাকে মর্তে এনেছিলেন তাঁরই সাধনার বিচিত্র কাহিনী......

ভক্ত, ভক্তি ও ভগবানের পুণ্যময় লীলাক্ষেত্র এই ভারতবর্ষ, যুগে-যুগে, কালে-কালে, এমন বহু দেবতাত্মা পুরুষ এই দেশে জন্মগ্রহণ করেছেন যাঁরা তাঁদের এক-নিষ্ঠ সাধনায় ভক্ত ও ভগবানের বিরাট ব্যবধানটুকু নিঃশেষে মুছে দিতে পেরেছেন। যখনি অন্ধকার বিরাট হয়ে ঘনিয়ে এসেছে, অশান্ত হয়ে উঠেছে দেশ, তখন তাঁরাই দেখিয়েছেন পথের নিশানা, শুনিয়েছেন শান্তির ললিতবাণী। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য, পরমপুরুষ শ্রীরাম-কৃষ্ণ এবং মহামানব বিবেকানন্দের মত যুগসাধকরা। তাঁরা আজ নেই বটে, কিন্তু আজকের সমস্যাক্লিষ্ট মানুষ যখন তার অভিশাপগ্রস্ত জীবনের পথে একান্ত দিশেহারা হয়ে পড়ে, তখন সেই যুগ-সাধকের পুণ্যময় জীবনই তাদের অনুপ্রেরণা জোগায়, তাঁদের আদর্শই আশান্বিত করে তোলে।

আজ থেকে প্রায় দু'শো বছর আগে ভারতের কোন এক প্রান্তে তেমনি এক ভক্তপ্রাণ পুণ্যাত্মা ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটেছিল। প্রথম জীবনে যিনি ছিলেন অতি সাধারণ, সাধারণ এক কুম্ভকার মাত্র। নাম তাঁর গোরা। সামান্য কুম্ভকার হয়েও গোরা যেদিন ভগবানের অস্তিত্ব মনে-মনে প্রথম অনুভব করতে পারলেন, যেদিন বুঝলেন যে, ভোগ, লালসা শুধু সাময়িক উন্মাদনা মাত্র, কিন্তু ভগবৎ-প্রেম সর্বসময়ের সর্ব-কালের—সেদিন থেকেই তাঁর কাছে জগতের সব কিছু মিথ্যে হয়ে গেল। মিথ্যে হয়ে গেল সংসার, মিথ্যে হয়ে গেল অপরূপ লাবণ্যময়ী স্ত্রীর ভরা যৌবন। ভগবানই তখন তাঁর রাত্রি-

দিনের স্বপ্ন। কিন্তু তাঁকে এই ভগবৎপ্রেমের মূল্য দিতে হোল অনেক। একে একে তাঁর সন্তান গেল, হাত গেল, এমন কি অমন রূপবতী স্ত্রীকে স্পর্শ করবার অধিকারটুকু পর্যন্ত তাঁর

চিত্রা, কালিকা, গণেশ টকীজ, নিউ সিনেমা, দীপ্তি, আলো-ছায়া প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে এই ছবি প্রদর্শিত হচ্ছে।

নে বসলো যদু। যদুর গানের পলব্ধি ক'রে শম্বীর বিষ খেয়ে ল। বিহ্বল যদু আলি শপথ করলে এর পর সর্বহারা হয়েও যখন গোরার মুখে শ্রীভগবানের নাম-মাহাত্ম্য, তখন ভগবান বিষ্ণু আর স্থির থাকতে পারলেন না। ভক্তের আকুল আহ্বানে বিষ্ণু ও লক্ষ্মী মর্তে নেমে এসে গোরার দীনকুটীরে বন্দী হয়ে রইলেন।

গোরা ধন্য, তাঁর গৃহ ধন্য। এত-বড় সৌভাগ্যের কথা তিনি যে স্বপ্নেও কল্পনা করে উঠতে পারেন নি। এতকাল ধরে তিনি যাঁর উপাচার সাজিয়ে এসেছেন, তিলে তিলে নিজেকে উৎসর্গ করেছেন যাঁর পায়ে, সেই নব-দূর্বাদল শ্যামমনোহর আজ সশরীরে তাঁর গৃহে উপস্থিত! ছুটে গেলেন তিনি আরাধ্য দেবতার কাছে। কিন্তু কোথায় তাঁর প্রাণের দেবতা? চারি-দিক খুঁজে ফিরলেন গোরা। তাঁর আকুল ক্রন্দনে আকাশ-বাতাস তখন মুখরিত হয়ে উঠেছে। প্রকৃতির বুকেও জেগেছে গোরার সেই হৃদয়-মথিত করুণ সুর......।

সেই মহাপুরুষ—যিনি তাঁর এক-নিষ্ঠ সাধনা ও ভক্তির বলে একদিন স্বর্গ ও মর্তকে একাকার করে তুলেছিলেন, তাঁরই বিচিত্র কাহিনী এই "চক্রধারী"। সুমধুর সুর-সমন্বিত এই ছবিখানি শুধু ভক্তিমনাদের জন্যেই নয়, সর্বশ্রেণীর দর্শকদেরই দেবে অপরিসীম তৃপ্তি।

অনুরূপা দেবীর "মন্ত্রশক্তি"-তে সন্ধ্যারাণী

আত্মবিস্মৃতির অন্তস্তল থেকে সত্য ঘটনার সবই উদ্ধার করা সহজ নয়, এ ছবিরও আখ্যানবস্তু রচনায় রচয়িতা সে চেষ্টায় বিরত থেকেছেন। ভারতবিজয়ী এই সংগীতজ্ঞের চল্লিশ বছরের স্বল্পকালীন জীবনী সম্পর্কে শোনা আর বানানো ঘটনার আশ্রয় নেওয়া হয়েছে যথেষ্ট; ইতিহাসের সংগে সম্পর্ক বলতে গেলে আভাসের মধ্যেই নিবদ্ধ। ঘটনার চেয়ে ভাবটাই অবলম্বিত হয়েছে চিত্রনাট্যটি পরিকল্পনায়। অবশ্য সেটা ছবির মুখ-বন্ধে স্বীকার করেও নেওয়া হয়েছে গোড়াতেই। শতখানেক বছর আগেকার ইতিহাস, তবে সে যুগের ব'লে দেখাবার জন্য ছবির আঙ্গিক চেহারা যা গ'ড়ে তোলা হয়েছে তার মধ্যে অনেক গোঁজা-মিল। কোনরকমে তৎকালের একটা পরিবেশ খাড়া করিয়ে দেওয়া ছাড়া ও থেকে জানবার, কিছু পাবার আশা করতে গেলে ঠেক খেতে হবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই, অথচ এদিক থেকেও ছবির সম্ভার ও সম্ভ্রম বাড়িয়ে তোলার বেশ একটা সুযোগ ছিল। এ বিষয়ে সমালোচনার মুখ বন্ধ করার জন্যই বোধ হয় চিত্রনির্মাতা তাঁদের এই প্রচেষ্টাকে "এক বরেণ্য বাঙালীর স্মৃতি-তর্পণে সামান্য আকিঞ্চন" ব'লে অভিহিত করেছেন। প্রচেষ্টাটি কিন্তু সামান্য নয়, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও বরণীয়।

* * *

যদু ভট্টকে এখানে পাওয়া যায় বছর চোদ্দ বছরের সংগীতমনা ছেলে অবস্থা থেকে। সুর কাণে ভেসে এলেই থমকে দাঁড়ায় বালক যদুনাথ ভট্টাচার্য, আর শ্রুতিধর ব'লে সংগে সংগেই গানখানি সে আয়ত্ত ক'রে নেয়। একদিন ধরা পড়লো বিষ্ণুপুরের জমিদার রামশংকর ভট্টাচার্যের কাছে। গদাধর চক্রবর্তীর কাছ থেকে তিনি গান শিখেছেন। একখানা গান ধ'রেছেন, হঠাৎ এক ফাঁকে আর একটা মিষ্টি গলা কাণে এলো তাঁর অবিকল তাঁরই সুর। রামশংকর ছেলেটিকে ডেকে পরিচয় নিয়ে তাকে গান শেখাতে আরম্ভ করলেন। মাস কয়েক পর স্বয়ং গদাধর চক্রবর্তী হঠাৎ উপস্থিত হলে এবং যদুর গান শুনে তিনিও মুগ্ধ হলেন। গদাধর পঞ্চকোট রাজের কা[ছ] থেকে সুপারিশপত্র নিয়ে এসেছিলে[ন] কাশীর মহা সংগীত সম্মেলনে যোগদানে[র] সুযোগ পাবার জন্য। রামশংকর সং[গে] যেতে না পারায় যদু হ'লো গদাধরে[র] সংগী। কাশীতে কিন্তু গদাধরকে সম্মেলনে প্রবেশ করতে তো দেওয়া হলে[া] না, উপরন্তু বাঙালীর সংগীত প্রতিভা[কে] উপহাস করে জুতো মেরে তাঁকে তাড়ি[য়ে] দেওয়া হ'লো। সেই জুতো তুলে নি[য়ে] বালক যদু কাশীর ঘাটে ব'সে গদাধরে[র] পা ছুঁয়ে শপথ করলে, বাঙালী ভারতের সংগীত সমাজে প্রতিষ্ঠিত ক[রে] এই অপমানের প্রতিশোধ নেবে। ছুটে বেড়াতে লাগলো ওস্তাদদের দরজায় দরজায়। গান শিখতে চায় সে এবং যে অযোগ্য হবে না তারও প্রমাণ [দিতে] দেয় সেই ওস্তাদদেরই গাওয়া গান হু[বহু] পুনরাবৃত্তি করে। কিন্তু কেউই ত[াকে] শিষ্য ক'রে নিতে রাজী নয়। কেউ ত[াকে] তাড়িয়ে দেয় বাঙালী ব'লে, কেউ তা[কে] যদু নিঃস্ব ব'লে, আবার কারুর থেকে ফিরে আসতে হয় শ্রুতিধর সব বিদ্যে আয়ত্ত করে নিয়ে ওস্তাদকেই ঘায়েল করে দেয়। দীর্ঘ সাতেক এইভাবে প্রত্যাখ্যাত হয়ে

তের নানা জায়গা ঘোরার পর একদিন নাথ শ্রান্ত ও বিফলমনোরথ হয়ে এক গায় ব'সে গাইলে তার নিরাশার গান। নের বাড়ির রতন বাঈয়ের কাছ থেকে এলো তাঁর। রতন বাঈ পেয়েছে র গানে বিষ্ণুপুরী ঘরাণার ছাপ, তাই আগ্রহ, কারণ বিষ্ণুপুরের জমিদারের গ তার সম্পর্ক রয়েছে। সংগীতের চ যদুর আগ্রহের কথা শুনে রতন বাঈ ক নিজের আঙটি দিয়ে পাঠিয়ে দিলে ভগিনী, ভারতের শ্রেষ্ঠ গায়ক কতাব-এ-মুশিকী আলি বক্সের মের কাছে। যদু একটা মালীর কাজ য় থাকবার ব্যবস্থা করলে এবং লুকিয়ে াদজীর গান শুনে শুনে আয়ত্ত করতে ক। একদিন আলি বক্স সংগীত আয়ত্ত য় ছেলের অপারগতায় হতাশ হয়ে সাধনা বিলুপ্ত হবার আশংকায় াপ করছেন, ঠিক সেই সময়েই তাঁর নের জবাব দিয়ে তাঁকে আশ্বস্ত করতে নে আবির্ভূত হলো যদুনাথ। আলি নিজেকে উজাড় ক'রে যদুকে গান খালেন। কিন্তু যদু আরও শিখতে আরও সুর পেতে চায়, তাই একদিন আলি বক্সের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ম পাওয়ার সন্ধানে বেরিয়ে পড়লো।

* * *

আলি বক্সের গৃহ থেকে যদু আবার লো রতন বাঈয়ের কাছে। রতন বাঈ কে পরম পাওয়ার সন্ধান ব'লে দিলে; ওয়া যাবে বৃন্দাবনের জংগলে ঝিন্নন ঈয়ের কাছে। যদু হাজির হ'লো খানে; ঝিন্ননও তারই প্রতীক্ষায় লো। ঝিন্ননের কাছ থেকে শিখলে রের বিস্তারে প্রেমের পরশ যোগ ক'রে তে। যদু কিন্তু ঝিন্ননেরও প্রেমে লো; ঝিন্ননও যদুকে ভালবাসলেও জীর গর্ভে জন্মের কলংক ভুলতে রে না ব'লে যদুর হাতে নিজেকে র্পণ করতে পারলে না। যদু বেরিয়ে ড়লো বৃন্দাবন থেকে; ঝিন্নন চললো র পিছু পিছু ছায়ার মতো। পথে ক শহরে যদু তার মীরার ভজন শুনিয়ে াকে মুগ্ধ করলে; সেই সংগে মুগ্ধ ল রাবেয়া, বিখ্যাত রবাবি ওস্তাদ াসেম আলির ভ্রাতুষ্পুত্রী। দীর্ঘদিন র যদু ফিরে এলো বাঙলা দেশে এবং এক যাত্রা দলের সংগে ভিড়ে গিয়ে নানা স্থান ঘুরে হাজির হলো ত্রিপুরায়। ঝিন্ননও চলেছে তার পিছু নিয়ে। যাত্রার যদুর কীর্তন শুনে মহারাজ তাকে ডেকে পাঠালেন দরবারে। রবাবি কাসেম আলিও দরবারে উপস্থিত। কৌতূহলী যদু কাসেম আলির রবাবটা স্পর্শ করতেই বাঙালী ব'লে অপমানিত হ'লো। যদু এ অপমানে চুপ রইলো না। মহারাজ যদুকে বললেন গান শুনিয়ে এ অপমানের যথাযথ প্রত্যুত্তর দিতে। যদু এক মাস সময় চেয়ে চলে এলো। রাবেয়ার সংগে দেখা হতে যদু তার সহায়তায় কাসেম আলির বাজনার তরফিকটা জেনে নেয়, আর রোজ গোপনে বাজনা শুনে আসে। এক মাস পর দরবারে হাজির হলো যদু। কাসেম আলি বিস্ময়ে দেখলে, যদু ঠিক তারই মতো একটি রবাব নিয়ে পাশে বসেছে। চললো বাজনার দ্বন্দ্ব। পরাস্ত কাসেম আলি যদুকে জড়িয়ে ধরলে যাদু-কর বলে। কাসেম আলি সে রাজ্য থেকে বিদায় নিলে। রাবেয়া যদুকে পেতে চেয়েছিল, কিন্তু যদুকে বাঁধতে পারলো না, সেও বিদায় নিয়ে চলে গেল। দরবার থেকে রংগনাথ খেতাব পাবার পর আবার সাক্ষাৎ হলো ঝিন্ননের সংগে। এবারে ঝিন্নন যদুকে সংগে নিয়েই চললো। পথে এক গ্রামে ভীষণ মড়ক; গ্রামবাসীর বিশ্বাস, অধিষ্ঠাত্রী দেবী কুপিতা হওয়ার ফলেই এই দুর্দিন এসেছে। ঝিন্ননের আগ্রহে যদু সে গ্রামে নামলো। গাইলে শ্যামার নাম গান; সবায়ের চোখের সামনে ভেসে উঠলো দেবীমূর্তি। চললো যদু এবার পঞ্চকোটে, আসন্ন কাশী মহা সংগীত সম্মেলনে যোগদানের ব্যবস্থা করার জন্য। পঞ্চকোট দরবারে সেদিন আলি বক্সের ছেলে শব্বীর খাঁর গান হচ্ছে। বেঠিক গাওয়া; যদু থাকতে পারলে না চুপ করে শুনে যেতে; শব্বীরের সংগে মাথার সর্ত রেখে গানে বসলো যদু। যদুর গানের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি ক'রে শব্বীর বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করলে। বিহ্বল যদু আলি বক্সের পা ছুঁয়ে শপথ করলে এর পর সে আর গান গাইবে না। কিন্তু ঝিন্নন তাকে মনে করিয়ে দিতে থাকে কাশীর এক প্রান্তে অপেক্ষমান গদাধর চক্রবর্তীর কথা—মৃত্যুকে যে ঠেকিয়ে রেখেছে যদু-নাথ কাশীর সম্মেলনে বাঙলার মান রক্ষার শপথ পূরণ করবার আশায়। অনেক বুঝিয়ে ঝিন্নন যদুকে সম্মেলনের দ্বার-প্রান্তে এনে হাজির করলে; কিন্তু তবুও যদু গান গাইতে তার অপারগতার কথা জানাতে থাকে। এই ফাঁকেই তার কাণে এলো বাঙলার সংগীত প্রতিভা সম্পর্কে

অপমানজনক উক্তি। আর যদু থাকতে পারলে না; আসরে তখন আলি বক্সের গান চলেছে, যদুও ধরলে তান। দেবী সরস্বতীর হাতের ফুল ঝরে পড়লো যদুর মাথায়। গান শেষ হ'তে ধন্য ধন্য পড়লো চতুর্দিক থেকে। সম্মেলন থেকে যদুকে সোনা-রুপায় মোড়া বীণা উপহার দেওয়া হলো; উপাধি দেওয়া হ'লো সংগীত রত্নাকর। আলি বক্স নিজের হাতে পরিয়ে দিলেন মুরাঠা। বিজয়ের বার্তা নিয়ে যদু পৌঁছলো গদাধরের পদপ্রান্তে; পরম শান্তির সংগে গদাধর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। যদু বেঁচে থাকতে সংগীত জগতে প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখা দায় দেখে ওকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র হ'লো। ঝিন্নন সে কথা জানতে পেরে যদুকে সাবধান করতে এসে নিজেই নিহত হ'লো ঘাতকের ছুরিতে। পাগল হয়ে গেলো যদু। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সে খবর শুনে যদুকে নিজের বাড়িতে নিয়ে এলেন ছেলেদের গান শেখাবার জন্য। রবীন্দ্রনাথ তখন অল্পবয়স্ক বালক মাত্র। এরপরই একদিন অসুস্থ যদু নৌকায় মারা গেল।

* * *

বলা বাহুল্য, ছবিতে গানের স্রোতটাই প্রবলতর। টাইটেল থেকে আরম্ভ ক'রে একেবারে সমাপ্তি পর্যন্ত সুরের নানা বৈচিত্র্যই মনকে বেশী প্রভাবিত ক'রে ধরে রেখে দেয়। রামশংকর ভট্টাচার্যের কাছে শিষ্যত্ব করা আরম্ভ থেকে আলি বক্সের কাছ থেকে শিক্ষা শেষ করে পরম পাওয়ার সন্ধানে বেরিয়ে আসার ঘটনা পর্যন্ত অংশ বাস্তবগণ্য ব'লে মনে হবে। বালক থেকে যদুর যুবত্বপ্রাপ্তি ব্যাপারটা অবশ্য একটি ঝাঁকুনিতেই সম্পন্ন করা হয়েছে। দ্বিতীয়াংশে ঝিন্ননের সংস্পর্শে আসা থেকে শেষ পর্যন্ত আখ্যানভাগে কল্পনার ছাপই বেশী; বিন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে রূপকঘেঁষা সিনেমাপনা। তাই ঘটনা-প্রবাহে মীরার ভজন গাইবার সময়ে যদুর সংগে রাস্তার সবায়ের যোগদান, এমন কি পথগামিনী রাবেয়ারও; সুরের প্রভাবে শ্যামামূর্তির আবির্ভাব, বা সরস্বতীর হাত থেকে ফুল ঝরে পড়ার মতো বাস্তবোত্তর ব্যাপারও প্রাধান্য পেয়েছে। তবে আবেগ সৃষ্টির দিক থেকে যদি এ ঘটনাগুলির মূল্য নির্ধারণ করতে হয় তাহ'লে সে প্রয়োজনে এগুলি কাজের হয়েছে। যদুর প্রতিভা যা দেখানো হয়েছে সে সম্পর্কেও প্রশ্ন করার ফাঁক রয়েছে। যদু এখানে অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন এমন এক শ্রুতিধর যে একবার মাত্র শুনেই সর্বকিছু হুবহু আয়ত্ত ক'রে নিতে পারে; এতে ওর সাধনা বড়ো বড়ো ওস্তাদদের গান শুনে নকল করার মধ্যেই নিবদ্ধ। তার শ্রেষ্ঠ পরিচয় দেখানো হয়েছে চিরকাল গান গেয়ে শেষে কাসেম আলির সংগে পাল্লা দেবার জন্য মাত্র এক মাসের মধ্যেই শুধু রবাব বাজনায় কাসেম আলিকে পরাভূত করার মতো ওস্তাদ হয়ে ওঠাই নয়, সেই সংগে অবিকল একটা রবাব তৈরী করার ব্যাপারে। সাধারণ শিক্ষা, চর্চা ও অনুশীলনের দ্বারা প্রতিভা উন্মেষের সাধনা যদুর ক্ষেত্রে অনুপস্থিত। বিষয়বস্তুর ঝোঁক বাঙালীয়ানা নিয়ে ভাবালু মনে আবেগ সৃষ্টি করার দিকেই। খানিকটা তার দরকারও ছিল বাঙলার সংগীত প্রতিভা সম্পর্কে চলতি ধার[illegible] দূর করার জন্যে।

* * *

শ্রুতির মধ্যে দিয়ে সুরের আন[illegible] মর্মে পৌঁছে দেবার প্রভূত সম্ভার রয়ে[illegible] কিন্তু সে-তুলনায় দৃষ্টির ক্ষেত্রে অনে[illegible] দীনতাই চোখে পড়বে। দরবারের দৃশ[illegible] গুলো বা কাশী মহা সংগীত সম্মেলনে অধিবেশন ঘটনা অনুযায়ী ভরাট নয় কাশীর সম্মেলনে অপমানিত হবার [illegible] গান শেখবার জন্য যদুর ভিন্ন ভি[illegible] ওস্তাদদের দরজায় হাজির হওয়ার ঘট[illegible] গুলো সবই একেবারে এক ধরনের, একঘে[illegible] হয়ে পড়া থেকে রক্ষা পেয়ে যায় কে[illegible] ঘটনার সংগে পরিবেশিত ভিন্ন [illegible] রাগের সুগীত গানগুলির জন্য। [illegible] ছোট করে গাওয়া গান, বিস্তার দী[illegible] নয় এবং সম্পূর্ণও নয়, তবে এ[illegible] তা-ই খাপ খেয়েছে ভালো। গা[illegible] কসরতের চেয়ে দরদটাই বেশী ফু[illegible] তাতে, ঘটনার ছন্দও তাই বাধা প[illegible] কোথাও। সাজ-সজ্জার ব্যাপারে খ[illegible] আছে এবং আরও ত্রুটি-বিচ্যুতি [illegible] ওপরে পড়বে কিন্তু সুরের প্রবাহে

তারাশংকরের "কবি" হিন্দী সংস্করণের নায়িকা নলিনীজয়ন্ত

...ক্তি জমার অবকাশ পাওয়া যায় না। ...শেষ পর্যন্ত সব জুড়ে বেশ একটা ...ণালাভের অনুভূতিই মনকে ভরিয়ে ...।

...পরিচালক নীরেন লাহিড়ী এবং ...গীত পরিচালক জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ এদের ...জনের কৃতিত্বই সর্বাগ্রগণ্য। পঁচিশখানি ...কে ঘটনার তাল ও ছন্দের সঙ্গে ...গীত বজায় রেখে সন্নিবেশিত করার ...কার কৃতিত্ব পাওয়া যায়। একঘেয়ে ...য় পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল, কিন্তু তা হ'তে পারেনি গানগুলি পরিবেশনের গুণে। ঘটনার মধ্যে নাটকীয়তা আনার মধ্যেও পরিচালনা কৃতিত্ব আছে। অভিনয়ে যদু ভট্টের ভূমিকায় বসন্ত চৌধুরী একটা ভাবময় সাধক চরিত্র ফুটিয়েছেন। সংগীতের শ্রেষ্ঠ সম্পদটি আহরণ করার জন্য বা ঝিন্নরকে পাবার জন্য জীবনের একটা অস্থির আকুলতার যে রূপটি তিনি তুলে ধরেছেন তা তাঁর অভিনয়-প্রতিভার সুন্দর পরিচায়ক। তার প্রায় পাশ ঘেঁষে গিয়েছে ঝিন্নরের ভূমিকায় অনুভা গুপ্তার অভিনয়। অবশ্য সংগীতের যাদুকরীর চেয়ে প্রেমিকার অভিনয়েই ওকে মানিয়েছে ভালো।

রাবেয়ার ভূমিকায় যমুনা সিংহ এ তুলনায় অনেক নীরেস। রাস্তায় যেতে যেতে থেমে প'ড়ে ডুলি থেকে নেমে যদু ভট্টের সঙ্গে জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে গান গাওয়াটা হাসি এনে দেয়; অবশ্য এ দোষটা পরিচালকের। তেমনি ঐ দৃশ্যেই জনতার মধ্যে ক'জন কুরূপাকে দেখেও লোক হেসে ফেলে যাতে ঘটনার মাহাত্ম্য নষ্ট হয়।

ঐ রকমই ঘটনার গাম্ভীর্য নষ্ট হয়েছে কাসেম আলির সঙ্গে যদুর রবাব বাজাবার সময়ে তবলায় যাত্রার অধিকারীরূপী তুলসী চক্রবর্তীকে বসিয়ে। তুলসী চক্রবর্তী অবশ্য অভিনয় করেছেন চমৎকার। একটানা সুরের মাঝে হাল্কা রসের বৈচিত্র্য একমাত্র তিনিই এনেছেন।

তেমনি যদুর সঙ্গে বিচ্ছেদের সময়েও ফুটেছে তার অভিনয়। আলি বক্সের ভূমিকায় নীতিশ মুখোপাধ্যায় অভিনয়ে ও গানের অভিব্যক্তিতে বেশ পাকা ওস্তাদ চরিত্রই ফুটিয়েছেন। গদাধর চক্রবর্তীর ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসকে শেষদিকে মৃত্যুর পূর্বক্ষণে মঞ্চঘেঁষা অভিনয় হ'লেও ভালো লাগবে। রামশংকর ভট্টাচার্যের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন অজিতপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায়। বালক যদুর ভূমিকায় সমরকুমার অল্পক্ষণের জন হলেও মনে ছাপ দেয়। বালক রবীন্দ্রনাথের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বেশ কৌতূহলের সৃষ্টি করবে।

অন্যান্য চরিত্রাভিনয়ে আছেন ব্রতীন ঠাকুর, প্রশান্তকুমার, রঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাণী বন্দ্যোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী প্রভৃতি। কলাকৌশলের বিভিন্ন দিকে আছেন আলোকচিত্রগ্রহণে বিজয় ঘোষ, শব্দগ্রহণে জগবন্ধু চট্টোপাধ্যায় ও শিল্পনির্দেশে সুধীর খান। রবীন্দ্রনাথের একখানি গান যা দিয়ে ছবির যবনিকা পড়েছে তা ছাড়া আছে যদু ভট্টের নিজের রচনা, মীরা বাঈয়ের গান, আগেকার অজ্ঞাত রচয়িতাদের গান এবং সেই সঙ্গে গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার ও প্রকাশের নতুন রচনা।

ট্রামে-বাসে

করিমগঞ্জের এক সংবাদে জানা গেল যে সেখানে সাতানব্বই বছরের এক বৃদ্ধ নাকি লেখাপড়া শিখিবার জন্য স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছেন।—"লেখাপড়ার ব্যাপারে কেঁচে গণ্ডূষ করে অনেকের

পক্ষেই অ-আ থেকে শুরু করা ভালো। দেখে-শুনে মনে হচ্ছে অনেকেই হ-য-ব-র-ল ছাড়া আর সব কিছু ভুলে গেছেন"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

লোক-সভার অনেক সভ্যদের মুখে অশুদ্ধ হিন্দী উচ্চারণ শুনিয়া হিন্দীজানা সভ্যরা হাসাহাসি করেন বলিয়া স্পীকার মবলঙ্কারজী তাঁহাদিগকে সতর্ক

করিয়া দিয়াছেন।—"নহাৎ লোকসভা না হ'য়ে এটা যদি পাঠশালা হতো এবং মবলঙ্কারজী স্পীকার না হয়ে গুরুমশাই হতেন তাহলে এ'দের কিলাকে কাঁঠাল পাকায় দিতে পারতেন! মতলব করকে হাসাহাসি করা সুবোধ বালককা কখনো উচিৎ নাহি হ্যায়"—বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

বিশেষ বিবাহ আইন পয়লা জানুয়ারী হইতে প্রবর্ত্তিত হইবে বলিয়া একটি সরকারী বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হইয়াছে।—"আইনটা প্যলা এপ্রিল থেকে বলবৎ হবে মনে করে যারা মূর্খের স্বর্গে বিচরণ করছিলেন তারা অতঃপর সতর্ক হলে উপকৃত হবেন"—পরম বিজ্ঞের মতো মন্তব্য করিল আমাদের শ্যামলাল।

* * *

ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি তাদের দলীয় পতাকা হইতে 'তারকা' চিহ্ন উঠাইয়া দিবেন বলিয়া নাকি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।—"আশমানের তারকা উঠিয়ে দিলে কিছু আসবে যাবে না, কিন্তু জমীনের তারকা সম্বন্ধে তাড়াহুড়ো করে কোন সিদ্ধান্ত না করাই ভালো"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম শ্রীযুক্ত নেহরু নাকি তালের চিনি খাইতে খুব ভালোবাসেন। সেইজন্য গ্রাম হইতে আনিয়া তাঁহাকে প্রায় সের দশেক চিনি উপহার দেওয়া হইয়াছে।—"তাল হইতে চিনি অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর এবং মধুরতম দ্রব্য উৎপন্ন হইয়া থাকে, শ্রীনেহরু নিশ্চয়ই ইহা অবগত নহেন"—ভিড়ের মধ্য হইতে কোন সহযাত্রী সাধুভাষায় মন্তব্য করিলেন।

* * *

কলিকাতা শহরের অর্দ্ধেক হইল স্বর্গ এবং বাকী অর্দ্ধেক নরক—এই মন্তব্য করিয়াছেন কলিকাতার পুলিশ কমিশনার।—"খানিকটা নরক আছে বলেই তো রক্ষে, শুধু স্বর্গ হলে লালবাজারকে স্বর্গ হ'তে বিদায় পালা অভিনয় করতে হতো"—বলিলেন বিশু-খুড়ো।

* * *

স্যার চার্চিল তাঁর জন্মদিনের ভাষণে বলিয়াছেন যে তিনি সিংহ কোন কালেই ছিলেন না, শুধু গর্জ্জন করিয়াছেন
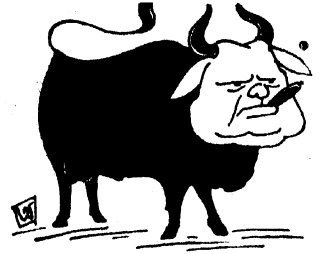
সিংহের মতো।—"শুধু গর্জন সার বলে কেঙ্গারুতেও যে সিংহের ল্যাজ মুচড়ে দেয় তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ তো অস্ট্রেলিয়া বনাম ইংলণ্ডের প্রথম টেস্ট খেলার ফল দেখেই বোঝা গেল"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

টোকিওর সংবাদে প্রকাশ সেখানে পকেটমারদের ব্যবসা নাকি বড়ই মন্দা, তাই তাহারা নগ্ন চিত্র বিক্রয় করিয়া দু'পয়সা কামাইবার চেষ্টা করিতেছে। সংবাদে প্রকাশ এই নূতন ব্যবসায়ে নাকি বেশ ভালো আয় হইতেছে—"নগ্ন চিত্র বিক্রয়ও একধরনের পকেটমারি ব্যবসা এবং তা অত্যন্ত নগ্ন সত্য"—বলে শ্যামলাল।

* * *

সিংহলের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহাশয় কলিকাতা মহাবোধি হলে তাঁর সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, বুদ্ধদেবের বন্ধনই সিংহল ও ভারতকে এক সঙ্গে যুক্ত করিয়া রাখিয়াছে।—"কিন্তু বহুদিনের পুরনো বাঁধনদাড়ি কিনা তাই হয়ত আর একসঙ্গে বেঁধে রাখা চলছে না, দাড়ি কেবল পট্‌পট্‌ করে ছিঁড়ে যাচ্ছে"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

সদ্যমৃত পিতার সৎকারের জন্য সাহায্য প্রার্থনা করিয়া কোন এক অজ্ঞাতনামা ছেলে নাকি মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের কাছে একটি দরখাস্ত দাখিল করিয়াছিল। ডাঃ রায় তার প্রার্থনা মঞ্জুর করিয়াছিলেন কিন্তু পরে জানা গেল পিতার মৃত্যুসংবাদ মিথ্যা। ছেলেটিকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।—"এখন দেখা যাক পিতৃশ্রাদ্ধ কতদূর গড়ায়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

খেলার মাঠে

একলব্য

স্পিন বোলার সুভাষ গুপ্তের মারাত্মক বোলিংয়ের ফলে প্রথম ইনিংসে পাকিস্থান টীম ১৫২ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি। তাদের দ্বিতীয় ইনিংস আরও কম রানে শেষ হওয়ায় পাকিস্থানকে বোম্বাইয়ের কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে এক ইনিংস ও ১২৫ রানে। সুভাষ গুপ্তে অসাধারণ নৈপুণ্যে বোলিং করে মাত্র ৭৮ রানে পাকিস্থানের প্রথম ইনিংসের সব ক'টি উইকেট দখল করেছেন। দেশ বিদেশের ক্রিকেটের পুঁথিপত্র ঘাটলে একজন বোলারের এক ইনিংসের ১০টি উইকেট লাভের ঘটনার কিছু কিছু হদিস পাওয়া যায় বটে, কিন্তু বোলিং নৈপুণ্যের এই অসাধারণ কৃতিত্ব লাভ বিশ্বের বেশী বোলারের পক্ষে সম্ভব হয়নি। বিশেষ করে ৭ জন টেস্ট খেলোয়াড়সমৃদ্ধ একটি দলের বিরুদ্ধে সব ক'টি উইকেট লাভ, ভারতের পক্ষে তো বটেই, বিশ্বের যে কোন প্রতিভাবান বোলারের পক্ষেই মহাকৃতিত্বের পরিচায়ক।

* * *

পাকিস্থানের বিরুদ্ধে ১০টি উইকেট পেয়েছেন বলেই গুপ্তের সম্বন্ধে আজ কিছু লেখার সুযোগ পাওয়া গেছে, এমন মনে করলে ভুল করা হবে। বহুদিন পূর্বেই গুপ্তের বোলিং প্রতিভার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে। আর নৈপুণ্যগত উৎকর্ষের সংগে কিছুটা ভাগ্যের সহায়তা না থাকলে এক ইনিংসের সব ক'টি উইকেট লাভ করা যায় না। ভারতের ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে গুপ্তের অসাধারণ বোলিং প্রতিভা দেখে বহু ক্রিকেট সমালোচক গুপ্তের বিশ্বের শ্রেষ্ঠ স্পিন বোলার বলে অভিহিত করেছেন। বস্তুত ওয়েস্ট ইণ্ডিজের তিন ধুরন্ধর ব্যাটসম্যান ওরেল, উইকস্ ও ওয়ালকট (Worrell, Weeks, Wallcott)—যারা বিশ্ব ক্রিকেটে তিন 'W' নামে পরিচিত তারাও গুপ্তের বলকে যেমন সমীহ করেছেন, বিশ্বের অন্য কোন বোলারকে তেমন সমীহ করেননি। কিন্তু ক্রিকেট স্রষ্টা ইংরেজের নিয়ম ব্যতিক্রমে গুপ্তে এখন পর্যন্ত কৌলীনের মর্যাদা লাভ করেননি। কৃতিত্ব স্বীকৃতির ক্রিকেট অভিধান 'উইসডেনে' গুপ্তে বছরের পাঁচজন সেরা খেলোয়াড়ের অন্যতম বলে বিবেচিত হননি। কারণ ইংলণ্ডের বাইরের খেলার কৃতিত্ব স্বীকার করে না 'উইসডেন' খাস ইংলণ্ডের মাটিতে যে খেলা হয় তার নৈপুণ্যের নিরিখেই পাঁচজন সেরা খেলোয়াড় বাছাই হয়ে থাকে। গুপ্তের দুর্ভাগ্য যে তিনি এখন পর্যন্ত ইংলণ্ডে খেলার সুযোগ পেলেন না।

• • •

বোম্বাইতে খেলতে এসে পাকিস্থানের

বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের রজত য়ন্তী উৎসব ক্রিকেট খেলায় সুভাষ গুপ্তের ক ইনিংসের সব ক'টি উইকেট পাবার ঘটনা ত সপ্তাহের খেলাধুলোর খবরের মধ্যে ব চেয়ে বড় খবর। রজত জয়ন্তী উৎসব পলক্ষে বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের ভাপতির দলের সংগে পাঁচদিনব্যাপী এক

খ্যাতনামা স্পিন বোলার সুভাষ গুপ্তে

দর্শনী ক্রিকেট খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা রবার জন্য সদ্য ইংলণ্ড প্রত্যাগত পাকিস্থান লকে আমন্ত্রণ জানান হয়। পাকিস্থানের ্রকেট অধিনায়ক আব্দুল হাফিজ কারদার র রথী মহারথী নিয়ে বোম্বাই সমরে তিদ্বন্দ্বিতা করতে আসেন। ভারতের কৃতী খেলোয়াড়পুষ্ট বোম্বাই দলের শক্তিও কম য়। আগামী পাক-ভারত টেস্টে দুই দেশের ই নির্বাচিত অধিনায়ক মানকড় ও কারদার রস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। তাই বোম্বাইয়ের এই দর্শনী খেলাকে ঢাকা টেস্টের 'রিহার্সেল' লা যেতে পারে। কিন্তু ইংলণ্ড ক্রিকেট করে যে পাকিস্থান টীম এত প্রশংসা অর্জন রে এসেছে বোম্বাইয়ের 'রিহার্সেলে' তাদের খলা মোটেই ভাল হয়নি। অবশ্য পাকিস্থানের এই টীমকে পুরোপুরি পাকিস্থানের প্রতিনিধিমূলক টীম বলা যায় না। রণ প্রতিনিধিমূলক টীম গঠনের জন্য াকিস্থানের আর যে ক'জন খেলোয়াড় অপরিহার্য তারা এ খেলায় অংশ গ্রহণ রেননি। তবুও ৭ জন টেস্ট খেলোয়াড়-মৃদ্ধ পাকিস্থান টীমের শক্তি কোন অংশেই ম ছিল না; সুতরাং তাদের বিরুদ্ধে গুপ্তের ১০টি উইকেট লাভ পাক-ভারত ক্রিকেট তিহাসের স্মরণীয় ঘটনা।
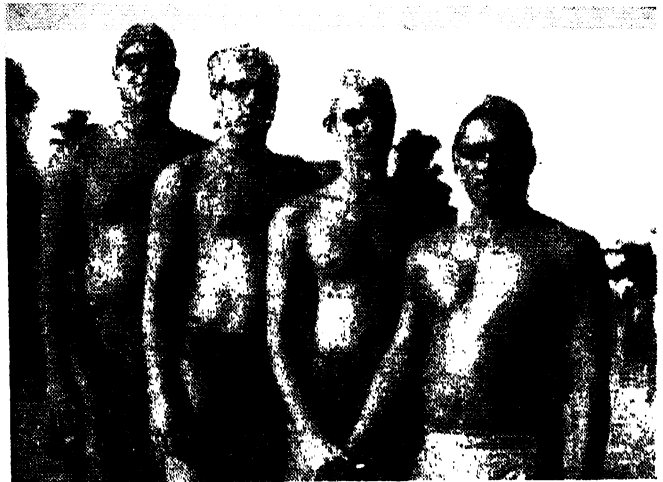
৪×১০০ মিটার রিলে সাঁতারে নূতন ভারতীয় রেকর্ড (৪ মিঃ ৩১.৩ সেঃ) সৃষ্টিকারী সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব দল। বাম থেকে দাঁড়িয়ে আছেন বিমল চন্দ্র, রবীন দে, শান্ত কর্মকার ও ব্রজেন দাস।

উইমেন্‌স স্পোর্টস ফেডারেশন পরিচালিত মহিলাদের সাঁতারের ১০০ মিটার ফ্রি-স্টাইলে প্রথম তিনজন। বাম থেকে আরতি সাহা (প্রথম), ভারতী সাহা (দ্বিতীয়) গায়ত্রী সরকার (তৃতীয়)

অধিনায়ক কারদার আগামী পাক-ভারত টেস্ট সম্বন্ধে যে নূতন কথা শুনিয়েছেন তাতে ভারতের ক্রিকেট মহল বিচলিত না হলেও বেশ একটু ভাবিত হয়ে পড়েছেন। ভারত ও পাকিস্থানের পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে মাত্র করাচীর শেষ টেস্ট খেলা ম্যাটিং উইকেটে অনুষ্ঠিত হবার কথা ছিল। বাকী খেলাগুলো হবে ঘাসের পিচে। কিছুদিন আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সম্পাদক শ্রী এ এন ঘোষ বলেন—করাচীর ম্যাটিং উইকেটের শেষ টেস্ট খেলার উপর 'রাবারের' প্রশ্ন অনেকখানি নির্ভর করতে পারে, এইজন্য তিনি শেষ টেস্ট খেলার আগে ভারতের খেলোয়াড়েরা যাতে দুইদিন বিশ্রাম পায় তার জন্য খেলার তারিখের কিছু কিছু অদল বদল করবার জন্য পাকিস্থান বোর্ডকে এক চিঠি লিখেছেন। খেলার তারিখের কিছু অদল বদল হয়েছে বলে এখনো কোন সংবাদ পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে অধিনায়ক কারদার বোম্বাইতে ঘোষণা করেছেন পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে মাত্র লাহোর ও পেশোয়ারের দুটি খেলা ঘাসের উইকেটে হতে পারে, বাকী সব খেলাই হবে ম্যাটিং উইকেটে। কারদার আরও বলেন,—ঢাকায় ঘাসের পিচ করবার প্রচেষ্টা ফলপ্রসু হয়নি, সুতরাং সেখানেও খেলতে হবে ম্যাটের উপর।

ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং বর্তমান খেলোয়াড় নির্বাচক কমিটির সদস্য লালা অমরনাথ,—যিনি পাকিস্থান সফরে ভারতীয় দলের ম্যানেজার নির্বাচিত হয়েছেন তিনি কারদারের উক্তিতে কৌতুক বোধ করে বলেছেন—"পাক-ভারত টেস্টে এ ব্যাপারের গুরুত্ব অনেকখানি। এ সম্বন্ধে যা কিছু করণীয় সবই কণ্ট্রোল বোর্ডের, তবে আমি পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে এইটুকু বলতে পারি একমাত্র করাচী ছাড়া আর সব টেস্ট কেন্দ্রেই ঘাসের উইকেট রয়েছে; আর যেখানে ঘাসের উইকেট আছে সেখানে ম্যাটিং উইকেটে খেলবার কথা উঠতেই পারে না। ঘাসের পিচ হয়তো সর্বাঙ্গসুন্দর না হতে পারে, কিন্তু এখানে খেলার সুবিধা অসুবিধা দু'পক্ষেরই সমান"। অভিজ্ঞ এবং দূরদর্শী প্রাক্তন খেলোয়াড় অমরনাথের ক্রিকেট পাণ্ডিত্যে সন্দেহ করবার কিছু নেই। তিনি যা বলেছেন সবই সত্য, কিন্তু ঘাসের পিচে খেলবার সুবিধা অসুবিধা দু'পক্ষেরই সমান, তাঁর এই উক্তির সঙ্গে পাকিস্থান অধিনায়ক কারদার কি একমত হবেন? তা যদি হন, তবে আজ হঠাৎ তার মাথায় একটির বদলে তিনটি টেস্ট ম্যাটিংয়ে খেলবার বুদ্ধি গজাবে কেন?

*　　*　　*

গঙ্গার বুকে দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে এ বছরের সাঁতারের মরসুম শেষ হয়েছে। শীতকালে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন একটু অভিনব হলেও বেঙ্গল সুইমিং এসোসিয়েশন অর্থাৎ বাঙলার সাঁতার পরিচালক সমিতি এখন থেকে প্রতি বছর শীতকালেই সাঁতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। অভিজ্ঞতা থেকেই তাদের এই বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ। ইতিপূর্বে পুজোর আগেই সব সাঁতার ও জলক্রীড়া শেষ হয়ে যেতো এবং ক্লাবগুলির জলক্রীড়াকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন পুকুর ও ট্যাঙ্কে হৈ চৈও কম হতো না। কিন্তু দেখা গেছে শীতপ্রধান দেশে অলিম্পিক বা অন্য কোন আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বাঙলার সাঁতারুদের ঠাণ্ডা আবহাওয়ার জন্য যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। শুধু কি তাই, যে বাঙলার সাঁতারুরা ভারতের সাঁতারুদের পুরোভাগে স্থান পেয়েছিল তারা আন্তঃরাজ্য বা জাতীয় সাঁতারের অনুষ্ঠানেও পিছু হটতে আরম্ভ করলো পরিবেশের পরিবর্তনে। বাঙলার চেয়ে অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা আবহাওয়া যে সব জায়গায়, এতদিন সেই সব জায়গাতেই জাতীয় সাঁতারের অনুষ্ঠান হয়েছে, সুতরাং জলে নেমেই কাঁপুনি ধরেছে বাঙলার সাঁতারুদের, তারা মোটেই সুবিধা করতে পারেনি। এদিকে লক্ষ্য রেখেই বি এ এস এ অর্থাৎ বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশন বিভিন্ন ক্লাব ও সংস্থাকে শীতকালে সাঁতার প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করবার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

*　　*　　*

অবশ্য বাঙলার সাঁতারের ক্ষেত্রে ভাঁটা পড়ার উপরোক্ত কারণই একমাত্র কারণ নয়। এর সঙ্গে আরও বহু কারণ জড়িয়ে রয়েছে। রাজ্য সরকার বা কর্পোরেশনের কোন শিক্ষা পরিকল্পনা নেই, শহরে নেই কোন সুইমিং পুল, শহর এবং শহরতলীর কতগুলি পুকুর হেজে মজে আছে, অর্থাভাবে সাঁতারের ক্লাবগুলো গেছে অন্তঃসারশূন্য হয়ে। সেখানে নেই কোন কর্মচাঞ্চল্য। আগে ভবানীপুরের পদ্মপুকুরে ছিল ভবানীপুর সুইমিং ক্লাবের কর্মপ্রবাহ, তালতলা ইনস্টিটিউটের সভ্যদের হস্তপদ সঞ্চালনে ওয়েলেসলী ট্যাঙ্কে উঠতো জলকল্লোল, সকালে বিকালে সাঁতারুদের কলতানে মুখরিত হত খিদিরপুরের শান্ত পুকুর। কলেজ স্কোয়ার, আজাদ হিন্দ বাগ আর দেশবন্ধু পার্ক ছিল সাঁতারু তৈরীর তিন প্রধান কেন্দ্র। কিন্তু এখন একমাত্র আজাদ হিন্দ বাগ ছাড়া আর কোথাও সাঁতারে তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায় না। কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাব, বৌবাজার ব্যায়াম সমিতি, ওয়াই এম সি এ, শৈলেন্দ্র মেমোরিয়াল ক্লাব প্রভৃতি চার পাঁচটি সাঁতারের ক্লাব পাশাপাশি থাকা সত্ত্বেও গোলদীঘিতে এবার সাঁতারের যে আয়োজন দেখা গেছে তা নিতান্তই কম। তালতলা ইনস্টিটিউট, ভবানীপুর সুইমিং এসোসিয়েশন, খিদিরপুর সুইমিং ক্লাবের তো অস্তিত্বই চোখে পড়ে না। যাই হোক বাঙলার সাঁতারুদের মধ্যে আবার উৎসাহ জাগাতে এবং সাঁতারের ক্ষেত্রে বাঙলার পুরোনো দিন ফিরিয়ে আনতে হলে কি কি করা দরকার বেঙ্গল এমেচার সুইমিং এসোসিয়েশনকে তা ভেবে দেখতে হবে।

*　　*　　*

শীত মরসুমে সাঁতার প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যে বি এ এস এ-র সুবিবেচনাপ্রসূত কাজ এটা এবারকার বিভিন্ন সাঁতার প্রতিযোগিতা থেকে স্পষ্ট বোঝা গেছে। বিভিন্ন সাঁতার প্রতিযোগিতায় এ বছর য

বেশী রেকর্ড হয়েছে অন্য কোন মরসুমে এত বেশী রেকর্ড সৃষ্টি হতে দেখা যায়নি। বিশেষ করে জুনিয়র সাঁতারুদের বিভিন্ন বিষয়ে রেকর্ড সৃষ্টি খুবই আশার কথা। সিনিয়রদের মধ্যে একাধিক সাঁতারু বাঙলার রেকর্ড অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছেন আর ২০০ মিটার বুক সাঁতার ও ৪×১০০ মিটার ফ্রি স্টাইল রিলেতে ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন ভুবনেশ্বর পাণ্ডে ও সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব। বাঙলা দেশে সাঁতারের সামগ্রিক মানোন্নয়নে জুনিয়র ও সিনিয়র সাঁতারুদের এই কৃতিত্ব বিশেষ সহায়ক হবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। সাঁতার সম্বন্ধে এ বছর একটি ক্লাবের আগ্রহ বিশেষ প্রশংসনীয়। ফুটবল, হকি, এ্যাথলেটিক স্পোর্টস ও অন্যান্য খেলাধুলার মত এরা সাঁতারের ক্ষেত্রে এগিয়ে এসেছে। এ ক্লাবটি হচ্ছে সিটি এ্যাথলেটিক ক্লাব। এ বছরই এরা সাঁতারের মধ্যে এসে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করে। এদের প্রতিযোগিতায়ই সেণ্ট্রাল সুইমিং ক্লাব রিলে রেসে ভারতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়।

* * *

আগে গঙ্গার বুকে সাঁতারেই বা কি উৎসাহ উদ্দীপনা ছিল। ৩০ মাইল সাঁতার প্রতিযোগিতার অবলুপ্তি ঘটেছে। বন্ধ হয়েছে ২২ মাইল সাঁতারের অনুষ্ঠান। ১৩ মাইল সাঁতারেরও কোন আয়োজন নেই। গঙ্গার বুকের উপর এসব দূরপাল্লা সাঁতার যে সম্প্রতি বন্ধ হয়েছে, তা নয়। যুদ্ধের আগেই নানা কারণে এইসব মহা আড়ম্বরপূর্ণ সাঁতার বন্ধ হয়ে যায়। আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাব ৭ মাইল সাঁতারের ব্যবস্থা করে আসছিল। যুদ্ধের সময় তাও বন্ধ হয়ে যায়। যুদ্ধের পর নূতনভাবে তারা ৭ মাইল সাঁতারের আয়োজন করে। আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাবের এই সাঁতার প্রতিযোগিতাই এখন বাঙলার দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা। বালী উইলিংডন ব্রীজ থেকে বেনেটোলা ঘাট পর্যন্ত এই সাঁতার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই দূরত্বকে পরিচালক সমিতি ৭ মাইল বলে ঘোষণা করেছিলেন। সম্প্রতি বি এ এস এ এই দূরত্বের সঠিক পরিমাপের জন্য পোর্ট কমিশনার্স কর্তৃপক্ষের কাছে এক অনুরোধপত্র প্রেরণ করেন। পোর্ট কমিশনার্স নূতনভাবে জরিপ করে বালী উইলিংডন ব্রীজ থেকে বেনেটোলা ঘাট পর্যন্ত স্থানের দূরত্ব নির্ণয় করেছেন সওয়া চার মাইল। যাই হোক উইলিংডন ব্রীজ থেকে বেনেটোলা ঘাট পর্যন্ত এই সাঁতারই যে এখন বাঙলার দীর্ঘতম সাঁতার সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

* * *

গত ৫ই ডিসেম্বর বাঙলার এই দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতা শেষ হয়ে গেছে। আনন্দ স্পোর্টিং ক্লাব এই সাঁতারের আয়োজনে কোন ব্যবস্থারই ত্রুটি করেনি। স্টীমার ও মোটর লঞ্চই ভাড়া করা হয়েছিল ছ'সাতখানা —'গীতা', 'আশা', 'চৈতন্য', 'জনার্দন' এরা সব পরিচালক প্রতিষ্ঠানের পতাকায় শোভিত হয়ে গঙ্গার উপর দিয়ে বিচরণ করছিল। কোনটায় ছিল মেডিক্যাল ইউনিট, কোনটায় ব্যাণ্ড পার্টি, কোন লঞ্চে বিচারকদের ভিড় আবার কোন স্টীমার ভর্তি শুধু ছেলে-বুড়ো, তরুণ-তরুণী, দর্শক ও সমর্থক। তাছাড়া প্রতি সাঁতারুর একখানা করে লাইফ সেভিং বোট—আর পরিচালক সমিতির ভাড়া করা নৌকো নিয়ে, নৌকোই ভাড়া করা হয়েছিল শ'খানেক। সব নৌকোতেই উড়ছে সাঁতারুদের ক্লাব পতাকা ব্যাণ্ডের তালে তালে। গঙ্গার দুই তীরে কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে আছে উৎসাহী দর্শক। সে কি চমৎকার দৃশ্য।

গঙ্গার দীর্ঘতম সাঁতার প্রতিযোগিতার প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেবী দত্ত (বামে) ও লক্ষ্মী ভৌমিক

বেলা ১টা নাগাদ স্টীমার লঞ্চ ও নৌকো-গুলো বেনেটোলা ঘাট থেকে উজান পথে বালীর দিকে যাত্রা করলো। বালী ব্রীজ থেকে সাঁতার আরম্ভ হলো বেলা পৌণে তিনটেয়। দুজন মহিলা আর ৩০জন পুরুষ সাঁতারু বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে স্টার্টারের সংকেত পেয়ে নৌকো থেকে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আরম্ভ হলো বাঙলার দূরপাল্লার সাঁতার প্রতিযোগিতা। কলেজ স্কোয়ার সুইমিং ক্লাবের উদীয়মান সাঁতারু দেবী দত্ত যিনি গতবারও এই প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন, তিনি এগিয়ে চলেছেন সবার আগে। তার পেছনে ওয়াই এম সি এর পীযূষ মিত্র। ইনি জুনিয়র সাঁতারু এবং সম্প্রতি কি একটা রেকর্ড করেছেন, পীযূষের পিছনে ১৯৫২ সালের বিজয়ী কুমারটুলী শীতলা সমিতির লক্ষ্মী ভৌমিক, তার পেছনে এই ক্লাবেরই কালীকিংকর। আর সব সাঁতারুরা ক্রমেই পিছিয়ে পড়ছেন। ব্যাণ্ডের সুমধুর ঐক্যতান, 'মাইকে' ঘোষকের মুহুর্মুহু চীৎকার কে এগিয়ে যাচ্ছেন, কে পেছনে পড়ছেন। এলো রাসবাড়ীর মোড়। প্রায় একই অবস্থা। কেবল লক্ষ্মী এগিয়ে এসেছেন দ্বিতীয় স্থানে, পীযূষের স্থান তৃতীয়। বেলুড় মঠ পর্যন্ত এক অবস্থাই রইলো। সাঁতারুরা ১৬ মিনিটে বেলুড় মঠের কাছে পেঁৗছলেন। ঘুষুড়ীর বাঁকের মুখে পেঁৗছতে লাগলো ২৬ মিনিট। এতক্ষণ সাঁতারুরা এগুচ্ছিলেন হাওড়ার পাড় ঘেঁষে। তারপর স্রোতের টান অপর পারে। তাই ঘুষুড়ীর বাঁকে এসে সবাই এগুতে আরম্ভ করলেন মাঝ দরিয়ায়। উদ্দেশ্য এপারে আসা। লাইফ সেভিং বোট থেকেও

এই নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ৩৮ মিনিটে বাগবাজারের খাল বরাবর পাড়ি জমালেন প্রায় সব সাঁতারু। এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দেবী ও লক্ষ্মীর মধ্যে ব্যবধান হ্রস্বতর হ'ল। লক্ষ্মী বুঝি দেবীকে ধরে ধরে। কিন্তু দেবীর অদম্য উৎসাহ। তিনি সমান তালে হাত ও পা চালিয়ে জল কেটে এগিয়ে চলেছেন মোটর লঞ্চেরই মত। দেবীর 'সিক্স-টু-ওয়ান' 'স্কুল'। অর্থাৎ এক হাতের টানের পর আর এক হাতের টান পড়বার মধ্যে

জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাঙলার নির্বাচিত অধিনায়ক দ্বারিক দাশ

পা চলছে ছ'বার। সামনের লাইফ সেভিং বোটে বাঙলার প্রখ্যাত সাঁতারু দুর্গা দাশ। দেবীর ট্রেনার। দুর্গা দাশের হুঁশিয়ারী পতাকা নির্দেশে দেবী এগিয়ে চলেছেন মন্ত্রমুগ্ধবৎ। শ্রমকাতরতার চিহ্ন নেই। লক্ষ্মীনারায়ণ বেশ খানিকটা পিছিয়ে পড়েছেন। পেছনের সাঁতারুদের আর ঠাহর করা যাচ্ছে না। তারা অনেক পেছনে। বেনেটোলা ঘাটে পৌঁছতে আর বেশী দেরী নেই। বাগবাজার খালের মুখ থেকেই শত শত উৎসাহী ছেলের দল ভাগীরথীর কূল ঘেঁষে এগিয়ে চলছিলো বেনেটোলা ঘাটের দিকে। গাংচিল আর গাংশালিখদেরও উৎসাহ। তারাও উড়ে এগিয়ে আসছে সাঁতারুদের সাথে, ক্রমেই ভিড় বাড়তে লাগলো; এদিকে বেনেটোলা ঘাটেও এক বিশাল জনতা। ব্যাণ্ডের আওয়াজ চরমে উঠলো। মুহুর্মুহু চীৎকার আর করতালিধ্বনি। ৫২ মিনিট ৬ সেকেণ্ডে দেবী নির্দিষ্ট পথ অতিক্রম করলেন। দ্বিতীয় স্থান অধিকারী লক্ষ্মীর শেষ সীমায় পৌঁছতে ৫৫ মিনিট ২ সেকেণ্ড সময় লাগলো। ৫৩ সেকেণ্ড পরে পীযূষ মিত্র শেষ সীমায় পৌঁছে তৃতীয় স্থান দখল করলেন। তারপর একে একে এলেন কালী-কিঙ্কর, কলেজ স্কোয়ারের অরুণ গুহ, কুমারটুলীর মানিক হাজরা প্রভৃতি। এইভাবে ২৯ জন সাঁতারু নির্দিষ্ট-পথ অতিক্রম করলেন। মেয়েদের মধ্যে ভারতী সাহা ১৮ জনের পর আর গায়ত্রী সরকার ২৪ জনের পর বেনেটোলা ঘাটে পৌঁছলেন। এরা দুজনই হাটখোলা ক্লাবের সভ্যা। সাঁতারের পর অনেকে শীতের প্রকোপে আর পরিশ্রমে কাতর হয়ে পড়লেন। প্রয়োজন মত তাদের ইনজেকশন ও ওষুধ দেওয়া হল। অনেকক্ষণ ধ'রে ভিড় জমে রইলো বেনেটোলা ঘাটে। সন্ধ্যার আঁধারে সবাই দেবী, লক্ষ্মী প্রভৃতির সাঁতারের প্রশংসা করতে করতে ঘরে ফিরলো।

* * *

কলকাতা ময়দানের নবনির্মিত মাঠে ভারতের জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান বাঙলার বাস্কেটবল ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা। গত ৮ই ডিসেম্বর পশ্চিম-বঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ এইচ সি মুখার্জি জাতীয় বাস্কেট বলের পঞ্চম অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেছেন। পাঁচদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠান ১২ই ডিসেম্বর শেষ হবার কথা। ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন এই উপলক্ষে ময়দানে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব তাঁবুর দক্ষিণ দিকে যে নূতন মাঠ তৈরী করেছেন সেখানে প্রতিদিন সকালে সন্ধ্যায় লীগ ও নক-আউটের খেলা চলছে। সার্ভিস টীম নিয়ে জাতীয় বাস্কেটবলে এবার ১৩টি রাজ্য পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। সুভাষ দ্বীপ অর্থাৎ আন্দামান থেকেও একটি দল অংশ গ্রহণ করেছে। মহিলা বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে চারটি রাজ্য। যোগদানকারী রাজ্য-গুলির মধ্যে গত দু'বারের চ্যাম্পিয়ন মহীশূর ছাড়া পেপসু, পাঞ্জাব, দিল্লী বেশ শক্তিশালী। আমেরিকায় আবিষ্কৃত এবং ভারতের ওয়াই এম সি এ প্রবর্তিত বাস্কেটবল খেলা ভারতে এখনো তেমন জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। খেলার আইন কানুন সম্বন্ধে বহু লোকই অনভিজ্ঞ। সুতরাং খেলার মধ্যে যে মাধুর্য আছে তা গ্রহণ করতেও অক্ষম। বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন দর্শকদের বুঝবার সুবিধার জন্য এক বৈদ্যুতিক স্কোর বোর্ড প্রস্তুত করেছেন। এর থেকে এক নজরে খেলার সমস্ত অবস্থা উপলব্ধি করা যাবে। বাস্কেটবল খেলায় এ ধরনের স্কোর বোর্ডের ব্যবহার ভারতে এই প্রথম। জাতীয় বাস্কেট-বল খেলার পর এ সম্বন্ধে আলোচনা করার ইচ্ছে রইলো।

খেলাধুলোর টুকরো খবর

৬ বলে ৬টি উইকেট—নিউজিল্যাণ্ডের ওয়েলিংটনে এক ক্রিকেট খেলায় পামারস্টোন নর্থ-এর সিনিয়র ক্রিকেট খেলোয়াড়

জাতীয় বাস্কেটবলে গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন মহীশূর দলের খেলোয়াড়গণ

প কেণ্ডাল উপর্যুপরি ৬টি বলে ৬টি উইকেট লাভ করেছেন। সাধারণ খেলা হলেও বালিংয়ে এমন কৃতিত্বের কথা ইতিপূর্বে শোনা যায়নি। ৬ বলে ৬টি উইকেট লাভের ঘটনা সম্ভবত ক্রিকেট ইতিহাসের নূতন ঘটনা।

করাচীতে জার্মান হকি দল—পাকিস্থানে এক মাস সফর করবার জন্য ১৮ জন খেলোয়াড়বিশিষ্ট একটি জার্মান হকি টীম করাচীতে এসে উপস্থিত হয়েছে তারা লাহোর, পেশোয়ার, ভাওয়ালপুর ও করাচীতে ৪টি টেস্ট ও বাকী ১৪টি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বীতা করবে।

এম সি সি ইনিংসে বিজয়ী—প্রথম টেস্ট পরাজয়ের পর এম সি সি দল অস্ট্রেলিয়ার কুইন্সল্যান্ড কাউণ্টিকে এক ইনিংস ও ১২ রানে হারিয়ে দিয়েছে। এ্যাপল ইয়ার্ডের মারাত্মক বোলিং খেলাটির উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ইয়র্কশায়ারের স্পিন বোলার এ্যাপল ইয়ার্ড এক সময়ে মাত্র ১৮ রানে ৬টি উইকেট দখল করেন, শেষ পর্যন্ত তিনি ৫১ রানে ৭টি উইকেট পেয়েছেন। ফলাফলঃ—

এম সি সি—১ম ইনিংস—৩১৭ (এডরিচ ৭৪, মে ৬৯, উইলসন ৬১, হাটন ৪০; ওয়াট ৫৬ রানে ৫ উইঃ)

কুইন্সল্যান্ড কাউণ্টি—১ম ইনিংস—৯৫ (ব্রাউন ২২; লোডার ২২ রানে ৩ উইঃ, গ্রেভান ৮ রানে ২ উইঃ)

কুইন্সল্যান্ড—২য় ইনিংস—২১০ (ব্রাউন ৭৮; এ্যাপলইয়ার্ড ৫১ রানে ৭ উইঃ)

রনজি প্রতিযোগিতা—রনজি প্রতিযোগিতার প্রথম পর্বের খেলায় সার্ভিস টীম ৮ উইকেটে দিল্লী ক্রিকেট এসোসিয়েশনকে হারিয়ে দিয়েছে। ফলাফলঃ—

দিল্লী প্রথম ইনিংস—১৬৩ (ওয়াই চৌধুরী ৪১; ইন্দ্রজিৎ ১৩ রানে ৩ উইঃ, মুদিয়া ২৫ রানে ৩ উইঃ)

সার্ভিস প্রথম ইনিংস—২৮৮ (অধিকারী ৭১, পি যোশী ৫৭, সীতারাম ৪৪, প্রকাশ ৪২)

দিল্লী দ্বিতীয় ইনিংস—২৪২ (কুকরেজা ৫২, তুলজারাম ৫১; সীতারাম ৭৫ রানে ৫ উইঃ)

সার্ভিস দ্বিতীয় ইনিংস—১২১ (অধিকারী ৫২, আত্মা সিং ৪০)

দেশী সংবাদ

২৯শে নবেম্বর—আজ রাজ্যসভায় বিরোধী দলের সদস্যগণ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক অন্ধের শাসনভার গ্রহণ সংক্রান্ত ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, এইরূপ ঘোষণা অহেতুক ও সংবিধানবিরোধী।

আজমীরে কেন্দ্রীয় মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষৎ-এর রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠান উদ্বোধন উপলক্ষে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ স্কুলের শিক্ষা ১১ বৎসর এবং আর্টস ও সায়েন্স কলেজে ডিগ্রী কোর্স ৩ বৎসর করা সম্পর্কে মধ্যশিক্ষা কমিশন যে সুপারিশ করিয়াছেন, তাহা ভারতের বিভিন্ন রাজ্যকে কার্যে পরিণত করার আবেদন জানান।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি আজ কলিকাতায় আন্তর্জাতিক শিশু পাঠ্য পুস্তক প্রদর্শনীর উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, শিশু সাহিত্যের রচনা ও প্রচারে উৎসাহদানের জন্য সারা জগতে যে ক্রমবর্ধমান আগ্রহ দেখান হইতেছে প্রদর্শনীতে তাহাই পরিস্ফুট হইয়াছে।

৩০শে নবেম্বর—আজ লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে অর্থ বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রী এ সি গুহ বলেন যে, পাকিস্থান সরকার ভারত বিভাগকালীন ঋণ পরিশোধ বাবদ এ পর্যন্ত ভারতকে কিছুই দেন নাই। ভারত সরকারের হিসাব অনুযায়ী পাকিস্থানের নিকট ভারতের প্রাপ্য অর্থের পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকা।

১লা ডিসেম্বর—পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হইয়াছেন।

পর্তুগীজ ঔপনিবেশিক শাসনের কবল হইতে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে গোয়াবাসীদের সম্ভাব্য নিরুপদ্রব ও অহিংস সত্যাগ্রহের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগ করা হইলে গোয়াবাসী-সহ সমগ্র ভারতবাসীর মধ্যে যে গুরুতর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হইবে, ভারত সরকার সে বিষয়ে পর্তুগীজ গভর্নমেণ্টকে সতর্ক করিয়া দিয়াছেন।

আজ লোকসভায় ফৌজদারী কার্যবিধি (সংশোধন) বিল সম্বন্ধে পুনরায় আলোচনা আরম্ভ হইলে মামলা সোপর্দকরণকালে আসামীকে সাক্ষীদের জেরার অধিকার দিয়া একটি সংশোধন প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সাহায্য কমিশনের সভাপতি ডাঃ এস এস ভাটনগর অদ্য বিহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন ভাষণে শিক্ষকদের অবস্থা উন্নতি সাধনের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

২রা ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের এক সভায় বক্তৃতা

প্রসঙ্গে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন যে, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিই ভারতের লক্ষ্য।

৩রা ডিসেম্বর—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু আজ লোকসভায় সরকারের একটি আইন কমিশন নিয়োগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, কমিশন দেশের আইনসমূহকে সরল ও আধুনিক করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিবেন।

মণিপুরে জনপ্রতিনিধিমূলক পরিষদ ও দায়িত্বশীল গভর্নমেণ্ট গঠনের দাবীতে প্রজা-সমাজতন্ত্রীরা সেখানে যে সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করিয়াছে, আজ লোকসভায় সরকার বিরোধীপক্ষ হইতে তৎসম্পর্কে একটি মুলতুবী প্রস্তাব উত্থাপন করা হইলে অধ্যক্ষ উহাকে বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন। অধ্যক্ষের এই নির্দেশের প্রতিবাদে লোকসভার বিরোধীদলের সদস্যগণ সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

৪ঠা ডিসেম্বর—ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের কোন কোন অংশ আগামী ১০ই ডিসেম্বর হইতে দীর্ঘস্থায়ী ধর্মঘট চালাইবার চেষ্টা করায় দুঃখপ্রকাশ করিয়া ভারত সরকার সমস্ত ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের নিকট প্রস্তাবিত ধর্মঘট হইতে বিরত থাকিবার জন্য আবেদন জানাইয়াছেন। শ্রম দপ্তর হইতে প্রচারিত এক প্রেস নোটে বলা হইয়াছে যে, পরিকল্পিত ধর্মঘট বেআইনী বলিয়া সরকার মনে করেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রিবর্গের নিকট লিখিত এক পত্রে বলিয়াছেন যে, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও যুগোশ্লাভিয়ার ন্যায় দেশ শিল্পোন্নয়নের জন্য যাহা কিছু করিয়াছে, নিরপেক্ষ ও সংস্কার-মুক্ত মন লইয়া তাহা বিচার করিতে হইবে এবং সম্ভবপর সকল ক্ষেত্রে তাহাদের অভিজ্ঞতার দ্বারা লাভবান হইতে হইবে।

৫ই ডিসেম্বর—কেন্দ্রীয় সরকারে দুইজন নূতন মন্ত্রী নিযুক্ত করিয়া এবং তিনজন সহকারী মন্ত্রীকে মন্ত্রিত্বের পর্যায়ে উন্নীত করিয়া অদ্য সরকারীভাবে এক ঘোষণা করা হইয়াছে। নবনিযুক্ত মন্ত্রিদ্বয় হইতেছেন—ডাঃ সৈয়দ মামুদ এবং শ্রী এইচ ভি পটালকর। যে তিনজন সহকারী মন্ত্রী মন্ত্রিত্বের পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছেন, তাঁহারা হইতেছেন—শ্রীঅরুণচন্দ্র গুহ, শ্রী এম সি শা এবং শ্রী কে ডি মালব্য।

বোম্বাই-এর রাজ্যপাল শ্রীগিরিজাশঙ্কর বাজপেয়ী গতকল্য রাত্রি ২॥টার সময় বোম্বাইয়ের রাজভবনে পরলোকগমন করিয়াছেন। মস্তকের রক্তমোক্ষণের ফলে শ্রীবাজপেয়ীর মৃত্যু হইয়াছে। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৩ বৎসর হইয়াছিল।

মধ্যপ্রদেশের ভূতপূর্ব রাজ্যপাল শ্রীমঙ্গলদাস পাকবাসা বোম্বাইয়ের অস্থায়ী রাজ্যপাল নিযুক্ত হইয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

২৯শে নবেম্বর—অদ্য মস্কোতে সোভিয়েট রাশিয়ার উদ্যোগে আহূত ইউরোপীয় নিরাপত্তা সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। সোভিয়েট রাশিয়া ব্যতিরেকে আরও সাতটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র এই সম্মেলনে যোগদান করেন।

৩০শে নবেম্বর—যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো অদ্য উত্তর আদ্রিয়াতিক তীরবর্তী রেজেকা হইতে জাহাজযোগে ভারত ও ব্রহ্ম পরিদর্শনে যাত্রা করেন।

দক্ষিণ আফ্রিকার জাতীয়বাদী দলের নেতৃবৃন্দ দলের 'শক্ত মানুষ' ৬১ বৎসর বয়স্ক মিঃ জোহান্স স্ট্রিডমকে ডাঃ মালানের স্থলে প্রধান মন্ত্রী নির্বাচিত করিয়াছেন।

১লা ডিসেম্বর—পর্তুগীজ প্রধান মন্ত্রী ডাঃ সালাজার ঘোষণা করেন যে, ভারত ইউনিয়ন যদি ভারতস্থ পর্তুগীজ উপনিবেশে যুদ্ধ চালায়, তাহা হইলে পর্তুগীজরা শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ চালাইয়া যাইবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ ডালেস বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং জাতীয়তাবাদী চীনের মধ্যে নূতন চুক্তির সম্ভাব্য ফল হইবে এই যে, কম্যুনিস্ট চীন যদি ফরমোজা আক্রমণ করে, তাহা হইলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার উদ্ভব হইবে এবং চীনের মূল ভূখণ্ডে পাল্টা আক্রমণ চালান হইবে।

২রা ডিসেম্বর—ঢাকার সংবাদে প্রকাশ, গত ২৭শে নবেম্বর ঢাকার নবাব খাজা হবিবুল্লা এবং তাঁহার বেগমকে পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক হইতে [illegible] আত্মসাৎ করার অভিযোগে গ্রেপ্তার [illegible] হইয়াছে। নবাব ঐ ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর।

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার [illegible] সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, গত স[illegible] কোরিয়ার যুদ্ধবন্দী যে ১১ জন [illegible] বৈমানিককে চীন কারাদণ্ডে দণ্ডিত ক[illegible] সে বিষয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের দায়িত্ব আছে।

৪ঠা ডিসেম্বর—মিশর সরকারের [illegible] সাধনের নিমিত্ত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ[illegible] অভিযোগে মুসলিম ভ্রাতৃ সংস্থার সর্বাধিনায়ক হাসা এল হোদিবি এবং উক্ত সংস্থার অপর দুইজন সদস্য প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—।৶০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রী[illegible] লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ
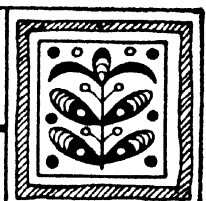
কংগ্রেসের নবনির্বাচিত সভাপতি

শ্রীযুক্ত নবলশঙ্কর ধেবর দুই বৎসরের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন। কংগ্রেসের আগামী ষষ্ঠিতম অধিবেশনে তিনি সভাপতিত্ব করিবেন এবং পণ্ডিত জওহরলাল সভাপতির দায়িত্ব হইতে অবসর লইবেন। কংগ্রেসের কার্যনির্বাহক সমিতি বিগত অধিবেশনে সভাপতির পদের জন্য শ্রীযুত ধেবরের নাম সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব করেন। সুতরাং তিনি যে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় উক্ত পদের জন্য নির্বাচিত হইবেন ইহা পূর্ব হইতেই অনুমান করা গিয়াছিল। ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্ব পরিচালনার গুরু দায়িত্বপূর্ণ এই মর্যাদা লাভে আমরা শ্রীযুত ধেবরকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রীযুত ধেবর আদর্শনিষ্ঠ কর্মী পুরুষ। মান, যশ, প্রতিপত্তির আড়ম্বর হইতে দূরে থাকিয়া তিনি জাতির সেবা করিতে চাহেন। গত ২০ বৎসরকাল তিনি এইভাবে জাতির সেবা করিয়াছেন। কংগ্রেসের ন্যায় জাতির বৃহত্তম গণপ্রতিষ্ঠান পরিচালনায় এতাবৎকাল সর্বভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে অগ্রগণ্য প্রবীণ নেতৃগণই প্রধানত দায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। শ্রীযুত ধেবর সর্বভারতের রাজনীতিক্ষেত্রে তাদৃশ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন নহেন এবং কংগ্রেস-সভাপতিদের অধিকাংশের তুলনায় তিনি বয়ঃকনিষ্ঠ। তাঁহার বয়ঃক্রম এখনও পঞ্চাশ পূর্ণ হয় নাই। সুতরাং দেশসেবার ক্ষেত্রে তিনি তরুণের মনোবৃত্তির দ্বারা প্রভাবিত। স্বাধীনতা লাভ করিবার পর সৌরাষ্ট্রের নবরাজ্য গঠনে তাঁহার জ্বলন্ত স্বদেশ-প্রেম এবং সংগ্রামশীল মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। জুনাগড় প্রভৃতি কয়েকটি অঞ্চলকে পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত করিবার প্রচেষ্টা সৌরাষ্ট্রের যে-সব কর্মীদের বীর্যবলে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়, শ্রীযুত ধেবর তাঁহাদের অগ্রণী ছিলেন। সৌরাষ্ট্রের সর্বজনপ্রিয় শ্রীযুত ধেবর

অতঃপর সেখানকার মুখ্যমন্ত্রীর পদে প্রতিষ্ঠিত হন। আরাম-বিলাসের জীবনের তিনি পক্ষপাতী নহেন। সাধারণ জনগণের একজনের মতই তিনি নিজের জীবন যাপন করেন। সৌরাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর জন্য নির্দিষ্ট ভবন ছাড়িয়া তিনি স্বল্পায়তন একটি গৃহে অবস্থান করেন। জাতির জনগণের জন্য তাঁহার অন্তর বেদনায় পূর্ণ এবং তাহাদের অবস্থার উন্নয়নের নিমিত্তই তাঁহার কর্মপ্রচেষ্টা প্রযুক্ত হয়। সাধারণ জনগণের সঙ্গে জীবনে এবং আচরণে সমাত্মবুদ্ধিসম্পন্ন এমন নেতারই নেতৃত্ব কংগ্রেস-পরিচালনের ক্ষেত্রে প্রয়োজন ছিল। বস্তুত ইতিমধ্যেই রাজনীতির ক্ষেত্রে একটা আভিজাত্য কংগ্রেসের শক্তিকে জনচিত্তের সংযোগসূত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার শঙ্কা সৃষ্টি করিয়াছে। নবদায়িত্বে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর শ্রীযুত ধেবর সাধারণ জনশ্রেণীর সেবার দিকেই জাতির দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়াছেন। আমরা আশা করি, শ্রীযুত ধেবরের নেতৃত্বে কংগ্রেস নবীন উদ্দীপনা লাভ করিবে এবং সমগ্র জাতির অন্তরে নবসৃষ্টির দুর্জয় প্রেরণা জাগাইয়া তুলিবে।

বিপ্লবী বীর কিরণচন্দ্র

গত ১২ই ডিসেম্বর বাংলার অগ্নি-যুগের অন্যতম প্রবীণ নেতা শ্রীকিরণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, তাঁহার বিস্তীর্ণ সমাজে সর্বজনপ্রিয় 'কিরণদা' পরলোকগমন করিয়াছেন। ১৯০৫ সাল হইতে দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের সর্ববিধ কর্মোদ্যমের সঙ্গে কিরণচন্দ্র ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। বাংলার বিপ্লব আন্দোলনের সূচনা হইতেই তিনি ইহাতে যোগদান করেন এবং চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের মামলা পর্যন্ত বৈদেশিক প্রভুত্বের উচ্ছেদ-প্রচেষ্টায় তাঁহার অতন্দ্রিত কর্মতৎপরতা মন্ত্রগুপ্তির পথে সম্প্রসারিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৪২ সালের আগস্ট বিপ্লবের সঙ্গেও তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন। শত সহস্র তরুণের অন্তরে কিরণচন্দ্র বিপ্লবের বহ্নিবীজ উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। অনন্যসাধারণ চরিত্র-শক্তি,

আদর্শনিষ্ঠা এবং প্রীতির প্রভাবে তাঁহার ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইয়া উঠিয়াছিল। কোনরূপ নির্যাতন এবং লাঞ্ছনায় তিনি দমিত হন নাই। কিরণচন্দ্র মনে-প্রাণে সম্পূর্ণ জাতীয়তাবাদী ছিলেন। এদেশের অধ্যাত্মনিষ্ঠ সনাতন সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়া চরিত্র-শক্তির বিকাশ সাধন এবং জনসেবার ভিতর দিয়া সমাজ-জীবনের উন্নয়ন তাঁহার আদর্শ ছিল। নিষ্কাম কর্মসাধনা, ত্যাগ এবং তপস্যাকেই তিনি বড় করিয়া দেখিতেন। মান, যশ, প্রতিষ্ঠার দিক হইতে রাজনীতিক প্রতিপত্তিকে তিনি উপেক্ষা করিয়া গীতার আদর্শ কর্মযোগ জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে সাধনা করিয়া গিয়াছেন। বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টার অর্ধশতাব্দব্যাপী ইতিহাসে সমুজ্জ্বল এই বিপ্লবী সাধকের স্মৃতির উদ্দেশে আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

জাতির ঐতিহ্য এবং ঐক্য

সরকারী নীতির সমালোচনা করিবার অধিকার সকলেরই আছে, কিন্তু স্বদেশের নিন্দা করিয়া মাতৃভূমিকে সমীবর্ণে লিপ্ত করিবার জন্য যাহারা উন্মুখ, তাহাদের দুষ্প্রবৃত্তি বরদাস্ত করা সত্যই কঠিন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল সম্প্রতি উড়িষ্যার কয়েকটি বক্তৃতায় এই শ্রেণীর লোকদের কর্মতৎপরতার জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহাদের কাজ জাতির পক্ষে কল্যাণকর নহে। আমরা ভারতের প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের কঠোরতার মাত্রা আরও বাড়াইয়া এই কথাই বলিব যে, তাহারা জাতির শত্রু। প্রকৃতপক্ষে যে জাতির আত্মপ্রত্যয় নাই, সে জাতি কখনও বড় হইতে পারে না এবং এই আত্মপ্রত্যয় প্রধানত ঐতিহ্যগত। ফলত পরের নিকট হইতে ঐ বস্তু ধার করিয়া লওয়া যায় না, বরং সে পথে আত্মপ্রত্যয়বোধ ক্ষুণ্ন হইয়া পড়ে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারতের ঐক্যবোধের মূলে জাতির এই ঐতিহ্যকেই মূল্য দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ভারত সুপ্রাচীন দেশ এবং ইহার গৌরবময় ইতিহাস রহিয়াছে। এই ইতিহাস প্রাচীন সভ্যতা এবং সংস্কৃতির ইতিহাস। বহু দেশের উত্থান-পতন ঘটিয়াছে; কিন্তু কোন বিপর্যয় ভারতের সভ্যতা ধ্বংস করিতে পারে নাই। বস্তুত ভারতের সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যগত এই যে প্রাণশক্তি, ইহার উপর ভিত্তি করিয়াই জাতিকে সংহত করিয়া তুলিতে হইবে। রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদও সম্প্রতি দিল্লীর মালয়ালী সমিতির বার্ষিক সভায় এই বিষয়ের উপরই গুরুত্ব দিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি বলিয়াছেন, বহু বৈচিত্র্য সত্ত্বেও ভারতীয় সংস্কৃতির মূলগত একটি ঐক্য আছে এবং বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি এইভাবে সংহত হইয়া উঠিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যগত বিকাশ বলিষ্ঠভাবে একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করিয়াছে এবং বিভিন্ন বৈচিত্র্যের মধ্যে একত্বে পরিস্ফূর্তি লাভ করিয়াছে। সব প্রদেশ সব ভাষাকে লইয়া এই সংস্কৃতি। কোন একটি বিশেষ অঞ্চল সে সংস্কৃতির একমাত্র অধিকারী এমন দাবী করিতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে এই সংস্কৃতিকে ভিত্তি করিয়াই সমগ্র ভারতে ঐক্যবোধ জাগ্রত করা সম্ভব এবং তাহাই স্বাভাবিক। যাঁহারা জাতির এই গৌরবময় ঐতিহ্যকে অস্বীকার করেন এবং বৈদেশিক মতবাদের আনুগত্যই যাঁহাদের জীবনে উদ্দেশ্য তাঁহারা জাতির সংহতি এবং ঐক্যবোধকে ধ্বংস করিয়া পরাধীনতার পথই উন্মুক্ত করিতেছেন। প্রত্যুত যে একতার অভাবে ভারত বিদেশীর পদানত হইয়াছিল, তাঁহারা জাতির ভাগ্যে সেই দুর্দৈবকেই ডাকিয়া আনিতে উৎসুক। বিদেশীর যেগুলি গুণ সেগুলি গ্রহণ করিতে হইবে না, আমরা এমন কথা বলি না; কিন্তু আত্মসত্তাকে বিকাইয়া দিলে অপরের গুণকে আয়ত্ত করিবার শক্তিও থাকে না। পরন্তু জীবনে ক্রীতদাসের বিড়ম্বনাই জুটে।

বৈদেশিক শাসনের স্মৃতি

ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত স্মৃতিস্তম্ভ এবং প্রস্তরমূর্তিসমূহ অপসারণ করিবার জন্য দেশের লোকের মনে পূর্বে যতটা উত্তেজনা পরিলক্ষিত হইত, বর্তমানে তাহা অনেকটা মন্দীভূত হইয়াছে। তথাপি এই প্রশ্ন এখনও রহিয়া গিয়াছে। ভারতের কোন কোন রাজ্য সরকার এগুলি অপসারিত করিবার পক্ষপাতী, আবার কোন কোন সরকার এইগুলির সম্বন্ধে অনেকটা উদাসীন থাকিতে ইচ্ছুক, শুধু যেগুলি জাতির মনোবৃত্তিকে সাক্ষাৎ সম্পর্কে আঘাত করে তাঁহারা শুধু সেইগুলিই সরাইতে চাহেন। লোকসভার একটি প্রশ্নের উত্তরে মৌলানা আজাদ প্রকাশ করিয়াছেন যে, ভারত সরকার এ পর্যন্ত এ সম্বন্ধে নিজেরা কোন নীতি স্থির করেন নাই। প্রশ্নটির জটিলতা আমরাও স্বীকার করি। কারণ এইসব স্মৃতি এবং মূর্তি অনেকগুলির ঐতিহাসিক মূল্য রহিয়াছে, শিল্পের দিক হইতেও কতকগুলির মূল্য আছে। ব্রিটিশ প্রভুত্ব বর্তমানে ভারত হইতে অপসারিত হইয়াছে, বিজেতৃ শক্তির প্রতি বিদ্বেষের মনোভাব লইয়া এগুলির সম্বন্ধে বর্তমানে বিবেচনা না করিলেও চলে। আমাদের মতে ঐতিহাসিক সত্যকে বিকৃত করিয়া জাতিকে অবমানিত এবং হেয় করিবার উদ্দেশ্য লইয়া যেগুলি পরিকল্পিত কিংবা মানবধর্মবিরোধী ঔদ্ধত্য এবং পশুবলেরই যেগুলি প্রতীক, সেইসব স্মৃতি ও মূর্তিগুলিকে লোকচক্ষুর অন্তরালে অপসারিত করাই কর্তব্য, কারণ স্মৃতির সঙ্গে মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত আছে, তাহাকে একেবারে বাদ দেওয়া যায় না। মনুষ্যত্বে জাগ্রত জাতি মিথ্যাকে, পশুপ্রবৃত্তিকে, কিংবা অমানুষ ঔদ্ধত্য এবং বর্বরতাকে কোনরূপেই মর্যাদা দিতে চাহিবে না, ইহা স্বাভাবিক।

উৎকট প্রাদেশিকতা

বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমানা নির্ধারণ প্রশ্ন সম্বন্ধে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কাজ আরম্ভ না হইতেই বিহারের নেতৃবর্গ কিভাবে বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলিতে উৎকট বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচারে ব্রতী হইয়াছেন, মানভূম এবং পূর্ণিয়াতে এই পরিচয় আমরা পাইয়াছি। জামতাড়ায় অনুষ্ঠিত মহকুমা পঞ্চায়েৎ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে এই প্রচারকার্য আরও উৎকট হইয়া উঠিয়াছে। বিহারের রাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীকৃষ্ণ সহায় এই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন, সুতরাং বিহার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতাতেই এই কাজ চলিয়াছে ইহা স্বীকার করিতেই হয়। এ অবস্থার প্রতিকার অবিলম্বে প্রয়োজন।

উত্তরাখণ্ড

[প্রস্তাবনা]

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

গাছ মাটি পাথর মেঘ নদীর
সাম্রাজ্য উত্তরে। নিরবধি
সময় স্তম্ভিত সেইখানে।
শহরের সজ্জিত বাগানে
চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কোনো
নির্বোধ সন্ধ্যায় বারে বারে
একই ম্লান আকাঙ্ক্ষার হাড়ে
কে হাওয়া লাগাও?
এখনও সময় আছে, শোনো,
সেইখানে যাও।

যাও এই মূর্খ লাভ-ক্ষতির
রাজ্য ছেড়ে উত্তরে, যেখানে
পিতামহ পর্বতের প্রাণে
গাছ মাটি পাথর মেঘ নদীর
রহস্য নিহিত।
সারা দিন
এই বন্ধ্যা অ্যাসফ্যাল্ট-কঠিন
শহরের এক কোণে দাঁড়িয়ে
কে ব্যর্থ চিন্তার জাল বোনো,
বিতৃষ্ণার পাত্রে ঠোঁট দিয়ে
কে তৃষ্ণা মেটাও?
এখনও সময় আছে, শোনো,
সেইখানে যাও।

গাছ মাটি পাথর মেঘ নদীর
সাম্রাজ্য উত্তরে।
যাও যাও
আত্মঘাতী ক্লান্তিকে ছাড়িয়ে
উত্তরাখণ্ডের পথে গিয়ে
এই মূর্খ লাভ-ক্ষয়-ক্ষতির
অনির্বাণ যন্ত্রণা নেভাও;
যাও আরও উত্তরে বিশাল
জ্যোতির্ময় তমিস্রার টানে,
পর্বতের ছায়ায় যেখানে
নিদ্রিত রয়েছে গাড়োয়াল।

শহরের সজ্জিত বাগানে
চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কোনো
নির্বোধ সন্ধ্যায় বারে বারে
একই ম্লান আকাঙ্ক্ষার হাড়ে
কে হাওয়া লাগাও?
এখনও সময় আছে, শোনো,
সেইখানে যাও।

যাব, আমায় যেতেই হবে, আশার
অতল খুঁজে খুঁজে,—
থাকব না এই ব্যর্থ ভালবাসার
বিবরে মুখ গুঁজে;
যাব, আমার জীর্ণ মনোরথের
রজ্জু থরোথরো,—
যাব, আমায় যেতেই হবে, পথের
প্রদীপ তুলে ধরো।

কাল রাত্রে ছেড়েছি কলকাতা,
বর্ষার প্রবল জলধারে
মুছে গেল গঙ্গার ওপারে
বিদ্যুতের সমারোহ, আর
কোলাহলমুখর চৌমাথা।
সারারাত্রি ট্রেনের জানলায়
অন্ধকার হানা দিয়ে যায়;
অন্ধকার, তারই মাঝে মাঝে
ছিটকে যায় স্টেশন, আবার
চিন্তায় ট্রেনের চাকা বাজে।

বাংলা থেকে বিহার। ধুধু করে
রৌদ্রজ্বলা টাল-খাওয়া প্রান্তর।
মাঠের পর মাঠকোঠা, তারপরে
গোলপাতার ছাউনি-দেওয়া ঘর।
দু-একটা পাহাড় দূরে দূরে,
দু-একটা মানুষ কাছে এসে
সরে যায়, উত্তরপ্রদেশে
ট্রেন চলেছে, ওখানে কাদের
ভিড় জমেছে নির্জন দুপুরে,

এটা কী, ওটা কী, ছাড়া-ছাড়া
গ্রামগুলি—ওখানে থাকে কারা,—
জানব না কখনো।
কানে কানে
হাওয়ার ফিসফিস। মাঠ বন
ঝাপসা হয়ে এসেছে কখন।
দেরি নেই নাজিবাবাদের
শেষ রাত্রে পৌঁছব সেখানে।

কে তুমি গানে গানে বেদনা দিয়ে যাও,
হৃদয়ে গৈরিক রঙ
ছড়িয়ে দিয়ে যাও কে তুমি, কেন দাও,
তোমার গানে সারা মন
ব্যাকুল হল, বলো, ব্যর্থ বাসনার
বাঁধন খুলে প্রাণে-প্রাণে
যে-গান গাও, পাব কোথায় দেখা তার,
কোথায় যাব, কোনখানে।

গাছ মাটি পাথর মেঘ নদীর
সাম্রাজ্য উত্তরে।
যাও যাও
আত্মঘাতী ক্লান্তিকে ছাড়িয়ে
উত্তরাখণ্ডের পথে গিয়ে
এই মূর্খ লাভ-ক্ষয়-ক্ষতির
অনির্বাণ যন্ত্রণা নেভাও।
যাও আরও উত্তরে মহান
জ্যোতির্ময় তমিস্রার টানে,—
যাও আরও উত্তরে, যেখানে
অন্তহীন জীবনের গান
রোমাঞ্চিত অরণ্যে-পাহাড়ে।
ঘর ছেড়ে তবুও বারে বারে
কে ব্যর্থ চিন্তার জাল বোনো,
জীবনের অন্বেষণে এসে
তবুও মৃত্যুকে ভালবেসে
কে থমকে দাঁড়াও?
এখনও সময় আছে, শোনো,
সেইখানে যাও।

রূপাবলী

সৌমিত্রশঙ্কর দাশগুপ্ত

যুগান্ত

ভাবনা স্তম্ভিত হয়ে—অচল কুণ্ডলী।
সীমিত বৃত্তের কেন্দ্রে বন্দী বিহঙ্গম
ঝাপটায় ডানা।

উজ্জ্বল আলোর রোদ হিম হয়ে আছে
উচ্ছল সিন্ধুর ঢেউ জমাট পাথর!

ক্লান্ত দেহ শিথিল চরণে
মঞ্জীর শৃঙ্খল হয়ে বাজে।

বিবর্ণ বিষণ্ণ কাল
মেলিয়াছে প্রেত-প্রতিচ্ছায়া।
* * *

প্রাণ-গঙ্গোত্রী

অবিচ্ছেদ সৃষ্টির প্রবাহ—
তন্দ্রাতুর চোখে,
কত যে হারায়!
আবিলতা অণুতে তনুতে।

পথিকের চক্রবৃত্তে
পরম মুহূর্ত আসে—
ফিরে আসি প্রাণ-গঙ্গোত্রীতে।

স্বচ্ছ-সুনির্মল
হৃদয়ের তীর্থের সলিলে—
পাই মহাজীবনের তীর!
* * *

আর এক পৃথিবী

আধো-জাগা পলাশের রাগে
কাঁচা সোনা রোদ্দুরের হাসি—
আবীর ছড়ায়;
উচ্ছলিত শিশুদের গায়।

চাঁদ-ধোয়া জ্যোৎস্না-জলে
নেয়ে ওঠে—
শত শতদল;
উজ্জ্বল মেয়েরা।

প্রথম উষার আলো মেখে
হেসে ওঠে আর এক পৃথিবী।

হে রামমোহন, আজি শতেক বৎসর করি পার
মিলিল তোমার নামে দেশের সকল নমস্কার।
মৃত্যু অন্তরাল ভেদি' দাও তব অন্তহীন দান
যাহা কিছু জরাজীর্ণ তাহাতে জাগাও নব প্রাণ।
যাহা কিছু মূঢ় তাহে চিত্তের পরশমণি তব
এনে দিক উদ্বোধন, এনে দিক্ শক্তি অভিনব।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বঙ্গসাহিত্যের রাত্রি স্তব্ধ ছিল তন্দ্রার আবেশে
অখ্যাত জড়ত্বভারে অভিভূত। কী পুণ্য নিমেষে
তব শুভ অভ্যুদয়ে বিকীরিল প্রদীপ্ত প্রতিভা,
প্রথম আশার রশ্মি নিয়ে এল প্রত্যুষের বিভা,
বঙ্গভারতীর ভালে পরালো প্রথম জয়টিকা।
রুদ্ধভাষা আঁধারের খুলিলে নিবিড় যবনিকা,
হে বিদ্যাসাগর, পূর্ব দিগন্তের বনে উপবনে
নব উদ্বোধনগাথা উচ্ছ্বসিল বিস্মিত গগনে।
যে বাণী আনিলে বহি নিষ্কলুষ তাহা শুভ্ররুচি,
সকরুণ মাহাত্ম্যের পুণ্যগঙ্গাস্নানে তাহা শুচি।
ভাষার প্রাঙ্গণে তব আমি কবি তোমারি অতিথি;
ভারতীর পূজা তরে চয়ন করেছি আমি গীতি
সেই তরুতল হতে যা তোমার প্রসাদ সিঞ্চনে
মরুর পাষাণ ভেদি' প্রকাশ পেয়েছে শুভক্ষণে॥

২৪ ভাদ্র
১৩৪৬

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পরমহংস রামকৃষ্ণদেব

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা
ধেয়ানে তোমার মিলিত হয়েছে তা'রা।
তোমার জীবনে অসীমের লীলাপথে
নূতন তীর্থ রূপ নিল এ জগতে;
দেশবিদেশের প্রণাম আনিল টানি
সেথায় আমার প্রণতি দিলাম আনি।

[১৩৪২]

To the Paramahansa Ramkrishna Deva

Diverse Courses of Worship from varied springs of fulfilment have mingled in your meditation.

The manifold revelation of the joy of the Infinite has given form to a shrine of unity in your life where from far and near arrive salutations to which I join mine own.

বঙ্কিমচন্দ্র

যাত্রীর মশাল চাই রাত্রির তিমির হানিবারে,
সুপ্তিশয্যাপার্শ্বে দীপ বাতাসে নিভিছে বারে বারে
কালের নির্মম বেগ স্থবির কীর্তিরে চলে নাশি',
নিশ্চলের আবর্জনা নিশ্চিহ্ন কোথায় যায় ভাসি'।
যাহার শক্তিতে আছে অনাগত যুগের পাথেয়
সৃষ্টির যাত্রায় সেই দিতে পারে আপনার দেয়।
তাই স্বদেশের তরে তারি লাগি উঠিছে প্রার্থনা
ভাগ্যের যা মুষ্টিভিক্ষা নহে, নহে জীর্ণ শস্যকণা
অঙ্কুর ওঠে না যার, দিনান্তের অবজ্ঞার দান
আরম্ভেই যার অবসান

সে 'প্রার্থনা পূরায়েছ, হে বঙ্কিম, কালের যে বর
এনেছ আপন হাতে নহে তাহা নির্জীব স্থাবর।
নবযুগসাহিত্যের উৎস উঠি' মন্ত্রস্পর্শে তব
চিরচলমান স্রোতে জাগাইছে প্রাণ অভিনব
এ বঙ্গের চিত্তক্ষেত্রে, চলিতেছে সম্মুখের টানে
নিত্য নব প্রত্যাশায় ফলবান ভবিষ্যৎ পানে।
তাই ধ্বনিতেছে আজি সে বাণীর তরঙ্গকল্লোলে
বঙ্কিম, তোমার নাম, তব কীর্তি সেই স্রোতে দোলে
বঙ্গভারতীর সাথে মিলায়ে তোমার আয়ু গণি,
তাই তব করি জয়ধ্বনি

হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়
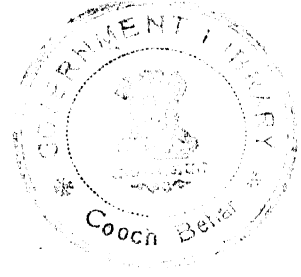
জীবন-ভাণ্ডারে তব ছিল পূর্ণ অমৃত পাথেয়
সংসার-যাত্রায় ছিল বিশ্বাসের আনন্দ অমেয়।
দৃষ্টি যবে আঁধারিল ছিল তব আত্মার আলোক,
জরা-আচ্ছাদনতলে চিত্তে ছিল নিত্য যে বালক।
নির্বিচল ছিলে সত্যে, হে নির্ভীক, তুমি নির্বিকার
তোমারে পরালো মৃত্যু অম্লান বিজয়মাল্য তার।
২। মাঘ ১৩৪৪

স্মরণীয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

একদা তোমার নামে সরস্বতী রাখিলা স্বাক্ষর,
তোমার জীবন তাঁর মহিমা ঘোষিল নিরন্তর।
এ মন্দিরে সেই নাম ধ্বনিত করুক তাঁরি জয়,
তাঁহার পূজার সাথে স্মৃতি তব হউক অক্ষয়॥
[১৯৩৪]

Once the Goddess of Wisdom left her own
signature upon your name, and you
maintained her majesty with all your life.

Let that name of yours ever proclaim her
triumph uniting your memory with her
service in this Temple of Learning.

আচার্য শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল, সুহৃদ্বরেষু

জ্ঞানের দুর্গম ঊর্ধ্বে উঠেছ সমুচ্চ মহিমায়,
যাত্রী তুমি, যেথা প্রসারিত তবু দৃষ্টির সীমায়
সাধনা-শিখরশ্রেণী; যেথায় গহন গুহা হ'তে
সমুদ্রবাহিনী বার্তা চলেছে প্রস্তরভেদী স্রোতে
নব নব তীর্থ সৃষ্টি করি, যেথা মায়া-কুহেলিকা
ভেদি উঠে মুক্তদৃষ্টি তুঙ্গশৃঙ্গ, পড়ে তাহা লিখা
প্রভাতের তমোজয়-লিপি; যেথায় নক্ষত্রলোকে
দেখা দেয় মহাকাল আবর্তিয়া আলোকে আলোকে
বহ্নিমণ্ডলের জপমালা; যেথায় উদয়াচলে
আদিত্যবরণ যিনি, মর্ত্যধরণীর দিগঞ্চলে
অবাবৃত করি দেন অমর্ত্যরাজ্যের জাগরণ,
তপস্বীর কণ্ঠে কণ্ঠে উচ্ছ্বসিয়া—শুন বিশ্বজন,
শুন অমৃতের পুত্র, হেরিলাম মহান্ত পুরুষ
তমিস্রের পার হতে তেজোময়, যেথায় মানুষ

শুনে দৈববাণী। সহসা পায় সে দৃষ্টি দীপ্তিম্লান,
দিক্‌সীমাপ্রান্তে পায় অসীমের নূতন সন্ধান।
বরেণ্য অতিথি তুমি বিশ্বমানবের তপোবনে,
সত্যদ্রষ্টা যেথা যুগ-যুগান্তরে ধ্যানের গগণে
গূঢ় হ'তে উদ্‌বারিত জ্যোতিষ্কের সম্মিলন ঘটে,
যেথায় অঙ্কিত হয় বর্ণে বর্ণে কল্পনার পটে
নিত্যসুন্দরের আমন্ত্রণ। সেথাকার শুভ্র আলো
বরমাল্যরূপে তব সমুদার ললাটে জড়ালো
বাণীর দক্ষিণ পাণি।

মোরে তুমি জানো বন্ধু বলি;
আমি কবি আনিলাম ভরি মোর ছন্দের অঞ্জলি
স্বদেশের আশীর্বাদ, বিদায়কালের অর্ঘ্য মোর
বাহুতে বাঁধিনু তব সপ্রেম শ্রদ্ধার রাখীডোর।

১ ডিসেম্বর ১৯৩৫

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন

এনেছিলে সাথে করে
মৃত্যুহীন প্রাণ,
মরণে তাহাই তুমি
করি গেলে দান।

*

স্বদেশের যে ধূলিরে শেষ স্পর্শ দিয়ে গেলে তুমি
বক্ষের অঞ্চল পাতে সেথায় তোমার জন্মভূমি।
দেশের বন্দনা বাজে শব্দহীন পাষাণের গীতে—
এসো দেহহীন স্মৃতি মৃত্যুহীন প্রেমের বেদীতে॥

Thy motherland spreads the veil from her breast on this dust where thy body left its last touch.
Thy country's invocation is chanted in these silent stones for thy bodiless presence to take its seat here on the altar of deathless love.

16-6-35.

চার্লস এন্ডরূজের প্রতি

প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধার
হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।
প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার
হে বন্ধু গ্রহণ করো, করি নমস্কার।
খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার
হে বন্ধু প্রবেশ করো, করি নমস্কার।
তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।

শরৎচন্দ্র

যাহার অমর স্থান প্রেমের আসনে
ক্ষতি তার ক্ষতি নয় প্রেমের শাসনে।
দেশের মাটির থেকে নিল যারে হরি'
দেশের হৃদয় তারে রাখিয়াছে বরি'।

রামমোহন রায়॥ জন্ম ১৭৭২ (মতান্তরে ১৭৭৪), মৃত্যু ২৭ সেপ্টেম্বর ১৮৩৩
রামমোহন শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লিখিত। শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষ্যে সংকলিত **The Students' Rammohun Centenary Volume** (Calcutta, 1934)-এ প্রকাশিত।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর॥ জন্ম ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০, মৃত্যু ২৯ জুলাই ১৮৯১
মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দির রচনা উপলক্ষ্যে লিখিত। "মেদিনীপুরে বিদ্যাসাগর-স্মৃতিরক্ষণ-সমিতির অধিবেশনে পঠিত।" ১৩৪৫ কার্তিক প্রবাসীতে প্রকাশিত। বিদ্যাসাগর-স্মৃতিমন্দির প্রবেশ-উৎসবের (৩০ অগ্রহায়ণ ১৩৪৬) আমন্ত্রণপত্রে কবির হস্তাক্ষরে মুদ্রিত।

রামকৃষ্ণ পরমহংস॥ জন্ম ১৮৩৬, ১২৪২। মৃত্যু ১৬ আগস্ট ১৮৮৬, ৩১ শ্রাবণ ১২৯৩
রামকৃষ্ণ জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে লিখিত। ফাল্গুন ১৩৪২ উদ্বোধন পত্রে প্রকাশিত। ইংরেজি অনুবাদটি ফেব্রুয়ারি ১৯৩৬ **Prabuddha Bharat** পত্রে মুদ্রিত।

বঙ্কিমচন্দ্র॥ জন্ম ২৬ জুন ১৮৩৮, মৃত্যু ৮ এপ্রিল,১৮৯৪
"বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত বঙ্কিম-জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১০ আষাঢ় ১৩৪৫ তারিখে পঠিত।" শ্রাবণ ১৩৪৫ প্রবাসীতে মুদ্রিত।

হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয়॥ জন্ম ৫ ডিসেম্বর ১৮৫৭, মৃত্যু ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮। পরলোকগমনে শ্রদ্ধার্ঘ্য। ফাল্গুন ১৩৪৪ প্রবাসীতে প্রকাশিত।

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়॥ জন্ম ২৯ জুন ১৮৬৪, মৃত্যু ২৫ মে ১৯২৪
১৯৩৪ সালে 'Asutosh Mookerjee Memorial Building' নির্মাণ সম্পূর্ণ হয়, তদুপলক্ষ্যে লিখিত। অশীতিতম জন্মবার্ষিকীতে প্রচারিত পত্রী হইতে পুনর্মুদ্রিত।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল॥ জন্ম ৩ সেপ্টেম্বর ১৮৬৪, মৃত্যু ৩ ডিসেম্বর ১৯৩৮
'আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়ের ৭২ বৎসর বয়ঃক্রম পূর্ণ হওয়া উপলক্ষ্যে ভারতবর্ষীয় দার্শনিক কংগ্রেসের উদ্যোগে' ১৩৪২ পৌষ মাসে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত জয়ন্তী উৎসবে প্রেরিত অর্ঘ্য। ১৩৪২ মাঘ প্রবাসীতে প্রকাশিত। শ্রীকালিদাস নাগ কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ করিয়াছিলেন।

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন॥ জন্ম ৫ নভেম্বর ১৮৭০, মৃত্যু ১৬ জুন ১৯২৫
পরলোকগমনে শ্রদ্ধার্ঘ্য। দেশবন্ধুর শেষ চিত্রে কবির স্বহস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়; ঐ চিত্র দেশবন্ধু স্মৃতিভাণ্ডারের জন্য বিক্রীত হয়। সমসাময়িক বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত।
দ্বিতীয় কবিতাটি দেশবন্ধু স্মৃতিসৌধ প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে রচিত। জুলাই ১৯৩৫ **Visva-Bharati News** পত্রে প্রকাশিত।

দীনবন্ধু সি. এফ. অ্যান্ড্রুজ॥ জন্ম ১২ ফেব্রুয়ারি ১৮৭১, মৃত্যু ৫ এপ্রিল ১৯৪০
"অ্যান্ড্রুজ মহোদয়ের শান্তিনিকেতনে প্রথম যোগদান উপলক্ষ্যে রচিত। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা হইতে পুনর্মুদ্রিত"—প্রবাসী, বৈশাখ ১৩৪৭

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়॥ জন্ম ১৫ সেপ্টেম্বর ১৮৭৬, মৃত্যু ১৬ জানুয়ারি ১৯৩৮
পরলোকগমনে শ্রদ্ধার্ঘ্য। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে মুদ্রিত।

[বিশ্বভারতীর অনুমতিক্রমে মুদ্রিত॥ শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক সংকলিত]

ফ্রান্সের কেন্দ্রীয় চ্যাসল্টাং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র
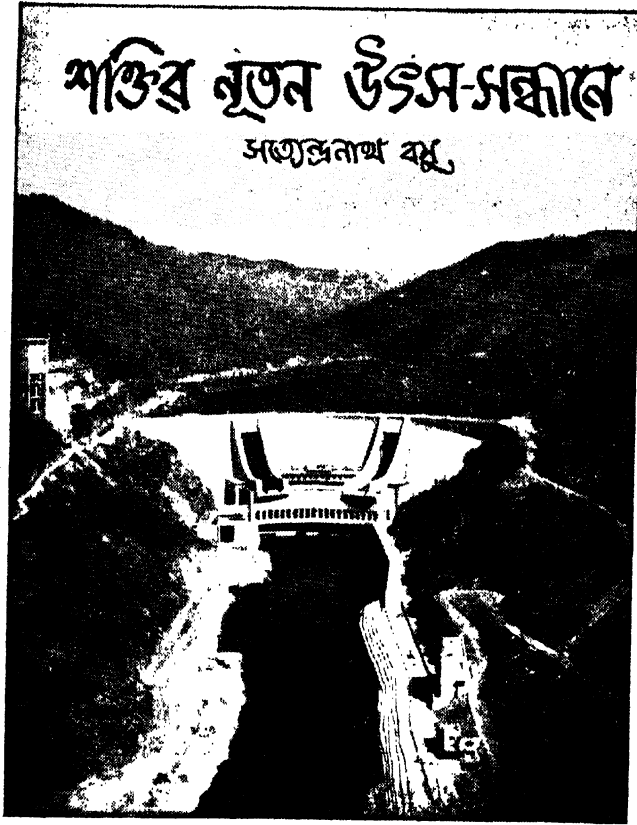
বিশ্বজগতে শক্তির মূল উৎস হচ্ছে সূর্য। সূর্য সারা ব্রহ্মাণ্ডে তেজ ছড়াচ্ছে, পৃথিবীকে দিচ্ছে উত্তাপ, আলো। সেই তেজ, আলো, উত্তাপের সাহায্যে প্রাণ গড়ছে অদ্ভুত জীবজগৎ। অচেতন বস্তুর জড়তাকে দূর করে চেতনের কায়বস্তু গড়তে দরকার বিপুল কার্যসম্ভারের, তারও চাহিদা যোগায় সূর্যের এই তেজ।

আমাদের পৃথিবী থেকে সূর্য বহু দূরে, ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে অবস্থিত। সূর্য থেকে আমাদের পৃথিবীকে দেখলে মনে হবে অসীম মহাশূন্যে একটি ধূলিকণার মতো। এই দুস্তর ব্যবধানের দরুণ সূর্যের তাপ ও আলোর অতি সামান্য অংশই পৃথিবী পায়। বস্তুত সূর্য থেকে প্রতি মুহূর্তে বিকীর্ণ শক্তি পরিমাণের ১০ হাজার কোটি ভাগের ৫ ভাগ মাত্র আহরণ করতে পারে আমাদের পৃথিবী। এই সামান্য ভগ্নাংশেরই পরিমাণ দাঁড়ায় ১৬ লক্ষ কোটি কিলোওয়াট শক্তির সমান।

বহু যুগ পূর্বে এক মহাজাগতিক বিক্ষোভের ফলে জন্মলাভ করে আমাদের এই ক্ষুদ্র পৃথিবী। সূর্য দেহ থেকে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিপিণ্ডগুলির মধ্যে পৃথিবী হচ্ছে একটি। সৃষ্টির আদিকালে জ্বলন্ত অবস্থা থেকে ক্রমশ ঠাণ্ডা হতে হতে ২০০ কোটি বছরের মধ্য দিয়ে পৃথিবী বর্তমান অবস্থায় এসেছে। উত্তপ্ত পিণ্ডের উপর ঘন স্তর জন্মেছে, স্থলভূমি ও পাহাড় পর্বত, দেশ-মহাদেশ ও মহাসাগরের হয়েছে সৃষ্টি। তারপ বহু বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আমাদে পৃথিবী নিরবচ্ছিন্নভাবে চলার পর বহু সুদূরপ্রসারী ক্রিয়াকলাপের ফ এক সময়ে প্রাণের আবির্ভাব হ'ল এ গ্রহে।

নিরন্তর আঘাতের পর আঘা পৃথিবীপৃষ্ঠে পাহাড় পর্বত পরিণ হয়েছে প্রান্তরে, ঊষর দেশ-মহাদেশ ছে গেছে শ্যামল উদ্ভিদে। প্রাণ যে কি ব তা আজও আমরা ঠিক জানি না। ত এটুকু আমরা বুঝি যে, এই বিরা বিবর্তনের জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন মূলত সংগৃহীত হয়েছে সেই শ থেকেই যে শক্তি পৃথিবী প্রতিনিয়ত লা করে সূর্যের কাছ থেকে। সূর্যের উত্তা সমুদ্র থেকে জলীয় বাষ্প ঊর্ধ্বে উত্থি হয় এবং বৃষ্টি ও তুষাররূপে ঘনীভূ হয়ে এই জলীয় কণা আবার নেমে আ ধরণীর বুকে এবং সহস্রসহস্র ন নদীর মধ্য দিয়ে জলধারা বাহিত হ সবশেষে আবার ফিরে আসে সাগরে ক্রোড়ে। বায়ু চলাচলেও মূল কার সূর্যের উত্তাপ। সালোক-সংশ্লে প্রক্রিয়ায় উদ্ভিদ জগৎ প্রতিদিন সূর্যে কাছ থেকে শক্তি আহরণ করে এবং খাদ রূপে তা সঞ্চয় করে রাখে তার দেহে সর্বশেষে এই খাদ্য দ্বারা সমগ্র প্রাণ জগৎ জীবন ধারণ করে এবং অঙ্গারাত্ম বস্তু দিয়ে তাদের দেহ গঠিত হ পৃথিবীতে প্রাণ-আবির্ভাবের সময় থে যুগ-যুগান্তর ধরে এই প্রক্রিয়া চ আসছে এবং যদিও অগণিত প্রাণ আবির্ভাব ও তিরোভাব ঘটেছে, সালো সংশ্লেষ ক্রিয়াকলাপের ফল আজও আ অক্ষুণ্ণ। কয়লা ও খনিজ তেলের ম এটা সঞ্চিত রয়েছে এবং এই কয়লা তেলই হ'ল আধুনিক যুগে শ উৎপাদনের মূল উপকরণ।

এই দুটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি (স্থলভাগ থেকে জলপ্রবাহের সম

প্রত্যাবর্তন (যার উপর জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের ভিত্তি রচিত), (২) সালোক-সংশ্লেষ প্রক্রিয়া (যার উপর নির্ভর করে উদ্ভিদের জন্মবৃদ্ধি), কিন্তু খুব বেশ কার্যকরী নয়। কার্যকরী নয় এই অর্থে যে, সূর্য থেকে মোট যে পরিমাণ শক্তি পাওয়া যায় তার কয়েক সহস্রাংশ মাত্র আহরিত হয় এ দুটি পদ্ধতিতে। সূর্যের কাছ থেকে আমরা যে পরিমাণ তাপ পাই তার অধিকাংশই মহাশূন্যে আবার ছড়িয়ে পড়ে।

শক্তিকে বিপুলভাবে ঘনীভূত করে কাজে লাগাতে পারলেই পরম-আকাঙ্ক্ষিত ফল লাভ করা যায়। বাষ্প ও কয়লার যুগের আগে মানুষ ও পশুর শক্তির ব্যাপক ব্যবহারের উপর নির্ভর করতে হত মানুষকে। খাদ্য ও সুখকর পরিবেশ ছিল তখন মানুষের সন্ধানের লক্ষ্যবস্তু এবং কৃষিকার্য ছিল তার প্রধান শ্রম-শিল্প। মানব সমাজের অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী পোশাক পরিচ্ছদ ও আবাসস্থল, এগুলির জন্যে মানুষ তখন মাথা ঘামাত না। মানুষের মনে যান্ত্রিক বুদ্ধি উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী হ'ল পরিবর্তিত। শ্রমলাঘবের কৌশল আবিষ্কারের চেষ্টায় মানুষ তার বুদ্ধি খাটাল এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহায়তায় শ্রমশিল্পে সংঘটিত হ'ল বিপ্লব। বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিষ্কার এবং তারপর বিদ্যুৎ বলবিদ্যা সংক্রান্ত প্রণালী, ও বিবিধ কাজে বিদ্যুতের ব্যবহার সম্বন্ধে ধারণার ফলে প্রগতির ধারা বিস্তৃত হ'ল বিপুলভাবে। প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার এবং কি কৌশলে সেগুলিকে কোন কাজে যথাযথভাবে কেন্দ্রীভূত করা যায় তারই উপর রচিত আধুনিক সভ্যতার ভিত্তি। মানুষের শ্রমশক্তি এখন আর কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে না তার সকল প্রচেষ্টায়— বিশেষ করে সেই সব জাতির মধ্যে যারা আজ মানব প্রগতির পুরোভাগে আছে।

কোন দেশে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তির উন্নয়ন হয়েছে সেটিই হ'ল সে দেশের অর্থনীতিক উন্নতি ও সে দেশ-বাসীর জীবনযাত্রার মান নির্ধারণের একটি যথার্থ মাপকাঠি। ভারতবাসী হিসাবে নিজের দেশের কথা আমার স্বতঃই মনে পড়ে এবং বিষণ্ণ হৃদয়ে আমি দেখি, শ্রম-শিল্পে উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারত এখনও বহু পশ্চাতে রয়েছে।
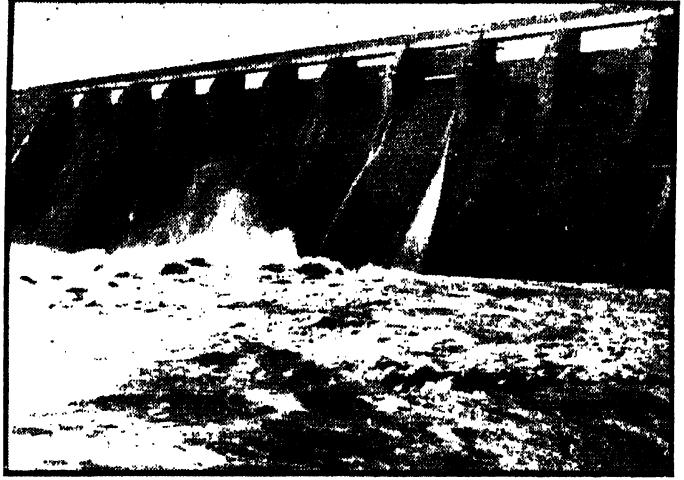
তিলাইয়া বাঁধের উন্মুক্ত জল নির্গমন পথের একাংশ

প্রাচীনকালে ভারতের বিস্ময়কর কীর্তি ও মানবসভ্যতায় তার অতুলনীয় অবদান সত্ত্বেও বর্তমানে ভারত পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির মধ্যে একটি। এ-দেশের মাটিতে যে প্রাকৃতিক সম্পদসমূহ সঞ্চিত রয়েছে তা সদ্ব্যবহারের জন্যে এবং ভৌগোলিক ও অবস্থানিক দিক থেকে যে প্রাকৃতিক সুবিধা এদেশের আছে তা কাজে লাগাবার জন্যে চেষ্টা করতে হবে। একথা পরিষ্কার করেই বলা যায় যে, ভবিষ্যৎ উন্নয়ন ব্যবস্থা সুপরিকল্পিত-ভাবে রচনা করতে হবে এবং সে কারণে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনকল্পে আমাদের উৎস-সমূহ সুষ্ঠুভাবে সমীক্ষা করা প্রয়োজন।

বিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনের তিনটি প্রধান উৎস হচ্ছে তেল, কয়লা ও জলপ্রবাহ। আমাদের দেশে যে সমস্ত খনিজ তৈল-সম্পদ এখন পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়েছে তার পরিমাণ খুব বেশী নয়। দেশের চাহিদা মেটাবার জন্যে এখনও আমাদের বৈদেশিক আমদানীর উপর নির্ভর করতে হয়। যদিও বাংলাদেশে তৈল খনি প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সাম্প্রতিক
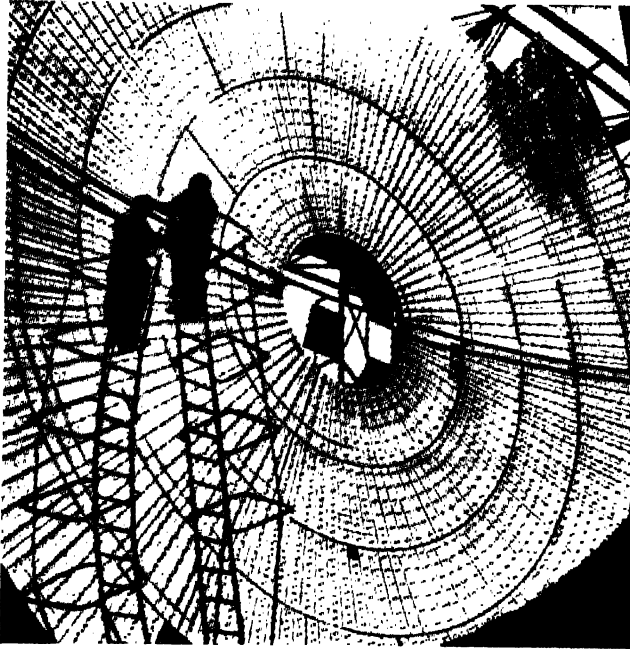
পরবলয়াকার দর্পণ (প্যারাবোলয়েড)

কথাবার্তা ঘিরে আমাদের মনে অদূর ভবিষ্যতে পরম উন্নতির সুখস্বপ্ন জেগেছে, কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা রচনায় সত্যসত্যই কাজে নামার আগে অনেক কাজ ও অনুসন্ধান এখনও বাকী রয়েছে। তবে আমাদের কয়লা-সম্পদের পরিমাণ প্রচুর বলেই মনে হয়। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি সরকারী বিবরণ অনুযায়ী এদেশে এখন পর্যন্ত যে প্রকৃতিজ সম্পদের প্রমাণ পাওয়া গেছে তার পরিমাণ প্রায় ১৬,০০ কোটি টন এবং সম্ভাব্য মোট পরিমাণ এর চেয়ে অনেক বেশী, প্রায় ৬০০০ কোটি টন। তবে এর অনেকাংশে অবাঞ্ছিত ভস্ম-উপাদান মিশ্রিত থাকে কিংবা হয়তো এর উপাদানে গন্ধক প্রভৃতি ক্ষতিকারক জিনিস থাকে। এছাড়া আমাদের মনে রাখতে হবে যে, ব্যাপক শিল্পোন্নয়নের জন্যে প্রয়োজন এদেশে সুদূরপ্রসারী ধাতুতাত্ত্বিক পদ্ধতির উন্নয়ন (যার জন্যে প্রয়োজন হবে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা)। পরিবহন ও শক্তি উন্নয়নের কাজে কয়লার ব্যবহার সম্পর্কে সতর্কতার সঙ্গে এমনভাবে চিন্তা করতে হবে, যাতে আমাদের প্রকৃতিজ সম্পদসমূহ অত্যন্ত পরিমিত মাত্রায় ব্যয়িত হয়। দুর্ভাগ্যক্রমে এতদিন পর্যন্ত এই বিষয় চিন্তা করা হয় নি এবং আমাদের বহু মূল্যবান সম্পদের এই-ভাবে অযথা অপব্যবহার ও অপচয় হয়েছে। সুখের বিষয়, সম্প্রতি আমাদের সম্পদগুলির প্রতি অধিকতর যত্ন নেওয়া হয়েছে এবং আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নয়নে এদেশর নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা ক্রমশ কাজে লাগানো যাবে।

একথা বলা বোধ হয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, অন্যান্য শিল্পোন্নত দেশগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর জ্বালানী ব্যবহারের বিষয় চিন্তা করেছে এবং কিভাবে সেগুলিকে দক্ষতার সঙ্গে ও সুবিধাজনকরূপে ব্যবহার করা যায় তার উপায় উদ্ভাবন করেছে। দহনের সুষ্ঠু প্রণালী আবিষ্কৃত হয়েছে এবং গ্যাসীকরণ সমস্যা সম্পর্কিত বহু গবেষণা চালানো হয়েছে। পীট, লিগনাইট প্রভৃতি নিকৃষ্ট শ্রেণীর কয়লা দহনের দ্বারা বড় বড় শহরে বিদ্যুৎ সরবরাহের কথা আমরা শুনেছি। অধিকতর চাপ ও উন্নততর জেনারেটর সহযোগে শ্রেয়তর ফললাভের প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দেশে একটি বেদনাদায়ক দৃশ্য আমরা দেখতে পাই যে, উন্মুক্ত অগ্নিকুণ্ডে খোলাভাবে কয়লা পোড়ানো হয়—এর ফলে যে সমস্ত মূল্যবান গ্যাস রাসায়নিক শিল্প উন্নয়নে ব্যবহৃত হতে পারত, অনবধানতায় সেগুলি নষ্ট হয়।

কলিকাতার রাস্তাগুলির উপর এখন সন্ধ্যার সময় যে ঘন ও পুরু ধূম্রজাল ভেসে থাকে তা থেকেই বোঝা যায় যে আমরা আমাদের আচার প্রণালীর দিকে কত কম নজর দিই এবং আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সমস্যাগুলি বৈজ্ঞানিকভাবে সমাধানের আশু প্রয়োজনীয়তা কতখানি।

এখন কয়লা থেকে জলশক্তির দিকে দৃষ্টি ফেরালে আমরা আশাব্যঞ্জক ভাষায় বলতে পারি যে, আমাদের জলবিদ্যুৎ সম্পদগুলি ব্যাপক উন্নয়ন পথের সম্মুখে এসে পৌঁচেছে। দক্ষিণ ভারতে জলশক্তির উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে, পক্ষান্তরে বোম্বাই, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, মহীশূর ও মাদ্রাজে জলবিদ্যুৎ শক্তি উৎপাদনে আমাদের সম্পদগুলির ব্যবহার ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ভাক্রা-নাঙ্গল হীরাকুদ, ও ডি ভি সি পরিকল্পনার কথা আমরা শুনেছি। শক্তি উৎপাদন-উদ্দেশে কোশী ও তিস্তার সমীক্ষা করা হচ্ছে বলেও আমরা শুনেছি।

আমাদের দেশে জলবিদ্যুৎ শক্তির ব্যাপক উন্নয়নের সমর্থনে কোন যুক্তি প্রদর্শনের প্রয়োজন হয় না, তা স্বতঃসমর্থনীয়। অপরাপর দেশের মতো এখানেও আমাদের মনে রাখতে হবে যে একবার বাঁধ ও অন্যান্য স্থাপন সমাধা হবার পর প্রকৃতি-দত্ত সম্পদগুলি প্রতি বছরই আমরা ব্যবহার করতে পারব এবং আমাদের জল সরবরাহ ব্যবস্থা প্রতি বছর বৃষ্টির দ্বারা প্রতিপূরণের ফলে তা চিরন্তন শক্তি উৎসস্বরূপ হবে। যদি কেবল কয়লা বা তেল দহনের উপর আমাদের নির্ভর করতে হত, তাহলে

ক্রমান্বয়ে আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতি অনটন ঘটত। অন্যান্য দেশগুলি কয়লাসম্পদ সম্বন্ধে আন্তরিকভাবে চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে এবং শক্তি উৎপাদনের বিকল্প উপায় গভীরভাবে অনুসন্ধান করছে যার দ্বারা তাদের সম্পদগুলির ক্রমান্বয়ে ক্ষয় প্রতিপূরিত হতে পারবে শেষ পর্যন্ত। এমন কি যে সব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ নয়, যেমন কানাডা, স্ক্যাণ্ডিনেভিয়া সেখানেও ...য়ে জলশক্তির দ্রুত ও সুষ্ঠু উন্নয়নের ...তি নিবিড় মনোনিবেশ করেছে। ভারতীয় ইঞ্জিনীয়াররা কিন্তু বেশী রকম সাবধানী—যে সব জায়গায় জলপ্রবাহ ও জলউৎস আছে সেখানেও তাঁদের প্রায়ই মনে হয় যে, ভারী যন্ত্রপাতি পরিবহনের সমস্যা হচ্ছে জলশক্তি উৎপাদনের পথে শেষ অন্তরায়স্বরূপ

তবে এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ...বার যখন আমরা আমাদের পরিকল্পনাগুলি স্থির করে নেব, তখন কোন ...ই আমাদের নিরস্ত করতে পারবে ...। অন্যান্য স্থানে পরিবহনের সুবিধা ও পথের দুর্গমতার নানাভাবে ...ধান করা হয়েছে।

যেমন মনে করুন, দূরে পাল্লায় ...গ ইউনিটগুলি পরিবহনের পরি-...র্তে আমরা মূলকেন্দ্রে ইউনিটগুলি ...পনের কথা চিন্তা করতে পারি। এ ...ত বিষয়ে প্রাচীন প্রবাদবাক্য 'ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয়' এখনও অনেকাংশে ...জ্য।

সাম্প্রতিক যুদ্ধের সময় আমরা ...ভূত অদ্ভুত ঘটনার কথা শুনেছিলাম ...ন ভারী ভারী যন্ত্রপাতি দুর্গম পার্বত্য ...া অতিক্রম করে পরিবাহিত হয়েছিল ...ং এরকম ঘটনা ভারতের পূর্ব প্রান্তেই ...িছল। যুদ্ধের সময় যদি সংঘবদ্ধ চেষ্টার দ্বারা সাফল্য অর্জন করা যায়, ...িতকালীন পরিবেশে এরকম সর্বাত্মক ...টার কেনই বা অভাব হবে। এরকম চেষ্টা করা হলে দেশের ভবিষ্যৎ ...ন্ধে আমরা চিরকালের মতো ...িশ্চিন্ত হতে পারি। আমি মনে করি, শক্তি উন্নয়নের দিকে আমাদের অধি-...র মনোনিবেশ করা উচিত এবং ...াদের প্রাকৃতিক সম্পদগুলি যতদূর

সম্ভব পরিপূর্ণ ব্যবহারের জন্যে সর্বাত্মক চেষ্টা করা প্রয়োজন।

এটা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, যে কোন ক্ষেত্রে সর্বব্যাপক উন্নয়ন সাধনা করতে হলে অন্যান্য ক্ষেত্রেও অনেক সময় একই সঙ্গে সুনিপুণ উন্নয়ন সাধনের প্রয়োজন হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, আমাদের শ্রমশিল্পের যেমন কাঁচামাল সরবরাহে প্রস্তুত থাকা উচিত কুটিরশিল্পেরও তেমনি ইস্পাত, সিমেণ্ট ও অন্যান্য ধাতু যা প্রয়োজন হবে তা সরবরাহ করতে সমর্থ হওয়া উচিত। অন্যান্য আমাদের যে সম্পদ আছে তা থেকে আমরা আশা করতে পারি যে, একবার আমরা এই বিষয়ে মনস্থির করলে সব কিছুরই সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যাবে।

ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার খসড়া এখন তৈরী হচ্ছে। আমরা আশা করবো, ভারতে জলশক্তির যথোপযুক্ত উন্নয়নের সমস্যা যথাগুরুত্ব ও যত্ন সহকারে বিবেচনা করা হবে তাতে।

আন্তর্জাতিক ক্রিস্ট্যালোগ্রাফী সম্মেলনের প্রতিনিধি হিসাবে সাম্প্রতিক ইউরোপ ভ্রমণকালে আমার দেখার সৌভাগ্য হয়েছিল, ফ্রান্স কিভাবে তার বিদ্যুৎশক্তি উন্নয়নের সমস্যা সমাধান করছে। ফ্রান্সে বিদ্যুৎ শক্তির জাতীয়করণ সাধিত হয়েছে। গত যুদ্ধের পর থেকে সেখানে জলবিদ্যুতের ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে এবং মধ্য ম্যাসিফ, পীরেনিজ, আল্পস্ ও রোন উপত্যকায় জলবিদ্যুৎ পরিকল্পনার বিভিন্ন কেন্দ্রে এত দূর উন্নয়ন সাধিত হয়েছে যে, ফ্রান্স এখন তার মোট বিদ্যুৎ উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫০ ভাগ জলবিদ্যুৎ প্রণালীতে সম্পন্ন করছে। যখন আমরা ফ্রান্সের আয়তন (যা ভারতের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশের সমান), তার অপেক্ষাকৃত কম নদী সংখ্যা ও সেখানকার সাধারণমাত্রার বারিপাতের কথা স্মরণ করি তখন আমরা দেখতে পাই, বুদ্ধিবিবেচনাপ্রসূত পরিকল্পনায় সাফল্য অর্জন করা যায় কতখানি। আমাদের আরও স্মরণ রাখা প্রয়োজন, ফ্রান্সের বাৎসরিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪০,০০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টা (যা হচ্ছে আমাদের বর্তমান উৎপাদন ক্ষমতার প্রায় ১০ গুণ) এবং উৎপাদন পরিমাণের শতকরা ৫০ ভাগ আমাদের দেশের জলবিদ্যুৎ প্রণালীতে পরিকল্পিত উৎপাদন-ক্ষমতার চেয়ে বহু গুণ বেশী।

এইভাবে যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন হয় তা ফ্রান্সের শ্রমশিল্পগুলি পুরোপুরিভাবে ব্যবহার করতে সমর্থ। জলশক্তি দ্বারা শ্রমশিল্পের সকল চাহিদা মেটানো সম্ভব হয়না বলে তাপীয় কেন্দ্রেরও (থার্মাল স্টেশন) ব্যাপক উন্নয়ন একই সঙ্গে করা হয়েছে। কিভাবে একটি প্রগতিশীল দেশ তার অপ্রতুল কয়লা-সম্পদ সংরক্ষণের চেষ্টা করছে এবং কিভাবে জলশক্তির ব্যাপক উন্নয়নে অগ্রসর হয়েছে, তার দৃষ্টান্তস্বরূপই একথা আমি উল্লেখ করলাম।

প্রারম্ভেই আমি উল্লেখ করেছি, সৌরশক্তির নিত্যপ্রবাহ কাজে লাগাতে আমরা কত অক্ষম। আধুনিক উন্নয়নের ধারা-রক্ষায় এত বিপুল পরিমাণ শক্তি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে যে, মানুষ এখন সৌরশক্তিকে (যার অধিকাংশই মহাশূন্যে বিকীর্ণ হয়ে যায়) কাজে লাগাবার অন্যান্য উপায় উদ্ভাবনের চিন্তা করতে আরম্ভ করেছে। সৌরশক্তিকে এমন সুবিধাজনকভাবে আহরণ করা যেতে পারে কিনা যার দ্বারা স্বল্প ব্যয়ের কোন রকম শক্তি-উৎস প্রস্তুত হতে পারে, সেটা এখনও ভবিষ্যতের একটা সমস্যা। তবে এটা একটা বিশেষ আকর্ষণীয় সমস্যা। এখানে উল্লেখ করলে আগ্রহ সঞ্চারিত হবে যে, প্রখ্যাত ভারতীয় পদার্থবিদ্ আচার্য জগদীশচন্দ্র সৌরশক্তিকে কাজে লাগাবার সম্ভাব্য উপায়গুলি বহু পূর্বেই চিন্তা করেছিলেন এবং এটাই বোধ হয় অন্যতম কারণ যার দরুণ পদার্থবিদ্যা থেকে জীব-পদার্থবিদ্যার সমস্যাগুলির প্রতি তাঁর দৃষ্টি বিবর্তিত হয়েছিল। তিনি তাঁর ডায়রীর একটি পাতায় (৫ই মার্চ ১৮৮৫) লিখেছেন—

"আমি দীর্ঘকাল ধরে চিন্তা করছি, বিপুল সৌরশক্তি যা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলগুলিতে অযথা বিনষ্ট হয় তাকে কোন উপায়ে কাজে লাগানো যেতে পারে কিনা। গাছপালারা অবশ্য সৌরশক্তি আহরণ করে। কিন্তু সূর্য থেকে বিকীর্ণ শক্তিকে সরাসরিভাবে কাজে লাগাবার আর কোন উপায় কি নেই? তাপজনিত ক্রিয়াকলাপের সুযোগ গ্রহণ করে সৌর ইঞ্জিন প্রস্তুত করার চেষ্টা হয়েছে—সেটা কিন্তু 'হিট-ইঞ্জিন' ছাড়া আর কিছুই নয়। দুটি ধাতুর একটি সংযোগ-প্রান্তকে উত্তপ্ত করে আমরা তাপবিদ্যুৎ প্রবাহও (থার্মো-ইলেকট্রিক কারেণ্ট) পেতে পারি। কিন্তু এই ধরনের থার্মো-ইলেকট্রিক ব্যাটারীর বিশেষ কোন উপযোগিতা নেই বাস্তবক্ষেত্রে। তাছাড়া পরিবহনের দরুণ শক্তির একটা বিরাট অংশ অযথা নষ্ট হয়ে যায়।

আমি এখন চিন্তা করছি, আলোক-শক্তিকে সরাসরি বৈদ্যুতিক প্রবাহের শক্তিতে আমরা পরিণত করতে পারি কিনা।"

উদ্ভিদ জীবনে ক্লোরোফিলের ভূমিকা তাঁর কাছে সর্বদা আকর্ষণীয় বলে মনে হত। তিনি চিন্তা করেছিলেন, উদ্ভিদ যেভাবে সৌরশক্তিকে ধরে রাখে সে ছাড়া অন্য কোন উপায়ে এই শক্তি আহরণ করে কাজে লাগানো যায় কিনা।

যাই হোক, এই সমস্যা এখনও বহুলাংশে অমীমাংসিত আছে। তবে সম্প্রতি আমেরিকা থেকে এই বিষয়ে সাফল্য লাভের সংবাদ পাওয়া গেছে—ফটো-ভোল্টাইক সেল প্রস্তুতের কাজ বহু দূর অগ্রসর হয়েছে। এই বিষয়ে বিস্তারিত বিবরণের অভাবে প্রকৃত কৃতকার্যতা সম্পর্কে আমি কিছু বলতে পারি না। এই আবিষ্কারের পূর্ণ বিবরণ জানবার জন্যে আমরা সকলে উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।

গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে যেখানে বছরে ২০০ দিনেরও বেশী সূর্যকিরণ পাওয়া যায়, সে সব স্থানে সূর্যকিরণকে কাজে লাগাবার সমস্যা সর্বদাই ঔৎসুক্যের সৃষ্টি করে। কেবলমাত্র শ্রমশিল্পের জন্যেই আমরা সৌরশক্তি ব্যবহার করি না আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বর্ধনের জন্যে আমরা তা ব্যবহার করি। শৈত্যতাপ নিয়ন্ত্রণ ও হিমীকরণের (রেফ্রিজারেশন প্রসঙ্গ আমাদের স্বতঃই মনে পড়ে এবং সেটা আমাদের দেশে যেমন অন্যান্য দেশে তেমনি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংবাদ প্রকাশ, হেলিওস্ট্যাট ও প্যারাবোলয়েড

র্পণের সাহায্যে ১৯৪৬ সালে সোভিয়েট রাশিয়ায় তাসখন্দে হিমীকরণ উদ্দেশে সৌরশক্তি ব্যবহারের প্রচেষ্টা সাফল্য-মণ্ডিত হয়েছে।

৮০ বর্গ মিটার আয়তনের সিমেণ্ট-নির্মিত একটি প্যারাবোলয়েড (যা সূর্যের আহ্নিক গতি অনুসরণকল্পে সম্ভবত ঘোরানো যায়) রূপোর প্রলেপ-দেওয়া কাচের (সিলভারড্ গ্ল্যাস) ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দর্পণ দিয়ে আবৃত থাকে। এইগুলি সূর্যের উত্তাপ একটি বয়লারে ঘনীভূত করে। বয়লারটি আবার একটি হিমীকরণ যন্ত্রের (রেফ্রিজারেটর) সঙ্গে যুক্ত থাকে, যার মধ্যে অ্যামোনিয়া গ্যাস সঞ্চালনের ফলে শৈত্যের সৃষ্টি হয়।

আমরা গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বাসিন্দা বলে এই সংবাদটি আমাদের মনে বিশেষ কৌতূহল সঞ্চার করে। এই ব্যাপারে আমাদের যন্ত্রপাতি নিয়ন্ত্রণের এমন একটা সম্ভাবনার পথ আমরা দেখতে পাই, যার ফলে গ্রীষ্মকাল আমাদের কাছে আর ক্লান্তিকর বোধ না হয়ে সুখদায়ক বলে প্রতিভাত হবে। ভারতের পদার্থবিজ্ঞান মন্দির ব্যবহারোপযোগী কয়েক রকম সৌরচুল্লী এবং ওয়াটার-বয়লার উদ্ভাবন করেছেন। আশা করা যায়, আরও গবেষণার ফলে সৌরশক্তি ব্যবহারের উন্নততর কৌশল আমরা আবিষ্কার করতে পারব।

ফ্রান্সে সুবৃহৎ প্যারাবোলয়েড দর্পণের (যা ফটো-ইলেকট্রিক নিয়ন্ত্রণ কৌশলে সুনিপুণভাবে ঘোরানো যায়) সাহায্যে সৌরশক্তি বিপুলভাবে ঘনীভূত করে অভিনব উপায়ে তা কাজে লাগানো হয়েছে। সংবাদে প্রকাশ—সেখানে সৌর-চুল্লীতে অতি প্রচণ্ড উষ্ণতা উৎপাদন এবং জারকোনিয়াম অক্সাইড ও অ্যালুমিনা প্রভৃতি যে সব পদার্থ অতি উত্তাপেও গলে না, সেগুলিকে সহজে গলানো সম্ভব হয়েছে। ধাতুতাত্ত্বিক কাজেও সেগুলি ব্যবহৃত হয়েছে এবং তার ফলে সুপরিশুদ্ধ কয়েকটি ধাতু পাওয়া গেছে।

শান্তিকালীন কাজে পরমাণুশক্তি ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্পর্কে উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করবো। আমরা শুনেছি, সোভিয়েট রাশিয়ায় ইতিমধ্যে পরমাণুশক্তি-চালিত বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এবং ১৯৭০ সালের মধ্যে ইংল্যাণ্ডে পরমাণুশক্তি-চালিত কেন্দ্র স্থাপনের সম্ভাবনা আছে, যা থেকে অপেক্ষাকৃত কম খরচে শক্তি ও বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। যদিও টেকনিক্যাল ব্যাপারের অনেক কিছুই এখন গোপন রাখা হয়েছে, তবে যতটুকু প্রকাশ পেয়েছে, তা থেকেই বলা যায়, অদূরভবিষ্যতে এরকম উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী সেই সব দেশে, যেখানে পর্যাপ্ত পরিমাণ ইউরেনিয়াম সঞ্চিত আছে।

আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইউরেনিয়ামের কোন বৃহৎ আকর এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি এবং আমরা নিঃসংশয়ে অনুমান করতে পারি, আগামী পঁচিশ বছর পর্যন্ত আমাদের বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্যে প্রাচীন ও গতানুগতিক পন্থা অর্থাৎ বাষ্প এবং ওয়াটার-টারবাইনের উপরই নির্ভর করতে হবে।

তবে এ কথার দ্বারা এই বোঝায় না যে, আমাদের দেশে পরমাণবিক গবেষণায় নিরুৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে কিংবা মাঝারি ধরনের পরমাণু শক্তি উৎসের শান্তিকালীন কাজে ব্যবহারোপযোগী অপর কোন উপায় নেই, যা অদূরভবিষ্যতে ভারতে আমরা গড়ে তুলতে পারি।

সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত পরমাণু-শক্তি সম্মেলনে সমস্ত দিক থেকে এই সমস্যা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং সন্তোষজনকভাবেই বলা যায় যে, আমরা এখন ভালোভাবে আমাদের সীমাবদ্ধতা ও আশু সমস্যাগুলি উপলব্ধি করতে পেরেছি।

এই সংক্ষিপ্ত আলোচনায় আমি শক্তির উৎস সন্ধানে বর্তমান কালের আগ্রহশীলতা দেখাতে চেষ্টা করেছি। অন্যান্য দেশের মতো ভারতেও মানুষ এইরকম উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হয়েছে। এইরকম উন্নয়নের ফলে সাধারণ মানুষের ভাগ্যোন্নতি হবে এবং মূল্যবান ও সুলভ যান্ত্রিক সাহায্য তারা লাভ করতে পারবে। সমাজের পক্ষে তখন সম্ভব হবে প্রত্যেক লোককে পর্যাপ্ত অবসর দেওয়া যাতে তারা পৃথিবীতে মানুষের জীবন সুখ-শান্তিময় করে তোলার উপযোগী মানবীয় বৃত্তি-গুলি বিকাশের সুযোগ পায়। এইরকম কর্মোদ্যোগের পক্ষে অপরিহার্য হ'ল সুলভ শক্তির ব্যাপক উন্নয়ন এবং সাধারণ মানুষের দ্বারে দ্বারে তা পৌঁছে দেওয়া। আমি আশাবাদী এবং বিশ্বাস করি ভারতে এমন সুদিন আসার আর খুব বেশী দেরি নেই। *

---

* বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠাদিবসে প্রদত্ত ভাষণ অবলম্বনে রবীন বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক অনুলিখিত। প্রবন্ধের অন্তর্গত ছবিগুলি শিবব্রত ভট্টাচার্যের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

দূর থেকে দাঁড়িয়ে দেখতে অদ্ভুত ভাল লাগে। শহরের উপকণ্ঠে বড় বড় দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়ার নির্জন ছায়ায় ছোট এক গীর্জা, আর তারই গা-লাগান শ' দেড়েক ছেলেমেয়ের এক 'অর্‌ফেনেজ'। সকালে গীর্জায় প্রার্থনার ঘণ্টা বেজে উঠতেই 'অর্‌ফেনেজ' থেকে ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দল গীর্জার দিকে আসতে থাকে। সাদা ধবধবে পোশাক, চট্‌পটে হাবভাব, এক অদ্ভুত শৃঙ্খলায় তারা সারি বেঁধে চলতে থাকে। চোখে-মুখে উজ্জ্বল দীপ্তি! ওই কচি কচি মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে কল্পনাও করা যায় না, এরা কোনও এক পঙ্কিল রন্ধ্রপথ থেকে কুড়িয়ে আনা জীব, সমাজে অপাংক্তেয়, করুণার পাত্র মাত্র।

গীর্জার বেদীমূলে দাঁড়িয়ে সামনের সারিতে উপবিষ্ট কচি কচি মুখগুলোর দিকে তাকিয়ে ফাদার নিকোলাসের দু' চোখ করুণায় আপ্লুত হয়ে ওঠে। সৌম্যকান্তি গম্ভীর লোক। এতগুলো অসহায় ছেলেমেয়ের একমাত্র প্রতিপালক তিনি। গীর্জার ওই মৌন পরিবেশের মতই পক্ক কেশ আর শ্মশ্রু সম্বলিত মুখখানি স্থির ও গম্ভীর। তবু ওই মুহূর্তে তাঁর মুখখানি যেন অদ্ভুত থমথমে হয়ে ওঠে। নিষ্পাপ শিশু; সমাজের চোখে অবাঞ্ছিত হ'লেও ঈশ্বরের করুণার রাজ্যে অপাংক্তেয় নয়। ছোট বড়োর প্রভেদ নেই, সাদা কালোর পার্থক্য নেই, তাঁর অপার করুণায় সবাই সমান।

প্রার্থনার পর গীর্জার সেই শান্ত পরিবেশে শ' দুই আড়াই শ্রোতার সামনে কথাগুলো বলতে বলতে বৃদ্ধ ফাদার নিকোলাসের দু' চোখ ঝাপ্‌সা হয়ে আসে। অলক্ষ্যে একবার চোখ মুছে সামনের সারিতে কচি কচি মুখগুলোর দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে আবার উদাত্ত কণ্ঠে তিনি বলতে থাকেন,—'ঈশ্বরের অসীম করুণা যে, আমরা তাঁর আশ্রয় পেয়েছি। পঙ্কিল জীবন থেকে কুড়িয়ে আনা ওই নিষ্পাপ শিশুরাও জীবনের রাজপথের সন্ধান পেয়েছে। স্বয়ং যীশুর আবির্ভাব তো আস্তাবলে।'

ডোরা এক কোণে চুপচাপ বসে কথা গুলো শুনছিল। 'অর্‌ফেনেজে'র আয়ু বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। প্রার্থনার প রোজ ওই একই কথা শুনতে শুনতে আ

ায় মুখস্থ হয়ে গেছে। ফাদার নিকোলাস খানে যা' বলছেন, ফাদার রোজারিও ঠিক কথাগুলোই বলতেন। শুধু স্থান আর ালের প্রভেদ।

বহুকালের কথা। তবু আজও ডারার স্পষ্ট মনে পড়ে। দুই ভ্রূ কুঁচকিয়ে সদিনের ছবিটা যেন সে স্মরণ করতে ষ্টা করে। আসামের এক পার্বত্য ঞ্চলে এক বড় টিলার উপর বড় বড় াইন গাছের আড়ালে ছোট এক গীর্জা ার তৎসংলগ্ন এক 'অরফেনেজ'। ছাট একদল ছেলেমেয়ের সঙ্গে এমনি রে হাঁটু গেড়ে বসত ডোরা, আর অবাক য়ে তাকিয়ে থাকত। বৃদ্ধ ফাদার রাজারিও প্রার্থনার পর রোজ বক্তৃতার ঙ্গিতে কি যেন সব বলে যেতেন। অদ্ভুত রুণায় তাঁর দু' চোখ ঝাপসা হয়ে উঠত, ড়দের দু' চোখে নামতো অশ্রুধারা! ছাটদের সে বক্তৃতা বুঝবার কথা নয়, ানের সারিতে ব'সে সঙ্গীদের সঙ্গে বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকত ডোরা। রে অবশ্য বুঝতে পেরেছিল, জানতে পেরেছিল তার কুড়িয়ে আনা শৈশব জীবনের আদি রহস্য। সেই পাপের নুশোচনা জানিয়ে ডোরা প্রার্থনা করত, ভিক্ষে করত ঈশ্বরের করুণা। পরম রুণাময় যীশুর রাজ্যে অবাঞ্ছনীয় তো কেউ নয়!

এখন সেকথা স্মরণ হলেও হাসি পায় ডোরার। বীতশ্রদ্ধায় সমস্ত মন যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। কিন্তু সেদিন ডোরার চোখে সত্য সত্যই অশ্রুর ধারা নেমেছিল। ঈশ্বর মঙ্গলময়। ফাদার রোজারিও তাকে কুড়িয়ে এনে আশ্রয় না দিলে সে আজ কোথায় থাকত? সেকথা ভাবতেও যেন সে শিউরে ওঠে। যীশুর অসীম করুণা যে, সে তাঁর কৃপা লাভ করেছে. জীবনের আঠারোটা বছর এই 'অরফেনেজে' ফাদার রোজারিও'র স্নেহ-চ্ছায়ায় পালিত হয়ে এসেছে।

ফাদার রোজারিও একদিন বললেনঃ মানুষের সেবা, সেও' পরোক্ষে ভগবানেরই সেবা। আমি মিঃ মরিসনকে বলে রেখেছি, তাঁর একটি আয়ার প্রয়োজন।

ডোরা অবাক হ'ল। ফাদার নিকটে এসে সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে আস্তে আস্তে বললেনঃ 'অরফেনেজে'র নিয়মে আর তোমাকে তো রাখা যাবে না, বাছা। এবার থেকে তোমাকে নিজের জীবিকার পথ নিজেকেই বেছে নিতে হবে।'

কথাটা সত্য। আঠারো বছর পার হবার পর আর 'অরফেনেজে' গলগ্রহ হয়ে থাকবার নিয়ম নেই। এরই মধ্যে যাদের বিয়ের পাত্র জুটে গেল, তারা তো সৌভাগ্যবতী। আর যারা কুমারী থেকে যায়, যার যার নিজের পথ বেছে নিতে হয় তাদের। কেউ কেউ লেখাপড়া শিখে সিস্টার হয়ে 'অরফেনেজেই' থেকে যায়। আর যারা ডোরার মতই শুধু মাত্র আশ্রিতা, তাদের জীবনের দীর্ঘপথ জটিলতায় ভরা। কেউ খুঁজে নেয় আয়ার কাজ, কেউ বা হয় পাচিকা।

অগত্যা ডোরা রাজী হয়। গীর্জাটা থেকে চার পাঁচ মাইল দূরে এক চা-বাগানের ম্যানেজারের বাংলোয় আয়ার কাজ। সাহেব আর মেম-সাহেবকে পূর্বেও দেখেছে ডোরা। ছোট্ট এক শিশুকে নিয়ে তাঁরা প্রতি রোববার গীর্জায় আসতেন। এতটুকু ছেলেকে দেখাশুনা করা তেমন আর কঠিন কাজ কি?

তবু প্রথমদিনই এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হ'ল ডোরাকে। মিসেস্ মরিসন তীক্ষ্ণ ভ্রূকুটিতে ডোরার আপাদ-মস্তক নিরীক্ষণ করে বললেনঃ তুমি কি উইডো?

—না।

—বিবাহিতা?

—না।

মিসেস্ মরিসনের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি আরো সতর্ক হয়ে ওঠে। ডোরার কালো নিটোল দেহটার দিকে বার বার দৃষ্টি বুলিয়ে কেমন বিরক্ত হয়ে ওঠেন। তারপর বলেনঃ তোমাকে দিয়ে তো হবে না বাছা।

ডোরা শঙ্কিত হয়ে ওঠে। মিসেস্ মরিসনের দু' পা জড়িয়ে ধ'রে ব'লে ওঠেঃ আমায় তাড়িও না, মেম-সাহেব। আমি এ কাজ খুব পারব। তোমার ছেলেকে খুব যত্ন করব।

মিসেস্ মরিসন আবার ভ্রূ কুঞ্চিত করেন। কিন্তু মনে মনে কি যেন অনুমান ক'রে সে যাত্রা ডোরাকে রেহাই দেন। তবু একটা সন্দিগ্ধ দৃষ্টি যে আড়াল থেকে প্রতিক্ষণ সজাগ হয়ে থাকত. ডোরা তা' স্পষ্ট অনুভব করত। কারণটা অস্পষ্ট; কিন্তু মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠত ডোরা।

দিন কয়েকের মধ্যেই ব্যাপারটা স্পষ্ট বুঝতে পারে ডোরা। এক আরক্তিম লজ্জায় যেন সে আড়ষ্ট হয়ে ওঠে। মিসেস্ মরিসন বলেনঃ তুমি বাছা, ভেতরেই রান্না-বান্না নিয়ে থেকো, সাহেবের যখন যা' প্রয়োজন, বেয়ারা চাপরাশীরাই দেখাশুনা করবে।

ডোরা যেন আরো সংকুচিত হয়ে যায়। সে তো প্রায় আড়ালে আড়ালেই থাকে। এত বড় বাংলোটাতে মুষ্টিমেয় কয়টা লোকের মধ্যে কোথায় যে সে লুকিয়ে থাকে, তা' বুঝি জানতেও পারা যায় না। কিন্তু মিঃ মরিসনের দৃষ্টি আরো তীক্ষ্ণ। শিকারীর মতই তাঁর দৃষ্টি শাণিত। মিসেস্ মরিসন শঙ্কিত হ'ন। গ্রীষ্মের সময়টা তিনি প্রায়ই 'হোমে' চলে যান। এদেশের গরমের আঁচ তাঁর সহ্য হয় না। তা' ছাড়া তিনি নিজে সন্তান-সম্ভবা। সন্তান হবার পরও পুরো একটা বছর তাঁকে দেশেই কাটাতে হবে। এদেশের জলবায়ু ঠিক অনুকূল নয়, গরমের আঁচে ছেলেপুলের গা'য়ের রংটাও যেন তামাটে হয়ে যায়। তাই এই সতর্কতা। কিন্তু সঙ্গে মিঃ মরিসনের যাবার উপায় নেই। অমনিতে লোকটি ভালই. বরং একটু বেশী ভাল। এদেশের নেটিভগুলোর সঙ্গে মেলামেশা করতে যেন রুচিতে বাধে না। মিসেস্ মরিসন যদ্দিন এখানে থাকেন, তদ্দিন অবশ্য রাশ টেনে রাখেন। কিন্তু তাঁর অবর্তমানে লোকটি একা একা কি করে কে জানে? অবশ্য বিশ্রী একটা কিছু নিশ্চয়ই হয় না। তবু পুরুষ মানুষকে সে কথা কি মুখ ফুটে বলা যায়? তাই 'হোমে' যাবার আগে তিনি ডোরাকে ডেকে বার বার সতর্ক ক'রে দিয়ে বললেনঃ তুমি বাছা, তোমার কাজ নিয়েই থেকো। যদি বাড়াবাড়ি কিছু জানতে পারি, তবে লাথি মেরে তাড়িয়ে দেব।

লজ্জায় ডোরা সংকুচিত হয়ে ওঠে। কথাটার অব্যক্ত ইঙ্গিত তার নিকট অস্পষ্ট থাকে না। মেম-সাহেব চ'লে যেতেই সে যেন আরো আড়ালে ডুবে যায়। এতবড় বাংলোটাতে ডোরার অস্তিত্বও যেন খুঁজে পাওয়া ভার। কিন্তু মিঃ মরিসনের লুব্ধ দৃষ্টি ক্রমেই তীক্ষ্ণতর হয়ে উঠছে। এক

অব্যর্থ জালের ফাঁদে ভীতা হরিণীর মতই যেন ডোরা পালাবার পথ পায় না।

একদিন লুকিয়ে এসে ডোরা ফাদারকে বলেঃ ওখানে আর চাকরি করবো না, ফাদার।

ফাদার রোজারিও বিস্মিত হ'ন। কেন?

কথাটা স্পষ্ট মুখ ফুটে বলা যায় না। কেমন একটা লজ্জায় ডোরা যেন আরক্তিম হয়ে ওঠে। তারপর খানিকটা সংকোচের সঙ্গে আস্তে আস্তে বলেঃ

—সাহেবের ব্যবহার আমার ভাল লাগছে না।

ফাদার ভ্রূ কুঞ্চিত করেন। মেয়েটার আস্পর্ধা দেখে অবাক হয়ে যান। একটা ধমকের স্বরে তিনি বলে ওঠেনঃ এমন কথা ভবিষ্যতে আর কখনো মুখে এনো না।

ডোরা চুপ। নিজের কথাটার মধ্যেই একটা লজ্জাকর ইঙ্গিত যেন অত্যন্ত প্রকট হয়ে উঠেছে। মুহূর্তের জন্য ফাদারের দিকে মুখ তুলে তাকাতেও সাহস পায় না সে। মাথা নীচু করেই আস্তে আস্তে এক সময় বেরিয়ে আসে।

তারপর ডোরা বহুদিন আর ওমুখো হয়নি। এতদিনের ঘটনা যেন এক দুঃস্বপ্ন মাত্র। পুরো একটা বছর পর ডোরা একদিন সন্ধ্যার আঁধারে গা' ঢাকা দিয়ে চুপি চুপি চার্চে এসে উপস্থিত হ'ল।

ফাদার রোজারিও সান্ধ্য-প্রার্থনার পর সবেমাত্র বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। এমন সময় হঠাৎ কি যেন দেখে চমকে উঠলেন। মুহূর্তে তাঁর চোখ মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠল। পরক্ষণেই দু' হাত বুকের উপর আড়াআড়িভাবে ক্রুশবন্ধ ক'রে অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠলেনঃ ভগবান! এদের তুমি ক্ষমা করো!

ডোরা ভয়ে তখনো কাঁপছিল। কোলে বস্ত্রাঞ্চলে ঢাকা নবজাত শিশুটা একবার যেন কেঁদে উঠল। ধবধবে সাদা রং। ডোরার কালো দেহটার সঙ্গে অদ্ভুত বেমানান। এ কলঙ্কের লজ্জা ডোরা লুকোবে কোথায়? লজ্জায় ও ধিক্কারে সে যেন মিশে যেতে চাইল।

ফাদার বললেনঃ কবে হ'ল?

—পরশু।

ডোরা এবার মুখ তুলে তাকাল। ফাদারের দু' চোখ তখন করুণায় ভরে উঠেছে। তিনি বললেনঃ ঈশ্বরের দান। যীশুর করুণার রাজ্যে অবাঞ্ছিত কেউ নয়।

এবার ডোরা যেন ভেঙ্গে পড়ল। ফাদারের পা' জড়িয়ে ধ'রে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বললেঃ আমাকে বাঁচান। আমি আর সেখানে যাব না, ফাদার।

মুহূর্তে রোজারিও যেন আরেক মানুষ হয়ে যান। দু' চোখ ভ্রূকুটি হেনে পা'টা টেনে নিয়ে বলে উঠেনঃ যাবে না তো দাঁড়াবে কোথায়? পথে? ব্যভিচারিণীর স্থান এ গীর্জায় হবে না।

ডোরা যেন অবাক হয়ে যায়। পরক্ষণেই এক অদ্ভুত মনোভাব নিয়ে সে উঠে দাঁড়ায়। লজ্জা নয়, ঘৃণাও নয়, মুহূর্তে মোহভঙ্গের মতই সে যেন সজাগ হয়ে ওঠে।

এর পর থেকে নিজেকে যেন সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয় ডোরা। এতটুকু ইচ্ছা নেই, অভিযোগ নেই, এক অদ্ভুত নির্লিপ্ততায় দিনের পর দিন কলঙ্কের পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জ হয়ে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেলে। চেতনা ব'লেও বুঝি কিছুমাত্র অবশিষ্ট নেই। এক-একবার মিসেস্ মরিসন সন্তান-সম্ভবা হ'য়ে 'হোমে' চলে যান, বছরের ব্যবধানে ডোরা এসে তার কলঙ্কের ভার চার্চে যীশুর নামে উৎসর্গ করে দিয়ে যায়। ফাদার রোজারিও তেমনি দু' চোখ কুঞ্চিত করেন, যথারীতি দু' হাত বুকে আড়াআড়িভাবে ক্রুশবন্ধ করেন। ঈশ্বরের দান; নিষ্পাপ শিশু। যীশুর করুণার রাজ্যে বেঁচে থাকবার অধিকার সবারই আছে। 'অরফেনেজে' একের পর এক শিশুর সংখ্যা বেড়ে ওঠে।

একবার মিঃ মরিসন এক অদ্ভুত প্রস্তাব করেন।

শুনে ডোরা শিউরে উঠে। পঞ্চম সন্তান আসবার পূর্বে মিঃ মরিসন 'হোমের' ডাকে চিঠিটা পান। মিসেস্ মরিসন নাকি শীঘ্র চলে আসছেন। সেখানে হঠাৎ যুদ্ধের হিড়িক পড়ে যাওয়ায় ইণ্ডিয়াই এখন নিরাপদ। কিন্তু বিপদ দেখা দিল মিঃ মরিসনের মনে। আসন্ন-প্রসবা ডোরাকে নিয়ে তিনি বিপদ গুণলেন। বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসব ছোট-খাটো ব্যাপার অবশ্য সামান্য খেয়াল ছাড়া আর কিছু নয়। পথে-প্রবাসে রেস্ট ক্যাম্পের বিশ্রাম-ভোগের মতই ক্ষণিক বিলাস। কিন্তু মিসেস্ মরিসনের কাছে এর কৈফৎ নেই। তা' ছাড়া নিজের মান-সম্ভ্রমের ভয়ও আছে।

উপায়ান্তর না দেখে তিনি আবার ডোরাকে বললেনঃ

—হাসপাতালে ব্যবস্থা করে দিচ্ছি, সেখানেই এর একটা কিছু করে ফেল।

—না।

—না? তীক্ষ্ম স্বর মিঃ মরিসনের। জান, পরের জাহাজেই মেম-সাহেব আসছেন?

—জানি। দুরন্ত আবেগে ডোরার যেন কণ্ঠরোধ হয়ে আসে। প্রতিবাদের বোবা-কান্নায় সে বুঝি ভেঙ্গে পড়বে। দ্রুত পালিয়ে গিয়ে ও বাঁচে।

কিন্তু পালিয়েও নিষ্কৃতি নেই। ছায়ার মত অনুসরণ করে লোকটি। দিনের পর দিন তার পিছনে থেকে তাকে যেন পাগল করে তুলবে। ঘৃণায় বিদ্রোহী হয়ে উঠে ডোরার মন। হোক কলঙ্কিত, তবু তো তার সন্তান!

এদিকে মাত্র কয়টা দিন বাকী। দেশ থেকে আবার চিঠি এসেছে, মিসেস্ মরিসন নাকি প্লেনেই আসছেন। মিঃ মরিসন চঞ্চল হয়ে ওঠেন। দেরি করবার আর উপায় নেই।

—আর দু'দিন মাত্র বাকী।

—জানি।

হঠাৎ মরিসন কি ভেবে ডোরার একটা হাত চেপে ধ'রে ফিস্ ফিস্ ক'রে বলেনঃ যদি কিছু টাকা চাও, তা'ও দেব।

একটা হেঁচকা টানে নিজেকে মুক্ত ক'রে নেয় ডোরা। ঘৃণায় তার চোখ মুখ কুঞ্চিত হয়ে উঠে। বিকৃত কণ্ঠে বলেঃ টাকা আমি চাই না।

—কিন্তু এদিকের ব্যবস্থাটা?

—হবে।

—আজ?

—হ্যাঁ।

যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন মিঃ মরিসন। খানিকটা অন্তরঙ্গভাবে আবার বলেনঃ আমি তবে ওদিকের ব্যবস্থা ঠিক করে রাখব। রাত দশটার পর গাড়ি প্রস্তুত থাকবে। মনে থাকে যেন।

কোন উত্তর না দিয়ে ডোরা এড়িয়ে য়। কিন্তু এড়িয়ে গিয়েও উপায় নেই। রাদিন ব'সে ব'সে ডোরা সে কথাই াবছিল। পালিয়েই যাবে সে। রাত শটার পূর্বেই এ আশ্রয় থেকে তাকে ালাতে হবে। কিন্তু কোথায়? সেই র্ফেনেজে? কলঙ্ক নিয়ে সেখানেও ার স্থান নেই। কিন্তু এক অদ্ভুত ংকল্পে যেন তার মন দৃঢ় হয়ে উঠে। া থাক স্থান, ভিখারীরও তো একটা াশ্রয় আছে। লোকের দুয়ারে ভিক্ষে রবে সে, এতবড় দুনিয়াটাতে তার কটিমাত্র সন্তানকে নিশ্চয় বাঁচিয়ে াখতে পারবে......।

যত হিজিবিজি চিন্তায় রাত দশটা য় কখন পেরিয়ে গেছে, ডোরা তা' লক্ষ্যই রেনি। একটা গোপন চক্রান্তের লগ্ন হেক্ষণ পূর্বেই পার হয়ে গেছে, পালিয়ে য়ে আত্মরক্ষার শুভসংকল্পের সময়ও ুঝি আর নেই।......আকাশপথে মিসেস্ রিসন হয়ত কলকাতা পর্যন্ত পেঁছে গেছেন। ট্রেনে চেপে এ পথটুকু চলে াসতে আর কতক্ষণ? হয়ত আজ াতটাও পোহাবে না—।

হঠাৎ এক সময় ঘরের বন্ধ দরজাটা সশব্দে খুলে যায়। জ্বলন্ত অঙ্গারের মত দু'টি জ্বল্ জ্বলে চোখ তুলে ধ'রে চাপা গর্জনের স্বরে মিঃ মরিসন বলেনঃ শয়তান মেয়ে। পেটে পেটে এত বদ্‌মাশি? আমাকে বিপদে ফেলতে চাও?

ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়ায় ডোরা। অন্ধকারে দু'টি হিংস্র চোখের তারায় চোখ পড়তে যেন শিউরে উঠে! কিন্তু মুহূর্ত মাত্র। পরমুহূর্তেই পেটে আচম্‌কা এক লাথির আঘাতে ছিট্‌কে পড়ে যায়।

* * *

চার্চের চারপাশটায় ঝাপ্‌সা আলো ফুটে উঠেছে। বড় বড় পাইন গাছগুলোর ডালপালায় তখনো রাতের নীরবতা। চারদিক নিস্তব্ধ। দিনের আলো ফুটে উঠতে আর সামান্য দেরি।

ফাদার রোজারিও নিরিবিলিতে প্রভাতের প্রার্থনা সেরে সবেমাত্র বাইরে এসে দাঁড়িয়েছেন। অকস্মাৎ সম্মুখে ভূত দেখবার মতই আঁৎকে উঠলেন। পরক্ষণেই নিজকে সামলিয়ে নিয়ে মৃদু হেসে বললেনঃ

—কবে হ'ল?

—কাল রাতে।

ফাদার আবার যথারীতি দু' হাত বুকে আড়াআড়িভাবে ক্রুশবদ্ধ ক'রে গদ্‌গদ্ কণ্ঠে ব'লে উঠলেনঃ নিষ্পাপ শিশু; ভগবানের দান। তাঁর করুণার রাজ্যে অবাঞ্ছিত কেউ নয়।

তারপর দু' হাত বাড়িয়ে ডোরার কোল থেকে নবজাতকটিকে তুলে নিতে গিয়ে অকস্মাৎ তিনি অদ্ভুতভাবে চম্‌কে উঠলেন—'মরা?'

ডোরার ওষ্ঠ দু'টি যেন একবার কেঁপে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে অদ্ভুত নির্বিকারভাবে বললঃ পেটেই মরে গিয়েছিল। 'বেরিয়্যালের' জন্য নিয়ে এসেছি।

* * *

ডোরা একবার মুখ তুলে তাকাল। এতকাল পর তার দু' চোখ বেয়ে যেন বন্যা নেমেছে। নিজকে বুঝি সামলাতে পারবে না! সমস্ত হলটা নিস্তব্ধ। শুধু বেদীমূলে দাঁড়িয়ে ফাদার নিকোলাস তখনো উদাত্ত কণ্ঠে বলে চলেছেন— ভগবান তুমি এদের ক্ষমা করো। এরা জানে না, এদের পাপের সঞ্চয় কত!

কবি জীবনানন্দ

সবিনয় নিবেদন,

ট্রাম দুর্ঘটনায় জীবনানন্দ দাশ মারাত্মক আঘাত পেয়েছেন শুনে সঙ্গে সঙ্গে তাঁর একটি কবিতার কয়েকটি পঙ্‌ক্তি আমার মনের মধ্যে তোলপাড় করে উঠেছিল :

বিশ্বাস স্পর্শ অনুভব ক'রে হাঁটছি আমি।
কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে—
কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো
এই যে ট্রামের লাইন ছড়িয়ে আছে
পায়ের তলে, সমস্ত শরীরের রক্তে এদের
বিস্বাদ স্পর্শ অনুভব ক'রে হাঁটছি আমি।
(ফুটপাথে ঃ মহাপৃথিবী)

শহরের যানবাহন জীবনানন্দ দাশের কোনো দিনই পছন্দ হয়নি এবং তাদের সঙ্গে বরাবরই তিনি দুর্ঘটনাকে ওতপ্রোত ব'লে ভেবেছেন ঃ

এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে
অস্থির পেট্রল ঝেড়ে; সতত সতর্ক
থেকে তবু

কেউ যেন ভয়াবহভাবে প'ড়ে গেছে জলে।
(রাত্রি ঃ শ্রেষ্ঠ কবিতা)

ইন্‌ট্যুইশন বা সজ্ঞাদৃষ্টি জীবনানন্দের কাব্যে পরিব্যাপ্ত; নিজের মৃত্যুর কারণটাও তিনি আগে থেকে লক্ষ্য করতে পেরেছিলেন ব'লে মনে হয়। —অরুণকুমার সরকার

ছদ্মনাম

মহাশয়,

'নখদর্পণে' উত্তমপুরুষ অতি খাঁটি কথা বলেছেন ঃ 'আমাদের দেশে সাহিত্যিকদের নামও খবরের কাগজে ছাপা হয় দু'বার, কোনও পুরস্কার প্রাপ্তি ঘটলে বা ভবলীলা সাঙ্গ হলে'।' আমরা (বিশেষত যাঁরা কলকাতা হ'তে দূরে থাকেন) অধিকাংশ নূতন লেখকের কোন পরিচয় জানি না। আজকাল ছদ্মনামের আড়ালে লেখারও একটা বেশ হিড়িক পড়ে গেছে এবং অধিকাংশ ছদ্মনামের লেখকই বেশ চমকপ্রদ লেখা লেখেন। সেজন্য তাঁদের পরিচয় সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহলও বেড়ে উঠে।

প্রত্যেক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় 'লেখক-পরিচিতি'র মাধ্যমে লেখকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। ইতি— শ্রীসুশীল সামন্ত, সিংভূম।

'নূতন ঘর' না 'বাপের বাড়ী'?

প্রিয় মহাশয়,

৪ঠা ডিসেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীমণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত লিখিত "দুর্গা মূর্তির আধুনিক রূপ" লেখাটি পড়িলাম। ৩২৬ পৃষ্ঠার ফুট নোটে 'নাঈয়র' শব্দটি সম্বন্ধে লেখা হইয়াছে—বিক্রমপুরের "নাঈয়র" শব্দ হিন্দী 'নূতন ঘর' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। কিন্তু হিন্দীতে নৈহর বলিয়া একটি শব্দ আছে যাহার অর্থ 'পিতৃ-গৃহ'—কথ্য বাংলায় 'বাপের বাড়ী'। মনে হয় লেখক উল্লিখিত "ভগবতী নাঈয়র যাইব গো বাপ-ভাইয়ের বাড়ী"তে 'নাঈয়র ঐ নৈহর' শব্দেরই বিকৃত বা পরিবর্তিত রূপ। ইতি— সবিতা বসু, মেদিনীপুর।

ট্রামে-বাসে

ভারতে চর্মশিল্পের বেশ উন্নতি হইয়াছে বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম।—"আমাদের চামড়া যে

বেশ মজবুত এবং টেকসই বিশ্বের বাজারে এ সুনাম চিরকালই ছিল, এখনো আছে" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

প্রস্তাবিত ব্যাংক ধর্মঘট আপাতত স্থগিত রাখা হইয়াছে শুনিয়া সর্বসাধারণ স্বস্তি বোধ করিয়াছেন।—"তবে সাম্প্রতিক লেন-দেন দেখে সর্ব-সাধারণ একথাও বুঝে নিয়েছেন যে, সরকারের ব্যাংক-'ব্যালেন্স্' বড়ই কম"—মন্তব্য করিলেন খুড়ো।

* * *

পার্লামেণ্টের মহিলা সদস্যারা নাকি মন্তব্য করিয়াছেন যে, হিন্দু বিবাহ এবং বিচ্ছেদ আইন মূলত ভালো হইলেও ইহাদ্বারা মহিলাদের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভের কোন সুবিধাই হইবে না।—"তবে কি তাঁরা বিয়েটা একদম উঠিয়ে দেবার কথাই ভাবছেন"—প্রশ্ন করেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

আন্তর্জাতিক রোটারি ক্লাবের ডাইরেক্টর তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে মন্তব্য করিয়াছেন যে, মানুষ শুধু রুটি নিয়ে বাঁচতে পারে না—"তা সত্যি পারে না, কারুর রুটির সঙ্গে মাখন চাই, কারুর কিছু ভাত ঐ সঙ্গে না খেলে পেট ভরে না, আবার একথাও শুনেছি, রুটির বদলে বেয়োনেট্ নাকি কারুর পছন্দ"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

বক্সি গোলাম মহম্মদ বলিয়াছেন যে, পাকিস্তানে কাশ্মীরীর স্থান নাই। বিশুখুড়ো বলিলেন—"কাঁথা নিয়ে যারা মেতে আছে তারা কাশ্মীরীর কদর কী-ই বা বুঝবে"!!

* * *

নাট্যাচার্য শিশিরকুমার তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, জাতি যেখানে জীবন্ত সেখানে নাট্যশালাও প্রাণবন্ত এবং যেখানে নাট্যশালা নাই সেখানে জাতিও নাই।—"সিনেমা যদি থাকে আর হাউস ফুলের আগে যদি টিকিট মেলে তাহ'লে জাতির তোয়াক্কা কে রাখে"—মন্তব্য করিল জনৈক কিশোর সহযাত্রী।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম, কলিকাতা কর্পোরেশান নাকি বস্তি-উন্নয়ন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ।—"একথা সংবাদ পাঠ করার আগেই আমরা জানতাম, কর্পোরেশান মট্কা মেরে পড়েছিলেন বই তো নয়"—বলে শ্যামলাল।

* * *

করাচীর নয়টি রাজনৈতিক এবং ধর্ম-প্রতিষ্ঠান এক বিবৃতিতে এই বলিয়া শাসাইয়াছেন যে, মিশর সরকার যদি মুসলিম ভ্রাতৃসঙ্ঘের প্রতি তাদের চণ্ডনীতি না থামান, তাহা হইলে তাঁহারা রাষ্ট্রপুঞ্জে গিয়া ইহার বিচার প্রার্থনা করিবেন। সংবাদে এই কথাও জানা গেল, তাঁহারা এই ব্যাপারে পাক্ গভর্নর এবং প্রধানমন্ত্রীর নিকট একটি ডেপুটেশান পাঠাইবেন।—"আমরা বলি, ডেপুটেশানটাই ভালো। রাষ্ট্রপুঞ্জ অনেকদূর সুতরাং দৌড়টা পাক্‌মন্ত্রী তক্ হলেই ideal distance হয়"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

পাটনাতে অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীরা একটি বানপ্রস্থ সমিতি স্থাপন করিয়াছেন।—"বনং ব্রজেৎ" যখন আর সম্ভব নয় তখন লোকালয়ের বানপ্রস্থই প্রশস্ত। কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সাম্প্রতিক পদোন্নতি দেখে বানপ্রস্থ

সমিতির ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে খুব আশান্বিত হ'তে পারছিনে"—বলিলেন বৃদ্ধ খুড়ো।

* * *

সুইডিস দলের আলমাম্না ফুটবল টীম মোহনবাগানের সঙ্গে প্রথম খেলায় তিন—এক গোলে জয়লাভ করিয়াছেন। সংবাদে শুনিলাম, এক মাম্না ছাড়া মোহনবাগানের কোন খেলোয়াড়ই ভালো খেলিতে পারেন নাই।—"উনি আলমাম্না না হলেও শুধু মাম্না তো বটেন, তাই মন্দের ভালো খেলা তিনিই খেলেছেন"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

রাশিয়ার শল্য চিকিৎসকরা শুনিলাম তাঁদের কৃতিত্বের বলে কুকুরের দেহে অতিরিক্ত একটি মস্তক সংযোজন

করিতে সমর্থ হইয়াছেন।—"চিকিৎসা সাহায্য ছাড়াই অনেকের ঘাড়ে একাধিক মাথা গজাতে আমরা দেখেছি। মাথার ভেতর মস্তিষ্ক সংযোজনায় শল্যচিকিৎসকগণ কতটা কৃতী সেইটেই হ'লো বড় এবং ভাববার কথা"!!
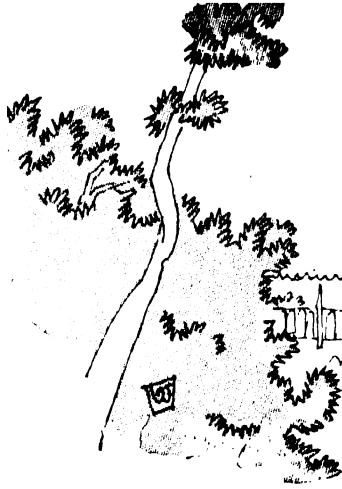
ব্যারিস্টারের বাবু (২)

শংকর

টেলিফোনে খবর এসেছে। ভয়ঙ্কর খবর। সেকথা ভাবলে আজও কাদার বুকের ভিতর কেমন ক'রে ওঠে। নওয়ারীবাবুর সায়েব আর এ জগতে ই। হার্টফেল, বেলা সাড়ে দশটায়। গ্নির মত খবর ছড়িয়ে পড়ছে, এতবড় রিস্টারের আকস্মিক মৃত্যু।

সেদিনের দৃশ্য আজও ছোকাদা খের সামনে দেখতে পাচ্ছেন। নওয়ারীবাবুর বিশাল দেহ কয়েক হূর্তের জন্য কেঁপে উঠল, ম্যালেরিয়া র আসার আগে রোগীর যেমন হয়। রপর তিনি হঠাৎ লুটিয়ে পড়লেন ঝেতে। মেঝের ধুলোয় বানওয়ারী-রের গিলেকরা পাঞ্জাবী লুটোতে লাগল। াই ছুটে এল, বানওয়ারীবাবু জ্ঞাহীন।

বানওয়ারীবাবুর অবস্থা বর্ণনায় কাদা একটা উপমা দিয়েছিলেন। সে পমায় সূক্ষ্ম রসবোধ কিছু না থাকলেও ক চিন্তা করেও তার থেকে ভাল কিছু জে পাচ্ছি না। ছোকাদা বলেছিলেন, জা মরলে রাণীর যেমন হয়। রাজার র্তমানে রাণীকে কে চিনবে? সোনার ংহাসনে আর স্থান হবে না রাণীর।

বানওয়ারীবাবুর সংজ্ঞাহীন দেহটা নক্রমে গাড়িতে চড়িয়ে বাড়ি পাঠান লো। বিদায় বানওয়ারীবাবু, বিদায়। কাল থেকে হাইকোর্টে কে তোমায় চিনবে? কোন্ এটর্নি বলবে, 'ব্রীফ পাঠাচ্ছি, দেখবেন।' কোন্ বাবু সসব্যস্ত হয়ে ও'র জন্যে বেঞ্চিতে জায়গা ক'রে দেবে?

"সেদিন আমার মনে কিরকম ভয় হ'লো। শুধু মনে হ'তে লাগল, সেন সায়েবও যদি......" ছোকাদা দোতলা থেকে উঠোনের দিকে উদাস নয়নে চেয়ে ফেলে-আসা জীবনের কথা বলছিলেন। সেদিনের কিশোর ছেলেটি আর ব'সে থাকতে পারল না, নিজের অজান্তেই কোন এক সময়ে সে বার লাইব্রেরীর ভিতর ঢুকে পড়েছে। দূরে সেন সায়েব বই পড়ছেন, একমনে বই পড়ছেন। মোটা ফ্রেমের চশমায় সেন সায়েবকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে। তার নিজের সেন সায়েব, বয়স খুব কম। এখনও অনেকদিন কাজ করবে তবু ছোকাদার মন প্রবোধ মানে না। ছোকাদা খুব কাছে এগিয়ে যায়। তারপরের কথা ভাবতে ছোকাদার আজও লজ্জা হয়। ছোকাদার হাত নিজের অজান্তে সেন সায়েবের দেহ স্পর্শ করেছে, না কোন ভয় নেই। উষ্ণ রক্ত সেন সায়েবের ধমনীতে বয়ে যাচ্ছে। সেন সায়েব চমকে উঠে পিছনে চাইলেন। "কি ব্যাপার কানাই।" লজ্জায় ছোকাদার মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছা করল। এই জঘন্য ব্যবহারের কি যুক্তি দেবেন? কিন্তু ভগবান মুখে কথা যুগিয়ে দিলেন। "না স্যার, একটা পিঁপড়ে ঘুরছিল।" সেন সায়েব বিশ্বাস করলেন, ছোট ছেলের মত হেসে বললেন, "আজকে তুমি যেতে পার, কোর্ট তো বন্ধ থাকবে। সকাল সকাল বাড়ি তো রোজ যেতে পার না।"

বানওয়ারীবাবু মাইনে এমন কিছু পেতেন না। কিন্তু ছোকাদার ভাষায়, "জ্বরে কি আসে যায়, পিলেয় মেরে দেয়।" অনেক টাকা তহুরী পেতেন। তহুরী এক মজার জিনিস। ব্যারিস্টারের বাবুদের তহুরী হাইকোর্টের আদি থেকে চলে আসছে। তহুরীর সোজা অর্থ বখ্‌শিশ্‌। ব্যারিস্টার যত মোহর নেবেন তাঁর বাবুর তত টাকা প্রাপ্য। অর্থাৎ ব্যারিস্টার ত্রিশ মোহর পেলে বাবু ত্রিশ টাকা পাবেন। তহুরীর কোন আইন নেই, তবে প্রথা হিসেবে অনেকদিন ধ'রে চ'লে আসছে।

আজকাল তো তহুরী আদায় করতে মাথায় রক্ত উঠে যায়। সায়েবরাও কোনো সাহায্য করেন না। তখন অন্যদিন ছিল। উডরফ সায়েব মস্ত ব্যারিস্টার। এক এটর্নি তাঁকে ব্রীফ পাঠাল। ফী ঠিক হয়ে গেল কিন্তু তহুরী? সায়েব এটর্নি জানালেন, তহুরী দেওয়াটা ওদের প্রথা নয়। উডরফ সায়েবও কম যান না, ব্রীফ ফেরত পাঠিয়ে লিখে দিলেন,

"দুর্ভাগ্যক্রমে বাবুকে তহুরী না দিলে ব্রীফ গ্রহণ করা আমারও প্রথা নয়।" এটর্নি তহুরী দেবার জন্য ছুটে এলেন।

ছোকাদা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, "সে রামও নেই, সে অযোধ্যাও নেই।"

উডরফ সায়েবের বাবু দীনদয়াল অনেক ব্যারিস্টারের চেয়েও বেশী রোজগার করতেন। দীনদয়ালবাবু গম্ভীর প্রকৃতির লোক, পারতপক্ষে কথা বলতেন না। তিনি বেঞ্চিতেও বসতেন খুব কম। তিনি কখনও আসতেন ধুতি চাদর পরে, কখনও বা কালো চোগা-চাপকান চাপিয়ে, খানদানি মুসলমান যুগের সাজে। চোগা-চাপকান আজকাল বড় চোখে পড়ে না। বার লাইব্রেরীর কেদারবাবু এখনও চোগা-চাপকানের ঐতিহ্য বজায় রাখবার চেষ্টা করছেন।

"দীনদয়ালবাবুর ব্যাপার শুনলে তোমরা চমকে যাবে", ছোকাদা বলতেন, "উকিল এটর্নি তো দূরের কথা, বড় বড় ব্যারিস্টারদের পর্যন্ত তিনি তোয়াক্কা করতেন না।"

দীনদয়ালবাবু সে যুগে জুড়িগাড়ি চড়তেন, তাজা বাঘের মত দুটো ঘোড়া সে গাড়ি টানতো। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের মোড়ে তাঁর কোচ্‌ম্যান পা দিয়ে ঘণ্টা বাজিয়ে লোক সরাতো, পিছন থেকে সহিস লাফ মেরে মাটিতে নেমে দরজা খুলে দিতেই দীনদয়ালবাবু ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতেন হাইকোর্টের ভিতর। এই কলকাতা শহরেই কয়েকখানা বাড়ি করে-ছিলেন উড্‌রফ সায়েবের বাবু।

সেই দীনদয়ালবাবুও একদিন জুড়ি-গাড়ি ছাড়লেন। দীনদয়ালবাবুর জুড়ি-গাড়ি ত্যাগের গল্প ছোকাদা খুব ধীরে ধীরে রসিয়ে আমাদের বলেছিলেন, তবে সে গল্পের কতটুকু সত্যি তা বলতে পারব না। গল্পের ঝোঁকে ছোকাদা সে-কাহিনীর মধ্যে আপন মনের মাধুরী মিশিয়েছিলেন কিনা কে জানে। তবু দীনদয়ালবাবু আমার মনে পাকা বাসা বেঁধেছেন। আজকে যাঁরা বার লাইব্রেরীর বেঞ্চিতে বসে বিড়ির ধোঁয়া ছাড়ছেন এবং সেই ধোঁয়া অবলম্বন করে যে সকল পূর্বসূরীদের স্মরণ করছেন, দীনদয়ালবাবু তাঁদের সর্বাগ্রে।

সে যুগের খাঁটি জমিদারী স্বভাব ও মেজাজ ছিল দীনদয়ালবাবুর। বাঘের মত তাঁর ঘোড়াদুটি। (ঘোড়ারা বাঘের মত হয় কিনা বলতে পারব না, তুলনাটি ছোকাদার)। দীনদয়ালবাবুর একটা বড়ো নেশা ছিল তাঁর গাড়ি সবাইকে ডিঙিয়ে চলে যাবে। কোচম্যানরা সে কথা জানতো তাই সামনের যত গাড়িকে পিছনে ফেলে তারা ঘোড়া ছোটাতো। একদিন হেস্টিংস স্ট্রীটের মোড়ে এক গাড়ি পড়ল দীন-দয়ালের গাড়ির সামনে। আর যাবে কোথায়! দীনদয়ালবাবুর কোচ্‌ম্যান ঘোড়ার পিঠে চাবুক মেরে সামনের গাড়িকে নিপুণভাবে পাশ কাটিয়ে পিছনে রেখে হাইকোর্টের সামনে এসে দাঁড়াল। পরের গাড়িও যথাসময়ে পিছনে এসে হাজির। কে সে গাড়ি থেকে নামল? দীনদয়াল-বাবু যা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি স্বয়ং উড্‌রফ সাহেব। 'হ্যাল্লো দীনদয়াল,' বলে উড্‌রফ সায়েব দীনদয়ালের পিঠে হাত রাখলেন। দীনদয়ালবাবু মর্মান্তিক আহত হলেন। জ্ঞানত না হোক অজ্ঞানত তিনি প্রভুকে টেক্কা দেবার চেষ্টা করেছেন? দীন-দয়ালবাবু সেইদিন থেকে জুড়ি গাড়ি চড়া ছেড়ে দিলেন।

অপরের গল্প বলতে গিয়ে ছোকাদা নিজের কাহিনী একেবারেই চেপে যান। সে কথা মনে করিয়ে দিলে ছোকাদা হাসেন, "ওসব হবে, পরে হবে। আমি কি আর দীনদয়ালবাবুর সমান যে তাঁর গল্প ফেলে রেখে নিজের কথা বলব।"

সেন সায়েব পশার জমাতে শুরু করলেন। ছোকাদার চোখের সামনে ধীরে ধীরে সেন সায়েব বড় হয়ে উঠলেন, ফী বাড়ালেন, দু-চারজন জুনিয়রও জুটলো। ছোকাদাও দুটো পয়সার মুখ দেখতে শুরু করলেন।

গল্পের মধ্যে ছোকাদা হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, "বল্ দেখি, ব্যারিস্টারদের মধ্যে সবচেয়ে বোকা কারা?"

আমরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। ছোকাদা গম্ভীরভাবে বললেন, "যারা ব্যারিস্টারী ছেড়ে জজিয়তী করতে যায়।"

বললাম, "সে কি? বিচারকের চেয়ে বড়ো কোন সম্মান আছে না কি? গাউন পরে মক্কেলের সত্যি কিংবা মিথ্যা মামলা সাজানোর চেয়ে ন্যায়দণ্ডের পরিচালন অনেক সম্মানজনক।"

ছোকাদা চটে উঠলেন, "তুমি একা হস্তীমূর্খ। ব্যারিস্টারী করলে তাঁরা ক রোজগার করতে পারতেন তার হিসে রাখিস? টাকা কেন রোজগার করবে না জীবনের বারো আনা তো তাঁদের পড়া শোনায়, আর মক্কেলের পিছনে চলে যায় বাকী চার আনা সময়ে পুরো ষোল আন উসুল না করলে চলবে কেন।"

ছোকাদা মনেপ্রাণে এই মতে বিশ্বা করতেন কিনা জানি না কিন্তু সেন সায়ে যখন আহ্বান পেয়ে জজিয়তী গ্রহ করলেন, ছোকাদা মাথা চাপড়াতে শু করলেন। কত পয়সা সেন সায়েব ইচ্ছে করলে রোজগার করতে পারেন, সে আ ছেড়ে শুধু আদর্শের উপর নির্ভর ক সেন সায়েব বিচারের ন্যায়দণ্ড গ্রহ করলেন! ছোকাদার স্বপ্নভঙ্গ হ'ল।

সেন সায়েবকে অবলম্বন করে বানওয়ারীবাবু হবার স্বপ্ন ব্যর্থ হ সেন সায়েব লোক ভাল, তাই যাবার আ মুখার্জী সায়েবকে ছোকাদার কথা ব গেলেন।

ছোকাদা বলতেন, "দেখ্, এই এ সায়েব ছেড়ে অন্য সায়েবের কাজ করা অনেকটা এই যাকে বলে দ্বিতীয় পক্ষ সংসারের মতো। মন বসলেও প্রাণ বস চায় না, প্রাণ বসলে মন বসতে চায় ন পনের বছর একজনের কাজ করে অ নতুন করে কি ঘর বাঁধতে ইচ্ছা হয়?"

ছোকাদার গল্পের ভাণ্ডার অক্ষয় বার লাইব্রেরীর সামনের সরু বেঞ্চি বসে যুগ যুগ ধরে তিনি জীবনের ভাঙা গড়া নিরীক্ষণ করেছেন। ছোকাদা অ অবাক হয়ে ভাবেন কোথায় গেল তাঁ প্রথম যুগের আইনজ্ঞ দিক্‌পাল কোথায় গেলেন সি আর দাশ, লর্ড সিং স্যর বিনোদ মিত্র। এ তো সেদিনের কথা স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসাদ যখন তাঁর বাগ্মিত আদালতে নাটকীয় পরিবেশ সৃ করছেন, কলকাতা বারে তখন ভারতে শ্রেষ্ঠ রত্নরাজি বিরাজমান। হিমালয় থে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত সকল আদাল তাঁদের আবির্ভাব হয়। যেখানেই মাম জটিল, আইনের ব্যাখ্যা অস্পষ্ট, সেখা স্যর সত্যেন্দ্রপ্রসাদ, কিংবা সি আর দা

আর দাশ তখনও শুধুই সি আর দাশ, শবন্ধু চিত্তরঞ্জন নন।

আর একজনের কথা। তিনি ব্যারিস্টার । বিলেত হতে তিনি আইনের শিক্ষা ন নি কিন্তু কী বাগ্মিতায়, কী আইন ানে তাঁর দোসর মেলা ভার। কলকাতা ইকোর্টে কেন, ভারতবর্ষের কোনো ইকোর্টে এরকম যুগন্ধর প্রতিভা আর খা দেয়নি। তিনি স্যর রাসবিহারী ঘোষ, ড্ভোকেট। হাইকোর্টের আনাচে কানাচে র রাসবিহারী সম্বন্ধে যত গল্প আজও চে আছে সংগৃহীত হলে সেগুলি র্ঘ পুস্তকের উপাদান হতে পারে।

ছোকাদার ব্যারিস্টারী মেজাজ, কিলদের প্রতি করুণা প্রদর্শন করতে নি অভ্যস্ত। কিন্তু দু'জন উকিলের মে তাঁর চোখ বিস্ময়ে বড় হয়ে উঠতো। রু ও শিষ্য স্যর রাসবিহারী ঘোষ ও র আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

ছোকাদা বলতেন, রাসবিহারী ঘোষ কি হাতে করলে রাতকে দিন ও দিনকে ত করতে পারতেন। দেশের যত আইন র নখাগ্রে। এইতো সামনের এই বারান্দা য়ে কতদিন ছোকাদা তাঁকে যেতে খেছেন, ধীরে ধীরে গাউন হাতে চলতেন র রাসবিহারী। তাঁকে দেখার জন্য, তাঁর মলা শোনার জন্য রাজ্যের ছোকরা উকিল ও ব্যারিস্টাররা কোর্টে হাজির হতেন। র রাসবিহারীর উপস্থিতি কোর্টের আবহাওয়ায় এক অদ্ভুত পরিবর্তন আনত, জেরা অধির আগ্রহে তাঁর বক্তব্য ুনতেন।

"জজেরা জানতেন, তাঁদের সামনে কে াঁড়িয়ে।" ছোকাদা বলতেন, "রাসবিহারীর াছে আইনের ব্যাখ্যা শোনা অনেকটা বেদব্যাসের মুখে মহাভারত শোনার ত।"

তখনকার প্রধান বিচারপতি রাস-বিহারীকে অসীম শ্রদ্ধা করতেন। এ ম্বন্ধে এক মজার গল্প আজও শোনা য়। বড় বড় উকিল ব্যারিস্টারদের অনেক ময় দুই কোর্টে একই সময় মামলার ক হয়। এক্ষেত্রে সাধারণত এক কোর্টের মলা স্থগিত রাখা হয়। রাসবিহারী ধান বিচারপতির আদালতে এক জটিল মলায় ব্যস্ত, এমন সময় জানা গেল ন্য এক কোর্টে পরদিন আর এক মামলা শুরু হবে। বাধ্য হয়ে রাসবিহারী তাঁর জুনিয়রকে মামলাটি একদিনের জন্য স্থগিত রাখার আবেদন করতে পাঠালেন।

জুনিয়র আদালতে বললেন, "ধর্মাবতার, স্যর রাসবিহারী প্রধান বিচারপতির আদালতে এক জটিল মামলায় ব্যস্ত। সুতরাং অনুগ্রহ করে আগামী সকালের মামলাটি একদিনের জন্য স্থগিত রাখলে স্যর রাসবিহারী কৃতজ্ঞ থাকবেন।"

জজ সায়েব খাঁটি ইংরেজ, দোর্দণ্ড প্রতাপ তাঁর। যে কোনো কারণে হোক রাসবিহারীর প্রতি তিনি কিঞ্চিৎ বিরূপ ছিলেন। তিনি এমন সুযোগ ছাড়তে চাইলেন না। গম্ভীরভাবে বললেন, "মামলা

স্থগিত রেখে কি হবে? রাসবিহারীর অনুপস্থিতিতে তুমিই মামলা চালাতে পার। After all one man is as **good** as another man.”

অপদস্থ জুনিয়র রাসবিহারীকে সব জানায়। ব্যাপার শুনে প্রধান বিচারপতি নিজের মামলাটি পরদিনের জন্য স্থগিত রাখলেন।

পরের দিন সকালে নিজের কোর্টে রাসবিহারীকে উপস্থিত দেখে আমাদের জজসায়েব খুব আনন্দিত হলেন, রাসবিহারীর অসুবিধা সৃষ্টি করতে পেরে তাঁর আনন্দের সীমা নেই। রাসবিহারীকে উদ্দেশ্য করে বললেন, “যতদূর শুনেছিলাম আপনি অন্য আদালতে ব্যস্ত থাকবেন। তবুও এখানে কেমন করে এলেন?”

রাসবিহারীও এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন, বিনয়ের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করে তিনি বললেন, “ধর্মাবতার, এই আদালত এক মজার জায়গা। এখানে one man is not always as **bad** as another man.” তারপর নির্বিকারভাবে তাঁর মামলা শুরু করলেন। জজ সায়েবের মুখের অবস্থা বর্ণনা করার দরকার নেই। তবে দিনের শেষে ব্যক্তিগত ভাবে স্যর রাসবিহারীকে তাঁর ঘরে ডেকে পাঠিয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলেন।

স্যর রাসবিহারীর কৃতিত্ব শুধু শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞ রূপে নয়, তিনি পরবর্তী যুগের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ আইনজ্ঞের গুরু। একজনের কথা পূর্বেই বলেছি তাঁর নাম অবশ্য বহুদিন হাইকোর্টের গন্ডী পেরিয়ে সমস্ত ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়েছে। বাঙলার বাঘ স্যর আশুতোষের কাহিনী সবাই জানে, সে কিছু আজকের কথা নয়। তখন ১৮৮৮ সাল, আইন পরীক্ষায় পাশ করে এক তরুণ যুবক রাসবিহারীর কাছে আইনের রহস্য জানতে এলেন। আইন জগতের বর্তমান সম্রাটের সংগে পরিচয় হ'ল ভাবি সম্রাটের, গুরু শিষ্য কেউ কারো থেকে কম নন। অচিরেই আশুতোষ নিজেকে আইন জগতে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করলেন। সময়ের স্রোতে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটল, শিষ্য বিচারক নিযুক্ত হলেন। শিষ্যের আদালতে গুরু বহুবার মামলা করেছেন। শিষ্য বিচারক, গুরু বিচার ভিক্ষা করছেন, এ এক দুরূহ পরিস্থিতি। যে শিষ্য সন্তানতুল্য, আজ তিনি 'মাই লর্ড,' ধর্মাবতার। শিষ্য গুরুর প্রতি অসীম শ্রদ্ধাশীল, বিচারকের উচ্চ আসন হতে তাঁর আচরণে সেই শ্রদ্ধা সদা প্রস্ফুট। অথচ আইনের সূক্ষ্ম বিচারের সময়, ন্যায়দণ্ডে দুই পক্ষের তুলনার সময় তিনি নিস্পৃহ, কঠিন ও কঠোর। গুরুও শিষ্যের কাছে তাই চান। শিষ্যগর্বে গুরুর বুক ফুলে ওঠে, শিষ্যের পক্ষে এ কী কঠিন সমস্যা।

বাঙলা গল্প ও উপন্যাসে এর থেকেও কঠিন আদর্শের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। একটি উপন্যাসে পিতা বিচারক, ঘৃণিত অপরাধে সন্তান বিচারক পিতার সম্মুখে অভিযুক্ত। একদিকে অপত্য স্নেহ, স্ত্রীর অশ্রুসজল আঁখি, অপরদিকে বিচারকের ন্যায়দণ্ড। এই দ্বন্দ্বে পিতার বিচারক সত্তার জয় হ'ল। সন্তানকে তিনি কঠোরতম দণ্ডদান করে আদালতকক্ষের অন্তরালে কান্নায় ভেঙে পড়েন। নাটকীয় পরিবেশ ও সাসপেন্স সৃষ্টির পক্ষে প্লটটি আদর্শ হলেও কাহিনী হিসাবে এটি অসম্ভব, অলীক স্বপ্নও বলা যেতে পারে। কোন বিচারকই, আত্মীয় দূরের কথা, পরিচিত কোন ব্যক্তির বিচার ভার গ্রহণ করতে পারেন না। গল্পকার উৎসাহের আতিশয্যে সেটি সম্পূর্ণ ভুলে যান এবং এই ধরনের কাহিনী ভুলতে পারলে আশুতোষের শ্রেষ্ঠত্ব বিচার করতে পারব।

ইতিহাসের কর্ণধারদের জীবনলীলাও একদিন শেষ হয়, দুর্দান্ত দিগবিজয়ী যিনি মহাদেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত অংগুলি হেলনে জয় করেন মহাকালের দুর্বার রথচক্রের সম্মুখে তিনিও সভয়ে মাথা নত করেন।

কলকাতা হাইকোর্টের মুকুটহীন সম্রাট স্যর রাসবিহারীও একদিন চির নিদ্রায় অভিভূত হলেন। সে দিনটি আজ ছোকাদার মনে আছে। একুশ সালের কথা বোধহয় ফেব্রুয়ারী মাসের মাঝামাঝি স্যর রাসবিহারীর মৃত্যুসংবাদ সমস্ত হাইকোর্টের উপর পুরু কালো কুয়াশার মত নেমে এল।

কোন্ আদ্যিকালে কলকাতায় সুপ্রিম কোর্টের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল তারপর কত যুগ গত হয়েছে। কত অসংখ্য আই

জীবী কত দিকপাল বিচারকের সম্মুখে আইনের ব্যাখ্যা করেছেন, দেড়শ বছরের এই ইতিহাসে সকলের ঊর্ধ্বে হিমালয়ের মত মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছেন বাংলা-দেশের স্যর রাসবিহারী ঘোষ।

প্রধান বিচারপতির অতবড় ঘরে তিলধারণের স্থান নেই। ছোকাদা তারই এক কোণে দাঁড়িয়ে। যাঁকে তিনি কতবার দেখেছেন আজ তিনি নেই, আর তিনি আসবেন না। এডভোকেট জেনারেল তাঁর শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, বার এসোসিয়েশনের সভাপতি প্রণাম জানালেন স্বর্গত আত্মার প্রতি। প্রধান বিচারপতি সমগ্র দেশের বিচার বিভাগের প্রধানরূপে শ্রদ্ধায় মাথা নত করলেন।

এর পরেও এই ঘরে কত সভা হয়েছে, ছোকাদা অনেক সভায় যোগ দিয়েছেন, প্রতিবারেই তাঁর চেনা জানা কেউ না কেউ এজগতে লীলা শেষ করে ওপারের জগতে পাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু এরকম শূন্যতা তিনি কোনদিন বোধ করেন নি।

উকিল আশুতোষকে ছোকাদা দেখেন নি, বিচারক আশুতোষ তাঁর চেনা জানা। কোর্টঘরে বাংলার বাঘ-সিংহের মত তিনি বসে থাকতেন, গম্ভীর মুখ।

আশুতোষের বাইরের রূপ ছোকাদার মত লোকদের বিস্মিত করেছে আর তাঁর বিচারকরূপে মুগ্ধ করেছে ছোকাদাদের সায়েবদের।

আশুতোষ যখন জজিয়তী শুরু করেছেন র‍্যাম্পিনী সায়েব তখন একজন প্রবীণ বিচারক। নবীন আশুতোষের কয়েকটি রায় পড়ে তিনি আশ্চর্য। কী পাণ্ডিত্য, কী চুলচেরা বিশ্লেষণ, কী প্রকাশভঙ্গী। র‍্যাম্পিনী সায়েব আশুতোষকে বলেছিলেন, "এখন বয়স কম তাই, পরে কিন্তু এত পরিশ্রম করে রায় লিখতে পারবে না।" আশুতোষ যথাযোগ্য উত্তর দিয়েছিলেন, "যতদিন এই পরিশ্রম করতে পারব ততদিনই জজিয়তী করব, যখনই বুঝব আর পারছি না, তখনই কাজে ইস্তফা দেব।"

জজিয়তীর শেষ দিন পর্যন্ত আশুতোষ এই প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন। অসংখ্য মামলার বিচার করেছেন তিনি, তাঁর বহু রায় ইতিহাসে স্থান পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই প্রসঙ্গে আর একজনের নাম মনে পড়ে, সুপ্রিম কোর্টের শেষ ও বর্তমান হাই-কোর্টের প্রথম প্রধান বিারপতি স্যর বার্নেস পিকক্। কিন্তু পিককের প্রকাশিত রায়ের সংখ্যা আশুতোষের প্রকাশিত রায়ের অর্ধেক। ভাবলে আশ্চর্য লাগে। আশুতোষের প্রায় আড়াই হাজার রায় বিভিন্ন ল-রিপোর্টারে প্রকাশিত হয়েছে।

আইনের কথা থাক। ছোকাদার ভাষায় "আমরা বাবুরা আদার ব্যাপারি, জাহাজের খবরে দরকার কি। আমরা শুধু সায়েবদের সেবা করে যাব, আইনটাইন তাঁরা বুঝবেন।"

ছোকাদার অনেক কথা আমার অনভিজ্ঞ মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ছোকাদাকে বুঝবার ও জানবার ইচ্ছা হয়েছে, ছোকাদা সযত্নে এড়িয়ে গেছেন নিজের কথা।

ক্রমশ অপরের মুখে তাও জেনেছি। ছোকাদার নতুন প্রভু মুখাজী সায়েবও লোক খারাপ নন। নিজের পশার জমার সাথে সাথে বাবুর মাইনে বাড়িয়ে দিলেন, এমন কি আজকালকার সওদাগরী অফিসে যা নিয়ে এত চাঞ্চল্য সেই বোনাস পেতেন ছোকাদা। এক মাসের নয়, পুরো তিন মাসের। তবুও এই নতুন সংসারে ছোকাদার মন বসেনি। বহু বর্ষ আগে কাসুন্দের একটি ছেলে সেন সায়েবকে কেন্দ্র করে বানওয়ারীবাবু হবার যে স্বপ্ন গড়েছিল, সেখানে অন্য কিছু স্থান পায়নি।

সামান্য শিক্ষা নিয়ে ছোকাদা কম পয়সা রোজগার করেন নি। কাসুন্দের টিনের বাড়ি ভেঙে কোটা বাড়ি তুলছেন তিনি। তবুও ছোকাদার দুর্ভাগ্য। নাহলে সেন সায়েব জজ হবেন কেন। কিন্তু সে তবু সহ্য হ'ল কিন্তু একদা মুখাজী সায়েবও জজিয়তী পেয়ে লাফিয়ে উঠলেন, ছোকাদার ভাষায় ফুটবল খেলা ছেড়ে রেফারীগিরি শুরু করলেন। মুখাজী সায়েব বলেন, "তোমারও বয়স হয়েছে, অবসর নাও। আমি যতদিন আছি পুরো মাইনেই মিলবে।"

ছোকাদা পেনশন নিলেন কিন্তু কাসুন্দের বাড়িতে তিনি দুপুর কাটাতে পারেন না, দশটা বাজলেই কি এক আকর্ষণে মন আকুল হয়ে ওঠে। ব্রীফ, এফিডেভিট, অরিজিনেটিং সামনস, জাজমেণ্ট আপন এওয়ার্ড, প্লেণ্ট, রিটার্ন স্টেটমেণ্ট এরা সব একসঙ্গে তাকে হাতছানি দেয়। কাজ নেই, তাতে কি, গল্প আছে তো।

ভাবিকালের কোন ঐতিহাসিক নিশ্চয়ই ভারতের এই অন্যতম ও প্রবীণতম ধর্মাধিকরণের ইতিহাস রচনা করবেন। সে ইতিহাসের উপকরণ সংগৃহীত হবে অসংখ্য দলিল-দস্তাবেজ থেকে। আমি ঐতিহাসিক নই তবু কেন জানি না আমার বারবার মনে হয় ছোকোদার মত যাঁরা জীবনের অনেকগুলি বৎসর হাইকোর্টের পূর্বদিকের বারান্দায় সুখে-দুঃখে হাসি-কান্নায় কাটিয়ে গেছে, তাঁদেরও অধিকার আছে সেই ইতিহাসের অঙ্গীভূত হবার।

হর্ষদেব
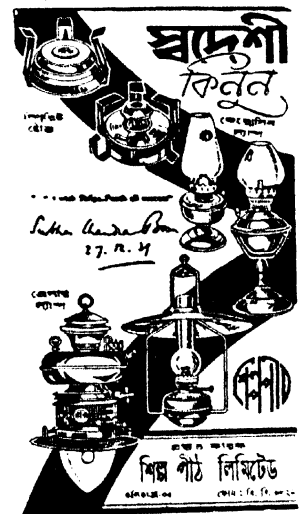
রাজকুমার সিদ্ধার্থের জীবনে যে সমস্যা দেখা দিয়েছিল, আলেকজান্দারের জীবনে তেমন কোন সমস্যা দেখা দিয়েছে—এ কথা ইতিহাস বলে না। রোগ, শোক, জরা ও মৃত্যুর চিন্তায় আকুল হয়ে পড়লে গ্রীক সম্রাটের দিগ্বিজয়-যাত্রার উত্তেজক কাহিনী হয়ত অসম্পূর্ণ থেকে যেত। কিংবা হয়ত যেত না। রোমক দার্শনিক-সম্রাট মার্কাস অরেলিয়াসের মতন মৃত্যুভয়কে অবজ্ঞা করে হয়ত তিনিও বলতে পারতেন রতিসুখের মতন মৃত্যুও জীবন-চক্রের একটি অংশ।

আপাতদৃষ্টিতে জীবনের বর্তমান উপস্থিতি এবং প্রাণ-পালনের কয়েকটি প্রয়োজনীয় অভ্যাসকে আশ্রয় করা ছাড়া—আর যা কিছু, আমাদের কাছে তার চিন্তা বৃথা এবং অনর্থক। তথাপি মানুষ চিন্তার শতসহস্র শাখায় ভবিষ্যৎ-প্রাজ্ঞ হবার চেষ্টা করে চলেছে। বিশ শতকের মানুষের লক্ষ্য যদি একুশ শতকের পৃথিবীতেই নিবন্ধ থাকত তবে হয়ত-বা সেই অদূর ভবিষ্যতের স্বপ্ন-কাহিনী তেমন বিসদৃশ মনে হত না। কিন্তু পাঁচশ কি হাজার বছর পরের পৃথিবীর রূপটা কেমন হবে তার চিন্তাতেও কিছু কম মানুষ ধ্যানস্থ হয়ে বসে নেই। এ সব বৃত্তান্ত শুনলে মনে হবে, আজগুবী। বলা বাহুল্য সাধারণ লোকের কাছে তাদের অতি সংকীর্ণ এবং সংক্ষিপ্ত জ্ঞানের অনায়ত্ত যা, তাই ত আজগুবী। পরমাণু-শক্তির অকল্পনীয় সম্ভাবনার প্রাথমিক সংবাদ এককালে আজগুবী বলেই মনে হত। পৃথিবীর সূর্য পরিক্রমণের বার্তাও সে যুগে ক'জন সত্য বলে মেনে নিতে পেরেছিলেন!

ইদানীংকালের এমনি এক সমস্যা-সংবাদ সে দিন চোখে পড়ল। সমস্যা হচ্ছে পৃথিবীর আবহাওয়া নিয়ে। গত একশো বছরে পৃথিবীর সাধারণ উত্তাপ মোটামুটিভাবে ২° ফারেনহিট্ (প্রায় ১ সে) বেড়ে গেছে। কোথাও কোথাও আরও খানিকটা বেড়েছে। বলে রাখা ভাল, বিজ্ঞানের নানা শাখায় তত্ত্বান্বেষীর মতন আবহাওয়া-বিজ্ঞান নিয়ে বহু বিজ্ঞানী মাথা ঘামান। অবশ্য এঁরা আবহাওয়া-দপ্তরের সংবাদ প্রচারক নন। তাঁদের প্রধান চিন্তার বিষয় হল—পৃথিবীর আবহাওয়ার পরিবর্তন কেন হয়, কি করে হয়, যদি এই এই পরিবর্তন হয় ভবিষ্যতে আমাদের কোন্ কোন্ সমস্যার সম্মুখীন হতে হবে—ইত্যাদি।

গ্লেসিয়ার নেমে আসছে : আল্পস পর্বত

এঁরা বলেন (মুখের বলা নয়, রীতিমত গবেষণালব্ধ তথ্যাদি ঘেঁটেই বলেন) পৃথিবীর আবহাওয়া বড় সহজে পরিবর্তন হয় না। আমরা প্রতি বছর গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত—প্রভৃতি ঋতুতে যে আবহাওয়া-অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করি এবং প্রায়শই বলে থাকি, উঃ এবার কী গরমই না পড়েছে, এমন বৃষ্টি দু বছরের মধ্যে আর হয়নি, কিংবা এবারের শীত গতবারের চেয়ে তিনগুণ বেশি—এ সব উক্তি নিছক কথার কথা। বস্তুত পৃথিবীর আবহাওয়ায় সাময়িকভাবে একটু আধটু পরিবর্তন ঘটলেও—কোন বড় রকম পরিবর্তন ঘটতে পারে না। অর্থাৎ কলকাতায় একশো কুড়ি ডিগ্রী গরম একশো, দুশো কি পাঁচশো বছরে একবার হয়ত পড়তে পারে—তা বলে দু-চার পাঁচ বছর পরে পরে নিশ্চয়ই নয়। যদি পড়ে তবে তার অন্য কোন কারণ আছে জানতে হবে। কাজে কাজেই পৃথিবীর আবহাওয়ায় উল্লেখযোগ্য ও স্মরণীয় পরিবর্তন বহুকাল অন্তর বিশেষ কারণবশত ঘটতে পারে, নিত্য তা ঘটে না।

পৃথিবীর বয়স প্রায় দুশো কোটি বছর। আর পৃথিবীতে প্রাণের স্থিতি-কাল তিরিশ কোটি বছর। অর্থাৎ পৃথিবীর জন্মলাভের পর যে একশো সত্তর কোটি বছর কাল কেটে গেছে তার মধ্যে এবং পরে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটেছে অতি দ্রুত এবং বার বার। কখনো হিমশীতল পৃথিবী, কখনো অগ্নিবর্ষী পৃথিবী। এই দুই বিপরীত আবহাওয়ার মধ্য থেকে ধীরে ধীরে একটি প্রাণোপযোগী আবহাওয়া তৈরী হয়েছে, প্রাণের স্থিতি শাশ্বত হয়েছে। এই বিশাল পৃথিবীতে আমাদের ভূমিষ্ঠ হবার আগেই প্রাকৃতিক বহু বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে প্রকৃতি আমাদের জন্যে বহুবিধ সম্পদ সঞ্চয় করে রেখেছিলেন গোপনে গোপনে। আজকের খনিজ পদার্থ অতীত পৃথিবীর সেই সম্পদ আহরণের স্বাক্ষর।

অতীতে যা হয়েছে—বর্তমানে বা অদূর ভবিষ্যতে তা হবার আশংকা কম। যদি হয় তবে এ জন্ম ও সভ্যতা ধ্বংসে

গিয়ে বহু কোটি বছর পর যারা আবার প্রাণ নিয়ে আসবে—তাদের স্মৃতিতে কয়েকটি ফসিল হয়েও আমরা বেঁচে থাকতে পারব কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

চূড়ান্ত আবহাওয়ার কথা বাদ দিলাম—সাধারণ আবহাওয়ার তারতম্যের কথা ধরা যাক্। আগেই বলেছি, গত একশো বছরে পৃথিবীর সাধারণ আবহাওয়া মোটামুটি ২° ডিগ্রী ফারনহিট বেড়েছে। এভাবে যদি আর অল্প কয়েক ডিগ্রী বেড়ে চলে তবে উত্তর মহাসাগরের বরফ গ'লে যে জলস্ফীতি ঘটবে তার ফলাফল সমুদ্রতীরবর্তী স্থলভাগের ওপর বিপজ্জনক হয়ে ওঠা মোটেই অসম্ভব নয়। আবার ঠিক উল্টো হয় যদি—অর্থাৎ এখন পৃথিবীর যে সাধারণ তাপমাত্রা তা থেকে খানিকটা ক'মে যায়, তবে মেরু-প্রদেশ থেকে গ্লেসিয়ার নেমে এসে ক্যানাডার, উত্তর য়ুরোপের এবং এশিয়ার বহু অংশ বরফাচ্ছাদিত হয়ে পড়বে।

আবহাওয়ার পরিবর্তন কেন হয় এই রহস্য উদ্ঘাটন করতে বহু বিজ্ঞানী বহু-কাল থেকেই মাথা ঘামাচ্ছেন। এ সম্পর্কে নির্দিষ্টভাবে এখনো কিছু বলা যায় না। তবে মোটামুটিভাবে দু'টি কারণ নিশ্চিত-ভাবে জানা গেছে। তার মধ্যে একটি হচ্ছে বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইডের হ্রাস-বৃদ্ধি এবং অপরটি হচ্ছে আগ্নেয় গিরির অগ্নিস্রাব।

শুনলে আশ্চর্য হ'তে হবে যে, গত পঞ্চাশ বছরে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের ভাগ শতকরা দশ ভাগ বেড়ে গেছে। এর ফলে পৃথিবীর সাধারণ আবহাওয়া-তাপ এখন বৃদ্ধির পথে। অতিবৃদ্ধির পরিণাম ভয়াবহ হ'তে পারে। কার্বন ডাই-অক্সাইড যে কেন বেড়ে যাচ্ছে তার হিসেব নিতে গিয়ে অন্যতম কারণ হিসেবে দেখা গেছে—পৃথিবীর বিভিন্ন শিল্পাঞ্চলে যে কয়লা পোড়ানো হচ্ছে তার পরিমাণ কিছু কম নয়, বছরে কয়লা পুড়ে দু'শ কোটি টন কার্বন ডাই-অক্সাইড পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে সঞ্চিত হ'চ্ছে। বাতসে শতকর ০·০৩ ভাগের বেশি যেটুকু কার্বন ডাই-অক্সাইড পাওয়া যাবে বুঝতে হবে সেটুকু তার

ক্রাকাটোয়া অগ্নিগিরির অগ্ন্যুৎপাত

অধিক সঞ্চয়। অবশ্য প্রকৃতির রাজ্যে সব সময় হরণ-পূরণের একটি আশ্চর্য বোঝাপড়া আছে। তা সত্ত্বেও অনেক সময় বোঝাপড়া যখন হয়ে ওঠে না, তখন বুঝতে হবে প্রকৃতিও তার ব্যর্থতা স্বীকার করছে।

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত পৃথিবীর আবহাওয়ায় পরিবর্তন সূচনা করে একথা আগেই বলেছি। পৃথিবীতে শেষ বিরাট অগ্ন্যুৎসব হয়ে গেছে ১৮৮৩ সালে—ক্রাকাটোয়া আগ্নেয়গিরির আকস্মিক জাগরণে। শুনলে আশ্চর্য হ'তে হবে, দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত পৃথিবীর এক বিরাট অংশের আবহাওয়া এর ফলে পরিবর্তিত হয়েছিল। উৎক্ষিপ্ত ধূলি-ধোঁয়া-ছাইয়ের গুঁড়ো দীর্ঘ দশ বছর ঊর্ধ্বস্তরের বায়ুমণ্ডলে এমনভাবে মিশে ছিল যার ফলে সূর্যরশ্মির শতকরা দশ ভাগ আটকা পড়ে যেত শূন্যেই—ভূতলে অবতরণ করতে পারত না। সৌভাগ্যের বিষয়, এ রকম বিরাট অগ্ন্যুৎপাত এ যাবৎ আর হয়নি।

আবহাওয়ার পরিবর্তন মানুষ, পশু এবং উদ্ভিদ জীবনে বিশেষভাবে তাৎপর্যময়। স্বাভাবিক আবহাওয়ার অদল-বদলে সমস্ত প্রাণীজগতেই আকস্মিক বিপর্যয় ঘটতে পারে। কোথায় যেন একবার পড়েছিলুম—(প্রাকৃতিক আবহাওয়া বিপর্যয়ের কাছে পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার তুচ্ছতা তুলনা করতে গিয়ে লেখক বলেছিলেন) একটি রাত্রির অস্বাভাবিক হ্রাস-তাপমাত্রা সহজেই ভূমণ্ডলের নতুন মানচিত্র সৃষ্টি করতে পারে এবং অধিকাংশ প্রাণীকুলকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে পারে। কথাটা অবিশ্বাস করার মতন নয়।

যাই হোক্ সমস্যাটা উপস্থিত অন্যত্র। পৃথিবীর আবহাওয়ায় অতি সামান্য যা পরিবর্তন হয়েছে তা'তে য়ুরোপের এবং এশিয়ার কোন কোন অঞ্চলে উপস্থিত লাভ ছাড়া ক্ষতি কিছু হয়নি। তবে মুশকিল দেখা দিতে পারে অন্যভাবে। দেশবিদেশের বড় বড় নগরী এবং শিল্পাঞ্চলে যদি কার্বন ডাই-অক্সাইডের

পরিমাণ দিন দিন আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে তবে স্থানগুলির আবহাওয়ায় উষ্ণতাই শুধু বাড়বে না—মানুষের স্বাস্থ্য রক্ষায় বিপদ দেখা দিতে পারে। বলা যায় না, হয়ত বায়ুমণ্ডলের কার্বন ডাই-অক্সাইডের আধিক্য কমাবার জন্যে বিজ্ঞানী-দের অন্য পথ অবলম্বন করতে হবে।

সৌভাগ্যবশত যদি প্রাকৃতিক কোন বিপর্যয় দেখা না দেয় তবে আগামী কয়েক শ' বছর পৃথিবীর আবহাওয়ায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সূচিত হবে না। আর মানুষ যদি সাবধানী হয় তবে পৃথিবীর ক্রম-উষ্ণতা ব্যাহত হ'তে পারে। অন্যথায় পৃথিবী দিন দিন উষ্ণ থেকে উষ্ণতর এবং শুষ্কতর হবে। তখন ভূমণ্ডলের দক্ষিণাঞ্চলের ফসল উত্তর মহা-সাগর এলাকার কাছাকাছি জায়গায় দেখতে পেলে বিস্মিত হবার কিছুই থাকবে না। ফিনল্যাণ্ড এবং স্ক্যানডানেভিয়ার বহু জমি যা যুগ যুগ ধ'রে তুষারাচ্ছাদিত ছিল এখনই কৃষকেরা সেই জমিতে ফসল বুনতে শুরু করেছে। ক্যানাডা এবং সাইবেরিয়ার চিরতুষারাচ্ছাদিত এলাকা ক্রমশই মেরু-কেন্দ্রে স'রে যাচ্ছে। বছরে অনেকটা ক'রে জমি এইভাবে হাতে এসে পড়ছে মানুষের। এক সময় গ্রীনল্যাণ্ড এবং আইসল্যাণ্ডে সংস্কৃতির প্রদীপ উজ্জ্বল হয়েই জ্বলেছে—আজ সেখানে আশ্চর্য শূন্যতা। আশা করা যায়—অতীত সম্ভার আবার সেখানে ফিরে আসবে।

২৯

রাস্তায় শিবনাথকে শেখর ডাক্তার আটকায়, তার ডিস্‌পেনসারীর দরজা হন হন করে যখন সে পার হচ্ছিল। যেন ডিস্‌পেনসারীর ভিতর চেয়ারে বসা ছিল। শিবনাথকে দেখে ডাক্তার লাফিয়ে রাস্তায় নামল। 'আপনাকেই আমি খুঁজছি মশায়, সেই সন্ধ্যা থেকে। কোথায় ছিলেন সারাদিন। ছুটি ফুরিয়ে গেছে নাকি।'

হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে শিবনাথ যেন অনেকটা ধৈর্যসংবরণের মত গলার স্বর গম্ভীর করে আস্তে আস্তে বলল, 'কেন। আমাকে আপনার কিসের দরকার?'

'অনেক দরকার মশায়, এক জায়গায় আছি, এক বাড়িতে খাওয়া-শোয়া হয় দুজনের, সকালে ঘুম ভাঙলেই দরজা খুলে আপনার মুখদর্শন। আপনাকে এড়িয়ে চলব সেই সাধ্য কোথায়। আসুন তামাক খেয়ে যান।'

যেন ডাক্তার বুঝতে পেরেছে এভাবে ছুটে এসে হঠাৎ হাত চেপে ধরায় শিবনাথবাবু রুষ্ট হয়েছেন। একটু লজ্জা পেয়ে শেখর প্রশ্ন করল, 'বিশেষ ব্যস্ত নাকি?'

'না।'

শিবনাথ অন্যদিকে ঘাড় ফিরিয়ে কথা বলল। অর্থাৎ বিরক্তি গোপন করল।

'তবে স্যার ভিতরে আসুন, বড় বিপদে পড়ে গেছি, আপনার সঙ্গে একটু কনসাল্ট করার দরকার হয়ে পড়েছে।'

হঠাৎ এ-রকম করুণ স্বর শুনে শিবনাথ চমকে উঠল। 'কি হয়েছে আপনার?' ঘাড় ফেরাল সে ডাক্তারের দিকে।

'আসুন স্যার, ভেতরে আসুন। না বসে বলতে পারব না।' শেখর আবার শিবনাথের হাত ধরল।

শিবনাথ বুঝল নিছক বসে গালগল্প করতে লোকটা ছুটে এসে তার হাত চেপে ধরেনি। একটা উঠানের ওপর আছে সেই আত্মীয়তার দাবীতে বিপদে পরামর্শ চাইতে তাকে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।

'বসুন বসুন।' ডাক্তার ঘরে ঢুকে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিল। শিবনাথ এই প্রথম ডিস্‌পেনসারীর ভিতরে ঢুকল। চেয়ারটা দেখিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত হ'ল না শেখর। নিজের কাপড়ের খুঁট দিয়ে চেয়ারের ধুলো মুছে দিল। 'বসুন।'

চেয়ারে বসে লক্ষ্য করল শিবনাথ টেবিল আলমারির কাচ এমন কি ঘরের দেয়ালগুলো পর্যন্ত ধুলোয় আচ্ছন্ন।

'এত ধুলো আসে কোথা থেকে?'

'রাস্তার। শালার রাতদিন লরির আর মোষ চলছে। আমরা কি আর এখানে মানুষের মত বাস করছি।'

ডাক্তারের এই উক্তিতে শিবনাথ কিছু মন্তব্য করল না। আলমারির মাথায় বসানো টাইমপীসটায় সময় দেখছিল সে। সেটাও ধুলোতে ঢাকা। ময়লা কাচের মধ্য দিয়া অনেক কষ্টে সে সময়টা দেখতে পেল। সাতটা দশ।

সময় দেখে শিবনাথ এদিকে ঘাড় ফিরাল।

'কি বলুন?'

যেন ডাক্তার মাটির দিকে তাকিয়ে কি ভাবছিল। যখন মুখ তুলল শিবনাথ দেখে বুঝল লোকটি খুবই চিন্তান্বিত।

কিন্তু ডাক্তারের দিক থেকে সরে তৎক্ষণাৎ তার দৃষ্টি বাঁ-দিকে চলে গেল। কোণার দিকের বেঞ্চটায় একটি ছেলে বসে আছে মুখ গুঁজে। জায়গাটা একটা বাক্সের আড়ালে আছে বলে অন্ধকারমতন। এতক্ষণ পর শিবনাথ ছেলেটিকে দেখতে পেয়ে চিনল।

'এর নাম সুধীর। আমাদের বাড়িতে দেখেছেন।'

ডাক্তারের দিকে চোখ রেখে শিবনাথ মাথা নাড়ল। 'এবং ছেলেটি সম্পর্কে অনেক কথা কানে এসেছে আমার'—বলা উচিত ছিল শিবনাথের কিন্তু বলল না। গম্ভীরভাবে শুধু আর একবার সুধীরের দিকে তাকাল।

'আর এঁর নাম শিবনাথবাবু, ইনি একজন গ্র্যাজুয়েট, তাঁর স্ত্রী গ্র্যাজুয়েট। হাইলি কালচার্ড ফ্যামিলী।'

ডাক্তার পরিচয় দিতে সুধীর হট্ করে একবারটি শিবনাথের আপাদমস্তক লক্ষ্য করে ফের মাটির দিকে চোখ নামাল এবং পূর্ববৎ কাঠের মত স্থির ও শক্ত হয়ে চুপ করে বসে রইল। যেন চিন্তান্বিত না, সুধীর রাগান্বিত।

'বাড়িতে আরো পাঁচটা লোক আছে।' ডাক্তার সুধীরের দিকে তাকাল না, শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিন্তু সেগুলোকে আমি কুকুর ভেড়ার মতন দেখি। কে গুপ্তটার বেকার থেকে থেকে মাথা খারাপ। বিধুটা বাচ্চা পয়দা করে আর ছেলে ঠেঙিয়ে নিজে একটা জন্তুতে পরিণত হয়েছে। পাঁচুটা মদে বেশ্যায় নিমগ্ন। বলাই মূর্খ, বুদ্ধি বলতে কিছু নেই, রমেশটা চোর, ওর ভাই ক্ষিতীশটা ডাকাত। অমলটা ছিল বৌ-পাগলা বাউণ্ডুলে, বৌ ছাড়া সাতও চিনত না পাঁচও চিনত না, আর বিমলটা ফাজিল চালিয়াৎ। কাজেই এদের কাউকে ডেকে এনে তো আর আমি এ-মামলার বিচারক সাজাতে পারি না, এদের কি-ই-বা বুদ্ধি বিবেচনা আর আমায় পরামর্শই দেবে কি ছাই। তাই অনেক চিন্তা করে আপনাকে ডাকলুম।'

'বলুন।' শিবনাথ আর একবার ধুলোর পলেস্তারার মধ্য দিয়ে ঘড়ির কাঁটা দুটো দেখতে চেষ্টা করল।

'আমি পারব না শিবনাথবাবু, আপনি বলুন, আপনি চেষ্টা ক'রে যদি এই মূর্খকে বোঝাতে পারেন যে, নিজের ব্লাড

শুদ্ধ কি অশুদ্ধ এটা জেনে নিয়ে বিবাহ এবং তারপর স্ত্রীর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করার প্রশ্ন এখানে ওঠে কি না?'

'কি ব্যাপার?' শিবনাথ এই প্রথম শুনছে এসব কথা, মুখের এমন ভান করে অত্যধিক গম্ভীরভাবে আড়চোখে আর একবার সুধীরকে দেখে নিল।

'এটি আপনার কে হয়?'

'দূর সম্পর্কে শালা,' ডাক্তার মাথা নেড়ে বলল, 'অবশ্য এই আত্মীয়তায় বিবাহ আটকায় না। কিন্তু যেস্থলে তোমার এমন একটা মারাত্মক ব্যাধি ছিল এখন সেটা থেকে তুমি সম্পূর্ণরূপে মুক্ত হয়েছ কিনা আমার মেয়েকে তোমার হাতে তুলে দেবার আগে একথা জানবার রাইট আমার আছে কিনা আপনি বলুন, আপনি এই মহামান্য জ্ঞানীগুণী আসামের সুনামগঞ্জ-নিবাসী সুধীরবাবুকে বলে বোঝান।'

'কি রোগ?' শিবনাথের মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল এবং আড়চোখে আরো একবার সুধীরকে দেখল।

'অতি বিশ্রী রোগ!' শেখর ডাক্তার ঘৃণায় মুখ বিকৃত করল। 'মশাই ভাগ্যিস পামারবাজারের ইয়ে ডাক্তার আমায় খবরটি বলল—'

'আপনি যা-তা কথা বলবেন না, আমি বলে দিচ্ছি।' ওধার থেকে যেন বারুদের মত জ্বলে উঠল সুধীর। 'আমার কোনোদিন এসব অসুখ ছিল না। ইয়ে ডাক্তার মিথ্যাবাদী।'

'কিন্তু সেইজন্যেই তো বলছিলাম, বাপু একটা ব্লাড এক্স্যামিন করিয়ে নাও, তা'তে তোমার আপত্তি কি?' শেখরও জোরে ধমক দিয়ে উঠল সুধীরকে।

'বেশ তো! যদি মনে করেন আমার ইয়ে ব্যারাম আছে, আমি আসব না, আমি তো চাই না আপনার বাড়িতে আসতে, আপনারা ডাকেন।'

যেন রাগটা চাপতে শেখর কতক্ষণ গম্ভীর হয়ে থেকে পরে প্রশ্ন করল, 'কে ডাকে তোমাকে শুনি?'

'সুনীতি, সুনীতির মা।' সুধীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে যেন কি খুঁজছিল। 'এই দেখুন কালকেও সকালে আপনার ওয়াইফ চিঠি দিয়েছেঃ ভাই সুধীর, বিকেলে সময় পেলে একবারটি অবশ্যই এসো। তোমার জন্যে পেঁপের মোহন-ভোগ তৈরী ক'রে রেখেছি।' বলে সুধীর পকেট থেকে ডাকঘরের ছাপ মারা একটা খাম বার করল। 'দেখুন বিশ্বাস না হয়।'

প্রভাতকণার হাতের লেখা। শেখর ডাক্তার দূর থেকে দেখে চিনল। খামটি আর হাতে নিল না। যেন আর একটু কি ভেবে পরে বলল, 'না আর চিঠি যাবে না, আমি ওদের সব বলে দিয়েছি, হ্যাঁ, সুধীরের ইয়ে আছে—'

আর বসে থাকা প্রয়োজন মনে না ক'রে যেন সুধীর বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। একটু সময় গুম মেরে থেকে পরে ডাক্তারের দিকে কটমট্ ক'রে তাকিয়ে বলল, 'ইডিয়েট, আপনাকে একটা ইডিয়েট পেয়ে পামারবাজারের ইয়ে ডাক্তার ধাপ্পা মেরেছে—' ব'লে পরে মুখটাকে বিকৃত ক'রে সুধীর হাসল।

'বটে!' শেখর ডাক্তার তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠল। 'কী স্বার্থ তার! তোমার নামে ভদ্রলোক খামোকা? যা ফ্যাক্ট তাই বলেছেন?'

'স্বার্থ আছে বৈকি।' প্রকাণ্ড একটা ঠাট্টা দুই ঠোঁটে ধ'রে রেখে সুধীর হাতের আঙুল দিয়ে শূন্যে একটা ছবি আঁকল। 'পামারবাজারের ইয়ে ডাক্তারের সুনীতিকে দেখে খুব পছন্দ হয়েছে। সেদিন যখন সুনীতিকে নিয়ে আমি সিনেমায় যাচ্ছি বাসে আপনার সেই বিখ্যাত বন্ধুটির সাথে দেখা, তিনি বাসে উঠে আমাকে ধাক্কা মেরে সিটটা থেকে তুলে দিয়ে সুনীতির পাশে ব'সে পড়েন আর সারা রাস্তা সুনীতির ঘাড়ের ওপর হাত রেখে বললেন—'মা মা, তুই আমার বাড়িতে একবারটি যাবি মা, আহা তুই আমার বন্ধু শেখরের মেয়ে, আমার কত আদরের জন। তোর জ্যাঠাইমা তোকে দেখতে পাগল। কুলিয়া-ট্যাংরা থেকে পামারবাজার তো খুব বেশি দূরে না পাগ্‌লী—ইত্যাদি—'

বলে সুধীর খুক্ ক'রে হেসে ফেলল।

'মিথ্যাবাদী, লায়ার! ইয়ে ডাক্তার কখনই এতবড় মেয়ের ঘাড়ে হাত রেখে কথা কইবে না। তুমি স্কাউন্ড্রেল এসব বানানো কথা বললেই আমি বিশ্বাস করব?'

'স্কাউন্ড্রেল, ইডিয়েট', সুধীরও চোখ লাল করল। 'তুমি গিয়ে সুনীতিকে একবার জিজ্ঞেস করো, বুড়ো তার কাঁধে হাত রেখেছিল কিনা শেয়ালদা পর্যন্ত গাড়ি থেকে নেমেই সুনীতি আমাকে কথাটা বলল।' বলেই সুধীর সুনীতির মার নিমন্ত্রণপত্রটা পকেটে পুরে নতুন বার্মিজ স্যাণ্ডেলের মচ্‌মচ্ আওয়াজ তুলে ও কড়া একটা সেণ্টের গন্ধে ঘরের বাতাসকে ভারাক্রান্ত ক'রে দিয়ে বেরিয়ে গেল।

বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে শেখর একটা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'দেখলে তো কেমন গোঁয়ার, কী সব কথাবার্তা, ওই পাজি হারামজাদা হবে আমার মেয়ের জামাই, রাস্তার গুণ্ডার শ্বশুর হব আমি।'

শিবনাথ বলল, 'আর আসবে না ব'লে দিয়েছেন যখন লজ্জায় আর হয়তো—'

'ছাই বুঝেছেন আপনি। আপনি হারামজাদাকে কদ্দুর চিনলেন শিবনাথ বাবু! আপনি আসবার আগে ও কী সব কথাবার্তা বলছিল আমাকে শুনলে আপনি কানে আঙুল দিতেন।'

শিবনাথ মাথা নত করল।

'আবার আসবে। ও আমার সর্বনাশ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে এখানে মাথা ঢুকিয়েছিল।'

শিবনাথ চুপ ক'রে রইল।

ডাক্তার পায়চারী করছিল।

'আবার আসবে। জানেন? আপনি আসবার আগে আমায় সে প্রেমতত্ত্ব শোনাচ্ছিল। বলছিল, আমি মূর্খ, বলছিল, সুনীতি যদি তার অসুখ আছে জেনেও তার পত্নী হ'তে স্বীকার করে তো আমি বাধা দেবার কেউ নই। সুনীতির বয়েস অনেকদিন আঠারো পার হ'য়েছে।'

ঘড়ি দেখতে ঘাড় ফেরাতে শিবনাথ বেশ কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্ করছিল, কিন্তু ডাক্তার এমন সব হৃদয়বিদারক কাহিনী শোনাচ্ছিল যে, যেন অনেকটা লজ্জার ও ভদ্রতার খাতিরে সে একটু সময়ের জন্যে ওদিকে তাকানো মুলতুবী রাখল এবং মনোযোগ সহকারে সুধীরের কাহিনী শুনল।

'কিউপিড ইজ ব্লাইণ্ড। হারামজাদা আমায় বোঝাচ্ছিল, আমি শেক্সপীয়র পড়িনি, একটা অকাট মূর্খ। মেটিরিয়া মেডিকা মুখস্থ করা লোক মানুষের মনের কামনা বাসনার তথ্য বুঝতে পারে না। বলছিল, আগেই নাকি সুনীতিকে এসব কথা বলাটলা হয়ে আছে এবং সুধীরের যে আর অসুখের চিহ্নটি নেই সুনীতি তার বড় প্রমাণ, তার অধিক কিছু নাকি এ সম্পর্কে আমাকে আর বলবার নেই।'

শিবনাথ জোর ক'রে ঘড়ি দেখতে ঘাড় ফেরাল।

'কই শিবনাথবাবু, আপনি আমাকে বুদ্ধি দিন, আমাকে পরামর্শ দিন। এই বিপদ থেকে আমি কী ক'রে উদ্ধার পাব বিদ্বান্ শিক্ষিত মানুষ আপনি যদি আমাকে এড়িয়ে যান আমি কোথায় দাঁড়াই বলুন।'

খুব অনিচ্ছা সত্ত্বে এদিকে তাকাল শিবনাথ এবং অত্যন্ত নীরস কণ্ঠে প্রশ্ন করল, 'আর কি বলল, আর কিছু বলেছে আমি আসার আগে?'

'বলেছে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমি যদি এখন সুনীতিকে বাধা দিই, ডাবাড়ি করি সুধীরের সংগে মেলামেশা করতে তো ফর লাইফ আমাকে অনুতাপ করতে হবে।'

'আপনি সুনীতিকে বুঝিয়ে বলুন যে, সুধীরের অসুখ আছে কি নেই না জানা পর্যন্ত যাতে সে তার নিজের দিক থেকে অন্তত সাবধান থাকে। বিয়েতে তার অনিচ্ছা থাকাটাই এখন বড় কথা।'

'মশাই!' শেখর ডাক্তারের গলা দিয়ে যেন শব্দ বেরোচ্ছিল না, খস্‌খস্ করছিল কথাগুলো। 'বেশি সর্বনাশ করেছে সুনীতির মা। বিয়ে বিয়ে ক'রে মেয়ের কানের ফুলকা দু'টো উনি ঝাজরা ক'রে ফেলেছেন। মানে, সর্বনাশ শুরু হয়ে গেছে আমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি শিবনাথবাবু। তাই তো ডেকে এনেছি আপনাকে, কী বলছি এসব।'

'সুনীতি আপনাকে কিছু বলেছে?'

'আমার সংগে কথা বলছে না। কাল রাত্রেও খায়নি। আজ এখন পর্যন্ত উপবাস।'

অত্যন্ত অপ্রিয় প্রসংগ।

কিন্তু বাধ্য হয়ে শিবনাথকে ফের প্রশ্ন করতে হ'লঃ 'মা? আপনার স্ত্রী কি বলছেন? সুধীর সম্পর্কে কিছু বুঝিয়েছিলেন কি তাঁকে?'

'বেফেল্ হয়েছি মশায়, ব্যর্থকাম হয়েছি বোঝাতে গিয়ে, কী বলতে তবে আপনাকে আমি ডেকে আনলাম ডিস্‌পেনসারীতে। আমাদের হোমিও-প্যাথী শাস্ত্রে মশায় এ ধরনের রোগিনীও আছে। হু লাভস্ হার ডটার্স লাভার। দ্যাট্ টাইপ প্রভাতকণা, হ্যাঁ, আমার স্ত্রী দ্যাট টাইপ অব উম্যান, আপনাকে বলতে পেরে আমার বুকটা হাল্কা হয়েছে, ধ'রে দেখুন শিবনাথবাবু।'

ব'লে খপ্ ক'রে শিবনাথের হাত চেপে ধ'রে শেখর প্রায় জোর ক'রে সেটা টেনে তার বুকের কাছে নিয়ে যেতেই শিবনাথ হাত সরিয়ে আনল।

'আমায় মশায় যেতে দিন, কাজ আছে। এ ব্যাপারে আপনাকে আমি কী সাহায্য করতে পারি।'

যেন লজ্জিত হ'ল শেখর ডাক্তার, ঘরের বাতাসে সুধীরের পরিত্যক্ত সেণ্টের গন্ধটা টেনে নেবার মত ক'রে জোরে নিশ্বাস টেনে বলল, 'না, আমার এটা প্রাইভেট লাইফের কথা। লোকে টাকা-পয়সার অভাবে ভোগে, আমি ভুগছি বাড়ির যিনি কর্ত্রী ঘরে গৃহিণী তিনি একটা মারাত্মক ব্যাধিতে ভুগছেন দেখে।'

ব'লে ডাক্তার হাতের দু'টো আঙুল দিয়ে কপালের রগ টিপে ধরল।

টাইমপিস্ ঘড়িটার টিক্‌টিক্ আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। যেন আজ ঠাণ্ডাটা খুব কম। গুমোট। কতক্ষণ স্থির হয়ে ভেবে নিয়ে কথাটা চিন্তা করার পর ডাক্তার বলল, 'আমার ব্যক্তিগত জীবন কত দুঃখের তাই আপনাকে শুনাচ্ছিলাম।' ব'লে ডাক্তার সুধীর সম্পর্কে নিজের স্ত্রীর কথাবার্তা ও ব্যবহারগুলো একটা একটা ক'রে খুলে বলল। ছেলের অসুখ আছে কথাটাই প্রভাতকণা বিশ্বাস করতে চাইছে না। কেন? তার কারণ কি শুনতে গিয়ে প্রশ্নটা করামাত্র শেখর স্ত্রীর কাছে ধমক খেয়েছে। বলছে, মেয়ের বয়স হয়ে গেছে। তা অসুখে ওরা ভুগুক। তোমার কি, ছেড়ে দাও। সুনীতি যখন মাথা পেতে

সব রিস্ক্ নিতে চাইছে তখন তুমি আর অমত করো না। ইত্যাদি।

বলা শেষ ক'রে ডাক্তার বলল, 'বুঝেছেন মশায়, এটা হ'ল আর্নিকা সিক্স এক্স-এর লক্ষণ। তার অবশ্য কারণও আছে। আর্নিকা নার্ভের চেয়ে বেশি ব্লাডের ওপর কাজ করলে সেই স্ত্রীলোক বয়স বাড়ার সংগে সংগে সেক্স-কন্‌সাস্ বেশি হয়। অর্থাৎ প্রভাতকণার—হ্যাঁ ওর সন্তানের বয়স বলুন যৌবন বলুন মা হয়ে সে আগে ভাগে মাথা পেতে বলতে গেলে গায়ে পড়ে যেন অনুভব করতে চাইছে। ফিলিং। দ্যাট্ ব্লাডি সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোর অস্থিরতা বা ক্ষুধা-তৃষ্ণা যাই বলুন বেড়ে গেছে ওর। সুনীতির মা প্রভাতকণা বুড়ো বয়সে সেই সিম্‌পটমে ভুগছে। ওর ফিট্-এর ব্যারাম ভাল করতে গিয়ে আমি ভুলে আরো হায়ার ডাইল্যুসন আর্নিকা দিতে ভুলে গিয়ে এটি হয়েছে—'
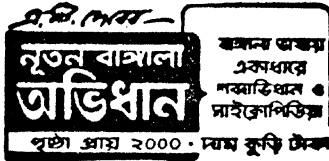
'আচ্ছা, আমি উঠি।'

শিবনাথ চেয়ার ছেড়ে এবার উঠে দাঁড়াল।

'না মশায়, আপনাকে বিরক্ত করলুম। পার্ডন মি, ক্ষমা চাইছি। আসল কথা হচ্ছে, শালা—হ্যাঁ ওই সুধীর ছোকরা, আস্ত গুণ্ডা। আমি যদি বাড়ির মেয়েদের ওপর আরো বেশি কড়াকড়ি করি এবং তার এখানে আসা একেবারে বন্ধ ক'রে দিই তো স্কাউণ্ড্রেল আমাকে গুণ্ডা লাগিয়ে মারতে পারে। সেই আশংকা আছে।'

'তা আমি করব কি।' অসহিষ্ণু হয়ে শিবনাথ রাস্তা করতে ডাক্তারকে হাত দিয়ে সরাতে গেল। হাতখানা ডাক্তার এবারও খপ্ ক'রে ধ'রে ফেলে অস্থির-ভাবে বলল, 'আমি তাই আপনার সাজেশন চাইছি স্যার। এ বাড়িতে ছাগল গরুকে তো আর ডেকে এনে সব সিক্রেসি আউট করা যায় না। তাই আপনাকে জিজ্ঞেস করছিলাম থানায় একটা ডাইরী ক'রে রাখব কি? যে একটা গুণ্ডা প্রকৃতির ছেলে আমার বাড়িতে আসা-যাওয়া করছে। আমি নিষেধ করলেও মানছে না। কিছু বলতে গেলে উল্টে ধমক দেয়?'

'তা করতে পারেন।' শিবনাথ এবার না হেসে পারল না। অবশ্য শব্দ করল না। ঠোঁট মুচড়ে হেসে বলল, 'বাড়িতে সুধীর ঘোষ কার কাছে আসে, কেন আসে থানায় কিন্তু তা আপনি গোপন করতে পারবেন না। সিক্রেসি সেখানে আউট করতেই হবে—'

'তা হোক গে, তাতে আমি গ্রাহ্য করি না, কিন্তু আপনাকে আমি ব'লে রাখছি, আই শ্যাল টিচ্ দ্যাট্ রাস্কেল এ গুড্ লেসন। দরকার হলে আপনি উইটনেস্ হবেন। থানার লোকে যদি এসে জিজ্ঞেস করে পাড়াপ্রতিবেশী কাউকে তো—আমি আঙুল দিয়ে আপনাকে দেখিয়ে দিয়ে বলব, এ'কে প্রশ্ন করুন। প্রতিবেশী হিসাবে আমি এ'কে সবচেয়ে উচ্চ সম্মান দিই। কি বলেন? স্কাউণ্ড্রেলটা যে সুনীতিকে না পেলে আমার মাথা দু' ফাঁক ক'রে দেবে তার চেহারা, চাউনি, কথাবার্তায় আপনার সেই ধারণা জন্মাতে তো আর বাকি নেই; সুতরাং এখন আমাকে সেভ্ করুন স্যার।'

'সে দেখা যাবে।' ব'লে শিবনাথ শেখরকে রীতিমত ঠেলে সরিয়ে দিয়ে চৌকাঠ পার হয়ে তাড়াতাড়ি রাস্তায় নেমে এল।

থানা আর পুলিস। আসামী। সাক্ষী। অর্থাৎ আর একটি দুশ্চিন্তা। কে গুপ্তর ছেলে রুণু গাড়ি চাপা পড়েছে সেই মামলায় দারোগার কাছে রায়সাহেবের ছেলে পারিজাত ইনফ্লুয়েঞ্জায় কাতর হয়ে তিনদিন বিছানায় পড়ে আছে কিনা সত্য সাক্ষী হ'তে কাল শিবনাথকে যেমন কে গুপ্ত অনুরোধ জানিয়েছিল। আজ ডাক্তার তাকে 'রিকোয়েস্ট' করছে মেয়ের সংগে মিশতে সুধীরকে নিষেধ করা হয়েছে, এখন সুধীর গুণ্ডা লেলিয়ে তাকে মারধর করবে, এমন কি 'মার্ডার' করতেও পারে, দারোগা এসে জিজ্ঞাসাবাদ করছে শিবনাথ এসব নিজের কানে শুনেছে যেন বলে দেয়। যত সব মাথাখারাপ! রাস্তায় চলতে চলতে শিবনাথ নিজের মনে বিড়বিড় ক'রে উঠল। তা ছাড়া লোকটাকে তার চালচলন, বেশভূষা এখানে এসে পা দিয়েছে পর দেখে দেখে একটুক সহানুভূতি শিবনাথের মনে সৃষ্টি হয়নি। সে পারতপক্ষে শেখর ডাক্তারকে এড়িয়ে চলছিল। কী সব ঘটনা! পাত্রের বিশ্রী রোগ। বাপ সন্দেহ করছে। মা মেয়ে কথা শুনছে না। গুণ্ডা। মারামারি। তুমি তার সাক্ষী থাকবে।

কাঁধ থেকে ধুলো ঝাড়ার মতন শিবনাথ হোমিওপ্যাথের প্রস্তাবগুলোকে মন থেকে তাড়িয়ে দিল। কী কদর্য পরিবেশের সৃষ্টি করে সুধীর জাতীয় প্রেমিক ও সুনীতি জাতীয় প্রেমিকারা সমাজে চিন্তা করে ও তাদের মনে মনে অনুকম্পা ক'রে লম্বা নিশ্বাস ছাড়তে গিয়ে শিবনাথ ছাড়তে পারল না। এখানে নিশ্বাস ফেলে জিরোবার, নিজের সম্পর্কে চিন্তা করবার সময় নেই বুঝল সে।

(ক্রমশ)

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সাউদাম্পটন থেকে লন্ডন। ওয়াটার্লু স্টেশনে যে বিপুল সম্বর্ধনা ঘটল তাঁর, তা প্রায় কল্পনাতীত। গোটা স্টেশন লোকে লোকারণ্য, শহরের সমস্ত লোক যেন সেখানে এসে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। পাঁজাকোলে করে গাড়ি থেকে তারা বার করে নিয়ে এল তাঁকে, স্টেশনের বাইরে অপেক্ষমান গাড়িতে নিয়ে তুলল। সেখানেও সেই একই দৃশ্য। কাতারে কাতারে লোক দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার দুপাশে। চার্লিকে তারা দেখতে চায়, না দেখে তারা ফিরবে না। আনন্দে উত্তেজনায় মুহুর্মুহু তারা চিৎকার করে উঠছে, "ঐ যে চার্লি!" "সাবাস চার্লি!" "গুড লাক চার্লি!" সাউদাম্পটন থেকে লন্ডনের পথে রেল-লাইনের দু পাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে সবাই তাঁকে অভ্যর্থনা জানিয়েছিল, লন্ডনেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। স্টেশন থেকে হোটেল পর্যন্ত রাস্তার দুপাশে সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে সবাই, দাঁড়িয়ে আছে তাদের প্রিয়তম অভিনেতাকে শুধু একবার দেখবার জন্যে। ভিড়ের চাপে গাড়ির প্রায় অচল অবস্থা। ঈশ্বর জানেন, কতক্ষণে তিনি রীজ হোটেলে গিয়ে পৌঁছবেন।

চার্লি নিজেই তাঁর এই অভিজ্ঞতার সুন্দর একটি বর্ণনা দিয়েছেন। প্রতি মুহূর্তেই তাঁর অনুভূতির তখন পরিবর্তন ঘটছে। প্রথমে তাঁর মনে হল, তিনি সম্রাট, দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছেন। সমস্ত মুখে অপরূপ একটি হাসি ছড়িয়ে পড়ল। সে-হাসি অকৃত্রিম, সে-হাসি তাঁর নিউইয়র্কী নকল হাসি নয়। "কনস্টেবলরাও দেখি রীতিমত উত্তেজিত, উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে। কী করবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। স্টেশনের বাইরে বিরাট জনতা। জনতা, না জনসমুদ্র? ভাবছি, আর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠছি। আমাকে এরা এত ভালবাসে? আমি যে কল্পনাও করতে পারিনি। ভালবাসার সেই বিপুল অভিব্যক্তিকে আমি নীরবে উপভোগ করতে লাগলাম।" তারপর "আমার উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল সবাই, শূন্যে দোদুল্যমান অবস্থায় বাইরে নিয়ে গিয়ে এক মোটরগাড়ির মধ্যে বসিয়ে দিল। টুপিটা খসে পড়েছিল, গাড়ির ভিতরে কে যেন ছুঁড়ে মারল সেটাকে। গাড়ির এক-একদিকে তিনজন করে কনস্টেবল। পা-দানির উপরে তারা দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছে করলেও আর এখন বাইরে যাবার উপায় নেই। কনস্টেবলদের নির্দেশে শোফার হঠাৎ গাড়ি চালিয়ে দিল। মনে হল, গাড়িখানা যেন জনতার উপর দিয়েই সামনে এগিয়ে চলেছে।"

হঠাৎ খেয়াল হল চার্লির, অচেনা কে-একজন মানুষ যেন গাড়ির মধ্যে তাঁর ঠিক পাশেই বসে রয়েছেন। "চেয়ে দেখি, সমস্ত শরীর তাঁর ক্ষতবিক্ষত, ক্ষতস্থান থেকে রক্ত গড়িয়ে পড়ছে। কে ইনি? নিশ্চয়ই কোনও কর্তাব্যক্তি। জরুরী কোনও কাজে চলেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একি, আমাকে তাঁর দিকে তাকাতে দেখেই কেমন যেন থতমত খেয়ে গেলেন ভদ্রলোক। যাই হোক, তাঁকে বললাম, 'আমার ভাই অব্রে চ্যাপলিন আমার সঙ্গে এসেছিল, তাকে কোথাও খুঁজে পাচ্ছি না।' শুনে তিনি বললেন, 'ক্ষমা করবেন, আপনার সঙ্গে এখনও আমার পরিচয় হয়নি, তবু যে আপনার গাড়িতে উঠে বসেছি, তার জন্যে কিছু মনে করবে না।' বললাম, 'বিলক্ষণ, কিন্তু কোথায় যাচ্ছেন সেটা জানেন?' তিনি বললেন, 'না। কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।' জিজ্ঞেস করলাম, 'কে আপনি?' তিনি বললেন, 'বিশেষ কেউ নই। ঠেলাঠেলি করে সবাই আমাকে গাড়ির মধ্যে তুলে দিয়েছে।' প্রাণ খুলে এবার হাসলাম দুজনে। অপরিচয়ের ব্যবধান হঠাৎ ঘুচে গেল। খানিক বাদে রাস্তার মোড়ে তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হল।"

ওয়াটার্লু স্টেশনের বাইরে জনতার বিপুল সম্বর্ধনা

"পে ডে" চিত্রের একটি দৃশ্য

গাড়ির মধ্যে চার্লি এখন একা। চুপচাপ বসে ভাবতে লাগলেন তিনি, এত যে হৈ চৈ করছে এরা, কেন? "কী এমন করেছি আমি? কী দিয়েছি এদের? খানকয়েক ছবি। তার জন্যেই এই সম্বর্ধনা? এর কি কোনও অর্থ হয়? 'শোলডার আর্মস' বইখানা অবশ্য ভালই হয়েছিল। তা হোক। তাই বলে সামান্য একজন চিত্রাভিনেতাকে নিয়ে এত মাতামাতি করতে হবে নাকি?" উল্লেখ করা প্রয়োজন, ইংল্যাণ্ডের চিত্রগৃহে "দী কীড" তখনও মুক্তিলাভ করেনি। এবং "দী গোল্ড রাশ", "দী সার্কাস" ইত্যাদি সব বিখ্যাত বইয়ের কাজে তিনি হাতও দেননি তখনও।

পীকাডিলি অঞ্চলের একটা হোটেলে এসে তিনি উঠবেন, আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল। হোটেলে পেৌঁছে দেখলেন, জনতার চাপ বিন্দুমাত্র হ্রাস পায়নি। অনেক কষ্টে গাড়ি থেকে নেমে তিনি হোটেলে গিয়ে ঢুকলেন। আর সেই আগ্রহাকুল জনতা—রোদবৃষ্টি উপেক্ষা করে যারা দাঁড়িয়ে আছে, তারা—দাঁড়িয়েই রইল। দাঁড়িয়ে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। একবার তারা চার্লিকে দেখেছে, তাতে তৃপ্ত হয়নি। আবার দেখবে। হোটেলের জানলায় এসে দাঁড়ালেন চার্লি, জনতার উদ্দেশ্যে হাত নাড়লেন, নিজের সঙ্গেই নিজে করমর্দন করলেন কয়েকবার, তবুও তারা নড়ল না। চার্লির বন্ধুরা ততক্ষণে ভিড় ঠেলে হোটেলে এসে পেৌঁছেচে। সর্বাঙ্গ ক্ষতবিক্ষত। লাঞ্চের অর্ডার দেওয়া হল, "অথচ তার কোনও প্রয়োজন ছিল না। ক্ষুধাতৃষ্ণার বোধ পর্যন্ত আমাদের লোপ পেয়ে গিয়েছিল।" তারপরেই আবার ভাবান্তর ঘটল চার্লির। "এক্ষুনি এদের চলে যাওয়া দরকার। আমি একটু একলা থাকতে চাই। এই ভিড়ের হাত থেকে পালাতে চাই আমি। কোথায় যাব? কেন, কেনিংটনে। একা-একা সেখানে গিয়ে আমি ঘুরে বেড়াব। আমার ছেলেবেলার সেই পরিচিত দৃশ্যগুলিকে আবার নতুন করে দেখব। হ্যাঁ, কেনিংটনেই যেতে হবে আমাকে। আজই।" হোটেলের বাইরে অপেক্ষমান সেই জনতা তখনও মুহুর্মুহু তাঁর জয়ধ্বনি দিয়ে চলেছে। একটু বাদেই সাংবাদিকরা এসে পেৌঁছলেন। এলেন আরও অনেক গণ্যমান্য সব ব্যক্তি। কারও কারও নামের পিছনে বিরাট এক-একটা খেতাব। দুঃখের বিষয়, কাউকেই চার্লি চেনেন না।

সুতরাং নিঃশব্দে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে হোটেল থেকে তিনি সরে পড়লেন। যাবার আগে সেক্রেটারিকে শুধু বলে দিয়ে গেলেন, চার্লির হয়ে তিনিই যেন সকলের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেন। নীচে নেমে দেখেন, হোটেলের দরজায়-দরজায় সবাই ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের হাত এড়িয়ে কোথায় যাবেন চার্লি। বাধ্য হয়ে শেষ পর্যন্ত খিড়কির দরজা দিয়ে তাঁকে বাইরে বেরিয়ে আসতে হল। রাস্তায় নেমে একটা ট্যাক্সি নিলেন। "কী সৌভাগ্য, ট্যাক্সিওয়ালা আমাকে চেনে না।"

শৈশবে যে-অঞ্চলে তিনি ছিলেন, যে-সব রাস্তায় তিনি তখন ঘুরে বেড়াতেন, সরাসরি সেইখানে চলে এলেন চার্লি। পথের বর্ণনা শুনুন। "ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে দিয়েছি, সে যেন তাড়াহুড়ো না করে, যেন খুব আস্তে-আস্তে গাড়ি চালায়। তারপর চুপচাপ বসে-বসে দুচোখ ভরে আমার লণ্ডনকে আমি দেখতে লাগলাম। ঐ তো ওয়েস্টমীনস্টার ব্রীজ, কুয়াশা কেটে গিয়ে এখন আরও স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। এ-সব আমার চেনা জায়গা। ওদিকে ওই বাড়িটা, ওটা হল লণ্ডন কাউণ্টি কাউন্সিল। কী আশ্চর্য, বাড়িটা এখনও শেষ হয়নি। আমি যখন লণ্ডন থেকে অ্যামেরিকা যাই, তখন থেকে শুরু হয়েছে, আজও শেষ হল না। ওয়েস্টমীনস্টার রোড যে এত এবড়োখেবড়ো, আগে জানতাম না। গাড়ির ঝাঁকুনি থেকে এখন টের পাচ্ছি। পায়ে হাঁটার সুবিধে এই যে, তাতে এত ঝাঁকুনি লাগে না। এই সেদিনও তো এসব জায়গায় দুবেলা আমি হেঁটে বেড়িয়েছি।"

ট্যাক্সি থেকে নেমে সেই ছোটবেলাকার মতই রাস্তায়-রাস্তায় তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এই তো চেস্টার স্ট্রীট। এইখানে পাওনল টেরাসের এক চিলেকোঠায় তাঁরা থাকতেন। তিনি, তাঁর দাদা, আর মা। রাস্তার উপরে গরিব-ঘরের ছেলেমেয়েরা সেই আগের মতই খেলা করছে। সেই একই দৃশ্য, কোথাও কোনও পরিবর্তন হয়নি। নিজেকে তাদের মধ্যে মিশিয়ে দিয়ে সবকিছুকে আবার আগের মতন অনুভব করতে চাইলেন চার্লি। একটা শুধু পরিবর্তন হয়েছে। এখনকার এই ছেলেমেয়েরা যেন আরও মিষ্টি, আরও ভাল। ছোটবেলার কথা মনে পড়ল। রাস্তার ছেলেগুলো ভারী দুষ্টু ছিল তখন, সারাক্ষণ তাঁকে জ্বালাতন করত। এরা বোধ হয় অত নির্দয়, নির্মম নয়। চৌকাঠে বসে বাচ্চা মেয়েরা পুতুল খেলছে। চার্লিকে তারা কেউ চিনতে

প্পুরেনি। লাজ্‌ক-লাজ্‌ক হাসছে সবাই। হঠাৎ তাঁর মনে হল, এত দামী পোশাক-আশাক পরে এখানে আসা তাঁর উচিত হয়নি। এখানকার এই পটভূমিকার সঙ্গে তাঁকে মানাচ্ছে না। হঠাৎ এসে একটা ছন্দোপতন ঘটিয়ে দিয়েছেন।

ছোটবেলায় একটি মেয়ের সঙ্গে খুব ভাব হয়েছিল তাঁর। ঘুরতে ঘুরতে মেয়েটির সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। "আরে, চার্লি না? চিনতে পারছ আমাকে?" "নিশ্চয়ই পারছি।" অনেকক্ষণ কথা হল দুজনের। আত্মীয়তার উত্তাপে আবারও তাঁর সারা মন ভরে উঠেছে। আরও অনেকক্ষণ গল্প করতেন তিনি, হঠাৎ খেয়াল হল, চারদিকে ভিড় জমতে শুরু হয়েছে। তাঁকে চিনে ফেলেছে সবাই। এক্ষুনি এখান থেকে সরে পড়া দরকার।

কোথায় যাবেন। পিছনে-পিছনে সবাই ছুটে আসছে। "হ্যাঁ হ্যাঁ, চার্লিই। এ একেবারে হলফ করে বলতে পারি।" লোক জমছে। লোক ছুটে আসছে। "একটু বাদেই আমাকে ওরা ধরে ফেলবে। ভাবতেই কেমন ভয় হতে লাগল। আমি একা, অসহায়। না, একা-একা এইভাবে বেরনো আমার উচিত হয়নি।" তারপর—"যাই বল, এই ককনিদের কিন্তু আমার ভারী ভাল লাগে। ভারী সুন্দর এদের ব্যবহার, এদের কথাবার্তা।...বুঝতে পেরেছে, আমি এখন একা থাকতে চাই। তাই কেউ কাছে আসছে না, দূরে দূরে দাঁড়িয়ে আছে সবাই। বাচ্চা ছেলেরা শুধু কাছে এসে গোল হয়ে আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে আমাকে দেখছে। তাদের মধ্যে আমি মিশে গেলাম। মনে পড়ল, এ কিছু নতুন ব্যাপার নয়। পাড়ায় কেউ বিখ্যাত ব্যক্তি এলে ছোটবেলায় আমিও তো এইভাবে তাঁকে দেখতে ছুটতাম। আমিও তো এই একই-ভাবে ভিড় ঠেলে ধাক্কাধাক্কি করে একেবারে তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়াতাম। সেই ময়লা মুখ, সেই ময়লা পোশাক। তফাতটা শুধু এই যে, আগের তুলনায় এদের পোশাক এখন আরও বেশী ময়লা।"

খানিক সময় সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে চার্লি একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠলেন।

চার্লস চ্যাপলিন আর উয়ি জর্জি উড

চললেন, "দী হর্নস"-এ। কেনিংটনের এই ভাটিখানায় তাঁর বাবা প্রায়ই গিয়ে বসতেন। চার্লির বাবার সাহায্যকল্পে একবার একটা সংগীতানুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, পাঠকদের সেটা মনে থাকতে পারে। মনে থাকতে পারে, ভাটিখানায় যখন গোপনে টিকিট বিক্রি করা হচ্ছে চার্লির বাবা হঠাৎ চৌকাঠে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। "দী হর্নস"-এ গিয়ে প্রবেশ করলেন চার্লি। অর্ডার নেবার জন্য পরিচারিকা তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। চার্লি বললেন, "জীঞ্জার বীয়ার।" এর চাইতে কড়া কোনও পানীয়ে তাঁর আগ্রহ নেই।

(১৯)

লণ্ডনে থাকতে জনসাধারণের কাছ থেকে যে বিপুল অভ্যর্থনা তিনি পেয়েছিলেন, সত্যিই তার তুলনা হয় না। নানান জায়গা থেকে আমন্ত্রণ করা হয়েছে তাঁকে, দৈনিক সামান্য কয়েকটির বেশী তিনি গ্রহণ করতে পারেননি। প্রত্যহ তাঁর কাছে অজস্র, অসংখ্য চিঠি এসেছে। প্রথম তিন দিনে তিনি তিয়াত্তর হাজার চিঠি পেয়েছিলেন। তার মধ্যে নখানা চিঠির লেখিকা দাবি তুলেছেন যে, তাঁরাই চার্লির মা; অনেক দিন আগে তাঁদের ছেলেকে কারা চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, চার্লিই যে সেই হারানো-ছেলে তাতে তাঁদের সন্দেহ নেই। প্রায় সাত শো জন দাবি জানালেন, চার্লির তাঁরা খুড়ো, নয়তো পিসি, নয়তো মামাতো ভাইবোন। এ-সব চিঠি যাঁরা লিখেছিলেন, তাঁদের মধ্যে অধিকাংশেরই আর্থিক অবস্থা খুব খারাপ, চার্লির কাছে তাঁরা সাহায্য চেয়েছিলেন। আত্মীয়তার দাবি না তুলেও অনেকে তাঁর কাছে টাকা চেয়ে পাঠিয়েছেন। আত্মীয়তার দাবি তোলেননি, অথবা সাহায্য চাননি, এমন কিছু কিছু লোকের কাছ থেকেও চিঠি এল। তাঁদের মধ্যে কাউকে-কাউকে ছোটবেলায় তিনি চিনতেনও। "কেসি'জ কোর্ট"-এ যেসব শিশুর সঙ্গে তিনি অভিনয় করেছিলেন, তাঁদেরই একজন তাঁকে লিখলেন, "আজ তুমি প্রতিষ্ঠালাভ করেছ। চার্লি, তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। 'কেসিজ কোর্ট'-এর সেই হা-ঘরে ছেলেমেয়েরা, তাদের কথা কি তোমার মনে আছে? তাদেরই একজন আমি। আমার সঙ্গে দেখা করতে তোমার সংকোচ হবে না তো?" জনৈকা বৃদ্ধার কাছ থেকে আর একটি চিঠি পেলেন চার্লি, এককালে তিনি চার্লির মায়ের সঙ্গে কেট প্যারা-

ডাইসের প্রমোদ-সম্প্রদায়ে রঙ্গাভিনয় করতেন। লণ্ডনে থাকতে এ'দের কয়েক জনের সঙ্গে চার্লি দেখা করতে চেষ্টা করেছিলেন।

স্যার জেমস ব্যারির সঙ্গেও একদিন তাঁর দেখা হল। এককালে তাঁর "পীটার-প্যান" নাটকে চার্লিকে এক নেকড়ে বাঘের ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়েছিল। হাসতে হাসতে ব্যারি তাঁকে জানালেন, লণ্ডনের এক রঙ্গমঞ্চে তাঁর একখানি নাটকের অভিনয় হচ্ছে; চার্লি যদি রাজী থাকেন তো তাঁকে নায়কের ভূমিকায় নামানো যেতে পারে। উত্তরে চার্লি বললেন, এ নিয়ে আলোচনা করবার সাহস তাঁর নেই। এইচ জি ওয়েলসও তাঁকে ডিনারে ডাকলেন একদিন। পরে একদিন ওয়েলসের এসেক্সের বাড়িতেও তিনি গিয়েছিলেন। অ্যামেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ডে আসবার পথে জাহাজে বসে ওয়েলসের "আউটলাইন অব হীস্ট্রি" বইখানি পড়েছিলেন চার্লি, পড়ে এতই মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, ওয়েলসের সঙ্গে দেখা করত তাঁর আগ্রহের অন্ত ছিল না। সেই কামনা এবারে পূর্ণ হল। ওয়েলস বললেন, চার্লি যে গোলটুপি পড়েন, ছবিতে তাঁকে যে এত দীনদরিদ্র দেখায়, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। আর ঐ ছড়িটা, সত্যিই ওটা তাঁর চালচলনের সঙ্গে চমৎকার মানিয়ে গিয়েছে। বলেই করলেন কি, চ্যাপলিনের টুপিটা নিয়ে নিজের মাথায় বসিয়ে দিলেন তিনি; অতঃপর তাঁর ছড়িটা হাতে নিয়ে চ্যাপলিনের ভঙ্গিতেই সেটাকে ঘোরাতে আরম্ভ করলেন। চ্যাপলিনের কাছে শুনেছি, ওয়েলসের ভাবভঙ্গী দেখে সত্যিই ভারী মজা লাগছিল তাঁর। আর-একটা ব্যাপারেও তিনি খুব মজা পেয়েছিলেন। ওয়েলসের বইয়ের আলমারিতে মস্ত একটা ডিকশনারি। হলিউডের কথা মনে পড়ল চার্লির; স্টুডিয়োর অফিস-ঘরে তাঁর নিজেরও তো এই রকমের একখানি ডিকশনারি রয়েছে। সপ্তাহান্তিক কয়েকটা দিন খুব আনন্দে কাটল। আলাপ-আলোচনায় দুজনেই বুঝলেন যে, তাঁদের মধ্যে অনেক ব্যাপারেই বেশ মিল রয়েছে। ওয়েলসের সঙ্গে বসে কয়েক হাত শ্যারাড (শব্দ তৈরির খেলা) খেললেন চার্লি, বাড়ির ছেলেমেয়েরাও তাতে যোগ দিল। তারপর ওয়েলসের ক্লগ নাচ। চার্লি দেখলেন, নাচের ব্যাপারে তিনি রীতিমত পারদর্শী ব্যক্তি। অ্যামেরিকা থেকে এতটা পথ পাড়ি দিয়ে এসে যদি শুধু ওয়েলসের সঙ্গেই সাক্ষাৎ হত চার্লির, কয়েকটা দিন যদি শুধু তাঁরই সঙ্গে কাটত, তাতেও চার্লি বোধ হয় দুঃখবোধ করতেন না।

এ-যাত্রায় আর যাঁদের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল, তার মধ্যে টমাস বার্কের এখানে নামোল্লেখ করা যেতে পারে। বিশিষ্ট এই ইংরেজ লেখকের নাম আপনারা শুনেছেন। ডী ডবলু গ্রীফিথ তাঁর একটি গল্পকে অবলম্বন করে একখানি ছবি তুলেছিলেন, "ব্রোকেন ব্লসম্‌স"। ছবিখানি আপনারা দেখে থাকবেন। দিন কয়েক চার্লি তাঁর সঙ্গে এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়ালেন।

চ্যাপলিন সম্পর্কে বার্কের মতামত এখানে জানানো দরকার। তাঁর মতে, মানুষ হিসেবে চ্যাপলিন রীতিমত আত্মকেন্দ্রিক, খামখেয়ালী, এবং জীবন সম্পর্কে ঈষৎ অসন্তুষ্ট। বার্ক বলছেন, "সহজে তাঁর নাগাল পাওয়া যায় না। স্পষ্টভাবে তাঁর চরিত্র বিচার করাও সম্ভব নয়। বুদ্ধিমান, বোকা, চালাক—আপন ব্যক্তিত্বের বিদ্যুচ্ছটায় প্রত্যেকেরই চোখ ধাঁধিয়ে দেন তিনি। এবং সেই ব্যক্তিত্বেরও নির্দিষ্ট কোনও রূপ নেই। কারো পক্ষেই তাই কখনও সুনির্দিষ্টভাবে তাঁকে বিচার করা সম্ভব হবে না, কেউই কখনও কোনও একটা মতামত দিয়ে বলতে পারবে না যে, 'এই হলেন চার্লস চ্যাপলিন।' পারবে না, তার কারণ, পরমুহূর্তেই হয়তো দেখা যাবে, আবার তাঁর ব্যক্তিত্বের চেহারা পালটে গিয়েছে। আসলে তিনি একজন অভিনেতা, কখন কোন্ ভূমিকায় তিনি অবতীর্ণ হবেন কেউই তা বলতে পারে না। যে-ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেন, তারই পরিচয়ে তাঁর পরিচয়। ভূমিকার থেকে তাঁকে আলাদা করে দেখতে গেলে দেখা যাবে যে, কিছুই আর অবশিষ্ট নেই। আপন ব্যক্তিসত্তার সন্ধান তিনি পাননি। তাই, অভিনয়ের বাইরের জগতে কোনই অবলম্বন নেই তাঁর। বাধ্য হয়েই তাই তাঁকে এক কাল্পনিক আরোপিত জীবনের আশ্রয় নিতে হয়।... চ্যাপলিনের চরিত্র-রহস্য বুঝতে হলে এই সহজ কথাটা জেনে রাখা দরকার। তিনি এত দুর্জ্ঞেয় চরিত্রের মানুষ কেন, তাঁর প্রতি এত সহজে আমরা আকৃষ্ট হই কেন, কী করে এত অনায়াসে লক্ষ লক্ষ মানুষের হৃদয়জয়ে তিনি সমর্থ হয়েছেন, এ-সবেরই উত্তর পাওয়া যাবে যদি শুধু মনে রাখি যে, জনসাধারণের সঙ্গে তাঁর মস্ত বড় একটি মিল রয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষের মত তিনিও তাঁর প্রার্থিত বস্তুর সন্ধান পাননি। অথচ কী তিনি চান, তিনি নিজেই তা জানেন না। জানেন না, তবু সেই অজ্ঞেয় ঐশ্বর্যের সন্ধানেই তিনি নিযুক্ত রয়েছেন। যারা দুর্বল, প্রধানত তারাই তাঁকে ভালবাসে। এবং মনে রাখা দরকার, দুর্বলদেরই এখন সংখ্যাধিক্য।"

বার্ক আর চ্যাপলিন, দুজনেরই শৈশব কেটেছে কেনিংটনে। ছেলেবেলার অবশ্য কেউই কাউকে চিনতেন না। দুজনেই ছিলেন ভাবপ্রবণ, দুজনেরই কল্পনা-শক্তি ছিল সূক্ষ্ম। কেনিংটন সম্পর্কে অনেক গল্প করলেন দুজনে। এবং যখন বুঝতে পারা গেল, শৈশব-দিনের সেই পরিচিত পরিবেশে একই রকমের অনুভূতি তাঁরা লালন করতেন—একইরকমের সুখ-দুঃখ, একই আনন্দ-বেদনা—দুজনেই তখন বিস্মিত হলেন।

চার্লির অবশ্য অনেক পরিবর্তন হয়েছে তারপর। দারিদ্র্য আর অভাবের নির্মম কশাঘাতে এই সেদিনও তাঁকে পাগল হয়ে ছুটে বেড়াতে হয়েছে। আর

'আজ? মাত্রই কয়েকটা বছরের ব্যবধানে এখন তিনি একজন রীতিমত গণ্যমান্য মানুষ, বার্কের ভাষায় 'রাদার এ স্পয়েল্ট চাইল্ড'। যতখানি কামনা করি আমরা, সাধারণত তার থেকে অনেক কমই আমরা পাই। যতখানি কামনা করেছিলেন চার্লি, তার থেকে অনেক বেশীই তিনি পেয়েছেন। বার্ক লিখছেন, "হঠাৎ একদিন কেমন করে দারিদ্র্যের খানিকটা অবসান ঘটল, চার্লির কাছে তার গল্প শুনেছিলাম। ছিলেন বেকার, বলা নেই কওয়া নেই, দুম করে এক মীউজিক-হল সম্প্রদায়ে সপ্তাহে দু পাউন্ড মাইনের এক চাকরি পেয়ে গেলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'ভবিষ্যৎ জীবনের কী স্বপ্ন আপনি দেখতেন তখন? এক-একটা ধাপ আমরা পার হয়ে যাই, আর একটু একটু করে আমাদের আকাঙ্ক্ষা আরও বেড়ে ওঠে। কোন্ আকাঙ্ক্ষা তখন আপনি লালন করতেন, কোন্ অসম্ভব আকাঙ্ক্ষা?' চার্লি বললেন, 'ওয়েস্ট এন্ডের কোনও মীউজিক-হলে অন্তত একটিবারের জন্যেও যেন আমি প্রধান ভূমিকায় অভিনয় করবার সুযোগ পাই। এর চাইতে বড় আকাঙ্ক্ষা আর কিছুই আমার ছিল না। আকাঙ্ক্ষা নয়, স্বপ্ন। এবং সে-স্বপ্ন যে কোনওদিন সফল হবে, ভাবতে পর্যন্ত তখন সাহস পাইনি। চার্গউইন, রবি, আর আলবেয়ব শেভালিয়র, এ'রাই তখন আমার স্বপ্ন-লোকের নায়ক। কখনও যে এ'দের সমকক্ষ হতে পারব, এমন দুরাশাকে প্রশ্রয় দিতেও আমার ভয় করত।"

বার্ক বলছেন, "যতটুকু চেয়েছিলেন, ঠিক ততটুকুই যদি পেতেন চার্লি, হয়তো সুখী হতেন। মুশকিল এই যে, জীবনের কাছে যতটুকু আমরা চাই, ঠিক ততটুকুই আমরা পাই না। হয় কিছু কম, নয় কিছু বেশী পাই। অধিকাংশ লোকই কম পেয়ে থাকে। চার্লি যে শুধু বেশী পেয়েছেন তা নয়, হাজার গুণ বেশী পেয়েছেন। অপরপক্ষে, যেটুকু সাফল্য আমরা পাই, পাই জীবনের প্রায় অন্তিম-কালে; সুদীর্ঘ সংগ্রামের শেষে শরীর যখন শ্রান্ত, মন অবসন্ন। পাওয়ার আনন্দ তখন থাকে না। চার্লস চ্যাপলিন কিন্তু তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়েই—তাঁর যৌবনে—সেই সাফল্য পেয়েছেন। পঁচিশেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত। পঁচিশেই তাঁর আয়ের অঙ্ক বিশ্বাসযোগ্যতার সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছে। এই যে সাফল্য, এর জন্য তাঁকে সংগ্রাম করতে হয়নি; করতে হয়নি, তার কারণ, এত সাফল্য যে তাঁর হবে, এ তাঁর কল্পনাতেও ছিল না।......এই অবিশ্বাস্য সাফল্যের কারণ কী? চারিত্রিক শক্তি? অমানুষিক পরিশ্রম? না, তার কোনটাই নয়। আসলে তাঁর এই সাফল্য প্রায় দৈব আশীর্বাদের সামিল।......আর পাঁচজন মানুষ যেটুকু পরিশ্রম করে, ঠিক সেইটুকু পরিশ্রমই তিনি করেছেন। যা-কিছু করেছেন, ভালভাবে করবার চেষ্টা করেছেন। তার বেশী কিছু নয়।"

বার্ক যখন চার্লিকে এইভাবে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলেন, চার্লির চক্ষু দুটিও তখন বেকার বসে ছিল না। তিনিও তখন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছেন এই বিশিষ্ট লোকটিকে, তাঁর চরিত্র উপলব্ধির প্রয়াস পেয়েছেন। বার্ক সম্বন্ধে তিনি লিখছেন, "আলাপের পরমুহূর্তেই মনে হল, বার্ক অবসন্ন; জীবন সম্পর্কে যেন বিন্দুমাত্র উৎসাহও তাঁর নেই। ছোটখাটো মানুষটি, শীর্ণ পাণ্ডুর চেহারা। বার্কের কিছু কিছু ছোটগল্প আমি পড়েছি। কামনা, বাসনা, আবেগের কী বিপুল প্রাবল্য সেখানে। সে-সব গল্প কি এ'রই লেখা? বিশ্বাস হয় না।"

চার্লস চ্যাপলিনের প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস টমাস বার্কের নজর এড়ায়নি, "সেই ভয়ংকর প্রাণোচ্ছ্বাস, যা আছে বলেই প্রতিভাবান মানুষকে আমরা চিনে নিতে পারি। যা কিছু শক্তি তাঁর আছে, আপন শিল্পকর্মের উপরে তার সবটুকুই তিনি ঢেলে দিতে চান। এ ব্যাপারে এতটুকু কার্পণ্য তাঁর নেই।......প্রথম কয়েক ঘণ্টা তাঁর সঙ্গ খুব ভালই লাগে; মনে হয় তিনি অসামান্য, তিনি অসাধারণ। কিন্তু তারপরই, কী জানি কেন, কেমন বিরক্তি লাগতে থাকে। কথার এই প্লাবন, এ কি শেষ হবে না? এই সুবিপুল কর্মচাঞ্চল্য, এর কি অবসান নেই? কাউকে কাছে পেলে তাঁর উৎসাহ যেন সীমা ছাড়িয়ে যায়। আমার সঙ্গে তাঁর কতক্ষণেরই বা আলাপ। তারই মধ্যে তিনি প্রস্তাব করে বসলেন, তাঁর সঙ্গে আমাকে বার্লিন যেতে হবে; বার্লিন থেকে স্পেনে। এ-অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করতে আমার বিন্দুমাত্র দ্বিধা হয়নি। তার কারণ, আমি জানতাম, এই লক্ষ ভোল্টের বিদ্যুৎ-শক্তির কাছাকাছি দিন কয়েক থাকলে আমাকে আর খুঁজে পেতে হবে না, নির্ঘাত আমাকে পুড়ে মরতে হবে।"

এ-ব্যাপারে বার্কের সঙ্গে আমি একমত নই। সত্যিই তাঁর প্রাণ-প্রাবল্যের কোনও তুলনা হয় না, কিন্তু কই আমার তো কখনও তাতে বিরক্তি বোধ হয়নি। বরং, ঠিক তার উল্টো। এত সুন্দর কথা বলেন চার্লি, এবং এত বিভিন্ন বিষয়ে বলেন, যে তাতে শ্রান্তি কেটে যায়, সারা মন উৎসাহে ভরে ওঠে। বার্ক তাঁকে ভুল বুঝেছেন। চার্লির সঙ্গে দিন পনের কাটালেই তিনি বুঝতে পারতেন, সারাক্ষণ কথা বলতে তাঁরও ভাল লাগে না, মাঝে-মাঝে তিনি নিজেও এক নির্জন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে ফিরে যান।

বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে কখনও একটু অবসন্ন বোধ করলেই সটান তিনি তাঁর শয়নকক্ষে চলে যান। গিয়ে ঘুমিয়ে পড়েন। অবসাদ না কাটা পর্যন্ত তিনি আর দেখা করবেন না কারো সঙ্গে। কতবার যে কত কোলাহলমুখর পার্টির মধ্য থেকে অকস্মাৎ তাঁকে অন্তর্হিত হয়ে যেতে দেখেছি। বন্ধু-বান্ধবরা আসবেন, সারাদিন যত্ন করে ঘরদোর সাজিয়েছেন চার্লি; তাঁরা আসবার পর নানান বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে গল্প করেছেন, তাঁদের হাসিয়েছেন। তারপর

কখন যে এক সময় নিঃশব্দে সরে পড়েছেন সেখান থেকে, কেউ টের পায়নি। কিন্তু সেই সঙ্গে এ-কথাও এখানে বলে রাখা দরকার যে, অল্পে তিনি অবসন্ন হন না। কখনও কখনও এমনও হয়েছে যে, তিন দিন তিন রাত্রি সমানে তিনি কাজ করে গিয়েছেন, তবুও ক্লান্ত হননি।

যেমন আকস্মিকভাবে একদিন হলি-উড থেকে লণ্ডনের পথে পাড়ি দিয়েছিলেন, ঠিক তেমনই আকস্মিকভাবে হঠাৎ একদিন আবার লণ্ডন থেকে তিনি প্যারিসে রওনা হয়ে গেলেন। ভেবেছিলেন প্যারিসে গিয়ে সবাইকে চমকে দেবেন। তা আর হল না। আগে থাকতেই কে যেন সেখানে খবর পাঠিয়ে দিয়েছিল। জাহাজ যখন ক্যালেতে গিয়ে পেঁছিল, দেখেন কাতারে কাতারে মানুষ এসে জেটির উপরে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে। টুপি নাড়ছে, চুমো ছুঁড়ে দিচ্ছে, চিৎকার করে তাঁর জয়ধ্বনি দিচ্ছে, "ভীভ লো শার্ল!"

চার্লি লিখছেন, "সব জায়গাতেই দেখলাম আমাকে এরা 'শার্ল' বানিয়ে দিয়েছে।......এদের ভাষা আমি জানি না; কী যে বলে তার বিন্দুবিসর্গও বুঝতে পারি না। শুধু একটু হাসি, চোখেমুখে 'সবই বুঝতে পারছি' গোছের একটা ভাব ফুটিয়ে রাখি।" অটোগ্রাফের খাতায় চার্লি যখন নাম সই করলেন "চার্লস চ্যাপলিন", সবাই তো অবাক। এ আবার কে রে বাবা। কই, এ নাম তো তারা শোনেনি। বাধ্য হয়েই চার্লিকে তখন নতুন করে আবার সই দিতে হল......"শার্ল...... শার্ল......"

প্যারিসে পেঁছে দেখেন খবরের কাগজের রিপোর্টাররা সব আগে থেকেই সেখানে এসে প্রতীক্ষা করছেন। ফরাসী ভাষায়—যে-ভাষার বিন্দুবিসর্গও চার্লি বোঝেন না—একটার পর একটা প্রশ্ন বর্ষণ করতে লাগলেন তাঁরা। লণ্ডনে পেঁছে যে বিশাল জনতার তাঁকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল, এখানেও প্রায় সেই রকমেরই ভিড় জমে গিয়েছে। এই বিপুল অভ্যর্থনার জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। প্যারিসে পেঁছে প্রথম রাত্রেই গেলেন ফলি বার্জারিয়ে। অনেক দিনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে এর সঙ্গে। গিয়ে দেখেন, সে ফলি বার্জার আর নেই, মাঝখানের এই কয়েকটা বছরে অনেক পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। পরিবর্তনটা তাঁর ভাল লাগেনি। চলে গেলেন মঁমার্তর-এ। এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলেছেন আর আপন মনে গান গাইছেন। পুরনো সব গান। "আফটার দী বল", "দী ম্যান দ্যাট ব্রোক দী ব্যাংক অ্যাট মণ্টি কার্লো"। গান গাইছেন, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে চলছে অতীত জীবনের স্মৃতি-রোমন্থন। নানা জায়গায় ঘুরে বেড়িয়ে শেষ পর্যন্ত এক নৈশ কাফেতে গিয়ে বসলেন। অল্পবয়সী একটি যুবক এ-টেবিল থেকে ও-টেবিলে বেহালা শুনিয়ে বেড়াচ্ছে। চারদিকে অচেনা সব লোক। ব্যক্তিত্ব আর চরিত্র বিশ্লেষণে চার্লির ক্ষমতা প্রায় অসামান্য। এক নজর তাকিয়েই সকলকে তিনি বুঝে নিলেন; বুঝে নিলেন কে কেমন মানুষ, কার কী ত্রুটি, কার অন্তস্তলে কী গভীর বেদনা আত্মগোপন করে রয়েছে। মানবচরিত্র বিশ্লেষণে তাঁর এই অস্বাভাবিক ক্ষমতার পরিচয় পেয়ে টমাস বার্ক স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, "চার্লির কাছে পোজ করে কোনও লাভ হয় না; এক নজর তাকিয়েই তিনি সব ধরে ফেলতে পারেন।" প্যারিসের সেই নৈশ কাফেতে যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন, তাঁদেরই একজনের সম্পর্কে চার্লি লিখছেন, "বিচিত্র মানুষ ইনি। বাড়ি বোধ হয় কর্সিকায়। ভদ্র আচরণ, কেতাদুরস্ত ব্যবহার। এক-কালে খুবই বড়লোক ছিলেন। কাউণ্ট-টাউণ্ট হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়। তবে এখন বেশ অর্থকষ্ট চলছে। কাফের টেবিলে-টেবিলে মীউজিসিয়ানদের জন্য এখন দক্ষিণা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছেন।"

প্যারিসে কোনও সালোনে অনুষ্ঠিত এক ড্রেস শো সম্পর্কেও তিনি এই-রকমের একটি বর্ণনা দিয়েছেন। বিরাট সালোন। জাঁকজমকে "প্রায় ভার্সাইয়ের রাজপ্রাসাদের সমতুল্য। দীর্ঘাঙ্গী সব মেয়েরা যখন নেপথ্য থেকে নানান রকমের কায়দাদুরস্ত পোশাকে সেজেগুজে বেরিয়ে এসে আলতো পায়ে আমাদের সামনে দিয়ে হেঁটে চলে গেল, নিজেকে তখন কী অসহায়ই যে লাগছিল। কারো মুখে অপরিসীম আভিজাত্য, কারো মুখে ঈষৎ বিরক্তির ভ্রূকুটি। এ-সবই এদের মেক-আপ, সবটুকুই অভিনয়। কিন্তু চট করে-তা বুঝবার উপায় নেই। সত্যিকারের ধনী অভিজাত বংশের ভদ্রলোক আর ভদ্র-মহিলাদের সামনে দিয়ে যখন এই-ভাবে দামী পোশাক পরে নকল আভিজাত্যের অভিনয় করে চলে যায় এরা, কী তখন মনে হয় এদের? জানতে আমার ভারী ইচ্ছে করছিল। তবে একটা কথা, অভিনয়ের কৌশলগুলিকে এখনও এরা ভালভাবে রপ্ত করে নিতে পারেনি। আমাদের সামনে দিয়ে ধীরেসুস্থে হেঁটে গিয়ে তারপর অকস্মাৎ সব বিস্মৃত হয়ে যে-ভাবে এরা হুড়মুড় করে ড্রেসিং রুমে গিয়ে ঢুকছিল, আগের সেই আভিজাত্যময় ভঙ্গীর সঙ্গে তার এতটুকুও সঙ্গতি নেই। সামান্য একটা ভুল। তারই জন্য ধরা পড়ে গেল এরা। যে-কোনও অনভিজ্ঞ লোকও তখন বলে দিতে পারত, এ-সব সত্যি নয়,—অভিনয়, নিছক অভিনয়।"

(ক্রমশ)

আবু ভ্রমণ

শুভংকর

এবারে পুজোর সময় দুদিনের জন্য আবু পাহাড়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম।

বাড়মের থেকে দোসরা অক্টোবর রাত দশটায় বেরিয়ে লুনী আর মারোয়াড় জংশন হয়ে পরদিন বিকেল সাড়ে তিনটের সময় আবু রোড স্টেশনে পেঁাছলাম। লুনী জংশনের নাম হয়েছে মারোয়াড়ের সব চেয়ে বড় নদী লুনীর নামে। অবশ্য নামেই নদী, কারণ বছরে বড় জোর এক মাস জল থাকে। এ বছর তো একদিনও জল আসেনি। তবে নদীর গর্ভে তিন চার হাত বালি খুঁড়লেই জল পাওয়া যায়। চৈত্র মাসে লুনীর উপর তিলওয়ারাতে খুব বড় একটা পশুমেলা হয়। বোধ হয় বিহারে সোনপুরের পর এইটাই ভারতের সবচেয়ে পুরনো আর বড় পশুমেলা। তিলওয়ারার পর অর্থাৎ র‍্যান অব কচ্ছ, যেখানে লুনী গিয়ে পড়েছে, সেখান পর্যন্ত বালি খুঁড়লে শুধু নোনা জল বেরোয়। তাই এই নদীর নাম হয়েছে লবণাবতী বা লুনী।

লুনী জংশনে ট্রেনে উঠলাম সকাল সাড়ে নটায়। গাড়িতে দেখি এক দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক অন্য সহযাত্রীদের অনর্গল গল্প শুনিয়ে যাচ্ছেন। একটু পরেই বুঝতে পারলাম যে, তিনি পার্লামেন্টের মেম্বার। পরে যখন টিকিট চেকার উঠল, তখন তাঁর পাসের উপর লেখা নাম পড়ে জানলাম যে, রীতিমত বড়দরের নেতা। ভদ্রলোক ভারতীয় সংস্কৃতির উপর যে দেশের ছেলেদের শ্রদ্ধা নেই, সেই বিষয়ে অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন। তাঁর কাছে সারা পৃথিবীর বহু মজার মজার গল্প শুনলাম। ইন্দোনেশিয়াতে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্পর্কে একটা গল্প বড় ভাল লাগল। প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ নাকি প্রসিদ্ধ অভিধান প্রণেতা ডাক্তার রঘুবীরকে নিজের নামের মানে জিজ্ঞাসা করেন। ডাক্তার রঘুবীর বলেন যে, সুকর্ণ শব্দের দুরকম মানে করা যেতে পারে। এক সুকর্ণ মানে এমন লোক যাঁর কান খুব সুন্দর অথবা সুকর্ণ মানে এমন লোক যিনি সব জিনিসের ভাল দিকটাই শুধু শোনেন। ডাক্তার সুকর্ণ বলেন যে তিনি কিন্তু তাঁর বাবার কাছে তাঁর নামের অন্য অর্থ শুনেছিলেন। মহাভারতে কর্ণ ছিলেন সবচেয়ে ভাল লোক, আর সবচেয়ে বড় বীর। সেই কর্ণেরও একটি দোষ ছিল যে, তিনি দুর্যোধনের মত লোকের বন্ধু ছিলেন। যাতে তাঁর সেইটুকু দোষও না থাকে, তাই তাঁর বাবা ছেলের নাম রেখেছিলেন সুকর্ণ।

ডাক্তার আলি শাস্ত্রমিদজোজোকে [শাস্ত্র+অসিত+জয়] একজন শুভানুধ্যায়ী নাকি নামের শেষাংশ ত্যাগ করতে উপদেশ দেন, তাতে তিনি জবাব দেন যে, তার চেয়ে আমি 'আলি' ত্যাগ করতে রাজি আছি।

গল্প শুনতে শুনতে বেশ সময় কেটে যাচ্ছিল। যতই দক্ষিণ দিকে যাচ্ছি, দেখি দেশ ততই কম রুক্ষ হয়ে আসছে। দুপাশে শুধু বাজরীর খেতের জায়গায়
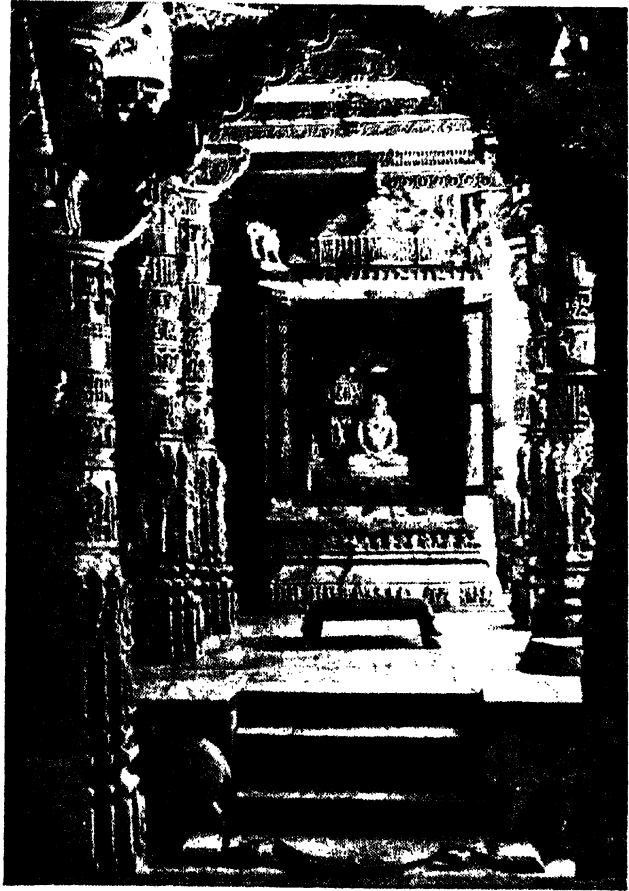
দিলওয়ারার প্রসিদ্ধ জৈন মন্দির

মাঝে মাঝে জোয়ারের খেতও দেখা যাচ্ছে। হঠাৎ একটা কলাগাছ দেখে স্ত্রী আর আমি প্রায় চেঁচিয়ে উঠেছিলাম। দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল?' বললাম, 'কিছু না অনেকদিন পরে কলাগাছ দেখলাম।' দুটোর সময় থেকে আরাবলী পর্বতমালা দেখা যেতে লাগল। এই আরাবলী রাজস্থানকে দুভাগ করে রেখেছে। এক পাশে মারোয়াড়ের মরুভূমি আর অন্য পাশে মেবার। আরাবলীর দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে একটি সাত মাইল চওড়া সমতল ভূমি, তার মধ্য দিয়ে বনাস নদী বয়ে গিয়েছে, অন্য পারে আবু পাহাড়। আবু তাই কোন পর্বতমালার অংশ নয়। চারিদিকে সমতল ভূমির মাঝে প্রায় বার মাইল লম্বা, দু তিন মাইল চওড়া এই পাহাড় দাঁড়িয়ে আছে। ওপরটা সমুদ্রতল থেকে চার হাজার ফুট উঁচু, অনেকটা মালভূমি মতন।

বিকেল সাড়ে তিনটের সময় আবু রোড স্টেশনে পেঁছে গেলাম। সেখান থেকে আবু সতর মাইল। স্টেট বাসে যেতে হয়। চা খেয়ে বাসে উঠে পড়লাম। বাসের ভিতর সব নোটিস গুজরাটীতে লেখা। সরকারীভাবে যে গুজরাটে ঢুকে পড়েছি সেকথা বাসে উঠে প্রথম মনে হল। আবু আগেকার সিরোহী রাজ্যের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত। স্বাধীনতা লাভের পর সিরোহীকে দুই ভাগ করে উত্তরভাগ রাজস্থানকে আর দক্ষিণভাগ বোম্বাইকে দিয়ে দেওয়া হয়। তাই আবু এখন বোম্বাই রাজ্যে। একটা নোটিস লেখা রয়েছে দেখলাম, 'সভ্যতা তোমার হক, আর আমাদের কর্তব্য।' আমরা বাঙলায় হলে 'তোমার' জায়গায় 'আপনার' ব্যবহার করতাম। গুজরাটীতে 'আপনার' হ্যাঙ্গাম নেই সবাই 'তমে'। গুজরাটীর জ্ঞাতি ভাষা মারোয়াড়ীতে আবার সবাই 'থে'—'তুই'।

সাড়ে চারটের সময় বাস ছাড়ল। বাসে দেখলাম উনিশজন বাঙালী স্কুল-কলেজের ছেলে রয়েছে। এরা পুজোর ছুটিতে দেশ ভ্রমণে বেরিয়েছে। প্রথমে আবু এসেছে, এখান থেকে ফেরবার সময় রাজস্থানের অন্যান্য জায়গা দেখতে দেখতে যাবে। একজনকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোথা থেকে এসেছো'। বললে 'ক্যালকাটা থেকে'। কলিকাতার ছেলেরা দেখেছি বাইরে নিজেদের শহরকে সব সময় ক্যালকাটা বলে।

চার মাইল সমতল ভূমির উপর দিয়ে গিয়ে বাস পাহাড়ে উঠতে আরম্ভ করল। আবু পেঁছতে প্রায় দেড় ঘণ্টা লাগে। পাহাড়ের গায়ে দেখলাম গভীর জঙ্গল। মারোয়াড়ের বৃক্ষবিরল প্রান্তরের মাঝখানে এই গভীর জঙ্গলে ঢাকা পাহাড় দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। সংস্কৃত ভাষার কবিরা বলেছেন আবু [অর্বুদ] পাহাড়
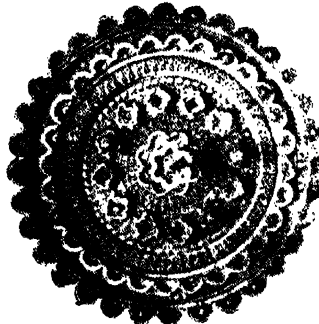
দিলওয়ারা মন্দিরের ছাতের কারুকার্য

হিমালয়ের পুত্র। লোকের প্রতি অনুকম্পাবশত তিনি পুত্রকে মরু প্রদেশে স্থাপন করেছেন। আবুর অধিবাসীদেরও নিজেদের পাহাড় সম্পর্কে কম গর্ব নেই। নীচের লোকদের শুনিয়ে শুনিয়ে তারা বলে—

টঁকে টঁকে কেতকী, ঝরণে ঝরণে জুঁই।
আবুরী ছবি দেখ তন উর না আওয়ে
দই॥

শিখরে শিখরে কেতকী, ঝরণায় ঝরণায় জুঁই; আবুর শোভা দেখার পর আর কিছু ভাল লাগে না। বেশীর ভাগ গাছই চিনি না, কিছু কাঞ্চন, অর্জুন, পীলু প্রভৃতি আছে আর তাছাড়া অনেক বাঁশ ঝাড়। নতুন পাখি বিশেষ চোখে পড়ল না। দু-চারটে স্পটেড ডাভ দেখলাম। মারোয়াড়ে এই পাখি নেই।

আবু পেঁছে হোটেল খুঁজতে খুঁজতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। কাজেই সেদিন আর কিছু দেখা হল না। রাজপুতানার সব রাজাদের আগে আবুতে কয়েকখানা করে বাড়ি ছিল। এখন রাজারা আবু আসা প্রায় ছেড়ে দিয়েছেন। তার কারণ এই যে, আগে রাজপুতানার রাজ্যগুলির রেসিডেণ্ট আবুতে থাকতেন। তাঁকে সেলাম করতে রাজাদের এখানে আসতে হত। তাছাড়া বোম্বাই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দরুণ এখানে মদ খাওয়া যায় না। তাই রাজারা তাঁদের এখানকার সব বাড়ি ভাড়া দিয়ে দিচ্ছেন। যোধপুরের রাজার একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে এক ভদ্রলোক যোধপুর হোটেল খুলেছেন। আমরা সেই হোটেলে উঠেছিলাম। অক্টোবর মাসে নাকি আবুতে খুব মশা হয়। এই সময় আবুতে আসা ফ্যাশান নয়। হোটেলে তাই একমাত্র বাসিন্দা আমরাই ছিলাম। আর সব ঘর খালি পড়ে ছিল। যদিও প্রায় চার হাজার ফুট উঁচু, তবু শীত বিশেষ করছিল না। এখানকার লোকেরা দেখলাম সন্ধ্যে বেলাও ঠাণ্ডা কাপড়ই পরে ছিল।

পরদিন সকালে উঠে বেড়াতে বেরুলাম। আগে ছবি দেখে ধারণা ছিল যে, আবু বুঝি সমতল মালভূমি। দেখলাম তা নয়। জায়গাটা অন্যান্য পাহাড়ের মতই, তবে চড়াই ওতরাই বেশি নেই, আর অন্য পাহাড়ে যেমন রাস্তার একধারে খাদ থাকে এখানে তা নেই। ছোট্ট শহর; রাজাদের বাড়ি ছাড়া অন্য বাড়ি বিশেষ নেই। অনেকগুলি গুজরাটী হোটেল আছে তীর্থযাত্রীদের জন্য। দার্জিলিং, মুসৌরী প্রভৃতি পাহাড়ে যেমন অনেক বড় বড় দোকান থাকে, এখানে সে রকম কিছু নেই। বোধ হয় ক্রেতা জোটে না। বাজারটা নিতান্তই ছোট আর সাদাসিধে।

শহরের এক পাশে নখীতালাও বলে একটা হ্রদ আছে। প্রায় আধ মাইল লম্বা আর সিকি মাইল চওড়া। দেবতাদের নখ দিয়ে খোঁড়া বলে নাকি এর নাম নখীতালাও। আসলে ছোট একটা বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ বানান হয়েছে। চারিপাশে পাহাড় দিয়ে ঘেরা ছোট্ট সুন্দর হ্রদ। এককালে ফার্গুসন বলেছিলেন যে, এটি ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে মনোরম জায়গা। হয়ত কথাটা একটু বাড়িয়ে

বলী. যেন মনে হয় টুরিস্টদের লোভ দেখান হচ্ছে, তবে জায়গাটা সত্যই বেশ মনোরম। হ্রদের একপাশে একটা পাহাড়ের উপর প্রসিদ্ধ ব্যাঙ পাথর। একটা খুব বড় পাথরের নুড়ি বৃষ্টির জলে ঘষে ঘষে অনেকটা ব্যাঙের মত দেখতে হয়ে গেছে। মনে হয় যেন প্রকাণ্ড একটা কোলা ব্যাঙ এখনই নখীতালাওতে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

ফিরবার সময় হোটেলের গেটের সামনে বড় বাড়িটার গায়ে দেখলাম লেখা রয়েছে সেণ্ট্রাল পুলিস ট্রেনিং কলেজ। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য ঢুকে পড়লাম। প্রথমেই একজন বাঙ্গালী অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো। তিনি আর একজন বাঙ্গালী অধ্যাপকের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। বাঙ্গালী মাত্র এই দুইজন অধ্যাপকই এখানে আছেন। এই কলেজে প্রধানত যে সব ছেলেরা ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিস কম্পিটিশন পরীক্ষা পাস করে আসে তাদের এক বছর প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হয়। শিক্ষণীয় বিষয়ের তালিকা বেশ লম্বা। সব রকম ফৌজদারী আইন ছাড়া, অপরাধী খুঁজে বার করবার বৈজ্ঞানিক উপায়, ওয়্যারলেস, ঘোড়ায় চড়া, মোটরগাড়ি সারান, পুলিসের মেকানিক, অগ্ন্যস্ত্র, প্যারেড ইত্যাদি যে পুলিসের কাজে লাগতে পারে এমন জিনিস নেই যা শেখান হয় না। অধ্যাপকেরা বললেন যে, সকাল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যে অবধি ছেলেরা এক মিনিট সময় পায় না। এই বাড়িটা আগে লরেন্স স্কুল ছিল। লরেন্স স্কুল স্থাপিত হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। ভারতে যে সব ইংরাজ সৈন্যরা থাকত তাদের ছেলেমেয়েদের শিক্ষার জন্য এই স্কুল খোলা হয়। এখন প্রয়োজনের অভাবে স্কুল উঠে গিয়েছে। ট্রেনিং কলেজের ছেলেরা থাকে আধ মাইল দূরে আগেকার রাজপুতানা হোটেলের বাড়িতে।

দুপুরে বেলা হাঁটতে হাঁটতে প্রায় মাইল খানেক দূরে আবুর প্রধান আকর্ষণ দিলওয়ারা [দেবলওয়ারা—মন্দিরপাড়া] মন্দির দেখতে গেলাম। সকাল থেকে বেলা বারোটা অবধি মন্দির শুধু জৈনদের জন্য খোলা থাকে, তারপর অন্যদেরও ঢুকতে দেওয়া হয়। এখানে পাঁচটি মন্দির আছে, তার মধ্যে তিনটি সাধারণ, অন্য দুটির জন্যই এখানকার খ্যাতি।

প্রথম মন্দিরটি প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথ বা ঋষভনাথের। এটির নাম বিমলবশাহী মন্দির। ১০৩২ খৃষ্টাব্দে বিমল শাহ এটি তৈরি করান। বিমল শাহ ছিলেন গুজরাটের রাজা ভীমদেবের মন্ত্রী, যিনি ১০২৬ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ গজনীর হাত থেকে সোমনাথের ইঁট-কাঠের মন্দির রক্ষা করতে অসমর্থ হন ও পরে নতুন করে সোমনাথের মন্দির পাথর দিয়ে গড়ে তোলেন। দরজার উপর হিন্দীতে একটা নোটিশ বোর্ড টাঙান আছে,—যেমন শেঠেদের বানান অনেক মন্দিরে থাকে—যে এই মন্দির তৈরি করতে বিমল শাহ এত লক্ষ টাকা খরচ করেছিলেন। মন্দিরটি বাইরে থেকে দেখলে নিরাশ হতে হয়। একটা চার কোনা বাড়ি, বেশি উঁচুও নয়, বড় জোর ফুট কুড়ি হবে। কোন শিখর নেই, বাইরে থেকে দেখলে মোটে মন্দির বলেই মনে হয় না। ভিতরে ঢুকলেই কিন্তু বড় সুন্দর লাগে। একটি উঠোনের মাঝখানে প্রথমে একটি শ্বেত পাথরের মণ্ডপ, তার পর একটু উঠে ছোট একটি মন্দির। মণ্ডপটি আটচল্লিশটি শ্বেত পাথরের থামের উপর দাঁড়িয়ে আছে। উঠোনের চারিদিক ঘিরে বাহান্নটি ছোট ছোট কুঠরি। প্রত্যেকটিতে একজন করে তীর্থঙ্করের পদ্মাসনমূর্তি। অবশ্য মূর্তিগুলি সবই এক রকম দেখতে। আসনের উপর লাঞ্ছন না দেখলে বোঝবার উপায় নেই যে, কোন্ মূর্তিটি কোন্ তীর্থঙ্করের। কুঠরিগুলির সামনে শরু বারান্দা। এক মেঝেতে ছাড়া সমস্ত মন্দিরের কোন জায়গায় এতটুকু ফাঁক রাখা হয়নি। সব জায়গাতেই শ্বেতপাথর খুদে ছোট-বড় নানারকম মূর্তি বার করা হয়েছে। কোথাও হাতি বা ঘোড়ার সার চলেছে, কোথাও নৃত্যগীত হচ্ছে, কোথাও জৈন পুরাণের নানারকম দৃশ্য, কোথাও বা এক ঝাড় আধফোটা পদ্ম নেবে এসেছে; সব মিলিয়ে একটা চমক লাগিয়ে দেয়। মণ্ডপের ছাতের যে কারু-কার্য তাও পৃথিবী বিখ্যাত।

মণ্ডপের ছাতে গোল করে ঘিরে ষোলটি দেবীমূর্তি ব্র্যাকেটের মত করে লাগান আছে। ভারত সরকারের প্রচার বিভাগ থেকে দিলওয়ারা মন্দির সম্পর্কে যে পুস্তিকা বার করা হয়েছে তাতে এই-

গুলিকে সরস্বতীর মূর্তি বলা হয়েছে। আসলে এ'রা জৈন পুরাণের ষোল জন বিদ্যাদেবী। এ'দের নাম রোহিনী, প্রজ্ঞপ্তি, বজ্রশৃংখলা, বজ্রাংকুশা, অপ্রতি-চক্রা, পুরুষদত্তা, কালী, মহাকালী, গৌরী, গান্ধারী, সর্বাস্ত্রমহাজ্বালা, মানবী, বৈরোট্যা, অচ্ছুপ্তা, মানসী ও মহা-মানসী। পুস্তিকা লেখক কেন ভুল করেছেন বুঝলাম না, কারণ হিন্দু ও জৈন দুই সরস্বতীরই বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে, আর এই মূর্তিগুলির হাতে ঐ দুইটির কোনটিই নাই।

পুরানো মন্দির বললেই যেমন একটা অন্ধকার স্যাঁতসেঁতে মতন হবে বলে মনে হয়, এখানে তা নয়। খোলা উঠানের মধ্যে বলে বেশ আলো আছে, আর জৈনদের কেবল মন্দির পরিষ্কার রাখা বাতিক বলে সমস্ত মন্দিরটি ঝকঝক করে।

এই মন্দিরের পাশেই বিরষবলের মন্ত্রী দুই ভাই বস্তু পাল আর তেজ পালের তৈরি দ্বাবিংশতিতম তীর্থংকর নেমীনাথের মন্দির। ১২৩০ খৃষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরটিও প্রায় বিমল বশাহী মন্দিরের নক্সাতে ও সম্পূর্ণ শ্বেতপাথরের তৈরী, তবে চারি পাশে কুঠরির সংখ্যা এখানে ঊনচল্লিশটি। আর দশ বছর আগে তৈরি বিমলবশাহী মন্দিরের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্য এখানকার কারুকার্য আরো সূক্ষ্ম। পদ্মের পাপড়ি

গুলি এত পাতলা যেন মনে হয় স্বচ্ছ। গল্প এই যে, যখন কারিগরেরা কাজ শেষ করে তেজপালকে খবর দেয়, তখন তিনি নাকি এসে বলেন যে, এইসব পদ্মের পাপড়ি থেকে ঘ'ষে যদি আরো পাথর বার করতে পার তাহ'লে সেই ওজনের রূপো তোমাদের বকশিশ দেব। তাই এই মন্দিরের কাজ এত মিহি। মণ্ডপের ছাতটি একটি চমৎকার ব্যাপার, শত শত পদ্মের ঝাড় উপর থেকে ঝুলে আছে। শুধু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাক।

দুই মন্দিরের কুঠরিগুলির সামনে বারান্দার ছাতে অনেক জায়গায় জৈন পুরাণের গল্প খোদাই করা আছে। যেমন নেমীনাথ বিবাহ করতে যাচ্ছেন, পথে দেখলেন যে, বিবাহের ভোজে কাটবার জন্য অনেক পশু বাঁধা রয়েছে। দেখে তাঁর বৈরাগ্য হ'ল, তিনি বিবাহ না ক'রে সন্ন্যাসী হয়ে তপস্যা করতে চলে গেলেন, ইত্যাদি। একই ফ্রেমের মধ্যে গল্পের অনেকগুলি দৃশ্য দেখানো, আমাদের দেশে প্রাচীন যুগ থেকে চলে আসছে, আর এখনো জৈন শেঠেরা এই পরম্পরা বজায় রেখেছেন। যে কোন আধুনিক জৈন মন্দিরে গেলে বড় বড় ফ্রেমে আঁকা জৈন পুরাণের গল্পের ছবি লাল আর সোনালী রঙে আঁকা দেখা যাবে। তলায় বড় বড় অক্ষরে লেখা "শেঠ অমুকমল অমুকচন্দ্র এই ছবি ১৫০১৲ টাকা খরচ করে বানিয়েছেন।" দিলওয়ারাতে কিছু হিন্দু পুরাণের গল্প, যেমন কালীয় দমন, ইত্যাদিও আছে। জৈন আর হিন্দু পুরাণের অনেক জায়গায় মিল আছে। জৈন প্রতি সর্পিনীতে (যুগে) ন' জন করে বাসুদেব জন্মগ্রহণ করেন। প্রত্যেক বাসুদেবের একজন ক'রে বলদেব ও একজন ক'রে প্রতিবাসুদেব থাকেন। বলদেব আর বাসুদেব একই রাজার দুই রাণীর পুত্র। 'বলদেব গৌরবর্ণ ও বাসুদেবের গায়ের রঙ কালো, এ'দের প্রতিদ্বন্দ্বীর নাম প্রতিবাসুদেব। নেমীনাথের কাছাকাছি সময় হরিবংশে বসুদেব নামে রাজা ছিলেন। তাঁর দুই ছেলে বলদেব আর কৃষ্ণ। কৃষ্ণই সেই সময়কার বাসুদেব। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী জরাসন্ধ ছিলেন সেই যুগের প্রতিবাসুদেব। কাজেই কৃষ্ণলীলার যে সব দৃশ্য এখানে আছে সেইগুলিকে জৈন পুরাণের দৃশ্যও বলা যায়।

জৈনরা হাতিকে একটি মঙ্গল চিহ্ন বলে মনে করেন। তাই জৈন মন্দিরের কাছাকাছি হাতির মূর্তি বা ছবি থাকা নিয়ম। দিলওয়ারা'র দুই মন্দিরের সঙ্গেই একটি করে হাতিশাল আছে। হাতিশাল মানে একটি ক'রে ঘর, সেখানে মন্দির প্রতিষ্ঠাতাদের ও তাঁদের আত্মীয়-স্বজনের হাতির উপর বসান মূর্তি রাখা আছে। উপরের মূর্তিগুলি এখন আর বেশীর ভাগই নেই, শুধু হাতিগুলি বর্তমান। প্রায় চার ফুট উঁচু এই হাতির মূর্তিগুলি অনেকটা জীবন্ত মনে হয়। দড়ি দিয়ে বাঁধা হাওদা, শিকল প্রভৃতি খুব যত্ন ক'রে খোদা হয়েছে। তেজপালের মন্দিরের হাতিশালের উপর শ্বেতপাথরের জালি দেওয়া। যদিও তাজমহল বা সেলিম চিস্তির কবরের জালির সঙ্গে তুলনীয় নয়, তাহলেও এখানকার জালিগুলি খুব খারাপ নয়, একটু মোটা কাজ।

আটশ' নয়শ' বছরের পুরানো এই মন্দিরগুলির অনেক জায়গায় কিছু কিছু কারুকার্য ভেঙে গেছে। আহমেদাবাদের একটি জৈন ট্রাস্ট জয়পুর থেকে কারিগর আনিয়ে মন্দিরের জীর্ণোদ্ধার করছেন। দেখলাম, খুব ভাল কারিগর। কোন মূর্তির যদি মাথা ভেঙে গিয়ে থাকে, তা'হলে প্রথমে একটা মাটির মাথা বানিয়ে নেয়। সেইটি বসিয়ে যদি দেখে যে, মন্দ দেখাচ্ছে না তা'হলে তারই পাথরের নকল বানিয়ে সিমেণ্ট দিয়ে এমন বেমালুম জুড়ে দেয়—দেখে বোঝার উপায় নেই যে, মূর্তিটি কখনো ভাঙা ছিল। এদের পূর্বপুরুষরাই তো মন্দিরগুলি বানিয়েছিল।

দিলওয়ারা মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখি, একদল লোক একটা বাস ভাড়া ক'রে অচলগড় দেখতে যাচ্ছে। আমরাও তাদের সঙ্গী হয়ে গেলাম। অচলগড় দিলওয়ারা থেকে চার মাইল দূরে। রাস্তা গুরুশিখরের পাশ দিয়ে গিয়েছে। গুরুশিখর (৫৬৪৬ ফুট) নীলগিরি আর হিমালয়ের মাঝে সবচেয়ে উঁচু জায়গা। অচলগড়ে গিয়ে দেখলাম, বিশেষ কিছু দেখবার নেই। সিরোহীপতি সুরতান যেখানে অচল হয়ে বাস করতেন সেই দুর্গের বাইরের দেয়ালের কিছু অংশ দেখা যায়। আর সব ভেঙে গেছে। তা'ছাড়া একটা শিবমন্দির আর গোটা দুই জৈন মন্দির আছে। একটা পুকুর আছে, তার পাশে তিনটে পুরো মাপের মোষের মূর্তি। একজন রাজা তীর ছুঁড়ে তাদের মারছেন। মোষ তিনটি নাকি রাক্ষস। ঐ পুকুর একদিন ঘিয়ের পুকুর ছিল। রাক্ষসরা মোষের রূপ ধ'রে এসে চুরি ক'রে ঘি খেয়ে যেত, তাই পরমার রাজা আদিপাল তাদের তীর ছুঁড়ে মারেন।

সন্ধ্যেবেলা হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন সকালে আবু শহরে খানিক বেড়িয়ে এগারটার সময় বাস ধ'রে নীচে আবু রোড স্টেশনে নেবে এলাম।

চক্রদত্ত

চক্ষু চিকিৎসকদের পক্ষে অন্যের চোখের গতিবিধি যথাযথ লক্ষ্য করা খুবই কঠিন কাজ, বিশেষত চোখ নীচু ক'রে যখন কিছু পড়তে থাকে তখন তাদের চোখের তারার নড়াচড়া কিছুই অন্যে দেখতে পায় না অথচ এই সময়টিতে চোখের ওপর লক্ষ্য রাখতে পারলেই চোখের দৃষ্টিশক্তিহীনতা কতটা এবং কী ধরনের সহজেই ধরা পড়ে। চোখ পরীক্ষার সময়ে এই সমস্ত লক্ষ্য করার জন্য একটি

চোখের তারার গতিবিধি লক্ষ্য করার চশমা

আর্শি লাগান চশমার ব্যবস্থা হয়েছে। সাধারণ চশমার মত একটি কাঁচহীন ফ্রেমের সংগে এই আর্শিওয়ালা চশমাটা লাগান থাকবে যাতে আর্শি দুটো ঠিক গালের ওপর থাকে। ঐভাবে কোন কিছু পড়তে বা দেখতে থাকলে চোখের তারার গতি-বিধি আয়নায় প্রতিফলিত হবে এবং সামনে থেকে যে কোনও লোকই সেটা লক্ষ্য করতে পারে। এই আয়নার মধ্য দিয়ে ডাক্তার লক্ষ্য করতে পারেন যে, পড়তে পড়তে কতক্ষণের জন্য চোখটা থেমে যাচ্ছে, কীরকম তাড়াতাড়ি ক'রে লেখার ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে যাচ্ছে, কতক্ষণ অন্তর এবং কতবার থামছে এবং কতবার পিছনে তাকাতে হচ্ছে ও কতখানি সহজভাবে পড়তে পারছে।

*

ক্যানসার রোগটা প্রথম অবস্থায় বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই ধরা সম্ভব হয় না। ডাক্তাররা অনেকদিন ধ'রেই চেষ্টা করছেন কোন একটা সহজ উপায় খুঁজে বার করতে যাতে ক'রে এটা প্রাথমিক অবস্থায় বোঝা যায়। অবশ্য এখন পর্যন্ত এই ধরনের গবেষণায় যে একটা কিছু ভাল ফল পাওয়া গেছে তা বলা যায় না। তবে গবেষণাকারীরা ক্যানসার রোগীর রক্তের সংগে একটা রাসায়নিক বস্তু মিশিয়ে প্রায় শতকরা ৯০ জন লোকের রোগ নির্ণয় করতে পারছেন। এ পর্যন্ত প্রায় ১০,০০০ রোগীর ওপর এই পরীক্ষা করা হয়েছে।

*

অপুষ্ট ছেলেমেয়েরা সাধারণত ভীরু, স্পর্শকাতর এবং অল্পেই বিরক্ত হয়ে ওঠে। এই ধরনের তিরিক্ষে মেজাজের জন্যই এদের সাধারণের তুলনায় ক্ষিদে তেষ্টা কম হয়। আর তাছাড়া এরা যতটা খায় সেটার সমস্তটাই এদের পুষ্টিসাধনে লাগে না। শিশুদের ডাক্তাররা বলেন যে, এই সমস্ত ছেলেমেয়েদের যদি খাবার আগে এমন কোন ওষুধ দেওয়া যায় যার জন্য এদের স্নায়ু স্নিগ্ধ হয়, তাহ'লে খুব উপকাব পাওয়া যায়। ৪০ জন ছেলেমেয়ের ওপর এই ধরনের পরীক্ষা ক'রে দেখা গেছে যে, শতকরা প্রায় ৯৩টি ছেলেমেয়ে ১ থেকে ৬ পাউন্ড পর্যন্ত ওজনে বাড়ছে। এটাও লক্ষ্য করা হয়েছে যে, ঐ ধরনের কোন স্নায়ু স্নিগ্ধকারী ওষুধ খাওয়ানোর ফলে ছেলেমেয়েদের ক্ষিদে বেশ বেড়ে যায়। এছাড়াও, ঐ একই খাবার খাওয়াতেও ছেলেমেয়েদের ওজনের তারতম্য হ'তে দেখা যায়। যখন ছেলেমেয়েদের স্বভাবের বদল হয় তখন আর ওষুধ খাওয়ানোর দরকার হয় না।

*

কথায় বলে লোকটা যেন গরুর মত খাচ্ছে। সত্যিই কি আমরা গরুর মত খাই। তবে এটা লক্ষ্য করা গেছে যে, আমরা দিনে গরুর চেয়ে খাদ্যে খুব কম ক্যালরী তো খাই না বরং বেশীই খাই। একটা ৪০০ পাউন্ড ওজনের গরুর দিনে ৫,৪০০ ক্যালরী দরকার। একটা বাছুরের প্রত্যেক দিনে ১½ পাউন্ড ক'রে ওজন বাড়বার জন্য ১২,৫০০ ক্যালরী দরকার। এর সংগে তুলনা করলে দেখা যায় যে, একটি ১২৩ পাউন্ড ওজনের স্ত্রীলোকের দিনে প্রায় ২,৫০০ ক্যালরী দরকার; আর ১৫৪ পাউন্ড ওজনের পুরুষের প্রায় ৩,০০৬ ক্যালরী দরকার।

*

গাছগাছড়ার শখ যাদের আছে তারা অন্তত বেশ ভালো করেই জানেন যে, গাছের গোড়ার মাটি যত উল্টো পাল্টা ক'রে দেওয়া যায় গাছের বৃদ্ধি ততই বেশী হয়। বৈজ্ঞানিকগণ এই পদ্ধতিই আর একটু সংস্কৃত ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখেছেন। এ'রা বলেন যে, ওপরের স্তরের মাটিকে যদি কোনও উপায়ে নীচের স্তরে পাঠিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে গাছের বাড় খুব বেশী হয়। বনে জংগলে এই জিনিসটি লক্ষ্য করা গেছে। দুটি ফাঁপা মোটা নলের মধ্যে দুটি পাইন গাছ পুঁতে পরীক্ষা শুরু হ'লো। একটি নলের ওপরের মাটি নীচে পাঠানো হ'লো আর অন্যটি একভাবেই রাখা হ'লো এবং দেখা গেল যে, যে নলটির মাটি তোলপাড় করা হয়েছে সেই নলের মধ্যের গাছটিই ভাল-ভাবে বেড়েছে। মাটির ওপরের স্তর সব সময়ে বেশী উর্বর থাকে অথচ ওপরে থাকার দরুণ তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায় ফলে গাছ এই শুকনো মাটি থেকে সার পদার্থ সহজে সংগ্রহ করতে পারে না। সুতরাং এই উর্বর মাটি যদি নীচের স্তরে পাঠিয়ে দেওয়া যায় তাহ'লে সব সময় ভিজে থাকতে পারে ফলে এর থেকে উপাদান সংগ্রহ করা গাছেদের পক্ষে সহজ হয়। তাছাড়া নিম্নস্তরের মাটি ওপরের স্তরের মাটির চেয়ে কম উর্বর এবং কোনও কিছু বীজ থাকে না ব'লে ঐ মাটি ওপরে আনলে সহজে আগাছা জন্মাতে পারে না।

[লেখার প্রচার]

ওপারেতে সর্বসুখ, বাঙালী লেখক এবং প্রকাশকমাত্রের বিশ্বাস, সুতরাং ইংরেজী বইয়ের মুদ্রণসংখ্যা দেখে তাঁরা এখন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলেন না। এটাকে অমোঘ বিধিলিপি ব'লে ধরে নিয়েছেন। বাংলার তুলনায় ইংরেজী বই বেশি তো কাটবেই। ইংরেজীভাষীরা সংখ্যায় ভারী, তাঁদের পকেট ভারী, উক্ত ভাষায় রচিত গ্রন্থের বাজার পৃথিবীর প্রায় সব দেশে। কথাটার অনেকটাই ঠিক, তবু সব দোষটাই দৈবের নয়। দু'টি ভাষার বই বিক্রীর তারতম্য শুধু লোক-সংখ্যাতত্ত্বে ব্যাখ্যাত হয় না। কবিরা কবি হয়েই জন্মান বটে, কিন্তু পাঠক তৈরি করে নিতে হয় এবং সেই কৌশলটুকু জানা চাই। এই জ্ঞানের পরিচয় এদেশীয় সাহিত্যহিতৈষীদের মধ্যে বিশেষ দেখতে পাইনে।

ভালো বই ভালো বিক্রী হবে জেনেও বিলেতী বইওয়ালারা চুপ করে বসে নেই: তাদের লক্ষ্য আরো ভালো বিক্রীর দিকে; এ ব্যাপারে কয়েকটি সরকারী বা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠান তাঁদের সহায়। যেমন লন্ডন বুক সোসাইটি। সমস্ত ইংরেজী বইয়ের প্রকাশক তাঁদের আসন্নপ্রকাশ্য বই-গুলির এক সেট প্রুফ এই সোসাইটিকে পাঠিয়ে দেন। সুপরিচিত লেখক এবং সমালোচক নিয়ে গঠিত সোসাইটির কমিটি এই প্রুফ আদ্যন্ত পাঠ করেন এবং একটি বইকে উল্লেখযোগ্য ব'লে চিহ্নিত ক'রে হাজার হাজার মেম্বরের কাছে পাঠিয়ে দেন। সোসাইটির মুখপত্র 'The Bookman'-এ নির্বাচিত বইয়ের বিস্তৃত আলোচনাও থাকে। এতে পাঠকের সুবিধে, তাঁরা অনায়াসে একটি সুপাঠ্য বই বেছে নিতে পারেন। (বাংলা বইয়ের ক্রেতার অবস্থা কল্পনা করুন। মাসিক পত্রিকার পাতা ওল্টাতেই তাঁদের চোখে পড়ে প্রতি পৃষ্ঠায় পাইকা, ডবল পাইকা, গ্রেট, ডবল গ্রেট হরফে ছাপা রকমারি শ'খানেক বইয়ের বিজ্ঞাপন, যাতে নাম আর দামের মাত্র উল্লেখ থাকে, আর কিছু না। কোন্‌টা কিনব, কোন্‌টা কিনব না স্থির করতেই পাঠক হিমসিম

উত্তমপুরুষ

খেয়ে যান। পুস্তক সমালোচনা থেকে হদিশ পাবেন, সে আশা দুরাশা, কেননা সেখানে তো শুধু 'কালোও ভালো, ধলোও ভালো' টাইপের বাঁধা বুলি)।

'বুক সোসাইটির' বাছাইয়ের ফলে সুবিধা প্রকাশকেরও। নির্বাচিত বই বেশ কয়েক হাজার বিক্রী হবে তাঁরা পূর্বাহ্ণেই ধ'রে নিতে পারেন এবং সেই হিসাবে বইয়ের দাম ধার্য করেন। একটি অধুনা প্রকাশিত ইংরেজী বইয়ের কথা জানি। প্রথম সংস্করণে বইটির দাম একুশ শিলিং হবে ব'লে বিজ্ঞাপন বেরিয়েছিল, কিন্তু সোসাইটির মারফৎ এত অর্ডার এসে পড়ে যে, প্রকাশক খতিয়ে দেখলেন, পনেরো শিলিং দাম ফেললেও লাভ থাকে। ব্যবস্থাটিকে বলা যেতে পারে Twice blessed. এ-যুগের বেশির ভাগ 'বেস্ট সেলর' সোসাইটির জয়টীকা নিয়ে প্রকাশিত হয়েছিল। কয়েকটির নাম উল্লেখ করা যেতে পারেঃ **Grand Hotel (Vicki Baum); The Rains Came (Louis Bromfield); Rebecca (Daphne du Maurier); For Whom the Bell Tolls (Hemingway); The Gathering Storm (Churchill); The Kon-Tiki Expedition (Thor Heyerdahl)** ইত্যাদি। সোসাইটির পছন্দর দিকে চোখ রেখে বই ছাপেন ব'লে ওদেশের প্রধান প্রকাশকেরা শুধু ব্যবসা করেননি, ইংরেজী বইয়ের একটা মোটামুটি মানও রক্ষা করে চলেছেন। 'টাইম্‌স' লিটরারি সাপ্লিমেন্ট' পত্রিকাও প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত পুস্তকাদির বিস্তৃত আলোচনা ছাড়া 'Books to come' কলমে শীঘ্র প্রকাশ্য বইগুলির উল্লেখ করেন।

সর্বোপরি আছে **Arts Council.** এই প্রতিষ্ঠানটি ১৯৫৩-৫৪ সালে যে ক'টি সংকার্য করেছেন তার একটি বিবরণী সম্প্রতি 'Public Responsibility for the Arts' নামক পুস্তিকা মারফৎ জানা গেছে। গত বৎসরে প্রতিষ্ঠানটির আয়ের তিন ভাগের এক ভাগ ব্যয়িত হয়েছে কাব্য পাঠে উৎসাহ দানে এবং কাব্যগ্রন্থ প্রচারে। প'ড়ে বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু বিস্ময়ের একটু বাকি ছিল। কয়েকটি নাটকের দর্শকদের গ্রামাঞ্চল থেকে শহরে নিয়ে আসতে এই প্রতিষ্ঠানটি বাস্‌ ভাড়ারও অনেকটা বহন করেছিলেন— এদেশে আমরা এটা ভাবতেই পারি না। মফস্বলের বিভিন্ন কেন্দ্রে Arts Council-এর উদ্যোগে Civic Art Trust গড়ে উঠেছে।

অনেকে বলবেন, আর্ট কৌন্সিল আমাদের দেশেও তো আছে। যথা, সাহিত্য আকাদেমি। কিন্তু সরকারী আনুকূল্যে স্থাপিত এই সদ্যোজাত প্রতিষ্ঠানটি সম্ভবত 'Little done, un-done vast'-এর কথা ভেবে মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। কিন্তু বড় রকমের কাজে হাত দেবার আগে এ'রা ছোটখাটো কয়েকটি বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন। প্রতি বছরে ভারতের নানা ভাষায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের একটি পঞ্জী রচনা এবং প্রচার দুঃসাধ্য কর্ম কিছু নয়। তর্জমার প্রশ্ন পরে আসবে, মহাকোষ, ইত্যাদি সংকলন আরও পরে। বিভিন্ন আঞ্চলিক পত্র-পত্রিকায় মুদ্রিত প্রবন্ধ-কাব্য-কাহিনীর একটি সংকলন মধ্যে মধ্যে আকাদেমির উদ্যোগে ছাপা হতে পারে। শুনেছি এ'রা একটি **who's who** রচনায় উদ্যোগী হয়েছেন, এই তালিকা-ভুক্তিতে কোন রকম দলীয় বা আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্ব দেখা না পায়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। আকাদেমি নিঃ ভাঃ বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের সাহায্য চেয়েছেন, জানি। সেই সঙ্গে এ'রা মুখ্য সাহিত্য পত্রিকাগুলির সম্পাদকদের পরামর্শ নিলে ভাল করবেন। বহুকাল পূর্বে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় এ-কাজের ভার নিয়ে কিছুদূর অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা আকাদেমির কাজে লাগতে পারে।

আসল কথা, ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার ও সাহিত্যের মধ্যে অপরিচয়ের প্রাচীর ভেঙে দেবার সময় এসেছে। কবি জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর বোম্বায়ের একটি পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যের উল্লেখ করে লিখেছিলাম, এটা ব্যতিক্রম মাত্র। ব্যতিক্রম যে, তার প্রমাণ হাতে হাতেই মিলেছে। আধুনিক তামিল সাহিত্যের সবচেয়ে জনপ্রিয় ও কুশলী লেখক আর কৃষ্ণমূর্তি ('কল্কি') সম্প্রতি লোকান্তরিত হয়েছেন। কোন বাংলা পত্রিকায় এ'র সম্বন্ধে বিশেষ প্রবন্ধ দূরে থাক, সম্পাদকীয় মন্তব্য পর্যন্ত দেখেছি বলে মনে পড়ে না

* * *

নতুন হাওয়া

বিখ্যাত সোভিয়েট লেখক এরেনবুর্গ তাঁর নতুন উপন্যাসটির নাম দিয়েছেন **'The Thaw'**, নামকরণ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। দীর্ঘ শীতের শেষে যখন তুষার-গলা আরম্ভ হয়, তাকে বলে Thaw. রুশ দেশের চিন্তারাজ্যে তবে কি এতদিন পরে তুষার গলতে শুরু করেছে? এই প্রশ্ন একই সঙ্গে বহু চিন্তাশীল লেখকের মনে উঠেছে। স্টীফেন পোলক এবং ভিলেস বার্নার্ড চেক সাহিত্যের সাম্প্রতিক প্রবণতার আলোচনা করে বলেছেন, রাশে ঢিলে দেওয়া হয়েছে মাত্র, ছেড়ে দেওয়া হয়নি। **("The leash is lengthened but is not weakened').** সোভিয়েট সাহিত্যের আলোচনায় পোলিশ বা চেক সাহিত্যের উল্লেখ প্রাসঙ্গিক এই কারণে যে, বিশেষ একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার আওতায় আসার ফলে এই দুই দেশে শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে বিশেষ বিপর্যয় দেখা গেছে। বহু কবির বীণা নীরব হয়েছে, শুধু তাঁরা নির্দিষ্ট সুরে তার বাঁধতে পারেননি বলে। ১৯৫২ সালে চেক কবি কনস্টান্টিন বীব্স আত্মহত্যা করেন। মৃত্যুর পূর্বে কোন বন্ধুকে তিনি লিখে যান 'রাজনৈতিক কবিতা রচনার মত হৃদয়বিদারক ব্যাপার কিছু নেই।'

খাস রুশ দেশের সাহিত্যের অধুনাতন গতি-প্রকৃতি নিয়ে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখেছেন আইজাক ডয়েশার। (ইনি এ যুগের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়কদের অগ্রণী। বিশেষ পরিশ্রমের সঙ্গে স্তালিনের জীবনী রচনা করেছেন। ট্রট্স্কির জীবনীর প্রথম পর্ব 'The Prophet Armed' নামে কিছুকাল আগে বেরিয়েছে, দ্বিতীয় পর্ব শীঘ্রই বেরুবে। লেনিনের একটি প্রামাণ্য জীবনচরিত রচনার সংকল্পও লেখকের আছে)।

রুশিয়ায় শিল্পকর্মের ক্ষেত্রে স্তালিনের মৃত্যুর পর থেকে স্বাধীন চিন্তার দু-একটি ধারা বইতে শুরু করেছে, ডয়েশার লক্ষ্য করেছেন। শিল্পী এবং স্থপতিরা **Zhdanov** উদ্ভাবিত 'সোস্যালিস্ট রিয়েলিজমের' বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছেন। কবি এবং ঔপন্যাসিক বলছেন, ফর্মুলামাফিক সাহিত্য-সৃষ্টি আর না, সত্যিকার কিছু লিখতে হবে। এতকাল ধরে আবেগহীন কাব্য, প্রকৃত সংঘাতহীন নাটক (আদর্শ যেখানে একমেব, সেখানে সংঘাত থাকে না, শেষ অঙ্কে শুধু হরিবোল থাকে, আর্টের পক্ষে সেটা 'বল হরি'), আর কলের পুতুলের মত প্রাণহীন চরিত্র নিয়ে কাহিনী রচনায় এ'দের বিরাম এসেছে, সেটা বিস্ময়ের নয়। বিস্ময় এইখানে, সেকথা সশব্দে উচ্চারণ করবার এ'রা সাহস পেয়েছেন। উদীয়মান লেখক **Ovechkin** তো এক রকম বলেই ফেলেছেন, **'We have had enough of your Stalin prizes'.**

ভি পমেরাণ্টসেভ নামক কোন সমালোচক একটি নিবন্ধে বলেছেন, সাহিত্য সমালোচকের প্রথম কর্তব্য, রচনায় প্রকৃত আবেগ আছে কি নেই, সেটা বিচার করা। কথাটা নতুন নয়,—অস্কার ওয়াইল্ড বহু আগেই বলেছেন, **Emotion for the sake of emotion is the aim of art,**——কিন্তু সোভিয়েট দেশে নতুন। সঙ্গে সঙ্গে ওদেশে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে, গেল রাজ্য, গেল মান বলে কেউ চেঁচিয়ে উঠেছেন, কিন্তু এইটেই সুখের কথা পমেরাণ্টসেভের সমর্থকেরাও দলে হাল্কা নন। তাঁদের বক্তব্যও ছাপা হয়েছে। অন্য স্তালিন আমলে প্রকাশ্যে এ-জাতীয় কোন বিতর্ক তো সম্ভবই হত না।

অচলায়তনে মুক্ত হাওয়া ঢুকেছে আনন্দের কথা। কিন্তু ডয়েশার প্রশ্ন করেছেন, এতে কর্তৃপক্ষের সায় আ কতখানি। পরিবর্তনটা হৃদয়ের না কৌশলের। রাষ্ট্রপরিচালকেরা এ দিনে কি বুঝেছেন শিল্পীর চো 'Sees things differently from othe people's eyes and sees them bette (শ'—প্লেজ আনপ্লেজেণ্টের ভূমিকা নাকি জাতীয় অর্থনীতি থেকে দর্শ বিজ্ঞান, বুদ্ধি, ধ্যান-ধারণা সব কিছু কঠিন নিগড়ে বেঁধে তাঁরা উপল করেছেন, এতে সীমাবদ্ধ এবং সাময়ি ফলমাত্র পাওয়া যেতে পারে, আর অগ্রসর হতে হলে অন্তত কিছুটা না দিয়ে উপায় নেই? শিল্পীকে সা চিন্তার আংশিক স্বাধীনতাদান অর্থনৈ **N. E. P.** এর একটা নতুন সংস্ক নয় তো।

এই সংশয়ের জবাব সময় দে কিন্তু সুস্থবুদ্ধির এই কৃপণ প্রকাশটু অভিনন্দনযোগ্য। রুশ সাহিত্যের ঐ বিপুল, হয়ত ক্ষীণ স্রোতটুকু বে সে পুনরুজ্জীবনের সাগরসঙ্গমে পৌঁছ মস্কো থিয়েটারে আবার হয়ত বা জীবনধর্মী নাটক অভিনীত হবে, ক শুধু জয়ধ্বনি করবেন না, নিভৃত-নি বেদনার কথাও লিখবেন।

কলকাতা

॥ ১॥

গত ৮ই ডিসেম্বর থেকে শ্রীমতী হৈমন্তী সেন তাঁর একক চিত্র-প্রদর্শনী শুরু করেছেন। পার্ক স্ট্রীটে আর্টিস্ট্রী হাউসের একতলার তিনখানা ঘরে এই ব্যবস্থা। মোট ৬০ খানা ছবি

'রিমোর্স'

টাঙান হয়েছে, তার মধ্যে দশটি জলরঙচিত্র আর বাকি তৈলচিত্র। ছবির সংখ্যা খুব বেশী না হওয়ায় বেশ পরিপাটি করে সাজান গোছান সম্ভব হয়েছে। নাম-তালিকার পুস্তিকাটি থেকে স্বচ্ছ রুচির পরিচয় পাওয়া যায়।

শ্রীমতী সেন ১৯৫২ সালে গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্র্যাফ্‌ট্‌-এর শেষ বাৎসরিক পরীক্ষা সমাপ্ত ক'রেই বিদেশে যাত্রা হন। ফ্লরেন্সে তিন মাস শিক্ষা-নবিশী করার পর প্যারিসে এক বছর থাকেন। প্যারিসে মুখ্যত তিনি সুবিখ্যাত শিল্পী জাদকিনের কাছেই শিক্ষালাভ করেন। তাছাড়া, আরও বহু শিল্প-কর্মালয়ে ঘুরে ঘুরে শিক্ষা করেছেন। জার্মানী, স্পেন—এসব স্থানেও গিয়ে থেকেছেন এবং নিজের অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধতর করেছেন। ভারতীয় শিল্পীদের মধ্যে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু মহাশয়ের ছবিই তিনি সবচেয়ে পছন্দ করেন।

চার পাঁচটি ছবি ছাড়া আর সব ছবিই ওদেশে থাকাকালে রচনা, সুতরাং শিল্পীর পক্ষে আধুনিক ফরাসী চিত্রধারায় প্রভাবান্বিত হওয়া স্বাভাবিক, তবে একেবারে উগ্র আধুনিকপন্থী ইনি নন। এঁর ছবি সহজেই বোঝা যায়। মোটামুটি বলা যেতে পারে, ইম্প্রেশনিজমের পরবর্তী যুগ থেকে কিউবিজম অভ্যুদয়ের আগে পর্যন্ত যে ধরনের রঙ, আঙ্গিক এবং বিষয়বস্তু নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা চলেছিল এঁর শিল্পকলা তারই মধ্যে এখনও সীমাবদ্ধ। আধুনিক শিল্প পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার বিশ্লেষণ করতে হলে শিল্পীর সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে জানাশোনা থাকা দরকার এবং আরও ধৈর্য ও যত্ন সহকারে ছবি দেখা দরকার।

যদিও শ্রীমতী সেন বহুবিধ বিষয়বস্তু নিয়ে ছবি এঁকেছেন তাহলেও তাঁর পোরট্রেটগুলিই আনন্দ দান করে সবচেয়ে বেশী। ছবিগুলি রিয়ালিস্টধর্মী হলেও

থ্রু দি শর্ন ট্রীজ

ইম্প্রেশনিস্টসুলভ আঁচড়ে অঙ্কিত। রঙ নির্বাচন ও বুনন সেজান এবং তাঁর পরবর্তী দু'-একজনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। ব্যক্তিগতভাবে, আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছে "রেডী ফর দি অ্যাক্ট" (৭) ছবিটি। এ ছবিটিতে কোথায় যেন লত্রেকের শিল্পকলার মিল আছে। ভাব-প্রধান ছবিগুলির মধ্যে "এ সানডে মরনিঙ" (৪৪) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

'স্টিললাইফ'

নারীদেহের অঙ্গসৌষ্ঠব সম্বন্ধে শিল্পী যথেষ্ট সচেতন। এই প্রদর্শনীতে নুড ছবির বাহুল্য লক্ষ্য করলাম তবে নারীদেহের যৌবনপুষ্ট প্রাকৃতিক রূপের দিকে লক্ষ্য না দিয়ে নক্সা এবং ছন্দের দিকেই শিল্পী নজর রেখেছেন। মাঝে মাঝে যৌন সচেতনতা পরিহার করেছেন অস্বাভাবিক বর্ণসমাবেশে। বোধ করি, মডেল ব্যবহার করেছেন তাঁর স্টাইলাই-জেশনকে কিছুটা রাশ টেনে রাখার জন্য। কয়েকটি ছবিতে নগ্নদেহের প্রাকৃতিক গঠন বিকৃতিকরণ এবং সরলকরণ কিছুটা আধুনিক ভাস্কর্য ঘেঁষা মনে হয়েছে। তাঁর কিছু রচনায় শূন্য স্থান এবং আকৃতির মধ্যে একটি ছন্দ তোলবার চেষ্টা করেছেন, সম্ভবত কৃতকার্যও হয়েছেন। এসব ছবিতে চোখ ধাঁধান রঙ ব্যবহার না ক'রে ম্লান রঙ ব্যবহার করায় ছবির অ্যাবস্ট্র্যাক্ট দিক চাপা পড়ে যায়নি। কিন্তু

শ্বেত-হ্রদ — শৈলেন মিত্র

ছবিগুলি কষ্টকল্পিত এবং খুব যত্নরচিত হওয়ায় স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়েছে।

তাঁর স্টীল লাইফ ছবিগুলির কম্পোজিশন নতুন ধরনের না হলেও বর্ণব্যঞ্জনায় অভিনবত্ব আছে। জলরঙ চিত্র অপেক্ষাকৃত ম্রিয়মান। ছবির সংখ্যা থেকেও বোঝা যায়, জল মাধ্যম অপেক্ষা তৈল মাধ্যমেই তিনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বেশী। 'টাউনস্কেপ'গুলিতে হাল্কা রঙ ব্যবহারেও যে আলো ও ছায়ার পার্থক্য ফুটিয়ে তুলেছেন তা' বেশ উপভোগ্য।

কিছু ছবির বিষয়নির্বাচন এবং প্রকাশভঙ্গী পুরুষালী হলেও তাঁর বেশীর ভাগ ছবি থেকেই নারীসুলভ অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর ছবিতে বিদেশী প্রভাব বিদ্যমান, কিন্তু যা ভাল, বিদেশীই হোক্ বা স্বদেশীই হোক্, তা সব সময়ই প্রশংসনীয়। বাঙলাদেশের শিল্পকলার মান উন্নয়নের জন্য এ ধরনের শিল্পীর যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। একান্ত স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এখনও আসেনি তবে এ'র অনুসন্ধিৎসু মন প্রভাবমুক্ত হয়ে শীঘ্রই তা আবিষ্কার করবে—এই আমাদের বিশ্বাস। দ্বিধাহীন অভিনন্দন শিল্পীর অবশ্যই প্রাপ্য। প্রদর্শনীটি ২০শে ডিসেম্বর অবধি জনসাধারণের জন্য খোলা আছে।

'চিত্রগ্রীব'

॥ ২ ॥

কিছুদিন হল চৌরঙ্গী টেরেসে শিল্পী শৈলেন মিত্রের একটি একক প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। শিল্পীর শিল্পকলার এটি তৃতীয় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান। এবারের প্রদর্শনীতে প্রায় পঞ্চাশটি রচনা স্থান পেয়েছিল। জলরঙ, তেলরঙ, প্যাস্টেল প্রভৃতি বিভিন্ন মাধ্যমে এই সব ছবিগুলি রচিত হয়েছে। সমগ্রভাবে বিচার করলে একটি কথা প্রথমেই মনে হবে যে, পরীক্ষণের যুগ অতিক্রম করে শিল্পী এখনো কোন নিজস্ব শিল্পসিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। এই প্রদর্শনী থেকে স্বতন্ত্র করে দেখলে তার বহু রচনাই মনোরম ও সুখদৃশ্য মনে হবে। সেখানে রূপরচনা ও বর্ণব্যবহারের চাতুর্য অবশ্যই স্বীকার করতে হবে। কিন্তু কোন একটি মাত্র ছবি শিল্পীর মানসিকতা ও দৃষ্টিকোণের বিশেষত্ব উপলব্ধির পক্ষে যথেষ্ট নয়। এই প্রদর্শনীর প্রতিটি ছবিতে শিল্পী এতো বিভিন্ন শিল্পরীতি ও আঙ্গিকের আশ্রয় নিয়েছেন যা থেকে তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ধরা সুকঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং কোন শিল্প মতবাদের আশ্রয়ে সামগ্রিকভাবে এই প্রদর্শনীর রচনাগুলি না দেখে বিশিষ্টভাবে দেখাই বোধহয় সমীচীন হবে। শিল্পীর দক্ষতার পরিচয় এক একটি রচনা লক্ষ্য করলেই পাওয়া যাবে। সমগ্রতার বিচারে কোন সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে পৌছনো যাবে না। তবুও অধিকাংশ চিত্রে মধ্যে সহজ আবেদনের জন্যে আলোকের বিশিষ্ট ব্যবহার প্রাধান্য লাভ করেছে। পশ্চাৎপট থেকে একটা বিচ্ছুরিত আলোর দ্যুতি চিত্রের একটা অংশ উদ্ভাসিত করেছে। এই বিশিষ্ট রীতিটি কয়েকটি রচনাকে সত্যই উপভোগ্য করেছে এবং ছবির মধ্যে একটা রহস্যময় আবেদন এনে দিয়েছে। এই পর্বের রচনার মধ্যে গ্রাম্যরীতি (৩৫) বিলম্বিত আলোক (২৮) রাতের বাজার (১৪) উপভোগ্য। অন্যান্য রচনার মধ্যে ক্রুশ ও কাঁটা (৩) ছবিটিতে কিছুটা নাটকীয়তা সত্ত্বেও ব্যঞ্জনার বিশেষত্ব আছে। রহস্যময় রাত (১৯) আর একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। একটা রহস্যময় আবহাওয়া সৃষ্টিতে শিল্পী বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মনে হয় শিল্পী যেন তেল রঙের ব্যবহারের মধ্যে অনেক বেশী আত্মস্থ এবং এই মাধ্যমেই শিল্পীর আত্ম প্রকাশের সম্ভাবনা অধিকতর। তেল রঙের ছবির মধ্যে কাফে কর্নার (৫) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সাদা দেয়াল (৭) ছবিটিতেও কোমল রঙ ও ভারসাম্য সৃষ্টি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। শিল্পীর স্কেচগুলিও রেখাব্যবহারের দক্ষতার পরিচয় বহন করছে। শিল্পী মি আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও অতিআধুনিকতা

বন্য-ক্রীড়া — নিখিল বিশ্বাস

ভাবে মোহগ্রস্ত হননি, এইটেই তাঁর সম্বন্ধে সবচেয়ে আশার কথা। শিল্পী শলেন মিত্রের প্রদর্শনীর পরেই ২৫শে ডেসেম্বর থেকে শিল্পী নিখিল বিশ্বাসের চিত্র প্রদর্শনী চৌরঙ্গী টেরেসে অনুষ্ঠিত হয়েছে। কোন শিল্পীর রচনায় অন্য কোন শিল্পী অথবা শিল্পিকুলের প্রভাব নিয়ে আলোচনা নিরঙ্কুশ নয়। তবুও একথা বলা যেতে পারে শিল্পী বিশ্বাসের শিল্প-প্রেরণার মূলে আদর্শ এসেছে আধুনিক য়ুরোপীয় শিল্পকলা থেকে এবং অত্যন্ত স্পষ্ট ও অসংশয়িতভাবেই শিল্পী সে আদর্শকে গ্রহণ করেছেন। সাদৃশ্যকে যতদূর সম্ভব বর্জন করে রচনাকে একটা শিল্পগত গাঠনিক রূপে দেবার প্রচেষ্টাই এই আধুনিকতার মূলে উদ্দেশ্য। শিল্পী বিশ্বাসের শিল্পদৃষ্টির ঝোঁকটিও প্রধানত সেই দিকেই যদিও সাদৃশ্যমূলক রচনার নিদর্শনও এই প্রদর্শনীতে দেখা গিয়েছে। এই নির্ভরতাকে অতিক্রম করে যেখানে তিনি স্বতন্ত্রভাবে কিছু রচনা করেছেন সেইখানেই তাঁর কৃতিত্ব ও বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট-ভাবে দেখা দিয়েছে। যেমন তাঁর কাশীর চিত্রাবলী। দ্বারভাঙ্গাঘাট (৩১), বেনারসের ঘাট (৩৩), দ্বিপ্রহরে (৩৭) প্রভৃতি দৃশ্য-চিত্রের মধ্যে শিল্পীর বিশিষ্ট দৃষ্টির পরিচয় ধরা পড়েছে। অন্যান্য রচনার মধ্যে বন্যাক্রীড়া (৪৪) ছবিটিতে বন্য উল্লাস অতি সফলভাবে ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। জ্যামিতিক ভঙ্গিমা সত্ত্বেও লড়াই (৫৩) একটি সার্থক রচনা। বৈরাগী (২০) ছবিটিতেও শিল্পী তাঁর দক্ষতা দেখিয়েছেন। রাগরূপের ছবি তিনটিতে শিল্পীর রেখারচনার দক্ষতা প্রকাশ পেলেও ইলাস্ট্রেশনধর্মী হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন কোন রচনার মধ্যে রিলিফের অভাব সম্পূর্ণ চিত্রগুণের পক্ষে বাধাসৃষ্টি করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ নৃত্য (১১) ছবিটি উল্লেখ করা যেতে পারে।

ত্রুটি সত্ত্বেও অন্যান্য বারের চেয়ে এবারের প্রদর্শনী অনেক পরিচ্ছন্ন মনে হলো। যে প্রভাবের কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি, তাকে অতিক্রম করতে পারলে শিল্পী নিঃসংশয়েই নিজস্ব বিশেষত্বের পরিচয় দিতে পারবেন। অন্ততপক্ষে সেই ইঙ্গিত এই প্রদর্শনীতেই যথেষ্ট পাওয়া গিয়েছে।

নয়াদিল্লী

চিত্রপ্রসঙ্গ

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে চারিটি চিত্র-প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রথমটি শ্রীরামকুমারের ব্যক্তিগত প্রদর্শনী—ইহা দিল্লী শিল্পিচক্রের উদ্যোগে ফ্রী-ম্যাসনস্ হলে অনুষ্ঠিত হয় ও উর্দু সাহিত্যের বিখ্যাত কবি জোশ মালিহাবাদী ইহার উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয়টি শ্রীপ্রতুল বিশ্বাসের ব্যক্তিগত প্রদর্শনী—ইহা নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতি হলে অনুষ্ঠিত হয় ও সর্দার কে এম পানিক্কর ইহার উদ্বোধন করেন। এতদ্ব্যতীত এইচ এ গাডে ও অরূপ দাশের উল্লেখযোগ্য দুইটি ব্যক্তিগত প্রদর্শনীও ঐ একই হলে অনুষ্ঠিত হয়।

রামকুমার স্থানীয় শিল্পী এবং তিনি প্রায় প্রতি বৎসরই নিজ প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। বর্তমান প্রদর্শনীতে তিনি ২৫ খানি চিত্র পেশ করেন, তন্মধ্যে অধিকাংশই তৈল মাধ্যমে অঙ্কিত তবে রঙিন স্কেচের কয়েকটি নমুনাও ছিল। রামকুমার আধুনিক শিল্পধারার পক্ষপাতী সেজন্য অধিকাংশ চিত্রেই কল্পনা বা চিন্তা-ধারার মৌলিকতা দেখা যায় না। সমাজের নিপীড়িত জনসাধারণের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি আছে, তাই কয়েকটি চিত্রের মধ্য দিয়া তাহাদের কঠিন অভাবগ্রস্থ দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়গুলিই বিশেষভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। বিষয়বস্তুর দিক দিয়া একদিকে যদিও শিল্পীর বিশিষ্ট মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় অন্য দিকে সেইরূপ অঙ্কনরীতি বা বর্ণনচাতুর্যের বিশেষ কোনও সন্ধান পাওয়া যায় না। কারণ কয়েকটি ব্যতীত অধিকাংশ চিত্রই অযথা লঘুবর্ণ ব্যবহারের ফলে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। "মজুর পরিবার", "জীবনযুদ্ধ" ও "পথের উপর" চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। অবশিষ্ট চিত্রগুলি রসোত্তীর্ণ হয় নাই। স্কেচগুলির মধ্যে দুই তিনটিকে বর্ণের বিভিন্ন প্যাটার্ন হিসাবে উল্লেখ করা চলে।

* * *

প্রতুল বিশ্বাস সর্বসমেত ৩৬ খানি চিত্র পেশ করেন। ইতিপূর্বে খ্যাতনামা শিল্পী শ্রীসত্যেন ঘোষালের সহিত তিনি যুক্ত প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিলেও এইটিকেই তাঁহার প্রথম ব্যক্তিগত প্রদর্শনী বলা যায়। বিভিন্ন মাধ্যম ও রীতিতে নানাপ্রকার কাজ করিলেও তিনি এখনও নিজস্ব পথটুকুর সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। সেইজন্য কি জলরঙ, কি তৈলচিত্রে কোনও অসামান্য প্রতিভার পরিচয় মেলে না। বহির্দৃশ্য হইতে শুরু করিয়া বিভিন্ন বিষয়বস্তু লইয়া তিনি একাধিক ছবি রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি অধিকাংশ চিত্রই যেন ঠিক রসোত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। অবশ্য সমগ্রভাবে বিচার করিলে প্রদর্শনীর মধ্যে দুই চারিখানি চিত্র যে চোখে পড়ে না তাহা নহে। উদাহরণ স্বরূপ "নৌকা, বোম্বাই (জলরঙ) বা "কমরেড" (তৈল প্রতিকৃতি) ও "মাংক ব্রীজ, লক্ষ্ণৌ" (টেম্পারা) উল্লেখ করা যাইতে পারে। অঙ্কনরীতি, বর্ণব্যবহারপ্রণালী ও পরি-প্রেক্ষিতের দিক দিয়া এই রচনাগুলি সুন্দর হইয়াছে। বিশেষ করিয়া রঙিন কাগজের উপর ড্রাই ব্রাশ রীতিতে তিনি যে কয়খানি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, সেই-গুলিই সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সংক্ষিপ্ত সরল, দৃঢ় রেখাবৈচিত্র্য ও স্বাভাবিক বর্ণব্যবহারের ফলে এই চিত্র-গুলির মধ্য দিয়া একটি বিশিষ্ট নিজস্ব রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। বিশেষ করিয়া "দ্বারপ্রান্তে", "কাশী" ও "গতিবেগের" মধ্য দিয়া শিল্পীর আত্মবিশ্বাস ও প্রকাশ ভঙ্গিমার পরিচয় পাওয়া যায়। লতাগুল্ম-সমাচ্ছন্ন শৈলশিখর হইতে নির্ঝরিণীধারা

গতিবেগ
প্রতুল বিশ্বাস

বিপ্লবেগে শত শাখায় নিম্ন দিকে ছুটিয়া চলিয়াছে—এই দুর্নিবার উচ্ছ্বাস ও শক্তির মধ্য দিয়াও যে সাবলীল ছন্দের একটি বিশিষ্ট রূপ ফুটিয়া উঠে তাহা শিল্পী অতিশয় কৌশলের সহিত 'গতি-বেগ' চিত্রে দেখাইয়াছেন।

* * *

এইচ এ গাডে বোম্বাইয়ের পরিচিত শিল্পী এবং তিনিও এই প্রথমবার দিল্লীতে ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিলেন। গাডে সর্বসমেত ষাটখানি চিত্র পেশ করেন। গাডের রচনাবিষয়ে সর্বপ্রথম দুইটি জিনিস বিশেষভাবে চোখে পড়ে। প্রথমত তাঁহার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী। গাডে আধুনিক ধারায় প্রভাবান্বিত, সুতরাং যে বিষয়েই তিনি রচনা করিয়াছেন সেটিকে সাধারণ শিল্পীর দৃষ্টিতে তিনি দেখেন নাই। বরং তিনি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ হইতে বিষয়-বস্তুটি পর্যবেক্ষণ করিয়া বিশেষ কোনও আকারের মধ্য দিয়া রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার চক্ষু তীক্ষ্ণ ও

'মন্দিরদ্বার'
এইচ এ গাডে

সজাগ—কোনও বস্তুই তিনি বাদ দেন নাই—তাই প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দির, গীর্জা, পথঘাট এমন কি অতি পরিচিত জীবজন্তুর মধ্য হইতে তিনি প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। তাঁহার রচনাগুলিকে হয়ত বাস্তব জগতের অবিকল প্রতিলিপি হিসাবে গণ্য করা যায় না, তথাপি সেগুলিকে আদৌ অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয় না। ভিন্ন ভিন্ন বিষয়বস্তুগুলিকে নানা আকার-বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া তিনি যেন এক নূতন রূপ দান করিয়াছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহার অকৃত্রিম বর্ণপ্রীতি ও বর্ণব্যবহার করিবার সুকৌশল রীতি। তৈলচিত্রের দুই চারিখানি নমুনা থাকিলেও গাডে প্রধানত টেম্পারাকেই মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন। পীত, লোহিত, নীল ইত্যাদি নানা মৌলিক বর্ণ তিনি ব্যবহার করিয়াছেন এবং এই বর্ণসামঞ্জস্যের মধ্য দিয়া প্রত্যেক চিত্রেই একটি স্বাভাবিক পৃষ্ঠভূমির সৃষ্টি করিয়াছেন। কয়েকটি চিত্র দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, বোম্বাইএর খ্যাতনামা চিত্রকর হুসেনের নিকট হইতে তিনি অনু-প্রেরণা পাইয়াছেন। কিন্তু সবক্ষেত্রেই যে

তিনি হুসেনকে অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা বলিলে ভুল হইবে। মাত্র দুইটি বা তিনটি সমগোত্র বা এমন কি পরস্পর-বিরোধী বর্ণ মনোনীত করিয়া এই শিল্পী যেন বর্ণচাতুর্যের মধ্য দিয়া স্বপ্নপুরীর ইন্দ্রজাল রচনা করিয়াছেন। বস্তুতপক্ষে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সাবলীল রেখা ও অপরূপ বর্ণচ্ছটা সহযোগে প্রত্যেকটি রচনায় তিনি যেন সত্যই স্ফটিকের স্বচ্ছতা সৃষ্টি করিয়াছেন। তদুপরি গাঢ় ও লঘুবর্ণের তারতম্যের দ্বারা কয়েকটি চিত্রে তিনি একটি বিশিষ্ট টোনের সৃষ্টি করিয়াছেন। গাড়ে কৃতী শিল্পী এবং বর্ণচাতুর্যের কারুকার্যে তাঁহার দক্ষতা অসীম।

* *

অরূপ দাশ বয়সে তরুণ। ইতিপূর্বে কয়েকটি প্রদর্শনীতে স্বীয় বৈশিষ্ট্যের জন্য এই উদীয়মান শিল্পী সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। প্রদর্শনীতে তিনি সর্ব-সমেত ৫৪ খানি চিত্র পেশ করেন।

এই প্রদর্শনীটি লক্ষ্য করিলেই সর্ব-প্রথমে কয়েকটি কথা বিশেষ করিয়া মনে জাগে। প্রথমত, তাঁহার রুচি ও শিল্প-বোধ। তিনি সম্পূর্ণরূপে তৈয়ারী হইয়া কেবলমাত্র রসোত্তীর্ণ রচনাগুলিই সকলের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন, অন্যান্য শিল্পীর ন্যায় কেবলমাত্র নাম প্রচারের জন্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন নাই। দ্বিতীয়ত, তাঁহার চিন্তাধারা। চিত্রধারার আধুনিকতম আবেদনে সাড়া না দিয়া তিনি নিজ দেশ, বিশেষ করিয়া সুজলা সুফলা বঙ্গভূমিকে নানারূপে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে এই স্বদেশ প্রীতিই যে তাঁহার প্রেরণার মূল উৎস তাহা বলিলে ভুল হইবে না। কুটীরের দ্বারপ্রান্তে নগণ্য পল্লীবালিকা নিতান্ত অকারণে আপনার

ধাবমান টাঙ্গা'
অরূপ দাশ

মনে দাঁড়াইয়া আছে, কৃষকের দল নগ্নগাত্রে লাঙ্গল লইয়া মাঠের উদ্দেশ্যে চলিয়াছে, লতাগুল্মোচ্ছাদিত অযত্ন বর্ধিত ঈষদন্ধকার ও অব্যবহার্য ছোট পুষ্করিণীর বুকে নিতান্ত সংগোপনে কয়েকটি শালুক আঁখি মেলিবার চেষ্টা করিতেছে অথবা কুটীরশ্রেণীর পশ্চাৎ হইতে দীর্ঘ তালী-বনরাজির মধ্য দিয়া সপ্তবর্ণচ্ছটায় সূর্য-দেব আত্মপ্রকাশ করিতেছেন—এই জাতীয় দৃশ্যমাত্রেই এই শিল্পীকে মুগ্ধ করিয়াছে। তৃতীয়ত, তাঁহার অঙ্কনরীতি ও প্রকাশ-ভঙ্গিমা। অধিকাংশ চিত্রই তিনি সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে রচনা করিয়াছেন এবং বিশেষ করিয়া ডিম-টেম্পারা মাধ্যমে কাজ করিবার ফলে প্রায় প্রত্যেক চিত্রই বর্ণ-বহুল একটি বিশিষ্টরূপে ঝলমল করিয়া উঠিয়াছে। লোকচিত্রের প্রাথমিক রেখাকে ভিত্তি করিয়া শিল্পী যে কয়খানি চিত্র রচনা করিয়াছেন তাহার প্রত্যেকটির মধ্য দিয়াই যেন কাব্যের সাবলীল গতি ও ছন্দ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। আজিকার যুগ এক হিসাবে অনুকরণের যুগ। বিষয়বস্তু বা অঙ্কন পদ্ধতির দিক দিয়া যেখানে অন্যান্য শিল্পী বিদেশ হইতে অনুপ্রেরণা লাভ করেন এই শিল্পী সেই যুগে ঋতুবহুলা ও শস্যশ্যামলা স্বদেশের বিভিন্ন আলেখ্য রচনা করিয়া সত্যই সাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি তাঁহার কল্পনা উদ্যানে ক্রুসানন্থিমাম বা নার্সি-সাসের মিথ্যা বর্ণসমারোহ সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করেন নাই—সন্ধ্যাসমাগমে পল্লীর কুটির প্রাঙ্গণে বকুল বা কামিনী যে পরিচিত সৌরভ বিতরণ করে আজিকার যুগেও তিনি তাহারই জয়গান গাহিয়াছেন এবং সেইজন্যই এই শিল্পী রচিত নগণ্য পল্লীবালার পদধ্বনি পর্যন্ত যেন আমরা শুনিতে পাই, তাহাদের হাতের চুড়ির আওয়াজটুকুও যেন কানে বাজিতে থাকে, এমন কি বিভিন্ন তরুর বিভিন্ন ফুলের গন্ধও যেন আমাদের সত্যই আকুল করিয়া তোলে। চতুর্থত, তাঁহার বর্ণমনোনয়ন ও ব্যবহার করিবার ক্ষমতা। ডিম-টেম্পারা মাধ্যমে বিভিন্ন বর্ণ তিনি অতিশয় কৌশল ও সংযমের সহিত ব্যবহার করিয়াছেন—ফলে প্রতি চিত্রই এক নূতন ও স্থায়ীরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে।

ভারতীয় রীতি অনুযায়ী রচনা ব্যতীত অরূপ দাশ ইম্প্রেশনিস্টিক পদ্ধতিতে রচিত কয়েকখানি স্কেচেরও নমুনা পেশ করেন। পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা ও অঙ্কণ কৌশলের দিক দিয়া এইগুলিও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

রম্যরচনা

হাসির অন্তরালে—শ্রীনলিনীকান্ত সরকার। প্রকাশক—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দাম—তিন টাকা।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্যে ব্যঙ্গ আছে, বিদ্রুপের কশাঘাত আছে, মননশীলতার সহযোগী ভাষা শিল্পের চকিত চমকও আছে, কিন্তু সত্যি কথা বলতে অনাবিল আনন্দ খুব বেশী নেই। দীপ্ত প্রাণের উচ্ছলতায় রবীন্দ্র-সাহিত্য পরিপূর্ণ, তাই অনিবার্য-ভাবেই সেখানে উদ্দেশ্যহীন আনন্দের প্রচুর সন্ধান মেলে এবং বোধ হয় এইজন্যেও সদ্য-প্রাক্তন যুগে জনকয়েক বয়স্ক সাহিত্যিক সত্যিকারের আনন্দ দান করতে সক্ষমও হয়েছিলেন। সাম্প্রতিক কালে যে সে স্রোতধারা ক্ষীণতর হয়েছে তার জন্য লেখক পাঠককে দোষ দেওয়া চলে না, দোষ যদি কারো থেকে থাকে তো সেটা যুগের। নানা কারণেই আজকের প্রতিটি দিন চলেছে বড় বেশী গম্ভীর চালে, মানুষের জীবন-যাত্রাটাই যেন একটু সিরিয়াস হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এইজন্য লেখক-পাঠক উভয়েরই চিন্তাধারা আজ বিষণ্ণ। ফলে সাহিত্যেও আনন্দের অবকাশ বড় কম। কিন্তু মানুষের জীবনকে সমগ্রভাবে দেখতে ও দেখাতে হলে, প্রসন্ন হৃদয়ের উদারতাকে ফুটিয়ে তুলতে হলে, হাসতেও হবে বৈকি এবং নিরবচ্ছিন্ন বিষণ্ণতার মধ্যেই বোধ হয় তার সুযোগ আর সময়টা প্রশস্ত। সে-দিক থেকে ভাবতে গেলে, নলিনীকান্তের 'হাসির অন্তরালে' গ্রন্থটির প্রকাশ এবং প্রকাশকাল দুটোই সংগত হয়েছে।

কিন্তু সবটাই আনন্দ হলেও সবটাই কেবলমাত্র হাসি নয়। বস্তুত নলিনীকান্ত যেন মানুষের হাসি নামক একান্ত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিটিকে নিয়ে নানাভাবে খেলা করেছেন। মর্মান্তিক অবস্থায় যখন মানুষের কান্না আসা উচিত, যখন ভদ্রজনের তিরস্কারে আর উপহাসে মাথা কাটা যাবার কথা, তখনও তিনি পরম উদাসীনতায় হাসির খোরাকটুকু জোগাড় করে নিয়েছেন। আবার আপাত-ভাবে যাকে নিছক হাস্যকর ব্যাপার ছাড়া আর কিছু মনে হবে না, তার পিছনের করুণতাটিকেও তিনি সমান দক্ষতায় একটা সিল্কের আবরণের মধ্যে ঈষৎ স্পষ্ট করে তুলেছেন। দুটো একটা উদাহরণে মন ভরে না, সমস্তটা বই-ই উদাহরণ।

অর্থাৎ নলিনীকান্ত দক্ষ কারিগর। তিনি যে একজন বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ, একথাটা সর্ব-জনবিদিত। না হলেও এ গ্রন্থেই তার প্রমাণ আছে (যদিও প্রচারের নামগন্ধও নেই)। কিন্তু সহজ ঘটনাকে এমনভাবে রসোপলব্ধির পর্যায়ে উত্তীর্ণ করা সহজ কথা নয়; এখানে সেটি সম্ভব হয়েছে খানিকটা পঞ্চেন্দ্রিয়ের সজাগ উপভোগে, খানিকটা লিখনভঙ্গীর জোরে। প্রসংগত উল্লেখ করা যেতে পারে, এ-ক্ষেত্রে লেখকের কৌশলটিও লক্ষ্যণীয়। যথা, অনাবিল আনন্দদানের উদ্দেশ্য থাকলেও অনেক জায়গাতেই ব্যঙ্গবিদ্রুপের গন্ধ মেলে। কিন্তু লেখক ব্যঙ্গ করেছেন নিজেকেই, বিদ্রুপ হেনেছেন গায়েই। ফলে, পাঠকের গায়ে কখনও জ্বালা ধরলো না, পড়তে পড়তে বরং তিনি লেখককে বাহবা দিলেন। এমন কথা হয়তো বলা চলতে পারে যে, নলিনীকান্ত খ্যাতিবান গায়ক, তাই বহুকাল বহু গানের আসরে গিয়ে বা গানের অজুহাতে নানা বাড়ীতে ঢুকে এ-ধরনের বিষয়বস্তু সঞ্চয় করার সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু তা নয়, বিষয়বস্তু কখনও লুকিয়ে থাকে না, কৌশলটুকু জানা থাকলে যে-কোনো জায়গা থেকেই তাকে আহরণ করা সম্ভব। কল্পনার আশ্রয় না নিয়ে নিছক সত্য কাহিনী বর্ণনাতেও প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুকে প্রকাশ করা চলে—তা সাহিত্যিকও পারে, চিত্রকরও পারে। সংগীতজ্ঞ নলিনীকান্ত সাহিত্যিক না হয়েও তা পেরেছেন এবং এইজন্যই 'হাসির অন্তরালে' সাহিত্য গ্রন্থ।

শেষ কথা, বোধ হয় আসল কথাও, হাসির অন্তরালে নলিনীকান্ত কয়েকটি চরিত্রচিত্র এঁকেছেন। সমসাময়িক বহু গুণীজনের নাম প্রসংগতই তাঁর রচনায় এসে স্থান পেয়েছে, কিন্তু তাঁদের ব্যবহারিক জীবনের এমনই একটা সরস কাণ্ডকীর্তি তিনি প্রকাশ করেছেন যে, পড়তে মজা লাগে; লোভ হয় দু'দশজনের আসরে দু'একটি কাহিনী বলে বাহবা নিই। অন্যদিকে আছেন অজ্ঞাত বহুজন, যারা চালাকিতে, বোকামীতে কিংবা হাসিতে-কান্নায় প্রতি মুহূর্তেই কত কাণ্ড করে চলেছেন, যা তুলে নিলে সরস গল্পগাঁথা তৈরী হতে পারে, যেমন আলোচ্য গ্রন্থে হয়েছে। ৪৯৬।৫৪

নাটক

ভূতপূর্ব স্বামী : প্র না বি। মিত্র ও ঘোষ ১০নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট কলিকাতা—১২। মূল্য দুই টাকা।

একখানি নাটক। রসসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্র না বির ইহা নবতম অবদান। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধ মানুষের মনোজগতে যে বিপুল পরিবর্তন আনিয়া দিয়াছে তাহারই পটভূমিতে নাটকীয় ঘটনার সমাবেশ।

জনৈক ভদ্রলোক জাপানীদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সিঙ্গাপুরে গিয়াছেন এবং যাইবার পূর্বে পত্নীর তত্ত্বাবধানের ভার দিয়া গিয়াছেন কোন এক বন্ধুর উপর। কিছুদিন পরে ভুলক্রমে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ প্রচারিত হইল এবং তত্ত্বাবধানের ভারপ্রাপ্ত বন্ধুটি সুযোগ বুঝিয়া বন্ধুর শূন্য গৃহে জাঁকিয়া বসিতে মনস্থ করিলেন, চেষ্টিত হইলেন বন্ধু-পত্নীর ফাঁকা মনে আসন পাতিতে।

সে চেষ্টা অচিরে সফল হইল। বিবাহকার্য সম্পন্ন হইবার পর উভয়ে যখন সানন্দে নীড় বাঁধিতে উদ্যত এমন সময়ে মহিলার ভূতপূর্ব স্বামী আসিয়া স্বশরীরে হাজির। এইখান হইতে শুরু হইল বর্তমান ও ভূতপূর্ব স্বামীর মধ্যে পত্নীর অধিকার লইয়া দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্ব কেবল অধিকার লইয়াই বাঁধিল না, দ্বন্দ্ব জাগিল সেই সনাতন প্রশ্নকে কেন্দ্র করিয়া : প্রেম বড় না বিবাহ বড়?

যে ঘটনাস্রোত এতক্ষণ প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল অত্যন্ত লঘুছন্দে, জটিল এই জিজ্ঞাসায় আহত হইয়া তাহা আবর্তিত হইয়া উঠিল দুরন্ত সমস্যারূপে। আনুসঙ্গিক আরও কয়েকটি চরিত্র আশ-পাশ হইতে আসিয়া জুটিয়া সমস্যার জটিলতা আরও বহুগুণে বর্ধিত করিয়াছে। নবাগত চরিত্রগুলির মধ্যে

সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য চরিত্র হইল মিস গুপ্ত। নারী ও পুরুষের মধ্যে বন্ধু ও বান্ধবীর সম্পর্ক কাম্য অথবা বিবাহোত্তর জীবনের পতি-পত্নীর সম্পর্কই লোভনীয়, ইহাই হইল সমস্যার সার কথা। লেখক বিভিন্ন চরিত্রের মুখ দিয়া এই সম্পর্ক দুইটির সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন।

গ্রন্থের নায়িকা মিস্ গুপ্ত নোঙরহীন উদ্‌ভ্রান্ত জীবনের জীবন্ত প্রতীক। আনুসঙ্গিক অপর আর-একটি চরিত্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তিনি অর্থাৎ, মিস গুপ্ত নিজের জীবনে সুখী কিনা! উত্তরে মিস্ গুপ্ত যাহা বলিলেন তাহা শুধু তাঁহারই নিজস্ব কথা নয়, পরন্তু আধুনিক শিক্ষিত সমাজের বহু নারীরই ব্যর্থ জীবনের স্বীকারোক্তি তাহার মধ্যে ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। মিস্ গুপ্ত বলিলেন:

"আমার এই চলমান জীবনে? নৌকো যত সুন্দরই হোক, তবু তা নৌকো। আমার জীবন কি রকম জানেন? শুনেছি চীনের ক্যান্টন শহরে লোকে নৌকোয় সংসার পেতে জীবন কাটিয়ে দেয় অনেকটা সেইরকম। আমার জীবনে জলের দোলা আছে, মাটির নিশ্চয়তা নেই। বাইরে থেকে দেখে লোকের ভাল লাগে—ভিতরের বাসিন্দার মনে স্বস্তি নেই।"

লঘুতার সহিত গাম্ভীর্যের, চটুলতার সহিত চিন্তার, নিরঙ্কুশ জীবনযাত্রার সহিত সমাজের নিয়ম ও নিয়ন্ত্রণের সমাবেশ সমস্ত নাটকটিকে সরস ও চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলিয়াছে এবং সব মিলিয়া অভিনয়ের সম্পূর্ণ উপযোগিতা দান করিয়াছে নাটকখানিকে।

৫০৫।৫৪

উপন্যাস

এক **বিহঙ্গী**—মনোজ বসু। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম চার টাকা।

বয়োজ্যেষ্ঠ অনেকেই প্রায় নীরব হ'য়ে গেছেন। যে দু' একজন এখনো সরব আছেন তাঁদের সম্বন্ধে খুব বেশী আশা বুঝি পাঠক সাধারণ আর করেন না। 'বনমর্মরের' মনোজ বসু এখনো সাহিত্য ক্ষেত্রে সজীব, এখনো নবীন। প্রতি বৎসরই নবীনদের মত তাঁর লেখা গল্প-উপন্যাসের আস্বাদন পাঠক পেয়ে থাকেন, লেখনী তাঁর ক্লান্ত নয়, কণ্ঠ ক্ষীণ নয়, সর্বদাই নূতন সুরে বীণা বাঁধার পক্ষপাতী তিনি।

আলোচ্য উপন্যাসটিতে সেইরূপ এক নতুন সুর সংযোজনার স্পষ্ট অনুরণন আছে। মনোজবাবু মূলত অন্তঃধর্মী লেখক, বাহিরের ঘাত-প্রতিঘাতের চেয়ে অন্তরের নানা রহস্যময় আনন্দ-বেদনার সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলি পাঠক সমক্ষে উপস্থিত হয়। বিমুগ্ধ পাঠক তাদের মধ্যে নিজের প্রতিচ্ছবি দেখে আশ্চর্য হন। যে কোন কাহিনীকে মনোমত করবার ক্ষমতা তাঁর অননুকরণীয়। ভাষা এবং বর্ণনার ভঙ্গিতে অদ্ভুত এক যাদু আছে।

বড়লোকের মা-মরা আদুরে মেয়ে অনীতা। খেয়াল খুশির অন্ত নেই। মুক্ত বিহঙ্গীর মতই সদা চঞ্চল, প্রাণ-প্রাচুর্যে পূর্ণ, উড়ু-উড়ু। হাতের লক্ষ্মী পায়ে ঠেলতে যেমন এতটুকু দ্বিধা নেই, তেমনি অবার প্রথম সাক্ষাতেই অজ পাড়াগেঁয়ে অক্ষম অবস্থার শিক্ষিত এক যুবকের প্রতি হৃদয় দৌর্বল্য প্রকাশ করতে সংকোচের বালাই নেই। রূপে গুণে যোগ্যতর যে পাত্র বাপের মনোনীত শেষ মুহূর্তে মেয়ে তাকে করে দিলে বাতিল—বেঁকে বসল। বিয়ে হ'য়ে গেল একটা অচেনা-অদেখা এক জায়গায় (মানুষটি অবশ্য অচেনা নয়!)—নদী, বিল, খাল, ঝোপ-ঝাড় পেরিয়ে অনেক দূরে। অবশেষে 'বিহঙ্গীর' উড়ন্ত ডানা শান্ত হ'লো, পেল সে শান্তির সুখ-নীড়। আগাগোড়া উপন্যাসটি মনোরাজ্যের অদ্ভুত এক রহস্য-ময়তার ইঙ্গিত করছে—হেথা নয় আর কোনখানে! আধুনিক অস্থিরচিত্ত যুবক-যুবতীদের এমন সার্থক চিত্র বাঙলা সাহিত্যে ইতিপূর্বে দেখা যায়নি।

বইটির অঙ্গসজ্জা বিশেষ প্রশংসনীয়।

৩৫৬

শুভাশুভ : মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—চার টাকা মাত্র।

ভূমিকায় লেখক বলেছেন—"এটি আমার পরীক্ষামূলক উপন্যাস। আমার বিশ্বাস, প্রধান নায়ক ও নায়িকাদের প্রধান করে বজায় রেখেও সংশ্লিষ্ট আরও অনেক চরিত্র আমদানী করলে উপন্যাসের শ্রেণীগত সামাজিক বাস্তবতা রূপায়ণে সাহায্য হয়।" তা হয়, কিন্তু উপন্যাসের নামে পাঠক সাধারণ যে সম্পূর্ণাঙ্গ একটি কাহিনীর প্রত্যাশা সচরাচর করে থাকেন, সেটার পূরণ হয় না। 'শুভাশুভ'-এও হবে না। নিছক অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে, জীবিকার সংঘাতে, জীবনের মানের অন্বেষণে বিধ্বস্ত-বিপর্যস্ত গুটিকয় নরনারীর চিত্র এখানে লেখক উপস্থাপিত করেছেন। খণ্ড, কিন্তু বাস্তবিক চিত্র এবং আশার কথা, গল্প তৈরীর মোহে অনেকানেক প্রগতিপন্থী লেখকের মত উপসংহারে একটি বিপ্লবী সিদ্ধান্তও জুড়ে মানিকবাবু দেননি। কিন্তু তবু যেন মন ঠিক ভরে না। লেখকের বিশ্লেষণধর্মী অনন্যসাধারণ রচনাশৈলী মনকে আগাগোড়া আবিষ্ট করে রাখে, থেকে থেকে চমক দেয়, সাড়া জাগায়—কিন্তু তবু যেন মন ঠিক ভরে না! লেখক ভূমিকায় বলেছেন—"উপন্যাস লেখার পুরানো একটি রীতি অথবা নীতি আজও অনেকে আঁকড়ে আছেন—সেটা এই যে উপন্যাসে কোন চরিত্র আনলে তার একটা গতি ও পরিণতির সম্পূর্ণতা দিতেই হবে। শেষ পর্যন্ত মানুষটার কি হল? এ "রীতি অথবা নীতি" কেউ কেউ আঁকড়ে থাকলেও আজকের সচেতন পাঠক 'অতঃপর তাহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে ঘর করিতে লাগিল' বা 'এইভাবে পাপের পরাজয় ও পুণ্যের জয় ঘটিল'-র জন্যে মোটেই আগ্রহী নয়—তবু শেষ পর্যন্ত মানুষটার কি হল—তার একটা আভাস অন্তত পাঠক পেতে চায় বৈকি। লেখক তো শুধু ফটোগ্রাফার নন, শিল্পী-স্রষ্টাও।

বাঁধাই, মুদ্রণ, প্রচ্ছদ সুরুচিসম্মত।

৫৩৪।৫৪

ছেঁড়া চিঠি : বিভূতিভূষণ নন্দী। প্রকাশক—হিন্দুস্থান প্রিণ্টার্স, ৫২বি, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। মূল্য—দুই টাকা।

লম্পট স্বামীর অত্যাচার, জমিদারের

লাম্পট্য, স্বয়ং মিল মালিকের নারীহরণ, জমিদার-ভ্রাতা আদর্শবাদী দেশসেবক, ব্যর্থ প্রেমিক, পরহিতব্রতী ডাক্তার, গণিকার শিক্ষিকা বৃত্তি গ্রহণ, বড়লোক ডাক্তারের মেয়ের অধঃপতন, ব্যারিস্টার দুহিতার দাম্ভিকতা, অনুতপ্ত সতীর আত্মহত্যা ইত্যাকার বহু ঘটনা আছে, বর্তমান সমাজ-ব্যবস্থার পরিবর্তনের স্বপক্ষে সোচ্চার ঘোষণা আছে, দিন বদলের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি আছে, পাপ-অন্যায়ের জোরদার প্রতিবাদ আছে, কিন্তু যেটা নেই সেটা হল সাহিত্যের রস। নইলে উপন্যাসটির ছাপা বাঁধাই প্রচ্ছদ নেহাৎ খারাপ নয়। ৫২৪।৫৪

আরাকান। হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়। মিত্র ও ঘোষ; ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা—১২। পাঁচ টাকা।

কাহিনী-বয়নের কৌশলে এবং দৃষ্টি-ভঙ্গীর অভিনবত্বে সাম্প্রতিক বাঙলা কথা-সাহিত্যে যাঁরা একটি স্বতন্ত্রস্বাদ আবেদন সৃষ্টি করতে পেরেছেন, সংখ্যায় তাঁরা খুব বেশী নন। সেই স্বল্পসংখ্যকদের মধ্যেও হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায় তাঁর রচনা-রীতির বৈশিষ্ট্যে একটি স্বতন্ত্র আসন দাবি করতে পারেন। তাঁর সর্বাধিক কৃতিত্ব এই যে, বাঙলা সাহিত্যের গতানুগতিক বিষয়বস্তুর মধ্যে তিনি বহির্জগতের একটি সুগভীর বার্তা পেঁছে দিয়েছেন। চিরাচরিত উপাদান-গুলিকে বর্জন করে এমন কিছু-কিছু উপাদান তিনি তাঁর সাহিত্যে ব্যবহার করেছেন, যার সঙ্গে আমাদের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, অথচ যার প্রতি আমাদের আকর্ষণও বড় সামান্য নয়। বস্তুত, বাঙলা সাহিত্যের কঠোরপরিধি কক্ষে তিনি যে একটি নূতন সম্ভাবনার বাতায়ন উন্মুক্ত করে দিয়েছেন, পাঠক এবং সমালোচকমাত্রেই নির্দ্বিধায় তা স্বীকার করে নেবেন।

তাঁরই সাম্প্রতিক উপন্যাস এই "আরাকান"। "ইরাবতী" আর "উপকূল"-এর মত এ-বইয়ের পটভূমিও এমন একটি ভূখণ্ডে, যার সঙ্গে আমাদের স্থানগত দূরত্ব খুব বেশী না-হলেও যেখানকার অধিবাসীদের রীতি-নীতি, আচার-আচরণ এবং জীবন-পদ্ধতি সম্পর্কে কোনও ধারণাই আমাদের নেই। হরিনারায়ণবাবুর কৃতিত্ব, সেই অপরিচিত দেশের অপরিচিত অধিবাসীদের জীবনযাত্রার এমন একটি স্পষ্ট ছবি তিনি তাঁর এই উপন্যাসের মধ্যে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন যে, বইখানি পড়তে পড়তে অপরিচয়ের সেই ব্যবধান কখন যেন লুপ্ত হয়ে যায়; মনে হয় উপন্যাসের পাত্রপাত্রীদের আমরা চিনি; দেশ-কালের সীমানা উত্তীর্ণ হয়ে তাদের এবং আমাদের মধ্যে যেন একই অখণ্ড প্রাণস্রোত প্রবহমান রয়েছে। সংগ্রামী জনসাধারণের চিন্তা-অনুভূতি আর আনন্দ-বেদনার একটি সার্থক শিল্পরূপ এই "আরাকান"। ঘন-সন্নিবদ্ধ সুন্দর একটি কাহিনীর মধ্য দিয়ে মহত্তর মানব-সত্তার যে সার্থক পরিচয় এখানে তুলে ধরা হয়েছে, লেখককে তার জন্য আমাদের অকুণ্ঠ অভি-নন্দন জানাই।

"আরাকান"-এর মুদ্রণ এবং অঙ্গসজ্জা পরিচ্ছন্ন, প্রচ্ছদচিত্র সুরুচিশোভন। ৩০৭।৫৪

অনুবাদ সাহিত্য

রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ—অনুবাদ—শ্রীসুভাষ মুখোপাধ্যায়। ক্যালকাটা বুক ক্লাব। মূল্য—৩্ টাকা।

যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসী জুলিয়াস এবং এথেল রোজেনবার্গ সোভিয়েট রাশিয়াকে গোপন আণবিক তত্ত্ব সরবরাহ করার অপরাধে গ্রেপ্তার হইয়া মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হন। বিচারাধীন অবস্থায় এবং মৃত্যুদণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্তির পরে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে রোজেনবার্গ দম্পতির পত্রালাপ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য পুস্তকখানি উহারই বঙ্গানুবাদ।

পত্রালাপের বিষয়বস্তু অক্ষুণ্ণ রাখিয়া অনুবাদের স্বাধীনতা, প্রাঞ্জল ভাষা ও ভাবের সাবলীলতা পুস্তকখানাকে সুখপাঠ্য করিয়া তুলিয়াছে। ছাপা ও বাঁধাই মনোজ্ঞ। ৪৫১।৫৫

পতিতা (ব্যুল দে সুইফ) মোপাসাঁ—অনুবাদ—শ্রীবিমল রায়। ৭বি, বিডন রো, কলিকাতা। মূল্য—১৷৷০ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানা মোপাসাঁর বিখ্যাত গল্প ব্যুল দে সুইফের অনুবাদ। ফ্রাঙ্কো প্রাশ্যান যুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা তৎকালীন ফরাসী সমাজজীবনের নিখুঁত চিত্র হইলেও একটি গণিকার দেশাত্মবোধ ও আত্ম-সম্মান জ্ঞানের বিস্ময়কর চরিত্র চিত্রণই বইটির মূল আকর্ষণ।

অনুবাদে মোপাসাঁর মানসভঙ্গি ও রচনাশৈলীর প্রতি বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে বলিয়া পুস্তকখানি বেশ উপভোগ্য হইয়াছে।

ছাপা, বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপট মনোরম। ৪৫০।৫৫

ধর্মতত্ত্ব

তত্ত্ব-সংগ্রহ ঃ শ্রীধীরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় **ঃ বুক কোম্পানী লিমিটেড। ৪৩বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। ১৷৷০।**

তত্ত্ব-সংগ্রহের বিভিন্ন প্রবন্ধে নানাবিধ শব্দ, প্রবন্ধ এবং তার আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গ আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু প্রবন্ধগুলিকে আলাদ করে সাজাবার তাৎপর্য সব সময় ঠিক বোঝা গেল না। পরিবেশন-পদ্ধতি আর একটু প্রাঞ্জল এবং গোছাল হলে বইটি 'রেফারেন্স' হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারত। ৩৯৬।৫৪

চীন ও মার্কিন গভর্নমেণ্টের পরস্পরের উপর রাগারাগি বেড়েই চলেছে। ফরমোজা সম্পর্কে আমেরিকা চিয়াং কাইশেক গভর্নমেণ্টের সঙ্গে যে-নূতন চুক্তি করেছে পিকিং তার তীব্র প্রতিবাদ করেছে। ফরমোজা চীনের ন্যায্য প্রাপ্য, চিয়াং কাইশেক চীনের শত্রু ও বিশ্বাসঘাতক, চিয়াং কাইশেকের দলকে সাবাড় ক'রে ফরমোজাকে মুক্ত করা পিকিং সরকারের ঘরোয়া অধিকারের মধ্যে পড়ে, এ ব্যাপারে কোনোরকম বিদেশী হস্তক্ষেপ চীন সহ্য করবে না, আমেরিকা ফরমোজা সম্পর্কে যা করছে তার ফল অত্যন্ত গুরুতর হবে এবং সেজন্য আমেরিকা দায়ী হবে—ইত্যাদি সাবধানবাণী চীনের প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন-লাই কর্তৃক উচ্চারিত হয়েছে। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আমেরিকার ফরমোজা-চুক্তি অনুমোদন করেছেন বলে চীন গভর্নমেণ্ট বৃটেনকেও দোষী করছেন। মার্কিন নীতি বৃটিশ স্বার্থের অনুকূল নয়, বৃটেন মার্কিন গভর্নমেণ্টের নীতি সমর্থন করে নিজের স্বার্থহানি করছেন—মিঃ চৌ-এর বিবৃতিতে এরূপ ইংগিতও করা হয়েছে।

অবশ্য বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মার্কিন গভর্নমেণ্টের ফরমোজা-চুক্তিকে অন্য দৃষ্টিতে দেখছেন। বৃটেনে বে-সরকারী মতও এই নূতন চুক্তির সমর্থক দেখা যাচ্ছে। বহু বিষয়ে মার্কিন নীতির সমালোচক এবং চীনের পিওপল্‌স্ গভর্নমেণ্টের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন "নিউ স্টেটস্‌ম্যান এ্যাণ্ড নেশন"-এর মতো পত্রিকা পর্যন্ত এই নূতন ফরমোজা চুক্তির প্রকারান্তরে সমর্থনই করেছে। সম্প্রতি উক্ত পত্রিকার সম্পাদক মিঃ কিংস্‌লি মার্টিন কর্তৃক লিখিত একটি প্রবন্ধে বলা হয়েছে যে, নূতন চুক্তির উদ্দেশ্য চীনকে রাগানো নয়, বরঞ্চ চিয়াং কাইশেককে সংযত রাখাই উহার উদ্দেশ্য।

বলা বাহুল্য, এই মতের পিছনে যে ধারনা রয়েছে তা এই যে, ফরমোজাকে চীনের হস্তে প্রত্যর্পণের কথা এখন তুলে লাভ নেই। পিকিং গভর্নমেণ্টও হয়ত তা জানেন এবং ফরমোজার জন্য আমেরিকার সংগে তাঁরা যুদ্ধ বাধাতে প্রস্তুত, এরকম মনে করাও হয়ত ঠিক হবে না। কিন্তু কড়া কথা না ব'লে চীন সরকারের উপায় কি? যে-চুক্তি হ'লো তা'তে ফরমোজাকে চিরতরে পিকিং গভর্নমেণ্টের নাগালের বাইরে রাখার জন্য মার্কিন গভর্নমেণ্ট প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন, এইটাই প্রতীয়মান হয়। এ অবস্থায় অন্য কোনো কারণে না হোক, অন্তত চীন জনমতের "ডিমরালাইজেশন"—নিরুৎসাহ হওয়া বন্ধ করার জন্যও পিকিং গভর্নমেণ্টকে গরম কথা বলতে হবে।

উপরোল্লিখিত প্রবন্ধে মিঃ কিংস্‌লি মার্টিন সাধারণভাবে পিকিং সরকারকে বর্তমান অবস্থায় উত্তেজক প্রোপাগাণ্ডা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিয়েছেন। মিঃ মার্টিনের আশংকা এই যে, চীনের কথাবার্তায় বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, এমন কি ভারতবর্ষের মনেও ভয় উৎপাদন করতে পারে: দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশে যে বহুসংখ্যক চীনা রয়েছে তাদের মনের উপর ঐরূপ প্রোপাগাণ্ডার ফল কী হতে পারে বিশেষ ক'রে সেই কথা ভেবেই মিঃ মার্টিন এই উপদেশ দিয়েছেন।

কিন্তু ফরমোজার সমস্যার সামাধান কীভাবে হবে? অনেকেই ভাবছেন, ফরমোজাকে শেষ পর্যন্ত পিকিং গভর্নমেণ্টের হাতেই দেয়া হবে তবে এখন সে-কথা তোলা ঠিক হবে না, এখন যেমন

আছে তেমনি থাক, অন্যান্য বিষয়ে আমেরিকার সঙ্গে চীনের ঝগড়া-ঝাঁটি একটু কমলে মামলাটা আপনিই সহজ হয়ে আসবে। কিন্তু এ অবস্থায় চীনের সঙ্গে আমেরিকার ঝগড়া-ঝাঁটি কমবে কী করে? চিয়াং কাইশেক যদি জানেন যে, চীনের সঙ্গে আমেরিকার ভাব হলেই পিকিং গভর্নমেণ্টকে ফরমোজা মুক্ত করার (অর্থাৎ তাঁর দলকে সাবাড় করার) সুযোগ দেওয়া হবে তা'হলে স্বভাবতই চিয়াং কাইশেকের চেষ্টা হবে যা'তে আমেরিকা ও পিকিং গভর্নমেণ্টের মধ্যে মিটমাট না হয়। আমেরিকার দিক থেকেও চিয়াং কাইশেককে ত্যাগ করা কেবল ফরমোজায় দখল রাখার জন্য নয়, অন্য কারণেও সম্ভব নয়। চিয়াং কাইশেককে যদি আমেরিকা ত্যাগ করে তবে অন্যান্য মার্কিন-আশ্রিত দেশের উপর তার যে প্রতিক্রিয়া হবে তা'তে বর্তমান মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিতে গুরুতর চোট লাগবে। সুতরাং চিয়াং কাইশেককে কোনোদিন আমেরিকা ত্যাগ করবে, এরূপ ধারণার সৃষ্টি হতে আমেরিকা দিতে পারে না। অপরপক্ষে ফরমোজা যতদিন মার্কিন-আশ্রিত চিয়াং কাইশেকের হাতে থাকবে ততদিন চীনের চোখে ফরমোজা মার্কিন অর্থাৎ শত্রুপক্ষীয় ঘাটি ভিন্ন অন্য কোনোরূপে প্রতীয়মান হতে পারে না। ফরমোজা থেকে চীনের কোনো অনিষ্ট হবে না, এ ভরসা চীন গভর্নমেণ্টের কিছুতেই হ'তে পারে না যতদিন ফরমোজা সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে মার্কিন গভর্নমেণ্টের হাতে থাকবে।

ফরমোজার নিরপেক্ষতা যদি মার্কিন এক্তিয়ারের বহির্ভূত হয়ে একটা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি দ্বারা নিশ্চয়ীকৃত হ'তো, তাহ'লে হয়ত বা চীনের মনোভাব অন্যরকম হ'তো বা হওয়ার সম্ভাবনা হ'তো। কিন্তু বর্তমান অবস্থায়, বিশেষ করে ফরমোজাকে মুক্ত করার সম্বন্ধে পিকিং সরকার চীন জনমতকে যেভাবে আশান্বিত ও উত্তেজিত করেছেন তা'তে একটা বৃহত্তর আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি দ্বারা ফরমোজার "নিউট্রালাইজেশন"—নিরপেক্ষীকরণের কোনো প্রস্তাবকে পিকিং-এর পক্ষেও আমল দেয়া অত্যন্ত কঠিন, কারণ তা'তেও চীনের আভ্যন্তর ব্যাপারে বিদেশী হস্তক্ষেপ করতে দেওয়া হচ্ছে এরূপ দেখাবে। তবে চীনে গভর্নমেণ্টের বিরোধী পক্ষ বা "অপোজিশন" ব'লে কিছু নেই। সরকার যদি ইচ্ছা করেন তবে আজ যা একান্ত প্রয়োজনীয় বলে লোকের সামনে ধরা হচ্ছে কাল তাকে তুচ্ছ বলে লোককে মনে করতে বলতে পারেন। কিন্তু এরূপ পরিবর্তনের কোনো আশু সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না।

সুতরাং চীন এবং মার্কিন গভর্নমেণ্টের মধ্যে রাগারাগির উপশমের সম্ভাবনাও অল্প। বর্তমানে একদিকে যেমন ফরমোজা সম্পর্কে মার্কিন গভর্নমেণ্টের ব্যবহারে চীনের উষ্মা বেড়ে চলেছে, অন্যদিকে তেমনি ১১ জন মার্কিন বৈমানিক সৈন্যকে চীন সরকার চর অভিযোগ দিয়ে জেলে ধরে রেখেছেন বলে আমেরিকা ভীষণ চটেছে। এদের ছাড়াবার জন্য খুব চেষ্টা চলছে। কিন্তু বদলে কিছু না পেয়ে চীন সরকার যদি এদের ছেড়ে দেন তবে সেটা চীনের দুর্বলতার লক্ষণের মতো দেখাবে—এও একটা মুশকিল। সুতরাং কীভাবে যে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উষ্ণতা কমবে বুঝা কঠিন।

* * *

সাত বছর জাপানের প্রধানমন্ত্রিত্ব করার পর মিঃ ইওশিদা পদত্যাগ করেছেন—স্বেচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে। তাঁর নিজের দল অর্থাৎ লিবারেল পার্টির এক অংশ তাঁর বিরুদ্ধে যাওয়াতেই তাঁকে গদি ছাড়তে হ'লো। মিঃ ইওশিদের বিরুদ্ধে যাঁরা গেছেন তাঁরা লিবারেল পার্টি থেকে আলাদা হয়ে মিঃ হাতোয়ামার নেতৃত্বে ডেমক্রাটিক পার্টি নামে একটি নূতন পার্টি করেছেন। মিঃ হাতোয়ামা এবং মিঃ ইওশিদার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা গোড়া থেকেই ছিল। আসলে মিঃ হাতোয়ামাই লিবারেল পার্টির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। ম্যাকার্থারী আমলে তাঁর উপর নিষেধাজ্ঞা না থাকলে তিনিই লিবারেল পার্টির দলপতি হিসাবে গোড়া থেকেই প্রধানমন্ত্রী হতেন। ইতিপূর্বেও লিবারেল পার্টির মধ্যে দলাদলির ফলে মিঃ ইওশিদার পদ একাধিকবার বিপন্ন হয়েছে, কিন্তু মিঃ ইওশিদা কোনোরকমে টাল সামলাচ্ছেন। এবার আর তা সম্ভব হ'লো না। মিঃ হাতোয়ামার দল সোস্যালিস্টদের সঙ্গে একযোগে মিঃ ইওশিদাকে কাত করেছে। মিঃ হাতোয়ামা জাপানের নূতন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছেন কিন্তু এক মাসের জন্য। মিঃ হাতোয়ামার বর্তমান মন্ত্রিমণ্ডলী কেয়ার-টেকার গভর্নমেণ্ট মাত্র। সোস্যালিস্টদের সঙ্গে তাঁর শর্ত হয়েছে যে, এক মাস পরে পার্লামেণ্টের সাধারণ নির্বাচন করতে হবে। জাপানের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আগামী সপ্তাহে আলোচনা করা যাবে।

১৩।১২।৫৪

মন্ত্রশক্তি

অনুরূপা দেবী

মৃত্যুর পূর্বে পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কচূড়ামণি যে শেষ পর্যন্ত সকলের অবজ্ঞেয়, অল্পবয়সী অম্বরনাথকেই টোলের অধ্যাপক এবং জমিদার বংশের গৃহদেবতা রাধাবল্লভের পুরোহিত পদে বৃত ক'রে যাবেন, এ কথা এক সুধাকর ছাড়া আর কোন শিক্ষার্থীই কল্পনা করতে পারে নি।

ঈর্ষা কাতর আদ্যনাথের প্ররোচনায় বিদ্রোহী পড়ুয়ার দল নালিশ ক'রতে গেল জমিদার রমাবল্লভের কাছে। প্রতিবিধান না করলে নতুন টোল খুলবে ব'লে শাসাল তারা। কিন্তু রমাবল্লভ কিইবা করতে পারেন, পিতার উইল অনুসারে জগন্নাথ তর্কচূড়ামণির সিদ্ধান্তই যে চরম!

তবু চিন্তিত হ'য়ে পড়লেন কন্যা বাণীর কথা ভেবেই। রাধাবল্লভের নিত্য সেবার সব আয়োজন, আশৈশব নিজের হাতেই ক'রে আসছে। নতুন পূজারীর সামান্যতম ত্রুটিও সে হয়ত সইতে পারবে না।

আশংকাটা যে তাঁর মিথ্যা নয়, সেটা অচিরেই প্রমাণিত হল। অম্বরনাথ সমস্ত অন্তর দিয়েই দেবতার অর্চনা করতে চায়, কিন্তু ঐশ্বর্যের আড়ম্বর তাকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। মন ভরে না বলেই বাহ্যিক অনুষ্ঠানে ঘটে ত্রুটিবিচ্যুতি। বাণী রুষ্ট হয়। ধমক দেয় তাকে। চেষ্টা করে সংশোধন করে দেবার। বিভ্রান্ত মন নিয়ে অম্বর চ'লে যায়। সখী তুলসী পরিহাস তরল কণ্ঠে গেয়ে ওঠে "মনকে তাড়িয়ে দিস্‌নো লো, রাই"........ একদিন আদ্যনাথের হ'য়ে সুপারিশ করতে গেছিল সে বাণীর কাছে কিন্তু অম্বরনাথের সৌম্য শান্ত মূর্তি দেখে, আর পারল না।

বাণী আন্তরিকতার সুরেই জানিয়ে দিল রাধাবল্লভকে যে স্বামী ব'লে জেনেছে, অন্যের গলায় সে কোনদিনই মালা দিতে পারবে না—"

এদিকে বাপ রমাবল্লভ, মা কৃষ্ণপ্রিয়া—মেয়ের বিয়ের চিন্তায় দিশাহারা হয়ে পড়লেন। আর ক'টা দিনের ভেতর যদি বাণীর বিয়ে দিতে না পারেন, তাহ'লে স্বর্গীয় বিশ্বম্ভর রায়ের উইল অনুসারে সমস্ত সম্পত্তির মালিক হবে দূর সম্পর্কের ভাগিনেয় মৃগাঙ্ক—মদ্যপ এবং উচ্ছৃংখল ব'লে যার হাতে একদিন রমাবল্লভ মেয়েকে কোনমতেই তুলে দিতে পারেন নি।

কিন্তু উপায় বিহীন যখন, তখন কৃষ্ণপ্রিয়া পরামর্শ দিলেন তাকেই তার ক'রে দিতে। শুনে বাণী আপত্তি জানাল। চোখের জল ফেলল—তবু তারের গতিরোধ করতে পারল না।

মৃগাঙ্কের হাতে সে তার গিয়ে যখন পৌঁছল, তখন বৈঠকখানায় জহুরা বাইজীর গান রীতিমত জমে উঠেছে। অকস্মাৎ মামার এই জরুরী তলবে তার চোখের নেশা গেল ছুটে। বন্ধুদের জোর ক'রেই বিদায় ক'রে ঢুকে পড়ল অন্দর মহলে। যে তরুণীটি এসে দাঁড়াল ঘোমটায় মুখ ঢেকে, সে অব্জা —তার স্ত্রী।

মৃগাংক অবশ্য তাকে বন্ধু বলেই ডাকে। সে যে খুব ভোরে উঠেই মামার বাড়ী রওনা হ'বে—দিদিকে এই খবরটুকু জানাতে ব'লেই মৃগাংক খুশী মনে তার কর্তব্য শেষ করল।

কিন্তু রাজনগরে পৌঁছবার আগেই এক বিভ্রাট ঘটে গেল সেখানে। এক চাষীর দেওয়া জবাফুলে হাতে সেদিন যখন অম্বরনাথ মন্দিরে এসে দাঁড়াল, তখন বাণী আর সহ্য করতে পারল না। রূঢ় তিরস্কারে অম্বরনাথকে বিদায় ত ক'রলই, সেই সঙ্গে হুকুম দিল আদ্যনাথকে ডেকে আনতে।

অম্বরনাথ পদত্যাগপত্র দাখিল ক'রল রমাবল্লভের কাছে। টোলের অধ্যাপকের পদ থেকেও অব্যাহতি চায় সে। গুরুর নির্দেশে আসামে যেতে হবে তাকে।

কিন্তু তখন কি জানত কি অভাবিত ঘটনাজালে জড়িয়ে পড়তে চলেছে সে।

রাজনগরে পৌঁছে মৃগাংক মামীর মুখে জরুরী তলবের কারণটা শুনে হেসেই উড়িয়ে দিল। বোন হবে স্ত্রী! তাছাড়া বিবাহিত সে।

খবরটা শুনে কৃষ্ণপ্রিয়া একেবারে বজ্রাহত হলেন। বাণীকে পাত্রস্থ করার শেষ আশাটুকুও বুঝি মুছে যায়।

কিন্তু মৃগাংক অন্ধকারের মধ্যেও আলোর সন্ধান পেল, অকস্মাৎ নদীর তীরে অম্বরনাথের সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে। কৈশোরে তাদের পরিচয় হয়েছিল কাশীর এক টোলে। এখনও সে অবিবাহিত আছে কিনা কৌশলে সেটা জেনে নিয়ে, ছুটল বাড়ীর দিকে।

তার প্রস্তাব শুনে স্তম্ভিত হ'লেন রমাবল্লভ।

বাণী কিন্তু একেবারে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠল। মানুষকে যদিই বা সে বিয়ে করতে রাজী হয়েছে, তাই ব'লে ওই সামান্য পূজারী বামুনকে—

তবু শেষ পর্যন্ত তাকে হার মানতে হ'ল বাপ মায়ের মুখ চেয়ে। চোখের জল চেপে রাধাবল্লভের সামনে এসে ভেঙ্গে পড়ল "ঠাকুর, তোমার একী নিঠুর খেলা......"

অম্বরনাথ এসেছিল মন্দিরে মন স্থির করতে না পেরে। পরাজয়ের লজ্জাটুকু বাণী এড়াবার জন্যেই উদ্ধতভাবে জানাল বিয়ের সময় থেকে কিন্তু কোন সম্বন্ধ থাকবে না তাদের মধ্যে।

দৃঢ় কণ্ঠে প্রতিবাদ জানাল অম্বরনাথ। না, বিয়ের সময় থেকে নয়। সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠান পালন করার পর থেকে।

তেজস্বিনী বাণী, অভিমানিনী বাণী এই দ্বিতীয়বার পরাভব মানতে বাধ্য হ'ল, বলল "বেশ, তাই হ'বে। দেবতার সামনে শপথ কর—'

শপথ ক'রল অম্বরনাথ।

পানী গ্রহণের সময় অম্বরনাথের হাতের ওপর বাণীর হাত রেখে পুরোহিত যখন উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি করলেন, "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু, মম চিত্তমনুচিত্তন্তে অস্তু..." তখন বাণীর বুকখানা বার বার কেঁপে উঠল, আর অদূরে দাঁড়িয়ে বিহ্বল হ'য়ে পড়ল মৃগাংক। বিয়ের মন্ত্রে এত!

পর দিনই সে রওনা হ'ল নতুন আলো চোখে নিয়ে। বাড়ী পৌঁছে, অব্জাকে নিভৃতে ডেকে বলল, "আজ থেকে আমরা আর বন্ধু নয়। যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব—মানে বোঝ?"

মানে বুঝতে হয়ত বাণীও চেয়েছিল; কিন্তু সুযোগ মিলল কই?

সকালে উঠেই অম্বরনাথ আসামে রওনা হচ্ছে। সকলের কাছেই বিদায় নিয়েছে সে; শুধু নেয়নি বাণীর কাছে। সব চেয়ে যে আপন, সেই হ'য়ে রইল সব চেয়ে পর।

দূরে, বহুদূরে মিলিয়ে গেল অম্বরনাথের গাড়ী। খোলা জানালা পথে বাণী দাঁড়িয়ে রইল। নিষ্কৃতি দিয়ে গেল স্বামী, তবু সে খুশী হ'তে পারল কি? তবে বার বার চোখের কোণে অশ্রু ঘনিয়ে ওঠে কেন? কেন উদাত্ত সুরে মন্ত্র ধ্বনিত হয় তার কানে "ওঁ মম ব্রতে তে হৃদয়ং দধাতু......যদিদং হৃদয়ং মম, তদস্তু হৃদয়ং তব......"

(বিজ্ঞাপন)

অশ্রু কমল

উপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের গানে আছে—
"অশ্রুজলের পদ্মখানি
চরণতলে দিলাম আনি..."

অশ্রু দিয়ে তৈরী কোন পদ্মের কথা যে বলা হয়নি, তা তোমাদের না বললেও চলবে;—জানো তো তাজমহলকে কবি বলেছেন—

"এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল"।

যাকগে, এসব হল কবিত্ব, ভারি ছোঁয়াচে রোগ ওটা। আপাতত তাকে দূর থেকে প্রণাম জানিয়ে জলজ্যান্ত অশ্রু দিয়ে তৈরি একটি পদ্মের কাহিনীই বলব।

সে লক্ষ-কোটি যুগ আগেকার কথা।
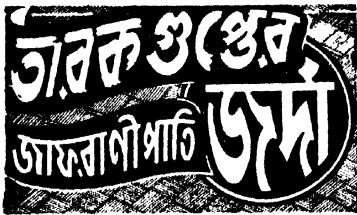
জল-মাটি, পোকামাকড়, সাপ-ব্যাং, পশু-পাখি, মানুষ-টানুষ সব কিছু সৃষ্টি করবার পর দেবতারা আর কী সৃষ্টি করলেন জানো? অগুনতি রঙ-বেরঙের ফুল তৈরি করে পৃথিবীর নানান জায়গায় ছড়িয়ে দিলেন। তাঁদের হাতে-গড়া সমস্ত ফুলের মধ্যে সবচেয়ে সুষ্ঠু গড়ন তাঁরা মনে করলেন আর কোন ফুলের নয়—পদ্মের। এসব ফুল তৈরি হল অবশ্য মানুষের মনে আনন্দ দেবার জন্যেই।

কিন্তু স্বর্গের নন্দনকাননের জন্যেও তো একটি পদ্ম চাই—রঙটি হবে তার রূপোর মতো সাদা, দেখলে চোখ যেন জুড়িয়ে যায়।

পদ্ম চাই—সে ভালো কথা, কিন্তু ভাবনা হল, ওরকম একটি কমনীয় পদ্ম তৈরী করা যায় কী দিয়ে!

দেবতারা ভেবে দেখলেন, সৃষ্টির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে যা কিছু আছে, তার মধ্যে সবচাইতে কোমল জিনিস হল চোখের জল। চোখের জল দিয়েই তৈরি হবে তাঁদের পদ্ম।

কিন্তু কোথা থেকে কে এনে দেবে চোখের জল?

ইন্দ্রাণী—স্বর্গের দেবী। অরুণ-দেবকে ভালবাসেন তিনি। নিষ্ঠুর অরুণদেব কিন্তু তাঁর দিকে ফিরেও চান না। দেবী নিজের প্রাসাদের শয়নকক্ষে রাত জেগে বসে থাকেন, যদি তাঁর প্রিয়তম দয়া করে একবার আসেন। প্রিয়তমের তো সেকথা ভেবে ঘুম নেই। অনেকক্ষণ বসে থেকে শেষটা যখন ইন্দ্রাণী ঘুমিয়ে পড়েন, তখন অরুণদেব তাঁকে স্বপ্নে দেখা দিয়ে বলেনঃ ইন্দ্রাণী, মানিক আমার, এই যে এসেছি আমি...... কিন্তু তোমায়-আমায় মিলন হবে না তো কোনদিন—স্বপ্নেই তুমি আমায় পাবে চিরকাল, জাগরণে নয়।"

ঘুমের ঘোরে চমকে ওঠেন দেবী, চোখ থেকে গড়িয়ে পড়ে দু-ফোঁটা জল, দু-টুকরো বর্ণহীন পোখরাজ যেন।

দেবতারা এ খবর জানতে পেরে নিশাচর বাদুড়কে দিয়ে ইন্দ্রাণীর চোখের এক ফোঁটা জল আনিয়ে কী একটা মন্ত্র আওড়ালেন। দেখতে দেখতে ছোট্ট অশ্রুকণা থেকে বেরিয়ে এলো নরম ফুটন্ত একটি পদ্ম।

কিন্তু কোমল হলে কী হবে—না আছে তার রঙের জলুস, না আছে তার সুগন্ধ। দেবতারা কিন্তু ভারি খুশী, তাঁরা বললেনঃ "এই তো সৃষ্টির সেরা পদ্ম, পাপড়ি এর ঝরে পড়বে না কোনদিন, চিরকাল এমনি ফুটে থাকবে ফুলটি।"

যমপুরী, কিনা পাতাল, মরণের পর মানুষের আত্মা যেখানে গিয়ে থাকে—সেই যমপুরী থেকে যমরাজ একদিন দেবতাদের ডেকে চেঁচিয়ে বললেনঃ "হাসি পায় তোমাদের দশা দেখে, যতো সব নিরেট আহাম্মকের দল! সৃষ্টির সেরা পদ্ম তোমাদের হাতে রূপ পেয়েছে, এই তোমাদের গর্ব, না? উজবুক আর কাকে বলে! আমার হাতের ছোঁয়া না পেলে কোন কিছুরই সৌন্দর্য যে খোলে না, তা বুঝি জানা নেই তোমাদের?"

দেবতারা কী আর করেন! বাদুড়ের ডাক পড়ল আবার। বর্ণগন্ধহীন পদ্মটি নিয়ে তক্ষুনি সে উড়ে চলে গেল সোজা পাতালে যমরাজের কাছে। যমরাজ কী করলেন জানো? পাতালের কোল ঘেঁষে 'যম্ যম্' শব্দ করে সেই যে বৈতরণী নদী বয়ে যাচ্ছে, সেই নদীর জলে পদ্মটিকে তিনি বেশ করে ধুয়ে নিলেন। বৈতরণীর জলের স্পর্শে ফুলটির রঙ হয়ে গেল দুধের মতো সাদা, আর তার গন্ধ এমন চমৎকার হল যে, তার আর তুলনাই হয় না।

বর্ণে আর গন্ধে ফুলটি অনুপম হল সত্য, কিন্তু এবার আরেক মুশকিল দেখা দিলঃ এতদিন ওর একটা গুণ ছিল এই যে, গন্ধ না থাক, রঙের বাহার না থাক, ও চিরকাল ফুটে থাকবে—কবি যাকে

বলেন অমরার অম্লান দূত, ঠিক তারই মতো।—কিন্তু বৈতরণীর জলের ছোঁয়াচও লাগল, আর ওকেও চলে আসতে হল আমাদের এই মাটির পৃথিবীতে। নন্দন-কাননে ওর ঠাঁই হল না আর—স্বর্গে জরা-মৃত্যু নেই কিনা, তাই।

সমুদ্রের মাঝখানে ছোট্ট একটি দ্বীপ, সেই দ্বীপে নল-খাগড়ার ঝোপের ভিতর ফুটল পদ্মটি।

ফুটল সত্য; কিন্তু মাত্র দু-তিন মাস রূপ আর সুবাস ছড়িয়ে শেষটা ধীরে ধীরে একদিন সে শুকিয়ে ঝরে পড়ল।

তার পরের বছর আবার ফুটল সেই মোহন রূপ, আর মনোমদ গন্ধ নিয়ে—কিন্তু ওই দু-তিন মাসের জন্যেই শুধু।

সেই থেকে বছরের পর বছর ইন্দ্রাণীর চোখের মুক্তাটি ফুটছে, আর ঝরছে, ফুটছে আর ঝরছে। ও তো স্বর্গের ফুল নয় আর, ওর মালিক এখন স্বয়ং যমরাজ। ক্ষণিকের আনন্দ দেবার জন্যই তিনি ফুলটিকে পাঠিয়ে দেন পৃথিবীতে।

স্বর্গের ইন্দ্রাণী তাঁর অন্তরের দেবতা অরুণদেবকে—স্বপ্নে নয়—জাগরণে কখনো পেয়েছিলেন কি? কে বলবে!

ইন্দ্রাণীর অশ্রু-কমলটি কিন্তু তখনি ফোটে, পূর্বাশার কালো আকাশ যখন অরুণদেবের আলোয় ঝলমল করে হেসে ওঠে। সন্ধ্যাবেলায় দিনের চিতা নিভে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অরুণদেবও যে-ই পশ্চিম-সাগরে ডুব দেন, অশ্রু-কমলটির চোখেও তখন অশ্রু দেখা দেয়, মুখখানি তার মলিন হয়ে যায়।

তোমরা বোধ হয় ভাবছ, ওই একটি-মাত্র পদ্মই যমরাজের যা কিছু দৌলত? তা নয়,—যা কিছু সুন্দর, যা কিছু আমাদের মনে আনন্দ দেয়, সে সবেরই মালিক হচ্ছেন যমরাজ। মাত্র কয়েকদিনের জন্য তিনি তাঁদের এ পৃথিবীতে পাঠিয়ে দেন—কাজ শেষ হলে আবার তাদের ফিরিয়ে নিয়ে যান যমপুরীর কুহেলি-ঢাকা বনকুঞ্জে। দেবী ইন্দ্রাণীর চোখের কমলটির মতো বিস্মৃতিই তাদের ললাটের লিখন!

ভাঙাগড়া

প্রভাবতী দেবী সরস্বতী

(শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক লেখিকা)

ভাঙা আর গড়া! এই নিয়েই সৃষ্টি!

আজিকার জন কোলাহল মুখরিত নগরী কাল যেমন সমুদ্রের অতল তলে বিলীন হ'তে পারে—তেমনি অন্যদিকে সর্বগ্রাসী সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ লোপ পেয়ে দেখা দিতে পারে শস্য-শ্যামলা ধরিত্রী। সৃষ্টির আদিম কাল থেকেই এই ভাঙাগড়ার খেলা চলছে। কেউ তাকে রুখতে পারবে না। এই ভাঙাগড়াতেই নাকি সৃষ্টির আনন্দ!

এই ভাঙাগড়ার খেলা শুধু প্রকৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না—মানুষের জীবনেও এর লীলা প্রতিফলিত হয়। মনিষীরা বলেন—এই নিয়েই তো সংসার! গভীর অমানিসা রাত্রির পর প্রভাত সূর্যের যেমন আবির্ভাব ঘটে তেমনি প্রখর দিবা অবসান হয় গাঢ় অমানিসায়! সুখ সাচ্ছন্দ্যের পর দারিদ্র্য আগমন কিছু আকস্মিক নয়! তেমনি সংসারে আসে সুখ আর দুঃখ। যেন এরা দু'টি যমজ ভাই। যে উভয়কে আহ্বান জানাতে পারবে সেই তো প্রকৃত মানুষ!

যোগীন্দ্রনাথের বয়স যখন মাত্র ষোল কি সতের তখন তার পিতৃবিয়োগ ঘটল। বিধবা পিসিমা আর ছোট ছোট তিনটি ভাই নৃপেন, রমেন ও শৈলেনকে নিয়ে যোগীন্দ্রনাথ রীতিমত দিশেহারা হয়ে পড়েন। কিন্তু তার মনোবল এত প্রখর যে, এততেও সে একটু মুষড়ে পড়ল না। নিজ একনিষ্ঠা ও অসীম ধৈর্যের বলে যোগীন্দ্রনাথ অল্প মূলধনে ব্যবসা সুরু করল। ধীরে ধীরে ব্যবসা তার বড় হ'ল। একদিন যে যোগীন্দ্রনাথ মাথায় করে কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় কম্বল ফেরী করতো—আজ তার কলকাতা ও বোম্বেতে বিরাট কারবার চলতে সুরু করেছে। আজ যোগীন্দ্রনাথের সংসারে কোন দুঃখ বা কষ্ট নেই। ভাইরাও সব উপযুক্ত হয়েছে। কেউ উকিল, কেউ ডাক্তার, কেউ বা কলেজের মেধাবী ছাত্র। প্রথম পক্ষের স্ত্রী শিশুপুত্র রেখে অসময়ে মারা যান। তাই যোগীন্দ্রনাথ আবার বিয়ে করে। দ্বিতীয় পক্ষীয়া স্ত্রী সুষমা কল্যাণময়ী-রূপে সংসারে এলো। সকলকে সে আপন করে নিল। যোগীন্দ্রনাথ বিয়ের আগে ভয় করেছিল তাদের এই সোনার সংসার যদিবা তার বিয়ে করায় ভেঙে যায়? কিন্তু তা হ'ল না। সংসারে আজ তাদের সর্বত্র শ্রী ও কল্যাণ বিরাজ করছে।

এই কল্যাণ ও শান্তি কি চিরদিন থাকবে—?

না আচম্বিতে আর আর সংসারের মত আবার এদের মধ্যেও দেখা দেবে অশান্তির আগুন! যোগীন্দ্রনাথের এই সোনার সংসারে কি কোন দিন দেখা দিবে কেবল চোখের জল?

যোগীন্দ্রনাথ এত পরিশ্রম করে যে সুখের সংসার নিজ হাতে গড়ে তা কি কোনও দিন ভাঙবে? যদি সত্যি সে একদিন ভাঙে তবে তার রূপ তখন কেমন ভয়ঙ্কর হবে? এরই জবাব দেবে রূপালী পর্দা।

বিজ্ঞাপন

কোন একটি গল্পের ভূমিকা

অঙ্কুর মুখোপাধ্যায়

ট্রেনের ঝাঁকানিতে দুলতে দুলতে চলেছি। গন্তব্য ছিল বেনারস। হাতে রয়েছে সাংখ্য-দার্শনিকের লেখা একখানা বই 'কাল দিক অথবা অবকাশ'। ট্রেন-যাত্রার সময় হাল্‌কা ধরনের বই আমার আদৌ পছন্দ হয় না। বিশেষ করে থার্ড ক্লাসের যাত্রীর পক্ষে হাল্‌কা ধরনের বই আমার ধারণায় একেবারেই বেমানান। কনট্রাক্ট খুব উগ্র হওয়া চাই, নতুবা মাধুর্যের আস্বাদ থেকে বঞ্চিত হবেন। ইসাডোরা ডানকান-এর আত্মজীবনী যাঁরা পড়েছেন, তাঁরা জানেন প্লেটোর দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্র থেকে তাঁর অবস্থান অনেক দূরে। তবু দেখতে পাবেন ইসাডোরা একখানা 'প্লেটো' নিয়ে বসেছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে। সহসা অ্যাবস্ট্রাক্ট আইডিয়ার তরঙ্গ-দোলা দেহের তটে এসে আছড়ে পড়লো। ইসাডোরার দেহে জেগে উঠলো নৃত্য-হিল্লোল। স্থির, স্পন্দন-হীন, সমভঙ্গ-ভঙ্গী আর নেই। দ্বিভঙ্গ, ত্রিভঙ্গ, বহুভঙ্গ ভঙ্গী। সরল, বক্র, বিচিত্র চলন। মনে হতে পারে, এ ধরনের বাঞ্ছিত অভিজ্ঞতার জন্যে একটু নির্জন অবকাশ দরকার। থার্ড ক্লাসের একটি কোণে কোণঠাসা হয়ে এই অবকাশের সন্ধান পাওয়া যাবে না। হয়তো যাবে না। কিন্তু এই অবকাশ খুঁজে পাওয়া চাই কোণে অথবা বনে নয়, মনে। দেশ ও কালের ব্যবধান নাকি সংকুচিত হয়ে এসেছে। খবরটা আদৌ শুভ নয়। আশপাশের যাত্রীদের দিকে লক্ষ্য করছি। একটি অভিনব গোধূলি আলোকে সব ধূসর হয়ে গেছে। দেহ দিয়ে যার সান্নিধ্য অনুভব করছি মন দিয়ে তাকে ছুঁতে পারছি না। এই মনের ব্যবধানই কালের ব্যবধান।
I like people quite well at a little distance!
কথাটা বলেছেন লরেন্স। খুব খাঁটি কথা। এই একটু ব্যবধানের অভাবে ঘরে ঘরে কত যে ট্র্যাজেডি ঘটছে, কত প্রেমের যে ঘটছে অপমৃত্যু, তার লেখাজোখা নেই। একটু দূর থেকেই মানুষকে ভালবাসা যায়। এই দূরত্বই অধুনা নাকি অতীতের বস্তু। তৎসত্ত্বেও এই দূরত্বের 'ইলিউসন্‌' অন্তত থাকা চাই।........
If they will only leave me alone I can still have the illusion that there is room enough in the world.
লরেন্সের উক্তি। বিচ্ছিন্ন একাকীত্বের অন্তরালে আত্মগোপন করার কথা উঠ্‌ছে না। আপনাতে আপনি থাকার অর্থই যথাযথ ব্যবধানে অবস্থান করা। এই ব্যবধান মনের, দার্শনিক পরিভাষায় কালের। আর কে না জানে, "আপনাকে তার হারিয়ে প্রকাশ আপনাতে যার আপনি আছে"! এরই অপর নাম প্রেম।.........
ঊর্ধ্বশ্বাসে ট্রেন ছুটে চলেছে। গোমো পার হয়ে গয়ার দিকে চলেছি। কোদারমার অরণ্য-অঞ্চল। এইখানে একদিন ঘুরতে ঘুরতে এক পাগলের সন্ধান পাই। একটি সুবৃহৎ মহীরূহের ফাটলের মধ্য দিয়ে পাগলটি অতিকষ্টে এ-ধার থেকে যাচ্ছিল ও-ধারে। এমনই বহুবার। এই এক জন্মেই সে বহু-জন্মের ব্যবধান ঘুচিয়ে দিতে চায়। বহবোঽপি ময়া দৃষ্টং যোনি-দ্বারং পৃথক্‌ পৃথক্‌ গর্ভবাসে মহদ্দুঃখং ত্রাহি মাং মধুসূদন! এই সিম্বলিক্‌ যোনি-পরিক্রমার মধ্য দিয়ে সে চেয়েছিল দেশ-কালের সীমান্ত পেরিয়ে যেতে।—চিন্তার খেই হঠাৎ ছিঁড়ে গেল। এক দেহাতী সহযাত্রী প্রকৃতির একটি ছোট্ট আহ্বানে সাড়া দিতে গিয়ে ভয়ে আঁৎকে উঠেছে। পায়ের নীচের সমস্ত জমি সরে যাচ্ছে দেখে সে আতঙ্কে চীৎকার করে উঠেছেঃ বিলকুল জমিন চলা যাতা, হিসাব করে-গা কাঁহা! হাসবার কথা নয়। একই নদীতে আমরা দু'বার ডুব দিতে পারি না! প্রসারণশীল বিশ্বে পা রাখবার মত কোন স্থির বিন্দু নেই! আপনিও কি ভয়ে আঁৎকে উঠছেন না? দিক-কালের প্রশ্ন বড়ই জটিল। আইনস্টাইনের বিশ্ব শান্ত হলেও তার সীমা নেই। আবার এই অসীম বিশ্ব প্রসারণশীল। বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে কোথায়? কোন্‌ দেশে? সুতরাং ধরে নিতে হ'ল বিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে দেশে নয়, কালে। আমরাও প্রসারিত হচ্ছি কালে অর্থাৎ মনে অর্থাৎ প্রেমে।

বৈষ্ণব মহাজনরা প্রেমের একটা ডেফিনিশন্‌ দেবার চেষ্টা করেছেন আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা তার নাম কাম। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি-ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম। কৃষ্ণ বস্তুতে আপত্তি থাকলে ওটা বাদ দিন। কিন্তু চার ভল্যুম্‌ 'স্টেকেল্‌' পড়ে দেখবেন তিনিও এর বেশী কিছু বলেন নি। প্রেমই যে সবচেয়ে বড় প্যানাসিয়া, কথাটা আমরা প্রায় ভুলে গেছি। অতি সুসভ্য আধুনিক মানুষের কাছে প্রেম বস্তুটি আশা করা বৃথা। প্রেমের সে উৎকণ্ঠা আধুনিক-সুলভ নয়।

এক চরণে আল্‌তা পরিয়ে
ভুলিল প'রিতে অপর পা'য়,
এক নয়নে অঞ্জন দিয়ে
বাঁশী শুনি ধনি চমকি চায়।

এ চিত্র কি আধুনিক! তবু সব প্রেমই কৃষ্ণ-প্রেমের মতই নিত্য-সিদ্ধ। সাধ্য-সাধনের বিষয় এ নয়। ......কখন যে ডিহরী ছেড়েছি খেয়াল নেই। সাসারাম পার হয়ে ট্রেন উর্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে। দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে রোটাসের নীল রেখা।...... পর্বত ও নারী দূর হতে নেহারি, দূর হতে রম্য, দুরধিগম্য! দুরারোহ পর্বত-শিখরে মানুষের পদ-চিহ্ন পড়তে পারে তবু তা অজেয়। নারীকেও জয় করা যায় না। আত্মাহুতি দিয়েই তাকে আপন করে নিতে হয়। এই আত্মাহুতিই প্রজ্বলন্ত প্রেম।

কিন্তু প্রেমের কাহিনী এ যুগে অচল। নেপোলিয়নের আর্মি মার্চ করতো পেটের উপর ভর করে, শুধু পায়ের উপর নয়। এ যুগের আর্মি, বিশেষ করে রেড নেপোলিয়নিজম্‌-এর আর্মি মার্চ করে মাথার উপর, শুধু পা এবং পেটের উপর নয়। একটা যুগ মেরুদণ্ড-প্রধান, আর একটা যুগ মস্তিষ্ক-প্রধান। লম্বমান মেরুদণ্ডটি বিবর্তিত হ'তে হ'তে উর্ধ-প্রান্তের স্নায়ুপিণ্ড পরিণত হ'ল মস্তিষ্কে। মূলাধার থেকে সহস্রার। মেরুদণ্ডের পথ ধরে এই দু'-এর যোগাযোগ। কুমেরু আর সুমেরু। এই কু আর সু'-এর সমতাসাধন কচিৎ ঘটে থাকে। আমাদের যুগটা ছিল মেরুদণ্ড-আশ্রয়ী ইমোশনের যুগ। এখন শুনছি মস্তিষ্কের ছাড়পত্র না পেলে প্রেমও ব্যর্থ। ভলতেয়ার কিংবা ঐ ধরনেরই কেউ বলেছিলেনঃ 'মাই লাভ্‌ ইজ্‌ সেরিব্রাল্‌'! এটা সেরিব্রাল লাভ'এর যুগ। যে কোন মনোবিকলনবিদকে জিগ্যেস করে দেখবেন, সেরিব্রাল লাভ বলে কিছু নেই। মাথা দিয়ে ভালবাসা যায় না। ....

রোটাসের নীল রেখা দিগন্তে মিলিয়ে গেছে। চোখের সামনে ফুটে উঠ্‌ছে এক ফেলে-আসা দিনের অশ্রু-সজল কাহিনী। এ কাহিনীর নায়ক আমি নই। ইমোশন এবং ইন্‌টেলেক্ট, সুমেরু আর কুমেরু, সু ও কু এই দ্বিত্বের সমতা-সাধনে যারা অক্ষম, তারা প্রত্যেকেই এই কাহিনীর অঙ্গাঙ্গী। আমি কেবল ভূমিকাটুকু ফেঁদে রাখছি। ......ডিহরী-অন্‌-শোনের যে রাস্তাটা রেল-লাইন টপ্‌কে জি টি রোডে মিশেছে, তার নামটা ভুলে গেছি। শোনের গা ঘেঁষে এই রাস্তা। চল্‌তে চল্‌তে খুব দূর থেকে শুন্‌তে পাবেন যান্ত্রিক আর্তনাদ। একদিন প্রাতঃভ্রমণের সময় এইরকম কাতরানি শুনে পাশের ভদ্রলোকের প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করতেই এক নারীকণ্ঠে উত্তর এলোঃ ওঃ! আপনি বুঝি নতুন এসেছেন। এ হচ্ছে বয়েল গাড়ির চাকার শব্দ। কোনদিন তো তেল পড়ে নি! সন্ধ্যাবেলায় আবার দেখা। অ্যানিকাটের ধারে। নাহারের উঁচু পাড়ের ওপারে শিশু গাছের আড়ালে চাঁদ উঠছে। দিগ্বলয়িত অস্ত-সূর্যের শেষ আভা তখনও মিলিয়ে যায় নি। ব্যাক্‌গ্রাউণ্ডে রোটাসের নীলাভ রেখা। সেটিং খুব সুন্দর। সময় শেষ গোধূলি। মেয়েটি জলের ধারে বসে এক মনে জল-তরঙ্গের ঐক্যতান শুন্‌ছিল। রূপ-বর্ণনায় আমি পটু নই। অরূপের কোন বর্ণনা হয় না। নেতি নেতি করে অরূপে পৌঁছতে হয়। ইতি ইতি করেও রূপের কোন ইতি মেলে না। জনম অবধি হাম রূপ নেহারনু নয়ন না তিরপিত ভেল! এ বর্ণনা নেতি-বাচক। গোধূলি সময় ফেলি, ধনি মন্দির বাহির গেলি, নব জলধরে বিজুরী-রেহা দ্বন্দ্ব পাসরিয়া গেলি! এ-রূপের ইতি পাওয়া ভার! উপমা এবং উৎপ্রেক্ষার বেড়ি দিয়ে বাঁধা গেল না বলে শেষ পর্যন্ত হার মেনে বল্‌লুমঃ **a form that is the denial of all chaos!** এই রকমই ফর্ম ছিল তার। শেষ-গোধূলি-লগ্নে তার সঙ্গে আমার আলাপ। তারপর একটি খণ্ড কাল টপ্‌কে আসুন মন্বন্তরের যুগে। ভাগ্য-সূত্রে দক্ষিণ বিহারের একটি শহরের যে পুরানো বাঙলোটিতে বাসা নিয়েছি, তারই অন্য দিকে এই মেয়েটি থাকে তার বাপ-মার সঙ্গে। ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠি। নিস্তরঙ্গ জল সহসা সফেন হয়ে উঠলো। কোথা থেকে মেয়েটি কুড়িয়ে আনলো একটি কুকুর-ছানা। তারই সেবা-যত্নে তার দিন-রাত্রি কেটে যায়। কুকুরটা হয়ে উঠ্‌লো আমার চোখের বালি। উন্মত্তের মত আচরণ করতে লাগলুম। সুযোগ পেলেই কুকুর-ছানাটাকে প্রহার দিই। একদিন প্রথম রাত্রে বাচ্চাটাকে প্রহারের জন্যে যেই লাঠি তুলেছি পিছন থেকে টান পড়ল। ধীরকণ্ঠে মেয়েটি বললঃ আপনার আর এখানে থাকা উচিত নয়। ভোরের ট্রেনে সে-স্থান ত্যাগ করলুম। কুকুর-ছানাটা কিন্তু স্টেসন পর্যন্ত আমাকে এগিয়ে দিয়েছিল! ট্রেনে তন্দ্রা-ঘোরে স্বপ্ন দেখলুমঃ নির্জন পথ দিয়ে চলেছি, সঙ্গে নারী। এক জায়গায় এসে মেয়েটি থেমে যায়। মেয়ে আর নেই; সুরভি গাভী। গাভীটি এগোতে পারে না। পথের বুক চিরে একটি রক্তের রেখা এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্তে চলে গেছে। সেই রক্ত শুঁকে শিঙ্‌ নেড়ে গাভীটি পিছিয়ে আসে। আবার সেই মেয়ে। আমি ভাবি, এ তো ওরই রক্ত। তবে কেন পার হতে পারছে না। ঘুম ভেঙে যায়। এ রক্ত কিসের সিম্বল্‌?

এ গল্পের উপসংহার নেই। শুধুই উপক্রমণিকা। আজও সেই রক্ত-রেখার এ-ধারেই রয়ে গেছি। সুতরাং উপসংহারের দিকে পৌঁছতে পারি নি। প্রেমের উপসংহার আত্মাহুতিতে। উপক্রমণিকায় স্থির হয়ে থাকা আত্মহত্যারই নামান্তর। দিক-কাল নিঃশেষে অবলুপ্ত হয় বলেই প্রেম হচ্ছে ত্রৈকালিক সত্য।

এই কাহিনীর নায়ককে প্রশ্ন করেছিলুম, প্রেম বল্‌তে আপনি কি বোঝেন? জবাব পেয়েছিলুমঃ **By love I mean the study I underwent in order to win the love of this lady!** এই রমণীর প্রেম পাবার জন্যে তিনি যে-সব করণ-কারণের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন, তাকেই তিনি বল্‌ছেন প্রেম। বেয়াত্রিচের সম্বন্ধে দান্তেরও এই একই উক্তি।

খেলার মাঠে

একলব্য

ফুটবল, টেনিস, ব্যাডমিণ্টন, বাস্কেটবল প্রভৃতি খেলাধুলার মধ্য দিয়ে গত সপ্তাহে কলিকাতার ক্রীড়ামোদীদের সময় বেশ ভাল-ভাবেই কেটেছে। কলকাতা হ'চ্ছে ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের বারোয়ারীতলা। গত সপ্তাহে ক্যালকাটা মাঠে অনুষ্ঠিত হয়েছে সুইডিস টীমের প্রদর্শনী ফুটবল খেলা, ইডেন উদ্যানে বেঙ্গল লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানশিপ, ময়দানের

সুইডিস গোলকিপার কেজেলকে সত্তারের সট আটকাবার জন্য ব্যর্থ চেষ্টা করতে দেখা যাচ্ছে

অপর প্রান্ত মশগুল ছিল জাতীয় বাস্কেট-বলের পঞ্চম অনুষ্ঠান নিয়ে,—শোভাবাজারে শেষ হয়েছে পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন। ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে টেবিল টেনিস যাদুকর ভিক্টর বার্নার প্রদর্শনী খেলা আর আলীপুরে 'এয়ার্সট্রিপে' মোটর স্পোর্টসের পাক্ষিক অনুষ্ঠানের আকর্ষণও কম ছিল না। বিহারের ক্রিকেট টীম রনজি প্রতিযোগিতার খেলায় যোগ দেবার জন্য আসাম যাবার পথে কলকাতায় একদিনব্যাপী এক ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করে গেছে। বারো মাসের তেরো পার্বণের মত কলকাতার খেলার মাঠে পাল-পার্বণ লেগেই আছে। এর মধ্যে অবশ্য বড় মাঠের বড় খেলার হিসেব ধরা হয়নি। কারণ সেটা নিছক খেলা নয়। ঘোড়দৌড় স্পোর্টসের অঙ্গীভূত হলে সেখানে ভাগ্যের খেলা, টাকার খেলা,—রাজার ফকির হবার এবং ফকিরের রাজা হবার খেলা। খেলার মাঠের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা ক্রীড়ানৈপুণ্যের চারু সুষমা সেখানে কিছু নেই। হ্যাঁ, তবে ঘোড়ার যে খেলার মধ্যে সত্যই ক্রীড়ানৈপুণ্যের দিকটা নিহিত আছে সেই পোলো খেলাও আরম্ভ হচ্ছে এই সপ্তাহে। কলকাতার খেলাধুলার এ সপ্তাহের বড় আকর্ষণ হচ্ছে এশিয়ান কোয়াড্রাঙ্গুলার বা চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা। তা ছাড়া সামরিক বাহিনীর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা এবং গলফ্ খেলাও আরম্ভ হচ্ছে এ সপ্তাহে। চতুর্দলীয় ফুটবলে ভারত ব্রহ্মদেশ, পাকি-স্থান ও সিংহল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। 'ভারততীর্থ' কবিতায় বিশ্বকবি লিখে গেছেন—"হেথায় আর্য, হেথায় অনার্য, হেথায় দ্রাবিড় চীন; শক্ হুন দল, পাঠান মোগল এক দেহে হল লীন"। ভারতের অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে শুধু কলকাতার খেলার মাঠের দিকে তাকালেই কবির কথার যথার্থতা উপলব্ধি করা যায়।

* * *

সুইডেনের যে দলটি এবার কলকাতায় খেলে গেছে, এদের নাম আলমান্না ইদ্রটস্ ক্লাব। সংক্ষেপে এ আই কে। কলকাতায় এরা তিনটি খেলায় অংশ গ্রহণ করে তিনটি খেলাতেই জয়লাভ করে হাওয়াই পথে স্বদেশ অভিমুখে পাড়ি দিয়েছে। এ আই কে প্রথম দিন পরাজিত করে কলকাতার লীগ চ্যাম্পিয়ন ও শীল্ড বিজয়ী মোহনবাগান ক্লাবকে ৩—১ গোলে। পরের দিন নিখিল ভারত ফুটবল টীমকে একই ফলাফলে আলমান্না ক্লাবের কাছে হার স্বীকার করতে হয়। একদিন বিরতির পর আই এফ এ ও সুইডিস দলের খেলায় সুইডিস টীম ১—০ গোলে আই এফ এ-কে পরাজিত করে। তিনটি প্রদর্শনী খেলাতেই সুইডিস দল দর্শকমনে তাদের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের কিছুটা ছাপ রেখে গেছে। সুইডিস দলের খেলা দেখে অনেকে মন্তব্য করেছেন—যুদ্ধোত্তর ফুটবল ইতিহাসে বাইরের যতগুলি দল কলকাতায় খেলে গেছে তার মধ্যে এ আই কে সবচেয়ে শক্তিশালী। অনেকের আবার অভিমত, আলমান্না ক্লাবের চেয়ে ১৯৪৯ সালের সুইডেনের হেলসিংবর্গ ক্লাব বেশী শক্তিশালী ছিল। হেলসিংবর্গ টীমের সেণ্টার ব্যাক ও 'স্টপার' হেনরী এ্যাপলটপ্ট বা রাইট আউট মার্লে মর্টেনসনের মত কুশলী একজন খেলোয়াড়ও আলমান্না ক্লাবে নেই। ব্যক্তিগত

উড়ন্ত পিরীচের মত ছুটে এস শেঠকে সুইডিস দলের একটি অব্যর্থ গোল বাঁচাতে দেখা যাচ্ছে

জাতীয় বাস্কেটবল উদ্বোধন উৎসবে শঙ্খধ্বনির দৃশ্য

ক্রীড়াকুশলতায় আলমান্না ক্লাবের কোন খেলোয়াড় দর্শকদের মনোহরণ করতে পারেননি সত্য, কিন্তু এ আই কের দলগত সংহতি এবং পুরোভাগের অনবদ্য ক্রীড়া-নৈপুণ্য প্রশংসার দাবী রাখে, এ বিষয়েও কোন দ্বিমত নেই। তবে একই সময়ে দু'টি দলের খেলা না দেখলে বলা শক্ত কোন্ দলটি বেশী শক্তিশালী। তাছাড়া দু'টি দলের শক্তির তুলনামূলক বিচার করতে হলে একটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে। ১৯৪৯ সালে হেলসিংবর্গ দলের সঙ্গে আমরা খেলেছি খালি পায়ে। ইউরোপীয় ফুটবলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছি ভারতীয় ফুটবলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য নিয়ে। আর এখন খেলতে হচ্ছে বুট পরে। কাঁঠালের আমসত্ত্বের মত। আমের গন্ধ নেই অথচ আমসত্ত্ব। তার সঙ্গে লেগে রয়েছে শুকনো কাঁঠালের ছারপোকার গন্ধ। আমাদের খেলার মধ্যেও তেমনি আছে ভারতীয় ক্রীড়াধারা অথচ পায়ে রয়েছে বুটের বন্ধন। খালি পায়ের চাতুর্য ও গতিবেগ হারাতে বসেছি, বুটেও রপ্ত হইনি। অবশ্য সুইডিস টীমের সঙ্গে বুট পরেই খেলতে হবে এমন কোন বাধ্যবাধকতা ছিল না। তবুও লজ্জায়ই হোক বা অভ্যাসের জন্যই হোক অধিকাংশই খেলেছেন বুট পরে, মাত্র দু' একজন খেলোয়াড়কে খালি পায়ে খেলতে দেখা গেছে। তাই তখনকার খেলার বিচারে এখনকার খেলার বিচার করা ঠিক নয়। আর একটি কথাও মনে রাখা প্রয়োজন, একটানা বহুদিন ফুটবল খেলে খেলে আমাদের খেলোয়াড়রা এখন শ্রান্ত ক্লান্ত। তবে আলমান্না ক্লাবের খেলা খুবই সংহতি-পূর্ণ একথা অস্বীকার করলে চলবে না। ভারতীয় ফুটবলের সঙ্গে এদের ফুটবলের পার্থক্য—এক দলের খেলায় বহু আয়াসসাধ্য সুপরিকল্পিত ক্রীড়াধারার পরিচয় পাওয়া গেছে, অপর পক্ষ উদ্দেশ্যবিহীন ক্রীড়া-পদ্ধতি এবং স্বার্থদুষ্ট ফুটবলের অবতারণা করেছে। হেলসিংবর্গ ও গোটেবর্গ ক্লাবের মত এ আই কে-ও তিন-ব্যাক প্রথায় খেলতে অভ্যস্থ। ঘাসের উপর বল রেখে এবং অল্প দূরত্বে বল নেওয়া-দেওয়া করে এরা আক্রমণ রচনা করে। আক্রমণের মুখে খেলোয়াড়রা প্রতিনিয়িত পরস্পর স্থান পরিবর্তন করতে খুবই পটু। বল হেড করবার কৌশলও সুন্দর। সমস্ত খেলোয়াড়ই সু-স্বাস্থ্যের অধিকারী। ফুটবল মরদের খেলা। সু-স্বাস্থ্য ফুটবল খেলার পরম সম্পদ। সেই দিক দিয়ে ইউরোপের সকল টীমই সম্পদশালী। টাচ লাইনের কাছে এ আই কের খেলোয়াড়দের বল আদান-প্রদানের কৌশল দর্শকদের খুবই আনন্দ দিয়েছে। বল নিয়ে অহেতুক কালক্ষেপ নেই। অযথা ফাউল করবার বা বাইরে বল মারবারও চেষ্টা নেই। আলমান্না ক্লাবের খেলার প্রধান ত্রুটি গোলের মুখ থেকে যথাযথভাবে সট করবার ব্যর্থতা। অন্য স্থানের খেলার সঙ্গে এখানেই সঙ্গতির অভাব। গোলে সট করতে এরা মোটেই পটু নয়। মধ্য বিভাগও আক্রমণ বিভাগের তুলনায় দুর্বল। এ আই কের যে ধরনের খেলা গোলে ঠিকভাবে সট করতে পারলে এরা শেষ প্রদর্শনী খেলায় আই এফ এর বিরুদ্ধে বহু গোলে জয়লাভ করতে পারত। অবশ্য আই এফ এর তরুণ গোলরক্ষক এস শেঠ এইদিন অদ্ভুত ভাল খেলেন। প্রধানত শেঠ এবং অধিনায়ক এস মান্নার দৃঢ়তার জন্যই শেষ দিন আই এফ এর বিরুদ্ধে একটির বেশী গোল হয়নি। এ আই কের যে ধরনের খেলা এই ধরনের খেলার সঙ্গে আমরা আগেও পরিচিত হয়েছি। আর একবার পরিচিত হবার সুযোগ পাওয়া গেল। কিন্তু এই ধরনের প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থায় আমাদের দেশের ফুটবলের কতটুকু উন্নতি হবে সেইটাই ভাববার বিষয়।

* * *

সুইডিস টীমের প্রদর্শনী খেলার ব্যবস্থা করে কলকাতার দর্শকদের কাছে কিছু নূতন ধরনের ফুটবল পরিবেশন করেছেন বলে আই এফ এর কর্তৃপক্ষ গর্ববোধ করতে পারেন। কিন্তু এই ধরনের খেলার ব্যবস্থা করে ভারতের জাতীয় অর্থের অপচয় করা হচ্ছে সে দিকে আই এফ এ কর্তৃপক্ষের খেয়াল আছে কি? এ আই কের তিনটি প্রদর্শনী খেলা থেকে প্রায় আধ লাখ টাকা সংগৃহীত হয়েছে। খরচ খরচা বাদে এই টাকার অর্ধেক পকেটস্থ করে সুইডিস দল স্বদেশে পাড়ি দিয়েছে। ভারতের কোষাগার থেকে এই যে টাকাটা বিদেশে চলে গেল এটা কি জাতীয় অর্থের অপচয় নয়? কোনো ভারতীয়কে বিদেশে অর্থ খরচ করতে হলে উপযুক্ত কারণ দেখিয়ে অনুমতি নিতে হয়। আর বিদেশ থেকে একটি কানা কড়ি আনবার বেলায়ও ভারতীয়ের হাত-পা বাঁধা। একমাত্র পুণ্য ছাড়া পরলোকে যাবার সময় আর কিছু যেমন সঙ্গে যায় না, বিদেশ থেকে ভারতে আসবার সময়ও তেমনি সুনাম বা দুর্নাম ছাড়া আর কিছু ভারতীয়ের সঙ্গে আসে না। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের রাশিয়া সফর থেকে এর প্রমাণ পাওয়া গেছে। বুখারেস্টে বিশ্ব-যুব উৎসবের ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব গতবার রাশিয়া সফর করে। রাশিয়ায় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আশানুরূপ না খেলতে পারলেও ভারতীয় ফুটবল নৈপুণ্য দেখবার জন্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতি খেলায় বিপুল জনসমাগম হয়। সোভিয়েট রাশিয়ায় ফুটবল খুবই জনপ্রিয়। খেলা থেকে সংগৃহীত অর্থের কিছু অংশ আনতে পারলেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বহু অর্থ নিয়ে আসতে পারতো, কিন্তু সেই দেশের কিছু জিনিসপত্র ছাড়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাব একটি কানাকড়িও সঙ্গে আনতে পারেনি। সত্যি মিথ্যে জানি না পরে নাকি রাশিয়া থেকে ইস্টবেঙ্গলের কাছে কিছু টাকা এসেছে। যাই হোক, বিদেশ থেকে টাকা অর্থাৎ 'হার্ড মানি' আনবার এত কড়াকড়ি আর ভারতের বেলায় এর ব্যতিক্রম। যে যা পার নিয়ে যাও।

আলমান্না ক্লাব কলকাতা থেকে যে অর্থ উপার্জন করে নিয়ে গেল এর আয়কর দিয়েছে কি না জানি না। কিন্তু এই ধরনের অর্থোপার্জন যে আয়কর আইনের আওতায় পড়ে একথা আই এফ এ কর্তৃপক্ষের অজানা নেই। ইতিপূর্বে একটি ভ্রমণকারী দল আয়কর ফাঁকি দিয়েছিল বলে আই এফ এ সম্পাদককে আয়কর বিভাগের কাছে জবাব দিহি করতে হয়েছিল। সাদা কাগজের উপ

কালো অক্ষরের জবাবদিহিতে আয়কর বিভাগ এবারও কি আই এফ একে রেহাই দেবেন?

* * *

গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে সুইডিস খেলোয়াড়দের আপ্যায়ন সভায় চায়ের পেয়ালায় চুমুক দিয়ে আই এফ এ, তথা ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত সুইডিস খেলোয়াড়দের প্রশস্তির পর উপস্থিত সাংবাদিকদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়ে বললেন—"ভারতের কোন টীমের সঙ্গে একাধিক কর্মকর্তা বিদেশ সফর করলে তোমরা সব বিরুদ্ধ সমালোচনা কর, কিন্তু দেখ আলমাগ্রা ক্লাব তাদের সঙ্গে ৬ জন কর্মকর্তা এনেছে। শ্রী গুপ্ত নিজেও সাংবাদিক। বিদেশী একটি দলের কাছে ভারতীয় সাংবাদিকদের বেয়াদপি (?) জাহির করতে তার শালীনতায় বাধল না; কিন্তু শালীনতায় বেধেছে বলেই কোন সাংবাদিক গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলের চা-সভায় শ্রী গুপ্তর অভিযোগের উত্তর দিতে পারেন নি।

সুইডেন থেকে যে দলটি এসেছে এটি সুইডেনের কোন জাতীয় দল নয়। একটি ক্লাব মাত্র। তারা এসেছে সার্কাস পার্টির মতই অর্থ উপার্জন করতে। অর্থ উপার্জন করে নিয়েও গেছে তারা। আয়ের প্রশ্ন না থাকলেও কোন ক্লাববিশেষের সফরে কর্মকর্তার কমবেশীতে কারো কিছু যায় আসে না। কিন্তু কোন জাতীয় দলে প্রয়োজনাতিরিক্ত কর্মকর্তা নির্বাচিত হলে সব দেশেই বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়ে থাকে। ক্রীড়াক্ষেত্রের অন্যতম পরিচালক ও প্রবীণ সাংবাদিক শ্রী গুপ্তের কি এ তথ্য জানা নেই? অলিম্পিক বা ওই জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে ভারতের বিভিন্ন টীমে তারা যে সব পাত্র-মিত্র আত্মীয়-কুটুম্বকে কর্মকর্তা হিসাবে নিয়োগ করে থাকেন বর্তমানে ভারতের ক্রীড়া পরিচালনাভার সেই সুখী পরিবারেরই করতলগত। এখানে যোগ্যতা অযোগ্যতার প্রশ্ন নেই। আরও একটি কথা। সুইডেনের আলমাগ্রা ক্লাবের সঙ্গে যে সকল কর্মকর্তা এসেছিলেন তাঁদের অতীত জীবন খেলোয়াড়ের মহিমায় মহিমান্বিত। বহুবার আন্তর্জাতিক খেলায় নিজ দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। খেলার মাঠের পাঠের 'এ' থেকে 'জেড' পর্যন্ত তাঁদের শেষ করা আছে। কিন্তু আমাদের দেশের জাতীয় দলে যাঁরা কর্মকর্তা নির্বাচিত হন তাঁদের মাঠের পাঠ আরম্ভ করাতে হলে 'অ' 'আ' থেকে আরম্ভ করাতে হয়। আশা করি, শ্রী গুপ্ত এবার বুঝতে পারবেন ভারতীয় দলে একাধিক অযোগ্য কর্মকর্তা নির্বাচিত হলে সংবাদপত্রে কেন বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'য়ে থাকে।

* * *

কলকাতায় জাতীয় বাস্কেটবলের পঞ্চম অনুষ্ঠান বাঙলার বাস্কেটবল ইতিহাসের এক স্মরণীয় ঘটনা, এ কথা পূর্বে সংখ্যায় উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত জাতীয় বাস্কেটবলের পাঁচদিনব্যাপী অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে কলকাতা ময়দানের নবনির্মিত মাঠে যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গেছে এ দেশের বাস্কেটবল খেলার ইতিহাসে তা অভূতপূর্ব। ভারতের জাতীয় খেলাধুলার সঙ্গেই এতদিন জাতীয় বাস্কেটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান হয়ে এসেছে, কিন্তু একই সঙ্গে সমস্ত রকমের জাতীয় প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা সুশৃঙ্খল পরিচালনার পরিপন্থী বিবেচিত হওয়ায় বাস্কেটবল, ভলিবল প্রভৃতি প্রতিযোগিতা পৃথক পৃথকভাবে পরিচালনের ব্যবস্থা করা হয়। সুভাষ দ্বীপ ছাড়া জাতীয় বাস্কেটবলে এবার ১৩টি রাজ্য যোগ দিয়েছিল। এর মধ্যে চারটি রাজ্য মহিলা বিভাগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। গত দু'বছরের চ্যাম্পিয়ন মহীশূর রাজ্য এবারও ফাইন্যালে সার্ভিস টীমকে হারিয়ে উপর্যুপরি তিন বছর চ্যাম্পিয়নশিপ লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছে। মহিলা বিভাগেও গতবারের বিজয়ী বাঙলার চ্যাম্পিয়নশিপ অক্ষুণ্ণ আছে। বাঙলার উইমেনস বাস্কেটবল এসোসিয়েশনের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে জাতীয় প্রতিযোগিতারও আয়োজন করা হয়। ক্যালকাটা ওয়েস্ট ক্লাব ওয়ান্ডারার্স ক্লাবকে ফাইন্যালে হারিয়ে জুবিলি ট্রফি লাভ করেছে।

বঙ্গের ভিতরে বাহিরের বাঙালী—কলকাতায় জাতীয় বাস্কেটবলে উত্তর প্রদেশের মহিলা টীম। উত্তর প্রদেশ থেকে এলেও একজন ছাড়া এ'রা সবাই বাঙালী

১৯৫৪ সালের বাঙলায় টেনিস চ্যাম্পিয়ন নরেশ কুমারের বল মারবার ভঙ্গী

* * *

জাতীয় বাস্কেটবলের পঞ্চম অনুষ্ঠানকে বর্ণাঢ্য সুষমায় আকর্ষণীয় করতে ওয়েস্ট বেঙ্গল বাস্কেটবল এসোসিয়েশন যথেষ্ট চেষ্টা করেছেন। ময়দানের নূতন মাঠটিকে আলোকমালায় সজ্জিত করে তাঁরা সুন্দর করে তুলেছিলেন। ৮ই ডিসেম্বর সন্ধ্যার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জি যখন নানা বর্ণের পতাকাবাহী দলগুলির 'মার্চ পাস্টে' অভিবাদন গ্রহণ করছিলেন, তখন তোপধ্বনির আতসবাজীর মধ্যে যোগদানকারী রাজ্যগুলির নাম আকাশের বুকে ফুটে ওঠে—পেপসু, পাঞ্জাব, ত্রিবাঙ্কুর-

জাতীয় বাস্কেটবলে সুভাষ দ্বীপ (আনন্দামান) ও রাজপুতানার খেলার একটি দৃশ্য

কোচিন, মাদ্রাজ, বোম্বাই, দিল্লী, হায়দরাবাদ, মহীশূর, রাজপুতানা প্রভৃতি। লাল, নীল, সবুজ, মেরুন, সাদা, হলুদ বর্ণের বিচিত্র পতাকা একে একে রাজ্যপালকে আনত অভিবাদন জানিয়ে যায়। সমাপ্তি উৎসবেও আতসবাজীর মধ্যে যোগদানকারী দলগুলির 'নামের' খেলা দেখান হয়েছিল।

বাস্কেটবল আমাদের দেশের খেলা নয়। আমেরিকা থেকে এদেশে এসেছে। ওয়াই এম সি এ ভারতে এই খেলাটি প্রবর্তন করেছেন। অল্প জায়গার মধ্যে খেলা যায় এবং বেশী আনন্দ পাওয়া যায়, এই ধরনের খেলা আবিষ্কারের চেষ্টায় বাস্কেটবলের সৃষ্টি। যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটসে স্প্রিংফিল্ড ওয়াই এম সি এ কলেজের শারীর-শিক্ষা বিভাগের উপদেষ্টা ডাঃ জেমস নেস্মিথ ১৮৯১ সালে বাস্কেটবল খেলা আবিষ্কার করেন।

মাটি থেকে ১০ ফুট উঁচুতে দুখানি বোর্ডের সঙ্গে লাগানো থাকবে ১ ফুট ৬ ইঞ্চি ব্যাসের দুটি লোহার রিং। এই রিংয়ের মধ্য দিয়ে বল গলাতে পারাটাই খেলার বাহাদুরি। বলের আকার প্রায় ফুটবলের সমান। সামান্য একটু বড়ই হবে। বল নিয়ে ছুটোছুটি কর, নিজেদের মধ্যে দেওয়া নেওয়া কর, প্রতিপক্ষকে এড়িয়ে চল, তারপর সুযোগ বুঝে রিংয়ের মধ্য দিয়ে বল গলাও। তোমাকে বাধা দেবার জন্য প্রতিপক্ষে পাঁচজন খেলোয়াড়ের সদাজাগ্রত তৎপরতা। তবে সুবিধা এই, তুমি তাদের অবৈধ ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। শুধু বলকে বাধা দেবার বা বল ধরবার অধিকার আছে প্রতিপক্ষের। অবৈধভাবে তোমাকে ধরলেই তুমি ফ্রি থ্রো পাবে। ফ্রি থ্রোতে স্কোর করতে পারলে এক পয়েন্ট। খেলার সময়কার স্কোরে দুই। আবার থ্রো করবার সময় বাধা দেবার জন্য দুবার থ্রো করার সুযোগ পাওয়া যায়। খেলা সমাপ্তির ৩ মিনিট পূর্বে যে কোন ফাউলের জন্য দুটি থ্রো-র সুযোগ মেলে। খেলার নিয়ম-কানুনে খুবই কড়াকড়ি। আবার খেলোয়াড় বদলেরও সুযোগ রয়েছে। প্রতি দলে থাকে ৫ জন করে খেলোয়াড়। মহিলা দলে ৬ জন; এঁদের আবার আক্রমণ ও রক্ষণ বিভাগ রয়েছে। কিন্তু পুরুষদের আক্রমণ রক্ষণ বিভাগের মধ্যে কোন রেখা টানা নেই। যত্র-তত্র গতি। যে কোন সময় পরিশ্রান্ত খেলোয়াড় পরিবর্তনের সুযোগ রয়েছে। তাই পাঁচজন করে দল গঠন করা হলেও একসঙ্গে ১০।১২ জন খেলোয়াড় এই খেলা থেকে আনন্দ পেতে পারে। বাস্কেটবল খেলার এই হচ্ছে সংক্ষিপ্ত নিয়ম। এ খেলার মধ্যে নৈপুণ্য দেখাবার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। দৈহিক সামর্থ্য, গতিবেগ, স্থির লক্ষ্য, সুযোগসন্ধানী হওয়া, পারস্পরিক সমন্বয় সব কিছুরই প্রয়োজন বাস্কেটবল খেলায়। ডাঃ নেস্মিথের আবিষ্কারের পর অনেকদিন পর্যন্ত খেলাটি আমেরিকায় সীমাবদ্ধ থাকলেও ক্রমে সারা বিশ্বে এই খেলাটির আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। ১৯৩৬ সালে বার্লিন অলিম্পিকে বাস্কেটবল অলিম্পিক খেলাধুলার অন্তর্ভুক্ত হয়। আন্তর্জাতিক বাস্কেটবল এসোসিয়েশন সৃষ্টি হয়েছে ১৯৩২ সালে।

* * *

কলকাতায় জাতীয় বাস্কেটবলের পঞ্চম অধিবেশনে চ্যাম্পিয়ন মহীশূর, রানার্স সার্ভিসেস প্রভৃতি টীমের খেলায় যথেষ্ট নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। বাঙলার মহিলা টীমও উন্নত ক্রীড়াকুশলতার পরিচয় দিয়েছেন। বাঙলার মহিলা টীম অর্থে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান টীমকেই বুঝায়। বাঙলার অধিবাসিনী বলে ব্যাপক অর্থে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ানরা বাঙালীর মর্যাদা দাবী করলেও এদেরকে সত্যিকারের বাঙালী বলে ধরা যায় না। সে দিক দিয়ে বাঙলা দেশকে লজ্জা দিয়েছে উত্তর প্রদেশের মহিলা টীম। বাঙলার মহিলা দলে যেমন একটিও সত্যিকারের বাঙালী মেয়ে দেখা যায়নি, তেমনি উত্তর প্রদেশের মহিলা টীমেও দেখা যায়নি একাধিক উত্তর প্রদেশীয়াকে। ওই দেশের ক্রিশ্চিয়ান সমাজের এডিলেড পল ছিলেন উত্তর প্রদেশের অধিনায়িকা, তাছাড়া দলের আর সব খেলোয়াড়, ম্যানেজার, 'কোচ' ছিলেন বাঙালী। উত্তর প্রদেশের একটি মেয়ে খেলতে যাবার সময় সাংবাদিকদের ঠাট্টা করে বলে গেল,'আমরা ইউ পি থেকে এলাম, দলে একজন ছাড়া অবাঙালী নেই, আর আপনারা বাঙলা টীমে একজন বাঙালীকে খেলাতে পারলেন না।" সাংবাদিকদের মাথা হেঁট হয়ে গেল। যাই হোক, উত্তর প্রদেশ ও বাঙলার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খেলা হল বাঙলা দলের সঙ্গে বাঙালী দলের। বাঙলার চট্পটে এ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মেয়েদের সঙ্গে উত্তর প্রদেশের মেয়েরা অবশ্য পেরে উঠছিল না। তবে উ

দেশের টীমও বেশ শক্তিশালী ছিল। তারা ম্ব চাইছিল—'রেণু দি বল দাও', 'মীনাক্ষী মাকে দে'। আর বাঙ্গলা দলের মেয়েরা লার সময় বলছিল—'কাম অন ডালসী', গভ মী ভ্যাণ্ডা' ইত্যাদি বলে। স্বাভাবিক-াবেই বাঙ্গালী সমর্থকদের সহানুভূতি য়ে পড়ে উত্তর প্রদেশ দলের উপর। কিন্তু ত্তর প্রদেশ দল খেলায় জিততে পারেনি। ঙ্গলার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে বাধ্য য়েছে।

* * *

উত্তর প্রদেশের বাঙ্গালী মেয়েদের খেলা-লায় পারদর্শিনী হবার একটু সংক্ষিপ্ত তিহাস আছে। বাস্কেটবল টীমেরই চারজন লোয়াড় ভারতের মহিলা ভলিবল টীম সঙ্গে ইতিপূর্বে মস্কো সফর করে এসেছে। লাহাবাদের জগত্তারণ কলেজকে কেন্দ্র করেই ত্তর প্রদেশের মহিলাদের মধ্যে খেলাধূলার সার। কলেজের অধ্যক্ষা সুরভি সিংহ জেও বাল্যজীবনে রেঙ্গুনে থাকা অবস্থায় লাধূলা করেছেন। খেলাধূলায় তাঁর এত নোক যে, পরীক্ষার মুখে তিনি নিজে স্কেটবল টীম নিয়ে বাঙ্গলায় আসেন। গত্তারণ কলেজে এক ঘণ্টা করে বাধ্যতা-লকভাবে খেলাধূলোর চর্চা করবার রীতি ছে। শ্রীযুক্তা সিংহ বলেন, এতে পড়াশুনার কোন ক্ষতি হয় না। বরং স্বাস্থ্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে পড়ার প্রতিও আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। উত্তর দেশের মেয়েরা ভলিবল, বাস্কেটবল, কপাটি, থলেটিক স্পোর্টস প্রভৃতি সকল বিষয়েই চা করে থাকে। পড়াশুনা, গান-বাজনা এবং ভিনয়েও তাদের খ্যাতি আছে। বাস্কেটবল মে যে সব মহিলা এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ণু শিমলাই জগত্তারণ কলেজের ইংরেজীর ধ্যাপিকা। ভলিবল টীমের সঙ্গে ইনি মস্কো ফর করেছেন। মীনাক্ষী চৌধুরী ফিল-ফিতে এম এ ক্লাসের ছাত্রী, ইউ পি এ্যাথ-লেটিক স্পোর্টসের মহিলা চ্যাম্পিয়ন। ইনিও স্কো গিয়েছিলেন। মস্কো টীমের অপর ভা শুক্লা রায়ও এম এ পড়েন, দীর্ঘ লম্ফে র ইউ পির রেকর্ড আছে। দ্বারিকাপ্রসাদ লেজের শরীরচর্চার ট্রেনার নির্মলা মুখার্জিও স্কো সফর করেছেন, বাস্কেটবল টীমেরও লতমা খেলোয়াড় ছিলেন তিনি। যা চ্যাটার্জি বি এ পড়েন। এমনি স্কেটবল টীমের সব মেয়েই খেলা-লা আর লেখাপড়া এক সঙ্গে করে কেন। খেলাধূলা লেখাপড়ার অগ্রগতি হত করে বলে যাদের ভুল ধারণা আছে, ত্তর প্রদেশের বাঙ্গালী মেয়েদের দৃষ্টান্ত দের ভুল ভাঙতে সাহায্য করবে সন্দেহ ই। উত্তর প্রদেশে বাঙ্গালী মেয়েদের লাধূলায় পারদর্শিনী হবার আরও কারণ ছে। এখানে বাঙ্গালী সংখ্যালঘু। সমাজ-ন নেই, লোকনিন্দার ভয় নেই, সর্বত্র গতাগতি, তাই শাড়ীর বদলে স্কার্ট পরে মাঠে খেলাধূলা করতেও তাদের কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ জাগে না।

এশিয়ান গেমের পিস্তল চ্যাম্পিয়ন মিস মেরী রাইটকে ভেনেজুলায় বিশ্ব সুটিং প্রতিযোগিতায় পিস্তল ছুঁড়তে দেখা যাচ্ছে। মিস মেরী রাইট ফিলিপাইনের অধিবাসিনী। পিয়ানো বাজনায়ও তাঁর নিপুণ হাত

খেলাধূলোর অপরাপর খবর

বেঙ্গল লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ—বেঙ্গল লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল খেলায় নরেশ কুমার ৬—২, ১—৬ ও ৬—০ গেমে সুমন্ত মিশ্রকে পরাজিত করেছেন। মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন মিস রিতা ড্যাভার ৬—৩ ও ৬—০ গেমে মিস উডব্রিজকে হারিয়ে দিয়ে।

পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন—পূর্ব ভারত ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় জি হেমাডি বাঙ্গলার চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াড় মনোজ গুহকে ১০—১৫, ১৫—১১ ও ১৫—৩ পয়েণ্টে পরাজিত করেছেন।

ডি সি এম ফুটবল—দিল্লী ক্লথ মিল ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় কলকাতার জিওলজিক্যাল সার্ভে টীম ১—০ গোলে হায়দরাবাদ ফুটবল এসোসিয়েশনকে হারিয়ে দিয়ে সুদৃশ্য ট্রফি লাভ করেছে।

রণজি প্রতিযোগিতা—রণজি প্রতি-যোগিতার পূর্বাঞ্চলের খেলায় বিহার ৪৬ রানে আসামকে হারিয়ে দিয়ে পরবর্তী খেলায় বাঙ্গলা ও উড়িষ্যার খেলার বিজয়ীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই খেলায় বিহারের অধিনায়ক বি বসুর শত উইকেট পূর্ণের বিষয় উল্লেখযোগ্য। এই খেলার শেষে তিনি রণজি প্রতিযোগিতার খেলায় ১০০ উইকেট লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেন।

ইফতিকার আমেদের

ট্রিপল ক্রাউন—দিল্লী লন টেনিস চ্যাম্পিয়ানসিপের ফাইন্যালে পাকিস্থানের পয়লা নম্বর খেলোয়াড় ইফতিকার আমেদ তাঁর সহ খেলোয়াড় নাসিমকে হারিয়ে দিয়ে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন। ইফতিকার ও মিস্ পারভিন সেক মিক্সড ডাবল ফাইন্যালে পরাজিত করেন সুমন্ত মিশ্র ও মিস উমা বাসুদেবকে। ডাবলস ফাইন্যালে ইফতিকার ও প্রেমপান্ধী বিজয়ী হয়েছেন সুমন্ত মিশ্র ও প্রেম মেটার বিরুদ্ধে।

মহিলাদের সিংগলসে মিস উর্মিলা থাপর পাকিস্থানের এক নম্বর মহিলা খেলোয়াড় মিস পারভিন সেককে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ানসিপ লাভ করেছেন।

দেশী সংবাদ

৬ই ডিসেম্বর—আজ লোকসভায় প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহর, ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের এই প্রতিশ্রুতি দেন যে, সংশোধিত ব্যাঙ্ক রোয়েদাদ অনুযায়ী ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা এক বৎসরের জন্য বর্তমান হারে প্রদান করা হইবে বলিয়া সরকার যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন, কোনো ব্যাঙ্ক যদি তাহা কার্যকরী না করেন, তাহা হইলে ভারত সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

আজ দিল্লীর জেলা ও দায়রা জজ শ্রী এস বি কপুর দুর্নীতির অভিযোগে বাণিজ্য ও শিল্প দপ্তরের ভূতপূর্ব সেক্রেটারী শ্রী এস এ বেঙ্কটরামনকে ৬ মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

পুনর্বাসন দপ্তরের উপদেষ্টা শ্রীমেহের-চাঁদ খান্না কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার অন্যতম মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন।

৭ই ডিসেম্বর—ভারতের প্রধান নির্বাচন কমিশনার শ্রীসুকুমার সেন ঘোষণা করেন যে, আগামী ১১ই ফেব্রুয়ারী অন্ধ্র বিধান সভার সাধারণ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ আরম্ভ হইবে।

পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য নিযুক্ত হওয়ায় অদ্য উত্তর প্রদেশ আইন সভার কংগ্রেসী দলের কার্য-নির্বাহক সমিতি তাঁহার স্থলে দলের নেতৃত্ব পদে শ্রীসম্পূর্ণানন্দের নাম সুপারিশ করেন।

৮ই ডিসেম্বর—নিঃ ভাঃ ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির ধর্মঘট কমিটি প্রস্তাবিত সাধারণ ব্যাঙ্ক ধর্মঘট নিঃ ভাঃ ব্যাঙ্ক কর্মচারী সমিতির বিশেষ অধিবেশন না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখিবার সিদ্ধান্ত করেন।

আজ জামতাড়া মহকুমা পঞ্চায়েৎ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে পণ্ডিত বিনোদানন্দ ঝা পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের সীমানা সংক্রান্ত প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন যে, পশ্চিমবঙ্গের দাবী অসংগত ও অযৌক্তিক।

৯ই ডিসেম্বর—স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ডাঃ কে এন কাটজু আজ লোকসভায় নিবারক নিরোধ আইনের মেয়াদ আরও তিন বৎসর বর্ধিত করিবার প্রস্তাব করেন।

আজ বোম্বাইয়ে প্রায় দুই হাজার বয়ন-শিল্প শ্রমিকের এক শোভাযাত্রার উপর পুলিশ লাঠি চালনা করে এবং উহার ফলে পাঁচ ছয়জন লোক আহত হয়।

আজ সুপ্রীম কোর্টের ফুল বেঞ্চ শ্রী এইচ ভি কামাথের আপীল মঞ্জুর করেন এবং নাগপুর হাইকোর্ট ও নির্বাচনী ট্রাইব্যু-নালের নির্দেশ বাতিল করিয়া দিয়া কংগ্রেস প্রার্থী জনাব সৈয়দ আমেদের নির্বাচন অসিদ্ধ ঘোষণা করেন।

জনৈক সশস্ত্র পর্তুগীজ ইউরোপীয় সৈন্য একটি অটোমেটিক পিস্তল ও ২৪ রাউন্ড গুলী লইয়া দমন সীমান্তের নিকট ভারতীয় এলাকায় প্রবেশ করে। ভারতীয় পুলিশ তাহাকে গতকল্য গ্রেপ্তার করিয়াছে। আজ লোকসভায় এক সরকারী বিবৃতিতে এই ঘটনা জানা যায়।

১০ই ডিসেম্বর—সৌরাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ইউ এন ধেবর দুই বৎসরের জন্য ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পরবর্তী সভাপতিরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন বলিয়া ঘোষণা করা হইয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ কটকে এক লক্ষাধিক লোকের এক বিপুল জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনগণের প্রতি জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাইয়া বলেন, "বিশেষ-ভাবে এই আণবিক যুগে গিরি সদৃশ ঐক্য ব্যতীত আমরা বহুধা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িব এবং এমন কি, আমাদের স্বাধীনতাও বিপন্ন হইতে পারে।"

১১ই ডিসেম্বর—নাগপুর হইতে প্রায় একশত মাইল দূরে পরাশিয়ার খনি অঞ্চলে আকস্মিক প্লাবনের ফলে খনির মধ্যে আটক নিউটন-চিখালি কলিয়ারীর অন্তত ৬৫ জন শ্রমিকের সলিল-সমাধি ঘটিয়াছে বলিয়া আশংকা করা হইতেছে। গতকল্য মধ্যাহ্নে এই দুর্ঘটনা ঘটে।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রী নেহরু আজ সম্বলপুরে উৎকল প্রাদেশিক কংগ্রেস সম্মেলনের দুইদিনব্যাপী অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। এই উপলক্ষে তিনি পুনরায় কম্যুনিস্ট পার্টি ও সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান-গুলিতে তাহাদের হানিকর কার্যকলাপের জন্য তীব্র কশাঘাত করেন।

অনশনরত কলিকাতার পুলিশ বাহিনী পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট হইতে তাহাদের অভাব-অভিযোগ সম্পর্কে প্রতিকারের আশ্বাস পাওয়ায় আজ বিকালে অনশন ভঙ্গ করে। গতকল্য হইতে কলিকাতার পাঁচ হাজার সশস্ত্র পুলিশ, লালবাজার পুলিশ দপ্তরের রিজার্ভ ও ট্রাফিক কনস্টেবল এবং ড্রাইভার প্রভৃতি তাহাদের বেতন বৃদ্ধি, ঘর ভাড়া বাবদ ভাতা মঞ্জুর প্রভৃতির দাবীতে অনশন ধর্মঘট শুরু করিয়াছিল।

১২ই ডিসেম্বর--ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের প্রজা-সমাজতন্ত্রী মন্ত্রিসভাকে সাধারণ-ভাবে সমর্থন এবং উহার সহিত সহযোগিতার যে ব্যবস্থা গত নয়মাস যাবৎ চলিয়া আসিয়াছে, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন বিধান-সভার কংগ্রেস দল তাহা প্রত্যাহার করিবেন বলিয়া অদ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

অগ্নিযুগের বিপ্লবী বীর শ্রীকিরণচন্দ্র মুখার্জি আজ কলিকাতায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরলোকগমন করেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কলিকাতায় গ্র্যান্ড হোটেলে ইঞ্জিনিয়ার ও গৃহ নির্মাণবিদ্‌দের এক সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে ইঞ্জিনিয়ার এবং গৃহ নির্মাণ বিশেষজ্ঞদিগকে স্বল্পমূল্যে গৃহ নির্মাণ সমস্যার সমাধান করিবার জন্য যত্নবান হইতে আহ্বান জানান।

বিদেশী সংবাদ

৬ই ডিসেম্বর—আজ রাষ্ট্রপুঞ্জের বিশেষ রাজনৈতিক কমিটিতে ভারতীয় প্রতিনিধি শ্রীপুরুষোত্তম দাস ত্রিকমদাস এইরূপ অভিযোগ করেন যে, বর্ণবৈষম্য নীতির ফলে দক্ষিণ আফ্রিকা শুধু যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সন[illegible] অনুযায়ী দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হইয়াছে তাহা নহে, এমন একটি উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা সৃষ্টি করিয়া রাখিয়াছে যাহার কুফল সম[illegible] বিশ্বে পরিব্যাপ্ত হইবার আশঙ্কা।

৭ই ডিসেম্বর—মিশর সরকারের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হওয়ার অভিযোগে মুসলি[illegible] ভ্রাতৃত্ব সংস্থার ছয়জন সদস্যের ফাঁসি হই[illegible] গিয়াছে।

৮ই ডিসেম্বর—মিত্রশক্তিপুঞ্জের ১৫[illegible] রাষ্ট্র কোরিয়ায় আন্তর্জাতিক তত্ত্বাবধা[illegible] অবাধ নির্বাচন অনুষ্ঠানের যে দাবী করি[illegible] ছিলেন, অদ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের রাজনৈতি[illegible] কমিটিতে তৎসংক্রান্ত একটি প্রস্তাব ৫০— ভোটে গৃহীত হইয়াছে।

৯ই ডিসেম্বর—আজ জাপানের আ[illegible] সভায় মিঃ যোশিদার স্থলে মিঃ ইচি[illegible] হাতোয়ামা জাপানের প্রধানমন্ত্রী নির্বা[illegible] হন।

১০ই ডিসেম্বর—কম্যুনিস্ট চী[illegible] গুপ্তচর বৃত্তির অভিযোগে বন্দী ১১ [illegible] মার্কিন বৈমানিকের মুক্তির দাবী জানা[illegible] রাষ্ট্রপুঞ্জের সাধারণ পরিষদে যে প্রস্[illegible] উত্থাপন করা হইয়াছিল তাহা বি[illegible] ভোটাধিক্যে গৃহীত হইয়াছে।

চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই [illegible] মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সতর্ক করিয়া দিয়া ব[illegible] যে, ফরমোজা হইতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাহাদের সমুদয় সশস্ত্র বাহিনী সরাইয়া লয়, তাহা হইলে তাহাদিগকে সর্বপ্র[illegible] গুরুতর পরিণতির সম্মুখীন হইতে হই[illegible]

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
সংখ্যা ৮

শনিবার
৯ পৌষ, ১৩৬১

DESH SATURDAY, 25TH DECEMBER 1954

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

বড়দিনের বাণী

সুদীর্ঘ দেড় হাজার বৎসর অতীত হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বিশ্বে মানবসমাজের মনস্তাত্ত্বিক পরিবর্তন বিশেষ কিছু ঘটে নাই। মহামানব যীশুর আবির্ভাব অতীত স্মৃতিকে প্রতি বৎসর উজ্জ্বল করিয়া মানুষের হৃদয়ে জাগে, কিন্তু মানব-কল্যাণের মূর্ত-বিগ্রহ যীশুর—জীবনা-দর্শের আলোক তথাপি মানবসমাজকে পশু-প্রবৃত্তির সম্যক্ ঊর্ধ্বে উন্নীত করিতে সমর্থ হয় না। মানুষের মঙ্গলব্রতে যীশু ক্রুশ-কাষ্ঠে আত্মবলি দিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর পূর্বে ভারতেও তেমন ব্যাপার আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। আততায়ীর গুলীর আঘাতে মহাত্মা গান্ধীকে জীবনদান করিতে হইয়াছে। মানবসমাজের মর্মমূলে মহামানবগণের এই যে আত্মদান তবে কি একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে? তেমন কথা অবশ্যই বলা চলে না। বিশ্বের দিক্‌চক্রবালে হিংসা ও বিদ্বেষের কুটিল আবর্ত উত্থিত হইতেছে, আমরা ইহা প্রত্যক্ষ করিতেছি; কিন্তু এই আবর্তের বাহ্য আলোড়নের অন্তঃস্তলে নূতন মানুষ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিতেছে। সে চায় শান্তি, সে চাহে কল্যাণ। সে এই যে মানুষ, ইহার বেদনা বর্তমান প্রতিবেশে সর্বত্র পরিস্ফুট না হইলেও স্ফুটনোন্মুখ বৈপ্লবিক বীর্যে সেই চেতনা সর্বত্র সাড়া দিবার জন্য পথ খুঁজিতেছে। বস্তুত জগৎ বর্তমানে বিরাট পরিবর্তনের সন্ধিক্ষণে আসিয়া পড়িয়াছে। প্রভুত্ব-স্পর্ধী শক্তিবর্গের দর্প, দম্ভ, মদাভিমান এবং তাহাদের পশুশক্তির সামগ্রিক সন্দোমের অন্তালে ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিতেছে আর্ত, পীড়িত, বঞ্চিত মানুষের প্রাণের আগুন। এই আগুনের ব্যাপ্তি এবং স্ফূর্তিতে প্রলয়ংকর বিপর্যয় সংঘটিত করিবে, এই আশংকার কারণ সৃষ্টি হইয়াছে। নবজাগ্রত ভারতের অন্তরকে মানুষের এই বেদনা স্পর্শ করিয়াছে এবং ভারত তাহার রাষ্ট্রসাধনায় সেই বেদনাকে নব-সৃষ্টির পথে রূপ দিতে চাহিতেছে। বিশ্বব্যাপী দ্বন্দ্ব-সংঘাতের মধ্যে ভারত এই চেতনাকে সফল করিয়া তুলিয়া কিরূপ সমাজ-জীবনের বিভিন্ন সমস্যায় সমাধানে তাহার সামঞ্জস্য সাধন করিতে সমর্থ হইবে, ইহাই বিবেচ্য। মহামানব যীশুর আবির্ভাব-দিবসে এই কর্তব্যের গুরুত্ব আমরা উপলব্ধি করিতেছি। ভারতের সংস্কৃতি, সভ্যতা এবং বৈশিষ্ট্যীয় আদর্শ মানবতার উদার মহিমায় পরিস্ফুর্ত করিয়া তুলিবার সাধনায় যীশুর পুণ্য-জীবনের আমরা আজ অনুধ্যান করিতেছি। ফলত দুই হাজার বৎসরের কালগত ব্যবধান এবং বিবর্তন সত্ত্বেও প্রেমাবতার যীশুর জীবনাদর্শ পরিম্লান হয় নাই। আজ তাহা সনাতন সত্যস্বরূপে মানব-সমাজকে আকর্ষণ করিতেছে। হিংসা-বিদ্বেষে ব্যাকুলিত বিশ্বে শান্তি-প্রতিষ্ঠায় তাহা দীপ্ততর হইয়া উঠুক, এই প্রার্থনা।

ভারতে যুগোশ্লাভ রাষ্ট্রপতি—

যুগোশ্লাভিয়ার রাষ্ট্রপতি মার্শাল টিটোর ভারত পরিদর্শনের ফলে দেশের সর্বত্র উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। বাংলা দেশ এবং বাঙালী জাতির পক্ষ হইতে আমরা যুগোশ্লাভিয়ার এই বিপ্লবী বীর সন্তানকে আমাদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। স্বদেশের মুক্তিসাধনার অগ্নি-মন্ত্রে তিনি দীক্ষিত। এই ক্ষেত্রে অন্তরের যোগসূত্রে তাঁহার সঙ্গে আমরা আত্মীয়তার নিবিড় সম্পর্ক উপলব্ধি করি। মহাত্মা গান্ধীর আন্দোলনের সহিত যুগো-শ্লাভিয়ার জনসাধারণের সহানুভূতির কথা উল্লেখ করিয়া তিনি সেই সৌহার্দ্য ব্যক্ত করিয়াছেন। মার্শাল টিটো বিদেশীর কাছে নিজের দেশ এবং জাতীয় স্বাধীনতার মর্যাদাকে বলি দানে অস্বীকৃত হইয়া যে বীর্য এবং মনোবলের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। বস্তুত বাঙালী জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতি এবং বিশিষ্ট জাতীয়তাবোধের সঙ্গে তাঁহার আদর্শের এইখানে সামঞ্জস্য রহিয়াছে। মার্শাল টিটোর নেতৃত্বে যুগোশ্লাভিয়ার বীর সন্তানগণ সংকট-যাত্রার পথে বাহির হন। তাঁহারা হিটলারের দুর্জয় শক্তির সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া জাতির স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেন। মার্শাল স্ট্যালিনের প্রভুত্ববাদ অগ্রাহ্য করিয়া টিটো সেই স্বাধীনতাকে প্রদীপ্ত এবং সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। সামাজিক, রাজনীতিক এবং ভৌগোলিক ব্যবধান সত্ত্বেও স্বদেশের স্বাধীনতার মৌলিক আদর্শের ক্ষেত্রে আমাদের সঙ্গে তাঁহাদের অন্তরের যোগ রহিয়াছে। জাতির সামাজিক এবং রাজ-নীতিক আদর্শের বৈশিষ্ট্য অক্ষুণ্ন রাখিয়া মানব-সভ্যতাকে শান্তি ও সহযোগিতার পথে প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, ভারতের ন্যায় যুগোশ্লাভিয়াও এই আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়াছে। জগতের বিভিন্ন জাতিকে প্রভুত্ব-

পর শক্তিগোষ্ঠীর হাত হইতে মুক্ত করিবার জন্য উভয়ের নীতিও সমভাবে নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। উভয় দেশের লক্ষ্য ও আদর্শের এই ঐক্য দুই দেশ পারস্পরিক সহযোগিতায় প্রগতি ও সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করিবে, আমরা এই আশা অন্তরে পোষণ করিয়া স্বদেশের মুক্তি-সাধনার গৌরবময় ঐতিহ্যে অনুপ্রাণিত পশ্চিমবঙ্গ যুগোশ্লাভিয়ার এই বিপ্লবী বীরকে পুনরায় অন্তরের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছে।

পূর্বাঞ্চলের পুনর্বাসন

কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীযুত মেহেরচাঁদ খান্না কলিকাতায় তাঁহার দপ্তর প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। প্রত্যক্ষভাবে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ এবং নির্ধারণের দায়িত্ব তিনি নিজের হাতে লইয়াছেন। পূর্ব হইতেই এইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন ছিল। ইহাতে আমরা আশ্বস্ত হইয়াছি। পুনর্বাসন বিভাগের মন্ত্রিপদে উন্নীত হইয়া শ্রীযুক্ত খান্না পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির পুনর্বাসন সমস্যার স্বরূপ প্রধানমন্ত্রী নেহরুজীকে ব্যক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার নির্দেশ লইয়াই কলিকাতায় ফিরিয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে পূর্বাঞ্চলের পুনর্বাসনের সমস্যা ঠিক পশ্চিমাঞ্চলের অনুরূপ নয় বরং সেই স্থলের সমস্যা যে সমধিক জটিল, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ইহা উপলব্ধির প্রয়োজন ছিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এ সম্বন্ধে অনেকটা আগ্রহের অভাবই তাঁহাদের কাজে দেখাইয়াছেন। পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর বরাবরই আছে, আমরা একথা স্বীকার করি। তথাপি ইহাও বলিতে হয় যে, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে সন্তোষজনকভাবে অগ্রসর না হওয়ার দায়িত্ব উদ্বাস্তুদের উপর এবং কতকটা সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকারের উপর আরোপ করিবার চেষ্টা হইয়াছে। অথচ ইহাতে লাভ কিছুই নাই এবং সমস্যা এইভাবেও মিটে না, একথা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। ফলত উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব যেভাবে হোক্ শেষটা কেন্দ্রীয় সরকারের উপরই গিয়া পড়ে। এতদিনে কেন্দ্রীয় সরকারের এসম্বন্ধে সচেতন হইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গ ঘনবসতিপূর্ণ রাজ্য হওয়ায় জমির অভাব এখানে একান্ত শ্রীযুত খান্না এই দিক হইতে সমস্যার সমাধানে উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বনে উদ্যোগী হইবেন, আমরা ইহাই আশা করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের অসুবিধা দূর করিবার জন্য এই দিক হইতে এপর্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ হয় নাই। নিরাশ্রয় নরনারীর দলকে তাহাদের অনভ্যস্ত এবং অনেক স্থলে প্রতিকূল প্রতিবেশের মধ্যে চালান করিয়া দিয়াই কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের কর্তব্য শেষ করিয়াছেন। শ্রীযুত খান্না অতীতের এই ত্রুটির নিরাকরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, সুতরাং তাঁহার কর্তব্য পালনের সূচনা শুভই হইয়াছে। এই শুভ সূচনা সাফল্যমণ্ডিত হইয়া পরিণতি লাভ করুক, পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যার সুসমাধান হোক্, ইহাই কামনার বিষয়।

বিশ্বভারতী ও পণ্ডিত নেহরু

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবের সভাপতিস্বরূপে প্রদত্ত অভিভাষণ দেশে নূতন উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সঞ্চার করিবে। প্রকৃতপক্ষে বিশ্বভারতীর এদেশের পরাধীন অবস্থায় অবলম্বিত বৈদেশিক স্বার্থ-প্রভাবিত শিক্ষাপদ্ধতির অনুবর্তন নহে। প্রত্যুত পরাধীন ভারতের প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বিশ্বকবি এই প্রতিষ্ঠানের ভিতর দিয়া জাতির আত্মধর্ম উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার প্রাণময় অবদানে তিনি এই প্রতিষ্ঠানে শক্তি সঞ্চার করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর আদর্শে কবির অবদানের সেই বৈশিষ্ট্য উজ্জ্বল রাখিতে হইবে। ফলত সেই আদর্শ স্বাধীন ভারতের সংস্কৃতিকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিবার পক্ষে সহায়ক হইবে এবং সমগ্র জাতির অভ্যুন্নতির পথে নূতন আলোকসম্পাত করিবে। বর্তমান যুগ যন্ত্রবিজ্ঞানের যুগ। যন্ত্রবিজ্ঞানের উন্নতিতেই সভ্যতার পথে প্রগতি ঘটে, এইরূপ একটা মোহ আধুনিককালে দেখা দিয়াছে। যন্ত্রবিজ্ঞান মানুষের জীবনের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক, সুতরাং মানব-সমাজের উন্নতির পক্ষে ইহার প্রয়োজন অবশ্যই স্বীকার্য। ভারতের সংস্কৃতি এবং সভ্যতা সামাজিক জীবনের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যকে অস্বীকার করিয়াছে, এমন ধারণা ভুল। দুঃখের বিষয় এই যে, অস্ত্রোপচার-সম্ভার মানুষের সমাজ-জীবনের মানসিক সমুন্নতি এবং সমগ্রের কল্যাণেচ্ছাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে উদ্যত হইয়াছে। ইহার ফলে মানুষের মনন-ধর্ম ক্ষুণ্ণ হইয়া মানুষ পশুর জীবনে পরিণত হইতে চলিয়াছে। রবীন্দ্রনাথ এই বিপদ হইতে মানুষকে মুক্ত করিবার জন্য সাধনা করিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার তপস্যার প্রভাব বিশ্বভারতীকে প্রতিষ্ঠা দিয়াছে। বিশ্বভারতীতে কবির তপঃপ্রভাবে সমুজ্জ্বল সেই আদর্শ বিশ্ব-মানবসমাজকে উদ্দীপ্ত করিয়া তুলুক এবং মানুষ অমৃতের অধিকারী এই সত্যে উদ্বুদ্ধ হইয়া বিশ্বের সব জাতি ও সমাজ সর্ববিধ সংকীর্ণতা এবং ক্ষুদ্রতা হইতে মুক্তিলাভ করুক।

সভ্যতার নিরিখ

সর্দার পানিক্কর সুপণ্ডিত এবং মনীষী পুরুষ। রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সমস্যাসমূহের সম্বন্ধে তাঁহাদের অভিমত সর্বদা সুগভীর চিন্তাশীলতা উদ্রেক করে। সম্প্রতি যাদবপুর জাতীয় শিক্ষা পরিষদের সমাবর্তন উৎসব উপলক্ষে তাঁহার অভিভাষণও এই দিক হইতে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সর্দারজী তাঁহার এই অভিভাষণে প্রধানত যন্ত্রবিজ্ঞানের সহিত সভ্যতার সম্পর্কের সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি একথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন যে, যন্ত্রবিজ্ঞান সাধনার উন্নতিই সভ্যতার নিরিখ, ইহা মনে করা ভুল। সামাজিক প্রতিবেশে মানুষের পারস্পরিক সম্বন্ধ এবং সেই সম্বন্ধের ক্ষেত্রে সমগ্রভাবে জনগণের নৈতিক এবং মানসিক উৎকর্ষই প্রধানত সভ্যতার পরিচায়ক। প্রত্যুত, এই সম্বন্ধ যদি উপেক্ষিত এবং অবহেলিত হয়, তবে শুধু ব্যবহারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য কিংবা বিত্তোপপত্তিই কোন দেশ বা জাতির সভ্যতার পথে প্রগতি সূচনা করে না।

অন্য প্রেমিককে

জীবনানন্দ দাশ

মাছরাঙা চ'লে গেছে—আজ নয়, কবেকার কথা;
তারপর বারবার ফিরে এসে দৃশ্যে উজ্জ্বল।
দিতে চেয়ে মানুষের অবহেলা উপেক্ষায় হ'য়ে গেছে ক্ষয়;
বেদনা পেয়েছে তবু মানুষের নিজেরও হৃদয়
প্রকৃতির অনির্বচনীয় সব চিহ্ন থেকে দু' চোখ ফিরিয়ে;
বুদ্ধি আর লালসার সাধনাকে সব চেয়ে বড় ভেবে নিয়ে।

মাছরাঙা চ'লে গেছে—আজ নয়, কবেকার কথা;
তারপর বারবার ফিরে এসে ডানাপালকের উজ্জ্বলতা
ক্ষয় ক'রে তারপর হ'য়ে গেছে ক্ষয়।
মাছরাঙা মানুষের মতো সূর্য নয়?
কাজ ক'রে কথা ব'লে চিন্তা ক'রে চলেছে মানব;
যদিও সে শ্রেষ্ঠ চিন্তা সারাদিন চিন্তানাশা সাগরের জলে
ডুবে গিয়ে নিঃশব্দতা ছাড়া আর অন্য কিছু বলে?

অন্য এক প্রেমিককে

মাথার উপর দিয়ে কার্তিকের মেঘ ভেসে যায়;
দুই পা স্নিগ্ধ করে প্রান্তরের ঘাস;
উঁচু উঁচু গাছের অস্পষ্ট কথা কি যেন অন্তিম সূত্র নিয়ে,
বাকিটুকু অবিরল গাছের বাতাস।

চিলের ডানার থেকে ঠিকরিয়ে রোদ
চুমোর মতন চুপে মানুষের চোখে এসে পড়ে;
শত টুকরোর মতো ভেঙে সূর্য ক্রমে আরো স্থির—
স্থিরতর হতে চায় নদীর ভিতরে।

লাল নীল হলদে শাদা কমলা পালকের
মাছরাঙা চিহ্ন হ'য়ে চুপে উড়ে এসে
দুই অন্ধ সমুদ্রের মাঝখানে কতটুকু রৌদ্রবিন্দু আছে
দেখাতে চেয়েছে ভালোবেসে।

সমস্ত সন্দেহ থেকে হৃদয়কে সরিয়ে এবার
শান্ত স্থির পরিস্কার ক'রে
চেয়ে দেখি মাছরাঙা সূর্য নিভে গেছে;—
অন্য প্রেমিককে পাবে অন্য এক ভোরে।

ট্রামে-বাসে

পাক-আলেকগণ জনাব ফজলুল হক্‌কে করাচীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। —"হক্‌ সাহেবের না-আঁচানো পর্যন্ত নিমন্ত্রণটা আমরা কাজে

কাজেই বিশ্বাস করতে পারছিনে"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

অন্য এক অনুরূপ সংবাদে শুনিলাম, পাক - প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ আলি নাকি শ্রীযুক্ত নেহরুকেও করাচীতে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। সংবাদে একথাও শুনিলাম, নেহরুজী নাকি মার্চ-এপ্রিলের আগে এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে পারিবেন না। —"কিন্তু আমরা বলি ছাব্দ-গড়ানোর নিমন্ত্রণে না যাওয়াই বরং ভালো"—মন্তব্য করিল আমাদের শ্যামলাল।

* * *

ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটি ঢাকার নাম বদলাইয়া "জাহাঙ্গীর নগর" রাখিবেন বলিয়া স্থির করিয়াছেন।—"নিজের পাঁঠা কেউ লেজ দিয়ে জবাই করলে আমাদের কী-ই বা বলবার আছে। কিন্তু ঢাকাই পরেটাকে জাহাঙ্গীর নগরী পরেটা বলার দাবী জানালে যে আন্ত-র্জাতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হবে, সে সম্বন্ধে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিকে আগেই হুঁশিয়ার করে দিচ্ছি"—বলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

শ্রীযুক্ত জহরলাল তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, ভারত এশিয়ার অন্যান্য দেশের মধ্যে একটি অগ্রগামী দেশ। কিন্তু তার একটি Twin সমস্যা আছে, সে হলো তার দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব।—"অগ্রগমনের পক্ষে দেখছি হ্যান্ডিকেপ্‌টা সত্যিই একটু বেশি, দুটি দুটি যমজ ঘাড়ে নিয়ে লিড্‌ মেন্‌টেন্‌ করা সত্যিই একটু শক্ত"—বলিলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

জহরলালজী তাঁর অন্য এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন যে, তিনি বিদেশী প্যাটার্নের নকল মোটেই পছন্দ করেন না। —"আমরাও করিনে, কিন্তু কথা হচ্ছে প্যাটার্ন বাছতে বাছতে এদিকে শীতে হাড় কাঁপিয়ে তুলছে কিনা সেই হলো মুশকিল"—মন্তব্য করেন বিশুখুড়ো।

* * *

অর্থ মন্ত্রী শ্রীযুক্ত দেশমুখ সরকারী অর্থ তহবিল বৃদ্ধির জন্য দেশের সাধারণ লোকের নিকট

আবেদন জানাইয়াছেন। রাজা-মহারাজা, জমিদার এবং শিল্পপতিরা এখন প্রায় ফতুর হইয়া আসিয়াছেন, তাই ভরসা—"সাধারণ লোক"।—"অর্থ মন্ত্রী মশাই ঠিক্‌ কামধেনুটি চিনেছেন, এরা মুলতানী নয়, দিশি-গাই, খড় খোলের কোন বালাই নেই, এদিক ওদিক চরে এক মুঠো দুব্বোর পাতা মুখে দিতে পারুক চাই না পারুক, দুধ ঠিক দিয়ে যাবে।"

* * *

প্রসিদ্ধ হিন্দী লেখক ও চলচ্চিত্র সেন্সার বোর্ডের সদস্য অধ্যাপক দিনকার বলিয়াছেন যে, মানুষের আত্মাকে নীরব করিয়া শুধু তার রক্তমাংসকে উত্তেজিত করিয়া চিত্রনির্মাতাগণ অর্থ উপার্জন করিতেছেন।—"কিন্তু অধ্যাপক কি জানেন না যে, নায়মাত্মা অর্থহীনেন লভ্য"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

সংবাদদাতা জানাইতেছেন যে, ভূ-দান যজ্ঞে বিহার নাকি সকলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছেন। —"কিন্তু সীমানাদান যজ্ঞে বিহার সকলের পশ্চাতে থেকে অগ্র পশ্চাৎ দুই-ই রেখে দুধের বাটিটি হাতে রেখেছেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

ফাউন্টেন পেনের কালি শিল্প সম্বন্ধে সরকারী ঔদাসীন্যের কথা আমরা পাঠ করিলাম। হাসিখুশীর ছড়াটি একটু রকমফের করিয়া আবৃত্তি করিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী—"থালাভরা আছে মিঠাই, কলম আছে, কালি নাই!"

* * *

মার্শাল টিটো লালকেল্লায় একটি কাঠ বেড়ালীর ফটো নিতে দুই-দুইবার চেষ্টা করিয়াও কৃতকার্য হইতে পারেন নাই।—"কাঠবেড়ালীর রসজ্ঞানের তারিফ আমরা নিশ্চয়ই করব। মহাজ্ঞানী মহাজনদের আসরে সে নিজের ফটো দিতে রাজী হয়নি। কিন্তু মার্শালের ফটোর বিষয় নির্বাচনে আমরা তুষ্ট হতে পারিনি, চারদিকে V.I.P. থাকতেও তাঁর নজরে পড়লো কিনা শুধু একটি কাঠবেড়ালী!!

* * *

পুলিসের অনাহার ধর্মঘট কলিকাতার সাম্প্রতিক জোর খবর। —"ব্যাপারটা নিশ্চয়ই হাসি-তামাসার আওতায় পড়ে না। কিন্তু তবু ভাবছি

হঠাৎ যদি একদিন শুনি শ্রীযুক্ত বিধান রায় প্রমুখ মন্ত্রিবর্গ অনশন ধর্মঘটের সমাধানের জন্য নিজেরা হরিমটর করছেন, তাহলে পরিস্থিতিটা কেমন হয়"—বলিলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

পথচলতি উছল হাসিখুশীর মধ্যে যেন খেজুরকাঁটা ফুটল আচমকা। হঠাৎ খটকা লেগেছে। ফুলবাসিয়ার মনে। গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে। আতঙ্কে।

.....না না! তা কেন হতে যাবে!

নিজেকে আশ্বাস দিতে চায় সে; কিন্তু তবু মন মানে কই। মনে পড়লেই বুকের রক্ত হিম হয়ে আসে। বুকের ভিতরের ভারি ভারি ভাবটা আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ে সারা দেহকে বিকল করে দেয়। যতই ভুলতে চেষ্টা করুক, এই নাছোড়বান্দা চিন্তাটির হাত থেকে তার রেহাই নেই মুহূর্তের জন্য।

এই মন নিয়ে কি কাজ করতে পারা যায়! থাকগে সে আর কাজে যাবে না আজ। ঘরের কোণায় ধুলোর নীচে দুটি খেয়ে-ফেলে-দেওয়া সিগারেটের টুকরো। কবেকার যেন। রোজই হয়ত দেখে। আজ নজরে পড়তেই সারা শরীর রি রি করে উঠল। সে দুটোকে পা দিয়ে মাড়িয়ে, পিষে, বাইরে ফেলে দিয়েও কি শান্তি আছে!

গায়ে আঁচল টেনে দিয়ে সে গিয়ে বসল খেজুরপাতার চাটাইখানির উপর। দুজনে মিলে বুনেছিল তারা। সে আর মংলা। মংলাই শিখিয়ে দিয়েছিল। ফুলবাসিয়া জানত শুধু তালপাতার চাটাই বুনতে। মংলা বলে—ও চাটাই টেকে কম; তলা দিয়ে ঠাণ্ডা ওঠে। ফুলবাসিয়া দুষ্টুমি করে জবাব দেয়—হ'ক পুরু, হ'কগে গরম; খেজুরপাতার চাটাইতে শুলে আমার গা কুটকুট করে। তুই শুস খেজুরপাতার চাটাইয়ে, আমি শোব তালপাতার চাটাইতে।

বলে আর হাসে।

—ধেৎ!

প্রস্তাব মংলার অপছন্দ। সে ঠাট্টা বোঝে দেরীতে; অনেক সময় বোঝেও না।

—আচ্ছা বাপু, আর মুখ গোমড়া করতে হবে না। তোর কথাই থাকল। গোমড়ামুখ আমি দুচক্ষে দেখতে পারি না। দুজনের শোবার মত বড় করে চাটাই বোনা হবে।

এতক্ষণে মংলার মুখে হাসি ফোটে। অসীম উৎসাহের সঙ্গে সে বউকে খেজুরপাতার বুনন শেখাতে বসে। মুখে বলে বটে যে দুজনের শোবার মত চাটাই হবে। কিন্তু দুটি মনের অব্যক্ত সহযোগিতায় বোনা হয়েছিল তার চেয়েও আর একটু বড় করে। এত সন্তানের আকাঙ্ক্ষা তাদের।

এ সব কতদিনের কথা আর হবে। বছর তিন-চার হবে বোধ হয় আজ থেকে।......

এর বছর খানেক পরই তো মংলা চলে যায় রোজগার করতে দাড়িওলা কনট্রাক্টরের বিলাসপুরী কুলির দলের সঙ্গে। ওই যে যিনি বক্রা নদীর উপর পুল বাঁধবার সময় এসেছিলেন। মংলাকে নিরীহ ভালমানুষ দেখে তিনি তার উপর ভার দিয়েছিলেন জিনিসপত্র পাহারা দেবার। তারপর এখানকার কাজ শেষ হলে তিনি তাকে সঙ্গে যেতে বলেছিলেন। ফুলবাসিয়াকে ছেড়ে যেতে মন চায়নি; তবু মংলা রাজী হয়ে গিয়েছিল। এখানে তার রোজগার কম। মিস্ত্রীপাড়ার

সকলেই ছেলেবেলায় রাজমিস্ত্রীদের সঙ্গে জন-মজুরের কাজ করে; তারপর ধাপে ধাপে আগিয়ে একদিন কর্নিক হাতে নিয়ে বার হয় পাকা রাজমিস্ত্রী হয়ে। মংলা কিন্তু পারল না। চটপটে নয় লোকটা; হাত যেন চলতেই চায় না। হাতের সূক্ষ্ম কেরামতির দৌড় ওই চাটাই বোনা পর্যন্তই। ফুলবাসিয়ার কি ইচ্ছা করত না যে তার স্বামী বড় রাজমিস্ত্রী হ'ক; পুরো মজুরির উপরও শাগরেদদের কাছ থেকে মাথাপিছু দস্তুরি পাক; পাড়ার সবাই তাকে মিস্ত্রীবউ বলে ডাকুক? খেজুরপাতার চাটাইয়ের বদলে দড়ির

খাটিয়া কে না চায়? তাই মংলা যখন বিদেশে রোজগার করতে যেতে চাইল তখন সে বিশেষ আপত্তি করেনি।

"বুঝলি ফুলবাসিয়া, নাচালি মিস্ত্রী টাকার গরমে বড় লম্বা লম্বা কথা বলে। আমিও দেখবি একশ টাকা জমিয়ে ফিরব। তুই ততদিন নিজের মত নিজে চালিয়ে নিবি;—একটা মাত্র তো পেট!"

একটি মাত্র তো পেট! মংলা কিছু ভেবে বলেনি; তবু ওই শেষের কথাটি শুনেই একটু কিন্তু কিন্তু ভাবের ছায়া পড়েছিল ফুলবাসিয়ার চাউনিতে। দোষীর মত সে চোখ নামিয়ে নিয়েছিল মাটির দিকে। বুদ্ধি কম হলেও এ জিনিস মংলার নজর এড়ায়নি। সে স্ত্রীকে প্রবোধ দেয়—"ছেলেপিলে হওয়া ভগবানের হাতে। তোর ভয় করবে না তো রে, আমি চলে গেলে?"

"পাড়ার মধ্যে ভয়টা কিসের? বাঘে খেয়ে ফেলে দেবে?"

"রাতে ভয় করলে চাচীর কাছে শুস; কেমন?"

"তোর চাচী আমাকে বাঘের হাত থেকে বাঁচাবে?"

ফুলবাসিয়া হেসে ফেলে। তার আর খুড়শাশুড়ীর কুঁড়ের চাল গায়ে গায়ে লাগান। সে বুড়ীও থাকে একা। চোখে ছানি পড়েছে; সেইজন্য আজকাল শুধু এক জায়গায় বসে বসে সুরকি-কোটার কাজ করতে পারে। কাজের জায়গায় কারও সঙ্গে না হলে যেতে পারে না। রাতে ভয়ের কোন কারণ ঘটলে এ বুড়ী কি সাহায্য করতে পারবে? তাই ফুলবাসিয়ার এই হাসি।

"আরে, ভয়ের সময় একটা বিড়াল কাছে থাকলেও মনে জোর পাওয়া যায়।"

"নিজের ঘরে এই চাটাইখানার উপর না শুলে আমার ঘুম আসে না।"

তবু মংলা বুঝি ভরসা পায় না।

"না হয় চাচীকেই তোর কাছে এসে শুতে বলিস।"

"আমার চাটাইতে আমি অন্য কাউকে শুতে দিলাম আর কি!"

যাবার দিনে কথাটি খুব ভাল লেগেছিল মংলার। ভাল লাগবে জেনেই বলা। এমন মিষ্টি করে মনের মত কথা ওই মেয়েটা ছাড়া আর কেউ কি বলতে পারে! ছেড়ে যেতে মন চায় না; তবু মংলাকে চলে যেতে হল, ডগায়-পুঁটুলি-বাঁধা লাঠি কাঁধে ফেলে। মরদের মন শক্ত না হলে কি চলে। এখানে যে দুজনকার রোজগার চোখেও দেখা যায় না।

"মন খারাপ করিস না। সাবধানে থাকিস। বিলাসপুরীরা যা বলছে, তাতে একশ টাকা জমতে আর কদিন লাগবে। গেলাম আর এলাম। সাবধানে থাকিস!"......

......সাবধানে থাকিস!......

দু'বছর আগেকার যাবার দিনের কথাগুলো আজ ফুলবাসিয়ার মনের মধ্যে বিঁধছে। চাটাইয়ের বুননির গাঁটবিনুনি-গুলোও এতকাল পর আজ গায়ে ফুটছে।

......এখনও সন্দেহমাত্র! তবু—তবু—হে ভগবান! তা' যেন না হয়!

নিজের ঘরে বসে আগাগোড়া ব্যাপারটা যে দু'দণ্ড ভাববে, তারও জো রাখেন নি ভগবান! খুড়শাশুড়ী ডাকছে।

"কইরে! বউ! ও বউ! সাড়াশব্দ পাই না কেন? পহর বেলা যে হয়ে গেল!"

অন্যমনস্ক ছিল বলে বুড়ীর লাঠির শব্দ শুনতে পায়নি ফুলবাসিয়া। সাড়া দিতেই হ'ল!

"এই যে চাচী। শরীরটা ভাল লাগছে না।"

"জ্বর? তোর উনুনের ধোঁয়ার গন্ধ না পেয়ে ভাবলাম বুঝি যে আজ ছাতু বেঁধে নিয়ে যাবি কাজের জায়গায়। আজ বার হবি না আজ?"

"না।"

"তা তোর শরীর খারাপের কথা আগে বলিসনি কেন? আমি এখন কার সঙ্গে যাই!"

তার রোজগার নিয়ে টানাটানি; তাই বুড়ীর গলার স্বর বেশ কড়া।

নিজের জ্বালায় নিজে পাগল এখন ফুলবাসিয়া।

এরই মধ্যে বুড়ীটা এল জ্বালাতে করতে!

"আমার শরীর খারাপ হলে কি পাড়ায় বাড়ী বাড়ী গিয়ে খবর দিয়ে আসতে হবে!"

কথায় কথা বাড়ে। চোখ গিয়ে বুড়ীর জিবের ধার আরও বেড়েছে।

• "আমি হলাম পাড়া! আমি হলাম বাড়ী-বাড়ী! আজ মংলা এখানে থাকলে তুই এমন কথা বলতে পারতিস?...... তোর মত আঁটকুড়ী আমি নই; পেটে দু-দুটো ছেলে ধরেছিলাম। তারা বেঁচে থাকলে আজ আমি রাজার মা; কাজে না বেরুলেও দুটো দানা পেটে পড়ত।"......

অনর্গল ছানিপড়া-চোখের জল ও কটুকথার স্রোত বইয়ে খুড়শাশুড়ী চলে গেল নিজের উঠনে। সেখান থেকেও তার মরা ছেলেদের উদ্দেশে বলা কথা-গুলো কানে আসে।......

ছেলে......ছেলে......ছেলে......

বুড়ীর গালাগালি একটুও খারাপ লাগছে না আজ ফুলবাসিয়ার। আঁটকুড়ী কথাটির মধ্যে সে পাচ্ছে আশ্বাসের ইংগিত।......

......তাই যেন হয়......হে ভগবান! ......বুড়ীর গালাগালিই যেন সত্যি হয়!......

বুড়ীর খেদোক্তি এইবার নতুন পথ নিল।

......"আর কি এত বেলাতে পাড়ায় কেউ আছে যে আমাকে নিয়ে যাবে। সকলকেই যে বার হতে হয় তাড়াতাড়ি, কাজের খোঁজে। তোর যেন হাতধরা নাচালি মিস্ত্রী আছে। বাঁধা কাজ—দেরী করে গেলেও পাবি।......"

বিছুটির চাবুক ওই মিস্ত্রীর নামটা। জ্বালা ধরায় গায়ে। যে নামটা সে ভুলতে চাচ্ছে আজ, সেটা ভুলবার আর বুঝি উপায় নেই! সেই তো তার ভয়। যদি তাই হয়! শুধু খুড়শাশুড়ী কেন, পৃথিবীশুদ্ধ লোক বারবার আলো ফেলে তুলে ধরবে ওই নামটা তার চোখের সম্মুখে!......না না তা কেন হতে যাবে! ......বৃথাই সে এত ভাবছে। কিন্তু মংলার কথা কেন বারবার মনে পড়ছে এই ভয়-ভাবনার মধ্যে? আর দুজনে মিলে বোনা চাটাইখানার কথা,—আড়াই জনের জন্য বোনা চাটাইখানার কথা!......

"ফুলবাসিয়া! ও ফুলবাসিয়া! এ তোর কি কান্ড! মিস্ত্রী কাজের জায়গায় যাবার আগে জনমজুরে গিয়ে মালমশলা সব তয়ের করে রাখবে হাতের কাছে, তবে না সময় নষ্ট হয় কম!"

ফুলবাসিয়া চমকে উঠেছে। সবচেয়ে অবাঞ্ছিত মানুষটির গলার স্বর!......কে একে তার নাম ধরে ডাকবার অধিকার দিয়েছে? কেন—মংলার বউ বলে ডাকতে পারে না?......

নাচালি মিস্ত্রীর গলা শুনে পাশের উঠন থেকে খুড়শাশুড়ী জবাব দিল—"মংলার বউয়ের অসুখ। সে আজ কাজে যেতে পারবে না।"

"আগে থেকে কেন খবর আমায় না দিয়ে, এত বেলায় এখন কাজে যাব না বললেই হ'ল?"

নাচালি মিস্ত্রীর হাবভাব বুড়ীরও পছন্দ না। দেখতে না হয় না পেল, নাকে কানে তো আর সে তুলো গুঁজে থাকে না। এখনও তার সিগারেটের ধোঁয়ার গন্ধ নাকে আসছে, সংগে সংগে আমলার তেলের গন্ধ। আমলার তেল না মাখলে নাকি সে রোদ্দুরে কাজ করতে পারে না; বিড়ি খেলে তার নাকি গলায় লাগে। এমন লোকের সংগে একটু সমীহ করেই কথা বলতে হয়। এরই দৌলতে মংলার বউ রোজ কাজ পায়; সংগে সংগে সেও। নাচালি মিস্ত্রী আজ যদি তাকে সংগে করে কাজের জায়গায় নিয়ে যায়! একবার বলে দেখবে নাকি?...

উঠতেই কানে এল ফুলবাসিয়ার চীৎকার—"পয়সার গরম দেখাতে এসেছিস। ওসব করিস নিজের বাড়ীর উঠনে। আমি কি কারও চাকরি করি, না মাইনে খাই, যে সে উঠতে বললে উঠব, বসতে বললে বসব। আমার বাড়ী পর্যন্ত ধেয়ে এসেছিস দাপট দেখাতে?"......

এ মূর্তি দেখবার জন্য নাচালি মিস্ত্রী প্রস্তুত ছিল না। সে নরম হয়ে গেল।

"না না। শীতের ছোট বেলা। যে বাবু পয়সা দিয়ে কাজ করাচ্ছে, সে তো গালাগাল দিচ্ছে এই নাচালি মিস্ত্রীকেই।"

"যার ইচ্ছে মিস্ত্রীকে গালাগালি করুক!"

এই অর্থহীন কথাটার মানে বুঝবার চেষ্টা করতে করতে নাচালি মিস্ত্রী বেরিয়ে গেল উঠন থেকে। গোল-মাল দেখে বুড়ী সাহস পেল না তাকে সংগে নিয়ে যাবার কথা বলতে।

দরজার ঝাঁপ টেনে দিয়ে ফুলবাসিয়া আবার এসে খেজুরপাতার চাটাইখানার উপর শুল। ভেবে কূলকিনারা পাওয়া যায় না।......যদি তাই হয়!......তাহলে কি হবে!......এত বড় সমস্যা জীবনে কখনও তার সম্মুখে দেখা দেয়নি। অসুখ করে কাজে না বেরুতে পারলে কঠিন বিপদে পড়তে হয় ঠিকই; কিন্তু সে সময়ও পাড়াপ্রতিবেশীর দুটো মিষ্টি কথা শুনতে পাওয়া যায়। কিন্তু এতে? ......শিউরে উঠল গা। ভেবে শেষ করা

যায় না।......না না, একটা উড়ো আপদের কথা ভেবে নিয়ে সে মিছেই মন খারাপ করছে!......খ‍ুঁটির জিওল গাছটা পর্যন্ত ঠেলে মাথা তুলে ডালপালা ছাড়ছে!...... তুলে ধরছে ঘরের চালাখানাকে খানিকটা। ফাঁকের মধ্যে দিয়ে ঘরে এসে ঢ‍ুকেছে চালায় তোলা 'সাতপ‍ুতিয়া' সিমের ডগা। এক এক থোকায় অনেকগ‍ুলো করে ফলে বলে এর নাম সাতপ‍ুত্তুর সিম। বাড়ীর উঠনে প‍ুঁতলে মা-ষষ্ঠী কৃপা করেন। বছর কয়েক আগে মংলা এনে প‍ুঁতেছিল। এখন প্রতি বছর বিচি পড়ে আপনা থেকেই হয়। এ সব জিনিস মংলাকে বলে দিতে হ'ত না। ছেলে-ছেলে করে মরে সে। ফ‍ুলবাসিয়ার নিজেরই কি সাধ কম? মা-ষষ্ঠীকে খ‍ুশী করবার জন্য ছটপরবের দিন লাউ শাক সে প্রতি বছর খায়।......কিসে থেকে কি হয় কে জানে! ......প্রথম যেদিন নাচালি মিস্ত্রী তাকে নাম ধরে ডেকেছিল, সেদিনই যদি সে তাড়া দিয়ে উঠত, "আমাকে অম‍ুক মরদের বউ বলে ডাকতে পারিস না!"—তা'হলে কি আজ এই হয়! কিন্তু সে স‍ুযোগ সে পেল কই? মিস্ত্রী যে কথাটা পেড়েছিল অন্য রকমভাবে। সে তখন ভারার উপর চড়ে কাজ করছে। আধ-খাওয়া সিগারেটটা ফ‍ুলবাসিয়াকে দিয়ে, ম‍ুখের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বলে—"আমার বাপ-মা কি যে নাম রেখেছিল! নাচালি! কি যে পছন্দ! তোর বাপ-মা কিন্তু বেশ নামটা বেছেছিল।"

"ফ‍ুলবাসিয়া আবার ভাল নাম হল কোত্থেকে? বাসি ফ‍ুল! কি নামের ছিরি!"

"বাসি ফ‍ুল নারে; ফ‍ুলের মধ্যে তোর বাসা; তাই তোর নাম ফ‍ুলবাসিয়া।"

একটা অকারণ খ‍ুশীতে ভরে উঠেছিল ফ‍ুলবাসিয়ার মন। সেদিনের একটি কথাও সে ভোলেনি। তখনই সে যদি গম্ভীর হয়ে যেত!......মংলা তাকে সাবধানে থাকতে বলে গিয়েছিল।...... আড়াই জনের জন্য তারা দ‍ুজনে মিলে চাটাইখানা ব‍ুনেছিল।......

কাল সারারাত ঘ‍ুম হয়নি। কখন যেন একট‍ু তন্দ্রা এসে গিয়েছিল। কতক্ষণ হবে খেয়াল নেই। হঠাৎ ডাক শ‍ুনে সে ধড়মড় করে উঠে বসে।

"বউ! ও বউ! এই দেখ ডাকপিয়ন-সাহেব এসেছেন। তোমার চিঠি আছে। মংলার বউয়ের বাড়ী খ‍ুঁজতে খ‍ুঁজতে আমার বাড়ীতেই প্রথমে গিয়েছিলেন।"

ঝাঁপ খ‍ুলে ফ‍ুলবাসিয়া বার হল।

"চিঠি! আমার নামের!"

ব‍ুকের ভিতরটা কেঁপে উঠেছে। উঠবারই কথা; এ পাড়ায় ডাকপিয়নসাহেব আসেন কালেভদ্রে।......নিশ্চয়ই মংলার! খারাপ খবর না হয়েই পারে না!...... নইলে আজকের মত দিনেই বা আসবে কেন?......

ডাকপিয়ন উঠনের লাউমাচাটি দেখে অবাক হয়ে গিয়েছে।

"বাঃ! বেশ লাউ ধরেছে তো! অগ‍ুনতি কচি কচি জালি পড়েছে দেখছি!"

একটি কথাও পড়তে পায় না ব‍ুড়ীর কাছে। সে-ই জবাব দিল—"মংলার বউয়ের লাউভাগ্য চিরকালই ভাল। কিন্তু কলিয‍ুগে পাঁজিপ‍ুঁথির লেখা আর ফলে কই!"

তেওয়ারীজীকে দিয়ে চিঠি পড়াতে গেলে সেই সন্ধ্যার আগে হবে না। সেইজন্য ডাকপিয়নসাহেবকে একটি লাউ কবলে ব‍ুড়ী চিঠিখানি পড়ে দিতে বলল।

সর্দার না কাকে দিয়ে যেন মংলা চিঠিখান লিখিয়েছে। বেশ গ‍ুছিয়ে লিখেছে লোকটা। পিয়ন পড়ল—

—"মংলার বউ

শালা একশ টাকা কিছ‍ুতেই জমল না। ওখানে থাকি কি করে। সর্দার ঘর দিয়েছে। এখন অঘ্রান। হোলির সময় তোকে নিয়ে আসব। আর তোর খেজ‍ুর-পাতার চাটাইখানায় শোয়া হবে না। এখানে শোয়া বোরার উপর। এতদিনে আমার একটা ঠিকানা হয়েছে। ইট খ‍ুলে থাকলে তেওয়ারীজীকে দিয়ে পোস্‌কার্ট

লেখাবি। তাহ'লে সেটার জন্য একটা কুর্তা নিয়ে যেতে হবে।"

সুসংবাদ নয় মংলা আসছে তিন মাস পরে! মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছে ফুলবাসিয়ার। যে চাটাইখানির কথা আজ তার বারবার মনে পড়ছে, সেখানার কথা মংলার চিঠির মধ্যেও লেখা হয়ে গেল কি করে?

চিঠির খবরে নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে খুড়শাশুড়ী মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়েছে।—"বউ! তোরা চলে গেলে আমার কি হবে!"

এ কথায় কান দেবার মত মনের অবস্থা এখন ফুলবাসিয়ার নয়। পিয়ন একটার জায়গায় দুটো লাউ নিয়ে চলে গেল, সেদিকেও তার খেয়াল নেই। ভাবনা-চিন্তাগুলো জট পাকিয়ে গিয়েছে, চিঠিতে লেখা ইট খুলবার কথাটিতে।

ইট খুলবার কথা লিখেছে মংলা। এর অর্থ সে চলে যাবার পর ফুলবাসিয়ার ছেলে হয়েছে কি না।......শহরে যাবার পথে 'সতীথান' আছে না? ভারী জাগ্রত। সেখানে কোন কালে যেন কোন সতী স্বামীর চিতায় ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তাজা তেল-সিঁদুর মাখানো বেদীটির উপর উঁচু বাঁশের সঙ্গে লাল তেকোনা নিশান টাঙানো। এত উঁচু, যে পাশের বুড়ো বটকেও ছাড়িয়ে উঠেছে। ও নিশান বহু দূর থেকে দেখতে পাওয়া যায়। বটগাছটিই কি কম প্রাচীন নাকি? গাছ থেকে নামা কয়েকটি ঝুরি এত মোটা যে এয়োস্ত্রীরা দু'হাতের বেড়ে নাগাল পান না। বটের আওতার ঠিক বাইরেই একটি ঘর উঠেছে বছর কয়েক হল। যে 'সাধুবাবা'টি দশ বছর আগে বটতলায় আস্তানা গেড়েছিলেন, তিনি থাকেন আজকাল ওই ঘরে। সাধুবাবা কাজের লোক। বেশ গুছিয়ে নিয়েছেন। তীর্থার্থিনীদের সুবিধার জন্য পাশেই আর একখানি ঘরের দেওয়ালও গাঁথা হচ্ছে। বাঁশের ভারা বাঁধা থাকে বারো মাস। মিস্ত্রীরা নিজেদের অবসর মতে মাঝে মাঝে এক আধ ঘণ্টা স্বামীয়ের কাজ করে দিয়ে যায়। বটগাছটির কাছে গেলে দেখা যায় যে, গুঁড়ির কোটরে কোটরে, শাখাপ্রশাখার খাঁজে খাঁজে, ঝুরির বিনুনিগুলির ফাঁকে ফাঁকে, সম্ভব অসম্ভব সব জায়গায় অসংখ্য ইট বাঁধা। এলোমেলোর মধ্যেও গোছানো। এই ইট খুলবার কথাই মংলা চিঠিতে লিখেছিল। যে সব মেয়েরা সন্তান চায়, তারাই ওখানে ইট বেঁধে দিয়ে আসে। মনস্কামনা পূর্ণ হবার পর সতীথানে পূজো দেবার আগে ইটখানি খুলে নামিয়ে রাখে। নীচে নামানো ইটের পাহাড় দিয়েই সাধুবাবা ঘর তয়ের করিয়েছিলেন।

বাঁধবার পর মাসকয়েক ইটের কথাটি ছিল কত আশা-আকাঙ্ক্ষা, কত ভয়-ভক্তির লক্ষ্য। তারপর নিষ্ফল ও অপ্রয়োজনীয় বলে কথাটি কবে যেন সরে গিয়েছিল মন থেকে। আজ মংলার চিঠিতে আবার মনে পড়ল।

কেন মরতে সে সতীথানে ইট বাঁধতে গিয়েছিল? কেন সে ছটপরবের দিন লাউশাক খেয়েছিল? কেন সে সাত-পুতিয়া সিমের চারাগুলো ছোটতেই উপড়ে ফেলে দেয়নি?

কেন?......কেন?......কেন?

আগেকার করা প্রত্যেক কাজ, ঘটে যাওয়া প্রত্যেক ঘটনা, ভেবে নেওয়া প্রতিটি চিন্তার অদৃশ্য সুচিমুখ তারই দিকে! এতদিন বোঝেনি! গাছপালা, ফলমূল, লতাপাতা, ইট-পাটকেল, ঠাকুর-দেবতা, সব তার বিরুদ্ধে! এই বিম্বাদ পৃথিবীর প্রতি অণু-পরমাণু তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছে। নইলে আজকের মত দিনেই মংলার চিঠি আসবে কেন? মংলার চিঠিতে কেনইবা চাটাইখানার কথা লেখা হয়ে যাবে? ভগবান নারাজ হলে এমনিই হয়! চারিদিকে অন্ধকার! কোন উপায় নেই এই কানা গলি থেকে বার হবার! ......পথ হাতড়ে বেড়ালে কি হবে!......

......খুড়শাশুড়ী কি যেন বলছে।...

হঠাৎ!......হঠাৎ আঁধারের মধ্যে আলো দেখতে পেয়েছে ফুলবাসিয়া। একমাত্র উপায়! ...... পথের হদিশ! ..!... বিপদের মুখে ভগবান পথ দেখিয়েছেন চিঠির মধ্যে দিয়ে। —এইজন্যই চিঠি এসেছে।......

হেঁচকা টান মেরে ফুলবাসিয়া লাউ-মাচার একখান' লম্বা বাঁশ বার করে নিতে গেল। মড়মড় করে পুরনো নড়বড়ে মাচাটি ভেঙ্গে পড়ল।

পড়! পড়! ভেঙেচুরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যা!

"বউ, ও কি হলরে? কি ভাঙ্গল?"

......মাচার বাঁশ লম্বায় কম; একেবারে ঘুণধরা; এতে হবে না; আরও মজবুত জিনিসের দরকার; আরও লম্বা; কিছু পাওয়া যাচ্ছে না হাতের কাছে; এক 'উখলি-সামাট' ছাড়া; এতেই হবে; এই 'সামাট' দিয়েই হবে; এর চেয়ে মজবুত জিনিস পাবে কোথায়; কিন্তু এ যে ছোট; উখলিটাকেও নিতে হয়।......

মাথায় উখলি, হাতে সামাট, পাগলের মত বেরিয়ে গেল ফুলবাসিয়া উঠন থেকে।

"ও বউ! কোথায় যাস?"

ছুটে চলেছে সে। প্রতি মুহূর্তের মূল্য আছে তার কাছে এখন। এক ক্রোশ দূরের সতীথান মনে হচ্ছে কত দূর।...... কেন এত দূরে হল সতীথান?......নাগাল পাবে তো? অত উঁচুতে? উখলির উপর চড়ে এই সামাটটা দিয়ে? এই-জন্যাই উখলিটা নেওয়া।......ইটখানি যে সে বেঁধেছিল অনেক উঁচুতে। মইয়ের উপর চড়ে। সাধুবাবার ঘরে মিস্ত্রীদের কাজ চলছিল তখন। সেইখান থেকেই এনে মংলা লাগিয়ে দেয় মইখানাকে বট-গাছের ডালের সংগে। বলেছিল সবচেয়ে উঁচুতে বাঁধতে হবে। পুজো দিতে এসে তার ইটখানি অন্য কেউ যদি ভুলে নিজের ভেবে নামিয়ে দেয়, তাই ছিল তাদের এত সাবধানতা। সাধুবাবা দূরে থেকে তাড়া দিয়ে উঠেছিলেন মেয়েমানুষকে মই দিয়ে গাছে উঠতে দেখে। ফুলবাসিয়াও তুড়ে জবাব দিয়েছিল যে, মিস্ত্রীবাড়ীর মেয়েদের মইয়ে চড়ায় দোষ নেই—সতীথানের গাছের ডালে পা না লাগালেই হল। সাধুবাবা শুনে চুপ করে গিয়েছিলেন।

......নিজের ইটখানি সে দেখলেই চিনতে পারবে। মস্ত থান-ইট—এক পিঠে গর্তর মধ্যে ঢ্যারাকাটা দাগ—বাবুসাহেব-*দের পাঁজার ইটের চিহ্ন। মাটির মেঝে স্যাঁতসেঁতে বলে তাদের চাটাইয়ের নীচে ইট বিছানো আছে। তারই একখানি সে* ভেবেছিল সতীথানের বটগাছে বাঁধবে। মংলা শুনে রেগে আগুন—"যে ইটের উপর আমরা রোজ শুই, সেই ইট তুই পৌঁছুবি সতীমায়ের দরবারে! মেয়ে-মানুষের আক্কেল আর কত হবে!" তারপর মংলা ওই আনকোরা নতুন ইট-খানি নিয়ে আসে বাবুসাহেবদের পাঁজা থেকে।......ইট বাঁধবার জায়গাটি তার ঠিক মনে আছে। সেখান থেকে একটা ঝুরি নেমেছে। তারই খাঁজে ঢুকিয়ে দিয়েছিল থানইটখানাকে। গেল তিন বছরে নিশ্চয়ই ঝুরিটা মোটা হয়ে চেপে ধরেছে ইটখানাকে। যদি সামাটের ধাক্কায় না পড়ে! যদি কেটে বার করতে হয়! তাহ'লে দা পাবে কোথায়? মই পাবে কোথায়? দরকার যে এখনই! হয়তো সতীমায়ের আশীর্বাদ এখনও সে পায়নি! সেই আশীর্বাদ পাবার আগেই সে ইট নামিয়ে নিতে চায়। বিপদ থেকে রক্ষা পাবার তার একমাত্র পথ! সময় থাকতে সে নিজের ইটখানিকে খুলে নিতে চায়।......

......সাধুবাবার ঘর স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। সন্তানবতী মেয়েদের সফল কামনার প্রতীক ওই ঘরখানি; গাঁথনির প্রত্যেকটি ইটে সতীমায়ের প্রতি তাদের কৃতজ্ঞতা মেশানো। তাঁর আশীর্বাদ-নিষিক্ত ইটগুলি দিয়ে ঘরটি তৈরি; সেই-জন্য সেদিকে তাকাতে ভয় করছে। বাড়ীর প্রত্যেকটি ইট তার শত্রু। ভয় দেখাচ্ছে। সিঁদুর-মাখানো বেদীটি তাকে চোখ রাঙিয়ে শাসাচ্ছে। লাল রঙের নিশানটিও।......সতীথান এত জাগ্রত বলেই তো ভয়!......সতীমা যদি তার উপর বিরূপ হন তাহ'লেই সে বাঁচে।

এতক্ষণে গাছে-বাঁধা ইটগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। ওগুলির একখানির পিছনেও কি কোন বন্ধ্যার বুকের দুরু-দুরু লুকানো নেই?......সকলে বাঁধা ইট খোলে সাফল্যের গর্বে। কিন্তু সে?......

......আমার উপর সত্যিকার রাগ করে আমার ইট-বাঁধা বিফল করে দাও সতীমা!......

গাছতলাতে গিয়ে ফুলবাসিয়া মাথা থেকে উদুখলটি নামাল।

কিন্তু কই? তার সেই ইটখানি নেই তো! কে যেন নামিয়ে নিয়েছে সেখানকার গাছের ছাল ছেঁড়া ছেঁড়া রস গড়াচ্ছে দুধের ধারার মত! শুধু তার কেন—পুরনো বাঁধা ইট একখানিও নেই। গাছের গায়ে অনেক জায়গাতেই তাজা ক্ষতের দাগ! পুরনো বাঁধা ইটে শ্যাওলা ধরে; গাছের ছাল চেপে কেটে বসে ইটের উপর; তা কি সে জানে না? যে ইট-গুলো গাছে এখন রয়েছে সেগুলো সব যেন আলগা আলগা ভাবে রাখা; আলগোছে বসানো; একটা বর্ষাও বোধ হয় কাটেনি ওদের উপর দিয়ে; সব ইদানীংকার বাঁধা।

এ কি হ'ল! তার রক্ষা পাবার একমাত্র পথ বন্ধ করে কে নামিয়ে নিল ইট? কে তার সংগে এই শত্রুতা করল?

"ও সাধুবাবা! আমার ইট কে খুলে নিল?"

সাধুবাবার মুখ-চোখে দোষী দো[illegible] ভাব। বন্ধ্যা নারীদের অভিশাপ মেশা[illegible] বহুদিন আগেকার বাঁধা ইটগুলি সতী-থানের খ্যাতির অন্তরায়। দেখলেই লো[illegible] বুঝে যায় যে, অতগুলি ক্ষেত্রে সতীমা[illegible] মাহাত্ম্য নিষ্ফল হয়েছে। তাই সাধু[illegible] মধ্যে মধ্যে পুরনো ইটগুলি রাত্রে নাম[illegible] রাখেন—বিশেষ করে যখন নতুন দালান[illegible] গাঁথনির কাজ আরম্ভ হয় তখন। এই [illegible] কাল রাত্রিতে সবচেয়ে উঁচু ডা[illegible] ইটখানি তিনি গাছের ছাল চেঁছে [illegible] বার করতে পেরেছিলেন। কিন্তু [illegible] কথা তো বলা যায় না এর কাছে। অভ[illegible] মৃদু হাসি মুখে এনে তিনি বললেন—"ওরে বোকা মেয়ে! তুই তো সেই ই[illegible] খুলতেই এসেছিস। তোর মনোবাঞ্ছা প[illegible] হয়েছে জানতে পেরে নিশ্চয়ই অন্য কার[illegible] হাত দিয়ে ইটখানি নামিয়ে নিয়েছে সতীমা। তিনি যে সব টের পান। [illegible] তুই কেঁদে মরছিস কেন? মনের ই[illegible] পূরণ হয়েছে; কোথায় পুজো দিবি[illegible] নয় কেঁদে ভাসালি! তেল-সিঁদুর, প[illegible] সুপুরি এনেছিস তো? বাতাসা এনেছি[illegible] না আমার কাছ থেকে নিবি?"

তার সন্দেহ বিশ্বাসে পরিণত হয়ে[illegible] আর কোন অনিশ্চয়তা নেই! কিছু[illegible] তার নিস্তার নেই! ফুঁপিয়ে ফুঁপি[illegible] কাঁদছে ফুলবাসিয়া।

দ্রুত-ফেনিল সানলাইট

না আছড়ে কাচলেও সাদা ও ঝকঝকে ক'রে দেয়

"সানলাইট দিয়ে কাচলে কেমন সহজে কাপড়ের ভেতর থেকে ময়লা বেরিয়ে আসে দেখুন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই আপনার রুমাল থেকে আরম্ভ ক'রে বিছানার ছাদর পর্য্যন্ত সব সাদা কাপড়ই নতুনের চেয়ে আরও সাদা হ'য়ে যায়। আর সানলাইটে কাচা কাপড় আরও বেশীদিন পরা চলে।"

"এ কথা মনে গেঁথে রাখবেন যে আর কিছুতেই না, না সত্যিই আর কিছুতেই রঙিন জিনিষ অত সুন্দর ঝকঝকে তক-তকে হয় না যেমন সানলাইট সাবানে হয়। এর দ্রুত উৎপাদিত ফেনা সব ময়লা উড়িয়ে দিয়ে কাপড়ের রঙকে জীবন্ত ক'রে তোলে, আর না আছড়াতেই তাই হয়।"

S. 222-X52 BG

ভারতে প্রস্তুত
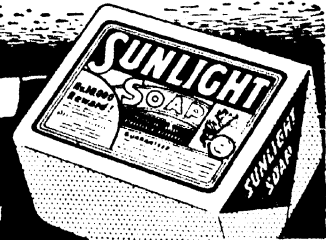
ইউরোপে বিদ্যাসাগরের কথা

শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

বিদ্যাসাগর মহাপণ্ডিত, মহাপ্রাণ; কিন্তু তাঁহার খ্যাতি মহাপ্রাণতার জন্য যত, মহাপাণ্ডিত্যের জন্য তত নয়। এমনকি সমাজ সংস্কারে বা শিক্ষাবিস্তারে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্বও যেন তাঁহার এই মহাপ্রাণতার কাছে সামান্য গৌরব বলিয়া মনে হয়। বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব তাঁহার এত মহৎ কীর্তিরও উর্ধ্বে—তাঁহার অমরত্ব তাঁহার মনুষ্যত্বে। এবং তাঁহার কৃতিত্বের মূল্যে এই মনুষ্যত্বেরই ইতিহাস হিসাবে। তবে এই ইতিহাসের আজ যে আকর্ষণ আমাদের পরবর্তীকালে সে আকর্ষণ থাকিবে কি না জানি না। এ করুণার মূর্তি আজ যত উজ্জ্বল কাল হয়ত তত উজ্জ্বল মনে হইবে না। সামাজিক ইতিহাসে বিদ্যাসাগরের নানা সংস্কারের হিসাব থাকিবে, শিক্ষার ইতিহাসে তাঁহার অক্লান্ত উদ্যমের কথা থাকিবে, সাহিত্যের ইতিহাসে তাঁহার সুন্দর গদ্যরীতির উল্লেখ থাকিবে। কিন্তু যে মনুষ্যত্বের কাহিনী বাল্যকালে রূপকথা শোনার উৎসাহ লইয়া শুনিয়াছি এবং যাহা আজ ঊনবিংশতি শতাব্দীর বাঙালী জীবনের এক মহৎ পুরাণ বলিয়া গ্রহণ করি তাহা ভবিষ্যৎ বাঙলার কানে পেঁৗছাইবে কি না তাহাই ভাবি। তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিতে হইলে এই পবিত্র পুরাণখানিকে সযত্নে রক্ষা করিতে হইবে।

এমন মানুষের খ্যাতি দেশের বাইরে ছড়ায় না। কারণ জগৎজোড়া খ্যাতির আকাঙ্ক্ষা লইয়া বিদ্যাসাগর তাঁহার কোন প্রচেষ্টায় অগ্রসর হন নাই। বরঞ্চ অখ্যাতির বোঝা মাথায় লইতেই তিনি সব সময় প্রস্তুত। তাছাড়া যিনি গোপনে মানুষকে ভালবাসেন, তাঁহার সে ভালবাসার কথা এক বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যেই গোপন থাকে।

> করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে
> দীন যে দীনের বন্ধু।

বিদ্যাসাগরের খ্যাতি এই নানা জনের মনের কথা এবং তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি আবার এই করুণার কথা। একথা দেশের কথা; বিদেশীর কানে একথা বড় একটা পেঁৗছায় না। যিনি সাধারণের তৃষ্ণা-নিবারণের জন্য পুকুর কাটাইয়া দেন

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

তাঁহার দাক্ষিণ্যের কথা একমাত্র গ্রামের লোকেই জানে। কিন্তু সুউচ্চ পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মাণ করিয়া দিলে নির্মাণকর্তার খ্যাতির আর যেন অন্ত থাকে না। বিদ্যাসাগরের কাজ ছিল রাস্তা বানাইয়া পুকুর কাটাইয়া আমাদের প্রতিদিনের জীবনকে সহজ ও সরল করিয়া তোলা। তাঁহার সমস্ত কর্ম তাঁহার বর্ণপরিচয় ও উপক্রমনিকার ন্যায় আমাদের সমস্ত শিক্ষার প্রথম সোপান। তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্যও তিনি নিয়োগ করিয়াছেন এই প্রাথমিক শিক্ষারই উদ্দেশ্যে। বহু শ্রমলব্ধ শাস্ত্রজ্ঞানের সার্থক প্রয়োগ বিধবা-বিবাহের শাস্ত্রীয়তা প্রমাণে, তাঁহার সংস্কৃত কাব্যচর্চার শ্রেষ্ঠ ফল দেখি সরল সুন্দর বাংলা আখ্যানে। হিন্দু দর্শন মন্থন করিয়া তিনি বলিলেন সাংখ্য ও বেদান্ত ভ্রমাত্মক দর্শন, সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের এত অনুশীলন করিয়া মন্তব্য করিলেন যে, সংস্কৃতকে দেবভাষা মনে করিয়া এ ভাষার রচনা মাত্রকেই আদর্শ রচনা বলিয়া গ্রহণ করা মূর্খতা। বস্তুত বিদ্যাসাগরের সমস্ত কথা এবং সমস্ত কাজ বাঙালী জীবনের বোধোদয়। একথা বাঙালী যেমন বুঝিবে অন্যে তেমন বুঝিবে না। তাই বলিয়াছি বিদ্যাসাগরের খ্যাতি বিদেশে পেঁৗছাইবে না।

এ বিষয়ে আর কথা এই যে, বিদ্যাসাগর তাঁহার প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ইউরোপীয় পণ্ডিতের নিকট উপস্থিত করিতে কোনদিন তৎপর হন নাই। তাঁহার কোন সাহিত্য-কর্মে দেশী বা বিদেশী পণ্ডিত সমাজে খ্যাতি অর্জনের স্পৃহা দেখি না। প্রাচীন ভারতের গৌরব প্রচারেও তাঁহার উৎসাহ পরিমিত। কারণ তাঁহার প্রধান কাজ বর্তমান লইয়া। অতীত লইয়া সৌখীন আলোচনায় সময় তিনি দিবে কোথায়? তাই দেখি, ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যান্য পণ্ডিত, সংস্কারক বা লেখকের বিদেশে যে খ্যাতি, বিদ্যাসাগরের সে খ্যাতি নাই। ব্লুমহার্ট সাহেব তাঁহার এক গ্রন্থের বাংলা শব্দের হিসাব দিলেন, টনি সাহেব উত্তরচরিতের ব্যাখ্যায় তাঁহার পাঠই সন্দেহস্থলে গ্রহণ করিলেন, হার্ডি Exile of Sita নাম দিয়া সীতার বনবাস অনুবাদ করিলেন এবং তাহার ভাষার প্রশংসা করিয়া ভূমিকায় স্বীকার করিলেন—

"What is pathos in one language may become bathos in another"।

কিন্তু সমগ্র মানুষটিকে কয়জন বিদেশী বুঝিল? সম্প্রতি এক জার্মান পণ্ডিত রচিত বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ পড়িয়াই এই প্রসঙ্গ করিতেছি। এ প্রবন্ধে বিদ্যাসাগরের সমগ্র ব্যক্তিত্বটি বুঝিবার এক সার্থক প্রয়াস দেখিতে পাই।

বিদ্যাসাগরের মহত্ত্ব কোনকালে কোন বিদেশী বোঝে নাই এমন কথা বলি না। যে সমস্ত সাহেব কর্মচারী তাঁহার সংস্পর্শে আসিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকেই তাঁহার চরিত্রের দৃঢ়তা, সংযম প্রভৃতি গুণের প্রশংসা করিয়াছেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারী মার্শেল সাহেব বলিয়াছিলেন—

I have been strongly impressed with his tact and intelligence and freedom from all bias or unworthy motives."

আর যে কয়টি সাহেব বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কোন কথা বলিয়াছেন, তাঁহারাও দেখি, তাঁহার নানা গুণের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বাকল্যান্ড সাহেব লিখিলেন—

"He combind a fearless independence of character with great gentleness and simplicity of a child in his dealings with people of all classes. A stern disciplinarian, he could yet forgive the short-comings of others less gifted and less exact than himself....Though persecuted for his reform movement he never lost heart but maintained his faith in the ultimate triumph of truth and justice.'

রোপার লেথব্রিজও তাহাই লিখিয়াছেন—

"Under the simplicity of a child he hid the sternness of a judge, which won him the respect of everybody. His dealt was felt as a national calamity".

ফ্রেজার তাঁহার Literary History of India গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের সাহিত্য কীর্তিরই শুধু উল্লেখ করিয়াছেন :

"His 'Exile of Sita' showed how Bengali had become a classic prose language with all the flexibility, dignity and grace requisite for the purpose of interpreting to the mass of the people the old life-history of the nation, and the new phase of thought introduced from the West."

আবার দেখি অনেক ইংরেজ বিদ্যাসাগরকে জানিয়াও এবং তাঁহার সমস্ত কর্মের তাৎপর্য লক্ষ্য করিয়াও তাঁহার আসল মহত্ত্ব ধরিতে পারেন নাই। সীটন্ কার সাহেব ইঁহাদের মধ্যে একজন। তাঁহার স্যার জন পিটার গ্রাণ্টের জীবনীগ্রন্থে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁহার কথা শুধু এই যে—

"Vidyasagar was a man of high caste unquestionable integrity and profound learning"

গ্রন্থের এই ভাগে সীটন্ কার বিধবা বিবাহ আন্দোলন ও আইন পাশ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। এই আলোচনার শেষ কথা :

"The credit, in the main, is due to John Peter and to Ishwar Chandra Vidyasagar"!

এখানে বিদ্যাসাগরের সংগ্রামের কোন উল্লেখ নাই—বিধবা বিবাহ আইন গ্রাণ্ট ও বিদ্যাসাগরের এক যৌথ কীর্তি ইহা বলিয়াই সীটন্কার সাহেব এ প্রসঙ্গ শেষ করিয়াছেন। এখানে আমাদের বক্তব্য এই যে, যে সব ইংরেজ বিদ্যাসাগরকে বুঝিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহারা যদি স্বদেশে ফিরিয়া তাঁহার জীবনকথা প্রচার করিতেন, তাহা হইলে পাশ্চাত্য দেশ পৃথিবীর ইতিহাসের আর একটি মহাপুরুষের সংবাদ পাইত। এ সংবাদ সে দেশ আজও পায় নাই। আমরা মিল, বেন্থামকে চিনিলাম—ইংরেজ বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রকে তেমন চিনিল কই?

যে জার্মান প্রবন্ধটির উল্লেখ করিয়াছি, তাহার উদ্দেশ্য বিদ্যাসাগরের সমস্ত কীর্তি ও ব্যক্তিত্ব অল্প কথায় উপস্থিত করা। এ উদ্দেশ্য মোটামুটি সফল হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে প্রবন্ধটি জার্মানীর শ্রেষ্ঠ ও প্রাচীনতম প্রাচ্য-বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র Deutscher Akademischer Austanschdienst নামক পরিষদের পত্রিকা Zeitschrift der deutschen morgenlan dischen Gesellschaft-এর উনবিংশ খণ্ডে প্রকাশিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানটি পূর্বে ছিল বন্ শহরে; দেশ বিভাগের পর ইহা হালে শহরে স্থানান্তরিত হইয়াছে। জার্মান দেশ প্রাচ্যবিদ্যার, বিশেষ করিয়া ভারতীয় বিদ্যার পীঠস্থান। সে দেশের সংস্কৃত পণ্ডিত সেকালে বিদ্যাসাগরকে কি চোখে দেখিলেন, তাহা জানিবার কৌতূহল স্বাভাবিক। এই কৌতূহলবশেই এই প্রতিষ্ঠানটির কর্তৃপক্ষের কাছে এই বিষয়ে ১৯শে জুলাই পত্র প্রেরণ করি। ১৫ই অগাস্ট অধ্যাপক ফিউক আমার সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়া আমাকে পত্র লেখেন। এই পত্রখানির কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম:

Vidyasagar was elected corresponding member of the German Oriental Society in 1864 and he remained a member till his death which is announced in our journal Vol. 50, 1896, p XVII.

He was elected in recognition of his merits in promoting the spread of literacy and education amongst his compatriots by means of ex-

amplary books written in the Vernacular.

Vidyasagar was elected together with Babu Rajendra Lala Mitra in Calcutta who died in 1891, these gentlemen were however not the **first Asiatic** members of our Society, as in 1853 Rajya Radhakanta Dev Bahadur in Calcutta was elected corresponding member. Besides in 1863 H.E. Subhi Pasha former minister of the Osman empire in Stambaul was elected honorary member of the Society."

রাজেন্দ্রলালের পাণ্ডিত্য বিশ্ববিশ্রুত। যে কয়টি পণ্ডিত ইউরোপীয় গবেষণা প্রণালী গ্রহণ করিয়া ভারতীয় ভাষা, সাহিত্য, দর্শন প্রভৃতির চর্চা করিয়াছেন রাজেন্দ্রলাল তাঁহাদের মধ্যে অগ্রণী। ম্যাক্সমূলার তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "He is a pandit by profession, but he is at the same time a scholar and critic in our sense of the word"!

তাঁহার বহু ইংরাজী প্রবন্ধ বিদেশীর কাছে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য উপস্থিত করিয়াছে। রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের প্রতিভারও সার্থক প্রকাশ তাঁহার বিদ্যা-বত্তায়। তাঁহার শব্দকল্পদ্রুমই তাঁহার শ্রেষ্ঠ কীর্তি। রাজেন্দ্রলাল দেব বাহাদুরের স্মৃতিসভায় বলিয়াছিলেন—

"The learned societies of Europe were the first to recognize the merits of the Raja's lexicon."'

এই দুই মহাপণ্ডিত যে একমাত্র পাণ্ডিত্যের গুণেই এই জার্মান প্রতিষ্ঠানের সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু বিদ্যাসাগরের কথা দেখিতেছি ভিন্ন। তিনি সভ্য নির্বাচিত হইয়াছেন বাংলা শিক্ষার বিস্তারকল্পে লিখিত তাঁহার বাংলা গ্রন্থসমূহের জন্য। অর্থাৎ বিদ্যা-সাগর বিদেশে এই সম্মান পাইলেন তাঁহার দেশের কাজের পুরস্কার হিসাবে। এ প্রশংসা তাঁহার বর্ণপরিচয়, বোধোদয়, শকুন্তলা, সীতার বনবাসের প্রশংসা—ইহা সাহিত্যকর্মে দেশহিতৈষিতার প্রশংসা। এবং জার্মান পণ্ডিত লিখিত প্রবন্ধটির বৈশিষ্ট্যও এইখানে। এ প্রবন্ধের লেখক ব্রখাউজও বিদ্যাসাগরের এই দেশপ্রাণতারই বিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন।

প্রবন্ধের আরম্ভে জার্মান পণ্ডিত লিখিয়াছেন, "যে কয়টি বাঙালী লেখক বিশুদ্ধ বাংলাভাষায় গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহাদের দেশবাসীর শিক্ষার উন্নতিবিধান করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।" এই সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হইবার পর বিদ্যাসাগর ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত যত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহা সমুদয় সোসাইটির পাঠাগারের জন্য প্রেরণ করেন। এ ছাড়া বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার ইংরাজী লেখাটিও পাঠাইয়া দেন। এই প্রবন্ধে এই সতরখানি গ্রন্থের আলোচনা করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণের উপ-ক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদীতে ব্রখাউজ্ ইউরোপীয় ভাষার ব্যাকরণ রচনার সরল প্রণালী লক্ষ্য করিয়াছেন। বর্ণপরিচয় সম্বন্ধেও সেই কথা। শকুন্তলা সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "হয়ত এই রচনায় তিনি Lamb's Tales From Shakspeare এর আদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন।" এর কোন মন্তব্যই অসমীচীন নয়।

তবে বিধবা বিবাহ প্রবন্ধ লইয়া ব্রখাউজের আলোচনাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য: "লেখক আগাগোড়া নিজেকে রক্ষণশীল ব্রাহ্মণদেরই দলভুক্ত বলিয়া উপস্থিত করিয়াছেন এবং বুঝাইয়াছেন যে, হতভাগ্য বিধবাদের প্রতি তাঁহার গভীর সমবেদনা সত্ত্বেও তিনি শাস্ত্র অমান্য করিয়া বিধবা বিবাহের পক্ষে কথা বলিবেন না। তবে তাঁহার মতে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসম্মত—শাস্ত্রের বিকৃত ব্যাখ্যাই ইহাকে অশাস্ত্রীয় করিয়া রাখিয়াছে।" তারপর প্রবন্ধকার লিখিতেছেন, "আমরা স্বভাবতই এই সব যুক্তি বুঝিতে পারি না; তবে আমাদের আনন্দ এই যে, এই ক্ষেত্রে ভারতীয় পাণ্ডিত্য মানবতার কার্যেও প্রযুক্ত হইয়াছে।" উপসংহারে বলিয়াছেন, "এই মানুষটি তাঁহার সমস্ত মনপ্রাণ তাঁহার দেশবাসীর শ্রেষ্ঠ হিতার্থে উৎসর্গ করিয়া-ছেন এবং তাঁহার মানবপ্রীতি ও জ্ঞান উভয়ই গভীর।" বিদ্যাসাগরের মহাপ্রাণতা এবং সেই মহাপ্রাণতার সঙ্গে তাঁহার পাণ্ডিত্যের সম্পর্ক সম্বন্ধে এমন স্পষ্ট ধারণা এক সমসাময়িক বিদেশীর পক্ষে বাস্তবিকই একটু বিস্ময়কর।

যে বৎসর বিদ্যাসাগর German Oriental Society-র সভ্য নির্বাচিত হন সেই বৎসরই মাইকেল তাঁহার কয়েকখানি গ্রন্থ প্যারিসের এক গ্রন্থালয়ে দেখিতে পান। এ বিষয়ে মাইকেল বিদ্যাসাগরকে যাহা লিখিয়াছিলেন, তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে :

I have seen one or two of your **works in a shop in Paris. I** told **the shopkeeper,** "This author is a **great friend of mine". "Ah** Sir", said, he, "we thought he was dead" "God forbid" said I—"His country **and friends cannot** spare him." Fancy this on the banks of the famous Seine.

সীন নদীর তীরে এই পুস্তকবিক্রেতা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যেটুকু জানিতেন তাঁহার দেশের পণ্ডিত সমাজ তাহা হইতে বেশী জানিতেন বলিয়া মনে হয় না। তাই বলিতেছি, ব্রখাউজের এই প্রবন্ধ বিদেশে বিদ্যাসাগর-প্রসঙ্গের এক সুন্দর নিদর্শন

ব্যারিস্টার বোস

শংকর

ভয়ংকর গরম পড়েছিল ক'দিন। পুরোদমে পাখা চালিয়ে চেম্বারে টাইপ করে যাচ্ছিলাম এমন সময় কে যেন জিজ্ঞাসা করল, "সায়েব ভিতরে আছেন নাকি।" আগন্তুকের দিকে চেয়ে দেখলাম। এমন বিচিত্র বেশভূষা সচরাচর চোখে পড়ে না। বিলিতি আদবকায়দা, কিন্তু পরিধানের প্যান্টে অন্তত ডজন খানেক তালি। শার্টের কলার ফেটে প্রায় জামা থেকে আলাদা হয়ে গেছে। জামাটি কবে কাচা হয়েছে ভগবান জানেন। টাই-এর আসল রঙ কেনার সময় কি ছিল বলতে পারব না, তবে তেল ও কাদায় বর্তমানে যে রঙ ধারণ করেছে তা বর্ণনা করার মত ভাষা খুঁজে পাচ্ছি না। জুতো ক্যাম্বিশের হলেও অসংখ্য চামড়ার তালিতে বর্তমানে চামড়ার জুতোর রূপ নিয়েছে।

এমন লোককে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া ঠিক হবে কি না ভাবছি। সাধারণত ভিক্ষার জন্য নানান ধরনের লোক এই সব অফিসে হানা দেয়। আগন্তুকের মুখের দিকে আবার চাইলাম। সমস্ত শরীরে মাংসের লেশমাত্র নেই, একটি দীর্ঘ কঙ্কাল যেন চামড়া দিয়ে ঢাকা। এই শ্রীহীনতার মাঝে নিখুঁতভাবে দাড়ি কামানো।

হাতের জীর্ণ এটাশি কেস্‌টা খুলতে খুলতে আগন্তুক বলল, "আমি সায়েবের বন্ধু।"

অতি কষ্টে হাসি সংবরণ করতে হল। আমাকে নির্বাক দেখে লোকটি তীব্র দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে সামনের চেয়ারে বসল। এটাশি কেসের ভিতর হাত চালিয়ে একটা কার্ড বার করল, কার্ডটিও মালিকের মতই বহু ব্যবহারে মলিন।

কার্ডটি পড়ে নিজের চোখকে বিশ্বাস করতে পারলাম না—

"বি কে বোস বি এ (ক্যান্টাব),
ব্যারিস্টার-এট-ল"

ইনি ব্যারিস্টার? অসম্ভব। চৌরঙ্গী অঞ্চলের সিনেমা-হাউসগুলির সামনে বীণা বাদ্যরত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ভিখারির গোষ্ঠীভুক্ত বলে যাকে আশা করছিলাম তিনি কিনা ব্যারিস্টার! ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে কাজ করে বহু ব্যারিস্টার দেখেছি, অনেকের সঙ্গে পরিচয়ও আছে। কারুর হয় তো ভাল পসার, দু-হাতে টাকা রোজগার করেন, আবার কেউ হয়তো ছমাসে একবার গাউন পরেন। তবু সকলেরই চালচলনে, বেশ-বাসে আভিজাত্যের ছাপ লক্ষ্য করেছি। কিন্তু ব্যারিস্টার বোসের একি রূপ!

ব্যারিস্টার বোস নিজেই ভিতরে চলে গেলেন। কিন্তু একি! সায়েব চেয়ার থেকে উঠে বোসকে অভ্যর্থনা করলেন, আমাকে ডেকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বললেন। কথাবার্তায় বুঝলাম বোসের আগমনে সায়েব আনন্দিত। দুজনের কথাবার্তা অনেকক্ষণ চলল। আমার চেয়ার থেকে সে সব স্পষ্ট শোনা না গেলেও এই শীর্ণকায় গলিত বস্ত্র পরিহিত ভদ্র-লোকের ইংরাজি বলার অপূর্ব ভঙ্গিমায় আরও আশ্চর্য বোধ করলাম।

সায়েবের ঘর থেকে বার হয়ে ব্যারিস্টার বোস আমার সামনে দাঁড়ালেন। সামনের বেঞ্চিতে পা তুলে ক্যাম্বিশের জুতোর ফিতে আঁট করে এটাশি কেস্ নিয়ে বিদায় নিলেন।

"বোসকে দেখলে?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন?

উত্তর দিলাম, "হ্যাঁ"।

আমার কথার ভঙ্গীতে হয়ত সায়েব আমার মনের কথা বুঝলেন, তাই সামান্য হেসে বললেন, "তোমাদের শাস্ত্রেই বলে না, পুরুষের ভাগ্য স্বয়ং দেবতার অজ্ঞাত, মানুষ তো ছার। এমন একদিন ছিল যখন আমরা স্বপ্নেও ভাবতে পারতাম না বোসকে সামান্য কয়েকটি টাকার জন্য দ্বারে দ্বারে ঘুরতে হবে।"

বুঝলাম বোসের অতীত সম্বন্ধে সায়েব অনেক কিছুই জানেন। সেদিন কিন্তু অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি বোসের কথা এড়িয়ে গেলেন।

ব্যারিস্টার বোসের দারিদ্র্যক্লিষ্ট কঙ্কালসার চেহারা ক্রমশ আমার খুবই পরিচিত হয়ে উঠল। এটাশি কেস্ হাতে বোস মাঝে মাঝে চেম্বারে আসতেন। সেই তালিমারা প্যান্ট, তেল চিটচিটে শার্ট ও টাই, সেই ক্যাম্বিশের জুতো, সেই একই ভঙ্গীতে এটাশি কেস্ ও ব্রীফের বান্ডিল নামিয়ে জিজ্ঞাসা—"সায়েব ভিতরে আছেন?" এবং ভিতরে প্রবেশ ও সায়েবের সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা ও প্রস্থান। বুঝতাম প্রস্থানের আগে সায়েব কিছু টাকা দিতেন।

ব্যারিস্টার বোস ইদানীং প্রায়ই চেম্বারে আসতে শুরু করলেন। আগে মাসে হয়ত একবার ব্যারিস্টার বোস দেখা দিতেন, কিন্তু সময়ের ব্যবধান কমতে কমতে সেটি সপ্তাহে দু-তিনবারে দাঁড়াল। বোসের ঘন ঘন উপস্থিতিতে সায়েবের কাজের ক্ষতি হয়। তাঁর এক ঘণ্টার মূল্যে বেশ কয়েক মোহর। বোস একবার এলে সহজে উঠতেন না, কেসের কাগজপত্র ফেলে সায়েবকে কথাবার্তা বলতে হ'ত। অনেক সময় তাঁকে অস্বস্তি অনুভব করতে দেখেছি।

"বোসের কি কোন কাজ নেই?" একদিন সায়েবকে জিজ্ঞাসা করলাম।

ম্লান হেসে সায়েব বললেন, "বেচারা কোন ব্রীফ পায় না।"

"তাহলে ও'র হাতের ব্রীফগুলো কি সবই বাজে?"

"ওগুলো পড়লে দেখবে কোনটির বয়স কুড়ি বছরের কম নয়। ডাক্তারদের স্টেথিসকোপের মত আইনজীবীদের ব্রীফ হাতে রাখতে হয় মক্কেল থাক আর না থাক।"

'বোস আসে কিছু বলতে পারি না। অনেক দিনের পরিচয়। তাছাড়া বিপদে পড়েই আসে। আমি বিদেশী হলেও হয়তো আমিই তার একমাত্র জানা-শোনা লোক, দু-একটা টাকার জন্য বেচারা হয়ত পেটপুরে খেতেও পায় না। তাছাড়া মদ আছে। অনিয়মিত মদ্যপানের বিষক্রিয়ায় বোস ধীরে অথচ নিশ্চিতভাবে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।" কিন্তু একজনের মদের খরচ অপর একজনের পক্ষে চির-কাল বহন করা সম্ভব নয়। বোসের ঘন ঘন আবির্ভাবে অর্থনৈতিক দিক থেকেও সায়েব লজ্জিত হচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত আমি বললাম বোস এবার এলে আভাসে তাঁকে খানিক বুঝিয়ে দেব। সায়েবের নিজের পক্ষে সেটি সম্ভব নয় বলেই সায়েব প্রথমে কিছুতেই রাজী হন না, কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে মত দিলেন।

দারিদ্র্যরোগ ক্যানসারের মত মানুষের মনোবলে ঘুণ ধরিয়ে দেয়। মাথা উঁচু করে হাঁটার শক্তিটুকুও সে শোষণ করে নেয়। বোস কিন্তু এই আইনের ব্যতিক্রম। তাঁর চালচলন ও ব্যবহারে ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি ছিল, কুণ্ঠার লেশমাত্র নেই সেখানে। বোসের সামনা-সামনি আমি নিজেই সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলাম। বোস জিজ্ঞাসা করলেন, "সায়েব আছেন?" যথাসম্ভব মনোবল সঞ্চয় করে বললাম, "হ্যাঁ আছেন, তবে কাজে ব্যস্ত রয়েছেন। যদি কিছু না মনে করেন, আপনার কি প্রয়োজন জানালে সায়েবকে বলতে পারি।"

বোস চমকে উঠলেন। উত্তেজনায় তাঁর হাত থর থর করে কাঁপতে লাগল। "কি বললেন? স্লিপ দিয়ে দেখা করতে হবে?" বোসের স্বর পর্যন্ত কম্পমান। বুঝলাম বোস এই আঘাতের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। বোসের সুপ্ত আত্মসম্মান-বোধ হঠাৎ জেগে উঠল কুম্ভকর্ণের নিদ্রা-ভঙ্গের মত। তিনি আমার দিকে এমন দৃষ্টি হানলেন, মনে হ'ল যেন লক্ষ লক্ষ রঞ্জনরশ্মির তরঙ্গ ভিতরে প্রবেশ করে আমার সবকিছু দেখে নিচ্ছে। অপ্রীতি-কর কথা শোনবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রইলাম।

কিন্তু পরের মুহূর্তে বোসের মুখে চোখে ভয়ঙ্কর পরিবর্তন এল। তাঁর চোখের আগুন যেন দপ করে নিবে গেল। কোন কিছু না বলে এটাশি কেস্ ও ব্রীফের বান্ডিল হাতে তুলে দরজার দিকে পা বাড়ালেন। লজ্জিত কণ্ঠে বললাম, "চলে যাচ্ছেন কেন?"

বোস মুখ ফিরে আর একবার চাইলেন, চোখটা যথাসম্ভব কুঞ্চিত করলেন, কিন্তু কোন উত্তর পেলাম না। শুধু তাঁর দ্রুতবেগে ঘর থেকে নিষ্ক্রমণের শব্দ কানে এসে বাজতে লাগল। সম্বিত ফিরে এলে গভীর বেদনা বোধ করলাম। ব্যারিস্টার বোসকে অপমানের কোন উদ্দেশ্যই আমার ছিল না।

যথাসময়ে সায়েবকে সব বললাম। সায়েব নির্বাক নিস্তব্ধ রইলেন। বুঝলাম মনের গোপন কোণে কোন আঘাত পেয়েছেন, লজ্জিত হয়েছেন। সামনের মোটা আইন বই-এর দিকে শূন্য দৃষ্টিপাত করে বললেন, "বোস চলে গেল? নাঃ, খুব অন্যায় করলাম।"

আমি বললাম, "কোন রূঢ় কথা বলিনি আমি।"

সায়েব মুখের দিকে চাইলেন। "না সে কথা বলছি না। আমার বহুদিনের বন্ধু সে তাই আজ নিজেকে বড় অপরাধী মনে হচ্ছে।"

লোকে বলে আইনজীবীরা অন্য ধাতুতে গড়া। সাধারণের সঙ্গে অনেক বিষয়েই কোন মিল নেই তাঁদের। মোটা মোটা আইন বই-এর পাতায় তাঁদের মন ও প্রাণ দুই-ই চাপা পড়ে থাকে। হিন্দু ল'এর ব্যাখ্যা আর কণ্ট্রাক্ট অ্যাক্টের কোন ধারাকে অবলম্বন করে মান্নালাল সাগরমল বা সোহনলাল বানারসুলালের মামলায় জেতা যায় এই চিন্তাই তাদের সমস্ত মাথা জুড়ে থাকে। স্নেহ-ভালবাসা, বন্ধুবান্ধব, কাব্য-নাটক এমন কি, কন্যা-জায়ারা সেখানে পাত্তা পান না। বিলেতের একজন বিখ্যাত ব্যারিস্টার পরবর্তীকালে ভারতবর্ষের কোন প্রদেশের প্রধান বিচারপতি হয়ে এসেছিলেন। তিনি অবিবাহিত। তাঁর অন্তরঙ্গ এক বন্ধুকে বলেছিলেন যে, যেহেতু তিনি সংসারে স্ত্রী-পুত্রের প্রতি কর্তব্য করার সময়ে পাননি সেইজন্য কোনদিন বিবাহ করা সঙ্গত বোধ করেননি। বিখ্যাত ব্যারিস্টারদের ব্যক্তিগত জীবন বলে কিছু থাকে না। ভোরবেলা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত আইন, জজ, মামলা, মক্কেল ও এটর্নি নিয়েই তাঁদের মশগুল থাকতে হয়। সায়েব কিন্তু আইনের কচকচি, প্লেণ্ট, রিটার্ন স্টেটমেণ্ট ঝগড়া-ঝাটির মধ্যেও নিজের রসিক সত্তাটিকে সযত্নে বাঁচিয়ে এসেছেন। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এই রসঘন উদার ব্যক্তিত্বের অনেক পরিচয় পেয়েছি।

মনের কোণে যে মেঘ জমেছিল তার প্ররোচনায় বোধ করি তিনি ধীরে ধীরে ব্যক্ত করলেন বোসের কাহিনী। হাতে

জ ছিল সেগুলো পাশে সরিয়ে খীলেন, বললেন, এসব তো রোজই আছে।

বোসের সঙ্গে পরিচয় আজকের নয়, াস আমার সহপাঠী। বোসের সঙ্গে ামার প্রথম পরিচয়ও একটু আশ্চর্য ।নের।

তখন আমরা কেম্ব্রিজে পড়ি। ম্ব্রিজের কয়েকজন দুষ্টু ছাত্র মিলে লডগ নামে এক কাগজ বার করত। লডগকে ভয় করত না এমন লোক ম্ব্রিজে তখন ছিল না। মাসের গোড়ায় গেজ বার হবার সময় ছাত্র শিক্ষক সবাই ষ্থ। বুলডগের কামড় কার উপর ড়বে কে জানে।

আমাদের নিজেদের ছোট্ট একটি হিত্য আসর ছিল, বুলডগের নজর য় পর্যন্ত এই আসরটির উপর পড়ল। াসরের কীর্তিকাহিনী ব্যঙ্গ করে বুল-গে যে লেখা বার হ'ল তাতে ছাত্রসমাজে ামাদের মুখ দেখানো দায় হয়ে উঠল, মন কি আসরটি ভাঙ্গতে বসল। বুল-গের উপর ভয়ঙ্কর রাগ হ'ল। ম্পাদকের সঙ্গে দেখা করতে একদিন লডগের অফিসে গেলাম। সম্পাদক ন ক্রফোর্ড আমাদের পাশের কিংস লেজের ছাত্র। উত্তেজনার মাথায় বেশ-ছু শুনিয়ে দিলাম ক্রফোর্ডকে। ক্রফোর্ড সে বলল, "প্রবন্ধটি বিশেষ প্রতিনিধি খিত। একটু অপেক্ষা করো লেখকের গে দেখা হয়ে যাবে।"

কিছুক্ষণ পরে এক সুদর্শন যুবক রে প্রবেশ করল। মিষ্টি হাসিতে সারা খোনি ভরে আছে। দেখেই বুঝলাম শিয়াবাসী, খুব সম্ভবত ভারতীয়। রকান্তি, কালো কুচকুচে চুল, নিখুঁত শবাস। হাতের চওড়া কব্জি দেখলেই নে হয় পাকা স্পোর্টসম্যান।

ক্রফোর্ড পরিচয় করিয়ে দিলেন, "এই ন আপনার লেখক, যা-কিছু বলার কেই বলুন। ইনি মিস্টার বোস, সেণ্ট নের ছাত্র। ইণ্ডিয়া থেকে পড়তে সেছেন।" ক্রফোর্ডের কথায় স্তম্ভিত লাম। ইংরিজী যার মাতৃভাষা নয়, সে তো সুন্দর ইংরিজী লিখতে পারে আর দেশে পড়তে এসে মাথায় এত দুষ্টুমি দ্ধি খেলে!

কথাবার্তায় সম্মোহনী শক্তি ছিল বোসের। দু মিনিটেই ভুলে গেলাম ঝগড়া করতে এসেছি। বোস বললে, "বন্ধ ঘরের মধ্যে বসে ঝগড়া করতে ভাল লাগে না, এসব খোলা মাঠে জমে ভাল।" আমরা দুজনে সোজা চলে এলাম 'বায়রনস্ পুলে'র কাছে। ছাত্রাবস্থায় কবি লর্ড বায়রন এই পুকুরের সামনে বসতেন, কখনো জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসতে হঠাৎ মনে পড়ল আমরা দুজন ঝগড়া করতে এসেছিলাম। বিদায়ের সময় বোস বলল, "আপনার খানিকটা ক্ষতিপূরণ করতে চাই। আমাদের আড্ডার সভ্য হয়ে যান।"

বীরেন বোসের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। ক্রমে ক্রমে পরিচয় অন্তরঙ্গ বন্ধুত্বে রূপান্তরিত হ'ল। বাবার একমাত্র সন্তান বীরেন বোস। বন্ধুবান্ধবের পিছনে দুহাতে টাকা খরচ করে সে। একা কিছু খাওয়া, একা থিয়েটারে যাওয়া বীরেন বোসের কল্পনার অতীত। কোথাও পিকনিক হবে, খাবারের দায়িত্ব বোস জোর করে নিজের উপরে নেবেই। পাঁচটা কি দশটা টাকা আজ বোসের কাছে কতো মূল্যবান অথচ একদিন কথায় কথায় সে দু-তিন পাউণ্ড খরচ করত।

বোস ছবি আঁকে। ঘোড়ায় চড়ে। ছুটির দিনে বন্দুক কাঁধে শিকারে বার হয়। অব্যর্থ তার লক্ষ্য। সারাদিন জলা-জঙ্গলে ঘুরে সন্ধ্যার আগে ফেরে, কাঁধে বেশ কয়েকটা বন্য পাখি। বোস গুন-গুন করে তার নিজের ভাষায় গাইত। আমরা বুঝতাম না, তবু ভাল লাগত। বোসের হস্টেলের ঘরের এক কোণে ছোট্ট কটেজ-পিয়ানো, কত সন্ধ্যায় তার বাজনা শুনেছি। সে বসেছে আমি পিয়ানোর উপর হাত বুলিয়েছি। কতদিন বাজনায় বিভোর হয়ে সময় ভুলে গেছি তারপর হঠাৎ দূরের ট্রিনিটি কলেজের ভারী পুরুষালী স্বরের ঘণ্টা শুনে চমকে উঠেছি, রাত অনেক। বোস তখনও বিভোর, সুরের মূর্চ্ছনায় সম্পূর্ণ মগ্ন। কোনদিন বা কাব্যচর্চা, বায়রন, শেলী কিংবা কীটস্।

বীরেন বোসের আর এক রূপ ছিল, সেটি কলেজের পড়াশুনার বাইরের রূপ। যত রাজ্যের দুষ্টুমি বুদ্ধি তখন তার মাথায় খেলে যায়। কোন কিছু বুদ্ধি বা মতলবের দরকার হলে বন্ধুবান্ধবরা তার পরামর্শ নিতো। বোস আমাদের বলত, "ভেবেছিলাম বিলেত থেকে ব্যারিস্টারি শিখে দেশে প্র্যাক্টিস্ করব। এখন

দেখছি ইচ্ছে করলে এখানেই ব্যবসা ফাঁদতে পারি।”

বোসের বহু কীর্তির মধ্যে একটি আজও আমার বেশ মনে পড়ে। ডক্টর ডেভিস ছিলেন ল্যাটিনের প্রধান অধ্যাপক। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি জগৎ-জোড়া, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে যা হয়, অধ্যাপক হিসাবে তিনি একেবারে ব্যর্থ। মানুষ হিসাবে কিন্তু তাঁর তুলনা হয় না। অবিবাহিত অধ্যাপকের সংসারে কোন আকর্ষণ নেই। ছাত্রদের কিসে উপকার হয়, কিভাবে তাদের সাহায্য করা যায় এই চিন্তায় বিভোর। ছাত্রদের উপকার করার অদম্য আগ্রহে অধ্যাপক ডেভিস মাঝে মাঝে উদ্ভট কিছু করে বসতেন।

একবার ডক্টর ডেভিসের মাথায় ঢুকলো যে তাঁর ছাত্রদের জ্যাম ও জেলির পিছনে অনেক খরচ করতে হয়। অধ্যাপক ডেভিস তৎক্ষণাৎ সুলভ মূল্যে ছাত্রদের জন্য জেলি তৈরি করতে মনস্থ করলেন। ল্যাটিনের অধ্যাপক আহার নিদ্রা ত্যাগ করে জেলি তৈরির নানান মশলা নিয়ে রান্নাঘরে রাতের পর রাত কাটাতে লাগলেন। কটু গন্ধে চারিদিক ভরপুর হয়ে উঠলো, অধ্যাপক কিন্তু অবিচলিত। মোটা মোটা বই নিয়ে তিনি রান্নাঘরে বসে আর সামনের কড়াইয়ে জেলি তৈরি হচ্ছে। কোন বাধাই তিনি মানবেন না, বাজারের জেলির পিছনে ছাত্রদের অপচয় বন্ধ করতেই হবে।

অবশেষে অধ্যাপক ডেভিসের জেলি আণ্ডার গ্র্যাজুয়েট বাজারে বেরুলো। অতি সুলভ মূল্য, মাত্র এক পেনীতে এক শিশি। শুধু তাই নয়, অধ্যাপক ডেভিস নিজে প্রত্যেক হস্টেল ঘুরে দেখতে লাগলেন ছাত্ররা এখনও অন্য কোন জেলি ব্যবহার করছে কি না।

অধ্যাপক ডেভিসের জেলি স্বাদে ও গন্ধে শুধু অতুলনীয় নয় অভোজ্য। এই দুর্গন্ধময় জেলির হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কয়েক জন ছাত্র শেষ পর্যন্ত বোসের শরণাপন্ন হ'ল। বোস সব কিছু শুনে অতি গোপনে তাদের কি সব মন্ত্রণা দিল গোড়ায় আমরা কিছুই জানতে পারিনি।

দিন দশেক পরে সমস্ত কেম্ব্রিজ শহর সেদিনের প্রভাতী সংবাদপত্রে অবাক হয়ে এই বিজ্ঞাপনটি পড়ল ঃ

> “কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ল্যাটিনের প্রধান অধ্যাপক ডক্টর জন ডেভিস এতদ্দ্বারা সর্বসমক্ষে বিখ্যাত জেলি প্রস্তুতকারক মেসার্স কাইলার এণ্ড কোম্পানির নিকট উক্ত কোম্পানির ছাপমারা শিশিতে নকল জেলি বিক্রয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ও অঙ্গীকার করিতেছি যে, ভবিষ্যতে কখনও এইরূপ কাজ করিব না।”

পরে অনুসন্ধান করে সমস্ত জানলাম। অধ্যাপক ডেভিস জেলি তৈরির পর খেয়াল করলেন যে জেলি রাখার জন্য কোন শিশি আনা হয়নি। তাঁর ঝি তখন কাছাকাছি হস্টেলের যত খালি শিশি আছে নিয়ে আসে। দুর্ভাগ্যক্রমে শিশি-গুলো কাইলার এণ্ড কোম্পানীর নামাঙ্কিত। বুঝলাম, এই খবরটুকুই কাইলার এণ্ড কোম্পানীকে জানিয়ে দেওয়ার বুদ্ধি বোস সেদিন দিয়েছিল।

কেম্ব্রিজের পাঠ শেষ করে আমরা দুজনেই ব্যারিস্টারি পড়তে লণ্ডনে এলাম। আমি গেলাম ইনার টেম্পলে, বোস লিংকনস্ ইনে। বেশীরভাগ ভারতীয় ছাত্রই লিংকনস্ ইনে যেতো সেই সময়।

বোসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কমে এল, তবে একেবারে সম্পর্কচ্ছেদ নয়। পত্রালাপ তো ছিলই, তাছাড়া ছুটি-ছাটায় বোস আমার ফ্ল্যাটে আসত, আমিও মাঝে মাঝে গিয়েছি বোসের কাছে। বোস আতিথ্যের কোন ত্রুটি রাখত না। খাওয়া-দাওয়া, এমন কি প্রায়ই থিয়েটারের টিকিট কাটা, কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করিনি। সেই চিরপরিচিত সদাহাস্যময় আনন্দের প্রস্রবণ তার চোখে মুখে সব সময় জেগে আছে। আমরা গল্প করেছি, কবিতা পড়েছি, বোসের ভারতবর্ষের শিকার কাহিনী শুনেছি।

ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান পত্রিকার বিশেষ প্রতিনিধির কাজ পেয়ে এক ছুটির সময় আমাকে জার্মানিতে ছুটতে হ'ল। সমস্ত জার্মানি পরিভ্রমণ করে মাস কয়েক পরে লণ্ডনে ফিরে এলাম। ইতিমধ্যে বোসের কোন সংবাদ রাখতে পারিনি, তাই সুযোগ পেয়েই দেখা করতে গেলাম। প্রথম দর্শনেই চমকে উঠলাম। বোসকে একেবারে অন্য মানুষ মনে হচ্ছে। আগেকার মত আমাকে দেখে উল্লাসে চীৎকার করে উঠল না, মুখে চোখে অত্যধিক গাম্ভীর্যের ছাপ। বেশ অস্বস্তি বোধ হতে লাগল। মামুলি কথাবার্তার পর সেদিনের মত বিদায় নিলাম।

কিছুদিনের মধ্যেই এক সন্ধ্যায় বোস আমার ফ্ল্যাটে দর্শন দিল। রাত্রের মত তাকে থেকে যেতে বললাম, বোস সহজেই রাজী হ'ল। ইতিমধ্যে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় দুজনেই সাফল্য লাভ করেছি। ডিনার খেয়ে আমরা আগুনের সামনে এসে বসলাম। দুজনের মুখেই পাইপ। প্রথমে কোন কথা নেই শুধু পাইপের ধোঁয়ায় ড্রইংরুমের আলোটা ক্রমশ নিস্তেজ হয়ে পড়ছে। বোস অবশেষে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞাসা করল ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি কি প্ল্যান করছি। বললাম এখনও ঠিক করে উঠতে পারিনি, খুব সম্ভবত ব্যারিস্টারী করব না। ক্রমশ আলোচনা জমে উঠল। বিষয় অনেক— কেম্ব্রিজের ছাত্রজীবন, আমার জার্মানি

ণ্ ইত্যাদি। হঠাৎ বোস বলে উঠল, াজ কেন এলাম জান?"

উত্তর দিলাম, "না, কেন?"

বোস আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। াট্ থেমে বুকপকেট থেকে একটা ছবি । করে সামনে ধরল, "চিনতে পার?"

চিনতে না পারার কোন কারণ নেই। স যাঁদের বাড়িতে পেইং গেস্ট সেই ন্টার এণ্ড মিসেস ডেভেনহামের মেয়ে মলি।

বোসের পকেটে এমিলি ডেভেনহামের ব আমাকে অবাক করল। আরও অবাক াম যখন আমার পিঠে একটা হাত খে বোস বলল, 'এমিলি ও আমি বিয়ে রছি। আমাদের দেশে বাপ-মায়ের ুতে বিয়ে করাটা রীতি নয়, হয়ত নেক গঞ্জনা সইতে হবে। মা বেঁচে কলে হয়ত কান্নাকাটি করতেন, তিনি বশ্য অনেক কাল চোখ বুজেছেন। াঃ? সে যা হয় হবে।"

করমর্দনের জন্য হাত বাড়িয়ে লাম, "কংগ্রাচুলেসন্স, এই তো োচিত কার্য।"

বোসের মুখে তোমাদের কচ ও যানীর গল্প শুনেছিলাম সেদিন, রি সুন্দর কাহিনী। সর্বদেশের শিষ্য গুরুকন্যাদের কাহিনী। গুরুগৃহে ক্ষা সমাপ্ত করে বিদায় নেবার কাল াগত, কচ গুরুকন্যা দেবযানীর কাছে য় দেখা করতে এলেন। 'দেবযানী মার যাবার সময় হয়েছে তাই দেখা রতে এলাম।' দেবযানী মধুকণ্ঠে জ্ঞাসা করলেন, 'তোমার সকল অভিলাষ র্ণ হয়েছে তো?' দেবযানীর প্রশ্নের িগত কচ ধরতে পারলেন না, তাই ললেন, 'হ্যাঁ সুন্দরী, আমার জীবন ার্থ। আমার মাঝে কোন দৈন্য, কোন নতা নেই। আমার সকল আশা রিতার্থ।' অভিমানিনী গুরুকন্যা তখন ে করিয়ে দিলেন, 'হে উদারদর্শন যুবক ভবে দেখ কত উষায়, কত জ্যোৎস্নায়, ত অমানিশায় এই পুষ্পগন্ধ ঘন বনে ুমি আমার প্রতি সলজ্জ দৃষ্টি হেনেছ। স কি আমি দেখিনি? আমার হৃদয়ও ক সাথে সাথে কেঁপে ওঠেনি?'

পৃথিবীর সব কচ ও দেবযানীর কাহিনীই অভিশাপ বর্ষণে শেষ হয় না, কচের প্রশস্ত ও উষ্ণ বক্ষে ব্রীড়াবিধুরা দেবযানীরা অনেক সময় ঝাঁপিয়ে পড়ে।

বীরেন বোস ও এমিলি ডেভেনহামের প্রণয় কাহিনী কচ ও দেবযানীরই উপাখ্যান। তবুও আমার কেমন আশ্চর্য মনে হয়েছে। এমিলি ডেভেনহাম কুৎসিত না হলেও সুন্দরী নন। একদা কেম্ব্রিজে এই বীরেন বোস অনেক সুন্দরী ইংরেজ তরুণীর জীবনে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে এসেছেন, আগুনের দিকে পতঙ্গের মত লিউলহাম কলেজের কয়েকজন সুন্দরী ও সম্বংশজাত তরুণী বীরেন বোসের কক্ষপথে এসেছে। বীরেন বোস নির্বিকার। বীরেন বোস বেরিল হিউমকে প্রত্যাখ্যান করেছে নিষ্ঠুরভাবে, হৃদয়হীনভাবে। ভেরনিকা সাদারল্যাণ্ডকে মরমে আঘাত দিয়ে প্রত্যাখান করেছে। বেরিল হিউম ভেরনিকা সাদারল্যাণ্ড চোখের জলে রুমাল সিক্ত করেছে, বীরেন বোস বলেছে জীবনটাকে স্পোর্টসম্যানের মত নিতে শিখতে হবে। জয়-পরাজয়ে কী আসে যায়?

বীরেন বোসের এই ব্যবহারের কারণ অনুসন্ধান করবার চেষ্টা কোনদিন করিনি, তাই বীরেন বোসের আত্মসমর্পণে অবাক হয়েছি। তবুও বীরেন বোস ও এমিলি ডেভেনহামের বিয়েতে যোগ দিয়েছি। এর কিছুদিন পরেই সস্ত্রীক বীরেন বোস ভারতবর্ষের পথে রওনা হয়ে যান।

বীরেন বোসের আর কোন সংবাদ পাইনি। ব্যারিস্টারী না করে সাংবাদিকতা শুরু করলাম। তারপর মহাযুদ্ধ বাধতে বহুজনের মত কলম ফেলে বন্দুক হাতে করলাম। যুদ্ধশেষে অক্সফোর্ড ও ব্যাকিংহামশায়ার রেজিমেণ্টের কর্নেলরূপে ভারতবর্ষে পাড়ি দেবার আহ্বান এল। সে অনেক কথা।

বছর কয়েক বোম্বাই ফৈজাবাদ প্রভৃতি জায়গা ঘুরে অবশেষে একদিন কলকাতায় বদলি হলাম। ব্যারিস্টারী করার বিশেষ ইচ্ছা আগে ছিল না। কিন্তু ভাগ্যের লিখন, কয়েকজন বিচারক বন্ধুর উপদেশে সৈন্যবাহিনী হতে অবসর নিয়ে প্র্যাকটিস্ শুরু করলাম।

হাইকোর্টের করিডোরে একদিন হঠাৎ বোসের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। আমি চিনতে পারিনি, বোসই আমাকে ডাকল। চিনতে পারবই বা কি করে? শরীরের কিছুই নেই। কোথায় সেই কাঁচা সোনার মত রঙ, সমস্ত মুখে অস্বাভাবিক ক্লান্তির ছাপ। দু-একটা কথা বলেই বোস বিদায় নিল, বুঝলাম সে আমাকে এড়াতে চায়। সত্যি বলতে কি, পুরোন বন্ধুর এমন ব্যবহারে অপমানিত বোধ করলাম।

ক্রমশ সব প্রকাশিত হ'ল। বোস হাইকোর্টে কোনো পসার করতে পারেনি। তোমরা যাকে বল 'ব্রীফবিহীন' ব্যারিস্টার বোসের অবস্থা ঠিক তাই। ইংরিজীতে বলে ব্যারিস্টারদের দুটি শ্রেণী। এক শ্রেণীর ব্যারিস্টাররা এক হাতে গাউন জড়িয়ে মক্কেল ও এটর্নির পিছনে ছোটেন কেস পাবার লোভে, অন্য শ্রেণীতে মক্কেল ও এটর্নি ব্রীফ নিয়ে ব্যারিস্টারের পিছনে ছুটতে থাকে আর বলে, যত মোহর চান দেব, দয়া করে কেসটা নিন।

বোসের মত প্রতিভাবান ছাত্রের আদালতে ব্যর্থতার কোন কারণ খুঁজে পেলাম না। রহস্য মোচন করা একমাত্র বোসের পক্ষেই সম্ভব, তাই এক রকম জোর করেই বোসকে এক রাত্রে ডিনারে

আনলাম। ডিনার টেবিলে বোস নির্বাক নিস্তব্ধ। বহু বর্ষ আগে লণ্ডনের আর একটি এমনি সন্ধ্যার কথা মনে করিয়ে দেয়। ডিনার শেষে আমরা বারান্দায় এসে বসলাম মুখোমুখি। আজ কিন্তু কারুর মুখে পাইপ নেই। আমি ধূম-পানের সঙ্গে সকল সম্পর্ক ত্যাগ করেছি, বোসের ধূমপান না করার কারণ বলতে পারব না। চাঁদের স্তিমিত আলোয় বোসের করুণ কাহিনী শুনতে হলো আমাকে।

এ কাহিনীকে বোসের কাহিনী না বলে এমিলি ডেভেনহামের কাহিনী আখ্যা দেওয়া ভালো। কলকাতায় এসে লণ্ডনের এমিলি বোসের স্বরূপ প্রকাশ পেল; বোসের বাবা তাদের ঘরে স্থান দেননি। তবে বলেছিলেন, "অন্য জায়গায় থাকো, যা খরচ নাগে দেব।" এর নাম কলকাতা! এমিলি একেবারে হতাশ। এর জন্যেই বিলেত থেকে চলে এসেছে নাকি? এমিলি ভেবেছিল স্বামী তাকে রাজ-প্রাসাদে রাখবেন, রোলস রয়েসে রেড্ রোডে হাওয়া খেতে নিয়ে যাবেন, মাস-খানেক অন্তর কলকাতা থেকে প্রস্থান করে গোপালপুরের সমুদ্রতীরে রঙগীন ছাতার তলায় বসে দুজনে ক্যাডবেরির চকোলেট চুষবেন, মুসোরী বা ডালহৌসী পাহাড়ে দুজনে লুকোচুরি খেলবেন পাহাড়ের কোণে কোণে। এমিলি বোস বুঝল তা আর সম্ভব হবে না। হতাশ ও ব্যর্থতার শোকে উচ্ছৃঙ্খলতার পাগলা স্রোতে এমিলি নিজেকে ভাসিয়ে দিল। বোসের সাধ্য কি তাকে রক্ষা করে। অনেক রাতে এমিলি যখন ক্লাব থেকে ফেরে, ট্যাক্সি থেকে ঘর পর্যন্ত আসার ক্ষমতা থাকে না, মদে বেহুঁশ। বোস অনেক বোঝাবার চেষ্টা করে, ক্লাবে যেতে বারণ করে, এমিলি মুখ বেঁকিয়ে বলে, "আমি কি তোমার হিন্দু ওয়াইফ যে ঘরের কোণে প্যাকিং বাক্সর মত বসে থাকব?"

তবুও বোস হতাশ হয় না। এমিলির কটূক্তি অসুস্থ প্রিয়জনের প্রলাপ বলে মনে করার চেষ্টা করে। দিন কাটে। বোস জীবনের শ্যামলতা আর দেখতে পায় না। মনে হয় সব মেকি সব নিরর্থক। মানুষের মন যতই দৃঢ় হোক, তার প্রতিভা যতই সবল হোক, নিরন্তর আঘাতে তারও পতন অবশ্যম্ভাবী। সংসারের শান্তি পুরুষের পক্ষে অপরিহার্য। সংসারের বাইরে নির্মম জীবন-দেবতার সঙ্গে যাকে প্রতিমুহূর্তে সংগ্রাম করতে হবে অন্দরমহলে তার প্রয়োজন অখণ্ড শান্তি ও অনুপ্রেরণা। অভাবে ফল সুখপ্রদ হয় না। অশান্তি-ক্লিষ্ট বীরেন বোসও অন্য পাঁচজনের মত ধ্বংসের পথে পা বাড়ালেন, নিজের স্ত্রীর সাথে মিতালি পাতাতে অসমর্থ হয়ে বীরেন বোস মিতালি পাতালেন মদের পেয়ালার সাথে।

বড় ব্যারিস্টার হবার জন্য যে সব গুণের প্রয়োজন বীরেন বোসের সবই ছিল, কিন্তু সিদ্ধির জন্য প্রয়োজন একাগ্র সাধনা, একনিষ্ঠ পরিশ্রম। নিম্নতর প্রতিভা নিয়ে বোসের সমাসাময়িক অনেকেই হাইকোর্টে সুনাম ও অর্থের অধিকারী হলেন, কিন্তু তাঁরা যখন মক্কেলের মামলা হৃদয়ঙ্গম করার জন্য ব্রীফের পাতায় লাল ও নীল রঙের পেন্সিলের দাগ দেন, বোস তখন সুরার ঝোঁকে লাল ও নীল রঙের খেলা দেখেন। তাঁরা যখন প্রয়োজনীয় নজীরের সন্ধানে কিংসবেঞ্চ, কুইন্স বেঞ্চ ও এ-আই-আরের পাতা তল্লাসী করেন, বোস তখন বায়রনের পাতা ওল্টায়।

এমিলি বোসের অন্তরে সামান্যতম দায়িত্বজ্ঞানের উদয়ও বোসকে এই নিশ্চিত পতন হতে রক্ষা করতে পারত, কিন্তু তা হবার নয়। বোসের পৈতৃক সম্পদ এক-প্রকার নিঃশেষ করে এমিলি বোস এখান-কার এক পাটকলের জনৈক ইংরেজ-নন্দনের কণ্ঠলগ্না হলেন এবং যথাসময়ে তারই অঙ্কশায়িনী হয়ে স্বদেশে প্রস্থান করলেন।

কালের গতিতে বোসও একদিন সম্বিত ফিরে পেলেন, কিন্তু বড় দেরিতে। চোখ খুলে দেখলেন পৈতৃক বাড়িটি ছাড়া আর সবই লোকসানের অঙ্কে। লাভের অঙ্কে যকৃতের ব্যাধি। অনুতপ্ত বোস নতুন জীবনযাপন করতে মনস্থ করলেন, পূর্ণ উদ্দীপনা নিয়ে ব্যারিস্টারী করতে সঙ্কল্প নিলেন। কিন্তু এক্ষেত্রে সঙ্কল্প ও সিদ্ধির দূরত্ব অনতিক্রম্য। ব্রীফবিহীন ব্যারিস্টারদের পাকা খাতায় বীরেন বোসের নাম ইতিপূর্বেই লেখা হয়ে গিয়েছিল, অপ্রকৃতিস্থ মদ্যপকে কোন এটর্নিই কেস দিতে চান না। আর যাই হোক, মক্কেলের স্বার্থ তাঁকে দেখতে হবে তো। ফলে এগারটা থেকে চারটা পর্যন্ত বারলাইব্রেরীতে দিবানিদ্রা ছাড়া বোসের আর কিছু করার রইল না। বন্ধ্যা নারীর সন্তান লাভের মত বীরেন বোসের ব্রীফ লাভ স্বপ্নেই রয়ে গেল।

পত্রপুষ্পেভরা বৃক্ষে শীতের আগমনে ক্ষয় শুরু হয়, একে একে ঝরে পড়ে প্রতিটি পাতা। শুধু শাখাপ্রশাখার দল কঙ্কালের মত বীভৎস রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বীরেন বোসেরও তাই, তার জীবনযাত্রার ব্যারোমিটারের পারা ক্রমশ নিচের দিকে নামতে শুরু করল। এক-কালে বীরেন বোস র‍্যাঙ্কিন ছাড়া সুট পরতেন না। ক্রমশ র‍্যাঙ্কিন ছেড়ে ওয়াছেল মোল্লা ধরলেন, অবশেষে সেখান থেকে পতিত হয়ে হাওড়া হাটের জামা পরতে শুরু করলেন। সে জামাতেও ক্রমশ তালি পড়তে লাগল একের পর এক। মোটর ছেড়ে ট্যাক্সি, ট্যাক্সি ছেড়ে বাস্। সায়েব চুপ করলেন। কয়েক মুহূর্ত পরে আবার বললেন, "বোস কিন্তু কখনও আমার কাছে হাত পাতেনি। প্রকারান্তরে বুঝতে পেরে আমিই কিছু কিছু দিয়েছি।"

"বোসকে আমি খুব ভালভাবে জানি। আর কখনও সে আসবে না। ভাবতে লজ্জা লাগছে বহুবার যে বন্ধুর আতিথ্য গ্রহণ করেছি, ঘটনাচক্রে তার মনেই আঘাত দিলাম।"

অজানিতে আমার নিজের মনের কাণে বেদনার ছায়া নেমে এল।

সেদিনই ফিরবার পথে কাউন্সিল হাউস স্ট্রীট দিয়ে যাবার সময় ব্যারিস্টার বোসের দর্শন পেলাম। শালপাতার ঠোঙ্গা হাতে ছোলা আর মটর সিদ্ধ চিবোতে চিবোতে ধীরে ধীরে চলেছেন। চলার গতি কমিয়ে দিলাম, দেখা দিয়ে ওঁকে লজ্জা দিতে চাই না। আর একটু এগিয়ে এসে একটা ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাস কামরায় উঠলেন একদা কেম্ব্রিজের প্রতিভাবান ছাত্র ব্যারিস্টার বীরেন বোস।

৩০

'মশাই দেখছি ডুমুরের ফুল হয়ে গেছেন। সেই যে গালটি একবার দেখিয়ে স'রে পড়লেন আর দর্শন নেই।'

পাঁচু ভাদুড়ী শিবনাথের হাত চেপে ধরে জোরে। তার দরজার সামনে দিয়ে শিবনাথ বাঁ-দিকের গলিতে রমেশের চা-এর দোকানে চা খেতে যাচ্ছিল।

'না ভেবেছি, আজ আর না, কাল সন্ধ্যার দিকে এসে মাথা ও মুখটা সাফ করব।'

'আচ্ছা লোক আপনি!' আক্ষেপের সুরে পাঁচু ভাদুড়ী বলল, 'আমরা সেলুন খুলেছি ব'লে কি সারাক্ষণ ঐসব চিন্তা করছি ঠাউরেছেন নাকি। কেন, দেশের কথা, ফাইভ ইয়ার প্ল্যান নিয়ে দু'টো চারটে কথা বলার উপযুক্ত নই ব'লে ঘেন্না করেন বুঝি।'

'না না ছি!' শিবনাথ এভাবে আক্রান্ত হবে বুঝতে পারেনি। 'কাজে কর্মে ব্যস্ত তাই—'

'সকালে ডেলি পেপারখানা আমরাও একটু আধটু দেখি স্যার, একেবারে ক্ষুর কাঁচি নিয়ে পড়ে থাকি যদি মনে করেন অবিচার করা হবে হা হা—' পাঁচু হাসল।

'না না সে আমি কখনো মনে করি না। কি ব্যাপার?' শিবনাথ আর হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা করল না।

'আসুন স্যার, ভিতরে আসুন। আপনাকে একটু দরকার।'

শিবনাথ প্রায় ঘেমে উঠল। কিন্তু উপায় নেই। এই পরিবেশে যতক্ষণ আছে এদের একেবারে এড়িয়ে চলা শক্ত। পাঁচুর সঙ্গে সে 'উর্বশী হেয়ার কাটিং সেলুনে' ঢুকল।

'বসুন স্যার এই চেয়ারটায় বসুন।'

পাঁচু আঙুল দিয়ে যে চেয়ারে বসে লোকে চুল কাটে, দাঁড়ি কামায় তারই একটা দেখিয়ে দিল। শিবনাথ বসে লক্ষ্য করল ওধারে আর একটা উঁচু চেয়ারে বিধু মাস্টার বসে আছে। মাথায় হাত দিয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে কিছু ভাবছে মনে হয়।

'সিগারেট খান।'

পাঁচুর বাড়িয়ে দেওয়া প্যাকেট থেকে শিবনাথ একটা সিগারেট তুলল। 'কি খবর, কি ব্যাপার, আমাকে দরকার হ'ল হঠাৎ?'

ওধার থেকে বিধু বলল, 'আর কে আছে বাড়িতে বলুন। এসব বিষয়ে কনসাল্ট করতে কি আর ছাগল গরুকে ডাকব। তা'ছাড়া শেখর ডাক্তার তো মেয়ের মামলা নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছে, শুনেছেন স্যার?'

'হ্যাঁ, একটু একটু কানে এসেছে—' শিবনাথের বলার ইচ্ছা ছিল না তবু বলতে হ'ল। এধার থেকে পাঁচু বলল, 'অবশ্য ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যাপারে আমি রমেশের সঙ্গেও পরামর্শ করতে পারতাম, কিন্তু জানেন তো, বলেছি আপনাকে হারামজাদার সঙ্গে আমার কী সম্পর্ক। শালার ছায়া মাড়াতে আমার ঘেন্না হয় মশায়, বলব কি—'

'আহা, তুমি ওর কথা আবার বলছ কেন? চোর। ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার নাম্বার ওয়ান। যদি মহা সম্ভাবও থাকত তোমাদের মধ্যে, দুষ্ট বুদ্ধি ছাড়া আর কিছু দিত না, পাঁচু; আমি হলপ ক'রে বলতে পারি।'

পাঁচু কথা বলল না।

'আপনি কি বলাইকে দেখেছেন, আজ বা কাল? রাতারাতি ব্যাটার চেহারা পাল্টে গেছে লক্ষ্য করেন নি?'

'না তো।' শিবনাথ একটা শুকনো ঢোক গিলল ও মৃদু হেসে প্রশ্ন করল, 'কাজকর্মের কিছু সুবিধা করেছে বুঝি?'

'বলছে না। কিন্তু আই ডাউট সামথিং, বুঝলেন মশায়। ওর গায়ে নতুন শার্ট, পায়ে নতুন চটি। পরশুও ছেঁড়া গেঞ্জি, ছেঁড়া লুঙ্গি ছিল আপনার চোখে পড়েছে নিশ্চয়।' বিধু মাস্টার তার দাড়ির জঙ্গলে হাত বুলিয়ে বলল, 'দু'দিন ধরে দেখছি তৃপ্তি-নিকেতনের সামনে দিয়ে যেতে আসতে বলাইটা রমেশের সঙ্গে কি যেন ফিসফাস গুজুর গাজুর করছে।'

'মাস্টারের যেমন কথা।' এবার পাঁচু মুখ খুলল, 'এ বাজারে দু' চার আনার সাবান বেগুন বেচে কেউ পেট চালাতে পারে না। তা-ও কি একটা। তিনটা মুখ। তা রমেশ যদি ওকে বড়রকমের একটা ব্যবসা-বাণিজ্যে টেনে নেয় তো হিংসা করার আছে কি। তবু খেয়ে বাঁচুক। অমলের যেমন দশা হয়েছে। কোথায় গেছে ও? ঘোলপাড়ায়। বলাই-চরণকেও আমরা হারাতুম। তা ওর রমেশবাবা যদি ওকে রক্ষা করে মন্দ কি, কি বলেন স্যার?' কাটা ঠোঁট ফাঁক ক'রে পাঁচু হাসে। শিবনাথ নীরব। ক্লান্ত, সত্যি ভীষণ ক্লান্তিবোধ করছিল সে এদের এ সমস্ত কথাবার্তা, অমল বলাই কি রমেশ সংক্রান্ত নিন্দাবাদ শুনে। কিন্তু হুট্ ক'রে উঠে পড়ার উপায়ও ছিল না। অগত্যা নিরুপায় হয়ে সে সময় দেখতে এদিক ওদিক তাকায়। পাঁচুর সেলুনে সব আছে, ঘড়ি নেই।

'মশায়, সে-কথাই এতক্ষণ বোঝাচ্ছিলাম পাঁচু ভায়াকে। ওপরের ঘরখানা কাউকে ভাড়াটাড়া না দিয়ে সে নিজেই রাখুক। এবং আমি ক্রমাগত দু'দিন চিন্তা ক'রে ওকে যে বুদ্ধিটা দিলুম তা'তে সে মোটেই সাহস পাচ্ছে না। বলছে, চলবে না—'

'কি বুদ্ধি' প্রশ্নটা মুখ দিয়ে বার করল না শিবনাথ। একটু উৎসুকভাবে সে মাস্টারের মুখের দিকে তাকাল। পাঁচু শিবনাথের দিকে তাকিয়ে হাসছিল। 'আমি কি আর কাউকে ডেকে আনছি ঘর ভাড়া দিতে, বুঝেছেন স্যার? যেন খবর পেয়ে মাছির মত সব উড়ে এসে আমায় ছেঁকে ধরছে। পঞ্চাননতলার রাখহরি সরখেল বলছিল আমায় দাও, ষাট টাকা সেলামী নাও, আমি আমার বেহালা হারমোনিয়ামের দোকান ওদিক থেকে তুলে এদিকে নিয়ে আসি, সেখানে সুবিধা হচ্ছে না, চিংড়িঘাটার তারিণী চক্রবর্তী চেয়েছিল এ্যালোপ্যাথি ওষুধের দোকান খুলতে, নব্বুই টাকা সেলামী সাধল, মঠপুকুরের মোহন চাইছে এটাকে তার দাঁত তোলাই বাঁধাই-এর চেম্বার করতে, পাগলাডাঙার সেই চাঁদসীর ডাক্তার কি যেন নাম, ওপরের একখানা ঘরের জন্যে তিনবার এসে ঘুরে গেছে দু' মাসের এ্যাড্‌ভান্স ভাড়া নিয়ে।'

পাঁচু থামতে বিধু মাস্টার বলল, 'আরো বল, থামলে কেন, সেই যে চিনা-বাজারের সোনার দাঁত পরা বুড়ো চিনাটা কত টাকা যেন সেলামী সেধেছিল? সলভেণ্ট পার্টি, কিন্তু পাঁচু ভায়া তাকেও বিদায় ক'রে দিলে এক কথা বলে।'

কি কথা, যেন জানতে উৎসুকভাবে শিবনাথ পাঁচুর দিতে তাকায়। পাঁচু কিছু বলে না। নতুন সিগারেট ধরিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে মুখ ক'রে কি ভাবে। পাঁচুর হয়ে বিধু বলল, 'এক কথা ভায়ার আমারঃ সেলামীর টাকা বিষ্ঠা, ও আমি হাত দিয়ে ছুঁই না। আমার কি রোজগারে ভাঁটা পড়েছে যে, ইয়ে নিয়ে হাত কালো করব। দেখুন দেখুন, শিবনাথবাবু, আজও যে পৃথিবীতে ধর্ম আছে, চন্দ্র-সূর্য ওঠে পাঁচু তার বড় প্রমাণ। না পাঁচুর সামনেই আমি বলি, মদ থাক আর ইয়ে বাড়ি যাক, পাঁচুর অন্তরটা মহৎ, সে যে কত খাঁটি আমি তার পরিচয় পেয়েছি। চোখের সামনে তো দেখলাম, সাধারণ একটা ঘরভাড়া দেয়ার ব্যাপারে—'

যেন প্রশংসার উচ্ছ্বাসে মাস্টারের চোখে জল এসে গেল। দরজা থেকে স'রে এসে পাঁচু শিবনাথের সামনে দাঁড়ায়। শিবনাথ উঠি উঠি ক'রে উঠতে পারছে না।

'যাকগে, আসল কথা বলি আপনাকে শিবনাথবাবু, পাঁচু যদি একান্তই এখন কাউকে ঘর না দেয় আমি বলছিলাম কি, উঠতি অঞ্চল, লোকজনের বিলাস-ব্যসনও বেড়েছে খুব, শহরে অবশ্য এর অভাব নেই, ক্যানেল সাউথ রোডে আজ যদি একটা ম্যাসেজ ক্লিনিক খোলা যায় ভাল চলে। এ-সম্পর্কে আপনার কি অভিমত?'

শিবনাথ ফ্যাল ফ্যাল চোখে বুড়ো মাস্টারের দিকে তাকিয়ে রইল। বিধু মাস্টার হেসে মাথা নেড়ে বলল, 'কাল রাত্রে আইডিয়াটা আমার মাথায় এল। চামেলীকে পড়িয়ে ওখান থেকে বেরিয়ে, বুঝেছেন শিবনাথবাবু, খালপাড় ধ'রে হাঁটছি আর প্রবলেম্‌স অব প্রেজেণ্ট ডেজ—এই ধরুন খাওয়া-পরার কষ্ট, জিনিসপত্রের মহার্ঘতা, দেশের বেকার সমস্যা, কুটির শিল্প ইত্যাদি হাজারটা ভাবনা আমার মাথায় কুট কুট করছিল, এমন সময় হঠাৎ খেয়াল হ'ল আমাদের এ-অঞ্চলে ডাইং ক্লিনিং, চুল কাটার সেলুন আছে, সিনেমা-হাউস, রেস্টুরেণ্ট ইত্যাদিও দিন দিন বাড়ছে, কিন্তু অবশ্য আমি পাঁচুকে বলছি না যে, আমার সাজেশানটা চূড়ান্ত, এ-সম্পর্কে তুমি আরো দু' একজন ভাল লোকের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে দ্যাখো, আমার তো মনে হয় ওপরের কামরাটায় একটা ম্যাসেজ-ক্লিনিক স্টার্ট দিলে ভাল চলে, আপনার কি মত?'

শিবনাথ কথা বলবার আগে পাঁচু হাসল।

'মাস্টার তো ব'লে খালাস, কিন্তু ম্যাও ধরে কে। ক্লিনিক খোলার হাঙ্গামা অনেক দাদা।'

'কেন, হাঙ্গামাটা কি?' বিধু মাস্টার উত্তেজিত হয়ে বলল, 'কিছু হাঙ্গামা নেই, এ তোমার রেস্টুরেণ্ট কি হোটেল না যে, চিনি বা চালের জন্যে পারমিট জোগাড় করতে হাঁটাহাঁটি ক'রে পায়ের ছাল তুলতে হবে,—ভাল ক'রে একখানা সাইনবোর্ড করাতে হবে আর যৎসামান্য ফার্নিচার। খুব যে একটা মোটারকমের ক্যাপিটেলের দরকার আমার তো তা মনে হয় না, কি বলেন স্যার?'

শিবনাথ একটুখানি 'হুঁ' শব্দ ক'রে শুধু মাথা নাড়ল। যেন কি ভেবে ঈষৎ হেসে ঠাট্টার সুরে পাঁচু বলল, 'কিন্তু তা'তে মাস্টারের যে খুব একটা সুবিধা হবে আমার তো মনে হয় না, আপনি বলুন শিবনাথবাবু, দোকান টোকান হ'লে কানু না হয় দাঁড়িপাল্লা ধ'রে দু'টো পয়সা রোজগার করতে পারত; আমাকে মেয়েমানুষ রাখতে হবে বাবুদের গায়ে তেল মাখতে, নরম হাতের ব্যবস্থা না রাখলে এই শহরতলীতেও আমি ম্যাসেজ ক্লিনিক চালাতে পারব না। লস্‌ খাব।'

কথা শেষ ক'রে পাঁচু টেনে টেনে হাসতে লাগল। শিবনাথের কপালের দুদিকের রগ টিপটিপ করছিল। কিন্তু তা হ'লেও এমন একটা সুযোগ উপস্থিত ছিল না যে, সে এই প্রসঙ্গের ইতি টানিয়ে 'আচ্ছা উঠি আমি, কাজ আছে' ব'লে উর্বশী হেয়ার কাটিং সেলুনের চৌকাঠ ডিঙিয়ে রাস্তায় নামবে।

অসহায় চোখে তাকিয়ে থেকে শিবনাথ বিধু মাস্টারের উত্তর শুনল।

'পাঁচু, তুমি কারবারে হাত দিয়েছ আর আমার ছেলেকে প্রভাইড করার দরুণ তা অমনি ফেল্ পড়ল, অন্তত আমি যতক্ষণ বেঁচে আছি হ'তে দেব না। জান তো আমার পেশা গুরুগিরি। মাস্টারি। শিল্পে, সংস্কৃতিতে জাতি যা'তে উন্নতির পথে চলে মানুষকে সেই শিক্ষা ও প্রস্তাব দেওয়াই আমার কাজ। আমি কানু সম্পর্কে অন্যরকম চিন্তা ক'রে রেখেছি। রাত্রে ভেবে ভেবে সব প্ল্যান ঠিক করেছি। কানুকে মালিশের কাজে রাখা হবে না। ও থাকবে বাইরে। বাবুদের ডেকে আনবে। এই খোট্টা পাড়ায় এখনো যেখানে অসভ্য অশিক্ষিতের সংখ্যা বেশি, ডোম আর ধোবাদের প্রাধান্য, আজ হঠাৎ সেখানে যে তুমি চকৎকার একটি ম্যাসেজ-ক্লিনিক, যার আর এক নাম হেল্‌থ-ক্লিনিক খুলে বসেছ তা একটু এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি ক'রে ভদ্রলোকদের না জানিয়ে দিলে তাঁরা টের পাবেন কেন, আসছেনই বা কি ক'রে, কি বলেন শিবনাথবাবু, আপনি রেগুলারলি কাগজ পড়েন। হেলথ্-ক্লিনিকের নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই।' কথা শেষ ক'রে মাস্টার টেনে টেনে হাসতে লাগল।

পাঁচু কথা না ব'লে দরজায় দাঁড়িয়ে কেবল সিগারেট টানল।

বিধু মাস্টার ঘাড়টা সেদিকে ফিরিয়ে বলল, 'বেশ, না হয় সেভাবে কানুকে প্রভাইড করা হোক, বাঁধা মাইনে দিতে তোমার আপত্তি, না হয় কমিশন বেসিসে কাজ করুক, কি বলেন মশাই, আপনি চুপ ক'রে আছেন কেন, পাঁচুকে পরামর্শ দিন।'

শিবনাথের মেজাজ গরম হয়ে উঠল। এখানে অবশ্য ছেলের গাড়ি-চাপা পড়া, কি মেয়ের ভাবি বরের হাতে ছোরা খাওয়ার আশঙ্কার মামলা না। ছেলের চাকরির প্রশ্ন।

'কি মশাই বলুন!' বিধু অধীরভাবে অপেক্ষা করছিল। শিবনাথ বলল, 'মন্দ কি।'

উত্তেজিত হয়ে বিধু মাস্টার বলল, 'না, একবারে সবগুলো ম্যাসেজ-ক্লিনিক খারাপ ব'লে যে কাগজে আজকাল লেখালেখি হ'চ্ছে তা আমি বিশ্বাস করছি না, এখানে আদার পার্টির এই ইণ্ডাস্ট্রিটা নষ্ট করার অথবা এই ইণ্ডাস্ট্রির মিথ্যা বদনাম তুলে প্রেজেণ্ট গভর্নমেণ্টকে ঘায়েল করার চেষ্টা আছে। সব আইনই আইন না, সব আইনই খারাপ না। স্ট্যাণ্ডার্ড হেল্‌থ ক্লিনিক ব'লে আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংলণ্ডে, এমন কি এত যে প্রগতিশীল দেশ রাশিয়া সেখানেও প্রচুর আছে। এবং আর পাঁচজন পারছে না ব'লে পাঁচুও যে স্ট্যাণ্ডার্ড ঠিক রেখে এই অঞ্চলে একটা হেলথ্ ক্লিনিক চালাতে পারবে না আমি তা বিশ্বাস করি না। ওর সেলুনখানা দেখুন কত সুন্দর। কত ভদ্র। একটা ভদ্রলোকের ড্রইংরুম ব'লে মনে হয়।'

পাঁচু কথা বলছে না।

শিবনাথ এবার সুযোগ পেলঃ 'হ্যাঁ, ওটা আপনাদের দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা ব'লে ঠিক ক'রে নিন এ-সম্পর্কে আর আমি কি বলব, তা'ছাড়া—'

'হেল্‌থ-ক্লিনিক সম্পর্কে আপনার আইডিয়া কম এই তো বলতে চান।' দাঁড়ির জঙ্গলে হাত বুলিয়ে মাস্টার বলল, 'আমার একেবারেই নেই। তবে পাঁচু—আমিও কথার কথা বলছি, একটা বুদ্ধি দিচ্ছি শুধু। যদি এরকম একটা কিছু খোলা যায় তো মন্দ হয় না। এবং খুললে কানুকেও কাজে লাগানো যায়, হ্যাঁ, ফর দি ডেভলাপ্‌মেণ্ট অব্ দি ইণ্ডাস্ট্রি। বাবুদের ডেকে আনা মানে ম্যাসেজ-ক্লিনিকের একটা পাবলিসিটি দেয়া। না মশাই, আমার তত প্রেজুডিস নেই। আমার ছেলে যদি ম্যাসেজ-ক্লিনিকের কি হোটেলের কি রেস্টুরেণ্টের কি অন্য কোনরকম এস্টাবিসমেণ্টের বয়গিরি ক'রে দু'টো পয়সা ঘরে আনতে পারে আমি তা'তে তাকে নিরুৎসাহ করব না। কে গুপ্ত যে তার মেয়েটাকে রেস্টুরেণ্টে ঢুকিয়ে

দিয়েছে এইজন্য পাগল ছাগল হ'লেও গুপ্তর স্পিরিটটাকে আমি প্রশংসা করি। তবু তো রমেশ ক্ষিতিশের অনুকম্পা বা দয়ায় যা-ই বলুন পরিবারটা এখনো দাঁড়িয়ে আছে। যা দিনকাল পড়েছে। মা জগদম্বা!'

বলতে বলতে মাস্টার দুই হাতে মুখ ঢেকে হঠাৎ যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল। পাঁচু ভাবছে আর সিগারেট টানছে আর তার কপালের রগ দু'টো এক একবার ফুলে ফুলে উঠছে লক্ষ্য ক'রে 'আচ্ছা চলি' বলে শিবনাথ সেখান থেকে বেরিয়ে রাস্তায় নামল।

শিবনাথ দ্রুত হাঁটছিল। বিধু মাস্টার পিছন থেকে এসে সজোরে তার হাত চেপে ধরল। একটু অভদ্রের মতই শিবনাথ হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা ক'রে বলল, 'আবার কি, আমার কাজ আছে দেখতে পাচ্ছেন।'

'শুনুন শুনুন। পাঁচুর সামনে তো আর বলতে পারিনি। আসল কথা হ'ল কি—'

মাস্টারের মুখের পচা ভ্যাপ্‌সা গন্ধটা শিবনাথের নাকে লাগতে তাড়াতাড়ি সে পকেট থেকে রুমাল বার ক'রে তা নাকের ওপর ধ'রে বলল, 'আমি তো বলেছি, এসব আপনাদের ব্যাপারে আমাকে আর এর মধ্যে ডেকে নিয়ে—'

'আচ্ছা, আপনি রাগ করছেন।' মাস্টার নাছোড়বান্দা। 'শুনুন স্যার, আসল কথা হ'ল কি, পাঁচু ঘরটাকে অমনি ফেলে রাখবে, দেখবেন, বাড়তি কিছু টাকাপয়সা খাটিয়ে যে একটা কারবার-টারবার খুলবে তাকে দিয়ে তা আশা করা যায় না। বলবেন কেন? আপনি নিশ্চয় খোঁজ রাখেন, সন্ধ্যে হতে ব্যাটা গিয়ে শুঁড়িখানায় ঢোকে, সেখান থেকে বেরিয়ে বাজারে মেয়েমানুষের ঘরে যায়,—অর্থাৎ মেজর পোর্শন অব হিজ ইন্‌কাম এভাবেই সে নষ্ট ক'রে ফেলছে। এদিকে কিছু করব করব ক'রে কাউকে ভাড়াও দিচ্ছে না ঘর দু'টো। এখন আমার কথা হচ্ছে কি, ওই যে বললাম ম্যাসেজ ক্লিনিক—'

নোংরা দাঁতগুলো বার ক'রে বিধু মাস্টার হাসতে লাগল। যেন নিরুপায় হয়ে দাঁড়িয়ে শিবনাথ সেই হাসি দেখল।

মাস্টার বলল, 'আপনি বুঝতে পারছেন কেন আমি তাকে এ ধরনের একটা সাজেশান দিলাম? হা-হা। এখানে অপজিট সেক্স নিয়ে কারবার। বলতেই পাঁচু নিমরাজী হয়েছে। না হয়ে উপায় কি। কথায় বলে যেমন দেবতা তেমন তার নৈবেদ্য সাজাতে হয় তবেই দেবতা সন্তুষ্ট থাকে হা-হা। এখন নিশ্চয়ই আপনি পাঁচু ভায়াকে এ ধরনের একটা প্রস্তাব দেয়ার তাৎপর্য রিয়েলাইজ করতে পারছেন।' একটু থেমে এদিক-ওদিক তাকিয়ে মাস্টার ফিসফিসিয়ে বলল, 'ক্লিনিক খুলে ও তার ভেতর যা খুশি তা করুক, আমার কি, আমার ছেলেকে তো আর ভেতরে রাখা হচ্ছে না। বাইরে থেকে ও কাজ করবে। মানে যে দিনকাল পড়েছে। অ্যানি হাও পাঁচু একটা কিছু আরম্ভ করলে কানুটার যদি একটা প্রভিশন হয়ে যায়, তাই এত কথা—'

'ভাল।' সংক্ষেপে উত্তর সেরে শিবনাথ হাঁটবার উপক্রম করল। কিন্তু মাস্টার সঙ্গ ছাড়ল না। হাঁটা অবস্থায় বলল, 'আগেও বলেছি আপনাকে, মান সম্মান বোধটা আমার একটু কম। আমার কেন, আমার মত অবস্থায় পড়লে সকলেরই কমে যাওয়া উচিত এদিনে, কি বলেন?'

কিছু বলল না শিবনাথ এবং মাঝখানে বেশ একটু ফাঁক রেখেই সে বিধু মাস্টারের সঙ্গে হাঁটতে লাগল। কিছুমাত্র হতোদ্যম না হয়ে মাস্টার জঙ্গলে ভর্তি মুখটা ওদিকে ফিরিয়ে ফিরিয়ে বলে চলল, 'তার ওপর মশাই বুঝতে পারছেন, আমার ওয়াইফ, অর্থাৎ লক্ষ্মী এবার বিট্রে করবে ব'লে মনে হচ্ছে। অই যে বলে বাঘ এলো বাঘ এলো, এবং বাঘ এলো দিন আর কেউ গেল না। ঠিক সেই অবস্থায় পড়বে সাধনার মা, দেখবেন আপনারা, স্বচক্ষে। অম্বলের বেদনা উঠতেই ব্যথা উঠেছে, ব্যথা উঠেছে চিৎকার করতে করতেই একদিন ঠিক ডেলিভারী পেনটি ডেকে আনবে। অর্থাৎ যেদিন আমার হাতে একটি আধলাও থাকবে না। এবং এ-বাড়িতে এমন একটি লোক নেই জানেন যে, পাঁচ আনা পয়সা কর্জ চেয়ে পেয়ে পরে তা দিয়ে আমি এম্বুলেন্স ডাকতে টেলিফোন করব। কি বলেন?' (ক্রমশ)

কথারম্ভ

জম্মু-কাশ্মীরের প্রবেশমুখে পাক-ভারত সীমান্তে অমৃতসর হইতে পাঠানকোট। ৬৭ মাইলের পথ। ট্রেনে চলিয়াছি। বাসেও যাওয়া যায়। গন্তব্যস্থান কাঙড়া উপত্যকার পালমপুর পাঠানকোট হইতে ৭২ মাইল। রেলে এবং মোটরে যাওয়া যায়। মোটরেই সুবিধা।

গৃহিনীর পালিত মার্জার-শিশু সঙ্গে চলিয়াছে। অমৃতসর স্টেশনে আসিবার পর হইতেই তাহার কাতর ক্রন্দন, কখনও বা রুদ্ধ গর্জন এবং লাফ-ঝাঁপে অস্থির হইয়া পড়িলাম। একবার ত খাঁচা হইতে বাহির হইয়া পালাইয়াছিল আর কি!

বিড়াল চলিয়াছে বিনা মাশুলে। অপরাধ আমার নহে। রেলের এন্কোয়ারি অফিসে খোঁজ লইয়া জানিয়াছিলাম যে, রেলের আইনে বিড়াল সম্বন্ধে কোন বিধান নাই। সুতরাং রেলের পথে মার্জার অবশ্যবর্জনীয়। এদিকে মার্জার-শিশুর পালিকা-মাতা এবং তাঁহার বালখিল্য বাহিনীর মার্জার বর্জনে ঘোরতর আপত্তি। ভোট লইয়া দেখা গেল যে, বর্জনের পক্ষে ১ এবং বিপক্ষে ৪ ভোট হইয়াছে। অগত্যা বিড়াল আনিতেই হইল। স্টেশনে আসিবার পর হইতে তাহার দুর্ব্যবহার শুরু। ধরা না পড়িয়া যাই! তাহা হইলে ত মার্জার বর্জন ব্যতীত উপায়ান্তর থাকিবে না। আরও কত ফাঁসাদে পড়িতে হয় কে বলিবে! যাক, শেষ পর্যন্ত বিড়ালের জান এবং আমার মান বাঁচিল।

বেলা পৌনে বারোটায় পাঠানকোট। ১৯৪৭ সালের ২৭শে অক্টোবরের কথা। পরশাসনের দীর্ঘ দুঃখ-রাত্রির অবসানে রক্তরঞ্জিত, আত্মঘাতী হানাহানির মধ্যে ভারতের দিগন্তে সবেমাত্র স্বাধীনতাসূর্য উদিত হইয়াছে। রাজধানী নয়াদিল্লীতে সংবাদ আসিল সীমান্তের উপজাতির আক্রমণে কাশ্মীর বিপন্ন। পাকিস্থানের সাহায্যপুষ্ট হানাদার বাহিনী বিদ্যুৎ-গতিতে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। লুণ্ঠিত ভস্মীভূত জনপদ, মৃতের শব, মুমূর্ষুর কাতর আর্তনাদ, সর্বস্বাপহৃতা নারীর বুক-ফাটা হাহাকার তাহাদের চলার পথের নিশানা হইয়া রহিয়াছে। রাজধানী শ্রীনগর যায়-যায়। মহারাজা হরি সিং ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করিয়া ভারত সরকারকে কাশ্মীর রক্ষা করিতে অনুরোধ করিলেন। এ পর্যন্ত কাশ্মীর ন যযৌ ন তস্থৌ অবস্থায় ছিল অর্থাৎ ভারত বা ভারতে ইংরেজের চরম অপসৃষ্টি পাকিস্থান কোন রাষ্ট্রেই যোগদান না করিয়া স্বাধীনতা (!) রক্ষা করিয়াছিল। নয়াদিল্লী কাশ্মীরের ভারতভুক্তিতে সম্মত হইয়া যুদ্ধের আসরে নামিল। স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রথম যুদ্ধ। কিন্তু কাশ্মীর যাইতে হয় পাকিস্থান হইয়া—রাওয়ালপিন্ডির পথে। সে পথ ত ভারতবর্ষের পক্ষে রুদ্ধ। কাশ্মীরের সহিত নূতন সংযোগপথের কথা ভাবিতে হইল। ইহারই ফলে পাঠানকোটের শ্রীবৃদ্ধির সূচনা। পাঠানকোট দেখিতে দেখিতে জমিয়া উঠিল। এখন ত বেশ জমজমাট শহর। এই অঞ্চলের একটি বড় সামরিক ঘাটি। পাঠানকোট হইতে জম্মু হইয়া শ্রীনগর পর্যন্ত মোটরের পাকা রাস্তা। পাঠানকোটের প্রাচীন নাম নাকি প্রতিষ্ঠানপুর। এই নাম রূপান্তরিত হইয়া পাঠানকোট হইয়াছে। মতের অভ্রান্ততা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

পৌনে একটায় বাস ছাড়িল। প্রায় পাঁচ ঘণ্টা লাগিবে। প্রথম কয়েক মাইল সমতল রাস্তা। তাহার পর শুরু হইল চড়াই-উৎরাই এবং বাঁকের পর বাঁক। পাহাড়ের গা বাহিয়া, কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের পিচঢালা সড়কের উপর দিয়া কখনও উঠিয়া, কখনও বা নামিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমাদের মোটর অগ্রসর হইয়া চলিল। কিছু দূর যাইতেই পথের এক-পাশে নদী এবং আরও খানিকটা গেলে রেল লাইন। এখন হইতে মোটরের রাস্তা, রেল লাইন এবং নদীর মধ্যে রীতিমত লুকোচুরির খেলা আরম্ভ হইল। নদী এবং রেলপথ পাশে পাশে পাল্লা দিয়া চলিতে চলিতে কখনও হঠাৎ অদৃশ্য হইয়া যায়। কখনও বা চকিতের জন্য ডানে বা বাঁয়ে দেখা দিয়া আবার উধাও হয়।

পাহাড়ী নদী বর্ষার জলে ফুলিয়া ফাঁপিয়া উঠিয়াছে। যেমন তীব্র গতি, তেমনই ভীষণ গর্জন। পথের দুইধারে বৃষ্টিস্নাত সতেজ ও সরস বৃক্ষশ্রেণী। যতদূর চোখ চলে সবুজের সমারোহ। পাহাড়ের গায়ে থাকে থাকে ধান ও মকাই ক্ষেত। কোথাও কোথাও পথের গা ঘেঁষিয়া খাড়া পাহাড় ঊর্ধ্ব আকাশে মাথা তুলিয়াছে। অপর পাশে গভীর খাদ। মধ্যে মধ্যে দু' চারজন পায়ে চলা পথিক দেখা দিয়াই চকিতের মধ্যে অদৃশ্য হইয়া যাইতেছে। দূর পাহাড়ের গায়ে গ্রামগুলিকে পটে আঁকা ছবির মত মনে হয়।

একটানা শোঁ শোঁ শব্দ। পাহাড় হইতে বৃষ্টির জল নামিতেছে। দেবতাত্মা হিমাচলের শান্ত নির্জনতাকে দলিত, মথিত করিয়া সগর্জনে ছুটিয়া চলিয়াছে আমাদের যন্ত্ররথ। হিমাচলের তুলনায় কত তুচ্ছ, কত ক্ষুদ্র! কিন্তু হইলে কি হইবে? গর্জন এবং আস্ফালনের জোরে স্বীয় ক্ষুদ্রতা ঢাকিয়া রাখিতে সে বদ্ধ-পরিকর।

পনের মাইলের মাথায় কাঙড়া উপত্যকার প্রবেশমুখে নূরপুর দুর্গ। দুর্গ নহে, দুর্গের ভগ্নাবশেষ। পথের ডানদিকে পাহাড়ী নদীর উপর দুরারোহ গিরিশৃঙ্গে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ন্যূনাধিক দুই হাজার ফুট উঁচুতে ভীমদর্শন দুর্গ-কঙ্কাল। একটি অতিকায় দানবশিশু যেন গর্জমান টিনের খাঁচা এবং তাহার ভিতরের গুটিকায় কীট অর্থাৎ আমাদের প্রতি পরম নির্বিকারভাবে তাকাইয়া রহিয়াছে।

নূরপুরের পাঠানিয়া রাজবংশ এক সময় কাঙড়া উপত্যকায় বিশেষ পরাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছিল। কাঙড়া উপত্যকার বাহিরে সমতল পাঞ্জাবের কোন কোন

অঞ্চলও নূরপুর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল। পাঠানিয়া রাজগণ তোমর-বংশীয় রাজপুত ক্ষত্রিয়। তোমরবংশ এক সময় দিল্লীতে রাজত্ব করিত। তোমরবংশ পাণ্ডবদিগের বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ।

আনুমানিক ১,০০০ খৃষ্টাব্দে ঝেত-পাল নূরপুর রাজ্যের গোড়াপত্তন করেন। পাঠানকোট তাঁহার রাজধানী ছিল। এই পাঠানকোট হইতেই ঝেতপাল প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ পাঠানিয়া রাজবংশ নামে পরিচিত হয়। পাঠানদিগের সহিত এই পদবীর কোন সম্বন্ধ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে সম্রাট আকবরের রাজত্বের প্রথম দিকে পাঠানিয়া রাজগণ মোগল সাম্রাজ্যের বশ্যতা স্বীকার করেন। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে পাঠানিয়া রাজা বসু বা বাসদেব নূরপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। নূরপুর তখন ধামেরী নামে পরিচিত। ধামেরী এবং তৎসন্নিহিত অঞ্চলের প্রাচীন নাম সম্ভবত ঔড়ুম্বর। মহাভারতে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়। ১৬২২ সালে জাহাঙ্গীর কাঙড়া উপত্যকায় আগমন করেন। নূরপুরের পথেই তিনি আগ্রায় ফিরিয়া যান। সম্রাটের আগমন চির-স্মরণীয় করিবার জন্য ধামেরীর নূতন নামকরণ হইল। জাহাঙ্গীরের প্রকৃত নাম নূরউদ্দিন। নূরউদ্দিন হইতে ধামেরীর নূতন নাম হইল নূরপুর। রাজা বসু নূরপুরে দুর্গ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করিয়াছিলেন। পরবর্তী রাজাগণ তাঁহার আরব্ধ কাজ সমাপ্ত করেন। ঔড়ুম্বর বা ধামেরীতে খুব সম্ভবত একটি প্রাচীন দুর্গ ছিল। ঐতিহাসিক কানিংহাম সাহেবের মতে খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীতে সুলতান মাহমুদের বংশধর ইব্রাহিম গজনভি দীর্ঘ অবরোধের পর এই দুর্গ অধিকার করেন।

সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের নূরপুর খুবই ভাল লাগিয়াছিল। তিনি এখানে একটি প্রাসাদ নির্মাণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তাঁহার ইচ্ছাই জাহাঙ্গীরের নিকট হুকুম। বিরোধিতা করিবার শক্তি বা সাহস তাঁহার ছিল না। বেগমের ইচ্ছা পূরণের জন্য বাদশাহ এক লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিলেন। জাহাঙ্গীরের জীবন-স্মৃতিতে ইহার উল্লেখ আছে। মৌজা ঘুরকারিতে প্রাসাদ নির্মাণ আরম্ভ হইল। রাজা বসুর পুত্র জগৎ সিং তখন নূরপুরের রাজা। তিনি এই প্রাসাদ নির্মাণের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। কিন্তু প্রকাশ্যে ত আর বিরোধিতা সম্ভব নহে। তিনি কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। কাঙড়া উপত্যকার সর্বত্র ঘ্যাঁগ বা গলগণ্ড রোগের খুবই প্রাদুর্ভাব। শরীরে আয়োডাইডের অভাবে এই ব্যাধি হয়। জগৎ সিং-এর ইঙ্গিতে বাছিয়া বাছিয়া কদাকার এবং গলগণ্ড রোগগ্রস্ত মজুরদিগকেই প্রাসাদ নির্মাণের কাজে লাগানো হইল। কিছুদিন পর কাজ কতটা অগ্রসর হইল দেখিবার জন্য আগ্রা হইতে লোক পাঠানো হইল। এই লোক নূরপুর হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সম্রাজ্ঞী সকাশে নিবেদন করিল যে, প্রাসাদ নির্মাণে নিযুক্ত শ্রমিকগণ সকলেই কদাকার ও রোগগ্রস্ত এবং কাঙড়ার আবহাওয়াই ইহার একমাত্র কারণ। প্রাসাদ নির্মাণের কাজ ইহার পর আর অগ্রসর হয় নাই। মৌজা ঘুরকারিতে এই অসমাপ্ত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ আজও বিদ্যমান।

পাঠানিয়া রাজগণের মধ্যে জগৎ সিং (১৬১৯—৪৬) সর্বাধিক খ্যাতিমান্। তাঁহার রাজত্ব কালেই নূরপুর শক্তি ও সমৃদ্ধির সর্বোচ্চ শিখরে অধিষ্ঠিত হইয়াছিল। মোগল সাম্রাজ্যের অনুগত সামন্তরূপে বহু রণক্ষেত্রে তিনি স্বীয় বীর্যবত্তার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের রাজত্ব কালে কুমার খুরম (পরে সম্রাট শা-জাহান) বিদ্রোহী হইলে জগৎ সিং তাঁহার সহায়তা করেন। নূর-জাহান সম্রাটের উদ্যত রোষানল হইতে জগৎ সিংকে রক্ষা করেন। শা-জাহানের রাজত্ব কালে ১৬৪১ সালে জগৎ সিং সম্রাটের বিরুদ্ধাচরণে প্রবৃত্ত হন; কিন্তু অতি অল্প দিনের মধ্যেই পরাজিত হইয়া পুনরায় বশ্যতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন। ১৬৪৬ সালে তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হন। সমসাময়িক লেখকদিগের রচনায় এবং চারণ কবিদিগের কণ্ঠেও জগৎ সিং-এর স্মৃতি অমর হইয়া রহিয়াছে। তাঁহার সম্বন্ধে একটি বহুল প্রচলিত কবিতায় বলা হইয়াছে—

"জস্‌তা রাজা, ভস্‌তা রাজা,
বাসদেব কা জায়
সিন্দু (সিন্ধু?) মারে, সাগর মারে
হিমাচল ডেরা পায়
আকাশ কো আর্ক কিতা
তান্ জস্‌তা কহায়।"

অর্থাৎ "বাসদেবের পুত্র ভক্ত জগৎ রাজা সিন্দু নদীর অপর তীর জয় করিয়া তুষারাবৃত পর্বতশৃঙ্গে বস্ত্রাবাস সন্নিবিষ্ট করিয়াছিলেন। তিনি ঊর্ধ্বে আকাশের দিকে আগ্নেয়াস্ত্র (বন্দুক) লক্ষ্য করিয়া-ছিলেন। এইজন্য তাঁহাকে জগৎ বলা হয়।"

নূরজাহান জগৎ সিংকে বিশেষ অনুগ্রহ করিতেন। রাজাও তাঁহাকে 'বেটি' অর্থাৎ কন্যা বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর নূর-পুর সমতল পাঞ্জাবের শিখ রাজ্যের সামন্ত শ্রেণীভুক্ত হয়। ১৮১৫—১৬ সালে রণজিৎ সিং সর্বশেষ পাঠানিয়া রাজা বীর সিং-এর রাজ্য কাড়িয়া লন। রণজিৎ সিং তাঁহাকে জায়গীর দেওয়ার প্রস্তাব করিলেন। বীর সিং সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া হৃতরাজ্য উদ্ধারে যত্নবান হইলেন। কিছুই করিতে না পারিয়া তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অধিকারে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। ১৮১৬ সালে তাঁহাকে

পালমপুর বাজার—দূরে বরফে ঢাকা ধবলাধার শৃঙ্গ

মোহল্‌খাদ, পালমপুর

কাবুলের বিতাড়িত আমীর শাহ সুজার সহিত রণজিৎ সিং-এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেখা যায়। রণজিৎ সিং এই ষড়যন্ত্রের কথা ইংরেজ কর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করিলে তাঁহারা বীর-সিংকে তাঁহাদের অধিকার হইতে অন্যত্র চলিয়া যাইতে বলেন। পরবর্তী দশ বৎসরকাল (১৮১৬—২৬) তিনি সিমলা পাহাড়ের আরাকি রাজ্যে অবস্থান করেন। ১৮২৬ সালে বীর সিং নূরপুর দুর্গ অবরোধ করেন। লাহোর হইতে দুর্গ রক্ষার জন্য নূতন শিখ সৈন্য উপস্থিত হইলে বীর সিং পলায়ন করিয়া বর্তমান হিমাচলের অন্তর্গত চম্বারাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। চম্বারাজ তাঁহাকে রণজিৎ সিং-এর হাতে ধরাইয়া দিলেন। শিখ নৃপতির আদেশে তাঁহাকে অমৃতসর গোবিন্দগড় দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হইল। সাত বৎসর পর চম্বারাজ রণজিৎ সিংকে ৮৫,০০০ নজর দিয়া বীর সিংকে মুক্ত করিয়া লইলেন। বীর সিং জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখিয়াছেন। ১৮৪৫ সালে প্রথম শিখ যুদ্ধের সময় তিনি পুনরায় নূরপুর দুর্গ আক্রমণ করিয়া দুর্গ প্রাচীর মূলে শেষ-নিশ্বাস পরিত্যাগ করেন। স্বাধীনতার বেদীমূলে বীর সিং-এর আত্মবলিদান কি মহীশূরের টিপু সুলতানের আত্মোৎসর্গের সমপর্যায়ভুক্ত নহে? ১৮৪৬ সালে প্রথম শিখ যুদ্ধের অবসানে নূরপুর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলিয়া গেল। বীর সিং-এর নাবালক পুত্র যশোবন্ত সিংকে বার্ষিক পাঁচ হাজার টাকা আয়ের জায়গীর প্রদান করা হইল। ১৮৬১ সালে এই জায়গীরের পরিমাণ দ্বিগুণ করা হয়।

রাজ্যহীন পাঠানিয়া রাজবংশের প্রধান শাখা আজও নূরপুরে বাস করিতেছে। দুর্গটি সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে আছে।

বেলা সাড়ে পাঁচটায় পালমপুর। পালমপুর হইতে কিছু দূরে থাকিতেই জোর বৃষ্টি আরম্ভ হইল। 'হৃদয় আমার' ময়ূরের মত না নাচিলেও বেশ লাগিল। প্রায় বৃষ্টিহীন সমতল পাঞ্জাবের রুক্ষতার মধ্যে দীর্ঘ দিন কাটাইবার পর মুষলধারে বারিবর্ষণ বিধাতার করুণাধারার মতই মনে হইল।

অমৃতসরের বন্ধু শ্রীপ্রফুল্লকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পালমপুর আসিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন। তিনি সামরিক কর্মচারী। তখন মেজর। তাঁহারই চেষ্টা এবং সহায়তায় বাড়ীর বন্দোবস্ত হইয়াছে। মোটরের আড্ডায় তাঁহার লোক আসিবার কথা। মোটর হইতে নামিয়া খোঁজ করিলাম। 'কা কস্য পরিবেদনা।' কয়েকজন কাশ্মীরী কুলি এবং বাসের যাত্রী ভিন্ন আর কাহাকেও দেখিলাম না। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের লোক আমাকে আমার জন্য নির্দিষ্ট বাড়ীতে লইয়া যাইবে কথা ছিল। লোকের দেখা নাই। নূতন জায়গা, কাহাকেও চিনি না। বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়িতেছে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। 'বিপত্তৌ মধুসূদনম্‌' স্মরণ করিয়া একটি কুলি লইয়া বাড়ী খুঁজিতে বাহির হইলাম। অল্পায়াসেই সন্ধান পাইলাম। গৃহ-প্রবেশে আর কোন অসুবিধা হইল না। কিন্তু বাড়ীর হদিশ পাওয়ার পূর্বেই একটি ছোটখাট দুর্ঘটনা ঘটিয়া গিয়াছে। অন্যমনস্কভাবে চলিতে চলিতে কখন একেবারে পথের একধারে আসিয়া পড়িয়াছি। পাহাড়ী কাঁচা রাস্তা। বৃষ্টিতে মাটি ভিজিয়া নরম হইয়া রহিয়াছে। পাড় ভাঙিয়া নয়ানজুলির মধ্যে পড়িয়া গেলাম। রীতিমত বিয়োগান্ত নাটক। ভাগ্যে সঙ্গী টানিয়া তুলিয়াছিল। বাঁ পাখানা বেশ জখম হইল।

ঘর-সংসার গুছাইতে গিয়া বাক্স-প্যাঁটারা, বিছানার বাণ্ডিল খুলিয়া ত চক্ষুস্থির। যে বারিবর্ষণ পালমপুরের পথে মনে আনন্দের দোলা দিয়াছিল সে যে এমন শত্রুতা করিবে কে জানিত? মোটরের ছাদের উপর যে তেরপল দিয়া যাত্রীদিগের মালপত্র ঢাকা ছিল বার্ধক্যের জন্য তাহার জলরোধ করিবার ক্ষমতা লোপ পাইয়াছে। সমস্ত ভিজিয়া গিয়াছে।

কি বা আছে করিবার? ভিজা কাপড়ে, ভিজা বিছানায় রাত কাটাইতে হইল। পালমপুর প্রবাসের প্রথম রাত্রি। বহু কাল মনে থাকিবে।

১

পাঞ্জাবের বৃহত্তম জেলা কাঙড়া। অধিবাসীসংখ্যা ৯।১০ লক্ষ। তাহারই একটি তহশীল পালমপুর। পাঞ্জাবে চির-স্থায়ী বন্দোবস্ত বা জমিদারী প্রথা নাই।
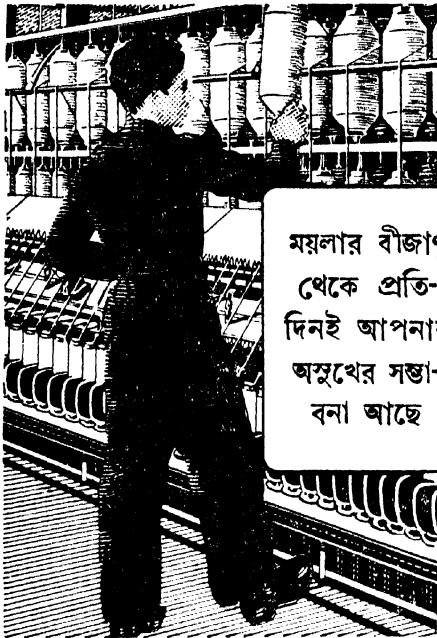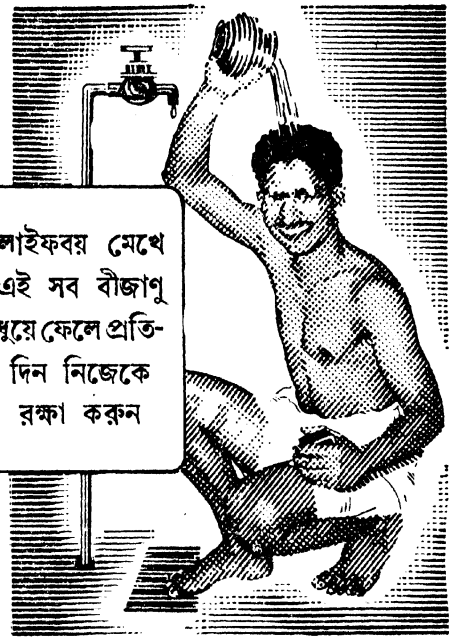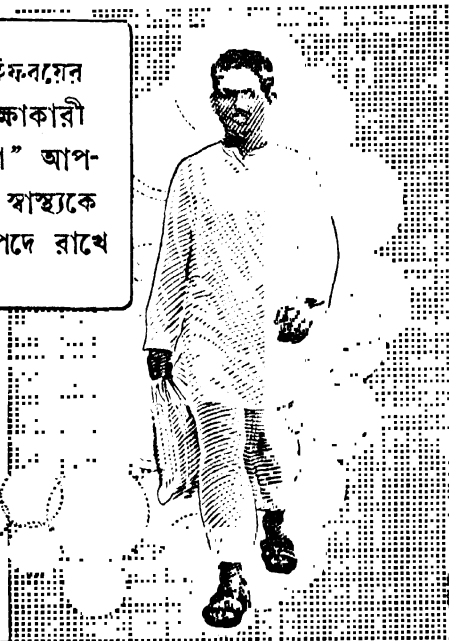
প্রজা সরাসরি সরকারকে খাজনা দেয়। রাজস্ব সংগ্রহের সুবিধার জন্য প্রত্যেক মহকুমাকে কয়েকটি তহশীলে ভাগ করা হইয়াছে। তহশীলদার তহশীলের প্রধান কর্মচারী।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৩৯৯৩ ফুট উঁচুতে অবস্থিত পালমপুর গ্রাম্য শহর বা শহুরে গ্রাম অর্থাৎ না শহর, না গ্রাম। পাঠানকোট হইতে কুলু পর্যন্ত বিস্তৃত ১৭৪ মাইল লম্বা সড়ক। তাহারই দুই পাশে কিছু দোকানপাট, হোটেল, দুইটি ব্যাংক ইত্যাদি। রাস্তায় বিজলির আলো জ্বলে। বেশীর ভাগ বাড়ীতেও বিজলীর আলো, জলের কলও আছে। এমন কি একটি সিনেমাও আছে। ছেলেদের জন্য দুইটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, মেয়েদের জন্য একটি মধ্য-বিদ্যালয়, একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, থানা ডাক ও তারঘর, হাসপাতাল, করদাতাগণ কর্তৃক নির্বাচিত টাউন কমিটি, আদালত, এক-কথায় শহরে যাহা যাহা থাকে সমস্তই পালমপুরে আছে। এমনকি দেশী ও বিদেশী মদের দোকানও বাদ যায় নাই।

১৮৬৯ সালে পালমপুরের গোড়া-পত্তন হয়। এই অঞ্চলে বহুদিন হইতে কৃত্রিম উপায়ে জমিতে জল সেচের ব্যবস্থা আছে। খাদ বা পার্বত্য নদী হইতে ক্ষেত্র পর্যন্ত ছোট ছোট খাল কাটিয়া খাদের জলকে কৃষিকার্যে লাগানো হয়। এই সমস্ত খালকে 'কুল' বলা হয়। পালম অর্থ কৃত্রিম উপায়ে জল নিষিক্ত ভূখণ্ড। পালমপুরে সরকারী ফল, সব্জী ও চা বাগান এবং রেশম উৎপাদনের কেন্দ্র আছে। সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (Border Scouts) শিক্ষা-শিবিরও এখানে অবস্থিত। শিক্ষা-শিবির দেখিবার অনুমতি চাহিয়া শিবিরের বড়কর্তার নিকট পত্র লিখিয়াছিলাম। অনুমতি দূরের কথা, পত্রের উত্তর পর্যন্ত পাই নাই। উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মচারী হয়ত বে-সামরিক, বে-সরকারী লোকের পত্রের উত্তর দেওয়া প্রয়োজন মনে করেন নাই।

কাঙড়া জেলার কাঙড়া, নুরপুর, পালমপুর, হামিরপুর এবং ডেরা এই পাঁচটি তহশীল কাঙড়া উপত্যকার অন্তর্গত। হিমালয়ের ধবলাধার—আঞ্চলিক নাম ধৌলাধার—শৃঙ্গের পাদমূলে এই উপত্যকার অবস্থান। ধবলাধারের সর্বাধিক উচ্চতা ১৬,০৫৩ ফুট। নূন্যাধিক ত্রিশ মাইল দীর্ঘ এবং দশ মাইল প্রশস্ত ভূমিখণ্ড লইয়াই প্রকৃত কাঙড়া উপত্যকা গঠিত। সমগ্র কাঙড়া জেলার এই ৩০০ বর্গ মাইল পরিমিত স্থানই মাত্র উর্বর।

কাঙড়ার সর্বত্র হিন্দু প্রভাবের ছাপ। কি প্রাকৃতিক অবস্থান এবং দৃশ্যাবলী, অধিবাসীদিগের সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার এবং প্রকৃতি কিছুতেই ইহার সহিত সমতল পাঞ্জাবের সাদৃশ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। শাসনকার্যের সুবিধার জন্যই কাঙড়াকে পাঞ্জাবের সহিত

গদ্দি রমণী
(কটিবন্ধ ও গলার অলংকার লক্ষ্যণীয়)

জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। একই কারণে ব্রহ্মদেশ এবং ভারতবর্ষও একদিন এই রকম অসম বিবাহের গাঁট-ছড়ায় বাঁধা পড়িয়াছিল। রক্ত, ভাষা, সংস্কৃতি এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার দিক্ হইতে হিমাচল এবং কাঙড়া অভিন্ন। কাঙড়াকে হিমাচলের অন্তর্ভুক্ত করাই উচিত ছিল। একদিন হয়ত করিতেও হইবে। সমতলবাসী পাঞ্জাবী কাঙড়াবাসীকে পাহাড়ী বলিয়া বেশ একটু অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে।

সমতল পাঞ্জাব হইতে কাঙড়ায় আসিবার পর প্রথমেই মনে হয় যে এক নূতন জগতে পদার্পণ করিলাম। এ যেন পাঞ্জাব হইতে একেবারেই পৃথক্। পাঞ্জাবের রুক্ষতা, নীরসতা এবং কাঠিন্য কিছুই চোখে পড়ে না। কাঙড়ার সমস্যাও পাঞ্জাবের সমস্যা হইতে স্বতন্ত্র। অনুপম নিসর্গ শোভা, কলনাদিনী পার্বত্য স্রোত-স্বিনী, প্রাচীন পাষাণ মন্দির, দুরারোহ পর্বতশৃঙ্গে পাষাণের দুর্গ-কঙ্কাল, পাষাণময় রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ, শ্লেট পাথর এবং খড়ের ঘর, শিরোদেশে তুষার-মণ্ডিত ধবলাধার, পদতলে শস্য-শ্যামলা উপত্যকা—এই কাঙড়া। গিরি-কুন্তলা, সরিৎ-মেখলা কাঙড়াকে ভাল না বাসিয়া উপায় নাই। কাঙড়ার সৌন্দর্যমুগ্ধ বিদেশীরাও পঞ্চমুখে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।*

শিক্ষা-দীক্ষা এবং অর্থনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে কাঙড়া পাঞ্জাবের অন্যান্য দেশের তুলনায় অনগ্রসর। কাঙড়াই বোধ হয় পাঞ্জাবের সর্বাধিক অনুন্নত অঞ্চল। কিন্তু কাঙড়ার মানুষের চরিত্রের সহজাত মাধুর্য, দূরকে কাছে টানিবার, পরকে আপন করিবার ক্ষমতা মনে গভীর রেখা-পাত করে। পাঞ্জাবের অন্য কোন অঞ্চলের সংগেই কাঙড়ার মিল নাই। পাঞ্জাবী হিন্দু, শিখ, মুসলমান সকলের সহিতই কাঙড়া জেলার লোকদের কোথায় যেন একটা ঘোরতর অমিল। আমার মনে হয়, এই অমিলের একটা মস্ত কারণ এই যে কাঙড়া পৌরাণিক হিন্দু সংস্কৃতির প্রভাবে প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত। কাঙড়া-বহির্ভূত পাঞ্জাবের বাহ্যিক চটক এবং জলুষ থাকিলেও খাঁটি সংস্কৃতি—হিন্দু, মুসল-মান বা খৃষ্টান—অর্থাৎ যে গুণ মানুষের মানবতার দ্যোতক তাহার একান্তই অভাব।

* "No scenery, in my opinion, presents such sublime and delightful contents. Below lies the plain, a picture of rural loveliness and repose, the surface is covered with the richest cultivation, irrigated by streams which descend from perennial snows, and interspersed with homesteads buried in the midst of groves and fruit trees. Turning from these scenes of peaceful beauty, the stern and majestic hills confront us; their sides are furrowed with precipitions water courses, forests of oak (sic.) clothe their flanks, and higher up give place to gloomy and funeral pines, above all the works of snow or pyramidal masses of granite too perpendicular for the snow to rest on".—G. C. Barnes.

(বার্ণেস সাহেব কাঙড়ার দ্বিতীয় ইংরেজ শাসনকর্তা। ১৮৪৭ হইতে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত ইনি কাঙড়ার শাসনকর্তা ছিলেন।)

কোমলতা এবং সরসতা বর্জিত সমতল পাঞ্জাবের স্বার্থপরতা, অশিষ্টতা এবং ঔদ্ধত্যের পাশে কাঙড়া একেবারেই বে-মানান। এ যেন অন্য কোন দেশ। পাঞ্জাব ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারেও এই কথাই বলা হইয়াছে।*

কাঙড়া জেলার দুইটি মহকুমা—সদর ও কুলু। অতীতে কুলু ব্যতীত সমগ্র কাঙড়া জেলা জলন্ধর বা ত্রিগর্ত রাজ্যের অঙ্গীভূত ছিল। শতদ্রু এবং চন্দ্রভাগা নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র পার্বত্য পাঞ্জাব, সমতল পাঞ্জাবের জলন্ধর দোয়াব (শতদ্রু ও বিপাসার মধ্যবর্তী ভূখণ্ড) এবং সির-হিন্দ একদা এই রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। মহাভারতে ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা কর্তৃক মৎস্যরাজ বিরাটের গোপাল অপহরণের কাহিনীর বর্ণনা আছে। বৃহন্নলারূপী অর্জুনের সহায়তায় মৎস্যরাজকুমার উত্তর অপহৃত গোধন উদ্ধার করিয়াছিলেন।

ত্রিগর্ত অর্থ 'তিন নদীর দেশ'। এই নদী তিনটি কি কি এবং কোথায়? মত-ভেদ আছে। এক দলের মতে শতদ্রু, বিপাশা এবং ইরাবতী-বিধৌত ভূখণ্ডই ত্রিগর্ত। অন্যেরা আবার একথা স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, বাণগঙ্গা (বানের বা বাণ্ডের), নিউগল্ এবং কুরালি নদী-বিধৌত অঞ্চলই ত্রিগর্ত। বিপাশার এই তিনটি উপনদীই কাঙড়া উপত্যকার ভিতর দিয়া প্রবাহিত।

খৃষ্টোত্তর ষষ্ঠ শতকের পর ঐতিহাসিক ত্রিগর্তের আয়তন সংকুচিত হইয়া পড়ে। ইহার পর ত্রিগর্ত বলিতে বর্তমান কাঙড়া জেলার নুরপুর, কাঙড়া, হামিরপুর, ডেরা এবং পালমপুর তহশীল অর্থাৎ কেবলমাত্র কাঙড়া উপত্যকাকেই বুঝাইত। ঐতিহাসিক যুগে কাঙড়াকে নুরপুর, গুলের, দাতারপুর, সিবা, জসোয়ান, কাঙড়া, কুটলেহুর, মণ্ডি, সুকেত, কুলু, চম্বা এই একাদশটি খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত দেখা যায়। এই সমস্ত রাজ্যের রাজন্যবৃন্দ বিভিন্ন সময়ে মৌর্য, কুষাণ, গুপ্ত এবং কাশ্মীর রাজগণের আনুগত্য স্বীকার করিলেও ইহাদের অভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা কোনদিনই ক্ষুণ্ণ হয় নাই।

গদ্দি সমাজের অচ্ছুৎ ধোগরী নরনারী

কাঙড়ার বর্তমান অধিবাসীদিগের মধ্যে গদ্দিজাতি সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। প্রধানত হিমাচল রাজ্যের গধেরণ উপত্যকার অধিবাসী হইলেও হিমাচলের মণ্ডি জেলা হইতে কাঙড়া জেলার নুরপুর তহশীল পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে ইহারা বহু উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছে। অন্তত ১৫,০০০—২০,০০০ গদ্দি এই অঞ্চলে বাস করে। হিমালয়ের নীচের দিকে যে সমস্ত বিচিত্র এবং বিভিন্ন জাতির মানুষ বাস করে, গদ্দি জাতি তাহাদের মধ্যে একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির দিক হইতে বিচার করিলে ইহারাই সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। সমুদ্র-পৃষ্ঠ হইতে ৩,৫০০।৪,০০০ ফুট হইতে ৭,০০০ ফুট পর্যন্ত উঁচুতে ইহাদিগকে বাস করিতে দেখা যায়। ৭,০০০ ফুটের বেশী উপরে চাষ-বাস প্রায় অসম্ভব।

'গদ্দি' অর্থ মেষপালক এবং 'গধেরণ' অর্থ মেষের দেশ। গদ্দি জাতির পূর্বপুরুষ একদা পাঞ্জাবের সমতল অঞ্চলে—প্রধানত লাহোর এবং তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে বাস করিত। মুসলমানের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হইয়া এবং ধর্মনাশের ভয়ে সম্রাট আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তাহারা দেশত্যাগ করিয়া হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। বিপদ কত গুরুতর হইলে মানুষ বাস্তুত্যাগ করে আমরা অনেকেই তাহা জানি। দক্ষিণ আফ্রিকার বুয়র ঔপনিবে-শিকদিগের নাটাল হইতে অরেঞ্জ ফ্রি স্টেট ও ট্রান্সভালে প্রস্থানের এবং চীনের সাম্য-বাদিগণের কিয়াংসু হইতে ইয়েনানে 'দীর্ঘ অভিযানের' (Long March) খবর অনেকেই রাখেন। কিন্তু গদ্দি জাতির পূর্বজগণ যে নিজেদের মর্যাদা, ধর্ম এবং সংস্কৃতিকে অপঘাত হইতে রক্ষার জন্য নিশ্চিতকে ত্যাগ করিয়া অনিশ্চিতের উদ্দেশ্যে দুর্গমের যাত্রী হইয়াছিলেন সেকথা ক'জন জানেন? এই দুঃখব্রত দুঃসাহসীদের উত্তরপুরুষ আজও হিন্দুধর্ম ও সংস্কৃতির শিখাটিকে সযত্নে জ্বালাইয়া রাখিয়াছে। দেশান্তরের ফলে অনিবার্য-ভাবেই তাহার আংশিক রূপান্তর ঘটিলেও মূল ধারাটি আজও অক্ষুণ্ণ, অপরিবর্তিত।

এই বাস্তুত্যাগী দলে শাস্ত্রোপজীবী ব্রাহ্মণ, শস্ত্রজীবী ক্ষত্রিয় ও রাজপুত, শূদ্র জাতীয় কৃষিজীবী রাথি এবং ঠাকুর সম্প্রদায়ভুক্ত* লোক থাকিলেও ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল ক্ষত্রিয়। ইহা ব্যতীত বাড়ি, হালি, সিপি, ধোগ্রি, সুরায়া প্রভৃতি কয়েকটি জাতি বা সম্প্রদায়ও ইহাদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। এই শেষোক্তগণ গদ্দি সমাজের অচ্ছুৎ। অন্যান্য গদ্দিদের সহিত ইহাদের পান-ভোজন এবং বৈবাহিক আদান-প্রদান নিষিদ্ধ।

গদ্দি জাতির পূর্বপুরুষদিগের

---

* "Thus it is not only the natural features of the country but also the character of the people, their manners and their customs which take one back to primitive conditions and which make Kangra partake more of the characteristics of Hindustan than of the rest of the Punjab in which the district is for the purpose of administration included. As soon as one enters the valley one is in an old world with its own problems, with a beautiful scenery, with its old stone temples, slate-covered houses, roaring hill torrents, snow-peaked hills on one side and a valley full of fertile lands below".—Punjab District Gazetteers, Vol. VII, Part Kangra District, Pp. 7-8. (Introductory).

* অতি প্রাচীন যুগে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলে যাঁহারা রাজত্ব করিতেন, ঠাকুর সম্প্রদায় তাঁহাদেরই বংশধর। ঠাকুরগণ সামাজিক মর্যাদায় রাজপুত অপেক্ষা হীনতর।

অভ্যুমনে গধেরণ উপত্যকায় প্রথম মানুষের পদস্পর্শ পড়ে। গদ্দিগণ কৃষিকার্য এবং পশুপালন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। পশুপালনই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা, মেষ এবং ছাগপাল ইহাদের প্রধান সম্পদ। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় মেষপূজা ইহাদের পরম পবিত্র ধর্মানুষ্ঠান। গধেরণ, চম্বা, প্রভৃতি অঞ্চলের গদ্দিগণ শীতের প্রারম্ভে পশুপাল লইয়া হিমাচল রাজ্যের মণ্ডি ও সুকেত এবং পাঞ্জাবের কাঙড়া উপত্যকার দিকে নামিয়া আসে। সমস্ত শীতকাল অর্থাৎ প্রায় ৬ মাস এই অঞ্চলে কাটাইয়া শীতের শেষে ইহারা আবার যে যাহার ঘরে ফিরিয়া যায়।

পালমপুরের আশে পাশে বহু গদ্দির বাস। পাহাড় হইতে জ্বালানি কাঠ কাটিয়া শহরে আনিয়া সেই কাঠ বিক্রয়, গরমের দিনে দূর পাহাড় হইতে বরফ সংগ্রহ করিয়া পালমপুর বাজারে বিক্রয়, কৃষি-কার্য এবং পশুপালন করিয়া ইহারা অন্ন-সংস্থান করে। পালমপুরে পাথর কয়লা পাওয়া যায় না। বরফের কলও নাই। সুতরাং কাঠ এবং বরফ বিক্রয় করিয়া ইহারা বেশ দু'পয়সা কামাই করে। চাষ-বাস এবং পশুপালন ত আছেই। ফলে ইহাদিগের অবস্থা মোটের উপর বেশ স্বচ্ছল। মোটা ভাত-কাপড়ের—রুটি-পায়জামার?—ভাবনা নাই।

গদ্দিগণ সাধারণত পশমের কাপড়-চোপড়েই লজ্জা নিবারণ এবং শীতাতপ হইতে আত্মরক্ষা করে। সমস্তই ঘরে বোনা। দরজিও ইহারা নিজেরাই। সুতীর কাপড়ের রেওয়াজ খুবই কম। পুরুষেরা টুপি পরে। বর্ষা বা শীতের এই টুপি দ্বারা কান পর্যন্ত ঢাকিয়া দেওয়া যায়। আজকাল সাধারণ হিন্দুস্থানী টুপির ব্যবহারও প্রচলিত হইয়াছে। পুরুষ পায়জামা এবং নারী ঘাগরা পরিধান করে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই সাধারণত খালি পায়ে চলে। মেয়েরা ওড়না ব্যবহার করে। এই ওড়নাই ক্ষেত্র বিশেষে পাগড়ি এবং মস্তকাবরণে রূপান্তরিত হয়। গদ্দীনারী অলঙ্কার-প্রিয়া। কোন্ নারীই বা নয়? মেয়েদের পোশাক বেশ আঁটসাঁট এবং সুরুচিসম্মত।

গদ্দিগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি বিভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলেও নামের শেষে পদবী ব্যবহারের রেওয়াজ ইহাদের

বিবাহিতা গদ্দি তরুণীর পতিগৃহে যাত্রা

মধ্যে নাই। গদ্দিসমাজে অস্পৃশ্যতা বর্তমান। স্পৃশ্য, অস্পৃশ্য সকলেই উপবীত ধারণ করিলেও ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় প্রভৃতি বর্ণের কোন গদ্দি হালি, বাড়ি, প্রভৃতি অস্পৃশ্য জাতির সহিত পানাহার বা বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে না। বিধবা-বিবাহে বাধা নাই। তবে বিধবা-বিবাহ বড় একটা দেখা যায় না। পত্যন্তর

মেষশাবক স্কন্ধে গদ্দি বালিকা

গ্রহণকারিণী বিধবার পূর্বে স্বামীর ঔরসজাত সন্তান পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধি-কারী হয়। যৌন অপরাধ প্রায় অজ্ঞাত বলিলেই চলে। ব্যভিচারী নারী এবং পুরুষকে একঘরে করিয়া রাখা হয়। প্রায়শ্চিত্ত, তীর্থযাত্রা প্রভৃতি দ্বারা শুদ্ধির পর পুনরায় তাহাদিগকে সমাজে গ্রহণ করা হয়। বর-কনের বাপ-মা বা অভিভাবকগণই বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির করেন। বর-কনের মতামত লওয়া হয় না। বিবাহের পূর্বে কন্যাপক্ষ হইতে কেহ আসিয়া বর দেখিয়া যায়। কনে দেখিবার রীতি নাই। বর-কনে যদি পরস্পরকে পত্নী বা স্বামীরূপে গ্রহণ করিতে একান্তই অনিচ্ছুক হয়, তবে সম্বন্ধ ভাঙিয়া যায়। কন্যাপক্ষ নিজের অবস্থানুযায়ী যৌতুক দেয়। কোন দাবী-দাওয়া নাই। যৌতুক দুই প্রকার—সজ ও ফুলোনি। সজ বরের প্রাপ্য। ফুলোনি স্ত্রীধন। স্বজাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণ বা স্বজাতীয় পাত্রে কন্যা সম্প্রদান নিষিদ্ধ। ব্রাহ্মণ গদ্দি ব্রাহ্মণেতর রমণীকেই বিবাহ করিতে পারে এবং ব্রাহ্মণেতর পাত্রেই কন্যা বা ভগ্নীদান করিতে পারে। ক্ষত্রিয় এবং অন্যান্য জাতি সম্বন্ধেও একই ব্যবস্থা। বাল্য-বিবাহ অজ্ঞাত। গদ্দিগণ বলে যে, 'নও-জোয়ান' হইলে বিবাহ করিতে হয় এবং অপরিণত দেহ দম্পতীর সন্তান ক্ষুদ্রকায় ও ক্ষীণজীবী হয়। ২০ বৎসরের পূর্বে নারীর এবং ২৫ বৎসরের পূর্বে পুরুষের বিবাহ হয় না। অনেক সময় পাত্র-পাত্রীর শৈশবেই বাগ্দান অর্থাৎ বিবাহের কথাবার্তা স্থির হইয়া থাকে।

গদ্দিগণ হিন্দু ধর্মাবলম্বী। আমাদেরই মত এক ভগবানে বিশ্বাসী হইলেও ইহারা বিভিন্ন দেব-দেবীরও উপাসনা করিয়া থাকে। আমাদেরই মত ইহারাও স্বর্গত পিতৃপুরুষের উদ্দেশ্যে শ্রাদ্ধ, তর্পণ ইত্যাদি করিয়া থাকে। ইহাদের মন্ত্রাদি সংস্কৃত ভাষায় রচিত। একমাত্র ব্রাহ্মণ জাতীয় গদ্দিই পুরোহিতের কাজ করিতে পারে। অস্পৃশ্য গদ্দিগণের পুরোহিত নাই, বিবাহ, শ্রাদ্ধ, উপনয়ন এবং মৃত সংকারের জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। গদ্দিগণ পুরোহিতদিগকে অতিশয় শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখে। পুরোহিত সম্প্রদায়ের সামাজিক প্রভাব-প্রতিপত্তি খুবই বেশী। সমাজ-

জীবন বহুলাংশে পুরোহিতদিগের ইঙ্গিতেই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

গদ্দি নারী-পুরুষের নামের মধ্যে একদিকে যেমন হিন্দু পৌরাণিক নাম আছে, অপরদিকে তেমনই আবার অদ্ভুত অদ্ভুত নামেরও অভাব নাই। * গ্রাম্য মাতব্বরগণই ছোটখাট বিবাদ-বিসম্বাদ মিটাইয়া দেন। বাড়াবাড়ি হইলে আদালত-ফৌজদারী করিতে হয়। বহু-বিবাহ প্রথার প্রচলন আছে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলেই সাধারণত পত্ন্যন্তর গ্রহণ করা হয়। মৃতদার গদ্দি দ্বিতীয়বার বিবাহ করিলে সাধারণত কোন বিধবাকেই বিবাহ করে। তবে ইহার ব্যতিক্রমও দেখা যায়। সন্তানবতী বিধবার স্বামীর পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে অধিকার নাই। কন্যারও পিতৃ-সম্পত্তিতে অধিকার নাই। সন্তানহীনা বিধবা পুনরায় স্বামী গ্রহণ করিলে মৃত স্বামীর জ্ঞাতিবর্গ তৎপরিত্যক্ত সম্পত্তির অধিকারী হয়।

বিবাহের পর কনে স্বামীর ঘরে চলিয়া যায়। কখনও কখনও জামাতাকেও কিছুদিনের জন্য শ্বশুরগৃহে অবস্থান করিতে দেখা যায়। অবরোধ-প্রথা অজ্ঞাত হইলেও গদ্দিগণ স্ত্রী-পুরুষের অবাধ মেলামেশার ঘোরতর বিরোধী। স্বামী-স্ত্রীও সাধারণত অন্যের সম্মুখে পরস্পরের সহিত বাক্যালাপ করে না।

গদ্দি জাতি অতিশয় সরল, সত্যনিষ্ঠ এবং ধর্মভীরু। সরলতা, সত্যনিষ্ঠা এবং ধর্মভীরুতা কাঙড়া-হিমাচলের অধিবাসী মাত্রেরই বৈশিষ্ট্য হইলেও গদ্দিজাতি এই সমস্ত গুণে অন্য সকলকে ছাড়াইয়া গিয়াছে। অপরাধ ইহাদের মধ্যে প্রায় অজ্ঞাত। গদ্দি রমণীর চরিত্রের দৃঢ়তা অতুলনীয়। প্রাণান্তেও সে দ্বিচারিণী হয় না বা বিবাহ ব্যতীত যৌন সম্পর্ক স্থাপন করে না।

গদ্দিগণ দিল-খোলসা, স্ফূর্তিবাজ জাতি। মদ্যাসক্তি ইহাদের চরিত্রের একটি প্রধান দুর্বলতা। পূর্বে ত ইহারা নিজেরাই মদ্য প্রস্তুত করিত। এখন কি করে বলা শক্ত। গদ্দি জাতি দেখিতে সুদর্শন। ইহাদের মেয়েরা ত প্রায়ই রূপসী হইয়া থাকে। গদ্দি রমণীর গাত্রবর্ণ সাধারণত উজ্জ্বল গৌর, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুগঠিত এবং মুখশ্রী লালিত্য-পূর্ণ। হিমালয়ের আরও উপরের দিকের অন্যান্য অধিবাসীদিগের তুলনায় গদ্দিগণ অধিকতর নিষ্ঠার সহিত হিন্দুধর্মের আচার-অনুষ্ঠানগুলি প্রতিপালন করিয়া থাকে।

গদ্দি জাতি নিরক্ষর। শতকরা এক-জনও নিজের নাম সই করিতে পারে কিনা সন্দেহ। চাকুরি অর্থাৎ দাসত্বকে ইহারা অত্যন্ত ঘৃণা করে। একটি গদ্দি লোক-গীতির দুইটি কলিতে বলা হইয়াছে—

"টা চাক্‌রা জো না দেনি, চাচুয়া,
দেনি, চাচুয়া
"হাক্ পান্দে উথি গহ্‌ন্দে হো" অর্থাৎ
"পিতা, আমাকে ভৃত্যের হস্তে সমর্পণ করিও না। (প্রভু) আহ্বান করিলে সে ত (আমাকে ফেলিয়া) চলিয়া যাইবে।"

গদ্দি ভাষায় অনেকে সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষ্য করিলেও ইহা আসলে পাহাড়ী ভাষা। গদ্দি নৃত্য-গীত গদ্দি জাতির নিজস্ব সম্পদ। ঢোলক ইহাদের প্রধান বাদ্যযন্ত্র। জন্মাষ্টমীর পরদিন গদ্দিদিগের গ্রামে গিয়াছিলাম। সঙ্গী পালমপুরের স্কুল-ইন্সপেক্টর শ্রীতারাচাঁদজী। তিনিই দোভাষীর কাজ করিলেন। আমাদের অনুরোধে একটি গান গাওয়া হইল। গান এবং তাহার অনুবাদ নীচে দেওয়া হইল—

"ভাদ্‌রু মাহিনে নেহ্‌রি রাতি হাঁ
"কৃষ্ণে হাঁ জনম লিয়া হাঁ
"আন্ধি দাইয়া লোজন হোই
"প্যাহ্‌রী ও যে নিন্দ্রা যে আই হাঁ
খুড়ি যান্দি বজর প্রাউলি হাঁ
"খুড়ি যান্দি হাথে হাথ কড়িয়া হাঁ
"খুড়ি যান্দি গলারে জঞ্জীর হাঁ
"খুড়ি যান্দি প্যাড়ারি বেড়ি হাঁ
"সম্ভা চোটা পাইয়া নিগাড়ে হাঁ
"বালক গল্লাঁ লাগা লানা হাঁ
"মিঞো পজাও গোক্‌লা নগরী হাঁ
"বসুদেব কুছ্‌ড়ে মা পায়া হাঁ
"আগো আয় দণ্ডক্রারণ বন হাঁ
"শের শেড়ালী গর্জি আই হাঁ
"বড় উরন্দা হাঁ বসুদেব হাঁ
"থর থর কাম্বে বসুদেব হাঁ
"আগো আয়ী ত নদী যমুনা
"কি'হা লঙ্ঘনী নদী যমুনা হাঁ
"ডর বহুত করে বসুদেব হাঁ
"চরণা বন্দি হটি যান্দি হাঁ
"আগো আয়তা গোকুল নগরী
"তঠি ভোল্যা নন্দ ম্যাহ্‌রা দা ম্যাহ্‌ল।"

অর্থাৎ ভাদ্র মাসের অন্ধকার রজনী। কৃষ্ণ জন্মগ্রহণ করিলেন। অন্ধ-ধাত্রী দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া পাইল। রক্ষী নিদ্রামগ্ন। কারা-কক্ষের পাষাণ-কবাট খুলিয়া গেল। হাতের কড়ি, গলার শৃঙ্খল, পায়ের বেড়ি সমস্তই খুলিয়া গেল। ঢাকগুলি আপনা হইতেই বাজিয়া উঠিল। সদ্যোজাত শিশু বলিতে লাগিল। 'আমাকে গোকুল নগরে পৌঁছাইয়া দাও' বসুদেব শিশুকে কোলে তুলিয়া লইলেন। পথে পড়িল দণ্ডকারণ্য। সাপ এবং বাঘ গর্জন করিয়া ছুটিয়া আসিল। বসুদেব ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। আরও কিছুদূর গেলে যমুনা নদী। বসুদেব কি করিয়া নদী পার হইবেন? (তিনি) খুবই ভয় পাইলেন। নদী (কৃষ্ণের) চরণ বন্দনা করিয়া সরিয়া গেল। (নদী পার হইয়া) কিছুদূর যাইতেই গোকুল নগরী। গোকুলে রাখালরাজ নন্দের রাজপ্রাসাদ।

হিমাচল-বক্ষে পার্বত্য স্রোতস্বিনী তীরে বিন্ধ্যবাসিনীর মন্দির-প্রাঙ্গণে বসিয়া সেদিন মনে হইয়াছিল যে, বাঙলার পল্লী-বাউলের মুখে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্ম-কাহিনী শুনিতেছি। ভুলিয়া গিয়া-ছিলাম দেশান্তরের কথা। গান শেষ হইবার পরেও বহুক্ষণ কানে বাজিতে লাগিল—

"ভাদ্‌রু মাহিনে নেহ্‌রি রাতি হাঁ
"কৃষ্ণে হাঁ জনম লিয়া হাঁ"

দুর্যোগের অন্ধ-তামসী নিশীথেই ত যুগে যুগে পরিত্রাণ-কর্তার আবির্ভাব ঘটে; দুঃখের বরষায় যেদিন অশ্রু-নদীতে বান ডাকে, সেদিনই ত বক্ষস্বার বন্ধুর রথচক্রে মুখরিত হইয়া উঠে।

গদ্দি ছড়াগুলিও গভীর তাৎপর্য-বোধক। একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

"খসম মরে দলবর করে
"ইয়ার মরে কি'হা জিনা
"সিন্দ টুটে তম্পী পাইয়ে
"অম্বর টুটে কি'হা সিনা"।

অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যু হইলে এখানে সেখানে নূতন স্বামী খোঁজা যায় ('দেশে দেশে কলত্রাণি'?) কিন্তু দয়িতের মৃত্যু হইলে প্রাণই যে বাঁচে না। কম্বল ছিঁড়িলে না হয় তালি দেওয়া যায়; কিন্তু আকাশ ভাঙিলে ত আর জোড়া দেওয়া (সেলাই করা) চলে না। (ক্রমশ)

---

* পুরুষের নাম—স্যাণ্ডা, রাবণ, ভীমসেন, ড্যাঞ্জু ইত্যাদি।
নারীর নাম—বুধুলি, তুলসী, ছ্যালো (রূপসী), সাহাবো (সাহেবের মত) ইত্যাদি।

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

দিন দুয়েক প্যারিসে ছিলেন চার্লি, তারপর ট্রেনে করে তিনি বার্লিন রওনা হয়ে গেলেন। বার্লিনে গিয়ে দেখেন, অবাক কাণ্ড, কেউই তাঁকে চেনে না, তাঁর নাম পর্যন্ত শোনেনি কেউ। আসলে কিন্তু এতে অবাক হবার কিছু ছিল না। তার কারণ, যুদ্ধ চলতে থাকায় মিত্রপক্ষীয় দেশগুলিতে তোলা কোনও ছবি এতদিন জার্মানিতে আসতে পারেনি। কেউ তাঁকে চেনে না। তাতে একটা সুবিধে হল এই যে, বার্লিনে তিনি কয়েকটা দিন নিরিবিলিতে একটু বিশ্রাম নেবার সুযোগ পেলেন। কিন্তু সত্যি বলতে কি, চার্লির এটা খুব ভাল লাগেনি। "আমার নাম পর্যন্ত এরা শোনেনি! ভাবতে অবাক লাগছে, খারাপ লাগছে।" একদিন এক রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকেছিলেন। তা ওয়েটার তাঁকে কোথায় নিয়ে বসাল, না "ঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে। কেউই আমাকে চেনে না এখানে, কেউ না। ভাবতেই কেমন বিরক্তি লাগতে লাগল। অথচ, বিরক্তি-বোধেরই বা এতে আছে কী। আমি তো একটু বিশ্রাম পেতেই চেয়েছিলাম।"

রেস্তোরাঁর মধ্যেই অকস্মাৎ হলিউডের এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। চার্লিকে দেখে তাঁর আনন্দের আর সীমা রইল না। কাছে এসে বললেন, "চুপচাপ বসে আছ কেন? আমাদের টেবিলে এস। পোলা নেগ্রি তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চান।" পোলার জন্মভূমি পোল্যান্ড, জার্মান চলচ্চিত্রের তিনি একজন সেরা অভিনেত্রী। আলাপ করে চার্লি একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। এই আলাপ-পরিচয়ের মধ্য দিয়ে দুজনের মধ্যে একটি নিবিড় অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক গড়ে উঠল। যে কটা দিন জার্মানিতে ছিলেন চার্লি, প্রায়ই তাঁদের দেখাসাক্ষাৎ হত। পোলা পরে অ্যামেরিকায় গিয়েছিলেন। কিন্তু পরের কথা পরে হবে।

বার্লিন থেকে প্যারিস হয়ে বিমান-যোগে চার্লি ইংল্যান্ডে ফিরে এলেন। বিমান বিভাগীয় আন্ডার সেক্রেটারী স্যার ফিলিপ স্যাসুন তাঁর সম্মানার্থে একটা পার্টির আয়োজন করেছিলেন। নিমন্ত্রণ রক্ষা করে বিমানযোগে আবার প্যারিসে ফিরে গেলেন। সেখানে তাঁর "দী কীড" বইয়ের মুক্তি উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে যোগ দিয়ে পরের দিনই আবার লণ্ডনে ফিরে এলেন চার্লি। লণ্ডনে সেদিন দু-দুটো জায়গায় তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল, কিন্তু কোনওটাতেই তাঁর যাওয়া হয়ে উঠল না। কেন, বলছি। প্রথম নিমন্ত্রণটা করেছিলেন লয়েড জর্জ। সেইখানেই চার্লি যাচ্ছিলেন। কিন্তু লণ্ডন শহরে তাঁকে নিয়ে তখন কাড়াকাড়ি পড়ে গিয়েছে। ক্রয়ডন বিমানঘাটিতে এসে নামতে-না-নামতে পরিচিত একদল লোক এসে প্রায় ছিনিয়ে নিলেন চার্লিকে, তাঁকে নিয়ে তাঁরা ক্ল্যাপহ্যামের এক সিনেমা-হাউসে চলে গেলেন। প্রাণপণে বাধা দিয়েছিলেন চার্লি, প্রবল আপত্তি জানিয়েছিলেন, কিন্তু হা হতোস্মি, কে কার কথা শোনে। যখন বুঝলেন, বাধা দিয়ে আর কোনও লাভ নেই, ভাগ্যের হাতে সঁপে দিলেন নিজেকে। ক্ল্যাপহ্যামের সেই
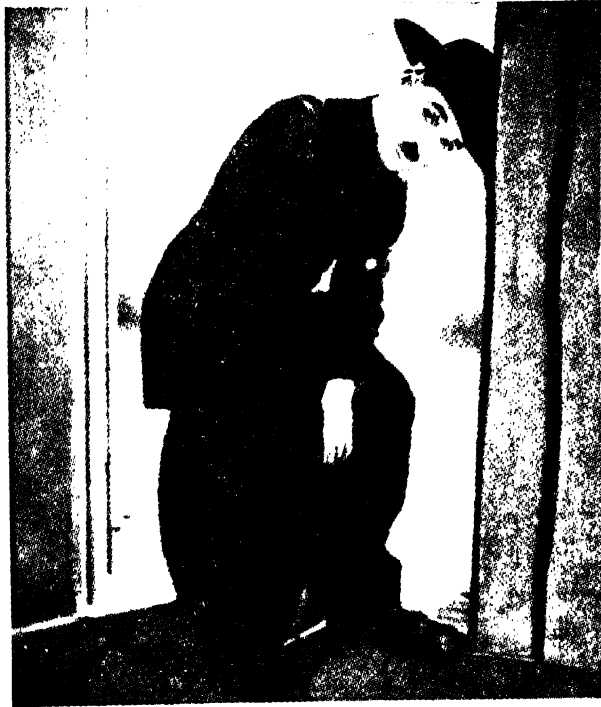
"দী পীলগ্রিম" চিত্রে চার্লি

এ উয়োম্যান অব প্যারিস"-এর একটি দৃশ্য

সিনেমা-হাউসে চার্লি সেদিন ছোটখাট একটা বক্তৃতাও দিয়েছিলেন। দর্শকরা তো স্তম্ভিত। চার্লি নিজেও অবশ্য কিছু কম বিস্মিত হননি। দ্বিতীয় নিমন্ত্রণটা করেছিলেন এইচ জি ওয়েলস। লয়েড জর্জের কাছ থেকে সেইখানেই যাবার কথা তাঁর। ওয়েলস তাঁকে জানিয়েছিলেন যে, প্রখ্যাত রুশ গায়ক চালিয়াপিনও সেদিন তাঁর বাড়িতে উপস্থিত থাকবেন। নামের মধ্যে খানিকটা সাদৃশ্য থাকায় চালিয়াপিনকে অনেকে চার্লি বলে ভুল করত। একদিনের একটা ঘটনার কথা বলি। চালিয়াপিন সেদিন কোথায় যেন যাবেন। ট্রেনে উঠে খানিক বাদে বুঝলেন, ভুল গাড়িতে উঠেছেন। বেশ কিছুটা রাস্তা তখন তিনি পার হয়ে এসেছেন। চালিয়াপিন তো হতবুদ্ধি। কী আর করেন, অ্যালার্ম চেন টেনে গাড়ি থামালেন তিনি। গার্ড আসতে নিজের পরিচয় দিয়ে ব্যাপারটা তাঁকে বুঝিয়ে বললেন। সব শুনে গম্ভীর মুখে গার্ড বললেন, "হুম্, সবই তো বুঝলুম, কিন্তু উপায় নেই। আপনি মশাই চার্লি চ্যাপলিনই হোন আর যে-ই হোন, গাড়িকে আর ফেরানো যাবে না।" যে কথা বলছিলাম। ওয়েল্সের বাড়িতেও চার্লির আর সেদিন যাওয়া হল না। তার কারণ, খুড়তুতো ভাই অব্রেকে তিনি কথা দিয়েছিলেন যে, ইংল্যান্ড ছাড়বার আগে অব্রের বাড়িতে একটা রাত তিনি কাটিয়ে যাবেন। পরদিন সকালেই ইংল্যান্ড থেকে তাঁর অ্যামেরিকায় রওনা হবার কথা। বাধ্য হয়েই ওয়েল্সের নিমন্ত্রণও তাঁকে বাতিল করতে হল।

অব্রে তাঁকে প্রথমেই নিয়ে গেলেন বেজওয়াটারের সেই ভাটিখানায়। গিয়ে দেখেন, ভাটিখানার দেয়ালে তাঁর আর সীডনির খানকয়েক ছবি সযত্নে টাঙানো রয়েছে। চার্লিকে এসে ঘিরে দাঁড়ালেন তাঁর পুরনো বন্ধুবান্ধবরা, তাঁর স্বাস্থ্যপান করলেন। ভাটিখানা থেকে অব্রের বাড়িতে। চার্লি সেখানে পিআনো বাজালেন, গান গাইলেন। গল্পগুজবে সময়টা যে কোথা দিয়ে কেটে গেল, বুঝতেও পারলেন না। হুঁশ হতে দেখেন, রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

হাতে আর সময় নেই। দৌড়ে তিনি রাস্তায় এসে দাঁড়ালেন। অত ভোরে ট্যাক্সি পাওয়া গেল না। কী করা যায় তাহলে? শাকসবজি-বোঝাই একখানা লরি তখন কভেন্ট গার্ডেনের দিকে চলেছে। হাত দেখাতেই লরিখানা থেমে দাঁড়াল, লাফিয়ে লরিতে উঠে ড্রাইভারের পাশের আসনটিতে গিয়ে বসে পড়লেন চার্লি। ড্রাইভার তো হতভম্ব। এ কাকে সে তার গাড়িতে তুলেছে। মাথা খুঁড়েও যার দেখা পাওয়া যায় না। সারাপথ গল্পগুজব চলল দুজনের। যথাসময়ে ড্রাইভার তাঁকে রীজ হোটেলের দোর-গোড়ায় এনে পেঁাছে দিয়ে গেল।

হেটির ভাই আর্থার কেলি তাঁকে বিদায় জানাতে এসেছেন। যাত্রার পূর্ব-মুহূর্তে চার্লির হাতে ছোট্ট একটা প্যাকেট গুঁজে দিলেন তিনি। বললেন, "একটা উপহার দিলাম, হয়তো তোমার ভাল লাগবে।" উপহার? জাহাজে উঠে প্যাকেটটা খুলে ফেললেন চার্লি। হেটির ফটো। হেটি! তাঁর প্রথম প্রণয়িনী। হেটি নেই। সে মারা গিয়েছে। তাকিয়ে থাকতে থাকতে দু-চোখ তাঁর জলে ভরে উঠল।

চার্লিকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাবার জন্য স্যাম গোল্ডউইন নিউইয়র্কে এক পার্টির আয়োজন করেছিলেন। তার দিন দুয়েক পরে ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসকে সঙ্গে নিয়ে চার্লি সিংসিং কারাগার পরিদর্শন করতে যান। স্যার টমাস লীপটন সেখানকার কয়েদীদের একটি কাপ উপহার দিয়ে-ছিলেন। কাপটি চার্লিকে দেখানো হল। তার উপরে লেখা রয়েছে, 'কেউই আমরা নিষ্পাপ নই।" সবাই ধরে পড়লেন, চার্লিকে একটি বক্তৃতা দিতে হবে। শুনে বিব্রত হলেন চার্লি, কী যে বলবেন কিছুই বুঝে উঠতে পারলেন না। আর তা ছাড়া বক্তৃতা জিনিসটা তাঁর আসে না। ও পথে না গিয়ে তিনি তাই একটু মূকাভিনয় করে দেখালেন। ছড়ি ঘোরাতে ঘোরাতে কয়েক পা এগিয়ে এলেন তিনি, শ্রাগ করলেন, তারপর এক-পা পিছনে তুলে দিয়ে তাঁর সেই বিখ্যাত ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তুমুল হাততালি। হাততালি থামবার পর কয়েদীদের উদ্দেশে তিনি বললেন, "বন্ধুগণ, যীশুখৃষ্ট বলেছিলেন, 'যদি কেউ নিষ্পাপ থাকে তো অপরাধীর উপরে সে এসে পাথর ছুঁড়ুক।' পাথর ছোঁড়ার অধিকার আমার নেই। তবে হ্যাঁ, পচা ডিম আমি অনেক ছুঁড়েছি।"

ইংল্যান্ডে গিয়ে চার্লির মানসিক অশান্তি অনেকটা কেটে গিয়েছিল। হলিউডে ফিরে এসে নতুন উদ্যমে তিনি

...াল্লার তাঁর "পে ডে"র কাজে হাত দিলেন। ...-বইয়ের শ্যুটিং শুরু করে দিয়েই তিনি ইংল্যান্ডে চলে গিয়েছিলেন। "পে ডে" দু রীলের বই। এর পর আর দু রীলের ...ই তিনি তোলেননি।

চার্লি নেমেছিলেন এক ফাঁকিবাজ শ্রমিকের ভূমিকায়। রাজমিস্ত্রীর কাজ। একটা অসমাপ্ত বাড়ির গায়ে ভারা বেঁধে অনেক উঁচুতে তিনি দাঁড়িয়ে রয়েছেন, আর নীচের তলা থেকে তাঁর দিকে ইঁট ছুঁড়ে দেওয়া হচ্ছে। ইঁটগুলিকে নিয়ে অনায়াস দক্ষতায় যেভাবে লোফালুফি খেলছেন তিনি, তাতে বিস্মিত হতে হয়।

মাইনের দিন। শ্রমিকদের হপ্তা মিটিয়ে দেওয়া হচ্ছে। চার্লির ধারণা, যত টাকা তাঁর পাওয়া উচিত ছিল, তা তিনি পাননি। অথচ উপরওয়ালাকে গিয়ে যে সে-কথা বলবেন, এমন সাহস নেই। অগত্যা নিজের সামনে একটা মানুষের অস্তিত্ব কল্পনা করে নিয়ে তার সঙ্গে তিনি যুক্তিতর্ক শুরু করে দিলেন। এরকম কৌতুককর দৃশ্য আরও কয়েকটি আছে। "পে ডে"র পর "দী পীলগ্রিম"। ফার্স্ট ন্যাশনালে এইটিই তাঁর শেষ বই। ছবি হিসেবে "পে ডে"র সঙ্গে এ-বইয়ের কোনও তুলনাই হয় না। "দী পীলগ্রিম" তাঁর অন্যতম শ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। তখন পর্যন্ত যে-সব বই তিনি তুলেছেন, তার মধ্যে একমাত্র "শোলডার আর্মস্" আর "দী কীড"-এর সঙ্গেই এর তুলনা চলতে পারে।

চার্লি নেমেছিলেন এক পলাতক কয়েদীর ভূমিকায়। প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় যে, তিনি পালাচ্ছেন। এর আগে মীউচুয়ালের হয়ে যে শেষ বইখানি তুলেছিলেন ("দী অ্যাডভেঞ্চারার") তারও আরম্ভ অনেকটা এইরকম। এ-বইয়ে অবশ্য কনস্টেবলদের ছোটাছুটির দৃশ্য নেই। খানিক এগিয়ে চার্লি দেখতে পেলেন, পুকুরের পারে জামাকাপড় ছেড়ে রেখে এক পাদরি স্নান করতে নেমেছেন। চট করে কয়েদীর পোশাক খুলে রেখে তিনি পাদরির পোশাক পরে নিলেন। কোথায় যাওয়া যায় এখন। সামনে একটা ম্যাপ বিছিয়ে চার্লি করলেন কি, চোখ বুঁজে ম্যাপের এক জায়গায় একটা পিন গেঁথে দিলেন। যেখানে পিন গেঁথেছেন, সেইখানেই তিনি যাবেন। চোখ খুলে দেখেন, অজান্তে সিং-সিং কারাগারের উপরে পিন বিদ্ধ করেছেন তিনি। শিউরে উঠে আবার চোখ বুজলেন। এবারে যে জায়গায় পিন বিদ্ধ হল, তার নাম ডেভিলস গাল্শ্। উত্তম, সেইখানেই তিনি যাবেন।

ট্রেনে উঠলেন চার্লি। পাশের ভদ্রলোক চুপচাপ বসে বসে খবরের কাগজ পড়ছেন। কী খবর? উঁকি দিয়ে দেখেন, আরে সর্বনাশ, তারই জেল থেকে পালানোর খবর। শুধু তাই নয়, যে ভদ্রলোক বসে বসে কাগজ পড়ছেন, তিনি একজন পুলিশ কর্মচারী। পরের স্টেশনেই নেমে পড়লেন চার্লি। প্ল্যাটফর্মে এত ভিড় কিসের? না, নতুন একজন পাদরি আসবেন, স্থানীয় লোকরা তাঁকে অভ্যর্থনা জানাতে এসেছেন। শহরের শেরিফও তার মধ্যে আছেন। চার্লি অতশত জানতেন না, তিনি ভাবলেন, শেরিফ এসেছেন তাঁকে গ্রেপ্তার করতে। হাত দুখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন চার্লি। কিন্তু কই, তাঁকে তো হাতকড়া পরিয়ে দেওয়া হল না। সবাই ভেবেছে, তিনিই সেই নতুন পাদরি, হাত তুলে তাদের আশীর্বাদ করছেন। চার্লির পরনেও পাদরির পোশাক, সুতরাং ভুল হওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়।

"এ উয়োম্যান অব প্যারিস"-এ অ্যাডলফ মঞ্জু ও এডনা পারভিয়াস

শহরের গির্জায় নিয়ে যাওয়া হল চার্লিকে। এবারে তাঁকে প্রার্থনানুষ্ঠান পরিচালনা করতে হবে। কীভাবে তা করতে হয়, চার্লি জানে না। নিরুপায় হয়ে গির্জার সেক্সটনের ভাবভঙ্গীগুলোকে তিনি হুবহু নকল করে যেতে লাগলেন। কাশি, গলা-খাকারি, কিছুই বাদ গেল না।

অর্থ-সংগ্রহের জন্য গির্জার প্রবেশ-পথের পাশে যে বাক্স বসানো থাকে, প্রার্থনানুষ্ঠানের শেষে সেগুলিকে চার্লির কাছে নিয়ে আসা হ'ল। হাতে নিয়ে চার্লি দেখলেন, বেশ ওজন সেগুলোর; তার মানে বাক্সের মধ্যে প্রচুর টাকা-পয়সা জমেছে। চার্লিকে এবারে উপদেশ দান করতে হবে। কী যে বলবেন, কিছুই তিনি জানেন না। ঘাবড়ে গিয়ে শেষ পর্যন্ত তিনি ঠিক করলেন, ডেভিড আর গলিয়াথের কাহিনীটিকে তিনি অভিনয় করে দেখাবেন। একক অভিনয়ের মধ্য দিয়ে যে অপরূপ দক্ষতায় কাহিনীটিকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তাতে চমৎকৃত হতে হয়। পরিচিত বন্ধুবান্ধবদের কাছে এ অভিনয় তিনি আগেও করেছেন, এই সর্বপ্রথম চিত্রে তার রূপদান করলেন। এবং "দী পীলগ্রিম" চিত্রের এইটিই যে সর্বশ্রেষ্ঠ দৃশ্য, তাতেও কোনও সন্দেহ নেই। তিনিই ডেভিড, আবার তিনিই গলিয়াথ। ডেভিডের ভূমিকায় খানিকক্ষণ অভিনয় করে তারপর তিনি গলিয়াথের ভূমিকায় গিয়ে দাঁড়ান, তারপর আবার ফিরে আসেন ডেভিডের ভূমিকায়। প্ল্যাটফর্মের একদিক থেকে আরেক দিকে যাওয়া-আসা ছাড়া অন্য আর কোনও স্থূল বৈলক্ষণ্য অবশ্য দেখতে পাওয়া যায় না। ডেভিডের ভূমিকায় অভিনয় করতে করতে এক টুকরো পাথর কুড়িয়ে নেন তিনি, গলিয়াথের উদ্দেশ্যে সজোরে সেটাকে নিক্ষেপ করেন। তারপর নিজেই আবার গলিয়াথের জায়গায় গিয়ে দাঁড়ান, যেন সেই পাথরের টুকরোটা অকস্মাৎ তাঁর ললাটে এসে বিদ্ধ হয়েছে, এমন একটা ভাব দেখিয়ে প্ল্যাটফর্মের উপরে আছড়ে পড়েন চার্লি। শুধু ডেভিড আর গলিয়াথকে ফুটিয়ে তোলেননি তিনি, তাঁর অভিনয় দেখে মনে হয় যেন দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর আপনাপন সৈন্যবাহিনীও সেখানে উপস্থিত রয়েছে, অবাক বিস্ময়ে দুই বীরের যুদ্ধ দেখে যাচ্ছে। প্রার্থনানুষ্ঠানে যারা যোগ দিতে এসেছিল নতুন পাদরির কাণ্ডকারখানা দেখে তারা তো হতবুদ্ধি। জনতার মধ্যে ছোট্ট একটি

শিশুও ছিল। সে কিন্তু এই অভিনয় দেখে খুব খুশী হয়েছে। চার্লি সেটা বুঝতে পেরে তার উদ্দেশ্যে 'বাউ' করলেন বার কয়েক। জনতা তাতে আরও বিমূঢ় হয়ে গেল।

গির্জা থেকে একটি বাড়িতে নিয়ে আসা হল চার্লিকে। এইখানেই তাঁকে থাকতে হবে। প্রার্থনানুষ্ঠানের সময় একটি মেয়ের সংগে বারকয়েক তাঁর চোখাচোখি হয়েছিল। এই বাড়িরই একাংশে সে থাকে। সেটা বুঝতে পেরে চার্লি খুব খুশী হলেন। বিকেলবেলা আর এক বিপদ। শহরের একটা ডানপিটে ছেলেকে তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়েছে। বাচ্চা ছেলে, কিন্তু তার অত্যাচারে সবাই নাকি অতিষ্ঠ। চার্লিকে সবাই অনুরোধ জানালেন, ছেলেটিকে কাছে রেখে তাঁকে তার মতির পরিবর্তন ঘটাতে হবে। পরিবর্তন ঘটাবেন কি, তার কাণ্ডকারখানা দেখে চার্লি নিজেই ততক্ষণে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছেন। মেয়েদের পোশাকে আঠা-মাখানো কাগজ আটকে দিয়ে, লাল-মাছের জার উল্টে ফেলে, বাসনপত্র ভেঙে দু মিনিটেই সে ঘরের চেহারা পাল্টে দিল। চার্লি তাকে বাধা দিতে গিয়েছিলেন, তাঁকে সে খিমচে দিয়েছে। তখন-তখনই চার্লি আর কিছু বললেন না। তারপর, সবাই যখন চলে গিয়েছে, একা পেয়ে ছেলেটিকে ধরে তিনি বেশ কয়েক ঘা লাগিয়ে দিলেন। খানিক বাদে এক গুণ্ডার আবির্ভাব। তাকে দেখে চার্লি তো থ। একই জেলে এই লোকটা তাঁর সংগে কয়েদী ছিল। এখন এই বাড়িতে এসে কাজ নিয়েছে। সর্বনাশ, চার্লির কীর্তি-কাহিনী এ ফাঁস করে দেবে না তো? তা অবশ্য করল না লোকটা। তবে চার্লিকে বেকায়দায় পেয়ে, সেই মেয়েটির কিছু টাকাকড়ি সে চুরি করল। বুঝল যে, চার্লি এ নিয়ে হৈ-চৈ করতে সাহস পাবেন না। মুখে তাকে কিছুই বললেন না চার্লি, শুধু প্রতীক্ষায় রইলেন, কখন সে একটু অন্যমনস্ক হয়। তারপর সুযোগ বুঝে তার পকেট থেকে টাকাটা তিনি আবার হাতিয়ে নিলেন।

পুলিস এসে কিন্তু চার্লিকেই চোর বলে সন্দেহ করল। মেয়েটি এদিকে ততক্ষণে সবই বুঝতে পেরেছে। পুলিসের কাছে আসল ব্যাপারটা খুলে বলল সে; অনুরোধ করল, চার্লিকে যেন তারা ছেড়ে দেয়। বইখানির পরিণতি ভারী সুন্দর। মেয়েটির কাকুতি-মিনতিতে শেরিফের দয়া হল; স্থির করলেন চার্লিকে তিনি ছেড়ে দেবেন। কিন্তু খোলাখুলিভাবে তো আর এই জেল-পালানো কয়েদীকে ছেড়ে দেওয়া যায় না, তাই একটু চাতুরির আশ্রয় নিতে হল তাঁকে। চার্লিকে তিনি মেক্সিকোর সীমান্তে নিয়ে গেলেন। সীমান্ত-রেখাটা পার হলেই চার্লি নিরাপদ; এদিকের আইন তখন আর তাঁকে ছুঁতে পারবে না। চার্লিকে তিনি সীমানা-রেখার ওদিক থেকে গোটাকয়েক ফুল তুলে নিয়ে আসতে বললেন। শেরিফ আশা করেছিলেন, একবার ছাড়া পেলে চার্লি আর ফিরে আসবে না। কিন্তু অবাক হয়ে দেখলেন যে, ফুল তুলে নিয়ে চার্লি আবার এদিকে ফিরে এসেছে। বিরক্ত হয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন শেরিফ, ফুল-হাতে চার্লি তাঁর পিছন পিছন দৌড়তে লাগলেন। চটে গিয়ে শেরিফ করলেন কি, ঘোড়া থেকে নেমে চার্লিকে আবার সীমানা-রেখার কাছে নিয়ে গেলেন তিনি, লাথি মেরে চার্লিকে তিনি সীমানা-রেখার ওদিকে পাঠিয়ে দিলেন। চার্লির তখন উভয় সংকট। একদিকে মেক্সিকোর দস্যুদল, অন্যদিকে ক্রুদ্ধ শেরিফ। কী করেন এখন? সীমানা-রেখার দুই দিকে দু পা রেখে বেসামাল হয়ে তিনি দৌড়তে লাগলেন।

ফার্স্ট ন্যাশন্যালের সংগে চুক্তির মেয়াদ ফুরিয়ে এল এদিকে। চার্লি তাতে খুশীই হলেন। এর পর কী করবেন, অনেক দিন আগে থেকেই তা ঠিক করে রেখেছেন। এতদিন শুধু ছবি তৈরি করেই এসেছেন চার্লি, ছবির পরিবেশন-ভারও এবারে তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করবেন। খেটেখুটে ছবি তুলে তারপর অন্যের হাতে তা সঁপে দিয়ে কোনও লাভ নেই।

যাকিছু ব্যবস্থা করা দরকার, সিডনীই সব করে রেখেছিলেন। তাঁরই উদ্যোগে চলচ্চিত্র জগতের সেরা চারজন প্রযোজক—চ্যাপলিন, মেরি পীকফোর্ড, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস আর ডী ডবু গ্রীফিথ—এসে একত্র মিলিত হয়েছিলেন। গড়ে উঠেছিল ইউনাইটেড আর্টিস্টস কর্পোরেশন।

১৯১৯ সালে এর প্রতিষ্ঠা। চার্লি অবশ্য তখন-তখনই এতে যোগ দেননি। প্রতিষ্ঠার চার বছর বাদে—"দী পীলগ্রিম" ছবিখানি তৈরি হয়ে যাবার পর, ১৯২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে—তিনি এসে যোগ দিলেন।

এখনও তিনি এর অন্যতম ডিরেক্টর। ইউনাইটেড আর্টিস্টস কর্পোরেশনে এখনও তাঁর চার আনা অংশ রয়েছে। এখানে এসে প্রথম যে বইখানি তিনি তুললেন, তার কোনও প্রধান ভূমিকায়

তিনি নামেননি। ছোট্ট একটা ভূমিকায় তিনি নেমেছিলেন, অনেকে তো তাঁকে চিনতেই পারেনি। আমিও পারতাম না। চার্লিই চিনিয়ে দিলেন। তাঁরই পাশে বসে ছবিখানি আমি দেখছিলাম। হঠাৎ এক জায়গায় এসে আমার হাঁটুর উপরে হাত রাখলেন তিনি, পর্দার দিকে আঙুল তুলে চাপা গলায় বললেন, "ঐ যে আমি।" তাকিয়ে দেখি, ক্ষুদ্রকায় এক রেল-কুলি। কাঁধের উপর বিরাট একটা ট্রাঙ্ক চাপিয়ে দ্রুতপায়ে ট্রেনের দিকে এগিয়ে চলেছে। চার্লি।

বইখানার নাম "এ উয়োম্যান অব প্যারিস"। নায়িকার ভূমিকায় নেমেছিলেন এডনা পার্‌ভিয়াস। চার্লির ছবিতে এই তাঁর শেষ অভিনয়।

এর আগে যেসব বই তুলেছেন চার্লি, "এ উয়োম্যান অব প্যারিস"এর সঙ্গে তার কোথাও কোনও মিল নেই। এ-বই হাসির নয়। এর কাহিনী বিয়োগান্তক। এবং এর পরিকল্পনায় যে পরিণত, মার্জিতরুচির স্পর্শ রয়েছে, তখনকার দিনের চলচ্চিত্র-শিল্পে তা প্রায় অকল্পনীয় বললেও চলে। পরবর্তী কালের চিত্র-শিল্পের উপরে এর প্রভাবও বড় সামান্য নয়। তখনকার দিনের যাঁরা অগ্রগণ্য চিত্রশিল্পী, আপনাপন চিত্রে ব্যবহারের জন্য নির্দ্বিধায় তাঁরা এ-বইয়ের কয়েকটি কৌশলকে গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি, আর্নেস্ট লুবিৎসও এর থেকে প্রয়োজনীয় শিক্ষা আহরণে কুণ্ঠাবোধ করেন নি।

নায়কের ভূমিকায় নামানো হয়েছিল এডল্‌ফ মঞ্জুকে। এর আগে তিনি মেরি পিকফোর্ড, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস আর রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর কয়েকখানা বইতে নেমেছিলেন। তবে ছোটখাটো ভূমিকায়। এই সর্বপ্রথম তাঁকে প্রধান ভূমিকা দেওয়া হল। পেশাদার প্রেমিকের ভূমিকায় এর পর যে অভিনয় তিনি করেছেন, এইখানেই তার গোড়াপত্তন।

"এ উয়োম্যান অব প্যারিস"-এর কাহিনী রচনা করেছিলেন চার্লি স্বয়ং। কাহিনী ঐতিহ্যপন্থী। গ্রীক ট্র্যাজেডির মত এ-বইয়েও নিয়তির প্রাধান্য দেখতে পাওয়া যাবে। ছবি আরম্ভ হবার আগে কয়েক লাইনের একটি ভূমিকা রয়েছে। চ্যাপলিন তাতে বলছেন, "মানব-সমাজ গঠিত হয়েছে হীরো আর ভীলেন নিয়ে নয়, মানব আর মানবী নিয়ে। ঈশ্বর তাঁদের হৃদয়ে কিছু কিছু কামনা মিশিয়ে দিয়েছেন। সেসব কামনার কিছু ভাল, কিছু মন্দ। আমরা যে মাঝে মাঝে অন্যায় করি, সেটা ইচ্ছা-কৃত নয়, আমাদের ভ্রান্ত বুদ্ধিই তার কারণ। এই সব ভ্রান্তিকে যাঁরা ঘৃণা করেন, তাঁরা অজ্ঞ। যাঁরা প্রাজ্ঞ, তাঁরা করুণা করেন।" সিংসিং কারাগার পরিদর্শন করতে গিয়েই কি এই জ্ঞান লাভ করেছিলেন তিনি? তখন থেকেই কি তাঁর মনে এই চিন্তার উদয় হয়েছে? নির্বাক চিত্রে সংলাপ থাকে না, আপনাপন মনোভাবকে যথাযথভাবে ফুটিয়ে তুলবার ব্যাপারে কণ্ঠস্বরের সাহায্য নেবার কিছুমাত্র উপায় নেই সেখানে। নির্বাক চিত্রে তাই ভূমিকার প্রয়োজন হয়। এ-বইয়ে সে-প্রয়োজন আরও বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তার কারণ, বেদনামিশ্র, বিয়োগান্ত এই বইয়ের যিনি নির্মাতা, দর্শকরা তাঁকে মিলনান্ত রঙ্গচিত্র-শিল্পী বলেই জানে। আর একটা কথা এখানে মনে রাখা দরকার। এ-বই তোলা হয়েছিল এই শতকের তৃতীয় দশকে। প্রথম মহাযুদ্ধ তার কিছুদিন আগেই শেষ হয়েছে। সর্বত্রই তখন একটা দায়িত্বহীন আনন্দের ভাব। জ্যাজ-এর উৎকট সুরঝঙ্কারের উদ্দাম উল্লাসের মধ্যেই সবাই তখন গা ভাসিয়ে দিয়েছে। চিত্রশিল্পের ক্ষেত্রেও যে তার প্রভাব এসে পৌঁছেছে, তাতে বিস্ময়বোধের কিছু নেই। সীসিল বী দ্যমীলের মত কল্পণাপ্রবণ শক্তিমান পরি-চালকরাও তখন প্রাচীন ইতিহাস আর বাইবেলের এক-একটা উত্তেজনাময় অধ্যায়কে অবলম্বন করে যে-যার বুদ্ধিমতন এক-একটি বই তুলে চলেছেন। নিতান্তই পরিতাপের কথা, এ-মনোভাবের এখনও অবসান ঘটেনি।

সে যাই হোক, এই রকমের একটা পরিবেশের মধ্যেই তোলা হয়েছিল "এ উয়োম্যান অব প্যারিস"। ফ্রান্সের একটি গ্রামে এর গল্পাংশের সূত্রপাত হয়েছে। গ্রামের মেয়ে মেরি (এডনা)। বাড়ি ফিরতে তার একটু রাত হয়েছে। সঙ্গে রয়েছে তার

বয়-ফ্রেন্ড। মেরির বাবা আগে থাকতেই চটে ছিলেন, মেরিকে তিনি বাড়িতে ঢুকতে দিলেন না। ছেলেটির নাম জাঁ। মেরিকে সে নিজের বাড়িতে নিয়ে গেল। গিয়ে তার বাবা-মাকে অনুরোধ করল, রাত্তিরের মতো মেরিকে আশ্রয় দিতে হবে। জাঁর বাপ-মা তাতে রাজী হলেন না। বাধ্য হয়েই তাই আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল দুজনে। স্থির করল, ট্রেনে করে তারা অন্য কোথাও চলে যাবে। স্টেশনে পেঁৗছে কুলির (চার্লি) সঙ্গে চটাচটির একটা দৃশ্য আছে।

মেরির হাতে কিছু টাকা তুলে দিল জাঁ; মেরিকে সে বলল যে, সে যেন দুখানা টিকিট কেটে রাখে। ট্রেন আসতে দেরি আছে, ইতিমধ্যে বাড়ি থেকে সে তার জিনিসপত্র নিয়ে আসবে। বাড়ি ফিরে জাঁ দেখল, বাবা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। দৌড়ে সে তখন ডাক্তার ডাকতে বেরিয়ে গেল। মেরি ওদিকে স্টেশনে বসে অপেক্ষা করছে তার জন্যে। জাঁ এত দেরি করছে কেন, সে বুঝে উঠতে পারছে না। একটু বাদেই ট্রেন এসে গেল।

ট্রেন এসে স্টেশনে প্রবেশ করল। সামনাসামনি ট্রেনটাকে না দেখিয়ে আভাসে সেটা বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এর আগে কোনও কিছুর উপস্থিতি জানাতে হলে সরাসরি সেটা দেখিয়ে দেওয়া হত। সে-পথে গেলেন না চার্লি। তিনি একটু সুক্ষ্ম কাজ দেখিয়ে দিলেন। প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আছে মেরি, আর ট্রেনের জানালা থেকে আলো পড়ে তার মুখের উপর আলোছায়ার খেলা চলেছে। প্রথম দ্রুত, তারপর আস্তে। তারপর এক সময় আলোটা তার মুখের উপরে স্থির হয়ে থাকে। বোঝা যায়, ট্রেন থেমে গিয়েছে। "এ উয়োম্যান অব প্যারিস"-এ এই ধরনের সুক্ষ্ম কাজ আরও অনেক আছে। অন্যান্য পরিচালকরাও এই সুক্ষ্ম কাজ দেখে খুব উৎসাহিত হয়েছিলেন। গতানুগতিক স্থুলতাকে বর্জন করে তাঁরাও একে একে এই ধরনের সুক্ষ্ম ব্যঞ্জনার আশ্রয় নিয়েছেন।

মেরিকে এর পর প্যারিসের এক বিরাট রেস্তোরাঁয় দেখতে পাওয়া যায়। তার পরনে দামী পোশাক। পাশে বসে রয়েছে তার নতুন প্রেমিক (অ্যাডলফ মঞ্জু)। অ্যাডলফকে সবাই যেভাবে অভিনন্দন জানাচ্ছে, তাতে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, এখানে তার খুবই খাতির। মেরির সঙ্গে আসলে তার কী সম্পর্ক, খুব সুক্ষ্ম একটি ইঙ্গিতের সাহায্যে চার্লি সেটা বুঝিয়ে দিয়েছেন। মেরির সঙ্গে তার বাড়িতে এল অ্যাডলফ, মেরিরই ওয়ার্ড্রোব থেকে নিজের একটি প্রয়োজনীয় জিনিস বার করে নিল।

দিনকয়েক বাদেই খবরের কাগজে একটি বিজ্ঞপ্তি দেখতে পেল মেরি। তাতে জানানো হয়েছে, অ্যাডলফ মঞ্জুর সঙ্গে এক ধনী-দুহিতার বিবাহ হবে। মেরি ভেবেছিল, শেষ পর্যন্ত তাকেই বিয়ে করবে অ্যাডলফ। এখন সেই বিজ্ঞপ্তি দেখে সে বুঝতে পারল যে, অ্যাডলফ এতদিন তাকে মিথ্যা আশ্বাস দিয়ে এসেছে। প্রথমে খুব রাগ হল তার, তারপর হঠাৎ এক সময় সে কান্নায় ভেঙে পড়ল। অ্যাডলফ এসে তাকে বোঝাল যে, আর কাউকে বিয়ে করলেও মেরিকে সে ত্যাগ করবে না। মেরির সঙ্গে তার সম্পর্ক ঠিক আগের মতই থাকবে। সেই দিনই সন্ধ্যাবেলায় জনৈক শিল্পী-বন্ধুর স্টুডিও থেকে ফোন করে অ্যাডলফ তাকে জানাল, স্টুডিওতে একটি পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। মেরি যেন এক্ষুনি সেখানে চলে আসে। স্টুডিওতে যেতে পথ হারিয়ে ফেলল মেরি, ভুল করে আর একজন শিল্পীর স্টুডিওতে গিয়ে ঢুকল। শিল্পীকে দেখে তো মেরি স্তম্ভিত। আর কেউ নয়, তারই প্রথম প্রেমিক জাঁ। জাঁর মায়ের সঙ্গে অনেক গল্প হল মেরির। তাঁরই কাছে সে জানতে পারল, যে-রাত্রে তাদের গ্রাম থেকে চলে আসবার কথা, সেই রাত্রেই জাঁর বাপ মারা যান। মাকে নিয়ে জাঁ এখন এখানেই আছে, ছবি এঁকে খুব নাম হয়েছে তার। পরে জাঁ তাকে বলল যে, সে তার একখানা প্রতিকৃতি আঁকতে চায়।

কী পোশাক পরে সীটিং দেবে "সে, জাঁ নিজেই সেটা ঠিক করে দেবে। পোশাক বাছাই করবার জন্য পরদিনই সে মেরির বাসায় গিয়ে উপস্থিত। তারপর ওয়ার্ড্রোব খুলতেই অ্যাডলফের পোশাক বেরিয়ে পড়ল। সমস্ত ব্যাপারটা আঁচ করে নিতে জাঁর কোনও কষ্ট হল না। সে যাই হোক, অনাড়ম্বর গ্রাম্য পোশাকে মেরির একটি ছবি আঁকল সে।

অ্যাডলফের সঙ্গে মেরির যে একটা অবৈধ সম্পর্ক রয়েছে, সেটা বুঝতে পেরেও জাঁর মনোভাবের কোনও পরিবর্তন হয়নি। মেরিকেই সে বিয়ে করতে চায়। জাঁর মায়ের সেটা মনঃপূত নয়। ওদিকে মেরির জীবনে জাঁর এই পুনরাবির্ভাবে অ্যাডলফও খানিকটা বিচলিত হয়ে উঠেছে। এর পরের দৃশ্যটি খুব তাৎপর্যময়। মেরিকে হাতছাড়া করতে চায় না অ্যাডলফ তবে সে যে খুব বিচলিত হয়েছে, সেটা সে বুঝতে দিতে চায় না। মেরিকে সে বলল যে, আসলে এই রকমের বন্ধনহীন জীবনই ভাল। মেরি ঐশ্বর্য চেয়েছিল, পেয়েছে। তবে আর তার দুঃখ কীসের। প্রেম ভাল, কিন্তু তার জন্যে দারিদ্র্যবরণ কিছু কাজের কথা নয়। মেরি কিন্তু অধৈর্য হয়ে উঠেছে। ঐশ্বর্যের লোভে যদি প্রেমকে বিসর্জন দিতে হয়, সে ঐশ্বর্যে তার প্রয়োজন নেই। জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মেরি, রাস্তার দিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গেই দারিদ্র্যের একটি নির্মম চিত্র চোখে পড়ল তার। দারিদ্র্য ছিন্নবসনা একটি মেয়ে, শীর্ণ কঙ্কালসার কয়েকটি সন্তানকে সঙ্গে নিয়ে সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে চলেছে। অ্যাডলফও ততক্ষণে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। মেরির গলায় তারই দেওয়া হীরের নেকলেস। নেকলেসের উপরে হাত রাখল অ্যাডলফ। যেন তাকে মনে করিয়ে দিল, ওই দারিদ্র্যের চেয়ে এই হীরের নেকলেস অনেক ভাল। গলা থেকে নেকলেসটাকে খুলে নিল মেরি, জানালা দিয়ে সেটাকে সে পথের উপরে নিক্ষেপ করল। না, হীরের নেকলেসের প্রলোভনে সে আর ভুলবে না। জাঁকেই সে বিয়ে করবে।

এর পরের দৃশ্যটির আবেদন আরও গভীর। রাস্তার উপরে পড়ে রয়েছে হীরের নেকলেস, এক ভবঘুরে এ
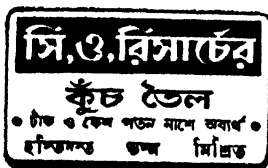
সেটিকে কুড়িয়ে নিল। জানলা দিয়ে সেটা দেখতে পেল মেরি। সঙ্গে সঙ্গেই ভাবান্তর ঘটল তার। অ্যাডলফকে এসে ব্যাপারটা সে জানাল। অ্যাডলফের কিন্তু ভাবান্তর নেই। হন্তদন্ত হয়ে রাস্তার উপরে ছুটে এল মেরি, ভবঘুরে মানুষটির হাত থেকে হীরের নেকলেস সে ছিনিয়ে নিল। স্ত্রী-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যকে অপরিসীম দক্ষতায় চার্লি এখানে ফুটিয়ে তুলেছেন।

এর পর ছোট ছোট কয়েকটি দৃশ্য। একা মেরি তার খাবার টেবিলে বসে আছে, নীচে ফুটপাথের উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে জাঁ; মেরি তার সঙ্গে দেখা করবে না। জাঁ বাড়ি ফেরেনি, জাঁর মা টেবিল থেকে তার খাবার তুলে রাখছেন—তারপর তাঁর ছেলের শূন্য শয্যার শিয়রে একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দিলেন তিনি। অ্যাডলফ তার পরিচারককে নির্দেশ দিচ্ছে, মেরিকে যেন সে জানিয়ে দেয় যে, অ্যাডলফ আর মেরি আজ এক সঙ্গে খেতে বসবে। মেরি তাতে সম্মতি জানাল।

মেরিকে ম্যাসাজ করা হচ্ছে, এ-রকম একটি দৃশ্য এ-বইয়ে আছে। ব্যঞ্জনা-কৌশলের দিক থেকে দৃশ্যটি উল্লেখযোগ্য। মেরিকে অবশ্য নগ্ন গাত্রে কোথাও দেখানো হয়নি, পরিচারিকাদের হাতের ভঙ্গিমার সাহায্যে তার শরীরের বিভিন্ন অংশের উত্থান-পতনের একটা আভাস দেওয়া হয়েছে। পাশে দাঁড়িয়ে মেরির সঙ্গে আলাপ করছে দুটি মেয়ে। আলাপটা অ্যাডলফের সম্পর্কে। তাদের কথাবার্তা শুনতে শুনতে মুহূর্তে মুহূর্তে পরিচারিকার মুখের যে ভাবান্তর ঘটছে, সেটা লক্ষ্য করবার মত।

মেরি আর অ্যাডলফকে অনুসরণ করে জাঁ এক রাত্রে তাদের রেস্তোরাঁয় গিয়ে উপস্থিত। সঙ্গে তার গুলীভরা রিভলবার। মেরির সঙ্গে দেখা করতে চেয়ে জাঁ তার কাছে একটা স্লিপ পাঠিয়ে দিল, তাতে লেখা রয়েছে, "শেষবারের জন্য তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাই।" স্লিপটা অ্যাডলফকে দেখাল মেরি। অ্যাডলফ বলল, মেরির যদি দেখা করতে আপত্তি না থাকে, তারও কোনও আপত্তি নেই। জাঁ এসে প্রবেশ করল। অ্যাডলফের সঙ্গে করমর্দন করল সে। মেরির ঠিক পাশের চেয়ারটিতে তাকে বসতে বলল অ্যাডলফ, তাকে একটি সিগারেট দিয়ে তাতে অগ্নিসংযোগ করল। তারপর টেবিল থেকে জাঁর স্লিপটি তুলে নিয়ে নিঃস্পৃহভাবে সেটিকে পকেটে রাখতে যাচ্ছে,—হঠাৎ তার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ল জাঁ। ওয়েটাররা ছুটে এল তৎক্ষণাৎ, জাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। হোটেলের প্রাঙ্গণে সুন্দর একটি ফোয়ারা, তার মাঝখানে পাথরের তৈরি একটি নগ্ন নারীমূর্তি। সেইখানে, সেই ফোয়ারার পাশে দাঁড়িয়ে জাঁ আত্মহত্যা করল। ঘটনাটিকে অবশ্য সামনাসামনি দেখানো হয় না, স্থূলতার বীভৎসতাকে এখানেও এড়িয়ে গিয়েছেন চার্লি। রেস্তোরাঁর অভ্যন্তরে খাওয়া-দাওয়া চলছে, এমন সময় অকস্মাৎ একটা গুলীর আওয়াজ শুনতে পাওয়া যায়। ফোয়ারার মধ্যে থেকে জাঁর মৃতদেহটি বাইরে নিয়ে এল সবাই, মৃতদেহটি তার মায়ের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। মা বুঝলেন, মেরির জন্যই তাঁর পুত্রকে এইভাবে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। রিভলবার হাতে নিয়ে মেরির উদ্দেশ্যে তিনি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন, তাকে হত্যা করে তিনি তাঁর পুত্রের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবেন। মেরিকে কোথাও খুঁজে পেলেন না তিনি। তারপর বাড়িতে ফিরে এসে দেখেন, মেরি তাঁর পুত্রের মৃতদেহের উপরে লুটিয়ে পড়ে কাঁদছে। ভেবেছিলেন, প্রতিশোধ নেবেন। তা আর হল না। মেরির মাথায় সস্নেহে তিনি হাত বুলিয়ে দিতে লাগলেন।

পরের দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়, জাঁর মা আর মেরি একত্রে বসবাস করছে। গ্রামাঞ্চলে একটি বাড়ি নিয়েছে তারা, সেইখানে কয়েকটি অনাথ শিশুকে তারা মানুষ করে তুলছে।

শেষ দৃশ্যটি ভারী সুন্দর। খড়-বোঝাই একটি গাড়িতে বসে কোথায় চলেছে মেরি; তার পাশে বাপ-মা-মরা একটি শিশু। মেরি গান গাইছে। হঠাৎ একটা শৌখিন মোটরগাড়ি তাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল। গাড়িতে বসে আছে অ্যাডলফ আর তার এক বন্ধু। দুজনে গল্পগুজব করছে। বন্ধুটি হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, "আচ্ছা, সেই যে মেরি বলে একটি মেয়েকে তুমি ভালবাসতে, তার কোন খবর জান?"

অ্যাডলফ শ্রাগ করল। কোনও খোঁজই সে রাখে না।

"এ উয়োম্যান অব প্যারিস" বইখানি তুলতে "দী কীড"-এর প্রায় দ্বিগুণ অর্থব্যয় হয়েছিল। দর্শকদের কাছে এ-বই অবশ্য তেমন সমাদৃত হয়নি। চার্লির বই দেখতে এসে জনসাধারণ চার্লিকেই দেখতে চায়, চায় মিলনান্ত রঙ্গনাট্য। সেদিক থেকে এ-বই তাদের খুশী করতে পারেনি। বইখানি সমাদৃত না হবার আরও একটি কারণ আছে। এডনা পারভিয়াসকে সবাই মনে করত সারল্য আর পবিত্রতার প্রতীক। নষ্টচরিত্র একটি মেয়ের ভূমিকায় তাঁকে অভিনয় করতে দেখে সবাই খুব ক্ষুন্ন হয়েছিল। সমালোচকরা অবশ্য একবাক্যে স্বীকার করলেন, চার্লির এখানি শ্রেষ্ঠ শিল্প-কীর্তি; বললেন, পরিচালক হিসেবে তিনি অদ্বিতীয়। তাঁর সূক্ষ্ম শিল্পরুচি, তাঁর কল্পনা-শক্তি, তাঁর ব্যঞ্জনা, সব কিছুরই তাঁরা অকুণ্ঠ প্রশংসা করলেন। এ-বইয়ে জোর করে কোনও মতবাদ প্রচার করা হয়নি, ভাবপ্রবণতাকে কোথাও প্রশ্রয় দেওয়া হয়নি (সমালোচকরা বললেন, এ ব্যাপারে ডীকেন্সের চাইতেও তিনি বেশী কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন)। ধর্মের জয়, অথবা অধর্মের পরাজয় ঘোষণা করতে চাননি চার্লি; কৃত্রিমতাকে বর্জন করে বাস্তব জীবনকেই তিনি ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন।

(ক্রমশ)

চক্রদত্ত

দাঁতের রোগে ভুগতে বেশীরভাগ লোককেই দেখা যায়। এর মধ্যে আবার পোকাধরা দাঁতওয়ালা লোকের সংখ্যা বেশী। দন্তবিশারদের মত হচ্ছে, এটা কম-বেশী নির্ভর করে বিভিন্ন ধরনের পরিশ্রুত জল—যা আমরা প্রত্যহ ব্যবহার করি। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, জলে যদি বেশী পরিমাণে ক্লোরিন যোগ করা যায়, তাহলে প্রায় শতকরা ৫৪ ভাগ দাঁতের রোগ কম হতে দেখা যায়। ক্লোরিন শরীরের হাড় এবং দাঁতের শক্ত অংশকে আরো শক্ত করতে সাহায্য করে। প্রায় ২,০০০ সাত থেকে চোদ্দ বছরের ছেলেমেয়েকে নিয়ে এই পরীক্ষা করা হয়েছে।

*

সাধারণ অবস্থায় মানুষের রক্ত নূতন রক্তকণিকা জন্মায়। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় অনেকের রক্তে এই রক্তকণিকা জন্মাচ্ছে না। এই রক্তকণিকা জন্মাবার জন্য ভিটামিন বি ১২-এর বিশেষ প্রয়োজন। অবশ্য এই বি ১২ ভিটামিন প্রত্যেক মানুষের শরীরে কিছু না কিছু পরিমাণে থাকে। কিন্তু বি ১২ ভিটামিন থাকলেই যে রক্তকণিকা জন্মাবে, তার কোন কারণ নেই। শরীরের ভেতরে কোন এক অজানা পদার্থ এই ভিটামিনের ওপর কাজ করে, ফলে রক্তে রক্তকণিকা জন্মায়। কিন্তু কি উপায়ে এবং শরীরের কোন্ স্থানে যে এই কাজটি ঘটে, সেটা বৈজ্ঞানিকদের সঠিকভাবে জানা নেই। এটা জানা গেছে যে, মানুষের অন্ত্রে একজাতীয় ব্যাক্‌টিরিয়া বি ১২ ভিটামিন তৈরী করে; কিন্তু তারপর যে কিভাবে শরীরের ভেতর কাজ করে, তার সঠিক হদিশ এতদিন পাওয়া যায়নি। বর্তমানে বৈজ্ঞানিকরা এই অজানা তথ্যটি আবিষ্কার করবার জন্য তেজষ্ক্রিয় বস্তুর সাহায্য নিয়েছেন। তাঁরা মানুষের পাকস্থলীতে তেজষ্ক্রিয় ভিটামিন প্রবেশ করিয়ে দেখেছেন যে, বি ১২ ভিটামিন শুধু পাকস্থলীতে পাকস্থলীর ক্ষরণের সাহায্য কাজ করে। একটি সাধারণ লোকের এক গ্রামের এক লক্ষ ভাগ বি ১২ ভিটামিন রক্তকণিকা জন্মাবার জন্য দিনে প্রয়োজন হয়।

*

যে সমস্ত লোকের ইলেকট্রিক সারানোর কাজে বিশেষ করে বেশী ভোল্ট-ওয়ালা ইলেকট্রিকে ব্যস্ত থাকতে হয়, তাদের সব সময় খুব সাবধানে কাজ করতে হয়। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ইলেকট্রিক চালু থাকা অবস্থায় তাদের নাট, বল্টু, ফিউজের অংশ ইত্যাদি ঠিক মত ধরে ভেতর থেকে টেনে আনতে হয়। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিপদ ঘট্‌তে পারে। এই সমস্ত কাজের জন্য ধরবার সাঁড়াশীটা খুব শক্ত এবং খুব সহজেই যাতে ব্যবহার করা যায়, এমন একটা কিছু হওয়া দরকার। আজকাল এই কাজের জন্য এক নতুন ধরনের ভাঁজ করা প্ল্যাসটিকের সাঁড়াশী ব্যবহার করা হচ্ছে। এই ধরনে প্ল্যাসটিকের সাঁড়াশীর প্রথম সুবিধা হ যে, এটা খুবই হাল্কা, তাছাড়া এটা কো রকম ধাতুর তৈরী না হওয়ার দরুণ এটা নির্ভয়ে বিদ্যুতের সংগে ঠেকিয়ে ক করা যায়। প্ল্যাসটিকের হওয়ার দর এই সাঁড়াশী ধাতুর তৈরী সাঁড়াশীর চে কমজোরী তো নয়, বরং বেশী শক্ত ব যায়।

প্লাসটিকের সাঁড়াশী দিয়ে ইলেকট্রিকের তার টেনে আনা হচ্ছে

*

আজকের দিনে 'এ বোমা' 'এ বোমা'র নাম আমাদের কাছে নতুন ন এইসব বোমার একটার সাহায্যে পৃথিবী যে কোন বড় শহর সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস ক দেওয়া যায়। আমাদের মনে এই প্রশ্ন ওঠা খুবই স্বাভাবিক যে, এই বোম ফাটবার পর কিসে মানুষ মারা যায় সাধারণ বোমা অথবা গোলা ফাটবার প বোমার ভেতর থেকে টুকরো এবং খোলের টুকরো খুব জোরে চারদিকে ছিটকে পড়ার দরুণ মানুষরা মারা পড়ে; কিন্তু আণবিক বোমা ফাটবার পর এর থেকে কোন কিছু ছিটকে পড়ে না—তার বদলে বিরাট একটা আগুনের ঝলকানি দিয়ে ছাতার মত ঘন ধোঁয়া ওপরের দিকে উঠে চারদিকে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। তাহলে মানুষ কি করে মারা পড়তে পারে? মানুষ মারা পড়ে হঠাৎ একটা ধাক্কার সাহায্যে, যেটা হাওয়ার তরঙ্গের দ্বারা সৃষ্টি হয়। এই তরঙ্গের সৃষ্টি আমরা প্রত্যেক দিনই দেখতে পাই। খুব সাধারণ-ভাবে দেখতে গেলে—যখন আমরা চিৎকার করে কাউকে ডাকি অথবা জলে একটা ঢিল ফেলি, তখনই এই তরঙ্গ একটার পর একটা আলোড়িত হতে থাকে। আর এই ধরনের হঠাৎ তরঙ্গ যখন মানুষকে খুব জোরে এসে ধাক্কা দেয়, তখন মানুষ মারা পড়ে। আণবিক বোমা ফাটার পর তার থেকে যে 'গামা রে' বিচ্ছুরিত হয়, তাতে মৃত্যু-সংখ্যা খুবই সামান্য। আসলে হঠাৎ ধাক্কার জনাই এত বেশী মানুষ মারা পড়ে।

বাংলা গানে তান-বৈচিত্র্য ও লালচাঁদ বড়াল

বাংলা গানে রাগসংগীতের বৈচিত্র্য আনবার কথা বলছিলাম। কতভাবেই যে এ বৈচিত্র্য আনা যায়, বিশেষ করে আমাদের যখন এমন মনোহর কাব্য-সম্পদ রয়েছে। কিন্তু ওস্তাদপন্থীদের মনোভাব এখনও বাংলাগানের সপক্ষে এমন কথা বলতে পারি না। বাংলাগানের বিরুদ্ধে অনেক কুযুক্তি এখনও তাঁরা দেখিয়ে থাকেন—বড় আসরে বাংলাগান গাইতে এখনও তাঁরা ভরসা পান না। বিরুদ্ধ যুক্তি আগে ছিল অনেক রকম—যথা বাংলাগানে যুক্তাক্ষর-বাহুল্যের জন্য তেমন তানের অবকাশ নেই, বাংলাগানে রাগসংগীতের তেমন মেজাজ আসে না, বাংলাগানে সুরকে খেলিয়ে নিয়ে সমে আসবার সময় হিন্দী গানের মত দু-চারটে শব্দকে অবলম্বন করবার সুবিধা নেই। এককথায় বাংলা গান একান্তই মেয়েলী ও ঘরে বসে গাওয়া চলে, আসরে নয়। বলা বাহুল্য কোন আপত্তিই গ্রহণীয় নয়। বাংলাগানে তান দেওয়া চলে না এই যুক্তি দিলীপকুমার রায় মহাশয় চমৎকারভাবে খণ্ডন করেছেন। তাঁর উক্তিই উধৃত করিঃ—

"শুনতে পাই না কি বাংলা ভাষায় গান হয় না যেহেতু বাংলার স্বরবর্ণে তান দেওয়া চলে না। কেন চলে না জিজ্ঞাসা করলে উত্তর মেলা ভার। হিন্দুস্থানী ও বাংলা একই আদি সংস্কৃতভাষার অপভ্রংশঃ কাজেই হিন্দুস্থানীতে যে স্বরবর্ণ আছে বাংলাতেও সেই স্বরবর্ণ আছে—এক হ্রস্ব অ্য (Cup ব্যস্—এদের অ্য) ছাড়া। কিন্তু সত্যি খুবই অবাক লাগে ভাবতে যে, যদি সুকুমারী বঙ্গবাণীর এটা একটা অপরাধই হয় তাহলে মাত্র একটা অকারের অজন্মা হওয়ার দরুণ এ-ভাষায় গানের ফসলই হবে না এ-দণ্ড ওস্তাদি গানের তালুকদাররা কেমন করে দিলেন? আমাদের এমন অবর্ণনীয় সুন্দরী গীতি-ভাষার আশ্চর্য উর্বর জমিতে গানের আবাদ নৈব নৈব চ—এ বিধান দিতে তাঁদের প্রাণে কি একটুও বাজল না? আমরা বাঙালী বলেই যে বাংলাভাষা নিয়ে গৌরব করি তা তো নয়, এই তো সেদিনও অক্সফোর্ডের বিখ্যাত সংগীতজ্ঞ স্ট্রাংগোয়েজ

শাঙর্গদেব

সাহেব সারা ভারত ঘুরে তাঁর Music of Hindusthan-এ লিখে গেছেন যে, যেমন তেলুগু হ'ল দাক্ষিণাত্যের শ্রেষ্ঠ সাংগীতিক ভাষা তেমনি বাংলা হ'ল আর্যাবর্তের সেরা সাংগীতিক ভাষা। ("Telegu, the most musical language of the South as Bengali is of the North") আর এ তো শুধু স্ট্রাংগোয়েজ সাহেবেরই রায় নয়, ধ্বনিলালিত্যে, ছন্দবৈচিত্র্যে, ভাব-গরিমায় বাংলা কাব্য বাংলা গান আজ ক্রমে বহু অবাঙালীরও সশ্রদ্ধ বিস্ময়ের উদ্রেক করছে। কেবল আত্মঘাতী হ্রস্বদৃষ্টি বাঙালী ওস্তাদিপন্থীরাই এখনো এই সব তুচ্ছ ন্যায়ের ফাঁকিতে মেতে আছেন যে, বাংলা ভাষা স্বরবর্ণে দীন, যুক্তাক্ষরবহুল। জিজ্ঞাসা করি—আমাদের রামপ্রসাদী "প্রসাদ বলে ভবার্ণবে বসে আছি ভাসিয়ে ভেলাঃ জোয়ার এলে উজিয়ে যাব, ভাঁটিয়ে যাব ভাঁটার বেলা" শ্রেণীর গানের চেয়ে কি ধরা যাক তুলসীদাসের "নব কুঞ্জলোচন কঞ্জমুখকর কঞ্জ পদ কঞ্জারুণম্" শ্রেণীর গানে যুক্তাক্ষর কম? নিধুবাবুর "ভালবাসিবে বলে ভালবাসিনে" ধরনের টপ্পায়; রবীন্দ্রনাথের "জীবনে যত পূজা হ'ল না সারা" শ্রেণীর ধ্রুপদে; দ্বিজেন্দ্রলালের লঘুগুরুছন্দী "এসো প্রাণসখা এসো প্রাণে—মম দীর্ঘ বিরহ অবসানে" শ্রেণীর খেয়ালে; অতুলপ্রসাদের "আমার বাগানে এত ভুল" শ্রেণীর ঠুংরিতে; কাজি নজরুল ইসলামের "বসিয়া বিজনে কেন একা বনে? পানিয়া ভরণে চল লো গোরী" শ্রেণীর গজলে; অজয়কুমারের "ফোটে ফুল মনের বনে সে কেন যায় রে ঝরে" শ্রেণীর টপ্‌ঠুংরিতে কি স্বরবর্ণের দুর্ভিক্ষ আছে? না, সুরকে যাঁরা লীলায়িত করতে জানেন তাঁরা এসব গানের তালবিস্তারে স্বরবর্ণের একটুও

কম সহায়তা পান? এর পর বোধ করি এ বিষয়ে আর কিছু বুঝিয়ে বলবার প্রয়োজন নেই।

যাঁরা বলেন, বাংলায় হিন্দী গানের মত মেজাজ আসে না তাঁদের জিজ্ঞাসা করি জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয় যে সব বাংলা খেয়াল গেয়ে গেছেন এই অল্প ক'দিন আগে, তাতে কি তিনি একটা জমাট গম্ভীর আবহাওয়া সৃষ্টি করেন নি? না সে সব গান আসরে গাইবার অনুপযুক্ত? ঠুংরির কথাও যদি বলতে হয়, তবে অতুলপ্রসাদের বহু গান রয়ে গেছে যা আসরে গেয়ে চোখে জল আনা যায় সুর এবং কাব্যলালিত্যে। টপ্পার কথা তো বলাই বাহুল্য, বাংলার মতো এমন মনোহর টপ্পা আর কোথায় পাওয়া যাবে?

অথচ আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আমরা এখনো এ বিষয়ে তেমন সচেতন নই। সচেতনতা যে আমাদের আসে নি তা নয়, অনেক বড় বড় গাইয়ে বাংলা গানে কত তান-বৈচিত্র্য দেখিয়ে দিয়ে গেছেন, কিন্তু বারে বারেই সেটা পড়ে গেছে কেবল আমাদের আত্মশ্লাঘবতার দরুণ। হিন্দী গানের কাছে বাংলা গানকে আমরা বরাবরই ছোট করে দেখেছি অনেক বড় বড় শিল্পীর অভয় পাওয়া সত্ত্বেও। একটা কারণ অবশ্য এই যে, গানের ক্ষেত্রে ইতিপূর্বে যে সব ওস্তাদ আসর জুড়ে ছিলেন, তাঁদের অনেকেরই গান গাওয়াটুকুর বেশি ভাববার সামর্থ্য ছিল না। গুরুর কাছে শুনেছেন বাংলা গানে কিছু নেই, নিজেও সেটা সারাজীবন প্রচার করে গেছেন। কিন্তু এমনি অশিক্ষার যে যুগটা ছিল সেটা আমরা পেরিয়ে এসেছি। এখন গানের ক্ষেত্রে শিক্ষিত ব্যক্তির সংখ্যা কম নয়। সুতরাং চিন্তার অবকাশও কম থাকবার কথা নয়। এখন এই মনোভাব থাকলে চলবে না। বাংলা গানে বৈচিত্র্য আনতে হবে, তানের ফুলঝুরি ফোটাতে হবে এবং সেটা করতে হবে তার কাব্যসম্পদ অক্ষুণ্ণ রেখে। এই রসচেতনা বাংলার সংগীত সমাজে না জাগ্রত করলে আজকালকার গাইয়েরা দেশের কাছে অপরাধী হবেন। তবে, এই চেতনাটি আনতে হলে আমাদের কিঞ্চিৎ প্রস্তুতির প্রয়োজন।

আজকের যুগে বাংলা গানে তান-বৈচিত্র্য এবং রাগসংগীতের অপরাপর বৈচিত্র্য সম্পাদন করতে গেলে এক পুরুষ আগে যে সব প্রচেষ্টা হয়েছিল, তার খবর রাখা দরকার। সংগীতজগতে এই খবর রাখা একটু দুরূহ ব্যাপার, কেননা বহু শিল্পীর তেমন রেকর্ড নেই। সে সব তানবৈচিত্র্যের প্রমাণ আজ নিঃশেষে হারিয়ে গেছে। গুণী শিল্পী সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার কিভাবে গানের বাণীর সঙ্গে তান মিশিয়ে দিতেন বা অঘোর চক্রবর্তী কেমন দানাদার তান লাগাতেন, আজকে সেটা লিখে বোঝাবার উপায় নেই, একমাত্র লালচাঁদ বড়াল মহাশয়ের নাম বোধ হয় করা চলে,

লালচাঁদ বড়াল

কেননা তাঁর বহু গান রেকর্ড হয়েছিল এবং সে সব এখনো বোধ হয় একেবারে দুষ্প্রাপ্য নয়—অনেক পুরনো পরিবারে রক্ষিত আছে। বাংলা গানে তিনি এক নতুন ওজস্বী রীতিতে তানের প্রবর্তন করে যান। এই অপূর্ব তান-কৌশলে তিনি হিন্দুস্থানী গায়ক মহলেও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেন এবং বাংলার সংগীতজগতে বহুদিন তাঁর আসন পুরোভাগেই নির্দিষ্ট ছিল। তাঁর গানে দোষ-ত্রুটি অনেক ছিল—মাঝে মাঝেই গানের সৌকুমার্যকে তিনি অস্বীকার করতেন—তথাপি উচ্ছল তান হিল্লোলে তিনি যে চমক লাগাতেন, আনন্দময় পরিবেশ সৃষ্টি করতেন, তা অসামান্য প্রতিভা এবং অক্লান্ত সাধনা না থাকলে পারা যায় না। অনেক গান তিনি এমন গেয়েছেন, যার ভাষা নিতান্তই তুচ্ছ, কিন্তু অজস্র প্রাণশক্তিতে সেই সব গানেই তিনি প্রচুর রস সঞ্চার করতেন। তাঁর বহু ভুল-ভ্রান্তি সত্ত্বেও এই তান-বৈচিত্র্যে তিনি অননুকরণীয় এবং এই কারণেই তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন, যা সে যুগে আর কারুর অদৃষ্টেই ঘটে নি। এক পুরুষ আগেকার টপ্-খেয়াল গায়কদের প্রতিনিধি হিসাবে এই নতুন যুগে আবার তাঁকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা কর্তব্য বলে মনে করি। তাঁর কাহিনী বিবৃত করছি এই কারণে যে, কৌতূহলী পাঠক এখনও অনুসন্ধান করলে তাঁর গানের রেকর্ড শুনতে পারেন এবং সে যুগে এই পরীক্ষা নিরীক্ষা কিভাবে চলেছিল, সে সম্বন্ধে একটা ধারণা করতে পারেন। নতুন প্রচেষ্টার পূর্বে এই আদি-প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা বিশেষ দরকার, তা না হলে সৃষ্টিতে পরিণতি আসা সম্ভব নয়।

লালচাঁদ জন্মগ্রহণ করেছিলেন ১৮৭০ সালে। খাস কলকাতার বনেদি পরিবারে জন্ম তাঁর। বাবা প্রসিদ্ধ এটর্নি নবীনচাঁদ বড়াল এবং ঠাকুরদাদা ছিলেন প্রেমচাঁদ বড়াল, যাঁর নামে বৌবাজারের সেই রাস্তার নামকরণ হয়েছে প্রেমচাঁদ বড়াল স্ট্রীট। তাঁর মাতামহ ছিলেন দানশীল পুণ্যব্রত সাগরলাল দত্ত।

লালচাঁদ লেখাপড়া শেখেন সেন্ট জেভিয়ার্স এবং ডাভটোন কলেজে। ইংরেজী শিক্ষার জন্য ডাভটোন কলেজের অধ্যক্ষকেই তাঁর গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল। পরবর্তীকালে তিনি বহু ইংরেজী ক্লাব এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।

তাঁর বাবা গান-বাজনার তেমন অনুকূলে ছিলেন না কিন্তু ছেলেবেলা থেকেই তিনি সংগীতের দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। মার কাছ থেকে গোপনে অর্থসাহায্য পেতেন সংগীত শিক্ষার জন্য। অল্প বয়সেই তিনি পাখোয়াজে কৃতবিদ্য হন মুরলীমোহন গুপ্তের শিক্ষকতায়। বহুবিধ যন্ত্রসংগীতেই তাঁর বিশেষ পারদর্শিতা ছিল। হারমোনিয়ম, পিয়ানো জল-তরঙ্গ, বাঁয়া-তবলা সবই তিনি বাজাতে পারতেন দক্ষতার সঙ্গে। সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে সন্ধ্যাবেলায় পিয়ানো

ক্লাস হতো। সেখানে নিয়মিত যোগ দিয়ে তিনি চমৎকার পিয়ানো বাজনা শিখে-ছিলেন। পরে বড় বড় ওস্তাদের কাছে তালিম নিতে আরম্ভ করলেন। ধ্রুপদে তাঁর গুরুর মধ্যে বিশ্বনাথ রাও, জগকরণ মিশ্র এবং কাশীনাথ মিশ্র অন্যতম ছিলেন। খেয়াল শিখেছিলেন তদানীন্তন বিখ্যাত গায়ক নুলোগোপাল (এ'র কাছে ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁও গান শিখেছিলেন), গুরুপ্রসাদ মিশ্র এবং নান্দে খাঁর কাছে। টপ্পা শিখেছিলেন স্বনামধন্য রমজান মিঞার কাছে। রমজান এবং নুলো গোপালের কাছে শিক্ষার জন্য বোধ হয় তাঁর তানে খেয়ালিয়া ঢঙের সঙ্গে টপ্পা-ভঙ্গীর একটা চমৎকার সংমিশ্রণ ঘটেছিল। তাঁর তান ছিল টপ্-খেয়াল শ্রেণীর। এই সব দ্রুত তান ছিল ঠিক মেঘের ভিতর দিয়ে যেমন চকিতে বিদ্যুৎ খেলে যায় সেই রকম চঞ্চল এবং চমক লাগানো। কত রকমভাবে এক একটা বাণীকে তিনি ঘুরিয়ে ফিরিয়ে গাইতেন, শুধু নানা ঢঙের তান আনবার জন্য। তবু তো তখন বাংলা গান কাব্য-সুষমায় এত মনোহর হয়ে ওঠে নি। আজকের এই ঐশ্বর্য-মণ্ডিত কাব্যসংগীতে তানবৈচিত্র্য সৃষ্টি করে আরও কত উৎকর্ষ সাধনের সুযোগ রয়েছে।

ক্রমে তাঁর সংগীতের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। অনেক সম্ভ্রান্ত আসরে শৌখিন শিল্পী হিসাবে তিনি যেমন যোগদান করতেন, তেমনি গ্রামোফোন কোম্পানীকেও গান বিতরণ করতেন বিনা পারিশ্রমিকে। সে যুগে তাঁর রেকর্ডের চাহিদা ছিল প্রচুর। গ্রামোফোন কোম্পানী কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ বিলাত থেকে একটি দামী মোটরগাড়ি আনিয়ে তাঁকে উপহার দেবার ব্যবস্থা করেছিলেন, কিন্তু সে গাড়ি এসে পেঁ'ছবার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর সংগীতের খ্যাতি বহু দূরদেশে পেঁ'ছেছিল। কাবুলের আমীর তাঁর গান শোনবার জন্য কলকাতায় এসে তাঁর কাছে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। কিন্তু তখন তিনি অসুস্থ, নিজে দেখা করতে পারেন নি। তাঁর পিতা আমীরের সেক্রেটারীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেছিলেন, লালচাঁদ সুস্থ হলে তাঁকে তিনি কাবুলে পাঠিয়ে দেবেন আমীরকে গান শোনাবার জন্য। সে আর হয়ে ওঠে নি। সেই অসুখেই মাত্র সাঁইত্রিশ বৎসর বয়সে ১৯০৭ সালে তাঁর মৃত্যু হয়।

তাঁর তিন পুত্র। সকলেই সংগীতজ্ঞ, বিশেষ করে রাইচাঁদ বড়াল মহাশয়ের খ্যাতি বহু বিস্তৃত।

সে যুগের এই সব বাংলা গানের কথায় আর একটা কথা মনে পড়ল এবং সেটাও এই উপলক্ষে বলে রাখা কর্তব্য। বছর কয়েক আগে কেউ কেউ খবরের কাগজে চিঠি লিখে গ্রামোফোন কোম্পানীকে অনুরোধ করেছিলেন, সেকালের এই সব শ্রেষ্ঠ গায়কের সুবিখ্যাত গানগুলি আবার নতুন করে প্রকাশ করবার জন্য। গ্রামোফোন কোম্পানী তার উত্তরে জানিয়েছিলেন যে, প্রাচীন রেকর্ডের মূল রূপগুলি তাঁরা ইতিমধ্যে বিনষ্ট করে ফেলেছেন; সুতরাং সেগুলি আর পুনঃপ্রচারের উপায় নেই। আমার

যতদূর মনে পড়ছে, ১৯৩০।৩১ সালেও এই সব পুরনো গানের অনেকগুলি পাওয়া যেতে এবং আমরা সুদূর মফস্বলেও এসব অর্ডার দিয়ে আনিয়েছি। এখন আর একটি কপিও পাবার উপায় নেই। এ নিয়ে গ্রামোফোন কোম্পানীকে দোষ দেওয়া চলে না, কেননা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হিসাবে তাঁদের পুরনো জিনিস স্তূপাকার করে রাখবার উপায় নেই। তবে একটি কাজ করা যেতে পারে। কোন গবেষক বা সাংগীতিক প্রতিষ্ঠান উক্ত কোম্পানীর সহায়তায় যদি সেকালে শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের রেকর্ডের একটি তালিকা প্রস্তুত করতে পারেন, তাহলেও সংগীতামোদীদের অনেক উপকার হয়। খোঁজ নিয়ে তাঁরা কোনও কোনও স্থান থেকে এসব গান শুনতেও পারেন এবং কোন কোন বিখ্যাত প্রাচীন বাংলা গানের রেকর্ড হয়েছে, সেটাও তাহলে জানা যায়। স্বয়ং গ্রামোফোন কোম্পানী যদি এ কাজটি করেন, তাহলে তো খুবই ভাল হয় বলাই বাহুল্য। ইতি-পূর্বে রবীন্দ্রনাথের গানের যত রেকর্ড *হয়েছে তার একটি তালিকা প্রকাশিত হয়েছে দেখেছি। এর থেকে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী যে রবীন্দ্রনাথের গান রেকর্ড করেছিলেন, সেটি জানা যায় এবং এমন* একটি গান গেয়েছিলেন, যার কোন স্বর-লিপি নেই। অতএব এই ধরনের রেকর্ডের মূল্য যে খুবই বেশি একথা আর বলে বোঝাবার দরকার নেই।

এই নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজটি এখনও হবার অপেক্ষায় আছে। আরও কত কাজ রয়েছে, কিন্তু সে সব করবে কে আর হবেই বা কবে।

রবিবাসরের সংগীতানুষ্ঠান

গত ১৯শে ডিসেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেডের ডিরেক্টর শ্রীঅশোক-কুমার সরকার মহাশয়ের আমন্ত্রণে তাঁর বাসভবনে রবিবাসরের একটি পরম মনোজ্ঞ অধিবেশন বসেছিল। সভাপতিত্ব করেন শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়। সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। রবি-বাসরের এই অনুষ্ঠানটিতে বাংলার তিন-জন গুণী ব্যক্তিকে সংগীত পরিবেশনের জন্য আমন্ত্রণ করা হয়েছিল—শ্রীকালীপদ পাঠক, শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীগোবিন্দ মিত্র ঠাকুর। তিনজনেই কৃতী সংগীতজ্ঞ, অতএব আমরা পরম পরি-তৃপ্তিভরে তাঁদের সংগীতানুষ্ঠান শুনেছি। অনুপম টপ্পাগায়ক শ্রীকালীপদ পাঠক নিধুবাবু, শ্রীধর কথক এবং দাশু রায়ের তিনটি বিখ্যাত গানে শ্রোতাদের বিমোহিত করেন। তাঁর ভরাট গলায় টপ্পার দানাদার তান, বিস্তারের বৈশিষ্ট্য এবং অননু-করণীয় গায়কী আজকালকার সংগীতে একটি দুর্লভ বস্তু। টপ্পার মধ্যে মাঝে মাঝে তিনি টপ্-খেয়ালের চমৎকার তান কর্তব দেখাচ্ছিলেন এবং এই সব কারু-কার্যের মধ্যে সংগীতের কাব্যমাধুর্য নানাভাবে লীলায়িত হয়ে উঠছিল। আর একটি উপভোগ্য বস্তু তাঁর লয়জ্ঞান। তান আরম্ভ করে আবার বাণীতে ফিরে এসে ঠিক কথাটি শেষ হবার পরমুহূর্তে সম যেন স্বাভাবিকভাবে এসে পড়ে তাঁর গানে। এটিই হচ্ছে টপ্পার বৈশিষ্ট্য। এই প্রবীণ সংগীতজ্ঞের গান যখনই শুনি তখনই তৃপ্তি পাই। এই অনুষ্ঠানের জন্যও তাঁকে আমরা বহু সাধুবাদ প্রদান করছি। ধ্রুপদ পারঙ্গম শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় *তাঁর গম্ভীর এবং মধুর কণ্ঠে রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উচ্চাঙ্গ সংগীতে সকলকে পরিতৃপ্ত করেন। তাঁর সঙ্গে উত্তম সঙ্গত করেন স্বনামধন্য মার্দঙ্গিক* শ্রীপ্রতাপনারায়ণ মিত্র। রমেশবাবু রবীন্দ্র-নাথের কয়েকটি ধ্রুপদ, ধামার, খেয়ালাঙ্গ এবং টপ্পা গান করেন এবং এর সঙ্গে মূল হিন্দী গানগুলিও গেয়ে দেখান। সভাপতি শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এই উপলক্ষে বলেন যে, রবীন্দ্র-নাথের উচ্চাঙ্গ সংগীতের সংখ্যা বড় কম নয় এবং এই সব গান যদি উচ্চাঙ্গ সংগীতের আসরে গাওয়া হয়, তাহলে বাংলা গানের একটা শ্রেষ্ঠ দিক ভারতীয় সংগীত জগতে তুলে ধরা যেতে পারে। রমেশবাবু বিস্তার এবং তান সহযোগে কয়েকটি গান গেয়ে প্রমাণ করলেন যে, এই গুণপণায় তিনি যথার্থ পারদর্শী। পরিশেষে ময়নাডালের শ্রীগোবিন্দ মিত্র ঠাকুর মহাশয় একটি চমৎকার কীর্তন গেয়ে এই অধিবেশন সমাপ্ত করেন। এই রকম বলিষ্ঠ কণ্ঠে এমন মনোহর কীর্তন কমই শোনা যায়। তাঁর আখরগুলি যেন মর্মে এসে লাগে। শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গো-পাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে আমরাও একমত যে, এমন মধুর ঘরোয়া আসর খুব কমই অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীঅশোককুমার সরকার মহাশয়কে ধন্যবাদ প্রদানান্তর অনুষ্ঠান সমাপ্ত হয়।

আসরের খবর

ডোভার লেন উচ্চাঙ্গ সংগীত আসর—

গত বৎসরের মত এবারও আগামী ৩১শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত ডোভার লেনে উচ্চাঙ্গ সংগীতের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। বহু ভারতবিখ্যাত শিল্পী, যথা—ওস্তাদ আলা-উদ্দিন, বড়ে গোলাম আলি, হাফিজ আলি, বিলায়েৎ খাঁ, রবিশঙ্কর, ডাগর বন্ধু, আহ্মদ জান থেরাকুয়া, আব্দুল হালিম জাফর খাঁ, শ্রীমতী হীরাবাঈ, গাঙ্গুবাঈ এবং স্থানীয় বহু বিখ্যাত শিল্পীদের আমন্ত্রণ জানান হয়েছে এবং আশা করা যাচ্ছে যে, তাঁরা আমন্ত্রণ গ্রহণ করবেন। অনেকে ইতিমধ্যেই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন। সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ জানিয়ে-ছেন যে, প্রবেশমূল্য যথাসাধ্য স্বল্পই রাখা হবে।

যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো ভারত ভ্রমণে এসেছেন। যুগোশ্লাভিয়ার সাম্প্রতিক ইতিহাস এবং মার্শাল টিটোর বীরত্ব ও স্বদেশানুরাগাপ্লুত জীবন কাহিনী সংবাদপত্র পাঠকদের নিকট অবিদিত থাকার কথা নয়।

সম্মানিত বিদেশী অতিথির প্রতি সৌজন্য প্রকাশের একটা চিরাচরিত প্রথা হচ্ছে অতিথি ও আতিথ্যকারীর মধ্যে ভাবের ঐক্য এবং উভয়ের আস্থা ও সমস্যাদির সাদৃশ্যের কথা জোর দিয়ে বলা। দুই জাতির মধ্যে বন্ধুত্বের জন্য এরূপ সাদৃশ্য বা ভাবের ঐক্য কিন্তু অবশ্য-প্রয়োজনীয় নয়। বরঞ্চ ভাবের অর্থাৎ কৃষ্টি ও রাজনৈতিক মতবাদের ঐক্য এবং অবস্থার সাদৃশ্য না থাকা সত্ত্বেও আন্তর্জাতিক বন্ধুত্ব সম্ভব এবং কাম্য, এটাই আজ সকল জাতির হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। যুগোশ্লাভিয়া এবং ভারতবর্ষের মধ্যে রাজনৈতিক মতবাদ, অবস্থা এবং সমস্যার সাদৃশ্য আবিষ্কার করতে হলে কষ্ট কল্পনার আশ্রয় নিতে হয়। অবশ্য বলা যেতে পারে যে ভারতবর্ষ ও যুগোশ্লাভিয়া উভয়েরই চেষ্টা হচ্ছে কোনো ব্লকের সামিল না হওয়া। কিন্তু এ বিষয়েও উভয়ের অবস্থা ও চেষ্টা এক রকম নয়।

যুগোশ্লাভিয়া পূর্বে সোভিয়েট ব্লকের ভিতরেই ছিল। সোভিয়েট ব্লকের বাইরে আসার অথবা তা থেকে বহিস্কৃত হবার পরে কয়েক বৎসর যুগোশ্লাভিয়া সোভিয়েট ব্লকের দুচক্ষের বিষ ছিল। তখন কম্যুনিস্টদের চোখে টিটোর মতো পাপী আর কেউ ছিল না—"টিটো-ইজম্" ছিল সবচেয়ে বড়ো পাপ। স্তালিনের মৃত্যুর পূর্বেই কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ার প্রতি সোভিয়েট নীতিতে বিভিন্ন পরিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। পরে তা ক্রমশ স্পষ্টতর হয়। শেষ পর্যন্ত সোভিয়েটের সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়ার কূটনৈতিক সম্বন্ধ পুনঃ স্থাপিত হলো। বর্তমানে রাশিয়া যুগোশ্লাভিয়াকে আরো কাছে টানার চেষ্টা করছে। কিন্তু ইতিমধ্যে যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে পশ্চিমা-শক্তিদের একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছে। সোভিয়েটের দিক থেকে আক্রমণের ভয় যখন বেশি ছিল তখন মার্শাল টিটোর প্রধান ভরসা ছিল এই যে, সোভিয়েট আক্রমণ করলে পশ্চিমা শক্তিরা যুগোশ্লাভিয়া রক্ষার্থে এগিয়ে আসবে। অর্থাৎ যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হলে পশ্চিমা শক্তিদের সঙ্গে সোভিয়েটের সাক্ষাৎ সংঘর্ষ অর্থাৎ তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আরম্ভ হবে। সোভিয়েট তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে চায় নি বলেই যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষে স্তালিনের ক্রোধকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব হয়েছিল এবং সম্ভবত সোভিয়েট তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বাধাতে যাবে না একথা মার্শাল টিটো জানতেন বলেই তিনি স্তালিনের ক্রোধকে অগ্রাহ্য করতে সাহসী হয়েছিলেন। যাই হোক "কমিনফর্মের" বাইরে এসে যুগোশ্লাভিয়া আমেরিকার কাছ থেকে প্রভূত পরিমাণে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য নিয়েছে।

তবে এ বিষয়েও যুগোশ্লাভিয়ার নীতির একটা বৈশিষ্ট্য আছে। যুগোশ্লাভিয়া NATOতে যোগ দেয়নি। সুতরাং যুগোশ্লাভিয়া ঠিক সোভিয়েট বিরোধী ব্লকে যোগ দিয়েছে, একথা বলা যায় না। তাই বলে NATO-সংশ্লিষ্ট কোনো দেশের সঙ্গে আলাদাভাবে সামরিক চুক্তি করতে যুগোশ্লাভিয়ার আপত্তি নেই, যদিও এরূপ চুক্তি সাক্ষাৎভাবে সোভিয়েট-বিরোধী না হলেও পরোক্ষভাবে সোভিয়েটকে দূরে রাখাই তার উদ্দেশ্য হয়। গ্রীস ও তুর্কীর সঙ্গে যুগোশ্লাভিয়া যে বলেকান-আরক্ষা চুক্তি করেছে, সেটা এই রকমেরই চুক্তি। গ্রীস ও তুর্কী অবশ্য ষোল আনাই ইঙ্গ-মার্কিন ব্লকের অন্তর্গত।

অতএব দেখা যাচ্ছে যে, দুই ব্লকের বাইরে থাকা বলতে ভারতবর্ষের পক্ষে যা বুঝায় যুগোশ্লাভিয়ার পক্ষে তা নয়, তা হতেও পারে না। কারণ যুগোশ্লাভিয়া ও ভারতবর্ষের অবস্থান এবং অবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা রকমের। তবে এই সম্পর্কে একটা কথা মনে পড়ে। যুগোশ্লাভিয়ার সঙ্গে তুর্কীর বলকান সম্পর্কে একটা সামরিক মৈত্রী-চুক্তি আছে। তুর্কীর সঙ্গে আবার পাকিস্তানের একটা চুক্তি হয়েছে। ভারতবর্ষ এই চুক্তি পছন্দ করে নি, যদিও তুর্কী গভর্নমেণ্ট বলেছেন যে, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের সম্পর্ক যেমনই হোক না কেন তুর্কী-পাকিস্তান চুক্তির ফলে ভারত ও তুর্কীর মধ্যে সৌহার্দ্যের কোনো অনিষ্ট হবে না। ভারত ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় থাকলে যুগোশ্লাভিয়ার মিত্র হিসাবেও তুর্কীর এই আশ্বাসের মূল্য বাড়বে।

* * *

কোরিয়া যুদ্ধের ১১ জন মার্কিন

বৈমানিক সৈন্যকে "চর" অভিযোগে আটক রাখার জন্য ইউনো কর্তৃক পিকিং গভর্নমেণ্টের নিন্দা করে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। পিকিং গভর্নমেণ্টের পক্ষে কী বলার আছে তা না শুনেই এইভাবে প্রস্তাব পাশ করা অনুচিত বলে ইউনোতে ভারতের প্রতিনিধি মত প্রকাশ করেন। এরূপ প্রস্তাব পাশ করাতে পিকিং গভর্নমেণ্ট খুবই চটেছেন সন্দেহ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও যে চীন গভর্নমেণ্ট ইউনোর সেক্রেটারী-জেনারেলের পিকিংএ গিয়ে এই সম্পর্কে মিঃ চৌ এন লাইয়ের সঙ্গে কথাবার্তা বলার প্রস্তাবে রাজী হয়েছেন, এটা আশার কথা।

ইউনো'র সেক্রেটারী জেনারেলের পিকিংএ যাওয়ার প্রস্তাবে রাজী হওয়ার জন্য পণ্ডিত নেহরু মিঃ চৌ এন লাইকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। পণ্ডিত নেহরুর অনুরোধ ব্যর্থ হয় নি। অবশ্য কেবল পণ্ডিত নেহরুর অনুরোধেই কাজ হয়েছে তা মনে হয় না। বর্তমানে পিকিং গভর্নমেণ্ট ঝগড়া বাড়াতে চান না, কমাতে চান এইটাই বোধ হয় আসল কারণ। চীন ভ্রমণের পরে বর্মার প্রধান মন্ত্রী যে সব কথা বলেছেন তা থেকেও মনে হয় যে, চীন শান্তির জন্য ব্যগ্র এবং সেজন্য আমেরিকার সঙ্গে একটা আপোষের সুযোগ যদি আসে তবে চীন সরকার তার সদ্ব্যবহার করতে পশ্চাৎপদ হবেন না। তবে অবস্থা যে রকম জটিল তাতে চট করে সব কিছুর একটা ফয়সালা হয়ে যাবে সে আশা নেই।

* *

ইন্দোচীনের ক্যাম্বোডিয়া ও লাও রাজ্যের সঙ্গে ভারত গভর্নমেণ্ট কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের ব্যবস্থা করছেন, এটা আনন্দের কথা। একদা ভারতের লোকই গিয়ে ক্যাম্বোডিয়া ও লাওতে উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। ক্যাম্বোডিয়া এবং লাওতে এখনো ভারতীয় সংস্কৃতির ধারাই বহমান।

* * *

দ্বিধা বিভক্ত ভিয়েৎনামের সঙ্গে বর্তমানে ভারতবর্ষের পক্ষে কূটনৈতিক সম্বন্ধ স্থাপনের কথা উঠে না। ভিয়েৎনামের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। জেনেভা চুক্তির শর্ত অনুসারে ১৯৫৬ সালে ভিয়েৎনামের ঐক্য বিধান এবং সমগ্র ভিয়েৎনামের এক গভর্নমেণ্ট নিয়োগের উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু যে রকম ঘটনার গতি দেখা যাচ্ছে তাতে উক্ত প্রকারে ভিয়েৎনামের ঐক্য সাধনের আশা অতি অল্প। উত্তর ভিয়েৎনাম কম্যুনিস্টদের হাতে রয়েছে এবং থাকবেও। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যাতে কম্যুনিস্ট প্রভাব জড় গাড়তে না পারে তার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করার বিষয়ে ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন কর্তারা একমত হয়েছেন। অবশ্য এই ব্যবস্থা করার ভার মার্কিন গভর্নমেণ্টের উপরেই পড়েছে। ফলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সাহায্য দেওয়া শুরু হয়েছে। তবে সেখানকার পরিস্থিতি অত্যন্ত বিশ্রী। মার্কিন সরকারের সাহায্যে কতখানি কাজ হবে বলা যায় না। কিন্তু মার্কিন সাহায্য পেয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের স্বাস্থ্য ফিরুক আর নাই ফিরুক, দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে আমেরিকা সহজে হাত ছাড়া হতে দেবে না। ১৯৫৬ সালে ভিয়েৎনামে ইলেকশন হবে এবং সেই ইলেকশন অনুযায়ী সারা ভিয়েৎনামে এক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবে, এরূপ আশা একেবারেই করা যায় না। অনির্দিষ্টকালের জন্য ভিয়েৎনাম দ্বিধাবিভক্ত হয়ে থাকবে এই সম্ভাবনাই দেখা যাচ্ছে। জেনেভা চুক্তি হওয়ার সময়েই আমরা এরূপ আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলাম। SEATO'র দ্বারা এই আশঙ্কা আরো দৃঢ়ীভূত হয়। সম্প্রতি প্যারিসে বৃটিশ, ফরাসী ও মার্কিন কর্তারা দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে চাঙ্গা করার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে যে ঘোষণা করেছেন তাতে আর প্রায় কোনো সন্দেহই রইল না। ২০।১২।৫৪

শিল্পী গোপাল ঘোষ

গত ১লা থেকে ৮ই ডিসেম্বর বম্বেতে শ্রীগোপাল ঘোষের যে চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল তার সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ও আশ্চর্যজনক ঘটনা হল যে, তিনি এখানকার তথাকথিত শিল্প সমালোচকদের মুখর লেখনী একেবারে নীরব করে দিয়েছেন। স্থানীয় দু চারজন বিদেশী শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকরাই চারুকলায় এখানকার শিল্পবোধ, বিচার বা বিবেকের রক্ষক। এ'রা এবং এ'দের সমর্থকরা সাধারণত তথাকথিত "বেঙ্গল স্কুল" বিদ্বেষী। এ'দের বিচারে ভারতীয় আদর্শে অনুপ্রাণিত চিত্রকলামাত্রই "রিভাইভালিজম্"-এর পর্যায়ে পড়ে ও এ'রা সকলেই ইউরোপীয় বিভিন্ন শিল্প আন্দোলনের নিকৃষ্ট অনুকরণকারীদের সমর্থক। শহরের একটি মাত্র ইংরেজী দৈনিকপত্র ছাড়া অন্যান্য দৈনিকপত্রে শিল্প সমালোচনার কোন ব্যবস্থা নেই। মাঝে মাঝে যা বার হয় তাকে ঠিক শিল্প সমালোচনা বলা চলে না, তাকে বলা উচিত জার্নালিস্টিক রচনা। গোপালবাবুর চিত্রকলার সমালোচনা করতে কেন এ'রা সাহসী হলেন না তার বহুবিধ কারণ আছে। প্রথমত এ'দের বিচারের মাপ-কাঠির বাইরের একজন শিল্পীর প্রদর্শনীর আশাতীত সাফল্য, দ্বিতীয়ত প্রবেশমূল্য থাকা সত্ত্বেও উদ্বোধন রজনী ও পরের সাতদিন অভূতপূর্ব জনসমাগম কেমন যেন আশঙ্কিত করেছে এ'দের, ভাবখানা মৌরসীপাট্টা বুঝি নষ্ট হতে বসল। একেবারে নস্যাৎ করে কিছু লিখে নিজেদের হাস্যাস্পদ করাও সমীচীন নয়, কারণ স্টেলা ক্রামরিশের মত বিশ্ববিখ্যাত শিল্প-সমালোচক উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন গোপালবাবুর, যা আগে থাকতেই প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা সর্বত্র প্রচার করেন। তাছাড়া দর্শকদেরও ত বোধ শক্তি আছে। ভাল কিছু লিখলেও শিল্পীর খ্যাতির সম্ভাবনা, তাই নীরব থাকাই শ্রেয়। এই হল এখানকার শিল্প-সমালোচকদের মনোভাব। এ ছাড়া এ'দের ধারণা মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই ও তাঁর গভর্নমেণ্ট আর্ট কালচারের কিছুই বোঝেন না। শ্রী দেশাইকে চিত্রকলার জগতে আনা ও প্রদর্শনী উদ্বোধন করানো এতেও এ'রা সন্ত্রস্ত। কিন্তু শ্রীমোরারজী তাঁর শিল্পবোধের অসাধারণ পরিচয় দিয়েছিলেন গোপালবাবুর চিত্র-

শ্রীগোপাল ঘোষের চিত্রপ্রদর্শনী উদ্বোধনকালে বোম্বাইয়ের মুখ্য-মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই

কলকাতার গলি

পাহাড়ী পথ

প্রদর্শনীতে ছবি দেখার সময়। এখানকার জনৈক কলারসিক চারুকলায় আধুনিকতা ও প্রগতির কথা তোলেন। শ্রীমোরারজী আর্ট সম্বন্ধে জ্ঞানহীন একথা বিনয়ের সঙ্গে স্বীকার করে নিয়ে সুন্দর জবাব দেন, যার পরে "আধুনিক" কলারসিকটি আর কোন প্রত্যুত্তর খুঁজে পায়নি।

এই শহরে গোপালবাবুর চিত্রকলার আবেদন খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, যা গত বছর নন্দলাল, রবীন্দ্রনাথ বা বিনোদবিহারীর চিত্রপ্রদর্শনীর সময় লক্ষ্য করিনি। গোপালবাবু সব রকম দর্শককেই সন্তুষ্ট করতে পেরেছেন তাঁর চিত্রকলার কিছু না কিছুর দ্বারা। কারো কাছে তাঁর স্কেচ বা রেখাঙ্কন ভাল লেগেছে, কেউ পছন্দ করেছে তাঁর রঙের বৈচিত্র্য ও মাধুর্য, কেউ আকৃষ্ট হয়েছে তাঁর জলরঙে আঁকার রীতি পদ্ধতিতে। তাঁর গাছ, আকাশ, মেঘ, জল, সমুদ্র পাহাড় ইত্যাদির বিভিন্ন ট্রিট্‌মেণ্টের কিছু একটা ভাল লেগেছে সকলের কাছেই।

এই শহরে গোপালবাবুর প্রথম চিত্রপ্রদর্শনীতে ১০৮টি জলরঙ ও দুইটি টেম্পারা চিত্র ছাড়াও তাঁর রেখাঙ্কন ও এচিং-এরও নিদর্শন ছিল। গোপালবাবুর রেখাচিত্রের স্বচ্ছন্দ সাবলীল বলিষ্ঠ গতি সকলকেই মুগ্ধ করেছে। এদিককার শিল্পীরা রঙীন ছবি আঁকে কিন্তু বেশীর ভাগই এই ধরণের স্বতঃস্ফূর্ত রেখাচিত্রে অপটু। এঁদের চিত্রপ্রদর্শনীতে কখনও কোন রেখাচিত্র থাকে না। গোপালবাবু রেখাঙ্কনে, বিশেষ করে জাপানী কাগজে আঁকা গাছের স্টাডিগুলিতে ও অন্যান্য স্কেচ-এ একেবারে চীনা সুলভ মাধুর্য ও কমনীয়তা অর্জন করেছেন।

গোপালবাবুর রঙীন বেশী ভাগ ছবিকেও অনেকে স্কেচ পর্যায়ে ফেলতে পারেন। কিন্তু আমার কাছে ছবিগুলিকে আরও finished করতে গেলে সেগুলোর আন্তরিকতা ও স্বতঃস্ফূর্তি নষ্ট হত বলে মনে হয়। গোপালবাবু অন্যদের খুশী করার জনাই শুধু আঁকেননি, কিছু দেখার পর নিজের অনুভূতিকে ব্যক্ত করতে চেয়েছেন, নৈসর্গিক দৃশ্যের ভেসে যাওয়া একটি "মুড", বাঁশের কঞ্চির একটি কচি রেখা কিম্বা বৃদ্ধ বৃক্ষের রাজসিক জাঁকজমক। তিনি যে অবাধ স্বাধীনতা ও সাহসের সঙ্গে রেখা, বস্তু ও রঙের ব্যবহার করেছেন তা বিস্ময়কর। কোথাও কোনো অব্যাহতি নেই, কি আঁকবেন সমস্তই তাঁর মনে ও হৃদয়ের মধ্যে গেঁথে আছে, তুলি হাতে নিয়ে আর হাতড়াতে হয় না। আপনি খেয়ালে স্বচ্ছন্দে সব হয়েছে এবং সেই জন্য তাঁর কাজের আন্তরিকতা ও ঘনত্বর দ্বারা প্রবলভাবে আকৃষ্ট হতে হয়। স্থানীয় বেশী ভাগ শিল্পীর চিত্রকলার সঙ্গে গোপালবাবুর চিত্রকলার এই তফাৎ। এঁরা কেমন যেন জোর করে কিছু সৃষ্টি করতে চাইছেন বলে মনে হয়।

জলরঙে তাঁর নিজস্ব কয়েকটি টেকনিক গোপালবাবু খুব ভালভাবেই আয়ত্ত করেছেন যা এই শহরের কলারসিকদের নিকট একেবারে নতুন। এখানকার আর্ট স্কুলের অধ্যাপক ছাত্র ছাত্রী ও বহু দর্শকের কৌতুহল ছিল, কিভাবে তিনি ওরকম "Lifting of Colour" করেছেন

কোনারকের পথে

ং লাগিয়ে ও আঁচড় দিয়ে তিনি যে ভিন্ন আবেদন সৃষ্টি করেছেন, বিশেষ রে গাছ আঁকার সময় তা খুবই ফল হয়েছে। যেমন—'Wilderness', Through the forest', 'Sal orest' (নং ৩২, ৪৪, ৮৬) কয়েকটি বিতে তুলির বদলে ছুরি বা ব্লেড দ্বারা ঙ ঘসে তুলে দিয়েছেন যার ফলাফল বই ভাল ও চমকপ্রদ হয়েছে। যেমন কোণারকে আঁকা "Village huts", Temple", "Way to the Temple" (নং ৬৮, ৬৯, ৭০)এ। এই পদ্ধতিতে চীনা ধরনে আঁকা "চিল্কা দে'র কয়েকটি দৃশ্যচিত্র অপূর্ব। বিশ্ব-বখ্যাত ইটালীয়ান পণ্ডিত ও শিল্প সমালোচক মিঃ লাওনেলো ভেনটুরি গোপালবাবুর এই ছবিগুলির প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন ও প্রশংসা করেন।

গোপালবাবুর অধিকাংশ ছবিই বিভিন্ন ও বিচিত্র ধরনে আঁকা। কোথাও মোলায়েম রঙ গীতিকাব্যের মাধুর্য বর্ষণ করেছে, আবার কোথাও চড়া বিপরীত রঙ পাশাপাশি বিদ্রোহ ঘোষণা করছে। প্রত্যেকটি ছবির প্রাণপ্রাবল্য ও বিচিত্র অনুভূতি মনকে আকৃষ্ট করে ও একঘেঁয়ে মনে হয় না। অনেকস্থলে গোপালবাবুর ধৈর্যের অভাব লক্ষ্য করলাম, শেষরক্ষা করতে পারেননি। কোনো কোনো চিত্রে অল্পেতে কিস্তিমাৎ করতে চেয়েছেন এবং তখনই তিনি বিফল হয়েছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্যই গোপালবাবুর চিত্রকলার প্রধান প্রেরণা। লেখক ভবিষ্যতে গোপালবাবুর ছবিতে অন্যান্য বিষয়বস্তুরও আশা করেন।

বম্বেতে চিত্র প্রদর্শনী করতে ইচ্ছুক কলকাতার শিল্পীদের গোপালবাবুর চিত্র-প্রদর্শনীর একটি খুঁৎ সম্বন্ধে অবহিত না করে পারা গেল না। তাঁর ছবির মাউন্ট ও বাঁধাই ছিল নিতান্ত সাধারণ, মাউন্ট ছিল অত্যন্ত ছোট ও ময়লা। বম্বেতে শোম্যানশিপের বিশেষ প্রয়োজন, ভাল মাউণ্ট ও ফ্রেম না থাকলে দর্শক ও ক্রেতারা আকৃষ্ট হয় না এবং সেইজন্যই এখানকার শিল্পীরা ছবি যতই নিকৃষ্ট হোক্ না কেন প্রচুর খরচ করে ভাল মাউণ্ট ও রকমারী চটকদার ফ্রেম লাগিয়ে প্রদর্শনী করে যা বেশী ভাগ সময় ছবির বদলে ফ্রেম-এর প্রদর্শনী হয়ে দাঁড়ায়। কলকাতার শিল্পীদের কাছে ব্যাপারটা হয়ত হাস্যকর হবে. কিন্তু উপায় নেই। "যস্মিন্ দেশে যদাচার"।

আলোচনা

সিনেমায় তবলা ও সারেংগীবাদক

মহাশয়,

আজকাল সিনেমাজগতে সঙ্গীতসমৃদ্ধ সংগ্রহণের প্রয়াস খুবই বেড়ে গেছে, কিন্তু এই ধরনের চিত্রে এক শ্রেণীর সঙ্গীতজ্ঞদের সম্বন্ধে এক বিচিত্র মনোভাবের পরিচয় প্রায় প্রতিটি চিত্রেই কম অথবা বেশী পরিমাণে দেখা যাচ্ছে। তাই এই ধরনের মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে পারলাম না।

আপনারা হয়ত দেখে থাকবেন যে, এই ধরনের চিত্রগুলিতে তবলা এবং সারেংগী-শিল্পীদের ভাঁড় হিসেবে চিত্রিত করা হয়। তাঁদের বিচিত্র পোশাক ও হাবভাব (যা পরি-চালকের নির্দেশেই হয়ে থাকে) কখনই এক সাধক শিল্পীর রূপ নিয়ে ফুটে উঠতে পারে না। অথচ সেই সব বাদ্যযন্ত্রে এমন সব নেপথ্য শিল্পীর নাম থাকে, যাঁরা ভারতের বিশিষ্ট শিল্পীদের অন্যতম এবং তাঁদের দেখবার সুযোগ যাঁদের হয়েছে তাঁরা জানেন যে, চিত্রে দেখান হাবভাবের সাথে তাঁদের প্রকাশিত হাবভাবের কত পার্থক্য। এই সব শিল্পীর নাম শুধু পয়সা রোজগারের উদ্দেশ্যেই দেওয়া হয়, উপরন্তু তাঁদের এবং তাঁদের সাধিত বাদ্যযন্ত্রকে হেয় প্রতিপন্ন করা হয়।

এই বিষয়ে আমি সেই সব শিল্পীদেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করছি যে, চিত্রে দেখান এই লঘু হাবভাবের প্রতিবাদ তাঁদের পক্ষ থেকেও হওয়া উচিত, কারণ তা না হলে তাঁদের সাধনার গাম্ভীর্য সম্বন্ধে জনসাধারণের শ্রদ্ধা চলে যাবে। ইতি—শ্রীসুনির্মল গুপ্ত, কানপুর।

"আবু ভ্রমণ"

মহাশয়,—

এ সংখ্যার 'দেশে' (২২ বর্ষ, সংখ্যা ৭) শ্রীযুক্ত শুভঙ্কর রচিত "আবু ভ্রমণ" প্রবন্ধটির এক স্থানে বলা হয়েছে, "গুজরাটির জ্ঞাতি ভাষা মারোয়াড়ীতে আবার সবাই 'থে'—'তুই'।" যদি লেখক 'থে' শব্দের প্রতিশব্দ হিসাবে 'তুই' ব্যবহার করে থাকেন, তাহলে আমি যতদূর জানি, তা শুদ্ধ নয়।

মারোয়াড়ী ভাষায় সম্বোধনে "তুমি" শব্দের প্রয়োগ নাই সত্য, কিন্তু তাঁরা সম্বোধনে দুটি শব্দ প্রয়োগ করেন, যথা—থে—আপনি; তুঁ—তুই। উপরোক্ত উভয় শব্দের প্রয়োগ হেতু ক্রিয়ার রূপও পরিবর্তিত হয়। ইতি—শক্তি মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা।

"অবিস্মরণীয়"

মহাশয়,—

দেশ পত্রিকার গত ২২শ বর্ষ ৭ম সংখ্যায় কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের 'অবিস্মরণীয়' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছে কয়েকটি প্রখ্যাত কবিতা পুনঃপ্রকাশিত করিয়াছেন। এই জাতীয় কবিতার পুনঃপ্রকাশ দেশের পক্ষে নিঃসংশয়ে মঙ্গলপ্রদ। বিশেষত—সাম্প্রতিক এই নিঃসম্বল বাংলাদেশে উক্ত প্রেরণার প্রয়োজন আছে। এই প্রসঙ্গে 'শরৎচন্দ্র' শীর্ষক কবিতাটির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। কবিতাটির ২য় পংক্তিতে ছাপা হইয়াছে—

'ক্ষতি তার ক্ষতি নয় প্রেমের শাসনে।'

আমার মনে হয় 'প্রেমের শাসনে' না হইয়া ঐস্থানে 'মৃত্যুর শাসনে' হইবে। কেননা ওস্থানে 'প্রেমের শাসনে'র কোন অর্থ করা যায় না। যতদূর মনে পড়ে ঐ কবিতাটি প্রথম যখন প্রকাশ হয় তখন 'মৃত্যুর শাসনে' কথাটিই ছিল। ইতি—শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ সোমন্দার, বাঁকুড়া।

"নাঙ্গৈয়র"

মহাশয়,—

"দেশ"এর বর্তমান সংখ্যায় (২ পৌষ) আলোচনা বিভাগে "নাঙ্গৈয়র" সম্বন্ধে যা লেখা হয়েছে সে সম্বন্ধে জানাচ্ছি—সুনীতি-কুমার চট্টোপাধ্যায়ের "নাঙ্গৈয়র" এসেছে "জ্ঞাতিগৃহ" থেকে!

[Origin & Development of the Bengali Language pp. 528, 545, 553]

হীরেন্দ্রনাথ ঘোষাল, কলিকাতা

গ্রীস থেকে জুগোশ্লোভিয়া

ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইউরোপের পশ্চিমের লোকের ধারণা ছিল, বলকান দেশগুলিতে সভ্যতা আদৌ বিস্তার লাভ করেনি; সাধারণ প্রজার অবস্থা মধ্যপ্রাচ্য আরবী দেশগুলিরই মত বা ভারতবর্ষের সামিল।

একথা সর্বজনবিদিত গ্রীসের সভ্যতাই ইউরোপে আদিম তবুও বর্তমান গ্রীস সর্ববিষয়ে অনগ্রসর। কথাটা মিথ্যা আদৌ নয়। ৪ শত ৫ শত বৎসর যত-গুলি দেশ তুর্কীর কড়াশাসনে ছিল শিক্ষার বিস্তার সে সব দেশে একেবারেই হয়নি। স্ত্রীলোকের অর্থনৈতিক স্বাধীনতা দূরে থাকুক, তারা সমাজে হীন, পর্দার অন্তরালে থাকাই তাদের পক্ষে প্রকৃত ব্যবস্থা, এমনকি বহুবিবাহ প্রথা পর্যন্ত খৃষ্টীয় পরিবারেও গা-সহা হয়েছিল। ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত নবগঠিত রাজ্য জুগোশ্লেভিয়ায় ১২২ মাইলের বেশী রেল পথ নির্মিত হয়নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ যে যুগান্তকারী, অনেক অঞ্চলেই আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছে একথাও প্রচার হয়েছে। সোভিয়েৎ প্রভাবিত দেশ সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ ইংলণ্ডে বা ইউরোপের বড় শহরেও মেলে না। লৌহ যবনিকার অন্তরালে বাস করে বালকানের সব দেশগুলিই যাতায়াতের কড়াকড়িতে কৌতূহলও বড় একটা নেই সাধারণ প্রজার। শুধু ১৯৪৮ সাল থেকে জুগোশ্লেভিয়া সম্বন্ধে জানা গেল বেশী। যে কোনও ইউরোপীয় প্রজা সেখানে অবাধে যাতায়াত করতে পারে, এমনকি সেখানকার গভর্নমেণ্ট বাইরের লোককে তাদের দেশের খবর দিতে উৎসাহী, আমন্ত্রণ করে নিয়ে যেতে চায়, দেশের অবস্থা বুঝাতে ব্যগ্র। সর্বরকমে পাশ্চাত্ত্য জাতিদের সঙ্গে, আমেরিকার সঙ্গে সহযোগিতা করবার আগ্রহ বেশ পরিস্ফুট। ইংলণ্ডে কোনও সাধারণ পুস্তকাগারে জুগোশ্লেভিয়ার বর্তমান ক্রমোন্নতির বিবরণ পুস্তিকাকারে পড়া যাবে। পুস্তকও অনেকগুলি লেখা হয়েছে গত ৫ বৎসরের মধ্যে। যুদ্ধের পরে। বিসদৃশ অবস্থার মধ্যে হোটেলের বন্দোবস্ত ভাল হয়ে উঠেনি, কিন্তু যে কয়টি হোটেল এই রাজ্যের ৬টি গণতন্ত্রের মধ্যে আছে গ্রীষ্মকালে সেখানে যায়গা পাওয়া দুষ্কর। বিদেশী লোকে হ্রদের দৃশ্য দেখতে, পর্বতের শোভা উপভোগ করতে অন্য ভাষাভাষীজাতির পরিচয় নিতেই ইচ্ছুক। সেখানকার স্থানীয় লোকেরা বড় একটা এক শহর থেকে অন্য শহরে গেলে হোটেলে থাকে না; সামর্থ্যও নেই, হোটেলের সংখ্যাও এত কম যে বিদেশীর জন্যই জায়গা দেওয়া যায় না। কিন্তু ডিসেম্বরের শীতেও রাজধানী বেলগ্রেডে কোনও হোটেল ছোট বা বড় সবই ভর্তি থাকবে একথা লণ্ডনে আমাকে কেউ বলে দেয়নি। সহজেই জায়গা মিলবে এই ভরসাই ছিল। যখন গ্রীস থেকে বেলগ্রেডে যাই, তার চারদিন আগে পেঁৗছাবার কথা ছিল। গ্রীস দেখতে দেরী হওয়ায়, লণ্ডনস্থ সাংবাদিক বন্ধু শ্রীনৃপেন্দ্র ঘোষ জুগোশ্লেভিয়া নিউজ এজেন্সীতে পেঁৗছানর তারিখ যা জানিয়ে-ছিলেন তা উত্তীর্ণ হওয়ায় প্রথম রাত্রি বারটায় জায়গা পাওয়া মুশকিল হয়েছিল। তবু জুগোশ্লেভিয়ার প্রজার আতিথেয়তা কৃতজ্ঞতার সঙ্গেই স্মরণ করছি। গ্রীস থেকে সোজা রেলপথে বেলগ্রেডে যাই, সেখানে পেঁৗছাই ৪ঠা ডিসেম্বর রাত্রে।

জুগোশ্লেভিয়ায় প্রবেশ করা যায় ইতালীর ভিনিস নগরী থেকে ত্রিয়েস্ত হয়ে উত্তর সীমানায়; অষ্ট্রিয়া, সুইজারল্যাণ্ড থেকেও রেলপথ অতি সুগম। গ্রীস থেকে দক্ষিণ প্রদেশ জুগোশ্লেভিয়ার ম্যাসি-ডোনিয়ায় যাওয়া যায়। এটা ইস্তাম্বুল থেকেও যাবার রাস্তা। আকাশপথে পেঁৗছাবার অসুবিধা একেবারেই নেই।

আমি গ্রীসের ম্যাসিডোনিয়ার বড় শহর স্যালোনিকা থেকে রেলপথেই যাত্রা করেছিলাম। একই রেল দুই রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে একেবারে ফ্রান্সের পশ্চিম সীমান্ত ক্যালে পর্যন্ত দৌড়ায়।

এডিনবরাতে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সামাজিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের অধ্যাপক ক্রু (Crew) জ্যাগ্রেব শহরের প্রফেসার স্টাম্বার নামে এক পরিচয়পত্র দিয়ে বলেছিলেন—এই অধ্যাপক একজন শ্রম-মন্ত্রী জুগোশ্লেভিয়ায়; সামাজিক চিকিৎসা বিজ্ঞান অধ্যাপনা করেন যদিও নিজে ডাক্তার চিকিৎসক নন। বলা বাহুল্য, ইংরাজী খুবই ভাল জানেন। এডিনবরাতে একজন বেলগ্রেডের ছাত্রের সঙ্গে হঠাৎ ইউনিভার্সিটি ইউনিয়নে আলাপ হয়। তার দেশে যাব শুনে সে ছাত্রটি দেশের ম্যাপ, দ্রষ্টব্য স্থানগুলির বিবরণ আমাকে দেখিয়ে দেন। বেলগ্রেড থেকে আন্তর্জাতিক নৌ সম্বন্ধে আইন পড়তে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার গভর্নমেণ্ট পাঠিয়েছে তাকে। অনেকটা দেশের অবস্থা তার মুখেও জানতে পারলাম, কোথা থেকে কোথায় গেলে সারা দেশটা সহজে দেখা যাবে, যেন কিছু ঐতিহাসিক উল্লেখযোগ্য স্থান বাদ না পড়ে যায়; লোকের অবস্থা সহজে কেমন করে বুঝা যাবে সবই জানিয়ে দেন। একখানি পত্র ভগ্নীর নামে দেন আর আমার সঙ্গে দুই পাউণ্ড কফীর প্যাকেট

াঠিয়ে দেন। কফির দর সেখানে আমাদের দেশী ৫৩৲ টাকায় এক াউণ্ড। চায়ের দর আর একটু বেশী াই মা বোনদের জন্য কফি পাঠাতে াত উৎকণ্ঠা। কত করে বলেছিলেন এই ্কুশ বছরের যুবক, মা যেন কোনও চন্তা না করেন, আমি ভাল পড়াশুনা রছি; শীঘ্রই দেশে ফিরব। পিতার ত্যু হয়েছে জার্মানের হাতে, দুই াহোদরও জার্মান যুদ্ধে হত হয়েছে। ুই ভগ্নী আর ৭০ বৎসরের বৃদ্ধা মাতা বলগ্রেডে বাস করেন। বড় ভগ্নী বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে সমাজ সেবিকা Social worker)। আমাকে আশ্বাস দয়েছিলেন—ভগ্নীরা ভাল ইংরাজী লেন, কিন্তু যখন দেখা করি, তখন দেখি াঁরা ফরাসী খুবই ভাল জানেন, ইংরাজীটা জানেন না। যাহোক্ ভাষা নদে কষ্ট বিশেষ হয়নি। যেদিন এথেন্স অভিমুখে যাত্রা করি, লন্ডনে সেদিন য়াশাও ছিল না, বৃষ্টিও পড়েনি। এরোপ্লেনে একেবারে এথেন্স পেঁাছাতে সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টা হয়ে গেল। পথে মাত্র ১ ঘণ্টা রোমে থেমেছিল প্লেন। এথেন্সে হোটেল সহজেই মিলে। একেবারে যেন পশ্চিম ইউরোপের শহর। এত বড় যুদ্ধ হয়ে গিয়েছে দশ বছর আগে কিন্তু তার কোনও নিদর্শনই নেই। ছোট শহর, আলোয় উজ্জ্বল, ইংরাজী জানলেই চলে, ফরাসী বা জার্মান জানবার এত দরকার হয় না। স্বাচ্ছন্দ্যের ত্রুটি নেই। যুদ্ধের পরে এদেশটা আদৌ কম্যুনিস্ট প্রভাবিত হয়নি। এখনও বৈশ্য প্রধান আর একেবারে ইউরোপীয় হাবভাব। প্রাচ্য দেশের মোটেই কিছু পাওয়া যাবে না। সকলেই ইউরোপীয় টুপি, টাই পরে। ১৮৩৪ সালে এথেন্সের উত্তরে ১৩০ মাইল পর্যন্ত ভূখণ্ড ফরাসী ইংরাজের সাহায্যে তুর্কীর শাসনশৃঙ্খল থেকে মুক্তি পেয়েছে। একশো বছর পরে আজ মুসলমান কীর্তি কিছুই আর নেই। বণিকের প্রাধান্য, কৌলীন্য শুধু কাঞ্চনের। ধনী যেমন বিলাসিতায় মগ্ন, ভিক্ষুক, নিরন্ন নরনারী পথেঘাটে অনেক। চৌরঙ্গীর মত রাস্তাও আছে, বস্তীও আছে উপান্তে অনেক। এই বৈষম্য ইংলণ্ডে চোখে পড়বে না, সুইজারল্যাণ্ডে ত নয়ই যদিও ধনী দরিদ্র দুইই আছে এ দুটো দেশে, তবে বাইরে থেকে বুঝা যায় না একেবারেই। অতি সুসজ্জিত দোকানে আমেরিকা থেকে আমদানি জিনিসপত্র ক্যামেরা, সিগারেট, রেডিও, বিজলীবাতি বিক্রয়ের জন্য আছে। গ্রীসের নিজস্ব পোশাক, জুতা কোনও কোনও দোকানে আমেরিকানের জন্য বিক্রীত হয়। এই সব জিনিস আমাদের দেশেও বিক্রীত হয়, তবে গ্রীসে দাম প্রায় দেড়গুণ এই তফাৎ। সিনেমাতে আমেরিকার ছবিই বেশী, গ্রীক ভাষায় এক লাইন লিখে দেওয়া হয়। ইউরোপ, বিশেষ করে আমেরিকাকে অনুকরণ করে ধন্য হয় লোকে—এই মনে হবে। ট্যুরিস্টের সংখ্যাও বেশী, আমেরিকার পুরুষ ও স্ত্রী ধন-কুবেরের দল সারা বছরই গ্রীসে আনাগোনা করে, তাদের সন্তুষ্ট করেই অনেক লোক দিন গুজরান করে। তাই ইংরাজীতে খবরের কাগজ প্রকাশিত হয়। লোকেও ইংরাজী বলে, তবে আমেরিকান ভঙ্গীতে। এথেন্সের লোকে ইতালীর বন্দর শহরগুলোর লোকদের মত গরীবও নয়, সততাও হারায়নি। ধনী দরিদ্রের তফাৎ তত বেশীও নয়। প্রাচীন গৌরবের কথা ভেবে দিন কাটালে চলে না; পরিশ্রম করতে হয়। অধিকাংশ গ্রীকই সমুদ্রতীরে বা দ্বীপে বাস করে বলেই স্মরণাতীত যুগ থেকে তারা সমুদ্রে চলা-ফেরা করে বিদেশকে ভয় করে না। পেটের জ্বালায় বিজাতীয় শাসনের স্বৈরাচারে জন্মভূমি ছেড়ে চলে যায় দূর বিদেশে। যারাই বিদেশে যায় তারাই ধনী হয়। রোমের শাসনের সময় থেকে প্রায় দু'হাজার বছর ধরে গ্রীক প্রজা পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। ধনশালীও হয়েছে অনেকে। জন্মভূমির উপরে আকর্ষণও আছে। দান ধর্মও করতে পারে। যেখানে ওলিম্পিক খেলা শুরু হয়েছিল, সে ওলিম্পিয়া—ভগ্ন অবস্থায় ছিল; ঠিক সেই রকমে মার্বেল পাথর দিয়ে—বানিয়ে দিয়েছেন একজন ধনী বণিক। (তাঁর মর্মর মূর্তিও নিকটে স্থাপিত হয়েছে)। একজনের অর্থে এই অক্ষয়-কীর্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তিনি কাপড়ের কারবার করতেন সারা ইউরোপে, রুশিয়ায় জারের রাজধানী সেণ্ট পিটার্স-বার্গে তাঁর কারবার ছিল সব চেয়ে বড়। ইংলণ্ডে, বিশেষত লণ্ডন শহরে ছোট খাট চায়ের দোকান, রেস্তোরাঁর শতকরা ৯৮টী গ্রীকের। আমেরিকায় বহু গ্রীক চলে গিয়ে ধনী বা মধ্যবিত্ত হয়েছে। আমাদের দেশে সিন্ধু, কচ্ছের ব্যবসায়ীরা যেমন পৃথিবীর সর্বত্র আছে, মাড়োয়ারী বণিকেরাও বড়বাজারের টাকায়—বিকানীরে রাজপ্রাসাদ নির্মাণ করে, গ্রামেও বিজলী বাতি জ্বালায়, মরু-ভূমির দেশে ২০০ হাত নীচ থেকে

ইলেকট্রিক পাম্প দিয়ে জল উঠায়, সেই রকম গ্রীসের লোকেও বিদেশে থাকে অনেক বছর জীবনের।

প্রাচীন কীর্তির অধিকাংশই লুপ্ত হয়েছে তবে পাহাড়ের উপরে অ্যাক্রো-পোলিসের স্তম্ভগুলি বহু দূরে থেকে দেখা যায়। এখানে কত বৈদেশিক আক্রমণই হয়েছে। দেবদেবীর মন্দির ক্রীশ্চান গির্জায় পরিণত হয়েছিল, এ্যাথেনা (গ্রীসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা) দেবীর মন্দিরে মসজিদ নির্মিত হয়েছিল; সমুদ্র দেবতার মন্দিরে সুলতানের প্রতিনিধির হারেম বসান হয়েছিল। আজ শুধু প্রাচীন দুর্গপ্রাকার, মন্দিরের স্তম্ভ প্রমাণ করিয়ে দেয় প্রাচীন গ্রীস কত সভ্যতার উচ্চশিখরে ছিল। গবর্ন-মেণ্টের পক্ষ থেকে ইংরাজী, ফরাসী ভাষায় বুঝিয়ে দেবার গাইড আছে। গাইডেরা প্রাচীন ইতিহাসের তুলনামূলক আলোচনায় অভ্যস্ত। ভারত গবর্নমেণ্টের ট্যুরিস্ট বিভাগ মাত্র অল্প দিন কাজ আরম্ভ করেছে। কিম্বদন্তী বর্জন করে, নিছক ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ করা এখনও তাদের অভ্যাস হয়নি। এইরকম তুর্কীর শাসনে ৫ শত বৎসর গ্রীসের লোকে আত্মবিস্মৃত হয়েই ছিল, পূর্ব-পুরুষদের স্মরণ করবার অবকাশ তাদের ছিল না। হঠাৎ মনে পড়ল নদীয়া জেলায় কৃত্তিবাসের জন্মস্থান ফুলিয়ার কথা। এখন কয়েক বৎসর সেখানে বৎসরে একবার কৃত্তিবাস স্মৃতি সভা হয়। গত দু বৎসর পূর্বে যখন শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্য সভাপতিত্ব করতে যান, স্থানীয় ভদ্রলোকেরা দুঃখ প্রকাশ করছিলেন বাঙ্গালী রামায়ণ ভুলে গিয়েছে, কৃত্তিবাসকে সম্মান করে না। গবর্নমেণ্টের উৎসাহ না হলে পরবর্তী যুগে লোকে ভুলে যায় সর্বত্র। বাংলায় কত ঐতিহাসিক কীর্তি আছে, কতই না জনপদ আছে তার ঐতিহ্য কৃষ্টি ছাত্রদের অজানা এ বোধ হয় একমুখী শিক্ষার কারণে। স্কুল থেকে কলেজের পক্ষ থেকে মাঝে মাঝে এইসব স্থান দেখাতে পারলে আমরা বোধ হয় আবার আমাদের পুরাতন ইতিহাস গড়তে পারব। বৈদেশিক আক্রমণে গ্রীসের মতন আমরাও সব হারিয়ে ফেলেছি, বিশেষত বিদেশী যদি এমন হয় অধিকৃত দেশের প্রজার জাতীয়তাবোধকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে আনন্দ পায়। তুর্কীর আমলের কিছুই আর এথেন্সে বা নিকটে ১০০ মাইলের মধ্যে নেই। সবই তুলে নেওয়া হয়েছে। বহু লক্ষ ডলার ব্যয়ে আমেরিকান প্রত্নতত্ত্ব সমিতি খননকার্য আরম্ভ করেছে, যদি কৃতকার্য হয় রোমের মত ফোরাম এথেন্সে পুনরুদ্ধার হবে আশা করা যায়। গ্রীসে খৃষ্টের উপদেশ প্রচারিত হয়েছিল রোমেরও আগে। সেণ্ট পল যে পাহাড়ে প্রথম বাণী প্রচার করেন ৬৮ খৃষ্টাব্দে আজও তা পুণ্যক্ষেত্র। তিনি রোমে পরে যান, সেইখানেই তাঁর ঐহিক জীবনের অবসান। কাজেই গির্জা স্থাপন গ্রীসে রোমেরও পূর্বে। এখনও লোকের ধর্ম-বিশ্বাস দৃঢ়। গ্রীক চার্চের সম্মুখ দিয়ে গেলেই বুড়ালোকেরা, স্ত্রী মাত্রেই বুকে আঙ্গুল দিয়ে ক্রুশ চিহ্নিত করে। পুরাতন গির্জায় লোকে মানত দেয়; সফলকাম হলে সোনারূপার ক্রুশ চড়ায়। এক একটা মেরী ও শিশু খৃষ্টের ক্ষোদিত মূর্তির পায়ের আঙ্গুলে মানুষ চুমু খেয়ে, পায়ে ছুঁয়ে ক্ষয়িত করেছে, সেটা রোমেও দেখা যায়। প্রাচীনতম গ্রীক চার্চ এখনও এথেন্সে আছে, তবে সর্বপ্রধান বিশপ Patriarch ইস্তাম্বুল (Constantinople)এ থাকেন। মারাথন বা থার্মপলীর কথা সাধারণ প্রজা জানে না। কালের ধর্মে আজ এই দুই স্থানেই সাইপ্রাস তার অলিভ বৃক্ষের অরণ্য। আলেকজান্দারের জন্মস্থান ও প্রথম রাজ্য ম্যাসিদন দেখবার আগ্রহে রেলপথে উত্তরমুখে যাত্রা করেছিলাম। যেদিন এথেন্স ছাড়ি প্রাতঃকালে পথে এক বিরাট জনতার চীৎকার ধ্বনি, সাইপ্রাস দ্বীপ গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত করতেই হবে। জনতার পুরোভাগে একজন গ্রীক চার্চের ধর্মযাজক। যদিও ৭ শত বৎসরের বেশী এই দ্বীপ মধ্যপ্রাচ্যের সন্নিহিত অঞ্চলে বিভিন্ন বৈদেশিক শাসনে আছে, সেখানকার ভাষা আজও গ্রীক; সব কিছুতে তারা গ্রীসকেই মর্যাদা দিয়ে চলে। জনতা কিছু অগ্রসর হলেই এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক ডেকে এক চায়ের দোকানে নিয়ে গেলেন। হয় কালো কফি দুধ না দিয়ে—না হয় পাতলা চা লেবুর রস চিনি দিয়ে পান করা অভ্যাস সারা পূর্ব ইউরোপে। আমাদের দেশের মতন চা পান একমাত্র ইংলণ্ডেই চলিত। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখেই বুঝেছেন আমি ভারতবাসী। তিনি শ্রীনেহরুর নামে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে বললেন তিনিই শুধু সাইপ্রাসকে গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য জিদ প্রকাশ করছেন। ব্যথা না পেলে ব্যথা বোঝা যায় না একথাও বললেন। ভারতবর্ষ সর্বরকমে এগিয়ে যাচ্ছে একথা তাঁরা শুনেছেন। পণ্ডিত নেহেরুর 'ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া', পৃথিবীর ইতিহাস, যেমন প্রায় সব ভাষাতেই অনূদিত হয়েছে, তেমনই গ্রীক ভাষাতেও ছাপা হয়েছে। গ্রীসের পুরাকীর্তি, বর্তমান অবস্থা অনেক কিছুই তিনিই আলোচনা করলেন তবে আলেকজান্দারের জন্মস্থানটি ঠিক কোথায় স্যালোনিকার সন্নিকটে সেটা তিনিও বলতে পারলেন না।

ডায়োনিসিউস-এর থিয়েটারে গ্রীক দেব দেবীর মূর্তি এখনও স্পষ্ট বুঝা যায়, মাংসপেশী শিরাগুলো পর্যন্ত এখনও উজ্জ্বল দেখা যায়, বসবার আসন এখনও অভগ্ন যেখানে ৫০,০০০ হাজার লোকে অভিনয় দেখতে আসত, কিন্তু মূর্তিগুলির মস্তক ভগ্ন। এটা কালের প্রভাবে নয়, খৃষ্ট ধর্ম প্রচারিত হলে এমনই করে পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে ধর্মমতের দৃঢ়তা প্রমাণ করা হত। পরের দিন ম্যাসিডোনিয়ার রাজধানী সালোনিকায় পৌঁছাই। গ্রীস আর রোমের ইতিহাস ইউরোপে স্কুলে পাঠ্য। সভ্যতা গ্রীসেই প্রাচীনতম—এই সেখানকার লোকের ধারণা। মুষ্টিমেয় লোক যাঁরা ইণ্ডোলজি চর্চা করেন, তাঁদের বাদ দিলে প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে পশ্চিম দেশের লোকে কিছুই জানেন না বলা যায়।

(ক্রমশঃ)

ছোট গল্প

স্বনির্বাচিত গল্প—তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। দাম—৪, টাকা।

তেরোটি গল্পের সমষ্টি নিয়ে তারাশঙ্করের স্বনির্বাচিত গল্প। এই গ্রন্থটির গল্প নির্বাচন প্রসঙ্গে লেখক ভূমিকায় তাঁর মনোভাবটি ব্যক্ত করেছেন। সেই মনোভাবটি এই, যে-কাহিনীর মধ্যে একটি শাশ্বত আবেদন আছে এবং যার আকর্ষণ কাল থেকে কালান্তরেও ক্ষুণ্ণ হবে না বলে লেখকের বিশ্বাস, লেখক সেই গল্পগুলিই নির্বাচন করে এই পুস্তকে গ্রথিত করেছেন। নির্বাচন প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কথা এই, লেখকের প্রিয় গল্প ও শ্রেষ্ঠ গল্পের মধ্যে যে সব গল্প আছে, স্বনির্বাচিত'তে সেগুলি বাদ দেওয়া হয়েছে।

স্বনির্বাচিত গ্রন্থের তেরোটি গল্পই পুরানো। যদি কদর্থে প্রয়োগ করা না হয়, তা হলে সসঙ্কোচে এই কথা বলবো, তারাশঙ্করবাবুর রচনাশক্তি এবং লিখন-প্রতিভা যখন শিখরদেশে—তাঁর প্রতিটি রচনাই সে সময় পাঠক মনকে চুম্বকের মত আকর্ষণ করত—এই গল্পগুলির সব কটিই বোধ হয় সে-সময়ের। গল্পগুলির রচনাকাল থেকে সাম্প্রতিক কালের মধ্যে অল্প হলেও—কয়েকটি বছরের ব্যবধান আছে। এই অল্প সময়ের ব্যবধানে একদা অতি-উৎসাহে পঠিত গল্পগুলি ইদানীং কেমন লাগে বর্তমান সমালোচকের তাই হচ্ছে বক্তব্য। বলা বাহুল্য, লেখক স্বয়ং এই অধিকার পাঠককুলকে দিয়েছেন। তাঁর ভূমিকা-ই এ কথার প্রমাণ।

স্বনির্বাচিতের তেরোটি গল্পের প্রত্যেকটিই বর্তমান সমালোচকের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা মেটাতে পারে নি। এর দুটি কারণ থাকতে পারে—হয় স্বনির্বাচিতের সব কটি গল্পের আবেদন শাশ্বত নয়, আর না হয় বর্তমান পাঠকশ্রেণীর মনের ছাঁচ বদলেছে—যার ফলে কয়েকটি গল্পের আবেদন তাকে উৎসাহিত করতে পারে না।

তারাশঙ্করবাবু যে বাঙলা ছোটগল্পের প্রথম শ্রেণীর শিল্পী সে কথা বলার অপেক্ষায় থাকে না। ছোটগল্প বিষয়ে তাঁর নিজস্ব কারুকৃতি, দৃষ্টিভঙ্গী এবং পরিবেশবৈচিত্র্যের যে নিজস্বতা তা এমনই একান্ত যে, কোন ক্রমেই অপর কোন লেখকের সঙ্গে তার বিন্দুমাত্র সাদৃশ্য আবিষ্কারের চেষ্টা ব্যর্থ হবে।

বর্তমান সমালোচকের ধারণা, তারাশঙ্করবাবুর গল্প রচনার বৈশিষ্ট্য প্রধানত তিনটি—এক, কাহিনী বয়নে লেখক মনের সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতা; দুই, আঞ্চলিক পরিবেশ এবং চরিত্র-চিত্রণ; তিন, একটি সবল ট্র্যাজিক বোধ। এই তিন যখন এক হয় তখন তারাশঙ্করের ছোট গল্পের তুলনা হয় না। স্বনির্বাচিতের 'ইমারত' গল্পটি এ কথার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

স্বনির্বাচিত গ্রন্থের কয়েকটি **গল্প—ময়দানব, যাদুকরী, ইমারত, ইস্কাপন,** মতিলাল আজও শক্তিধর তারাশঙ্করকে অনুভব করায়। অপর কটি গল্প করায় না, অন্তত বর্তমান সমালোচককে করায় নি।

তবে একথা ঠিক স্বনির্বাচিত গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অন্যান্য গল্পগুলি সুখপাঠ্য। লেখকের বিশেষ শিল্পীমনের ছাপ কম বেশি থেকে গেছে।

বইয়ের ছাপা, বাঁধাই চমৎকার।

৩৬০।৫৪

গজেন্দ্রকুমার মিত্রের শ্রেষ্ঠ গল্প—মিত্র ও ঘোষ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৫৲ টাকা।

গত দশ-পনের বছরে বাংলা ছোট গল্প কি লিপিকুশলতায়, কি বিষয় বৈচিত্র্যে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছে। কিন্তু তা বলে একথা বলা চলে না, বাংলা ছোট গল্পের আজকের উৎকর্ষতার মানটা সর্বকালের পক্ষে সমান প্রযোজ্য। অর্থাৎ শক্তি-সামর্থের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন বাঙালী গল্প-লেখকরা! আরো দশ-বিশ বছর পরে আজকের লেখা গল্পগুলি সম্বন্ধে আমরা কি বলতে পারবো সে কথাও ভেবে দেখতে হ'বে। এখনি তাই সমসাময়িক কালের রচিত কোন গল্পের শ্রেষ্ঠত্বের দাবীটা স্বীকার করে' নেওয়া ঠিক হ'বে না।

সমগ্রভাবে বাংলা সাহিত্যের ছোট গল্প সম্বন্ধে যদি একথা খাটে তা হ'লে আধুনিক লেখক বিশেষের পক্ষেও সে-কথা খাটবে। একটি লেখকের "এতগুলি শ্রেষ্ঠ গল্পের" অর্থ কি? শ্রেষ্ঠ বলতে সংখ্যার যে তারতম্য, বিশেষ গুণের দ্বারা বস্তুর যে সংজ্ঞা, আলোচ্য গল্প-সংকলনটিতে তার কোন্ প্রকাশ আছে? সৃষ্টিকর্তা হিসাবে গল্পগুলির উপর গজেন্দ্র-কুমারের সমদৃষ্টি থাকলেও পাঠক হিসাবে নিশ্চয়ই কেউ সব গল্পগুলিকে সমান আদর করবেন না। কুড়িটি গল্পের মধ্যে আমি একটিকে শ্রেষ্ঠ বলতে পারি, কিন্তু সবগুলিকে 'শ্রেষ্ঠ' নামে অভিহিত ক'রতে দ্বিধা বোধ করি।

তবুও একথা বলবো গল্পগুলি সুনির্বাচিত এবং গজেন্দ্রকুমারের লেখার প্রকৃত প্রতিনিধিত্বের দাবীদার। গল্পগুলির মধ্যে বিষয় বৈচিত্র্যের (সর্বাধিনায়ক!) চমক যা-থাক, সহজ ভাব এবং অনাড়ম্বর ভাষার জন্যে তা সহজেই পাঠক মনকে আকৃষ্ট ক'রবে। পড়া শেষ হ'লে প্রতিটি গল্প পাঠককে খুশী করতে সক্ষম। আন্তরিকতা যদি লেখার প্রাণস্বরূপ হয় গজেন্দ্রকুমারের এতগুলি গল্পের মধ্যে তাঁর প্রতিষ্ঠার পরিচয় পাঠক লক্ষ্য করবেন।

ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

৩৫৭।৫৪

উপন্যাস

কালো ঘোড়া—সরোজকুমার রায়চৌধুরী। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড কোং লিং, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। দাম—৩৷৷০ আনা।

সরোজকুমার রায়চৌধুরীর প্রসিদ্ধ উপন্যাস 'কালো ঘোড়া'র নতুন পরিবর্ধিত সংস্করণখানি পাঠক সম্প্রদায়কে প্রভূত তৃপ্তি দিবে বলিয়াই বিশ্বাস। প্রায় নয় দশ বৎসর পূর্বে এই উপন্যাসখানি আনন্দবাজার শারদীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। তখন যুদ্ধের আবহাওয়ায় আমাদের মানসিক চিন্তাধারা আর সহজ প্রবাহে বহিতেছে না, জীবনের জটিলতা বাড়িয়েছে—অনেক কলুষ কামনার প্রকাশ প্রকট হইয়াছে। এইরূপ সময় সরোজকুমারের কালো ঘোড়া রচিত। বলা বাহুল্য সমগ্র উপন্যাসখানির মধ্যে লেখকের একটি বক্তব্য ছিল এবং নায়ক শ্রীমন্তের চরিত্র সৃষ্টির মধ্যে লেখক যুদ্ধপীড়িত এক শ্রেণীর বাঙালী মনের মানবত্ববর্জিত আত্মস্ফীতির রূপটি প্রকাশ করিতে চাহিয়াছিলেন। শ্রীমন্ত সরোজ-কুমারের উল্লেখযোগ্য চরিত্র সৃষ্টি। হৈমন্তীও মনে দাগ রাখিয়া যায়। বহুকাল পরে উপন্যাসটি আবার পড়িলাম এবং পড়িয়া আনন্দিত হইলাম। পুস্তকের ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ চমৎকার।

৪০২।৫৪

রহস্যময়ী শিখা—শ্রীপ্রভাবতী দেবী সরস্বতী। দেব সাহিত্য কুটীর, ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯। দাম—বারো আনা।

এলাহাবাদের কোন এক পুলিস অফিসার, পরের সম্পত্তি নিজে আত্মসাৎ করে ও আসল মালিককে কি করে সমাজের বুকে অপরাধী করে তুলবে তারই সূক্ষ্ম ষড়যন্ত্র। অবশ্য শেষ পর্যন্ত নারী-গোয়েন্দা শিখার কাছে সব ষড়যন্ত্রই ফাঁস হয়ে যায়।

ঘটনা-বিন্যাস ও বর্ণনায় লেখিকা বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় না দিতে পারলেও গতানুগতিক রহস্য কাহিনী হিসাবে আলোচ্য বইখানিকে উল্লেখ করা চলে। চলনসই ভাষা, মুদ্রণ ও প্রচ্ছদপট মনোরম।

৪৮১।৫৪

কবিতা

স্বর ও অন্যান্য কবিতা—কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত। মডার্ন পাবলিশার্স, ৬, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—দেড় টাকা।

আধুনিক বাঙলা কবিতার যে-কোনো সংকলনে যাঁর কবিতা অবশ্যম্ভাবীরূপে গ্রহণীয়, সাম্প্রতিক কাব্যক্ষেত্রে তাঁর স্থানও নিশ্চিত এবং এ পরিণতিতে এসে পৌঁছনোর পূর্বে সে কবির উত্থান-পতনের ইতিহাস কখনও উজ্জ্বল, কখনও করুণ। কবি কিরণ-শঙ্করেরও তাই। দীর্ঘ দিনের চেষ্টা ও সাধনায় তিনি তাঁর ঠিক জায়গাটি যখন তৈরী করে নিতে পেরেছেন, তখন পশ্চাৎপটের আলোচনা ছেড়ে তাঁর ক্রমবিকাশের ধারাটিতে লক্ষ করাই বাঞ্ছনীয়। সে বিচারে স্বর ও অন্যান্য কবিতা পাঠকমনের কৌতূহল নিবৃত্তির সহায়ক, কারণ এ গ্রন্থে প্রাচীনতম কবিতা এবং নবীনতম কবিতার জন্মকালের ব্যবধান, যতদূর মনে হয়, এক যুগেরও বেশী, অন্যপক্ষে এই দীর্ঘ কালে কিরণশঙ্কর নিশ্চয়ই মাত্র একুশটি কবিতা রচনা করেন নি। অর্থাৎ এ গ্রন্থটি, বস্তুত, কিরণবাবুর কয়েকটি ভালো কবিতার সমষ্টি।

প্রথমাবধি কিরণশঙ্করের কবিতার যাঁরা নিয়মিত পাঠক, তাঁরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন, কিরণবাবু বিভিন্নকালে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে বদলাতে চলেছেন এবং এমনও এক-এক সময় কারো কারো মনে হয়েছে, তাঁর স্বাভাবিক হৃদয়বৃত্তিরও বুঝি কখনও কখনও পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথম বিবর্তনটি যে-কোনো কবির পক্ষে গুণের বিষয় হলেও, দ্বিতীয়টি কবিধর্মবিরোধী। কিন্তু কিরণশঙ্করের কবিতা পাঠে মনোযোগ

ব্যাহত না হলে সহজেই ধরা পড়বে যে, হৃদয়বৃত্তির যে চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গিয়েছিলো তাঁর মধ্যজীবনের কাব্যসাধনায়, তাতে প্রচুর আন্তরিকতা থাকলেও তা নিতান্তই সাময়িক এবং অল্পায়াসেই কবি তাঁর সহজাত চেতনার কাছে ফিরে এসেছেন। আসল কথা, কিরণ-শঙ্কর রোমাণ্টিক কবি এবং এ আত্মবিচারে তাঁর ভুল হয়নি বলে তিনি পাঠককুলের ধন্যবাদার্হ। 'স্বর' কবিতাটিই এ সত্যের প্রমাণ। তা ছাড়াও আছে ঃ

দৃষ্টি ক্রমে হয়ে আসে ফিকে
মনে-মনে গেঁথে চলি পলাতক
অতীতের বহু শতাব্দীর
ম্লান ইতিহাস
ছিন্নভিন্ন বহু স্মৃতি বহু শতাব্দীর।
—শীত রাত

কাব্যপ্রেরণা স্বতোৎসার হলেও তার রূপায়ণ আয়াসসাধ্য। ভাষা ও শৈলীর ওপর সাহিত্য নির্ভরশীল, তাই নিখাদ আন্তরিকতা সত্ত্বেও বহু কবিতাকে ব্যর্থ হতে দেখেছি। এবং এ নিয়ে বহু জ্ঞানী-গুণী প্রচুর গবেষণাও করেছেন। ভাষা ও রচনাভঙ্গীর প্রতি কিরণশঙ্করের সজাগ চেতনা পাঠকের লক্ষ্য এড়াবে না। স্বর ও অন্যান্য কবিতা সে-দিক থেকেও সার্থক। ৪৩৬।৫৪

আরেক জীবন—অমলেন্দু দত্ত। কাব্য-লোক; ১, যদু ভট্টাচার্য লেন, কলিকাতা—২৬। এক টাকা।

আধুনিক বাংলা কবিতার একটি মস্ত বড় সুলক্ষণ, আঙ্গিকের ক্ষেত্রে বিন্দুমাত্র শৈথিল্যও আর আজকাল চোখে পড়ে না। তা ছাড়া তার বিন্যাস আর ভাবগত আকর্ষণও কিছু কম নয়।

'আরেক জীবন'-এর কবি আঙ্গিকে এবং ভাব-বিন্যাসে যথেষ্টই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এ-বইয়ের কয়েকটি কবিতায়—বিশেষ করে প্রথম কবিতাটিতে সেই দক্ষতার ছাপ পরিস্ফুট। অনুশীলন অব্যাহত থাকলে শ্রীযুক্ত অমলেন্দু দত্ত পাঠক-সমাজকে স্থায়ী কিছু কবিতা উপহার দিতে পারবেন, তাতে সন্দেহ নেই। ৫৪৬।৫৪

সাহিত্যালোচনা

বাঙলা সাহিত্যে মহিলা সাহিত্যিক (প্রথম পর্ব)—রমেন চৌধুরী। প্রকাশক—বি সেন এ্যান্ড কোং, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা ১২। দাম—তিন টাকা আট আনা।

বাঙলা সাহিত্যের লেখক বা লেখিকাদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা বিশেষ কিছু হয়নি। এ প্রচেষ্টা আজ পর্যন্ত মোটামুটি রবীন্দ্রনাথ আর শরৎচন্দ্রকে নিয়েই সীমাবদ্ধ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাহিত্য সাধক গ্রন্থমালা এ ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ এবং সার্থকও। কিন্তু সেখানেও সমগ্রভাবে বাঙলা দেশের মহিলা সাহিত্যিকদের নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা হয়নি। সে দিক থেকে বিচার করলে বলা যায়, রমেনবাবু একটা নতুন পথের সন্ধান দিলেন।

প্রথম পর্বে তিনি ঊনিশজন সাহিত্যিককে নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রতিটি পরিচ্ছেদ দু'দিক থেকে আলোচিত—জীবনী এবং সাহিত্যালোচনা। কিন্তু সংক্ষেপে এ আলোচনা করতে যাওয়ার যে বিপদ লেখক তা থেকে রক্ষা পান নি। কখন কখন তাঁকে জীবন কথার ওপর ঝোঁক দিতে হয়েছে বেশী, কখন কখন বা সাহিত্যালোচনার ওপর। বোধ হয়, দুটো ভাগ প্রতি পরিচ্ছেদে একেবারে ভিন্ন করে নিলে সংক্ষিপ্তির মধ্যেও ভারসাম্য রক্ষা করার সুবিধা হতো। অবশ্য এ কথা সত্য যে, ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয় প্রত্যক্ষ না পরোক্ষভাবে এবং এই জন্যে সাহিত্যালোচনায় ব্যক্তি জীবনও আলোচ্য, তথাপি ঐশ্বর্যশালী সাহিত্য শিল্পীর আলোচনায় এ প্রথা অপরিহার্য হলেও প্রত্যেকটি লেখক বা লেখিকাকে সেভাবে বিচার করা নানাকারণে সম্ভব নয়।

এ গ্রন্থ-রচনায় লেখক যে পরিশ্রম স্বীকার করেছেন তার প্রশংসা না করে উপায় নেই। সাধারণতই আমরা প্রাচীন সাহিত্য পাঠে বিমুখ, তদুপরি যা সন্ধান সাপেক্ষ তার কথা চিন্তাও করি না। কিন্তু প্রাচীন বা স্বল্প পরিচিত রচনা মাত্রই যে অপাঠ্য নয়, এ গ্রন্থটি তা সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছে। বহু লেখিকা যে সত্যিকারের প্রতিভার অধিকারী ছিলেন, তার সন্ধান পেয়ে কোনো কোনো পাঠক নিশ্চয়ই বিস্মিত হবেন।

অগ্রগতিতে সাহিত্যের প্রাণের সন্ধান থাকলেও প্রাক্তন সাহিত্যের বিচারে সে প্রাণ-প্রবাহ সঠিকভাবে ধরা পড়ে। রমেনবাবু একদিক থেকে সে প্রবাহকে ধরতে চেষ্টা করে সার্থক হয়েছেন, তাই তিনি বাঙালী পাঠক সাধারণের ধন্যবাদ লাভের যোগ্য। ৪৯৪।৫৪

বঙ্কিমচন্দ্র ও মুসলমান সমাজ—রেজাউল করীম এম এ বি এল প্রণীত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩নং হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৸৹ আনা।

রেজাউল করীম সাহেব বাঙলার সাহিত্যিক এবং মনীষী সমাজে সুপরিচিত। বিগত ১৯৩৮ সালে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার লেখাগুলি ১৯৪৪ সালে প্রথমে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া বাঙলা দেশের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে আমরা সুখী হইয়াছি। বঙ্কিমচন্দ্র বাঙলা ভাষায় নবযুগের প্রবর্তক। তিনি মহাপুরুষ; তাঁহার অবদান

সম্বন্ধে এ দেশের মুসলমান সমাজের একদলের মনে ভ্রান্ত ধারণা রহিয়াছে। এই ধারণার মূলে মুসলিম লীগের সমগ্র প্ররোচনাই প্রত্যক্ষভাবে কাজ করে। রেজাউল করীম সাহেব তাঁহার লিখিত প্রবন্ধরাজীতে বিভিন্ন দিক হইতে বঙ্কিম-প্রতিভার বিচার বিশ্লেষণ করিয়া তাঁহার অবদানের মহত্ত্ব পরিস্ফুট করিয়াছেন। তাঁহার রচনাভঙ্গী অনবদ্য, বলিষ্ঠ তাঁহার যুক্তি-বিন্যাস এবং তাঁহার সিদ্ধান্তসমূহ গভীর মনস্বিতার পরিচায়ক। র‍্যাডক্লিফ সিদ্ধান্ত অনুসারে ভারত বিভক্ত হইবার পূর্বে অর্থাৎ পাকিস্থান প্রতিষ্ঠিত হইবার আগে করীম সাহেবের রচনাগুলি প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক সে পটভূমিকার পরিবর্তন ঘটিয়াছে; কিন্তু তাহাতে লেখাগুলির গুরুত্ব হ্রাস পায় নাই। বাঙলা সাহিত্য ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্রের অবদান, তাঁহার স্বদেশপ্রেম, তাঁহার রাজনীতিক দূরদর্শিতা, সর্বোপরি কৃষক এবং শোষিত জনশ্রেণীর জন্য তাঁহার চিত্তের বেদনা জাতি ও সমাজের উন্নয়ন মূলে এবং মানব সংস্কৃতির সম্প্রসারণ ক্ষেত্রে সেগুলির মূল্য সমানই রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে সাহিত্যের গুণ, ধর্ম এবং আদর্শ সম্বন্ধে সুপণ্ডিত সাহিত্যিক লেখকের মন্তব্যের যৌক্তিকতা তো আছেই, ইহা ছাড়া এ দেশের জাতীয়তার সম্বন্ধে তিনি যে সব কথা বলিয়াছেন, সেগুলিরও স্থায়ী মূল্য রহিয়াছে। পুস্তকখানি পাঠ করিলে বাঙালী মাত্রেই ভারতের মুসলমানসমাজই শুধু নহেন, পরন্তু পাকিস্থানের মুসলমানেরাও বিশেষভাবে উপকৃত হইবেন। কারণ দেশ বিভক্ত হইলেও পূর্ববঙ্গে বাঙালী মুসলমান সমাজের ভাষা অন্তত এখন পর্যন্ত বাঙলাই রহিয়াছে এবং ঐতিহ্যের দিক হইতে তাঁহারা বাঙালীই আছেন। ফলতঃ শাসনতান্ত্রিক হুকুমনামার জোরে সে ঐতিহ্যকে উড়াইয়া দেওয়া যায় না, পরন্তু তেমন চেষ্টা করিতে গেলে জাতির সর্বনাশই সাধিত হয়। "বঙ্গের জলবায়ু শস্যে প্রতিপালিত বাঙালী মুসলিম কি বঙ্কিমচন্দ্রের মহান্ আদর্শকে ত্যাগ করিতে চান? মেরুদণ্ডহীন না হইলে নহে" পুস্তকের ভূমিকায় মনীষী স্যার যদুনাথ এই প্রশ্ন করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মুসলমান সমাজ বহু পূর্বে এই প্রশ্নের সমাধান করিয়াছেন; কিন্তু পূর্ববঙ্গের এই প্রশ্ন বর্তমানে বিশেষ গুরুত্ব লইয়া উপস্থিত হইয়াছে। রেজাউল করীম সাহেবের পুস্তকখানি সেই প্রশ্নের সুষ্ঠু সমাধানে চিন্তাশীলতা জাগ্রত করিবে। এমন পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

অনুবাদ সাহিত্য

অপমানিতা—মোপাসাঁ। অনুবাদক—রমেন চৌধুরী। প্রকাশক—বি সেন য়্যাণ্ড কোং, জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা—১২। দাম—দুই টাকা।

মোপাসাঁ মূলত ছোটগল্প লেখক। এবং খ্যাতিও তাঁর প্রধানত এই কারণেই। কিন্তু বাঙালী পাঠক যেহেতু ভালো গল্পগ্রন্থের রস আস্বাদনের চেয়ে অপাঠ্য উপন্যাস গলাধঃকরণেই বেশি আগ্রহী—প্রকাশকরাও সেই কারণেই মুনাফার বাঁধা সড়ক বেছে নেন। এমতাবস্থায় 'অপমানিতা'র প্রকাশ স্বভাবতই অভিনন্দনযোগ্য।

'অপমানিতা' মোপাসাঁর সাতটি অনূদিত গল্পের সংকলন। অনুবাদ আক্ষরিক নয়, অনুবাদের ক্ষেত্রে অনিবার্য প্রয়োজনীয় স্বাধীনতাটুকু অনুবাদক নিয়েছেন এবং সে-স্বাধীনতার সদ্ব্যবহার সর্বত্র পুরোপুরি করতে না পারলেও কাহিনীর মূলে আবেদনটি অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছেন। তবে তাঁর নির্বাচনের প্রশংসা মুক্ত মনে করতে পারছিনে। 'বর-পণ' বা 'সত্যকাম'-এর চেয়েও উৎকৃষ্ট এবং এখনো বাংলায় অ-অনূদিত বহু গল্প মোপাসাঁর রয়েছে।

প্রচ্ছদ ও গল্পের শিরোনামাগুলি সুন্দর। অন্যান্য—মন্দ নয়।

৪৯৩।৫৪

প্রাপ্তি স্বীকার

নির্ম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

সঞ্চারিণী—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

জোয়ারের বেলা—গোপাল হালদার।

শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র—গোপালচন্দ্র রায়।

Where are We Going?—J. B. Kripalani.

বঙ্কিম বাণী—বিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য।

প্রজ্ঞার আলো—ডাঃ মহেন্দ্রনাথ সরকার।

প্রতিমার প্রাণপ্রতিষ্ঠা—শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী।

Our Patriots of Wax Iron and Clay—J. N. Lahiri.

শ্রীমদ্ভগবদগীতা—অধরচন্দ্র চক্রবর্তী।

প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীরমেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী।

শুক্ল যজুর্বেদীয়া ঈশাবাক্যোপনিষদ্ ও ক্ষেপাজী তারানাথ ব্রহ্মচারী বাবার উপদেশাবলী—ডাঃ অভয়পদ চট্টোপাধ্যায়।

দীঘ নিকায় (৩য় খণ্ড)—ভিক্ষু শীলভদ্র।

আত্মস্মৃতি—শ্রীসজনীকান্ত দাস।

বৃষ্টি এল—প্রেমেন্দ্র মিত্র।

রাণী রাসমণি—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।

দক্ষিণেশ্বর মন্দির (শতবার্ষিকী সংখ্যা)—শ্রীগোপালচন্দ্র রায়।

Eastern Interlure—R. Pearson.

মুস্কিল আসান—রাজেশ্বর ভট্টাচার্য।

আধুনিক বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা—কল্যাণনাথ দত্ত।

তাস—সৈয়দ শামসুল হক।

নির্ঝর সংগীত—প্রোজ্জ্বল নীহার ভারতী।

ক্যাপটেনের মেয়ে—পুশকিন; অনুবাদক—ত্রৈলোক্য বিশ্বাস।

ক্যারি অন জীভস্—পি জি ওডহাউস; অনুবাদক—শ্রীমণীন্দ্র দাশগুপ্ত।

নতুন জীবন—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যায় প্রকাশিত শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির দ্বিতীয় ছত্র এইরূপ হইবে—ক্ষতি তার ক্ষতি নয় মৃত্যুর শাসনে। মুদ্রাকরপ্রমাদে অন্যরূপ ছাপা হইয়াছে। এবিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যে পত্র আসিয়াছে, তাহা আলোচনা বিভাগে মুদ্রিত হইল। **—সম্পাদক,** দেশ

মন্ত্রের সাধন

স্বামী ও স্ত্রীর প্রকৃত সম্পর্ক নির্দেশে অনুরূপা দেবী রচিত "মন্ত্রশক্তি"র মতো জোরালো কাহিনী কমই আছে। সাহিত্যক্ষেত্রে একটা অনবদ্য সৃষ্টি বলে প্রখ্যাতই শুধু নয়, অতি জনপ্রিয়ও। এ থেকে মঞ্চে একটি অতি জনপ্রিয় নাটকও পরিবেশিত হয়েছে এবং সঙ্গে একখানি ছবিও তৈরী হয়েছে। "মন্ত্রশক্তি"র আবেদন সাধারণ সামাজিক কাহিনী থেকে পৃথক; এর আবেদনটা আধ্যাত্মিক দিক নিয়ে। বিয়ের মন্ত্র, এ-মন্ত্র স্বামীর প্রতি স্ত্রীর এবং স্ত্রীর প্রতি স্বামীর অধিকার ও কর্তব্য নির্ণয় করে দেয়। যে-শাস্ত্র আচারনিষ্ঠ ধর্মপ্রাণ মানুষকেও যেমন, তেমনি অনাচারী পাষণ্ডের মনের ওপরেও একটা সম্মোহনী মন্ত্রের কাজ করে। যার উচ্চারণ মাত্রই স্ত্রীর কাছে স্বামী সম্পর্কে এবং স্বামীর কাছে স্ত্রী সম্পর্কে কর্তব্যবোধ জাগিয়ে তুলে পরস্পরের প্রতি আকর্ষণের সৃষ্টি করে দেয়। এ চিত্র-কাহিনীতে শাস্ত্রের নির্দেশ ও অনুশাসনটাই মানুষের কাছে সবচেয়ে বড়ো কথা, তাই এখানে হৃদয়ের আবেগটা হচ্ছে পরের কথা। এখানে আগে হচ্ছে শাস্ত্র, পরে মানুষ। অন্ধ গোঁড়ামী বলেই কেউ আখ্যাত করুক, আর অন্যায় বিধিনিষেধই বলুক, শাস্ত্রের মন্ত্রই যে মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার সবচেয়ে প্রকৃষ্ট অবলম্বন, এই প্রতিপাদ্যই হচ্ছে "মন্ত্রশক্তি"র অন্তরের বাণী।

* * *

গল্পের আরম্ভ রায়নগরের চতুষ্পাঠী থেকে। শিরোমনি মারা যাবার সময় আচার্য-পদ দিয়ে গেলেন অম্বরনাথের ওপর। টোলের ছাত্ররা তাকে স্বীকার করে নিতে রাজী না হয়ে জমিদারের কাছে নালিশ জানালে। জমিদার রমাবল্লভ কিন্তু এ ব্যাপারে অক্ষম, কারণ তাঁর পিতৃদেবের উইল অনুসারে চতুষ্পাঠীর আচার্য বা তাঁর গৃহদেবতা রাধাবল্লভের পূজারী নির্বাচনের ভার কেবল শিরোমনি মহাশয়ের ওপরে। শিরোমনি মহাশয় মৃত্যুকালে অম্বরকেই উভয় পদেই বসিয়ে দিয়ে গেছেন। জমিদার-কন্যা বাণী রাধাবল্লভগতপ্রাণা।

—শৌভিক—

ঠাকুরের সেবাতেই সে নিমগ্না। রমাবল্লভ ইদানীং বাণীর বিবাহের জন্য বিশেষ চিন্তিত, কারণ তাঁর পিতৃদেবের উইল-মতো একটা নির্দিষ্ট তারিখের মধ্যে কোন নিকষ কুলীন ব্রাহ্মণ পাত্রের সঙ্গে বাণীর বিবাহ না দিতে পারলে সমস্ত জমিদারী যাবে ভাগিনেয় মৃগাঙ্কের হাতে। মৃগাঙ্ক দুশ্চরিত্র, মদ্যপ যুবক। ইয়ার-বন্ধু নিয়ে বাড়িতে বসেই মদ খায়, বাঈজী নাচায়। বিবাহ করলেও সে আলাদা ঘরে শোয়। কোন উপায় না দেখে রমাবল্লভ মৃগাঙ্ককেই ডেকে পাঠালেন জরুরী তার দিয়ে। মৃগাঙ্ক লোভী নয়; নিজে সে বিবাহিত, তাছাড়া যাকে বোন বলে জানে, তাকে বিয়ে করার কথাও ভাবতে পারে না সে। এদিকে বাণীও কোন মানুষকেই বিয়ে করতে রাজী নয়; রাধাবল্লভকেই সে স্বামীত্বে বরণ ক'রে রেখেছে অনেককাল ধরেই। কিন্তু বিবাহ না হলে বাপ-মাকে পথে গিয়ে দাঁড়াতে হয়, এই কথা ভেবেই বাণী বিবাহে সম্মতা হলো।

* * *

অম্বরনাথ রাধাবল্লভের পূজো করতে আসে, কিন্তু কেমন যেন অন্যমনস্কভাব; বাণীর নিষ্ঠা ও ভক্তির দিকে চেয়ে তন্ময় হয়ে থাকে। বাণী তাতে কুপিতা হয়, একদিন শূদ্রের হাতের জবাফুল নিয়ে পূজোর জন্যে মন্দিরে এসে দাঁড়াতেই বাণী তাকে লাঞ্ছনা করে বিতাড়িত করলে। এর পর অম্বরনাথ আচার্য-পদেরও ইস্তফা-পত্র দিয়ে এলো রমাবল্লভের হাতে। রাস্তায় মৃগাঙ্কর সঙ্গে তার দেখা। ছোট বয়সে ওরা একসঙ্গে কাশীতে অধ্যয়ন করতো। অম্বর পরদিন রায়নগর ছেড়ে চলে যাবে শুনে মৃগাঙ্ক তাকে একটা দিনের জন্য অপেক্ষা করার অনুরোধ করলে। মামা-মামীর কাছে মৃগাঙ্ক অম্বরের সঙ্গে বাণীর বিয়ের প্রস্তাব করলে। রমাবল্লভের আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো নিঃস্ব এক টোলের অধ্যাপকের হাতে তাঁর একমাত্র কন্যাকে অর্পণ করে দিতে; কিন্তু উপায়ও আর ছিল না, কারণ আর মাত্র কয়েকদিনের মধ্যে বাণীর বিয়ে দিতে না পারলে পিতার উইল অনুসারে তাঁকে পথের ভিখারী হতে হয়। বাণীরও আত্মসম্মানে আঘাত লাগলো, কিন্তু সে-ও বাপ-মার কথা ভেবে সম্মতি দিলে, কিন্তু

মন্দিরে রাধাবল্লভের সামনে অম্বরকে দিয়ে বাণী শপথ করিয়ে নিলে যে, বিয়ের পর তাদের কোন সম্বন্ধই থাকবে না; অম্বর দূরে সরে থাকবে এবং কেউ কারুর খোঁজ পর্যন্ত রাখবে না। যথারীতি বিয়ে হয়ে গেল। ওদের বিয়ের সময়ে উচ্চারিত মন্ত্র সবচেয়ে প্রভাবিত করলে মৃগাঙ্কর মনকে। একটা নতুন আলো যেন দেখতে পেলে সে। বাড়ি ফিরলো সে এক নতুন মানুষ হয়ে; স্ত্রীর প্রতি তার কর্তব্য বিষয়ে চেতনা নিয়ে।

* * *

ফুলশয্যার পরদিনই অম্বরনাথ রায়-নগর ত্যাগ করে চলে গেল। আসামের নানাস্থানে ঘুরে অম্বর সংস্কৃত টোল প্রতিষ্ঠা ও শিক্ষা-প্রচারে আত্মনিয়োগ করলে। কাগজে তার প্রশংসা বের হলো। রমাবল্লভ তা পড়লেন; জামাতার জন্য তাঁর মনটা আকুল হয়ে উঠলো। বাণীও পড়লে সে খবর, তারও মনটা উদাস। এমনভাবে অম্বর সর্বস্ব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখে অক্ষরে অক্ষরে শপথ পালন করলে, এতোটা বাণী ভাবতে পারেনি। ইদানীং কোন কিছুতেই তার মন নেই, এমন কি রাধাবল্লভেরও যত্নে ত্রুটির অন্ত থাকে না। মাঝে মাঝে বিয়ের মন্ত্রের কথাটা তার মনে পড়ে যায়, সেই সংগে অম্বরের শপথের কথাটাও। এই শপথের কথাটা রমাবল্লভও জানেন, জানেন না শুধু বাণীর মা। উতলা হয়ে তিনি প্রশ্ন করেন, কিন্তু জবাব পান না। শপথের কথা ভুলে গিয়ে বাণী এক একবার চিঠি লিখতে যায় অম্বরকে, কিন্তু মনে পড়তেই টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে দেয়। বাণীর মা অসুখে পড়লেন, অম্বরনাথকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিলেন তিনি, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আর হলো না, তিনি মারা গেলেন। অম্বরের মনে হলো সে নতুন করে মা-হারা হলো। পিতা ও পুত্রীর জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। তীর্থ-ভ্রমণে বের হয়ে ওরা গেল চন্দ্রনাথে। সাধুর কাছে যুক্তি নিলে বাণী—দেবতাকে অর্পিত জিনিস মানুষকে দেওয়া যায় কি না। বাণী জানলে, মানুষের মাধ্যমেই দেবতা তার সেবা গ্রহণ করেন। ফেরবার পথে অম্বরের সংগে দেখা হলো মাঝে এক স্টেশনে। রমাবল্লভ এক অছিলায় ওদের দুজনকে কামরায় একা রেখে অন্য কামরায় গিয়ে উঠলেন। দীর্ঘপথ দুজনের মুখে কোন কথা নেই। বাণীর চোখ জলে ভরে ওঠে, লুটিয়ে পড়তে চায় হয়তো অম্বরের পায়ে, কিন্তু সংকোচ বাধা হয়ে দাঁড়ায়, এক সময় অম্বর কামরা থেকে নেমে চলে যায়।

* * *

নিজের আশ্রমে ফিরে অম্বর অস্থির হয়ে ওঠে। অসুখে পড়ে অম্বর। সেই মুহূর্তে চিঠি এলো বাণীর—বাণী আসবে বলে লিখেছে। দারুণ দুর্যোগ মাথায় নিয়ে অম্বর বেরিয়ে পড়লো। ওদিকে মৃগাঙ্ককে নিয়ে রমাবল্লভ ও বাণী আসামে যাবার জন্য শিয়ালদহ স্টেশনে উপস্থিত। একটা গোলমাল কানে এলো; শুনলে, কোন এক অচৈতন্য যুবককে পাওয়া গিয়েছে থার্ড ক্লাস কামরায়। স্ট্রেচারে বাহিত মূর্তিটি সামনে দিয়ে যেতেই বাণী ছুটে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো—এতদিনে সে পেয়েছে তার হৃদয়বল্লভকে। মৃগাঙ্কর বাড়িতে নিয়ে আসা হলো অম্বরকে। যমের সংগে লড়াই করে বাণী তা[র] স্বামীকে বাঁচিয়ে তুললে। বিবাহে[র] মন্ত্রোচ্চারণ এতদিনে সার্থক হ'ল।

* * *

গল্পের জোর বলতে "মন্ত্রশক্তি"[র] মতো উপাদানের চেয়ে আর বেশী কি আশ[া] করা যায়! কিন্তু বিন্যাসটা হয়েছে অত্যন্ত চড়া পর্দা ধরে, যার ফলে মন্ত্রে[র] অন্তর্নিহিত বাণীটা মধুর মনোময় হ[য়ে] প্রতিভাত হবার বদলে এসে পড়েছে রুদ্রে[র] ঝাঁপ নিয়ে, যেন দাপট দেখিয়ে মনকে বশীভূত করার চেষ্টা—মহিমার স্পর্শে জা[গ্রত] করার চেষ্টা নয়। গল্পটি ফুটিয়ে তোলা[র] সূক্ষ্ম শিল্পকারিতা প্রকাশের যথেষ্ট সুযোগ থাকলেও সেদিকে বিশেষ কোন চেষ্টা না করে সহজ নাটকীয় গতি ধ[রে] গল্পটাই বলে যাওয়া হয়েছে। বিষয়বস্তুর সংগে খাপ খাবার মতো একটা গাম্ভীর্য পাওয়া যায় ছবিখানির সর্বাংগে, একমা[ত্র] মৃগাঙ্কর প্রথম পরিচক সূত্রে বাঈজী[র] নাচটুকু ছাড়া। বিশ্রী একটা রুচির পরি[চয়] পাওয়া যায় অধিকাংশ বাঙলা ছবি[র] পরিচালকের ক্ষেত্রে। এমনিধারা কো[ন] দৃশ্যের সুযোগ পেলেই তাঁরা মাত্রা না ছাড়িয়ে থাকতে পারেন না। বাঈজীর নাচে কুৎসিত ভংগীর নিতম্ব-দোলন কিছু কম করে দেখালে মৃগাঙ্কের দুরাচারিত্বের পরিচয় কিছু কমে যেতো না। এছাড়া ছবিখানিতে স্থানে স্থানে নাটকীয় দুর্বলতা ফুটলেও নিন্দার্হ কিছু কোন দৃশ্যে নেই। পরিবেশাদির দিক থেকে ছবির চেহারাটি কাহিনীর ভাবোপযুক্ত হয়েছে। আংগিক পারিপাট্যের দিক থেকেও ছবিখানি সাধারণ বাঙলা ছবির তুলনায় উঁচু-স্তরের। তবে সম্ভবত অতি-জোরালো প্রক্ষেপণের ফলে শব্দ ও আলো দুই-ই বড়ো ঝাঁঝালো মনে হয়েছে, অনেক জায়গায় ঝাঁঝের চোটে কথাই বুঝতে কষ্ট হয়েছে। খুঁতখুঁতে মনে নগণ্য হলেও ছোটখাটো ত্রুটি চোখে খটকা লাগিয়ে দেয়। যেমন—সাজপোশাক আসবাব প্রায় সব কিছুর চেহারার মধ্যে গত শতাব্দীর ছাপ ফুটে উঠেছে, অথচ রমাবল্লভের চোখে একেবারে হাল-আমলের টরটয়েজ-শেল চশমার ছন্দোপাত। কে

…টিই বা থাকতে দেওয়া হবে? এ যদি …খা যেতো যে, কোন কিছুর মধ্যে কোন …দিষ্ট কালের ছাপ নেই, তাহলে পাঁচ- …শেলী চেহারায় অনেক জিনিসই …নাতো। তাছাড়া, এ যা গল্প—সেই …ষ্পাঠী আমলের পটভূমিকা না রাখলে …বেদনটা এখনকার মনে ধরতো কি না …দেহ।

* * *

…দর্শক-মনকে অভিভূত করে দেবার …তা নাটকীয় মুহূর্ত গড়ে তোলার …তিত্ব দেখিয়েছেন পরিচালক চিত্ত বসু। …কাজে তিনি বিশেষ জোর পেয়েছেন …বর ও বাণীর ভূমিকায় উত্তমকুমার ও …ধ্যারাণীর অভিনয় থেকে। শান্ত, …নিরভিমান যুবক এমনিই অম্বর- …যেন কাহিনীর সঙ্গে মিলে যায়। …নার তাঁর অভিনয়-প্রতিভার আর …টি অতি বিশিষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় …টিয়ে তুলেছেন। প্রথমে দাম্ভিকা, …র অনুশোচনাদগ্ধা অথচ চাপা এবং …যে অভিমানক্ষুব্ধা এবং অম্বরের পায়ে …জেকে লুটিয়ে দেবার জন্য উতলা …ণীর চরিত্রটি সন্ধ্যারাণীর অভিনয়ে …র্ণ হয়েছে। বেল ফুল নিয়ে দেরীতে …জোয় আসার জন্য বাণীর ভর্ৎসনা; …য়ের আগে একান্তে মন্দিরে দুজনের …ক্ষাৎ এবং বিয়ের পর পরস্পর …রস্পরকে ছেড়ে সরে থাকার শপথ …গ্রহণ; ফুলশয্যার রাতে উষার অপেক্ষায় …দের দুজনের বিনিদ্র রজনী যাপন; …রদিন অম্বরের নিঃসঙ্গ চলে যাওয়া; …ন্দ্রনাথ থেকে ফেরবার পথে চন্দ্রনাথের …সঙ্গে দেখা এবং একটি কামরায় থেকেও …পরস্পরের প্রতি অভিমান এবং শপথের …কথা স্মরণ করে নিস্পৃহ বসে দীর্ঘকাল …সময় কাটানো; আসামের টোলে অন্বরের …অসুস্থ হয়ে পড়া এবং দারুণ দুর্যোগের …মধ্যে গৃহত্যাগ করা প্রভৃতি দৃশ্যগুলি …স্বতঃই আবেগকে উচ্ছ্বলিত করে …তোলে। তবে শেষাংশে শিয়ালদহ স্টেশনে …স্ট্রেচারবাহিত অম্বরকে দেখে বাণীর …ঝাঁপিয়ে পড়ার দৃশ্যটি চেঁচিয়ে মাৎ …করার মতো ব্যাপার; ওটা নাটকীয় …প্রয়োজন মিটিয়েছে, বাস্তবের দিক …থেকেও অস্বাভাবিক নয় এবং বুকের মধ্যে …আলোড়ন সৃষ্টির কাজেও সফল হয়েছে, কিন্তু সূক্ষ্ম শিল্পসৌন্দর্যের পরিচয় নেই।

* * *

ক্ষমতাবান শিল্পীদের যোগাযোগে অভিনয়ের দিকটা এমনিতেও একটা স্ট্যাণ্ডার্ড রক্ষা করে গিয়েছে। রমা-বল্লভের চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী ও তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণপ্রিয়ার চরিত্রে মলিনা দেবী থাকায় ছবির সামগ্রিক অভিনয় জোরালো হয়ে উঠতে পেরেছে। মৃগাঙ্কের চরিত্রে অসিতবরণ একটু বেশী সহজ হয়ে পড়েছেন, তবুও জমিয়েছেন ভালো। স্ত্রী অব্জাকে নিয়ে ওর ফর্স্টিনস্টি লোকে বেশ উপভোগ করবে। অব্জার ভূমিকায় অনুভা গুপ্তা আড়ষ্টও বটে, আর ওর করবারও বিশেষ কিছু নেই। অম্বরের এক সতীর্থের চরিত্রে শান্তি ভট্টাচার্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের লক্ষণ প্রকাশ করেছেন। বাণীর সই তুলসীর চরিত্রটি খাপছাড়া, তবুও মঞ্জু দে থাকায় দৃষ্টিতে পড়ে এবং বাণীকে উদ্বুদ্ধ করার কাজের জন্য চরিত্রটির প্রয়োজন উপলব্ধি হয়। চতুষ্পাঠীতে অম্বরের বিরোধী দলের নায়ক চরিত্রে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ নৈপুণ্য ফোটাবার কিছুই নেই। তেমনি মৃগাঙ্কের ভৃত্য মথুরোর চরিত্রটি জহর গাঙ্গুলী আছেন বলেই দর্শক মন কৌতূহলী হয়, কিন্তু তার আবির্ভাব যৎসামান্য। অবশ্য এ চরিত্রটি মূল গ্রন্থের নয়, নাটকের সৃষ্টি। অন্যান্য চরিত্রে আর শিল্পীদের মধ্যে রবি রায়, সন্তোষ সিংহ, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, ভূপেন চক্রবর্তী, শিবকালী চট্টোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর, অজিত চট্টোপাধ্যায়, প্রীতি মজুমদার, ঋষি বন্দ্যোপাধ্যায়, রাণীবালা প্রভৃতি।

* * *

সঙ্গীতের দিক থেকে মৌলিকত্ব প্রকাশের যোগ ছিল। সে জায়গায় আগাগোড়া পাশ্চাত্ত্য ধাঁচের আবহ-সঙ্গীত নাটকের প্রয়োজন কোন রকমে আওয়াজের জোরে মেটানো ছাড়া কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারে নি। বরং নাটকীয় সংঘাত মুহূর্তে সম্মিলিত যন্ত্রবাদ্যের আকস্মিক বিকট ঝণাৎকার বিরক্তিরই উৎপাদন করে। রাধাবল্লভের মন্দিরে কীর্তন পরিবেশনের অবকাশ ছিল; তাও বিফলে যেতে দেওয়া হয়েছে। খান পাঁচেক গান আছে এবং শুনতে ভালো। ছবির কলাকুশলীদের মধ্যে আছেন চিত্রনাট্য রচনায় মণি বর্মণ, আলোক-চিত্র গ্রহণে ধীরেন দে, শব্দ-যোজনায় নৃপেন পাল, সুর যোজনায় উমাপতি শীল, শিল্প নির্দেশে কার্তিক বসু ও নৃত্য পরিকল্পনায় পিটার গোমেজ।

একান্নবর্তী পরিবারের স্বরূপ

একান্নবর্তী পরিবারে নানা মানুষের নানা মানসিক গতি সুখ ও শান্তি জায়গায় জায়গায় যে কি অনর্থ নিয়ে আসে তারই গল্প "ভাঙাগড়া"। প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর 'বিজিতা' থেকে নেওয়া আখ্যান বস্তু। তবে ছবিতে সাজানো গল্পটার ক্ষেত্রে ও নামটা সাজে না, কারণ 'বিজিতা' বলতে লক্ষ্য হয় একটি চরিত্র, এখানে তা নেই। ছবিতে যে গল্প এবং যেভাবে বলা হয়েছে তাতে "ভাঙাগড়া"

নামই ঠিক। ছবিতে যে গল্প পাওয়া যায় সেটা মনে হয় যেন "প্রফুল্ল"-ই একটু অন্যভাবে ঘুরিয়ে বলা হয়েছে। সবই প্রায় একই ব্যাপার এবং একই রকমের চরিত্র! সেই পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা বড় ভাই যোগেশ, সেই কুচক্রী স্বার্থপর রমেশ, সেই মাতাল সুরেশ, সেই কাঙালীচরণের মতো দুর্বৃত্ত, সবই—। কেবল এখানে ঘটনার উপলক্ষ্য আলাদা এবং ঘটনাস্থল একই পরিবারের মধ্যে নিবদ্ধ না রেখে আরও চারিয়ে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে ব্যক্ত করা। মূলত কাঠামোটা একই। তবে এ কাহিনীটিও আবেগের সঞ্চারণে কিছু কম শক্তিশালী নয়।

* * *

ষোল বছর বয়সের যোগীন্দ্রনাথ পিতার মৃত্যুর সময়ে ছোট ভাই তিনটিকে মানুষ করার এবং বাস্তু ভিটে দেনার দায় থেকে রক্ষা করার শপথ গ্রহণ করলে। তিনটি ভাই নৃপেন, রমেন ও শৈলেন এবং বিধবা পিসীমাকে নিয়ে যোগীন্দ্র সংসার পথে যাত্রা শুরু করলে। পিতৃবন্ধু এটর্নী জগবন্ধুর কাছে বাড়িটি বাঁধা ছিল। যোগীন্দ্র তার কাছে গেল সময় চাইতে। সহৃদয় জগবন্ধু সময় তো দিলেনই এমন কি যোগীন্দ্রনাথ যাতে ব্যবসার সুযোগ পায় তারও ব্যবস্থা করে দিলেন। যোগীন্দ্র প্রথমে নিজের কাঁধেই কম্বলের বোঝা চাপিয়ে ফিরি করা শুরু করলে; ক্রমে হলো ছোট্ট দোকান এবং কালক্রমে সেটা এক বিরাট ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হলো। ইতিমধ্যে যোগীন্দ্র একবার বিবাহ করেছে, কিন্তু স্ত্রী একটি শিশু পুত্র রেখে মারা গিয়েছে। পিসীমার জিদে এবং শিশু-পুত্রের কথা ভেবে যোগীন্দ্র আবার দার পরিগ্রহ করলে। বধূ সুষমা সংসারটি মাথায় তুলে নিলে। পাঁচ বছর বয়েসের বিধবা বোন প্রতিভাকে সে কাছে এনে রাখলে। আরও কয়েক বছর পার হয়ে গেল। যোগীন্দ্রর ব্যবসায়ে আরও উন্নতি হচ্ছে। নৃপেন এম-এ পড়ছে, রমেন ডাক্তারি আর শৈলেন নেহাটীতে থেকেই কলেজে পড়ে, প্রতিভার সঙ্গে তার দিনরাত খুন-সুটি। সংসারের লক্ষ্মী কল্যাণময়ী হয়ে আছে সুষমা। গ্র্যাজুয়েট হলেও পাছে অশিক্ষিত স্বামীর কোন সংকোচ বোধ হয় তাই সেটা সে গোপন করে রেখেছে। জানে কেবল শৈলেন। সুন্দর আদর্শ সুখী পরিবার।

* * *

দুর্যোগের দিন আরম্ভ হলো ভায়েদের বিয়ে দেওয়ার পর থেকে। নৃপেনের সঙ্গে বিয়ে হলো পিতৃবন্ধু জগবন্ধুর গ্র্যাজুয়েট কন্যা সুলতার। রমেনের সঙ্গে বিয়ে হলো যোগীন্দ্রর এক গুণগ্রাহীর কন্যা পূর্ণিমার। একই দিনে দুটি বধূ ঘরে এলো। বধূবেশে গৃহপ্রবেশ করার সময়ই কিন্তু পূর্ণিমার কানে গেলো একটা কথা বালবিধবা প্রতিভা সম্পর্কে। ফুলশয্যার রাতেই মুখরা পূর্ণিমা তাই নিয়ে ঝগড়া করলে রমেনের সঙ্গে। বিধবা প্রতিভা কিন্তু কুমারী মেয়ের মতো তার পরিচ্ছদ আর বধূ বরণে তাকে শাঁখ বাজাতে দিয়ে মহা অমঙ্গলের কান্ড করা হয়েছে। নববধূর প্রথম মুখ খুলতেই এই অভিযোগ ও কটূক্তি রমেন সইতে পারলে না। ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। প্রতিভাকে উপলক্ষ্য করে পূর্ণিমা দুর্যোগ বেশ ঘনিয়ে তুললে। মুখে তার আটকায় না কিছু। এমন কি যোগীন্দ্র বা সুষমা সম্পর্কেও বক্র মন্তব্য করতে সে ছাড়ে না। পূর্ণিমা সুলতার কান ভারি করে তুলতে লাগলো। প্রথম প্রথম সুলতা পূর্ণিমার কথায় বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হলো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূর্ণিমা তারও মনে বিষ ছড়াতে সক্ষম হলো। পূর্ণিমা যাবে কলকাতায় বাপের বাড়ি, শৈলেনের পৌঁছে দিয়ে আসার কথা। কিন্তু শৈলেন বাগে মাছ ধরায়, সে স্পষ্ট তার আগরপাড়ায় যাবার কথা জানিয়ে দিলে। রুষ্টা সুলতা এলো সুষমার কাছে। কথায় কথায় কথা বাড়লো। শৈলেন ও প্রতিভাকে নিয়ে একটা ইঙ্গিত করলে প্রতিভা—বিধবা মেয়ের কুমারী বেশ কেন, কেনই বা সাজের ঘটা। প্রতিভা কাছেই ছিল রুদ্ধ আবেগে ছুটে বেরিয়ে গেলো সে সেই রাত্রে। যাবার সময় প্রতিভাকে বিধবা বেশে দেখে সুষমার বুকটা হাহাকার করে উঠলো। সংসারের ভাঙন শুরু হলো।

* * *

বিক্ষুব্ধ শৈলেন সুলতাকে কলকাতায় পৌঁছে দিয়ে এলো। সুলতা

বাবা তখন কাশীতে। দাদা বীরেন এটর্নী হয়ে কারবার দেখছে। শ্বশুর-বাড়িতে সুলতার অপমান হয়েছে এমন একটা ধারণা বাগিয়ে ধরে যোগীন্দ্রকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ায় তৎপর হয়ে উঠলো। যোগীন্দ্র কিছুদিন হলো ব্যবসার ভার ছেড়ে দিয়েছে নৃপেন ও রমেনের ওপর। রমেন পূর্ণিমার মুখে দাদা বৌদি সম্পর্কে অবমাননাকর মন্তব্য শুনে কলকাতায় এসে রয়েছে; মদও ধরেছে। ব্যবসা দেখে নৃপেন। এই সুযোগটা নিলে বীরেন। সংসারে অশান্তি বেশী পাকিয়ে ওঠার আগেই যোগীন্দ্র বাড়ি পার্টিশান করে সুষমা, শৈলেন আর পিসীমাকে নিয়ে তার সাবেকী বাস্তুতে গিয়ে বাস করতে লাগলো। বীরেন চক্রান্ত বেশ পাকিয়ে তুললে। দাদার সামনে গিয়ে দাঁড়াবার একটা সংকোচ ছিল নৃপেনের, তাছাড়া ব্যবসা দেখাশোনার পুরো ভারও সে বীরেনের ওপরে ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিল। এই সুযোগে বীরেন যোগীন্দ্রর কোম্পানীকে ফেল করে দিলে। সর্বস্বান্ত যোগীন্দ্র সুষমার গয়না বেচে দেনামুক্ত হলো কোন খাতিরই তার বাজারে রইল না; আবার ব্যবসা করে পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা ব্যর্থ হলো তার। শেষে স্ত্রী পুত্রকে খাওয়াবার জন্য একটা দোকানে চাকরি নিলে। বীরেনের কারসাজিতে এতো সব কান্ড নৃপেনের গোচরেই আসেনি। রমেন নিরুদ্দেশ; শৈলেন চাকরি নিয়ে চলে গেছে মাদ্রাজ; প্রতিভাকে তার ভাসুর এসে নিয়ে গিয়েছে। সে সংসারে প্রতিভার লাঞ্ছনার অন্ত রইল না। ওকে নেহাৎ অপমৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখলে ভাসুরপো, যাত্রার দলের অর্জুন।

* * *

বীরেন চক্রান্ত করে নৈহাটীর বাড়িটি পুরো দখল করে নিলে। যে পূর্ণিমা বিষ ছড়িয়েছিল তাকেই অপমানিতা হয়ে চলে আসতে হলো বাপের কাছে। যোগীন্দ্রকে একদিন অচৈতন্য অবস্থায় দোকানের লোক বাড়ি পৌঁছে দিয়ে গেল। মরণাপন্ন অবস্থা তার, কিন্তু চিকিৎসার পয়সা নেই সুষমার হাতে। বালক পুত্র অমিয়কে কলকাতায় পাঠিয়েছিল নৃপেনদের খোঁজ নেবার জন্য, কিন্তু বীরেন তাদের পাত্তা জানালে না। পুরাতন ভৃত্য কেষ্ট কোন উপায়ে শৈলেনের কাছে টেলিগ্রাম পাঠালে। প্রতিভার কাছেও টেলিগ্রাম গেলো। ওদিক থেকে নিজের ভুল বুঝতে পেরে পূর্ণিমা এসে উপস্থিত হলো এবং সমস্ত গয়না উজাড় করে দিলে ভাসুরের চিকিৎসার জন্য। প্রতিভা এসে উপস্থিত হলো। মাদ্রাজ থেকে শৈলেন চলে এলো এবং বীরেনের স্ত্রীর কাছ থেকে নৃপেনের ঠিকানা জোগাড় করে হাজির হলো ওদের কাছে। নৃপেন ও সুলতা দাদার অসুখের কথা জানতে পারেনি বীরেনের বদ মতলবে। সুলতার বাবাও এসে হাজির হলেন কাশী থেকে। বীরেন ধরা পড়ে গেল। সবাই গিয়ে উপস্থিত হলো যোগীন্দ্রর বাড়িতে। একে একে সকলেই ক্ষমা চেয়ে নিলে যোগীন্দ্রর কাছ থেকে। কিন্তু শত

চেষ্টাতেও যোগীন্দ্রকে বাঁচান গেল না। রমেন ফিরলো বিদেশ থেকে অনেক টাকা রোজগার করে; শৈলেনের সেদিন বিয়ে। বৌদিকে বিধবা বেশে দেখে ভেঙে পড়লো সে। তবুও এই সান্ত্বনা রইলো যে, যোগীন্দ্রের মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে ভাঙা সংসার আবার জোড়া লাগলো।

* * *

একটানা কমা, সেমিকোলান, দাঁড়ি বাদ দেওয়া গল্প। আরম্ভ থেকেই আবেগের প্রবাহ গড়িয়ে গিয়েছে শেষ দৃশ্যটি পর্যন্ত কিন্তু ঘটনাবলী একটার পর একটা এমন হুড়মুড় করে ঘাড়ে এসে পড়ে যে, অনেক ক্ষেত্রে কালক্ষেপের লক্ষণ বুঝতে সময় লেগে যায়। পুরনো ঢংয়ের ঘরোয়া গল্প এবং পুরনো ঢংয়েরই বিন্যাস, কিন্তু একটা নাট্যরেশ সর্বক্ষণই অনুভব করা যায়। দুর্যোগের দৃশ্যে কাহিনীর আরম্ভ, মরণোন্মুখ পিতার কাছে যোগীন্দ্রের শপথ গ্রহণ। তারপর বালক যোগীন্দ্রের নিজের পায়ে দাঁড়াবার জন্য চেষ্টা—ফিরি করা থেকে আরম্ভ করে ক্রমে বিরাট ব্যবসা গড়ে তোলার ব্যাপারটি অতি তাড়াহুড়োর মধ্যে সেরে দেওয়া হলেও আদর্শ হিসেবে ভালো। এই দ্রুততার ভাব সর্বঘটনাতেই। যার ফলে দু একটি ছাড়া অধিকাংশ চরিত্রেরই ধারাটা এলোপাতাড়ি হয়ে পড়েছে। সুলতা এই বলে এক রকম, যার ফলে তার দাদা বীরেন যোগীন্দ্রকে পথে বসাতে উৎসাহ পেয়ে যায়, আবার পরক্ষণেই যোগীন্দ্রর কাছে ফিরে যাবার জন্য তার আকুতি। তেমনি নৃপেনকে এই দেখা যায় দাদাগত প্রাণ; তারপর দ্রুত তার পরিবর্তন। বীরেনকে প্রথম নৃপেনের বন্ধুরূপে দেখা গেল এক রকম, কিন্তু সে যে কি করে অমন দুর্বৃত্ত হলো ভেবেই আশ্চর্য হতে হয়। পিসীমা গোড়ায় ছিলেন শান্ত নিরীহ, কিন্তু কোন হেতুর অবতারণা না করিয়েই তাকে হঠাৎ রূঢ়া কটুভাষিণী দেখানো হলো। এইভাবে আবার সংসারটি ভাঙতে যতো পরিসর নেওয়া হয়েছে শেষে গড়ে তোলার ব্যাপারটি সারা হয়েছে তেমনি তাড়াহুড়ো করে। আসলে দেখা যায় যে, এতো ঘটনা এনে ফেলা হয়েছে যে, থিতিয়ে কিছু দেখবার অবকাশই করে নেওয়া দুষ্কর।

* * *

করুণ রস পরিবেশন করে গল্পের আরম্ভ তারপর সুখী পরিবার দেখে আনন্দ, পরে ট্রাজেডীর প্রবাহ এবং শেষ হয় একদিকে যোগীন্দ্রর মৃত্যুর জন্য শোক, আবার অপর দিকে সংসারটা জোড়া লাগার মধুর পরিবেশের মধ্যে দিয়ে। কাহিনীর স্পষ্ট কোন প্রতিপাদ্য নেই, তবে মনে রাখার মতো কতগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির চরিত্র আছে। অসংলগ্ন ব্যাপারের মধ্যে মনে পড়ে সুষমার বিদ্যে সম্পর্কে যোগীন্দ্রর অজ্ঞতা। সুষমা গ্র্যাজুয়েট এ তথ্য কি বিয়ের আগেই জানবার কথা নয় তবুও সুষমার মধ্যে দিয়ে এক আদর্শ কল্যাণময়ী নারীকে পাওয়া যায়। প্রতিভাকে তার ভাসুরের বাড়িতে পাঠিয়ে আর এক স্বতন্ত্র অধ্যায়ই রচিত হয়েছে, ওখানে ওর ওপর লাঞ্ছনার সঙ্গে মূল গল্পের যোগ নগণ্য। তবে যদি শেষে শৈলেনের সঙ্গে ওর পুনর্বিবাহ হতো তাহলে এক কথা ছিল; তাতে প্রগতি মনের পরিচয়ও পাওয়া যেতো। কিন্তু তা হয়নি। এমনিভাবে খুঁটিয়ে ধরে যেতে থাকলে ত্রুটি বিচ্যুতির একটা দীর্ঘ তালিকাই প্রণয়ন করা যাবে। কিন্তু এ সব সত্ত্বেও তারিফের দিক প্রভূত। পরিচালনার তারিফ করতে হবে এই যে, গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত তিনি নাট্যপ্রবাহ অব্যাহত রেখে দর্শক চিত্তকে এমনভাবে বাগিয়ে রেখে দেন যে, শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পাওয়া যায় না।

* * *

ছবিখানির সবচেয়ে বড়ো সম্পদ হচ্ছে অভিনয়ের দিকটা। যোগীন্দ্রের ভূমিকায় ছবি বিশ্বাসের কতক জায়গার অভিব্যক্তি, বিশেষ করে ভাঙনের দশা আরম্ভ হবার পর তাঁর অভিনয় মনের ভেতরে আলোড়ন এনে দেয়। সুষমার চরিত্রে আরতি মজুমদার অভিব্যক্তিতে চরিত্রটিকে দীপ্ত করে তুলেছেন তার কথার উচ্চারণে টান থাকা সত্ত্বেও। প্রতিভার চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় শৈলেনের সঙ্গে হাসি-কৌতুকের মধ্যে দিয়ে সরল চপলতা ফোটাতেও যেমনি, তেমনি বিধবার করুণ বেশে বঞ্চিত লাঞ্ছিত নারীর প্রতিমূর্তি ফুটিয়ে তোলাতেও যে কৃতিত্ব ফুটিয়েছেন তা তাঁরই অভিনয় প্রতিভার যোগ্য-পরিচয়। শৈলেনের চরিত্রে নির্মলকুমার চরিত্রটিকে স্বাভাবিক করে ফুটিয়ে তোলায় অসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সুলতার ভূমিকায় সন্ধ্যারাণী কয়েক জায়গায় আবেগকে উচ্ছ্বসিত করে তোলেন। রমেনকে ভালো লাগবে রবীন মজুমদারের অভিনয়গুণে। পূর্ণিমার চরিত্রে রেখা মল্লিক মুখরা কুচক্রীর চরিত্রে প্রতি ঘৃণার উদ্রেকে সফল হয়েছেন। নৃপেনের চরিত্রে বীরেন চট্টোপাধ্যায় মনে হয়, তার শিল্প কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। কানু বন্দ্যোপাধ্যায় বীরেনের দুর্বৃত্তপনায় দর্শক মনে রোষ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। জগবন্ধুর ভূমিকায় মিহির ভট্টাচার্য যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন তাতে মনে হলো প্রৌঢ় এমন শান্ত সদাশয় চরিত্রেই ওকে ভালো মানায়। এক সদাশয় মারোয়াড়ীর ব্যবসাদারের একটি সুন্দর টাইপ চরিত্র ফুটিয়েছেন ঋষি বন্দোপাধ্যায়। প্রতিভার ভাসুরপোটির চরিত্রে ভানু বন্দোপাধ্যায় একটা গোঁয়ার মূর্খ সাচ্চাদিল চরিত্রে দর্শকদের হাসাবার সঙ্গে প্রতিভাকে লাঞ্ছনা থেকে উদ্ধার করার জন্য মনের ধন্যবাদও আকর্ষণ করেন। আর অভিনয়ে আছেন নৃপতি, কেতু সিংহ, অশোক সরকার, প্রীতি মজুমদার, ননী মজুমদার, রাজলক্ষ্মী, আশা দেবী, শান্তা প্রভৃতি।

* * *

কলা কৌশলের দিকটা অবজ্ঞাত। প্রারম্ভেই দুর্যোগে একটা মডেল দৃশ্য এমন ধরা পড়ে যায় যে, মনটা তখনই বিরক্ত হয়ে ওঠে। ঐ ফিট কয়েক কেটে বাদ দিলে কোন ক্ষতিই হতো না। সঙ্গীতের দিকটা বেশ দুর্বল। সঙ্গীতের নতুন সাড়াটা এদের মনে লাগেনি দেখা যাচ্ছে। ছবিখানির গঠনশিল্পীবৃন্দ হচ্ছেন—পরিচালনায় সুশীল মজুমদার, আলোকচিত্র গ্রহণে অনিল গুপ্ত, শব্দযোজনায় পরিতোষ বোস, সুর যোজনায় গোপেন মল্লিক এবং শিল্প নির্দেশে তারক বোস।

খেলার মাঠে

একলব্য

কলকাতায় এশিয়ান চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার খেলা আরম্ভ হয়েছে, কিন্তু শেষ হয়নি। প্রতিযোগিতার মাঝপথে হাতে কলম নিয়ে বসেছি,—কিছু লিখতে হবে। ৪টি দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকেই চতুর্দলীয় বা কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতার নামকরণ। প্রতিযোগিতার নাম থেকেই বোঝা যায় কেবল ৪টি দলই এতে যোগদানের অধিকারী। এশিয়ার অন্য কোন দেশের চতুর্দলীয় ফুটবলে অংশগ্রহণের অধিকার নেই। কিন্তু কে জানে, কালে কালে এই কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতা পেণ্টাঙ্গুলার বা আরও বেশী দলীয় প্রতিযোগিতায় পরিণত হবে কি না! ইতিপূর্বে ভারতের মহাআড়ম্বরপূর্ণ পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতাও ট্রাঙ্গুলার, কোয়াড্রাঙ্গুলার থেকে ধাপে ধাপে উঠে পেণ্টাঙ্গুলারে রূপ পেয়েছিল। হয়তো আরও উপরে উঠতো কিন্তু মহাত্মা গান্ধী পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেটের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ পেয়ে পেণ্টাঙ্গুলারকে বন্ধ করে দেন। পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট ছিল শুধু ভারতের মধ্যে সীমাবদ্ধ। ভারতের পাঁচটি সম্প্রদায় ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী—হিন্দু, মুসলিম, ইউরোপীয়ান, পার্শী ও অবশিষ্ট দল। যদিও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বা কোন অপ্রীতিকর ঘটনা পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেটের আবহাওয়াকে কলুষিত করেনি—তবুও মহাত্মাজী দেখলেন দেশের মধ্যে সম্প্রদায়গত প্রতিযোগিতায় পরস্পরের বিদ্বেষ ও স্বাতন্ত্র্যবোধ জাগ্রত হতে পারে এবং ইহা দৃষ্টিকটুও বটে। তাই পেণ্টাঙ্গুলার ক্রিকেট প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে অভিমত প্রকাশ করে সংবাদপত্রে গান্ধীজী এক বিবৃতি দিতেই তৎকালীন ক্রিকেট পরিচালকরা পেণ্টাঙ্গুলার বন্ধ করে দিলেন। পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় গান্ধীজীর আপত্তি ছিল না,—তাঁর আপত্তি ছিল ক্রীড়াক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করায়। যাই হোক পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও প্রীতির বন্ধনকে দৃঢ় করবার পক্ষে ক্রীড়াক্ষেত্র যে একটি প্রকৃষ্ঠ স্থান একথা সবাই স্বীকার করে থাকেন। পণ্ডিত নেহরুর মতে এখন সহ-অস্তিত্বের যুগ। এই সহ-অস্তিত্বের যুগে যত বেশী দেশের সঙ্গে সম্প্রীতি ও সখ্যসূত্র গ্রথিত হয় ততই মঙ্গল। এই ধরনের প্রতিযোগিতা ক্রীড়ামান উন্নয়নেরও পরিপোষক। সামাজিক অনুষ্ঠান হিসাবেও এর মূল্য আছে। তাই আজকের কোয়াড্রাঙ্গুলার বা চতুর্দলীয় প্রতিযোগিতা যদি পঞ্চ বা ষষ্ঠ দলীয় প্রতিযোগিতায় পরিণত হয় তবে আশ্চর্যের কিছুই নেই। অবশ্য বেশী দল নিয়ে প্রতিযোগিতা পরিচালনার পথে আছে অনেক অন্তরায়। তা ছাড়া ৪ বছর অন্তর এশিয়ান গেমের মধ্যেই রয়েছে এশিয়ার দেশগুলির ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা। বার্ষিক অনুষ্ঠান হিসাবে এশিয়ান ফুটবলের ক্ষুদ্র সংস্করণ কোয়াড্রাঙ্গলার ফুটবলের আয়োজন মন্দ কি?

১৯৫২ সালে সিংহলের স্বাধীনতা উৎসব উপলক্ষে এক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এই প্রদর্শনীর অন্যতম আকর্ষণ হিসাবে এক ফুটবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ভারত, সিংহল, পাকিস্থান ও বর্মা ছিল পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও প্রীতির ভাববন্যার মধ্যে লীগ প্রথায় খেলা শেষ হবার পর চারিটি দেশের প্রতিনিধি ঠিক করেন—প্রতি বছরই এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে এবং প্রতি দেশ পর্যায়ক্রমে খেলা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে। সেই থেকে চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। কলম্বোতে প্রথম বছরের খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল বলে সিংহল ফুটবল এসোসিয়েশন 'কলম্বো কাপ' বিজয়ীর পুরস্কার হিসাবে দান করে। গতবার কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবল প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে রেঙ্গুনে। ভারত তৃতীয় অনুষ্ঠানের ভার পেয়ে কলকাতায় খেলার আয়োজন করেছে।

* * *

১৯৫১ সালে দিল্লীর এশিয়ান গেমের পর ভারতের মাটিতে এই প্রথম আন্তর্জাতিক

চতুর্দলীয় ফুটবলে ভারত ও সিংহলের প্রথম খেলায় সিংহল গোলরক্ষক শেরিফ পুরণ বাহাদুরের মাথার উপর থেকে একটি বল রক্ষা করছেন
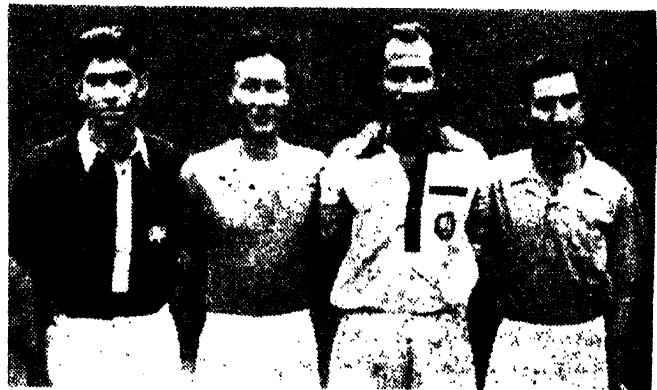
চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় ৪ দেশের ৪ অধিনায়ক। বাম থেকে— পি রণ সিংগে (সিংহল) বা কিউ (বর্মা), এস মান্না (ভারত) ও জামিল আকতার (পাকিস্থান)

আন্তর্জাতিক টেনিসের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার ডেভিস কাপ। ২৭শে ডিসেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ার সিডনীতে আরম্ভ হচ্ছে ডেভিস কাপের ফাইন্যাল খেলা

ফুটবল প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান। পরস্পরের সান্নিহিত চারিটি দেশ ভারত, ব্রহ্ম, পাকিস্থান ও সিংহল এখানে পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৮ই ডিসেম্বর ক্যালকাটা মাঠে কোয়াড্রাঙ্গুলার ফুটবলের উদ্বোধন দিনে যে দৃশ্য প্রত্যক্ষ করা যায় তা এক বৃহৎ অনুষ্ঠানের সঙ্গেই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কলকাতার পুলিশ ব্যান্ডের ঐক্যতানের মধ্যে চারটি দল একে একে মাঠে উপস্থিত হলেন। তাঁরা লাইন বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন ক্যালকাটা মাঠের পশ্চিম দিকে মুখ করে। সুস্থ সবল-দেহী এশিয়ার অর্ধশতাধিক নওজোয়ান। প্রথমে বর্মা, পরে সিংহল, তারপর পাকিস্থান, শেষে ভারত। বর্মার খেলোয়াড়দের গায়ে ছিল জামা, তাতে সাদা ফিতের গলবেষ্টনী। সিংহল খেলোয়াড়দের চকলেট রংয়ের ইউনিফর্ম—কলার ও বুকপটির রং হলুদ। পাকিস্থান খেলোয়াড়দের গায়ে ছিল আসমানী রংয়ের এক রঙা ইউনিফর্ম। ভারত পরেছিল গাঢ় আকাশী রংয়ের জামা—বাহু-বেষ্টনী, বুকপটি ও জামার কলারের রং নীল। সবারই সাদা প্যাণ্ট পায়ে মোজা ও বুট। জনতার ফ্রেমে বাঁধানো সবুজ ক্যালকাটা মাঠের উপর খেলোয়াড়ী পোশাকে সজ্জিত চারটি দলকে চমৎকার দেখাচ্ছিল। এ আই এফ এফের সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত সবার সঙ্গে কর-মর্দন করলেন। তারপর সামরিক বাদ্যের ঐক্যতানের মধ্যে একে একে তুললেন তিনি চারটি দেশের জাতীয় পতাকা। জাতীয় সঙ্গীতও বেজে উঠলো। দর্শকগণ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে আনত অভিবাদন জানাল। খেলার মাঠে রাষ্ট্রীয় তথা সামাজিক অনুষ্ঠানের চমৎকার পরিবেশ। তারপর আরম্ভ হ'ল খেলা। খেলা সম্পর্কে আগামী সংখ্যায় আলোচনার ইচ্ছে রইলো। এসপ্তাহে শুধু গত দু বছরের লীগ তালিকা প্রকাশ করছি।

১৯৫২ সাল

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
ভারত	৩	২	১	০	৭	০	৫
পাকিস্থান	৩	২	১	০	৩	০	৫
সিংহল	২	০	০	২	০	৫	০
বর্মা	২	০	০	২	০	৫	০

১৯৫৩ সাল

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
ভারত	৩	৩	০	০	৭	২	৬
পাকিস্থান	৩	১	১	১	৭	২	৩
বর্মা	৩	১	১	১	৬	৭	৩
সিংহল	৩	০	০	৩	২	১১	০

* * * *

শেষ পর্যন্ত রাশিয়ান ফুটবল টীমের ভারত সফরের ব্যবস্থা পাকাপাকি ঠিক হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থানুযায়ী ৩০জন খেলোয়াড়বিশিষ্ট সোভিয়েট রাশিয়ার একটি শক্তিশালী ফুটবল টীম জানুয়ারী মাসে তৃতীয় সপ্তাহে ভারতে এসে ৬ সপ্তাহকাল এদেশ সফর করবে। কলকাতায় রাশিয়ান দলের খেলার কথা ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে ঠিক জাতীয় খেলাধুলা আরম্ভ হবার আগে। আগেই বলেছি কলকাতায় এবার খেলাধুলার মহোৎসব। একটা না একটা অনুষ্ঠান লেগেই আছে। ভারতের জাতীয় খেলাধুলারও এবার আয়োজন হয়েছে কলকাতায়। ফেব্রুয়ারী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের নওজোয়ানদের পদধ্বনিতে কলকাতার 'এলেনবোরো' মাঠ সরগরম হয়ে উঠবে। সুতরাং রাশিয়ান ফুটবল আর জাতীয় খেলাধুলা নিয়ে কলকাতার ক্রীড়া পরিচালক তথা ক্রীড়া সাংবাদিকদের ফেব্রুয়ারী মাসটাও থাকতে হবে কর্মব্যস্ত।

রাশিয়ান ফুটবল টীমের ভ্রমণ ব্যবস্থা সম্পর্কে এপর্যন্ত অনেক টাল বাহানা হয়েছে। প্রথমে স্বাস্থ্যমন্ত্রী রাজকুমারী অমৃত কাউরের পৃষ্ঠপোষকতায় ন্যাশনাল স্পোর্টস ক্লাবের এণ্টনী ডি'মেলো রাশিয়ান দলের ভারত সফর সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা-সম্পন্ন করে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের অনুমতি প্রার্থনা করেন খেলার ব্যবস্থা করবার জন্য। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের এতে একটু গোসা হয়। তারা বলেন, ভারতে বাহিরের কোন দলের খেলার ব্যবস্থা করবার একমাত্র অধিকারী নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন। অন্য কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কোন দলকে ভারতে আমন্ত্রণের অধিকার নেই। কিন্তু তারা ডি'মেলো বা স্বাস্থ্যমন্ত্রীকে চটাতেও পারেন না। "যার বিয়ে তার দেখতে মানা" গোছের ব্যাপারটা হয়ে দাঁড়ায়। কারণ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর অনুরোধেই ভারত সরকার রাশিয়ান ফুটবল দলের ভারত সফরের অনুমতি দিয়েছেন। ইতিপূর্বেও একবার 'মস্কো ডায়নামোস' দলের ভারত সফরের কথা উঠেছিল, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে সে সফরের আয়োজন কার্যকরী হয়নি। তাই নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন দিল্লীস্থিত সোভিয়েট রাষ্ট্রদূত মারফৎ এক আনুষ্ঠানিক নিমন্ত্রণ পাঠালেন সোভিয়েট রাশিয়ায়। ভ্রমণ ব্যবস্থায় আর কোন জটিলতা সৃষ্টি হলো না। এই প্রসঙ্গে সেই বাড়ীর কর্ত্রী আর ভিখিরির গল্প মনে পড়ছে। ভিখিরি ভিক্ষে চাইতে এসেছে; বাড়ীর বধু বললেন—"ভিক্ষে পাবে না ফিরে যাও" ভিখিরি আর করে কি! ফিরে যাচ্ছে এমন সময় বাড়ীর কর্ত্রীর সঙ্গে দেখা। ব্যাপার শুনে তিনি বধূর উপর চটে গিয়ে ভিখিরিকে বাড়ীতে ডেকে আনলেন। বাড়ীতে এসে তিনি ভিখিরিকে ঐ একই কথা বললেন—'ভিক্ষে পাবে না চলে যাও'। ভিখিরি কর্ত্রীর মুখের দিকে জিজ্ঞাসু নেত্রে চেয়ে রইলো। মনের ভাব বুঝে কর্ত্রী বললেন—

ভিক্ষে পাবে না, একথা বলবার বৌ কে? আমি বাড়ীর গিন্নি, আমি বলছি ভিক্ষে পাবে না, তুমি এখন যাও।' তাই বলছিলাম ভারতীয় ফুটবলের গিন্নি যখন সোভিয়েট রাশিয়ার ফুটবল টীমকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন, তখন আর তাদের আসবার বাধা কোথায়? কর্তৃত্বের নেশা বড় নেশা। কেউই কর্তৃত্ব ছাড়তে চায় না। কি রাজনীতি, কি ক্রীড়ানীতি, কি সমাজ ব্যবস্থা, সব ক্ষেত্রেই এক অবস্থা।

* * * *

২৭শে ডিসেম্বর থেকে অস্ট্রেলিয়ায় আরম্ভ হচ্ছে আন্তর্জাতিক টেনিসের শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা ডেভিস কাপের ফাইন্যাল খেলা। গত চার বছর ধরে অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপের অজেয় যোদ্ধা। কেউই চার বছরের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার কাছ থেকে ডেভিস কাপ ছিনিয়ে নিতে পারে নি। যুদ্ধোত্তর টেনিসে অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য খর্ব করবার জন্য টেনিসের শিরপ্রধান দেশ আমেরিকা এবারেও চেষ্টা করবে সন্দেহ নেই। তাই সারা টেনিস বিশ্ব আগ্রহ ভরা দৃষ্টি নিয়ে চেয়ে আছে 'সিডনীর' দিকে। ইতিপূর্বে ১৭ বারের ডেভিস কাপ বিজয়ী আমেরিকা জয়ী হবে না, অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপকে এবারও নিজেদের দখলে রাখবে?

ডেভিস কাপের প্রচলিত নিয়ম, যে দেশ জয়ী হবে কাপটি সেই দেশেরই অধিকারে থাকবে। পরের বছর সমগ্র বিশ্বের আঞ্চলিক প্রতিযোগিতার বিজয়ী দেশকে আগের বছরের বিজয়ীর দেশে গিয়ে তাকে পরাজিত করে কাপটি ছিনিয়ে আনতে হবে। অর্থাৎ "বিশ্ব মাঝে আছ কেবা বীর, পার যদি ধর অস্ত্র করে"। আমি তো অজেয় তোমার শক্তি থাকে আমার কাছ থেকে ডেভিস কাপ ছিনিয়ে নাও। একমাত্র ডেভিস কাপ ছাড়া বিশ্বের অন্য কোন ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এমনধারা নিয়ম নেই। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার এই ব্যবস্থার মধ্যে যেন কতকটা বলীর দর্প নিহিত আছে। পার যদি ছিনিয়ে নাও। আমি তো বাহুবলে ডেভিস কাপ জয় করে বসে আছি।

* * * *

হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের টেনিসপ্রিয় এক ছাত্রের দুর্দমনীয় জয়ের আকাঙ্ক্ষায় ডেভিস কাপের সৃষ্টি। একটি ছাত্র খেলোয়াড়ের জয়ের আকাঙ্ক্ষা আজ বিশ্বের সকল দেশের জাতীয় আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়েছে। যে কোন দেশই টেনিস খেলায় এই শ্রেষ্ঠ মুকুট লাভ করবার জন্য উদ্‌গ্রীব। বিশ্ব টেনিসে ডেভিস কাপ বিজয়ীর মর্যাদা অনন্য। ডেভিস কাপ প্রতিযোগিতার আর একটি নাম হচ্ছে চ্যাম্পিয়নশিপ অব দি ওয়ার্লড বা বিশ্ব টেনিস প্রতিযোগিতা।

১৮৯৯ সালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক তরুণ ছাত্র, নাম ডুইট এফ ডেভিস, আমেরিকার সিংগলস চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করবার পর অন্য এক সহ খেলোয়াড়ের সংগে ডাবলসের খেলাতেও বিজয়ী হন। টেনিসে অধিক সম্মান লাভের জন্য তিনি যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুসন্ধান করতে থাকেন। কিন্তু তখন টেনিস খেলা এত জনপ্রিয় হয়নি।

খেলোয়াড়ের সংখ্যাও বেশী ছিল না। জয়ের নেশায় ডেভিস আমেরিকা ছেড়ে ইংলণ্ডে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অনুসন্ধান করতে আরম্ভ করেন। ক্রমে ক্রমে তিনি খবর পান গ্রেট ব্রিটেনে ডোহার্টি ব্রাদার্স নামে দুই ভাই আছেন, যারা ইংলণ্ড টেনিসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ডোহার্টি ব্রাদার্সের সংগে খেলবার জন্য ডুইট ডেভিসের মন নেচে ওঠে। কিন্তু তখন আমেরিকা ও ইংলণ্ডের মধ্যে খেলার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ডেভিসের সাধও অপূর্ণ রইলো। তিনি সুযোগের অন্বেষণ করতে আরম্ভ করলেন, কিভাবে ডোহার্টি ব্রাদার্সের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা যায়। জয়ের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর মাথায় এক বুদ্ধি খেলে গেল। যদি এক আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতার আয়োজন করা যায়, তবে ডোহার্টি ব্রাদার্স তো বটেই বিশ্বের যে কোন শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড়ের সংগে খেলবার সুযোগ পাওয়া যাবে। পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হতে মোটেই দেরী হল না। ডেভিস ২০০ পাউণ্ড ব্যয়ে এক সুদৃশ্য কাপ নির্মাণ করে আন্তর্জাতিক টেনিস প্রতিযোগিতা পরিচালনের জন্য আমেরিকার জাতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশনের হাতে কাপটি তুলে ছিলেন। এই কাপটিই ডুইট এফ ডেভিস প্রদত্ত 'ডেভিস কাপ'। শিল্প প্রতিভার নিপুণ ছাপ লেগে রয়েছে কাপটির সারা অংগে। রূপোর উপর সূক্ষ্ম সোনার কাজ করা। ডেভিস কাপের প্রথম অবস্থায় শুধু আমেরিকা ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে খেলার ব্যবস্থা ছিল। কারণ এই সময় একমাত্র আমেরিকা আর গ্রেট ব্রিটেন ছাড়া অন্য কোন দেশে টেনিস খেলার তেমন প্রচলন ছিল না।
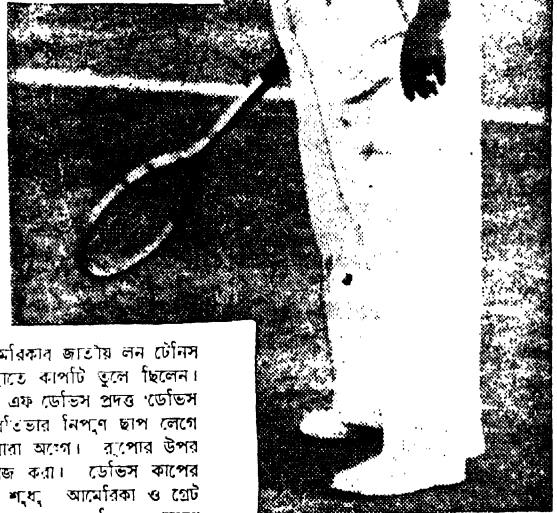
১৯০০ খৃষ্টাব্দের ১৬ই জানুয়ারী আমেরিকার জাতীয় লন টেনিস এসোসিয়েশনের সভাপতি ইংলণ্ডের জাতীয় লন টেনিসের সভাপতির কাছে ডেভিসের ইচ্ছে জানিয়ে এক পত্র লেখেন। তারই ফলে ১৯০০ সাল থেকে ডেভিস কাপের খেলা আরম্ভ হয়। প্রথম বছর ডোহার্টি ব্রাদার্স ইংলণ্ডের পক্ষে যোগদান করতে না পারায় আমেরিকার পক্ষে ডেভিস কাপ দখলে রাখা সহজ হয়। ১৯০৪ সালে বেলজিয়াম ও ফ্রান্স ডেভিস কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করে। ক্রমে সারা বিশ্বে ডেভিস

জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের মুখে ভারতের যে সম্মানিত অতিথি টেনিস র‍্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে আছেন ইনি ভারতে টেনিস খেলতে আসেন নি। ইনি যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো। টিটো টেনিস খেলতে খুবই ভালবাসেন।

চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণকারী বর্মা দল

কাপের আকর্ষণ ছড়িয়ে পড়ে এবং বিভিন্ন দেশ খেলায় অংশ গ্রহণ করতে থাকে। ১৯২১ সালে ভারত সর্বপ্রথম ডেভিস কাপের খেলায় অংশ গ্রহণ করে ফ্রান্সকে ৪—১ খেলায় পরাজিত করে। পরবর্তী খেলায় ভারতকে জাপানের কাছে সব কয়টি খেলায় হার স্বীকার করতে হয়। ডেভিস কাপে কোন মহিলা খেলোয়াড়ের অংশ গ্রহণের সুযোগ নেই। ৩টি সিংগলস ও ২টি ডাবলসের খেলায় জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়। নীচে ডেভিস কাপের পূর্ববর্তী বিজয়ীর তালিকা দেওয়া হল—

ডেভিস কাপের পূর্ববর্তী বিজয়ী দেশ

১৯০০ সাল—ইউ এস এ
১৯০১ „ — খেলা হয়নি
১৯০২ „ — ইউ এস এ
১৯০৩ „ থেকে ১৯০৬—বৃটিশ আইলস
১৯০৭ „ থেকে ১৯০৯—অস্ট্রেলিয়া
১৯১০ „ — খেলা হয়নি
১৯১১ „ — ইউ এস এ
১৯১২ „ — বৃটিশ আইলস
১৯১৩ „ — ইউ এস এ
১৯১৪ „ — অস্ট্রেলেশিয়া
১৯১৫ „ থেকে ১৯১৮—খেলা হয়নি
১৯১৯ „ — অস্ট্রেলেশিয়া
১৯২০ „ থেকে ১৯২৬—ইউ এস এ
১৯২৭ „ থেকে ১৯৩২—ফ্রান্স
১৯৩৩ „ থেকে ১৯৩৬—গ্রেট ব্রিটেন
১৯৩৭—১৯৩৮ — ইউ এস এ
১৯৩৯ — অস্ট্রেলিয়া
১৯৪০ „ থেকে ১৯৪৫—খেলা হয়নি
১৯৪৬ „ থেকে ১৯৪৯—ইউ এস এ
১৯৫০ „ থেকে ১৯৫৩—অস্ট্রেলিয়া।

* * * *

ব্রিসবেন মাঠের টেস্ট খেলায় অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১৫৪ রানে ইংলণ্ডকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল, কিন্তু সিডনীর টেস্টে ইংলণ্ডকে অস্ট্রেলিয়ার কাছে হার স্বীকার করতে হয়েছে ৩৮ রানে। দুটি টেস্টে উভয় দেশই একটি করে খেলায় জয়লাভ করে সমান অবস্থায় রইলো। ক্রিকেট মাঠের বাঘ সিংহের বাকি তিনটি লড়াই আরও তীব্র হবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

প্রথম টেস্টে যেমন ইংলণ্ড দলের ডেনিস কম্পটন হাতে চোট পেয়েছিলেন, বিশ্বশ্রেষ্ঠ উইকেটকিপার ইভান্স ছিলেন অসুস্থ। এ টেস্টেও তেমন অসুস্থতার জন্য অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক আয়ান জনসন ও বিশ্বখ্যাত চৌখস খেলোয়াড় কিথ মিলার অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে খেলতে পারেননি। বৃষ্টির ফলে খেলায় জয়পরাজয়ের মীমাংসা আরও ত্বরান্বিত হয়েছে—৬ দিনের খেলা পুরো ৫ দিনের আগেই শেষ হয়ে যায়। দ্বিতীয় টেস্টের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা সারের খেলোয়াড় পিটার মের সেঞ্চুরী লাভ এবং টাইসনের মারাত্মক বোলিং। টেস্ট খেলায় মে ইতিপূর্বে আরও দুবার সেঞ্চুরী করেছেন, অস্ট্রেলিয়ায় এসেও তিনি এই সেঞ্চুরী নিয়ে তিনটি সেঞ্চুরী করলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে টাইসন একাই ৬টি উইকেট দখল করেছেন। অস্ট্রেলিয়ার নীল হার্ভে মাত্র ৮ রানের জন্য সেঞ্চুরী করতে পারেননি। তিনি ৯২ রান করবার পর অস্ট্রেলিয়ার ইনিংস শেষ হয়ে যায়। হার্ভে নট আউট থাকেন। নীচে দুই দলে যারা খেলেছিলেন, তাদের নাম ও সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড দেওয়া হলঃ—

ইংলণ্ড—হাটন (অধিনায়ক), বেলী, মে, গ্রেভনি, কাউড্রে, এডরিচ, টাইসন, ইভান্স, ওয়ার্ডল, এ্যাপলইয়ার্ড ও স্ট্যাথাম।

অস্ট্রেলিয়া — মোরিস (অধিনায়ক), ফেবেল, বার্ক, হার্ভে, হোল, বিনাউড, আর্চার, ডেভিডসন, লিণ্ডওয়াল, ল্যাংলে ও জনস্টন।

স্কোর বোর্ড

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস ১৫৪ (ওয়ার্ডল ., হাটন ৩০, কাউড্রে ২৩; আর্চার ১২ ন ৩, জনস্টন ৫৬ রানে ৩, ডেভিডসন : রানে ২ ও লিণ্ডওয়াল ৪৭ রানে ২ ঃ)।

অস্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস ২২৮ (আর্চার ., বার্ক ৪৪, ফেবেল ২৬; টাইসন ৪৫ ন ৪, বেলী ৫৯ রানে ৪ ও স্ট্যাথাম ৮৩ ন ২ উইঃ)।

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস ২৯৬ (পিটার মে ১৪, কাউড্রে ৫৪, হাটন ২৮, এডরিচ ২৯, াথাম ২৫; আর্চার ৫৩ রানে ৩, লিণ্ড-াল ৬৯ রানে ৩ ও জনস্টন ৭০ রানে উইঃ)।

অস্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস ১৮৪ (নীল র্ভে নট আউট; টাইসন ৮৫ রানে ৬ উইঃ)।

রণজি প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায়

বাঙলার সাফল্য

রণজি প্রতিযোগিতার প্রথম খেলায় ঙ্গলা দল এক ইনিংস ও ১৪৫ রানে ড়িষ্যাকে হারিয়ে দিয়ে পরের খেলায় হারের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার যোগ্যতা র্জন করেছে। ক্রিকেটের শিশু রাজ্য ড়িষ্যা বাঙলার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে পারেনি বলেই হয়। বাঙলা দল প্রথম দিন ৪ উইকেটে ৩২৯ রান করবার পর দ্বিতীয় দিন মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হলো। খেলাও হলো বন্ধ। তৃতীয় দিন বাঙলা অল্প নের মধ্যে উড়িষ্যার দুটি ইনিংসই শেষ রে দিল।

এই খেলার শেষ ওভারে পি সেনের হ্যাট্রিক বাঙলার অধিনায়ক পি বি দত্তর সেঞ্চুরী এবং বোলার এন চৌধুরীর শত উইকেট লাভ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এই খেলার শেষে এন চৌধুরী রনজি প্রতিযোগিতার খেলায় শত উইকেট পূর্ণ করেছেন। নীচে বাঙলা ও উড়িষ্যার খেলার সংক্ষিপ্ত ফলা-ফল দেওয়া হল।

পশ্চিম বাঙলা—প্রথম ইনিংস—৩২৯ (৬ উইঃ ডিঃ) (পি বি দত্ত ১১০, ডি জি ফাদকার নট আউট ৮৭, শিবাজী বসু ৫৫; টি শাস্ত্রী ১০৩ রানে ৩ উইঃ)

উড়িষ্যা—১ম ইনিংস—৫৮ (বি পটনায়েক ১৬; ফাদকার ২১ রানে ৪ উইঃ, এন চৌধুরী ২০ রানে ৪ উইঃ, এম সেন ৭ রানে ২ উইঃ)

উড়িষ্যা—২য় ইনিংস—১২৬ (টি রাম-শাস্ত্রী ৩৯, স্বামী রাও ৩২, রামপ্রকাশ ১৯; পি সেন হ্যাট্রিকের সঙ্গে ৪ রানে ৩ উইঃ, এ ভট্টাচার্য ৪৩ রানে ৪ উইঃ)

হাজারে ও কৃপাল সিংয়ের ডাবল সেঞ্চুরী

—গত সপ্তাহে রণজি প্রতিযোগিতার আরও তিনটি খেলায় বরোদা গুজরাটকে, মধ্য প্রদেশ উত্তর প্রদেশকে এবং মাদ্রাজ ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনকে পরাজিত করেছে। তিনটি খেলারই ফলাফল মীমাংসা হয় প্রথম ইনিংসের ফলাফলে। মাদ্রাজের কৃপাল সিং ২০৮ রান এবং ভারতের প্রাক্তন অধিনায়ক ও বরোদার খেলোয়াড় ভি এস হাজারে ২০৪ রান (নট আউট) করে ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। কৃতী চৌকস খেলোয়াড় হাজারের পক্ষে ডাবল করা কিছু নূতন কথা নয়। বহুবারই তিনি এই কৃতিত্ব লাভ করেছেন। একটানা ক্রিকেট খেলে খেলে হাজারের ক্রিকেট জীবনের ঔজ্জ্বল্য মলিন হয়ে আসছিলো। পাকিস্থান সফরে ভারতের টীম থেকে বাদ পড়ে তিনি আবার পুরোনো প্রতিভা ফিরে পেলেন নাকি?

টমাস কাপ—টমাস কাপের ইউরোপ অঞ্চলের কোয়ার্টার ফাইনাল খেলায় সুইডেন ৯—০ খেলায় ফ্রান্সকে হারিয়ে দিয়ে ইংলণ্ডের সঙ্গে সেমি-ফাইনালে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

এশিয়ান টেবিল টেনিস—এশিয়ান টেবিল টেনিসের কোন ফাইনালেই এবার ভারতের কোন খেলোয়াড় সাফল্য অর্জন করতে পারেন নি। এশিয়ান টেবিল টেনিসে ভারতীয় দলের পক্ষে বাঙলার কোন খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্ত না হবার ঘটনাও উল্লেখযোগ্য। ভারতের টেবিল টেনিস ইতিহাসে এই সর্ব-প্রথম ভারতীয় দল থেকে বাঙলার খেলোয়াড় বাদ পড়লেন। এশিয়ান টেবিল টেনিসের দলগত প্রতিযোগিতায় হংকং ৫—১ খেলায় সিঙ্গাপুরকে হারিয়ে দিয়ে বরোদা কাপ লাভ করেছে। মেয়েদের বিভাগেও হংকং কমলা রামানুজন কাপ পেয়েছে কোরিয়াকে ৩—১ খেলায় পরাজিত করে।

সিঙ্গলস ফাইনালে ভিয়েৎনামের খ্যাত-নামা খেলোয়াড় মাই ভান হোয়া ১৭—২১, ২১—১২, ২১—১৭, ১১—২১ ও ২১—১৩ পয়েণ্টে ফিলিপাইনের ডি আগ্যাশিনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন।

দেশী সংবাদ

১৩ই ডিসেম্বর—রাজ্য সভা অদ্য হিন্দু বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদ বিলের বিশদ আলোচনার পর যুক্ত সিলেক্ট কমিটির সুপারিশ বাতিল করিয়া বালক ও বালিকাদের বিবাহের বয়স মূল বিল অনুযায়ী যথাক্রমে ১৮ বৎসর ও ১৫ বৎসর বহাল করিয়াছেন। যুক্ত সিলেক্ট কমিটি এই বয়স বাড়াইয়া যথাক্রমে ২১ ও ১৬ বৎসর করিবার সুপারিশ করিয়াছিলেন।

কলিকাতায় এসোসিয়েটেড চেম্বার অব কমার্স অব ইণ্ডিয়ার বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ সরকারী শিল্পোদ্যমের পরিপূরক হিসাবে বে-সরকারী শিল্পের বিশিষ্ট ভূমিকা এবং সরকারী ও বে-সরকারী শিল্প প্রচেষ্টার মধ্যে ঘনিষ্ঠ সহযোগিতার আবশ্যকতার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

১৪ই ডিসেম্বর—হাওড়ায় পুলিশ বাহিনীর কনস্টেবলগণের অনশন ধর্মঘট আজও অব্যাহত থাকে এবং এই ধর্মঘট হুগলী, বাঁকুড়া ও মুর্শিদাবাদ জেলার কনস্টেবলদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়ে। অবস্থার গুরুত্ব বুঝিয়া পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঐ দিন হাওড়ায় সেনাবাহিনীর সাহায্য গ্রহণ করেন।

রাজ্য সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আশ্বাস সত্ত্বেও কলিকাতার বাহিরে বিভিন্ন এলাকার পুলিশ বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত কিছু সংখ্যক কনস্টেবল অনশন ধর্মঘট শুরু করায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এক বিবৃতিতে দুঃখ প্রকাশ করেন।

১৫ই ডিসেম্বর—পাক প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী উভয় দেশের সমুদয় অমীমাংসিত বিষয়ের নিষ্পত্তিকল্পে সরাসরি আলাপ আলোচনা পুনরায় আরম্ভের জন্য প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুকে আগামী মাসে করাচী আগমনের আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

ভারতীয় সংসদের ইতিহাসে অদ্য প্রথম বিরোধী দলসমূহের সদস্যগণ লোকসভার অধ্যক্ষ শ্রী জি ভি মবলঙ্করের বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে এক অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করেন।

১৬ই ডিসেম্বর—যুগোশ্লাভ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো আজ বোম্বাইয়ে পৌঁছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। বোম্বাইয়ে সাতঘণ্টা অবস্থান করিয়া তিনি স্পেশাল ট্রেনযোগে দিল্লী যাত্রা করেন।

আজ শেষ রাত্রিতে শিবপুরস্থ হাওড়া পুলিশ লাইনের ব্যারাকে হাওড়া পুলিশের এক হাজারেরও অধিক অনশন ধর্মঘটকারী কনস্টেবলকে গ্রেপ্তার করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কনস্টেবলদের ন্যায় বেতন ও মাগ্গীভাতা বৃদ্ধি, রেশন ভাতা ও ঘরভাড়া ইত্যাদি মঞ্জুরীর দাবীতে আলিপুর ও প্রেসিডেন্সী জেলের সাড়ে ছয় শত ওয়ার্ডার আজ সকাল হইতে অনশন ধর্মঘট আরম্ভ করে।

১৭ই ডিসেম্বর—নবনিযুক্ত কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না কলিকাতায় সাংবাদিকগণকে জানান যে, ভারত সরকার গত কয়েক দিনের মধ্যে পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের জন্য প্রায় ৫॥ কোটি টাকার পুনর্বাসন পরিকল্পনা মঞ্জুর করিয়াছেন। তিনি বলেন, এক্ষণে পূর্বাঞ্চলের উদ্বাস্তুদের দাবীকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে।

যুগোশ্লাভ প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো আজ নয়াদিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাকে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আজ অনশন ধর্মঘটী কনস্টেবলগণকে অবিলম্বে কাজে যোগ দিবার নির্দেশ দিয়া এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, উহা না করিলে তাহাদের নিয়োগ রদ হইতে পারে।

১৮ই ডিসেম্বর—নয়াদিল্লীতে প্রেসিডেণ্ট টিটোর সম্মানার্থে প্রদত্ত এক ভোজসভায় রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ এই আশা ব্যক্ত করেন যে, তাঁহার ভারত পরিদর্শনের ফলে উভয় দেশের মধ্যে প্রীতির বন্ধন দৃঢ়তর হইবে এবং এই মৈত্রী বিশ্বের জাতি সমষ্টির মধ্যে ভাববিনিময়ে এবং শান্তি প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করিবে। সম্বর্ধনার উত্তরে মার্শাল টিটো বলেন যে, বিশ্বশান্তি স্থাপন ও সংরক্ষণে ভারতের অতুলনীয় অবদানের কথা সমগ্র যুগোশ্লাভিয়ায় সুবিদিত।

আজ লোকসভায় মৌখিক ভোটে অধ্যক্ষ শ্রী মবলঙ্করকে অপসারণের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হইয়াছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গে কনস্টেবলদের অনশন ধর্মঘটজনিত পরিস্থিতির প্রভূত উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৩ হাজার কনস্টেবল তাহাদের কতিপয় অভাব-অভিযোগ পূরণের দাবীতে অনশন ধর্মঘট শুরু করিয়াছিল। তন্মধ্যে অল্প কয়েকজন ছাড়া সমুদয় কনস্টেবল ঐদিন অনশন ভঙ্গ করিয়া কাজে যোগ দেয়। ঐদিন জেল ওয়ার্ডারদের অনশন ধর্মঘটেরও অবসান ঘটে।

পুরুলিয়ার সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য পুরুলিয়া হইতে ২২ মাইল দূরে রঘুনাথপুরে মানভূম লোকসেবক সঙ্ঘের অন্যতম সচিব শ্রীজগবন্ধু ভট্টাচার্য এবং অপর কয়েকজন বিহার পুলিশের সাদা পোশাক পরিহিত ছয় সাতজন কনস্টেবল কর্তৃক ভীষণভাবে প্রহৃত হইয়াছেন।

১৯শে ডিসেম্বর—আজ লালকেল্লায় দেওয়ানী-ই-খাসে অনুষ্ঠিত নাগরিক সম্বর্ধনার উত্তরে যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো ঘোষণা করেন যে, ভারত ও যুগোশ্লাভিয়ার মধ্যে মৈত্রী সম্পর্ক দৃঢ় ও ব্যাপক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৩ই ডিসেম্বর—মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী আজ করাচীতে এক সম্বর্ধনা সভায় প্রদত্ত মানপত্রের উত্তরে বলেন যে, পাকিস্থানে যাহাতে যথার্থ গণতান্ত্রিক শাসন পরিচালিত হয়, তাহা দেখাই তাঁহার প্রথম কর্তব্য হইবে।

১৪ই ডিসেম্বর—নয়াচীনের সংবাদ প্রতিষ্ঠান অদ্য এই বলিয়া অভিযোগ করিয়াছেন যে, মার্কিন সরকার পাঁচ সহস্রাধিক চীনা ছাত্রকে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে আটক রাখিয়াছে এবং তাহাদিগকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সুযোগ দিতে অস্বীকার করিয়াছেন।

১৬ই ডিসেম্বর—সোভিয়েট ইউনিয়ন আজ ফ্রান্সকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিয়াছে যে, সে যদি জার্মানীর পুনরস্ত্রসজ্জা সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তি অনুমোদন করে তাহা হইলে রাশিয়াও ১৯৫৪ সালের ফরাসী সোভিয়েট চুক্তি বাতিল করিয়া দিবে।

১৭ই ডিসেম্বর—প্রজাতন্ত্রী চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই অদ্য ১১ জন মার্কিন বৈমানিককে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করার 'প্রাসঙ্গিক প্রশ্নটি' আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারস্কোল্ডকে পিকিংএ আগমন করিতে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন।

পাক সরকারের এক বিজ্ঞপ্তিতে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, পঞ্চাশটি জেলা ও দশটি কমিশনারের বিভাগ লইয়া পশ্চিম পাকিস্থান প্রদেশ গঠিত হইবে। প্রদেশের শাসনকর্তারূপে একজন গভর্নর, একটি মন্ত্রিসভা ও একটি মাত্র সরকারী দপ্তর থাকিবে।

১৮ই ডিসেম্বর—উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার সামরিক অধিনায়কগণকে আণবিক শক্তির সাহায্যে প্রতীচ্য রক্ষার পরিকল্পনা রচনার ক্ষমতা দিয়া চৌদ্দটি দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ আজ এক ইস্তাহার প্রচার করিয়াছেন।

১৯শে ডিসেম্বর—করাচীর ওয়াকিবহাল মহলের খবরে প্রকাশ, আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এইচ এস সুরাবর্দী আগামীকল্য কেন্দ্রীয় পাক-মন্ত্রিসভার অন্যতম সদস্যরূপে শপথ গ্রহণ করিবেন।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

ভারতের উন্নয়ন পরিকল্পনা

ভারতের পঞ্চবার্ষিকী উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতি মোটের উপর সন্তোষজনক হইয়াছে লোকসভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। সেই সঙ্গে লোকসভা এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এ পর্যন্ত উন্নয়ন পরিকল্পনাগুলিতে যে সব দোষত্রুটি পরিলক্ষিত হইয়াছে, সেগুলি দূর করিয়া উন্নয়ন প্রয়াস সমধিক সবল ও সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের উন্নয়ন প্রচেষ্টা একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছে, কিংবা তাহা কিছুই ফলপ্রসূ হয় না, এমন কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের মন্তব্যে অনেকটা নিজেদের রাজনীতিক উদ্দেশ্য রহিয়াছে। প্রত্যুত তাঁহারা বাস্তবকে একেবারেই অস্বীকার করিতে চাহেন। ফলত উন্নয়ন-প্রয়াস যে কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছে, এ সত্য কোনক্রমেই অস্বীকার করা চলে না; কিন্তু সে সাফল্য অনেকটা উপরভাসা রকমের। এই প্রচেষ্টা জাতির মর্মমূলকে স্পর্শ করিয়া সামগ্রিক রকমে প্রাণশক্তি উজ্জীবিত করিয়া তুলিতে সমর্থ হয় নাই। অথচ সাফল্যের অভিমুখে উন্নয়ন প্রয়াসের পরিণতি ও গতির দ্রুততা ইহার উপরই নির্ভর করে। সুতরাং উন্নয়ন প্রচেষ্টার আংশিক সাফল্যে উল্লসিত হইবার কিংবা আত্মশ্লাঘা লাভ করিবার মত কারণ এখনও দেখা দেয় নাই। এই প্রচেষ্টার পরিপূর্ণ এবং সর্বাঙ্গীন সাফল্য লাভ যত দিন না হইতেছে ততদিন বিশেষ নিষ্ঠা, তৎপরতা এবং দৃঢ়তার সঙ্গেই ইহাকে পরিচালিত করিতে হইবে। এজন্য দেশের জনসাধারণের মধ্যে সংহতি গড়িয়া তোলা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বিশেষ কোন মতবাদের সূত্র ধরিয়া এই কাজে অগ্রসর হইলে ভুল হইবে। প্রকৃতপক্ষে বর্তমান অবস্থা হইতে দেশবাসীর আর্থিক অবস্থার উন্নয়ন, তাহাদের দারিদ্র্য মোচন, শিক্ষার সম্প্রসারণের যে নীতি বাস্তব সম্পর্কে কার্যকর তাহাই অবলম্বন করিয়া সংকল্পশীলতার সঙ্গে অগ্রসর হইতে হইবে। দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার ফলে আমাদের সমাজ-জীবনে শোষণনীতির যে সব গ্রন্থি সৃষ্টি হইয়াছে, সেগুলির উচ্ছেদসাধন করিতে হইবে, এইভাবে পরগাছাগুলি কাটিয়া পরিষ্কার করিয়া জাতির প্রাণশক্তির অবাধে অভিব্যক্তির পথ প্রশস্ত করা প্রয়োজন। বলা বাহুল্য আমাদের লক্ষ্য এখনও দূরেই রহিয়াছে এবং এই কয়েক বৎসরে আমরা যেটুকু আগাইয়া গিয়াছি, তাহা খুবই সামান্য। ফলত গর্ব করিবার মত কিছু নয়।

ভারতের সাংস্কৃতিক শক্তি

বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ সি পি রামস্বামী আয়ার সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করেন। এই সংস্কৃতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করিয়া তিনি বলেন, পরমত-সহিষ্ণুতা, উদারতা এবং অপরের গুণ-গ্রাহিতার শক্তি ভারতের সংস্কৃতিতে যুগে যুগে প্রাণবল সঞ্চার করিয়াছে। তাঁহার অভিমত এই যে, ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতির বিচার করিতে গিয়া অনেকেই বিগত দুইশত বৎসরের ঐতিহাসিক তথ্যরাজীই বড় করিয়া দেখেন। কিন্তু এই সময় ভারত সম্পূর্ণ নির্বীর্য হইয়া পড়ে এবং তাহার সংস্কৃতির শক্তি অভিভূত হয়; সুতরাং এই যুগের ঐতিহাসিক বিচারের দ্বারা ভারতের সংস্কৃতির স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। ডাঃ রামস্বামীর এই অভিমতের যৌক্তিকতা আমরাও স্বীকার করি। প্রকৃতপক্ষে বিগত ২ শত বৎসরে ভারতের প্রাণশক্তি বহিরাগত শক্তির প্রভাবে আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেও তাহা লুপ্ত হয় নাই। প্রত্যুত সে সংস্কৃতি আত্মস্থ হইয়া পুনরায় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জাগরণের সন্ধিক্ষণেই ভারত স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতার উন্মুক্ত প্রতিবেশে এই সংস্কৃতি বিশ্বমানব-সভ্যতার মূলে নূতন শক্তি সঞ্চার করিবে, ভারতের সাধক, তত্ত্বদর্শী এবং মনীষিগণ এই আশা প্রকাশ করিয়াছেন। বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দের কণ্ঠে উদ্দীপনাময়ী তেমনই বাণী উদ্গীত হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সংস্কৃতি বহুদিনের প্রাচীন হইলেও ইহার প্রাণমূলে তারুণ্যের বল রহিয়াছে। সেই তারুণ্য-প্রভাবে এই সংস্কৃতি বহু বাধা বিপর্যয় অতিক্রম করিয়া অভিনব শক্তিতে পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে আয়ত্ত করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে। উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সেদিন ভারতীয় সংস্কৃতির এই স্বরূপের কথাই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, কোন

ধর্মকে চিরন্তন করিয়া তুলিতে হইলে তাহার মধ্যে তারুণ্যের প্রাণসম্পদ থাকা আবশ্যক এবং পরিবর্তনশীল অবস্থার উপযোগী করিবার শক্তি থাকিলে তবে ধর্মের স্থায়িত্ব লাভ করে। ভারতের সংস্কৃতি বলিতে আমরা এই ধর্মকেই বুঝি। বাস্তবিকপক্ষে বিভিন্ন ধর্ম-সংস্কারকে আত্মস্থ করিয়া লইয়া ভারতীয় সংস্কৃতি বা ভারতের ধর্ম গড়িয়া উঠিয়াছে এবং ভারতীয় সংস্কৃতির সে শক্তি আজও বিলুপ্ত হয় নাই।

কম্যুনিস্টবাদ ও পুঁজিবাদ

আচার্য বিনোবা ভাবে মহাত্মা গান্ধীর আদর্শে একনিষ্ঠ পুরুষ। গান্ধীজীর জীবনের সামাজিক আদর্শের বর্তিকা ঊর্ধ্বে ধরিয়া তিনি আজও পরিব্রাজকের মত ভারতের গ্রাম পথে পথে ঘুরিতেছেন। সেদিন বিহারে একটি বক্তৃতায় ভাবেজী কম্যুনিস্ট মতবাদ এবং পুঁজিবাদ একই গোত্রের জিনিস, এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। এই দুইটি মতবাদ পরস্পর বিরোধী ইহাই লোকে জানে, ভাবেজী এই দুইয়ের মধ্যে ঐক্য দেখাইয়াছেন। তাঁহার এইরূপ অভিমত অনেকের কাছে আশ্চর্য মনে হইবে। কিন্তু আচার্য বিনোবা ভাবে কোন মতবাদের লঘুভাবে বিচার করিবেন, ইহা সম্ভব নয়। বিশেষ মতবাদকে নিন্দা করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি নিন্দা করিবেন, রাজনীতিগত উপদলীয় এমন চক্রের ফেরে তাঁহার বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন হইবে ইহাও বিশ্বাস্য নহে। প্রকৃতপক্ষে সর্বোদয় সমাজের বিকেন্দ্রীকরণ নীতিতে এই সত্য ইতিপূর্বেই স্বীকৃত হইয়াছে। সুতরাং কথাটা নূতন নয়। এ-পক্ষে যৌক্তিকতা এই যে, পুঁজিবাদ যেরূপ মানুষকে যন্ত্রস্বরূপে পরিণত করে, কম্যুনিস্ট মতবাদের প্রভাবও ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের উপর সেইরূপ আড়ষ্টকর প্রভাবই বিস্তার করিয়া থাকে। উৎপাদনের শক্তিকে শাসন-নিয়ন্ত্রণাধিকারে প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীর হস্তে কেন্দ্রীভূত করিয়া কম্যুনিস্ট মতবাদ পুঁজিবাদেরই মত মানুষের ব্যক্তিত্বকে অভিভূত করিয়া ফেলে। প্রকৃতপক্ষে কোন গোষ্ঠীর হাতে অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করিবার শক্তি যদি কেন্দ্রীভূত হয় এবং সেই শক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করিবার ক্ষমতা জনসাধারণের না থাকে, তবে কেন্দ্রীয় শক্তি যতই সদিচ্ছামূলক হোক্ না কেন, কার্যত তাহা অনাচারের পথে প্রশ্রয় পাইবে ইহা নৈতিক সত্য। এইরূপ প্রতিবেশে শক্তির একাধিপত্যকে অব্যাহত করিবার জন্য চেষ্টা একদিকে যেমন শাসকগোষ্ঠীর লক্ষ্য হইয়া দাঁড়ায়, সেইরূপ জনসাধারণের মধ্যেও তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবার আশঙ্কা ঘটে। ফলত, কম্যুনিস্ট মতবাদ মানুষের সমাজ জীবনের সমস্যাসমূহের সর্বাঙ্গীণ-ভাবে সমাধান করিতে সমর্থ হয় নাই—ভীতি এবং আশঙ্কার পথেই অনিশ্চিত অব্যবস্থিত তাহার রীতি এবং গতি চলিয়াছে। রাশিয়ার সোভিয়েট নীতি সর্বময় কর্তৃত্বে কঠোরহস্তে পরিচালিত হইয়াও স্বাভাবিক শক্তিতে এ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই। পরন্তু সোভিয়েট নীতিতে নিষ্ঠাবান্ নেতৃবৃন্দকে দফায় দফায় উৎখাত করিয়া সেখানে প্রতিক্রিয়ার আশঙ্কা দমিত রাখিতে হইতেছে।

সামাজিক উন্নতির ধারা

সম্প্রতি লক্ষ্ণৌতে বিশ্ব স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানের অধিবেশনে উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত কানাইয়ালাল মুন্সী জাতির উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সমাজ সেবার উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। সমাজ সেবার ধারাটি কিরূপ হইবে তৎসম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মুন্সী বলেন, ব্যক্তি জীবনে যাহাতে নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক আদর্শ উদ্দীপ্ত হয় এবং সমগ্রভাবে পারিবারিক সূত্রে প্রীতির প্রতিবেশ গড়িয়া উঠে সমাজ-সেবার লক্ষ্য সেই দিকেই থাকা উচিত। বস্তুত সমাজ-সেবার মূলে এই যে আদর্শ, বর্তমানে সে বস্তু দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। আধুনিক সমাজ-সেবার ধারা অপেক্ষাকৃত রাজনীতিক মতবাদের ধারা ধরিয়া বিশেষ কোন দলের রাজনীতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠারই ঝোঁকের মাথায় পরিচালিত হইতেছে। ইহার মধ্যে সাময়িক উত্তেজনা এবং উদ্দীপনাই কিছু থাকে; কিন্তু নৈতিক আদর্শ উপদলীয় প্রচারকার্যের পাকচক্রে চাপা পড়িয়া যায়। কোন জাতির শক্তি এইরূপ ভিত্তির উপর দৃঢ়ভাবে গড়িয়া উঠিতে পারে না, পরন্তু জাতি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া দুর্বল হইয়া পড়ে এবং নানা রকমের সংকীর্ণ মনোবৃত্তি সমাজ-জীবনের সুষ্ঠু অভিব্যক্তির পথে অন্তরায় হইয়া দাঁড়ায়। রাজনীতিক বোধের জাগরণের প্রয়োজন সমাজ-জীবনে রহিয়াছে, একথা আমরা অস্বীকার করিতেছি না; কিন্তু রাজনীতিক সাধনার মূলে মানবোচিত গুণরাজীর বিকাশের প্রেরণা যদি না থাকে, তবে কোন জাতির পক্ষেই তেমন রাজনীতি কল্যাণকর হইতে পারে না। প্রত্যুত রাজনীতি গোষ্ঠীগত শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষের স্বার্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হইয়া পড়ে। এই পথে নূতন রকমের এক আভিজাত্যের ভার সমাজের উপর আপতিত। এই অবস্থা প্রকৃত স্বাধীনতার সম্পূর্ণই পরিপন্থী। ভারতীয় রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ আশীর্বাদম তাঁহার অভিভাষণে এই বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে গান্ধীজী যে আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রাম পরিচালিত করিয়াছিলেন, তাহা আজও সিদ্ধ হয় নাই। আমরা রাজনীতিক স্বাধীনতা লাভ করিয়াছি সত্য, কিন্তু নৈতিক আদর্শে সমাজ-জীবনের সমুন্নতির দিকটা নিতান্তই উপেক্ষিত হইতেছে। সামাজিক ক্ষেত্রে অন্যায়, অবিচার, পারস্পরিক বৈষম্য, বিরোধ প্রভৃতি দুষ্প্রবৃত্তি বাড়িয়া চলিয়াছে। অথচ আমাদের সমাজ যদি এই সব পাপ হইতে মুক্ত না হয়, তবে স্বাধীনতার কোন মূল্যই থাকে না। প্রকৃতপক্ষে সমাজ-চেতনার মূলে যদি ত্যাগ এবং নিঃস্পৃহ সেবার আদর্শ সমগ্রভাবে আমাদের রাষ্ট্র-সাধনাকে সবল এবং সংহত করিয়া না তোলে তাহা হইলে গান্ধীজীর দোহাই দিয়া রাজনীতির আসর জমাইয়া তুলিবার চেষ্টা আমাদের পক্ষে আত্মবঞ্চনাতেই পর্যবসিত হইবে। দুই দিনের মান, যশ প্রতিষ্ঠার চমক দেশকে বড় করিতে পারিবে না, বৃহৎ ভাবনা বৃহতের সাধনা তো দূরের কথা।

বৈদেশিকী

আজ, সোমবার ২৭এ ডিসেম্বর, এই
্রবন্ধ লেখা হচ্ছে। ফরাসী পার্লামেণ্টে
র্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবের
পর আজ আবার ভোট হবার কথা। গত
ক্রবার ঐ প্রস্তাব ২৮০—২৫৯ ভোটে
াতিল হয়েছিল। কিছুকাল পূর্বে লণ্ডন
বং প্যারিসে নয় শক্তির মধ্যে যে-সব
ক্তি হয়েছিল সেগুলির মধ্যে কয়েকটা
রাসী পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত
য়েছে কিন্তু পশ্চিম জার্মানীর
ুনরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব অনুমোদিত
য়নি। পশ্চিমা শক্তিদের মৈত্রীর পক্ষে
বস্থাটা খুবই গুরুতর। পুনরায় যে
ভাট হবে তাতেও যদি ফরাসী গভর্ন-
ণ্ট জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের চুক্তি
াতিল করে দেয় তবে যে কী পরি-
স্থিতির উদ্ভব হবে বলা যায় না। তবে
শ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ তাতে
টকাবে না। শুক্রবারের ভোটের খবর
কাশিত হবার পরেই বৃটিশ গভর্ন-
ণ্টের পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে একটি
জ্ঞপ্তি প্রচার করা হয় যাতে ফ্রান্সকে
রণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, জার্মানীর
নরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা কোনোমতেই
খন আর আটকাবে না. তবে ফ্রান্স যদি
শক্তির চুক্তিগুলি অনুমোদন না করে
বে বৃটেন য়ুরোপে যে সৈন্য বাহিনী
খার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা পালন
রতে সে বাধ্য থাকবে না। এর অর্থ হচ্ছে
জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ হবেই,
ন্তু বৃটিশ সৈন্য বাহিনী য়ুরোপে
বস্থান না করতেও পারে। বলা বাহুল্য,
টা ফ্রান্সের পক্ষে আরও ভয়াবহ
াপার। বৃটিশ সৈন্যবাহিনী য়ুরোপে
াকলে তবু জার্মানদের দিক থেকে
য়ের কারণটা কিঞ্চিৎ কম হয়, তা না হলে
জার্মানরা যে আবার দেখতে দেখতে
র্বেসর্বা হয়ে উঠবে! EDC পরি-
কল্পনায় য়ুরোপে স্থায়ীভাবে বৃটিশ
সৈন্যবাহিনী রাখার দায়িত্ব বৃটিশ গভর্ন-
মণ্টের ছিল না। EDC ফরাসী পার্লা-

মেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হয়নি। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নূতন প্রতিশ্রুতি দানের ফলে লণ্ডন ও প্যারিস চুক্তি ফরাসী পর্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হবে, এটা অনেকে আশা করেছিলেন। তাঁদের নিকট গত শুক্রবারের ফরাসী পার্লামেণ্টের ভোট অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত লেগেছে। ফরাসী প্রধানমন্ত্রী মঃ মেঁদে-ফ্রান্সের অবস্থাও বেশ দুশ্চিন্তাজনক। নয়শক্তির চুক্তির পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত শর্ত যদি ফরাসী পার্লামেণ্টের ভোটে পুনরায় বাতিল হয় তবে মঃ মেঁদে-ফ্রান্স পদত্যাগ করতে পারেন। তিনি ব্যাপারটাকে তাঁর প্রতি পার্লামেণ্টের আস্থার বিষয় করে তুলবেন বলে শুনা যাচ্ছে।

এদিকে রুশিয়া ফ্রান্সকে লক্ষ্য করে বলছে যে বৃটেন ফ্রান্সের উপর অন্যায় চাপ দিচ্ছে। ইঙ্গিত হচ্ছে—এরূপ বিদেশী চাপ ফ্রান্সের বরদাস্ত করা উচিত নয়। অবশ্য এর আগে নিজের দিক থেকেই রাশিয়া ফ্রান্সের প্রতি একটা হুমকি ছেড়েছে। সেটা হচ্ছে এই যে, ফ্রান্স যদি পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের চুক্তি অনুমোদন করে তবে রাশিয়া এবং ফ্রান্সের মধ্যে যে মৈত্রী চুক্তি আছে তা ভেঙ্গে যাবে। (রাশিয়া বৃটিশ গভর্নমেণ্টের নিকটও অনুরূপ সতর্কবাণী প্রেরণ করেছিল) ফরাসীরা যে কী করবে ভেবে পাচ্ছে না। জার্মানরা আবার অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে উঠবে, একথা চিন্তা করলেই ফরাসীদের আতঙ্ক হয়। কিন্তু পশ্চিমা শক্তিদের জোটের আশ্রয়চ্যুত হবার সাধ্যও ফ্রান্সের নেই। এতদিন টালবাহানা করে চলেছে। কিন্তু এইবার বিষম মুশকিল। কারণ লণ্ডন ও প্যারিসের চুক্তি ফরাসী পার্লামেণ্ট অনুমোদন না করলেও পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ আটকে থাকবে না। খুব সম্ভবত পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের প্রাথমিক কাজ ইতিমধ্যেই আরম্ভ হয়ে গেছে। ফ্রান্স যদি প্যারিস ও লণ্ডন চুক্তির পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত ব্যবস্থার অনুমোদন না করে তবে উক্ত চুক্তির অন্যান্য যে-সব শর্ত আছে সেগুলির বাঁধনও অনেকটা আলগা হয়ে যাবার সম্ভাবনা। ফলে জার্মানী আরো বেশি আলগা পাবে, এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্বে ফরাসী পার্লামেণ্ট যখন EDC পরিকল্পনা অনুমোদন করতে চায়নি তখন আমেরিকা খুব চটেছিল এবং জার্মানীর সঙ্গে একলা ব্যবস্থা করার ভয় পর্যন্ত দেখিয়েছিল। অবশ্য সেটা মোটেই সহজ নয়। ফ্রান্সকে বাদ দিয়ে পশ্চিমা শক্তি জোট ঠিক রাখা সম্ভব নয়। কেবলমাত্র য়ুরোপের জন্যই ফ্রান্সের সহ-যোগিতা প্রয়োজনীয় নয়, আমেরিকার 'global strategy'র খাতিরে পৃথিবীর আরো অনেক জায়গায় ফ্রান্সের সহযোগিতা আবশ্যক। ইন্দোচীন, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং আরো অনেক ফরাসী ঔপনিবেশিক অঞ্চল মার্কিন "global stratagy"র সঙ্গে সংযুক্ত। অন্যদিকে অবশ্য মার্কিন গভর্নমেণ্টের সমর্থন না পেলে আজ অনেক জায়গা থেকেই ফরাসীদের পাত-তাড়ি গোটাতে হোত। ফরাসী দুর্বল, মার্কিন প্রবল, কিন্তু প্রবল যখন দুর্বলের উপর ভর করে তখন সে দুর্বলকে একেবারে ভেঙ্গে পড়তে দিতে পারে না। ফলে, দুর্বলেরও প্রবলের উপর এক ধরনের জোর খাটানোর সুযোগ হয়। দুর্বল যখন বলে, "এই আমি গেলাম!" তখন দুর্বলকে শাসন না করে সে যা চায় তাই দিয়ে তাকে লালন করতে হয়। এই জন্যই ফ্রান্সের উপর চটে আমেরিকার যা-খুশি করার সাধ্য নেই। এমন কি, এবার মার্কিন সরকার কোনো হুমকি পর্যন্ত দেননি, ফরাসী পার্লামেণ্টের দ্বিতীয়বার ভোটের জন্য এই আশা নিয়ে অপেক্ষা করছেন যে, গত সপ্তাহের সিদ্ধান্ত ফরাসী পার্লামেণ্ট পাল্টে দেবেন। যদি তা না হয়, তাহলে কূটনৈতিক পরিস্থিতি কোন্ রূপ নেবে বলা কঠিন।

তবে আসল ব্যাপার যা তার গতিতে বিশেষ কিছু অদল-বদল হবে বলে মনে হয় না। পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা বোধহয় যেমন স্থির হয়েছে তেমনি চলবে। ওদিকে রাশিয়ার হুকুমে পূর্ব জার্মানীতেও অস্ত্রসজ্জা চলছে। কিন্তু তাই বলে যুদ্ধ আসন্ন হয়েছে এরূপ আশঙ্কা করারও কোনো হেতু নেই। বলা বাহুল্য, যতদিন না পর্যন্ত জার্মান বাহিনী বেশ ভালোরকম গ'ড়ে না [illegible] ততদিন যুদ্ধ যাতে না লাগে সেট জার্মানদেরই গরজ হবে। অন্যপক্ষে জার্মান রণশক্তি আবার সংহত হলে সমগ্র য়ুরোপীয় পরিস্থিতির একটা মৌলিক পরিবর্তন হবে। জার্মানরা কোনো পক্ষের ক্রীড়নক হয়ে চিরকাল থাকবে, এটা ভাবা বাতুলতা মাত্র। আবার জার্মানী এতো বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠবে যে, সে স্বেচ্ছামতো সোভিয়েট বা পশ্চিমা শক্তি-দের উপর জুলুম করবে সে সম্ভাবনাও নেই। তবে শক্তিশালী হয়ে উঠলে সে নিজেই হয়ত উভয়পক্ষের সঙ্গে সমতা রেখে চলার একটা পথ আবিষ্কার করবে। তথাকথিত "জার্মান সমস্যা"র সমাধান জার্মান শক্তির (কেবল সামরিক নয় অভ্যুত্থানের দ্বারাই সম্ভব। দুর্বল জাতি সমস্যা প্রবল জাতিরা মিটিয়ে দিতে পা[illegible] কিন্তু প্রবল জাতির সমস্যার সমাধা[illegible] তাকে নিজেই করতে হয়।

* * *

জাপানের ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী মি[illegible] যোশিদা ক্রমাগত অর্থনৈতিক দুর্নীতি প্রশ্রয় দিয়ে যে বদনাম কেনেন সেইটা শেষ পর্যন্ত তার পতনের প্রধান কার[illegible] হয়ে উঠে। তবে তাঁর অতিরিক্ত মার্কিন ঘেঁষা নীতিও যে তাঁর গদিচ্যুতির অন্যত[illegible] কারণ হয়ে উঠেছিল সে বিষয়েও সন্দে[illegible] নেই। জাপানীরা যে আর কেব[illegible] ওয়াশিংটন-মুখো হয়ে থাকতে চায় [illegible] তার প্রমাণ অনেক দিন থেকেই পাও[illegible] যাচ্ছিল। এমন কি, মিঃ যোশিদার মধ্যে[illegible] পরিবর্তনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল। মি[illegible] যোশিদার মন্ত্রিত্বকালেই চীন [illegible] সোভিয়েট রাশিয়া জাপানের [illegible] "স্বাভাবিক" সম্পর্ক স্থাপনের আগ্র[illegible] কথা বলে এবং প্রধানমন্ত্রী থাকতে থাক[illegible] মিঃ যোশিদা জাপানী পার্লামেণ্টের এ[illegible] সর্বদলীয় বে-সরকারী মিশনকে চ[illegible] যেতে অনুমতি দেন। এ'রা চীন [illegible] অত্যন্ত উৎসাহিত হয়ে ফিরে এসে[illegible] জাপানের পররাষ্ট্রনীতিতে একটা প[illegible] বর্তন আসন্ন সে বিষয়ে কোনো স[illegible] নেই। জাপান যেমন করে হোক, চী[illegible] সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্বন্ধ স্থাপন ক[illegible] আমেরিকা ঠেকাতে পারবে না।

২৭।১২।৫৪

ডঃ ওয়াই ডি শর্মা

ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় প্রত্নতত্ত্ব ভাগ আম্বালা জেলার রূপাড়ে কিছুকাল বং প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে নিযুক্ত য়েছেন। সম্প্রতি সেখানে খনন-কার্যের লে যেসব তথ্য উদ্ঘাটিত হচ্ছে তাতে ত্তর ভারতে, বিশেষত পাঞ্জাবে একাধিক স্কৃতির একটি ধারাবাহিকতা এবং রূপ ম্পর্কে অনেক কিছুই জানা যাচ্ছে। রপ্পা সভ্যতা থেকে মধ্যযুগ, খৃস্টপূর্ব হাজার বছর থেকে প্রায় আধুনিক কাল র্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন অধিকারের একটি তিহাস এই খননকার্যের ফলে আজ লাকচক্ষুর সামনে উদ্ভাসিত। ভারতীয় প্রত্নতত্ত্বের ইতিহাসে এই আবিষ্কার অনন্য-সাধারণ। কারণ ভারত ইতিহাসে যাকে তথাকথিত "অন্ধকার যুগ" (Dark age) বলে, অর্থাৎ হরপ্পা সংস্কৃতির শেষাবস্থা থেকে বুদ্ধের সমসাময়িক ভারতের প্রারম্ভিক-ঐতিহাসিক যুগ পর্যন্ত যে বিরাট অজ্ঞাত যুগ, রূপাড়ের আবিষ্কার এই দীর্ঘ যুগের ওপর আলোকপাত করেছে।

আজ থেকে তিরিশ বছর আগেও—ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কিত সকল পাঠ্য-বই শুরু হত আলেকজান্দারের ভারতাক্রমণ এবং মৌর্যবংশ স্থাপনের ইতিবৃত্ত থেকে। খুব বেশি হলেও, ঐতিহাসিক প্রমাণিত তথ্যগুলি বুদ্ধের জীবিত কাল পর্যন্ত প্রলম্বিত করা চলত। কাজেই "কেম্ব্রিজ হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়া" লেখার সময় (১৯২২ সালে প্রকাশিত) স্যার জন মার্শাল রাজগৃহের বিরাটাকার প্রাচীরগুলি ছাড়া প্রাচীন নিদর্শনের অবশিষ্ট হিসাবে যদি আর কিছু না চিন্তা করতে পেরে থাকেন তবে আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। এই নিদর্শনগুলিকে খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের বলে অনুমান করা হয়। যাই হোক, অনতিকাল পরেই দুজন বিখ্যাত এবং যোগ্য ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং রায় বাহাদুর দয়ারাম সাহনি হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদড়ো আবিষ্কারের পর, ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস দু'হাজার বছর পিছিয়ে গিয়েছে। কিন্তু এই ইতিহাসের গতি-পথও এক জায়গায় খণ্ডিত। খৃস্টপূর্ব ২ হাজার বছরের মধ্যভাগ থেকে এক হাজার বছরের মধ্যভাগ পর্যন্ত—অর্থাৎ হরপ্পা সভ্যতার অন্তিম অবস্থা থেকে

খৃষ্টজন্মের পরবর্তী সময়ের প্রাচীন বাড়িঘরঃ রূপাড়

বুদ্ধের সময় পর্যন্ত—এই যে দীর্ঘ এক হাজার বছর—এই বিরাট সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা চলে এমন কিছুই খুঁজে পাওয়া যায়নি। ফলে এই দীর্ঘ সহস্র বৎসর, তথাকথিত 'অন্ধকার যুগ' বলে যা পরিচিত তা ভারতীয় প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে এ-যাবৎ রহস্যময় হয়ে রয়েছে।

প্রাচীন ভারতের মৃৎ-পাত্রের ঐতিহ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণের পর আলোচ্য রহস্যের একটি সন্ধানসূত্র খুঁজে পাওয়া গেল। তক্ষশীলার বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ে কাজ করার সময় এক ধরনের উজ্জ্বল পাত্র পাওয়া যায়। এগুলির অধিকাংশই কৃষ্ণ বর্ণের। এবং পাত্রগুলি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। খৃস্টপূর্ব পঞ্চম ও তৃতীয় শতাব্দীতে আলোচ্য পাত্রগুলির খুব চলন ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকদের কাছে এগুলি উত্তর ভারতের কৃষ্ণ-উজ্জ্বল পাত্র বলে পরিচিত। প্রাচীন ঐতিহাসিক স্থানগুলির বহু জায়গায় এই পাত্রগুলি আবিষ্কৃত হয়। সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে পূর্বে পশ্চিমবঙ্গের গৌড় এবং দক্ষিণে অমরাবতীতেও এই রকম পাত্র পাওয়া গেছে। ঠিক এই সময় আর এক ধরনের মৃৎপাত্রের ঐতিহ্য আবিষ্কার হওয়ায় আর এক ধাপ অগ্রসর হওয়া গেল। এগুলি অতি সুন্দর ধূসর মৃৎপাত্র, কাল রঙের নক্সা আঁকা। খৃস্টপূর্ব দু'হাজার বছরের শেষাশেষি এই ধরনের পাত্রগুলির চল ছিল বলে অনুমান করা হচ্ছে। তারও আগেকার হলেও হতে পারে।

রূপাড়ে খননকার্যঃ সম্প্রতি আম্বালা জেলার রূপাড়ে যে খনন কার্য চালান হচ্ছে তাতে আরও এক ধাপ অগ্রসর হওয়া গেছে। কারণ এই খননকার্যের ফলে এ তথ্য আবিষ্কৃত হয়েছে যে, এখানে বিভিন্ন সংস্কৃতি একের পর এক দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেছে, একের পর অন্য একের ছায়া পড়েছে। একটি নিরবচ্ছিন্ন বিভিন্ন অধিকারের ধারা এখানে বর্তমান। হরপ্পা থেকে মধ্যযুগ পর্যন্ত সময়ের একটি ইতিহাস এই থেকে জানা যায়। বলা বাহুল্য আলোচ্য ইতিহাসের ধারাবাহিকতা এখানে ওখানে ব্যাহত। প্রচুর পরিশ্রমের ফলে এই ফাঁকগুলি ভরাট করে তুলতে হবে। কিন্তু উত্তর ভারতে একটির পর একটি সংস্কৃতি কিভাবে পর পর এসেছে তার ইতিহাস মোটামুটি ভাবে আজ আর অজানা নেই। বিস্তারিত এবং সুপরিকল্পিত অনুসন্ধান ও কাজের ফলে যথাসময়ে আজকের ফাঁক-থেকে-যাওয়া অংশগুলি নিঃসন্দেহে পূর্ণ হয়ে উঠবে।

রূপাড় ১ঃ সুবিধে এবং বোধগম্যতার জন্যে রূপাড়ের সুপ্রাচীন ইতিহাসকে পাঁচটি পর্বে ভাগ করা যায়। সর্বপ্রথম এখানে যে সভ্য মানুষ সম্প্রদায় বসতি স্থাপন করে তারা হরপ্পা সভ্যতার উত্তরাধিকারী। এরা স্বভাবতই, খৃস্টপূর্ব তিন হাজার বছর আগে শতদ্রুর উত্তরে হাজির হয়। সিন্ধু উপত্যকা থেকে যাত্রা শুরু করে নদীপথ ধরে তাদের যাত্রা। আর এই যাত্রার পথে পথে তারা শহর এবং গ্রাম স্থাপন করেছিল। বিকানীর মরুভূমির সরস্বতী এবং দৃশদবতী নদীর শুষ্ক তীরে আজও আমরা তার প্রচুর চিহ্ন খুঁজে পাই। এইভাবে চলতে চলতে শতদ্রু নদীর উত্তরে এসে পৌঁছোয় ওরা। কেবল মাত্র রূপাড়েই নয়, কাছাকাছি অন্যান্য জায়গাতেও। বিকানীর এবং রূপাড়ের মধ্যবর্তী ব্যবধানে তাদের যাত্রাপথের নিশানা খুঁজে বের করতে হবে, এখনও তা জানা যায়নি।

রূপাড়ের আশেপাশে, হরপ্পা সংস্কৃতি বাহকদের প্রায় বারোটি বসবাস কেন্দ্র

...পাওয়া গেছে। নদীটি যেখানে ...তল ভূমিতে দৃষ্টিগোচরে আসে, ঠিক ...ইখানটিতে রূপাড়ের অবস্থান। সামরিক ...ক দিয়ে রূপাড়ের এই অবস্থান গুরুত্ব-...র্ণ। ছবির মতন সুন্দরই শুধু নয় ...য়গাটি, উপরন্তু আক্রমণকারীদের ...গাল থেকে সুরক্ষিত। একমাত্র এই ...রণেই সম্প্রদায় পরম্পরায় রূপাড় ...ধিকৃত হয়েছে। বর্তমানে এখানে যে ৭০ ...ট উঁচু মাটির স্তূপ তার ৩০—৫০ ...ট নীচে হরপ্পা সংস্কৃতির ধ্বংসাবশেষ ...ড়ে রয়েছে। এর নিম্নাংশের স্তরে ...াভাবিক বালি এবং নুড়ি পুরু হয়ে ...মে রয়েছে। হরপ্পা সংস্কৃতিপুষ্ট ...প্রদায়ের জীবনযাত্রার অতি প্রয়োজনীয় জিনিসগুলির মধ্যে এখানে পাওয়া গেছে তাদের বিশিষ্ট ধরনের মাটির পাত্র, ব্রঞ্জের দ্রব্যাদি এবং বাসনপত্র, মাটির অলঙ্কার, পোড়ামাটির নানা জিনিস, সূক্ষ্ম অস্ত্র। পাত্রের মধ্যে আছে থালা, গোল কুঁজোর মত পাত্র, ডিম্বাকৃতি ফুলদানির অনুরূপ পাত্র, চ্যাপ্টা থালা, অল্পগভীর কড়াই, সচ্ছিদ্র অগ্নিবহনযোগ্য পাত্র, বিখ্যাত সিন্ধু দেশীয় পানপাত্র। এ ছাড়া আরও পাওয়া গেছে ছোট এক ধরনের পাথরের শিলমোহর। তিনটি প্রতীকী চিহ্ন খোদাই করা। সিন্ধু উপত্যকায় একদা ব্যবহৃত এই লিপিগুলি আজও পাঠোদ্ধার করা যায়নি।

রূপাড়ে পৌঁছে, হরপ্পা সংস্কৃতিপুষ্ট মানুষগুলি প্রথম প্রথম তাদের যে ঘর-বাড়ি তৈরি করে, প্রধানত সেগুলি সূর্য-তেজে শুকোনো ইট, নদীর নুড়ি ও কাঁকরের। আবর্জনাকে তারা বাড়ি তৈয়ারির মশলা হিসেবে ব্যবহার করত। আগুনে পোড়ান ইট তাদের অজানা ছিল না। আর এই ধরনের ইট কাজে লাগাতেও তাদের দেরি হয় নি। রূপাড় খনন কার্য তাদের গৃহ নির্মাণের চারটি পর্যায় আবিষ্কার করেছে। আরও পর্যায় থাকতে পারে; কিন্তু যতটুকু এলাকা ঘিরে খনন-কার্য অগ্রসর হচ্ছে তার মধ্যে আর কিছু পাওয়া যায় নি।

রূপাড় ২ঃ খৃস্টপূর্ব দু'হাজার বছরের মাঝামাঝি হরপ্পার লোকেরা
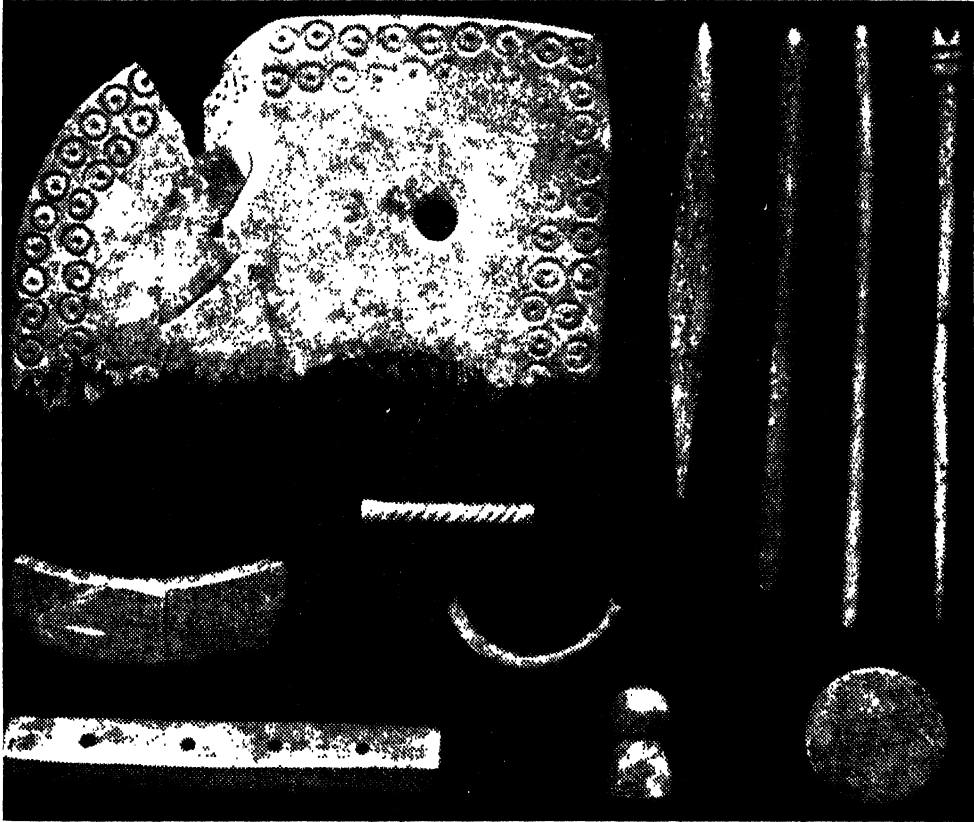
হাড় এবং হাতীর দাঁতের তৈরি জিনিস
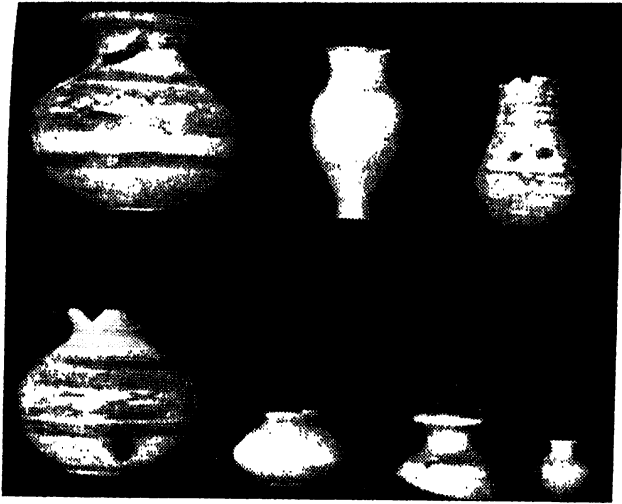
হরপ্পা আমলের বিভিন্ন ধরনের পাত্র

রূপাড় ছেড়ে চলে যায়। কেন এবং কি অবস্থায় তা বলা মুশকিল। এরপর বেশ কিছুকাল রূপাড় বসতিহীন হয়ে পড়ে থাকে। খৃস্টপূর্ব দু' হাজার বছরের শেষাশেষি অন্য আর এক সম্প্রদায়ের লোকেরা এখানে এসে বসতি শুরু করে। যারা নতুন এল তারা তথাকথিত ধূসর নক্সা-খচিত মৃৎপাত্র ব্যবহার করত। এই মৃৎ-পাত্রগুলি অতি সুন্দর ধূসর বর্ণের, বিশেষ ধরনের কালো নক্সা তার গায়ে আঁকা। পাঞ্জাব এবং উত্তর প্রদেশের পশ্চিম অংশে বহু জায়গায় এরকম পাত্র পাওয়া যায়। যাই হোক, রূপাড়ে নতুন যে সম্প্রদায়টি এল নির্দিষ্টভাবে তাদের পরিচয় জানার কোন সূত্র এ যাবৎ পাওয়া যায়নি। কিন্তু এমন লক্ষণেরও অভাব নেই যাতে ওদের প্রথম আর্য বলে মনে করা না-যেতে পারে। সম্ভবত ওরা প্রথম আর্য। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এদের গৃহাদি নির্মাণের কোন চিহ্নই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এমন অবস্থায়, তারা কি কি ধরনের গৃহে বাস করেছে তা বলা মুশকিল। তবে একথা সম্ভবত সত্য যে এই আগন্তুকদের সভ্যতা—স্বরূপ প্রকাশে তা যতই কেননা ক্ষীণ হোক—ভারত ইতিহাসের 'অন্ধকার যুগ' নামক

আবর্জনা সঞ্চয়ের কূপ

শূন্যতাকে পূর্ণ করছে। সংস্কৃতির পারম্পর্য রক্ষায় রূপাড় তার যথার্থ স্থান অধিকার করে আছে।

রূপাড় ৩ঃ খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত রূপাড় নক্সাকাটা ধূসরপাত্র নির্মাতাদের বাসভূমি ছিল। এরপর শহরটি তারা ছেড়ে যায়। অল্পকাল পরে প্রায় খৃস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে শহরটি আবার অন্য সম্প্রদায়ের অধিকারে আসে। এ যুগের মৃৎশিল্পের একটি পরিচিত রূপ উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ-উজ্জ্বল পাত্র। সভ্যতা তখন দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে ব্রঞ্জ ছাড়াও মানুষ তখন লোহার ব্যবহ শিখেছে। ছাপ দেওয়া মুদ্রার প্রচল হয়েছে। এই যুগ, আনুমানিক খৃস্টপূ ষষ্ঠ শতক থেকে দ্বিতীয় শতক উত্তরাং মৌর্য শাসন প্রত্যক্ষ করেছে। মৌ কারুকলায় যে অসামান্য দক্ষতা অর্জি হয়েছিল তার প্রমাণস্বরূপে রয়েছে দেব মূর্তি খোদাই করা পাথরের একটি সু চক্র। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য দ্রব্যের মধ্যে রয়েছে দৈনন্দিনের ব্যবহার্য হাড় এ হাতীর দাঁতের জিনিসপত্র—যেমন চিরুণি চুলের কাঁটা, পোড়ান মাটির পুতুল হাতীর দাঁতে তৈরি একটি শীলমোহ ব্রাহ্মী অক্ষরে লেখা আছে, ভাদপালকাশ

অনুমিত হচ্ছে, এই যুগের মাঝামা সময়ে ১২ ফুট চওড়া ইটের একটি দেওয়াল তোলা হয়েছে। দেওয়ালে আড়ালে যে কী আছে তা গোচরে আ কঠিন। কারণ সেই অন্তরালবর্তী কাঠামোর বেশির ভাগ অংশটাই বর্তমান শহরের অভ্যন্তরে। তা ছাড়া দেওয়ালের আড়ালে যা ছিল, আজও তার অবশিষ্টাংশ আছে কিনা কে জানে। দেওয়ালের দুটি প্রান্ত আজও দেখা যায়। বে ভাবে তা প্রসারিত। মনে হয় দেওয়ালটি গঠন পরিকল্পনা ছিল ডিম্বাকৃতি এ যুগের একেবারে শেষাশেষি নগর জীবনের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট পয়ঃপ্রণালীর অপূর্ব ব্যবস্থা। নগর বাসীরা তাদের গৃহের আবর্জনা এবং নর্দমার নোঙরা জল পোড়ান মাটির চাক দিয়ে গাঁথা গভীর গর্তে ফেলে দিত। গর্তটি ভরাট হয়ে গেলে, পাশে নতুন একটি গর্ত খোঁড়া হত। রূপাড়ে এই

ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহারযোগ্য রূপোর বাসনপত্র

ানের আবর্জনা ফেলার অনেকগুলি কূপ িবিষ্কৃত হয়েছে।

রূপাড় ৪ঃ মৌর্য বংশের শেষে শুঙ্গ বংশের অভ্যুত্থান। শুঙ্গদের বিশিষ্ট শিল্প রীতি, বিশেষত তাদের আমলের অপূর্ব সুন্দর পোড়ামাটি শিল্প শুঙ্গদের উৎকৃষ্ট পরিচয় বহন করছে। আনুমানিক খৃস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী থেকে ৬০০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তাদের অধিকার বজায় ছিল এবং এ সময়ের কিছু পোড়ামাটি শিল্পের কাজ রূপাড়েও মৃত্তিকাভ্যন্তরের নিম্নস্তরে পাওয়া গেছে। প্রাপ্ত শিল্প কাজগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, দিব্যআভা এবং দিব্যাঙ্গ যক্ষী মূর্তি। এ যুগের ধর্মবিশ্বাসের প্রতীক এই যক্ষী মূর্তি। মুদ্রা যা পাওয়া গেছে তাতে ভারতীয় এবং গ্রীকদের মধ্যে যোগাযোগ ঘটেছিল বলে বোঝা যায়। অন্য একটি উল্লেখযোগ্য জিনিস যা পাওয়া গেছে তা দ্বিতীয় অ্যাপোলোডোটাসের মুদ্রা থেকে তৈরি মাটির একটি ছাঁচ। তা ছাড়া এখানে বিক্ষিপ্ত কুশান নৃপতিদের কিছু মুদ্রা, ছয় শতর বেশি তাম্র মুদ্রা পাওয়া গেছে। তাম্র মুদ্রার অধিকাংশই বাসুদেবের। রূপাড় যে গুপ্ত শাসনের আওতায় এসেছিল তার প্রমাণ হিসেবে রয়েছে প্রথম চন্দ্রগুপ্তের একটি সুবর্ণমুদ্রা। এর চেয়েও বুঝি উল্লেখযোগ্য হল কিছু মাটির শীলমোহরের ছাপ, যা প্রাচীন লিপি বিচারে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর বলে মনে হয়।

মাটির পুতুল : পুড়িয়ে নেওয়া হত

গুপ্ত যুগের পোড়ামাটি শিল্পের উদাহরণ এখানে বেশি নেই। কিন্তু বীণা বাদ্যরতা এক তরুণীর অপূর্ব সুন্দর একটি পোড়ামাটির মূর্তি এখানে পাওয়া গেছে। গুপ্ত শিল্পকলার দক্ষ কারি-গরিতার আর এক উৎকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া গেছে ধর্মানুষ্ঠানে ব্যবহার্য রূপোর এক সেট বাসনপত্রে। এই সময়, সম্ভবত অল্প কিছুকাল অনুপস্থিতির পর রূপাড়ের অধিবাসীরা স্তূপটির দক্ষিণ দিকে সরে যায়। বর্তমান শহর দক্ষিণেই অবস্থিত। এখানে খননকার্যের ফলে অষ্টম থেকে দশম শতাব্দীর সুনির্মিত ইটের বাড়ি আবিষ্কৃত হয়েছে।

রূপাড় ৫ঃ ১০০০ খৃস্টাব্দে সম্ভবত আর একবার এই অঞ্চল থেকে স্থানীয় বাসিন্দারা চলে যায়। কারণ স্তূপের উপরিভাগে যে ধ্বংসাবশিষ্ট পাওয়া যাচ্ছে

তা ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলে মনে হয়। স্তূপের উপরিভাগে বহু বর্ণবিশিষ্ট উজ্জ্বল পাত্র প্রচুর পাওয়া গেছে। এগুলিতে মুসলিম শিল্পের প্রভাব লেগেছিল। মোগলরা সাধারণত যে ছোট লাখাউরি ইট ব্যবহার করত, রূপাড়ে তা প্রচুর পাওয়া গেছে। বর্তমান শহরে রাস্তার প্রান্ত-অংশে এই ইট পুনরায় কাজে লাগান হয়েছে—তাও দেখা যায়। স্তূপের উপরিভাগ থেকে মোগল আমলের মুদ্রাও পাওয়া গিয়েছে। স্থানীয় লোকের মুখে কিম্বদন্তী এই যে, রূপাড়ের আগেকার নাম ছিল রূপনগর। মুসলমানরা যখন ভারতাক্রমণ সবে আরম্ভ করেছে সেই সময় রক্ষেশ্বর নামে এক রাজা এখানে রাজত্ব করতেন। তিনিই এই শহর নির্মাণ করে তাঁর পুত্র রূপ সেনের নামানুসারে শহরের নামকরণ করেন। এই কিম্বদন্তী সত্য হলেও হতে পারে, নাও পারে। কিন্তু এর মধ্যে তাৎপর্যময় সূত্র হল মুসলমান আমলের প্রথমভাগে রূপাড় শহর পুনরধিকৃত হয়।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সভ্যতা, পরম্পরায় কিভাবে দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে গেছে

একটি পোড়ামাটির মূর্তি

তার একটি স্পষ্ট রূপ রূপাড় ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। সূচনায় এই সভ্যতার মূল কেন্দ্রগুলি যেখানে ছিল এখন তা পশ্চিম পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত কিন্তু তার প্রসার যে অন্তত পক্ষে রূপাড় পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে ভারতের প্রায় অন্তঃস্থলে এসে পৌঁছেছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর আর্য সভ্যতা বিস্তারের সময় গঙ্গা-যমুনার মধ্যবর্তী ভূমিখণ্ডে যে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি ঘটে যায়—রূপাড় তার থেকে খুব বেশি দূরে নয়। যাই হোক, সাম্প্রতিক রূপাড় খননকার্যের দ্বারা সুপ্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ বিচ্ছিন্নতা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং তৎকালীন যুগের ভারতীয় সভ্যতা ও জাতীয় উত্থান-পতনের সম্পর্কে জ্ঞানলাভও সম্ভব হয়েছে। সুচিন্তিতভাবে একাদিক্রমে চেষ্টা এবং পরিশ্রম করে গেলে ইতিহাসের অন্যান্য বিচ্ছিন্ন অংশগুলিও যথাসময়ে উদ্ধার করা যাবে।

---

* মূল ইংরেজি প্রবন্ধের সচ্ছন্দ অনুবাদ। প্রবন্ধ লেখক ডঃ শর্মা রূপাড় খননকার্য পরিচালনা করছেন।

আলোচনা

"অবিস্মরণীয়"

সবিনয় নিবেদন,

'দেশ' পত্রিকার ২২ বর্ষ ৭ম সংখ্যায় প্রকাশিত 'অবিস্মরণীয়' কবিতাগুচ্ছের জন্যে সাধুবাদ। পরিকল্পনা অভিনব, সংকলনে শ্রম ও যত্ন স্পষ্ট। পুরোগামী এবং সমসাময়িকদের প্রতি রবীন্দ্রনাথ আরও কয়েকটি কবিতায় শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেছিলেন, মনে পড়ছে। তার মধ্যে দুটি—সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত' এবং নমস্কার (শ্রীঅরবিন্দ)—অত্যন্ত দীর্ঘ, সাময়িকপত্রের স্বল্প পরিসরে পুনর্মুদ্রণ হয়ত সম্ভব নয়, কিন্তু পাদটীকায় উল্লিখিত হলে ভাল হত। শেক্সপীয়র এবং কালিদাসের উদ্দেশে রচিত কবিতা ক'টিও অবিস্মরণীয়।

এছাড়া, বিভিন্ন রচনায়, কখনো সম্পূর্ণ গদ্য-নিবন্ধে, কখনো প্রসঙ্গত উল্লেখে, বিদ্যাসাগর বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ অগ্রজদের প্রতি কবিগুরুর অপরিসীম শ্রদ্ধা অকুণ্ঠ-ব্যক্ত। এগুলি বিভিন্ন গ্রন্থে ছড়ানো আছে, কিন্তু স্বতন্ত্র একটি গ্রন্থে সংগৃহীত হলে একটি মূল্যবান সংগ্রহ হত সন্দেহ নেই। বিশ্বভারতী বোধ হয় এ-কাজের ভার নিতে পারেন। ইতি। সন্তোষকুমার ঘোষ, দিল্লী।

"ছদ্মনাম"

মহাশয়,—গত ১৮ ডিসেম্বরের 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীসুশীল সামন্ত লিখিত **'ছদ্মনাম'** আলোচনাটি পড়লাম। সুশীলবাবু যে প্রত্যেক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় 'লেখক-পরিচিতি'র মাধ্যমে লেখকদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন তা খুবই উপযুক্ত। তবে চিঠি পড়ে মনে হয় তিনি শুধু 'ছদ্মনামে' যাঁরা লেখেন তাঁদেরই 'লেখক-পরিচিতি'র মাধ্যমে পরিচয় করিয়ে দেবার কথা বলেছেন—আমার মতে শুধু ছদ্মনামের লেখকরাই নয়, তার সঙ্গে বর্তমান বঙ্গ সাহিত্যের নূতন প্রতিভাবান লেখকদেরও পরিচয় করিয়ে দেওয়া উচিত। তাতে সকলের, বিশেষ করে প্রবাসী বাঙ্গালীদের বিশেষ উপকার হবে। ইতি—শ্রীসতীন্দ্রপ্রসাদ রায়, ভাগলপুর।

'নূতন ঘর' না 'বাপের বাড়ী'

মহাশয়,—১৪ই ডিসেম্বর তারিখের 'দেশ' পত্রিকার 'আলোচনা' স্তম্ভে 'নাইয়র' শব্দের অর্থ সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয়া সবিতা বসুর অভিমত পাঠ করিলাম। আমার মনে হয়, ইহাই ঠিক। কারণ, আমি শ্রীহট্টবাসী এবং শ্রীহট্ট জেলায় 'নাইয়র' শব্দটি এতই বহুল প্রচলিত যে ইহার বিকল্প প্রতিশব্দ কেহই ব্যবহার করেন বলিয়া শুনি নাই। শ্রীহট্ট অঞ্চলে বধূ নাইয়র যাইবে মানে শ্বশুর বাড়ী হইতে বাপের বাড়ী বা ভাইয়ের বাড়ী যাইবে। এবং বিবাহিতা মেয়ে নাইয়র আসিবে মানে শ্বশুর বাড়ী হইতে বাপ বা ভাইয়ের বাড়ী আসিবে। অবশ্য বিবাহিতা মেয়েরা শ্বশুর বাড়ী হইতে মামার বাড়ী ও নাইয়র যায়। কাজেই 'নাইয়র' মানে নূতন ঘর না বাপের বাড়ী এ বিষয়ে তর্কের অবকাশ আছে বলিয়া মনে হয় না। শ্রীহট্ট অঞ্চলে 'ভগবতীর আগমনী সঙ্গীতেও 'নাইয়র শব্দের উল্লেখ আছে। সর্বশেষ সবিনয়ে ইহাও স্বীকার করিতেছি যে, হিন্দি 'নৈহর' শব্দের সঙ্গে আমার পরিচয় নাই। ইতি—শ্রীরঞ্জিত পুরকায়স্থ, বাগরাকোট, ডুয়ার্স।

ভূদান-বিনোবা-ভারতবর্ষ

নিখিল সরকার

বিন্দু বিন্দু জলে সমুদ্র হয়। ভূদান যজ্ঞও তাই হয়েছে। অতি সামান্য সূচনা থেকে একটি মানুষের একক উদ্যোগ আজ বহু মানুষের সহযোগিতায় এক বহুধারা কূলপ্লাবী স্রোতের সৃষ্টি করেছে। লক্ষ কোটি দরিদ্র ভূমিহীনের মুখে তার কলধ্বনি। শুধু ভারতবর্ষে নয়, ভূদান-বিনোবা আজ বিশ্বের এক বিস্ময়কর সংবাদ। সেই সঙ্গে ভারত-ভূমিও আজ নতুন করে পৃথিবীর বিস্ময়। পৃথিবীর বিষ হাওয়া দূর হবে, সমস্ত মানুষের স্থায়ী কল্যাণের পথ উন্মুক্ত হবে, কোটি কোটি মানুষের প্রত্যাশা পূর্ণ হবে এমনি হাজার স্বপ্ন ভূদানকে ঘিরে। এর পরিণতির দিকে, বিনোবা-ভূদান এবং ভারতবর্ষের দিকে তাই দেশে দেশে মানুষের আজ পরম আগ্রহ।

ভূদান যজ্ঞ দান নয়,—যজ্ঞই। অধিকার, লোভ এবং হিংসার আহুতি। ভূমি ব্যবস্থা ভারতের পুরানো ব্যাধি। এর পূর্ণ মীমাংসা এতে আশা করা যায় না। এমন কি একদিক থেকে ভূমির বহুবিধ সমস্যার আংশিক মীমাংসাও হয়ত হয় না এতে। কিছু ভূমিহীন ভূমি পাবে সত্য। কিন্তু সংখ্যায় তারা বিপুল ভূমিহীনদের কত ভগ্নাংশ? বিনোবা স্থির করেছেন ১৫৭ সালের মধ্যে ভারতের পাঁচ লক্ষ গ্রামের অন্তত একজনের হাতে তুলে দেবেন তিনি পাঁচ একর জমি। ভারতের চাষযোগ্য জমির এক-ষষ্ঠাংশ মাত্র হস্তান্তরিত হবে এর ফলে। সুতরাং বোঝা যাচ্ছে সংখ্যা হিসাবে উল্লেখযোগ্য হলেও আসলে সমস্যার ব্যাপ্তির তুলনায় তা কত সামান্য। তাছাড়া শুধু ভূমিহীনের সমস্যা ভারতের কৃষি সমস্যা নয়। আরও আছে। জোতদার জমিদার, দরিদ্র অক্ষম চাষী, ভাগচাষী—বিলি-বন্দোবস্ত-আইন-নিরিখ কত কি? তাছাড়া আছে উৎপাদন বৃদ্ধি, চাষের উন্নয়ন ইত্যাদি আরও সহস্র প্রশ্ন। সুতরাং এটা ধরে নেওয়াই সঙ্গত, সাধারণ অর্থে ভূমি সমস্যার সমাধান বলতে যা বোঝায়—ভূদান তা নয়। বিনোবাও তা বলেননি। তবুও ভূদান যজ্ঞ চলেছে ভারতবর্ষে। কারণ মীমাংসা না থাকলেও এতে রয়েছে স্থায়ী মীমাংসার বিপুল সম্ভাবনা। আর তার ক্ষেত্র শুধু ভূমি নয়—ভূমিকে উপলক্ষ্য করে একদিকে এ প্রসারিত আরও বহুদূরে, সভ্যতার হৃদপিণ্ড পর্যন্ত। সেদিক থেকে ভূদান গভীর অর্থবহ।

পৃথিবীর আরও বহু সমস্যার মত মূলত আমাদের জমির সমস্যা অসাম্যের সমস্যা। বিরাট দেশের বিপুল জমির অধিকার মাত্র কয়েকজনের। প্রয়োজনের অতিরিক্ত জমি তাঁদের হাতে, বহুর হাত—রিক্ত, বাসের ভূমিটুকুও নেই তাদের। একটি গ্রাম হায়দরাবাদের। চাষযোগ্য জমি সেখানে তিন হাজার একর। লোক সংখ্যা

ভূদান পরিক্রমায় বিনোবাজী

তাই, তিন হাজার, সুতরাং মনে হয়—সুখী গ্রাম। কিন্তু ৬০০ ভূমিহীন চাষী পরিবার সেখানে। কারণ এই গোটা জমির মালিকানা ৯০ জনের হাতে। সুতরাং বোঝা যায় বিরাট অসাম্যের কারণে বিরোধ সেখানে স্বাভাবিক এবং হয়ত অনিবার্যও।

কিন্তু সত্যিই কি তাই? এই বিরোধ কি অনিবার্য? আর বিরোধ মানেই কি হত্যা, হিংসা, আক্রমণ প্রতি আক্রমণ? এ ছাড়া কি আর পথ নেই—বিনোবা ভাবছিলেন, এই বিরোধের কুরুক্ষেত্র হায়দরাবাদের তেলেঙ্গনার এক গ্রামে দাঁড়িয়ে। ১৯৫০-৫১ সালের তেলেঙ্গনা। এক দুঃস্বপ্নের স্মৃতি। তিন হাজার নরনারীর জীবন গেছে রাজাকর-কম্যুনিস্ট হত্যালীলায়। পঁয়ত্রিশ হাজার লোক তখন নিরাপত্তা ব্যবস্থা হিসাবে কারাগারে। দশ হাজার বর্গমাইল জুড়ে আশী লক্ষ নরনারীর জীবন ঘিরে এক বিভীষিকার রাজত্ব। হত্যা, ষড়যন্ত্র, লুণ্ঠন,—তেলেঙ্গনা তখন অরণ্য।

এইখানে নলগুণ্ডা জেলার এক গণ্ডগ্রামে, একদল আর্ত ভূমিহীনের সামনাসামনি দাঁড়িয়ে বিনোবা ভাবলেন। তিনি জানতে চাইলেন—কি চাই তাদের। উত্তর পেলেন, ভূমি আর শান্তি। ভূমিহীন ভূমি চায়, আর সেই সঙ্গে চায় শান্তি। কিন্তু পথ? যে পথে এরা এগিয়েছিল তার ব্যর্থতা আজ স্পষ্ট। ভূমি যেমনভাবে পাওয়া উচিত, তা পায়নি, পেলেও সে ভূমি রক্তের ছাপে অভিশপ্ত,—শান্তিহীন। তবে? বিনোবা দরখাস্ত লিখলেন নিজ হাতে, ওদের হয়ে। ৪০ একর উঁচু আর ৪০ একর নীচু জমি চাই। সরকারের কাছে আবেদন। কিন্তু পাঠানো হলো না। লেখা দরখাস্ত পড়েই রইল। নিজেই ছিঁড়ে ফেললেন টুকরো টুকরো করে। সরকার কেন? আইন কেন? মানুষের কাছে আইনের ক্ষমতা কি মানুষের চেয়েও বলীয়ান্? আইন কি মানুষের সম্মতির ভিত্তিতে নয়? বিনোবা ভাবলেন মানুষের আইন তো সামান্য সৌজন্য মাত্র—মানুষের আস্থা এবং স্বীকৃতির একটা লিপিবদ্ধ সঙ্কলন মাত্র। বইয়ের শেষ 'সমাপ্ত' কথাটির মাত্র। বই শেষ হলে তো—'সমাপ্ত'। শেষ না হওয়া বইয়ে এমন অন্তিম বিরতি তো হাস্যকর। আর যা যথার্থ সমাপ্ত, তার উল্লেখ না থাকলেই বা ক্ষতির কি। তিনি উপস্থিত গ্রামবাসীদের কাছে আবেদন জানালেন। শ্রীরামচন্দ্র রেড্ডী উঠে দাঁড়িয়ে জানালেন—১০০ একর জমি বিনা সর্তে দিতে রাজী তিনি। মানুষের শুভবুদ্ধির উপর আস্থা সত্য হলো। বিনোবা আলো দেখলেন। ১৯৫১ সালের ১৮ই এপ্রিল। হায়দরাবাদের নলগুণ্ডা জেলার পচন পল্লী গ্রামে একটি মানুষের গ্রহণ এবং দানে জন্ম হলো—দানও নয়, ভিক্ষাও নয়, ভূদান যজ্ঞের।

তারপর আরও অনেকে দিয়েছেন। মহামান্য নিজাম থেকে দীন চাষী। কে একজন ভূস্বামী দিয়েছেন দশ হাজার একর। তেলেঙ্গনার এক কৃষক তার ছিল এক একর। সেও দিল—এক গান্থা। তার মোট জমির আট ভাগের এক ভাগ। এক তেলেঙ্গনা থেকেই সংগৃহীত হলো ৩৫০০০ হাজার একর জমি। উত্তর ভারত ১ লক্ষ একর, বিহার ৩২ লক্ষ একর!

তথাকথিত জনপ্রিয় ধারায়—ইতিহাস চলছিল সর্বগ্রাসী মরুভূমির দিকে। তাকে থামতে হলো। ইতিহাস মানেই অতীতের চক্রমন নয়। রাশিয়ায় যদি ইতিহাস হয়—ভারতে নয় কেন? এক বৃদ্ধের নির্দেশে তাকে তাই গতি পরিবর্তন করতে হলো। তারপর বিনোবার পিছু পিছু সেই ধারা চলেছে আজও কাটা খাল ছেড়ে আদি ধারায়। গতি মানুষের মনের গভীরালোকের দিকে। তাই বলছিলাম ভূদান যজ্ঞ এদিক থেকে—অতি অর্থবহ। শুধু একটা ধারা নয় স্থায়ী গভীর সমুদ্রের সম্ভাবনা এতে।

হায়দরাবাদ থেকে—মধ্য ভারত, উত্তর ভারত হয়ে পূর্ব ভারতের সীমান্তে উপনীত হয়েছেন তিনি। প্রায় সাত হাজার মাইল পায়ে হেঁটে এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেছেন ষাট বছরের বৃদ্ধ বিনোবা। যেখানেই গেছেন তিনি স্বেচ্ছায় তাঁর পথ সাজিয়েছে জনসাধারণ। তোরণ গড়েছে, জয়ধ্বনি দিয়েছে প্রণাম নিবেদন করেছে। ভূমি-প্রণামী। এই সম্মান কি ভিক্ষুকের?

ভিক্ষুকের এই সম্মান নয়। ভিখারীকে দেওয়ায় থাকে করুণা। কিন্তু এতো সম্মান। তবুও লোকে দিচ্ছে কারণ এটা দাবী। জমি ভগবানের আলো-হাওয়ার মত মাটিও তাঁর। জল চাইতে যদি ভিক্ষা না হয় মাটি চাইলে হবে কেন? সুতরাং আত্মাবমাননার সম্ভাবনা এতে নেই। যিনি চাইছেন—তাঁর চাওয়া দাবী। যিনি দিচ্ছেন তাঁর দান সেই দাবীর স্বীকৃতি। অস্বীকৃতি থেকে বিরোধ এই স্বীকার থেকে তার নিষ্পত্তির সূচনা। বিনোবাও তাই বলেন। তিনি বলেন—"দান অর্থই সমবিভাগ।—"দানং সমবিভাগঃ। ভূমিহীনদের উপকার করিব এই ভাব হইতে নয়—তাহাদের ভূমিতে অধিকার আছে এই ভাব হইতে দান করিতে হইবে।" তাই তিনি দাবী করেন—"তোমার চার পুত্র থাকলে আমি পঞ্চম পুত্র। আমার ভাগ, জনতার ভাগ দাও।" কম্যুনিস্ট লুঠে নিতে পারে, সরকার আইন করে নিতে পারে, সুতরাং "আমিও লুঠ করতে এসেছি,—তবে প্রেমে।" প্রেমের মধ্যে মানুষের জন্ম, প্রেমে মানুষ লালিত, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই প্রেম-ই তার শ্রেষ্ঠতম বাঞ্ছা—বিনোবার স্থির বিশ্বাস। সুতরাং তিনি প্রেমের শক্তিতেই আস্থাবান। দেখা গেল বিনোবার আস্থা চোরাবালির উপর নয়। গত তিন বছরের ভূদান যজ্ঞের ব্যাপ্তি অন্ততঃ তাই বলে।

যাঁরা অঙ্কের হিসাব মিলিয়ে যজ্ঞের বিচার করেন তাঁরা বলেন,—বিনোবা ভ্রান্ত। অধিকার চ্যুতির পরমক্ষণে জমিদার স্বভাবতই সামান্য কিছু দেবে হয়তো। কিন্তু সে তো পরিবর্তন নয়। সেতো শান্তির মূল্য। ভোগকে স্থায়ী করবার চেষ্টায় সামান্য খয়রাতি। তেলেঙ্গনার পটভূমিকায় এ হয়তো হতে পারতো। কিন্তু এই তেলেঙ্গনা থেকে বহু দূরে—বিহারে? তাছাড়া শুধু জমিদার ভূস্বামী নয়, দরিদ্র চাষীর দান—তার কি কোন অর্থ নেই?

সবাই দিচ্ছে। সামান্য হোক্ বেশী হোক্ সকলেই যোগ দিচ্ছে এতে। এর নিশ্চয়ই তাৎপর্য আছে। জমি যা পাওয়া গেল—তা বিলি হচ্ছে। গ্রামেই সবাই মিলিত হয়ে স্থির করছে কার প্রাপ্য এ জমি? যার সর্বাধিক প্রয়োজন। তাহলে

। জমি তার। দশ বছর হস্তান্তর করা লবে না, যেখানে যোগ্য পাত্র নিয়ে মত-ভদ সেখানে নিষ্পত্তির অন্য ব্যবস্থা আছে াও গ্রামবাসীদের। এ সব অভিনব। জমি াচ্ছে গ্রামে একজন, দিচ্ছে হয়ত তিনজন কন্তু সহস্র জনের সম্মেলন একে নিয়ে। বনোবা এর পাঠ নিয়েছেন। তিনি দখেছেন দুটো জিনিস। বিচার-বিপ্লব টেছে মানুষের অন্তরে। মানুষ পরিবর্তন াইছে, কিন্তু তথাকথিত প্রচলিত ধারায় য়। অন্ধকারের চোরা পথ তাদের কাছে প্রিয়। একদা যার প্রতি ছিল ঘৃণা তাকে াজ ভালবাসতে শিখছে তারা। মানুষ মে উপলব্ধি করছে—তারা আদিতে ানুষই। পাশবিক প্রবৃত্তি তার আদি য়—সাময়িক অবস্থা মাত্র। বিনোবাও ইটুকুই চেয়েছিলেন—আইনের বাধ্যতার াগে মানুষের শুভবুদ্ধির উপর তার ভত্তি স্থাপিত হোক। "আমার উদ্দেশ্য ক? আমি পরিবর্তন চাই। প্রথমে হৃদয়ে পরিবর্তন, তারপর সমাজে পরিবর্তন, তারপর সমাজ রচনায় পরিবর্তন। এই ত্রিবিধ পরিবর্তন আমি আনিতে প্রয়াসী।" প্রথম পরিবর্তের ভিত্তির সংগে এই ক্রম-পরিবর্তন কি হবে না অদূর ভবিষ্যতে?

এই হৃদয় পরিবর্তনের কথা ভারত-বর্ষে নতুন নয়। আজকের পৃথিবীতে এটা বিস্ময়কর উক্তি বলে মনে হলেও এ বহুদিনের সত্য। মাত্র সেদিন—গান্ধী, ভারতের বাপু এই সত্যেরই নানা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গিয়েছেন এদেশের মাটিতে। গান্ধীর সর্বোদয়ের যে আদর্শ বিনোবার এই ত্রিধারা বিপ্লব তার থেকে অভিন্ন। অ-পরিগ্রহী, আদর্শ সমাজের পরিকল্পনা উভয়ের। ভারতবর্ষের সৌভাগ্য বিনোবার মত কর্মযোগী ছিল তার ভান্ডারে।

বিনোবা ভারতের জনসাধারণের কাছে আজ দ্বিতীয় গান্ধী। তাদের বাপুর পুণ্য স্মৃতি। বিনোবা গান্ধীবাদী। গান্ধীবাদী স্থূল অর্থে নয়,—জীবনের প্রতিটি কথায় এবং কাজে তিনি গান্ধী-বাদের শ্রদ্ধাবান অনুশীলনকারী। ভারতে গান্ধীবাদীর সংখ্যা কম নয়। কিন্তু বিনোবা তাদের ভীড়েও অনন্য। চিন্তা এবং কর্মে, আচার এবং প্রচারে সমন্বয় যে মতবাদের গোড়ার কথা তাকে অন্তর দিয়ে গ্রহণ করা কঠোর সাধনার মূল্যে প্রয়োজন। যৌবন থেকে বিনোবা এই সাধনায় সিদ্ধ পুরুষ।

বিনোবার বয়স যখন দশ বছর তখন থেকেই তিনি একটু ভিন্ন-মতি। কিশোর বয়েসেই তিনি তত্ত্বজ্ঞানী হওয়ার বাসনা জাগে তাঁর অন্তরে। সেই বয়েসেই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন, বিয়ে করবেন না, খালি পায়ে হাঁটবেন, চিনি খাবেন না—ইত্যাদি। বাবা ছিলেন বরোদার রাজসরকারের পদস্থ কর্মচারী। ছেলেকে বরোদা কলেজ থেকে বিদ্যার্থী ক'রে পাঠালেন বোম্বাইয়ে। কিন্তু বিনোবার মন তখন ভিন্ন পথে। তিনি চলে এলেন বাংলায়। কিন্তু এখানেও হলো না। চলে এলেন কাশীতে। ইচ্ছা সংস্কৃত শিখবেন, উপনিষদ পড়বেন, ভারতবর্ষের অন্তরকে জানবেন। তারপর কাশী থেকে আরও ঘুরলেন নানা জায়গায়। অবশেষে একদিন সামনে এসে দাঁড়ালেন মহাত্মার। ১৯১৬ সালের কথা। বিনোবা তখন ২২ বছরের যুবক। গান্ধীকে ভালবাসলেন তিনি। গান্ধী ভালবাসলেন তাঁকে। বিনায়ক ছিল পিতৃদত্ত নাম—বাপু ডাকলেন বিনোবা। গান্ধী যখন জানলেন, বিনোবা দীর্ঘদিন বাড়ি থেকে নিরুদ্দিষ্ট, তিনি তখন নিজে বসলেন চিঠি লিখতে। বিনোবার বাবার কাছে লিখলেন—'আপনার বিনোবা আমার কাছে। তাহার আধ্যাত্মিক সিদ্ধি এত গভীর, যে দীর্ঘ লড়াই করে তা আমার মিলেছে।'

বিনোবা থেকে গেলেন ওয়ার্দায়। কিন্তু এখানেও স্থায়ী হলো না তাঁর চঞ্চল মন। একদিন বিদায় নিলেন। বলে গেলেন মহাত্মাকে—যদি কোথায়ও শান্তি না পাই তো আবার ফিরবো। এক বছর পর।

এক বছর চলে গেল। আশ্রমের সবাই ভুলে গেছে বিনোবার কথা। কিন্তু একদিন ভোরে প্রার্থনা সভায় গান্ধীজি সবাইকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—আজ বিনোবার প্রতিশ্রুত ফিরার দিন।' সন্ধ্যার আগেই ফিরলেন বিনোবা। পর পর গান্ধীজীর স্নেহধারাতেই লালিত হয়েছেন। আশ্রম-বাসী হয়েই ছিলেন। গান্ধীজীর মৃত্যুর পর থেকে নিজের আশ্রমেই ছিলেন হরিজনদের সেবাকার্যে মগ্ন হয়ে। ওয়ার্দা থেকে মাত্র দু' মাইল দূরে পুনারে বিনোবার আশ্রম।

গান্ধীজীর বিচিত্র রাজনৈতিক কার্যা-বলীর পেছনে ছিল—এক বিরাট আধ্যা-ত্মিক দিক। আশ্রমিক বিনোবাকে সব চেয়ে প্রভাবিত করেছিল তাই। এদিক থেকে তাঁর জীবনেই বোধ হয় গান্ধীজীর ব্যক্তিগত জীবন প্রভাব সব চেয়ে বেশী।

বিনোবা যখন চলেন, বিনোবা যখন প্রার্থনা সভায় ভাষণ দেন—তখন তাঁকে ঘিরে পটভূমিতে ভেসে ওঠে আর একটি মূর্তি, সেটি মহাত্মার। অবশ্য আকৃতিগত সাদৃশ্যও এর একটা হেতু। প্রকৃতির নৈকট্য আরও স্পষ্ট। বিনোবার কৃশকায় দেহের ওজন মাত্র ৪৬ পাউন্ড। উচ্চতায় নাতি দীর্ঘ ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি মাত্র। চোখে স্টিল ফ্রেমের পুরু লেন্সের চশমা, পায়ে সস্তা কাপড়ের খাকী জুতো, হাঁটুর উপর তোলা কাপড়, খালি গা। এই শীতেও একখানা উত্তরীয় মাত্র দেহে।

বিনোবা অভ্যাস এবং আচরণের দিক থেকেও গান্ধীপন্থী। তিনি পায়ে হাঁটেন। সাম্প্রতিক কালের মানবেতিহাসে দীর্ঘ সাতহাজার মাইল পথ যানবাহনের সাহায্য ছাড়া তিনিই হেঁটেছেন একমাত্র। গান্ধীজীর মত তাঁরও বিশ্বাস—জনসাধারণের সঙ্গে ন্যূনতম দূরত্বই সঙ্গত জননেতার পক্ষে। জনতাকে তাই তাঁর মুখোমুখি ভাল লাগে। তাই তিনি নিয়মিত প্রার্থনা সভা করেন। প্রার্থনা সভায় তাঁর বাচনভঙ্গীও বাপুর মত। অনুচ্চ কণ্ঠ—সরল অনাড়ম্বর বাক্য লঘু হাসিতে উজ্জ্বল। কথার ফাঁকে ফাঁকে সুন্দর উপমা। অশিক্ষিত সরল গ্রাম্য জনতার কাছে বিনোবার কথকতা তাই অতি প্রিয়।

বিনোবা কবি। মাতৃভাষা মারাঠীতে তাঁর কবিখ্যাতি প্রতিষ্ঠিত। জেলে থাকা-কালে গীতার অনুবাদ করেছিলেন তিনি। সেই অনুবাদ মারাঠাভাষীদের ঘরে ঘরে সমাদৃত। মাতৃভাষা ছাড়াও তিনি ষোলটি ভাষায় পণ্ডিত। সংস্কৃত, ফার্শী, উর্দু, গুজরাটি, মালয়ালাম, তেলেগু, কানাড়ী, ইংরেজী এমন কি বাংলাও। কিন্তু এত বড় পণ্ডিত হয়েও বিনোবা আজকাল মাত্র তিনখানা বইয়ের নিয়মিত পাঠক। গীতা, ইউক্লিডের জ্যামিতি, আর ঈশপের গল্প। এই বই তিনখানা তাঁর নিত্য পাঠসূচীর অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটিই কর্মযোগী বিনোবার সব চেয়ে প্রিয়। কারণ ফলভোগ স্পৃহা-হীন অবিরাম কর্মের প্রেরণা গীতা। দ্বিতীয়টি যুক্তি তথা বুদ্ধির অনুশীলন। তৃতীয়টি গল্পের ছলে বৃহৎ সত্যের সহজ প্রকাশ। বিনোবা তাই এগুলো ভালবাসেন অনুশীলন করতে।

বিনোবা স্বাস্থ্যহীন রুগ্নপুরুষ। ম্যালেরিয়ার দীর্ঘ দিনের রোগী। কিন্তু অভ্যাসের দিক থেকে তিনি আজও প্রথম আশ্রম জীবনের সুনিষ্ঠ প্রতিপালক। এখনও নিরামিশভোগী। দুই পেয়ালা দুধ মাত্র আজকাল তাঁর খাদ্য। চিনি আজও খান না। দুধের সঙ্গে একবার একটু মধু মাত্র। ভোর ৪টায় ওঠেন। কাজের দিনে আরও ভোরে। ঔষধ তাঁর অপ্রিয়। চাণ্ডিলে যখন তিনি গুরুতর অসুস্থ—ঔষধ গ্রহণে তিনি গররাজী হলেন। অবশেষে যখন শুনলেন ব্যবস্থাকৃত ঔষধে কোন জৈব উপাদান নেই তখন রাজী হলেন। বিনোবা সম্পর্কে সবই আশ্চর্য। সব খবরই বিস্ময়কররূপে গান্ধীর স্মৃতি। একটা আদর্শের প্রতি আস্থার গভীরতা কতখানি হওয়া সম্ভব বিনোবা প্রতিমুহূর্তের জীবনে তাই প্রমাণ করে চলেছেন। এদিক থেকে তিনি শুধু গান্ধীর সার্থকতম উত্তরাধিকারী নন, নতুন একটা আদর্শও বটে।

ষাট বছরের বৃদ্ধ চলেছেন। ইষ্ট নিষ্ঠা তাঁকে পথের প্রেরণা দিয়েছে। গান্ধী বিংশ শতকের পৃথিবীতে যে মহাজিজ্ঞাসা হয়ে এসেছিলেন—গান্ধীহীন ভারতবর্ষে বিনোবা তারই উত্তর সন্ধান হয়ে চলেছেন। যাত্রা করেছিলেন একা। আজ চলমান এক বিরাট আশ্রম তার সহযোগী। ভাবের আশ্রমও এক সুন্দর প্রতিষ্ঠান। বারো চোদ্দ জন তরুণ-তরুণী তাঁর সঙ্গী। এরা কেউ স্থায়ী আশ্রমিক নন। তিন মাস তাদের আশ্রম জীবনের মেয়াদ। তারপর এরা চলে যাবেন যে যার গ্রামে। অন্য দল আসবে। বিনোবার সাহচর্যে নতুন জীবনের শিক্ষা নিয়ে আবার ফিরে যাবে।

রাত্রি তিনটে। হঠাৎ অন্ধকার পৃথিবীর বুকে ভারতবর্ষের কোন মেঠো রাস্তায় আলো দেখা যাবে। দুটো কেরোসিন লণ্ঠনের আলো। একটি ছোট দল ধীরে ধীরে স্পষ্ট হয়ে উঠছে গ্রামের সীমান্তে প্রতীক্ষমান জনতার চোখে বিনোবার দল আসছেন, পায় পায়ে ধুলো উড়ছে। হাততালি শুনা যাচ্ছে। দলে কবি আছেন পরের দুঃখে দুঃখী কবি দুখ লালজী। তাঁর হাতে খঞ্জনী বাজবে, কণ্ঠে গান—'এ কি ধ্বনি শুনি এখন'। জনতা জয়ধ্বনি তুলবে—'সন্ত বিনোবা অমর হো, ভূদান যজ্ঞ-কি জয়!'

১৯৫৫ সাল, ১লা জানুয়ারী। আজ বিনোবার পুণ্য পাদস্পর্শ পড়েছে বঙ্গ-ভূমিতে।

র‍্যাঁবো শতবার্ষিকী

লোকনাথ ভট্টাচার্য

র‍্যাঁবো গত শতাব্দীর এক সমুদ্র, আজ তার মরণমুখর ঊর্মিমালা ীরব, নিস্তেজ, নিরুত্তাপ—আগাগোড়া কটি সমুদ্র ম'রে গিয়ে পার হয়ে গিয়েছে। জ সে নিজেই ভাস্কর, নিজেই ভাস্কর্য। যে এক অম্লান জ্যোতি, চিরকালের ন্যে নির্বাপিত হয়ে গেছে। আজ তাঁকে নুসরণ করবে না কেউ, সমাজ গেছে ল্টে, তাঁর বিচিত্র ছায়াছবির খন্ড খন্ড ণ্টি শোভা পাবে গ্রন্থাগারে—লোকে ড়বে, কেউ কেউ বুঝবে, ভালোও বাসবে। মি তাদের একজন। শুধু তাই নয়, নুভূতির জগতে মানুষ আশ্চর্য সামান্য, সেখানে পরস্পরবিরোধী সত্যকে ন্দ ক'রে সে নিজেকে গৌরবান্বিত করে—তাই আজো নালন্দার কোনো ী কোন হঠাৎ সূর্যাস্তরাগের মায়ায় কিত এক স্তূপ দেখে নিজেকে তার ধ্যে আবিষ্কার করে, তার শিরায় শিরায় গীত তোলপাড় ক'রে বেড়ায়, তার খ জলে ভ'রে ওঠে, পা কাঁপে ঠকঠক রে, মনে মনে বলে, এইখানে আমি ছিলাম কদিন, ওগো অস্তসূর্য, সেই হাজার জার বছর আগেকার চাওয়া এমন ক'রে ন তুমি আজ চাইলে আমার দিকে! াঁবোকে যখন পড়েছি, গত শতাব্দীর ভাগ্য শিশু সেই একই চাওয়া চেয়েছেন মার দিকে কত না বার!

র‍্যাঁবোর সম্বন্ধে কিছু লিখতে যাওয়ার রো এক মুশকিল হচ্ছে এই যে, তিনি কেবারে জাত-ফরাসী—তাঁকে বুঝতে গলে আগাগোড়া ফরাসী সংস্কৃতির তিহাসের সারাংশটুকু গুলে খেতে হবে —আর তাঁকে অনুভব করতে গেলে সেই রাসী সংস্কৃতিকে অনুভব করতে হবে, টা আরো শক্ত ব্যাপার। তবু কবিতার াত্মা মানসযাত্রী হংসের মতন, নিরুদ্দেশ াত্রা তার, উড়েই চলেছে, কখন কোথায় র মধ্যে গিয়ে বাসা বাঁধে, কিছুই বলা য় না।

১৯৫৪ সাল। আজ থেকে একশো বছর আগে বিশে অক্টোবর ফ্রান্সের প্রান্ত-সীমায় বেলজিয়ামের ধারে শার্লভিল নামে ছোট্ট একটি শহরে জন্মেছিলেন র‍্যাঁবো, সেই দুর্দান্ত শিশু, দানব, দেবতা, উল্কা। তাঁর শতবার্ষিকী নিয়ে যা বলতে বসেছি,

কিশোর র‍্যাঁবো

তাতে তাঁর প্রসংগ আলোচনায় নিজের প্রসংগও না উঠে উপায় নেই, কিন্তু র‍্যাঁবোর প্রসংগে আমার কথা টেনে আনার হয়তো সত্যিই যৌক্তিকতা নেই। শুধু এইটুকু বলি, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, ভক্তির থালায় প্রেমের পূজা আরতির আলোর মত, তাতে পূজক ও পূজা, উভয়েই আলো পায়। তাই আজকের এই বন্দনায় র‍্যাঁবোর মুখের সংগে যদি আমাদের অতি তুচ্ছ নগণ্য মুখখানা কখনো সখনো উঁকি মেরে ওঠে, পাঠকরা ক্ষমা করবেন।

তখনো ফ্রান্সে আসিনি, ভারতবর্ষ ছাড়ার কয়েক মাস আগে, ১৯৫১ সাল। ফরাসী শিখছি কলকাতায় Alliance Francaiseএ এবং সেখানেই কাজ করছি গ্রন্থাগারিকের। ক্যাটালগ হাতড়াতে হাতড়াতে মাঝে মাঝে নজরে পড়েছে একটি নাম, RIMBAND—মনে মনে বলেছি, কী অদ্ভুত নাম রে বাবা, কী ক'রে উচ্চারণ করে কে জানে! একদিন সন্ধ্যে-বেলায় গিয়েছি বুদ্ধদেব বসুর বাড়ি, এবং ...সেখান থেকেই সূত্রপাত এই ইতিহাসের।

Alliance Francaiseএ এই ধরনের কোনো নাম কেউ কখনো শোনেনি, এমন কি এখানকারও ফরাসী-শেখানো ইস্কুলে এই ধরনের নাম ট্যাবু। আমার মনে পড়ে, তখনো কলকাতায়, 'Voyellis' কবিতাটি বুঝতে গেছি আমাদের শিক্ষয়িত্রীর কাছে —তিনি বোঝানো তো দূরের কথা, বইখানা দেখেই তেলে-বেগুনে জ্ব'লে উঠলেন। বল্লেন, আগে ফরাসীতে গাছ-ফুল-পাতা-পাখি-চেয়ার-টেবিল শেখো—তা নয়, হাত দিয়েছ র‍্যাঁবোতে; ফরাসীরাই এসব বই ছোঁয় না—আর একান্তই যদি কবিতা পড়তে চাও তো ভিক্তর উগো পড়, লা মার্তিন পড়, যা ভালো কবিতা, যা প'ড়ে বুঝতে পারবে। কবিতার ভালো-মন্দের প্রশ্ন ছেড়ে দিলাম, ফরাসীদের এইসব বই ছোঁওয়া-না-ছোঁওয়া নিয়ে তিনি যা বলে-ছিলেন, তা যে কত সত্যি কথা, তা এখানে এসে বুঝতে পেরেছি। কয়েক বছর আগেও এমন বহু ফরাসী সাহিত্যের ইতিহাস লিখিত হয়েছে যাতে মাথা কুটে ম'রে গেলেও র‍্যাঁবোর কোনো উল্লেখ খুঁজে পাওয়া যাবে না। একটি বই-এ দেখে-ছিলাম ভেরলেনের প্রসংগে ফুটনোটে র‍্যাঁবোর উল্লেখ। লেখক বলছেন, এই গোল্লায়-যাওয়া ছেলেটি অত্যন্ত অল্প বয়সে খেয়াল-খুশী মাফিক কবিতা লিখত এবং তার সংস্পর্শে এসে ভেরলেনের সমস্ত জীবনটি ছারখার হ'য়ে যায়। সুতরাং যেহেতু ভেরলেন একজন মস্ত বড় কবি এবং তাঁর জীবন উলটে পালটে যায় একটি কিশোরের সংস্পর্শে এসে, সেই কুখ্যাত কিশোরটিরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। কিন্তু আজ চাকা গেছে ঘুরে—সেই কিশোর জাগছে দেশে-দেশান্তরে, নতুন ক'রে।

তবু আজো বহু ফরাসীকে জানি যারা র‍্যাঁবোর নাম শোনেনি কখনো। অনেকে হয়তো শুনেছে, কিন্তু তাঁর কোনো লেখা পড়েনি। এবং তারা কেউ-ই নিরক্ষর নয়, কেউ-কেউ তো বেশ বিদগ্ধ—তাদের একজনকে ভিক্তর উগোর একটি প্রকাণ্ড কবিতার সমস্তটা বই-না-দেখে আবৃত্তি করতে শুনেছি। সুতরাং এরকমও বলা চলে না যে, সাহিত্যের প্রতি তারা নাক-কান-চোখ বন্ধ রাখতে চায়।

আরো একটি মজার ঘটনা মনে পড়ছে। গত বছরের গ্রীষ্মে বেড়াতে গিয়েছি ইতালিতে। ফ্লোরেন্সে কয়েকদিনের জন্যে আস্তানা গেড়েছি—একই ঘরে আমার এক ভারতীয় সহযাত্রী এবং একটি ফরাসী ছেলে। ফরাসীটিকে চিনি না, সেও আমাদেরই মত বেড়াতে এসেছে। যাত্রার পাথেয় হিসেবে আমার সঙ্গে কিছু ভালেরি আছে, কিছু র‍্যাঁবো আছে এবং কিছু দিদরো আছে। সারাদিন ঘোরাঘুরির পর এক সন্ধ্যায় ফিরে এসেছি ঘরে, শরীর জুড়ে ক্লান্তি, মনটাও এক অদ্ভুত বেদনায় আচ্ছন্ন, যেন তাকে বেঁধেছে কেউ কাঁটা-জড়ানো এক কোমল রেশমী সুতো দিয়ে। পা দুটো মাটিতে রেখে বিছানায় কাত হয়েছি। দু'দিকে দুই পাহাড়, একদিকে Ficsole, অন্যদিকে Piazzale Michelangelo-র আলো—মাঝখানে শুয়ে আছে ফ্লোরেন্স সমতল কোনো ধাতুর পাতের মত। কখনো বিদ্রোহ করেছে Palazzo Vecchio-র গগনচুম্বী মাথা, কখনো Duomo শান্ত গম্ভীর ধ্রুপদী মহিমায় অনন্তের বাসনা তুলেছে। আমি খুলেছি র‍্যাঁবো, পড়ছি Bal des pendus.

ফরাসী ছেলেটি ঢুকল ঘরে—ক্লান্ত, রিক্ত চাউনি নিয়ে। আমারই মত বিছানায় কাত হ'ল। তারপর খানিকক্ষণ চুপচাপ। কখন দেখি উঠে এসেছে আমার কাছে, বসেছে একটি চেয়ার টেনে। জিজ্ঞেস করল, কী পড়ছ? বললাম, র‍্যাঁবো। ও পড়েনি র‍্যাঁবো কখনো। আমি পড়তে লাগলাম, ও শুনতে লাগল। মাথায় আমার ঘুরছে তখন Bal des pendus—হতভাগ্য শহীদদের অসহায় নাচ, টিং-ট্যাটাং-ট্যাং-ট্যাটাং-ট্যাং। আর সেই Belzebuth, রক্তাক্ত চাউনি তার, তাকে যেন দেখতে পাচ্ছি সামনে। ঐ ছোট কবিতাটি আমরা পড়লাম ঘণ্টাখানেক ধ'রে—ফল হ'ল এই, মক্কেল আর আমার সঙ্গ ছাড়ে না। পরের দিন পেছনে লেগে রইল আঠার মত—বাজারে মাংসের দোকানে গিয়ে বলে, Bal des pendus দেখছে—সন্ধ্যের আকাশের দিকে চেয়ে বলে, Bal des pendus দেখছে।

ফিরে এলাম ইতালি থেকে। দেখতে দেখতে ১৯৫৪-এর মাঝামাঝিতে পৌঁছে গেলাম। বুদ্ধদেববাবু আমেরিকা থেকে দেশে ফেরার পথে পারী হ'য়ে গেলেন। পারী পৌঁছোলেন লণ্ডন হ'য়ে। প্রথম দেখা যেই, বল্লেন, তোমার জন্যে অক্সফোর্ড থেকে একটা জিনিস এনেছি। দেখি র‍্যাঁবো-শতবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত Enid Starkie-র একটি পুস্তিকা। হঠাৎ মনে পড়ল, সত্যিই তো, ১৯৫৪ থেকে একশো বাদ দিলে ১৮৫৪ই তো হয়। Starkie তাতে গর্ব ক'রে লিখেছেনঃ

It is gratifying that the first celebration of this centenary should take place in Oxford, the university that welcomed, his close friend Paul Verlaine in 1854, when he came here to lecture.

প'ড়ে আনন্দও হ'ল, একটু দমেও গেলাম—ফ্রান্সে কেন কিছু হ'ল না?

তখনো বুদ্ধদেববাবু যাননি, এবং আচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসুও পারীতে। একদিন সন্ধ্যেয় সত্যেনবাবু বললেন, এবারকার paris Match-এ তোর র‍্যাঁবো নিয়ে অনেক কিছু বেরিয়েছে—দেখেছিস? দেখিনি। সংখ্যাটা নিয়ে এলাম। দেখি, ফ্রান্সও উদ্‌যাপন করছে শতবার্ষিকী, কিন্তু যথাসময়ে, একেবারে অক্টোবর মাসে, এবং শার্লভিলেই।

তখন প্রবল বাসনা ও আর্থিক অসামর্থ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব বেঁধে গেল। শেষে ঠিক করলাম, এই দুশো মাইল হেঁটেই মেরে দেব—র‍্যাঁবো তো এই পথ হেঁটেই মেরে দিয়েছিলেন, আর আমি পারব না? তাই শুনে এক বন্ধু যেচে ঘরে এসে হাজির, বলে, খেপেছ নাকি? শীত পড়ল ব'লে, তারপর ওসব দিকে রীতিমত ঠাণ্ডা, হেঁটে যাবে কি দুশো মাইল? কিন্তু আমি যে যাবই; আমাকে যে যেতেই হবে। বন্ধু বললে, তাহ'লে খোঁজ নাও, ওসব দিকে কেউ মোটরে যাচ্ছে কি না।

একদিন মধ্যাহ্ন-ভোজনের পর আমাদের Maison Internationale-এর কাফেতে ব'সে আছি, মাথায় ঘুরছে শার্লভিল ও র‍্যাঁবো শতবার্ষিকী, হাতে অ মাত্র ৮ দিন সময় আছে—এদিকে ক জুড়িয়ে যাচ্ছে। শতবার্ষিকী উৎ আরম্ভ হয়েছে শার্লভিলে দিন দশে ধ'রে, কিন্তু ১৭ই অক্টোবরই পরম দিন সেদিনই প্রথম উদ্বোধিত হচ্ছে র‍্যাঁবে মিউজিয়ম এবং সেই উপলক্ষে দেশ-বিদে থেকে অনেক রথী-মহারথী আসছে ঐ একটি দিনের জন্যেও অন্তত আমা যেতেই হবে শার্লভিলে—কিন্তু কী ক যাব, সে-চিন্তাও যাচ্ছে না মন থে মুহূর্তের জন্যেও। আমি না ছাত্র, আমা না পয়সা নেই? শার্লভিল পারী থে এত দূর, যাওয়া-আসার খরচ, সেখা থাকার খরচ, এসব কী ক'রে হবে? এম সময় কয়েকটি ভারতীয় ছাত্র ঢুকল।.... তাদের মধ্যে একজন, পারীতে আ অনেকদিন, আমাকে নিমন্ত্রণ করল ১৭ তারিখে এক concert-এ যাবার জন্যে সোজাসুজি ব'লে দিলাম, না। জিজ্ঞেস করল, কেন? বললাম, শার্লভিল যা র‍্যাঁবো-শতবার্ষিকীতে। তবু কেন জা না, মনের দুঃখে সমস্ত কথাই তাকে খু বললাম। ছেলেটি বললে—এত ভাবছ কেন তুমি র‍্যাঁবোকে এত ভালোবাসো এবং তাঁর অনুবাদ করেছ, এই উৎসবে তোমাকে নিমন্ত্রণ করা এদের উচিত—ভিক্তর উগোর উৎসবে ফরাসী গভর্নমেন্টের পয়সায় দেশ-বিদেশ থেকে রাম-শ্যাম-যদু-মধু-হরি মোড়ল সবাই তো এসেছিল—তাছাড়া এক ভদ্র-মহিলাকে আমি জানি, ভিক্তর উগোর এক নাতির নাতনী তিনি, নাম Valentine Hugo, নিজে শিল্পী এবং র‍্যাঁবোর অতি আন্তরিক ভক্ত, তিনি এই র‍্যাঁবো শত-বার্ষিকী কমিটির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, তাঁকে তোমার কথা বলছি আমি—তোমাকে ওঁরা নিশ্চয়ই নিমন্ত্রণ করবেন। আমারো কী খেয়াল হ'ল, ঘরে এসে শতবার্ষিকী কমিটির কর্তাকে সম্বোধন ক'রে এক চিঠি ছেড়ে দিলাম।

চার-পাঁচ দিন যেতে না যেতে এক উত্তর এসে হাজির। এরকম সকাল আমার জীবনে কমই এসেছে। Jean paul Vaillant-র চিঠি, ভদ্রলোক নিজে সাহিত্যিক এবং এই কমিটির কর্তা। লিখেছেন—অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে

ামাকে আমরা নিমন্ত্রণ করছি আমাদের ধী, তোমার সমস্ত খরচ আমরাই বহন রব—১৬ই সন্ধ্যেয় পৌঁছোনোর চেষ্টা র; তোমার প্রকাশিত অনুবাদের কয়েকটি পি সঙ্গে এনো, একটি মিউজিয়মে দান রবে, অন্যগুলি র‍্যাঁবোর বাড়ির তলার ই-এর দোকানে বিক্রী করার বন্দোবস্ত রব আমরা।

আমার কাছে অনুবাদগুলির একটি র কপি ছিল না—তাও সেটি 'কবিতার' একটি চটী সংখ্যা, যাতে 'মাতাল তরণী'র ঙ্গে অন্য দুটি কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। সেইটি নিয়েই ট্রেনে চাপলাম ১৬ই দুপুরে। মনটা যেমন অস্থির, তেমন শান্ত। শার্লভিলে চলেছি। শার্লভিলে চলেছি—যত বড় আনন্দ, বেদনাও তার তত বড়।

একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, Jean paul Vaillant তাঁর চিঠির সঙ্গে ১৭ই অক্টোবরের একটি সমগ্র অনুষ্ঠান-সূচীও পাঠিয়েছিলেন। কাঁধে শান্তি-নিকেতনের ব্যাগ, তার মধ্যে নানান জিনিসের সঙ্গে অনুষ্ঠান-সূচীটিও নিতে ভুলিনি। যাই হোক, ট্রেনে তো চাপলাম। তারপর যথাসময়ে ঝিক-ঝ্যাক-ঝিক-ঝ্যাক-ঝিক-ঝ্যাক-ঝ্যাক। তারপর Reins থেকে শার্লভিলের পথ। আহা, বর্ণনা করতে গেলেও চোখে জল এসে যায়। ফ্রান্সে যে এত সুন্দর জায়গা আছে, এমন ঘন অরণ্য আছে, এইরকম সবুজ, এইরকম উঁচু-নীচু মাটির ওপর পায়ে-চলা পথ আছে, আগে জানতাম না। মন সারাক্ষণই বলছে—

এ-পথে আমি যে গেছি বারবার,
ভুলিনি তো একদিনও—
আজ কি ঘুচিল চিহ্ন তাহার
উঠিল বনের তৃণ!

সমস্ত নিসর্গ-শোভা যেন র‍্যাঁবোর মূর্তিমান কবিতাঃ

নিদাঘের সুনীল সন্ধ্যায় যাব আমি
পায়ে-চলা পথ দিয়ে......

দেখতে দেখতে ঘণ্টা চারেক কেটে গেল, শার্লভিল পৌঁছোলাম—ইস্টিশানটি নেহাৎ ছোট্ট নয়। নেমেই হোটেল খুঁজে নিলাম, যে-হোটেলে আমার থাকার বন্দোবস্ত করা হয়েছে। তারপর বেরোলাম কমিটির কর্তৃপক্ষেদের সঙ্গে দেখা করতে। ধারণা ছিল, মফস্বল শহর নির্জন বিষণ্ণ হবে, chopin-র etudes-এর আবহাওয়া থাকবে তা'তে। কিন্তু একি, এরকম আমুদে শহর কমই দেখেছি। সমস্ত শহরটা জুড়ে যেন মেলা বসেছে, চারিদিকে গান, গান, গান আর গান। কে জানে, হয়তো শতবার্ষিকী উৎসবের জন্যেই এই সজ্জা। সওদাগররা রাস্তার ওপর ব'সে বিক্রী করছে ছিট, খেলনা, ফল-মূল, আলু-ভাজা—চেঁচাচ্ছে আমাদের দেশের সওদাগরদের মতন।

এক জায়গায় দেখি একটা বই-এর দোকানে র‍্যাঁবোর রচনাবলীর অনেক সুদৃশ্য সংস্করণ সাজানো রয়েছে কাঁচের জানলায়। তখনো জানি না, একশো বছর আগে এই বাড়িতেই জন্মেছিলেন র‍্যাঁবো। ওপরে একটা বিজ্ঞাপনও মারা আছে। তাতে লেখা আছেঃ Poete ও explorateur আর্তুর র‍্যাঁবো এইখানে জন্মেছিলেন। তবু ভালো, 'poete' কথাটা উল্লেখ করেছে। বোদলেয়ারের বেলায় তো শুধু 'explorateur' আছে। যাই হোক, কী রকম একটা তাগিদের চোটেই ভেতরে ঢুকে পড়লাম। এক জায়গায় লেখা আছেঃ

আবার ফিরে পেয়েছি তারে—
কারে?—শাশ্বতীরেঃ
সূর্য আর সমুদ্রের
মিলন-মন্দিরে।

হোটেলে এলাম ফিরে। স্মরণ না ক'রে পারলাম না, আজ র‍্যাঁবোকে নিয়ে এরা হৈ হৈ করছে—কোথায় হাজার হাজার মাইল দূরে বাঙলা দেশের একটা ছেলে তাঁর গোটাকয়েক কবিতা অনুবাদ করেছে; সেই খাতিরে সে বিনা পয়সায় থাকতে পাচ্ছে এমন হোটেলে, এত আদর-অভ্যর্থনা পাচ্ছে। আর র‍্যাঁবো স্বয়ং পায়ে হেঁটে পারী যেতে বাধ্য হয়েছিলেন—একবার তো বিনা-টিকিটে ভ্রমণ করার জন্যে রেল-কোম্পানী তাঁকে জেলেই পুরে দিল! Rimband le voyou, Rimband le voyant!

রাত্রে ঘুম হ'ল না বললেই হয়। ভোরে তাড়াতাড়ি breakfast খেয়ে নিয়ে আবার ঘরে উঠেছি। সকাল থেকে বৃষ্টি, আকাশ কুয়াশাঘন কাপড় প'রে নেমেছে—জানলা দিয়ে দেখছি দূরে দূরে কোথাকার এক একটা কোন উঁচু বাড়ির চূড়ো অস্পষ্ট আলিঙ্গনে মেঘের ওপর মাথা তুলেছে। দু' পা গেলেই বেলজিয়াম, ফ্রান্সের এই প্রান্ত মফস্বল শহরে আজ ১৭ই অক্টোবর—শার্লভিল পুণ্যতীর্থে পরিণত, র‍্যাঁবোর শতবার্ষিকী।

তখন খেতে নেমেছি তলায়, breakfast, আরো কয়েকজন এ-ধারে ও-ধারে ব'সে আছেন, সকলেই উঠেছেন এই হোটেলে এবং সকলেই এসেছেন এই দিনের জন্যে। তাঁরা কাঁরা, আসছেনই বা কোথা থেকে, কিছুই বুঝলাম না। কয়েকজনকে তো ফরাসী ব'লে মনে হ'ল। সকলের হাতেই র‍্যাঁবোর রচনাবলী, এই দিনের অনুষ্ঠান-লিপি। দুয়েকজন 'intellec-

tuel' নীচু গলায় আলোচনা করছেন, মাঝে মাঝে 'র‍্যাঁবো' শব্দটা কানে আসছে। আমিও এসেছি এইসব মহারথীদের একজন হ'য়ে—ভাবতে গা কেমন করে!

তবু ভালো, সকালে উঠেই র‍্যাঁবোর নাম শুনলাম।

তোমারি নামে নয়ন মেলিনু
পুণ্য প্রভাতে আজি।

তখুনি ছুটতে হবে Marrie-তে—সেখানেই rendez-vous। তার আগে ঘর খালি ক'রে দিতে হবে। জিনিস-পত্তর তলায় জমা রেখে যাব। কেবলি ভাবছি, জানি না কী-অভিজ্ঞতা আমার জন্যে অপেক্ষা করছে আজ।

Marrie-তে পৌঁছে দেখি হৈ হৈ ব্যাপার। টেলিভিশান থেকে লোক এসেছে, সিনেমা থেকে লোক এসেছে—সঙ্গে তাদের জবরজঙ্গ যন্ত্রপাতি, গাড়ি ইত্যাদি। তা ছাড়া জমায়েত হয়েছে দেশ-বিদেশের অগণ্য লোক। প্রথমে আমরা গেলাম এক বাড়িতে, সামনে খাল, অদূরে অরণ্য, সেখানে র‍্যাঁবোর সাহিত্যিক জীবনের বেশির ভাগ কেটেছে এবং সেখানেই লিখিত হয়েছে 'মাতাল তরণী'. একটা পাল-তোলা নৌকাও নোঙর বাঁধা রয়েছে দেখলাম। কমিটির অন্যতম হর্তা-কর্তা একজন, ভদ্রলোক নিজে ডাক্তার এবং শার্লভিলের মেয়র, যেখানেই যাই, তাঁর গাড়িতেই চলছি। সেই বাড়ির সামনে লোক দাঁড়িয়ে গেল, এক ভদ্রলোক বক্তৃতা দিলেন। বললেন, চেয়ে দেখুন এই বীথির দিকে, এই অরণ্যের দিকে, এই খালটির দিকে—স্মরণ করুন সেই কবিতাটিঃ On nest pas serieux quand on a dix-sept ans.

পরে গেলাম এক গ্রন্থাগারে, যেখানে র‍্যাঁবো গ্লুলে খেতেন রাজ্যের যত জ্ঞান-বিজ্ঞানের বই। অমানুষী শক্তির অধিকারী হ'তে চেয়েছিলেন তিনি। তারপর হুড়ুম দুড়ুম ক'রে Square de la Gare-এ। এক কোণে একটি tribune খাটানো হয়েছে, তা সম্মানিত অতিথিদের জন্যে। প্রথমে আমাকে সেইখানেই তোলালেন Jean Paul Vaillant—কিন্তু জায়গা কম, শেষে আবার মন্ত্রিসভার বড় বড় লোকেরা এসে হাজির হলেন, তাঁদের সেইখানে বসতে দিতেই হয়। অনেকের সঙ্গে আমাকেও নামতে হ'ল।

সামনে র‍্যাঁবোর একটি ভাস্কর্য।—তলায় চারিদিকে সোনার জলে লেখা, Une Saison in Enfer, Les Illuminations, Voyelles এবং Le Bateau Ivre। 'Ce Sont les parlementaries', কথাটা কানে বাজতে লাগল। তোদের কত গালাগাল র‍্যাঁবো দিয়েছিলেন, আজ ভুলে গেছিস। অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার আগে ভ্যাম্‌পম্‌-ভ্যাম্‌পম্‌ ক'রে মিলিটারী কায়দায় Marseillaise বেজে উঠল। চিরকালের অভিশপ্ত শিশু সরকারী কায়দায় সম্মানিত হ'য়ে অভ্যর্থিত হলেন। আগাগোড়া প্রহসন একটি। বক্তৃতা চলল একের পর এক। আমার মনে পড়তে লাগল একেবারে এই জায়গায় ব'সে লেখা La Musique কবিতাটি। আমি সেই তলায় প্রথম সারিতে, পাশে র‍্যাঁবোর এক আত্মীয়। এই সম্মান ও অভ্যর্থনার চোটে তিনি রীতিমত ব্যতিব্যস্ত বোধ করছেন। বললেন, আমাদের নিয়ে এতদিন কেউ কিছুই করেনি, উল্টে র‍্যাঁবোকে অভিশপ্ত শিশু ব'লে এসেছে সকলে, তাঁকে গালাগাল দিয়েছে, সেই থেকে আমরা নিজেদের ঐ রকম সম্মানের অযোগ্য ব'লেই জেনে... আজ হঠাৎ এই বাড়াবাড়ির কারণটা বুঝে উঠতে পারছি না। বৃদ্ধার চাউনি আশ্চর্য সরল, গাঁয়ের মেয়ে তিনি, থাকেন দূরে, সন্ধ্যার আগে ফিরতে চান, তাঁর গরুদের খাওয়াতে হবে। আজ লোকে তাঁকে নিয়ে এসে গাড়িতে চাপিয়ে, ফিরিয়েও নিয়ে যাবে একইভাবে। র‍্যাঁবোর মূর্তিটির দিকে চেয়ে বললেন, আমার কাকা দেখতে আরো অনেক সুন্দর ছিলেন।

নানান ধরনের লোক বক্তৃতা দিলেন, কেউ বা অধ্যাপক, কেউ বা মন্ত্রী, কেউ বা এসেছেন দেশ-দেশান্তর থেকে। অধ্যাপক বললেন, আমার আমেরিকান ছাত্রদের যখন জিজ্ঞেস করি, ফরাসী কোন্ কবি তোমাদের আজ সবচেয়ে প্রিয়—তারা সকলেই একবাক্যে বলে, র‍্যাঁবো। শার্লভিলের এক বৃদ্ধ নিজেকে র‍্যাঁবোর মাস্টার কল্পনা ক'রে একটি নিবন্ধ রচনা ক'রে এসেছিলেন—তিনি ঐ শহরের ভূতপূর্ব মেয়র, অথবা সেই ধরনের একটা কিছু। লাল-নীল জবড়জঙ্গ পোশাক প'রে দাঁড়ালেন মাইক্রোফোনের সামনে। বললেন, র‍্যাঁবো আমার ছাত্র হ'লে তার পিঠে হাত বুলিয়ে বলতাম, বাপু, এরকম উদ্ঘুটে কবিতা না লিখে ব্যাঙ্কে টাকা জমাবার চেষ্টা কর। মাননীয় শিক্ষা-সচিব মহাশয়ও বললেন কিছু আবোল-তাবোল। তাঁর কাছে যা' আশা করা গিয়েছিল, তার থেকে অনেক ভালো বলেছেন তিনি।

পরে উঠলেন বেলজিয়ামের এক ভদ্রলোক—বল্লেন, র‍্যাঁবোই বল আর ভেরলেনই বল, তাঁদের প্রথম সম্মান আমরাই দিয়েছি, তোমরা দাওনি; তোমাদের অনেক কবি সম্বন্ধে তোমরা যখন ভুরু কুঁচকে ছিলে, তাঁদের বই আমরাই সাহস ক'রে ছেপেছি—আজ তাঁদের নিয়ে তোমরা যতই হৈ-হৈ কর না কেন, আমাদের কথাটা ভুলে যেও না।

মধ্যাহ্ন ভোজন Hotel du d-এ। সে এক এলাহি ব্যাপার। লোক যে নিমন্ত্রিত হয়েছিল প্রকাণ্ড হল, অসংখ্য টেবিল, জন্যে জায়গা আগে থেকে নির্দিষ্ট, জন্যে একটি ক'রে menu এবং উপরে তার নাম লেখা। হলের এক দেয়ালে রয়েছে র‍্যাঁবোর এক বিরাট এবং তারি পাশে একটি মাইক্রো- খাওয়ার পরেই Jean paul illant ঘোষণা করলেন, এবার আরম্ভ এক বিচিত্রানুষ্ঠান। সেটি কী? মশিয় দুয়ামেল আবৃত্তি 'মাতাল তরণী' কবিতাটি। কবিতা আবৃত্তি করতে যাওয়া ঝকমারি বাহুল্য, ভদ্রমহিলার আবৃত্তি ভালো লাগেনি। তারপর 'কমেডি একটি অভিনেতা আমার অতি Bal des Pendus আবৃত্তি করলেন। অক্সফোর্ড-এর এরিড স্টারকী ইংরিজী-ঘেঁষা ফরাসী উচ্চারণে একটি বক্তৃতা দিলেন। অনুষ্ঠান লাগল, চলতেই লাগল, শেষ আর না। শেষে মঁসিয় ভ্যালাঁ আমার এসে বললেন, এবার তোমায় কিছু হবে। আমি বললাম—আমি একজন সামান্য ভক্ত বই নয়, তা এখানে জগতের যত বড় বড় গুণীরা আছেন, তাঁদের মধ্যে আমি কী হঠাৎ মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। র‍্যাঁবোর যে-কবিতাগুলি অনূদিত বাঙলায়, তার একটিতে সুর দেওয়া। বাজে কথা। কিন্তু যেই-না বলা, Vaillant বললেন, আশ্চর্য এমন কি ফ্রান্সেও এরকম কোনো হয়নি, তুমি দয়া ক'রে মাইক্রোফোনের এসো। গিয়ে দাঁড়ালাম 'কবিতা' টি হাতে নিয়ে। আরম্ভ করার র‍্যাঁবোর ছবিটির দিকে তাকিয়ে মনে বললাম, ক্ষমা ক'রো মহারাজ, তুমিও শয়তান ছিলে না। অনুবাদগুলির টি সেছে নিয়ে গেয়ে দিলাম—কী যে লাম জানি না। তারপর আর যাই কোথায়! অটোগ্রাফ দিতে দিতে মরি র কি!

সকলে ছুটেছে র‍্যাঁবো-মিউজিয়মের উদ্বোধনে, সকলেই তার গাড়িতে আমাকে তুলতে চায়। একজন জিজ্ঞেস করলে, গীতার দ্বারা র‍্যাঁবো অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন শোনা যায়—সত্যি কী?

অনুষ্ঠানের শেষ পর্ব। র‍্যাঁবোর সমাধি ক্ষেত্রে তীর্থ-যাত্রা। ফুলের দোকান উজাড় ক'রে সকলে ফুল কিনেছে। আমি বুদ্ধি ক'রে আগের দিন মাঠ থেকে নাম-না জানা নানান বনফুল সঞ্চয় ক'রেছিলাম —শীত তখনো পড়েনি তেমন ক'রে, তখনো ফুল ফুটছে। হাজার হ'লেও 'মাতাল তরণী'র কবিকে কি আর দোকান-থেকে-কেনা ফুল উৎসর্গ করা যায়? যার ফোটো একদিন দেখেছিলাম কলকাতায়, সেই সমাধি-ক্ষেত্র চোখের সামনে দেখলাম। লেখা রয়েছে: J. Arthur Rimband, 37 ans 10 novembre 1891—Priez pour lui.

এটুকুও উল্লেখ করি, এই অনুষ্ঠানে যোগদান করার জন্যে র‍্যাঁবোর অত্যন্ত ভক্ত ও প্রসিদ্ধ ক্যাথলিক কবি পল ক্লোদেলকে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। জানি না কেন, তিনি র‍্যাঁবোকে তাঁর গুরু ব'লে সম্বোধন করেছেন। সত্যিই জানতে ইচ্ছে করে, র‍্যাঁবোর দ্বারা কী ক'রে তিনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে অনুপ্রাণিত হলেন। এত বড় কবি তিনি, ধার্মিক না হ'য়ে কি তিনি পারেন? এবং যেহেতু তিনি এত অসম্ভব অধার্মিক, তাঁকে মানতে গেলে একেবারে চরম ধার্মিক ব'লে ঘোষণা ক'রে দিতে হবে। তাই র‍্যাঁবো পল ক্লোদেলের কাছে মিস্টিক কবিই থেকে গেছেন। শুধু পল ক্লোদেলই নয়, মৃত্যু-শয্যায় র‍্যাঁবোকে আশীর্বাদ করতে যে-পুরোহিত এসেছিলেন, তিনিও ব'লে গেলেন, হ্যাঁ হ্যাঁ এর বিশ্বাস আছে—এরকম বিশ্বাস কম লোকেরই থাকে। ইজাবেল, র‍্যাঁবোর অত্যন্ত ধার্মিক বোন, তাঁর ভাই-এর মৃত্যুতে তাই মাকে লিখলেন: ভগবানকে শত সহস্র ধন্যবাদ—গত রবিবার এমন একটি সুখবর পেলাম যা আমি পরম আনন্দের সঙ্গে স্মরণ রাখব চিরকাল; আর আমার চোখের সামনে দিয়ে ঘুরে মরবে না একটি পথভ্রষ্ট হতভাগ্য জীব—আজ সে মানুষের মত মানুষ, শহীদ, পুরুষোত্তম, যাকে তুমি নির্বাচন করেছ, ভগবান: ধন্যবাদ তোমায়, অজস্র ধন্যবাদ!

যাই হোক, ক্লোদেল এই অনুষ্ঠানে যোগদান তো করেনই নি, উত্তরে চিঠি লিখে জানিয়েছেন, এত কাণ্ড করার কোনো দরকার ছিল না—র‍্যাঁবোর নামে গীর্জায় একটি উপাসনা করলেই যথেষ্ট হত।

শতবার্ষিকী বছর এটা। রেডিওতে, সিনেমায়, খবরের কাগজে বা সাধারণ পত্রিকায়, সর্বত্রই কিছু না কিছু চলছে এই নিয়ে। আপাতত তো বিবলিওথিক্ ন্যাশনেল-এ র‍্যাঁবো সম্বন্ধে একটি চমৎকার প্রদর্শনী হচ্ছে। উদ্বোধন-দিনে নিমন্ত্রিত হ'য়ে গিয়েছিলাম তাতে। র‍্যাঁবোর সম্বন্ধে যা কিছু জ্ঞাতব্য, সবই প্রায় পাওয়া যাবে সেখানে। 'কবিতার' চটী সংখ্যাটিও প্রদর্শিত হচ্ছে। জাপানী অনুবাদও দেখলাম। র‍্যাঁবোকে নিয়ে যত গ্রন্থ, শিল্প, সঙ্গীত রচিত হয়েছে বা হচ্ছে, দেশ-বিদেশে, তারও অনেক সন্ধান মিলবে প্রদর্শনীতে। তবু বিস্মিত হলাম দেখে যে, র‍্যাঁবো সম্বন্ধে আরাগ' যা ব'লেছেন তাঁর একটি অতি-উল্লেখযোগ্য বইতে 'ক্রোনিক দ্যু বেল ক্যাণ্টো', সেই বইটিই সেখানে নেই। ফরাসী সাহিত্যে র‍্যাঁবোর যথার্থ স্থান কোথায়, তা ঐতিহাসিক ও নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে তিনি আলোচনা করেছেন। ভুলবশত কর্তৃপক্ষ বইটি যোগাড় করেননি, সেরকম ভাবতে দ্বিধা হয়।

র‍্যাঁবোর জীবন অথবা তাঁর কাব্য নিয়ে আলোচনা করলাম না এখানে। অদ্ভুত এক নিয়তি নিয়ে জন্মেছিলেন এই শিশু—তাঁর সম্বন্ধে যতই বলা যায়, কথা ততই বেড়ে যাবে। তাঁর পথ আমাদের পথের থেকে চিরকালের জন্যে স'রে গিয়েছে—তাছাড়া তাঁর পথ, শুধু তাঁরই পথ, তাতে পা বাড়ানোর স্পর্ধা কেউ করেওনি কোনোদিন। তবু তাঁকে পড়ার দরকার, জানার দরকার—তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে এইটুকু আমার নিবেদন।

সুশীলকুমার গুপ্ত

প্রত্যহের ডাক ভুলে ঘুম-ঘুম বৃষ্টির দুপুরে
যদি এসে বসা যায় শহরের ধূসর অন্তরে
খোলা জানালায়, তবে বিদ্যুতের মত মনে পড়ে
তাকে,—যে গিয়েছে চলে প্রতিকূল স্রোতে বহুদূরে।

হঠাৎ চমক ভাঙে, দরোজায় করাঘাত কার?
কেউ নেই, খিলখিল হেসে ঝড়ো হাওয়া যায় চ'লে;
মায়াবী কাজল চোখে মাখে মন দেখে নেবে ব'লে
বিস্মৃতি—গুণ্ঠন তুলে রামধনু মুখখানি তার।

আজো কি সে ভালোবাসে? টবের পুষ্পিত বেল গাছে
নামের নূপুর বাজে, বাতাসে জড়ায় ভিজে চুল,
মেঘের মালিকা ছিঁড়ে ঝরে পড়ে বৃষ্টির বকুল;
ছায়ার পরীর মত আসে সে যে কাছে—খুব কাছে।

রোদকে হারিয়ে দিয়ে ক্ষণিকের বৃষ্টির দুপুর
ছড়ায় জীবনে এক মহাশ্চর্য প্রেম, স্বপ্ন, সুর।

প্রতীক্ষা

শান্তশীল দাশ

ধূমায়িত অসন্তোষ দিকে দিকে ঃ ক্লান্ত দেহমন;
কোথাও পাই না খুঁজে ঋজুদেহ, বলিষ্ঠ মানুষ।
উদার উদাত্ত কণ্ঠে শুনিনাকো মানব-বন্দনা;
রঙিন মুখোস-পরা ঘুরে ফেরে আরণ্য শ্বাপদ।

সুদীর্ঘ দিনের আশা ব্যর্থ হবে? শুধু প্রবঞ্চনা?
অন্ধ তমসার শেষে আলোকের শুভ উত্তরণ
হবে না ধরণী-বক্ষে? মিছে আশা? অলীক স্বপন?
বারে বারে প্রশ্ন জাগে ঃ কোথা পাই, কে দেবে উত্তর?

মনের অতল কোণে খুঁজে ফিরি; কে যেন সহসা
কানে কানে বলে যায় ঃ দিশেহারা হ'স্‌নে হৃদয়;
দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে সে যে আসে মহা সমারোহে;
দুর্গমের পথে পথে চলে তার দীপ্ত অভিসার।

প্রতীক্ষায় থাকি তাই বেদনারে করি অস্বীকার;
আলোকের ধারাস্নানে তৃপ্ত হবে হৃদয় আমার।

হাওয়া

নিজন দে চৌধুরী

কিছু নয়—সব হাওয়া।
হৃদয়ের সুর যতো খুঁজে পাও ঃ
যতো কেন গা'ও—যতোই বাজাও ঃ
কে জানে—কোথায়
কিসে মিশে যায়
জীবনের গান গাওয়া
সব হাওয়া—সব হাওয়া।

প্রাণের চাওয়া ও পাওয়া—
দাও, দাও, দাও ঃ য়তো কিছু চাও ঃ
বাসনার হাত যতোই বাড়াও,
হাওয়ার ঈথারে
তবু বারে বারে
ফিরে সে হারিয়ে—যাওয়া ঃ
সব হাওয়া—সব হাওয়া।

নিকোলাস ড্রুলাস

শংকর

নিকোলাস ড্রুলাসকে আজও ভুলতে পারিনি। ধর্মতলা স্ট্রীট কিংবা ডালহৌসির মোড়ে এখনও মাঝে মাঝে চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিই, ভিড়ের মধ্যে থেকে ড্রুলাসের হঠাৎ আবির্ভাব হওয়া অস্বাভাবিক নয়। দেখা হলেই চিরপরিচিত কায়দায় ভাঙগা ভাঙগা ইংরিজীতে সে নিশ্চয় বলবে,—"হ্যাল্লো বাবু, হাউ দু ইউ দু।" তারপর সে মামলার খবর জানতে চাইবেই, কোনো উত্তর দিতে পারব না। ড্রুলাস যে-ধরনের মানুষ উত্তর না পেয়ে রাস্তার মধ্যেই চিৎকার শুরু করে দিতে পারে।

টেম্পল্ চেম্বারে যত অদ্ভুত ও দৃষ্টিছাড়া মানুষ দেখেছি নিকোলাস বোধহয় তাদের মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্যজনক। ড্রুলাসের প্রথম সাক্ষাতের কথা মনে পড়ছে। একখানা চিঠি নিয়ে ড্রুলাস এসেছিল সায়েবের সঙ্গে দেখা করতে। কঙ্কালসার চেহারা, চোখে মুখে কর্কশ রুক্ষতার ভাব। চিঠি এগিয়ে দিয়ে ড্রুলাস কাশতে শুরু করল। কাশি সহজে থামতে চায় না, সঙ্গে হাঁপের টানের মত শব্দ। চিঠিটা সম্পূর্ণ পড়তে দেবার মত ধৈর্য তার নেই। দুবার ঢোক গিলে ভাঙগা ভাঙগা ইংরিজীতে জিজ্ঞাসা করল, "ইউ টেক্ মাই কেস অর নট্।"

চিঠি লিখেছেন বিচারপতি রায়। পত্রবাহক জনৈক দুঃস্থ নাবিক, এখানকার এক বিখ্যাত জাহাজ কোম্পানীর বিরুদ্ধে এক জটিল মামলায় জড়িত। সায়েব এই মামলা গ্রহণ করলে জাস্টিস রায় আনন্দিত হবেন।

সায়েব মামলা গ্রহণ করবেন জেনে ড্রুলাসের সমস্ত মুখ এক মুহূর্তের জন্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। কি একটা বলতে গিয়ে কাশিতে আবার তার কথা আটকে যায়। একটু সুস্থ হয়ে ছেঁড়া শার্টের হাতা গুটিয়ে ঘুষি পাকিয়ে বলে, "হুঁ, জোর না করলে কিছু হয় না দুনিয়াতে। যতদিন ভাল ছেলের মত সবার হাতে পায়ে ধরলাম কিছুই হলো না আর যেই মেজাজ গরম করলাম, চিৎকার করলাম, অমনি জজ সায়েবেরও টনক নড়ল। আর ব্যারিস্টার জোগাড় হল পাক্কা কুড়ি মিনিটে।"

সেদিন নিকোলাসের ভাবভঙগীতে ভয় পেয়েছিলাম। লোকটা মাতাল না পাগল! কিন্তু ক্রমশ নিকোলাসকে নিবিড় ভাবে জেনে বুঝেছি নিকোলাস পাগল তো নয়ই, মাতালও নয়।

নিকোলাস ড্রুলাসকে বুঝতে হলে নিকোলাসের বিচিত্র জীবনকাহিনী গোড়া থেকে শুরু করা প্রয়োজন। সায়েবও নিকোলাসের কেস নিয়ে আদ্যোপান্ত তার জীবন কাহিনী শুনতে শুরু করলেন।

নিকোলাস ড্রুলাস গ্রীসের লোক। যে গ্রীসে পেরিক্লিস ও আলেকজাণ্ডার জন্মেছিলেন, যেখানে জন্মেছিলেন সক্রেটীস ও এরিস্টটল, নিকোলাস ড্রুলাসের গ্রীস অবশ্য অন্য যুগের। সেখানে বিগতকালের বীরত্ব বা পাণ্ডিত্যের লেশমাত্র নেই, সে যুগের একটুখানি অংশও বুঝি আজ আর খুঁজে পাওয়া যায় না। সমস্ত দেশ দারিদ্র্যে জীর্ণ, কটা লোক পেট পুরে খেতে পায়? নিকোলাস ড্রুলাসের স্বপ্ন ছিল বড় লোক হবার। নিজের দেশে সে স্বপ্ন সফল হবে না। নিকোলাসের এক দূর সম্পর্কের ভাই দেশ ছেড়ে নিউইয়র্কে এক রেস্তোরাঁ খুলে কিছুকালের মধ্যে ব্যাঙ্কে দু'পয়সা করেছিল। নিউইয়র্কের লোকের হাতে পয়সা আছে আর সে পয়সা তারা যখের মত আগলে রাখে না। তারা খরচ করতে জানে। সুতরাং সেখানে তার পক্ষে ত দু'পয়সা করা শক্ত হবে না, নিকোলাস ভেবেছিল। কোন এক অশুভ মুহূর্তে সে দেশ ছেড়ে নিউইয়র্কে পাড়ি দিয়েছিল নিশ্চয়ই নতুবা যে নিউইয়র্কে লোটা কম্বল সম্বল করে এসে লোকে বছর কয়েকের মধ্যে ডলারের সমুদ্রে সাঁতার কাটে সেখানে তিন বছরেও ভাইয়ের রেস্তোরাঁয় কুকের কাজ ছাড়া নিকোলাসের অন্য কিছু জুটল না। রোজগারের মধ্যে খাওয়া পরা ছাড়া সপ্তাহে দু' ডলার।

ড্রলাসের ধৈর্যের বাঁধ ক্রমশ ভেঙেগ এলো। আত্মীয়স্বজনও বিশ্বাসের যোগ্য নয়, সুযোগ পেলে তারাও কুড়ি ডলারের কাজ করিয়ে দু' ডলার দেয়। শেষে একদিন ভাইএর সংগে তার হাতাহাতির উপক্রম। লোকজন এসে না সরিয়ে দিলে দুজনকেই পুলিসের স্মরণ নিতে হতো।

রাজপথে রাত্রি কাটিয়ে ড্রলাস চাকরির সন্ধান করে। অবশেষে এক জাহাজে চাকরি জুটল। ড্রলাস ভাবে, ভাগ্য প্রসন্ন বলতে হবে। এত সহজে চাকরি আর এসিস্ট্যাণ্ট স্টুয়ার্টের চাকরি! সাড়ে তিন বছরের চুক্তি। মাইনে প্রথম বছরে মাসিক দু'শ ডলার তার পর মাসিক আড়াই শ।

সাগর দিয়ে ঘেরা দেশের মানুষ ড্রলাস সমুদ্রকে তাই ভয় পায় না। ড্রলাস ভাবল মন্দ কি? নানান দেশ দেখা যাবে, ঘোরা যাবে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত।

জাহাজের নাম এস এস ওয়াটার-ম্যান। জাহাজ চলেছে ভারতবর্ষের দিকে। জাহাজের খাবারের দায়িত্ব ড্রলাসের—কোল্ড রুম থেকে মাংস, মাখন ইত্যাদি বার করা, রান্না ও মেনুর ব্যবস্থা সব কিছু। কোল্ড রুমে সর্বক্ষণ কাজ করে ড্রলাসের ঠান্ডা লাগল। চীফ্ স্টুয়ার্টকে সে ক'দিন বলেছিল, সর্দি না কমা পর্যন্ত কোল্ড রুমে অন্য কাউকে কাজ দিতে। চীফ্ স্টুয়ার্ট তাতে কান দেয়নি। ডিউটি কমা দূরের কথা বেড়ে ছ'ঘণ্টা থেকে ন'ঘটা হলো।

অনিয়ম ও অত্যাচারে ড্রলাসের রোগ ক্রমশ পাকিয়ে উঠল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ঠান্ডা ঘরে কাজের কিন্তু বিরাম নেই। কলকাতায় এসে ড্রলাসের অত্যাচার-জর্জরিত শরীর আর বশে থাকতে রাজী হলো না। জাহাজের ডাক্তার রায় দিলেন ডবল নিউমোনিয়া। খিদিরপুরের কাছা-কাছি এক হাসপাতালে রোগীকে পাঠান হলো।

এস এস ওয়াটারম্যানের কলকাতায় স্থিতির কথা বারো দিন, কিন্তু কোনো কারণে সাতদিনের মাথায় জাহাজ রেংগুনের পথে পাড়ি দিল। ড্রলাস তখনও হাস-পাতালে। ডাক্তাররা মত দিয়েছেন অসুস্থ অবস্থায় ঠান্ডা ঘরে কাজ করে রোগ জটিল হয়েছে। জাহাজের কর্তারা ড্রলাসকে জানিয়ে গেলেন, চিন্তার কিছু নেই। রেংগুন থেকে ফেরার পথে তাকে তুলে নেওয়া হবে।

প্রায় একমাস পরে নিকোলাস ড্রলাস হাসপাতালের বাইরে এসে দাঁড়াল। বুক ভরে গ্রহণ করল উন্মুক্ত পৃথিবীর আলো-বাতাস। যমে মানুষে টানাটানিতে যমের হার হয়েছে কিন্তু ডাক্তাররা বললেন সারা জীবনই তাকে ব্রংকাইটিস ও হাঁপানিতে ভুগতে হবে।

"শয়তান, ওরা আসল শয়তান।" নিজের কাহিনী বলতে বলতে এইখানে ড্রলাস চিৎকার করে উঠেছিল। মুখের ভাবে মনে হলো জাহাজ কোম্পানির সায়েবদের সামনে পেলে সে খুন পর্যন্ত করতে পারে।

"আমার কি এই শরীর ছিল, না কোনদিন ভেবেছি চব্বিশঘণ্টার মধ্যে ষোল ঘণ্টা শুধু কেশে কেশেই কেটে যাবে। বড়কর্তারা হাঁচি হলেই কেবিনে শুয়ে পড়বেন আর হতভাগা ডাক্তারগুলো ব্রেক-ফাস্ট লাঞ্চ ফেলে রেখে ডেকের এ কোণ থেকে ও কোণ পর্যন্ত ছুটোছুটি করবে। আর আমরা বমি করে মরতে বসলেও ডাক্তারের দর্শন মেলে না।"

কলকাতায় কোম্পানির অফিসে মাস খানেক নিষ্ফল ঘুরে ড্রলাস জানল এস এস ওয়াটারম্যান আর কলকাতায় আসছে না। ড্রলাস ভাবল হয়ত অন্য কোন জাহাজে তাকে পাঠিয়ে দেওয়া হবে এবং পরে কোন বন্দরে এস এস ওয়াটারম্যানের দেখা মিলবে।

নতুন জাহাজের অপেক্ষায় আরও কিছুদিন কাটে। ধৈর্যের শেষ সীমায় ড্রলাস একদিন জাহাজ কোম্পানির বড় সায়েবের ঘরে ঢুকে চিৎকার শুরু করল, "অতশত বুঝি না। মাসের পর মাস আমাকে ল্যাজে খেলানো চলবে না। কোন জাহাজে আমার যাবার ব্যবস্থা করছ বলো।" বড় সায়েব উত্তর না দিয়ে বেয়ারা দিয়ে ঘর থেকে তাকে বার করে দিলেন। যাবার আগে ড্রলাসও বলেছিল, "আমাদের কথায় উত্তর দেবে কেন? তবে উকিলের চিঠির উত্তর দিতে পথ পাবে না।"

এটর্নির চিঠি জাহাজ অফিসে সত্যি এলো। কোম্পানিও সত্বর উত্তর দিতে কসুর করেননি। এটর্নি জানতে চাইলেন, তাঁর মক্কেল নিকোলাস ড্রলাসকে এস●এস ওয়াটারম্যানে ফেরত পাঠাবার কি ব্যবস্থা হচ্ছে।

কোম্পানি উত্তর দিলেন, "নিকোলাস ড্রলাস নামে আমাদের কোন কর্মচারী নেই। তবে একজন নিকোলাস ড্রলাসকে কয়েক-মাস আগে অসুস্থতার জন্য বরখাস্ত করা হয়েছে।"

মাথার উপর বাজ পড়লেও নিকোলাস এত আশ্চর্য হতো না। চাকরি গেছে! কি অপরাধে? এতদিন পর্যন্ত তাকে কিছু বলা হয়নি কেন? রাগে ও অপমানে ড্রলাসের সর্ব শরীরে জ্বলন শুরু হয়। কোম্পানিকে সে ছাড়বে না, তাদের যোগ্য শিক্ষা না দেওয়া পর্যন্ত সে শান্তি পাবে না। গ্রীসের সন্তান সে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা নোয়ানোর শিক্ষা তাদের সাত পুরুষে নেই।

সামান্য যা কিছু সঞ্চয় ছিল তাই দিয়ে হাইকোর্টে মামলা দায়ের হলো। অন্যায় ভাবে চাকরি থেকে বরখাস্তের ক্ষতি-পূরণের মামলা।

ভারতবর্ষে মামলা চালানো খুব সোজা ব্যাপার নয়, এর জন্য প্রয়োজন অর্থ ও ধৈর্যের। আইনের লড়াইয়ে ড্রলাস অভ্যস্ত নয়। যে পরিবেশে সে মানুষ সেখানে হাতের কব্জিতে জোর থাকতে কেউ আদালতে যায় না, মরদ ব্যক্তি আদালতে নালিশ করার আগে নদীতে ঝাঁপ দেবে। চেম্বারে এসে ড্রলাস প্রায়ই বলত, "ভেরি ব্যাদ প্লেস, এভ্রিবদি থিফ্ হিয়ার, বিগম্যান বিগ্ থিফ্।" পৃথিবীতে কাউকে সে বিশ্বাস করে না। সবাই এখানে চোর, সবাই নাকি জাহাজ কোম্পানির টাকায় ওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে।

মামলা দায়ের হয়েছে ১৯৪২ সালে, তারপর বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন এই ক'বছর কি করা হচ্ছিল।

ড্রলাসের মুখ হঠাৎ লাল হয়ে উঠল। চোখ দুটো কোটর থেকে বেরিয়ে আসার উপক্রম। কি যেন সে বলতে চায় কিন্তু ভাষার অসুবিধা। ইংরিজী সে ভাল বলতে পারে না, উত্তেজনার মাথায় সে যে ভাষা বলতে লাগল সেটি গ্রীক। সায়েব ও আমি মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করি। বুঝতে পেরে ড্রলাস ভাংগা ভাংগা ইংরিজীতে

শুরু করে, "শয়তান কোম্পানি, দুশমন কোম্পানি। ওরা ভেবেছিল আমাকে কলকাতা থেকে সরাতে পারলেই ল্যাঠা চুকে যাবে।"

আসলে মামলা দায়েরের কিছুদিন আগেই পুলিসের শুভদৃষ্টি তার উপর পড়ল। যুদ্ধের বাজারে বেকার বিদেশী ভাবতই সন্দেহজনক। জাহাজ কোম্পানিও স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে এই সন্দেহ-জনক গ্রীকটির দেশে ফিরবার সব খরচ দিতে রাজী।

তখনো ভাল করে সকাল হয় নি, সূর্যের আলো তখনও নেভেনি। এলিয়ট রোডের এক অন্ধকার ঘর থেকে নিকোলাস ড্রলাসকে তুলে নিয়ে সিকিউরিটি পুলিসের গাড়ীটা সোজা খিদিরপুরে হাজির হলো। কেন তাকে বহিষ্কৃত করা হচ্ছে ড্রলাস তা বুঝতে পারে নি, শুধু তাকে বলা হলো তোমায় দেশে পাঠানো হচ্ছে। কিন্তু দেশ কোথায়? দেশ তো নাৎসীদের হাতে। বিতাড়িত গ্রীক গভর্নমেণ্ট তখন আলেক-জান্দ্রিয়াতে রাজধানী বসিয়ে দিন কাটাচ্ছেন। সুতরাং আলেকজান্দ্রিয়াই পুলিসের মতে ড্রলাসের দেশ। ড্রলাস চিৎকার করে প্রতিবাদ করেছিল, অনুনয় করেও। অভিমানে হতভাগ্য নাবিকের চোখের কোলে সেদিন জলও এসেছিল। সে জানতে চেয়েছিল কী তার অপরাধ। সে তো চোর নয়, গুণ্ডা নয়, সে তো কোন দোষ করেনি। তাছাড়া কোম্পানির কাছে তার অনেক টাকা পাওনা রয়েছে, অনেক টাকা। কোম্পানি তাকে ফাঁকি দেওয়ার চেষ্টা করছে। কিন্তু পুলিস অচল ও অটল।

গ্রীসের অস্থায়ী রাজধানীতে ড্রলাসের জন্য আরও অনেক দুঃখ তোলা ছিল। জাহাজ থেকে নামবার সঙ্গে সঙ্গে সামরিক পুলিস শত্রুপক্ষের গুপ্তচর সন্দেহে তাকে গ্রেপ্তার করে। ড্রলাস আবার কাকুতি মিনতি করে বোঝাবার চেষ্টা করে সে গুপ্তচর নয় কিন্তু সামরিক কোর্টের বিচারকরা সহজে বিচলিত হন না। এরকম হতছাড়া লোক গুপ্তচর না হয়েই পারে না। অগত্যা অনির্দিষ্টকালের জন্য কারাগারের অন্ধকার নিকোলাস ড্রলাসকে গ্রাস করলো।

প্রায় চার বছর পরে লোহকবাট উন্মুক্ত হলো কিন্তু এই চার বছরের এক-দিনও ড্রলাস জাহাজ কোম্পানিকে ভুলতে পারে নি। আর ভুলবেই বা কী করে? পুরো চার বছরই সে কাশিতে কষ্ট পেয়েছে। কাশতে কাশতে চোখ দুটি প্রায়ই বেরিয়ে আসতে চেয়েছে আর প্রতিবারই মনে পড়েছে, কোম্পানিই তার পিছনে পুলিস লাগিয়েছে। কে জানে তারাই হয়ত এখানে জেলের ব্যবস্থা করেছে।

মুক্তি পেয়ে ড্রলাস দেশে ফিরল না। ফিরবার ইচ্ছা হয়নি এমন নয়, কিন্তু তাকে প্রতিশোধ নিতেই হবে। অন্যায়ের উত্তর না দিতে পারলে গ্রীকের জীবনে রইল কি?

আবার কলকাতা। চার বছর আগে যে নিকোলাস ড্রলাসকে কলকাতা বিদায় দিয়েছিল, সে আবার এসেছে। কোথায় আলেকজান্দ্রিয়া আর কোথায় কলকাতা, কপর্দকহীন নিকোলাস কি করে এই দূরত্ব অতিক্রম করল জানি না।

"আমার কেসের কি হলো?" ভূত দেখলেও হাজরা ও বাসু কোম্পানির সিনিয়র পার্টনার হাজরা সায়েব এত আশ্চর্য হতেন না। কোনো মক্কেল যে বছর পাঁচেক পর হঠাৎ আবির্ভূত হতে পারে ও মামলার খবর জানতে চাইতে পারে, এ তার স্বপ্নেরও অগোচর।

ড্রলাস বলল, "মাই কেস উইথ দি শিপিং কোম্পানি। আই নত্ ঘোস্ত্।"

বাদির অনুপস্থিতিতে মামলার অবস্থা কি হয়েছে হাজরা সায়েব জানতেন না। সে খবর যদি কেউ জানে, তিনি স্বয়ং ভগবান কিংবা ওপাড়ার ভাষায় যম।

আইনের চৌহদ্দি ড্রলাসের জানা নেই জানতেও সে চায় না। কিন্তু কেন সে ক্ষতি-পূরণ পাবে না, জাহাজ কোম্পানি কেন তাকে প্রতারণা করবে। বাদী, বিবাদী, প্লেণ্ট, রিটর্ন স্টেটমেণ্টের কি প্রয়োজন সে বুঝতে পারে না।

ড্রলাসের সমস্ত রক্ত তখন মাথায় উঠেছে। সে নিজেই আজ জজের সঙ্গে বোঝাপড়া করবে। কি আজব জায়গা! নিজের কথা নিজে বলার রেওয়াজ নেই। তোমার হয়ে কথা বলার জন্য অন্য লোক গাউন পরে বসে রয়েছে পয়সা দিলেই জজ সায়েবকে সব বুঝিয়ে দেবে। সোজা কোর্ট ঘরের মধ্যে ঢুকে ড্রলাস চিৎকার শুরু করে। "হোয়াত্ এবাউত্ মাই কেস্? কোম্পানি এ থিফ্ স্যর। দে সেন্ত মি তু জেল।"

কোর্টঘরে আলোড়ন পড়ে যায়। চাপরাসীরা ছুটে আসে। আধময়লা শার্ট ও প্যাণ্ট পরা ড্রলাসকে পাগল ভেবে অনেকে ভয়ে ছুটতে শুরু করে। জাস্টিস রায় নিজে নেমে এসে ড্রলাসকে শান্ত করার চেষ্টা করেন। সব কিছু গুছিয়ে বলার শক্তি ড্রলাসের নেই শুধু হাতের মুঠো পাকিয়ে সে বলে, "এভরিবদি থিফ্। কোম্পানি গিভিং মনি টু এভরিবদি।" যাস্টিস রায় সেদিন এই গ্রীক নাবিকটির জন্য প্রকৃত দুঃখ অনুভব করেছিলেন। নচেৎ এটর্নি হাজরাকে তিনি ডেকে পাঠাতেন না আর সায়েবকে ব্যক্তিগত চিঠি দিয়ে মামলা গ্রহণ করতে বলতেন না।

ড্রলাস প্রায়ই আমাদের চেম্বারে আসত। প্রথমদিকে তাকে এড়িয়ে যেতাম। সে কিন্তু মুখে হাসি ফুটিয়ে বলত, "হ্যাল্লো বাবু, হাউ দু ইউ দু।"

ময়লা বেসবাস আর কংকালসার রক্ত-হীন দেহ সত্ত্বেও ড্রলাসের বিচিত্র আকর্ষণী শক্তি ছিল। তার টানা টানা চোখ দুটোর দিকে তাকালে অকারণে ভালবাসা জন্মায়। গ্রীক বলতে পূর্বে আমার মনের মধ্যে ভেসে উঠত গ্রীক ভাষ্কর্যের নিদর্শন-গুলি। প্রশস্ত বক্ষ, উন্নত নাসা, পেশী-বহুল দেহ। এখন বুঝেছি সে শুধু শিল্পীর স্বপ্নস্তরে রূপ পরিগ্রহ করেছে।

ড্রলাসের প্রতি সায়েবের গভীর মমতা, দিনের পর দিন বিনা ফীতে তাঁকে নথিপত্র তৈরী করতে দেখেছি। সায়েব বলতেন, "জলের লোকদের আমি ভাল-বাসি। আমি নিজে সাগরজলে-ঘেরা দেশের লোক। ছোটবেলায় কত জেলে, কত নাবিকের সঙ্গে ভাব করেছি, কত গল্প করেছি। ওরা বড় অসহায়, জলের মানুষ ওরা। ডাঙ্গার মানুষের প্যাঁচালো বুদ্ধির সঙ্গে পেরে ওঠে না।"

কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি নিজেও ড্রলাসের অনেক গল্প শুনেছি। শুধু জাহাজের গল্প নয়, দেশবিদেশের গল্প। গ্রীসের গল্প, নিকোলাসের নিজের গ্রামের গল্প। তার পাড়াপড়শীরা কত ভাল লোক, আমরা স্বচ্ছন্দে তার গ্রামে যেতে

পারি কোন অসুবিধা হবে না। নিকোলাসের কাছ থেকে আসছি জানলে তারা খুব যত্ন করবে। তবে হ্যাঁ, নিকোলাস যে এত কষ্টে আছে, যেন কিছুতেই না বলি। আমি হেসে জিজ্ঞাসা করতাম, কিন্তু কথা কইব কি করে, গ্রীক তো জানি না আর ও ভাষা শিখতে গেলে তিন মাসে মাথায় টাক পড়ে যাবে। নিকোলাস অসীম আগ্রহে আমাকে বোঝায়, একদম মিথ্যা। ইংরেজরা ইচ্ছে করে পৃথিবীতে এইরকম রটিয়েছে। গ্রীক খুব সোজা ভাষা ইংরিজী থেকে অনেক সোজা। আমার শিখতে কোন অসুবিধা হবে না। আর না শিখলেও কোন ভাবনা নেই। বুড়ো ইউমোফপুলাস খুড়ো গ্রামে আছে, রেলী ব্রাদার্সের চাকরি নিয়ে পুরো পঁচিশ বছর কলকাতা আর বোম্বাইয়ে কাটিয়ে গেছে। চোস্ত ইংরিজী বলেন ইউমোফপুলাস খুড়ো। তিনিই সব বুঝিয়ে দেবেন। ইংরিজীতে কথা বলার লোক পেলে খুশী হবেন ইউমোফপুলাস খুড়ো।

ড্রলাসের এই শান্ত স্নেহমধুর রূপটিই সব নয়, অতি সহজে সে ধৈর্য হারায়। একদিনের কথা। কোম্পানির কাছে কতটাকা দাবি করা যায় আলোচনা হচ্ছে। সায়েব বললেন, তিন বছরের বেশী মাইনে দাবি করে লাভ নেই। সঙ্গে সঙ্গে ড্রলাস চিৎকার শুরু করল। "কেন? আমি তো সাত বছরের মাইনে পাবো। আমাকে তো অন্যায়ভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।" সায়েব মৃদু হেসে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, আইন অনুযায়ী কাজ করতে হবে, নিজের খেয়াল খুশি মত দাবি করা চলে না। ড্রলাস তখন পুরোদমে চিৎকার শুরু করেছে. "আমি কাউকে বিশ্বাস করি না। সবাই চোর এখানে। কোম্পানি সব জায়গায় টাকা ঢালছে।"

কথাগুলো আর সহ্য করতে পারলাম না। বললাম, "ড্রলাস, তুমি অকৃতজ্ঞ। কেন সায়েব তোমার জন্য শুধু শুধু এত পরিশ্রম করছেন জানি না।"

গলার স্বর আরও চড়িয়ে ড্রলাস বলল. "আমিও তাই জিজ্ঞাসা করছি। আমি কি লোক দেখিনি? বিনা উদ্দেশ্যে কেউ এত খাটে? হুঁ হুঁ আমি বোকা নই, নিশ্চয়ই ভিতরে কিছু—" কথা শেষ না করেই সে ঘর থেকে সবেগে প্রস্থান করে।

রাগে আমার সর্বশরীর জ্বলতে লাগল। এমন অকৃতজ্ঞের জন্য সায়েব কেন সময় নষ্ট করেন, তিনিই জানেন।

বই থেকে মুখ তুলে সায়েব মৃদু হাসলেন, বললেন, "বেচারাকে দোষ দিই না। পৃথিবীতে স্নেহ ভালবাসা কারুর কাছে পায়নি। কেন সে আমাকে বিশ্বাস করতে যাবে?"

তবুও ড্রলাসের ঔদ্ধত্য সেদিন ক্ষমা করতে পারিনি, ভেবেছি এমন লোকের কোন কাজ না করাই ভালো।

কয়েক ঘণ্টা পরের কথা। সায়েব ডিক্টেশন দিচ্ছেন। আমি শর্টহ্যান্ড খাতায় টুকছি এমন সময় জুতোর শব্দে চেয়ে দেখলাম দরজার আড়ালে ড্রলাস দাঁড়িয়ে, সমস্ত মুখে অপরাধীর অনুশোচনার চিহ্ন। ধীরে ধীরে ভিতরে প্রবেশ করে ঘাড় নিচু করে দাঁড়াল অপরাধী ছাত্র যেমন করে শিক্ষকের সামনে দাঁড়ায়। কোন কথা নেই. সায়েব মুখ তুলে বললেন, "হ্যাল্লো ড্রলাস," মুখ নিচু রেখেই ড্রলাস কাঁদ কাঁদ স্বরে বলল, "স্যর আই এম সরি, ইউ নত্ ব্যাদ ম্যান, আই এম সরি।" তারপর আচমকা সবাইকে বিস্মিত করে দৌড়ে সে ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

"আশ্চর্য মানুষ," দরজার দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে সায়েব বললেন।

পরের দিন ড্রলাসের সঙ্গে আবার দেখা হয়েছে। মুখে হাসি ফোটাবার চেষ্টা করে সে আবার বলেছে, "হ্যাল্লো বাবু, হাউ দু ইউ দু।" আগের দিনে যেন কিছুই ঘটেনি।

সায়েবের ঘরে অন্য মক্কেল। ড্রলাসকে আমার সামনের চেয়ারে বসতে দিলাম, জিজ্ঞাসা করলাম চা আনাব কিনা। অনেক অনুরোধে রাজী হলো। চা-এর কাপে চুমুক দিতে দিতে কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করলাম, "মিঃ ড্রলাস, এখন কি করে চলে?"

"ওয়ান লোফ্ ফর লাঞ্চ এন্ড ওয়ান লোফ্ ফর দিনার।" ড্রলাস উত্তর দিল।

"মাঝে মাঝে ডকের জাহাজের অফিসারদের ছোটখাট কাজ করে দিই মাসে বারো তেরো টাকা হয়। তাছাড়া তুমি তো জান, সায়েব কিছু কিছু......।" আমি অবশ্য জানতাম না। বুঝলাম সায়েব সেটা গোপন রাখতে চান।

জিজ্ঞাসা করলাম, "মিস্টার ড্রলাস, এত কষ্ট কেন সহ্য করছ? চেষ্টা করলেই অন্য কোন জাহাজে চাকরি পেতে পার।"

দাঁতে দাঁত ঘষতে ঘষতে ড্রলাস আমার দিকে চাইল। মনে হলো সন্দেহ করছে কোম্পানি হয়তো আমাকেও টাকা দিয়েছে। কিন্তু খুব শান্তভাবে বলল, "তুমি কি বলতে চাও শয়তানকে শাস্তি না দিয়েই চলে যাব? সে হবে না। বছরের পর বছর তারা আমাকে ঘুরিয়েছে, আমাকে চালান করেছে, জেলে পাঠিয়েছে। আমি ওদের ছেড়ে দেব? তাছাড়া মামলা তো শীঘ্রই কোর্টে উঠবে।"

মামলার দিন নির্ধারণ এক ভয়ঙ্কর ব্যাপার। স্বয়ং দেবতারাও এখানে অক্ষম। মামলা দায়ের করে আপনি পায়ে হেঁটে পৃথিবী ভ্রমণে বেরুতে পারেন, হিমালয় পর্বত অতিক্রম করে তিব্বত ও চীন পরিভ্রমণ সমাপ্ত করুন তারপর সাহারায় বছরখানেক কাটিয়ে সোজা দক্ষিণে চলে যান। শ্বাপদ সঙ্কুল অফ্রিকার অরণ্যে মনের আনন্দে বাঘ ভাল্লুক শিকার করুন। তারপর উত্তর মেরু দক্ষিণ মেরু যেদিকে দুই চোখ যায় চলে যান। সব আশা পূর্ণ করে ফিরে এসে দেখবেন আপনার অপরপক্ষ আজ পেটের ব্যথা, কাল মেয়ের বিয়ের অজুহাতে দিন নিচ্ছেন, মামলা উঠতে দেরী আছে।

ড্রলাসের মামলায় এই সত্যের নিদারুণ উপলব্ধি হলো। তাড়াতাড়ি শুনানির যথাসাধ্য চেষ্টা করেও কোন ফল হয়নি। কোন না কোন অজুহাতে দিন পিছোয়। রুক্ষ চুলে মলিন মুখে ড্রলাস এসে দাঁড়ায়, যখন শোনে আবার দিন পড়েছে একমাস কিংবা দুমাস পরে, সমস্ত মুখ যন্ত্রণায় কুঁচকে ওঠে। তার সর্ব শরীর যেন শিউরে উঠছে। ড্রলাসের এই ভয়াবহ রূপ আমাকে অনেক বার দেখতে হয়েছে।

একদিন কিন্তু ড্রলাস বোমার মত ফেটে পড়ল, "এগেন ডেট। অল থিফ্ হিয়ার। এভরিবদি টেকিং মনি ফ্রম কোম্পানি।" সায়েবের শরীর কদিন ভাল যাচ্ছিল না। রাগত স্বরে বললেন, "শঙ্কর, কবে এই নাবিকটার হাত থেকে উদ্ধার পাব বলতে পার?"

"আচ্ছা আচ্ছা দেখা যাবে।" বলে ড্রলাস দ্রুতবেগে ঘর থেকে বেরিয়ে আমার টেবিলের সামনে বসল। তারপর কাগজে ঘস ঘস করে কি যেন লিখতে থাকে। কাগজটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে গম্ভীর ভাবে বলল, "দেখে রাখ, আমিও চিঠি লিখে দিচ্ছি।"

বারকয়েক চেষ্টা করেও পাঠোদ্ধারে অক্ষম হলাম। বুঝলাম এটা নির্ঘাত গ্রীক-ভাষা। ফেরত দিয়ে বললাম, "মিস্টার ড্রলাস, আমি গ্রীক বুঝি না। আর এই চত্বরে কেউ বোঝে বলেও জানি না।" রাগত স্বরে ড্রলাস বলল, "তুমি কি বলতে চাও জজেরাও গ্রীক জানে না?" আমিও শ্লেষের সুরে বললাম, "এটা গ্রীস নয়, তবে জজেরা যদি মিস্টার নিকোলাস ড্রলাসের জন্য গ্রীক শিখে থাকেন, বলতে পারব না।" বলে লজ্জা অনুভব করলাম। বেচারাকে আঘাত দেওয়া উচিত হয়নি, ড্রলাস আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। সমস্ত মুখে অসহায়তার চিহ্ন। সে বিড় বিড় করতে লাগল, "আমি যে ইংরিজী জানি না, জানলে চীফ জাস্টিসকে লিখতাম। আর লিখেই বা কি হবে। সেখানেও কোম্পানি কি যায়নি?" কাগজটা পকেটে পুরে যথা-সম্ভব জোরে মাটিতে পা ঠুকতে ঠুকতে ড্রলাস বার হয়ে যায়।

পরের দিন সকালে ড্রলাস আবার হাজির। হাসিমুখে বলল, "হ্যাল্লো বাবু, হাউ দু ইউ দু।" আগের দিনের সব কিছু ঘটনা সে ভুলে গেছে মনে হলো। অন্য-দিনের চেয়ে অনেক হাসিখুশী মনে হলো, জামাকাপড়গুলোও ধোপভাঙ্গা।

"বাবু আমার সঙ্গে একবার আসবে?" জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন?" "সেটা পরে জানতে পারবে।" অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে লিফ্‌টে চড়তে হলো। ড্রলাসের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝতে পারছি না। সত্যি বলতে কি একটু ভয় হলো। যে রকম লোক, সব কিছুই করা সম্ভব। টেম্পল্‌ চেম্বার থেকে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে পড়ে আমরা হাঁটতে শুরু করলাম, আমার ভয় আরও বাড়তে লাগল। হঠাৎ কাঁধে ড্রলাসের হাতের স্পর্শ অনুভব করলাম, "বাবু, আমার জন্য তোমাকে খুব খাটতে হচ্ছে, না?"—ড্রলাসের স্নেহভরা কণ্ঠস্বর।

যেখানে এসে আমরা থামলাম সেটি একটি রেস্তোরাঁ, খাবারের অর্ডার দিয়ে ড্রলাস মৃদু হাসতে লাগল।

"আশ্চর্য লাগছে? কিন্তু আজ যে বিশে নভেম্বর, আমার ছেলের জন্মদিন। দেশে থাকলে কত আনন্দ হতো। নয়, দশ, এগার...হ্যাঁ বারো বছরেই পা দিল।" চায়ের কাপে মুখ দিয়ে ড্রলাস হঠাৎ চমকে উঠল, "কিন্তু, ওরা বেঁচে আছে তো? এত বড় যুদ্ধ গেল, সব হয়ত লণ্ড-ভণ্ড হয়ে গেছে। সাত বছর কোন খবর পাইনি। আচ্ছা বাবু, তোমার কি মনে হয়। আমার ছেলে, তার মা, ওরা বেঁচে আছে?"

কি উত্তর দেব। ঘরছাড়া হতভাগ্য নাবিক, পুরো সাত বছর প্রিয়জনের সঙ্গ-সুখে বঞ্চিত। জীবনের মরুভূমিতে নিজেকে রক্ষা করতেই ব্যস্ত, স্ত্রী-পুত্রের চিন্তার অবসর নেই। তবুও মাঝে মাঝে ক্যালেণ্ডারের কোন একটা দিন হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে; মনে পড়ে যায় ঘরের কথা, সন্তানের কথা।

বললাম, "নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। হয়তো এতদিনে অনেক বড় হয়ে উঠেছে মাস্টার ড্রলাস।"

"হয়ত আমাকে চিনতেই পারবে না। কিন্তু যাই বল প্রথম সাক্ষাতে ভারি মজা হবে।"

বিরহী ড্রলাসের মন কোন সুদূরে চলে যায়। কল্পনার পটে হয়ত জেগে ওঠে আগামী দিনের কথা। মামলায় জিত হয়েছে, অনেক টাকা নিয়ে নিজের গ্রামে একটা দোকান করে বসেছে ড্রলাস। পাড়ার লোকেরা গল্প শুনতে আসে নিউইয়র্ক শহরটা কেমন, এডেন আলেকজান্দ্রিয়ার কোনটা ভাল, ইণ্ডিয়া, সেই ইণ্ডিয়া। যেখানে আলেকজাণ্ডার সসৈন্যে এসে-ছিলেন। কলকাতা শহর, মস্ত জায়গা। জাহাজ কোম্পানি, ইংরেজ ব্যারিস্টার, আরও কত কি......

বিল এল দু'টাকার, ড্রলাসের কয়েক-দিনের খাবার খরচ। ভাবলাম নিজেই পয়সাটা দিই। মন বলল, না। ছেলের জন্ম-দিনে পিতার গর্ব ক্ষুণ্ণ করার অধিকার নেই তোমার।

অবশেষে জানুয়ারীর গোড়ার দিকে মামলার দিন পাকাপাকিভাবে নির্ধারিত হলো। জাস্টিস রায় কথা দিয়েছেন, ড্রলাসের মামলা দিয়ে নববর্ষ শুরু করবেন।

বড়দিনে সেবার সায়েব কলকাতায় রয়ে গেলেন। মেমসায়েব হয়ত মনঃক্ষুণ্ণ হবেন। হিমালয়ের কোলে রাণীক্ষেতে ছোট্ট বাড়ির নাম ফেয়ারল্যাণ্ড, দূরে বহু-দূরে নগাধিরাণী নন্দা দেবী চির-তুষারাবৃতা, কিন্তু ডিসেম্বরের উৎসবে আশেপাশের পর্বতশ্রেণী—নন্দাদেবীর অনুগত প্রজাবৃন্দ—তুষারের মুকুট পরবে। প্রতি বৎসর সায়েব ছুটতেন হিমালয়ের সেই আনন্দ উৎসবে যোগ দিতে। এবার যাওয়া হলো না, ছুটির পরই মামলা। শক্ত কেস, উপরন্তু কোন সহকারী নেই।

কথায় কথায় সায়েবকে জিজ্ঞাসা করলাম বড়দিনের উৎসবে কে কে আসছেন? সায়েব হাসলেন, "তুমি জান, এককালে আমি যুদ্ধ করতাম?"

"হ্যাঁ জানি, অ্যালবামে অনেক ছবি দেখেছি।"

"এবারের বড়দিনে একজন যোদ্ধাকে নিমন্ত্রণ করেছি, মস্ত যোদ্ধা।"

নাম জানতে চাইলাম, সায়েব আবার হাসলেন, "ইলিয়ড, অডিসির গল্প পড়েছ? হোমারের অমর মহাকাব্যের নায়ক মহাবীর ইউলিসিস, অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি খড়্গহস্ত। শত্রু সংহারের জন্য দেশ-ত্যাগী হলেন তিনি। পিছনে পড়ে রইল প্রিয়া, পড়ে রইল সাধের সংসার। বহুবর্ষ অতিক্রান্ত হলো। তাঁর বিজয়কেতন নানান দেশের আকাশে উড়ল তবু ইউ-লিসিস ক্লান্ত শ্রান্ত। জায়া চিন্তায় মগ্ন।

ইউলিসিসকে কেন্দ্র করে ছোটবেলায় কত স্বপ্ন রচনা করেছি, কিন্তু সেদিন তার দেখা পাইনি। ভেবেছি বড় মজা হবে ইউলিসিসের সাক্ষাৎ পেলে। আজ বৃদ্ধ বয়সে ইউলিসিসের দেখা মিলেছে। তিনি আজও প্রবাসী, গৃহহারা। এবারের বড়-

দিনে তিনিই আমার একমাত্র অতিথি, এ-যুগের ইউলিসিস নিকোলাস ড্রলাস।"

বড়দিনের নিমন্ত্রণ পত্র নিয়ে আমিই ড্রলাসের কাছে যাব। "শঙ্কর, যাবার পথে আমার একটা শার্ট, একটা প্যাণ্ট ও একটা টাই নিয়ে যেও, দেওয়ান সিংকে বলা আছে। আর ড্রলাসকে বলো, এগুলো না নিলে আমি দুঃখিত হব।"

সেদিন শনিবার। স্যালভেশন হোমে যখন পৌঁছুলাম প্রায় দুটো বাজে। ঘরের মধ্যে ঢুকতেই দুর্গন্ধে গা ঘুলিয়ে উঠল। হাফ্‌প্যাণ্ট ও গেঞ্জী পরে এক কোণে ড্রলাস খাবারের যোগাড় করছে, সামনে পুরনো খবরের কাগজের উপর একটা পাঁউরুটি ও খানিকটা চিনি। কাপড়ের বাণ্ডিল ও চিঠিটা হাতে দিলাম। ড্রলাস কোন কথা বলতে পারল না শুধু পরম কৃতজ্ঞতায় আমার হাত চেপে ধরল।

বড়দিনের লাঞ্চ টেবিলে সেবার আমিও উপস্থিত। ধোপদুরস্ত স্যুটে মন্দ দেখাচ্ছিল না ড্রলাসকে। সিগারেটের টিন এগিয়ে দিয়ে সায়েব বললেন, "মিঃ ড্রলাস, তুমি আমার অতিথি। কোনরকম লজ্জা করলে চলবে না।" খাওয়ার আগে ড্রলাসের জন্য গ্রীক মদ এলো। যথারীতি গ্লাস উপরে তুলে সায়েব বললেন, "নববর্ষে আমার একান্ত প্রার্থনা নিকোলাস ড্রলাসের জীবনে নূতন অধ্যায়ের সূচনা হোক।" অভিভূত ড্রলাস ফুঁপিয়ে কাঁদতে শুরু করল। অনেক কালের রোদ্দুরে দগ্ধ মাটিতে প্রথম বৃষ্টির ফোঁটা পড়েছে।

বছরের গোড়ায় মামলা শুরু হলো, কঠিন মামলা। জাহাজ কোম্পানি নামজাদা ব্যারিস্টার দিয়েছেন, আইনের সামান্যতম খুঁটিনাটি নিয়ে বাক্যযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক আইনের ব্যাখ্যার জন্য দু'পক্ষই অসংখ্য নজির দেখালেন। জাহাজের মালিক স্প্যানিশ, কিন্তু জাহাজ আর্জেণ্টিনায় রেজিস্ট্রীকৃত, চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে ও চুক্তি ভেঙ্গেছে ভারতবর্ষে। পুরো পাঁচদিন মামলা চলল, পঞ্চমদিনের শেষে সায়েবকে চিন্তিত মনে হলো। গাউন হাতে করে হাই-কোর্টের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন, শীতের দিনেও তাঁর কপালে ঘাম জমে উঠেছে। ঐতিহাসিক সিঁড়ি, শতাব্দী ধরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের অধিকার রক্ষার জন্য আইন যোদ্ধারা এই সিঁড়ি বেয়ে এসেছেন, হাইকোর্ট একাধারে দুর্গ ও মন্দির।

রেড্ রোড্ ধরে সায়েবের গাড়ি ছুটছিল। শীতের অপরাহ্ন, সূর্য অনেকক্ষণ কাজ শেষ করে বিশ্রামে গেছেন। ছমছমে ভাব, দিনের শেষে ক্লান্ত পাখির দলও বাসা অভিমুখে চলেছে। বাইরের দিকে তাকিয়ে সায়েব বললেন, "প্রাচীন যুগে এমনি সময়ে যুদ্ধ বিরতির বিউগল বেজে উঠত, নিকোলাস ড্রলাসের যুদ্ধও শেষ করে এলাম। ফলাফল অনিশ্চিত।" বুঝলাম ফলাফল সম্বন্ধে সায়েব নিজেই সন্দিহান।

রায়ের দিনে সায়েব কোর্টে গেলেন না, পরিবর্তে জুনিয়র মিস্টার মজুমদারকে পাঠালেন। ড্রলাসকে সঙ্গে নিয়ে কোর্টে গেলাম, কোর্ট রুমে বেশ ভীড়। ড্রলাস গম্ভীর, তাঁর পাশে বসতে সাহস হলো না। কে জানে, রায় শুনে সে কি করে বসবে। মিনিট কয়েক পরেই ঘরের কোণের পর্দা সরে গেল, জাস্টিস রায় আসন গ্রহণ করলেন। বুকের মধ্যে দপ দপ করতে লাগল।

নিকোলাস ড্রলাসের জয় হয়েছে। আনন্দের আতিশয্যে বেঞ্চি থেকে লাফিয়ে পড়লাম কিন্তু ড্রলাস কোথায়? সে ততক্ষণ ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটতে আরম্ভ করেছে। তাকে সামলাতে আমিও পিছনে পিছনে ছুটলাম কিন্তু ড্রলাসের কোনদিকে দৃষ্টি নেই। রাস্তা পেরিয়ে সে তখন টেম্পল্ চেম্বারের উপর উঠছে, ম্যারাথন দৌড়ের মত অনেকটা। ম্যারাথনের যুদ্ধে জয় হয়েছে, প্রধান সেনাপতির জয়বার্তা নিয়ে চলেছেন গ্রীক বার্তাবহ।

চেম্বারে যখন হাজির হলাম সায়েব তখন খবর পেয়ে গেছেন। শুনতে পেলাম ড্রলাস বলছে, "আই এম সো সরি স্যর, এভরিবদি নট্ থিফ্ স্যর।"

সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "যুদ্ধে জয় তো হলো। এখন কি করবে?"

আনন্দের আতিশয্যে প্রায় নাচতে নাচতে ড্রলাস বলল, "টাকা পেলেই দেশে ফিরব, তার আগে আমার বৌকে তার পাঠাব, আমি বেঁচে আছি। শীঘ্র দেখা হবে।"

মিঃ মজুমদার কিন্তু গম্ভীর মুখে ফিরলেন। আড়ালে সায়েবের সঙ্গে কি সব কথা হলো। সায়েবের মুখের হাসি মিলিয়ে যেতে দেখলাম। এক মুহূর্তের মধ্যে জয়ের আনন্দ কোথায় হারিয়ে গেল। কোম্পানি রায় মানবে না, তারা আপীল করবে। অর্থাৎ আরও দু'বছর।

চোখের নিমিষে ড্রলাস কি যেন করে বসল। তার হাতের কাঁচের গ্লাস মেঝেতে আছড়ে পড়ল। সম্বিত ফিরে তাকিয়ে দেখি ড্রলাস নেই।

ঘরের মধ্যে থমথমে একটা বিশ্রী গুমোট ভাব বিরাজ করতে লাগল। ভাঙ্গা গ্লাসের টুকরো কাঁচগুলোর দিকে সায়েব কয়েকবার বিষণ্নভাবে তাকালেন। সেদিন আর কোন কথা বলেননি সায়েব। সেদিন বিকেলে এক জরুরি কেসে তাঁকে মাদ্রাজে যেতে হলো।

দিন দুই পরের কথা। চেম্বারে বসে আছি, সায়েবের অনুপস্থিতিতে বিশেষ কোন কাজ নেই। টেলিফোন বেজে উঠল, নিকোলাস ড্রলাস ফোনে সায়েবের সঙ্গে কথা কইতে চাইছে।

"তারা আবার এসেছে আমাকে ধরতে, আমাকে এখুনি ধরে নিয়ে যাবে তারা। সায়েবকে একটিবার ফোন ধরতে বল, প্লীজ।"

আমাকে বলতে হলো সায়েব এখানে নেই মাদ্রাজ গেছেন। টেলিফোনেই তার ফুঁপিয়ে কান্নার আওয়াজ পেলাম, আর কোন কথার আগেই ফোনের সংযোগ কেটে গেল।

এক সপ্তাহ পরে সায়েব ফিরলেন, সব বললাম তাঁকে। সিকিউরিটি পুলিসকে ফোন করে তিনি ড্রলাসের সংবাদ জানতে চাইলেন। উত্তর এলো, নিকোলাস ড্রলাস নামে এক গ্রীককে বিশেষ ক্ষমতাবলে ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কৃত করা হয়েছে।

ফোন নামিয়ে রেখে সায়েব বললেন, "হুঁ।"

নিকোলাস ড্রলাসের আর কোন খবর পাইনি, কিন্তু ড্রলাসকে আমি জানি, সে আবার এসে হাজির হবে। আবার ছুটবে কোম্পানির পিছনে।

নিকোলাস ড্রলাসের প্রতীক্ষায় আছি।

বারো ঘর একটি উঠোন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

৩১

একটা বাক্স বোঝাই মোষের গাড়িকে আড়াল ক'রে শিবনাথ তাড়াতাড়ি বাঁদিকের গলিতে ঢুকে পড়ল। লক্ষ্মী-মণির ব্যথা-বেদনার কথা বলছিল যখন তখন প্যাকিংবাক্স বোঝাই গাড়িটা বিপরীত দিক থেকে এসে মাস্টারকে আড়াল করে দিয়ে শিবনাথকে রক্ষা করল। 'আচ্ছা চলি'-টা আর শিবনাথকে বলতে হল না।

জন্তু জানোয়ার! ডাক্তারের চেহারা, চুল দাড়ি পোশাকের সঙ্গে ম্যাসাজ ক্লিনিকের প্রস্তাবটার সামঞ্জস্য কোথায় যেন মনে মনে খুঁজতে খুঁজতে ক্লান্ত হয়ে সে রমেশের রেস্টুরেন্টে এসে ঢুকল।

'আসুন স্যার, আসুন। সারাদিন ছিলেন কোথায়? একটু গুমোট পড়াতে রমেশের মাথায় টুপি কি হাতে দস্তানা নেই।

'এই নানা কাজে ঘোরাঘুরি।' শিবনাথ সরাসরি চায়ের কথা বলতে গিয়ে কাউকে দেখতে পেল না।

'বসুন স্যার, জলটা ফুটছে।'

শিবনাথের চায়ের নেশা পেয়েছে লক্ষ্য করে রমেশ খুশি হয়ে বলল, 'আমিও একটু খাব।' বলে ঠিক এক মিনিট অপেক্ষা করার পর উঠে পর্দার ওপারে চলে গেল। শিবনাথ একমিনিট সময় চেয়ারে একলা বসে পিছনে ফেলে আসা শেখর ও বিধু-মাস্টারের কথা চিন্তা করল না, কেননা সেখানেই সে ওদের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে এসেছে, নিজের একটু বিশেষ দরকারী কাজে সে এত রাত্রে রেস্টুরেন্টে ঢুকেছে। তা ছাড়া চা। 'দোকান আরো খোলা রাখবেন নাকি?'

রমেশ নিজের হাতে দু'বাটি চা ক'রে নিয়ে আসতে শিবনাথ প্রশ্ন করল, 'ওরা কোথায়? আপনার ভাই, বৌদি, কাউকে দেখছি না।'

'আপনি কি মনে করেন যে, কর্ম-চারীরা না থাকলে মালিক ম্যানেজাররা চুপ করে বসে খদ্দের এসে চা না খেয়ে ফিরে যাচ্ছে চোখের ওপর দেখতে পারে? তা হলে গণেশ ওল্টাতে বেশিদিন বাকি থাকে না।'

'না না, তা না।' শিবনাথ একটু লজ্জিত হ'ল। হাত বাড়িয়ে রমেশের হাত থেকে চা-টা তুলে নিল।

'তারপর আপনি দেখা করেছিলেন?'

শিবনাথ চায়ে চুমুক দিয়ে ঘাড় নাড়ল।

'উত্তম চা। আপনি দেখছি মশাই সকলরকমে গুণী।'

'হতে হয় স্যার, দিনকাল যেমন খারাপ পড়েছে ভাল চা করাটা শেখা থাকলে বেগতিক দেখলে কোনো রেস্টু-রেন্টে চাকরি নিয়ে পেট চালাতে পারব।' কথা শেষ করে দুবার টেনে টেনে হেসে পরে গম্ভীর হয়ে গেল।

শিবনাথও গম্ভীর হয়ে রইল।

'তারপর, আপনার কন্দুর, কিছু সুবিধা হবে বলে সেখানে মনে করেন?'

শিবনাথ ইতস্তত করল প্রথমটায় তারপর দীপ্তিরাণীর সঙ্গে আলাপের আদ্যোপান্ত গল্পটা রমেশের কাছে বলে ফেলল।

'তবে আর কি।' রমেশ চোখ বুজে মাথা নেড়ে বলল, 'যখন অন্তরের কথা-গুলো আপনাকে বলে ফেলেছেন তখন জানবেন যে, আপনাকেই পছন্দ হয়েছে। ঠিক দেখবেন ও-বাড়ির পার্মানেন্ট প্রাইভেট টুইশানি আপনি ক'রে যাচ্ছেন, বছরের পর বছর। টাকা পয়সা কোনদিক থেকে কোনদিন আটকাবে না। অর্থাৎ আপনি এখানেই আমাদের সঙ্গে একজন স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেলেন। তা ভদ্র-লোকরা থাকতে আরম্ভ করেছেন যখন জায়গাটা খুব খারাপ না। শুনতে খারাপ শোনায় আর কি। কুলিয়া-টেংরা। যেন সব কুলি থাকে। আর ওরা মরা টেংরা মাছ খায়।'

শিবনাথ চুপ করে রইল।

পুরু ঠোঁট দু'টো টিপে হেসে রমেশ আবার প্রশ্ন করল, 'কতক্ষণ ছিলেন ওখানে?'

'আধঘণ্টা।'

'এই ফিরলেন বুঝি?'

'না, মশাই, আপনাদের এখানে কত বিচিত্র রকমের মানুষও আছে,' বলে আর একটু ইতস্তত করতে করতে শিবনাথ হাসল।

'বলুন না, আমি সব জানি, এখানকার ইতিবৃত্তান্ত আপনি আমাকে কিছু নতুন শোনাবেন কি?'

রমেশ তার কোটের পকেট থেকে নস্যির কৌটো বার করল। রুপোর। শিব-নাথ আজ এই প্রথম লক্ষ্য করল ওটা।

ডাক্তারের মেয়ে সংক্রান্ত গল্পটা শিবনাথ বলতে রমেশ দাঁতে এবং নাকে একসঙ্গে হাসল।

'মশাই, ওসব হবেই আমি জানি। এক উঠোনের উপর আছি। সহ্যও করা যায় না আবার বলতে যাওয়াও বিপদ। স্বয়ং প্রভাতকণা ওই ছোকরাকে পেয়ে প্রথম থেকে যেমন ঢলাঢলি করছিল তখনই জানি এ প্রেমবন্যার পরিণতি সাংঘাতিক।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে চা-টা শেষ করে পরে চোখ দুটো বড় ক'রে রমেশ প্রশ্ন করল, 'বলেন কি? স্ট্যাব করবে সুনীতিকে না পেলে? সুধীর শাসিয়ে গেছে বুঝি শেখরকে?'

'শুনেছি তো।'

রমেশ রায় কিছু মন্তব্য করল না।

শিবনাথ বলল, 'তা সব বস্তীতেই এরকম একটা দু'টো পরিবার থাকে।'

'আপনি জানবেন এর মূলে কারণটা অর্থনৈতিক।' বড়বড় চোখে রমেশ শিব-নাথের দিকে তাকায়। 'মশাই, এখন যে

সুনীতির মা'রও না করবার উপায়টি নেই। এখন সুধীরকে না করতে গেলে সুধীর সব ফাঁস ক'রে দেবে।'

'কি রকম?'

'অনেক তেল খেয়েছে ডাক্তারের গিন্নী। বুঝেছেন মশাই। জামাইয়ের আদর দেখিয়ে সুধীরের মাথায় হাত বুলিয়ে অনেক তেল শুষে নিয়েছে চালাক মেয়ে প্রভাতকণা। আর সেই তেল দিয়ে ভেটকি মাছ আর ধাপার বাজারের বড় বড় গলদা চিংড়ি ভেজেছেন।'

একটু চুপ থেকে শিবনাথ বলল, 'তবে যে শুনেছি ডাক্তারের রোজগার ভাল। তেলিপাড়ায় জেলেপাড়ায় ওর মেলাই পয়সাওয়ালা পেসেন্ট।'

'ওই শুনতেই সোনার গাঁ, কে মশায় তলায় আর হাত দিয়ে দেখতে গেছে কা'র কত মাসিক ইনকাম। এসব গুহ্য খবর। দেখে আমাদের পরিবারের চোখ টাটাবে। তাই সুধীরের কাছ থেকে টাকা কর্জ চেয়ে নিয়ে মা মেয়ে সুধীরকে দিয়েই দ্বারিক আর ভীমনাগের সন্দেশ আর বড়বাজারের আপেল আতা আনিয়ে খেয়ে খেয়ে ধ্বংস করেছে। শুনলাম আমার স্ত্রীর কাছে সব। ভুবনবাবুর ওয়াইফ ওকে বলেছে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ।' দুই চোখ বিস্ফারিত করে রমেশ নাসারন্ধ্র স্ফীত করল এবং এতটা নস্যি নিল।

নস্যি নেওয়া শেষ করে বলল, 'কাজেই টাকা আদায় না করা তক সুধীর এখান থেকে নড়ছে না, আর সুনীতির গা থেকে হাত নামাচ্ছে না। এখন বাধা দিতে গেলেই রক্তারক্তি।'

'কী বিশ্রী ব্যাপার!'

শিবনাথ নিজের মনে বিড়বিড় করে উঠল। এবং আবহাওয়াটাকে একটু তরল করার চেষ্টায় সে বিধুমাস্টারের গল্পটা তুলল।

বলা শেষ করতে রমেশ খুক্ করে হেসে বলল, 'আমি শুনেছি। আমার কাছে ক'দিন ইতিমধ্যে ঘুর ঘুর করছিল টাকার জন্যে। ছেলেকে দিয়ে কী ব্যবসা খোলার ইচ্ছা। আমি স্রেফ না বলে দিয়েছি। কেন দেব বলুন, ব্যবসা তো করবে না টাকাগুলো জলে ফেলে দেবে পুত্রধন কানু।'

'চরিত্র-টরিত্র?' শিবনাথ প্রশ্ন করতে রমেশ ভ্রূকুঞ্চিত করে মাথা নেড়ে বলল, 'সেদিক থেকে এখন কিছু বলব না। আসলে ওই টাকা পেয়ে লক্ষ্মীমণির ছেলে বাবাজীবন কানু কি করে তাই বলছি শুনুন। রবীন্দ্র গ্রন্থাবলীর পুরো সেট কিনিয়ে ফেলাবে ছেলেকে দিয়ে লক্ষ্মী-মণি, হ্যাঁ, সব কবিতার বই।'

'লক্ষ্মীমণির বুঝি খুব কবিতা পড়ার শখ?'

'হ্যাঁ, বিয়ের আগে থাকতে। বিধু সেদিন আমায় তার স্ত্রীর গল্প শোনাচ্ছিল।' রমেশ রায় ব্যঙ্গের সুরে হেসে উঠল। 'সেই শখ বিয়ের পর এবং এখনো পুরোমাত্রায় আছে। বলছিল, বিধু। এতগুলো গর্ভে এসেছে বলে লম্বা কবিতা মুখস্ত করার এখন সময় পায় না। তাই ছোট ছোট ছড়া মুখস্ত করে রেখেছে গিন্নী। ভোরবেলা ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে এক কুড়ি বাচ্চা নিয়ে সেগুলোর চর্চা করে।'

'না না এতগুলো হবে না।' শিবনাথ 'কুড়ি' কথাটায় আপত্তি জানিয়ে মৃদু হাসল।

'আহা যা-ই হোক, না হয় চৌদ্দটা। কিন্তু মাস্টারের আয়টা কি? গিন্নী যে বড় সবগুলোকে ইস্কুলে পাঠিয়ে সরস্বতী গণেশ করতে উঠে পড়ে লেগেছে। আর কবিতার বই কিনছে ওদিকে যে মাস্টার হালে পানি পাচ্ছে না।'

শিবনাথ চুপ করে রইল।

'আর একবার কার কাছ থেকে গোটা ত্রিশ টাকা চেয়ে এনেছিল বিধু, সব বলল আমায়, ছোটখাটো একটা বিস্কুট-পাঁউরুটি লজঞ্জুস বাতাসা এবং সম্ভব হলে তার সংগে একটা তেলেভাজার দোকান খুলে পাড়ার মধ্যে কোথাও এক জায়গায় বসিয়ে দেবে।'

'তারপর?'

রমেশ বলল, 'কিন্তু ঢাকা বারান্দার সুবিধামত জায়গা পাওয়া গেল না। কে দেবে, কার ক'খানা পাকা ঘর আছে এ পাড়ায়। কাজেই—'

ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শিবনাথ আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'ওদিকে রাস্তার ধারে একটা গোটা কামরা ভাড়া নেবারও ক্ষমতা নেই'

'সেই টাকাটা ঘরে রেখে রেখে মধুসূদন গ্রন্থাবলী, হেমচন্দ্রের কাব্য, আরও কি কি সব কাব্যের বই কিনে লক্ষ্মীমণি খরচ করে ফেললেন।'

'রুচিটা মন্দ ছিল না।' যেন কি আর একটু বলতে গিয়ে শিবনাথ রমেশের দিকে তাকিয়ে হাসল। রমেশ চোখ দুটো বড় করে বলল, 'হ্যাঁ, এখন সব কাব্য ঘরে রেখে তিনি যাচ্ছেন হাসপাতালে, কাজেই পয়সার ধান্দায় বিধু এখন ছেলেকে তাড়াতাড়ি একটা কিছুতে লাগাবার জন্যে পাঁচুকে ওই ধরনের একটা কিছু খুলে বসতে পরামর্শ দেবে বৈকি।'

শিবনাথ কিছু বলবার আগে রমেশ দাঁতের আগায় হিসহিস্ করে উঠল:

'মাস্টার শেষ পর্যন্ত গিয়ে জুটেছে ভাল লোকের সংগেই। পাঁচুর একটা ঠোঁট কাটা আপনি লক্ষ্য করেছেন কি?'

শিবনাথ মাথা নাড়ল।

'বাজারের কমলা ওর ঠোঁট কেটে দিয়েছিল।' রমেশ ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'পাঁচু ভায়া আমাদের টাকা-পয়সাটা একটু বেশি চেনে কিনা তাই একটা পয়সার জন্যে ও হাতের ক্ষুরখানা কারো গলায় বসাতে ভ্রূক্ষেপ করে না।'

শিবনাথ ফ্যাল ফ্যাল ক'রে রমেশকে দেখছিল।

একদিন পাঁচু আট বোতল কালি-
র্কা কামিনীর ঘরে বসে খেয়ে কামিনীকে
হুঁশ করে দিয়ে ওর গলার সাড়ে
াঁচশ টাকার বিছা হারখানা চুরি ক'রে
য়ে সরে পড়েছিল।'

'তারপর?'

'সেই টাকায় পাঁচুর সেলুন। যান নি
কোনোদিন? ধূপকাঠি জ্বালিয়ে রাখে।
ব সাজানো গোছানো দোকান।'

একটু ভেবে পরে শিবনাথ প্রশ্ন
রল, 'তা কামিনী এখন কোথায়? পাঁচুর
াটি কাটল কখন?'

'তখনই। দুদিনের মধ্যেই হারের
াকে কামিনী পাগল হয়ে যায়। এ
র গরীব অঞ্চল। কত টাকাই বা উপায়
রে একটা মেয়ে, তা যত সুন্দরী হোক,
র থেকে কারোর পাঁচশ' টাকার হার চুরি
লে তার মাথা ঠিক রাখা কঠিন
য়েছিল।'

'ভীষণ লোক ভাদুড়ি।' শিবনাথ
বিড় করে উঠল।

'কাজেই সাহায্যের জন্যে বিধু
টুকে ধরবে না তো ধরবে কাকে।'

রমেশ আবার নস্যির টিপ নিল।

শিবনাথ কিছু বলল না।

এবার চোখ দুটো ছোট করে রমেশ
শ্ন করলে, 'কানুকে কি কাজে লাগাবে
লো। মাসাজ ক্লিনিক তো মেয়ে মানুষ
য়ে চালাতে হয়। আপনি গিয়েছেন
ক এক আধটাতে? আমার বন্ধু রাস-
িবাজারের রমনী রায় একবার একটাতে
মায় নিয়ে গিয়েছিল। ধরমতলায়।
সেই এ সম্পর্কে এক আধটু আইডিয়া
াছে।'

'আমি যাইনি', ঈষৎ হেসে শিবনাথ
লল, 'কানুকে কমিশন বেসিসে কাজ
রানোর প্রস্তাব। খদ্দের ডেকে
নবে।'

'ভাল আনুক।' রমেশ রাস্তার দিকে
াকিয়ে বলল, 'জন্তু জানোয়ারগুলোর
া আমায় বলবেন না। মাস্টার হলে
হবে। বিধুটার মাথায় পদার্থ বলে
ছু নেই। আর থাকবেই বা কি করে।
কুলের চাকরি ছাড়াও যদি আট টাকা,
টাকায় রাত বারোটা পর্যন্ত ঘুরে ঘুরে
শানি করতে হয় তো মাথা খারাপ হবে
তো কি।'

'তরকারীর ব্যবসা করতে বলেছিল
মাস্টার ছেলেকে। কথা শোনে নি।'
শিবনাথ বলল, 'তাঁর স্ত্রীর বুদ্ধিটাই
একটু বাঁকা। কানুকে তিনি নিষেধ
করেন।'

আর নিষেধ শুনবে না। সেদিন
মাস্টার আমার কাছে টাকা চেয়ে না পেয়ে
রাগ করে প্রতিজ্ঞা করে গেছে। অপ-
মানের হাত থেকে বাঁচবার জন্যে যে-কোন
মেহনতির কাজে ছেলেকে ঢুকিয়ে
দেবে। লোকের নিন্দাবাদ কানে তুলবে
না। আর যদি গিন্নী বাড়াবাড়ি করে
তো হাসপাতালে যাত্রা করার আগে পেটে
লাথি মেরে গিন্নীকে যমালয়ে পাঠাবে।'

'হ্যাঁ, ওই এক খেয়াল মাথায়
চেপেছে বিধু মাস্টারের। সেদিন হঠাৎ
কি একটা কারণে আমার সঙ্গে কথা
বলতে গিয়ে ম্যানুয়েল লেবার ম্যানুয়েল
লেবার বলে খুব চেঁচাচ্ছিল।'

আলাপটা বাধা পেল।

বলাই কিন্তু বেশিক্ষণ দাঁড়াল না।
শিবনাথকে দেখা সত্ত্বেও বলাই এমন ভান
করল যেন দেখেনি। ভিতরে ঢুকে
সোজা রমেশের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।
ঘাড়টা নামিয়ে রমেশের কানে কানে
ফিসফিস ক'রে দুটো কথা বলে আবার
যেমন আসে অন্য কোনদিকে না তাকিয়ে
গট্‌গট্‌ ক'রে বেরিয়ে যায়।

চামড়ার পেটে লাগিয়ে ক্ষুর দিয়ে
ঘাড়টা চেঁছে পালিশ করা হয়েছে বলে
এবং চমৎকার রঙের নতুন একটা হাফ্‌-
শার্ট গায়ে ও পকেটে নীল একখানা
রুমাল থাকাতে এবং পায়ে কালো ভেল-
ভেটের চটি দেখে শিবনাথের প্রথম
চিনতে কষ্ট হচ্ছিল বলাইকে। যেন বাকি
চুলে অনেকটা তেল ঢেলে স্নান করা
হয়েছে। মাথার অতিরিক্ত তেলটা চাঁছা
ঘাড় চুঁইয়ে গায়ের শার্টের মধ্যে ঢুক-
ছিল। সেইজন্যে নতুন শার্টের কলারে
একদিনেই দাগ ধরে গেছে।

বলাইকে ডেকে শিবনাথের বলতে ইচ্ছা
হচ্ছিল যেন কলারের চারদিকে রুমলাটা
সে এই বেলা জড়িয়ে নেয়। তবে আর
তেলের হলদে দাগ ধরবে না জামায়।
কিন্তু সেরকম কোন কথা বলতে দেবার
সুযোগ না দিয়ে অতি-পরিচিত বলাই
যখন রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল, তখন
রমেশ বলল, 'মশাই দেখেছেন। সংসারে
সকলেই অক্ষম না। সক্ষম লোকও আছে।
কে গুপ্তর কথা ছেড়ে দিন। ওটা এখন
পাগলের পর্যায়ে পড়ে। পড়ে কেন,
পাগলই বলুন। মাথার ঠিক নেই।
আপনার এই পোস্টের জন্যেই বিধু
মাস্টারকেও পাঠিয়েছিলাম। হয়নি। কেন
হয়নি শুনেছেন বোধ করি?'

'হ্যাঁ।' শিবনাথ ঘাড় নেড়ে বলল,
'ভয়ানক ডার্টি। দীপ্তি বলছিলেন।'
শিবনাথ হাসল।

'কে গুপ্তও প্রার্থী হয়েছিল।'

রমেশ বলল, 'অমলকেও গোড়ায় আর
একটা সৎ পরামর্শ দিয়েছিলাম, কিন্তু
নিতে পারল না, জানেন বোধ হয়।
কোথায় আছে হতভাগাটা এখন? শুনেছেন
কিছু?'

'ঘোলপাড়ায়।'

'মরুক গে। যত ঝি ক্লাসের মেয়েছেলে
আর গাঁটকাটা, পকেট কাটার দল থাকে
বাড়িটায়। আমিও শুনেছি।' রমেশ
শিবনাথের দিকে না তাকিয়ে রাস্তার
দিকে চোখ রেখে বলল, 'দেখুন, এখন
কাজের মানুষ কে। কথাটা বলতে চট্‌
করে ধরে ফেলেছে বলাই এবং সেটা কাজে
লাগিয়ে কাল রাত্রেই একটা ভাল প্রফিট
পেয়েছে?'

শিবনাথ রমেশের চোখে চোখে তাকাতে
রমেশ চোখ দুটো গোল করে ফেলল।
'বুঝতে পেরেছেন?' দাঁতে হিস হিস করে
রমেশ জানায়ঃ 'চোখকান একটু সজাগ
রেখে চললে এদিনে ঠেকতে হয় না।
অন্তত উপোসে মরতে হয় না। মিছা
বলছি?'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল।

'বলাই কি কোন বড় ব্যবসা-টেবসা?'

'তা বলতে পারেন; হ্যাঁ, ব্যবসা ছাড়া
কি।'

শিবনাথের চোখে কৌতূহল।

'মশাই, চশমখোর হার্ডাকপ্টে, আমার
অনেক বদনামই আছে। আমি দুমুঠো
ভাত খেয়ে আছি তাই এর-ওর চোখ
টাটায়। টাটাবেই। কিন্তু আমি তা গ্রাহ্য
করব কেন। কিন্তু এ-ও আপনাকে বলে

রাখছি, দান খয়রাত, সাহায্য, সহানুভূতি অপাত্রে ঢেলে পরে সেটা জলে গেল বলে হায়-আপশোশ করব, সে-পাত্র আমি না।'

শিবনাথ কথা বলল না।

রমেশ শূন্যে হাত ঘুরিয়ে বলল, 'ব্যবসা করতে বিধু টাকা চেয়েছিল। কি ব্যবসা করবে তুমি? তা-ও বলেছি তো আপনাকে, টাকাটা একবার ঘরে গেলে ওটা তার গিন্নী হাত করতো। আর যদি-বা মাস্টার গিন্নীকে ফাঁকি দিয়ে সরাসরি সেটা খাটিয়ে কিছু আরম্ভ করে দেয়, ঐ তো বললাম, গাছতলায় তেলে-ভাজা দোকান, নয়তো ধাপার বাজারের লাউ-কুমড়ো কিনে নিয়ে আর এক বাজারে বসে তার দোকানদারি। ক' পয়সা আয় তাতে, কত মুনাফা থাকে?'

শিবনাথ ঠোঁট টিপে হাসল।

'ও লোকটার দৃষ্টিভঙ্গীই এমন। অথচ রাতদিন গালভরা কথা—বিজনেস, বিজনেস।'

রমেশ গম্ভীর হয়ে বলল, 'কাজেই ব্যবসার জাত আছে, কারবারের রকম আছে। আপনাকে আমি অবশ্য সব এখন ডিসক্লোজ করব না; কিন্তু কাল বিকেলে বলাই যখন এসে বলল, দাদা মাথা ঠিক করেছি, এই এই বিষয়, কাজেই কিছু টাকা না হলে কারবারে হাত দিতে পারছিনে। শুনে মনটা এত ভাল লাগল, তখনই বুঝলাম, শক্ত ধাত। কে গুপ্ত না, অমল না, বিধু না—মাথাটা ঠিক রেখে চলে। না হলে, চোখের ওপর তো দেখছিলেন, উপোস করে কি ও আর ওর পরিবার কম থেকেছে।'

'তা তো বটেই।' শিবনাথ ঘাড় কাত করল।

যেন কি একটু চিন্তা করে রমেশ পরে বলল, 'আমার কানে সবই আসে। এখন থেকেই নাকি বলাইর নামে বাড়ির মাতব্বররা বদনাম গাইতে শুরু করেছে। আপনি শুনেছেন কিছু?'

'না।'

শিবনাথ এদের সব ব্যাপার থেকে দূরে থাকতে চায়। সেইজন্য তার সতর্কতাও কম না। আছে এদের মধ্যে, কাজেই একথা সেকথা শুনতে হয়। শুনে ইংরেজিতে যাকে বলে 'ডিটো' দিয়ে যাওয়া—হুঁ-হাঁ করে তারপর সুযোগ বুঝে সরে আসে। কাজেই তখন সেলুনে পাঁচু ভাদুড়ি কি বিধু, রমেশ বা বলাই সম্পর্কে কি সব কথাবার্তা বলছিল, এখন এখানে শিবনাথ তার বিন্দুবিসর্গও প্রকাশ করল না। কেবল আগের মত ঘাড় কাত করে বলল, 'ওদের সঙ্গে আমার তেমন কথাবার্তাই বা কি হয়। তখন হঠাৎ রাস্তায় বিধুর সঙ্গে দেখা হল, আর বকর বকর করে সাত-পাঁচ কত কি বললে, সব মনেও নেই।'

রমেশ কতক্ষণ আর কিছু বলল না। শিবনাথ উঠি উঠি করছিল, এমন সময় দোকানে ক্ষিতীশ ঢুকল। সঙ্গে বেবি।

ক্ষিতীশ একটিও কথা না বলে সরাসরি পর্দার ওপারে চলে গেল। বেবি, যেন খুব ক্লান্ত, মেঝের ওপর বসে পড়ল। উস্কুখুস্কু চুল। হাত-পাগুলো দুদিনে আরো শীর্ণ হয়ে পড়েছে শিবনাথ লক্ষ্য করল।

'কি ব্যাপার, ভাইকে দেখে এলি, এবেলা কেমন আছে?' রমেশ প্রশ্ন করল। বেবি মুখ তুলল না। 'ভাল না।' বলল ও অস্পষ্ট গলায়।

'ভাল মন্দ যেন তুই কত বুঝিস।' রমেশ অল্প হেসে শিবনাথের দিকে ঘাড় ফেরায়। শিবনাথ কিছু প্রশ্ন করবার আগে পর্দার ওপার থেকে ক্ষিতীশ বলল, 'যেন ভাইকে কত ও দেখে এসেছে, ভাইকে দেখতে হাসপাতালে যাবে বলে বেলা দুটো না বাজতে দোকান থেকে বেরিয়ে শেয়ালদা ছুটে গেলেন তিনি। তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল।'

ক্ষিতীশ থামতে রমেশ একবার পর্দার দিকে তাকিয়ে পরে মাটিতে মুখ গুঁজে বসা বেবির দিকে চোখ রাখল।

'কিরে, রুনুকে দেখিসনি?'

'দেখেছি।' ভয়কাতর বিমর্ষ মুখখানা এবার একটু সময়ের জন্যে কে গুপ্তর মেয়ে তুলে ধরল। বেবির চোখের কোণা চিক চিক করছে।

'আজ আবার মারধর করেছিলি নাকি?' পর্দার দিকে বিরক্ত চোখে তাকাল রমেশ রায়। 'কি ব্যাপার। তুই কি চা করছিস নাকি?'

'হুঁ।' রুক্ষ অপ্রসন্ন স্বর ক্ষিতীশের। বাটির মধ্যে চামচ নাড়ার দ্রুত কঠিন শব্দ হল দু-তিনবার। তারপর ক্ষিতীশ বেরিয়ে এল।

'কি হয়েছে তুই আমায় পরিষ্কার করে বল না।' রমেশ সোজা হয়ে বসল।

'কি হয়েছে তুমিই জিজ্ঞেস কর না। আদর দিয়ে তুমিই তো ওর ইহকাল-পরকাল ঝরঝরে করে দিচ্ছ।' ক্ষিতীশ গরম চা-য়ে চুমুক দিতে দিতে দরজার কাছে সরে গেল। চাপা একটা নিশ্বাস ফেলল রমেশ। এবার শিবনাথের নজরে পড়ল বেবির ফ্রকটা পিঠের দিকে একটা জায়গা ছিঁড়ে গেছে। যেন কিসের সঙ্গে খোঁচা লেগে বা টানাটানির দরুণ জামাটা এভাবে ছিঁড়েছে অনুমান করল শিবনাথ। কিন্তু পূর্ববৎ সম্পূর্ণ নীরব ও নিরপেক্ষ থেকে সে দু ভাইয়ের কথা শুনল।

দরজা থেকে সরে এসে ক্ষিতীশ বেবি ও রমেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিকৃতকণ্ঠে বলল, 'তখনই আমার সন্দেহ হয়েছিল। হাসপাতাল খোলে বেলা চারটেয়। হেঁটে গেলেও শেয়ালদা যেতে আধ ঘণ্টার বেশি লাগে না। আর তিনি সেই ভরদুপুরে ছুটলেন, মনে মনে ভাবি বিষয় কি [illegible] শেষ না করে ক্ষিতীশ কটমট করে অনতু-মুখী বেবির দিকে তাকাল।

রমেশ অসহিষ্ণু গলায় বলল, 'তা কী হয়েছে, কি করেছে ও এখানে [illegible] কি আমায় জানাবি না।'

বাকি চা-টুকু গলায় ঢেলে বাটিটা [illegible] করে টেবিলের ওপর রেখে ক্ষিতীশ বলল, 'আমি পৌনে চারটেয় এখান থেকে বেরোই। একপেটি চা ও আমার নিজের জন্যে একটা গামছা কিনতে এমনিও আজ আমার শেয়ালদা যেতে হত। ভাবলাম, ওমনি কে গুপ্তর ছেলেকেও একবার দেখে আসব। এক উঠোনে আছি, এক ইঁদারার জল খাই তাছাড়া বেবি আমাদের দোকানে আ[illegible] এদিক থেকেও ওদের সঙ্গে একটা সম্প[illegible] দাঁড়িয়ে গেছে বৈকি। কী বলব [illegible] তোমাকে, হাসপাতালের উল্টো দিকে [illegible] ঠিক সার্কুলার রোডের ওপর একটা [illegible] বড়সড় নতুন চায়ের দোকান হয়েছে তুমি খেয়াল করেছ কি না, জানি না। [illegible] শিখের রেস্টুরেণ্ট ওটা। তখন কাঁটা [illegible]

রো সাড়ে পাঁচটা, চা ও গামছা কিনে আমি তাতাড়াড়ি হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি, উল্টো দিকের ফুটপাথে দেখলাম, ফ্রক-পরা একটা মেয়ে। বেশ বড়, হ্যাঁ, আমাদের রুনুর চেয়েও মাথায় লম্বা, টুকটুকে পরা ভারি কেতাদুরস্ত কোন ছেলের হাত ধরে গুটগুট করে যেন সেই রেস্টুরেন্টে গিয়ে ঢুকল। কত গন্ডা মেয়েছেলে রাস্তায় চলে, হঠাৎ তো আর পছনটা দেখে বোঝা যায় না, কিন্তু দোকানের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভেতরে ঢোকবার সময়, ওই যে কথায় বলে দুর্বল মন, কুকাজ করবার আগে ভয় পাছে কেউ দেখছে কি না, গলাটা ঘুরিয়ে বেবি যখন ...ক করে রাস্তার লোকজন দেখে নিচ্ছিল, তখনই আমি চিনে ফেললাম ...তে মেয়েকে।'

'তারপর!' রুদ্ধশ্বাস হয়ে রমেশ ...ইয়ের কথা শুনছিল। 'তারপর?'

'তারপর তুমি বুঝতেই পারছ আমার ...ক্ত মাথায় উঠে গেল। হাসপাতালে আর ...বে কি, লাফিয়ে রাস্তা পার হয়ে আমি ...য়ে সেই শিখের চায়ের দোকানে ঢুকলাম।'

...গিয়ে কি দেখলি, ছেলেটার সঙ্গে ...সে ও চা খাচ্ছিল? শুধু চা না আর কিছু?' রমেশ বেবির দিকে একটা অগ্নি-...ষ্টি নিক্ষেপ করে পরে শিবনাথের দিকে ...কাল। 'কি রকম বোঝেন মশাই।'

শিবনাথ নীরব।

ক্ষিতীশ গলার অদ্ভুত শব্দ করে ...লল, 'তুমিও যেমন, পাঁচটা খদ্দেরকে না ...খিয়ে চা খাবে বলে কে গুপ্তর মেম-...হেবের ইস্কুলে-পড়া গুণী মেয়ে বন্ধুরে ...ত ধরে বেছে বেছে ওই পর্দা-খাটানো ...পার্টি-করা রেস্টুরেন্টেই ঢোকে। নাহলে ...র পীরিত জমবে কেন।'

'কতক্ষণ ছিল? ছেলেটা কোথায় থাকে, ...ক হয় ওর?'

'কেউ না।' ক্ষিতীশ হাতের দুটো ...আঙুল দেখিয়ে বলল, 'এক বাটি চা নিয়ে ...র দু ঘণ্টা বসে থেকে ওখানে শিরদাঁড়া ...কিয়ে ফেলেছি। তা কি আর বেরোয় ...পার থেকে। পর্দার এপিঠে থেকে আমি ...ধরে হারামজাদীর খিল খিল হাসির শব্দ শুনেছি। তুমি এবার জিজ্ঞেস করে দ্যাখো না কি বলে?'

'এই, ওই ছেলের সঙ্গে তোর জানা-শোনা কবে থেকে। কোথায় থাকে ও?' চোখ লাল করে রমেশ প্রশ্ন করল। যেন ভয়ে লজ্জায় বেবি মুখটা আরো নত করল।

'কথা বলছিস না কেন, উত্তর দে। কোথায় থাকে ছোঁড়া?'

'পার্ক স্ট্রীট।'

'তোর সঙ্গে কোথায় দেখা, আগে পরিচয় ছিল?'

বেবি মাথা নাড়ল।

'হাসপাতালে দাদাকে দেখতে এসেছিল সন্তোষ। দাদার ফ্রেন্ড। ওদের পাড়ায় আমরা ছিলাম।'

'তা তো ছিলিই, কিন্তু এতক্ষণ চায়ের দোকানের খুপরির মধ্যে বসে দুজন করছিলি কি? দাদার ফ্রেন্ড!' বিশ্রী একটা শব্দ করল রমেশ গলার।

বেবি নীরব।

দাদার ফ্রেন্ড, কাজেই ইনিরও বন্ধু। সহজ কথাটা তুমি ধরতে পারছ না কেন।' ক্ষিতীশ রমেশের দিকে না তাকিয়ে বেবিকে দেখছিল। 'এ্যাঁ, আমার চোখে ধুলো! তুই আমায় অন্ধকারে রেখে তোর পার্ক স্ট্রীটের সন্তোষকে নিয়ে চায়ের দোকানে বসে ঢলাঢলি করবি। এত বড় বুকের পাটা! বেরিয়ে যা এখান থেকে—আমি—আমি—'

কুদ্ধ ক্ষিতীশকে শান্ত করতে রমেশ একটা হাত শূন্যে বাড়িয়ে দিল। 'আহা, তুই এত বেসামাল হয়ে পড়লে চলবে কেন। দাঁড়া আমি বলছি, আমি বোঝাই—'

'তুমি বুঝিয়েছ! তোমার বোঝানোর বড় তোয়াক্কা করে শেয়ানা মেয়ে। ও যে দিনকে দিন কত বড় বজ্জাত, বদমায়েস হতে চলেছে, তা তুমি টের পাবে কি করে। আমাকে তোমাকে ঘুমে রেখে ও ওর কাজগুলি ঠিক করে যাচ্ছে।'

'কথা বলছিস না কেন।' রমেশ আর বসে নেই। উঠে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠল। 'কি কথা হচ্ছিল এতক্ষণ পার্ক স্ট্রীটের সেই ছোকরার সঙ্গে। কি নিয়ে হাসা-হাসি হচ্ছিল?'

বেবি নখ খুটছিল। মুখ তুলে আস্তে বলল, 'হাসিনি তো।'

'আলবৎ হেসেছিলি।' ক্ষিতীশ চিৎকার করে উঠল। 'আবার মিথ্যে কথা বলবি তো কিলিয়ে হাড় ভেঙে দেব। আমার কানকে ফাঁকি। তুই ডালে ডালে চলিস, আমি চলি পাতায় পাতায়। অ্যাঁ, হাসিনি! কানে আমি তুলো গুঁজে বসেছিলাম সেখানে।'

বেবি চুপ করে কাঁদছিল।

রমেশ আবার চেয়ারে বসে পড়ল।

শিবনাথ একদিন কপি ক্ষেতে বেড়াতে গিয়ে ঝোপের পাশে দাঁড়িয়ে বলাইর মেয়ে ময়না ও রুনুকে পার্ক স্ট্রীটের টাই স্যুট-পরা সন্তোষকে নিয়ে একদিন কথা বলতে শুনেছিল আজ তার মনে পড়ল। এবং সন্তোষ মাঝে মাঝে রুনুর সঙ্গে দেখা করতে এ-বাড়িতে এসেছে। আজ রুনুকে হাসপাতালে দেখতে আসা

অস্বাভাবিক না এবং বেবিকে নিয়ে রেস্টুরেণ্টে গিয়ে চা খাওয়াও অসম্ভব না। কিন্তু সেখানে দু ঘণ্টা বসে দুজনের গল্পসল্প বা হাসাহাসি সত্য কি মিথ্যা বুঝতে না পেরে শিবনাথ শুধু হাঁ করে তাকিয়ে বেবির কান্না, ক্ষিতীশের আস্ফালন এবং রমেশের কখনো গর্জন করে-ওঠা, কখনো শান্ত হয়ে থাকার ছবি দেখতে লাগল।

'বোঝাও, তুমি বুঝিয়ে দেখ কে গুপ্তর মেয়েকে যদি লাইনে আনতে পার। আমার দোকানও না কর্মচারীও না। ঠেকতে তুমিই ঠেকবে আমার কি!' বলে ক্ষিতীশ পেরেকে ঝোলানো একটা র‍্যাপার টেনে নিয়ে সেটা গায়ে জড়াতে জড়াতে আরো কি নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে দোকান থেকে হন হন করে বেরিয়ে গেল।

'বুঝলেন মশাই, আমার হয়েছে সব দিকে বিপদ।'

রমেশের কথায় শিবনাথ চোখ তুলল শুধু, কথা বলল না। রমেশ অনেকটা নিজের মনে বলতে লাগল। 'ঘরে হাঁড়ি চড়ে না, দিনের পর দিন উপোস থাকা হয়, ভাল মনে আমি জায়গা দিলুম এখানে, তা এরকম করলে চলাফেরা সংশোধন না করলে বাধ্য হয়ে আমাকে ছাড়িয়ে দিতে হবে।'

বেবি চোখ মুছছিল।

'তা, তুই মনে মনে কি ঠিক করেছিস?'

'এখন আমি বাড়ি যাব। মা চিন্তা করছে।'

রমেশ সজোরে মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ, তা তো যাবিই।' আমিও এই-বেলা দোকান বন্ধ করব। তা এখন নিয়ে কথা হচ্ছে না। কথা হচ্ছে, প্রত্যেক দিন নিয়ে। ভাইকে দেখতে গেলি হাসপাতালে। গিয়ে চায়ের দোকানে বসে আড্ডা মারা হ'ল একটা বাঁদরের সঙ্গে। এসব একেবারে বন্ধ করতে হবে যদি আমার কাছে থাকতে চাও। আর তাছাড়া, তাছাড়া—' একটা ঢোঁক গিলে আপাদমস্তক বেবিকে দু-তিনবার লক্ষ্য করে রমেশ শিবনাথের দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'তুমি যে এখনো কচি খুকিটি আছ, সেকথা ভুলে যাও। রীতিমত বড় মেয়ে হয়ে গেছ, কি বলেন।'

শিবনাথ নিঃশব্দে ঘাড় নেড়ে রমেশকে সমর্থন করল। বেবি গায়ের ফ্রকটা হাঁটুর নিচে টেনে দিয়ে তেমনি মুখ গুঁজে বসে।

'যাও, আজ ঘরে যাও। যে কথা-গুলো বললাম মনে রেখো। ক্ষিতীশ আজ আবার ভয়ানক চটেছে তোমার ওপর। কেন ও মাঝে মাঝে এমন চটে নিশ্চয়ই বুঝতে পার। তুমি ছোট না!'

রমেশ থামতে বেবি আস্তে আস্তে উঠে দোকান থেকে বেরিয়ে গেল। রাস্তার দিকে বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে রমেশ কি যেন ভাবে।

শিবনাথও ভাবছিল। হঠাৎ আপনা থেকে তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল—'কে গুপ্তর ছেলে কি শিগগির সেরে উঠবে?'

প্রশ্নটা রমেশের কানে যেতে সে এদিকে ঘাড় ফিরিয়ে দার্শনিকের মত একটুখানি হাসল। 'জানি না, ও ছেড়ে দিন মশাই, যাদের ছেলে তারা কত খোঁজ রাখছে দেখছেন তো, আর খোঁজ রেখে হবেই বা কি।' রমেশ আর হাসল না। চোখ দুটো গোল করে গলার স্বর ফিস-ফিস করে তুলল। 'আপনি তো ভিতরের খবর জানেন না। বাড়িওলার জুলুম চলবে না, বাড়িওলার গাড়ি রুখতে যাওয়া এসব হ'ল বানানো কথা, সাজানো গল্প। আসলে ব্যাপার আরও গুরুতর।'

'কি রকম?' শিবনাথ দম বন্ধ করে রমেশের কথা শুনছিল।

'হারামজাদা, হ্যাঁ, কে গুপ্তর ওই অতটুকুন ছেলে আরো কতগুলো গুণ্ডার সঙ্গে মিশে গাড়িটা আটকাতে গেছল অন্যরকম উদ্দেশ্য নিয়ে। পারিজাত গাড়িতে ছিল না। ছিল তার দারোয়ান আর তার এখানকার কারবারের আমদানী নগদ হাজার ত্রিশেক টাকা। জায়গা ভাল না, তাই টাকাটা এখানে না রেখে পারিজাত রামসিংকে দিয়ে বালিগঞ্জে বাপের কাছে পাঠিয়ে দিচ্ছিল. কাল ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া হবে বলে।'

'রামসিং বলল একথা?' চোখ গোল ক'রে এবার শিবনাথও ফিসফিস করে উঠলঃ 'পলিটিক্যাল রবারি?'

'পলিটিক্যাল কি না জানি না মশাই।' রমেশ বিশেষ প্রসন্ন হ'ল না শিবনাথের কথা শুনে। বরং চেহারাটা আরো বিকৃত করে বলল, 'চারদিকে বেকার-সমস্যা, ভাতের সমস্যা, রুজি আছে তো তার সঙ্গে টেক্কা দিয়ে চলতে পারছে না মানুষ। জিনিসপত্র দিনকে দিন আক্রা হচ্ছে। অভাব মশাই, সর্বত্র অভাব। আর তার ফলে চোরের সংখ্যা বাড়ছে, গাঁটকাটার দল বাড়ছে, ডাকাতি, রাহাজানি রাতদিন লেগেই আছে।'

যেন দম নিতে একটু থেমে পরে রমেশ বলল, 'এই বেলেঘাটা চিংড়িঘাটা টেংরা, নারকেলডাঙায় মিলিয়ে না হলেও কমসে কম পঞ্চাশটা গ্যাঙ আছে, তার খবর রাখেন কিছু?' রমেশ টেবিলের ওপর আঙুলের বাড়ি দিয়ে বলল, 'পলিটিক্যাল ফলিটিক্যাল বলছেন, সেসব মশাই আগে ছিল, যবে ব্রিটিশ ছিল, এখন স্রেফ [illegible] খাদ্য-সমস্যা মানুষকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে এবং যাবে দেখুন না, আরো দুদিন সবুর করুন না।'

কথাটা বলে ভুল করেছে বুঝতে পেরে শিবনাথ লজ্জায় ঈষৎ হাসল। 'হ্যাঁ, সেসব এখন একরকম নেই। [illegible] লাগছে এই বয়সে রুনুটা কেমন [illegible] এসব দলে গিয়ে মিশল।'

রমেশ হঠাৎ কথা বলল না। রাস্তার দিকে চোখ রেখে গভীরভাবে আবার [illegible] কি চিন্তা করল। তারপর এক সময় ঘাড় ফিরিয়ে সতর্ক চাপা গলায় বলল, '[illegible] ক'রে মিশল, কখন মিশল সেসব [illegible] পরের কথা, রাম সিং ইচ্ছা করে চো[illegible] দিয়েছে. না বেমক্কা ছুটতে গিয়ে [illegible] গাড়িচাপা পড়ল, সেসব আলোচনা [illegible] এখন বন্ধ রাখুন। আমি আজ সকালে [illegible] গুপ্তকেও এখানে ডেকে এনে বুঝিয়ে [illegible] কেন আপনি বুঝতে পারছেন? [illegible] নিয়ে এখন বেশি নাড়াচাড়া করতে [illegible] বিশ্রী ব্যাপার দাঁড়াবে। যতটা [illegible] চুপচাপ থাকা ভাল. হ্যাঁ, আমা[illegible] সকলের। আমরা সবাই এক [illegible] আছি, এটা তো আর অস্বীকার করা[illegible] না। একটা ডাকাতি মামলায় [illegible]

জড়িয়ে পড়লে আমাদের পাঁচজনকে পর্যন্ত পুলিস টানা-হেঁচড়া করবে।'

'তা তো বটেই, তা খুবই সত্য।' শিবনাথ ছোট্ট একটা নিশ্বাস ফেলে দু'বার মাথা নাড়ল।

'পলিটিক্যাল আন্দোলন, এই ধরুন যেমন ভাড়া-বন্ধ-কর, বাড়িওলার জুলুম চলবে না, ট্যাক্স-দান রহিত কর—এসব কেস বরং পুলিস আজকাল একটু নরম চোখেই দেখছে, কেন না কেবল এই ফাঁয়ো গেয়ে সরকারের গায়ের চুল চাঁদেরা খুবে কমই ছিঁড়তে পারছে। কিন্তু ডাকাতি-ফাকাতি উঁহু—দেখলেন তো পর পর কলকাতা শহরের ওপর ভরদুপুরে ক'টা লুঠ হয়ে গেল। পুলিস হদিশই পেলে না কিছু। কাজেই এখন আমাদের পাড়ায় এরকম একটার চেষ্টা হয়েছে এবং এক আসামী পালাবে দূরে থাক জখম হয়ে হাসপাতালে আছে জানতে পারলে পুলিস সবটা ব্যাপার কেমন কড়া হাতে চেপে ধরবে খেয়াল রাখেন?'

'তা তো বটেই।' শিবনাথ আবার মাথা নাড়ল। 'পারিজাত কি পাল্টা কেস্-কেস্—'

কথা শেষ হবার আগে রমেশ মাথা নাড়ল। 'পারিজাত সেই ছেলেই না মশাই, পাক্কা জেণ্টেলম্যান, ওর তো আর ঘরে খাওয়ার অভাব নেই যে, একটা কথা শুনে অমনি হুট্ ক'রে মেজাজ খারাপ করবে। তা ছাড়া, আপনারা তার প্রজা, রুনু এ-বাড়ির ছেলে ভাল জানে সে। যা হবার হয়েছে। হ্যাঁ, তবে যদি গুপ্ত এই নিয়ে থানা-পুলিস করতে যায় তো বিপদ আছে। পারিজাত কিছুতেই ছাড়বে না। কাজেই ও যখন চুপ করে গেছে, আমাদেরও এই নিয়ে আর—'

'তা তো বটেই, তা তো বটেই।'

রমেশ লম্বা একটা নিশ্বাস ছাড়ল। 'যাকগে অনেক বাজে কথা হ'ল। কি যেন তখন বলছিলাম, হ্যাঁ, বলাই ব্ল্যাক-মার্কেটের ব্যবসায় নেমেছে পাঁচ শালা নিন্দাবাদ শুরু করেছে। আরে চুরি কে না করে, তোরা করিস, আমি করি, আপনি করেন সুবিধা পেলে। আমি মিথ্যা বললাম? জিজ্ঞেস করবেন, কি রকম? ধরুন, আজ রাস্তায় বেরোলেন। পকেটে পয়সা শর্ট আছে। ট্রাম কি বাস-এ চলতে গিয়ে দেখলেন কণ্ডাক্টার ভুলে পয়সাটা আর চাইলে না। নামবার সময় মনে পড়ল, টিকিট কাটা হয়নি, তখন কি আর ডেকে কণ্ডাক্টারকে পয়সাটা দিয়ে দেবেন আপনি, আমি তো দিই না, কেউ দেয় না। সুবিধে পেলে, বুঝেছেন, পাঁচশো টাকা মাইনের চাকুরে হোক, কি বেগুন ফিরি করে খাক, সবাই গাঁটের পয়সাটা ধরে রাখতে চায়। একটা নকল দু'আনি হাতে এসে গেলে আপনি সেটা জলে ফেলে দেন কখনো? আমি তো দিই না। কেউ দেয় না। বরং ফাঁকে-ফিকিরে দু'পাঁচ জায়গায় চেষ্টা করে ওটা চালিয়ে দেবার দিকেই আমাদের নজর থাকে। এগুলো কি চুরি না, আইনকে ফাঁকি দেওয়া না? বলুন, চুপ করে আছেন কেন?' কথার শেষে রমেশ মৃদু-মন্দ হাসল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে শিবনাথের দিকে তাকাল।

যুক্তিগুলো সরাসরি অস্বীকার করতে পারল না শিবনাথ। সামান্য হেসে সে-ও মাথা নাড়ল।

রমেশ বলল, 'রায় সাহেবের বাড়ির ছেলেপুলেকে পড়াতে গিয়ে সেখান থেকে গলা-ধাক্কা খেয়ে বিদায় হয়ে এসে বিধু এখন লোকের নামে নিন্দা গাইবে, পাঁচুর সেলুনে বসে ওকে, নিজের ছেলে খেটে পয়সা আনবে বলে তাড়াতাড়ি একটা তেল-মালিশের দোকান খুলতে পরামর্শ দেবে, এ তো জানা কথা। উল্লুকটাকে দেখলে আমার গা ঘিনঘিন করে মশাই।'

বলাইও রমেশ সম্পর্কে নিন্দাবাদটা ইদানীং একটু বেশি আরম্ভ করেছে বলে বিধু মাস্টারের ওপর রমেশ ভীষণ চটে আছে, শিবনাথের বুঝতে কষ্ট হয় না। তবু প্রসঙ্গটা এখানে শেষ হলে ভাল হয় এবং শিবনাথও উঠতে পারে চিন্তা করে—সে বাইরের দিকে তাকিয়ে যখন উস্খুস করছিল, রমেশ হঠাৎ মুখটা সরিয়ে এনে মোলায়েম গলায় বলল, 'ভাল কথা, দীপ্তি কি আপনাকে চা-টা দিয়েছিল?'

শব্দ না ক'রে শিবনাথ হাসল। নিজের পরিচ্ছন্ন বেশভূষা হাত-পা-নখ নতুন রং-করা জুতোর দিকে একবার চোখ বুলিয়ে ও হাত দিয়ে দাড়ি-কামানো পালিশ গালটা অনুভব করে শিবনাথ বলল, 'না, বলেছি আপনাকে, আজ পারিজাতের মহিষীর মেজাজ খুব ভাল ছিল না; গিয়ে বসতেই সে-সব কথা শুরু করে কাঁদাকাটা করলেন।'

'বুঝেছি, বুঝেছি, শুনলাম তো বললেন তখন। তবে এটা সাময়িক। টেম্পোরারি অশান্তি বড়লোকের ঘরেও থাকে বৈকি। যাকগে, চিন্তা করবেন না, আপনার সেখানে হয়ে যাবে। হয়ে গেছে ধরে নিন। কেন বললাম, বুঝতে পেরেছেন নিশ্চয়।' একটা চোখ বুজে রমেশ হাসতে শিবনাথ ঠোঁট বাঁকা করে হাসল। 'আচ্ছা, চলি আজ।'

'আসুন।'

রাস্তায় বেরিয়ে শিবনাথ রমেশের অন্য সব কথা ভুলে গিয়ে দু'টো কথাই চিন্তা করল বেশি। নোংরা বিধুকে পারিজাত গিন্নী অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করেছেন, আর শিবনাথ সেখানে পা দিতে না দিতে তার কাছে অন্তরের সব কথা খুলে বলেছেন। শিবনাথকে চা খেতে দেয়া হয়েছিল কি—রমেশের এই প্রশ্নটাও বার বার তার কানের কাছে ঘোরাফেরা করল। মনে উৎসাহ ও নিজের ওপর শ্রদ্ধা জাগাতে এইসব ছোট-খাটো কথা সাধারণ এক একটা ঘটনা কত বেশি সাহায্য করে অন্ধকারে রাস্তায় চলতে চলতে শিবনাথ ভাবল। ভাবনায় ছেদ পড়ল তার বাদামগাছের তলায় এসে। এখানেই কে গুপ্তর ছেলে কাল গাড়ি-চাপা পড়ে। ঝিঁ-ঝিঁ ডাকছিল। অল্প হাওয়ায় গাছের পাতাগুলো খসখস করছিল। যতটা সম্ভব দ্রুত ব্যস্ত পায়ে শিবনাথ গাছটা পার হয়ে গেল। আজ গ্যাসের বাতিটা কেন জ্বালানো হয়নি, নাকি জ্বালানো হয়েছিল নিভে গেছে, চিন্তা করল সে। (ক্রমশ)

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

এতদিন চার্লি শুধু পরিশ্রমই করে এসেছেন; এবারে স্থির করলেন, জীবনকে আরও পরিপূর্ণ, আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করে তুলবেন। ইউরোপ ভ্রমণ, সেখানকার বিপুল অভ্যর্থনা, বিশিষ্ট সব ব্যক্তিদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার, ঐশ্বর্য, খ্যাতি, প্রতিষ্ঠা—এত সবের মধ্যেও চার্লির চারিত্রিক মাধুর্য কিছু নষ্ট হয়নি। তাঁর এই চূড়ান্ত সৌভাগ্যও তাঁকে উদ্ধত, দুর্বিনীত করে তুলতে পারেনি। উদ্ধত নন, আবার অতি-নম্রও নন। বরং বলা যায়, আগের চাইতে তিনি এখন আর একটু-খানি সামাজিক হয়েছেন।

চার্লি যখন একটু খোশমেজাজে থাকেন, তাঁর মতন সহৃদয় ব্যক্তি তখন আর দ্বিতীয় কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অতিথি-অভ্যাগতদের সঙ্গে তখন তিনি প্রাণ খুলে কথা কইবেন। বিচিত্র এক-একটি ভঙ্গির মধ্য দিয়ে তাঁর বক্তব্যকে আরও প্রাঞ্জল, আরও হৃদয়গ্রাহী করে তুলবেন। এ ব্যাপারে তাঁর দক্ষতার কোনও তুলনা হয় না। যাঁর সম্পর্কে কিছু বলছেন, মনে হয়, তাঁকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। শুধুই মানুষ অথবা জীবজন্তু নয়, নিষ্প্রাণ উদ্ভিদেরও যে পৃথক একটি চরিত্র রয়েছে, তা তিনি জানেন; তাঁর কথাবার্তার মধ্য দিয়ে সেই চরিত্রটিকে তিনি ফুটিয়ে তুলতে পারেন। এ-ছাড়া আছে মূকাভিনয়। ছোট ছোট এক-একটি বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে বন্ধুবান্ধবদের তিনি অভিনয় করে দেখাতেন। এ তাঁর একক অভিনয়। একই সময়ে একাধিক চরিত্রে তিনি অভিনয় করে যাচ্ছেন, অথচ এতই তাঁর দক্ষতা যে, প্রত্যেকটি চরিত্রই তার স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য নিয়ে ফুটে উঠছে। উদাহরণ হিসেবে "ডেভিড আর গলিয়াথ"-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। পরে এই বিষয়বস্তুটিকে তিনি "দী পীলগ্রিম" বইয়ে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। আর একটি বিষয়বস্তু ছিল ষাঁড়ের লড়াই। তিনিই ষাঁড়, আবার তিনিই যোদ্ধা। কিংবা ধরুন, 'ক্যামিল'। দুমার এই বিখ্যাত নাটকের বিয়োগান্ত দৃশ্যটিকে তিনি তাঁর মূকাভিনয়ের বিষয়বস্তু করে নিয়েছিলেন। নায়ক আর নায়িকা এই উভয় চরিত্র তিনি একাই অভিনয় করে দেখাতেন। এই ঘরোয়া অভিনয়ে মেটার-লিঙ্কের স্ত্রী একবার ক্যামিলের ভূমিকায় নেমেছিলেন। নাটকে আছে শেষ পর্যন্ত নায়িকার মৃত্যু হল। কিন্তু মেটারলিঙ্কের স্ত্রী অভিনয় করতে করতে যেই না এক-বার খুক করে একটু কেশেছেন, সঙ্গে সঙ্গেই বেদম কাশি শুরু হয়ে গেল চার্লির। কাশতে কাশতে মাটিতে শুয়ে পড়লেন তিনি। নায়িকার মৃত্যু হবার কথা, তার জায়গায় নায়কই দেখা গেল কাশতে কাশতে মারা পড়েছেন। বার্লিনে থাকতে পোলা নেগ্রির এক পার্টিতে একদিন উপস্থিত ছিলেন চার্লি। সেখানে তিনি রাশিয়ান ব্যালের অনুকরণ করে দেখান। নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গ কেউই তাঁকে চিনতেন না। কিন্তু তাঁর সেই অভিনয় দেখে তাঁরা হাসতে হাসতে সেদিন মারা পড়বার দাখিল হয়েছিলেন। আর একটি ঘটনার কথা বলছি। চার্লি তখন লন্ডনে। ঘরের মধ্যে বসে জনকয়েক বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে গল্প করছেন। বাইরে চলেছে তুমুল ঝড়বৃষ্টি। মূকাভিনয়ের মধ্য দিয়ে সেই ভয়ঙ্কর আবহাওয়াকে তিনি ফুটিয়ে তুললেন। বন্ধুরা তো স্তম্ভিত। বিস্ময়টা একটু প্রশমিত হয়ে এলে তাঁদেরই মধ্যে একজন মন্তব্য করলেন যে, চার্লি তাঁর জীবনের চূড়ান্ত সিদ্ধি অর্জন করেছেন, নতুন করে আর কিছুই তাঁর অর্জন করবার নেই। শুনে চার্লি বললেন, "তাই যদি হয়, তো বেঁচে থেকে আর লাভ কী, আজই আমি আত্মহত্যা করব। এই মুহূর্তেই।" বলে তিনি জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন; ইচ্ছেটা এই যে, রাস্তার উপরে লাফিয়ে পড়ে তিনি প্রাণ বিসর্জন দেবেন।

আসলে এ-সবই তাঁর অভিনয়, বন্ধুটিকে জব্দ করবার ফন্দি। বন্ধুর নাম টম গেরাটি। গেরাটি ছাড়া আর যে-কজন বন্ধু সেখানে উপস্থিত ছিলেন, ইশারায় চার্লি তাঁদের আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, গেরাটিকে নিয়ে একটু মজা করা হবে। চার্লি গিয়ে জানালার কাছে দাঁড়াতেই আকাশে হঠাৎ বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। এবং তন্মুহূর্তেই—যেন তড়িতাহত হয়েছেন, এই রকম একটা ভঙ্গি করে মেঝের উপরে আছড়ে পড়লেন চার্লি। টেবিলে বসে গেরাটি তখন হুইস্কি টান-ছিলেন। চার্লিকে ওইভাবে লুটিয়ে পড়তে দেখে তো তাঁর চক্ষুস্থির। "সর্বনাশ, সত্যিই যে মারা পড়ল।" অর্ধ-স্ফুট কণ্ঠে কোনও রকমে কথা কটি তিনি উচ্চারণ করলেন। অন্যান্য বন্ধুরা ততক্ষণে চার্লির কাছে ছুটে গিয়েছেন। নাড়িতে হাত দিয়ে মুখ শুকিয়ে উঠল তাঁদের, ধরাধরি করে চার্লিকে তাঁরা তাঁর শয়নকক্ষে নিয়ে গেলেন। টম গেরাটিও তাঁদের পিছন-পিছন ছুটে এসেছিলেন, কিন্তু তাঁকে সেখানে ঢুকতে দেওয়া হল না, সশব্দে তাঁর মুখের উপরে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। পাংশু মুখে দরজায় ধাক্কা দিচ্ছেন গেরাটি, জিজ্ঞেস করছেন, "কী হল, চার্লি বেঁচে আছে তো?" উত্তর নেই।

একটু বাদেই দরজা খুলল। চার্লির সেক্রেটারি কার্ল রবিনসন ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। বিবর্ণ, ভয়ার্ত তাঁর মুখ। কার্লের কাছে ছুটে এলেন টম। কার্ল তাঁর সঙ্গে কথা কইলেন না। ধাক্কা দিয়ে টমকে একপাশে সরিয়ে দিলেন তিনি, তারপর দ্রুত পায়ে টেলিফোনের কাছে গিয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন।

●"চার্লি কি মারা গিয়েছে?"

কার্ল সে-কথার জবাব না দিয়ে বললেন, "দোহাই টম, এখন আর আমাকে বিরক্ত কর না। বুঝতে পারছ না, কতবড় সর্বনাশ ঘটে গিয়েছে?" বলে তিনি রিসিভারে মুখ রেখে গম্ভীর গলায় অপারেটরকে বললেন, "হ্যাঁ, লাইনটা একবার করোনারকে দিন।" করোনার! টমের আর বাক্‌স্ফূর্তি হল না। মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন তিনি। অন্যান্য বন্ধুরাও ততক্ষণে ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। টমকে এসে তাঁরা সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। টম একবার ঘরের মধ্যে যেতে চাইছিলেন। অন্যান্য বন্ধুরা বললেন, "না, ঘরে যাওয়া নিষেধ। করোনার কী বলেন, না শুনে কাউকেই এখন ঘরের মধ্যে ঢুকতে দেওয়া হবে না।" কার্ল ওদিকে টেলিফোনে কথা বলে চলেছেন, "কী, করোনারের লাইন এনগেজড আছে? আচ্ছা, তাহলে চীফ অব পুলিশকে লাইন দিন। কিন্তু তার আগে ডাক্তার ডাকুন এখুনি। হ্যাঁ, খুব তাড়াতাড়ি।"

প্রতিটি কথার সঙ্গে সঙ্গে টমের মানসিক যন্ত্রণা এদিকে বেড়ে চলেছে। এমন সময় শয়নকক্ষের দরজা হঠাৎ খুলে গেল। চ্যাপলিন বেরিয়ে এলেন। তাঁর পরনে—। না থাক, বর্ণনাটা চ্যাপলিনের মুখ থেকেই শুনুন। "বিছানার চাদরটাকে আমি কোমরে জড়িয়ে নিয়েছি। মেঝের উপরে লুটিয়ে পড়েছে তার শেষাংশ। দুই হাতে দুটি বালিশ। না বালিশ নয়, আমার ডানা। আমি তো আর মানুষ নই এখন, দেবদূত সেজে টমের সামনে এসে হাজির হয়েছি।" কী আশ্চর্য, তবুও টমের মুখে হাসি ফুটল না।

টমকে চ্যাপলিন জিজ্ঞেস করেছিলেন, ঠাট্টা না হয়ে ব্যাপারটা যদি সত্যি হত, কী করতেন তা হলে টম? "টম বলল, 'তুমি মারা গেলে আমারও আর বাঁচবার ইচ্ছে থাকত না। জানলা থেকে নীচে লাফিয়ে পড়ে আমিও তাহলে আত্মহত্যা করতাম।" শুনে চ্যাপলিন দুঃখ পেয়েছিলেন, ভারি খেলো মনে হয়েছিল নিজেকে। টমের মতন সাচ্চা মানুষকে এইভাবে জব্দ করতে যাওয়া তাঁর উচিত হয়নি।

মাথা খাটিয়ে সুন্দর একটি খেলা বার করেছিলেন চ্যাপলিন। তাঁর নিজের বাড়িতে যে-সব পার্টির আয়োজন হত, সেখানে তো বটেই, হলিউডের অন্যান্য বাড়িতেও খেলাটা খুব চলত। খেলাটার নাম 'ক্যারেক্টার ব্যালট'। পার্টিতে যাঁরা এসেছেন, পর্যায়ক্রমে তাঁদের প্রত্যেকের হাতে একটি করে স্লিপ দেওয়া হত। প্রতিটি স্লিপে ঘর থাকত গোটাকয়েক, প্রতিটি ঘরে একটি করে গুণের উল্লেখ। স্লিপগুলি অনেকটা এইরকমের:—

চার্লস চ্যাপলিন ও পোলা নেগ্রি

'গোল্ড রাশ'-এর একটি দৃশ্য

যৌন আবেদন	... ...
সৌন্দর্যানুভূতি	... ...
চেহারা	... ...
রুচি	... ...
বন্ধুত্বের ক্ষমতা	... ...
রসবোধ	... ...
মনোহারিতা	... ...
আন্তরিকতা	... ...
বুদ্ধি	... ...
করুণা	... ...
মোট	... ...

অতিথির হাতে স্লিপটি দিয়ে তাঁর নিজ-চরিত্রের উল্লিখিত গুণাগুণের পাশে নম্বর বসিয়ে যেতে বলা হত (এক-একটি বিষয়ে ফুল মার্কস হল ১০)। নম্বর বসানো শেষ হলে অতঃপর তাঁকে অন্য কোনও ঘরে পাঠিয়ে দিয়ে এ-ঘরে বসে সবাই তাঁর স্লিপটিকে স্ক্রুটিনাইজ করতেন। কোনও-কোনও বিষয়ে নম্বর কেটে নিতেন কিছু, কোনও কোনও বিষয়ে আবার বাড়িয়ে দিতেন। তার পর অতিথিকে এ-ঘরে ডেকে এনে সংশোধিত স্লিপটি তাঁকে ফেরত দেওয়া হত। প্রায়-ক্ষেত্রেই সংশোধনের বহর দেখে স্তম্ভিত হয়ে যেতেন তিনি। দেখা যেত, বিভিন্ন বিষয়ে, যথা আন্তরিকতা কি যৌন আবেদন সম্পর্কে তাঁর নিজের যা ধারণা, বন্ধুদের ধারণার সঙ্গে তার প্রচণ্ড গরমিল। নিজেকে তিনি নিজে যা নম্বর দিয়েছিলেন, অনেকক্ষেত্রেই তা কেটে কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। খেলাটা যে কৌতুকপ্রদ তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-খেলা খেলতে গিয়ে অনেকেরই বন্ধু-বিচ্ছেদ ঘটেছে।

চ্যাপলিন বলেন, "আর কিছু না হোক, এতে করে তোমার সম্পর্কে অন্য লোকের মনোভাবটা তুমি জেনে নিতে পার।"

ডগলাস ফেয়ারব্যাংকস থাকতেন বীভার্‌লি হীলস-এর সামিট ড্রাইভ অঞ্চলে। নিজের নামের সঙ্গে স্ত্রীর নামের (মেরি পীকফোর্ড) জোড় মিলিয়ে বাড়ির নাম দিয়েছিলেন "পীকফেয়ার"। ফেয়ারব্যাঙ্কসের বাড়ির কাছে কিছু জমি কিনলেন চার্লি, নিজের থাকার জন্যে একটি বাড়ি তৈরি করিয়ে নিলেন। বিরাট বাড়ি। ছ'টি শয়নকক্ষ, পাঁচটি স্নানঘর। বাড়ির সামনে পাঁচ একর জমি। তার উপর রচনা করা হল লন, আর ফুল-বাগান। টেনিস-কোর্ট, সুইমিং পুল, কোনও কিছুই বাদ পড়ল না। সুইমিং পুলটাকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যে দেখলেই মনে হত বিরাট একটা টুপি! গোলাকৃতি বিরাট সেই টুপিটাকে যেন কেউ চিত করে বসিয়ে রেখেছে। চার্লির বাউলার-হ্যাট তো আপনারা দেখেছেন, তারই মস্ত বড় একটা আকৃতি কল্পনা করে নিন; তা হলেই সেই পুকুরের একটা আন্দাজ পাওয়া যাবে। খেলাধুলো আর দৌড়ঝাঁপে চিরকালই চার্লির অদম্য উৎসাহ। ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস স্বয়ং এ-ব্যাপারে একজন পারদর্শী ব্যক্তি। কিন্তু প্রায় প্রত্যেক খেলাতেই চার্লির কাছে তাঁকে পরাজয় স্বীকার করতে হত। জাপানীদের চার্লি খুব ভালবাসতেন। তাঁর পরিচারকদের অধিকাংশই ছিল জাপানী। জাপানী শোফার কোনো-ই তাদের জুটিয়ে দিয়েছিল। চার্লির এই জাপানী-প্রীতি অকারণ নয়। জাপানী 'নো' নাট্যে তাঁদের অপূর্ব রঙ্গাভিনয়-দক্ষতার পরিচয় পেয়ে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন। তখন থেকেই তাদের প্রতি তাঁর অপরিসীম অনুরাগ।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর পুত্র অ্যান্টনি অ্যাসকুইথ এই সময় হলিউড পরিদর্শনে এসেছিলেন। মেরি পীকফোর্ডের এক পার্টিতে চার্লির সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। অ্যান্টনি অ্যাসকুইথ লিখছেনঃ

"এর আগে শুধু তাঁর ছবিই দেখেছি। আসলে যে তাঁর চেহারা এত

সুন্দর, তা আমি জানতাম না। কিন্তু একটা কথা, মুখের চাইতে মুখভঙ্গিমাই আমাকে সেদিন বেশী মুগ্ধ করেছিল। একটিও কথা না বলে শুধু এক-একটি ভঙ্গির সাহায্যেই মুখের উপরে বিচিত্র এক-একটি ভাব তিনি ফুটিয়ে তুলছিলেন। মনে হচ্ছিল, আমি যেন এক অপরূপ ব্যালে অনুষ্ঠান দেখে চলেছি। না, ব্যালে নয়। ব্যালের মধ্যে তবু খানিকটা ছক্-কাটা ভাব এসে যায়। আর এ যেন এক স্বতঃস্ফূর্ত নৃত্যানুষ্ঠান।

"হাসতে তো কতজনকেই দেখেছি, কিন্তু চার্লির হাসির সঙ্গে তার তুলনা হয় না। অধিকাংশ মানুষেরই প্রথমে ঠোঁটে কাঁপন লাগে, এক মুহূর্ত বাদে চোখ দুটিও উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। অনেকের হাসি আবার ঠোঁটেই আটকে থাকে, দৃষ্টিতে তার ছোঁয়া লাগে না। এই প্রথম এমন একজনকে দেখলাম, যাঁর হাসি মূলত চোখেরই হাসি। ঠোঁট দুটিতে এতটুকু কাঁপন লাগেনি, অথচ তিনি হাসছেন। সেই হাসি, সেই স্বপ্নময় পরিবেশ, এক নিমেষে আমার লজ্জা-সঙ্কোচ যেন ধুয়েমুছে গেল। এমনভাবে তাঁর সঙ্গে কথা কইতে লাগলাম যেন তিনি আমার কতই অন্তরঙ্গ, যেন তিনি আমার অনেক-কালের বন্ধু।

"আলাপচারিতে তাঁর দক্ষতা প্রায় অসামান্য। আমাদের সেই সাক্ষাৎকারের পর প্রায় তিরিশ বছর কেটে গিয়েছে, কিন্তু এখনও তার কিছুই আমি ভুলিনি। নানান বিষয়ে তিনি কথা কইছিলেন, শিল্প, জীবন, ধর্ম, রাজনীতি, কোনও-কিছুই বাদ যায়নি। শুনতে আমার ভালই লাগছিল, তবে কলেজী ছাত্ররা এ-সব ব্যাপারে যে-ধরনের মতামত দিয়ে থাকে, চার্লির কথাবার্তা থেকে তার বেশী কিছু —তখন পর্যন্ত অন্তত—পাওয়া যায়নি। অক্সফোর্ডের বিভিন্ন সাহিত্য-চক্র অথবা দর্শন-সমিতিতে ঠিক এই ধরনের কথা-বার্তা আমি অনেক শুনেছি। তারপর জীবন সম্পর্কে ধোঁয়াটে কথাবার্তার পাট চুকিয়ে দিয়ে বাস্তব জীবনের প্রসঙ্গে নেমে এলেন তিনি। এবং সঙ্গে সঙ্গেই যেন তাঁর চেহারা একেবারে আমূল পালটে গেল। কত রকমের মানুষের

'গোল্ড রাশ' চিত্রে জর্জিয়া হেল ও চার্লি

সংস্পর্শে তিনি এসেছেন, কত বিচিত্র অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন। তাঁর কথা-বার্তার মধ্য দিয়ে সেই সব মানুষের চরিত্র, সেই সব অভিজ্ঞতার চেহারা যেন স্পষ্ট অবয়ব নিয়ে ফুটে উঠতে লাগল। অ-দৃষ্ট ঘটনাকে এইভাবে দৃশ্যমান করে তোলার ক্ষমতা এক শুধু চার্লিরই আমি দেখেছি। এ-ব্যাপারে তিনি অতুলনীয়, অদ্বিতীয়। যেন পুরনো কোনও ঘটনাকে তিনি তাঁর কথা আর ভঙ্গির মধ্য দিয়ে মূর্ত করছেন না, যেন নতুন কিছু সৃষ্টি করে চলেছেন। চার্লিকে তখন আর দেখতে পাচ্ছিলাম না আমি; হঠাৎ কোন জাদুমন্ত্রে যেন তিনি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছেন;—আর যাঁদের কথা তিনি বলছিলেন, সেই সব অচেনা মানুষ যেন আমার চোখের সামনে এসে মূর্ত হয়ে উঠছে।"

একদিন এক ডীনার-পার্টিতে গিয়ে জীম টুলির সঙ্গে আলাপ হল তাঁর। দীর্ঘদিন দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে টুলি তখন সবেমাত্র তাঁর প্রথম বইখানি লিখে উঠতে পেরেছেন। বইয়ের বিষয়-বস্তু চার্লি-চরিত্র।

সেই ডীনার-পার্টির গল্প আমি টুলির মুখেই শুনেছি। চ্যাপলিনের পরনে সান্ধ্য পোশাক, খুবই নাকি স্মার্ট দেখাচ্ছিল তাঁকে। টুলি তখনও ভদ্র-গোছের জামা-কাপড় কিনে উঠতে পারেননি; পুরনো সস্তা পোশাক পরেই ডীনার-পার্টিতে এসে হাজির হয়েছেন। সে যাই হোক, দু জনে তো টেবিলে গিয়ে বসলেন। আয়োজনের বিন্দুমাত্র ত্রুটি নেই। প্লেটের সামনে পাঁচ-সাত রকমের মদের গেলাস, দু পাশে কয়েক প্রস্ত ঝকঝকে ছুরি-কাঁটা। তার মধ্যে কোনটাকে যে কখন ব্যবহার করতে হবে, টুলি তার কিছুই জানতেন না। মহা সমস্যায় পড়ে গেলেন তিনি। কী করা যায় এখন? চার্লির দিকে চেয়ে দেখেন, মিটমিটে হাসিতে তার মুখখানি ভরে গিয়েছে। ইশারায় টুলিকে তিনি

বুঝিয়ে দিলেন যে, এ-সব ব্যাপারে তিনিও সমান অনভিজ্ঞ।

ডীনারের পর অনেক কথাবার্তা হল দুজনের। টুলি যাতে নির্বিঘ্নে তাঁর সাহিত্যসাধনা চালিয়ে যেতে পারেন, তার জন্য চার্লি তাঁকে সাহায্য করবেন বললেন। বললেন, ইচ্ছে করলে টুলি তাঁর স্টুডিয়োতে এসে চাকরি নিতে পারেন। টুলির কথাবার্তা শুনে তাঁর মনে হয়েছিল, স্টুডিয়োর কাজে তিনি তাঁর যোগ্যতার পরিচয় দিতে পারবেন। চার্লির কাছে বছর কয়েক কাজ করেছিলেন টুলি। চ্যাপলিন সম্পর্কে তাঁর সুন্দর একটি বইও আছে। এই বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতার চরিত্র এবং ব্যক্তিত্বের যে নিপুণ বিশ্লেষণ তাতে রয়েছে, তার প্রশংসা না করে উপায় নেই।

লণ্ডনের বস্তি-পাড়ার সেই দরিদ্র ছেলেটি, টুলির ভাষায় মাত্রই দশ বছরের ব্যবধানে আচার-আচরণে সে কেতাদুরস্ত একটি ভদ্রলোক হয়ে উঠেছে। টুলি লিখছেন, "শৈশব-জীবনের মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা চার্লির মনের উপরে দাগ কেটে বসে গিয়েছিল। কিন্তু বাইরে থেকে তা বুঝবার উপায় নেই।......এক যখন খুব রেগে যেতেন, কিংবা একটু নির্জনে থাকতেন, তখন তাঁর মধ্যে সেই দুরন্ত সরল শিশুটির সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। রেগে গিয়ে মাঝে মাঝে ভীষণ কলহ করতেন চার্লি, কিন্তু রাগ পুষে রাখতেন না। প্রতিহিংসাপরায়ণ মানুষ তিনি নন। ...রাগী মানুষ, অল্পে চটে যান, চটে গেলে খুব-খানিকটা গালাগালি করেন, কিন্তু ব্যস, ঐ পর্যন্তই। একটু বাদেই জল হয়ে গেলেন। তখন তিনি একেবারে অন্য মানুষ। বলতে কি, এক-এক সময় যে গভীর নির্লিপ্তের মধ্যে তাঁকে মগ্ন থাকতে দেখেছি, সে শুধু প্রথম শ্রেণীর শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। আলাপে তিনি মনোহর, আচরণে তিনি সহজ; কথা-বার্তার মধ্যেও সুন্দর একটি সুষমা জড়ানো রয়েছে। অনেকের কাছেই অনেক দুর্ব্যবহার পেয়েছেন চার্লি; কিন্তু তাঁদের কারো সম্পর্কেই কখনও তাঁকে কোনও কঠোর মন্তব্য করতে শুনিনি। নিজে কখন কার কোন্ উপকার করেছেন, সে-সম্পর্কেও তিনি সম্পূর্ণই নীরব থাকতে ভালবাসেন।"

চার্লির সামাজিক প্রতিষ্ঠা যদিও দিনে-দিনে অভ্রভেদী হয়েছে, তাঁর দুর্দিনের বন্ধুদের কথা এক মুহূর্তের জন্যেও তিনি বিস্মৃত হননি। চার্লি অবশ্য এ-বিষয়ে আমাকে কিছু বলেননি, কাউকেই বলেন না; কিন্তু আমি জানি যে, এই সময়ে অন্তত পঞ্চাশটি পরিবারকে তিনি নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য পাঠিয়ে গিয়েছেন। ব্রিটেনে তাঁর দূরসম্পর্কের দুঃস্থ আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তিনি টাকা পাঠাতেন। চার্লি যখন শিশু, লণ্ডনের রাস্তায়-রাস্তায় এক ভিখিরী তখন গান গেয়ে বেড়াত। তাকেও কিছু টাকা পাঠাতেন চার্লি। মূকবধির শিল্পী গ্রেনভিল রেমণ্ডের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল একদিন। দু চার মিনিট কথা বলার পরই চার্লি তাঁকে জানালেন, প্রয়োজন হলে রেমণ্ড তাঁর স্টুডিয়োতে এসে উঠতে পারেন। রেমণ্ড যেন হাতে স্বর্গ পেলেন। মৃত্যু পর্যন্ত চার্লির কাছেই তিনি ছিলেন।

চার্লির নতুন বন্ধু-বান্ধবীদের মধ্যে ব্রিটিশ লেখিকা ঈলিনর গ্লীনের নাম বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। হলিউডে তখন তাঁর দুখানি উপন্যাসের চিত্ররূপ গ্রহণ করা হচ্ছে। বই দু'খানির নাম 'থ্রী উইক্স' আর 'ফাইভ নাইটস'। এই উপলক্ষেই তিনি হলিউডে এসেছিলেন। মেরি পীকফোর্ডের বাড়িতে ডীনারের নিমন্ত্রণে গিয়ে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল চার্লির। ঈলিনরের বয়স তখন ষাট, কিন্তু তখনও অটুট তাঁর সৌন্দর্য। উজ্জ্বল সবুজ দুটি চক্ষু, কেশরাশি স্বর্ণাভ। তারও পর প্রায় পঁচিশ বছর তিনি বেঁচেছিলেন, এবং এই পঁচিশ বছরে তাঁর সৌন্দর্য এতটুকু ম্লান হয়নি। চার্লির সঙ্গে তাঁকে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হল। ইনিই চার্লি! ঈলিনর তো স্তম্ভিত। বললেন, "সে কি, ছবিতে যে আপনার আরেক-রকম চেহারা দেখেছি। আসলে যে আপনাকে এইরকম দেখতে, ভাবতেই পারিনি আমি।" দুষ্টু হেসে চার্লি বললেন, "আমিই কি পেরেছি!" অন্যের সম্পর্কে এই ধরনের মন্তব্য করতেই ঈলিনর ভালবাসতেন। চার্লির সম্পর্কে তাঁর অনুরাগের অন্ত ছিল না; তাঁর পরিহাস-ক্ষমতা, তাঁর প্রতিভাকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন। আমি যখন হলিউডে যাই, ইংল্যাণ্ড থেকে যাত্রা করার আগে ঈলিনরের সঙ্গে দেখা করেছিলাম। তিনি বললেন, আমার পরিচয় দিয়ে চার্লির

কাছে তিনি একটি চিঠি লিখে দেবেন। তার অবশ্য কোনও প্রয়োজন ছিল না।

চার্লির সঙ্গে বন্ধুত্ব সম্পর্কে তিনি লিখছেন, "প্রথম যেদিন চার্লির সঙ্গে দেখা হয় আমার, তখন থেকেই পরস্পরের আমরা ঘনিষ্ঠ বন্ধু। তাঁর বাড়িতে প্রায়ই পার্টির আয়োজন হত। একদিনের কথা এখনও আমার স্পষ্ট মনে আছে। নানান রকমের খেলা হত সেখানে। বিশেষ করে ডাম-ক্র্যাম্বো আর শ্যারাড। সেদিন ঠিক হল, মানবিক এক-একটি অনুভূতিকে অভিনয়ের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলা হবে। এক-একবারে দুজনে মিলে অভিনয় করবেন। কে কার সঙ্গে অভিনয় করবে, সেটা ঠিক হবে লটারিতে। লটারিতে চার্লির সঙ্গে অভিনয় করবার জন্য আমার নাম উঠল। কোন্ অনুভূতিকে ফুটিয়ে তুলব আমরা? ঘৃণা। আমাদের অভিনয় হল সকলের শেষে। তার আগে আর সবাই বিভিন্ন অনুভূতিকে রঙ্গকৌতুকের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। চার্লি ঠিক করলেন, রঙ্গকৌতুক নয়, একটু সীরিয়স রসের অবতারণা করবেন। পর্দা উঠতে সবাই দেখলেন, জানালার ঠিক সামনে স্থির হয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, মাথাটা সামনের দিকে অল্প-একটু নোয়ানো, জানালার রড দুটি তার পিছনে ঠিক ক্রুশের মত দেখাচ্ছে। ক্রুশবিদ্ধ যীশু। ঊর্ধাঙ্গ অনাবৃত, কোমরে শুধু একফালি কাপড় জড়ানো রয়েছে। হাত দুটিকে দুদিকে প্রসারিত করে দিয়েছেন চার্লি, আর তাঁর সামনে নতজানু হয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে আমি বসে আছি। আমার গায়ে শুভ্র একটি চাদর জড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। অনুতাপজর্জর পৃথিবীরই আমি প্রতীক-মূর্তি। চার্লির জাপানী ভৃত্যটি ওদিকে ছোট্ট একটি মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে। সারা ঘর অন্ধকার। তার মধ্যে মোমবাতির সেই শান্ত বিষণ্ণ আলোকে অপরূপ একটি পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল সেদিন। একটু-আগেই বন্ধু-বান্ধবদের ঠাট্টাকৌতুক চলছিল, অকস্মাৎ কী এক জাদুমন্ত্রে যেন সবাই নির্বাক হয়ে গিয়েছিল। স্থির বিস্ময়ে চার্লির মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন তাঁরা। কী দেখছেন সেখানে? যন্ত্রণা, না প্রশান্তি? নাকি যন্ত্রণা আর প্রশান্তির এক আশ্চর্য সমন্বয়?"

আলোক-সম্পাতের যথাযথ ব্যবহার এবং ভঙ্গীর মাধ্যমে ভাবাভিব্যক্তি সম্পর্কে চার্লির সুগভীর জ্ঞানেরই এখানে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। শুধু তাই নয়, "ঘৃণা"কে ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে তার মাধ্যম হিসেবে অপ্রত্যাশিত একটি বিষয়-বস্তু বেছে নিয়েছিলেন তিনি,— নির্বাচনের এই বৈশিষ্ট্যের মধ্যেও তাঁর প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়।

উইনস্টন চার্চিলের ভগ্নী প্রখ্যাত মহিলা-ভাস্কর ক্লেয়ার শেরিডানের সঙ্গেও এই সময়ে পরিচয় হয়েছিল তাঁর। ক্লেয়ার আর তাঁর সাত-বছরের ছেলে রিচার্ড ব্রীন্সলি শেরিডানকে (বিখ্যাত নাট্যকার শেরিডানের বংশধর) সঙ্গে নিয়ে তিনি একদিন পিকনিক করতে গেলেন। চ্যাপলিনের একটি আবক্ষ মূর্তি গড়েছিলেন ক্লেয়ার। চ্যাপলিনকে সেটি দেখাতে তিনি খানিকক্ষণ চুপ করে রইলেন; তারপর গম্ভীর গলায় মন্তব্য করলেন, "চেহারা দেখে মনে হচ্ছে, খুনে আসামী হওয়াও কিছু বিচিত্র নয়।" অতঃপর অপরাধী আর শিল্পীদের জীবনে কোথায় কোথায় সাদৃশ্য রয়েছে, তার উপরে ছোটখাট একটি বক্তৃতা দিয়ে উপসংহারে বললেন, আসলে উভয়েই এরা সমাজবহির্ভূত জীব।

পোলা নেগ্রী তখন সবেমাত্র হলি-উডে এসেছেন। বার্লিনে থাকতে চার্লির সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়েছিল, বন্ধুত্বের সেই সম্পর্ক অল্প কদিনেই বেশ ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠল। তার কিছুদিন বাদে সবাই শুনলো, পোলাকে তিনি বিবাহ করবেন। মাস দুয়েক বাদে দুজনের মধ্যে ভয়ঙ্কর কলহ হল একদিন; এবং, বলাই বাহুল্য, বিবাহের কথাবার্তা ভেঙ্গে গেল। কলহটা যে বিবাহের পরে হয়নি, এইটেই একমাত্র সুখের কথা।

চার্লির সঙ্গে তাঁর কী সম্পর্ক, এ নিয়ে খবরের কাগজে প্রায়ই বিবৃতি দিতেন পোলা, এবং চার্লি তাতে অত্যন্তই অস্বস্তি বোধ করতেন। পোলা তাঁর সর্বশেষ বিবৃতিতে জানালেন, 'চার্লির সঙ্গে সম্পর্ক চুকে গেছে আমার। গিয়ে ভালই হয়েছে। তার কারণ, আমার কাজের ভারি ক্ষতি হচ্ছিল। চার্লিকে বিয়ে করলে অভিনেত্রী-জীবনে উন্নতি করবার কোন আশাই আর আমার থাকত না।' চার্লিও একটি বিবৃতি দিলেন। বললেন, 'টাকা কই আমার যে বিয়ে করব।'

এই একই সময়ে চার্লি তাঁর 'গোল্ড রাশ' ছবিখানির কাজে হাত দিয়েছিলেন। ভাল ছবি তুলতে হলে মনটাকে একটু শান্ত রাখা দরকার। পোলার সঙ্গে সম্পর্ক চুকে যাওয়ায় তিনি খুশীই হলেন।

(ক্রমশ)

তিন প্রবীনের গল্প

সত্যেন্দ্র আচার্য

নৈমিত্তিকের নিয়ম মাফিক কাফেতে ঢুকলেই, ম্যানেজার ঠিকই বলত, আদর্শবাদের সত্যিই তিনটি প্রতীক আপনারা তিনজন। শুধু এ কাফেতে কেন, এই অশীতি বসন্তের জীবনটা নিয়ে কতই ত বিস্তির আসরে ঘুরলাম, কোথায় না গেছি বলুন না? না, এম্নি আদর্শবাদের এক রঙা তিন টেক্কা কোনো দিনো চোখে পড়েনি। পড়বেও না।

না পড়বারই কথা। অতএব আমরা তিনজন ছাড়া এই শহরটায় নীতি, আদর্শ বা প্রতিভার দিক দিয়ে ভিন্ন কোন উদাহরণ থাকতে পারে, এ আমাদের বিশ্বাস ছিল না। তখনকার জন্যে অন্তত ম্যানেজার নীলাক্ষ সেনের এই দূরদর্শিতাকে তারিফ জানাবার অবকাশ পেতাম।

আর, আশ্চর্য আরেক এই নীলাক্ষ সেন। যিনি শীতের আগমনে হেমন্তে কানঢাকা টুপি পরতেন, এবং বসন্ত চলে গেলে ভয়ে ভয়ে খুলে ফেলতেন।

তবুও আমরা, আমাদের এই সব নীতির পাহারা, এত সতর্কতা, এই আদর্শবাদের কঠিন আস্তরণ মুহূর্তে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে নীলাক্ষ সেনের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিয়ে দিতুম কথাগুলোকে। দেখুন, নীলাক্ষবাবু, কিছু একটা বন্দোবস্ত করান অন্তত। আপনার মেয়ে আমাদের সামনে দিয়ে টেবিলে টেবিলে ঘুরে বেড়াবে, আর যাই হোক, সেরকম রেস্তরাঁর ত্রি-সীমানায় আমরা তিনজন ভুলেও কখনো পা দেব না। আমাদের রাখতে হয় ত এসব বন্ধ করুন, না হয় ছেড়েই দিন একেবারে।

কুল্লে, দৈনিক তিন কাপ চা-এর ক্ষয়-ক্ষতির আন্দাজে নীলাক্ষ সেন যতটা না ভয় পেত—কথাগুলো বলতে পেরে আমাদের মত বিশিষ্ট তিনজন নীতিবাগীশ তার চাইতে যে কত গুণ বেশী গর্ব অনুভব করতুম, তা তিনজনেই বলতে পারি না। তিনজনেই। অরবিন্দ চট্টো শংকর গুহ আর আমি।

ম্যানেজার কানঢাকা টুপিটা, ঠিকমত কান দুটোকে ঢাকা দিতে পেরেছে কিনা, তা দু' আঙুলে একবার পরীক্ষা করে নিয়ে চারচৌকো একটা কাঠের মেনু বোর্ডে অনাবশ্যকভাবে আরো একবার থড়ি বুলোতেন।

তবুও আমরা, যারা নিজেদের মাফকাঠিতে আর সাধারণের মানদণ্ডে আদর্শবাদের একমাত্র প্রকৃষ্ট তিনটি উদাহরণ বিচিত্র ভূলোকের প্রদীপ্ত আলোকে রীতিমত ভাস্বর, পাণ্ডিতিপনার দিক দিয়ে যারা বিরাট রকমের বোদ্ধা, তর্ক বা যুক্তির নজীরে সকলের চোখে আকাশ প্রদীপ, তবু, তবু ম্যানেজার নীলাক্ষ সেনের সামনে, মেয়ের নোংরামিটাকে নিতান্ত উপেক্ষার ছলেও পাশ কাটাতে পারলাম না কখনো।

আবার যখন ওপাশের টেবিল থেকে সেদিন নোংরা মেয়েটার সেই আলোচনার

এল একঝলক, অরবিন্দ নিতান্ত ছেল্যোর সঙ্গেই শনিয়ে ছাড়লে, দেখনে নেজারবাবু, নিজে কানঢাকা টুপি পরে রইলুম, এ চলে না। শুধুমাত্র জন্ম ইই যদি পিতার একমাত্র কর্তব্য শেষ , তবে ত আর কথাই ছিল না। সত্যিই তে ভয় করে, সত্যিকারের মানুষ না কিছু আপনি!

তবু আশ্চর্য এই ম্যানেজার নীলাক্ষ ন। যিনি কানঢাকা টুপি পরেন, কুশ শরবিদ্ধ হয়েও যিনি আশ্চর্য মের বোবা হতে পারেন, আর নিস্পৃহ, র্বিকার চিত্তে কাঠের রংচটা মেনু র্ডের গায়ে জাবর কাটার মত ধীর, র খড়ি বুলোন।

না হাসি, না তাচ্ছিল্য। সহানুভূতির টি খুল্লে শংকর।—এক যদি নজীর লেন জীবিকার, অবিশ্যি তাহলে, র একটা খ'ুজে নেওয়া কঠিন হবে না পনার পক্ষে। তবু, তবু কি জানেন? রের মেয়ের পক্ষে এ বৃত্তিটা বেছে ওয়া কোন যুক্তি দিয়েই সমর্থন করা া না কিন্তু।

নিশ্চয়ই না। আমিও সাধ্যমত সমর্থন লাম শংকরের কথাটাকে।

ওপাশের টেবিল থেকে কে একজন নেজারের পক্ষ সমর্থন করলে। কেন শাই, এক কাপ চা দিতে একটুখানি রি হলে ত গলা শুকিয়ে গেল বলে চঁচোর ছাড়েন। আত্মা-মাত্মা আর পদেশ-টুপদেশ ওসব হল ফালতু, রণে ত আর শ্রমের প্রয়োজন হয় না। হ মশাই, তৃপ্তি আগে পরে শুদ্ধি। ভুক্ত থেকে চিত্তশুদ্ধি হয় না।

চায়ের কাপটাকে ঠোঁটের অনেক কাছে এ আবার নামিয়ে রাখল অরবিন্দ। েন, বল্লে ও, তা বলে চরিত্রকে জলাঞ্জলি দিয়ে যারা মাটি আঁকড়ে বেঁচে থাকতে য়, অন্তত আমরা তাদের ক্ষমা করিনা। না করলে না-ই করলেন। আশ্চর্য-কমের উদ্ধত হল ছেলেটা। ক্ষমতা থাকে দিন একটা অন্য কিছু জুটিয়ে দেখি—

একটু চুপ করে থেকে অরবিন্দ আবার জবাব দিলে, জুটিয়ে দেব কাকে শাই? যে এই কানাগলি দিয়ে বাড়ি ফেরে শেষ রাত্তিরে? ঐ একটা নষ্টচন্দ্রের জন্যে জীবনে কোনদিন সুপারিশ জানাতে আসবেন না, প্লীজ—

শংকর একটা সিগারেট থেকে একমুখ ধোঁয়া চুষে মাকড়সার জালের মত হিজি-বিজি সুক্ষ্ম কতকগুলো রেখা ভাসিয়ে বল্লে, একটা নোংরা মেয়েকে ঘৃণা করতে হবে, এ যেন ভাবতেও কেমন ভয় করে।

তবু, তবু আশ্চর্য ঐ নীলাক্ষ সেন—সে ব্যথার তীক্ষ্ম শরে ক্ষতবিক্ষত হয়েও ব্যথার লেশটুকু মাত্র অনুভব করে না। হয়ত বা করত, যদি ডান পা-টা বিয়োগের পরে কাঠের পা-টাকে এম্নি না অপ্রত্যাশিতভাবে যোগ দিতে হত।

আবার ফিরে আসতুম আমরা আমাদের আলোচনায়। আর ঠিক তারি মাঝে যখন কোন একটা মন্তব্য ছুঁড়তে চাইত ও টেবিলের সেই চোখে কাজল-টানা উদ্ধত ছেলেটা,—অরবিন্দ তখন জোর গলায় বাইবেলের যে অংশে অসংযমি নারীদের অবৈধ লিপ্সার প্রতি যীশু-খৃষ্টের মনোভাবের কারণ বর্ণিত আছে তার নির্গলিতার্থ, আরো স্পষ্ট, আরো বিন্যাসপ্রবণতার সঙ্গে উচ্চারণ করত।

নিস্পৃহ চোখে নিবন্ত বালবু-এর মত নিষ্প্রভ তাকাত ছেলেটা।

হাসি পায় আমাদের। করুণা হয় বা কখনো-সখনো। তবু তার ধৃষ্টতায় আমরা অতিষ্ঠ হতাম। শিক্ষা আধুনিকতার আবহাওয়া থেকে অতটা দূরে থেকে কেমন করে যে সাহস পায় আমাদের মত সুরুচি আর শিক্ষার কালিতে পালিশকরা চকচকে তিনটে মনের পাশে ফড়িং-এর মত ডানা নাচাতে, তা ভেবে আমরা তিনজনেই হেসে উঠতুম একসঙ্গে। তেম্নি চেয়ে থাকত ছেলেটা। আমরা চোখ ঘুরিয়ে আলোচনায় মগ্ন হতাম।

ওকে ওম্নি শোনাবার জন্যেই হাসি হাসি ঠোঁট দুটোয় হয়ত ওলট-পালট করেও বা, তবু বলতে চাইত অরবিন্দ—মোট কথা দর্শনে কিন্তু বিশ্বাস নেই আমার। প্রত্যেকটাকেই যদি স্বীকার করতে হয় তবে অস্বীকার করব কোনটাকে বল? শ্যাপেন হাওয়ারের উইল টু লিভ, নিৎসের উইল টু পাওয়ার, বার্গশ'র এলান ভাইটাল, মার্কস-এর ডায়ালেকটি-কাল মেটিরিয়ালিজম্ আর শ'র লাইফ ফোর্স, —এর কোনটাকে গ্রহণ করব বল না?

আশ্চর্য, তখনো ওম্নি নিরতিশয় অভিমানে নিষ্প্রভ তাকিয়ে থাকত ছেলেটা।

এর দিনকয়েক পরে হঠাৎ এসে একদিন বেশ কিছুটা হকচকিয়ে গেলুম তিন জনেই। রংচটা কাঠের জায়গায় আইভরির কার্ডে আঁকা হরেকরকমের খাদ্য প্রস্তুতি। দেয়ালের সাদা পেটের নীচে কালো রেখার আঁকি বুকি। এম্নি সব রং পাল্টানোর গোলকধাঁধায় শংকর গুনেগুনিয়ে বল্ল, তিন কাপ ডবল হাফ, বয়,—

অরবিন্দ তার স্বভাবসিদ্ধ চোখ ঘুরিয়ে একবার দেখলো চারদিকটা, ওম্নি গুনেগুনিয়ে স্বগতোক্তি করলে,—সব গেল কোথায়?

চা আসলো। লংকোটের নীচে দিয়ে পাতলুনে আঁটা ছিপছিপে চেহারার বয়টার শরীর থেকে কটাক্ষটা ঘুরিয়ে নিয়ে শংকর নিজের মনেই জবাব দিলে, যাবে আর কোথায়?

চা-এ চুমুক দিয়ে শংকর আবার বল্লে, কিছু একটা কেচ্ছা-কেলেংকারি হয়ে থাকবে নিশ্চয়ই। না হলে এই দীর্ঘ দিনের জলবেচা পয়সা ছেড়ে ল্যাংড়া নীলা এম্নি হঠাৎ উধাও হতে পারে?

হবে আবার কি? অরবিন্দ হাসি-হাসি ঠোঁটে চা-এ চুমুক দিলে। যা হবার তার বেশী আর কী হবে বল? কী হয়েছে বুঝতে পারিস না?

শংকর গম্ভীর হল। আমি অরবিন্দর সমস্তটা অনেক আগেই যেন বুঝতে পেরেছি এম্নি একটা ছাপ আঁকলুম চোখে।

বেশ অনেকক্ষণ চুপচাপ কাটিয়ে চা-টুকু নিঃশেষ করল অরবিন্দ। বল্ল, যাবে আর কোন রাজ্যে? রূপজীবিদের গলি মাড়ালেই ছায়া ডিঙোতে হবে। অবিশ্যি যদি লজ্জা ঢাকতে না পেরে স্বর্গে এতদিনে না পেঁাছে থাকে।

শংকর সিগারেটের রিং ওড়ালে। বল্ল, স্বর্গে মানে? কুলটারা যদি স্বর্গের যাত্রী হয় আমরা তবে নরকে যাব নাকি?

আবার একটু চুপ করে থেকে

অরবিন্দই কথাটা তুলল প্রথম। না হয় চলনাই একদিন, স্বর্গ কি নরক পরখ করা যাক।

অতএব—

অতএব—সত্যিই এলাম একদিন শহরের এই অতি প্রসিদ্ধ কুখ্যাত গলিটায়। গলিটার প্রতিটি উচ্ছিষ্ঠের শরীরে শরীরে সজাগ দৃষ্টি রেখে লঘুপদবিক্ষেপে ঘুরলাম গলিটা। চোখের তারায় তারায় অবজ্ঞার অস্পষ্ট কুয়াশা আমাদের। প্রতিটি নিঃশ্বাস ছুঁয়ে তাচ্ছিল্যের উষ্ণ অভিশাপ। মনে হল, ওদের উচ্ছল শরীরগুলোর চাইতে ডাস্টবীনের বিষগর্ভ অনেক ভাল। অন্তত আমাদের চোখে, ঐ ঘৃণার্হ লীলা-মৃগয়ার চাইতে অনেক ভাল, শরবিদ্ধ শিশু হরিণীর করুণ-কাতর আর্তনাদ।

সজাগ দৃষ্টি দিয়ে গলির ভাঁজে ভাঁজে প্রয়াসলব্ধ আঁটোসাঁটো শরীরগুলোকে লক্ষ্য করলাম। হঠাৎ ছ'টা চোখের কৌতূহলী দৃষ্টি যাকে স্পর্শ করলে, বিবশ চেতনার সমস্ত অনুভূতি দিয়ে তাকে অনুভব করলাম। মুহূর্তেক স্তব্ধ দাঁড়িয়ে তিন-জনেই তাকালাম এক সঙ্গে। কী যেন অদৃশ্য হোঁচটে পরস্পরে মুখ চাওয়া-চায়ি করলাম। একটু অবজ্ঞার হাসি টেনে আবার তিনজনে গতিময় হলাম।

আধ ঘণ্টা পরে নির্বাক তিনটি আদর্শের প্রতিভূ তেম্নি দাঁড়ালাম এসে 'বাস স্টপে'। অরবিন্দই বল্ল প্রথম, হয়ত বা ব্যস্ত এখন, নইলে দেখলাম না কেন? কতকগুলো বাজে মেয়ে দেখে দেখে চোখটা স্রেফ ব্যথা হয়ে গেল। একটু থেমে আবার বল্ল, যে চোখ আমাদের মনের রং ফিরোয়, পাতাবাহারের ঝিলমিলে রংয়ে বিভোর হয়, যে চোখ সুরুচি-ধৃত, সে চোখ ঐ নোংরা গলিটায় কেমন করে খুলি বল ত?

শংকর কেন জানি গম্ভীর ছিল। কিছু বল্ল না। আমি শুধু বল্লাম, সে আর বলতে?

অরবিন্দ তবু বল্ল, যে মেয়েটা নিজেকে সুন্দরী ভেবে আমাদের হঠাৎ অবাক করতে চেষ্টা করেছিল, তখন যা আমার হাসি পাচ্ছিল না?

শংকর এবার মুখ খুল্ল, বল্ল, নোংরা মেয়েরা কোনদিন আবার সুন্দর হয় নাকি?

সেইজন্যেই ত গলিটার মোড় পর্যন্ত মনে করতে পারছিলুম তাকে। অরবিন্দ তার স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসি ঠোঁটে জবাব দিলে। কিন্তু এখন? এখন ত চেষ্টা করেও মনে পড়ে না আর। ভোরের শিউলি ঝরে গেলে গায়ে যে তার শিশিরের দাগ থাকতে হবে, এমন কোন কথা নেই। গলিটা পার হয়ে এসেও, স্মরণের শিশির যে দু'ফোঁটা তার গায়ে লেগে থাকবে, এ যেন ভাবতেও কেমন বিশ্রী লাগে।

বাস এসে পড়ল। শংকর হাতের সিগারেটটাকে মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে কী এক নির্মম আক্রোশে শেষ জ্বলাটুকু পর্যন্ত জুতোর চাপ দিয়ে নিভিয়ে দিয়ে বল্ল, ওঠ—

উঠলাম। তিনজনেই উঠে পরস্পরে নীরব মুখ চাওয়াচায়ি করলাম। কিছুটা সময় কাটিয়ে শংকর বল্ল, শহরে ত' আর এই একটা গলি নেই? আর কী-ই বা এত গরজ আমাদের, যে ল্যাংড়া নীলার মেয়ে নরকে গেল কি গলির গোলক-ধাঁধায় বেঁচে রইল তার জন্যে এম্নিভাবে ঘুরে বেড়াতে হবে?

ভ্রূ কোঁচকাল অরবিন্দ। বল্ল নরক আবার এর চাইতে আলাদা কিছু নাকি? সমাজভ্রষ্ট মানেই ত স্বর্গচ্যুত। আর সমাজ মানেই ত স্বর্গ। যারা সমাজের চোখে ঘৃণ্য, কদর্য, তারা নরকের অধিবাসী ছাড়া অন্য কিছু নাকি?

কলেজ স্ট্রীটের কাছে এসে আমি মুখ খুল্লুম। মেয়েটা কিন্তু সত্যিই ভালো। নইলে, তিনজনকেই এম্নিভাবে ভাল লাগাতে পারে কখনো?

শংকর কথাটাকে মাঝপথে কেড়ে নিলে। ভাল লাগালো?

কী যেন একটা বলতে যাচ্ছিলাম। অরবিন্দ বল্ল, কোন মেয়েটার কথা বলছিস? যাকে সেই গলিটার মোড় পর্যন্ত চেষ্টা করলে মনে করতে পারতুম মিনিট কুড়ি আগে?

বাসটা ততক্ষণে এসপ্লানেড পার হয়ে লাল বাতির ইশারায় স্তব্ধ হয়েছে। নিরবচ্ছিন্ন নিস্তব্ধতা। ওদিকের দূরে চাইলে গড়ের মাঠের দুর্বোধ্য নিস্তব্ধতা ভেদ করে সারবন্দি আলোর আশ্লেষ চোখে লাগে।

সবুজের সজীবতায় আবার চলল বাস। শংকর এবার কথা বল্ল, আশ্চর্য, আমারো সেই এক-ই অবস্থা। অনেক কষ্টে কলেজ স্ট্রীট ক্রসিং পর্যন্ত হয়ত তখন মনে করতে পারতুম। আর এমন কোন ছবি নয় যে, মনের ক্যামেরায় স্ন্যাপ নিয়ে স্মৃতির এ্যালবামে সেঁটে রাখতে হবে।

আমার স্টপ এসে গেল। উঠতে উঠতে বললুম, আমিও কিন্তু সম্পূর্ণরূপে ভুলতে পেরেছি। অনেক কষ্টে হাজরা রোডের স্টপ পর্যন্ত মনে করতে পারতুম হয়ত। সত্যি, চোখ দুটো আকর্ষণের চুম্বক দিয়ে তৈরী আমার, কিন্তু সে ত আর আকর্ষণের তেম্নি ধাতু নয়? দস্তা, অত্যন্ত সস্তা দরের।

ওরা দু'জনে তাকায় একসঙ্গে। বিস্ময়ে প্রায় দু'জনেই সমোচ্চারণ করলে, কার কথা বলছিস?

কার কথা বলছি কেমন করেই বা বলব ওদের। ওরা ত সেই গলির মোড় আর কলেজ স্ট্রীট ক্রসে ভুলেছে আর আমি ত নিজেই হাজরার স্টপে নিশ্চিন্তরূপে ভুলতে পেরেছি। বল্লুম, ওই যা ভুলে গেলুম যার কথা বলছিলুম।

পরের দিন আবার দেখা হল চা-এর টেবিলে। বেশ কতক্ষণ চা আর সিগারেট পুড়িয়ে হাত ঘড়িটা দেখে নিয়ে শংকর বল্ল, অরবিন্দ এখনও আসলো না কেন বলত?

সিগারেটটায় বারকতক উপর্যুপরি টান দিয়ে ছাই ঝাড়লাম। বল্লুম, আর্টিস্ট্রী হাউসে একটা আর্ট এগ্‌জিবিশন হচ্ছে কিন্তু—

তবুও জানি আশ্চর্য রকমের রং পাল্টাতে পারে এই পৃথিবীটা। দু'দিন আগে এই কাফেটার কী চেহারাই না ছিল! আর অরবিন্দর আমার রুটীনটা একটু পাল্টাবে এতে আর আশ্চর্য কি?

রং পাল্টানোর এম্নি প্রহরে এক চোখ আগুন নিয়ে কে যেন দাঁড়াল এসে এ গলিটার রঙ্গমঞ্চে।

একবার তাকাল মেয়েটা। সেই চোখ

...ই বিনীত আর উদ্বেল সিক্ত সলজ্জ ...উনি। স্তিমিত। বল্লে, আসুন।

ভেতরে এল মেয়েটা। লোকটাও। ...কাল মেয়েটা; লোকটাও। বেশ কিছুক্ষণ ...পলক তাকিয়ে থেকে বলল, একটা ...শেষ তারা যদি নিতান্ত অপ্রকৃতিস্থের ...খেও ছায়া ফেলতে পারে তবে তোমাকে ...লাগবে এতে আর আশ্চর্য কি?

এক চোখ বিস্ময়ে তাকাল মেয়েটো। ...লল, দেখুন, জীবনে যে কোনদিন 'ক'এর ...কৃতিটাকেও পুরোপুরি কল্পনা করতে ...পারে না, তারাও কিন্তু এখানে এসে আশ্চর্য রকমের কাব্যি করে বসে।

একটা ঢোক গিলল লোকটা। আধ ঘণ্টার মেয়াদ শেষে জুতোটা পায়ে ...লাল। একটু ফিকে হাসল মেয়েটা। ...নুনয়-সিক্ত কপট উচ্চারণ করল, কোনদিন ...এলে এদিকে মনে করে আসবেন ত ...আবার?

গতিহত হল লোকটা। ঋজু দাঁড়িয়ে ...কণ্ঠে জবাব দিলে, ভোরের শিউলি ঝরে ...গেলে গায়ে যে তার শিশিরের দাগ থাকতে ...হবে এমন কোন কথা নেই।

কপট ভনিতায় আরো এক ঝলক ...হাসল মেয়েটা। উৎসুক চোখে অভিমান-...ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উচ্চারণ করল, তবে আসবেন না?

পরের দিন যখন কাফেতে ঢুকলাম, অরবিন্দ আগে থেকেই বসেছিল। ক'টা মুহূর্ত, ক'কাপ চা আর ক'টা সিগারেট পুড়িয়ে অরবিন্দই বলল প্রথম, ...এখনো আসল না যে?

হয়ত বা লিখছে কিছু। বললুম। একবার লেখার প্রেমে পড়লে বাইরের জগতের সঙ্গে খেয়াল থাকে কি কারো?

কিন্তু, তবু কি খেয়ালে মন্থর হাঁটলো লোকটা। গলিটার গোলকধাঁধা পার হয়ে তেমনি আবছা আলোয় মুহূর্তকয়েক দাঁড়াল নীরবে। বল্লে, চল।

ঘরভর্তি আলোয় হকচকিয়ে তাকাল লোকটা। একটা আশ্চর্য স্বর গলায়, আশ্চর্য লাগছে তোমাকে সত্যি—

হেসে ফেলল মেয়েটা। অদ্ভুত এক গ্রীবাভঙ্গি করে উত্তর দিলে, এত আশ্চর্যের কী পেলেন হঠাৎ? সাধারণ মেয়েমানুষের যা যা থাকে তার চাইতে কিছু অদলবদল বা রকমফের দেখলেন নাকি?

একটু আহত হল লোকটা। তেমনি মেয়াদ শেষে জুতোটায় ফিতে বাঁধতে থাকল।

তেমনি ফিকে হাসল মেয়েটা। তেমনি অদ্ভুত গ্রীবাভঙ্গি করে বল্লে, এদিকে এলে মনে করে আসবেন ত আবার?

সোজা দাঁড়াল লোকটা। একটা সিগারেট জ্বালল। হাঁটতে হাঁটতে বল্লে, তুমি এমন কোন ছবি নও যে, মনের ক্যামেরায় স্ন্যাপ নিয়ে স্মৃতির এ্যালবামে সেঁটে রাখতে হবে।

এ গোলকধাঁধার চক্করে পরের দিন আবার এল আরেকটা লোক।

একটা নোংরা গলি। যে গলির শুভ-দৃষ্টিতে কুকুরেরো যক্ষ্মা হয়। যেখানে শীতের হাওয়া কুঁকড়ে মরে। জীবনের

ক্রুর হাতছানিতে ভাগ্যের নির্মম গতি-বিধির সমাপ্তি যেখানে।

সরাসরি ভিতরে এল লোকটা। তবু অদৃশ্য কী এক সতর্ক হাতছানিতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে। নিতান্ত অপরাধীর মত গলার আড়ষ্টতা সরিয়ে কোন উপায়ে উচ্চারণ করলে, না না, জানো ত আমার স্ত্রী আছেন ঘরে।

উদাত্ত হাসল মেয়েটা। চোখ নাচিয়ে বল্ল, বিয়ে হলেই যে এখানে আসতে বাধা-নিষেধের প্রাচীর থাকবে এ আপনাকে কে বুঝোলে? যে সমস্ত রাজকুমার অশ্বমেধ যজ্ঞের ঘোড়া ধরতে বেরুত, আস্তাবলে কি তাদের ঘোড়া ছিল না?

অবাক বিস্ময়ে তাকাল লোকটা। বল্ল, তুমি এত ভাল কথা বলতে পারো?

হাসল মেয়েটা। বল্ল, আবার একদিন আসবেন, আরো কত ভাল কথা শোনাব আপনাকে।

জুতোটা পায়ে গলাল লোকটা। হন-হনিয়ে বেরুতে গিয়ে বল্ল, চোখদুটো হয়ত আকর্ষণের চুম্বক দিয়ে তৈরী আমার, কিন্তু তুমি ত আর আকর্ষণের তেমনি ধাতু নও?

একটু রাত করেই অবসন্ন মনটাকে টেনে টেনে আলোচনার মাঝখানে হঠাৎ গিয়ে পড়লাম আমি। আমার অনুপ-স্থিতিতে সেই চোখে কাজলটানা ফিউজ বাল্‌ব-এর মত চোখ করা ছেলেটা শঙ্কর আর অরবিন্দকে কি যেন শোনাচ্ছিল। আমি ঢুকতেই সভীত উঠে দাঁড়াল ছেলেটা। অরবিন্দ বল্ল, এত দেরি যে, গেছিলি কোথায়?

চেয়ারটা টানতে টানতে বল্লুম, না যাব আর কোথায়, একটা ছবি আঁকছিলুম।

শঙ্কর হঠাৎ উদ্গ্রীব চোখে জিজ্ঞেস করলে, তারপর?

ছেলেটা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে একটু কী ইতস্তত করল। তারপর তেমনি দাঁড়িয়ে থেকেই বল্ল, অপরাধের মধ্যে আসলে অবন্তী ছিল কোন একটা বে-সরকারী সেবাসদনের নার্স। হঠাৎই ম্যানেজারের পা-টা যোগাবিয়োগের সময় কেমন করে যে গোঁজামিল হয়ে ঢুকে পড়ল অবন্তী এই বে-সরকারী সেবাসদনের বাড়িটাতে হয়ত তা ভাবতে পারত একমাত্র ম্যানেজারই হ্রস্ব পা-টায় কাঠ-পা'র সঙ্গে বেল্ট আঁটতে গিয়ে। একটু হঠাৎ চুপ করল এখানে।

আবার বল্ল, তারপর সংসারের চাপ ক্রমশ যখন আরো ভারি হল, সেদিন থেকেই ত ডবল ডিউটি শুরু করল অবন্তী। —আর এই দুর্বল বৃত্তিটার অজুহাত নিয়ে কে যে কবে রং ধরিয়ে অবন্তীকে নিতান্ত অসহায়ের মত সমাজের একান্তে ঠেলে দিতে চাইল, সে খোঁজ অবিশ্যি কেউ রাখল না। রাখবার চেষ্টাও করল না। শুধু তাদের চেষ্টাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে বেঁচে রইল, যারা— ভারবাহী জন্তুর মত নীলাক্ষ সেনের সংসারটাকে যে টেনে আসছে সেই অবন্তী আর তার শ্রম, তার নিষ্ঠাটুকুকে পর্যন্ত পঙ্গু করে দিয়ে বধ্য হিসাবে না কাছে পাচ্ছিল। না পাওয়ার অভিমানে স্বার্থান্বেষীদের বদনামটুকুও।

এক নিশ্বাসে এইটুকু পর্যন্ত বলে আবার থামল ছেলেটা। একটু দম নিলে। একবার তাকাল বাইরেটায়। আবার বল্লে, তারপর যখন তদ্বির-তাগিদে সব ঠিক হয়ে গেল, সেদিনেই ত কাফে বিক্রীর বিজ্ঞাপন বেরুল কাগজে।

কিসের সব ঠিক হয়ে গেল? প্রায় তিনজনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

সে কি? এক চোখ বিস্ময় নিয়ে নির্নিমেষ তাকাল ছেলেটা। জানেন না? আজকের কাগজটা পড়েন নি? সরকার যে জাহাজে একশ'টা পরিবার নিয়ে আন্দামান যাচ্ছে, তাতেই ত স্থান পেয়েছে ওরা?

থামল আবার। নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত হল। চোখটাও সামান্য বিস্ফারিত হল। গলাটাও কেমন ভারি আর আনুনাসিক হল। বল্ল, কিন্তু সে আপনারা যা-ই বলুন, ওরকম মেয়ে কিন্তু হবে না আর।

তেমনি দাঁড়িয়েছিল ছেলেটা। আমাদের সঙ্গে বসতে বলতে কেমন যেন ঘৃণা হচ্ছিল তিনজনেরই।

তেমনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বল্ল, দুঃখ দারিদ্রের সুযোগ নিয়ে মেয়ের কুৎসা যাকে হজম করতে কানের ওপর কান-ঢাকা টুপি বসাতে হয়, সে ব্যর্থ প্রয়াসের চাইতে এই শহরের সুরুচি আর শিক্ষার গণ্ডি থেকে জীবনের মত নির্বাসন, সে অনেক ভাল।

ঘৃণায়, অবজ্ঞায়, কোন উপায়ে ছেলে-টার চোখে তাকালাম আমরা। ততক্ষণে কালো কাজলের সেই নিষ্প্রভ চোখ দুটো কী এক অনুভূতিতে আমাদের চাইতেও উজ্জ্বল। প্রদীপ্ত।

আবার আমরা এতদিন পরে ল্যাংড়া নীলার দূরদর্শিতাকে বিশুদ্ধ এক দফা তারিফ জানাবার অবকাশ পেলাম। বল্লাম, ওরকম মেয়ে নিয়ে গোটা আন্দামানটা মজিয়ে জাহাজ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়া আরো অনেক বুদ্ধিমানের কাজ কিন্তু—

কিন্তু—

কিন্তু তবুও ভাবলাম, একশ'টা পরিবার নিয়ে আন্দামানের পথে যে জাহাজটা জল কেটে যাবে, সে জাহাজের পাটাতনে ভাগ্যের চরকায় যে স্বপ্ন বুনবে ম্যানেজার তার রেশমী সুতো হয়তো মেয়েটারই নিষ্কলুষ চরিত্র।

আন্দামানে ভিড়বার আগে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসেও যে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে আর আর সংগীদের সংগে গভীর গল্পে মেতে ওঠেনি ম্যানেজার এ কথাটা বা কে বল্লে?

হয়ত তখন প্রপেলারে জল কাটা বীভৎস শব্দ। সকালের সূর্য কি সন্ধ্যা মলিনতা মাস্তুলটার গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। এমনি অবসর আর একটা মুক্তির আনন্দে ম্যানেজার হয়ত নিশ্চয় বলছে তার জীবনের ছোট্ট কাফেটা কথা।

শ্রোতাদের কেউ হয়ত তাকা উৎসুকে। জাহাজ তখন জল কাটবে। কে হয়ত কৌতূহল চাপতে না পেরে সরাস বলে ফেলবে, আশ্চর্য ত?

সত্যিই আশ্চর্য! ম্যানেজার স্বপ্নে চরকা থেকে সত্যের সুতো বোনা কাপড়টা মেলে ধীরে ধী চাইবে মেয়েটার চোখ দুটো চোখটা ঘুরিয়ে নিয়ে আবার বল হয়ত, সত্যিই আশ্চর্য, এই অশী বসন্তের জীবনটা নিয়ে কতই ত বিভি আসরে ঘুরলাম, কোথায় না গেছি বল না? না, এমনি আদর্শবাদের একরঙা টেক্কা কোনদিন চোখে পড়ে পড়বেও না।

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

(২)

চা এবং চাল কাঙড়ার প্রধান সম্পদ। একমাত্র কাঙড়া এবং পালমপুর তহশীলেই চা-এর আবাদ হয়। বেশীর ভাগ চা-বাগিচাই আবার পালমপুরে। ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি (১৮৫০-৬০) ইংরেজগণ কাঙ্ড়া উপত্যকায় চা এবং সিংকোনার চাষ প্রবর্তন করে। লাভ না হওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই সিংকোনার চাষ বন্ধ করিয়া চা-এর উপর জোর দেওয়া হয়। কাঙড়ার আবহাওয়া এবং প্রাকৃতিক সংস্থান সর্বাংশেই চা চাষের অনুকূল।

কাঙড়া উপত্যকার ২৫৮০টি বাগিচায় প্রায় ৮,০০০ একর জমিতে চা উৎপন্ন হয়। ইহার মধ্যে প্রায় ৫০০০ একরই পালমপুর তহশীলে। বাদবাকী কাঙড়া তহশীলে। অনেকগুলি বাগান একেবারেই ছোট। অনেক বাগিচাতেই নাকি এক হইতে চার একর জমিতে চা-এর চাষ হয়। এক চা-বাগিচার ম্যানেজারের মুখে শোনা কথা। সত্য-মিথ্যা জানিনা ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপের বাজারে কাঙড়ার চা-এর বেশ সুনাম ছিল। আমাদের মুখে কিন্তু কাঙড়ার চা ভাল লাগে নাই। বন্ধুবর শ্রীসুধীরকুমার বলেন যে, তাঁহার পাচক যাহাই রান্না করুক না কেন স্বাদটি হয় খাপির ডালনার মত। আমরাও কাঙড়ার উৎকৃষ্ট এবং খুব নিরস চা-এর স্বাদ, বর্ণ বা গন্ধের তারতম্য ধরিতে পারি নাই। দার্জিলিং, এমন কি আসামের চা-এর পাশেও কাঙড়ার চা দাঁড়াইতে পারে না। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের পূর্ববর্তী যুগে কাঙড়ার চা-ব্যবসায় শ্বেতাঙ্গ পুঁজিপতিগণের একচেটিয়া ছিল। ১৯০৫ সালের ৪ঠা এপ্রিল এক প্রলয়ঙ্কর ভূমিকম্পে সমগ্র কাঙড়া জেলা বিধ্বস্ত হইয়া যায় এবং ধন-প্রাণের অপরিসীম ক্ষতি হয়।

ইহার পর হইতেই শ্বেতাঙ্গ চা-করগণ পাততাড়ি গুটাইতে আরম্ভ করেন। ভারতীয় পুঁজিপতিগণ তাঁহাদের স্থান গ্রহণ করিতে থাকেন। কেহ কেহ বলেন যে, আসন্ন আন্তর্জাতিক দুর্যোগের আভাস পাইয়াই শ্বেতাঙ্গ পুঁজিপতিগণ তল্পি-তল্পা গুটাইতে শুরু করিয়াছিলেন। আজ কাঙড়ার সমস্ত চা-বাগিচার মালিক

কামিনরা চা-পাতা তুলিতেছে

ভারতীয়। ইঁহারা সকলেই প্রায় কাঙড়া জেলার অধিবাসী।

কাঙড়ার বাগানগুলি হইতে বৎসর প্রতি একরে গড়ে ২৫০ পাউন্ড চা পাতা পাওয়া যায়। পক্ষান্তরে আসাম এবং বাংলাদেশের বাগানগুলির গড় বার্ষিক উৎপাদন একর প্রতি ১,০০০ পাউন্ড। চাষের অনুন্নত পদ্ধতি, অত্যধিক বৃষ্টিপাত, জমির নিকৃষ্টতা, আবহাওয়া এবং জমিতে উপযুক্ত সার না দেওয়ার জন্যই এই পার্থক্য।

১৯৩৯ সালে ৫০ একর জমি লইয়া পালমপুরে একটি পরীক্ষামূলক চা-বাগিচা খোলা হয়। বর্তমানে এই বাগিচার আয়তন মাত্র ১৫ একর। এখানে প্রতি একরে গড়ে বার্ষিক ৪০০০ পাউন্ড চা পাতা পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হইয়াছে। কাঙড়ার কোন কোন বাগান সরকারী বাগানে অনুসৃত পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া নিজেদের উৎপাদন বাড়াইতে সক্ষম হইয়াছে। কিন্তু স্বাদের দিক হইতে কাঙড়ার চা আজও পাটপাতার স্বগোত্রীয়।

পালমপুরের বান্দলা চা-বাগিচার খুব নাম ডাক। কাঙড়া উপত্যকার ইহাই দ্বিতীয় বৃহত্তম বাগান। এখানে বৎসরে প্রায় দুই লক্ষ পাউন্ড চা উৎপন্ন হয়। এই অঞ্চলের সর্বত্র বান্দলা চা-এর খুব পশার। পালমপুরের একেবারে গা ঘেঁষিয়া এই বাগান।

শ্রাবণের ক্ষান্তবর্ষণ মেঘমেদুর এক অপরাহ্নে বান্দলা বাগিচার পথে পা বাড়াইলাম। একে পাহাড়ী জায়গা। তাহার উপর একেবারেই ছোট্ট। যানবাহনের বালাই নাই। ভাগ্যবান দু'একজনের অবশ্য নিজস্ব মোটর আছে। কিন্তু আমাদের আর তাহাতে কি লাভ? প্রকৃতির অকৃপণ বদান্যতায় শ্রীমণ্ডিত বনভূমির বুক চিরিয়া প্রায় জনহীন, অসমতল পার্বত্যপথ পালমপুর হইতে বাগিচার দিকে চলিয়া গিয়াছে। পথের এক পাশে ছোট পাহাড়ী নদী কুল কুল শব্দে বহিয়া চলিয়াছে। একটু আগে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। জলের বেগ তাই খরতর। পথের ধারে মধ্যে মধ্যে বাড়ি-ঘর। কোন ঘরেই জানালার বালাই বড় একটা নাই।

বাগানের প্রবেশপথে সারাদিনে সংগৃহীত চা পাতা ওজন করা হইতেছে। কুলি কামিনের দল পাতার ঝুড়ি পিঠে লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। ফটো নেওয়ার প্রস্তাব করিলে তাহারা সমস্বরে আপত্তি জানাইল। নেত্রীস্থানীয়া একজন ত কটু-কাটব্যই করিতে লাগিল। সঙ্গী যোগীন্দ্র-নাথজী এবং সত্যপ্রসাদজী পালমপুর-বাসী। তাঁহারাও নাছোড়বান্দা। দু'জনেই অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন। কিন্তু বড় কঠিন ঠাঁই। সাধ্য-সাধনায় যখন কাজ হইল না, তখন অগত্যা কৌশলে কাজ হাসিল করিতে হইল। ফটো দিতে কাঙড়ার মেয়েদের মহা আপত্তি। কুলি-কামিনরা সকলেই কাঙড়াবাসিনী। আশে-

পাশের পল্লীতে ইহাদের ঘর। তাই আমাদের অসুবিধায় পড়িতে হইয়াছিল।

বান্দলা বাগিচার বয়স কিঞ্চিদূন একশত বৎসর। প্রথম মালিক ইংরেজ। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে ইংরেজ মালিক চলিয়া গেলে এই বাগান ভারতীয় মালিকের হাতে আসে। বাগানের আয়তন ২৬০ একর। প্রায় ৫০০ কুলি এই বাগানে কাজ করে। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৩০।৩২ জন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, ৪০।৪৫ জন প্রাপ্তবয়স্কা নারী। বাদবাকী অপ্রাপ্ত বয়স্ক। পুরুষদিগকে ৷৷৴০, মেয়েদিগকে ৷৷৬ এবং অপ্রাপ্তবয়স্কদিগকে ৷৵০ হিসাবে দিন-মজুরি দেওয়া হয়। শ্রমিকগণ সকলেই স্থানীয় অধিবাসী। কেহই বাগানের বেতনভোগী কর্মচারী নহে। কৃষি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। কাহারও কাহারও নিজেরই জমি আছে। অন্যেরা ভাগচাষী। চা-বাগানে দিনমজুরি ইহাদের অবসর সময়ের উপজীবিকা। চাষ এবং ফসল কাটার মরসুমে অর্থাৎ মার্চ, এপ্রিল, মে, অক্টোবর, নবেম্বর এবং ডিসেম্বর এই ছয়-মাস শ্রমিক পাইতে অসুবিধা হয়। বাগানের কাজও এই ছয়মাস ঢিমে তেতালায় চলে।

শ্রমিকগণ কেহই বাগানে থাকে না। সুতরাং আসাম, দার্জিলিং-এর চা-করদের তুলনায় কাঙড়া উপত্যকার চা-করদের খরচ অনেক কম। ঝঞ্ঝাটও কম। লোক-দেখানো একটা দাতব্য চিকিৎসালয়ে রুগ্ন শ্রমিকদের চিকিৎসার ব্যবস্থা আছে। চিকিৎসা কতদূর কি হয় 'দেবাঃ ন জানন্তি'। শ্রমিকদিগের পুত্রকন্যার জন্য একটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ও আছে। পালমপুরের 'একমেবাদ্বিতীয়ম্' ছবিঘর লক্ষ্মী থিয়েটারে শ্রমিকদিগকে মাসে চারদিন মালিকদিগের ব্যয়ে ছবি দেখাইবার ব্যবস্থা আছে।

কোন কুলি বাগানে থাকিতে চাহিলে কর্তৃপক্ষ ঘর করিবার জায়গা দেন। ঘর তুলিবার খরচ যে থাকিবে তাহার। নির্দিষ্ট পরিমাণ পাতা অপেক্ষা বেশী পাতা সংগ্রহ করিতে পারিলে অতিরিক্ত প্রতি পাউন্ডের জন্য দুই পয়সা হিসাবে বিশেষ মজুরি দেওয়া হয়। চা-এর কারখানাও বান্দলা বাগানে আছে। উৎপন্ন চা বস্তা বা প্যাকেটবন্দী করিয়া চালান দেওয়া হয়। স্থানীয় বাজারেও কিছু বিক্রয় করা হয়। পাহাড়ী ঝরণার জলে উৎপন্ন এবং পাঞ্জাব সরকারের পূর্ত বিভাগের সরবরাহ করা বিদ্যুতে বান্দলার চা কারখানা চলে। কার-খানায় কালো এবং সবুজ দুইপ্রকার চা-ই উৎপন্ন হয়। আমরা কালো চা ব্যবহার করি। ম্যানেজার বলিলেন যে, তাঁহাদের সবুজ চা কাশ্মীর, আফগানিস্থান প্রভৃতি দেশে চালান হয়। দুধ এবং চিনির পরিবর্তে নুন মিশাইয়া সবুজ চা পান করিতে হয়। মুসলমান অধ্যুষিত দেশ-গুলিই সবুজ চা-এর বড় খরিদ্দার। দেশ

বৈদ্যনাথ মন্দির

বিভাগের পূর্বে কাঙড়া হইতে পশ্চিম পাঞ্জাবে প্রচুর সবুজ চা রপ্তানি হইত। 'তে হি নো দিবসাঃ গতাঃ'।

(৩)

অতীত হিন্দু গৌরবের শ্মশান কাঙড়া! দেবভূমি (Valley of the Gods) কাঙড়া। পথে ঘাটে ইহার প্রাচীন ইতিহাস। এখানে সেখানে ছড়ানো প্রাচীন গৌরব, বিগত বৈভবের নিদর্শন। ধ্বংসপ্রাপ্ত বা ধ্বংসপ্রায় কত দুর্গ, কত না রাজপ্রাসাদ কাঙড়ার সর্বত্র ছড়াইয়া আছে। মন্দির ও দেবস্থানের ত কথাই নাই। কে খোঁজ রাখে? কোথায় সেই অনুসন্ধানী শক্তিমান ঐতিহাসিক যিনি ভারত-ইতি-হাসের বিস্মৃত, গৌরবোজ্জ্বল একটি অধ্যায়ের উপর আলোকসম্পাত করিবেন।

বৈদ্যনাথ—আঞ্চলিক ভাষায় বৈজনাথ—এই অঞ্চলের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। পালমপুর হইতে ১০ মাইল। বৈজনাথ পালমপুরের মতই না শহর, না গ্রাম। সনাতন ধর্ম প্রতিনিধি সভার একটি বিশিষ্ট কর্মকেন্দ্র এই বৈদ্যনাথ। সভা এখানে একটি উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়, বনিয়াদী শিক্ষক-শিক্ষণ কেন্দ্র, সংস্কৃত চতুষ্পাঠী এবং কারিগরী বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন।

শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার মন্দিরে মেলা বসে। পুণ্যার্থীর দল দূর দূরান্ত হইতে এই উপলক্ষ্যে মন্দিরে সমবেত হয়। সোমবার দেখিয়াই দেবদর্শনে চলিলাম। দেবতার দর্শন পাই আর না পাই, লোক-যাত্রা দেখিবার সুযোগ ত পাইব। পথে লোকের ভিড়। জনস্রোত বৈদ্যনাথ মন্দিরে চলিয়াছে। নারীদের কাহারও কাহারও কোলে শিশুসন্তান। দূর দূর হইতে আগত অনেকেই বাড়ি হইতে খাবার লইয়া আসিয়াছে। পার্বত্য পল্লীর বৈচিত্র্যহীন, নিস্তরঙ্গ জীবনধারায় এ তীর্থযাত্রা একদিনের জন্য চাঞ্চল্য সঞ্চার করে। তীর্থযাত্রীর দল মন্দিরে দেবদর্শনান্তে সারাদিন ঘোরাফিরা করি নূতন মানুষ দেখিবে। নূতন ক শুনিবে। হয়ত কিছু কেনাকাটা করিবে। দিনান্তে যে যার ঘরে ফিরি সাগ্রহে মেলার দিনটির প্রতীক্ষায় ব কাটাইবে। মেলা পল্লী-জীবনের রসায় মেলা উপলক্ষ্যে পল্লীবাসী বাহির বি পরিচয় লাভ করে। সেইজন্যই ই আকর্ষণ দুর্নিবার।

বৈদ্যনাথের মন্দির অতিশয় প্রাচী কত প্রাচীন কেহই সঠিক বলিতে পা না। প্রস্তর নির্মিত নাতিবৃহৎ মন্দির। প্রবেশপথে প্রস্তর নির্মিত দ বৃষভ মূর্তি। ভূতভাবন, বৃষভবাহ মন্দিরে বৃষভ মূর্তি থাকিবেই। মন্দি গাত্রে ভিতরে এবং বাহিরে আগাগো অতি চমৎকার কারুকার্য এবং সুগঠিত পাষাণ-মূর্তি। কালের প্র মূর্তি এবং কারুকার্য বহু জায় বিকৃত এবং ক্ষয়প্রাপ্ত।

মন্দিরে প্রবেশ করিতেই দুই পা

...সারদা লিপিতে উৎকীর্ণ দুইখানা ...লিপি। ইহাতে কিরাগ্রামের—...গ্রামের প্রাচীন নাম কিরাগ্রাম—রাজা-...বংশপরিচয় দেওয়া হইয়াছে। শিলা-...উল্লিখিত কিরাগ্রাম রাজবংশ ত্রিগর্ত ...জলন্ধর রাজবংশেরই এক শাখা। ...গ্রামের রাজগণ জলন্ধর রাজের ...শ্রেণীভুক্ত ছিলেন। লেখ দুইখানি ...৬ শকাব্দ বা ১২০৪ খৃষ্টাব্দে ...লিখিত। হৃদয়চন্দ্রের পুত্র লক্ষ্মণচন্দ্র ...সময় কিরগ্রামের রাজা। লক্ষ্মণচন্দ্রের ...জয়চন্দ্র জলন্ধরের রাজা ছিলেন। ...এখন যেখানে বৈদ্যনাথ ডাকবাংলা ...পূর্বে সেইখানে লক্ষ্মণচন্দ্রের ...এবং প্রাসাদ ছিল। স্থানীয় লোকের ...ইহা ... কপুর নামে পরিচিত। ...এবং মন্যুক নামে বণিক্ ভ্রাতৃ-...বায়ে বৈদ্যনাথ মন্দির নির্মিত। ...পুরে অর্থাৎ প্রাচীন কাঙড়া শহর ...মন্দির নির্মাণের স্থপতি আনা ...ছিল। আসিকের পুত্র নায়ক এই ...রের প্রধান স্থপতি। থোডুক নামে ...একজন শিল্পীর নামও উল্লিখিত ...লেখে পাওয়া যায়।

...নিংহাম এবং ফার্গুসন সাহেবের ...কাঙড়ারাজ ২য় সংসারচাঁদ কাটোচের ...কালে (১৭৭৬—১৮২৪ খৃঃ অঃ) ...নাথ মন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করা হয়। ...রেল স্টাইন ১৮৯২ সালে মন্দির ...দেখিবার পর ইঁহাদের মতের প্রতিবাদ ...করিয়াছেন।

পাথুরে প্রমাণ পাওয়া গেল যে, ...বৈদ্যনাথ মন্দির ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার ...দিকে নির্মিত। জনশ্রুতির সহিত কিন্তু ...ইহার একটু অমিল আছে। রাক্ষসরাজ ...রাবণ নাকি এইখানে শিবের তপস্যা ...করিয়াছিলেন। পাণ্ডবগণ পরে এইখানে ...একটি মন্দির নির্মাণ করেন। ৮ সম্বতে ...বিক্রম সম্বত না শক সম্বত, জনশ্রুতি ...সম্বন্ধে নির্বাক—মন্যুক এবং আহুক ...নামে স্থানীয় দুইজন ধনাঢ্য বণিক্—...যাহারা দুই ভাই—হঠাৎ কিছু অর্থলাভ ...করিয়া মন্দিরটি মেরামত করেন। বণিক্ ...ভ্রাতৃদ্বয়ের অকস্মাৎ ধনপ্রাপ্তি সম্বন্ধেও ...একটি কাহিনী আছে। একবার এক সাধু ...তীর্থে যাওয়ার পথে বৈদ্যনাথে এক গাছের ...উপর তাঁহার ঝুলিটি রাখিয়া যান।

যোগীন্দ্রনগর রেলওয়ে স্টেশন

গাছের তলায় কয়েকজন গদ্দির কিছু লোহা ছিল। হিমালয়ের এই অঞ্চলে লোহের আকর বিদ্যমান। গদ্দিগণ পূর্বে আকর হইতে লৌহসংগ্রহ করিত। তখন বর্ষাকাল। বৃষ্টির জল ঝুলি চোঁয়াইয়া নীচে লোহার উপর পড়িল। দেখিতে দেখিতে লোহা সোনা হইয়া গেল। লোহার মালিকরা ত অবাক্। তাহারা সাধুর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিল। অবশেষে সাধু ফিরিয়া আসিলেন। ফিরিয়া দেখেন গাছের নীচে সোনার তাল। গদ্দিগণ তাঁহাকে সোনা লইয়া যাইতে বলিলে তিনি অস্বীকার করিলেন। তিনিও লইবেন না। গদ্দিরাও ছাড়িবে না। তখন জীর্ণ মন্দির সংস্কারের জন্য সেই স্বর্ণ দান করিবার উপদেশ দিয়া তিনি নিজের ঝুলিটি লইয়া চলিয়া গেলেন।

সাধু বোধহয় পরম সম্পদের আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন। সমস্ত পার্থিব সম্পদ সেইজন্যই কি তাঁহার নিকট তুচ্ছ, অসার হইয়া গিয়াছিল?

"মূল্যহীনেরে সোনা করিবার
পরশ পাথর হাতে আছে তার
তাইতো প্রাচীন সঞ্চিত ধনে
উদ্ধত অবহেলা।"

মন্দির মধ্যে পাষাণের লিঙ্গমূর্তি। মন্দিরের সেবায়েৎ বলিলেন যে, এই লিঙ্গ মূর্তি শাস্ত্রোক্ত দ্বাদশ *জ্যোতির্লিঙ্গের অন্যতম। জ্যোতির্লিঙ্গ স্বয়ম্ভু। মনুষ্য নির্মিত নহে। ইহার অতি সামান্য অংশই মাটির উপর থাকে।

শ্রাবণ মাসের সোমবার ব্যতীত শিব-চতুর্দশীতেও বৈদ্যনাথে মেলা বসে। যাত্রী-সমাগমও সেই সময় খুব হয়। আজ শ্রাবণের চতুর্থ সোমবার। যাত্রীর কলরবে মন্দির প্রাঙ্গণ মুখরিত। এখানে সেখানে দু' একজন গেরুয়াধারী ধুনি জ্বালাইয়া বসিয়াছেন। গেরুয়াধারিণীরও অভাব নাই। ইঁহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া বেশ ভিড় জমিয়া উঠিয়াছে। প্রণামীও কিছু কিছু পড়িতেছে। কাহারও প্রার্থনা, "মোর রোগ দূর করি দেহ", না হয় "সন্তান লাগি কাঁদাকাটি করে বন্ধ্যারমণী কেহ", অথবা এই জাতীয় আর কিছু। একজন বাঙ্গালী সাধু এখানে থাকেন

---

*"সৌরাষ্ট্রে **সোমনাথঞ্চ** শ্রীশৈলে **মল্লিকার্জ্জুনম্**
"উজ্জয়িন্যাং **মহাকালম্ ওঙ্কারং** মামলেশ্বরে
"চিতাভূমৌ **বৈদ্যনাথম্** ডাকিন্যাম্ **ভীমশঙ্করম**
"সেতুবন্ধে তু **রামেশ্বরম্ নাগেশঞ্চ** দারুকাবনে
"বারাণস্যাম্ বিশ্বেশ্বরম্
ত্র্যম্বকং তু গৌতমীতটে
"হিমালয়ে চ **কেদারম্ ঘুশ্মেশঞ্চ** শিবালয়ে"

অনেকেই কাঙড়া জেলার বৈদ্যনাথকে **শাস্ত্রোক্ত** চিতাভূমি বলিয়া স্বীকার করেন না। তাঁহাদের মতে দেওঘরই চিতাভূমি। দেওঘর বৈদ্যনাথ মন্দিরের লিঙ্গমূর্তিও জ্যোতি-র্লিঙ্গের লক্ষণ বিশিষ্ট। ইহাও ভূপ্রোথিত মনে হয়। লিঙ্গমূর্তির অগ্রভাগ মাত্র দেখা যায়।

শুনিয়া দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করিবার আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। বেগতিক দেখিয়া আলাপ-আলোচনা বেশীদূর অগ্রসর হইবার পূর্বেই সরিয়া পড়িলাম। পাষণ্ড আমি! আমার ফুল ফুটিবার সময় এখনও আসে নাই।

মন্দিরের প্রায় ৩০০ ফুট নীচে ক্ষীরগঙ্গার ঘাটে স্নানার্থী-স্নানার্থিনীর ভিড়। স্ত্রী-পুরুষের স্নানের ঘাট পৃথক্। বিনোদগঙ্গা এবং বিনুয়া ক্ষীর-গঙ্গার অপর দুইটি নাম। ইহার প্রাচীন নাম বিন্দুকা। ক্ষীরগঙ্গা বিপাশার উপনদী।

পাহাড়ের পথে ৬০০ ফুট ওঠা-নামা করা মুখের কথা নহে। দলে দলে নরনারী—ইহাদের মধ্যে শিশু এবং বৃদ্ধ-বৃদ্ধারও অভাব নাই—নদীতে স্নান সারিয়া মন্দিরে পূজো দিতে চলিয়াছে। কেন এই দুঃখ বরণ? হয়ত অজ্ঞতা, হয়ত কুসংস্কার। কিন্তু এই অজ্ঞ, কুসংস্কারাচ্ছন্ন নরনারীর নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা এবং বিশ্বাসের দৃঢ়তা আমাদের আছে কি?

পাষাণময় সোপানশ্রেণীর পথে স্নানের ঘাটে নামিলাম। স্নান আর করিলাম না। বর্ষার বারিধারা উপলবক্ষা স্রোতস্বিনীর দেহে—মনেও কি?—নব-যৌবন সঞ্চার করিয়াছে। 'যৌবনজলতরঙ্গ রোধিবে কে? বর্ষণপুষ্টা পর্বত দুহিতা ক্ষীরগঙ্গার ফেনশীর্ষ জলরাশি কল কল শব্দে পাথর হইতে পাথরে নাচিতে নাচিতে বিপাশা সঙ্গমে চলিয়াছে

> "ভূধর হইতে ভূধরে লুটিব,
> হেসে খল খল গেয়ে কল কল
> তালে তালে দিব তালি।"

কবিগুরুর বর্ণনায় একটুও অতিশয়োক্তি নাই।

রাজা লক্ষ্মণচন্দ্র প্রদত্ত বার্ষিক ৬০০০৲ টাকা আয়ের দেবোত্তর এবং যাত্রি-গণ প্রদত্ত প্রণামীর আয়ে মন্দিরের ব্যয় নির্বাহ হয়। সেবায়েৎ বলিলেন যে, প্রণামী হইতে মাসে ৪০৲/৫০৲-র বেশী আয় হয় না। কিন্তু অন্যের মুখে শুনিয়াছি যে, প্রণামী হইতে মাসে ২৫০৲/৩০০৲ হয়। তীর্থযাত্রিগণের সুবিধা-অসুবিধার প্রতি সেবায়েতের লক্ষ্য নাই। বিশ্রামাগার, পানীয় জল, শৌচাগার প্রভৃতি অবশ্য-প্রয়োজনীয় কোন ব্যবস্থাই নাই।

মন্দিরের প্রায় এক ফার্লং দূরে তারা দেবীর মন্দির। মন্দিরে পাষাণময়ী কালীমূর্তি। দেবী এবং মন্দির আধুনিক। মন্দিরের পাশেই একটি মার্বেল পাথরে বাঁধানো চৌবাচ্চার মধ্যে একখানা বৃহদায়তন সাধারণ পাথর কেদারনাথ নামে পরিচিত। কেদারনাথ মন্দিরের শিবলিঙ্গ নাকি দেখিতে এইরকম। চৌবাচ্চার গায়ে বাহিরের দিকে হিন্দীতে "বে-অন্ত মায়া" অর্থাৎ "অনন্ত মায়া" লেখা। এইখানে ইমারত তুলিলে নাকি পড়িয়া যায়। অনাবৃষ্টির সময় চৌবাচ্চা জলে ভরিয়া দিবার সঙ্গে সঙ্গে নাকি বর্ষা নামে। কে জানে! "There are more things in heaven and earth......"

ঘুরিতে ঘুরিতে অনেক বেলা হইল। বাজারের হোটেলেই মধ্যাহ্ন ভোজন সারিলাম। ॥৵০ আনায় পেট ভরা ভাত, দুই রকম ডাল, এতদঞ্চলের জনপ্রিয় আলু-ছোলার ঝাল এবং কড়ি (দই হইতে প্রস্তুত)। সঙ্গে কিছু পেঁয়াজকুচি, কাঁচালঙ্কা এবং পুদিনার চাটনি। রাম-রাজ্যে আসিয়া পড়িলাম নাকি?

বৈদ্যনাথের সেবায়েতের সহিত আলাপে জানিলাম যে, তাঁহার আদিপুরুষ বঙ্গদেশাগত শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ব্রাহ্মণ। তাঁহার পদবী ছিল বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি মণ্ডি রাজবংশের আদিপুরুষের সহিত বঙ্গদেশ হইতে মণ্ডিতে আগমন করেন। কতদিন পূর্বে আসিয়াছিলেন জানা গেল না। যতদিন পূর্বেই হউক, তাঁহার বংশধরদিগকে আজ আর বাঙ্গালী বলিয়া চিনিবার উপায় নাই। আচার-ব্যবহার, ধরন-ধারন, কথাবার্তা সমস্তই একেবারে বদ্‌লাইয়া গিয়াছে। বন্দ্যোপাধ্যায় পদবীও তাঁহারা ত্যাগ করিয়াছেন। দেশান্তর এবং কালান্তর তাঁহাদের রূপান্তর সাধন করিয়াছে। আরও কত শত বাঙ্গালীর এই অবস্থা হইয়াছে কে বলিবে? হিমাচলের মণ্ডি ও সুকেত এবং কাঙড়ার বিড ও কুটলেহ্‌র রাজবংশও শুনিয়াছি বঙ্গদেশাগত। মণ্ডি ও সুকেতের রাজ-গণের পদবী ছিল সেন। বিড ও কুটলেহ্‌র রাজ্যের রাজগণ পাল পদবীধারী ছিলেন। এই কয়টি রাজবংশের বংশধরগণ আজ স্ব স্ব নামের শেষে কৌলিক পদবী ব্যবহা[র] করিয়া থাকেন।

এই পাল এবং সেন কাহারা? পা[ল] এবং সেন বংশীয় রাজগণ ত এক[দা] বঙ্গদেশে রাজত্ব করিতেন। পাল এ[বং] সেন দুই-ই বাঙ্গালী পদবী। পা[ল] শাসনাধীন বঙ্গদেশ উত্তর ভারতে[র] অন্যতম প্রধান রাষ্ট্রে পরিণত হইয়াছিল[।] খালিমপুর তাম্র শাসনে ইহার অকা[ট্য] প্রমাণ পাওয়া যায়। আর একটি কথা[ও] এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঐতিহাসিকগ[ণ] বলেন যে, বাঙ্গলার সেন রাজগণ ব্রহ্ম[-] ক্ষত্রিয়। তাঁহাদের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্ম[ণ] কুলে জন্মগ্রহণ করিলেও ক্ষাত্রবৃত্তি গ্রহ[ণ] করিয়া ক্ষত্রিয়ে পরিণত হইয়াছিলে[ন।] পাঞ্জাবের সমতল অঞ্চলেও ব্রহ্মক্ষত্রিয় সম্প্র[-] দায় বর্তমান। পাণ্ডব এবং কৌরবদিগে[র] অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের বংশধর ব[লিয়া] প্রসিদ্ধ পাঞ্জাবী ব্রহ্মক্ষত্রিয়গণ মোহিয়া[ল] ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত। ইঁহারা ব[া]লি দত্ত, মোহন, ছিব্‌ভর, বৈদ, ভীমওয়াল এ[বং] লাও এই সাতটি শাখায় বিভক্ত। ব্রহ্ম[-] ক্ষত্রিয় বা মোহিয়াল ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে[র] জ্ঞাতি-গোষ্ঠীই উত্তর প্রদেশে ত্যাগী এ[বং] বিহার অঞ্চলে ভূমিহার ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত।

(৪)

পাঞ্জাবের শ্রম-শিল্পের প্রাণ-কেন্দ্[র] যোগীন্দ্র নগর! এখানে উৎপন্ন জল[-] বিদ্যুতে পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাবের কল[-] কারখানা চলে। যাত্রার দিনটি ছিল শুভ। বহুদিন পর আকাশের হাসিমুখ। মেঘ-হীন, নির্মল আকাশ। বালসূর্যকিরণ দূরে নীল গিরিশৃঙ্গে অপরূপ মায়াজাল বিস্তার করিয়াছে। যতদূর চোখ যায় মনে হয় কে যেন পাহাড়ের গায়ে গলানো সোনা ঢালিয়া দিয়াছে। সোনালী প্রভাত তাহা হইলে কবি-কল্পনা নহে।

বাসের অপেক্ষায় পালমপুর বাজারে দাঁড়াইয়া আছি। গিরিশৃঙ্গ মেঘমুক্ত। জায়গায় জায়গায় পেঁজা তুলার মত বরফ। হঠাৎ দেখিলে রূপার চুমকি বসানো নীলবস্ত্র বলিয়া ভ্রম হয়। শীতের সকালে শিশির ভেজা ঘাসের উপর মাকড়সার জালও দেখিতে এইরকমই হয়।

পাহাড়ের গায়ে পিচ বাঁধানো সরকারী

সড়কে আমাদের বাস চলিয়াছে। গিরিগাত্র বেষ্টন* করিয়া, কখনও উঠিয়া, কখনও নামিয়া, মোড়ের পর মোড় ঘুরিয়া পাঠানকোট হইতে কুলু পর্যন্ত বিস্তৃত সড়ক। ১৭৪ মাইলের পাল্লা। পালমপুর হইতে ১৩২ মাইল। মণ্ডি হইতে কুলু ৪০ মাইল কাঁচা রাস্তা। পথের এই অংশই সর্বাপেক্ষা বিপজ্জনক। বর্ষাকালে অনেক সময় পাহাড় ভাঙিয়া পথ বন্ধ হইয়া যায়। আমাদের অতদূর যাইতে হইবে না। পালমপুর হইতে ২৪ মাইলের মাথায় যোগীন্দ্রনগর। পথে বৈদ্যনাথ। বৈদ্যনাথের পরই হিমাচল রাজ্যের এলাকা। পথের চড়াই-উৎরাই এবং বাঁকও পূর্বের তুলনায় অনেক বেশী। পথের একপাশে পাহাড়, অন্য পাশে [illegible] পাহাড়ী নদী। রাস্তার সঙ্গে পাল্লা দিয়া রেলপথ চলিয়াছে। পাঠানকোট হইতে যোগীন্দ্রনগর পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় একশত মাইল দীর্ঘ রেলপথ। পূর্বে নাম ছিল কাঙড়া ভ্যালি রেলওয়ে। এখন নর্দার্ন রেলওয়ের অন্তর্গত। ছোট লাইনের ছোট্ট গাড়ী। দার্জিলিং ও সিমলা লাইনের গাড়ীর মত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বের কথা। তখন যোগীন্দ্রনগর পর্যন্ত রেলে যাতায়াত করা চলিত। যুদ্ধের ডামাডোলে পথ বন্ধ হইয়া গেল। রেলের লাইন তুলিয়া নেওয়া হইয়াছিল। কিছুদিন হয় আবার পথ খোলা হইয়াছে। কিন্তু এখনও মালগাড়ীই আনাগোনা করে।

শ্রাবণের মাঝামাঝি। ইহারই মধ্যে আকাশে-বাতাসে শরতের আমেজ। মেঘমুক্ত দিনে 'শুভ্র মেঘের রথে,' 'নির্মল নীল পথে,' 'আলো ঝলমল বন-বীথির পথে' সত্যই কি শারদলক্ষ্মীর আবির্ভাব ঘটিল?

যোগীন্দ্রনগরের পূর্ব নাম সিক্রোটি। প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে সিক্রোটি মণ্ডি-রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মণ্ডিরাজ যোগীন্দ্র সেনের নামানুসারে সিক্রোটি যোগীন্দ্রনগর নামে পরিচিত। যোগীন্দ্র সেনই মণ্ডির সর্বশেষ রাজা। ইনি এখন ব্রাজিলে ভারতীয় রাজদূত। মণ্ডি বর্তমানে হিমাচল রাজ্যের একটি জেলা। যোগীন্দ্রনগর মণ্ডি জেলারই একটি তহশীল। এখানে থানা, বাজার, ডাক ও তার-ঘর, সরকারী স্কুল ইত্যাদি আছে।

বাস হইতে নামিয়া প্রায় দুই মাইল হাঁটিয়া পাওয়ার হাউসে পৌঁছিলাম। বেলা প্রায় ৯টা। হিমাচলের রাজ্যপাল মেজর-জেনারেল হিম্মৎ সিংজী পাওয়ার হাউস দেখিতে আসিবেন। কর্মচারীরা সকলেই শশব্যস্ত। ইঞ্জিনিয়ার সর্দার গুলাব সিং ইহার মধ্যেই আমাদের পাওয়ার হাউস দেখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। তাঁহাকে ধন্যবাদ।

পাওয়ার হাউস পাঞ্জাব সরকারের পরিচালনাধীন। এখন পর্যন্ত ইহাই ভারতের বৃহত্তম জল-বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র। পরিকল্পিত ভাক্‌রা-নাঙ্গাল কেন্দ্র যোগীন্দ্রনগর অপেক্ষা চারগুণ অধিক শক্তিশালী হইবে। যোগীন্দ্রনগরে প্রতিদিন ৪,০০০,০০০ ইউনিট জল-বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই বিদ্যুৎ ১১,০০০ ভোল্ট শক্তি-সম্পন্ন। কিন্তু এই বিদ্যুৎই যখন অন্যান্য স্থানে পাঠানো হয়, তখন ইহা ১৩২,০০০ ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন হয়। ইহাকে ট্রান্সমিশন ভোল্টেজ (Transmission Voltage) বলা হয়। যোগীন্দ্রনগর হইতে পূর্ব পাঞ্জাবের বহু অঞ্চলে এবং পশ্চিম পাঞ্জাবেরও কোন কোন অঞ্চলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। পশ্চিম পাঞ্জাবে সরবরাহ করা বিদ্যুৎ ৫০০০-৬০০০ ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন। পাকিস্থান এইজন্য ভারত সরকারকে মাসে দুই লক্ষ টাকা দেয়।

১৯৩০-৩১ সালে যোগীন্দ্রনগরে জলবিদ্যুৎ উৎপাদন আরম্ভ হয়। সাত মাইল দূরে প্রায় সাড়ে ছয়হাজার ফুট (৬,৫০০) উঁচু ব্রোট উপত্যকার উহ্‌ল্ নদীর জলরাশিকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের কাজে লাগানো হইয়াছে। বিপাশার উপ-নদী উহ্‌ল্ মণ্ডি জেলায় বিপাশার সহিত মিশিয়াছে। প্রথমত পাহাড়ের বুকে আড়াই মাইল দৈর্ঘ্য এবং নয় ফুট পরিধি বিশিষ্ট সুড়ঙ্গ কাটিয়া উহ্‌লের জল-রাশিকে সেই সুড়ঙ্গপথে চালান করা হইয়াছে। এই সুড়ঙ্গ যেখানে শেষ হইয়াছে পাওয়ার হাউস হইতে সে জায়গার উচ্চতা ১,৬৬৮-২,০০০ ফুট। সুড়ঙ্গপথে আনীত উহ্‌লের জলস্রোতকে এইখান হইতে দুইটি অতিকায় নলের সাহায্যে পাওয়ার হাউসে লইয়া আসা হইয়াছে। জলস্রোতের পতনের বেগে যে শক্তি উৎপন্ন হয়, যান্ত্রিক কৌশলে তাহাকেই বিদ্যুতে রূপান্তরিত করিয়া মানুষের কাজে লাগানো হইয়াছে।

পাওয়ার হাউসের যন্ত্রপাতি সমস্তই বিদেশ হইতে আমদানী করা। নির্মাণ দূরের কথা, দেশে এগুলি মেরামতও হয় না। চারটি জেনারেটর বা উৎপাদন যন্ত্রের মধ্যে একসঙ্গে দুইটির বেশী চালানো হয় না। ১৭,০০০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ইঞ্জিনের সাহায্যে জেনারেটরগুলি চালিত হয়। উৎপন্ন বিদ্যুৎ প্রথমত সুইচ রুমে (Switch Room) স্থানান্তরিত হয়। পরে সেখান হইতে বিভিন্ন সাব-স্টেশনে (Sub-Station) পাঠানো হয়। সমগ্র পূর্ব পাঞ্জাবে ১৩২,০০০ ভোল্টের সাতটি, ৩৩,০০০ ভোল্টের দুইটি এবং আরও কমজোর কয়েকটি সাব-স্টেশন আছে।

বৈদ্যুতিক রজ্জুপথের (Electric Rope way) সাহায্যে পাওয়ার হাউস হইতে 'হেড ওয়াটারস্' (Head waters) অর্থাৎ যেখানে উহ্‌লের জলরাশিকে সুড়ঙ্গ হইতে নলে চালান করা হইয়াছে সেখানে যাতায়াত করা হয়। প্রায় খাড়া রজ্জুপথ, কোন কোন জায়গায় ইহার খাড়াই প্রায় ৪৫°। নলের উপরের মুখ হইতে আড়াই মাইল দূরে উহ্‌ল্ নদী। কী অসামান্য সাহস, অসীম অধ্যবসায় এবং অজস্র অর্থব্যয়ে মানুষ প্রকৃতিকে জয় করিয়াছে ভাবিলে অবাক্ হইতে হয়।

যোগীন্দ্র নগর হইতে আরম্ভ করিয়া পাঞ্জাবের কাঙড়া, দীননগর, গুরুদাস-পুর, ধারিওয়াল, বাটালা, অমৃতসর, জলন্ধর, লুধিয়ানা, জাগ্রাও, মোগা এবং ফিরোজপুর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের প্রায় সমস্ত শহর এবং পল্লীতে যোগীন্দ্র নগর হইতে সুলভে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়। ইহারই ফলে এই অঞ্চল শ্রম-শিল্পে উন্নত। সুলভ বিদ্যুৎ কৃষিক্ষেত্রে জল সেচন সহজ এবং স্বল্পব্যয়সাধ্য করিয়া কৃষিকার্যেরও সহায়ক হইয়াছে। ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নতি এবং ভারতবাসীর জীবন-যাত্রার মানের উন্নয়নের জন্য আরও বহু যোগীন্দ্রনগর প্রয়োজন।

ব্রোট এবং যোগীন্দ্রনগরকে কেন্দ্র করিয়া ছোট্ট একটি উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রায় পাঁচশত পরিবার এই উপ-নিবেশে বাস করে। ইহার মধ্যে প্রায় তিন-শতটি শ্রমিক পরিবার। (ক্রমশ)

[লেখকদের হয়ে]

কোন বিদেশী নাটকে পড়েছিলুম, গায়ককে গাইতে অনুরোধ করে এক মহিলা বললেন, যারা মারা গেছে গানে যেন তাদের কথা না থাকে—'I am a little tired of the dead.'

গায়ক বীণাযন্ত্রটি তুলে নিয়ে হেসে জবাব দিয়েছিলেন, 'Ah, Madam, the dead are tired too.'

মৃতেরাও ক্লান্ত। বঙ্গ সাহিত্যের আধুনিক সমালোচকদের এই তথ্যটি স্মরণ করিয়ে দিতে ইচ্ছে হয়। অতীতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানর একমাত্র পথ, এঁদের ধারণা, সমকালীন রচনার শ্রাদ্ধ, এবং অনেকে মহোৎসাহে তাই করে চলেছেন। ইদানীং বাংলা সাহিত্য-সম্পর্কিত কোন আলোচনার পাতা ওলটাতেও ভরসা পাইনে। সব শেয়ালের যেমন এক রা, সব সমালোচকের তেমনি এক রায়; কিচ্ছু ('ছ'-য়ের উচ্চারণ দন্ত্য, তাচ্ছিল্যের) হচ্ছে না। আমাদের সাহিত্যের ইহকাল গেছে, পরকাল ঝরঝরে। যদি কিছু থাকে তবে অতীত। এঁদের চর্মচক্ষু সামনের দিকে বটে, কিন্তু মনশ্চক্ষু পিছন দিকে ফেরানো, এঁরা আগতের প্রতি বিমুখ, গতের শোচনাতে পঞ্চমুখ। কথায় কথায় অযথা মাইকেল-বঙ্কিমকে নিয়ে টানাটানি করেন, রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্র পর্যন্ত কোন-ক্রমে এগিয়ে ঢোঁক গিলে থেমে যান।

জানি, এই সমালোচকদের কিছু কিছু মন্দ কবি, একদা যশঃ প্রার্থনা করে অধুনা ব্যর্থ, অতএব আঙুর মাত্রই এঁদের জিভে টক। এঁদের কথা ধরিনে। যে দু' চারজন বোদ্ধা, রসগ্রাহী—তাঁরাও মূল্য-বিচারে বার বার ভুল করেন, পরিতাপ এই।

পরকালের ভাবনা ভাবিনে, আমাদের সাহিত্যের ইহকাল যদি সত্যি সত্যি যেত

উত্তমপুরুষ

তবে এত কথা লেখার বালাই থাকত না। যায়নি, যাবার কোন লক্ষণও দেখছিনে। আমাদের সাহিত্যের সাজি এখনও কাব্য-কাহিনীর পুষ্পে-পর্ণে-পল্লবে প্রতিদিন ভরে উঠছে, তার চিহ্ন অসংখ্য গ্রন্থের প্রকাশে, অগণন পত্র-পত্রিকার আবির্ভাবে। সরস্বতীর প্রাঙ্গণে এক সঙ্গে এত পূজার্থীকে কখনও কৃতাঞ্জলি হয়ে দাঁড়াতে দেখা যায়নি। সব ফুল হয়ত বেদীমূলে গিয়ে ঠেকে না, তাই বলে ফুল ফোটেনি এ-কথা বলি কী করে। প্রয়াসেরও একটা সার্থকতা আছে; সেই সার্থকতা দেখি ভীরু কাঁপা-কাঁপা অক্ষরে লেখা সারি সারি লাইনে, মুষ্টিমেয় সহৃদয় সুহৃদের অনতিস্পষ্ট প্রশংসার পুরস্কৃতিতে, এমন কি ফিকে-লাল ফিতের বাঁধা অমনোনীত রচনার প্রতি সম্পাদকীয় অস্বীকৃতিতেও। দেখি সৃষ্টি-ধর্মী প্রাণ নিরন্তর নিজেকে প্রকাশ করবার পথ খোঁজেঃ ভাবে, ভাষায়, দুঃসাহসে। আনন্দ-বেদনার উপলব্ধি সাহিত্য সাধনার প্রথম শর্ত, সেই শর্তটি পূরণ হল কিনা, সমালোচকের সেইটুকুই দ্রষ্টব্য। পরীক্ষা-নিরীক্ষার দুর্গম পথে গিয়ে কারও যদি দিক্‌ভুল হয়ে থাকে তা নিয়ে টিটকারি দেওয়া রসবোধ আর সুরুচির অভাব।

এখন কী নেই। সমালোচক বলবেন, রবীন্দ্রনাথের মত উত্তুঙ্গ প্রতিভা নেই। স্বীকার করব, সঙ্গে সঙ্গে এ-কথাও বলব বিদেশী সাহিত্যেরও কিছু কিছু খবর তো রাখি, ইংরেজীর সরাসরি, তর্জমা-মারফৎ অন্য সাহিত্যের, রবীন্দ্রনাথের তুল্য প্রতিভা অন্য কোন দেশেই কি এ-কালে আছেন? নেই। এত বড় প্রতিভার আবির্ভাব দেশে-দেশে যুগে-যুগে কিছু ঘটে না, ঘটলে জীনিয়স শব্দটির অর্থই বদলে যেত। তা-ছাড়া রাজনীতির মত শিল্পেও একনায়কতন্ত্রের যুগ বুঝি শেষ হয় গেছে, একমেব ব্রহ্মের বদলে এখন দেবতা অনেক। শিক্ষার যত প্রসার ঘটছে (শিক্ষা অর্থ শুধু বর্ণপরিচয় নয়), সাধারণের মধ্যে শিল্প-চেতনাও ততই পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে, যাদু-স্পর্শে তাদের মধ্যেও স্রষ্টা তো জাগবেই। যুগ-জয়ী প্রতিভা এদের কেউ নন, সবাইকে মাঝারিও হয়ত বলা যায় না, তবু বহুর কোলাহলে কান পাতলে স্পন্দিত প্রাণের ঐকতানটুকু ঠিকই শোনা যায়। জল-তরঙ্গের সব কটি বাটিও তো আকারে সমান নয়। ঋক্ থেকে গীতাঞ্জলি পর্যন্ত যে প্রবাহটি নানা বাঁক ঘুরে এতদূর এসেছে, তার গতি হঠাৎ রুদ্ধ হবে না, সমালোচকের ভ্রূকুটি সত্ত্বেও না।

সমালোচক বলেন, উনিশ শতকে ও এই শতকের প্রথম দিকে সাধারণের মধ্যে যে সাহিত্যাগ্রহ দেখা যেত, অধুনা তার অভাব ঘটেছে। সাধারণ বলতে এঁরা অবশ্য মোটামুটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই বোঝেন। অভাব ঘটেছে তার প্রমাণ কী, না সেকালের শিক্ষিত ভদ্রলোক মাত্রেরই বঙ্কিম গ্রন্থাবলী আদ্যন্ত পড়া ছিল, এমন কি অন্তঃপুরিকারাও মাইকেল-হেম-নবীনের কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলতে পারতেন। এ-কালের শিক্ষিতমাত্রেই বিভূতি-ভূষণ বা তারাশঙ্করের রচনা পড়েছেন এমন দাবী করেন না। দাবী তো করেনই না, বরং অনধ্যয়নজনিত কোন সঙ্কোচও তাঁদের মধ্যে দেখা যায় না, এ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সঙ্গে পরিচয় নেই বলে তাঁদের শিক্ষাই অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে এ-কথাও তাঁরা স্বীকার করেন না। কথাটা সত্যি, কিন্তু কারণ যেটা দেখান হয়, সেটা সত্যি নয়। অভাবটা আগ্রহের নয়, অবসরের। দুটি বিশ্বযুদ্ধের ফলে আমাদের দেশে অর্থ-নৈতিক বিপর্যয় ঘটে গেছে, একদা-তৃপ্ত নিশ্চিন্ত মধ্যবিত্ত সমাজ ক্ষয় পেতে পেতে আজ নিশ্চিহ্ন হবার মুখোমুখি। কোন-ক্রমে কলেজের চৌকাট পার হতে না হতে মধ্যবিত্ত যুবক জীবনমরণ সমস্যার লোনা জলে হাবুডুবু খান, সেখান থেকে সাহিত্যের অবকাশ-আকাশ অনেক দূরে।

আরও একটা কারণ আছে, ঊনিশ শতকের নব্য শিক্ষিত সমাজে বিদেশী জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিদ্যুৎ-স্পর্শে যে-শিহরণ বয়ে গিয়েছিল, তাকে দীপ্ত করে তোলার একটিমাত্র পথ খোলা ছিল, শিল্প, সাহিত্য। অন্য কোন পথে প্রকাশের গতি না পেয়ে দেশের সেরা প্রতিভা এই একটি আধারেই সার্থক হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতেন। আজ আমাদের ব্যবহারিক জীবনে আরও নানা দিক খুলে গেছে—রাজনীতি, বিজ্ঞান, ইণ্ডাস্ট্রী, দেশগঠন, কারও দাবীই কম নয়।

এর একটা স্থূল দিকও আছে। সে-যুগের বাঙালী সবিস্ময়ে চেয়ে দেখেছে, প্রথম গ্রাজুয়েট, প্রথম ডেপুটি, বিলাত ফেরত ব্যারিস্টার, অভিজাতকুলচূড়ামণিরা বাংলা লিখছেন। সুতরাং সাহিত্য পাঠের সঙ্গে শ্রদ্ধাও ছিল। কিন্তু এটা শুধু বড়-লেখকের যুগ নয়, পরিচয়হীন লেখকেরও, যার সূত্রপাত মোটামুটি শরৎচন্দ্র থেকে। তিনি শুধু পরিচয়-হীনদের নিয়েই প্রথম সাহিত্য সৃষ্টি করেননি, পরিচয়হীনদেরও যে সাহিত্য-সৃষ্টির অধিকার আছে, সেটা প্রমাণ করেছেন। অজ্ঞাতকুলশীল লেখকদের নিয়ে সাধারণের মাতামাতি না করবার কারণ আছে বৈকি।

এ-কালের লেখকদের হয়ে আরও একটা কথা। পাঠক যেমন, লেখকও তেমনই অর্থনৈতিক সংগ্রামে আহত, ক্ষতবিক্ষত। রেবা-সিপ্রা-বেত্রবতী তীরের বেতসকুঞ্জের সেই শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন কবেই শেষ হয়ে গেছে, এমনকি গত শতকের আশ্বাস, বিশ্বাস, পর্যাপ্তির সুখও নেই। পুরোনো সমাজ ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে, পড়ছে, উত্তরাধিকারসূত্রে অর্জিত নীতিগুলোকেও আজ নিকষে যাচাই করে নিতে হয়। কোন মূল্যই পরম নয়, আপেক্ষিক। পিতৃভক্তি, পাতিব্রত্য, ভ্রাতৃস্নেহ, এই মৌল বৃত্তিগুলোও রামায়ণে যেমন ছিল ঠিক তেমন নেই। কালিদাসের কালের প্রিয়াকেও খুঁজে পাওয়া ভার। পারিবারিক সম্পর্কের মত সামাজিক সম্পর্কও জটিল, স্বার্থবুদ্ধিতে বিকৃত। জীবন যদি সাহিত্যের মসলা হয় তবে এই অস্থির, উৎকেন্দ্রিক কালের ভাষ্যকারদের কাজ গুরুতর-দুরূহ, তাঁদের সাফল্য-অসাফল্যের বিচার এই তথ্যটি স্মরণ রেখেই করতে হবে। সমসাময়িক সমস্যা এ-যুগের কোন কোন লেখককে হয়ত হতবুদ্ধি করেছে। কেউ কেউ ভুল করেছেন, সে-যুগেও, যখন ব্যক্তি ও সমাজজীবন আজকের তুলনায় ধীরবহ ছিল, করতেন। এমন কি বঙ্কিমও যখন ইতিহাসের গুহায় আলো না ফেলে আপন কালের কথা লিখেছেন সর্বত্র সুবিচার করেননি। বিধবা বিবাহ সম্পর্কে তাঁর

পাঁতি এ-কালে কেউ মানতে রাজী নন, তাই বলে পথিকৃৎ হিসাবে বঙ্কিমের গৌরব খর্ব হয়নি। এ-কালের অশান্ত অশ্বটির ঝুঁটি ধরে সওয়ার হওয়া সোজা নয়; কেউ কেউ হয়ত টাল সামলাতে পারছেন না, কিন্তু অস্বীকার করবার জো নেই, গতিটা সমুখের দিকেই।

সাহিত্য সম্মেলন

এই রচনাটি যে-দিন প্রকাশিত হবে সেদিনই অতুলপ্রসাদের লখনউতে নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন শুরু। সম্মেলনটি সেদিন পর্যন্ত নামে নিজভূমে পরবাসী ছিল, অধুনা সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে নতুন নাম পরিগ্রহ করেছে। নতুন জন্মও কিনা, সেইটুকুই এবার দেখা যাবে। হোলি রোমান এম্পায়ার যেমন না-ছিল হোলি, না রোমান, না এম্পায়ার, এই সম্মেলনটিও তেমনি বহুকাল ছিল সাহিত্যসম্পর্ক বিবর্জিত, জনকয়েক শাঁসালো প্রবাসী বাঙালীর অর্থানুকূল্যে আহূত সাম্বৎসরিক মজলিসমাত্র। কখনও কখনও পৌরোহিত্য করতে কোন কোন সাহিত্যিকের ডাক পড়েছে বটে, কিন্তু সে-পৌরোহিত্য দেশজ অর্থে নমো-নমো পুরুতগিরিমাত্র। এবার দলগত সংকীর্ণতা ঘুচিয়ে একে যথার্থ প্রতিনিধিমূলক রূপ দেবার প্রয়াস চলছে, শুনেছি। সত্য হলে সুখের।

গত শতকের কংগ্রেসের মত বাঙালীর এই নামী প্রতিষ্ঠানটি বছরে একবার সাড়ম্বরে অধিবেশন ডেকে বাকি সময়টা কী করে কাটান জানতে ইচ্ছে করে। কাজের মত কাজ অনেক আছে। 'উত্তরা' পত্রিকাটি সম্ভবত টিম-টিম করে বেরচ্ছে; 'সম্মেলন' নামে এঁদের একটি মুখপত্র আছে সেটিকে সার্থক সাহিত্যপত্রে পরিণত করলে বঙ্গেতর প্রদেশের বাঙালীর একটি প্রধান অভাব দূর হয়। উত্তরাপথে বঙ্গ সাহিত্য প্রচারের প্রধান ভারও সম্মেলনই নিতে পারেন, ভারতবর্ষের ছোট-বড় শহরে বাঙালীর মধ্যে মেলামেশা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের অবকাশ আরও বিস্তৃত হবার সুযোগ আছে। বাঙালী-অবাঙালীর মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের দৌত্য সম্মেলনকেই করতে হবে, সেই সঙ্গে দেখতে হবে মূল মাতৃভূমি থেকে রসসংগ্রহের শিকড়টিও যেন শুকিয়ে না যায়।

আশঙ্কা আছে বলেই কথাটা বলেছি। এখনকার প্রবাসী বাঙালীদের উচ্চারণ-ভাষা বিকৃত, এঁদের অনেকের ভাতে 'বিলকুল' রুচি নেই, ছেলের 'বরিয়াত' হয়। বহু বিশ্ববিদ্যালয়েই বাংলা পঠনপাঠনের সুযোগ নেই, দীর্ঘ বিচ্ছেদের ফলে বাংলার সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে এঁদের যোগসূত্র ছিন্ন হতে বসেছে। কিছুকাল আগে কোন প্রবাসী বাঙালী আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'প্রবাসী পত্রিকাই কি নাম বদলে এখন ভারতবর্ষ হয়েছে?' জানতুম ইনি নিয়ম নন, ব্যতিক্রম, তবু চট করে জবাব দিতে পারিনি, অবাক হয়ে অনেকক্ষণ চেয়েছিলুম।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকে বিশ শতাব্দীর প্রথম অবধি উত্তরাপথের সাংস্কৃতিক জীবনে বাঙালীর আধিপত্য ছিল। প্রায় সর্বত্র হিন্দীভাষীদের পরেই বাঙালীরা সংখ্যাগুরু। আর্যাবর্তের সব শহরে বাঙালীর কীর্তির চিহ্ন আছে নানা ধরমশালায়, যৌথপ্রচেষ্টায় গড়ে তোলা কালীবাড়িতে। ইংরেজ আমলের শুরু থেকেই বহু বাঙালী কমিসারিয়েটে কাজ নিয়ে নানা শহর আর ছাউনিতে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রাক্‌মিউটিনি সময়ের প্রবাসীদের অনেকের সন্তান-সন্ততি এখন এই অঞ্চলেরই স্থায়ী অধিবাসী। পরবর্তী কালে কেউ এসেছেন সামন্ত-নৃপতিদের সচিব হয়ে, কেউ শিক্ষাব্রত নিয়ে। পঞ্চাশোর্ধ্ব পুণ্যলোভীদের অধিষ্ঠান কাশীধামে। বড়বাজারে যদি বিকানীরের উপনিবেশ থাকে, তবে ছোট-খাটো শ্যামবাজার আছে বাঙালীটোলায়।

বাঙালী প্রভাবের সেই স্বর্ণযুগের মধ্যাহ্নে বাংলা সাহিত্যে প্রবাসীর দান কারও চেয়ে কম ছিল না। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রবাসবাসের ফল 'বোম্বাই-চিত্র', সঞ্জীবচন্দ্রের পালামৌ। গোবিন্দচন্দ্র প্রয়াগে বসে তাঁর 'যমুনে ও' গেয়েছিলেন। কেদারনাথের জীবনের বেশির ভাগই কেটেছে পূর্ণিয়ায়; শরৎচন্দ্রের প্রথম জীবন ভাগলপুরে, মধ্য-জীবন বর্মায়। অতুলপ্রসাদের 'গীতিগুঞ্জ' লখনউ। পরশুরাম, অনুরূপা দেবী, উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় প্রভৃতি দীর্ঘকাল কাটিয়েছেন বাংলার বাইরে। পরবর্তী কালের লেখকদের মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, বনফুল এবং সতীনাথ ভাদুড়ী প্রবাসী বাঙালী। সৈয়দ মুজতবা আলী, নরেন্দ্র ঘোষ এবং সন্তোষকুমার ঘোষও অধুনা প্রবাসী। সাময়িক পত্রিকার ইতিহাসে বহির্বঙ্গের বাঙালীর দানের প্রমাণ আছে 'প্রবাসী' পত্রিকার নামে।

সাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্রে গল্প-উপন্যাস-কবিতার পাশাপাশি সেকাল-একালের বাঙালীর কীর্তি, সমস্যা ও খবরও যেন থাকে। বিশেষ করে, ভারতীয় আঞ্চলিক সাহিত্যের সংবাদ আর শ্রেষ্ঠ কলাকৃতির তর্জমা। সম্মেলন লখনৌ অধিবেশনে এ-সম্পর্কে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করলে ভাল হয়।

অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস

গত ১৮ই ডিসেম্বর থেকে অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টসের বাৎসরিক চিত্রপ্রদর্শনী মিউজিয়মের দোতলার বারান্দায় শুরু হয়েছে। এটি অ্যাকাডেমীর ঊনবিংশতিতম চিত্রপ্রদর্শনী। রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন এবং শিক্ষা মন্ত্রী শ্রীপান্নালাল বসু মহাশয় পুরস্কার বিতরণ করেন। এই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে পুরস্কার পেয়েছে চিন্তামণি করের 'পেজেণ্ট উইমেন, (২৪১)। শ্রেষ্ঠ তৈল

'কিড্' ঃ শিল্পী কালোশশী বন্দ্যোপাধ্যায়

চিত্র হয়েছে জগদীশ রায়ের 'বয় ইন গ্রে' (৫)। শ্রেষ্ঠ জলরঙ চিত্র হয়েছে জি ডি পলরাজের 'ফার্মার্স হাট' (৩৪৮)। শ্রেষ্ঠ প্রাচ্য প্রথায় অঙ্কিত ছবি হয়েছে শান্তি-রঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের 'মুকুল' (৫৪২)। শ্রেষ্ঠ আধুনিক চিত্র হয়েছে হাজারনিসের 'ফিশেস্' (৫২১)। ভাস্কর্যে পুরস্কার পেয়েছেন নিখিল বিশ্বাস। গ্রাফিক আর্টের পুরস্কার পেয়েছেন হরেন দাশ। কল্যাণ সেন পুরস্কার পেয়েছেন তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রুপ প্রদর্শিত করেছেন ব'লে এবং পূর্ণে-ন্দুজ্যোতি ভট্টাচার্য পুরস্কার পেয়েছেন শ্রেষ্ঠ প্যাস্টেলের কাজে। এ বছর সব শুদ্ধ ৬৩১টি ছবি এবং ৩৫টি ভাস্কর্য সাজানো হয়েছে। এত বেশী ছবি এর আগে আর কখনও টাঙানো হয়নি এবং ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক কোণ থেকেই এ বছর ছবি

এসেছে। কিন্তু ছবির সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় দেওয়ালের কোথাও আর ফাঁক দেখা যায় না। ফলে, ভালো খারাপ সব ছবির এফেক্ট তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে যায়। নির্বাচকমণ্ডলী আর একটু সতর্ক হলে বেশ কিছু বাদ পড়তে পারতো বলে মনে হয়। তা'হলে পরিপাটি করে সাজানো গোছানও সম্ভব হ'ত এবং ভারতের শ্রেষ্ঠ চিত্র প্রদর্শনীর মান বজায় থাকতো।

বিচারকমণ্ডলী সিদ্ধান্ত করেছেন, 'পেজেণ্ট উইমেন' এবছরের শ্রেষ্ঠ ছবি। চিন্তামনি কর মহাশয় খুবই শক্তিশালী শিল্পী এ বিষয় কিছু সন্দেহ পোষণ করি না, কিন্তু তাঁর 'পেজেণ্ট উইমেন' যে শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারে একথা বোধকরি তিনিও মেনে নিতে পারবেন না। ছবিটি কল্পনাসম্ভূত মোটেই নয়। বিষয়, আঙ্গিক, রঙ—কোনোটাতেই অভিনবত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না। এডগার ডেগার প্রভাব ছবিটিতে যথেষ্ট প্রকাশ পেয়েছে। শ্রেষ্ঠ তৈলচিত্র 'বয় ইন গ্রে' ছবিটি মোটামুটি ভাল, তবে 'শ্রেষ্ঠ' একথা মেনে নিতে পারা যায় না। জগদীশ রায় তাঁর অন্য ছবিটিতে নিতান্তই অপটুতার পরিচয় দিয়েছেন। 'হাইলি কমেণ্ডেড' মার্কা ছবিগুলির মধ্যে কয়েকটি ছবি সত্যিই ভাল লাগল, বিশেষ করে রণেন আয়ান দত্তের 'লোডিঙ এণ্ড আন-লোডিঙ্' (৪০৯), অরুণ মৈত্রের 'রেবা' (৫০) এবং চুনিলাল দত্তগুপ্তের 'অ্যাট-ওয়ার্ক' (৪৮)। তা ছাড়া মোহন সামন্তের 'মিউজিশিয়ান' (৫১৬), হাজারনিসের 'ফিশেস' (৫২১)—যে ছবিটি এবছরের শ্রেষ্ঠ আধুনিক ছবি বলে বিবেচিত হয়েছে এবং সুধা মুখোপাধ্যায়ের ছন্দ-পূর্ণ নিরর্থক কয়েকটি কম্পোজিশন বেশ আনন্দ দেয়।

প্রখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে গোপাল ঘোষ, মাখন দত্তগুপ্ত, ডেসমণ্ড ডোইগ, ব্ল্যাকবার্ন এবং বীরেন দে উল্লেখযোগ্য। তবে, খোলাখুলিভাবেই বলি, গোপাল-বাবুর কাছ থেকে যতটা আশা করেছিলাম তা তিনি দিতে পারেন নি। তাঁর কাব্য-পূর্ণ তুলির আঁচড় ও রঙ, যা প্রকৃতিকে তাঁর একান্ত স্বকীয় আবেগময় রূপদান ক'রে বিস্ময়কর করে তুলতো তা গেল কোথায়? তাঁর ছবি এমনভাবে ভীড়ের মধ্যে কখনও তো হারিয়ে যেতো না। অ্যাকাডেমীর প্রদর্শনীতে আমরা তাঁর

'পেজেণ্ট উইমেন'—চিন্তামণি কর

শ্রেষ্ঠ রচনাই দেখব আশা করেছিলাম। তৈলচিত্রে মাখন দত্তগুপ্তকে কেউ ছাপিয়ে যেতে পারেনি বলেই আমাদের বিশ্বাস যদিও বিচারকমণ্ডলীর মত অন্যরকম। তাঁর 'উইন্‌ডো' (৪৬) ছবিটি সত্যিই সুন্দর। এ ছাড়া আরও কয়েকটি অতি মনোরম স্টাডি আছে। গত বছর ডেস্‌মণ্ড ডোইগ মাথা ঘামিয়েছিলেন, এ বছর তাকে আবার ইম্প্রেশনিস্টসুলভ আঙ্গিক ও রঙ নিয়ে অন্য রূপে দেখা গেল। প্রতি বছর এমন-ভাবে ভোল পাল্টাতে দেখে মনে হয় তিনি নিজের পথ কিছুতেই বেছে নিতে পারছেন না। এ বছর তিনি নিজের অবচেতন মনকে নাড়া দিয়েছেন। তাঁর 'দেন্ নাথিঙ' ছবিটি সত্যিই ভাল লাগল। একমাত্র ডোইগ ছাড়া সুর্রিয়ালিস্ট ধর্মী ছবি আর কারুর দেখলাম না। তবে মাত্র দুখানা ছবি থেকে

'গ্রীন বুল' ঃ শিল্পী পানিকর

বোঝা গেল না সুর্‌রিয়ালিজমে ইনি কতখানি কৃতকার্য হয়েছেন। এঁর সম্বন্ধে কৌতূহল রইল। ব্ল্যাকবার্ন সাহেব কয়েকটি 'অ্যাবস্ট্রাক্ট' ছবি দিয়েছেন। অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি মোটামুটি বলা যেতে পারে প্রাকৃতিক রূপকে সম্পূর্ণ তালাক্ দিয়ে জ্যামিতিক নক্সা এবং রঙের অদ্ভুত সমন্বয়ে একটি নন্দনরূপ সৃষ্টি করা। যাঁদের অ্যাবস্ট্রাক্ট ছবি দেখা অভ্যাস আছে তাঁদের কাছে ব্ল্যাকবার্ন সাহেবের ছবিগুলি খুব খারাপ লাগবে না। কিন্তু 'অ্যাওকেনিঙ উওম্যান' বা 'গার্ল ইন রেজ', এ ধরনের নামকরণ করার ফলে সাধারণ দর্শকদের বিভ্রান্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা আছে। তাঁর অন্য ছবিগুলি মন্দের ভাল। জলরঙে বীরেন দে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রাখতে সমর্থ হয়েছেন, নিঃসন্দেহে বলতে পারা যায়। অনেকে বলছেন, তাঁর স্টাইলে আগে যে বলিষ্ঠতা এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যেতো তা তাঁর এবছরের ছবি থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। আমরা এ বিষয় ভিন্ন মত পোষণ করি। বিশেষ করে তাঁর 'হাউ গ্রীন ইজ দি ভ্যালি' (৩০৯) বা 'এ স্টাডি' (৪৭৩) খুবই চমৎকার লাগলো।

তথাকথিত 'বম্বে স্কুল' সম্বন্ধে আমাদের কিছু বক্তব্য আছে। বোম্বাইয়ের উগ্র আধুনিকপন্থী শিল্পীরা সত্যি সত্যি যে কতটা ক্ষমতাবান সে সম্বন্ধে প্রশ্ন করার যথেষ্ট কারণ ঘটেছে। সেখানকার প্রখ্যাত কয়েকজন শিল্পী ফরাসী বা ইংরেজী ছবির অল্পবিস্তর রকমফের করে হামেশাই বাজারে ছাড়ছেন দেখা যাচ্ছে। এঁরা যতটুকু রকমফের করেন ততটুকুই মূল ছবিকে নষ্ট করেন। আধুনিকতা দেখাবার জন্যে নিতান্তই অবুঝের মত আর্টকে বিকৃত ক'রে থাকেন। অবিশ্যি এই প্রদর্শনীতে বম্বে স্কুলের শিল্পীদের ছবি খুব বেশী নেই। একটি লক্ষ্মণ রায়, একটি আরা এবং দুটি হাজারানিস টাঙানো হয়েছে। তার মধ্যে কেবলমাত্র হাজারানিসের 'ফিশেস' (যার সম্বন্ধে আগে উল্লেখ করেছি) ছাড়া আর কোন ছবিই দর্শনীয় নয়। 'বেঙ্গল স্কুল'কে বোম্বাইয়ের সমালোচকরা 'অতি সাধারণ এবং একঘেয়ে' এই আখ্যা দিয়ে থাকেন, কিন্তু সত্যিকারের যাঁদের দৃষ্টি আছে তাঁরা দেখবেন ভারতবর্ষে এখনও মৌলিক শিল্পসৃষ্টি একমাত্র বাঙলাদেশেই হয়ে থাকে।

আজকাল দেখতে পাই, কলকাতার কোনও একটি বিশিষ্ট দৈনিক সংবাদপত্র 'বম্বে স্কুল'কে খুব মাথায় তুলছেন। পত্রিকাটি শুধু 'বম্বে স্কুল'কে বাহাদুরী দেবার জন্যই এই চিত্র প্রদর্শনীটির সমালোচনায় অত্যন্ত অপ্রাসঙ্গিক ভাবে অন্য আর একটি প্রদর্শনীর কথা তুলেছেন। ঐ রকম মেকী শিল্পকে এত প্রাধান্য দেবার হেতু কি? পত্রিকাটির মতামতের উপর আমাদের যথেষ্ট আস্থা ছিল। কিন্তু উপর্যুপরি এঁদের কয়েকটি সমালোচনা পাঠ করে ক্রমশই তা হারিয়ে ফেলছি।

জলরঙের ছবির মধ্যে জি ডি পলরাজের ছবিগুলিই অন্যতম আকর্ষণ। সুশীল মুখোপাধ্যায়ের বিষয়বস্তু ও অঙ্কণরীতি বিদেশী হলেও ছবিগুলি প্রশংসনীয়। রথীন মৈত্র, কানোয়াল কৃষ্ণ এবং পানিকার এমন কিছু ভাল ছবি দেখাতে পারেন নি। পানিকার দেশী এবং আধুনিক বিদেশী চিত্রধারার মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটাবার বৃথা চেষ্টা করেছেন। কিশোরী রায়ের ছবিগুলি না ভাল না মন্দ গোছের।

প্রাচ্য শিল্প বিভাগে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত 'মুকুল' (৫৯২) ছবিটি মাপে অত্যন্ত ছোট হওয়ায় সহজেই চোখ এড়িয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। তবে ছবিটি ভাল। প্রাচ্য প্রথায় শিল্পী শান্তিরঞ্জন মুখোপাধ্যায়ের পাকা হাত, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। এই বিভাগে ইন্দু দুগারের ছবিগুলি বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ছবিগুলির রচনা খুবই নিপুণ। কিন্তু এগুলিকে কি খাঁটি প্রাচ্য শিল্প বলা চলে? দীপেন বসুর 'দি কল' (১৩৮) চমৎকার লাগল, চীনা ছবি বলে ভ্রম হয়। একটা প্রশ্ন মনে জাগে, প্রাচ্য প্রথায় যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁরা আজকাল বড় ক্যানভাস ধরতে সঙ্কোচ বোধ করেন কেন? অবনীন্দ্রনাথের একটি প্যাস্টেল পোর্ট্রেট এবং নন্দলাল বসুর 'রাধা' টাঙিয়ে কর্তৃপক্ষ এই বিভাগের ইজ্জত বাড়িয়েছেন, এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ।

ভাস্কর্যে উপযুক্ত পাত্রের হাতেই পুরস্কারটি অর্পিত হয়েছে। যদিও আরও দু' একজন বেশ দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা হলেও নিখিল বিশ্বাসের 'মাদার এন্ড চাইল্ড' (১২) এবং 'মাদার অ্যাট ওয়ার্ক' (১৯) এই দুটি মূর্তিই

সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক। কালোশশী বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কিড' (২৩) প্রশংসনীয়। রামকিংকরের স্টাডিগুলি কৌতূহলোদ্দীপক। গ্রাফিক আর্ট-এ একমাত্র হরেন দাশ ছাড়া আর কারুর কাজ চোখে পড়ার মত নয়। বিচারকদের মতে শ্রেষ্ঠ গ্রুপ প্রদর্শিত করেছেন কল্যাণ সেন—এ বিষয় এক মত হতে পারলাম না।

প্রদর্শনীটি দৈনিক জনসাধারণের জন্য খোলা আছে।

*　　*　　*

২৩শে ডিসেম্বর থেকে শ্রীশক্তিপ্রসাদ রায় বর্মণ তাঁর একক চিত্র প্রদর্শনী শুরু করেছেন পার্ক স্ট্রীটের আর্টিস্ট্রী হাউসে।

ঘুংগ্রু ঘাট —শক্তিপ্রসাদ রায় বর্মণ

পঞ্চাশখানি ছবি টাঙানো হয়েছে তার মধ্যে বেশীর ভাগই জলরঙ ছবি। একটি লিথোগ্রাফ, একটি চারকোল এবং কয়েকটি তৈলচিত্রও আছে। শিল্পী কলেজ অব আর্ট অ্যান্ড ক্রাফটের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র। বয়সে খুবই ছেলেমানুষ কিন্তু উচ্চাভিলাসী। অধ্যবসায় ও আগ্রহ আছে সুতরাং ভবিষ্যতে উন্নতি করবেন সে বিষয় কোন সন্দেহ নেই।

সব ছবিতেই শিক্ষানবিশীর ছাপ অত্যন্ত প্রকট। অবিশ্যি চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রের পক্ষে যা সম্ভব তা তিনি দিয়েছেন। কয়েকটি তৈল-চিত্র যেমন 'ওয়ে টু টেম্পল' (৪২), 'প্লেস অব ওয়ারশিপ' (৪৩) 'যোধপুর প্যালেস' (৪৯) ইত্যাদি ভাল লাগল। তবে এই ছাত্রাবস্থাতেই একক প্রদর্শনীর ব্যবস্থা—একটু হঠকারিতা হয়ে যায়নি কি? আরও কয়েক বছর পর, সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস এলে, এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করলে সুবিবেচনার কাজ হত। তিনি ভবিষ্যতে উন্নতি করুন, এই আমাদের একান্ত কামনা। —চিত্রগ্রীব

দিল্লী

ভারত সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগের উপমন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দ্র বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে শ্রীমতী আমিনা লোদীর ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। শ্রীমতী আমিনা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রী ডাঃ আর আহমেদের কন্যা। তিনি কলিকাতা আর্ট স্কুল এবং দিল্লী পলিটেকনিকে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন ও পরে উচ্চশিক্ষার জন্য প্যারিসে গমন করেন। শ্রীমতী আমিনা ইতিপূর্বে কলিকাতায় প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছেন। নয়াদিল্লীতে এই তাঁহার প্রথম প্রদর্শনী।

একাধিক কারণে এই প্রদর্শনীটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমত, শ্রীমতী আমিনার সাহস ও আত্মবিশ্বাস। আধুনিক চিত্রকলাধারায় প্রভাবান্বিত হইয়া বা বিদেশী শিল্পীর ব্যর্থ অনুকরণ করিয়া কয়েকজন শিল্পী অতি আধুনিক রচনার দুই চারিখানি নমুনা কি ব্যক্তিগত বা কি সঙ্ঘবদ্ধ প্রদর্শনীতে পেশ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু ইতিপূর্বে কোনোও শিল্পীই সমগ্রভাবে অতি আধুনিক বা বস্তুনিরপেক্ষ (Abstract) চিত্রের প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিতে সাহসী হন নাই। সেইদিক দিয়া বিচার করিলে শ্রীমতী আমিনাই সর্বপ্রথম পথ দেখাইলেন এবং এই সৎসাহসের জন্য তিনি প্রশংসা দাবী করিতে পারেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহার চিত্রধারা প্রীতি। অন্যান্য শিল্পীদের ন্যায় তিনি আধুনিক চিত্রধারায় পরীক্ষামূলকভাবে রচনা করিয়া যান নাই, উপরন্তু তিনি সেই চিত্রধারা সুগভীরভাবে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং তাহার মধ্যেই নানাভাবে পরিবেশন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তৃতীয়ত, তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিক গতি। তাঁহার মন সচেতন ও অনুভূতিশীল, দৃষ্টিভঙ্গী নূতন এবং চিন্তাধারা বলিষ্ঠ ও মৌলিক। সর্বোপরি, সমস্ত বস্তুই তিনি যেন কবির চক্ষে দেখেন। প্রকাশপদ্ধতি বিদেশীয় হইলেও তিনি যে ভারতীয় সে কথাটি তিনি আদৌ ভুলেন নাই। নীল আকাশের বুক হইতে হংস-বলাকা সুললিত রেখাছন্দে ধরণীর বুকে নামিয়া আসিতেছে, রাত্রির যবনিকা নামিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝি বা কোন নগণ্য পল্লীর এক অজানা কুটীরের মধ্যে একটি প্রদীপশিখা সকলের অলক্ষ্যে আপন মহিমায় জ্বলিয়া উঠিয়াছে, আবার

প্রদীপ —আমিনা লোদী

কোন শুভমুহূর্তে বীজ বা অঙ্কুরের মধ্য হইতে নবপত্র বা পুষ্পমঞ্জরী আত্মপ্রকাশ করিতেছে—বহির্জগতের এই বিভিন্ন বস্তু ও দৃশ্যগুলি যেন তিনি সমগ্র হৃদয় দিয়া অনুভব করিয়াছেন ও সেই অনুভূতিকেই নানা রেখা ও বর্ণসাহায্যে ভাষা দিয়াছেন। সচেতন মনের সূক্ষ্ম সুগভীর ও বিচিত্র অনুভূতি হইতেই বস্তুনিরপেক্ষ চিত্রকলার জন্ম। সুতরাং যাঁহারা সীমাবদ্ধ ও বস্তু জগতধর্মী চিত্রাদি দেখিতে অভ্যস্ত তাঁহাদের নিকট শ্রীমতী আমিনার রচনাবলী কিঞ্চিৎ দুরূহ বলিয়া মনে হইতে পারে।

কিন্তু বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে যে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলি দুর্বোধ্য নহে। একথা সত্য যে বস্তুনিরপেক্ষ চিত্র-কলা প্রাথমিক অঙ্কনরীতি বা বর্ণব্যবহার প্রণালীর বিশিষ্ট কোন নিয়মই মানিয়া চলে না। কিন্তু তথাপি এহেন চিত্রের একটি নিজস্ব ছন্দ ও শৃঙ্খলা আছে—তাহার সংজ্ঞা নিরূপণ করা কঠিন হইলেও অনুসন্ধানী চক্ষুর নিকট তাহা অবশ্যই ধরা পড়ে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত রসের ন্যায় ইহা উপভোগ করিতে হয়, কিন্তু হয়ত ব্যাখ্যা করা যায় না।

প্রদর্শনীতে শ্রীমতী আমিনা ৬২টি চিত্র ও ২১টি এচিং এর নমুনা পেশ করেন। রচনাগুলি তৈল ও গুয়াশ মাধ্যমে রচিত এবং দুইটি কারণে সেইগুলি চোখে পড়ে। প্রথম শিল্পীর আবেগ ও চিন্তা-ধারা, দ্বিতীয়, তাঁহার বর্ণনির্বাচন, বিন্যাস ও সংস্থাপন করিবার কৌশল। চিত্রগুলির মধ্যে যে আকারের কোনও স্থান নাই, তাহা নহে, তবে তাঁহার কল্পনা ও অনুভূতিকে আশ্রয় করিয়াই এই আকার রেখা ও বর্ণের ভিতর দিয়া নানাভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। অনেক সময়ে সেগুলি বিশেষ কোনও প্রতীকের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। আবার কখনও সেগুলি নানা প্যাটার্নের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। উদাহরণ-স্বরূপ "প্রদীপ" বা "নীলবর্ণ-সমাবেশ"-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। অন্য কয়েকটি রচনা আবার আপন দৃষ্টিভঙ্গী, ছন্দ ও রেখাসৌষ্ঠবের জন্য চোখে পড়ে। "নর্তনোদ্যত ময়ূর", "নিম্নে ধাবমান পক্ষী" এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। সর্বাপেক্ষা লক্ষ্য করিবার বিষয় এই শিল্পীর বিষয়-নির্বাচন করিবার ক্ষমতা। বিশেষ করিয়া এচিং মাধ্যমে রচনা করি-বার জন্য বহির্জগত হইতে তিনি যে উৎপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন, তাহার দ্বারা একটি সমবেদনাশীল কবি মনেরই পরিচয় পাওয়া যায়। পক্ষী আপন চঞ্চু দিয়া শাবককে খাওয়াইতেছে অথবা সঙ্গীবিহীন কোনও পক্ষী বৃক্ষশাখায় একান্ত নীরবে বসিয়া আছে—বহির্জগতের এই অতি-স্বাভাবিক দৃশ্যগুলি তাঁহার কোমল মনকে দোলা দিয়াছে এবং এই বিষয়গুলিই তিনি এচিংএর মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। গভীর সমবেদনা, কবিসুলভ সূক্ষ্ম অনু-ভূতি ও প্রকাশচাতুর্যের জন্য "উড্ডীয়মান রাজহংস", "ভিক্ষু বুদ্ধ" (ড্রাই পয়েণ্ট) ও পাপেটস্ (একুয়াটিণ্ট) বিশেষভাবে চোখে পড়ে। মোটের উপর শ্রীমতী আমিনা প্রতিভাবতী শিল্পী।

* * *

আন্তর্জাতিক শিশু চিত্র প্রদর্শনী ইস্টার্ণ কোর্টে অনুষ্ঠিত হয় ও প্রধানমন্ত্রী, বিভিন্ন দেশের দূত মহোদয়গণ ও বিশিষ্ট নিমন্ত্রিত ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে রাষ্ট্রপতি

অজন্তা ঘোষ অঙ্কিত চিত্র
(৫ বৎসরের নিম্নবয়স্কা)—ভারতবর্ষ

ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ ইহার উদ্বোধন করেন। শ্রীশঙ্কর পরিচালিত এই প্রদর্শনীটি এখন একটি উল্লেখযোগ্য আন্তর্জাতিক ঘটনা হিসাবে গণ্য হইয়া থাকে এবং এবারেও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে ২০ হাজার চিত্র শঙ্করের হস্তগত হয় ও তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত দুই হাজার চিত্র প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারেও পৃথিবীর ভিন্ন ভিন্ন ৫৬টি দেশ হইতে বিভিন্ন বয়স্ক বালক-বালিকাগণ আপন আপন রচনা প্রদর্শনীতে পাঠায়। ৫ বৎসরের নিম্ন বয়স্ক বালক-বালিকা হইতে ১৬ বৎসর বয়স্ক বালক-বালিকাদের রচনাগুলিকে বয়সের তারতম্য হিসাবে ১২টি বিভাগে ভাগ করা হয় ও সেই অনুযায়ী মনোনীত চিত্রগুলি পেশ করা হয়।

এবারকার প্রদর্শনীটি লক্ষ্য করিলে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে মনে জাগে। প্রথমত, অল্পবয়স্ক শিশুগণের মধ্যে অধি-কাংশই আপন আপন কল্পনা অনুযায়ী কেবলমাত্র নানা মূর্তি রচনা করিয়াছে। অনেক স্থলেই এই মূর্তিগুলির সহিত বাস্তব জীবনের কোনো সম্বন্ধ নাই। সকলেই মানবমূর্তি রচনা করিতে চেষ্টা করিয়াছে, কোনোটি বা এক অদ্ভুত জগতের জীব হইয়াছে আবার কোনোটি বা মানবাকার থাকা সত্ত্বেও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দিক দিয়া ভৌতিক জগতের কোনোও জীবের রূপ ধারণ করিয়াছে। তাহার উপর আছে অদ্ভুত ও বিচিত্র রঙের খেলা। ফলে রেখা ও রঙে মূর্তিগুলি কল্পনারাজ্যেরই অধি-বাসী থাকিয়া গিয়াছে। দ্বিতীয়ত, ঈষৎ অধিক বয়স্ক (৬-৭) [illegible] মূর্তির সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বিষয়বস্তু ও বিভিন্ন বর্ণব্যবহারের দিকে মনোযোগ দিয়াছে এবং আরও অধিক বয়স্ক বালক-বালিকাগণ (৮-৯) প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া এমন কি বস্তুনিরপেক্ষ চিত্রও রচনা করিয়াছে। তৃতীয়ত, "কোলেজ" মাধ্যমে রচিত চিত্রের নমুনা ব্যতীত দু' একটি দেশের শিশুগণ বিভিন্ন বর্ণের কাপড়ের টুকরা পর পর সাজাইয়া চিত্র রচনা করিয়াছে। বিশেষভাবে জাপান ও হল্যাণ্ডের নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে। চতুর্থত, উচ্চ-বয়স্ক বিভাগের রচনাগুলি সত্যই উচ্চাঙ্গের হইয়াছে, তবে অধিকাংশ চিত্রে শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী কিঞ্চিৎ সাহায্য করিয়াছেন, সেটি অতি সহজেই বুঝা যায়।

এই শিশুচিত্র প্রদর্শনীর প্রধান বৈশিষ্ট্য বিচিত্র বর্ণসমারোহ। প্রত্যেক বিভাগের রচনাগুলি লক্ষ্য করিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাথমিক অঙ্কনবিদ্যা বা বিষয়বস্তুর উপর লক্ষ্য না রাখিয়া শিল্পিগণ কেবল বর্ণব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দিয়াছে। শুধু তাহাই নহে অধিকাংশ শিশুশিল্পীই অতিশয় গাঢ়বর্ণ মনোনীত করিয়াছে। প্রদর্শনীর একপ্রান্ত হইতে অপরপ্রান্ত পর্যন্ত বার বার প্রদক্ষিণ করিলে মনে হয় সত্যই বুঝি

স্বপ্নরাজ্যের কোন সপ্তবর্ণের বিচিত্র ক সরোবর তীরে আসিয়া উপস্থিত ইলাম।

শিশুশিল্পীদের মধ্যে ভারতবর্ষের ঞ্জন্তা ঘোষ ও কাম্মো মেহেরার রচনার ধ্যে অঙ্কন প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। রার পরেই আয়ার ও বেলজিয়মের চিত্র-লি চোখে পড়ে (৪৯২৬, ২৪৮৮ ও ৬৫০) একদিকে যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্যা-লী চেকোশ্লোভাকিয়ার শিশুদের মন াকৃষ্ট করিয়াছে অন্যদিকে তেমনই াপানের শিশুগণ তাহাদের বিচিত্র বাস-স্থানগুলিকেই নানাভাবে চিত্রিত করিয়াছে ১৬৪২, ৫১৬৩)। অপরপক্ষে, বিরাট েতার মিছিল অথবা পাদপ্রদীপসমন্বিত াটমঞ্চ হইতে তুরস্ক দেশের ছেলেমেয়েরা ষ্ট উৎপ্রেরণা লাভ করিয়াছে (৩২৪৪, ৩০১ ও ৩০৫৪)। শিশুমন যে কল্পনা-বলাসী সে বিষয়ে সন্দেহ নাই, তথাপি নাডার একটি শিল্পী (৮-৯) নানাবর্ণ ও আকারের মধ্য দিয়া বস্তুনিরপেক্ষ চিত্র-রার যে নমুনা পেশ করিয়াছে, তাহা দেখিয়া বিস্ময়ান্বিত হইতে হয় ৬৩০এ)। এতদ্ব্যতীত হল্যান্ড ৩০৭), লঙ্কা (৬৭৩৬এ) জার্মানী ৮৯১এ, ৪৮৯২ডি) জাপান (৬৯১৩, ৬৫৮ই) সুইজারল্যান্ড (৩৪২৫), লন্ড (৪৬২৩), পাকিস্থান (৭২৩৩), স্ট্রিয়া (২৮-৩৮), আমেরিকা (১১৩১) ও রাশিয়ার (৭৫৬১) বিভিন্ন রচনাগুলি ষ্টি আকর্ষণ করে।

এদেশের বালকবালিকাদের রচনার মধ্যে বর্ণচাতুর্য অপেক্ষা অঙ্কনপদ্ধতি ও স্থূল বিষয়বস্তুই বিশেষভাবে চোখে পড়ে। সুতরাং সমতা, রচনা-পারিপাট্য ও অঙ্কন-রীতির দিক দিয়া চিত্রগুলি অনেকাংশে নির্ভুল হইলেও প্রখর বর্ণ আলিম্পনের অভাবে অধিকাংশ চিত্র যেন ঈষৎ ম্রিয়মান বলিয়া বোধ হয়। তথাপি, অন্যান্য দেশের রচনার সহিত তুলনা করিলে আমাদের দেশের ছেলেমেয়েদের নিরাশ হইবার কোনও কারণ দেখি না। প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বহির্জগতের নানা বস্তু প্রতিলিপি দেশবাসীর দৈনন্দিন জীবনের নানা অধ্যায়গুলি পর্যন্ত তাহা-দের সরল শিশুমনকে দোলা দিয়াছে ও আপন আপন কল্পনা ও ক্ষমতা অনুযায়ী তাহারা সেইগুলিকে রূপ দিবার চেষ্টা করিয়াছে। বিশেষ করিয়া ৭৪০২, ২০১৩, ৬৪৮৭ডি, ৭১৬৯বি, ৭১৭০, ৭১৬৯, ৬৪৮৭বি—চিত্রগুলি সত্যই চোখে পড়ে। রঞ্জন সেনের চিত্র ব্যতীত সলিল দাশের স্কেচ (৮৭২৫সি ও ৮৭২৫) বিদ্যাসাগরের টেম্পারা চিত্র ও কে বর্মণের প্রতিলিপি বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
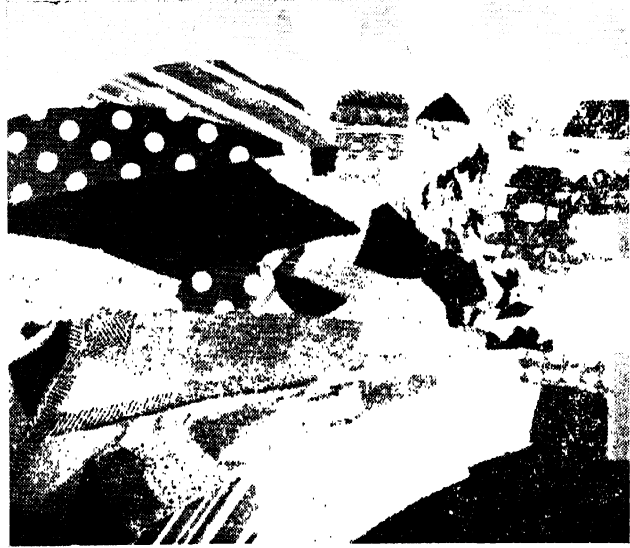
রঙীন কাপড়ের টুকরা বসান ছবি (১০—১১) জাপান

বিদ্যাসাগর (১৫—১৬) ভারতবর্ষ

গত বৎসরের ন্যায় এবারেও শ্রীশঙ্কর সর্বজনসমক্ষে অঙ্কন প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করেন। ১২ বৎসরের অনধিক ৭০০ বালকবালিকা এই প্রতিযোগিতায় যোগদান করে এবং তাহাদের রচনাসম্ভার হইতে মনোনীত ২০০ চিত্র প্রদর্শনীর এক অংশে পেশ করা হয়। পরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শ্রেষ্ঠ বিবেচিত প্রায় ৪০ জন বালকবালিকাকে পুরস্কার বিতরণ করেন।

আন্তর্জাতিক শিশুচিত্র প্রদর্শনীর বিভিন্ন বিভাগের পুরস্কারের তালিকা 'শঙ্করস্ উইকলি—শিশুসংখ্যায়' জানু-য়ারী মাসে প্রকাশিত হইবে। এই প্রদর্শনীটি শীঘ্রই কলিকাতা ও মাদ্রাজ শহরে অনুষ্ঠিত হইবে।

—চিত্রপ্রিয়

গ্রীস থেকে জুগোস্লাভিয়া

ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী

গ্রীসে বিদেশী লোক যাতে বেশী বার বা বেশী সংখ্যায় আসে এজন্য গভর্নমেণ্টের চেষ্টা যথেষ্ট, হোটেল-গুলির উপরে স্টেটের হাত অনেকখানি। প্রত্যেক আগন্তুককে মন্তব্য করতে হয় 'ভাল লেগেছে তাঁর'। আমেরিকান এয়ার-ওয়েজ প্রায় সমস্ত বড় দ্বীপে বিমান অব-তরণের ব্যবস্থা করেছে, আগে এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে যাওয়া সহজ ছিল না, সময়ও লাগত অনেক। সমস্ত পূর্বাঞ্চলে কাল কফি, দুধ না দেওয়া, পরিমাণে আন্দাজ ২ই আউন্স চিনির সঙ্গে খাওয়া অভ্যাস; পরে বোধ হয় মুখ বদলাতে ঠাণ্ডা জল খেতে হয়। সমস্ত ইউরোপ অঞ্চলে জলপান করার অভ্যাসটা দস্তুরমত কম। ইংরাজী সামাজিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের পুস্তকে আলোচনা হয়েছে, ইংলণ্ডের মফস্বলে একসময়ে পবিত্র পরিষ্কৃত জল মিলত না বলেই খাবার সময়ে জলপান করার অভ্যাসটা সেদেশে প্রচলিত নয়। অথচ শরীরের অনেক অপ্রয়োজনীয় পদার্থ শুধু জলেই ধৌত হয়ে যায়। এইসব পূর্ব দেশে খাবারের দোকানে জল চাইলে লোকে নীরবে তাকিয়ে দেখে; ওয়েটার ঔষধ খাবার মত পাত্রে ২ আউন্স আন্দাজ জলও দেয়। এথেন্স থেকে স্যালোনিকা পর্যন্ত দ্রুত-গামী রেলেও ১০ ঘণ্টার কিছু বেশী সময় লাগে। মাঝে মাঝে এক একটা স্টেশনে গাড়ি থামে কিন্তু স্টেশনের আশেপাশে বসতি নজরে পড়বে না। শুধু শস্যক্ষেত্র দুধারে আর উঁচু পাহাড়, দূরে থেকে দেখে মনে হয় সমুদ্রের ঢেউয়ের মত পাহাড়-গুলো চলেছেই মাইলের পর মাইল। কৃষকেরা থাকে কোথায় রেলগাড়িতে বসে বুঝতে পারা যাবে না। ক্বচিৎ কখনও একখানা দুখানা খাপরেলের ছাদ পাথরের দেওয়ালের ঘর দেখা যাবে, মুরগীও চরে বেড়াচ্ছে। ঘোড়ায় চড়ে স্ত্রী-পুরুষ দূর-স্থান থেকে জমি চাষ করতে আসে। পথে কোথাও পার্বত্য নদী পর্যন্তও নেই, ই'দারাও নেই; জলের বন্দোবস্ত একমা আকাশ থেকেই সম্ভবত হয়। লোকজনে পোশাক বিভিন্ন রং-এর বিশেষত মেয়েদের স্ত্রীলোকে চাষের কাজ বোধহয় সবকিছু করতে পারে, সন্ধ্যাকালে ঘোড়ায় চ দূরে বসতিতে চলে যাচ্ছে দেখা যাবে। এ রকম চাষের জমি আর পাহাড় গ্রীসে বৈশিষ্ট্য। একটানা জীবন চলেছে বহ শতাব্দী ধরে। দুটো পাহাড়ের মাঝখানে ঘোড়ায় চড়ে যাবার পথ খুবই সংকীর্ণ সম্ভবত আলেকজাণ্ডারের সময় ম্যাসি ডোনিয়ান অশ্বারোহী পাহাড়ের ওপ দিয়েই ঘোড়া ছুটিয়ে চলত, সমতলভূমি জন্যে গরজ ছিল না। পাহাড়গুলো আলপসের তুলনায় অনেক ছোট। ম্যাসি ডোন যেমন সে আমলের জানিত পৃথিবী অনেকটা দখল করেছিল, দক্ষিণে গ্রীস তাঁর অধিকারে ছিল তবে সে অনেকদিনে কথা, তবু ম্যাসিডনের প্রজা নিজেকে সহ গ্রীক বলতে চায় না। পাঁচ শ বছরের বেশ তুরস্কের সুলতান আধিপত্য করেছে সারা পূর্ব ইউরোপে। মধ্যযুগে পাহা প্রদেশের আলাদা নাম বিদেশীর কা প্রচার ছিল না। ম্যাসিডোনিয়া সার্বি দক্ষিণেও আছে, বুলগেরিয়াতেও তার এ অংশ পড়েছে, একই জাতি একই ভা যদিও বিভিন্ন রাষ্ট্রে এটা স্পষ্ট প্র হ'ল ১৯১২ সালে বাল্কান সমরের শে যখন তুর্কীর ইউরোপীয় সাম্রাজ্য 'মুষ্টি মেয় ভস্মাকারে' পরিণত হ'ল গ শতাব্দীর মানচিত্র দেখলে ম্যাসিডোনি মনে হবে আসল তুরস্ক, একটা ইস্তাম্বুল পর্যন্ত বিস্তৃত। তখনকার না ছিল রুমেলিয়া। বুলগেরিয়ার ম্যাসি ডোনিয়া হ্রস্ব বলে এখনও সেখানকা লোকে ক্ষুব্ধ। এই প্রদেশের একটা নিজস্ব রূপ আছে। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই শরীরে চর্চা করে, তীরধনুক, বন্দুক চালাতে জানে। পাহাড়ী সরল জাতি সভ্যতার ঋ শোধ করে না, সত্য কথাই বলে আর অল্পে সন্তুষ্ট। অপেক্ষাকৃত শীতের দেশ হলেও লোকে পরিশ্রমে কাতর। গ্রীসের ম্যাসি ডোনিয়ার বড় শহর স্যালোনিকা (Thess-Saloniki) আলেকজাণ্ডারের বিশ্ববিজয়ের সময়ে তাঁর ভগ্নী ও ভগ্নী

...তি স্থাপনা করেছিলেন। সেই ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হলে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের মিউজিয়ামে যেতে হয়। ফরাসী প্রত্নতত্ত্ববিদেরাই বোধ হয় মধ্যযুগের ইতিহাস সংরক্ষণ করেছেন। কায়রোর অপূর্ব যাদুঘরও ফরাসী ঐতিহাসিকের প্রচেষ্টায়। সাধারণ প্রজা পুরানো কথায় কান দেয় না। ...মধ্য প্রাচ্যের আর একটা শহর, ইউরোপের হাবভাব নিতান্তই অল্প। শহরটা অপরিচ্ছন্ন কাফিখানায় ভর্তি, লোকে ফুটপাথে চেয়ার নিয়ে তাসখেলা করছে, জুয়োখেলার হল্লাও শুনতে পাওয়া যাবে। কোথায় হয়ত নাচ দেখাচ্ছে একজন আর অনেকলোক কাজকর্ম ছেড়ে তাই দেখছে আর চীৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছে। ইউরোপের রাস্ততা, বিদ্যুতের মত গতিতে ... এখানে এখনও শুরু হয়নি। মাঝামাঝি খাবারের দোকানেও সিককাবাবের, ...লের দুর্গন্ধ। লোকে নিরুদ্বেগে থুথু ফেলে রাস্তাঘাটে, চীনাবাদাম কিনে ঠোঙ্গার কাগজটা, খোসা রাস্তাতেই ফেলে দেয়; কেউ মন্তব্যও করে না, ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায়ও না। বিদেশীর প্রতি কৌতূহল বেশ আছে; ভারতীয় দেখলে জিজ্ঞাসা করে ইজিপ্টের প্রজা না পারসীক। ... ইতালীর বন্দরের লোকদের মত ...ও নয়, দুর্নীতিপরায়ণও নয়। সেবার আমাদের এক দেশী পরিবারের সঙ্গে জেনোয়া বন্দরের রাস্তায় চলতে ... হতে হয়েছিল। মহিলাদের শাড়ি আর লম্বা চুল দেখে বেশ বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রী-পুরুষে ঘিরে দাঁড়াল আর একসঙ্গে চীৎকার 'ইন্ডিয়ানো, ইন্ডিয়ানা'। একজন ইতালীয় স্ত্রীলোক শাড়ি পরীক্ষা করতে লম্বায় কত হাত রাস্তাতেই মাপজোখ করতে শুরু করলো। অনুমতির অপেক্ষা নেই, এক বৃদ্ধা মুখব্যাদান করে অপরিচ্ছন্ন দন্তপাটি দেখিয়ে আমাদের একটি মেয়ের চুল কত লম্বা মেপে দেখতে কৃতসংকল্প। পথচারী লোকেরা আপত্তি ত করেই না বরং কৌতুক উপভোগ করে। সেবারে বহু কষ্টে পুলিস ডেকে উদ্ধার পাওয়া যায়। নেপলস্, ব্রিন্ডিসি ইতালীর প্রায় সব বন্দরগুলিই নিষ্কর্মা অসৎ অলস লোকে ভর্তি। ম্যাসিডনের লোকেরা অশিষ্ট অভদ্র নয় তবে পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় খুবই অলস। সমুদ্রতীরে স্যালোনিকার কূটনৈতিক প্রয়োজনীয়তা তুরস্কের খুবই বেশী ছিল। নেপোলিয়ান নাকি মনে করতেন এ বন্দর হাতে থাকলে পূর্ব-ইউরোপ, আফ্রিকা একসঙ্গে হাতে রাখা যায়। মধ্যযুগে ব্যবসায়ীদের ক্যারাভানের সরাইখানা স্যালোনিকা আজও পূর্ব থেকে পশ্চিমে যাবার প্রধান সঙ্গমস্থল। স্যালোনিকা থেকে কিছু উত্তরে ম্যাসিডোনিয়া নতুন রাজ্য যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দশ বছর আগেও দক্ষিণাংশের সঙ্গে কোন পার্থক্যই বুঝা যেত না। আজও এই দক্ষিণের গণতন্ত্রটি সবরকমে পশ্চাতে আছে, আর এই প্রদেশের উন্নতির জন্যে সমস্ত যুগোশ্লাভ প্রজা যেন সর্বদাই চিন্তিত। উত্তরের ধনী রাষ্ট্রতন্ত্রের উদ্বৃত্ত অংশ এই প্রদেশের জন্য গচ্ছিত রাখা হয়। পথেঘাটে যে কোনও নরনারীর মুখে একথা শোনা যায়। কলকারখানা এখানে এখনও বড় একটা স্থাপিত হয়নি; স্থানটাই কৃষিপ্রধান। গত দু'বছর আগে অনাবৃষ্টি সারা দেশে দুর্ভিক্ষের শঙ্কা এনেছিল। যুগোশ্লাভ ম্যাসিডোনিয়ার বড় শহর স্কোপিয়ে (Skopje) এখন একটা মাঝারী রকমের শহর। বিশ্ববিদ্যালয় আছে, মেডিক্যাল কলেজ আছে, টেকনিক্যাল স্কুলও হয়েছে, বৈজ্ঞানিক কৃষির জন্য শিক্ষায়তনও স্থাপিত হয়েছে। রেলের লাইনের দু'ধারে চাষের জমিই বেশী, সেইরকমই পাহাড়ের ঢেউ তবে মাঝে মাঝে একই জমির এক অংশে ট্র্যাক্টরের চাষ অপরাংশে বলদ দিয়ে লাঙ্গল টানা—রেলগাড়িতে বসে দেখা যাবে। শিক্ষা বাধ্যতামূলক তবু ম্যাসিডোনিয়ার মুসলমান গৃহস্থ মেয়েকে এখনও স্কুলে পাঠাতে আপত্তি করে, এ নিয়ে উত্তরাঞ্চলের লোকেরা হাসাহাসিও করে। হায়রে! খাস তুরস্কে নারীপ্রগতি, স্ত্রী-স্বাধীনতা পূর্ণমাত্রায় কিন্তু তুর্কীর অধীন রাজ্যের রক্ষণশীলতা রাতারাতি যায়নি। গাড়িতে আদৌ যাত্রী ছিল না। গ্রাম থেকে একটি ২০।২১ বছরের মেয়ে পুরাতন সুটকেশ নিয়ে উঠল; পরনে মলিন পুরাতন পোশাক, জুতাতে কাদা, উলের পুরান মোজা।

ইউরোপে যত গরীবই হোক না কেন রাস্তায় বের হলে পোশাক সকলেরই প্রায় সমান নাইলনের মোজা সকলেই পরে। কাজেই আমার মনে হয়েছিল কোন ম্যাসিডন গৃহস্থের দুঃস্থা কন্যা চাকুরীর অন্বেষণে রাজধানীতে যাচ্ছে, সে মেয়ে যে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করে টেকনোলজিক্যাল কেমিস্ট্রি পড়ছে মোটেই ভাবতে পারিনি। পরে অন্যান্য যাত্রীরা গাড়িতে উঠলে তাদের কাছে জানতে পেরে বড় লজ্জা পেয়েছি। মেয়েটি গাড়িতে বসে তার দেশের ম্যাপ ইংরাজী বইতে যুগোশ্লাভিয়ার বিবরণ দেখে আনন্দে অধীর হয়ে উঠল। অবশ্য ইংরাজী সে জানে না। চলতি কথাগুলির সার্বিয়ান প্রতিশব্দের ইংরাজী নাম দেওয়া একখানা ছোট বইও ছিল, সেটা থেকে খুঁজে খুঁজে বললে, 'কলিকু ক্যালকুটা' অর্থাৎ এখন কলকাতার সময় কত? বোধ হয় মেয়েটা ক্ষুধা বোধ করছিল। একখানা নুন মাখানো গোলরুটির আধখানা আমাকে অত্যন্ত বিনীতভাবে হাত বাড়িয়ে দিতে চায়। বাড়ি থেকে রুটি আর ছোলা ভাজা সঙ্গে নিয়ে এসেছে। তার রুটি আমি নিয়ে তাকে

ক্ষুধায় থাকতে দিই কেমন করে। বিশেষত ট্রেনে খাবারের কামরাও আছে আর আমার সঙ্গে যুগোশ্লাভ টাকাও আছে যথেষ্ট। রুটি শেষ করে যখন কাগজের ঠোঙা থেকে ডালভাজা বের করে আমার হাতে গুঁজে দিল, ফিরিয়ে দিতে পারলাম না। খেয়ে মনে হ'ল ছোলাভাজা, তবে আমাদের ছোলার চেয়ে দানা অনেক বড়। একটা নদী 'মোরাডা' সঙ্গ নিয়েছে আমাদের, আর চলেছে রেলের ধারে ধারে প্রায় বেলগ্রেড পর্যন্ত। পাহাড়ে নদীর স্রোত খুবই খর; অগভীর জল, বর্ষাকালে কলকাতার গঙ্গার মত ঘোলা। তবে বোধ হয় বন্যা হয় না নচেৎ রেলের লাইনের দু'হাত দূরেই নদী, কোন বাঁধও নেই। স্কোপিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় শহর, সেখানে আর তিনজন যাত্রী উঠলেন। এক ভদ্রলোক ঔষধের দোকানের ফার্মাসিস্ট, ১৬ বছর প্যারিসে ছিলেন কাজেই ফরাসী খুব ভাল জানেন। একটি ছাত্র উঠেই বললে আমি ইংরেজী ভাল জানি, কিন্তু অল্পক্ষণেই বুঝলাম দু'চারটে ইংরাজী কথা ছাড়া আর কিছুই জানে না। সে উত্তরাঞ্চলের লুবলিয়ানা শহরের বিখ্যাত টেকনোলজিক্যাল স্কুলে কেমিস্ট্রি পড়ছে। এদেরই মুখে শুনলাম এ ম্যাসিডোনিয়ান কন্যা গ্রামবাসিনী, বেলগ্রেডে কেমিস্ট্রি পড়ে, ছুটিতে গ্রামে এসেছিল বাপমায়ের ক্ষেতের কাজে সাহায্য করতে, আবার কলেজে ফিরে যাচ্ছে। দু'জনেই গভর্ন-মেণ্টের বৃত্তি পায়; পড়া, থাকা, জামা-কাপড় সব খরচাই মেলে। বছরে দু'বার বাড়ি যাবার রেলভাড়াও লাগে না। ছেলেটি একটি ভুল করেছিল রেলের পাশে সাধারণ গাড়িতে যাবার নিয়ম, কিন্তু সেই আন্তর্জাতিক দ্রুতগামী রেলে চড়ার কারণে তাকে অতিরিক্ত ভাড়া দিতে হবে। তর্ক আরম্ভ হয়ে গেল রেল কণ্ডাক্টারের সঙ্গে, প্রায় একঘণ্টা বচসার পরে ছেলেটি ২৭৫০ দিনার দিতে বাধ্য হ'ল। বড় দুঃখ করে বললে, আমার এক বছরের একজোড়া জুতোর দাম একরাত্রে দণ্ড দিতে হ'ল। কিন্তু যদি সাধারণ রেলে যেতাম আমার পৌঁছতে ৪৮ ঘণ্টা লাগত। যুদ্ধের পরে জার্মানরা যতটুকু রেলের লাইন গরীব দেশে ছিল, উপড়ে দিয়ে গিয়েছে। ইঞ্জিন গাড়ির অভাব এখনও যথেষ্ট, সম্প্রতি সার্বিয়ায় কয়লার খনি আবিষ্কৃত হয়েছে, তবে সে কয়লা কমদরের, ইংলণ্ডের মত নয়। কেমিস্ট্রি পড়া ছেলে পৃথিবীর কোথায় কত কয়লা উৎপন্ন হয়, তার দেশেই বা কতটা অভাব অসঙ্গতি আমাকে বিদেশী দেখে বোঝাতে তার কর্তব্য বিবেচনা করল। কথাবার্তায় আলোচনায় সময় শীঘ্র কাটতে লাগল। সেইখানেই তাঁরা বুঝলেন আমি একজন কলকাতার ডাক্তার তাদের দেশ দেখতে এসেছি। তাঁরা ভরসা দিলেন হোটেলে জায়গা পাওয়া দুষ্কর হলেও তাঁরা একটা ব্যবস্থা করে দেবেন। তৃতীয় যাত্রী একজন মুসলমান রেল-কর্মচারী, সম্ভবত মিস্ত্রি। যুদ্ধের নৃশংসতা দেখে স্ত্রী আর কন্যা ইস্তাম্বুলে চলে গিয়েছে আর ফেরেনি। শীর্ণকায় তিরিশ বছরের যুবক, বয়স দেখায় অনেক বেশী। ফার্মাসিস্ট ভদ্রলোকেরও বয়স ৪০, কিন্তু চুলগুলি সব বরফের মত সাদা। যুদ্ধের দুর্দিনে রাতের পর রাত পাহাড়ের উপরে, পেছনে থেকে অতর্কিতে জার্মান সৈন্যকে বে-কায়দায় ফেলে বন্দুক কেড়ে নেওয়া তাদের কাজ ছিল। অল্পাহারে, অনাহারে, দুশ্চিন্তায়, রাত্রি-জাগরণে তিন চার বছর কত কষ্টেই কেটেছে, আজ সমস্যা কিন্তু অন্যরকমের। কাজ করতেই হবে গরীব দেশের লোক, কাজ না করলে অনাহারে মরবে। স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, কিন্তু স্বাধীনতার পরে যে কিছুদিন আরাম করা এ জাতির লোকের ভাগ্যে ঘটল না। পথে নিস্ আর একটা শহর। সেখানকার উন্নতিও হয়েছে অনেকখানি। সেটা সার্বিয়ার দ্বিতীয় শহর। একবার সেখানকার লোকেরা বিদ্রোহ করায় তুর্কী সেনাপতি বিদ্রোহ দমন করে একটি স্তম্ভ স্থাপিত করেন। সেই স্তম্ভের গাত্রে ৯৫২টি স্বাধীনতাপ্রয়াসী সার্বিয়ান-এর নরকপাল খচিত আছে। যাহোক সার্বিয়া মুক্তি পেয়েছে তুর্কীর হাত থেকে ১৮৬৭ সালে। দক্ষিণাংশের উদ্ধার হয়েছে মাত্র ৩০ বছর কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না, ইতিহাস আলোচনা করবার অবসর লোকের নেই। আর মানুষের স্মরণশক্তিরও স্থিতিস্থাপকতা আছে। এখনকার সমস্যাটা কি—সমস্ত দেশের লোকই বা কি করে তার সমাধান করে চলেছে এইটা দেখতে বিদেশী ইংরেজ, ফরাসী বহু সংখ্যায় যুগোশ্লাভিয়ায় আসে। এলে পুরোনো ইতিহাসের কাসুন্দিও ঘাঁটতে হয়, হ্রদের শোভাও দেখতে হয়, পর্বতের উপত্যকায় গরমের দিনে বিশ্রাম উপভোগ করা ইউরোপের সাধারণ প্রজার একটা বাতিক। শুধু তারা নিজের দেশ নিয়েই সন্তুষ্ট নয় তাই দুর্দান্ত শীতের সময়েও অল্পসংখ্যক হোটেলে জায়গা সহজে মেলে না।

(ক্রমশঃ)

ছোট গল্প

চার ইয়ার ঃ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী ঃ শুভানী, ৫৫ সিকদার বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা—৪ ঃঃ মূল্য দেড় টাকা।

একটু লক্ষ্য করলেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হবে যে, আধুনিক বাংলা গল্প-উপন্যাসের ধারা দুটি বিভিন্ন খাতে প্রবাহিত—একটি আবেগাশ্রয়ী অন্যটি মননশীল। সাহিত্যে স্বতঃস্ফূর্তি আনার জন্য একদল হৃদয়বৃত্তি বা আবেগের পথ বেছে নিয়েছেন, অপরপক্ষে যুক্তি আর বিচারবোধের দাঁড়ে ভর দিয়ে সাবধানে এগিয়ে চলার পক্ষপাতী মননশীল সাহিত্যিকের দল। আবেগপ্রধান রচনায় মূলত যে পরিমাণে সংবেদনশীলতা সঞ্চারিত, মননশীল রচনায় সেই পরিমাণে পাওয়া যায় যুক্তি আর সংযম। অবশ্য প্রকৃত সৎসাহিত্য সৃষ্ট হয় এই দুই ভাবধারার বুদ্ধিগ্রাহ্য সমন্বয়ে।

জ্যোতিরিন্দ্রবাবু বাংলা সাহিত্য-জগতে সুপরিচিত। রচনার সংখ্যায় যাঁদের জনপ্রিয়তার পরিমাপ, ইনি সে দলের নন। সংখ্যায় অল্প অথচ মানবিক আবেদনে গভীর, পড়ার পরেও বহুক্ষণ পাঠকের মনে ঘোরাফেরা করে চরিত্র, অনুভূতিতে দাগ কাটে এমন গল্পের স্রষ্টা হিসাবে রসিক পাঠকসমাজে জ্যোতিরিন্দ্রবাবু সুপ্রতিষ্ঠিত।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থটিতে আবেগ ও মননের সার্থক সমন্বয়ের প্রকৃত স্বাদ পাওয়া যায়। আনন্দের কথা, প্রতিটি গল্প হৃদয়াবেগে স্বচ্ছ অথচ আবেগপ্রবণতার আতিশয্য থেকে মুক্ত। আবার গল্পগুলি মননশীলতার শুষ্ক কাঠামো-সর্বস্বই নয়, বরং সংস্কারমুক্ত চিন্তাশীলতার প্রতীক। সংযম সাহিত্যের প্রাণবস্তু। অতিকথন ও স্বল্পভাষণ দুই-ই সাহিত্য-রসাস্বাদনের অন্তরায়। ঠিক এতটুকু বলা উচিত বলা তার নিরিখ দেওয়া সম্ভব নয়। এটা অনুভূতির এলাকার নিজস্ব। জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর প্রতিটি গল্পে এই ভারসাম্য পরিলক্ষিত হয়। অনাড়ম্বর ভাষা ও প্রসাদগুণে লেখকের সহজাত। কষ্টকল্পনা অথবা অযথা প্রয়াসের সামান্য লক্ষণও দেখা যায় না। আরো একটি বিশেষ গুণ জ্যোতিরিন্দ্রবাবুর রচনার অঙ্গীভূত—যথাযথ চরিত্রচিত্রণ। অতিরিক্ত রঙের প্রলেপ নয়, বর্ণাঢ্য পটভূমিও নয়, দু-একটি আঁচড়ে প্রত্যেকটি চরিত্র নিখুঁত সজীব। অনেকটা যেন এচিংয়ের সমগোত্রীয়।

"চার ইয়ার" গল্পগ্রন্থে লেখকের ছ'টি গল্প সন্নিবেশিত হয়েছে। গল্পগুলি সম্ভবত ইতস্তত প্রকাশিত হয়েছিল, হয়তো নজরে পড়ে থাকবে। কিন্তু এমন নিটোল গল্প একাধিকবার পড়লেও কোন অসুবিধা নেই। প্রতিবারই নূতনতর রসাস্বাদে মন ভরে ওঠে। প্রত্যেকটি গল্পই অপরূপ, তবু 'চার ইয়ার' আর 'স্ট্যাম্প' এ দুটি শুধু এ সঙ্কলনেরই নয়, বোধ হয় জ্যোতিরিন্দ্রবাবুরও শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির পর্যায়ভুক্ত।

ছাপা সুন্দর প্রচ্ছদচিত্রণ কদর্য।

৩৩৫।৫৪

শিলানগরের রাণী। দেবকুমার ঘোষ। প্রকাশক ঃ সাহিত্য তীর্থ। দাম ঃ দু' টাকা। পৃষ্ঠা ঃ ১৩৫।

মোট সাতটি গল্পের সংকলন। 'এস্রাজ', 'জয়ন্তী সেন', 'ভগীরথ সরকারের গল্প', 'রাণী চৌধুরী', 'উত্তর সাধক" 'তামসীতীর' ও 'শিলানগরের রাণী'। শেষ গল্পটির নামানুসারে সংকলনটির নামকরণ করা হয়েছে। গল্পগুলিতে ক্ষয়িত মধ্যবিত্ত, যুদ্ধ, প্রেম, দেশ ভাগ সবই আছে। কিন্তু যে দরদ, যে শিল্পবোধের স্পর্শে ছোট ছোট জীবনের ঘটনা মর্মগ্রাহী আর্টের পর্যায়ে পৌঁছায়, লেখকের রচনায় তার অভাব আছে। গল্পগুলি নিছক সংবাদধর্মী, ফলে ঠিক শিল্পসম্মত হয়ে ওঠেনি। তবু এর মধ্যে 'জয়ন্তী সেন' গল্পটি মন্দ লাগল না। শেষ গল্পটির বক্তব্য ভালো। লেখকের নারীচরিত্র বিশ্লেষণের একটা প্রবণতা আছে। সেখানে তিনি অনেকটা সার্থক। বাঙলা সাহিত্যে ছোট গল্প অনুক্রম হয়েও যে পরিমাণে উৎকর্ষ লাভ করেছে, তা বিস্ময়কর। লেখক সেই বিরাট উৎকর্ষের দিকে সশ্রদ্ধ দৃষ্টি রেখে অনুশীলন করলে উপকৃত হবেন। তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতায় পরিমিতিবোধ আর শিল্পের দরদী উত্তাপ যুক্ত হলে তিনি উৎকৃষ্ট গল্প লিখতে পারবেন।

৫২১।৫৪

ময়ূর-মেখলা ঃ রবীন চট্টোপাধ্যায়। প্রিণ্ট হল, কলিকাতা—২০। মূল্য দু' টাকা।

সাহিত্যের গোড়ার কথা সংযম। এ সংযম শুধু সাহিত্য-সৃষ্টির নয়, স্রষ্টারও। ছাপার অক্ষরে নিজের লেখার রূপান্তর দেখতে চাওয়ার মোহ খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সামর্থ্য আর সুযোগ থাকলেই নিজেদের রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশ করতে যাঁরা সচেষ্ট হন, তাঁরা পাঠকসাধারণের ক্ষতি ততটা করেন না, যতটা করেন নিজেদের। একটা কথা তাঁদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, বাংলা সাহিত্য আজ বিশ্বের গর্বের বস্তু। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যে, চরিত্রচিত্রণের চমৎকারিত্বে, ভাষার সৌকর্যে, বহু লেখকের সম্মিলিত সাধনায় সাম্প্রতিক কথাসাহিত্য আজ যে স্তরে উন্নীত, তার কাছাকাছি অন্তত পৌঁছাতে না পারলে পরবর্তী রচনার কোন মূল্যবোধই সম্ভব নয়। সব রচনাই বাংলা সাহিত্যের এই উন্নত মানের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচিত হবে, লিপিকুশলতা যাচাই করা হবে এই কষ্টিপাথরে।

আলোচ্য গল্পগ্রন্থের রচয়িতাকে শুধু এইটুকুই বলব যে, ছাপার অক্ষরে নিজের লেখা দেখার সময় তাঁর এখনও আসে নি। যে পরিমিতিবোধ, সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গী রচনাকে রসোত্তীর্ণ করে, তার যথেষ্ট অভাব।

সাহিত্যের পথ সাধনার পথ। আত্মসমাহিত হোন, অনুশীলন করুন সাম্প্রতিক কথাসাহিত্যের গতি-প্রকৃতি, যথাকালে সিদ্ধিলাভ অনিবার্য।

৪৩৭।৫৪

অনুবাদ সাহিত্য

ফসল (১ম খন্ড)—গালিনা নিকোলায়েভার; অনুবাদ—রণজিৎ রায়। প্রকাশক—বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

বাংলা ভাষায় ইদানীং অনুবাদ সাহিত্য একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে নিয়েছে। এরজন্য অনেক ক্ষেত্রে একদিকে বিশ্বসাহিত্যের উৎকৃষ্ট বইগুলির সুষ্ঠু ও সুললিত অনুবাদের দ্বারা যেমন আমরা নিজেদের
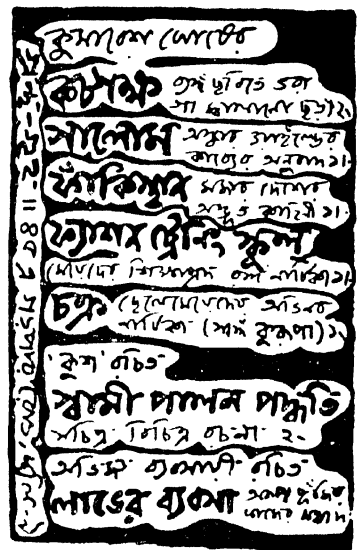
জ্ঞান পিপাসা চরিতার্থ করতে পারছি, অপরপক্ষে লেখকপদপ্রার্থী দুর্বল ও আনাড়ি অনুবাদকের দৌলতে বহু ভালো পুস্তকের রসাস্বাদন থেকেও বঞ্চিত হচ্ছি। আলোচ্য পুস্তকটিকে শেষোক্ত শ্রেণীতে ফেলা যায়। রাশিয়ান ভাষায় রচিত মূল উপন্যাসখানি দেশে বিদেশে আদৃত হলেও বাংলা অনুবাদটির মাধ্যমে তার মর্যাদা মোটেই রক্ষিত হয়নি। অনুবাদকের সাহিত্যসিদ্ধি বলে কোন বস্তু না থাকায় রচনা আক্ষরিক আভিধানিক ঘেঁষা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভাব ও পরিবেশ সৃষ্টির উপযুক্ত সুন্দর শব্দচয়নের প্রয়াস নেই, এমনকি কোন কোন জায়গায় কাঠ খোট্টা বাংলা। বিন্যাসের দিক থেকে শব্দসমষ্টির মধ্যেও নেই সামঞ্জস্য; দুজনের মধ্যে আলোচনার সংলাপ একই প্যারাগ্রাফে (উদাহরণ স্বরূপ ৯৮ পৃষ্ঠার ১ম ও ২য় লাইন) রাখা হয়েছে। অনুবাদকের অক্ষমতা প্রকট দেখা দেয় যতি ও ছেদ চিহ্নের যথাযথ ব্যবহার ও বানানের ব্যাপারে। তারপর বিষয়-বস্তুর কথা তো আছেই। পড়া শেষ করে ভাসিলী ও আনদ্রীভ্না ছাড়া অন্য পার্শ্ব-চরিত্রগুলির আকৃতি ও প্রকৃতি মন থেকে একেবারে অস্পষ্ট হয়ে যায়। আর কত বলব। এক কথায় কাঁচা হাতের একটি অসার্থক অনুবাদ। ছাপা মোটামুটি রকমের তবে লাইনগুলি অনেক ক্ষেত্রে সোজা হয় নি, কয়েকটি জায়গায় টাইপও ভেঙে গেছে। আশু বন্দ্যোপাধ্যায়ের আঁকা প্রচ্ছদপটটি প্রশংসার যোগ্য। ৪৮৩।৫৪

থ্রী মাসকেটিয়ার্স—আলেকজান্দ্রে দ্যুমা। অনুবাদক—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায়। দেব সাহিত্য কুটীর, ২২।৫বি, ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য দেড় টাকা।

ফ্রান্সের জনপ্রিয় লেখক আলেকজান্দ্রে দ্যুমা, জন্ম ১৮০২ খৃষ্টাব্দে। মাত্র চার বৎসর বয়সের সময় দ্যুমা পিতৃহারা হন। লেখাপড়ার দিকে আদৌ তাঁর ঝোঁক ছিলনা বটে, কিন্তু হাতের লেখা ছিল অতি চমৎকার।

বার বৎসর বয়সে হাতের লেখার জন্য তিনি চাকরি পান প্যারিসে, এই সময় তিনি আরম্ভ করেন নাটক রচনা। নাটক লিখে তিনি খ্যাতি ও অর্থ পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু এক সময় নাটকের চাহিদা কমে যাওয়ায় তিনি শুরু করেন ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনা। এবং ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তিনি ছিলেন সিদ্ধহস্ত।

১৬২৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের রাজা যখন ত্রয়োদশ লুই, মন্ত্রী কার্ডিনাল রিচল্যু, এদের দেহরক্ষীদের নাম থ্রী মাসকেটিয়ার্স। খুব বেপরোয়া ও সাহসী না হলে এই দলে স্থান পাওয়া দুরূহ। বালক দারতাঁইয়া কেমন করে তার শৌর্য-বীর্য ও সাহসের পরিচয় বহন করে শেষ পর্যন্ত এই দলের অধিনায়ক হতে পেরেছিলেন তারই কাহিনী। ছোটদের উপযোগী হিসাবে আলোচ্য বইটি সুন্দরভাবে অনুবাদ করা হয়েছে। ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট মনোরম। ৪৮০।৫৪

উপন্যাস

সঞ্চারিণী। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশক : ডি এম লাইব্রেরী। দাম : তিন টাকা। পৃষ্ঠা : ১৫৯।

উপন্যাসটিতে প্রায়-বিচ্ছিন্ন দুটি কাহিনীর মধ্যে যোগ রচনার প্রচেষ্টা। প্রথম পর্বের আয়নায় দীনেশ-গার্গীর মানসম্বন্ধ বিম্বিত হয়েছে।

দীনেশ লোহার ব্যবসায়ী। ইস্পাতের মত নির্মম রক্ষণশীলতা আর অখণ্ড আত্ম-বিশ্বাসের দুর্গে সে নিরাপদ শান্তিতে ছিল। বিচিত্র যোগাযোগে তার জীবনে গ্রথিত হলো গার্গী। গার্গী কাশীর এক কলাবিলাসিক দার্শনিকের কন্যা। বাবার স্নেহচ্ছায়ায় অপরূপ এক কবিত্বের পরিমণ্ডলে সে একটি একটি করে জীবনের দল মেলেছে। গার্গী কবিত্ব। লোহা আর কবিতা। দীনেশ আর গার্গী। দুটি বিরোধী সত্তায় সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠল। এই সংঘাতই নানারূপ ধরে এসেছে এ পর্বে। দীনেশের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় আখ্যানের সূচনা। এখানে নায়ক-নায়িকা শুভো আর সুলতা। শুভো দীনেশ গার্গীর ছেলে, আর সুলতা দীনেশের বন্ধু মন্মথর মেয়ে। শুভো-সুলতার প্রেম অকস্মাৎ কিন্তু তাদের বিয়েকে কেন্দ্র করে জটিল ভেদের দ্বন্দ্বে সমস্যা দেখা দিল। সুলতা শুভোর হৃদয়ের সৌন্দর্যকে ভালোও তার দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে ধরা দিল না। সে গেল মেহনতী মানুষের সংগ্রামে যোগ দিতে। একটা পারম্পর্যহীন ভাবালুতার মধ্যে বিশাল জিজ্ঞাসা রেখে উপন্যাসের যবনিকা নেমে এলো। দুটি কাহিনীর মধ্যে যোজক হয়ে রইল গার্গীর জীবনব্যাপী গ্লানি, ধিক্কার, ঘৃণা আর আত্মবিশ্লেষণ। লেখকের ভাষা সমুদ্রস্রোতের মত দুর্বার; প্রয়োগের দিক থেকে তিনি উচ্ছ্বাসের উপমা আর অজস্র অলঙ্কারের পক্ষপাতী। তাঁর রচনা বর্ণাঢ্য, চিত্রময়। ফলে কিছুটা ভাষণবিলাস তাঁর আছে, যা এই ছোট উপন্যাসের স্থানে স্থানে বাহুল্য বলেই মনে হলো। লেখকের মন মূলত বহির্মুখী। ফলে পরিবেশের রূপ তিনি যতটা গীতিধর্মী তুলিতে এঁকেছেন, মনের গভীরতার সংবাদ ততটা দেননি। অথচ গার্গীর বিক্ষত হৃদয়ের, সুলতার আহত নির্লিপ্তির অতলতা থেকে আরো অজস্র চুনী-পান্না তুলে আনা যেত। চরিত্রগুলির অন্তর্দ্বন্দ্ব ছোট ছোট ঘটনার মাধ্যমে মর্মগ্রাহী আবেদন নিয়ে এসেছে। কিন্তু যেখানেই মানসবিশ্লেষণ করেছেন লেখক, সেখানেই মনে হয় কিছুটা কৃত্রিমতার আভাস পাওয়া গিয়েছে। কয়েকটি পার্শ্বচরিত্র লেখক বিচিত্র কৌতুক আর অপূর্ব সহানুভূতির রঙে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। চন্দ্রশেখর, গায়ত্রী, অন্নপূর্ণা, মন্মথ, সুরমা—এই চরিত্রগুলো মনোজ্ঞ। মণিকর্ণিকার দীপ্তির মত সংলাপ মাঝে মাঝে অপরূপ। সমস্ত যোগ বিয়োগের পরেও উপন্যাসটি সুখপাঠ্য। শুধু পড়া শেষ হয়ে গেলেও শুভো-সুলতার জীবনজিজ্ঞাসার কোন স্পষ্ট বা অনুমেয় সমাধান না থাকায় একটা পরিতাপ নেমে আসে। ৫৩৩।৫৬

নব-দিগন্ত—অনুরূপা। ডাক প্রকাশনী, ৮৬এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা ১৪। মূল্য—পাঁচ সিকা।

বাঙলাদেশের সাম্প্রতিক পরিপ্রেক্ষিতে লিখিত উপন্যাস। লেখকের ভাষা সাহিত্য রচনার উপযোগী কঠিন নয়। তার উপর আবার একটি নিবিড় লক্ষ্য রেখে চলেছেন লেখক—সেটি হচ্ছে সহানুভূতিতে ভরা লেখকের মন। তাঁর এই দরদী মনের প্রতিবিম্ব দেখে মন খুশী হয়।

কিন্তু বইটি পড়ে আমাদের মনে হয়েছে—এত নিকটের ঘটনা নিয়ে উপন্যাস রচনা করা ঠিক কি না। দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষ এবং উদ্বাস্তুদের জীবনের যা পরিণতি আমরা এমন প্রত্যক্ষভাবে দেখেছি এবং দেখছি যে ঠিক এমন চিত্র শুধু মুন্সীয়ানার সঙ্গে অঙ্কিত করা যায় না যেন, আসল চিত্র পাশে দাঁড় করালেই এটিও নিষ্প্রভ হয়ে আসে। এমন সত্ত্বেও লেখক কিছুটা সাফল্য লাভ করেছেন।

এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছেন শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। ৫৬৪।৫৬

কন্যারত্ন : শ্রীনরেশচন্দ্র চক্রবর্তী : প্রকাশক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ সান্যাল, ১।২এ, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২ : মূল্য চার টাকা।

যে সমস্ত দূষিত প্রথা ব্যাধির মত বাঙালী সমাজঅঙ্গকে পঙ্গু ও দুর্বল করিয়া তুলিয়াছে, পণপ্রথা তাহাদের অন্যতম শুধু নয়, প্রধানতমও। সত্য কথা, সামাজিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বহু নিন্দিত ও দূষণীয় প্রথার বিলুপ্তি সাধিত হইয়াছে, তথাপি কন্যাদায় সমস্যা আজও মধ্যবিত্ত বাঙালী সামাজিক জীবনের কলঙ্কস্বরূপ।

এই পণপ্রথার বিষময় ফলের নগ্ন চিত্র প্রকাশ করাই আলোচ্য উপন্যাসটির প্রধান লক্ষ্য। গ্রন্থকার এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কাহিনী বিবৃত করার চেষ্টা করেছেন।

ভাগ্যের কাছে নির্বিচারে নিজেকে বলি দেওয়া নয়, উদ্যতফণা সাপিনীর মত পঙ্কিল সমাজ-ব্যবস্থার প্রতি ছোবল দেওয়ার প্রয়াস। চিত্রাঙ্গদার মতন 'নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার' অধিকার অর্জনের বিবরণী।

রচনার প্রসাদগুণ আছে, স্থানে স্থানে চরিত্রচিত্রণ-নৈপুণ্য প্রশংসার্হ। কিন্তু মাঝে মাঝে রসাভাসও পরিলক্ষিত হয়। উপন্যাসের মূল সূত্রটি নানা কাহিনীর ভারে জর্জরিত। উপযুক্ত গ্রন্থনের অভাবে বহু সামঞ্জস্যহীন কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছে। উপন্যাসের পরিণতি অতি দ্রুত সংঘটিত হওয়ায় কিছু পরিমাণে অস্বাভাবিকতা দোষদুষ্ট। সাবিত্রীর অভিনেত্রীজীবন গ্রহণ এবং প্রভূত অর্থোপার্জনের কাহিনী বাস্তবানুগ তো নহেই, উপরন্তু অতিমাত্রায় কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে।

ছাপা ও প্রচ্ছদচিত্রণ প্রথম শ্রেণীর।

৩২৮।৫৪

শিশু সাহিত্য

জরির নাগরা—উমা দেবী। প্রকাশক—মদনকান্ত চৌধুরী। ৩৬।১ রসা রোড সাউথ ফার্স্ট লেন, কলিকাতা—৩৩। মূল্য—দেড় টাকা।

স্বর্গের দুজন দেবতা, তারা পরীক্ষা করতে লাগল মর্তের মানুষের ইচ্ছা শক্তি দিয়ে। তাদের শুভেচ্ছাটি পড়ল নিতান্ত কোন এক হাকিম-সাহেবের জরির জুতোর উপর।

সেই জুতো পায়ে হাকিম-সাহেব দেখেন ঐতিহাসিক রাজত্ব, এক চোর সেই জুতো পায়ে হয় বড়লোক, এক পাহাড়ীওয়ালার পুত্র বাপ সেই জুতো পায়ে ছুটতে লাগে ছেলেদের সঙ্গে, আবার এক হতভাগা সেই জুতো পায়ে পায় তার তিন পুত্রের সন্ধান।

তারপর সেই জুতো আসে বাংলার কোন কবির কাছে, কবির মা অকালে মারা যাওয়ায় কবি সেই জুতো পায়ে হাজির হয় যমরাজের দুয়ারে। সেখান থেকে তার মাকে অকাল-মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে আনে। আবার এ বরও আনে যে, বাংলার কবিরা যেন জগতে চিরদিন অমর হয়ে থাকে।

গল্পের ভূমিকা সুন্দর। একটি মারাত্মক ভুল আছে যা পাঠক-পাঠিকার খুব সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করবে—একুশ পৃষ্ঠায় কুড়ি টাকার আঠারটি থাক কি করে একশো আশী টাকা হয়!

ছোটদের উপযোগী রচনা। প্রচ্ছদপট, ছাপা ও ভাষা সুন্দর।

৩১৪।৫৪

নাটক

নতুন ফৌজ—বরেন বসু। প্রকাশক—সাধারণ পাবলিশার্স ৭, ওয়েস্ট রো, কলিকাতা—১৭। দাম—দেড় টাকা।

'নতুন ফৌজ' এই লেখকেরই 'রঙরুট' উপন্যাসের নাট্যরূপ। ঔপন্যাসিক ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও, রচনাশৈলী যথোচিত মার্জিত না হলেও একথা অনস্বীকার্য যে সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশ আমলের ভারতীয় সেনাবাহিনীর আভ্যন্তরীণ মর্মান্তিক চিত্র প্রথম উপস্থাপিত হয় 'রঙরুট' উপন্যাসে। সেই হিসেবে বাংলা সাহিত্যে বইটি অভিনব। এবং বাংলায় যখন,—সারা ভারতীয় সাহিত্যেও।

এই একই উক্তি আলোচ্য নাটকটি সম্পর্কেও প্রযোজ্য। 'রঙরুটের' বিরাট পটভূমিকে ছোট একটি নাটকের পরিসরে সীমাবদ্ধ করা স্বভাবতই দুরূহ। আশার কথা, নাটকীয় সূক্ষ্ম কারুকার্যগত কৃতিত্ব, তেমন কিছু না দেখাতে পারলেও এই দুরূহ দায়িত্বে লেখক মোটামুটিভাবে সফল হয়েছেন।

৫২৩।৫৪

ধর্মতত্ত্ব

প্রতিমায় প্রাণ প্রতিষ্ঠা—শ্রীমৎ নরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী প্রণীত। শ্রীঅখিলচন্দ্র সাহা কর্তৃক দেবসংঘ বোমপাশ টাউন, বৈদ্যনাথ, বিহার হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা।

মূর্তি পূজা জড়োপাসনা নহে। দুর্গা, কালী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, রামকৃষ্ণ এই সব সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করা যায়। পুস্তকখানির ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। গ্রন্থকার সাধক পুরুষ। পুস্তকখানির সমগ্র আলোচনায় তাঁহার প্রত্যক্ষানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। মনকে কিভাবে বিষয় হইতে মুক্ত করা সম্ভব এবং নির্বিষয় সেই মনে মূর্তির চিন্ময় ধর্ম কিরূপে পরিস্ফুট হইয়া উঠে, তিনি অনাবিল ভাবের অতি গূঢ় এই সব রহস্যের উপর আলোকসম্পাত করিয়াছেন। অধিকারী ভেদে বিভিন্ন ধারায় মনকে অনুশীলিত করিবার রীতি বা কৌশল পুস্তকখানিতে উপলব্ধি হইয়াছে। আচমন, আসন শুদ্ধি, প্রাণায়াম, ধ্যান, ধারণা, ষটচক্র ভেদ এ সব প্রক্রিয়ার কথাও পুস্তকখানিতে আছে। আমাদের মতে এই সব প্রকরণ অপেক্ষাকৃত পরোক্ষ এবং এইগুলির মধ্যে নানারূপ জটিলতা রহিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কৃপা এবং ভক্তিভাবে উজ্জীবিত আত্মবোধে মনকে নিষিক্ত না করিতে পারিলে ঐ সব প্রকরণ মনকে বিষয় হইতে মুক্ত করিতে পারে না, শুদ্ধ মন লাভ হয় না। ভাগবতী তনু কথাটা আজকাল অনেকটা সস্তা হইয়া পড়িয়াছে সে তো অনেক উপরের ব্যাপার। চিন্ময় আনন্দ রসে মন ডুবিয়া গেলে এবং বিভিন্ন ইন্দ্রিয়বৃত্তি সে রসে পরিস্ফূর্ত হইলে আত্মনিবেদনে সার্থক হয়; তবে সে অপ্রাকৃত জীবন। প্রভাত অনাহত ধ্বনি যৌগিক বিভূতি নয়, মনের মূলে কৃপারই স্ফূর্তি। সে গান শ্রুতিতে জাগিলে দিব্য জীবনের বিকাশ আপনা হইতেই হইয়া যায়। কৃপাকে ছাড়িয়া "পৃথক আয়াসে যোগ দুঃখময়, বিষভোগ।" আচার-বিচার অহঙ্কারেরই বিকার মাত্র। ফলতঃ ব্রহ্মচারীজীর উপদেশ বিভিন্ন ধারার ভিতর দিয়া এই সত্যকেই উন্মুক্ত করিয়াছে। স্মরণ, মননের পথে ভগবৎ কৃপার সর্বতোভাবে উপলব্ধিতেই দেহাত্ম-বোধ বিদূরিত হয় এবং সমগ্র বিশ্বে চিন্ময় আনন্দ-লীলা বিকশিত হইয়া উঠে। আমাদের সর্বার্থ সিদ্ধ হয় তখন। এই কথাই তাঁহার প্রজ্ঞানময় উপদেশে পরিস্ফুট। পুস্তকখানি পাঠে ভক্ত রসিকসমাজ উপকৃত হইবেন এবং আনন্দ লাভ করিবেন।

৫৫০।৫৪

আমি ও আমার মুক্তি—স্বামী শঙ্করানন্দ প্রণীত। শ্রীসুজনকৃষ্ণ দে, এম এ কর্তৃক ৮০।৮এ গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা।

আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে উপদেশ। লেখক মনকে বিশুদ্ধ করিবার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। শরণাগতির পথে অহংকার হইতে মুক্ত হওয়াই জীবনের লক্ষ্য। সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডি কাটাইয়া না উঠিলে সত্যের প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ হয় না ইহাই বক্তব্য। পুস্তকখানি পাঠে অধ্যাত্মরস-পিপাসুগণ উপকৃত হইবেন।

৫১২।৫৪

প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ—শ্রীরামকৃষ্ণ গোস্বামী, ভাগবতশাস্ত্রী প্রণীত। শ্রীজীবেন্দ্রকৃষ্ণ গোস্বামী, ভগবান মহাপ্রভুবাড়ী, নিমতিতা, মুর্শিদাবাদ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২ টাকা।

আলোচ্য গ্রন্থের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ সরকার লিখিয়াছিলেন, "ভগবানের

বিস্ময় মহাপ্রভুর আলেখ্য রচনায় অভিজ্ঞ লেখকের ভাষা পারিপাট্য, ভাবসৌন্দর্য এবং অধ্যাত্ম দৃষ্টিভঙ্গী আমাকে সত্যই মুগ্ধ করেছে'—পুস্তকখানি পড়িয়া আমরাও মুগ্ধ হইয়াছি। গ্রন্থকার তাঁহার প্রাণের সব দরদ ঢালিয়া দিয়া মহাপ্রভুর লীলাকথা কীর্তন করিয়াছেন। মধুর গৌরাঙ্গ-লীলা ভক্তের পরম শ্রদ্ধায় স্পর্শে বড়ই মধুর হইয়া ফুটিয়াছে। প্রেমিক ভক্তগণ ইহা আস্বাদে প্রীতি লাভ করিবেন। ৫৮৩।৫৪

শ্রীশ্রীটোটা গোপীনাথ কথামৃত—শ্রীরঙ্গনাথ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত। সম্পাদক কর্তৃক গোস্বামী মঠ, পুরী হইতে প্রকাশিত।

শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় তাঁহার অন্তরঙ্গস্বরূপে পুরীধামে ছিলেন। গোপীনাথ তাঁহারই সেবিত বিগ্রহ। টোটা অর্থ উদ্যান, উদ্যানে বিরাজিত বলিয়া গোপীনাথ, টোটা গোপীনাথ বলিয়া পরিচিত। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে ইহার মহাত্ম্য কীর্তিত হইয়াছে। গোপীনাথকে কেন্দ্র করিয়া গদাধর প্রভুর সঙ্গে মহাপ্রভুর প্রেমের লীলা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, চৈতন্য ভাগবত প্রভৃতি বৈষ্ণব শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। মহাপ্রভু এই গোপীনাথের অঙ্গেই বিলীন হইয়া যান বৈষ্ণব শাস্ত্রকারদের মধ্যে এই মতও প্রচলিত দেখা যায়। গ্রন্থকার ভক্ত এবং বৈষ্ণব শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি। গোপীনাথের মাহাত্ম্য কীর্তনপ্রসঙ্গে রাধাভাবে বিভাবিত মহাপ্রভুর প্রেমোন্মাদ লীলা তিনি মধুর ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বইখানি প্রাণের সমগ্র আবেগ দিয়া লেখা। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনায় অনেক নিগূঢ় রহস্য সেই আবেগে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে মহাপ্রভুর গম্ভীরা লীলার রসমাধুর্য এবং তাৎপর্য আস্বাদনে রসিক সমাজ আনন্দলাভ করিবেন।

প্রাচীন সাহিত্য

প্রত্যক্ষদর্শীর কাব্যে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য—শ্রীসতী ঘোষ, এম এ, ডি ফিল। প্রকাশক—জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম—৫, টাকা।

সমগ্র বাংলাসাহিত্যে সর্বজনপঠিত এবং বহু আলোচিত অংশ হচ্ছে বৈষ্ণব কাব্য। বিদ্যাপতি এবং বড়ু চণ্ডীদাস পূর্বেই এ সাহিত্য ধারায় কবিতা রচনা করে যশস্বী হলেও, প্রকৃতপক্ষে বৈষ্ণব কাব্যের প্লাবন আসে মহাপ্রভুর পরবর্তী যুগে। একদিকে যেমন বিদ্যাপতি, বড়ু চণ্ডীদাস, অন্যদিকে চৈতন্য-পরবর্তী বহুসংখ্যক কবির কাব্য আলোচনায় বাংলার অনেক বিদ্বান ও পণ্ডিতজন তাঁদের গবেষণার মূল্যবান সিদ্ধান্ত প্রচার করে আমাদের উপকৃত করেছেন। কিন্তু তার অধিকাংশই কাব্যরসসংক্রান্ত। যদিও সেটাই সাহিত্য বিচারের সবচেয়ে বড় কথা তথাপি ঐতিহাসিক ধারাপ্রবাহকে পরম্পরায় অনুধাবন করার পক্ষে যে আরও একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের নজর দেওয়ার প্রয়োজন ছিলো, তা হলো মহাপ্রভুর সমসাময়িক কবিদের রচনার আলোচনা। ইতিপূর্বে আধুনিক দু'একজন ঐতিহাসিক সেদিকে দৃষ্টি দিলেও সে সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনায় মনোনিবেশ করতে পারেননি। কিন্তু শুধু ইঙ্গিতেই পূর্ণতার সন্ধান পাওয়া যায় না। তাই সতী ঘোষের আলোচ্য গ্রন্থটির প্রয়োজন ছিলো। তিনি চৈতন্য-সমসাময়িক নয়জন কবির কাব্য নিয়ে ঐতিহাসিক আলোচনা করেছেন। কাব্যবিচারে হয়তো বলা চল্তে পারে যে, চৈতন্য-পরবর্তী প্রায় প্রত্যেক কবিই এই নয়জন কবি অপেক্ষা অনেক সার্থক কবিতা রচনা করেছেন, কিন্তু সে মূল্যমান দিয়ে এ'দের বিচার করলে চলবে না। লেখিকাও তা করেননি। পরবর্তী যুগে বৈষ্ণবকাব্য যে হাজার গীতে ফেটে পড়বার সুযোগ পেয়েছিলো, বস্তুত তার জন্য দায়ী এই নয়জন কবিই, সুতরাং ঐখানেই তাঁদের কৃতিত্ব এবং লেখিকা সে সম্মানই তাঁদের দিয়েছেন।

ভূমিকায় লেখিকা বলছেন, উপাধি পরীক্ষার থিসিসের ওপর ভিত্তি করে এ গ্রন্থ রচিত। এই জন্যেই কি তথ্য ও তত্ত্বের প্রতি তাঁর যতটা নজর ছিলো, ভাষার প্রতি ততটা নজর দেওয়ার প্রয়োজন তিনি বোধ করেননি? প্রকৃত অর্থে এ গ্রন্থ সাহিত্যালোচনা না হতে পারে, কিন্তু গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্তকে আরো একটু সাহিত্যানুগ ভাষায় প্রকাশ করলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং সাধারণ পাঠক উভয় শ্রেণীর কাছেই এ গ্রন্থ সমান আদরের বস্তু হতে পারতো। এই গ্রন্থ মুখ্যত সাহিত্য-পাঠকদের জন্যেই তো! ৪৪৮।৫৪

বিবিধ

From My China Diary: Brajkishore Shastri, Siddhartha Publications Ltd., 35, Faizbazar, Delhi. Price Rupee one only.

এ পর্যন্ত আমরা নয়াচীনের উন্নতি ও সুব্যবস্থা সম্পর্কে যে সব তথ্য জানতে পেরেছি আলোচ্য পুস্তিকাটির লেখক তার সম্পূর্ণ বিপরীত অভিমত প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে নয়াচীনের জনগণের দুঃখ-দুর্দশার অন্ত নেই, সরকার ও জনগণের মধ্যে পার্থক্য অত্যন্ত প্রকট—সাধারণ নাগরিক যখন বস্ত্রাভাবে শীতের প্রকোপে কষ্ট পাচ্ছে তখন নাকি সরকারী কর্মচারীরা দিব্যি পশমের দামী পোশাক পরিহিত অবস্থায় ঘুরে বেড়ায়। লোকে নাকি পুলিসের পূর্ব অনুমতি ছাড়া টিকেট কিনে রেলে ভ্রমণ করতে পারে না, পুলিসের অনুমতি ছাড়া তারা নাকি পিকিংএর বিখ্যাত হোটেলে প্রবেশাধিকার পায় না, শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব প্রকাশের সুযোগ দেওয়া হয় না......এমনি আরও অনেক আনকোরা নয়া সংবাদ। ভারতের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সদস্যরা নয়াচীনের শাসন ও সমাজব্যবস্থার প্রত্যক্ষ পরিচয় অর্জন করে এসেছেন—তারা এ বিষয়ে কী বলেন? ৩৯৩।৫৪

Indian Ephemeris of Planets' Positions according to the Nirayana or Indian System for 1955 A. D. শ্রীনির্মলচন্দ্র লাহিড়ী এম এ প্রণীত। এস্ট্রো-রিসার্চ ব্যুরো, ৫৫-এ, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। মূল্য—২,।

এই বার্ষিক Ephemeris বা গ্রহপঞ্জী বিগত ১৭ বৎসর হইতে প্রকাশিত হইয়া বিশুদ্ধ গ্রহস্ফুট প্রভৃতি পরিবেশন করিতেছে। ইহাতে ফলিত জ্যোতিষীর নিত্য প্রয়োজনীয় গ্রহস্ফুট, গ্রহের পেক্ষা (aspects) প্রভৃতি ব্যতীত গণিত জ্যোতিষে আবশ্যক বহু বিষয় সন্নিবেশিত হওয়ায় গ্রন্থের উপযোগিতা বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। ইহাতে যে গ্রহস্ফুট ও তিথি নক্ষত্রের কাল দেওয়া আছে, তাহা দ্বারা দেশে পঞ্জিকা সংস্কারেরও সহায়তা হইবে। ৬৫৭।৫৪

কৃপা-বিন্দু—মাতাজী শ্রীশ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী সম্পাদিত। শ্রীহেমন্তকুমারী গুপ্তা কর্তৃক সত্যব্রত মঠ, গুপ্তিপাড়া, হুগলী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১, টাকা।

পুস্তকখানি মাতাজী শ্রীশ্রীচিন্ময়ী ব্রহ্মচারিণী কর্তৃক তাঁহার জনৈকা শিষ্যার নিকট লিখিত পত্রাবলীর সংগ্রহ। মাতাজীর উপদেশাবলী পাঠে ভগবৎপ্রেমিক মাত্রেই আনন্দলাভ করিবেন। ৪৯২।৫৪

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

মনে মনে—সুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।
এক নজর—শশাঙ্ক শেখর ভট্টাচার্য।
জীবন সাধনার পথে—স্বামী আত্মানন্দ।
কুসুমের স্মৃতি—অমরেন্দ্র ঘোষ।
কবির কথা—হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্বপ্ন মায়া—শ্রীকরুণাকান্ত চক্রবর্তী।
কয়েদী—সুধাংশু কিরণ ঘোষ।

দেয়াল পঞ্জী ও ডায়েরী

আমরা ইউনাইটেড স্টেট্স্ ইনফরমেশন ব্যুরো ও বৃটিশ ইনফরমেশন সার্ভিসের নিকট হইতে ১৯৫৫ সালের দুইখানি সুদৃশ্য দেয়াল পঞ্জী পাইয়াছি এবং বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক এম সি সরকার অ্যাণ্ড সন্স-এর মনোরম ডায়েরী পাইয়াছি।

চক্রদত্ত

যৌবন ধরে রাখবার চেষ্টা প্রায় প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই দেখা যায়। এর মধ্যে আবার মাঝারি বয়সের মেয়েদের চেষ্টাটা একটু বেশী হয়। যৌবন ধরে রাখবার জন্য বর্তমানে বিজ্ঞান অনেক কিছু তৈরী করেছে এবং সব সময়ই নতুন উপায় বার করবার চেষ্টা করছে। হরমোন থেকে তৈরী ওষুধ এই কারণে আজকাল খুব বেশীই ব্যবহার করা হয়। এই ওষুধ ব্যবহারের বেলাতেও মতের তফাৎ দেখা যায়। একদলের মত হচ্ছে হরমোন জাতীয় ওষুধ যৌবনকে ধরে রাখবার ব্যাপারে স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। কারণ তাদের মত হচ্ছে এই জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করার ফলে মেয়েদের শরীরে ক্যান্সার রোগ হতে পারে। তাঁরা বলেন যে, মেয়েরা এই ধরনের ওষুধ সব সময় ব্যবহার না করে যদি মাঝে মাঝে এবং অল্প পরিমাণে ব্যবহার করে তাহলে ভয়ের কোন কারণ নেই। এদিকে আর একদলের মত সম্পূর্ণ উল্টো। তাঁরা বলেন যে এই জাতীয় ওষুধ ব্যবহারের ফলে কোনপ্রকার ক্যান্সার হতে পারে না। তাদের যুক্তি হচ্ছে ১৯৩০ সালে যখন এই ধরনের ওষুধের এত বেশী চল ছিল না—তখনকার চেয়ে আজকের দিনে হরমোন জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করার ফলে ক্যান্সারে মৃত্যুর হার মোটেই বৃদ্ধি পায়নি—প্রায় একরকমই আছে। অথচ খুব কম হলেও প্রায় ৭ লক্ষ মেয়ে এখন এই ওষুধ ব্যবহার করছে। তাছাড়া তাদের আরও একটু যুক্তি হচ্ছে, যে সব মেয়েরা নিয়মিত ওষুধ খায় তাদের বছরের পর বছর নিয়মিত পরীক্ষা করে দেখা গেছে তাদের কোন রকম ক্যান্সার রোগ হয় না।

*

রোগীর শরীরে প্রয়োজনে বাইরে থেকে রক্ত প্রবেশ করিয়ে রোগীর জীবনদান করা বর্তমানে একটা সাধারণ ব্যাপার। প্রয়োজনের সময় রক্ত যাতে পাওয়া যায় তার জন্য বড় বড় হাসপাতালগুলোতে সুবন্দোবস্ত আছে। রক্তকে শরীরে ঢোকানোর সময় রক্তটি তরল অবস্থায় এবং একটি নির্ধারিত তাপে থাকা দরকার। কিন্তু প্রয়োজনের সময় এই রক্ত এমন সব স্থানে নিয়ে যেতে হয়, বিশেষ করে যুদ্ধ ক্ষেত্রে, যেখানে তাপ শূন্যে ডিগ্রীর অনেক নিচে। ফলে বোতলে করে রক্ত তরল অবস্থায় নিয়ে যাওয়া যায় না—ঠাণ্ডায় সেটা সম্পূর্ণরূপে জমে যায়। এই অসুবিধা কোরিয়া-যুদ্ধের একজন উড়ো-জাহাজচালক দূর করতে পেরেছেন। তিনি বোতলটাকে ঢেকে রাখবার জন্য এক বিশেষ ধরনের জামা তৈরী করেছেন। এই জামাটার ভেতরে তিনি এক রাসায়নিক তরল পদার্থ জলের সঙ্গে মিশিয়ে ঢুকিয়ে

তরল রক্তকে গরম রাখবার জন্যে ঢাকা হচ্ছে

দেন। এর পর বোতলের রক্তটা প্রয়োজনমত গরম এবং তরল অবস্থায় থাকে। তিনি এই উপায়ে রক্ত শূন্য ডিগ্রীর ৯০ ডিগ্রী নিচে তরল অবস্থায় নিয়ে যেতে পেরেছেন।

*

অনেক সময় আমরা বলে থাকি—আহা যদি আবার সেই পুরনো দিনগুলি ফিরে পেতাম, তাহলে কি ভালই না হোত। কথাটা খুবই সত্যি। অনেক সময় আমরা ছেলেবেলার পুরান কথা ভেবে আমাদের বর্তমান জীবনে কত আনন্দই না পাই। কিন্তু সত্যি কি আমাদের সেই পেছনে ফেলে আসা দিনগুলিতে ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়? বিজ্ঞানের যুগে সবই সম্ভব। এক নতুন ধরনের ওষুধ বের হয়েছে যেটা খেলে বয়স্ক লোকেরা তাদের শৈশবকালে পেঁৗছে যাবে। তখন তাদের শৈশবের সমস্ত ঘটনা এমনভাবে মনে পড়তে থাকবে যে যেন তাদের মনে হবে এই সমস্ত তাদের জীবনে এইমাত্র ঘট্‌ছে অথবা অল্প-ক্ষণ আগেই ঘটে গেছে। ওষুধটা একটা ছত্রক থেকে তৈরী করা হয়েছে। এই ছত্রক শস্যদানার ওপর জন্মায় এবং দানার ক্ষতি করে। ওষুধটা যথার্থ কাজে লাগবে মনস্তত্ত্ববিদ্‌দের। তাঁরা এই ওষুধ তাঁদের মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগীদের খাইয়ে তাদের অতীতকালের সব কথা মন থেকে বার করে নিতে পারবেন, ফলে তাদের চিকিৎসার খুব সুবিধা হবে। এই ওষুধটা পরীক্ষামূলকভাবে ব্রিটেনের একটি মানসিক চিকিৎসার হাসপাতালে রোগী-দের উপর ব্যবহার করে সুফল পাওয়া গেছে। ওষুধের কম বেশী মাত্রা ব্যবহার করা অনুযায়ী রোগীরা তাদের শৈশবের বিভিন্ন বয়সের কথা মনে করতে পারেন। দরকার হলে রোগীদের তাদের দু'বছর বয়সেও নিয়ে যাওয়া যায়।

*

খুব তাড়াতাড়ি মোটর করে যাওয়া হচ্ছে; এমন সময় হঠাৎ চাকার সব হাওয়া বের হয়ে গেল। তখন মনের অবস্থা যা হয় তা ভুক্তভোগীরাই জানেন। এরও একটা সুরাহা হয়েছে টিউববিহীন চাকা তৈরী করে। এই ধরনের চাকায় রাস্তার পেরেক অথবা কোন লোহার টুকরো ফুটে কোনই অসুবিধার সৃষ্টি করতে পারবে না। সাধারণ মোটরের চাকার ভেতরে টিউব এবং ওপরে টায়ার থাকে। এই নতুন ধরনের চাকা টায়ার এবং টিউবের বদলে একটি সম্পূর্ণ বায়ু প্রতিরোধক আবরণ দিয়ে তৈরী করা হয়। এটা সাধারণ চাকার টায়ারের চেয়ে অনেক বেশী পুরু এবং ভারি হয়। শুধু রবার দিয়ে চাকার আবরণটা তৈরী না করে তার সঙ্গে রেয়ন, নাইলন মিশিয়ে তৈরী করা হয়। ফলে চাকাটায় যদি কোন কিছু ফুটে যায় তাহলে সেটা এবং ফুটোটা এমনভাবে চেপে ধরে যে আর কোন রকমেই চাকা থেকে হাওয়া বের হতে পারে না। আর যদিও বা ফুটোটা কোন কারণে বড় হয় তাহলে ভেতরের হাওয়া খুব অল্প অল্প করে বের হতে থাকে।

—শৌভিক—

ভারতের নাট্য বিবর্তন

সংস্কৃতির দিক থেকে মাসাধিককাল-ব্যাপী একটা মস্ত অনুষ্ঠান গত রবিবার দিল্লীতে সুসম্পন্ন হলো। ভারতে এই প্রথম বিভিন্ন আঞ্চলিক ভাষার নাটকের এক উৎসব অনুষ্ঠান। উদ্যোক্তা ছিলেন দিল্লীর সঙ্গীত নাটক আকাদেমি। উদ্যোক্তাদের গাফিলতির জন্যেই হোক, অথবা তাদের অনুষ্ঠান পরিচালন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ বলেই হোক, এই নাট্যোৎসবের বার্তা বিভিন্ন অঞ্চলে মনে ছাপ রাখার মতো হয়ে প্রচারলাভ করেনি। কিন্তু ভারতের নাট্য বিবর্তনের ইতিহাসে এই নাট্যোৎসবটির একটি প্রধান অংক স্বীকার করতে হবে। এই সম্পর্কে আগামী সপ্তাহে একটি বিশেষ প্রবন্ধ 'দেশ' সম্পাদক প্রকাশ করবেন বলে জানা গেল। দিল্লীর এই নাট্যোৎসব প্রসঙ্গে আরও একটা কথা মনে পড়ে গেল। যতদূর মনে হয় কলকাতার পেশাদারী মঞ্চ প্রবর্তনেরও বয়েস বোধহয় একশো হয়েছে। এই উপলক্ষে বাঙলা পেশাদারী মঞ্চের এক শতবর্ষ জয়ন্তীর ব্যবস্থা করলে কেমন হয়? সদ্য জেগে ওঠা বাঙলার মঞ্চের প্রতি জনসাধারণের উৎসাহ ও আগ্রহ তো তার দ্বারা তীব্রতর হবে বলেই আশা করা যায়। সাড়া জাগাবার মতো এমন একটা অনুষ্ঠান হওয়াও দরকার।

মিনার্ভার দ্বারোদ্ঘাটন

বছরখানেক আগে এমন একটা গুমোট বাঙলার পেশাদারী মঞ্চকে ছেয়ে ফেলেছিল যে অতি আশাবাদী নাট্যামোদীরও মুখ

"হ্যামলেট"-এর হিন্দী সংস্করণ। কিশোর সাহু প্রযোজিত-পরিচালিত ছবিখানির একটি দৃশ্যে কমলজিৎ ও কিশোর সাহু

চূন হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার পেশাদার মঞ্চ কটিকে আর যে রক্ষা করা যাবে না সে বিষয়ে সন্দেহ প্রায় নিশ্চিত ধারণার কোঠাতেই পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু প্রায় ঐন্দ্রজালিক পরিবর্তন এনে দিলে স্টার থিয়েটার। প্রেক্ষাগৃহের সংস্কার সাধন করে নতুন করে দল গঠন করে স্টার থিয়েটার পরিবেশন করলে 'শ্যামলী'। তারপর থেকে 'শ্যামলী' বাঙলা মঞ্চের সমগ্র ইতিহাসেই একটা নতুন রেকর্ড স্থাপন করতে চলেছে। স্টার থিয়েটারের প্রেরণা রঙমহলকে সঞ্জীবিত করে তুললো। নতুন দল এগিয়ে এসে প্রেক্ষাগৃহটি চালাবার ভার নিলেন। প্রেক্ষাগৃহটি ভেঙেচুরে নতুনের মতো হয়ে উদ্ঘাটিত হলো নতুন নাটক নিয়ে। এপর্যন্ত 'দুরভাষিণী' ও 'উল্কা' এই দুখানি নাটক পরিবেশন করে স্টারের মতো অতোটা না হলেও, বেশ জমেই উঠেছে। থিয়েটারের যে চাহিদা অটুট রয়েছে রঙমহল সেটা আরও দৃঢ়ভাবেই প্রতিপন্ন করে দিলে। এদের সাফল্যের দৃষ্টান্ত আরও একদল নাট্যকেকে অনুপ্রাণিত করে তুললো। অব্যবহার্য গৃহ হিসেবে মিনার্ভা থিয়েটার পরিত্যক্ত হয়ে ছিল বহু মাস যাবৎ। মহেন্দ্র গুপ্ত একটা দল গড়ে থিয়েটারটি চালাবার ভার নিলেন।

* * *

নতুনভাবে উদ্বোধিত মিনার্ভা থিয়েটারকে স্টার বা রঙমহলের মতো এমন সুসংস্কৃত প্রেক্ষাগৃহ বলে উল্লেখ করা যায় না। এখানে কাঠকাঠরা মেরামত করে রঙচুনিয়ে ঝকঝকে চেহারা ফুটিয়ে তোলার চেয়ে বেশী কিছু হয়নি। পরিবর্তন সাধিত হয়েছে টিকিট ঘরে; ওটাই কেবল নতুন করে তৈরী, আর তাও তেমন আকর্ষণীয় চেহারার কিছু নয়। তবে সমগ্রভাবে প্রেক্ষাগৃহটি অন্ততঃ গিয়ে বসবার মত হয়েছে বলা যায়। যাই হোক, বাঙলা নাটকের অভ্যুত্থান আমলের অনেক স্মৃতিবিজড়িত মিনার্ভার পুনরায় দ্বারোদ্ঘাটনটাই নাট্যরসিকদের কাছে বড়ো কথা এবং তা সম্পাদনে এগিয়ে আসার জন্য মহেন্দ্র গুপ্তের প্রচেষ্টা ধন্যবাদার্হ। সেই সঙ্গে কিন্তু মহেন্দ্র গুপ্ত একটা অপ্রশংসনীয় কাজ করে ফেলেছেন 'জাহাঙ্গীর' নাটকখানি দিয়ে উদ্বোধন করিয়ে। মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা বহু পুরনো নাটক, এখন যা একেবারে অচল। মিনার্ভার পুনরুদ্ঘাটনে যে উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছিল তা উবে গেল এই নাটকখানি দেখে। প্রেক্ষাগৃহ ঝকঝকে ও পরিচ্ছন্ন হওয়াটা দর্শক আকর্ষণের একটি উপায়মাত্র হতে পারে, কিন্তু আসল কথা হচ্ছে নাটক দেখা। নতুনভাবে উদ্বোধনে নাট্যরসিকরা নতুন নাটকও দেখার আশা পোষণ করেছিলেন, কিন্তু সেদিক থেকে একেবারেই দমে যেতে হয়েছে। স্টার থিয়েটার বা রঙমহল নতুন চেহারায় যদি নতুন নাটক পরিবেশন না করতো তাহলে ওখানেও দর্শক সমাগমের আশা ছিল না।

* * *

'জাহাঙ্গীর' এমন পুরনো নাটক যার কোন আবেদনই নেই। অসংলগ্ন প্রকৃতির চরিত্র সব। ঘটনার বাঁধুনী বলতেও কিছু নেই, ইতিহাসের দিক থেকেও প্রণিধানযোগ্য জ্ঞাতব্য কিছু নেই, এমন কি ভাষা থেকেও রস আহরণের কোন জোরও নেই। তদুপরি ভালো মহলা না দেওয়ার ইতস্ততঃ ভাব এবং অভিনয়ের অনুৎকর্ষ মিলে একটা চৌকশ নিরেস বস্তু সামনে হাজির হয়। চরিত্রগুলিরই খুঁটির জোর নেই, তার আর অভিনয়ের জোর আসবে কোত্থেকে? প্রথম নাটকখানিরই এমন সর্বাঙ্গীণ দীন দশা মনকে বড়ো পীড়িত করে তোলে। এমন এলোপাতাড়ি ব্যাপার যে একটা পুরো গল্প অনুধাবন করাই মুশকিল। জাহাঙ্গীর এখানে এক মদ্যপ যার রাজত্ব চালিত হয় বেগম নূরজাহানের নির্দেশে। হিন্দু বিধবা অবস্থা থেকে জোর করে বেগম করে নেওয়ার জন্যে নূরজাহান জাহাঙ্গীরের প্রতি প্রতিহিংসা-পরায়ণা। এই প্রতিহিংসা সে চরিতার্থ করতে চায় জাহাঙ্গীরের প্রাণাধিক পুত্র সাজাহানকে বিনষ্ট করে। সাজাহান স্বতই নূরজাহানের বিরোধী। ফলে নূরজাহানের নির্দেশে জাহাঙ্গীরের সৈন্যের সঙ্গে

"চাঁদনী চক"-এর একটি চরিত্রে স্মৃতি বিশ্বাস

সাজাহানের সংগ্রাম। পনেরটি দৃশ্যে তিন অঙ্কের নাটকখানি কোন রসই উপভোগের সুযোগ এনে দেয় না।

* * *

এ নাটকে শিল্পীদলের মধ্যে আছেন, মহেন্দ্র গুপ্ত, ধীরাজ ভট্টাচার্য, ফাল্গুনী ভট্টাচার্য, রাধারমণ পাল, সূর্য সেন, শিবকালি চট্টোপাধ্যায়, শান্তি চক্রবর্তী, মণিময় মজুমদার, মণ্টু গাঙ্গুলী, পশুপতি কুণ্ডু, নির্মল ভট্টাচার্য, তারক দাস, সরিৎ চট্টোপাধ্যায়, বনানী চৌধুরী, ছন্দা দেবী, গীতশ্রী দেবী, মঞ্জুশ্রী চট্টোপাধ্যায়, শেফালি সরকার, বেলা সরকার, অনিন্দিতা দাশগুপ্তা, সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুরূপা ভারতী, মাধুরী প্রভৃতি। এখানেও সেই বিসদৃশ ব্যাপার—বনানী, ছন্দা, গীতশ্রী, মঞ্জুশ্রীর নামের পাশে ব্র্যাকেটে 'ফিল্ম' যোগ করে দেওয়া। যেন এদের যোগদানে মঞ্চ উদ্ধার পেয়ে গেল! পর্দায় এরা যতোই আকর্ষণীয় হোন না কেন, মঞ্চের অভিনয়ে মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন এমন যোগ্যতা আছে ব'লে এরা নিজেরাও স্বীকার করবেন কি-না সন্দেহ! আর তাও যদি সুপরিচালকের হাতে পড়তো। মহেন্দ্র গুপ্ত নিজে নাটকখানি পরিচালনা করেছেন এবং একার্যে তিনি নাটককে টেনে নিয়ে যাবার কৃতিত্ব আগে যাও বা দেখিয়েছেন, এখন আর তাও নেই। এ নাটকের অভিনয়ে ব্যক্তিগত কৃতিত্বের কথা অনুল্লেখিত থাকাই ভালো, কারণ মূলেতেই চরিত্রকে দাঁড় করাবার উপাদান বা অভিব্যক্তি প্রকাশের অবলম্বনই অতীব দুর্বল। মিনার্ভার এই নব উদ্বোধন কোন সাড়া নিয়ে আসতে একেবারেই ব্যর্থ হয়েছে কেবল ঐ নাটকখানি নির্বাচন করার জন্যই। তাই আশা করা যাচ্ছে যে উৎসাহ নিয়ে মহেন্দ্র গুপ্ত, ধীরাজ ভট্টাচার্য প্রমুখ শিল্পীবৃন্দ মিনার্ভার দ্বারোদ্ঘাটনে এগিয়ে এসেছেন ঠিক তেমনিই উৎসাহ ও বিচারবুদ্ধির পরিচয় তাঁরা দেবেন ভালো নাটক পরিবেশন করতে পারলে। তাতে তাঁদেরও প্রচেষ্টা সার্থক হবে, এবং বাঙলার নব নাট্য জাগরণও জোর পাবে। তা না হ'লে, শুধু দরজা খুলে রাখায় কারুরই কোন লাভ হবে না।

দুখানি রবীন্দ্র নাট্য

গত শনি ও রবিবার একই জায়গায় এবং একই সময়ে, নিউ এম্পায়ারে রবীন্দ্রনাথের দুখানি নাটক মঞ্চস্থ হয়—'শাপমোচন' এবং 'হালদার গোষ্ঠী'। অবশ্য দু'খানিই রবীন্দ্রনাথ রচিত নাটক নয়; 'শাপমোচন' তাঁর লেখা নৃত্যনাট্য এবং 'হালদার গোষ্ঠী' তাঁর একটি ছোট গল্প অবলম্বনে নাট্যরূপ দেওয়া। নাট্যরূপ দিয়েছেন সুবীর ঘোষ। প্রথমটি পরিবেশন করেন প্রান্তিক সম্প্রদায় এবং দ্বিতীয়টি দক্ষিণীর নাট্য-সংস্থা। 'শাপমোচন' চেহারার দিক থেকে বেশ সুদৃশ্য হলেও, নাটকীয়তা সৃষ্টির মধ্যে কেমন যেন একটা নির্লিপ্ত-ভাব দেখা দিয়েছিল। বেশ নাচ ও সাজ-পোশাক, চমৎকার সংগত এবং অসাধারণ কৃতিত্ব ভাবময় পরিবেশ রচনায় আলোক-সম্পাতে। কিন্তু গানের অস্পষ্ট বাণী, বিশেষ করে সম্মেলক গানে এবং ঘটনার ধারার অসংলগ্নতা কাহিনীটির মর্মে পৌঁছনর অন্তরায় হয়। সব মিলিয়ে মনে একটা সুন্দরের ছাপ এনে দেয় কিন্তু অসাড়। এই নৃত্যনাট্যটির পরিবেশনের পিছনে ছিলেন গান তত্ত্বাবধানে অনাদিকুমার দস্তিদার, গান পরিচালনায় সমর

গুপ্ত, দিলীপকুমার রায় ও শৈলেন ঘোষ; নৃত্য পরিকল্পনায় গোপাল পিল্লাই; নৃত্য রচনা ও পরিচালনায় বিজয় দাশ; যন্ত্র-সংগীত পরিচালনায় অমল দেব; আলোক-সম্পাতে তাপস সেন এবং শিল্পনির্দেশে শ্যামদুলাল কুণ্ডু। বিভিন্ন চরিত্রে অংশ গ্রহণ করেন হিমাংশু পাল, বিজয় দাশ, কৃষ্ণা ঘোষ, সুনন্দা সেন, মীরা ব্রহ্মচারী ও চিত্রা সোম। একক সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন পংকজকুমার মল্লিক, দিলীপ-কুমার রায়, সমর গুপ্ত, গীতা সেন, বনানী ঘোষ, পূরবী চট্টোপাধ্যায়, সুবীর কর ও সলিল দে। নৃত্যনাট্যটি পরিচালনা করেন অমল দেব।

* * *

প্রাচীনপন্থী গোঁড়া পরিবারের ভাঙনের কাহিনী 'হালদার গোষ্ঠী'। সংলাপপ্রধান বৈঠকী নাটক তবুও অভিনয়গুণে উপভোগ্য হয়। এ বিষয়ে আশিস মুখোপাধ্যায়ের কৃতিত্বই সবচেয়ে বেশী; মানসিক সংঘাতকে তিনি নাটকীয় করে ফুটিয়ে তুলেছেন। আর প্রশংসাযোগ্য অভিনয় দেখিয়েছেন রেখা চট্টোপাধ্যায়। মাধবী চট্টোপাধ্যায়, তারা সরকার ও সুনির্মল অধিকারীর অভিনয় মোটামুটি। মঞ্চসজ্জা ও আলোকসম্পাতের কাজ প্রশংসনীয়।

বম্বের দুখানি ছবি

বম্বের ছবিরই শুধু নয়, সমগ্রভাবে ভারতীয় চলচ্চিত্র শিল্পেরই সম্মান বাড়িয়ে দেবার মতো দুখানি ছবি সম্প্রতি কলকাতায় মুক্তিলাভ করেছে। একখানি হচ্ছে বিমল রায়ের 'নোকরি' আর অপর-খানি সোরাব মোদির 'মির্জা গালিব'। ভিন্ন রকমের দুখানি ছবি এবং দুখানি ছবিই লোকের সম্ভ্রম বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হবে।

* * *

'দো বিঘা জমিন'-এর স্রষ্টা বিমল রায় 'নোকরি'-তে শুধু দেশেরই নয়, সারা পৃথিবীরই একটা সমস্যাকে মূর্ত করে তুলেছেন—বেকার সমস্যা। বিন্যাসেও তিনি একটা নতুন পরীক্ষা চালিয়েছেন, অনেকটা ইতালিয় পরিচালক দে সিকার মতো,—যে ধারাটি পাওয়া যায় তার 'বাইসিকল থিপ' বা 'মিরাকেল অফ মিলান'-য়ে।

''সাজঘর''-এর একটি নাটকীয় মুহূর্তে নবতর চরিত্রে সুচিত্রা সেন

"ইন্দ্রলীলা'তে ইন্দু পাল ও কুলদীপ

আশাবাদী সদাই খুশমেজাজ এক যুবকের গল্প। সংসারে বিধবা মা আর রুগ্না ভগিনী। সর্বস্ব বেচে মা ছেলেকে লেখাপড়া শেখালেন এবং শেষ সম্বলটুকু হাতে দিয়ে পাঠালেন শহরে চাকরির খোঁজে। কিন্তু চাকরি কোথাও খালি নাই। শেষে একটা চাকরি যদিও বা জুটলো তো ঘটনাচক্রে ঠিকানা এবং নিয়োগপত্র গেল হারিয়ে। শেষ অবধি অবশ্য চাকরিটা পাওয়া গেল, কিন্তু মনুষ্যত্বকে বড়ো করে দেখতে গিয়ে তাও চলে গেল। নিঃসম্বল, নিরুপায়; তার ওপরে মাথায় এসে বসেছে তারই প্রেমে গৃহত্যাগিনী দয়িতা। আশার সব রেখা তার দৃষ্টি থেকে বিলীন হয়ে গেল। জীবনযুদ্ধে পরাজয় বরণ করে অবশেষে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হলো সে, কিন্তু নিবৃত্ত করলে তার প্রেমিকা।

*   *   *

সংসারের একটা জীবন্ত অবস্থা এসে পড়েছে এ ছবিখানিতে। জীবনকে পায়ের ভৃত্য করে নিয়ে চলার মতো সহজ চরিত্র একটি। কিন্তু শেষে তারও আত্মহত্যা করে জীবন-রণের ময়দান থেকে সরে পড়ার চেষ্টার মধ্যে নাটকীয় যুক্তি যতোই থাক, সংগ্রামী মনে বড়ো নৈরাশ্য এনে দেয়। ওকে একটা চাকরি দেবার জন্য সর্বজনে আবেদন জানিয়ে ছবি শেষ করা হয়েছে, কিন্তু গল্পের ওখানে দাঁড়ি পড়ে না। অমন একটি যুবক, যে হতাশ জীবনে আশার সঞ্চার করে, নিরাশার মধ্যে উৎসাহ এনে দেয়, অকপট, হিতৈষী এবং দরদী; সে আত্মঘাতী হওয়া থেকে প্রাণে রক্ষা পেয়ে গেলো বলে লোকে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উৎফুল্ল হয় বটে, কিন্তু একদিন যে অন্য হতাশ বেকারকে আত্মহত্যা থেকে রক্ষা করেছিল সে যদি নিজের ক্ষেত্রেও সর্বদুঃখ ও বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও পৃথিবীতে বেঁচে থাকার একটা সার্থকতা প্রতিপন্ন করে দিতে পারতো তাহলে কেবলমাত্র সহানুভূতি ছাড়া সে শ্রদ্ধাভাজনও হতে পারতো। ছবিখানিরও সেইটেই হতো বড়ো সার্থকতা।

*   *   *

দেশের যারা নায়ক তাদের ভাবিয়ে তোলার মতো জোর নিয়েই ছবিখানি উপস্থাপিত হয়েছে। বেকার সমস্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে সচেতন হওয়ার সতর্কবাণী বলেও ধরা যায় ছবিখানিকে। সমাজের আরও অসম ব্যাপারও রয়েছে 'নোকরি'-তে। যেমন, শিক্ষিতা, প্রাপ্তবয়স্কা মেয়ের মতের বিরুদ্ধে তার বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা; কর্মদক্ষতা না থাক বড়বাবুর শ্যালক হওয়াই যোগ্যতা নিরূপণের একমাত্র ব্যাপার; চিকিৎসার অপ্রতুল ব্যবস্থা ইত্যাদি। ঘটনাস্রোতে জীবনসংগ্রামের আরও কতক পরিচয় সামনে তুলে ধরা হয়েছে যা চেতন মনে একটা

প্রভৃতি এনে দেবেই। পরিহাসচ্ছলে বিন্যাস ধারার অনেক কথাই বলতে সক্ষম হয়েছেন পরিচালক বিমল রায়। কলাকৌশলের দিকটায় একমাত্র সুরযোজনার দিকটা ছাড়া, সর্বক্ষেত্রেই অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। সুরযোজনায় গানের দিক থেকে জোর বা মনোময়তা আছে। পুরনো বাঙলা ছবি থেকেও সুর যোগ করা হয়েছে। আর, আবহসংগীতে পাশ্চাত্ত্য যন্ত্রে পাশ্চাত্ত্য সুরের রেশ পরিবেশকে ব্যাহত না করলেও কেমন যেন একটা খটকা ধরিয়ে দেয়। প্রধান চরিত্রে কিশোরকুমার অনন্যসাধারণ অভিনয় কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন এবং বেকার সমস্যার মতো একটা গুরুগম্ভীর নিরেট বিষয়বস্তুকে জীবন্ত করে মনে ধরিয়ে দেওয়ায় তাঁর অভিনয় অনেকখানি সাহায্য করেছে। বেকার মেসের এক দরদী বৃদ্ধ ভৃত্যের চরিত্রে কানাইয়ালাল মনের ওপর গাঁথা হয়ে থাকবেন। শীলা রমানিকে প্রেমিকার চরিত্রে ঈষৎ রূক্ষই লাগবে। বহু টাইপ-চরিত্রে ভরা ছবিখানি এবং প্রত্যেকটি চরিত্রই ক্ষণিকের আবির্ভাবেও একটা বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেই। কলাকুশলীদের মধ্যে আছেন আলোকচিত্র গ্রহণে কমল বসু, শব্দযোজনায় দিনশা বিলিমোরিয়া, শিল্পনির্দেশে সুধীন রায় এবং সম্পাদনায় হৃষি মুখোপাধ্যায়—'নোকরি'-কে একখানি বিশিষ্ট চিত্রসৃষ্টিতে পরিণত করে তুলতে এদের কৃতিত্ব সমুজ্জ্বল। সুরযোজনা করেছেন সলিল চৌধুরী। 'নোকরি'-র মূল আখ্যানবস্তুটি গ্রহণ করা হয়েছে সুবোধ বসুর 'শুভযাত্রা' থেকে এবং বর্তমান চিত্রনাট্যে দাঁড় করিয়েছেন নবেন্দু ঘোষ।

* * *

'মির্জা গালিব' গত শতাব্দীর সর্বজনপ্রিয় উর্দু কবির জীবন-কথা। অবশ্য জীবন-কথা ঠিক নয়; কবির জীবনের কিছু কিছু ঘটনা অবলম্বনে ওর নামটি সম্বল করে কাল্পনিক কাহিনীই পরিবেশন করা হয়েছে। একথা ছবির মুখবন্ধে সশ্রদ্ধভাবে স্বীকারও করে নেওয়া হয়েছে। ছবিখানিতে ঐতিহাসিক সত্যের অভাব থাকুক, কিন্তু গালিবের প্রাণের সাড়া ওতপ্রোতভাবে সারা ছবিখানিতেই মূর্ত। একটা ঐতিহ্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক চিত্রসৃষ্টি বলে আখ্যাত করা যায় ছবিখানিকে। শিল্পপ্রিয় মোগল সম্রাট বাহাদুর শা'র আমলের ঘটনা। সাজে ও শোভায় সেকালের চমৎকার একটা পরিবেশ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। গালিবের কাব্যরস পরিবেশনের সংগে তখনকার সমাজের অবস্থারও বিবরণ পাওয়া যায়, আর সেই সংগে রয়েছে নাট্যরসপুষ্ট একটি নিবিড় প্রণয়কাহিনী। পরিচালক-প্রযোজক সোরাব মোদি তাঁর এই এক চেষ্টাতেই বোম্বাই ছবির দুর্নাম অনেকখানি অপনোদনে সক্ষম হয়েছেন। শিল্প ও কাব্যরসিক মাত্রই ছবিখানিতে মুগ্ধ না হয়ে পারবেন না। উর্দু ভাষাই ব্যবহার করা হয়েছে, কিন্তু তাতেও শিল্পরসপানে আনন্দ উপভোগ করা থেকে কোন দর্শকই বঞ্চিত হবেন না। তার কারণ, কাব্যের সুর ও প্রাণশক্তিটা রয়েছে এর মধ্যে, আর রয়েছে অনাবিল প্রণয়কাহিনী।

* * *

নামভূমিকায় ভারতভূষণ একটা ব্যক্তিত্বপূর্ণ চরিত্রকে সামনে হাজির করে দিয়েছেন। তার প্রণয়িনীর ভূমিকায় সুরৈয়ার কৃতিত্বও বিশেষভাবে প্রশংসিত হবে। বম্বের অনেক নামকরা শিল্পীকেই অন্যান্য চরিত্রে দেখা যাবে। তাদের মধ্যে গালিবের প্রণয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী নগর কোতোয়ালের চরিত্রে উল্লাসের হুংকারভরা অভিনয় ছাড়া আর সকলের অভিনয়েই অ-বম্বাইসুলভ সংযমের পরিচয় লক্ষ্য করার বিষয়। গানের দিকটা খুবই ভালো, তবে এক্ষেত্রেও বিদেশী যন্ত্রের সমাবেশ কাণে লাগে। সুললিত সংলাপ বিশেষভাবেই প্রশংসনীয়। কৃতি কলাকুশলীদের মধ্যে আছেন কাহিনী রচনায় এস এইচ মিণ্টো; চিত্রনাট্য রচনায় জে কে নন্দা; সংলাপ রচনায় রাজেন্দ্র সিং বেদি; আলোকচিত্র গ্রহণে ভি অমদুত; শব্দ যোজনায় এম এদলজি; সুর যোজনায় গোলাম মহম্মদ এবং শিল্প নির্দেশে রুশি কে ব্যাংকার—এদের সম্মিলিত এই প্রচেষ্টা বম্বাই ছবির ধারা সুস্থ ও এমনি শিল্পমার্জিত করে তুলুক।

খেলার মাঠে

একলব্য

চতুর্দলীয় ফুটবলের তৃতীয় অনুষ্ঠানের উপর যবনিকা পড়েছে। ১৯৫২ ও ১৯৫৩ সালে ভারত অপরাজিত থেকে বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছিল, এবারও ভারত কলম্বো কাপ লাভ করেছে অপরাজিত থেকে। সুতরাং উপর্যুপরি তিন বছরই সে অপরাজিত থেকে এশিয়ান চতুর্দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করলো।

চতুর্দলীয় ফুটবলে যেরূপ উন্নত ক্রীড়া-নৈপুণ্য আশা করা গিয়েছিল কার্যক্ষেত্রে তা প্রত্যক্ষ করা যায়নি। একমাত্র পাকিস্থান ও ভারতের শেষ চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলাটি ছাড়া কোন খেলারই ক্রীড়ামান সাধারণ পর্যায়ের উপরে ওঠেনি। এশিয়ান গেমের পরিপ্রেক্ষিতে বর্মা দলের ক্রীড়ানৈপুণ্য সম্পর্কে সবার মনে ছিল উঁচু ধারণা। এশিয়ান গেমের ফুটবলে ভারতের খেলায় পাওয়া যায় চরম ব্যর্থতা আর বর্মা করে তৃতীয় স্থান অধিকার। বর্মার তৃতীয় স্থানে অবস্থানও ভাগ্যপ্রসূত। কারণ দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী বর্মা ও কোরিয়ার মধ্যে টসের সাহায্যে তৃতীয় স্থান নির্ণয় করা হয়। ভাগ্যের খেলায় জয়ী হলে বর্মাও এশিয়ান ফুটবলে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হতে পারতো। যাই হ'ক বর্মার সমকৃতিত্ব অধিকারী কোরিয়া নিজেদের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে বিশ্ব ফুটবলে অংশ গ্রহণ করে। প্রাথমিক খেলায় 'ওয়াক ওভার' পেয়ে এরা বিশ্ব ফুটবলের মূল প্রতিযোগিতায়ও খেলার সুযোগ পায়। অবশ্য বিশ্ব কাপের মূল প্রতিযোগিতায় কোরিয়াকে পরাজয় স্বীকার করতে হয় হাঙ্গেরীর কাছে ৯—০ গোলে আর তুরস্কের কাছে ৭—০ গোলে। বর্মার ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয়ের জন্যই তাদের সমকৃতিত্বের অধিকারী কোরিয়ার কথা উল্লেখ করা হ'ল। চতুর্দলীয় ফুটবলে কিন্তু বর্মার ক্রীড়াধারা দর্শকমনে কোন রেখাপাত করতে পারেনি।

ইংলণ্ডের নামকরা ক্লাব প্রেস্টন নর্থ-এর প্রাক্তন খেলোয়াড় ও কোচ মিঃ উইয়ার বর্মার ফুটবল কোচ। এর শিক্ষাধীনে বর্মা অভ্যস্থ হয়েছে তিন ব্যাক প্রথার ক্রীড়াধারায়। কিন্তু এরা রক্ষণকার্যের সকল গুণাগুণ এখনো আয়ত্ব করতে পারেনি। আক্রমণ রচনায় অবশ্য নৈপুণ্যের অভাব আছে। উঁচুতে বল মারতে এবং বল ভালভাবে 'রিসিভ' করতে এরা পটু। বর্মার খেলার এটাই বিশেষত্ব। তিনটি খেলায় মধ্যে মাত্র এক পয়েণ্ট অর্জন করে বর্মা লীগ কোঠায় সবার নীচে স্থান পেয়েছে। ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যে অধিনায়ক বা কিউ দর্শকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

রাজনৈতিক কারণ এবং ভাগ্য বিড়ম্বনায় এশিয়ান চতুর্দলীয় ফুটবলে অংশ গ্রহণকারী চারটি দল পৃথক পৃথক দেশের অধিবাসী হলেও একমাত্র বর্মা ছাড়া আর কোন দলের খেলোয়াড়দের মধ্যে আকৃতিগত পার্থক্য ছিল না। বার্মিজ খেলোয়াড়দের মুখাবয়ব মঙ্গোলীয় ধরনের। সিংহলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়দের যথেষ্ট সামঞ্জস্য ছিল—'আমাদের ছেলে বিজয় সিংহ' যে দেশ জয় করে রেখে গেছেন সেই সিংহলের খেলোয়াড়েরা শৌর্যের পরিচয় দেবে এতে আর আশ্চর্যের কি আছে! আর পাকিস্থান—সেতো ভারতেরই খণ্ডিত বাহু। বাহু বলে তারাও বলীয়ান। সিংহল সত্যই অল্প দিনের মধ্যে ফুটবলে অনেকখানি এগিয়ে গেছে। যারা প্রথম দু' বছর একটি পয়েণ্টও পায়নি, তারা এবার অধিকার করেছে দ্বিতীয় স্থান। চ্যাম্পিয়ান ভারতের কাছ থেকেও তারা ছিনিয়ে নিয়েছে একটি পয়েণ্ট। সিংহলের কয়েকজন খেলোয়াড়ও ব্যক্তিগত ক্রীড়ানৈপুণ্যে দর্শকদের প্রশংসা অর্জন করেছেন। এদের মধ্যে গোলকিপার শেরিফ, রাইট ব্যাক এ সি

চতুর্দলীয় ফুটবলের চ্যাম্পিয়ন ভারতের অধিনায়ক এস মান্নার হাতে শ্রীযুক্তা বাসনা গুপ্তা 'কলম্বো কাপ' তুলে দিচ্ছেন

খাঁ, সেণ্টার হাফ রণসিঙ্গে এবং রাইট ইন সাইনের নাম করা যেতে পারে। অধিনায়ক পিটার রণসিঙ্গের খেলাই সবচেয়ে চোখে লাগে। সিংহলের সব খেলোয়াড়ই ছিলেন বয়সে তরুণ, খেলার গতিবেগও ছিল বেশী। চারটি দলের মধ্যে সিংহলের বল হেড করবার পদ্ধতিও ছিল সবচেয়ে উন্নত।

পাকিস্থান টীমের দলগত শক্তি কোন অংশেই কম ছিল না, কিন্তু নূতন পরিবেশে তারা হয়তো সুবিধা করতে পারেনি। রক্ষণ বিভাগের চেয়ে পাকিস্থানের আক্রমণ বিভাগ বেশী সংহতিপূর্ণ। খেলার সময় পাক খেলোয়াড়দের অহেতুক দৈহিক শক্তি প্রয়োগের ঝোঁক আছে। পাকিস্থান টীমে যারা ভাল খেলেছেন, তাদের অধিকাংশই কলকাতা মাঠের চেনা জানা। ফাকরী, জামিল, ফজলুর রহমান, নিয়াজ সবাই ভাল খেলেন। সেণ্টার হাফ নবী ও রাইট ইন আমীনের খেলার মধ্যেও নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। পাকিস্থানের সবচেয়ে বিপজ্জনক ও কীর্তিমান খেলোয়াড় ফাকরী প্রথম দিন বর্মার বিরুদ্ধে ছাড়া সিংহল ও ভারতের বিরুদ্ধে সুবিধা করতে পারেনি, কিন্তু ভারতের বিপক্ষে তিনি যে অদ্ভুদ গোলটি করেছেন তাতেই প্রমাণ হয়েছে তিনি কত উঁচু দলের খেলোয়াড়।

ভারতের খেলোয়াড়দের কথা বলতে হলে প্রথমেই সামরিক বিভাগের খর্বাকৃতি শ্রমশীল খেলোয়াড় পূরণ বাহাদুরের কথা বলতে হয়। শেষ দিনের খেলায় হ্যাট্রিক করে ভারতের জয়লাভের কৃতিত্বের অনেকখানি গৌরব অর্জন করেছেন পূরণ একা। পূরণ আগেও নিপুণ খেলোয়াড় ছিলেন, আরও মার্জিত হয়েছেন। উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যে পূরণ তিন দিনই দর্শকদের আনন্দ দিয়েছেন। তার শেষ দিনের খেলা সবচেয়ে আনন্দদায়ক হয়। এই দিনের তিনটি গোলের মধ্যেই তার যথেষ্ট বাহাদুরী ছিল। শেষদিন সত্তারের খেলাও খুব ভাল হয়। ২১জন বুটপরা খেলোয়াড়ের মধ্যে একা সত্তার খালি পায়ে খেলে ভারতীয় ক্রীড়াধারার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেন। অধিনায়ক মান্না প্রথম দুদিন এবং লেফ্‌ট নূর তিনদিনই ভাল খেলেন। গত দু বছরও এস মান্না ভারতের অধিনায়ক ছিলেন, এবারও তার অধিনায়কতায় ভারত কলম্বো কাপ লাভ করেছে। যে কোন অধিনায়ক এই কৃতিত্বে গর্ব অনুভব করতে পারেন।

চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতায় কোন দলের মধ্যেই প্রকৃত সেণ্টার ফরোয়ার্ডের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়নি। এবিষয়ে ভারতের ব্যর্থতা সবচেয়ে চরমে উঠেছে। সেণ্টার ফরোয়ার্ডের অভাব সর্বত্র। ইউরোপীয় অঞ্চলের যে সব দেশ ভারতে খেলতে আসে

এশিয়ান চতুর্দলীয় ফুটবলের অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন ভারতের খেলোয়াড়দের গ্রুপ ফটো

তাদের মধ্যেও সেণ্টার ফরোয়ার্ডের দেখা পাওয়া যায় না। ফেব্রুয়ারী মাসে রাশিয়ান ফুটবল দল কলকাতায় আসছে, তাদের মধ্যে প্রকৃত সুযোগ সন্ধানী সেণ্টার ফরোয়ার্ডের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে কিনা কে জানে!

চতুর্দলীয় ফুটবলের বিভিন্ন খেলায় শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের আমন্ত্রণ জানিয়ে দুই দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। প্রথম দিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে চারটি দেশের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্ত। পরে কলিকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখার্জি, পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার স্পীকার শ্রীশৈলকুমার মুখার্জি, রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রী পি বি চক্রবর্তী এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার সৈন্যাধ্যক্ষ মেজর জেনারেল মহীন্দার সিং চোপড়া পর পর খেলার দিন দুই দেশের জাতীয় পতাকা শূন্যে উড়িয়ে খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করেন। প্রতিযোগিতার শেষ দিন পুরস্কার বিতরণ করেন শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের সহধর্মিণী শ্রীযুক্তা বাসনা গুপ্তা। নিচে লীগ তালিকা ও ৬টি খেলার ফলাফল দেওয়া হল।

লীগ কোঠা

	খে	জ	ড্র	পরা	স্ব	বি	প
ভারত	৩	২	১	০	৬	৩	৫
সিংহল	৩	১	১	১	৪	৪	৩
পাকিস্থান	৩	১	১	১	৪	৫	৩
বর্মা	৩	০	১	২	৩	৫	১

৬টি খেলার ফলাফল

ভারত (১) ঃ সিংহল (১)
পাকিস্থান (১) ঃ বর্মা (১)
পাকিস্থান (২) ঃ সিংহল (১)
ভারত (২) ঃ বর্মা (১)
সিংহল (২) ঃ বর্মা (১)
ভারত (৩) ঃ পাকিস্থান (১)

* * *

অভিজ্ঞ ও তরুণ খেলোয়াড়ের সংমিশ্রণে গঠিত এবারকার পাকিস্থান সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলকে বেশ শক্তিশালী দল বলে অভিহিত করা যায়। ১৭জন খেলোয়াড় নিয়ে ভারতীয় দল গঠিত হয়েছে। ম্যানেজার অমরনাথকে নিয়ে দলের সভ্যসংখ্যা ১৮। এ'রা ইতিমধ্যেই পূর্ব পাকিস্থানে পৌঁছে গিয়ে ইস্ট পাকিস্থান ক্রিকেট টীমের সঙ্গে চট্টগ্রামে খেলাও আরম্ভ করেছেন। ভারতের খেলোয়াড়দের মোট ৯ সপ্তাহ পাকিস্থানে অবস্থান করতে হবে এবং পাঁচটি টেস্ট খেলা নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে ১৪টি খেলায়।

ব্যাটিংয়ের দিক দিয়ে ভারতীয় দল বেশ শক্তিশালী। স্পিন বোলিংয়ের দিক দিয়েও দলটি যথেষ্ট সমৃদ্ধ। লেগব্রেক ও গুগলী বোলার সুভাষ গুপ্তে, ন্যাটা স্পিন বোলার মানকড়, অফ স্পিনার গোলাম আমেদ ও ভাণ্ডারী প্রভৃতি যাদের নিয়ে দল গড়া হয়েছে তারা এক একজন দিকপাল। এদের বল বিশ্বের যে কোন শক্তিশালী দলের ভীতি সঞ্চারক। ভারতীয় দল দুর্বল হয়েছে ফাস্ট বোলিংয়ে। এখন দলে সত্যিকারের একজনও ফাস্ট বোলার নেই। এক ফাদকারের উপর ভরসা। ফাদকারও পূর্বের গতিবেগ হারিয়ে ফেলেছেন। ১৭জন খেলোয়াড়ের গড় বয়স ছাব্বিশের বেশী নয়। মানকড়, মন্ত্রী আর গোলাম আমেদের বয়স ত্রিশের ঊর্দ্ধে। অধিনায়ক মানকড় সর্বজ্যেষ্ঠ। সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় প্রকাশ ভাণ্ডারী। এর বয়স মাত্র উনিশ। গুপ্তে, প্যাটেল এবং গোলাম আমেদ শুধু বোলার হিসেবে দলে স্থান পেয়েছেন, ব্যাটিংয়ে এদের হাত নেই বললেই হয়। উমরিগর, মঞ্জরেকার, গাদকারী, গোপীনাথ, পি রায় ও পাঞ্জাবীর দলে অন্তর্ভুক্তি ব্যাটসম্যান হিসেবে। অবশ্য পাঞ্জাবী ছাড়া আর

সবাই বোলিংও করতে পারেন। উমরিগর ও গদকারীর মিডিয়াম ফাস্ট অফ ব্রেক বোলার হিসেবে সুনাম আছে। ফাদকার, রামচাঁদ ও দানী, ভাণ্ডারী, মানকড় ও বোর্ডের ব্যাটিং ও বোলিংয়ে সমান কৃতিত্ব। এরা ৬জনই চৌকশ খেলোয়াড়। ভারতীয় দলে রয়েছেন তিনজন ওপেনিং ব্যাটসম্যান, পি রায়, পাঞ্জাবী ও মন্ত্রী, তাছাড়া মানকড় নিজেও ওপেন করতে পারেন। সুতরাং ওপেনিং ব্যাটসম্যানের কোন সমস্যা নেই। অভিজ্ঞ মন্ত্রী এবং তরুণ তামানে দলের উইকেট কিপার। নীচে খেলোয়াড়দের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হল—
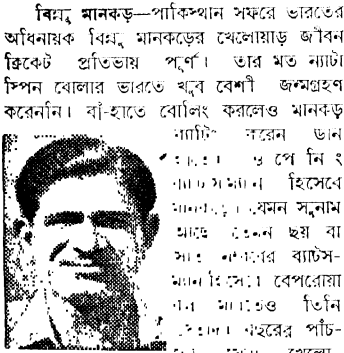
বিনু মানকড়—পাকিস্থান সফরে ভারতের অধিনায়ক বিনু মানকড়ের খেলোয়াড় জীবন ক্রিকেট প্রতিভায় পূর্ণ। তার মত ন্যাটা স্পিন বোলার ভারতে খুব বেশী জন্মগ্রহণ করেননি। বাঁ-হাতে বোলিং করলেও মানকড়

ব্যাটিং করেন ডান হাতে। ওপেনিং ব্যাটসম্যান হিসেবে মানকড়ের যেমন সুনাম আছে তেমন ছয় বা সাত নম্বরের ব্যাটসম্যান হিসেবে বেপরোয়া ভাবে মারতেও তিনি পারেন। বছরের পাঁচজন সেরা খেলোয়াড়ের অন্যতম বলে ১৯৪৬ সালে উইসডেন মানকড়ের কৃতিত্ব স্বীকার করেছে। টেস্ট খেলায় হাজার রান ও একশ উইকেট লাভ করে মানকড় যত তাড়াতাড়ি 'ডাবলস' করেছেন, অন্য কোন খেলোয়াড় এত তাড়াতাড়ি 'ডাবলস' লাভ করতে পারেননি। ১৯৩৮ সাল থেকে মানকড় গুরুত্বপূর্ণ ক্রিকেট খেলায় অংশ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেন। গত বছর ওয়েস্ট ইণ্ডিজ সফরে তিনি ভারতের সহ-অধিনায়ক ছিলেন। পাকিস্থান সফরকারী ভারতীয় দলের ১৭জন খেলোয়াড়ের মধ্যে মানকড়ই বয়োঃজ্যেষ্ঠ। তিনি বর্তমানে বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়, বোম্বাই দলের অধিনায়কও বটে।

জে এস প্যাটেল——গুজরাটের কৃতী খেলোয়াড় জেসু প্যাটেল অফ ব্রেক বোলার। গুজরাট ক্রিকেটে প্রতি বছরই প্যাটেল অনেকগুলি উইকেট দখল করে থাকেন। ম্যাটিং উইকেটে প্যাটেলের বোলিং খুবই কার্যকরী হয়। যেহেতু পাকিস্থানের পাঁচটি টেস্টের মধ্যে তিনটি টেস্ট ম্যাটিং উইকেটে খেলবার ব্যবস্থা হয়েছে সেইহেতু নির্বাচকমণ্ডলী প্যাটেলকে দলভুক্ত করেছেন। গতবার রজত জয়ন্তী কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে তিনি একটি টেস্ট খেলায় অংশগ্রহণ করেছিলেন। প্যাটেলের সবে ৩০ বছর পার হয়েছে।

পলি উমরিগর—সুস্বাস্থ্যের অধিকারী দীর্ঘকায় প্রিয়দর্শন ক্রিকেট খেলোয়াড় পলি উমরিগর ১৯৪৮ সালে ভারত সফরকারী ওয়েস্ট ইণ্ডিজ দলের বিরুদ্ধে সেঞ্চুরী করে
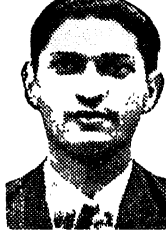
সর্বপ্রথম সকলের প্রশংসা অর্জন করেন। উমরিগর তখন ছিলেন কলেজের ছাত্র। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে খেলেই তিনি সেঞ্চুরী করেন। বর্তমানে উমরিগর ভারতের পরম নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান। স্পিন বোলিংয়ের বিরুদ্ধে তিনি খুবই ভাল খেলেন। ড্রাইভ মারতে উমরিগর সিদ্ধহস্ত। মাঝে মাঝে লং-অনে বাউণ্ডারী মেরে দর্শকদের আনন্দ দেন। মিডিয়াম-ফাস্ট বোলার হিসেবেও উমরিগরের সুনাম আছে। যে কোন যায়গায় ফিল্ড করতে পারেন। উমরিগরের বর্তমান বয়স ৩২ বছর। তিনি বোম্বাইয়ের সহ-অধিনায়ক। পাকিস্থান সফরকারী ভারতীয় দলেরও সহ-অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন।
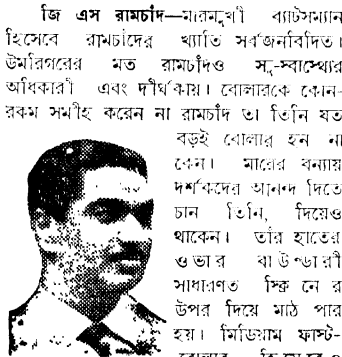
জি এস রামচাঁদ—মারমুখী ব্যাটসম্যান হিসেবে রামচাঁদের খ্যাতি সর্বজনবিদিত। উমরিগরের মত রামচাঁদও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং দীর্ঘকায়। বোলারকে কোনরকম সমীহ করেন না রামচাঁদ৷ তিনি যত

বড়ই বোলার হন না কেন। মারের বন্যায় দর্শকদের আনন্দ দিতে চান তিনি, দিয়েও থাকেন। তাঁর হাতের ওভার বাউণ্ডারী সাধারণত স্ক্রিনের উপর দিয়ে মাঠ পার হয়। মিডিয়াম ফাস্ট-বোলার হিসেবেও ভারতীয় দলে রামচাঁদের নির্বাচন অপরিহার্য। রামচাঁদের বর্তমান বয়স মাত্র ২৭ বছর। তিনি বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়। ১৯৫০ সাল থেকে স্বদেশ ও বিদেশে ভারতের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ খেলায় উমরিগর অংশ গ্রহণ করেছেন।

এন এস তামানে—বোম্বাইয়ের কলেজ ছাত্র তামানে সম্প্রতি ভারতের শ্রেষ্ঠ উইকেট কিপার হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেছেন। গতবার রজত জয়ন্তী কমনওয়েলথ দলের বিরুদ্ধে তামানে খুবই ভাল খেলেন। ব্যাটিংয়ে তার বিশেষ সুনাম ছিল না কিন্তু এখন তামানের ব্যাট করবার ভঙ্গি মার্জিত। উইকেটের পিছনে তিনি খুবই তৎপর অথ[চ] খেল[বার] সময় কোন চঞ্চলতা প্রকাশ পায় না।

ডি জি ফাদকার—ভারতের খ্যাতনা[মা] চৌকশ খেলোয়াড় ডি জি ফাদকার-বোম্বাইয়ের অধিবাসী কিন্তু বর্তমা[নে] বাঙলার খেলোয়াড়। ফাস্ট বোলার এ[বং] নির্ভরযোগ্য ব্যাটসম্যান ফাদকার ইংলণ্ডে

গোভার স্কুলে শিক্ষা সমাপনান্তে আরও মার্জি[ত] হয়েছেন। গোভ[ার] স্কুলের শিক্ষা গ্রহণে[র] পূর্বেও ফাদকারে[র] সুনাম ছড়িয়ে পড়ে[ছিল।] ফাস্ট বোলা[র] ফাদকার দুদিকে বল ঘুরিয়ে ব্যাটস[ম্যানকে] কাবু কর[তে] পারেন। ব্যাটিংয়েও ফাদকারের নিপুণ হাত। তিনি মেরে খেলতেই বেশি পটু। তাঁ[র] মারগুলির মধ্যে 'স্কোয়ার কাটস' ও 'স্ট্রে[ট] ড্রাইভস' প্রিয়।

গোলাম আমেদ — হায়দরাবাদের স্পি[ন] বোলার গোলাম আমেদ ১৯৪৮ সালে ভার[ত]

সফরকারী ওয়েস[্ট] ইণ্ডিজ দলের বিপক্ষে সর্বপ্রথম টেস্ট খেলা[র] সুযোগ পান। সেবছ[র] তিনি তিনটি টে[স্ট] খেলায় অংশগ্রহণ ক[রে] বোলিংয়ে প্রশংস[া] অর্জন করেন। তারপ[র] ভারতের অধিকাং[শ] গুরুত্বপূর্ণ খেলাতে[ই] গোলাম আমেদ অংশ[-] গ্রহণ করেছেন। স্পিন বোলারের উপযোগ[ী] পিচে গোলাম আমেদ ব্যাটসম্যানদের ভীতি[-] সঞ্চারক। তার বলে রান তোলা খুবই শক্ত[।] ১৯৫২ সালে মাদ্রাজের যে টেস্টে ভারত পাকিস্থানকে পরাজিত করে গোলাম আমে[দ] সেই টেস্টে ভারতের অধিনায়ক ছিলেন।

ভি এল মঞ্জরেকার—স্কুলের ছাত্রাবস্থাতেই মঞ্জরেকারের ক্রিকেট খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে[।]

১৯৫০ সালে দ্বিতীয় কমনওয়েলথ টীমের বিরুদ্ধে মঞ্জরেকার সব-চেয়ে বেশী রান সংগ্রহ করেছিলেন। উইকেটের চারদিকে নিপুণ হাতে বল মারতে পারেন মঞ্জরেকার ফাস্ট বোলিংয়ের বিরুদ্ধে রান তুলতে তিনি খুবই পটু। মঞ্জরেকারের বর্তমান বয়স ২৩ বছর। তিনিও বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়।
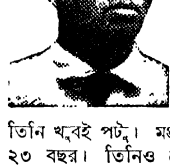
গতবার কলকাতায় মোহনবাগান ক্লাবের পক্ষে খেলেছেন।

সুভাষ গুপ্তে—গুপ্তে যে বিশেষ সেরা লেগ-ব্রেক বোলার একথা বিদেশী ক্রিকেট সমালোচকরাই স্বীকার করেছেন। বোম্বাইয়ের এই তরুণ খেলোয়াড়ের 'সর্বনাশা' বলকে ওয়েস্ট ইণ্ডিজের ওরেল, ওয়ালকট, উইকস, স্টলমায়ার প্রভৃতি ধুরন্ধর ব্যাটসম্যানরাও সমীহ না করে পারেননি। গুপ্তের হাতে অসম্ভব 'ব্রেক' আছে।

তাঁর বলের গতি ব্যাটসম্যানের পক্ষে বিভ্রান্তিকর। তাঁর 'গুগলী' বোঝাও ভার। অনেক আগে থেকে গুপ্তের বোলিং প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গেলেও ১৯৫১ সালের আগে তিনি ভারতের টেস্ট নির্বাচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হননি। সম্প্রতি বোম্বাই ক্রিকেট এসোসিয়েশনের রজত-জয়ন্তী উপলক্ষে বোম্বাই দল ও পাকিস্থানের মধ্যে যে প্রদর্শনী খেলা অনুষ্ঠিত হয় তাতে গুপ্তে একাই পাকিস্থানের প্রথম ইনিংসের সব ক'টি উইকেট দখল করেন। গুপ্তের বর্তমান বয়স ২৫ বৎসর। তিনি বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়। গ... কলকাতায় কালীঘাট ক্লাবের খেলেছিলেন।

এম কে মন্ত্রী—উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান এম কে মন্ত্রীর বর্তমা... বছর। ই... খেলো... ১৯৪... কমন... বির... খে... সু...

দুটি টেস্ট খেলায় ... ব্যাটিং প্রতিভা প... তিনি বেশ ভাল ... বোম্বাইয়ের প্রদর্শ... ফলে পুনরায় ...

পি ভাণ্ডা... প্রকাশ ভাণ্ডা... ভাণ্ডারীর বয়স ... সফরকারী ... প্রকাশ, এরই ... হাত পাকি... করেন, কিন্ত... পয়েণ্টের

পাকিস্তান রজত জয়ন্তী কমনওয়েলথের বিরুদ্ধে ভাণ্ডারী আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করেছেন।

পি রায়——বাংলার প্রিয়দর্শন ক্রিকেট খেলোয়াড় পঙ্কজ রায় ১৯৫০ সাল থেকে গুরুত্বপূর্ণ খেলায় নিয়মিতভাবে খেলে আসছেন। তার আগেই পঙ্কজের ক্রিকেট খ্যাতি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। ফুটবলও ভাল খেলতেন পি রায় কিন্তু ক্রিকেটের জন্যই তিনি ফুটবল ছেড়ে দেন।
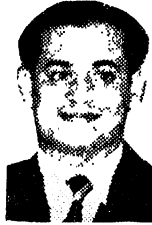
অধ্যবসায় ও সাধনায় পি রায় আজ ভারতীয় ক্রিকেটে পুরোভাগের খেলোয়াড়দের অন্যতম বলে পরিগণিত হয়েছেন। উইকেটের চারদিকে চমৎকারভাবে বল মেরে খেলেন পি রায়। ওপেনিং ব্যাটসম্যান পি রায়ের আউট ফিল্ড হিসেবেও সুনাম আছে। পি রায়ের বর্তমান বয়স ২৬।

পি এল পাঞ্জাবী—পি ... গুজরাটের একজন অভি... এর বর্তমান বয়স ...

গদকারী কভার পয়েণ্টের নির্ভরযোগ্য ফিল্ডসম্যান।

সি ডি গোপীনাথ—মাদ্রাজের উদীয়মান খেলোয়াড় গোপীনাথের বয়স মাত্র ২৪ বছর। দ্বিতীয় কমনওয়েলথ দল ও এম সি সি দলের বিরুদ্ধে গোপীনাথের চমৎকার ব্যাটিং ভারতের টেস্ট নির্বাচক কমিটির মনে যে রেখাপাত করে, তার ফলে গোপীনাথ ১৯৫২ সালে ইংলণ্ড সফরকারী ভারতীয় দলে স্থান পান।

কিন্তু ইংলণ্ডে গোপীনাথ মোটেই ভাল খেলতে পারেননি। নয়নাভিরাম মার আছে গোপীনাথের হাতে, বিশেষ করে 'অফে' বল মারতে তিনি খুবই পটু। এবছর ভালই খেলছেন। গোপীনাথ ...

দেশী সংবাদ

২০শে ডিসেম্বর—লোকসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে আলোচনার উদ্বোধন করিয়া ঘোষণা করেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার শেষে এক কোটি বিশ লক্ষটি নূতন চাকুরীর সংস্থান করাই হইবে দেশের লক্ষ্য। তিনি আরও ঘোষণা করেন যে, রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার পল্লী উন্নয়ন ব্যবস্থা সম্পর্কিত অনুসন্ধান কমিটি একটি স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া স্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছেন। ভারত সরকার নীতিগতভাবে এই প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছেন।

আজ লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীনেহরু ভারতের সংবিধান সংশোধনকল্পে একটি বিল উত্থাপন করেন। সংবিধানের ৩১, ৩১(ক) ও ৩০৫ অনুচ্ছেদ ও নবম তপশীলের সংশোধন করাই বিলের লক্ষ্য।

২১শে ডিসেম্বর—লোকসভায় ভারত সরকারের বৈষয়িক নীতি সংক্রান্ত বিতর্ক-
শ্রী করেন
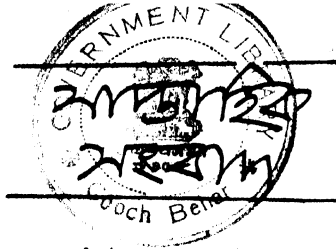
একমাত্র প্রতিষ্ঠান, যাহা বর্তমানে দেশের কল্যাণ সাধন এবং নবভারত গঠন করিতে পারে।

আলীপুরের অতিরিক্ত দায়রা জজ শ্রী কে এন ভট্টাচার্য টার্ফ রোডের বেচুলাল দত্ত ওরফে বীরেন্দ্রনাথ দত্তকে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্রী কমলা ওরফে বেলার হত্যার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করিয়াছেন। জুরীগণ আসামীকে দোষী সাব্যস্ত করেন।

২৪শে ডিসেম্বর—আজ শান্তিনিকেতনে বিশ্বভারতীর বার্ষিক সমাবর্তন উৎসবে প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লইয়াই ভারতবর্ষের অগ্রসর হওয়া উচিত; কারণ
রাষ্ট্রই অপরের অনুকরণের দ্বারা
তে পারে না।"
দিকদের নিকট এক
পরস্পরের সার্ব-
পারে

পাক প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ
আজ দমদম বিমান ঘাটিতে বলেন যে,
ও পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রিদ্বয়ের
আলোচনা সাপেক্ষে পাকিস্থান নিরা
পরিষদে কাশ্মীর সম্পর্কিত প্রশ্ন
আলোচনা স্থগিত রাখার সিদ্ধ
করিয়াছেন।

বিদেশী সংবাদ

২০শে ডিসেম্বর—আওয়ামী লীগ
মিঃ এইচ এস সুরাবর্দী আজ কেন
পাকিস্থান মন্ত্রিসভার আইন মন্ত্রিরূপে শ
গ্রহণ করেন।

সোভিয়েট ইউনিয়ন অদ্য বৃটেনের নি
প্রেরিত এক পত্রে এই সতর্কবাণী উচ্চ
করিয়াছে যে, পশ্চিম জার্মাণীকে পুন
অস্ত্রসজ্জিত করিয়া তুলিবার উদ্দে
সম্পাদিত প্যারিস চুক্তি অনুমোদন
হইলে ইঙ্গ-সোভিয়েট চুক্তি বাতিল
হইবে।

২১শে ডিসেম্বর—ফরাসী জাতীয় পরি
প্রধান মন্ত্রী মঃ মাদে ফ্রাঁস ও তাঁহার ম
সভার উপর বিপুল ভোটাধিক্যে আ
জ্ঞাপন করিয়াছে।

২২শে ডিসেম্বর—শ্রমিক দলের স
মিঃ ফেনার ব্রকওয়ে আজ কমন্স স
কেনিয়ার অবস্থা সম্পর্কে মূলতুবী প্রস্তা
বিতর্ক আরম্ভ করিয়া বলেন যে, গত
ম কেনিয়ায় প্রতি মাসে গড়ে ৫০
কানকে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছে।

শে ডিসেম্বর—আজ কমন্স স
সদ্য অনুষ্ঠিত উত্তর অতলান্তি
বৈঠকের বিবরণ পেশ ক
রাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার এন্টনী ইডে
লান্তিক চুক্তিভুক্ত রাষ্ট্রস
তির অন্তর্নিহিত উদ্দে
করিয়া দেখিয়াছেন, বি
পক্ষে সোভিয়েট বিপদাশ
বলিয়া মনে করিবার
য়া পান নাই।

সেম্বর—সারারাত্রিব্যা
রাসী জাতীয় পরি
রস্ত্রসজ্জার বিরু

টন আজ ফ্রান্স
য়াছে যে, প্যা
নীকে পুনর
ফরাসী জাত
জ্জার বিরু
ঘণ্টা পর
হইতে প্রচা
ণী প্রচার

২২ বর্ষ
সংখ্যা ১০
দেশ
শনিবার
২৩ পৌষ, ১৩৬১
DESH
SATURDAY, 8TH JANUARY, 1955

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

বাংলা ভাষার স্বরূপ এবং শক্তি

বিগত নিখিল বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশনের মূল সভাপতিস্বরূপে ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় যে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছেন, বর্তমান বাংলার রাষ্ট্রনীতিক এবং সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে সাহিত্য সাধনার আদর্শ ও লক্ষ্য সম্বন্ধে তাহা চিন্তাশীল সমাজকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিবে। ডাঃ রায় প্রধানত ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বাস্তব অবস্থার বিচার করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, ইতিহাস সীমাহীন, তার বিধান অমোঘ এবং বাঙালীর ইতিহাসের অন্যতম দীন কর্মী হিসাবে একথা আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, অন্যান্য কারণের সঙ্গে আমাদের খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ ভাষা ও সাহিত্যধ্যান অন্তত কিছুটা পরিমাণে বাংলা দেশের দ্বিধাখণ্ডিত হইবার জন্য দায়ী। দেখা যায়, অনেকটা এই দৃষ্টিভঙ্গী হইতেই বাংলা সাহিত্য-সাধনার বৃহত্তর পট-ভূমিকারও তিনি বিচার করিয়াছেন। তাঁহার অভিভাষণে তিনি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "বাঙালীর প্রতিভা সূক্ষ্ম, সংবেদনশীল, গভীর; কিন্তু একথাও সত্য, আপেক্ষিকভাবে তার ব্যাপ্তি কম, প্রসারতা স্বল্পায়ত, বৃহতের মধ্যে তার দৃষ্টি ও বুদ্ধি বিস্তার লাভ করে না।" তাঁহার এমন মন্তব্য সম্বন্ধে অনেকের মনে স্বভাবতই প্রশ্ন জাগিবে, আমাদের জাগিয়াছে। আমাদের বিশ্বাস, বাঙলা সাহিত্য সম্বন্ধে বিচারের এই ক্ষেত্রে যেরূপ রাজনীতিক পরিস্থিতির ভিতর দিয়া বাংলা দেশকে অগ্রসর হইতে হইয়াছে, সে দিকে ডাঃ রায়ের দৃষ্টি সম্যক্ আকৃষ্ট হয় নাই। পরন্তু পরাধীন প্রতিবেশের আড়ষ্টকর সেই পরিস্থিতির ছায়া তাঁহার বিচারের উপর অনেকখানি আসিয়া পড়িয়াছে। বাঙালীর প্রতিভা স্বল্পায়ত, তাহার দৃষ্টি বৃহতের মধ্যে বিস্তার লাভ করে না এই কথায় তিনি এই ভাবটিই সম্ভবত প্রকাশ করিতে চাহিয়াছেন যে, বৃহৎ ভারতবর্ষের জীবন-ধারার সঙ্গে বাঙালী সাহিত্য সাধনা যুক্ত হইয়া সম্প্রসারিত হয় নাই। বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পরে তিনি যে শুভেচ্ছা অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাতে বিষয়টি সুস্পষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। আমাদের কিন্তু অনুরূপ বিশ্বাস নয়। প্রকৃতপক্ষে বাংলা দেশের সাহিত্য সাধনা সমগ্র ভারতের ব্যাপ্ত অনুভূতি লইয়াই দীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে। রাজনীতিক পরাধীনতার প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তাহার শক্তি সম্প্রসারিত হইয়াছে এবং সমগ্র ভারতের ঐক্যবোধকে বলিষ্ঠ করিতে চেষ্টা করিয়াছে। ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামে সর্বতোভাবে শক্তি সঞ্চার করিয়াছে বাঙালীরই সাহিত্য সাধনা। অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি স্বরূপে ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায়ের মুখে আমরা সেই কথাটাই শুনিতে পাইয়াছি। তিনি বলিয়াছেন—'সমসাময়িক ভারতবর্ষের এখন সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় সাধনা, সংস্কৃতির এমন দৃষ্টি-কোণ যাহা বিভিন্ন ও বিচিত্রকে এক করিতে পারে এবং ইহাই হইতেছে যুগ-পরম্পরার্জিত বাংলা সাহিত্যের অন্ত-র্নিহিত গভীর অনুবেদন।' ভারতের অন্য কোন সাহিত্যের এ সম্পর্কে এতটা প্রবল, সূক্ষ্ম ও গভীর উপলব্ধি নাই যাহা বিভিন্ন রাজ্যের সাংস্কৃতিক ঐক্য ও সামাজিক ঐক্য সাধনের সহায় হইতে পারে। অ-বাঙালী জাতির ক্রমবর্ধমান ধিক্কার অপমান ও দুর্দশার মধ্যে বাংলা সাহিত্যই উহাকে নৈরাশ্য ও আত্মগ্লানি হইতে উদ্ধার করিবে এবং ভারতের মহত্তর ঐক্য বন্ধনের দিক দর্শন করাইবে। 'বস্তুত বৃহতের বেদনা এবং বৃহৎ ভারতবর্ষের ভাবনা বাংলা সাহিত্যের প্রাণ শক্তির স্বরূপ, সুতরাং সেই পথেই যে বাঙালী জীবন বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মুক্তি। সে মুক্তি অন্য কোথাও নাই' নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতি ডাঃ নীহাররঞ্জনের এই যে মন্তব্য তৎসম্বন্ধে আমরাও সম্পূর্ণ একমত।

পশ্চিমবঙ্গে বিনোবাজী

ভূদান-যজ্ঞের ঋষি সন্ত বিনোবা ভাবেজী পশ্চিমবঙ্গে আগমন করিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে আমাদের অন্তরের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। গত কয়েকদিন ধরিয়া বিনোবাজী বাঁকুড়ার বিভিন্ন স্থানে পর্যটনে রত আছেন। মহাত্মা গান্ধীর তিরোধানের পর ভাবেজী গান্ধীজীর জীবনাদর্শকে উদ্দীপ্ত রাখিয়াছেন এবং সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে সেই আদর্শকে বাস্তব রূপদানের সুমহান্ ব্রতে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। তাঁহার ভূদান যজ্ঞ নৈতিক উন্নয়নের ধারা ধরিয়া মানবতার চেতনায় সমগ্র দেশকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছে এবং ভারতের জন-

জীবনে বৈপ্লবিক প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছে। বৃহৎ আদর্শে সমাজের মনোমূলে সেবা এবং ত্যাগের সংহত চেতনার উদ্দীপনে সন্ত বিনোবাজীর সাধনা সমাজকে সঞ্জীবিত করিয়া তুলিতেছে। প্রকৃতপক্ষে শাসন কেন্দ্রগত রাজনৈতিক সূত্রে বা বিধান কোন জাতিকে বড় করিয়া তুলিতে পারে না। জাতির আত্মাকে সর্বাগ্রে জাগাইয়া তোলা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। আধুনিক যান্ত্রিক যুগে এই দিকটা আমাদের দৃষ্টিতে গৌণ হইয়া পড়িয়াছে। বর্তমানে মানুষের চেয়ে আর্থিক ভোগ সুখের বিচার বড় হইয়া পড়িতেছে। কিন্তু মানুষ যদি মনোমহিমায় জাগ্রত না হয়, তবে আর্থিক উপচার সমাজ এবং জাতির জীবনকে আড়ষ্ট ও অভিভূত করিয়া ফেলে। সে অবস্থায় পশু প্রবৃত্তি প্রশ্রয় পায় এবং ব্যক্তিস্বার্থই পরিশেষে প্রধান হইয়া উঠে। আচার্য বিনোবা ভাবে এই সংকট হইতে জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য প্রেমের উজ্জ্বল বর্তিকা উর্ধ্বে তুলিয়া ধরিয়াছেন। এদেশের বিশিষ্ট সংস্কৃতি এবং প্রাণশক্তির উৎস ধারার সঙ্গে তাঁহার অন্তরের সংযোগ রহিয়াছে। ভাবেজী বাঙলাকে শ্রীচৈতন্যের ভূমি বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন এবং চিন্তা-জগতে বৈপ্লবিক বীর্য সঞ্চারে বাঙলার প্রাণশক্তির বৈশিষ্ট্যের কথাগুলি ব্যক্ত করিয়াছেন। বৃহৎ আদর্শের প্রেরণা বাঙলার জনজীবনে সহজেই সাড়া জাগায়। পশ্চিম বাঙলা বিনোবাজীর নূতনতম এই সামাজিক আন্দোলনের সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব ও শান্তিপূর্ণ বৈপ্লবিক পথে অর্থনৈতিক সমস্যা সমাধান প্রয়াসের তাৎপর্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবে এবং তাঁহার আবেদনে যথাযোগ্য সাড়া দিবে এই আশা অন্তরে লইয়া জাতির গৌরবময় ঐতিহ্যের মঙ্গল-মূর্তিস্বরূপ এই সাধু পুরুষকে পশ্চিম-বঙ্গের পক্ষ হইতে আমরা পুনরায় অভি-বাদন জ্ঞাপন করিতেছি।

বৈজ্ঞানিক সাধনার আদর্শ

ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের উদ্বোধন-কালে ভারতের প্রধান মন্ত্রী বৈজ্ঞানিক-দিগকে মানবসমাজের কল্যাণ হইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছেন। স্বাধীনভাবে মননের পথেই যে বৈজ্ঞানিক সাধনার ভবিষ্যৎ জগতের পক্ষে হিতকর হইতে পারে, একথা তিনি বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে বৈজ্ঞানিক এবং বিজ্ঞান-সাধনা বর্তমান ক্ষেত্রে রাজনীতিক স্বার্থের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছে। পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষের প্রতিবেশে বৈজ্ঞানিকদের সাধনালব্ধ শক্তি বিশ্বে প্রলয়ঙ্কর বিপর্যয় আসন্ন করিয়া তুলিয়াছে। মঙ্গলের নামে আসিতেছে অমঙ্গল। পণ্ডিত নেহরু সম্বন্ধে সতর্ক-বাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকদের উক্তিতেও সেই আশঙ্কা সমর্থিত হইতেছে। কালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের প্রবীণ অধ্যাপক ডাঃ কার্ট স্টার্ন সম্প্রতি এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, হাইড্রোজেন বোমা বিস্ফোরণের পরীক্ষার ফলে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক পদার্থই অল্প পরিমাণে তেজস্ক্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। বিভিন্ন শক্তিবর্গের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার প্রতিবেশ বিদূরিত হইলে পরস্পরের প্রতি সন্দেহকে কেন্দ্র করিয়া বোমা পরীক্ষার খেলা চলিতেই থাকিবে। বিভিন্ন দেশের আর্থিক উন্নয়নের পথে এই সমস্যা মিটিবে, ইহাও মনে হয় না; কারণ আর্থিক উন্নয়নে সাহায্য করিবার প্রলোভনে শক্তি-গোষ্ঠী অপর দেশকে নিজেদের সামরিক আবেষ্টনের অন্তর্ভুক্ত করিয়া অবস্থাকে আরও জটিল করিয়া তুলিবে। সুতরাং অনুন্নত দেশসমূহের আর্থিক উন্নয়নে বিশ্ব শান্তির প্রয়োজন রহিয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক উন্নয়নের দিকটাও উপেক্ষা করিলে চলিবে না। সাংস্কৃতিক উন্নয়ন আবার বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য এবং সামাজিক অবস্থাকে ভিত্তি করিয়াই সাধিত হওয়া সম্ভব। সুতরাং বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে আন্তর্জাতিকতাবোধের প্রয়োজন যেমন রহিয়াছে, সেইরূপ জাতীয়তাবোধের গুরুত্বও আছে। পণ্ডিত নেহরু এই কথাটা খুলিয়াই বলিয়াছেন। ফলত জাতীয়তাবোধকে ভিত্তি করিয়াই দুর্গত জাতিসমূহ নূতন জীবনে জাগিয়া উঠিতেছে। এই জাতীয়তাবোধকে সাংস্কৃতিক পথে সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত করিয়া উদার ও সম্প্রসারিত করাই বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার পক্ষে বর্তমানে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

পরলোকে শান্তিস্বরূপ ভাটনগর

ডাঃ শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের পরলোক-গমনে ভারত একজন প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিককে হারাইল। চৌম্বক রসায়ন এবং শিল্পগত রসায়নে শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের গবেষণা সমগ্র বিশ্বের স্বীকৃতি এবং প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। ভারতীয় রাসায়নিকগণের মধ্যে একমাত্র ডাঃ ভাটনগরই ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটির সদস্যস্বরূপে বিশিষ্ট বিজ্ঞানীর সম্মান ও সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভারতে বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্য ডাঃ ভাটনগরের অবদান বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য। ১৯৪০ সাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তিনি ভারত সরকারের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও শিল্প সম্পর্কিত গবেষণার ডিরেক্টর পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ঐ সময়ের মধ্যে ডাঃ ভাটনগরের চেষ্টায় কতিপয় গবেষণাগার গড়িয়া উঠিয়াছে এবং সেগুলিতে উচ্চাঙ্গের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাঁহার আকস্মিক মৃত্যুতে এই সব কল্যাণকর উদ্যোগ ব্যাহত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হইল, ইহা আক্ষেপের বিষয়। প্রত্যুত ডাঃ ভাটনগর তাঁহার স্বদেশ এবং দেশবাসীর জন্য যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। আমরা তাঁহার পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি ও তাঁহার পরিজনবর্গের শোকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।

তথাকথিত "কলম্বো শক্তিপঞ্চকের"—অর্থাৎ ভারত, পাকিস্তান, সিংহল, বর্মা এবং ইন্দোনেশিয়ার—প্রধানমন্ত্রীদের সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত বৈঠকে স্থির হয়েছে যে, নিম্নলিখিত ২৫টি রাষ্ট্রকে প্রস্তাবিত এ্যাফ্রো-এশিয়ান কনফারেন্সে আমন্ত্রণ জানানো হবে—চীন, জাপান, ফিলিপিনস্, থাইল্যান্ড, উত্তর ভিয়েৎনাম, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, লাওস, ক্যাম্বোডিয়া, নেপাল, আফগানিস্তান, ইরাণ, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন জর্ডান, সৌদী আরব, ইয়েমেন, তুর্কী, মিশর, সুদান, ইথিয়োপিয়া, সেণ্ট্রাল আফ্রিকান ফেডারেশন, গোল্ড কোস্ট, লাইবেরিয়া এবং লিবিয়া। কনফারেন্স এপ্রিল মাসে হইবে। আমন্ত্রিত রাষ্ট্রগুলির প্রধানমন্ত্রীরা এবং/অথবা পররাষ্ট্র মন্ত্রীরাই কনফারেন্সে যোগ দিবেন। কেবল পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্রগুলিকে আমন্ত্রণ করা হবে, এই নীতি অনুসারেই নাকি নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে কিন্তু নিমন্ত্রিত দেশগুলির মধ্যে কয়েকটি রয়েছে যাদের কোনরকমেই পূর্ণ স্বাধীন বলা চলে না। যাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে তাদের মধ্যে কেউ কেউ কনফারেন্সে যোগ দেবে না, এরূপ সম্ভাবনা রয়েছে। যেমন তুর্কী থাইল্যান্ড ও ফিলিপিনস্ কনফারেন্সে যোগ দেবে কিনা সন্দেহ। এরা যোগ দেবে না, এ সম্ভাবনা জেনেই তাদের নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে।

অথচ ইজরেলকে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে না। ইজরেল কনফারেন্সে যোগ দেবে কি দেবে না, এ প্রশ্নের সংগে ইজরেলকে নিমন্ত্রণ না করার কোনো সম্পর্ক নেই। ইজরেলকে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে না, কারণ তাতে আরব দেশগুলির আপত্তি এবং পাকিস্তান (এবং সম্ভবত ইন্দোনেশিয়াও) মুসলিম দেশ হিসাবে এই আপত্তি সমর্থন করাতেই ইজরেলকে নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে না। এইরূপ নাকি আশংকা করা হচ্ছে যে, ইজরেলকে নিমন্ত্রণ করলে আরব এবং মুসলিম দেশগুলি কেউ কনফারেন্সে আসবে না।

এই ভয়ে যদি ইজরেলকে নিমন্ত্রণ না করা সাব্যস্ত হয়ে থাকে তবে প্রস্তাবিত এ্যাফ্রো-এশিয়ান কনফারেন্সের মূল্য কনফারেন্স হওয়ার আগেই অনেকখানি নষ্ট হয়ে গেল। এই কনফারেন্সের "নৈতিক" ভিন্ন অন্য কোনরকম মূল্য বিশেষ কিছু হবে, এরূপ আশা করার কারণ কোন সময়েই পূর্বে ছিল না, এখন সে আশাও অনেকটা গেল। কারণ গোড়াতেই যাঁরা এরূপ নৈতিক দুর্বলতা দেখালেন তাঁদের আহূত কনফারেন্সের বিশেষ কোনো নৈতিক ফল আশা করা যায় না। ইজরেলের সংগে আরব দেশগুলির ঝগড়া আছে বলে ইজরেলের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে হবে, এই জুলুম মেনে নেয়াতে প্রস্তাবিত এ্যাফ্রো-এশিয়ান কনফারেন্সের ভিত্তিরই নৈতিক জোর চলে গেল।

জ্যাকর্তা থেকে ফেরার পরে পণ্ডিত নেহরু কলকাতায় সাংবাদিকদের সংগে সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, সর্বসম্মতিক্রমে কাজ করার নীতি অনুসরণ করার জন্যই ইজরেলকে বাদ দিতে হয়েছে। "সর্বসম্মতি"র অর্থ কী? ইজরেলকে নিমন্ত্রণ করতে পাকিস্তানের অনড় অসম্মতি ছিল, অন্যেরা ইজরেলকে নিমন্ত্রণ না করার কোনো সংগত কারণ না দেখা সত্ত্বেও পাকিস্তানের মতে মত দিয়ে অর্থাৎ নিজেদের মত বিসর্জন দিয়ে "সর্বসম্মতি" সৃষ্টি করলেন—এই তো? অন্ততপক্ষে ভারত, বর্মা এবং সিংহলের পক্ষে ইজরেলকে নিমন্ত্রণ থেকে বাদ দেয়ার কোনো ইচ্ছা থাকতে পারে না।

তবে কি এর মধ্যে আর একটা কোনো লেন-দেনের ব্যাপার ছিল? এমন হ'তে পারে যে, পাকিস্তান চীনকে নিমন্ত্রণ করার বিরুদ্ধে ছিল এবং শেষ পর্যন্ত এই রকম একটা রফা হোল যে, যদি ইজরেলকে নিমন্ত্রণ না করা হয় তবে পাকিস্তান চীনের নিমন্ত্রণে আপত্তি করবে না। ইহাই কি "সর্বসম্মতি"র গূঢ় কথা? তাই যদি হয়, তবে নৈতিক দিক থেকে তা আরো গর্হিত। বাহ্যিক গুরুত্বের পরিমাণে চীনের সংগে ইজরেলের কোনো তুলনাই হতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নৈতিক দিক থেকে বড়ো দেশকে ঢুকানোর জন্য ছোট দেশকে বাতিল করে যে কার্যারম্ভ তার ফল সম্বন্ধে বিশেষ আশান্বিত হওয়া যায় না। ইজরেলকে বাদ দেওয়ার দ্বারা চীনের প্রবেশ সম্ভব হয়েছে, এই যদি সত্য হয় তবে সেটা

চীনের পক্ষেও সম্মানজনক নয়, চীনের পক্ষে সত্যই খুব অসম্মানজনক। পাকিস্তান যদি চীনকে নিমন্ত্রণ করতে আপত্তি করে থাকে তবে সে প্রশ্নের বুঝাপড়া আলাদাভাবে করা উচিত ছিল। চীনের প্রবেশের পরিবর্তে ইজরেলের বহিষ্কার—এই ধরনের যদি "সওদা" হয়ে থাকে তবে চীনকে নিমন্ত্রণ করার জন্য যাঁরা আগ্রহশীল ছিলেন তাঁরা নিজেদের এবং চীনের সমভাবেই অবমাননা করেছেন। এ সম্পর্কে ভিতরের ঘটনা প্রকাশিত হওয়া উচিত। কর্তব্য ছিল সকলকেই নিমন্ত্রণ করা, চীনকে তো বটেই। যদি কোনো দেশ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে তবে সে তার নিজের দায়িত্বে। ইজরেলকে নিমন্ত্রণ করলে যদি আরব দেশগুলি কনফারেন্সে না আসে তবে তার দায়িত্ব তাদের উপরই ফেলে দেয়া উচিত ছিল। তা না করে এইরকম অন্যায় আবদারের প্রশ্রয় দেয়া আন্তর্জাতিক ব্যবস্থায় একটি কু-দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হোল।

শুধু তাই নয়, এর দ্বারা আরব দেশগুলিরও ক্ষতি করা হচ্ছে। আগে থাকতে তাদের আবদার রক্ষা করার চেষ্টা না করে যদি সবার সঙ্গে ইজরেলকেও নিমন্ত্রণ করা হোত তবে আরব রাষ্ট্রগুলিকে নিজেদের কার্য সম্বন্ধে চিন্তা করার এবং দায়িত্বজ্ঞানের পরীক্ষা দেবার একটা সুযোগ দেয়া হোত। এটা অসম্ভব নয় যে, "কলম্বো শক্তি"রা যদি সত্যই একটি সুষ্ঠু নীতির অনুসরণ করে সকলকে এবং তার মধ্যে ইজরেলকেও নিমন্ত্রণ জানাতো তাহ'লে আরব রাষ্ট্রগুলি অথবা উহাদের মধ্যে কেউ কেউ হয়ত ইজরেলের উপস্থিতি সত্ত্বেও কনফারেন্সে যোগ দেয়ার সুযোগ উপেক্ষা করত না। যাই হোক, নৈতিক ফল ছাড়া অন্য কোনরকম ফললাভের আশা যেখানে নেই, সেখানে গোড়াতেই নীতিত্যাগ করা বড়ো বিসদৃশ ব্যাপার। যে এ্যাফ্রো-এশিয়ান কনফারেন্সের সম্পর্কে এতো লম্বাচোড়া কথা বলা হচ্ছে তার উদ্যোক্তারা যদি এশিয়াস্থ সম্পূর্ণ স্বাধীন অথচ ক্ষুদ্র ইজরেলের অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করতে কুণ্ঠিত হন তবে তাঁরা যে জগতের সামনে কী মহান্ নৈতিক সৎসাহসের পরিচয় দিবেন তা বুঝা কঠিন।

অবশ্য এখানে ইজরেলের দোষগুণ বিচারের কোনো কথা নেই। ইজরেল ও আরব রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ঝগড়ার ন্যায় অন্যায় বিচারের কথাও তোলা হচ্ছে না। সে-সব প্রশ্ন এখানে বিচার্য নয়। চীনকে স্বীকার না করা যেমন আমেরিকার পক্ষে পাগলামি বলে আমরা মনে করি, ইজরেলকে অস্বীকার করাও আরবদের পক্ষে তেমনি পাগলামি, যদিও আয়তনে ও গুরুত্বে চীনের সঙ্গে ইজরেলের তুলনা হয় না। যদি ভারত গভর্নমেণ্ট আরবদের মতো ইজরেলের অস্তিত্ব অস্বীকার করতে না চান তবে পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে চীনকে নিমন্ত্রণ করার জন্যও যেমন, ইজরেলকে বাদ না দেবার জন্যও তেমনি সমান জোর করা উচিত ছিল।

নিমন্ত্রিত দেশসমূহের তালিকার মধ্যে আর একটা জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করার আছে। ইন্দোচীনের লাওস, ক্যাম্বোডিয়া এবং ভিয়েৎনামের উত্তর ও দক্ষিণ উভয় খণ্ডের গভর্নমেণ্টকেই আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। অবশ্য ভিয়েৎনামকে নিমন্ত্রণ করতে হলে উত্তর ও দক্ষিণ খণ্ডের গভর্নমেণ্টকে আলাদা আলাদা নিমন্ত্রণ করা ছাড়া উপায় নেই। তবে সকলেই একরকম ধরে নিচ্ছে যে, উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম অনির্দিষ্টকালের জন্য আলাদা হয়েই থাকবে। কোরিয়াও দ্বিধাবিভক্ত, উত্তর কোরিয়া এবং দক্ষিণ কোরিয়াকেও কেন নিমন্ত্রণ করা হোল না, এই প্রশ্নের জবাবে বলা হয়েছে যে, কোরিয়া কার্যত বিভক্ত হ'লেও দক্ষিণ কোরিয়া সরকার সমগ্র কোরিয়ার প্রতিনিধিত্ব দাবী করেন বলে কোরিয়ার কোনো অংশের গভর্নমেণ্টকেই নিমন্ত্রণ করা হচ্ছে না। ভিয়েৎনামের দুই গভর্নমেণ্টের স্ব স্ব এলাকা জেনেভা চুক্তির দ্বারা সীমিত হয়েছে। জেনেভা চুক্তিতে ১৯৫৬ সালে সমগ্র ভিয়েৎনামে সাধারণ নির্বাচনের দ্বারা এক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠার কথাও অবশ্য আছে। কিন্তু তা কেউ বিশ্বাস করে না। ভিয়েৎনাম দু'ভাগ হয়েই থাকবে, এই ধারণাই প্রবল হচ্ছে। তা যদি না হোত তবে হয়ত এ্যাফ্রো-এশিয়ান কনফারেন্সের উদ্যোক্তারা ভিয়েৎনামের দুই ভাগকে এখন এমন করে নিমন্ত্রণ করতেন না। যাই হোক, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের কনফারেন্সে যোগদান সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

* * *

শেষ পর্যন্ত ফরাসী পার্লামেণ্ট—অতি অল্প ভোটাধিক্যে—পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ সম্পর্কিত চুক্তিগুলির অনুমোদন করেছে। তদনন্তর য়ুরোপীয় পরিস্থিতি আগামী সপ্তাহে আলোচনার জন্য থাকল।

৩ জানুয়ারী, ১৯৫৫

উৎসবমুখর শান্তিনিকেতন

কিরণকুমার রায়

বোলপুর থেকে শান্তিনিকেতনের পথ। নরম রোদ আর হিম হাওয়া। শীতে কাঁপছে দেহ, রিক্সা ছুটছে। কোটটাকে আর একটু চেপে চুপে নাও, বসো শান্ত হয়ে, আর শোনো গান। গান গাইছে একদল ছেলে, দল বেঁধে কাঁধের ঝুলিতে কাপড়জামা আর কম্বল ঝুলিয়ে চলেছে পায়ে হেঁটে। লাল মাটি, উঁচুনিচু, ভাঙাচোরা প্রান্তর। এক পায়ে দাঁড়ানো তাল গাছ আর মাঝে মাঝে নির্জন দু'একটা একতলা বাড়ি।

৭ই পৌষের সকাল হলো শান্তিনিকেতনে। রিক্সা এসে থামলো সিংহ সদন, শ্রীসদন আর সংগীত ভবনে। সদলবলে আমরা নামলুম। খুশীর হাওয়া মেলে গেছে আমার মনে। আশ্চর্য এক উৎসবের তীরে এসে পেঁৗছলুম। লাল কাঁকর, গেরুয়া বালি আর নয়নাভিরাম উদ্যানপল্লী শান্তিনিকেতনে।

এই সব-পেয়েছির দেশে যে শান্ত সুন্দর নির্জনতা স্মিত হাসির মতো ছড়িয়ে থাকে, উৎসবের দিনে তা ভেঙে গেছে জনতারণ্যে। ভিড় জমেছে এখানে ওখানে, এ-পথে ও-মাঠে। অজস্র মানুষ এসেছেন উৎসবের আনন্দে যোগ দিতে, আশে পাশের গ্রাম শহর, নগর কলকাতা, দেশ বিদেশ থেকে। বিভিন্ন বিচিত্র মানুষ। কারো গায়ে দামী বিলিতি পোশাক, বহুমূল্য শাড়ি, রুজ লিপস্টিক। ছেঁড়া চাদর আর আধ ময়লা ধুতিজামা কারো গায়ে। গুজরাট থেকে এসেছেন, এসেছেন চৈনিক নরনারী, এসেছেন মার্কিন - য়ুরোপীয় - আফ্রিকান মানুষ। এসেছেন শিল্পী সাহিত্যিক সাংবাদিক রাজনৈতিক লোক, সাধারণ জীবনের সহজ নরনারী।

আমাদের গুরুদেব
শিল্পী—বিনায়ক মাসোজী

এসে মিলেছেন এই সুন্দর শান্তিনিকেতনে। স্বচ্ছ নীল আকাশের নিচে লাল মাটি আর সবুজ গাছপালা এবং ছোট ছোট বাড়ি ছবির মতো সুচিত্র শান্তিনিকেতনে। সকলের মুখে খুশীর আভা, আচরণে সংগীতের রেশ। আজ ৭ই পৌষ, তিনদিনের উৎসবের শুরু।

একশ বছর আগে এই দেশ ছিল

আচার্য বরণ

ধুধু বালির মরুপ্রান্তর। কৃপণ দু'-একটা গাছ কদাচিৎ মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল। আজ সে চেহারা মনে আনা যায় না, ভাবা যায় না এই উদ্যান-পল্লী ছিল চোরডাকাতের ভয়ে থমথম থমথম নিঃসঙ্গ খোলা মরু-মাঠ। এই মরুমাঠ দিয়ে একদা যাচ্ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ। এখানকার এক নির্জন ছাতিম গাছের তলায় এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেছিলেন তিনি। উদার উন্মুক্ত আকাশের নিচে নিরাভরণ প্রান্তরবেলায় গাছের ছায়ায় বসে তার মনে খেলে গিয়েছিল আশ্চর্য শান্তির তরঙ্গ। সেই শান্তি তিনি অনুভব করেছিলেন যা জীবনের মহৎ অনুভূতির পরম বিকাশ।

আজ ৭ই পৌষের এই হিম সকালে আমি অনুভব করতে চাইছিলুম মহর্ষির সেই বিচিত্র অনুভব। তার ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র তিলাংশ অনুভূতি। মহর্ষির প্রতিষ্ঠিত শান্তিনিকেতনে, রবীন্দ্রনাথের গড়া শান্তিনিকেতনে। ১৩৬১ সালের এই সকালে।

সেই ছাতিমতলায় সকাল সাড়ে সাতটায় আজ উপাসনা। ছাতিমতলায় এখন সুন্দর বেদী বাঁধানো। বেদীর পায়ে উঁচু জমিতে উপাসনার চত্বর তৈরি। তার নিচে গাছের তলায় ঘাসের কার্পেটের ওপর বসেছেন মেয়েরা, তার পেছনে কিছু বসে, কিছু দাঁড়িয়ে পুরুষ। শ্রীতপন-মোহন চট্টোপাধ্যায় পাঠ করলেন উপনিষদ থেকে স্তোত্র আর বাংলা অনুবাদ, প্রার্থনার সঙ্গে সুর মিলিয়ে গাইলেন বিশ্বভারতীর শিল্পীরা রবীন্দ্র সঙ্গীত। মনে পড়লো, রবীন্দ্রনাথ আজকের এই স্মরণীয় দিনটির ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছিলেন,

> 'একদিন যাঁর চেতনা-বিলাসের আরামশয্যা থেকে হঠাৎ জেগে উঠেছিল —এই ৭ই পৌষ দিনটি মহর্ষি দেবেন্দ্র-নাথের দিন। এই দিনটিকে তিনি আমাদের জন্য দান করে গিয়েছেন। রত্ন যেমন করে দান করতে হয়, তেমনি করে দান করেছেন। এই দিনটিকে এই আশ্রমের কৌটোর মধ্যে দান করে দিয়ে গিয়েছেন। আজ কৌটোটি উদ্ঘাটন করে রত্নটিকে এই প্রান্তরের আকাশের মধ্যে তুলে ধরে দেখবো—এখানকার ধূলি-বিহীন নির্মল নিভৃত আকাশতলে যে নক্ষত্রগুলি দীপ্তি পাচ্ছে—সেই তারা-গুলির মাঝখানে তাকে তুলে ধরে দেখবো। সেই সাধকের জীবনের ৭ই পৌষকে আজ উদ্ঘাটন করার দিন—সেই নিয়ে আজ উৎসব করি।'

ছাতিম তলার উপাসনা থেকে ফিরে এলুম। আজ উৎসব করি। আজ উৎসব। কিসের উৎসব? অতিথিশালার সামনে দিয়ে মন্দিরের দক্ষিণ পাশে তোরণের পায়ে এসে দাঁড়ালুম। ভিড়, ভিড়। যে দিকে চোখ যায়, লোকে লোকারণ্য। বাঁ পাশে অশ্বত্থ গাছের তলায় বাউল সম্প্রদায় নাচছে আর গাইছে। বেষ্টন করে জনতা।

সেই জনতার ওপাশে স্বেচ্ছাসেবকদের কুটীরের গায়ে খোলা মাঠটায় গোটা দশেক হরেক রকম নাগরদোলার ভিড় জমেছে। প্রত্যেকটি দোলার পাখায় ভরে গেছে সুন্দর শাড়ি পরা মেয়ে আর ছেলে। উচ্ছল হাসি আর বোঁ বোঁ শব্দ। আনন্দের ফোয়ারা ওদিকে।

উত্তর দিকে রাস্তার পুব পাশে মেলা-দপ্তরের পেছনে ভ্রাম্যমান পশুশালা। নগদ দক্ষিণা দিয়ে ঢুকছে ছেলেমেয়েরা। শহুরে শৌখীন ছেলেদের সঙ্গে গ্রাম্য অর্ধউলঙ্গ মাটির শিশুরা।

রাস্তাটা পেরিয়ে গিয়ে ঢুকলুম মেলা প্রাঙ্গণে। বাঁ পাশে বিশ্বভারতীর শিল্প-সম্ভারের বিপণি, কয়েকটা বই-এর স্টল আর দীঘল একটা লাইন রেস্তোরাঁ আর কাফে। সব থেকে ভিড় পৌষালি, কালোর দোকান আর ডি জীতে। বসবার জায়গা নেই, ভিড় সামনে। সবগুলো রেস্তোরাঁই লোকে লোকারণ্য। গত বছর মাঠের একাংশ জুড়ে বসেছিল এই মেলার বিপণি। এ বছর তার চত্বর বেড়েছে, গ্রাস করেছে সবটুকু প্রান্তর। মাঝখানে সামিয়ানা টাঙিয়ে জায়গা করা হয়েছে কবি গানের। কবি গান দুপুর একটায়। সন্ধ্যায় সে জায়গায় আরম্ভ হবে যাত্রার পালা।

মেলা প্রাঙ্গণটা দু'ভাগে বিভক্ত।

ভাষণদান রত নেহর

একটা উত্তমাংশ, অন্যটা অধমাংশ। মনে হলো আমার। উত্তমাংশে শিল্পসম্ভার। বইএর দোকান আর ভদ্রজনের খাবার ঘর। রাস্তার উত্তরাংশে অধম অংশ। সেখানে নানান বিপণিমালা। কাছাকাছি শহর গ্রাম থেকে এসেছে ছোট ছোট দোকান, কোন কোন দোকান কেবল এ-মেলা সে-মেলা আর এ-স্থান ও-স্থান ঘুরে বেড়ায়। ভ্রাম্যমান দোকানদার। হরেক রকম দোকান সেখানে। কাচের চুড়ি, পেতলের রূপোর গয়না, স্টুডিও, লোহার নানা সাংসারিক জিনিসপত্র, স্টেশনারী, জুতোর দোকান ,মিষ্টির দোকান, বস্ত্রালয়, বটতলার বই, সস্তা ফাউন্টেনপেন ও ঘড়ি, কী নেই সেখানে? সব আছে, সব ধরনের জিনিস পাওয়া যাবে সেখানে, যা আপনি চান। তবে দাম একটু চড়া। পুষিয়ে নিতে হবে রেল ভাড়ার খরচ আর বিদেশ ব্যয় এই বাড়তি মুনাফায়। কলকাতা বা অন্যান্য শহর থেকে যাঁরা গেছেন, তাঁদের বড় একটা পদার্পণ ঘটে না এখানে। এখানে ভিড় আশেপাশের গ্রামের মানুষদের, সাঁওতাল মেয়েদের। বছরের এ কয়টা দিনের জন্য তারা তাকিয়ে থাকে, আসে ভিড় করে এ সব দোকান-পত্তরে, কেনে শখের জিনিস। কেনে চুড়ি, শাড়ি, জুতো আর যা চাই, যদি অর্থে কুলোয়। নইলে তাকিয়ে থাকে অমাবশ্যার মতো মুখ করে জিনিসপত্তরের দিকে। এত জিনিসের দরকার এ জীবনে, না হলে চলে না কিছুতেই, কিন্তু অর্থের থলি শূন্য।

অর্থের থলি যেখানে শূন্য নয়, অথবা যে সব ঘরের মেয়েরা গর্বের ঝুলি হাতে চড়িয়ে পথে বেরোন, তাঁরা ভিড় করেন মেলা প্রাঙ্গণের উত্তমাংশে। বিশ্বভারতীর শিল্পসম্ভার কেনেন, এ-রেস্তোরাঁ সে-রেস্তোরাঁয় চা খান, কফি খান। আর ঘুরে বেড়ান উদ্দেশ্যহীন মন্থর চক্রে মেলা-প্রাঙ্গণে সদলবলে। তাঁদের পোশাক চমকপ্রদ, মুখের নিরক্ত মীনাও ভয়ংকরা। মনে আছে কয়েক বছর আগে, এই পৌষের মেলায় দেখা হয়েছিল কলকাতার একটি মেয়ের সঙ্গে। তিনদিন তার সঙ্গে থাকতে হয়েছিল একত্রে ঘুরে বেড়াবার দায়িত্ব নিয়ে, পরিচিতির সূত্রে।

ঘণ্টায় ঘণ্টায় সে শাড়ি বদলাতো। জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'তুমি কি শাড়ির দোকান নিয়ে এসেছো এখানে?'

বলেছিল, 'নইলে কি করতে এসেছি?' কিছুটা রহস্য ছিল কথার ভঙ্গীতে, তবু আমার মনে হয়েছিল এখানের এই উৎসবের অর্থ বোঝে না অনেকেই, এদের মতো।

পরিচয় হয়েছিল বিশ্বভারতীর একটি ছাত্রীর সঙ্গে। হিন্দী ভবন, চীনা ভবনের পাশের রাস্তা দিয়ে আমরা হাঁটছিলুম। বলেছিল, 'এই উৎসবের দিনগুলো আমার ভালো লাগে না। কলকাতা থেকে এমন সব লোক আসেন, যাঁদের ব্যবহার এখানকার মাটি হাওয়ার অপমান।'

ঝকঝকে পোশাকে তাদের অনেককে চেনা যায় না। রঙ চঙে কিম্ভূতকিমাকার হয়ে অনেকে থাকে মাকাল ফলের মতো। নইলে তারাও বোঝে না এখানকার মাটির অর্থ, যেমন বোঝে না কালোদেহ গ্রামীণ সাঁওতালরা।

ওরা অশিক্ষিত। ও'রা কুশিক্ষিত। শিক্ষার এই ব্যর্থতা দূর করে প্রাণের মধ্যে
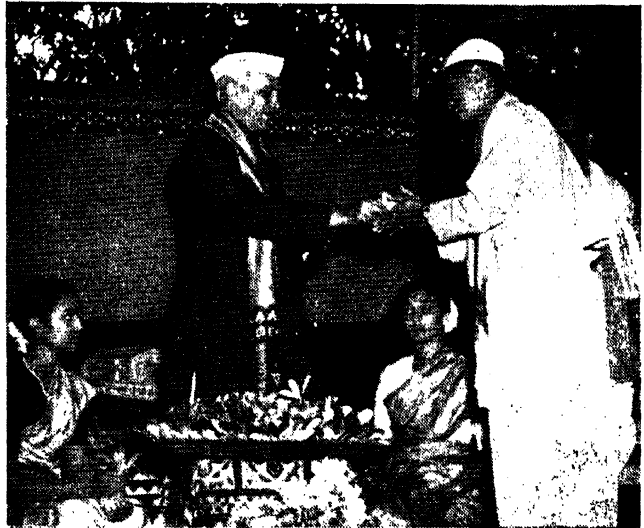
চীনদেশের স্নাতক মাও সে তুঙকে পণ্ডিত নেহরু আশীর্বাদ করছেন

শান্তিনিকেতনে শিল্পাচার্যের গৃহে আচার্য নন্দলাল, প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল ও আচার্য পত্নী সুধীরা দেবী ফটোঃ সুজিত মিত্র

যথার্থ জীবনের মশাল জ্বালিয়ে দেবার জন্যই এখানে রবীন্দ্রনাথের মহৎ সাধনা দিনে দিনে এই শান্তিনিকেতন, এই বিশ্বভারতী গড়ে তুলেছে। তেষট্টি বছর আগে কবি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়, তার আঠেরো বছর পর বিশ্বভারতী। শিক্ষার যে গোলামখানায় অপচিত হচ্ছিল দেশের প্রাণ; তার থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন ভারতবর্ষ জন্ম নিয়েছিল প্রাচীন মর্মের রক্তরেখায় এই রুক্ষ রক্তিম মাটিতে। তাই শান্তিনিকেতনে এসে আমাদের প্রণাম, আমাদের প্রাণের আনন্দ। আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার দিনে কবি বলেছিলেন,

> 'বর্তমানে আমাদের দেশে জীবনের বড় লক্ষ্য আমাদের কাছে জাগ্রত হয়ে ওঠেনি, কেবলমাত্র জীবিকার লক্ষ্যই বড়ো হয়ে উঠল। জীবিকার লক্ষ্য শুধু অভাবকে নিয়ে প্রয়োজনকে নিয়ে; কিন্তু জীবনের লক্ষ্য পরিপূর্ণতা নিয়ে...বিশ্বভারতী একটা মস্ত ভাব, কিন্তু সে অতি ছোট দেহ নিয়ে আমাদের আশ্রমে উপস্থিত হয়েছে। কিন্তু ছোটর ছদ্মবেশে বড়োর আগমন পৃথিবীতে প্রতিদিনই ঘটে। অতএব আনন্দ করা যাক, মঙ্গলশঙ্খ বেজে উঠুক।'

আজ শান্তিনিকেতনে সেই উৎসব। সেই মঙ্গল শঙ্খ। নানান মানুষ এসে মিলেছেন এখানে এ উৎসবে। পাশের ভুবনডাঙ্গা, পারুলডাঙ্গা, সুরুল, বল্লভপুর, গোয়ালপাড়া ইত্যাদি গ্রাম থেকে এসেছেন পায়ে হেঁটে, গরুর গাড়ী চড়ে গ্রামীণ মানুষ, এসেছেন মোটরে জীপে রেলে শহরে শৌখীন ভদ্রজনতা। সবায়ের সমবেত আনন্দে ও মিলনে পূর্ণ হোক মেলার পারস্পরিক চেনাজানা মেলামেশা। শুভ কামনা ও সহমর্মিতার সঙ্গীত উচ্চারিত হোক মঙ্গল শঙ্খে।

এগারোটা না বাজতেই উত্তরায়ণের পথে ভিড়। পথের দু' পাশে জনতা জমে উঠতে লাগলো। বিশ্বভারতীর জাতীয়সমর শিক্ষার্থী দল ও অল্প কিছু পুলিস জননিয়ন্ত্রণ ও পাহারায় ব্যস্ত।

কি ব্যাপার?

জওহরলাল আসছেন। ছাব্বিশ মাইল দূরের পানাগড় সামরিক এরোড্রোম থেকে আসবেন এখানে। দু'দিন থাকবেন শান্তিনিকেতনে। জাকার্তার পথে নামবেন। সঙ্গে ভি কে কৃষ্ণমেনন ও সৈয়দ মামুদ। এখানকার প্রাক্তন অধ্যাপক অধুনা ভারতের সহকারী পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীঅনিলকুমার চন্দও উপস্থিত থাকবেন উৎসবে। আর আসছেন প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের ডাঃ ভাটনগর।

জওহরলাল বিশ্বভারতীর আচার্য। বক্তৃতা করবেন তিনি ৮ই পৌষের সমাবর্তন উৎসবে।

দেশের স্বাধীনতা না পাওয়া পর্যন্ত বিশ্বভারতীর স্বপ্ন যথার্থ সার্থক হতে পারে নি। যে শিক্ষা ব্যবস্থায় কবির সম্মতি ছিল না, পাঠ করাতে হয়েছে সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন তালিকা, তাদের পরীক্ষা গ্রহণ করতে হয়েছে এখানে। এমন একটা বাধা ছিল যা উত্তীরণ হতে না পারলে এখানকার আশ্রমে কবি যে কল্পনা রচনা করে গেছেন, তা সত্য হতে পারে না। দেশের স্বাধীনতা বিশ্বভারতীর মুক্তি এনে দিয়েছে। এবার বিশ্বভারতীকে যথার্থরূপে সার্থক করার পালা। যাঁদের উপর এ দায়িত্ব ন্যস্ত, তাঁরা জাতির কর্তব্য পালন করছেন। সকলেই আশা করেন, এ কর্তব্য পালনে তাঁদের ত্রুটি হবে না। যথার্থ সার্থক হবে কবির বিশ্বভারতীর স্বপ্ন।

জওহরলালের সঙ্গে বিশ্বভারতীর অনেকদিনের সম্পর্ক। রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধায় এখানকার সব কিছুর প্রতি তাঁর অনুরাগ।

শান্তিনিকেতনের প্রতি জওহরলালের প্রীতি অনুভব করেছি সর্বসময়। দুপুরে এসেই হঠাৎ জীপে চড়ে এসেছেন মেলা প্রাঙ্গণে, এক চক্কর ঘুরে দেখেছেন। জনতা ভিড় করতেই ফিরে গেছেন উত্তরায়ণে। সমাবর্তন উৎসবে বক্তৃতা দিয়ে স্নানাহার সেরে ঘুরে দেখেছেন শান্তিনিকেতনের নানা ভবন ও সদন। কীচেনে তখন খাওয়া শুরু হবে, ঢুকে গেছেন তার মধ্যে। দেখেছেন খাবার ব্যবস্থা, ছাত্রীরা অনুরোধ জুড়েছে, একটু খান জওহরলালজী, একটু খান।'

খাবার একটু মুখে তুলে নিয়েছেন। মনে হয় নি, আমার কোন সময়ই মনে হয় নি, তিনি শাসন কর্ণধার এই ভারতভূমির

বিশ্বভারতীর এম-এ ডিগ্রীপ্রাপ্ত বাঙালী ছাত্রকে আচার্য নেহরু আশীর্বাদ করছেন

বিস্তৃত জনপদের। পুলিসের আড়ম্বর তিনি পছন্দ করেন না। স্বল্প পুলিস ছিল তাঁর পিছনে লুকিয়ে লুকিয়ে। জনসাধারণের সঙ্গে পুলিসের সম্পর্কটা জওহরলালের সামনে মধুর না হয়ে উপায় নেই। আমার মনে হচ্ছিল শাসক নয় মনীষী জওহরলাল, আন্তর্জাতিক বিরাট খ্যাতিসম্পন্ন সহৃদয় মনীষী।

আমরা দাঁড়িয়ে আছি গাড়ির পাশে। কয়েকজন ক্যামেরা ঠিকঠাক করে ধরে আছেন। কীচেনের নানান জায়গা দেখে বেড়ালেন জওহরলাল। উপাচার্য ডাঃ বাগচী সঙ্গে, কৃষ্ণমেনন ও সৈয়দ মামুদ সহচর।

স্মিত হাসি মুখে জওহরলালের, এসে গাড়িতে উঠলেন। উপাচার্য পাশে, পরের গাড়িতে কৃষ্ণমেনন। বিশ্বভারতীর ছাত্রী একজন দু' হাত তুলে চেঁচিয়ে বল্লে, 'আবার আসবেন জওহরলালজী।'

কথাটা বুঝতে পারলেন তিনি, কিন্তু জবাব দিতে পারলেন না। বাংলা জানেন না যে।

মেয়েটি বল্লে, 'বলুন, আসবো।'
জওহরলাল বল্লেন, 'আসবো।'

স্মিতমুখে প্রসন্ন আত্মীয়তার সুস্পষ্ট ছায়া। সেই মেয়েটি যেমন ভালোবাসে শান্তিনিকেতনকে, তার থেকে কম নয় জওহরলালের। আবার আসবার ইচ্ছা ব্যক্ত করেছেন তিনি বিশ্বভারতী সংসদের কাছে। তিনি আবার আসবেন, বারবার।

কলাভবন, সঙ্গীত ভবন ঘুরে ঘুরে দেখেছেন তিনি। তারপর গেছেন আচার্য নন্দলাল বসুর ভবনে। আচার্য বসু অসুস্থ, দেখতে গেছেন কেমন আছেন শিল্পী, সৌজন্য নয় সহমর্মিতা।

৮ই পৌষ সকাল না হতেই আম্রকুঞ্জে ভিড়। সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হবে এখানে। সুন্দর আলপনা আঁকা হয়েছে, নীল সামিয়ানা টাঙানো। সাড়ে আটটার একটু আগে এলেন জওহরলাল উপাচার্য ডাঃ বাগচীর সঙ্গে, পেছনে শোভাযাত্রা করে বিশ্বভারতীর কর্ণধারবৃন্দ। হলুদ চাদর সকলের কাঁধে। মাটির মতো গৈরিক লম্বা কোট পরেছেন জওহরলাল, লাল গোলাপ কোটের মাথায়। কাঁধের দু পাশ দিয়ে এসে পড়েছে বিশ্বভারতীর হলদে চাদর। একটা নতুন রূপ জওহরলালের, প্রধান মন্ত্রী নয় বিশ্বভারতীর আচার্যের।

সংস্কৃত স্তোত্র পাঠ হলো, শুভেচ্ছাজ্ঞাপনী চিঠি পাঠ করে শোনানো হলো। মন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন পাঠ করলেন প্রধান অতিথি ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাষণ। ডাঃ রায় অসুস্থতার জন্য অনুপস্থিত এই উৎসবে। সাতটি ছাতিমপাতার গুচ্ছ দান করলেন আচার্য জওহরলাল প্রত্যেক স্নাতক ও উচ্চতর উপাধি প্রাপককে। তারপর হিন্দীতে বক্তৃতা করলেন তিনি। বল্লেন, গুরুদেবের অসমাপ্ত কাজ আমাদের সমাপ্ত করতে হবে।

শান্তিনিকেতনের এই উৎসবে বাঙলা লোক-সংস্কৃতির নানা রূপ চোখে পড়ে। বাউল, কীর্তন, যাত্রা, কবিগান, সাঁওতাল নৃত্য। নাগরিক সভ্যতার চাপে ধীরে ধীরে যা অবলুপ্তির পথে, এখানে তাদের সাদর সহানুভূতি। আর সবগুলো জায়গাতেই রসজ্ঞদের ভিড়। নেচে নেচে গান করে বাউল একতারা বাজিয়ে, দোঁহা তুলে কবির লড়াই চলে, ভক্তির রসধারা ওঠে কীর্তনের অমিয়সুরে—সর্বত্রই ভিড়, ভিড়। আমাদের অতীত যুগকে যে রূপ-সংস্কৃতি আনন্দদান করেছে, যা এখন ক্ষয়িষ্ণু; শান্তিনিকেতনের এই উৎসবের মধ্য দিয়েও যদি তার সমাদর একটু বাড়ে, তাহলে তাই বা মন্দ কী! সাঁওতাল নৃত্য আর একটি বিচিত্র লোক-সংস্কৃতি। মৃদঙ্গ বাজিয়ে বাঁশি বাজিয়ে সাঁওতাল যুবক নৃত্যের সুর তুলে ধরে, কোমরে হাত জড়িয়ে একদল সাঁওতাল মেয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে নাচে। বিচিত্র সেই নাচের

শান্তিনিকেতনে বিদেশী ছাত্রদের সঙ্গে শ্রী নেহরু

ভঙ্গী। নেশার মতো। এ বছর সে নাচ হতে পারেনি, শুনলুম কিছুদিন আগে কোথায় নাকি সাঁওতাল নাচিয়েদের ওপর পুলিসের গুলী চলেছিল, তাই বাইরে গিয়ে নাচা তারা বন্ধ করেছে। ৯ই পৌষ দুপুরে হলো সাঁওতাল ছেলেদের খেলাধুলা। তীরের খেলা হলো প্রথম, লক্ষ্যভেদের খেলা। বাচ্চা বাচ্চা ছেলেরা এসে তীর চালিয়ে তাতে যোগ দিলো।

তিনদিন কাটলো আনন্দে। এই শান্তিনিকেতনে। এবার যাত্রা করার পালা। সেই গতানুগতিক কলকাতার জীবনে।

যাবার আগে গেলুম আচার্য নন্দলাল বসুর ভবনে। তাঁকে প্রণাম জানাতে। তখন চারটে।

বড় হল্ বারান্দায় একটা ছোট খাটে শুয়ে আছেন। মনে হলো একটু কৃশ হয়েছেন যেন।

জিজ্ঞেস করলুম, 'কেমন আছেন?'

'এখন একটু ভালো।'

'এবার মেলায় গিয়েছিলেন কি?'

'একবার গিয়েছিলুম কালকে।' আরও দু'-একটি ছোটখাট প্রশ্ন।

সাঁওতাল দম্পতি

—নন্দলাল বসু

বল্লুম, 'আমাকে কিছু ছবি দেবেন না?'

বার করে দিলুম রাইটিং প্যাড থেকে কাগজ। বল্লেন, 'কলমটা দাও।'

আমার কলমটা খুলে তাঁর হাতে দিলুম। এক মিনিটও ইতস্তত করলেন না, কলম চলতে লাগলো। মনে হলো তাঁর যেন ভালো লাগছে কলম চালাতে। আমি নিচুতে মোড়ায় বসে, তিনি একটু উপরে বিছানায়। ছবি আঁকা দেখতে পাইনে, তাকিয়ে রইলুম বাইরের দিকে। ধানের জমি, উঁচু-নিচু মাঠ, একপায়ে তালগাছ। বিকেলের ম্লান সূর্যের আলো এসে পড়েছে। গুটিকয় সাঁওতাল মেয়ে আসছে মাঠ ভেঙে গ্রাম থেকে মেলায়।

একটু দূরে বসেছিলেন দু'জন ভদ্রমহিলা। শিল্পীর তন্ময়তা দেখে কাছে সরে এসে তাঁরা দেখতে লাগলেন ছবি।

আচার্য জিজ্ঞেস করলেন, 'এখন ৬১ সাল তো?'

বল্লুম, 'হ্যাঁ।'

কিন্তু তারিখ লেখা হয়ে গেছে ৭ই পৌষ। আর শুধরে নিলুম না। সাল তারিখ ঠিকঠাক এখন স্মরণ থাকে না,, তাঁর। নাই বা রইলো। শুধু সুস্থ থাকুক তাঁর দেহ!

ছবিটির দিকে তাকিয়ে দেখলুম। সাঁওতাল দম্পতি, তীর-ধনুক হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে।

পৌষের মেলায় সাঁওতালরা ভিড় করে আসে এই কবিতীর্থের ভূমিতে, এ ছবিতে তাদের রূপ রেখার টানে টানে।

বল্লুম, 'এখন পর্যন্ত আপনার সর্বশেষ ছবির মালিক আমি!'

তিনি হাসলেন। প্রণাম করে ফিরে এলুম মেলা-প্রাঙ্গণে। শেষ চা খেয়ে এবার যাত্রা শুরু। কলকাতায়।

শাঙ্গর্দেব

কিছুদিন থেকেই আমাদের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে কয়েকটি কথা বলব বলব করছি, কিন্তু একটু দ্বিধা করছি এই জন্য যে, কথাগুলি নেহাৎ টেকনিক্যাল। সঙ্গীতের রূপবন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা নেই, তাঁদের কাছে এ-আলোচনা একটু নীরস ঠেকবে। তথাপি নানা আসরে গান-বাজনা শুনে আমার বক্তব্যগুলি প্রকাশ করাই উচিত মনে করি, কেননা, কয়েকটি বিষয় সম্বন্ধে আমাদের সঙ্গীতমহল এখনও উদাসীন।

প্রত্যেক আসরেই দেখি, রাগের নামটা যেমন জোর গলায় ঘোষণা করা হয়, তালের উল্লেখ তেমনভাবে করা হয় না। তালটা যেন নেহাৎ গৌণ ব্যাপার। বিশেষ কেউ এদিকে লক্ষ্য করেন না বলে এই সব ঠেকায় নানারূপ গোঁজামিল চলছে। অনেক সময় দেখা যায়, সরোদ বা সেতারে শেষের দিকে দ্রুত ঝনঝনানির সঙ্গে সগৌরবে তবলার নানারকম চটপটি চলছে। শ্রোতারা এইখানে খুব হাততালি দেন এবং মনে করেন, খুব একটা ছন্দের চাতুর্য চলেছে, কিন্তু আসলে লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, এসব কাজ আদৌ তালেই হচ্চে না এবং সময়মত সমেও এসে পড়ছে না। দুজনেই ইচ্ছামত বাজিয়ে চলেছেন এবং ইচ্ছামত এক সময় এসে থামছেন। বস্তুত দ্রুত লয়ের 'ধা-ধিন-ধিন-ধা'র একটা সীমা আছে। এঁরা বাজাবার সময় সেই সীমা অতিক্রম করে বোধ হয় নাদব্রহ্মের দিকেই ধাবমান হন। অতএব গোঁজামিল ছাড়া আর কোন্ মিলই বা এর সঙ্গে দেওয়া যায়!

বিলম্বিত খেয়ালের সঙ্গে কখনই তালের উল্লেখ করা হয় না। এতে অনেক অসুবিধার কারণ ঘটে। বিলম্বিত খেয়ালের ছন্দ আমরা ঠেকা দেখেই নির্ণয় করতে পারি, নতুবা গান শুনে কিছু ঠিক করবার উপায় নেই। অতএব এই ঠেকা যদি প্রচলিত বোল অনুসারে না চলে, তবে সঙ্গীত রসাস্বাদনে বিঘ্ন ঘটে। উদাহরণ-স্বরূপ বিলম্বিত একতালের উল্লেখ করি, কেননা, শতকরা নব্বুইটি বিলম্বিত খেয়াল এই তালেই গাওয়া হয়ে থাকে। উক্ত তালের 'তে রে কে টে' এই বোলটি যদি পাল্টে অন্য বোল প্রয়োগ করা হয়, তাহলে শ্রোতাদের তালটা ধরতে বেশ খানিকটা অসুবিধা হবে এবং মাত্রা গুণে ছন্দটা ঠিক করতে হবে। আগে থেকে যদি তালের নাম ঘোষণা করা হয়, তাহলে তাল বুঝে এই বোলের তারতম্য ধরা যায়। অনেক বহিরাগত শিল্পী তাঁদের তবলচি নিয়ে আসেন এবং তাঁরা সব সময় আমাদের বোল বাজান না। এই তো সেদিন একটি সঙ্গীত সম্মেলনে গাঙ্গুবাঈএর সঙ্গে তাঁর তবলিয়া একটি ত্রিতাল বাজালেন, কিন্তু তার বোল যেমনটা আমরা শুনি, তেমন নয়। আর একটি তালে আজকাল খেয়াল শুনি—এর নাম **ঝুমরা**। এটি বাংলায় তেমন প্রচলিত নয়, সুতরাং এটি বিশেষভাবে ঘোষণা করা উচিত।
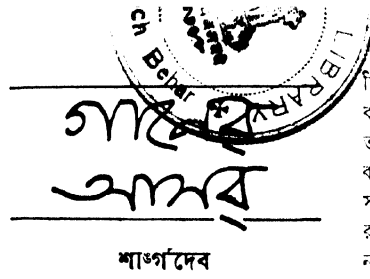
এ বিষয়ে শিল্পীদের দোষও বড় কম নয়। একটি ফেরও পুরোপুরি তাঁরা বেশ মাত্রানুগভাবে গান না। গান ধরেই বাঁকাচোরা পথে চলতে থাকেন এবং সমের আগে দুচার মাত্রায় অস্পষ্ট উচ্চারণ করে সমের ঝোঁক দেন। এটা সঙ্গীতের রীতি নয়। বিলম্বিত খেয়াল খুব পরিচ্ছন্নভাবে গাওয়া উচিত। এই রীতিটা শ্রীযুত পালুসকর খুব সুন্দরভাবে পালন করেন —এই কারণেই তাঁর গান এত হৃদয়গ্রাহী হয়। অবশ্য অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে বাংলা দেশে সঙ্গীত রীতির দিকে একটু বেশি নজর দেওয়া হয় এবং বাঙালী শিল্পীরা স্বভাবতই পরিষ্কার রাস্তায় চলতে চেষ্টা করেন, কিন্তু বাইরের প্রভাবে আজকাল একটু যথেচ্ছচারিতা দেখা যেতে আরম্ভ করেছে।

মধ্য লয়ে বা দ্রুত লয়ে তালবৈচিত্র্য তো আজকাল উঠেই গেছে। এক ত্রিতাল ভিন্ন আর কিছুই শোনা যায় না। একতাল, ঝাঁপতাল এসব প্রায় ভুলেই যেতে বসেছে লোকে। একতালের দ্রুত খেয়াল চমৎকার জিনিস এবং আগে খুবই গাওয়া হত, কিন্তু আজকাল আর কেউ তেমন গান না। ঝাঁপতাল আরও কম শোনা যায়। তবলিয়ারাও বোধ হয় সহজে বিশ্বাস করেন না যে, শিল্পী ঝাঁপতালে গাইছেন। সম্প্রতি এক সঙ্গীত সম্মেলনে শ্রীযুত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় রবীন্দ্রনাথের 'যদি এ আমার হৃদয় দুয়ার বন্ধ রহে গো কভু'—এই বিখ্যাত গানটির দু-তিন লাইন গাইবার পরও সঙ্গতকার কি যে বাজিয়ে চলেছিলেন, তিনিই জানেন। অবশেষে রমেশবাবু তালটা ভাল করে বলে দিতে তিনি ঠেকা দিতে আরম্ভ করলেন, কিন্তু স্পষ্টই বোঝা গেল, এ-তালের ঠেকায় তাঁর তেমন অভ্যাস নেই। কথা হচ্চে এই যে, ঝাঁপতাল দ্রুত লয়ে এমন একটা স্পষ্ট জিনিস যে, এটা বলে দেবার কোন প্রয়োজনই হয় না, অথচ কনফারেন্সের তবলা-বাজিয়ে এমন একটা ছন্দ আপনা থেকেই ধরতেই পারলেন না। দেখিয়ে না দিলে তিনি হয়তো গোঁজামিল

দিয়ে যেতেন সারাটা গানে এবং শিল্পী বিশেষ সজ্জন ব্যক্তি না হলে একটা ঝগড়াঝাটি হয়ে যেত। অথবা হয়তো কিছুই হত না, যে যার গেয়ে বাজিয়ে চলে যেতেন। এমনি অবস্থায় তো এসে পড়েছে আমাদের কনফারেন্সের মান আজকাল। গত দু বছর যাবৎ এই সব সম্মেলন থেকে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে, তার থেকে এটা না স্বীকার করে পারছি না যে, সমগ্র উত্তর ভারতে সংগীত অবনতির পথেই চলেছে।

অনেক শিল্পী দেখেছি, বিলম্বিত এবং মধ্য লয়ের খেয়ালে বিশেষ পার্থক্য রাখেন না। বিলম্বিত ঠেকায় এমন দ্রুত-গতি খেয়াল গাওয়া হয়, যে তাকে বিলম্বিত না বলাই উচিত। অনেকেই মধ্য লয়ে যে যে কাজ করা উচিত, সেইগুলি সবই বিলম্বিত লয়ে সেরে নিয়ে কেবলমাত্র ঠেকাটি পাল্টে মধ্য লয়ে আসেন এবং একই কাজের পুনরুক্তি করে চলেন। এতে অনর্থক সময় নষ্ট হয় এবং গানের এক-ঘেয়েমিতে শ্রোতারাও বিরক্ত হন। বিলম্বিত লয়ে গাইবার সময় তার রীতিটি যথাযথ-ভাবে রক্ষা করা উচিত। এই শ্রেণীর খেয়ালে বিস্তার এবং তানকর্তবের একটা বিশিষ্ট পদ্ধতি আছে, সেটি অনুসরণ না করলে এটিই বোঝা যাবে যে, শিল্পী সংগীত রীতি সম্বন্ধে অজ্ঞ। এই সব কাজগুলি খুব বড় ওস্তাদরা বজায় রেখেছেন। ভারতবিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে যাঁরা এখন বেশ প্রাচীন হয়েছেন, তাঁদের গান শুনলে এই মাত্রা বিভাগগুলি স্পষ্ট ধরা যায়। মনে হয়, গান যেন প্রাথমিক শিক্ষার্থীর মত ধীরে ধীরে মেপে মেপে চলেছে এবং আপাতদৃষ্টিতে খুব সরল সহজ বলেই ঠেকে, কিন্তু গাইতে গেলে বোঝা যায়, এই সরল সহজ ভঙ্গী আয়ত্ত করা কত শক্ত। এই রকম সাধারণ ঠেকায় সাধারণভাবে গেয়েই তাঁরা সংগীতের দুর্লভ এবং অসাধারণ কৌশল প্রদর্শন করেন। ভাল খেলোয়াড়ের সঙ্গে খেলতে নামলে বা তাঁদের খেলা দেখলে মনে হবে, এ-খেলা মোটেই শক্ত নয়, এমন সহজভাবে খেলে চলেন তাঁরা, কিন্তু প্রতিপক্ষের বহু কূটকৌশল যখন এ'দের কাছে পরাস্ত হয়, তখনই বোঝা যায়, এই সহজ ভঙ্গীটি আয়ত্ত করতে কত সাধনার প্রয়োজন হয়েছে। ভাল শিল্পীও ঠিক এই রকম-ভাবেই গেয়ে যান অথচ মুনশীয়ানার পরিচয় পাওয়া যায় প্রতিটি কাজে।

তালে গোঁজামিলের অনেক রকম কায়দা-কানুন আজকাল দেখছি। অনেক সময় দেখা যায়, শিল্পী যেই লয়ের কাজ আরম্ভ করলেন, অমনি তবলিয়া একটা রেলা ধরে বসলেন। শিল্পী ছন্দের কাজ করে সমে এসে পড়লেন আর অমনি তবলাও ধড়াম করে সমে আছড়ে পড়ল। একে নাকি তবলায় জবাব দেওয়া বলে। এটি মোটেই জবাব নয়, বরঞ্চ জবাবের অভাব, তবলিয়ার অক্ষমতার পরিচয়। শিল্পী যখন ছন্দের কাজ করেন, তখন তবলিয়া যদি অবিকল ঠেকাটি স্পষ্টভাবে বাজিয়ে যান, তাহলে তাঁর লয়জ্ঞানের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায় এবং শ্রোতাও বুঝতে পারেন, প্রতি মাত্রায় কিভাবে ছন্দের কাজ হয়ে চলেছে। তা না হয়ে যদি গান একদিকে চলে আর তবলা আর একদিকে চলে, তবে কোনটারই যথার্থ মূল্যে নিরূপণ করা সম্ভব হয় না। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, শ্রোতারা এই সব সময়েই হাততালিতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠেন। শিল্পী ছন্দের যে কাজটা করলেন, তবলিয়া একটা উড়ন্ত বোল বাজিয়ে তার কৃতিত্বটা বোঝাতে দিলেন না—এটা যে একটা গুরুতর অপরাধ, সেটা বোঝবার ক্ষমতাও এ'দের নেই, অথচ হাততালি দিয়ে নিজেদের সমঝদারিত্বের পরিচয় দেবার প্রচেষ্টা আছে। শিল্পীরা শ্রোতাদের এই সব অজ্ঞানতার সুযোগ নিয়েই তো সস্তায় কাজ হাসিল করেন। আমাদের শ্রোতাদের মত এমন হাততালি ইউরোপীয় কনসার্টে পড়ে না। গান-বাজনার প্রতিটি সূক্ষ্ম কাজ তাঁরা নীরবে উপভোগ করেন, হাততালি দিয়ে সেটিকে ডুবিয়ে দেন না। অনুষ্ঠান শেষ হলে হাততালি অবশ্যই তাঁরা দিয়ে থাকেন এবং সেখানেও সেটা প্রবলভাবেই দিয়ে থাকেন। এই সব রসবোধ আমাদের আসবে কবে? যাক্ যা বলছিলাম। তবলা এমন একটি যন্ত্র, যা ঠেকা দেবার পক্ষেই একান্ত উপযোগী। পাখোয়াজ বা খোলে বাজাবার যে বিস্তৃত পরিধি রয়েছে, খেয়ালের সঙ্গে তবলার সে পরিধি নেই। তবলিয়া অবশ্য জোর করে এই সীমা লঙ্ঘন করতে পারেন, কিন্তু সেটা গায়ের জোরেই হবে এবং হচ্ছেও তাই।

অথচ মজা দেখুন, যখন তবলিয়া এককভাবে লহরা বাজিয়ে শোনান, তখন কিন্তু সারেঙ্গীতে ঠিক মাত্রা গুণে গুণে বাজানো হয়। কেন? না, তাহলে তবলার কৃতিত্ব বুঝতে অসুবিধা হবে। খুব ভাল কথা, আমরা সেটা উপভোগ করে থাকি—কেমন ভাবে তালের একটি ফেরে তবলায় বহু বোল বেজে চলেছে, সেটা অনুভব করে তবলিয়াকে বাহবা দিই। কিন্তু এক্ষেত্রে যদি সারেঙ্গীবাদক নিজের ইচ্ছামত চলতেন, তবে কি তবলিয়া অসুবিধা বোধ করতেন না? না, সেটা সংগত হত? এক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য। শিল্পী যখন গেয়ে যাবেন এবং ছন্দের কাজ করবেন, তখন তবলিয়ার উচিত পরিচ্ছন্নভাবে মাত্রায় মাত্রায় ঠেকা দিয়ে যাওয়া, যাতে গানটি সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করা যায়। তবলিয়ার এটি মনে রাখা উচিত যে, এর বেশি তাঁর সুযোগ বা Scope নেই।

বস্তুত গানের সঙ্গে তবলার ঠেকার যখন সুন্দর সমন্বয় হবে, তখনই সংগীত রসে ভরপুর হয়ে উঠবে। এই অপূর্ব সমন্বয়টি হয় আমাদের উচ্চাঙ্গের কীর্তনে। খোলে তবলার চেয়ে অনেক বেশি বোল ব্যবহৃত হয়ে থাকে, কিন্তু সে বাজনা

আপনাকে গানের সঙ্গে এমনভাবে বিলীন করে দেয় যে, তার সত্তাও গানের সঙ্গে মিশে যায়। এই কারণেই কীর্তনের সঙ্গে খোলের সম্বন্ধ অত্যন্ত নিকট এবং কীর্তনের তাল যথেষ্ট কঠিন হওয়া সত্ত্বেও গায়কেরা অনায়াসেই গেয়ে থাকেন এই খোলের সাহচর্যে। বাজনা যেখানে নিজেকে পদে পদে না জাহির করবার চেষ্টা করে এবং গানকে প্রকাশের প্রকৃত সহায়তা করে, সেখানেই সঙ্গীত তার সার্থকতা লাভ করে। তবলিয়াদের এই আদর্শ মেনে চলা উচিত, গানের সঙ্গে সঙ্গত করবার সময় নতুবা রসভঙ্গ হবেই।

আসরের খবর

অখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন

২৪শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ন'টি অধিবেশনে অখিল ভারত সঙ্গীত সম্মেলন সমাপ্ত হয়েছে।

অনুষ্ঠান নবম অধিবেশন পর্যন্ত বিস্তৃত হলেও সংগীত রস যে বিশেষ ঘনীভূতভাবে পরিবেশিত হয়েছে, এমন নয়। অনায়াসেই বহু শিল্পীকে বাদ দেওয়া যেতে পারত। এ'দের ধারণা যে, স্থানীয় গীতিশিল্পীদের মধ্যে এই সম্মেলনে গাইবার যোগ্যতা একমাত্র এ'দের প্রতিষ্ঠিত ভূপেন্দ্র সংগীত বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অথবা উক্ত বিদ্যালয়ের এবং কস্তুরবা বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদেরই আছে এবং এই কারণেই বোধ হয় কলকাতার প্রথম শ্রেণীর বহু শিল্পীকে আহ্বান জানাবার প্রয়োজনীয়তা এ'রা বোধ করেন নি।

অবাঞ্ছিত গীতানুষ্ঠানের মত নৃত্যানুষ্ঠানও বড় কম নয় এবং অধিকাংশই অনায়াসে বাতিল করা চলত। কিন্তু সেটা বোধ হয় হবার নয়, কেননা, শেঠজী আর পণ্ডিতজীরা আবার নৃত্য-গতপ্রাণ এবং প্রেক্ষাগৃহে এ'দেরই আধিপত্য দেখা গেল। আমার পার্শ্ববর্তী এক শেঠজী তাঞ্জোর ভগ্নীদের নৃত্যানুষ্ঠান খালি চোখে দেখে তৃপ্ত না হয়ে একটা বাইনাকুলার লাগালেন দেখলুম। একেই বলে নৃত্যরসিক। এহেন রসিক ব্যক্তিদের আনুকূল্যেই যখন সম্মেলন সম্ভব হয়েছে, তখন এ'দের কি আর নৃত্যরস থেকে বঞ্চিত করা যায়? অনেক সায়েব-সুবোকেও নাচে আপ্যায়িত করা হল দেখলুম। মনে করেছিলুম, এ'রা কোনও কোনও বিদেশী দূতাবাসের লোক, কিন্তু শুনলুম, এ'রা সব মার্চেণ্ট অফিসের সায়েব। উক্ত বণিক শ্বেতাঙ্গগণকে এতটা আপ্যায়নের বোধ হয় কোন গূঢ় কারণ বর্তমান, আমাদের সেটা জানা নেই। এ'দের খাতিরে ঘোষণাটাও রাষ্ট্রভাষা থেকে ইংরেজিতে করা হল।

গান সম্বন্ধেও যে বিশেষ কিছু বলবার আছে, এমন নয়। এখানকার বিশিষ্ট শিল্পীরা তো অনেকেই বাদ। উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী কেশরবাঈ, গাঙ্গুবাঈ, শ্রীযুত তারাপদ চক্রবর্তী, পণ্ডিত পালুসকর, শ্রীযুত যোগ, শ্রীশ্যাম গাঙ্গুলী—এ'রা যে সঙ্গীতানুষ্ঠান ভালই করবেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ নেই এবং এ'দের কৃতিত্বের উল্লেখ বারম্বার করবার প্রয়োজনীয়তা নেই। স্থানীয় শিল্পীদের ওপর টেক্কা দেবার জন্য এবার বাইরে থেকে নতুন যেসব শিল্পী আনানো হয়েছে, তাঁদের বেড়াতে আসাটা সার্থক হতে পারে, তবে সঙ্গীতানুষ্ঠান নয়। উদাহরণস্বরূপ লখনউএর ওস্তাদ মুর্জাদ্দিদ্ নিয়াজীর উল্লেখ করা যেতে পারে। এ'র পিছনে বহু উৎসাহ প্রকাশ করেও কিছুই করা যায়নি। এ'র ঠুংরী কারুর প্রাণে কোন সাড়াই জাগায় নি। এ'র সঙ্গীতানুষ্ঠানের মাঝখানে এক বৃদ্ধ ব্যক্তি হঠাৎ আবেশে বিভোর হয়ে একেবারে স্টেজে হাজির হয়ে 'সেঁইয়া' বলে গান ধরে ফেল্লেন। সে কী গদগদ ভাব। এই প্রকার ভাবাবেগ সচরাচর বাগান বাড়িতে নাচের আসরে বাবুদের বেসামাল অবস্থায় দেখা যায়। বেশ একটা হাসির ধুম পড়ে গেল। শুনলাম, উক্ত ভদ্রলোকটি এই সম্মেলনের একজন প্রধান উদ্যোক্তা। যাই হোক, এমন রুচিবহির্ভূত ব্যাপার কোন বিশিষ্ট অনুষ্ঠানে আমি তো দেখিনি। যাই হোক, এত প্রেরণা সত্ত্বেও নিয়াজীর ঠুংরী মাঠেই মারা গেল। এ'র গান শোনবার সময় দীর্ঘশ্বাস ফেলে অনুপম ঠুংরীগায়ক শ্রীশচীনদাস মতিলাল মহাশয়ের কথা স্মরণ করেছি। এত নিকটে এত বড় শিল্পী থাকতে তাঁকে উপেক্ষা করবার কোন কারণ বোঝা গেল না। তবে কারণ একটা আছে বৈকি, লোককে বলাবলি করতে শুনলাম যে, গতবারে শচীনবাবুর গান অসময়ে বন্ধ করতে গিয়ে এ'দের যে বিড়ম্বনা সহ্য করতে হয়েছিল, তার ফলেই এ বৎসর এ'দের মনোভাব শচীনবাবুর অনুকূলে নয়। গতবারে শ্রীধীরেন মিত্র মহাশয় ছিলেন—এবার তাঁকেও আহ্বান করা হয়নি। সবই এ'দের মর্জির ওপর নির্ভর করে কি না? আর একটি অসার উদাহরণ অনন্ত মনোহর ও তৎপুত্র গজানন রাও যোশী। এ'রা পিতাপুত্রে খুব খানিকটা গলাবাজি করে গেছেন গানের নামে।

পরিশেষে নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গের প্রতি এ'দের অগাধ শিষ্টাচারের উল্লেখ না করে পারছি না। আতিথেয়তার আদর্শ দৃষ্টান্তস্বরূপ নিমন্ত্রিত অতিথিবর্গের কার্ডে এ'রা লিখেছেন, 'Late arrival seat not guaranteed', অর্থাৎ বিলম্বে এলে আসন সম্বন্ধে নিশ্চয়তা দেওয়া যায় না। এই আসন হচ্ছে প্রেক্ষাগৃহের আনাচে কানাচে এবং স্টেজে শিল্পীর পিছনে (যেটা অত্যন্ত Vulgar প্রথা) ছড়ানো কতিপয় বাড়তি ভাঁজকরা চেয়ার। এবম্বিধ 'বহুৎ আচ্ছা বন্দোবস্ত' করবার পর আবার অনুষ্ঠান আরম্ভ হবার পনের মিনিট আগে এসে এই আসন দখল করবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা বাহুল্য, কোন কর্মীব্যক্তির পক্ষে পনের মিনিট আগে থেকে এই রকম আসনে বসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে আজে বাজে অনুষ্ঠান দেখে কাটানো সম্ভব নয়। নেহাৎ নিষ্কর্মা বা অখিল ভারত সম্মেলনের কোন উন্মাদ সমর্থকের পক্ষেই এটা সম্ভব।

ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ

২৪ পরগণা জেলা ক্রান্তি শিল্পী সঙ্ঘ জানিয়েছেন যে, আগামী ২১শে থেকে ২৩শে জানুয়ারী ৩নং মলরোড দমদমে দ্বিতীয় বার্ষিক জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে। এই উপলক্ষে নানারকম সাহিত্যিক আলোচনার সঙ্গে কবিগান, মার্গ সঙ্গীত, রবীন্দ্র-সঙ্গীত, পল্লী-সঙ্গীত, গণ-সঙ্গীত, গীতিনাট্য, গম্ভীরা প্রভৃতি পরিবেশিত হবে।

গ্রীস থেকে— যুগোশ্লোভিয়া
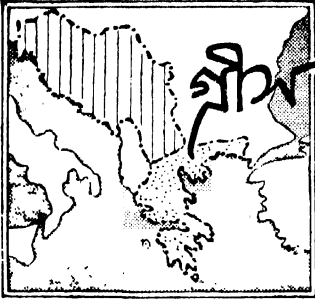
ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী

রাত্রি অধিক হয়ে গেল বেলগ্রেড স্টেশনে; অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছে তবে শীত বেশী নয়। সম্ভবত শহরে ট্যাক্সির সংখ্যা নিতান্তই স্বল্প আর তাছাড়া রেলের বন্ধু নিজেই আমার দুটো সুটকেশ নিয়ে লম্বা লম্বা পায়ে হোটেল খুঁজতে, প্রায় দৌড়ালেন। পাহাড়ের উপরে শহর, চড়াই উৎরাই অনেক। দোকান পাট সমস্ত বন্ধ, তিনটি হোটেলে জায়গা মিলল না। চতুর্থটিতে ম্যানেজার পরিষ্কার ইংরাজীতে বললেন—আপনি পরের ট্রেনে উত্তরের শহর জ্যাগ্রেবে চলে যান, বেলগ্রেডে আজ হোটেলে জায়গা সম্ভব হবে না। জাফর হোসেন (রেলের কর্মচারী, যিনি আমার মাল বহন করে-ছিলেন) দুটি যুবকের সঙ্গে হোটেল মস্কোর বাইরে কি যেন কথাবার্তা ব'লে আমাকে ইঙ্গিত করলেন—অগ্রসর হও! ঘটনাটা ঠিক বুঝতে পারিনি; ইচ্ছা ছিল এডিনবরার ছাত্রটির বাড়িতেই গভীর রাত্রে হানা দিই, ঠিকানাও আছে; কিন্তু দুটো চড়াই উৎরাই পার হয়ে একটা বড় রাস্তার উপরে ছয়তালা বাড়ির সম্মুখে দাঁড়িয়ে তারা ইশারা করল, পাঁচতলায় ঘর আছে, ঘুমোবার অসুবিধা হবে না। বলেই আমার অনুমতির অপেক্ষা না করেই প্রশস্ত সিঁড়ি বেয়ে পাঁচতলার এক কোণের ঘরের চাবি খুলে ফেলল। সিঁড়িতে আলো নেই; এটা একটা ফ্ল্যাট বাড়ি, একটি ডাক্তারীর ছাত্র এখানে থাকে, খায় বাইরে। ঘরের মধ্যে জলের কল নেই, একখানা খাটে পাতলা বিছানা আর আমাদের দেশের মত লেপ। বাথরুম বুঝলাম নীচে, সকল ভাড়াটিয়ার জন্য এজমালি। এখানে একটি ডাক্তারীর ছাত্র থাকে বা ঘুমোয়, খায় অন্যত্র, কাজও করে। কেননা, মাত্র শতকরা ৬০ জন ছাত্রছাত্রী গভর্নমেণ্টের বৃত্তি পেয়ে উচ্চশিক্ষা পেতে পারে, এ ছাত্রটি হয়ত তত মেধাবী নয়, অবসরকালে কাজও করে। কাজ অর্থে অবশ্য যে কোনও কাজ যার দরকার আছে আর টাকা পাওয়া যায়। তারা জাফর হোসেনের সঙ্গে শুভরাত্রি জ্ঞাপন করে বিদায় নেয়। ঘরে আগুনের ব্যবস্থাও আছে, তবে একটা এলুমিনিয়মের বড় পাইপ ছাদ ফুটো করে বাইরে গেছে; কয়লা কাঠ দেশলাই সবই আছে। কিন্তু পাছে কার্বন মনোক্সাইড গ্যাস গ্রাস করে (হাওয়া চলাচলের একটিই দরজা) ভয়ে আগুন জ্বালাবার চেষ্টা করিনি। রেলের একটানা দীর্ঘ পথের যাত্রা, হোটেল খোঁজার পরিশ্রমে সহজেই নিদ্রাকর্ষণ হয়েছিল। ইউরোপ থেকে এলে এ অবস্থা বিসদৃশ ঠেকতে পারে বা এর বর্ণনা অদ্ভুত মনে হতে পারে। আমাদের ছাত্র-জীবনে এমন ঘরে দুজন তিনজনও হয়ত খাট পেতে পড়াশুনা করেছে। কথা ছিল, ছাত্র দুটি নটায় আসবে, এডিনবরার ছাত্রের বাড়িতে নিয়ে যাবে, হোটেলেরও ব্যবস্থা করবে। তারা ঠিক সকাল নয়টায় এসে উপস্থিত, একটা হোটেলে খবর করতেই জানা গেল, বারটায় একটা ঘর পাওয়া যাবে।

যে রাস্তায় এই হোটেলটি, তার নাম এভিনিউ প্রিন্সিপিস্। এই প্রিন্সিপিস্ ১৯১৪ সালে সারাজেভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজকে গুলী করেছিল, ফলে ইউ-রোপে, এমনকি সারা বিশ্বে যুদ্ধের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল।—সারাজেভো শহরে প্রিন্সিপিসের একটা মর্মরমূর্তি আছে; স্থানীয় মুজিয়ামে তার পোশাক, ছোরা সযত্নে রক্ষিত আছে। এই আততায়ীর সম্মান দেখে মনে পড়ে উদয়পুরে রাণা প্রতাপের প্রতি মেবারীর শ্রদ্ধা। তাঁরও শিরস্ত্রাণ, বর্ম লোহার সিন্দুক থেকে বছরে একদিন খোলা হয়, পুজোও হয়। সারা-জেভোর প্রিন্সিপিসের নামে রাস্তা বোধ হয় সব গণতন্ত্রেই আছে। জর্জ ওয়াশিংটনের সম্মানার্থ আমেরিকার প্রত্যেক স্টেটেই প্রায় ওয়াশিংটন নামে শহর আছে, যেমন, কতকটা সেইরকম। মার্শাল টিটো কিন্তু প্রকাশ্যে সম্মান দেখান কামনা করেন না। নরপুজা তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ, একথা পরে আমি শিক্ষিত লোকের সঙ্গে কথাবার্তায় জানতে পেরেছি। দ্বিতীয় শ্রেণীর হোটেল, ভাড়া প্রায় ইংলণ্ডের দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর হোটেলের মতই। নীচে খাবার ঘর থাকে তবে প্রায় সব খাদ্যদ্রব্যেই মাংসের বহুলতা। ইলেকট্রিক লিফ্‌টও আছে দোতালার বা তেতালার ঘরে উঠতে, তবে অচল হয় প্রায়ই। সিঁড়িতে কার্পেটও আছে তবে ছেঁড়া কার্পেট যেখানে, সেটুকু সারান আর ঘটে উঠেনি। যুদ্ধের পরে

১৮১৭ সালে ইউরোপে তুরস্ক সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি

ইংলণ্ডে, ফ্রান্সে প্রায় সব দেশেই এমনটা অবস্থা হয়েছিল।

[১৯৪৭ সালে জানুয়ারী মাসে প্যারিসে একটা ভাল হোটেলের জানলার কাঁচ ভাঙা দেখে রাত্রে পরিচারিকাকে বলায় সে বললে, আজ খবরের কাগজ এ'টে দিচ্ছি, কাল কাঁচ বদলান হবে। খবরের কাগজে হাওয়া বন্ধ হ'ল কিছুক্ষণ, তারপরে আবার হাওয়ার জোরে কাগজ ছি'ড়ে গেল, পরিচারিকা এসে বললে, আজ রাত্রিটা কাটিয়ে দেও, কাল অন্য ঘরে জায়গা করে দেব।] বেলগ্রেডের হোটেলে বাইরের চাকচিক্য মন্দ নয়, তবে বিজলী-বাতির আলো খুব ক্ষীণ, অনেক কষ্টে ম্যানেজারের চেষ্টায় একটা টেবিল ল্যাম্প জোগাড় হয়েছিল। চেয়ার নেই মোটেই ঘরে। বিছানায় বসেই পড়তে হয় বা লিখতে হয়। অথচ বিদেশী এত আনা-গোনা করে যে, কোথাও একখানা ঘর সহজে মেলে না। বলা বাহুল্য, হোটেলে যাঁরা আসেন তাঁরা অন্য দেশের লোক; জুগোশ্লাভ প্রজার শতকরা ৯৮ জনের হোটেলে থাকার খরচ দেওয়া সম্ভব নয়। অথচ স্থান পরিবর্তন বাধ্যতামূলক, রাষ্ট্রের ব্যবস্থায়। প্রত্যেকটি শ্রমিককে, পরিবার সমেত বছরে দু' মাস চেঞ্জে যেতেই হবে কোথাও দেশের মধ্যে। যাতায়াতের মাশুল, বাড়ির ভাড়া লাগে না, তবে ছুটীতে বেতন পুরা মেলে বলেই খাবার খরচ গভর্নমেণ্ট আলাদা দেয় না। এক জায়গায় বেশীদিন থাকলে জীবনে বৈচিত্র্য থাকে না, শরীর ও মন দুই-ই মরচে ধরে যায়, এই এখন চিকিৎসা বিজ্ঞানের উপদেশ। কিন্তু একেবারেই বাড়ির বাইরে যাননি এমন বৃদ্ধা কলি-কাতায় এখনও কম নয়। উত্তর কলকাতায় অনেক মায়েদের মুখে শুনেছি—'বেরিয়েছি বই কি বাবা, সেই গেরোণের দিনে গঙ্গা চান করতে'। কলকাতায় যখন প্রথম কলেজে পড়তে আসি, কলকাতাবাসী সহপাঠী ছাত্রেরা গৌরব প্রকাশ করতেন—'জলের কলের বাইরে যাইনি, হাওড়া শিয়াল'দা পেরোইনি'। এক প্রদেশ থেকে অন্য প্রদেশে যাতায়াতের ফলে দেশের কোথায় কি নূতন খনি বের হ'ল; চাষের অবস্থা কেমন, দ্রষ্টব্য স্থান কি আছে—এ যেন আবালবৃদ্ধবনিতার আঙ্গুলের ডগায়। পরের দেশের খবর নেবার আগ্রহও বেড়ে যায়। সকালে উঠে এডিনবরার ছাত্রটির ভগ্নীদের বাড়িতে উপস্থিত হই। ট্রামে চড়তে ভিড় কলকাতার মতনই। ট্রামের সংখ্যা কম, লোক বেশী। উঠবার সময়েই পয়সা দিয়ে আগে যেতে হয়। মনে হল, কলকাতায় ট্রাম বাসে অনেক লোকে পয়সা না দিয়েও খানিকটা চড়তে পারে।

হোটেলগুলি কি কোনও ধনী ব্যবসায়ীর নিজস্ব সম্পত্তি, না গভর্ন-মেণ্টের দ্বারাই চালিত, কর্মচারীরা

বেতনভুক্, এই একটা কৌতূহল জাগল মনে। আলোচনায় জানতে পারলাম, দুটোর কোনটাই নয়। ৭।৮টি হোটেলের কর্মচারীরা একত্র হয়ে ম্যানেজার ডিরেক্টর, পরিচারক, পরিচারিকা ভোট দিয়ে নির্বাচিত করে; হিসাব দেখায় গভর্নমেণ্টের এক প্রতিনিধির কাছে; লাভের কিছু অংশ সেই গণতন্ত্রের অন্য খরচের জন্য জমা দিয়ে (যেসব রাষ্ট্রে অবস্থা অনুন্নত তাদের জন্য লাভের কতক অংশ নির্দিষ্ট থাকে) নিজেরা নিজেদের যোগ্যতা অনুসারে বেতন পায়। বেতনের তারতম্য সারা দেশেই আছে, কাজের রকম, মস্তিষ্কের শক্তি, গুরু-দায়িত্ব কতখানি বিবেচনা করে। তবে তফাৎ খুব বেশী নয়। সারা ইউরোপে প্রচার—জুগোশ্লাভিয়ায় খরচ পশ্চিমের দেশগুলোর তুলনায় অনেক কম; খাওয়া নাকি ভাল অথচ সস্তা আর প্রকৃতির শোভা এই ক্ষুদ্র দেশে অল্প সময়ে, স্বল্প ব্যয়ে ভোগ করা যায়। কাজেই গ্রীষ্মকালের ত কথাই নেই, দারুণ শীতেও বিদেশী লোক সারা দেশে যাতায়াত করছে। একটা কথা লণ্ডনেও প্রচারিত আছে, সুইজারল্যাণ্ডের হোটেলের সুবিধা সেখানে পাওয়া যাবে না, ইংলণ্ডেরও নয় তবে সব দেশের লোকেরই রুচিকর খাদ্য এরা সরবরাহ করতে পারে।

বেলগ্রেড শহর দুটি খরস্রোতা নদীর সঙ্গমস্থলে; এই নগরী বহু শতাব্দী থেকেই আছে। কাজেই বহু যুদ্ধ বিসম্বাদ এখানে হয়েছে। পুরাতন বাড়ি ভাঙা হলে, নূতন প্রাসাদের রূপ স্বতঃই নূতন হয়। গত ১৮৬৭ সালে সার্বিয়া তুর্কীর পরাধীনতা অগ্রাহ্য করেছে কিন্তু অনতিদূরে প্রদেশগুলো হয় অষ্ট্রিয়া হাঙ্গেরী না হয় সুলতানের তাঁবেদারিতে ছিল। বেলগ্রেড শহরে পুরাতন মস্‌জিদ বা গ্রীক চার্চের অপরূপ স্থাপত্যকৌশল দেখা যাবে না। দানিউব এখানে অনেক প্রশস্ত; জার্মানী, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গেরী ভেদ করে এখানে আরও চওড়া হয়েছে। নদীটিকে সেতু দিয়ে বাঁধবার সংকল্পও হয়েছে তবে অপর নদী স্যাভা আরও ছোট, তার উপরে পুল বাঁধাও হয়েছে। শুধু নদীর খরস্রোতে পালের নৌকা, জেলে ডিঙ্গী ভাসিয়ে জলবিহার ইউরোপে অন্যত্র এত কম খরচে বোধ হয় হয় না। অনতিদূরে বিরাট হ্রদ সুইজারল্যাণ্ডকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কিন্তু সেখানকার আরাম সুবিধার দাম দিতে হয় বেশী। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বরফের শীত থেকে উষ্ণ প্রবস্রণে অবগাহন এই দেশে সম্ভব। বর্তমান বেলগ্রেড হঠাৎ দেখলে মনে হবে, এখানে পার্ক, উদ্যানের সংখ্যা বেশী। কিন্তু পার্ক এখন যেখানে বড় বাড়ি ইমারত ছিল, যুদ্ধে ধূলিসাৎ হবার পরে আবার প্রাসাদ গড়ে উঠেনি; একটু পরিচ্ছন্ন করে লোকেদের বেড়াবার জায়গা করে দেওয়া হয়েছে। আমেরিকার টাকায়, আমেরিকার অনুকরণে বাড়িও দেখা যাবে। সকালেই ছাত্রটির বাসস্থানে তার মা ও ভগ্নীদের সঙ্গে দেখা করতে যাই। রাস্তা খুবই চওড়া; বোধ হয় শহরের বড় রাস্তা এইটাই, রাস্তার নাম Boulevar Reodhitienizi। এইখানেই প্রথম বিদ্রোহ শুরু হয়; সাম্প্রদায়িক কলহের সূত্রপাতও এখানে। জার্মানী এই অঞ্চলের বাড়িগুলোর উপরে এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলে হঠাৎ বিনা নোটিশে। কাজেই ভাঙা বাড়ি নজরে পড়ে অনেক। নামে রাজধানী হলেও, বেলগ্রেডের উন্নতি উত্তরাঞ্চলের প্রদেশগুলোর মত হয়নি, হয়ত ২৫।৩০ বৎসর লাগবে একথাটা যেন সকলেই ব'লে স্বস্তি পায়। ১৮৬৭ সালে তুর্কীর প্রভাবমুক্ত হয়ে সম্রাট একজন এই শহরে বসেন। অনতিদূরে তুর্কীর কড়া শাসন, অষ্ট্রিয়ার হাপ্‌সবার্গ পরিবারের শক্তি সারা ইউরোপে স্বীকৃত। স্বাধীন হলেই যে এককালীন সব প্রজাই কিসে দেশের শ্রীবৃদ্ধি হবে তা ভাবতে অভ্যস্ত হয়নি। পক্ষান্তরে অষ্ট্রিয়ার অধীনে প্রদেশগুলিতে স্কুল, কারখানা রেল মোটর সবই সংখ্যায় বেশী ছিল। শিক্ষার বিস্তার মাত্র কিছুকাল হয়েছে। এখানে গ্রীক চার্চের প্রভাব বেশী উত্তরে, সকলেই রোম্যান ক্যাথলিক। লেখায় গ্রীকের মতন অক্ষর, উত্তরে রোম্যান হরফে পথে ঘাটে পড়ে নিতে আমাদের কোনও অসুবিধা নেই। কাজেই রাজধানী বলেই সব রকমে উন্নততর একথাটা খাটে। নূতন গণতন্ত্রের কেন্দ্রও বেলগ্রেডে, তাই বলে কলকাতা বাদ দিলে গ্রামের বা মফস্বলের শহরে চিকিৎসা নেই, শিক্ষার প্রসার নেই—তা এখানে লক্ষ্য করা যাবে না। টিটো নিজে ক্রোট, প্রথম জীবনে অষ্ট্রিয়ার সম্রাটের অধীনেই ছিলেন। এক কথায় বেলগ্রেড থেকে উত্তরে গেলে মনে হবে, ইউরোপেই এসেছি, প্রাচ্যভাব শুধু দক্ষিণে এখনও রয়েছে। তুর্কীর আমলে মুসলমান প্রজার সম্ভ্রম ইজ্জৎ বেশী ছিল, তারা জায়গীরদার, জমিদার হয়ত নবাবের মতন কেউ কেউ ছিল, তবে ব্যাপকভাবে মুসলমান ধর্ম তুর্কীর ইউরোপের সাম্রাজ্যে প্রসারিত হয়নি। আজ আর ধর্মের স্থান রাষ্ট্রে কোথাও মুখ্য নয়, তবে শেষ যুদ্ধের পূর্বে, বিশেষ করে জার্মান অধিকারের সময়ে রোম্যান ক্যাথলিক ধর্মযাজকের আদেশে লোকে উঠত বসত, সেও অতি অল্পদিন আগেকার কথা। (ক্রমশ)

চিত্রগ্রীব

॥ ১ ॥

গত ২১শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুল নিজস্ব শিক্ষা ভবনে তাঁদের ছাত্রছাত্রীদের একটি শিল্পপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। ফাইন আর্ট, ক্লে মডেলিঙ, কমার্শিয়াল আর্ট, উড্‌কাট এবং ক্রাফ্‌টস্‌ম্যানশিপ—এ সব ক'টি বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের সব সমেত ৮৫৪টি রচনা সাজানো হয়েছিল। রচনার সংখ্যা এত বেশী হওয়ায় দেওয়ালের কোথাও ফাঁক ছিল না। সেই কারণে প্রত্যেকটি ছবি খুঁটিয়ে দেখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। হয়ত অনেক ভাল ছবি চোখ এড়িয়ে গিয়ে থাকতে পারে। ভবিষ্যতে যদি তাঁরা কিছুটা স্থান বাড়াতে পারেন অথবা প্রদর্শিত রচনার সংখ্যা কিছু কম করেন, তাহ'লে দর্শকদের পক্ষে বিশেষ দ্রষ্টব্য ছবিগুলি খুঁজে বের করা সহজ হবে। শহুরে জীবনযাত্রা, পশুপক্ষী, গাছপালা, আলপনা, ব্যবহার্য জিনিসপত্র, পোরট্রেট প্রভৃতি বিষয়বস্তু নিয়েই ছাত্রছাত্রীরা ছবি এঁকেছেন। সম্পূর্ণ কল্পনাকে আশ্রয় করে অঙ্কন বা নতুন ধরনের বিচিত্র পরীক্ষণের প্রয়াস লক্ষ্য করা গেল না। পেইণ্টিঙ্‌ অপেক্ষা স্কেচের সংখ্যাই বেশী। যদিও কারুর মধ্যে একান্ত স্বকীয় আবেগ বা বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম না তা'হলেও কয়েকটি স্কেচ খুব পাকা হাতের কাজ বলে ভ্রম হয়। বিশেষ করে বিরথ দত্তের ৩২৪, ৩২৮ এবং ৩৩১ নম্বরের স্কেচগুলি খুব পরিণত আঁচড়ের কাজ হয়েছে। অবশ্য ছাত্রাবস্থায় স্বকীয় বৈশিষ্ট্য আবিষ্কারের দিকে ঝোঁক না দিয়ে বিচক্ষণ মাস্টার মশাইদের নির্দেশ অনুসারে কাজ করাই সমীচীন। ভিত্তিমূল কাঁচা থেকে গেলে ভবিষ্যতে মস্ত কিছু করা সম্ভব হয় না। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকগণ যে অত্যন্ত যত্ন নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষাদান করে থাকেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় প্রদর্শিত রচনাগুলি থেকেই। ফাইন আর্টস বিভাগে কয়েকটি ছবি খুব উচ্চাঙ্গের মনে হয়েছে। এর মধ্যে অশোককুমার নন্দীর 'আণ্ডার দি বাম্বু ট্রি' (৬৪৩), পরেশনাথ পালের 'হেড স্টাডি' (৬৬৭), সজলকুমার রায়ের 'পালিশ' (৭২১), পরিতোষ মুখোপাধ্যায়ের 'ক্যামেল' (৬২৩), সুকুমার সাহার 'হেড অব অ্যান ওল্ড ম্যান' (৮৩৬), সুরেন্দ্র সিংহের 'রেস্ট' (৮৪২), শ্রীমতী রমা রায় চৌধুরীর 'ডেইলি লাইফ' (৭৪৬), সুহাস রায়ের 'মাই ফ্যামিলিয়ার' (৭৩৩), পরেশচন্দ্র মালাকারের 'পোরট্রেট স্টাডি' (৫৭৯), মিস্‌ ফিলোমেনা গোমেসের 'আণ্ডার দি গ্রীন ট্রি' (৪৮৩), দিলীপ দত্তের 'থ্রী ডাকস' (৩৪৬), শঙ্কর চক্রবর্তীর 'পেন অ্যাণ্ড ওয়াস' (১৫৩), সমরেন্দ্রনারায়ণ বসুর 'পেন অ্যাণ্ড ব্রাস' (১১৫)—এই ক'টি ছবি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। তৈল মাধ্যমে খুব পরিণত কাজ চোখে প'ড়ল না। শিক্ষকগণ যদি এ বিষয় একটু চিন্তা করেন তাহ'লে ভবিষ্যতে এই দুর্বলতাটুকুও দূরীভূত হবে। শুনলাম, উডকাট্‌ এবং ক্লে মডেলিঙ বিভাগ মাত্র

প্রিটেনশন —ফুলচাঁদ পাইন

তিন মাস হ'ল খোলা হয়েছে। এই অল্প সময়ের মধ্যেই ছাত্রছাত্রীরা বেশ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছে। উডকাট-এ কুমারী রমা রায় চৌধুরীর 'আনলোডিঙ' (৭৪১) অশোক বসুর 'স্লিউমেজ' (১৪০) এবং প্রাণকৃষ্ণ পালের 'কাঠগোলা' (৬৭৮) লক্ষ্যণীয়। টেরাকোটার কাজের মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগল, 'এ থটফুল মেইডেন' (১০০) এবং 'ডিয়ার কিড' (৩০০)।

বাছুর —বীরেন গোতম

প্রথমটি তৈরী করেছেন অসীমকুমার বসু এবং দ্বিতীয়টি তৈরী করেছেন ললিত-মোহন দে। কমার্শিয়াল আর্ট বিভাগটি ফাইন আর্ট অপেক্ষা অনেক দুর্বল ব'লে মনে হ'ল। তবে একেবারেই যে দর্শনীয় রচনা এখানে ছিল না তা নয়। এই বিভাগে প্রাচীরচিত্র, প্রচ্ছদপট, সংবাদপত্রের উপ-যোগী বিজ্ঞাপন লে-আউট, ক্যালেন্ডার প্রভৃতির রচনার নমুনা সাজানো হয়েছিল। কয়েকটি রচনা নকল মনে হ'ল। অবশ্য অধুনা কমার্শিয়াল আর্ট এই নকলবিদ্যার উপরই চলছে, তাহ'লেও ছাত্রাবস্থায় যতদূর সম্ভব মৌলিক রচনার চেষ্টা করাই উচিত নয় কি? স্ক্রেপার বোর্ড, শেডিঙ শীট, এয়ারব্রাস, ক্রাফটিন্ট, সলোটোন ও কলোটোন এবং ফটোগ্রাফী সম্বন্ধেও এই বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের কিছু কিছু শিক্ষা দান করা দরকার।

ড্রাফট্‌স্‌ম্যানশিপ বিভাগের ছাত্রদের রচনাও একটি ঘরে সাজানো হয়েছিল। এই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাধীনে থেকে কয়েক-জন ছাত্রছাত্রী সত্যিকার শক্তিশালী শিল্পী তৈরী হচ্ছেন এজন্য দ্বিধাহীন অভিনন্দন ইণ্ডিয়ান আর্ট স্কুলের অবশ্যই প্রাপ্য।

॥ ২ ॥

ইন্সটিটিউট অব আর্ট এণ্ড কালচার তাঁদের পঞ্চম বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনী করলেন কয়েক দিন আগে ১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরাসে। সব সমেত ৮৩টি ছবি এবং ৭টি ভাস্কর্য সাজান হয়েছিল। স্বর্গীয় ললিত-মোহন সেন এবং স্বর্গীয় প্রহ্লাদ কর্মকারেরও কয়কটি ছবি টাঙান হয়েছিল।

এ'দের বেশীরভাগ ছবিই অত্যন্ত মামুলি ধরনের। অল্প কয়কজন শিল্পী ছাড়া আর প্রত্যেকেই শিক্ষানবিশীর ছাপ কাটিয়ে উঠতে পারেননি। সম্ভবত ইন্সটিটিউটের সম্পাদক মশাই এই দুর্বলতা লক্ষ্য করেই পূর্বাহ্নেই সমালোচকদের মুখ বন্ধ করে দেবার জন্য তাঁদের নাম তালিকার পুস্তিকাটিতে এক জায়গায় লিখেছেন—"সমালোচকবৃন্দ দুর্বোধ্য এবং আঙ্গিক প্রধান ছবি হলেই তাতে আর্টের সন্ধান পাচ্ছেন এবং ভাষার ধূম্রজালে অক্ষম শিল্পকে রসোত্তীর্ণ করে সাধারণের সামনে উপস্থিত করার ফলেই দর্শক বিভ্রান্ত হয়ে পড়েন এবং নিজের রসগ্রহণের ক্ষমতা সম্বন্ধেও সন্দিহান হয়ে পড়েন।" কিন্তু আমাদের বিশ্বাস, সাধারণ দর্শকদের যতটা বুদ্ধিহীন মনে করা হয় ঠিক ততটা অবুঝ তাঁরা নন। আর পত্র-পত্রিকার মতামত দ্বারাই তাঁরা সবসময় চালিত হয়ে থাকেন একথাও মনে করা ঠিক নয়। আরেক জায়গায় ইনি লিখেছেন—"এই উৎকট ফর্ম-সর্বস্বতা যে সীমিত এবং শিল্পাদর্শের বিচ্যুতি এ উপলব্ধি যদি শিল্পী এবং সমালোচকবৃন্দ এখনও না করেন তবে আমাদের শিল্পজগতের ভবিষ্যত সম্পর্কে কোন আশা পোষণ না করাই শ্রেয়।" কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত শিল্পরসিক ডাঃ রীড বলেছেন—

Art is most simply and most usually defined as an attempt to create pleasing forms.

এই 'প্লিজিঙ ফর্ম'কে সীমাবদ্ধ বাস্তব জগতধর্মীই হতে হবে এমন কোনও কথা নেই। অবশ্য যাদের এই সীমা অতিক্রম করে এগিয়ে যাবার মত বোধশক্তি নেই তাঁদের আধুনিক চিত্রধারার দিকে ঘেঁষা কোনমতেই যুক্তিসংগত নয়। যে কোনও কল্পনাকে গঠন বা আকৃতিতে রূপান্তরিত করতে পারলেই শিল্পসৃষ্টি করা হয়। তবে বিদেশী আধুনিক ছবি সামনে ফেলে, অল্পবিস্তর অদলবদল করে, 'আর্ট' সৃষ্টি করাকে কোনমতেই সমর্থন করা চলে না। সমালোচকরা বাস্তবজগতধর্মী শিল্পের সবসময়ই নিন্দা করেন একথা সত্য নয়। বাস্তবজগতধর্মীই হোক বা অবাস্তবজগতধর্মী হোক—ছবি ভাল হলে তা সব সময়েই প্রশংসা পেয়ে থাকে।

এই প্রদর্শনীর উল্লেখযোগ্য শিল্পী-বৃন্দ হলেন, রণেন আয়ান দত্ত, সমর ঘোষ, অজিত গুপ্ত, বিনোদ কর্মকার এবং ভুটু প্রধান। এই প্রদর্শনীতে রণেন আয়ান দত্তের যে কটি ছবি টাঙান হয়েছে তা থেকে তিনি যে শক্তির অধিকারী তার পুরো পরিচয় পাওয়া যায় না। তাঁরও কয়েকটি ছবি অত্যন্ত মামুলীদের দলে ভিড়ে গেছে। ভারতীয় চিত্রে সমর ঘোষ শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারেন। তাঁর তিনখানি ছবির মধ্যে 'বিটেল নাটস প্লাকাস' (৫১) ছবিটি সবচেয়ে ভাল। অজিত গুপ্তের দুটি বড় বড় ভারতীয় চিত্রও চিত্তাকর্ষণ করে। বিনোদ কর্মকারের দুটি তৈলচিত্র 'ক্যানাল সাইড' (৬০) এবং 'রাতের পথ' (৬১) ভাল লাগল। এঁর প্যাস্টেলের কাজগুলি অপেক্ষাকৃত দুর্বল। ভুটু প্রধানের 'বোটস অ্যাট সী শোর' (৭৩) সত্যিই উৎকৃষ্ট ছবি। ইলা রায়চৌধুরীর কাঠখোদাইয়ের কাজটি খুব খারাপ নয়। কনক ভঞ্জন বিশ্বাস বর্মণের 'সন্ধ্যা' (১৩) ছবিটি মন্দ লাগল না। চিত্তরঞ্জন দাশের প্যাস্টেলের কাজ 'ইন এ মুড' (২২) ছবিটিও উল্লেখযোগ্য। স্বতস্ফূর্ত হস্তাক্ষর নকল করা যেমন সম্ভব নয়, গোপাল ঘোষের একান্ত স্বকীয় কাব্যপূর্ণ তুলির আঁচড় অথবা ওয়াশও নকল করা সম্ভব নয়। তাপস দত্তের 'ব্রোকেন আর্থে'-এ এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। যামিনী রায়ের শিল্প অত্যন্ত সযত্ন রচিত সুতরাং তাঁকে অনুকরণ করা খুব শক্ত নয়। সতীন্দ্রনাথ লাহা তাঁর 'মিতালী' (৬৫) ছবিতে যামিনী রায়কে অনুগমন করেছেন। ছবিটি চোখে পড়ে। কয়েকটি অতিশয় নিকৃষ্টদরের 'ল্যাণ্ডস্কেপ' টাঙিয়ে এই প্রদর্শনীর মান একেবারে নষ্ট করে ফেলা হয়েছে। ভাস্কর্যে চিত্তাকর্ষক কিছু চোখে পড়ল না।

নির্বাচকমণ্ডলী ভবিষ্যতে আরও যত্ন সহকারে এবং খাতির এড়িয়ে ছবি নির্বাচন করবেন আশা করি। ভাল ছবি দেখতে পেলে সমালোচকরা যাই বলুন না কেন—সাধারণ দর্শক পঞ্চমুখে প্রশংসা করবেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ভারতস্থ পাকিস্থানী হাই কমিশনার জনাব গজনফর আলি কলিকাতায় আসিয়া পাকিস্থানের রাজনৈতিক পরিবেশ সম্বন্ধে এই মন্তব্য করিয়াছেন যে, আবহাওয়ার অবস্থা পূর্বের তুলনায় বর্তমানে অনেকটা অনুকূল। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আবহাওয়ার পূর্বাভাসের কোন ঠিক ঠিকানা নেই, বৃষ্টি হবে না বলা হলে ছাতা বর্ষাতি না নিয়ে রাস্তায় বেরুলে পস্তাতে হয়, সুতরাং"...........

* * *

একটি প্রশ্নের উত্তরে জনাব সুরাবর্দি জানাইয়াছেন যে, গভর্নরের হাত হইতে তিনি ক্ষমতা পান নাই, ক্ষমতা
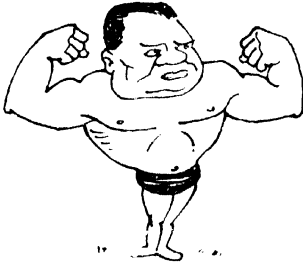
পাইয়াছেন তাঁর বিবেকের নিকট হইতে। "যাত্রার দলের বিবেক শ্রোতাদের থেকে অনেকবার "এন্‌কোর" পেয়ে থাকেন, সুরাবর্দি সাহেবও কিছু কম পাননি। দেখা যাক এবারের পালা কদ্দুর গড়ায়"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

পাটনাতে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের সভাপতি ডাঃ আর পি পরাঞ্জপে শিক্ষকদের প্রতি ন্যায় বিচারের আবেদন জানাইয়াছেন। "কিন্তু যাঁরা একলব্যের গুরুদক্ষিণাকেই শিক্ষকদের একমাত্র প্রাপ্য বলে মনে করে আসছেন তাঁরা এই আবেদনে সাড়া দিতে পারবেন কি?" মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

ভাষা সমস্যা প্রসঙ্গে ডাঃ পরাঞ্জপে বলিয়াছেন যে, যাহাদের মাতৃভাষা হিন্দী নহে তাহাদের জন্য মাধ্যমিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দীকে শিক্ষার মাধ্যম করা বাঞ্ছনীয় নহে। "পাটনার সিংহ-

বিবরে বসে এরকম কথা বলবার সাহসের তারিফ আমরা নিশ্চয়ই করব"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ডাঃ রাধাকৃষ্ণাণ তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে মন্তব্য করিয়াছেন যে, ধর্ম সম্বন্ধে প্রতিযোগিতা আমাদিগকে ত্যাগ করিতে হইবে। "বারোয়ারি পুজোয় পাশের গলি টেক্কা মেরে যাবে সে আমরা কিছুতেই সইব না, যিনি যা-ই বলুন না কেন"—বলে আমাদের এক সহযাত্রী কিশোর রক ফেলার (রকে বসে আড্ডা দেয় ইত্যর্থ)।

* * *

কর্পোরেশান কলিকাতার প্রধান প্রধান রাস্তার মোড়ে ভাস্কর্য অলংকরণের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়া একটি সংবাদ পাঠ করিলাম।—"অপ্রধান গলির মোড়-

গুলি অবশ্য প্রাচীন ঐতিহ্য বহন করেই চলবে"—বলিলেন বিশুখুড়ো।
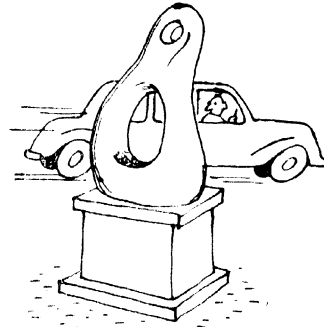
* * *

বারাসতের এক সংবাদে প্রকাশ, সেখানে কালু ফকির নামক এক ভিক্ষুকের পত্নী এক সঙ্গে তিনটি সন্তান প্রসব করিয়াছে। কালুর বয়স পঞ্চান্ন বৎসর। নবজাত তিনটি সন্তান ছাড়াও কালু ফকির আরও পাঁচটি সন্তানের জনক—"অর্থাৎ একুনে আটটি সন্তান। হতে পারে দীন, তবু নহে কালু হীন"—গান গাহিয়া শুনাইলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

নিউ ইয়র্ক টাইমস কাগজে শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী একটি পত্র প্রেরণ করিয়াছেন। সেই পত্রে তিনি আমেরিকাকে তার আণবিক বোমা কুমেরু অঞ্চলে ফেলিয়া দিতে পরামর্শ দিয়াছেন। "এই

পরামর্শ গ্রহণে আমেরিকার সংকোচের কোন কারণ নেই। মান্দ্রাজের এক সংগীত অনুষ্ঠানের উদ্বোধনী সভায় রাজাজী এই মন্তব্য করেছেন যে, সংগীত আণবিক বোমা অপেক্ষা শক্তিশালী। সুতরাং যুক্তরাষ্ট্র আণবিক বোমা ফেলে দিয়ে প্রাণভরে লারেলাপ্পা রেয়াজ করুন। পরবর্তী পত্রে রাজাজী প্রাভদা কাগজে সান্‌ডে কি মান্‌ডে সংগীতের রেয়াজের পরামর্শ নিশ্চয়ই দেবেন। পরামর্শ গৃহীত হলে বিশ্ববাসীর কান যাবে বটে, কিন্তু প্রাণটা বাঁচবে"—বলিলেন খুড়ো।

* * *

'গণ্ডার শৃঙ্গ-চূর্ণের ব্যবসায়ে ইংরেজদের সাফল্য"—একটি প্রবন্ধের শিরোনামা।—"প্রবন্ধকার বোধ হয় একথা জানেন না যে শুধু গণ্ডারের শৃঙ্গ চূর্ণ নয়, গণ্ডারের চর্ম ব্যবসাতেও ইংরেজেরা অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছেন"—বলে শ্যামলাল।

* * *

'ধান ভানাই কমিটি" পশ্চিমবঙ্গে ধান ভানাই ব্যবস্থাদির অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন ব্যক্তির বক্তব্য শ্রবণ করিয়াছেন। "বিভিন্ন ব্যক্তিরা কি বক্তব্য কমিটিকে শুনিয়েছেন তা জানিনে, অন্তত আশা করছি তাঁরা ধান ভানতে শিবের গীত গাননি"—বলেন বিশুখুড়ো।

চক্রদত্ত

"জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার" কথাটি বোধ হয় একদিন ভুল ব'লেই প্রমাণিত হতে পারবে। বর্তমানে বৈমানিকদের আকাশে না উড়ে বিমান চালনা শিক্ষা দেওয়ার উপায় উদ্ভাবিত হচ্ছে। জনৈক ইটালিয়ান ভদ্রলোক উপায়টি উদ্ভাবন করেছেন। কোনও
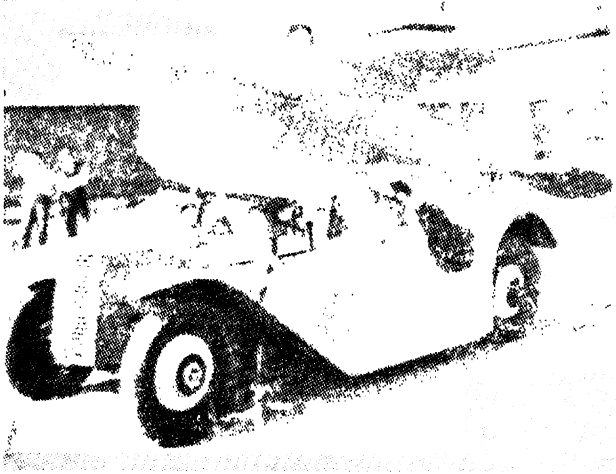
ধরি মাছ না ছুঁই পানি

মোটরের ওপর ছোটখাট একটি বিমান লাগিয়ে নিতে হবে। বৈমানিক অ্যারোপ্লেনের মধ্যে বসে সাধারণভাবে চালনা শিক্ষা করতে থাকবেন। বিমানটি অবশ্য কোনও সময়েই আকাশে উড়বে না। মোটরচালক যখন মোটরটি চালাবেন তখন ওপরের বিমানের সঙ্গে একটি যান্ত্রিক যোগাযোগ রক্ষা করা হবে, ফলে বিমানচালক এই অবস্থায় বিমানের বিভিন্ন অংশ চালনা শিক্ষা করতে থাকবেন।

*

সাধারণত ব্যাধি উপশমের জন্য সাধারণ চিকিৎসকের এবং আধি উপশমের জন্য মনস্তত্ত্ববিদের সাহায্য দরকার হয়। মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণ রোগীকে নানারকম প্রশ্ন করে, তাদের চালচলন ধরন-ধারণ লক্ষ্য ক'রে মনোবিকারের কারণ নির্ধারণ করতে চেষ্টা করেন এবং সেই কারণটি অপসারণ করার চেষ্টা করেন। এছাড়া সাধারণ চিকিৎসকগণ আজকাল বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সাহায্যে কিংবা বাজারের পেটেন্ট ওষুধের সাহায্যে এইসব বিকারগ্রস্ত রোগীদের চিকিৎসা করেন। ক্যালিফোর্নিয়ার ডাঃ ওয়াটসন অন্য একটি উপায়ে এদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছেন। ডাঃ ওয়াটসনের মতে মানুষের দেহ ও মনকে সুস্থ ও স্বাভাবিক অবস্থায় রাখার জন্য মনুষ্যদেহের প্রায় ৫০ রকম রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয়। তিনি বলেন যে, এই বিভিন্ন ধরনের পদার্থ যদি দেহের মধ্যে পরিমিতভাবে প্রবেশ করান যায় তাহ'লে এইসব বিকারগ্রস্ত রোগীদের খুব উপকার হয়। ডাক্তারগণ এই দিকটা বিশেষ চিন্তা না ক'রে গতানুগতিক উপায়ে চিকিৎসা ক'রে চলেন, ফলে খুব কম ক্ষেত্রেই চিকিৎসা ফলপ্রসূ হয়। ডাঃ ওয়াটসন বলেন যে, শুধুমাত্র ক্যালিফোর্নিয়াতেই প্রায় ৩৬ মিনিট অন্তর একটি ক'রে মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়। হিসাব করলে দেখা যাবে যে, গড়ে চারটি পরিবার পিছু একটি মানসিক বিকারগ্রস্ত রোগী পাওয়া যায় এবং প্রতি বিশ জনের মধ্যে একটি মারা পড়ে। ডাঃ ওয়াটসন ৩২টি রোগীকে তাঁর পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে ২৯ জনকে ভালো করে তুলেছেন, এর মধ্যে ১৫ জনকে সম্পূর্ণ সুস্থ করতে পেরেছেন। তিনি বলেন যে, এইভাবে পরীক্ষা করে যদি আশাপ্রদ ফল পাওয়া যায় তাহ'লে অদূর ভবিষ্যতে আর পুরোনো পদ্ধতিতে চিকিৎসার প্রয়োজন হবে না।

*

স্বর্গীয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এক সময়ে ব্যঙ্গচ্ছলেই গেয়েছিলেন- "একটা নতুন কিছু কর।" আজকাল যেন মানুষকে এই নতুন কিছু করার নেশায় পেয়েছে। নিত্য নব নব আবিষ্কারের ফলে মানুষের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য যে কত বেড়ে গেছে তার আর ইয়ত্তা নেই। আমেরিকার একটি কোম্পানী কাগজ দিয়ে সাঁতারের পোশাক তৈরী করে বাজারে বিক্রী করছেন। আমরা শিশুকালেই জলে কাগজের নৌকা ভাসিয়ে দেখেছি কাগজ জলে কত সহজে গলে যায়। অথচ আজ সাঁতারের পোশাক তৈরী হচ্ছে কাগজ দিয়ে। এই কাগজের পোশাক পরে একজন সাঁতারু খুব কম করলেও পাঁচবার সাঁতার কাটতে পারেন। অবশ্য সাধারণ কাগজ দিয়ে এই পোশাক তৈরী হয় না। সাঁতারের পোশাক তৈরীর কাগজ রেজিনে ডুবিয়ে নেওয়া হয়। যে কোম্পানী এই পোশাকের প্রচলন করেন তাঁরা প্রথমে এইরকম রেজিনে ডোবানো কাগজ দিয়ে জল প্রতিরোধক ঠোঙ্গা তৈরী করতেন। পরে এরা একটা নতুন কিছু করার নেশাতেই ঐ কাগজ দিয়ে সাঁতারের পোশাক তৈরী করেন। যুদ্ধের সময় এইসব কাগজ সৈন্য বিভাগে নক্সা তৈরীর কাজে ব্যবহার করা হতো, কারণ যুদ্ধক্ষেত্রে সাধারণ কাগজ জল, তেল, রং কাদা ইত্যাদিতে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল।

শাঁখামুঠি

শ্রীঅজয় হোম

শীতের পর গরম পড়তে শুরু করেছে। আকাশ পরিষ্কার। নীল আকাশের কোণে শুধু সাদা সাদা মেঘ। ঝলমলে সকালবেলার রোদে পুরনো বেসাল্ট পাথর দিয়ে গাঁথা দেওয়ালটা আস্তে আস্তে গরম হয়ে উঠছে। পাশেই প্রকৃতির সম্ভারপ্রাচুর্যে মকাই-খেতের ডগাগুলোর মাথা আপন ভারে আপনিই নত হয়ে প্রণতি জানাচ্ছে।

বেসাল্ট পাথরের পাঁচিলটার উপরে শুয়ে ছিল ফিকে হলদে আর কালোর প্রায় দু' ইঞ্চি করে বেড় দেওয়া প্রমাণ সাইজের এক রাজসাপ—শাঁখামুঠি। সকালের রোদটা তার বেশ ভালই লাগছিল। কিন্তু পাথর তেতে ওঠাতে তার মৌতাতে রসভঙ্গ ঘটলো। নেহাৎ অনিচ্ছায় সুখশয্যা ছেড়ে বাতাসে দোল খাওয়া মকাই-সমুদ্রের মধ্যে নেমে এসে দিল ডুব।

দিন তিনেক আগে এক গোলার নীচে দু'তিনটে বাচ্চা ইঁদুর মাত্র জুটেছিল তার কপালে। ব্যস—তারপর তিনদিন স্রেফ পেটে কিছু পড়েনি। মকাই-খেতের তলায় তলায় প্রথম খানিকটা সে যদৃচ্ছা বিচরণ করল নাকটাকে মাটিতে আলতো-ভাবে ঠেকিয়ে—যেন কুকুর চলেছে গন্ধ শুঁকে শিকারের পিছু পিছু।

হঠাৎ বাতাসে যেন কিসের একটা গন্ধ সে অনুভব করল। চেনা চেনা গন্ধ তার নাকে আসছে। কোন্ বাবুর্চিখানায় কে যেন বানাচ্ছে মোরগ-মসল্লা! তিন-দিনের না খাওয়া খিদের তেজ বেড়ে উঠল তার। চলল সে আঁকা-বাঁকা পথে সেই প্রাণমাতানো সুগন্ধ ধ'রে।

রাজসাপ—জাত-শিকারী সে। পথ ভুল বা বিভ্রান্ত হবার ছেলে সে নয়। ধীরে ধীরে পৌঁছল তার শিকার তার মোরগ-মসল্লা—এক মেঠো-ইঁদুরের সন্নি-কটে। ভুট্টার দানা খেয়ে বেশ নধর পুষ্ট। সন্তান সম্ভাবনাতে দেহে একটা পরি-পূর্ণতাও এসেছে।

মেঠো-ইঁদুর তাকে আগেই দেখে ফেলে দিল ছুট্ মাটির তলায় তার আস্তানার দিকে। আস্তানায় পৌঁছাবার পথ তার অনেক। মাটির উপর ছোট ছোট গর্ত তার করা আছে। বিপদ দেখলেই সট্‌কাবে যে কোন একটা পথে। তার আস্তানায় পৌঁছবার দরজা এগুলো। কিন্তু কোন পথই তার আর নিরাপদ নয়। সাক্ষাৎ কৃতান্তের সঙ্গে তার দর্শন লাভ ঘটেছে। তার কি আর নিস্তার আছে! কোথায় পালাবে সে?

শাঁখামুঠি তার পলায়মান শিকারের গর্তের ভিতর ঢুকে প'ড়ে ভীতা সন্ত্রস্তা ইঁদুরীকে ধরল তার তীক্ষ্ণ দাঁতের ফাঁকে। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যে সব শেষ।

আজকের এই সুন্দর সকালে রাজ-সাপই ভুট্টাখেতের একমাত্র একচ্ছত্র শিকারী নয়। এক ছোকরা পাহাড়ী বোড়া সাপও সাত সকাল থেকে ঘুরে একটা ছুঁচো ও গোটা তিনেক পুঁচকে মেঠো-ইঁদুরের ছানায় মোটা রকমের প্রাতরাশ সেরে গদাইলস্করী চালে ফিরছিল পাথরের পাঁচিলটার ধারে রাজসাপের আস্তানার কাছ দিয়ে। মনের বাসনা কোন ফাটলের মধ্যে ঢুকে একটু বিশ্রাম নেবে। সকালের ভোজনপর্বটা তার বেশ গুরুই হ'য়েছে হজম হওয়াতো চাই।

একটা ফাটল দেখে ঢুকতে যাচ্ছে তার ভিতরে এমন সময় সামনে এসে হাজির রাজসাপ। সাধারণত পাহাড়ী বোড়ারা কোন জীবিত প্রাণীকে তার পথ ছাড়ে না, কিন্তু এই মুহূর্তে তরুণ বোড়াটির যুদ্ধের সাধ একদম ছিল না। ভরাপেটে বিশ্রামটাই ছিল বর্তমানে তার একমাত্র কাম্য। এই বিবেচনায় বিশালকায় রাজসাপ শাঁখামুঠির পাশ কাটাতেই সে চাইল। কে শুনবে সে কথা? রাজসাপের ইচ্ছে যে অন্যরূপ। শান্তিতে বিষধর নব্য ছোকরাটিকে যেতে দিতে সে রাজি নয়। তড়িৎগতিতে পাহাড়ী বোড়াটার ঘাড় কামড়ে ধরে এক ঝটকায় নিজের আয়ত্তে এনে সমস্ত শরীরের ওজন দিয়ে পেশীর সাহায্যে তাকে পাকাতে লাগল।

আচমকা এই অভদ্রজনোচিত ব্যবহারের জন্য পাহাড়ী মোটেই প্রস্তুত ছিল না। উপায় নেই—আত্মরক্ষার্থে তাকে সংগ্রামে নামতেই হ'ল। দু'জনের মল্ল-যুদ্ধের দাপটে, চাবুকের মত লেজের ঝাপটায় চতুর্দিকের ঘাস থেঁতলে যেতে লাগল। শাঁখামুঠির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রাণপণ শক্তিতে পাহাড়ী তার নিজের দেহকে সংকুচিত করার চেষ্টা করল। ধারাল দাঁত ও শ্বাসরোধকারী পেষণের হাত থেকে মুক্ত হ'তে না পারলে তার আর নিস্তার নেই।

একবার সে প্রায় নিজেকে মুক্ত করে ফেলেছিল একটা চারা গাছের গোড়ায় লেজটা জড়িয়ে কিন্তু শাঁখামুঠি মুহূর্তের মধ্যে এক প্যাঁচে তাকে গাছের গোড়া থেকে সরিয়ে নিল। বারকয়েক রাজসাপকে বিষাক্ত দাঁত দিয়ে কামড়ও দিল। তার বিষে কিন্তু কোন ফলই হ'ল না, কারণ কোন বিষেই রাজসাপকে কাবু করা যায় না।

শরীরে শক্তি তার আর নেই। শাঁখা-মুঠির বজ্রসম কঠিন পেষণকে প্রতিহত করার ক্ষমতা তার লোপ পেয়ে যাচ্ছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার শিথিল হ'য়ে আসছে। সে ধীরে ধীরে নিজেকে ছেড়ে দিল। চেতনা তার লোপ পাবার উপক্রম। অবশ অসাড় হ'য়ে আসছে তার সমস্ত সত্তা। সকালের উজ্জ্বল আলো ক্রমে ক্রমে তমসা-বৃত রাত্রির মতন প্রতীয়মান হ'চ্ছে।...... আস্তে আস্তে সব আলো তার নিভে গেল।......

শাঁখামুঠি অপেক্ষা পাহাড়ী বোড়া দৈর্ঘ্যে ছোট হ'লেও প্রস্থে বেশ বড়ই। তাতে রাজসাপ ঘাবড়ায় না। সে তরুণ বোড়াটিকে গিলতে শুরু করল। মোটা দেহের জন্য তার গ্রাস করায় কোন অসুবিধাই নেই। প্রকৃতি তার সুব্যবস্থা করেই রেখেছেন:

সব সাপেরই চোয়াল এমনভাবে ঝিল্লিময় সন্ধি-বন্ধনী দিয়ে তৈরী যে গিলবার সময় সেগুলো প্রয়োজনমত বেড়ে যায় স্বাভাবিক মুখ-ব্যাসের দশ-বারোগুণ বেশী। ধ'রে খাবার মত সাপদের তো আর হাত নেই! তাদের সূঁচের মত সরু তীক্ষ্ণ দাঁতগুলোর ডগা ভিতর দিকে বাঁকানো। সাপের মুখ-গহ্বর থেকে সাপ নিজে না ছেড়ে দিলে

কোন জীবের মুক্ত হওয়া দুরূহ ব্যাপার। যদি কেউ ভাগ্যবলে দৈবাৎ নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে পারে তবে এই ভিতর দিকে বাঁকা দাঁতের জন্য সমস্ত দেহ ফালি ফালি হয়ে ক্ষতবিক্ষত হবে ঠিক চষা জমির মত। সাপের মুখে ঢোকারই পথ আছে বেরোবার পথ নেই।

সাপের তলার পাটির চোয়াল দুভাগে ভাগ করা। এক অংশ অপর অংশের কোন সম্পর্ক না রেখে ইচ্ছামত নড়াচড়া করতে পারে। বাম অর্ধাংশের চোয়াল স্বল্প নড়াচড়ায় সক্ষম উপর পাটির চোয়ালে অবস্থিত যে দন্তশ্রেণী আছে তাকে সাহায্য করে। কোন জন্তুকে সে যখন গেলে তখন তার নীচের পাটির চোয়ালের ডান অর্ধাংশকে এগিয়ে নিয়ে যায় জন্তুটির দেহরেখা ধরে যতটা তার পক্ষে সম্ভব, তারপর সেই এগোনো অবস্থায় ডান অর্ধাংশকে স্থির রেখে বাম অর্ধাংশকে এবার ঠেলে এগিয়ে নেয়। এইভাবে অতি ধীরে ধীরে তলার চোয়ালের এগোনো পিছনো করে শিকারকে সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করে ফেলে।......রাজসাপও তাই করতে শুরু করল।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই কেবলমাত্র পাহাড়ীর লেজের ডগাটুকু মুখের বাইরে ঝুলছে দেখা গেল। মিনিটখানেকের ভিতর শেষগ্রাসে সেটুকুকেও মিলিয়ে দিল মুখগহ্বরে।

পরম শান্তি। পরম নিশ্চিন্ত। এরপরে নড়াচড়া করতে কি আর কারুর ভাল লাগে? রাজসাপ কোথাও গেল না। কোনমতে শরীরটাকে নিতান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে ঘেঁষড়ে পাথরের দেওয়ালটার তলায় কুণ্ডলী পাকিয়ে ঝিমুতে লাগল।

চোখ দুটো তার খোলাই রইল। মানুষের মত চোখ বন্ধ করে সাপেরা তো কখনও ঘুমোয় না। তাদের চোখ কখনই বন্ধ হয় না, সব সময়েই খোলা থাকে। চোখের উপরে থাকে একটা স্বচ্ছ পর্দার চাকতি বসানো। ঘুমের সময় কেবল তাদের চোখের তারাটা ছোট হয়। কখনওবা ঘুমের সময় চোখের মণির মাংসপেশীগুলো আলগা হয়ে চোখের যে কোন এক কোণে সেটা অবস্থান করে।

শাঁখামুঠি দিনকতক এখন বিশ্রাম করবে। নেহাৎ না সরলে নয় ততটুকুই সে শরীরটাকে নাড়াবে মাত্র। গুরুভোজনের পর সাপেরা নড়াচড়া মোটেই পছন্দ করে না যতদিন না ভোজ্যবস্তুটি সম্পূর্ণরূপে পরিপাক হয়।

পাহাড়ী বোড়ার সঙ্গে লড়ায়ের মাস দেড়েক আগেই শীতের আশ্রয় ও খোলস ছেড়ে রাজসাপ বেরিয়েছিল তার সফরে। এখন এই পূর্ণ ভোজনের পর শরীরে এসেছে শক্তি। ভিতর থেকে একটা অব্যক্ত তাগিদ আসছে সঙ্গিনী সান্নিধ্যের জন্য। সমস্ত দেহটা যেন কী এক অসোয়াস্তিতে ভরা। প্রবল ঘ্রাণশক্তির বলে বুঝল ধারে কাছে তার সমগোত্রীয় কোন নারী বিরাজ করছে না। এমন কি তার বর্তমান আবাসস্থল এই পাথরের দেওয়ালের খোঁদলের পাশ দিয়ে তাকে উপেক্ষা করেও কেউ যায় নি। এমত অবস্থায় তাকে বেরতেই হয়। ক'দিন বিশ্রাম নিয়ে শরীরটা বেশ ঝরঝরে চাঙ্গা মনে হচ্ছে তার।

সে চলল মকাই-খেতের ভিতর দিয়ে। খেতটা যেখানে শেষ হয়েছে সেখানে গিয়ে দেখল তাকে শ'দুই ফিট নীচে নামতে হবে মালভূমির উপর থেকে কাটা ধানখেতের মধ্যে। ধানখেতের শেষে বয়ে চলেছে বরফ ধোয়া নীল নদী সিন্টুক্সিয়ার।

সিন্টুক্সিয়ার — 'স্বর্ণফুলী'। জয়ন্তীয়া পাহাড়ের রাজধানী জোয়াই-এর মধ্যে দিয়ে বয়ে চলেছে অপূর্ব সঙ্গীতে—প্রাণচাঞ্চল্যে। কোথাও পরিষ্কার নীল জল কোথাও বা ঘোলা। যেখানে স্বচ্ছ নীল পরিস্কার জল সেখানে তলা দেখা যায়। আর দেখা যায় ট্রাউট ও মহাশোল মাছের খেলা।

পাথরের বড় বড় ঢিবির পাশ দিয়ে আগাছা ও ঘাসের উপর দিয়ে ধীরে ধীরে শাঁখামুঠি নীচে নামতে লাগল।

একটা বড় পাথরের ঢিবির পাশে আসতেই যে গন্ধ সে খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই পরম আরাধ্যার ঘ্রাণ তার নাকে এসে ঠেকল। কাছেই তার দয়িতা—তার কাম্য—তার ঈপ্সিতা! কোথায়? এপাশে ওপাশে পাথরের গায়ে আগাছার আগায় ঘাসের মাঝে নূতন-পুরাতন সব গন্ধই সে প্রাণ ভরে নিচ্ছে আর আস্তে আস্তে এগোচ্ছে সদ্য পরিত্যক্ত গন্ধ ধ'রে।......ঐ ঐতো বড় পাথরের তলার খোঁদলের পাশেই একটা কাঁটাঝোপের গা ঘেঁষে তার হবুসঙ্গিনী।

তেল চক্‌চ'কে কালো আর সোনালী হলদের বেড়ের মোটা বলয় যেন তার সারা দেহে। সুন্দর! ভয় বিস্ময় আর সৌন্দর্যের সমাবেশে সুন্দর। বাতাসে ভাবী-সঙ্গীর আগমন সংবাদ পেয়ে রূপসীর চেরা জিভ নিমেষের মধ্যে অনবরত ভিতরে ঢুকছে আর বাইরে বেরচ্ছে। চেরা জিভ তাদের শুধু স্পর্শেন্দ্রিয় নয়। এর সাহায্যে ধরতে পারে সুদূর থেকে ভেসে আসা সামান্যতম গন্ধও।

তার রাজ্যে যে একজনের প্রবেশ ঘটেছে তীব্র ঘ্রাণশক্তি দিয়ে বুঝতে তার বিন্দুমাত্র দেরি হল না। এই অচেনা অজানা পুরুষ দেখে সে মোটেই ভয় পেল না। সেও যে রাজপুত্রের জন্য অপেক্ষা করছিল—কবে সে আসবে তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে। কবে তার সেই দয়িত আসবে যে তাকে করবে সার্থক—পূর্ণ।......

শাঁখামুঠি নবলব্ধ প্রেয়সীর উপর দিয়ে দু'একবার তার দেহকে আস্তে আস্তে পারাপার করল। রাজকন্যা নিথর নিস্পন্দ। কোন বাধাই সে দিল না। শাঁখামুঠি এবার তার দেহটাকে প্রেয়সীর উপর ন্যস্ত করে দেহের ওজন দিয়ে বেড় দিল।......দু'জনের মুখ সামনাসামনি। একটু কেবল তুলে ধরা......পলকহীন চোখের শুভদৃষ্টি!......তড়িৎগতিতে পরস্পরের দ্বিখণ্ডিত জিভ পরস্পরের জিভকে স্পর্শ করছে আর মুখ-গহ্বরে প্রবেশ করছে।...দ্রুত নিশ্বাস সঞ্চালনে গলার কাছটা ফুলে ফুলে উঠছে। নির্জন পরিবেশে নিশ্বাসের এই ফোঁস ফোঁস শব্দ চতুর্দিক বেশ ভীত চকিত করে তুলেছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কীটপতঙ্গ ও বিহঙ্গকুলকে।......দু'জনেই দু'জনের দিকে স্থির নেত্রে তাকিয়ে দুলছে।......

কিছুক্ষণ পরেই শেষ হ'ল তাদের সর্প-সঙ্গম। পরস্পরকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে চলে গেল যে যার পথে। শাঁখামুঠি ফিরে গেল তার নিজের আস্তানায় উপরে সেই বেসাল্ট পাথরের দেওয়ালের খোঁদলে। আর তাদের দেখা হবে না।

সেই সঙ্গমের পর দু'মাস কেটে গেছে। স্ত্রী-রাজসাপ অনুভব করতে শুরু

করেছে তার শরীর ভারী হয়ে উঠছে। পেটের ভিতর ডিমগুলি দিন দিন বড় হচ্ছে। ডিম পাড়বার জন্য নতুন বাসার দরকার। তার এই আস্তানা ডিম ফোটার পক্ষে উপযুক্ত নয়। তার প্রিয় আবাসভূমি ছেড়ে সে নীচে নামতে লাগল সমতলক্ষেত্রে।

পাহাড় আর মাটির সন্ধিস্থলে নেমে এসে দেখল একটা পুরনো গাছের মোটা গুঁড়ি পড়ে আছে। ঘুণ ধ'রে গর্ত হয়ে গেছে। সেই গর্তের মধ্যে দিয়ে গুঁড়ির ভিতর ঢুকল সে। যুগ যুগব্যাপী সহজাত সংস্কার বশে তার বুঝতে বাকি রইল না যে ডিম ফোটাবার আদর্শস্থান এই ঘুণে ধরা পাউডারের মত কাঠের গুঁড়ো ভর্তি গর্তটাই। আসন্ন সন্তান-সম্ভাব্যে মা-সাপ কুন্ডলী পাকিয়ে সেখানেই শুলে। কিছুক্ষণ পরেই শুরু করল ডিম প্রসব করতে।

কয়েক মিনিটের ব্যবধানে দু'ঘণ্টার মধ্যে মা-রাজসাপ পনেরটি সাদা, চামড়ার খাপে ঢাকা লম্বাটে ধরনের ডিম পাড়া শেষ করল। ডিমগুলি লম্বায় প্রায় সওয়া ইঞ্চি, চওড়ায় আধ ইঞ্চিটাক হবে। কুন্ডলীকৃত দেহটার মাঝে ডিমগুলি স্তূপীকৃত হয়ে উঠল। শেষ ডিমটি প্রসব করার কিছু কালের মধ্যেই কুন্ডলী পাকানো অবস্থা থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে কাঠের গর্ত থেকে সে এল বাইরে।

ডিমগুলোকে কিছু দিয়ে ঢাকা দেবার চেষ্টা বিন্দুমাত্র সে করল না। দেখল সে নরম কাঠের গুঁড়োর মধ্যে নিজে থেকেই ওগুলো বেশ খানিকটা করে ডুবে গিয়েছে। হাবভাব দেখে মনে হল সে যেন জানে যেখানে ডিম সে পেড়েছে কয়েক সপ্তাহ সেখানে সেগুলো থাকলে প্রাকৃতিক নিয়মে আপনা থেকেই ফুটবে। তাকে আর তদ্বির করতে হবে না। ডিম ফোটাবার দায় থেকে সে মুক্ত। তাই সে পাহাড়ের গা বেয়ে পরম নিশ্চিন্তে ও নির্ভাবনায় ফিরে চলল নিজের আস্তানার দিকে পিছনের কোন টান না রেখে।

উপরের দিকে ফিরে যেতে পাশেই পড়ল একটা গরু। আগাছা চিবোচ্ছে আপন মনে।......সাপ সম্বন্ধে সাধারণ মানুষ নানারকম উদ্ভট কল্পনার আশ্রয় নিয়ে থাকে। বদনামটা বিশেষ করে শাঁখামুঠির (Lampropeltis getulus) নিকট জ্ঞাতি দুধরাজ সাপের (Lampropeltis doliata) উপরই বেশী। তারা নাকি গরুর বাঁটে মুখ দিয়ে দুধ টেনে খায়।

খামারের মধ্যে শাঁখামুঠি ও দুধরাজ ঢোকে ছুঁচো ইঁদুর খেতেই, গরুর দুধ নয়। সাপের গলার ভিতর দুধ টেনে চুষে খাবার মত এমন কোন শক্ত পেশীই নেই। তাছাড়া কোন গরুই তার বাঁটের উপর সাপের ঐ তীক্ষ্ণ দাঁতের স্পর্শকে সুখদায়ক বলে মনে করবে না। আগে থেকেই সে লাফাতে ও পা ছুঁড়তে থাকবে। সাপ দেখে ভয় বা অন্যান্য কারণে দুধ কম দিলে মানুষ অকারণে তার উপর এ কলঙ্ক চাপিয়ে থাকে।

শুকনো কাঠের স্বাভাবিক উষ্ণতা ও দুপুরের রোদ গুঁড়িটার উপর পড়াতে ভেতরটা আপনা থেকেই বেশ গরম হয়ে উঠল। সেই গরমে ডিমের ভিতরে অবস্থিত ভ্রূণগুলি বেশ তাড়াতাড়ি বাড়তে শুরু করে দিল। কাঠের পাউডারের পার্টিকিলে রঙের সঙ্গে মিশে ডিমের খোসার রঙও সেই ধরনের হয়ে গেল এমন যে হঠাৎ সেগুলোকে ডিম বলে চেনা শক্ত।

নরম অথচ শক্ত চামড়ার খোসার ধরন-ধাঁচ একটু একটু করে বদলাতে থাকল যেমন যেমন ভ্রূণগুলি ভিতরে বড় হতে লাগল। ওদের মধ্যে তিনটে ডিম গেল কাঠপিঁপড়েদের ভোগে। তাদের হাত থেকে ওরা পরিত্রাণ পেল না। তারা শক্ত চামড়ার মুখ কেটে ভিতরের মালমশলা সব সাফ করে দিলে। বাকি বারোটা স্বাভাবিকভাবেই পরিণতির পথে বেড়ে চলল।

মা তাদের ছেড়ে যাবার প্রায় পাঁচ সপ্তাহ পরে ওদের মধ্যে সবচেয়ে যেটা বড় ডিম সেটা হঠাৎ একদিন নড়েচড়ে ওলট-পালট খেতে শুরু করে দিলে। খানিকবাদেই খোসার এক কোণে একটা ছোট্ট ছেঁদা দেখা গেল। তারপরেই কুতকুতে একজোড়া গোল কালো উজ্জ্বল চোখ উঁকি মারল তার ভিতর থেকে। ধীরে ধীরে বার করে আনল তার সমস্ত মাথাটা। এদিক ওদিক মাথাটা ঘুরিয়ে দেখল তার অন্ধকারময় স্বল্প দুনিয়াটাকে। অল্প পরেই তার আট ইঞ্চি দেহটাকে পুরো বের করে এনে তার অজাত ভাইবোনদের ডিমের উপর চড়ে বিশ্রাম করতে লাগল। খুব বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে তাকে হ'ল না। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে কাঠের গর্তটা শিশু-সাপে ভরে উঠল। এক কোণে পড়ে রইল তাদের পরিত্যক্ত ডিমের শক্ত খোসাগুলি।

প্রতিটি সাপের নাকের উপর ছিল ছোট্ট শক্ত সূঁচোগ্র ব্রণের মত একটি মাংসপিন্ড যাকে বলে ডিম-দাঁত। তাই দিয়ে তারা ডিমের শক্ত খোসায় প্রথমে ছেঁদা করে মাথাটা বের করে। ডিম থেকে বেরিয়ে আসার পর এই দাঁত আস্তে আস্তে আবার শরীরের মধ্যেই মিলিয়ে যায়।

বাচ্চাগুলো কিন্তু সঙ্গে সঙ্গেই বাইরের আলোয় বেরিয়ে আসার জন্য ব্যস্ত হল না। বাইরে গিয়ে খাবার খোঁজার সময় এখনও তাদের হয় নি। ডিমের খোসার গায়ে যে খাবার এখনও লেগে আছে, যে খাবার ডিমের ভিতরে থাকতে খেয়ে এতদিন পুষ্ট হয়েছে সেই অবশিষ্ট খাবারেই এখন তাদের বেশ চলবে দু'চারদিন।

ঐ খেয়ে তারা অল্প অল্প বড় হ'তেও লাগল। কিন্তু পশুপাখীর মত এদের দেহের চামড়া-মাংস স্বাভাবিকভাবে টান হয়ে বড় হয় না। দেহ বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা খোলস ছাড়ে। পুরনো কাপড় ছেড়ে গায়ের মাপে একটু বড় নতুন কাপড় পরে। বাইরের খোসা ছেড়ে নতুন একটু বড় খোসা পরাকেই সাপের খোলস ছাড়া বলে। এই বাইরের খোসা ছাড়া তাদের বয়স বাড়ার সঙ্গে সমানে চলতে থাকে।

এই খোলস ছাড়ার সময় দুধের মত দেখতে একরকম তৈলাক্ত পদার্থ বেরতে থাকে নতুন আর পুরনো চামড়ার মধ্যে। চোখের উপরের স্থায়ী চামড়ার ঢাকনীটা সাদা ঘোলাটে দুধের মত হ'য়ে ওঠে দু'একদিনের জন্য। এর থেকেই অনেকের বিশ্বাস যে সাপ যখন খোলস ছাড়ে তখন সে অন্ধ হয়ে যায়। সত্যিই তারা এসময় পরিস্কার করে বিশেষ কিছুই দেখতে পায় না। তাই কাছাকাছি কেউ এলে ছোবল মেরে আক্রমণ করে থাকে।

খোলস ছাড়ার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমাদের বাচ্চা রাজসাপদের চেহারা হ'ল অত্যন্ত মজাদার—, হাস্যকরও। কারুর বা সার্কাসের ভাঁড়ের মত গলার কাছে সাদা ফ্রিল, কারুর বা খোঁচা খোঁচা গোঁপ নাকের

কাছে, কারুর মুখ বা হ'ল হোঁদল কুত্-কুতের মতন। মুখের কাছে পুরনো খোলস ছেড়ে নতুন খোলস পরার সময়েই এটা হয়। কারণ নতুন খোলস হবার সময় পুরনো খোলসটা খুলতে শুরু করে উল্টো দিক দিয়ে।

এই সময় বাচ্চাগুলো খুব তৎপর হয়ে উঠল। গর্তের ভিতর কাঠের গায়ে তাদের মাথা মুখ ক্রমাগত ঘষে ঘষে পুরনো ঝুল্‌ঝুল করে লেগে থাকা খোলসটা তুলে ফেলতে লাগল। এমনি করে কেউবা একটা আস্ত খোলসই ছাড়িয়ে ফেলতে পারল। মাথা থেকে লেজ পর্যন্ত পুরো চামড়াটা দেখতে হল ঠিক অবিকল তার পূর্ব দেহ। আর কেউ বা ছেঁড়া ছেঁড়া টুক্‌রো অবস্থায় খুলে ফেলল পুরনো খোলসটা। গর্তের ভিতর চারিদিকে জমা হল তাদের পুরাতন আধা স্বচ্ছ দেহের আবরণ।

নতুন কাপড় তাদের পরা হয়ে গেল। ডিমের অবশিষ্টাংশও প্রায় শেষ। এখন তাদের ক্ষুদ্র কাঠের গুঁড়ির আশ্রয় ছেড়ে বৃহত্তর দুনিয়ায় বেরিয়ে পড়ার সময়। ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আর তারা বাঁধা থাকবে না। প্রত্যেকে চলবে স্ব স্ব ভাগ্য অন্বেষণে তাদের নিজ নিজ পথে।

বড় ভাইটি সেই কাঠের গুঁড়ির ভিতর থেকে এল বেরিয়ে। সূর্যের আলোয় তাকে মনে হল ঠিক যেন রূপকথার শাপভ্রষ্ট রাজপুত্র! ছোট ছোট মিশ্‌মিশে কালো আর সোনালী হলদের বেড়ের অপরূপ পোশাক রোদে ঝলমল ক'রে উঠল।

ছোট্ট চেড়া জিভটি এদিক-ওদিক ঘন ঘন বের করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চেষ্টা করল বুঝতে পারিপার্শ্বিক দুনিয়াটাকে। সাপের জিভ স্পর্শেন্দ্রিয় শ্রবণেন্দ্রিয় দুইই। জিভ নিজে থেকে স্পর্শের স্থূল অনুভূতি বা শুনতে যদিও পায় না কিন্তু চেরা জিভের দুই ডগা বাতাস থেকে খুব মৃদু গন্ধ ও স্পর্শজনিত কোন অনুভূতি ধরে নিয়ে এসে ঠেকায় মুখের ভিতরে উপরের টাক্‌রায়—গন্ধ ধরার স্থান সেটা। সেখান থেকে অনুভূতি জোরদার করে সাহায্য করতে চলে যায় নাকে। নাক তখন গন্ধ স্পর্শের সাহায্যে চলে সঠিক পথে।

জন্মজন্মান্তরের সহজাত সংস্কারই তাকে নিয়ে চলল আড়াল-আবডাল দিয়ে ঝোপঝাড়ের তলায় তলায়।......কদিন আগে বৃষ্টি হয়ে যাওয়াতে মাটি বেশ নরম। একটা পাতার তলায় ভেজা মাটিতে মাথা দিয়ে সামান্য একটু খোঁচা দিতেই তার প্রথম প্রাতরাশ হিসেবে পেল এক ঘোড়া-কেঁচোকে।

জায়গাটি বড় ভাইটির বেশ পছন্দই হল। তার শিকারের বেশ প্রশস্ত স্থান। নানা রকমের পোকামাকড়, টিকটিকি-গিরগিটি খেয়ে বেশ কয়েক সপ্তাহে নিজেকে খানিকটা বড় করে তুলল। পাথরের খোঁদলের মধ্যে যেখানে বৃষ্টির জল জমে আছে দেখতে পেত সেখানেই তার মাথার খানিকটা ডুবিয়ে তলার চোয়াল ফাঁক করে জল টেনে গলার মধ্যে নিয়ে পান করত।

মাঝে মাঝে তার অন্যান্য ভাইবোনদের সঙ্গেও যে দেখা হ'ত না এমন নয়। তাদের অনেকেই যে আবার ওরই আশেপাশে আস্তানা গেড়েছিল। বড় ভাইটি কিন্তু বিশেষ কোন রকম আমল তাদের দিত না।

গ্রীষ্ম শেষ হবার আগেই তার তিন-চারবার খোলস ছাড়া হয়ে গতরটা হয়েছে বেশ বাড়ন্তই। ছোটখাট শিকার ছেড়ে সে এখন বড় শিকার ও চট্‌পট্ গাছে উঠতেও শিখে নিয়েছে। মাটি থেকে চারপাঁচ হাত উঁচু কোন ঝোপের আগায় যেদিন পাখীর বাসায় ডিমের সন্ধান পায় সেদিন তার বড় স্ফূর্তি। একদিন এক গর্তে ঢুকে দেখে সদ্যজাত মেঠো-ইঁদুরের কয়েকটা ছানা। সবগুলোকে গিলতে কতক্ষণ আর! আর একদিন দেখা হয় এক দাঁড়াশ সাপের বাচ্চার সঙ্গে। লড়ায়ে হারিয়ে উদরসাৎ করার পর নিজের উপর বিশ্বাস গেল তার বেড়ে। আত্মগরিমা জেগে নিজেকে নিজেই তারিফ করল। দাঁড়াশ-বাচ্চা ইঞ্চি তিনেক ওর চেয়ে বড়ই ছিল।......

দিনের সূর্যতাপের হ্রাসে ও রাতের ঠাণ্ডার উত্তরোত্তর বৃদ্ধিতে নির্জন এই বনাকীর্ণের সব প্রাণীকে আসন্ন শীতের জানান দিতে শুরু করেছে। বড় ভাইটির বড়ই কষ্ট হতে লাগল সকালবেলায় তার রাতের কুণ্ডলী পাকানো অবস্থা থেকে নিজেকে খুলে সোজা করতে। ঠাণ্ডায় পেশীগুলোয় এক আড়ষ্টভাব জেগে শক্ত হয়ে যাচ্ছে। গায়েও বড় ব্যথা।......

নাঃ বাইরে কাটানো আর চলে না। বড় একটা গাছের গোড়ায় গভীর এক গর্ত দেখে তার মধ্যে ঢুকে পড়ল সে। হাওয়ায় উড়ে গর্তের প্রায় সবটাই শুক্‌নো পাতায় ভরাট হয়ে আছে। শীতের এই মরশুমে শুক্‌নো পাতা ওর বেশ ভাল কম্বলই হবে। ঠাণ্ডা ঝড়ো হাওয়া, বৃষ্টি ও জানুয়ারী-ফেব্রুয়ারীর তুষারপাত ভাল-ভাবেই ঐ কম্বলে আটকাবে। ব্যথায় আড়ষ্টতায় শরীরের যা অবস্থা আশ-পাশের কোন কিছুর দিকে তাকাবার ফুরসৎ বা খেয়াল তার আর নেই। এক-মাত্র চিন্তা একটা আশ্রয়ের। কোনমতে সেই আশ্রয়ে ঠাঁই করে নিয়ে নিজেকে নিশ্চিন্ত করা, রক্ষা করা। সমস্ত ইন্দ্রিয়ই তার ভোঁতা হ'য়ে আসছে। না হ'লে কি তার নজর এড়াতো দু দুটো কেঁদো কট্‌কটে ব্যাঙ! ব্যাটাদের কি আস্পর্ধা—তাকে ডিঙিয়ে তারই পাশে জায়গা করে নিল! কোন ভ্রূক্ষেপই তারা করল না। নির্জীব তাদের ঘুম!......গায়ের চাপ পড়ল তারই মত পাতার তলায় আশ্রয় নিয়েছে এক কুড়ি কেন্নো।

এরপর পাঁচটি মাস কোন জ্ঞান ছিল না। ইতিমধ্যে ঝড়ো হিমেল হাওয়া সশব্দে গাছের ডাল নুইয়ে বেঁকিয়ে যা ইচ্ছে তাই করেছে। গাছের পাতার উপর ঝরে পড়েছে বৃষ্টির ধারা। কুয়াশায় ঢেকে গেছে দিক্‌মণ্ডল। তুষারপাতে গাছ সব হয়েছে সাদা।......এসব কোন কিছুই সুগভীর মোহাচ্ছন্ন জড়তার মধ্যে সে অনুভব করে নি। জীবন স্পন্দনের সব-গুলো প্রধান দ্বার স্তিমিত হয়ে পড়াতে জল বা খাদ্যের কোন কিছুরই প্রয়োজন হয়নি। এই অসাড় অনড় অবস্থা থেকে তাকে মুক্ত করতে পারে একমাত্র কড়া রকমের উত্তাপই।

ঠাণ্ডা বা শীতের বর্ষায় জমে যাবার ভয় তার ছিল না। তার নির্বাচিত গর্তটি বেশ সুগভীর। শুক্‌নো পাতার আব-রণের এত তলায় সে ঢুকেছিল যে বৃষ্টি তুষারের আর্দ্রতা বা ঠাণ্ডা কোনটাই ওখানে পৌঁছে ওকে জমিয়ে দিতে পারে নি। প্রাণস্পন্দন তাই চলেছিল ধিকিধিকি।......

অবশেষে এল বসন্তের আহ্বান। গাছের পাতা শুরু করল গজাতে। ঘাসে রঙ ধরল সবুজ। সিন্‌টুক্‌সিয়ার—স্বর্ণ-

ফুলী নদীও যেন জোরে শব্দ ক'রে চলতে লাগল। ঠাণ্ডার আড়ষ্টতা তারও যেন ভেঙেছে।

মার্চের শেষে একদিন সে বেরিয়ে এল উজ্জ্বল রোদে তার পাতা ঢাকা গহ্বর থেকে। আবার তাকে শুরু করতে হবে দৈনন্দিন জীবনযাত্রা—শীকার আর ঘুম।......

জয়ন্তীয়ার খৃষ্টান অভিজ্ঞ চাষী ক্যাট সার্জেণ্ট-এর খামারে ঢুকে পড়ল সে। গোলাবাড়ীতে কতকগুলো মেঠো ও ঘরো-ইঁদুর চাষীর এত কষ্টের সঞ্চিত ধান নয়ছয় ক'রছে দেখে তার মেজাজ গেল বিগড়ে। ওখানেই আস্তানা গেড়ে এক একটিকে ধরে গিলতে শুরু করে দিলে।

দিনের বেলায় একদিন এদিক ওদিক ঘোরা-ফেরায় চোখে পড়ে গেল চাষী সার্জেণ্ট-এর। সে একটু হাসল ওকে দেখে। একটু খুশীও হ'ল। ক্যাট সার্জেণ্ট একথা জানে, যে মাত্র এক জোড়া মেঠো-ইঁদুরকে ও তাদের সন্ততিদের স্বেচ্ছামত প্রজনন যদি করতে দেওয়া হয় তবে ঐ প্রথম জোড়া থেকেই এক বছরের মধ্যে লাখ খানেকের বেশী ইঁদুর হ'য়ে জায়গাটা ছেয়ে ফেলবে। ছুঁচো-ইঁদুর-খেকো সাপের দাম যে কেবল চাষীর কাছেই তা নয় শহুরের কাছেও। ঘরো-ইঁদুর কত যে মারাত্মক রোগের বীজ বহন ক'রে আনে এ কে না জানে! তাই সে বিশেষ সাবধান হ'ল কেউ যেন তাকে না মাড়িয়ে দেয় বা ভয় না দেখায়। শাঁখামুঠি যে লক্ষ্মী পয়মন্ত সাপ!...অজ্ঞতার জন্য সব দেশেই মানুষের কত উপকারী জন্তু যে প্রাণ হারায় তার ইয়ত্তা নেই। সাপ মাত্রই মানুষের ক্ষতিকর ও বিষাক্ত এই একটা ধারণা সাধারণ মানুষের মধ্যে থাকার জন্যই বিনা কারণে তারা মারা পড়ে।

সার্জেণ্টের কাছে তাড়া না খেয়ে রাজসাপ বড়ভাইটির সাহস বেড়ে গেল। মানুষ-জীবটি যা সে প্রথম দেখছে তার কাছে ভাল বলেই মনে হ'ল।......এরপর একদিন সকালবেলায় কাছ দিয়ে যেতে দেখে সার্জেণ্ট ডানহাতের আঙুল জড়ো করে মাটিতে পেতে রেখে আস্তে আস্তে শাঁখামুঠির গলাটা তলা দিয়ে চেপে ধরে মাটি থেকে তুলে নিল। বড়ভাইটি কোন ফাঁক পেল না কামড়াবার। ভয়ানক আশ্চর্য লাগল তার! ভয়ও সে কম পেল না। কী এক অদ্ভুত পরিবেশ! কিন্তু হাতের চেটোর গরমভাব ও স্পর্শে ভয়টা তার ভেঙে গেল অল্পক্ষণের মধ্যেই। উল্টে ভালই লাগতে শুরু করল।

পলকহীন চোখে তাকিয়ে সে দেখল এই মানুষটির মুখে কী রকম যেন এক সস্নেহ হাসি। আর তার মধ্যে লুকিয়ে আছে একটা নিরাপত্তার ভাব। কামড়াবার যে ইচ্ছাটা ছিল তার মনে সেটা হয়ে গেল দূর। নতুন অবস্থাকে মানিয়ে নিতে চাইল। আজন্ম সংস্কারে যাকে শত্রু বলে জেনেছে সে যে বন্ধুর পর্যায়ে নেমে আসতে পারে এটাই তাকে বিস্ময় জাগাচ্ছে সর্বাপেক্ষা বেশী। অবশ্য সাপে অতশত ভাবে না। তাদের সহজাত সাহসই তাকে এ পরিবেশে মানিয়ে নিতে সাহায্য করছে। তাছাড়া ভাল ব্যবহার অনুভব করার শক্তি সমস্ত প্রাণীরই আছে।

সার্জেণ্ট তাকে আদর করতে করতে বাড়ির লোকদের ডাকতে লাগল। হাঁক-ডাকে তার বর্ষীয়সী স্ত্রী ও মেয়ে-জামাই যে যার কাজ ফেলে ছুটে এল।

সৌন্দর্যের তারিফটা সকলের কাছ থেকেই পেল। সার্জেণ্ট-গিন্নী বলল—দাও ওকে ফরাস-সীমের খেতের কাছে ছেড়ে। ইঁদুরগুলো সীমের বড্ড ক্ষতি করছে।

সার্জেণ্টের খামার তার ঘরবাড়িই হয়ে উঠল। কিন্তু জন্মগত সংস্কার কি আর সে সহজে ছাড়তে পারে? মানুষ সহবাসের আগে তার দিন কেটেছে লোকালয়ের বাইরে বনাকীর্ণ জায়গায়। পাখীর বাসার ডিমে যে তার ন্যায্য অধিকার সে ভুলবে কেমন করে? তাই সার্জেণ্ট-এর মুরগীর ঘরে ঢুকে মহানন্দে বিনা দ্বিধায় দু'চারটে করে ডিম উড়িয়ে দিয়ে তার দাবী ও ন্যায্য অধিকার বজায় রাখতে লাগল।

সাপ ডিম ভেঙে খায় না। খোসা শুদ্ধই গিলে ফেলে। দেহের ভিতর পাকস্থলীর পথে যে পাচনরস থাকে সেটাই খোসাকে গলিয়ে দেয়। ডিম গিলবার পর সেটা পরিপাক যন্ত্রের পথে যাওয়ার সময় কিছু সময়ের জন্য বাইরে থেকে ডিমের অস্তিত্বটা বোঝা বা অনুভব করা যায়।

ক'দিন বাদেই সার্জেণ্ট-এর মেয়ে নোরিয়ান-এর কাছে হাতেনাতে ধরা পড়ল রাজসাপের এই চৌর্যবৃত্তি। শাঁখামুঠিই যে তাদের ডিম-চোর তা সে প্রথমে বুঝতেই পারে নি। ডিম নিতে এসে রোজই কম পায় আর তাই নিয়ে একে ওকে বকাবকি করেই সে মরে। বাপকে ডেকে এনে দেখাল পেয়ারের সাপের এই কীর্তিটি। সার্জেণ্ট হেসে তাকে বুঝিয়ে দিল, ইঁদুরের উৎপাতে ফরাস-সীম ও গোলাঘরের যে অবস্থা, যে ক্ষতি হচ্ছিল তাতো এখন আর নেই, সুতরাং তার বদলে দু'চারটে ডিমই যদি ও খায় তবে কি লোকসানটা খুব গায়ে লাগে?

সেই থেকে বড়ভাই রাজসাপ শাঁখামুঠি অন্যান্য গৃহপালিত পশুর সমপর্যায়ে রয়ে গেল সার্জেণ্ট-পরিবারের খামারে।

৩২

'এ মশাই, একবারে রাজ্য জয় করে ফিরছেন বলে মনে হয়। শুনুন।'

এখানেও অন্ধকার। আজ শিবনাথ এই প্রথম দেখল রাত ন'টা না বাজতে বনমালীর দোকানের ঝাপ বন্ধ। দোকানের আলো পড়ে সামনেটা যা-হোক খানিকটা ফর্সা থাকে। এখন দেখা গেল আবছা অন্ধকারে পায়া ভাঙ্গা বেঞ্চটায় কে গুপ্ত একলা চুপচাপ ভূতের মত বসে।

'কি বলুন।' বেশ একটু বিরক্ত হয়ে শিবনাথ দাঁড়ায়। প্রত্যেকদিন বাড়িতে ঢোকার সময় লোকটা তাকে ডেকে বাধা দিচ্ছে, মুখে সেটা প্রকাশ না করলেও শিবনাথ মনে মনে অত্যন্ত অপ্রসন্ন হয়। আজ এমনি তার এখানে ওখানে বসে দেরি হয়ে গেছে।

'মশাই, এদিকে যে ভয়ানক ঘটনা ঘটে গেল।'

'কি ঘটনা? শিবনাথ খুব একটা কৌতূহল প্রকাশ করল না। এমন কি হাসপাতালে রুনু কেমন আছে সেই প্রশ্নটাও সে সতর্কতার সঙ্গে চেপে যায়।

'পাখি আমাদের মায়া কাটাল।' গুপ্ত হাল্কা গলায় হাসল। ভয়াবহ কিছু না, তবে আকস্মিক হি-হি।

পাগলটা কি বলতে চাইছে, কার কথা বলছে ভাবতে গিয়ে শিবনাথের একটা কথা মনে পড়তে হুট্ করে তৎক্ষণাৎ মন্তব্য করল, 'সেই পাখি তো কালই মায়া কাটিয়ে ঘোলপাড়ায় গিয়ে বাসা বেঁধেছে, সেই খবর তো স্যার পুরোনো হয়ে গেছে। আপনার বন্ধুর বইয়ের নায়িকা কিরণের কথা বলছেন তো।'

'হোপ্‌লেস।' গুপ্ত আর হাসল না। 'আপনি দেখছি রসের 'র'-ও বোঝেন না। পাঠ্যাবস্থায় কি করে কবিতা লিখতেন?'

শিবনাথ নীরব।

'মশাই, কিরণ মায়া কাটায়নি। তাকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আজও সে আপনার স্ত্রীর কথা জিজ্ঞেস করলে এ-বাড়ির বারো ঘরের আরো পাঁচজনের খোঁজ খবর নিলে। তার কথা আর আপনি আমায় বলবেন কি। কমলা। ইয়েস দ্যাট হোর্। বলিনি আপনাকে কবে একদিন? এই মাত্র ভাড়াটাড়া চুকিয়ে ঘর ছেড়ে দিয়ে সুটকেস বিছানা নিয়ে বেরিয়ে গেল।'

'কোথায় গেল?'

'সে আপনি, ওই যে কি নাম, কাল মুর্গির মাংস দিয়ে ভাতটাত খেয়ে কমলার বিছানায় সারা দুপুর গড়িয়ে গেল তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন। কোথায় গেছে সে-খবর দিয়ে কাজ কি, কার সঙ্গে গেছে সেটাই বরং জেনে রাখুন।'

'শিশিরবাবু ভদ্রলোকের নাম।' শিবনাথ বলল, 'কমলা তাঁর সঙ্গে গেছে কি করে জানলেন?'

'জানব কি, চোখে দেখলাম মশাই। কর্তা স্বয়ং এসেছিলেন। এই তো ট্যাক্সিতে করে দুজন বেরিয়ে গেল।'

শিবনাথ একটু সময় কথা বলল না। ভদ্রলোক বিবাহিত, এবাড়ির কার মুখে সে শুনেছিল। কিন্তু সেসব আলোচনা চাপা দেবার জন্য ইচ্ছা করে সে হেসে বলল, 'তা গেছে ভালই হয়েছে। হয়তো ভাল ঘর পেয়েছে। বস্তিতে চিরকাল পড়ে থাকবে তার কি মানে আছে। সুযোগ পেলে এঘর ছেড়ে দেওয়াই তো বুদ্ধিমানের কাজ।'

'যাকগে মশাই, আপনার সঙ্গে কথা বলা আর গাছের সঙ্গে কথা বলা এক।' গুপ্ত আক্ষেপের সুর বার করল, 'যাওয়ায় যাওয়ায় বেশকম আছে ছাড়ায় ছাড়ায় তফাৎ আছে। নতুন ঘর পেয়েছে আপনাকে কে বললে। আমি তো এখানে সন্ধ্যা থেকে বসা। শুনলাম ট্যাক্সিতে উঠে বাবুটি শেয়ালদার একটা হোটেলের নাম করলে। আজ সেখানে রাত্রিবাস।'

শিবনাথ কি বলতে যাচ্ছিল গুপ্ত বাধা দিল।

'আমি গোড়া থেকে বলে আসছি দাদা, শী ইজ এ ব্যাড্ টাইপ। আপনারা তো আর আমার কথায় বিশ্বাস করেন না। এই বেলা দেখুন। আরে চালচলন দেখলে বোঝা যায় না? আর, তা ছাড়া হারামজাদী যে ভদ্রলোকের ঘরের সন্তান না সে-তো আমি ওর হাতঘড়ি পরার কায়দা আর জুতো পরে হাঁটার নমুনা দেখেই বুঝেছি। হ্যাঁ, এখানে পা দিয়ে আমি বনমালীকে প্রথম দিন বলছিলাম। দাসীর মেয়ে ধোবা নাপিতের মেয়ে। শহরে এসে নার্সগিরির চাকরি নিয়ে এখন খুব তরপাচ্ছে আর খোলা হাত-পা ছুঁড়ে মেলা জল ছিটোচ্ছে। কত দেখলাম এ-টাইপের মেয়ে।'

একটু থেমে গুপ্ত লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'কথা তো সেটা নয়। দুঃখ হয় ওই, কি যেন নাম বললেন, ছাগলটার জন্যে। বৌ-বাচ্চা আছে শুনছি। আরে মেয়েমানুষ আমরাও এ-জীবনে কম দেখিনি। তা বলে কি তুই একেবারে গলায় গেঁথে নিবি। আহাম্মক। মদ খাবি, গ্লাশটা দাঁত দিয়ে চিবোবি কেন, সিগারেট খা যত খুশি জিহ্বায় ছাই মাখবি কেন, জল খেতে গিয়ে পুকুরে নেমে কাদার মধ্যে মুখ গুঁজে দেওয়া, তুই দেখছি সেই রাস্তার পথিক। ইডিয়েট। বুঝেছেন, কাল কমলার ঘরে খাওয়াদাওয়া ঘুমটুম দেখেই তো আমি বুঝলাম শালার হয়ে গেছে।'

'যাকগে, এই নিয়ে আমাদের মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই।' শিবনাথ বলল, 'যদি তাই হয় তো, আপনার আমার মাথা গরম না করাই ভাল।'

'ভাল মন্দর কথা হচ্ছে না, বলছিলাম, আমি অবশ্য পয়লাদিন এই উঠোনে পা

দিয়েই মেয়েটাকে দেখে ধরে ফেলেছিলাম, ভেরি ব্যাড টাইপ। ঐ যে বলে ছুঁচ হয়ে ঢোকে লাঙলের ফাল হয়ে বেরোয়। শিশিরকে শুষে ছিবড়ে বার করে তারপর আমের আঁটির মত ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে আর একজনকে ধরবে। এই ওরা করে এ-ই ওদের পেশা। কতখানি প্যাজি হলে কত বড় জিহনা হলে একটা ম্যারিড ম্যানকে তার স্ত্রী-পুত্রের কাছ থেকে টেনে নিতে পারে আপনি পুরুষ হয়ে কি বুঝতে পারছেন না। এর চেয়ে বাজারের ওরা অনেক ভাল ঢের ধার্মিক।'

বক্তৃতা শুনে শিবনাথ হাসল।

'তবু ভাল যে এবাড়ির কোনো পুরুষের ওপর কমলার লোভ জাগেনি।'

'জাগলে কি আর রক্ষে থাকত, জুতোর বাড়ি খেতো, আমিই জুতো মারতাম। ধরুন, আপনাকে নিয়ে যদি এরকম লটখটি বেঁধেছে দেখতাম, আর ওদিকে ঘরে আপনার ওয়াইফ আপনার মেয়ে কাঁদা-কাটা করছে। কেটে ফেলতুম ওকে। কে গুপ্ত পাগল, কিন্তু এসব বিষয়ে ভয়ানক পারটিকুলার। একবার জিজ্ঞেস করে আসুন বেবির মাকে। মেয়ে মানুষ পিঁপড়ের মত মাথা হেঁটে হাঁটত। কিন্তু ঐ রাত নটা অবধি। দশটার মধ্যে আমি বাড়ি ফিরে গিয়ে বেবির মার হাতের বাড়া ভাত খেয়ে শুয়ে পড়েছি। রোজ।'

শিবনাথ একটা নিশ্বাস ফেলল।

'আচ্ছা চলি আমি।'

গুপ্ত হঠাৎ কথা বলল না।

'এই ঠাণ্ডার মধ্যে বসে আছেন কেন, বাড়ি গিয়ে—' শিবনাথ কেটে পড়ার মতন একটা কথা বলে পা বাড়াতে চেষ্টা করতে গুপ্ত বলল, 'শুনুন।'

'কি?'

'আনা দুয়েক পয়সা হবে?'

শিবনাথ অবাক হয় না। আকাশের দিকে চোখ তুলে একটু চিন্তা করে শুধু। ফিরে আসবে না পয়সাগুলো ঠিক। কিন্তু তবু, তা হলেও এই সামান্য কয়েক আনা পয়সার তুলনায় তার সম্মান ভদ্রতা আভিজাত্য—আর না ভেবে চট করে পকেট থেকে একটা দু আনি তুলে সে হাসল। 'সিগারেট ফুরিয়েছে বুঝি।' ইচ্ছা করেই সিগারেটের কথাটা বলল যদিও।

'না মশাই।' কে গুপ্ত পয়সা হাতে পেয়ে ঘাড় নাড়ল। 'পেট। দুপুর থেকে শালা এমন কাইকুঁই করছে। বেলা দশটা এগারোটা পর্যন্ত কিন্তু আজ খুবই ঠাণ্ডা ছিল। কাল রাত্রে কিরণের বাড়িতে আমাদের ভারি রকমের ফিস্টি হয়েছিল, শুনেছেন তো।'

'শুনেছি, বলেছেন।' সংক্ষেপে উত্তর সেরে শিবনাথ এবার লম্বা পা ফেলে হাঁটতে লাগল। এবং ইতিপূর্বে আরো বহুবার যেমন করা হয়েছে, তেমনি এখন কে গুপ্তকে আর একবার গভীরভাবে অনুকম্পা করতে সে ভুলল না। কি হ'ত ভাবল সে, কমলার জঘন্য চরিত্রের কথা চিন্তা করে কে গুপ্ত মনমেজাজ খারাপ ক'রে অন্ধকারে একলা বসে রাত্রির প্রহর গুনেছে,—এই অবস্থায় তার ছেলে হাস-পাতাল থেকে ফিরে আসবে কি আসবে না বা এ-সম্পর্কে আর কিছু করা উচিত ভেবে দেখেছে কিনা, শিবনাথ যদি প্রশ্ন করত কে গুপ্ত চটে গিয়ে হয়তো গালি-গালাজ আরম্ভ করতঃ 'বেরসিক, মশাই, আপনি রসের বুকে ছুরি বসাতে ওস্তাদ, —এ যে দেখছি ধান ভানতে শিবের গীত শুরু করছেন।' ইত্যাদি।

নীরব থেকে শিবনাথ বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। ভাবল। তা ছাড়া রমেশ রায়ের মুখ থেকে বৃত্তান্ত শোনার পর এই ব্যাপারে মুখ বন্ধ করে থাকা ছাড়া উপায়ই বা কি।

ঘরে এসে শিবনাথের মনমেজাজ অবশ্য প্রফুল্ল হয়ে উঠল। মনে মনে সে হিসাব করে দেখল দীপ্তির ওখান থেকে বেরিয়ে আসার পর রাস্তায় এই আড়াই ঘণ্টা তিন ঘণ্টা বিধু পাঁচু ক্ষিতীশ (রমেশকে অবশ্য সে এদলে ফেলে না) কে গুপ্ত ইত্যাদি অনেকগুলো কদর্য চেহারার সামনে তাকে উপর্যুপরি কয়েকবার দাঁড়াতে হয়েছে এবং নানারকম অপ্রয়োজনীয় ও অপ্রীতিকর কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু এখানকার পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা।

মন প্রফুল্ল হয়ে ওঠার বিশেষ কারণ শিবনাথ ঘরে পা দিয়েই বীথিকে দেখল। রুচির সঙ্গে কথা বলছে। বীথি এ-ঘরে আসুক রুচির সঙ্গে একটু মেলামেশা করুক—কেন জানি প্রথম থেকেই শিব-নাথের এই ইচ্ছা। ইচ্ছাটা গোপন। এবং বীথি সম্পর্কে আজ পর্যন্ত রুচির কাছে সে কোনরকম কথা বলেনি যদিও। এক উঠোনের ওপর বাস করে দূরে থেকে যত-টুকু দেখার শিবনাথ চোখ ভরে সুশ্রী সুঠাম যৌবনবতী এই কুমারীকে চলতে ফিরতে কথা বলতে হাসতে ঝগড়া করতে বেলা নটা বাজতে স্নান করে খেয়ে সেজে-গুজে কাজে বেরিয়ে যেতে এবং সন্ধ্যার পর কোনোদিন একটু শুকনো মুখে কোনো দিন বা একটু বেশি হাসিখুশি হয়ে ঘরে ফিরতে দেখেছে। দেখছে। আর বহুকাল আগে পড়া সুন্দর একটা কবিতার লাইন তার বুকের মধ্যে গুনগুন করে উঠছেঃ 'আঠারোটি বসন্ত দিয়ে ঘেরা যে যৌবন কেমনে নিন্দব তারে।' এটা যে কিছু দোষের শিবনাথের মনে হয় না। হ'ত, যদি তার মনে প্রশ্ন জাগত বীথি তার সম্পর্কে উৎসুক কিনা এবং এই প্রশ্নের উত্তর পাবার আশায় সারাক্ষণ সে বিব্রত বোধ করত। সে সব কিছুই না। কেবল যতক্ষণ দেখার সেই সময়টুকু সে তাকিয়ে থাকে ওর দিকে। একটা ফুল, একটা পাখির দিকে মানুষ যে চোখে তাকায়।

রুচি খাটের ওপর বসা। বীথি পাশে দাঁড়িয়ে। এতবড় একটা রীবন, বেণীর মাঝামাঝি জায়গায় প্রজাপতির মত সুন্দর করে বাঁধা। বেণীটা যতখানি চওড়া ওর শাড়ির কালো পাড়টাও ততখানি চওড়া। একটু বেশি না কম না। শাদা জুতো।

হাতে ছোট্ট ব্যাগ। কালো রং। কালো ব্যাগ, মিশমিশে কালো বেণী, কালো রীবন ও লম্বা পালক ঘেরা কালো চোখ পরনের শাদা শাড়ি ব্লাউস ও জুতোর শাদাটাকে আরো বেশি উজ্জ্বল পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে। শিবনাথ, বলতে কি, কেমন একটা পবিত্রতা বোধ করছিল কুমারী মেয়েটির পিছনে দাঁড়িয়ে। আর সে সবচেয়ে বেশি অভিভূত ও রোমাঞ্চিত হ'ল ওর চুলের গন্ধে। বিকেলে চৌরঙ্গির রাস্তায় বিদেশিনীর মাথার চুল থেকে চুরি করে যে গন্ধ সে খানিকটা বুকে পুরে নিয়েছিল, তাই-ই যেন বীথি অকৃপণ হাতে ঢেলে দিতে এসেছে তার ঘরে, ঘরের বাতাসে। উত্তেজনায় শিবনাথ প্রায় বিড়বিড় করে ওঠে।

'চলি এখন।'

'কেন, এত তাড়া কি।' রুচি বলল, 'একটু বসবে না।'

'না, বৌদি।' ঘাড়টা ঠিক ঘোরালো না বীথি, যেন অত্যন্ত সতর্কভাবে আড়চোখে শিবনাথকে একবার দেখে নিয়ে ও খাটের এ-পাশে ঘুমন্ত মঞ্জুকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল।

'একটু রোগা হয়ে গেছে মনে হয়।'

'না, শরীরটা ভাল যাচ্ছে না তেমন। সর্দি কাশিতে খুব ভুগছে মেয়ে।'

'আমার তো মনে হয় কডলিভার অয়েল টয়েলের মত একটা কিছু ওকে ঠান্ডার সময়টা দিতে পারেন। তাতে সর্দিকাশি তো বটেই জেনারেল হেল্থটাও ভাল করবে।'

রুচি বীথির এই প্রস্তাবে কোন মন্তব্য করল না। আড়চোখে না, পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলেই সে বীথির পিছনে দাঁড়ানো শিবনাথকে দেখল।

শিবনাথ কথা না কয়ে একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল।

'তোমার বাবার শরীরটা একটু ভালর দিকে?'

'না, ঐ-তো বুড়ো হয়েছে, এখন আর—' একটু থেমে মঞ্জুর মুখের ওপর থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে বীথি রুচির দিকে তাকাল। 'ওই শুয়ে শুয়েই কাটবে আর কি, যে ক'দিন আছেন। চলি।'

রুচি ঘাড় নাড়ল।

শিবনাথ দরজা ছেড়ে এক পাশে সরে দাঁড়ায়। বীথি মাথা নিচু করে আস্তে আস্তে বেরিয়ে যায়।

'কেন এসেছিল?' রুচির চোখের দিকে তাকিয়ে শিবনাথ অল্প হাসে।

'একটা ইংরেজী শব্দের মানে জানতে এসেছিল।'

'কি শব্দ।' হাসি না নিভিয়ে শিবনাথ ভুরু কুঁচকোয়।

রুচি কথা বলল না। মঞ্জুর মশারি খাটাতে ব্যস্ত। মশারি খাটানো শেষ করে সে খাট থেকে নামল।

'দেরি করে ফিরলে?'

'হ্যাঁ, দু'চার জায়গায় বসতে হল, কথায় কথায় রাত হয়ে গেল।' শিবনাথ কোথায় কার সঙ্গে কথাবার্তা বলেছে বলল না যদিও।

'জামাকাপড় ছেড়ে খেয়ে নাও।' বলে রুচি এক পাশে সরে গিয়ে থালা গ্লাস ধুয়ে শিবনাথকে ঠাঁই করে দেয়। যেন আজ আবার একটু বেশি গম্ভীর ও। খেতে বসে আবহাওয়াটা তরল করার লোভে শিবনাথ বলল, 'আজ পারিজাতের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। চমৎকার মানুষ।'

রুচিও খাচ্ছিল। কথা না কয়ে ও জলের গ্লাস মুখে তুলল। যেন কথা বলবে না বলে মুখটা ও আড়াল করল। পিছনে টিনের বেড়ায় রুচির মাথার ছায়াটার দিকে চোখ রেখে শিবনাথ একটা নিশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললঃ 'ওখানে হয়ে যাবে। তাঁর কথায় বুঝলাম।'

রুচি এবার চোখ বড় করল।

'তা হলে আজো পাকাপাকি কোনো কথা পাওনি?'

'হ্যাঁ, একরকম—' এবার শিবনাথ মুখের কাছে জলের গ্লাস তুলল। একটু পর গ্লাসটা নামিয়ে রেখে নিচু গলায় বলল, 'ওই ওদের মানে পারিজাতের, সামনে ইলেকসন আসছে, তাই খুব ছুটো-ছুটি করতে হচ্ছে। আজতো সে বাড়িতেই ছিল না। দেখি কাল একবার গিয়ে—'

রুচি নীরব।

'ও, আর একটা কথাই তোমাকে বলা হয়নি।' শিবনাথ এবার জোর করে একটু-খানি শব্দ করে হাসল। 'বীথি তোমায় বলেছে কিছু?'

'কি?'

তেমনি বড় বড় চোখ রুচির।

শিবনাথ আবার দমে যায়। কিন্তু তা হলেও সে চুপ করে রইল না। 'নতুন চাকরি পেয়ে বীথি দীপালি সঙ্ঘের সেক্রেটারী পদে রিজাইন দিয়েছে। দীপ্তি এখন মুশকিলে পড়েছেন। তেমন কাউকে পাচ্ছেন না, যাকে আবার সেক্রেটারী করা যায়।'

'তা ওটা তো মেয়েদের সঙ্ঘ, তোমার কি।' কেমন একটু রূঢ় গলায় কথাটা বলল রুচি। শিবনাথ আহত হল। যেন আঘাত ঢাকতে তাড়াতাড়ি সে হেসে ফেলল। 'দীপ্তির ইচ্ছা তোমাকে এই পোস্ট দেয়।'

খাওয়া শেষ হয়েছে রুচির। হাত ধুয়ে সে উঠে পড়ে।

'আমার আর খেয়েদেয়ে কাজ নেই।' মুখ মুছতে মুছতে বলল সে, 'তা ছাড়া ওটা পারিজাতের গিন্নীর আর পাঁচটা খেয়ালের একটা খেয়াল। সমিতি না ছাই। কিছু কাজ হয়? আমার কানে সবই আসে। একটা শো দাঁড় করিয়ে রেখেছেন বড়-লোকের বৌ। দু'চার আনা চাঁদা চাইলে দেওয়া যায়, কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ওখানে যাওয়া আসা করা আর দীপ্তিরাণীর পায়ে তেল মাখান আমার পোষাবে না।'

শিবনাথ রীতিমত জব্দ হয়ে গেল।

'তোমায় বলছিল নাকি আমাকে সেক্রেটারী করবেন?' রুচি প্রশ্ন করল।

'না, ঠিক আমার কাছে এখনো কথাটা তোলেননি। মদন ঘোষ বলছিল। ওর সঙ্গে কথা হয়েছে।' শিবনাথ বিরক্ত। প্রসঙ্গটা তুলতে না তুলতে রুচি এতটা কড়া মেজাজ দেখাবে সে ভাবেনি। উঠে সে হাত মুখ ধুয়ে মুখ মুছে সিগারেট ধরায় এবং কি একটু ভেবে পরে আস্তে আস্তে বলে, 'সমিতির সেক্রেটারী হলে দীপ্তির পায়ে তেল মাখাতে হবে এটা আমি ঠিক বুঝলাম না কিন্তু।'

'তা ছাড়া কি, আমি বস্তীতে থাকি তিনি প্রাসাদে থাকেন, আমাদের কী চোখে দেখেন সহজেই বুঝতে পার।'

'না, না,—অ সেই চিন্তা, রিয়ালি, দীপ্তি সে-ধরনের মেয়ে না, অন্তত আমার তো তাই মনে হল। খুব ভদ্র মার্জিত অমায়িক।'

'যাকুগে, তোমার কাছে যখন তিনি এখনো প্রস্তাব তোলেননি, এনিয়ে এখন গবেষণা করে লাভ কি। তুমি কি শুয়ে পড়বে?'

'হ্যাঁ, না, ভাল কথা—' শিবনাথ এতক্ষণ পর আবার স্বাভাবিক হতে পারল। 'বীথি যেন কি জিজ্ঞেস করতে এসেছিল, ইংরেজী শব্দের মানে, কি শব্দ বললে না তো।'

'লিউক-ওয়ার্ম'।'

'খুব সাধারণ কথা।' শিবনাথ হাসল। 'অবশ্য ওয়ার্ম ও লিউক-ওয়ার্ম নিয়ে অনেকেই গোলমালে পড়ে। লিউক-ওয়ার্ম মানে টেপিড অর্থাৎ আমরা যাকে বলি কুসুম কুসুম গরম, খুব গরম না, বলে দাওনি?'

দীপ্তি মাথা নেড়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'আমি জাতে মাস্টারনী ভুলে যাচ্ছ কেন। যতটা সম্ভব পরিষ্কার করে শব্দের অর্থ বোঝাতে চেষ্টার ত্রুটি করি না।'

'তা তো বটেই।' শিবনাথ আর হাসল না। আজ আবার স্ত্রীর কথায় ব্যবহারে এতটা ঝাঁজ অসন্তোষ ফুটে ওঠার কারণ কি ভাবে সে। কিন্তু একেবারে চুপ করে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ না, চিন্তা করে তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল, 'আর, আর কি জিজ্ঞেস করছিল?'

'ডিজার্ট-স্পুন বলতে ঠিক কত বড় চামচ বোঝায়।'

'ওরে বাবা, সব যে ডাক্তারি ব্যাপার দেখছি।' শিবনাথ হাসবার মতন গলায় খুক করে একটা শব্দ করল। 'টি-স্পুন ডিজার্ট-স্পুন, হ্যাঁ, একটু গোলমেলেই, আমার,—আমারও খুব ভাল জানা নেই ওটা ঠিক কাকে বলে।'

'ডিজার্ট মানে খাওয়ার পর যে প্যাস্ট্রি পুডিং ফলটল খেতে দেওয়া হয়, তাকে বলে। এবং সেসব সার্ভ করার জন্যে যে-চামচ ব্যবহার করা হয়, ইংরেজীতে তাকেই ডিজার্ট-স্পুন বলে। ওটা সাহেবসুবোর ব্যাপার।'

'তার মানে সাধারণ চামচ না, বড় সাইজের।' শিবনাথ এবার শব্দ ক'রে হাল্কা গলায় হাসল। 'তা বীথির হঠাৎ এত সব শব্দের মানে জানতে আসার কারণ?'

'আমি কি ক'রে বলব। আমি এ-বাড়িতে থাকি কতক্ষণ।' আরও খানিকটা ঝাঁজ। 'হয়তো নতুন চাকরি করতে গিয়ে এসব শব্দের মানে জানার দরকার হচ্ছে।' কথাটা বলে রুচি জানালার কাছে সরে গিয়ে চুলে চিরুনি চালাতে আরম্ভ করল।

শিবনাথের বুক দুরদুর করছিল। বীথি কোথায় চাকরি করছে কি ধরনের কাজ রুচি জানে না নিশ্চয়। শিবনাথ জানে। এক রাত্রে ডোমপাড়ার আগুন দেখতে গিয়ে সে বীথি ও কমলার কথা-বার্তা চুরি করে শুনে প্রায় সবই জেনেছে। এখন রুচি না হুট্ করে শিবনাথকে প্রশ্ন করে বসে বীথির চাকরিটা কি এই আশঙ্কায় সে ভিতরে ভিতরে বিব্রতবোধ করছিল বৈকি। বীথির কাজটা একটু অদ্ভুত রকমের। রুচি কোনমতেই তা সহজভাবে নিতে পারবে না শিবনাথ বেশ বুঝতে পারে।

কিন্তু শিবনাথের আশঙ্কা তৎক্ষণাৎ দূর হয়। রুচি এই নিয়ে মাথা ঘামায় না তার পরের কথা থেকে বোঝা গেল। 'দুটো ইংরেজী শব্দের মানে জানতে এসেছিল তার অর্থ ভাল একখানা শাড়ি পরেছে, নতুন জুতো পায়ে উঠেছে, মাথায় দামী তেল মেখেছে আমাকে জানিয়ে গেল দেখিয়ে গেল।'

একটু নিশ্চিন্ত হল শিবনাথ। কিছুক্ষণ চুপ থেকে পরে আস্তে হেসে মাথা নাড়ল। 'না আমার মনে হয় না। জানি না অবশ্য।' মুখে বলল একথা আর স্ত্রীর দিকে বেশ একটু অনুকম্পার চোখে তাকিয়ে সে মনে মনে বিড়বিড় করে উঠল: 'কমপ্লেক্স, ইনফিরিয়রিটি কমপ্লেক্স। দীপ্তির সমিতিতে যোগ দেওয়া নিয়ে রুচির আপত্তি করার মূলেও তাই—এই মনোভাব।'

'কে?'

'আমি।'

'বেবি! কি চাই?'

'বৌদিকে।'

শিবনাথ দরজা থেকে চোখ সরিয়ে স্ত্রীর দিকে তাকায়। চিরুনী রেখে রুচি মাথার কাপড় তুলল। 'আমার হয়ে গেছে, এখুনি যাচ্ছি। তোমার মা'র জ্বরটা এখন কেমন।'

'আছে, কমেনি।' বেবি চৌকাঠে দাঁড়িয়ে। যেন শিবনাথকে ঘরে দেখতে পেয়ে চট করে ভিতরে ঢুকতে সাহস পায় না। তেমনি মাথার চুল উস্কুখুস্কু আছে, হাত পা এখনো অপরিচ্ছন্ন, গায়ে সেই ছেঁড়া ফ্রক। ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখ।

'তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।'

কি একটু কাজ সারতে রুচি খাটের উল্টোদিকে রাখা বাসনকোসনের কাছে সরে গেল।

বেবিও আর দাঁড়ায় না। শিবনাথের দিকে আর একবারও চোখে না তুলে ঘাড় ঘুরিয়ে ও আস্তে আস্তে দরজা ছেড়ে চলে গেল। অনুকম্পার আর একটা চাপা নিশ্বাস ফেলে অস্ফুটগলায় শিবনাথ বলল, 'কি দুরবস্থায় পড়েছে পরিবারটা।'

কথাটা রুচি শুনল কিনা বোঝা গেল না। কেননা, মুখের কোনো ভাবান্তর লক্ষ্য করল না শিবনাথ। কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এনে রুচি শিবনাথের পাশে কেরোসিন কাঠের বাক্সটার ওপর রাখল। একটা পুরোনো পোস্টকার্ড গ্লাসের মুখে চাপা দিয়ে বলল, 'আমি একটু বেবিদের ঘরে যাচ্ছি।'

অবাক হয়ে শিবনাথ স্ত্রীর মুখের দিকে তাকায়।

'বেবির মা'র অসুখ করেছে বুঝি। জ্বর, কবে হ'ল?

'জানি না, সম্ভবত আজই হয়েছে।'

'এখন পক্স ফক্স-এর দিন।' চিন্তান্বিত শিবনাথ। 'গা হাত-পা ব্যথা নেই তো। হঠাৎ তোমাকে?'

'রুনু হাসপাতালে, খবর পাওনি?'

'হ্যাঁ, ও-তো, কী সব ছেলে! তুমি ভিতরের ব্যাপার জানো? আমি সব শুনে এলাম বাইরে।'

'পারিজাত গাড়ি চাপা দিয়েছে।'

'কে বললে।' শিবনাথ প্রবলবেগে মাথা নাড়ল। 'আসল খবর তুমি শোননি।'

'ময়না সঙ্গে ছিল। মাঠ থেকে ফিরছিল দু'জন। ময়নার চেয়ে আর বড় সাক্ষী কে। বাদামগাছের নিচে পারিজাত অ্যাক্সিডেন্ট করেছে।' রুচি এক নিঃশ্বাসে বলল।

'ধ্যেৎ!' ফিসফিসে গলায় শিবনাথ ধমক দিয়ে উঠল। 'বলাইর মেয়েটা একটা লায়ার। আসলে আমি জানি, আমি নিজের চোখে দেখেছি দু'টিকে একসঙ্গে।

ময়নার লাভার রুনু, হ্যাঁ, কে গুপ্তর ছেলেটা। পারিজাত চাপা দিয়েছে এসব বানানো কথা। সাংঘাতিক কাজ করতে গেছল বেবির ভাই, অতটুকুন ছেলে, বুঝলে।'

রুচি ভুরু কুঁচকোয়।

শিবনাথ চোখ বড় ক'রে স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে রইল। কিছুক্ষণ দু'জন কথা বলল না।

'যাকগে।' ঢোক গিলে, কি একটু ভেবে পরে রুচি বলল, 'ভদ্রমহিলা দু'বার খবর দিয়েছেন, যাইনি, এখন একবার দেখা ক'রে আসি।'

'দরকার নেই।' শিবনাথ ব্যস্তভাবে মাথা নাড়ল। 'প্রতিবেশী হিসাবে আমাদের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে, থাকবে। কিন্তু এখন না, দু'চার দিন ওই ঘরে যাওয়া আসা স্রেফ বন্ধ রাখতে হবে।'

'কেন?' রুচি গলার স্বর কঠিন করল। 'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না তুমি কি বলতে চাইছ। কি করেছে রুনু।

কা'র মুখে শুনলে সব? পারিজাতের স্ত্রী বলছিল, বুঝি?'

গম্ভীর হয়ে শিবনাথ বলল, 'পারিজাতের স্ত্রীর অন্য চিন্তা, এসব ছাই ভস্ম নিয়ে তার মাথা ঘামাবার মোটেই সময় নেই। তা ছাড়া বিশ ত্রিশ কি পঞ্চাশ হাজার টাকা যদি এক রাত্রে লুঠ হয় খুব বেশি ওরা মাথা ঘামাবে বলে মনে হয় না। পারিজাতের চেয়েও দীপ্তির বাপের বাড়ির অবস্থা ভাল। হাতে এত বড় একটা হীরের আঙটি। তুমি তো কোনোদিন ওর সামনে যাওনি, কাছে দাঁড়িয়ে দেখোনি দীপ্তিকে। মেয়েদের গায়ের চামড়া এত সফ্‌ট উইলো পালিশ এমন সুন্দর আমি কিন্তু আগে আর দেখিনি। হ্যাঁ, ঐ যে বলে আপেল—আপেলের মতন চামড়া আর রং। তা ছাড়া আজো, এখনো। বয়েস খুব বেশি না যদিও, কিন্তু এতগুলো বাচ্চা হয়েছে এটা তো ঠিক। বোঝা যায় কত সুখ-বিলাসের মধ্যে বড় হয়েছে সে।'

রুচির চোখের তারা দুটো একবার জ্বলে উঠল, শিবনাথ লক্ষ্য করল না, আর রুচিও তৎক্ষণাৎ সামলে নেয়। না কি শিবনাথ লক্ষ্য করেছে কিনা বাজিয়ে নিতে রুচি ঠাট্টার সুরে ব'লে উঠল, 'সেজন্যেই কি পারিজাতের ছেলেমেয়েদের টুইশনটা পাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছ—রোজ একবার বাচ্চাদের মা-টিকেও দেখা চলবে।'

'কী যে বল তুমি।' শিবনাথ রাগ করল না, হাসল। 'আমার সম্পর্কে এ-ধরনের রিমার্ক, কই আগে তো তুমি কোনোদিন করনি,—

'না, এখন করছি।' হঠাৎ আবার শক্ত গলায় রুচি উত্তর করল।

শিবনাথ কথা বলল না।

'তুমি শুয়ে পড়তে পার, দোরে খিল দেবে না, এখনি ফিরছি আমি, পাল্লা দুটো ভেজিয়ে রাখো।'

'অর্থাৎ তুমি বেবিদের ঘরে যাবেই?'

'হ্যাঁ।' রুচি চৌকাঠের দিকে পা বাড়ায়। শিবনাথ তার হাত চেয়ে ধরে।

'তুমি এখন মাঝরাত্রে কে গুপ্তর ঘরে গেলে কী ব্যাপার দাঁড়াবে জানো?'

'কি?'

'কাল আমাদের ঘরে পুলিশ আসবে। তোমার কি, তুমি তো কমলাক্ষী গার্লস স্কুলের টিচারি করছ, বড় সার্টিফিকেট। মুশকিল বাঁধবে আমাকে নিয়ে। কে গুপ্তর ছেলে রুনু একটা মস্ত বড় গ্যাঙে আছে। পারিজাতের গাড়ি আটকে টাকা লুঠ করতে গেছল। এখন সে-ঘরে বেশি যাওয়া আসার অর্থ দাঁড়াবে আমার সঙ্গেও দলের যোগাযোগ আছে। তা ছাড়া আমি—আমার চাকরি বাকরি নেই, বেকার, কথাটা তেমন চাপা নেই।' এক নিশ্বাসে কথাগুলো ব'লে শিবনাথ হাঁপায়।

'মিথ্যা কথা।' রুচি হাত ছাড়াবার চেষ্টা করল না। অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় আস্তে আস্তে বলল, 'আমি জানি শুনেছি সব, আসল ঘটনা চাপা দিতে অনেকরকম মিথ্যা গল্প এখন সাজানো হচ্ছে, যা হয়।'

'মোটেই মিথ্যা নয়। খুব রিলায়েবল সোর্স থেকে এ-খবর পাওয়া গেছে।' আর ফিস্‌ফিস্ ক'রে না, উত্তেজনায় রীতিমত বড় গলায় শিবনাথ বলল, 'তা সত্য মিথ্যা এসব আমাদের যাচাই ক'রে লাভ নেই,—আমার কথা ওঘরে তুমি যেতে পারবে না। ব্যস্ ফুরিয়ে গেল।' রুচির হাত আর ধ'রে রাখার প্রয়োজন বোধ না ক'রে শিবনাথ বিরক্ত হয়ে ঝাড়া দিয়ে তা সরিয়ে দেয়। ফলে রুচির হাতটা বাক্সের ওপর রাখা কাচের গ্লাসে লাগতে সেটা উল্টে নিচে পড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায় আর বিশ্রী ঝন্‌ঝন্ শব্দ হয়।

রুচিও উত্তেজিত হয়ে ওঠে। 'একটু ভদ্র হ'তে শেখ। আর একটা গ্লাস কিনতে ছ' আনা খরচ করতে হবে ভুলে যেও না।'

'ভারি তো একটা কাঁচের গ্লাস।' শিবনাথ ঠোঁট উল্টোয়। 'অ, তোমার পয়সার কেনা বলে এত লাগছে। মনে ছিল না, মাপ করো।'

'আমার পয়সা শুধু কেন, তুমিও তো সেদিন ধার ক'রে পঞ্চাশ টাকা এনে সংসারে সাহায্য করেছ, দরকার হলে আবার ধার করবে।' রাগে কাঁপতে কাঁপতে রুচি নুয়ে কাচের টুকরোগুলো একত্র ক'রে তুলে একটা কাগজে মুড়ে একপাশে সরিয়ে রাখে।

একটা বড় রকমের খোঁচা খেয়ে শিবনাথ কতক্ষণ চুপ থাকে। রুচি ফের দরজার দিকে এগোয়।

'অভদ্র আমি না, অভদ্র তুমি। বস্তিতে এসে কথা ব্যবহার দিন দিন সেরকমই হচ্ছে।' রুচি না বলে পারল না।

'বটে।' শিবনাথ উত্তর করল, 'তার প্রমাণ দিচ্ছ রাত দুপুরে একটা লোফার একটা পাগলের ঘরে তোমার যাওয়া চাইই।'

রুচি ঘুরে দাঁড়ায়। চট্ ক'রে কি উত্তর দেবে বুঝতে না পেরে পরে গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে বলে, 'বেশিদিন বেকার গরিব থাকলে মানুষ লোফার হয় পাগল হয় হয়তো। আমি ঠিক জানি না কে গুপ্ত পাগল কি না, কিন্তু তাঁর স্ত্রী বেবির মা অপ্রকৃতিস্থ নন। ভদ্র মহিলা অসুস্থ তার ওপর তাঁর এই বিপদ। টাকাপয়সা দিয়ে সাহায্য করতে পারব না জানি। কিন্তু তিনি দু'বার ডেকেছেন একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করতেই হবে। তাঁর সঙ্গে কথা বললে থানা পুলিশের বিপদ আছে আর সেই ভয়ে আমি চুপ ক'রে ঘরে বসে থাকব এতটা কাপুরুষ তুমি হ'তে পার আমি নই।' রুচি চৌকাঠের বাইরে পা বাড়াবার উপক্রম করল।

শিবনাথ বলল, 'আহা, থানা পুলিশের ভয় হয়তো এখনও তেমন নেই, কেন না এ-পক্ষ যখন চুপ ক'রে আছে চেপে গেছে তখন পুলিস গায়ে পড়ে অ্যাক্‌সিডেণ্টের তদন্ত করতে আসবে না ঠিক। কিন্তু আরো একটা কথা আছে। আফ্‌টার অল্ একটা আনপ্লেজেণ্ট ব্যাপার। পারিজাতের দোষ কি রুনুর দোষ তার প্রমাণ যারা ঘটনা চোখে দেখেছে তারা। কিন্তু এখন কে গুপ্তর ফ্যামিলির সঙ্গে বেশি মেলা-মেশা করতে গেলে আমি ও-বাড়ির টুইশনিটা পাব না এটা সত্য কথা। কাজেই—'

'তাই বলো, সেই দুশ্চিন্তায় তুমি সারা হয়ে যাচ্ছ, পারিজাতের বাচ্চাদের পড়াতে পারবে না, দীপ্তিকে রোজ একবার দেখা হবে না, মরুক না কে গুপ্তর ছেলে হাসপাতালে পচে,—ছি ছি—' বলে দরজার শব্দ ক'রে দ্রুত পায়ে রুচি ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

'ছোটলোক্, মিন্, লো-হার্টেড ক্রিচার—' উত্তেজনায় শিবনাথ স্ত্রীর পশ্চাদ্ধাবন করে চৌকাঠ পর্যন্ত ছুটে গেল তারপর থমকে দাঁড়াল। পাশের কোন্ ঘরে যেন হাসির রোল উঠেছে। হাসিটা যখন বন্ধ হ'ল কথাগুলি পরিষ্কার বোঝা

গেল। 'অশান্তি আবার কি নিয়ে হয়, টাকাপয়সা দিদি, রূপচাঁদ। ওতে টান ধরলে সব প্রেমেই ভাটা পড়ে, চারদিক দেখেশুনে এখনো কি তোমার বুঝতে বাকি রইল।'

'কি ভাঙল, কাঁসার থালা না কাচের বোয়ম। জোর আওয়াজ হ'ল।' যেন অন্য ঘর নিচু গলায় মন্তব্য করল।

'দেখিনি, কারো ঘরে চুপি দেয়া স্বভাব না বোন্। আছি নিজের ঘরেই আছি, শাকভাত মাছভাত যেদিন যেমন জোটে খাই। পরের ফুটোয় চোখ গলিয়ে করব কি।'

অন্য ঘর কি বলে আর বোঝা গেল না। 'আরাম হারাম হ্যায়।' বিধু মাস্টার গলা বড় ক'রে ছেলেমেয়েদের বোঝাচ্ছিল। 'নেহরুর কথাগুলো দামী। আমিও অবশ্য গোড়া থেকে তোমাদের বলে আসছি আলস্য করো না। অলসতায় বৃথা কালক্ষেপ করলে অশেষ দুর্গতি থাকে কপালে। আলস্য পাপ।' বিধুর গলাও অবশ্য দেখতে দেখতে চাপা পড়ে গেল ভুবনের চিৎকারে। খুশী গলা। 'না না দেড়পো আমি হজম করতে পারব না। ঐ এক পো দুধ যথেষ্ট তিন ছটাকও রাখতে পারিস, বরং তুই তোর গলাটা একবার ডাক্তারকে দেখা মা পয়লা মাসের মাইনেটা পেয়ে, বলছিলি দু'দিন পর পর সর্দি-কাশি হয়।' বীথি, কি বলল শোনা গেল না। মেয়ের হয়ে ভুবনের স্ত্রী চড়া গলায় উত্তর দেয়, 'ও গলাফলার দোষ এখন এমনিতে সেরে যাবে। দু'দিন একটু নিয়ম ক'রে মাছটা ডিমটা খাক না। থাকবে না এসব। প্রীতির মাইনের টাকায় তো আর আমি সবাইকে নিত্য মাছ খাওয়াতে পারিনি। দশদিকের খরচ মিটিয়ে আর কুলানো যাচ্ছিল না।' দেখতে দেখতে ভুবন-গিন্নীও চাপা পড়ে গেল। রমেশগিন্নী মানে মল্লিকার খিলখিল হাসি বাড়ির উঠোনকে তৎক্ষণে পুলকিত করে তুলেছে। 'সিবিল মারিজ, খাতায় নাম লিখিয়ে কমলা শিশিরবাবুকে বিয়ে করছেন প্রেমথর দিদিমা, আমাদের হিন্দুদের মত ছাদনাতলায় সাতপাক খাওয়া বিয়ে না। এখন বুঝতে পারসেন?'

'শিশিরের না স্ত্রী আছে শুনলাম?' পাশের ঘর থেকে প্রমথর বুড়ি দিদিমা খনখনে গলায় হাসে। 'তা এখানেই তো ভাল ছিল, ডুব দিয়ে দিয়ে একাদশী ঠাকুর জল খেতে আসত। এখন বিয়ে করলে জানাজানি হবে কোঁদল বাঁধবে যে আগের পক্ষের সঙ্গে।'

'তা বলে কমলা শুনবে কেন। ধান খেলি মুর্গি যাবি কোথা। সেয়ানা মেয়ে। ব্যাঙ্কে মোটা টাকা আছে শিশিরের, পরশু দুপুরে ভাত রেঁধে খাইয়ে কমলা পেটের ভিতরের কথা টেনে বার করেছে তারপর সোজা বিয়ের প্রস্তাব। নিজেই হেসে হেসে সব বলল রওনা হবার আগে।'

'হরি হরি।' প্রমথর দিদিমা আর হাসে না। লম্বা নিশ্বাস ছেড়ে দেবতার নাম নিয়ে বলে, 'যা করেছে ভালই করেছে, কোনরকমে ঝুলে পড়া নিয়ে কথা। মেয়েছেলের আইবুড়ো হয়ে ঘরে থাকার মত অশান্তি আছে নাকি কিছু। আমাদের কমলা পাকা কাজ করছে। দোজবরে কী আসে যায়। এখন সতীনের সাথে মিলেমিশে ঘর করুক, কি বলো বোন?'

মল্লিকা চুপ। শিশির কমলাকে নিয়ে হোটেলে তুলবে তারপর সুবিধামত ছোটখাট একটা ঘর নেবে কোথাও, আগের পক্ষকে বিন্দুবিসর্গও জানানো হবে না। ইত্যাদি কোন কথা বুড়ির কাছে হুট্ করে প্রকাশ করতে যেন মল্লিকার বাধল। দিনকাল ঘুরে গেছে; পুরুষ মেয়ের মেজাজ মর্জি আর এখন আগের মতন নেই বললেও বুড়ি মানবে না বরং কমলার এ-প্রস্তাব শুনলে আবার হাউ মাউ করে উঠবে চিন্তা করে মল্লিকা আর কথা বলল না।

'হরি হরি।' ও ঘরে বুড়ি পাশ ফিরে শুয়ে আবার দেবতার নাম নিয়ে একটা আক্ষেপের নিশ্বাস ফেলল। 'দুদিনের মধ্যে দুটো ঘর খালি হয়ে গেল। কাল পরশু আবার কোন্ ঘরের লোক আমাদের মায়া কাটাবে কে জানে।'

বলতে বলতে মনে হল টুপ্ করে যেন প্রমথর দিদিমা একসময়ে ঘুমে তলিয়ে গেল।

তারপর সারা বাড়ি নিঃসাড়। অমল ও কমলার ঘরের তালা দুটো দু'বার অল্প বাতাসে নাড়া খেয়ে ঠুকুস ঠুকুস শব্দ করে থেমে যেতে বারো ঘরের উঠোনে পায়ের শব্দ হয়। যেন কে বাড়িতে ঢুকল, প্রথমে বোঝা যায় না কোন্ ঘরের বাসিন্দা। কান খাড়া করে একটু মনোযোগ দিয়ে শুনলে টের পাওয়া যায় চার নম্বর ঘরের দরজার হুড়কা খোলা হয়েছে। অর্থাৎ শেখর ডাক্তার ঘরে ফিরেছে। আজ আর প্রভাতকণার সাড়াশব্দ নেই। সন্ধ্যা থেকে নীরব। ডাক্তারও এত রাত অবধি ডিস্পেন্সারীতে বসে সুধীরের সঙ্গে কথা কাটাকাটি তর্কবিতর্ক করে এসে ঘরে ঢুকে কারো সঙ্গে একটা কথা না বলে এক ঘটি জল খেয়ে সোজা নিজের বিছানায় চলে গেল। প্রভাতকণা মেঝের একধারে আলাদা শয্যা নিয়েছে। কেবল একলা জেগে আছে সুনীতি। পড়ার টেবিলে হ্যারিকেনের আলোয় মাথা গুঁজে বসে কাগজ পেন্সিল নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে কি যেন আঁকাআঁকি করছিল। পাখি, একটা সুপুরি গাছ? কিন্তু আঁকতে গিয়ে সুনীতি লক্ষ্য করলে কোনোটাই ঠিক হচ্ছে না। কোনোদিন সে ছবি আঁকতে পারবে না বুঝতে পেরে হতাশ হয়ে একসময় পেন্সিলটা কাগজ থেকে তুলে সেটা গালে ঠেকিয়ে সুনীতি বেড়ার টিনের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে থাকে। একটু আগে ও-ঘরের মল্লিকা যখন প্রমথর দিদিমাকে 'সিবিল মারিজ' ব্যাখ্যা ক'রে শোনাচ্ছিল সুনীতি কান খাড়া রেখে সব শুনেছে। তারপর বড় বড় চোখ মেলে চাদর মুড়ি দিয়ে মেঝেয় শুয়ে থাকা মা'র দিকে তাকিয়েছে। অন্যদিন হ'লে কমলার এই ধরনের বিয়ের গল্প শুনে প্রভাতকণা শয্যা ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁত বার করে হি হি হাসত আর সুনীতিকে তার বিয়ের পিঁড়িতে কোন্ ফুল 'চিত্রি করা' হবে তাই ব্যাখ্যা করে শোনাত। আজ প্রভাতকণার মনের অবস্থা অন্যরকম। যেন কথাটা বুঝতে পেরে সুনীতি একসময় বেড়ার টিন থেকে চোখ সরিয়ে অত্যন্ত সতর্কভাবে তক্তাপোশের ওপর লেপ মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকা বাবার দিকে তাকিয়ে কি ভাবে। এদিকে হ্যারিকেনের তেল ফুরিয়ে গিয়ে সল্‌তের আগুন থেকে থেকে লাফিয়ে উঠে ফুট্‌ফাট্ শব্দ করছে।

(ক্রমশঃ)

চিঠিটা পেয়ে না এসে কোনও উপায় ছিল না। সুখলতাকে আমি কথা দিয়েছিলাম। শুধু ওঁকে নয়, ঘটনাচক্রে এক মৃত্যুপথযাত্রীর শিয়রে বসে বলতে হয়েছিল, দেখা শোনা করবো সুখলতার। এখনও আমি ছাত্র, বাবার মাসিক মনিঅর্ডার ভরসা। এ অবস্থায় যতোটা দেখা আর শোনা যায় তার বেশি আর কি করবো। তবু না এসে পারলাম না।

এখান থেকে আর দুটো স্টেশন পরেই পুণা। কলেজ কামাই করে সকালে বেরিয়েছি বম্বে থেকে। এখানে, মানে এই খান্দালায় আগে কখনো আসিনি। তবে সুখলতা এমনভাবে পথ নির্দেশ দিয়েছেন যে, পেঁ'ছতে কষ্ট হবে না। বড়ো রাস্তা থেকে নেমে ডান দিকের কাঁচা সড়ক... খানিকটা গিয়েই গির্জা...নারকেল সুপারি বাগান তারপর...ছোট একতলা বাড়িটা তারের ফেন্সিং দেওয়া। গেটে দেখবে ও'র নাম...খ'ুজে নিতে অসুবিধে হবে না।

কিন্ত আমায় কেন? তাও এতদিন বাদে? চিঠিতেও তার কোনও হদিশ নেই। সুখলতা লিখেছেন...'তোমরা সেদিন কতো কী বলেছিলে।... জীবনটা হেলা ফেলার জিনিস নয়...আরও কতো কি। বসন্তও বলতো, যাই হোক না কেন, এরই মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে বাঁচতে হবে। কিন্তু আমি আর পারছি না। পায়ের নিচের মাটি যেন সরে যাচ্ছে। যাহোক, কিছু একটা এবার আমায় করতেই হবে। এ আমার অসহ্য লাগছে।'

আসলে সুখলতার অধৈর্য'ই আমার অবাক লাগছিল। যে সময়ে ভেবেছিলাম ভেঙে পড়বেন সুখলতা, সেই সময়ে দেখে অবাক হয়ে গিয়েছিলাম তাঁর স্থৈর্য। অস্বাভাবিক স্থৈর্য। তাঁর চিঠিতে এমন অধীরতা দেখে চিঠি পাওয়ার পর দিনই দু দশ টাকা ধারধোর করে কলেজ ফাঁকি দিয়ে চলে এলাম...। কিন্তু সুখলতার কথায় এসে বসন্ত বসন্ত মজুমদারকে বাদ দিতে পারি না। তিনিই প্রথম।

...... বসন্ত মজুমদারের সঙ্গে বম্বেতেই হঠাৎ আমার আলাপ। দাদার থেকে আমি আর বিকাশ ট্রেনে উঠেছি।... চার্চ গেট যাবো। মেট্রোতে কাটাবো শনিবারের বিকেল। দুজনেই ধুতি পাঞ্জাবী পরে পুরোদস্তুর বাঙ্গালী সেজেছি। একে বম্বে, তায় যুদ্ধের মরশুম...আমরা হংস মধ্যে বকো যথা। স্যুট হ্যাটের মধ্যে এ সাজটা চোখে ঠেকবেই তো। তাই অবাক হলাম না যখন অতি পরিচ্ছন্ন বিদেশী পোশাকে মোড়া সুদর্শন যুবক স্মিত মুখে আমাদের পাশে দাঁড়ালেন।

—আপনারা তো বাঙালী।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—অনেক দিন বাদে পুরোপুরি বাঙালী পোশাক দেখলাম।

—কেন এখানে তো অনেকেই অফ আওয়ার্সে পরেন...

—আমি এখানেও থাকি না, পুণার কাছে এক গাঁয়ে থাকি...

কি একটা স্টেশনে কামরা থেকে জনকয়েক লোক নেমে গেল। একজনের বসার জায়গা হলো। তাঁকে বসিয়ে দিলাম।

চার্চ গেটে নেমে ভদ্রলোক বল্লেন, কয়েকদিন বম্বেতেই আছি, আপনাদের সঙ্গে আলাপ করবো, ঠিকানাটা যদি পাই।

ঠিকানা দিলাম। বিকাশ পুরো বাঙালী কায়দায় জিজ্ঞেস করলে...মশায়ের নাম?

—বসন্ত মজুমদার। মাতুঙ্গার নোবল

লজিংএ উঠেছি। আপনাদের তো কিংস সার্কেল? কাছেই দেখছি। নিশ্চয়ই দেখা হবে। আচ্ছা আসি।'

চলে গেলেন ভদ্রলোক। বিকাশ বল্লে, বসন্তের মতো চেহারা বটে সাহেবের।

'নিশ্চয়ই দেখা হবে' বলেছিলেন ভদ্রলোক। হলো বটে, তবে মাতুঙ্গার নোবল লজিংএ নয় বা আমাদের কিংস সার্কেলের মেসেও নয়।

কলেজ থেকে ফিরে সেদিন চিঠি পেলাম। দাদারের মডার্ন নার্সিং হোম থেকে ডাক্তার মোদী লিখেছেন পোস্টকার্ডটা।

'আমার এক রুগী, মিস্টার বি মজুমদার আপনাদের সঙ্গে দেখা করতে উৎসুক। যত সত্বর সম্ভব আসা বাঞ্ছনীয় বলে মনে করি।'

দোতলার একটি ঘরে রাখা হয়েছিল বসন্ত মজুমদারকে। ঘরে ঢুকতেই ম্লান হেসে হাতের ইঙ্গিতে বসতে বল্লেন। নার্স সাবধান করলে হাসি মুখে বন্ধুদের পেয়ে খুব হৈচৈ করবেন না। এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি আপনি। তার উত্তরে ম্লান হাসি ফুটলো বসন্ত মজুমদারের মুখে। সে হাসি যেন বলছে, আর সুস্থ হয়েছি।

একটা চেয়ার ঘরে ছিল, পাশের ঘর থেকে জমাদার একটা টুল দিয়ে গেল। আমরা দুজনে বসলাম।

মাত্র তিন দিনে যেন গলার স্বর বদলে গেছে মজুমদারের। ভাঙা ভাঙা স্বরে থেমে থেমে কথাগুলো বল্লেন; 'কষ্ট দিলাম, না—আরও দেবো খানিকটা বুকের ব্যথাটা খারাপ বোধ হচ্ছে। আমার স্ত্রীকে একটা চিঠি লিখে দিতে হবে।' বিকাশ বল্লে—তা ডাক্তারকে বল্লেন না কেন, একটা টেলিগ্রাম করে দিতে?

না-না, ভয় পাবেন উনি। ভারি ডেলিকেট মহিলা। একা আছেন ওখানে। ডাক্তার লিখলে ভয় পাবেন বলে আপনাদের ডেকেছি—একটু বুঝিয়ে সাহস দিয়ে প্লীজ? পারবেন না?

চিঠিটা লিখে পড়ে শোনালাম। পছন্দ হলো, তবে বল্লেন, অতো জড়িয়ে লিখবেন না দয়া করে। উনি পড়তে পারবেন না। সুখলতা মারাঠি মেয়ে—আমার কাছেই বাংলা শিখেছেন। ছাপা অক্ষর বেশ বুঝতে পারেন।

আবার লিখে দিলাম চিঠিটা।

অবস্থার গুরুত্ব তখনও বুঝিনি। ডাক্তারের কাছে শুনে ভয় পেলাম।

হার্টটা ডায়েলেটেড এবং এবারের এট্যাকটাও সাংঘাতিক।

কি করি? এখানে কি ওঁর চেনাশোনা কেউ নেই আর?

ডাক্তার মোদী বল্লেন, আপনাদের নাম করার আগে চার্চগেটে এক মহিলাকে লিখতে বলছিলেন মজুমদার। পরে নিষেধ করলেন। আপনাদেরই ঠিকানা দিলেন।

—চার্চগেটের মহিলাটির ঠিকানা?

—ভদ্রলোক তো জানান নি।

—গিয়ে জিজ্ঞেস করবো নাকি?

—জিজ্ঞেস করতে পারেন—তবে ওঁকে একসাইট না ক'রে। তাঁকে লেখার কথা নিজে বলেই কেমন একসাইটেড হয়ে পড়লেন দেখলাম...তাই, আমাদেরও সাহস হলো না।

বিকাশ বল্লে, ঝামেলায় কাজ কি বাপু? ভালো করতে গিয়ে হার্টফেলের দায়ী হবি? চল্ তার চেয়ে সুখলতার চিঠিটা এক্সপ্রেস ডেলিভারী করে দিয়ে আসি। চিঠি পাওয়ার পর সুবিধে মতো ট্রেন পেলে কাল রাত্তিরে নয় পরশু সকালে সুখলতা এসে পড়লে আমাদের দায়িত্ব ঘোচে।

কল্যাণের দক্ষিণে পুণার পথে পড়ে খান্দালা। ভয় বাঁচাতে গিয়ে তেমন তাড়াতাড়ি আসার কথা লেখা হ'ল না—কখন পেঁৗছবেন কি জানি?

পরের দিন কলেজ থেকে সোজা এসেছি নার্সিং হোম। অবিশ্রান্ত বর্ষণ সেদিন সকাল থেকে। ভিজে একসা হয়ে গেছি। ডাক্তার বল্লেন, অবস্থা একই রকম। বরং আরও ভয়াবহ। মাঝে মাঝে খুঁজছেন আপনাদের। —হ্যাঁ দাঁড়ান! নার্সকে ডাকলেন ডাক্তার মোদী। নার্স জানালো, লাস্ট ইঞ্জেকশানের পর একটু রেস্টফুল মনে হচ্চে।

ডাক্তার হাসলেন। নার্স চলে যেতেই বল্লেন, ওয়েটিং ফর দি ফাইন্যাল রেস্ট। শেষ বিশ্রামের জন্য তৈরি হচ্চেন।

আমি প্রায় আর্তনাদ করে উঠি। কোনো আশা নেই?

—মনে তো হয় না।

—কিন্তু সুখলতা যে এসে পেঁৗছননি?

—ওঁর 'স্ফীত হৃদয়' কি আর সেকথা শুনবে! তবে বলা যায় না, কতক্ষণ যুঝতে পারবেন...স্ট্যামিনা আছে ভদ্রলোকের।

তবে তো অপেক্ষা করতেই হয়। ডাক্তার তাঁর ভাবী রুগীদের পোশাকের আলমারী থেকে স্লিপিং স্যুটের দুটো পাজামা আর জামা আনিয়ে দিলেন দুজনকে।

—নিন, বদলে ফেলুন ভিজে কাপড়! আপনারা আবার অসুখ বাধাবেন না।

বিকাশ বল্লে, 'আমি মেসে গিয়ে বলে আসি। ওরা ভাববে নয়তো।'

মেস হলেও ক'ভাই যেন ঘর বেঁধে থাকি আমরা। ফিরতে বেশী দেরি হলে খোঁজাখুঁজি পড়ে যাবে। বিকাশ চলে গেল। আমারও বইপত্তর গুছিয়ে দিলাম তার হাতে। কাপড় বদল করে এসে বসলাম।

কিছুক্ষণ বাদে নার্স এসে বল্লে, উনি জেগেছেন। আপনার খোঁজ করছেন।

ঘরে ঢুকেই মনে হলো মুখে অন্তিম অন্ধকারের ছায়া পড়েছে। বাইরে তেমনি অশ্রান্ত বর্ষণ। কোনো ছেদ নেই।

আমি ওঁর খাটের কাছে গিয়ে ঝুঁকে পড়লাম। বসন্ত মজুমদার চেয়ারটার দিকে নির্দেশ করলেন—'বসুন, অতো ব্যস্ত হবেন না।' চোখে গম্ভীর স্বপ্নের দৃষ্টিঃ 'আপনায় তবু পেলাম। দুটো কথা বলে রাখতে পারবো।' আমার মুখের দিকে চেয়ে মজুমদার কি যেন দেখলেন; তারপর বল্লেন, 'আপনি একেবারে ছেলেমানুষ, তবু আর কাকেই বা বলি? সুখলতা ভারি একা পড়বে। তাঁকে দেখবেন একটু! একেবারে একা...'

সান্ত্বনা দেওয়া ছাড়া গতি ছিল না। বল্লাম, 'অতো ভাবচেন কেন? এখন তো আপনি কতকটা ভালো।'

যেন শুনতে পেলেন না বসন্ত মজুমদার। টেবিলের দিকে হাত বাড়ালেন, —ওই পোর্ট ফোলিওটা আনুন! ওদিকের ফ্ল্যাপটা খুলে ফেলুন।...হ্যাঁ—ওই ছবিটা; ওই সুখলতা।

আয়ত-নয়না হাস্যমুখী সুখলতাকে সেই প্রথম দেখলাম। খোঁপায় জড়ানো বেল ফুলের মালা। পাশের দিকে মুখ

ফিরিয়ে আছেন। কি সুন্দর মানিয়েছিল দুজনকে। প্রথমে একথাই মনে হলো আমার।

—দিন, আমায় দিন একবার ছবিটা। ভালোই হয়েছে, সে এখানে নেই! ওকে কাঁদতে দেখিনি কখনো। ভারি কষ্ট হতো দেখলে।

বলার কিছু খুঁজে পাই না। বিকাশ থাকলেও বা হতো। ও বেশ চালাক চতুর। স্বগতোক্তির নীরব সাক্ষী হয়ে বসে রইলাম।

—জানেন? ও খুব শক্ত মেয়ে। আপনাদের বেশী বিপদে ফেলবে না। শুধু প্রথমটায় হয়তো একটু বেশী... ভারি একা পড়বে কিনা? নিজের পরিবার, গোঁড়া মারাঠি ব্রাহ্মণ পরিবারের মতের বিরুদ্ধে একাই দাঁড়িয়ে ও আমায় বিয়ে করেছে। আমারও কেউ নেই আর! একটি ছেলে ছিল আমাদের...বেবী, ছোট্ট বেবী... যাক যা বলছিলাম, প্রথম ক'টা দিন একটু থাকবেন কাছে কাছে। পারবেন না?

আমার হঠাৎ মনে পড়লো—'আচ্ছা, চার্চগেটের কাছে আপনার কে যেন আছেন একজন...'

নিমেষে মুখের সমস্ত প্রশান্তি লুপ্ত হলো। কী আর্ত চোখদুটো। ওষ্ঠাধর কেঁপে উঠলো বার কয়! ভয় পেলাম আমি!

সুখলতার ছবিটা চোখের সামনে তুলে ধরলেন মজুমদার। আবার সেই শান্ত ছায়া ঢেকে দিল মুখটাকে। মাথা নাড়লেন ধীরে ধীরে। —'না, আর কেউ নেই আমার। আপনি ছেলেমানুষ, নয়তো বলতাম যে একবার...না, থাক ও কথা। সুখলতাকে শুধু আমার হয়ে বলবেন... বলে থামলেন বসন্ত মজুমদার; মুদ্রিত নেত্রে কী ভাবলেন কয়েক মুহূর্ত, তারপর বল্লেন...'না, বলার কিছু নেই, কি আর বলবেন? সুখলতাকে শুধু একটু সাহায্য করবেন, নিজেকে সামলে নিতে।'

খানিক বাদে ছবিটা আমার হাতে দিতে দিতে চাইলেন সেদিকেঃ চেনা হয়ে রইল আপনার। চিনে নিতে একেবারেই অসুবিধে হবে না। দেখবেন, ঠিক অমনটিই আছে, মোটেই বদলায় নি...

ছবিটার দিকে দেখছিলাম আমি। এখনও যদি এসে পড়েন সুখলতা। ওই হাসিমুখ আর এখনকার মুখে কি মিল পাবো কোনো? দেখি, মজুমদার চোখ বুজে শুয়ে আছেন শান্তভাবে। কিছু বলেন যদি, সেই অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রইলাম। বুকের ওপর রাখা হাতটা ওঠা-নামা করছে ধীরে ধীরে। যেন আমায় কাজ বুঝিয়ে দিয়ে উনি নিষ্কৃতি পেয়েছেন। নিশ্চিন্ত মুদিত নেত্রে বোধ হয় সুখলতার স্বপ্ন। সার্সির ওপাশে দ্যুতিহীন মহা-কাল থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের মৃদু মন্ত্র।

নার্স আমায় ইঙ্গিতে ডাকলো। বাইরে আসতে বল্লে, ডাক্তার মোদী আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।

তেতলার ফ্ল্যাটে ডাক্তার সপরিবারে থাকেন। সিঁড়ির কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন তিনি।

—আপনার বন্ধু বোধ হয় বর্ষার জন্যে আসতে পারছেন না। রাত হচ্ছে। আপনি এখানে বরং খেয়ে নিন।

খিদের কথা ভুলেই ছিলাম। বিকেলে কিছু পেটে পড়েনি। তবু ক্ষমা চাইলাম। স্লিপিং পাজামা পরে ভদ্রলোকের বাড়ি খেতে যাই কি করে? আমি বরং একতলায় ইরাণী হোটেলে কিছু খেয়ে আসি! মিসেস মোদীকে বলবেন, আমার হয়ে...'

বৃদ্ধ সহাস্যে মাথা নাড়লেন, পাগল হয়েছেন নাকি? এখন ও বেটা সব পাট তুলে দিয়েছে। বড়ো জোর চা আর কাঁচা রুটি পাবেন। আমার এখানে খুব সাহেব নেই কেউ। মিসেস মোদী সব জানেন, টাইমস অফ এমারজেন্সি...ফরম্যালিটির সময় নয়। আসুন, আসুন...'

অগত্যা মোদী সাহেবের খাবার টেবিলে অনেকক্ষণ কাটলো। নানান গল্প করি আর থেকে থেকে বসন্ত মজুমদারের গলার স্বর আর সুখলতার ছবিটা ভেসে ওঠে।

বিকাশ এসেছে, নিজের খাওয়াদাওয়া সেরে, টিফিন কেরিয়ারে আমার খাবার নিয়ে। এই বাদলার মধ্যেও কয়েক জায়গায় ঘুরে আসচে ও। কাজ এগিয়ে রাখা বিকাশের স্বভাব। আড্ডায় আড্ডায় ঘুরে পরের ভোরের জন্যে তৈরি থাকতে বলে এসেছে। না বেরোলেও যাদের চলে, কাল সকালে খবর না নিয়ে যেন তারা কেউ না যায় কাজে। একেবারে খাটিয়া নিয়ে যে হাজির হয়নি, সে বোধ হয় কেবল অনেক রাত হয়ে গেছে বলে। আমি বিরক্ত বোধ করলাম। এই কাজ করে করে তখনও হাড় পাকেনি আমার। বল্লাম, ক' ঘণ্টা আর সবুর সইলো না তোর, এখনও টার্ন নিতে পারে তো?

বিকাশ সবজান্তার মতো হাসলো, আরে খ্যাপা, এ কি টাইফয়েড, যে টার্ন নেবে? ডাক্তার মোদী যখন ঠোঁট বেঁকিয়েছেন, তখন ধরে নে, হয়েই গেছে; তারপর ওরা সব কাজে গেলে তখন লোক পাবো কোথায়?

সত্যিই, নার্স এসে জানালো সব শেষ। ডাক্তারের চেম্বার থেকে উঠে দোতলায় গেলাম। ঘরে গিয়ে দেখি, যেমনটি শুয়ে-ছিলেন, তেমনি। প্রশান্ত স্বপ্নলাগা সুপ্তি—সমস্ত মুখে।

সুখলতার সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের উপহার, এই অবশেষটুকু নিয়ে বর্ষার দীর্ঘ ক্লান্ত রাত জেগে বসে রইলাম। বিকাশ সঙ্গে করে এক নভেল নিয়ে এসে-ছিল। টেবিলে পা তুলে দিয়ে কয়েক পাতা পড়লো তার। তারপর নিশ্চিন্তে মাথা এলিয়ে দিলো।

ডাক্তার আমাদের পাশের ঘরের একটা বেডে শুয়ে পড়তে বলেছিলেন। তাঁকে জানালাম—শবদেহকে অরক্ষিত রেখে যাওয়া আচারে নিষেধ আছে।

—আপনারা মানেন না কি?

—না, আমি মানি না। তবে কি জানি, সুখলতা যদি মানেন...?

দুই ঘুমের মাঝখানে আমার জেগে থাকা। ওদের দুজনের স্বপ্নে ওরা সারা বিশ্বজগৎকে উপেক্ষা করতে পারে। আমি পারি না, ঘড়ির কাঁটার নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে এগিয়ে আসচে সুখলতার এসে পৌঁছানোর সময়। একে কি কোনোক্রমে থামিয়ে দেওয়া যায় না? সুখলতার প্রথম কান্না, বোধ করি নিরবচ্ছিন্ন কান্না আরম্ভের আগেই এই মুহূর্তটাকে স্তব্ধ করা যায় না?......

খান্দালার স্টেশনে নামার পর থেকে সেই রাত্রেই সেই উদ্বেগ আমার বুকে চেপে বসেছে। এই তো গির্জাটা এসে পড়েছে......এর পর

নারকেল সুপারি বাগানের মাথাটাও দেখা যায়। বেশ খানিকটা পথ...। গিয়ে কেমন দেখবো? কি শুনবো? কোনো হদিশ পাই না। সুখলতা সম্পর্কে কোনো ধারণা আগে থেকে করতে সাহস হয় না। সেদিন কি অবাকই না হয়েছিলাম।

কতো ভয় করেছিলাম, কান্না থামাবো কি করে? অথচ সেদিন...।

সেদিন সবে সকাল হয়েছে। ট্যাক্সি থেকে নেমে সুখলতা ডাক্তারের সামনে এসে দাঁড়ালেন,—আপনিই ডাক্তার মোদী? ভ্যানিটি ব্যাগ থেকে আমার লেখা চিঠিটা বার করলেন। আমিও দাঁড়িয়ে ছিলাম সেখানে। দুজনেই অপেক্ষা করে ছিলাম সুখলতার আগমনের। বৃদ্ধ ডাক্তার মোদী সস্নেহে বসালেন তাকে। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বল্লেন, তোমার কাছে হাসি-মুখে কথা বলার সুযোগ ভগবান দিলেন না, বেটি! তীক্ষ্ণধী সুখলতা গৌরচন্দ্রিকা সেখানেই শেষ করে দিল। ইঙ্গিতটি বোঝার সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট স্বরে শুধু বল্লে, ইস হী ডেড্? কখন, কখন মারা গেলেন উনি।

চমক লাগলো সবায়ের, মিসেস মোদীও এসে দাঁড়িয়েছেন, সান্ত্বনা দেবার জন্যে আমি তাঁকে তৈরি হয়ে আসতে বলে-ছিলাম। হাসপাতালে তো নয়। ক্লিনিক দু চারটি কেস রাখেন ডাক্তার মোদী। চিকিৎসা ও পরিচর্যা করেন আত্মীয়মনাতায়। এই আকস্মিক ঘটনা তাঁকেও স্পর্শ করেছে।

কয়েক ফোঁটা চোখের জল রুমালে মুছে নিতে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকুই নীরবে বসলেন সুখলতা। 'তাঁকে একবার দেখতে পারি? কোথায়...?'

মিসেস মোদী গিয়ে তাঁর হাত ধরলেন। আমি দ্রুত পায়ে ঘরে গিয়ে বিকাশকে ঠেলে তুল্লাম, 'সুখলতা এসে গেছেন! এ ঘরেই আসছেন......'

'—এই সেরেছে, এবারে তা হলে খসে পড়া যাক...' বলে ধড়মড় করে উঠে পড়লো বিকাশ। ও দেখায় যেন কিছুই ওর লাগে না। আমি জানি মেয়েদের কান্না ও সহ্য করতে পারে না। ওর চোখেও জল এসে যায়। খসে পড়ার সময় পেল না বিকাশ। মিসেস মোদী সুখলতাকে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন।

খাটের পায়ের দিকের রেলিংটা ধরে দাঁড়ালেন সুখলতা এক মিনিট।' ধীর পায়ে এসে মুখের থেকে চাদর সরিয়ে গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখলেন বসন্ত মজুমদারের মুদ্রিত নেত্রের দিকে। জানলার ভারী পর্দাগুলো আড়াল করে রেখেছে সেদিন সকালের প্রভাহীন আকাশের স্বল্প আলো।

'—শেষের দিকে বেশী কষ্ট পাননি বোধ হয়?' সপ্রশ্ন মুখে সকলের দিকে চাইলেন। আমার দিকে চেয়ে বল্লেন, 'আপনিই চিঠি লিখেছিলেন বুঝি? অনেক ধন্যবাদ! আপনার সঙ্গে মজুমদারের......'

'—পথে হঠাৎ আলাপ, কাল সারা রাতই এখানে ছিলাম। সত্যিই, তেমন বিশেষ যন্ত্রণা পাননি মিস্টার মজুমদার...'

'—যন্ত্রণা হলেও ও বুঝতে দেয় না। ভারি সহ্যশক্তি।' কথা শেষ করে আমার দিকে চাইলেন। আমার পাশে টেবিলের ওপর রাখা নিজের ছবিটায় নজর পড়লো...

তাঁর বিস্মিত দৃষ্টি অনুসরণ করে আমি জানালাম—কাল উনি দেখতে চাইলেন ছবিটা! আমাকে বার করে দিতে বলে-ছিলেন পোর্টফোলিও থেকে।

সহসা আবহাওয়া বদলে গেল। কথা শেষ হবার আগেই দেখি সুখলতা মজুম-দারের বুকের ওপর পড়ে কেঁদে উঠলেন, আমি থাকলে এমন হতে পারতো না বসন্ত, আমি থাকলে এমন হোতো না...

বিকাশ আর আমি ঘর থেকে চলে এলাম...।

সন্ধ্যের মধ্যে সব কাজ চুকিয়ে ডক্টর মোদীর নার্সিং হোমে এলাম। খবর পাঠাতেই তেতলা থেকে ডাক এলো। ভাব দেখেশুনে বিকাশ বল্লে, আমাকেও হার মানাল রে সুখলতা। পায়ের ধুলো নেবো ভাবচি।

খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব জেনে নিলেন আমাদের কাছ থেকে। কেমন করে দেখা হল, কি কি কথা হলো, শেষ রাত্রের, সেই নিদারুণ রাত্রের সমস্ত কাহিনী বর্ণনা করতে হলো। আমার স্বর আর চোখ, বিকাশের ভাষায়, আমার পৌরুষকে ধিক্কার দিয়েছে, কিন্তু তিনি পাথরের মতো এক-দৃষ্টে চেয়ে সব শুনলেন। কিছু বাদ দেবার উপায় নেই। অবশ্যই চার্চগেটের মহিলাটির প্রসঙ্গ উত্থাপন করিনি, যতো আমার হয়েছে।

দুদিন বাদে সুখলতা বল্লে, এবার খান্দালায় যাই। সবকিছু চাকরের জিম্মায় পড়ে আছে।

ভবিষ্যতের কথা উঠতেই বলতে হলো ছেলেমানুষই হই, ওটুকু বোঝার মত জ্ঞান আমায়—'একা থাকবেন?'

আশ্চর্য এমন অবস্থাতেও সুখলতা হাসলেন, কি কোরবো ভাই, আর কেউ নেই আমার...' পুরোনো কথা আবার শোনালাম তাঁকে। আমাদের তিনি বলে গেছেন দেখাশোনা করতে। শক্তি অবশ্য সামান্য, তবু যদি বম্বেতে এসে থাকেন বা...

বিষাদে গভীর মৃদুকণ্ঠ; সজল দৃষ্টি তবু কঠিন প্রত্যয় নিয়েই বল্লেন সুখলতা, 'যিনি আমায় পাশে স্থান দিয়েছিলেন, তিনিই ফেলে চলে গেলেন, তোমরা কি করবে ভাই? না, রাগ করে বলছি না। তাঁর সাধ্যমত তিনি করে গেছেন, তোমাদের কর্তব্যও তোমরা করেছো, অন্তত করতে চেয়েছো...কিন্ত আমি তা পারি না।' অনেকক্ষণ চোখে আঁচল চাপা দিয়ে রইলেন সুখলতা—পরে বল্লেন, 'কেন জানো, আমার বাপ, দাদা, ছোট ভাই সবাই—অন্য জাতে বিয়ে করছি বলে শাপ দিয়েছিল। এ শখের প্রেম বেশী দিন টিকবে না। তোকে লোকের দরজায় দরজায় হাত পাততে হবে। তাদের সে শাপ আমি ফলতে দেবো না।' মহারাষ্ট্র কন্যার অশ্রু নিষিক্ত চোখে আগুন দেখলাম। কোনো কথা জোগালো না। ট্রেনে তুলে দিলাম সুখলতাকে। জানলা দিয়ে দুহাতে আমার আর বিকাশের হাত ধরলেন, ভাই, তোমাদের স্নেহ আমি কখনো ভুলবো না। ভয় কোরো না, আমি শোকে মরে যাবো না। তোমরা সেদিন বলেছিলে না, আর বসন্তও বলতো, জীবন হেলাফেলার জিনিস নয়। দুজনে মিলেছিলাম, স্বর্গ করে তুলেছিলাম পৃথিবীকে...এখন না হয় মাটির পৃথিবীতেই থাকবো...সেই বা মন্দ কী?

আমরা চুপ করেই ছিলাম। সেদিন আমাদের মূর্খতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছি। সান্ত্বনা দিতে গিয়ে সুখলতাকে মুখস্ত দর্শনের এক পাতা আউড়ে শুনিয়েছি।...

তারপর আমাদের কিছু তত্ত্ব নিলেন সুখলতা...গাড়ি ছাড়ার সময় হলো। বল্লেন, সত্যি ভাই, দুশ্চিন্তা কোরো না। আমার জীবনটাও তো জীবন। ক্ষোভে বিষিয়ে দেব না। আমি ছেলেবেলায় কনভেণ্টে পড়েছি...ওখানের মিসনারী স্কুলে নিশ্চয়ই একটা কাজ জোগাড় হয়ে যাবে...আচ্ছা,...নমস্তে...।

গাড়ি ছাড়া মাত্র সোজা হয়ে বসলেন সুখলতা। আমরা হাত তুল্লাম। তিনি আর পেছনের দিকে চাইলেন না। বর্তমানেরও একভাগ স্খলিত হয়ে অতীতে গিয়ে মিশছে, অন্য অংশে আগামী। সুখলতা আর এদিকে চাইলেন না।

সেই সুখলতার বাড়ি আসছি। তবু সুখলতার সম্বন্ধে আগে থেকে কি করে ধারণা করি? এইতো ফেন্সিং দেওয়া একতলা বাড়ি। নেম প্লেট দেখছিলাম...... বি মজুমদার...

মাঝ বয়সী এক মহিলা বারান্দার দুটো সিঁড়ি পেরিয়ে গেটের কাছ অবধি এলো।—আপনি কি বম্বে থেকে আসচেন?

—হ্যাঁ, আমায় সুখলতা দেবী আসবার জন্যে লিখেছিলেন...

তাড়াতাড়ি গেট খুলে দিলো সে। আসুন...আসুন...সকাল থেকেই আপনার কথা জিজ্ঞেস করচেন বাই। যাক্ ...বাড়ি খুঁজতে অসুবিধে হয়নি তো? গাড়ি লেট ছিল নাকি?

প্রশ্নকর্ত্রী উত্তরের অপেক্ষায় ছিল না। তাকে অনুসরণ করে মাঝে বসার ঘর অবধি এলাম। অতি সুরুচিসম্মত সুসজ্জিত ঘরখানি। সাটিনের তাকিয়া দেওয়া নিচু চৌকী দুটি। দুটি কৌচ এক কোণে। তার সামনে কাঠের কাশ্মিরী কাজ করা টীপয়! আমাকে সেখানেই একটি আসন দেখিয়ে দিল মহিলাটি। হাত থেকে স্যুটকেসটা নিয়ে চলে গেল। পর্দাটা তখনও দুলছে। ফিরে এলো সে। মুখে গোপন উদ্বেগ। বেশবাস বা আচরণে তাকে পুরোনো পরিচারিকাই মনে হল—স্বামীনীর জন্য উদ্বিগ্না। ইতস্তত করে বল্লে, একটা কথা বলি আপনায়। কোনো-মতে বুঝিয়ে আপনি বাইকে বম্বেতে নিয়ে যান, এখানে থাকলে কি যে হবে বুঝতে পারচি না; কেউ নেই, আপনার লোক।

আমিও উৎকণ্ঠা চেপে রাখতে পারলাম না। কেন? কি হয়েছে বলো তো? আগে তো ওখানেই থাকতে বলেছিলাম। উনি নারাজ। বল্লেন, এখানেই চাকরি করবেন।

মহিলাটি স্বর নিচু করে বল্লে, চাকরিই তো করছেন, বাবুজী! এতোদিন বেশ ছিলেন হাসিখুসী। এতো বড়ো একটা ব্যাপার হলো, একেবারে বোঝাই যেতো না। বাগান নিয়ে, সেতার নিয়ে, বই নিয়ে বেশ কাটাচ্ছিলেন...হঠাৎ তিন চার দিন থেকে কি যে হলো, কোনো কথা বলেন না। যাও বা বলেন, বুঝতে পারি না। শোবার ঘর থেকে মোটে বাইরেই আসেন না।

'...রতন...ও রতন...' ভেতরের কোনও একটা ঘর থেকে আওয়াজ এলো। সুখলতারই স্বর। 'কার সংগে কথা কইছিস তুই?'

মহিলাটি ভেতরে চলে গেল দ্রুত পায়ে। কি হলো সুখলতার?

'আমার জীবনটাও তো জীবন...' ট্রেনের জানলায় সেই বিশ্বাসদীপ্ত কথা-গুলি মনে পড়ছিল। এতোদিনে কি বিরহের, বৈধব্যের আগুন সেই স্বপ্নলতার প্রাণরস শুকিয়ে নিল!

'আসুন আপনি...' পর্দার কাছে দাঁড়িয়েই মহিলাটি ডাক দিলে। কাছে পেঁছিতেই চুপিচুপি অনুনয় করলে,... 'চেষ্টা করে দেখুন। যা বল্লাম মনে থাকে যেন...এই যে, এদিকে...'

সুখলতা বালিশে ভর দিয়ে পালঙ্কে বসে আছে। পা পর্যন্ত তার নক্সা-করা হাল্কা হলুদ রংয়ের শাল। পাংশু মুখ, অবিন্যস্ত চুল।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে থেকে কুশন দেওয়া টুলটা টেনে এনে আমি পালঙ্কের কাছে বসলাম। কথা শুরু করি কি করে?

—শরীর খারাপ না কি আপনার?

কোনো উত্তর দিলেন না সুখলতা। সরাসরি অন্য কথা তুল্লেন, 'তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করবো বলে ডেকে এনেছি। তুমি যেটুকু জানো, আমায় সত্যি করে বলবে তো?' আশ্চর্য স্বর তাঁর, আশ্চর্য চোখের চাউনি। গাম্ভীর্যের দম্ভ নেই, বিষাদের দৈন্য নেই—নির্বিকারও নয়, আবেগে পরিস্ফুট তাঁর কণ্ঠ। উত্তর দিতে ভুলে গিয়ে শুধু চেয়েছিলাম। এবার আমার মুখের থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিজের দীর্ঘ আঙগুলগুলির দিকে চেয়ে প্রশ্ন করলেন, —কী? বলবে তো, সত্যি করে? তুমি যেটুকু জানো, আশা করি বলবে? তোমাদের দুজনকেই বিশ্বাস করে ফেলেছি আমি। এখনও সংসারে ঢোকোনি, চট করে মিথ্যা বলতে পারবে না, বিশেষত আমার কাছে, আমার মতো...

আমার এতোক্ষণে চমক ভাঙগলো—নিশ্চয়ই বলবো। মিথ্যে কেন? বলুন, কি জানতে চান...

ঈষৎ ওষ্ঠাধর কুঞ্চনে সামান্য হাসিতে মুখের ভাব বদল হলো, বল্‌বো বই কি? এতো দূরে ডেকে এনেছি যখন। আগে মুখ হাত ধুয়ে নাও, চা খেয়ে নিই চলো... তারপর...

—তার জন্যে তাড়া নেই বিশেষ, আপনি বলুন না।

—'বলবো ভাই বলবো, অতো ব্যস্ত কেন?' পায়ের থেকে চাদরটা সরিয়ে খাট থেকে নামলেন সুখলতা।

চায়ের টেবিলেও আমি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। আমার পড়াশুনো কেমন হচ্চে, নভেল টভেল পড়ি কি না, কি কি ছবি দেখেছি সম্প্রতি, বাড়িতে কে আছেন, মেসে কতো খরচ পড়ে......একাদিক্রমে এই সব আলোচনা।

ধৈর্যের শেষ সীমায় পেঁছে আমি বল্লাম, ওসব থাক......আপনি কি জানতে চান বলুন, আমার গাড়ির তো বেশী সময় নেই।

......না, বেশী নেই, ছটা কুড়িতে গাড়ি। এখন সবে পাঁচটা। উঠে দাঁড়ালেন সুখলতা। 'চলো ও ঘরে......' মুখের ভাব পরিবর্তিত হলো নিমেষে।

পাশের ঘরের পানে যেতে যেতে বল্লেন, 'আমার প্রশ্নটি অতি ছোট, উত্তরও ছোটই হবে। তার জন্যে বেশী সময় লাগবে

না। এসো, এইখানে বোসো।' পালঙ্কে বসলাম আমি, উনি বসলেন সেই টুলটায়, ড্রেসিং টেবিলের সামনে। সহসা প্রশ্ন করলেনঃ

—কবে, আই মীন, কোন তারিখে তোমাদের সঙ্গে ওর চার্চ গেটে দেখা হয়? তারিখটা আমি চিন্তা করতে চেষ্টা করি। এর জন্যে এতো কৌতূহল!

'—পনেরো তারিখ কি?' সোজা আমার মুখের দিকে চেয়ে আছে তীব্র দুটো চোখ। শুধু চোখ নয়, সর্বাঙ্গ, যেন সমস্ত সত্তাটাই।

তখনও মনে মনে হিসেব করছি আমি। দেয়ালে চারিধারে চেয়ে একটা ক্যালেণ্ডারের খোঁজ করচি। সেদিন তো শনিবার? ভাবছিলাম......ভাগ্যক্রমে তা বলে ফেলিনি।

সুখলতা মনে পড়িয়ে দেবার জন্যে বলছিলেন, 'এটা তো অকটোবার...... সেপ্টেম্বার ... অগাস্ট ... জুলাই ... হ্যাঁ, জুলাই ফোর্টিন্থ বসন্ত অফিস থেকে ফিরে বল্লে অর্ডিন্যান্স অফিসে পনেরোই ওর দেখা করার কথা। এখন আমার শুধু জানা দরকার......আমায় শুধু তুমি বলো ......তার সঙ্গে তোমাদের চার্চগেটে কবে দেখা হয়েছিল? ফিফ্‌টিন্থ......না তার পরে?'

শনিবার পনেরোই ছিল—আমার মনে পড়ছে। পনেরোই তো। সেদিন টারমিনাল ফি জমা দেওয়ার লাস্ট ডেট ছিল। কিন্তু চার্চগেট...সেই মহিলাটি...বসন্ত মজুমদারের সেই আর্তমুখ সহসা মনে পড়লো ...মনে পড়লো...তুমি ছেলেমানুষ, নইলে বলতাম একবার গিয়ে......।

বেশ সপ্রতিভভাবেই বল্লাম...না, ফিফ্‌টিন্থ তো শনিবার, রবিবার আমাদের সঙ্গে দেখা হয়েছিল, আমি আর বিকাশ সিনেমা যাচ্ছিলাম। ছুটির দিন ...রবিবার...

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে উঠে দাঁড়ালেন, সুখলতা।

'—চলো তোমায় পৌঁছে আসি... রতন...' ডাক দিয়ে বাইরে এলেন উনি। আমিও অনুসরণ করলাম।

ব্যাগটা হাতে এনে দিল পরিচারিকা। তাকে দু-চারটে গৃহকর্মের নির্দেশ দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামলেনঃ 'কি সুন্দর লাল গোলাপ হয়েছে আমার বাগানে দেখেছো?' ...এসো, এটা তোমার কোটে লাগিয়ে দিই।' বটনহোলে সস্নেহে গোলাপটা পরিয়ে দিলেন সুখলতা।

আমার মনে মিথ্যেটা কাঁটার মতো বিঁধচে।

পথে নেমেই সুখলতা বল্লেন, 'তোমার অবাক লাগচে খুব, না? সামান্য এই কথাটার জন্যে এতো ক'রে ডাকলাম কেন তোমায়!'

সামান্য যে নয় আন্দাজে বুঝেছি— তবু বল্লাম, 'সত্যিই'।

'—অনেক সময় আছে, চলো, যেতে যেতে তোমায় বলে দেবো সব। সিনেমা দেখছো, নভেল পড়ছো, এতো ছোট আর নেই তোমরা, কি বলো?'

উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন হয় না। কান পেতে রইলাম।

সুখলতার মনের অর্গল খুলে গেছে, উনি নিজেই বলতে উৎসুক, বুঝতে পারলাম। তাই জবাবদিহি করলেনঃ 'না বললে হয়তো ভাববে আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছে।'

নারকেল গাছের মাথায় তখন চিক্-চিক্ করচে বিকেলের রোদ্দুর। অনতিদূর সমুদ্রের হাওয়া পেয়ে সারা নারকেল বাগানটাই ঝালরের ঢেউ তুলে গাইচে সেই সাগর সঙ্গীত।

সুখলতা মৃদুকণ্ঠে কথা বলতে বলতে পাশে পাশে চলেছেন। আকাশে নীল শাড়ির আঁচল উড়ছে বাতাসে—যেন সিনেমা নভেলেরই কাহিনী বলে যাচ্চেন, ওঁর সংস্রব নেই তার সঙ্গে...

'মিসেস মোদী একবার বলেছিলেন চার্চগেটে কে আত্মীয়া থাকেন আপনাদের। তখন মনে পড়েনি সুখলতার। দিনচারেক আগে বসন্তের ফার্মের একটা বিল দরকার পড়লো। পোর্ট ফোলিওটা খুঁজছিলেন তাই সুখলতা। হাতে পেলেন এই চিঠি। চিঠিটা রমলার লেখা—চার্চগেটের রমলার। সুখলতার সহপাঠিনী বান্ধবী; তার বাড়িতেই বসন্তের সঙ্গে সুখলতার আলাপ। রমলাই আলাপ করিয়ে দিয়েছিল দুজনের। ওদের ফিলসফি পড়াতো বসন্ত...। আমার দিকে ফিরে চাইলেন সুখলতা—'আমি বিশ্বাসঘাতকতা করছি ভাবচো? না ভাই, না। বসন্তই হটাৎ বেঁকে বসলো...বল্লে, 'লতা, রমলার মোহটা রূপের, চাকচিক্যের। তার মুখে রূপের খ্যাতি শুনে শুনে নিজের ওপর ঘেন্না ধরে যায়। আমার কি আর কিছু ভালোবাসার যোগ্যতা নেই?' আমার কি যে হলো, আমি বল্লাম, 'হ্যাঁ রূপ তোমার আছে প্রথমে তো তাই চমক ধরায়। তাতে দোষ কি?' অনেকদিন মেলামেশা করছি —খুব খোলাখুলি কথা বলতাম আমরা। বলে ফেল্লাম, 'আমি তো প্রায় ভুলেই গেছি তোমার ছ'ফিটের কাঠামোটাকে। চোখ নাক ঠোঁটের কারুকার্য।'

'একদিন রমলার বাড়ি থেকে ফিরছিলাম, বসন্তও ফিরে যাচ্ছিল নিজের ফ্ল্যাটে। বেশ রাত হয়েছিল। মেরিন ড্রাইভের ওখানে রাত্তিরটা কি রকম অদ্ভুত দেখায়, দেখেছো তো? সারা বছরই দেওয়ালি জ্বলে। সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা। বসন্তকে কিছুতেই বোঝাতে পারলাম না। সে আমার কোনো আপত্তি শুনবে না। আমারও মনে হোলো, জীবনের যদি কোনো সত্য থাকে তা এই দেহোত্তর নির্মল ভালবাসার মধ্যে। লুকো-চুরি নয়, মুখোমুখি সব কথা ব'লে, নিজের অতীতকে অতিক্রম করে, বসন্ত যদি আমার কাছে আসে—আমিই বা ভয় করবো কেন? লজ্জা করবো কিসের?

তারপর ভারী সুন্দর কেটেছে আমাদের। কতো নতুন কথা শুনেছি, কত শিখেছি বসন্তের কাছে। আমাদের একটি বেবি...'

বসন্ত মজুমদারের মতো সুখলতাও থেমে গেলেন। কথাটা শেষ করতে পারল না। আমরা গির্জার সামনে এসে পড়েছি। আর খানিকটা গিয়েই রাস্তা ফিরবে দক্ষিণে। এখন আমরা চলেছি পূবমুখে। অস্তমান সূর্য আমাদের দুজনের দীর্ঘ-ছায়া পথের ওপরে অনেকদূর পর্যন্ত ফেলেছে। মন্থরপদে চলেছি। সুখলতা ঘড়ির দিকে তাকালেন...অনেক সময় আছে...।

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম, বসন্তর পোর্ট ফোলিও হাতড়াতে গিয়ে হাতে পেলাম রমলার চিঠি। সে এখনও বিয়ে করেনি। আমি জানি কখনো সে করবে না। রমলা লিখেছে বসন্তকে, অনেকদিন তোমায় দেখিনি, দেখতে খুব ইচ্ছে করে,...। ওহোঃ

দাঁড়াও' বলে দাঁড়িয়ে পড়লেন সুখলতা। ভ্যানিটি ব্যাগটা খুল্লেন, বল্লেন, 'চিঠিটা আমার কাছেই আছে, পড়ে দেখ।' আমি ইতস্তত করছিলাম। সুখলতা তেমনি গম্ভীর মুখেই বল্লেন, 'লজ্জা কি? তেমন কিছু হলে পড়তে বলতাম না তোমায়। শুনচো যখন, পুরো গল্পটা না জানলে হেঁয়ালি কাটবে না।'

আমাকে জানাবার জন্যে এতো উদ্‌গ্রীব কেন সুখলতা? গির্জার নিচু পাঁচিলের ওপর ব্যাগটা নামিয়ে রেখে চিঠিটা নিলাম। সুখলতা ব্যাগটা তুলে নিয়ে চলতে শুরু করলেন সঙ্গে সঙ্গে।

পনেরোই তারিখের জন্যে এতো অধীরতার কারণ বুঝতে পারলাম। সুন্দর হস্তাক্ষরে লেখা ছোট্ট চিঠিখানি—

...দেখতে খুব ইচ্ছে করে। এটাও রূপজ মোহ কি না জানি না। তবু না জানিয়ে পারি না। ভাবতে ইচ্ছে করে যে তুমি এখনও আমায় ভোলো নি। এতবার লিখেছি, একবার শুধু দেখা দিয়ে যাও, আর কিছু চাই না। তুমি আসো নি। এবার তাই ঠিক করেছি শেষবারের মতো যাচাই করে নেবো—আমার এত সাধের ভাবনায় কিছু সত্যি আছে কি না। চিঠিটা হাতে পাবে তুমি পয়লা, পনেরো তারিখের মধ্যে তোমায় আশা করবো। দূর তো বেশী নয়, আর সময়...এই পনেরোদিনের মধ্যেই প্রতিপদের ক্ষীণ প্রাণ পূর্ণতা পায়। আমার জীবনে কখনো পূর্ণিমা আসবে কি না যাচাই করতে বসেছি।

না যদি আসো, জানি না সেই স্বপ্ন-হারানো অন্ধকার কি করে বইবো। আর যদি এসো, আমার সব পূর্ণিমার সব জ্যোৎস্নাই তোমার হয়ে থাকবে। ইতি—

তোমারই রমলা

আমায় সজাগ করে তুল্লেন সুখলতা। চিঠি পড়া হয়ে যেতেই উনি বল্লেন, '—রমলা ছিল আমার প্রাণের বন্ধু। অদ্ভুত সুন্দরী সে। তার সঙ্গেই আমার রেষারেষি! ভেবো না বসন্তকে নিয়ে। ভালবাসার শক্তি যাচাই করতে দাঁড়িয়েছি দুজনে। অপরূপ রূপবতী সে; বসন্তের যা আন্তরিক চাহিদা ছিল আমি তাই মেটাতে চেয়েছি। পেরেছিও—এ বিশ্বাস ছিল। মাঝে কেমন যেন সন্দেহে পড়েছিলাম। এখান থেকে যাওয়ার আগে পনেরো দিন কি অস্থির, অন্যমনস্ক হয়ে থাকতো বসন্ত। বলতো ব্যবসার জন্যে। খোঁজ নিয়ে সেদিন জানলাম সত্যিই ব্যবসায় গোলযোগ ছিল তখন। কিন্তু এই চিঠিটার কথা ও আমায় কেন যে জানালো না!

আমি বল্লাম—হয়তো মজুমদার ভেবেছিলেন, যাবেনই না যখন দেখা করতে এসব কথা তুলে আপনার মনে ব্যথা দেবেন কেন?

হাসলেন সুখলতাঃ বাঃ তুমি যে দেখচি রীতিমত অভিজ্ঞ লোকদের মতো কথা বলচো। যাক্—স্টেশন তো এসে গেল। চলো, টিকিটটা কাটা যাক্। প্ল্যাটফর্ম টিকিট নিয়ে এসো একটা।

প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়ালাম আমরা।

সুখলতা আবার পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এলেন। "প্রথম সন্ধ্যেতেই আমি বসন্তকে বলেছিলাম—'ভালো করে নিজের মন বিচার ক'রে দেখো।' অসহিষ্ণু বসন্ত থামিয়ে দিয়েছিল আমায়—'জানি, জানি, ওর মূল্যে আমায় বোঝাতে চেষ্টা কোরো না। রমলা মহার্ঘ, হিরের ফুল; আর তুমি, তুমি হলে মরুভূমির দেশে অকালের গোলাপ। দুর্লভ, প্রাণবন্ত।'" বিজয়িনীর দৃপ্ত হাসি মুখে ফুটলো সুখলতার। বসন্ত মজুমদারের হার্টের অপরাধ কি?

—'যাক্, তুমি আমার ভাবনা অনেকটা দূর করলে। আর কিছু না হোক দুই ফুলের দাম যাচাই হয়ে গেল। পনেরো তারিখের পরে যদি গিয়ে থাকে, তার মানে সহানুভূতি যদি জেগে থাকে তাতে আমার ভালবাসার কোনো অপমান নেই, কিন্তু রমলার ওই চ্যালেঞ্জের পর......'

এমন অদ্ভুত প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আমার মনটা কেমন বিরূপ হয়ে উঠলো সুখলতার ওপর। বসন্ত মজুমদার আজ বেঁচে নেই, এই হারজিৎ যাচাই করার কি মূল্য থাকতে পারে?

ওয়ার্নিং বেল বাজলো। কয়েক মিনিট পরেই আমার গাড়ি এসে পৌঁছবে। সুখলতা বলে চলেছেনঃ জানো, প্রথমটায় যখন হার্টের ট্রাবলটা দেখা দেয়, প্রায় জোর করে ওকে আমি এখানে আনি। বম্বে ছাড়তে একেবারে নারাজ। বেজায় খাটুনি খাটতো, এখানে তো তার উপায় নেই। সেই সময়ে রসিকতা ক'রে বসন্ত আমায় বলেছিল—'সেফ্ ডিস্টান্সে, মানে, আওতার বাইরে নিয়ে এলে?' আমি ওকে সত্যিই সিরিয়সলী বলেছিলাম—বসন্ত, রাগ করে নয়, সত্যিই বলচি, এখনও তোমার খোলা ছুটি আছে। তুমি যদি যাও আমি মোটেই বাধা দেবো না। শুধু কখনো লুকিও না, আমায়। বসন্ত বল্লেঃ তুমি রসিকতাও বোঝো না?

আমি বলেছিলাম—বুঝি, আর এ-ও বুঝি যে এর সবটা রসিকতা নয়!

গাড়ি যেখানে দাঁড়াবে তার সামনে বেশ ভিড় জমে উঠেছে। আমরাও তার মধ্যে গিয়ে পড়লাম।

সুখলতাকে বল্লাম, 'আচ্ছা, এখন তো আর খুব ছোট ভাববেন না, অনুমতি

দিন—ওখানেই একটা স্কুলে চেষ্টা করি......'

সুখলতা উত্তরে যা বল্লেন, আমি বিচলিত হয়ে উঠলাম—'মিসেস মোদী কি করে চার্চ গেটের আত্মীয়ার কথা জানলেন—সেটাই আমার অবাক লাগে। না-না, তোমার কথা অবিশ্বাস করচি না, এ-ও তো হতে পারে যে, ফিফ্‌টিন্থ-ও বসন্ত কোনো এক সময়ে গিয়েছিল। খোঁজ পেয়েছি অর্ডিন্যান্সের অফিসেও সেদিন তার কাজ সেরেছে সে। তবু যদি......'

আমার আর সহ্য হ'ল না। বল্লাম—'যদি গিয়েই থাকেন, তাতেই বা কি?'

কঠিন কণ্ঠে বল্লেন সুখলতাঃ কি যে বলো তুমি? তাতেই তো সব! যাই হোক, আমি সোজাসুজি যাবো রমলার কাছে—সে লুকোনোর পাত্রী নয়। যদি সত্যি হয়, তো ও জাহির করেই বলবে...

দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে ইঞ্জিনের।

আমি বল্লাম, দেখুন, ব্যাপারটাকে আপনি বড়ো বাড়িয়ে দেখচেন। যদি তিনি গিয়েই থাকেন দেখা করতে—কি এসে যায় তাতে। আপনার সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব আমি শেষ পর্যন্ত যা দেখেছি...

সুখলতা এবার ঘুরে দাঁড়ালেন আমার দিকে—'ভাই, তুমি কিছু লুকোচ্চো আমার কাছে। সত্যি করে বলো? তুমি শুধু শুধু মিছে বলবে কেন? বলো, চাও আমার দিকে!'

আমার মনে হ'লো এ লুকোচুরি ঠিক হচ্ছে না। রমলার কাছে গিয়ে তো সব জানতেই পারবেন। আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম—, হ্যাঁ, পনেরোই দুপুরেই চার্চগেটে বসন্তর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়। ডাক্তার মোদীকে প্রথমে বলেছিলেন ওখানে চিঠি দেওয়ার কথা, পরে নিষেধ করেন...।

কথা শেষ হওয়ার আগেই সুখলতার সমস্ত সংযম খান্ খান্ হয়ে ভেঙে পড়লো।

—'তুমিও আমায় মিথ্যে বলেছ এতোক্ষণ?...ও হেভেন্স্...ও গুড্ হেভেন্স্...'

উত্তেজনায় ক্রোধে শরীর কাঁপচে তাঁর।

আমি সান্ত্বনা দেবার ছলে বল্লাম ঃ যাঁকে নিয়ে এতো করছেন, তিনিই তো নেই, কেন অকারণে...

বাঘিনীর মতো চোখ জ্বলে ওঠে সুখলতার। আবার অশ্রুর বন্যা এসে ভাসিয়ে দেয় তাকে। ক্ষোভ যেন বুক ঠেলে উঠছে—'কেউ বুঝবে না, তোমরা কেউ বুঝবে না। সব ধাপ্পা, সমস্ত মিথ্যে, জালিয়াতী...কোনো মানে হয় না, এতো কথার কোনো মানে হয় না।'

এ বিলাপের সত্যিই কিছু বুঝতে পারি না। হাতটা ধরি সুখলতার; বলি, 'শান্ত হোন্, এটা স্টেশন...লোকেরা কি ভাবচে...'

সত্যিই কৌতূহলী লোকেরা বিদায় সম্বর্ধনা মনে করে চারপাশে দাঁড়িয়ে রস গ্রহণ করচে। আর কিছু না বল্লেই হ'তো, সুখলতা পুতুলের মতো দাঁড়িয়ে ছিলেন। তবু আমি বল্লাম—'আপনি এতো বড়ো আদর্শ নিয়ে জীবন কাটান, এতো বিচলিত হবেন ভাবিনি।'

সুখলতার ওষ্ঠাধার কেঁপে ওঠে বার কয়,...'আদর্শ!...সব ভুয়ো, ভণ্ডামি! যে আমায় শেখালো, দিনরাত বলে এলো এই সব কথা—সে-ই একটা ভণ্ড? এসব কিছু না, মন ভুলোনো, লোক দেখানো ছল।'

গাড়িটাও দেখা গেল এবার। সত্যি মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল, বল্লাম ঃ 'এমন অবস্থায় আপনায় রেখে যেতে ইচ্ছে করচে না। আপনি বরং চলুন...'

যে মুখ ক্রোধে রক্তবর্ণ ছিল, সে-ই এখন বিবর্ণ, পাংশু! গলার শিরা তখনও কাঁপচে থর থর করে। কঠিন কণ্ঠে সোজা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে বল্লেন,—'না, তোমাকেও, তোমাদেরও আর বিশ্বাস করি না। কাউকে না, কোনো কথাকে না!' তারপর অচিন্তনীয় তিক্ততার বিষ ঢেলে দিলেন বুকের থেকে—'তুমিও যে আর পাঁচজনের মতো আমার বয়স আর চেহারা দেখে এতো দরদ দেখাচ্চো না—তাই বা কি করে বুঝবো?'

অপমানে আমার সারা গাটা রি রি করে উঠলো। স্যুটকেসটা পেছনের বেঞ্চি থেকে তুলে আনতে গেলাম। ট্রেন প্ল্যাটফর্মের মধ্যে প্রবেশ করছে। তার বুক কাঁপানো ঝঙ্কার পেরিয়েও সুখলতার তিরস্কার মনের মধ্যে জ্বালা করছে। চঞ্চল তৎপর যাত্রীর ভিড় গাড়ি থামার অপেক্ষায় দৌড়োদৌড়ি করছে।

হঠাৎ দারুণ কলরব উঠলো ঃ গেল, গেল, গেল...

আমি এগিয়ে এলাম; সুখলতা? সুখলতা কোথায়? এখানেই তো দাঁড়িয়ে ছিলেন। ট্রেন থেমেছে। ভিড় সরিয়ে পোর্টার জমাদার আর গার্ড গাড়ির নিচে থেকে তুলে আনছে তাঁকে। ওদের শরীরের আড়ালে আকাশনীল শাড়িটা দেখছি—রক্তে কাদায় কদর্য।

বসন্ত মজুমদারের মুদ্রিত নয়ন দেখেছি, যারই হোক, তাতে স্বপ্ন ছিল, কিন্তু হৃতমানা সুখলতার ও মুখ আমি দেখতে পারবো না।

আমার কোটে বুকের কাছে সুখলতার বাগানের রক্ত গোলাপ। তাকেই বল্লাম যেন মনে মনে, আমরা যাই হই, তুমি তো ফাঁকি দাওনি! তুমি।
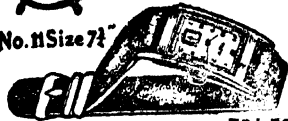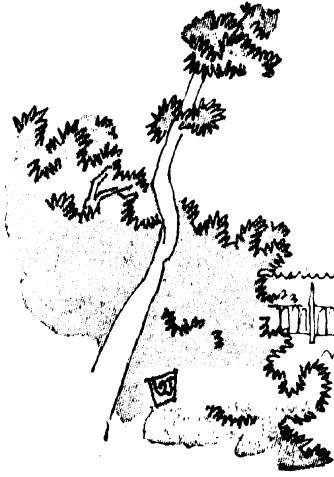
শ্রীমতী সুনন্দা উইলসনকে মিসেস সুনন্দা উইলসন বলাই উচিত, সুনন্দা দেবী বাঙালী হলেও 'শ্রীমতী' সম্ভাষণ পছন্দ করেন না। খামের উপর ঠিকানায় শ্রীমতী লিখে সুনন্দা দেবীর কাছে ইংরিজি কেতা সম্বন্ধে মস্ত বড় লেকচারও শুনেছি, তবুও বাঙালী মেয়েদের শ্রীমতী সম্ভাষণ আমার ভালো লাগে। এই লেখা পড়লে সুনন্দা দেবী নিশ্চয়ই খুব রেগে যাবেন, কিন্তু আমার ভয়ের কোনো কারণ নেই। সুনন্দা দেবী বাংলা কাগজ কখনও ভুলেও পড়বেন না।

সায়েব তখন ক্যালকাটা ক্লাবে থাকেন। মস্ত বড় ক্লাব, ইংরেজ ও ভারতীয় উভয়েরই সমান যাতায়াত এই ক্লাবে। থাকার ব্যবস্থাও আছে। সুনন্দা দেবীকে সেখানেই প্রথম দেখি। হাতে টেনিস র‍্যাকেট, বোধ হয় সেই মাত্র খেলে ফিরছেন, কপালে মুক্তোর মতো কয়েকটি ঘামের ফোঁটা রুমালের বাধা মানতে চাইছে না। রুমাল দিয়ে মুছে নেওয়ার কয়েক মুহূর্তের মধ্যে তারা আবার গজিয়ে উঠছে।

সুনন্দা দেবীর মুখে একবার মাত্র বাংলা শুনেছিলাম। ঘরে আমি একা। "সায়েব আছেন?" মধুক্ষরা কণ্ঠস্বর। সায়েব ছিলেন না। লাইব্রেরীতে গেছেন বই আনতে। বাংলাতেই বললাম, "এখনই আসবেন, একটু যদি অপেক্ষা করেন।"

সুনন্দা দেবী নিতান্ত বালিকা নন, বয়স হয়েছে। অন্তত পঁয়ত্রিশ। কিন্তু ব্যবহারে ও চোখে মুখে বালিকাসুলভ চপলতা। সুনন্দা দেবীকে ফর্সা বলতে হবে, তবে কুঁচবরণ রাজকন্যা মেঘবরণ চুল জাতীয় কিছু নয়।

সুনন্দার পরিধানে বাঙ্গালোর সিল্কের আকাশ রঙের শাড়ি, হাতাকাটা ব্লাউজ, মণিবন্ধে কালো ব্যাণ্ডে ছোট সোনার ঘড়ি চিকচিক করছে। মাথাভর্তি বিলিতি ফ্যাশনের এক ঝাঁক চুল, সব জায়গায় বিন্যস্ত নয়। সুনন্দা দেবীর চোখের চাহনি অদ্ভুত। প্রাণ-চাঞ্চল্যে পরিপূর্ণ পাহাড়ী ঝর্ণার মতো। কৌচে বসে হাতের র‍্যাকেট ছোট ছেলের মত লোফালুফি করতে লাগলেন, একটু পরেই উঠে গিয়ে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখতে লাগলেন। পরমুহূর্তেই আবার র‍্যাকেটটিকে হাতের উপর স্থিরভাবে দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে লাগলেন। এই বয়সে জীবনের এত প্রাচুর্যে আমি অবাক হলাম।

ঘরে ঢুকেই সায়েব আশ্চর্য হলেন। "সুনন্দা যে, কি খবর? এতদিন কোথায় ছিলে? বোম্বাই থেকে কবে আসা হ'ল।"

সুনন্দা দেবীর ইংরিজিতেও অপূর্ব মিষ্টতা, "প্লেজেণ্ট সারপ্রাইজ দিতে এলাম। রবার্টও আসতো কাজে আটকে পড়েছে বেচারা।"

সায়েব ও সুনন্দা দেবীর মধ্যে অনেক কথা হ'ল। সুনন্দা জানাল, "আমরা ইণ্ডিয়া ছেড়ে চলে যাচ্ছি। রবার্টের কাজের মেয়াদ ফুরিয়ে এসেছে, তাছাড়া বিলেতের হেড অফিসে সে প্রমোশন পাচ্ছে। যাবার আগে ভাবলাম বাংলাকে দেখে যাই, কলকাতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আসি। হয়ত আর দেখা হবে না। কলকাতায় দিন কয়েক এসেছি, ভাবলাম শেষ বিদায় আপনার কাছেই নেওয়া উচিত। অনেক দিনই তো আপনার কথা মনে রাখতে হবে।"

সায়েব মৃদু হাসলেন। "না সুনন্দা, বাঙালীদের প্রশংসায় আমার মোটেই বিশ্বাস নেই। তারা আমায় এত ভালবাসে যে, প্রশংসার মাত্রা বেড়ে যায়। যা হোক, রবার্টের উন্নতির খবরে খুবই আনন্দিত হলাম। কলকাতা থেকে যাবার আগে আর একদিন এসো। কাল ডিনারে আসতে বাধা আছে নাকি? লাস্ট ক্যালকাটা ডিনার। মনে আছে কি তোমার প্রথম ক্যালকাটা ডিনার এই বুড়োর সঙ্গে হয়েছিল।"

সুনন্দা হেসে ফেলল। বলল,

নিশ্চয়ই আসব রবার্ট'ও খুব আনন্দিত হবে।

"হ্যাঁ, একেবারে ভুলে গেছি। ছেলে-দের কি হলো, তাদের কি ব্যবস্থা করলে?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

সুনন্দা গম্ভীর হয়ে উঠলেন, একটু যেন বিমর্ষ মনে হ'ল। "রবার্ট বেচারার তুলনা হয় না। বললে ওরাও সঙ্গে যাবে। পাশপোর্টের গোলমাল আছে, সে এমন কিছু নয়।"

সায়েব বললেন, "আহা বেচারাদের জন্য কষ্ট হয়। রবার্টের কোন ছেলে-পুলে হয়েছে নাকি?"

সুনন্দার চোখে আবার ছেলেমানুষী ফিরে এল। দুষ্টু হাসি হেসে বললেন, "রবার্ট বলে এরাই তো ছেলেপুলে, আর দল বাড়িয়ে কি হবে?"

টেনিস র‍্যাকেট ঘোরাতে ঘোরাতে সুনন্দার ঋজু তনু-দেহ ক্রমশ অদৃশ্য হয়ে গেল। তাঁর হাঁটার মধ্যেও ছন্দ আছে, প্রাণ আছে, স্বীকার করতেই হবে।

দুজনের কথাবার্তা কেমন হেঁয়ালি ঠেকল। কে এই সুনন্দা? রবার্ট উইল-সনই বা কে? ছেলেপুলেই বা কাদের?

সুনন্দার কাহিনী পরে সম্পূর্ণ জেনেছি। সায়েব বলছিলেন "উকিল বা ডাক্তারদের ট্রাজেডি এই যে, রোগ সেরে যাওয়ার পর বা মামলা জেতার পর রোগী বা মক্কেলের কোন খোঁজ পাওয়া যায় না। ডাক্তার তাঁর রোগীকে সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী দেখলে আনন্দিত হন, সুনন্দাকে সুখী দেখে আমারও আনন্দ হচ্ছে। সুনন্দাকে আর এক কারণে মনে থাকবে। সুনন্দার জন্য দুবার ডাই-ভোর্স কোর্টে হাজিরা দিয়েছি, এখানে সচরাচর এমনটি ঘটে না।

সুনন্দাদের সঙ্গে সায়েবের পরিচয় অনেক দিনের। সায়েব তখনও কলকাতা হাইকোর্টে ব্যারিস্টারী শুরু করেন নি। শিলং-এ শৈলবিহারে এসেছেন বিলেত থেকে সদ্য আগত কর্নেল সায়েব। শিলং পাহাড়ে প্রভাতের শীতের আমেজ তখনও বেশ, অন্ধকার ভালভাবে কেটে ওঠেনি, ঘোড়ার পিঠে সামনের চড়াই ধরে সায়েব এগিয়ে যাচ্ছেন, অবাক হয়ে দেখছেন প্রকৃতির অপরূপ লীলাবৈচিত্র্য। হঠাৎ আর একজন অশ্বারোহী কাছে এসে পড়লেন। সুন্দর স্বাস্থ্য। দুজনের পরিচয় হল। ইনিই অসিত সেন, সুনন্দার বাবা।

অসিত সেন খৃষ্টান। তিনি ইঞ্জিনীয়ার। দুটি ছেলে ও একটি মেয়েকে মনের মত করে মানুষ করছেন। ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যেই কয়েকবার বিলেত ঘুরে এসেছেন। অসিত সেনের বিশ্বাস, ভারতীয় আদবকায়দা তাঁর সন্তানরা যত কম শেখে ততই মঙ্গল। শ্রীমতী সেন বিদেশিনী, ফ্রান্সের মেয়ে, বাংলাদেশে স্বামীর ঘর করতে এসেছেন। মেয়ের নামকরণে অসিত সেন ভারতীয় ধারা অনুসরণ করলেন; অডি, ফ্যান্সি, বিউটি নয়, সুনন্দা।

আশ্চর্য মেয়ে এই সুনন্দা। বয়স কত হবে? দশ কি এগারো। ঘোড়ায় চড়ে, সাঁতার দেয়, ভায়েদের সঙ্গে ফুটবল খেলে, এমন কি বাবার সঙ্গে শিকারে বার হয়। সদাচঞ্চলা, হাসামুখরা, ছোট্ট মেয়ে সুনন্দাকে সায়েব নিজের মেয়ের মত স্নেহ করতেন।

কয়েক বছর পরে সুনন্দা বিয়ে করল। সুনন্দার রুচি ও পছন্দ ভালো। ছেলেটি উচ্চবংশের বাঙালী খৃষ্টান, নাগপুর প্রবাসী। সুনন্দার শুভবিবাহে সায়েব খুব আনন্দ পেলেন।

বিয়ের অনেক আগেই সায়েব ব্যারিস্টারী শুরু করেছেন, সুনন্দার বিবাহে প্রচুর উপহার পাঠালেন। অসিত সেনও জানালেন মেয়েটিকে সৎপাত্রে দান করে তিনি নিশ্চিন্ত হলেন।

কলকাতায় যে বাড়িতে থাকতেন সেটি জনৈক উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্মচারীর সরকারী বাসভবন। গৃহস্বামী মিস্টার ফিলিপ নর্টন সায়েবের বহুদিনের পরিচিত।

"এই বাড়িতেই সুনন্দাকে কদিন কাটিয়ে যেতে লিখলাম। সুনন্দা সানন্দে রাজী হল। নাগপুরের একঘেয়েমি কাটাবার জন্য কলকাতা মন্দ নয়, সুনন্দার স্বামীও সঙ্গে এল। পরে বুঝেছি সুনন্দার কলকাতা আগমনের সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যের সূচনা হ'ল।"

সুনন্দা এল। মিস্টার ও মিসেস নর্টনের সঙ্গে সায়েব সুনন্দার পরিচয় করিয়ে দিলেন। মিঃ নর্টনের পাশে ছিলেন আর একটি লোক, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সুনন্দার সঙ্গে তার পরিচয় হ'ল। ভদ্র-লোকের আসল নাম বলব না। বাংলা-দেশের অনেকেই তাঁকে চিনে ফেলতে পারেন। গত যুদ্ধের সময় প্রচুর অর্থ ও সেই সঙ্গে প্রচুর সুনাম তিনি জোগাড় করেছেন। মনে করা যাক তাঁর নাম শৈলেন বৈরাগী। বহুকাল আগে নর্টন সায়েব দার্জিলিং থেকে ছেলেটিকে এনে-ছিলেন। প্রতিভা আছে, বাবা মা চা-বাগানের কুলি, নর্টন সায়েবের অদ্ভুত মায়া পড়ল ছেলেটির পরে। ছেলেটিকে খৃষ্টান ধর্মে দীক্ষিত করলেন, নতুন নামকরণও হ'ল। দক্ষিণের এক কনভেন্টে পড়িয়ে সোজা পাঠিয়েছিলেন বিলেতে।

মিস্টার বৈরাগী খৃষ্টান হয়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করলেন।

মিস্টার বৈরাগী প্রখর বুদ্ধির অধিকারী, কিন্তু বুদ্ধি বিপথে পরি-চালিত হওয়ায় সুফল ফলল না। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় ফেল করা ছাত্রদের মধ্যে অন্যতম স্থান দখল করলেন বৈরাগী সায়েব। পরীক্ষায় ফেল হলেও বৈরাগী সায়েব বিলেতের আদবকায়দা শিখতে মনস্থ করলেন। বিলেতের কোন ডিগ্রী না পেলেও নাচ, গান ও মদ্যপানে অনেক-গুলি ডিগ্রী পাবার যোগ্যতা নিয়ে বৈরাগী দেশে এলেন।

মিঃ নর্টনের চেষ্টায় এবং বিলেতের গল্পের জোরে ক্লাইভ স্ট্রীটের এক বড় সওদাগরী অফিসে মিঃ বৈরাগীর মোটা মাইনের চাকরি হ'ল।

বৈরাগীর গুণাবলী ক্রমশ কলকাতার উচ্চ মহলে ছড়িয়ে পড়ল। চৌরঙ্গীতে এক ফ্ল্যাটে বৈরাগী থাকে। বৈরাগীর দৃষ্টি এক দিকে খুবই উদার। রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর ও স্যারদের কন্যা থেকে অফিসের টাইপ ললনাদের উপর তিনি সমান নজর রাখেন, ফলে তাঁর মাইনে অপেক্ষা খরচ অনেক বেশী।

একদিনের কথা। সায়েব কোর্ট থেকে ফিরছেন, গাড়ির ভিতরে ঢোকার সময় দেখা গেল সামনে মালপত্র বোঝাই এক ট্যাক্সি, কয়েকজন চাকরবাকর ভিড় করে দাঁড়িয়ে। সায়েব এগিয়ে গেলেন, গাড়িতে দুজন ইংরেজ মহিলা। হাবভাবে বোঝা যায় সদ্য এদেশে পদার্পণ করেছে।

মহিলাদের মধ্যে একজন বয়স্থা, তিনি আগ্রহের সংগে জিজ্ঞাসা করলেন, "এটি কি রাজকুমার বৈরাগীর প্যালেস?" সায়েব আশ্চর্য হয়ে উত্তর দিলেন, "যতদূর জানি বাড়ির মালিক ভারত সরকার। বর্তমানে মিঃ ফিলিপ নর্টনের সরকারী বাসভবন।" যুবতী মহিলাটি ভীতা হয়ে উঠলেন, তাঁর মুখ কাগজের মত সাদা দেখাল। অনুসন্ধানে জানা গেল, মহিলা দুটি সদ্য বোম্বাই মেল থেকে নেমেছেন, তাঁরা আসছেন বিলেত থেকে। 'রাজকুমার' বৈরাগীকে তাঁরা জাহাজ থেকে টেলিগ্রাম করেন। আশা ছিল, রাজকুমার স্টেশনে উপস্থিত থাকবেন। আরও জানা গেল, যুবতী মহিলাটি মিস্টার বৈরাগীর বাগদত্তা, বিবাহের উদ্দেশ্যেই তাঁদের ভারতবর্ষে আগমন।

বৈরাগী এতে ভয় পেলেন না। কয়েকদিন ছোটাছুটি করে ভদ্রমহিলাদের কি বোঝালেন ভগবান জানেন, তারপর একদিন রুমাল নাড়তে নাড়তে বোম্বাই মেলে মা মেয়েকে বিদায় করে এলেন।

বৈরাগীর বিচিত্র আকর্ষণ শক্তি, অনেকটা সম্মোহনী শক্তির মতো। বৈরাগীর সম্পূর্ণ গুণাবলীর পরিচয় জেনেও অনেক মেয়ে তার পিছনে ছুটত।

কিন্তু কে জানত সুনন্দার মত বুদ্ধিমতী মেয়েও সেই ফাঁদে পা দেবে। বৈরাগী ঘন ঘন যাতায়াত শুরু করল; সুনন্দাও আজ এই অছিলায়, কাল অন্য অছিলায় দেরি করে ফিরতো। সুনন্দা পলাশকে গোলাপ ভাবল, অন্ধের মত ছুটল তার পিছনে।

ঘটনার গুরুত্ব মাস কয়েক পরে বোঝা গেল। অসিত সেন কলকাতায় সায়েবের সংগে দেখা করতে এলেন, সেনের মুখ চিন্তাক্লিষ্ট। মনের কোণে উদ্বেগের উপস্থিতি সহজবোধ্য। অসিত সেন সায়েবকে অবাক করলেন, বিবাহে সুনন্দা নাকি সুখী হয়নি। নাগপুরে মাত্র এক মাস ছিল তারপর সোজা ফিরে এসেছে গৌহাটীতে বাবার কাছে।

দু'দিন পরে সুনন্দাও এল। সুনন্দা মুক্তি চায়. প্রথম স্বামীর হাত থেকে মুক্তি চায়। সাহেব বোঝালেন, "সুনন্দা তোমার বয়েস হয়েছে। কোনো সিদ্ধান্তে আসার আগে ভাল করে চিন্তা করে দেখো।" সুনন্দা অবিচলিত। যে-স্বামীর মধ্যে প্রাণের চাঞ্চল্য নেই উদ্দামতা নেই, সেখানে তার জীবন নষ্ট হ'তে দেবে না, কিছুতেই নয়। শিলং পাহাড়ের লীলা-চঞ্চল নৃত্যরতা ঝর্ণার পরিণতি নাগপুরের বদ্ধ ডোবায় হ'তে পারে না, সুনন্দা মুক্তি চায়।

সুনন্দারা যে পরিবেশে মানুষ সেখানে মা বাবারাও সন্তানের ব্যক্তিগত ব্যাপারে মাথা গলাতে সাহস করে না। সাংসারিক ব্যাপারে অসিত সেনের মাথা খোলে না, কারণ সুনন্দা তাঁর একমাত্র আদরের মেয়ে। তার জীবনে তিনি কণ্টক হতে চান না।

ইতিমধ্যে বৈরাগীর সন্ধানে সুনন্দা বেশ কয়েকবার কলকাতায় নেমে এসেছে। সবার অজান্তে মিস্টার বৈরাগীও শিলং পাহাড়ের ডাকে সাড়া দিয়েছেন বার দুয়েক।

বৈরাগীর আকর্ষণ দুনির্বার। একরকম গাছ আছে অদ্ভুত তাদের ব্যবহার। বাহার ক'রে পাতা মেলে পোকামাকড়দের নিমন্ত্রণ করে—এসো, এসো, তোমাদের জন্যই তো ব'সে আছি। অনেকেই ছুটে আসে। কী রঙের বাহার, কী সুন্দর, কী কমনীয়। শিকার এসে পড়লে আস্তে আস্তে পাতা মুড়তে থাকে, মুঠোর বন্ধন দৃঢ় হ'তে থাকে। গাছের আসল রূপ তখন বেরিয়ে পড়ে।

সুনন্দা দেবীকে এসব কথা বলা হয়েছিল কিনা জানি না, বলা হ'লেই বা কী আসে যায়। সুনন্দার কাছে মনের মিল সবচেয়ে গোড়ার কথা এবং শেষ কথাও বটে। নাগপুরের স্বামী তার মনের মানুষ নয়।

সুনন্দারা খৃীষ্টান, খৃীষ্টান আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ সম্ভব কিন্তু কাজটি খুব সোজা নয়। এর জন্য কতকগুলো অভিযোগ এবং অপরাধের প্রয়োজন, বৈবাহিক অপরাধ। ভারতীয় ডাইভোর্স আইনে সেগুলি বিষদভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এর মধ্যে চরিত্রহীনতা ও নিষ্ঠুরতা অন্যতম। নিষ্ঠুরতার আইনগত অর্থ খুবই ব্যাপক, দেশ কাল ও সমাজ ভেদে নিষ্ঠুরতার বিভিন্ন অর্থ।

নিষ্ঠুরতা অর্থে অনেকে দৈহিক আঘাত বোঝেন। আবার নিম্নশ্রেণীর লোকেরা স্ত্রীকে প্রহার ব্যক্তিগত অধিকার মনে করেন। একটি ঘটনা বলি।

কোনো বস্তিতে একটি লোক প্রায় রোজই তার স্ত্রীকে প্রহার করে। স্ত্রীর করুণ চিৎকার পাড়ার লোকেদের অসহ্য হয়ে উঠল। শেষে এমনই প্রহারের সময় পাড়ার লোকেরা এসে বাধা দিল। লোকটি জোর গলায় বলল, "আমার ইস্ত্রিকে আমার মারবার রাইট আছে।" পাড়ার লোকেরা ছাড়বে না। তারা আজ লেকটিকে শিক্ষা দিয়ে যাবেই। এমন সময় স্ত্রী এসে স্বামীর সংগে যোগ দিয়ে কাংসবিনিন্দিত কণ্ঠে বলল, "আমার সোয়ামী আমায় মারছে তা'তে পাড়ার লোকের মাথা ব্যথার কি আছে।"

ইউরোপের লোক দৈহিক নিষ্ঠুরতা কল্পনা করতে পারে না। তাঁদের চিন্তার বিষয় মানসিক নিষ্ঠুরতা। মানসিক নিষ্ঠুরতার জন্য গালিগালাজের প্রয়োজন নেই। সেদিনই তো ওদেশে এক মামলা হয়ে গেল। স্বামী রাতে এমন বিশ্রী নাক ডাকেন যে, স্ত্রী ঘুমোতে পারেন না। তার ফলে তাঁর মানসিক কষ্ট হচ্ছে এবং বড় বড় ডাক্তাররা সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে, এতে স্ত্রীর স্নায়ু দৌর্বল্য দেখা দিয়েছে এবং যে কোন সময় ভয়ংকর কিছু হ'তে পারে।

আমেরিকায় এক ভদ্রলোক ঘড়িতে এলার্ম দিয়ে ঘুমোন। যেই ভোর হয় এলার্ম-ঘণ্টা মিনিট পাঁচেক বাজতে থাকে। স্ত্রী বললেন, ওসব চলবে না। এলার্ম আমার ঘুমের মৌজ নষ্ট করে দেয় কারণ সকালের দিকেই আমার ঘুম আসে। স্বামী রাজী হয় না। দিন কয়েকের মধ্যে ভদ্রমহিলা কোর্টে নিষ্ঠুরতার অভিযোগে বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা করলেন।

সুনন্দাও নিষ্ঠুরতার অভিযোগ আনল। নাগপুরের বর আত্মপক্ষ সমর্থন করলেন না। তিনি হয়তো ভাবলেন, যে-মেয়ে ঘর করতে চায় না, তাকে বেঁধে রেখে কি হবে। সুনন্দার মামলার খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করব না। মামলায় আইনগত যুক্তি যাই থাক, ঘটনার মারপ্যাঁচ যাই থাক, সুনন্দা জিতে গেলেন। হাইকোর্ট ডিক্রী দিলেন, তুমি মুক্ত। নাগপুরের সেই ছেলেটি, যাকে তুমি একদিন লজ্জাবনত চোখে স্বামীরূপে গ্রহণ ক'রে চার্চ থেকে বেরিয়ে এসেছিলে সে তোমার স্বামী নয়।

এর কিছুকাল পরে সুনন্দা আবার চার্চে ঢুকলো। ফুলের সাজে আবার নিজেকে সাজালো, আবার ব্রীড়া বিধুরা হয়ে একটি উষ্ণ হাত ধরে চার্চ থেকে বেরিয়ে এল। সে হাত অন্য কারও নয়, স্বয়ং মিস্টার বৈরাগীর।

কাহিনীর সমাপ্তি এখানে হ'লে অনেকেই খুশী হতেন। যাকে ভাল লাগেনি তাকে পরিত্যাগ ক'রে যাকে ভালো লাগে তাকে গ্রহণ করা অপরাধ নয়, সুতরাং শ্রীমতী সুনন্দার শান্তি কামনা সবাই করেছিলেন। কিন্তু সুনন্দার অগ্নিপরীক্ষার সেই শুরু। শৈলেন বৈরাগীকে নিজের মত ক'রে গ'ড়ে তুলবে সে।

সুনন্দারা কলকাতায় এক ফ্ল্যাটে উঠল; কিছুদিন পরে তারা দুজনেই কলকাতা থেকে অদৃশ্য। যতদূরে শোনা গেল, মিস্টার বৈরাগী অন্য কোথাও আরও ভাল চাকরী পেয়েছেন।

বছর কয়েক সায়েব সুনন্দার কোন সংবাদ পাননি। হঠাৎ একদিন সকালে টেলিফোন বেজে উঠল, সুনন্দা কথা কইছে। দেখা করতে চায়, খুব জরুরী প্রয়োজন।

সুনন্দা এল। এ কোন্ সুনন্দা? এ কী অবস্থা হয়েছে তার! চোখের কোলে কালি, রক্তহীন পাণ্ডুর মুখ। শরীরের বাঁধুনি ভেঙ্গে গেছে, কঙ্কালসার চেহারা। সায়েব চমকে উঠলেন। একি সেই সুনন্দা যে একদিন শিলঙে টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটাত। একি সেই সুনন্দা যে বাবার সঙ্গে শিকারে বার হতো।

"কেমন আছ, সুনন্দা"। সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

সুনন্দা ম্লান হাসল।

"কোন বড় অসুখ হয়েছিল নাকি? একদম চেনা যায় না যে।"

সুনন্দা আবার ম্লান হাসল, কোন উত্তর দিল না।

"বাবার খবর কি? অনেকদিন তাঁদের কোন সংবাদ পাইনি।"

সুনন্দা মুখ নিচু করে। বাবার অবস্থা নাই বা বললাম। অলোক ও অসীম দুজনেই ফ্রন্টে, মা বছরখানেক মারা গেছেন।

সায়েব কোন কথা বললেন না।

সুনন্দা ফুঁপিয়ে উঠল। "আপনার কাছে আবার আসতে হ'ল। কোনদিন যাতে না আসতে হয় তার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি, পাঁচ বছর সব সহ্য করেছি। কিন্তু আর পারছি না।"

সুনন্দা ধীরে ধীরে ব্যক্ত করল তার পাঁচ বছরের ইতিহাস। তারা ইচ্ছে ক'রে কলকাতা ছাড়েনি। চারিদিকে বৈরাগীর দেনা। ছোট আদালত থেকে প্রায়ই অফিসের মাইনে কোর্টে জমা দেবার হুকুম আসে। কোম্পানী এসব সহ্য করবে কেন। চাকরি গেল।

রাঁচীতে ছোটখাটো একটা চাকরি মিলল কিন্তু মদের বিল দিতেই সব চলে যায়। সুনন্দার প্রতি বৈরাগীর মোহভঙ্গ হয়েছে। খোলাখুলি সে ব'লে দিয়েছে, তুমি যেতে পার কোন প্রয়োজন নেই আমার। সুনন্দা চোখে অন্ধকার দেখে। অর্থ নেই, সুনন্দার প্রতি বৈরাগীর ভালো-বাসা নেই। অথচ প্রতি বছর বৈরাগী অনাকাঙ্ক্ষিত সন্তান ডেকে এনেছেন পৃথিবীতে, একে একে ওরা চারজন এল। ছোট ছোট ছেলে, তারা কী জানে। পাওনাদারদের ভয়ে মিস্টার বৈরাগী রাঁচী ছেড়ে মাদ্রাজে পালালেন। সেখানকার বাজারে বেশ কিছু দেনা বাঁধিয়ে ভারতবর্ষ ছেড়ে রেঙ্গুনে পালালেন। স্ত্রীপুত্র পড়ে রইল মাদ্রাজে, প্রতিশ্রুতি দিলেন, টাকার ভাবনা নেই বড় চাকরি পেয়েছি। মাসে মাসে টাকা পাঠাব। সুনন্দার যা কিছু সঞ্চয় জাহাজ খরচ হিসেবে হস্তগত ক'রে মিস্টার বৈরাগী ভারতবর্ষের ম্যাপ থেকে অদৃশ্য হলেন।

রেঙ্গুন থেকে কোনো টাকা আসেনি। বৈরাগী সায়েব ইতিমধ্যে গোপনে কলকাতায় আড্ডা গেড়েছেন, স্ত্রীপুত্রের খোঁজ খবর নেবার দরকার মনে করেন নি।

সুনন্দার কান্না আর বাধা মানল না, "আমি মুক্তি চাই, শয়তানের হাত থেকে বাঁচতে চাই।" বছর পাঁচেক আগেও সুনন্দা এইরকমই মুক্তি চেয়েছিল। সেদিনের সুনন্দা ছিল সত্যিই মুক্ত, কোনো দায়িত্ব ছিল না তার। আজ সে চারটি সন্তানের জননী, তবু সে মুক্তি চায়। জীবনে বাঁচার মত বাঁচতে চায় সে।

শোকে মুহ্যমান অসিত সেন চিঠি লিখলেন,—"মেয়েটাকে সুখী দেখতে পেলাম না, ও মুক্তি চায়। শয়তানটার হাত থেকে সুনন্দাকে বাঁচাতেই হবে। তোমার কাছে আমার বোধ করি এই শেষ অনুরোধ।"

আবার মামলা শুরু হ'ল, বিবাহ বিচ্ছেদের মামলা। এবারের অভিযোগও আগেকার মতই, নিষ্ঠুরতা।

সুনন্দাকে কোর্টে দাঁড়াতে হ'ল। ছোট ছোট চারটি ছেলেকেও বিচারকের সামনে আনতে হ'ল। সায়েব জজকে আইন দেখালেন। সাক্ষী তো আছেই। কাগজের রিপোর্টাররা তাঁদের পাঠকদের জন্য মনোমত খবর জোগাড় করলেন। সুনন্দা আবার মুক্তি পেল।

জীবনের অন্তহীন যাত্রাপথে সুনন্দা আবার একাকী যাত্রা শুরু করে।

গল্পকার হ'লে সুনন্দার কাহিনী এখানেই শেষ করতাম কিন্তু আমি যে স্মৃতিকথা লিখতে বসেছি।

সুনন্দারা এমন মেয়ে যারা বার বার আঘাত পেয়েও হতোদ্যম হয় না। বার বার তারা ঝড়ের মাঝেও জেগে উঠতে চায়, জীবনপদ্মের পাপড়িগুলো মেলে ধরতে চায়, জীবনের রূপ রস গন্ধ গানের স্বাদ পেতে চায়।

সুনন্দাকে ভাগ্যবতী বলব। কিছু-দিনের মধ্যেই এক বিপত্নীক ইংরেজ তাকে বিয়ে করল। রবার্ট উইলসন সুনন্দাকে ভালবাসে, তাকে সুখী করতে চায়। সুনন্দা আবার পুরোনো দিনের সুনন্দার মত টেনিস খেলে, মোটর ড্রাইভ করে। আশা করি, সাগরপারে সুনন্দা পূর্ণ আনন্দেই দিন কাটাচ্ছে।

মিঃ বৈরাগীর নাম প্রায়ই কাগজে দেখি। তিনি প্রখ্যাত ব্যক্তি, সমাজের নেতা। তাঁর সংবাদই আজও আমাকে মাঝে মাঝে বিদেশবাসিনী সুনন্দার কথা মনে করিয়ে দেয়।

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

"এ উয়োম্যান অব প্যারিস"-এর পর "দী গোল্ড রাশ"। ছবির কাহিনী তৈরি হয়ে গিয়েছে, এইবারে নায়িকার ভূমিকায় নামবার জন্য মনোমত একটি অভিনেত্রী খুঁজে বার করা দরকার। এডনা পারভিয়াস তার কিছুদিন আগেই চার্লির কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন। এমন একটি মেয়েকে এখন খুঁজে বার করা প্রয়োজন, চার্লি যাকে নিজের হাতে গড়ে তুলতে পারবেন। একটি বিষয়ের এখানে উল্লেখ করা ভাল। খ্যাতনাম্নী অভিনেত্রীদের সম্পর্কে তাঁর কোনও মোহ নেই, বরং অভিনয়ের ব্যাপারে অপটু কোনও মেয়েকে খুঁজে বার করে নিয়ে অতঃপর নিজের হাতে তাকে গড়ে তুলতেই তাঁর আগ্রহ। এবারেও তার কোনও ব্যতিক্রম ঘটল না। সপ্তাহের পর সপ্তাহ অনুসন্ধান চলল তাঁর। অসংখ্য মেয়ের কাছ থেকে আবেদন-পত্র এসে পৌঁছল তাঁর হাতে,—রাস্তায়, দোকানে, রেস্তোরাঁয় কত মেয়ে যে তাঁর সঙ্গে এসে সাক্ষাৎ করল তার কোনও লেখাজোখা নেই। কেউই তাঁর মনঃপূত নয়। তারই মধ্য থেকে জনকয়েককে ফিল্ম-টেস্টে ডাকা হয়েছিল। প্রাথমিক সেই চৌকাঠের উপরেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল তারা, কেউই উত্তীর্ণ হতে পারল না। এই সময়েই অকস্মাৎ একদিন লীটা গ্রের আবির্ভাব। চ্যাপলিন তখন স্টুডিয়োতে ছিলেন না। লীটাকে সে-কথা জানাতে মাথা ঝাঁকিয়ে ক্রুদ্ধ কণ্ঠে তিনি বললেন, "বেশ, পাঁচ মিনিট আমি অপেক্ষা করব।" শুনে সবাই হাসল, কেননা পাঁচ মিনিটের মধ্যে চ্যাপলিন যে স্টুডিয়োতে আসবেন তার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নেই। কিন্তু ভাগ্যের লিখন, মিনিট দুয়েক কাটতে-না-কাটতেই, আশ্চর্য কাণ্ড, অকস্মাৎ চ্যাপলিন এসে উপস্থিত। ব্যাপারটা প্রায় নাটকীয়। এবং আগের থেকেই বলে রাখি, এ-নাটক শেষ পর্যন্ত অনেকদূরে গড়িয়েছিল।

লীটাকে দেখলেন চার্লি। মুখখানা যেন চেনা-চেনা। আগে কোথাও দেখেছেন নাকি? দেখেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। "দী কীড"-এর সেই স্বপ্নের দৃশ্যে ছোট্ট একটি ভূমিকায় একে নামানো হয়েছিল। শুনে চ্যাপলিন হাসলেন। বললেন, উত্তম, একটা ফীল্ম-টেস্টের সুযোগ দেওয়া যেতে পারে।

জীম টুলি সেদিন স্বয়ং সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লীটার সম্পর্কে তিনি যা লিখেছেন, তা এখানে তুলে দিলামঃ—

"লীটা তখন স্টুডিয়োর কাছে ছোট্ট একটা বাংলো-বাড়িতে থাকত। বাড়িতে ছিলেন তাঁর মা, দিদিমা আর দাদামশাই। এঁরা সবাই মেক্সিকোর লোক। গরিব হলেও লীটা ছিল খুবই সুন্দরী। দুরন্ত, উচ্ছল প্রকৃতির মেয়ে। সেই সঙ্গে যে বেপরোয়া সৌন্দর্যের মিশ্রণ ঘটেছিল, তার আকর্ষণও বড় সামান্য নয়। তার দিকে তাকালে তার সস্তা চটকদার পোশাক কারো চোখে পড়ত না, তার সদ্যোদ্ভিন্ন যৌবন-সৌন্দর্যই সকলের চোখে পড়ত। লীটার বয়স তখন বছর ষোল। নির্ভীক, দুঃসাহসী মেয়ে। কৃষ্ণাক্ষী, কৃষ্ণকেশা। ভব্যতার ধার ধারে না, কী-এক চঞ্চলতায় যেন সব সময়েই অস্থির হয়ে রয়েছে। লেখাপড়ায় মন ছিল না। স্কুলে দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু প্রায়ই স্কুল থেকে পালিয়ে যেত সে। জোর করে লেখাপড়া শেখাবার জন্য যে চেষ্টা করা হয়নি তা নয়। কিন্তু তার রকম-সকম দেখে বোর্ড অব এডুকেশন শেষ পর্যন্ত হাল ছেড়ে দিলেন।"

লীটার এদিকে পরীক্ষা চলছে, নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার মত যোগ্যতা তার আছে কিনা। কারো আর সেদিন লাঞ্চ খেতে যাওয়া হল না। পরীক্ষামূলকভাবে কিছু ছবি তোলা হয়েছিল লীটার, সেগুলিকে পর্দায় প্রতি-

"গোল্ড রাশ"-এর একটি দৃশ্য। নাচ-ঘরের সামনে চার্লি

লার্সেনের কুটিরে আশ্রয়প্রার্থী চার্লি ("গোল্ড রাশ")

ফলিত করে দেখাবার আয়োজন হল। টট্লি লিখছেন, "নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য যারা আবেদন জানিয়েছিল, তাদের যে-কেউই বোধ হয় লীটার চাইতে ভাল অভিনয় করতে পারত। কিন্তু চার্লিকে সে-কথা বোঝায় কে! পর্দায় তার ছবি দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন চার্লি; বলতে লাগলেন, 'অপূর্ব! অপূর্ব!'" "গোল্ড রাশ"-এর নাচঘরের সেই দুরন্ত নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করবার জন্য তৎক্ষণাৎ লীটাকে তিনি নিয়োগপত্র দিয়ে দিলেন। কারো আর বুঝতে বাকি রইল না যে, আবারও চার্লি ধরাশায়ী হয়েছেন।

লীটার আসল নাম লোলিটা ম্যাকমারে। স্টুডিয়োতে আসবার সময় মাকে তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। তীক্ষ্ন সন্ধানী নজর ফেলে মা সব দেখে নিলেন। তিনি নিজেও এর আগে চ্যাপলিনেরই একটি বইয়ের ছোট্ট-একটি ভূমিকায় নেমেছিলেন। তাঁর মেয়েকে এবারে নায়িকার ভূমিকায় নামানো হচ্ছে। লোলিটা ম্যাকমারে নামটা পছন্দ হল না। চার্লির, তিনি তাঁর নতুন নামকরণ করলেন লীটা গ্রে। মা কোনও আপত্তি করলেন না। তাঁর মাথায় তখন নানান রকমের ফন্দী খেলছে। চুক্তিপত্র সই হয়ে যাওয়ার প্রায় সঙ্গে-সঙ্গেই লীটার মা নিজের হাতে স্টুডিয়োর ব্যবস্থাপনার ভার গ্রহণ করলেন। চার্লি যে তাঁর কোনও কাজেই বাধা দেবেন না, তা তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন। স্টুডিয়োর কর্মচারীরা তো হতভম্ব। "সামান্য একটা এক্সট্রার ভূমিকায় নামতে পারলে যাদের ধন্য হয়ে যাবার কথা, এখনই তাদের এত দাপট।"

লীটাকে নিয়ে হৈ-চৈ কিছু কম করা হয়নি। কাগজে-কাগজে ফলাও করে ঘোষণা করা হল তাঁর আগমন-বার্তা; বিজ্ঞাপনের তুবড়ি জ্বালিয়ে সবাইকে চমকে দেওয়া হল। কী তার ভাষা! বলা হল, "ক্যালিফোর্নিয়ার একটি প্রাচীন বংশের মেয়ে তিনি। স্পেনের যে ক'জন অসমসাহসী পুরুষ সর্বপ্রথম ক্যালিফোর্নিয়ার মাটিতে এসে পদার্পণ করেছিলেন, তাঁদেরই একজন—অ্যান্টোনিও নোভারো—তাঁর পূর্বপুরুষ।" লীটার উজ্জ্বল বাদামী চোখ, হাতির দাঁতের মতন শুভ্র গাত্রত্বক, অপরূপ সৌন্দর্য, বিজ্ঞাপনে সবকিছুরই উল্লেখ করা হয়েছিল।

চার্লি আর লীটাকে এরপর সব সময়েই একত্রে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেতে লাগল। যেখানে চার্লি, সেইখানেই লীটা; যেখানে লীটা, সেইখানেই চার্লি। লীটার সম্পর্কে চার্লি তখন একবার টট্লির মতামত জানতে চেয়েছিলেন। টট্লি বলেছিলেন, "সুন্দরী মেয়ে, এই পর্যন্ত। তার বেশী কিছু নয়।" শুনে এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন চার্লি, কী যেন চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, "আমিও সেটা জানি। কাল তো ও আমায় খোলাখুলি বলল যে, নেহাত আমি চার্লস চ্যাপলিন বলেই ও আমার প্রেমে পড়েছে। আমি যদি একটি কেরানী হতুম, ও আমায় চাইত না।"

কিন্তু তখন আর গত্যন্তর নেই। সমস্ত বুঝেও লীটা আর তাঁর অসংখ্য আত্মীয়স্বজনকে সঙ্গে নিয়ে নিঃশব্দে চার্লি একদিন মেক্সিকোর এক অখ্যাত গ্রামের দিকে রওনা হলেন। যাবার আগে স্টুডিয়োর লোকজনদের বলে গেলেন, "গোল্ড রাশ"-এর জন্য গোটাকয়েক লোকেশন-শট নেবার জন্যে তিনি একবার গ্রামাঞ্চলের দিকে যাচ্ছেন। সাংবাদিকদের অত সহজে ধোঁকা দেওয়া গেল না। কিছু একটা ঘটতে চলেছে, এ তাঁরা আগে থাকতেই আঁচ করতে পেরেছিলেন। চার্লিকে অনুসরণ করে তাঁরাও সেই গ্রামে গিয়ে হাজির। গ্রামের লোকরা তো আর কিছু জানত না, ব্যাপার দেখে তারা হতভম্ব। কোনওকালেই এ-সব হৈ-হল্লা পছন্দ করেন না চার্লি, কিন্তু কী আর করবেন, নিজের জালেই তিনি তখন জড়িয়ে গিয়েছেন। বিবাহ-পর্ব সমাধা হবার পর দল বেঁধে সবাই গিয়ে ট্রেনে উঠলেন আবার, ট্রেনের ডাইনিং-কারেই সবাইকে খাবার পরিবেশন করা হল। চার্লি ভেবেছিলেন, এবারে অন্তত সাংবাদিকদের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যাবে। যখন বুঝলেন, কিছুতেই তাঁরা স্থানত্যাগ করবেন না, চেন টেনে গাড়ি থামিয়ে লীটাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে পড়লেন তিনি, নববধূর হাত ধরে ক্ষেত-খামার পাড়ি দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বিয়ের পর লীটার মা আর দিদিমাও চার্লির বীভারলি হীলসের নতুন বাড়িতে এসে আশ্রয় নিলেন। এবং আর-কিছু দিনের মধ্যেই চার্লি নিঃসংশয় হলেন যে, বিয়ের ব্যাপারে এবারেও তিনি মারাত্মক একটা ভুল করে বসেছেন। কী করে সংসার চালাতে হয়, দেখা গেল যে, মীল-

ব্রেডের মতই লীটাও সে-বিষয়ে সমান অনভিজ্ঞ। তার চাইতেও ভয়ের কথা, অভিজ্ঞতা অর্জনের কোনও ইচ্ছেই তাঁর নেই। বাড়িতে এতদিন চাকর-বাকররাই ঘর-সংসারের কাজ চালিয়ে এসেছে, লীটা আসবার পর কয়েকটি পরিচারিকা নিয়োগ করতে হল। সেই সঙ্গে এসে জুটল লীটার অসংখ্য বান্ধবী। বান্ধবীদের সকলেই প্রায় ফীল্ম-এক্সট্রা, কিছুদিন আগে লীটা নিজেও তো তা-ই ছিলেন। দুঃখের দিনের সঙ্গী তারা। সেই দুঃখের কবল থেকে ছিটকে বেরিয়ে এসেছেন লীটা। তিনি এখন চার্লস চ্যাপলিনের ঘরণী; তাঁর ঐশ্বর্যের এখন অন্ত নেই। আসুক, বন্ধুরা এসে দেখুক তাঁর সৌভাগ্য, তাঁর সাফল্যে এসে অভিনন্দন জানিয়ে যাক। ঢালাও হাতে বন্ধবীদের তিনি আমন্ত্রণ জানাতে লাগলেন।

ফীল্ম-এক্সট্রাদের কলকোলাহলে, আর সংসারের অব্যবস্থায়, দুদিনেই বিরক্ত হয়ে উঠলেন চার্লি। টুলি লিখছেন, "চার্লি আর তাঁর বালিকাবধূর চরিত্রে কোনও-খানেই কোনও মিল ছিল না। যে-সুরে চার্লি তাঁর জীবন-বীণার তার বেঁধে নিয়েছিলেন, সে-সুরের কোনও খবরই রাখতেন না লীটা। চার্লিরও বুঝতে পারা উচিত ছিল, কোনওদিনই তাঁর ঈপ্সিত বস্তুর সন্ধান তিনি পাবেন না, পাওয়া সম্ভব নয়। দিন কয়েকের মধ্যেই তাঁর স্বপ্নভঙ্গ ঘটল।"

অকস্মাৎ চার্লি একদিন ঘোষণা করলেন, লীটাকে নিয়ে "গোল্ড রাশ" বইয়ের যে-ক'হাজার ফুট ছবি তোলা হয়েছে তা বাতিল করে দিয়ে তাঁর জায়গায় নতুন কোনও অভিনেত্রীকে দিয়ে অভিনয় করানো হবে। লীটা তখন সন্তানসম্ভবা। সবাই ভাবল, অভিনেত্রী-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে লীটা হয়তো এবারে সংসারের কাজে মন দেবার চেষ্টা করবেন। এখন থেকে তিনি আদর্শ গৃহিণী হবার চেষ্টা করবেন হয়তো। চার্লি নিজেও ঠিক সেইরকমটাই আশা করেছিলেন। সে-আশা ব্যর্থ হল।

এবং সেই আগের মতই, স্টুডিয়োতে সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রমের পর ঘরে ফিরে যখন একটু শান্তি পাওয়া দরকার, রাস্তায়-রাস্তায় চার্লি ঘুরে বেড়াতে

সেই অবিস্মরণীয় আহার-পর্ব ("গোল্ড রাশ")

লাগলেন। ওদিকে লীটা তখন তাঁর বাড়িতে বন্ধুবান্ধবদের নিয়ে আসর জমিয়ে বসে আছেন, অষ্ট প্রহর সেখানে উৎসব চলছে। মীলড্রেডও বোধ হয় এতখানি যন্ত্রণা দেননি চার্লিকে। ১৯২৫ সালের বসন্তকালে একটি ছেলে হল লীটার। বাবার নামে তার নামকরণ করা হল চার্লস স্পেন্সার চ্যাপলিন।

যন্ত্রণা আর আনন্দের এই সন্ধিক্ষণেও কাজ থেকে অবসর নেননি চার্লি, দ্রুত-গতিতে তিনি তখন তাঁর "গোল্ড রাশ"-এর কাজ এগিয়ে নিয়ে চলেছেন। কিছুতেই তিনি বিচলিত হবেন না, কিছুতেই তিনি ভেঙে পড়বেন না। শুধু মাঝে-মাঝে তখন দেখতে পাওয়া যেত, কাজ করতে-করতে হঠাৎ এক-এক সময় অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন তিনি, মাথা নিচু করে স্টুডিয়োর এক কোণে গিয়ে পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন, আঙুল মটকাচ্ছেন, আর বিড়-বিড় করে কী-যেন বলছেন।

(২২)

লীটার জায়গায় নতুন যে অভিনেত্রীটিকে নেওয়া হল, তাঁর নাম জর্জিয়া হেল। এর আগে খানকয়েক বইয়ে ছোটখাটো কয়েকটি ভূমিকায় তিনি অভিনয় করেছেন, তবে তার কোনওটাতেই তেমন-কিছু নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়নি। চার্লির যে তাঁকে ভাল লাগল তার কারণ আর অন্য-কিছুই নয়, ঠিক এইরকম মেজাজের আর এইরকম চরিত্রের একটি মেয়েই তিনি খুঁজছিলেন। মাসের পর মাস অমানুষিক পরিশ্রম করে তোলা অনেকগুলি দৃশ্য বাতিল করে দিয়ে নতুন করে সেগুলি আবার তৈরি করা হল। নায়িকার ভূমিকায় এবারে আর লীটা গ্রে নন, জর্জিয়া হেল।

"গোল্ড রাশ"-কে চার্লি বলেছেন, "একটি মিলনান্ত রঙ্গনাট্য"। কিন্তু শুধু এইটুকু বললে এ-বইয়ের পুরো-পরিচয় দেওয়া হয় না। এ-বই আরও-কিছু, আরও অনেক কিছু। আবেদনের যে উত্তুঙ্গ শিখরে এ-বই গিয়ে পৌঁছেছিল, এর আগে আর কোনও বই-ই সেখানে পৌঁছতে পারেনি। রসোপেত অনির্বচনীয় কয়েকটি ঘটনা এখানে রয়েছে, পরি-চালনাতেও একটি অনুভূতিশীল হৃদয়ের সন্ধান পাওয়া যায়। এবং শুধু পরি-চালক হিসেবেই নয়, অভিনেতা হিসেবেও চার্লি এখানে অভিনব, প্রায় অপ্রত্যাশিত, একটি পরিচয় নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছেন। একটি দৃশ্যের কথা বলছি। নাচ-ঘরে ঢুকে দর্শকদের দিকে পিছন

ফিরে তিনি দাঁড়ালেন। হাত দুখানি ঝুলে রয়েছে। মুখ দেখা যায় না, কিন্তু কী তিনি ভাবছেন, কখন কোন্ ঘটনায় তাঁর মনের উপরে কী প্রতিক্রিয়া ঘটছে, শুধু ডান হাতের আঙুলগুলোর অস্থিরতার থেকেই তা স্পষ্ট বুঝে নেওয়া যায়। বুঝে নেওয়া যায়, কেননা চার্লির তখনকার অনুভূতির সঙ্গে প্রত্যেকেই আমরা পরিচিত। অপরিচিত একঘর লোকের সামনে দাঁড়িয়ে এ-রকম অনুভূতি, এ-রকম অস্বস্তি, কখনও-না-কখনও আমাদেরও যন্ত্রণা দিয়েছে। আমরাও ঠিক তাঁরই মতন ভেবেছি, অপরিচিতের এই ভিড়ের মধ্যে পরিচিত একটি মানুষকে দেখতে পাওয়া গেলেও বেঁচে যাওয়া যায়। "গোল্ড রাশ"-এ এ-রকম দৃশ্য আরও অনেক আছে। এ-রকম আরও অনেক জায়গা আছে যেখানে কাঁধ বাহু অথবা ভ্রূযুগলের সামান্য একটি ভঙ্গীর সাহায্যেই গোটা দৃশ্যের আবেদন-চরিত্রকে তিনি পাল্টে দিয়েছেন। চার্লি পরে বলেছিলেন, "যদি একটিমাত্র বইয়ের জন্যেও দর্শকেরা আমাকে মনে রাখেন, 'গোল্ড রাশ'-এর জন্য মনে রাখলেই আমি সুখী হব।"

প্রথম দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়, তুষারাবৃত চিলকুট গিরিবর্ত্ম দিয়ে একদল অভিযাত্রী স্বর্ণ-সন্ধানে চলেছে। সময়টা ১৮৯৮ সাল। সোনার লোভে একদল মানুষ যে সেই সময়ে কতখানি উন্মত্ত হয়ে
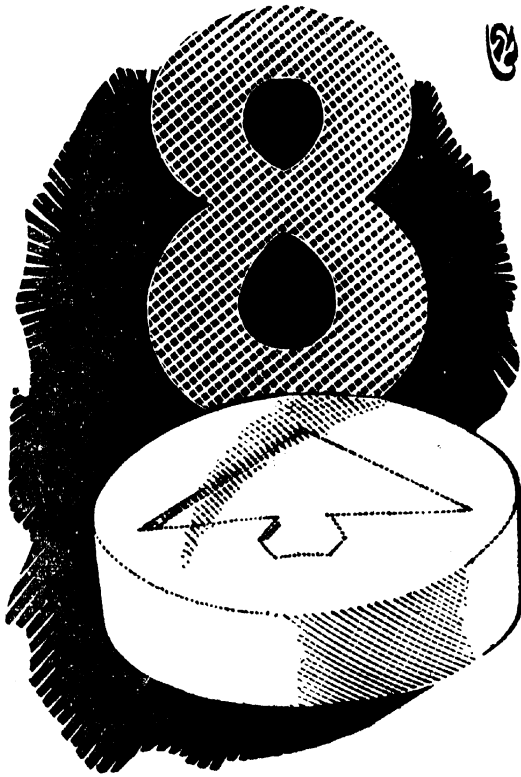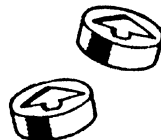
উঠেছিল, তা কারো বিস্মৃত হবার কথা নয়। সেই ঘটনাটিকে কেন্দ্র করেই এই বই। অভিযাত্রীদের একেবারে পিছনে আছেন চার্লি; ছড়ি দোলাতে দোলাতে নির্বিকার ভঙ্গীতে তিনি চলেছেন। চলতে চলতে খাদের মধ্যে তিনি আছাড় খেয়ে পড়লেন, পড়তে পড়তে একটা পাথরকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে গেলেন কোনওরকমে, তারপর পিছন ফিরে দেখেন, সর্বনাশ, বিরাট একটা ভালুক। পাহাড় বেয়ে দ্রুত নীচে নামতে লাগলেন চার্লি, আবার হাত ফসকে গেল তাঁর, এবং গড়াতে-গড়াতে পাহাড়ের একেবারে পাদ-দেশে গিয়ে তিনি পেঁছলেন। একটু বাদেই ঝড় উঠল। সেই সঙ্গে প্রবল হাওয়া। অনেক খোঁজাখুঁজির পর পরিত্যক্ত একটা কাঠের ঘর খুঁজে পেলেন চার্লি। ভিতরে গিয়ে দেখেন, তাঁর আগে আর-একজন লোক সেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছে। লোকটার নাম লার্সেন। যেমন বিপুলকায়, তেমনি শক্তিশালী। চার্লিকে সে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলল।

এরকম একটা কাঠ-জোয়ানের সঙ্গে একই ঘরে থাকতে হবে, চার্লিরও তা মনঃপূত নয়। কিন্তু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যাবেন, সাধ্য কী। বাইরে তখন প্রবল হাওয়া দিচ্ছে। এক-একবার দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ান চার্লি, আর হাওয়ার ধাক্কায় ঘরের মধ্যে ছিটকে এসে পড়েন। দৃশ্যটি ভারী মজার। একটু বাদেই দেখা গেল, বাইরে থেকে আর-একজন মানুষও প্রায় উড়তে-উড়তে চার্লিদের আশ্রয়ে এসে ঢুকল। তার পিছনে-পিছনে এসে ঢুকল তার তাঁবু। হাওয়ার ধাক্কায় এক-দরজা দিয়ে ঢুকে আর-এক দরজা দিয়ে তাঁবু-সমেত ছিটকে বেরিয়ে গেল সে। তারপর আবার এসে ঢুকল। এ-লোকটিও বিপুল-কায়। নাম বীগ জীম ম্যাকে (ম্যাক সোয়েনকে এই ভূমিকাটিতে নামানো হয়েছিল)। লার্সেন দেখল, মহা যন্ত্রণা। এতক্ষণ তবু একটা অবাঞ্ছিত মানুষকে নিয়ে তার সময় কাটাতে হচ্ছিল, এখন আবার আর-একটা এসে জুটল। ঘর থেকে এদের বার করে দেওয়া দরকার। কিন্তু যেই না সে দু-পা এগিয়েছে, হাওয়ার ধাক্কায় নিজেই সে ছিটকে বেরিয়ে গেল। চার্লি, বীগ জীম আর লার্সেন, একজনের-পর-একজন ঘরে এসে ঢুকছে আর হাওয়ার হাতে নাকাল হচ্ছে, দৃশ্যটি দেখে অতি বেরসিক লোকও না-হেসে পারবেন না।

লার্সেন তো চটে লাল। অবাঞ্ছিত এই আগন্তুক দুজনকে খতম করা দরকার, নয়তো তার আশ্রয়টি বেদখল হয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। বন্দুক উঁচিয়ে ধরল লার্সেন, কিন্তু ঘোড়া টিপবার আগেই বীগ জীম তার উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ব্যাপার দেখে চার্লির তো চক্ষুঃ-স্থির। ধস্তাধস্তির মধ্যে বন্দুকের নল এক-একবার তাঁর দিকে ঘুরে আসে, আর প্রাণভয়ে তিনি ঘরের মধ্যে ছুটোছুটি করতে থাকেন। অকস্মাৎ বন্দুক গর্জে উঠল, গুলী ছুটে গিয়েছে। শব্দ শুনেই ভির্মি গেলেন চার্লি। তাঁর ধারণা, নির্ঘাত মারা পড়েছেন। তারপর বারকয়েক মাথা ঝাঁকিয়ে, নিজের গায়ে নিজেই বার-কয়েক চিমটি কেটে তিনি নিঃসন্দেহ হলেন যে, না, তখনও তিনি বেঁচে আছেন। বীগ জীম ওদিকে লার্সেনের হাত থেকে বন্দুক ছিনিয়ে নিয়েছে ততক্ষণে। লার্সেনকে কাবু করে সে-ই অতঃপর কেবিনের কর্তা হয়ে বসল। চার্লি বুঝলেন, প্রাণে বাঁচতে হলে, বীগ জীমকে খুশী রাখা দরকার। টুঁ শব্দটি না করে অতিশয় অমায়িকভাবে তিনি তার ফাইফরমাস খেটে যেতে লাগলেন।

কয়েকটা দিন এইভাবেই কাটল। বাইরে তখনও সমানে ঝড়ো হাওয়া বইছে, তুষার পড়ছে। আর সেই কেবিনের মধ্যে বন্দী হয়ে রয়েছে চারটি প্রাণী। তারা তিনজন, আর একটি কুকুর। ঝড়ের দাপটে কুকুরটিও সেই কেবিনের মধ্যে এসে আশ্রয় নিয়েছে। খাবার ফুরিয়ে গিয়েছে, অথচ বাইরে যাবার উপায় নেই। ক্ষিদেয় অস্থির হয়ে উঠেছে সবাই। উপায়ান্তর না দেখে চার্লি করলেন কি, একটা মোমবাতির উপরে নুন ছিটিয়ে দিয়ে সেটাকে চিবোতে শুরু করলেন। বীগ জীম তাঁর দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর নিঃশব্দে একসময় উঠে গিয়ে পিছনের ঘরটিতে গিয়ে ঢুকল। কুকুরটা সেখানে আশ্রয় নিয়েছিল। খানিক বাদে একটা কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচাতে খোঁচাতে চার্লির কাছে ফিরে এল বীগ জীম। তার হাবভাব দেখে মনে হয়, বেশ এক পেট খেয়ে এসেছে। কী খেয়ে এল সে? কুকুরটাকেই খেয়ে এল না তো? ভয়ে শিউরে উঠলেন চার্লি। তারপর কুকুরটা বেঁচে আছে কিনা সেটা বুঝবার জন্য, শিস দিতে লাগলেন। শিস শুনতে পেয়ে পিছনের ঘর থেকে কুকুরটা ডেকে উঠল। চার্লিও এদিকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। পরের দিন ঠিক হল, তিনজনের মধ্যে একজনকে বাইরে গিয়ে খাবার জোগাড় করে আনতে হবে। কে যাবে? লটারিতে যার নাম উঠবে, তাকেই যেতে হবে। লটারিতে লার্সেনের নাম উঠল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও ঝড়বৃষ্টি মাথায় করে বেরিয়ে পড়তে হল তাকে। বাইরে গিয়ে সে পড়ল পুলিসের হাতে। পুলিস তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। পুলিসের উপর বন্দুক চালিয়ে তাদেরই স্লেজগাড়িতে উঠে সেখান থেকে উধাও হয়ে গেল লার্সেন। চার্লি আর বীগ জীম ওদিকে ব্যর্থ প্রতীক্ষায় বসে রইল দিনকয়েক।

তারপর তারা বুঝতে পারল যে, লার্সেনের আর ফিরে আসবার সম্ভাবনা নেই। ক্ষুধার যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে তারা তখন ঠিক করল যে, চার্লির এক পাটি জুতো রান্না করে খাওয়া হবে।

দৃশ্যটি অবিস্মরণীয়। ডেকচির মধ্যে জুতো পুরে দিয়ে উনুনে চাপিয়ে দিয়েছেন চার্লি। আর, রান্নাটা জুতসই হচ্ছে কি না সেটা বুঝবার জন্য মাঝে-মাঝে পাকা রাঁধুনির মত সেটাকে চেখে দেখছেন। রান্না সেরে জুতোটিকে বেশ সন্তর্পণে দু ভাগ করে নিলেন তিনি, দু টুকরো মাংসের মতন করে দুখানি ডিশের উপরে সাজিয়ে রাখলেন। হাতায় করে তার উপরে ঝোল ঢাললেন খানিক। তারপর আয়েস করে দুজনে খেতে বসলেন। জুতোর সোলের অংশটা তিনি বীগ জীমকে দিয়েছিলেন, আর উপর-দিককার নরম অংশটা রেখেছিলেন নিজের জন্যে। বীগ জীম সেটা বুঝতে পেরে নিজের ডিশটা চার্লির দিকে ঠেলে দিয়ে চার্লির ডিশটা টেনে নিল। চার্লি আর কী করেন, নির্বিকার চিত্তে সোলটাকেই তিনি খেতে লাগলেন। জুতোর ফিতেটাকে চামচের উপরে স্প্যাঘেটির মতন পাকিয়ে নিলেন তিনি। আর জুতোর কাঁটাগুলিকে এমনভাবে বেছে নিয়ে চুষতে লাগলেন যেন সেগুলো লোহার কাঁটা নয়, মাংসের হাড়।

কিন্তু জুতো চিবিয়ে আর কতক্ষণ চালান যায়। পরদিনই বাইরে বেরিয়ে পড়লেন চার্লি। উদ্দেশ্য, কিছু খাবার জোগাড় করে আনবেন। বেরিয়ে দেখেন, তুষারের চাদরে পথঘাট সব ঢাকা পড়ে গিয়েছে। সারাদিন পথে-পথে ঘুরে শূন্য হাতে তিনি কেবিনে ফিরে এলেন। ফিরে এসে বীগ জীমের কাছে প্রস্তাব করলেন, আর-একপাটি জুতো চিবিয়েই আপাতত ক্ষুন্নিবৃত্তি করা যাক। ক্ষিদের জ্বালায় আগের থাকতেই অস্থির হয়ে ছিল বীগ জীম। আবারও জুতো চিবোতে হবে শুনে তার মাথা ঘুরতে লাগল। সে আর তখন প্রকৃতিস্থ নয়, তার পেটে তখন আগুন জ্বলছে। সেই অবস্থায় অকস্মাৎ তার মনে হল, তার সামনে যে দাঁড়িয়ে রয়েছে, সে যেন চার্লি নয়, যেন হৃষ্টপুষ্ট একটি মুরগী। মুরগীটা যেন ডানা ঝাপটাচ্ছে। এক্ষুনি হয়তো পালিয়ে যাবে। বিরাট একখানা ছুরি বাগিয়ে নিয়ে চার্লিকে সে তাড়া করল। ঊর্ধ্বশ্বাসে দৌড়তে লাগলেন চার্লি। ছুরি ফেলে দিয়ে বীগ জীম ততক্ষণে বন্দুক তুলে নিয়েছে। বন্দুক-হাতে দৌড়ে আসছে। বাইরে আসতেই তার মুখে চোখে ঠাণ্ডা হাওয়া লাগল। তৎক্ষণাৎ সম্বিত ফিরে এল তার। বীগ জীম বুঝতে পারল যে, অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় মুরগী ভেবে চার্লিকেই সে জবাই করতে চলেছিল। খানিক বাদে দেখা যায়, একই বিছানায় শুয়ে আছে তারা। চার্লি আর বীগ জীম। একটু আগেই ক্ষিধের তাড়নায় বীগ জীম প্রলাপ বকছিল। এখন সে ভাবছে, চার্লিকে খেয়ে নিলেই বা ক্ষতি কী। ঠিক এই সময় ঘরের মধ্যে একটি ভালুক এসে ঢুকল। বন্দুক চালিয়ে ভালুকটাকে হত্যা করলেন চার্লি। তারপর টেবিল সাজিয়ে ছুরিতে শান দিতে লাগলেন। খাদ্য হিসেবে ভালুকের মাংস তখন অতিশয় উপাদেয় লাগবার কথা।

ঝড় থেমে গিয়েছে। পরস্পরের কাছ থেকে বিদায় নেওয়া হল। বীগ জীম গেলেন এক পথে, আর-এক পথে চার্লি। পরের দৃশ্যে দেখা যায়, হাঁটতে হাঁটতে চার্লি নৃত্যগীতোচ্ছল এক শহরে গিয়ে হাজির হয়েছেন। সেইখানে এক নাচ-ঘরে সুন্দরী একটি মেয়ের সঙ্গে দেখা হল তাঁর (এই ভূমিকাটিতেই প্রথমে লীটা গ্রে, এবং পরে জর্জিয়া হেলকে নামানো হয়)। মেয়েটি তাঁকে দেখে হাসল। চার্লি তো হাতে স্বর্গ পেলেন, তাঁর আনন্দ আর ধরে না। আসলে কিন্তু চার্লিকে দেখে মেয়েটি হাসেনি, তাঁর পিছনে আর-একজনকে দেখে সে হেসেছিল। চার্লি সেটা বুঝতে পেরে মুষড়ে পড়লেন। কিন্তু তাঁর কপাল ভাল, তুচ্ছ কী একটা ব্যাপার নিয়ে লোকটির সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল মেয়েটির। মেয়েটি তখন চার্লিকে তার নৃত্যসঙ্গী করল। নাচতে গিয়ে চার্লি দেখলেন, মহা বিপদ। তার ঢিলেঢোলা প্যাণ্টটা খালি খুলে যেতে থাকে। কিন্তু নাচ তো আর তাই বলে থামানো যায় না। ছড়ির বাঁকানো হাতল দিয়ে প্যাণ্টটাকে আটকে ধরে রেখে তিনি নাচতে লাগলেন। এভাবে আর কতক্ষণ চালানো যায়। খানিক বাদে দেখেন, টেবিলের উপরে খানিকটা দড়ি পড়ে রয়েছে। নাচতে-নাচতেই দড়ির এক মুড়ো হাতে তুলে নিয়ে প্যাণ্টটাকে তিনি কষে বেঁধে নিলেন। তার পরেই তাঁর চক্ষুঃস্থির। দড়ির আর-এক মুড়োয় একটা কুকুর বাঁধা রয়েছে। আগে সেটা তিনি খেয়াল করেননি। বিপদের উপর বিপদ। কুকুরটা এতক্ষণ চুপচাপ বসে ছিল। ঘরের এক কোণায় একটা বেড়াল দেখতে পেয়েই সে তাকে তাড়া করল। টানের চোটে চার্লিও তার পিছন-পিছন চললেন। সে এক হুলুস্থুল কাণ্ড।

(ক্রমশ)

(পূর্বানুবৃত্তি)

(৫)

ইতিহাস বিশ্রুত, অজেয় দুর্গ কাঙড়া। পালমপুর হইতে ২৪ মাইল কাঙড়া শহর। এখান হইতে ২॥—৩ মাইল দূরে প্রাচীন দুর্গের ধ্বংসস্তূপ। ছোট্ট শহর কাঙড়া। হাজার পাঁচেক লোকের বাস। আর্যসমাজ পরিচালিত ছেলেদের এবং ক্যানাডিয়ান মিশন পরিচালিত মেয়েদের হাই স্কুল, থানা ডাক ও তারঘর, ডাক-বাংলা, হাসপাতাল ইত্যাদি আছে। কাঙড়া জেলার একটি তহশীল এই কাঙড়া শহর। জেলার সদর ধরমশালা এখান হইতে মোটরে ১১ মাইল। ধরমশালা প্রাকৃতিক সৌন্দর্য, শ্লেট পাথর এবং বৃষ্টিপাতের জন্য প্রসিদ্ধ। চেরাপুঞ্জি ব্যতীত ভারতবর্ষের আর কোন জায়গাতেই এত বর্ষা হয় না। ধরমশালার শ্লেট বিভিন্ন জায়গায় চালান হয়। গদ্দি জাতীয় ধোগরিগণ পাহাড় হইতে শ্লেট কাটিয়া আনিয়া স্থানীয় বাজারে বিক্রয় করে। সমগ্র কাংড়া জেলায় একটিমাত্র কলেজ। সরকার পরিচালিত এই কলেজটি ধরমশালায় অবস্থিত।

বেলা সাড়ে আটটায় কাঙড়া পৌঁছিলাম। কাল রাত্রি হইতে শুরু করিয়া আজ সকাল পর্যন্ত মুষলধারে বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে। কেমন একটা স্যাঁতসেতে ভাব। ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে প্রাচীন কাঙড়া শহর ধ্বংস হয়। ভূমিকম্পের পর বর্তমান কাঙড়া শহরের গোড়াপত্তন। জেলার সদরও এই সময় ধরমশালায় স্থানান্তরিত হয়। নূতন কাঙড়া তহশীল কাঙড়া এবং প্রাচীন কাঙড়া কোট কাঙড়া বা কাঙড়া টাউন (Kangra Town) নামে পরিচিত।

তহশীল কাঙড়া হইতে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ ২॥--৩ মাইল। পূর্বেই একথা বলিয়াছি। সোজা পথে একটু কম। কিন্তু সে পথে চড়াই-উৎরাই অনেক বেশী। ঘোরা পথেই চলিলাম। একটু বেশী হাঁটিতে হইল। তবু ভাল।

পাথরে বাঁধানো উঁচু-নীচু, সংকীর্ণ রাস্তাই মাত্র কাঙড়া শহরের প্রাচীনত্বের একমাত্র নিদর্শন। রাস্তার এক পাশে খোলা, অগভীর নর্দমা এবং মধ্যে মধ্যে অতি প্রাচীন দু' একটি মন্দিরও কাঙড়ার প্রাচীনত্বের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। বাড়ি-ঘর সমস্তই ভূমিকম্পের পর উঠিয়াছে। দেশ-বিভাগের পর পশ্চিম পাঞ্জাবের দুইশত উদ্বাস্তু পরিবারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এখানে হইয়াছে।

প্রাচীন শহরের এক প্রান্তে ৩॥ বর্গ-মাইল পরিমিত স্থান জুড়িয়া বিরাট ভগ্নস্তূপ। গৌরবের শ্মশান। এই কাঙড়া দুর্গ। একদিন লোকে বলিত "কাঙড়া দুর্গের অধিপতি সমগ্র পার্বত্য অঞ্চলের অধীশ্বর"। হায়রে সেদিন!

সুশর্মাপুর, ভীমনগর, ভীম কোট, নগর কোট, কাঙড়া। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন নামে পরিচিত দুর্গ ও শহর। কাঙড়া নামটি মোগল যুগ হইতে প্রচলিত হইয়াছে। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বলা হয় যে, কাঙড়া আসলে কানগড় অর্থাৎ কর্ণদুর্গের অপভ্রংশ। লৌকিক কাহিনী এই যে, দেবাদিদেব মহাদেব দৈত্যরাজ জালন্ধরকে পরাজিত করিয়া পাহাড় চাপা দেন। দৈত্যরাজ ত আর আমাদের মত ৫॥ ফুট জীব ন'ন। জায়গা একটু বেশীই লাগিল। কাঙড়া উপত্যকায় তাঁহার মাথা, প্রাচীন কাঙড়া শহরে কান—একটি কি দুইটি কাহিনী তাহা বলে না—জ্বালামুখীতে মুখ, বর্তমান জলন্ধর শহরে পৃষ্ঠদেশ এবং মুলতানে শ্রীচরণযুগল পড়িল। (কোথায়

কাঙড়া দুর্গের প্রবেশ তোরণ

জাহাংগীর দরওয়াজা

মহালোঁ কি দরওয়াজা

লাগেন বৃকোদর নন্দন ঘটোৎকচ? কাহিনীর একাধিক সংস্করণ বর্তমান।)

কতদিন পূর্বে কাঙড়া দুর্গ নির্মিত হইয়াছিল কে জানে! কতজনে কত কথা বলে! গ্রামবৃদ্ধগণ বলেন যে, বাণ রাজা ১৪,০০০ বৎসর পূর্বে এই দুর্গ নির্মাণ করেন। কেহ বলেন যে, মহাভারতোক্ত ত্রিগর্তরাজ সুশর্মা কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ফলে রাজ্য-হারা হইয়া কাঙড়ায় দুর্গ ও নগর স্থাপন করেন। যুদ্ধের পূর্বে তিনি নাকি মুলতান অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। সুশর্মা পান্ডবদিগের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। কেহ বা আবার বলেন যে, ভারত-যুদ্ধের পূর্বে সুশর্মা কাঙড়ায় রাজত্ব করিতেন। অর্জুন তাঁহার হাত হইতে এই দুর্গ ছিনাইয়া ল'ন।

ঐতিহাসিক যুগে কাটোচ পদবীধারী ক্ষত্রিয় রাজগণকে কাঙড়ায় রাজত্ব করিতে দেখা যায়। 'বংশাবলী' নামে একখানা বহু প্রাচীন পুঁথিতে কাটোচ রাজবংশের ইতিহাস(!) লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। 'বংশাবলী' অনুসারে ভূমচাঁদ কাঙড়া রাজবংশের আদিপুরুষ। এই রাজবংশ চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধ। ভূমচাঁদের বংশধরগণ তাঁহার মৃত্যুর বহুদিন পর কাটোচ পদবী গ্রহণ করেন। রাজ্যহীনরাজবংশধরগণ আজও এই পদবীর মায়া ছাড়িতে পারেন নাই।

'বংশাবলী' অনুসারে ভূমচাঁদের ২৩৪শ অধস্তন পুরুষ রাজা সুশর্মা। এক পুরুষে গড়ে ২৫ বৎসর করিয়া ধরিলে সুশর্মা ভূমচাঁদের ৫৮২৫ বৎসর (২৩৩×২৫ বৎসর) পর আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধেয় রাজশেখর বসু মহাশয়ের মতে খৃষ্টপূর্ব পঞ্চদশ শতাব্দী শেষ হইবার মুখে ভারত-যুদ্ধ সংঘটিত হইয়াছিল। আজ খৃষ্টোত্তর ১৯৫৮ অব্দ। সুতরাং আজ হইতে ৫৮২৫+১৪০০+১৯৫৮ বৎসর অর্থাৎ ৯১৭৯ বৎসর পূর্বে রাজা ভূমচাঁদ আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কে বিশ্বাস করিবে এই রূপকথা?

রূপকথা হইতে ইতিবৃত্তে আসা যাক্। ১০০৯ খৃষ্টাব্দে গজনির স্বনামধন্য সুলতান মাহ্মুদ নগর কোট (কাঙড়া) আক্রমণ করেন। দুর্গরক্ষী সৈন্যগণ নামমাত্র প্রতিরোধের পর রণে ভঙ্গ দিলে মুসলমান সৈন্য দুর্গ অধিকার করিল। মুসলমান ঐতিহাসিক ফেরিস্তার বর্ণনায় দেখি, মাহ্মুদ নগরকোট লুণ্ঠন করিয়া সাত লক্ষ সুবর্ণ মুদ্রা (দিনার), সাত লক্ষ মণ সোনা ও চাঁদির পাত, দুই শত মণ সোনা, দুই হাজার মণ চাঁদি এবং কুড়ি মণ মুক্তা, প্রবাল, চুনী, হীরক প্রভৃতি হস্তগত করেন।

১০৪৩ সালে হিন্দুগণ মুসলমানদিগের হাত হইতে কাঙড়া কাড়িয়া লয়। চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি (১৩৩৭) দিল্লীর সুলতান মোহাম্মদ তুঘ্লক কাঙড়া অধিকার করিলেও ইহা বেশীদিন তাঁহার হাতে থাকে নাই। তাঁহার পরবর্তী সুলতান ফিরোজ তুঘ্লক আবার কাঙড়ায় হানা দিলেন। রূপচাঁদ এই সময় কাঙড়ার রাজা। তিনি দিল্লীর আনুগত্য স্বীকার করিলেন। ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি (১৫৪০—৪১) শের শাহের রাজত্বকালে খাওয়াস খাঁন আবার কাঙড়া দুর্গ আক্রমণ করেন। মুসলমান সৈন্য দুর্গ জয় করিল। প্রাচীন কাঙড়ার উপকণ্ঠ-ভবনে কাটোচ রাজবংশের কুলদেবী বজ্রেশ্বরী বা মাতা দেবীর মন্দির। খাওয়াস খাঁন মন্দিরের মূর্তিটি দিল্লীতে পাঠাইয়া দেন। মূর্তির মাথার তামার ছাতাটিও তিনি লইয়া যান। দিল্লীর কসাইগণ মূর্তি ভাঙিগয়া বাটখারা করিল। ছাতাটি গলাইয়া খাওয়াস খাঁনের নিজের ব্যবহারের লোটা, বদ্না ইত্যাদিতে রূপান্তরিত করা হইল।

মোগলযুগে কাঙড়া মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাঙড়া আগমনের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। পার্বত্য পাঞ্জাবের রাজগণের মধ্যে কাটোচগণই বোধ হয় সর্বপ্রথম মোগলদিগের নিকট নতি স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৬২০ সালে জাহাঙ্গীর কাঙড়ারাজকে সিংহাসনচ্যুত করেন। কাঙড়া ইহার পর মোগল সাম্রাজ্যের অধীন প্রদেশে পরিণত হয়। নাবালক রাজা হরিচাঁদ এবং রাজপরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য রাজগিরিতে জায়গীর দেওয়া হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আহাম্মদ শাহ্ আব্দালি পাঞ্জাবের ভাগ্যবিধাতা হইয়া বসিলেন। তখনও কাঙড়া নামে শেষ মোগল সাম্রাজ্যের অধীন। মোগল সাম্রাজ্যের পতনের যুগে রাজা ঘমন্দচাঁদ কাটোচের নেতৃত্বে কাঙড়ার পূর্বগৌরব বহুলাংশে ফিরিয়া আসে। কাঙড়া দুর্গ জয়ের চেষ্টায় ব্যর্থকাম ঘমন্দচাঁদ সুজানপুরে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। পালমপুরের প্রায় ৩০ মাইল দক্ষিণে সামান্য পূর্বদিকে (S. S. E.) সুজানপুর। টিরা সুজানপুর ইহার আধুনিক নাম। টিরা অর্থ প্রাসাদ। সুজানপুর রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ আজও কাটোচ

রাজপ্রাসাদ হইতে পাতাল গঙ্গা পর্যন্ত খনিত সুড়ঙ্গের মুখ

ধ্বংসাবশেষের সাধারণ দৃশ্য

বংশের স্মৃতি বহন করিতেছে। ঘমন্দচাঁদের পৌত্র ২য় সংসারচাঁদ কাটোচ বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। ১৭৭৫ সালে মাত্র দশ বৎসর বয়সে যখন তিনি সিংহাসন লাভ করেন, ভারতবর্ষের ইতিহাসে তখন এক ঘোর সঙ্কটময় যুগ-সন্ধিক্ষণ। মোগল সাম্রাজ্য নামে মাত্র টিকিয়া আছে। দেশী ও বিদেশী বিভিন্ন শক্তি সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চলে স্ব-স্ব আধিপত্য স্থাপনের জন্য হানাহানি করিতেছে।

"শবলুব্ধ গৃধ্রদের ঊর্ধ্বস্বর
বীভৎস চীৎকারে
মোগল মহিমা
"রচিল শ্মশান শয্যা..................."

১৭৮৩ সালে সংসারচাঁদের নেতৃত্বে কাটোচবাহিনী মোগলদিগের হাত হইতে কাঙড়া দুর্গ কাড়িয়া লইল। অদৃষ্টের পরিহাসে বিজয়ী সংসারচাঁদ দুর্গের কর্তৃত্ব লাভ করিতে পারিলেন না। তাঁহার মিত্র শিখনেতা জয়সিং কাহেয়া দুর্গটি হস্তগত করিলেন। তিন বৎসর পর (১৭৮৬) রফা হইল যে, সংসারচাঁদ সমতল পাঞ্জাবের যে যে অঞ্চল জয় করিয়াছেন সমস্ত জয়সিংকে প্রদান করিবেন এবং জয়সিং কাঙড়া দুর্গ সংসারচাঁদকে ফিরাইয়া দিবেন। ইহার পর সমগ্র কাঙড়া উপত্যকা সংসারচাঁদের পদানত হইল। রাজধানী সুজানপুরে তিনি যে দরবারকক্ষ নির্মাণ করেন তাহার দুই পার্শ্বে এগারোটি করিয়া বাইশটি দরজা দেখা যায়। এক একটি দরজা এক-একজন সামন্তরাজার জন্য নির্দিষ্ট ছিল। কাঙড়া উপত্যকার সমস্ত রাজা তাঁহাকে কর প্রদান করিবার এবং যুদ্ধকালে সসৈন্যে তাঁহার অনুগামী হইবার প্রতিশ্রুতি প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সংসারচাঁদ গুণগ্রাহী, সদাশয়, শিল্পানুরাগী এবং শিল্পচর্চার পৃষ্ঠপোষক প্রজারঞ্জক নৃপতি ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের সমতল অঞ্চলেও কাটোচ প্রাধান্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেন। দুরাকাঙ্ক্ষা মানুষকে দুঃসাহসী করে। দুঃসাহসে দুঃখ হয়। অদম্য উচ্চাভিলাষ সংসারচাঁদেরও কাল হইল। ১৮০৩ এবং ১৮০৪ সালে তিনি পর পর দুইবার সমতল পাঞ্জাবের হোসিয়ারপুর এবং বাজওয়ারা আক্রমণ করিলেন। পঞ্চনদীর তীরে তখন নবীন প্রভাত। পাঞ্জাব কেশরী মহারাজা রণজিৎ সিং-এর প্রেরণায় শিখ জাতি নব জীবন লাভ করিয়াছে। সংসারচাঁদকে দুইবারই পরাজয়ের গ্লানি বহন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করিতে হইল।

পাঞ্জাবের সমতল অঞ্চলে রাজ্য বিস্তারের চেষ্টায় ব্যর্থকাম সংসারচাঁদ কাঙড়া উপত্যকার বাহিরে পার্বত্য অঞ্চলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ১৮০৫ সালে তিনি কাহলুর (বর্তমান বিলাসপুর) রাজ্যের কিয়দংশ গ্রাস করিলেন। এই রাজ্য জয়ই সংসারচাঁদের পতনের প্রত্যক্ষ কারণ। তাঁহার কার্যে বিক্ষুব্ধ পার্বত্য নৃপতিগণ গুর্খা নায়ক অমর সিং থাপাকে কাঙড়া আক্রমণ করিতে আহ্বান করিলেন। ঊনবিংশ শতকের প্রথমদিকে নেপালের গুর্খা জাতি রাজ্য বিস্তারের নেশায় মাতিয়া উঠিয়াছিল। তাহারা কাঠমাণ্ডু হইতে কাশ্মীর পর্যন্ত আধিপত্য স্থাপনের স্বপ্ন দেখিতেছিল। গুর্খা বাহিনী কাঙড়া উপত্যকাতেও হানা দিয়াছিল। পরাজিত গুর্খাগণ শতদ্রু নদী পর্যন্ত কাটোচ আধিপত্য মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিল।

সংসারচাঁদের কার্যে অসন্তুষ্ট পার্বত্য নৃপতিগণ গুর্খাবাহিনী শতদ্রু অতিক্রম করিলে প্রকাশ্যে সংসারচাঁদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। ১৮০৬ সালে গুর্খা সৈন্য শতদ্রু পার হইয়া কাটোচ রাজ্য আক্রমণ করিল। পার্বত্য রাজগণ সকলেই পূর্বপ্রতিশ্রুতি অনুযায়ী গুর্খা পক্ষে যোগদান করিলেন। মহাল মোরিয়াঁর যুদ্ধে পরাজিত সংসারচাঁদ কাঙড়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। গুর্খাসৈন্য দুর্গ অবরোধ করিল। চার বৎসর অবরুদ্ধ থাকিবার পর সংসারচাঁদ রণজিৎ সিং-এর শরণাপন্ন হইলেন। শিখ নৃপতি এবং সংসারচাঁদ জ্বালামুখী মন্দিরে মিলিত হইলেন। সংসারচাঁদ অবরোধ মোচনের পর কাঙড়া দুর্গ রণজিৎ সিং-এর হস্তে সমর্পণ করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। রণজিৎ সিংও জ্বালামুখীর পবিত্র শিখা স্পর্শ করিয়া কাটোচ নৃপতির কোন অনিষ্ট করিবেন না, এই আশ্বাস প্রদান করিলেন। ইহার পরও কিন্তু সংসারচাঁদকে গুর্খাদের সহিত শিখ নৃপতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত দেখা যায়। 'কণ্টকেনৈব কণ্টকম্'?

শিখ সৈন্য কাঙড়ায় উপস্থিত হইলে গুর্খাগণ পশ্চাদপসরণ করিল। কাঙড়া

দুর্গ এবং তাহার আশেপাশে ৬৬টি গ্রাম শিখরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া সন্ধেটা (Sandheta) নামে পরিচিত হইল। সর্দার দেশা সিং মজিঠিয়া শিখরাজ্যভুক্ত পার্বত্য পাঞ্জাবের নাজিম অর্থাৎ শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইলেন। সংসারচাঁদ শিখ রাজের সামন্তরূপে টিরা সুজানপুরে অবস্থান করিতে লাগিলেন। সন্ধেটা ব্যতীত প্রায় সমগ্র কাঙ্‌ড়াই তাঁহার শাসনাধীন রহিল। ১৮২৪ (১৮২৩?) সালে সংসারচাঁদের মৃত্যুর পর অল্পদিনের মধ্যেই সমগ্র কাঙ্‌ড়া শিখরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কাটোচ রাজবংশ এবং স্বতন্ত্র কাঙ্‌ড়া রাজ্যের নাম চল্‌তি ইতিহাসের পাতা হইতে মুছিয়া গেল। ১৮৪৬ সালে ১ম শিখযুদ্ধের অবসানে কাঙ্‌ড়া ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলিয়া যায়। লেঃ এড্‌ওয়ার্ড লেক (Lt. Edward Lake) কাঙ্‌ড়ার প্রথম ইংরেজ শাসন-কর্তা। দুই বৎসর পর কাটোচ রাজকুমার প্রমোদচাঁদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া তিনি আত্মসমর্পণ করেন। কাটোচ বংশের প্রধান শাখা এখন কাঙ্‌ড়া জেলার লম্বাগাঁও-এ বাস করিতেছে।

১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে প্রাচীন কাঙ্‌ড়া শহর নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়। পরিত্যক্ত কাটোচ দুর্গ এবং রাজপ্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। এই ধ্বংসস্তূপ সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে সংরক্ষিত। ধ্বংসাবশেষের অদূরে পুরা-তত্ত্ব বিভাগের ছোট একটি দফ্‌তর। এখান হইতে অনুমতি লইয়া দুর্গে চলিলাম। সঙ্গে একজন চৌকিদার। প্রদর্শকের কাজও সে-ই করিবে।

উত্তর দিক হইতে দুর্গে প্রবেশ করিলাম। পুরু কাঠের দরজায় সুরক্ষিত তোরণ। মহারাজা রণজিৎ সিং-এর আদেশে নির্মিত। প্রবেশ-পথের পরই প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণ পার হইলে দ্বিতীয় একটি তোরণ। প্রথমটি ফটক এবং দ্বিতীয়টি দরওয়াজা নামে পরিচিত। ইহার পর পাথরে বাঁধানো সংকীর্ণ পথে কিছুদূর গেলে পর পর আরও দুইটি তোরণ। প্রথমটি আহানি দরওয়াজা এবং দ্বিতীয়টি আমীরী দরওয়াজা। এই দুইটি তোরণ পার হইয়া দুর্গশিখরে উঠিতে হয়। আহানি দরওয়াজার কবাট পূর্বে লোহার পাতে মোড়া ছিল। কাঙ্‌ড়ার প্রথম মোগল দুর্গাধ্যক্ষ নবাব আলিফ খাঁনের আদেশে আহানি দরওয়াজা এবং আমীরী দরওয়াজা নির্মিত হইয়াছিল।

পাথরে বাঁধানো পথ প্রায় ৫০০ ফুট সোজা চলিবার পর হঠাৎ ডানদিকে ঘুরিয়াছে। বাঁকের মুখে জাহাঙ্গীরী দরওয়াজা। কানিংহ্যাম সাহেবের মতে হিন্দু যুগে এইখানেই দুর্গের প্রথম তোরণ ছিল। সত্যাসত্য জানি না। ইহার হিন্দু নামও অজ্ঞাত। প্রাচীন তোরণের কোন চিহ্নই আজ বর্তমান নাই। সর্ব-ধ্বংসী কাল নিঃশেষে সমস্ত গ্রাস করিয়াছে। জাহাঙ্গীরী দরওয়াজা মুসল-মান যুগে নির্মিত বলিয়া মনে হয়। সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক ১৬২০ সালে কাঙ্‌ড়া দুর্গ জয়ের পর, হয়ত বা তাঁহারই আদেশে, এই তোরণ নির্মিত হইয়াছিল। আমীরী দরওয়াজা এবং জাহাঙ্গীরী দরওয়াজা দুইটি ১৯০৫ সালের ভূমি-কম্পে বিধ্বস্ত হইলেও ধূলিসাৎ হয় নাই। দুইটিই ভূমিকম্পের পর মেরামত করা হইয়াছে। জাহাঙ্গীরী দরওয়াজার পর আন্ধেরী বা হান্দেলী দরওয়াজা এবং দর্শনী দরওয়াজা নামে আরও দুইটি তোরণ ছিল। ইহাদের কোন চিহ্নই আজ নাই। একটি উচ্চ প্রাচীর মাত্র আন্ধেরী দরওয়াজার স্থান নির্দেশ করিতেছে। এই দরওয়াজা হইতে খিলান করা ছাদে ঢাকা একটি পথ দুর্গের ভিতরের দিকে প্রসারিত ছিল। আলোবিহীন এই পথটির প্রবেশমুখকে সেইজন্যই আন্ধেরী দরওয়াজা বা অন্ধকার তোরণ বলা হইত।

দুর্গের সর্বোচ্চ অংশে রাজপ্রাসাদের ধ্বংসস্তূপ। তিনটি বড় বড় পাথরের ঢিবি মাত্র বিগত বৈভবের বিষাদকরুণ স্মৃতি বহন করিতেছে। পথপ্রদর্শক চৌকিদার ঢিবিগুলির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিল। এইগুলির মধ্যে একটি ছিল শিষমহল। এইটি তিনতলা ছিল। দ্বিতীয় ঢিবিটি রঙমহলের ধ্বংসস্তূপ। অতীতে একদিন কর্মক্লান্ত দিবসান্তে কাটোচ নৃপতিগণ এখানে আসিয়া চিত্ত-বিনোদন করিতেন। নর্তকীর নিপুণ নূপুর-শিঞ্জন এবং গায়িকার কিন্নরী-কণ্ঠ কি সেদিন রঙমহলের পাষাণবক্ষে রোমাঞ্চের শিহরণ জাগাইত না? বিলোল হিল্লোল নর্তকীর নৃত্যের তালে তালে পুরুষের বক্ষোমাঝে যৌবন চঞ্চল রক্ত-ধারায় কি কামনার আগুন জ্বলিয়া উঠিত না? আর আজ? তৃতীয় ঢিবিটি বার-দ্বারীর ধ্বংসস্তূপ। পুরাঙ্গনাগণ এইখানে অবসর যাপন করিতেন। পথপ্রদর্শকের মুখে শুনিলাম যে, ইংরেজ আমলে কাবুলের এক আমীরকে সপরিবারে বারো বৎসর বারদ্বারীতে বন্দী করিয়া রাখা হইয়াছিল। ইনি আমীর শের আলির পুত্র আমীর ইয়াকুব খাঁ। ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ১৮৭৯ সালে ইঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

অধ্যাত্ম-সাধনা

প্রজ্ঞার আলো—ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার প্রণীত। প্রবর্তক পাবলিশার্স কর্তৃক ৬১নং বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১।০ আনা।

ডক্টর মহেন্দ্রনাথ সরকার মহামনীষা-সম্পন্ন পুরুষ ছিলেন। দার্শনিক হিসাবে তাঁহার খ্যাতি আন্তর্জাতিকতা লাভ করিয়াছে। কিন্তু শুধু দার্শনিক তত্ত্ববিচার বা সিদ্ধান্ত-সমুপস্থানেই তাঁহার মনীষা সীমাবদ্ধ নহে। তিনি নিজে সাধক এবং যোগী ছিলেন। তাঁহার দার্শনিকতাকে তিনি জীবন-সাধনায় সত্য এবং প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অবদাননিচয় ভারতের অধ্যাত্ম-সাধনার উপর উজ্জ্বল আলোকসম্পাত করিয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থখানি ডক্টর সরকারের সর্বশেষ রচনা। 'প্রবর্তক' পত্রে তাঁহার এই লেখা যখন প্রকাশিত হইতে থাকে, তখন সাধক এবং মনীষী সমাজের প্রশংসমান দৃষ্টি তৎপ্রতি আকৃষ্ট হয়। বেদান্ত দর্শনের সাধ্য ও সাধন তত্ত্বকে এমনভাবে সুপরিস্ফুট করা এবং সূক্ষ্ম সেই পথে সাধনার গতিকে এরূপভাবে নির্দেশ করা শুধু তাঁহার পক্ষেই সম্ভব, যিনি সাধনার উচ্চস্তরে উঠিয়াছেন এবং বিষয়ের নিম্নাভিমুখী আকর্ষণকে অতিক্রম করিয়া অনাময় সত্যকে অব্যবহিত একত্বে উপলব্ধি করিয়াছেন। 'প্রজ্ঞার আলো' ডক্টর সরকারের তেমন স্তরের অনুভূতিরই ফল। ডক্টর সরকার তন্ত্রোক্ত সাধনার পথে অধ্যাত্ম-রাজ্যে নিগূঢ় রহস্যসমূহের সমাধানের উপায় নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি অত্যন্ত সহজ এবং সরল ভাষায় নিজের কথা বলিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে সাধনার ধারা বিভিন্ন হইতে পারে, ইহা সত্ত্বেও সব সাধককেই প্রধানত গ্রন্থকারের প্রদর্শিত সাধনার একই সূত্র সংযোগে আত্মতত্ত্ব উপলব্ধি করিতে হয়। ডক্টর সরকারের 'প্রজ্ঞার আলো' চিরদিন উজ্জ্বল থাকিবে এবং সনাতন সত্য উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাঁহার এই অবদান তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। পুস্তকখানি বাংলার সাধক এবং চিন্তাশীলসমাজের সর্বত্র সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। ৫৩১।৫৪

সঙ্গীত

গীত-প্রবেশিকা (তৃতীয় সংস্করণ): শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক—বসুমতী সাহিত্য মন্দির, ১৬৬, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—চার টাকা।

প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গীতশিক্ষার পদ্ধতি অনুযায়ী গ্রন্থটি ১৩৪৪ সালে প্রচুর পরিশ্রমপূর্বক রচনা করিয়া প্রকাশিত করেন।

ইহার পর গ্রন্থের আরও দুইটি সংস্করণ হইয়াছে। বর্তমান তৃতীয় সংস্করণ অনেকাংশে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে এবং পরীক্ষার্থীর সুবিধার জন্য স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষার পাঠ্যসূচী অনুযায়ী যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থে আকারমাত্রিক ও দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি সুন্দরভাবে বোঝানো হইয়াছে। রাগসঙ্গীতের পারিভাষিক শব্দ, স্বরসাধনা, রাগপরিচয়, অলঙ্কার, তাল-সাধন, রাগালাপ রীতি, শাস্ত্রবোধ, রসোদ্দীপনা প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিক্ষার্থীদের উপযোগী করিয়া প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। প্রচলিত রাগগুলির মধ্যে আলাহিয়া, ইমন, কালিংগড়া, কাফি, কেদারা, খাম্বাজ, জৌনপুরী, দেশ, পূরবী, বাগেশ্রী, বেহাগ, বৃন্দাবনী সারঙ্গ, ভূপালী, ভৈরব, ভৈরবী, মালকোষ, সিন্ধু খাম্বাজ, সিন্ধু ঝিঁঝিট—এইগুলি সঙ্গীতোদাহরণ সহ বর্ণিত হইয়াছে। গানগুলি বহু বিখ্যাত রচয়িতার রচনা হইতে সংকলিত হইয়াছে—যথা, চাঁদাপিয়া, গুণসেন, অচপল, মীরাবাঈ, যদু ভট্ট, তানসেন, সুরতসেন, সদারঙ্গ প্রভৃতি। পাঠ্যসূচী অনুযায়ী কয়েকটি রবীন্দ্রনাথের কয়েকটি উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতও গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া কীর্তন, গ্রাম্য সঙ্গীত ও পুরাতন বাংলা গানের উদাহরণও দেওয়া হইয়াছে। গ্রন্থশেষে অনুশীলনীতে সঙ্গীতবিষয়ক বহু প্রশ্নের উত্তর প্রদান করা হইয়াছে। পুস্তকটি শিক্ষার্থীদের বিশেষ উপকারে লাগিবে। ৫২৯।৫৪

প্রার্থনা ও সংগীত—স্বামী তেজসানন্দ সংকলিত। স্বামী বিমুক্তানন্দ সম্পাদিত রামকৃষ্ণ মিশন সারদাপীঠ কর্তৃক বেলুড় মঠ, হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

শিক্ষালাভ করিবার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যার্থীরা যাহাতে ধর্মভাবে এবং নৈতিক শক্তিতে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে পুস্তকখানি সংকলিত হইয়াছে। ভগবদ্বিষয়ক স্তব-স্তুতি-ভজন সংগীতগুলির এই সংগ্রহ অতি সুন্দর। কয়েকটি স্তবের স্বরলিপি সংযোজিত হওয়াতে শিক্ষার্থীদের সুবিধা হইবে। শ্রীরামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রদর্শিত সার্বজনীন আদর্শ সুকুমারমতি ছাত্র-ছাত্রীদের নির্মল অন্তরে প্রতিফলিত করিয়া পুস্তকখানি এ দেশের একটি বিশেষ অভাব পূরণ করিবে। ছাপা, কাগজ সুন্দর। ৫৭০।৫৪

জীবনী

রাণী রাসমণি— শ্রীগোপালচন্দ্র রায় প্রণীত। শ্রীগোপীনাথ দাস কর্তৃক দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ী হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০।

পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির সংক্ষিপ্ত জীবনী। পুস্তকখানিতে রাণী রাসমণির কর্তব্যনিষ্ঠা, তাঁহার ধর্মভাব, তেজস্বিতা, দানশীলতা প্রভৃতি মহনীয় গুণরাজীর জীবনী আলোচনাসূত্রে সুন্দর ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালীন সাধনা এবং তাহার উপদেশেরও কিছু কিছু উদ্ধৃত হইয়াছে। এই আলোচনা সংক্ষিপ্ত হইলেও উপাদেয়। ৫৪৯।৫৪

শ্রীরামদাস—অধ্যাপক শিবনাথ বাগচী এম এ (ডবল) প্রণীত। লেখক কর্তৃক ৫।২।৪, রাজা মণীন্দ্র রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০ আনা।

শ্রীলরামদাস বাবাজী মহারাজের মধুর জীবন-কথা। তাঁহার শৈশব-জীবন, পরে

শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর কৃপালাভ, শ্রীল ভৈরবচন্দ্র গোস্বামীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ, পরিশেষে শ্রীমৎ চরণদাস বাবাজী মহারাজের জীবনাদর্শে নাম প্রেম প্রচারণ লীলা। লেখক হৃদয়ের সমগ্র আবেগ দিয়া বইখানা লিখিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেম-মাধুর্যে উদ্দীপিত ভক্ত-জীবনের মাহাত্ম্যমূলক এই আলোচনা সকলেরই উপভোগ্য হইবে। ৫২০।৫৪

দক্ষিণেশ্বর মন্দির—শত বার্ষিকী সংখ্যা। শ্রীগোপাল রায় সম্পাদিত। দক্ষিণেশ্বর দেবোত্তর এস্টেটের পক্ষে শ্রীগোপীনাথ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত।

পুস্তকখানিতে পুণ্যশ্লোকা রাণী রাসমণির জীবন ও তাঁহার পুণ্যকীর্তিসমূহ এবং দক্ষিণেশ্বর মন্দিরকে কেন্দ্র করিয়া ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের লীলা এবং মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিক এবং ভক্তদের লিখিত প্রবন্ধ সমাহৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি পাঠে সকলেই আনন্দ পাইবেন। ৫৫০।৫৪

পদ্যছন্দে শ্রীশ্রীঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবন-কথা। (তৃতীয় খণ্ড)। শ্রীনীলরতন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। শ্রীকুন্তলা দেবী কর্তৃক ২৬।২ নাজীর লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৸৹ আনা।

ঠাকুর অনুকূলচন্দ্রের জীবনকথার তৃতীয় খণ্ডস্বরূপে তাঁহার উপদেশের সংগ্রহ। গ্রন্থকার পদ্যছন্দে উপদেশগুলি গ্রথিত করিয়াছেন। উপদেশগুলি উন্নত জীবনের আদর্শ অন্তরে জাগ্রত করে। এগুলি পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন। ৫৭১।৫৪

অমিয় স্মৃতি—স্বামী সিদ্ধানন্দ সরস্বতী প্রণীত। শ্রীমৎ স্বামী ভুবনানন্দ সরস্বতী কর্তৃক শ্রীশ্রীনিগমানন্দ সারস্বত আশ্রম, হাবলি সহর (২৪ পরগণা) হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷৹ আনা।

লেখক তাঁহার গুরু শ্রীশ্রীনিগমানন্দ পরমহংস দেবের মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। পদ্যছন্দে নিবেদিত ভাবাবেগোদ্দীপ্ত তাঁহার এই শ্রদ্ধা নিবেদনে মহাপুরুষের জীবনাদর্শের স্পর্শ অন্তরে পাওয়া যায় এবং শ্রদ্ধায় মন আপ্লুত হয়। ৪৮৪।৫৪

ইতিহাস

Our patriots of wax, Iron and Clay—টি এন লাহিড়ী প্রণীত। ইউ এন ধর এণ্ড সন্স্ লিমিটেড, ১৫নং বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা।

১৮৫১ সালে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতা লাভ কাল পর্যন্ত এ দেশের রাজনীতিক আন্দোলনের ক্রমবিকাশ, পরিশেষে তাহার বৈপ্লবিক গতি এবং সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে তাহার সংগ্রামরীতি, অসহযোগ আন্দোলনে পরিণতি এই বিস্তৃত পটভূমিকায় গ্রন্থখানির আলোচনা সম্প্রসারিত হইয়াছে। গ্রন্থকার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক পরিপ্রেক্ষায় স্বাধীনতা-সংগ্রামের গতি-প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করিয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহ হইতে আরম্ভ করিয়া আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তত্ত্বরাজী বিন্যাসপূর্বক তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে এই আলোচনা করিয়াছেন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের কোন ঘটনাই বাদ পড়ে নাই। পুস্তকখানি পাঠে বিভিন্ন আন্দোলনের রূপ পাওয়া যায়, সেইসঙ্গে আন্দোলনের মূল কারণগুলি উপলব্ধি করিবারও সুযোগ ঘটে। এদেশের রাজনীতিক আন্দোলনের শক্তি এবং তাৎপর্য বিশ্লেষণে গ্রন্থকারের যুক্তিসমূহ বলিষ্ঠ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অপ্রিয় হইলেও সেগুলি অকাট্য। পুস্তকখানি পাঠ করিলে ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের স্বরূপ এবং তাহার পরিণতি সম্বন্ধে বেশ স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। ৫৪১।৫৪

আড়াই হাজার বছরের বাঙালী—প্রথম ভাগ—শ্রীকালীপদ সমাদ্দার প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক ৪।৫, যোগেন্দ্র বসাক রোড, বরাহনগর, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৸৹ আনা।

প্রবীণ ঐতিহাসিক স্বরূপে গ্রন্থকারের প্রসিদ্ধি আছে। বিভিন্ন সাময়িক পত্রে তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণামূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি বাঙালী জাতির গৌরবময় ঐতিহ্য সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। বিশ্ব সভ্যতায় বাঙালীর দান, বাঙালার ভাষা, সাহিত্য এবং সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত হইলেও বাঙালী জাতির লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারে চিন্তাশীলতা উদ্রিক্ত করিবে। ৫৬৯।৫৪

প্রাচীন সাহিত্য

ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গলের গল্প—শ্রীকালিদাস রায় কর্তৃক পরিচালিত। ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী, কলিকাতা—১২। দাম চৌদ্দ আনা।

ভারতচন্দ্রের অন্নদা মঙ্গল কাব্য কাহিনীর গদ্যরূপ। ইহাতে মহারাজা প্রতাপাদিত্যের পতন ও কৃষ্ণনগর রাজবংশের আদি পুরুষ ভবানন্দ মজুমদারের অভ্যুদয় দেখানো হইয়াছে। কিশোর-কিশোরীরা এই কাহিনী পড়িয়া যথেষ্ট আনন্দ লাভ করিবে।

ছাপা এবং প্রচ্ছদসজ্জা সুন্দর। ৩৭১।৫৪

গোয়েন্দা কাহিনী

সীমান্তহীরা। শ্রীগোবিন্দলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক : বাসন্তী বুক স্টল। দাম : আড়াই টাকা। পৃষ্ঠা : ১৩৫।

রুচিমান পাঠকের দরবারে বাঙলার গোয়েন্দা-কাহিনী এখনও অন্ত্যজ। তার কৌলীন্যপ্রাপ্তির পথে দু'টি প্রধান অন্তরায় রয়েছে। প্রথমত কোন শক্তিমান সাহিত্য-শিল্পী এ বিষয় নিয়ে বিশেষ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেননি। দ্বিতীয় কারণ, যাঁরা এজাতীয় কাহিনী রচনা করেন, তাঁদের অধিকাংশেরই সশ্রদ্ধ অনুশীলন আর নিষ্ঠার অভাব।

'সীমান্তহীরা'র লেখকের রচনায় কিছুটা অনুশীলনের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু ঘটনা-গ্রন্থনে তাঁর শিথিলতা আছে। ফলে, গোয়েন্দা-কাহিনীর প্রাণবন্ত যে রহস্যসৃষ্টি দুর্বারগতিতে পাঠকের কৌতূহলকে রুদ্ধশ্বাস করে রাখে, সে গুণটুকু 'সীমান্তহীরা'য় সম্যকভাবে নেই। একটি রহস্যময় হত্যাকান্ড ঘটানো হয়েছে উপন্যাসটিতে। কিন্তু গ্রন্থি-মোচনের পর হত্যার যে কারণটি ব্যক্ত করা হয়েছে, তা অবাস্তব। একটা প্রেমিকার স্বামী ভিন্ন নামে আর একটি মেয়েকে বিবাহ করায়, চিরকুমার প্রেমিক প্রৌঢ় বয়সে সেই স্বামীটিকে হত্যা করল। কারণ, স্বামীর দ্বিতীয় ঘরণীর জন্য প্রেমিকার দাম্পত্য-জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। উপন্যাসের পটভূমি দার্জিলিং আর কার্শিয়াং। ভাষা হচ্ছে রচনার স্বাস্থ্য, কিন্তু লেখক সেই ভাষাকে মাঝে মাঝে উৎকট প্রসাধনের মত ব্যবহার করেছেন। সংলাপ চরিত্রানুগই হয়েছে। গোয়েন্দার রহস্য উন্মোচনে তিনি কিছু কিছু বৈচিত্র্যের চমক দিয়েছেন। কাহিনীর সঙ্গে নামকরণের সার্থকতা আবিষ্কার করা গেল না।

ধর্মগ্রন্থ

শ্রীগৌরাঙ্গ-স্বরূপ-রহস্য—ডাক্তার গণপতি ঘোষ এম বি প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—দাশগুপ্ত এন্ড কোং, লিমিটেড, ৫৪।৩, কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৲ টাকা।

নাগরী ভাবে গৌরাঙ্গের উপাসনাই শ্রেষ্ঠ সাধনা—পুস্তকখানির ইহাই প্রতিপাদ্য বিষয়। লেখকের মতে গৌরাঙ্গ লীলাতেই এই রসের সমুজ্জ্বল প্রকাশ। অন্য সব লীলায় মধুর রস অংশ স্বরূপে; শুধু নবদ্বীপ লীলাতেই সব রসের অঙ্গগুলিকে ক্রোড়ীকৃত করিয়া অঙ্গীস্বরূপে সমুচ্চ সীমায় আরূঢ় হইয়াছে মধুর রস। ব্রজলীলায় মোহন ভাবের পর্যন্ত বিকাশ ঘটে। নদীয়া লীলায় নাগরী-নাগর-একীভূক্ত মাদলভাব, রসরাজ মহাভাবের আপন-স্বরূপে শ্রীগৌরাঙ্গে প্রকাশ পাইয়াছে। রসেই এই অনুভূতি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয় এবং সাক্ষাৎ সম্পর্কে কৃপালব্ধ। সাধনার ভিতর দিয়াই ইহার উপলব্ধি সম্ভব। লেখক তাঁহার আলোচনার ভিতর দিয়া সেই উপলব্ধির বিস্তার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গৌরপ্রেমিক সাধক ভক্ত সমাজে পুস্তকখানি সমাদৃত হইবে। ৫৩০।৫৪

দীঘনিকায়—তৃতীয় খণ্ড। ভিক্ষু শীলভদ্র প্রণীত। শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ কর্তৃক মহাবোধি সোসাইটি, ৪এ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৷৹ আনা।

সুপণ্ডিত গ্রন্থকার ভগবান্ বুদ্ধের রচনামৃত বিতরণে জাতিকে মনন-সম্পদ-সম্বৃদ্ধ এবং বাংলা সাহিত্যের পুষ্টিসাধনে বহুদিন হইতেই প্রবৃত্ত হইয়াছেন। দীঘ-নিকায়ের প্রথম ও দ্বিতীয় খন্ড ইতিপূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে, তৃতীয় খন্ড প্রকাশিত হওয়াতে আমরা বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার সুপণ্ডিত পুরুষ। পালি ভাষায় নিবন্ধ এবং পারিভাষিক জটিলতায় সাধারণের পক্ষে অনেকক্ষেত্রে দুষ্প্রবেশ্য দীঘনিকায়ের সূত্রনিচয় তিনি প্রাঞ্জল ভাষায় অনুবাদ করিয়া সকলের বুঝিবার পক্ষে সুগম করিয়াছেন। জাতির চিন্তাক্ষেত্র সম্প্রসারিত এবং সত্যোপলব্ধির চেতনা উদ্বুদ্ধ করিতে দীঘনিকায়ের এই অনুবাদ বিশেষভাবে সাহায্য করিবে। ৫৪৫।৫৪

নানক-বাণী—অমরেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক উকিলপাড়া, বারুইপুর, ২৪ পরগণা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৹ আনা।

আলোচ্য পুস্তিকাখানি শিখগুরু নানকের কতকগুলি বাণীর সংগ্রহ। নানক অসাম্প্রদায়িক, উদার আদর্শ প্রচার করিয়াছেন। ভগদ্ভব-প্রণোদিত তাঁহার উপদেশাবলী সর্বসমাজে এবং সর্বকালে সমাদৃত হইবে। ৪৯৫।৫৪

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

শ্রীহর্ষ : অন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের মুখপত্র।

১৯৫৫ **কেমন যাবে? (রাশি ফল)**—শ্রীজগদীশ সেন।

ভাত কাপড়ের কথা—শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ।

Yogiraj Gambhirnath—Akshaya Kumar Banerjea.

নহবৎ—চিত্তরঞ্জন ঘোষ।

দেয়ালপঞ্জী ও ডায়েরী

আমরা ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিমিটেডের নিকট হইতে একটি সুদৃশ্য দেয়ালপঞ্জী ও ছোট ডায়েরী পাইয়াছি। ইহা ছাড়া এইচ এন সি প্রডাকশন্স ও চন্ডীচরণ নায়েক কোম্পানীর নিকট হইতেও দুইখানি দেয়ালপঞ্জী পাইয়াছি।

সাহিত্যে অসাধুতা

একাধিক পাঠক পত্রযোগে আমাদের জানাইয়াছেন যে, গত সংখ্যা দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত সত্যেন্দ্র আচার্যর লেখা 'তিন প্রধানের গল্প' ইতিপূর্বে ক্রান্তি পত্রিকায় (অগ্রহায়ণ ১৩৬১) প্রকাশিত হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, সম্পাদকের পক্ষে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত রচনার খবর রাখা সম্ভব নহে বলিয়া তাঁহাকে লেখকদের সততার উপরেই সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়। সেই সুযোগ লইয়া কোনো লেখক যদি অন্যত্র প্রকাশিত রচনা পুনঃপ্রকাশের জন্য অপর একটি পত্রিকার সম্পাদকের নিকট প্রেরণ করেন, তাহা লেখকেরই অপরিণামদর্শিতার পরিচয় জ্ঞাপন করে। ইহার ফলে নূতন লেখকদের প্রতি সম্পাদককে সন্দিগ্ধ হইয়া পড়িতে হয়—যাহা কোনক্রমেই বাঞ্ছনীয় নহে। উক্ত লেখকের প্রতি আমাদের নিবেদন এই যে, সম্পাদককে ফাঁকি দিতে পারিলেও পত্রিকার অগণিত পাঠকদের ফাঁকি দেওয়া যায় না। সাহিত্য সৃষ্টি মহতের কাজ। স্বামী বিবেকানন্দের বহুপ্রচলিত উক্তিটি স্মরণ করাইয়া বলিতে চাই যে, চালাকির দ্বারা মহৎ কাজ হয় না। পরিশেষে এই অসাধুতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া যাঁহারা পত্র দিয়াছেন তাঁহাদের নিকট আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি। —সম্পাদক 'দেশ'

পাহাড়ে রাতে

সুরেন দে

পাশ দিয়ে হ্যাপি ভ্যালির রাস্তা
যেন একটা ঘুমন্ত কিং কোবরা;
মাঝে মাঝে মিলিটারী ট্রাক
তার ঘুম ভাঙিয়ে চলে যাচ্ছে।

এ পাশে কয়েকটি খাসিয়া বস্তি
অন্য পাশে সরল গাছের বন;
ছোট্ট একটি পাহাড়ী ঝরণা
তার ঘুম নেই,
খুকীর মত মিষ্টি হাসছে।

নং থু মাইয়ে রাত নেমেছে
মাঘের রাত।
খাসিয়া মেয়ের আপেল-মুখ
দু' একটা দরজার পাশে
প্রতীক্ষা করছে।

আমার ঘুম আসে না
পূর্ণিমার রুপোলী আলো
ঘুম কেড়ে নিয়েছে।
বেরিয়ে পড়ি
সামনে উঁচু পথটায় বসি:
দূরে হ্যাপি ভ্যালির আলো তাকিয়ে থাকে।
হাতপাগুলো কন্‌কনিয়ে ওঠে,
সিগারেট ধরাই।

একটা ছায়া কাছে আসে
হাতছানি দেয়
কাছে আসে
আমি ভয় পাই
সে আরও কাছে আসে।
বলে—যাবে আমার সঙ্গে?
আমি বলি—কোথায়?
সে বলে—ঐ সরল গাছের বনে,
ঐ পাহাড়ের চূড়ায়,
ঐ ঝরণার দোলায়।
আমি বলি—কেন?
সে বলে—এমনি।
আমি ভাবি—যাব কি!
হেসে উঠল সে
বলল—ভয় পাচ্ছ?
জান—আমিই রয়েছি তোমার ভাবনায়
তোমার কামনায় যুগযুগান্তর ধরে।
সিগারেটটা টানতে গিয়ে দেখি—
সেটা নিভে গেছে,
হিমেল হাওয়ায়।

দেশলাইটা জ্বালাই
সামনে একটা আধমরা গাছ।
কিন্তু কোথায় গেল সে?
পাশ দিয়ে হ্যাপি ভ্যালির রাস্তা
যেন একটা জ্যান্ত কিং কোবরা।
নং থু মাইয়ে রাত নেমেছে
মাঘের রাত।

অবন্ধনা

জয়শ্রী চৌধুরী

মাঝে মাঝে মনে এক প্রতিজ্ঞা ঘনায়,
মৃত্যুর মতন তীব্র, হিংসার মতন হিংস্র হয়
বার বার মুঠিতে সে নেয় অঙ্গীকার
এ বন্ধন করিনে স্বীকার।

এ বন্ধন কতটুকু? দেহে বাঁধে—মনের সীমায়
অধিকার কত ক্ষুদ্র তার
মন হতে আরো দূরে, সীমাহীন আত্মার চূড়ায়
এ বন্ধন ধূলায় মিশায়।

এ তীব্র বেদনা নিয়ে বারে বারে যেন জেগে উঠি
বন্ধনের বেদনায় কাঁদি, আর দ্বন্দ্ব হয়ে টুটি
বারে বারে তবু যেন কখনও না ভুলি অঙ্গীকার
হে মৃত্যু, হে দেহের মরণ
তোমারে করেছি অস্বীকার॥

গত বছরের বাঙলা ছবি

বাঙলা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে ১৯৫৪ সাল কয়েকটি স্মরণীয় ঘটনা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। প্রথমত ও বছর যতো বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে, আর কখনো তা হয়নি। শুধু বাঙলা ভাষার ছবিই বা কেন, অন্যান্য ভাষার সব রকমের ছবি মিলিয়ে এক বছরে কলকাতায় তোলা এতো ছবিও মুক্তিলাভ করেনি আর কোন বছরে। ১৯৫৪ সালে মোট বাঙলা ছবি মুক্তিলাভ করেছে ৫০ খানি;

"চাঁদনী চকে"র একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় **মীনাকুমারী**

এর মধ্যে মাত্র একখানি ছবি ইংরিজী থেকে ডাব করা, আর বাকি সব ছবিই কলকাতার স্টুডিওতে তোলা। এছাড়া কলকাতায় তোলা ৩খানি হিন্দী এবং অসমীয়া ও ওড়িয়া ভাষায়ও একখানি করে ছবি মুক্তিলাভ করেছে। একুনে কলকাতায় তোলা এই ৫৫ খানি মুক্তি-প্রাপ্ত ছবির মধ্যে প্রকারভেদে সামাজিক পর্যায়ের ৩৩খানি, কমিক ৭, পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক ৭, জীবনী ৩ এবং 'ক্রাইম' জাতীয় ২ খানি। এ থেকে দেখা যাচ্ছে যে, বর্তমানে সামাজিক ছবি তোলার প্রতি ঝোঁক আগের তুলনায় প্রভূত বৃদ্ধি-

—শৌভিক—

লাভ করেছে; ১৯৫৩ সালে সামাজিক ছবি ছিল ২৮। পৌরাণিক জাতীয় ছবি আগের বছরের চেয়ে মাত্র একখানি বেশী দেখে মনে হয় চিত্র-নির্মাতারা এই জাতীয় ছবি তোলার খরচের কথা বিবেচনা করেই বোধ হয় ঝোঁক কম দেখাচ্ছেন। তা নয়তো পৌরাণিক ছবির চাহিদা দর্শকদের কাছে কমেনি, তবে এখন আর পৌরাণিক আখ্যাত করে যা-তা কিছু তাদের সামনে ধরে দিলে তা নিতে তারা প্রস্তুত নয়। ভালোভাবে পৌরাণিক ছবি তুলতে সাধারণ ছবির চেয়ে খরচ হবারই সম্ভাবনা।

* * *

গত বছরের সাতখানি পৌরাণিক জাতীয় ছবির মধ্যে কেবলমাত্র "নরমেধ যজ্ঞ" ছাড়া আর কোনখানিই অনুমোদন পাবার যোগ্য নয়। "সতীর দেহত্যাগ" পাঁচমিশেলি উপাদানের আকর্ষণে ওদেরই মধ্যে কিছুটা জনপ্রিয়তা অর্জন করে, যার মধ্যে অভিনয়ের দিকটাই ছিল বলিষ্ঠ। "জয়দেব" ও "বিল্বমঙ্গল"কে জীবনী-চিত্র বলে এখানে ধরা হয়েছে, যদিও ঠিক ইতিহাসের বাস্তবকে মেনে ছবির রূপ পরিকল্পনার চেয়ে কল্পনার ভাগই বেশী। তেমনি একখানি কল্পনাপ্রসূত জীবনী-চিত্র "যদু-ভট্ট"। এদের মধ্যে "বিল্ব-মঙ্গল" বিন্যাস দুর্বলতায় তেমন আদর পায়নি। "জয়দেব" ও "যদু-ভট্ট" ও ব্যাপারে খুব ধনী না হলেও সঙ্গীতের জোরে ছবি দু'খানি বছরের শ্রেষ্ঠ সাফল্যমণ্ডিত ছবির পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়িয়েছে। এ থেকে বিশেষ লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে ভালো এবং উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রতি জনসাধারণের আদর। অবশ্য এ বিষয়ে অসাধারণ জনপ্রিয়তার সম্ভাবনা আগে প্রমাণিত করে "ঢুলি"। প্রায় সবই ক্ল্যাসিকাল সুর সমন্বিত ডজন দুই গান পরিবেশন করে "ঢুলি" বাঙলা চিত্রজগতে বেশ একটা আলোড়ন এনে দিতে সক্ষম হয়েছে। যার ফলে এখন ছবিতে গানের মাত্রা বাড়িয়ে দেবার দিকে একটা ঝোঁক যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনি ঝোঁক হয়েছে শুদ্ধ রাগ-রাগিনী ব্যবহারের দিকে। কমিক জাতীয় ছবির স্থায়িত্ব দীর্ঘ হয় না বলেই হয়তো সংখ্যা কমের দিকে যাচ্ছে। গত বছর যে সাতখানি

চিত্রাঙ্গদাতে নমিতা সেনগুপ্তা

ছবি পরিবেশিত হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হয় "গৃহ-প্রবেশ"। "লেডিজ সিট", "ছেলে কার" ও "আজ সন্ধ্যায়"-এর মধ্যেও কিছু মৌলিকত্ব থাকলেও আলগা বাঁধুনী আর কৃত্রিমতা নিয়ে তারা কোন ছাপ রেখে যেতে পারেনি।

* * *

কাহিনীর দিক থেকে সামাজিক ছবিগুলির উপাদানে বৈচিত্র্য প্রচুর পাওয়া গিয়েছে। বাঙলা ছবির এইটেই বৈশিষ্ট্য এবং চিত্রশিল্পও টিকে থাকার এইটেই প্রধান জোর। অতি নগণ্য এবং অনাদৃত ছবিও কাহিনীর দিক থেকে কিছু না কিছু মৌলিকত্ব পরিবেশন করেছে। এ বছরের মোট সংখ্যার মধ্যে উল্লেখ করবার মতো সৃষ্টি বেশ খানকয়েক পাওয়া গিয়েছে। "সদানন্দের মেলা"তে বিদেশীয়ানার কৃত্রিমতা পরিস্ফুট হয়ে পড়লেও প্রেমেন্দ্র মিত্রের চিত্রনাট্য এবং সুকুমার দাশগুপ্তের পরিচালনা বাসার অনটনের সমস্যা ব্যক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। এদেরই দুজনের যোগাযোগে "ওরা থাকে ওধারে" বাঙাল-ঘটির বিবাদের মধ্যে দিয়ে মিলেমিশে থাকার মনুষ্যত্বের আবেদনটাকেই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রেমেন্দ্র মিত্রের নিজেরই লেখা ও পরিচালনায় তোলা "ময়লা কাগজ" সমাজের আর এক শ্রেণীর দরিদ্র মানুষের কথা বলেছে, যারা পথের নোঙরা ঘেঁটে অন্নের সংস্থান করে। কিন্তু দুর্বল বিন্যাস ও কলাকৌশলের দৈন্যে স্মরণীয় ছবি হয়ে ওঠায় বঞ্চিত হয়েছে। ক'জন কলাকুশলীর চেষ্টায় তোলা "অংকুশ" প্রজা ও জমিদার সংঘর্ষের বেশ একটা অভিনব চেহারা নিয়ে উপস্থিত হলেও সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণে ব্যর্থ হয়। প্রায় এমনিই ভাগ্য ঘটে প্রবোধ সান্যাল রচিত এবং চিত্ত বসু পরিচালিত "নদ ও নদী"রও। এতে ছিল শ্রমিক ও মালিকের সংঘর্ষ। অভিনবত্বের দিক থেকে আর উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব তারাশংকরের লেখা, চিত্ত বসু পরিচালিত "চাঁপাডাঙার বৌ"।

১৯৫৪ সালের সবচেয়ে জনপ্রিয় ছবিগুলি বলতে ধরা যায় "মরণের পরে", "ঢুলি", "মা ও ছেলে", "অগ্নিপরীক্ষা", "প্রফুল্ল", "অন্নপূর্ণার মন্দির", "মনের ময়ূর", "মন্ত্রশক্তি" ও "ভাঙাগড়া"। গুণের দিক থেকে "শুভযাত্রা", "চাঁপা-ডাঙার বৌ" বেশ ছাপ রেখে গিয়েছে। এ থেকে দেখা যায় লোকের কোন নির্দিষ্ট রুচি বা পছন্দ বলতে কিছু নেই। একটা লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে আলোচ্য বছরে শরৎচন্দ্রের তিনটি রচনা, "ষোড়শী", "সতী" ও "নববিধান" পরিবেশিত হলেও এদের কোনখানিই তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করতে পারেনি। আরও কয়েকটি শরৎ-রচনা চিত্ররূপ দানের কথা ছিল, কিন্তু সম্ভবত অভিনেতৃ সঙ্ঘের সঙ্গে রচনার স্বত্ত্বাধিকারীর বিবাদজনিত বয়কটের ফলে সেগুলি স্থগিত হয়ে গিয়েছে। অবশ্য এ বছর সাহিত্য রচনার চিত্ররূপই বেশী। মোট ছবিগুলির মধ্যে পূর্ব-প্রকাশিত সাহিত্য রচনা থেকে আখ্যানবস্তু আহরণ করে নেওয়া হয়েছে ২০টি ক্ষেত্রে। এছাড়া ছবির জন্য সাহিত্যিকদের সহায়তায় কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনা করিয়ে নেওয়া হয়েছে ১৪খানি ছবির ক্ষেত্রে। সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের এই সহায়তা বাঙলা ছবির মধ্যে আর কিছু না হোক, একটা পরিচ্ছন্নতা রক্ষা করে গিয়েছে—সেকথা সেন্সর বোর্ডের বার্ষিক বিবরণীতে স্বীকৃত হয়েছে। আরও একটা লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে মহিলা সাহিত্যিকদের রচনার প্রতি আগ্রহ। মহিলা সাহিত্যিক-দের ৮টি রচনার চিত্ররূপ প্রদান করা হয়েছে, যার মধ্যে আছেন অনুরূপা দেবী, নিরুপমা দেবী, আশাপূর্ণা দেবী, প্রভাবতী দেবী সরস্বতী এবং প্রতিভা বসু। ঘনিষ্ঠ পারিবারিক পরিবেশ নিয়ে এদের গল্পগুলির অধিকাংশই বছরের সর্বাধিক জনপ্রিয় ছবিগুলির দলভুক্ত হতে পেরেছে।

* * *

সাহিত্যিকদের রচনা অবলম্বন করায় আখ্যানবস্তুতে অনেক বৈচিত্র্যযুক্ত হতে পেরেছে। একই রকমের বা বিষয়বস্তুর দুটো গল্প বিশেষ চোখে পড়ে না। বাঙলা ছবির প্রতি আকর্ষণ বাড়িয়ে যাবার এ একটা কম বড়ো কারণ নয়। তবে সাফল্যমণ্ডিত ছবির অনুসরণে কিছু আকর্ষণীয় উপাদান যোগ করার চেষ্টা অনেক ছবির ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে। যেমন "মা ও ছেলে"র মতো বিভিন্ন তীর্থস্থান দর্শনের সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে "সতীর দেহত্যাগ" প্রমুখ চিত্রে। "মা ও ছেলে"র ভূমিকালিপিতে '৪২ জন তারকা' সন্নিবেশের দেখাদেখি এখন অধিকাংশ ছবিতে যতো বেশীসংখ্যক সম্ভব তারকাকে নামিয়ে দেওয়ার প্রায় রেওয়াজই দাঁড়িয়ে গিয়েছে। "ঢুলি" সাফল্যের মূলে সংগীতের প্রবাহ লক্ষ্য করে "জয়দেব", "যদুভট্ট" অনুপ্রাণিত হয়েছে বলাটা অবান্তর হবে না। এ ঝোঁকগুলো অবশ্য ভালোর দিকেই, কারণ এর মধ্যে পাওয়া যায় কাহিনীর ঘটনাস্থল ও পরিবেশের মধ্যে বৈচিত্র্য আনার স্পৃহা

গল্পের পরিসর ব্যাপক ক্ষেত্রে ছড়িয়ে দেওয়া, যার মধ্যে দেশের নানা দর্শনীয় স্থান দেখতে পাওয়া যায় ("মা ও ছেলে", "সতীর দেহত্যাগ", "যদু ভট্ট", "মন্ত্রশক্তি" প্রভৃতি); অভিনয়ের দিকটা যথাসম্ভব বলিষ্ঠ করে তোলা ("মা ও ছেলে", "ভাঙাগড়া", "ওরা থাকে ওধারে", "অন্নপূর্ণার মন্দির" প্রভৃতি) এবং দেশের নিজস্ব সংগীত ঐতিহ্যের প্রতি জনসাধারণকে আকর্ষিত করা ("ঢুলি", "যদুভট্ট", "জয়দেব" প্রভৃতি)। এই ভালো দিকের ঝোঁকের মধ্যে সাহিত্যিকদের রচনার প্রতি মোহের কথা আবার উল্লেখ করা যায়। আলোচ্য বছরের ছবিগুলির কাহিনীর সংগে যাদের নাম জড়িত রয়েছে, তাদের মধ্যে মহিলা সাহিত্যিকদের নাম পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁরা ছাড়া আছেন শরৎচন্দ্র, প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, সুধীরবন্ধু, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, বীরেন্দ্র ভদ্র, মনোজ বসু, প্রবোধকুমার, গিরিশচন্দ্র, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, তারাশংকর, নিতাই ভট্টাচার্য, বিধায়ক ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

* * *

ছবি প্রযোজনা ও পরিচালনা ব্যাপারে একেবারে উটকো লোকের আবির্ভাব ক্রমশই বন্ধ হয়ে যাবার লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। বাঙলা চলচ্চিত্রের সংগে দীর্ঘকাল সংশ্লিষ্ট না থাকতেই হুট্ করে এসে ছবি প্রযোজনায় আত্মনিয়োগ করেছে, এমন দৃষ্টান্ত বিরল হয়ে দাঁড়িয়েছে। পরিচালক শিল্পী বা কলাকুশলীরা অনেক ক্ষেত্রে নিজেরাই দল তৈরী করে ছবি করেছেন। এদিক থেকে প্রণিধানযোগ্য প্রচেষ্টা কয়েকখানি পাওয়া গিয়েছে, যেমন যৌথ শিল্পীর "নরমেধ যজ্ঞ", তাছাড়া "গৃহপ্রবেশ", "শুভযাত্রা", "এই সত্যি", "অংকুশ" প্রভৃতি। বেশ একটা বৈশিষ্ট্যের ছাপ দিয়েছে এদের প্রত্যেকখানি প্রচেষ্টা। পরিচালকদের মধ্যে চিত্ত বসু একাই পাঁচখানি ছবিতে কাজ করেছেন—"ছেলে কার", "শুভযাত্রা", "নদ ও নদী", "প্রফুল্ল" ও "মন্ত্রশক্তি"। তিনখানি ছবি উপহার দিয়েছেন সুশীল মজুমদার—"মনের ময়ূর", "জাগৃহি" এবং "ভাঙাগড়া"; পিনাকী মুখোপাধ্যায়—"বিল্বমংগল", "ঢুলি" ও "বলয়গ্রাস"। দুখানি করে ছবি উপহার দিয়েছেন শৈলজানন্দ—"মণি আর মাণিক" ও "বাঙলার নারী"; সুকুমার দাশগুপ্ত—"সদানন্দের মেলা" ও "ওরা থাকে ওধারে", নীরেন লাহিড়ী "কল্যাণী" ও "যদুভট্ট"। আর বাকী সকলেই একখানি করে যাদের মধ্যে আছেন পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, নির্মল দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নরেশ মিত্র, মণি বর্মা, অজয় কর, ভোলানাথ মিত্র, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, অরুণ চৌধুরী, সুধীর মুখোপাধ্যায়, বিনু বর্ধন, অগ্রদূত, মহেন্দ্র গুপ্ত, অমর মল্লিক, সুধীরবন্ধু, শ্রীতারাশংকর, মানু সেন, মধু বোস, হরিদাস ভট্টাচার্য, গুণময় বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর দত্ত, সতীশ দাশগুপ্ত, বিনয় বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি।

* * *

বিষয়বস্তু ও নাট্যবৈভবে বাঙলা ছবি দর্শকদের আস্থা পুনঃপ্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেও কিন্তু কলাকৌশলের দিকটা যেন ক্রমশই অধোগতির দিকে এগিয়ে চলেছে। আংগিক পারিপাট্যের দিক থেকে অসাধারণ কৃতিত্ব কিছুই দেখা যায়নি বলা চলে। সবায়ের কাজের মধ্যে একটা সমতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কেবল সংগীতের দিক থেকেই যা উল্লেখ করার মতো কাজ মাত্র চারখানি ছবিতে পাওয়া গিয়েছে—"ঢুলি" (রাজেন সরকার); "জয়দেব" (নচিকেতা ঘোষ), "যদুভট্ট" (জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ) এবং "অংকুশ" (কালীপদ সেন)। কাহিনীতে রস সঞ্চারে সংলাপের দিক থেকে অসাধারণ কৃতিত্ব পাওয়া গিয়েছে প্রেমেন্দ্র মিত্রের "ওরা থাকে ওধারে" ও "সদানন্দের মেলা"তে এবং নিতাই ভট্টাচার্যের "অগ্নিপরীক্ষা"তে। কলাকৌশলের দিকটা উন্নততর না হওয়াটা কিন্তু মোটেই ভালো লক্ষণ নয়। হয়তো কলাকুশলীদের চাকরীর অনিশ্চয়তা, আর্থিক দুরবস্থা প্রভৃতি মিলে তাদের নিবিষ্ট হওয়ার পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করছে। লক্ষ্যও করবার বিষয় যে বাঙলা ছবি কেবল সংখ্যাতেই নয়, জনপ্রিয়তা অর্জনেও গত বছরের মধ্যে যথেষ্ট সাফল্যমণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও চিত্র-নির্মাণে সংশিলষ্ট কর্মী-কুশলীদের অবস্থা উল্টে খারাপের দিকেই চলেছে। এদিকটার প্রতিকার ব্যবস্থা না হলে আর সব দিকে যতোই উন্নততর লক্ষণ দেখা দিক, সবই ভেস্তে যাবে। গত বছর বাঙলা ছবির উন্নতি আকস্মিক কোন ঘটনা নয়; লেখক, পরিচালক, শিল্পী ও কলাকুশলীদের সম্মিলিত আন্তরিকতা, বাঙলা ছবিকে ভব্য ও মনোজ্ঞ রসসমৃদ্ধ করেছে। বাঙলার শিল্পী কলাকুশলীদের এইসব গুণ নতুন বছরে বাঙলার চিত্রশিল্পের আরও যে মহিমা বাড়িয়ে তুলবে, তার আভাস আগে থেকেই পাওয়া যাচ্ছে।

খেলার মাঠে

একলব্য

এ্যাংলো - অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট যুদ্ধের 'ব্রিসবেন' ফ্রন্টে অস্ট্রেলিয়া ইংলণ্ডকে এক ইনিংস ও ১৫৪ রানে হারিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু 'সিডনী' ও 'মেলবোর্ন' ফ্রন্টের দু'টি লড়াইতে অস্ট্রেলিয়াকে পর পর পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে ইংলণ্ডের কাছে। সিডনীতে ইংলণ্ড ৩৮ রানে জয়লাভ করে আর মেলবোর্নে জয়লাভ করেছে ১২৮ রানে। তিনটি টেস্ট লড়াইয়ের কোন লড়াই-ই পুরো সময় ৬ দিন পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। প্রথম

'টাইফুন' টাইসন—যাঁর সর্বনাশা বোলিং ইংলণ্ডের জয়লাভকে সহজ করে তুলেছে

দু'টি পাঁচদিন না পুরতে শেষ হয়ে যায়। তৃতীয় টেস্টে চারদিনের কিছু বেশী সময় লেগেছে। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার বাকী দু'টি টেস্ট-যুদ্ধের উপর এখন সমগ্র ক্রিকেট বিশ্বের দৃষ্টি নিবদ্ধ। জানুয়ারী মাসের ২৮শে 'এডিলেড' মাঠে আরম্ভ হচ্ছে চতুর্থ টেস্ট। সিডনীর মাঠে ফিরে এসে ২৫শে ফেব্রুয়ারী থেকে দু'পক্ষ পঞ্চম সমরে পরস্পরের সম্মুখীন হচ্ছে।

মেলবোর্ন মাঠের তৃতীয় টেস্ট খেলার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার শোচনীয় ব্যাটিং বিপর্যয়। আগের দিন যারা দুই উইকেটে সংগ্রহ করেছিল ৭৫ রান, তারা পরের দিন বাকী ৮টি উইকেটে ৩৬ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি। এই অনিশ্চয়তা ক্রিকেটেই সম্ভব। মহা অনিশ্চয়তাই ক্রিকেটের বিশেষত্ব। ইংলণ্ডের ফাস্ট বোলার ফ্রাঙ্ক টাইসনের 'সর্বনাশা' বোলিংই অস্ট্রেলিয়ার বিপর্যয়ের প্রধান কারণ। শক্তিশালী অস্ট্রেলিয়ার কোন ব্যাটসম্যানই বেশিক্ষণ 'টাইফুন' টাইসনের বোলিংয়ের বিরুদ্ধে ব্যাট ধরে দাঁড়াতে পারেন নি। এক সময়ে তিনি ১৬ রানে ৬টি উইকেট পেয়েছিলেন, শেষ পর্যন্ত ২৭ রানে ৭টি উইকেট দখল করেন। তৃতীয় টেস্টে দুই দলের মধ্যে একজন মাত্র ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন—তিনি হচ্ছেন ইংলণ্ডের উদীয়মান খেলোয়াড় কলিন কাউড্রে। ইংলণ্ডের অপর কৃতী খেলোয়াড় পিটার মে-ও মাত্র ৯ রানের জন্য শত-রান লাভের কৃতিত্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছেন।

মেলবোর্ন মাঠের টেস্ট খেলার বিশেষত্ব, এখানেই ৭৮ বছর পূর্বে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার প্রথম টেস্ট খেলা আরম্ভ হয়েছিল। অস্ট্রেলিয়া সেই খেলায় ৪৫ রানে জয়লাভ করে। তার পর দুই দেশের লড়াইয়ে এই মাঠে ক্রিকেট ইতিহাসের কত বিচিত্র অধ্যায় রচিত হয়েছে, তার স্থিরতা নেই। নীচে তৃতীয় টেস্টে দুই দলে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নাম ও খেলার ফলাফল দেওয়া হ'ল :—

ইংলণ্ড—হাটন (অধিনায়ক), এডরিচ, মে, কাউড্রে, কম্পটন, বেলী, ইভান্স, ওয়ার্ডলে, টাইসন, স্ট্যাথাম ও এ্যাপলইয়ার্ড।

অস্ট্রেলিয়া—মোরিস, ফেবেল, মিলার, হার্ভে, হোল, বিনাউড, আর্চার, ম্যাডকস, লিণ্ডওয়াল, জনসন (অধিনায়ক) ও জনস্টন।

ইংলণ্ডের উদীয়মান ব্যাটসম্যান কাউড্রের ব্যাট করবার ভংগী

স্কোর বোর্ড

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—১৯১ (**কাউড্রে** ১০২, বেলী ৩০, ইভান্স ২০; মিলার ১৪ রানে ৩ উইঃ, আর্চার ৩৩ রানে ৪ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—২৩১ (**ম্যাডকস** ৪৭, জনসন ৩৩, হার্ভে ৩১, ফেবেল ২৫; স্ট্যাথাম ৬০ রানে ৫ উইঃ)

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস—২৭৯ (মে ৯১, হাটন ৪২, ওয়ার্ডলে ৩৮; **জনস্টন** ৮৫ রানে ৫ উইঃ)

জাতীয় টেনিসের মহিলা চ্যাম্পিয়ন মিস রিতা ডেভার

অস্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস—১১১ (**ফেবেল** ৩০; টাইসন ২৭ রানে ৭ উইঃ)

* * *

পাকিস্থান সফরের প্রথম খেলায় ভারত এক ইনিংস ও ১৫ রানে পূর্ব পাকিস্থান দলকে পরাজিত করবার পর প্রথম টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ করেছে। ভারত ও পাকিস্থানের প্রথম টেস্ট খেলাকে কেন্দ্র করে ঢাকায় অভূতপূর্ব উৎসাহ-উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করা যায়। এই টেস্টে কি ভারত, কি পাকিস্থান, কোন পক্ষই আশানুরূপ ব্যাটিং-নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেনি; তবে বোলিংয়ে দুই পক্ষই পারদর্শিতা দেখিয়েছে। নীচে দুই দলে যাঁরা অংশ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের নাম ও খেলার ফলাফল দেওয়া হ'ল :—

পাকিস্থান — হানিফ, আলিমুদ্দিন, ওয়াকার, মাকসুদ, ওয়াজির, ইমতিয়াজ, কারদার (অধিনায়ক), সুজাউদ্দিন, ফজল মামুদ, মাসুদ হোসেন ও খান মহম্মদ।

ভারত—রায়, পাঞ্জাবী, মন্ত্রী, মঞ্জরেকার, রামচাঁদ, উমরিগর, ফাদকার, মানকড় (অধিনায়ক), তামানে, গোলাম আমেদ ও গুপ্তে।

স্কোর বোর্ড

পাকিস্থান—১ম ইনিংস—২৫৭ (ওয়াকার

৫২, ইমতিয়াজ ৫৪, হানিফ ৪১, কারদার ২৯; গোলাম আমেদ ১০৯ রানে ৫ উইঃ, রামচাঁদ ১৯ রানে ২ উইঃ)

ভারত—১ম ইনিংস—১৪৮ (রামচাঁদ ৩৭, উমরিগর ৩২, পাঞ্জাবী ২৬; মামুদ হোসেন ৬৭ রানে ৬ উইঃ, খান মহম্মদ ৩২ রানে ৪ উইঃ)

পাকিস্থান—২য় ইনিংস—১৫৮ (আলিমুদ্দিন ৫১, ওয়াকার ৫১; গুপ্তে ১৮ রানে ৫ উইঃ)

ভারত—২য় ইনিংস—(২ উইঃ) ১৪৭ (রায় ৬৭, মঞ্জরেকার ৪৭; খান মহম্মদ ১৮ রানে ২ উইঃ)

* * *

বিংশ শতকের প্রথম পাদের প্রখ্যাত খেলোয়াড় অভিলাষ ঘোষের পরলোকগমনের সংগে সংগে ভারতের ফুটবল আকাশ হতে আর এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের তিরোধান ঘটলো। অভিলাষ ঘোষ সেই দলের খেলোয়াড় ছিলেন, যে দলের একাদশ বাঙ্গালী ভারতের ফুটবলে স্বর্ণযুগ এনেছিল, ক্ষমতাগর্বী ব্রিটিশ সামরিক দলের ফুটবলগর্ব খর্ব করেছিল, ভারতের আকাশ বাতাস মুখরিত করেছিল মোহনবাগানের জয়গানে। ঐতিহাসিক ১৯১১ সালের ইতিহাস স্রষ্টা অভিলাষ ঘোষ আজ নেই। ১৯১১ সালে মোহনবাগান দলের সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় ছিলেন অভিলাষ ঘোষ। ফাইন্যাল খেলা শেষ হবার ৩ মিনিট আগে তিনিই ইস্ট ইয়র্কের বিরুদ্ধে বিজয়সূচক গোলটি করে ভারতীয় দলের পক্ষে আই এফ এ শীল্ড বিজয়ের স্বপ্নকে সার্থক করেছিলেন। ১৯১১ সালের শীল্ড বিজয়ী বীরদের ৬ জন ইতিপূর্বেই পরলোকগমন করেছেন; অভিলাষ ঘোষের মৃত্যুর পর আর ৪ জন জীবিত রইলেন——এ'রা হচ্ছেন—হীরালাল মুখার্জি, রেভারেণ্ড সুধীর চ্যাটার্জি, জে এন রায় ও হাবুল সরকার।

* * *

সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত এশিয়ান চতুর্দলীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার অধিকাংশ খেলায় আশানুরূপ দর্শক সমাগম হয়নি বলে অনেকে কলকাতায় ফুটবল স্টেডিয়াম নির্মাণের যৌক্তিকতায় সন্দিহান হয়েছেন। বলা বাহুল্য এই অনেকে অর্থে তারাই যারা একে মিলে বহু। বাঙলা ফুটবলের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা, ভাগ্য বিধাতা। এদের অভিমত, আন্তর্জাতিক খেলাতেই যদি মাঠ না ভরলো তবে স্টেডিয়ামের প্রয়োজন কি? একমাত্র মোহনবাগান এবং ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যখন পরস্পরের সম্মুখীন হয়, তখনই নাকি আমরা স্টেডিয়ামের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি; বাকী খেলার জন্য বর্তমানের তিনটি ঘেরা মাঠই যথেষ্ট। ফুটবল সমাজের হোমরা-চোমরা বিশেষের একথা পুরোপুরি সত্য না হলেও আংশিক সত্য এ বিষয়ে কোন সন্দেহ

ভারতের ডাক টিকিট শতাব্দী উপলক্ষে ইতিপূর্বে নূতন ধরনের ডাক টিকিট ছাপা হ'য়েছে, ডাক টিকিট সংগ্রাহকদের জন্য কলকাতায় এক প্রদর্শনীরও আয়োজন করা হয়েছে, অলিম্পিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে ভিন্ন ভিন্ন দেশে যে সব ডাক টিকিট চালু হয় তার কিছু নমুনা এখানে ছাপা হ'ল

নেই। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলে এর ফাঁকি ধরাও কষ্টসাধ্য নয়।

* * *

যাদের উপর ফুটবলের পরিচালনাভার ন্যস্ত তাঁরা বাঙলার ফুটবল সংস্থাকে একরকম ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে তুলেছেন। ফুটবল সংস্থার এই সব মহাজনেরা চ্যারিটি বা বড় প্রদর্শনী খেলার টিকিটের যে মূল্য নিরূপণ করে রেখেছেন সাধারণ দর্শকের পক্ষে সে মূল্য দিয়ে খেলা দেখা একরকম অসাধ্য। তিন টাকা, দু'টাকা এবং এক টাকা দর্শনী দিয়ে এক ঘণ্টার সাধারণ খেলা দেখা ক'জনের পক্ষে সম্ভব? গড়ের মাঠের নিত্যকার যাত্রী যারা, খেলা বিদ্যা, খেলা-ধর্ম, খেলা-হৃদি, খেলা-মর্ম যাদের তাদের পক্ষেই এ মূল্যে খেলা দেখা সম্ভব। তারপর চতুর্দলীয় ফুটবলে দু'টি খেলার প্রবেশমূল্য নিরূপিত হয়েছিল চার টাকা, আড়াই টাকা ও দেড় টাকা করে। সাদা আসনের প্রবেশমূল্য—চার টাকা, সবুজ আসনের আড়াই, দেড় টাকা ছিল সবজু গ্যালারীর টিকিটের মূল্য। কলকাতায় ইতিপূর্বে কোন আকর্ষণীয় খেলায় এত বেশী প্রবেশমূল্য করা হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই। সম্ভবত চার টাকা দিয়ে ফুটবল খেলা দেখা কলকাতার দর্শকদের নতুন অভিজ্ঞতা। কলকাতার চ্যারিটি খেলাও এক শ্রেণীর দর্শকদের ম বিভীষিকার সৃষ্টি করে থাকে। চ্যারি খেলার টিকিট অর্থে তারা দুর্লভ কি কল্পনা করে থাকেন। এটা ক্রীড়া সংস্থা ব্যবসায়ী বুদ্ধি বৈকি! এরা চ্যারিট খেলা টিকিটের এমন একটা কৃত্রিম চাহিদা সৃ করে রেখেছেন, যা যুদ্ধকালীন কালে বাজারী যুগের কণ্ট্রোলভুক্ত জিনিসে চাহিদাকেও হার মানিয়েছে। একটা সাধার চ্যারিটি খেলাতেও সাধারণ দর্শকের পা আগে থেকে একখানা টিকিট পাবার উপ নেই। শহরের ভিড় ঠেলে, আই এফ অফিসের চৌকাট পেরিয়ে একখানা টিকি চাও, ধর্মতলার ধার্মিকদের কাছ থেকে উ পাবে—"টিকিট তো নেই, সবই শেষ হ গেছে।" পরের দিন হয়তো দেখবে প্রবে দ্বারেই টিকিট বিক্রী হচ্ছে। এ'রা চা লোককে হাতে রাখতে। পিপাসিত জ পিপাসার তীব্রতা বাড়িয়ে দেখিতে কৌতুক কিন্তু সাধারণ দর্শদের সঙ্গে এই চাতু আর কতদিন চলবে? দর্শকদের স্বল্পমূ খেলা দেখার সুযোগ, ক্রীড়ামানের উন্ন এবং শহরের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য কলকাতা স্টেডিয়ামের আশু এবং একান্ত প্রয়োজন।

* * *

কলকাতার সাউথ ক্লাবে অনুষ্ঠি ভারতের জাতীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে ভারত চ্যাম্পিয়ন আর কৃষ্ণনকে অস্ট্রেলিয়া জ্যাক আর্কিনস্টলের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। গতবার আর্কিনস্টলকে হারিয়েই উদীয়মান টেনিস খেলোয়াড় কৃষ্ণ জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছিলেন কৃষ্ণনের বর্তমান বয়স ১৯ বছর। গতবার তিনি যখন চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন, তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৮ বছর। এত কম বয়সে আজ পর্যন্ত কোন খেলোয়াড়ই জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে পারেন নি। প্রতিভাবান বালক খেলোয়াড় কৃষ্ণনের হাতে অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতিমান খেলোয়াড় আর্কিনস্টলের পরাজয় ভারতের টেনিস খেলার ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আর্কিনস্টল এই পরাজয়ের গ্লানি কিছুতেই মন থেকে মুছে ফেলতে পারেন নি। কৃষ্ণনকে হারাবার সংকল্প নিয়ে গতবার তিনি ভারত ত্যাগ করেন এবং এ বছরও ভারতের জাতীয় টেনিসে তাঁর অংশগ্রহণের উদ্দেশ্য গতবারের পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করা। আর্কিনস্টলের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু এবারকার প্রতিযোগিতায় কৃষ্ণনের পরাজয় খানিকটা দুর্ভাগ্য সূচিত একথাও অস্বীকার করা যায় না। খেলার সময়েও তার দুরদৃষ্টের পরিচয় পাওয়া গেছে। পুরো পাঁচটি গেমের মধ্যে কৃষ্ণন প্রথম এবং তৃতীয় খেলাটিতে জয়লাভ করে ২—১ গেমে অগ্রগামী রইলেন। আর্কিনস্টল লাভ করলেন দ্বিতীয় ও চতুর্থ গেম। সুতরাং পঞ্চম বা

শেষ গেমের উপর জয় পরাজয়ের মীমাংসা। এখানেও কৃষ্ণনের দূরদৃষ্টের পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য শ্রমসহিষ্ণুতার অভাবই ছিল কৃষ্ণনের পরাজয়ের প্রধান কারণ। অভিজ্ঞ ও দূরদর্শী খেলোয়াড় আর্কিনস্টলের সঙ্গে শেষ দিকে তিনি সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারছিলেন না।

শ্রমকাতরতার স্পষ্ট ছাপ তার চোখে মুখে ফুটে উঠছিল। তবুও ম্যাচ পয়েন্টের মুখে কৃষ্ণন চারবার আর্কিনস্টলকে প্রতিরোধ করলেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। দীর্ঘ ২৪ মিনিটকাল তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড় গেম পেলেন। গত বারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন কৃষ্ণন হলেন পরাজিত।

জাতীয় টেনিস চ্যাম্পিয়ন
আর্কিনস্টল

আর্কিনস্টল ও কৃষ্ণনের ফাইন্যাল খেলার পাঁচটি গেম মীমাংসিত হতে সবশুদ্ধ সময় লেগেছে ১০৮ মিনিট। কোয়ার্টার ফাইন্যাল এবং সেমি ফাইন্যালেও কৃষ্ণনকে একে একে স্কোনোকি এবং আর হোর সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ফাইন্যালে উঠতে হয়েছিল। অপর দিকে আর্কিনস্টলের ফাইন্যালে উঠবার পথ ছিল সহজ সরল। কোয়ার্টার ফাইন্যালে সুমন্ত মিশ্র এবং সেমি ফাইন্যালে নরেশ কুমারকে স্ট্রেট সেটে হারিয়েই তিনি ফাইন্যালে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেন। মিশ্র বা কুমার কেউই আর্কিনস্টলের সঙ্গে সমানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন নি। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার অপর কৃতী খেলোয়াড় আর হোকে কোয়ার্টার ফাইন্যালে পরাভূত করতেই কৃষ্ণনের সময় লেগেছে পুরো দুই ঘণ্টা। প্রাক্তন পোলিশ খেলোয়াড় স্কোনোকি ও কৃষ্ণনের সেমি-ফাইন্যাল খেলাটিও দুই ঘণ্টার পূর্বে মীমাংসিত হয়নি। পুরো পাঁচটি গেম খেলার পর কৃষ্ণন বিজয়ী হন। কোয়ার্টার ফাইন্যাল, সেমি-ফাইন্যাল এবং ফাইন্যালের তিনজন কৃতী বিদেশী খেলোয়াড়ের সঙ্গে কৃষ্ণনকে উপর্যুপরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে। একদিন বিশ্রাম জোটেনি। এটাও কম অসুবিধার কথা নয়। জাতীয় টেনিসের মাঝ-পথে জল বৃষ্টি বাধার সৃষ্টি না করলে এই অসুবিধার সম্মুখীন হতে হতো না। আর্কিনস্টলের কৃতিত্ব এবং প্রতিভাকে কোন রকমে খাটো না করেও বলা যেতে পারে, সাময়িক অনভ্যাসও কৃষ্ণনের পরাজয়ের আংশিক কারণ। অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা কোচ হ্যারী হপম্যানের কাছে কৃষ্ণনকে পাঠান হয়েছিল উন্নত টেনিস নৈপুণ্যে আরও পারদর্শী হবার জন্য, কিন্তু এই অল্প সময়ের মধ্যে কৃষ্ণন নূতন কিছু তো আয়ত্ত করতে পারেন নি, অধিকন্তু তাঁর স্বাভাবিক অনুশীলনের পথেও বাধার সৃষ্টি হয়েছে। হপম্যান নাকি কৃষ্ণনকে শ্রমসহিষ্ণু করবার জন্য রোজ আধঘণ্টা করে দৌড় করিয়েছেন। তাঁর নাকি মত আগে 'স্ট্যামিনা' তারপর খেলা। সে যাই হোক জাতীয় টেনিসে কৃষ্ণনের পরাজয় তাঁর প্রতিভা স্ফুরণের সহায়ক বলে মনে করা যেতে পারে।

ডাবলসের খেলাতেও কৃষ্ণন এবং নরেশ কুমারকে অস্ট্রেলিয়ান জুটি হো-আর্কিনস্টলের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। এখানেও প্রথম গেমে কৃষ্ণন ও কুমার অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দেন, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারেন না। লেডিস সিঙ্গলসে গতবারের চ্যাম্পিয়ন মিস রিতা ডেভার উন্নত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে মিস উর্মিলা থাপরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। নীচে জাতীয় টেনিসের ফাইন্যালের ফলাফল দেওয়া হলঃ—

মেনস সিঙ্গলস

জে আর্কিনস্টল ৩—৬, ৬—৩, ৩—৬, ৬—২ ও ৬—৩ গেমে আর কৃষ্ণনকে পরাজিত করেন।

মেনস ডাবলস

জে আর্কিনস্টল ও আর হো পরাজিত করেন আর কৃষ্ণন ও নরেশ কুমারকে ২—৬, ৬—৩, ৬—৩ ও ৬—৩ গেমে।

লেডিস সিঙ্গলস

মিস রিতা ডেভার ৬—৪ ও ৬—১ গেমে মিস উর্মিলা থাপরকে পরাজিত করেন।

লেডিস ডাবলস

মিস রিতা ডেভার ও মিস উর্মিলা থাপর ৬—৪ ও ৬—৩ গেমে মিস উডব্রিজ ও মিস ভি এ্যালোক্সকে হারিয়ে দেন।

মিক্সড ডাবলস

সুমন্ত মিশ্র ও মিস উর্মিলা থাপর ৬—৪ ও ৭—৫ গেমে আর হো ও মিস উডব্রিজকে পরাজিত করেন।

* * * *

এবার পুণায় ভারতের জাতীয় এবং আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার কতগুলি খেলায় উন্নত ব্যাডমিণ্টন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। উভয় প্রতিযোগিতাতেই বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়দের একচেটিয়া প্রাধান্য প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রথমে আন্তঃরাজ্য প্রতিযোগিতার ফাইন্যালে বোম্বাই দিল্লীকে ৩—১ খেলায় হারিয়ে দিয়ে উপর্যুপরি ছয় বছর স্যার ইব্রাহিম রহিমতুল্লা কাপ সে অধিকারে রাখে। পরে জাতীয় প্রতিযোগিতার খেলায় গতবারের চ্যাম্পিয়ন বোম্বাইয়ের উদীয়মান কুশলী খেলোয়াড় নন্দু নাটেকার
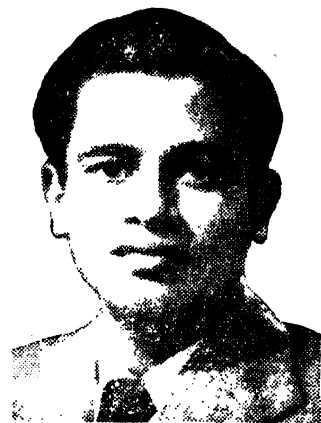
জাতীয় ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ন
নন্দু নাটেকার

এবারও চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেন। মিক্সড ডাবলস এবং মেয়েদের সিঙ্গলসেও বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়েরা বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। মেয়েদের ডাবলসের ফলাফলকেও বোম্বাইয়ের সাফল্য বলা যেতে পারে। বিখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধরের দুই কন্যা সুন্দর ও সুমন। সুন্দর এখন বোম্বাইয়ের ঘরণী হয়ে নামের শেষে পটবর্ধন উপাধি যোগ করেছেন। আর কুমারী সুমন এখনও দেওধর আছেন। মেয়েদের ডাবলসে এই ভগ্নি জুটিই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন। যাই হোক, ভারতীয় ব্যাডমিণ্টনে বোম্বাইয়ের প্রাধান্য অনস্বীকার্য। ১৯৪৪ সাল থেকে আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টনের প্রবর্তন হয়। ১৯৪৪ সালে দিল্লী এবং পরের দু'বছর পাঞ্জাব স্যার রহিমতুল্লা কাপ লাভ করে। কিন্তু তারপর থেকে প্রতি বছরই বোম্বাই কাপটিকে নিজেদের অধিকারে রেখেছে।

১৯৪৮ সালে আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন পরিচালিত হয়নি।

এ বছর জাতীয় প্রতিযোগিতার চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় নন্দু নাটেকার ও ত্রিলোক শেঠ উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যের পরিচয় দিলেও প্রথম গেমটি ছাড়া শেঠ নাটেকারের সংগে সমান তালে খেলতে পারেননি, কিন্তু ডাবলসের খেলায় উন্নত ব্যাডমিটন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। বাংগলার খেলোয়াড়দ্বয় মনোজ গুহ ও গজানন হেমাডি বোম্বাই জুটি নাটেকার ও ডোংগরেকে হারিয়ে ডাবলস চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। মনোজ এবং হেমাডি গতবারের ডাবলস চ্যাম্পিয়ন, কিন্তু এ বছর এরা কয়েকটি প্রধান প্রতিযোগিতায় সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। সম্ভবত এই ব্যর্থতা জাতীয় প্রতিযোগিতার খেলায় এ'দের মনে দৃঢ়তা এনে দেয় এবং এ'রা অপূর্ব ক্রীড়া নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে নাটেকার ও ডোংগরেকে পরাভূত করেন। পূর্বেকার খেলার ফলাফল দৃষ্টে নাটেকার ও ডোংগরেকে সবাই ডাবলসের চ্যাম্পিয়ন বলে কল্পনা করে নিয়েছিলেন। ১৫—৬ গেমে তাদের প্রথম খেলাটিতে জিততেও বিশেষ অসুবিধা হয় না, কিন্তু পরের গেমে বাংগলা ও বোম্বাইয়ের মধ্যে আরম্ভ হয় তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শূন্যপথে 'সাট্‌লকক' একবার এদিক একবার ওদিকে চালিত হচ্ছে। মনোজের র‍্যাকেট থেকে নাটেকারের র‍্যাকেটে আবার হেমাডির র‍্যাকেটে। যেন ঝড়ের পাখী। নিজের কোন গতি নেই। যে যেভাবে চালাচ্ছে সেই ভাবেই চলছে। চাপমারে মাটি ছুঁয়েও ছুঁতে পারছে না। মাটিতে পড়বার মুখেই কেউ 'সাট্‌লকক' উপরে তুলে দিচ্ছে। আবার ফাঁক খুঁজে আলতোভাবে মারবার প্রচেষ্টাও ব্যর্থ হচ্ছে। এমনি ভাবে মার প্রতিমারের দীর্ঘস্থায়ী রণে একটি করে পয়েণ্ট পেতে বাংগলা ও বোম্বাইয়ের খেলোয়াড়দের হিমসিম খেয়ে উঠতে হচ্ছে। ১৫—১২ পয়েণ্টে বাংগলা দ্বিতীয় খেলায় বিজয়ী হল। শেষ খেলায় বাংগলা সহজেই এগিয়ে গেল ৯—১ পয়েণ্টে। শ্রান্ত ক্লান্ত নাটেকার ও ডোংগরে। কিন্তু তাদের মনের দৃঢ়তা সতেজ রয়েছে। অমিতবিক্রমে খেলা আরম্ভ করলো। মার আর মার। চাপ মারের বন্যায় ব্যাডমিণ্টন কোর্ট উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। মনোজ হেমাডির জয়লাভের অদম্য আগ্রহ। শেষ পর্যন্ত বাঙলার স্বপক্ষে ১৫—১৩ পয়েণ্টে শেষ গেমের মীমাংসা হ'ল। মনোজ-হেমাডি হলেন বিজয়ী। খেলার পরে নাটেকার ও ডোংগরে স্বীকার করলেন তাদের চেয়ে বাংগলার খেলোয়াড়রা অনেক ভাল খেলেছেন।

জাতীয় ও আন্তঃরাজ্য ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতা সমাপ্তির সংগে ভারতের ব্যাডমিণ্টন খেলোয়াড়দের ক্রমপর্যায় রচিত হয়েছে। ক্রমপর্যায়ে প্রথম দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান অধিকারী খেলোয়াড়দের কোন

ডেভিস কাপ বিজয়ী আমেরিকার খেলোয়াড় টনি ট্রাবার্ট

আলীগড়ে আন্তর্বিশ্ববিদ্যালয় এ্যাথলেটিক প্রতিযোগিতায় মহিলা ছাত্রীদের উঁচু লাফের তিন বিজয়িনী। বাঁদিক থেকে—
মিস আর পেরো (৩য়)
মিস আর কামাথ (২য়)
মিস আর ভান্নাজা (১ম)

পরিবর্তন হয়নি। চতুর্থ ও পঞ্চম স্থানে অধিকারী মনোজ গুহ ও দেবীন্দার[illegible] ক্রমপর্যায় তালিকা থেকে বাদ পড়েছেন ডাবলসে পয়লা জুটি নির্বাচিত হয়েছে নাটেকার ও ডোংগরে। জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপে এরা বাংগলার খেলোয়াড় মনোজ গুহ ও জি হেমাডির কাছে হার স্বীকার করলেও সকল প্রধান প্রতিযোগিতার ফলাফল বিচারে ক্রমপর্যায় ঠিক করা হয়েছে। নীচে জাতীয় প্রতিযোগিতার খেলার ফলাফল ও ক্রমপর্যায় তালিকা দেওয়া হল।

মেনস সিংগলস

নন্দু নাটেকার (বোম্বাই) ১০—১৫, ১৫—৮ ও ১৫—২ পয়েণ্টে ত্রিলোক শেঠকে (ইউ পি) পরাজিত করেন।

মেনস ডাবলস

মনোজ গুহ ও গজানন হেমাডি (বাংগলা) পরাজিত করেন নন্দু নাটেকার ও রবীন্দ্র ডোংগরেকে (বোম্বাই) ৬—১৫, ১৫—১২ ও ১৫—১৩ পয়েণ্টে।

মিক্সড ডাবলস

নন্দু নাটেকার ও মিস শশী ভাট (বোম্বাই) ত্রিলোক শেঠ (ইউ পি) ও সুমন দেওধরকে (মহারাষ্ট্র) ১২—১৫, ১৫—৯ ও ১৫—৯ পয়েণ্টে পরাজিত করেন।

উইমেনস সিংগলস

মিসেস সুন্দর পটবর্ধন (বোম্বাই) ১১—৪ ও ১১—৫ পয়েণ্টে মিস সুমন দেওধরকে (মহারাষ্ট্র) পরাজিত করেন।

উইমেনস ডাবলস

মিস সুমন দেওধর (মহারাষ্ট্র) ও মিসেস সুন্দর পটবর্ধন (বোম্বাই) পরাজিত করেন মিসেস প্রেম পরাশর ও মিস শশী ভাটকে (বোম্বাই) ১৭—১৬ ও ১৫—৩ পয়েণ্টে।

ক্রমপর্যায়—মেনস সিংগলস

১ম—এ নাটেকার (বোম্বাই)
২য়—টি এন শেঠ (উত্তরপ্রদেশ)
৩য়—অমৃত দেওয়ান (দিল্লী)
৪র্থ—পি এস চাতলা (দিল্লী)
৫ম—গজানন হেমাডি (বাংগলা)
৬ষ্ঠ—ডি ধনগাদে (বোম্বাই)

ক্রমপর্যায়—মেনস ডাবলস

১ম—নাটেকার ও ডোংগরে (বোম্বাই)
২য়—গুহ ও হেমাডি (বাংগলা)
৩য়—দেওয়ান ও ম্যাডান (দিল্লী)

* * *

চার বছর পরে অস্ট্রেলিয়ার কবল থেকে টেনিসের শ্রেষ্ঠ মুকুট ডেভিস কাপ পুনরুদ্ধার করে আমেরিকা বিশ্ব টেনিসে নিজেদের প্রাধান্য পুনরায় প্রতিষ্ঠা করেছে। ১৯৫০ সালে আমেরিকার কাছ থেকেই অস্ট্রেলিয়া ডেভিস কাপ ছিনিয়ে নেয়, তারপর চার বছরের মধ্যে কেউই অস্ট্রেলিয়াকে হারাতে পারেনি। আমেরিকা প্রতি বছরই ফাইন্যালে

তাদের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজয় স্বীকার করেছে। এবার অস্ট্রেলিয়াকে যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে পরাভব স্বীকার করতে হল।

খেলার ধারা দেখে মনে হয়, আমেরিকা জয়লাভের অদম্য আগ্রহ নিয়ে অস্ট্রেলিয়ার সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। চারটি সিংগলস ও একটি ডাবলসের ফলাফলে খেলার জয়পরাজয় নিরূপিত হবে। প্রথম দিন দুটি সিংগলস, পরের দিন ডাবলস, তৃতীয় দিন বাকী দুইটি সিংগলসের খেলা। আমেরিকার পয়লা ও দোসরা নম্বরের খেলোয়াড় ভিক সেক্সাস ও টনিট্রাবার্ট প্রথম দিনই একটি করে সিংগলসের খেলায় জিতে জয়লাভের পথ সুগম করে রাখলেন। দ্বিতীয় দিন ডাবলসের খেলায় জয়ের সংগে সংগে ডেভিস কাপ ও তাদের করায়ত্ত হবে। অস্ট্রেলিয়ার দুই ধুরন্ধর হোড ও রোজওয়াল তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেও পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেলেন না। পরের দিন বাকী দুটি সিংগলসের জয়-পরাজয় অনেকটা নিরর্থক। তবুও হোড এবং রোজওয়ালে পরের দুটি সিংগলস জিতে পরাজয়ের গ্লানিকে লঘু করে তুললেন। শেষ-দিন খ্যাতনামা লুইস হোড ও তরুণ রোজওয়ালের খেলায় যে উন্নত টেনিস নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, প্রথম দুদিন সেই নৈপুণ্য দেখাতে পারলে খেলার ফলাফল কি হত বলা যায় না। যাই হোক যুদ্ধোত্তর টেনিসে চার বছরের অজেয় যোদ্ধা অস্ট্রেলিয়া আগামীবার আমেরিকার কাছ থেকে ডেভিস কাপ পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করবে একথা বলাই বাহুল্য। তবে চার বছর অস্ট্রেলিয়া আমেরিকার সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে আপন দেশে। এবার অস্ট্রেলিয়াকে বিশ্বের অপর গোলার্ধে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে। নীচে ডেভিস কাপের এ বছরের ফাইন্যালের ফলাফল দেওয়া হল।

টনি ট্রাবার্ট (ইউ এস এ) ৬—৭, ২—৬, ১২—১০ ও ৬—৩ গেমে লুইস হোডকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

ভিক সেক্সাস (ইউ এস এ) ৬—৮, ৬—৪ ও ৬—৩ গেমে কেন রোজওয়ালকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

আমেরিকার পয়লা নম্বর খেলোয়াড় ভিক সেক্সাস

ভিক সেক্সাস ও টনি ট্রাবার্ট (ইউ এস এ) ৬—২, ৪—৬, ৬—২ ও ১০—৮ গেমে লুইস হোড ও কেন রোজওয়ালকে (অস্ট্রেলিয়া) পরাজিত করেন।

কেন রোজওয়াল (অস্ট্রেলিয়া) ৯—৭, ৭—৫ ও ৬—৩ গেমে টনি ট্রাবার্টকে হারিয়েছেন।

লুইস হোড (অস্ট্রেলিয়া) ভিক সেক্সাসকে (ইউ এস এ) হারান ৪—৬, ৬—৩, ৬—২ ও ৬—৩ গেমে।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট:—আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আঞ্চলিক খেলায় বিহার ৬৮ রানে কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়কে পরাজিত করেছে। পাটনায় খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। বিহার প্রথম ও দ্বিতীয় ইনিংসে যথাক্রমে ১৮৭ ও ১৭৮ রান এবং কলকাতা প্রথম ইনিংসে ১৬২ ও দ্বিতীয় ইনিংসে ১৩৫ রান করে। বিহারের রাজেন সান্যাল দ্বিতীয় ইনিংসে ১১০ রান করে ব্যাটিংয়ে নৈপুণ্য দেখিয়েছেন।

নৈহাটিতে আফগান ভলিবল টীমের প্রদর্শনী খেলা। গত সপ্তাহে নৈহাটি রেলওয়ে মাঠে নৈহাটি এ সি ও আফগান দলের মধ্যে এই খেলা অনুষ্ঠিত হয়

দেশী সংবাদ

২৭শে ডিসেম্বর—আমেদাবাদে ভারতীয় ইতিহাস কংগ্রেসের সপ্তদশ অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডাঃ এন পি চক্রবর্তী সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন যে, বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রগুলিকে আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সহিত পরিচিত করিয়া তুলিবার জন্য বৃটিশ কাউন্সিলের ন্যায় ভারতীয় পরিষদ গঠন করা উচিত।

নয়াদিল্লীতে ভারত-পাকিস্থান রেলওয়ে ষ্ট্যান্ডিং কমিটি এবং রেলওয়ে ষ্টোর্স কমিটির অধিবেশন শেষ হইয়াছে। এই বৈঠকে স্থির হইয়াছে যে, ভারত এবং পাকিস্থানের এলাকায় যে সকল অবিভক্ত রেলওয়ে সরঞ্জাম রহিয়াছে, ঐগুলি সেই সেই দেশেরই সম্পত্তি হইবে।

২৮শে ডিসেম্বর—বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও অস্ট্রেলিয়ায় ভারতের প্রাক্তন হাই কমিশনার ডাঃ আর পি পরাঞ্জপের সভাপতিত্বে আজ পাটনায় নিখিল ভারত শিক্ষা সম্মেলনের চার দিনব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডাঃ পরাঞ্জপে তাঁহার ভাষণে শিক্ষকদের প্রতি ন্যায় বিচার করিবার আবেদন জানান।

গত কয়েক দিন ধরিয়া পূর্ববঙ্গ হইতে কলিকাতায় উদ্বাস্তু সমাগম বৃদ্ধি পাইয়াছে। গত সোমবার ৩০৬টি উদ্বাস্তু পরিবারের প্রায় ১৫০০ জন লোক শিয়ালদহ স্টেশনে উপনীত হয়।

২৯শে ডিসেম্বর—নবগঠিত পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক সভায় শ্রীঅতুল্য ঘোষ তৃতীয়বারের জন্য পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি পুনর্নির্বাচিত হন।

বিহারে 'বাংলা, বাঙালী ও বাংলা ভাষা সম্বন্ধে অকথ্য কটূক্তি'র বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির এক সাধারণ সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তুদের গৃহ নির্মাণ ঋণ বাবদ ভারত সরকার ১৯৫৪-৫৫ সালের তৃতীয় ত্রৈমাসিককালের জন্য প্রায় এক কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৩০শে ডিসেম্বর—ভারত সরকার ১৯৫৫ সালের প্রথম ছয় মাসের আমদানী নীতি ঘোষণা করিয়াছেন। সরকারের এই আমদানী নীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, কতিপয় দ্রব্যের বিশেষ করিয়া শিল্পে ব্যবহার্য কাঁচামাল আমদানীর ব্যাপারে অধিকতর সুবিধা দান এবং যে সমস্ত শিল্প ইতিমধ্যেই সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে বা উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে সেই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী সম্পর্কে আমদানী কোটা হ্রাস।

গত এক বৎসরে পূর্ব পাকিস্থান হইতে ৪০ হাজারের অধিক উদ্বাস্তু পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া আসিয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তন্মধ্যে গত জুলাই মাস হইতে বিগত ছয় মাসেই ৩২ হাজারের অধিক নরনারী পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করিয়া আসে।

৩১শে ডিসেম্বর—যুগোশ্লাভ প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো আজ কলিকাতায় পৌঁছিলে নাগরিকগণের উচ্ছ্বসিত বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন।

আজ লক্ষ্ণৌতে প্রচুর উৎসাহ-উদ্দীপনার মধ্যে নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন। সম্মেলনের মূল সভাপতি ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁহার অভিভাষণে বলেন, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য-কর্মীদিগকে প্রমাণ করিতে হইবে যে, বাংলাদেশ, বাঙালী জাতি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য এক ও অখণ্ড।

১লা জানুয়ারী—ভারতের বিশিষ্ট বিজ্ঞানী এবং ভারত সরকারের প্রাকৃতিক সম্পদ ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা দপ্তরের সেক্রেটারী ডাঃ এস এস ভাটনগর আজ রাত্রি সাড়ে আটটায় হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হইয়া নয়াদিল্লীতে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬০ বৎসর হইয়াছিল।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু জাকর্তা হইতে দিল্লী প্রত্যাবর্তনের পথে আজ কলিকাতায় পৌঁছেন। কলিকাতায় রাজভবনে উপনীত হইয়া শ্রী নেহরু প্রথমেই যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটোর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

নাগপুরে ভারতীয় জাতীয় ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেসের সপ্তম সম্মেলনের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণ প্রসঙ্গে শ্রী এস আর বাসোয়াড়া বলেন যে, শিল্প কর্মীদের বেতন, ভাতা এবং বোনাস প্রভৃতি নির্ধারণের জন্য গবর্নমেণ্টের একটি বেতন কমিশন নিয়োগ করা কর্তব্য।

২রা জানুয়ারী—আচার্য বিনোবা ভাবে আজ শালতোড়ায় এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, ভূদান যজ্ঞ মারফৎ যে ৩৩ লক্ষ একর জমি দানস্বরূপ পাওয়া গিয়াছে, তাহা ভূমিহীনদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ আজ ভাকরা পরিকল্পনার প্রথম বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষেত্র গাঙ্গুয়াল উৎপাদন কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

আজ লক্ষ্ণৌতে নিখিল ভারত বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনের তিনদিনব্যাপী অধিবেশন সমাপ্ত হয়। এই দিন খ্যাতনামা হিন্দী সাহিত্যিক শ্রীঅমৃতলাল নাগরের সভাপতিত্বে ভারতীয় ভাষা ও সাহিত্য শাখার অধিবেশন হয়। শ্রী নাগর তাঁহার অভিভাষণে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষার পুষ্টিসাধনে বাংলা সাহিত্যের অবদানের কথা বিশেষ জোরের সহিত উল্লেখ করেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ নয়াদিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

বিদেশী সংবাদ

২৮শে ডিসেম্বর—ভারত, পাকিস্থান, সিংহল, ব্রহ্ম ও ইন্দোনেশিয়ার প্রধান মন্ত্রিবর্গ অদ্য দ্বিতীয় "কলম্বো শক্তি" বৈঠকে মিলিত হন। ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকর্তার নিকটবর্তী বোগর শৈলাবাসে প্রেসিডেণ্ট সুকর্ণর প্রাসাদে রুদ্ধদ্বারকক্ষে আড়াই ঘণ্টাকাল পঞ্চশক্তির বৈঠক হয়। বৈঠক অন্তে ঘোষণা করা হয় যে, আগামী বৎসর এপ্রিল মাসে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশসমূহের এক সম্মেলন আহ্বান করা হইবে।

২৯শে ডিসেম্বর—এশিয়ার পাঁচজন প্রধান মন্ত্রী (ভারত, ব্রহ্ম, পাকিস্থান, সিংহল ও ইন্দোনেশিয়া) আজ বোগরে, তাঁহাদের দুই দিনব্যাপী বৈঠকের শেষে ঘোষণা করেন যে, কোনরূপ আঞ্চলিক রাষ্ট্রজোট গঠনের উদ্দেশ্যে প্রস্তাবিত আফ্রিকা-এশিয়া সম্মেলন আহ্বান করা হইতেছে না।

৩০শে ডিসেম্বর—আজ ফরাসী জাতীয় পরিষদ জার্মানীর পুনরস্ত্রসজ্জা পরিকল্পনা চূড়ান্তভাবে অনুমোদন করিয়াছে। পরিকল্পনার পক্ষে ২৮৭ এবং বিপক্ষে ২৬০ ভোট হইয়াছে।

১লা জানুয়ারী—সোভিয়েট প্রধান মন্ত্রী মঃ জর্জি মালেনকভ নববর্ষ উপলক্ষে আমেরিকার অধিবাসীদিগকে আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, রাশিয়া ও আমেরিকার অধিবাসীদের মধ্যে নিবিড়তর মৈত্রীর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার পূর্ণ অবসর রহিয়াছে।

পাক্ প্রধান মন্ত্রী জনাব মহম্মদ আলী আজ এক বেতার ভাষণে বলেন, শান্তি আমাদের জীবনের মূলধন এবং তজ্জন্যই আমি কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য পুনরায় ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত সরাসরি আলোচনার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করিয়াছি। মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে আমাদের মধ্যে সাক্ষাৎকার ঘটিবে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
সংখ্যা ১১

শনিবার
১ মাঘ, ১৩৬১

DESH

SATURDAY, 15TH JANUARY, 1955

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

কলিকাতায় চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদল

চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলের কলিকাতায় আগমনে শহরের পৌর জনসমাজ, বিশেষভাবে তরুণদের মধ্যে উৎসাহ-উদ্দীপনার সঞ্চার হইয়াছে। দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক সংযোগ ও সম্পর্কের ক্ষেত্রে বর্তমানে রাজনীতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থই সাধারণত বড় হইয়া দেখা দেয়। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে সেই স্বার্থ সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন না আছে, এমন কথা অবশ্য আমরা বলি না। কিন্তু সে ক্ষেত্র অনেকটা সীমাবদ্ধ এবং সংকীর্ণ—তেমন প্রতিবেশের মধ্যে মানুষ মানুষকে ঠিক আপনার করিয়া পায় না। প্রকৃতপক্ষে সংস্কৃতির উদার ক্ষেত্রেই মানুষের সঙ্গে মানুষের হৃদ্যতা বলিষ্ঠ হইয়া উঠে। সুখের বিষয় এই যে, সাংস্কৃতিক অন্তরঙ্গতার এই উদার পরিবেশের মধ্যেই চীনা প্রতিনিধিদলকে আমরা পাইয়াছি এবং রাজনীতিক ও অর্থনীতিক বিচার সাক্ষাৎ-সম্পর্কে আমাদের দৃষ্টিকে এক্ষেত্রে পরিচ্ছিন্ন করিতে পারে নাই। প্রকৃতপক্ষে ভারতের সহিত চীনের ঘনিষ্ঠতা দুই হাজার বৎসরের প্রাচীন এবং তাহা পারস্পরিক রাজনীতিক এবং অর্থনীতিক স্বার্থের ঊর্ধ্বে সাংস্কৃতিক পথেই গড়িয়া উঠে। সেই সম্পর্ক পারস্পরিক প্রীতির পথে উভয় দেশের ভিতরকার ব্যবধান দূর করিয়া দেয়। চীনা প্রতিনিধিদলের নেতা মিঃ চেন টু এই প্রসঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কবিকে তিনি চীনাদের বন্ধু বলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সহিত চীনের এই যে সম্পর্ক—সাংস্কৃতিক পথেই তাহা প্রতিষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশ ও জাতির ব্যবহারিক জীবনের বৈচিত্র্য এবং বিভেদ সত্ত্বেও মানুষ হিসাবে মানুষের যোগ আছে। ভারতের সাধনা এই সাম্যের বলেই বিশ্বমানবকে আপনার করিয়া লইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে এই ব্রহ্মসূত্র উন্মুক্ত হইয়াছিল। ভারতের সংস্কৃতির মর্মমূলে মৈত্রীর রীতিকে তিনি ধরিয়া ফেলিয়াছিলেন। আজকাল সংস্কৃতির ব্যাখ্যা অনেক রকমে হইতেছে। কিন্তু কোন জাতির সংস্কৃতি বলিতে অভিজাত-জীবনের উপরভাসা রকমের মানস-বিলাস বোঝায় না। সংস্কৃতি দুই দিনের হুজুগে বা ফ্যাশানও নয়। প্রত্যুত সমগ্র জাতি ও সমাজের চেতনাসংবদ্ধ সঞ্জীবনাত্মক সর্বজনীন রসানুভূতির পরিস্ফূর্ত রূপই তাহার সংস্কৃতি এবং সেই উৎস-সংযোগেই বহির্জগতের সঙ্গে জাতির সম্পর্ক যুগোগতভাবে সম্প্রসারিত হইবার নৈতিক শক্তি লাভ করে। চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া আমরা ভারতীয় সাধনার সেই সনাতন ঐতিহ্যের সম্বন্ধে সচেতন হইবার সুযোগ লাভ করিয়াছি। আমাদের সংস্কৃতির নিজ বীজ অন্তরে উপলব্ধি করিয়া আমরা প্রতিনিধিদলকেও নিজ করিয়া পাইয়াছি। ফলত পারস্পরিক সংযোগ ও সৌহার্দের পক্ষে রাজনীতিক ও অর্থনীতিক স্বার্থ নিতান্তই পরোক্ষ। বিশ্ব-জীবনের মূলীভূত ঐক্যের সাংস্কৃতিক পথ ছাড়িয়া বিভিন্ন জাতির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিতে গেলে ভুলই করা হয়।

পশ্চিমবঙ্গের দাবীতে বিক্ষোভ

বিহারের প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শ্রীযুত অতুল্য ঘোষের উপর খাপ্পা হইয়াছেন। ঘোষ মহাশয় সত্যকে বিকৃত করিয়াছেন এবং অবান্তরভাবে বিহার কংগ্রেস, বিহার সরকার, অধিকন্তু বিহারের কতকগুলি জনপ্রতিষ্ঠানকে আক্রমণ করিয়াছেন, ইহাই তাঁহাদের অভিযোগ। ওদিকে বিহারের কংগ্রেস কর্মীদের ধীরতার সীমা নাই। পশ্চিমবঙ্গ হইতে প্রায় প্রতিদিনই লোকে গিয়া বিহারে নিজেদের পক্ষে প্রচারকার্য চালাইতেছে, অথচ বিহার কংগ্রেস অপরিসীম সংযমের সঙ্গে সেইভাবের প্রচার কার্য হইতে বিরত আছেন। তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া হানা দিতেছেন না, এতই তাহাদের কৃপা। অধিকন্তু বিহারের বাংলা ভাষাভাষীদিগকে স্বাধীনভাবে রাজ্য কমিশনের কাছে নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করিতে তাঁহারা পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়াছেন। কিন্তু এই স্বাধীনতার স্বরূপ দেখিয়া আমরা হতবাক্ হইয়া পড়িয়াছি। বিহার কংগ্রেস কমিটির এই সাফাইয়ে যে সত্যের অপলাপ কি আন্দাজ ঘটিয়াছে, বিহারেরই কয়েকখানা সংবাদপত্র পাঠ করিলেও তাহা স্পষ্ট হইয়া পড়ে। প্রকৃতপক্ষে অল্প কিছু দিনের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্তবর্তী কয়েকটি স্থানে বিভিন্ন সম্মেলনের অছিলায় বাঙালী ও বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে

বেপরোয়াভাবে, এমনকি সভ্য সমাজের রীতিবিগর্হিত ভাষায় প্রচারকার্য চালানো আরম্ভ হইয়াছে। বিহারের কংগ্রেসকর্মীরাই শুধু নহেন, বিহার সরকারের মন্ত্রীরাও এইসব সম্মেলনের সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট আছেন এবং সক্রিয়ভাবেই তাঁহারা এই অপ-প্রচারে সাহায্য করিয়াছেন। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং আসরে নামিতে ইতস্তত করেন নাই। বিহারের এক ইঞ্চি জমি ছাড়া হইবে না, তিনিও শাসাইয়াছেন। এসব কথা চাপা থাকিবার বিষয় নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেদিন আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, বাংলা ভাষার ন্যায় সমৃদ্ধ এবং গৌরবময় ঐতিহ্যসম্পন্ন ভাষা অপর ভাষার চাপে পিষ্ট হইবার নয়। ইহা আমরাও বুঝি। বাংলা ভাষাকে পিষ্ট করা সম্ভব হইবে না, ইহা নিশ্চয়; কিন্তু পিষ্ট করিবার জন্য বলপ্রয়োগ, ভীতি প্রদর্শন প্রভৃতি নানা গর্হিত উপায়ে চেষ্টা যে বিহারে হইতেছে, ইহা তো অস্বীকার করা যায় না এবং তেমন চেষ্টার ফলও ভাল হইতে পারে না। ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ ইহা বেশই বুঝিতে পারেন। অথচ এই বিতর্ক অবলম্বন করিয়া প্রাদেশিক তিক্ততা উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে, ইহাও তাঁহারা দেখিতেছেন। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এজন্য অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে কুণ্ঠিত হইতেছেন, ইহাও স্পষ্ট দেখিতেছি। এ অবস্থায় তাঁহাদের মুখে বাংলা ভাষার ফাঁকা মাহাত্ম্য শুনিয়া আমরা কৃতার্থ হইতে পারি না।

উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের রীতি ও নীতি

ভারত সরকারের পুনর্বাসন সচিব শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের লোকসভা এবং পরিষদের সদস্যদিগকে লইয়া একটি সম্মেলনে সমবেত হইয়াছিলেন। শ্রীযুত খান্না উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে নূতন কথা বিশেষ কিছু বলেন নাই। বস্তুত এতৎসম্পর্কে সরকারের অবলম্বিত নীতিরই তিনি নূতন করিয়া ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করিয়াছেন। পুনর্বাসন সমস্যার গুরুত্ব এবং সে পথের অন্তরায়গুলির কথা তিনি শুনাইয়াছেন। কিন্তু এগুলি দফায় দফায় শুনাইয়া লাভ কি, বুঝি না। সমস্যার কতটা সমাধান হইল, ইহাই বিবেচ্য। উদ্বাস্তু যুবকদিগকে কারিগরী শিক্ষা দিবার জন্য সরকার হইতে কিরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে, শ্রীযুত খান্না সে সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন, কিন্তু শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকরা যদি উপজীবিকার সংস্থান লাভ না করে, তবে এমন সব ব্যবস্থার কোন সার্থকতাই থাকে না। ফলত বহুসংখ্যক যুবক এইরূপ শিক্ষালাভ করিয়াও কোন কাজ না পাইয়া কলিকাতার রাজপথে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। সরকার ঐসব উদ্বাস্তু যুবকদিগকে কাজ দিবার জন্য ব্যবসা-বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন, কিন্তু পুনর্বাসন সচিবের উক্তি হইতেই স্পষ্ট জানা গিয়াছে যে, সে সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার ফল আশাপ্রদ হয় নাই। বিভিন্ন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানকে এই সব বেকার উদ্বাস্তু যুবকদের কর্মের সংস্থান করিবার জন্য সরকারের অনুরোধে বিশেষ সাড়া মিলে নাই, ইহাও দেখা যায়। এখন ভরসা রহিয়াছে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে। এতদ্দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, পুনর্বাসনের ক্ষেত্রে সরকার হইতে বাস্তব অবস্থার যথোচিত বিবেচনার দ্বারা কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতেছে না কিংবা সংকল্পশীলতার সহিত তাঁহাদের এতৎসম্পর্কিত নীতি প্রযুক্ত হইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গের পুনর্বাসন সমস্যার জটিলতা আছে, আমরাও স্বীকার করি; কিন্তু সেই অসুবিধাকে স্বীকার করিয়া লইয়াই সমাধানের পথ অবলম্বন করিতে হইবে এবং সেক্ষেত্রে দেশের স্বার্থের বৃহত্তর দিকটাকেই বড় করিয়া দেখা দরকার। সকলের স্বার্থ, অর্থাৎ ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মন যোগাইয়া এবং প্রাদেশিক স্বার্থগত রুচি ও মর্জি মিটাইয়া চলিতে গেলে এই সমস্যার সমাধান সহজে হইবে বলিয়া আমরা মনে করি না। প্রত্যুত বিভিন্ন সম্মেলনে সরকারের সদিচ্ছামূলক নীতির বিবৃতি কিংবা পরিসংখ্যানগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের বিচারমাত্রে দেশবাসী সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। সে সমস্যার নূতনত্ব কিছুই নাই; সুতরাং ইহার সমাধানে সরকারী কর্মপন্থাও সুনির্দিষ্ট পথে পরিচালিত হওয়া আবশ্যক।

স্বামী বিবেকানন্দ

অমৃতের সন্তান বলিয়া এদেশের সাধক এবং তত্ত্বদর্শীরা মানুষকে আহ্বান করিয়াছিলেন। তাঁহারা বলিয়াছিলেন এই বিশ্বসৃষ্টির মধ্যে মানুষের শক্তি সামান্য বলিয়া প্রতীত হইলেও সে অনন্তের অধিকারী। অজ্ঞানতার জন্যই তাহার পরাভব এবং এই অজ্ঞানতার জন্যই অদৃষ্ট, নিয়তি, এইগুলির স্থান মানুষের জীবনে আসিয়া পড়ে এবং মানুষ বদ্ধ হয়। এই বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার শক্তি মানুষের আছে। সেখানে আলোকের রাজ্য, সব পরিস্কার, মানুষের পূর্ণ অধিকার। দীর্ঘ পরাধীনতার ফলে এদেশের প্রাণবীর্য প্রসুপ্ত হইয়া পড়ে এবং প্রমাদ, আলস্য নিদ্রার জড়তায় এদেশের সমাজজীবন অভিভূত হয়। এদেশে মানবধর্মের পরিম্লান ঘটে। এই দুর্দিনে এক প্রাণবান মহাপুরুষ এই বাঙলার বুকে আবির্ভূত হন। বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের কণ্ঠে অমৃতের বাণী বাজিয়া উঠে। সেই বাণীর মূর্ছনা আত্মভাবনাকে জীবন্ত করিয়া তোলে। অন্তরের সুপ্ত দেবতাকে স্বামীজী বাহিরে দীপ্ত করিয়া ধরেন। তিনি দেখাইয়া দেন নরের ভিতরে নারায়ণকে। ত্যাগ এবং সেবার পথে মানুষ পরম বলে প্রতিষ্ঠিত হয়। যুগাগত দৈন্য, গ্লানি এবং কুসংস্কার হইতে মুক্ত জাতির অন্তরশতদল নব প্রভাতের অরুণোদয়ে উজ্জ্বল হইয়া ফোটে এবং অমল ধবল সেই কমলের পরিমল দিগ্দিগন্তে ছোটে। ভারতের মুক্ত আত্মার সেই অনাময় প্রকাশ, তাহার বৈভব বিলাসের ভাস্বর সূর্যস্বরূপ স্বামীজীর আবির্ভাব তিথিতে বৈদিক ঋষিদের অন্তরের আকুতিই আমাদের চিত্তে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। আমাদের আজ এই প্রার্থনা—জাগো দেবতা আবার জাগো, প্রাণ দাও বল দাও—"তমসো মা জ্যোতির্গময়, মৃত্যো র্মা অমৃতংগময়।"

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

আ লোচনাটা চলেছে বেশ কিছুদিন ধরেই। প্রয়োজন আছে কি সাধারণ পাঠকমহলে বিজ্ঞান সংবাদ পরিবেশনের? বিশ্বজগতে সংবাদ সরবরাহের দায়িত্ব ও বিজ্ঞান সংবাদের গুরুত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি না, তা এক বিরাট প্রশ্ন। বহু দায়িত্বশীল সমালোচক মহল থেকে বিভিন্ন মনোভাব প্রচারের জন্য এ আলোচ্যবিষয় খুবই জটিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। দৈনিক ও সাময়িকপত্র মারফৎ যে বিশ্বপরিচয় সাধারণ পাঠকমহল গ্রহণ করেন তার থেকে বিজ্ঞানজগতের ঘটনাবলী বাদ গেলে মানসিক সম্পূর্ণতা লাভ করা অসম্ভব। বর্তমান জগতের প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে বিজ্ঞান অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত, তাকে বাদ দিয়ে দৃষ্টিভঙ্গী গঠন করার চেষ্টা বাতুলতা ছাড়া আর কিছুই নয়। পাঠকসাধারণকে জগতের পরিবেশের সাথে পরিচিত করে স্বাধীন মনোভাব গঠন করতে সাহায্য করাই দৈনিক ও সাময়িক পত্রের অন্যতম প্রধান কর্তব্য, সুতরাং সেই উদ্দেশ্যেই বিজ্ঞানকর্মী ও বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সংবাদ প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই বিখ্যাত বিলাতী পত্রিকা "নেচার"এর অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক ব্রিম্‌বল্‌ সাহেব বক্তৃতা প্রসঙ্গে পত্রপত্রিকাতে বিজ্ঞান সংবাদ প্রকাশের গুরুত্বের উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, সংবাদ প্রতিষ্ঠানসমূহ বিজ্ঞানীদের সাহায্য গ্রহণ করতে সর্বদাই প্রস্তুত। কিন্তু বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাই এ বিষয়ে পেছিয়ে আছেন। সংবাদ প্রতিষ্ঠানের প্রতি কর্তব্য সম্বন্ধে তাঁরা এখনও খুব সজাগ নন। বিজ্ঞানীরা মনে করেন সাধারণলোকের জন্য সহজবোধ্যভাবে কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত করা কঠিন ব্যাপার। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁরা কোনদিন চেষ্টা করেও দেখেন না সহজবোধ্য লেখা তাঁদের পক্ষে সম্ভব কি

না। অনেক বিজ্ঞানকর্মী আবার সমালোচনা ভয়ে বিজ্ঞান রচনা বা সংবাদ পরিবেশনে বিরত থাকেন। তাছাড়া যেসব বিজ্ঞানকর্মী সাধারণের উপযোগী করে লিখতে চেষ্টা করেন, তারাও আবার সময়-সময় বিজ্ঞানীমহলে আদর পান না। একথা ভুললে চলবে না, বিজ্ঞানজগতের সঙ্গে দেশবাসীর পরিচয় ঘটাবার দায়িত্ব কেবলমাত্র সংবাদ প্রতিষ্ঠানের নয় দেশের বিজ্ঞানকর্মীদেরও। ব্রিমবল্ সাহেব বলেছেন, "আমাদের সংবাদ প্রতিষ্ঠানসমূহ বর্তমানে বিজ্ঞানের প্রতি খুবই সহানুভূতিশীল এবং তাঁদের এই মনোভাবকে উৎসাহিত করার দায়িত্ব বিজ্ঞানীদের।" সাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী পরিচালিত করবার মহান দায়িত্বকে অস্বীকার করে কেন বিজ্ঞানীরা সংবাদ প্রতিষ্ঠান থেকে দূরে থাকেন? এই প্রশ্নের সুন্দর জবাব দিয়েছেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডাঃ কোহেন। ডাঃ কোহেন লিখেছেন,—সংবাদ প্রতিষ্ঠানসমূহ যেভাবে বিজ্ঞানের মূলগত তথ্যাবলী এবং নতুন আবিষ্কার পাঠকমহলে প্রচার না করে কেবলমাত্র বিজ্ঞানের চাঞ্চল্যকর সংবাদ পরিবেশনের দিকে দৃষ্টি দিয়েছেন, বিজ্ঞানীমহলে তা সমালোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

সত্যিই কি সংবাদ প্রতিষ্ঠানসমূহ বিজ্ঞানের মূলগত তথ্যাবলী পরিবেশনে বিরত আছেন? এ বিষয়ে সত্যাসত্য নির্ধারণ করা খুবই কঠিন কাজ, এরজন্য প্রতিটি সংবাদপত্রের বিজ্ঞানসংবাদের হিসাবনিকাশ প্রয়োজন। ইম্পিরিয়াল কলেজ অব্ সায়েন্স এ্যান্ড টেক্‌নলজির একদল ছাত্র এক মাস ধরে কয়েকটি পত্রিকার বিজ্ঞান সংবাদ জরিপ করেছিলেন। প্রতিটি বিজ্ঞান সংবাদ বিচক্ষণতার সঙ্গে পর্যালোচনা করে তাঁরা নিম্নলিখিত ফলাফল প্রকাশ করেছেন।

সংবাদপত্র		বিজ্ঞানের জন্য নিয়োজিত স্থান %	খবরের সংখ্যা	প্রতিটি খবরের গড় দৈর্ঘ্য (ইঞ্চি)
দি টাইমস্ ...	...	০.৭০	৬০	৫.৫
ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান	...	০.৪০	২৩	৭.৫
এক্সপ্রেস ...	...	০.১৩	১১	৩.৭
মেইল ...	...	০.১৫	১০	৫.৩
স্কেচ্ ...	...	০.১২	১০	৪.৪
টেলিগ্রাফ ...	...	০.২৫	২০	৫.৩
হেরাল্ড ...	...	০.৪৫	৯	১৪.৫
নিউজ ক্রনিকলস্ ...	...	০.২৫	১৩	৬.২

যে মাসে পর্যবেক্ষণ করা হয়েছিল দুর্ভাগ্যবশত সে মাসে কোন অস্বাভাবিক ঘটনা না ঘটার জন্য কেবলমাত্র বিজ্ঞানের মূলগত তথ্য ও আলোচনামূলক প্রবন্ধের জন্য নিয়োজিত স্থানের মোটামুটি একটা হিসাব পাওয়া গেছে। সম্পাদকমণ্ডলী মন্তব্য করেছেন, এই সমস্ত পত্রিকার বিজ্ঞানরচনাবলীর মান এক নয়। যেমন 'দি টাইমস্' পত্রিকার তুলনায় স্কেচ্ পত্রিকা খুবই হাল্কাভাবে বিজ্ঞান পরিবেশন করে। নিয়োজিত স্থানের পরিমাণটাও নিশ্চয়ই আপনাদের অবাক্ করেছে। ভারতের কথা দূরে রাখুন, বর্তমান বিজ্ঞানজগতে ইংল্যান্ডেও সাধারণ পত্র-পত্রিকাতে শতকরা ১ ভাগ স্থানও বিজ্ঞান সংবাদের জন্য ব্যয় করা হয় না। অবশ্য ইংল্যান্ডের পাঠকমণ্ডলী জনপ্রিয় বিজ্ঞান পত্রিকাসমূহ নিয়মিত পাঠ করেন, সুতরাং সাধারণ পত্রিকায় বিজ্ঞান সংবাদের অভাব পূরণে তাঁদের অসুবিধা ঘটে না। খুবই আশ্চর্যের কথা, বিজ্ঞান সংবাদ যতই কম থাকুক না কেন, ঐ দেশে প্রায় প্রতিটি পত্রিকাতেই নিদেনপক্ষে একজন বিজ্ঞান সম্পাদক অথবা বিজ্ঞান সমালোচক আছেন, যাদের কাজ পত্রিকার বিজ্ঞান সংবাদ পরিবেশনের নিজস্ব পদ্ধতি নিরূপণ করা।

বিশ্বের অগ্রগতির সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলবার জন্য স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রতিটি নাগরিকেরই সাধারণ বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বর্তমান জড়জগতে বিজ্ঞানসম্মত মনোভাবের একান্ত দরকার। বিজ্ঞান-শিক্ষার প্রসারই চিন্তাজগতের এই বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে, তাই জনমতের পরিবাহক সংবাদপত্রসমূহকে এ বিষয় অনেকবেশী দৃষ্টি দিতে হবে। পাঠককে আকৃষ্ট করতে হবে বিরাট এই বিজ্ঞান জগতের ঘটনাবলীর দিকে। যে বিজ্ঞানের দানে মানুষের জীবন সর্বদিকে সর্ববিষয়ে পরিপূর্ণ তাকে অবহেলা করে ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ানো কোন দেশের পক্ষেই নিরাপদ নয়।

খুবই আশার কথা বাংলাদেশের সংবাদপত্রসমূহ এ বিষয়ে যথেষ্ট মনোযোগ দিয়েছেন। নিয়মিত বিজ্ঞান রচনাবলী প্রকাশ করে পাঠকসাধারণকে তাঁরা পরিচিত করিয়ে দিচ্ছেন বিজ্ঞানজগতের বিরাট পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে। কিন্তু তবুও তাঁদের কাজ সম্পূর্ণ হয়নি। বিজ্ঞান প্রতি-মুহূর্তেই এগিয়ে যাচ্ছে ভবিষ্যতের দিকে, তার প্রতিটি পদক্ষেপের সঙ্গে সংযোগসাধন করতে হবে পাঠকমহলের। নিয়মিত চিন্তাকর্ষক আলোচনার মাধ্যমেই এই কাজ করা সম্ভব। এই আলোচনা হবে সহজ, সরল ও সুন্দর। গল্পের মধ্য দিয়ে পরিবেশন করতে হবে দুরূহ সমস্যার, জানবার ইচ্ছাকে জাগিয়ে তুলতে হবে আকর্ষণীয় শক্তির মাধ্যমে, তবেই আবির্ভাব ঘটবে বিশ্লেষণকারী চিন্তাশক্তির ও বৈজ্ঞানিক মনোভাবের যার প্রয়োজন আজকের ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী।

সেই থেকেই আলাপ। চোখ তুলতে ভদ্রলোক হাত তুলে নমস্কার করে' স্মিতমুখে এক পাশে দাঁড়িয়ে রইলেন।

অবনী আলাপ করিয়ে দিলে, এ'র কথাই বলেছিলুম, আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। আপনার লেখার খুব ভক্ত—

তোলা চোখটা সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিলুম। কি জানি কেন, ভদ্রলোকের মুখটা কেমন কৌতুককর মনে হলো। হয়তো বা সশরীরে ভক্তের সাক্ষাৎ লাভের জন্যে মনের এই অবস্থা। ভদ্রলোক খুবই আন্তরিক।

অবনী বললে, আপনার কোন লেখাই বাদ নেই, যেখানে যা লেখেন উনি ঠিক সন্ধান রাখেন! 'সময় বয়ে যায়' বলে কোন কাগজে লিখেচেন নাকি?

মাথা নাড়লুম অপরাধীর মত।

দেখুন, আমরা কেউ জানি না, উনি কিন্তু ঠিক সন্ধান করে' পড়েচেন আপনার লেখা! বলছিলেন, গল্পটা খুব চমৎকার!

আরো অপ্রস্তুত। কি বলে ভদ্রলোককে প্রথম সম্ভাষণ করবো ভেবে পেলুম না। অবনীর মুখ দিয়ে ভদ্রলোক পরিচয়-সম্ভাষণের আর বাকি রাখেননি।

আড়ষ্ট কণ্ঠে বললুম, বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন!

তেমনি হাসি-খুশী মুখে ভদ্রলোক বললেন, ঠিক আছে!

মানে, ভক্তের পক্ষে এটুকু ক্লেশ স্বীকার কিচ্ছু নয়। তবু কেমন দৃষ্টিকটু লাগে, পাশের চেয়ারটা দেখিয়ে বললুম, বসুন না! শুধু শুধু দাঁড়িয়ে থাকবেন কেন।

ভদ্রলোক তেমনি নিঃশব্দে হাসলেন। চেয়ারটা খালি রইল।

অবনী বললে, আপনারা আলাপ করুন। যাই, ওদিকে সহায় বেটা ঠিক চর লাগিয়েচে—সিট্ থেকে একটু যদি কোথাও যাবার উপায় আছে! অমরবাবু এই আপনার লেখক, আপনি এবার বুঝেপড়ে' নিন—আলাপ করিয়ে দিলুম, ব্যস।

অবনী চলে যেতে নৈঃশব্দটা যেন প্রকট হয়ে উঠলো। ভদ্রলোক না বসা পর্যন্ত অস্বস্তিবোধ করতে লাগলুম। হাতের কাজ ছেড়ে নিজেই উঠে দাঁড়াব কিনা ভাবছি, অমরবাবু পাশে এসে বসলেন। ভক্তি গদগদ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করছেন, কি করচেন?

লুকোবার কিচ্ছু নেই। সরকারের

গোলাগুলী-বাবুদের কারখানার লাভ-লোকসানের হিসেব করছি। উপস্থিত যোগফলটা বার বার গুলিয়ে যাচ্ছে। চোখ তুলে হাসলুম।

ব্যথিত কণ্ঠে অমরবাবু বললেন, এসব কাজ কিন্তু আপনাকে মানায় না।

আবার হাসলুম।

হাসিটা লক্ষ্য করেই অমরবাবুর কণ্ঠটা আরো উচ্চ হয়ে উঠলো, সত্যি আপনাকে মানায় না, বিশ্বাস করুন। আপনার কি এই যোগ্য?

বিশ্বাস করলেও কৌতুকবোধ করতে বাধা নেই। বললুম, না মানাবার কি দেখলেন বলুন! অযোগ্যতাটা কোন্‌খানে?

অমরবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, ছি, ছি, কি যে বলেন! কাজটার কথাই বলচি!

হেসেই বললুম, কেন বেশ তো কাজ! কোন ঝামেলা নেই, কোনরকমে টোটালটা ঠিক করতে পারলে দায়িত্ব শেষ! "লাইটও" আছে—

হোক, তবু আপনাদের জন্যে এ নয়। কোথায় এখন বসে বসে গল্পের প্লট ভাববেন তা নয়—অমরবাবুর কণ্ঠ আন্তরিকতায় আর্দ্র।

প্লট ভাববেন! কথাটা আজকাল আর কানে লাগে না, শুনে মনেও করি না কিছু। যোগ্যতার এ হেন পুরস্কার আমার কাম্য নয়। অবনীর মুখে যদি অমরবাবুর সম্বন্ধে কিছু না শুনতুম, তাহলে শ্লেষ ভেবে বিরূপ হওয়া বোধ করি অন্যায় হতো না। কি ভাবে এ'রা?—বসে বসে প্লট ভাববেন!

হাসলুম। বললুম, না বসেও ভাবা যায়। তার জন্যে কাজ না-করার দরকার হয় না।

কি জানি, আমার তো মনে হয় এতে আপনাদের বিশেষ ক্ষতি হয়। যাঁরা লেখক, তাঁরা কেরানীগিরি করবেন! এই করেই দেশটা—অমরবাবু সম্পূর্ণ করলেন না উত্তেজনার আধিক্যে বুঝি কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে এল।

দেশের হয়ে ক্ষমা চেয়ে বললুম, তাতে কি! তাকে কি! উপজীবিকাটা তো কারো আসল পরিচয় নয়।

নয় কেন? একটুখানি তর্ক উঠলো। অমরবাবু প্রশ্ন করলেন, যে যা করে, তাই দিয়েই তো তার পরিচয়—কার নয়? ছোট, বড়, সব কিছুর। আপনাকে কেরানী ভাবতে সত্যিই কষ্ট হয়—আমাদের দুর্ভাগ্য, আপনার মত একজন খ্যাতিমানকে দশটা-পাঁচটা কলম পিষতে হচ্চে!

কিন্তু আমার পক্ষে আরো দুর্ভাগ্যের কারণ হতো যদি এই কলম পেষাটা না থাকতো। হয়তো কোনকালে আর আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎই হতো না। খাতা বন্ধ করে আলগোছে বললুম।

অমরবাবু খানিক চুপ করে রইলেন। হঠাৎ যেন ধরতে পেরে বললেন, কি যে বলেন! আমার সঙ্গে দেখা না হলে কোন ক্ষতি ছিল না।

আমার কিন্তু ক্ষতি ছিল। সাগ্রহে বললুম।

অমরবাবু হাসলেন, কি যে বলেনঃ আমরা আবার—

ভক্তের বিনয় উপভোগ্য হলেও স্থান-কাল হিসেবে কেমন যেন কানে লাগে। একটু লিখি বলে তুলনায় এমন কিছু নয়, যাতে অমরবাবুর নিজেকে অতটা ছোট মনে ক'রতে হবে।

বললুম, ওকথা বলবেন না। এমন কিছু হাতি-ঘোড়া লিখি না, যার জন্যে—

অমরবাবু সহজে ছাড়েন না,—বললে কি হবে আপনাদের জাতই আলাদা। আপনারা হলেন নমস্য ব্যক্তি—শিল্পী, লেখক!

নীরব হওয়া ছাড়া এ লজ্জার হাত থেকে নিস্তার নেই। হাতের কাজটা সেরে নিতে অন্যমনস্ক হবার চেষ্টা করলুম।

নিজের মনে অমরবাবু বললেন, এখানে এসে যখন শুনলুম আপনি আমাদের সঙ্গে কাজ করেন তখন কি যে খুশী হয়েছিলুম কি বলবো! ভাবতেও অবাক লাগে......আপনার লেখা পড়ে যে আনন্দ পেয়েচি তার চেয়েও বেশী!

হাতের কাজ হাতেই থাকবে, কানের কাছে মুখের ওপর এত প্রশস্তি নির্বিবাদে পরিপাক হওয়া অসম্ভব।

কেন জানি না, মুখ থেকে বেরিয়ে এল, অবাক যেমন হয়েচেনে একসঙ্গে কাজ করতে দেখে, তেমনি আবার অবজ্ঞা করেননি তো প্রকৃত মূল্যটা বুঝতে পেরে? ভারি তো!

সঙ্গে সঙ্গে অমরবাবু উত্তর দিতে পারলেন না। কেমন যেন তাঁকে মিয়োন মনে হলো। খোঁচাটা তাঁর ঠিকই লেগেছে।

অমরবাবু বললেন, ভারি-ই! আর কেউ না বুঝলেও আমি বুঝি! একসঙ্গে কাজ করার জন্যে মূল্যে আপনার কানাকড়ি হ্রাস পায়নি! আজ যারা বুঝচে না, কাল তারা বুঝবে। দুঃখু তাদেরই হওয়া উচিত।

খোঁচাটা যেন উল্টে নিজের গায়ে লাগল এবার। বড় যেন ধরা পড়ে গেছি অমরবাবুর কাছে। কথার মধ্যে কোথায় যেন অহমিকা প্রকাশ করে ফেলেছি। লিখি বলে সবার মাথা কিনে রেখেছি। ছি, ছি!

বললুম, আপনার মত সবাই ভাবে না। তাছাড়া কি আর এমন লিখি—

অমরবাবু হেসে উঠলেন। আমিও হাসলুম।

অতঃপর সিট ছেড়ে বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়ালুম। অমরবাবু পকেট থেকে নতুন একটা সিগারেটের প্যাকেট বার করে সামনে বাড়িয়ে ধরলেন, নিন ধরান!

সিগারেট ধরিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলুম। আর কি বলবো ভেবে পাচ্ছি না। কেমন যেন অপ্রস্তুতের একশেষ।

অমরবাবু বললেন, একদিন কিন্তু আপনাকে দয়া করে আমার বাড়ি যেতে হবে। আপনার আর একটি ভক্ত আছেন। যখন শুনবেন আপনার সঙ্গে আলাপ হয়েচে তখন আর—

মাথায় করে' নাচবেন! সিগারেটটা শেষ ক'রে বললুম।

না না, ঠাট্টা নয়। সত্যি তিনি আপনার একজন বিশেষ ভক্ত। সে তুলনায় আমরা কিছুই নয়। অমরবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন।

কে তিনি? প্রশ্নটা যেন বড় তাড়াতাড়ি করে ফেলেছি, উচিত হয়নি কৌতূহল প্রকাশ করা।

চোখে-মুখে হাসি ফুটিয়ে অমরবাবু বললেন, সে দেখবেনঃ আপনার সব

লেখা তাঁর মুখস্থ। আমরা আর কটা মনে রাখি তেমন করে।

কিন্তু কবিতা তো লিখি না! মনে মনে দমে যাই, উল্লসিত মন হঠাৎ চুপসে যায়।

ঐখানেই তো আপনার লেখার বাহাদুরী। না শুনলে আপনি বিশ্বাসই করবেন না। লাইনকে লাইন তাঁর মুখস্থ। কত সময় আমাদের তাই নিয়ে তর্ক হয়—দেখেচি, তিনিই ঠিক।

আবার ফানুষ ফুলে ওঠে। আমার সেই অদৃশ্য ভক্তকে চাক্ষুষ দেখবার জন্যে মনে মনে ব্যস্ত হয়ে উঠি। মুখে বললুম, কি যে বলেন। কেবল লজ্জা দিচ্চেন।

একদিন চলুন দেখবেন। অমরবাবু বললেন, ভাবচি, জানলে তিনি কি করবেন। এই তাই কতবার তিনি আপনাকে চিঠি লিখতে গেচেন, আমি কেবল ঠেকিয়ে রেখেচি। কোথায় কার হাতে গিয়ে সে চিঠি পড়বে তার ঠিক আছে! এবার আর পার নেই! বলুন আপনি কবে আসবেন দয়া করে?

একদিন যাওয়া যাবে। যতদূর সম্ভব উৎকণ্ঠিত আগ্রহকে সংযত করে বললুম।

একদিন নয়, বলুন কবে আসবেন? অমরবাবু পেড়াপিড়ি করলেন। তাঁকে বলবো!

বললুম, হবে'খন, ব্যস্ত কেন! আলাপ হোক।

হাতের ঘড়ির দিকে নজর পড়ল। অমরবাবু পীড়াপীড়ি করলেন। তাঁকে ছুটির পর দেখা করবো। থাকবেন কিন্তু।

এরপর অনেকবার অমরবাবুর সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে, অনেক কথাও হয়েছে অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত। কিন্তু এ পর্যন্ত যাই যাই করে' তাঁর বাড়িতে যাওয়া হয়ে উঠলো না। লেখার বিষয়ে কথা উঠলেই অমরবাবু কিন্তু তাঁর কথা তোলেন। তাঁর মতামত আমাকে বিনা দ্বিধায় জানিয়ে দেন। এত দিনে তাঁর প্রকৃত পরিচয়টা পেয়ে গেছি। তিনি অমরবাবুরই সহধর্মিণী।

নিঃসন্দেহে ভদ্রলোকের স্ত্রী-ভাগ্য ভাল! সামান্য কেরানীর পক্ষে লটারীতে হঠাৎ মোটা কিছু পাওয়ার মত। তিনি শুধু বিদুষীই নন, সাহিত্যানুরাগিনী।

আত্মপ্রশংসায় যত না, তত মহিলাটির অদৃষ্টপূর্ব রূপের কল্পনায় কেমন আনন্দ অনুভব করি, মনে-মনে খুশী হই তাঁর কথা উঠলেই।

অমরবাবুর সঙ্গে দেখা হলেই আর একটি স্মিত মুখ দেখতে পাই। আত্মপ্রত্যয়ে, কৌতুকে সদা চারুহাসিনী। আলাপের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মনে হতো এই নেপথ্যচারিণীর প্রভাবটা। নিজের কথা অমরবাবু খুব কমই বলতেন আমার লেখার আলোচনা প্রসঙ্গে—উনি বলেন, তিনি বলেন, ইত্যাদি।

হঠাৎ মাঝে একদিন অমরবাবু এসে আমাকে বললেন, আঃ, কি লিখচেন মশাই!

এসব উক্তিতে স্বভাবতই আমি উল্লসিত হই না। তবু কেমন যেন মনের ভেতরটা গুরে গুরে করে উঠলো। হয়তো সত্যি এমন লিখেছি যা নিয়ে পাঠক-মনে কিছু আলোড়ন উঠেছে। অমরবাবুরা আমার পরিচিত হলেও তাঁর প্রশংসাটা অগ্রাহ্যের নয়।

নীচু সুরে বিনীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলুম, কেন! কি হলো?

তখনো মুখ-চোখ অমরবাবুর দিব্যি চক্-চক্ করছে—বললেন, সত্যি, চমৎকার লিখেচেন, গ্র্যান্ড!

কণ্ঠের সলজ্জতা কিছুতে কাটাতে পারলুম না, চুপ করে' কাজে চোখ দিয়ে রইলুম।

অমরবাবু কানের কাছে বলতে লাগলেন, উনি তো বলছিলেন এমন গল্প আপনি আর লেখেননি। আমাকে কতবার পড়বার জন্যে বলেছেন—

তার মানে অমরবাবু নিজে পড়েননি। স্ত্রীর পড়ায় তারিফ করেছেন।

বোধ হয় আমার মনের কথাটা অমর-বাবু ধরতে পেরেছেন। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, রেখে দিয়েছি মশাই, ধীরে-সুস্থে পড়বো। ভাল জিনিস আমি ও'র মত নই, পেলেই গোগ্রাসে গিলবো—রয়ে-বসে জিরিয়ে রসিয়ে পড়তে হয় এসব জিনিস।

বললুম, পড়বেন!

নিশ্চয়ই। পড়বো না মানে? অমর-বাবু ধমকে উঠলেন। আপনার কোন্ লেখাটা পড়িনি?

কথাটা বোধ হয় বেফাঁসই বলে ফেলেছি। যিনি আমার সব লেখা আগ্রহের সঙ্গে পাঠ করেন তাঁকে বিশেষ করে' একটি লেখা পড়বার জন্যে অনুরোধ করার কোন মানে হয় না।

অমরবাবু বললেন, এ গল্পটা নিয়ে উনি তো হৈ-চৈ লাগিয়ে দিয়েছেনঃ ওয়ান অব্ দি বেষ্ট—কাউকে বলতে বাকি নেই আর।

বুঝতে পারলেও জিজ্ঞেস করলুম, কোন্ গল্পটা?

ঐ আপনার 'প্রভাত সূর্য' কাগজে এ মাসে যেটা বেরিয়েচে—কি নাম যেন, ইস্‌স, মনে করতে পারচি না! বলুন না—

জায়া?

হাঁ, হাঁ। কি যেন সব ব্যাপার-ট্যাপারটা আছে—গোপন কি সব—

লজ্জায় মাথা কাটা যেতে লাগল। মনে হলো একটা ফোঁড়ার ওপর এতক্ষণ সন্তর্পণে হাত বুলিয়ে সইয়ে নিয়ে ফ্যাঁস করে' ছুরি বসিয়ে দিলে। মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া উপায় নেই।

হঠাৎ গলার স্বরটা সমালোচকের মত নৈর্ব্যক্তিক হয়ে উঠলো অমরবাবুর। বললেন, ঠিকই লিখেচেন, অমন হয়। পরস্ত্রী হলেই বা—

চুপ করতে বলবো এমন মুখ নেই। গল্পটা নিয়ে আমার নিজের দুর্ভাবনার অন্ত ছিল না—অনেক কথা ইতিমধ্যে শুনতে হয়েছে পরিচিত বন্ধুমহলে। নানারূপে বিরূপ মন্তব্য তাঁরা করেছেন। অশ্লীল বলে' কোন কোন জায়গায় গালাগাল খেয়েছি। আমার যোগ্য লেখা আমি লিখিনি, এতদিনে আমার জাত গেল।

আরে মশাই, যাদের মনে পাপ আছে তারাই পাপ ভাববে। ঠিক করেচেন লিখেচেন। অমরবাবু তারিফ করতে লাগলেন।

না পড়েই এত, পড়লে না জানি অমরবাবু কি করবেন ভেবে পাই না। বললুম, পাপ-পুণ্য জানি না, যা বুঝেচি তাই লিখেচি—বলুন তো বুকে হাত দিয়ে, পরের বৌকে আপনার ভাল লাগে না?

হঠাৎ অমরবাবু থতমত খেয়ে যান। প্রশ্নটার তাৎপর্য করতে পারেন না। আমার মুখের দিকে কেমন অসহায়ভাবে চেয়ে রইলেন।

বললুম, আপনার বলে বলচি না, সবার লাগে। নিজেরটা কেউ ভাল দেখে না।

অমরবাবু একেবারে নীরব। হঠাৎ ভদ্রলোকের কি হলো বুঝতে পারলুম না। তাঁর সমস্ত উৎসাহ একেবারে নিভে গেল।

প্রসঙ্গটা ঘোরাবার জন্যে বললুম, অবনীর খবর কি? তাঁকে ক'দিন আপিসে দেখতে পাচ্ছি না।

অমরবাবু বললেন, ছুটিতে আছেন।

কতদিনের ছুটি? গল্পের প্রসঙ্গটা একেবারে দূরে করে দিতে চাই, কোথায় গেচে নাকি?

কি জানি, কিছু তো বলেন নি! তিন উইক বোধ হয়। মনে হলো অমরবাবুও গল্পের কথাটা এড়িয়ে যেতে চান।

কে জানে মনে মনে আমার ওপর তিনি রুষ্ট হয়েছেন কি না! কি বেফাঁস বলে ফেললুম হয়তো।

তারপর অনেক গল্প লিখেছি জাতে ওঠবার জন্যে। আমার বন্ধুবান্ধবরা প্রশংসা করেছেন—হ্যাঁ এই ঠিক, তা নয় পরস্ত্রী নিয়ে কি যা তা লিখেছিলে! ওসব তোমার যোগ্য নয়—তোমার কাছে আমরা অন্য জিনিস আশা করি। সিরিয়স গল্প। এই তো বেশ!

আজও প্রশংসা ক'রলেও সেদিনকার মত মনে হয় না অমরবাবুর কথাগুলো।

সেদিন 'প্রভাত সূর্যে' প্রকাশিত গল্পের জন্যে যে নেপথ্যে সাধুবাদ লাভ করেছিলুম, তার সঙ্গে তুলনাই হয় না। পাঁচজনে যাকে 'না' করে দিয়েছিল, কেবল 'উনিই' তাকে পরম সমাদরে গ্রহণ করেছিলেন। আমার মনে সেদিন সেইটুকুই সান্ত্বনা ছিল। তবু একজন প্রশংসা করেছেন, আমার মর্ম উপলব্ধির কিছুটা তিনি অনুভব করেছেন। মনে মনে অমরবাবুর স্ত্রীকে কৃতজ্ঞতা জানিয়েছিলুম। ভদ্রমহিলার নেপথ্যচারিণী, সকৌতুক উজ্জ্বল মুখটা সেদিন বড় আনন্দে মানসপটে ভেসে উঠেছিল। সেদিন অমরবাবুর আলাপের শেষের দিকে হঠাৎ মনোভাবের পরিবর্তন বোধগম্য না হলেও ভদ্রলোককে বিশেষ স্ত্রী-সৌভাগ্যবান বলে মনে হয়েছিল। ঘরে এমন যাঁর বিদুষী, বুদ্ধিমতী স্ত্রী, তাঁর আর ভাবনা কি! ভয়ই বা কাকে!

একবার মনে হয়েছিল, সকল সহধর্মিণীর গুণাগুণ নিয়ে অমরবাবুর সঙ্গে আলোচনা করি। কোন্ স্ত্রী কেন কাম্য তার একটা প্রামাণিক সিদ্ধান্তে উপনীত হই। বলি, আপনার মত আর ক'জনের ভাগ্যে স্ত্রী জোটে। আমি হলে তো মশাই—

না, থাক—কে জানে এই নিয়ে সেদিনকার মত হয়তো উনি গম্ভীর হয়ে যাবেন। বড় 'ডেলিকেট' ব্যাপার এই স্ত্রী-প্রসঙ্গ।

বললুম গল্পটা তা হলে পড়েচেন? ভাল লেগেচে?

অমরবাবু তেমনি উৎসাহিত। কেবল তিনিই পড়েননি, 'উনি'ও পড়েছেন। সুন্দর হয়েছে।

একটা কথা—হঠাৎ সভার মাঝখান থেকে টেনে নিয়ে গিয়ে কানে কানে বলার মত অমরবাবু বললেন।

একটু সন্ত্রস্ত হলুম। গল্প প্রসঙ্গে কথা হলে তা অমরবাবুর নিজস্ব নয়, জানা কথা—সেই 'তাঁর' কথা বলচেন।

অমরবাবু বললেন, গল্পটা কি সত্যি? মনে হয় কোন জানা জিনিস থেকে—

মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলেও মুখে বললুম, কেন, তাই মনে হলো নাকি প'ড়ে?

না, অমরবাবু একটুখানি হাসলেন, উনি বলছিলেন……একেবারে মিলে যাচ্ছে—

মিলে যাচ্ছে! কার সঙ্গে? মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করতে কেমন যেন বাধল। ব্যাপারটা ভদ্রমহিলার যখন জানা—

বিস্ময় প্রকাশ করে' বললুম, তাই নাকি! আশ্চর্য—

ঘটনাটা যদি আপনার জানা না হয়, বলতে হবে আপনি মশাই একজন—যাকে বলে—অমরবাবু সপ্রশংস দৃষ্টিতে চাইলেন।

কি? স্বরটা আঁৎকে ওঠার মত শোনাল।

প্রকৃত স্রষ্টা, দ্রষ্টাও। অমরবাবু দম ফেললেন। একেবারে মিলে গেছে, এতটুকু এদিক-ওদিক নেই……

খানিক থেমে বললেন, বঙ্কিমবাবুর ঠিক এমন হতো—সেই যে সেই গল্পটা, কোন্ এক ইংরেজের সঙ্গে যেন মিলে গেছল। ঈশ্বরের সৃষ্টি আর আপনাদের সৃষ্টি তফাৎ হবে কেন—শিল্পী এক মশাই।

পাছে আরো কিছু অপরাধ করে' ফেলি চুপ করে শুনে গেলুম। একে চোর দায়, তায় এই প্রশস্তি। মুখ তুলতে

পারলুম না। গল্প লেখা ছেড়ে দেব কিনা ভাবচি।

অমরবাবু বললেন, লেখা আপনার চমৎকার! ও'র মুখে যেন ঘটনাটা শুনেছিলুম, কিন্তু আপনার লেখা পড়ে মনে হলো নতুন করে শুনচি! চমৎকার!

আমার বক্তব্য বোধ হয় অমরবাবুরে শোনবার ইচ্ছে নেই, আর শোনালেও কাকে বিশ্বাস করবে!

বৌটার জন্যে ভারি কষ্ট হয়, বেচারী! চিরকাল স্বামীর মন পাবার জন্যে কি কিম্ভূতকিমাকার হয়ে রইল—এই হলো সত্যিকারের ট্র্যাজিডি! নয় কি না, বলুন? অমরবাবু জিজ্ঞেস করলেন।

মাথা নাড়লুম অপরাধীর মত। এমন একটা সৃষ্টি, তাও অনুলিখিত! হায়, হায়, লেখক হবার কি বিড়ম্বনা!

নিজের সিটে ফিরে যাবার সময় অমরবাবু চুপি চুপি একটা মর্মান্তিক খবর শুনিয়ে গেলেন, ও'র কিন্তু গল্পটা তত ভাল লাগেনি।

ইচ্ছে ক'রে কিনা জানি না, অমরবাবু এই প্রথম আমার লেখা সম্বন্ধে 'ওঁর' বিরুদ্ধ মতটা জানিয়ে গেলেন।

শুনে একটু ম্লান হাসলুম। একই লেখকের সব গল্প যে সব সময় ভাল লাগবে তার কোন মানে নেই। বোধ হয়, লাগাও উচিত নয়। ভদ্রমহিলার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা আরো বেড়ে গেল। ছোট ছেলের মুখে সব কিছু ভাল লাগার মত প্রিয় লেখকের সব গল্পই নির্বিবাদে তাঁর ভাল লাগে না! ভদ্রমহিলার রুচির বৈশিষ্ট্য আছে।

ক'দিন একটা গল্পের উপসংহার নিয়ে মনের মধ্যে বড় অস্বস্তি বোধ করছি। আপিস, বাড়ি, সঙ্গ-সুখ কিছুই ভাল লাগছে না। অনেকখানি লিখে একেবারে থেমে গেছি। গল্পটা মাঠেই মারা যাবে দেখছি। সময় সময় মনের এমন অবস্থা হয় যেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে চিন্তা বলে কোন কিছুই নেই—কার্য কারণের কোন সুসামঞ্জস্য বিধানও নেই। সূর্য-চন্দ্র যেমন রোজ না উঠে পারে না, আমিও তেমনি যা করছি, তা না করে পারি না। গল্প বানান, ও বানানই। চিন্তা না, অর্থহীন প্রলাপ!

এর ওপর আবার অমরবাবু বছর শেষ ছুটি ভোগ করতে ডুব দিয়েছেন। মনের কথাটা যদি এ সময় তাঁকে বলতে পারতুম, কি তাঁর মারফৎ তাঁর স্ত্রীর মতামতটা নিতে পারতুম! সবাই মিলে আমাকে 'বয়কট' করেছে। দেখা হলে ঠোঁট বেঁকিয়ে আর কারো কুশল প্রশ্ন ক'রতে আর ভাল লাগে না।

পকেটে পকেটে গল্পটা নিয়ে ঘুরে বেড়ালুম—যদি কোন সময় এর শেষটুকু মনে আসে সঙ্গে সঙ্গে লিপিবদ্ধ করে দেব। মনের এই দুর্বোধ্য রহস্যময়তার সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। দেখি কতদিন আমাকে সে যন্ত্রণা দিতে পারে।

আমার গল্পের নায়ক অতি সজ্জন। শিক্ষায় দীক্ষায় যাকে বলে নিখুঁত। আলাপে অত্যন্ত ভদ্র, মিষ্টভাষী। সর্বোপরি লোকটির একটি শিল্পাশ্রয়ী মন আছে। (আমার ভাল লাগার কারণ সেই জন্যে!) কিন্তু তাঁর স্ত্রীকে নিয়েই হয়েছে যত ভাবনা। তাঁকে কোনদিন চোখে দেখিনি, কিন্তু তাঁর সর্বাশ্রয়ী অস্তিত্বের অনুভব আমার নায়কের মধ্যে পরিপূর্ণ। মনে হয়, পাছে যদি এমন একটি স্ত্রীরত্ন না থাকত, তাহলে আমার গল্পের নায়ক অমনটি হতে পারতেন না। আমি বোধ হয় প্রমাণ করতে চাই, নায়ক বা নায়িকা কেউই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, পরস্পর পরস্পরে ওপর অনেকটা নির্ভরশীল। গৃহধর্মের মূলে সূত্র বোধ হয় এই।

দূর-র, এ যে তত্ত্ব কথা হয়ে যাচ্ছে। গল্পই হচ্ছে না। শিব গড়তে বানর গড়ছি।

চুপিসাড়ে অমরবাবু কখন এসে পাশে বসেছিলেন টের পাইনি। নিজের মনে দূর-র বলে ফুৎকার দিতে অমরবাবু লাফিয়ে উঠলেন। শব্দ পেয়ে চোখ ফেরালুম।

হেসে অমরবাবু প্রশ্ন ক'রলেন, কি দূর-র? কাকে দূর-র করচেন? আমাকে নয়তো!

অপ্রস্তুত হ'য়ে বললুম, না, না! ও কিচ্ছু নয়।

বোধ হয় আমার আর এক পরিচয় পেয়ে অমরবাবু পরম কৌতুকে হাসছেন এখনো। সত্যিই পাগলামী!

অন্যকথা পেড়ে বল্‌লুম, কেমন ছুটি ভোগ করলেন?

মুখের হাসিটা অমরবাবুর মেলায়নি। বললেন, কই আর—বাড়িতেই ছিলুম রাতদিন! ভোগ আর কি, বরং বলতে পারেন ভোগান্তি!

আমার ছুটি অনেক আগেই শেষ! এমন বড়দিনে রেজি আপিস ক'রতে হ'লো! আপশোষ করি—হঠাৎ যেন খেয়াল হয় জিজ্ঞেস করি, সে কি, আপনার দুর্ভোগ! বাড়িতে অমন যাঁর—

অমরবাবু হাসলেন, আরে মশাই তাঁদেরও মাঝে মাঝে সি-এল দরকার হয়।

আমারও ছুটি তাঁরও ছুটি! একলা-একলা কি আর করি, বাড়ি আগ্‌লালুম্!

বল্‌লুম, বেশ আছেন! আপনারা 'আইডিয়েল' যাকে বলে, চমৎকার ব্যবস্থা! সংসারে এই আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকলে চলে! অশেষ ভাগ্যবান আপনি।

অমরবাবু হাসতে লাগলেন। স্ত্রী-ভাগ্যে তিনি গৌরব বোধ করছেন হয়তো। বললেন, তারপর আর কি লিখলেন-টিখলেন? অনেকদিন আপনার গল্প দেখিনি কোথাও, উনিও আজ বলছিলেন—রামেন্দ্রবাবু অনেককাল লেখেননি!

বল্‌লুম, লিখবো। একটা গল্প হ'বো হ'বো ক'রছে।

ভেবেছিলুম অমরবাবু গল্পটা শুনতে চাইবেন, আর সেই প্রসঙ্গে ঘুরিয়ে তাঁর মতামতটা জেনে নেব। উপসংহারটা যা ভেবেছি তা সম্ভব কি না। কিন্তু না, অমরবাবু কিচ্ছু জিজ্ঞেস করলেন না গল্প সম্বন্ধে। কেবল বললেন, তাড়াতাড়ি শেষ করে' ফেলুন, উনি অধৈর্য হ'য়ে পড়েছেন।

আপাতত সামর্থ্যহীনতার জন্যে ক্ষমা চেয়ে নিলুম। বল্‌লুম, দেখি গল্পটা শেষ করতে পারি কি না!

একবার ইচ্ছে হ'য়েছিল নিজে থেকে গল্পটা অমরবাবুকে শোনাই। দেখাই যাক না উনি কি বলেন, তারপর—

খানিক লক্ষ্য করে অমরবাবু বললেন, অত কি ভাবচেন?......তখন থেকে লক্ষ্য করচি! কি এত ভাবনা?

বল্‌লুম গল্পটা। খসড়াটা প্রায় মুখস্থই ছিল।

অমরবাবু চুপ করে' শুনে উঠে যেতে যেতে বললেন, আপনারা লেখক, ভাবুক, আমরা আর কি বলবো! যা ভাল বোঝেন সেইভাবে শেষ করে দিন! আমরা পড়েই খালাস—তাছাড়া বুঝিই বা কি......সন্দেশ খেলেই কি সন্দেশ তৈরীর প্রক্রিয়া বলতে পারে কেউ? ও আলাদা জিনিস!

খুব সত্যি কথা। এ গল্পের দায় এখন আমার। ভালই হোক আর মন্দই হোক, একে শেষ করবার দায়িত্ব আমার।

এর পর অমরবাবুর সঙ্গে আমার আর কোন কথা হয়নি। জানি, তাঁর (তাঁদের) সব কথা আমার নতুন গল্পের জন্যে চুপ করে আছে। অমরবাবু আসেন, বসেন—সিগারেট খেয়ে এবং খাইয়ে নিঃশব্দে উঠে চলে যান। হয়তো বুঝেছেন আমার মনের দুরবস্থাটা

ইতিমধ্যে মনে-মনে গল্পটা আমি ঠিক করে' ফেলেছি। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যেরই মিলন হয়—নায়িকাকে নায়কের মতই করে' সৃষ্টি করবো। গোলমালের মধ্যে গিয়ে কাজ নেই। তা ছাড়া প্রবীরকুমারের স্ত্রীর সঙ্গে হঠাৎ একদিন আমার দেখাও হ'য়েছে। আমার দুর্ভাবনার কোন কারণ নেই। সত্যিই ভদ্রলোক ভাগ্যবান, যেটুকু দূর থেকে লক্ষ্য করেছি তাতে মনে হ'য়েছে মনোমত স্ত্রী পেয়েছে প্রবীরকুমার। এইবার কিছু ঘটনা সংযোজন করলে গল্পটা পুরো হয়। আমিও রেহাই পাই। দুর্ভাবনার অন্তর্জ্বালার নিবৃত্তি।

একদিন গল্পটা শেষ করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাইরে বেরিয়ে এলুম। পুরো একটি দিন আপিস কামাই হ'লো। তা হোক। গল্পের শেষ পেয়ে গেছি।

অনেকদিন পরে সন্ধ্যাটা ভারি ভাল লাগছে। ঘুম-ভাঙা-চোখে দেখার মত রহস্যময়-অদ্ভুত মাদকতাপূর্ণ। পরি-বেশটাকে যেন নতুন করে উপলব্ধি করছি। ফুরফুরে হাওয়াটাও লাগছে ভাল।

'পেয়েছি!' 'পেয়েছি!' বলে ছুটে বেরিয়ে পড়ার মত আমার গন্তব্যের কোন ঠিক ছিল না। বেড়াতে বেরিয়েছি কি না ঠিক জানি না। হাঁটতে হাঁটতে এ রাস্তা সে-রাস্তা করে' অনেকটা পথ এসে পড়েছি—রাস্তার নামটা চোখে পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে গেলুম। মনে হলো, এ নাম যেন আগে শুনেছি, এ নামের সঙ্গে আমার পরিচয় অনেক দিনের—একটা সাদর অভ্যর্থনা আছে এ নামের সঙ্গে জড়িয়ে।

নম্বরটাও মনে পড়ল। এখুনি মনে হ'লো স্মৃতিশক্তি আমার বিশেষ প্রবল। আশ্চর্য করে একবার শুনেছিল ঠিক মনে আছে! সে গৃহে পৌঁছবার আগেই সে-মুখ চোখের সামনে ভেসে উঠলো—অভ্যর্থনার কলকণ্ঠ কানে মধু ঢালল। একটু বিমূঢ়ের মত হ'য়ে গেলুম।

কড়া নাড়ার চেয়ে আমার বক্ষস্পন্দন যেন দ্রুত হ'তে লাগল। হাতটা থামতে একসময় মনে হ'লো, আমার আশপাশে সব যেন থেমে গেছে। শব্দহীন একটা জগতে এসে নেমে গেছি।

অমরবাবু দরজা খুলে গম্ভীরভাবে বললেন, আপনি!

হাসবার চেষ্টা করে বললুম, হ্যাঁ, আমি! কেন বিশ্বাস হ'চ্ছে না?

অমরবাবু বুঝি হাসলেন, না, বিশ্বাস হ'বে না কেন। আসুন।

আশানুরূপে না হ'লেও ব্যথিত হই না আর একজনের কথা ভেবে। বললুম, দেখ্‌লেন এলুম তো! এত কাছে কে জানতো!

অমরবাবু উত্তর করলেন না। দরজাটা বন্ধ করে সামনেই একটা চৌকি টেনে দিয়ে বললেন, বসুন।

বস্‌লুম। কিন্তু কোথায় যেন আমার বড় লাগল। চৌকিতে চেপে বসে অন্য-মনস্কের মত এদিক-ওদিক লক্ষ্য ক'রতে লাগলুম। এখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হ'য়ে গেলেও বাইরেটা বুঝি এর চেয়ে সপ্রতিভ, সমুজ্জ্বল! ঘরটা খুবই ছোট, তার ওপর জিনিসপত্তর, বিছানা, মাদুরে কেমন চৈ-ভটিকার! এক কোণে তিন চারিটি শিশু এতক্ষণ কিচিরমিচির করছিল, আমাকে দেখে সন্দেহে-বিস্ময়ে বোবা হ'য়ে গেছে। কতকাল যে ঘরটায় কলি ফেরান হয়নি তার ঠিক নেই—কোণে-কোণে ঝুল জমে আছে, পেরেক ঠোকায় দেওয়াল গাত্র ক্ষত-বিক্ষত।

অমরবাবু বললেন, এই তোরা উঠে যা ওখান থেকে—মাকে চায়ের কথা বল।

বাধা দিয়ে বললুম, থাক, এই খোকা শোন তো এদিকে, শোন শোন...ভয় কি, এস!

ধমক দিয়ে অমরবাবু বললেন, অসভ্য ছেলেমেয়ে সব! যাও—ও—

সুড়-সুড় করে বোবা ছেলেমেয়েগুলো গড্ডালিকাপ্রবাহের মত অন্দরের দরজা লক্ষ্য করে চলে গেল। মনে হ'লো, তাদের নিঃশব্দ গতি আমাকে লক্ষ্য করে হো হো অট্টহাসে ফেটে পড়ল—একটা মজার জিনিস আমার উপস্থিতিটা!

আর কি নিয়ে আলাপ ক'রবো ভেবে পেলুম না। এ অমরবাবুর সঙ্গে যেন আমার পরিচয় নেই। তাঁর কাছে কোন একটা জিনিসের উমেদার হ'য়ে উপস্থিত হ'য়েছি। তিনি বেজার হ'য়েছেন।

ভাবছি, আর কতক্ষণ এভাবে বসে থাকবো! উঠলেই হয়। অমরবাবু বললেন, আপিসে যাননি আজ?

না।

আজ অবনীবাবু জয়েন করেচেন। আপনার খোঁজ করছিলেন!—অমরবাবুর এ আলাপ আমি আদৌ শুনতে ইচ্ছে করি না।

ও। সোজা চৌকি ছেড়ে উঠে পড়লুম। বললুম উঠি। অমরবাবু বললেন, বসুন। চা হচ্ছে।

এমনিই বিরূপ হ'য়ে উঠেছিলুম। বললুম, না, থাক—চা আমি খেয়েই বেরিয়েচি!

অমরবাবু উঠে দরজার দিকে গিয়ে বললেন, সেকি! তা হয় না। চা, না খেয়ে গেলে—

আপ্যায়নটা আর টানতে দিলুম না। বললুম, আর একদিন খাব। আসুন দরজাটা বন্ধ করে দিন।

অমরবাবু ঘরের মাঝখানে এসে দাঁড়ালেন। গায়ের চাদরটা ঠিক করে ঘুরে দাঁড়াতে ভেতরের দরজায় আধ-ভেজান পাল্লার ফাঁকে একটা সধূম চায়ের পেয়ালার কিছুটা দৃষ্টিগোচর হ'লো। অদ্ভুত নিরুৎসুক, একজোড়া চোখও দেখ্‌লুম সেই সঙ্গে। বোধ হয় অমরবাবুর স্ত্রী!

আবার বসতে অমরবাবু জিজ্ঞেস ক'রলেন, বসলেন?

চাটা খেয়েই যাই! সপ্রতিভ কণ্ঠে বল্‌লুম, হ'য়েছে যখন!

অমরবাবু ঘুরে চট করে এগিয়ে গিয়ে একরকম ছোঁ মেরে কাপটা টেনে নিয়ে এসে আমার মুখের সামনে ধরলেন, নিন, খান!

তাড়াতাড়ি চাটা গলাধঃকরণ করতে জিভটা বুঝি আধখানাই পুড়ে গেল।

গল্পটা ছাপতে দেবার সময় কিছু অদল-বদল করে দিয়েছিলুম।

"গৌরী দেবী অন্তঃপুরিকা। তিনি কিছুতেই আমার সমক্ষে উপস্থিত হ'তে রাজী হননি। প্রবীরকুমারের দোষ নেই, স্ত্রীকে অনুরোধ ক'রতে সে ত্রুটি করেনি। যোগ্যের সঙ্গে যোগ্যের মিলন হ'বেই, এমন কথা আমি জোর করে বলি না! গড়ে নেওয়াটাই আসল!"

সম্পূর্ণ গল্পটি একটি বিখ্যাত পত্রিকায় প্রকাশিত হ'য়েছিল, কিন্তু এ পর্যন্ত গল্পটি সম্বন্ধে কোন নিন্দা বা প্রশংসা কিছুই শুনিনি। হয়তো লেখাটি কারো মনঃপূত হয়নি।

বিশেষ করে' অমরবাবুর ব্যবহারটা বড় মর্মান্তিক। বেশ বোঝা যায়, তিনি আর আমার লেখার ভক্ত নন।

সেই সঙ্গে 'উনি'ও বোধ হয়।

যাকে ভুলতে চাই

পরিতোষ খাঁ

হয়তো কখনো কোনো দুঃসহ চৈত্রে
তোমাকেই মনে পড়বে, আবার পড়বেই।
তা' বলে বন্ধ্যা ভ্রান্তির এই মৈত্রী
মিছে টেনে চলা সব হারানোর গর্বে।

সেদিন হয়তো বাইরে রুদ্র সূর্যে
প্রাণান্ত উদ্যত। বিষণ্ণ ঘরে কেউ
সাথী নেই; তাই বিস্মৃতি-পরিচর্যা,
তোমাকে ভুলতে, দুর্গতি-রূঢ় সড়কে।

হোক সে মৃত্যু। অবহেলাভরা করুণা
তবু তো ফুরাবে। তবু তো এ জ্বালা জুড়াতে
কতো পথ খুঁজে, মাস্তুলে ঝড়, শুনানি
শেষ হবে। মন ঘুমাবে তো—দিনে রাতেও।

আবর্তন

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

শোনো, শোনো, বলি, ম্লান সন্ধ্যায় এ কোন্ মায়ায় তুমি
দিনের তুচ্ছ হাওয়ায় মাতালে নীলান্ত বনভূমি
অথচ তুমিই অনিবার, তুমি তীব্র কৌতূহলে
আকাশ ব্যাপ্ত নীল অরণ্য জ্বালিয়েছ' দাবানলে।

দিন ভরা শুধু ছায়ার কাকলি, গত রাত্রির ঘুমে
তোমাকে করেছি নিঃশেষ আমি ভীরু শীত মরশুমে।
তোমার হৃদয়ে কান পেতে শুনি অন্ধকারের স্বর
তোমার আগুনে আমার শরীর মাধুর্যে ভাস্বর।

এ কোন উজ্জীবনের মন্ত্রে আবার আজকে তুমি
আপন রূপের বিভাসে মাতালে বিষণ্ণ বনভূমি।
কি দেবে আমাকে এবার আবার, সৌরভ সম্ভার?
মুঠো খুলে শুধু উপহার দিলে একটু অন্ধকার।

ঘেরাটোপ

গোবিন্দচরণ মুখোপাধ্যায়

পরিচিত পরিধিতে ঘেরাটোপ-ঘেরা এ জীবন,
আজো দেখি—প্রজাপতি-মন নিয়ে করে সঞ্চরণ!
পৃথিবী বদলে যায়। ভালো করে দেখবার আগে
সে কোথায় চলে যায়—একবার যাকে ভালো লাগে!
পথ পড়ে থাকে, আর ফুরায় পাথেয়। উঠি কেঁপে,
রঙ ঢালে কৃষ্ণচূড়া মনের দিগন্ত-পথ ব্যেপে।
কী বিপুল আলোড়ন অন্ধ এক ক্ষুব্ধ বাসনার
অগ্নি জ্বালে! আকাশ-বাতাসে গান ওঠে বন্দনার।

প্রাণ জাগে। আকাঙ্ক্ষার ঢেউ ভাঙে জীবন-বেলায়,
মনের ময়ূরপঙ্খী ছিন্নভিন্ন প্রচণ্ড খেলায়।
তবু ভাবি, মৎস্যকন্যা—দারুচিনি দ্বীপে যার ঘর
শুনেছে—সমুদ্র-বুকে ভেসে-যাওয়া এই কণ্ঠস্বর।
পরিচিত তারাটিকে নতুন আলোকে চেয়ে দেখি,
জীবনের ঘেরাটোপ সে-মুহূর্তে মনে হয়—মেকী।

চারুকলা প্রদর্শনী প্রসঙ্গে

কৃষ্ণা চৌধুরী

আজকাল কলকাতায় কলা-প্রদর্শনীর কোন অভাব নেই। একটু শীত-শীত পড়তেই আর্টিস্ট্রি হাউসে, সদর স্ট্রীটের আর্ট সালোঁতে, চৌরঙ্গী টেরাসে এবং অন্যত্র নানা কলা-প্রদর্শনীর দরজা খুলে যায়, একাডেমি অব ফাইন আর্টস-এর সম্মিলিত চিত্রসম্ভার তো রয়েছেই। এই প্রদর্শনীগুলি কলকাতার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিশিষ্ট ঘটনা। এই সমস্ত প্রদর্শনী উপলক্ষ্য করে ক'দিন শহরের গণ্যমান্য নাগরিকেরা, কলা-রসিকজনেরা মিলিত হন, বিদগ্ধ আলোচনার সুযোগ ঘটে, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সমালোচনা প্রকাশিত হয়, শিল্প-বিচারে মতভেদ নিয়ে চলে তর্ক-বিতর্ক, উত্তর-প্রত্যুত্তর। তারপর যথাসময়ে শীত বিদায় নেয়, প্রদর্শনীর দরজাও একে একে বন্ধ হয়ে যায়। প্রদর্শনীর দরজা তো বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু মনে একটা প্রশ্ন থেকে যায়। এই ধরনের প্রদর্শনীর যা আসল উদ্দেশ্য, সেটা কতখানি সফল হয়? সোজা কথায় বিক্রী হল ক'খানাই বা ছবি, ক'খানাই বা অন্য কারু-দ্রব্য?

বলা যেতে পারে, কেনা বেচাটাই বড় কথা নয়, এই সব প্রদর্শনীর সুযোগে সর্বসাধারণকে যদি কলা-সচেতন ক'রে তোলা যায়, তবেই তার উদ্দেশ্য সফল হয় নাকি? কিন্তু এরকম নিষ্ক্রিয় কলা-চেতনার কি মূল্য আছে? কোন্ দেশে শিল্পকলা কতখানি প্রসার লাভ করবে, তার অনেকখানিই নির্ভর করে সে দেশের জনসাধারণ অর্থের বিনিময়ে শিল্পীর কাজ গ্রহণ করতে কতটা প্রস্তুত, তার উপর।

প্রকৃতপক্ষে এ ধরনের প্রদর্শনীর সৃষ্টিই হয়েছিল ক্রেতা সংগ্রহের তাগিদে। একদিন ছিল যখন কলা-প্রদর্শনীর কোন অস্তিত্বই ছিল না। সে যুগের প্রথা ছিল আগে ক্রেতা, পরে শিল্পসৃষ্টি। খরিদ্দার বলে দিতেন এই জিনিস আমার চাই। শিল্পী সেই নির্দেশানুসারে কাজ করে দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নিয়ম দাঁড়ালো আগে শিল্পসৃষ্টি, পরে ক্রেতা অন্বেষণ। ফলে শিল্পী তার কাজে অবাঞ্ছিত হস্তক্ষেপের, অযাচিত নির্দেশের হাত থেকে মুক্তি পেলেন বটে, কিন্তু তার জন্য মূল্যও দিতে হল অনেক, শিল্প-সৃষ্টির পর গ্রাহকের আশায় অনন্তকাল প্রতীক্ষা।

পাশ্চাত্য আর্টের ইতিহাসে দেখতে পাই, প্রায় সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিল্প-কলা ছিল বিভিন্ন কারুকর্মেরই অন্যতম—একটা পেশা যাতে করে এক সম্প্রদায়ের লোক জীবিকা অর্জন করত। কাজের অভাব তখন শিল্পোপজীবীর বড় একটা হত না। কারণ এ বিষয়ে ধর্ম ছিল তার প্রধান সহায়। গির্জা গড়তে হবে, তার অভ্যন্তরে দেয়াল-চিত্র আঁকতে হবে, তার বেদী অলংকরণ করতে হবে, আরো কত কিছু। তারপর বিত্তশালী পৃষ্ঠপোষক ও তার পরিজনদের প্রতিকৃতি অঙ্কনও ছিল। কোন শিল্পীই একা কাজ করে কুলোতে পারত না, কাজে সাহায্য করবার জন্য সহকারী রাখতে হত। পঞ্চদশ, ষোড়শ শতাব্দীতে ইতালীর কর্মব্যস্ত কারু-শালাগুলিতে ওস্তাদ শিল্পীর কাজে সাহায্য করেই সঙ্গে সঙ্গে হাতে-কলমে শিক্ষালাভ করত তরুণ বয়স্ক সহকারি-বৃন্দ। প্রথমে তাদের থাকত হয়ত শুধু রং-গোলার কাজ, তারপর গুরু যে রচনা নিয়ে ব্যস্ত, তার কোন অকিঞ্চিৎকর অংশে হাত-লাগানোর ভার। কিন্তু এমনি করে এই শিষ্যদল থেকেই আবির্ভাব হত বিরাট প্রতিভার। বেরোকিয়োর কারুশালায় শিক্ষানবীশ কর্মী ছিলেন লিওনার্দো, মাইকেল এঞ্জেলো কাজ করতেন গির্লান্দায়োর সঙ্গে। ইতালীতে, জার্মানীতে সর্বত্রই এই প্রথা চালু ছিল। জর্জোনে ও তিসিয়ান বেরিয়েছিলেন যোবানি বেলিনির কারুশালা থেকে, আর ডুরারের গুরু ছিলেন বোলগেমোট।

সপ্তদশ শতাব্দীতে একবার অর্থ-নৈতিক সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়েছিল পাশ্চাত্য শিল্পীর। তখন জার্মানী, হল্যাণ্ড ইংলণ্ড প্রভৃতি য়ুরোপের কতকগুলি দেশ প্রোটেস্টান্ট ধর্মবাদ গ্রহণ করায় গির্জার অভ্যন্তরীণ অলংকরণের প্রথা উঠে গেল। বাকী রইল শুধু প্রতিকৃতি আঁকা। তবে সে যুগে রাজা-রাজড়া, রাজ দরবারের আমীর ওমরাহ, বিত্তশালী বণিক সম্প্রদায় সকলেই নিজের নিজের এবং প্রিয়জনদের চেহারা পটের উপর মুদ্রিত দেখতে ভাল-বাসতেন। প্রতিকৃতি অঙ্কনের চাহিদা ছিল, মূল্যের বিনিময়ে কাজ গৃহীত হবার সম্ভাবনা ছিল বলেই সে যুগে অনেক কৃতকর্মা প্রতিকৃতি-চিত্রকরের আবির্ভাব হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ধর্ম-বিপ্লবের প্রথম ধাক্কাতেই জার্মানী ছেড়ে হোলবাইন ইংলণ্ডে বসবাস করছেন দেখতে পাই—ইংরেজ রাজদরবারের প্রতিকৃতি চিত্রকররূপে। সপ্তদশ শতাব্দীতে চিত্র-জগতে আবির্ভাব হল রুবেনস, ভান ডাইক, বেলাস্কেৎ, ফ্রান্স হলস্ প্রভৃতি বিখ্যাত শিল্পীর-প্রতিকৃতি অঙ্কনে যাদের দক্ষতা অবিসম্বাদিত।

দিনেমার চিত্রকরেরা অন্য আর এক উপায়েও আর্থিক সঙ্কট এড়াবার চেষ্টা করেছিলেন। প্রতিকৃতি আঁকাতে যাদের হাত নেই, তারা এক ধরনের চিত্রকলায় মনো-নিবেশ করলেন, চিত্রশিল্পের ইতিহাসে যা জেনর পেইন্টিং (genre painting) নামে পরিচিত। কোন শিল্পী হয়ত কোন বিশেষ ধরনের ছবি এঁকে প্রথম নাম করলেন, তারপর থেকে তিনি শুধু সেই ধরনের ছবিই আঁকতেন এবং সর্বসাধারণও তার কাছ থেকে সেই ধরনের ছবিই চাইত। যেমন স্টীল লাইফ বা নিষ্পন্দ প্রকৃতির ছবি এঁকে যাঁর নাম হয়েছে, তাঁর আঁকা নিষ্পন্দ প্রকৃতির ছবি কেনাই ফ্যাশান হয়ে দাঁড়াত। জেনর পেইন্টিং বা জাত-চিত্রাঙ্কন তাই যেমন লাভজনক ছিল, তেমনি একই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তির ফলে নিপুণ শিল্পদক্ষতাও শিল্পীর করায়ত্ত হ'ত।

কিন্তু শিল্পক্ষেত্রে একটা বিরাট পট-পরিবর্তন প্রথম দেখতে পাই অষ্টাদশ শতাব্দীতে। শিল্পকর্ম তখন আর পেশা নয়, ললিতকলায় উন্নীত, কারুশালার কর্মীদের উপজীবিকা মাত্র নয়, সাহিত্য বা দর্শনের মত একটা অধীতব্য শাস্ত্র। কিন্তু এই পরিবর্তনের সঙ্গেই শিল্পীর জীবিকা সমস্যারও উদ্ভব। একাডেমি থেকে অধ্যয়ন সমাপ্ত করে তো বার হলেন শিল্পী। কিন্তু তারপর? কি করে জীবিকা নির্বাহ হবে তার, কি করে

জনসাধারণের কাছে তার শিল্পকাজ উপস্থিত করা যাবে? সেই সূত্রেই প্রথম লণ্ডনে, প্যারিসে কলা-প্রদর্শনীর সৃষ্টি, উদ্দেশ্য ক্রেতা সংগ্রহ, আপন শিল্পকর্মের প্রতি কলারসিকের দৃষ্টি আকর্ষণ। প্রদর্শনীর সেই মূল উদ্দেশ্য আজকাল কতখানি সফল হচ্ছে, সেটাই প্রশ্ন।

আমাদের ঘরের কথাই ধরা যাক। আমাদের দেশে চিত্র-প্রদর্শনীর মরশুম দেখে একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, আমাদের মধ্যে চিত্রস্রষ্টার, চিত্রোৎসাহীর সংখ্যা বেড়েছে। চিত্র-সমালোচক ও চিত্রসমজদারেরাও রয়েছেন। কিন্তু সে তুলনায় চিত্রক্রয়েচ্ছু ব্যক্তি কতজন দেখতে পাওয়া যায়? প্রকৃতপক্ষে আগে যা-ও বা কিছু দেখতে পাওয়া যেত, এখন তাদের সংখ্যা যেন দ্রুত বিলীয়মান। এর পিছনে গুরুতর কারণ একটা কিছু নিশ্চয়ই রয়েছে। সমস্যাটা দুদিক থেকে বিবেচনা করা যেতে পারে, এক, শিল্পীর দিক আর এক, ক্রেতা বা জনসাধারণের দিক।

সাধারণের দিক থেকে ভাবতে গেলে একটা খুব সহজবোধ্য বাধা প্রথমেই মনে পড়বে, আর্থিক অক্ষমতা। এ যুগে জীবনধারণের জন্য নিতান্ত প্রয়োজনীয় জিনিসই সংগ্রহ করে উঠতে পারা দায়, তার উপর শখ করে ছবি কিনবার ক্ষমতা লোকের কোথায়? প্রদর্শনী প্রসঙ্গে কলকাতাতেই চিত্রানুরাগীদের পক্ষ থেকে একটা কথা মাঝে মাঝে উঠেছে। তাঁরা বলেছেন, হাজার বারশ'র কথা ছেড়েই দিলাম, আজকালকার দিনে দুশো, আড়াইশো দিয়েই ছবি কিনবার ক্ষমতা কটা লোকের আছে? দামের বেলায় শিল্পীরা যদি একটু নামেন, তবে তাঁদের কাজ বেশী সংখ্যায় গৃহীত হবার সম্ভাবনা। কারণ সাধারণ লোক আর্টের মস্ত বড় সমজদার না হলে না-ও হতে পারে, কিন্তু তা-ই বলে তাদের যে ঘর সাজাবার ইচ্ছে হয় না বা সুন্দর করে জীবনযাপন করবার প্রবৃত্তি হয় না, একথা সত্য নয়। সৌন্দর্যবোধ মানুষের সহজাত সংস্কার।

কিন্তু শিল্পীরা এই অভিযোগের জবাবে যা বলেন, তা-ও অবশ্য অযৌক্তিক নয়। তাঁরা তাঁদের নিজেদের জীবনের দারুণ অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছেন যে, কোন প্রদর্শনীতে নামকরা চিত্রকরেরও ছবি কিছুতে একখানা কি দুখানার বেশী বিক্রী হয় না। অতএব সেই একখানা কি দুখানাতেই যাতে অন্তত কিছু আর্থিক স্বাচ্ছল্যের উপায় হয়, সে কথা ভেবেই তাকে মূল্য নিরূপণ করতে হয়। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়।

তবে অর্থসমস্যাই একমাত্র কথা নয়। আর্থিক সমস্যার সঙ্গে আরো একটা দুর্লঙ্ঘ্য বাধা জড়িত আছে। যারা চিত্রানুরাগী, অথচ যথেষ্ট অর্থশালী নন, তাঁদের কথা বাদই দিলাম। কিন্তু ক'জন বিত্তবানই বা ছবি কিনতে উৎসুক? অথচ কলকাতাতেই কিছুকাল আগেও বনেদী বাড়িতে চিত্রসংগ্রহ করবার একটা শখ ছিল। নিজস্ব চিত্রশালার বিচিত্র সংগ্রহ সম্বন্ধে আত্মপ্রসাদ বা গর্ব ছিল। আসল কথা এখন আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীরই একটা আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। আমাদের জীবনে শিল্পকলার স্থান এখন গ্রহণ করেছে ব্যবহারিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যবর্ধক নানা জিনিস। এতে ভাল হয়েছে কি মন্দ হয়েছে, সে প্রশ্ন এখানে তোলা নিষ্প্রয়োজন। তবে পরিবর্তন যে হয়েছে, সে কথা আমরা কেউই অস্বীকার করতে পারব না। অর্থনীতিতে পড়েছিলাম, মানুষের জীবনের অভাববোধ অসীম, কিন্তু তা পূরণ করবার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। তাই সারাজীবন কেবলি বাছাই করে চলতে হয়, কোনটা গ্রহণ করব—কোনটা ছাড়ব। এই বাছাই-এর প্রশ্ন যখনি আসে, যখনি মনে হয় কি করি, ছবি কিনি না মোটরগাড়ি করি, না কি একটা রেফ্রিজেরেটর? তখন শেষের জিনিসগুলিই নিঃসংশয়ে প্রাধান্য পায়। এই মনোভঙ্গীতে আর একবার পরিবর্তনের সূচনা দেখা না দিলে শিল্পীর আশা সত্যই কম।

এ তো গেল জনসাধারণের কথা। এবার দেখতে হবে শিল্পী-ক্রেতার সহজ সম্পর্কে শিল্পীর দিক থেকে কোন জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে কিনা। প্রদর্শনী-একাডেমির যুগে ভবিষ্যৎ-ক্রেতার মনোভাব জানবার শিল্পীর কোন উপায় থাকল না। ফলে, নির্দিষ্ট বিষয়বস্তুর গণ্ডিতে আবদ্ধ হয়ে থাকার দায়িত্ব থেকেও সে পেল মুক্তি। দিনকতক বিষয়বস্তুর সন্ধানে ইতস্তত ছুটোছুটি চলল। কখনো ধর্ম, কখ[নো] ইতিহাস, কখনো প্রাত্যাহিক জীবনযা[ত্রা] শিল্পীকে তার রচনার উপাদান জোগা[তে] থাকল। কিন্তু ধীরে ধীরে তা[র] অন্তর্দর্শন খুলে গেল, নিজের মনে[র] দিকে তাকাতে শিখল শিল্পী। চিত্র হ[য়ে] পড়ল সম্পূর্ণরূপে তার ব্যক্তিমানসে[র] প্রতিফলন। তখন থেকে আম[রা] প্রদর্শনীতে আর শুধু কলাদক্ষতা দেখতে যাই না, কলাকর্মের পিছনে শিল্পী[র] ব্যক্তিত্ব খুঁজি।

শিল্পকলার ক্ষেত্রে এক নিঃশব্দ, বিরা[ট] বিপ্লব ঘটে গেল। আর্টের অন্য উদ্দেশ[্য] লুপ্ত, আর্ট থাকল শুধু শিল্পীমনে[র] ভাবের অভিব্যক্তির মাধ্যম। এতে ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, প্রতিভাবান শিল্পীর পক্ষে যেম[ন] বিরাট সম্ভাবনার সৃষ্টি হল, তেমনি সাধারণভাবে শিল্পীর স্বার্থ কিছু ক্ষুণ্ণ[ও] হল। তৃতীয় ব্যক্তির পছন্দ-অপছন্দে[র] হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে শিল্পী একাগ্র মনে কখনো টেকনিক, কখনো রচনা[র] বিষয়বস্তু নিয়ে নানা পরীক্ষা নিরীক্ষা[য়] ব্যস্ত থাকলেন। ফলে, শিল্পীর সঙ্গে জনসাধারণের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। প্রায়ই দুর্বোধ্যতার অভিযোগ হতে থাক[ল] শিল্পীর বিরুদ্ধে। লোকের ছবি কেনা[র] বাসনাও ম্লানতর হতে থাকল। কার[ণ] এক বিশেষ ব্যক্তির যা মানস-প্রত্যক্ষ তাতে অপর পাঁচজনের আগ্রহ না-ও থাকতে পারে। কৌতূহল হয়ত থাকল, সমালোচনাও হল, নিন্দা-প্রশংসায় ভূষিত হলেন শিল্পী। কিন্তু অর্থের বিনিময়ে তাঁর কাজ গ্রহণ করবার তাগিদ থাকল কি?

তবে শিল্পোপজীবীর উপায় কি হবে? ঘড়ির কাঁটা পিছন দিকে ঘুরিয়ে তাকে তো আবার সেই সত্যযুগে, ফরমায়েসী আর্টের যুগে ফিরে যেতে বলা যাবে না। প্রস্তাবান্তর হচ্ছে রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা। সেকালে যেমন রাজা-বাদশাহের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পকলা পুষ্ট হ'ত, বর্তমানে রাষ্ট্র যদি তাঁদের স্থান গ্রহণ করে, তবে একটা উপায় হতে পারে। কিন্তু রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা পরিণামে বিপজ্জনক হবার সম্ভাবনা। ক্ষমতায় আসীন ব্যক্তিবিশেষ বা সম্প্রদায়-বিশেষের প্রভাবে শিল্পীর কলাকর্ম আচ্ছন্ন হয়ে পড়তে পারে।

আর্টের, বিশেষ করে চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের সঙ্গে জনসাধারণের মনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, একথা আগেই বলেছি। অথচ আর্টের সৃষ্টি হয়েছিল সাধারণ মানুষের সৌন্দর্য-পিপাসা পরিতৃপ্ত করবার জন্যেই। একটা চোঙগা-জাতীয় জিনিস দিয়ে জল খাওয়া অনায়াসেই চলত, কিন্তু গেলাসের কত রকমারী আকৃতি যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে। এল্যুমিনিয়মের ডেকচি জাতীয় পদার্থ দিয়ে রান্না সহজেই করা যায় এবং করা যাচ্ছেও। কিন্তু পিতল-কাঁসা-তামার বাসন ছেড়ে দিলেও মাটির হাঁড়িরই বা কত সুন্দর আকার দেখতে পাওয়া যায়। যে শিল্পী গেলাসে বা হাঁড়িতে আকার দিয়েছিল, সে পিকাসো কিংবা হেনরী মুরের চাইতে কম বড় শিল্পী ছিল, একথা স্বীকার করতে পারি না। এদিক দিয়ে শিল্পীর এবং জনসাধারণের মনের মধ্যে আদানপ্রদান যদি না চলে, আর্টিস্টের এবং জনসাধারণের মনের যে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, তা যদি পুনঃস্থাপন না করতে পারা যায়, আর্টকে যদি জীবনে প্রতিষ্ঠিত না করা যায়, তবে জীবিকা উপায়ের দিক থেকে শিল্পীর যে বিশেষ কোন আশা আছে, তা তো মনে হয় না।

শিল্পকার এবং শিল্পগ্রাহকের যে সম্বন্ধ তার মধ্যে একটা পারম্পর্য আছে। শিল্পগ্রাহকের মনে যেটা অপরিস্ফুট, সেটাই রূপে ফুটিয়ে তোলেন শিল্পকার। আবার শিল্পকারের অসামান্য মানস-প্রত্যক্ষে যে রূপ দেখা দেয়, তা দিয়ে তিনি উদ্বুদ্ধ করে তোলেন শিল্পগ্রাহকের মনকে। মানবমনের চিরন্তন অধ্যাত্ম-জিজ্ঞাসা সৃষ্টির মূলে যে বিরাট শক্তি কল্পনা করেছিল, সেই বিরাটের ভাবকেই রূপ দিয়েছিলেন শিল্পী আকাশস্পর্শী মন্দিরে, ভগবানের যে বাৎসল্য ভক্তকে পরিপ্লুত করে মনে হয়েছিল তাই দেখা দিয়েছিল মাদোনা রূপে, প্রকৃতির খেলায় যে সমস্ত ঐশী শক্তি আছে বলে আদি-মানব ভেবেছিল, সেগুলিকেই রূপে ফুটিয়ে তুলেছিলেন শিল্পী নানা দেব-দেবীর মূর্তিতে। প্রিয়জনবিরহ দূর করবার যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনে সর্বদা জাগরূক, তাকেই তৃপ্ত করেছিলেন শিল্পী প্রতিকৃতি এঁকে দিয়ে।

মানবমনের আকাঙ্ক্ষা এখনো রয়েছে, তবে বর্তমান যুগে তার বিষয়বস্তুর কিছু পরিবর্তন ঘটেছে বটে। যে শিল্পী পুরাকালে ভগবানের আরাধনাকে মন্দিরে, গির্জায় রূপ দিয়েছিল, সেই শিল্পীই বর্তমান যুগে এরোপ্লেনের স্রোতোরেখায় গতিবেগকে মূর্ত করে তুলেছে। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে ব্যবহারিক বা এপ্লায়েড্ আর্টের জগতে এখনও শিল্পীর কর্মের বহু অবকাশ রয়েছে। বস্তুত ধর্ম, জাত-চিত্রাঙ্কন, প্রতিকৃতি আঁকা ইত্যাদি এক এক সময়ে শিল্পীর জীবনে যে ভূমিকা নিয়েছে, ব্যবহারিক আর্ট আজ তার জীবনে প্রায় সেই ভূমিকাতেই অবতীর্ণ। অর্থাৎ সেদিকে সাধারণের চাহিদা আছে, শিল্পীরও তাদের প্রয়োজন মেটাবার সুযোগ রয়েছে। শিল্পী ও সাধারণের মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান দিনে দিনে রচিত হচ্ছে, এদিক দিয়ে অগ্রসর হলে তাও খানিকটা রোধ করা যেতে পারে।

শিল্পসাধনা পরিত্যাগ করে শিল্পী শুধুই ব্যবহারিক আর্ট নিয়ে মত্ত থাকবেন, এরকম একটি অসঙ্গত প্রস্তাব নিশ্চয়ই করা যায় না। কিন্তু আংশিকভাবে এই দিকটা কাজে লাগিয়ে অবশিষ্ট সময় শিল্পী যদি তাঁর নিজস্ব শিল্পসাধনায় মগ্ন হন তবে হয়ত কিছু সুরাহা হতে পারে। জীবিকা সম্পর্কে হতাশ হয়ে শিল্পচর্চাই পরিত্যাগ করেছেন শিল্পী—এরকম নজীর দুর্লভ নয়। তাই এমন কোন পথের অন্বেষণ করতে হয় যাতে শিল্পী তাঁর নিজস্ব কর্মক্ষেত্রে থেকেই একাধারে জীবিকার উপায় ও আপন সৃজন প্রতিভার স্ফুরণ দুই-ই করতে পারেন।

তার তাছাড়া ব্যবহারিক আর্টকে হেয় মনে করবারও তো কোন কারণ নেই। কমার্শিয়াল আর্ট কথাটা শুনলেই অবশ্য আমাদের অনেকের নাসিকা কুঞ্চনের অভ্যাস আছে। কিন্তু কমার্শিয়াল আর্ট নামে যা পরিচিত সেটা শুধু বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকা নয়। এরোপ্লেন, মোটরগাড়ীর আকৃতি কল্পনা, শাল দোশালা, কার্পেট বা বস্ত্রের বোনা বা আঁকা ডিজাইন, আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকার নিরূপণ ইত্যাদি অনেক কিছুই এই পর্যায়ে পড়ে। এই সমস্ত ডিজাইন বা রূপকল্পনার পিছনে বহু শিল্পসাধনা রয়েছে—এ শুধু হাতুড়ে কাজ নয়। বিশুদ্ধ আর্টে যার যথেষ্ট দখল আছে সেই ব্যবহারিক আর্টে নূতন সৃষ্টি করতে পারে।

অবশ্য, জীবিকার জন্য ব্যবহারিক আর্ট অবশিষ্ট সময়ে শিল্পসাধনার এই পন্থাকেই আমাদের আলোচ্য সমস্যার একমাত্র বা অদ্বিতীয় সমাধান বলে উপস্থিত করা কখনই আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে যখনই দেখতে পাই কোন শক্তিমান, সৃজনী প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী প্রদর্শনীর মাধ্যমে তাঁর পসরা সাজিয়ে বসেছেন কিন্তু সাধারণের কাছ থেকে আশানুরূপ সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না বলে খেদ করছেন তখন এই কথাই মনে হয় যে শিল্পী যদি শুধু তাঁর মনোমত ভাস্কর্য বা চিত্ররচনায় ব্যাপৃত থাকতে ইচ্ছুক হন, তবে জীবিকার জন্য তাঁকে অন্তত অংশত অন্য উপায়ের উপর নির্ভর করতেই হবে। সপ্তদশ শতাব্দীতে হল্যাণ্ডের খ্যাতনামা শিল্পী যান্ স্টীন যখন দেখলেন তুলির সাহায্যে জীবিকা নির্বাহ আর সম্ভবপর হচ্ছে না তখন তিনি এক সরাইখানা খুলে বসলেন। এতে শুধু যে জীবিকানির্বাহের উপায় হল তা-ই নয়, সরাইখানার কোলাহলমুখর পরিবেশ, বিচিত্র জনসমাগম তাকে চিত্ররচনার উপাদান যোগাত। জীবিকার জন্য যে কাজ করব এবং নিজের উচ্চাশার জন্য যে কাজ—দুটোতে সামঞ্জস্য ঘটাতে পারলে সমস্যার সমাধান হয় শিল্পীর।

শিল্পীর পক্ষে আশার কথা এই যে, শিল্পকলার ইতিহাসে দেখতে পাই যখনই কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়, সমাধান আপনা থেকেই উপস্থিত হয়। এই তো যখনই ধর্মের দিক থেকে অর্থোপার্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল অমনি প্রতিকৃতি প্রাকৃতিক দৃশ্য, জাতচিত্র ইত্যাদির দিকে ঝুঁকলেন শিল্পী। আবার যখনই সাধারণের সঙ্গে শিল্পীর যোগ বিচ্ছিন্ন হবার উপক্রম দেখা দিল তখনই হল কলাপ্রদর্শনীর সৃষ্টি। আজ যদি প্রদর্শনীর প্রথা শিল্পীর ভরণ-পোষণের পক্ষে অনুপযুক্ত বিবেচিত হয় তবে নিশ্চয়ই তার স্থান অন্য কোন রীতি গ্রহণ করবে।

ভূমিকম্পের স্মৃতি

শ্রীসরলাবালা সরকার

আমার জীবনে প্রথম ভূমিকম্প দেখিতে পাই সম্ভবত ১২৯৬ সালে। তখন আমরা বগুড়ায় ছিলাম। সে সময় সুলতানপুর স্টেশন হইতে গরুর গাড়িতে করিয়া বগুড়া যাইতে হইত। পথ অতিক্রম করিতে প্রায় বারো ঘণ্টা সময় লাগিত।

করতোয়া নদীর ধারে বগুড়া, অতি সুন্দর শহর। নরোত্তম দাসের জন্মস্থান খেতরী গ্রাম বগুড়া হইতে বেশী দূরে নয়। সেজন্য প্রতি বৎসর খেতরীর উৎসবের সময় বগুড়ায় তীর্থযাত্রীর ভিড় হইত। সেই তীর্থযাত্রীর মেলা একটি দেখিবার জিনিস। দূর দেশ হইতে এক-তারা হাতে বাউলের দল আসিত। এই বাউলের দলের সঙ্গে অনেক মুসলমান বাউলও থাকিত, ইহারা সুফি সম্প্রদায়ের সাধক। তখনকার দিনে উত্তরবঙ্গে এই শ্রেণীর অনেক মুসলমানকে দেখা যাইত।

বগুড়ায় কোঠা বাড়ি বেশী ছিল না। স্কুল, কাছারি এবং ইউরোপীয়ান কর্ম-চারীদের বাড়িগুলি পাকা বাড়ি অর্থাৎ ইঁটের তৈরী বাড়ি। অন্য সমস্ত বাড়িই মাটির দ্বিতল বা খড়ে ছাওয়া মাটির ঘর। মাটির দ্বিতলকে মাটকোঠা বলা হইত। মাটি এত শক্ত যে, মাটির ঘরগুলিও ইঁটের ঘরের মতই মজবুত। আবার সেই মাটি এমন উর্বরা যে, শস্য-সম্পদে দেশ পরি-পূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী। জীবনযাত্রা সচ্ছল, সুতরাং দেশে অশান্তির আবহাওয়া ছিল না, হিন্দু-মুসলমানের বিরোধের কথা কেহ কল্পনা করিতে পারিত না।

তখনকার দিনে জলপথে নৌকা করিয়া আসা-যাওয়া খুব প্রচলিত ছিল, পাবনা হইতে আমরা নৌকায় করিয়া প্রথমবার বগুড়া আসিয়াছিলাম। আমি তখন নূতন বধূ, আমার শ্বশুর ছিলেন বগুড়ায় প্রথম মুন্সেফ।

ভূমিকম্প কি মাসে হইয়াছিল, তাহা এখন আমার ঠিক মনে নাই, তবে মনে হইতেছে, সেটি যেন মাঘ মাসের শেষ। রাত্রি প্রায় এগারোটা, পল্লীগ্রামে এমন সময় বড় কেহ জাগিয়া থাকে না; আমি ও আমার অপেক্ষা ২।৩ বছরের ছোট এক ননদ এক ঘরেই শুইয়া ঘুমাইয়াছিলাম। ঘুমের মধ্যে গুড়্ গুড়্ শব্দে গর্জনের মত কি একটা ধ্বনি শুনিয়া ঘুম ভাঙিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে তক্তাপোশটা নড়িয়া উঠিল, আর চারিধারে শাঁখ বাজিয়া উঠিল।

আমি তখনই বুঝিলাম, ভূমিকম্প হইতেছে। ভূমিকম্প সম্বন্ধে কিভাবে আমার অভিজ্ঞতা হইয়াছিল, তাহা এখন মনে নাই। হয়তো বই পড়িয়া জানিয়া-ছিলাম কিম্বা কাহারও মুখে ভূমিকম্পের বর্ণনা শুনিয়া থাকিব। যাহা হউক, ভূমিকম্প হইলে যে ঘরের মধ্যে থাকা নিরাপদ নয় তাহা জানিতাম, তাই ননদকে বলিলাম, "ওঠো, ওঠো, ঘরের বাহিরে যাই।" কিন্তু ইতিমধ্যে তক্তাপোশ যেন কম্পনের বেগে আছড়াইতেছে, বাহিরে শঙ্খধ্বনি থামিয়া গিয়াছে, প্রবল কলরব ও আর্তনাদ শোনা যাইতেছে। ঘরের দরজা বন্ধ ছিল, খিল খুলিয়া বাহির হইতে হইবে; কিন্তু তক্তাপোশ এত দুলিতেছে যে, নামিতে গেলেই পড়িয়া যাইতে হইবে। আমার ননদ ভয়ে কাঁদিয়া উঠিল এবং দুইহাতে আমাকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "বৌদিদি, তুমি উঠোনা, তাহ'লে আমি মরে' যাব।"

যাহা হউক, অনেক কষ্টে তাহাকে লইয়া বাহিরে আসিলাম। বাহিরে আসিয়া দেখি, বাড়ির সমস্ত লোকই উঠানে বাহির হইয়াছেন। শ্বশুর যে মাট-কোঠায় ছিলেন সেটি এমন দুলিতেছে যেন ঘাড়ের উপর আসিয়া পড়িবে।

প্রথম কম্পন কতক্ষণ স্থায়ী হইয়াছিল তাহা ঠিক বলিতে পারি না, মনে হয়, ৪।৫ মিনিট ছিল। তাহার পর কম্পন থামিল বটে, কিন্তু ইহার মধ্যেই অনেক-গুলি বাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল, নদীর জল ফাঁপিয়া উঠিয়া পাশের স্থানগুলি প্লাবিত করিয়াছিল এবং কূপ ও ইঁদারা হইতে গলিত ধাতুস্রাব উৎক্ষিপ্ত হইয়াছিল, এ সকল সংবাদ পরে জানিতে পারিয়া-ছিলাম।

সেই একই রাত্রে আরও অনেকবার বসুন্ধরা কাঁপিয়া উঠিয়াছিল, তবে প্রথম-বারের মত প্রবল বেগে নয় এবং কম্পন-গুলি অল্প সময় স্থায়ী হইয়াছিল। কিন্তু প্রত্যেকবারেই ভূমিকম্পের আগে গুড়্ গুড়্ শব্দ শোনা গিয়াছিল।

সে রাত্রে সাহস করিয়া কেহ ঘরের ভিতর যায় নাই, অনেকেই খোলা জায়গায় জাগিয়া বসিয়া রাত্রি কাটাইয়াছিল। সেদিন হইতে প্রায় এক মাসকাল মাঝে মাঝে ভূমিকম্প হইতে লাগিল, আর প্রত্যেকবারই ভূমিকম্পের আগে গুড়্ গুড়্ শব্দ হইত, সুতরাং শব্দটি শুনিলেই সকলে সতর্ক হইত।

বগুড়ায় শিববাটি ও মালতী-নগরে বড় বড় ময়দান ছিল, সেই সব ময়দানে তাঁবু খাটাইয়া সাহেবেরা বসবাস করিতে লাগিলেন; জনসাধারণ অবশ্য নিজের নিজের বাড়িতেই থাকিল, তবে রাত্রে প্রত্যেক বাড়িতে পালা করিয়া এক একজন জাগিয়া থাকিত। এইভাবে বগুড়া-বাসিগণ ভূমিকম্পের মাসটি কাটাইল।

এই ভূমিকম্পে সেবার সমস্ত উত্তরবঙ্গ বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছিল। অনেক জমি-দারের বৃহৎ বৃহৎ অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হইয়াছিল। রংপুর কাকিনার রাজা মহিমারঞ্জনের বাড়ির এক দিক ভাঙিয়া গিয়াছিল, টেপার জমিদার অন্নদামোহন রায়চৌধুরীর পত্নী ধ্বংস-স্তূপের ভিতর চাপা পড়িয়াও ভাগ্যক্রমে বাঁচিয়া যান। তবে শোনা যায়, দেবালয়-গুলি রক্ষা পাইয়াছিল।

ইহার পরের বার বড় ভূমিকম্প হয় ১৩০৪ অথবা ১৩০৫ সালে। জৈষ্ঠ মাসের শেষ, আমি তখন কলিকাতায় ছিলাম। প্রাসাদ নগরী কলিকাতায় প্রবল ভূমিকম্পে যতগুলি বাড়ি পড়িয়া যাইবার কথা আশ্চর্যের বিষয়, সেই অনুপাতে

খুব বেশী বাড়ি পড়িয়া যায় নাই। অনেক বড় বড় বাড়ি ফাটিয়া গিয়া দুইদিকে দোল খাইয়া আবার যে কেমন করিয়া জোড়া লাগিয়া গেল ভাবিলে আশ্চর্য হইতে হয়। আমি চোখের সম্মুখেই এইরকম একটি দৃশ্য দেখিয়াছি। আমাদের দ্বিতল বাড়ির পাশেই ছিল এক প্রকাণ্ড ত্রিতল অট্টালিকা। আমরা উঠানে দাঁড়াইয়া দেখিলাম, সেই বাড়িটি ফাটিয়া গিয়া দুইদিকে হেলিয়া পড়িয়া দোল খাইতেছে, ঝড়ের সময় বড় বড় গাছের ডাল যেমন দুইদিকে নুইয়া পড়ে ঠিক সেইভাবে দুইদিকে হেলিয়া পড়িতেছে, আবার আসিয়া জোড়া লাগিতেছে। মনে হইতেছিল, বাড়ির এই ভগ্ন অংশ আমাদের ঘাড়ে আসিয়া পড়িল বুঝি; আমরা রাস্তায় বাহির হইয়া পড়িলাম, কিন্তু বাড়িটি ভাঙ্গিয়া পড়িল না, ভূমিকম্পের পর দেখিলাম, ভগ্ন দুই অংশ আবার জোড়া লাগিয়াছে, তবে উপর হইতে নীচে পর্যন্ত ফাটলের প্রকাণ্ড একটা দাগ আছে।

ভূমিকম্পের সময় লোকে আতঙ্কে হতবুদ্ধি হইয়া যায়, তাই ভূমিকম্পের দৃশ্য অনুভব বা উপভোগ করিবার তাহার ক্ষমতা থাকে না, আবার চলন্ত গাড়িতে ভূমিকম্প বুঝিতে পারা যায় না। সেবার কলিকাতায় ভূমিকম্পে অনেক নূতন তৈরী বাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল কিন্তু বহুদিনের জীর্ণ অনেক অট্টালিকা ভাঙ্গিয়া পড়ে নাই। ভূমিকম্পের সময় লোকের মানসিক অবস্থা কিরূপে হইয়াছিল সে সম্বন্ধে কয়েকজনের কাছে কয়েকটি কাহিনী শুনিয়াছি, তাহার দুটি এখানে উল্লেখ করিতেছি।

তখন কলিকাতায় ক্ষান্তমোহিনী নামে একজন ধাত্রী ছিলেন, তিনি সে সময় শুশ্রূষা কার্যের জন্য প্রতিদিন আমাদের বাড়ি আসিতেন। ভূমিকম্প যেদিন হয় সেদিন তিনি পায়ে ব্যথা হইয়া শয্যাগতা ছিলেন, তাহার পর যেদিন আমাদের বাড়ি আসিলেন সেদিন আমাকে ভূমিকম্পের কাহিনী যেভাবে শুনাইয়াছিলেন তাহা তাঁহার কথাতেই উল্লেখ করিতেছি। "ভূমিকম্প আরম্ভ হল, মোক্ষদা ছিল ছাদের উপর, আমি তাকে ডেকে বল্লাম, 'ওরে মোক্ষদা, শাঁখটা বাজা; বল্‌তে বল্‌তে সে কী দুলুনি; তখন চেঁচাচ্ছি, 'ওরে মোক্ষদা, শীগ্‌গির আয়, আমার হাতটা ধর, আমাকে বাইরে নিয়ে যা।' কিভাবে যে ঘর থেকে বেরিয়েছিলাম সেই পা নিয়ে, তা এখন মনে পড়ে না। আমার ছাদের পাশে অন্য বাড়িতে একটা পাঁচিল গাঁথছিল, কাদার গাঁথনি। সেই আধ গাঁথা পাঁচিলের পাশে বসে পড়েছি, দু'হাতে ধরেছি ছাদের কার্নিশটা, আর প্রাণপণে চেঁচাচ্ছি, "মধুসূদন! মধুসূদন!" ভূমি-

কম্প থাম্‌লে পাশের বাড়ির লোকেরা ছুটে এল আমার কি হয়েছে দেখবার জন্যে। এসে আমাকে ঐ অবস্থায় দেখে সবাই হেসে কুটিকুটি। বল্‌লে, বাঁচবার জন্য বেশ জায়গাটি বেছে নিয়েছো তো! ছাদের কার্নিশের ধারে, আধগাঁথা কাদায় গাঁথুনি পাঁচিলের পাশে; পাঁচিলটা যে তোমার ঘাড়ে পড়েনি, সেইটাই আশ্চর্য। তা পড়বে কি, যে ক'রে 'মধুসূদন' মধুসূদন' করে চেঁচাচ্ছ, মধুসূদনই পাঁচিলটা ধ'রে রেখেছিলেন পাছে তোমার ঘাড়ে এসে পড়ে।"

আমার মামার বাড়ির সম্পর্কিত তিনটি মহিলা সেই ভূমিকম্পের সময় কাশীপুরের এক বাড়িতে ছিলেন। বাড়িটি ফ্লোরের উপর ত্রিতল, সেজন্য মনে হইতেছিল বুঝি এখনই ভাঙিয়া পড়িবে। এই তিনটি মহিলার ভিতর একজন পরে এইভাবে আমার কাছে ভূমিকম্পের বর্ণনা দিয়াছিলেন, "শোন্‌ গৌরী, ক্ষীরির কান্ডটা। বাড়ি দুলছে, যেন এই পড়ে, এই পড়ে। দোতলার সিঁড়ি ভাঙতে আরম্ভ করেছে। ক্ষীরিকে বললুম, আয় এইবেলা নেমে পড়ি, না হ'লে আর নামতে পারবো না। ক্ষীরি তখন "আইমা আইমা" ক'রে ছুটোছুটি করছে। কেবলই বল্‌ছে, "আইমা বুড়ি কোথায় গেল, বুড়ি যে চাপা পড়ে মরবে।" আরে মর্‌ ছুঁড়ি, তুই যে এদিকে চাপা পড়বি সে খেয়াল তোর নেই!" আমি দেখ্‌লুম, সিঁড়ি ভাঙতে আরম্ভ করেছে, আর রক্ষে নেই। বারন্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম, বারন্দা এমন দুল্‌ছে যে, দাঁড়ায় সাধ্য কার? আর বারন্দার সামনে বড় রাস্তায় লোকেরা সব হাঁ করে দেখ্‌ছে, তাদের মুখ দেখে মনে হচ্ছে, তারা ভাব্‌ছে 'এইবার পড়লো, এইবার পড়লো।' আমার মনে কি হ'ল জানিস্‌ গৌরী, বারন্দা যেন বল্‌ছে, 'দিলুম ফেলে, দিলুম ফেলে।' আমার তখন আর জ্ঞান রইলো না, বীর বলাই! বলে হুংকার দিয়ে 'দিলুম এক লাফ ভাঙ্গা সিঁড়ির উপর, আর হুড়মুড় করে গড়াতে গড়াতে নেমে গেলুম নীচের দিকে; কে ধরলে, কে নামালে কিছু আর মনে নেই, সে সময় কি মানুষের জ্ঞানগম্যি কিছু থাকে? আর ক্ষীরি ছুঁড়ি? সে দোতলাতেই র'য়ে গেল, 'আইমা আইমা' করে। আমার ভাঙলো পা, তার গায়ে আঁচড়টিও লাগলো না। এর পরে ক্ষীরিকে যখন জিজ্ঞেসা করলাম, "ক্ষীরি, তুই কোন্‌ ভরসায় নীচে নামলিনে? যদি বাড়ি চাপা পড়তিস?" ক্ষীরি বল্‌লে কি জানিস্‌ "নতুন খুড়ি, আমার অত প্রাণের মায়া নেই।" "আ মর ছুঁড়ি, প্রাণের মায়া নেই তো তোর কিসের মায়া আছে? প্রাণ গেলেই তো সবই গেল।"

ইহার পর বেহারের সেই ভীষণ ভূমিকম্প! মজঃফরপুরে এই ভূমিকম্পে কত লোকের একেবারে সর্বনাশ হইয়া গিয়াছে। কত লোকের একদিনের ভিতর স্ত্রী পুত্র পরিবার, সাজানো পুরী সমস্ত শ্মশান হইয়া গিয়াছে। আমি এখানে সে সময়ের পাটনার ভূমিকম্পের কথাই বলিতেছি। পাটনায় মজঃফরপুরের মত অত বেশী ক্ষতি না হইলেও খুব কম ক্ষতিও হয় নাই।

পৌষ সংক্রান্তির দিন দুপুরবেলায় সেই ভূমিকম্প হয়। দুপুর তখন বিকালের দিকে গড়াইয়াছে। পাটনায় বহু প্রবাসী বাঙালী আছেন, প্রত্যেক বাড়িতেই পৌষ পার্বণের আয়োজন হইয়াছিল। 'মথুরানাথ সিংহ মহাশয় পাটনার প্রসিদ্ধ উকিল, সারদা মিত্রের লেনে তাঁহার প্রকান্ড দ্বিতল বাড়ি। সিংহ মহাশয়ের স্ত্রী সকাল হইতেই পিঠা পুলির আয়োজন করিয়াছিলেন; বাড়ির লোক তো আছেই, আবার বিতরণ করিবার লোকও অনেক। বড় বড় গামলা ভর্তি করিয়া পাটিসাপ্‌টার গোলা প্রস্তুত হইয়াছে, পরাত ভর্তি নারিকেলের ছাঁই ও ক্ষীরের পুর, রাশি রাশি সকরকন্দ্‌ আলু সিদ্ধ করিয়া ছাড়ানো হইয়াছে পুলি গড়িবার জন্য; খাওয়া দাওয়ার পাট মিটাইয়া এইবার আরম্ভ হইবে পিঠা গড়া, এমন সময় আরম্ভ হইল ভূমিকম্প। তাড়াতাড়ি সমস্ত পাত্রে ঢাকা চাপা দিয়া রান্নাঘরে শিকল তুলিয়া গৃহিণী যখন বাহিরে আসিলেন তখন বাড়ি ঘর দুড়দাড় করিয়া ভাঙিতে আরম্ভ হইয়াছে। গুনে্‌তি করিয়া ছেলেমেয়েদের বাহিরে নিরাপদ জায়গায় আনিয়া গৃহিণী কর্তার সন্ধানে গিয়া দেখিলেন, কর্তার সর্বাঙ্গ বাড়ি ভাঙ্গা সুড়কি ও বালীতে আচ্ছন্ন, বৈঠকখানার দিকটাই বেশী ভাঙিয়াছিল। যাহা হউক, সকলে নিরাপদেই ছিলেন।

ভূমিকম্প থামিবার পর গৃহিণীর প্রথম কাজ কে কোথায় শুইবে তাহার ব্যবস্থা করা। ইহার পর তাঁহার স্মরণ হইল পিঠা পুলির কথা। রান্নাঘরে গিয়া দেখিলেন, সমস্তই ঠিক আছে, কিছুই নষ্ট হয় নাই। সেই রাত্রেই বৌ ও মেয়েদের লইয়া তিনি রাত্রি বারোটা পর্যন্ত যতদূর সাধ্য পিঠা গড়িলেন ও সকলকে খাইতে দিলেন। সকলেই খাইল, কেবল তাঁহার মেজছেলে রাগ করিয়া খাইল না,—বলিল, "মা, কতলোকের সর্বনাশ হ'য়ে গেল, আর তুমি কিনা লাগিয়েছ পিঠে পুলির মহোৎসব?" উত্তরে মা বলিলেন, "সর্বনাশ যা হ'বার তা তো হয়েছেই, পিঠে পুলি যদি না ভাজ্‌তাম এতগুলো কাচ্চাবাচ্চা আর মানুষজন এই রাত্রে কি খেতো? তাতে কি সর্বনাশের কিছু সুরাহা হ'ত?"

আমার জীবনে এই তিনটিই বড় ভূমিকম্প। মনে হয়, এইরকম ভূমিকম্প দেখিবার মত দুর্ভাগ্য আর যেন না হয়। পৃথিবী এবার শান্তিময়ী হোন্‌ আজিকার দিনে ইহাই প্রার্থনা। মহাত্মাজী বেহারের ভূমিকম্পকে পাপের শাস্তি বলিয়াছিলেন, কিন্তু কাহার পাপে কাহার শাস্তি হয় কে জানে। এক একবার মনে হয়, মানুষের সমস্ত জীবনটাই যেন ভূমিকম্পের দোলায় মাঝে মাঝে দুলিয়া উঠে; সেই সংঘাতের ভিতর যাঁহারা বিচলিত হন না তাঁহারাই বীরশ্রেষ্ঠ, মানবজন্ম গ্রহণ তাঁহাদের জন্মেই সার্থকতা লাভ করে।

চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী গত সপ্তাহে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার স্বীয় গভর্নমেণ্টের নীতি ও কার্যাবলী পর্যালোচনা করে মার্কিন কংগ্রেসের উদ্দেশে যে বাণী "স্টেট অব দি ইউনিয়ন মেসেজ" দেন তাতে মার্কিন রণশক্তির সংহতি ও বৃদ্ধির উপর সর্বাধিক জোর দেয়া হয়েছে। পৃথিবীর শান্তিরক্ষার নাকি এ ছাড়া উপায় নেই। কম্যুনিস্টরা যদি বোঝে যে, তারা আক্রমণ করলে তাদের বিরুদ্ধে পাল্টা আক্রমণও অতিশয় ভীষণ হবে, তবেই তারা যুদ্ধ লাগাতে ভয় করবে। পৃথিবীর পক্ষে এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার যুদ্ধের আশঙ্কা নিবারণ করার উপায় হচ্ছে আমেরিকার ভাণ্ডারে এইসব অস্ত্রের শক্তি ও পরিমাণ ক্রমশ বাড়িয়ে যাওয়া—যাতে কম্যুনিস্ট শক্তিরা বোঝে যে তারা যদি আক্রমণ করে, তবে তারা তাদের দেশ ও অন্যান্য দেশের সর্বনাশ ডেকে আনবে। কম্যুনিস্ট শক্তিদের মনে এই ভয় জাগিয়ে

রাখাই হচ্ছে এ্যাটম যুদ্ধের ধ্বংসলীলা থেকে পৃথিবীকে বাঁচাবার উপায় অর্থাৎ এ্যাটম যুদ্ধের সম্ভাবনা হ্রাস করার উপায় হচ্ছে এ্যাটম অস্ত্রগুলিকেই বেশি করে আঁকড়ে ধরা এবং এ্যাটম অস্ত্রাদির ব্যবহারের জন্য প্রস্তুতি বাড়ানো। এই প্রস্তুতির জন্য আমেরিকা কী কী ব্যবস্থা করছে এবং করতে চায়, প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার তার একটা আভাসও দিয়েছেন—যা থেকে বোঝা যায় "নিউ-ক্লিয়ার" অস্ত্রাদির উপর পশ্চিমা রণ-কৌশল ক্রমশ কিরূপ নির্ভরশীল হয়ে পড়ছে।

এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা আঁকড়ে থাকার পক্ষে পশ্চিমা শক্তিদের যুক্তি হচ্ছে এই যে, কম্যুনিস্ট শক্তিদের জনবল অনেক বেশি, ভূ সৈন্যবলে তাদের সমান হওয়া পশ্চিমা শক্তিদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়, তাই এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা এবং অন্যান্য "নিউক্লিয়ার" অস্ত্রের প্রাধান্য দ্বারা জনবলের অসমতা পুষিয়ে নিতে হবে। এই যুক্তি যতদিন বলবৎ থাকছে, ততদিন এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবে আমেরিকা ও তার মিত্রগণ রাজী হচ্ছে না। আমেরিকা যদি সোভিয়েট রাশিয়ার এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাবে রাজী হয়, তবে কম্যুনিস্টদের রণশক্তি দুর্বার হবে, আমেরিকার এ্যাটম বোমার ভয়েই নাকি রাশিয়া কিঞ্চিৎ সংযত আছে, তা না হলে নাকি পশ্চিম য়ুরোপ কবে রাশিয়ার কবলিত হয়ে যেতো।

যতদিন পর্যন্ত রাশিয়া এ্যাটম বোমা বানাতে সক্ষম হয়নি, ততদিন পর্যন্ত এ যুক্তি হয়ত চলত; কিন্তু রাশিয়া কয়েক বছর ধরে এ্যাটম বোমা এবং এখন হাইড্রোজেন বোমা এমন কি হাইড্রোজেন বোমার চেয়েও সাংঘাতিক বলে কথিত কোবাল্ট বোমাও নাকি তৈরী করছে। তাই যদি হয়, তবে একমাত্র প্রশ্ন থাকে কোন্ পক্ষ কী পরিমাণ ঐসব মাল তৈরী করছে এবং সেগুলি প্রয়োগ করার শক্তি কার কত বেশি ও প্রয়োগের ফলে কোন্ পক্ষের কতটা ক্ষতি হবার সম্ভাবনা।

রাশিয়া যখন থেকে এ্যাটম বোমা তৈরী করছে বলে জানা গেছে, তখন থেকেই আমেরিকার য়ুরোপীয় মিত্রগণের, বিশেষ করে বৃটেনের ভয় ধরেছে। আমেরিকা দূরে এবং বড়ো দেশ, সে

অপেক্ষাকৃত নিরাপদ, কিন্তু প্রথম ধাক্কাতেই যে বৃটেন শেষ হবে। বৃটেনে আবার মার্কিন বোমারু বিমানের ঘাঁটি রয়েছে। সুতরাং এ্যাটম যুদ্ধ আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গে বৃটেনের উপর এ্যাটম বোমা পড়বে এবং বৃটেন ছাতু হয়ে যাবে। আমেরিকাকে পূর্বে যতটা নিরাপদ মনে করা হোত, এখন আর সেরূপ মনে করা হয় না। আমেরিকা নানা দেশে সোভিয়েট রাজ্যের কাছ ঘেঁষে বহুসংখ্যক বোমারু বিমানের ঘাঁটি তৈরী করেছে, যাতে যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গেই সোভিয়েটের উপর বিমান আক্রমণ চালানো যায়। সোভিয়েটের পক্ষেও কিন্তু এখন নিজ রাজ্য থেকেই বিমানবহর পাঠিয়ে খাস আমেরিকার উপর বোমারু আক্রমণ করা সম্ভব। মার্কিন রণবিশারদগণ নিজেরাই বলেছেন যে, যুদ্ধ হলে সোভিয়েট থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উপর বিমান আক্রমণ হবেই এবং আক্রমণকারী সোভিয়েট বিমানের শতকরা ৩০ ভাগকে মাত্র আটকানো সম্ভব হবে, অর্থাৎ আক্রমণকারী সোভিয়েট বিমানের শতকরা ৭০ ভাগ তাদের কাজ করে যাবে। সুতরাং আমেরিকার বিপদও বড়ো কম নয়। তাছাড়া আর একটা বড়ো কথা রয়েছে। কী বৃটেনে এবং পশ্চিম য়ুরোপ, কী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার আক্রমণে পশ্চিমা শক্তিদের যত ক্ষয় ও ক্ষতির সম্ভাবনা সোভিয়েট রাজ্য এবং চীনে তত নয়; কারণ পশ্চিমা দেশগুলিতে আক্রমণের লক্ষ্যগুলি অনেক বেশি ঘন-সন্নিবিষ্ট। লোকালয়ের কী শিল্পকেন্দ্রের পক্ষে এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার বিপদ পশ্চিমা দেশগুলির তুলনায় কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির অনেক কম। কেউ কেউ হিসাব করে দেখাচ্ছেন যে, গড়পড়তা একটা এ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমা রাশিয়ার তরফে যে "কাজ" দেবে, আমেরিকার তরফে তার অনেক কম কাজ দেবে। হয়ত আমেরিকা ১০০ বোমা ফেলে যতটা "কাজ" পাবে, অর্থাৎ যে পরিমাণ ধ্বংস ও মৃত্যু ঘটাতে পারবে, রাশিয়া তাকমত ফেলতে পারলে দশটা মাত্র বোমায় ততটা "কাজ" পাবে। উভয়পক্ষের সমপরিমাণ ধ্বংস এবং মৃত্যুও কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রসমূহের পক্ষে লাভজনক হবে; কারণ রাজ্যের পরিমাণ ও লোক-সংখ্যা তাদের অনেক বেশি।

এই দিক দিয়ে দেখলে সাধারণ জ্ঞানে মনে হবে যে, যুদ্ধে এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার প্রয়োগের সম্ভাবনা থাকা পশ্চিমা শক্তিদের পক্ষে ক্রমশ দুর্বলতার কারণ হয়ে উঠছে। তাহলে তো পশ্চিমা শক্তিদেরই স্বার্থ হওয়া উচিত এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার ব্যবহার নিষিদ্ধ করার চেষ্টা করা। তা না হয়ে উল্টো হচ্ছে কেন? রাশিয়া এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব করছে, আর আমেরিকা তাতে রাজী হচ্ছে না—এর মানে কী? জেনে-শুনে ইচ্ছা করে আমেরিকা নিজের দুর্বলতা টেনে আনছে অথবা রাশিয়া সজ্ঞানে একটা সুবিধা ত্যাগ করার জন্য আকুল হয়েছে। এরূপ বিশ্বাস করা কঠিন। হয়ত এমন কোনো ব্যাপার আছে, যাতে রাশিয়াতে এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা তৈরী হওয়া সত্ত্বেও এবং রাশিয়ার আমেরিকার উপর বোমারু আক্রমণ করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও আমেরিকা ভাবছে, এ্যাটম যুদ্ধের কৌশলে সে এখনো রাশিয়ার চেয়ে এগিয়ে আছে এবং এগিয়ে থাকতে পারবে বলে আশা করছে। এরূপ ভাবা অবশ্য ভুলও হতে পারে। কিন্তু এ্যাটম বোমা ও হাইড্রোজেন বোমা বাদ দিলে সোভিয়েটের তুলনায় আমেরিকা রণশক্তিতে দুর্বল হয়ে যাবে, একথা যে আগে থাকতেই ধরে নেয়া হয়েছে। সুতরাং ঐ এ্যাটমের পথে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করা ছাড়া আমেরিকা করবে কী?

সোভিয়েটের সুবিধা হচ্ছে এই যে, আমেরিকা যাই করুক, তাতেই আমেরিকার মুশকিল আছে। সোভিয়েট নিশ্চিত জানে যে, এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা থেকে ভয় ক্রমশ কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রগুলির চেয়ে পশ্চিমা রাষ্ট্রগুলির পক্ষেই বেশি হবে, কিন্তু তা সত্ত্বেও আমেরিকার এ্যাটমের পথ ছাড়ার উপায় নেই—তাহলে সোভিয়েটের পক্ষে এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমা পরিত্যাগের আন্দোলন চালানোতে কোন ক্ষতি নেই, বরঞ্চ প্রোপাগান্ডার দিক দিয়ে যথেষ্ট লাভ আছে,—কেবল অদলীয় জাতিগুলির সহানুভূতি লাভের দিকেই নয়, আমেরিকা এবং তার মিত্রদের মধ্যে মতভেদ সৃষ্টি করার দিক দিয়েও। কারণ এ্যাটম বোমার ভয়ে বৃটেনেও বহু লোক মার্কিন-নীতিকে সন্দেহের চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছে।

কিন্তু তাহলেও যা হবার তাই হচ্ছে এবং হবে বলে মনে হয়। যুদ্ধের অন্যান্য ব্যবস্থা এবং তার মূলীভূত কারণ যদি থেকে যায়, তবে কেবল এ্যাটম বা হাইড্রোজেন বোমা নিষিদ্ধ হবে, এরূপ আশা করা যায় না। যে দুই পক্ষ বর্তমানে এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমার অধিকারী, তাদের মধ্যে যদি সাক্ষাৎ-যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তবে সে-যুদ্ধ এ্যাটমিক যুদ্ধে পরিণত হতে বাধ্য। এই দুই মহাবলীর কাছে "দোহাই তোমাদের, তোমরা আর যাই কর, এ্যাটমিক যুদ্ধ কোরো না" বলে কাঁদুনি গেয়ে কোনো লাভ নেই। অন্য জাতিদের যদি কিছু করণীয় থাকে, তবে তা হচ্ছে এ্যাটম বোমার অধিকারীদের সংস্রব ত্যাগ করা, সম্পূর্ণভাবে উভয় দল-নিরপেক্ষ হওয়ার চেষ্টা করা। উভয়কে বলা, "ইচ্ছা হয়, তোমরা লড়ে যাও, কেবল আমাদের জড়িও না।" প্রতিবাদ হবে, তাতে কি কেউ ছাড়া পাবে? যুদ্ধ লাগলে সকলকেই জড়িয়ে পড়তে হবে। কেন? যদি কেবল দূরপাল্লায় এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমারই যুদ্ধ হয়, তবে মধ্যের দেশগুলিকে জড়াতে হবে কেন? বরঞ্চ যদি ঠিক হয় যে, অতঃপর কেবল এ্যাটম ও হাইড্রোজেন বোমারই যুদ্ধ হবে এবং যাদের ঐসব বোমা আছে, কেবল তারাই যুদ্ধ করবে ও কেবল তাদের দেশের উপরই যুদ্ধ হবে, তবে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক কিছুটা স্বস্তিবোধ করতে পারে।

১০।১।৫৫

৩৩

আর ঘুম নেই প্রীতি ও বীথির চোখে।

তিনদিন চাকরি করার পর বড় বোন প্রীতির কাছে বীথি তার কাজের ধরনটা আজ বর্ণনা না ক'রে পারল না। কমলা থাকলে হয়তো তার কাছেই বলত, হ্যাঁ, যে ওকে এমন চমৎকার কাজ জুটিয়ে দিয়েছে। নাকে মুখে ভাত গুঁজে ঘড়ির কাঁটার সঙ্গে পা মিলিয়ে ছুটে গিয়ে হাজিরা খাতায় নাম সই করার বালাই নেই। কি মেরুদাঁড়া সটান রেখে সারাক্ষণ হস্ত আঙুলে টেলিফোন বোর্ডের চাবি টেপা। আর একটু এদিক সেদিক হ'লে পান থেকে চুন খসলে ওপরওয়ালার ধমক খেতো সে বাবুটি লাইনের ওপার থেকে নম্বর চাইলেন তার বাস্ত অধৈর্য গলার হুঙ্কার, কুৎসিত গালিঃ "ছুঁড়িগুলোকে নিয়ে আর পারা গেল না...হ্যালো মিস টু নাইন জিরো, টু নাইন জিরো......সারাদিন বসে মাগিগুলো গল্প করবে তো কারেক্ট নম্বার দেবে কখন, যতসব......" ইত্যাদি। পিঠ ব্যথা করে, হাতের আঙুল টনটন করে, চোখে জল আসে, কানের ভিতর ঝিঁঝি ঝিঁঝি ডাকার মতন শব্দ হ'তে থাকে কাজ সেরে অফিস থেকে বেরিয়ে আসার পরও। একদিন না, অনেকদিন প্রীতি ছোট বোন বীথির কাছে, মা'র কাছে নিজের চাকরির অবস্থা ব্যাখ্যা ক'রে নিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে। হাড়ভাঙ্গা খাটুনি। সুযোগ পেলে সে আজই এ-কাজ ছেড়ে দেয়।

তা তো বটেই। সেই তুলনায় বীথি খুব সুখী।

'কি বলছিল মিহিরবাবু,—মিহির ঘোষাল তো ভদ্রলোকের নাম?' আধ-বোজা চোখে বীথির গালের কাছে মুখটা সরিয়ে নিয়ে প্রীতি কথাটা আবার শুনতে চায়। পাশাপাশি শুয়ে দুই বোন। সেই ছোটবেলা থেকে একটা কম্বল ভাগাভাগি ক'রে দু'জন গায়ে দিয়ে এসেছে। আজ অবশ্য আর কম্বল না। শীতের রাত্রে টিনের ঘরে বেশি ঠান্ডা লাগে। প্রীতি গত বছর তাদের দু'জনের জন্য এবং বাবার জন্যে লেপ তৈরী করেছিল। মা আর ছোট ভাইবোনগুলো মেঝের ওধারে ভুবনের বিছানার পাশাপাশি আলাদা একটা বিছানায় শোয়। দু'টো কাঁথা এবং প্রীতি বীথির পুরোনো কম্বলটা এখন ওরা ব্যবহার করছে। ঠান্ডাটা একেবারে নেই বরং কেমন গুমোট লাগছিল ব'লে বীথি লেপটা পায়ের কাছে ঠেলে দিয়েছে। প্রীতি অবশ্য ওটা এখনো গলা পর্যন্ত জড়িয়ে আছে। 'মিহির ঘোষাল আজ বলেছে তোকে এ-কথা, না কাল?'

'আজ।'

একটু চুপ থেকে প্রীতি বলল, 'তা করবেন কি ভদ্রলোক। মা মরা ছেলে নিয়ে মুশকিলে পড়েছেন। ছেলেটা এমনিতে কেমন, খুব দুষ্টু,-কি নাম যেন?'

'টুটুল।' বীথি বলল, 'এমনি খুব ঠান্ডা, শান্ত ছেলে। কিন্তু আমি একটু বাথরুমে গেছি কি যদি অন্যমনস্কও হয়েছি তো চিৎকার। সে কী ভীষণ কান্না। আধ ঘন্টা কোলে নিয়ে আদর করব, পায়চারি করব, এটা ওটা মুখে তুলে দেব, ছড়া কাটব তারপর যদি ঠান্ডা হয়।'

'কি খায়?'

'টিনের দুধ।' বীথি বলল, 'দুধ, কোয়েকার ওটস্, সুজি, নেবুর রস, টমেটোর রস। এক চামচ ক'রে ডিমের কুসুমও দিতে হয়। আর একটু তরকারীর জুস্। মশলা ছাড়া।'

'দাঁত উঠেছে?'

'একটা।'

'তবে দু'টো দু'টো ভাত দিলেই পারিস? অবশ্য যতটা হজম করতে পারে।'

বীথি অল্প হাসল।

'এ কি আর আমাদের ঘরের বাচ্চা দিদি। বড়লোকের ছেলে। মিহিরবাবু তো স্রেফ দুধ আর নেবুর রস এ্যাদ্দিন চালিয়ে আসছিলেন। অতটুকুন বাচ্চাকে ভাত দেবার কথা ভদ্রলোক হয়তো স্বপ্নেও ভাবতে পারেন না। তবুতো, শুনলাম, এদিকে খুব বেশি কাঁদাকাটা করত ব'লে ডাক্তার দেখানো হয়েছিল। কিচ্ছু অসুখ নেই ডাক্তার বলেছে। কেবল খাওয়াটার পরিবর্তন ক'রে দিয়েছে। দুধ ছাড়াও সুজি ওটস্ ডিম একটু সেদ্ধ আলু তরকারীর জুস্ টমেটোর রস সব মিলিয়ে এতবড় এক ফর্দ তৈরী ক'রে দিয়েছে। এবং কখন কোনটা খাবে তার ঘড়ি-ধরা সময়। একটু নড়চড় হ'লে চলবে না।'

'মা মরা ছেলে বড় ক'রে তোলা শক্ত কাজ।' প্রীতি মন্তব্য করল। দু' বোনের কথাবার্তা শুনে মা'র ঘুম ভেঙ্গে গেছে। ভুবনগিন্নী একবার কাসল। কিন্তু প্রীতি বীথি তা গ্রাহ্য না ক'রে কথা বলতে লাগল। তা ছাড়া বীথি কাল মাকেও তার কাজটা কোথায়, কি ধরনের বলেছে। বলেছে এবং বুঝিয়েছে। অফিসে এক গাদা পুরুষের সঙ্গে ব'সে কাজ করার চেয়ে বরং এটা অনেক ভাল। আর কত নির্দোষ কাজ। একটি মা-হারা শিশুকে মানুষ করার দায়িত্ব এবং মহত্ত্ব সন্তানের জননী হয়ে ভুবনগিন্নী অস্বীকার করতে পারেনি। শুনে এ সম্পর্কে আর কোনোরকম বিরূপ মন্তব্য করা দূরে থাক্ বেশ সহানুভূতির সঙ্গে ছোট বোনের সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলছে শুনে মা আরো বেশি নিশ্চিন্ত হয়। এবং আরো একটু সময় দু' মেয়ের কথায় কান পেতে থেকে পরে গলা পরিষ্কার ক'রে আস্তে আস্তে বলল 'নিয়মমত তেল-টেল মাখাস তো খোকার গায়ে?'

'ধোৎ।' মা'র কথা শুনে বীথি অল্প শব্দ ক'রে হাসল। 'কি তেল, সর্ষের তেল? হি-হি। মিহিরবাবু যদি তোমাকে

এ-কাজে বহাল করত তবেই হয়েছিল আর কি। গাদা গাদা তেল মাখিয়ে আর তেল-তেলে কাজল পরিয়ে ছেলেটাকে সারাদিন সঙ সাজিয়ে রাখতে।'

'রমেশের ঘরের ছোট বাচ্চাটাকে যেমন রাখা হয়।' প্রীতি একটা দৃষ্টান্ত তুলল।

ভুবনগিন্নী একটা ছোট্ট নিশ্বাস ছেড়ে বলল, 'তোদেরও রেখেছি ছোটবেলায়। তখন দিনকাল ভাল ছিল, টাকায় তিন সের সর্ষের তেল পাওয়া গেছে। এখন তোদের ছোট ভাই ষষ্ঠীটার সময়ই তো আর তেমন তেলটেল মাখাতে পারলাম না। সর্দিতে ভুগছে সারা বছর।'

বীথি বলল, 'না মা বড়লোকের বাচ্চা। মিহিরবাবু সর্ষের তেলের পক্ষপাতী না। অলিভ অয়েল এনেছেন বাচ্চার জন্যে। দু'রকমের পাউডার, দু' বাক্স সাবান। আধ ডজন তোয়ালে তো কেবল অই বাচ্চাটার জন্যেই সর্বদা ধুইয়ে মজুত রাখা হয় দেখছি। আমাকে পরশু খোকার জিনিস-পত্র সব বুঝিয়ে দিতে চোখে পড়ল।'

কথা বলল না ভুবনের স্ত্রী।

প্রীতি ছোটবোনের পেটে আঙুলের ছোট্ট একটা গুঁতো দিয়ে বলল, 'মাকে বল্ না, মিহিরবাবু আজ তোকে আসবার সময় কি বলছিল।'

বীথি হঠাৎ কথা বলল না।

লজ্জা পেয়ে কথাটা প্রকাশ করছে না অনুমান ক'রে মা বলল, 'কি বল্ না। খেতে টেতে বলছিল? ফাজিল ফক্কড় লোক না, কাল তোর কথা থেকে বুঝলাম। চলাবলায় ভদ্রলোকের সন্তান। কি আরো শাড়িটাড়ি কিনতে মাস না পুরতেই আবার কিছু টাকা দিতে চেয়েছিল নাকি?'

বীথির হয়ে প্রীতি বলল, 'রাতে ওখানে থাকতে পারবে কিনা জিজ্ঞেস করছিল। অবশ্য এটা তোমাদের অনুমতি নিয়েই হবে। তোমার আর বাবার। আলাদা কামরা আছে মানে বীথি যে-ঘরে থাকবে। ভিতর থেকে চাবি আটকাবার ব্যবস্থা। সেদিক থেকে ভয়ের কিছু নেই।'

ভুবনগিন্নী হঠাৎ কথা বলল না।

বীথি বলল, 'কেবল তাই না। রাস্তার উল্টোদিকের বাড়ি তার দাদার শ্বশুরের। মিহিরবাবু,—মানে আমি যদি ইচ্ছা করি সেখানেও রাত্রে শুতে পারেন। সেদিক থেকে সমস্ত রকম বন্দোবস্তই আছে। তারাও মস্ত বড়লোক। কামরার পর কামরা খালি পড়ে থাকে। লোক নেই থাকবার।'

'তা তুই কি বলে এলি?' ভুবনগিন্নী প্রশ্ন করল।

'বা-রে! তোমাদের অনুমতি না নিয়ে আমি এ-কথার কি জবাব দিই?'

'প্রীতি কি বলছিস?'

'আমি কি বলব।' প্রীতি মাকে বোঝায়, 'তুমি মা, তুমি বলবে বীথির এখন এ-কথায় রাজী হওয়া উচিত হবে কি না। তবে আমার বোন। এই হিসাবে বলতে পারি, শক্ত মেয়ে সেদিক থেকে ভাববার নেই। এখন ছেলে যদি বেশি কাঁদাকাটা করে। মিহিরবাবু যদি একেবারেই না রাখতে পারেন তবে ভদ্র-লোক রাত্রে থাকতে পারে বাড়িতে? এমন নার্সই হয়তো রাখতে চেষ্টা করবেন পরে। কি করে বলি এখন?'

'কান্না ব'লে কান্না।' বীথি মাকে শোনাল, 'আমার ব্লাউজ কামড়ে ধরে কাঁদছিল অতটুকুন বাচ্চা যখন কোল থেকে নামিয়ে তাঁর হাতে দিই। আসতে পারি না।'

প্রীতি বলল, 'আমি হলে এতটা হ'ত না। আমি দু'দিনেই অত আদর ঢালতে পারতাম না আর এক বাড়ির বাচ্চা ছেলের ওপর। অর্থাৎ ভিতর বাইর দু'টোই আমার একটু বেশি শক্ত। বীথির এদিকটা চিরকালই কেমন কাঁচা। দ্যাখোনা কতদিন আমাদের ষষ্ঠীটাকে নিয়ে কী হৈ-চৈ করে।'

'হ্যাঁ, মা হওয়ার ধাত কারো কারো একটু বেশি থাকে। বীথির মধ্যে এটা বেশি আমি স্বীকার করি।' ভুবনগিন্নী লম্বা নিশ্বাস ফেলল, 'এখন ভদ্রলোকের ছেলেকে আড়াই দিনেই এমন মায়া ধরিয়ে দিলি। রাত্রে তিনি শিশু রাখার কি ব্যবস্থা করেন। বিপদের কথা বৈকি।'

'ভেবে দ্যাখো।' বীথি দিদির গলা জড়িয়ে ধরল। 'যদি বোঝ দিদি এখন যে টাকা পাচ্ছে তা দিয়েই আমাদের মত বড় সংসারের সব খরচ চলে যাবে আর টাকার দরকার নেই বা এই নিয়ে দিনরাত মাথা ফাটাফাটি চিৎকার হল্লা করবে না, তবে কাল আমি 'না' বলে আসি। কেননা আমারও এভাবে সারাদিন আদর ক'রে খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে কোলে রেখে তারপর সন্ধ্যাবাতি লাগতে একটা শিশুকে একলা ফেলে রেখে আসতে খুব কষ্ট হয়। পুরুষ মানুষ বাচ্চাকে কতটা আদর দিতে পারে তা তুমিও ভাল জান। আড়াই দিনে আমার ওপর মায়া ধরেছে। আর দু'দিন না গেলে সেটা ভুলে যাবে। ভাল নার্স পাওয়া গেলে এবং রাত্রে কাছে শুতে পারলে মিহিরবাবুর ছেলের স্বাস্থ্য আরো ভাল হবে আমি বাচ্চাটাকে কোলে নিয়েই কাল টের পেয়েছি।'

ভুবনগিন্নী নীরব।

'এবং আমারও আর ঠিক করে কোথায় চাকরি হবে তার কিছু ঠিক নেই। এখন কমলাদিও এবাড়ি ছেড়েছে। কাজেই কেবল দিদির দিকে তাকিয়ে আমার সম্পর্কে কি ব্যবস্থা করবে বাকি রাত ভেবে ঠিক কর। দিদির কানে সেজন্যেই একটু আগে কথাটা তুলেছিলাম।'

প্রীতি লেপের মধ্যে মাথা গুঁজল। যেন ঘুম পেয়েছে। চোখ দু'টো একেবারে বুঁজে বড় রকমের একটা হাই তুলে বলল, 'বিশ্বাস মা বিশ্বাস। ঈশ্বরের ওপর বিশ্বাস রেখেই তো তুমি আমাদের এত-গুলো ভাইবোনকে জন্ম দিয়েছিলে। ভরসা ক'রে এসেছ, তোমরা যদি খাওয়াতে না পারো তো ঈশ্বর এদের কাউকে উপোস রেখে মরতে দেবেন না। একভাবে তিনি চালিয়ে নেবেনই—'

যেন ভুবনগিন্নী কি বলতে চাইল। কিন্তু আরম্ভ করার আগেই প্রীতি বলল, 'সেই ভগবানকে ডেকে প্রথমদিন আমায় বাইরে পাঠিয়েছিলে চাকরি করতে মনে আছে? তা-ও দেখতে দেখতে তিন বছর ঘুরল। অঘটন যখন ঘটাইনি বীথিও তা করবে না। রাত্রে থাকাটা তো বড় কথা না। খারাপ রাস্তায় যে যাবার দিনের বেলাও তার রাস্তা খোলা থাকে।'

ভুবনগিন্নী কথা বলল না।

প্রীতি শেষবারের মত চোখ খুলে বেশ একটু বড় গলায় মাকে বলল, 'বীথিকে কালই আবার কাজ ছাড়িয়ে বাড়িতে বসাও আমার আপত্তি নেই। কিন্তু আমি সামনের মাস থেকে ষাট টাকা ক'রে দিতে পারব না ব'লে রাখছি। গত মাসেই কথাটা বলব ভেবেছিলাম। অন্তত

পাঁচটা টাকা ক'রে রাখতে না পারলে আমার পলিসির প্রিমিয়াম চালাতে পারব না। অন্তত কিছুদিন তো দিই, দিয়ে না হয় পরে পেড্ আপ ক'রে রাখা যাবে। না না কেস্ যখন করিয়েছি আমি, সামান্য ক'টা টাকার জন্যে সেটা নষ্ট হ'তে দেব না।'

'না, কেন নষ্ট হ'তে দিবি।' ভুবন-গিন্নী নিশ্বাস ফেলল। "ভারি তো দু'টি হাজার টাকা। তা-ও যদি ভবিষ্যতের মতন নিজের একটা সম্বল ক'রে না রাখবি তো উপায়ই বা কি। বিয়ে থা তো আর শীগ্গির হবে এমন আশা দেখছি না। তবু না হয় ভাবতাম একটা খুঁটি থাকবে আপদে বিপদে।'

বীথি লেপের বাইরে মুখ এনে বলল, 'থাক মা রাত দুপুরে তুমি এখন প্রজা-পতির বিলাপ গাইতে শুরু করো না। বিয়ে বিয়ে ক'রে ওধরের ডাক্তারনী সুনীতিকে কি অবস্থায় এনে ফেলেছে শুনলে তো সব। এখন আমি কাল গিয়ে ভদ্রলোককে কি বলব, সেটা ঠিক কর।'

কথাটা শেষ করার সময় বীথি হাল্কা গলায় একটু হাসল। প্রীতি হাসল। মা হাসল। হেসে বলল, 'সত্যি, প্রভাতকণার না হয় মাথা খারাপ কিন্তু সুনীতিটা কী। তুই রোজগেরে বাপের মেয়ে। তুই যদি বিয়ের নামে অইটুকুন বয়েস থেকে অজ্ঞান হ'তে আরম্ভ করিস তো মুশকিলের কথা।'

'চাবুক মারতে হয় এসব মেয়েকে।' প্রীতি দাঁতে দাঁত ঘষল। 'টাইপ বস্তির মেয়ে। ঘরে থেকে এরা যত দুর্নাম, কেলেঙ্কারী ছড়াচ্ছে, যারা চাকরি করতে গেল তাদের দিয়ে তার ছটাকও হচ্ছে না। তারাই বরং এখন ভাল।'

'সুনীতিটাকে দেখলে আমার গা ঘিন্ ঘিন্ করে।' বীথি দিদির কোমরে হাত রাখল। 'এত বড় একটা খোঁপা। আলতা। রঙিন শায়া। চুড়ি। মাকড়ি। ওয়াক্ থুঃ, সারাক্ষণ বিয়ের কনেটি সেজে আছে।'

'ও-ই থাকে এক এক জাতের মেয়ে।' প্রীতি আর চোখ খুলল না। 'খেয়ে আর বিয়ে ক'রে কতগুলো শেয়ালকুকুরের জন্ম দিতে কেবল সংসারে বেঁচে থাকতে চায়। এখন বড় হয়েছিস। একটু একটু ক'রে চিনতে পারবি, চেহারা দেখলে বুঝবি কোন মেয়ের কি চরিত্র।'

বীথি কথা না ব'লে কি যেন ভাবে। তারপর আস্তে আস্তে অনেকটা নিজের মনে এক সময় বলল, 'ইস্ ভুলে গেছি। টড্লার কথাটার মানে জিজ্ঞেস করা হ'ল না। তোর মনে আছে দিদি?'

'নুনা।' প্রীতির ভীষণ ঘুম পেয়েছে। তন্দ্রাচ্ছন্ন গলায় বলল, 'কি হবে ওই শব্দ দিয়ে, কোথায় পেলি?'

আর বলো না। টুটুলের বিলিতি দুধের টিনে ব্যাটারা এমন সব লম্বা লম্বা কাগজ ঢুকিয়ে রাখে, অবশ্য ওগুলো দেখে সেই নিয়মে বাচ্চাদের ফুড্ খাওয়াতে হয়। সব ক'টা ইংরেজী শব্দের মানে বুঝতে পারিনি। আজ এসেই বারো নম্বরের রুচিদিকে জিজ্ঞেস ক'রে দু'টো শব্দের মানে জেনে নিয়েছি। টড্লার আর জিজ্ঞেস করা হ'ল না।'

'কে রুচিদি? ইংরেজী ভাল জানেন বুঝি?'

'অই তো সেদিন এল স্বামী-স্ত্রী। একটা ছোট্ট মেয়ে আছে। বৌ-টা মাস্টারি করে। ভদ্রলোক খুব সম্ভব বেকার।' বীথি ভয়ে ভয়ে বাবার প্রশ্নের জবাব দিল। মেয়েদের কথাবার্তায় ভুবনের ঘুম ভেঙেছে বোঝা গেল। এইমাত্র তার হাই তোলার শব্দ হ'ল। 'বুঝেছি বুঝেছি, এখন বুঝতে পেরেছি।' ভুবন অন্ধকারে মাথা নাড়ল।

এতক্ষণ পর ভুবনগিন্নী কথা বলল।

'বেশ আছে ভদ্রলোক। খুকির বাবা। বৌয়ের রোজগারে খায় দায়। ফর্সা কাপড় জামা পরে বেড়ায়। দাঁড়িগোফ কামায়, মুখখানা আয়নার মত ক'রে রাখে। সিগারেটও মুখে দেখি। বাচ্চাকাচ্চা বেশি নেই। অই একটা মোটে মেয়ে। তাই বৌ যা আনছে কুলিয়ে যায়। ঝঞ্ঝাট কম। সন্তান বেশি থাকলে আমাদের মত ঠেকত। ইস্কুলের মাস্টারের চেয়ে টেলিফোন অফিসের মাইনে বেশি। প্রীতি কি আমার কম আনছে। কিন্তু কুলাতে পারছি কই। বীথিটারও লেখাপড়া সাঙ্গ দিয়ে চাকরিতে ঠেলতে হ'ল। উপায় কি। কিন্তু বীথিরটা যোগ করলেও এই রাবুণে সংসারের সব দিকের অভাব যে আমি মেটাতে পারব মনে তো হয় না।'

ভুবন আর কথা বলল না। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। কেন না, সে একটা কথা বললে স্ত্রী এখন আটটা কথা বলবে। চাল ডাল ঘরভাড়া ঘুটে কয়লা কেরোসিন ইত্যাদি মাসের মোটা মোটা খরচ থেকে হিসাবটা গিয়ে ভুবনের আফিং এবং শেষ পর্যন্ত সামান্য এক পো দুধের ওপর গিয়ে চড়াও হবে ভয়ে ভুবন চুপ থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস দিয়ে তার সকল অসহায়তা ঘোষণা করল।

বীথি লেপের মধ্যে মুখ ঢুকিয়ে চুপ ক'রে রইল। মা-বাবার কথা আরম্ভ হ'লে তারা কথা বলে না। প্রীতির রীতিমত নাক ডাকছিল।

পরদিন বেলা দশটা পর্যন্ত আকাশ ঘোলাটে হ'য়ে রইল। পাতলা মেঘ আর কুয়াশায় মিলে বিশ্রী আবহাওয়া। না এই কুয়াশায় ঘাস ভিজে, না গাছের পাতা শুকনো থাকে। কুয়াশার ধার কমে গেছে। আর কি এইবেলা ছেঁড়া লেপ-কম্বল-কাঁথা গুটিয়ে ফেল, আর পাঁচ সাত দিন। ঠাণ্ডা বলে ঠাণ্ডা, টিন তেতে এমন হয়ে থাকবে যে, লেপ কম্বল কাঁথার দিকে চোখ গেলে গা-বমি-বমি করবে। তাছাড়া তেলে ময়লায় ধোঁয়ায় ধুলোয় এক এক ঘরে বিছানার চেহারা এমন হয়ে আছে যে এমনিও ওগুলোর দিকে তাকাতে এখনই আর ইচ্ছা করে না। আর কি। শীত গেল।

এবাড়িতে লক্ষ্মীমণি সকলের আগে ছেঁড়া কাঁথা কম্বলগুলো একটা ইঁদুরে খাওয়া চটের মধ্যে পুরে বাঁধতে বসে।

'তোমার সবটাতেই এবার তাড়াহুড়ো সাধনার মা, লক্ষণ ভাল না।' বুড়ি প্রমথর দিদিমা জানালায় গলা বাড়িয়ে দিয়ে ভাঙা খনখনে গলায় হাসছিল।

আর সেই হাসির শব্দে রকে চৌকাঠে সিঁড়ি কুয়াতলার সিমেণ্টের ওপর কালো হয়ে বসে থাকা মাছিগুলো নড়েচড়ে উঠছিল। ঠাণ্ডা কমছে আর মাছির ঝাঁক বড় হচ্ছে, বাড়ছে।

ওদিকে স্নানের ধুম পড়ে গেছে। হ্যাঁ মেয়েদের। এবাড়িতে এখন মেয়েরা ছাড়া আর এত সকালে স্নান করে কারা। রুচি প্রীতি বীথির সকালে কাজে বেরোতে হয়। তাছাড়া মল্লিকারও সকালে স্নানটি ক'রে তবে রান্নাটি চড়াতে হবে।

রমেশ এই বিষয়ে ভীষণ সতর্ক। রাত্রি-বাসের পর স্ত্রী ওমনি হেঁসেলে ঢুকবে তা সে কোনমতেই সহ্য করবে না। মল্লিকা হেসে হেসে কুয়াতলার অন্যান্য স্নানার্থীকে প্রত্যেক দিন বেলা সাতটায় স্নান করতে এসেই খবরটা জানিয়ে দেয়। আজও সে নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটল না। স্নান করতে আসে প্রমথর বুড়ি দিদিমা। অর্থাৎ লক্ষ্মীমণিকে সঙ্গে নিয়ে স্নান করতে আসবে ইচ্ছাতেই বুড়ি তার জানালায় উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু লক্ষ্মীমণি তখন কাঁথাকম্বল গুটোতে ব্যস্ত।

মাছি আর ময়লার গন্ধ। দিনটা ভ্যাপ্‌সা হলে, কোন কারণে রোদ অনুপস্থিত থাকলে আর রক্ষা থাকে না। কাঁচা ড্রেনের গন্ধে বাতাস ভারি হয়ে ওঠে। অবশ্য কুয়াতলায় বীথির দামী সাবানের গন্ধটাও বারো ঘরের উঠোনকে কম আমোদিত করছিল না।

অর্থাৎ বারো ঘরের উঠোন বারান্দা সিঁড়ি চৌকাঠের মাছির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ির পিছনে আমগাছটা ছেয়ে যেমন গুটি এসেছে তেমনি ময়লার দুর্গন্ধ ছাপিয়ে বীথির দামী মাখনের মত তকতকে নতুন নরম সাবানটা গন্ধ ছড়াচ্ছিল।

এমন সময় প্রীতি বীথির হাসি বন্ধ হয়ে গেল। লক্ষ্মীমণির সকাল সকাল হাসপাতালে যাওয়ার গল্প একটু সময়ের জন্য স্থগিত রইল। অর্থাৎ ঠাট্টা থামিয়ে প্রমথর দিদিমাও খবরটি মনোযোগ দিয়ে শুনল।

যেন মাঘের শেষের ফাল্গুনে ছুঁই ছুঁই সকালের এক টুকরো মিষ্টি হাওয়া সংবাদটা সকলের কানে কানে রটিয়ে দিয়ে গেল।

মুখে বলতে হয়নি। হাওয়া মারফৎ জানাজানি হয়ে গেল।

এমন কি চিকেন্‌ পক্স-এ আক্রান্ত শয্যাশায়ী ও-ঘরের বিমল পর্যন্ত কি ক'রে খবরটা পেয়ে গেছে। মশারীর তলা থেকে মুখ বাড়িয়ে দিয়ে হিরণকে বলছে, 'যাও না, ভাল ক'রে জেনে এসো, সত্যি কি গুজব।'

মুখে আঁচল চাপা দিয়ে হিরণ খুক্‌ খুক্‌ হাসছে।

'গুজব হবে কেন, ডাক্তার ছুটে বেরিয়ে গেছে পুলিশে খবর দিতে।'

'তা কখন, রাত ক'টায় পালিয়েছে? কার সঙ্গে পালাল, এ্যাঁ, এমনিতে দেখতে ভেজা বেড়ালটি মনে হ'ত আমার।'

এবার মুখের আঁচল সরিয়ে হিরণ খিল খিল হাসল। 'মেয়েদের দেখতে আবার শুক্‌নো দেখায় কখন।'

'তা বটে কারণে অকারণে তোমরা অষ্ট প্রহর ভিজে আছ।' হি-হি হেসে বিমল প্রশ্ন করল, 'কা'র সঙ্গে সুনীতি পালিয়েছে বললে? কি ক'রে গেল?'

হাসি থামিয়ে হিরণ বলল, 'আর কা'র সঙ্গে, ওই সুধীর মামা, এটা আবার বলতে হয় নাকি। কি ক'রে গেছে তা জানে কে। সুনীতির মা তো বলছে, দরজায় খিল দিয়ে ডাক্তার আসবার আগেই সন্ধ্যাসন্ধি শুয়ে পড়েছিল। ডাক্তার ফেরে রাত সাড়ে বারোটায়। সুনীতিই দরজা খুলে দেয়। অনেক রাত পর্যন্ত জেগে কি একটা নাকি বই পড়ছিল।'

'কি বই।'

'নাটক নভেল হবে।' বিমল হালদার গলার একটা শব্দ করল। 'ওই কুমারী বয়সে মেয়েদের নাটক নভেল পড়তে দিলে আর সিনেমা দেখতে দিলে এই অবস্থাই হয়। ছি ছি, শেষ পর্যন্ত বাপ মাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে সুনীতি পালাল। বজ্জাত, বজ্জাত, আজকাল মেয়েগুলো এক একটা যেন বজ্জাতের ধাড়ি। কী বা চলা-ফেরার রকম, কী বা কথা বলার ঢং। গালার ফ্যাক্টরীতে যেতে-আসতে আমি তো ওদের ভিড়ের ঠেলায় অস্থির, বাসে উঠতে পারি না, বসতে পারি না, বাস থেকে নামতে পারি না। আর তলে তলে এদিকে করছেন এসব কর্ম। উঁহুঁ। আফিস করছেন যিনি তিনিও যেমন, ঘরে থেকে চালের কাঁকর বাছেন কি বুড়ো বাপের ছেঁড়া কোটে তালি লাগান তিনিরাও এখন সেই চরিত্রের হয়েছেন। ফাঁক পেলেই পিরীত, সুবিধে পেলেই পালিয়ে যাওয়া।'

বুড়ি দিদিমা খনখনে গলায় মল্লিকাকে বলল, 'আর একটা প্রাণী এবাড়ির মায়া কাটাল। কাল গেছে কমলা, পরশু গেল কিরণ আর অমল।'

'কমলা শিশিরকে সিবিল মারিজ করছে শুনেই তো প্রভাতকণার মেয়ে মামার সঙ্গে ঝুলে পড়ল। বিয়ের জন্য মুখপুড়ির ক'রাত চোখে ঘুম ছিল না কে জানে। আ কলঙ্ক!'

'বলি শিশির হারামজাদা কত রাতে ঢুকেছিল এবাড়ি কে জানে। উঠোনে ঢুকেছিল?'

লক্ষ্মীমণি চোখ বড় ক'রে মল্লিকার কানে কানে কি বলতে মল্লিকা মাথা নাড়ল।

'আমিও চার নম্বর ঘরের দরজায় আঙুলের টোকা শুনলাম। ক'টা তখন রাত? হ্যাঁ, তিনটা হবে।'

'আমিও শুনেছি। একবার ভাবলাম, ওঘরের দরজায় টিকটিকি ডাকছে। কিন্তু তারপর আর একবার টোকা পড়তে বুঝলাম মানুষ।'

বীথির মা'র দিকে তাকিয়ে লক্ষ্মীমণি বলল, 'তা দিদি এখন শোনা আর দেখা, একই কথা। জানালার পাল্লাটা ফাঁক ক'রে অন্ধকার উঠোন, তবু দেখে বেশ বুঝলাম মানুষ। একটা মানুষের মূর্তি। তারপর দু'টো মানুষের মূর্তি যেন দরজার কাছ থেকে সরে এসে আবার উঠোনে নামল। উঠোন পার হয়ে সদর দিয়ে বেরিয়ে গেল।'

লক্ষ্মীমণির বড় বড় চোখের দিকে তাকিয়ে কুয়াতলার লোকগুলো চুপ ক'রে রইল। তাদেরও চোখ বড় হয়ে গেছে, ঠোঁট ফাঁক হয়ে আছে।

'তা তখন ডেকে কিছু বলতে যাওয়া বিপদ।' ঢোক গিলে লক্ষ্মীমণি হেসে সকলকে বোঝাল।

'না না দিদি, ভালই করেছেন। কা'র ঘরে কি হচ্ছে আমরা বলবার কে। থালা ঘটি চুরি গেলে তবু দু'টো কথা বলি, কলেরা যক্ষ্মায় গেলে দোরে উঁকি দিয়ে চোখ মুছি। কিন্তু এ-ব্যাপার তো ভীষণ গুরুতর ব্যাপার। আমরা কথা বলার কে। চুপ ক'রে থাকা ভাল।'

অর্থাৎ এ-সম্পর্কে আর কোনো আওয়াজ উঠল না। বাতাসে ভর ক'রে একটা চাপা ফিস্‌ফিসানি উঠোনের এ-মাথায়, ও-মাথায় ঘুর ঘুর করতে লাগল এ-দরজা থেকে আর এক দরজায়।

(ক্রমশ)

(পূর্বানুবৃত্তি)

আবার নীচের দিকে নামিয়া চলিলাম। নামিবার মুখেই লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির। এই মন্দির নাকি সোনার পাতে মোড়া ছিল। ভিত্তিতল ব্যতীত মন্দিরের কোন চিহ্নই বর্তমান নাই। দু' চারটি সুগঠিত প্রস্তরমূর্তি এবং প্রস্তর স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ ভিত্তিতলে সযত্নে সাজাইয়া রাখা হইয়াছে। চমৎকার কারুকার্যখচিত। লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের এক পাশে অম্বিকা দেবীর মন্দির। তাহারই পাশে শীতলা মন্দির। দুইটি মন্দিরই শূন্য। অম্বিকা দেবীর মন্দিরটি অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে নির্মিত হইলেও ইহার কোন কোন অংশ যে অতি প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। অম্বিকা দেবীর মন্দিরের দক্ষিণে পশ্চিমদ্বারী দুইটি জৈন মন্দির। একটি মন্দির শূন্য। হয়ত কোন তীর্থঙ্করের মূর্তি ছিল। শূন্য পাদপীঠটি পড়িয়া আছে। অপর মন্দিরটিতে প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের উপবিষ্ট মূর্তি। মূর্তির পাদপীঠের লেখটি ১৫২৩ বিক্রমাব্দ বা ১৪৬৫ সালে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। লক্ষ্মীনারায়ণ, অম্বিকা দেবী এবং শীতলা দেবীর মন্দিরের এক পার্শ্বে একটি প্রাঙ্গণ। প্রাঙ্গণের প্রবেশপথে একটি তোরণের ধ্বংসাবশেষ। ইহার নাম দর্শনী দরওয়াজা। তোরণের দুই পার্শ্বে গঙ্গা ও যমুনার মূর্তি উৎকীর্ণ ছিল। দুইটি মূর্তিই ক্ষয়প্রাপ্ত এবং বিকৃত। বলিয়া না দিলে চিনিবার উপায় নাই। এই পথে দেব-দেবী দর্শনে আসিতে হইত বলিয়াই ইহার নাম দর্শনী দরওয়াজা। দর্শনী দরওয়াজা পার হইয়া রাজপ্রাসাদের দিকে কিছুদূর অগ্রসর হইলে আর একটি তোরণ। ইহাকে মহালোঁ কি দরওয়াজা বলা হইত। এইটিই ছিল রাজপ্রাসাদের অন্দরমহলে প্রবেশপথ।

অদূরে শান বাঁধানো একটি চত্বর। এক পার্শ্বে ভগ্নশীর্ষ গুটি তিন চার প্রস্তর স্তম্ভ। দরবার কক্ষের ধ্বংসাবশেষ। পাত্র-মিত্র লইয়া কাটোচ রাজগণ এখানে দরবারে বসিতেন। চত্বরের এক প্রান্তে খানিকটা জায়গা অপেক্ষাকৃত উচ্চ। এইখানেই বোধ হয় রাজসিংহাসন স্থাপিত ছিল। দরবার কক্ষের ছাদ বা প্রাচীরের কোন চিহ্নই নাই। রাজা রাজ্যপাট, রাজলক্ষ্মী সমস্তই গিয়াছে।

দুর্গের ভিতর পানীয় জলের পাঁচটি কূপ এবং দুইটি দীঘি ছিল। সব কয়টি কূপ এবং একটি দীঘিতে এখনও জল আছে। একটি দীঘি শুকাইয়া গিয়াছে। ইহাকে 'শুখা তালাও' অর্থাৎ শুষ্ক সরোবর বলে। দ্বিতীয় সরোবরটির নাম কর্পূর সাগর। দুর্গের অপেক্ষাকৃত নীচু অংশে ইহার অবস্থান। প্রায় কোমর সমান উঁচু ঘাসের ঘন জঙ্গল ভাঙিয়া বৃক্ষবহুল পার্বত্য পথ কর্পূর সাগরের দিকে চলিলাম। এখানে সেখানে দু' একটি গরু চরিতেছে। মধ্যে মধ্যে নাকি চিতাবাঘের উপদ্রব হয়। সঙ্গী চৌকিদার আশ্বাস দিল যে, নরমাংসে তাহাদের রুচি নাই। তবে সুযোগমত গরু-মহিষ, ভেড়া-ছাগল বা হাঁস-মুরগী পাইলে স্বতন্ত্র কথা। অনেকক্ষণ চলিবার পর চৌকিদার সম্মুখে বেশ খানিকটা দূরে একটি স্থান নির্দেশ করিয়া বলিল, 'ঐ কর্পূর সাগর'। চাহিয়া দেখি, হাল্কা সবুজ রং-এর খানিকটা জল। এই? বড়ই নিরাশ হইলাম। কাছে যাইতেই কিন্তু আর ক্ষোভ রহিল না। তলা হইতে পাথরে পাড় বাঁধানো একটি বেশ বড় জলাশয়। পাষাণময় সোপানশ্রেণীতে এখনও কালের চিহ্ন পড়ে নাই। এক কোণে একটি স্বাভাবিক কূপ। দীঘির জল আগাগোড়া সবুজ পানায় ঢাকা। মনে হয়, কে বুঝি একখানা সবুজ গালিচা বিছাইয়া রাখিয়াছে। জলের কাছে যাইয়া পানা সরাইতেই কাকচক্ষু জল। এত পরিষ্কার যে, বহুদূর পর্যন্ত জলতলের পাথরের নুড়িগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। খানিকটা জল মুখে লইয়া দেখিলাম যে, চমৎকার স্বাদ। তবে কি রকম একটা গন্ধ। বৈজ্ঞানিক মার্জনা করিবেন।

কাঙড়াতে যিনি প্রথম দুর্গ নির্মাণ করেন, তাঁহার রণ-নীতিজ্ঞান নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে সার্ধ-দ্বিসহস্র ফুট (২৪৯৪) উচ্চ পর্বতশৃঙ্গে দুইটি খরস্রোতা পার্বত্য স্রোতস্বিনী বেষ্টিত কাঙড়া দুর্গ একদিন শত্রুর মনে ত্রাসের সঞ্চার করিত। দুর্গের পূর্বদিকে প্রায় ৩০০ ফুট নীচে বাণগঙ্গা (বানের বা বাণ্ডের) এবং পশ্চিমদিকে প্রায় ৬০০ ফুট নীচে পাতাল গঙ্গা প্রবাহিতা। বাণ-গঙ্গার জল শ্বেত(!) বর্ণ। পাতালগঙ্গার জল রক্তবর্ণ। দুর্গ পাদমূলে গভীর পরিখার চিহ্ন আজও একেবারে মিলাইয়া যায় নাই। জলপূর্ণ এই পরিখা পারা-

বজ্রেশ্বরী মন্দির

পারের জন্য কাষ্ঠসেতুর ব্যবস্থা ছিল। এই সেতু ইচ্ছামত সরাইয়া নেওয়া চলিত। ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগীয় সামন্তদিগের দুর্গরক্ষার অনুরূপ ব্যবস্থার কথা শুনিতে পাই। পরিখা আজ জলশূন্য, অরণ্য সমাচ্ছন্ন। সেতুর চিহ্নও নাই। থাকিবার কথাও নয়। যে যে জায়গায় সেতু বসাইবার ব্যবস্থা ছিল, সে জায়গাগুলি এখনও চেনা যায়। চিহ্ন পড়িয়া থাকে। যাহার চিহ্ন সেই শুধু থাকে না। এই সনাতন নিয়ম। দুর্গমধ্যে একটি ভাঙ্গা মস্‌জিদ। সম্রাট জাহাঙ্গীরের আদেশে নির্মিত। রাজপ্রাসাদ হইতে খিড়্‌কি দরজা পর্যন্ত সুড়ঙ্গ পথ। অসূর্যম্পশ্যা অবরোধবাসিনীদিগের অবগাহন এবং জলকেলির জন্য এই ব্যবস্থা। একদিন এই পথে আসিয়া তাঁহারা পাতালগঙ্গায় অবগাহন করিতেন। সেদিন কি এই পর্বত দুহিতার বারিরাশি তাঁহাদের বরতনু ঘেরিয়া কলকল, ছলছল কাঁদিয়া উঠিত? রঞ্জিম ফেনশীর্ষ তরঙ্গরাজি কি নূপুরের মত তাঁহাদের চরণে চরণে বাজিয়া উঠিত?

দুর্গের চারিদিক ঘিরিয়া পাষাণবেষ্টন। জায়গায় জায়গায় প্রাচীর এখনও অভগ্ন। পর্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য প্রাচীরের উপর মধ্যে মধ্যে রক্ষিবাহিনীর ঘাটি ছিল। এইগুলি মোরচা নামে পরিচিত। প্রাচীরের গায়ে উপরে নীচে অসংখ্য ছোট ছোট ছিদ্র। ছিদ্রপথে বাহিরে তাকাইলে বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। সম্ভাব্য শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার জন্য এবং বাহির হইতে দুর্গ আক্রান্ত হইলে শত্রুকে বাধা দিবার জন্যই এই ব্যবস্থা।

অবসন্ন দেহে, বিষণ্ণ মনে দুর্গ হইতে বাহির হইয়া তহশীল কাঙড়ায় ফিরিয়া চলিলাম। বাস ধরিতে হইবে। পথে ভবনে বজ্রেশ্বরী বা মাতা দেবীর মন্দির। ভবন কাঙড়ার শহরতলী। ভবনের বজ্রেশ্বরী কাটোচ রাজবংশের কুলদেবী। ৫২ পীঠের অন্যতম ভবন জালন্ধর পীঠের অন্তর্গত। বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিতা দক্ষদুহিতা শিবজায়া সতীর দক্ষিণ স্তন ভবনে পতিত হইয়াছিল। পাঞ্জাব, দিল্লী, উত্তরপ্রদেশ এবং ভারতের অপরাপর অঞ্চল হইতে তীর্থযাত্রীর দল পুণ্যার্জন এবং পাপমোচনের আশায় ভবনে তীর্থ করিতে আসে। পুণ্য সঞ্চয় এবং পাপক্ষয় কতটা হয় জানি না। তবে মন্দিরের পুরোহিতগণের যে মোটা আয় হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।

ভবন অতি প্রাচীন তীর্থস্থান। মন্দিরে কোন মূর্তি নাই। কৃষ্ণবর্ণ একটি প্রস্তরখণ্ড দেবীরূপে পূজিত হয়। ভবনের প্রাচীন মন্দিরটি ১৯০৫ সালের ভূমিকম্পে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। বর্তমান মন্দির ভূমিকম্পের পর নির্মিত। ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরটিও খুব প্রাচীন ছিল না। বর্তমান মন্দিরের দ্বারদেশে সংরক্ষিত একখানা প্রাচীন শিলালেখ অনুযায়ী দিল্লীর সুলতানশাহী মুহাম্মদের (মুহাম্মদ সৈয়দ, ১৪৩৩—৪৬) রাজত্বকালে প্রাচীন মন্দিরটি নির্মিত হইয়াছিল। প্রথম সংসারচাঁদ (আঃ ১৪২৯—৫০) তখন কাঙড়ার রাজা। পার্বত্য পাঞ্জাবের প্রথম শিখ রাজপ্রতিনিধি সর্দার দেশা সিং মন্দিরটি মেরামত করিয়াছিলেন। শিখ নৃপতি শের সিং-এর পত্নী বিবি চাঁদ কৌর মন্দিরের চূড়াটি সোনার গিল্টি-করা পাতে মুড়িয়া দিয়াছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন যে, বজ্রেশ্বরী আসলে বৌদ্ধ দেবী এবং ভবনের মন্দির পূর্বে বৌদ্ধতীর্থ ছিল। যদি তাহাই হয়, তবে হয়ত হিন্দুধর্মের পুনরভ্যুত্থানের যুগে ভবন হিন্দুতীর্থে পরিণত হইয়াছে। তন্ত্রে বজ্রতারার উল্লেখ পাই। বজ্রতারার বজ্রেশ্বরীতে রূপান্তর বিচিত্র নহে।

আশ্বিন এবং চৈত্র মাসে নবরাত্রি উপলক্ষে ভবনে বহু যাত্রিসমাগম হয়। মন্দিরের নিজস্ব পঞ্চাশ বিঘা দেবোত্তর জমি এবং চার-পাঁচ বিঘা জমির উপর একটি ফলবাগান আছে। মন্দিরের আশে পাশের দোকানঘরগুলির ভাড়া হইতেও মন্দ আয় হয় না।

বিশেষ বিশেষ উপলক্ষে বজ্রেশ্বরী দেবীর নিকট মহিষ, ছাগ, কুক্কুট, কুষ্মাণ্ড, নারিকেল—এই পঞ্চবলি দেওয়া হয়। কুক্কুট বলি কি হিন্দুশাস্ত্রসম্মত? ইহা কি অ-হিন্দু, অনার্য প্রভাবের সাক্ষ্য বহন করিতেছে না?

(৬)

মহাতীর্থ জ্বালামুখী! ভবনের ন্যায় জ্বালামুখীও জালন্ধর পীঠের অন্তর্গত। কাঙড়া হইতে দশ মাইল রাণীতাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় পূর্ত বিভাগের পিচ বাঁধানো সড়ক। রাণীতাল হইতে কাঙড়া জেলাবোর্ডের কাঁচা রাস্তা। তেরো মাইলের মাথায় জ্বালামুখী। শিবালিক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর বাস কাঙড়া হইতে জ্বালামুখী যাতায়াত করে। রাণীতালের একেবারে লাগাও জ্বালামুখী রোড স্টেশন। রেলে যাঁহারা আসেন, এখানে নামিয়া তাঁহাদিগকে বাস ধরিতে হয়।

আমরা বাসের যাত্রী। ক্রমেই নীচে নামিতেছি। রাণীতাল পর্যন্ত কোনই অসুবিধা নাই। তাহার পর দুর্ভোগের শুরু। বর্ষাকালে কাঁচা পাহাড়ী রাস্তায় মোটর বিহারের সুখ(!) মর্মে মর্মে নহে, শরীরের প্রতিটি সন্ধিতে উপলব্ধি করিলাম। বাস নাচিয়া কুঁদিয়া, বহু বিচিত্র ভঙ্গীতে ঘুরিয়া ফিরিয়া, যাত্রীদিগকে হেলাইয়া দোলাইয়া এবং নাকের জলে চোখের জলে একাকার করিয়া অবশেষে এক সময়ে জ্বালামুখীতে পৌঁছাইয়া দিল। বাস হইতে নামিবার পর প্রথম কিছুক্ষণ মনে হইল, শরীরের হাড় এবং মাংস বুঝি আলাদা হইয়া গিয়াছে।

বেলা বেশী নাই। ধর্মশালায় জিনিসপত্র রাখিয়া মন্দির দর্শনে চলিলাম। মন্দির কমিটির সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীভৈরবদত্ত শর্মার নামে পরিচয়পত্র ছিল। দেখা করিয়া পত্র দিতেই পণ্ডিতজী খুব খাতির করিয়া আমাদিগকে বসাইলেন। পরে নিজের লোক সঙ্গে দিয়া আমাদিগকে মন্দির দেখিতে পাঠাইয়া দিলেন।

হিমালয়ের এক শাখা শিবালিক পর্বতশ্রেণী। তাহারই অনতি উচ্চ একটি শৃঙ্গ কালীধার। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা মাত্র ১৯৫৮ ফুট। কালীধারের এক অংশে খানিকটা জায়গা আপনা হইতেই বড় একটি কুলুঙ্গীর মত হইয়াছে। এই কুলুঙ্গীর মধ্যেই জ্বালামুখী মন্দির।

জ্বালামুখী শাস্ত্রোক্ত ৫২ পীঠের অন্যতম। সুদর্শন চক্রে খণ্ডিতা সতীর জিহ্বা নাকি এখানে পড়িয়াছিল মতান্তরে দেবী জগদম্বার কবন্ধ ভবনে এবং মস্তক জ্বালামুখীতে বর্তমান। তৃতীয় একটি মত এই যে, দেবাদিদেব

বাণগঙ্গার উপর অসমাপ্ত পুল

বাণগঙ্গা পুলের অপর দৃশ্য

মহাদেব দৈত্যরাজ জালন্ধরকে পাহাড় চাপা দিবার সময় দৈত্যরাজের মুখ জ্বালামুখীতে, কান প্রাচীন কাঙড়া শহরে এবং শরীরের বাকী অংশ কাঙড়া উপত্যকায় পড়িয়াছিল। দেবাদিদেব এবং দৈত্যরাজ দুজনকেই প্রণাম জানাই। শেষোক্ত কাহিনীটির আবার একাধিক সংস্করণ।

প্রথম মতটিই সর্বাধিক প্রচলিত। পাহাড়ের গায়ে বাঁধানো সিঁড়ি বাহিয়া মন্দিরে পৌঁছিলাম। দক্ষিণদ্বারী মন্দিরের উপরিভাগ সোনার গিল্টি-করা তামার পাতে মোড়া। কবাট রৌপ্যনির্মিত। অলঙ্কৃত এবং কারুকার্য খচিত। শিখরাজ খড়ক সিং-এর কীর্তি। গিল্টি-করা ছাদটি ১৮১৫ সালে মহারাজা রণজিৎ সিং-এর ব্যয়ে নির্মিত। মন্দিরের সম্মুখে দুইটি বৃহদায়তন গিল্টি-করা সিংহের প্রতিকৃতি। কেহ বলিয়া না দিলে কেশরবিহীন কেশরীযুগলকে চিনিবার সাধ্য নাই। কাহার কীর্তি জানিতে পারি নাই।

মন্দিরে কোন মূর্তি নাই। ভক্তজন বিশ্বাস করেন যে, আদ্যাশক্তি মহাদেবী জ্বালামুখীতে অগ্নিশিখারূপে প্রকাশমানা। অবিশ্বাসীর দল কিন্তু একথা মানে না। বিজ্ঞানীদের মতও এই দলের পক্ষে। তাঁহারা বলেন যে, পর্বতগর্ভস্থ গ্যাসের আকরের উপর নির্মিত বলিয়াই জ্বালামুখী মন্দিরে অগ্নিশিখা দৃষ্ট হয়।

বাহির হইতে জ্বালামুখী মন্দির খুব প্রাচীন মনে হয় না। কিন্তু মন্দিরের ভিতরদিকে লক্ষ্য করিয়া দেখিলে ইহার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। একজন বিশেষজ্ঞ নাকি ইহার নির্মাণশৈলী গুপ্তযুগীয় এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। মন্দিরের ভিতর উত্তরদিকের প্রাচীরগাত্রে একটি কুলুঙ্গী আদিপীঠ নামে পরিচিত। কুলুঙ্গীর ভিতর একদিকে ঘৃত প্রদীপ, অপরদিকে ফাটলের মধ্যে অনুজ্জ্বল অগ্নিশিখা। মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রায় তিন ফুট গভীর সমচতুষ্কোণ একটি কুণ্ড। উপরে চারিদিক্ বেষ্টন করিয়া প্রদক্ষিণ-পথ। সিঁড়ির সাহায্যে কুণ্ডের ভিতর নামিতে হয়। ভিতরে উত্তরদিকের ফাটলে একটি অগ্নিশিখা। আদিপীঠের শিখার তুলনায় উজ্জ্বল। দেবীর ভোগের জন্য প্যাঁড়া কিনিয়াছিলাম। সঙ্গী প্রদর্শক ফাটলের ভিতর প্যাঁড়া গুঁজিয়া দিলে শিখা উজ্জ্বলতর হইল। ফাটলের ভিতর হাত দিবার সাহস আমার হয় নাই। একবার ফাটলের মুখ পর্যন্ত হাত নিতে হাতে আগুনের ছোঁয়া লাগিল। স্বাভাবিক আগুনের মত গরম নহে। প্রদর্শক ছোট একটি জলপূর্ণ ঘটির মুখ অগ্নিশিখার মধ্যে রাখিতে ঘটির জলে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। উপর হইতে কিছু জল ফেলিয়া দিতে আগুন নিভিয়া গেল। ঘটির জল পূর্বের মতই ঠাণ্ডা। মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে তৃতীয় একটি অগ্নিশিক্ষা হিংলাজ নামে পরিচিত। হিংলাজ তীর্থ ত ভারতবর্ষের বাহিরে। কাজেই কাঙড়া উপত্যকায় হিংলাজের অবস্থিতির কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়াছিলাম বই কি। মন্দিরের বাহিরে উত্তর-পশ্চিম দিকে কিছু দূরে যাইবার পর অপেক্ষাকৃত উচ্চ স্থানে দুইটি শীতল জলের প্রস্রবণ। একটি বড়। অপরটি অপেক্ষাকৃত ছোট। জলে ধুনা দিলে দুইটি প্রস্রবণেই আগুন জ্বলিয়া উঠিল। ছোট প্রস্রবণটির আগুন নিভিবার পর তাহার কিছু জল হাতে করিয়া বড়টির মধ্যে ফেলিয়া দিলে জল (বড়টির) টগবগ করিয়া ফুটিয়া উঠিল। কোন প্রস্রবণের জলেই আগুন জ্বলিবার এবং নিভিবার পূর্বে এবং পরে তাপের তারতম্য ধরিতে পারি নাই।

জ্বালামুখীর মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহুল প্রচারিত একটি কাহিনী বর্ণনা করিতেছি। বাদশাহ আকবর একবার জ্বালামুখীতে আগমন করিয়াছিলেন। দেবী মাহাত্ম্যে অবিশ্বাসী যবন সম্রাট মন্দিরের ভিতরের কুণ্ডটি জলপূর্ণ করিয়া কুণ্ডের অগ্নিশিখা নির্বাপনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। আগুন নিভিল না। ইহার পর বাদশাহের হুকুমে আগুনের উপর তাওয়া অর্থাৎ রুটি সেঁকিবার চাটু বসাইয়া দেওয়া হইল। চাটু পুড়িয়া ছাই হইয়া গেল। অগ্নিশিখাও উজ্জ্বলতর হইল। তখন সম্রাটের চৈতন্য হয়। তিনি নাকি দেবীকে সওয়া মণ ওজনের একটি স্বর্ণছত্র দিয়াছিলেন। ইহার পর তাঁহার অভিমান হয় যে, তিনি দেবীকে যাহা দিয়াছেন কোন হিন্দু রাজাও তাহা দিতে পারেন নাই। দেবী দর্পীর এই দর্প সহ্য করিলেন না। তাঁহার ইচ্ছায় স্বর্ণছত্র অষ্টধাতুর ছত্রে পরিণত হইল। ছত্রটি আজও দেবীর ভাণ্ডারে সযত্নে রক্ষিত

হইতেছে। আমাদিগকে যে ছাতাটি দেখানো হইল তাহা হয়ত সত্যই অষ্ট-ধাতুর নির্মিত। কিন্তু হলফ্ করিয়াই বলিতে পারি যে, ইহার ওজন সওয়া মণ নহে। তবে কাঁচি মণ অর্থাৎ কাঙড়ার ষোল সেরী মণ হইলে স্বতন্ত্র কথা। ছাতাটির বিভিন্ন জায়গার কিছু কিছু অংশ কর্তিত। ঐ সমস্ত জায়গায় নাকি আকবরের নাম খোদিত ছিল। কে বা কাহারা কাটিয়া নিয়াছে।

বজ্রেশ্বরী, জ্বালামুখী এবং পার্বত্য পাঞ্জাবের বহু তীর্থস্থানের পুরোহিত-দিগকে ভোজকী ব্রাহ্মণ বলা হয়। কেহ কেহ ইঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন যে, 'ভোজকী'গণ গঙ্গাপুত্র অর্থাৎ মুর্দা-ফরাশ। 'ভোজকী'গণ নিজেরা বলে যে, তাহারা সারস্বত ব্রাহ্মণ। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজে ইহারা অপাংক্তেয়। ইহাদের বৈবাহিক আদান প্রদান স্ব সম্প্রদায়ের মধ্যেই আবদ্ধ। বোধপণ্ডিত নামে পরিচিত যোগী সম্প্রদায়ের সহিতও 'ভোজকী' ব্রাহ্মণদিগের বৈবাহিক আদান প্রদান হয়। অনেকে আবার বলেন যে, ইহারা ব্রাহ্মণ, রাজপুত এবং যোগী সম্প্রদায়ের সংমিশ্রণে উৎপন্ন বর্ণশংকর। ইহারা উপবিত ধারণ করে। হাণ্টার সাহেবের মতে 'ভোজকী' গণ হিমাচলের আদিবাসী। তিনি বলেন যে, হিমাচলের ধর্মস্থানগুলির পৌরোহিত্য কোনদিনই আদিবাসীদিগের হাতছাড়া হয় নাই। 'ভোজকী' পুরুষ প্রায়ই উচ্ছৃংখল, লম্পট। 'ভোজকী' নারীরও যৌন সংযমের সুখ্যাতি নাই। মদ্য-মাংসে ইহাদের আসক্তি, অত্যধিক, ভোজকীগণ অত্যন্ত কলহপরায়ণ। কথায় কথায় আদালত ফৌজদারী করিতে ইহারা পিছ্‌পা হয় না। 'খাও, দাও, মজা লোট' এই ইহাদের জীবন-দর্শন।

কাটোচ রাজবংশের যে শাখা বর্তমানে জ্বালামুখীর ছয় মাইল দূরে নাদাউনে বাস করে জ্বালামুখী তাহারই কুলদেবী। ভবনের বজ্রেশ্বরী দেবী লম্বাগাঁও শাখার কুলদেবী। নাদাউনে শাখার আদিপুরুষ রাজা ২য় সংসারচাঁদের গদ্দিপত্নীর গর্ভ-জাত পুত্র। গদ্দি লোক-সঙ্গীতে সংসার-চাঁদের গদ্দিরমণীর পাণিগ্রহণের স্মৃতি আজও অমর হইয়া আছে।*

যাত্রিগণ প্রদত্ত প্রণামী হইতে মন্দিরের প্রচুর আয় হয়। ইহার পরিমাণ বার্ষিক লক্ষ টাকার কম নহে। হয়ত বেশি। কাটোচ রাজগণ একদা এই মন্দিরের যাবতীয় আয় নিজেরা আত্মসাৎ করিতেন। মুসলমান আমলে জ্বালামুখীতে তীর্থ-যাত্রীদিগকে জনপ্রতি এক আনা হিসাবে কর দিতে হইত। জ্বালামুখী মন্দির বর্তমানে 'ভোজকী' পুরোহিতদিগের ব্যক্তিগত সম্পত্তি।

পুরোহিতদিগের একটি কমিটি মন্দির সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য পরিচালনা করেন। দুই বৎসর পর পর এই কমিটির নির্বাচণ হয়। সদস্যগণ সকলেই 'ভোজকী' পুরোহিত। বাহিরের কাহারও কমিটিতে দন্তস্ফুট করিবার সাধ্য নাই। কমিটির বর্তমান সম্পাদক পণ্ডিত ভৈরব দত্ত সদালাপী, অমায়িক প্রকৃতি। পণ্ডিতজী বহু তীর্থ পর্যটন করিয়াছেন। চমৎকার হিন্দী বলেন। পাঞ্জাবে কাহাকেও এত সুন্দর হিন্দী বলিতে শুনি নাই। ইংরেজী জানেন না। তাঁহার নিকট হইতে মন্দির সম্বন্ধে কিছু কিছু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে পারিলাম। দিনে পাঁচবার জ্বালামুখীর ভোগ হয়। মন্দিরে পশুবলিতে বাধা না থাকিলেও দেবীকে নিরামিষ ভোগই দেওয়া হয়। ভোগের জন্য দৈনিক বরাদ্দ ৩৫৸৵০। মন্দিরের ব্যয়ে একটি সাধারণ পাঠাগার ও পুস্তকাগার পরিচালিত হয়। পাঠাগারটির জন্য মাসিক ২১৲ হিসাবে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়। পুস্তকাগারে ৭০০।৮০০ পুস্তক আছে। একটি দাতব্য আয়ুর্বেদিক ঔষধালয়, একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং একটি সংস্কৃত পাঠশালার যাবতীয় ব্যয়ও কমিটি কর্তৃক নির্বাহিত হয়। সাধু-সন্ন্যাসী দেব দর্শনে আসিলে কমিটিই তাঁহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া থাকেন।

জ্বালামুখী রীতিমত পল্লীগ্রাম রাস্তার উপর যেখানে বাস দাঁড়ায়, সেখানে কয়েকখানি দোকান আছে। শিবালিক ট্রান্সপোর্ট কোম্পানীর স্থানীয় অফিসেই নর্দার্ন রেলওয়ের একটি 'আউট এজেন্সী (Out Agency) আছে। জ্বালামুখী রোড হইতে বিভিন্ন স্টেশনের রেলের টিকিট পাওয়া যায়। পূর্বে যাত্রীদিগের থাকিবার কোন ব্যবস্থা ছিল না। কয়েক বৎসর হয় কাঙড়া জেলার প্রসিদ্ধ ধনী রায়বাহাদুর যোধামল কুঠিয়ালা একটি ধর্মশালা নির্মাণ করিয়া যাত্রিগণের অসুবিধা দূর করিয়াছেন। ধর্মশালার ম্যানেজার সংগী শ্রীযোগীন্দ্রনাথজীর পূর্ব-পরিচিত। সুতরাং বিনা মাশুলে কেবল আশ্রয়ই মিলিল না। দড়ির চার পাই, বিছানা, ঘটি, বালতি এবং লণ্ঠনও পাওয়া গেল। যাত্রীদিগকে এইজন্য ভাড়া দিতে হয়। আমাদের কিছুই লাগিল না। খাতিরে কি না হয়।

সবই হইল। কিন্তু ধর্মশালায় পায়খানা দূরের কথা, প্রস্রাবের জায়গাও নাই। আঞ্চলিক রীতি অনুযায়ী মল-মূত্রাদি বাহিরেই ত্যাগ করিতে হয়। একটি গল্প মনে পড়িল। বেশীদিনের কথা নহে। পাঞ্জাবের নামজাদা একটি কলেজের ছাত্রগণ ছাত্রাবাসে শৌচাগার নির্মাণের দাবী উত্থাপন করে। উত্তরে প্রবীণ খ্যাতিমান্ অধ্যক্ষ বলিয়াছিলেন—তোমাদের পিতা, পিতামহ, সকলে চির-কাল বাহিরেই মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া-ছেন। তোমরা পার না? একেবারে **সাহেব** বনিয়া গিয়াছ! ছাত্রগণের দাবী অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছিল।

হোটেলে কাঙড়ার বিখ্যাত বাঁশমতী চালের ভাত, বিউলির ডাল, আলু ছোলার ঝোল এবং ছোলা-তেঁতুলের টক পাওয়া গেল। ফাউ হিসাবে কিছু পিঁয়াজ কুঁচি, চাটনি, কাঁচালঙ্কা। খুব তৃপ্তির সহিত খাইলাম। মাথা পিছু ৸৵০ করিয়া নেয়। দাম দিতে গেলে হোটেলওয়ালা কিছুতেই

---

* "গদ্দি চারে বকরিয়াঁ
"গদ্দন চারে গাই"
"ঘরা ভজ্জে সপ্‌রিয়া
"বিন্না খাউ গাই"
"হের জওয়ান রুইয়া
"রাজে গদ্দন বেহি"

অর্থাৎ গদ্দি পুরুষ ছাগল এবং গদ্দি রমণী গরু চরাইতেছিল। পাহাড়ে ধাক্কা লাগিয়া রমণীর ঘড়া ভাঙ্গিয়া গেল। গরু তাহার ঘড়া বহিবার বিড়াটি খাইয়া ফেলিল। তাহার তরুণ মুখ দেখিয়া (অর্থাৎ তাহার যৌবনমুগ্ধ) রাজা তাহাকে বিবাহ করিলেন। এই রাজা ২য় সংসার-চাঁদ।

পয়সা নিল না। পণ্ডিত ভৈরব দত্ত বারণ করিয়া পাঠাইয়াছেন। পণ্ডিতজীর সহিত যখন দেখা করি, তখনই তিনি তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। উত্তরে বলিয়াছিলাম যে, তীর্থে প্রতিগ্রহ অশাস্ত্রীয়। পণ্ডিতজী পাল্টা জবাব দিয়াছিলেন যে, তীর্থে আসিলে পুরোহিতের প্রসাদ গ্রহণ করিতে হয় ইহাই শাস্ত্রের বিধান। আমার শাস্ত্রজ্ঞানে(!) ইহার জবাব খুঁজিয়া পাই নাই।

ধর্মশালায় ফিরিয়া বিছানায় গা ঢালিয়া দিলাম। ক্লান্তিতে শরীর ভাঙিগয়া আসিতেছে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বাতাস বন্ধ। একটা অস্বস্তিকর গুমোট। ধর্মশালার অন্যান্য ঘর হইতে যাত্রীর কোলাহল কানে আসিতেছে। ক্রমে তাহাও থামিয়া গেল। ঘরে ঘরে আলো নিভিয়া গেল। চারিদিক নিঃশব্দ, নিঃসাড়। পাহাড় হইতে জল নামিবার একটানা শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দই নাই। হ্যাঁ, আর আছে সঙ্গী যোগীন্দ্রনাথজীর নাসিকা-গর্জন। কখন এক সময় ঘুমাইয়া পড়িয়াছি। হঠাৎ ঝড়ের গর্জনে ঘুম ভাঙিগয়া গেল। কত রাত জানি না। মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছে। ঘরের জানালা খোলা। ঝড়-বৃষ্টির মাতামাতি শুরু হইয়াছে। বিছানা ভিজিয়া যাইতেছে। জানালা বন্ধ করিয়া আবার শুইয়া পড়িলাম। এক ঘুমে রাত ভোর।

খুব ভোরেই লজ্জার মাথা খাইয়া অবশ্যকরণীয় প্রাতঃকৃত্যটি বাহিরে সারিয়া লইলাম। 'যস্মিন্ দেশে যদাচার'। চা-এর সন্ধানে পূর্বপরিচিত হোটেলে গেলাম। কাঙড়ার সর্বত্রই কলাইকরা পিতলের গ্লাসে চা পরিবেষণ করা হয়। অনেক সময় কলাই-করা ছোট একটি বাটিও সঙ্গে দেয়। পেয়ালা পিরিচের স্বদেশী সংস্করণ! দোকানে অবশ্য পেয়ালা পিরিচও থাকে। চাহিলে পাওয়া যায়। চা প্রস্তুতের প্রণালীও বিচিত্র। প্রথমত জল ফুটাইয়া তাহাতে চা পাতা ছাড়িয়া দিবার পর সেই জলকে দ্বিতীয়বার ফুটানো হয়। ইহার পর তাহার সহিত প্রচুর পরিমাণে দুধ ও চিনি মিশানো হয়। চা পর্ব শেষ করিয়া দাম দিতে গেলে দোকানদার এবারও পণ্ডিত ভৈরব দত্তের নিষেধের দোহাই পাড়িল।

সওয়া সাতটার বাসে ফিরিব মনে করিয়াছিলাম। রাণীতালে নাগসংক্রান্তির মেলায় যাত্রীর বেজায় ভিড়। জায়গা পাইলাম না। বহু কষ্টে পরের বাসে স্থান সংগ্রহ করিয়া বেলা আটটায় ফিরিয়া চলিলাম। কাঙড়ায় বাস বদ্‌লাইতে হইবে।

৩৯৯৩ ফুট উঁচুতে পালমপুর হইতে ১৯৫৮ ফুট উঁচু জ্বালামুখীতে নামিয়া আসিয়াছি। ২,০০০ ফুটেরও বেশী উঠিতে হইবে। বৃষ্টি হইয়া রাস্তায়

জ্বালামুখী মন্দির

কাদা জমিয়াছে। জায়গায় জায়গায় রাস্তার উপর দিয়া জলস্রোত গড়াইয়া চলিয়াছে। অগণিত জলধারা পাহাড়ের গা বাহিয়া নীচে নামিতেছে। শ্যামসুন্দর হিমাচলের কণ্ঠে রজতময় উপবীতগুচ্ছ! পথের বাম পার্শ্বে স্ফীতকায়া বাণগঙ্গা। দক্ষিণে খাড়া পাহাড়। রাস্তায় বাঁকের পর বাঁক। চালকের সামান্যতম বেহুঁশিয়ারীতে স-যাত্রী মোটরের গঙ্গাপ্রাপ্তি অথবা পাহাড়ের ধাক্কায় মারাত্মক অঙ্গহানি অবশ্যম্ভাবী। একেবারে ঢাকী শুদ্ধ ঢাক বিসর্জন! ধ্যানগম্ভীর ভূধরের "মূর্ত-বিঘ্নস্তপসইব" আমাদের মোটর পার্বত্য প্রকৃতিকে সচকিত করিয়া হর্ন বাজাইতে বাজাইতে ছুটিয়া চলিয়াছে। বেগের তীব্রতা অপেক্ষা গর্জনের প্রাবল্য অনেক বেশী। এই সনাতন নিয়ম। আস্ফালনের আতিশয্যে শক্তির অপ্রাচুর্য ঢাকিয়া রাখিতে মানুষের চেষ্টার ত্রুটি নাই।

রাস্তায় লোকারণ্য। দলে দলে নর-নারী, শিশু, বৃদ্ধ, যুবক পায়ে হাঁটিয়া রাণীতালের মেলায় চলিয়াছে। অপেক্ষাকৃত সম্পন্ন দু'চার জন ঘোড়ার পিঠে চলিয়াছে। দোকানী খচ্চরের পিঠে পসরার বোঝা চাপাইয়া চলিয়াছে।

কাঙড়ার মেয়েরা সত্যিই সুশ্রী। ইহাদের কাজল চোখের সলজ্জ কোমল দৃষ্টি এবং মুখের কমনীয়তা সহজেই মনে দাগ কাটিয়া বসে। যেমন ইহাদের গাত্র-বর্ণ, তেমনই মুখশ্রী, তেমনই বাহুল্য-বর্জিত সুগঠিত দেহযষ্ঠি। প্রসাধন পারিপাট্যে রূপের জৌলুসকে স্ফুটতর করিবার প্রয়াস ইহাদের নাই। সমতল-বাসিনী পাঞ্জাবী নারীর সহিত কোন সাদৃশ্যই কাঙড়ার মেয়েদের নাই। প্রথমোক্তাগণ কেমন যেন একটু পুরুষ-স্বভাবা। যাযাবরের কথায় 'পাঞ্জাবিনী'র দেহ এবং মন কোমলতা বর্জিত। তাহার উপর অঙ্গ-সজ্জা এবং অঙ্গরাগের সহায়তায় ইহারা স্ব-স্ব যৌন আবেদনকে বড় অশোভনভাবে তীব্র করিয়া তুলিতে যত্নবতী। নিজেকে পুরুষের মনোহারিকা করাই যেন সমতলবাসিনী পাঞ্জাবিনীর তপস্যা। ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে।

ঝাঁকুনি খাইতে খাইতে জ্বালামুখী রোড স্টেশন হইয়া রাণীতাল আসিতেই বাস একেবারে খালি হইয়া গেল। রাণী-তালেই কাঁচা রাস্তা শেষ এবং পাকা রাস্তা আরম্ভ। যাক্, আর ভাবনা নাই। কিন্তু নূতন আর এক বিপদ। রাণীতাল হইতে কাঙড়ার পথে দু' মাইল আড়াই মাইলের মাথায় অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতে পাহাড় ধসিয়া রাস্তা বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সরকারী লোক পাথর সরাইয়া রাস্তা সাফ করিতেছে। তিন চার ঘণ্টার পূর্বে রাস্তা খুলিবে না। পাহাড়ী পথে এই এক মুশকিল। বলা নাই, কওয়া নাই পাহাড় ধসিয়া রাস্তা বন্ধ হইয়া গেল। কখনও বা আবার ধসা পাহাড়ের চাপে রাস্তার খানিকটা হয়ত একেবারেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। চব্বিশ ঘণ্টাও হয় নাই এই পথে জ্বালামুখী গিয়াছি। এক রাত্রির মধ্যে এই অঘটন।

অদৃষ্ট সুপ্রসন্ন। বেশীক্ষণ বসিতে হইল না। অল্প সময় পরেই কাঙড়ার দিক্ হইতে জ্বালামুখীগামী একখানা বাস আসিলে তাহার যাত্রিগণ নামিয়া আমাদের বাসে উঠিল: আমরা তাহাদের স্থান অধিকার করিলাম। রাণীতালের পর কাঙড়া পর্যন্ত অনেক জায়গাতেই পাহাড় ধসিয়াছে। পাথরের নুড়ি রাস্তার

উপর ছড়ানো। তবে রাস্তা খোলাই আছে। কাঙ্ড়ার চার মাইল দূরে রাস্তার উপর সুড়ঙ্গ। সুড়ঙ্গ চোঁয়াইয়া জল ঝরিতেছে। বেলা ১১টায় কাঙ্ড়া পোঁছিলাম।

(৭)

পালমপুর হইতে পাঠানকোটের পথে বারো-তেরো মাইল মালাউং। মালাউং হইতে আড়াই মাইল তিন মাইল পায়ে চলার পাহাড়ী পথ। পথের শেষে বাণ-গঙ্গা নদী। নদীর উপর জেলাবোর্ডের সাঁকো। এখনও নির্মাণ শেষ হয় নাই। এই সাঁকো পার হইয়া চামুণ্ডা দেবীর মন্দির।

সকালবেলা দেবী দর্শনে চলিয়াছি। আগের দিন বৈকাল হইতে আরম্ভ করিয়া রাতভোর বর্ষণ হইয়াছে। পাহাড়ী পথ আগাগোড়া কর্দমাক্ত। বহু অংশ জলমগ্ন। দুই পাশে ধানক্ষেত। পল্লীবঙ্গের নিখুঁত ছবি! দূরে আকাশের গায়ে পাহাড়শ্রেণীই মাত্র স্মরণ করাইয়া দেয় যে, বাংলা মা'র শ্যামল ক্রোড় বিচ্যুত হইয়া সহস্রাধিক মাইল দূরে আসিয়া পড়িয়াছি।

কাঁচা রাস্তা। আকাশে মেঘের সমারোহ। যাইতে যাইতে বাঁদিকে তিন মাইল দূরে বাণগঙ্গা তীরে ইয়োল ক্যাম্প (Yole Camp)। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের সময় প্রায় ২০,০০০ ইটালীয় যুদ্ধবন্দীকে এখানে অন্তরীণ করিয়া রাখা হইয়াছিল। এখন ইহা সৈন্যাবাস। ইয়োল ক্যাম্প ছাড়াইয়া বাঁদিকেই আরও তিন মাইল দূরে বহু উচ্চে ধরমশালা শহর। পাহাড়ের গায়ে আঁকা ছবির মত মনে হয়।

ঘণ্টা দেড়েক চলিয়া বাণগঙ্গার অসমাপ্ত পুলের কাছে আসিলাম। এইবার পথ অত্যন্ত বিপজ্জনক। ১০০।১৫০ ফুট খাড়া পাড় বাহিয়া নীচে নামিলে তবে পুলের মুখ। পুলের উপর দিয়া নদী পার হইয়া আবার ১০০।১৫০ ফুট চড়াই উঠিবার পর বিপদের শেষ। পাথরের ফাঁকে ফাঁকে পা রাখিয়া অতি সন্তর্পণে ওঠা-নামা করিতে হয়। কোনক্রমে একবার পা ফস্‌কাইলে আর রক্ষা নাই।

চামুণ্ডা দেবীর মন্দির এ অঞ্চলে খুবই প্রসিদ্ধ। দেবী নাকি জাগ্রতা। বৈদ্যনাথের ন্যায় এখানেও শ্রাবণ মাসের প্রতি সোমবার মেলা বসে। মেলার দিন বাণগঙ্গায় অবগাহনের জন্য যাত্রীর ভিড় লাগিয়া যায়। মন্দিরের অবস্থান বড়ই মনোরম। ধর্ম সাধনার অনুকূল। মন্দিরের গা ঘেঁষিয়া একদিকে নদী, অপর দিকে প্রান্তর। প্রান্তরের শেষে তরঙ্গায়িত গিরিশ্রেণী। মন্দির হইতে পাহাড় পর্যন্ত সর্বত্র সবুজের সমারোহ। সকালবেলার মেঘের ভার কাটিয়া গিয়াছে। আকাশে খণ্ড মেঘের আনাগোনা। ছিন্ন মেঘের ফাঁকে অরুণ কিরণ পার্বত্য প্রকৃতিকে অপরূপ রঙ্গে রাঙ্গাইয়া তুলিয়াছে। সমস্ত মিলিয়া মনে একটা পরম প্রশান্তির ভাব নামিয়া আসে। 'এদেশ লেগেছে ভালো নয়নে।'

লৌকিক কিম্বদন্তী এই যে, ত্রিগর্ত-রাজ চন্দ্রভানের রাজত্বকালে চামুণ্ডা দেবীর মন্দির বর্তমান মন্দির হইতে আট মাইল দূরে ছিল। আজও নাকি প্রাচীন মন্দিরের চিহ্ন একেবারে লোপ পায় নাই। দেবীর নিকট তখন নরবলি হইত। কে এই রাজা চন্দ্রভান? কিম্বদন্তী এ সম্বন্ধে নির্বাক।

বর্তমান মন্দিরটি খুব প্রাচীন মনে হয় না। মন্দিরাভ্যন্তরে প্রস্তরময়ী দশ-ভুজা চামুণ্ডা মূর্তি মনে প্রীতি বা ভক্তির পরিবর্তে ত্রাসেরই সঞ্চার করে। মন্দির প্রাঙ্গণের এককোণে একটু নীচের দিকে খুব বড় একটি পাথরের চাঙ্গড়। তাহারই তলায় ফাঁকা জায়গায় নন্দিকেশ্বর শিব-মন্দির। মন্দিরে লিঙ্গ মূর্তি। উপরে উল্লিখিত রাজা চন্দ্রভানের রাজত্বকালে এইখানে উপবিষ্ট ছদ্মবেশী মহাদেবের উপর কোপান্বিতা চামুণ্ডা তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া গুল্‌তির সাহায্যে পাঁচটি পাথরের চাঙ্গড় ছুঁড়িয়া মারেন। চারটি চাঙ্গড় লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া দূরে দূরে পড়িল। পঞ্চমটি ছদ্মবেশী মহাদেবের মাথার উপর পড়িতে পড়িতে তাঁহার আদেশে থামিয়া গিয়া শূন্যেই রহিয়া গেল। এইটির নীচেই নন্দিকেশ্বর মন্দির। পরে পতিদেবতাকে চিনিতে পারিয়া দেবীর অবস্থা "ও মা, আর্যপুত্র যে"। লজ্জিতা দেবী পতির আদেশে বলি গ্রহণ করা বন্ধ করিয়া দিলেন এবং পূর্ব মন্দির পরিত্যাগ করিয়া বর্তমান মন্দিরে অধিষ্ঠিতা হইলেন। বহুদিন পর্যন্ত নন্দিকেশ্বরের কোন মন্দির ছিল না। পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্বে সুকেতের রাণী দেব দর্শনে আসি বর্তমান মন্দির নির্মাণ করিয়া দিয়াছে পাষাণ সোপান বাহিয়া একটু নীচে নামি মন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়। মন্দিরে ভিতর অন্ধকার।

দেব-দেবী দর্শন করিয়া অনেকক্ষ এদিক-ওদিক ঘুরিলাম। বেলা বাড়িব সঙ্গে সঙ্গে মেলাও জমিয়া উঠিতেছে যাত্রী এবং দোকানী-পসারীর ভি বাড়িতেছে। যাত্রীদিগের মধ্যে অল্পসংখ নেপালী। দূরে ধরমশালা হই আসিয়াছে। ইংরেজ আমলে বহু অবস প্রাপ্ত নেপালী সৈনিককে ধরমশালা এ আশে পাশে জায়গীর দেওয়া হইয়াছে ফলে ধরমশালা অঞ্চলে একটি নেপাল উপনিবেশ গড়িয়া উঠিয়াছে। যাত্রি অনেকেই বাড়ি হইতে খাবার লই আসিয়াছে। জায়গায় জায়গায় স্ত্রী-পুরু গোলাকার হইয়া খাইতে বসিয়াছে খাওয়ার উপকরণ সামান্য। রুটি এ সঙ্গে একটু হালুয়া বা তরকারী তজ্জাতীয় কিছু। তাহাই পরম পা তৃপ্তির সহিত খাইতেছে। মন এবং রুচি আনন্দের প্রকৃত অধিষ্ঠান-ভূমি। উপকর নয়। ক্বচিৎ দু' একজন গেরুয়াধারী সাধু কিনা জানি না। বর্ষার জলস্রোতে এক জায়গায় রাস্তা ধসিয়া বাণগঙ্গা নামিয়া গিয়াছে। ঘুরিয়া ঘুরিয়া পরি শ্রান্ত হইয়া তাহারই অদূরে এক খণ্ড পাথরের উপর বসিয়া পড়িলাম।

যতদূর চোখ চলে অবিরাম জনস্রোত স্তন্যপায়ী শিশু হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ বৃদ্ধাও আছে। কাঙ্ড়ার মেয়েদের বসন ভূষণও তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠবের মত চিত্তাকর্ষক। সকলেই শালোয়ার পরে কিন্তু বাহিরে আসিবার সময় শালোয়ারে উপর আগুল্ফলম্বিত ঘাগ্‌ড়া চাপাইয়া দেয়। গায়ে পাঞ্জাবী ঢং-এর লম্বা জামা তাহার উপর চাদর। নাকে প্রকাণ্ড নথ অনেকে আবার সরু চেনের সাহায্যে এই নথকে এক পাশে কানের দিকে টানিয়া রাখে। অনেকেরই মাথায় সোনা ব রুপার চূড়া বা চাক। ব্রহ্মরন্ধ্রের উপর ক্ষুদ্রাকৃতি মুকুটের মত একটি শিরো ভূষণকে চাক বলা হয়। চাকের দুই পাশে শিকলে গাঁথা ঝুম্‌কোর মত কর্ণাভরণ। এই চাকের উপর চাদর চড়াইয়া মুখমণ্ডল

আবৃত করা হয়। পুরুষদের পোশাকে কোন বৈশিষ্ট্য বা পারিপাট্য চোখে পড়িল না। পায়জামা, কোর্তা এবং টুপি। পাগড়ীর রেওয়াজ কম। রাজপুতেরা কিন্তু পাগড়ীই পরে।

সম্মুখে নদী, পশ্চাতে প্রান্তর। প্রান্তরের শেষে গিরিশ্রেণী তরঙ্গিত হইয়া সুদূরে দিগন্তে বিলীন হইয়াছে। দিগ্বলয় পর্যন্ত সবুজের সমারোহ। ধান-মকাইর ক্ষেত, ঊর্ধ্বশীর্ষ, ঘনবিন্যস্ত, ঋজু, সমান্তরাল দেবদারু বৃক্ষশ্রেণীর বর্ণাঢ্যতা চোখে এবং মনে শান্তির অঞ্জন মাখাইয়া দেয়। পুষ্পস্তবকনম্র চিরহরিৎ সদাবাহার (pride of India) নিরবচ্ছিন্ন হরিতের রাজ্যে বৈচিত্র্য সঞ্চার করিয়াছে।

নদীর ওপারে ধু-ধু চিতা জ্বলিতেছে। এপারে প্রাণবন্যার চঞ্চলতা। ওপারে মৃত্যুর প্রশান্তি। সমাপ্তির যবনিকা। এই সংসার!

দেব-দেবী দর্শন প্রথমেই হইয়া গিয়াছে। মেলাও দেখা হইল। কি-ই বা আছে দেখিবার?' সেই সস্তা মনোহারী দোকান, চা-খাবার, কাপড়-চোপড়, সব্জির দোকান। এইবার ফিরিবার পালা। বাণ-গঙ্গার খাড়া পাড় বাহিয়া আবার ওঠা-নামা। বিপরীতমুখী জনপ্রবাহের জন্য চড়াই-উৎরাই এবার আরও কঠিন, আরও বিপজ্জনক।

সমস্ত দুঃখেরই অবসান আছে। আমরাও অবশেষে এক সময় ওঠা-নামার পালা চুকাইয়া পাড়ে উঠিলাম।

কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টির পর ৮ঠা ভাদ্র জন্মাষ্টমীর দিন সকালবেলা হইতে আকাশ পরিষ্কার হইয়া গেল। গিরিশ্রেণী রৌদ্রকরোজ্জ্বল, গিরিপাদ-মূলে রৌদ্রস্নাতা, শস্যশ্যামলা উপত্যকা। রূপ চোখে দেখিবার, হৃদয় দিয়া উপলব্ধি করিবার। লিখিয়া বুঝাইবার নহে। সমগ্র জাগ্রত এবং মগ্ন-চৈতন্যের মধ্যে বার বার অনুরণিত হইতে লাগিল—

"অয়ি ভুবন-মনোমোহিনী

অয়ি নির্মল সূর্যকরোজ্জ্বল ধরণী"

পাহাড় হইতে জল নামিবার একটানা সোঁ সোঁ শব্দ। বৃক্ষে বৃক্ষে পত্রসজ্জা। আকাশ, বাতাস, অন্তরীক্ষ মধুময়, শান্তিময়। যেদিকে চোখ ফিরাই, অপরূপ সুষমা। গলা ছাড়িয়া গাহিতে ইচ্ছা হয়—

"আনন্দ আর ধরে না রে"।

কত-শতবর্ষ পূর্বে এই পরম দিনটিতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হইয়া-ছিলেন। সেই মহাবির্ভাব রাষ্ট্র এবং সমাজে নবজীবনের সূচনা করিয়াছিল। আজিকার মেঘমুক্ত প্রভাতের প্রসন্ন

চামুণ্ডাদেবীর মন্দির

আকাশ কি সেই মহাবির্ভাবেরই স্মারক? আবির্ভাবের পুণ্যতিথিটিকে বরণ করিবার জন্যই কি প্রকৃতির রূপসজ্জা?

পালমপুর আজ জাগিয়া উঠিয়াছে। আকাশ-বাতাস কীর্তনের শব্দে মুখরিত। পথে জনপ্রবাহ। বিচিত্রবাসা পালমপুর-বাসিনীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মোৎসবের পুণ্যদিনে দলে দলে দেব-দর্শনে চলিয়াছে। আজিকার দিনে সকলেরই বুঝি একটিমাত্র আকূতি—

"এস সুদর্শনধারী মুরারি"।

আমরাও বলি, 'হে মুরারি! আজিকার ঘোর দুর্যোগের দিনে তুমি আবির্ভূত হও। তোমার পাঞ্চজন্য নিনাদে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত হউক। হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর কানে শোনাও তোমার প্রেম ও মৈত্রীর দুঃখহরণ বাণী। হিংসা-দ্বেষ, সন্দেহ-অবিশ্বাস দূর হউক। আমাদের সকল কর্মে তোমার শান্ত, মঙ্গল ছন্দ সঞ্চারিত হউক।

"তথাগত কর ত্রাণ।"

* * *

এক সপ্তাহ পরের কথা। শ্রাবণের এক বিষণ্ণ, সজল সন্ধ্যায় পালমপুরের মাটিতে পা দিয়াছিলাম। আজ ফিরিয়া চলিয়াছি। মেঘমুক্ত শরৎ প্রসন্ন আকাশ। ফিরিয়া চলিয়াছি রুক্ষ, ধূলিধূসর, কোমলতাবর্জিত সমতল পাঞ্জাবের অমার্জিত ঔদ্ধত্য, অশিষ্টতা এবং কদর্যতার মধ্যে। সকালবেলা ছয়টা সওয়া ছয়টা হইবে। পালমপুরের চোখে তখনও ঘুমের ঘোর। বন্ধুবর শ্রীতারা-চাঁদজী, ভৃত্য সুভিয়ারাম বিদায় দিতে আসিয়াছে। শেষবারের মত ধবলাধার গিরিশৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম। তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ স্বর্ণাভ সূর্যকিরণে উদ্ভাসিত। বরফ পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে। জায়গায় জায়গায় বরফ জমিয়া রহিয়াছে।

৬-৫৫ মিঃ-এ বাস ছাড়িল। পালম-পুর পিছনে পড়িয়া রহিল। আর রহিলেন প্রবাস সঙ্গী তরুণ শিক্ষাব্রতী শ্রীযোগীন্দ্রনাথ ডহরু ও শ্রীসত্যপ্রসাদ ডোগরা, আদর্শবাদী, উৎসাহী স্কুল ইন্সপেক্টর বন্ধুবৎসল শ্রীতারাচাঁদজী, সনাতনধর্ম প্রতিনিধি সভার আজীবন সদস্য, নিষ্কাম, নীরবকর্মী পণ্ডিত শ্রীঅমরনাথজী। আর রহিল বিশ্বস্ত পরিচারক শুভিয়ারাম। ইঁহাদের সকলের সহানুভূতি, সহায়তা এবং সাহচর্য আমার স্বল্পদিনের প্রবাসকে মধুময় করিয়াছিল। কাহারও সঙ্গেই হয়ত জীবনে আর দেখা হইবে না। তবে "সুজনক পীরিতি পাষাণক রেহা"। কোনদিনই তাহা মুছিয়া যায় না।

সমাপ্ত

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

জর্জিয়ার প্রেমিক ওদিকে চার্লির উপরে খাপ্পা হয়ে আছে। একলা পেয়ে চার্লিকে একটা খুঁটির উপরে ঠেসে ধরল সে এবং ঠ্যাঙাতে লাগল। চার্লিও পাল্টা-ঘুষি চালালেন। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে ঘুষিটা গিয়ে পড়ল খুঁটির উপরে। নড়বড়ে খুঁটি, ঘুষির চোটে সেটা ভেঙে পড়ল। নড়ে উঠল গোটা নাচঘর, এবং ব্যালকনির উপর থেকে বিরাট ঘড়িটা গিয়ে সশব্দে আছড়ে পড়ল সেই প্রেমিকের মাথায়। প্রেমিক তো ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন। গোটা ব্যাপারটাই আকস্মিক। কিন্তু লড়াই জিতে চার্লি এমন একটা ভাব দেখালেন যেন তাঁর সঙ্গে কেউ চালাকি করতে এলে তাকে তিনি এমনি শিক্ষাই দিয়ে থাকেন।

নাচ-ঘরের পাশে ছোট্ট একটা কেবিন। এ-ঘরে যে থাকত তার নাম হাঙ্ক। সে গিয়েছে সোনার খোঁজে। তার অবর্তমানে চার্লি সেখানে এসে আশ্রয় নিয়েছেন। জানালায় বসে বসে তিনি দেখতে পেলেন জর্জিয়াকে। বান্ধবীদের সঙ্গে তুষারের উপরে সে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে; তুষারের ড্যালা পাকিয়ে পরস্পরের গায়ে ছুঁড়ে মারছে তারা। আর হেসে লুটিয়ে পড়ছে। অকস্মাৎ একটা ড্যালা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে চার্লির মুখে এসে লাগল। জর্জিয়া তার বান্ধবীদের নিয়ে এসে ক্ষমা চাইল চার্লির কাছে। চার্লি বললেন, তাতে কী হয়েছে, তারা যদি তাঁর ঘরে এসে দু দণ্ড গল্পগুজব করে তো তিনি খুব খুশী হবেন। বিদায় নেবার সময় জর্জিয়াকে তিনি নববর্ষের আমন্ত্রণ জানালেন। সামনেই নববর্ষ। নববর্ষের সন্ধ্যায় সে তার বন্ধুদের নিয়ে যেন চার্লির কাছে আসে। রাত্রির আহার-পর্বের ব্যবস্থা চার্লিই করবেন। নিমন্ত্রণ গ্রহণ করল জর্জিয়া। চার্লির তখন আনন্দ আর ধরে না। আনন্দে, আসন্ন উৎসবের উত্তেজনায়, ঘরময় তিনি লাফিয়ে বেড়াতে লাগলেন।

কিন্তু হাতে যে আর টাকা নেই। এতগুলো লোককে যে নেমন্তন্ন করে বসলেন, এদের খাওয়াবেন কী। পাশের বাড়ির সামনের দিকটা তুষারে ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। কোদাল নিয়ে তুষার সরাতে লেগে গেলেন চার্লি। মজুরি বাবদে গৃহকর্তার কাছ থেকে হয়তো কিছু পয়সা পাওয়া যাবে। কিন্তু তুষার সরিয়ে শেষ পর্যন্ত দেখা গেল যে, বাড়িটা হচ্ছে স্থানীয় কারাগার। সে যাই হোক, অনেক কষ্টে কিছু পয়সা জোগাড় করলেন চার্লি, এবং পরম উৎসাহে পার্টির আয়োজন করতে লেগে গেলেন। টেবল-ক্লথ নেই। কিন্তু তাতে কী। পুরনো একটা খবরের কাগজকে কাঁচি চালিয়ে এমন সুন্দরভাবে তিনি কেটে নিলেন যে, সেটা একটা ঝালর-লাগানো টেবল-ক্লথের মত দেখতে লাগল। নড়বড়ে টেবিল। তার উপরে সযত্নে ছুরি আর কাঁটা সাজিয়ে রাখলেন, চেয়ার-গুলোকে পরিষ্কার করলেন, মোমবাতি জ্বালালেন কয়েকটা, এক ফাঁকে দেখে এলেন মুরগীটা সিদ্ধ হয়েছে কিনা, তারপর ফিরে এসে নববর্ষের উপহার-গুলিকে গুছিয়ে রাখতে লাগলেন।

বাইরে ও শব্দ কিসের? দরজায় কে যেন টোকা মারল না? এ নিশ্চয় জর্জিয়া, বান্ধবীদের নিয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে এসেছে। ত্রস্ত পায়ে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন চার্লি। খুলে দেখতে পেলেন, জর্জিয়া নয়, একটা গাধা। শীতে জমে গিয়ে আশ্রয় খুঁজতে এসেছে। দরজা খোলা পেয়ে গাধাটা তো তাঁর ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। তারপরেই এক লণ্ডভণ্ড ব্যাপার। সবকিছু তছনছ করে ফেলে দিয়ে মনের সুখে গাধাটা একখণ্ড কাগজ চিবোতে লাগল। চার্লি সেটাকে বাইরে পাঠিয়ে দিয়ে দরজায় আবার কুলুপ এঁটে দিলেন।

বান্ধবীদের নিয়ে অনেক আগেই আসা উচিত ছিল জর্জিয়ার। এখনও এল না। চুপচাপ বসে রইলেন চার্লি। তাঁর বিশ্বাস, না এসে তারা পারবে না। আসবেই। বসে বসে তিনি স্বপ্ন দেখতে লাগলেন। যেন তারা এসেছে। চার্লি তাদের স্বাগত জানিয়ে ভিতরে নিয়ে এলেন। তাদের খুশী করবার জন্য দুটো ফর্কের মাথায় ক্রীমরোল গেঁথে নিয়ে খেলা দেখাতে লাগলেন। তাঁর সেই বিখ্যাত খেলা। ফর্কের নাচ। যেন ফর্ক নয়, দুটি মেয়ে। "গোল্ড রাশ" যাঁরা দেখেছেন, আর-সব ভুলে গেলেও ফর্কের সেই নৃত্য তাঁরা ভুলতে পারবেন না। জর্জিয়ার বান্ধবীরা তো অভিভূত। আনন্দে তারা হাততালি দিতে লাগল। অভিনন্দনের উত্তরে সামনের দিকে অল্প-একটু ঝুঁকে পড়ে ফর্ক দুটি অভিবাদন জানাল তাদের। মন্ত্রমুগ্ধের মত জর্জিয়া সব দেখে যাচ্ছিল এতক্ষণ। ছুটে এসে চার্লিকে চুমো খেল সে। আনন্দের আবেগে তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। তৎক্ষণাৎ স্বপ্ন ছুটে গেল তাঁর। চেয়ে দেখেন, শূন্য ঘর। জর্জিয়া আসেনি। তারা আসবে না।

নাচ-ঘরে ওদিকে উৎসব চলেছে। চার্লির কানেও এসে পৌঁছচ্ছে তার আনন্দ-ঝঙ্কার। পা টিপে টিপে ঘর থেকে পথে বেরিয়ে এলেন তিনি, নাচ-ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। জানলায় উঁকি দিয়ে দেখেন, জর্জিয়া তার বন্ধুদের নিয়ে আনন্দোৎসবে মত্ত হয়ে উঠেছে। হাতে-হাত দিয়ে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে তারা। গান গাইছে।

চার্লির কথা ভুলে গিয়েছে ওরা। ভাবতে কেমন দুঃখ লাগছে। নিঃশব্দে সেখান থেকে সরে এলেন চার্লি। সেই শীতরাত্রির তুষারের মধ্যে পথে-পথে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। জর্জিয়ার ওদিকে হঠাৎ মনে পড়েছে, চার্লির কুটিরে আজ

তাদের নিমন্ত্রণ। ব্যাপারটা সে ভুলেই গিয়েছিল. ছি-ছি, ভারী অন্যায় হয়ে গিয়েছে। নাচ-ঘর থেকে বেরিয়ে এল জর্জিয়া, চার্লির কেবিনের দিকে ছুটে চলল। সেখানে গিয়ে দেখে, চার্লি নেই। ঘরের দিকে এক-নজর তাকিয়ে আর তার বুঝতে বাকী রইল না যে, তারা আসবে বলে অনেক যত্নে চার্লি আজ তার ঘরখানাকে সাজিয়ে তুলেছেন। সত্যিই তাদের অন্যায় হয়ে গিয়েছে।

দিন কয়েক বাদে হঠাৎ একদিন বীগ জীমের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল চার্লির। চার্লিকেই সে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। দুজনে মিলে আবার যাত্রা করলেন সোনার সন্ধানে, আবারও তাঁরা লার্সেনের সেই কুটিরে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। এবারে আর খাদ্যের চিন্তা নেই। প্রচুর খাবার তাঁরা সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। খেয়ে দেয়ে আরাম করে শুয়ে পড়লেন দুজনে। মাঝরাতে অকস্মাৎ এক বিপদ। ঝড় উঠে কাঠের ঘরখানাকে খাদের কিনারায় উড়িয়ে নিয়ে এসেছে। অতলস্পর্শী সেই খাদের ঠিক প্রান্ত-সীমায় কোনওরকমে আটকে রয়েছে তাঁদের কুটির। এক-একবার খাদের মধ্যে ঝুলে পড়ে, পরক্ষণেই আবার উঠে আসে। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। দেখে মনে হয়, সামান্যতম একটু নিশ্বাসের আঘাতও বোধ হয় সইবে না, তাহলেই হয়তো ঘরখানা গিয়ে খাদের মধ্যে আছড়ে পড়বে।

অবস্থাটা শুধু একবার কল্পনা করুন। আর কল্পনাই বা করতে হবে কেন, ছবিখানা তো আপনারা দেখেছেন। দেখতে-দেখতে নিঃশ্বাস যেন আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে আসে, হঠাৎ এক সময় বুঝতে পারা যায়, উত্তেজনায় চেয়ারের হাতল চেপে ধরে সামনের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন আপনি, দম বন্ধ করে প্রতিটি ব্যাপার লক্ষ্য করে যাচ্ছেন। আপনার তো এদিকে এই অবস্থা, চার্লি আর বীগ জীম কিন্তু এতসবের কিছুই জানেন না। তাঁদের ধারণা, ঘরটা আসলে দুলছে না, অতিরিক্ত আহারের ফলে পেট গরম হয়ে গিয়ে তাঁরা একটা দুঃস্বপ্ন দেখছেন মাত্র। হঠাৎ এক সময় জোর একটা ঝাঁকুনি খেয়ে বুঝতে পারলেন যে, না, স্বপ্ন নয়, সত্যিই কোথাও কিছু গোলমাল ঘটেছে। চার্লি ঠিক করলেন, বাইরে গিয়ে ব্যাপারটা একটু

চার্লস চ্যাপলিনের দ্বিতীয়া স্ত্রী লীটা গ্রে, আর তাঁর দুই শিশু-সন্তান। আর দুজন হচ্ছেন লীটার মা আর দাদামশাই

দেখে আসতে হবে। দরজা খুলে পা বাড়াতেই—আরে সর্বনাশ, এ যে খাদের উপরে পা বাড়িয়ে দিয়েছেন! পড়তে পড়তে টাল সামলে নিয়ে ভিতরে চলে এলেন চার্লি।

সামান্য একটা দড়ি, তাতেই আটকে গিয়ে কোনওক্রমে তাঁরা এখনও বেঁচে রয়েছেন। এবং প্রতিটি মুহূর্তে যে রকম চাপ পড়ছে তার উপরে, তাতে দড়িটা যে আর বেশীক্ষণ টিঁকবে, এমন ভরসা হয় না। একটু-একটু করে দড়িটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, আর ওদিকে হামাগুড়ি দিয়ে একটু-একটু করে তাঁরা বেরিয়ে আসতে চেষ্টা করছেন। সবেমাত্র তাঁরা বাইরে এসে পৌঁছেছেন, এমন সময় হঠাৎ একটা দমকা হাওয়ায় দড়ি ছিঁড়ে সেই কাঠের ঘরখানি অতলস্পর্শী গহ্বরের মধ্যে গিয়ে আছড়ে পড়ল।

"গোল্ড রাশ"-এর শেষাংশে দেখা যায়, চার্লি আর বীগ জীম জাহাজে করে অ্যামেরিকায় ফিরে আসছেন। অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে তাঁদের। মাথায় টপ-হ্যাট, গায়ে গোটাকয়েক করে ফার-কোট। গোটাকয়েক করে, কেননা, তাঁরা এখন বড়লোক, এবং সবাইকে সেটা জানিয়ে দেওয়া দরকার। লার্সেনের সোনার খনির সন্ধান তাঁরা পেয়েছেন। কিন্তু বড়লোক হলে কী হবে, স্বভাব যায় না মলে। জাহাজের মধ্যে চার্লির এক সহযাত্রী তাঁর সিগারেটে শেষ-টান দিয়ে ফেলে দিতেই ডেকের উপর থেকে সেই উচ্ছিষ্ট সিগারেট কুড়িয়ে নিলেন চার্লি, চোখ বুজে ধূমপান করতে লাগলেন।

জর্জিয়াও রয়েছে এই জাহাজে। সবচাইতে কম ভাড়ার ডেকে সে আশ্রয় নিয়েছে। সাংবাদিকরা জাহাজে এসে উঠলেন, চার্লি আর বীগ জীমের ফটো তুলবেন। ভয়ে চার্লি পিছিয়ে গেলেন তিন পা, পা পিছলে নীচের ডেকের উপরে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। এবং পড়লেন গিয়ে জর্জিয়ার ঠিক পাশেই।

সাংবাদিকরা এসে জর্জিয়ার পরিচয় জিজ্ঞেস করতেই এক গাল হেসে চার্লি বললেন, "আমার হবু স্ত্রী।" মিলনান্ত এই বইটিতে অন্তত চার্লি তাঁর মনের মত সঙ্গিনী খুঁজে পেয়েছেন।

এযাবৎ যত বই তুলেছেন চার্লি, "গোল্ড রাশ"ই তার মধ্যে দীর্ঘতম। আয়তনে "দী কীড"-এর প্রায় দ্বিগুণ। বইখানি তুলতে মোট চোদ্দ মাস সময় লেগেছিল। নির্মাণব্যয় প্রায় দশ লক্ষ ডলার। লাভ হয়েছিল প্রায় দশ লক্ষ পাউন্ড।

(২৩)

"গোল্ড রাশ" বইখানি যখন তোলেন, চার্লির দাম্পত্য জীবনে তখন চূড়ান্ত রকমের অশান্তি শুরু হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সেই বিপর্যয়, সেই দুর্বিপাক সত্ত্বেও তাঁর শিল্পী-সত্তা কিছু লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়নি। "গোল্ড রাশ" দেখে একবাক্যে সবাই স্বীকার করল, এ একটি মহান সৃষ্টি, চার্লি এখানে তাঁর প্রতিভার এক অম্লান স্বাক্ষর ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। সমস্ত কিছু বিস্মৃত হয়ে শিল্প-সাধনায় মগ্ন হতে হলে যে একাগ্র অভিনিবেশের প্রয়োজন হয়, চার্লির জীবনে কখনোই তার অভাব ঘটেনি। সেই-সঙ্গে যন্ত্রণার গ্রন্থি-মোচনের আর-একটি অস্ত্রও তাঁর ছিল। সে তাঁর অসাধারণ প্রাণোচ্ছলতা। ছিল, নয়তো মানসিক অবসাদের যে অতল পঙ্ককুণ্ডে লীটা তাঁকে নিক্ষেপ করেছিলেন, কোনওক্রমেই চার্লি সেখান থেকে উদ্ধার লাভ করতে পারতেন না। "দী কীড" বইখানি যখন তুলেছিলেন, তার কিছুদিন আগেই মীলড্রেডের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। আর "গোল্ড রাশ" যখন তোলেন, তখনও লীটার সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটেনি তাঁর, তখনও তাঁর জীবনে তিনি উপস্থিত রয়েছেন, তাঁর দাম্পত্য জীবনের প্রতিটি মুহূর্তকে তিনি অশান্তির আগুনে জ্বালিয়ে তুলছেন। লীটা তখন সন্তানসম্ভবা। প্রথম পুত্রের জন্মলাভের ন মাস বাদে আর-একটি পুত্র-সন্তান লাভ করলেন চার্লি। পিতৃব্য সীডনির নামানুসারে তার নাম রাখা হল সীডনি চ্যাপলিন।

স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে তবু মনের মিল হল না। বাড়িতে প্রায়ই পার্টি দিতেন লীটা। প্রায় অষ্টপ্রহরই তাঁর বান্ধবীদের কলরবে সারা বাড়ি মুখর হয়ে থাকত। চার্লির সেটা ভাল লাগত না। সেই উচ্ছৃঙ্খল কোলাহলে অত্যন্তই বিরক্ত বোধ করতেন তিনি। শেষ পর্যন্ত, উপায়ান্তর না দেখে, বাড়িতে যাওয়া তিনি বন্ধ করলেন। স্টুডিয়ো থেকে বেরিয়ে চলে যেতেন সান্টা মনিকায়। ম্যারিয়ন ডেভিসের বাড়িতে গিয়ে দু দণ্ড গল্প করতেন। সংবাদপত্রের মালিক উইলিয়াম র‍্যাণ্ডলফ হার্স্টও সেখানে আসতেন। তিনজনে মিলে গল্পগুজব চলত।

টাকা আছে বলেই যে দু হাতে তার অপব্যয় করতে হবে, চার্লি এটা কোনও-কালেই পছন্দ করেননি। এই নিয়ে লীটার সঙ্গে প্রায়ই তাঁর কলহ হত। শেষ পর্যন্ত অবস্থা একদিন চরমে উঠল। সারাদিন স্টুডিয়োতে অমানুষিক পরিশ্রমের পর চার্লি সেদিন অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরেছেন। এসে দেখেন, অত রাত্রেও লীটার বন্ধু-বান্ধবরা সব আসর জমিয়ে বসে আছে। তার মধ্যে অনেকেই আসবমত্ত। সমস্ত মিলিয়ে একটা উচ্ছৃঙ্খল, বে-আব্রু, বীভৎস আবহাওয়া। ক্রোধে উন্মত্ত হয়ে উঠলেন চার্লি; তৎক্ষণাৎ সবাইকে তিনি বাড়ি থেকে বার করে দিলেন। ব্যাপারটা বরদাস্ত হল না লীটার। দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে তিনিও গৃহত্যাগ করলেন। এর

ম্যারিয়ন ডেভিসের পার্টিতে নেপোলিয়নের বেশে চার্লস চ্যাপলিন

কিছুদিন বাদেই শোনা গেল, আদালতে গিয়ে তিনি বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা এনেছেন।

লীটার কৌঁসুলিরা আদালত থেকে আদেশ জারি করে চার্লস চ্যাপলিনের সমস্ত সম্পত্তি আটক করবার ব্যবস্থা করলেন। সব কিছুই আটক করা হল,—বাড়ি, স্টুডিয়ো, সব। যে-অর্থ চিত্রশিল্পে বিনিয়োগ করেছিলেন চার্লি, তাও বাদ পড়ল না। ব্যাঙ্কে চার্লির যে অ্যাকাউন্ট ছিল, তার উপরে তো বটেই, তাঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুবান্ধব এমনকি ভৃত্যদের অ্যাকাউন্টের উপরে পর্যন্ত টান পড়ল। লীটার কৌঁসুলিরা সন্দেহ করেছিলেন, অন্যের অ্যাকাউন্টে নিজের টাকা তিনি সরিয়ে ফেলতে পারেন। নিজের বাড়ি থেকে সীডনির বাড়িতে উঠে এলেন চার্লি। স্টুডিয়োতে ঢুকবার অনুমতি নেই। সুতরাং বাধ্য হয়েই পরবর্তী ছবি "দী সার্কাস"-এর কাজ তাঁকে বন্ধ রাখতে হল। অথচ, এ-বইয়ের নায়িকার ভূমিকায় যাঁকে তিনি নামিয়েছিলেন সেই মার্ণা কেনেডি হচ্ছেন লীটারই এক বান্ধবী। চার্লি তখন কপর্দকবিহীন। সে এক মর্মান্তিক অবস্থা। একটা চেক ভাঙাবার পর্যন্ত উপায় ছিল না তাঁর। কী করে ভাঙাবেন, আদালত থেকে তাঁর সমস্তকিছুই তখন আটক করা হয়েছে।

এবং লীটা গ্রে ওদিকে বিভিন্ন কাগজে একটার-পর-একটা বিবৃতি দিয়ে চলেছেন। চাঞ্চল্যকর সব অভিযোগ, যদিচ অধিকাংশই তার ভিত্তিহীন। আপন বান্ধবী মার্ণা কেনেডির নামের সঙ্গে চার্লির নাম জড়িয়ে কুৎসা রটনা করতেও লীটার তখন আটকায়নি। চার্লি কিন্তু নীরব। একটা অভিযোগেরও তিনি উত্তর দিলেন না। কিন্তু তাঁর সমগ্র স্নায়ুতন্ত্রের উপরে যে একটা নির্মম অত্যাচার চলছে, যে-কেউই সেটা বুঝতে পারত। ডাক্তার এসে উপদেশ দিলেন, পূর্ণ বিশ্রাম গ্রহণ করতে হবে।

বিশ্রাম! সেই বিযাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে কে তাঁকে বিশ্রাম দেবে। সীডনির কাছ থেকে অল্প-কিছু টাকা নিয়ে নীউ ইয়র্কে চলে গেলেন চার্লি। সেখানে গিয়েও শান্তি পেলেন না। দুর্ভাগ্য তাঁর পিছন-পিছন যেন থাবা উঁচিয়ে ছুটে এসেছে। রীজ হোটেলে গিয়ে শুনলেন, টেলিফোনে বার-কয়েক কে যেন তাঁর খোঁজ করেছে। নিজের নাম সে জানায়নি। চার্লি সে-রাত্রে তাঁর কৌঁসুলি ন্যাথান বার্কানের বাড়িতে গিয়ে আহার করলেন। পথে বেরিয়ে এসে এখানে-ওখানে উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়াতে লাগলেন তিনি। শান্তি নেই, কোনওখানেই তাঁর শান্তি নেই। টেলিফোনে কে তাঁর খোঁজ করছিল। আদালতের কোনও কর্মচারী নয় তো? হোটেলে ফিরে গেলেই তাঁর উপরে সে হয়তো নতুন কোনও সমন জারি করবে। না, রীজ হোটেলে তিনি আর যাবেন না। কোথায় যাবেন তা হলে? কোথায় গিয়ে রাত কাটাবেন? ঘুরতে-ঘুরতে একটা ট্যাক্সিতে গিয়ে উঠে বসলেন, ড্রাইভারকে জিজ্ঞেস করলেন, "ছোটখাট কোনও হোটেল জানা আছে তোমার? অখ্যাত কোনও হোটেল? এক-রাত্তিরের জন্য আমাকে একটা ঘর জুটিয়ে দাও। না, সদর রাস্তায় নয়, পার যদি তো কোনও গলিঘুঁজির মধ্যে নিয়ে চল আমাকে। যেন

কানও গণ্ডগোল না থাকে, যেন একটু নিরিবিলি হয়।"

কয়েকটা হোটেলই জানা ছিল তার, কিন্তু একটা হোটেলেও জায়গা পাওয়া গেল না। সমস্ত ঘর ভাড়া হয়ে গিয়েছে, পছন দিককার কোনও ঘরও খালি নেই। পর-পর কয়েকটা রাত্রি অনিদ্রায় কেটেছে, অবসাদে ভেঙে পড়ছে তাঁর শরীর। আর কতক্ষণ এইভাবে ঘুরে বেড়াবেন। ক্লান্ত চোখ তুলে ড্রাইভারের দিকে তাকিয়ে তিনি শুধোলেন, "আর-কোনও হোটেল জানা নেই তোমার? একটা মাত্র রাত্তিরের জন্য একটু আশ্রয় চাই আমি। তাও আমাকে জুটিয়ে দিতে পারবে না?" মাথা ঝাঁকিয়ে ড্রাইভার বলল, "রাত প্রায় দুটো বাজতে চলল। যে-রকম ঘর আপনি চাইছেন, সারা রাত খুঁজেও বোধ হয় তা পাওয়া যাবে না। মাঝারী গোছের হোটেলগুলি সব ভর্তি হয়ে আছে। তার চাইতে আমি বলি কি, বড় কোনও হোটেলে চলুন। পয়সা কিছু বেশী লাগবে অবিশ্যি, কিন্তু ঘর ঠিক পেয়ে যাবেন।"

একমুহূর্ত নীরব হয়ে রইলেন চার্লি। তারপর বললেন, "ভেবেছিলাম বলব না, কিন্তু না-বলে আর কোনও উপায়ও নেই এখন। আমি চার্লি চ্যাপলিন।" ভেবেছিলেন, এইটুকু শুনেই ড্রাইভার হয়তো তাজ্জব বনে যাবে। কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত সেই নামটি শুনবার পরেও তার যখন কোনও ভাবান্তর ঘটল না, চার্লি তখন বললেন, "বড় হোটেলে আমি যাব না। ছোট হোটেলগুলিও দেখছি ভর্তি হয়ে আছে। কী করা যায় তা হলে? আমি বলি কি, তোমার বাসায় আমাকে নিয়ে চল। একটা রাত্তিরের জন্যে আমাকে আশ্রয় দাও। ঘুমে আমার চোখ জড়িয়ে আসছে।"

ঘুম শুধু চার্লিরই পায়নি, ড্রাইভারটিরও পেয়েছিল। জড়িয়ে-জড়িয়ে বলল, "বিলক্ষণ, আমার ওখানেই চলুন। কিন্তু একটি কথা, আপনি যে চার্লি চ্যাপলিন, দয়া করে এ-তথ্যটি সেখানে প্রকাশ করবেন না। তাতে বিপদ ঘটতে পারে। কী জানেন, আমার স্ত্রীর আবার খবরের কাগজ পড়ার বাতিক আছে কি না, আপনার সঙ্গে আপনার স্ত্রীর যে মামলা চলছে, সেটা তার অজানা নয়। তার ধারণা, আপনার স্ত্রীর কথাই ঠিক, আপনি অতি-শয় বদচরিত্রের লোক। এখন সে যদি টের পেয়ে যায় যে, আপনার মতন একটা খারাপ লোককে আমি খাতির করে আমার বাড়িতে নিয়ে তুলেছি তো আমাকে সে আর আস্ত রাখবে না। দয়া করে একটু চেপেচুপে চলবেন।"

"দী সার্কাস" চিত্রের একটি দৃশ্য

চার্লি বললেন, "বেশ তো, একটি কথাও আমি বলব না।" বলে কৃতজ্ঞতায় ড্রাইভারের হাত দুখানা তিনি জড়িয়ে ধরলেন।

হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ড্রাইভার বলল, "আর-একটা কথা, আমার বাসায় কিন্তু বাড়তি বিছানা নেই। ন বছরের একটি ছেলে আছে আমার। তার সঙ্গে একই বিছানায় আপনাকে রাত কাটাতে হবে।"

চার্লি বললেন, "এ আর বেশী কথা কি। একটা রাত বই তো নয়।"

নিঃশব্দে সেই ড্রাইভারের বাসায় গিয়ে ঢুকলেন দুজনে। কপাল ভাল, ছেলেটি তখন অঘোরে ঘুমুচ্ছে। সারাদিন খেটে-খুটে তার মা'ও তখন নিদ্রামগ্ন। সুতরাং, এত রাত্রে কে এল, ড্রাইভারকে তা নিয়ে কোনও জবাবদিহি করতে হল না। জামা-জুতো খুলে ছেলেটির পাশে গিয়ে শুয়ে পড়লেন চার্লি। অনেককাল তাঁর ঘুম হয়নি। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়লেন।

সকালে যখন ঘুম ভাঙল, ছেলেটি তখনও ওঠেনি। মিটমিট করে তাকিয়ে দেখেন, তাঁরই বালিশের উপরে হাত রেখে সে ঘুমুচ্ছে। ঘুমের মধ্যেই পাশ ফিরল একবার, ঘুমের মধ্যেই চার্লির আর-একটু কাছে সরে এল। সর্বনাশ, এক্ষুনি হয়তো ধরা পড়ে যাবেন। আতঙ্কে তিনি চোখ বুজলেন।

একটু বাদেই উঠে পড়ল ছেলেটি। চার্লির দিকে আড়চোখে একবার তাকিয়ে তারপর আয়নার সামনে গিয়ে জামাজুতো পরতে শুরু করল। আয়নায় ছায়া পড়েছে চার্লির। পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে তাকে। সেই প্রতিবিম্বের দিকে একবার তাকিয়েই ছেলেটির চক্ষুঃস্থির। কে এ? তার বাবা তো নয়। তাহলে? কাছে সরে এসে মনোযোগ দিয়ে দেখতে লাগল তাকে। আরে সর্বনাশ, এ যে চার্লি! বুঝতে পেরে বিদ্যুৎবেগে ঘর থেকে সে বেরিয়ে গেল। চার্লি দেখলেন, বেশী কথা না হয়ে চোখ বুজে চুপচাপ শুয়ে থাকাই এখন ভাল।

একটু বাদেই ছেলেটি আবার ফিরে এল। বন্ধুবান্ধবদের সে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এক-একজন করে এগিয়ে আসে, আর উত্তমরূপে তাঁকে নিরীক্ষণ করতে থাকে। চার্লি, হ্যাঁ চার্লিই। আনন্দে,

বিস্ময়ে, মুখ দিয়ে আর কথা সরছে না কারও। "আরেব্বাস!" "অবাক কাণ্ড!" বলে, আর পরস্পরকে ঠেলাঠেলি করতে থাকে। সদ্যোপিতৃহীন ছোট্ট একটি মেয়েও সঙ্গে এসেছিল। গণ্ডগোলের মধ্যে সবকথা সে ভালভাবে বুঝে উঠতে পারেনি। তার ধারণা, তার বাবাই আবার স্বর্গ থেকে ফিরে এসেছেন। চার্লির দিকে একবার তাকিয়েই সে অজ্ঞান হয়ে গেল।

সেই হৈ-চৈয়ের ভিতরে ট্যাক্সি-ড্রাইভারের স্ত্রী আবার ঘরের মধ্যে এসে উপস্থিত। চার্লির দিকে একবার তাকালেন তিনি। তাঁর স্বামী তাঁকে বলেছিলেন যে, এক বন্ধুকে তিনি সঙ্গে নিয়ে এসেছেন, রাত্তিরের মত এখানেই তিনি থাকবেন। আগন্তুক যে চার্লি চ্যাপলিন, সেটা আর তিনি প্রকাশ করেননি। এক নজর তাকিয়েই ব্যাপারটা তিনি বুঝে নিলেন। তারপর ছেলেমেয়েদের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বললেন, "এখনকার মত তোমরা বরং অন্য কোথাও যাও। দেখছ না, ভদ্রলোক একটু ঘুমোবার চেষ্টা করছেন। একটু বিশ্রাম করতে দাও ওঁকে। ও কি, দাঁড়িয়ে রইলে যে? যাও, পরে এসে বরং মিঃ চ্যাপলিনের সঙ্গে যতখুশি গল্প কর।"

মামলার বিবরণ পড়ে চার্লির উপরে তাঁর ক্রোধের অন্ত ছিল না। এখন, চার্লিকে এই অসহায় অবস্থায় দেখে, তাঁর সমস্ত হৃদয় যেন মমতায় ভরে উঠল। আহা রে, কতদিন হয়তো ঘুম হয়নি, কতদিন হয়তো পথে-পথে ঘুরে বেড়িয়েছে। যে যাই বলুক, তিনি এখন চ্যাপলিনের পক্ষে। একটু বাদেই ব্রেকফাস্ট নিয়ে এলেন তিনি, চার্লি যাতে আর-দুদিন তাঁদের বাড়িতে থেকে যান, তার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালেন। বৌয়ের ভয়ে ট্যাক্সি-ড্রাইভার যেন তটস্থ হয়ে ছিল, এতক্ষণে তার স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়ল।

যে বিপুলপরিমাণ অর্থ দাবি করলেন লীটা, তার অঙ্কটা প্রায় অবিশ্বাস্য। সংবাদপত্রে তাঁর এই দাবিকে "দ্বিতীয় গোল্ড রাশ" বলে বর্ণনা করা হল। চার্লির কাছ থেকে তিনি দশ লক্ষ ডলারেরও বেশী আদায় করে নিয়েছিলেন। টাকাটা দিয়ে দিলেন চার্লি। লীটার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভের জন্য তিনি তখন যে-কোনও মূল্যে দিতে রাজী ছিলেন। পর পর দুটি মেয়েকে বিয়ে করেছিলেন চার্লি, কিন্তু দুজনের কেউই তাঁকে একটি শান্তি-পূর্ণ পারিবারিক জীবনের আনন্দ দান করতে পারলেন না। দুজনের কেউই তাঁর গৃহিণী হতে চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন অভিনেত্রী হতে। তাঁরা ভেবেছিলেন, চার্লির মতন বিখ্যাত একজন প্রযোজক-পরিচালককে যদি স্বামী হিসেবে পাওয়া যায় তো দেখতে-না-দেখতেই তাঁরা অভিনয়-জীবনের সপ্তম স্বর্গে আরোহণ করতে পারবেন। চার্লি যখন তাতে বাদ সাধলেন, যখন খোলাখুলি জানালেন যে, স্ত্রীর কাছে শান্তিপূর্ণ সাংসারিক জীবনই তাঁর কাম্য, ক্রোধে আর হতাশায় তখন উন্মত্ত হয়ে উঠলেন তাঁরা, তাঁর আকাঙ্ক্ষার ঘরে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। তাঁরা জানতেন, কোলাহল তিনি সইতে পারেন না। সমস্ত জেনেও—না, সমস্ত জেনেই—রাত্রিদিন পার্টি দিয়ে তাঁ গৃহকে তাঁরা এক অশান্ত কোলাহলে পূ করে রেখেছেন। মীলড্রেডের সঙ্গে তাঁ দাম্পত্য জীবন দু বছর স্থায়ী হয়েছিল (বছরখানেকের মধ্যেই অবশ্য স্বেচ্ছায় তাঁরা পৃথক হয়ে গিয়েছিলেন); লীটার সঙ্গে বছর তিনেক। মামলা চলবার সময় বিভিন্ন মহিলা-প্রতিষ্ঠান থেকে লীটাকে সমর্থন করা হয়। তাঁরা দাবি জানালেন, চার্লি চ্যাপলিনের বইগুলোকে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হোক। ব্যাপার দেখে ভয় পেয়ে গেলেন চার্লি। আশঙ্কা হল, তাঁর অভিনয় জীবনের এবারে সমাধি রচিত হতে চলেছে। কিন্তু না, সকলেই তখন কিছু লীটার পক্ষ সমর্থন করেনি। মার্কিন সমালোচক এইচ এল মেনকেন সেই সময় লিখেছিলেন, "দু দিন আগেও চার্লিকে যারা দেবতা মনে করত, চার্লির এই সংকট-কালে তাদেরই দেখি আনন্দের অন্ত নেই। চার্লির এতে উপকারই হল। জনচিত্ত বলতে যে কী-বস্তু বোঝায়, চার্লি সেটা শিখে নিলেন।" ফ্রান্সেও তাঁর সমর্থনের অভাব হয়নি। রেনে ক্লেয়ার, লুই আরাগঁ, জারমেঁ দুলাক, মাঁ রে এবং আরও বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি সেইসময় তাঁকে সমর্থন জানিয়েছিলেন।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পর লীটার কী হল পাঠকদের সে-বিষয়ে কৌতূহল থাকতে পারে। দিনকয়েক রঙ্গমঞ্চে অভিনয় করলেন তিনি। বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম ছাপা হত লীটা গ্রে চ্যাপলিন। বিভিন্ন নাইট ক্লাবের অনুষ্ঠানেও সেই সময় তিনি অংশগ্রহণ করেছেন। দিনকয়েক বাদেই তার স্বাদ হয়তো পানসে হয়ে এল। আবার তিনি বিয়ে করলেন। ছ মাস বাদেই বিবাহ-বিচ্ছেদ। তারপর আবার বিয়ে। আবার বিবাহ-বিচ্ছেদ। শেষ পর্যন্ত চিত্র-প্রতিষ্ঠানের এজেন্টের কাজ নিয়েছিলেন। যে-সব মেয়ে অভিনেত্রী হতে চায়, তাদের জুটিয়ে আনার কাজ। নিজে অভিনেত্রী হতে চেয়েছিলেন। সে-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়নি। অন্য মেয়েদের এনে অভিনেত্রী-জীবনের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে কী আনন্দ তিনি লাভ করতেন, আমি জানি না।

(ক্রমশ)

যুগ হতে যুগান্তরে

হর্ষদেব

গত মহাযুদ্ধের সময়কার এক গল্প। ফ্রান্সের আকাশ তখন নাৎসী বিমানে পঙ্গপালের মতন ছেয়ে গেছে। স্থলপথে বিদ্যুৎগতিতে এগিয়ে আসছে জার্মানীর ট্যাঙ্ক, সৈন্যবাহিনী। প্যারীর পতন অনিবার্য। যুদ্ধের এমন ভয়ঙ্কর দিনে ফরাসী সরকার সব বিষয়ে খুব কড়াকড়ি করেছেন। ফ্রান্সের কোনও এক শহরের রেস্টুরেন্টে এক ভদ্রলোক খেতে বসে দেখলেন, প্লেটে তাঁর বাসি রুটি, তা-ও মাখন ছাড়া। ডাক পড়ল রেস্টুরেন্টের কর্তার। হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল ম্যানেজার। ভদ্রলোক চোখ পাকিয়ে বললেন, রুটি দিয়েছ, মাখন নেই কেন? ম্যানেজার করজোড়ে জবাব দিলে, মঁসিয়ে আপনি বোধ হয় এ শহরে নতুন। নয়ত জানতেন মাখন খাবার জন্যে সরকারকে এখন আমরা ট্যাক্স দিচ্ছি না, পাথর আর মাটি বাঁচাবার জন্যেই ট্যাক্স দিচ্ছি। ভদ্রলোক তার জবাবে কি বলেছিলেন তা আমার জানা নেই। তবে ম্যানেজারের বক্তব্যের অর্থ ছিল সরল। অর্থাৎ ফরাসী সরকার তখন জন্মভূমি রক্ষায় ব্যস্ত। আর ব্যস্ত ফ্রান্সের স্থাপত্য ভাস্কর্য শিল্প এগুলিকে অক্ষত রাখার চেষ্টায়।

ফরাসী সরকারের এ চেষ্টা এমন নতুন কিছু নয়। যুদ্ধের সময় সকল সভ্য-দেশের সরকারই তাঁদের জাতীয় মহামূল্য শিল্প-সম্পদগুলি রক্ষার জন্যে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করে থাকেন। স্থানযোগ্য শিল্পসম্পদগুলি লুকিয়ে রাখা সহজ, কিন্তু মুশকিল বাধে স্থাপত্য-কীর্তি এবং ভাস্কর্যগুলি নিয়ে। এগুলিকে সরাবার উপায় নেই—অথচ মুক্ত আকাশতলে দাঁড়িয়ে শত্রুপক্ষের বোমার আঘাতে যুগ-যুগান্তরের এই ঐতিহ্যপুষ্ট সম্পদগুলি ভেঙেচুরে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে যাবে, এ যেন সহ্য করা অসম্ভব হয়ে ওঠে। তখন নানারকম চেষ্টা চলে। সে চেষ্টায় কিছু হয়ত রক্ষা পায়—কিছু পায় না।

স্বদেশের শিল্পসম্পদ শুধু শত্রু-পক্ষের বোমার আঘাতই সহ্য করে না, বহুক্ষেত্রে এগুলি শত্রুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়। দেড়শ বছর আগে নেপোলিয়ান ইটালীয় শিল্পের মূল্যবান বহু সম্পদ অপহরণ করেছিলেন। আর এ যুগে নাৎসি সরকার বেছে বেছে হিটলার আর গোয়েরিঙয়ের অর্ন্ট-আওাসর অপহরণ-শালায় য়ুরোপের বহু শিল্পসম্পদ জড় করেছিলেন।

গত বিশ্বযুদ্ধের পর য়ুরোপে শিল্প-সংরক্ষণের একটা জোর হিড়িক পড়ে গেছে। যুদ্ধের সময় যেসব ঐতিহাসিক গির্জা, স্থাপত্য-কীর্তি, ভাস্কর্য নষ্ট হয়ে গেছে, সেগুলিকে যথাসম্ভব মেরামত করে আবার তাদের পুরোনো রূপ ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে এখন।

প্রশ্ন হতে পারে, এ চেষ্টা কেন? যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশের সাধারণ মানুষের

চতুর্দশ লুইয়ের ভার্সেলির রাজপ্রাসাদের একটি কারুকার্যমণ্ডিত কক্ষ 'আয়না ঘর'

ঘরবাড়ি, কলকারখানার পুনর্গঠনের চেয়ে শিল্পসম্পদ সংরক্ষণই কি বড় হ'ল! জবাবে বলতে হয়, ঐতিহ্যগত অধিকারের প্রতি মানুষের একটা সাধারণ দুর্বলতা আছে। এমন ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত বিরল নয়, যেখানে মানুষ একটি গির্জা, মন্দির, কি মসজিদ রক্ষায় দলে দলে আত্মবিসর্জন দেয়নি। সোমনাথের মন্দির লুণ্ঠিত হয়েছিল ঠিকই; কিন্তু সে লুণ্ঠনে বাধা দেবার জন্যে যারা এগিয়ে এসেছিল, তারা নিশ্চয় নির্বোধ নয়। বিগত যুগের তুলনায় বর্তমান যুগে মানুষে তার দেশজ শিল্প-ঐতিহ্য রক্ষায় অপেক্ষাকৃত তৎপর বুঝি। তার ফলে দেশের আর্থিক উন্নতির প্রচেষ্টা এবং শিল্পসম্পদ রক্ষার চেষ্টা চলেছে একই সঙ্গে।

গত বিশ্বযুদ্ধে য়ুরোপের প্রায় প্রতিটি দেশই নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। শিল্প-সম্পদের ক্ষতির পরিমাণও বিরাট। শুনলে অবাক হতে হবে, গত মহাযুদ্ধে ইটালীরই ৫ হাজারেরও বেশি সুন্দর সুন্দর গির্জা
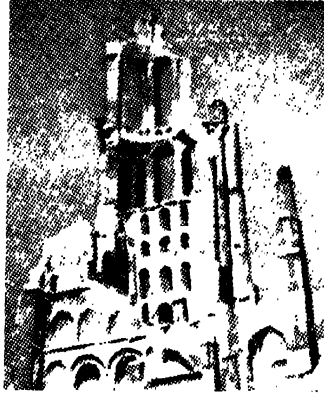
আর্নহেমের যুদ্ধবিধ্বস্ত বিখ্যাত গির্জা সেন্ট ইউসিবিয়াস

এবং ঐতিহাসিক ভবন ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এর মধ্যে যেগুলি আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত—ইটালী সরকার তার বেশিরভাগই ইতিমধ্যে মেরামত করে ফেলেছেন। অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা ক্যাথিড্রাল ১৯৪৫ সালে সমানে তিনদিন পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে গিয়েছিল প্রায়। গত কয়েক বছরের মধ্যে এই ঐতিহাসিক ক্যাথি-ড্রালটিকে পুনরায় স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে। নেদারল্যান্ডের হাজারখানেক প্রাচীন কীর্তি বিগত যুদ্ধে নিশ্চিহ্ন হতে বসেছিল। এখন তাদের অনেকগুলির মেরামত চলছে। আর্নহেমের বিশ্ববিখ্যাত গির্জা সেন্ট ইউসিবিয়াস গত যুদ্ধে ভগ্নস্তূপে পর্যবসিত হয়েছে। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর থেকেই গির্জাটিকে সারাবার কাজও শুরু করেছেন সরকার। নানান দেশ থেকে খ্যাতনামা স্থপতি, শিল্পী এসেছেন; উপদেশ দিয়েছেন। সেই মতন কাজ চলছে। প্রকৃতপক্ষে য়ুরোপে এখন যে অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে যে কোনও দেশের পুরাতন শিল্প-সম্পদ শুধুমাত্র সে দেশের সামগ্রী নয়—বিশ্বের চিরন্তন সৌন্দর্য, সম্পদ বলে গণ্য হচ্ছে এবং পারস্পরিক সাহায্য ও উপদেশের দ্বারা মানুষের এই সৌন্দর্য-সৃষ্টিগুলিকে কালজয়ী করবার চেষ্টা চলেছে। জনসাধারণও আর্থিক-ভাবে সরকারকে এ কাজে সাহায্য করতে পিছপা হচ্ছে না।

জগৎ বিখ্যাত তাজমহলঃ ১৮২৮ সালে ব্রিটিশ সরকার এই অপরূপ স্থাপত্যকীর্তিকে ভেঙে ফেলার প্রস্তাব তুলেছিলেন

যুদ্ধ ছাড়াও শিল্পসম্পদগুলির ক্ষতি যে না হয় এমন নয়। আবহাওয়া, দুর্ঘটনা, কালস্রোত পৃথিবীর বহু মূল্যবান শিল্প-ঐতিহ্যকে নিশ্চিহ্ন করেছে, করে চলেছে এখনও। উদাহরণস্বরূপ চতুর্দশ লুইয়ের ভার্সেলির রাজপ্রাসাদের কথা ধরা যেতে পারে। প্রায় তিন শতাব্দী ধরে যুদ্ধ, আবহাওয়া, বিপ্লবের ছোঁয়া লেগে লেগে চতুর্দশ লুইয়ের আশ্চর্য সুন্দর প্রাসাদটির বহু কক্ষ আবর্জনা-স্বরূপ হয়ে উঠেছিল। ইঞ্জিনীয়াররা বলেছিলেন ষাট বছরের মধ্যে সমস্ত প্রাসাদটি ভেঙে পড়বে। এই প্রাসাদের একটি কক্ষ 'আয়না ঘর' নামে বিখ্যাত। এই ঘরটিরও ছাদে

ফুটো দেখা দিয়েছিল, ভেঙে পড়েছিল কড়িকাঠ। চতুর্দশ লুইয়ের রাজপ্রাসাদকে নিছক একটি শৌখিন সম্রাটের ব্যক্তিগত ভবন হিসেবে না দেখে ফরাসী সরকার এই ভবনটিকে ফরাসী সভ্যতার এক গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতিচিহ্নরূপে গ্রহণ করে প্রাসাদটি সারাবার কথা চিন্তা করলেন। শুধু ঘর সারানোই নয়, তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ফরাসী জাতির সেই অতীত সুবর্ণ-যুগের আবহাওয়াটি পর্যন্ত আবার ফুটিয়ে তুলতে হবে। সরকার এই উদ্দেশ্যে ৫০ লক্ষ ফ্রাঙ্কের এক তহবিল তৈরি করেন। জনসাধারণের স্বেচ্ছা-প্রণোদিত সাহায্যও আছে এর মধ্যে। যাই হোক, চতুর্দশ লুইয়ের ভগ্ন প্রাসাদের অনেকগুলি কক্ষ এখন পুনর্গঠিত, সুসজ্জিত। ভার্সেলিকে কেবল যাদুঘর হিসেবেই নয়, বর্তমানে জাতীয় নাটক এবং সংগীত অনুষ্ঠানাদির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসেবে পরিণত করা হয়েছে।

এ তো গেল বিদেশের কথা। স্বদেশে আমরা প্রাচীন শিল্প-ভাস্কর্য-স্থাপত্যের নবীন উত্তরাধিকারী। সমগ্র ভারতে যত স্থাপত্য-কীর্তি তার রক্ষণাবেক্ষণ ঠিকমত করতে হলে সরকারকে হিমসিম খেয়ে পড়তে হবে। আমাদের ভাগ্য ভাল, মৌসুমী আবহাওয়ার দেশ হওয়া সত্ত্বেও এখানে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ মারাত্মক নয়। সাম্প্রতিক সর্বনাশা যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়লেও তার প্রত্যক্ষ আঘাত থেকে আমরা মুক্ত ছিলাম গত দুই যুদ্ধেই। কাজেই বোমার আঘাতে ভারতের পাথুরে ঐতিহ্য-গুলি ধ্বংসস্তূপে পর্যবসিত হতে পারে নি। তথাপি সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হবার কোন কারণ দেখি না। উদাহরণ-স্বরূপ তাজমহলের কথা ধরা যেতে পারে। তাজমহলও ভাঙতে বসেছিল।

১৯৩৬ সাল থেকে তাজমহলের ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হচ্ছে। এর বিরাট গম্বুজটিকে সম্পূর্ণরূপে মেরামত করা হয়েছে। অনেকগুলি ভগ্ন স্তম্ভ, দেওয়ালে গাঁথা চূর্ণ-বিচূর্ণ পাথর সরিয়ে নূতনভাবে তৈরি করতে হয়েছে কর্তৃপক্ষকে। তাজমহলের মর্মর মূল্যের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের লুব্ধ দৃষ্টি বরাবরই। শুনলে অবাক হতে হবে, ১৮২৮ সালে সমগ্র তাজমহলটিকে ভেঙে ফেলার প্রস্তাব তোলা হয়েছিল। আর সাত-সাতটি বছর ধরে এই প্রস্তাব রীতিমত বিবেচনাধীন ছিল সরকারের। সৌভাগ্য আমাদের, ভারতের তাজমহলের মর্মররাশি সাগর-পারে চালান হয়ে যায় নি।

আগেই বলেছি, প্রাচীন শিল্প-ঐতিহ্যে ভারত যত ধনী, এত ধনী খুব কম দেশই আছে। শত শত বৎসরের পুরাতন, অনন্যসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত মন্দির, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ভারতের কোন প্রান্তে না ছড়িয়ে আছে! ভারতীয় ভ্রমণকারী এবং ঐতিহাসিকদের তথ্য-সমৃদ্ধ রচনা পড়লেই দেখা যায়—কালস্রোতে বহু উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক প্রস্তর-স্মৃতি আজ ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

ধামেক স্তূপ

জনসাধারণের পক্ষ থেকে এই মহান কীর্তিগুলিকে রক্ষা করার দায়িত্ব যত, সরকারের পক্ষেও তত। চতুর্দশ লুইয়ের রাজপ্রাসাদ রক্ষায় ফাসী সরকার যদি ৫০ লক্ষ ফ্রাঙ্কের তহবিল গঠন করতে পারেন, তবে গুপ্ত যুগে নির্মিত প্রসিদ্ধ একটি স্তূপের এমন শ্রীহীন অবস্থা কেন?

বলা বাহুল্য, সভ্যতার ক'টি বিশিষ্ট লক্ষণ শিল্প, ভাস্কর্য ও সাহিত্যে যে পরিমাণ পরিস্ফুট হয়, এমন আর কোন কিছুতেই নয়। কাজেই আমাদের ঐতিহ্যগত উৎকর্ষতাকে যুগ থেকে যুগান্তরে স্মরণীয় করে রাখতে হলে এদের সংরক্ষণ একান্তভাবেই প্রয়োজনীয়।

মিস ব্রাইটন

শংকর
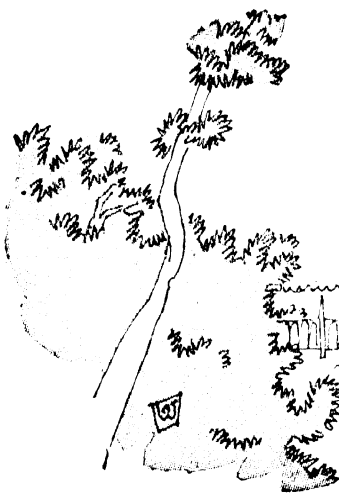
মিস ফ্যানি ব্রাইটনের সঙ্গে সায়েবের প্রথম সাক্ষাৎ রাণীক্ষেতে। প্রতি বৎসর ছুটিতে সায়েব রাণীক্ষেতে আসতেন। হিমালয়ের কোলে উত্তরপ্রদেশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শৈলাবাস এই রাণীক্ষেত।

মিস ব্রাইটন রাণীক্ষেতে কতদিন আছে কেউ জানে না। ওখানকার বাসিন্দারা তাঁকে বহুকাল ধরে দেখে আসছে। মিস ব্রাইটনকে আমিও দেখেছি। বয়স অনেক। সত্তরের কম নয়। বিশাল দীর্ঘ দেহ বয়সের ভারে সামান্য বেঁকে গেছে। কিন্তু রোজ সকালে লম্বা লম্বা পা ফেলে প্রকৃতির শোভা দেখতে বেড়াতে বের হন। বয়সের দরুণ মিস ব্রাইটনের শরীরের জলুস চলে গেছে। কিন্তু প্রথম দর্শনেই বলা যায়, বয়স কালে তিনি সুন্দরী ছিলেন। প্রকৃত সুন্দরী বলতে যা বোঝায়। মিস ব্রাইটনের বর্তমান অঙ্গের ধ্বংসাবশেষ থেকেও বিগত দিনের সুন্দরী শ্রেষ্ঠা মিস ব্রাইটনকে কল্পনা করা খুব শক্ত নয়।

মিস ব্রাইটনের বেশবাসে দারিদ্র্যের চিহ্ন। পাহাড়ের ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় তাঁর বাড়িটি নিজস্ব। মিস ব্রাইটন এখনও তিন মাইল পথ ভেঙে নিজে বাজারে আসেন। আলু থেকে ঢ্যাঁড়স পর্যন্ত সবকিছুর দরাদরিতে দোকানদাররা অস্থির হয়ে পড়ে। আর কলকাতার গঙ্গাস্নান-ফেরৎ বুড়িদের মত একটি ফাউ না পাওয়া পর্যন্ত দোকানদারদের নিষ্কৃতি দেন না তিনি। বাজারের লোকেরা বলে, "এইসা মেমসাব সারা দুনিয়ায় মিলবে না।"

মিস ব্রাইটনের সমাজ নেই; বন্ধু নেই। আত্মীয়স্বজন আছে বলে মনে হয় না। চাঁদার ভয়ে মিস ব্রাইটন কখনও রাণীক্ষেত ক্লাবের ধারে কাছেও ঘেঁষেন না। অথচ বই পড়ার ইচ্ছে হলে অন্য মেম্বরদের ধরেন, 'প্লিজ রবার্ট। ওই বইটা যদি তোমার নামে ইস্যু করাও।'

বাড়িতে একটি বেয়ারা ও একটি খানসামা। গৃহকর্ত্রীর মতন তাদের অবস্থাও শোচনীয়। মিস ব্রাইটনের বিশ্বাস চাকরদের বেশী মাইনে দেওয়া খুব অন্যায়। তার ফলে তিনি কখনও চারকদের মাইনে বাড়াননি। তারা এই দুর্মূল্যের বাজারে ১৯১৪ সালের হারে মাইনে পায়। অন্য কোথাও চাকরি নিলে তারা অন্তত তিন গুণ রোজগার করতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় বুড়ির প্রতি তাদের এত মমতা যে, চাকরি ছাড়তে পারে না। বলে বুড়ির কষ্ট হবে। মিস ব্রাইটনের ধারণা অন্য। "আমাকে বোকা পেয়ে ওরা চারিদিক থেকে চুরি করছে।" অথচ সপ্তাহে একবার কেরোসিন তেলের দাম ছাড়া অন্য কোন পয়সা চাকরদের হাতে আসে না।

চাকররা বলত, মেমসায়েবের বয়স হয়েছে। পয়সাকড়ি নেই। কোথা থেকে পয়সা দেবে। মিস ব্রাইটনও বলতেন, কোথায় টাকা পাব! লোকেও এই ব... বুদ্ধার জন্য দুঃখ করত। অনেকে পরো... ভাবে সাহায্যও করত তাঁকে।

মিস ব্রাইটন ছবি আঁকেন। ও... বাড়িতে অন্তত শখানেক ছবি সব... টাঙানো থাকে। অতিসাধারণ সস্তা ধরনে... ছবি, ছবির বিষয় একেবারে এক। চাঁদি... রাতে পাল তুলে নৌকা চলেছে। অথবা... পাহাড়ের পিছনে সূর্যাস্ত। গ্রীষ্মকালে যেসব সায়েব-মেমরা হাওয়া-পাল্টাতে আসতেন মিস ব্রাইটন তাঁদের ধরে এনে ছবি দেখান। তাঁদের অনেকেই বুড়ির দারিদ্র্যে করুণাদ্র হয়ে এক-আধটা ছবি কেনেন। সায়েব নিজেও কয়েকবার ছবি নিয়েছেন। সে ছবি বাড়িতে টাঙানর মত নয়। কিন্তু বুড়িকে সাহায্য করাই প্রধান উদ্দেশ্য। ছবি কেনার সূত্রেই সায়েবের সঙ্গে মিস ব্রাইটনের আলাপ। পরে দুজনের পরিচয় আরও গভীর হয়েছে।

একদিন মিস ব্রাইটন সায়েবকে ডেকে পাঠালেন। "আমি উইল করতে চাই। এখানে আপনাকে ছাড়া কারুকে আমি বিশ্বাস করি না।" সায়েব ভাবলেন বুড়ির উইল করার মত কিইবা আছে। কিন্তু যখন বুড়ির সম্পত্তির তালিকা হাতে এল তিনি আশ্চর্য, অবাক। ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কে কারেণ্ট একাউণ্টে পঞ্চাশ হাজার টাকা। আর বিভিন্ন কোম্পানির কাগজে অন্তত সাড়ে তিন লাখ টাকা।

মিস ট্রাইটনকে ঘিরে স্থানীয় লোক-
নানান গল্প। কেউ বলে বুড়ি ইংরেজ
ফিরিঙ্গী। কেউ বলে, না বুড়ি আসল
। কিন্তু এখানে গুপ্তচরের কাজ করে।
উ বলে বুড়ি ডাইনী। যে কোন লোককে
পাগল করে দিতে পারে।

মিস ট্রাইটন ভয়ঙ্কর খিটখিটে। ছোট
লেদের তিনি দেখতে পারেন না।
লেরা নাকি ভারী নোংরা আর ভয়ানক
লমাল করে। নেটিভদের তিনি দেখতে
রেন না। ভারতবর্ষের সবকিছুর প্রতি
র ঘৃণা।

ছুটির সময় যেসব সায়েবরা আসেন
দের গৃহিণীদের সঙ্গেই মিস ট্রাইটনের
মান্য মেলামেশা। মাঝে মাঝে চায়ের
সরে যদি তারা নেমন্তন্ন করে বসেন সেই
দেশ্যে। কেবল তখনই প্রাণখুলে কথা
লে বাঁচেন। ইংরেজ শাসনের সোনার
নগুলো চলে গেছে। তখন নিজের মত-
কাশে কোন বাধা ছিল না। কিন্তু এখন?
থায় বলে দেওয়ালেরও কান আছে।

চায়ের আসরের অতিথিদের অনেকে
া হোম কেবাৎ। মিস ট্রাইটন হোমের খবর
দের জিজ্ঞাসা করেন। ডিমের র‍্যাশন
কি না। অমুক পার্কে নিয়ন আলোর
জাপান দেওয়া খুবই অন্যায় হয়েছে।

পনরই আগস্টের পর দেশটার সর্বনাশ
য়েছে। মিস ট্রাইটন বলছিলেন। সবকিছু
াধঃপাতে যেতে বসেছে। ব্যবসাবাণিজ্য
ন রসাতলে যাবে।

কলম্বো পরিকল্পনায় আগত জনৈক
ইঞ্জিনিয়রের স্ত্রী বললেন, "কিন্তু
ইন্ডিয়াতে অসংখ্য নতুন কারখানা গড়ে
উঠছে।"

মিস ট্রাইটন বিজ্ঞের মত বললেন,
কিন্তু ওসব কারখানায় কোনদিন মাল
তরী হবে না: হতে পারে না। হাজার
াক এদেশে আমি অনেক দিন আছি।
দের সবকিছু জানতে আমার বাকী নেই।
য়ঙ্কর নোংরা জাত। সেবারে আমার
ানপো এসেছিল বিলেত থেকে। সে
লল, মাসি, সমস্ত ইন্ডিয়াতে ভদ্রলোক-
দের ক্রিকেট খেলার মত একটাও মাঠ নেই।"

মিস ট্রাইটনের কথাবার্তায় উৎসাহিত
য়ে একজন মিশনারীর স্ত্রী বললেন, "যা
লেছেন। এদের ধর্মকর্মও তেমন। বিশ্রী।
ত রাজ্যের বীভৎস দেবদেবী।"

মিস ট্রাইটনের মুখ হঠাৎ কালো হয়ে
উঠল। মনে হলো যেন ভয় পেয়েছেন।
মিশনারীর স্ত্রী অবাক হলেন। তাঁকে সায়
না দেওয়ায় অপমানিত বোধ করলেন।
মিস ট্রাইটনের প্রকৃতিস্থ হতে সময় লাগে।
ততক্ষণে ইন্ডিয়ার ক্লাইমেট নিয়ে আলোচনা
আরম্ভ হয়ে গেছে।

আমার সায়েবের স্ত্রী অন্য ধরনের।
ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার প্রতি তাঁর
প্রগাঢ় শ্রদ্ধা। ভারতের অধ্যাত্ম জীবনকে
তিনি শুধু শ্রদ্ধা করেন না, মনপ্রাণ দিয়ে
উপলব্ধি করার চেষ্টা করেন। ভারতের
অন্তরপুরুষকে জানার অসীম আগ্রহ
মেমসায়েবের।

মিস ট্রাইটন এসব মোটেই পছন্দ করেন
না। তবু দুজনে দুজনকে ভালবাসেন।
মেমসায়েবকে প্রাণের কথা বলতে দ্বিধা
করেন না মিস ট্রাইটন। মেমসায়েবকে রোজ
যেতে হয় মিস ট্রাইটনের বাড়ি। কোনোদিন
দেরী হলেই বেয়ারা এসে হাজির, খবর
নিতে পাঠিয়েছেন মিস ট্রাইটন।

মিস ট্রাইটনের নিঃসঙ্গ জীবনের মরু-
ভূমিতে মেমসায়েব মরুদ্যানের মত।

মিস ট্রাইটন জোর গলায় বলতেন,
প্রকৃতি তাঁকে প্রভাবান্বিত করে না। কিন্তু
মুখে যাই বলুন, অস্তগামী সূর্যের
আলোকে দূরদূরান্তের শৈলশিখরে ইন্দ্র-
জাল শুরু হলে, তিনি কেমন উদাস হয়ে
ওঠেন। কথা বন্ধ করে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে
থাকেন। দূরে গিরিরাজ হিমালয়ের
মুকুটে বিচিত্র বর্ণালীর সমারোহ তিনি যেন

ভুলে যেতে চান। মুখ ফিরিয়ে অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন। এমনই দুর্বল মুহূর্তে মিস ব্রাইটন জীবনের হিসাব মেলাবার চেষ্টা করেন। কি পাননি তার দীর্ঘ হিসেব কষতে বসে জ্বালা অনুভব করেন।

জীবনের হিসাব মেলাতে অক্ষম হয়েই বোধ করি মেমসায়েবকে ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর জীবনের ইতিহাস—তাঁর নিষ্ফল জীবনের ইতিহাস। মেমসায়েবের কাছে যেদিন সে কাহিনী শুনেছি মিস ব্রাইটন তখন ইহজগতে নেই। মর্ত্যের দেনাপাওনা চুকিয়ে স্বদেশ ও স্বজন হতে বহুদূরে মিস ব্রাইটন তখন চিরনিদ্রায় মগ্ন।

ব্রাইটনরা তিনপুরুষ ধরে ভারতবর্ষকে জানেন। মিস ব্রাইটনের পিতামহ সিপাহী বিদ্রোহে যুদ্ধ করেন। সেদিনের ভারতবর্ষ আর নেই। কোম্পানির যুগের দুর্ধর্ষ ইংরেজ সন্তানরা সময়ের স্রোতে হারিয়ে গেছে।

মিস ব্রাইটনের বাবা বেঙ্গল পুলিসের বড় কর্মচারী। তখনকার পুলিসবাহিনীতে অর্থ উপার্জনের অজস্র পথ।

একমাত্র মেয়েকে মিস্টার ব্রাইটন ভয়ঙ্কর ভালবাসেন। বাইরে তিনি দোর্দণ্ডপ্রতাপ অফিসার। মেয়ের কাছে তিনি একেবারে ছোট ছেলেটির মত। মিস্টার ব্রাইটনের একমাত্র নেশা শিকার। শিকারের নামে তিনি পাগল।

সময় পেলেই ছুটে আসেন কুমায়ুনে রেঞ্জের কাঠুরিকোটে। সুন্দর ছোট্ট শহর। দূরে ওক ও পাইন বনে কুমায়ুনের মানুষখেকো বাঘ। গ্রীষ্মে ইংরেজ পরিবারে কাঠুরিকোট ভরে যায়। কে বলবে তাঁরা ভারতবর্ষে রয়েছেন। হোমেও এমন সম্পূর্ণ বিলিতি পরিবেশ মিলবে না।

সে দিনের মিস ব্রাইটনকে কল্পনা করুন। উদ্ভিন্ন যৌবনা রূপবতী ইংরাজ-ললনা। চোখে মুখে রূপলাবণ্য ও প্রাণ-চাঞ্চল্য ঝরে পড়ছে। অনেক ইংরেজ মহিলা তাঁর রূপকে ঈর্ষা করে। সবাই জানে মিস ব্রাইটনের খুব ভাল বর মিলবে। ক্যাপ্টেন ওয়েণ্টওয়ার্থ পাত্র হিসেবে মন্দ নয়। গভর্নরের এডিসি। অনেক ইংরেজ মেয়ে তাকে পাবার জন্য পাগল। তাদের আহ্বানে কান না দিয়ে ওয়েণ্টওয়ার্থ মিস ব্রাইটনের বাড়ি আসা-যাওয়া করে।

একদিন সন্ধ্যাবেলা। সে সন্ধ্যার কথা মিস ব্রাইটন কোনদিন ভুলতে পারেনি। আবছা অন্ধকারে দীর্ঘদেহ ইংরেজ ঘোড়া থেকে নেমে বাড়ির দিকে এগিয়ে এলেন। পরিধানে শিকারীর পোশাক। মাথার টুপি কপাল পর্যন্ত নামান। মিস্টার ব্রাইটন যখন আগন্তুককে চা-এর জন্য ভিতরে আনলেন, তখন বোঝা গেল আগন্তুক ইংরেজ নয়। ঝোলপুরের যুবরাজ। মিঃ ব্রাইটনের খোঁজে এসেছেন। আগামী কালের শিকারে কজন বাজনাদার নেওয়া হবে আলোচনার জন্য। মিস ব্রাইটন ও আগন্তুকের দৃষ্টি বিনিময় হয়। অপূর্ব সৌন্দর্যবান পুরুষ। তার মাথার চুল ঘন কৃষ্ণ। চোখের তারা দুটি কুচকুচে কাল। যুবরাজের শরীরে কি এক আকর্ষণ আছে যা মিস ব্রাইটনকে চঞ্চল করে তুলল। এমন সময় ক্যাপ্টেন ওয়েণ্টওয়ার্থ হাজির হলেন। চায়ের আসর জমে যায়। মিস ব্রাইটনের শরীরে অনাস্বাদিতপূর্ব শিহরণ জাগে। একসাথে দুটি পুরুষ যেন তাকে আকর্ষণ করতে থাকে।

চায়ের শেষে যুবরাজ বিদায় নিলেন। ওয়েণ্টওয়ার্থ সিগারেট ধরিয়ে অতিক্রান্ত যুবরাজের দিকে সরীসৃপের মত দৃষ্টি হানল, 'কালা নিগারগুলো আমাদের বাড়িতে ঢুকে মেয়েদের সঙ্গেও ভাব জমাতে শুরু করেছে।'

দুষ্টুমি করে মিস ব্রাইটন উত্তর দেয়, 'অমন সুন্দর যার গায়ের রঙ, তাকেও তুমি কালা নিগার বল।'

ওয়েণ্টওয়ার্থ অবাক। বলে কি মিস ব্রাইটন!

মিঃ ব্রাইটন ওয়েণ্টওয়ার্থের আরও কাছে সরে এসে বলে, 'তোমাকে মানতেই হবে, যুবরাজকে হঠাৎ দেখলে ইংরেজ বলে মনে হয়।'

রাগে ওয়েণ্টওয়ার্থের মুখ লাল হয়ে ওঠে।

'হুঁ, তাই বটে। মুসলমান হলেও বা কথা ছিল। কিন্তু এই হিন্দুগুলো...'

মিস ব্রাইটনের ওইখানেই থামা উচিত ছিল। কিন্তু তার আরও দুষ্টুমি করতে ইচ্ছা হলো। 'ঘোড়ায় চড়লে যুবরাজকে আরও সুন্দর দেখায়।'

'ঘোড়ায় চড়লে কি হবে, হতভাগাটা সুদখোরেরও অধম।' ওয়েণ্টওয়ার্থ উত্তর দেয়।

মিস ব্রাইটনের মাথায় বোধ হয় ভূত চেপেছিল। না হলে কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'বিল, যুবরাজকে তুমি দেখতে পার না কেন?'

'যুবরাজকে পছন্দ করি না বললে ভুল হবে, তবে ইংরেজ মেয়েদের—বিশেষ করে সোমত্ত মেয়েদের এদেশে আসতে দেওয়া উচিত নয়। যুবরাজের অনাসৃষ্টি হয় তার থেকে। এই লোকগুলো ভারি চালাক, তাদের বাড়ির মেয়েদের মুখ পর্যন্ত আমাদের দেখায় না। অথচ আমাদের মেয়েদের সঙ্গে মেশার কি আগ্রহ।'

মিস ব্রাইটন বলে, 'বিল, এদেশের মেয়েদের দেখলে তোমার খুব লাভ হবে না। অসম্ভব লাজুক তারা।'

'হতে পারে। কিন্তু শাড়ি-পরা মেয়েদের যা সুন্দর দেখায়, আমাদের অনেক বিউটি কুইন সেখানে দাঁড়াতে পারবে না।'

মিস ব্রাইটন ভয়ংকর আঘাত পেলেন। বিলের মুখে ভারতীয় মেয়েদের সৌন্দর্য-স্তুতি কেমন সন্দেহজনক মনে হয়। বিলের মুখে অমন কথা তিনি কোনদিন শোনেন নি।

'আসলে যুবরাজকে তুমি হিংসা কর', মিস ব্রাইটন বিলকে আঘাত করতে চায়।

ওয়েণ্টওয়ার্থ কিন্তু রাগ করল না, শুধু গম্ভীরভাবে বলল, 'যাহোক, যুবরাজ যদি তোমার উপর বেশী আগ্রহ দেখায়

াাকে ক্ষতে ভুলো না, ডার্লিং, তার ্ধ আমার জানা আছে।'

'আগ্রহ দেখানোর অর্থ ঠিক বুঝতে রছি না,' সোফায় হেলান দিয়ে ভমানের সুরে মিস ব্রাইটন বলল।

ওয়েণ্টওয়ার্থ চেয়ে দেখল, লণ্ঠনের ঃমিত আলোয় মেয়েটিকে বড় সুন্দর ব হলো। ওয়েণ্টওয়ার্থ তার সোনালি নর মধ্যে আঙুল চালিয়ে দেবার লোভ রণ করতে পারল না। যার চুল, সে ান প্রতিবাদ করল না। তাকে আরও ন এনে আদর করে ওয়েণ্টওয়ার্থ বলে, ানি, বড় দুষ্টু তুমি, দুষ্টুমিতে াাকে আরও সুন্দর দেখায়।'

যুবরাজের কথা মিস ব্রাইটন হয়ত ল যেতেন। কিন্তু ওয়েণ্টওয়ার্থের চরণ যুবরাজকে ভুলতে দিল না। বরং রও আকৃষ্ট করল। মিস ব্রাইটন প্রায়ই রাজের কথা ভাবেন, কি সুন্দর াঠিত দেহ, কি সুন্দর চোখ।

সেদিন ক্লাবে মিস ব্রাইটন এক বিশ্রী ন করে ফেলে। স্ফিয়ার ম্যাগাজিনের া উল্টোতেই একটা ছবি চোখে পড়ল। র, এ যে যুবরাজের ছবি। একটা নিহত নর উপর পা দিয়ে যুবরাজ দাঁড়িয়ে। াটা নেবার অদম্য ইচ্ছে তাঁর বুকের া চেপে বসল। ক্লাবঘরে তখন কেউ া। সবাই বাইরে লন্ টেনিসে ব্যস্ত। ্ যুবরাজ ছবিতে হাসছেন। চারিদিক র মাথার কাঁটা দিয়ে ছবিটা আস্তে স্ত কেটে নেয়। ছবির দিকে আর বার চেয়ে, তাড়াতাড়ি ব্যাগের মধ্যে র মিস ব্রাইটন স্বস্তির নিঃশ্বাস লেন।

বাড়ি ফিরে তাঁর মন অনুশোচনায় া ওঠে। নিজেকে ধিক্কার দেন। ছবি া জঘন্য স্বভাব। তাছাড়া ছবিটা বেই বা কোথায়। চাকর-বাকরদের াব, সব কিছু নেড়ে চেড়ে দেখা। অন্য ট জানতে পারলে! জানলার সামনে ড়িয়ে মিস ব্রাইটন ভাল করে ছবিটা াতে থাকেন। যুবরাজ হাসছেন। কি দর পেশীবহুল দেহ। প্রকৃত বীরের ারা। নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছবিটা ড়ে ফেলতে হয়।

সবার আশা ওয়েণ্টওয়ার্থ মিঃ ব্রাইটনের কাছে বিয়ের কথা তুলবে। বিয়ের বাজারে তার দাম আছে সত্য। কিন্তু মিস ব্রাইটনের মত সুন্দরী সহজে মেলে না, হেমন্তের পাকা ফসলের মত সোনালি চুল, টানা-টানা চোখ, নরম গড়ন, সারা দেহে গোলাপী রঙের আভা। ওয়েণ্ট ওয়ার্থের মত যুবকের প্রাণে সাড়া জাগাবার পক্ষে যথেষ্ট।

সেদিনের ঘটনার পর ওয়েণ্টওয়ার্থ আবার এসেছে। দুজনে হেসেছে, গল্প করেছে। হাতে হাত রেখে ওয়েস্টভিউ পাহাড় হতে সূর্যাস্ত দেখেছে।

স্যর এণ্টনি ব্রেকনের জন্মোৎসবে বিরাট চড়ুই-ভাতির আয়োজন হচ্ছে। ওদের দুজনকেই স্যর এণ্টনি নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

ওয়েণ্টওয়ার্থ মিঃ ব্রাইটনকে বলে, 'স্যর এণ্টনির পার্টিতে মিস ব্রাইটনকে যেতে দেবেন না। হতভাগা যুবরাজটা ওখানে থাকবে।'

মিঃ ব্রাইটন নির্বিবাদী মানুষ। ভিতরের খবর কিছু জানতেন না, তাই হেসে বললেন, 'যুবরাজ অদ্ভুত শিকারী, আর ফ্যানিকে দেখবার জন্য তুমি তো রয়েছ।'

ওয়েণ্টওয়ার্থ রাগত স্বরে বলে, 'স্যর এণ্টনি যে কেন ইণ্ডিয়ানদের পার্টিতে ইনভাইট করেন।'

মিঃ ব্রাইটন হাসলেন, 'যুবরাজ স্যর এণ্টনির কলেজ-জীবনের বন্ধু। দুজনে একই সময়ে কেম্ব্রিজে যান।'

চড়ুই-ভাতিতে সারাদিন খুব হৈ-চৈ হলো। স্যর এণ্টনি লোককে আপ্যায়িত করতে জানেন, শুধু স্যাণ্ডউইচই চারকমের। স্যর এণ্টনি রসিক লোক। সমস্ত দলটিকে সারাদিন হাসির উপাদান যোগাড় করে দিলেন। নানান রঙের বেলুন আকাশে ভাসছে। চার-পাঁচটি পিকনিকের ছাতা, হঠাৎ দেখলে মনে হবে মেলা বসেছে। ক্রমশ বেলা পড়ে আসে। সারা-দিনের আনন্দ শেষ হবার সময় এগিয়ে আসে। ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সবাই বেড়াতে শুরু করল, কেউ চলল দূরের পাহাড়ী ঝরণার দিকে, কেউ-বা স্থির হয়ে দূর পাহাড়ে সূর্যাস্তের সমারোহ দর্শনে মগ্ন।

মিস ব্রাইটন ও যুবরাজ কিভাবে দল ছাড়া হয়ে পড়লেন। হাঁটতে হাঁটতে তাঁরা এক কালী মন্দিরের সামনে হাজির।

'আপনাদের এই দেবীটিকে আমার মোটেই ভাল লাগে না,' মিস ব্রাইটন যুবরাজকে বলে।

'চলুন, দেবীকে দেখেই আসি', যুবরাজ হেসে বলেন।

অস্তগামী সূর্যের রক্তরাঙা আভায় লোলজিহ্বা দেবীকে ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। চারিদিকে শ্মশানের অখণ্ড নীরবতা।

মিস ব্রাইটন বলে, 'মাগো, এমন ভয়ঙ্কর দেবীকে আমার মোটেই পছন্দ হয় না।'

যুবরাজ যেন শুনতে পেলেন না। তিনি কয়েক পা এগিয়ে, স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। দৃষ্টি নিবদ্ধ দেবীর দিকে, শুধু একবার পিছনে তাকিয়ে যুবরাজ আবার দেবীর দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।

মিস ব্রাইটনের মনে হলো যুবরাজ তাঁর কথায় কোন গুরুত্ব আরোপ করলেন না। ভদ্রতার খাতিরেও যুবরাজের উত্তর দেওয়া উচিত ছিল। তাঁর মনে হয়,

ুবরাজ যেন পথে অন্য কাউকে দেখে াঁকে অবজ্ঞা করছেন।

'মাটি বা পাথরের মূর্তিতে আমি য় পাই না', মিস ব্রাইটন জোরে বলেন। কন্তু যত জোরে কথাটা উচ্চারিত হল, নে তত জোর পাওয়া গেল না। ভারত-র্ষেই তাঁর জন্ম। দূর হতে অনেক কালী ন্দির তিনি দেখেছেন; কিন্তু কখনও ান্দিরের ভিতরে ঢোকবার সুযোগ হয়নি। মস ব্রাইটন ভালভাবেই দেবী-ূর্তির দিকে তাকাল। নানা অলংকার-ূষিতা, ঘোর কৃষ্ণবর্ণা নারীমূর্তি। ম্পূর্ণ উলঙ্গিনী বেশে এক পুরুষের উন্মুক্ত বক্ষের উপর দণ্ডায়মান। কণ্ঠে নরমুণ্ডের মালা। কটিদেশে বিচ্ছিন্ন নর-হস্তের সারি, উপরের বাম হাতে উন্মুক্ত তরবারী, অপর হাতে সদ্যছিন্ন নরমুণ্ড। নব থেকে বীভৎস নারীমূর্তির লোল-জিহ্বা। অজানা ভয়ে তরুণী মিস ব্রাইটনের বুক শিউরে ওঠে। মনে হয়, এখানে না এলেই ভাল হত। দেবী যেন তাঁকে গ্রাস করতে চাইছে।

'যুবরাজ কি স্বার্থপর। আমাকে বাঁচাবার চেষ্টা করছে না'! মিস ব্রাইটনের মনে হয়।

হঠাৎ যুবরাজ বলেন, 'দেবী হলেন জগৎশক্তি। জীবন, মৃত্যু, সৃষ্টি, ধ্বংস, সকল কিছুর প্রতিভূ এই দেবী। এক হাতে ধ্বংস করেন, অপর হাতে বর দেন। আরও বয়স না বাড়লে সব উপলব্ধি করা যায় না।

মিস ব্রাইটন রাগত স্বরে বলে, 'সব মিথ্যে। এই কুৎসিত দেবীকে আপনি জীবনের প্রতিমূর্তি বলেন? জীবন কি এত কুৎসিত? মানসিক অসুস্থতা না থাকলে জীবনকে কেউ এমন ভাবতে পারে না।'

যুবরাজ আবার দেবীর দিকে চেয়ে-ছিলেন। হঠাৎ ফিরে চাইলেন। এক-দৃষ্টিতে মিস ব্রাইটনের মুখের দিকে চেয়ে যেন ভাবছেন কি উত্তর দেবেন, তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'জীবনে আঘাত না পেলে এই তত্ত্ব বোঝা যায় না, মিস ব্রাইটন।'

'জীবনে কেউ আঘাত পেয়েছে কি না, সেটা অত সহজে বলা উচিত নয় যুবরাজ।'

'তা সত্যি, আমি দুঃখিত।' যুবরাজ ধীরে ধীরে উত্তর দিলেন। যুবরাজের স্বর কেমন রহস্যময় মনে হলো। তিনি যেন কাছে নেই। লক্ষযোজন দূর হতে শুধু শব্দ ভেসে আসছে।

মিস ব্রাইটন যুবরাজের মুখের দিকে তাকাল। বাইরের প্রকৃতির মত যুবরাজের সারা মুখে দুঃখের অন্ধকার নেমে এসেছে। যুবরাজ যেন বৃদ্ধ, পঙ্গু।

এক বিচিত্র অনুভূতিতে মিস ব্রাইটনের মন ভরে ওঠে। একটি শান্ত অবসন্ন পুরুষের উষ্ণ মাথা নিজের বুকে চেপে ধরার এমন এক অদম্য ইচ্ছে তাঁর কোন-দিন হয়নি। একটি অশান্ত শিশুকে বুকে জড়িয়ে ঘুম পাড়াতে মায়ের যেমন ইচ্ছা হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এক অব্যক্ত বেদনায় মিস ব্রাইটনের মন ভরে ওঠে।

হঠাৎ চিন্তায় বাধা পড়ে। 'তোমরা দুটি মাণিকজোড় এখানে।' ঝড়ের মত ওয়েণ্টওয়ার্থ ভিতরে ঢুকে আসে।

মিস ব্রাইটন শিউরে ওঠে। যুবরাজ নির্বাক নিশ্চল।

'দূর হও এখান থেকে' মত্ত হাতীর মত ওয়েণ্টওয়ার্থ টলতে থাকে।

ধীর পদক্ষেপে যুবরাজ বেরিয়ে আসেন।

'কাল কুত্তা, নোংরা শুয়োর' ওয়েণ্ট-ওয়ার্থ চিৎকার করতে থাকে।

যুবরাজ স্থির হয়ে বললেন, 'কোন কিছু অশোভন উদ্দেশ্য থাকলে এমন প্রকাশ্য স্থানে আমি আসতাম না, ক্যাপ্টেন ওয়েণ্টওয়ার্থ।'

'চোপরাও কুত্তা', ওয়েণ্টওয়ার্থ যুবরাজের গালে ঠাস করে এক চড় বসিয়ে দেয়।

'মিস ব্রাইটন, হতভাগাটা আপনার কোন—মানে, কোন কিছু ইয়ে করার চেষ্টা করেনি তো', ওয়েণ্টওয়ার্থ জিজ্ঞাসা করে।

স্যার এণ্টনি এগিয়ে এসে বললেন, 'ওয়েণ্ট, যুবরাজকে আমি জানি, তিনি সেরকম মানুষ নন।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ আমার জানা আছে। বেটাদের হারেমে ডজন ডজন মেয়ে, তবু আশা মেটে না। ওদের স্ত্রীদের জন্য আমার দুঃখ হয়।'

'আমার স্ত্রী সম্বন্ধে কিছু না বললে অনুগৃহীত হব। তিনি মৃতা', সবাই চমকে ওঠে। যুবরাজ মৃতদার। কেউ জানে না।

পরের ইতিহাস সংক্ষিপ্ত। বিয়ের বাজারে মিস ব্রাইটনের কুৎসা ছড়িয়ে পড়ল। যে মেয়ে নেটিভদের সঙ্গে কেলেঙ্কারী করে, কোন ইংরেজ সন্তান তাকে বিবাহ করতে প্রস্তুত নয়। রূপ-যৌবনসহ মিস ব্রাইটন বছরের পর বছর নিষ্ফল প্রতীক্ষায় কাটালেন। আকাঙ্ক্ষিত জন কি আসবে না? তিনি ভাবতেন, সঙ্গে সঙ্গে কালী মন্দিরের লোলজিহ্বা ভয়ঙ্করা দেবীমূর্তি তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠত। মন্দিরের ভিতরের অন্ধকার যেন তাঁকে সম্পূর্ণ গ্রাস করতে চাইত।

চল্লিশ বছরের মিস ব্রাইটন বহুকাল প্রতীক্ষায় রইলেন। দিগন্তের অস্তমিত সূর্য তাঁকে পাগল করে তুলেছে। ওই বুঝি সেই নরকঙ্কালভূষিতা দেবী তাঁকে গ্রাস করতে আসছে। তাঁর তরবারী কোষ উন্মুক্ত, পদতলে উন্মুক্ত বক্ষ পুরুষটি কে, উনিই কি মিস ব্রাইটনের প্রতীক্ষিত পুরুষ, কালী তাঁকে গ্রাস করেছেন।

বহু বর্ষ অতিক্রান্ত হল। যুবতী মিস ব্রাইটনের শরীরের লালিত্য ক্রমশ ঝরে পড়ে। ধীরে ধীরে যৌবন-বসন্ত বিদায় নেয়। মিঃ ব্রাইটন ইতিমধ্যে পরলোকের পথে পাড়ি দিয়েছেন। কাঠুরি-কোট ছেড়ে দশ মাইল দূরে রাণীক্ষেতে একটা ছোট বাড়ি কিনলেন। যদি সেই মন্দিরকে জানা যায়।

রূপ, গুণ, স্বাস্থ্য ও বিত্তের অধিকারী হয়েও জীবনে পরিপূর্ণরূপে বেঁচে থাকার আনন্দে বঞ্চিত হলেন মিস ব্রাইটন। স্বামী-পুত্র নিয়ে যিনি সুখ ও শান্তিতে জীবন কাটাতে পারতেন, সমাজের নির্মম বিধানে নীরবে নিঃসঙ্গে অপরিতৃপ্ত থেকে তাঁকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হল।

অথচ মিস ব্রাইটন জেনে গেলেন, কাঠুরিকোটের লোলজিহ্বা দেবী নিষ্ঠুর পরিহাসে বাদুড়ের মত দুই বিশাল পক্ষ দিয়ে একটি মেয়ের জীবনের সমস্ত আলোক ঢেকে দিলেন চিরকাল।
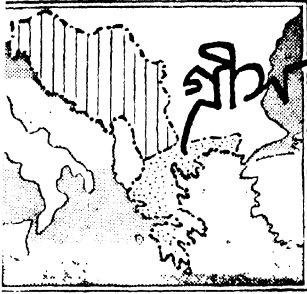
গ্রীস থেকে জুগোশ্লাভিয়া

ডঃ রামচন্দ্র অধিকারী

জুগোশ্লাভিয়া রাজ্য নির্দিষ্ট হলে সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড স্ত দেশেরও রাজধানীতে পরিণত ন; এখনও রাজ্য সংক্রান্ত বড় দপ্তরনাগুলি এই শহরেই আছে। গত দ্ধের পূর্বে সম্রাট এইখানেই বাস রতেন, তাঁর অধীনে সার্বিয়া ছাড়া রও পাঁচটা প্রদেশ ছিল। শেষ সম্রাট ন্সের মার্সেলস বন্দরে আততায়ীর তে নিহত হলে তাঁর নাবালক পুত্র ংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর কজন আত্মীয় প্রতিনিধিভাবে রাজ্য াসন করতেন- তাঁর নাম প্রিন্স পল। র্মানীর শক্তিবৃদ্ধি এ রাজ্যের রাজাজা দিন দিনই মর্মে মর্মে বুঝেছিল। ন্তু কর্তব্য নির্ধারণে কৃতনিশ্চয় হতে ারেনি। বুলগেরিয়া সার্বিয়ার সীমানায় নেক আগে সৈন্য পাঠিয়ে জার্মানীর ক্ষে গিয়েছিল। অস্ট্রিয়ার গণতন্ত্র হটলারের হুমকিতে সর্বতোভাবেই র্মান হয়ে গেল; পশ্চিমে সমুদ্রের পারে ইতালী গোড়া থেকেই জার্মানীর অনুবর্তী। প্রিন্স পল নিরুপায় জেনে প্রজাদের না জানিয়েই হিটলারের বশ্যতা স্বীকার করে চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। এ সংবাদ প্রচার হওয়ামাত্রই বেলগ্রেডের প্রজারা এসে সে চুক্তিপত্র প্রিন্স পলের কাছে দাবী করে। শিক্ষিত, অশিক্ষিত সব লোকেই এটা জেনেছিল, হিটলারের বশ্যতা স্বীকার করার অর্থ চিরতরে দাসত্ব বরণ করে নেওয়া। কেননা হিটলারের বইতে এমন কথা লেখা ছিল, সুসভ্য জার্মান ছাড়া আর কোনও জাতি স্বাধীন থাকতে পারবে না। দেশের লোকে দাসত্বের বিনিময়ে মৃত্যুই শ্রেয় বিবেচনা করল। হিটলারের সঙ্গে গোপন চুক্তির কাগজ পোড়াবে, প্রকাশ্যে এই দাবী জানিয়ে রাজপ্রাসাদের কাছে সবাই জড়ো হল। বলা বাহুল্য, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বেতারে হিটলার ঘোষণা করলেন, যুগোশ্লাভিয়া আক্রান্ত হবে অবিলম্বে। অবিলম্বে অর্থ ২ ঘণ্টার মধ্যেই এতটা হয়ত লোকে ভেবে উঠতে পারেনি। ১৮টি বোমারু বিমান থেকে বোমা ফেলতেই যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। জার্মানীর যান্ত্রিক বাহিনীর সম্মুখে যুগোশ্লাভ সৈন্যের ভস্মীভূত হতে সময় বেশী লাগেনি নিশ্চয়ই। এঁরা বলেন, বোমার কারণে এক ঘণ্টার মধ্যেই বেলগ্রেডে পঁচিশ হাজার লোক হত হয়। তত্রাচ সারা দেশে লোকে কেমন করে অতর্কিতে পিছন থেকে বা পাহাড়ের উপর থেকে পাথর ফেলে জার্মান সৈন্যের বন্দুক, কামান কেড়ে নেবে, তবু নত হবে না যত অত্যাচারই হোক। এইভাবে অটুট রেখেছিল যুদ্ধশেষ পর্যন্ত। তবু রোমান ক্যাথলিক পাদরীদের প্ররোচনায় ক্রোট প্রজা সার্ব-প্রজাকে ছোরা মেরেছে। নিরীশ্বর রুশজাতি ঈশ্বরপরায়ণ ক্যাথলিকের শত্রু, এমন প্রচার করায় পাদরীদের কথায় অনেকে নরহত্যা করেছে।

খতিয়ানে জানা গিয়েছে, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় লোক হত হয়েছে আরও বেশী। পাদরীরা গরীব নন; গীর্জার জমিদারীও আছে, সোনা-রুপোও শতাব্দী ধরে চার্চের কোষে জমান থাকে। তাঁরাই উত্তেজিত করে পরলোকে অনন্ত স্বর্গবাসের আশ্বাস দিয়ে স্বজাতিকে অকাতরে হত্যা করতে, জন্মভূমিকে বিদেশীর হাতে তুলে দিতে প্ররোচিত করেছেন। যুদ্ধের পরে অবশ্য এই মোহান্তদের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হয়েছে, বিচারও হয়েছে। কিন্তু কোনও পাদরীর মৃত্যুদণ্ড হয়নি। টিটো তাদের কাউকেও প্রাণে মারেন নি। সবচেয়ে বড় আর্চ-বিশপ কিছুকাল আগেও জাগ্রেব শহরের নিকটে জরাগ্রস্ত অবস্থায় বেঁচে ছিলেন, এখনও জীবিত আছেন কি না সংবাদ পাইনি। রবিবার, কিন্তু গীর্জার ঘণ্টা শোনা যায় না; কাজেই মনে হয়, রাষ্ট্রতন্ত্র কৃশ্চান ধর্মকে অস্বীকার করে, কিন্তু তা ঠিক নয়। নিজ নিজ মত সকলেই পোষণ করতে পারে, রাজ্যে ধর্ম মানতে বাধাও নেই, উৎসাহও নেই। তবুও রোমান ক্যাথলিক পরিবারের লোকেরা ধর্মযাজকদের উপরে আস্থা হারিয়েছে। ইউরোপে একটা কথা প্রচলিত আছে যে, ক্যাথলিক পাদরীরা রাজনীতি, সমাজনীতি সব বিষয়েই

পরামর্শ দেন, শুধু শাস্ত্রের উপদেশ বা উপাসনা নিয়েই ব্যস্ত থাকেন না। গ্রীক পাদরীরা কিন্তু সাধারণ প্রজার সঙ্গে মেলামেশা করেন। তাঁদের নিজেদের জন্য ব্যয় অতি সামান্য; এমন কি শত্রু আক্রমণ করলে বহু পাদ্রী বন্দুক হাতে যুদ্ধ করেছেন, রণক্ষেত্রে প্রাণ দিয়েছেন। বেলগ্রেডের জাতীয় যাদুঘরে অনেক মনোরম চিত্রপট সংরক্ষিত আছে। কোনও চিত্রে দেখা যাবে তুরস্কের আক্রমণের পরে গ্রামবাসীরা গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে, সঙ্গে গ্রীক-পাদরীর হাত ভাঙ্গা; অন্য হাতে ঘোড়ার লাগাম ধরে ম্লান মুখে ফিরছেন। বিদ্রোহের রাস্তার অপর পারে বিস্তৃত উদ্যান, মাঝে মাঝে বেঞ্চি পাতাও আছে। এ উদ্যান মিউনিসিপ্যালিটি করেনি। বোমায় ভাঙ্গা বাড়ির জায়গায় নূতন বাড়ি ওঠেনি, কাজেই পার্ক বসাবার অসুবিধা নেই। এইটাই বেলগ্রেডের চৌরঙ্গীর মত বড় রাস্তা। এক একটা ফ্ল্যাটে তিনখানা ঘর। রান্নাঘর ও বাথরুম আছে। ভাড়া আমাদের দেশের টাকায় অন্তত ৪৪৲ টাকা মাসে। কাজ আরম্ভ হয় সকাল ছয়টায়, যত কড়া শীতই হোক না কেন। কিন্তু আফিস, কারখানা সব বেলা দুটোয় বন্ধ। সন্ধ্যাকালে শুধু সিনেমা, রেস্তোরাঁ, ট্রামের চালক, ট্যাক্সি-ওয়ালার কাজ থাকে। এদের ধারণা, বেশী পরিশ্রম করলে শরীর-মন অবসন্ন হয়। ইংলণ্ডে কিন্তু সকাল ন'টা থেকে বেলা বারোটা, আবার দুপুরে দুটো থেকে বিকেল পাঁচটা—রোজ ছ'ঘণ্টা কাজ করতে হয়। ছাত্রটির বাড়ির পাশের ফ্ল্যাটে যে মেয়ে থাকে, সে এবার ইংলণ্ডে কাজ করতে যাবে গ্রীষ্মকালে। ইউরোপের সব দেশের ছেলেমেয়েরা ইংলণ্ডে শস্যক্ষেত্রে আলু তুলতে বা স্ট্রবেরী তুলে দিতে আসে। ইংরেজি ভাষা শেখা হয়ে যায়, আবার উপার্জন ক'রে কিছু টাকাও দেশে নিয়ে যায়। একটু বয়স হলে ছেলেমেয়ের জন্য পড়ার খরচ, বেড়াবার খরচ ছেলে-মেয়েরা নিজেই জোগাড় করে নেয়, ইউরোপে এইটিই রেওয়াজ। এই দেশ ভ্রমণের ফলে তারা বিভিন্ন ভাষা সহজে শেখে, অন্য দেশের সঙ্গে নিজেদের অবস্থা মিলিয়ে দেখতে পারে। মোট কথা, ১৪।১৫ বছর বয়েসে বাপ-মায়ের দায়িত্ব এদেশে ছেলেদের উপরে থাকে না, এটা সুনিশ্চিত। কেননা বাধ্যতামূলক পড়া শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্যে মাত্র শতকরা ষাটজন ছাত্র-ছাত্রী গভর্নমেণ্টের বৃত্তি পায়। বাকী চল্লিশজনও বাপ-মায়ের টাকায় পড়ে না। কাজ করে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে। কিন্তু বৃদ্ধা মা'কে ছেড়ে থাকে, এমন একটা পরিবারও চোখে পড়েনি। এমন কথাও ওদের মুখে শুনে হ যে, বুড়ো বাপ-মাকে কোথায় ফেলে দেব। এ যেন প্রাচ্যভাব, কেননা ইংলণ্ডে বিবাহের পর শাশুড়ী-শ্বশুর বউএর সঙ্গে ঘর করে না, যেমন আমাদের দেশে মেয়ের বিয়ে দিয়ে জামাইএর বাড়িতে বাপ-মা

গিয়ে বাস করেন না। গ্রামে বা শহরে যে ক'টা পরিবারের মধ্যে গিয়েছি এবং মিশেছি, সেখানেই দেখেছি কপাল পর্যন্ত ঢাকা কালো অবগুণ্ঠনে বুড়ো মা এখনও বেঁচে আছেন। গভর্নমেণ্ট থেকে পেন্সন দেয়, কিন্তু সে হয়ত মাথাপিছু ৪০৲।৪২৲ টাকা মাত্র। বুড়ো বয়সে কে রান্না করে, কেইবা দেখাশোনা করে। সুইজারল্যাণ্ডে খাবারের দোকানে দিনের পর দিন বুড়ীরাও খায়। স্ত্রী-পুরুষ সকলেই কাজের সময় ব্যস্ততায় দোকানে খেতে বাধ্য হয়, কিন্তু বৃদ্ধ-বৃদ্ধারাও বাইরে খায় কেন জানতে কুতূহলী হয়ে বুঝতে পেরেছি যে, এদের ঘর আছে; কিন্তু তা এত ছোটো যে, রান্না করা সম্ভব নয়। এই কারণে ওরা দোকানেই খায়। একান্নবর্তী পরিবার প্রাচ্যদেশের প্রথা কিন্তু যুগোশ্লাভিয়ায় এ প্রথা প্রচলন আছে। স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই উপার্জন করে, তবে ঘরের অভাবে একসঙ্গে থাকাই সুবিধা। রান্নার খরচ, আগুনে পোহাবার খরচটা কম হয়। কিন্তু একই পরিবারে এক ভাই ডাক্তার (এম-ডি), দ্বিতীয় ভ্রাতা আফিসের কেরানী, তৃতীয় ভাই একটা ব্যাঙ্কের দরোয়ান, কনিষ্ঠ গভর্নমেণ্টের খরচায় হস্টেলে থাকে, মাঝে মাঝে বাড়িতে আসে—এমনটা বোধ হয় আমাদের বাঙলাদেশে নেই। মনের অমিলও বোধ হয় নেই, নইলে অনেক বছর এক সঙ্গে ভাইরা বিভিন্ন রকমের কাজ ক'রেও বাস করে কি করে। বেতনের তফাৎ আছে নিশ্চয়ই, তবে খুব বেশী নয়। একটা বড় হাসপাতালের সুপারিন্‌-টেণ্ডেণ্টের বেতন হয়ত ২৬৭৲ টাকা; দ্বিতীয় ডাক্তারের ২৪৫৲ টাকা; দরোয়ানের বেতন ১৪৭৲ টাকা হলেও তার বেশী ছেলেমেয়ে থাকার কারণে উপার্জন হয়ত সকলের চেয়ে বেশী। এক একটা ছেলে বা মেয়ে জন্মালেই ৩,০০০ হাজার দিনার খরচ বেশী পাওয়া যায়। তবে একজনের ন'টা ছেলেমেয়ে—সে নূতন আইনে ২৭,০০০ হাজার দিনার পাবে না, পায় মাত্র ২২,৫০০ দিনার অতিরিক্ত। নারী-জাতির সম্মান সত্যই বেশী দেওয়া হয়, স্বতই মনে হবে। একইরকম কাজে স্ত্রী-পুরুষের বেতনের পার্থক্য নেই। (এটা মাত্র অল্পদিন সুইজারল্যাণ্ডে প্রবর্তিত হয়েছে, ইংলণ্ডে কিন্তু এখনও সমান হয়নি)। পূর্ণ গর্ভাবস্থায় আর সন্তান হবার পরে সর্বসমেত ৪ মাস পুরা-বেতনে ছুটি মেলে। সন্তান প্রসবের কাপড়চোপড়, স্বাস্থ্য-পরি-দর্শিকার খরচ স্টেটের। তবে ছেলে-মেয়েদের পড়ার মাইনে নেই বটে, কিন্তু বই শুধু বছরে একবার গভর্নমেণ্ট থেকে দেয়। এক ডাক্তার বললেন—তাঁর এক ছেলে এক বছরে দুবার বই ছিঁড়েছে, একবার হারিয়েছে। এ দণ্ড শিশুকে দিতে হয় না, দিতে হয় পিতামাতাকে।

একটা কথা যেন সকলের মুখেই শোনা গেল যে, দেশে ধনী কেউ নেই, তবে দরিদ্র সকলেই। ব্যাঙ্কে টাকা জমান বে-আইনী নয়, ব্যাঙ্কও আছে—তবে খেয়ে-প'রে থাকে কি যে, ব্যাঙ্কে জমান সম্ভব হবে। জামাকাপড়, জুতোর দাম অত্যধিক। সস্তা শুধু রুটি, মাখন, চিজ, মাংস, ফল আর দেশী ওয়াইন। চায়ের দাম ভয়াবহ, একথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। যে মোটরকার ইংলণ্ডে হাজার পাউণ্ডে বিক্রীত হয়—এখানে আমদানি করলে এদেশের টাকায় দেড় হাজার পাউণ্ড খরচ করে কিনতে হয়।

এ দারিদ্র্যের জন্য নালিশ করতে লোকে অভ্যস্ত নয়। বাড়ি ছোট, এক-ঘরে অনেক লোক থাকে। জামাকাপড় কম-দরের, কেননা বছরে নূতন করে বানানো সম্ভব নয়। তবু ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া আর চিকিৎসাতে খরচ লাগে না। এঁরা বলেন, আমরা পশ্চিম ইউরোপ ঘুরে এলে দিনকতক মনে করি বড়ই গরীব, আবার স'য়ে যায়। যে কাজে মস্তিষ্কের প্রয়োজন, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাশ করে কাজ পাওয়া যায়, সেগুলিতে বেতনও অপেক্ষাকৃত বেশী মেলে। উত্তরাঞ্চলের লোকেরা অস্ট্রিয়ার প্রভাবে থেকে এই সব কাজ বেশি পায়। দক্ষিণে কৃষিপ্রধান ম্যাসিডোনিয়ায় বা অনুন্নত বসনিয়া প্রদেশের প্রজা কৃষিকার্য করতে বেশি অভ্যস্ত। সম্রাটের শাসনকালে শুনতে পেলাম, জমিদারী প্রথা পূর্ণমাত্রায় প্রচলিত ছিল। এক-একজন জমিদার অনেক বিঘা জমির মালিক ছিলেন। খাজনা পেতেন কিন্তু থাকতেন হয়ত প্যারিস না হয় এথেন্সে। কর্মচারী খাজনা আদায় করত, প্রজার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হত না।

এই সব তথ্য জানতে মাঝে মাঝে বড় অসুবিধায় পড়তে হয় যাঁরা বিদেশে গিয়ে সে দেশের খবর যথাযথ জানতে চান, তাঁরাও নিশ্চয়ই আমার মত মাঝে মাঝে জব্দ হয়েছেন। এক স্থানে আইনজ্ঞ, ডাক্তার, সাংবাদিকের দলে কৃষির অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হতেই সকলেই কুতূহলী

হয়ে যেন একসঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলেন—আপনার দেশে 'অনুপস্থিত জমিদার (absentee landlord) আছেন নাকি আজও? যখনই অনাবৃষ্টি হয়, শস্যের ফলন কম হয়, তখন টাকা ধার দিতে লোক আসে নাকি গ্রামে? ম্যালেরিয়া দক্ষিণাংশে যুগোশ্লাভিয়ায় যথেষ্ট ছিল (ডি ডি টি ছড়ানর ফলে এখন নেই বললেই হয়) কিন্তু জ্বরে পড়ে চাষ হল না, জমিদার খাজনা ছাড়বে না, এমন সব প্রথা আমি শুনেছি নাকি জবাব দিতে হয়। এক কথায় ইংরেজের শাসনে আর তুর্কীর শাসনে কতটা মিল আছে, জানতে যেন সকলেরই আগ্রহ। স্কুলে নাকি আগে ছাত্রকে মাইনে দিয়ে পড়তে হত। উচ্চশিক্ষার জন্য ব্যয় গরীব দেশেও কেম্বিজ, অক্সফোর্ডের মতনই ছিল। কাজেই খরচ করে যেখানে লেখাপড়া শিখতে হয়, সেখানে শিক্ষার প্রসার কম হবেই। আজ কিন্তু চিকিৎসা বা বিদ্যা ক্রয় করতে হয় না মোটেই। যে গণতন্ত্রে শিক্ষার প্রসার কম ছিল, সেখানকার প্রজার অবস্থা আজও উন্নত নয়, সেকথা বারংবার এদেশের লোকে বলাবলি করে, যদিও কেন্দ্রস্থ সরকার থেকে অনুন্নত দেশের জন্য খরচের বরাদ্দ আছে। এসব আলোচনা করবার সময় সন্ধ্যাকালে যথেষ্ট মেলে। অনেকেরই কাজ নেই, শুধু খবরের কাগজ পড়া, আর বই পড়া। ভিয়েনার মত তিন পয়সার কালো কফি নিয়ে কফির দোকানে সাতখানা সংবাদপত্র, সাপ্তাহিক-পত্র, মাসিকপত্র পড়বার প্রথা এখানে নেই। কাগজের অভাবে, ইংলণ্ডের মত দৈনিক পত্রগুলি দিনে চারবার প্রকাশিতও হয় না। সংবাদপত্রের সংখ্যাও কম, তবে দেশের বা বিদেশের মোটামুটি খবর না জানলে লজ্জার বিষয় মনে করে সকলেই।

কাজ শেষ হলে মানুষে মানুষে তফাৎ আর প্রায় থাকে না। রেস্তোরাঁয় কাজ করতে করতে ছুটি হল, দুজন পরিচারিকা পোশাক বদলে ভদ্রলোকদের পাশে বসে আলাপ-আলোচনা করতে আরম্ভ করে দিল। এমন দৃশ্য এখানে অনেক জায়গাতেই দেখা যাবে, কিন্তু ইংলণ্ডের মত দেশে দেখা তো যায়ই না, কেউ শোনেনি বোধ হয়। এ দেশটা এখনও কম্যুনিস্ট হতে পারেনি, সোস্যালিস্ট ধাপে উঠেছে। 'শ্রেণীহীন সমাজ' এখানকার আদর্শ বা লক্ষ্য। দেশ যখন একেবারে সম্রাটের অধীনে ছিল, তখন ধনী ধনীই ছিল, আর গরীব (আকাশ থেকে টাকা না পড়লে) গরীব অবস্থাতেই লীলা সংবরণ করত। জমিদার উত্তরাধিকারসূত্রে বহু সহস্র বিঘার মালিক ছিলেন, কৃষক পুরুষানুক্রমে জমিদারের জমিতে মান্ধাতার আমলের যন্ত্র নিয়ে আঁচড় কাটত; অজন্মা হলে ঋণ করে খাজনা দিত। যেদিন প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হল, সেই দিনই সকলের ব্যাঙ্কের টাকাও বাজেয়াপ্ত হল, জমিও ভূমিহীন কৃষককে বিতরণ করা হল। সবকিছু স্টেটের বা গবর্ণমেণ্টের সম্পত্তি, লোকে গভর্নমেণ্টের কাছেই বেতন পায়, ট্যাক্স লাগে না, কাজে উৎসাহও থাকে না। কেননা, ব্যবসা-বাণিজ্য, কৃষি সবকিছুই গভর্নমেণ্টের, প্রজা যেন গভর্নমেণ্টের বাঁধা চাকর।

'স্টেটের দাস' কথাটা কিন্তু ইংলণ্ডেও শোনা গিয়েছিল, যখন শ্রমিক গভর্নমেণ্ট কয়লার খনি, ইস্পাতের কারখানা, রেল, বিজলী ইত্যাদি জাতীয় সম্পত্তি করেছিল। এমন অবস্থায় শস্যের ধান জড় করে রাজধানীতে পাঠাতে হয়, রাজধানী থেকে প্রদেশে প্রদেশে প্রয়োজন অনুসারে বণ্টন করা হয়। এই 'লেভী' প্রথা আমাদের দেশে রেশনের সময় চালু ছিল; এর সম্বন্ধে বাংলার অধিবাসী ভাল রকমই জানে। যুদ্ধশেষে প্রায় সমস্ত বালকান (গ্রীস ছাড়া) রুশের তত্ত্বাবধানে আছে, কাজেই রুশের কর্তৃপক্ষ কার কত শস্য পাওয়া প্রয়োজন বিচার করেন। যুগোশ্লাভিয়ায় মার্শাল টিটো প্রজার দুরবস্থা, নিরুৎসাহতা দেখে এ প্রথায় মত দেননি। রুশের কর্তৃপক্ষ কিন্তু সকল সোভিয়েত স্টেটের অছি, তাঁদের পক্ষে এই প্রথাই সুষ্ঠু, নচেৎ দরিদ্র দেশগুলি রক্ষা পায় না। রুশের শাসনতন্ত্র আন্তর্জাতিকতা পোষণ করে, যুগোশ্লাভিয়া সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হলেও নিজের দেশকে স্বতন্ত্র ভাবতে, জাতীয়তাবোধের প্রসার করতে উদ্যত। উভয় রাষ্ট্রের মতের পার্থক্য এইখানেই হয়। কল-কারখানা অন্য দেশে স্থাপনা করা হয়ত মস্কোর ইচ্ছা নয়, যতদিন না রুশের যন্ত্রগুলি বিতরিত বা বিক্রীত হয়, কিন্তু টিটো চাইলেন, নিজের দেশেই কল-কারখানা প্রস্তুত করতে, হ্রদের জলে বাঁধ দিয়ে বিজলী উৎপাদন করতে, এমন স্বতন্ত্রতা সম্ভবত সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে অচল। ফলে ১৯৪৮ সাল থেকেই বা কিছু পরে রুশিয়ার সঙ্গে আর সঙ্গে সঙ্গে রুমানিয়া, অ্যালবেনিয়া ইত্যাদি দেশের সঙ্গেও যুগোশ্লাভিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন হল। তখন বড়ই সংকটের অবস্থা। ধনতান্ত্রিক দেশগুলির সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য করে টিটো আবার নিজ দেশের উন্নতি যতটা করেছেন, তাতে আমাদের পক্ষে চমক লাগার মতন অবস্থা।

ইংলণ্ডেও অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তি মনে করেন, যুগোশ্লাভিয়ায় স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করবার সুবিধা নেই, কম্যুনিস্ট রাষ্ট্র লোকের মুখে লাগাম দিয়ে রাখে। কথাটা সত্য নয়, পার্লামেণ্টে বা রাস্তাঘাটে লোকে যেমনই কথা বলুক না কেন, কিছু যায় আসে না। পার্টি বা রাজনীতি দলভেদ নেই বলেই যে লোকে স্বাধীনতা হারিয়েছে, তা ত বলা যায় না। পার্টি নেই, কেননা, দেশের আপামর-সাধারণ সম্রাট না থাকার পক্ষে, সকলেই জমিদারী প্রথার বিরোধী, ব্যক্তিবিশেষের হাতে ক্ষমতা বা ব্যবসায় থাকবে, আদৌ পছন্দ করে না।

একটা বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয়, কোনও স্থানে কোনও পুরুষ বা স্ত্রী অসন্তুষ্ট নয়; গভর্নমেণ্টের নিন্দা করে না, অদৃষ্টকে ধিক্কার দেয় না বা বিধাতাকে অভিশাপ দেওয়ার অভ্যাস নেই।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

চিত্রসেন

বম্বের জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে চিত্রপ্রদর্শনী চলছে একটার পর একটা, কোনই বিরাম নেই। প্রত্যেকটি প্রদর্শনীর বিষয় লেখা দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছে। প্রথমত আমি শিল্প সমালোচক নই। সেই জন্যই চিত্রকলা সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু লেখা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। যা অল্পবিস্তর লিখেছি, তা একান্ত নিজের বিচারে; সাধারণ একজন দর্শক হিসাবে যা মনে হয়েছে। বহু ব্যক্তিকেই বলতে শুনি, "আমি চিত্রকলা বুঝি না"। এই মনোভাবটাই আমার কাছে অত্যন্ত ভুল বলে মনে হয়। বোঝবার কি আছে? নিজের কাছে যা ভাল লাগে সেটাই ভাল; না লাগলে খারাপ। আর দেখতে দেখতে আপনা থেকেই বোধশক্তি বেড়ে যায়। ভাল কি খারাপ, তার জন্য আবার শিল্প সমালোচকদের দ্বারস্থ হতে হবে কেন? তাছাড়া তাঁদের মতও ত চিরন্তন নয়। বহু উদাহরণ দেওয়া যায় যে, এক যুগের শিল্প সমালোচকদের মতে যা খারাপ বলে প্রমাণিত হয়েছে, পরে তাই পরিগণিত হয়েছে শ্রেষ্ঠ বলে। তাছাড়া, আমাদের শিল্পের সমালোচনা সব সময় হয়েছে বিদেশী অ্যাসথেটিক্সের উপর ভিত্তি করে। কিন্তু বিভিন্ন দেশের অ্যাসথেটিক্স বিভিন্ন। বিদেশী সমালোচকরা আমাদের চিত্রকলা তাঁদের যে দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে দেখেন বা বিচার করেন, তাই যে আমাদের মেনে নিতে হবে তারও কোন কথা নেই। আমাদের অ্যাসথেটিক্স অনুযায়ী যদি কোন ভারতীয় শিল্প সমালোচক পাশ্চাত্যের চিত্রকলার বিচার করতে যান, যা এখন পর্যন্ত কেউ করেনি, তাহলে দেখা যাবে যে সেখানকার চিত্রকলার বহু শ্রেষ্ঠ স্বীকৃত নিদর্শনও সম্পূর্ণ বাতিল হয়ে গেছে। এত কথা বলতে হল পাঠকদের শুধু জানাবার জন্য যে, প্রদর্শনীর খবরের মধ্যে যদি কোন মতামত ব্যক্ত করি, তবে তা নিতান্ত ব্যক্তিগত এবং অন্যদের তা না মানলেও চলবে।

এর মধ্যে যে পাঁচটি চিত্রপ্রদর্শনী হয়ে গেল, তার বিবরণ দিলাম।

১। দি একস্‌প্রেশনিস্ট থিয়েটার ইউনিটের উদ্যোগে 'This is Modern Art' পর্যায়ের ষষ্ঠ প্রদর্শনী। আধুনিক ইয়োরোপীয় চিত্রকলার সহিত শহরবাসীদের পরিচিত করানোর উদ্দেশ্যে ইয়োরোপের বিভিন্ন শিল্প আন্দোলনের ও শিল্পীদের রচনার "প্রিন্ট্" বা "ফোটোর" ১১টি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন এই সঙ্ঘ। এঁদের প্রত্যেকটি প্রদর্শনী অত্যন্ত সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত এবং তথ্যপূর্ণ ক্যাটালগও সুপ্রকাশিত। উল্লিখিত একস্‌প্রেশনিস্ট প্রদর্শনীতে ১৩৯টি প্রিন্ট্ ও ফোটো ছিল ইয়োরোপের সুবিখ্যাত শিল্পীদের চিত্রকলা ও ভাস্কর্যের। ভ্যান গগ, গগাঁ, মুন্‌চ, মদিগলিয়ানি, রুয়োল্ট, ক্লি, পিকাসো, এপস্‌টাইন, মারুটিনি ও অন্যান্য প্রায় ৩১ জন শিল্পী ও ভাস্করদের রচনার নমুনা ছিল। মহিলা শিল্পী কেথ্ কলউইৎজ-এর ছবির বলিষ্ঠতা প্রবলভাবে মনকে আকৃষ্ট করে।

২। প্রোফেসর ল্যাং হ্যামারের চিত্র প্রদর্শনী—প্রোঃ লাং হ্যামার স্থানীয় সংবাদপত্রের শিল্প নির্দেশক, জাতিতে অস্ট্রিয়ান এবং বহু বৎসর এই শহরের শিল্পজগতের একজন প্রধান ব্যক্তি। প্রকৃতপক্ষে তিনি একজন সুদক্ষ ব্যবহারিক শিল্পী, অবশ্য এখানে চারুকলার ক্ষেত্রেও তাঁর প্রভাব প্রচুর। তাঁর বেশীর ভাগ ছবিই প্রাচীরপত্র, কাহিনীচিত্র বা দেয়ালপঞ্জীর উপযোগী ও নিপুণভাবে অঙ্কিত। তার বেশী আর কিছুই নেই।

কোচিনদেশের জেলে—এ এ আলমেলকার

দশেরার ফুলওয়ালী—এ এ আলমেলকার

৩। আমেরিকান জলরঙ চিত্র-প্রদর্শনী—আমেরিকার সাতজন শিল্পীর এই চিত্র প্রদর্শনী ইতিমধ্যে দিল্লী ও কলকাতায় হয়ে গেছে। ছবিগুলি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে আঁকা, মোলায়েম রঙে, যা আমেরিকানদের কাছে অনেকে আশা করেনি। অনেক আমেরিকানের মতে এই প্রদর্শনীটি বিদেশে না পাঠানই উচিৎ ছিল। সেদেশের প্রতিভাবান আরও অন্যান্য শিল্পী, যারা বিভিন্ন পরীক্ষা-নীরিক্ষা করছেন, তাঁদের ছবিও পাঠানর প্রয়োজন ছিল। শুধু "Safe Type"-এর শিল্পীদের ছবি পাঠান হয়েছে। খুব উৎসাহিত হলাম না প্রদর্শনীটি দেখে।

৪। শ্রী এম আর আছরেকারের চিত্র-প্রদর্শনী—শ্রী আছরেকার শহরের একজন খ্যাতনামা প্রবীণ শিল্পী। ইদানীং চলচ্চিত্রের শিল্প নির্দেশক রূপেও খ্যাতি অর্জন করেছেন। ১৯৩২ ও ১৯৩৫ সালে তদানীন্তন ভাইসরয় তাঁকে ইংলণ্ড পাঠান, "গোলটেবিল বৈঠক" ও "রাজা পঞ্চম জর্জের" রজত জয়ন্তী উৎসবের ছবি আঁকবার জন্য। ভারতীয় চলচ্চিত্রের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে আমেরিকা ঘুরে আসার পর পুস্তক লেখেন। "Sky-serapers and the Flying Gandhar-vas"। তাঁর রেখাচিত্রের "রূপদর্শিনী" পুস্তকটিও বিখ্যাত। চিত্র শিক্ষাদানের জন্য তাঁর একটি বিদ্যালয় আছে।

প্রদর্শনীতে জলরঙে আঁকা ৬৭টি ছবি ছিল। বাস্তব ধরনে নিপুণতার সহিত অঙ্কিত হলেও, তাঁর ছবি মনে কোনই রেখাপাত করে না।

৫। শ্রী এ আলমেলকারের চিত্র-প্রদর্শনী—উপরোক্ত চিত্র প্রদর্শনীর মধ্যে সব চাইতে ভাল লাগল তরুণ শিল্পী শ্রীআলমেলকারের চিত্রপ্রদর্শনীটি, যার নাম—"From Ashes to Life", তাঁর বিশ বছরের সাধনার যাবতীয় নিদর্শন ও নিজস্ব শিল্প সংগ্রহ গত বছর অগ্নিকাণ্ডে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। স্থানীয় গুণগ্রাহীদের সাহায্যে আবার নতুন উদ্দীপনায় এক বছরে যা রচনা করেছেন তারই নিদর্শন ছিল ৪০টি ছবি। বম্বেতে যে দুই এক-জন শিল্পী আছেন, যাঁদের চিত্রকলা ভারতীয় শিল্পকলার ঐতিহ্যের প্রতি আমাদের আস্থা ফিরিয়ে [illegible] আসে শ্রীআলমেলকার তাঁদের অন্যতম। তাঁর ছবি দেখে প্রথমেই মনে হয় যে কোথাও ফাঁকি নেই, প্রত্যেকটিই সাধনার সহিত পরিশ্রম করে অঙ্কিত। অত্যন্ত সাধারণ, Paste Board, Card Board, Brown Paper-এর উপর আঁকা ছবিগুলির বিচিত্র আবেদনে আকৃষ্ট হতে হয়। বিখ্যাত শিল্প সমালোচক বলেছেন—"Art is the expression of pleasure in work" কিম্বা "art is most simply and most usually defined as an attempt to create pleasing forms" এবং তা যদি মেনে নেওয়া যায়, তবে শ্রীআলমেলকারের বেশীরভাগ রচনাই সার্থক।

স্কেচ—এম আর আছরেকার

ব্রহ্মচারী—এ এ আলমেলকার

এই প্রদর্শনীর ছবিগুলিকে আলমেলকারের চিত্রধারার দুই বিভিন্ন ধরনে ভাগ করা যায়। প্রথমটিতে পড়ে ভারতীয় প্রকাশ পদ্ধতিতে "বাসোলী" চিত্রকলার প্রেরণায় অঙ্কিত ২০।২৫টি ছবি যা অলঙ্কার প্রধান। এমনকি প্রত্যেকটি ছবির Border দেওয়া হয়েছে সুন্দর আলংকারিক নক্সা দিয়ে। প্রচুর পরিশ্রম করে আঁকা সূক্ষ্ম অলঙ্করণে পরিপূর্ণ এই ছবিগুলি রাজপুত ও মোগল ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে তাঁর নৈসর্গিক দৃশ্য-চিত্র ও অন্যান্য ২।৪ ছবি। এর অঙ্কন-রীতি এতই বিপরীতধর্মী যে মনেই হয় না, একই শিল্পীর আঁকা। তুলির বদলে আঙ্গুল দিয়ে রঙ লাগান হয়েছে। এই ধরনে দশেরার ফুলওয়ালী ছবিটি উল্লেখযোগ্য। বেগুনী রঙের দুটি নারীমূর্তি, দশমীর দিন গাঁদাফুল বিক্রী করছে। এগ টেম্পেরায় আঁকা এই ছবিটির উপরে আঠার প্রলেপ দিয়ে যে আবেদন সৃষ্টি করেছেন তা খুবই সফল হয়েছে।

আলোচনা

'নতুন ঘর' না 'বাপের বাড়ি'

মহাশয়,

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে 'নাঈয়র' শব্দ নিয়ে আপনাদের পত্রিকায় যত আলোচনা বেরিয়েছে তা' কুতুহলী হয়েই পড়েছি। দেশ নবম সংখ্যায় (১লা জানুয়ারী) শ্রীরঞ্জিত পুরকায়স্থ এ সম্বন্ধে যা লিখেছেন তা সমর্থনযোগ্য। শ্রীহট্ট অঞ্চলে 'নাঈয়র' শব্দ বহুলে প্রচলিত এবং এর অর্থ হচ্ছে পতিগৃহ থেকে পিতৃগৃহে কিছুদিনের জন্য বেড়াতে যাওয়া। এর মধ্যে বিবাহিতা কন্যার আপন পিতৃকুলের আত্মীয় পরিজনদের সঙ্গে মিলন, বিশ্রাম ও চিত্তবিনোদনের ভাবটি প্রচ্ছন্ন আছে। 'নাইঈর' মুখ্যার্থে বাপের বাড়ী যাওয়া বুঝালেও তার একটি গৌণার্থও আছে, যাকে এর দ্যোতনা বলা যেতে পারে, আর তা' হচ্ছে পুনরায় পতিগৃহে ফিরে আসবার সম্ভাবনা। এই প্রত্যাবর্তনের ভাবটি 'নাঈয়র' শব্দের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। নইলে যে মেয়ে রাগ করে শ্বশুরবাড়ী থেকে বাপের বাড়ি গিয়ে আর ফিরে আসে না তাকে শ্রীহট্ট অঞ্চলেও আর 'নাঈয়র' যাওয়া বলে না। খুব বেশী মার্জিত ভাষায় বললেও বলবে যে অমুক নাঈয়র এসেছিল আর ফিরে যায়নি। ঠিক এ ভাবটি বুঝানোর জন্য বাংলা ভাষায় অনুরূপ আর কোন শব্দ নেই।

হিন্দীতে 'নৈহর' শব্দ আছে এবং 'নাঈয়র'-এর সমান অর্থ ও দ্যোতনা নিয়েই আছে। বেনারসে বহু প্রচলিত একটি সঙ্গীতে ঠুংরী গান আছে যা স্বর্গীয় কে এল সাইগল গ্রামোফোন রেকর্ডে গেয়েছেন, সে গানখানি হচ্ছে—

সাজন্ মোরা নৈহর ছুটো হি যায়।
চার কাহারো মিলে মোরা ডলিয়া সাজায়ে,
মোরা আপনা বেগানা সব ছুটো হি যায়॥
অঙ্গনা তো পর্বত ভয়া দেহুরী ভয়ী বিদেশ।
বাবুল্ তু ঘর আপনো মায় চলি
পিয়াকী দেশ॥

(মেয়ে পিতৃগৃহ ছেড়ে পতিগৃহে যাবার জন্য তৈরী হয়ে এসে বাপকে বল্‌ছে—বাবা আমার তো যাবার সময় হয়ে এল, আমার নৈহর কাল হয়েছে শেষ। ঐ দেখ চারটি বেহারা মিলে আমার ডুলি সাজাচ্ছে। একটু পরেই তো আত্মীয় অনাত্মীয় সকলকে ফেলেই আমায় চলে যেতে হবে। আর যে কবে তোমাদের সংগে দেখা হবে তা' জানি না; দেখা হবে কিনা তা'ও জানি না। শুধু এটুকু জানি যে এইমাত্র যে দেউড়ীটুকু পেরিয়ে এলাম তা' আমার কাছে দুস্তর, দুর্লঙ্ঘ্য পর্বত সদৃশ। আমি তো পতিগৃহে চললাম, তুমি আমার সংগে এসে আর কি করবে, বরং তুমি ঘরে ফিরে চলে যাও।)

এই যে ক্ষণিকের মিলনানন্দের পর বিচ্ছেদের বেদনাবিধুরতা; আগমনীর আনন্দ সঙ্গীতের মধ্যে বিজয়ার অশ্রু-ঝরাণো সুর, এইটিই নাঈয়র শব্দের প্রাণ। প্রত্যেক ভাষাতেই এমন কয়েকটি শব্দ থাকে যা' একটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ ভাবকেই প্রকাশ করে; যার মুখ্য অর্থ থেকে তার পরিপ্রেক্ষিত, ব্যঞ্জনা, ইঙ্গিত, আকৃতি শতগুণ বেশী অর্থপূর্ণ হয়ে দেখা দেয়। নাঈয়র ও নৈহর এরকমই দুটি শব্দ॥ ইতি—রমেন চৌধুরী, বিনয়নগর, নয়াদিল্লী।

॥ ২ ॥

মহাশয়,—গত ১৮-১২-৫৪ ও ১-১-৫৪ এই উভয় সংখ্যা 'দেশের' আলোচনার একটি অংশ "নাঈয়র" শব্দটি লইয়া শ্রদ্ধেয় শ্রীরঞ্জিৎ পুরকায়স্থ ও শ্রদ্ধেয়া সবিতা বসু উভয়েই অর্থ সংকোচন করিয়াছেন। নাঈয়র শব্দটি চট্টগ্রামের এবং আমিও চট্টগ্রামের মেয়ে; সুতরাং ইহার ভিন্নার্থ চোখে লাগে। ইহার অর্থ 'বাপের বাড়ী' কিম্বা 'নতুন ঘর' নয়; ইহার অর্থ আরও ব্যাপক। 'নাঈয়র' অর্থ কোথাও ২।১ দিনের জন্য বা বড় জোর ১। ২ মাসের জন্য বেড়াইতে যাওয়া। খালি বাপের বাড়ি নয়, বোনের বাড়ি, দাদার শ্বশুরবাড়ি, মাসীর বাড়ি, পিসিমার বাড়ি ইত্যাদিতে বেড়াইতে যাওয়াকেও বলে 'নাঈয়র'। সাধারণত মেয়েদের বেলায় এ শব্দটি ব্যবহৃত হয়। শ্রীশ্রীদুর্গাকে "তিন দিনা নাইওর ফিরপোআ" বলে এবং এই শব্দটি উদাহরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয় মেয়েদের বেলায়। ইতি—মঞ্জুষা চৌধুরী, খড়্গপুর।

॥ ৩ ॥

মহাশয়,

দেশ পত্রিকায় বহু আলোচিত 'নতুন ঘর' না 'বাপের বাড়ি' সম্বন্ধে আমার বক্তব্য হচ্ছে এই যে, 'নাঈয়র' শব্দের অর্থ পূর্ববঙ্গে, বিশেষ করে ত্রিপুরা এবং শ্রীহট্টে, বাপের বাড়ি অথবা পিতৃকুলের নিকট আত্মীয় বাড়ি বোঝায়। এ সম্বন্ধে ত্রিপুরার দিকে একটি বাউল গান প্রচলিত ছিল, তা হচ্ছে—

ও আমার আহ্লাদের সোয়ামী
বাপের বাড়ি নাঈয়র যাইতাম
নাঈয়র দিবায় নি।
আউজগা গেলে কাউলকা আমু
কাইন্দ না তুমি।
আহ্লাদের সোয়ামী,
বাপের বাড়ি নাঈয়র যাইতাম
নাঈয়র দিবায় নি।

নিরোদ রায়, কলিকাতা

[এ প্রসঙ্গে আর কোনো আলোচনা প্রকাশিত হইবে না। —সম্পাদক দেশ']

'অবিস্মরণীয়'

'দেশ' সম্পাদকেষু,

'অবিস্মরণীয়' শীর্ষক কবিতাগুলি পড়ে একটি পুরোনো প্রশ্ন নতুন করে মনে এল, আপনার পত্রিকা মারফৎ কেউ এ বিষয়ে আলোকপাত করলে উপকৃত হব।

রবীন্দ্রনাথ (১৮৬১—১৯৪১) তাঁর সমসাময়িক প্রায় প্রত্যেক বিখ্যাত ব্যক্তি সম্পর্কেই গদ্যে বা কবিতায় কিছু কিছু বলেছেন, কিন্তু স্বামিজী (১৮৬৩—১৯০২) সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কোথাও কিছু বলেছেন কি?

অবশ্য স্বামিজী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য চার জায়গায় আমি পেয়েছি। প্রথমটি অদ্বৈত-আশ্রম প্রকাশিত স্বামিজীর 'Complete Works'-এর মলাটে। কথাটি হ'ল—

If you want to know India, study Vivekananda. In him everything is positive and nothing negative

দ্বিতীয়টি পেয়েছিলাম কিছুকাল আগে প্রকাশিত স্বামিজীর 'শিক্ষা' বইটির গোড়ায়। (স্থানাভাবের জন্য সেটি উদ্ধৃত করলাম না।) রবীন্দ্রনাথ কোথায় ও কী প্রসঙ্গে এ দুটি মন্তব্য করেছিলেন? শ্রীদিলীপকুমার রায়ের 'আবার ভ্রাম্যমাণ' বইটিতেও (পৃঃ ১৫) স্বামিজী সম্পর্কে কবির একটি মন্তব্য আছে। এ ছাড়া কোথায় যেন পড়েছিলাম যে, দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কাছে কবি স্বামিজীর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' বইটির প্রশংসা করেছিলেন। এগুলি ছাড়া রবীন্দ্রনাথ স্বামিজী সম্পর্কে কোথায় ও কী বলেছিলেন জানতে ইচ্ছে হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, স্বামিজী তাঁর ছাত্রাবস্থাতেই রবীন্দ্রনাথের গান গাইতেন তার প্রমাণ আছে। 'মহা-সিংহাসনে বসি' ও 'তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুবতারা' গান দুটি স্বামিজীর খুব প্রিয় ছিল। রবীন্দ্রনাথের গান প্রথম যাঁদের অভিনন্দন লাভ করে স্বামিজী তাঁদের অন্যতম।

এঁদের দুজনের সাক্ষাৎকার কখনো ঘটেছিল কি? অমিয়কুমার, অণ্ডাল

বইয়ের বিজ্ঞাপন

মহাশয়,—আজকাল প্রায় প্রত্যেক সাপ্তাহিক, ও মাসিক পত্রিকায় পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখা যায়। এই সব পত্রিকায় পুস্তকের বিজ্ঞাপনে প্রায়ই দেখা যায়, পুস্তকটির নাম এবং লেখকের নাম দিয়েই প্রকাশকগণ নিজেদের কর্তব্য শেষ করেন। এর ফলে পুস্তকটি গল্প, উপন্যাস, কবিতা না অন্য কিছু তা' পুস্তকক্রেতারা বুঝতে পারেন না এবং অনেক অসুবিধা ভোগ করতে হয়। আশা করি, পুস্তক-প্রকাশকগণ বিজ্ঞাপনে পুস্তকের শ্রেণী বিভাগ করে ক্রেতাদের অসুবিধা দূর করবেন। ইতি—মৃণাল কর, কলিকাতা।

[লখনউএর পরে]

লখনউ থেকে মিশ্র মনোভাব নিয়ে ফিরেছি। আশা আর নিরাশা দুইই। এই প্রথম সম্মেলনের প্রাঙ্গণে বহুর পদধ্বনি শোনা গেল, আশা এই জন্যে। জড়তার জর্জর বন্ধ থেকে মুক্তির লক্ষণ দেখতে পেয়েছি।

হতাশার কারণ, আমাদের সাহিত্যের প্রকৃত প্রতিনিধিস্থানীয় হয়ে উঠতে

উত্তমপুরুষ

সম্মেলনের এখনও ঢের বাকি। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্যিকেরা সংখ্যায় নগণ্য, হয়ত অনেকেই আমন্ত্রণ পাননি, কিম্বা পেয়েও সাড়া দেননি। দায়িত্ব আমন্ত্রক ও আমন্ত্রিত উভয় পক্ষেরই। এক দল দু'চার জনকে শুধু-মাত্র সভাপতিরূপে আহ্বান করেই কর্তব্য সমাধা করেন, বাকী সকলের নামে বুক পোস্টে চিঠি বিলি করে লৌকিকতা রাখেন। অপর দল স্বভাবতই অভিমানী, হয়ত-বা ক্ষুদ্র ঈর্ষাও আছে। 'ক' সভাপতি নির্বাচিত হলে 'খ' 'গ' বা 'ঙ' সম্মেলনে আসবেন না, এ একরকম নিশ্চিত। এই জাতীয় অভিমান আত্মঘাতী, সম্মেলনকে সার্থক করে তুলতে আরও বেশি বাঙালী সাহিত্যিক স্বেচ্ছায় এগিয়ে আসবেন আশা করেছিলুম, তাঁদের অসহযোগের সুবিধা নিয়েছেন কলকাতার এক শ্রেণীর বাম-পন্থী লেখক সম্প্রদায়। এঁরা দলে বেশ ভারী হয়েই এসেছিলেন, এবং বলা বাহুল্য একেবারে শূন্যে হাতে ফিরে যাননি।

সমাগত প্রতিনিধিদের মধ্যে সাহিত্য-প্রীতি যে ক'জনের ছিল তাঁদের আঙুলে গোনা যায়। সাহিত্যরসিক কথাটা লিখলুম না, কেননা রসের সংজ্ঞা নির্ণয় দুরূহ। ক্ষোভের সঙ্গে লক্ষ্য করেছি, অনেকেরই আধুনিক সাহিত্য বা সংস্কৃতির ধারার সঙ্গে কোন যোগ নেই। রাজনীতিতে যেমন দলের ফোঁটা পেলেই ক্যাণ্ডিডেট, সম্মেলনেও তেমনি বার্ষিক চাঁদা ধরে দিলেই ডেলিগেট। সুবিধার রেলভাড়া পেলে এঁদের অনেকে বোধহয় নিউক্লীয়র ফিজিক্স সম্মেলনে যোগ দিতেও রাজী। পংক্তি ভোজনে বসে শুনেছি, এক ভদ্রলোক চর্বণ চোষণ এবং লেহনের ফাঁকে ফাঁকে পার্শ্ববর্তীকে বলছেন, 'ওহে, এবার লখনউয়ে বন্দোবস্তটা মন্দ হয়নি, আসছে বছর বাঙালোরে লাগিয়ে দাও। নতুন দেশ দেখা যাবে।'

আসল গলদ বোধহয় সম্মেলনের নাম-করণে। ট্রেডমার্ক জাল করার সাজা আছে, কিন্তু সাহিত্য শব্দটি অপব্যবহারের কোন প্রতিকার নেই। বৎসরান্তে কিছু লোক জড়ো হবে, ভাষণ শুনবে, অভ্যর্থনা সমিতির আপ্যায়নে প্রীত হয়ে ধন্যধন্য বলবে এই যদি উদ্দেশ্য হয়, তবে একে 'নিখিল ভারত বঙ্গসন্তান সম্মেলন' বললেই তো সব গোল চুকে যায়, খামোখা 'সাহিত্যে'র নাম নিয়ে টানাটানি কেন।

উদ্যোক্তারা বলবেন, 'আমরা ব্যাপক অর্থে সাহিত্য শব্দটি ব্যবহার করে থাকি।' অর্থাৎ সাহিত্য বলতে এঁরা সংস্কৃতিও বোঝেন। কিন্তু এটা বোঝেন না কেন, সাহিত্য-সম্মেলনের মধ্যে স্বতন্ত্র একটা সাহিত্য শাখা অর্থহীন, 'ইতিহাস' 'দর্শন', 'সমাজ-সংস্কৃতি', 'সঙ্গীত' ইত্যাদি বিভাগ বিভ্রান্তিকর। আরেকটা কথা। সঙ্গীত-শাখা যদি থাকে তবে চিত্রশিল্প নেই কেন। শিল্পের এই বিভাগে বাঙালীর কৃতিত্ব কি সাহিত্য বা সঙ্গীতের চেয়ে কম, না সর্বভারতে অস্বীকৃত। 'বঙ্গসন্তান সম্মেলন' কথাটা ঠাট্টা করে লিখেছি। কিন্তু এই সাংবৎসরিক অধি-বেশনকে **'বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলন'** আখ্যা দিতে আপত্তি কী।

সম্মেলনের গঠনবিধির কিছু পরি-বর্তন হবে শুনেছি। এ-বছরের কার্য-নির্বাহক সমিতিতে কয়েকজন সাহিত্যিকও স্থান পেয়েছেন। কিন্তু সংস্কার দরকার খোল-নলচে দুয়েরই। নাম যদি নিখিল ভারত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলন রাখতেই হয়, তবে এর নেতৃত্ব করতে ডাকতে হবে সর্বজনশ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত বা রাজ-শেখর বসুকে, পরিচালকমণ্ডলীতে নিতে হবে তারাশঙ্কর, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অন্নদা-শঙ্কর, সুনীতিকুমার প্রভৃতিকে। এঁদের বাদ দিয়ে প্রভাবশালী বা পদাধিকারবলী-দের নিয়ে যে কর্মপরিষৎ, তা নিখিলস্থের মর্যাদা পায় না, রহস্যার্থে পদ্মলোচন হতে পারে।

এ-কথাও স্মরণ রাখতে হবে সম্মেলনটি মূলে প্রবাসী ছিল। যে কয়জন প্রবীণ, নিঃস্বার্থ কর্মী সংকীর্ণ অর্থে সাহিত্যিক না হয়েও প্রথম থেকে এর সঙ্গে

যন্ত্র, নানা প্রতিকূলতার ভিতর দিয়ে একে বাঁচিয়ে রেখেছেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতার ঋণ অপরিশোধ্য। এঁদের সহযোগিতা হারানো সম্মেলনের পক্ষে মৃত্যুতুল্য হবে, মাত্রাতিরিক্ত উৎসাহে যাঁরা লখনউয়ে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছিলেন, তাঁদের কথাটা মনে রাখতে বলি। 'প্রবাসে বঙ্গবাণীর উৎসব মন্দির স্থাপন' করেছিলেন অতুলপ্রসাদ। 'বর্তমান প্রতিকূল প্রাদেশিক মনোবৃত্তিতে' বাংলা ভাষা ও সাহিত্য প্রচারে বিঘ্ন দেখে এর গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সংখ্যাগুরুত্বের মুগুরে একে ধূলিসাৎ করা সোজা, কিন্তু দ্বিতীয় একটি সর্বভারতীয় বাঙালী প্রতিষ্ঠান আজকের দিনে গড়ে তোলা দুঃসাধ্য।

সম্মেলনের মুখপত্র

গতবারের বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের মুখপত্র 'সম্মেলনী'র উল্লেখ করেছিলুম। আলোচনায় সামান্য তথ্যগত ত্রুটি ছিল। পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক শ্রীদীপেন্দ্রনাথ সরকার এই লেখককে যে চিঠি দিয়েছেন তার প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করছিঃ

"সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে এ-যাবৎ যাঁরা সভাপতির আসন অলঙ্কৃত করেছেন, তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই বিশিষ্ট সাহিত্যিক। অল্পসংখ্যক এমন আছেন, যাঁরা ঠিক সাহিত্যিক নন। যেমন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, গুরুসদয় দত্ত, ডাঃ যদুনাথ সরকার। কিন্তু বাঙালীর জীবন-সমৃদ্ধিতে এঁদের দান কম নয়।

"উত্তরা পত্রিকাটি সম্মেলনের নিজস্ব বস্তু নয়। মাঝে অল্পদিন সম্মেলনের মুখপত্র হিসেবে গৃহীত হয়েছিল মাত্র। 'সম্মেলনী' গত তিন বছরে পুরোপুরি সাহিত্য পত্রিকা না হয়ে উঠতে পারলেও নিছক বুলেটিন পর্যায়ের ঊর্ধ্বে উন্নীত হতে পেরেছে, সকলেই স্বীকার করেন। কিছুদিন পূর্বে 'সম্মেলনী'তে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধ (আধুনিক উর্দু-সাহিত্য পরিচিতি) 'দেশ' পত্রিকায় উদ্ধৃত হয়েছিল।"

'উত্তম পুরুষে'র বক্তব্যঃ চিঠিটির মূলকথার সঙ্গে আমার সায় আছে। 'সম্মেলনী' কয়েক সংখ্যা দেখেছি, এটি নিশ্চয়ই বুলেটিন-মাত্র নয়। তবে আরও উন্নতির অবকাশ আছে। মোটামুটি পত্রিকাটিতে একটি সার্বভৌম বঙ্গসংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপটি যেন ফুটে ওঠে, এটি কলকাতার অগণন পত্রপত্রিকার একটি প্রবাসী প্রতিধ্বনিমাত্র না হয়। বঙ্গেতর প্রদেশের অধিবাসীদের সহযোগিতার ছাপ পত্রিকাটিতে এখনও যথেষ্ট স্পষ্ট নয়। লখনউ সম্মেলনেও অবাঙালীরা কোন অংশ নেননি, সম্পূর্ণানন্দজীর উদ্বোধনী বক্তৃতা সত্ত্বেও এ-কথা লিখতে দ্বিধা নেই। প্রদর্শনীতেও বাঙলা ছাড়া অন্য প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত পত্রিকা ছিল না বললেই হয়।

তারপর সভাপতি নির্বাচন। নাম যখন সাহিত্য সম্মেলন, তখন সাহিত্যিকদের প্রাপ্য সম্মান দিতে হবে বইকি! সীজরের খাজনাটুকুও গোবিন্দায় নমো করলে চলবে কেন। সভাপতির তালিকাটি (১৯২২ থেকে ১৯৫৪ সাল অবধি) আবার পড়লুম। পরিচয়পত্র নিয়ে কড়াকড়ি করব না, কিন্তু সাতাশ জনের মধ্যে দশটির বেশি সাহিত্যিকের নাম চোখে পড়ল না।

এ-প্রসঙ্গে একটি গল্প মনে পড়ছে। এক ভদ্রলোক গোয়ালাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'টাকায় ক'সের দুধ?' জবাব হল, 'দু সের।' 'তিন সের দিতে পার?' গোয়ালা একটু ভেবে বললে, 'পারি।' 'চার সের?' 'পারি।' 'ছ সের?' গোয়ালা এবার হেসে বললে, 'তাও পারি কর্তা, তবে দুধের রঙ টিকবে না।'

জলের পরিমাণ অত্যধিক হয়ে পড়বে, গোয়ালা এই ইঙ্গিতই দিয়েছিল। সম্মেলন সম্পর্কে আমাদেরও সেই কথা। মনীষীরাও আসুন, কিন্তু আরও বেশি লেখককে ডাকতে হবে। নইলে সম্মেলনের 'সাহিত্য' রঙটুকুই যে টেঁকে না!
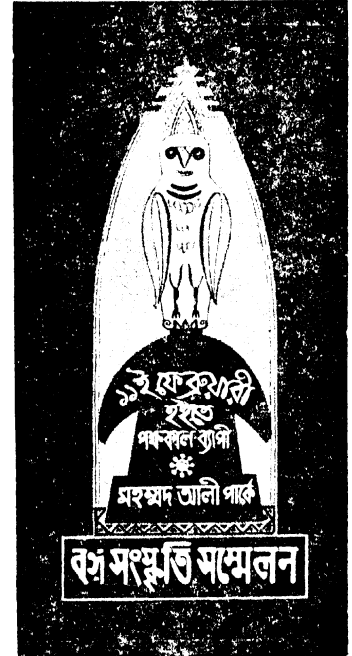
সর্ব্বদাই ফিট্‌ফাট

পুরুষদের জন্যও আট্‌পৌরে এবং পোশাকী নানারকম সুন্দর তাঁতের কাপড় পাবেন। মিহি সুতী ও সিল্কের, **সার্টের** কাপড়, **স্যুটের** কাপড়, প্লেন ও চেক্‌ প্যাটার্নে পাবেন। এগুলি টেকসই ও ধোপসই। তাছাড়া, সমারোহের লগ্নোপযোগী **কিংখাপ, ব্রোকেড, মাশরু, হিমরু** ইত্যাদিও পাওয়া যায়।

এ দেশের তাঁতীদের বয়ন-নৈপুণ্য ও বৈচিত্র্য, জগদ্বিখ্যাত। ভারতীয় তাঁতের কাপড়ের বুনানি ও নক্‌সা চিরকাল সর্ব্বত্র সমাদৃত। এগুলি টেকসইও খুব।

যতটুকুই কিনবেন তার প্রতিটি গজে দেশের আর্থিক উন্নতি।

অল ইণ্ডিয়া হ্যাণ্ডলুম বোর্ড, সেণ্ট্রাল মার্কেটিং অরগ্যানাইজেশন, ১।১৫৫, মাউণ্ট রোড, মাদ্রাজ-২

AC 651

আত্মজীবনী

আত্মস্মৃতি ঃ শ্রীসজনীকান্ত দাস। ডি এম লাইব্রেরী, ৪২, কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলকাতা ৬। মূল্য পাঁচ টাকা।

বাঙালী জীবন যে হারে শুষ্ক হতে শুষ্কতর হচ্ছে, বাঙলা লেখকদের আত্মজীবনীর প্লাবন যেন প্রায় সেই হারেই বেড়ে চলেছে। জীবনের ভাটায় এই জীবনীর বান ডাকাটা একেবারে অপ্রত্যাশিত নয় ঃ পূর্বতন প্রাণময়তার স্মৃতিমন্থন বর্তমানের দুঃসহতার হ্রাস ঘটাতে পারে। জাতি হিসাবে আমরা তো এমনিতেও স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। তাছাড়া আনাতোল ফ্রাঁস বলতেন, নিজের কথা ভালো করে বলতে পারলে শ্রোতার অভাব হয় না; আত্মজীবনীতে তাই অ-লেখকেরও অধিকার আছে। আমি ভিন্নমত। আমি আত্মজীবনীকে সাহিত্যকর্মের দুরূহতম শাখার অন্যতম বলে মনে করি। সম্প্রতি নানা অক্ষম আত্মজীবনী পাঠ করে উঠে এই বেদনাদায়ক ধারণা আমার মনে বদ্ধমূল হয়েছে যে, বহু বাঙালী লেখক ফ্রাঁসপন্থী ক্ষমতায় নয়, বিশ্বাসে। তাঁরা আবার একটু সংশোধন করেছেন, "ভালো করে বলতে পারা" অংশটুকু তাঁরা বাদ দিয়েছেন।

উপরের সাধারণ মন্তব্যগুলির অল্পই সজনীকান্তের আত্মস্মৃতির প্রতি প্রযোজ্য। তিনি অ-লেখক নন। বস্তুত, শব্দচয়নের এমন সবল অথচ স্বচ্ছন্দ ব্যবহার সম্প্রতি দেখেছি বলে স্মরণ করতে পারিনে। রামেন্দ্রসুন্দর ও মোহিতলালের পরে এমন জোরালো গদ্য কে লিখেছেন? দ্বিতীয়ত, সজনীকান্তের জীবন, ছবির বিজ্ঞাপনের ভাষায়, এমন বিচিত্রঘটনাসংকুল যে চেষ্টা করলেও তিনি তাঁর কাহিনী নীরস করতে পারতেন না। পারেনওনি। আক্ষেপের সঙ্গে যোগ করতে হবে, আরো একটু চেষ্টা করলে বইটি আরো অনেক বেশি কৌতূহলোদ্দীপক হোতো। ভুল বললুম, কৌতূহলের উদ্দীপনা হয়, পূর্ণ নিবৃত্তি হয় না। তবে আলোচ্য গ্রন্থ প্রকাশ্য জীবনীর প্রথম খণ্ড মাত্র, এবং এতেও এমন ত্রুটি অল্পই আছে যা সহজ পরিশোধ্য নয়।

আত্মজীবনীটির জন্মই কিছু প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে। সন্দেহ হয়, লেখক আপন প্রেরণায় এটি লিখতে বসেননি। ফরমায়েসি রচনারও নিখুঁত হতে বাধা নেই, কিন্তু ফরমায়েসের বিশেষ স্পেসিফিকেশন না থাকায় লেখ্যসূচী লেখককে নিজেই প্রায় 'অ্যাড হক্' করে নিতে হয়েছে। সেই সূচী থেকে আবার একাধিক বিচ্যুতি বা বিক্ষেপ ঘটেছে কারো আকস্মিক মৃত্যুতে বা কোনো সাময়িক বিতণ্ডার সমুচিত উত্তর

দিতে। চরম বাধা ছিল এই যে, বইটি ধারাবাহিকভাবে মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল, অর্থাৎ ধারাবাহিকভাবে লেখা হয়নি। একাধিক পরিবর্তন ও পরিবর্জন লক্ষ্য করলুম, কিন্তু এই সম্পাদনা সত্ত্বেও খণ্ডিত রচনার আভাস বিদ্যমান।

আবার রচনাই শুধু খণ্ডিত নয়, বিষয়টিও, অর্থাৎ ব্যক্তিটিও। আমরা কেউই একটি মাত্র মানুষ নই। সজনীকান্ত নিজের যে অন্তর্বিভেদের কথা বলেছেন তা পরিচিত বিভাজন ঃ একজন বাইরের লোক, একজন ভিতরকার লোক ঃ একজন বিজ্ঞানের ছাত্র, আরেকজন সাহিত্যের কাছে বাগ্‌দত্ত। কিন্তু বিজ্ঞানের বিসর্জনের পরেও সজনীকান্ত একটি ব্যক্তি হননি। অন্তত তিনটি সজনীকান্তের পরিচয় তো সর্বজনবিদিত—বিচক্ষণ কর্মাধ্যক্ষ, ভাবুক কবি এবং সরস সাংবাদিক। এই তিনজনের অবশ্যম্ভাবী বিরোধের বিশদ বিবরণ অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক হোতো। বিচক্ষণ কর্মাধ্যক্ষ হিসাবে তিনি তাঁর জীবন আলোচনা করলে আমরা প্রকাশন জগৎ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারতুম, আলোচ্য বইয়েও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কয়েকটি মূল্যবান তথ্য আছে। কবি তাঁর জীবনী লিখলে আমরা শুধু কবিতার উদ্ধৃতিই পেতুম না, তাঁর কাব্যের উৎসেরও বিস্তৃততর পরিচয় লাভ করতুম এবং জানতুম কর্মপরিচালনায় আর সাংবাদিকতায় কাব্য প্রেরণার কতখানি অপচয় হয়েছে। সাংবাদিকের কাহিনীতে শুধু কল্লোল-কলহ-সংবাদ থাকতো না, বইটি সহস্র রসাল বিতর্কের বিবরণে সমৃদ্ধ হোতো। লোকে সাধারণত দুটো স্টুলের মাঝখানে পড়ে, সজনীকান্ত তিনটের মধ্যে পড়বার ঝুঁকি নিয়েছেন; পড়েননি শুধু তাঁর কুশলতার কল্যাণে। আমি বিশ্বাস করিনে যে সজনীকান্তের জীবনে উপর্যুক্তত্রয়ীর মিলন সম্ভব হয়েছে, যদিও বই পড়লে মনে হয় শুধু সম্ভব নয় অবলীলাক্রমে সাধিত হয়েছে।

এমন অবলীলাবোধ বোধ হয় উৎকৃষ্ট আত্মজীবনী সৃষ্টির পক্ষে অন্তরায় স্বরূপ। কোনো এক্সট্রোভার্ট পলিটিশান যদি জীবন সায়াহ্নে তাঁর 'সাকসেস্ স্টোরি' বা 'অ্যাপলজিয়া' লিখতে বসেন তাহলে এই আত্মতৃপ্তির সুরটি সঙ্গত। অমন আত্মজীবনী সাহিত্য হিসাবে আলোচ্যই নয়—সাম্প্রতিক দৃষ্টান্ত স্যামুয়েল হোর বা এমারির আত্মজীবনী। কিন্তু সাহিত্যপদবাচ্য যত আত্মস্মৃতির কথা স্মরণ করতে পারি তাদের প্রতিটির মূল সুর অনুশোচনার, অপূর্ণতার। একথা শুধু সাফল্যে বীতশ্রদ্ধ

বর্তমান যুগ সম্বন্ধে সত্য নয়, কেননা সেই অগাস্টিন, চোলিনি, রুসো ইত্যাদির আত্মকথা যে সুরে বাঁধা আজকের দিনের ক্যেসলার প্রমুখ লেখকরাও তাঁদের অতীত জীবনের পর্যালোচনা করেছেন সেই একই বিষণ্ণ সুরে। ব্যবসায়ী বা পলিটিশানের আশা নির্দিষ্ট, লভ্য; শিল্পীর দিগন্ত তার অগ্রসরের সঙ্গে দূরে সরতে থাকে, কখনোই সেখানে হাত পৌঁছোয় না। আত্মতৃপ্তির সঙ্গে সত্যকার শিল্পী তাই অপরিচিত। সজনীকান্তের আত্মস্মৃতিতে সফল প্রকাশক ও সাংবাদিকের নানা অভিজ্ঞতার মনোজ্ঞ বর্ণনা আছে ঃ তার সবগুলি সুখেরও নয় ঃ কিন্তু সব-ভালো-যার-শেষ-ভালো গোছের আত্মাভিনন্দনের সুরটি কবি সজনীকান্তের প্রতি অবিচার করেছে। রবীন্দ্রনাথের অন্তিম আক্ষেপ ছিল, 'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি।' সজনীকান্ত স্পষ্ট একথা বলেননি, কিন্তু তাঁর বইয়ে এতটুকু ইঙ্গিত নেই যে দু' চারটে জিনিস তাঁরও আয়ত্তের বাইরে রয়ে গেছে। সজনীকান্তের সাফল্য সামান্য নয়, কিন্তু সেটা আমার বলবার কথা। তাঁর নিজের কাছ থেকে আমি আশা করি অতৃপ্তির সুরে অপূর্ণতার গান। কবিজনোচিত অতৃপ্তি। আত্মস্মৃতির প্রথম খণ্ডে অন্তত কবি জীবনের এই দিকটি অবহেলিত হয়েছে। অথচ সন্দেহ হয়, সজনীকান্তের নিজের বিচারে তাঁর স্বীকৃত সম্পাদনা সাফল্যে তিনি তুষ্ট নন ঃ কবি হিসাবে যশই তাঁর কাম্য। আত্মস্মৃতির প্রকাশের পরেও যদি তিনি সাহসিক সাংবাদিক ও প্রতিভাশালী স্যাটায়ারিস্ট বলেই সমধিক পরিচিত থাকেন তাহলে তার দায়িত্ব অংশতঃ তাঁর নিজের; জীবন কথায় তিনি নিজেই এই দ্বিতীয় সজনীকান্তের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করেছেন।

বেশ, রাজহংসের পূর্ণতর পরিচয় না হয় পরে মিলবে। আলোচ্য গ্রন্থে মোরগের পরিচয় কেমন হয়েছে? চমৎকার। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের স্বনিযুক্ত ম্যাকার্থি হিসাবে সজনীকান্তের কর্মিষ্ঠতা সত্যি অনস্বীকার্য। তিনি নির্ভীকভাবে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করেছেন এবং সে আক্রমণে দ্বেষ বা মাৎসর্যের পরিমাণ সত্যি বেশি ছিল না। তার চেয়েও বেশি উল্লেখযোগ্য, সে আক্রমণ অনেক ক্ষেত্রে সাহিত্যের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। প্রতিপক্ষও তাঁর ক্ষমতা স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছে। 'কল্লোল" আর "শনিবারের চিঠি"র বিবাদ আজ মৃত বিতণ্ডা। ময়না-তদন্তে দুটি

জিনিস চোখে পড়ে। এক ঃ বিবাদটা ঠিক কী নিয়ে তার সংজ্ঞানির্দেশে মোহিতলাল-সজনীকান্ত যে নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছিলেন, অপর পক্ষ তা দেননি। দুই ঃ রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রকে যে এই বিতণ্ডায় উভয় পক্ষই শিখণ্ডীরূপে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন তা থেকে সন্দেহ হয় যে, দুয়েরই মধ্যে আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা ছিল; তা নইলে নেতার প্রয়োজন হবে কেন? নীতি কেন যথেষ্ট হয়নি? শেষ পর্যন্ত কোনো নীতিই যে জয়ী হয়নি তার আরো প্রমাণ বাঙলা সাহিত্যের বর্তমান দিগ্‌ভ্রান্ত বিচরণ। নীতিনিষ্ঠ গোষ্ঠীর সাহিত্য-সেবা আজ আর নেই; প্রত্যেক লেখক এখন একক। এটা অবিমিশ্র অভিশাপ নয়। কিন্তু উল্লিখিত কলহের সময় বাঙলা সাহিত্যে যে সজীবতা ছিল আজ তা একেবারেই নেই। আজ যখন সব দিকে "থেমে গেছে জীবনের জ্বর" তখন মনে হচ্ছে গতকালের ওই প্রলাপমুখর রণাঙ্গনও বোধহয় বর্তমানের শান্ত সাহিত্য-শ্মশানের চেয়ে ভালো ছিল।

এই শান্তির পারাবারে সজনীকান্ত নিজেও যেন ডুব দিয়েছেন। এককালের যোদ্ধা সজনীকান্ত আজ রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"প্রায় জৈনমতে চলতে" চান। তাই তাঁর আত্মস্মৃতি যদিও বহুলাংশে "শনিবারের চিঠি"র ইতিহাস, ওই বিশিষ্ট ও একদা-চরিত্রশীল কাগজটির পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে এখনো ওই পত্রিকারই পুরানো ফাইল খুঁজতে হবে। আত্মস্মৃতিতে উদ্ধৃতি আছে কোথাও কোথাও একটু বেশি—কিন্তু বিশ বছর আগেকার পরিবেশের পুনঃসৃষ্টি নেই। অশান্ত অতীতকে দেখা হয়েছে বর্তমানের পরিশ্রান্ত দৃষ্টি দিয়ে। চিত্রটি তাই কথঞ্চিৎ ম্লান। প্রশান্ত মহলানবীশ ও শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে পূর্বতন অমিত্রতার পরিচয় আছে, কিন্তু আর সকলের সম্বন্ধে একটা অদ্ভুত সহনশীলতা পাঠককে প্রায় ভুলিয়ে রাখে যে শনিবারের চিঠি এককালে "অপোজিশন"-এর কাগজ ছিল। "শনিবারের চিঠি" একাধিক অর্থে সজনীকান্তের কাগজ—"হোরাইজন" যেমন ছিল সিরিল কনোলির বা "ব্লাস্ট" উইণ্ডহ্যাম লুইসের। সম্পাদকের বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে তবে কি তাঁর কাগজকেও যৌবন অতিক্রম করে প্রৌঢ়ত্বে ও বার্ধক্যে উপনীত হতে হবে? এখানেই ব্যক্তির সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের প্রভেদ। "ব্লাস্ট্" বা "হোরাইজন" বন্ধ হতে পায়নি। তাঁদের সম্পাদকরা সময় থাকতে বুঝেছিলেন কখন বিদায় নিতে হবে। ব্যবসায়িক ব্যর্থতা সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করেছিল। সজনীকান্ত ও "শনিবারের চিঠি"র ইতিহাস অন্যরূপ ঃ ব্যবসায়গত সাফল্য ও ব্যক্তিগত প্রৌঢ়ত্ব শুধু পত্রিকাটিরই রূপপরিবর্তন করেনি; তার সম্পাদকের জীবন ও জীবনীতেই তাদের শুভাশুভ প্রতিফলন ঘটেছে।

সজনীকান্তের কাছে বাঙলা সাহিত্যের ঋণ পুরানো "শনিবারের চিঠি" ঃ বাঙলা সাহিত্যের আধুনিক ইতিহাসে ঋণ তাঁর "আত্মস্মৃতি"। এমন সুখপাঠ্য, তথ্যবহুল ও অকপট গ্রন্থ শুধু ইতিহাস নয়, ইতিহাসের "সোর্স মেটীরিয়েল"-ও বটে। সাহিত্যিক ও সাংবাদিকে এমন ইতিহাসনিষ্ঠা এদেশে বিরল।

—নি. ম.

৫৪৭।৫৪

ধর্মগ্রন্থ

নারদীয় ভক্তিসূত্র—ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ।০ আনা।

নারদীয় ভক্তি সূত্রের মূল এবং অনুবাদ। সূত্রের অনুবাদ করিতে গেলে মূলগত ভাবের বিস্তার এবং বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। শিশিরকুমারের অনুবাদের বিশেষত্ব এ বিষয়ে যথেষ্ট; অধিকন্তু ইহাতে দার্শনিক বিচারের জটিলতা নাই। মূলের ভাবটি তিনি সোজাসুজি পরিস্ফুট করিয়াছেন। গীতার অংশসমূহের এতদুদ্দেশ্যে উদ্ধৃতিতে গ্রন্থকারের প্রগাঢ় শাস্ত্রানুভূতি এবং প্রয়োগ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়।

শুক্লযজুর্বেদীয়া ঈশাবাস্যোপনিষধ্ ও ক্ষেপাজী তারানাথ ব্রহ্মচারী বাবার উপদেশাবলী—ডাঃ অভয়পদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। শ্রীনির্মলকুমার মুখোপাধ্যায় ক্ষেপাজী তারানাথ আশ্রম সমিতি, ১-১-১-এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য—॥০ আনা।

পুস্তকখানিতে ঈশাবাস্যোপনিষদের মূল সহ সরল বঙ্গানুবাদ আছে, সেই সঙ্গে ক্ষেপাজী তারানাথ ব্রহ্মচারীর উপদেশ, তারানাথ স্মৃতি সিরিজের ২য় ক্রমিকাংশরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। উপদেশগুলি তন্ত্রসম্মত এবং মাতৃভাবে সাধনামূলক। ৫৪৪।৫৪

প্রাপ্ত স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

একে তিন তিনে এক—অবনীনাথ ঠাকুর।

মাও-এর রাজ্যে মানস-নিধন—সীতানাথ গোয়েল।

যোগবাণী (১ম পর্যায়)—আসনবীর।

সোমনাথের মন্দির—প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

স্ত ব ক ব চ মা লা—শ্রীগোপালদাস মুখোপাধ্যায়।

প্রথম প্রহর—রমাপদ চৌধুরী।

দরবারী—রমাপদ চৌধুরী।

আচার্য বিনোবা—বিধুভূষণ দাশগুপ্ত।

দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

দিনচর্যা—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

অভ্যাসযোগ—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

আত্মযোগ—শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল।

গৃহস্থমঙ্গল পত্রিকা—শ্রীমাখনলাল বসু ভাওয়াল।

মধুসূদনের বাসগৃহ

সুশীল রায়

এই সেই ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড। আজি হতে প্রায় শতবর্ষ আগের কথা। মাইকেল মধুসূদন দত্ত বাস করতেন এখানে। কেবল বাস করা নয়, এই অমর কবির জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কয়টি বছর অতিবাহিত হয়েছে এখানে। এই সেই গৃহ, যে-গৃহে ব'সে তিনি রচনা করেছেন মেঘনাদবধ কাব্য, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য, শর্মিষ্ঠা নাটক, পদ্মাবতী নাটক, কৃষ্ণকুমারী নাটক, একেই কি বলে সভ্যতা?, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ; এবং এই সেই গৃহ, যে-গৃহে বসে তিনি রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠা নাটক-দ্বয়ের ইংরেজি অনুবাদ কার্য সমাধা করেন। মধুসূদনের অদ্ভুত প্রতিভার বিকাশ এই গৃহেই। এই গৃহই কবিকে আকর্ষণ করে নিভৃত আশ্রয় দান করল, এই গৃহের প্রতিটি প্রাচীর যেন উৎকণ্ঠ আগ্রহে অপেক্ষা করছিল কবিকে অমরত্ব দেবার আকুলতায়। স্রোতের শ্যাওলার মত ঘাট থেকে ঘাটে ভেসে বেড়াচ্ছিল যে মূলহীন তরু, অকস্মাৎ সে পেয়ে গেল যেন শিকড়ের সন্ধান ও মৃত্তিকার সরস স্নেহ। সেই মূলহীন তরু অকস্মাৎ দেখা দিল বিরাট মহীরুহরূপে। মাদ্রাজ প্রবাসকালে তিনি পরিচিত হয়েছিলেন Mr. Holt নামে, কলকাতায় ফিরে এসে পুলিস কোর্টে চাকরি নিয়ে কর্তাদের কাছে তিনি হলেন Mr. Data; অচিরে সেসব নাম মুছে দিয়ে এই গৃহে এসে তিনি হয়ে উঠলেন দত্তকুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুসূদন। ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের এই ভবনটি ছিল একটি ভবনই। মধুসূদন নিজের প্রতিভার আলোয় উদ্ভাসিত করে সেই ভবনকে করে তুললেন এক পবিত্র কীর্তিমন্দির।

এই কীর্তিমন্দিরের সোপানাবলী অতিক্রম করে এসে পেঁছলাম এর অলিন্দে, ঘুরে ঘুরে দেখলাম প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ। কবির কণ্ঠস্বর স্তব্ধ হয়ে গেছে বহুদিন আগে। তবু মনে হল, এ-গৃহের প্রাচীরে-ঘেরা বাতাসে বেজে চলেছে সেই কবিকণ্ঠ—

> উর তবে, উর দয়াময়ী
> বিশ্বরমে! গাইব মা, বীররসে ভাসি
> মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া।

শ্বেতভুজা ভারতী পদছায়াদানে কার্পণ্য করেন নি, বঞ্চিত হননি মধুসূদন। কবি আহ্বান করেছেন তাঁর কল্পনাকে। তাঁর সেই আহ্বানের ধ্বনি এই কীর্তি-

মধুসূদন

মন্দিরের সর্বত্র এখনো যেন বেজে চলেছে বহুদূরাগত একটি আকুল আবেদনের মত—

> তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী
> কল্পনা! কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু
> লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে
> আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

মধুসূদন যে কীর্তিমন্দির প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন, গৌড়জন সেই মন্দিরে মধুচক্র রচনার জন্য আজ ব্যগ্র। এই ভবনটি জাতীয় স্মৃতিসৌধরূপে সংরক্ষিত হোক, গৌড়জনের আজ এই আকাঙ্ক্ষা।

বর্তমানে চিৎপুর রোড জনারণ্যে ও যানারণ্যে আচ্ছন্ন। প্রায় একশ' বছর আগের কলকাতায় চিৎপুরের এ-চেহারা ছিল না। কথিত আছে, চিত্তেশ্বরী দেবীর নাম থেকেই এ রাস্তার নাম হচ্ছে চিৎপুর। এই অঞ্চলে চিত্তেশ্বরী সিদ্ধেশ্বরী দেবীর মূর্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই দেবীমূর্তির সম্মুখে নরবলিও প্রচলিত ছিল। ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দের ৬ই এপ্রিল, শনিবার অমাবস্যার রাত্রে নাকি এখানে নরবলি হয়। এই ঘটনার প্রায় সত্তর বছর পরে মধুসূদন এখানে বসবাস আরম্ভ করেন ১৮৫৯ সালে। সত্তর বছরে এই অঞ্চলের তেমন পরিবর্তন হয়নি বলে ধরা যায়। নরবলি-প্রথা রহিত হলেও এ-অঞ্চল তখনো অবশ্যই নিভৃত ও শান্ত ছিল।

কিন্তু এখন চিৎপুরের চেহারা আলাদা। ট্রামে-বাসে, রিক্‌শায়, ঠেলা-গাড়িতে আর পুলিসের বাঁশীতে ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড এখন উচ্চকিত।

১৯৫৫ সালের ১০ই জানুয়ারি। বেলা দুপুর। এই গৃহের সম্মুখে এসে দাঁড়ালাম। নীচতলায় ফুটপাথের গা বরাবর পাশাপাশি চারটে বড় বড় দরজা— প্রত্যেক দরজার মাথায় একটা করে সাইন-বোর্ড লাগানো। চারটে দোকানই এক জাতের—হার্মোনিয়ম, তবলা, ফ্লুট, সেতার, এসরাজ আর তানপুরা নিয়ে এদের কারবার। পাশেই ভিতরে যাবার প্যাসেজ। এই সরু রাস্তা ধরে একটু এগতেই উপরে যাবার সিঁড়ি। মনে মনে আবৃত্তি করতে করতে উপরে উঠছি—

> সম্মুখ-সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
> বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপুরে
> অকালে,—

রেলিঙে হাত দিতেই চমকে উঠে অবিকল অমনিভাবে থমকে দাঁড়ালাম। মনে হল, কার স্পর্শ গিয়ে চকিতে পেঁছেছে যেন আমার মর্মদেশে। এই সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে এই রেলিঙেই কতদিন হাত রেখেছেন মধুসূদন। রেলিঙে রেখে-যাওয়া সেই স্পর্শটা এই-মাত্র ছুঁয়ে নিয়েছি আমার হাত দিয়ে।

ডান দিকে অনুচ্চ ছাতের ওপারে প্রাক্তন রন্ধনশালা। বাম দিকে ঘুরে গেছে সিঁড়ি। সম্মুখে বারান্দা। হলঘরে ঢোকবার দরজা। এই ঘরে এসে বসতেন মধুসূদনের অতিথি ও অভ্যাগত। তাঁর

মাইকেলের শয়নঘরসংলগ্ন লিখবার একটি ঘর

আবাল্যসুহৃদ গৌরদাস বসাক, কালীপ্রসন্ন সিংহ, মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর এবং সম্ভবত পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এসেছেন এখানে। বহু বর্ষ পরে সেই ঘরে এসে দাঁড়ালাম আমি এক রবাহূতের মত।

মধুসূদনের শয়নকক্ষ ও যে ঘরে বসে তিনি লিখতেন, ঘুরে ঘুরে সব দেখলাম। কবি-ভার্যা হেনরিয়েটার পিয়ানোটা ছিল কোথায়, আর কোন্ জায়গায় ছিল কবির কাব্য রচনার সরঞ্জাম—তাঁর টেবিল এবং তাঁর কলম—ঘুরে ঘুরে খুঁজতে লাগলাম। এই সেই ঘর, যেখানে পদচারণা করতে করতে উদাত্ত কণ্ঠে তিনি মুখে-মুখে রচনা করতেন তাঁর কাব্য। আর ওইখানে বসে

> স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে
> পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি
> ধূলায়?

ধূলি-ধূসরিত আজ সমস্ত ঘর। কিন্তু তবুও কোনো আক্ষেপ নেই। এই ঘরের প্রতিটি ধূলিকণায় মধু-কণ্ঠ প্রতিধ্বনিত। প্রমীলার আস্ফালন, রাবণের খেদ, শ্রীরামের বিলাপ, সরমার সমবেদনা, বিভিন্ন সুরে স্তনিত হয়ে উঠছে। মধুসূদনের পদধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে বাজছে যেন বীর নারীর দর্প—

> রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,
> আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে?

আবার এরই সঙ্গে গুঞ্জরিত হচ্ছে কোমল-কান্ত পদাবলী—

> সখি রে, বন অতি রমিত হইল

সূর্যের আলোর প্রসাদে যেমন বিকশিত হয় চন্দ্র, মধুসূদনের সূর্য-প্রতিভার প্রভায় তেমনি ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড আলোকোদ্ভাসিত। স্থাণুর ললাটে স্থান পাবার যোগ্য সেই চন্দ্র আজ ভূতলে পড়ে গড়াগড়ি যাচ্ছে। এ-স্থান ত্যাগ করে কবি চলে গেছেন, আজ এর দ্বিতলটি বৈদ্যুতিক সরঞ্জামের কারখানা হয়েছে।

এই কারখানার মালিক শ্রীপ্রমোদনাথ ঘোষ আগ্রহ ও উৎসাহের সঙ্গে একে একে সব কয়টি ঘর দেখালেন। কোন্‌টা ছিল কবির কোন্ ঘর বুঝিয়ে দিলেন, এখন চেনার উপায় নেই। পার্টিশান দিয়ে হলঘরটি খণ্ড খণ্ড করা হয়েছে।

বললাম, এটা জাতীয় স্মৃতিমন্দির হচ্ছে, জানেন নিশ্চয়?

—জানি। এটা আনন্দের কথা।

—আপনারা তাহলে যাবেন কোথায়?

নতুন জায়গা খুঁজে নিতে হবে।

কারবারী লোকের মুখে এমন কথা শুনব, আশা করিনি। কথাটা শুনে ভালো লাগল।

এই বাড়িটার মালিক হচ্ছেন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর। ২১৭নং পার্ক স্ট্রীটের মৌলভি মহম্মদ নুরুল ইসলাম, নবাব বাহাদুরের কাছ থেকে এ-বাড়ি লীজ নিয়েছেন। মৌলভি নুরুল ইসলাম এখন পাকিস্থানে, তাঁর প্রতিনিধি-রূপে ভুবনেশ্বর সাহা এখন বাড়ির ভাড়ার টাকা নিয়ে যান।

বাড়িটা পুরনো হয়েছে, কিন্তু জীর্ণ নয়। প্রায় একশ' বছর আগে মধুসূদন এই বাড়িতে যখন ছিলেন, তখন এ-বাড়ির অবস্থা নতুনই ছিল বলে ধরা যায়। মধুসূদন মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরেরই ভাড়াটে ছিলেন। প্রায় একশ' বছর আগে যে-বাড়ির নম্বর ছিল ৬, আশ্চর্যেরই কথা, কলকাতা শহরের এত পরিবর্ধন ও পরিবর্তন সত্ত্বেও সে-বাড়িটার নম্বরের কোনো পরিবর্তন ঘটে নি।

সর্বপ্রথম এই বিষয়টির প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন শ্রীপ্রমথনাথ বিশী। আমরাও বিলম্ব করি নি, আমাদের সাহিত্যিক সংস্থা বঙ্গসাহিত্য সমাবেশ এ বিষয়টি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের গোচরে

মন্দিরে পরিণত করার জন্য তাঁদের অনুরোধ [illegible]ন।

বঙ্গসাহিত্য সমাবেশের সাধারণ সম্পাদকরূপে বর্তমান প্রবন্ধ লেখকের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের, তথা শিক্ষা-মন্ত্রী শ্রী পান্নালাল বসুর পত্র-বিনিময় হচ্ছে গত জুলাই মাস থেকে। মধুসূদন এই গৃহে কোন্ সাল থেকে কোন্ সাল পর্যন্ত বাস করেছিলেন এবং কোন্ কোন্ কাব্য রচনা করেন, তার বিবরণ জানতে চেয়ে শিক্ষামন্ত্রী মহাশয়ের পত্রের উত্তরে তাঁকে তথ্যাদি জানাবার পর গত ৬ই জানুয়ারির সংবাদপত্রে খবর বের হয় যে, এই গৃহ জাতীয় স্মৃতিমন্দিরে পরিণত করতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মনস্থ করেছেন। এই সংবাদে বঙ্গবাসীমাত্রেই প্রসন্ন ও পুলকিত হয়েছেন। বঙ্গসাহিত্য সমাবেশ এজন্যে গৌরবান্বিত বোধ করেছেন।

সংবাদপত্রে খবরটি প্রকাশিত হবার পর অনেকে এই বাড়ি দেখতে আসছেন। কিন্তু প্রায় তিন বছর আগে নাকি এসেছিলেন এক বৃদ্ধ। জীর্ণ বস্ত্র তাঁর পরনে, হাতে জীর্ণতর একটি কাগজ। সে-কাগজ আর কিছু নয়, মধুসূদনের লেখা একটি চিঠি। এই ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড ঠিকানা সেই চিঠির উপরে লেখা। চিঠিটা কিভাবে তাঁর হাতে আসে, তারই সূত্র ধরে খুঁজতে খুঁজতে একদিন তিনি সমাগত হয়েছিলেন এখানে। এই রেলিঙ থেকে মধুসূদনের স্পর্শ অবশ্যই তিনি নিয়ে গেছেন, এই ঘরের বাতাস থেকে শ্বাস গ্রহণ করে গেছেন তিনি; কিন্তু সেই অজ্ঞাত ও অপরিচিত বৃদ্ধটি আজ এই শুভ সংবাদটি পেয়েছেন কিনা জানিনে। যদি পেয়ে থাকেন, তাহলে তাঁর আনন্দের মাত্রা সম্ভবত আমাদের আনন্দের চেয়ে বেশি। কিন্তু সব আনন্দকে ছাপিয়ে যাঁর আনন্দ বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত প্রবল হয়ে উঠত, তিনি হচ্ছেন মধুসূদনের আবাল্য-সহচর গৌরদাস বসাক। মধুসূদন যাঁকে একমুহূর্ত না দেখে থাকতে পারতেন না, যাঁকে তিনি কেবল কাছে ডাকতেন, বলতেন—

Come brightest Gour Dass,
on a hired palkee,
And see thy anxious M.S.D.

সেই গৌরদাস এই ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড ভবনটির উল্লেখ করে বলেছিলেন—

Had Bengal been England, this house would have been purchased and maintained by the public for being visited by the admirers of his genius.
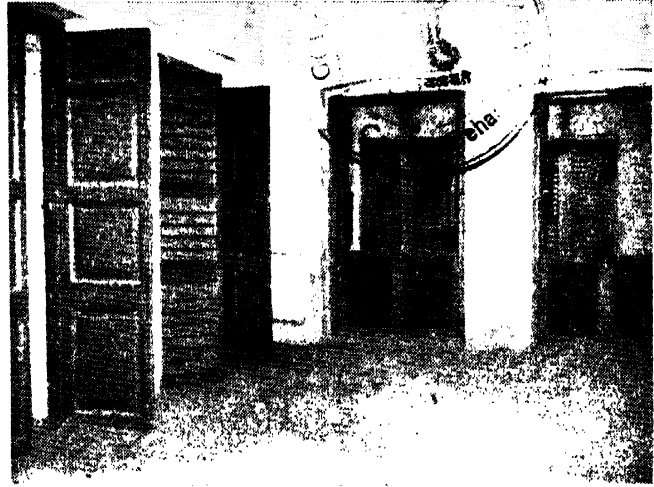
মধুসূদনের শয়নঘর

বাংলা দেশ বিলেত হয়নি, বাংলা দেশ হয়েছে স্বাধীন। গৌরদাস বসাকের প্রায় আশি বছর আগেকার আকাঙ্ক্ষাটি আজ পূরণ হতে চলেছে।

১৮৫৯ সাল থেকে ১৮৬১ সাল পর্যন্ত মধুসূদন এই গৃহে বাস করেন। এখানে তিনি রচনা করেন ১৮৫৯ সালে শর্মিষ্ঠা নাটক; ১৮৬০ সালে তিলোত্তমা-সম্ভব কাব্য, পদ্মাবতী, একেই কি বলে সভ্যতা? বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ; ১৮৬১ সালে মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা কাব্য ও কৃষ্ণকুমারী নাটক।

মাদ্রাজ প্রবাসের পর ১৮৫৬ সালে দেশে ফিরে এসে মধুসূদন পুলিস কোর্টে হেডক্লার্করূপে কর্মগ্রহণ করেন এবং ১নং দমদম রোডস্থ কিশোরীচাঁদ মিত্রের উদ্যানবাটিকায় বাস করতে থাকেন। কিন্তু

> কেরাণী-রূপে মধুসূদনকে অধিককাল থাকিতে হয় নাই। অনতিবিলম্বেই তিনি উক্ত আদালতের দ্বিভাষিকের (Court Interpreter) পদে উন্নীত হন। এই পদ লাভ করিয়া তিনি কিশোরীচাঁদের উদ্যান-বাটিকা পরিত্যাগপূর্বক তদানীন্তন লালবাজার পুলিশ কোর্টের পূর্বপারে লোয়ার চিৎপুর রোডের উপর অবস্থিত (৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড) দ্বিতল ভবন ভাড়া করিয়া তাহাতেই বাস করিতে লাগিলেন। —"মধুস্মৃতি"

বর্তমানে লালবাজার থানা যে স্থানে অবস্থিত, ঐ স্থানেই ছিল পুলিস কোর্ট। রাস্তার অপর পারেই মধুসূদনের এই গৃহ। তিনি "দুই-চারি পদ-ক্ষেপেই" আপিসে গিয়ে পেঁছিতেন (walked in a trice to his office).

এই গৃহে এসেই তাঁর প্রতিভার উন্মেষ হয়েছে, তাঁর শক্তির বিকাশ এই গৃহেই। এই গৃহ বঙ্গ সাহিত্যের তীর্থক্ষেত্র।

১৮৬২ সালে ব্যারিস্টার হবার জন্যে মধুসূদন ইংলণ্ড যাত্রা করেন। সেই সময়েই এই গৃহের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। তাঁর প্রতিভাও যেন তাঁর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এই গৃহ মধুসূদনের জীবনে এসেছিল একটি পরম আশীর্বাদ-রূপে। এই গৃহ একটি স্মরণীয় কীর্তি-মন্দির ও স্মৃতিসৌধ।

৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডের দ্বিতল থেকে ধীরে ধীরে নেমে এলাম। মনে হল, যেন নির্বাসিত হলাম একটি পবিত্র পীঠস্থান থেকে; মঞ্জু গুঞ্জরণে ঐ গৃহটিকে সান্ত্বনা দিয়ে যেন বেজে উঠল একটি কণ্ঠস্বর—

মধু—যার মধুধ্বনি কহে কেন কাঁদ ধনি,
ভুলিতে কি পারে তোমা শ্রীমধুসূদন?

আচার্য বিনোবা ভাবে নাকি পশ্চিম-বঙ্গের রোগ নির্ণয় করিয়াছেন। —"আমাদের মুখ্যমন্ত্রী স্বয়ং ডাক্তার, সুতরাং রোগনির্ণয়ের সমস্যা আমাদের কোন সমস্যাই নয়, আমাদের চিন্তা চিকিৎসাব্যবস্থার। আচার্য ভাবে সেদিকটা ভেবেছেন কি?"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

মার্শাল টিটো শ্রীযুক্ত জহরলালের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, জহরলালজী ঠিক্ right পথ ধরিয়াই চলিয়াছেন।—"অনেকে বলছেন জহরলালজী 'keep to the left' নীতি

মানেন না, তাই তো অ্যাকসিডেণ্টের ভয়" —বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

বিদায়ের প্রাক্কালে ইংরেজী নববর্ষে আমাদের জন্য শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছেন মার্শাল তিতো।—"তা'তে অবস্থাটা মধুর হওয়ারই কথা। তা ছাড়া বসন্তের এপিডেমিক্ বৎসরে তেতো প্রশস্ত"—বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

অহিন্দীভাষীদের উপর জোর করিয়া হিন্দী চাপাইলে সহজ প্রীতির পরিবর্তে বিরুদ্ধতাই জাগে—বলিয়াছেন নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের ভাষা ও সাহিত্য শাখার সভাপতি খ্যাতনামা হিন্দী সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত অমৃতলাল নাগর।—"কিন্তু অখ্যাতনামা হিন্দী অসাহিত্যিকরা অমৃতলালের কথায় কণামাত্র অমৃতের সন্ধান পাবেন না, বলবেন এটা নেহাৎ ফজুল বাৎ"—বলেন অন্য এক সহযাত্রী।

* * *

আসাম কংগ্রেস জাতিগঠনের ব্যবস্থাপনার উপর গুরুত্ব অর্পণ করিয়াছেন।—"কিন্তু আমরা জানি সাধারণ মানুষ বর্তমানে জাতি অপেক্ষা গৃহনির্মাণের সমস্যার কথাই বেশী ভাবছেন"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

পোস্ট এবং টেলিগ্রাফ অফিসের সৌজন্য সপ্তাহ শেষ হইয়া গেল, এবারে যান-বাহন চলাচলের সৌজন্য সপ্তাহ চলিবে।—"বছরের বাহান্ন সপ্তাহের মধ্যে অন্তত একটা সপ্তাহ সুবোধ বালক গোলাপ ফুল হয়ে থাকতে আশা করি কারু কোন কষ্টই হবে না"—মন্তব্য করিল আমাদের শ্যামলাল।

* * *

ধারওয়ার বার এসোসিয়েশনের এক সভায় সভাপতি ডাঃ কাটজু নাকি বলিয়াছেন যে, মামলামোকদ্দমা সালিসী দ্বারা নিষ্পত্তি করাই ভালো। আমাদের জনৈক উকীল সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"ধারওয়ার বার দেখছি বেশ হাতেই পত্র সমর্পণ করে বসে আছেন!!"

* * *

সংবাদে প্রকাশ, বৃটিশ শ্রমিক মন্ত্রিসভার ডেপুটি মন্ত্রী মিঃ হার্বার্ট মরিসন সম্প্রতি ৬৭ বৎসর বয়সে এক ব্যবসায়িনী মহিলার পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। প্রচলিত নিয়মানুসারে তাঁহার স্ত্রী স্বামীকে ভালবাসিবার এবং সম্মান করিবার প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। কিন্তু চিরাচরিত প্রথানুসারে স্বামীর আজ্ঞাবহ

হইবার প্রতিশ্রুতি বাক্য উচ্চারণ করে নাই।—"প্রতিশ্রুতি দেন নি বলেই এ সংবাদরূপে গৃহীত হয়েছে- প্রতিশ্রুতি দিয়েও স্বামীর আজ্ঞাবহ না ওয়ার প্রমাণ তোমার আমার সকলের ঘরেই আছে"—বলিলেন পাকা সংসারী বিশুখুড়ো।

* * *

দিল্লীর চক্ষুচিকিৎসাবিশারদ ডাঃ আগরওয়ালা নাকি বলিয়াছেন যে ভালো ছায়াছবি দেখা চোখের পক্ষে ভালো।—"আমরা চোখের চিকিৎসক নই, কাজেই কোন রকম মন্তব্য করা শক্ত। তবে বাইরে থেকে দেখেছি ছায়াছবি দেখে অনেকেরই 'চোখ গেল, চোখ গেল' বলে চেঁচাবার রোগ হয়। আর ছায়াছবির গান শুনে যে কানের পীড়া হয় এ কথা জানেন না এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া ভার"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

উপমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণাপ্পা জানাইয়াছেন যে, দিল্লীর লালকিল্লার নিকট যে-পশুশালা স্থাপিত হইবে

সেখানে দর্শকরা খাঁচায় আবদ্ধ থাকিবেন এবং পশুরা স্বাধীনভাবে বিচরণ করিবে। —"হিংস্রতায় মানুষ অনেক আগে থেকেই পশুর ওপর জয়লাভ করেছে, এই খাঁচা সেই জয়েরই প্রতীক। নয়াদিল্লীর গুণগ্রাহিতার তারিফ আমরা নিশ্চয়ই করব!!"

* * *

লক্ষ্ণৌর সংবাদে প্রকাশ, সেখানে প্রায় দেড় হাজার মেয়ে নাকি অভিভাবকদের অধীনতা হইতে মুক্তিলাভের জন্য সিটি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট আরজী পেশ করিয়াছেন।—"স্বাধীন হওয়ার পর আর্থিক সাহায্যের অর্থাৎ নেহাৎ গদ্যময় খাওয়াপরার দায়িত্বটা অভিভাবকদের হাতেই থাকবে কিনা তা অবশ্য সংবাদে বলা হয়নি!!"

বেলেঘাটা
২৪—১১৯৩

প্রত্যহ—২, ৫, ৮টায়

জয়দেব

মিনার্ভা থিয়েটার

বি বি ৫২৮৯
শনিবার—৪॥টায়
রবিবার—৩টা ও ৬॥টায়

পিতা পুত্র

রঙমহল

বি বি
১৬১৯

বৃহস্পতি ও শনি—৬॥টায়
রবিবার ৩টা ও ৬॥টায়

উল্কা

বি বি
৪০৩৩

প্রত্যহ—৩, ৬, ৯টায়

বাদবান

প্রাচী

৩৪—৪১৯৬

প্রত্যহ—২-৪৫, ৫-৪৫, ৮-৪৫

বলয়গ্রাস

রঙ্গজগৎ

—শৌভিক—

পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য!

পূর্ব ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বলতে কি কিছু নেই?—অন্তত পশ্চিম বঙ্গের সরকারী মহল যে এ বিষয়ে অবহিত নন ক'দিন আগে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। ব্যাপরটা ঘটেছিল চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দলকে আপ্যায়িত করা নিয়ে। চীনা প্রতিনিধিরা এসেছেন এদেশে তাদের জিনিস দেখিয়েও যেতে এবং এদেশের জিনিস দেখেও যেতে। ওদের পরিভ্রমণ সূচী সেইমতোই সাজানোও হয়। দিল্লীতে ওরা গিয়ে উত্তর ভারতের নৃত্যগীতাদি দেখে ও শুনে আসেন। বম্বেতে তেমনি তারা ও-অঞ্চলের কিছু কিছু দেখবার সুযোগ পান। মাদ্রাজেও তাদের জন্য ভারত নাট্যম, কথাকলি নৃত্য ও কর্ণাটি সঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। কিন্ত কলকাতায় এসে তাদের ডাহা ঠকে যেতে হয়েছে। এখানে তারা পূর্ব ভারতে প্রচলিত নৃত্যগীতাদির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন বলেই নিশ্চয় আশা করেছিলেন, এবং গত শনিবার সন্ধ্যায় নিউ এম্পায়ারে তাদের যা পরিবেশন করা হয় সে সবই যে পূর্ব ভারতের জিনিস নিশ্চয় তারা তা মনেও করে নিয়ে চলেছেন। অথচ সেদিন তাদের যা দেখানো হলো তার মধ্যে এক টুকরো জারিগান ছাড়া পূর্ব ভারতের কিছুই ছিল না।

* *

চীনা প্রতিনিধিদের কলকাতায় আপ্যায়নের জন্য প্রথম দিন পৌরসভার সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মণিপুরি নৃত্য পরিবেশিত হয়। পূর্ব ভারতের এই অনিন্দ্য নৃত্যধারাটি চীনাদের মনে যে রেখাপাত করতে সক্ষম হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেল পরদিন নিউ এম্পায়ারে সরকারিভাবে ওদের আপ্যায়ন অনুষ্ঠানে দলের নেতা কর্তৃক সে কথাটা উল্লেখ করতে শুনে। কিন্তু তারপর যে সূচী তাদের পরিবেশন করা হলো তা সম্মিলিত অতিথিবর্গকে কতখানি খুশী করতে পেরেছে জানা

য়ায়নি, কিন্তু এদেশীয়দের সবায়ের লজ্জায় যে কাণ লাল হয়ে উঠেছিল বার-বার তা স্পষ্টই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল। অনুষ্ঠানের অবশ্য নাম দেওয়া হয়েছিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রদর্শনী কিন্তু সবাই আশা করেছিল পূর্বভারতীয় জিনিসই পরিবেশন করা হবে। কিন্তু বোঝা গেল অনুষ্ঠান সূচী প্রণয়নের ভার যাদের ওপরে ছিল তারা পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে মোটেই অব-হিত নন। অনুষ্ঠানটি পরিবেশন ও পরি-চালনা করেন পঙ্কজকুমার মল্লিক।

*   *

অনুষ্ঠান আরম্ভ হলো পঙ্কজকুমার মল্লিক ও উৎপলা সেনের দ্বৈত কণ্ঠে বেদ থেকে "সংগচ্ছধ্বং সংগদধ্বং সংবোসনাং সি জানতাম্" স্তোত্রখানি গীত হয়ে। কতো চমৎকার এর সুর দিয়ে গিয়েছেন সরলা দেবী চৌধুরাণী যা স্বরলিপিতেও রয়েছে, অথচ এরা গাইলেন অসারভাবে। চীনারা বুঝতে পারবে না কাজেই যেমন খুশী গেয়ে যাও বোধহয় এমন একটা মনোবৃত্তি এর পিছনে ছিল। সেটা আরো প্রমাণিত হলো অনুষ্ঠান শেষে বন্দে-মাতরম্ গাওয়ার ধরন দেখে। পঙ্কজ মল্লিক দিব্যি মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে নিজের সুরে আর ক'জনকে নিয়ে গেয়ে গেলেন। সরকারী অনুষ্ঠানে সংবিধানবদ্ধ সুর বাতিল করে নিজের সুর ব্যবহার করা অত্যন্ত অপমানজনক ব্যাপার। আর চীনা অতিথিরাই বা কি মনে করলেন! যে বন্দে-মাতরম্ তারা ইতিপূর্বে শুনে এসেছেন এটাও সেই গানই কি না বুঝতে তাদের দেরি লাগবে আর বুঝতে পারলে তারা আশ্চর্যও হবেন এই ভেবে যে রাষ্ট্রীয় গীত নিয়ে ভারতে কিরকম ছেলে-খেলা বরদাস্ত করা হয়। সেদিনের অনুষ্ঠানে আরও কেলেঙ্কারি বাড়লো রবীন্দ্রনাথের "শ্যামা" নৃত্যনাট্যের এক বিকৃত রূপ পরিবেশন করে। নৃত্যনাট্যটির খানিকটা অংশ পরিবেশন করা হয় সন্তোষ সেনগুপ্তের পরিচালনায় কিন্তু অত্যন্ত যা তা ভাবে। এ ব্যাপারে একটা ধৃষ্টতাও দেখা গেল। চীনা প্রতিনিধিবৃন্দ কলকাতা থেকে ১৭ই তারিখে শান্তিনিকেতনে যাচ্ছেন এবং সেখানে তাদের 'শ্যামা' পরি-বেশন করেই আপ্যায়িত করার ব্যবস্থা হয়েছে। তা সত্ত্বেও নিউ এম্পায়ারে এ ধাষ্টামো করতে যাওয়ার মানে কি? একটি ছোট মেয়ের কথক নাচ খানিকটা দেখানো হলো। এ অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা কি জানতেন না যে প্রতিনিধি আগেই দিল্লী বম্বে প্রভৃতি স্থানে ভারতের শ্রেষ্ঠ কথক শিল্পীদের নাচ দেখে এসেছেন! কথকের সঙ্গে পূর্ব ভারতের সম্পর্কই বা কি? মঞ্জু গুপ্তকে দিয়ে ডি এল রায়ের 'আমরা এমনি এসে ভেসে যাই' গানখানি গাওয়ানো হলো। গাওয়া ভালোই হয়েছিল, কিন্তু এ আসরে এগান কেন? কীর্তন, বাউল, ভাটিয়ালি, টপ্পা, কবিগান, গম্ভীরা প্রভৃতি বাঙলা, আসাম, উড়িষ্যা, বিহারের কতো রকমেরই তো গান ছিল। অনাদিপ্রসাদ ও সম্প্রদায়ও নেহাৎই ধাষ্টামোর পরিচয় দিলেন ভারত নাট্যম, পশ্চিমঘাটার জেলে-দের নাচ, কাঠিওয়াড়ি নাচ প্রভৃতি পরি-বেশন করে এবং সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার যে দলটি কর্তৃক লোকনৃত্য পরিবেশন করা হবে বলে প্রোগ্রামে ছাপিয়ে দিয়েও তার মধ্যে দিব্যি ভারত নাট্যম চালিয়ে দেওয়া হলো!

*   *

এই অনুষ্ঠানটির মধ্যে অতিথি চীনা প্রতিনিধিদের অজ্ঞতার সুযোগ পূর্ণ-মাত্রায় গ্রহণ করা হয়েছে। তাড়াতাড়িতে অনুষ্ঠানসূচী প্রণয়ন করতে হয়েছে বলে অমন কেলেঙ্কারি ঘটে গিয়েছে বললে সে-ওজর টিকতে পারে না। কারণ চীনারা এসেছেন মাসাধিককাল পূর্বে এবং তখনই এদেশে তাদের অনুষ্ঠানগুলি ছকে নেওয়া হয়েছে। কাজেই এমনিধারা একটা যা-তা অনুষ্ঠান পরিবেশনের পিছনে উদ্যোক্তাদের দারুণ অশ্রদ্ধার মনোভাবই প্রকটিত হয়ে উঠেছে—অশ্রদ্ধা যেমন সম্মানিত চীনা প্রতিনিধিদের সম্পর্কে প্রকাশ পেয়েছে, তেমনি প্রকাশ পেয়েছে পূর্বভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের প্রতি। মণিপুরী, রাইবেঁশে, বাউল প্রভৃতি কি এতোই অপাঙক্তেয়? অথচ শুনি তো লোক-নৃত্য ও গীতের প্রচারে ও পৃষ্ঠপোষকতার জন্য

পশ্চিমবঙ্গ প্রচার অধিকর্তার অধীনে একটা [illegible] বিভাগই আছে, এবং আরও শোনা গেল নিউ এম্পায়ারের অনুষ্ঠানটি একরকমভাবে সেই বিভাগেরই পরিচর্যায় হয়েছে। তা সত্ত্বেও যে কেন অমন একটা বিশ্রী নিস্পৃহ অনুষ্ঠান পরিবেশিত হতে পারলো তা ভেবে বুঝে ওঠা যায় না। কি বাজে জিনিস পরিবেশন করা হয়েছে চীনারা তা হয়তো বুঝতে পারলেন না, তবে নিশ্চয়ই এই ধারণা নিয়ে গেলেন যে পূর্ব ভারতের বিশেষ কোন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নেই; উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের জিনিস ধার করেই পূর্ব ভারতের চলে এবং তারই প্রমাণ তারা পেলেন সেদিন ভারত নাট্যম, কথক ইত্যাদি দেখে। অনুষ্ঠানে একটিমাত্র ভালো জিনিস যে ছিল শ্যাম গাঙ্গুলীর সরোদ, তাও পূর্ব-ভারতের নয়। পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলিতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের কতো রকমের বাজনা রয়েছে, কিছু তাদের দেখানো হলো না। অথচ যা দেখানো হলো সেই সবই পূর্ব ভারতীয় বলেই জেনে গেলেন চীনা প্রতিনিধিবৃন্দ। কে দায়ী এর জন্যে?

সাহিত্যিকদের অভিনয়

নাটক উপন্যাস প্রভৃতি উপাদান যারা অভিনয়ের জন্য জুগিয়ে আসছেন, মঞ্চে পরিবেশন করার জন্য অভিনয়ের চরিত্র যারা সৃষ্টি করে আসছেন তাদের নিজেদেরকে বিভিন্ন চরিত্রে মঞ্চের ওপরে অভিনয় করতে কেমন দেখায় এটা অবশ্যই কৌতূহলোদ্দীপক। গত ৩১শে জানুয়ারী ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে সব-পেয়েছির আসরের বার্ষিক সম্মেলনে ভিড়ও হয়েছিল প্রচণ্ড। অভিনয়ের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল 'খ্যাতির বিড়ম্বনা' নামক একখানি স্ত্রীভূমিকা বর্জিত নাটিকা। রবীন্দ্রনাথের গল্পের ভাব অনুসরণ করে নাটিকাখানি রচনা করেন নন্দগোপাল সেনগুপ্ত। শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মনোজ বসু, সুবোধ ঘোষ, সাগরময় ঘোষ, নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, নরেন্দ্র দেব, পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়, পঙ্কজ দত্ত, ফণী পাল, সুনির্মল বসু, দিলীপ দাশগুপ্ত, অখিল নিয়োগী, ক্ষিতীশ বসু, হরেন ঘটক, ধীরেন বল প্রভৃতি সাহিত্যিক ও চিত্রশিল্পীর সঙ্গে পেশাদার অভিনেতা একমাত্র ছিল শ্রীমান সুখেন। নাট্যকার শচীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছিলেন স্মারক। জব্দ করার জন্য একজনের নামে দানসত্র খোলার বিজ্ঞপ্তি কাগজে ছাপিয়ে তাকে বিড়ম্বিত করে তোলার এই নাটিকাখানি এমনিতে কিছুই নয়, আর কয়েকটি চরিত্র ছাড়া সবই দু'এক লাইনের। তবে সাবলীল অভিনয়ে প্রহসন জমে ওঠে। তাছাড়া শৈলজানন্দ, ফণী পাল, নরেন্দ্র দেব, অখিল নিয়োগী প্রভৃতিরা রীতিমতো অভিনয় দক্ষতার পরিচয়ও দান করেন। দেখা গেল সাহিত্যিকরা চরিত্র সৃষ্টি করে তাকে রূপায়িত করারও ক্ষমতা রাখেন।

খেলার মাঠে

একলব্য

ব্যায়ামানুশীলন ও শরীর চর্চা খেলাধুলার গণ্ডির মধ্যে আসে কিনা জানি না। তবে খেলার সঙ্গে 'ধুলো' কথাটি যদি অবিচ্ছেদ্য হয়, তবে ব্যায়ামানুশীলন ও শরীরচর্চা খেলাধুলোর আওতায় আসে বৈকি। কারণ ধুলো না হলে খেলা হয় না। খেলতে গেলেই গায়ে ধুলো মাখতে হয়। তাই খেলাধুলো কথাটি ক্রীড়ানুষ্ঠানের ব্যাপক অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সুতরাং ব্যায়ামানুশীলন ও শরীরচর্চা খেলাধুলোরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্যায়ামানুশীলন ও শরীরচর্চাকে খেলাধুলোর প্রথম সোপানও বলা যেতে পারে। কারণ স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ না হলে কোন খেলাতেই পারদর্শী হওয়া যায় না, আশানুরূপ সাফল্য লাভও কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। সুস্বাস্থ্য এবং দৈহিক পটুতা উন্নত ক্রীড়াকুশলতা আয়ত্বের প্রধান এবং পরম সহায়ক, জাতীয় সম্পদও বটে।

সম্প্রতি লেক ময়দানে পশ্চিমবঙ্গ শারীর শিক্ষা মণ্ডলের উদ্যোগে অখিল ভারত শারীর শিক্ষা সম্মেলনের দশ দিনব্যাপী যে অধিবেশন হয়ে গেল, ভারতের ক্রীড়ামানের উন্নতি এবং জাতির শক্তি সঞ্চয়ের দিক দিয়ে এর প্রতিক্রিয়া সুদূরপ্রসারী। একদিক দিয়ে এ অনুষ্ঠান ভারতের জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানেরও উপরে স্থান পাবার যোগ্য। তাই পরম নৈষ্ঠিক শিক্ষাবিদ মনীষী স্যার যদুনাথ সরকার সম্মেলনের উদ্বোধন করতে এসে বলেছিলেন—"দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত যুবকদের মধ্যে যে প্রেরণা যে অটুট সংকল্প লক্ষ্য করেছিলাম, আজ স্বাধীনতা রক্ষার জন্য আর এক দল যুবকের মধ্যে সেই সংকল্প সেই প্রেরণা লক্ষ্য করছি।" শারীর শিক্ষা সম্মেলনে আগত বহু সুধীজন এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জিও জাতির স্বাস্থ্যমান উন্নয়ন প্রচেষ্টায় উৎসর্গীকৃতপ্রাণ যুবকদের ঐকান্তিক আগ্রহ দেখে ঐ এক কথাই ব্যক্ত করে গেছেন।

• • •

দেশের তরুণ ও যুবশক্তিকে শারীর শিক্ষায় উন্নত, নৈতিক চরিত্রে দৃঢ়, নিয়মানুবর্তিতায় অটল এবং জাতীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করবার মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে বঙ্গীয় প্রাদেশিক জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সঙ্ঘ বহু দিন ধরে চেষ্টা করে আসছে। লুপ্তপ্রায় জাতীয় খেলাধুলোর পুনরুদ্ধার ও প্রসারকল্পে যুদ্ধ-প্রাক্কালে এই সঙ্ঘটির সূচনা। রাজনৈতিক বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্ঘের কর্মধারার বিস্তৃতি। জাতীয় চরিত্রের সমস্ত ত্রুটি দূর করা, জাতিকে শক্তিশালী, কর্মঠ ও নিয়মানুবর্তী করে গড়ে তোলা, দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য কর্মী সৃষ্টি করা এবং জনসাধারণের মধ্যে সংগঠনমূলক কর্মপ্রচেষ্টার সাহায্যে নবচেতনার সৃষ্টি করাই বর্তমানে সঙ্ঘের উদ্দেশ্য ও পরিকল্পনা। শিবিরকে সঙ্ঘ এই [illegible]ত শিক্ষা দানের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করেছে। তাই প্রতি বছরই পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রাদেশিক শিক্ষা শিবির স্থাপিত হয়ে থাকে সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত শত শত যুবককর্মী শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্রছাত্রী এরকম ৩০ বার শিবির জীবনযাপন করেছেন। এ যেন সনাতন ভারতের বর্ণাশ্রম ব্যবস্থা। সামরিক অনুশাসন ও নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে ব্যায়ামানুশীলন, শরীরচর্চা, নৈতিক শিক্ষা, কর্মঠ, বিনয়ী, সদাচারী ও সত্যাশ্রয়ী হবার সাধনা। অখিল ভারত শারীর শিক্ষা সম্মেলনের সঙ্গে সঙ্গেই এবার প্রাদেশিক শিক্ষাশিবির স্থাপিত হয়। এবারকার শিবিরে যোগদানকারী নয়শ শিক্ষার্থীর মধ্যে অধিকাংশই এসেছিল গ্রামাঞ্চল থেকে। শহরের জটিল জীবনের সঙ্গে পরিচয় ছিল না অনেকেরই। পল্লীমায়ের সরল ছেলে এরা। বিউগিলের ভেরী শব্দে ঘুম ভেঙেছে ভোর পাঁচটায়। জাতীয় সঙ্গীতের ঐক্যতানের মধ্যে অভিবাদন জানিয়েছে ভারতমাতাকে। সারাদিন হৈ হল্লা, সামরিক কুচকাওয়াজ, ব্যায়াম, রাইফেল ড্রিল, ব্রতচারী নৃত্য, সামরিক শিক্ষা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সময় কাটিয়েছে, রাত্রিতে শয্যা গ্রহণ করেছে 'ধনে ধান্যে পুষ্পে ভরা' সঙ্গীতের সুরের মধ্যে। 'বিউগিলের শব্দে আলোকনগরীর আলো নিভে গেছে। ঘুমিয়ে পড়েছে সবাই।' কবির ভাষায় তারা 'বিউগিলের' ডাকে ঘুমিয়ে পড়ে 'বিউগিলের' ডাকে জাগে। শিবির জীবনের এ এক চমৎকার অভিজ্ঞতা। সংগঠন ও শৃঙ্খলাপরায়নের কাজে শিবির-জীবনের দশ দিনের শিক্ষা নিশ্চয়ই যথেষ্ট নয়, কিন্তু কল্যাণধর্মী এই মহৎ প্রচেষ্টা বাঙ্গলার গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে পরিব্যাপ্ত হলে দেশ ও জাতির কল্যাণ সাধিত হবে সন্দেহ নেই।

• • •

প্রাদেশিক শিক্ষা শিবিরের কথা ছেড়ে এখন আসা যাক অখিল ভারত শারীর শিক্ষার মধ্যে। বস্তুত অখিল ভারত শারীর শিক্ষা সম্মেলনকে সম্মেলন না বলে মহা-সম্মেলন বলাই উচিত। এখানে না এসেছিলেন এমন প্রদেশের লোক নেই। জাতির স্বাস্থ্যোন্নয়ন প্রচেষ্টায় সব রাজ্যের সরকারই উদগ্রীব, তাই সমস্ত রাজ্য সরকারই পাঠিয়ে দিলেন তাদের স্বাস্থ্য উপদেষ্টাকে। এসেছিলেন বিভিন্ন রাজ্যের সরকারী ব্যায়াম শিক্ষা কলেজের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকবৃন্দ, প্রখ্যাত ব্যায়ামবিদ ও শারীর শিক্ষাবিদেরা। পাঞ্জাব দ্বিখণ্ডিত, সিন্ধু পররাষ্ট্রভুক্ত। তবুও এসেছিলেন পাঞ্জাবের প্রতিনিধি, সিন্ধুর ভারত আশ্রয়ী ব্যায়ামবীর। পাঞ্জাব সিন্ধু ছাড়া আর এসেছিলেন গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকলবাসী। বঙ্গ তো আহ্বায়ক। তার দ্বারে আজ সবাই অতিথি। লেক ময়দানের শ্যামল শোভায় তাঁবুর ছাউনী। তাবু আর তাবু। সারি সারি

পশ্চিমবঙ্গের সেচ-মন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি ব্যায়ামনগরে সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্টেডিয়ামের উদ্বোধন করছেন
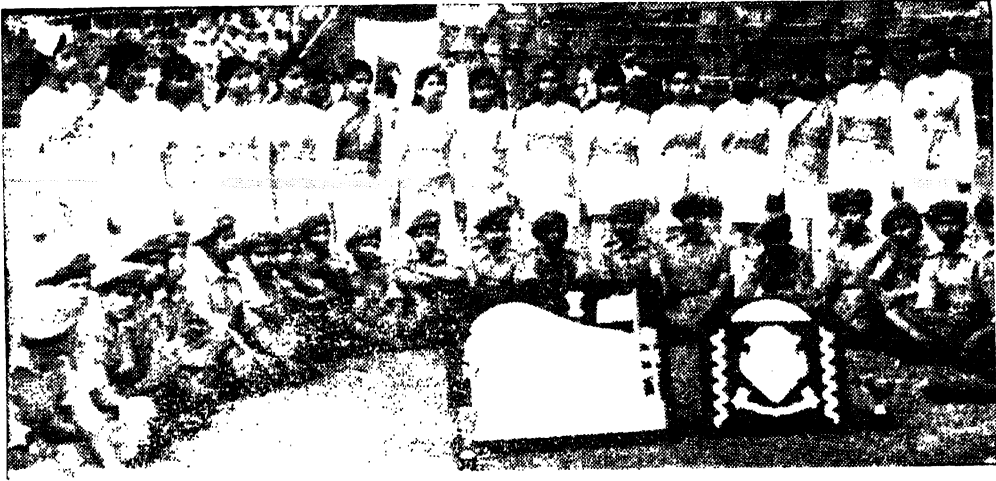
ব্যায়ামনগরের সুরেশচন্দ্র মজুমদার স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কুচকাওয়াজ প্রতিযোগিতার যে আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে উলুবেড়িয়া হাই স্কুল প্রথম স্থান অধিকার করে বালক বিভাগের পুরস্কার প্রফুল্লকুমার সরকার স্মৃতি শীল্ড এবং প্রেসিডেন্সী গার্লস স্কুল বালিকা বিভাগের পুরস্কার গণপতি স্মৃতি শীল্ড লাভ করে

তাবু, অভ্যর্থনা সমিতির অফিস, অনুসন্ধান অফিস, সম্মেলন মণ্ডপ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রেক্ষাগৃহ, ক্রীড়াঙ্গন, সুসজ্জিত সভামণ্ডপ, আহারের স্থান, রন্ধনশালা, অস্থায়ী পোস্ট অফিস, হাসপাতাল, টেলিফোন ঘর, ক্যান্টিন, নানা উপচারে সাজান বিপণীশ্রেণী। সবে মিলে এক বিরাট তাবুনগরী, নাম 'ব্যায়ামনগর'। শারীর শিক্ষা সম্মেলন ও প্রাদেশিক শিক্ষা শিবিরে সমাগত আড়াই হাজার নওজোয়ান নওযুবতীর এক সঙ্গে আহারবিহার, শয়ন, ভ্রমণ। নিত্যকার খরচ ১০ মণ চাল এবং ঐ পরিমাণ আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র। ১৩জন পাচক ও ১৪জন সহকারী রন্ধনশালায় কর্ম ব্যস্ত। এ যেন এক রাজসূয় যজ্ঞ। কিন্তু রাজা কোথায়? যিনি রাজা তিনিই ভৃত্য, যিনি প্রজা তিনিই প্রহরী। তাই রাজসূয় না বলে প্রজাসূয় যজ্ঞ বলাই ভাল। পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট, মারাঠা, দ্রাবিড়, উৎকল বঙ্গের মধ্যে গড়ে উঠেছে এক আত্মীয় সম্বন্ধ সর্বভারতীয় ভিত্তিতে। এ আত্মীয়তা ভারতের জাতীয় ঐক্যের প্রয়োজনে, এ আত্মীয়তা, এ সমন্বয় ভারতের জাতীয় স্বাস্থ্যোন্নয়নের প্রয়োজনে। আরম্ভ হল সম্মেলন।

* * *

"স্বাধীন ভারতে জাতির শারীর শিক্ষার ক্রম নির্ধারণের সত্যই উপযুক্ত সময় এসেছে। শুধু শিক্ষা, সংস্কৃতি ও কৃষ্টির মাপকাঠিতে জাতিকে বিচার করলে সেই জাতির সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না। জাতির স্বাস্থ্যশক্তিও এই বিচার বিশ্লেষণের পর্যায়ভুক্ত। অন্য যে কোন সম্পদে গরীয়ান হয়েও জাতি যদি ক্ষীণ ও দুর্বল হয়, তবে তার বহুমূল্য সম্পদও ব্যর্থ হতে বাধ্য। কেবলমাত্র লড়াই করা ও শত্রুর হাত থেকে নিজ দেশকে প্রতিরোধ করার জন্য শারীর শিক্ষার প্রয়োজন। একথা মনে করলে শারীর শিক্ষার ভুল ব্যাখ্যা করা হবে। জাতিকে সুগঠিত, উন্নততর এবং ঐশ্বর্যময় করে গড়ে তোলার কাজে শারীরশিক্ষার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। বিশ্বের আজ প্রতিটি রাষ্ট্রই এব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রেখে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু ভারত এব্যাপারে এখনও নির্বিকার ও নির্লিপ্ত। আজ আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে এক হকি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে ভারত পেছিয়ে রয়েছে শারীরিক যোগ্যতার অভাবে, শ্রমের ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের তুলনায় ভারতের স্থান অতি নগণ্য, কিন্তু তবুও আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের দৃষ্টি এদিকে পড়েনি। আজকের পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নবভারত গঠনের কাজে বিপুল শক্তি, প্রচেষ্টা ও অর্থ নিয়োজিত হচ্ছে, কিন্তু জাতির কল্যাণধর্মী শারীর শিক্ষার ব্যাপক উন্নতি ও প্রসারের জন্য কোন সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা হয়েছে বলে জানা যায়নি। বাস্তবিক পক্ষে শারীর শিক্ষা ব্যাপারে দেশের সাধারণ অধিবাসীর মধ্যে একটা নির্লিপ্ত ভাব রয়ে গেছে। অবশ্য এর জন্য যথোপযুক্ত সরকারী উদ্যমের অভাব এবং শারীর শিক্ষা সম্বন্ধে ভ্রান্ত ধারণাই মুখ্যত দায়ী। সাধারণ লোকের
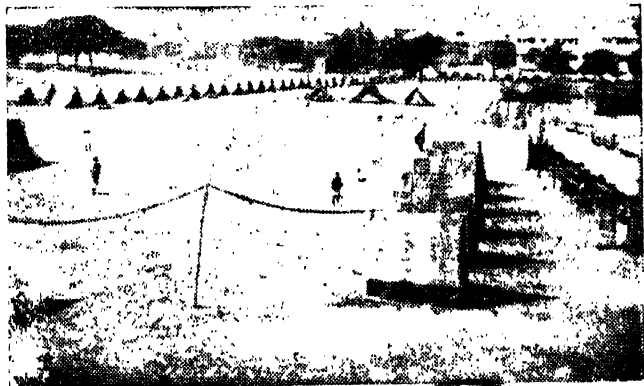
লেক ময়দানে ব্যায়ামনগরীর একাংশ
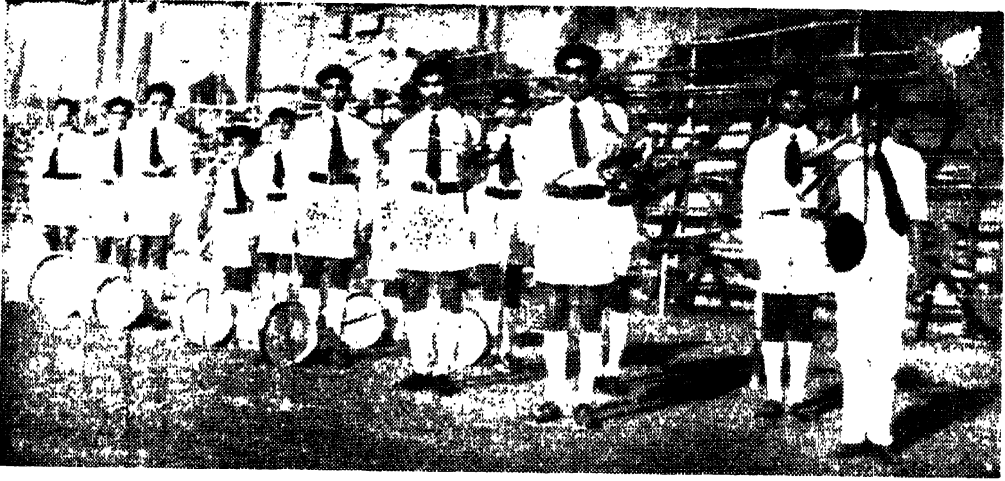
ব্যায়ামনগরে পশ্চিমবঙ্গ সামরিক বাদ্য প্রতিযোগিতায় বিজয়ী বরাহনগর জাগ্রত সংঘের সভ্যবৃন্দ

ধারণা যে, পেশীবহুল ও সুগঠিত দেহের অধিকারীদের মধ্যেই শরীরচর্চা ও শারীরশিক্ষা সীমাবদ্ধ। অনেকে আবার শারীরশিক্ষার বহুল প্রচার ও প্রসারের কথা ভেবে আশঙ্কিত হয়ে ওঠেন; তাঁদের ধারণা এ ব্যাপারে উন্নতি ঘটলে গুণ্ডামী ও রাহাজানি বেড়ে যাবে। আজ একথা বলবার সময় এসেছে যে, শারীর শিক্ষা সাধারণ শিক্ষা থেকে মোটেই পৃথক নয়। দৈহিক উন্নতি ও পেশীর স্ফীতির কাজে শারীরশিক্ষার একমাত্র প্রয়োজন নয় পক্ষান্তরে উদার, উন্নত মন, সুদৃঢ় চরিত্র ও সুশৃঙ্খল করে গড়ে তোলার ব্যাপারে জাতীয় জীবনে শারীরশিক্ষার বিশেষ সত্ত্বা রয়েছে।" গত ২৪শে থেকে ৩০শে ডিসেম্বর লেক ময়দানে নিখিল ভারত শারীরশিক্ষা সম্মেলনে একথাই বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ইতিপূর্বে এই সম্মেলনের প্রথম ও দ্বিতীয় অধিবেশন যথাক্রমে অমরাবতী ও পুণায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু ভারত 'প্রজাতন্ত্র' লাভ করার পর এই প্রথম সম্মেলন। সেই হিসাবে এই সম্মেলনের তৃতীয় অধিবেশন বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে। জম্মু-কাশ্মীর থেকে শুরু করে সুদূর আন্দামান নিকোবর পর্যন্ত ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের যেসব প্রতিনিধি এসেছিলেন, সাত দিনব্যাপী সম্মেলনে তারা দেশের শারীরশিক্ষার নানা সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাস্থ্যে ও শারীরশিক্ষায় জাতির শোচনীয় অবনতি পর্যালোচনা করে সম্মেলন অবিলম্বে শারীরশিক্ষাকে অন্যতম পাঠ্যবিষয় হিসেবে সাধারণ শিক্ষার অন্তর্ভূক্ত করতে পরামর্শ দেয়। দেশের প্রতিটি অধিবাসীর জন্যই শারীরশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা আছে, সেইমত বিভিন্ন বয়সভেদে সহজ গ্রহণযোগ্য বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে শারীরশিক্ষাদানের বহু পরিকল্পনা এই সম্মেলনে গৃহীত হয়।

শিশু ও বালকরাই জাতির ভবিষ্যত, এদের এখন থেকেই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে শারীরশিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে পারলে সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশা পোষণ করা নিরর্থক হবে না। সেই হিসেবে বিদ্যালয়ই শারীরশিক্ষা বিস্তারের প্রথম ও প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হওয়া প্রয়োজন। প্রাথমিক শিক্ষার সঙ্গে শারীরশিক্ষাকেও বাধ্যতামূলক করার জন্যও এই সম্মেলনে দৃঢ় অভিমত প্রকাশ পায়। এছাড়া শারীরশিক্ষা ও দৈহিক যোগ্যতার ক্ষেত্র বিস্তার, আকর্ষণীয় উপায়ে শারীরশিক্ষায় জনসাধারণকে আগ্রহশীল করে তোলা, বিভিন্ন পেশা, বৃত্তি ও অবস্থাভেদে শারীরশিক্ষার উন্নতিবিধান প্রভৃতি বহু গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সম্মেলনে আলোচনা হয়। কেবলমাত্র আলোচনা ও বক্তৃতাতেই সম্মেলনের কাজ সীমাবদ্ধ ছিল না। সম্মেলনের বিরাট এলাকার একাংশে একটি প্রদর্শনী ও দেশনায়ক স্বর্গত সুরেশচন্দ্র মজুমদারের স্মৃতির উদ্দেশ্যে গঠিত 'সুরেশচন্দ্র স্টেডিয়াম' সম্মেলনের আকর্ষণ অনেক বাড়িয়ে তোলে। যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, জার্মানী, যুক্তরাজ্য, ইস্রায়েল, সুইডেন, হল্যান্ড প্রভৃতি দেশের শারীরশিক্ষার ক্রমবর্তনের ইতিহাস, খেলাধুলো ও শারীরচর্চা সম্বন্ধীয় আলোকচিত্র, পুস্তিকা, চার্ট প্রভৃতি প্রদর্শনীটিকে বিশেষ শিক্ষনীয় করে তোলে। এছাড়াও ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের, পণ্ডিচেরী আশ্রমের শারীরশিক্ষা কেন্দ্রের বহু মূল্যবান ছবি, পুস্তক প্রদর্শনীতে স্থান পায়। কলিকাতা পৌর প্রতিষ্ঠানের জনস্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক জনস্বাস্থ্য সম্পর্কীয় মডেল, চিত্র এবং কলিকাতা পুলিশের দুর্নীতি দমন বিভাগ কর্তৃক জাল ঔষধ ও ভেজাল খাদ্য নিরোধব বহু শিক্ষনীয় বিষয় প্রদর্শিত হয়। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সম্মেলনের ক্রীড়াপ্রাঙ্গণ 'সুরেশচন্দ্র স্টেডিয়ামে' অনুষ্ঠিত ব্যায়াম, ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শনে বিভিন্ন রাজ্যের শরীরচর্চাবিদ খেলোয়াড়গণ অংশ গ্রহণ করেন। এর মধ্যে বোম্বাইয়ের কান্দুভালী ফিজিকাল কালচার ইনস্টিটিউট, বাঙ্গালোরের রিনাউনড্ স্টেট ফিজিকাল কালচার ইনস্টিটিউট, উড়িষ্যার কলিঙ্গ জিমন্যাসিয়ম কলিকাতা পুলিশের ঘোড়সওয়ার বাহিনী চাঁপাতলা জিমন্যাস্টিক ক্লাব প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের ক্রীড়াকৌশল বিশেষ দর্শনীয় হয়।

সম্পূর্ণভাবে রাষ্ট্রায়ত্ত না হলে এই জাতীয় অভাবের শেষ হয়ত হবে না, কিন্তু জাতির মহৎ কল্যাণ কামনায় নিতান্ত নিঃস্বার্থভাবে নিয়োজিত উদ্যোগী প্রতিষ্ঠানের এই বেসরকারী উদ্যম অবশ্যই প্রশংসা পাবার যোগ্য।

* * *

নববর্ষ উপলক্ষে বিশেষ গুণসম্পন্ন কৃতী পুরুষদের খেতাব বিতরণ ব্রিটীশ সরকারের চিরাচরিত বিধি। শিক্ষা, সংস্কৃতি, রাজনীতি, সমাজসেবা, সামরিক কীর্তি, সাহিত্য, কলা, বিজ্ঞান এমন কি খেলাধুলো বিষয়েও যারা দেশ ও জাতির মুখ উজ্জ্বল করেন, ব্রিটীশ এবং ব্রিটীশ কমনওয়েলথভুক্ত দেশের সেইসব সম্মানিত ব্যক্তিরাই নববর্ষের খেতাব লাভের অধিকারী হন। খেলাধুলোই আমাদের আলোচ্য বিষয়, সুতরাং ইতিপূর্বে যারা ক্রীড়ানৈপুণ্যে ব্রিটীশ খেতাব লাভ করেছেন, তাদের কথাই উল্লেখ করছি। ইতিপূর্বে বিশ্ববন্দিত ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্রাডম্যান ব্রিটীশ সরকারের কাছ থেকে স্যার খেতাব লাভ করেছেন। বিশ্ববরেণ্য মহিলা এ্যাথলীট মার্জোরি জ্যাকসন

এবং নিউজিল্যান্ডের মহিলা এ্যাথলীট জভেটি . য়ামসও ব্রিটীশ খেতাবে সৌভাগ্যবতী। জামাইকার অলিম্পিক দৌড়বীর আর্থার উইণ্ট এবং অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা ক্রিকেট খেলোয়াড় লিণ্ডসে হ্যাসেটের ক্ষেত্রেও ব্রিটীশ সরকার খেতাব দানে কার্পণ্য করেননি। গতবারও তারা হিমালয় বিজয়ী বীর তেনজিং, সুদক্ষ 'জকি' গর্ডন রিচার্ডস এবং যশস্বী ক্রিকেট খেলোয়াড় জ্যাক হবসকে 'স্যার' খেতাবে ভূষিত করেছেন। এবারও দেখছি ব্রিটীশ খেতাবপ্রাপ্ত ভাগ্যবানদের নামের তালিকায় অস্ট্রেলিয়ার দৌড়বীর জন ল্যাণ্ডির নাম। কিন্তু ইংলণ্ডের দৌড়বীর ও বছরের সেরা স্পোর্টসম্যান রজার ব্যানিস্টারকে কোন উপাধিতে ভূষিত করা হয়নি। মাইল দৌড়ে ব্যানিস্টারের অক্ষয় কীর্তির প্রতি ব্রিটীশ সরকারের এই ঔদাসীন্য ইংলণ্ডের ক্রীড়ারসিকদের মনোকষ্টের কারণ হয়েছে। ব্যানিস্টারের প্রতিদ্বন্দ্বী যিনি নাকি ব্যানিস্টারের পরে মাইল দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড করেছেন, তিনি এম বি ই উপাধিতে ভূষিত হলেন আর ব্যানিস্টার পেলেন না কোনই খেতাব। ব্যানিস্টার না হয় না পেলেন, কিন্তু ল্যাণ্ডি খেতাব পেলেন কেন? এ যে ব্রিটীশ ক্রীড়ারসিকদের 'কাটা ঘায়ে নুনের ছিটে'। তবে ক্রীড়ারসিকদের দুঃখ করবার কিছুই নেই। চিকিৎসা বিদ্যার ছাত্র ব্যানিস্টার মাইল দৌড়ে অসাধ্য সাধন করবার কিছু পরেই চিকিৎসা বিদ্যার পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে 'ডাক্তার' উপাধি লাভ করেন। বছরের সেরা 'স্পোর্টসম্যানের' সম্মানও লাভ করেছেন ডাক্তার ব্যানিস্টার। সম্প্রতি তিনি স্পোর্টস ছেড়ে আরম্ভ করেছেন ডাক্তারী। রানিং শুর পরিচর্যা ছেড়ে পরিচর্যা আরম্ভ করেছেন 'স্টেথিসস্কোপের'। ব্যানিস্টারের চিকিৎসক জীবন যদি ক্রীড়াক্ষেত্রের কীর্তি ও খেতাবকে পিছনে রেখে অধিকতর প্রতিভাদীপ্ত হয়ে ফুটে ওঠে, তাতে ইংলণ্ডবাসী উপকৃতই হবে।

* * *

করাচীতে ভারত ও করাচী একাদশের খেলাটি অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। পাকিস্থান সফরে এইটি ছিল ভারতের তৃতীয় খেলা। চট্টগ্রামে প্রথম খেলায় জয়লাভ করবার পর ভারত ঢাকার টেস্ট ও করাচীর তিন দিনব্যাপী খেলা পর পর অমীমাংসিতভাবে শেষ করলো। করাচীতে ভারতের ব্যাটসম্যানরা খুবই নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়ে তিনজন সেঞ্চুরী করেছেন। অধিনায়ক মানকড় করেছেন ১৩০ রান আর পাঞ্জাবী করেছেন ১১১। মঞ্জরেকার ১০৩ রান করেও নট আউট আছেন। দুই দিনে করাচীর বোলাররা ভারতের চারজন খেলোয়াড়ের বেশী আউট করতে পারেননি। করাচীর বিরুদ্ধে ভারতের চটকদার ব্যাটিং দেখে সেই নায়েব ও জমিদারের গল্প মনে পড়ছে। জমির দখল নিয়ে দুই জমিদারের মধ্যে গণ্ডগোল। দুইজনই লাঠিয়াল যোগাড় করেছেন, জমি দখল করতে হবে। এক জমিদারের নায়েব বহু অর্থ দিয়ে এক সর্দার লাঠিয়াল এনে বললেন—'বাবু এ একা একশ' লোকের মহড়া দিতে পারে, ভয় নেই।' জমিদার বললেন, 'ভয় নেই, বেশ ভাল কথা, কিন্তু।' 'কিন্তু কি বাবু' 'ভাবছি ও পক্ষও যদি ওর মত লাঠিয়াল আনে, তবে ও ক'জনের মহড়া দিতে পারবে'? নায়েব মাথা চুলকিয়ে বললেন, 'তবেই তো ভাবনার কথা'। তা পাকিস্থানেও ভারত সব জায়গায় চটকদার খেলা দেখাবে। কেবল টেস্টের বেলায় ভাবনার কথা। সেখানে প্রায় সমানে সমানে লড়াই।

দেশী সংবাদ

৩রা জানুয়ারী—রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী-জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারস্কোয়েল্ডে আজ সকালে নয়াদিল্লীতে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর সহিত দুই ঘণ্টাকাল আলোচনা করেন এবং অপরাহ্নে পিকিং যাত্রা করেন।

যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো আজ যুগোশ্লাভ রণতরী 'গালেব'যোগে কলিকাতা হইতে রেঙ্গুন যাত্রা করেন। মার্শাল টিটো তাঁহার ১৯ দিনব্যাপী ভারত ভ্রমণ সম্বন্ধে বলেন,—"যে নবভারত গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার রূপে দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি।"

আজ নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ পণ্ডিত গোবিন্দ-বল্লভ পন্থকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করান।

৪ঠা জানুয়ারী—বরোদায় ডাঃ শিশির-কুমার মিত্রের সভাপতিত্বে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ৪২তম অধিবেশন আরম্ভ হয়। প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু অধিবেশনের উদ্বোধন প্রসংগে দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার কার্যে ঐকান্তিক আগ্রহ প্রদর্শনের জন্য বৈজ্ঞানিক, ইঞ্জিনীয়ার এবং বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের নিকট আবেদন জানান।

পূর্ববঙ্গ জিন্না আওয়ামী লীগের প্রেসিডেণ্ট মৌলানা আবদুল হামিদ ভাসানী আজ প্যারিস হইতে বোম্বাইয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলেন,—'পূর্ব পাকিস্থানে গণতান্ত্রিক শাসন প্রবর্তনের জন্য আমি অক্লান্তভাবে সংগ্রাম চালাইয়া যাইব'।

৫ই জানুয়ারী—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আমেদাবাদে এক বিপুল জনসমাবেশে বক্তৃতা-কালে বলেন,—'ভারত-পাকিস্থানের অমীমাংসিত সমস্যাসমূহের সমাধানের জন্য অবস্থা বর্তমানে পূর্বের যে কোন সময়ের তুলনায় বেশী অনুকূল বলিয়াই আমি মনে করি'।

কলিকাতায় পশ্চিমবঙ্গের সংসদ সদস্যদের বৈঠকে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না বলেন,—'এক পশ্চিমবঙ্গেই উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য প্রায় ৫০ কোটি টাকা ব্যয় হইয়াছে। ১৯৫৫—৫৬ ও ১৯৫৬—৫৭ সালের বাজেটে প্রায় ২১ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হইবে'।

বৃটিশ বাণিজ্য দপ্তরের মন্ত্রী মিঃ এ আর ডব্লু লো আজ নয়াদিল্লীতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতাপ্রসংগে এইরূপ ইঙ্গিত দান করেন যে, প্রস্তাবিত ইস্পাত কারখানা নির্মাণে ভারত সরকার বৃটেনের সাহায্য গ্রহণ করিবেন।

নবগঠিত বিহার প্রদেশ কমিটির সভায় এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, ভাষাগত বা যে কোন কারণেই হউক বিহারের কোন অংশ পশ্চিমবঙ্গ বা উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত করা চলিবে না।

সাপ্তাহিক সংবাদ

৬ই জানুয়ারী আজ কলিকাতা কর্পো-রেশনের কেন্দ্রীয় ভবনে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে প্রজাতন্ত্রী চীন হইতে আগত চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিমণ্ডলীকে নাগরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কুষ্ঠরোগ নিয়ন্ত্রণ কমিটি যে রিপোর্ট প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহাতে কুষ্ঠ রোগীদের বিশেষতঃ ঐ রোগগ্রস্ত ভিখারীদের বাধ্যতামূলকভাবে পৃথকীকরণের ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

৭ই জানুয়ারী—ভারত সরকার অবিলম্বে প্রতি পাউণ্ড চায়ের রপ্তানি শুল্ক ৭ আনা হইতে বাড়াইয়া দশ আনা করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

পেপসুর মুখ্যমন্ত্রী কর্নেল রঘুবীর সিং দীর্ঘকাল রোগভোগের পর পাতিয়ালায় পরলোকগমন করিয়াছেন।

৮ই জানুয়ারী—নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের নেতৃবৃন্দ ফরোয়ার্ড ব্লক ভাঙ্গিয়া দিয়া উহা কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। আজ নয়াদিল্লীতে ফরোয়ার্ড ব্লকের ওয়ার্কিং কমিটির অধিবেশনে কংগ্রেসের সহিত ফরোয়ার্ড ব্লকের মিলন অনুমোদন করিয়া সর্বসম্মতভাবে একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেসের কার্যপরিচালনা কমিটির অধিবেশনে স্থির হইয়াছে যে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই দেশের লক্ষ্য বলিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু সংসদে যে ঘোষণা করিয়াছেন, কংগ্রেসের অর্থনীতি সংক্রান্ত নীতিরও উহাই লক্ষ্য বলিয়া ঘোষণা করিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আগামী আবাদী অধিবেশনে এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইবে।

৯ই জানুয়ারী—ভারতে সংবাদপত্র শিল্পের অবস্থা সম্পর্কে ব্যাপক তদন্তের পর প্রেস কমিশন এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ভারতের সকল সংবাদপত্র অপেক্ষা আনন্দবাজার পত্রিকার প্রচার অধিক।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে যে সরকারী প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে, উহাতে বিশ্ব-রাষ্ট্রসমূহকে, এমন কি পরীক্ষামূলকভাবেও আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটাইবার বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২রা জানুয়ারী—পানামা সাধারণতন্ত্রের প্রেসিডেণ্ট জোসে এণ্টোনিও রেমন আজ রাত্রে মেসিনগানধারী আততায়ীর গুলীর আঘাতে নিহত হইয়াছেন।

৩রা জানুয়ারী—লণ্ডনের সরকারী মহলের সংবাদে প্রকাশ, দঃ পূর্ব এসিয়া প্রতিরক্ষা সংস্থার সদস্য আটটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রিগণ ২৩শে ফেব্রুয়ারী ব্যাংককে এক বৈঠকে মিলিত হইবেন।

আমেরিকার 'ক্রিশ্চান সায়েন্স মনিটর' পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতা মিঃ জোসেফ মার্শ লিখিয়াছেন, ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু ১৯৫৪ সালে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদ।

৫ই জানুয়ারী—গুপ্তচর-বৃত্তির অভি-যোগে কারারুদ্ধ এগারজন মার্কিন বৈমানিকের ভাগ্য সম্বন্ধে চীন সরকারের সহিত আলোচনার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারস্কোয়েল্ড আজ পিকিংয়ে পৌঁছেন। উহার দুই ঘণ্টা পর তিনি চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাইয়ের সহিত সাক্ষাৎ করেন।

বৃটিশ কূটনৈতিক মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, আগামী ২৩শে ফেব্রুয়ারী ব্যাংককে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা দেশসমূহের যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে, উহাতে যোগদানের জন্য যাইবার পথে বা প্রত্যাবর্তনকালে বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন নয়াদিল্লীতে ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন।

৬ই জানুয়ারী—প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার আজ কংগ্রেসে ঘোষণা করেন যে, এশিয়ার স্বাধীন জাতিসমূহের বিরুদ্ধে সামরিক আক্রমণ বা অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপ পরিচালিত হইলে সম্মিলিতভাবে বাধা দেওয়া হইবে। প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার কংগ্রেসের সমক্ষে তাঁহার বাৎসরিক বাণীতে এই কথা বলেন।

৭ই জানুয়ারী—দক্ষিণ আফ্রিকা সরকার দক্ষিণ আফ্রিকার ইতিহাসে সর্বাধিক বিতর্ক-মূলক পরিকল্পনার কাজ আরম্ভ করিয়াছেন। এই পরিকল্পনা হইতেছে জোহানেসবুর্গ শহরের পশ্চিমাঞ্চল হইতে প্রায় ৬০ হাজার অশ্বেতকায় অধিবাসীকে অপসারণ করিয়া শহর হইতে ছয় মাইল দূরে তাহাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা।

৮ই জানুয়ারী—সোভিয়েট সরকার ইরাকস্থ সোভিয়েট কূটনীতিক প্রতিনিধি-গণকে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়াছেন। মস্কোস্থ ইরাকী দূতাবাস ইতিপূর্বেই ইরাক সরকারের নির্দেশক্রমে বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
সংখ্যা ১২

দেশ

শনিবার
৮ মাঘ, ১৩৬১

DESH SATURDAY, 22ND JANUARY, 1955.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

সাধারণতন্ত্র দিবস

২৬শে জানুয়ারী ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস। জগতের ইতিহাসে এই দিনটি দীর্ঘদিনের পরাধীনতার বন্ধন হইতে মুক্ত জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার গৌরবময় ঐতিহ্যের দীপ্তি বহন করিয়া আনে। ১৯৩০ সালে এই স্মরণীয় দিনে ভারত স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংকল্প গ্রহণ করে, পরে বৈদেশিক শক্তির সহিত সুদীর্ঘ সংগ্রামের পর এই দিনেই ভারতে স্বাধীন সাধারণতন্ত্র শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীন ভারতের এই আত্মপ্রতিষ্ঠা প্রকৃতপ্রস্তাবে জগতের পক্ষে এক যুগান্তকারী ব্যাপার। বিশ্বের বিভিন্ন জাতি এবং মানব-সমাজের সংস্কৃতিগত সংহতির এক অভিনব ইতিহাস ইহার ফলে রচিত হইতে চলিয়াছে, একথা অস্বীকার করা যায় না। পরাধীনতা হইতে ভারতের মুক্তি এবং জনগণের অনুমোদিত স্বাধীন সাধারণতন্ত্রে তাহার আত্মপ্রতিষ্ঠার ফলে সমগ্র এশিয়ায় নূতন জীবনের সঞ্চার ঘটিয়াছে। বস্তুত এশিয়ার বিভিন্ন দেশকে অধীনতার বন্ধনে আড়ষ্ট করিয়া পাশ্চাত্ত্যের সাম্রাজ্যবাদীর দল দীর্ঘদিন শাসনের পথে নির্ম্মম এবং নিষ্ঠুর শোষণ চালাইয়াছে। ভারতই ছিল ইহাদের এই শোষণযন্ত্রের মূল ঘাটি এবং ভারতে প্রভুত্বপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরাই ছিল তাহাদের প্রধান আশ্রয়। ভারত হইতে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ শক্তি অপসৃত হওয়া, এশিয়ার অপরাপর অংশে নীতিতে পাশ্চাত্ত্য সাম্রাজ্যবাদীর শোষণ-নীতি শিথিল হইয়া পড়ে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দীর্ঘদিনের নিপীড়িত জাতিগুলি মাথা চাড়া দিয়া উঠে। ব্রহ্ম ভারতের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ স্বাধীনতা পায়। ওলন্দাজেরা ইন্দোনেশিয়া পরিত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হয়। এশিয়ার এই নবজাগরণ বিশ্ব রাজনীতির আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীরা অবশ্য তাহাদের শেষ চেষ্টা এখনও ছাড়ে নাই। কূটনীতির পথে তাহারা নূতন আকারে নিজেদের শোষণ-চক্র সম্প্রসারিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে; কিন্তু সাধারণতন্ত্রে প্রতিষ্ঠিত স্বাধীন ভারত তাহাদের সে চেষ্টার পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের নীতি মানব-মুক্তির আদর্শকে ঊর্দ্ধে তুলিয়া চলিয়াছে। স্বাধীন ভারতের ত্রিবর্ণ লাঞ্ছিত পতাকা এশিয়ার বিভিন্ন জাতিকে মুক্তির সাধনায় অনুপ্রাণিত রাখিয়াছে। আন্তর্জাতিক রাজনীতিকে মানবতাবিরোধী বিষবাষ্প হইতে বিমুক্ত রাখিতেছে ভারত। বিশ্ববিধ্বংসী মারণাস্ত্রে সজ্জিত পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগোষ্ঠীর সংঘাত-সংঘর্ষে বিশ্বব্যাপী বিপর্যয়ের আতঙ্ক বিদূরিত করিবার মহান্ ব্রত ভারত অবিচলিত নিষ্ঠার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে।

সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইবার পর অভ্যন্তরীণ উন্নয়নের পথেও ভারতের অগ্রগতি নিতান্ত সামান্য নহে। ভারতের ন্যায় বিরাট দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি অবশ্যই রাতারাতি সাধিত হইতে পারে না, তবুও এই কয়েক বৎসরে দেশ অনেকটা আগাইয়া গিয়াছে। কিন্তু জাতির অগ্রগতির নীতি যথেষ্ট ত্বরান্বিত এবং জন-জীবনে আন্তরিকতা জাগাইবার পক্ষে উপযুক্ত নয়, এই ত্রুটি আমাদের দূর করিতে হইবে। ভারতের অর্থনীতিক সমস্যার সম্যক্ সমাধান হয় নাই, শিক্ষা সম্প্রসারণের ক্ষেত্রেও দেশ এখনও পিছনে পড়িয়া রহিয়াছে, বেকার সমস্যা খুবই জটিল। কিন্তু এই সব সমস্যা আমাদের অগ্রগতির পথ প্রতিহত করিবে না, আমরা এই আশাই পোষণ করিতেছি। ফলতঃ সমস্যা জাগ্রত যে জাতি তাহার কাছেই দেখা দেয় এবং আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত জাতি অপ্রতিহত সংকল্পশীলতার পথেই তাহার সমাধান করিয়া থকে। আমরাও সেইভাবেই আমাদের জাতীয় সমস্যাসমূহের সমাধান করিব এবং সেজন্য পরের দিকে তাকাইয়া দৈন্য বাড়াইব না। আমরা আত্মসত্তার উপরেই নিজেদের ভবিষ্যৎ গড়িব, নিজেদের ঐতিহ্যের ধারা ধরিয়াই জাতির আত্মাভিব্যক্তি সবল এবং সার্থক করিয়া তুলিব। আবাদী কংগ্রেসে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ জাতির প্রতি কর্তব্য প্রতিপালনে আমাদের মধ্যে অভিনব প্রেরণা সঞ্চার করিবে। অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সর্ববিধ বৈষম্য উদার প্রাণবলে বিদূরিত করিয়া জাতি সমাজের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধনের পথে কল্যাণ রাষ্ট্র গঠনের অভিনব অধ্যায় উন্মুক্ত করিবে, এই আশাই আমরা অন্তরে পোষণ করিতেছি। সাধারণতন্ত্র দিবসে সর্বজনীন কল্যাণ সাধনে ত্যাগ এবং সেবার মহান্ আদর্শ আমাদিগকে নব সৃষ্টির উদ্যমে অনু-

প্রাণিত করুক। জাতির জনকস্বরূপে মহাত্মাজী যে আদর্শ আমাদের কাছে রাখিয়া গিয়াছেন, ভারতের অগণিত স্বদেশপ্রেমিকের শোণিতোৎসর্গে যে আদর্শের উজ্জ্বলতা সাধিত হইয়াছে সাধারণতন্ত্রের পঞ্চম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-দিবসে তাহা আমাদিগের সঙ্কল্পকে সত্য এবং ব্রতকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে শক্তি দান করুক।

নেতাজী সুভাষচন্দ্র

২৩শে জানুয়ারী ভারতের ইতিহাসে মহাস্মরণীয় দিবস। নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ইহা জন্মদিন। বস্তুত এইদিনটি শুধু ভারতের কেন, সমগ্র জগতের পক্ষে স্মরণীয় বলা চলে। যে সব পুরুষশ্রেষ্ঠের প্রচণ্ড প্রাণবীর্যে এবং মনুষ্যত্বের ঔদার্য মহিমা জগতে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছে নেতাজী সুভাষচন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যত্বের বৈভব এবং বিলাস-বৈচিত্র্যের যে বলিষ্ঠ প্রকাশ আমরা সুভাষচন্দ্রের জীবনে দেখিতে পাইয়াছি বিশ্বের ইতিহাসে ঠিক তেমনটি দুর্লভ। অনন্যসাধারণ এবং অসম সে চরিত্রের বল এবং বিক্রম। দুর্গতি ও দীর্ঘ দিনের পরাধীনতার প্রভাবে অভিভূত জাতিকে মুক্তির অমোঘ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য ভারতের পক্ষে সুভাষচন্দ্রের ন্যায় পুরুষশ্রেষ্ঠের আবির্ভাব নিতান্তই প্রয়োজন ছিল, নহিলে ভারতের মত বিশাল দেশ এবং তাহার বিরাট সংস্কৃতির অন্তঃপ্রকৃতির পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটিত না, আত্মদীপ্তি অপূর্ণ থাকিত। ভগবানেরই আশীর্বাদস্বরূপে নেতাজীকে আমরা আমাদের মধ্যে পাইয়াছি। এমন হিরণ্যবর্ণ পুরুষকে পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।

সুভাষচন্দ্র সার্থকজন্মা পুরুষ। মানব-মুক্তির মঙ্গলমন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হইয়া যে মহাব্রতে তিনি আত্মনিয়োগ করেন, তাহার ব্যর্থতা কোন দিক হইতেই সম্ভব নয়। সে অভিক্রমের নাশ নাই, প্রত্যবায়ও নাই। অক্ষয় এবং অব্যয় সে সাধনা। সে সাধনা স্বয়ং ফলরূপ; ফলের জন্য সেখানে অপেক্ষা করিতে হয় না। এই হিসাবে সুভাষচন্দ্র সিদ্ধ পুরুষ। সিদ্ধ যাঁহারা, কালের গতি তাঁহাদের মহিমা লুপ্ত করিতে পারে না। সুভাষচন্দ্রও কালাতীত প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে ভারতের স্বাধীনতার মূলে সুভাষচন্দ্রের বীর্যময় অবদানই প্রত্যক্ষভাবে কাজ করিয়াছে। বৈধী সাধনায় ভারত স্বাধীনতা লাভ করে নাই। বৈধী সাধনা বলিতে সীমাবদ্ধ বিচারের সংস্কার সম্পর্কে খুঁটিনাটি পরিপাটির প্রতি দৃষ্টি রাখার কথাই আমরা বলিতেছি। ফলের দিকে লক্ষ্য থাকিলে নৈতিক আকারে ঐ ধরণের সূক্ষ্ম বিচার বুদ্ধিকে আড়ষ্ট করে। ফলতঃ ইহা এক শ্রেণীর দুর্বলতা। এই স্তরের ঊর্ধ্বে সুভাষচন্দ্রের প্রাণশক্তি আত্মভাবনায় জাগ্রত হইয়াছিল। গীতার কর্মযোগের আদর্শে তাঁহার জীবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। এজন্য তাঁহার শক্তি কেহ প্রতিহত করিতে পারে নাই। দূরকে তিনি নিকটে লইয়া আসিয়াছিলেন—তিনি অঘটন ঘটাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

অবিতর্কিত এমন আত্মোপলব্ধির বলেই সুভাষচন্দ্র ভারতের বুকে দীর্ঘদিনের প্রতিষ্ঠিত পাকা ঘাটির গোড়ায় ঘা দিয়েছেন, কোন আটসাট আর টিকে নাই। বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদের কেল্লা তাসের ঘরের মতই ভাঙ্গিয়া পড়ে। ভারতের স্বাধীনতা লাভের গোড়ার কথা ইহাই—অন্য দিকের কাজকে ইহার পরিপূরক হিসাবেই ধরিতে হয়। বুদ্ধি বিচার এবং যুক্তির মূল্য যত কিছুই থাকুক না কেন, মানবধর্মের সমগ্রভাবে উজ্জীবন এবং অভ্যুত্থানের মূলে তাহা বড় কথা নয়। সমগ্রের জন্য তপস্যার প্রকৃতি অগ্নিময়; তাহাতে আগুন জ্বালাইয়া তোলে এবং দহন ও দাহনের পথে শিখা বিস্তার করিয়া সে সাধনা যুগান্তের আবর্জনাকে দগ্ধ করিয়া নব সৃষ্টির পথ খোলে। সুভাষচন্দ্র এমনই আগ্নেয় পুরুষ। বহ্নিবীজে তাঁহার সাধনা এবং বহ্নিমধ্যে সাধ্য পরম মহান্ সত্যের মঙ্গল এবং উজ্জ্বল অনুধ্যান জাগাইয়া আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া তাঁহার সিদ্ধি।

ভারত আজ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে; কিন্তু এই স্বাধীনতা এখনও বাহ্য এবং অনেকটা পরোক্ষ। ফলত জাতির প্রাণবীর্যে সে স্বাধীনতা এখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া বলিষ্ঠ হইতে পারে নাই। জাতির লক্ষ্য অদ্যাপি ধ্রুব নয়। লক্ষ্য আমাদের আজও অস্পষ্ট। সঙ্কীর্ণ স্বার্থের জীর্ণতা, মান-যশ প্রতিষ্ঠার মোহজনিত গ্লানি, সর্বোপরি অতি তীব্র লুব্ধতা দুর্নীতির পাকে পাকে জড়াইয়া জাতির আত্মাকে ক্লিষ্ট করিয়া ফেলিতেছে। এই সব আবর্জনা দগ্ধ করিবার মত আগুন কোথায়? কোথায় এই সব পাপের দাহক পবিত্র পাবক? সুভাষচন্দ্রের আদর্শের জাতীয়তাবাদের সঙ্গে মানবতার উদ্দীপ্তিই এই অবস্থা হইতে জাতিকে উদ্ধার করিতে পারে। সুভাষচন্দ্রের ৫৯তম আবির্ভাব দিবসে আমরা তাঁহার দীপ্তিময় জীবনের অনুস্মরণ করিতেছি এবং তাঁহার কাছে নূতন করিয়া অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ লইতেছি, করিতেছি তাঁহারই জয়গান।

বৈদেশিকী
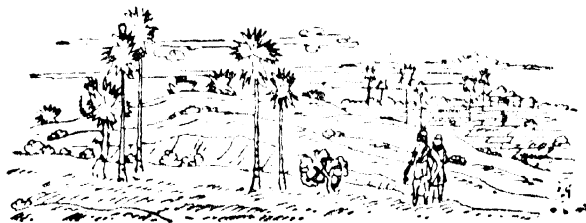
চীন সরকার কর্তৃক চর বলে কারা-দণ্ডিত মার্কিন বৈমানিকদের মুক্তির চেষ্টায় ইউনো'র সেক্রেটারী-জেনারেল ডক্টর হ্যামারস্কিয়েল্ড পিকিংএ মিঃ চৌ-এন-লাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। উভয়ের মধ্যে কী কী কথাবার্তা হয়েছে তার বিশদ বিবরণ প্রকাশ করা হয়নি। আলোচনান্তে পিকিং থেকে যে যুক্ত বিবৃতি দেওয়া হয় তা থেকে অথবা ডক্টর হ্যামারস্কিয়েল্ড ফিরে এসে সাংবাদিকদের নিকট যা বলেছেন তা থেকেও ভিতরের কথা বিশেষ কিছু প্রকাশ পায়নি। তবে এটা জানা গেছে যে, আলোচনা কেবলমাত্র কারারুদ্ধ বৈমানিক-দের নিয়েই হয়নি। অন্যান্য বিষয়েও মিঃ চৌ এন লাই ইউনো'র প্রতিনিধিকে, যাকে বলে—"বিলক্ষণ দু'কথা শুনিয়ে দিয়েছেন।" ডক্টর হ্যামারস্কিয়েল্ড তার জন্য প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলেন। তিনি পিকিং যাবার পথে নূতন দিল্লীতে পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে দেখা করে যান। পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে তাঁর কী কথাবার্তা হয় তা অবশ্য প্রকাশ করা হয়নি। তবে পণ্ডিত নেহরুর তদানীন্তন কয়েকটি উক্তি থেকে কিছুটা আন্দাজ করা গিয়েছিল—তিনি ডক্টর হ্যামারস্কিয়েল্ডকে পিকিং-এ কী ধরনের বাক্যবানের জন্য প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলবেন।

যদিও মার্কিন বৈমানিকদের চর বলে বিচার করে কারাদণ্ডদানের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে পণ্ডিতজী নিজে কোনো অভিমত ব্যক্ত করেন নি, কিন্তু চীন সরকারের পক্ষে কী বলবার আছে তা না শুনে ইউনো'র প্রস্তাবে যে-রূপ কঠোর ভাষায় চীন সরকারকে নিন্দা করা হয়েছে সেটা উচিত হয়নি বলে পণ্ডিতজী মত প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে তিনি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করেন, যে-সম্পর্কে পিকিং সরকারের গভীর ক্ষোভের কারণ বর্তমান রয়েছে। স্বদেশ প্রত্যাগমনে অনিচ্ছুক বলে কথিত কোরিয়া যুদ্ধ-বন্দীদের নিয়ে শেষপর্যন্ত কী রকম একটা বিশ্রী প্রহসন সংঘটিত হয় তা সকলেরই জানা আছে। বহু সহস্র চীনা বন্দীকে তাদের ইচ্ছা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করা সম্ভবই হোল না এবং তা না করেই Nutral Nations Repatriation Commission তাদের ভারতীয় রক্ষী বাহিনীর হেফাজত থেকে ইউনো অর্থাৎ মার্কিন বাহিনীর হাতে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। যাদের এইভাবে মার্কিন বাহিনীর হাতে ছেড়ে দেয়া হয় তাদের সম্বন্ধে NNRC'র ভারতীয় চেয়ার-ম্যান এই মত প্রকাশ করেন যে, জিজ্ঞাসা-বাদ করার সুযোগের অভাবে এই সমস্ত বন্দীর Status ঠিক হোল না। কিন্তু ফিরে হাতে পাওয়ামাত্রই মার্কিন বাহিনীর কর্তারা এদের চিয়াংকাইশেকের সৈন্যদলে ভর্তি করার জন্য ফরমোজায় চালান করে দিতে শুরু করলেন। এটা অন্যায় কাজ হয়েছে এবং এর জন্য চীন সরকারের ক্ষুব্ধ হওয়ার স্বাভাবিক কারণ আছে, পণ্ডিত নেহরু এরূপ মত প্রকাশ করেন।
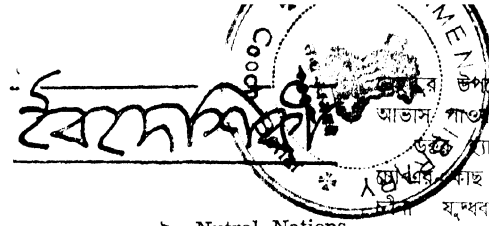
(বলা বাহুল্য এ ব্যাপারে ভারত সরকারেরও দুঃখ এবং কিঞ্চিৎ লজ্জাবোধ হওয়ার কথা, যদিও কোরিয়ার প্রসঙ্গে ভারত সরকারের গৌরবের কথাই কেবল প্রচার করা হয়ে থাকে। ভারতীয় রক্ষী বাহিনীর আচরণ খুবই প্রসংশনীয় হয়েছিল এবং NNRC'র চেয়ারম্যান হিসাবে ভারত সরকার প্রতিনিধির ব্যক্তি-গত আচরণ ও প্রসংশার্হ সন্দেহ নেই কিন্তু যে-কাজ তাঁরা করতে গিয়েছিলেন সেটা কিন্তু তাঁরা সমাধা করতে পারেন নি। নৈতিক দিক থেকে NNRC'র কার্য সফল হয়েছে একথা আদৌ বলা যায় না, বরঞ্চ তার উল্টোটা হয়েছে। যুদ্ধবন্দীদের সমস্যা মিটল বটে কিন্তু সেটা কোনো নীতির ভিত্তিতে নয়, বরঞ্চ একথা বলা যায় যে, যুদ্ধবিরতির চুক্তিতে এ সম্পর্কে যে-নীতি স্বীকৃত হয়েছিল কার্যত সেটা বাতিল করে দেয়া হয় এবং NNRC-কে তাই মেনে নিয়ে পাততাড়ি গোটাতে হয়। যদিও মুখে অন্যরকম প্রচার চলেছে তাহলেও ভারত সরকার এর জন্য মনে মনে নিশ্চয়ই একটা ক্ষোভ পুষে এসেছেন। পণ্ডিত [illegible]র উপরোল্লিখিত উক্তিতে তার আভাস পাওয়া যায়।)

ডক্টর হ্যামারস্কিয়েল্ড পিকিংএ মিঃ চৌ-এর কাছ থেকে কোরিয়া যুদ্ধের চীনা যুদ্ধবন্দীদের সম্বন্ধে—যাদের ফরমোজায় চালান করা হয়—নিশ্চয়ই অনেক কড়া কথা শুনে এসেছেন। ১১ জন মার্কিন বন্দীর জন্য আমেরিকা এতো হৈ চৈ করতে পারে আর হাজার হাজার

চীনা বন্দীদের জন্য পিকিং সরকার কিছু বলবেন না? ইউনো'তে চীনের স্থান চিয়াংকাইশেককে দিয়ে আটকে রাখা হয়েছে—ইউনো'র সেক্রেটারী জেনারেলকে ঘরে পেয়ে মিঃ চৌ এন লাই কি সে-কথাটাও তুলেন নি? নিশ্চয়ই বলেছেন। আরো অনেক কথাই হয়ে থাকবে। সে-সব কথা শুনবার জন্যই ডক্টর হ্যামারস্কিয়েল্ড পিকিং-এ গিয়েছিলেন।

তিনি পিকিং-এ গিয়েই মার্কিন বৈমানিকদের ছাড়িয়ে আনতে পারবেন, এরকম আশা কেউই করে নি। মার্কিন বৈমানিকদের মুক্তিকে যদি লক্ষ্য বলা যায় তবে ইউনোর সেক্রেটারী জেনারেলের পিকিং গমনকে তার দিকে একটি পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। ডক্টর হ্যামারস্কিয়েল্ড ফিরে এসে বলেছেন যে তাঁর পিকিং যাওয়া নিষ্ফল হয়নি, অর্থাৎ পরবর্তী পদক্ষেপগুলির লক্ষ্যকে নিকটতর করবে বলে তিনি আশা করেন।

তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি বলেছেন যে, মার্কিন বৈমানিকদের মুক্তি আদায় করার জন্য চীন সরকারকে কিছু দেওয়ার অর্থাৎ কোনো রকম "সওদা" করার ইঙ্গিত কোনো পক্ষ থেকেই করা হয় নি।

আমেরিকার জনমতের আবহাওয়া এমনি হয়ে আছে যে সেখানে লেন-দেনের কথা উচ্চারণ করাই মুশকিল। সুতরাং কোনো রকম 'সওদা' বা deal করার কথা যে উঠেনি এটা ডক্টর হ্যামারস্কিয়েল্ডকে একটু জোর দিয়েই বলতে হয়েছে। অবশ্য কোনো deal করা না করা ইউনোর সেক্রেটারী জেনারেলের হাতে নয়, যদি কিছু করার হয় তবে করবে মার্কিন গভর্নমেণ্ট। এবিষয়ে কিন্তু সন্দেহ নেই যে, পিকিং সরকারের পক্ষে মার্কিন বৈমানিকদের এখন ছেড়ে দেয়া অতি কঠিন যদি না সঙ্গে সঙ্গে চীনের আমেরিকার বিরুদ্ধে যে-সব অভিযোগ আছে তার দু-একটার নিষ্পত্তি না হয়, কারণ তা না হলে চীনের জনমতের কাছে পিকিং সরকারের মুখ থাকবে না। সুতরাং আ[illegible]রিকার "no deals" ধ্বনিতে কোনো কাজ হবে না। যদি বৈমানিকদের খালাস করতে হয় তবে deal একটা করতেই হবে (তা না হলে পিকিং সরকারকে যুদ্ধে আহ্বান করতে হয়) তবে সেটা হয়ত এমন করে করা হবে যাতে লেন-দেনের সম্বন্ধটা খুব স্পষ্ট না হয়।

* * *

ইরাক ও তুর্ক গভর্নমেণ্টের মধ্যে একটা সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। ফলে মধ্য প্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির ভিতর একটা গোলযোগ উপস্থিত হয়েছে। আরব রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে একটা আত্মরক্ষা চুক্তি আছে। ইরাক তার বাইরে এসে তুর্কীর সঙ্গে এ সামরিক চুক্তি করাতে অন্য আরব রাষ্ট্রগুলি একটু বেকায়দায় পড়ল, কারণ এতদিন নিজেদের একটা আলাদা জোটে থেকে আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষে পশ্চিমা শক্তিদের সঙ্গে দরাদরি করার একটু বেশি সুবিধা ছিল। তুর্কী পশ্চিমা শক্তিদের ব্লকের অন্তর্ভুক্ত। তুর্কীর সঙ্গে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়াতে ইরাকও একরকম খোলাখুলি-ভাবে পশ্চিমা ব্লকের সামরিক ব্যবস্থার মধ্যে এসে গেল। তুর্ক-পাকিস্তান চুক্তি যখন হয় তখন সেটা আরব রাষ্ট্রগুলির কাছে ভালো লাগে নি। তার কারণ প্রথমত, আরব রাষ্ট্রগুলি বুঝেছিল যে, তুর্ক-পাকিস্তান চুক্তির চাপে আরব লীগের বন্ধন আলগা হবার সম্ভাবনা। আরবদের উপর তুর্কী পূর্বে রাজত্ব করত, সেজন্যও তুর্কীর উপর আরবরা তেমন সন্তুষ্ট নয়। তুর্কী ইজরেলের প্রতি শত্রু-ভাব পোষণ করে না, সেটাও তুর্কীর প্রতি আরবদের একটা বিরক্তির কারণ। যাই হোক ইরাক তুর্কীর সঙ্গে যোগ দেওয়াতে আরব লীগ ভেঙ্গে না যাক দুর্বল হয়ে গেল। ইরাকের পরে আরব লীগের সাফল্যের মধ্যে অন্য কেউ-ও তুর্ক-ইরাক চুক্তির শরিক হতে পারে। পশ্চিমা শক্তিরা MEDO'র পরিকল্পনা কার্যে পরিণত করতে পারে নি। কিন্তু ধীরে ধীরে জনান্তরে তার আবির্ভাব দেখা যাচ্ছে বলে মনে হয়।

১৮।১।৫৫

সুভাষচন্দ্রের পত্র

[প্রায় ৩০।৩২ বৎসর পূর্বে ভবানীপুরে 'দক্ষিণ কলিকাতা সেবক সমিতি' নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। কয়েক বৎসর ইহা চাউলপটি লেন-এ অবস্থিত থাকে, পরে দেবেন্দ্র ঘোষ রোডে স্থানান্তরিত হয়। সেই সময়ে "মতিলাল ঘোষ লাইব্রেরী"ও উদ্বোধন হয়। সুভাষচন্দ্র ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি ও 'অনিলচন্দ্র বিশ্বাস ছিলেন ইহার সম্পাদক। তাঁত ও নানাবিধ কুটীরশিল্পের প্রচলন, অভিভাবকহীন দুঃস্থ বিধবা মহিলাদের সাহায্যদান, আত্মীয়স্বজনহীন মৃত ব্যক্তির সৎকার কার্য—সংক্ষেপে দেশ ও সমাজের নানা-প্রকার উন্নতিমূলক কাজ করাই ছিল এই সমিতির মুখ্য উদ্দেশ্য। সুভাষচন্দ্র এই সমিতিটিকে খুবই ভালবাসিতেন ও প্রায়ই স্বয়ং সেখানে উপস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন বিভাগের কর্মীদের নানাভাবে উৎসাহ দিতেন। ১৯২৬ সালে সুভাষচন্দ্র বর্মায় অন্তরীণ থাকেন এবং সেই সময়েই মান্দালয় জেল হইতে তিনি 'অনিল-চন্দ্র বিশ্বাসকে এই পত্রগুলি লেখেন। তখন সুভাষচন্দ্রের বয়স অল্প—তথাপি পত্রগুলির মধ্য হইতে তাঁহার দেশাত্মবোধ, সমাজসেবা ও গভীর চিন্তাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। সমিতির কয়েকজন কর্মী ব্যতীত পত্রোল্লিখিত অধিকাংশ ব্যক্তিই সুপরিচিত। এই অপ্রকাশিত পত্রটি 'দেশ'-এরই কোনও নিয়মিত লেখকের সৌজন্যে প্রাপ্ত। আগামী সপ্তাহে সুভাষচন্দ্রের আরেকখানি সুদীর্ঘপত্র দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে। সম্পাদক—'দেশ']

Mandalay
12. 2. 26.

প্রিয় অনিলবাবু,

আপনার ৪ঠা তারিখের পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। আমি ইতিপূর্ব্বে আপনার নিকট পত্র দিয়াছি—সে পত্রে আপনার পূর্ব্বে দুইখানি পত্রের উত্তর লিখিয়াছি। সে উত্তর দিতে অনেক বিলম্ব হইয়াছে—তজ্জন্য ক্ষমা করিবেন। আপনি যে constitution পাঠাইয়াছিলেন তাহা দেখিয়াছি বটে কিন্তু ভাল করিয়া সংশোধন করিতে পারি নাই। অন্য বিষয়ে মনটা তখন নিবিষ্ট থাকার দরুণ, সমিতির constitutionটা তেমন যত্নের সহিত দেখিতে পারি নাই—অতএব আপনারা সকলে আর একবার যত্নের সহিত দেখিয়া লইবেন এবং কোনও উকিল বা ব্যারিষ্টারকে একবার দেখাইয়া লইবেন।

'আপনি পূর্ব্বে যে সব কাগজ পাঠাইয়াছিলেন (মহাত্মাজীর অভ্যর্থনা-পত্র, দেশবন্ধু স্মৃতি ভাণ্ডারের জন্য যে সম্মিলনী হইয়াছিল তার কার্য্যসূচী ইত্যাদি) তাহা সব যথাসময়ে পাইয়া-ছিলাম। গত কাল আবার আপনার প্রেরিত লাইব্রেরীর পুস্তক-তালিকা variety entertainment-এর কার্য্য-সূচী ইত্যাদি পাইয়াছি। সমিতির কাজ
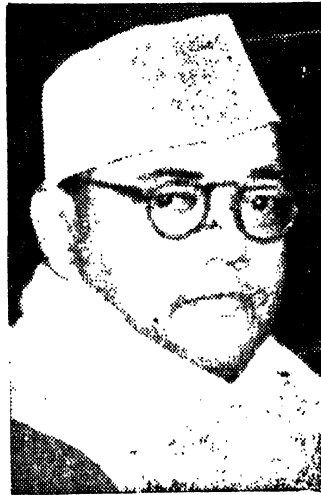
যে দিন দিন প্রসার লাভ করিতেছে তাহাতে আমি যে কিরূপ আনন্দিত হইয়াছি তাহা লিখিয়া জানাইতে পারি না। সমিতির যে টাকাগুলি আমার নিকট আছে (সম্পাদক হিসাবে) সে টাকা আশা করি আমার নামে দেখাইয়াছেন। হিসাবের যে অংশটুকু আমি না গেলে বোধ হয় পরিষ্কার হইবে না—আপাততঃ সমস্ত টাকাটা আমার নামে দেখাইয়া দিলে কাজ চলিবে। বাঙ্গলা বইর তালিকা আপাততঃ ছাপাইবার প্রয়োজন নাই। তবে যদি কোনও ছাপাখানাকে ধরিয়া বিনা খরচে ছাপান যায়—সে স্বতন্ত্র কথা। আপনি অথবা সমিতির কর্ম্মীরা এ বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখিবেন। কলিকাতায় নিশ্চয়ই এমন লোকের ছাপাখানা আছে যাঁহাকে ধরিতে পারিলে বিনা পয়সায় ছাপান যাইতে পারে। তার পর কাগজের দোকানকে ধরিয়া পুস্তক তালিকা ছাপাইবার জন্য কাগজ বিনা পয়সায় জোগাড় হইতে পারে। এ বিষয়ে মেজদাদার সহিত একবার পরামর্শ করিতে পারেন।

আপনারা যে খরচা বাদে এত টাকা পাইয়াছেন তাহা জানিয়া সুখী হইলাম। চরকা, সূতা-কাটা প্রভৃতি বিষয়ে আপনি যাহা লিখিয়াছেন সে বিষয়ে আমি সম্পূর্ণ একমত। তবে এখনও চেষ্টা ত্যাগ করিলে চলিবে না। আপনি পূর্ব্বপত্রে লিখিয়াছিলেন যে তুলার চাষ করিতে পারিলে জনৈক ভদ্রলোক ৮০, বিঘা জমি ছাড়িয়া দিতে পারেন। সেরূপ জমি পাইবার যদি সম্ভাবনা থাকে তবে তুলা চাষের জন্য বেশী খরচ অগ্রিম লাগিবে না। ২।১ জন মালির বেতন ও তুলার বীজের দাম জোগাইতে পারিলে আমরা এক বৎসরের মধ্যে ফল পাইতে পারি। জমিটা পতিত হইলে চাষোপযোগী করিবার জন্য বেশী খরচ লাগিতে পারে। অবশ্য কৃষিবিভাগের (agricultural department) সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিতে হইবে কোন্ জাতীয় তুলার বীজ লাগান উচিত। এ বিষয়ে বড়দাদা (সতীশবাবু) কিছু জানেন—কারণ বহু-কাল পূর্ব্বে তিনি বাড়ীতে একবার ভিন্ন রকমের তুলার গাছ লাগাইয়া দেখিয়াছিলেন। যে সব কুটীর শিল্প আরম্ভ করিয়াছেন (যেমন ঠোঙ্গা তৈয়ারী করা) সেগুলিতে যদি লোকসান না হয় —তবে অল্প লাভ হইলেও চালাইবেন। পরে অপেক্ষাকৃত লাভজনক শিল্প চালাইতে পারিলে আমরা এগুলি বর্জ্জন করিব। এখন যাহারা সাহায্য গ্রহণ করে তাহাদিগকে অন্ততঃ যে কোনও প্রকার কাজ করান দরকার। ভিক্ষাবৃত্তি ছাড়িয়া

তাহারা যখন কাজ করিতে শিখিবে তখন লাভজনক শিল্পে তাহাদিগকে লাগাইয়া দিলেই খুব ভাল ফল পাওয়া যাইবে। এখনকার কুটীর শিল্পগুলি যদি financial success না হয়, তবে কর্ম্মপ্রবৃত্তি ও dignity of labour জাগাইয়া তুলিলেও সমাজের প্রভূত কল্যাণ হইতে পারে।

কুটীর শিল্প সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মদন-মোহন বর্ম্মণ মহাশয়ের অনেক রকম ধারণা আছে। আপনি যদি একবার এই বিষয় লইয়া তাঁর সহিত দেখা করিতে পারেন তবে লাভ হইতে পারে।

বড়ি, আচার, চাটনি প্রভৃতি করিতে পারিলে না চলিবার কোনও কারণ নাই। স্ত্রীলোকেরা বিশেষতঃ বিধবারা একাজ ভাল করিতে পারিবে। কিন্তু শিখাইবার লোক পাইবেন কি? বাজারে চালাইতে গেলে এই জিনিষগুলি খুব ভাল হওয়া চাই। যদি ভাল জিনিষ প্রস্তুত করাইবার সম্ভাবনা থাকে তবে এবিষয়ে Experiment করিতে পারেন। Raw materials আপনারা supply করিয়া তৈয়ারী মাল লইতে পারেন—(বিক্রী করার ভার আপনাদের অবশ্য) অথবা তাহারা নিজেরাই raw materials কিনিয়া এবং মাল প্রস্তুত করিয়া আপনাদের নিকট বিক্রয় করিয়া যাইতে পারে। কাজ আরম্ভ করার পূর্ব্বে দোকানদারদের সহিত কথা বলা প্রয়োজন —তাহারা আমাদের মাল চালাইতে পারিবে কি না। Raw materials নিজেরা দিলে অবশ্য জিনিষ ভাল হইতে পারে কিন্তু অপর দিকে চুরীর সম্ভাবনা খুব বেশী। যাহারা এই কাজ করিবে তাহারা গরীব—সুতরাং আম, লেবু, তেল, লঙ্কা প্রভৃতি পাইলে তাহারা যে সংসারের কাজে লাগাইবে না, তা কে বলিতে পারে? অপর দিকে তাহারা যদি raw materials ক্রয় করিয়া মাল তৈয়ারী করিয়া supply করে—তবে খারাপ উপাদানে (যেমন তেল) মাল তৈয়ারী হওয়ার আশঙ্কা আছে। এসব বিষয়ে আপনি স্বপক্ষের ও বিপক্ষের সব কথা চিন্তা করিয়া কর্তব্য স্থির করিবেন। আর একটি কথা—এই সব বস্তুর বাজারে চাহিদা কিরকম—তা জানা দরকার। আমার নিজের মনে হয় যে খুব conscientious recipients না পাইলে এ বিষয়ে কৃতকার্য হওয়ার ভরসা কম। গরীব ভদ্র পরিবারদের দ্বারা একাজ চলিতে পারে। মাল তৈয়ারী হইয়া আসিলে সঙ্গে ২ তার দাম অথবা পারিশ্রমিক চুকাইয়া দিতে হইবে এবং বিক্রয় না হওয়া পর্যন্ত মালগুলি আমাদের ভাণ্ডারে রাখিতে হইবে।

মাসিক অথবা সাপ্তাহিক পত্রিকা আরম্ভ করার বিরুদ্ধে আমি মত ইতি-পূর্ব্বে জানাইয়াছি। এখনও সেই মত দিতেছি। আমার এ বিষয়ে কিছু অভিজ্ঞতা না থাকিলে আমি এত জোর করিয়া মানা করিতাম না। লোকসান যে হইবে তাহা সুনিশ্চিত এবং সমিতির টাকা journalistic উদ্দেশ্যে খরচ করা যুক্তিসঙ্গত হইবে না। যদি লোকসান না হইত তবে কথা স্বতন্ত্র হইত। সমাজ-সেবা সম্বন্ধে কোনও পত্রিকা বাঙলাদেশে নাই এবং বম্বাই অঞ্চলে Social Service Magazine আছে—তথাপি আমি বলিতে বাধ্য যে এরূপ প্রচেষ্টা অর্থ-সাপেক্ষ। আমাদের অবস্থা আরও স্বচ্ছল হইলে ও লোকবল আরও পুষ্ট হইলে এবিষয়ে পরামর্শ করা যাইবে। আপাততঃ Social Service সংক্রান্ত সকল বিষয় আত্মশক্তিতে প্রকাশ করিতে পারেন। কিছুদিন এরূপ করিয়া গেলে আপনি বুঝিতে পারিবেন Social Service বিষয়ে কোনও পত্রিকা আরম্ভ করিলে চলিবে কি না। Social Service সংক্রান্ত সকল সংবাদ ও প্রবন্ধ প্রকাশ করার ফলে যদি গ্রাহক সংখ্যা বাড়িয়া যায়—তবে বুঝিতে হইবে এরূপ পত্রিকার একটা demand আছে জনসাধারণের মধ্যে।......যাহাতে Social Service বিষয়ে full publicity হয় তার ব্যবস্থা আপনি গোপালবাবুকে বলিয়া করিয়া লইতে পারেন। প্রয়োজন হইলে আমার পত্রও দেখাইতে পারেন। সমিতির কাজের জন্য আমরা যৎসামান্য টাকা আজ পর্যন্ত সংগ্রহ করিয়াছি সে• টাকার জন্য আমরা public-এর নিকট trustee স্বরূপ—সুতরাং প্রত্যেক পয়সাটা হিসাব করিয়া খরচ করিতে হইবে।

বাড়ি বদলান সম্বন্ধে আমার মত আছে। তবে আপনি নিজে হিসাব করিয়া দেখিবেন বাড়ি ভাড়ার দরুণ ক্ষতি হইবে কিনা। আপনার মনে থাকিতে পারে যে, আমরা orphanageএর জন্য বড় বাড়ি বেশী ভাড়া দিয়া কালীঘাটে ঠিক করি। তখন আমাকে ভরসা দেওয়া হইয়াছিল যে, যে টাকা বেশী খরচ হইবে কালীঘাট (বিশেষত 'মার মন্দির) হইতে চাঁদা আদায় করিয়া সে টাকা পূরণ করা সম্ভবপর হইবে। কিন্তু কার্যকালে কোনও চাঁদা আদায়ের চেষ্টা হইল না এবং বাড়ি ভাড়ার দরুণ মাসে মাসে ক্ষতি হইতে লাগিল। অবশেষে ঐ বাড়ি ছাড়িয়া ছোট বাড়ি স্থির করিতে হইল। সমিতির বেলায় এরূপ দুর্ঘটনা যেন না ঘটে। সুখে দুঃখে ওখানে কাজ কর্ম

কোনও ট্রাম চলিতেছে—ঐ বাড়ি ছাড়িয়া দিলে "from the frying pan into the fire" অবস্থা যেন না ঘটে। তবে আমার মনে হয় যে, মোটের উপর যদি ৩০, টাকা বেশী খরচ হয় তবে স্বচ্ছন্দে নূতন বাড়ি করা যাইতে পারে। আপনারা অবশ্য দেখিবেন যেন তাঁত বসাইবার জায়গা থাকে এবং বাড়িওয়ালা যেন খারাপ লোক না হয়। জগ্‌বাবুর বাজারের নিকট যদি বাড়ি পান তবে খুব ভালই হয়।

Indoor games আরম্ভ করা বিষয়ে আমার আদৌ মত নাই। এরূপ feature ঢুকাইলে প্রতিষ্ঠানের স্বরূপ বদলাইবার আশংকা আছে। এ বিষয়ে আপাতত কিছু করিবেন না।

সমিতির পক্ষে আর একটি কাজে হাত দেওয়া বিশেষ দরকার। কলিকাতায় দুইটি বড় জেল আছে—Presidency ও আলিপুর সেণ্ট্রাল। জেলের হাসপাতালে যদি কোনও হিন্দু কয়েদী মারা যায় এবং তার যদি আত্মীয় স্বজন কলিকাতায় না থাকে তবে তার উচিতমত সৎকার হয় না। পয়সা দিয়া ডোম বা মেথর শ্রেণীর লোক দিয়া সৎকারের ব্যবস্থা করিতে হয়। এদিকে মুসলমানদের Burial association আছে এবং মুসলমান কয়েদী মারা গেলে তারা খবর পাওয়া মাত্র সৎকারের ব্যবস্থা করে। এরূপ একটা organization হিন্দু কয়েদীদের জন্য করা প্রয়োজন। এ কাজের ভার কি সেবক সমিতি লইতে পারে? যদি আপনাদের মত হয়, তবে বসন্তবাবুকে দিয়া জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে পত্র দিতে পারেন যে, সেবক সমিতি এ কাজের ভার লইতে প্রস্তুত আছে। আপনারা যদি এখন ব্যবস্থা নাও করিতে পারেন তবে আমি বাহিরে গেলে নিজে এ বিষয়ে চেষ্টা করিব। আমি নিজে লোকাভাব ঘটিলে অনেক সৎকার করিয়াছি, সুতরাং এরূপ কাজে আমি স্বেচ্ছাসেবকের কাজ করিতে স্বয়ং প্রস্তুত।

সমিতি সম্বন্ধে আমি যেরূপ নিশ্চিন্ত, সেবাশ্রম (orphanage) সম্বন্ধে আমি তদ্রূপ চিন্তিত। আপনারা যদি এই বিষয়ে কিছু সাহায্য করিতে পারেন তবে বড়ই ভাল হয়। কর্পোরেশন grant পাওয়া গেছে বলিয়া আমি আরও চিন্তিত। এই টাকার সদ্ব্যবহার যদি না হয়—এই টাকা পাওয়ার দরুণ যদি দিন দিন প্রতিষ্ঠানের উন্নতি না হয়—তবে আমার দুঃখের অবধি থাকিবে না। দুঃখের বিষয় এই যে, প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর যেরূপ উন্নতি হওয়া উচিত—সেরূপ হইতেছে না। লেখাপড়া ও শিল্প শিক্ষাও ভালরূপ হইতেছে না। জনসাধারণের দৃষ্টি ওদিকে আকর্ষণ করা হইতেছে না এবং মাসিক চাঁদা আদায়ের সেরূপ চেষ্টা হইতেছে না। আমার এখন মনে হয় যে, কর্পোরেশন grant না পাইলে বোধ হয় ভাল হইত। এই grant পাওয়ার ফলে সকলেই যেন নিশ্চেষ্ট হইয়া গিয়াছে। আমার বন্ধু ও পরিচিত ভদ্রলোকদিগকে এ বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য বলিলে আমি অত্যন্ত সুখী হইব।

স্বাস্থ্য সমিতির কাজ আরম্ভ হইয়াছে শুনিয়া আমি আহ্লাদিত

হইলাম। আমাদের সমিতি সর্বাঙ্গীণ উন্নতি লাভ করুক এবং সকল দিক দিয়া সমাজের সেবা করিয়া ধন্য হউক ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনা।

আমার শরীরের জন্য চিন্তিত হইবেন না। আমি নিজে এক সময়ে চিন্তিত হইয়াছিলাম। এখন বুঝিতে পারিয়াছি, যে, সকলই মায়ের ইচ্ছা, তাই আমি পরম শান্তি লাভ করিয়াছি। এখানকার জল-বায়ু আমার উপযোগী নয় তাই আসা অবধি অজীর্ণতা রোগে ভুগিতেছি। তারই কতকগুলি উপসর্গ জুটিয়াছে। শীতকালের দুই মাস একটু ভাল ছিলাম —এখন আবার কি হয় জানি না। শরীরের ওজনও পূর্বাপেক্ষা অনেক কমিয়াছে। সে যাই হউক, কিছুকাল যাবৎ আত্মসমর্পণ করিয়া পরম শান্তি লাভ করিয়াছি। এখন মনে হয় যে, সারাজীবনও যদি এখানে কাটাইতে হয় তবে আমি কিছুমাত্র ভীত বা সংকুচিত হইব না। Milton বুঝি একবার বলিয়াছিলেন—"The mind is its own place and can make a heaven of hell and a hell of heaven"—এই কথাগুলি আজকাল প্রায় মনে হয় এবং তার সত্যতা এখন প্রাণে২ অনুভব করিতেছি। আপনি ও হরিচরণ কেমন? আপনাদের জন্যই আমি চিন্তিত। আপনারা সুস্থ থাকিলে কাজ ভাল চলিবে এবং আমি নিশ্চিন্ত হইব।

ইতি

ভবদীয়

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

ভারতের সামাজিক নবনির্মাণ

সুবোধ ঘোষ

এই বছরের ছাব্বিশে জানুয়ারীতে প্রজাতন্ত্র দিবস উদযাপনের আনুষ্ঠানিক আয়োজনের মধ্যে দেশবাসীর অনেকেরই মনে একটি নূতন ভাবনার সাড়া দেখা দিতে পারে. অনেকেরই মনে পড়বে, কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে এমন একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যার লক্ষ্য হলো এই ভারতের সমগ্র জনজীবনেরই সামাজিক নব-নির্মাণ। সোস্যালিষ্ট প্যাটার্ণে, অর্থাৎ সমাজবাদী প্রকারে গঠিত সমাজ প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব। প্রস্তাবের মধ্যে এই লক্ষ্য ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যসম্মত পদ্ধতির কথাও বলা হয়েছে। প্রধান প্রধান উৎপাদনের ব্যবস্থাগুলির উপর সামাজিক স্বত্বাধিকার প্রযুক্ত হবে. উৎপাদনের ক্রমোন্নত ও দ্রুততর বৃদ্ধি সাধন করা হবে এবং [illegible]গণের ভোগে জাতীয় সম্পদের বণ্টনে সমতা রক্ষা করা হবে।

'কো-অপারেটিভ কমনওয়েলথ' তথা সামবায়িক স্বরাজ্য স্থাপন করাই কংগ্রেসের লক্ষ্য, কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রের প্রথম অনুচ্ছেদের এই উল্লেখ পরিবর্তিত হয়নি। ভারত রাষ্ট্রের সংবিধানে 'কল্যাণ-রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠা করাই সংবিধানের লক্ষ্যরূপে ঘোষিত হয়েছে। এই দুই লক্ষ্যই রাষ্ট্র ও সমাজের একটা আদর্শোচিত অবস্থা জ্ঞাপন করে। নামবাচক হলেও ঐ দুটি কথা বস্তুত ভাববাচক। কথা দুটির মধ্যে রাষ্ট্রিক বা সামাজিক প্রকারের পরিচয় সুস্পষ্ট নয়। লক্ষ্যের সঙ্গে পদ্ধতির পরিচয় বিশেষভাবে নির্দিষ্ট না হলে লক্ষ্যের পরিচয় সম্বন্ধেও ধারণা সম্পূর্ণ হয় না। আবাদী কংগ্রেসের প্রস্তাব আদর্শ সম্বন্ধেই স্পষ্টতর ও পূর্ণতর পরিচয়ের প্রকাশ, যার মধ্যে কল্যাণরাষ্ট্রের অথবা সামবায়িক স্বারাজ্যের পরিচয় ব্যাখ্যাত হয়েছে।

'সোস্যালিষ্ট' কথাটির তাৎপর্য নিয়েই নানা মুনির নানা মত আছে। সোস্যালিজম তথা সমাজবাদও বিশেষ একটি সামাজিক আদর্শবাদরূপে ঘোষিত হয়ে থাকে, কিন্তু সেই আদর্শবাদেরও কোন সর্ববাদিসম্মত রূপ নেই। ভাষ্যকারদের মধ্যে মতের ভেদ আছে এবং এমনকি যাঁরা সোস্যালিষ্ট চিন্তার প্রবর্তক, তাঁদেরও একজনের চিন্তার সঙ্গে অপরজনের চিন্তার মিল নেই। সোস্যালিষ্ট সাঁত-সিমঁ, ফুরিয়ে, লুই ব্লাঁক ও প্রুধোঁ, ফরাসী ঘরানার

এইসব বিখ্যাত সোস্যালিস্ট মনীষীদের চিন্তাধারা একই প্রকারের নয়, মতও এক-রকমের নয়। পরস্পরের অভিমতে বিষয়-বিশেষে মিল থাকলেও আবার অনেক মৌলিক বিষয়ে পারস্পরিক বিরোধিতা দেখা যায়। আবার, ইংরাজ ঘরানার সোস্যালিস্ট রবার্ট ওয়েন যে অভিমত পোষণ করেন, সেটা ফরাসী সোস্যালিস্ট চিন্তার অনুরূপ নয়। তা ছাড়া ক্রিশ্চান সোস্যালিস্টরাও আছেন। মরিস, কিংসলি ও লাডলো খৃস্টীয় ধর্মনীতিসম্মত পন্থায় সাধারণ সামাজিক সংস্কার ও হিতবাদকেই সমাজবাদ বলে প্রচার করে গিয়েছেন। ফেবিয়ান সোস্যালিস্টরাও সোস্যালিস্ট, যাঁদের চিন্তাকে অনেকেই প্রাচীনপন্থী লিবারালিজমেরই রকমফের বলে মনে করেন। কার্ল মার্ক্সও সোস্যালিস্ট, তিনি সমাজবাদের অর্থনীতিক ব্যাখ্যা সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ঐতিহাসিক ও দার্শনিক ব্যাখ্যাও সৃষ্টি করে গিয়েছেন এবং এই মার্ক্সীয় ব্যাখ্যাও বিভিন্ন সোস্যালিস্ট ভাষ্যকারের বিচারে বিচিত্র ও বিভিন্ন রূপ গ্রহণ করেছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে এমন অনেক রাষ্ট্রও আছে যাঁরা নিজেকে সমাজবাদী রাষ্ট্র বলে অভিহিত করেন। সোস্যালিস্ট রুশিয়া, নূতন চীন ও যুগোশ্লাভিয়া ইত্যাদি। এঁরা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্র হয়েও রূপে ও প্রকৃতিতে এক নয়। সমাজবাদী লক্ষ্য গ্রহণ করেও এইসব রাষ্ট্রের সামাজিক ও অর্থনীতিক পদ্ধতির ক্ষেত্রে ভিন্নতা দেখা যায়।

কিন্তু এইসব বিভিন্নতা সত্ত্বেও, সোস্যালিজম্ তথা সমাজবাদের নানা পরিচয়ের মধ্যেও বিশেষ একটি পদ্ধতিগত বিষয়ে সর্বসম্মত সমর্থন দেখা যায়। সেই বিষয়টি হলো, উৎপাদন ব্যবস্থাগুলির উপর রাষ্ট্রিক তথা সামাজিক অধিকারের প্রতিষ্ঠা এবং ব্যক্তিগত অধিকারের বিলোপ সাধন। পুঁজিবাদী চিন্তাই উদারনীতিক আবরণ গ্রহণ করে অনেক দিন থেকেই লেসে ফার, ফ্রী এণ্টারপ্রাইজ, ন্যাচারাল হার্মনি ইত্যাদি কথার মহিমা প্রচার করে এসেছেন। এই সব কথার ভিতরে ব্যক্তির অবাধ ব্যক্তিগত অধিকারেরই প্রসার এবং প্রতিষ্ঠার আগ্রহ নিহিত রয়েছে। সোস্যালিজমকে তাই ব্যক্তিপ্রাধান্যবাদ এবং তথাকথিত লিবারালিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আগ্রহ বলা যায়। সোস্যালিজম চায় সার্বিক সহযোগিতা, 'কো-অপারেটিভ' কর্মবিজ্ঞান। সোস্যালিজম্ চায় পরি-কল্পনা বা প্ল্যানিং, ব্যক্তির স্বেচ্ছায় উৎসাহিত উদ্যোগ নয়। সমাজবাদ চায় সর্বসাধারণের অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে স্থাপিত রাষ্ট্রিক ব্যবস্থা ও অবস্থা। সম্পদ বণ্টনে সমতার নীতি এবং ব্যক্তিগত উন্নতির ক্ষেত্রে সকলের পক্ষে সমান সুযোগের নীতি।

ভারতের সংবিধানে সমাজবাদী রাষ্ট্র স্থাপনের লক্ষ্য ঘোষিত না থাকলেও মুখ-বন্ধে যে সকল মৌল নীতির নির্দেশ

ঘোষণা করা হয়েছে, তার মধ্যে সমাজবাদী প্রকারের রাষ্ট্রিকতা ও সামাজিকতা প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা নিহিত রয়েছে। কংগ্রেসের অর্নীতিক লক্ষ্যের প্রস্তাবগুলিও এযাবৎ ভারতের সমাজজীবনে যে পরিবর্তন দাবী করে এসেছে, তার মধ্যেও সমাজবাদী আগ্রহেরই পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এবিষয়ে কংগ্রেসের প্রথম সুস্পষ্ট ভাষার ঘোষণা হলো বিগত জুলাই মাসে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে প্রথম 'সোস্যালিস্ট অর্থনীতি' অনুসরণের কথা উল্লিখিত হয়েছে।

কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনে এই প্রস্তাব কংগ্রেসের চূড়ান্ত সমর্থন আনুষ্ঠানিকভাবে লাভ করেছে; কিন্তু তার আগে দেশবাসী এই নূতন লক্ষ্যকে কতকটা সরকারী ঘোষণার রূপেও অভিব্যক্ত হতে দেখেছে। সংসদে এবং পরিকল্পনা কমিশনের কাউন্সিলের বৈঠকে প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু সোস্যালিস্ট প্রকারের অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাকেই পরিকল্পনার লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিলেন। স্মরণ করতে হয়, ব্যক্তি জওহরলালই ভারতে সোস্যালিস্ট চিন্তার শ্রেষ্ঠ প্রচারক। ভারতের জাতীয় অর্থনীতিক ও সামাজিক গঠন সমাজবাদী প্যাটার্ন বা প্রকারে রূপায়িত করা উচিত, তাঁর এই ব্যক্তিগত অভিমত তিনি অনেকদিন আগেই এবং তারপর থেকে নানা প্রসঙ্গে উল্লেখ করে এসেছেন।

জাতীয় কংগ্রেস ভারতকে সমাজবাদী প্রকারে গঠন করতে উদ্যোগী হবেন, এই প্রস্তাব নিছক একটি প্রস্তাব নয়। ভারতের ইতিহাসই যে বিপুল একটি পরিবর্তন বরণ করতে চলেছে, তারই অবশ্যম্ভাবিতা ও আসন্নতা এই প্রস্তাবের মধ্যে সঙ্কেতিত হয়েছে। ভারতের অর্থনীতিক জীবনে শিল্প-বিপ্লবের সংঘটন যতখানি দূর ভবিষ্যতের ঘটনা বলে মনে করা হয়েছিল, আজ উপলব্ধি করা যায়, সেই ঘটনা ততখানি দূরবর্তী নয়। শিল্প-বিপ্লব প্রায় আসন্ন এবং ভারতীয় শিল্প-বিপ্লবও যে দ্রুতগতিতে নিষ্পন্ন হবে, তার লক্ষণও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রসার, কারিগরি উচ্চশিক্ষার প্রসার এবং বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনের সুবৃহৎ আয়োজন, এই সবই শিল্পবিপ্লবের পথ মুক্ত করে দিয়েছে। সেই সঙ্গে জাতীয় জীবনের দুটি বৃহৎ প্রয়োজনের তাগিদও ঐতিহাসিক কারণের চাপে চরিতার্থতা খুঁজছে। জনসাধারণের জীবনযাত্রার প্রয়োজনের সামগ্রী উৎপাদনে 'প্রাচুর্য সম্পাদনার অর্থনীতি' গ্রহণ করতে হবে এবং সেই সঙ্গে সর্বজনের জীবিকাকর্মের সংস্থান রচনা। এই দুটি উদ্দেশ্য ত্বরিত শিল্পপ্রসার ছাড়া সিদ্ধ হবার নয়। ত্বরিত শিল্পপ্রসারকে শিল্প-বিপ্লব বলতে বাধা নেই।

এখানেই ভারতীয় জাতিকে সতর্ক হতে হচ্ছে। কংগ্রেসের নূতন প্রস্তাব জাতির সেই সতর্ক মর্মেরই পরিচয়। ইউরোপের শিল্প-বিপ্লবও সম্পদের প্রাচুর্য সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সেই শিল্প-বিপ্লব ক্যাপিটালিজম্ তথা পুঁজিবাদেরই উদ্ভব ও প্রতিষ্ঠার সহায়ক হয়েছিল। কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী দলের বৈঠকে শ্রীনেহরু তাঁর বক্তৃতায় প্রসঙ্গক্রমে একটি তাৎপর্যপূর্ণ উক্তি করেছিলেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লবের স্বাভাবিক পরিণামরূপেই আজ দেখা দিয়েছে হাইড্রোজেন বোমা। শ্রীনেহরুর মন্তব্যে ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লবের নৈতিক সত্তার অস্তিত্ব সম্বন্ধেই প্রশ্ন করা হয়েছে। সেই ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লবে যন্ত্রের মর্যাদা মানুষের মর্যাদার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছিল। সাধারণের কল্যাণ এবং সবাকার প্রয়োজনের দিকে যতটা লক্ষ্য ছিল, তার চেয়ে বেশি লক্ষ্য ছিল ব্যক্তিগত লাভ ও পুঁজির গৌরব পুঞ্জীভূত করার দিকে। সেই শিল্প-বিপ্লব হতে প্রসূত যান্ত্রিকতা যেন ধীরে ধীরে নিজেই একটি লক্ষ্য হয়ে উঠলো। যেন মানুষের জন্য যন্ত্র নয়, যন্ত্রের সুবিধারও প্রয়োজনের জন্য মানুষ। নৈতিক দায়িত্ব ও বাধ্যতা হতে বিচ্যুত এমন পরিবর্তন যে মানুষের মনোবৃত্তিকেও অসহায়ের মত অধীন করে নিয়ে নিজের রুদ্রত্ব বিপুল করে তুলবে, এই অভিযোগ যুক্তিহীন নয়। ইউরোপীয় শিল্প-বিপ্লব মানুষের অনেক কল্যাণের সহায়ক হয়েও সেই সঙ্গে অনেক কল্যাণের সংহারক হতে বাধ্য হয়েছে। এই ধরণের স্ববিরোধী শক্তির পরস্পরঘাতী দ্বন্দ্বে আবিল শিল্প-বিপ্লব ভারতের কাম্য নয়। সেই কারণে আসন্ন শিল্প-বিপ্লব যেন সমাজের সর্বের কল্যাণকারক হয়, সেই জনাই আসন্ন পরিবর্তনকে সমাজবাদী অর্থনীতিক প্রকার দান করার জন্য প্রস্তুত হবার প্রয়োজন ছিল।

সংবিধানে সমাজবাদসম্মত লক্ষ্যের ঘোষণা করলে, অথবা সমাজবাদসম্মত কোন রাষ্ট্রিক অর্থনীতিক বা সামাজিক পরিবর্তনের উপযোগী আইন প্রণয়ন করলেই ভারতের সামাজিক নবনির্মাণ দ্রুত সম্ভব হবে, এমন ধারণা কেউ সমর্থন করবেন না। ঐভাবে শুধু কতকগুলি আইন প্রবর্তন অথবা সাংবিধানিক সদুদ্দেশ্য ঘোষণা করে রাখাও প্রগল্‌ভ 'লেসে ফার'

নীতি। বৈপ্লবিক পরিবর্তন বিপুল গঠনমূলক উদ্যোগের দ্বারাই সিদ্ধ হতে পারে। সেই জন্যই প্লানিং বা পরিকল্পনা জনজীবনের বৈপ্লবিক আগ্রহেরই পরিচয় এবং অবলম্বনও। ভারতকে সমাজবাদী প্রকার লাভ করতে হলে পরিকল্পনার দ্বারাই জনশক্তিকে সক্রিয় করে তুলতে হবে। পরিকল্পনা বস্তুত কর্মকে বৈজ্ঞানিক সংগঠন দান করার ব্যাপার। প্ল্যানিং-এর মধ্যে সমাজবাদী দর্শনের আর একটি বৃহৎ সত্য নিহিত রয়েছে, সহযোগিতার নীতি। সর্বসাধারণের অধিকার জাতীয় সম্পদের উপর প্রতিষ্ঠা করলেই সমাজবাদী প্রকারের স্থায়িত্ব সত্য হয়ে ওঠে না। এক্ষেত্রেও 'সবার পরশে পবিত্র করা' নীতিই সত্য। সমাজবাদী জীবন ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে সহযোগিতার জীবন। ট্রেড ইউনিয়ান নামক শ্রমিক সংহতির পদ্ধতি সমাজবাদী চিন্তারই সৃষ্টি, কিন্তু এই সংহতিও মূলত সামবায়িক অথবা সহযোগিতামূলক অর্থাৎ কো-অপারেটিভ সংহতির উদাহরণ। শ্রেণীর উপর শোষণ আছে এবং সমাজ-স্বার্থ বিভিন্ন শ্রেণীস্বার্থে খণ্ডিত হয়ে আছে বলেই, বর্তমানকালের ট্রেড ইউনিয়নকে সংগ্রামের রীতি গ্রহণ করতে হয়। যদি শোষণ না থাকে এবং যেদিন শোষণ থাকবে না, সেদিন এই ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্য কো-অপারেটিভ উৎপাদন-সংহতির মধ্যে প্রকৃতিগত কোন প্রভেদও থাকবে না। কংগ্রেসের পুরাতন প্রস্তাবেই 'শ্রেণীহীন' ও 'জাতহীন' সমাজ গঠনের উদ্দেশ্য ঘোষিত হয়ে আছে। সংবিধানেও ভারতের নাগরিক সাধারণের মধ্যে শ্রেণীগত বা ব্যক্তিগত অধিকারের পার্থক্য করা হয়নি। ভারতের আইন এবং ন্যায়ালয়ও এই পার্থক্য স্বীকার করে না। আইনের চক্ষে সকলেই নাকি সমান।

কিন্তু এই ব্যবস্থায় শুধু প্রমাণিত হয় যে, আইনের এবং সংবিধানের চক্ষু উদার হয়েছে, সকলকেই সমান দেখতে পারছে। কিন্তু মাত্র আইনের ও সংবিধানের এই উদার দৃষ্টিপাতের জনাই ভারতের জন-জীবন শ্রেণীভেদ ও জাতভেদ হতে মুক্ত হয়ে যায়নি। শ্রেণীভেদ ও জাতভেদ নামক দুই বিষবৃক্ষ যে মাটির উপর দাঁড়িয়ে আছে, সেই মাটি হলো সমাজের ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে অর্থনীতিক যোগ্যতার বৈষম্য। আইন মূলত নিরোধমূলক প্রয়াস। আইন বড় জোর অস্পৃশ্যতাকে দণ্ডনীয় অপরাধ বলে ঘোষণা করতে পারে এবং অপরাধীকে শাস্তি দিতে পারে। কিন্তু স্পৃশ্যতা সৃষ্টি করতে পারে কি? স্পৃশ্যতা সৃষ্টি গঠনমূলক প্রয়াসের দ্বারাই সাধ্য এবং আইন প্রত্যক্ষভাবে গঠনধর্মী হতে পারে না বলেই নিরোধমূলক পন্থায় সমাজ-বিরোধী শক্তির বিলোপ অন্বেষণ করে। সমাজবাদী প্রকার লাভ করতে চায় যে সমাজ, সেই সমাজ শুধু আইন প্রকরণের উপর নির্ভর করে থাকতে পারে না। সেই সমাজ পরিকল্পনা বা প্ল্যানিং-এর দ্বারা জাতির জনশক্তিকে এবং জনমানসকে গঠন-মূলক কীর্তিকারিতা অর্জনে অনুপ্রাণিত করে।

পরিকল্পনার দ্বারা বৈপ্লবিক পরিবর্তন ত্বরান্বিত করতে হয়, কিন্তু পরিকল্পনাকে প্রয়োগ করবার রাষ্ট্রিক নীতিই বা কি হওয়া উচিত? সোভিয়েট রুশিয়ায় রাষ্ট্র পরিচালকেরা এক্ষেত্রে অবাধ ও অখণ্ড কর্তৃত্ববাদ গ্রহণ করেছেন। চীনেও তাই। রাষ্ট্রের পরিচালক সংঘ যে সিদ্ধান্ত করলেন, সেই সিদ্ধান্তই অমোঘ এবং জনসাধারণ সেই সিদ্ধান্ত মেনে চলতে বাধ্য। এখানে সিদ্ধান্তকে চূড়ান্ত বলে গণ্য করার আগে জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার পরিচয় জানবার জন্য রীতির বাধা নেই। একটি আইনের খসড়া তিনবার সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণ, দুই প্রতিনিধিসভায় তিনবার রিডিং দান করা, তারপর বিতর্ক, ডিভিসন ও ভোট গ্রহণের বালাই নেই।

কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনের প্রস্তাব সমাজবাদী রাষ্ট্রিকতা লাভের জন্য এক নূতন পন্থার পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব। প্রজাতন্ত্র ভারতের রাষ্ট্রীয় পরিচালনায় টোটালিটারিয়ান নীতির কোন স্থান নেই। ভারতের রাষ্ট্রিক পরিচালনায় 'পার্লামেণ্টারী ডেমোক্রেসী'কেই অক্ষুণ্ণ রেখে ভারতের জাতীয় জীবনকে সমাজবাদী প্রকারে গঠন করতে হবে, এই উদ্দেশ্য পৃথিবীর রাষ্ট্রিক গঠনের ইতিহাসেই অভিনব। পরিকল্পিত পন্থায় সামাজিক ও অর্থনীতিক পরিবর্তনের, সম্পদের প্রাচুর্য সৃষ্টির এবং শিল্প-বিপ্লবের সংঘটন ত্বরান্বিত করতে হবে, কিন্তু তার জন্য ভারত নিশ্চয়ই জনসাধারণকে কোন কাজে বাধ্য করবার আইন প্রবর্তন করবে

না। আজ পর্যন্ত সে-রকম কোন আইন প্রবর্তিত হয়নি, যদিও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার চার বছর প্রায় সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। জনসাধারণের বিচার বিবেচনা ও ইচ্ছাকে পরিকল্পনার সহযোগী হতে বাধ্য করার অবাধ কর্তৃত্ববাদ সত্যই প্রকৃত সমাজবাদী আদর্শের সহায়ক কি না, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট যুক্তি আছে। ভারত তার পরিকল্পিত উদ্যোগে জনসাধারণের স্বচ্ছাপ্রবণ সহযোগিতাকেই প্রকৃত শক্তি এবং স্থায়ী শক্তি বলে মনে করে। ভারতের ইতিহাসেই পৃথিবীর মানুষ একটি বিস্ময়কর নূতন সত্য লক্ষ্য করেছে যে, সংগ্রামও শান্তিপূর্ণ হতে পারে, এবং সে সংগ্রামের দ্বারা নিরস্ত্র জাতি পৃথিবীর এক প্রবল ও সশস্ত্র সাম্রাজ্যিক শক্তির হাত থেকে রাষ্ট্রিক ক্ষমতা জয় করে নিতে পারে। পুঁথিবাদী সমালোচক ইতিহাসের বাস্তব ঘটনার স্বরূপ ও প্রকৃতি থেকে শিক্ষা আহরণ করতে পারেন না এবং কংগ্রেসের এই নূতন সিদ্ধান্তের মর্যাদা উপলব্ধি করতে না পেরে তাঁদের চিন্তায় পোষা কয়েকটি ধরা-বাঁধা পুরণো বুলি হয়তো নতুন করে মুখর হয়ে উঠবে। রেভল্যুশন বাই কনসেণ্ট!

কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনের প্রস্তাব কংগ্রেসেরই আত্মার নবীকরণের পরিচয়। জাতীয় স্বাধীনতা অর্জনের জন্য কংগ্রেসের সঙ্কল্প ও প্রয়াস জয়যুক্ত হয়েছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শত সমস্যায় নিপীড়িত ভারতের রাজনীতিক ও অর্থনীতিক অস্থিরতার অবসান ঘটেছে। স্বাধীন ভারতের বিগত সাত বৎসরকে বস্তুত স্টেবিলাইজেশন তথা সুস্থিতি লাভের অধ্যায় বলা যেতে পারে। এইবার সামাজিক নবনির্মাণের জন্য সমাজবাদী পন্থাকে আনুষ্ঠানিক ভাবে এবং ব্যাপকভাবে প্রয়োগের উদ্যোগ। ভারতের সমাজবাদ নিশ্চয়ই অন্য কোন দেশের প্রচলিত সমাজবাদের সম্পূর্ণ অনুরূপ হবে না, কারণ সম্পূর্ণ অনুরূপ হতে পারে না। ভারতের ইতিহাস ও ঐতিহ্য, ভারতের জনজীবনের প্রয়োজন ও সমস্যার বৈশিষ্ট্য, এবং বিশেষ করে জাতির প্রতিভার বৈশিষ্ট্য অনুসারেই ভারতের সমাজবাদী প্রকরণের রূপও বিশিষ্ট হবে।

কংগ্রেসের নূতন ঘোষণার তাৎপর্য এবং মর্যাদা কংগ্রেসীদের মধ্যেই বা ক'জন উপলব্ধি করবেন এবং অনুপ্রাণিত হবেন? শ্রীনেহরু বলেছেন, কংগ্রেসের চিন্তাও অনড় হয়ে থাকবার আশঙ্কা আছে। সুতরাং কংগ্রেসের এই নূতন সংকল্পের পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য ও পরিপ্রকাশের পথে বাধা আছে কংগ্রেসীদেরই মনের ভিতরে এবং সেই বাধাই হলো আসল বাধা। কংগ্রেসবিরোধী ও সরকারবিরোধী সমালোচকের প্রচার বা ক্রিয়াকলাপের বাধা আসল বাধা নয়। শ্রেণীহীন ও 'জাত'হীন সমাজ প্রতিষ্ঠার কথা অনেক কংগ্রেসীর কাছে একটি বচন মাত্র, মনের এবং অনুভবের ক্ষেত্রে ঐ নীতির প্রতি আনুগত্যের যথেষ্ট অভাব আছে। সাম্প্রদায়িক ও প্রাদেশিক বিদ্বেষবাদে অনেক কংগ্রেসী অন্য অনেক অকংগ্রেসী বিদ্বেষবাদীর তুলনায় অনেক বেশি নিপুণ ও জবরদস্ত। সমাজকে সমাজবাদী প্রকার দানের জন্য কংগ্রেসের নূতন সংকল্প অনেক কংগ্রেসীরই মনের গভীরে অভিনন্দিত হবে না। তেমনই আর একটি নূতন সুসম্ভাবনাও আছে। কংগ্রেস এই নূতন সঙ্কল্পের গ্রহণ ক'রে অনেক বিরোধীকে হয়তো সহযোগিরূপেই কাছে দেখতে পাবেন। মার্ক্সবাদী ফরোয়ার্ড ব্লকের কংগ্রেসে যোগদানের সিদ্ধান্তে এই-রকম সম্ভাবনারই সত্যতা প্রমাণিত হয়।

কংগ্রেসের নূতন প্রস্তাবের প্রকৃত গুরুত্ব এই কারণে স্বীকার করতে হয় যে ঐ প্রস্তাব শুধু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানেরই কর্মসূচীর নিয়ামক হয়ে থাকবে না। যেহেতু কংগ্রেস হলেন রাষ্ট্রের শাসক-দল সেইহেতু কংগ্রেসের প্রস্তাবকে ভারত সরকারেরই আসন্ন কর্মক্রমের পরিচয় বলে মনে করা যায়। প্ল্যানিং করবেন দেশের সরকার এবং সেই প্ল্যানিং সফল করবে জাতির সুসংহত জনশক্তি।

সেই কারণে কংগ্রেসী বা অকংগ্রেসী প্রত্যেকেরই পক্ষে মনের দিক দিয়ে বিশেষ একটি প্রস্তুতি সৃষ্টির প্রয়োজনও স্বীকার করতে হবে। পরিবর্তন আসছে অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন। শিল্প-বিপ্লব আসন্ন। জাতির সমগ্র সাংস্কৃতিক রূপ ও প্রকৃতির উপরেই সেই পরিবর্তনের আবেগ এসে পড়বে। এই পরিবর্তনকে গ্রহণের পন্থা উদারনীতিকের 'লেসে ফার' বা 'ফ্রী এণ্টারপ্রাইজ' হতে পারে না। পন্থা হলো সমাজবাদী প্রকার দানের পরিকল্পনা। 'সমানী প্রপা' অথবা 'সহবোঁহয়াথা'—প্রাচীন ঋষিবাক্যে ঘোষিত সমতা ও সহতার নীতি মাত্র আদর্শরূপে লিখিত ও ঘোষিত থাকলেই সমাজ সেই আদর্শোচিত রূপে গ্রহণ করে না। কর্মে, কর্মবিজ্ঞানে, সুপরিকল্পিতভাবে এবং ব্যবহারিক রূপে সেই নীতির প্রয়োগ প্রয়োজন ছিল। প্রজাতন্ত্র ভারত, প্রাচীন সভ্যতার ঐতিহ্যে প্রতিভান্বিত ভারত যে সামাজিক নবনির্মাণের পথে অগ্রসর হবার জন্য উদ্যোগী হয়েছে, সেই নবনির্মাণ এবং উদ্যোগ, উভয়েরই মহত্ত্ব দেশের সাংস্কৃতিক কর্মীদের পক্ষে বিশেষভাবে উপলব্ধি করবার প্রয়োজন আছে। তা না হলে জাতি এগিয়ে যাবে, কিন্তু জাতির সাহিত্য ও শিল্প সেই অগ্রসৃত জাতীয় জীবনের আনন্দের অবলম্বন হবার যোগ্যতা হতে বঞ্চিত হবে।

ভারতের প্রথম 'জাতীয়' নাট্যোৎসব

ভরত দত্ত

সাংস্কৃতিক নবজাগরণের দিনে সম্প্রতি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত তীয়' নাট্যোৎসবটিকে একটা বড়ো না বলে উল্লেখ করা যায়। ২২শে ম্বর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক উদ্বোধিত হয়ে সবটি পরিসমাপ্ত হয় ২৬শে ডিসেম্বর। ই ছয় সপ্তাহ বিস্তৃত কালের মধ্যে দ্দটি ভারতীয় ভাষায় এবং একটি রেজি নিয়ে মোট একুশখানি নাটক রিবেশিত হয়। নাট্যোৎসবটির উদ্যোক্তা লেন দিল্লীর সঙ্গীত-নাটক-একাদমি বং ব্যবস্থাপনা ছিল সঙ্গীত-নাটক কাদমির নাটক সাব-কমিটির অধীনে ঠিত নাট্যোৎসব কমিটির ওপরে। নাটক ব-কমিটির সভ্য হচ্ছেনঃ চেয়ারম্যান মতী কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এবং নিত্যানন্দ কানুনগো ও শ্রীশচীন সনগুপ্ত। নাট্যোৎসব কমিটির সভ্য ছলেন সভাপতি ডাঃ বি ভি কেশকার; চয়ারম্যান শ্রী পি এম লাড; সংগঠন স্পাদক লেঃ কঃ এইচ ভি গুপ্তে এবং াধারণ সম্পাদক শ্রী পি এস পাটকে।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনার জন্য যে অভ্যর্থনা সমিতি গঠিত হয়, তাতে ছিলেন চেয়ারম্যান ডাঃ সত্যনারায়ণ সিংহ; অর্থ কমিটির আহ্বায়ক শ্রীরামলাল পুরি ও শ্রী এস এল বালি; আতিথেয়তা কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী সি ভি দেশাই, ভাইস-চেয়ারম্যান বেগম জে এইচ জাইদি এবং আহ্বায়ক শ্রী বি আর নিরুলা; কার্যসূচী কমিটির চেয়ারম্যান কঃ আর শ্রীনিবাসন; টিকিট কমিটির চেয়ারম্যান শ্রীমতী শীলা ভারত্রম এবং আহ্বায়ক লেঃ কম্যান্ডার ইউ নরসিং; স্বেচ্ছাসেবক গঠন সম্পাদক শ্রী আর এম কৌল; প্রচার কমিটির চেয়ারম্যান শ্রী ডি আর মানকেকর ও আহ্বায়ক শ্রী কে কে নায়ার এবং চতুষ্পাটি কমিটির আহ্বায়ক কুমারি আর মারকার।

ঐসব বিভিন্ন কমিটি ছাড়া ভাষা অনুযায়ী বিভিন্ন অঞ্চল থেকে একজন করে সংযোগরক্ষাকারি গ্রহণ করা হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন শ্রী এস কে মজুমদার (বাঙলা), শ্রী কে কাকোলি (অসমীয়া), শ্রী কে পান্তু (গুজরাটি), কুমারি এন কুপার (ইংরেজি), শ্রী আর জি আনন্দ (হিন্দী), শ্রী এ রঙ্গচারি (কানাড়ী), শ্রীকৃষ্ণ পিল্লাই (মালয়ি), শ্রী ডি এন বড়ুয়া (মণিপুরি), শ্রীমতী সারভাতে (মারাঠি), শ্রী জি আর দাস (ওড়িয়া), শ্রী এ এস যোগী (পাঞ্জাবি), শ্রীমুরলীধর ডালমিয়া (সংস্কৃত), শ্রীমতী ধর্মম্বল (তামিল), শ্রী জি জগৎপতি (তেলেগু) ও শ্রী এইচ তানবির (উর্দু)।

প্রায় বছরখানেক ধরে উৎসবটির আয়োজন চলতে থাকে এবং সঙ্গীত-নাটক একাদমির সম্পাদিকা শ্রীমতী নির্মলা যোশী এ ব্যাপারে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। সমগ্র ভারতের সাতশো তেরটি নাট্য সম্প্রদায় প্রায় এক হাজার নাটক নিয়ে উৎসবে যোগদানের জন্য আবেদন জানান। তামিল ও তেলেগু নাট্য সম্প্রদায়ের আবেদনই সংখ্যায় সবচেয়ে বেশি ছিল, প্রায় সাড়ে তিনশো বাঙলা নাটক অভিনয়ের জন্য আবেদন গিয়েছিল ছত্রিশটি সম্প্রদায়ের কাছ থেকে। উৎসবের জন্য নাটক নির্বাচনার্থে ভাষা অনুসারে দেশের এক-এক অঞ্চলে এক-একটি নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হয়, যেমন বাঙলা নাটক নির্বাচকমণ্ডলীতে ছিলেন শ্রীশচীন সেনগুপ্ত, শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায় এবং অহীন্দ্র চৌধুরী। ঠিক কি পন্থা অবলম্বন করে নির্বাচকমণ্ডলী নাটক নির্বাচন করেছিলেন, জানা যায়নি; তবে এ নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে অনেক অনুযোগ উঠেছে। গোড়ায় কথা ছিল বিভিন্ন অঞ্চলে একটি করে আঞ্চলিক নাট্যোৎসব অনুষ্ঠিত করে তা থেকে শ্রেষ্ঠ নাট্য সম্প্রদায়কে দিল্লীতে পাঠানো হবে। কিন্তু যে কোন কারণেই হোক এ পদ্ধতি অনুসৃত হয়নি বা হতে পারেনি। ফলে দিল্লীর উৎসবে যেসব নাটক পরিবেশিত হয়েছে, তা সব অঞ্চলেরই শ্রেষ্ঠ নাট্য-কৃতিত্ব বা গুণের যথার্থ প্রতিনিধিমূলক বলে ধরে নেওয়া যায় না। যদিও সেই রকম ধারণা করিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল। দিল্লীর এই নাট্যোৎসবের ফলে এইমাত্র জানতে পারা গিয়েছে যে, ভারতের সব ভাষাতেই নাটক অভিনীত হয়ে থাকে।

জাতীয় নাট্যোৎসব বলে অভিহিত করলেও কিন্তু ঠিক যে ধরনের নাটক দিল্লীর উৎসবে পরিবেশিত হয়েছে, তা ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যসম্মত নয়। এসব

'জাতীয়' নাট্যোৎসবের উদ্বোধনী নাটক কালিদাসের 'শকুন্তলা'-র দৃশ্য

মারাঠী নাটক "ভউ বন্দকি"-র দৃশ্য— দরবার কক্ষে সমবেত বড়ভাইরা—শিশু পেশোয়াকে নিয়ে সখারাম বাপু; রাঘোবার পদত্যাগপত্র; পুণা থেকে প্রত্যাবৃত রামশাস্ত্রী কর্তৃক শিশু পেশোয়াকে আশীর্বাদ এবং নিজেদের আত্মঘাতী সংগ্রাম বন্ধ করে যুক্তভাবে সমগ্র মারাঠা সাম্রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন

হলো পাশ্চাত্য আদর্শের নাটক, যার ভিৎ পত্তন হয় কলকাতায় ১৭৯৫ সালে লেবেডফের মঞ্চ প্রচেষ্টা থেকে। তাই সব আঞ্চলিক ভাষায় নাটকের চেহারা ও আচরণে বাঙলা নাটকের ছাপ পুরোমাত্রায় পাওয়া যায়। এমনিতেও ভারতের বিভিন্ন ভাষায় বাঙলা নাটকের অনুবাদও পাওয়া যায়। আঞ্চলিক ভাষা ও নাচ-গান এবং সাজ-পোশাকের পার্থক্য ছাড়া সব অঞ্চলের নাটকেরই দেহের কাঠামো একেবারেই প্রায় বাঙলাই অনুকরণ। কারুর অনুকরণ ভালো, কারুর দুর্বল। কিন্তু আধুনিক বাঙলা নাটক যা চলছে, যার প্রবর্তন হয় ১৮৩৩ সালে, এবং উৎসবে আর সব ভাষায় যে সমস্ত নাটক পরিবেশিত হলো, তার সবই ভারতীয় ভাষায় পাশ্চাত্য নাটক ছাড়া কিছু নয়। এই প্রভাব এনে দিয়েছে ইংরেজরা, হয়তো প্রকৃত ভারতীয় ঐতিহ্যকে চাপা দেবার জন্যে। আশা করা গিয়েছিল, 'জাতীয়' আখ্যাত স্বাধীন ভারতের এই প্রথম নাট্যোৎসব ইংরেজদের আমদানী পাশ্চাত্য ধারা কাটিয়ে ভারতের নিজস্ব নাট্যধারাকে আবার ফিরিয়ে নিয়ে আসবে। কিন্তু সে আশা থেকেই গেলো। নাটক নিয়ে শাস্ত্র পৃথিবীর আর কোন দেশে নেই এবং অভিনয় শিল্প নিয়ে বেদ থেকে প্রাচীন ভারতে যে ধারার প্রচলন ছিল, তার চেয়ে উন্নততর আর কিছু কোন দেশে আছে কিনা সন্দেহ। তাই স্বাধীন হবার পর ভারত নিজের অনেক ঐতিহ্যকে যেমন ফিরিয়ে নিয়ে আসছে, তেমনি তার অতুল ঐশ্বর্যমণ্ডিত নাট্যধারাকেও ফিরিয়ে আনবে বলেই ধারণা হয়েছিল; দিল্লী কিন্তু এদিক দিয়ে গেল না। অথচ প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু বার বার করেই মনে করিয়ে দিচ্ছেন, বিদেশের কোন ঐতিহ্য অনুকরণের পথ না ধরে ভারত নিজের জিনিস নিয়েই বড়ো হোক। আমাদের নিজেদেরই উন্নততর জিনিস যখন মজুত রয়েছে, তবে কেন অপরের ধার-করা জিনিস নিয়ে এই মাতামাতি!

দিল্লীর এই নাট্যোৎসবকে 'জাতীয়' না বলে 'আধুনিক' বলে আখ্যাত করাই সমীচীন হতো। উৎসবে পরিবেশিত নাট্যধারার বয়েস প্রবর্তনস্থান বাঙলা দেশেই মাত্র একশো ষাট বছর; অন্য কতক অঞ্চলে এখনও একশো বছরও পূর্ণ হয়নি। ইংরেজি শিক্ষার মতোই ওটা এদেশে এসে গিয়েছে পাশ্চাত্য থেকে; ওর কোন ঐতিহ্য ঠিকমতো গড়ে ওঠেনি।

* * *

দিল্লীর উৎসবে পরিবেশিত নাটকখানি হচ্ছেঃ ২২শে নবেম্বর সংস্কৃতে 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' (ব্রাহ্মণ সভা, বোম্বাই); ২৭শে নবেম্বর অসমীয়াতে 'সোনিত কুঁয়ারি' (আসাম সঙ্গীত নাটক একাদমি, শিলং); ২৮শে নবেম্বর 'শিবকামিন শপথম' (শ্রীরামকৃষ্ণ কৃপা এমেচার্স, মাদ্রাজ); ২৯শে নবেম্বর উর্দুতে 'নই রোশনি' (আঞ্জুমান তরক্কি-ই-উর্দু, হায়দরাবাদ); ৩রা ডিসেম্বর ওড়িয়াতে 'পরকলম' (জনতা রঙ্গমঞ্চ, কটক); ৪ঠা ডিসেম্বর গুজরাটিতে 'মাজমরাত' (ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল থিয়েটার, বম্বে); ৫ই ডিসেম্বর মারাঠিতে 'ভউ বন্দকি' (মারাঠি সাহিত্য সংঘ, বম্বে) ও ৬ই ডিসেম্বর 'শারদা' (মহারাষ্ট্র নাট্য সম্মেলন, পুণা); ১১ই ডিসেম্বর হিন্দীতে 'হাম হিন্দুস্তানী' (ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল থিয়েটার, নিউ দিল্লী) ও 'কুত্তে কি মৌত' (এলাহাবাদ ট্রুপ); ১৯শে ডিসেম্বর 'অম্বাপলি' (বিহার কলা কেন্দ্র, পাটনা); ১২ই ডিসেম্বর তেলেগুতে 'শ্রীকৃষ্ণতুলাভরম' (রাম মিলাপ সভা, তিনালি) ও ২২শে ডিসেম্বর 'উষা পরিণয়ম' (ভেঙ্কটরাম নাট্যমণ্ডলি, কুচিপট্টি); ১৩ই ডিসেম্বর কানাড়ীতে 'বাহাদুর গণ্ড' (রবি আর্টিস্টস, বাঙ্গালোর) ও ২৫শে ডিসেম্বর 'উগ্রকল্যাণ' (দত্তাত্রেয় নাটক সংঘ, গডাক); ১৬ই ডিসেম্বর পাঞ্জাবীতে 'বাদি কী গুঞ্জ' (দিল্লী আর্ট থিয়েটার্স) ও ১৮ই ডিসেম্বর 'খু দে মন তে' (কলা সঙ্গম, নিউ দিল্লী;); বাঙলাতে ২১শে ডিসেম্বর 'রক্তকরবী' (বহুরূপী, কলকাতা) ও ২৩শে ডিসেম্বর 'ছেঁড়া তার' (বহুরূপী); ২২শে ডিসেম্বর মালয়িতে 'ট্রান্সফরমেশন' (দিল্লী মালয়ি সংঘ); মণিপুরিতে ২৪শে ডিসেম্বর 'হাওরঙ লাইসং সাফাবি' (মণিপুর ড্রামাটিক ইউনিয়ন, ইম্ফল) এবং ২৬শে ডিসেম্বর ইংরাজিতে 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' (থিয়েটার গ্রুপ, বম্বে)। বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন অঞ্চলের এমন আধুনিক নাট্য সমাবেশ এই প্রথম।

নাটকগুলি মঞ্চস্থ হয় সপ্রু হাউসে। নাট্যোৎসব উদ্বোধন করেন রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুও উপস্থিত ছিলেন। উৎসব উদ্বোধিত হয় 'শকুন্তলা' মঞ্চস্থ করে এবং শেষ হয় ইংরাজি নাটক 'ইডিপাস কমপ্লেক্স' দ্বারা। পুরস্কারের জন্য তিনটি শ্রেণী নির্ধারিত হয়—জাতীয় ঐতিহ্য, লোকনাট্য ও আধুনিক। শ্রেষ্ঠত্ব নির্ধারণের জন্য অধ্যাপক সামুয়েল মাথাই, কাকাসাহেব কালেলকর ও শ্রী ডি আর মানকেকরকে নিয়ে একটি বিচারকমণ্ডলি গঠিত হয়। উৎসবের শেষ দিনে ফলাফল ঘোষিত হয়। জাতীয় ঐতিহ্যমূলক নাটক হিসেবে পুরস্কার পায় মারাঠি নাটক 'ভউ বন্দকি', লোকনাটকে মণিপুরী নাটক 'হাওরং লাইসং সাফাবি' এবং আধুনিক পর্যায়ে বাঙলা 'রক্তকরবী'।

একমাত্র বহুরূপীর ক্ষেত্রেই একটি দলকে দিয়ে দু'খানি নাটক পরিবেশন করিয়ে নেওয়া হয়েছে। বাঙলা নাটক 'রক্তকরবী' ও 'ছে'ড়া তার' দর্শকদের বিস্মিত ও অভিভূত করে দেয়। অভিনয় ও উপস্থাপনের সর্বাঙ্গীণ শ্রেষ্ঠত্ব এক-বাক্যে স্বীকৃত হয়; তা না হওয়াটাই অস্বাভাবিক হতো। শম্ভু মিত্রের পরি-চালনা বিস্ময়াবিষ্ট করে দেয় ওখানকার দর্শকদের। আর সেই সঙ্গে ওরা নতুন অভিজ্ঞতা লাভ করে তাপস সেনের আলোকসম্পাত থেকে। আলোকসম্পাতটা প্রায় সব নাটকের ক্ষেত্রে বিরক্তিকর লেগেছে; ব্যবহার জানা যখন নেই তখন ব্যবহার না করলেই বরং ভালো হতো। যাই হোক বাঙলা নাটক থেকে ওরা শেখবার সুযোগ পেয়েছে। পর্দার ব্যবস্থাও ভালো ছিল না, প্রতিদিনই গড়বড় করেছে। মঞ্চও প্রসারে এতো ছোট যে, অনেক নাটকের দৃশ্যসজ্জা বেমানান রকম বড়ো ঠেকেছে। এ দুটি নাটকের তুলনায় বাকি সব নাটকই অতীব দীন মনে হয়েছে সকলেরই। সাধারণের মতে এর পর যদি উল্লেখ করতেই হয় তো মণিপুরি নাটকখানিরই নাম করা যায়।

উৎসব আরম্ভে ডাঃ সত্যনারায়ন সিংহ তাঁর ভাষণে বলেন 'এমনি ধারা উৎসব সারা দেশ থেকে নাট্যশিল্পের সাধকদের এক জায়গায় সমবেত হওয়ার সুযোগ এনে দেয়। ভারতের বিভিন্ন স্থানে নানাভাবে নাট্য প্রযোজনা সম্পর্কে তাদের অবহিত হওয়ার সুযোগ দান করে। এইভাবেই ভারতে নতুন নাট্যশালার পত্তন আশা করা যায়।' ডাঃ সত্যানারায়ণের এই উক্তি সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলবার আছে। প্রথমত ভারতের নিজস্ব নাট্য ঐতিহ্য যা বেদ থেকে চলে আসছে তাকে অগ্রাহ্য করে পাশ্চাত্যধারাকে প্রতিষ্ঠা দেবার কোন যুক্তি পাওয়া যায় না। তাছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের নাট্যামোদিরা এক জায়গায় মিলিত হয়ে পরস্পরের ভাব ও রূপায়ন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ দিল্লীর উৎসবে ছিল না। সেইটেই হওয়া অনুষ্ঠানের যথার্থ প্রমাণিত করতো, কিন্তু সে জায়গায় হয়ে দাঁড়ালো কেবলমাত্র দিল্লীর নাট্যামোদী জনসাধারণকেই নানা অঞ্চলের নানা ভাষার নাটক দেখার সুযোগ করে দেওয়া। যদিও, ব্যবস্থার ত্রুটির জন্যে দর্শকরা যার যা মাতৃভাষার নাটক দেখতেই সমাগত হয়েছে, অপর কোন ভাষার নাটকের প্রতি তাদের আকর্ষণ টানার মতো যথেষ্ট প্রচার ও জনসংযোগ হয়নি। ফলে যে সকল ভাষার ভাষীরা দিল্লীতে বেশী সংখ্যায় আছেন সেই ভাষার নাটকগুলিতেই ভীড় হয়েছে—যেমন, বাঙলা, হিন্দী, তামিল, তেলেগু প্রভৃতি, কিন্তু অসমীয়া, ওড়িয়া, মণিপুরির ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে জনসমাগম যথেষ্ট হয়নি।

বাঙলা "রক্তকরবী"-র এক নাটকীয় মুহূর্ত—অভিনয়, পরিচালনা, আলোক-সম্পাত ও দৃশ্যসজ্জার দিক থেকে দিল্লীর উৎসবে যুগান্তকারি নাট্যসৃষ্টি বলে সুখ্যাত হয়

তবে শেষ দিনে উৎসব কমিটির সভাপতির ত্রুটিবিচ্যুতি সম্পর্কে বলেন, উৎসবটির অনুষ্ঠানে সঙ্গীত-নাটক একাদমিকে বহু বেগ পেতে হয়েছে, তবে প্রথমবার যে অভিজ্ঞতা লাভ করা গেল পরে তা কাজে লাগানো যাবে। দেখা গেল তিনিও এই নাটকাবলীকেই জাতীয় ঐতিহ্যের অঙ্গ বলে ধরে নিয়েছেন, অথচ এই ডাঃ কেশকারই ভারতীয় সঙ্গীতকে বিদেশী প্রভাবমুক্ত করে দেশের প্রকৃত ঐতিহ্যের প্রতিভূ করে তোলার জন্য কেমন প্রশংসনীয় চেষ্টাই না করে চলেছেন। অন্তত তাঁর উচিত ছিল আধুনিক সঙ্গীতের মতো এই নাট্য-ধারাকে 'আধুনিক' বলে আখ্যাত করে দেওয়া। এই 'আধুনিক' নাটকের প্রয়ো-জনীয়তাও আছে এবং আজকালকার অবস্থায় তার প্রতিষ্ঠা ও ব্যাপক প্রসারও দরকার। কিন্তু তাই বলে একেই জাতীয় বলে অভিহিত করাও ঠিক নয় বা প্রকৃত জাতীয় নাট্য ঐতিহ্যকে উপেক্ষা করাও উচিত হবে না।

বহুরূপী অভিনীত 'রক্তকরবী' ও 'ছে'ড়া তার'এর পরিচয় 'দেশ'এর পাঠদের কাছে নিষ্প্রয়োজন। উৎসবে পরিবেশিত অন্যান্য নাটকগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় নীচে দেওয়া গেলঃ—

শকুন্তলা (সংস্কৃত)—বম্বের ব্রাহ্মণ

তেলেগু নাটক "শ্রীকৃষ্ণতুলাভরম" পৌরাণিক হলেও সাজপোশাকের সংগতি ছিল না। ডানদিকে নীচে মাইকটা লক্ষ্যে পড়বে

সভা কর্তৃক প্রযোজিত নাটকখানি মূলে সংস্কৃত ভাষাতেই অভিনীত হয়। ভাষা সবাই অনুসরণ করতে না পারলেও সংস্কৃতের ঝঙ্কার কানে একটা সুর এনে দেয়। হয়তো জানা কাহিনী ব'লে ঘটনা বুঝতে দর্শককে বেগ পেতে হয়নি। গানের ওপরে বেশী জোর দেওয়া হয়েছে এবং গান সংখ্যায়ও অনেক। অর্গানের ব্যবহার এবং সাজ-পোশাক, বিশেষ করে মেয়েদের পোশাক এখনকার মহারাষ্ট্রীয় ঢঙের হওয়াটা সমালোচকদের কাছে আপত্তিকর মনে হয়েছে। মঞ্চের পরিসরের তুলনায় দৃশ্যসজ্জা সামগ্রী আকারে বড়ো, ফলে বড়ো ঘেঁষাঘেঁষি দেখিয়েছে। প্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে অভিনয়ে ছিলেন নাম ভূমিকায় শকুন্তলা ডোঙরে, দুষ্মন্তের ভূমিকায় কে সি এম ভাটওয়াড়েকর, বিদূষকের ভূমিকায় বি কে নেনে এবং প্রিয়ম্বদা ও অনসূয়ার ভূমিকায় যথাক্রমে সুধা দেশপাণ্ডে ও চন্দা খাড়ে।

হাম হিন্দুস্তানী (হিন্দী)—প্রাদেশিকতা নিয়ে রঙ্গনাট্য "হাম হিন্দুস্তানী" পরিবেশন করেন দিল্লীর ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল থিয়েটার সম্প্রদায়। আর জি আনন্দ রচিত নাটকখানি অনেকটা প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত বাঙলা ছবি "ওরা থাকে ওধারে"-র মতো। তবে এক্ষেত্রে প্রতিবেশী পরিবার দু'টির একটি মাদ্রাজী এবং অপরটি পাঞ্জাবী। পরস্পরের পৃথক প্রকৃতির আচার বিচার। কেবলই সংঘর্ষ। শেষে এই বিবাদের মধ্যে মিলনের সূত্র পাওয়া গেল। এক পরিবারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলো অপর পরিবারের মেয়ের। মঞ্চের মাঝে একটা দেওয়াল বসিয়ে দু'টি পরিবারকে একই সঙ্গে দেখানোর কৌশলটি সুপ্রযুক্ত। তিন অঙ্কের প্রহসন, প্রচুর হাসিয়েছে। অভিনয়াংশে ছিলেন পরশুরাম, এস ধর্মস্বিল, কে এস হুন, বি এস থাপা, মালহোত্র, সুধা হুন প্রভৃতি।

কুণ্ডে কি মৌত (হিন্দী)—দ্বিতীয় হিন্দী নাটক "কুণ্ডে কি মৌত" পরিবেশন করেন এলাহাবাদ গ্রুপ। এক ধনীর মেয়ের পোষা কুকুরের অসুখে দরদ অথচ বাড়ির পরিচারক পুত্রের অসুখের প্রতি অবজ্ঞা নিয়ে গল্প। এক অঙ্কের প্রহসনখানির ঘটনাস্থল বম্বের মালাবার হিল। অতি অপ্রাকৃত ব্যাপার, অত্যন্ত অসম্ভব ও কৃত্রিম। নাট্যরচয়িতা শ্রীকৃষণচন্দর।

অম্বাপল্লী (হিন্দী)—বিহার কলা কেন্দ্র কর্তৃক পরিবেশিত রামবৃক্ষ বেনিপুরি রচিত বিখ্যাত নাটক "অম্বাপলি" বিহার কলা কেন্দ্র কর্তৃক মঞ্চস্থ হয়। খানিকটা ইতিহাস ও খানিকটা কিংবদন্তী মেশানো কাহিনী। বৈশালির এক গ্রাম্য মেয়ে অম্বাপলি স্বপ্ন দেখতো রাজা, পক্ষীরাজের মতো অসম্ভব জিনিসের। বার্ষিক মেলায় গ্রামবাসী তাকে রাজনর্তকী নির্বাচিত করতে অম্বাপলির স্বপ্ন সত্যি হয়ে যায়। মগধের রাজা অজাতশত্রু অম্বাপলির রূপের কথা শুনে বৃজি আক্রমণ করলেন। অম্বাপলির নায়িকাত্বে বীরের মতো প্রতিরোধ করলেও অজাতশত্রু বিজয়ী হলেন। কিন্তু অম্বাপলিকে বিয়েতে রাজী করতে পারলেন না, কারণ বুদ্ধের সাক্ষাৎ পেয়ে অম্বাপলি তখন নতুন জীবন লাভ করেছে। ইতিমধ্যে অম্বাপলির বাল্যসখা অরুণধ্বজ যুদ্ধে আহত হয়ে মারা যায়। দুঃখে অম্বাপলি ভিক্ষুণীর বেশে বুদ্ধের বাণী প্রচার করতে থাকে। অপর হিন্দী নাটক দু'খানির তুলনায় অনেক ভালোভাবেই "অম্বাপলি" পরিবেশিত হয়। বেশ বলিষ্ঠ ও কাব্যিক সংলাপ। নাটক হিসেবে ত্রুটি যথেষ্ট। বিবৃতিপ্রধান নাটক। অম্বাপলি ছাড়া আর কোন চরিত্রের ওপরে কোন জোর দেওয়া নেই। নাম ভূমিকায় শোভা সিমোর কৃতিত্ব দেখান। অন্যান্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন ব্রজরাজ সিংহ, বীরেন্দ্রনারায়ণ প্রভৃতি। এমন পোশাকী কাহিনী হলেও পরিচালক নাচ গানে ব্যবহারে সংযম দেখিয়েছেন।

ভউবন্দকি (মারাঠী)—সত্য ও ন্যায় প্রতিষ্ঠা নিয়ে মহারাষ্ট্র ইতিহাসের একটি অধ্যায় অবলম্বনে রচিত স্বর্গত কাকা খাদিকরের (কৃষ্ণাজী প্রভাকর) নাটক "ভউবন্দকি" পরিবেশন করেন বম্বে মারাঠি সাহিত্য সঙ্ঘ এবং পরিচালনা করেন কেশবরাও দাতে। বাঙলা নাটক বহুরূপী পরিবেশিত "রক্তকরবী" ও "ছেঁড়া তার"-এর পর যদি আর কোন নাম করতেই হয় তো তা মারাঠি নাটক সম্পর্কে করা যায়। নাট্যকার খাদিকর ছিলেন লোকমান্যের সাথী এবং নামকরা সাংবাদিক। এই নাটকখানির সাহায্যে দেশাত্মবোধ প্রচারই ছিল উদ্দেশ্য। নাটকখানি প্রথম অভিনীত হয় ১৯০৯ সালে। পরিচালক কেশবরাও দাতে বম্বের নামকরা অভিনেতা। তিনি ছাড়া এ দলে দুর্গা খোটের আবির্ভাবও নাটকখানির ওজন বাড়িয়ে দেয়। মাধবরাও পেশোয়ার মৃত্যুর পর তাঁর নাবালক পুত্র নারায়ণরাওকে সিংহাসনে বসানোতে পরলোকগত পেশোয়ার ভাই রাঘবদাদা

হতাশ হয়ে পড়েন। তাঁর স্ত্রী আনন্দীবাঈ তাঁকে গদি দখল করার জন্য উত্তেজিত করে তোলে। রাজ্যের কোষাগার তখন শূন্যে, শাসন চালানো দায়। সেনারা বিদ্রোহ করতে চায়। রাঘব এই সুযোগে সৈন্যদের আশ্বাস দিলে যে নারায়ণরাওকে বন্দী করে আটক রাখতে পারলে সে ওদের টাকার ব্যবস্থা করে দেবে। আনন্দীবাঈ আরও অগ্রসর হয়ে নারায়ণরাওকে হত্যার আদেশ দিলে। এবং আনন্দীবাঈ তার সহচরের সহায়তায় নিজেই সে কাজ হাশিল করলে। রাজ্যের প্রধান বিচারপতি ন্যায়াবতার রামশাস্ত্রীর হাতে পড়লো জাল আদেশনামা। বিচারপতি রাঘব ও আনন্দীবাঈয়ের ফাঁসির আদেশ দিলেন। নানা ফড়নবীশের অধিনায়কত্বে ওদের গ্রেপ্তারের চেষ্টা হলো কিন্তু রাঘব ও আনন্দীবাঈ পালিয়ে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আশ্রয় নিলে। নিহত পেশোয়ার বিধবা সে সময়ে এক পুত্র প্রসব করেন যাকে নতুন পেশোয়া বলে ঘোষণা করা হয়। এতে অন্যান্য অভিনয়-শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মাস্টার দত্তারাম, কে সি এম ভাটাবাদেকর, নানাসাহেব পাঠক, মামা পেণ্ডসে, নানা অভ্যঙ্কর, এস ঘনেকর, সুধা আমোয়ঙ্কর, ডি দেবধর, সুমন মারাঠে প্রভৃতি। সাজ পোশাকের ব্যাপারে ইতিহাসের ছাপ চমৎকার এনে দেওয়া হয়।

সারদা (মারাঠী)—উৎসবে পরিবেশিত দ্বিতীয় মারাঠী নাটক 'সারদা' প্রযোজনা করেন পুণার মহারাষ্ট্র নাট্য সম্মেলন। নাট্যকার গোবিন্দবল্লভ দেবল। এটিও অনেক কালের পুরনো নাটক, প্রথম অভিনীত হয় ১৮৯৯ সালে। একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে এর অন্যতম অভিনেতা চিন্তুবুয়া দিবেকর যিনি নাটকখানি প্রথম মঞ্চস্থ হবার সময় অবতরণ করে আজও এতে অভিনয় করে যাচ্ছেন এখন বয়েস আশী বছরে পোঁছলেও। অতি পুরনো ধারার প্রযোজনা, সেই আগের আমলের মতো। সঙ্গীত ও কাব্যমুখর নাটক। গল্প বিয়ে পাগলা বুড়োকে নিয়ে। বিপত্নীক ভুজঙ্গনাথের যৌবন গেলেও আবার বিয়ে করতে চায়। চতুর ঘটক ভদ্রেশ্বর দীক্ষিত ওকে পরামর্শ দেয় এক দূর শহরে গিয়ে নিজেকে এক জায়গীরদার বলে পরিচিত করে নিতে। ভদ্রেশ্বর তারপর দরিদ্র ব্রাহ্মণ কাঞ্চন ভটকে টাকা দিয়ে তার নাবালিকা কন্যা সারদার সঙ্গে বিয়ের ব্যবস্থা করে। ভুজঙ্গনাথের কর্মচারী কোদণ্ড এই বিয়ের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়। ভদ্রেশ্বর কৌশলে কোদণ্ডকে বন্দী করে ফেলে। কিন্তু কোদণ্ড নিজেকে মুক্ত করে বিয়ে ভেঙে দেয়। এই শোকে মেয়ের বাবা পাগল হয়ে যায়। সারদা নদীতে আত্মহত্যা করতে যায়। কোদণ্ড তা জানতে পেরে সারদাকে বাঁচাবার চেষ্টা করে; এবং কোদণ্ড সারদাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিতে তবে সারদা নিবৃত্ত হয়।

চিন্তুবুয়া দিবেকর অভিনয়ই শুধু করেন না, এই বয়সে তিনি গানও করেন। পরিচালক গণপৎরাও বোডাসও একটি মুখ্য ভূমিকায় অভিনয় করেন। আর ছিলেন অনন্ত ধুমল, প্রভা আত্রে, বালচন্দ্র পেণ্ডারকর প্রভৃতি। পঞ্চাশ বছর আগে মারাঠী মঞ্চ যেমন ছিল 'সারদা' তার দৃষ্টান্ত।

মাজম রাত (গুজরাটি)—প্রযোজক বম্বের ইণ্ডিয়ান ন্যাশন্যাল থিয়েটার; নাট্যকার চন্দ্রবদন সি মেহতা এবং পরিচালক ফিরোজ আন্তিয়া। মধ্যবিত্ত পরিবারের সংকট ও সংস্কার নিয়ে কাহিনী। ধনুভাই ও বিনায়ক দু ভাই। বিনায়কের বেহিসেবী স্ত্রীর জন্যে পরিবারটি পথে বসবার উপক্রম হয়। ধনুভাই গ্রাম থেকে

হিন্দী নাটক "হাম হিন্দুস্তানী"-র শেষ দৃশ্যে মাদ্রাজী-পাঞ্জাবীর মিলন

ইংরিজী নাটকের অনুসরণে রচিত উর্দু নাটক "নই রোশনী"-র একটি দৃশ্য

রাজনীতির ওপর ভিত্তি ওড়িয়া নাটক "পরকলম"-এর লোকনৃত্য

এসে ভায়ের অবস্থা দেখে নিজের হাতেই সংসারের ভার তুলে নিলে। বিনায়ক স্ত্রীকে ভয় করলেও দাদার সব ব্যবস্থাতে সায় দিয়ে থাকে। ধনুভাই তার উচ্ছন্নে যাওয়া ভাইটিকেও শোধরাবার চেষ্টা করতে থাকে। বিনায়কের স্ত্রী ও কন্যার মধ্যে সংসারের এই সংস্কার নিয়ে প্রায়ই মতান্তর লেগে যায়। একটি বৈঠকখানাতেই তিনটি দৃশ্যের নাটক। সংলাপই সব। গুটি দশেক মাত্র চরিত্র।

শিবকামিয়িন শপথম (তামিল)—প্রযোজনা করেন মাদ্রাজের কৃপা এমেচারর্স সম্প্রদায়। মাদ্রাজের প্রখ্যাত সাহিত্যিক স্বর্গত কল্কি (আর কৃষ্ণমূর্তি) উপন্যাস অবলম্বনে ভি আর পার্থসারথী রচিত নাটকখানির ঘটনাকাল অষ্টম শতাব্দীতে পল্লব ও চালুক্যের রাজত্বকালে। শিবকামি নামকরা স্থপতি আয়ানারের কন্যা এবং পল্লব রাজধানী কাঞ্চির রাজনর্তকী। মহেন্দ্র বর্মনের পুত্র নরসিংহ বর্মণ শিবকামির প্রেমে পড়ে। কিন্তু পল্লব ও চালুক্যের পরস্পরের বিবাদের ফলে ওদের প্রণয় বাধা প্রাপ্ত হয়। চালুক্যের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নাগানন্দ ছিলেন বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি তার ভিক্ষু বেশের সুযোগ নিয়ে পল্লব রাজধানী থেকে গুপ্ত সংবাদ আহরণ করতে লাগলেন। নাগানন্দ শিবকামিকে নিয়ে রাখলেন বটপীতে। শিবকামি শপথ গ্রহণ করলে যে চালুক্যের ওপর প্রতিশোধ গ্রহণ করা না হলে সে কঞ্চীতে ফিরে যাবে না। যুদ্ধে মহেন্দ্র বর্মণ নিহত হলেন। বটপী আক্রমণ করে রাজা পুলেকেশিকে নিহত করে নরসিংহ শিবকামির শপথ রক্ষা করলে। তারপর ন' বৎসর অতিক্রান্ত হলো। ইতিমধ্যে নরসিংহ পাও রাজকুমারীকে বিয়ে করেছে। ব্যর্থ প্রেম নিয়ে শিবকামি নিজেকে ভগবৎ সেবায় উৎসর্গ করলে।

ডাঃ রামমূর্তি নাটকখানি পরিচালনা করেন এবং নাগা নন্দের ভূমিকায় অভিনয়ও করেন। সি বরদারাজন ছিলেন নরসিংহের চরিত্রে। এতে স্ত্রী চরিত্রগুলি অভিনীত হয় পুরুষ দ্বারা। এবং শিবকামির চরিত্রে ভি এস রামমূর্তি প্রারম্ভিক দৃশ্যে ভরতনাট্যমের একটি নাচ দেখিয়ে নাম করেন। সাজপোশাক জমকালো। নাট্য প্রয়োগে আধুনিক কলাকৌশল অবলম্বন করা হয়। বটপীর পতন দেখাতে ছায়া অভিনয় কৌশল প্রয়োগ করা হয়। মঞ্চ ছোট থাকায় মঞ্চ সাজগুলো মাত্রাছাড়া বড়ো দেখতে হয়। এ নাটকখানি মঞ্চস্থ হয় পোস্টাল সেন্টেনারি থিয়েটার হলে।

শ্রীকৃষ্ণ তুলাভরম (তেলেগু)—গত ৩০ বছর ধরে দাক্ষিণাত্যে প্রভূত জনপ্রিয় নাটক 'শ্রীকৃষ্ণ তুলাভরম' পরিবেশন করেন তেলানির শ্রীরামবিলাস সভা। অন্ধ্র নাট্যকলা পরিষদের ৫২ বৎসর বয়স্ক সভাপতি এস নরসিংহ রাও এতে অভিনয় করেন সত্যভামার চরিত্রে এবং অপরাপর স্ত্রী চরিত্রগুলিতে মহিলা শিল্পী অবতরণ করলেও এই প্রধান স্ত্রী চরিত্রটিতেই পুরুষকে নামানো হয়। বহু বৎসর ধরে শ্রী রাও এই চরিত্রটিতে অভিনয় করে আসছেন বলেই তার ক্ষেত্রে এই পক্ষপাতিত্ব দেখানো হয়। তবে বার্ধক্য হেতু অতি বেমানান হয়ে দাঁড়ায় এবং এমন একটা জাতীয় মেলায়ও ব্যাপারটা অতি বিসদৃশ লাগলো। পৌরাণিক আখ্যানবস্তুটি হচ্ছে রুক্মিণীর প্রতি সত্যভামার ঈর্ষার কাহিনী। নারদের পরামর্শে সত্যভামা এক অনুষ্ঠান করে শ্রীকৃষ্ণকে দান করে দেন, কিন্তু পরে সমস্ত অলঙ্কার ঐশ্বর্য পাল্লায় তুলেও শ্রীকৃষ্ণের ওজনের সমান করতে পারলেন না। শেষে রুক্মিণীর নিঃস্বার্থ ভক্তিই শ্রীকৃষ্ণকে ফিরিয়ে আনলে। এতে অন্যান্য অভিনয়শিল্পীর মধ্যে ছিলেন রঘুরামাইয়া, রামকৃষ্ণ শাস্ত্রী ভেঙ্কটসুব্বিয়া প্রভৃতি। প্রচুর সঙ্গীত। দৃশ্যসজ্জার বালাই ছিল না বলা যায়।

ঊষা পরিণয়ম (তেলেগু)—নাট্যোৎসবে পরিবেশিত প্রথম তেলেগু নাটক 'তেলেগু শ্রীকৃষ্ণ তুলাভরম'-এর মতো 'ঊষা পরিণয়ম'-এর কাহিনীও পৌরাণিক। ভেঙ্কটরাম নাট্যমণ্ডলী এই নৃত্যনাট্যখানি পরিবেশন করেন। অসমীয়া নাটক 'শোনিত কুঁয়ারী'র সঙ্গে এর কাহিনীর মিল রয়েছে। বিজয়ওয়াড়ার নিকটবর্তী কুচিপুরি গ্রামের নিজস্ব নৃত্যনাট্য এটি। এ স্থানকে ভরত নাট্যমের প্রাচীনতম কেন্দ্র বলে অভিহিত করা হয় এবং কথিত আছে যে এখানকারই শেকড় নিয়ে গিয়ে তাঞ্জোরে প্রোথিত করা হয়। ব্যাকরণ মেনে চলে এখানকার নাচে সে ঐতিহ্য যুগ যুগ ধরে রক্ষা করে আসা হচ্ছে। তাই 'ঊষা পরিণয়ম'-এর মধ্যে নাটকের চেয়ে কুচিপুরি নাচের বৈশিষ্ট্য প্রদর্শনই আসল বিষয়। পুরুষেরা এ নাটকে নারীর বেশ ধারণ করে আবির্ভূত হয়। এমন উপস্থাপন, যে দেখে মনে হয় মঞ্চের চেয়ে খোলা জায়গায় প্রদর্শনই প্রশস্ত। ভারতের একটা ক্ল্যাসিক্যাল ধারার নাচ দেখার আনন্দ উপভোগ করা যায় কিন্তু আলোকসম্পাত বড়ো বিরক্তি উৎপাদন করেছে।

বাহাদুর গণ্ডা (কানাড়ী)—'বাহাদুর গণ্ডা' অর্থাৎ সাহসী স্বামীর রচয়িতা নরসিংহ রাও পারবতবড়ি; পরিবেশন করেন বাঙ্গালোরের রবি আর্টিস্টস। পরিচালনা করেন বি এস নারায়ণ এবং প্রযোজনা জি

এস রায়ার রাও। মূল আখ্যানবস্তু সেক্সপীয়রের 'টেমিং অফ দি শ্রু' থেকে নেওয়া তাছাড়া সবই মৌলিক কর্ণাটি জিনিস এবং কানাড়ীভাষী মধ্যবিত্ত পরিবারের পরিবেশ। এক রণাণ্ডী মেয়েকে পাত্রস্থ করা নিয়ে গল্প। বিয়ে করতে সে রাজী না হওয়ায় তার ছোট বোনের জন্য পাত্রের খোঁজ চললো। এক কুতূহলী পাত্র বড় বোনের ছবি দেখে তাকেই বিয়ে করার সংকল্প করে এবং শেষে সাফল্যও অর্জন করে। তামিল ও তেলেগুর নাটকাভিনয়ের মতো এবং প্রধান দুটি স্ত্রী চরিত্রই পুরুষদের দ্বারা অভিনীত হয় এবং এইখানেই নাটকখানির ঔজ্জ্বল্য ক্ষীণ হয়ে যায়। প্রহসন; সংলাপে প্রচুর ইংরিজী শব্দ। সামান্য সঙ্গীত তাও অবহেলিত। অভিনয় করেন বি এস নারায়ণ, টি এস বিজয়া, সি জয়া বিদ্যা, এম এস রামচন্দর প্রভৃতি।

উগ্র কল্যাণ (কানাড়ী)—নিরামিষ আহারের মাহাত্ম্য থেকে, নিষ্ঠা, ত্যাগ, সত্য, অহিংসা প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়ে নিজের বক্তব্য পেশ করার জন্যই সম্ভবত স্বর্গত সদাশিবরাও গরুড় এই নাটকখানি লিখে গিয়েছেন। গডাগের দত্তাত্রেয় নাটক সংঘ নাটকখানি পরিবেশন করেন। কাহিনীটিও বিচিত্র। ঢাকার নবাবের কন্যা এক ব্রাহ্মণ যুবকের প্রেমে প'ড়ে মুসলমান ও হিন্দুর মধ্যে বিয়ে হতে পারে কি না এই এক সমস্যার সৃষ্টি করে। মৌলবী ও পণ্ডিতের বিতর্কের পর নবাব সন্তুষ্ট হলেন জেনে যে কোরাণে এরকম বিয়ের নিদান আছে। ব্রাহ্মণ যুবকও তার ধর্মগুরুর কাছে শুনলেন যে শাস্ত্রে এমন বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। কিন্তু বিয়ের পর ওরা দুজনে পুরীর মন্দিরে যেতে পাণ্ডারা নবাবের কন্যাকে মেরে আহত করলে। ক্রুদ্ধ যুবক এর প্রতিশোধ নিতে বদ্ধপরিকর হলো। কিন্তু নবাব তাকে অহিংসনীতি অবলম্বনে উপদেশ দিলে। যুবক মানবের সেবায় আত্মনিয়োগ করলে। খোলাখুলি প্রচারমূলক নাটক এবং এক একটা সমস্যা ধরে এক রাশ শুদ্ধ নীতি কথা। শিল্পীরাও পরস্পরের সঙ্গে কথা বলার ভঙ্গীর চেয়ে সভায় বক্তৃতা দেবার মতো করে সংলাপ বলে যান। কৃত্রিম ঘটনা বিন্যাস। নাটক শেষ হয় 'রঘুপতি রাঘব' ও 'সত্যমেব জয়তে' গেয়ে। এতে মহিলা শিল্পী এস কুলকারনিকে এক মৌলবীর চরিত্রে নামানো হয়। অন্যান্য চরিত্রে ছিলেন অনসূয়া গরুড়, বনদেবী পাগে, এস এস গরুড়, বি পুরুষোপ্পানভর প্রভৃতি।

ভাগবৎপুরাণম, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণ থেকে আহৃত উপাদান নিয়ে গঠিত অসমীয়া নাটক "সোণিত কুঁয়ারী"-র দৃশ্য

পর কলম (ওড়িয়া)—"পর কলম" অর্থাৎ পালকের কলম মঞ্চস্থ করেন কটকের জনতা রঙ্গমঞ্চ সম্প্রদায়। গোপাল ছোত্রে রচিত শ্লেষাত্মক নাটকখানির রস শেষের দিকে রাজনীতি এসে নষ্ট করে দেয়। চলতি ভাষার সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে এবং চরিত্রগুলি নেওয়া হয়েছে বাস্তব সমাজের বিভিন্ন স্তর থেকে। কলমটি হচ্ছে একজনের নির্বাচনী প্রতীক। আরম্ভ গভর্নমেণ্টের খাদ্যনীতি নিয়ে পরিষদে এক বক্তৃতা থেকে। বিরোধী দল সরকারী নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে নির্বাচনে জয়লাভ করে এবং মন্ত্রিত্ব গঠন করে। এই পরিবর্তনে গ্রামের লোকের কিছুই লাভ হলো না এবং তাদের মোহ ভাঙলো নতুন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে এক ব্যর্থ সাক্ষাৎকারের পর। এক খাদ্য আমদানী-কারকের দ্বারা বিকট দুর্ভিক্ষ এনে ফেলা, ছাত্র ধর্মঘট শেষে মন্ত্রীদের মধ্যে বিরোধ এবং রাজ্যপাল কর্তৃক নতুন মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ ইত্যাদি ব্যাপার দীর্ঘ ঘণ্টাখানেক নিরেট দৃশ্যে দেখানো হয়েছে। প্রভাকর, নিরঞ্জন, গোবর্ধন, পূর্ণচাঁদ, উমাশশী প্রভৃতি অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখান। অনুরাধার একটি নাচ প্রশংসিত হয়। গান ও নাচগুলি মনোরম হলেও সংখ্যাধিক্য ঘটনার গতিকে থমকে দিয়েছে। রূপসজ্জা ও আলোকসম্পাতের দিকে বিশেষ যত্ন দেখা গেল না।

নই রোশনি (উর্দু)—উৎসব উদ্যোক্তারা "নই রোশনি"-র ক্ষেত্রে একটা ব্যতিক্রমকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। এটি মৌলিক নাট্যরচনা নয়, শেরিডনের "দি রাইভালস্" অবলম্বনে রচিত একটি প্রহসন যদিও উর্দুতে মৌলিক নাটকের অভাব ছিল না। একেবারে ভারতীয় করে নেওয়া হয়েছে বলে ঘোষিত হলেও দেখা গেল ভাষান্তর ছাড়া প্রায় সবই শেরিডনের জিনিসই আছে। হায়দরাবাদের আঞ্জুমান-ই-তরক্কি দল নাটকখানি পরিবেশন করেন। অত্যন্ত হেলাফেলাভাবে মঞ্চস্থ হয় এ নাটকখানি। পর্দা ও আলোকপাতের গোলমাল তো লেগেই ছিল। নাটকখানির মধ্যে ধারকরা জিনিসের কৃত্রিমতা ভর্তি। উর্দু নাটক সম্পর্কে "নই রোশনি" খুব খারাপ ধারণা সৃষ্টি করিয়ে দিয়েছে। প্রযোজনা ও পরিচালনা করেন যথাক্রমে জিয়ায়ুল হাসান জাফারি ও শেহরিয়ার কাসুজী। নাট্যরচয়িতা মহম্মদ ফজলুর রহমান। হামিদ আনসারি, মহসিন আলি, শেহরিয়ার

তামিল "শিবকামিন শপথম"-র দৃশ্য—কাঞ্চির ভগবান একম্বরনাথের নিকট শিবকামির পূজা

কাসুজী, আহমদ রাজভী, কাসার জেহান প্রভৃতি অভিনয়ে কৃতিত্ব দেখান। তবে শিল্পীদের মাইক-সতর্কতা বিসদৃশ লাগলো।

সোনিত কুঁয়ারি (অসমীয়া)—আসাম সঙ্গীত-নাটক একাদমি কর্তৃক প্রযোজিত অসমীয়া নাটক "সোনিত কুঁয়ারী" প্রচলিত একটি পুরাণ কাহিনী। নাট্যকার জ্যোতি-প্রসাদ আগরওয়ালা। দানবরাজ বাণের কন্যা ঊষা ও শ্রীকৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের প্রণয়। কামদেব ও স্বপ্নাদেবীর ষড়যন্ত্রে ঊষা স্বপ্নে দেখা এক সুদর্শন যুবকের প্রেমে পড়ে যায়। সহচরী চিত্রলেখা বর্ণনা শুনে একটা প্রতিকৃতি এঁকে নিয়ে বালকের ছদ্মবেশে নানা দেশ ঘুরে অবশেষে দ্বারকায় এসে অনিরুদ্ধের সাক্ষাৎ পেলে। অনিরুদ্ধও ঊষার প্রতিকৃতি দেখে তার প্রেমে পড়ে যায় এবং চিত্রলেখার পরিচয় আবিষ্কার করে তাকে সঙ্গে নিয়ে সোনিতপুরে এসে অনিরুদ্ধ গন্ধর্বমতে ঊষাকে বিবাহ করে। ক্রুদ্ধ বাণরাজ অনিরুদ্ধকে বন্দী করে কিন্তু পরে শিবের চেষ্টায় ওদের বিবাহ স্বীকার করে নেয়।

অত্যন্ত আড়ম্বরপূর্ণ দৃশ্য ও সাজ-পোশাক। নাচ, গান ও আবহসঙ্গীত নাটকে সৌষ্টব এনে দেয়। অভিনয়ে ছিলেন বকুল সাইকিয়া, নিরুপমা বড়-ঠাকুর, অজয় চালিহা, ফণী শর্মা প্রভৃতি।

বাদি কি গুঞ্জ (পাঞ্জাবী)—"বাদি কি গুঞ্জ" বা উপত্যকার ডাক নৃত্যগীত বহুল লোকনাট্য শ্রেণীতে পড়লেও এর বিষয়বস্তু সরাসরি রাজনীতি নিয়ে। কাশ্মীর হচ্ছে এর ঘটনাস্থল। সামন্ত-তন্ত্রের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রাম; লুটেরাদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করার জন্য দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা ও ভারতীয় মুক্তিবাহিনীর সহিত সহযোগিতা; বিদেশীদের ক্রীড়নক হওয়া থেকে নিজেদের রক্ষা এবং শেষে গণতন্ত্রী ভারতের অন্তর্ভুক্তি প্রভৃতি এর ঘটনাবলী। এলোপাতাড়ি ব্যাপার। নাটক রচনা করেন শীলা ভাটিয়া এবং পরিবেশন করেন দিল্লী আর্ট থিয়েটার।

খু দে মুঁহ তে (পাঞ্জাবী)—ইউজিন ও'নীলের একখানা নাটকের ছাপ রয়েছে দ্বিতীয় পাঞ্জাবী নাটক "খু দে মুঁহ তে"। নাট্যরচয়িতা পরিতোষ গার্গি। দুর্বল রচনা এবং অভিনয়ও। বৃদ্ধের তৃতীয় পক্ষের যুবতী ভার্যা নিয়ে গল্প। বৃদ্ধের ছোট ছেলের নজর পড়লো এই বিমাতার ওপর। যুবতীর একটি সন্তান জন্মের পর গ্রামে কথা উঠলো তাই নিয়ে পিতাপুত্রে কলহ বাধলো যার ফলে পুত্র গৃহত্যাগ করলে এবং আত্মহত্যা করলে। তিন অঙ্কের নিরস নাটক। অভিনয় করেন সন্তোষ গার্গি, নরেন্দ্র গোস্বামী, চমন সেঠি প্রভৃতি। দৃশ্য সজ্জার দিকটাই শুধু যথাযথ ছিল। আলোকসম্পাত এলোমেলো।

মন্নাম পেন্নাম (মালয়ী)—দিল্লী মালয়ী এসোসিয়েশন কর্তৃক পরিবেশিত "মন্নাম পেন্নাম" বা অদল-বদল এক অঙ্কের নাটিকা। রচয়িতা পি সি কুট্টি কৃষ্ণ "ঔবুব"। সাজপোশাক দৃশ্যসজ্জার কোন পরোয়া না রেখে তৈরী নাটক। চরিত্রও সংখ্যায় মাত্র সাতটি। সবকিছুই নির্ভরিত হয়েছে সংলাপের ওপর। প্রাচীনতা ও নবীনতার সংঘর্ষ নিয়ে গল্প। চারটি চরিত্রই শুধু নজরে পড়ে। সুব্রহ্মণ্যম্ মেনন, কৃষ্ণ পিল্লাই, আপ্পু প্রভৃতি অভিনয় করেন।

হাওরঙ লাইসং সফাবি (মণিপুরী)—দুটি উপজাতির দুই রাজা বন্ধুত্ব অটুট রাখার জন্যে একের কন্যার সঙ্গে অপরের পুত্রের বিয়ে দেওয়ার শপথ গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে রাজকুমারী বাঘের মুখে পড়ে এবং এক রাজকুমার তাকে উদ্ধার করে। ওরা দুজনে পরস্পরের অনুগত থাকার শপথ গ্রহণ করে। রাজকুমারীর পিতা এ বারতা জানতো না, তাই কন্যার কক্ষে এক অপরিচিত যুবকের উপস্থিতির খবর শুনে রুষ্ট হলো; এবং একদিন রাজা সেই যুবককে হত্যা করলে। কিন্তু পরে জানা গেল ঐ নিহত রাজকুমারের কাছেই তার কন্যা বাকদত্তা। দুঃখে রাজা উন্মাদ; রাজ-কুমারী ছুরিকাঘাতে আত্মহত্যা করলে। কিন্তু দেখা গেল এ সব ব্যাপারই দেবতা-দের পরীক্ষা এবং তাদের খেলা শেষ হওয়াতে দেবতারা আবার প্রেমিক-প্রেমিকাকে বাঁচিয়ে তুললেন। ইম্ফলের মণিপুর ড্রামাটিক ইউনিয়ন কর্তৃক এই কিংবদন্তীর কাহিনীটি পরিবেশিত হয়। দক্ষিণ মণিপুরের ময়রাং অঞ্চলের প্রচলিত কাহিনী। মণিপুরী নৃত্য ও সঙ্গীতের সৌষ্ঠবে ভরিয়ে নাটকখানি অভিনীত হয়। সাজপোশাক ও দৃশ্যসজ্জায় মণিপুরীশিল্প প্রতিভারও চমৎকার নিদর্শন। প্রখ্যাত নৃত্যশিল্পী জয়চন্দ্র সিং ও তোম্দন দেবী যথাক্রমে রাজকুমার ও রাজকুমারীর চরিত্রে ললিত অভিনয় ভঙ্গী প্রকাশ করে। নাটকখানির রচয়িতা বোরামিন সিং এবং পরিচালনা করেন এস ললিত সিং।

৩৪

এই নিয়ে শিবনাথ এবং রুচি হাসাহাসি করত। কিন্তু গত রাত্রে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া হওয়াতে সকাল থেকে দু'জন খুব গম্ভীর।

স্নান খাওয়া সেরে রুচি ঘরে স্কুলে বেরোবার জন্য তৈরী হচ্ছিল এমন সময় ময়নার হাত ধরে হঠাৎ বলাই দরজায় এসে দাঁড়াল।

এই প্রথম বলাই শিবনাথের ঘরের চৌকাঠের সামনে পা রাখল।

কি ব্যাপার? না শিবনাথকে চাই না। 'মঞ্জুর মাকে দরকার।'

রুচির সঙ্গে বলাইর কি পরামর্শ থাকতে পারে। ভেবে শিবনাথ পিছনে তার মেয়েকে দেখল। আঁচলে চোখ মুছছে ময়না। হাতে একটা ভাঙ্গা শ্লেট ও একটা বই। বর্ণবোধ। এত বড় মেয়ের হাতে দু' আনা দামের লাল চটি বইটা দেখে ভিতরে ভিতরে শিবনাথ হাসল। কথা বলল না। বলাইর দরকার রুচিকে। তাই রুচিকে চৌকাঠের বাইরে যেতে পথ করে দিয়ে শিবনাথ একপাশে সরে দাঁড়ায়।

'ময়নাকে ইস্কুলে দিতে চাই।'

'ভাল কথা।' রুচি শিক্ষয়িত্রীসুলভ মন্তব্য করল। 'আরো আগেই দেয়া উচিত ছিল।'

বলাই আঙুল দিয়ে নিজের কপাল দেখাল। 'দুর্ভোগ না কাটলে কিছু হয় না দিদি। চোখের ওপর তো দেখছিলেন। সব আমার কেমন গণ্ডগোল হয়ে গেছল। বড়বাজারের ফলের দোকান গিয়ে আমি অকূল সায়রে নিমজ্জিত হয়ে ছিলাম।'

ফেরিওয়ালার মুখে এতটা শুদ্ধ ভাষা শিবনাথ আর কোনোদিন শোনেনি। চিন্তা করল কিন্তু হাসিটা মুখে সে প্রকাশ করল না।

'কোন স্কুলে দেবেন ঠিক করেছেন।'

'আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করতে এলাম।' বলাই আড়চোখে একবার শিবনাথকে দেখে রুচির দিকে তাকায়। 'না এসব ধারেকাছের ইস্কুলে মেয়েকে আমার দেবার ইচ্ছা নেই। তাই তো মেয়ে ঘরে থেকে এ দু' বছরে আরো বড় হয়ে ওঠার কারণ। এখানকার ইস্কুল সব চোর চামার ইতর হা-ভাতের ছেলেমেয়েদের জন্যে। এগুলো কি আর ইস্কুল। আমি শহরে পড়াবো মেয়েকে।'

রুচি নীরব।

যেন বলাইর এতটা ঔদ্ধত্য সহ্য করতে না পেরে শিবনাথ চৌকাঠের এপারে থেকে মন্তব করল, 'এখানকার স্কুলে এখন অনেক ভাল ভাল লোকের ছেলেমেয়েরা পড়ছে। চোর-চামার যেমন আছে ভদ্রলোকও বিস্তর।'

শিবনাথের কথার জবাব দিলে না বলাই। পকেট থেকে একটা নতুন কেনা মনিব্যাগ তুলে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করে রুচির দিকে বাড়িয়ে দিল।

'ধরুন। আমার ইচ্ছা আপনার সঙ্গেই যাবে আসবে শহরে। কাজেই আপনার ইস্কুলে ওকে ভর্তি করিয়ে দিন। আমি কাল রাত্রে এই নিয়ে আমার স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করলাম। না চিংড়িঘাটার বেলেঘাটার বিদ্যা ছেলে মেয়ে আমি তৈরী করতে চাই না দিদি। কাজেই আজই ওকে আপনি সঙ্গে করে নিয়ে যান। ভর্তি করে দিন।'

দেখা গেল আবার আঁচলে চোখ চাপা দিয়েছে ময়না। হাত থেকে লাল চটি বইটা মাটিতে পড়ে গেল। শ্লেটটা পড়ল না যদিও।

'বই'টি দিয়ে তোর গলা আমি দু'ফাঁক করে দেব বানর মেয়ে। ইস্কুলের নামে এখন কান্না। এতকাল খরচে কুলোতে পারিনি ধেই ধেই করে পাড়ায় ঘুরে খুব পেয়ারা জাম খাওয়া হয়েছে। আর না। এই বেলা—'

নুয়ে মাটি থেকে মেয়ের হাতে বইটা তুলে মেয়ের হাতে গুঁজে দেয় বলাই। ধমক খেয়ে কান্না থামিয়ে ময়না আবার চোখ মোছে।

টাকাটা হাতে নিয়ে রুচি বলল, 'হয়তো আরো কিছু লাগতে পারে। তা দেখা যাবে। অবশ্য টেস্ট না করলে এখনই আমি বলতে পারছি না কোন্ ক্লাসে অ্যাডমিশন দেয়া হবে।'

'আমি মেয়ে আপনার হাতে তুলে দিলাম। যা খুশী যেমন খুশী এখন করুন। আমি চাই না দুপুরে বেলাটা বাড়িতে থেকে পাড়ায় থেকে আর ও সময় নষ্ট করে। এখানকার হালচাল আপনার তো অজানা নেই খুকির মা।' বলাই গম্ভীর গলায় মন্তব্য করল।

'আচ্ছা।' রুচি পরে ময়নাকে ডাকল। 'আমার কাছে আয়।' ময়না রুচির সামনে গিয়ে দাঁড়াতে রুচি সস্নেহে তার মাথায় হাত রাখল।

'ইতর। ইতর ছাড়া এখানে মনিষ্যি বাস করে নাকি।' বলাই হঠাৎ ওপাশের সবগুলো ঘরের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে বলল, 'আপনি বলুন মঞ্জুর মা, বয়সে কি যায় আসে। লেখাপড়া যে-কোন বয়সে আরম্ভ করতে পারে মানুষ। কথাটা মিছা বলছি?'

'না।' রুচি বলল, 'গরিব দেশ। ঠিক বয়সে ছেলেমেয়েকে সবাই স্কুলে দিতে পারছে না। আমি তো দেখছি। এ লাইনে আজ আমার ক' বছর হয়ে গেল! আমার স্কুলে ময়নার চেয়েও বড় মেয়ে একেবারে নিচের ক্লাসে পড়তে আসে।'

'তবেই বুঝুন।' বলাই চোখ বড় করল। 'আর কাল নাকি, আমি পরে ঘরে এসে শুনলাম বিধু মাস্টারের কোন্ মেয়ে মুখ বেঁকিয়ে ঠাট্টা করছিল এখন যদি ময়না বর্ণপরিচয় ধরে তবে আই-এ বি-এ পাশ করতে করতে ঠানদি হয়ে যাবে। আই-এ বি-এ পাশ। ওই যে কথায় বলে ছাল নেই কুত্তার বাঘা ডাক। বলি বিধু-

মাস্টারের ঘর তো লেখাপড়ার আওয়াজে আটপহর গম্ গম্ করছে। আর খবর পাই ওদিকে তিন দিন ধরে চলছে মাস-কলাই সিদ্ধ। পরশু, আপনি বিশ্বাস করবেন, চার গণ্ডা পয়সা ধার চেয়ে বিধু-মাস্টার আমার পায়ে ধরা বাকি। এই তো অবস্থা। ঘরে মা মেয়ের বিদ্যার মকমকানি শুনে মরে যাই—'

'থাক এসব আলোচনায় এখন দরকার নেই।' রুচি গম্ভীরভাবে বলল, 'ময়নাকে আমার স্কুলেই ভর্তি করতে চেষ্টা করব। হয়তো আজকেই করানো যাবে না। দেখা যাক কতদূর কি হয়।'

'তাই দেখুন, আরো টাকা লাগলে আমি দেব।' বলাই ময়নার দিকে চোখ রাখল। 'তবে তাই কর্। এনার সঙ্গে চলে যা। দুপুরে জলখাবারের পয়সা নিবি।'

'না।' মুখ না তুলে ময়না জবাব দিল।

'আচ্ছা আমি চলি। দেখুন আমার যদি এই উপকারটা করতে পারেন।' বলাই আর কোনদিকে না তাকিয়ে হন্ হন্ করে উঠোন পার হয়ে, ঘরে ঢুকল না, সোজা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। গায়ে নতুন শার্ট পায়ে নতুন চটি।

কাপড়-চোপড় পরে রুচিও বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে বলাইর মেয়ে আর মঞ্জু।

শিবনাথ তখন রুচির সঙ্গে খেতে বসেনি। অন্যদিন তা-ই করে। কিন্তু আজ, আজ তার মাথায় অনেক চিন্তা, মন বিক্ষিপ্ত।

অবশ্য রুচি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই পেটের ক্ষুধা সে সুন্দরভাবে অনুভব করে।

তার সময়মত ক্ষুধা হয়, স্বাস্থ্য আজ পর্যন্ত অটুট মনে করে শিবনাথ কম খুশি হ'ল না।

শিবনাথ আয়নায় নিজের মুখ দেখল। হাত দিয়ে গাল অনুভব করল।

স্ত্রী রোজগার ক'রে খাওয়াচ্ছে। চাকরি করে সংসার খরচ চালাচ্ছে। এই অহঙ্কারের বিরুদ্ধে রুচির এই দু'বছরের আত্মম্ভরিতা সামনে দাঁড়িয়ে লড়বার মত যদি কিছু থেকে থাকে শিবনাথের, তো তার এই অপরিমিত স্বাস্থ্য এবং প্রায় সর্বদিক থেকে সুশ্রী এই চেহারা। আয়নায় নিজের মুখ দেখে শিবনাথ আর একবার খুশি হয়ে উঠল এবং তৎক্ষণাৎ হাত থেকে আরসী নামিয়ে শিস দিতে দিতে সে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে ওধার থেকে চট্ করে একটা থালা তুলে নিয়ে ডেক্‌চির সবটা ভাত ও বাটির সবটুকু ডাল ঢেলে খবরের কাগজ বিছিয়ে বিছানার ওপরই খেতে বসল। যা সে কোনোদিনই করে না। কিন্তু আজ সে অনেকক্ষণ ধরে আধশোয়া হয়ে বসে আরামে খেতে খেতে রুচির চরিত্র সমালোচনা করবে বলেই এটা করল। তা ছাড়া পিঁড়িটা একটু অপরিচ্ছন্ন লক্ষ্য করেই শিবনাথ আর সেটা টানল না।

হ্যাঁ, মোক্ষম কথা আজ শুনিয়ে দিয়েছে। স্বামীকে কমলাক্ষী গার্লস স্কুলের টিচার। ভোরবেলা বিছানা থেকে নেমে মাটিতে পা রেখেই রুচির মুখ থেকে অন্তরের গুপ্তকথা বেরিয়ে পড়েছে।

না, বড়লোকের বাড়ির টুইশন নিয়ে কাজ নেই। হাতের কাছে আর একটা এখন পাওয়া যাচ্ছে না? না যায় দেখা যাবে। এমনিও তো ক'মাস ঘরেই বসা। কাজেই এভাবে না হয় আরো কিছুদিন কাটুক। অভাব? নতুন কথা কিছু না। এবাড়ির আর পাঁচটা পরিবার যেভাবে আছে সেভাবেই থাকতে হবে উপায় কি। ভাল ভাল। শিবনাথ ডালমাখা ভাতের গ্রাস মুখে তুলে স্ত্রীর সৎপরামর্শটা মনের মধ্যে নাড়াচাড়া করে অত্যন্ত নিশ্চিন্ত হল। কিন্তু জিনিসটা তার কাছে নতুন ঠেকল। আর পাঁচটা লক্ষ্মীছাড়া পরিবারের মত হাজার অভাব স্বীকার ক'রে এখানে এই বাড়িতে থেকে যাওয়ার সুমতি রুচির কখন থেকে আরম্ভ হয়েছে তা-ই সে অবাক হয়ে ভাবে। কাল রাত্রে কে গুপ্তর ঘরে গিয়ে রুণু বেবির মাকে সহানুভূতি জানানো ও আজ বলাইর প্রস্তাবে রীতিমত খুশি হয়ে ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোনোর সঙ্গে গার্লস স্কুলের টিচারের বস্তি-প্রীতিটা সুন্দরভাবে খাপ খেয়েছে। ভাল ভাল ভাল। রুচির শিক্ষয়িত্রীসুলভ চরিত্রের পরিচয় এতকাল পর পরিষ্কার টের পাওয়া যাচ্ছে। ঢক্ ঢক্ ক'রে গ্লাসের জলটা গলায় ঢেলে শিবনাথ একটু স্থির হয়ে বিষয়টি চিন্তা করল। দি ভেরি আউটলুক। হবেই, হতেই হবে। যে কাজে তার স্ত্রী আজ ক'বছর লেগে আছে তা বিচার করলে এর চেয়ে উন্নত উদার বা মহৎ দৃষ্টিভঙ্গি তার কাছ থেকে আশা করা অন্যায়। দীপ্তির সমিতিতে যোগ দেওয়ার প্রস্তাবে শিক্ষয়িত্রীর মন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেছে, দীপ্তির ছেলেমেয়েকে পড়ানোর নামে শিউরে উঠছে। কিন্তু এসব আসে কোথা থেকে, এই মূঢ়তা, পঙ্গু অসহায়ের মত নিয়তিকে মেনে নেওয়ার প্রবৃত্তি মনের কোন্ সঙ্কীর্ণ ছিদ্র দিয়ে রুচির মধ্যে এসে বাসা বাঁধল তা কি আর বোঝা যায় না। হ্যাঁ, শিবনাথ হাতমুখ ধুয়ে একটা বিড়ি ধরিয়ে একলা ঘরে রীতিমত উচ্চারণ ক'রে বলল, দীপ্তি তোমার চেয়ে বড়লোক এবং রূপসী তো বটেই। সেই হিংসায় আক্রোশে বিধুর মতন বলাইর মতন বিমল হালদারের মতন বস্তির মাটি কামড়ে পড়ে থাকতে যদি সাধ হয়ে থাকে এবং দরকার হলে বাড়ি-ওলার-জুলুম-চলবে-না-দলের ছেলে-মেয়েকে নিয়ে আর একটা পাল্টা সমিতি দাঁড় করিয়ে বস্তি উন্নয়নের কাজে লেগে যাও তো আমি আশ্চর্য হই না করতে পার।

কবে একবার, শিবনাথের মনে আছে, বেতন বাড়ানো নিয়ে শহরের মাস্টার আর মাস্টারণীরা দল বেঁধে শোভাযাত্রা বার ক'রে লালদীঘির দিকে ছুটেছিল। শিবনাথের তখন চাকরি ছিল। অনেক বলে কয়ে এমন কি শেষটায় রীতিমত ধমক লাগিয়ে সেদিন স্ত্রীকে দলে যোগ দিতে নিবৃত্ত করে। দল ছাড়া হয়ে থাকলে বিপদ তাই 'অসুখ' বলে মিথ্যা একটা দরখাস্ত লিখিয়ে রুচির স্কুলে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়েছিল শিবনাথ। হাতে নিশান নিয়ে স্ত্রী পথে পথে ঘুরবে শিবনাথ সেদিন

কোনমতেই স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছিল না। তার রুচিতে বাধছিল। অতটা সাধারণ এতখানি নীচ মধ্যবিত্ত হতে সে আজও রাজী না।

'আর পাঁচটা পরিবার কায়ক্লেশে যেমন টিঁকে আছে...বড়লোকের বাড়ির টুইশনিতে দরকার নেই......'উপবাসী ছারপোকার মত কম বেতনভোগী স্কুল-মিসট্রেসের অভিমান বিক্ষোভ আজ অন্যভাবে ফুটে উঠেছে। ভাল। শিবনাথ আরামে চোখ বুজে বিড়ি টানে। আর দরকার নেই রাতারাতি একটা কিছু করতে হবে বলে ব্যস্ত হয়ে এখানে-ওখানে হাঁটাহাঁটি করার। শিবনাথ ক'দিন নিশ্চিন্ত হ'য়ে জিরোতে পারে। সহধর্মিণীকে সে আস্তে আস্তে অনুসরণ করতে আরম্ভ করবে কি। অর্থাৎ বস্তিকে ভালবাসতে? চিন্তা করে শিবনাথ মনে মনে হাসল। হ্যাঁ, পারে সে ভালবাসতে এ-বাড়ির উঠোন এ-বাড়ির সিঁড়ি-বারান্দা যদি মাছি ময়লা কাঁচা নর্দমার গন্ধটা না থাকে, বিধুমাস্টারের ঝাঁক কলেরায় লোপাট পায়, পাগল কে গুপ্ত মূর্খ বিমল ও মেটিরিয়া-মেডিকা-পণ্ডিত শেখর সপরিবারে রাতারাতি ঘোলপাড়া কি ধূবিতলার আরো সস্তা ঘরে চলে যায়। রমেশ ক্ষিতীশ চলে গেলেও আপত্তি নেই। প্রমথদের এমন কি অভাব অসুবিধা আছে যে এই উঠোনের মাটি কামড়ে পড়ে আছে। গোঁয়ার বলাই শিবনাথের চক্ষুশূলে, ঠোঁটকাটা পাঁচু তার দোকানঘরের ওপরের কামরা দু'টো দিব্যি নিজের কোয়ার্টার হিসাবে এখন ব্যবহার করতে পারে। তবে আর কে রইল, আর কোন্ কোন্ পরিবার এবাড়িতে থেকে গেলে শিবনাথ খুশি? হ্যাঁ, রুচি ও মঞ্জুকে নিয়ে তার নিরিবিলি ছোট্ট সংসার আর উল্টোদিকের ঘরের রুগ্ন ভুবনের পরিবার। কিন্তু ওদের তো লোক বেশি, রাতদিন চেঁচামেচি লেগেই আছে, অনেক সন্তান ভুবনের। তা হোক, তা হলেও সে ঘরে এমন কেউ আছে যার দিকে তাকিয়ে শিবনাথ বাস্তবজীবনের সব গ্লানি কতক্ষণের জন্য ভুলে যায়। বীথি। বলতে কি যদি এ-বাড়িতে বীথি না থাকে শিবনাথ দরকার হলে রুচি ও মঞ্জুকে ফেলেই হয়তো পরদিন কেঁদে পালিয়ে যাবে। 'হ্যাঁ, এই পরম সত্যটা আমি তোমার মুখের ওপর বলতে এখন আর দ্বিধা করছি না।' শিবনাথ জনালায় দাঁড়িয়ে কমলাক্ষী গার্লস স্কুলের সেকেণ্ড টিচারের সঙ্গে কথা বলল ও দুই চোখ মেলে অনেকটা রুচির ওপর আক্রোশ নিয়ে ওঘরের বীথিকে দেখতে লাগল। কাপড় পরেছে খোঁপায় প্ল্যাস্টিকের একটা ফুলের মালা জড়িয়েছে। আরসি সামনে ধরে ঠোঁটটাকে কামড়ে কামড়ে লাল করছে। হাত থেকে আরসি নামিয়ে রাখল। ওটা কে। বীথির ছোট ভাই ষষ্ঠী। দিদি স্নান করিয়েছে খাইয়েছে এখন ঘুম না পাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে দেখে ষষ্ঠীচরণ কেঁদে আকুল চিৎকার করে বাড়ি মাথায় তুলছে। ভুবনগিন্নী তাড়াতাড়ি ষষ্ঠীকে কোলে নিয়ে বীথির সামনে এসে দাঁড়ায়। 'দে আর একটা চুমু দিয়ে যা। সারা দুপুর তো আর তোর কোলে উঠবে না'

'ওই আমি কিরি, একটু তাড়াতাড়ি বেরোব, তা-ও তোমাদের জন্যে আর হয় না। জানো ওদিকে মিহিরবাবু মা-মরা ছেলে নিয়ে কী ভীষণ কষ্ট করছেন।'

এত বিরক্ত হয়ে বীথি কথা বলল যে মা ও ষষ্ঠীচরণ দু'জনেই হঠাৎ চুপ করে গেল। প্ল্যাস্টিকের সুন্দর ব্যাগটা হাতে ঝুলিয়ে বীথি বারো ঘরের উঠোন পার হয়ে বেরিয়ে গেল। শিবনাথের বুক থেকে একটা লম্বা নিঃশ্বাস উঠে এল। মনে মনে হেসে সে সার্কুলার রোডের ছোট্ট এক গলির মাথায় হলদে দোতলা বাড়ির অর্থাৎ কমলাক্ষী গার্লস স্কুলের থার্ড ক্লাসের কামরায় হাতল ভাঙ্গা চেয়ারে বসা রুচিকে সম্বোধন করে আজ আবার বলল, 'অশান্তি ভুলতে কে গুপ্ত মদ খায়, মোহিত আর এক নেশায় ডুবে আছে এবং চাকরি জোগাড় করতে না পারার ব্যথা ভুলতে আমি প্রাণভরে অষ্টাদশী বীথিকে দেখছি। ছোট দুঃখের জন্যে ছোট নেশা। তুমি চাকরি করছ কাজেই আমার কিছু না করাটা তেমন কিছু সাংঘাতিক ব্যাপার না। আগে মন খারাপ করলেও এখন আর তুমি তা গায়ে মাখছ না। চারদিকের অভাব দেখে আমাদের অভাবটাও ইদানীং তোমার বেশ সয়ে গেছে দেখতে পাচ্ছি। কেবল মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ হয় তোমার পয়সায় কেনা একটা কাচের গ্লাস ভাঙ্গলে কি তোমার পয়সায় অতিরিক্ত এক প্যাকেট সিগারেট কিনে খেতে চাইলে যখন তুমি মুখ ভার কর কি ছোট-খাটো এক আধটা মন্তব্য ক'রে খোঁচা দাও—অথবা—' শিবনাথ হঠাৎ স্ত্রীর সঙ্গে কথা বন্ধ করে বীথির মত ঠোঁট কামড়ে উঠোনময় কালো মাছির ঝাঁকের দিকে তাকিয়ে থেকে একটু সময় কি ভাবল, তারপর ঠোঁটটাকে বিকৃত করে হাসল। 'অথবা অফুরন্ত রূপ-যৌবনের অধিকারিণী আর এক নারী, হ্যাঁ, রায় সাহেবের পুত্রবধূ দীপ্তির মুখখানা দিনে অন্তত একবার দেখব তা তোমার অসহ্য সেই অখণ্ড বেদনা ভুলতে

আমি বীথির দিকে তাকিয়ে থাকি। বীথি কাজে বেরিয়ে গেছে এবার প্রীতিকে দেখব। প্রীতি আজ এমন টকটকে লাল শাড়িটা পরল কেন—'

'শালা কি সব বলে গেল আমার নামে, শুনলেন?'

শিবনাথ চমকে উঠল। বিধু মাস্টার জানালায় দাঁড়িয়ে দাঁত বার করে হাসছে।

শিবনাথের রক্ত মাথায় উঠে গেল। জানালার পাল্লা দু'টো দড়াম করে বন্ধ করে দেবে কি না একবার ভাবল। মুখ বিকৃত ক'রে বলল, 'কি হয়েছে কার কথা বলতে এসেছেন আমাকে?'

'বলাই, শুনলেন না? ব্ল্যাকমার্কেটে নেমে শালা কাঁচা পয়সার মুখ দেখছে, তাই এমন গরম। আমার ঘরে কলাই সিদ্ধ চলছে, আট আনা পয়সা ধার চাইতে গিয়ে ওর পায়ে ধরছিলাম।'

চেহারাটা একটুও প্রসন্ন না করে শিবনাথ বলল, 'তা আমি কি করব। আপনাদের বস্তির লোক এ ওর নামে চিরকালই তো বদনাম গেয়ে আসছে। এখানে এসে অবধি শুনছি।'

'হুঁ।' বিধু মাথা নাড়ল। 'আপনার ওয়াইফকে ধরে মেয়েকে শহরের স্কুলে পাঠাল।'

'বেশ করেছে। আপনার পয়সা থাকে আপনিও পাঠান না।' শিবনাথ জানালার একটা পাল্লা বন্ধ করে দিল।

'আপনি রাগ করছেন। আমার পয়েণ্ট সেটা না। তা ছাড়া কলকাতার স্কুলে কি আর খুব ভাল লেখাপড়া হয়? দেখুন না গত তিন বছরের ম্যাট্রিকুলেশনের রেজাল্ট। তা না। আমি বলছি, তোর মেয়ে কোনদিনই বর্ণপরিচয়ের ধাপ পার হতে পারবে না। বছর বছর ফেল করবে।'

'কেন। খুব পেকে গেছে নাকি?' শিবনাথ সামান্য খুশির ভাব দেখাল। 'আপনি কি করে জানলেন বলাইয়ের মেয়ের মাথায় কি আছে না আছে?'

'গোবর।' বিধু আপ শব্দ করে হাসল। 'মশাই ফাদার মাদার দুজনেই যদি অশিক্ষিত হয়, সন্তানকে অক্ষর শেখানো বড় কঠিন।'

'তা কঠিন সহজ বলাই গিয়ে বুঝুক। আপনি এখন যান। আমি শোব।' শিবনাথ দরজার আর একটা পাল্লায় হাত রাখল।

'ও, শোবেন।' মুখে বলল বিধু, কিন্তু জানালা থেকে নড়ল না। 'খবর শুনেছেন বোধ করি?'

'কি খবর।' শিবনাথ ভুরু কুঁচকোয়।

'শেখরের কন্যাকে নিয়ে সুধীর ইলোপ করেছে।'

'বেগতিক দেখলে আপনার কন্যাকে নিয়েও কেউ ইলোপ করবে।' শিবনাথ নিরুপায় হয়ে কথাটা বলে ফেলল। 'যান।'

'আরাম হারাম হ্যায়, বুঝেছেন শিবনাথবাবু। শেখর আর তার বৌ মেয়েকে খুব আরামে রেখেছিল আর জল বিক্রীর পয়সায় মাছ দুধ খাইয়েছিল। তার রেজাল্ট। আমার মেয়ে? একটি না। সুনীতির কাছাকাছি বয়সের তিনটি। মমতা সাধনা নীলিমা। উঁহু, এতটা সেক্স-কন্সাস হবে তার সময় কই। লেখাপড়া নেই? বাটনা বাট রান্না কর কাপড় আছড়াও। হি-হি।' মুখ বিকৃত করে বিধু হাসল। 'শেখর নিজেকে একটা লর্ড মনে করত। হ্যাঁ, ওই হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার হয়েই। আমাকে তো ও, ইদানিং এতটা বেড়েছিল যে, মানুষ বলেই মনে করত না। এখন? মুখে চুন-কালি পড়ল তো? গড্। আপনাকে বলেছি বোধ হয় আর একদিন। ওপরে একজন আছেন, যিনি সব অন্যায়ের বিচার করেন। একদিন একটা টাকা কর্জ চেয়েছিলাম বলে তুই আমায় ইনসাল্ট করেছিলি। বার্থ কণ্ট্রোল কর। মুর্খের মত এত ছেলেমেয়ে হইয়ে তুমি কি সব দিকে ঝাঁজরা হয়ে যাবে। এখন? তোর তো একটি ইস্যু। তবে তোর ঘরে এই সর্বনাশ ঢোকে কেন। কি মশাই চুপ করে আছেন কেন?'

শিবনাথ সশব্দে পাল্লাটা বন্ধ করে দিল।

'হ্যালো—মিস্টার।'

চারু রায়। চারু রায়কে দেখেই শিবনাথ এক-পা এক-পা করে বনমালীর দোকানের সামনে গিয়ে দাঁড়াল। শুধু কে গুপ্ত বসে আছে দেখলে সে রমারম রাস্তায় নেমে যেত।

কিন্তু দুর্ভাগ্য শিবনাথের কে গুপ্ত প্রথম কথা বলল।

'খুব ব্যস্ত মনে হচ্ছে? বেরোচ্ছেন নাকি কোথাও।'

'হ্যাঁ, একটা এনগেজমেণ্ট আছে এক-জনের সঙ্গে।' শিবনাথ কে গুপ্তর দিকে তাকাল না, চারু রায়ের চোখে চোখ পড়তে বলল, 'নমস্কার, কতক্ষণ এসেছেন।'

'এই তো।' চারু রায় হাত দু'টো একত্র করল। 'বসুন।'

গুপ্ত মুখে বলল না, হাত বাড়িয়ে শিবনাথের একটা হাত ধরে বলল, 'বসুন মশাই বসুন। এখানে আসার দিন থেকে তো শুনছি আপনার কাজ আর কাজ। আমরা না হয় অ-কর্মার ঢেঁকি। তা বলে পাঁচ সাত মিনিট আমাদের সঙ্গে বসে

গল্প করলে আপনার লাখ টাকা কিছু ক্ষতি হবে না, তা-ও জানি, বসুন।'

ছোট খাটো একটা ধমকের মতন গুপ্ত হাসছিল যদিও। শিবনাথ বিব্রত-বোধ করল। চারু রায় অল্প হাসল। বনমালী খাতা থেকে মুখ তুলে বলল, 'বসুন স্যার।'

পায়া ভাঙ্গা বেঞ্চের একপাশে শিবনাথকে বসতে হ'ল।

'এইমাত্র আপনার কথা হচ্ছিল।'

'তুই থাম গাধা, তুই থাম আমি বলছি।' কে গুপ্ত বলল, 'ময়নাকে সঙ্গে নিয়ে বেরোল দেখলাম আপনার স্ত্রী?'

শিবনাথ মাথা নাড়ল।

'ব্যাপার?'

কে গুপ্তর প্রশ্ন এবং ঠোঁট-চাপা হাসিটা শিবনাথের মোটেই ভাল লাগল না। দাঁতে দাঁত চেপে গম্ভীর হয়ে বলল, বলাই ওর হাতে পায়ে এসে ধরেছে। এখানে মেয়ে স্কুলে যেতে পারে না, সতের বছর বয়সে বর্ণপরিচয় পড়ছে দেখে বিধুর মেয়েরা ঠাট্টা করে। কাজেই শহরের ইস্কুলে ভর্তি হওয়া ছাড়া উপায় কি?'

'গুড আইডিয়া।' কে গুপ্ত নিজের কাঁধে একটা ঝাঁকুনি দিল। 'মেয়েটা দেখতে মন্দ না। বলাইটা যদিও চাষা। তা হলেও, চেষ্টা থাকলে ময়নাটা লেখাপড়া শিখতে পারবে। বেশ বেশ ভাল। না আমি কিন্তু আপনাদের সম্পর্কে আর একটা কথা শুনেছি।'

'কি কথা।' শিবনাথের দুই কান গরম হয়ে উঠল। শিবনাথ বনমালী এবং চারু রায়ের দিকে তাকাল। একটা কুকুর পাশের নর্দমা থেকে কার জুতোর একটা ছেঁড়া শুকতলি মুখে করে এনে শিবনাথের পায়ের কাছে রেখে ছুটে পালাল। 'নন-সেন্স' বলে চারু রায় নাকে রুমাল গুঁজল।

'কাল রাত্রে কি নিয়ে নাকি খুব গণ্ডগোল হয়েছে আপনার ঘরে? কি সব জিনিস টিনিস নাকি ভেঙ্গেছে?'

একটা ঢোক গিলল শিবনাথ। কিন্তু তৎক্ষণাৎ শিবনাথের দিকে তাকিয়ে সূক্ষ্ম হেসে বলল। 'একটা কাঁচের গ্লাস। অসাবধানে নাড়াচাড়া করতে গেছলেন শ্রীমতী।'

'আপনি তখন ঘরেই ছিলেন?'

'আরে ধেৎ মশাই। ঘরে। আমাকে রাত বেশি হলে ঘরে ঢুকতে দেয় নাকি বেবির মা। তা ছাড়া স্বদেশী মাল টেনে গেলে তো কথাই নেই। শুনলাম, টাকা-পয়সা নাকি আরো কি সব কথা নিয়ে খুব ঝগড়াঝাটি করেছেন স্ত্রীর সঙ্গে।' বলে কে গুপ্ত ঘাড় ফিরিয়ে বনমালীর দিকে তাকাতে বনমালী আবার হিসাবের খাতা থেকে মুখ তুলল।

'তুমি নিজের চরকায় তেল দাও গুপ্ত, নিজের চাকা চালু কর। কার ঘরে কি নিয়ে ঝগড়া হ'ল, খোঁজ নিয়ে তোমার কি হবে।'

শিবনাথের মুখটা কালো হয়ে গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান সে। এক সেকেন্ড মাটির দিকে চেয়ে থেকে পরে চোখ তুলে হাসল। 'আজ সকালে বুঝি ঘরে গিয়ে স্ত্রীর মুখে সব শুনলেন। হ্যাঁ, রাত্রে আমার ওয়াইফ আপনার স্ত্রীকে দেখতে গেছল। তাঁর জ্বরটা কমেছে তো, আজ ভাল?'

'আপনি দেখছি খুব সিরিয়সলি এটা নিচ্ছেন।' গুপ্ত অট্টহাস্য করে উঠল। 'আরে না না মশাই, এমনি জিজ্ঞেস করলাম। মেয়েদের মুখে শুনে নাচানাচি করা আর তাই নিয়ে আর একজনকে জেরা করা আমার নেচার না। ও কিছু না। এমনি বললাম। আসলে হয়েছে কি একটু আগে বিধুর ছোট ছেলেটা কি যেন নাম, হুবলা এসেছিল বনমালীর দোকানে এক পয়সার নুন কিনতে। পেট-মোটা সরু-ঠ্যাং ঘটির মত ঘাড়-বেঁটে ইঁচড়ে পাকা হুবলাকে আপনি দেখেন নি? হারামজাদা এসেই একগাল হেসে বলছিল, কাল বারো নম্বরের শিবদাদা বৌকে বেজায় মারধর করেছে, রাগ করে থালা-ঘটি ভেঙ্গেছে। আমরা তো শুনে থ।'

বনমালী বলল, 'ছেড়ে দাও ছেড়ে দাও, বিধুর ঝাঁক হ'ল গিয়ে মাছি। এখানের ময়লা ওখানে টেনে নেয়, ওঘরের খবর এঘরে আনে। আর মিছা কথা। তিলকে তাল করতে, মরার মুখে কথা বলাতে ওদের জুড়ি নেই।'

'ওই টুকুন বাচ্চা ছেলে, কত বড় এক একটা দাঁত। আর কী পাকা কথা। আমি কথা শুনব কি ওর বলার ঢং দেখে হেসে বাঁচি না।' চারু রায় শিবনাথের দিকে তাকাল।

'বস্তীর ছেলেমেয়ে এর চেয়ে ভাল হবে আপনি আশা করতে পারেন না নিশ্চয়ই মিস্টার রায়।' শিবনাথ সঙ্গে সঙ্গে হাসল।

'হ্যাঁ, আমি তো চড় মারতে চেয়েছিলাম।' কে গুপ্ত তার লম্বা শীর্ণ হাতটা শূন্যে তুলে ধরল। 'তারপর আর হারামজাদা এখানে দাঁড়ায়নি। এক দৌড়ে গিয়ে বাড়িতে ঢুকল।'

কে গুপ্তর হাত নাড়া দেখে বনমালী, চারু রায় এবং শিবনাথ এক সঙ্গে হেসে উঠল।

'থাকগে। কি আর করা যায় এসব ছেলেমেয়েদের আর ওদের গার্ডিয়ানদের। একমাত্র পিটি করা ছাড়া উপায় নেই। আমি তো, ঐ যে বসে আছি বটে এখানে, কিন্তু হাঁসের মত। কাদা লাগতে দিই না নিজের গায়ে।' শিবনাথ মুখোত চারুর দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেদিন লাইট-হাউসের সামনে কথায় কথায় আমি এ

ধরনের একটা আভাস দিয়েছিলাম আপনাকে মনে আছে? —নরকবাস এখানে থেকে।'

'খুব আছে।' মিহি সুন্দর গলায় চারু রায় মেয়েদের মত হাসল। এবং তারপর কি একটু ভেবে টিন থেকে দু'টো সিগারেট তুলে শিবনাথ এবং কে গুপ্তর হাতে গ'ুজে দিয়ে বলল, 'আচ্ছা, ব্রাদার আমি এখন পালাই। ক'টা বাজে? অ গড্।' হাতঘড়ির দিকে তাকিয়ে চারু অকস্মাৎ উঠে পড়ল। এবং একটা হাত নেড়ে 'বাই বাই' জানিয়ে কারো দিকে আর না তাকিয়ে রাস্তার ওপাশে সোজা সুপুরি-গাছের দিকে ছুটল।

ছোট্ট হল্‌দে গাড়িটা একটু পোড়া তেলের গন্ধ ছড়িয়ে চোখের নিমেষে অদৃশ্য হল।

(ক্রমশ)

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৪)

১৯২৫ সালের শেষাশেষি চার্লি তাঁর "দী সার্কাস" ছবিখানির কাজে হাত দেন। মাঝখানে অনেক বাধা-বিঘ্ন ঘটায় ১৯২৮ সালের জানুয়ারি মাসের আগে এ-বই শেষ হতে পারেনি। সীডনি ইতিমধ্যে তাঁর পৃথক কর্মক্ষেত্র খুঁজে নিয়েছেন। প্রায় দশ বছর ধরে চার্লির কাজকর্ম তদারকের পর স্বাধীন-ভাবে তিনি বই তুলতে শুরু করলেন। তাঁর তৈরি ছবিগুলির মধ্যে এখানে "চার্লিজ আন্ট" আর "দী বেটার 'ওল"এর উল্লেখ করা যেতে পারে।

"দী সার্কাস" তুলতে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয়েছিল চার্লির, তার আগে পর্যন্ত তাঁর আর অন্য কোনও ছবিতে তত টাকা খরচ হয়নি। এ-বই তুলবার জন্য পুরোদস্তুর একটি সার্কাস তাঁকে গড়ে তুলতে হয়েছিল। বিরাট তাঁবু, প্রয়োজনীয় নানান রকমের সাজসরঞ্জাম, জীবজন্তু, তাদের ট্রেনার, মালপত্র বোঝাই করবার ওয়াগন ইত্যাদি সব কিছুই সংগ্রহ করতে হয়েছিল তাঁকে। আর জোগাড় করতে হয়েছিল ঢাউস-উঁচু সব প্ল্যাটফর্ম। তার উপরে দাঁড়িয়ে ক্যামেরাম্যানরা ছবি তুলবেন। এবং এই বিপুলপরিমাণ সাজসরঞ্জাম, এক বছরের উপরে এগুলির ব্যয়ভার তাঁকে বহন করতে হয়েছিল। স্বয়ং চার্লিকে তখন মাসের পর মাস দড়ির উপর দিয়ে হাঁটাচলার কৌশল অভ্যাস করতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত এ-বিদ্যায় তিনি পারঙ্গম হয়ে উঠলেন। নায়িকা মার্না কেনেডির বয়স তখন মাত্র সতের। তিনিও রেহাই পাননি। দিনের পর দিন ট্রেনারের কাছে গিয়ে—একাগ্র অধ্যবসায়ে—তাঁকে অশ্বারোহণের প্রতিটি কৌশল আয়ত্ত করতে হয়েছে।

"দী সার্কাস"এর গল্পাংশ এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করছি। বদমেজাজী এক সার্কাসওয়ালা (এ ভূমিকায় নেমে-ছিলেন অ্যালান গার্সিয়া), দলের লোকজনদের উপরে তার অত্যাচারের অন্ত নেই। সারাক্ষণই সে খড়্গহস্ত হয়ে রয়েছে। তার স্ত্রীর আগের পক্ষের মেয়ে (মার্না কেনেডি) এখন তারই দলে অশ্বারোহণের কৌশল দেখায়। সার্কাস-ওয়ালার অত্যাচারে সর্বদাই সে তটস্থ হয়ে থাকে। ক্লাউনরাও সব ভয়ে কম্পমান। তারা সব অতিশয় রদ্দি খেলা দেখায় বলেই নাকি দর্শকদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে।

এ-বইয়ে চার্লি নেমেছেন এক নিরীহ দর্শকের ভূমিকায়। ভিড়ের মধ্যে চুপচাপ বসে আছেন। ওদিকে এক পকেটমার যে কখন এক ব্যক্তির পকেট কেটে অতঃপর ধরা পড়বার ভয়ে চার্লির পকেটের মধ্যে তার লুটের মাল চালান করে দিয়েছে, তিনি তা টেরও পাননি। হৈ-হল্লা একটু কমে যাবার পর চার্লির পকেট থেকে আবার যখন সে তার মালপত্র সরিয়ে আনতে যাচ্ছে, এমন সময় এক কনস্টেবল এসে বমাল তাকে গ্রেপ্তার করল। কনস্টেবলের ধারণা, ও-সব টাকাপয়সা চার্লিরই। পকেটমারের কাছ থেকে সব কিছু ছিনিয়ে নিয়ে চার্লির হাতেই সে প্রত্যর্পণ করল। চার্লি তো হতভম্ব!

চার্লি ঠিক করলেন, দৈবক্রমে টাকা-পয়সা যখন কিছু পাওয়াই গিয়েছে, তখন কোনও রেস্তোরাঁয় গিয়ে ভালমন্দ কিছু আহার করবেন। পকেটমারের কাছ থেকে শুধু টাকাপয়সাই তিনি পাননি, সেই সঙ্গে পেয়েছেন চেনসমেত সোনার একটি ঘড়ি। তাতেই ঘটল বিপদ। ঘড়ির যিনি প্রকৃত মালিক, চার্লির পকেট থেকে চেন ঝুলতে দেখেই তিনি চিনে ফেললেন। তৎক্ষণাৎ গিয়ে জনকয়েক কনস্টেবল ডেকে আনলেন তিনি। সবাই মিলে চার্লিকে তাড়া করল। ছুটতে ছুটতে সার্কাসেরই একটি ঘরের মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন চার্লি। ঘরের মধ্যে অনেকগুলো আয়না। এক একটা আয়নার দিকে তিনি তাকান,

'দী সার্কাস'-এর একটি দৃশ্য

আর বিকৃত বীভৎস এক একটা প্রতিচ্ছবি ভেসে ওঠে। দেখে তিনি ভয় পেয়ে গেলেন। ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার উপক্রম করছেন, এমন সময় সেই পকেটমার গিয়ে উপস্থিত। দৃশ্যটি দেখতে দেখতে, হাসতে হাসতে বে-দম হয়ে পড়তে হয়। শেষ পর্যন্ত সেই পকেটমারের চোখে ধুলো দিয়ে সরে পড়লেন চার্লি। কিন্তু কনস্টেবলরা তখনও তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। তাদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে, আর কোনও উপায়ান্তর না দেখে, চার্লি করলেন কি, সার্কাসের রঙ্গভূমির মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লেন।

পরনে শতচ্ছিন্ন তালি-মারা পোশাক, হাঁটাচলার ভঙ্গীও কেমন অস্বাভাবিক। দর্শকরা মনে করল, তিনিও একটি ক্লাউন। চার্লি তো তখন প্রাণভয়ে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন। দর্শকরা মনে করল, এ বোধ হয় নতুন কোনও খেলা। আনন্দে তারা হাততালি দিতে লাগল। রঙ্গভূমির মধ্যে এক জাদুকর তাঁর খেলা দেখাচ্ছিলেন। দৌড়তে দৌড়তে চার্লি তাঁর সহকারীদের মধ্যে মিশে গেলেন। জাদুকর তখন জ্যান্ত মানুষে অদৃশ্য করে দেবার খেলা দেখাচ্ছেন। বিরাট একটা বাক্সের মধ্যে একটি মেয়েকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তিনি, বাক্সের ডালা বন্ধ করে উত্তমরূপে তালা এঁটে দিয়েছেন। তারপর খানিক বাদে ডালা খুলতে দেখা গেল, মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে, আর তার জায়গায় বসে রয়েছেন চার্লি। কনেস্টবলরা এতক্ষণ থাবা উঁচিয়ে অপেক্ষা করছিল। চার্লিকে দেখতে পেয়েই আবার তাড়া করল তারা। কিন্তু জাদুকর আবার ততক্ষণে তাঁর বাক্সের ডালা বন্ধ করে দিয়েছেন। কনস্টেবলরা গিয়ে ডালা তুলে ধরল। কোথায় চার্লি! জাদুমন্ত্রে তিনি হাওয়া হয়ে গিয়েছেন, আর তাঁর জয়াগায় বসে রয়েছে আগেকার সেই মেয়েটি। সে যাই হোক, শেষ পর্যন্ত ধরা দিলেন তিনি, কনস্টেবলদের কাছে লুটের মাল ফিরিয়ে দিয়ে সব কথা খুলে বললেন। কনস্টেবলরা বিশ্বাস করল তাঁকে, এ নিয়ে আর টানা-হ্যাঁচড়া করল না। দৌড়ঝাঁপ করে চার্লিও ততক্ষণে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সার্কাসের তাঁবুর পাশে সাজানো রয়েছে সারি সারি ওয়াগন। তারই একটির মধ্যে গিয়ে আশ্রয় নিলেন তিনি, এবং সঙ্গে-সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

তাঁকে দেখতে না পেয়ে দর্শকরা ওদিকে হট্টগোল বাধিয়ে দিয়েছে। আর-সব ক্লাউনকে টিটকিরি দিচ্ছে তারা; সমস্বরে দাবি জানাচ্ছে, সেই নতুন ক্লাউনটিকে নিয়ে আসা হোক। সার্কাস-ওয়ালা পড়ল মহা-বিপদে। কে সেই হতচ্ছাড়া, এর আগে তাকে সে আর দেখেওনি কোনদিন, কোথায় গিয়ে এখন সে তার সন্ধান করবে। খুঁজতে খুঁজতে তাঁবুর বাইরে এসে দেখে, ওয়াগনের মধ্যে ঘুমিয়ে রয়েছেন চার্লি। ঘুম ভাঙিয়ে চার্লিকে সে ফের তাঁবুর মধ্যে টেনে নিয়ে চলল।

প্রথম রাত্রেই মার্নার সঙ্গে পরিচয় হল চার্লির। কী একটা তুচ্ছ কারণে সেদিনও সার্কাসওয়ালা তার মেয়ের উপরে খাপ্পা হয়ে ছিল। খেলা শেষ হবার পর মার্নাকে সে খেতে দিল না, অভুক্ত অবস্থায় তাকে শোবার ঘরে পাঠিয়ে দিল। দেখে ভারী মায়া হল চার্লির। মার্নাকে ডেকে এনে নিজের খাবারের অর্ধেকটা তিনি তাকে দিয়ে দিলেন। পরের দিন আর-সব ক্লাউনের সঙ্গে রঙ্গভূমিতে পাঠিয়ে দেওয়া হল তাঁকে। সুন্দর একটি দৃশ্য এইখানে রয়েছে। চার্লির মাথায় আপেল রেখে এক তীরন্দাজ সেটাকে বিদ্ধ করবে। এদিকে ভীষণ খিদে পেয়েছে চার্লির। তীরন্দাজ ওদিকে নিশানা ঠিক করছে, তারই মধ্যে মাথার থেকে আপেলটাকে নামিয়ে এনে খানিকটা তিনি খেয়ে নিলেন। চিবোতে গিয়ে দেখেন, আপেলের মধ্যে পোকা কিলবিল করছে (পোকাগুলি অবশ্য দর্শকদের দেখানো হয় না, কিন্তু চার্লির আঙুলের ভঙ্গী দেখেই সেটা স্পষ্ট বুঝে নেওয়া যায়)। মুখ থেকে আপেল ফেলে দিলেন চার্লি! পাশেই পড়ে রয়েছে এক-ছড়া কলা। তারই মধ্যে থেকে একটা তুলে নিয়ে তিনি খেতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে সার্কাস-ওয়ালা তো চটে আগুন।

পরের দৃশ্যটি এক সেলুনের। সার্কাসের লোকজন সেখানে দাড়ি কামাতে এসেছে। সাবান মনে করে মুখে এক-খাবলা রং লাগিয়ে ফেললেন চার্লি। যতই মুছে ফেলতে চেষ্টা করেন, ততই সেটা তাঁর মুখের উপর আরও ছড়িয়ে যায়। চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছেন না, রং লেগে চোখের পাতা আটকে গিয়েছে। সেই অবস্থায় খানিকক্ষণ টাল-মাটাল হয়ে ঘুরবার পর রঙের বাটিটা তিনি সার্কাস-ওয়ালার মাথার উপর ঢেলে দিলেন। আগে থাকতেই সার্কাসওয়ালা চটেছিল তাঁর উপর, এখন তাঁর এই বেয়াদবি দেখে সে আর রাগ সামলাতে পারল না। চার্লিকে সে বরখাস্ত করে দিল। চার্লি ঠিক করেছিলেন, চলেই যাবেন। কিন্তু মার্নাকে কাতর হয়ে পড়তে দেখে মতের পরিবর্তন হল তাঁর। ঠিক করলেন, যে করেই হোক, এই সার্কাসেই তিনি থাকবেন।

থাকবেন তো, কিন্তু কী করে। শিগগিরই তার একটা উপায় জুটে গেল। সার্কাসের খেলা চলছে, এমন সময় দলের মোটবাহী ভৃত্যেরা সব বেঁকে বসল। মালপত্র বইতে পারবে না তারা, অনেকদিন ধরে তাদের মাইনে দেওয়া হয়নি। চার্লি দেখলেন, এই তাঁর সুযোগ। সার্কাস-ওয়ালাকে গিয়ে বললেন, তাঁকে যদি দলে রাখা হয় তো মালপত্র বইতে তিনি রাজী আছেন। সাজসরঞ্জাম বইতে গিয়ে আর-এক বিপদ। একপাশে দাঁড়িয়ে ছিল একটা গাধা। চার্লির কিম্ভূত পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে ক্ষেপে গিয়ে গাধাটা তাকে তাড়া করল। একগাদা ডিশ হাতে নিয়ে বিদ্যুদ্বেগে গিয়ে রঙ্গভূমির মধ্যে ঢুকে পড়লেন চার্লি, এক দর্শকের ঘাড়ের উপর গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লেন। দর্শকরা মনে করল, এ-ও একটা ফুর্তির ব্যাপার। তারা তো হেসেই অস্থির। হাসি, আর হাততালি। হাততালির চোটে কানে তালা লাগবার উপক্রম।

সার্কাসওয়ালা বুঝতে পারল, দর্শকদের কাছে দিনদিনই চার্লির আদর বেড়ে যাচ্ছে। ব্যাপারটা তাঁর মোটেই ভাল লাগল না। প্যাঁচ কষে চার্লি হয়তো মাইনে বাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করবে। সেটি হচ্ছে না। চার্লিকে সে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিল যে, দলে থাকতে হলে চাকর-বাকরের কাজই তাঁকে করতে হবে। তাতেও আপত্তি নেই চার্লির। একদিন হয়েছে কি, বোতলের মধ্য থেকে লাল-মাছ-

গুলোকে ধার করে নিয়ে চার্লি তাদের ময়লা পরিষ্কার করছেন, এমন সময় অকস্মাৎ তাঁর একখানা হাত একটা বোতামের উপর গিয়ে পড়ল। বোতামে চাপ পড়তেই জাদুকরের বাক্সগুলো খুলে গিয়ে সে এক হুলুস্থুলু কান্ড। বিরাট এক একটা বাক্স, তার মধ্য থেকে পিল-পিল করে শুয়োরছানা, খরগোশ আর নানান রকমের সব পাখি বেরিয়ে আসতে লাগল। সেগুলিকে আবার বাক্সবন্দী করা দরকার। এক একটা প্রাণী তাঁর কাছে এগিয়ে আসে, আর ক্যাঁক করে তার গলা টিপে ধরে বাক্সের মধ্যে ঢুকিয়ে দেন চার্লি। সে বিপদ তো কাটল, পর-মুহূর্তেই আর এক সমস্যা। সার্কাসের একটা ঘোড়া অসুস্থ হয়ে পড়েছে, তাকে ওষুধ খাওয়াতে হবে। ওষুধের বড়ি হাতে নিয়ে এগিয়ে গেলেন চার্লি। গিয়ে করলেন কি, ঘোড়াটার মুখের মধ্যে রবারের একটা নল চালিয়ে দিয়ে নলের আর এক মুখে বড়িটা রাখলেন। তারপর নলে ফুঁ দিয়ে সেই বড়িটাকে ঘোড়ার মুখের মধ্যে চালান করে দেবেন, এমন সময়—চার্লি ফুঁ দেবার আগেই—ঘোড়াটা হঠাৎ হেঁচে উঠল। যে-বড়ি ঘোড়াকে খাওয়ানোর কথা, দেখা গেল চার্লিই সেটা গিলতে বাধ্য হয়েছেন।

খ্যাপা গাধাটা ওদিকে খুঁজে বেড়াচ্ছে চার্লিকে। দেখতে পেয়েই সে ফের চার্লিকে তাড়া করল। প্রাণভয়ে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে চার্লি একটা খাঁচার মধ্যে গিয়ে ঢুকে পড়লেন। গাধাটা চলে যাবার পর ফিরে দাঁড়িয়েই তিনি ভির্মি যাবার দাখিল। সিংহের খাঁচায় তিনি আশ্রয় নিয়েছেন। কপাল ভাল, সিংহটা তখন ঘুমচ্ছে। কিন্তু জেগে উঠতেই বা কতক্ষণ। পা টিপে টিপে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন চার্লি, কিন্তু দরজা ততক্ষণে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। একমাত্র বাইরে থেকেই সে-দরজা খুলতে পারা যায়। চেঁচাবেন তার উপায় নেই। সিংহটা তাহলে জেগে উঠবে। কী আর করেন, বাইরের লোকজনদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য খাঁচায় বসে তিনি রুমাল নাড়তে লাগলেন। কিন্তু হায়, কেউই তাঁকে দেখতে পেল না। খাঁচার ওদিকে আর একটা দরজা, এবং ও দরজা তো

'দী সার্কাস'এর আর একটি দৃশ্য

ভিতর থেকেই খোলা যায়। নিঃশব্দে এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলে পা বাড়িয়ে দেখেন, সর্বনাশ! সিংহের খাঁচা থেকে তিনি বাঘের খাঁচায় এসে ঢুকেছেন। পা টিপে টিপে আবার সিংহের খাঁচাতেই ফিরে এলেন চার্লি।

এই যমালয় থেকে কী করে তিনি এখন উদ্ধার পাবেন। হতাশায়, উত্তেজনায় খাঁচার এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, কোনও-রকমে যদি পালাবার একটা পথ পেয়ে যান। পথ তো পেলেনই না, লাভের মধ্যে হল কি, সিংহের জল খাওয়ার জন্য খাঁচার উপর থেকে টিনের একটা পাত্র ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ধাক্কা লেগে সেটা ছিটকে পড়ল। মেঝেয় পড়ে একটা শব্দ হবার আগেই শূন্যে হাত বাড়িয়ে সেটাকে লুফে নিলেন চার্লি। তখনকার মতন তো রক্ষা পেয়ে গেলেন, কিন্তু তারপরেই আর এক বিপদ। খাঁচার মধ্যে ঐ অবস্থায় তাঁকে দেখতে পেয়ে কোত্থেকে একটা কুকুর এসে পরিত্রাহি চিৎকার জুড়ে দিয়েছে। চোখ রাঙিয়ে তাকে থামাবার চেষ্টা করলেন চার্লি। কোনও ফল হল না। হাত জোড় করে চার্লি তখন অনুনয়-বিনয় করতে লাগলেন। তাতে যদি দয়া হয় ঐ নচ্ছার কুকুরটার। ঠিক এমন সময় মার্না এসে উপস্থিত। তাকে দেখে চার্লি তো আহ্লাদে আটখানা। দরজা খুলে দিয়ে মার্নাই তাঁকে রক্ষা করবে। কিন্তু হা হতোস্মি, কোথায় মার্না এসে এই বিপদ থেকে তাঁকে বাঁচাবে, তা নয় চার্লিকে ঐ অবস্থায় দেখেই তো সে অজ্ঞান হয়ে পড়ল। বাঁচবার একমাত্র উপায় এখন মার্নার জ্ঞান ফিরিয়ে আনা। হাতে রয়েছে সিংহের জল খাবার সেই পাত্র। শিকের মধ্যে দিয়ে হাত গলিয়ে মার্নার চোখে-মুখে প্রাণপণে জল ছিটোতে লাগলেন চার্লি। কিন্তু গোলমাল শুনে সিংহও ততক্ষণে জেগে উঠেছে। থাবা ছড়িয়ে একটা হাই তুলল সে, ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। চার্লির কাছে এসে উত্তম-রূপে তাঁকে শুঁকল বারকয়েক। তারপর—

তারপর যখন দেখল যে, মানুষটার গায়ে একরত্তিও মাংস নেই, তখন ঘৃণাভরে দু পা পিছিয়ে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আবার।

মার্না ইতিমধ্যে জ্ঞান ফিরে পেয়েছে। চটপট গিয়ে সে খাঁচার দরজা খুলে দিল। ইচ্ছে করলেই চার্লি তখন বেরিয়ে আসতে পারেন; কিন্তু সিংহের হাবভাব দেখে চার্লির ততক্ষণে সাহস উথলে উঠেছে।

সিংহটা যে তাঁকে আহার করতে অত্যন্তই অনিচ্ছুক, সেটা বুঝতে পেরে বীরবিক্রমে দুপা এগিয়ে গিয়ে তার গায়ের উপর হাত রাখলেন চার্লি। ইচ্ছে ছিল, জন্তুটাকে থাবড়া মেরে একটু আদর করবেন, কিন্তু তার আগেই সিংহটা হঠাৎ গর্জন করে উঠল। সে গর্জনের অর্থ অতি পরিষ্কার, ও-সব ইয়ার্কি এখানে চলবে না। লাফ দিয়ে খাঁচার ভিতর থেকে বেরিয়ে এলেন চার্লি।

বেরিয়ে এসে আপন মনে একটু পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন, এমন সময় সার্কাস-পার্টির এক সুপারভাইজারের সঙ্গে দেখা। সুপারভাইজার মনে করল, কাজে ফাঁকি দিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রেগে গিয়ে চার্লির প্যাণ্টের উপরে তিনি একটা লাথি কষিয়ে দিলেন। তাতে ভালই হল চার্লির। ঘোড়াকে খাওয়াতে গিয়ে ওষুধের যে বড়িটা তিনি নিজেই গিলে ফেলেছিলেন, লাথি খাবার সঙ্গে সঙ্গেই ছিটকে সেটা বেরিয়ে এল।

মার্নার মুখ চেয়ে সার্কাস-দলেই রয়ে গেলেন চার্লি। সেখানে আর-পাঁচজনের লাথিগুঁতো খেয়ে তাঁর দিন কাটতে লাগল। দেখে ভারী দয়া হল মার্নার। চার্লিকে গিয়ে সে জানাল যে, তিনিই এই সার্কাস-পার্টির প্রধান আকর্ষণ, তিনি যদি চলে যান তো সার্কাসও অচল হয়ে যাবে। চার্লি সেটা জানতেন না। মার্নার মুখে সব কথা শুনে মেজাজ চড়ে গেল তাঁর। সার্কাস-ওয়ালাকে গিয়ে সেইদিনই তিনি জানিয়ে দিলেন যে, তাঁকে যদি দলে রাখতে হয় তো অবিলম্বে তাঁর মাইনে বাড়িয়ে দিতে হবে। মাইনের টাকা হাতে পেয়ে ভদ্র-গোছের কিছু জামাকাপড় কিনে আনলেন চার্লি, অতঃপর ফুলবাবুটি সেজে মার্নার কাছে গিয়ে তিনি ঘুরঘুর করতে লাগলেন।

কিন্তু হায়, যার জন্য এত আয়োজন, সেই মার্নারই মন পাওয়া গেল না। নতুন কে এক ছোকরা যেন দলে এসে ভর্তি হয়েছে। দড়ির খেলা দেখায়। নাম রেক্স (রেক্সের ভূমিকায় নেমেছিলেন হ্যারি ক্রকার। চার্লির কাছে বেশ কিছুদিন ছিলেন তিনি। পরে তাঁর সেক্রেটারি হয়েছিলেন), চেহারা অতি চমৎকার। বাস্, চার্লিকে ভুলে গিয়ে মার্না তার প্রেমে পড়ে গেলেন। চার্লি বুঝতে পারলেন, মার্নার যদি মন পেতে হয় তো তাঁকেও দড়ির উপর দিয়ে হাঁটাচলার কৌশল রপ্ত করে নিতে হবে। গোপনে গোপনে দড়ির খেলা শিখতে লাগলেন চার্লি। কিন্তু শুধু শিখলেই তো হবে না, সর্বসমক্ষে খেলাটা দেখানোও তো চাই। শিগগিরই তার সুযোগ জুটে গেল। রেক্স সেদিন কাজে আসেনি; সার্কাসওয়ালা মাথায় হাত দিয়ে বসেছে। সর্বনাশ, দড়ির খেলা বাদ গেলে দর্শকরা তো তাকে খেয়ে ফেলবে। চার্লি গিয়ে নির্বিকার গলায় তাকে বললেন, অনুমতি পেলে ও-খেলা তিনিই দেখিয়ে দিতে পারেন। মার্না তাঁকে প্রাণপণে বোঝাল যে, দড়ির খেলা অত্যন্তই বিপজ্জনক, একবার একটু পা ফসকে গেলেই তিনি মারা পড়বেন। চার্লি নিজেই কি আর তা জানেন না! কিন্তু মারা যাতে না পড়তে হয়, গোপনে গোপনে তার ব্যবস্থাও তিনি করে রেখেছেন। উপর থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া সুক্ষ্ম অদৃশ্য একটা তারের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে নিয়েছেন তিনি। পা যদি ফসকেও যায়, অদৃশ্য সেই তারই তাঁকে আটকে রাখবে।

পড়ে যাবার কোনও ভয় নেই। সুতরাং চার্লিকে আর পায় কে। দড়ির উপরে দাঁড়িয়ে এমনভাবে তিনি লম্ফঝম্প আরম্ভ করে দিলেন যে, মার্না তো স্তম্ভিত। এমন সব কসরত দেখাতে লাগলেন, স্বয়ং রেক্সেরও যা সাধ্যাতীত। কিন্তু মাত্রাতিরিক্ত কায়দা দেখাতে গিয়েই ঘটল বিপদ। লাফঝাঁপের ঠেলায় অদৃশ্য সেই তারের বাঁধনটা এক সময় খুলে গেল। চার্লির এক সহকারী সেটা বুঝতে পেরেছে, বারবার সেদিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করবার চেষ্টা করছে, কিন্তু চার্লির সেদিকে খেয়াল নেই। আপন মনে তিনি কায়দা দেখিয়ে চলেছেন। হঠাৎ এক সময় ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন চার্লি। তাকিয়ে দেখেন, সর্বনাশ, সুক্ষ্ম সেই তারটা আলগা হয়ে তাঁর মাথার উপরে ঝুলছে।

হাত বাড়িয়ে সেটাকে ধরতে গেলেন চার্লি। পারলেন না। আতঙ্কে তাঁর হাঁটুতে তখন কাঁপন ধরে গিয়েছে। বিপদের উপর বিপদ। খাঁচা থেকে ছাড়া পেয়ে গোটাকয়েক বাঁদর উঠে এসেছে সেই দড়ির উপর। চার্লিকে গিয়ে ঘিরে ধরল তারা। ট্রাউজার ছিঁড়ে, চুল টেনে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। একটা বাঁদর তাঁর মাথার উপরে চড়ে বসেছে। সে এক ভয়াবহ অবস্থা। মাটির উপর থেকে অত উঁচুতে সংকীর্ণ একটা রজ্জুর উপর দাঁড়িয়ে কাঁহাতক এই বানরদের সঙ্গে লড়াই করবেন তিনি। হঠাৎ এক সময় পা ফসকে গেল তাঁর, পড়তে পড়তে সুক্ষ্ম সেই তারটাকে আঁকড়ে ধরে তিনি উঠে এলেন আবার, দড়িতে ঝুলে থেয়ে একটা বাইসাইকেলের উপরে গিয়ে পৌঁছলেন, তারপর বাইসাইকেল চালিয়ে নীচের দিকে পালিয়ে আসছেন, এমন সময় আবার হাত ফসকে গেল তাঁর,—সাইকেল সমেত তিনি তাঁবুর বাইরে গিয়ে ছিটকে পড়লেন। গায়ের ধুলো ঝেড়ে যখন উঠে দাঁড়ালেন চার্লি, তখনও তাঁর মাথা ঘুরছে। কিন্তু তাতে কি। মুখেচোখে নির্লিপ্ত একটা ভাব ফুটিয়ে তুলে দর্শকদের দিকে ঘুরে দাঁড়িয়ে এমনভাবে তিনি 'বাও' করলেন যেন, এতে আর কী হয়েছে, এ সব খেলা তিনি হামেশাই দেখিয়ে থাকেন।

ব্যাপার দেখে সার্কাসওয়ালা তো রেগে আগুন। আবারও চার্লিকে তিনি বরখাস্ত করে দিলেন। পর্দার উপরে এই সময়ে একটা ক্লোজ-আপ ছবি দেখানো হয় চার্লির। রেখাকুঞ্চিত নৈরাশ্যক্লিষ্ট সেই মুখচ্ছবি দেখে স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, এ তাঁর মেক-আপ নয়, শুধুই মেক-আপ নয়, দাম্পত্য জীবনের দুঃসহ যন্ত্রণাই তাঁর মুখের উপরে নৈরাশ্যের ওই নিবিড় কালিমা লিপ্ত করে দিয়ে গিয়েছে। ও-মুখ কৃত্রিম নয়, স্বাভাবিক, বড় বেশী স্বাভাবিক। এবং এই স্বাভাবিকতার স্পর্শেই দৃশ্যটির আবেদন যেন আরও করুণ, আরও মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে।

শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, চার্লির সহায়তায় রেক্সের সঙ্গে মিলন ঘটল মার্নার। মালপত্র বোঝাই করে সার্কাসের ওয়াগনগুলি সামনে এগিয়ে চলেছে। আর তারই একপাশে স্থাণুর মতন দাঁড়িয়ে রয়েছেন চার্লি। ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় সে এক অপরূপ অভিব্যক্তি। (ক্রমশ)

কালো গাউন

শংকর

জীবনের প্রান্তভাগে দাঁড়িয়ে ব্যারিস্টার সুব্রত রায় মাঝে মাঝে পিছন ফিরে চান, এ বয়সে সামনে দৃষ্টিপাত করে কোন লাভ নেই। তাতে শুধু শেষের দিনগুলির পদধ্বনি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর হয়ে জীবনের ক্ষণিক অবকাশ-মুহূর্তগুলোকে বিষাদপূর্ণ করে তোলে। ক্যালকাটা ক্লাবের ব্যালকনিতে বসে ব্যারিস্টার সুব্রত রায় সামনের সবুজ ঘাসের মখমলে মোড়া লনের দিকে তাকিয়ে থাকেন, ফিরে যান তাঁর পুরনো দিনে। বেশ লাগে, অন্তত কিছুক্ষণের জন্য মুক্তি, মামলার চিন্তা নেই। কেস্ ল নেই, ব্যারিস্টার এইচ সানিয়েলের সওয়ালের উত্তরের ভাবনা নেই। একদম মুক্ত, ভাবনা-লেশহীন আত্মসমাধি।

সুব্রত রায়ের নিশ্বাস ফেলার সময় নেই, ব্রীফের পাহাড়। একটা মাথা, কত কেস্ নেওয়া সম্ভব? কিন্তু কেউ শুনতে চায় না। দুরূহ কেস্, জটিল আইন? সুব্রত রায়ের কাছে সে ব্রীফ আসবেই। কাজ কমানোর জন্য তাঁর বাবু পাঁচুগোপালকে বলেছেন, "পাঁচু, ষাট মোহরের কম কেস্ নেব না।" পাঁচু ঘাড় নেড়েছে। কিছুদিন পরে মনে পড়ল কই কাজ তো কমেনি! "পাঁচুগোপাল, কি ব্যাপার?" পাঁচুগোপাল হাসে, "স্যার, একশ' মোহর চাইলেও এটর্নি'রা এখানেই আসবে।" ব্রীফ না দিয়ে তারা উঠবে না।

সুব্রত রায়ের হাসি আসে। "ওদের ধারণা আমি কেস্ নিলেই জয় সুনিশ্চিত—যত খারাপ মামলাই হোক। কিন্তু দিনকে রাত করা সম্ভব নয়। সত্যের নিজস্ব গতি আছে, আইনের যাদুতে তাকে রুদ্ধ করা সম্ভব নয়। কিন্তু ওরা বুঝেও বোঝে না।"

এটর্নি'রা আড়ালে বলে, লোকটা অর্থপিশাচ। এক পয়সা ফী কম নেবে না। সুব্রত রায় ভাবেন, কেন যদিচ্ছা ফী নেবেন না। ব্রীফের খোঁজে একদিন তিনি দ্বারে দ্বারে ঘুরেছেন। একটা কেস্, জুনিয়র ব্রীফ কিংবা আনডিফেন্ডেড ম্যাটার, তখন কোন এটর্নি মুখ তোলে নি। "কাজ কোথায় মশায়।"

আজ সারা হাইকোর্টে তাঁর যশ। সুব্রত রায় অমুক কোর্টে কেস্ করবেন, ছোকরা এডভোকেট ও ব্যারিস্টাররা ছোটে। ব্যারিস্টার রায় কিভাবে প্লিড করেন দেখতে হবে। অনেক দিনের পুরোন যোদ্ধা তিনি, ধীরে ধীরে এসে চেয়ারে বসেন। জজ সায়েব মৃদু হাসিতে স্বাগত জানান। তিনি বুঝতে পারেন, সোজা মামলা নয়। একমনে সুব্রত অন্যপক্ষের বক্তৃতা শুনে যান, জুনিয়রকে ফিস ফিস করে কিছু হয়ত বলেন, জুনিয়র সম্মতি-সূচক ঘাড় নেড়ে কোন একটি বইয়ের মধ্যে কি যেন খুঁজতে থাকে, তারপর এগিয়ে দেয় তাঁর সামনে। পড়া শেষে আত্মপ্রসাদের হাসি দেখা যায় তাঁর মুখে। বইএর পাতার নম্বর কাগজে লিখে রাখেন, অন্যপক্ষ কোন অস্ত্র ছাড়লে এক মুহূর্তের জন্য তাঁর চোখ বুজে যায়। মনের গহনে কিসের অনুসন্ধান চলে। অনেক যুক্তির অস্ত্র সেখানে থরে থরে সাজান। সুব্রত রায় তারই একটি তুলে নেন, দিনের শেষে হাতে মোটা অঙ্কের চেক আসে। এটর্নি ধন্যবাদ দেয়, মক্কেল এসে কৃতজ্ঞতায় হাত চেপে ধরে। ব্যারিস্টার রায় হাত ছাড়িয়ে নেন। না না, এসব তাঁর ভাল লাগে না। নিজের জন্যই তিনি পরিশ্রম করেন, কেমন একটা অদ্ভুত জিদ চেপে বসে। ন্যায় অন্যায় যাই হোক, জিততে হবে। রেম্পিনি সায়েবও তাই বলতেন, তখন বিশ্বাস হয়নি। "আমাদের পেশা ষাঁড়ের লড়াইএর মতন। গোঁ চাই। বেপরোয়া হতে হবে। টাকা নিয়ে তুমি অপরের হয়ে লড়াই-এ নেবেছ; চোখ বন্ধ করে শিং উঁচিয়ে সামনে ছুটে যাও আঘাত করো, জিতলে ধন্য ধন্য পড়ে যাবে, হারলে কেউ চেয়ে দেখবে না।"

ব্যারিস্টার রায় ক্লান্তি অনুভব করেন। সারা জীবন তাঁকে শুধু জিততে হবে, একের পর এক বিপক্ষকে হারাতে হবে। কেস্ ল' খুঁজতে হবে, যুক্তির শানিত অস্ত্রে অপর পক্ষকে ছিন্নভিন্ন করতে হবে। কোন বিশ্রাম নেই, মুক্তি নেই। জ্ঞানদা সুন্দরী দাসী ভারসেস চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়, জ্ঞানদা সুন্দরীকে জেতাতে হবে।

পরেই মোহনলাল ভারসেস ইউনিয়ন অফ ইণ্ডিয়া। প্রমাণ করতে হবে ভারত সরকারের সংবিধানের এত উপধারার বিধান লঙ্ঘন করেছেন।

সব কিছু মনে রাখতে হলে ব্যারিস্টার রায় বহু আগেই উন্মাদ হয়ে যেতেন। সে কথা রেম্পিনি সায়েব অনেক আগেই বলেছিলেন। "সুব্রত, এ লাইনে বড় হতে হলে অনেক কিছু মনে রাখতে হবে, অনেক কিছু নখাগ্রে চাই। কিন্তু অনেক কিছু ভুলতেও হবে, ভুলবার জন্য সাধনা করতে হবে। যা কিছু অপ্রয়োজনীয় অপ্রাসঙ্গিক সব স্মৃতির পট থেকে মুছে ফেলতে হবে।"

তখন সুব্রত রায়ের বয়স অনেক কম। এই হাইকোর্টের বারান্দায় রেম্পিনি চলেছিলেন, পুরনো মক্কেলের সঙ্গে দেখা। "গুড মর্নিং মিস্টার রেম্পিনি। সে বারে শুধু আপনারই জন্যে আমাদের জমিদারী রক্ষে পেল। সাতদিন ধরে যে রকম লড়াই করেছিলেন, কোনদিন ভুলব না।"

"না না, ও-সব বলে লজ্জা দেবেন না।" রেম্পিনি পা বাড়ান। সুব্রত রায়ের অসীম কৌতূহল। "কোন্ কেসটা স্যার?"

"মনে নেই!" রেম্পিনি দার্শনিকের মত বলেন, "একটুও মনে নেই। মামলার রায় বেরোবার সঙ্গে সঙ্গে আমি সব ভুলে যাই—নাম ধাম, ঘটনা কোন কিছু মনে থাকে না। শুধু আইনের পয়েণ্টটি ছাড়া।" রেম্পিনি সায়েব পিছনে ফিরে বলেছিলেন, "তোমাকেও ভুলতে হবে, না হলে বড় হতে পারবে না।"

ভুলতে ভুলতে সুব্রত রায় আজ জীবনের সব কিছু আনন্দ ভুলতে বসেছেন। কী আছে সুব্রত রায়ের জীবনে। সুব্রত রায় ব্যারিস্টার—কিন্তু অপর পাঁচজনের মত মানুষ নয়, সংসারের কর্তা নয়, স্নেহময় পিতা নয়। শুধু অর্থোপার্জনের যন্ত্র মাত্র। এর থেকে সাধারণ চাকরি অনেক ভালো, দশটা পাঁচটার বাইরে তারা মানুষকে গিলতে আসে না।

ভোর পাঁচটায় ব্যারিস্টার রায়ের দিনের শুরু। সাড়ে পাঁচটায় চা, কারুর দেখা নেই। মেয়েরা তখনও বিছানায়, দীপালিও তাই। দীপালি যখন নিদ্রাপর্ব শেষ করে দৈনন্দিন জগতের কাজে হাজিরা দেন, সুব্রত রায় তখন অন্য জগতে। লাইব্রেরী রুমে বইএর অতলে তাঁর সকল সত্তা নিমজ্জিত। আটটায় জুনিয়র অলোক সেনের পায়ের আওয়াজ হয়। দুজনে আলোচনা চলে সেকশন তেত্রিশ-এ, ইণ্ডিয়ান ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট। পাশের র‍্যাক হতে বই টেনে নেন, ঠিক ন'টায় চাকর এসে সামনে দাঁড়ায়। ইঙ্গিতে অপেক্ষা করতে বলে আরও খানিকটা পড়ে যান। চাকরের হাতে ইঁট-রঙের দুটো ট্যাবলেট ও এক গ্লাস জল। চাকরকে বিদায় করে ইলেকট্রিক বেলে মৃদু চাপ দেন। "ফাউলার ব্রাদার্সের মিস্টার মল্লিককে ডাকো।" কথাবার্তা জুনিয়র কাগজে নোট করে। পর পর এটর্নিরা আসে, কনসাল্টেশন চলে।

ঘড়ির দিকে চেয়ে আঁতকে উঠে অন্দরমহলে ছোটেন সুব্রত রায়। কোন কথাবার্তা নয়, বাথরুমে সব প্রস্তুত। পরে খাবার ঘর। খুব সামান্য খেতে হয়, যত সামান্য সম্ভব। ডাক্তারের কড়া আদেশ তেল নয়, ঘি নয়। মাংস বিষবৎ। চিনির সম্বন্ধ নেই। দীপালি সামনে এসে দাঁড়ায়, কী যেন বলতে চায়। কিন্তু এখন ওসব নয়, সময় নেই। মাথার মধ্যে আজকের কেস্ গজগজ করছে, অন্য কিছু সেখানে ঢুকবে না। ড্রেসিং টেবিলের সামনে দীপালি আজও সাদা ব্যাণ্ডটা গলায় পরিয়ে দেয়। "একটু যেন বেঁকে রইল" সুব্রত বলেন। দীপালি হাসে মনে মনে। আজ নয়, পঁয়ত্রিশ বছরে একদিনও সুব্রতর ব্যাণ্ড বাঁধা মনঃপুত হয়নি।

রোভার গাড়িটা হাইকোর্টের ভিতর ঢুকে যায়। লিফ্ট-এ সোজা দোতলায় বার লাইব্রেরী। ডেলি লিস্টে চার-পাঁচটা লাল দাগ দিয়ে রেখেছে পাঁচুগোপাল, বই-পত্র প্রস্তুত।

"গুড মর্নিং ব্রাদার," ব্যারিস্টার সুকান্ত সেন আসছেন।

"গুড মর্নিং।"

"তোমার ওই স্ত্রী-ধনের কেস্টা সুপ্রীম কোর্টে ঠেলছি।" সুকান্ত বলে।

"তাই নাকি? মোস্ট ইণ্টারেস্টিং। দেখা যাক স্পেশাল বেঞ্চের ডিসিশন আপহেল্ড হয় কি না।"

সুকান্ত সেন সুব্রতর কলেজ জীবনের বন্ধু। এক জাহাজে দুজনের বিলেত যাত্রা। সুকান্ত কেম্ব্রিজ ও সুব্রত অক্সফোর্ডে। তারপর আবার দেখা লিঙ্কলন্স ইন-এ, দুজনেই দেশে ফিরল। সুব্রত একা, সুকান্ত স্ত্রীকে নিয়ে। মিসেস আগাথা সেন। আগাথার রূপ ও যৌবন দুই ছিল। সেদিনও আগাথার সঙ্গে দেখা এক পার্টিতে। কে বলবে এই আগাথাকে সুকান্ত বিয়ে করেছিল। পরে লজ্জা পেয়েছে সুব্রত। বয়স কি তাঁদের কম হলো? পঁয়ত্রিশ বছর আগের আগাথা সেন আজও সেরকম থাকবে কী করে? এই আগাথা একদিন লণ্ডন প্রবাসী সুব্রতের মনেও দোলা জাগিয়েছিল কিন্তু সুব্রত বিচক্ষণ তাই নিজেকে সংযত করেছে, দীপালির বিশ্বাস ভঙ্গ করতে পারে না। প্রতি সপ্তাহে দীপালির চিঠি এসেছে।

রেম্পিনি সায়েব প্রথমে শুনে অবাক হয়েছিলেন, "তোমারও চাইল্ড ম্যারেজ?"

"না না স্যার, বিলেতে যাবার ঠিক আগে আমাদের বিয়ে হয়।"

রেম্পিনি আরও অবাক হন, "ইউ ওয়ার নাথিং বাট এ চাইল্ড দেন।"

সুব্রত রায়ের আজও কেমন লাগে, লোকটাকে বাইরে থেকে বোঝা যায়নি।

সুকান্তর বাবা রায় বাহাদুর অবনী সেন এলিস অ্যাণ্ড সেন সলিসিটরের ছয় আনা অংশীদার। বিরাট অফিস, অনেক কাজ। এলিস সায়েবও কিছু চিরকাল থাকবেন না তখন সব কিছু তাঁর। সুকান্ত সেনের কাজের ভাবনা! প্রথম থেকেই মাসিক হাজার টাকার ব্যবস্থা।

সুব্রত রায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের ছেলে, বিলেত যাওয়াটাই সৌভাগ্য। ব্যারিস্টারি পাশ করেছে এই যথেষ্ট, বাবা আর কিছু পারবেন না। সেকেলে পরিবার, উপার্জনের আগেই সংসারের দায়িত্ব। দীপালিকে যত্নে রাখতে হবে, দীপালি আলোকপ্রাপ্তা বেথুনের ভালো মেয়ে। তবুও সে কেমন সেকেলে। সংসারে মায়ের মতন, আগাথা সেনের মতো নয়। দীপালির অনেক আশা। স্বামী ব্যারিস্টার অথচ বেচারা ওপাড়া সম্বন্ধে কিছুই জানে না, ওখানে দাঁড়ানো কত কঠিন, সাফল্য কত অনিশ্চিত।

তিন বছর সুব্রত রোজ কোর্টে এসেছে। দিনের শেষে ক্লান্ত পদক্ষেপে

বাড়ি ফেরা। দীপালি পায়ের মোজা খুলে কোট নামিয়ে নেয়। নরম হাতে গলার ব্যাণ্ড খোলার সময় চুড়ির আওয়াজে সুব্রতর চোখ বুজতে ইচ্ছা করে। কি মিঠে আওয়াজ, সংগে সংগে ধিক্কার জাগে। কেমন করে দীপালিকে বলবে যে কোন কাজ নেই, একটা ব্রীফও পাওয়া যায় না। দীপালি বুঝতে পেরে নিজেই বলে—'এই তো শুরু ক্রমশ সব হবে। এখন থেকে ঝিমিয়ে পড়তে আছে নাকি।' বেরুবার আগে লাল ব্যাগে সে সব কিছু গুছিয়ে দেয় নিজের হাতে। ফ্লাস্কে গরম চা, কোন দিন কফি, টফির কৌটায় খাবার। এক কোণে সিগারেটের টিন। শাসনের সুরে বলে, "গোনা ছটি সিগারেট আছে, তার বেশী খাওয়া চলবে না। সিগারেট খেয়ে কি যে আনন্দ পাও আমার তো গা ঘুলিয়ে ওঠে।"

সুব্রত আনন্দ পায়। কাছে ডেকে বলে, "একটা খেয়ে দেখ না। তখন আর বকতে ইচ্ছা করবে না।"

দীপালি রেগে যায়, "ভারি অসভ্য মেয়েরা আবার সিগারেট খায় নাকি।"

"কেন খাবে না, সুকান্তর বৌ আগাথার রোজ একটা টিন লাগে।"

"বাঃ, উনি যে মেম।"

সুব্রত হাসিতে ফেটে পড়ে, "কি বুদ্ধি, মেমেরা কি মেয়ে মানুষ নয়।"

সুব্রত রাস্তায় বিষন্ন হয়ে যায়। রূপ, যৌবন, স্বাস্থ্য, সময় সব আছে তবুও কিছুই নেই। অর্থ চাই। দীপালিকে ভাল ভাল কাপড় কিনে দেবে, নিজে ট্রাম ছেড়ে মোটরে যাবে। কিন্তু অর্থ? কোথা থেকে তারা আসবে?

কৃতি ব্যারিস্টার সুব্রত রায়ের আজ হাসি পায়। টাকা, টাকা আছে যথেষ্ট কিন্তু কোথায় গেল সে সব দিন। আজকের সুব্রতর মাথায় আর অন্য কিছু নেই শুধু প্লেণ্ট, রিটার্ন স্টেটমেণ্ট, স্পেশাল বেঞ্চ, ফুল বেঞ্চ। দিনের শেষে যখন বাড়ি ফেরেন সমস্ত শরীরে ক্লান্তি। দীপালি আজও ব্যাণ্ডটা খুলে দেয়। মেয়েদের দেখা নেই, তারা বাবার কাছে আসে না, বাবাকে ভয় করে দূরে সরে থাকে। দীপালিকেও আজ অনেক দূরের দীপালি মনে হয়। কত গম্ভীর, কত নির্লিপ্ত।

"মীনার অনার্স পরীক্ষা আজ শেষ হোল," দীপালি বলে।

"তাই নাকি, কবে পরীক্ষা আরম্ভ হয়েছিল?" এইখানেই থেমে যেতে হয়। মীনার কোন্ বিষয়ে অনার্স তাও জানেন না তিনি। অভিনয় ধরা পড়ে যেতে পারে। সত্যি অন্যায়—কপালের কুঞ্চন গভীর হয়। রেম্পিনি সায়েব ঠিকই বলেছিলেন, "এ লাইনে সাধনার প্রয়োজন, সংসার পাতাও ঠিক নয়। তাতে হয় সংসার, না হয় তোমার প্রফেশন অবহেলিত হবে।" তখন সুব্রত হেসেছিল। আজ মনে হয় রেম্পিনি সায়েব বিয়ে না করে ভালই করেছিলেন।

লাইব্রেরীতে যেতে হবে এখনি! সেখানে প্রবেশমাত্র সুব্রত সব ভুলে যাবেন। অর্জুনের মতো লক্ষ্যভেদের সময় কিছুই চোখে আসে না, গাছ নয়, প্রিয়জন নয়, এমন কি, পাখিটির সর্বদেহ নয়, শুধু চোখ!' সুব্রতর সমস্ত মনোজগৎব্যেপে শুধু কেস্ নম্বর ত্রিশ, অর্ডিনারি অরিজিন্যাল সিভিল জুরিসডিকশন।

রেম্পিনি সায়েবের নজরে পড়াটা ভাগ্যের লিখন। তিন বছর ব্যর্থ অনুসন্ধানে কিছু হয়নি। তিন বছরের মোট আয় একশ' পনর টাকা। লাইব্রেরীতে বই পড়ছিল ব্রীফলেস সুব্রত রায়। কাঁধে একটা হাত পড়ল, সুব্রত চমকে তাকায়। মিস্টার উইলমট ড্যানিয়েল রেম্পিনি দোর্দণ্ড ব্যারিস্টার। রেম্পিনি তাকে চেম্বারে দেখা করতে বলে চলে গেলেন।

"তোমাকে আমার ভাল লেগেছে। যখনই লাইব্রেরীতে যাই, দেখি তুমি পড়ছ। আমার খুব পছন্দ। আমার চেম্বারে কাজ করবে?"

"এ আমার পরম সৌভাগ্য", সুব্রত উত্তর দেয়।

"ইয়ংম্যান, সৌভাগ্য বলে কোন কথা আমার ডিক্শনারিতে নেই। পরিশ্রম ও একাগ্রতাই সব।"

টেম্পল্ চেম্বারের দোতলা। একটি ঘরের বাইরে লেখা ডব্লিউ ডি রেম্পিনি, বার-এট-ল। ভিতরে দেওয়াল দেখা যায় না, অসংখ্য বইয়ের সারি। মধ্যিখানের বিরাট টেবিলেও ডজন খানেক বই ছড়ান। একদিকে বিরাট চেয়ার, কোন্ যুগের, কে বলবে। রেম্পিনি সায়েব বলেন, "এটি লাইব্রেরী নয়, আমার গবেষণাগার।"

রেম্পিনির কাজ নয়তো সাধনা। খ্যাতি ও অর্থ সে সাধনায় শৈথিল্য আনে নি। দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, মামলায় জিততে হবে। বইএর পর বই পড়ে যান, নথিপত্রের প্রতিটি লাইনে স্বপক্ষের যুক্তির অনুসন্ধান চলে।

সুব্রত রেম্পিনির সামনে বসে। রেম্পিনি বলে যান, সুব্রত লিখে চলে। টাইপিস্ট দিয়েও কাজ হয়, কিন্তু রেম্পিনি বলেন, "কাজ শিখতে হলে একেবারে নীচু থেকে শুরু কর।" বইএর ভিতর মুখ রেখে রেম্পিনি বলেন, "ফিফ্‌টিন হলসবেরী", সুব্রত আলমারি হতে বই বার করে, দুবার ফুঁ দিয়ে কিছুটা ধুলো তাড়িয়ে এগিয়ে দেয়, অতি সাবধানে রেম্পিনির হাতের অন্য বইটি বার করে

নিতে হয়, রেম্পিনি বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা পড়া চলেছে, কখনও তাঁর চোখে ক্লান্তি নামে, চশমা মুছতে মুছতে বলেন, "সুব্রত......" সুব্রত বুঝতে পারে, রেম্পিনির হাত হতে বই নিয়ে নিজেই পড়তে থাকে, রেম্পিনি চোখ বুজে শোনেন আর মাঝে মাঝে মাথা নাড়েন।

বাড়ি ফিরতে দেরি হয়। বেচারা দীপালিকে একা থাকতে হয়, পায়ের শব্দে দীপালি ছুটে আসে, কিন্তু কোন কথা বলে না।

কিন্তু রেম্পিনি সায়েব কি পাগল? বলে, কোর্টে যেতে হবে না, শুধু চেম্বারে বসে কাজ কর। তিন বছর কোন কেস্ নিতে পারবে না, এটর্নি হাতে ব্রীফ গুঁজে দিলেও না। সাধনায় নিজেকে পরিপূর্ণ যোগ্য করে তুলতে হবে প্রথমে।

"কিন্তু সংসার চলবে কেমন করে?"

"চাইল্ড ম্যারেজ বুঝি? যা হোক, সে ভাবনা আমার। প্রতি মাসে একশ' টাকা পাবে আমার কাছে। অনুগ্রহ নয়, চেম্বারে আমার কাজের পারিশ্রমিকরূপে।"

একদিন লাঞ্চের সময় রেম্পিনি বললেন, "সুব্রত, তোমায় শীর্ণ দেখাচ্ছে যেন।"

"না, কই?"

"আমার নজর এড়ায় না। যুদ্ধ করতে হলে ভাল শরীরের প্রয়োজন, বুঝেছ ইয়ংম্যান।" রেম্পিনি নিজের লাঞ্চ দু'ভাগ করেন।

"না না, সে হয় না। আপনার খাবার..."

"বুড়োদের কম খাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অবাধ্য হতে নেই।"

গুরু শিষ্যকে শিক্ষা দিয়ে যান যত গোপন অস্ত্র, গোপন রহস্য খুলে ধরেন সুব্রতর সামনে।

কোনদিন রাত হয়ে যায়, বিজলী বাতি জ্বলে ওঠে। টাউন হলের দিকের বড় জানলা দিয়ে গড়ের মাঠের হিমেল হাওয়া বয়ে আসে। রেম্পিনি কেস্ ল' খুঁজছেন। ঈপ্সিত বস্তু খুঁজে পান না। কিন্তু দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। সুব্রতর ভাল লাগেনি। বেচারী দীপালি একাগ্রে পদধ্বনির প্রতীক্ষা করছে, গোলাপী মুখটি হয়ত শুকিয়ে গেছে। একা হয়ত ভয় পাবে, কুয়েক গাছি অবাধ্য দুষ্টু চুল হয়ত মুখের ওপর এসে পড়েছে। মনে হয়, পাগলা সাহেবটাকে ছেড়ে চলে যায়, কিন্তু দীপালি বারণ করবে, মনের দুঃখকে চেপে রেখে বলবে, "তুমি বড় ছেলেমানুষ। আমি কি আর সেই ছোট খুকীটি আছি, যে ভয় পাব।"

রাত ন'টা। রেম্পিনি বললেন, "মনে এসেছে। এভিডেন্সের এনালিসিস এইভাবে করব।" সুব্রত নির্বাক। রেম্পিনি কাঁধে হাত রাখলেন, "অনেক দেরি হোল, আমি দুঃখিত।"

সুব্রত নিস্তব্ধ। রেম্পিনি পাইপ ধরালেন। "এমনি একটি মুহূর্তে আমার অন্ধকার জীবনে প্রথম সূর্যালোক এনেছিল।" রেম্পিনির এমন বিষণ্ণ মূর্তি সুব্রত কখনও দেখেনি। "ভাবলে আজও আশ্চর্য লাগে।" রেম্পিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস টানেন।

সার হেনরী লংএর দীর্ঘ দেহ যেন রেম্পিনির চোখের সামনে ভেসে ওঠে। সুব্রতর দিকে চেয়ে বলেন, "আমাকে অনেক নীচু থেকে শুরু করতে হয়েছিল।"

চোদ্দ বছরের ছেলে উইলমট্ রেম্পিনি বেয়ারার কাজ করে সার হেনরী লংএর চেম্বারে। চা আনা, টেবিল মোছা, বইএর ধুলো ঝাড়ার কাজ। স্যার হেনরী লন্ডনের অন্যতম ব্যারিস্টার, ভয়ানক গম্ভীর। কিশোর রেম্পিনির অসীম কৌতূহল। বড় ভাল লাগে বই পড়তে। সবার অলক্ষ্যে ধুলো ঝাড়ার সময় মোটা মোটা আইন-বইএর ভিতরে চোখ বুলোয়। কেউ দেখার পূর্বেই সভয়ে বই বন্ধ করে ফেলে নতুন আইন পত্রিকা তার কৌতূহলের ক্ষুধা মেটায়। দরজার পাশে আগ্রহে কান পেতে থাকে যখন সার হেনরীর মামলার আলোচনা চলে। কত অজানা শব্দ কানে আসে! সব না বুঝলেও ভাল লাগে। সে এক সন্ধ্যা। সার হেনরী তখনও চেম্বারে। কি ব্যাপার? যেতে এত দেরি সাধারণত হয় না। টুলে বসে রেম্পিনি সময় গোনে। দূরের ঘড়িটি রাতের বার্ধক্য ঘোষণা করে। রেম্পিনি ভিতরে নজর দেয়, সার হেনরী কি যেন খুঁজছেন। একের পর এক বই টেনে কিসের অনুসন্ধান চলে। নাঃ কোথায় সেই অভিষ্ট নজির। সার হেনরী পাগলের মত অন্য বইয়ের ভিতর অনুসন্ধান শুরু করেন। পরমুহূর্তে হতাশ হয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন বইটা। কত দেরি হবে কে জানে? রাত আরও বাড়ে। জুনিয়র অবশেষে বলে, "সার, আমার মনে হয় এ বিষয়ে আমাদের স্বপক্ষে কোন নজির নেই।"

"নিশ্চয় আছে। আমার বেশ মনে আছে কোথাও পড়েছি।" সার হেনরী মাথার চুল টানতে থাকেন। হঠাৎ রেম্পিনির বুকের ভিতরটা কেমন করে ওঠে। ভিতরে সার হেনরীর সামনে এসে দাঁড়ায় সে। উত্তেজনায় সর্বশরীর কম্পমান। সার হেনরী বিরক্ত কণ্ঠে বলেন, "বাড়ি যেতে চাও? একদিনের সামান্য দেরি সহ্য হয় না।"

"না না স্যর।"

"তবে কিজন্য আমার সময় নষ্ট করছ?"

রেম্পিনি রুদ্ধবাক। দূরের র‍্যাকের লাল কাপড়ের বাঁধান বইটি তাকে ডাকছে। এক অদৃশ্য শক্তি তাকে আকর্ষণ করছে ওই বইটির কাছে। রেম্পিনি বইটি টেনে নেয়—টাইমস ল' রিপোর্টার—"বলব, বলব সার?" রেম্পিনি কম্পিত হাতে বইএর পাতা খুলে যায়। "এইটা, এইটা কি?"

"ইউরেকা, ইউরেকা" সার হেনরী চিৎকার করে ওঠেন। "এরই নিষ্ফল সন্ধানে চার ঘণ্টা কেটে গেছে।"

সার হেনরী বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন পনের বছরের কিশোর রেম্পিনির দিকে। কোন কথা বললেন না। সার হেনরীর ক্যাব লন্ডনের রাতের অন্ধকারে মিশিয়ে যায়। রেম্পিনি অবাক। পাঁচ শিলিং বকশিস আশা করেছিল সে, মনের সুখে ডিনার খাওয়া যেত। কিন্তু বকশিস তো দূরের কথা, কোন মিষ্টি কথাও নয়।

পরের দিন সার হেনরী ডাকলেন, "উইলমট, তোমাকে এখনি দর্জির দোকানে যেতে হবে।"

"আপনার কোন সুট তৈরি করতে দেওয়া আছে কি?"

না না, আমার নয়, তোমার নিজের।"

"এ্যাঁ?"

"দেরি নয়, এখনি চল! অনেক কাজ বাকী, আজই সব শেষ করে রাখতে চাই। টেবিল মোছা তোমার কাজ নয়, তুমি ব্যারিস্টার হবে।"

নিদারুণ কর্মব্যস্ততার মাঝেও

জীবনের' সেই পরম পুণ্যে লগ্নটি রেম্পিনিকে নাড়া দেয়। কিছুক্ষণের জন্য ফিরিয়ে নিয়ে যায়। ফেলে আসা দিন-গুলির মাঝে। বহুবর্ষ আগের অফিস-বয় রেম্পিনি তাকে ডাকে, তাকে বিহ্বল করে তোলে। এমনি কোন স্মৃতিসলিলে অবগাহন মুহূর্তে রেম্পিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করেছিলেন সুব্রতর কাছে।

একনিষ্ঠ সাধনাই রেম্পিনিকে সাফল্যের সিংহদ্বারে বহন করে আনে সে কথা জেনেও সুব্রত নিজেকে পরিপূর্ণ রূপে উৎসর্গ করতে পারে না। রেম্পিনি বলেন, "সংসার, সমাজ সব ভুলে কাজ করে যেতে হবে, ছুটির দিনেও নিষ্কৃতি নেই।" খুব ভোরে বাড়িতে ডেকে পাঠান। কেসের আলোচনা, কিংবা কিভাবে জেরা হবে, সে বিষয়ে চিন্তা। সুব্রতর যেতে ইচ্ছা হয় না। ছুটিতেও কাজ? দীপালিকে কাছে বসিয়ে একটা দিন গল্প করাও চলবে না?"

ওই তো সুকান্ত সেন। কত মামলা হাতে, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনকে সে নষ্ট হতে দেয় নি। আগাথা সেন দীপালিকে সেই কথাই বলে গেল গতরাতে। ডিনারে সুকান্ত ও আগাথা কত গল্প করলে। পাহাড়ী ঝর্ণার মত মেয়ে। বন্য স্বাস্থ্য, অদম্য জীবনীশক্তি। আগাথা বলে, "টাকার প্রয়োজন কেবল জীবনকে উপভোগের জন্য। সুকান্তর প্রাইভেট ও প্রফেশনাল লাইফের মধ্যে একটা সরল রেখা টেনে ভাগ করে দিয়েছি।" সুকান্ত বাড়ি ফিরে আগাথার সঙ্গে চায়ে বসে, কত গল্প হয়। রাত আটটার পর কোন কাজ নয়। ঘড়ির বাজনার সাথে সাথে সুকান্ত ভিতরে চলে যায়, এক জগৎ থেকে ফিরে আসে অন্য জগতে। রবিবারে আগাথাকে পাশে বসিয়ে মোটর চালায়। পিছনের সিটে টিফিন কেরিয়ারে খাবার, স্বামী-স্ত্রীর পিকনিক। মাঝে মাঝে আগাথা স্টিয়ারিংএ বসে। স্পিডোমিটারের কাঁটার কম্পন ওকে ছেলে-মানুষ ক'রে তোলে। জোরে, আরও জোরে। হাওয়ায় আগাথার সোনালী চুলগুলো নাচতে থাকে। দু'জনে সিগারেট ধরায়, সঙ্গে মিহি সুরে কোনো ইংরেজী গানের কলি। কলকাতা শহর পিছনে ফেলে ওরা ছুটে চলে যশোর রোড ধরে। বেলা এগোয়, গাড়ি থামে। লাল রঙের চাদর

হাতে ওরা মাঠের মধ্যে নেমে পড়ে, বন-বালিকার মত আগাথা ছুটতে থাকে। দূরের পাখির ডাকের সঙ্গে মিশিয়ে দেয় তার কলহাস্য। দু'জনে লুকোচুরি খেলে। ক্যামেরায় আগাথা ছবি তোলে। তারপর টিফিন কেরিয়ারের খোঁজ পড়ে। দু'জনে কাড়াকাড়ি করে খায়। সান গ্লাসের কাঁচ মুছতে মুছতে আগাথা বলে, "বাব্বা খেতে পার বটে।" সুকান্ত উত্তর দেয়, "তুমিও কম যাও না।" "বটে? তিন ডজন স্যাণ্ডউইচ বুঝি পাখিরা খেয়ে গেল।" দু'জনে হেসে লুটিয়ে পড়ে।

দীপালি অবাক হয়ে শোনে। সুব্রত কোন উত্তর দেয় না। মনের ভিতর বাঁধন ছিঁড়ে আগাথাদের মত বেরিয়ে পড়ার আহ্বানকে সজোরে দমন করতে হয়।

রেম্পিনি এসব কিছুই জানেন না। "জান হে সুব্রত, মোস্ট ইণ্টারেস্টিং ব্যাপার।" সুব্রত ভাবে, কোন মজার কথা নিশ্চয়ই, তাই আগ্রহে অকায়। রেম্পিনি বলেন, "ট্রেড মার্ক অ্যাক্টের বাইস ধারা সম্বন্ধে লর্ড ডানেভিনের......"

বেশ কিছুদিন কাটে। সুব্রতকে রেম্পিনি কোর্টে নিয়ে এলেন। রেম্পিনির পাশে বসে জুনিয়র সুব্রত রায় কাগজ এগিয়ে দেয়। কখনও সুব্রতর গাউন টেনে বলেন, "ব্যারিস্টার দাসের জেরা মন দিয়ে শোন।" কখনও কোর্টে যাবার আগে জিজ্ঞাসা করেন, "বল, আমাদের আর্গুমেণ্ট কোন্ লাইনে হবে।" সুব্রত বলে যায়, তিনি গভীর মনোযোগ দিয়ে শোনেন। তারপর মৃদু হেসে বলেন, "চল, কোর্টে যাই। আমার বক্তব্য সেখানেই শুনতে পাবে।"

আরও দিন যায়। রেম্পিনি নিজে না উঠে সুব্রতকে তুলে দেন। "জেরা কর।" সুব্রতর ভয় আসে, গলা কেঁপে ওঠে। রেম্পিনি আস্তে আস্তে বলেন, "চমৎকার হচ্ছে। মোস্ট ইনটেলিজেণ্ট কোশ্চেন। এবার এইটা জিজ্ঞাসা কর।" কিছু পরে রেম্পিনি নিজেই হাল ধরেন। অনভ্যস্ত সুব্রত স্বস্তির নিশ্বাস নেয়।

দিনের শেষেও ছুটি নেই, টেম্পল চেম্বারে অধ্যয়ন চলে। দীপালির নরম মুখটি মনের পটে ভেসে ওঠে। মোটা মোটা আইন বইএর জগতে সে যেন ভয় পেয়ে ত্রস্তা হরিণীর মত নিমেষে অদৃশ্য হয়ে যায় সুব্রতর মন থেকে।

বাড়ি ফিরে একান্তে দীপালির পিঠে হাত রেখে সুব্রত খুব হাসতে চেষ্টা করে। সিনেমা থিয়েটারের সংবাদ, মিনি মাসি কেমন আছেন, দীপালির বান্ধবী অনুরূপা কবে আসছেন দিল্লী থেকে ইত্যাদি নানা প্রশ্ন।

দীপালি উৎসাহ পায়। "শুনেছ, আজ আগাথা সেন ফোন করেছিল। ওরা বড়দিনে মোটরে নৈনিতাল যাবে, ফিরবে নববর্ষে।" দীপালি আর কিছু বলে না। জিজ্ঞেসাও করে না। তবু সুব্রতর মনে হয়, দীপালির প্রশ্ন লুকিয়ে আছে এর ভিতর। আস্তে আস্তে বলে, "এবার কোথাও যাওয়া হবে না। রেম্পিনি সায়েবের বিপক্ষে একটা কেস্ পেয়েছি। খুব ভাল করে তৈরী হতে হবে।"

বড়দিনে রেম্পিনি উপহার পাঠিয়েছেন সুদৃশ্য বাক্স। রঙিন সেলাফোন কাগজে মোড়া। দীপালিও ছুটে আসে, সায়েব কী দিয়েছেন? কাপড়? ড্রেসিং সেট? প্যাকেট খুলে দীপালি মুখ কুঞ্চিত করে, বই। তাও আইন বই। সঙ্গের স্লিপে লেখা, বইটি যেন খুব মন দিয়ে পড়া হয়।

নতুন বছরে দু'জনে কোর্টে ঢুকলেন। একদিকে রেম্পিনি, অন্যদিকে সুব্রত। রেম্পিনি সুব্রতর দিকে চাইলেন না। যেন কোন পরিচয় নেই। কেসে সুব্রতকে প্রতি পদে বাধা দিলেন রেম্পিনি। বহু রাত্রি জাগরণে সুব্রত যে সব যুক্তি সংগ্রহ করেছিল, নিষ্ঠুরভাবে প্রতিটি খণ্ডন করলেন তিনি। কোন মায়া নেই, কোন মমতা নেই। সুব্রতর শোচনীয় পরাজয়। দিনের শেষে ক্লান্ত সুব্রত টেম্পল চেম্বারে ফেরে। রেম্পিনি পায়চারী করছেন, "সুব্রত, এত সুন্দর কেসটা নষ্ট করলে? তোমার অমুক পয়েণ্ট নেওয়া উচিত ছিল, আমার বক্তব্য ভুল প্রমাণ করার জন্যে! ফাইভ কিংস বেঞ্চে অন্য কথা বলা হয়েছে।" রেম্পিনি সম্পূর্ণ কেসটি আলোচনা করেন, "ভবিষ্যতে খুব সাবধানে কেস করবে।"

তারপরও কত মামলা হলো, যার একদিকে সুব্রত অন্যদিকে রেম্পিনি। প্রতিবার পরাজিত সুব্রত অবসন্ন মনে চেম্বারে ফিরেছে। রেম্পিনি রেগেছেন, বলেছেন—"সুব্রত, হারা উচিত হয়নি।" কেস্ ল' দেখিয়েছেন, সুব্রত চুপ করে শুনেছে।

সুব্রতর গোঁ চাপে। বার বার হারলে চলবে না। দ্বিগুণ উৎসাহে কাজ করে যায়, মামলার গভীরে যাবার চেষ্টা করে। মনে অন্য কিছুর প্রবেশাধিকার নেই, দীপালিরও নয়। কোর্ট থেকে ফিরে ব্রীফ নিয়ে বসে সুব্রত, দীপালি পাশে এসে বসে। সুব্রত লাল পেন্সিলে দাগ দেয়।

"ওগো শুনছ," জীবনে এই প্রথম দীপালির উপস্থিতি অস্বস্তিকর মনে হয়। সান্ধ্য-স্নানের পর দীপালির দেহের মোহময় সৌগন্ধও সুব্রতর প্রাণে সাড়া জাগায় না।

"চল না শ্যামবাজারে বাবাকে দেখে আসি, ক'দিন যাওয়া হয়নি। বাবার শরীর ভাল নয়।" দীপালির কথা সুব্রতর কানে যায়, কিন্তু বহুদূর হতে উচ্চারিত একটি ক্ষীণ কণ্ঠ। সুব্রতর মস্তিষ্কে কোন তরঙ্গ সৃষ্টি করতে পারে না। পড়া শেষ করে সুব্রত বলে, "কি যেন বলছিলে?" কোন উত্তর না পেয়ে সুব্রত চেয়ে দেখে দীপালি নেই। বোধ হয় অনেক আগে উঠে গেছে। সুব্রতর ইচ্ছা হয়, দৌড়ে গিয়ে দীপালিকে জড়িয়ে ধরে বলে, "চল কোথায় যেতে হবে, হুকুম কর।" সে শুধু এক মুহূর্তের জন্য। রেম্পিনি সায়েব ভেসে ওঠেন চোখের সামনে, "কাজ করে যেতে হবে সব কিছু ভুলে।" সুব্রত আর একটা বই টেনে নেয়।

অবশেষে সেই দিন এল, যে দিনের জন্য সুব্রত অপেক্ষা করছিল। যার জন্য দীপালিকে দূরে সরিয়ে দেওয়া, কত নিদ্রাবিহীন রাত্রি যাপন। সুব্রতর জিত হয়েছে, উইলমট ডানিয়েল রেম্পিনি আজ বকবেন না, আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে বুকে জড়িয়ে ধরবেন। তাঁর শিক্ষা সার্থক হয়েছে। লিফটের অপেক্ষা না করে সুব্রত টেম্পল চেম্বারের সিঁড়ি বেয়ে তিন তলায় উঠে আসে।

ভিতরে ঢুকে সুব্রত থমকে যায়। রেম্পিনি একমনে বই পড়ছেন, সুব্রতকে দেখতে পেলেন না। সুব্রত নিজের চেয়ারে বসে পড়ে, গাউন খোলে। রেম্পিনি নির্বাক যেন কিছুই হয়নি। সুব্রতর সাথে যেন

কোন পরিচয় নেই তাঁর। দেওয়ালের বইএর সারিরাও যেন ভয় পেয়ে জড়সড় হয়ে রয়েছে। শুধু ঘড়িটা প্রগলভ্ শিশুর মত আপন মনে বকে চলেছে, টিক্ টক্। সন্ধ্যা ছ'টা। সুব্রত চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ে, "গুড নাইট সার," মুখ না তুলে রেম্পিনি বলেন, "গুড নাইট।"

পরের দিন কাজের শেষে রেম্পিনি ডাকলেন, "সুব্রত।" এই ডাকের জন্য সুব্রত অপেক্ষা করছিল। রেম্পিনিকে চেনা যাচ্ছে না। একদিনে কত পরিবর্তন হয়েছে। গম্ভীর, মিতভাষী, বিমর্ষ। "সুব্রত," রেম্পিনি থামলেন, তাঁর চিন্তা যেন এখনও শেষ হয় নি। "সুব্রত, আমাদের আর এক-চেম্বারে কাজ করা চলে না।" আর কোন কথা নয়। রেম্পিনি আবার ব্রীফের ভিতর ঢুকে গেছেন।

সেদিন রাত্রে নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয় সুব্রতর। সে যেন একা। এখন থেকে আইনের আকাশে একাকী উড়তে হবে। দীপালিকে সব কিছু বলতে ইচ্ছা হয়, সঙ্কোচ আসে। নিজের পেশার ব্যাপারে স্ত্রীকে ব্যস্ত করা কি উচিত হবে? আগাথা সেন স্বামীর প্রফেশনাল টক্ বরদাস্ত করেন না।

চিন্তার জালে সুব্রত হয়ত জড়িয়ে যেত, কিন্তু কাজ আছে, অনেক কাজ। কোর্টে প্রতিষ্ঠা হয়েছে, এটর্নিরা দলে দলে ব্রীফ পাঠাচ্ছে। সুব্রতকে ডুবে থাকতে হয় কাজের মধ্যে।

ক্রমশ সবাই দূরে সরে যাচ্ছে। রাত্রে ডিনারের পরও কাজ। ঘড়িতে দশটা বাজে, দীপালি এসে দাঁড়ায় নিঃশব্দে। "শোবে চল।"

"এই, আর কয়েক মিনিট।"

"রাত যে অনেক হল।"

সুব্রত দীপালিকে অনুসরণ করে, বিছানার পাশে হাতের বইগুলো নামিয়ে রাখে। দীপালি আড় চোখে অসহায়ভাবে বইগুলোর দিকে তাকায়, কোন কথা বলে না।

সুব্রত রায়ের জগতের পরিধি ক্রমশ আরও ছোট হয়ে আসে। কাজ বাড়ার অনুপাতে সময় কমছে, গল্প বন্ধ। খাওয়ার সময়ও কমে।

একদিন সাজগোজ করে দীপালি এসে দাঁড়ায়। ঘিয়ে রঙের শিল্কের শাড়ি বেশ মানিয়েছে। "কী ব্যাপার", সুব্রত জিজ্ঞাসা করে।

"কেন গত শনিবার আগাথা সেন বার বার বলে গেল, টি পার্টি, তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।"

"সে কি! আমার একদম মনে নেই। এদিকে দু'জন মক্কেলকে কথা দিয়েছি, তারা এখনি আসবে, খুব দুঃখিত।" দীপালি করুণ নয়নে চেয়ে থেকে চলে যায়।

এর পরও কতদিন কাটল। সংসারে ছেলেমেয়েরা এসেছে, সুব্রত রায় কোন সময় দিতে পারেন নি তাদের জন্য। কেস্ আছে অনেক।

ব্যারিস্টার সুব্রত রায় মুখে সেদ্ধ গুঁজে যান। সব সেদ্ধ। তেল নয়, ঘি নয়, ডাক্তারের বারণ। খাওয়াটা নিতান্ত কর্তব্য বোধে। সামনে দীপালি, পঁয়ত্রিশ বছর সে এমনিভাবে দাঁড়িয়ে। মেয়েরা কোথায়? না সুব্রত রায় অযথা চিন্তায় সময় নষ্ট করবেন না। কালকে দুটো মামলা। দীপালি খুব আস্তে বলে, "খোকনকে চিঠি লিখবে না?"

"কেন, তুমি কি লেখনি? লণ্ডনের আবহাওয়া এখন কেমন?"

"আমি লিখলেই শুধু হবে কেন? তোমারই ছেলে। বিদেশে..."

সুব্রত কথা শেষ করতে দেন না। "রবিবারে একবার মনে করিয়ে দিও।" দীপালি কোন উত্তর দেয় না।

বিবেকের দংশন সুব্রতকে জ্বালা দেয়, নিজেকে অপরাধী মনে হয়। নিজের ছেলেকে চিঠি লেখা হয় না, মেয়েরা তাকে বোধ হয় ভুলেই গেছে। বহু দিনের পুরান স্বরে সুব্রত হঠাৎ ডেকে বসেন, "দীপা, চল আজ গল্প করি। মীনা ও ডলিকে ডাক।" ঠাকুরকে হাঁক দেন সুব্রত, "বাড়ির তরকারি একটু দিয়ে যাও, খেয়ে দেখি।" সুব্রতর মুখে কথার ফুলঝুরি। "একদিন সবাই মিলে সিনেমায় চল।"

কিন্তু কেউ উত্তর দিচ্ছে না কেন? দীপালি অবাক হয়ে চেয়ে আছে। কেউ বিশ্বাস করছে না তাঁকে, কেউ এগিয়ে আসছে না। সবাই তাঁকে ভয় করে, সমীহ করে, ভাল বাসে না। দীপালি শেষে বলল, "বেশ তো, ভাল কথা।" কিন্তু কোন ফেনিলতা, উচ্ছলতা নেই। প্রাণ নেই, আনন্দ নেই। সুব্রত ক্রমশ বুঝতে পারেন, এদের প্রাণ-চাঞ্চল্যকে তিনিই তিলে তিলে হত্যা করেছেন। আজ মৃতদেহে প্রাণ-প্রতিষ্ঠার চেষ্টায় কোন ফল নেই।

সুব্রত ঘড়ির দিকে চান। মনে পড়ে যায় কালকে মামলা আছে। লাইব্রেরীতে চলে যান, প্রচণ্ড শক্তিতে নিজের সাংসারিক চিন্তা ভোলার চেষ্টা করেন।

রেম্পিনি সায়েবের কথা মনে পড়ে যায়, শেষ দিনের কথা। অনেক দিন আগেকার কথা। রেম্পিনি ডেকে পাঠিয়েছেন সুব্রতকে, কতদিন দেখা নেই দু'জনে।

"আমাকে ডেকেছেন?"

"হ্যাঁ", কিছুক্ষণ থেমে রেম্পিনি ডাকেন, "সুব্রত।"

"বলুন।"

"আমি চলে যাচ্ছি।"

"সে কি?"

"হ্যাঁ, ফিরে যাব নিজের দেশে স্কটল্যাণ্ডে। একটি ছোট কুঁড়ে ঘর কিনেছি। অনেক দিন যুদ্ধ হোল, এবার অখণ্ড অবসর। চাষ করব নিজের হাতে, ফসল ফলাব।"

সুব্রত কোন উত্তর দিতে পারে না।

রেম্পিনি আলমারী খোলেন। অনেকগুলো কালো কালো কোট ও গাউন

ঝুলছে সেখানে। তার ভিতর থেকে একটি জীর্ণ গাউন যত্নে টেনে নেন। "এই গাউনটি চেন?"

"নিশ্চয়ই, কতদিন আপনাকে দেখেছি কোর্টে পরে যেতে। দু' একবার বলেওছি এত ছেঁড়া গাউন মানায় না। আপনি কোন উত্তর দেন নি।"

রেম্পিনি গাউনের দিকে আবার তাকান। পরম আগ্রহে দর্জির নাম লেখা লেবেলটি পড়বার চেষ্টা করেন। বইগুলো নির্বাক হয়ে দু'জনকে দেখছে।

"সুব্রত, তোমায় আগে বলিনি, কেউ জানে না। এ গাউন আমার নয়। মৃত্যুর আগে সার হেনরী লং আমাকে ডেকে পাঠিয়ে বলেছিলেন—'তোমায় কি দেব উইলমট?' উত্তরে বলেছিলাম 'আমার জীবনে সবই তো আপনার দান।' দীর্ঘ রোগশয্যায় শায়িত বৃদ্ধ সার হেনরী মৃদু হেসে বলেন—আমাকে আর কোর্টে যেতে হবে না, সব কিছু পিছনে ফেলে এসেছি। সে জীবনের উত্তরাধিকার তোমার। বিছানার পাশ থেকে কালো গাউনটি কম্পিত হাতে বার করেন সার হেনরী, গুরুর দান মাথা পেতে নিলাম।"

দীর্ঘ জীবনে পরম শ্রদ্ধায় ও যত্নে এই কালো গাউন রক্ষা করে এসেছেন রেম্পিনি।

সেদিন রাতে টেম্পল চেম্বারে লোকচক্ষুর অন্তরালে সুব্রতকে পরম স্নেহে আলিঙ্গন করলেন তিনি। অশ্রুসজল চোখে সঁপে দিলেন কালো গাউনটি। "যখনই কোন কঠিন কেসে নিজেকে বিব্রত বোধ করবে, এই গাউন গায়ে দিয়ো।"

বর্তমানে ফিরে আসেন সুব্রত রায়। তিনি ক্লান্ত। ঘুমে চোখের পাতা দুটি জুড়ে আসছে। তিনি জেগে ওঠবার চেষ্টা করেন। মামলার পয়েণ্ট বার করতে হবে, সুব্রত রায় পায়চারী আরম্ভ করেন। ওগো আমার চিন্তারা, তোমরা এস।

রাত কত? ব্যারিস্টার সুব্রত রায় চমকে ওঠেন। চারিদিক নিস্তব্ধ। সমগ্র পৃথিবী নিদ্রামগ্ন। বিজলী বাতিটিও বুঝি নিদ্রাকাতর। তিনি পয়েণ্ট খোঁজেন, মস্তিষ্ক শূন্য মনে হয়। অব্যক্ত যাতনায় চুলগুলো ছিঁড়তে ইচ্ছা করে।

কী হবে ভেবে, এখন নিদ্রা। চোখের সামনে আগামী কালের কোর্টের দৃশ্য ভেসে আসে। ব্যারিস্টার সানিয়াল একের পর এক বাণ ছুঁড়ছেন। তাঁর ঠোঁটের কোণে ঈষৎ হাসি, না না তা হয় না।

ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলে চলে, যক্ষপুরীতে বন্দী যেন সুব্রত রায়। চারিদিকে কলসী কলসী মোহরের মত মোটা মোটা আইন বইগুলো হাসছে। তাদের পাহারা দিতেই কে যেন তাকে যক্ষ করে রেখেছে। কেউ কি তাঁকে উদ্ধার করতে পারে না এই কক্ষ থেকে? ব্যারিস্টার রায় থমকে দাঁড়ান। দীপালি, হ্যাঁ দীপালি আসবে। এখনই এসে বলবে, "রাত অনেক শোবে চল।" ঘড়ির পেণ্ডুলাম দুলে চলে। না না ভুল হয়ে গেছে, দীপালি তো আর আসে না বহুদিন, অনেক বছর সে আসা বন্ধ করে দিয়েছে। কেউ কিছু বলবে না তাঁকে, যত ইচ্ছা পড়াশুনা।

দূরে টাঙানো গাউনটার দিকে হঠাৎ নজর পড়ে যায়। মিশ কালো রঙ, কত পুরোন কে জানে। অনেক জায়গায় ছোট ছোট ফুটো। রেম্পিনি সায়েবের গাউন। অনেক দিনের সঙ্গী। যখনই কোন জটিল মামলায় সন্দেহ জেগেছে, জেগেছে সামান্য ভয়, সুব্রত রায় পরম বিশ্বাসে তাকে অঙ্গে ধারণ করেছেন। বহু যুদ্ধের স্মৃতিমণ্ডিত বর্ম।

তাঁর দৃষ্টি গাউনটির দিকে নিবদ্ধ। সেটি যেন ক্রমশ আকারে বাড়ছে। সুব্রত রায় ফিরে যেতে চান নিদ্রার ক্রোড়ে। কিন্তু একি! কালো গাউনটি যেন এগিয়ে আসছে। হ্যাঁ, ওইটা আরও কাছে। পালাতে হবে। তিনি ছুটে যান পিছনে, পাশে, কিন্তু দরজা কোথায়? দরজা নেই না কি? শুধু বই। বইএর দেওয়াল। ওই তো সুব্রত রায় দেখতে পাচ্ছেন তার দেহটিকে নিশ্বাস রোধ করে হত্যা করা হচ্ছে। ওই তো মৃত দেহটি পড়ে আছে, বীভৎস পঙ্কিল। হৃদয় নেই, প্রাণ নেই, শুধু বিশাল মস্তিষ্ক। ভিতরে কি সব গিজ গিজ করছে। হ্যাঁ পোকা, আইনের পোকা।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলেন তিনি, নিজের আত্মাটিকে নিয়ে পালিয়ে এসেছেন কিন্তু নিষ্ফল প্রচেষ্টা। স্ত্রী-পুত্র-কন্যা জগৎ-সংসারকে বিলুপ্ত করে কালো গাউনটি আরও এগিয়ে আসছে। ধীরে ধীরে বিজলী বাতির স্তিমিত আলোকে নিদ্রামগ্ন পৃথিবীর অলক্ষ্যে ঐ হিংস্র, কুৎসিত, বিশাল দানব-পক্ষীটি তার ঘন কৃষ্ণবর্ণ পক্ষ বিস্তার ক'রে তাঁর সকল সত্তাকে গ্রাস করতে ছুটে আসছে।

বার লাইব্রেরীর সামনে বাবুদের বেঞ্চিতে বসে এই গল্প যিনি বলছিলেন তিনি চুপ করলেন। আমরা অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। ছোকাদা বেঞ্চির কোন থেকে আরও কাছে সরে এলেন। বাইরের দিকে তাকিয়ে ছোকাদা বিড়িতে আগুন ধরালেন। "ওই কালো গাউনের মোহ বহু ব্যারিস্টারকে বহু সংসার থেকে অনেক দূরে টেনে নিয়ে গেছে।" কিছুক্ষণ চুপ করে ছোকাদা আবার বললেন, "ওরে আমাদের সায়েবদের আসল বিয়ে ওই কালো গাউনের সঙ্গেই।"
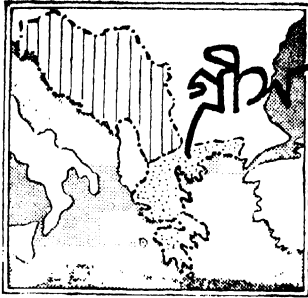
গ্রীস থেকে জুগোশ্লাভিয়া

ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী

ও দেশের অবস্থা অল্পদিনে, সামান্য দৃষ্টিতে যা মনে হলো সেটা এই যে, সব লোকই বুঝি সুস্থ শরীরে হাসি মুখে যার যা কাজ ঠিক সময়ে করে চলেছে। শীতের দেশে রাস্তায় শুয়েও থাকে না, দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাওয়াও কখনো দেখতে পাইনি। উত্তরে যে দুটো প্রদেশ আছে তাদের বড় শহর লুব্রিয়ানা আর জাগ্রেভ, সেখানে প্রবেশ করা মাত্রই মনে হয় পশ্চিম ইউরোপে এসেছি। দক্ষিণাঞ্চল থেকে এ দুটো প্রদেশের রাস্তা-ঘাট খাবারের দোকান, হোটেল, লোকজনের ঠিক একই রকমের পোশাক দেখামাত্রই মনে হয় যেন একেবারে স্বতন্ত্র মুল্লুক, দক্ষিণের প্রাচ্যভাব মোটেই নেই। লণ্ডনে যাঁরা জুগোশ্লাভ দেশের সঙ্গে পরিচিত তাঁরা বলেই দেন যে, ইটালি বা অস্ট্রিয়া থেকে তফাৎটা ধরতে পারা যাবে না বেলগ্রেডে না যাওয়া পর্যন্ত। আমি অবশ্য এসেছি একেবারে দক্ষিণ থেকে। আমার পক্ষে মনে হওয়া স্বাভাবিক, আবার বুঝি ইউরোপে ফিরে এসেছি। যতক্ষণ লোকে কাজ করে ততক্ষণ তাদের মুখে কোনো অপ্রসন্ন ভাব লক্ষ্য করা যায় না। সন্ধ্যাকালে কার্যবিরতির সময় কয়েকজন নামী ডাক্তারের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে বুঝতে পেরেছি, তাঁদের আলোচনার মুখ্য বিষয় কি রকমে দেশটা এগিয়ে যাবে বা আর দশটা দেশের মতন হবে। এ আলোচনা তাঁদের নিছক কাল অপহরণ তা মনে করতে পারছি না। আমাদের দেশেও ভদ্রলোকেরা এ আলোচনা খুবই করেন আজকাল, বিশেষত স্বাধীনতার পরে, তবু বেশ একটু তফাৎ আছে।

আমাদের মত দেশে সবকিছুই কেন্দ্রীয় সরকারের যাঁরা প্রতিনিধি, তাঁদের বিচার-বিবেচনায় পরিবর্তন যা ঘটে বা ঘটবে, নির্ভর করে। এখানে একটা ম্যুনিসিপ্যালিটি বা অফিস বা হাসপাতাল নিজেদের দায়িত্বে, সকলের সমবেত মত সমর্থন করেই চলে। নিজেরাই ছোট ছোট কারখানা, স্কুল বা অফিসের অবস্থার অদল-বদল করতে সক্ষম; তাঁদের পক্ষে কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের জন্য প্রতীক্ষা করতে হয় না। এই রকম স্বায়ত্তশাসন রয়েছে এদের সব ব্যাপারেই। এটা মনে রেখে এ অবস্থার আলোচনা বা এমন কি ভালরকম উপলব্ধি করাও বেশ কঠিন ব্যাপার, তাই মনে হয়েছিল। রাজনীতি ক্ষেত্রে কোনও পার্টি নেই, অথবা সব প্রজাই এক পার্টির অন্তর্ভুক্ত। ইংলণ্ডের মত গণতন্ত্র যেখানে সেখানেও এটা নতুন ঠেকে নিশ্চয়ই। সকল প্রজারই ভোট আছে, তাদের নিজস্ব মতামত থাকতেও পারে—তবে তারা সাম্রাজ্যবাদের বিরোধী, ধনীবিশেষের হাতে ব্যবসায় থাকবে বা জমিদারী প্রথায় জমি চাষ করতে হবে এমন কথা মনে প্রাণে বিশ্বাস করে না। সকল প্রজার স্থান এক পর্যায়ে। এই বিচারে পার্টির আর আবশ্যকতা থাকে না। আর যদি প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠান সেখানকার ছোটবড় সব লোকেরই নিজস্ব সম্পত্তি হয়, যার লভ্যাংশ প্রত্যেক শ্রমিক পায়—তাহলে ধর্মঘটও থাকে না। ইংলণ্ডে এক শ্রেণীর লোক এই দেশটা দেখে এসে প্রচার করেছেন যে, জুগোশ্লাভিয়ায় ট্যাক্স নেই, ধর্মঘট নেই, পার্টিও নেই অথচ মতামত লোকে দিতে পারে সব বিষয়েই; কোনও প্রকার আলোচনা নিষিদ্ধ নয়। নিজের বাড়িতে যেমন গৃহস্থ ধর্মঘট করতে পারে না, সেই রকম অবস্থা। যদি কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের বেতনভুক্ হয়ে লোকে কারখানায় কাজ করত বা জমি চাষ করত, তাঁদের বেশী কাজ করার উৎসাহ নিভে যেত। ফলে সারাদেশের উৎপন্ন দ্রব্য প্রত্যক্ষত কম হয়ে যেত। এ প্রথায় অসুবিধা আছে, অন্তত এখন পর্যন্ত উৎপন্ন সুষ্ঠু হয়নি বা আশানুরূপ হচ্ছে না, যতটা ধনতান্ত্রিক দেশে সম্ভব হয়েছে। সেখানে একই কাজে অভ্যস্ত শ্রমিক বছরের পর বছর বা পুরুষানুক্রমে কাজ ক'রে ফলন বাড়াতে পারে। তবু এদের চিন্তাশীল লোকেরা আশাবাদী, এটা অল্পক্ষণ আলোচনাতেই বুঝা যাবে। যুদ্ধের সময়ে বিপর্যস্ত অবস্থা, তার পরিণামে ভয়াবহ অনটন এসব কিছুই অবশ্য আলোচনার মধ্যে পড়ে না।—জার্মান যুদ্ধের আগে আর এখন পার্থক্যটা কি, এইটাই যেন তুলনার বিষয়।

যেমন আগে বাইরে থেকে কত কয়লা আমদানি করতে হ'তো এখনই বা কতটা বাইরে থেকে না আনলে চলে না; ইঞ্জিন ক'খানা সারা দেশে ছিল, এখনই বা দেশে কতটা ঘাটতি আছে ইত্যাদি। সব বিষয়ে উন্নতি প্রত্যক্ষ ক'রে এখানকার লোকে আশা পোষণ করেন অনেক দেশের চেয়ে বেশী। অসন্তোষের চিহ্ন কোথাও দেখা যাবে না; গভর্নমেণ্টকে এরা নিন্দা করে না—ভয়ে নয়, সে নিন্দা নিজের উপরে পড়বে বলে, এটা যেন স্ত্রীপুরুষের রক্তের মধ্যেই আছে। কাজেই এরা বোঝাতে চাচ্ছেন একটা রাষ্ট্র কম্যুনিস্ট হতে গেলে সর্বপ্রথমে কেন্দ্রস্থ গভর্নমেণ্টের ক্ষমতা এত বেশী থাকা উচিৎ যে প্রজামাত্রেই গভর্নমেণ্টের চাকরি করে, অর্থাৎ কোন যৌথ সমবায়ে গড়া বণিক সমিতির কাছে চাকরি নয় বা ব্যক্তিবিশেষ অর্থবলে মালিক হবেন না। পরের ধাপে গভর্নমেণ্টের কিন্তু কোন হাতই থাকে না। ওদেশে কয়লার খনি চলে সে-খনির শ্রমিক বা কর্মচারি একসঙ্গে মিলে, লাভালাভ অর্শায় তাদেরই উপর। ইংলণ্ডে শ্রমিক গভর্নমেণ্টের সময় সকল খনিরই জাতীয়করণ ঘটেছে; মুনাফার দিকে নজর দিয়ে, যারা খেটে খায় তাদের সুখ-দুঃখ নাকি মালিকেরা দেখতেন না অথবা শ্রমিকের প্রতি সুবিচার করা হ'তো না। কাজেই রেল, গ্যাস, ইস্পাত ও কয়লা ইত্যাদি অনেককিছু গভর্নমেণ্ট নিজেই নেন। ইংলণ্ডের এই শ্রমিক গভর্নমেণ্টের নাম দেওয়া হয়েছিল সোস্যালিস্ট গভর্নমেণ্ট। জুগোশ্লাভ প্রজা অনেকেই খবর রাখেন যে, ইংলণ্ডে শ্রমিক গভর্নমেণ্টের আমলে কতক লোক কলরব তুলেছিল তারা বুঝি 'স্টেটের দাস' হয়ে যাচ্ছে। এখানে ঠিক সেই অবস্থার পরিবর্তনে তারাও ইচ্ছুক। তফাৎটা এই যে তারা স্টেটের দাস হচ্ছে না এই জন্যে যে স্টেটই নেই। এই স্টেট উবে যাওয়া বা তার শক্তি খর্ব করা কার্ল মার্কসের শিক্ষা। মার্কস অবশ্য লিখেছিলেন স্টেট ঠিক একদিনে অন্তর্হিত হতে পারে না বা হবে না, প্রজা নিজের দায়িত্ব বুঝে নিতে কিছু সময় নেয়, স্টেটও ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে শুধু নামে পর্যবসিত হয়।

জুগোশ্লাভ প্রজার মধ্যে অনেকেই মনে করেন তাঁরাই মার্কসের একমাত্র অনুবর্তী। অবশ্য পুলিস, রেল, যানবাহন, পোস্ট বা তার, জাহাজ, সৈন্য বিমানবাহিনী এগুলি সবই স্টেটের অনুজ্ঞায় চলে। এদের সম্বন্ধে সাধারণ প্রজার কোন হস্তক্ষেপ করা বেআইনী। কাজেই ষোল আনা কম্যুনিস্ট জুগোশ্লাভিয়া হতে পারেনি একথাও শুনতে পাওয়া যায়।

আমাদের মত বিদেশী যারা শহরে রাস্তা-ঘাটে চলা-ফেরা করে অতিথিবৎসল নাগরিক বা গ্রামবাসীর গৃহে আহার্য পানীয়ের সঙ্গে রাজনীতি, সমাজ নীতি, অর্থনীতি আলোচনা করে, তাদের মনে হতে পারে, দেশে বুঝি সব প্রজা সুস্থ, সবল আর কর্মক্ষম কিন্তু এদেশেও ব্যাধির প্রকোপ কম নয়। দক্ষিণাংশে ম্যাসিডোনিয়া অঞ্চলে গ্রীসের মতই ম্যালেরিয়া গ্রামের কৃষিজীবিদের নিবীর্য করেছিল। হয়ত বাংলা দেশের মত ম্যালেরিয়া এখানে নেই, তবুও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার পক্ষ থেকে ডি ডি টি প্রয়োগ এখনও প্রচলিত। যে পলিও অসুখের কথা আমাদের দেশে অনেকেই আলোচনা করছেন, তার ফলে অনেক শিশু পক্ষাঘাতগ্রস্ত পঙ্গু হয়ে এদেশে আছে। স্বতঃই জানতে কৌতূহল হয় হাত-ভাঙা পা-ভাঙা লোকদের কী ব্যবস্থা সোস্যালিস্ট রাজ্যে নেওয়া হয়েছে। প্রলয়ের মত যে যুদ্ধ হয়ে গেল, তার কারণে ক্ষয়রোগের প্রসার কিংবা প্রতিকার কতটা হয়েছে। বেলগ্রেড শহরের উপান্তে একটি বিরাট পুনর্বাসনের জন্য কেন্দ্র আছে। খবরে জানতে পারলাম সারা দেশে পঙ্গু পক্ষাঘাতগ্রস্ত প্রজাকে গ্রাম থেকে, শহর থেকে সন্ধান করে করে, সেখানে নিয়ে আসা হয়। এই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক এদেশের একজন বিখ্যাত শস্ত্র চিকিৎসক। তাঁর সহকর্মিণী চারজন সেবিকা ইংলণ্ড ও আমেরিকা থেকে শিক্ষা পেয়ে অক্ষম লোকদের আবার কি করে কাজে ফিরিয়ে নেওয়া যায় বা বিকলাঙ্গ দেহের উপযোগী নূতন কি কাজ শেখান যায়, তাই আমাকে বড় যত্ন করে দেখাতে লাগলেন। বিদেশ প্রত্যাগত এই কর্মীরা পরিষ্কার ইংরেজী বলতে পারেন। কত দুঃখ প্রকাশ করে তাঁরা বললেন গত যুদ্ধে সত্তর লক্ষ লোক চার বছরে দুনিয়া ছেড়ে চলে গেল কিন্তু আরও পঁয়ত্রিশ হাজার লোক না মরে এখনও বেঁচে আছে, দরিদ্র এই দেশের স্বল্প উপার্জনের উপরে তাদের পরভৃৎ অস্তিত্ব নির্ভর করছে। অনাথ ও পিতৃহীন বালক-বালিকার দায়িত্ব স্টেট নেয়; তারা কেউ দূর আত্মীয় বা সদাশয় দেশবাসীর ভিক্ষায় নির্ভর করে বেঁচে থাকে না। বৃদ্ধ বয়সে সকল প্রজাকেই, স্ত্রী বা পুরুষ, পেনশন দেওয়া সম্ভব হয়েছে। কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনায় বা ব্যাধিতে পঙ্গু প্রজার জন্য এই একটামাত্র প্রতিষ্ঠান সারাদেশে। তারা যেন একটু সঙ্কুচিত বোধ করলেন যে ইউরোপ আমেরিকার পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলি যাঁরা দেখেছেন তাঁদের কাছে এই ক্ষীণ প্রচেষ্টা কত ছোট মনে হবে। এ'দেরই মুখে শুনলাম এ-রকমের প্রতিষ্ঠান পূর্বাঞ্চলে একমাত্র রুশিয়াতে অতুলনীয়। উদাহরণস্বরূপ বললেন, আমাদের দেশে যক্ষ্মা রোগীর সংখ্যা প্রভূত, তত্রাচ যক্ষ্মার পুনর্বাসন (Rehabilitation) এখনও আমাদের

দেশে আরম্ভ হয়নি। হাসপাতাল ও স্যানাটোরিয়ামের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ রোগীদের হয় হাসপাতালের বহির্বিভাগে না হয় তাঁদের বাড়িতেই চিকিৎসা করাতে হয়। তাঁদের কাজ বণ্টন করে দেবার জন্যে একটি কমিটিও গঠিত হয়েছে। যত ডাক্তারের সঙ্গে দেখা হয়েছে সকলেই অকপটে বলেছেন ক্ষয়ব্যাধির ব্যবস্থায় তাঁদের দেশ এখনও অনেক পিছিয়ে আছে। তবে একথা ঠিক যে ডাক্তারের সার্টিফিকেট পাওয়া রোগমুক্ত যক্ষ্মা রোগীর যোগ্য কাজ ফিরে পাওয়ার কোন বাধাই থাকে না। অফিসে কারখানায় তারা অবাধে চলা-ফেরা, কাজকর্ম করতে পারে, দেশের লোকের সংস্কারে বাধে না। যক্ষ্মা রোগ গোপন করার অভ্যাসটা দেশের লোকের আছে কি না জানতে কুতূহলী হয়েছিলুম। উত্তরে জেনেছি চিকিৎসা ক্রয় করতে হয় না, দায়িত্ব গভর্নমেণ্টের। যতদিন ছেলে বা মেয়ে কাজের যোগ্য না হবে ততদিন অভিভাবক বাপ-মা গভর্নমেণ্টের কাছ থেকে তাদের লালন-পালনের জন্য বৃত্তি পেয়ে থাকেন। এই সব কারণে (আমাদের দেশে রোগী মাত্রেরই যে পর্বতপ্রমাণ দুশ্চিন্তার ভার তার নেই বলেই) ব্যাধির বিষয়টা লোকে গোপন করে না। চিকিৎসা মোটামুটি সারা দেশেই নি-খরচায় সম্ভব। গরীবের চিকিৎসার ব্যয় নেই। যারা অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল তাঁরা অবশ্যই ইচ্ছা করলে ফী দিয়ে ডাক্তার ডাকতে পারেন, কিন্তু আমি ডাক্তারদের কাছে শুনলাম হাসপাতালে ক্লিনিকে বিনামূল্যে চিকিৎসিত হবার সম্ভাবনা আছে বলেই তাঁদের প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ করা সম্ভব হয় না। অবশ্য প্রাইভেট প্র্যাকটিস্ বে-আইনী নয়। ডাক্তার মীরকফের পত্নীও শিশু চিকিৎসক। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলছিলেন ম্যুনিসিপ্যালিটি ছাড়া বাইরে থেকে কিছু রোজগার করলে ভালই হত কিন্তু শহরবাসীর চিকিৎসা ক্রয় করবার সঙ্গতি নেই বললেই হয়। এই দম্পতী একদিন বড় আদরে তাঁদের গৃহে আমায় নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তাঁদের দুটি ছেলে একটি মেয়ে, বৃদ্ধামাতা শীর্ণকায়া। বৃদ্ধা আমাকে দেখেই কিছুক্ষণ তাকালেন মুখের দিকে; প্রথমটা ভেবেছিলাম কৃষ্ণবর্ণের লোক বোধ হয় তাঁর আগে দেখা নেই। কিন্তু যখন দেখলাম তাঁর দুই চোখ দিয়ে জল পড়ছে তখনই বুঝলাম যে আমারই মতো তাঁর এক ছেলে গত জার্মান যুদ্ধে নিহত হয়েছে। ডাক্তার বলে দিয়েছিলেন ট্যাক্সি করে আসতে কেন না সেদিন সন্ধ্যা থেকে শহরের সে অংশে বিজলী আলো বন্ধ। বিভিন্ন অঞ্চলে পালাক্রমে বিজলী বন্ধ করা হয় কেননা কারখানার জন্যে বিজলীর প্রয়োজন বেশী। কেরোসিন তেলের লণ্ঠনে আমার বোধ হয় বড়ই কষ্ট হচ্ছে, বোধ হয় কেরোসিন তেলের বাতি আমি কখনো দেখিনি—এই রকম একটা কিছু মীরকফ দম্পতী আমার সম্বন্ধে ভেবে নিয়েছেন। ডাক্তার মীরকফ্ ব্যাকটিরিয়োলজির অধ্যাপক। আট মাস ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন। স্ত্রী অবশ্য ঘরে ইংরেজী শিখেছেন, ইংরেজী বলতেও পারেন, নেহাৎ মন্দও নয়। আমি থাকাকালীন একটি প্রতিবেশী ভদ্রলোক এসেছিলেন, কিন্তু অল্পক্ষণেই চলে গেলেন। প্রৌঢ় ভদ্রলোকটি এঁদের মতোই দুখানা ঘরের ফ্ল্যাটে থাকেন। পরিচয় করিয়ে দিলেন, তিনি কোর্টের জজ। সেই ঘরেই দুটি ছেলে লণ্ঠনের আলোয় পড়ছে। কুতূহলী হয়ে প্রশ্ন করেছিলাম তাদের প্রাইভেট টিউটর আছে কি না। কথাটা তাঁরা বুঝতেই পারলেন না। অনেক রকমে বোঝাতে চেষ্টা করেছিলাম যে একজন শিক্ষক বাইরে থেকে এসে তাদের বেতন নিয়ে পড়ান কি না, অন্য বাড়িতেও এরকম পড়ানর প্রথা আছে কি না। স্বামী-স্ত্রী কেউই আমার কথার অর্থ পরিগ্রহ করতে পারলেন না। যারা কখনো আম খায়নি, আম কেমন খেতে লাগে তাদের বোঝানো অসম্ভব—এই মনে করে অন্য প্রসঙ্গ উত্থাপন করলাম।

বলা বাহুল্য ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কৌতূহল সারা দেশে অনেক গুণে বেড়ে গিয়েছে। মার্শাল টিটোর ভারত গমনের কারণে আগ্রহ অনেক বেশী হয়েছে। শিক্ষিত ভদ্রলোক অনেকেই শ্রী নেহরুর 'ডিস্‌কভারি অব্ ইণ্ডিয়া' পড়েছেন বা পড়তে ইচ্ছে আছে মুখে বলেন। রাশিয়ার সঙ্গে মূলত কি কারণে বিরোধ-বিচ্ছেদ ঘটেছিল এটা যেমন আর আর অনেকের কাছে শুনতে পেয়েছি, ডাক্তার মীরকফ্ কিন্তু কথাটা একেবারেই এড়িয়ে গেলেন। তিনি ছাত্রজীবনে কম্যুনিস্ট পার্টির মেম্বর ছিলেন। রাশিয়ার সম্বন্ধে অনেককিছু জানেন। সাধারণভাবে এই সব ভদ্রলোকেরা ধর্ম নিয়ে মাথা ঘামান না। ডাক্তার মীরকফ্ মন্তব্য করলেন ধর্ম ধর্ম ক'রেই ভারতবর্ষের লোক এত অলস হয়েছে। আমি আর কি বলি? উত্তর দিলাম ধর্মকে ঘুমপাড়ানো-মাসী বলা যায়। আরও বললাম যে কম্যুনিজমের প্রতি নিষ্ঠা হিন্দুধর্মের বা খৃষ্টধর্মের প্রতি নিষ্ঠারই মত প্রভাব বিস্তার করে। বলা বাহুল্য যারা সত্যিকারের কম্যুনিস্ট রহস্যচ্ছলেও এসব আলোচনা তাদের অপ্রিয়।

আতিথেয়তা জুগোশ্লাভ প্রজার এক বিশেষত্ব। বিদেশীর কাজে কিসে লাগব, কি করলে তার কষ্টের লাঘব হয়, দেখবার মতন জায়গাগুলিতে স্বেচ্ছায় এমন কি নিজে ভাড়া দিয়েও দেখাতে যত্নবান। আমাদের কাছে এসব নূতন ঠেকে। দেশটা গরীব, বাইরের চাকচিক্য নেই বললেই হয়, কিন্তু নরনারীর অন্তরের সরলতা যে কোন বিদেশীকে মুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত করবেই—এ বিশ্বাস আমার ক'টা দিন ওদেশে থেকে দৃঢ় হয়েছে।

সমাপ্ত

মনে হয়

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

মনে হয় বাড়ি যাই
ঠিক দুপুরের কাক ডেকে গেলে পড়ে আসে বেলা—
সময়ের ঘড়িঘরে বছর প্রহর দিন কত অবহেলা
করেছি, সে-সব থাক, আজ যেন পাই

স্মৃতির আকাশভরা নীল-রঙ, মেঘের কাজল
বাদলের ধারাসার সারাদিনভর,
বিকেলের আশ্চর্য চঞ্চল
নীড়মুখী পাখিদের বিশ্বাসের অনন্ত নির্ভর;

আমরা পুরানো তবু শ্রাবণের খর জলধারে
ধুয়ে মুছে যায় যদি সব গ্লানি ঘৃণা,
তা'হলে সমস্ত রাত এ-বৃষ্টির সেতারে সেতারে
ঝরে যাবে সব সুর যত আছে গূঢ় অন্তর্লীনা;
তারপরে চেনামুখ যদি আজো থাকে
তবে ফের ফিরে যাই ছায়াপথে তার কোন ডাকে।

অনুকল্প

পরিমলকুমার ঘোষ

হে রাত্রি ডেকোনা আর। তোমার অনেক ছায়া জানি—
পূর্বাশার সাতরঙ মুছে নিয়ে গ'ড়েছে তোমায়
যে ঈশ্বর, সে তোমাকে কী নরম, লোভন ছায়ায়
ভ'রে দিলো ভালোবেসে; কী নিটোল আলিঙ্গনে ছেয়ে
তোমার ছায়ার হাতে সমুদ্রের অতল, গভীর
প্রেমের আবেগ দিলো; বাধা ঠেলে বাঁকাপথ বেয়ে
শ্রান্ত চেতনার নদী যেন এসে ক্ষণিক যতির
অবকাশে মৃত্যুঘন সুধার আস্বাদ লাভ করে।

তবুও এমন ক'রে ডেকোনা, এ'কোনা হাতছানি
এ হৃদয়ে বার বার। বরং আমায় নাও, ধূ-ধূ
রিক্ত করো করপুট যা পেয়েছি সব নিয়ে, শুধু
আমার আকাশ কেড়ে নিওনা জটায়ু-পাখা ঢেকে।
কি নিয়ে তাহ'লে বাঁচি? কি আশার চরেতে পা রেখে?

বটকৃষ্ণ দাস

যে-মেয়ে আকাশ হ'য়ে ঝ'রে গেছে নদীর শিয়রে,
তার শীত বুকে নিয়ে পাখি
হলুদ পাতার ফাঁকে ধূসর চাঁদের পথ ধ'রে
আজ রাতে ফিরে এলো নাকি?

অথবা সে পাখি নয়; পুরাতন আমারই হৃদয়
এলো ফের সেই পাখি হ'য়ে!
যে-পাখি পালক সব ঝরিয়েছে এই বনময়
তার অতিবাহিত প্রণয়ে!

দুপাশে মলিন মাঠ। মাঝখানে নদীটির সিঁথি
দিনে দিনে বালুকা-লাঞ্ছিত;

যে-মেয়ে ফুরিয়ে গেছে, তার সেই গভীর প্রকৃতি
হ'য়েছে অনেক ব্যবহৃত।

তবুও সময় হ'লে পৃথিবীর প্রয়োজনমতো
সেই পাখি বুঝি ফিরে আসে,
যে গেলো নদীর জলে নিজেকে ঝরিয়ে অবিরত,
তার অনুরাগের আকাশে!

হয়তো সে পাখি নয়। আমারই হৃদয় এলো তার
পরিচিত গভীর ছায়াতে;
যে-আকাশ পুরাতন, তার হাতে প্রেমের খাবার
আছে নাকি এই শীত রাতে?

চিত্রগ্রীব

॥ ১ ॥
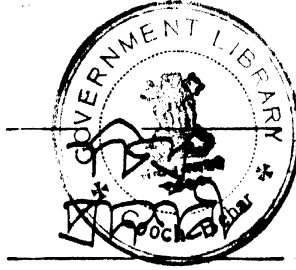
১ **নম্বর** চৌরঙ্গী টেরাসে 'আর্টিস্টস সার্কল' কর্তৃক একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল কয়েকদিন আগে। এটি ছিল এ'দের দ্বিতীয় বার্ষিক প্রদর্শনী। নয়জন শিল্পীর সব সমেত ৫৭টি ছবি এবং ৪টি ভাস্কর্য এ'রা প্রদর্শন করেছিলেন। দু' একজন ছাড়া এ'রা প্রত্যেকেই গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্টস অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্টস্-এর ছাত্র। কিন্তু 'অ্যাকাডেমীয়' রচনা পদ্ধতি এ'দের মনকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি, তাই কলেজের শিক্ষা থেকে তফাতে সরে গিয়ে এ'রা পরীক্ষানিরীক্ষা চালাচ্ছেন। গতানুগতিকতার সীমা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার যে আগ্রহ এ'দের মধ্যে লক্ষ্য করলাম তা সত্যিই প্রশংসনীয়। আঁচড়ে এবং রঙ বিন্যাসে 'অপেশাদারী' ছাপ এ'রা সকলেই কাটিয়ে উঠেছেন।

বোঝা যায়, ভ্যানগগ, রেনোয়া, সেজান পিসারো প্রভৃতির ছবিই এ'দের অনুপ্রেরণার উৎস। এই সব ফরাসী শিল্পীদের এক সময় 'বিদ্রোহী' বলা হ'ত বটে কিন্তু এখন এ'দেরও 'ট্র্যাডিশনাল' বা কখনও কখনও 'ওল্ড মাস্টার্স' বলা হয়ে থাকে। এ'দের ইম্প্রেশনিস্ট আন্দোলন আজ থেকে প্রায় আশী বছর আগে শুরু হয়েছিল। সুতরাং এই সব শিল্পীদের শিল্পধারায় প্রভাবান্বিত ছবিকে অভিনব কি করে বলি! আরেকটা কথা, অ্যাকাডেমীয় সীমা অতিক্রম করতে হলে সব সময় প্যারিসীয় চিত্রধারাকেই অনুগমন করতে হবে,—এর স্বপক্ষেই বা যুক্তি কি? অবশ্য একথা অস্বীকার করি না যে, গত একশত বছরের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রে যা কিছু পরিবর্তন এসেছে তার জন্য ফরাসী শিল্পীরাই ষোল আনা দায়ী। কিন্তু এই পরিবর্তন যে-সব শিল্পীর দ্বারা সম্ভব হয়েছিল তাঁরা কখনও কাউকে অনুসরণ করবার চেষ্টা করেন নি। এ'রা প্রত্যেকেই সম্পূর্ণ নিজস্ব চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ ধরা যাক পল গগাঁকে। মার্টিনিক-এ এবং তাহেটিতে থাকাকালে গগাঁ যেসব 'দক্ষিণ সাগরীয়' ছবি এঁকেছিলেন তা থেকে ইউরোপীয় সভ্যতার কোন গন্ধ পাওয়া যায় না বটে কিন্তু ছবিগুলি পলিনেশীয় শিল্পকলা থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁর ছবিতে যে ধরনের অলংকরণ এবং দেহের গঠন সরলকরণ বা বিকৃতিকরণ দেখা যায় তার সঙ্গে তাহেটিবাসীদের শিল্পকলার কোনও মিল পাওয়া যায় না। গগাঁর লেখা জারনালস্-এ অথবা তাঁর রচিত পুস্তক 'নোয়া নোয়া'তে কোথাও পলিনেশীয় চারুশিল্পের উল্লেখ নেই। এ থেকেও বোঝা যায় মার্টিনিক-এর বা তাহেটির শিল্পকলা থেকে তিনি কোন অনুপ্রেরণা পান নি। বিদেশীয় আবহাওয়ায় রচনা হওয়া সত্ত্বেও গগাঁর ছবি মূলত ফরাসী শিল্পই রয়ে গেছে। আর্টিস্ট সার্কলের শিল্পীদের সব চেয়ে বড় দোষ হ'ল—এ'দের ছবির বস্তুচরিত্র ভারতীয় হলেও ছবিগুলি দেখলে মনে হয় বিদেশীয়। আজকাল অনেকেই এই মত পোষণ করেন যে, শিল্পক্ষেত্রে স্বদেশী এবং বিদেশী বলে কোন ভেদাভেদ নেই। ব্যক্তিগতভাবে, আমি এই যুক্তিকে সমর্থন করতে পারি না। সার্থক শিল্পসৃষ্টি হয় তখনই যখন শিল্পী স্বকীয় চিন্তাধারাকে চিত্রে বা ভাস্কর্যে রূপান্তরিত করতে পারেন এবং এই চিন্তাধারায়, যে কোন কারণেই হোক, স্বদেশীয় প্রভাব থাকে, একথা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। অনুকরণ যদি না হয়, একটি চীনা ছবি তা যতই 'আধুনিক' হোক না কেন, চীনদেশীয় চিত্রকলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করবেই।

'দু'টি পাতা একটি কুঁড়ি'
রঘুনাথ সিংহ

আর্টিস্টস সার্কেলের তরুণ শিল্পীবৃন্দ যে সাহস এবং শক্তির পরিচয় দিয়েছেন তা সত্যিই আমাদের মনে আশার সঞ্চার করেছে। এ'রা যদি এ'দের দৃষ্টিভঙ্গীকে ফ্রান্স থেকে সরিয়ে আনতে পারেন তা' হলে ভবিষ্যতে সত্যিকার সার্থক শিল্পসৃষ্টি করতে পারবেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এ'দের ওপর কোন কোন ফরাসী শিল্পীর প্রভাব পড়েছে সেকথা চিন্তা না করে ছবি দেখলে বেশ স্ফূর্তি পাওয়া যায়। এই দলের মধ্যে সব চেয়ে শক্তিশালী শিল্পী মনে হ'ল অরুণ বসু এবং সনৎ করকে। অরুণ বসুর 'সী', 'ইভনিঙ কামস', 'কাম অ্যাণ্ড কোয়ায়েট', 'ব্রাউন স্টাডী' প্রভৃতি ছবি দেখে, তিনি যে ছাত্র একথা আদৌ মনে থাকে না। সনৎ করের 'ফ্যাণ্টাসী', 'ল্যাণ্ডস্কেপ,' 'ইণ্ডোর অ্যাফেয়ার্স' প্রভৃতি ছবি চিত্তাকর্ষণ করে। ভ্যান গগকে এমনভাবে আয়ত্তের মধ্যে আনা কম বাহাদুরীর কথা নয়। নিত্যানন্দ সাহার 'সী বীচ অ্যাট নুন' ছবিটির সঙ্গে গগের 'ফিসিঙ বোটস অন দি বীচ অ্যাট সেণ্ট-ম্যারিজ' ছবির খুব সাদৃশ্য আছে। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য ছবি হ'ল সুকান্ত বসুর 'গার্ল ইন ব্লু', অজিত বক্সীর 'উওম্যানস ক্যানটীন', জ্ঞানেন্দ্র রায়ের 'চিন্নাম্বরী স্ট্রীট', সুকুমার দত্তের 'আইড্‌ল টাইম' এবং নীরা সেনের 'অ্যাট স্পেয়ার মোমেণ্টস'। আধুনিক পাশ্চাত্য ভাস্কর্য যাঁদের দেখা অভ্যাস আছে তাঁদের কাছে রঘুনাথ সিংহ কৃত

মূর্তিগুলি নতুন লাগে না। তবুও সিমেণ্টে গড়া 'টু লিভ্স্ অ্যাণ্ড এ বাড্' এবং টেরাকোটা 'ডাইওলিনিস্ট' চিত্তাকর্ষণ করে।

॥ ২ ॥

কলকাতা টেলিফোন কর্মচারীদের উদ্যোগে ওয়েলেসলি স্ট্রীটের ২৪ নম্বর টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ভবনে ডাক ও তার বিভাগের একটি চারু ও কারুশিল্পের প্রদর্শনী হয়ে গেল। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন শ্রীরমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এবং প্রধান অতিথি হন শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার গঙ্গোপাধ্যায়। ডাক ও তার বিভাগের শ্রমিকদের কাজ হ'ল চিঠির ওপর শীল মারা, টেলিগ্রাফের তার খাটানো, চলন্ত রেলগাড়িতে বসে বসে চিঠি বাছাই করা, টেলিফোন ও টেলিগ্রাফ অফিসের নানান রকম যন্ত্রপাতি বসানো বা মেরামত করা, টেলিফোন গ্রাহকদের 'নাম্বার প্লীজ' বলে সম্বোধন করা ইত্যাদি। সুতরাং প্রধানত এ'রা 'কারিকর', সুকুমার শিল্পী নন। এ'দের মধ্যে কেউ কেউ একঘেয়ে যান্ত্রিক কাজের ফাঁকে ফাঁকে সুকুমার শিল্পও চর্চা করে থাকেন। সেই সব শিল্পকর্ম সাজিয়ে এই প্রদর্শনী করা হয়েছিল। পেইণ্টিং, ফটোগ্রাফ, এমব্রয়ডারী, কাঠখোদাই, কার্ডবোর্ডের বাড়ি, চামড়ার কাজ, উলের বোনা, সেলাইয়ের কাজ প্রভৃতি নানাবিধ জিনিস সাজানো হয়েছিল।

খোলাখুলিভাবেই বলি, খুব উঁচু দরের আর্ট সেখানে দেখতে পাব এ আশা করে যাইনি। কিন্তু দেখলাম এ'দের মধ্যেও কয়েক জন যথেষ্ট শক্তির অধিকারী। দু' একটি ছবি রীতিমত পাকা আঁকিয়ের কাজ বলে মনে হয়। অতি দাশের পেন্সিলে আঁকা পণ্ডিত নেহরুর প্রতিকৃতি (৮৯) এবং সন্তোষ রায়ের সিমেণ্টে গড়া মূর্তি 'স্মোকার' (১১০) যে কোন শিল্প প্রদর্শনীতে স্থান পাবার যোগ্য। এ ছাড়া উল্লেখযোগ্য চারুশিল্পী হলেন শ্রীমতী বাসন্তী রায়, শ্রীমতী সবিতা দাশ, কাশীনাথ ঘোষ, গোপীনাথ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীমতী সন্ধ্যা দাশগুপ্তা, অবনী ঘোষ, সন্তোষ রায়, প্রেমতোষ রায় এবং ননীগোপাল সাহা। শ্রীমতী রেবা চৌধুরী এমব্রয়ডারীর কাজে কয়েকটি নিপুণ নমুনা দেখিয়েছেন। ফটোগ্রাফের মধ্যে বিজয় লাহার 'মেঘের খেলা' (২২৪) এবং কনক ঘোষের 'শিভালরী' (১০৬) বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পরিশেষে এই সফল প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানাই।

দিল্লী

চিত্রপ্রিয়

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে দুইটি চিত্র ও একটি ভাস্কর্য প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে। প্রথমটি শ্রীবীরেন দে'র ব্যক্তিগত প্রদর্শনী—ইহা নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতিতে অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয়টি বালক শিল্পী শ্রীরঞ্জন সেনের ব্যক্তিগত প্রদর্শনী, ইহাও ঐ একই স্থানে অনুষ্ঠিত হয় এবং তৃতীয়টি শ্রীধনরাজ ভগতের ভাস্কর্য প্রদর্শনী, দিল্লী শিল্পী-চক্রের উদ্যোগে ইহা ফ্রী ম্যানসন হলে অনুষ্ঠিত হয়।

বীরেন দে স্থানীয় পরিচিত শিল্পী। ইতিপূর্বে তিনি দুইটি প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছেন, সেই হিসাবে এইটি তাঁহার তৃতীয় প্রদর্শনী। কোনো শিল্পী যখন প্রায় প্রতি বৎসরই জনসাধারণকে তাঁহার রচনাবলী দেখিবার সুযোগ দেন, তখন সাধারণ লোক বা সমালোচক দুইটি জিনিস বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন—প্রথমত, তাঁহার নূতন কার্যের নমুনা এবং দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিগত শিল্পী হিসাবে তিনি কতদূর অগ্রসর হইয়াছেন।

নববসন্ত (ভাস্কর্য)
ধনরাজ ভগত

বীরেন দে তৈল মাধ্যমে কাজ করেন ও বর্তমান প্রদর্শনীতে তিনি সর্বসমেত ৩০ খানি চিত্র পেশ করেন। বীরেন দে প্রধানত, প্রতিকৃতিশিল্পী হিসাবেই পরিচিত, তবে এই প্রদর্শনীতে ৬ খানি প্রতিকৃতি ব্যতীত ২২ খানি রচনা ও সেই সঙ্গে বিভিন্ন ভঙ্গীতে শায়িতা দুইখানি ন্যুড স্টাডিও চোখে পড়ে। যাঁহারা এই শিল্পীর অঙ্কনরীতির সহিত পরিচিত তাঁহারা এবারকার চিত্রগুলির বিষয়বস্তুর নূতনত্ব সর্বপ্রথমেই লক্ষ্য করিবেন। কোনও সংসারত্যাগী অর্ধনগ্ন সন্ন্যাসী মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া আছেন, কোথাও বা এহেন কয়েকজন সাধু বাহ্য জগতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া গঙ্গার পবিত্র সলিলে আবক্ষ মগ্ন থাকিয়া মন্ত্রপাঠ করিতেছেন। আবার কোথাও বা ইঁহাদেরই দুই চারিজন ভিক্ষার কমণ্ডলু সম্মুখে রাখিয়া প্রসন্ন বদনে পরম শান্তিতে বসিয়া আছেন—শহরের কল-কোলাহলের বাহিরে আত্মীয়স্বজন বিহীন অর্ধনগ্ন সাধু-সন্ন্যাসীদিগের বিচিত্র জীবনযাত্রা যেন এই শিল্পীর হৃদয় স্পর্শ করিয়াছে এবং তাঁহাদের জীবনের বিভিন্ন অধ্যায়গুলিকেই তিনি নানাভাবে রূপায়িত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কেবল বিষয়-বস্তুর দিক দিয়াই নহে, অঙ্কনরীতির মধ্য দিয়াও পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্যামিতিক রেখা ও বিভিন্ন বর্ণ-সংযোগে কোনও বিষয়বস্তুর সমগ্র রূপ প্রকাশ করাই ছিল এই শিল্পীর বিশেষত্ব। কিন্তু বর্তমান রচনাগুলি তিনি অন্য পদ্ধতিতে অঙ্কিত করিয়াছেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু রেখার পরিবর্তে তিনি অতি অল্প ও দীর্ঘাকার রেখা ব্যবহার করিয়া সমস্ত রচনাগুলিই একটি বিশেষ আকারের মধ্য দিয়া বাখ্যা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তদুপরি বিভিন্ন অংশে সহজ ও ব্যাপক বর্ণ আলিম্পনের ফলে অধিকাংশ চিত্রের

মধ্য দিয়াই একটি সরল ও স্বাভাবিক আবেদন ফুটিয়া উঠে। বিশেষ করিয়া "হরিদ্বারের সাধু", "লছমনঝোলার সাধু" ও "তান্ত্রিক" সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সরল অঙ্কনপ্রণালী, সুনির্বাচিত বর্ণপ্রলেপ ও সুচতুর প্রকাশভঙ্গিমার জন্য ইহাদের প্রত্যেকটির মধ্য দিয়াই সাধু-জীবনের একটি বিশিষ্ট রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ইহার পরেই "সন্ধ্যা" চিত্রখানি চোখে পড়ে। অতি সংক্ষিপ্ত অথচ বলিষ্ঠ কয়েকটি মাত্র রেখা, সুনির্বাচিত ও লঘু বর্ণ ব্যবহার। পূর্বেই বলিয়াছি বীরেন দে কৃতি প্রতিকৃতি শিল্পী। অঙ্কন পারিপাট্য ও বর্ণ ব্যবহার করিবার বিশিষ্ট রীতির জন্য প্রতিকৃতিগুলি চোখে পড়ে। সকলেই জানেন যে, শিল্পী যাঁহার প্রতিকৃতি রচনা করেন, তাঁহার মুখের সহিত মাত্র যথাযথ সাদৃশ্য থাকিলেই যথার্থ প্রতিকৃতি হয় না। মুখের সাদৃশ্যের সঙ্গে সঙ্গে ব্যক্তিগত চরিত্রের বিশিষ্ট রূপটুকু ফুটিয়া উঠিলেই প্রতিকৃতি রচনা সার্থক ও সুন্দর হইয়া উঠে। এবং এইজন্যই এই শিল্পী রচিত প্রতিকৃতিগুলি সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করিয়া "যুবক", "মিঃ জর্জ ফার্কুহারসন" ও "লাল শাল" সত্যই কৃতিত্বের পরিচায়ক। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ও সুনিপুণ অঙ্কন চাতুর্যের জন্য বিবস্ত্রা আদিবাসী রমণীর দুইখানি স্টাডি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

* * *

বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে শ্রীউষানাথ সেন শ্রীরঞ্জন সেনের ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। রঞ্জনের বয়সমাত্র ১৩ বৎসর। শৈশবকাল হইতেই এই বালকের অঙ্কন প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় এবং আন্তর্জাতিক শিশুচিত্র প্রদর্শনীর অন্যান্য কয়েকটি প্রদর্শনী হইতে সে বহু পুরস্কার লাভ করে। বালক শিল্পীর ব্যক্তিগত প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান দিল্লী শহরে তথা আমাদের দেশে বোধহয় সর্বপ্রথম, সুতরাং সেইদিক দিয়া দেখিতে গেলে ইহার নূতনত্ব আছে। শুধু তাহাই নহে, বিভিন্ন দূতাবাস হইতে আরম্ভ করিয়া স্থানীয় বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এই প্রদর্শনী দেখিতে আসেন।

তিন বৎসর হইতে আরম্ভ করিয়া আজ পর্যন্ত এই বালক যত চিত্র রচনা করিয়াছে, তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত ১৪৫ খানি চিত্র এই প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। বিভিন্ন বস্তু ও জন্তুর স্কেচ হইতে আরম্ভ করিয়া প্রতিকৃতি ও কয়েকটি স্টীল লাইফের নমুনা পর্যন্ত এই প্রদর্শনীতে দেখা যায় এবং কয়েকটি রচনার মধ্য দিয়া অঙ্কনপটুতা ও চিন্তাশীল মনেরও যে পরিচয় পাওয়া যায় না তাহা নহে। তবে দুঃখের বিষয়, অধিকাংশ রচনাতেই যেন অলক্ষ্যে তাহার পিতা শিল্পী অবনী সেনের অঙ্কন রীতির প্রভাব আসিয়া পড়িয়াছে। প্রদর্শনীর মধ্যে প্রতিকৃতি রচনাগুলিই সর্বাগ্রে চোখে পড়ে। কালীরেখা মাধ্যমে যে কয়টি প্রতিকৃতির নমুনা ছিল তাহার মধ্যে উষানাথ সেন, যোগেশ্বর দয়াল ও ম্যাডাম ভ্যালভেন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ প্রত্যেকটির মধ্য দিয়া কেবলমাত্র মুখ-সাদৃশ্যই নহে এমনকি ব্যক্তিগত চারিত্রিক রূপটুকুও সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার পরেই কয়েকটি স্টীল লাইফ চোখে পড়ে। দৃষ্টিভঙ্গী ও অঙ্কনরীতির দিক দিয়া ইহাদের মধ্যে দুই একটিকে যে কোনো প্রতিষ্ঠাবানশিল্পীর কার্যের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। স্কেচের মধ্যে "টাঙ্গা", "মুরগী" ও "সেলাই" উল্লেখযোগ্য। এই বালক শিল্পী যে প্রতিভাবান সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই এবং সে যে কৃতী শিল্পীপিতার নিকট হইতে শিক্ষা বা প্রেরণা লাভ করিবে তাহাও স্বাভাবিক। তথাপি অঙ্কনরীতির দিক দিয়া তাহার নিজস্ব পথের সন্ধান করিয়া লইবার চেষ্টা করা উচিত, কারণ একথা সত্য যে বাল্যাবস্থায় রচিত বলিয়াই তাহার চিত্রগুলি আজ সকলের চোখে পড়িতেছে, কিন্তু নিজস্ব ধারার সন্ধান যদি সে না পাইবার চেষ্টা করে, তাহা হইলে পরিণত বয়সে এহেন চিত্রাদির বোধ হয় বিশেষ কোনও মূল্যে থাকিবে না। সুতরাং এখন হইতেই সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে অগ্রসর হওয়াই তাহার একমাত্র কর্তব্য। বাস্তবিক-পক্ষে প্রতিকৃতি রচনার মধ্য দিয়াই তাহার প্রতিভার সমধিক বিকাশ হইয়াছে এবং আমার বিশ্বাস এখন হইতেই যদি এই বালক শিল্পী কেবলমাত্র প্রতিকৃতি অঙ্কনে মনোনিবেশ করে, তাহা হইলে তাহার ভবিষ্যত যে সমুজ্জ্বল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। বলা বাহুল্য, এই শিল্পীকে উৎসহ দিবার জন্য নিখিল ভারত শিল্প ও চারু-কলা সমিতি বিনামূল্যে একটি গ্যালারী ব্যবহার করিবার অনুমতি দিয়াছিলেন।

স্টীল লাইফ (জল রং) রঞ্জন সেন

* * *

ধনরাজ ভগত সর্বসমেত ভাস্কর্যের ২৮টি নমুনা ও কয়েকটি স্কেচ পেশ করেন। ইহাদের মধ্যে তিনটি ব্যতীত সব কয়েকটিই নূতন রচনা। এইটি তাঁহার তৃতীয় ব্যক্তিগত প্রদর্শনী।

ধনরাজের প্রদর্শনীটি দেখিলেই দুইটি

হরিদ্বারের সাধু

শিল্পী বীরেন দে

স্বাভাবিক আকার বা সামঞ্জস্যের সহি পরিচয় না থাকিলেও তাঁহার অধিকা মূর্তিরচনার মধ্য দিয়া একটি সুন আয়তনিক (dimensional) আবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। তবে চিন্তাধারা মৌলি হইলেও ধনরাজের প্রত্যেকটি রচ দেখিলেই স্পষ্ট বুঝা যায় যে, গঠ কৌশল ও প্রকাশভঙ্গিমার জন্য তি বিদেশ হইতে প্রেরণা লাভ করিয়াছেন।

প্রধানত চারিটি বিভিন্ন বিষয়ব হইতে ধনরাজ রসের সন্ধান পাইয়াছেন- যথা, "সংগীতজ্ঞ", "জীবনবৃক্ষ", "মজু ও "মাতা ও শিশু"। সর্বপ্রথমেই মাতা ও শিশুর দুইটি নমুনা চোখে পড়ে প্রথমটি দীর্ঘ—মাতা শিশুটিকে ব চাপিয়া ধরিয়া পরম স্নেহে তাহার মু চুম্বন করিতেছেন। একটি তামার পাতে পিটাইয়া দীর্ঘ সাবলীল রেখাছন্দের ম দিয়া শিল্পী এই ভাবটুকু অপরূ কৌশলে প্রকাশ করিয়াছেন। দ্বিতীয় খুবই ছোট—মাতা আনন্দে আত্মহারা হই এক অপরূপ ভঙ্গীতে শিশুটিকে মাথা উপরে তুলিয়া ধরিয়া আদর করিতেছেন নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও প্রকাশ-কৌশলে জন্য এই ক্ষুদ্র টেরাকোটা মূর্তিটি বিশে ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানববংশে ক্রমবর্ধমান ধারাবাহিক রূপটি শিল্পী বৃক্ষের প্রতীকের মধ্য দিয়া প্রকাশ করিয়া ছেন। একটি সাধারণ বৃক্ষ যেরূপ কয়ে বৎসর পরে শাখা-প্রশাখা ও পত্রপুষ্পে সজ্জিত হইয়া বিরাট মহীরূহে পরিণ হয়, নরনারীর মিলনের পর হইতেই সেই- রূপ পুত্রকন্যা সহ এক একটি বংশ কিরূপে বিস্তৃত হইয়া পড়ে শিল্পী এই মুখ্য ভাবধারাটিকেই বিভিন্ন প্রতীকমূলব গঠনকার্যের ভিতর দিয়া ফুটাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। সুগভীর চিন্তাধারা ও আয়তনিক গঠনকৌশলের জন্য ইঁহার কয়েকটি নমুনা বিশেষভাবে চোখে পড়ে। তবে দুঃখের বিষয় সিমেণ্ট কংক্রীটকৃত বিরাট মূর্তি-রচনাটির মধ্যে আয়তনগত বৈষম্য লক্ষিত হয়—বিশেষ করিয়া নিম্ন- ভাগটুকু অসমতা দোষে দুষ্ট।

অন্যান্য রচনার মধ্যে "বোঝা" "অত্যাচার" চিন্তাধারার বিরাটত্ব ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গিমার জন্য উল্লেখযোগ্য।

জিনিস চোখে পড়ে। প্রথমত, তাঁহার মাধ্যম-বিভিন্নতা। গতবারের ন্যায় কেবল- মাত্র সিমেণ্ট কংক্রীট বা কাষ্ঠফলক লইয়াই তিনি গঠনকার্য করেন নাই, উপরন্তু তামার পাত, টেরাকোটা ও কাগজের মণ্ড (papier mache) প্রভৃতি মাধ্যমের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়া- ছেন। দ্বিতীয়ত, তাঁহার চিন্তাধারা ও বিষয়বস্তু। একই বিষয়বস্তু লইয়া তিনি গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছেন এবং সেই বিষয়বস্তুটিকেই তিনি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ও কল্পনাধারার সাহায্যে নূতন করিয়া রূপায়িত করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে ভাস্কর্যরীতি সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলিলে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। চিত্রশিল্পী বিভিন্ন বর্ণ বা রেখার মধ্য দিয়া যে কথাটি ব্যক্ত করিতে চাহেন ভাস্কর সেই কথাটিই প্রকাশ করেন, তাঁহার নিজস্ব মাধ্যমের ভিতর দিয়া। কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই প্রকাশ ভঙ্গিমা হয় সম্পূর্ণ ভিন্ন। কোনো শিল্পী হয়ত প্রাচীন ও প্রথাগত রীতির পক্ষপাতী এবং সেই রীতি অনুযায়ী রচনা করিয়া তিনি তাঁহারই মধ্যে আপন বৈশিষ্ট্যটুকুই বজায় রাখিবার চেষ্টা করেন।

অপরপক্ষে, অন্য কোনো শিল্পী আধুনিক ধারায় প্রভাবান্বিত হইয়া সম্পূর্ণ নূতন ভাষার মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করেন। ভাস্করের সম্বন্ধেও এই কথা খাটে। একটি মজুর দিনের পর দিন একই স্থানে বসিয়া পাথর ভাঙিতেছে, একটি অন্ধ ভিখারী তাহার পত্নীর সহিত প্রতিদিন পথের ধারে ভিক্ষা করিতেছে অথবা কুয়াশাচ্ছন্ন শীতের সন্ধ্যায় কোনও এক বৃদ্ধা রমণী নামাবলী জড়াইয়া গৃহের একপ্রান্তে আপনার মনে ভগবানের নাম জপ করিতে- ছেন—এই বিভিন্ন বিষয়বস্তুগুলি যখন ভাস্কর্য মাধ্যমে প্রকাশিত হয় আমরা তাহা তৎক্ষণাৎ বুঝিতে পারি, কারণ এগুলি বস্তুজগতধর্মী। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনের নানা অধ্যায় অথবা বর্তমান জীবনের নানা জটিল সমস্যাগুলির বিষয়ে যদি কেহ গভীরভাবে চিন্তা করেন ও সেই চিন্তা- ধারাকে ভাস্কর্য মাধ্যমে প্রকাশিত করিতে চাহেন, তাহা হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সেগুলি যেন একটু দুর্বোধ্য হইয়া পড়ে। কারণ সেগুলি অনুভূতিসাপেক্ষ। এহেন মূর্তিরচনা সেইজন্য প্রায়ই নানা প্রতীকের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠে। ধনরাজের ভাস্কর্যও এই শ্রেণীর। তাঁহার অধিকাংশ সৃষ্টির মধ্য দিয়াই এক চিন্তাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিষয়টিই তিনি গভীরভাবে অনুভব করিয়াছেন ও সেই অনুভূতিকেই প্রতীকের মধ্য দিয়া গড়িয়া তুলিয়াছেন। তাই বাহ্যিক ও

বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ (I. Mus) এবং বি-এ (B. Mus)এর সংগীত শিক্ষাসূচী

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় I. Mus এবং B. Musএর সিলেবাস প্রকাশিত করেছেন এবং তার এক কপি আমাদের হস্তগত হয়েছে। এই শিক্ষা পরিকল্পনায় বাংলার সংগীত সম্বন্ধে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করেছিলাম গত ৮ই আশ্বিনের সংখ্যায়। সুতরাং তার আর পুনরাবৃত্তি করতে চাইনে। তবে B. Musএর সিলেবাসটি দেখে এই কথাই আমাদের মনে হয়েছে যে ঠিক এইভাবে সুরকার নির্বিশেষে একটা মিশ্রিত ব্যাপার না করে যুগ হিসাবে শিক্ষার্থীদের বাংলা গানের একটা পরিচয় দিতে চাইলেই ভাল হত। যুগ হিসাবে সিলেবাস রচনার সুবিধা এই যে মোটামুটিভাবে সব সুরকারই তাতে এসে পড়বেন অথচ অনাবশ্যক প্রাধান্য বা অনাবশ্যক বর্জনেরও কোন হেতু থাকবে না। এইভাবে বিচার করলে কীর্তন, লোকসংগীত- এ-সবই সমানভাবে শিক্ষা-সূচীতে স্থান পেত এবং শিক্ষার্থীদের একটা সর্বাঙ্গীণ ধারণা হত। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে গানের পুঁজি বাড়ানো নয় সংগীতের ক্রমপরিণতি সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করবার সুবিধা প্রদান করা। আমাদের মনে হয় সংগীতের বর্তমান অবস্থায় এই শিক্ষাপদ্ধতিই ছিল সামগ্রিক শিক্ষা হিসাবে শ্রেষ্ঠ।

I. Musএর কণ্ঠসংগীত বিষয় সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বলবার নেই কেননা এই পাঠ্যতালিকা সাধারণভাবে করা হয়েছে। মোটামুটিভাবে শিক্ষার্থীরা এই সিলেবাস অনুসরণ করলে উপকৃত হবেন। তবে বাংলা গান সম্বন্ধে হয়তো খুব ভাল ধারণা হবে না।

I Musএর বিষয় হচ্ছে—

(ক) সংগীতের ইতিহাস—রাগ, স্বর, তাল প্রভৃতির তত্ত্বনিরূপণ। বাদ্যযন্ত্রাদি সম্বন্ধীয় পরিচয়, স্বরলিপি ও স্বর-সাধনা। মাতৃভাষা ও অপর একটি ভাষা। (সর্বসমেত পাঁচটি পত্রে মোট ৪০০ নম্বর)

(খ) নিম্নলিখিত পাঁচটি বিষয়ের যে কোন তিনটি ঃ—ক্লাসিকাল, কীর্তন, রবীন্দ্র-সংগীত, রবীন্দ্রসংগীত ভিন্ন অপর কাব্যসংগীত, বাংলার লোকসংগীত।

শাঙ্গর্দেব

(সর্বসমেত তিনটি পত্রে মোট ৬০০ নম্বর)

B. Mus (Pass)এর বিষয় হচ্ছে—

(ক) উত্তর ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস, পাশ্চাত্যসংগীত ও স্বরলিপি সম্বন্ধে পরিচয়, মাতৃভাষা ও অপর একটি ভাষা (সর্বসমেত ছয়টি পত্রে মোট ৪০০ নম্বর)

(খ) নিম্নলিখিত বিষয়ের যে কোন দুটি ঃ—ক্লাসিক্যাল, কীর্তন, রবীন্দ্রসংগীত, রবীন্দ্রসংগীত ভিন্ন অপর কাব্যসংগীত, বাংলার লোকসংগীত। (সর্বসমেত দুটি পত্রে ৬০০ নম্বর)

"অনার্স"-এর শিক্ষার্থীদের (ক) অবশ্য পাঠ্য। (খ) থেকে তাঁদের একটি বিষয় নিতে হবে "পাস্"-এর পাঠ্যরূপে এবং (খ)র অন্তর্ভুক্ত বিষয়গুলি থেকেই এতদ্‌অতিরিক্ত আর একটি বিষয় নিতে হবে "অনার্স"এর পাঠ্যস্বরূপে। "পাস্" এবং "অনার্স"এর বিষয় কিন্তু সমান হতে পারবে না।

"পাস্ কোর্স"এ রবীন্দ্র সংগীত ভিন্ন বাংলা গানের শিক্ষা তালিকা হচ্ছে ঃ—

প্রথম পত্র—Theoritical বা তত্ত্ববিষয়ক —১৫০ নম্বর

(ক) Development of Bengali Songs বা বাংলা গানের বিবর্তন—৭৫ নম্বর

(খ) Basis of Composition বা রচনা সম্বন্ধীয় তথ্য—৭৫ নম্বর
(১) কাব্য (২) সুর, তাল প্রভৃতির বিশেষত্ব এবং বিভিন্ন যুগ অনুসারে সংগীতের ক্রম পরিণতি।

দ্বিতীয় পত্র—Practical বা প্রয়োগ সম্বন্ধীয় —১৫০ নম্বর

(ক) কবি এবং সুরকার—রামপ্রসাদ—৪, কমলাকান্ত—২, দাশরথী রায়—২, নিধুবাবু—২, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—৪, রজনীকান্ত সেন—২, অতুলপ্রসাদ সেন —৮, নজরুল—৪, যাত্রার গান—৬ (মোট সংগীত সংখ্যা—৩৪)

(খ) কবি—অজয় ভট্টাচার্য—৫, শৈলেন রায়—৬, প্রণব রায়—৪, সুবোধ পুরকায়স্থ —৪, অনিল ভট্টাচার্য—৫, হীরেন বসু—৩, গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার—৫, শ্যামলাল গুপ্ত—৩ (মোট—৩৫)

(গ) সুরকার—দিলীপ রায়—৪, হিমাংশু দত্ত—৮, শৈলেশ দত্তগুপ্ত—৮, অনুপম ঘটক—৮, ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়—৬, শচীন দেববর্মণ—৪, সলিল চৌধুরী—৪ (মোট সংগীত সংখ্যা—৪২)

উক্ত বিষয়ে "অনার্স কোর্স"এর তালিকা ঃ—

প্রথম পত্র—পূর্বের (ক) এর অনুরূপ—১০০

দ্বিতীয় পত্র—পূর্বের (খ)এর অনুরূপ—১০০

তৃতীয় পত্র—প্রয়োগ এবং তত্ত্ব—রামপ্রসাদ, দাশরথী রায়, নিধুবাবু, যাত্রার গান—১০০

চতুর্থ পত্র—প্রয়োগ এবং তত্ত্ব—জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং দ্বিজেন্দ্রলাল রায়—১০০

পঞ্চম পত্র—প্রয়োগ এবং তত্ত্ব—অতুলপ্রসাদ, নজরুল, দিলীপ রায়—১০০

ষষ্ঠপত্র—আধুনিক বাংলা গান তত্ত্ব (অর্থাৎ গতি, গঠন, বিশেষত্ব, সুর, তাল)—৫০

প্রয়োগ—৫০

এতে উপরোক্ত পাস্ কোর্সের দ্বিতীয় পত্রের (ক), (খ), (গ) এর অন্তর্ভুক্তগণ ভিন্ন আরো আছেন—কমল দাশগুপ্ত, অনিল বাগচী, রাইচাঁদ বড়াল, পঙ্কজ মল্লিক, সুধীরলাল চক্রবর্তী, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, দুর্গা সেন, রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, তুলসী লাহিড়ী, সুবল দাশগুপ্ত, সমরেশ চৌধুরী, জ্ঞান গোস্বামী।

প্রথমত Practical বা প্রয়োগ-এর পরীক্ষায় কবিদের নাম নির্দিষ্ট করার কোন তাৎপর্য বোঝা গেল না। দ্বিতীয়ত, তথাকথিত আধুনিক সংগীতের রচয়িতা এবং সুরকারগণের অধিকাংশকে সিলেবাসের অন্তর্ভুক্ত না করলেই ভাল হ'ত কেননা তাঁদের রচনা বা সুর সংযোগ উচ্চশিক্ষার বিষয়ীভূত হবার মত পরিণতি লাভ করেনি। এ যুগের সংগীত রচয়িতাদের মধ্যে নজরুল, দিলীপকুমার এবং বড় জোর হিমাংশুকুমারকে নেওয়া যায়,—এর বেশি সংখ্যা না বাড়ানই উচিত ছিল।

"অনার্স"এর তৃতীয় পত্রে দেখছি নিধুবাবুর সঙ্গে দাশরথী এবং রামপ্রসাদ রয়েছেন। দাশরথীর উচ্চাঙ্গ সংগীত খুব বেশি নেই, তিনি প্রধানত পাঁচালীকার এবং লঘুস্তরের ছড়া রচয়িতা। এ সত্ত্বেও তাঁর রচনা যদি স্থান পায় তবে শ্রীধর কথক এবং কালী মির্জার রচনা সিলেবাসে স্থান পেল না কেন? বাংলা টপ্পায় নিধুবাবুর পরেই শ্রীধরের স্থান এবং তার পরেই কালী মির্জা। এঁদের উল্লেখ না থাকায় বোঝা গেল এযুগ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় বিশেষ চিন্তা করে সিলেবাস নির্ণয় করেননি।

"অনার্স"এর চতুর্থ পত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালকে জুড়ে দেবার তাৎপর্যও বুঝতে পারা গেল না। দুজনেই নাট্যকার বা ইউরোপীয় সংগীতের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন বলেই কি এই বন্দোবস্ত? এই পত্রে দুজনকার সম্বন্ধে ভিন্নভাবে প্রশ্ন রচিত হবে এইটাই আমাদের ধারণা। জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে নিয়ে সিলেবাস কমিটির কিছু বিব্রত হতে হয়েছে বলে মনে হয়, তবে বাংলা গানকে সমগ্রভাবে নিয়ে যুগ হিসাবে সিলেবাস রচনা করলে এই সমস্যার সমাধান হত সহজে এবং সুন্দরভাবে।

"অনার্স"এর ক্লাসিকাল পত্রে ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা এবং ঠুংরী সম্পর্কে "origin, name and history"র একটা ব্যাপার আছে দেখা গেল। সংগীতালোচনার এই অবস্থায় এসব বিষয় দেবার একটা বিপদ আছে, কেননা ইতিহাসের দিক থেকে এই গীতরূপগুলির উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণসূত্র পাওয়া যায়নি। সুতরাং আমাদের ভয় হয় যে এ সম্বন্ধে যে যাঁর ইচ্ছামত গালগল্প চালাবেন আর তাই পাঠ্য নির্দিষ্ট হবে। আমাদের সংগীতের ক্ষেত্রে এই ধরনের গুরুনিসৃত আবোল তাবোল বাক্যের ওপর নির্ভর করে ইতিহাস রচনার প্রয়াস প্রায়ই দেখা যায় বলে এবিষয়ে কিছু সাবধান হওয়া দরকার। আপাতত ঈদৃশ ইতিহাস বাদ দিয়ে কিছু গান শিক্ষার ব্যবস্থা করলেই বোধ হয় ভাল হত।

এই শিক্ষাসূচীতে "অক্ষর মাত্রিক" স্বরলিপির উল্লেখে কি বোঝানো হয়েছে বলতে পারা গেল না। স্বরলিপির দিক থেকেও বাংলা গানের বিষয় সূচীতে কিছুই দেখছি না। বস্তুত স্বরলিপির ইতিবৃত্তও একটি বিশেষ শিক্ষণীয় বস্তু।

বাংলায় নাটকের বিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একটা নাট্যসংগীত গড়ে উঠেছিল এবং সেটিও বিশেষভাবে অনুশীলনযোগ্য। ইতিহাস এবং সংগীতের সংগঠনের দিক দিয়ে এটিও জানা দরকার। অবশ্য প্রাচীন নাটকের গানের প্রকৃত সুর পাওয়া কঠিন এবং একটু বাছাই করা দরকার। আশা করি, বিশ্ববিদ্যালয় ভবিষ্যতে এ বিষয়ে একটু মনোযোগী হবেন।

যাই হোক, নানা প্রচেষ্টা এবং ভুলভ্রান্তির ভিতর দিয়েই একটি কাজ সম্পূর্ণতার দিকে অগ্রসর হয়। বিশ্ববিদ্যালয় যে শেষ পর্যন্ত এই প্রচেষ্টায় হস্তক্ষেপ করেছেন এবং কিছুটা অগ্রসর হয়েছেন এইটি বিশেষ সুখের বিষয়। অভিজ্ঞতার ভিতর দিয়ে তাঁদের পরবর্তী পথ সুগম হয়ে উঠবে এইটিই আমরা আশা করি।

আসরের খবর

ডোভার লেন সংগীত সম্মেলন, মুরারি স্মৃতি বার্ষিকী সংগীত সম্মেলন, এণ্টালি সাংস্কৃতিক সম্মেলন

উপরোক্ত তিনটি সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে আমরা প্রচুর তৃপ্তিলাভ করেছি। বস্তুত অনেক সময় বড় বড় কনফারেন্সের চেয়েও এই ধরনের অপেক্ষাকৃত ছোট সম্মেলনে আনন্দ এবং শিক্ষার দিক থেকে আকর্ষণ বেশী থাকে। এই কারণে এই সম্মেলনগুলি সর্বতোভাবে সার্থক হয়ে ওঠে।

ডোভার লেনের প্রশস্ত মণ্ডপে পরিচ্ছন্ন পরিবেশে অনুষ্ঠানগুলি চমৎকার হয়েছে। দু একজন শিল্পীর জন্য কিছু অসুবিধায় পড়তে হলেও শ্রোতাদের সহযোগিতায় এঁরা অনুষ্ঠানগুলি বেশ সার্থক করে তুলতে পেরেছেন। শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী কেশরবাঈ কেরকার উত্তম সংগীত পরিবেশন করেছেন। অপরাপর শিল্পীরাও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। এই সম্মেলন ৩১শে ডিসেম্বর শুরু হয়ে ২রা জানুয়ারী সমাপ্ত হয়।

মুরারি স্মৃতি বার্ষিকী সংগীত সম্মেলন চেৎলা হাই স্কুলে ৩০শে ডিসেম্বর থেকে ২রা জানুয়ারী পর্যন্ত চলেছিল। এই অনুষ্ঠানে একটি বাংলা গানের অধিবেশনে রবীন্দ্র-সঙ্গীত, নজরুল গীতি, অতুলপ্রসাদের গান এবং কীর্তন গাওয়া হয়। অপর এক অধিবেশনে শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী বাংলায় ঠুংরী গেয়ে শ্রোতাদের বিশেষ তৃপ্তি দিয়েছেন।

এণ্টালী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ৫ই জানুয়ারী থেকে আরম্ভ হয়ে ৯ই জানুয়ারী সমাপ্ত হয়েছে। এই সম্মে-

ানে শুধু উচ্চাঙ্গ সংগীতই নয় অপরাপর লোকসংগীত, নৃত্য, নৃত্যনাট্য এবং নাটকের অনুষ্ঠান হয়েছে। সভাপতি স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ একটি সারগর্ভ ভাষণে সাংগীতিক প্রয়োজনীয়তার বিশেষভাবে উল্লেখ করেন। শ্রীঅর্ধেন্দু গঙ্গোপাধ্যায় রাগ-রাগিণীর চিত্ররূপ সম্বন্ধে একটি মনোজ্ঞ বক্তৃতা প্রদান করেন। সম্মেলন উপলক্ষ্যে এ'দের প্রকাশিত পুস্তিকাটি চমৎকার হয়েছে। এই পুস্তিকায় ভারতের বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন চিত্র এবং ভাস্কর্য অবলম্বনে শিল্পী শ্রীদেবব্রত মুখোপাধ্যায়ের আঁকা বহুবিধ বাদ্যযন্ত্রের রেখাচিত্র ছাপা হয়েছে। এগুলি বিশেষ মূল্যবান। এই শিল্পীর মঞ্চসজ্জাও প্রশংসনীয়।

এই সম্মেলনগুলিতে বাংলার এবং বাহিরাগত বহু শিল্পী অংশ গ্রহণ করেছেন। তাঁদের সকলকার অনুষ্ঠানের আলোচনা এই স্বল্প পরিসরে করা সম্ভব নয় এবং ইতিপূর্বে এ'দের বহু অনুষ্ঠানের আলোচনা আমরা করেছি। অতএব এবারে তার পুনরাবৃত্তি থেকে বিরত থাকা গেল।

আলাউদ্দিন সংগীত সমাজ

গত ১৪ই জানুয়ারি মিনার্ভা রংগমঞ্চে আলাউদ্দিন সংগীত সমাজের উদ্যোগে তাঁদের দ্বিতীয় বার্ষিক সংগীত সম্মেলন আরম্ভ হয়। প্রদেশপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় সম্মেলনের উদ্বোধনে শুভ কামনা জানিয়ে আলাউদ্দিন সংগীত সমাজের আর্থিক দুরবস্থার জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন এবং সমাজকে ২৫১৲ টাকা দান করতে প্রতিশ্রুত হন। এই উপলক্ষ্যে তিনি সংগীত-গুণগ্রাহীদের এই নব প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য দ্বারা উজ্জীবিত রাখবার জন্য উপদেশ প্রদান করেন। এর পরে শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ডাঃ সুধাংশু মুখোপাধ্যায় এবং শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয় বক্তৃতা করেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁ একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতায় যথোচিত বিনয় প্রকাশপূর্বক আমাদের সংগীতে ধ্রুপদের গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা বলেন এবং শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ’রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গাংগুলী, শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ, শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শ্রীরাধিকা মৈত্র মহাশয়ের উল্লেখ করেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি বাংলার ধ্রুপদের পুনঃপ্রচারের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেন।

ওস্তাদ আলাউদ্দীন অত্যন্ত বিনয়ী ব্যক্তি এবং তিনি পুনঃ পুনঃ নানা সভায় এই কথাই বলে থাকেন যে তিনি সংগীত বিদ্যার খুব অল্পই শিখেছেন। কিন্তু এটি নেহাৎ বিনয় বাক্য। সুদীর্ঘ জীবনে তিনি সংগীতের যে প্রয়োগশিল্প আয়ত্ত করেছেন বোধ করি তার তুলনা মেলে না। মামুলি বিনয়ের আতিশয্য পরিহার করে তিনি যদি তাঁর বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা এবং তাঁর সঞ্চিত জ্ঞান সম্বন্ধে এইসব সংগীত সম্মেলনে কিছু কিছু বলেন তবে আমাদের অনেক উপকার হয়। আমাদের মনে হয় তাঁর জীবনে এখন সেই সময় এসেছে যখন তাঁর বিস্তীর্ণ জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করে সংগীত জগতে প্রচার করা উচিত। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বল্লেন পশ্চিমদেশীয় ওস্তাদেরা কৃপণ তাঁরা কিছুই দিতে চান না। ওস্তাদ আলাউদ্দিন এইসব শিল্পীদের কাছ থেকে বহু জ্ঞান ছিনিয়ে নিয়েছেন এবং আমরা চাই এই জ্ঞান তিনি শিক্ষার জন্য সমগ্র দেশে প্রচার করে যান। তাঁর উপযুক্ত শিষ্যদের মধ্যে অনেকেই এই ভার তুলে নিতে পারেন। যদিও প্রয়োগশিল্প বই পড়ে আয়ত্ত করা যায় না, তথাপি এছাড়া এইসব দুর্লভ বিদ্যা সংরক্ষণের আর কোন উপায় নেই। ওস্তাদ আলাউদ্দীন বহু দুরূহ রাগ এবং সংগীতকলাকৌশলের পরিচয় জানেন। এগুলি কি তাঁর সংগেই লুপ্ত হয়ে যাবে? আমাদের প্রাচীন সংগীতজ্ঞ শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় বহু পুস্তকে তাঁর জ্ঞানভান্ডার উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। অপরাপর প্রবীণ সংগীতজ্ঞগণ যদি এই প্রচেষ্টা না করেন তবে আমাদের সংগীত বহু দুর্মূল্য সম্পদ থেকে চিরকালের জন্য বঞ্চিত থাকবে।

এই প্রসংগে এইসব সম্মেলনে বীণা এবং রবাবের সংগে সাধারণকে পরিচিত করবার প্রচেষ্টার জন্য শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী মহাশয়কেও আমরা ধন্যবাদ প্রদান করি। এই সম্মেলনে তাঁর বীণা-বাদন আমরা আনন্দের সংগে উপভোগ করেছি।

চিঠিপত্র

সম্পাদক দেশ,

গত ৮ই জানুয়ারির "দেশ"এ অখিল ভারত সংগীত সম্মেলনে আমার অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে অনেকে আমাকে নানাবিধ প্রশ্ন করায় গত বৎসরের ঘটনাটি সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

গতবারের অখিল ভারত সম্মেলনে একটি লিখিত কন্ট্রাক্টে রাত সাড়ে আটটায় আমার খেয়াল এবং ঠুংরীর প্রোগ্রাম নির্দিষ্ট করা হয়। কিন্তু উক্ত সময় শ্রীমতী অঞ্জনীবাঈ লোলেকারের সংগীতানুষ্ঠান হওয়াতে আমি রাত প্রায় সাড়ে দশটায় গান গাইবার সুযোগ লাভ করি। আমাকে আধ ঘণ্টার মধ্যে সংগীতানুষ্ঠান শেষ করতে বলা হয়, কেননা অপর একজন বহিরাগত শিল্পীর অনুষ্ঠান রাত এগারটা থেকে রেডিও যোগে "রিলে" করবার ব্যবস্থা ইতিমধ্যে ঠিক হয়েছিল। এতদনুযায়ী আমি আধ ঘণ্টার মধ্যেই আমার অনুষ্ঠান শেষ করে উঠে পড়বার উপক্রম করাতে শ্রোতৃবৃন্দ আমাকে আরও কিছুকাল গান করবার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করতে থাকেন। আমি এবং সম্মেলনের কর্তৃপক্ষ এদের অবস্থা বুঝিয়ে সবিনয়ে অনুরোধ করেও নিরস্ত করতে পারিনি। অতএব একটি অশান্তির পরিস্থিতি এড়াবার জন্য আমি আর একটি ঠুংরী ও ভজন গেয়ে যথাশীঘ্র আমার অনুষ্ঠান সমাপ্ত করি। এর পরে এবছর এই সম্মেলনে আমি আর আহ্বান পাইনি। ইতি—

শ্রীশচীনদাস (মতিলাল)

চক্রদত্ত

সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদি নিত্য-প্রয়োজনীয় ধাতু ছাড়াও পৃথিবীতে আরও এমন কতকগুলি ধাতু পাওয়া যায় যেগুলির জন্ম বৃত্তান্ত, প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কৌতূহল থাকে। এই ধরনের ধাতুর মধ্যে টিটানিয়াম অন্যতম। এটি পৃথিবীর সহজলভ্য নয়টি ধাতুর মধ্যে একটি। টিটানিয়াম মাটির স্তরে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ১৭৯১ সালে টিটানিয়াম সর্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। মাত্র ১৯৪৬ সালে এই ধাতুটি সহজভাবে তৈরী করার উপায় বার হয়। টিটানিয়ামের সঙ্গে অন্য একটি পদার্থ মিশিয়ে যে সংকর ধাতু (Alloy) তৈরী হয় সেটি প্রায় ৩৫০০° ডিগ্রী ফারেনহাইট তাপ সহ্য করতে পারে। আমাদের পরিচিত ধাতুর মধ্যে সোনার ব্যবহার আমরা খুব ভালো করেই জানি, কিন্তু এর গুণাগুণ বিশেষভাবে জানা নেই। সোনা উজ্জ্বলতায় সর্বশ্রেষ্ঠ ধাতু, বিশেষত এর ওপর রাসায়নিক প্রক্রিয়া ঘটে না ব'লে কোনওদিনই সোনার জলুস নষ্ট হয় না। সোনা খুব শক্ত ধাতু, খুব সহজেই পিটিয়ে পাতলা চাদর করা যায়। প্রয়োজনানুসারে এই চাদর এক ইঞ্চির ১/২৫০০০০০ ভাগ পর্যন্ত পাতলা করা যায়; তখন এ চাদরটি একটি স্বচ্ছ পদার্থ বিশেষ মনে হয় এবং এর মধ্যে দিয়ে আলো যেতে পারে। ইউরেনিয়ামও আর একটি ধাতু। ১৭৮৯ সালে ইউরেনিয়াম প্রথম আবিষ্কৃত হয়। আণবিক বোমা তৈরীর গবেষণা শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত ইউরেনিয়ামের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে মানুষের কোনও কৌতূহলই ছিল না। ইউরেনিয়াম বিভিন্ন রকমের হয় এবং এগুলি রাসায়নিকভাবে বিভিন্ন হলেও কিন্তু আণবিক ওজনের দিক থেকে সব সমান। পৃথিবীতে যত নিকেল পাওয়া যায় তার প্রায় ৮৫ ভাগের জন্মস্থান কানাডা। এর থেকে সহজেই বোঝা যায় যে, বিভিন্ন ধরনের ধাতু পৃথিবীতে কত অসমানভাবে ছড়িয়ে আছে। কার্বনকে আমরা বিভিন্নরূপে পাই। সবচেয়ে খাঁটি কার্বনের টুক্‌রো বলতে আমরা হীরাকেই বুঝি। কালো গ্রাফাইট কার্বনের আর একটি রূপ। এই জিনিসটি খুব তাড়াতাড়ি জ্বলে যায় না, এতে প্রচুর পরিমাণে স্বাভাবিক ও গ্যাসীয় তৈলাক্ত পদার্থ থাকে। বিটুমিনাস কয়লা প্রায় পৃথিবীর সর্বত্রই পাওয়া যায়। যে শক্ত কয়লা কোনও রকম ধোঁয়া উৎপন্ন না করেই জ্বলতে পারে সেটা পেনসিলভিনিয়ার একটি ছোট্ট জায়গায় প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ক্রোমিয়াম ও নিকেল ইস্পাতের সঙ্গে মিশিয়ে যে সংকর ধাতু তৈরী হয় সেটা সহজে ক্ষয় হয় না এবং মরচেও ধরে না।

*

অনেক সময় দেখা গেছে যে, জনৈক পথিক পথের মধ্যে এদিক ওদিক তাকিয়ে সকলের অলক্ষ্যে চট করে নিজের চাদরের খুঁট দিয়ে জুতোটা একটু মুছে নিচ্ছেন। এটা আর কিছুই নয়—নতুন জুতো জোড়াটা চিরদিন নতুন রাখার প্রচেষ্টা মাত্র। জগতে কোনও কিছুই অবিনশ্বর নয়। প্রকৃতির বিধানে জিনিসপত্র ব্যবহার না করলেও শীতাতপে নষ্ট হ'তে থাকে। আজকাল অবশ্য বহু কৃত্রিম উপায়ে জিনিসপত্র ক্ষয়-ব্যয়ের হাত থেকে রক্ষা করার চেষ্টা চলছে। এয়ারোপ্লেন, মোটর ইত্যাদির ওপরে যে সব রং লাগান থাকে সূর্যের উত্তাপে সে সব রং নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এয়ারোপ্লেনের ওপরে যে প্লাস্টিকের ঢাকা বা প্লাস্টিকের জানলা থাকে সেগুলোও রোদে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। একরকম রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে এই রংগুলি রক্ষার উপায় উদ্ভাবিত হয়েছে। এই পদার্থটি মোটর বা এয়ারোপ্লেনে মাখিয়ে দিলে রংটা নষ্ট হয় না। এই রাসায়নিক পদার্থ প্রথমে মানুষের চামড়ার স্বাভাবিক রং বজায় রাখার জন্যই ব্যবহারের প্রচলন হয়। আজকাল পাশ্চাত্য দেশে রোদ পোয়ান অথবা "সান বাথ" নেওয়া একটা ফ্যাশান হয়েছে। বেশীক্ষণ রোদে থাকার জন্য চামড়ার রং বাদামী হয়ে যেতে থাকে, সেজন্য চামড়ার স্বাভাবিক রং রক্ষার করার জন্যই এই রাসায়নিক পদার্থ গায়ে মাখার প্রচলন হয়। শূন্যের মধ্যের "আল্‌ট্রা-ভায়োলেট রশ্মি" শরীরের মধ্যে প্রবেশ করানই রোদ পোয়ানর উদ্দেশ্য অথচ এই আল্‌ট্রা ভায়োলেট রশ্মি দেহের মধ্যে পৌঁছানর আগেই ওপরের চামড়া ঝলসে যায় বলে চামড়ার রং বাদামী হতে থাকে। রাসায়নিক পদার্থটি চামড়ার ওপরে মাখান থাকলে আল্‌ট্রা ভায়োলেট রশ্মি দেহের মধ্যে যায় অথচ চামড়া ঝলসায় না। মোটর অথবা এয়ারোপ্লেনের ওপরও এই রাসায়নিক পদার্থ একই রকম কাজ করে।

*

সাবমেরিন থেকে জলের ওপরের স্তরে দৃষ্টি রাখার জন্য পেরিস্কোপ এবং জলের মধ্যের আশে পাশে কোনও কিছুর অস্তিত্ব অনুভব করার জন্য শব্দ-তরঙ্গের ওপর নির্ভর করতে হয়। সাবমেরিনের ইস্পাত-নির্মিত দেওয়ালগুলির মধ্য দিয়েই শব্দ-তরঙ্গের আদান-প্রদান চলতো। ইস্পাতের মধ্যে দিয়ে শব্দ-তরঙ্গের গতায়াতে শব্দ খুব স্পষ্ট হতো না। বর্তমানে নিউক্লিয়ার শক্তি-বিশিষ্ট যে নতুন ধরনের সাবমেরিন তৈরী হচ্ছে সেগুলোর ইস্পাতের বদলে একরকম নতুন ধরনের রবারের দেওয়াল দেওয়া হচ্ছে। সাধারণভাবে আমাদের ধারণা যে, রবার শব্দভেদী নয়, কিন্তু এই নতুন রবারের মধ্য দিয়ে শব্দ-তরঙ্গের গতায়াত স্পষ্টতর হচ্ছে। নতুন রবারটি গুড্ রিচ কোম্পানী তৈরী করেছে। এই রবার ইস্পাতের মতই শক্তিশালী। ইস্পাতের দেওয়াল যে পরিমাণ জলের চাপ সহ্য করতে পারে, এই রবারের চাদরের দেওয়ালও সেই পরিমাণ জলের চাপ সহ্য করতে পারে। দেখা গেছে যে, অন্য কোনও রকম ধাতু বা কোনও পদার্থ দিয়ে দেওয়াল তৈরী করলে এত স্পষ্টভাবে শব্দ-তরঙ্গ যাতায়াত করতে পারে না।

ছোট গল্প

অসবর্ণা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশক—এম, সি, সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য—আড়াই টাকা।

শরৎচন্দ্রোত্তর যুগে বাঙলা ছোট গল্পের ক্রমোন্নতির ইতিহাস কারোর অজানা নেই। বিষয় বৈচিত্র্যে, আঙ্গিক-পরিকল্পনায়, নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে, বাঙলা সাহিত্যের এই বিভাগটি এতই সমৃদ্ধ যে এ-সম্বন্ধে কারো সন্দেহের অবকাশ আছে বলে মনে করি না। কিন্তু যে বিপণি যত সমৃদ্ধ সেখানেই যেমন ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় বেশি, এ ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। খুঁজলে অশিল্পীজনোচিত রচনার আধিক্য এখানেও প্রচুর পাওয়া যাবে। চাহিদার বাহুল্যের জন্যে অখ্যাতনামা বা খ্যাতিমানদের রচনার মধ্যে বহুল পরিমাণে অপাঠ্যের সন্ধান হয়ত মিলবে। রচনার সংখ্যা-কৌলিন্যে হয়ত বাঙলার সমস্ত লেখকবৃন্দকেই অল্পবিস্তর কুলীন বলা যায়—অবশ্য গুণ বিচারে কুলীন কিনা সে-কথা এখানে অবান্তর। কিন্তু আধুনিক লেখকদের মধ্যে বোধ হয় নরেন্দ্রনাথ মিত্রই একমাত্র লেখক—যিনি শুধু সংখ্যাকৌলীন্যেই নয়, শিল্পগুণ বিচারেও সমান মর্যাদার অধিকারী। এই দিক দিয়ে বিচার করতে গেলে তিনি সত্যিকারের কুলীন লেখক। এটা যে-কোনও লেখকের পক্ষে গৌরবের বিষয় যে, হাতের পাঁচটা আঙুলও যেখানে সমান নয়, সেখানে নরেন্দ্রনাথের হাতের সৃষ্টি পাঁচ-পাঁচে পঁচিশটা কিম্বা পাঁচ-দশে পঞ্চাশটা গল্প সমান মর্যাদাই দাবী করতে পারে। যে-কোনও বছরের বিভিন্ন পত্রিকার পূজা-সংখ্যায় প্রকাশিত তাঁর কমপক্ষে পনেরোটা গল্প সে-সাক্ষ্য দেবে।

নরেন্দ্রনাথ মিত্রের ছোট গল্পের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য-হীনতা। তিনি আমাদের কোনও আপাত-নতুন চরিত্রের সন্ধান দেন না। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেন না কে রূপসী, কে কুৎসিৎ। তিনি আমাদের হাত ধরে নিয়ে যান একেবারে মানুষের হৃদয়ের অন্তঃপুরের অন্তস্তলে, সেখানে আলো-আঁধারের গোলোক ধাঁধার ভেতরে ক্ষণিকের মধ্যে কোনও গোপনচারিণীর ঘোমটা হঠাৎ ঈষৎ উন্মোচন করেই বিদায় দিয়ে দেন। অপাঙ্গের একটু ইঙ্গিত, হাতের একটু ইসারাতেই রসিক বিমুগ্ধ হয়, বিগলিত হয়। ফলে পুরোন চরিত্র নতুন হয়ে ওঠে। চেনা-মানুষ হঠাৎ রহস্যময় হয়ে ওঠে। তার জন্যে তাঁর কোনও ঘটনা-বিপর্যয়ের সাহায্য প্রয়োজন হয় না। হত্যা, মৃত্যু বা এই জাতীয় কোনও য়্যাকসিডেন্ট-এর আশ্রয় গ্রহণ করাও তাঁর পক্ষে একান্তই অবান্তর। এককথায় তিনি অতি-সাধারণ হয়েই অসাধারণ। অবিশেষ হয়েই বিশেষ। এদিক থেকে তিনি প্রকৃতই শেখভ-পন্থী—তা সে সচেতন ভাবেই হোক আর অচেতন ভাবেই হোক। নরেন্দ্রনাথের অভিজ্ঞতার পরিধি যদিও কম, কিন্তু তাঁর পক্ষে এটা কোনও অসুবিধা সৃষ্টির হেতু হয়নি। যে-লেখক অন্তর্মুখী তাঁর নিঃস্ব হবার আশঙ্কাও অল্প। করাণ, তাঁর কারবার মনকে নিয়ে আর মনের তো কোনও সীমা-পরিসীমা নেই! তাই প্রতি মুহূর্তের ভগ্নাংশ দিয়ে এক-একটা অপূর্ব গল্প রচনা করা তাঁর মত লেখকের পক্ষেই সম্ভব। সেই কারণেই মনে হয়, তিনি অখণ্ড মূলধনের অধিকারী। শিল্পদৃষ্টি ক্রমে সম্প্রসারিত হলে বাঙলা-সাহিত্যে অখণ্ড কীর্তি রেখে যাওয়া তাঁর পক্ষে শক্ত নয়। বর্তমান গ্রন্থটি তাঁর এমনি তিনটি গল্পের সঙ্কলন। 'অসবর্ণা', 'পুনর্ভবা', আর 'দয়িতা'। তিনটি গল্পই নরেন্দ্রনাথের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যহীনতায় বিশিষ্ট। সেই মধ্যবিত্ত বা নিম্নমধ্যবিত্তদের সংসার। সেই অনায়াস অবধারিত ক্লাইমেক্স। সেই চিরন্তন নারী-চরিত্রের আপাত-স্পষ্টতার মধ্যে একমুহূর্তের রহস্যময়তা, সেই সবগুলি গুণেই এ-গল্প তিনটিতে বর্তমান। তিনটি গল্পই নরেন্দ্র-সাহিত্যের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। তবে 'পুনর্ভবা' গল্পটি শুধু নরেন্দ্রনাথেরই নয়, বাঙলা সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য রচনা। যে-কোন সঙ্কলনের পক্ষে এ-গল্পটি একটি উজ্জ্বলতম রত্ন।

একশো চুরাশি পাতার বই-এর পক্ষে দাম নিতান্তই অল্প। প্রচ্ছদপট সুদৃশ্য।

৪৭৬।৫৪

উপন্যাস

প্রথম প্রহর : রমাপদ চেধুরী। প্রকাশক : ডি এম লাইব্রেরী, ৪২ কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। দাম ৪৷৷৹।

আধুনিক বাংলাসাহিত্যে যে কয়জন প্রতিভাবান কথাশিল্পীর আবির্ভাব ঘটেছে, তাঁদের মধ্যে রমাপদ চৌধুরী তাঁর নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। বাংলাসাহিত্যের সম্পর্কে একটা বহুকালের অভিযোগ ছিল, বিষয়বস্তু ও পটভূমিকার বৈচিত্র্যের অভাব। অভিযোগটা অনেকাংশে সত্য তাতে সন্দেহ নেই। রমাপদ চৌধুরীর রচনা নতুনতর পটভূমিকায় বুদ্ধি-দীপ্ত মনোবিশ্লেষণে যে কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে, তাতে আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গৌরব বেড়েছে নিঃসন্দেহে। শহরে শৌখীন নাগরিক পরিবেশে, কুসংস্কারাচ্ছন্ন সরল সাঁওতাল, পর্তুগীজ অধিকৃত গোয়ার বিকৃত বিকার, কয়লাখনির ধূমোচ্ছন্ন ক্লেদাক্ত আকাশ—তাঁর লেখায় নানা নূতন জগতের চেহারা, নানান বিচিত্র মানুষের আশ্চর্য রূপায়ন।

'প্রথম প্রহর' রমাপদ চৌধুরীর দ্বিতীয় উপন্যাস। একটি বালকের ক্রমবর্ধিষ্ণু বয়সের অন্তর্মুখী স্মৃতিচিত্র এই গ্রন্থে তিনি পরিমিত সংযমের সঙ্গে লিখেছেন। সংযম তাঁর লেখায়। এই ধরনের রচনায় আবেগের যে বিস্তৃতি ও গভীরতা, সেখানে লেখার সংযম কিছুটা অনন্যসাধারণ। মনে হয় আমার। 'প্রথম প্রহরে'র বিন্যাস ও রচনাশৈলীর দৃঢ় সংযত ঋজুতা তাই চমক লাগায় পাঠকমনে। তবু একটা কথা বলবো, আমার মনে হলো কখনো কখনো, লেখকের এই সংযমবোধের প্রখরতায় কোন কোন চিত্ররূপের বর্ণে যথেষ্ট গাঢ়তা দেওয়া হয় নি।

জীবনের প্রথম প্রহর পরমাশ্চর্য। চেতনার দ্বার খুলতে থাকে, বোধের পরিধি বাড়ে, বুদ্ধির পাপড়ি মেলে মেলে যায়। আস্তে আস্তে, দিনের পর দিন, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে। পৃথিবীর সঙ্গে, সংসারের সঙ্গে এই ক্রমবর্ধিষ্ণু বোধের ভেতর দিয়ে পরিচয় গভীর হয়। 'প্রথম প্রহরে' এই পরিচয়েরই ক্রমশ বিকাশ। কাহিনীর যবনিকা যৌবনের প্রথম সিঁড়িতে এসে বাস্তবের একটি বেদনারূঢ় আঘাতের উপান্তে। জীবনে এমনি অপ্রত্যাশিত বাঁক এসে স্রোতকে ঘুরিয়ে দেয় বারবার। নতুন তরঙ্গে হারিয়ে যায় পুরনো অতীত। তাই যেখানে এসে থেমেছে এই

উপন্যাসের কাহিনী, পাঠকের বাস্তবজীবনের দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে মিলেছে তার স্বাদ।

এই উপন্যাসের রূপকল্পনা আকর্ষণীয় নিঃসন্দেহে, পটভূমিকাও বিষয়গৌরবে উজ্জ্বল। একশ বছর আগে পাহাড় নদী সমতল ভূমির মেখলাপরা এই দেশে প্রথম রেলগাড়ীর স্বপ্ন দেখা দিয়েছিল। উটের গাড়িতে এসেছিল লোহালক্কড়, হাতীর পিঠে এসেছিল মালপত্র, পাল্কীতে চড়ে এসেছিলেন সাহেব এঞ্জিনীয়ার। গড়ে উঠেছিল রেলকুঠী, লোহপথের বলয় পরেছিল বিস্তৃত দেশ, ধোঁয়া উড়িয়ে ছুটেছিল লোহরথ। রেলকুঠীর একশ বছরের ইতিহাস আশ্চর্য। এই একশ বছরের রেলকুঠীর নানা কাহিনী এসে মিলেছে এই উপন্যাসে। নায়কের অর্ধ-উন্মীলিত মনের রেখায় এসে মিলেছে তার নানা বাঁকের শব্দতরঙ্গ, শ্রুতির ধারায় এসেছে সে-ইতিহাসের নানা বিচিত্র স্বাদ।

প্রাচীন রেলকুঠীর একটি সংবেদনশীল বালক ধীরে ধীরে যৌবনের সন্ধিক্ষণে এসে দাঁড়ালো। শিশুয়ালী নানা কৌতুক ও কৌতূহলের মধ্য দিয়ে, বড়োদের নানা ঘটনার অর্ধস্ফুট উপলব্ধির মধ্য দিয়ে। লেখকের কাহিনীবয়নের দক্ষতার ও পরিবেশ রচনার নৈপুণ্যে এই স্মৃতিকথা পাঠকমনকে মুগ্ধ ও নিবিষ্ট করে রাখে। প্রেমের প্রথম কিরণপাতের সঙ্গে বিদ্রোহের স্ফুলিঙ্গ যখন নায়কের মনে জেগে উঠে, তখন অপ্রত্যাশিত ও রূঢ় বাস্তবের আঘাতে পুরনো অধ্যায় সম্পূর্ণ মুছে গিয়ে আসে নতুন বাঁক, অনিবার্য গতিতে। লেখকের অসাধারণ ভাষানৈপুণ্য ও রচনাকৌশলে 'প্রথম প্রহরে' এমন বিচিত্র গভীর স্বাদ এসেছে, যার ফলে আধুনিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে এ বই স্মরণীয় হবে নিঃসন্দেহ।

চরিত্র সৃষ্টিতেও লেখক অসামান্য নৈপুণ্যের ও অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন। রাঙামামীমার কথা প্রথমেই মনে পড়ে, অসাধারণ সুন্দরী এই নতুন বধূর স্নিগ্ধ স্নেহময় মন গভীর আকর্ষণ করে। তাঁর শোকসন্তাপ ও বিচিত্র 'সহমরণ' একটা আলোড়ন জাগায় পাঠকমনে। ঝিঁঝিপোকা, সদাশিব জ্যেঠা, দাদু ও আবিদ হোসেন বিভিন্ন জগতের কয়টি বিচিত্র সৃষ্টি। মীরা, অঞ্জলিদি, পান্না, বিলাইতি ও ফুলজান বেগম আমাদেরই চেনাশোনা জগতের মানুষ—তবু যেন তাদের গভীর অন্তরঙ্গ রূপ দেখতে পাওয়া যায় এই কাহিনীর গ্রন্থিতে গ্রন্থিতে। 'প্রথম প্রহর' উপন্যাসের চরিত্র ক্লাসিক, রসানুভূতি গভীর এবং শিল্প সৃষ্টি হিসেবে স্মরণীয় হয়ে থাকার দাবী রাখে। ৬।৫৫

অকূলকন্যা—প্রভাত দেব সরকার। ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩ হ্যারিসন রোড, কলিকাতা ৭। দাম—দু টাকা চৌদ্দ আনা।

খুব সম্প্রতি নিষ্ঠাবান লেখকদের মধ্যে যে কয়জন সাধারণ পাঠকদের কাছে বিশেষ-ভাবে পরিচিত হয়ে উঠেছেন, নিঃসন্দেহে প্রভাত দেব সরকার তাঁদের একজন। এবং সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে যাঁরই কিছু যোগাযোগ আছে তিনিই জানেন, প্রভাতবাবু একজন উল্লেখযোগ্য গল্পকারও। সুতরাং পাঠকজন তাঁর অধুনা প্রকাশিত উপন্যাস 'অকূলকন্যা'কে একজন বিচক্ষণ সাহিত্যিকের রচনা বলে চিনে নিতে ভুল করবেন না।

সত্যিই তাই। বিচক্ষণ সাহিত্যিক বলেই প্রভাতবাবু নিভাননীকে অকূলে ভাসালেও তাঁর কাহিনীকে সঠিকভাবে কূলে এনে ভিড়াতে পেরেছেন। বস্তুত, কাহিনী-প্রবাহের দিক থেকে বিচার করলে এ উপন্যাসটিকে এমন কিছু জটিল বলে মনে হবে না। কিন্তু সমালোচক-পাঠক লক্ষ্য করবেন, কেবলমাত্র আখ্যানবস্তুতেই লেখক তাঁর সমস্ত কৃতিত্বকে নিঃশেষিত করেন নি।

অকূলকন্যা বস্তুত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস। এবং নায়িকার প্রতি লেখক সব সময় সজাগ মন ও দৃষ্টি রেখেছিলেন বলেই সে অবিচ্ছিন্ন ঘটনা পরম্পরায় সম্পূর্ণ হয়ে উঠতে পেরেছে। অন্যপক্ষে একই দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি থাকায় চিরাচরিত প্রথায় এক নায়কেই আখ্যায়িকা সীমাবদ্ধ হয়ে থাকতে পারেনি। তাতে অবশ্য পাঠকজনেরও আক্ষেপ নেই। কারণ, লেখক তাঁর নায়িকাকে একূল থেকে নবজীবনের কূলে এমন দ্রুতগতিতে এগিয়ে নিয়ে গেছেন যে, একাধিক প্রধান পুরুষচরিত্রের উপস্থিতিতে পাঠক বিহ্বল হয়ে পড়ার অবকাশও পায় না। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ঘটনার কাছে নিভা দায়ী না নিভার কাছেই ঘটনা দায়ী। আপাতভাবে মনে হবে ঘটনাই আগাগোড়া নিভাকে তাড়িয়ে বেড়িয়েছে। কিন্তু তা নয়। দুর্ঘটনা থেকে কাহিনী শুরু। নিভা তাই ছিটকে বেরিয়ে এলো সংসার থেকে, কিন্তু যে-মুহূর্তে দেখলাম সে অবকাশ পেয়েছে স্থিতধী হওয়ার তখনই সে ঘটনাপ্রবাহের বল্গাকে তুলে নিয়েছে নিজের হাতে। নিস্তরঙ্গ জীবনযাত্রায় আবর্তে এলো আর একটা দুর্ঘটনায়। অমলের মার মৃত্যুতে আবার তাকে গা ভাসাতে হলো পরিবর্তনের স্রোতে—অমলের আকস্মিক কাপুরুষোচিত আক্রমণ তার সে পরিবর্তনটিকে আর একটু তাড়াতাড়ি কাছে টেনে এনেছে মাত্র। হাসপাতালের নার্স হয়ে আবার সে অবকাশ পেলো আত্মস্থ হওয়ার। তখন আর ঘটনা বা দুর্ঘটনা তাকে তাড়িয়ে বেড়ায় না—সেই নিজের ইচ্ছায় ঘটনাকে তৈরী করে নিচ্ছে একটার পর একটা। এখানেই লেখক নিষ্ঠুরভাবে পরীক্ষা করেছেন নিজেকে। নিভা কি ভালোবেসেছিলো প্রকাশকে? কিন্তু অমলের প্রতিও তো তার ঘৃণা ছিলো না। প্রকাশের কাছে যে সে বার বার ছুটে গিয়েছে তা আসলে ভালোবাসার তাগিদে নয়—নারীত্বের স্বাভাবিক কর্তব্য বোধেও হতে পারে, গৌরী আর রেণু কাকীমার প্রতি প্রতিহিংসায়ও হতে পারে, কিংবা হতে পারে নিজেরই ভালোবাসাকে নিঃশেষে পুড়িয়ে ফেলার ঐকান্তিক ইচ্ছায়। যে-কারণেই হোক এ-আত্মনিপীড়নের প্রয়োজন ছিলো তার। তাই শেষবারের জন্য যখন আবার দুর্ঘটনার আঘাত এলো তার জীবনে, তখন আর সে

আগের মতো ছিটকে বেরিয়ে যেতে পারলো না, দেখা গেলো, আপন হৃদয়ের সত্যিকার ভালোবাসার কাছে ধরা পড়ে গেছে সে। সুতরাং অমলের কাছে আবার তার ফিরে আসাটা আকস্মিক হলেও অবাস্তব নয়। কাহিনীর পরিপ্রেক্ষিতে নিভাকে উপলক্ষ্য করে বস্তুত নিজেকে নিয়েই যে পরীক্ষা করেছেন লেখক, উপসংহারে বলতে বাধা নেই, তাতে তিনি উত্তীর্ণও হয়েছেন।

তথাপি, নিভাচরিত্রের সার্থকতাই অন্যদিকে লেখকের দুর্বলতাকে স্পষ্ট করে তুলেছে। নায়ক হওয়ার সুযোগ না থাকলেও অমল এবং প্রকাশ—এ দুজনই কাহিনীর প্রধান পুরুষ চরিত্র। অথচ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে কেউই উজ্জ্বল নয়। দুজনই নিভাকে পেতে চেয়েছিলো রাত্রির অন্ধকারে কাপুরুষোচিত পন্থায়, অর্থাৎ তারা নিভাকে চায়নি, চেয়েছিলো তার দেহ। অবশ্য অমলকে কৃপা করেছেন লেখক তার আকস্মিক দুর্বলতার প্রতি নিভার ক্ষমা দিয়ে। কিন্তু তা হলেও মনে বিস্ময় জাগে, অমলের যে চারিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রথম থেকে পাঠককে মুগ্ধ করে তা এত ক্ষণভঙ্গুর! ফলে, অমল বা প্রকাশ কেউই পাঠকমনকে বিশেষ আবিষ্ট করতে পারে না। অথচ চারিত্রবৈশিষ্ট্য যে দুজনের মধ্যে স্পষ্টতই প্রকাশ পেয়েছে তাদের উজ্জ্বলতাকে তো পাঠক সহজে ভুলতে পারবে না। এ-কাহিনীর পক্ষে অমল বা প্রকাশের চেয়ে কি সারদা দেবী আর অমিয়াদির প্রয়োজন বেশী? এমন কি রেণু কাকীমাও?

ভাষাশিল্পে সাম্প্রতিক কালের প্রায় সকল সাহিত্যিকই একটা উন্নত মান রক্ষা করে চলেছেন, এবং প্রভাত দেব সরকারের স্থান সাধারণ লেখকদের পর্যায় থেকে বেশ একটু উপরেই, সুতরাং তাঁর রচনা যে সুখপাঠ্য হবে তা বলাই বাহুল্য। তবে ভাষার চেয়েও লক্ষণীয় তাঁর রচনাকৌশল। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস রচনার সমস্ত অসুবিধাকেই তিনি অত্যন্ত সহজে কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন। ঘটনাপ্রবাহই বিশ্লেষণের ভার নিয়েছে, যেন এ-সম্বন্ধে লেখকের কোনো দায় নেই। এই জন্য মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের পীড়াদায়ক পদ্ধতি থেকে এ-গ্রন্থ সম্পূর্ণভাবে মুক্ত, ফলে পাঠকজনের পক্ষেও শান্তিকর।

মৌনমুখ। কুমুদকান্ত। প্রকাশক : ডি, এম, লাইব্রেরী। দাম : দু টাকা।

বিত্তহীন ধাঙড় জীবন নিয়ে কাহিনী রচনার প্রচেষ্টা। বিষয় নির্বাচনে লেখকের অভিনবত্ব আছে। কিন্তু বিষয়বস্তু যে নিপুণ পরিমিতি বোধে, যে দরদী ভাষার উপহারে সাহিত্যের সুস্বাদু প্রসাদ হয়ে ওঠে, 'মৌনমুখে' তার দুঃসহ অভাব। উপন্যাস রচনার ব্যাকরণ এখনও লেখকের অনায়ত্ত। তবে মোহিনী-কঙ্কার দাম্পত্য জীবনের আয়তক্ষেত্রটুকু ও কানাইয়া চরিত্রটি সাহিত্য-ক্ষেত্রে নতুন না হলেও সুন্দর। আরো অনুশীলনের ওপর লেখকের সাফল্য নির্ভর করছে। ৫০৬।৫৪

বিনোদিনীর ডায়েরী—যতীন্দ্রনাথ বিশ্বাস; প্রাপ্তিস্থান—ডি, এম, লাইব্রেরী; ৪২, কর্নওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মূল্য চার টাকা।

গতযুগের ভাবধারা ও আঙ্গিকে রচিত একখানি উপন্যাস। সাহিত্যের পংক্তিতে বেমানান। বর্তমান জগতের সঙ্গে এ পুস্তকের কাহিনীর বিশেষ কোন সংযোগ নেই, নেই কোন প্রতিফলন আধুনিক বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের বিবর্তন ও অগ্রগতির। আলোচ্য বইখানির সাহায্যে সময় অতিবাহিত করার সমস্যার সমাধান কিছুটা হতে পারবে, তার বেশি কিছু নয়। তবে লেখার বাঁধন একেবারে শ্লথ নয়—ভাষাতেও স্বচ্ছন্দ গতি অনেকটা আছে। পরিণতি অতখানি স্ট্যাণ্টধর্মী না হলে উপন্যাসখানি মোটামুটি রকমে উতরোতে পারতো। ছাপা ও বাঁধাই উত্তম। ৪৬২।৫৪

কবিতা

কলরোল—(কবিতার বই) অনিলকুমার ভট্টাচার্য প্রণীত। 'সোয়ান বুকস', ১।১।১বি, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। দাম—১৷৷০

'কলরোলে'র কবি অনিলকুমার ভট্টাচার্য খ্যাতনামা কথাশিল্পী, কিন্তু তিনি একটি বিশিষ্ট কবি-মনের অধিকারী—আলোচ্য কবিতার বই তাহারই অভিব্যক্তি। 'কলরোল' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ; কিন্তু স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল। আধুনিক কবিতায় বস্তুনৈষ্ঠিক মনোভাব—কবিতা শুধু কল্পনার কূজন নয়। কলরোলের কবিও রিয়্যালিস্ট—এ যুগের জীবন-দর্শন তাঁহার কবিতায় প্রতিফলিত—

"শিপ্রা নদীর কলোচ্ছ্বাসে আজ যে
সমুদ্রের ঝড়
সাগর—পাখিদের ডানায় ডানায় ঝরছে
রক্তক্ষরা পৃথিবীর শোণিতাশ্রু!
আমি কেমন ক'রে ব'লবো—আমি অমৃত,
মৃত্যু আমার নেই, আমি মৃত্যুঞ্জয়ী?"

'কলরোলে'র কবিতায় নির্জনতার ধ্বনি অপেক্ষা মিছিলের কলরোলই স্পষ্টতর; কিন্তু কাব্য তাহাতে ব্যাহত নয়। গণ-চেতনার সুস্পষ্ট ব্যঞ্জনায়, আগামীকালের নবীন আলোকের সম্ভাবনায় আশাবাদী আধুনিক কবি অনিলকুমার দৃপ্ত ভঙ্গীতে সমুজ্জ্বল কবিতা সৃষ্টি করিয়াছেন—

"কাব্যের ললিত সুর চেয়ে আছে পথ;
মিছিলের কলরোলে, আকাশের তলে
নবীন দিনের এক সোনালী সকাল।"

এ যুগের কাব্য-দর্শনে যে জিজ্ঞাসার সুর, 'কলরোলে' তাহারই প্রতিধ্বনি; কিন্তু অস্পষ্টতার কুয়াশায় কবি কোথাও নিজেকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখেন নাই—ইহাই তাঁহার সম্বন্ধে আশার কথা।

ধর্মগ্রন্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—'অধরচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত এবং শ্রীপুরাণ দাস অষ্টতীর্থ বিদ্যাবাচস্পতি কর্তৃক অনূদিত। শ্রীভোলানাথ চক্রবর্তী কর্তৃক ১৪।১, গোপীকৃষ্ণ লেন হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৫ টাকা।

গীতার এই অতি শোভন এবং সুসম্পাদিত সংস্করণখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। মূল শ্লোক, তাহার অন্বয় এবং সহজ ভাষায় ব্যাখ্যার সহিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর সারার্থবর্ষিণী টীকা প্রদত্ত হইয়াছে। পরিশিষ্টস্বরূপে শ্রীধর স্বামীপাদের সমগ্র টীকা সংযোজিত হইয়াছে। গীতাধ্যায়ীর পক্ষে প্রয়োজনীয় সর্বাংশসম্পন্ন গীতার এই সংস্করণের দ্বারা গীতা-রসপিপাসু মাত্রেই উপকৃত হইবেন। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সুন্দর। প্রচ্ছদপট শোভন।

পতিত শূদ্র উদ্ধারে বিপ্লবী শ্রীগৌরাঙ্গ—পণ্ডিত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য বিদ্যাভূষণ প্রণীত। নবদ্বীপ, শ্রীগৌরাঙ্গ মিশন হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।৵০ আনা।

লেখক বিখ্যাত সমাজ-সংস্কারক, স্বদেশ-প্রেমিক কর্মী এবং বাগ্মী। অস্পৃশ্যতাবর্জন এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের উন্নয়নকল্পে তিনি সুদীর্ঘকাল বর্ণ বৈষম্যগত সামাজিক জীর্ণ সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রবৃত্ত আছেন। আলোচ্য পুস্তকখানিতে গ্রন্থকার মহাপ্রভু-প্রবর্তিত ধর্মে বর্ণবৈষম্যগত অনাচার এবং আভিজাত্য প্রেমের প্লাবনে এবং মানবতার মহিমায় কিরূপভাবে উৎখাত হইয়াছে তাহাই দেখাইয়াছেন। প্রত্যুত লেখক বইখানাতে সমাজের উৎপীড়নমূলক দেশাচার ও সামাজিক বিধি-বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী শুনাইয়াছেন। এমন পুস্তকের বহুল প্রচারের প্রয়োজনীয়তা আছে।

বিবিধ

SELF realization Magazine—পরমহংস যোগানন্দ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। সেলফ রিয়ালিজেনশন ফেলোশিপ ৩৮৮০ সান র‍্যাফেল এভেনিউ, লস্ এঞ্জেলস, কালিফোর্নিয়া ইউ এস এ হইতে রাজর্ষি জনকানন্দ কর্তৃক প্রকাশিত।

যোগদা সৎসঙ্গ প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক মুখপত্র। পরমহংস যোগানন্দ ১৯২০ সালে আমেরিকায় এই সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পর উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স, আফ্রিকায় গোলকোস্ট, নাইজিরিয়া, জোহান্সবার্গ প্রভৃতি স্থানে এবং ভারতের অনেক জায়গাতেও প্রতিষ্ঠানের শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আলোচ্য সংখ্যা চিন্তাশীলপূর্ণ প্রবন্ধ-রাজী সন্নিবেশে মূল্যবান্। এইগুলির মধ্যে পরমহংস যোগানন্দের লিখিত অভ্যাসের পথে জীবনের উন্নয়ন, ভাগবত গীতার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা এবং বৌদ্ধাচার্য পদ্ম-সম্ভবের উপদেশাবলীর অক্সফোর্ড বিশ্ব-বিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ইংরেজীতে অনূদিত 'দি টিবেটিয়ান বুক অব লিবারেশন' গ্রন্থটির সমালোচনা বিশেষ মূল্যবান্। পদ্মসম্ভব ৭৪৭ খৃস্টাব্দে ভারত হইতে তিব্বতের তৎকালীন নৃপতির আমন্ত্রণে তিব্বতে গমন করেন। সমালোচনা সারগর্ভ এবং তত্ত্বানুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। পত্রিকাখানি পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি।

পুঁজিবাদের পরিণাম ও সর্বোদয় অর্থ-ব্যবস্থা—শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ মাইতি প্রণীত। শ্রীবিধুভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল, বনানী, কলিকাতা ৩২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷০ আনা।

আলোচ্য গ্রন্থে মহাত্মা গান্ধীর সর্বোদয় সমাজের আদর্শ অর্থনীতির দিক হইতে প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। পুঁজি-বাদ, সমাজবাদ এবং সাম্যবাদ—এই সব মতবাদ হইতে গান্ধীজীর আদর্শের বৈশিষ্ট্য এবং মানব-সংস্কৃতি ও বিশ্বশান্তির দিক হইতে সেই আদর্শের উপযোগিতা গ্রন্থকার সুন্দরভাবে অভিব্যক্ত করিয়াছেন। নানাবিধ মতবাদে বিভ্রান্ত দেশের যুবক সমাজ পুস্তকখানি পাঠ করিলে দেশসেবা এবং সমাজসেবার পথে অভিনব আলোকের সন্ধান পাইবেন।

যুগের দাবী—ধীরেন্দ্র মজুমদার প্রণীত। বিধুভূষণ দাশগুপ্ত কর্তৃক সর্বোদয় প্রকাশনী মণ্ডল, বনানী, কলিকাতা—৩২ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা।

সর্বোদয় কর্মিদলের অন্যতম নায়ক, সর্বসেবা সঙ্ঘের অধ্যক্ষ শ্রীযুত ধীরেন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয় ভূদান যজ্ঞ সম্পর্কে মুঙ্গের জেলার বিভিন্ন স্থানে যেসব বক্তৃতা করেন এবং সেই সঙ্গে প্রশ্নের উত্তর দিয়াছিলেন, আলোচ্য পুস্তকখানাতে তাহারই সংক্ষিপ্ত-সার হিন্দী হইতে অনুবাদ করিয়া প্রদত্ত হইয়াছে। এইসব ভাষণে শ্রীযুত মজুমদার মহাশয় ভূদান যজ্ঞের বৈপ্লবিক স্বরূপটি খুব সোজাভাবে উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার বিচারের ভঙ্গীতে মৌলিকত্ব আছে।

বাংলা অলঙ্কার—শ্রীজীবেন্দ্র সিংহ রায় প্রণীত। রামলাল বসু কর্তৃক ৩২, ফকির-চাঁদ মিত্র স্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৷০ আনা।

বাংলা অলঙ্কার বলিতে আমরা এখনও প্রধানত সংস্কৃত অলঙ্কারই বুঝি। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ইহার ভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য এবং আলঙ্কারিক রীতির স্বাতন্ত্র্যও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে লেখক বাংলা ভাষার এই আলঙ্কারিক বৈশিষ্ট্যগুলির ব্যঞ্জনার উপর লক্ষ্য রাখিয়াছেন এবং সহজ সরলভাবে সূক্ষ্ম তত্ত্ব বিচারের দিকে না গিয়া সেগুলির ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। তাঁহার উদ্ধৃত উদাহরণ গুলি বিষয়বস্তুকে বিশেষভাবে সুগম করিয়াছে। পুস্তকখানি শিক্ষার্থীদের জন্য লিখিত হইলেও বাংলা সাহিত্যের সাধারণ পাঠকগণও এখানি পাঠ করিয়া উপকৃত হইবেন এবং আনন্দ লাভ করিবেন।

সঙ্ঘবাণী—শ্রীমৎ স্বামী আত্মানন্দ সরস্বতী কর্তৃক কোকিলামুখ, জোরহাট, আসাম হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০ আনা।

পরমহংস স্বামী নিগমানন্দ তাঁহার শিষ্য বর্গের কাছে সঙ্ঘ সাধনার যে আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, গ্রন্থে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে এবং সঙ্ঘের বিধিবিধান নির্দেশিত হইয়াছে। পুস্তকের দ্বিতীয় পর্বে লেখক কবিতার আকারে ধর্মজীবনের সাধনা এবং আদর্শ উপস্থিত করিয়াছেন।

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

আদর্শ হিন্দী ব্যাকরণ ও অনুবাদ—শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপ্ন ও সাধনা—শ্রীসমর দে

তটিনিকা—শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়

অন দি ভল্গা—রোমান ফের অনুবাদক পরেশনাথ সান্যাল

রোম্ থেকে রমনা—দেবেশ দাশ

দুই বোন (১ খণ্ড)—আলেক্সি তলস্তয় অনুবাদক দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

মজুরি ও পুঁজি—কার্ল মার্কস

মজুরি দাম মুনাফা—কার্ল মার্কস

পরিত্রাতা বিজয়কৃষ্ণ—ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায়

শিক্ষা সমস্যার কয়েকটি দিক—শ্রীবিমল-চন্দ্র সিংহ

সাহিত্যিকী—ধীরানন্দ ঠাকুর

ভাস্করের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প—ভাস্কর

ট্রামে-বাসে

মাদ্রাজ যাত্রার প্রাক্কালে কংগ্রেস সভাপতি মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন, তাঁহার যেন মনে হইতেছে, তিনি শকুন্তলার মত পতিগৃহে যাত্রা করিতেছেন।—"তিনি রসিক এই পরিচয় পেয়ে আমরা খুশী হয়েছি। কিন্তু শকুন্তলার পতিগৃহে গমনের পরের কাহিনী খুব আনন্দদায়ক নয়, তাই আমরা শঙ্কিত হচ্ছি"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

শ্যামলাল বিশুখুড়োর কথার জের টানিয়া বলিল—"শঙ্কার খুব বেশি কোন কারণ নেই, কেননা এবার হলো অনাবাদির পর আবাদি কংগ্রেস। তবে আবাদটা ট্রাকটার চালিয়ে হবে কি হাতী চালিয়ে হবে তাই দেখবার জন্যে আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে আছি।"

* * *

যানবাহন চলাচল এবং সৌজন্য পক্ষে কলিকাতা পুলিশ শ্লোগান ছাড়িয়াছেন—অন্যের উপর সব সময় নজর
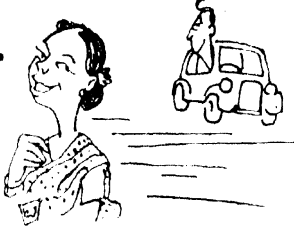
রাখবেন—। আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"কিন্তু অন্যের ওপর বেশি নজর দেওয়ার ফলেই পৃথিবীতে দুর্ঘটনা হয় বেশি, ঘরে এবং বাইরে"!!

* * *

চীনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের সময় কলিকাতার একদল দর্শক নাকি বলপূর্বক গেট্ ভাঙ্গিয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। — "চীনা প্রতিনিধিদল নিশ্চয়ই জানেন না, এ হ'লো ভারতীয় সংস্কৃতি নাট্যের একটি বিশেষ অঙ্ক"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

প্রসঙ্গত অন্য এক সংবাদে শুনিলাম কলকাতাস্থ অল্ ইন্ডিয়া রেডিও চীনা সাংস্কৃতিক প্রতিনিধিদলকে বীণা, সেতার, মৃদঙ্গ, সারঙ্গী এবং তবলা প্রভৃতি ভারতীয় বাদ্যযন্ত্র উপহার দিয়াছেন।—"খুবই আনন্দের কথা কিন্তু উপহারের তালিকা থেকে এ যুগের শ্রেষ্ঠ বাদ্যযন্ত্র ঢাক বাদ পড়ায় আমরা বিস্মিত এবং ক্ষুণ্ণ হয়েছি"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

বিহার সরকার সেখানকার কনস্টেবলদিগকে নাকি নৃত্যগীত শিখাইতেছেন।—"লাস্য না হলেও তাদের তাণ্ডব নৃত্যের সংবাদ আমরা সম্প্রতি প্রায়ই পাচ্ছি কিন্তু তাদের শিখিয়ে পড়িয়ে নৃত্যবিদ্যায় পটু করে তোলার সংবাদটা শুনলুম এই প্রথম"—মন্তব্য করে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

কোপেনহেগেনের একটি মহিলাকে নাকি সতর্ক করিয়া দেওয়া হইয়াছে তিনি যেন টেলিফোন করার সময় না হাসেন। কেননা পরীক্ষায় প্রকাশ পাইয়াছে, উক্ত ভদ্রমহিলার হাসি নাকি অদ্ভুত ধরনের এবং সেই হাসিতে অজ্ঞাত কারণে টেলিফোনের তার বিকল হইয়া যায়।—"আমাদের এখানকার ব্যবস্থা

অবশ্য অনুরূপ। এখানে নোটিশ না পেয়েও টেলিফোন করতে গিয়ে হাসির বদলে অনেকেরই কান্না পায়। টেলিফোনের তার তাতে বিকল হয় না বটে, কিন্তু নম্বরও সহজে পাওয়া যায় না"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণ মন্তব্য করিয়াছেন যে, বৃটিশ জাতীয় বৈশিষ্ট্য হইল বাইবেল্, ব্যাট এবং ব্যালট্।—"বাইবেল আর ব্যালট সম্বন্ধে

আমরা মন্তব্য করব না। তবে ব্যাটের কথাই যখন উঠলো তখন একথা বলব যে, ব্যাটের চেয়ে বলের কৃতিত্বই বৃটিশের বেশি। বডিলাইন বোলিং এক অবিস্মরণীয় ঘটনা"!!

* * *

কলিকাতাতে সম্প্রতি একটি মহিলা ইন্‌কামট্যাক্স অফিসার নির্বাচিতা হইয়াছেন।—"মহিলাটিকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি কিন্তু সেই সঙ্গে এই কথাও বলছি যে, অফিসার না হলেও ইন্‌কামের ওপর ট্যাক্স আদায়ের ব্যাপারে অনেক মহিলাই কৃতিত্ব প্রদর্শন করে আসছেন, সেখানে আয়কর ফাঁকি চলে না"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম, বোম্বাইতে নাকি আগামী মার্চ মাসে একটি রন্ধন প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হইবে।—"মোটে মা যেখানে রাঁধেন না সেখানে তপ্ত আর পান্তার বিচার অভূতপূর্ব বৈ কি" — মুখখানি বিকৃত করিয়া বলিলেন বিশুখুড়ো।

হিন্দী বাক্যের প্রয়োগ

সবিনয় নিবেদন,

আপনাদের বহুল-প্রচারিত সাপ্তাহিকের আলোচনা-বিভাগে আমার এই ক্ষুদ্র পত্রটি প্রকাশিত হলে হিন্দী শিক্ষার্থী বাঙালী ভদ্রজন উপকৃত হবেন বলে আমার বিশ্বাস। কোন কোন বাংলা গল্প ও উপন্যাসে হিন্দী কথার ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। সেটা কিছু দোষের নয়। কিন্তু দুঃখ হয় তখনি যখন দেখি নামজাদা সাহিত্যিকও হিন্দী বাক্যের ভুল প্রয়োগ করে থাকেন। এই ক্ষুদ্র পত্রে সে-সবের বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ নেই। আমি শুধু একটা দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই, যে-দিকটায় হামেশাই ভুল প্রয়োগ নজরে পড়ে।

হিন্দীর বৈশিষ্ট্য এই যে, ষষ্ঠীবিভক্তি-যুক্ত সম্বন্ধপদটি সর্বত্রই বিশেষণপদরূপে ব্যবহার হয় এবং সেই পদটি পরবর্তী বিশেষ্যের লিঙ্গের দ্বারা প্রভাবিত হয়। যেমন, 'আমার ছেলে' হিন্দীতে 'মেরা লড়্‌কা' (উচ্চারণ, ল্যাড়্‌কা) এবং 'আমার মেয়ে' 'মেরী লড়্‌কী' (ল্যাড়্‌কী) হবে। এখন, বাপ যদি বলেন, 'আমার মেয়ে' তবুও 'মেরী লড়্‌কী'ই হবে। আমার মা যখন বলেন, 'আমার ছেলে' তখনও 'মেরা লড়্‌কা'ই হবে। সুবিখ্যাত 'মহাপ্রস্থানের পথে'র লেখকও ভুল করে বসেন যখন তিনি এক পাঞ্জাবিনীর মুখ দিয়ে বলান, "মেরী লাল"। 'মেরা লাল'ই হবে, 'মেরী লাল' কিছুতেই নয়। ইতি—গোপালচন্দ্র দাস, জামশেদপুর।

চারুকলা প্রদর্শনী প্রসঙ্গে

গত ১৫-১-৫৫ সংখ্যায় সংখ্যার দেশে শ্রীকৃষ্ণা চৌধুরীর 'চারুকলা প্রদর্শনী প্রসঙ্গে' লেখা সত্যিই সময়োপযোগী হয়েছে এবং তিনি এই বিষয়ে নতুন আলোকপাত করেছেন। আমি এজন্য লেখিকাকে ধন্যবাদ জানাই।

আলোচনা

আর্ট কলেজের অধ্যয়ন শেষ করে তো বার হলেন শিল্পী। কিন্তু তারপর? কি করে তার জীবিকা নির্বাহ হবে, কি করে তিনি কর্মক্ষেত্রে ও শিল্পক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত হবেন, এ সমস্যা বহুদিনের। তারপর ব্যবহারিক আর্টের নাম শুনলে তো অনেকে নাসিকা কুঞ্চন করেন, বলেন,—'কমার্শিয়াল আর্ট? ওর কোন মূল্য নেই।' কমার্শিয়াল আর্ট বলতে শুধু বিজ্ঞাপনের ছবি আঁকা বুঝায় না। বিশুদ্ধ আর্টে যার যথেষ্ট দখল আছে, সেই ব্যবহারিক আর্টে নূতন সৃষ্টি করতে পারে। এই ধরুন, কোন প্রসিদ্ধ ফার্ম শিল্পাচার্য শ্রীযুত নন্দলাল বসুর একখানি প্রকৃতির ছবি চিত্র-প্রদর্শনী থেকে ক্রয় করে এনে যদি দেওয়াল পঞ্জিকারূপে ব্যবহার করেন, তখন সেই ক্যালেণ্ডার কোন্‌ শিল্পের পর্যায়ভুক্ত হবে? আমি শুধু ব্যবহারিক আর্টকে শিল্প সাধনার একমাত্র পথ বলে উল্লেখ করছি না। আমার বলার মুখ্য উদ্দেশ্য হল, কলেজের সীমানা অতিক্রম করে শিল্পীরা যাতে দুবেলা পেট ভরে খেতে পায়, জনসাধারণ, দৈনিক-মাসিক পত্র-পত্রিকা ও সরকারের দৃষ্টি যেন সেদিকে আকৃষ্ট হয়।

যা হোক এই বিষয়ে মাসিক, দৈনিক, সাপ্তাহিক পত্র-পত্রিকাতে নিয়মিতভাবে আলোচনা হওয়া উচিত। —শ্রীঅর্ধেন্দু-শেখর দত্ত, ১৫।এ, গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৬।

কয়েকটি বক্তব্য

মহাশয়,

উপরের ঠিকানা থেকেই বুঝতে পারবেন, দেশ থেকে প্রায় ২ হাজার মাইল দূরে বসে আপনাকে লিখছি। নিজের দেশের সঙ্গে যোগসূত্রটুকু রেখেছে "দেশ"। তাই প্রথমেই আমার কৃতজ্ঞতাটুকু জানিয়ে রাখছি।

২২ বর্ষ ৭ম সংখ্যা (১৮ই ডিসেম্বর) সম্বন্ধে আমার গুটিকয়েক বক্তব্য আছে।

"সাময়িক প্রসঙ্গের" প্রথম লাইনে নব-নির্বাচিত কংগ্রেস সভাপতির নাম লিখেছেন, "শ্রীযুত নবলশঙ্কর ধেবর"। ওটাতে একটু ভুল রয়ে গেছে। ও'র নিজস্ব নাম হলো শ্রীউচ্ছ্রঙ্গ রায়। আপনারা শুনে থাকবেন, দক্ষিণ ভারতীয়, মারাঠী এবং গুজরাটিরা প্রথমে নিজনাম উল্লেখ করে, পরে পিতার নাম যুক্ত করে। সবশেষে থাকে পারিবারিক পদবী বা উপাধি। "নবলশঙ্কর" ও'র পিতার নাম।

আপনাদের "অবিস্মরণীয়" নামে কবি-গুরুর সংকলনটি খুবই ভালো লাগলো। "অরবিন্দ" সম্বন্ধে দু'চার ছত্র দিলে ওটি সর্বাঙ্গসুন্দর হতো, মনে হয়।

৪৭০ পৃষ্ঠায় "গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত" শীর্ষক প্রবন্ধে তৃতীয় কলমে হর্ষদেব বলেছেন, পৃথিবীতে প্রাণের স্থিতিকাল ৩০ কোটি বছর। আমরা ভূ-বিজ্ঞানীরা জানি, ওটা আরও বেশী। আমাদের বিন্ধ্যশ্রেণীর কতকগুলি শিলাস্তরে "ফারমোরিয়া মিনিমা" নামে এক অমেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তাদের বয়স নির্ণীত হয়েছে ৫১ কোটি বছরেরও বেশী এবং এদেরই পৃথিবীর মধ্যে আদিমতম প্রাণী বলে স্বীকার করা হয়।

"আবু ভ্রমণ" প্রসঙ্গে শুভঙ্করের একটি উক্তির আংশিক প্রতিবাদ শ্রীশান্তিকুমার মুখোপাধ্যায় ৮ম সংখ্যায় করেছেন দেখলাম। আমি ওটা সম্পূর্ণ করে দিতে চাই। গুজরাটি ভাষাতেও "আপনি" কথাটার প্রতিশব্দ আছে। সেটা হ'ল "আপ"। যদিও কথাটা হিন্দী থেকে ধার করা, তবুও এর গুজরাটি পদ্ধতিতে আলাদা ও নিজস্ব শব্দরূপ আছে। আর গুজরাটিতে তুই এরও প্রতিশব্দ হ'ল মাড়োয়ারীদের মতো 'তু'। তবে নানাস্থানে নোটিশে 'আপনি'সূচক শব্দের ব্যবহার এরা কেন করে না, সে প্রশ্ন আলাদা। আমার এখানকার স্বল্পদিনের অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, এ অঞ্চলের সামাজিক শালীনতাবোধের" নিরিখটা একটু ভিন্ন। ইতি—

শ্রীসুরজিৎকুমার গুহ, ভূজ, কচ্ছ

ইউরেনিয়াম

মহাশয়,

বসু বিজ্ঞান মন্দিরের প্রতিষ্ঠা দিবসে প্রদত্ত ভাষণে অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু বলেছেন—"আমাদের দেশে ইউরেনিয়ামের বৃহৎ আকর এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয়নি......"

সেদিন বরোদায় বিজ্ঞান কংগ্রেসে পদার্থ ও রসায়ন বিদ্যা শাখায় আণবিক শক্তি উৎপাদন সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে আণবিক শক্তি কমিশনের সভাপতি ডাঃ এইচ জে ভাবা বলেন, "আণবিক শক্তি উৎপাদনের উপাদান ইউরেনিয়াম আমাদের দেশে প্রচুর পাওয়া যায়।"

এই দুইটি উক্তির কোনটা সত্য? আমার মনে হয়, অধ্যাপক বসুই ঠিক বলেছেন। ভারতে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইউরেনিয়াম অতি অল্পই আছে। সম্প্রতি মহীশূরে একটি প্রথম শ্রেণীর ইউরেনিয়াম আকর আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু সেখানে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ প্রায় শতকরা ০.২ ভাগ। ইতি—শ্রীকার্তিকচন্দ্র চক্রবর্তী, ৫এ, রাজবল্লভ স্ট্রীট, কলিকাতা—

চীন ও শ্যামের নৃত্যগীত

গত দু'সপ্তাহ কলকাতার প্রমোদক্ষেত্র আন্তর্জাতিক নৃত্যগীতের প্রায় একটা সম্মেলনে পরিণত হয়েছিল। চীন থেকে আগত চীনা শিল্পী প্রতিনিধিদল এসে হাজির হয়েছিলেন, এবং অত্যন্ত আকস্মিকভাবে কলকাতার আসরে পাওয়া

—শৌভিক—

যায় তাইল্যাণ্ডের (শ্যাম) একদল শিল্পী। তাইল্যাণ্ডের শিল্পীবৃন্দ ঢাকায় অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক নৃত্য-গীত উৎসব সেরে দেশে ফিরছিলেন। পথে কলকাতায় তারা এসে উপস্থিত হন দেশে ফেরবার বিমান ধরার জন্য: এখানে ওদের কোন প্রদর্শনীর ব্যবস্থা ছিল না। ওদের স্বল্পকালের অবস্থানের সুযোগে মহাবোধি সোসাইটির কর্তৃপক্ষ তাঁদের অনাথ-আশ্রমটির সাহায্যার্থে রঙমহলে গত রবিবার সকালে এবং সোমবার সন্ধ্যায় একটি করে দুটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়। পরে রাজ্যপালের পৃষ্ঠপোষকতায় মঙ্গলবারও একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। পরে রাজ্য- এই অতর্কিত প্রদর্শনী কলকাতার সুধীজনকে চীনের ঠিক পরই ওরই এক প্রতিবেশী রাষ্ট্রের নাচ দেখবার একটা সুযোগ পেয়ে যায়।

* * *

চীনা শিল্পীবৃন্দ কলকাতায় একদিন নিউ এম্পায়ারে এবং তিনদিন রণজি স্টেডিয়ামে তাঁদের দেশের নৃত্যগীতাদি পরিবেশন করেন। চীনের নাচগান ওদের নিজস্ব মৌলিক জিনিস, যার ধারা প্রবাহিত হয়ে আসছে কয়েক হাজার বছর ধরে। আসরে তাঁরা ক্ল্যাসিকাল ও লোকনৃত্য দুই-ই পরিবেশন করেন। সব বিষয়েই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায়, একটা বিরাট ঐতিহ্যের ছাপ রয়েছে সব জিনিসেরই অঙ্কশায়ী হয়ে। কণ্ঠসংগীতের দিকটা কেবল কেমন কেমন লাগলো। ক্ল্যাসিকাল এবং লোকসংগীত বলে যা ওরা পরিবেশন করে গেলেন তার সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য সংগীতেরই অদ্ভুত মিল পাওয়া গেল। পাশ্চাত্ত্য সংগীতের প্রভাব চীনের ক্ল্যাসিকাল গানের ওপরেও পড়েছে, না চীনের সংগীতই বহুকাল পূর্বে পাশ্চাত্ত্য সংগীতকে প্রভাবিত করেছে সেটা একটা ভাববার বিষয়। আরও দেখা গেল গানের ক্ষেত্রে ওরা একমাত্র পিয়ানো সংগতই ব্যবহার করে গেলেন। চীনের বাদ্যযন্ত্র যেগুলি দেখা গেল, সেগুলি আকারে ও প্রকারে অতি প্রাচীন। বেশী দেখা গেল তারের যন্ত্র। সবই সাদাসিধে যন্ত্র—একতারা, দোতারা, তিনতারা জাতীয়। ধনুকের মতো বাঁকা ছোট বড় ছড় টেনেও বাজানো হয়, আবার টোকা দিয়েও বাজানো হয়। জটিল যন্ত্র বলতে ভারতীয় সুরমণ্ডলের মতো একরকম যন্ত্র দেখা গেল এবং দেখা গেল, ওরা এই যন্ত্রটিকেই

সবচেয়ে ওপরে স্থান দিয়েছেন; এটির নাম রেখেছেন চেঙগ; এতে তার আছে তেইশটি। প্রকারের দিক থেকে চীনেতে বাদ্যযন্ত্র সংখ্যায় মাত্র ১৩০। তুলনামূলক বিচার বাদ দিয়ে শুধু এইমাত্র উল্লেখ করা যায় যে, ভারতে কেবলমাত্র চামড়ার যন্ত্রই, কোন কোন পণ্ডিতের মতে ৪৫০-রও বেশী। লম্বা বাঁশীর ব্যবহার দেখা গেল এদের মধ্যে। তাম্বরিন বা বড়ো খঞ্জরী, জাইলোফোন জাতীয় যন্ত্র, ঝাঁঝর, ঘণ্টা, আলতোভাবে কাঠি দিয়ে একধার বাজাবার ঢোলক প্রভৃতির ব্যবহারও দেখা গেল। কয়েকটি লোকসংগীতের মধ্যে নাগা অঞ্চলের মতো সুরের আভাস পাওয়া গেল। চীনেরও লোকসংগীত-নৃত্যের উৎস হচ্ছে খেত-খামার আর উপত্যকা অঞ্চল।

* * *

ক্ল্যাসিকাল ও লোকগীতি মিলিয়ে খান পাঁচেক গান এরা পরিবেশন করেন। একখানি গান ছিল হিন্দীতে হারীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় রচিত "হিন্দী চীনি ভাই-ভাই"। ঠিক এই ভাব নিয়ে ওদেরও হো লু তিন রচিত চীন-ভারত মৈত্রী সম্পর্কে একখানা গান পরিবেশিত হয়। চারটি মেয়ে ও চারটি ছেলের সম্মেলক গান দুখানিই। ওদের বিখ্যাত গীতি-নাট্য "শুভ্রকেশী কন্যা" থেকে একখানি গান শোনানো হয়। "আমাদের প্রিয় সিনকিয়াং" গানখানিতে মাও-সে তুং'য়ের জয়গান করা হয়। নাচ যা পরিবেশিত হয় তার অধিকাংশ ওদের কোন গীতিনাট্যের অংশ থেকে তুলে নেওয়া, তাছাড়া অন্য নাচও আছে এবং সব মিলিয়ে একটা বিপুল বৈচিত্র্যের সম্ভার সামনে এনে দেওয়া হয়। সুনির্বাচিত নাচ, যার সবই একান্ত প্রাচ্যেরই জিনিস বলে অনুভব করা যায় এবং কোন কোন নাচে মণিপুরী ও কথাকলি নাচের একটু আধটু সাদৃশ্যও খুঁজলে পাওয়া যায়। মুখ ও হাতের ভঙ্গীর ওপরেই যতো কিছু ভাব প্রকাশের কাজ। ভারতীয় ধরনের মুদ্রার ভাষায় ভাব প্রকাশ নয়। প্রায় সব নাচের মধ্যেই একটা কসরতি ভাব পাওয়া যায়। এমন সব নৃত্যরচনা ও ভঙ্গী কৌশল যা দেখে আনন্দটা আসে অনুভূতিকে বিস্ময় ও রোমাঞ্চ জাগিয়ে তুলে। দেখেই মনে হবে, বহু পরিশ্রম ও অধ্যবসায় রয়েছে প্রত্যেকটি নাচের পিছনে। এক্রো-ব্যাটিকসকে এরা যুগ যুগ সাধনার দ্বারা শিল্প পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন। নাচের মধ্যে দিয়ে দর্শক মনে চমক সৃষ্টি করার ভাবটাই প্রধান। সেটা নাচের ভঙ্গীর মধ্যে যেমন প্রকাশ পায়, তেমনি সাজসজ্জাতেও। অত্যন্ত জমকালো সাজ, বিচিত্র বর্ণসমন্বয়। রূপসজ্জায়ও রেখা স্পষ্ট, বেশ চড়া রঙ ব্যবহার করেন, পুতুলের মতো স্থির লক্ষণ; চোখের তারা ও ভ্রূকুঞ্চনের সাহায্যে যথাযথ অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তোলা হয়।

* * *

অতি ললিত ভঙ্গীর নাচের মধ্যে এদের "কমল নৃত্য" দীর্ঘকাল মনে থাকবে। পদ্মের মতো সাজ, চলার ভঙ্গীতে জলে ভেসে বেড়ানোর মতো দেখায়। দক্ষিণ শেনসির একটি লোক-

নৃত্য। দেশের স্তুতি, যার ভাবার্থ হচ্ছে—সবুজ জল আর নীল আকাশ; পদ্ম-পাপড়ির দৃষ্টি সূর্য পানে আর তার সুবাস হাওয়ায় ভেসে চলেছে দূরে; আমাদের মাতৃভূমিও পদ্ম-পাপড়ির মতো, সুন্দর আর উজ্জ্বল। ললিত ভঙ্গীর চমৎকার আর একটি নিদর্শন 'প্রজাপতি ধরা'। বসন্তে চারিদিকে ফুলের সাজ। হাতে সাজি নিয়ে মেয়ের দল চা-ফুল তুলছে, হঠাৎ একটা প্রজাপতির আবির্ভাব। হাতের পাখা দিয়ে মেয়েদের সেটা ধরবার চেষ্টা নিয়ে এই নাচ। ফুলের মতো ফুটফুটে মেয়েদের সাজপোশাকের বর্ণসমন্বয় দেখেই বসন্তের কথা মনে আসবেই। একটি ছেলে বড়ো কাগজের প্রজাপতি একটা ছড়ির ডগায় বসিয়ে মেয়েদের সামনে ধরতে থাকে আর মেয়েরা পাখা চাপা দিয়ে সেটা ধরার চেষ্টা করে কিন্তু বার বার তা ফসকে যেতে থাকে। বহু ভঙ্গীবৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় প্রজা-পতিটি ধরার চেষ্টায়। মণিপুরি নাচের মতো লতায়িত হাতের ভঙ্গী দেখা যায় এ'দুটি নাচে। লাস্যভঙ্গীর নাচ। রুদ্র ও ভয়ঙ্কর ভঙ্গীর চমকপ্রদ উদাহরণ পাওয়া গেল "বানররাজের স্বর্গ আক্রমণ" নৃত্যনাটিকাটিতে। হাজার বছর আগে ৎং রাজত্ব থেকে মিঙ রাজত্বকালে ভিক্ষু হুয়েন চ্যাঙের ভারত পরিভ্রমণ অবলম্বনে প্রচলিত কিংবদন্তীসমূহ নিয়ে রচিত "পশ্চিম যাত্রা" উপন্যাস থেকে এই নাচটির উপাদান আহরণ করা হয়েছে। উপন্যাসের নায়ক বানররাজ সান উকুঙগ দেবতাদের শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলে। এটা হচ্ছে শ্রমিকদের নিজেদের শক্তিতে প্রকৃতিকে পরাভূত করার প্রতীক। দেব-রাজ সান উ-কুঙগকে দুর্দমনীয় শত্রু বুঝতে পেরে তাকে সন্তুষ্ট করার জন্য "স্বর্গতুল্য গরীয়ান" উপাধি দিয়ে তাকে স্বর্গের পীচবাগানের রক্ষকপদে অধিষ্ঠিত করতে চাইলেন। কিন্তু বানররাজ তাতে ভোলবার পাত্র নয়। দেবরাজ মহিষীর জন্মদিনে সান উ-কুঙগ স্বর্গে এক দাঙ্গা বাধালে। পীচগুলো নিলে চুরি করে, আর অন্যান্য ফল ও সুরা সব ধ্বংস করে নিজের রাজ্যে ফিরে এলো। দেব সেনা-পতির ওপর হুকুম হলো বানররাজকে ধরে আনতে, কিন্তু দেবতারা সাংঘাতিক-ভাবে পরাস্ত হলো। অদ্ভুত মুখোস ও মুখে রঙের কাজ; মিল তেমন না থাকলেও কথাকলির কথা মনে করিয়ে দেয়। দেব-রাজ ও দেব সেনাপতির জাঁদরেল মুখোশ ও পোশাক অতি রহস্যময় রূপকথার দেশের চমক এনে দেয়। ছক কাটা কসরতি নাচ। অত্যন্ত মাপাজোখা হিসেবী বিন্যাস। ওরই মাঝে রূপোর একটা ঝকঝকে লাঠি হারোয়া কায়দায় ঘুরিয়ে অদ্ভুত একটা বর্ণচক্রের সৃষ্টি ক'রে লোককে তাক লাগিয়ে দেওয়া হয়। অন্য সমস্ত দিক থেকেও নাটকটি সর্ব-ক্ষণই তাক লাগিয়ে দেয়। বানররাজের চরিত্রে লি শাও-চুনের বহুমুখী ভঙ্গী কৌশল এবং রঙমাখানো মুখে তার অভিব্যক্তি একাধারে বীর ও হাস্যরস পরিবেশন করে যায়। এমনি হাসি ও একক কৃতিত্বের পরিচয় দেন নর্তকী তাই আই লিয়েন তাঁর "দাদুর পিঠে চড়া" নাচটিতে। এটা ঠিক নাচ নয়, মুখাভিনয়ই

চীনা যন্ত্রবাদ্য—একতারা, দোতারা, ব্যাঞ্জো, ম্যাণ্ডোলীন, সুরমণ্ডল বাঁশী জাতীয় যন্ত্র সহযোগে ঐক্যতান বাদন

বলা যায়। নর্তকীর কোমরের সঙ্গে ঝোঁকা অবস্থায় অতি বৃদ্ধের একটা মূর্তি এমনভাবে বসানো যে দেখা মাত্রই মনে হবে, এক বৃদ্ধের পিঠে একটি বালিকা চড়ে রয়েছে। এর আখ্যানভাগ হচ্ছে বসন্তের ফুল ফোটানো একটা দিনে নাতনীকে পিঠে নিয়ে দাদু চলেছে। হঠাৎ নাতনীর আবদার পিচফুল পাড়বার। নাতনীকে পিঠে নিয়ে দাদু টিলার ওপরে চড়তে চেষ্টা করলে। এবড়ো-থেবড়ো পথ। অনেক চেষ্টা করে দাদু উঠলো, তারপর একটা সাঁকো পার হয়ে ওরা বাড়িমুখো হ'লো। নাতনীকে পিঠে নিয়ে এবড়ো-থেবড়ো পথে বৃদ্ধের টলে টলে চলা, হোঁচট্ খাওয়া প্রভৃতি ভঙ্গী অতি অবিকল। এমনি মূক অভিনয়ের আর একটি চমৎকার দৃষ্টান্ত পাওয়া গেল "শারদপ্রবাহিনী" নৃত্য দৃশ্যে। এক তরুণী তার প্রেমিকার কাছে যাবে। বৃদ্ধ রসিক মাঝি তরুণীর চোখ দেখে মনের কথা বুঝে তাকে নিয়ে খানিকটা রসিকতা করলে। নৌকা, দাঁড় কিছুই নেই, অথচ এরা এমন ভঙ্গী করতে লাগলো যে, স্পষ্ট চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওদের নৌকায় চলার দৃশ্য। নৌকা টলছে, কাৎ হচ্ছে, বাঁক ঘুরছে সব স্পষ্ট হয়েছে ভঙ্গীতে। এতে মাঝি ও তরুণীর চরিত্রে অভিনয় করেন যথাক্রমে হুয়াং চু-হুয়া এবং ইয়ে শেন-চ্যাঙ্গ।

* * *

এদের গীতিনাট্য ও নাটকের অভিনয়ে আবহ-গান, আবৃত্তি বা সংলাপ অতি কচিত। নাচ ও মূকাভিনয়েই পরিসর জুড়ে থাকে আর সেই সঙ্গে দৃষ্টি আকর্ষণ করে রাখে বিমোহিত বর্ণের সাজ-পোশাক। সব জিনিসটা এমনিভাবে বিন্যস্ত যে, যে কোন বয়সের লোকই দেখে আনন্দ উপভোগ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নৈতিকতার দিক থেকেও যথেষ্ট শিক্ষালাভ করে। নিজেদের সুপ্রাচীন ঐতিহ্য মেনে চলার লক্ষণ সর্বক্ষেত্রেই পরিস্ফুট। সব বিষয়েই একটা মৌলিক অভিগতি পাওয়া যায় এবং পুরাতনের মধ্যেও অভিনবত্ব জাগিয়ে রেখে দিয়েছেন। এরা নাটকও যা পরিবেশন করে গেলেন তাও অন্যরকমের জিনিস। "তিন শয়তানের বিনাশ" নামক একখানি নাটকের অংশ পরিবেশন থেকে তা বোঝা গেল। দেড় হাজার বছর আগের জিন রাজত্বকালের একটি ঐতিহাসিক চরিত্র নিয়ে গল্প। ইসিং গ্রামে থাকতো চৌ চু নামে এক দুর্ধর্ষ শক্তির মাতাল। লোকে চৌ চুকে ঘৃণা করে সে অঞ্চলের এক শয়তান বাঘ, দ্বিতীয় শয়তান একটা কুমীরের সঙ্গে ওকে তৃতীয় শয়তান বলে অভিহিত করে। বন্ধু পুত্র উচ্ছন্নে যায় দেখে চৌ চুর পিতৃবন্ধু শিহ্ চি তাকে শোধরাবার চেষ্টা করলে। একদিন পথে দেখা হতে শিহ্ চি বাঘ আর কুমীরটাকে লোকে কি রকম ঘৃণা করে সেটা চৌয়ের কানে তুলেই চৌয়ের দুষ্কার্যের কথা বিবৃত করলে চৌ গিয়ে বাঘটাকে মেরে, কুমীরের সঙ্গে লড়াইয়ে নামলো। তিন-দিন খবর না পেয়ে লোকে চৌয়ের মৃত্যু ধরে নিয়ে শয়তান নিপাতে উৎসবে মেতে উঠলো। কুমীরকে হত্যা করে চৌ ফিরে তার সম্পর্কে লোকের ধারণার কথা জেনে লজ্জিত হলো। চৌ এর পর থেকে শিহ্‌র উপদেশ মতো চলে ভালো হয়ে উঠলো এবং একদিন মস্তো সেনাধ্যক্ষও হয়েছিল। চৌ ও শিহ্‌র প্রথম সাক্ষাৎ দৃশ্যটিই এ'রা পরিবেশন করেন। লি হো-শেঙ্গ ও য়ুয়ান শিহ্-হাই এতে অভিনয় করেন। গীতিনাট্য বা নাটকের এ'রা নির্বাচিত দৃশ্যই দেখান এবং যদি সব দৃশ্যই এই রকমই হয় তাহ'লে বলতে হবে, ওদের নাটক বা গীতিনাট্য দেখতে দর্শকগণ নিস্তেজ হয়ে পড়ার বা এক-ঘেয়েমী বোধের কোন ফাঁক পায় না। অদ্ভুত ধরনের অতি জমকালো সাজ-পোশাক, তীব্র বর্ণচ্ছটা এবং স্পষ্ট ভঙ্গী মিলে দৃষ্টিতে সারাক্ষণই চমকের একটা ঘোর ধরিয়ে রেখে দেয়। সেটা কি নাচ, কি গীতিনাট্য, আর কি নাটক সবেরই বেলায় পাওয়া যায়। এক সঙ্গীতের

কটা ছাড়া আর সবের মধ্যেই অতি লষ্ঠ শিল্পশক্তির পরিচয় পাওয়া য়েছে। যা দেখিয়ে গেলেন সবই ওদের ্ডিশনাল জিনিস যার সঙ্গে মিশে য়েছে ওদের কয়েক হাজার বছরের স্মৃতি।

*   *   *

শ্যাম দেশীয় নাচের মধ্যে ভারতীয় ভাব অতি স্পষ্ট দেখা গেল। এক সময়ে দেশেরই সংস্কৃতি চালান গিয়েছে খানে। ওরাও ওদের দেশের ক্ল্যাসিকাল লোকনৃত্য দেখিয়ে গেলেন। সাজ-শাক, ভঙ্গী সবেরই ভারতের সঙ্গে বই মিল পাওয়া যায়। এদের প্রায় ই লাস্যভঙ্গী। অতি ললিত কমনীয় গী, তবে প্রায় সবই বিলম্বিত লয়ের। যন্ত্রের দিক থেকে এরা বেশী ভক্ত টা জাতীয় বাদ্যের। এদের সবচেয়ে য় বাজনা গঙ—পর্দা মাফিক অর্ধ-াকারে বসানো। দুটো কাঠির মুদু তে বাজানো হয় দু'হাতে। তেমনি ছে কাঠের পাত সাজানো জাইলো-ন। মাদলের মতো দেখতে ঢোলক ছে তবে আওয়াজটা ঢপঢপে এবং অতি দে একভাবে শুধু ঠেকা দেওয়া হয়। টি ঢোল নিয়ে নাচ রয়েছে, অনেকটা ণপুরী পুংচোলমের মতো। প্রায় সব জনার সঙ্গেই খঞ্জনীতে তাল রাখা হয়। র মতো গুটি কয়েক ছোট বাজনা কারে সাজানো তবলা-তরঙ্গ জাতীয়। জপোশাকে রঙের ছন্দ লক্ষ্য করার য়। সাজপোশাকে পুতুলের মতো কটুকে চেহারা দেখায় ওদের।

*   *   *

'প্রজাপতি ধরা'—ফুলের মতো মনো রম রঙের সাজ-পোশাক, হাতে ফুলের সাজি আর হাতে পাখা—পুষ্পচয়নের ভঙ্গী

ক্ল্যাসিকাল নাচে রামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করা হয়। এ'রা দেখালেন সূর্পণখার নাসিকাচ্ছেদ অধ্যায়টি। ওদের নিজেদের পৌরাণিক কাহিনীও নাচের বিষয়বস্তু হিসেবে পাওয়া যায়। করুণ ও লাস্য এই দুই রসই এদের নাচে প্রাধান্য পেয়েছে। যতোগুলি নাচ এ'রা দেখালেন তার মধ্যে কোথাও অতি সামান্যও উদ্দামতা নেই। হাতের সঙ্গে পায়ের ছন্দ রেখে। মিষ্টি পেলব গতি কিন্তু ছন্দোবৈচিত্র্য সম, বাজনার সুরেও ছন্দ কম। অঙ্গে এদের কোন গহনা ব্যবহার করতে দেখা গেল না, তবে গোড়ালী, কব্জি ও বাহুতে মল, বালা ও তাগা পরার জায়গায় মখমলের ওপর জরির কাজ করা ফিতে জড়ানো। সরু চুড়ো টোপর জাতীয় মস্তকাবরণ এ'রা প্রায় প্রত্যেক নাচেই ব্যবহার করেন, তবে এক এক নাচে এক এক রঙের ও প্রকারের। নাচের অনেক ভঙ্গীতে প্রতিবেশী চীনের প্রভাবও বর্তমান। কতক নাচে মেয়েরাই পুরুষের বেশে অবতরণ করলেন; এদের পুরুষের পোশাকটাও অতি মেয়েলী। ভারতীয় প্রভাবের দৃষ্টান্ত কেবল রামায়ণের আখ্যান অবলম্বনেই নয়, এদের নাম ও আচার-আচরণের মধ্যেও পাওয়া যায়। শিল্পীদের মধ্যে নাম হচ্ছে মেয়েদের তোঙগড়ী নখদন্দ্রী, লজ্জা দিস্তপাণ্য, কেশকাও মহাবিশুধি, বেসাত্রি রুদ্রবর্ণিত, মালিনী সাগরিক, স্বপাক অনন্তসুপ, খণিগর সারতোয়ন। পুরুষ-দের নাম প্রসঙ্গ মুণ্ডিয়াচাইও, শালক বোধিসমতোন, শক্তিক বংশবানলু, ফাঙ্গ বুয়াইয়ম ও সঙ্গ গজরত্ন। পরিচালিকা ছিলেন শ্রীমতী লন্দা শিল্পানলেঙ, সংগীত পরিচালক প্রসিধ শিল্পবনলেঙ।

"শ্যামলী"-র সাফল্য

স্টার থিয়েটারে "শ্যামলী" ভারতীয় নাট্যজগতে এক অভূতপূর্ব কীর্তি স্থাপন করেছে। মাস পনেরো আগে নাটকখানি প্রথম উদ্বোধিত হয় এবং সেই থেকে সপ্তাহের পর সপ্তাহ ঐ একই জায়গায় এবং প্রায় একই শিল্পিগোষ্ঠী নিয়ে পর পর অভিনীত হয়ে চলেছে।

বাস্তবধর্মী ও বহির্দৃশ্যপ্রধান—জীবন-সংগ্রামের ছবি 'রিক্সাওয়ালা'র একটি পথের দৃশ্যে মাঃ মাসিক ও সুখেন

গত শনিবার তিনশত রজনী অভিনয় উদ্‌যাপন উপলক্ষে রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্র-কুমার মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে একটি স্মারক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। "শ্যামলী"র চলার আরও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, এই এতো রাত্রি ধ'রে যে চলছে তার প্রায় প্রত্যেক প্রদর্শনীই পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে দর্শক আকর্ষণ করেছে এবং আজও ক'রে চলেছে। এ পর্যন্ত প্রায় লাখ তিনেক লোক নাটকখানি দেখেছেন যার মধ্যে বহু বিদেশীও আছেন। এটা একটা 'ফেন-মেনন'-এর চেয়ে কম কিছু নয়। এবং আজ এমন হয়ে দাঁড়িয়েছে যে, কলকাতার কেউ "শ্যামলী" দেখে না থাকলে সেটা তার পক্ষে লজ্জার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বাইরে থেকেও কেউ এলে "শ্যামলী" দেখাটা কালীমন্দির দর্শনের সঙ্গে তার ভ্রমণসূচীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে থাকতে দেখা যায়।

"শ্যামলী"-র কেন এই জনপ্রিয়তা সেটা বিশ্লেষণ করে দেখা দরকার। সেদিনের স্মারক-উৎসব অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি শ্রীচপলাকান্ত ভট্টাচার্যের মতে, কাহিনীটির মূলমন্ত্রের সঙ্গে এদেশের সমাজ ও সংস্কৃতির নিবিড় যোগ রয়েছে ব'লেই কাহিনীটি এদেশের মর্মস্থলে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছে। এ যোগটা হচ্ছে স্ত্রী-পুরুষের সম্পর্ক নির্ণয় নিয়ে যার ভিত্তি বিয়ের মন্ত্র "ওঁ গৃহ্ণামি"-তে। নায়ক বোবা ও কালা মেয়ের সঙ্গে তাকে প্রতারিত করে বিয়ে দেওয়া হয়েছে জেনেও স্ত্রীকে ত্যাগ করা তো দূরের কথা বরং বিয়েতে পড়া মন্ত্রটির কথা স্মরণ করে তার সেই স্ত্রীকেই গ্রহণের জন্যে বিরোধীদের সঙ্গে সংঘাতে অবতীর্ণ হলো। নায়কের এই যে জয়, এটা বিয়ের সেই মন্ত্রের জয়, তথা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির জয়। "শ্যামলী"-র সাফল্যের আরও একটা কারণ নির্ধারণ করেন প্রখ্যাত অভিনেতা শ্রীঅহীন্দ্র চৌধুরী। তিনি জোর দেন "শ্যামলী"-র অভিনয়শিল্পীদের আন্তরিকতার ওপরে, যে আন্তরিকতা অধুনা শিল্পীদের মধ্যে থেকে চলে যেতে বসেছে। প্রথম দিন যাঁরা অভিনয়ে নেমেছিলেন তাঁদের প্রায় সকলেই আজও অভিনয় করে যে যাচ্ছেন তা বড়ো কম কথা নয়। এঁদেরই মধ্যে একজন প্রধান ভূমিকাভিনেতার মাতৃ-বিয়োগ হয়, কিন্তু তবুও তিনি অভিনয় থেকে ছুটি নেননি। মাঝে মাঝে কেউ বা নিজে অসুস্থ হয়েছে, অথবা কারুর বাড়ির অসুখ বিসুখ ঘটেছে, কিন্তু অভিনয়ে কেউ কোনদিন কামাই হননি। বিরল আন্তরিকতা নিঃসন্দেহে। এবং এ আন্তরিকতা বাঙলা মঞ্চের উন্নততর ভবিষ্যতেরই সূচনা। এছাড়াও মনে হয় আরো কিছু কারণও আছে "শ্যামলী"কে এমনিভাবে চালিয়ে নিয়ে যাবার। যদি থাকে তাহ'লে সেগুলোও বিশ্লেষণ ক'রে জানা দরকার।

শ্যামদেশীয় নাচ

মণিপুর সুন্দরী নূতন মঞ্জুশ্রী—প্রস্তাবিত "দি জাংগল কুইন অফ মণিপুর"-য়ের নির্বাচিতা নায়িকা

খেলার মাঠে

একলব্য

‘ইডেন উদ্যানে’ বাঙলা ও বিহার দলের ধ্য রণজি প্রতিযোগিতার পূর্বাঞ্চলের ইন্যাল এবং বাওয়ালপুরে ভারত ও াকিস্থানের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা। দুটি লাই এসপ্তাহে একসঙ্গে চলেছে এবং দুটি লার উপরই ক্রীড়ামোদীদের দৃষ্টি নিবদ্ধ লে। অবশ্য বাঙলা-বিহার প্রতিদ্বন্দ্বিতায় শ্লিষ্ট দুটি রাজ্য ছাড়া আর কোন রাজ্যের মন আগ্রহ থাকবার কথা নয়, থাকেওনি; ন্তু পাক-ভারত টেস্টের উপর সারা ভারত বং তামাম পাকিস্থানেরই দৃষ্টি নিবদ্ধ ছিল। কায় ভারত ও পাকিস্থানের প্রথম টেস্ট লায় কোন পক্ষই জয়লাভ করতে পারেনি, ওয়ালপুরের টেস্টেও জয় পরাজয় মীমাংসিত রইল। ইডেন উদ্যানে অবশ্য ঙলা দল প্রথম ইনিংসের ফলাফলে বিহারকে রিয়ে দিয়েছে। এর পর আঞ্চলিক ইন্যালের বিজয়ী বাঙলাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা রতে হবে মূল প্রতিযোগিতার সেমি-ইন্যালে সার্ভিস টীমের সঙ্গে। বাঙলা ও র্ভিস দলের খেলাটি দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বার কথা আছে।

* * *

সাগরপার থেকে কোন টীম না আসায় বার ভারতের ক্রিকেটে বেশ মন্দাভাব। কোন গাতেই উন্মাদনা নেই। কলকাতাতেই বা ন্মাদনা আসবে কোথা থেকে! বিভিন্ন রাজ্যের শলী খেলোয়াড় সমন্বয়ে রণজি প্রতি-যাগিতার খেলা যেটুকু জমবার কথা, ভারতের াকিস্থান সফরের ফলে সেটুকুও জমবার াশা নেই। যুদ্ধোত্তর ক্রিকেটের বার্ষিক মলার সঙ্গে আমরা যেভাবে অভ্যস্ত হয়ে ঠেছি, এবার সেই মেলার অভাবে অনেকটা াঁকা ফাঁকা বোধ হচ্ছে। কোথায় সাগর পার থকে নাম ডাকের সব খেলোয়াড় নিয়ে আসবে কমনওয়েলথ’ বা ‘ওভারসীজ’—ক্রিকেট দল, িতের আমেজে নতুন স্যুট, শাড়ী, গাড়ী ার খানাপিনায় ইডেন উদ্যান হয়ে উঠবে রগরম, তা নয় এলো বিহার টীম—বাঙলার াশের বাড়ীর প্রতিদ্বন্দ্বী, রণজি প্রতি-যাগিতার খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে। বহারের না আছে ব্যাটিং শক্তি, না আছে বালিং দক্ষতা। আর বাঙলার ক্রিকেট—? িত্য ক্রিকেট খেলতে জানে নাকি বাঙলার কউ? গেঁয়ো যোগীর যেমন গাঁয়ে ভিক মলে না, তেমন বাঙলার ক্রীড়ামোদীর কাছেও াঙলার ক্রিকেটারদের নেই প্রতিভার বীকৃতি। এ অবস্থায় ইডেন উদ্যানের খেলা মে কি ভাবে। কর্তৃপক্ষও দেখলেন বাঙলা-বহার খেলায় লাভের তো কোন প্রশ্নই নেই, পরন্তু লোকসানের অংকই টেনে যেতে হবে। ুতরাং দুঃখিনী মার্কা খেলা অনুষ্ঠানেরও ীন আয়োজন। তারা ঠিক করলেন মাঠ ঘেরা বে না। ইডেন উদ্যানের অসংরক্ষিত মাঠেই াঙলা ও বিহার পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। কিন্তু সেখানেও ভয় আছে। সমাজের নানাদিকে বিশৃংখলা। খেলার মাঠে বিশৃংখলা আরও বেশী। বালখিল্যের দল যদি মাঠে ঢুকে উৎসাহের আতিশয্যে খেলাটি পন্ড করে দেয়, তখন? দুর্নামের অন্ত থাকবে না। বাঙলার ক্রিকেট সম্পাদক আবার ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডেরও সম্পাদক। তাঁর একটা অতিরিক্ত দায়িত্বও আছে। সুতরাং মাঠটি ঘেরার ব্যবস্থা হ’ল। নামমাত্র মূল্যে তিন আনা দর্শনীর চালু ব্যবস্থায় দর্শকরা খেলা দেখারও সুযোগ পেল। বেতার কর্তৃপক্ষও পিছনে পড়ে রইলেন না। তারা খেলাটির ধারা বিবরণী প্রচারের ব্যবস্থা করলেন।

* * *

কিন্তু সে খেলার তেমন আকর্ষণ নেই—সেখানে তিন আনা কেন, বিনা পয়সায়ও লোকে যেতে চায় না। আবার মনটাও চঞ্চল হয়ে ওঠে। ‘আমাদের ছেলেরা তো ভালই খেলছে। যাব নাকি একবার। না, রেডিওতেই খবর শুনি।’ এইভাবে মাঠে যাবার ইচ্ছা-অনিচ্ছার সঙ্গে সংগ্রাম করে অনেকে গিয়েছে মাঠে, বেশীর ভাগ বাড়ীতে বসে খেলার খবর শুনেছে রেডিও যন্ত্রে। কলকাতা ‘ক’য়ে চলছে বাঙলা ও বিহারের খেলার ধারা বিবরণী আর ‘খ’য়ে চলছে পাক-ভারত টেস্ট সমাচার। ক্রীড়ামোদীরা কোনটা শোনে। বাড়ীর তো কথাই নেই, রাস্তার রেডিওর সামনেও বেশ ভিড়। বেতার যন্ত্রের মধ্য থেকে একবার ভেসে আসছে বাওয়ালপুরের টেস্ট খেলার খবর, একটু পরেই মিটার ঘুরিয়ে সবাই শুনছে ইডেন উদ্যানের ব্যাটবলের লড়াইয়ের বিবরণ। “পি সেন বিমল বসুর বলে চমৎকার লেট-কাট করলেন। অজিত দাশগুপ্তের কভার ড্রাইভে আর চারটি রান যোগ হ’ল। এবার বল করতে এলেন সুটে ব্যানার্জি, বাঙলার ছেলে, লোহা আর রূপোর ডাকে এখন বিহার প্রবাসী। সেই সুটে ব্যানার্জি, এককালে দর্শকরা যার নামে পাগল হত, বিলেতে সারভাতের জুটিতে যার শেষ উইকেটের বিশ্ব রেকর্ড আজও অম্লান রয়েছে, কিন্তু তার সোনার দিন আজ ফুরিয়ে গেছে, তার বলে আর সে তীব্রতা নেই, বোলিং চাতুর্যের অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলেছে সুটে ব্যানার্জি।” সহসা মন চঞ্চল হয়ে উঠলো। বাওয়ালপুরে কি হচ্ছে! পি রায়, পাঞ্জাবী, মানকড় তো আগেই আউট

টেলিভিশনে এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের ছবি। রেডিওতে খেলার ধারা বিবরণী শোনার মত ভারতের ক্রীড়ামোদীরা টেলিভিশনে খেলা দেখার সুযোগ পাবে না কি?

হয়েছেন, মঞ্জরেকার উমরিগর ভালই খেলছিলেন, তারাও আউট হলেন নাকি? ফজল মামুদের বল বড় সাংঘাতিক, না হলে বিলেতে এত প্রশংসা পেয়েছে? আবার রেডিওর মিটার-ব্যাণ্ডে হাত পড়লো। সবাই কিছুক্ষণ শুনে নিল পাক-ভারত টেস্টের ধারা বিবরণী। বলা বাহুল্য বাঙলার ক্রিকেট ক্রীড়ামোদীদের এ সপ্তাহটা এইভাবেই কেটেছে।

* * *

বস্তুত ভারতে ক্রিকেট খেলার প্রসার প্রচার ও আকর্ষণ বৃদ্ধিতে রেডিওর দান নিতান্ত কম নয়। যুদ্ধোত্তর কালে বেতার কর্তৃপক্ষ প্রতি বছর ভারতের সমস্ত টেস্ট খেলারই ধারা বিবরণী প্রচার করেছেন। ভারত বিদেশে যে সমস্ত টেস্ট খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে, আকাশবাণী থেকে প্রতিদিন তারও সংক্ষিপ্ত সার প্রচারের ব্যবস্থা হয়েছে। বিজ্ঞানের নতুন নতুন উদ্ভাবনী শক্তি সৃষ্টি ও সংহারের ক্ষেত্রে মানুষের যেমন কাজে লাগছে, তেমন মানুষ খেলাধুলার মধ্যেও টেনে এনেছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাফল্যকে। সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর পারের খেলার প্রতি-মুহূর্তের প্রতিটি মারের সঙ্গে আমরা পরিচিত হচ্ছি ঘরে বসে। সুযোগ পাচ্ছি চাক্ষুষ দেখবারও। অবশ্য ভারতে এখনো 'টেলিভিশন' যন্ত্রের প্রসার হয়নি। কিন্তু দেশ যেভাবে এগিয়ে চলেছে, তাতে 'টেলিভিশনে' খেলা দেখবার সুযোগ থেকে ভারতের খেলা-পাগলদের বেশী দিন বঞ্চিত থাকতে হবে বলে মনে হয় না। এসপ্তাহেই ফিলিপস ইলেকট্রিক কোম্পানী তাদের রজত জয়ন্তী উৎসব উপলক্ষে ময়দানে আয়োজন করেছিলেন এক 'টেলিভিশন' প্রদর্শনীর। সুতরাং রেডিওতে খেলার ধারা বিবরণী শোনার মত ভারতে টেলিভিশন যন্ত্রে খেলা দেখার দিনও বুঝি সমাগত।

* * *

যাই হক, এখন খেলার কথায় আসা যাক। দর্শকদের ধারণা অনুযায়ী সত্যই বিহার দল বাঙলার সঙ্গে মোটেই ভাল খেলতে পারেনি। বাঙলার প্রথম ইনিংসের ৩০৯ রানের প্রত্যুত্তরে যখন দ্বিতীয় দিন মধ্যাহ্ন ভোজের একটু পরে বিহারের প্রথম ইনিংস ১১৯ রানে শেষ হয়ে যায়, তখনই প্রকৃত প্রস্তাবে খেলাটির উপর যবনিকা পড়ে। কারণ এর পর খেলার আর কোনই আকর্ষণ থাকে না। আইন অনুযায়ী বাঙলার অধিনায়ক পি বি দত্ত বিহারকে 'ফলো অন' করিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করাতে পারতেন এবং তা করালে দ্বিতীয় দিনেই খেলাটি শেষ হবার সম্ভাবনা ছিল; কিন্তু পি বি দত্ত বিহারকে 'ফলো অন' না করিয়ে নিজেরাই দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং করবার সিদ্ধান্ত করেন। সম্ভবত ব্যাটিং প্র্যাকটিসের জন্যই অধিনায়কের এই সিদ্ধান্ত। এদিক দিয়ে তিনি সুবিবেচনা করেছেন বলেই মনে হয়। দ্বিতীয় ইনিংসে
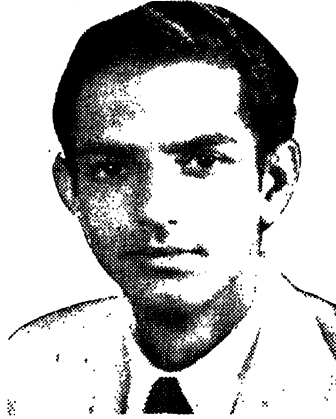
বাঙলার ক্রিকেট অধিনায়ক পি বি দত্ত। পি বি দত্ত রণজি প্রতিযোগিতার দুটি খেলায় পর পর সেঞ্চুরী করেছেন

ব্যাটিংয়ের ফলে অধিনায়ক পি বি দত্ত এবং একজন তরুণ খেলোয়াড়ের সেঞ্চুরী করবারও সুযোগ ঘটেছে। এই খেলোয়াড় হচ্ছেন অনিল ভট্টাচার্য। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি ১২৫ রান করে আউট হন। তাছাড়া অনিল ভট্টাচার্য প্রথম ইনিংসেও প্রশংসার সঙ্গে ব্যাটিং করে ৪৫ রান করেন। প্রথম ইনিংসে অবশ্য পি সেন এবং অজিত দাশগুপ্তের ব্যাটিং সবচেয়ে উপভোগ্য হয়। হুইটেকারও বেশ মেরে খেলে মাত্র ৪১ মিনিটে ৪৫ রান করেন। দ্বিতীয় ইনিংসে অধিনায়ক পি বি দত্তর সেঞ্চুরী এবং নির্মল চ্যাটার্জীর ব্যাটিংও প্রশংসার দাবী রাখে। বাঙলার
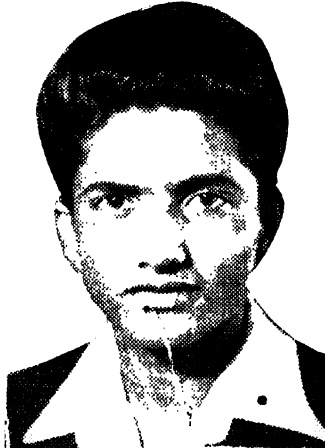
পাক-ভারত দ্বিতীয় টেস্টে সেঞ্চুরীর অধিকারী পাকিস্থানের ওপেনিং ব্যাটসম্যান হানিফ

বোলারদের মধ্যে পি চ্যাটার্জি এবং এন চৌধুরীর সুখ্যাতি করতে হয়। এদের মারাত্মক বোলিংয়ের জন্যই বিহার প্রথম ইনিংসে ১৩৯ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারেনি। নীচে দুই দলে যারা খেলেছেন, তাদের নাম ও খেলার ফলাফল দেওয়া হল।

বাঙলা—শিবাজী বসু, পি বি দত্ত (অধিনায়ক), অজিত দাশগুপ্ত, পি সেন, বেনু দাশগুপ্ত, নির্মল চ্যাটার্জি, ডি হুইটেকার, অনিল ভট্টাচার্য, এস সোম, পি চ্যাটার্জি ও এন চৌধুরী।

বিহার—এস দাশ, ওমপ্রকাশ, আর সান্যাল, সুটে ব্যানার্জি, টি দত্ত, ভি নারাং, পি চ্যাটার্জি, এস সিংহ, এস নটরাজন, বি বসু (অধিনায়ক) ও এস প্যাটেল।

সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড

বাঙলা—১ম ইনিংস ৩০৯ (পি সেন ৬৫, এ দাশগুপ্ত ৫৫, ডি হুইটেকার ৪৫, অনিল ভট্টাচার্য ৪৫; সুটে ব্যানার্জি ৭০ রানে ৪ উইঃ ওমপ্রকাশ ৩৯ রানে ৩ উইঃ)।

বিহার—১ম ইনিংস ১১৯ (এস দাশ ২৪, ভি নারাং ২১; পি চ্যাটার্জি ৫২ রানে ৫ উইঃ, এন চৌধুরী ৩৪ রানে ৪ উইঃ)।

বাঙলা—২য় ইনিংস (৯ উইঃ ডিক্লেঃ) ৪২১ (অনিল ভট্টাচার্য ১২৫, পি বি দত্ত ১১৫, এন চ্যাটার্জি ৭১, পি সেন ৩২; সুটে ব্যানার্জি ১৪২ রানে ৩ উইঃ)।

বিহার—২য় ইনিংস (৩ উইঃ) ১৩০ (ওমপ্রকাশ ৫৪, সুটে ব্যানার্জি ২৯)।

* * *

ঢাকার টেস্টের পর বাওয়ালপুরের টেস্ট খেলাতেও জয়পরাজয়ের মীমাংসা না হওয়ায় ভারত ও পাকিস্থানের দুটি টেস্ট খেলাই পর পর অমীমাংসিতভাবে শেষ হল। ভারত ও পাকিস্থান যেভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে, তাতে কোন টেস্টেই জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হবে কিনা এবিষয়ে ক্রীড়ামোদীদের মনে এখন গভীর সন্দেহের উদ্রেক হয়েছে। চার দিন-ব্যাপী টেস্টে হারজিতের আশা অনেকটা সুদূরপরাহত, বিশেষ করে ম্যাটিং উইকেটে। তারপর দুই দলের মন্থর ব্যাটিং জয়-পরাজয়ের সম্ভাবনাকে আরও অসম্ভব করে তুলছে। চার দিনব্যাপী খেলায় জয়লাভের জন্য যেভাবে রান সংগ্রহের প্রয়োজন, কোন পক্ষই সেভাবে রান সংগ্রহের ঝুঁকি নিতে পারছেন না। ভারতের ব্যাটসম্যানদের 'আগে বাঁচলে পরে রানের' নীতি, আর পাকিস্থানের 'চাচা আপন প্রাণ বাঁচা' পদ্ধতি। উভয়েরই আত্মরক্ষামূলক ব্যাটিং। সুতরাং জয়পরাজয়ের আশা বৃথা। অবশ্য রান তুলতে যাবার বিপদও আছে যথেষ্ট। দুই দলই বোলিং শক্তিতে শক্তিশালী। রান তুলতে গেলেই উইকেট পড়বার সম্ভাবনা। এই টেস্টে পাকিস্থানের ব্যাটিংয়ে তার প্রমাণও পাওয়া গেছে। যারা মাত্র ২ উইকেটে ২২৬ রান সংগ্রহ করে যথেষ্ট মনোবল সঞ্চয়

করেছে, তাঁরাই দ্রুত রান তুলতে গিয়ে মাত্র ৮৩ রানে আর ৭টি উইকেট হারিয়েছে। তাই মনে হয়, কোন পক্ষই নিতান্ত বাধ্য না হলে বিপদ ডেকে আনবে না। সুতরাং টেস্ট খেলায় জয়-পরাজয়ের আশাও অনেকটা সুদূরপরাহত; তবে লাহোর ও পেশোয়ারে ঘাসের পিচের উপর যে দুটি টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হবে, তাতে হারজিতের মীমাংসা হলেও হতে পারে।

দ্বিতীয় টেস্টে দুই দলের ২২ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে একজনমাত্র খেলোয়াড় সেঞ্চুরী লাভের কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, ইনি হচ্ছেন পাকিস্থানের তরুণ খেলোয়াড় হানিফ মহম্মদ। ১৪২ রান করে হানিফ আউট হন। প্রথম টেস্টে কোন পক্ষেরই কোন খেলোয়াড় সেঞ্চুরী করতে পারেননি। নীচে দুই দলে

ভারতের ওপেনিং ব্যাটসম্যান পি রায়

যারা খেলেছিলেন, তাদের নাম ও স্কোর বোর্ড দেওয়া হল।

ভারত—পি রায়, পাঞ্জাবী, মানকড় (অধিনায়ক), মঞ্জরেকার, উমরিগর, রামচাঁদ, নদকারী, গোপীনাথ, তামানে (উইকেট কিপার), গুপ্তে ও গোলাম আমেদ।

পাকিস্থান—হানিফ, আলীমুদ্দিন, ওয়াকার, মাকসুদ, ইমতিয়াজ (উইকেট কিপার), সারদার (অধিনায়ক), ফজল মামুদ, মামুদ হোসেন, সুজাউদ্দিন, ওয়াজির মহম্মদ ও খান মহম্মদ।

সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড

ভারত—১ম ইনিংস ২৩৫ (রামচাঁদ ৫৩, তামানে ৫৪, মঞ্জরেকার ৫০, খান মহম্মদ ৭৪ রানে ৫ উইঃ, ফজল মামুদ ৮৬ রানে ৪ উইঃ)।

পাকিস্থান—১ম ইনিংস (৯ উইঃ ডিক্লেঃ) ৩১২ (হানিফ ১৪২, আলীমুদ্দিন ৬৪, ওয়াকার ৪৮; পি উমরিগর ৭৪ রানে ৬ উইকেট)।

ভারত—২য় ইনিংস (৫ উইঃ) ২০৯ (পি রায় ৭৭, মঞ্জরেকার ৫৯, পাঞ্জাবী ৩৩)।

* * *

কলকাতায় জাতীয় লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলায় অস্ট্রেলিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় জ্যাক আর্কিনস্টল ভারতের তরুণ চ্যাম্পিয়ন আর কৃষ্ণণকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছিলেন, কিন্তু বোম্বাইতে নিখিল ভারত হার্ডকোর্ট চ্যাম্পিয়নশিপে আর্কিনস্টলকে হার স্বীকার করতে হয়েছে কৃষ্ণণের কাছে। শুধু সিঙ্গলস নয়, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের খেলাতেও আর্কিনস্টল সুবিধা করতে পারেননি। ফলে বোম্বাইতে কোন বিষয়েরই পুরস্কার জোটেনি আর্কিনস্টলের বরাতে। সিঙ্গল, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসের খেলাতেই তিনি হয়েছেন পরাজিত, অপরদিকে তিনটি বিষয়েই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে কৃষ্ণণ শোধ তুলেছেন পূর্ব পরাজয়ের। ডাবলসের খেলায় কৃষ্ণণের সঙ্গী ছিলেন প্রাক্তন পোলিস খেলোয়াড় ভ্লাডিস্লাভ স্কোর্নোক আর মিক্সড ডাবলসের সঙ্গী ছিলেন ভারতের মহিলা চ্যাম্পিয়ান মিস রিতা ডেভার। কৃষ্ণণের মত মিস রিতাও সিঙ্গলস, ডাবলস এবং মিক্সড ডাবলসে বিজয়ী হয়ে 'ট্রিপল ক্রাউনের' অধিকারিণী হয়েছেন। রিতা এবং কৃষ্ণণ কারো বয়সই কুড়ির কোঠা পার হয়নি। ভারতীয় টেনিসে এরা দুই উজ্জ্বল তারকা।

নিখিল ভারত হার্ডকোর্ট টেনিসে পুরুষদের ডাবলস ফাইন্যালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যায়। জ্যাক আর্কিনস্টলের সঙ্গী ছিলেন তার নিজ দেশেরই অন্যতম কুশলী খেলোয়াড় আর হো। মোট ১৩০ মিনিট কৃষ্ণণ ও স্কোর্নোকের সঙ্গে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবার পর অস্ট্রেলিয়ান জুটি পরাজয় স্বীকার করেন। পাঁচটি সেটে খেলার মীমাংসা হয়। কৃষ্ণণ ও আর্কিনস্টলের সিঙ্গলসের খেলাও পাঁচ সেট পর্যন্ত চলে। নীচে খেলার ফলাফল দেওয়া হল।

মেনস সিঙ্গলস—আর কৃষ্ণণ ৬—২, ০—৬, ৩—৬, ৬—১ ও ৬—৩ গেমে জ্যাক আর্কিনস্টলকে পরাজিত করেন।

মেনস ডাবলস—কৃষ্ণণ ও স্কোর্নোক ৭—৫, ৫—৭, ১—৬, ৬—৩ ও ৬—৪ গেমে আর্কিনস্টল ও হোকে পরাজিত করেন।

উইমেনস সিঙ্গলস—মিস রিতা ডেভার ৬—৩ ও ৬—১ গেমে মিসেস বি জ্যাকারিসনকে পরাজিত করেন।

উইমেনস ডাবলস—মিস ডেভার ও মিসেস মোদি ৬—০ ও ৬—১ গেমে মিসেস বি স্টুয়ার্ট ও মিসেস সিনক্লেয়ারকে পরাজিত করেন।

* * *

৩০জন খেলোয়াড়বিশিষ্ট শক্তিশালী রাশিয়ান ফুটবল দল সাত সপ্তাহকাল ভারত সফরের জন্য ২৩শে জানুয়ারী কলকাতায় এসে পৌঁচচ্ছে। ৩টি টেস্ট খেলা নিয়ে ভারতে রাশিয়ান টীমের ২৩টি খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। বিশ্বের পরম শক্তিশালী ফুটবল টীম মস্কো ডায়নামোস এবং স্পার্টাক দলের কয়েকজন খেলোয়াড় নিয়ে রাশিয়ান দলটি সমৃদ্ধ। এর মধ্যে অনেকেরই আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। সুতরাং রাশিয়ান টীম যে খুবই উন্নত ধরনের ফুটবল খেলবে, এতে

"এসো খেল না"।——দর্শকদের ব্যঙ্গ কাউকেই রেহাই দেয় না তা তিনি যতবড়ই প্রতিভাসম্পন্ন হ'ন না কেন। সিডনীর হোয়াইট সিটিতে বিশ্ববন্দিত টেনিস খেলোয়াড় ভিক সেক্সাস ব্যঙ্গে অস্থির হয়ে যে কোন দর্শককে খেলবার জন্য আহ্বান করছেন

কোন সন্দেহ নেই। ইতিমধ্যে আবার অস্ট্রিয়ার আর একটি ফুটবল টীম কলকাতায় দুটি খেলায় অংশ গ্রহণের আগ্রহ প্রকাশ করেছে। অস্ট্রিয়ার এই টীমটি ঢাকায় কয়েকটি খেলায় অংশ গ্রহণ করবে। রাশিয়ান দলের সম্মতি সাপেক্ষে আই এফ এ কর্তৃপক্ষ কলকাতায় অস্ট্রিয়ান ও রাশিয়ান দলের এক খেলা আয়োজনের ফন্দি এটেছেন। অবশ্য এ প্রস্তাব নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনেরও

ইস্টার্ণ কম্যান্ড স্পোর্টসে বর্শা ছোঁড়ার নূতন ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী স্যাপার সারোয়ান সিংয়ের বর্শা ছোঁড়ার দৃশ্য

অনুমোদন সাপেক্ষ। কিন্তু আই এফ এ আর এ আই এফ এফ তো ঘরে ঘরে কারবারের মত। যিনি কৃষ্ণ তিনিই হরি। সুতরাং ভারতের মাটিতে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার ফুটবল লড়াইয়ের ব্যবস্থায় বাধা কোথায়? এ খেলার ব্যবস্থা হলে কলকাতার দর্শকদের সত্যিকারের আন্তর্জাতিক খেলা দেখবার সুযোগ ঘটবে। যোগাযোগ ভালই হয়েছে, এখন চূড়ান্ত ব্যবস্থা বাকী। আর কলকাতায় রাশিয়ান দলের খেলা তো সেই মার্চ মাসে, এর মধ্যে অস্ট্রিয়া টীমের সঙ্গে তাদের লাগিয়ে দিলে মন্দ কি? নীচে রাশিয়ান দলের ভারত সফরের তালিকা দেওয়া হ'ল।

২৩শে জানুয়ারী—কলকাতায় উপস্থিতি
২৬শে ,, —হাজারীবাগে প্রথম খেলা
২৮শে ,, —বারানসীতে দ্বিতীয় খেলা
২৯শে ,, —লখনউতে তৃতীয় খেলা
২রা ফেব্রুয়ারী—দিল্লীতে ভারতের সৈন্যাধ্যক্ষের দলের সঙ্গে
৬ই ,, —**দিল্লীতে আন্তর্জাতিক টেস্ট**
৮ই ,, —আম্বালায় পাঞ্জাব রাজ্য দলের সঙ্গে
১০ই ,, —জব্বলপুরে জেলা দলের সঙ্গে
১২ই ,, —মাদ্রাজে রাজ্য দলের সঙ্গে
১৩ই ,, —মাদ্রাজে ভারতীয় একাদশের সঙ্গে
১৬ই ,, —ত্রিবান্দ্রমে রাজপ্রমুখের দলের সঙ্গে
১৯শে ,, —ব্যাঙ্গালোরে মহীশূর দলের সঙ্গে
২০শে ,, —ব্যাঙ্গালোরে ভারতীয় একাদশের সঙ্গে
২৩শে ,, —হায়দরাবাদ রাজ্য দলের সঙ্গে
২৬শে ,, হায়দরাবাদে ভারতীয় একাদশের সঙ্গে
২৭শে ,, নাগপুরে রাজ্যপালের দলের সঙ্গে
১লা মার্চ—পাটনায় রাজ্য একাদশের সঙ্গে
৩রা ,, —কলকাতায় মোহনবাগানের সঙ্গে
৫ই ,, —কলকাতায় আই এফ এর সঙ্গে
৬ই ,, —**কলকাতায় আন্তর্জাতিক টেস্ট**
৮ই ,, —শিলংয়ে রাজ্যপালের দলের সঙ্গে
৯ই ,, —জোড়হাটে রাজ্যদলের সঙ্গে
১২ই ,, —বোম্বাইয়ে রাজ্য একাদশের সঙ্গে
১৩ই ,, —**বোম্বাইয়ে আন্তর্জাতিক টেস্ট**

* * *

পুনার মহারাষ্ট্র ক্লাব মাঠে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলায় গতবারের বিজয়ী বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় দল এক ইনিংস ও ১৬৭ রানে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে দিয়ে 'রোহিণ্টন বেরিয়া ট্রফি' লাভ করেছে। বোম্বাইয়ের লেগ ব্রেক বোলার এস ভি নদকার্ণীর দ্বিতীয় ইনিংসের সব কয়টি উইকেট লাভ খেলার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। নদকার্ণী মারাত্মকভাবে বোলিং করে মাত্র ৪৩ রানে পাঞ্জাবের সব খেলোয়াড়ের উইকেট দখল করেন। ইনিংসের সব কয়টি উইকেট লাভ বোম্বাই খেলোয়াড়দের পক্ষে কিছু নূতন ঘটনা নয়। গত মাসেই বোম্বাইতে পাকিস্থানের সঙ্গে প্রদর্শনী খেলায় সুভাষ গুপ্তে এই কৃতিত্বের অধিকারী হয়েছেন। নদকার্ণী গুপ্তের সম কৃতিত্বের অধিকারী হলেন। প্রবীণ ক্রিকেট খেলোয়াড় অধ্যাপক দেওধর বোম্বাইয়ের অধিনায়কের হাতে বিজয়ীর পুরস্কার অর্পণের সময় নদকার্ণীর বোলিংয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন। নীচে খেলার ফলাফল দেওয়া হল।

বোম্বাই—১ম ইনিংস—৩৪৯ (বেলে ৯৬, আপ্তে ৮৭, কন্ট্রাক্টর ৬২, হরদিকার ৩৬; ভিগ ৮২ রানে ৩ উইঃ, এইচ ঘোষ ৩৮ রানে ২ উইঃ)।

পাঞ্জাব—১ম ইনিংস—৭৮ (ওমপ্রকাশ ২৯; এ ভি গুপ্ত ১৭ রানে ৪ উইঃ, নদকার্ণী ১১ রানে ৩ উইঃ)

পাঞ্জাব—২য় ইনিংস—১০৪ (চমনলাল ২৫; নদকার্ণী ৪৩ রানে ১০ উইকেট)

* * *

চেকোশ্লোভাকিয়ার দুই ধুরন্ধর টেবিল টেনিস খেলোয়াড় আইভান আনড্রিয়াডিজ ও ভ্যাকলাব টেরেবা ভারত সফরে এসে ইতিমধ্যে তিনটি টেস্ট খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে চেক খেলোয়াড়দ্বয়কে ভারতের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল; কিন্তু তারপর হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজ টেস্টে চেক খেলোয়াড়রা সহজেই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজের কোন খেলাতেই ভারতের খেলোয়াড়রা জয়লাভ করতে পারেননি। ৪টি সিঙ্গলস ও ১টি ডাবলসের খেলায় দুই দেশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলছে। বোম্বাইয়ের প্রথম টেস্টে মানের বন্যায় যারা আনড্রিয়াডিজ ও টেরেবাকে নাস্তানাবুদ করে তুলেছিলেন সেই চন্দ্রানা ও ব্যাস পরে কোন খেলাতেই জিততে পারলেন না, এর কারণ কি? শুধু টেস্টই নয়, চেক খেলোয়াড়দের আগমন উপলক্ষে বোম্বাইতে যে আমন্ত্রণ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছিল তাতেও ভারতের কৃতী খেলোয়াড় যতীন ব্যাসের কাছে আনড্রিয়াডিজকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়। ভারত চ্যাম্পিয়ন চন্দ্রানা পরাজিত করেন ভ্যাকলাব টেরেবাকে। আনড্রিয়াডিজ শুধু চেকোশ্লোভাকিয়ার খ্যাতনামা খেলোয়াড় নন। বিশ্ব টেবিল টেনিস ক্রমপর্যায়ে আনড্রিয়াডিজের স্থান দ্বিতীয়। ইনি ইতিপূর্বেও ভারত সফর করেছেন। চেক খেলোয়াড়রা ব্যাঙ্গালোরে ২৩শে জানুয়ারী চতুর্থ টেস্টে এবং কলকাতায় ৩০শে জানুয়ারী শেষ টেস্টে ভারতের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন।

• অনেক নূতন রেকর্ড

গত সপ্তাহে এলেনবোরো মাঠের সিণ্ডার ট্রাকে ইস্টার্ন কম্যাণ্ড এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে একজন এ্যাথলীট এশিয়ান এবং একজন নূতন ভারতীয় রেকর্ড করেছেন। এশিয়ান রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন স্যাপার গুরুদীপ সিং ১০ হাজার মিটার ভ্রমণ প্রতিযোগিতায়। এই বিষয়ে পূর্বতন এশিয়ান রেকর্ড ছিল ৫২ মিনিট ৩১.৪ সেকেণ্ড। গুরুদীপ সিং ৪৯ মিনিটে ২১.৮ সেকেণ্ড সময়ে নূতন রেকর্ড করেছেন। বর্শা ছোড়ায় নূতন ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন স্যাপার সারোয়ান সিং। বর্শা নিক্ষেপে ভারতীয় রেকর্ড ১৮৫ ফিট ৪½ ইঞ্চি দূরত্ব অতিক্রম করে সারোয়ান সিং ১৯১ ফিট ১ ইঞ্চি দূরত্বে নূতন রেকর্ড করেন।

আম্বালায় ওয়েস্টার্ন কম্যাণ্ডের এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে দফাদার প্রদ্যুম্ন সিং ১৪৬ ফুট ৪ ইঞ্চি দূরে ডিসকাস নিক্ষেপ করে নূতন এশিয়ান রেকর্ড করেছেন। এ বিষয়ে প্রদ্যুম্ন সিংয়ের নিজেরই এশিয়ান রেকর্ড ছিল। তাঁর ডিসকাস নিক্ষেপের বর্তমান দূরত্ব পূর্বের চেয়ে প্রায় ৪ ফুট বেশী। এই স্পোর্টসে ল্যান্সনায়েক দেবীদয়াল ১৫৬ ফুট ৩ ইঞ্চি দূরে হাতুড়ি ছুঁড়ে এবং নায়েক অজিত সিং ৪ মিনিট ১ সেকেণ্ড সময়ে ১৫০০ মিটার পথ দৌড়ে নূতন ভারতীয় রেকর্ড সৃষ্টি করেছেন। ওয়েস্টার্ন কম্যাণ্ড স্পোর্টসে হার্ডল রেসে নূতন ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন ল্যান্স নায়েক চাঁদরাম। সারোয়ান সিং ১৫ সেকেণ্ডে ১১০ মিটার হার্ডলের নূতন রেকর্ড করেছিলেন। কিন্তু চাঁদরাম ১৪.৮ সেকেণ্ড সময়ে হার্ডল অতিক্রম করে সারোয়ানের রেকর্ড ভেঙে দিয়েছেন।

বোম্বাইয়ে ক্রিকেট ক্লাব অব ইণ্ডিয়ার বার্ষিক স্পোর্টসে মহিলাদের 'সটপাট' এবং পুরুষদের ৪০০ মিটার দৌড়ে নূতন ভারতীয় রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সটপাটে মিস রেনি কোয়াড্রোর পূর্ব রেকর্ড ছিল ৩২ ফুট ½ ইঞ্চি। এখন তিনি ৩২ ফুট ১১½ ইঞ্চি দূরে লোহার গোলা ছুঁড়তে সমর্থ হয়েছেন। ৪৯.৫ সেকেণ্ডে ৪০০ মিটার পথ দৌড়ে সনাভেরিয়া করেছেন নূতন রেকর্ড আইভান জেকব ৪৯.৬ সেকেণ্ডে ইতিপূর্বে ৪০০ মিটার পথ দৌড়িয়েছেন।

১০০০ **মিটার সাইকেল রেসের নূতন রেকর্ড**—দিল্লী এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে খ্যাত সাইকেল চালক মদনমোহন ১৩.৩ সেকেণ্ড সময়ে ১০০০ মিটার অতিক্রম করে নূতন ভারতীয় রেকর্ড করেছেন। এই বিষয়ে জে উইলসনের রেকর্ড ছিল ১৩.৫ সেকেণ্ড।

খেলাধুলার টুকরো খবর

পিটার মে'র হাজার রান—ইংলণ্ডের সহ অধিনায়ক পিটার মে এ বছর অস্ট্রেলিয়া সফরে সবচেয়ে আগে হাজার রান পূর্ণ করেছেন। সাউথ অস্ট্রেলিয়া কাউন্টি ও এম সি সি'র খেলায় মে ৬৮ রান করেন, ৪০ রান করবার পরই তার সহস্র রান পূর্ণ হয়।

টমাস কাপ—ভারত ও হংকংয়ের মধ্যে টমাস কাপের এশিয়া আঞ্চলিক ফাইনাল খেলা মার্চ মাসের ৫ ও ৬ তারিখে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঠিক হয়েছে। তবে খেলার তারিখ হংকংয়ের অনুমোদন সাপেক্ষ।

দেশী সংবাদ

১০ই জানুয়ারী—পণ্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ আজ সকালে ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুর নিকট হইতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন। ডাঃ কাটজুও প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরুর নিকট হইতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ভার গ্রহণ করেন।

আসাম অয়েল কোম্পানী আসামের ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় আরও তৈলখনির অনুসন্ধানে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহারা জোড়হাটকে অনুসন্ধানের পরবর্তী স্থান হিসাবে নির্বাচন করিয়াছেন।

১১ই জানুয়ারী—আজ কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় ভারত সরকার কর্তৃক গঠিত রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের কার্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিহারে যে গণতন্ত্রবিরোধী নীতি ও কার্যকলাপ চলিতেছে, তাহাতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা যায়।

ভারত সরকার ও মার্কিন সরকারের মধ্যে আলোচনা ব্যর্থ হওয়ায় আগামী ১৪ই জানুয়ারী ১৯৪৬ সালে সম্পাদিত ভারত-মার্কিন বিমান চলাচল চুক্তির অবসান ঘটিবে।

খ্যাতনামা অঙ্কশাস্ত্রবিদ শ্রীসোমেশচন্দ্র বসু আজ কলিকাতায় তাঁহার বাসভবনে নিউমোনিয়া রোগে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৬৮ বৎসর হইয়াছিল।

বিদেশ হইতে আমদানী রাসায়নিক মণ্ড সাহায্যে অদ্য মধ্য প্রদেশের নেপানগরে ভারতের প্রথম জাতীয় নিউজ প্রিণ্ট কারখানায় উৎপাদন আরম্ভ হইয়াছে।

১২ই জানুয়ারী—বাঁকুড়া জেলায় একাদশ দিবস পদব্রজে পরিভ্রমণের পর ভূদান যজ্ঞের হোতা আচার্য বিনোবা ভাবে আজ বাঁকুড়া সীমান্ত অতিক্রম করিয়া মেদিনীপুর জেলায় পদার্পণ করেন।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁহারা জীবনদান করিয়াছেন, তাঁহাদের স্মরণে ৩০শে জানুয়ারী বেলা ১১টার সময় দুই মিনিটকাল নীরবতা পালন করা হইবে বলিয়া সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

ভারত সরকারের শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আজ ঘোষণা করেন যে, সরকার একটি মাধ্যমিক শিক্ষাপরিষদ গঠন সম্পর্কে বিবেচনা করিতেছেন। প্রস্তাবিত পরিষদ মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ সম্পর্কে সরকারকে পরামর্শ দিবেন।

১৩ই জানুয়ারী—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ ঘোষণা করেন যে, ভারত সরকার যথাশীঘ্র পুনরায় একটি অর্থ কমিশন নিয়োগ করিবেন। কারণ দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা ঘোষিত হইবার পূর্বেই পরবর্তী অর্থ কমিশনের সুপারিশসমূহ জানা প্রয়োজন।

১৪ই জানুয়ারী—রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের আমন্ত্রণে পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ আগামী ২৫শে জানুয়ারী চারিদিনের জন্য নয়াদিল্লীতে আসিতেছেন বলিয়া অদ্য সরকারীভাবে জানা গিয়াছে।

আজ বিশাখাপত্তনমে আসিয়া প্রথম নির্বাচনী সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু বলেন, কল্যাণ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় কলহে শক্তি ক্ষয় করিলে চলিবে না। দেশবাসীকে ঐক্যবদ্ধ হইয়া কাজ করিতে হইবে।

ভারত সরকার দিল্লীস্থিত পর্তুগীজ দূতাবাসের নিকট এক পত্র প্রেরণ করিয়া বলিয়াছেন যে, পর্তুগীজ সরকার যদি গোয়াবাসী এবং ভারতীয় সত্যাগ্রহীদের কারাদণ্ড ভোগের জন্য পর্তুগালের অথবা আফ্রিকাস্থিত পর্তুগীজ এলাকায় বন্দীনিবাসে প্রেরণ করেন, তাহা হইলে ভারতে গুরুতর প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে।

১৫ই জানুয়ারী—মাদ্রাজে এক সাংবাদিক বৈঠকে শ্রী নেহরু ঘোষণা করেন যে, দেশে সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাই যে কংগ্রেসের লক্ষ্য, আসন্ন আবাদী কংগ্রেসে তাহা সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করা হইবে।

আজ বিজয়গড়ায় বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রী নেহরু ভারতীয় কম্যুনিস্টদের "ভারতীয় জনগণের পেশাদার কুৎসা রটনাকারী" বলিয়া অভিহিত করেন।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ আজ রাত্রে পাটনায় এক সাংবাদিক বৈঠকে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট প্রস্তাব করেন যে, ভাষাগত সংখ্যালঘুগণ যাহাতে ন্যায়সঙ্গত আচরণ পাইতে পারেন এজন্য একটি উচ্চক্ষমতাবিশিষ্ট কমিশন নিয়োগ করা উচিত।

১৬ই জানুয়ারী—কংগ্রেস সভাপতির কর্মভার ত্যাগ করিয়া নিঃ ভাঃ রাষ্ট্রীয় সমিতিতে এক রিপোর্টে শ্রী নেহরু বলেন যে, ভারতের জাতীয় আদর্শ হইতেছে "গণকল্যাণ রাষ্ট্রপ্রতিষ্ঠা ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন।"

বোম্বাইয়ের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই অদ্য আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় প্রতিরক্ষা পরিষদের উদ্বোধন করেন। বিগত মহাযুদ্ধে নিহত বীরদের স্মৃতিরক্ষাকল্পে পুনার নিকট খাড়কবস্লায় ৬,৫০০ একর ভূখণ্ডে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে উহা নির্মিত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১০ই জানুয়ারী—আজ পিকিংয়ে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ হ্যামারস্কোয়েল্ডের সহিত চীনা প্রধানমন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাইয়ের চতুর্থ ও শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কে এম যুক্ত ইস্তাহারে বলা হয় যে, আলাপ-আলোচনাকালে আন্তর্জাতিক অশান্তি হ্রাসের ব্যাপারে কয়েকটি বিষয় আলোচিত হয়।

১১ই জানুয়ারী—পাকিস্থান আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এক অর্থনৈতিক চুক্তি স্বাক্ষর করিয়াছে। এই চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্থান ৬ কোটি ডলার মার্কিন সাহায্য পাইবে। এই অর্থে কাঁচা মাল এবং আবশ্যকীয় পণ্য ক্রয় করা হইবে।

১২ই জানুয়ারী—ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক মহলের সংবাদে প্রকাশ, বাণিজ্যিক ও নৌ চলাচল সংক্রান্ত সর্তাদি সংশোধনান্তর যাহাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের মধ্যে একটি মৈত্রীচুক্তি সম্পাদিত হইতে পারে, তজ্জন্য শীঘ্রই নূতন করিয়া আলাপ আলোচনা আরম্ভ হইবে।

কোস্টারিকা নিকারাগোয়া হইতে যে আক্রমণের অভিযোগ করিয়াছে, সে সম্বন্ধে তদন্তের জন্য ২১টি আমেরিকান রাজ্যের প্রতিনিধি লইয়া গঠিত এক তদন্ত কমিশন অদ্য বিমানযোগে কোস্টারিকা যাত্রা করিয়াছে।

১৩ই জানুয়ারী—হংকংএর এক সংবাদে প্রকাশ, মার্কিন ও জাতীয়তাবাদী চীনারা যে সকল চীনা গুপ্তচরকে প্যারাসুটযোগে দক্ষিণ চীনে নামাইয়া দিয়াছিল, তন্মধ্যে ১১ জনের প্রতি প্রাণদণ্ডাদেশ প্রদত্ত হইয়াছে এবং উক্ত দণ্ডাদেশ কার্যকরী করা হইয়াছে।

১৪ই জানুয়ারী—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাধ্যতামূলকভাবে সৈনাবাহিনীতে যোগদানের ব্যবস্থা আরও চার বৎসর চালু রাখার জন্য প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মার্কিন কংগ্রেসকে অনুরোধ জানাইয়াছেন।

১৫ই জানুয়ারী—সোভিয়েট সরকার আজ ঘোষণা করেন যে, পশ্চিম জার্মানী যদি অতলান্তিক চুক্তির অভ্যন্তরে সেনাবাহিনী গঠনের পরিকল্পনা ত্যাগ করে, তবে রাশিয়া উভয় জার্মানীর মিলনসাধনের প্রথম ব্যবস্থা হিসাবে পশ্চিম জার্মানীকে স্বীকার করিয়া লইবে।

১৬ই জানুয়ারী—ওয়াশিংটনের কস্টারিকান দূতাবাস হইতে ঘোষণা করা হয় যে, একখানা অজ্ঞাত পরিচয় বিমান নাইকারগুয়া সীমান্ত হইতে ৪০ মাইল দূরবর্তী কস্টারিকার লাইবিরিয়া শহরে বোমা বর্ষণ করিয়াছে এবং শহরের উত্তরে বড় রকমের যুদ্ধ চলিতেছে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
সংখ্যা ১৩

১৫ মাঘ

DESH SATURDAY, 29TH JANUARY, 1955.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

বিপ্লবের পথে ভারত

কংগ্রেস কি? কংগ্রেসের ষষ্ঠিতম অধিবেশনের সভাপতি শ্রীযুত ধেবর তাঁহার অভিভাষণে এই প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন এবং নিজেই সেই প্রশ্নের জবাব দিয়াছেন। কংগ্রেস-সভাপতির সেই উত্তরে মহাত্মা গান্ধীর জীবনাদর্শের আলোক আমাদের মনকে স্পর্শ করিয়া নৈতিক চেতনার ভাব জাগ্রত করে। কংগ্রেসের স্বরূপ বিশ্লেষণ করিতে গিয়া শ্রীযুত ধেবর বলিয়াছেন—ইহা পরাধীন মানবের দুঃখ-দুর্ভোগ-পীড়িত বিক্ষুব্ধ হৃদয় হইতে উদ্গত উত্তপ্ত অশ্রুবিন্দু। ত্যাগ, কৃচ্ছ্র সাধনা, জনসেবা এই সমুদয়ের দ্বারা গান্ধীজী দেশের নরনারীর অশ্রু মুছাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। জাতীয় কংগ্রেস তাঁহার হস্তের যন্ত্রস্বরূপে পরিণত হইয়া জাতির পুনর্জন্ম ঘটায়। শ্রীযুত ধেবর আশাশীল পুরুষ। তাঁহার অভিভাষণের আগাগোড়া সেই আশাশীলতাই প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি অবিসংবাদিত ভাবেই ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রনীতির সমর্থন করিয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গে আমাদের অনুদ্‌যাপিত ব্রতের গুরুত্বের সম্বন্ধে চেতনা এবং আত্মানুসন্ধানের কথা স্বভাবতই মনে উদিত হয়। প্রশ্ন জাগে এই যে, গান্ধীজী যে আদর্শ আমাদের কাছে উপস্থিত করিয়াছিলেন, আমরা তাহা প্রতিপালন করিতে কতটা সমর্থ হইয়াছি। ফলত দুঃখ-দুর্ভোগে পীড়িত নরনারীর উত্তপ্ত যে অশ্রুবিন্দু একদিন কংগ্রেসে জাতির মুক্তির মহতী সাধনায় প্রবল প্রাণবেগ সঞ্চার করিয়াছিল, জাগাইয়াছিল আত্মত্যাগের অমোঘ উদ্দীপনা—প্রাণপাতী প্রেরণা, সেই অশ্রু নদী হইয়া আজও বহিয়া চলিয়াছে। কংগ্রেস কর্ম-সাধনার ক্ষেত্রে যদি তাহা আত্যন্তিক গতিবেগ সঞ্চার করিতে পারে, তবেই বড় কিছু আশা করা যায়। প্রভুত মৃদু পদক্ষেপে সংকট এড়ানো যাইবে না—গতিবেগ বাড়াইতে হইবে। এ পথ বিপ্লবেরই পথ। কংগ্রেস-সভাপতি এই পথেরই উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, বিশ্বের পরিবেশ বৈপ্লবিক প্রবণতায় পরিপূর্ণ। আমরাও এই প্রতিবেশ এড়াইতে পারিব না। বস্তুত ভারতের সমৃদ্ধি ও নিরাপত্তার জন্য বিপ্লবের দাবীকে পূর্ণবেগে চলিতে দিতে হইবে। কিন্তু কে দিবে, কিভাবে দিবে? সভাপতির অভিমত এই যে, সাধারণের সেবায় আত্মনিয়োগ এবং ত্যাগ বরণের পরিবেশ সৃষ্টি না হইলে অর্থনৈতিক এবং সামাজিক বৈষম্য বিদূরিত হইবে না। সুতরাং সে অবস্থায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জাতির উন্নয়ন সার্থক হওয়া সম্ভব নয়। গান্ধীজীর আদর্শ, ভারতের সংস্কৃতির মূলীভূত নৈতিক অন্য কথায় আধ্যাত্মিকতার ভিত্তি এইখানেই। কংগ্রেস সভাপতির কর্মোদ্যমের অগ্নিময় সংস্পর্শে আমাদের রাষ্ট্রসাধনা আর্ত, পীড়িত অগণিত দেশবাসীর অশ্রু ধারার তপ্ততায় বলিষ্ঠ হইয়া উঠিবে, এই আশায় আবাডী কংগ্রেসের অবসানে আমরা সেই ভবিষ্যতের অপেক্ষা করিতেছি।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা

কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা অবলম্বনে দেশের অর্থনীতিক পুনর্গঠনের সংকল্প গ্রহণ করিয়াছে। ভারতের প্রধান মন্ত্রী আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, কংগ্রেসে গৃহীত এতৎসম্পর্কিত প্রস্তাবটি পূর্ব পূর্ব ঘোষণার পুনরুক্তি মাত্র নয়, ইহা চিন্তা-জগতে এক পরিবর্তনের সূচনা করিতেছে। কিন্তু পরিবর্তনের ইচ্ছা করিলেই তাহা সাধন করা সম্ভব হয় না, গণতান্ত্রিক ধারায় তো মোটেই নহে। প্রকৃতপক্ষে সমগ্রভাবে সমাজ-জীবনে পরিবর্তন সাধন করিতে হইলে বৃহতের ভাবনাকে ভিত্তি করিয়াই তাহাকে বাস্তবরূপ দেওয়া যায়। ভাবনার এই বিস্তার আদর্শনিষ্ঠা ও সাধনার উপরই অনেকখানি নির্ভর করে। কংগ্রেস-নীতির সম্বন্ধে যিনি যত বড়ই আশাশীলতা পোষণ করুন না কেন, একথা সত্য যে, আদর্শের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের সাধনার যথেষ্ট পতন ঘটিয়াছে। কংগ্রেসের পবিত্রতা রক্ষা সম্বন্ধে আবাডীর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবে একথা স্বীকৃত হইয়াছে। পণ্ডিত নেহরু নিজেই একথা বলিয়াছেন যে, কংগ্রেসের কাজে এত বেশী শৈথিল্য দেখা দিয়াছে যে, তাহার ফলে সত্য সত্যই সমগ্র প্রতিষ্ঠানটি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। এই দুর্বলতার পাপ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদিগকে পর্যন্ত স্পর্শ করিয়াছে, নেহরুজীর ইহাও সুস্পষ্ট অভিমত। বোম্বাইয়ের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমোরারজী দেশাই এ সম্বন্ধে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহার সোজা-সুজি তাৎপর্য এই যে, নিজেদের ব্যক্তি স্বার্থ, কিংবা মান, যশ প্রতিপত্তি লাভের আশায় কংগ্রেসের নাম ভাঙ্গাইয়া নেতা

সাজিবার লোভ দুর্নিবার হইয়া পড়িয়াছে। এরূপ অবস্থায় জন-সেবা, ত্যাগ এবং কৃচ্ছ্রতা বরণের পথে সামাজিক বৈষম্য অপনোদনের জন্য নৈতিক প্রতিবেশ গঠিত হইতে পারে না। এজন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের শুদ্ধি সাধন সর্বাগ্রে প্রয়োজন। ব্যক্তিগত জীবনের নৈতিক আদর্শের বিচারেই কংগ্রেসের নেতৃত্ব নিরূপিত হওয়া উচিত, আর্থিক সুযোগ সুবিধা সে ক্ষেত্রে সহায়ক না হয়। কংগ্রেসের আদর্শের প্রতি যাহারা নিষ্ঠাহীন নহে এমন মতলববাজ লোকদিগের প্রভাব হইতে কংগ্রেসকে মুক্ত করিবার জন্য কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। সকলের স্বার্থের সমন্বয়ের নামে আদর্শের ক্ষেত্রে গোঁজা-মিল চালানোর নীতির পরিণতি কি, আমরা দেখিতেছি, এখনও যদি সেই নীতিই চলিতে থাকে, তবে কংগ্রেস কোনক্রমেই সমষ্টিজীবনের সংবেদন সম্পর্কে বৈপ্লবিক প্রেরণা বা চেতনা দেশে জাগাইতে পারিবে না। ব্যক্তিস্বার্থ এবং গোষ্ঠীগত স্বার্থের কূটচক্রের পাক হইতে কংগ্রেসকে অগ্রগতির পথে পরিচালিত করিবার পক্ষে ঐরূপ কূটচক্রের ঘোঁট উৎখাত করিবার মত আন্তরিকতা কংগ্রেস নীতির পরিচালন কেন্দ্রে নিষ্ঠিত হওয়া দরকার। কংগ্রেসের কার্য নির্বাহক কমিটির নিকট আমরা ইহাই প্রত্যাশা করিতেছি।

মধুসূদনের স্মৃতিপূজা

রচ মধুচক্র গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি—শতাব্দীকাল পূর্বে মধুসূদনের লেখনীতে অন্তররসে উদ্বেলিত ছন্দে এই বাণী বিনিসৃত হয়। কবির মনোভৃঙ্গ সেই ছন্দে গুঞ্জিত হইয়া মধু-সঞ্চয়নে প্রবৃত্ত হয়। তাঁহার কল্পনা মধুচক্র রচনা করিয়াছে, গৌড়জন একশ বৎসর ধরিয়া সে মধু পান করিয়াছে; কিন্তু যে গৃহে বসিয়া এই মধুচক্র রচিত হইয়াছিল, কলিকাতা ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোডস্থ মধুসূদনের সেই গৃহটি এতদিন অনাদৃত ও উপেক্ষিতই ছিল। অথচ জাতির পক্ষে এই গৃহটি পরম তীর্থস্বরূপ। জল থাকিলেই তীর্থ হয় না, সঙ্কীর্ণতা হইতে উদাররস ভাবনাকে জাগ্রত করাতেই তীর্থের সার্থকতা। সাধকের তপঃপ্রভাব তীর্থভূমিতে পুঞ্জীভূত থাকে, স্মৃতিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তাহা অন্তরে দিব্য প্রেরণার উন্মেষ ঘটায়। মানুষ আপনাকে বড় করিয়া পায়। যে তীর্থ হইতে মেঘনাদ বধ, তিলোত্তমা-সম্ভব প্রভৃতি কাব্য এবং শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী নাটকের রসধারা বিনির্গত হইয়া বাঙলার সাহিত্যে একদিন নবীন প্রাণধারা সঞ্চার করিয়াছিল এবং জাতির অন্তরে বৃহতের অনুভাবনা জাগাইয়াছিল, তাহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তীর্থ আর কি হইতে পারে? বাঁধনভাঙা প্রাণের দান মধুসূদনের গান। মধুসূদন তীর্থপ্রব এবং তাঁহার সাধনার ক্ষেত্র জাতির পবিত্র তীর্থ। সুখের বিষয় এই যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই বাড়িটি ক্রয় করিয়া জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাঙালী পরমুখাপেক্ষী না হইয়া বাঙলা সাহিত্য হইতে আপনাকে আবিষ্কার করে, ইহাই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু আমরা এখনও 'পরধন লোভে মত্ত' এবং পরদেশের মতবাদ ধার করিতেই ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছি। 'পরজন হ'তে নিগুর্ণ স্বজন শ্রেয়'—এই উক্তির তাৎপর্য দেশাত্মবোধের দিক হইতে আমাদের একান্ত হৃদ্যতার সঙ্গে উপলব্ধি করা প্রয়োজন। মধুসূদনের গীতিময় জীবনে এই আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আত্মগৌরবই দীপ্তি ছড়াইয়াছে। জাতির প্রাণমূলে যাঁহার ধ্যানরসের এত বড় দান, তাঁহার স্মৃতি উপযুক্তভাবে রক্ষা করিবার জন্য প্রকৃতপক্ষে আমরা বিশেষ কিছুই করি নাই। বাঙলার সাহিত্যিক সমাজের পক্ষ হইতে যাঁহারা মধুসূদনের গৃহটি জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, তাঁহারা এই দিক হইতে সমগ্র জাতির ধন্যবাদের পাত্র। গত ২৫শে জানুয়ারী কবির জন্মদিবস ছিল। এই উপলক্ষে ঐ বাড়িটিতে মহাকবির অনুরাগী ও ভক্তগণ সম্মিলিত হইয়া তাঁহার উদ্দেশে শ্রদ্ধা-নিবেদন করেন। মহাকবি মধুসূদনের সাধনক্ষেত্র এই সাহিত্য-তীর্থ বাঙলার জাতীয় জীবনকে নবসৃষ্টির চেতনায় নিরবধি প্রেরণা উদ্দীপ্ত করিবে, এই আশা অন্তরে লইয়া আমরা তাঁহার আবির্ভাব দিবসে তাঁহাকে স্মরণ করিয়া অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি এবং কবির স্মৃতিরক্ষার এই উদ্যমের সাফল্য কামনা করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গ ও বিহার

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্যদের বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের আসিবার দিন যতই নিকটবর্তী হইতেছে, বিহারের সীমানাবর্তী অঞ্চলে বাঙালী বিরোধী আন্দোলনের তৎপরতা ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে বিহারের সংখ্যালঘু ভাষাভাষীদের দাবীর মূলে শুধু মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের প্রশ্নটিই প্রধান নয়। অর্থনীতিক, সাংস্কৃতিক সকল দিক হইতেই সে দাবীর যথেষ্ট গুরুত্ব রহিয়াছে, গুরুত্ব রহিয়াছে মানুষের ন্যায্য অধিকারের দিক হইতে। বস্তুত পশ্চিমবঙ্গ বিহারের অংশবিশেষ দাবী করিতেছে না। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের কূটনীতির ফলে বাঙলার যে অঞ্চল বিহারের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল, পশ্চিমবঙ্গ শুধু সেই অংশ সে ফিরিয়া পাইতে চায়। গুণ্ডামি কিংবা অপপ্রচারের সাহায্যে পশ্চিমবঙ্গের এই সঙ্গত দাবীর প্রতিরোধে যাহারা প্ররোচনা দিতেছেন, তাঁহারা ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ এবং সংস্কৃতিগত সংহতির পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছেন। ফলতঃ প্রাদেশিকতার অন্ধতা সাম্প্রদায়িকতার মতই মারাত্মক। বিহারের মন্ত্রীরা বিভিন্ন স্থানে সভা-সমিতি করিয়া জনগণের মধ্যে উত্তেজনা ছড়াইতেছেন আর লোকেরা মারমুখো হইয়া উঠিতেছে। তাহারা বাঙলার দাবী এবং বাঙলা ভাষার স্বপক্ষে কথা শুনিলে তাহাকে লাঠিপেটা করিবার জন্য রুখিয়া দাঁড়াইতেছে। কমিশনের কাজ আরম্ভ হইলে এই উত্তেজনার মাত্রা চরমে উঠিবে, আমাদের এই আশঙ্কা হইতেছে। বিহারী নেতারাও দেখিতেছি তাহাই চাহিতেছেন। কমিশন লোকের হল্লা দেখিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তের বিচার করিবেন না, তথ্যের উপর তাঁহাদের সিদ্ধান্তের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে। এরূপ অবস্থায় কমিশনের কাছে লোক জড়ো করিয়া পশ্চিমবঙ্গের দাবীর বিরুদ্ধে আখড়াই জমাইবার চেষ্টা সুস্পষ্টভাবেই অভিসন্ধিমূলক এবং অনিষ্টকর।

শ্রীশ্রীসরস্বতী পূজা

শ্রীসুধীররঞ্জন সেন

"পাবকা নঃ সরস্বতী বাজেভির্বাজিনীবতী।
যজ্ঞং বষ্টু ধিয়াবসুঃ॥"
ঋগ্বেদ ১।১।৩।১০

হে পাবনী সরস্বতী, তুমি আমাদিগকে পবিত্র করিয়া তুলিতেছ, তুমি অন্নে, ঊর্জে ও পূর্ণ সম্পদে আমাদিগকে সমৃদ্ধ কর। ধিয়াবসু তুমি, ধী-বুদ্ধিই তোমার সত্তার সম্পদ, তুমি আমাদের জীবনাহুতি গ্রহণ কর।

আজ বাঙ্ময়ী, বীণাপাণি সরস্বতীর বন্দনা-উৎসব। নীরস পাহাড়ের বুকে সরস স্রোতস্বিনীর মত, তপ্ত মরুর বুকে স্নিগ্ধ মরূদ্যানের মত, বিশুষ্ক উদ্যানে হঠাৎ ফোটা ফুলের মত, পঙ্কের বুকে পঙ্কজের মত, জমাট-বাঁধা জড়ের জীবনে অঙ্কুরন্ত প্রাণপ্রবাহের মত তমোমূঢ় অবিদ্যাচ্ছন্ন জগতের বুকে আজ জ্যোতির্ময়ী বাগ্‌দেবীর আবির্ভাব মহোৎসব! ঠিক এমনিতরই এক পুণ্যা তিথিতে, বাসন্তী শ্রীপঞ্চমীতে পরাপর-রূপিণী বাঙ্ময়ী পরাশক্তি শ্রীসরস্বতীর প্রথম আবির্ভাব হইয়াছিল। শীতের মৃত্যু-শীতল তুহিনস্পর্শে জীব-জগৎ যখন ম্রিয়মান, তখন নৈসর্গিক নিয়মে, প্রকৃতিরই বিধানে ধরিত্রীর বুকে যেমন নামিয়া আসে মৃদু মধুর মলয়-হিল্লোল, আকুলিত জীবকুলের বুকে জাগে জীবনের এক নূতন শিহরণ, তেমনই অমৃতের পুত্র হইয়াও অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন আমরা যখন অবিদ্যার অন্তরেই বসবাস করি, অন্ধের ন্যায় জগৎ-ধাঁধায় উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া যখন পরিত্রাহি চীৎকারে আর্তনাদ করি—

"অবিদ্যায়া অন্তরে বিদ্যমানাঃ
স্বয়ং ধীরাঃ পণ্ডিতম্মন্যমানাঃ।
জঙ্ঘন্যমানা পরিযন্তি মূঢ়াঃ
অন্ধেনৈব নীয়মানা যথান্ধাঃ॥"
কঠোপনিষৎ

—তখন বসন্তের মলয়ানিলের মত সন্তানের অন্ধতমিস্রা অপসৃত করিয়া আলোকমালায় আবির্ভূতা হন মাতৃস্নেহের

প্রস্তর খোদিত সরস্বতী
দশম শতাব্দী, সুন্দরবন, চব্বিশ পরগণা
[আশুতোষ মিউজিয়ামের সৌজন্যে]

মূর্ত বাণী বীণাপাণি! ভক্ত হৃদয়ে তাঁর ধ্যানমন্ত্র উদ্গীত হয়—

ওঁ "তরুণ শকলমিন্দোর্বিভ্রতী শুভ্রকান্তিঃ
কুচভরনমিতাঙ্গী সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে।
নিজ কর কমলোদ্যল্লেখনী পুস্তকশ্রীঃ
সকলবিভবসিদ্ধ্যৈ পাতু
বাগ্‌দেবতা নঃ॥"

সরস্বতী ব্রহ্মবিদ্যা। ভক্ত হৃদয়ের শ্বেত শতদলে তিনি সন্নিষণ্ণা। কী এক শুভ্র মাতৃত্বে চারিদিক উদ্ভাসিত। অকলঙ্করূপে গড়া এ অপরূপ মাতৃত্ব—"যেন কত চাঁদ নিঙাড়ি ও রূপ গড়ল গো'! মা আমার কুচভরনমিতাঙ্গী—স্তনভারে নম্রা, বাৎসল্যে ঢল ঢল, মাতৃত্বের অনুপম মূর্তি! স্নেহবিহ্বলা, স্নেহময়ী মা আমার যেন স্ব-মহিমায় 'সন্নিষণ্ণা সিতাব্জে' —শ্বেত শতদলে সম্যক্ আসীনা। তিলে যেমন তৈল থাকে, দধিতে যেমন ঘৃত থাকে, ইক্ষুতে যেমন মিষ্টত্ব থাকে, অরণিতে যেমন অগ্নি থাকে,

"তিলেষু তৈলং দধনীব সর্পিঃ
আপঃ স্রোতস্বরণীষু চাগ্নিঃ—
(শ্বেতাশ্বর)"

তেমনতরই মা আমার বিশ্বের সর্বত্র, সর্ববাদীন ব্যাপ্ত হইয়াই বিরাজমানা। সাধক, হৃদয়-শতদলে মায়ের এই সর্বব্যাপী মূর্তিকে অনুভব কর, আবার বাহিরে এই বিশ্বপটে তাঁহার শ্বেত-শুভ্রা জ্যোতি দর্শন কর।

সিতাব্জ কথার অর্থ শতদলরূপে বুদ্ধিতত্ত্ব। বুদ্ধি-গুহা বা হৃদয়-গুহায়ই মায়ের অবস্থান, "ঈশ্বর সর্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি'। হৃদয় তমো-রজোবিধৌত হইলেই সত্ত্বগুণের উদয় হয় এবং সেখানে ব্রহ্মবিদ্যা আবির্ভূতা হন। উপনিষৎ বলেন—

"অণোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্
আত্মা গুহায়াং নিহিতোহস্য জন্তোঃ।
তমক্রতুং পশ্যতি বীতশোকো
ধাতুঃ প্রাসাদান্মহিমানমীশম্॥"
শ্বেতাশ্বর ৩।২০

প্রাণিগণের বুদ্ধি-গুহায় প্রচ্ছন্নভাবে স্থিত আত্মা অণু অপেক্ষাও অতিশয় অণু এবং মহান্ অপেক্ষাও অতিশয় মহান্। তাই বুদ্ধিই মায়ের চিরন্তন বাসন। সর্বত্র মা পরিব্যাপ্ত থাকিলেও, সবই মায়ের আসন হইলেও বুদ্ধি ভিন্ন অন্য কোথায়ও তিনি সন্নিষণ্ণা—সম্যক্ আসীনা নহেন। বুদ্ধিরূপে শ্বেত শতদলের সহস্র দল অপূর্ব শোভায় বিকশিত করিয়া মা তোমার ঐ শুভ্র বুদ্ধিতেই সুপ্রকট। সাধক, এই শোভাময়ী মাকে তোমার ঐ বুদ্ধি শতদলে, বুদ্ধির বিদ্যোতনে, বোধে বোধে উদ্‌বুদ্ধ কর—"প্রতিবোধবিদিতমতমমৃতত্বং হি বিন্দতে", তোমার প্রতি বোধধারায় মাকে বন্দনা করিয়া অমৃতত্ব লাভ কর।" "বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য সচ্চিত্তঃ সততং ভব" (গীতা), এই বুদ্ধিরূপে যোগ অবলম্বন করিয়া সতত সচ্চিত্ত হও, শুভ্র

কান্তি মা আমার তাঁর শুভ্র জ্যোতিতে সব দিক ভরপুর করিয়া তোমার হৃদয়-পুরে নিত্য অধিষ্ঠিত থাকিবেন।

শুভ্র কান্তি—আমরা যে কান্তি বা রূপ দেখি, তা জড়ত্ব-কালিমা-মণ্ডিত, কিন্তু মায়ের রূপ অকলঙ্ক রূপবিভায় বিমণ্ডিত ঋষির দৃষ্টিতে বিশুদ্ধ বোধ যেন শুভ্র কান্তিরূপে মাতৃত্বঘন হইয়া প্রকাশিত হইল। এ-মাতৃত্ব ধ্যানের আবরক নহে, প্রকাশক। জ্ঞানের কলঙ্ক নয়, শোভা। "সত্যং জ্ঞানং অনন্তং" যিনি, "শান্তং শিবং অদ্বৈতং" যিনি, তিনি সুন্দর ও মধুর হইয়া প্রকাশিত হইলেন মাতৃরূপে। তাই জ্ঞানই কুচভরনমিতাঙ্গী, শুভ্র কান্তিতে আবির্ভূত।

সমুদ্রবক্ষ উদ্বেলিত হইলে, জলরাশি যেমন দিকে দিকে প্রবাহিত হয়, মাতৃবক্ষের ক্ষীরধারা যেমন শতধারে ক্ষরিত হয়, "প্রজ্ঞানং ব্রহ্ম'ও তেমনই মাতৃত্বের স্নেহ-ধারায় ধরার বুকে নামিয়া আসিলেন ব্রহ্মবিদ্যা বাগ্‌দেবীরূপে, "মহো অর্ণঃ" সরস্বতীরূপে। বিগলিত মাতৃত্বে সৃষ্টি-রঞ্জনা জাগিয়া উঠিল, মায়ের হাতের বীণায় বাজিয়া উঠিল সেই সৃষ্টি-রাগিণী নাদময়, ব্যোমময় ওঁ...ওঁ...ওঁ। নাদ বা শব্দ অবলম্বনেই জগতের সৃষ্টি। তাই নাদের প্রতীক ঐ বীণা বীণাপাণির হস্তে সুশোভিত 'যা বীণাবরদণ্ডমণ্ডিতভুজা'। এই বিচিত্র বিশ্ব বীণাবাদিনীর বীণার ঝংকার, বাগ্‌দেবীরই স্বর-সুষমা সাধক, তোমার জীবন ছিন্ন বীণার মত সুত্র-বিচ্ছিন্ন হইয়া নানা তুচ্ছতার মধ্যে ব্যর্থ হইয়া রহিয়াছে, তাই এর মধ্যে এখনও কোন সংগীতের আবির্ভাব হয় নাই। প্রিয় আমার, পুত্র আমার, বাঁধ তোমার ঐ জীবন বীণার ছিন্ন তারগুলি, বাজাও তাহাতে বিশ্ব-সংগীতের শ্রেষ্ঠ সুর ওঁ ওঁ ওঁ, বিশ্বকবির সৃষ্টি-লীলার লীলা-সহচর সাধক তুমি, তোমার জীবন-বীণায়ও উদ্গীত হউক সেই অনাদি সংগীত ওঁ ওঁ ওঁ, অনাহত নাদ ব্যোম ব্যোম ব্যোম, নাদময়ী, শব্দময়ী মা, মা, মা!

ঋষি জানেন, মা শব্দময়ী, সংগীত-ময়ী। বাহিরে যাহা বাধা, বিপত্তি, ব্যবধান, বাহিরে যাহা দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, বিপর্যয়, সবার সমন্বয় আমার মায়েরই অন্তরে। বাহিরে যাহা কল-কোলাহল, মায়ের বুকে তাহাই কলনিঃস্বন, কল-গীতি। মা আমার ভাবময়ী, ভাষাময়ী, বর্ণময়ী। আমাদের চক্ষে যাহা বৈষম্যময় জগৎ, ঋষির চক্ষে তাহাই রসস্রাবী কবিতা, মায়ের স্বহস্ত লিখিত গ্রন্থ। যাহার অক্ষর পরিচয় হয় নাই, তাহার কাছে কোন পুস্তকবিশেষ যেমন কতগুলি খামখেয়ালী রেখা বা অজানা অক্ষরের সমষ্টি মাত্র, তেমনই অজ্ঞ বা অ-তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তির চক্ষে এই বিশাল বিশ্বজাল একটা জটিল সমস্যা, একটা অর্থহীন জিজ্ঞাসা বা একটা দুর্বোধ্য রহস্য মাত্র। কিন্তু অজ্ঞানের জ্ঞানলাভ হইলে পুস্তকের খামখেয়ালী রেখাগুলি বা ঘুমন্ত অক্ষরগুলি যেমন জীবন্ত ও মুখর হইয়া উঠে; যা ছিল অর্থহীন, অবোধ্য অন্তরায় মাত্র, তাহা যেমন সার্থক রসের সৃষ্টি করে, যা ছিল দুর্বোধ্য ও অস্পষ্ট, তাহা যেমন ক্রমশ সুস্পষ্ট ও সরস হইয়া অফুরন্ত রস পরিবেশন করে—ঋষির চক্ষেও তেমনই আজ বিশ্বের সর্ব রূপ, সর্ব সত্তা এক সুমধুর বাণী-মূর্তিতে, মধুর সংগীতে সঞ্জীবিত হইয়া উঠিয়াছে। মায়ের কোমল করস্পর্শে মনো-মন্দিরের পাষাণ কপাট খুলিয়া গিয়াছে, ছিন্ন বীণার তন্ত্রীগুলি নূতন সুরের মোহন মূর্ছনায় বাজিয়া উঠিয়াছে—দিকে দিকে বিশ্ব-সংগীত ঝংকৃত হইতেছে ওঁ ওঁ ওঁ, বিশ্বের বাস্তব সত্তা আজ যেন বিলুপ্ত হইয়া শুধু মুখরিত হইতেছে সেই মহাসংগীত, মায়ের ভাষা ওঁ ওঁ ওঁ, ব্যোম তাহার বিশাল বক্ষ বিস্তার করিয়া বলিতেছে ওঁ ওঁ ওঁ, বায়ু তাহার ভীমবাহু উত্তোলন করিয়া বলিতেছে ওঁ ওঁ ওঁ, অনন্ত গগনে অসংখ্য চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারা জ্যোতির হাসি হাসিয়া জ্যোতির্ময় ভাষায় বলিতেছে ওঁ ওঁ ওঁ, অগ্নি তাহার অগ্নিময়ী বাণীতে অগ্নিবর্ণার বন্দনা গাহিতেছে ওঁ ওঁ ওঁ, সপ্তসিন্ধু তার সহস্র তরঙ্গ ভঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া স্তোত্রগীতি গাহিতেছে ওঁ ওঁ ওঁ, বসুন্ধরা তার সকল বসু, সকল ধন অর্পণ করিয়া অর্চনা করিতেছে ওঁ ওঁ ওঁ, সাধক, তুমিও আজ বীণাপাণির বীণার ঝংকারে মুগ্ধ হইয়া, ভক্তির উৎস উৎসারিত করিয়া আবেগভরে আবাহন কর ওঁ ওঁ ওঁ, বল, মা, মা, মা; মুক্তকেশীর মুক্ত আলোকে হৃদয়মণ্ডপ মণ্ডিত করিয়া, সর্বশুক্লার শুভ্র জ্যোতিতে দহরাকাশ বিভাসিত করিয়া বরণ কর সেই চিরবরেণ্যা বাঙ্ময়ীকে, অর্পণ কর তোমার ঐ হৃদয়-হ্রদের শ্বেত-কমল, আর আকুতিভরে প্রণতি জানাও সর্বশুভ্রার চরণসরোজে—

ওঁ সরস্বতী মহাভাগে বিদ্যে কমল লোচনে।
বিশ্বরূপে বিশালাক্ষি বিদ্যাং দেহি
নমোঽস্তুতে॥

সুভাষচন্দ্রের পত্র

[অপ্রকাশিত পত্রটি স্বর্গত অনিলচন্দ্র বিশ্বাসের নিকট লিখিত]

Mandalay Jail
c/o D.I.G., I.B. C.I.D.
13 Elysium Row, Calcutta
৯।৭।২৬

প্রিয়বরেষু,

আপনার ১০ই মার্চের পত্র আমি এতদিন উত্তর না দিয়া ফেলিয়া রাখিয়াছি—অপরাধ মার্জনা করিবেন। আপনার ১০ই জুনের পত্রও কিছুকাল হইল আমার হস্তগত হইয়াছে। আপনার প্রেরিত (১) Variety entertainment-এর কার্যসূচী (২) পুস্তক তালিকা (৩) সমিতির বিবরণী, আমি যথাসময়ে পাইয়াছি। দ্বিতীয় পত্রের সহিতও বিবরণীর আর এক কপি আমি পাইয়াছি। সমিতির নিয়মাবলী ও গত বৎসরের বিবরণী আশা করি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকায় propaganda ছাড়া বিস্তৃত সচিত্র কার্যবিবরণী প্রতি বৎসর ছাপান বিশেষ দরকার। বৎসরে দুইবার ছাপাইলে কোনও আপত্তি নাই যদি হাত থেকে খরচ না হয়। যদি খরচ হয়, তবে বৎসরে একবার বিবরণী ছাপাইলে চলিবে। সচিত্র বিবরণীর দ্বারা যেরূপ propaganda হইবে, পত্রিকায় সব সময়ে সেইরূপ হওয়া সম্ভব নয়। বিজ্ঞাপন লইলে লওয়া উচিত এবং মাছের তেলে মাছ ভাজিয়াও যাহাতে কিছু লাভ রহিয়া যায় তাহা করিতে পারিলে আরও ভাল হয়। বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিয়া আমি যেরূপ আনন্দ পাইয়াছি, পুস্তক তালিকা পাঠ করিয়া আমি সেরূপ খুসী হইতে পারি নাই। তার কারণ পুস্তিকায় ছাপার দোষ আছে, পুস্তকের নামগুলি সব সময়ে বর্ণানুক্রমিকভাবে ছাপান হয় নাই এবং একই পুস্তকের নাম একাধিকবার পাওয়া যায়—এমন কি সময়ে সময়ে একই পৃষ্ঠায় একই পুস্তকের নাম একাধিকবার পাওয়া যায়। Catalouge-এর মধ্যেও বিজ্ঞাপন লইলে ক্ষতি হইত না। Library catalouge বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গোছান নেহাৎ সহজ কাজ নয়—সুতরাং আমি আপনাদিগকে প্রথম বারের ছাপার দরুণ দোষ দিই না। তবে ভবিষ্যতে যাহাতে ভুলগুলি সংশোধিত হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা উচিত। ২।১টি ভাল ও বড় Libraryর Catalogue দেখিলেই বুঝা যাইবে কি প্রণালীতে পুস্তক সাজাইতে হয় এবং পুস্তকের নাম বা তালিকা Catalogue-এর মধ্যে কি প্রণালীতে তুলিতে হয়। আমাদের যিনি Librarian তাঁহার অন্যতম কর্তব্য, পুস্তক সাজাইবার বৈজ্ঞানিক প্রণালী ভাল করিয়া শিক্ষা করা। কোন্ পুস্তক কোন্ বিষয়ের মধ্যে সন্নিবেশিত হওয়া উচিত তাহা বিচার করাও সব সময়ে সহজ নয়।

বয়ন ও সীবন বিভাগের যে টাকা খরিদ্দারদের নিকট পাওনা ছিল তার মধ্যে কত আদায় হইয়াছে, কত আদায় হইবে এবং কত আদায় হইবার আশা নাই তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। সব ব্যবসায়ের মধ্যেই টাকা ফেলিয়া রাখিলে পরে আদায় করা খুব মুশকিল হয়। যে সব ভদ্রলোক সমিতির বা দোকানের দেনা শোধ করেন না বলিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত ভবিষ্যতে কারবার না করাই বাঞ্ছনীয়। ইহা ব্যতীত কোন্ কোন্ বিভাগে কত প্রাপ্য টাকা বাকী পড়িল সেদিকে ভবিষ্যতে আপনাকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

হরিচরণের পত্রে জানিলাম যে, বয়ন বিভাগের অবস্থা খুব ভাল নয় এবং সুতার অভাবের দরুণ বিশেষ অসুবিধা হইতেছে। মিলের সুতারও অভাব যদি হইয়া থাকে (টানার জন্য) তবে মেজদাদার (শরৎবাবু) সাহায্যে বঙ্গলক্ষ্মীর সহিত একটা বন্দোবস্ত করিবার চেষ্টা করিতে পারেন। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার লাহিড়ী ইচ্ছা করিলেই বঙ্গলক্ষ্মীর সুতা ধার দিতে পারেন—আমরা সুবিধামত পরে দাম শোধ দিব। আমি জানি তিনি কোনও কোনও তাঁতের প্রতিষ্ঠানকে এইভাবে সাহায্য করিয়া থাকেন। চরকার সুতা সম্বন্ধে আমি এখানে বসিয়া কিছু বলিতে পারি না। তবে আমার মনে হয় যে, বসুমতী অথবা Forward-এর সাহায্যে আপনারা চরকার সুতা কিনিবার অভিপ্রায় মফস্বলবাসীদিগকে জানাইতে পারেন। ইহা ব্যতীত ভবানীপুরেও যাহাতে চরকার সুতা উৎপন্ন হয় তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। সুতা সম্বন্ধে All India Khadi Committeeকে লিখিয়া দেখিতে পারেন—তাঁহারা কিছু করিতে পারেন কিনা। অভয়-আশ্রম ও খাদি প্রতিষ্ঠানের সাহায্য পাইবার জন্য আপনারা ইতিপূর্বেই চেষ্টা করিয়াছেন—আশা করি। যে জমির কথা আপনি লিখিয়াছেন সে বিষয়ে সবিশেষ জানিবার জন্য আমি উৎসুক আছি। জমির মালিক কিরকম লোক, জমিটা কোথায় এবং কি সর্তে তিনি জমি দিতে প্রস্তুত আছেন (অর্থাৎ তিনি জমি দান করিতে চান না ব্যবহারের জন্য দিতে চান) তাহা জানিবার জন্য আমি উৎসুক আছি। তুলার চাষের জন্য যদি জমি না পাওয়া যায়—তবে—সেবাশ্রমের জন্য (orphanage) অথবা অন্য কোনও জনহিতকর কাজের জন্য ঐ জমি পাইবার আশা আছে কিনা? ভবিষ্যতের কাজের জন্য আমার আরও অনেক কল্পনা আছে। সে সব কল্পনাকে সফল ও সার্থক করিয়া তুলিতে হইলে জমির প্রয়োজন হইবে।

"আত্মশক্তি" সম্বন্ধে আমি এখন কোনও খবর রাখি না—যদি কিছু খবর দিতে পারেন তবে সুখী হইব। Social Service-এর কাজে আপনি "আত্মশক্তির" সাহায্য পূর্ণমাত্রায় পাইতে পারেন। এ বিষয়ে যদি আমার কিছু লেখা প্রয়োজন হয় তাহা হইলে আমাকে জানাইবেন। আমি বোধ হয় আপনাকে ইতিপূর্বে লিখিয়াছি যে, আমার বিশ্বাস যে, বম্বাইতে যেরূপ Social Service Magazine আছে কলিকাতায়ও সেইরূপ হওয়া উচিত। আপনার সহিত আমার

মিল এইটুকু যে, আমি মনে করি, আমাদের পক্ষে ঠিক এই সময়ে এইরূপ কাজে হাত দেওয়া ঠিক নয়। ব্রাহ্ম মুহূর্তের জন্য আমাদিগকে অপেক্ষা করিতে হইবে। ইতিমধ্যে যদি কেহ এই কাজে হস্তক্ষেপ করেন তবে আমরা সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।

আপনি বোধ হয় ইতিপূর্বে শুনিয়াছন যে, আমাদের অনশন ব্রত একেবারে নিরর্থক বা নিষ্ফল হয় নাই। গভর্নমেণ্ট আমাদের ধর্ম বিষয়ে দাবী স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং অতঃপর বাঙ্গলাদেশের সকল রাজবন্দী পূজার খরচ বাবদ বাৎসরিক ৩০৲ টাকা allowance পাইবেন। ত্রিশ টাকা অবশ্য অতি সামান্য এবং ইহার দ্বারা আমাদের খরচ কুলাইবে না; তবে যে principle গভর্নমেণ্ট এতদিন স্বীকার করিতে চান নাই তাহা যে এখন স্বীকার করিয়াছেন—ইহাই আমাদের সবচেয়ে বড় লাভ—টাকার কথা সর্বক্ষেত্রে, সর্বকালে অতি তুচ্ছ কথা। পূজার দাবী ছাড়া আমাদের অন্যান্য অনেকগুলি দাবীও গভর্নমেণ্ট পূরণ করিয়াছেন। বৈষ্ণবের ভাষায় কিন্তু বলিতে গেলে আমাকে বলিতে হইবে—"এহ বাহ্য"। অর্থাৎ অনশন ব্রতের সবচেয়ে বড় লাভ অন্তরের বিকাশ ও আনন্দ লাভ—দাবী পূরণের কথা বাহিরের কথা, লৌকিক জগতের কথা। Suffering ব্যতীত মানুষ কখনও নিজের অন্তরের আদর্শের সহিত অভিন্নতা বোধ করিতে পারে না এবং পরীক্ষার মধ্যে না পড়িলে মানুষ কখনও স্থির নিশ্চিতভাবে বলিতে পারে না তাহার অন্তরে কত অপার শক্তি আছে। এই অভিজ্ঞতার ফলে আমি নিজেকে এখন আরও ভালভাবে চিনিতে পারিয়াছি এবং নিজের উপর আমার বিশ্বাস শতগুণে বাড়িয়াছে।

ব্যায়াম চর্চার ব্যবস্থা করিয়া আপনারা ভালই করিয়াছেন। এ বিষয়ে যদি কিছু টাকা খরচ করিতে হয় তাহা হইলে পশ্চাৎপদ হওয়া উচিত নয় কারণ "শরীরমাদ্যং খলু ধর্মসাধনং"। এ বিষয়ে যাহাতে সব স্কুলের ছাত্রেরা উদ্যোগী হয় তার জন্য আপনাদের চেষ্টা করা উচিত—প্রয়োজন বোধ করিলে স্কুলের কর্তৃপক্ষদের বলা উচিত বা তাঁহাদের নিকট লেখা উচিত। জাতীয় বিদ্যালয়ের ২।১ জন শিক্ষক আমাকে লিখিয়াছেন যে, তাঁহাদের ছাত্রদের খেলিবার মাঠ তাঁহারা পাইতেছেন না। এ বিষয়ে তাঁহাদের সাহায্য করিলে ভাল হয়।

সমিতির নিয়মাবলী সম্বন্ধে আপনি কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন তাহার উত্তর আমি একে একে দিতেছি।

(ক) কার্যকরী সমিতি

চারি বৎসর অন্তর সম্পূর্ণ পুনর্নির্বাচন হওয়া উচিত। কিন্তু প্রতি বৎসর এক-তৃতীয়াংশের পুনঃ নির্বাচন হওয়া উচিত। ইহার ফলে উভয় মতের সামঞ্জস্য হইতে পারে। বাৎসরিক নির্বাচনে সুবিধা যেরূপ আছে—অসুবিধাও তদ্রূপ আছে—এ বিষয়ে আমি আপনার সহিত একমত। প্রথম বৎসরের শেষে কোন্ তৃতীয়াংশের পুনর্নির্বাচন হইবে তাহা lottery-র দ্বারা স্থির করা যাইতে পারে। দ্বিতীয় বৎসরের শেষে বাকী two-thirds-এর মধ্যে কোন্ তৃতীয়াংশের নির্বাচন হওয়া উচিত তাহাও lottery-র দ্বারা স্থির হইতে পারে। তৃতীয় বৎসরের শেষে বাকী তৃতীয়াংশের পুনর্নির্বাচন করা উচিত। চতুর্থ বৎসরের শেষে কার্যকরী সমিতির সম্পূর্ণ নূতন নির্বাচন হওয়া উচিত।

Office bearersদের প্রতি বৎসর পুনর্নির্বাচন হওয়া উচিত। প্রথম বৎসরের, দ্বিতীয় বৎসরের ও তৃতীয় বৎসরের শেষে পুনর্নির্বাচন হইবে কার্যকরী সমিতি কর্তৃক। চতুর্থ বৎসরের শেষে যখন কার্যকরী সমিতি সাধারণ সমিতির দ্বারা সম্পূর্ণভাবে পুনর্গঠিত হইবে, তখন সাধারণ সমিতির দ্বারা Office bearers-দের নির্বাচন হইবে। সাধারণ সমিতির দ্বারা Office bearers-এর নির্বাচন একবার হইলে, তখন পরের তিন বৎসর কার্যকরী সমিতির দ্বারা Office bearers-দের পুনর্নির্বাচন হইবে। বৎসরের শেষে কার্যকরী সমিতির তৃতীয়াংশের পুনর্নির্বাচন হইবার পর Office bearers-দের পুনর্নির্বাচন হইবে। আমার প্রস্তাবটা একটু জটিল হইয়া পড়িল সন্দেহ নাই। কিন্তু একদিকে আমাদের পরিবর্তন চাই এবং অপরদিকে দুরভিসন্ধিযুক্ত বাহিরের লোকেদের হাত হইতে সমিতি'ক রক্ষা করা চাই—সুতরাং constitutionটা এ বিষয়ে একটু জটিল না হইয়া পারে না। উপরোক্ত constitutional safeguard-এর আদৌ কোনও প্রয়োজন আছে কি না তার বিচার করিবেন আপনারা।

(খ) চাঁদা। মাসিক চাঁদা ৷৷৹ করিতে পারেন—তাহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু আমার বিশেষ সন্দেহ হয় যে, সভ্যের সংখ্যা কমিয়া যাইতে পারে। যদি সে বিষয়ে আপনারা নিঃসন্দেহ হইতে পারেন তবে চাঁদা বাড়াইয়া ৷৷৹ করিতে পারেন। কিন্তু একটা নিয়ম থাকা উচিত যে, কোনও সভ্যের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হইলে কার্যকরী সমিতি ইচ্ছা করিলে চাঁদা কমাইয়া ৷৹ আনা অথবা ৵৹ আনা স্থির করিতে পারিবেন। যাঁহারা শুধু Libraryর সভ্য হইবেন তাঁহাদের চাঁদা ৷৹ আনা মাত্র ধার্য হইতে পারে—এ বিষয়ে আপনার সহিত আমি একমত। Indoor games-এর মধ্যে আমি এখন পর্যন্ত একমাত্র দাবা খেলায় রাজী হইতে পারি কারণ ঐ খেলায় মস্তিষ্ক চালনা বিলক্ষণ হয়। Mah Jong খেলায়ও বোধ হয় রাজী হইতে পারি। কিন্তু Carrom, তাস, Ludo, পাশা প্রভৃতি খেলায় আমার মোটেই মত নাই। এ সবের দ্বারা অনিষ্ট ছাড়া ইষ্ট হইবে না।

কর্মীরা (workers) সভ্যদের সকল সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে কিন্তু তাহাদিগকে চাঁদা দিতে হইবে না। কর্মীরা whole time বা part time এবং বৈতনিক বা অবৈতনিক হইতে পারেন। কে worker অভিহিত হইবে তাহা সাধারণত সম্পাদকই স্থির করিবে। কোনও আপত্তি উঠিলে কার্যকরী সমিতির দ্বারা মীমাংসা হইবে।

(গ) শাখা ও affiliated institution

এই দুইয়ের মধ্যে প্রভেদ এইঃ—

(১) শাখার নাম হইবে সেবক সমিতি, যথা "মজিলপুর সেবক সমিতি" affiliated institution-এর যে কোনও নাম হইতে পারে।

(২) শাখাকে অর্থের দ্বারাও সাহায্য করা যাইতে পারে। কিন্তু affiliated institutionকে অন্যভাবে সাহায্য করি

পারিলেও অর্থের দ্বারা সাহায্য করা আইনসঙ্গত হইবে না।

(ঘ) **Building Fund-এর জন্য Board of Trustees** করা প্রয়োজন

আপনার প্রথম পত্রের উত্তর এতক্ষণে শেষ হইল—এখন ১০ই জুনের পত্রের উত্তর দিতেছি। ১৩৩২ সনের বিবরণী প্রকাশ করা সম্বন্ধে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। আমি এই পত্রের গোড়ায়ই লিখিয়াছি যে, আপনার প্রেরিত বিবরণী প্রভৃতি আমি সব পাইয়াছি। আপনি লাইব্রেরী হইতে কি আমাকে কতকগুলি বই পাঠাইতে পারেন? আমি এক সঙ্গে দুইখানির বেশী চাই না। সেগুলি পড়া হইয়া গেলে আমি ফেরত দিব এবং আরও দুইখানি চাইব। ডাকমাশুলের খরচ আমি দিব—যাহাতে লাইব্রেরীর এক পয়সাও খরচ না হয়। যদি কোনও অসুবিধা না হয় তবে লিখিবেন—আমি আপনাকে জানাইব কোন্ কোন্ বই আমি চাই।

অনাথবন্ধুবাবুকে আমার নাম করিয়া বলিবেন যে, তাঁহাকে বেশী করিয়া খাটিতে হইবে। Social Service-এর ভিতর দিয়া গৃহশিল্প প্রতিষ্ঠার চেষ্টা আমাদিগকে করিতে হইবে। এ কাজে তাঁহার একটু পরিশ্রম করা দরকার। Commercial Museum, Bengal Home Industries প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বা দোকান ঘুরিয়া দেখিলে আমাদের মনে নূতন ভাব আসিতে পারে। বাঙ্গলা গভর্নমেণ্টের শিল্প বিভাগের বাৎসরিক বিবরণী (Administration Report of the Department of Industries) কয়েক বৎসরের পাঠ করিলেও উপকার হইতে পারে। সর্বোপরি, যেখানে গৃহ-শিল্প চলিতেছে, সেখানে গিয়া স্বচক্ষে কার্যপ্রণালী দেখা ও শিক্ষা করা প্রয়োজন। কুটীরশিল্প চালাইতে হইলে যে খুব বেশী টাকার প্রয়োজন হইবে, তাহা আমার মনে হয় না। সর্বপ্রথমে আমাদের দরকার সভ্যদের মধ্যে অন্তত একজন ভদ্রলোক পাওয়া—যিনি শুধু এই বিষয়ে চিন্তা করিবেন, খবর লইবেন এবং পুস্তকাদি পড়িবেন। তারপর যেসব কুটীরশিল্প চালাইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা আছে, তিনি সেগুলি নিজে দেখিয়া আসিবেন। যখন শেষে কুটীরশিল্পবিশেষ চালাইবার প্রস্তাব স্থির হইবে, তখন কর্মীকে পাঠাইয়া কাজ শিখাইয়া লইতে হইবে। Polytechnic Institute-এ আগা-গোড়া কাহাকেও পড়াইবার প্রয়োজন এখন দেখি না। সেলাইর কাজ, কামারের কাজ, electroplating প্রভৃতি শিল্প সেখানে গিয়া শিখিবার কোনও প্রয়োজন এখন আমি দেখি না। কারণ সেলাইর বিভাগ আমাদের নিজেদেরই আছে এবং কামারের কাজ অথবা electroplating-এর কাজ আপাতত সমিতির কর্মীকে শিখাইয়া কোনও লাভ হইবে না। আমার যতদূর স্মরণ আছে (আমি মাত্র একবার Polytechnic-এ গিয়াছি) Polytechnic-এর সমস্ত শিল্পের মধ্যে একমাত্র বেতের কাজ অথবা মাটির পুতুলের কাজ আমরা কুটীরশিল্প হিসাবে চালাইতে পারি—ইহার মধ্যেও আমি বেতের কাজ সম্বন্ধে কতকটা সন্দিহান ,কারণ স্ত্রীলোকদের দ্বারা এ-কাজ করাইতে পারিব কি না, ঠিক বলিতে পারি না। এখন যদি শেষে মাটির পুতুলের কাজ চালাইবার প্রস্তাব গৃহীত হয়, তবে হরিচরণ অথবা যে কোনও কর্মী কয়েক দিনের মধ্যেই এই কাজ শিখিয়া আসিতে পারে। খরচ কিছুই লাগিবে না এবং আমরা যখন কুটীরশিল্প আরম্ভ করিব, তখন মাত্র রং-এর জন্য কিছু নগদ টাকা খরচ করিতে হইবে। ইহা ব্যতীত আর খুব কম খরচই লাগিবে। সুতরাং আপনাদের মধ্যে যদি একজন লাগিয়া থাকেন, তবে দেখিবেন যে, কুটীর-শিল্প সম্বন্ধে আপনারা যতটা নির্ভরসা—এতটা নির্ভরসা হইবার কোনও কারণ নাই। মোট কথা, একজনকে শুধু এই সমস্যা লইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে—he must become made over it.

আর একটা কথা আমার বারে বারে মনে আসে—পূর্বেও বোধহয় আপনাকে এ বিষয়ে লিখিয়াছি—ঝিনুকের বোতাম তৈয়ারী করা। ঢাকা জেলার অনেক গ্রামে এই শিল্প ঘরে ঘরে চলিতেছে। গরীব গৃহস্থের বাড়ির স্ত্রী-পুরুষেরা তাহাদের অবসর সময়ে এই কাজ করিয়া থাকে। একজন কর্মীকে খুব অল্প দিনের মধ্যেই এই কাজ শিখান যাইতে পারে। অথবা এই কাজ জানে এবং শিখাইতে পারে, এমন একজন নূতন কর্মীকে আপনারা নিযুক্ত করিতে পারেন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়া আপনারা এরূপ কর্মীকে আকর্ষণ করিতে পারেন। আমার নিজের মনে হয় যে, পাথরের গায়ে ঘসিয়া বোতাম তৈয়ারী করা যায়—আমরা নিজেরা ইচ্ছা করিলে তৈয়ার করিতে পারি। শুধু সরু যন্ত্র একটা থাকিলে গর্ত করা যায় এবং হয়তো গোল করিয়া কাটিবার জন্য একটা ধারাল যন্ত্রের প্রয়োজন হইতে পারে। সমিতি হইতে কয়েকটা যন্ত্র এবং এক বস্তা

ঝন্‌কে আনাইয়া দিলে কাজ আরম্ভ করিতে পারিবেন। কাজটা সাহায্যপ্রার্থী-দের মধ্যেই আবদ্ধ হইবে, কিন্তু একবার কৃতকার্য হইলে দেখিবেন যে, সাধারণ গরীব গৃহস্থরা নিজেদের আয় বাড়াইবার জন্য এই কাজ আরম্ভ করিবে। সমিতি শুধু সস্তা দরে raw materials প্রভৃতি জোগাইবে এবং প্রস্তুত জিনিস বেশী দরে বিক্রী করিবার ব্যবস্থা করিবে। এই বিষয়ে কাজ আরম্ভ করিতে হইলে প্রথম দিকটা খুব বেশী সময় দিতে হইবে। আপনার সেরূপ অবসর আছে কি না সন্দেহ, সেই-জন্য আমি বলি যে, আরও কয়েকজনকে এই কার্যে ব্রতী করা দরকার। বিষয়টা একবার পরিষ্কারভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝিবেন, কত সহজ। আপাতত আপনারা ঠোঙ্গা, বড়ী প্রভৃতি লইয়া যাহা করিতেছেন, তাহাতে আমার মত আছে—শুধু দেখিবেন যেন জিনিস প্রস্তুত হইবার পর শীঘ্র কাটতি হয়।

২২নং ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য বিভাগের কাজ নাকি ভাল রকম চলিতেছে না—এরূপ শুনিতেছি। এ বিষয়ে সবিশেষ লিখিবেন। স্বাস্থ্য বিভাগের কোনও Scheme আছে কি না এবং থাকিলে কিরূপ Scheme অনুসারে তাঁহারা কাজ করিবার চেষ্টা করিতেছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছা করি। স্বাস্থ্য বিভাগের কাজে বেশী উদ্যোগী কে? সমিতির সহিত স্বাস্থ্য বিভাগের সম্বন্ধ কি?

ব্যায়ামচর্চা সম্বন্ধে যাহা করা হইতেছে, তাহাতে আমার খুব মত আছে। তবে স্থায়ী কর্মী না পাইলে নূতন বিভাগ খোলা বাঞ্ছনীয় নহে। মিঃ প্যাস্কার কি স্থায়িভাবে কাজ করিবেন? আমার মনে হয় যে, এখন হইতে অন্তত আর একজন কর্মীকে তৈয়ারী করা উচিত, যিনি মিঃ প্যাস্কারের অভাবে কাজ চালাইতে পারিবেন। এখন হইতে যদি এরূপ ব্যবস্থা না করেন, তবে যেদিন মিঃ প্যাস্কার আসা বন্ধ করিবেন, সেদিন একটি বিভাগও উঠিয়া যাইবে। যে কাজে একবার হাত দিবেন, সে কাজ যেন কখনও না উঠিয়া যায়—এইভাবে organise করিবেন। ইহার জন্য যদি ধীরে ধীরে ও সতর্কভাবে কাজ করিতে হয়, তাহাতে কোনও ক্ষতি নাই। Slow and steady wins the race. ব্যায়াম সম্বন্ধে আমার যে মত, Boxing সম্বন্ধেও ঠিক সেই মত। যিনি এখন Boxing শিখাইতেছেন, তাঁহার অভাবে যেন কাজ বন্ধ না হয়, এইজন্য আরও কয়েকজন শিক্ষক তৈয়ারী করিয়া লউন। আমি ইতিপূর্বেই বলিয়াছি যে, ব্যায়াম বিভাগের কাজের জন্য কিছু খরচ করিলে কোনও আপত্তি নাই। এমনকি, আমার মনে হয় যে, এ বিষয়ে যতটা দৃষ্টি দেওয়া উচিত এবং যতটা ব্যয় করা উচিত, আমরা তাহা আদৌ করি না। Gymnasium সম্বন্ধেও আমার মত আছে—তবে তাড়াতাড়ি খুব বেশী কাজে হস্তক্ষেপ করা বাঞ্ছনীয় নহে। চাই সর্ব-প্রথমে দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন কর্মী এবং স্থানীয় লোকেদের সহানুভূতি। Gymnasium-এ সময়ে সময়ে স্বাস্থ্যের উন্নতি না হইয়া অবনতি ঘটিয়া থাকে। দুর্ঘটনা, অত্যধিক পরিশ্রম, অবৈধ বা অবৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ব্যায়াম—এই সবের ফলে অমঙ্গল ঘটিবার আশঙ্কা যে নাই, তাহা বলিতে পারি না। আপনারা Gymnasium আরম্ভ করিলে এই সব বিপদের জন্য আপনাদের দায়ী হইতে হইবে। সুতরাং দায়িত্ব বুঝিয়া সুঝিয়া কাজে অগ্রসর হইবেন। Gymnasium যাহাতে অন্যান্য অনেক খেলার মাঠের ন্যায় বাজে আড্ডার জায়গায় পরিণত না হয়, সেদিকেও দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবে আমার মনে হয় যে, ব্যায়ামশালা (Gymnasium) আরম্ভ করিবার মত স্থায়ী কর্মী ও স্থানীয় লোকেদের সহানুভূতিরূপ সম্বল যদি আপনারা পান, তবে কর্পোরেশনের খালি কোনও জমি যদি পড়িয়া থাকে, আপনারা চেষ্টা করিলে ব্যবহার করিবার অনুমতি পাইতে পারেন। এমনকি, দশ বা ত্রিশ বৎসরের lease-ও পাওয়া যাইতে পারে। এ বিষয়ে রমাপ্রসাদবাবু প্রভৃতি স্থানীয় Councillorগণ সাহায্য করিতে পারেন।

Boy Scouts সম্বন্ধে আমার খুব মত আছে। তবে Scoutmasterকে দিয়া গঠন করাইলে ভাল হয়। মিঃ প্যাস্কার Scoutmaster কিনা, তাহা আমি জানি না। যদি Scoutmaster না হন, তবে তিনি অনায়াসে Scoutmaster হইতে পারেন—বিশেষ হ্যাঙ্গাম নাই। Boy Scouts Troop গঠন করার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় কয়েকজন যুবককে Scout training লইয়া Scoutmaster হইতে হইবে। একবার যদি Troop গঠন করেন, তখন আপনাদের দেখিতে হইবে—যাহাতে তাহারা অন্যান্য Troop-দের অপেক্ষা কম উপযুক্ত না হয়। এই নিমিত্ত উপযুক্ত শিক্ষক বা Scoutmaster-এর প্রয়োজন। Inefficient Troop গঠন করা অপেক্ষা না গঠন করা ভাল। এ বিষয়েও লোকবল (অর্থাৎ কর্মী) বুঝিয়া কর্মে অগ্রসর হইবেন। প্রথমে এমন বালক লইয়া গঠন করিবেন, যাহারা পোশাকের (Uniform) খরচের ভার নিজেরা বহন করিতে পারিবে। অকর্মণ্য বা অত্যন্ত গরীব বালকদের প্রথমে না লওয়াই শ্রেয়—প্রথমেই যদি তাহাদিগকে লওয়া হয়, তবে বিপদে পড়িবেন। একবার Troop দাঁড়াইয়া গেলে অকর্মণ্য বালকদিগকে লইয়া তাহাদিগকে মানুষ করিবার চেষ্টা করিতে পারেন এবং গরীব বালকদের Uniform-এর খরচের জন্য সমিতির ভাণ্ডার হইতে কিছু খরচ করিতে পারেন। পোশাক যতদূর সম্ভব খদ্দরের বা স্বদেশী হইবে। আমি পাগড়ীর পক্ষপাতী নহি; বালকেরা তাহা পছন্দ করিবে না এবং এখনও পর্যন্ত পাগড়ী বাঙ্গালীর শিরোভূষণ বা শিরস্ত্রাণ বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। বাঙ্গালীর পক্ষে পাগড়ী গ্রহণ করা আদৌ উচিত কি না, সে বিষয়ে আমি এখনও মত স্থির করিতে পারি নাই। Boy Scout যখন একটা International সঙ্ঘ, তখন পোশাকের পরিবর্তন করিবার প্রয়োজন আমি দেখি না। তবে Scout-দের টুপী যদি মহার্ঘ্য হয়, তবে সস্তার মধ্যে Forage Cap চালাইতে পারেন। Forage Cap কতকটা গান্ধী টুপীর মত, তবে বাঁকা করিয়া মাথায় একধারে বসাইতে হয়। University Infantry-তে আমাদের সময়ে Forage Cap-ই আমরা পরিতাম—তখন পর্যন্ত বর্তমান Helmet ব্যবহার করা আরম্ভ হয় নাই। Forage Cap খুব হাল্কা—বাঙ্গালী ছেলেদের পছন্দ হইবে এবং দেখিতেও খুব Smart.

রচে কুলাইলে Scout-এর টুপী রাখিলে
াষ কি? একটা Uniformity থাকে।
বে প্রত্যেক Troop-এর যে বিশিষ্ট
adge বা Collour থাকে, তার মধ্যেই
ামাদের Troop-এর বিশিষ্টতা ফুটিয়া
ঠিবে। আমাদের Badge হইবে লাল,
াদা ও সবুজ। সমিতির নামে Troop-এর
ামকরণ করা উচিত। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য
াম ও Badge) রাখিতে পারিলে
রিচ্ছদের মধ্যে কোনও পরিবর্তন
রিবার প্রয়োজন নাই এবং এই দুইটি
িশিষ্ট্য না রাখিতে পারিলে Troop গঠন
রা উচিত নয়।

কোন বড় লোককে ধরিয়া দানস্বরূপ
কটি Magic Lantern apparatus
াগাড় করা উচিত। রমাপ্রসাদ ইচ্ছা করিলে
জে একটা দিতে পারে অথবা জোগাড়
রিয়া দিতে পারে। স্বাস্থ্যবিষয়ক
ান্দোলনে আপনারা Bengal Health
ssociation-এর সাহায্য পাইতে পারেন।
াঁহাদের অফিস মির্জাপুর স্ট্রীটে
৩।৭নং অথবা ৬৭।৩নং) Bactro
linical Laboratory-র বাড়িতে।
ssociation-এর সম্পাদক ডাঃ নীরদ-
ধু ভট্টাচার্য ও শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার
ঙ্গুলী। তাঁহাদের সহিত আমার বিশেষ
রিচয়ও আছে।

Professional Begging সম্বন্ধে
পনি চিন্তা করিতেছেন জানিয়া সুখী
লাম। আমিও এ বিষয়ে কিছু চিন্তা
রিয়াছি। কিন্তু আপাতত এ বিষয়ে
মাদের বিশেষ কিছু করিবার নাই।
র্পোরেশন এ বিষয়ে কিছুকাল পূর্বে
টি কমিটি নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সেই
মিটির রিপোর্ট আপনি আনাইয়া পড়িতে
রেন। কিছু উপকার সাধন করিতে
লে খুব বেশী টাকার প্রয়োজন এবং
কগুলি নূতন আইন প্রবর্তন করা
কার। এসব কাজ সমিতির ক্ষমতার
হিরে। আমি আশা করি, কর্পোরেশন
গভর্নমেণ্ট মিলিয়া এ বিষয়ে কিছু
রবেন। আমি বাহিরে থাকিতে এ-সমস্যা
র্পোরেশনের সম্মুখে উপস্থিত করিবার
টায় ছিলাম এবং আমি বিশ্বাস করি
এই সমস্যা পুনরায় কর্পোরেশনের
মুখে উপস্থাপিত করা হইবে। জনমত
গঠন করা ছাড়া আপাতত এ বিষয়ে
আমাদের করিবার কিছু নাই।

আপনি তো জানেনই যে, Orphanage-এর প্রকৃত নাম Orphanage নয়—দক্ষিণ কলিকাতা সেবাশ্রম। Orphanage অথবা অনাথ আশ্রম, ইহার মধ্যে কোনও নামই আমি পছন্দ করি না। তাই আমরা নাম রাখিয়াছি "সেবাশ্রম"। পিতা, মাতা বর্তমান থাকিলেও বালককে সেবাশ্রমে ভর্তি করিতে কোনও আপত্তি দেখি না—যদি বালকের অবস্থা অনাথের ন্যায় নিঃসহায় হয়। তবে একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, যাহারা প্রকৃত অনাথ, তাহাদিগকে সর্বাগ্রে লওয়া উচিত। তাহাদিগকে লইবার পর যদি আরও সম্বল আমাদের থাকে, তখন এমন নিঃসহায় বালকদিগকেও লওয়া যাইতে পারে, যাহাদিগের পিতা-মাতা বর্তমান আছে। সেবাশ্রমের মূল নীতি কি? যেসব বালকদের পিতা-মাতা, অভিভাবক অথবা তত্ত্বাবধান করিবার কোনও লোক নাই—সমাজ তাহাদের তত্ত্বাবধানের ভার গ্রহণ করিবে—ইহাই সেবাশ্রমের মূল নীতি। আমরা সমাজের পক্ষ হইতে এই কাজ করিতেছি বা করিবার চেষ্টা করিতেছি। পিতা, মাতা বা অভিভাবক বর্তমান থাকিলে সাধারণত তাঁহাদের বালকদিগকে গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ পিতা, মাতা বা অভিভাবকের কাজ সমাজ করিবে কেন? (অবশ্য বিশেষ স্থলে লইতে আপত্তি নাই)। সমাজ অভিভাবকদের সাহায্য করিবে এবং সাহায্য করাও সমাজের উচিত, কিন্তু দায়িত্বের ভার হইতে পিতা-মাতা বা অভিভাবককে সম্পূর্ণভাবে অব্যাহতি দিলে সমাজের কল্যাণ না হইয়া অকল্যাণ হইবার কথা। সেবাশ্রমকে বড় করিতে গিয়া অথবা তাহার কলেবর বৃদ্ধির চেষ্টায় মূল নীতির দিকে দৃষ্টি হারাইলে চলিবে না।

সেবাশ্রমের তাঁত কি চলিতে আরম্ভ করিয়াছে? বোনা কি রকম হয় বলিয়া আপনার মনে হয়? সেলাইর কাজ কি রকম হয়? সেলাই কে শেখায়? সেবাশ্রমের শিক্ষার ব্যবস্থা সেবাশ্রমে হইলেই ভাল হয়—অবশ্য উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া চাই। কিন্তু গোড়া হইতে যদি বাহিরের স্কুলে ছেলেদের পাঠান হয়, তবে নিজেদের স্কুল বা নূতন সুসংস্কৃত শিক্ষাপ্রণালী কি করিয়া গড়িয়া উঠিবে? আমাদের ভুলিলে চলিবে না যে, নূতন পদ্ধতিতে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী জাতীয় শিক্ষার প্রবর্তন করা দেশের একটা বড় সমস্যা। যেখানে যেখানে নিজেদের বিদ্যালয় বা আশ্রম আছে, শুধু সেখানে Educational Experiment করা সম্ভব—অন্যত্র সম্ভব নয়। সুতরাং সেবাশ্রমেই শিক্ষার ব্যবস্থা করিলে পরিণামে ভাল ফল ফলিবে বলিয়া আমার ভরসা হয়। আমরা যদি আন্তরিক-ভাবে লাগিয়া থাকি, তবে বর্তমান অসাফল্যের ভিতর দিয়া আমরা একদিন না একদিন নূতন জাতীয় শিক্ষাপদ্ধতি আবিষ্কার করিতে পারিব। সকল বিষয়েই আমার এত unbounded optimism আছে যে, বর্তমান অসাফল্য আমাকে নির্ভরসা অথবা পঙ্গু করিতে পারে না। আমাদের শুধু আন্তরিকতার সহিত আদর্শের দিকে স্থির দৃষ্টি রাখিয়া কাজে লাগিয়া থাকিতে হইবে। অন্যান্য aspiration-এর মধ্যে দেশের উপযোগী নূতন শিক্ষাপ্রণালী আবিষ্কার করিবার আকাঙ্ক্ষা ও আশা আমি অন্তরে পোষণ
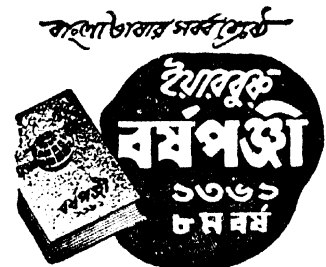
করি; সুতরাং সে আকাঙ্ক্ষা পূরণের আশা যেখানে দেখিতে পাই, সেই দিকেই আমি ধাবমান হই। এক্ষেত্রে যদি আপনার পরামর্শ লইয়া আমরা আশ্রমের বালকদিগকে সাধারণ স্কুলে পাঠাই, তাহা হইলে কি আমরা একটি মহান্ সুযোগ হারাইব না? বর্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে আমি এতদূর বীতশ্রদ্ধ যে, যাহাদের উপর আমার পূর্ণ প্রভাব আছে, সেসব বালকদিগকে আমি সমর্থপক্ষে সাধারণ স্কুলে পাঠাইতে প্রস্তুত নহি। আমি অবশ্য স্বীকার করি যে, নূতন উৎকৃষ্টতর ব্যবস্থা করিতে সময় লাগিবে এবং তৎপূর্বে (অর্থাৎ Experimental Stage-এ) শিক্ষাদীক্ষার ত্রুটি হইতে পারে; কিন্তু উপায় কি? Experimental Stage বাদ দিলে কি আমরা কোনও দিন সাফল্য লাভ করিব? ইহা ব্যতীত সাধারণ স্কুলে পড়িয়া জীবিকা অর্জনের দিকে যে বিশেষ সুবিধা হইবে, তাহা আমার মনে হয় না—বরং উল্টাটা হইবার সম্ভাবনা অধিক। তাঁতের কাজ বা সেলাইর কাজ শিখিয়া তাহারা জীবিকা অর্জন কেন করিতে পারিবে না, তাহার কোনও কারণ আমি দেখি না। তবে সকলের পক্ষে এইগুলি উপযোগী না হইতে পারে। এইজন্য অন্যান্য শিল্পের ব্যবস্থাও করিতে হইবে।

আপনার মতের সহিত এ বিষয়ে অমিল হইল বলিয়া আপনি দুঃখিত হইবেন না। সব বিষয়ে যে মতের মিল হইবে বা হওয়া বাঞ্ছনীয়, তাহা কে বলিল? আপনার মত গ্রহণ না করিতে পারিলেও আপনার স্বাধীন মত পাইয়া আমি সুখী হইয়াছি। আমি নিজে free thinker, সুতরাং অপরের Free thinking-এ আমি সুখী না হইয়া পারি না। আমাদের সকলেরই মতের পরিবর্তন যথাসময়ে হইতে পারে। Emerson বলিতেন—

"A foolish consistency is the hobgoblin of little minds"—

এই উক্তি আমার বড় ভাল লাগে।

শুনিয়া সুখী হইলাম যে, প্রেসিডেন্সী জেলের হিন্দু কয়েদীরা অসহায় অবস্থায় মারা গেলে আপনারা তাহাদের সৎকারের ভার সুপারিন্টেন্ডেন্টের নিকট হইতে পাইয়াছেন। আলীপুর সেন্ট্রাল জেলের সহিতও এই ব্যবস্থা শীঘ্র করিবেন। আমার মনে হয় যে, সাধারণ সমিতির এক অধিবেশন করিয়া Cremation Department বলিয়া একটা নূতন কার্য বিভাগ খুলিলে মন্দ হয় না। এ-কাজের ভার যখন লইয়াছেন, তখন সর্বদা স্বেচ্ছাসেবকদের যাহাতে পাওয়া যায়, তার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিবেন। ডাক পাওয়া মাত্র আপনারা যেন সৎকারের ব্যবস্থা করিতে পারেন। প্রথম দিকটা যদি লোকের অভাব হয় তবে আপনাদেরই অগ্রণী হইতে হইবে। অভিভাবকদের অমতেও আমি এরূপ সৎকার অনেক করিয়াছি এবং বলিতে পারি যে, এরূপ কাজে এত শান্তি ও আনন্দ পাওয়া যায় যে বলা যায় না। কলেরা অথবা বসন্ত রোগে মৃত্যু হইলে যখন সৎকার করিবার লোক পাওয়া যাইত না তখন স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া এইরূপ কাজ করিয়াছি। আপনারা Cremation Department গঠন করিয়া যদি কাজের programme খবর কাগজে ছাপাইয়া দেন তবে কাজের বেলায় অনেক সুবিধা

হইতে পারে এবং স্বেচ্ছাসেবকও সহজে জুটিবে।

এখন হরিচরণ সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। তাহার পত্রে জানিলাম যে, তাহার allowance ও কাজকর্ম সম্বন্ধে সমিতির কোনও কোনও সভ্য নাকি তীব্র ও অন্যায় সমালোচনা করিয়াছেন যাহাতে তাহার আত্মসম্মানের উপর আঘাত করা হইয়াছে। এ কথা শুনিয়া আমি দুঃখিত হইলাম। কর্মীরা allowance লইতে পারেন—ইহা তাঁহাদের ন্যায্য দাবী—কিন্তু এই বিষয় লইয়া যদি সমিতির কোনও সভ্য কোনও কর্মীর আত্মসম্মানের উপর আঘাত করেন তবে ইহা অত্যন্ত অন্যায়। আপনি এ বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া যাহা উচিত বিবেচনা করেন করিবেন।

হরিচরণ প্রাথমিক শিক্ষার প্রণালী সম্বন্ধে আমার মত জানিতে চাহিয়াছিল এবং তাহার নিজের শিক্ষার জন্য আমার নিকট পুস্তকের তালিকা চাহিয়াছিল। আমি তাহাকে লিখিয়াছিলাম যে, আপনাকে যে পত্র দিব তাহাতে এই দুই বিষয়ে লিখিব। কিন্তু পত্র এত দীর্ঘ হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন আর লিখিতে পারিব না—তা ছাড়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। ২।১ সপ্তাহের মধ্যে আমি উপরোক্ত দুই বিষয়ে হরিচরণের নিকটই পত্র দিব—তাহাকে বলিবেন।

বর্তমানে সেবা বিভাগ হইতে কয়জন পুরুষ বা স্ত্রী বা গৃহস্থ পরিবার সাহায্য পায় এবং কিরূপ সাহায্য পায়—সে বিষয়ে আমাকে একটা তালিকা করিয়া পাঠাইবেন।

পরিশেষে আবার বলিতেছি—খুব সতর্ক ও ধীরভাবে নূতন কার্যে হস্তক্ষেপ করিবেন বা নূতন বিভাগ খুলিবেন। স্থায়ী কর্মী না পাওয়া পর্যন্ত নূতন বিভাগ খুলিবেন না। এমন কোনও কাজে হাত দিবেন না যাহা পরে উঠিয়া যাইবে—তবেই জনসাধারণের বিশ্বাস লাভ করিতে পারিবেন—অন্যথায় নয়।

সম্প্রতি সমিতির বাহিরে সমিতির ত্রুটি সম্বন্ধে কিরূপ সমালোচনা চলিতেছে তাহার তালিকা আমি পাঠাইতেছি। সমালোচনার নামে অধীর হইবেন না। যেখানে যেখানে আমাদের ত্রুটি রহিয়া গিয়াছে এবং সমালোচনার মধ্যে পদার্থ আছে বলিয়া মনে করেন সেখানে সংশোধন করিবার চেষ্টা করিবেন।

(১) বাড়ি ভাড়ার দরুণ অত্যধিক খরচ হইতেছে। (আপনার হিসাব অনুসারে এখন মোট ২২৲ টাকা বেশী খরচ হইতেছে।)

(২) যাহারা সমিতির জন্য প্রাণ দিয়া খাটে তাহাদিগকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না।

(৩) সমিতিতে উৎপন্ন জিনিসপত্র (যেমন খদ্দর, ঠোঙ্গা প্রভৃতি) বিক্রয় করিবার চেষ্টা করা হয় না। ২০।৩০ টাকা বেতনে আলাদা লোক এই কাজের জন্য রাখিলে ভাল হয়।

(৪) কর্মীরা সময়মত মাহিনা পায় না। তাহাদের পারিশ্রমিক grudgingly দেওয়া হয়।

(৫) Lansdowne Centreকে আলাদা করিবার জন্য দায়ী সমিতির কর্ণধারগণ। তাহারা (Lansdowne Centre) নাকি স্বেচ্ছায় আলাদা হইতে চায় নাই—তাহাদিগকে পৃথক হইতে একরকম বাধ্য করা হইয়াছিল। যাঁহারা meeting-এ ভোট দিয়া Lansdowne Centreকে আলাদা করা সাব্যস্ত করিলেন তাঁহাদিগকে ভোট দেওয়াইবার জন্য আনা হইয়াছিল—বস্তুত তাঁহাদের মধ্যে অনেকে সমিতির কোনও কাজে আগ্রহ রাখে না।

(৬) Lansdowne Centre আলাদা হইবার পর কিছুকাল জেদের বসে কাজ ভাল চলিয়াছিল কিন্তু এখন আবার সব কাজকর্ম শিথিল হইয়া পড়িয়াছে।

(৭) তাঁতীদের অত্যন্ত দুরবস্থা। সুতার অভাবের দরুণ তাহারা সকল সময়ে কাজ পায় না। ফলত তাহাদের আয় বিনা দোষে কম হইয়া যায় এবং তাহাদের পক্ষে জীবিকা নির্বাহ করা কষ্টকর হইয়া পড়ে। ইহা ব্যতীত তাঁতীরা সময়মত বেতন পায় না। তাহারা এই কারণে ছাড়িয়া চলিয়া যায় এবং তাহাদের সম্বন্ধে মিছামিছি বলা হয় যে, তাহারা রাগী কুঁড়ে ইত্যাদি। তাঁতীরা সব সময়ে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পায় না এবং সময়ে সময়ে শুধু নুন ভাত খাইয়া দিন কাটায়। দুইজন ভাল তাঁতী নাকি শীঘ্র ছাড়িয়া যাইবে। তারপর বাকী থাকিবে শুধু যতীন ও পুলিন। যতীন নাকি তত ভাল কাজ করে না বা জানে না এবং পুলিন দর্জি-বিভাগে কাজ করে। অবশেষে তাঁতের কাজ বন্ধ হইবার উপক্রম হইবে।

আমার মন্তব্য আমি ইচ্ছা করিয়াই দিলাম না। কারণ সত্যমিথ্যা আমার পক্ষে এখানে বসিয়া নির্ধারণ করা সম্ভবপর নয়। সব কাজেই ত্রুটি থাকিতে পারে সুতরাং আপনি সমালোচনায় অসন্তুষ্ট না হইয়া যদি কোনও ত্রুটি রহিয়া গিয়া থাকে তাহা সংশোধন করিবার চেষ্টা করিবেন—বিশেষত তাঁতের ও তাঁতীদের বিষয়ে যে অভিযোগ করা হইয়াছে সে বিষয়ে অনুসন্ধান করিবেন। এখানে আমার বলিয়া রাখা ভাল যে, উপরোক্ত অভিযোগ সম্বন্ধে সমিতির কোনও কর্মী আমাকে লেখেন নাই। যাঁহারা লিখিয়াছেন তাঁহারা সমিতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং ঈর্ষা বা বিদ্বেষ প্রণোদিত হইয়া তাঁহারা লেখেন নাই। কিন্তু motive বিরুদ্ধ হইলেও মানুষের ভুল ভ্রান্তি হইতে পারে।

আজ এই পর্যন্ত থাক। আশা করি, আপনাদের সকলের কুশল। আমার প্রীতিসম্ভাষণ জানিবেন। আমার শরীর একরকম—অধিক কি লিখিব। ইতি

ভবদীয়

শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু

বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে গান্ধীজী ও ভারত

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত

ভারতের মাটিতে সেই রাতটিই আমার শেষ রাত। পরের দিন সকালেই আমি মস্কো ফিরে যাচ্ছি; রাশিয়ায় ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমার কার্যভারের শেষ দু মাস তখনও বাকি। দেশ ছেড়ে বিদায় নেবার আগে সবার সঙ্গেই দেখাশোনা শেষ করেছি, একমাত্র গান্ধীজীর কাছ থেকে তখনও বিদায় নেওয়া হয়নি। তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে দেরি হচ্ছিল কারণ দিনটি ছিল সোমবার, এ দিনে তিনি কথা-বার্তা বলেন না, নীরবতা অবলম্বন করেন। সন্ধ্যে প্রায় আটটার সময় আমি তাঁর কাছে গেলাম। মনে মনে আশা ছিল, হয়ত তিনি আমার সঙ্গে কথা বলবেন। কিন্তু গিয়ে দেখি তাঁর নীরবতা ভঙ্গ হতে তখনও দু ঘণ্টা বাকি। হতাশ হওয়ারই কথা, কিন্তু কিছুক্ষণের জন্যে তাঁর কাছে একা থাকতে পারব ভেবে আমি খুশী হলাম। অপেক্ষা করতে থাকলাম তাঁরই কাছে বসে।

একটা গুরুতর মানসিক টানা-পোড়েনের আর দুশ্চিন্তা দুর্ভাবনার সময় যাচ্ছে তখন। সোমবারের নীরবতা অবলম্বন গান্ধীজীর সুস্থ থাকার পক্ষে খুবই প্রয়োজনীয় ব্যাপার। মেঝেতে তিনি বসে-ছিলেন, একটা বড় শাদা তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে। ওঁকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। ঘরের মধ্যে একটি শুধু ছোট বৈদ্যুতিক বাতি; ঠিক তাঁর পাশেই। সেই মৃদু আলো মেঝেতে কেমন এক রহস্যময় ছায়া ফেলেছে, তাঁর পিছনদিকের দেওয়ালেও সেই ছায়া। ঘরের দরজা খোলা। বাগান থেকে ফুলের আর টাটকা মাটির গন্ধ ভেসে আসছে। গান্ধীজীর সঙ্গে আমার যে সম্পর্ক তাতে এই অখণ্ড নীরবতার উদ্বেগ আমি অনায়াসেই সহ্য করতে পারি—কাজেই তাঁকে বিরক্ত করার উদ্দেশ্য আমার ছিল না। আমি শুধু চাইছিলাম তাঁর শান্ত উপস্থিতি এবং তাঁর মধ্যে যে শক্তির উৎস তারই স্পর্শ। সহসা তিনি ছোট একটি লেখার প্যাড তুলে নিলেন। এ রকম একটি প্যাড সবসময় তাঁর পাশে থাকত। প্যাডটি তুলে তিনি লিখলেনঃ "তুমি কখন মস্কো রওনা হচ্ছ? সেখানে তোমার কার্যভার কবে শেষ হবে?"

নীরবতা অবলম্বনের দিন গান্ধীজী কাগজে লিখে প্রশ্ন করতেন, যাকে প্রশ্ন করা হত মুখের কথায় সে উত্তর দিত—এই ছিল নিয়ম। আমি তাঁকে জানালাম, পরের দিন খুব সকালেই আমি চলে যাচ্ছি, সেখানে আমি আর অল্প দিনই থাকব, কারণ আমার পরবর্তী কার্যভার গ্রহণের কথা ঘোষণা করা হয়ে গেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নবনিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত হিসেবে আমার বসবার আগে মনে মনে নিজেকে আমি প্রস্তুত করে নিচ্ছি।

তাঁর দ্বিতীয় প্রশ্ন হলঃ "রাশিয়া ছেড়ে যেতে পারছ বলে তুমি কি খুশী হচ্ছ—আমেরিকায় যাচ্ছ বলে তুমি কি সুখী নাকি?"

এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সহজ নয়। মুহূর্তের জন্য আমি ভাবলাম, তাকালাম গান্ধীজীর দিকে। দেখলাম আমায় লক্ষ্য করতে করতে তাঁর চোখে একটি দুষ্টু হাসি খেলে গেল। গান্ধীজীর অন্যতম প্রধান এক আকর্ষণ ছিল তাঁর কৌতুক বোধ। গান্ধীজীর এই বিশেষ দৃষ্টি আমি ভাল করেই চিনি। অত্যন্ত স্পষ্ট, ঠিক যেন কথার মতই বলছে, 'তবে, তোমায় ত আমি ধরে ফেলেছি!'

গান্ধীজীর কাছ থেকে মনের কথা লুকোবার প্রশ্ন কখনই কারুর ওঠে না, কিংবা তাঁর কাছে মিথ্যে কথা বলাও অসম্ভব। আমি বললাম, 'বাপু, এ ব্যাপারে আমার মনোভাবটা কেমন যেন হ্যাঁয়ে-নায়ে মেশানো। আমেরিকায় আমি ভারতের প্রতিনিধিত্ব করতে পারছি বলে আমি খুশী। আমেরিকার আদর্শ কি তা আমি জেনেছি এবং ভালোও বেসেছি তা। তা ছাড়া সে দেশের অনেকের সঙ্গে ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব আমায় প্রচুরভাবে ঋণী করেছে। তবু আমেরিকায় যেতে আমার ইচ্ছে নেই। মস্কোতে আমায় সব সময় এক ধরনের চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে, আমার ভয় হয় আমেরিকায় এ রকম কোন সমস্যার সামনে না দাঁড়াতে পেরে আমি যেন বেশী দুর্বল হয়ে পড়ব। সেখানে হয়ত বিনা বিচারে সব কিছুকে ত্রুটিহীন বলে ধরে নেব এবং ভারতের প্রয়োজনে অপেক্ষাকৃত কমই কাজে আসব।

মস্কোতে প্রায় রোজই একটা না একটা সমস্যা থাকত সমাধানের জন্যে, অসংখ্য ছোটখাটো দুর্ভাবনা ছিল—তবু আমি অসুখী ছিলাম না। যে সব লোকের সঙ্গে আমার আলাপ পরিচয় হয়েছে ওখানে তাঁরা সকলেই আমার প্রতি সহৃদয় বন্ধুত্বপূর্ণ ব্যবহার করেছেন। আজ যখন মস্কোতে আমার কাজের পালা শেষ হতে চলেছে, তখন মনে হচ্ছে ওখানে আমি বড় অল্প দিনই ছিলাম। আমি জানি, আমি শেষ করতে পারিনি এমন অনেক কিছুই থেকে গেছে। মস্কোর ব্যাপারে এমন একটি জিনিস আছে, যা ঠিক সংজ্ঞা দিয়ে বোঝান যায় না—অন্তত আমার ত তাই মনে হয়। আমার ইচ্ছে হয়, ওখানে আমি থাকি—আর মস্কোর চ্যালেঞ্জগুলোর মুখোমুখি দাঁড়াই। এতে যাই হোক আমায় সব সময় সতর্ক থাকতে হবে, পিছিয়ে পড়ে বসে থাকার সম্ভাবনা থাকবে না। এ ছাড়া ত্রুটিহীন বলে সমস্ত কিছুকে মেনে নেবার কথা ওঠে না; আত্মসন্তুষ্টির কারণও ঘটবে না।

গান্ধীজী তাঁর অভ্যাস মত নীরবে শুনে গেলেন। আমার কথা শেষ হলে, দেওয়ালের দিকে মাথা হেলিয়ে দিয়ে চোখ বুজে থাকলেন অনেকক্ষণ। এত দীর্ঘ সময় ধরে তিনি ওইভাবে বসে থাকলেন যে, আমি মনে মনে অবাক হয়ে ভাবছিলুম বুঝিবা আমাদের দেখা সাক্ষাতের পালা সাঙ্গ হয়েছে, এবার আমার বিদায় নেওয়া উচিত। শেষ পর্যন্ত গান্ধীজী তাঁর পেন্সিল তুলে নিয়ে লিখলেনঃ

"তোমার কথায় আমি কৌতূহল বোধ করছি। কিন্তু একটা কথা তুমি বাদ দিয়ে গেছ। জগতের কাছে ভারত যা বলবার চেষ্টা করছে, আমাদের নিজস্ব বিচার বিবেচনার ক্ষমতা দিয়ে দেখা জিনিস, তা সব সময়ই একটা চ্যালেঞ্জ। এটা মস্কো এবং

ওয়াশিংটনে উভয় জায়গাতেই খাটে। আমাদের ধর্মবিশ্বাসের সেইটেই সার কথা, আমাদের জীবনযাপন এবং রাজনৈতিক মনোভাব ও মতামতের গোড়ার কথাও তাই। আমার ভাবনা চিন্তার ধারা তুমি জানো। ফলের প্রত্যাশায় যে পথ গ্রহণ করলাম, তা যদি ন্যায়সঙ্গত না হয়, তবে ফল কি পেলাম তার কোন গুরুত্ব নেই। পাশ্চাত্ত্য দেশগুলি যদি এ কথা বোঝার চেষ্টা করে, তাতে ভাল হবে। আমেরিকার জনসাধারণের কাছে এই কথাই তোমায় বোঝাতে হবে। যদি এ কথা তারা পরিষ্কার করে না বোঝে তবে আমাদের দেশ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে যে সব সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে, তার মর্মোপলব্ধি তারা এখনই হোক কি পরেই হোক কখনই করতে পারবে না।"

গান্ধীজীকে সেই আমি শেষ দেখি। এর মাসখানেক পরে তাঁকে হত্যা করা হয়।

॥ ২ ॥

প্রাচীন নীতিধর্মের বিধানগুলিকে বাস্তবে রূপায়িত করতে পারা গান্ধীজীর এক বিশেষ কৃতিত্ব আর এগুলোকে তিনি ব্যাপকভাবে রাজনৈতিক কর্মের ভিত্তি ক'রে তুলেছিলেন। গান্ধীজীর এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী যে মতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং বিকশিত সেই মতটিই ফল লাভের ব্যাপারে পন্থার ওপর জোর দিয়েছে। তাতে বলে, যদি অসৎ উপায়ে সৎ লাভ হয় তবে সে-সৎ বিকৃত। সংক্ষিপ্তভাবে এই হচ্ছে গান্ধীজীর বাণী। ঠিক এই বাণীই ছিল তাঁর বহু পূর্ববর্তী মহাপুরুষ বুদ্ধের। বুদ্ধের আগেও ভগবৎ গীতায় এই বাণী প্রচার করা হয়েছে। স্বাধীন ভারত এই প্রাচীন ঐতিহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে প্রভাবান্বিত হ'তে বাধ্য। আর এও ঠিক এরই আদর্শে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয়গুলি সম্পর্কে তার সিদ্ধান্ত গ'ড়ে উঠবে।

বৈদেশিক রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে ভৌগোলিক এবং বাস্তবগত নানা কারণ অবশ্যই ভারতের নীতি নির্ধারণ করবে কিন্তু তা ব'লে অতীত সম্পর্ক উপেক্ষা করা যায় না।
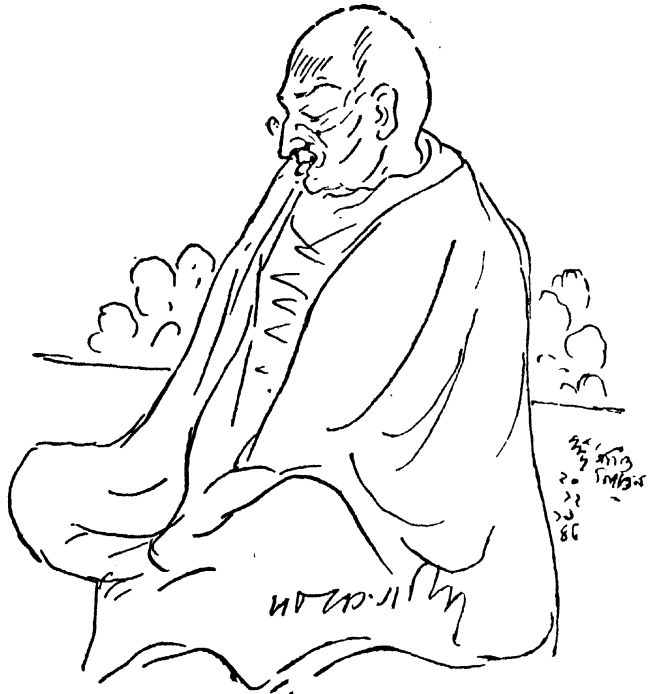
বিদেশী শাসনে ভারত অল্পবিস্তর বাইরের জগৎ থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ছিল। তার আগে ভারত তার প্রতিবেশী এশিয়া মহাদেশের রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে দীর্ঘকাল শান্তি এবং বন্ধুত্ব বজায় রেখে এসেছে। ১৯৪৭ সালে যখন বিশ্ব মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে তার অভ্যুত্থান হল, তখন সৌভাগ্যবশত ভারতের কোন শত্রু নেই এবং বিশ্ব রাজনীতিতে তার স্বার্থের সম্পর্ক নেই। অন্যান্য দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা প্রকাশ করা তার পক্ষে সম্ভব—আর সম্ভব বিশ্ব শান্তি রক্ষায় অন্যান্য দেশের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য এগিয়ে আসতে চাওয়া।

যাই হোক, সেই থেকে বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে ভারতের দুটি প্রধান নীতি রয়েছে। এক, জাতি-বর্ণের বৈষম্য দূর করা; দুই, এশিয়ার পরাধীন রাষ্ট্রগুলিকে বিদেশী রাজনৈতিক ও সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্ত হতে সাহায্য করা। নিজে ঔপনিবেশিক এবং সাম্রাজ্যবাদী শাসনের সকল রকম কুফল ভোগ করায় ভারত এই কাজে সাহায্য করবে, সেটাই স্বাভাবিক। সে নিজে প্রজাতন্ত্র রাষ্ট্র; এশিয়ার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির জাতীয় জীবন একই ছাঁচে গড়ে উঠুক, এই তার কামনা। জাতিসঙ্ঘে বর্ণ ও ঔপনিবেশিক বিষয়গুলি সম্পর্কে ভারত এই সব কারণেই এক দৃঢ় মনোভাব অবলম্বন করেছে। ঔপনিবেশিক শক্তিগুলি সম্পর্কে ভারতের মনে ঘৃণা অথবা শত্রুতার ভাব নেই; শুধু এই তার দৃঢ় বিশ্বাস যে, ঔপনিবেশিক শাসন জাতিসঙ্ঘের নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী এবং তার সনদের উদ্দেশ্যকে সংকটাপন্ন করবে। ভবিষ্যৎ যুদ্ধের বীজ উভয়ের মধ্যে সুপ্ত রয়েছে। এই কারণেই ভারত মনে করে, যে-কোন রাষ্ট্রই হোক, যারা বর্ণবৈষম্যকে প্রশ্রয় দেয় ও এশিয়ার জনগণের স্বাধীনতা লাভের পথে বাধা দিচ্ছে, তারা গণতন্ত্রের বন্ধু নয়, বিশ্ব শান্তিও কামনা করে না।

আমাদের পররাষ্ট্র নীতি ব্যক্ত করতে গিয়ে ভারতের প্রধান মন্ত্রী ১৯৪৭ সালে বলেছিলেন ঃ

"আমরা পূর্বেই ঘোষণা করেছি যে, আমরা কোন বিশেষ দলের সঙ্গে নিজেদের জড়াবো না। এর সঙ্গে নিরপেক্ষতার ও নিষ্ক্রিয়তার কোন সম্পর্ক নেই। যদি বড় রকম কোন যুদ্ধ বেধে ওঠে, সে যুদ্ধে আমরা কেন ঝাঁপ দিয়ে পড়বো না, তার বিশেষ কোন কারণ নেই। যদি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে বাধ্য না হই, যুদ্ধে আমরা যোগ দেব না। বিশ্বের সমস্ত দেশের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব বজায় রাখাই আমাদের উদ্দেশ্য, অবশ্য যতক্ষণ না কোন রাষ্ট্র বন্ধুত্ব রক্ষার ব্যাপারে নিজে থেকে গণ্ড-গোল সৃষ্টি করছে। আমেরিকার সঙ্গে আমরা বন্ধুত্বের সম্পর্ক রক্ষা করবো, সম্পূর্ণভাবে তাকে সহযোগিতা করতে চাই। কিন্তু এই সঙ্গে সোভিয়েট ইউনিয়নের সহযোগিতা করতেও আমরা ইচ্ছুক।"

বিপরীত দুই শক্তি-শিবিরের কোন একটিতেও যোগ না দেবার যে দৃঢ়তা ভারত দেখিয়ে আসছে, তার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। পরস্পরের প্রতি শত্রুতার মনোভাব নিয়ে যে শক্তিগুলি ক্রমশই জেগে উঠছিল এবং সমগ্র বিশ্ব সেদিকে তাকিয়ে এক অবশ্যম্ভাবী পরিণতির বিষয়ে নিঃসন্দেহ হতে চলেছিল, ভারতের নিরপেক্ষতার ফলে তাদের সেই প্রত্যয় বহু পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে। তাছাড়া ভারতের এই নীতির ফলে এশিয়া ভূখন্ড এক আশ্বাস পেয়েছে, আশা পাচ্ছে। সেই আশা এই যে, বিশ্বের একটি এলাকা বিশ্বশান্তি রক্ষার অনুকূলে এক চিন্তা-ধারা গড়ে তুলতে পারে, আর সেখানে শান্তির কথাই সবচেয়ে বেশি শোনা যাবে।

বিরাট শক্তিগুলির বাস্তব শক্তির তুলনায় ভারতের সামরিক সম্পদ নগণ্য। কাজে কাজেই অনেকেই হয়ত আশ্চর্য হয়ে ভাবেন, সামরিক শক্তির গুরুত্ব অনুপাতে আন্তর্জাতিক পরিষদগুলিতে যখন সকলের কথায় কর্ণপাত করা হয়, তখন ভারত কি করে তার স্বাধীন নীতি নির্ধারণ করতে পারে। এর উত্তরে জানা উচিত যে, ভারত কখনোই সামরিক শক্তির ওপর আস্থা রাখার কথা চিন্তা করে না। সামরিক শক্তির ওপর ভারতের নির্ভর নয়। লিন্‌কলন্‌-এর সেই বিখ্যাত কথাগুলির ওপর তার অগাধ বিশ্বাস। আর এই কথা-গুলিতে ভারতের নিজস্ব বিশ্বাস ও ঐতিহ্যের আদর্শই ব্যক্ত হয়েছে।

লিন্‌কলন্‌ বলেছিলেনঃ আমাদের মুক্তি এবং স্বাধীনতার নির্ভর কিসের ওপর? আমাদের ভয়াবহ যুদ্ধ-ক্ষমতা, আমাদের খাড়া সমুদ্রতীর, সৈন্যবাহিনী এবং নৌবাহিনী—এর ভিত্তি নয়, নির্ভর নয়। নৃশংসতার বিরুদ্ধে এরা আমাদের আস্থাস্বরূপ নয়। সংগ্রামের সময় আমাদের দুর্বল না করেও এগুলি আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড় করান যেতে পারে। ঈশ্বর আমাদের মধ্যে স্বাধীনতাকে ভালবাসার যে বীজ বপন করেছেন, আমাদের আস্থা, আশ্রয়, আশ্বাস একমাত্র তারই ওপর। বিশ্বের সর্বত্র, সমস্ত দেশে —উত্তরাধিকার সূত্রে মানুষের স্বাধীনতার যারা মূল্য দিয়েছে, তাদের সেই মহৎ আদর্শই আমাদের রক্ষাকবচ। ......

জাতীয় জীবনে ভারত সর্বপ্রকার ভয় দূরে সরিয়ে এই মহৎ ভাবকে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। ভয় যখন সরে যাবে, তখনই কর্মযোগের পথে ভাবতে পারবে। ভারত সকলের প্রতি বন্ধুমনোভাবাপন্ন, কাউকে সে ভয় করে না, কাউকে ভয় দেখায় না।

আমাদের নীতিকে নিরপেক্ষ নীতি বলে অভিহিত করে নিন্দা করা হয়। যেন ভারত উচিত-অনুচিতের মধ্যপথে দাঁড়িয়ে রয়েছে, কোন্‌ পথে যাবে, তার সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না। 'নিরপেক্ষ' এই একটি শব্দ আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, যা কোনমতেই আমাদের নীতির ব্যাখ্যা নয়। কতকগুলি দেশের বিশেষ একটি দলের এবং তাদের বর্তমান বা ভবিষ্যত নীতির সঙ্গে আমরা নিজেদের জড়াই নি—শুধু এই দিক দিয়েই আমরা যা নিরপেক্ষ। আমাদের প্রধান মন্ত্রীর কথায়—"স্বাধীনতাকে যেখানে খর্ব করা হবে, ন্যায় যেখানে সংকটাপন্ন হবে, অথবা যেখানে আক্রমণ উদ্যত হবে, সেখানে আমরা নিরপেক্ষ থাকতে পারি না, নিরপেক্ষ থাকব না।"

ভারতীয় নিরপেক্ষতা প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাব, ঘৃণা এবং ভয়ের মধ্যে নিরপেক্ষতা অবলম্বন হলেও হতে পারে, কিন্তু ন্যায় এবং অন্যায়ের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা কিছুতেই নয়।

কোরিয়ায় শত্রুপক্ষের আক্রমণ শুরু হলে আমরা আমাদের নীতিগতভাবে নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়েছি। কিন্তু যখন দেখা গেল, যুদ্ধ কোরিয়া ছাড়িয়েও ছড়িয়ে যেতে পারে, তখন আমরা ভেবেছি, সেটা নীতি-বিরুদ্ধ, অন্যায় এবং এর সঙ্গে আমরা যুক্ত থাকতে পারি না। যদিও আমরা সাবধান করে দিয়েছিলাম, জাতিপুঞ্জের সৈন্যবাহিনী ৩৮ অক্ষরেখা ছাড়িয়ে গেলে চীন উত্তর কোরিয়ার সঙ্গে যোগ দেবে, সে সাবধান-বাণী গ্রাহ্য করা হয়নি—এবং যদিও শেষ পর্যন্ত সেই সাবধান-বাণীই সত্য হল—তবু ভারত জাতিসঙ্ঘের আনুগত্য থেকে বিচ্যুত হয়নি। কোরিয়া সম্পর্কে জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবে সমর্থন সে প্রত্যাহার করবে—এ প্রস্তাবও ভারত কখন তোলেনি।

কম্যুনিস্ট চীনকে জাতিসঙ্ঘের সদস্য-পদ দেওয়া উচিত, এশিয়া এবং বিশ্বের মতামতের দিক থেকে তা একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা আমরা বুঝেছি—তাই সাধারণ পরিষদে আমাদের কথা খোলা-খুলি বলতে আমরা দ্বিধা করিনি। এর অর্থ এই নয় যে, চীনের পররাষ্ট্র নীতি আমরা অনুমোদন করি। কিন্তু এর দ্বারা বিশ্ব-সমস্যা সমাধানের জন্যে অপেক্ষাকৃত ভাল রাজনৈতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি হতে পারে—এই বাস্তব সত্যটিকেই আমরা স্বীকার করেছি।

ভারত তার বুদ্ধিতে যা ন্যায়ের পথ বলে মনে করে, তাই অনুসরণ করবার চেষ্টা করছে। অপরের মতামত, দৃষ্টি-ভঙ্গীকে অনুধাবন করবার চেষ্টাতেও সে কাতর নয়। বর্তমান বিশ্বসংকটের সময় সমস্ত দেশকেই তাদের শুভবুদ্ধির অনুসন্ধান করতে হবে এবং তারপর আমরা সকলেই যা চাই—সেই অভিপ্রেত শান্তির কামনায় কর্মপন্থা স্থির করতে হবে। আজকের উন্মাদনার জন্যে আগামী-কালের শুভকে আমরা ত্যাগ করতে পারি না।

শ্রীবিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের একটি ইংরাজী প্রবন্ধের সচ্ছন্দ অনুবাদ।

মানবেন্দ্রনাথ রায়

শ্রীসরলাবালা সরকার

মা **নবেন্দ্রনাথ** রায়কে প্রথম দেখি চাংড়িপোতা স্টেশনের প্লাটফর্মে। তাহার দিদি কলিকাতা হইতে আসিতেছিলেন, সে তাহাকে লইয়া যাইতে আসিয়াছিল।

আমিও সেই ট্রেনেই আসিতেছিলাম, বারুইপুরে যাইব বলিয়া, গাড়িতে নরেনের দিদির সহিত আলাপ হইল। মানবেন্দ্রনাথের পূর্বনাম ছিল নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। আমি তাহাকে নরেনই বলিতাম, সে ছিল আমার সন্তানের মত, সুতরাং এই প্রবন্ধে তাহাকে 'নরেন' বলিয়াই উল্লেখ করিব।

চাংড়িপোতায় অনেক বৈদিক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। স্বর্গীয় তারাকুমার কবিরত্ন মহাশয় এই গ্রামেরই অধিবাসী এবং নরেনের সহিত তাঁহার সম্পর্কও ছিল। বিখ্যাত বিপ্লবী হরিকুমার চক্রবর্ত্তী নরেনের অন্তরঙ্গ বন্ধু, তাহার ছেলেবেলায় তাহাকেও দেখিয়াছিলাম।

নরেন মানবেন্দ্রনাথ নাম কেন লইল একথা আমি তাহাকে একদিন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। তাহার উত্তরে হাসিতে হাসিতে বলিয়াছিল, "নরেন্দ্র আর মানবেন্দ্র মানে তো একই, মানবেন্দ্র নামটি বেশ জমকালো, নয় কি? আর ভট্টাচার্যে আমার অরুচি হইয়া গিয়াছে, তাই ভট্টাচার্যকে রায় করিয়া নিয়াছি।"

যাহা হউক, সেই প্রথম দিন নরেনের দিদির সহিত আলাপে জানিয়াছিলাম, তাহার একটি ভাই তাহাকে স্টেশনে নিয়া যাইতে আসিবে। সেই ভাইটি সম্বন্ধে গল্পচ্ছলে তিনি অনেক কথা বলিয়াছিলেন; বলিয়াছিলেন, "ভাই বড় খেয়ালী আবার ভীষণ স্বদেশী। হয়তো তিনদিন কোথায় গিয়ে রইলো খোঁজই নেই, আবার বাড়ি এসে চাষীদের সঙ্গে মাঠে লাঙ্গল দিতে লেগে গেল। একদিকে লাজুক, আবার দারুণ জেদী।" 'ভাই' সম্বন্ধে যেভাবে তিনি গল্প করিতে লাগিলেন, তাহাতে আমার মনে হইল ভাইকে তিনি বড়ই ভালবাসেন এবং আমাকে এই গল্প শুনিবার আগ্রহী শ্রোতা বলিয়াই বুঝিতে পারিয়াছেন।

স্টেশনে গাড়ি থামিতেই হাত বাড়াইয়া দেখাইয়া দিলেন "ঐ দেখুন আমার ভাই দাঁড়িয়ে আছে।"

দেখিলাম,—শ্যামবর্ণ, দীর্ঘদেহ, অতি শ্রীমান ছেলেটি, বয়স ১৬।১৭ বৎসর হইবে। দেখিয়াই ভাল লাগিল।

ইহার পর দিনের পর দিন চলিয়া গেল, আবার নরেনের সংবাদ পাইলাম সুরেশের এক পত্রে। সুরেশের ডাকনাম পরাণ, এখন তাহার নাম সুরেশচন্দ্র মজুমদার। ডিটেকটিভ্ সামসুল আলম খুন হইবার পর যাহারা গ্রেপ্তার হয় সুরেশ তাহাদের মধ্যে একজন। অল্পবয়স্ক পিতৃহীন ছেলে, আমার বাবা স্বর্গীয় কিশোরীলাল সরকার মহাশয়ের বাড়িতে সে থাকিত। সে যে বিপ্লব কর্মের সহিত

মেক্সিকোতে মানবেন্দ্রনাথ (১৯১৬)

ভারতে—কারামুক্তির পর মানবেন্দ্রনাথ ও এলেন (১৯৩৬)

সংযুক্ত বাড়ির অন্য কেহই ইহা জানিত না, কিন্তু আমি তাহা জানিতাম; তাই যেদিন সে রাত্রে বাড়ি ফিরিতে দেরি করিত, কিম্বা মোটেই ফিরিত না, সেদিন সারারাত্রি জাগিয়া জানালায় বসিয়া থাকিতাম। আমার বাবার বাড়ি হইতে সে গ্রেপ্তার হইয়াছিল এবং হাজতে প্রায় আঠারো মাস ছিল, আর সেই হাজতেই নরেনের সহিত তাহার বন্ধুত্ব হয়।

তখন আমার 'প্রবাহ' নামে একখানি কবিতার বই বাহির হইয়াছিল, পরাণ জেল হইতে সেই বইখানি চাহিয়া পাঠাইয়াছিল এবং সেই সঙ্গে ছোট একটি চিঠিতে নরেনের সহিত তাহার বন্ধুত্বের কথা জানাইয়াছিল এবং সে-ই যে বইখানি পড়িবার জন্য ব্যগ্র হইয়াছে তাহাও জানাইয়াছিল।

কিন্তু বইতে 'ইতিহাস' শীর্ষক একটি কবিতা ছিল, সেটি হয়তো রাজদ্রোহ-কর হইবে, এই ভয়ে প্রথমে পাঠাইতে সাহস করি নাই পরে তাহাদের তাগাদায় পাঠাইতে হইয়াছিল।

সুরেশ যখন ছাড়া পায়, তখন আমি আরামবাগ নামক একটি স্থানে ছিলাম আমার দাদা ছিলেন সেখানে ডাক্তার। সুরেশ ছাড়া পাইয়া সেইদিনই আরামবাগ রওনা হইয়াছিল এবং চাঁপাডাঙ্গা স্টেশন হইতে হাঁটিয়া আরামবাগে আসিয়াছিল। তাহার হাতে নরেনের হাতের লেখা একখানি পত্র পাইলাম। পত্রে সমস্ত পাতা ভরিয়া একটি কথাই লেখা ছিল, 'মা' 'মা' 'মা'। আর শেষে ছিল তোমার ছেলে নরেন। দুঃখের বিষয় চিঠিখানি এখন আমার কাছে নাই।

সুরেশের কাছে নরেনের কথা অনেক কিছু শুনিলাম। সে আমাকে বলিল, "সে তোমাকে একবার প্রণাম করবার জন্যে অস্থির হয়েছে।"

আমার বাবার বাসা ছিল ১২১ কর্ন-ওয়ালিস স্ট্রীট। তিনি খুব বড় উকিল ছিলেন কিন্তু তাঁর চালচলন ছিল খুবই সাদাসিদা। তাঁর বাড়িতে অনেক ছেলে আশ্রয় পাইত ও পড়াশুনা করিত। বাহিরের ঘরে জোড়া তক্তাপোশের উপর শতরঞ্জি ও চাদর পাতিয়া ছিল বসিবার স্থান এবং ছেলেদের সেটি রাত্রে শুইবারও স্থান ছিল। আবার বাবার বিশিষ্ট মক্কেলরাও সেইখানে আসিয়াই বসিতেন। একদিন বাবা আমাকে বাহিরের ঘরে ডাকিয়া পাঠাইলেন, গিয়া দেখিলাম নরেন তক্তাপোশের একধারে মাটিতে পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। বাবা বলিলেন, "ছেলেটি পরাণের বন্ধু, তোর সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। কিছু খাবার থাকে তো নিয়ে আয়।"

নরেন যেন লজ্জায় অভিভূত, মুখ তুলিতেই চায় না, যাহা হউক ক্রমশ কথা-বার্তা বলিতে বলিতে কতকটা সংকোচ কাটিয়া গেল।

আমার দাদা ডাক্তার সরসীলাল সরকার তখন উলেবেড়েয় বদলী হইয়াছিলেন। সেখানে আমি যাই এবং আমার খুব অসুখ হয়। সে সময় নরেন ঘন ঘন সেখানে যাইত, এইভাবে দাদার সহিত তাহার বিশেষ আত্মীয়তা হইয়া গেল।

দাদা চিরকালই বিপ্লবী ছেলেদের ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন। আসলে দাদার নিজেরও বিপ্লবী মনোভাবই ছিল। নরেনকে পাইয়া দাদা অতিশয় আনন্দিত

হইলেন এবং কিভাবে এই সব ছেলেদের একটা আস্তানা গড়িয়া তুলিতে পারা যায় সেই আলোচনা করিতে লাগিলেন। ময়ূর-ভঞ্জের রাজধানী বারিপদার কাছে হোম সাহেব নামে এক সাহেব অনেক জায়গা-জমি লইয়া আখের চাষ করিতেন, সাহেব বিলাতে যাইবেন, এজন্য জমিটা বিক্রি করিয়া যাইতে চাহেন, দাদা এই সংবাদ পাইয়াছিলেন, তিনি ঐ জমি সম্বন্ধে কথা-বার্তা বলিবার জন্য নরেনকে পাঠাইলেন; নরেন যাতায়াত করিতে লাগিল এবং সাহেবেরও সঙ্গে তাহার ঘনিষ্ঠতা হইয়া গেল, কিন্তু ময়ূরভঞ্জ স্টেটের আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত জমিটা পাওয়া যায় নাই।

নরেনের একটি বিশেষ গুণ ছিল যে, সে সহজেই লোকের মন আকর্ষণ করিতে পারিত। উলুবেড়েয় অনবরত যাওয়া আসা ও মাঝে মাঝে থাকা ইহাতে সে বাড়ির সকলেরই নিতান্ত আত্মীয় হইয়া উঠিয়া-ছিল। দাদা তাহাকে ছোট ভাইয়ের মত ভালবাসিতেন, সেজন্য যখন দাদার মেজ-ছেলে কানাইকে অসুস্থ অবস্থায় ঘাট-শীলা পাঠানো হয় তখন দাদা তাহাকেই সঙ্গে যাইবার জন্য প্রস্তাব করিয়াছিলেন এবং নরেন আগ্রহের সঙ্গেই সে প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছিল।

কানাইয়ের মা সঙ্গে যাইতে পারেন ই আমিই কানাইকে নিয়া গিয়াছিলাম। ন্তু আমিও তখন হার্টের অসুখে ীড়িত ছিলাম, সঙ্গে গিরিবালা দিদি মে একজন মহিলা ছিলেন এবং নরেনই ল আমাদের অভিভাবক।

পাঁচ ছয় মাস আমরা ঘাটশীলায় লাম, এই সময় নরেন যেভাবে আমার বা করিয়াছিল, তাহা বর্ণনা করা সম্ভব া। সে যেন মায়ের কোলের ছোট ছেলে য়া পড়িল। কুয়ার জল তুলিয়া আমাকে ান করাইত, চাকরকে জল তুলিতে দিত । বারণ করিলে তাহার এত অভিমান তে যে বারণ করাও সম্ভব হইত না। হার এত ভাবালুতা আমার ভাল লাগিত তাই তাহার যতীন দাদাকে (স্বর্গীয় ীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়) জানাইয়াছিলাম, াপনার লোহার ছেলে নরেন কি আমার ছে এসে মাখমের ছেলে হয়ে যাবে?" রে তিনি জানাইয়াছিলেন, "তা কখনও সম্ভব নয়, বরং লোহা ইস্পাত হয়ে যাবে।"

নরেন সাহিত্যিক ছিল, সেজন্য "মুক্তি কোন্ পথে?" নামে সংখ্যায় সংখ্যায় প্রচারিত বিপ্লবীদিগের পত্রিকায় তাহার অনেক সুচিন্তিত লেখা বাহির হইয়া-ছিল। ঘাটশীলায় সে আমাকে তাহার গত জীবনের বহু ঘটনা শুনাইয়া ছিল, ইহার মধ্যে ঢাকার ম্যাজিস্ট্রেটকে কিভাবে গুলী করা হয় সে ঘটনাও ছিল। ম্যাজিস্ট্রেট ছুটি পাইয়া দেশে গিয়াছেন ইহা সে বিশ্বাস করে নাই, সে বলিত তিনি মারাই গিয়া-ছিলেন। ইহা ছাড়া আরও অনেক ঘটনার কথা তাহার কাছে শুনিয়াছিলাম, সে সমস্তই বিপ্লবী জীবনের কাহিনী।

ছেলেবেলারও অনেক কাহিনী সে শুনাইত, তাহার দাদা সুশীল, তাহার দিদি, তাহার ছোট ভাই খোকন ইঁহাদের কথাও যেন তাহার মনে গাঁথা হইয়াছিল। চাংড়িপোতা, সোনারপুর প্রভৃতি স্থানে প্রচুর ফসল হয়, গ্রামের লোক তাহা পায় না, সমস্তই রপ্তানি হইয়া যায় কলি-কাতায়। এত ভাল লীচু ফল অথচ গাঁয়ের লোক লীচু খাইতে পায় না, তাই লীচুর মরসুমে সে কিভাবে দলবল লইয়া লীচু চুরি করিয়াছিল, তাহার কাহিনীও শুনাইয়াছিল এবং সেই লীচু আঁটি বাঁধিয়া গ্রামের সকলের বাড়ি বাড়ি কিভাবে পৌঁছাইয়া দিয়াছিল এবং কিভাবে তাহারা স্বচ্ছন্দে আত্মসাৎ করিয়াছিল এই সকল ঘটনা বর্ণনা করিতে তাহার বিশেষ উৎসাহ দেখা যাইত।

একদিকে সাহস, উৎসাহ আবার অন্য দিকে ছেলেমানুষী ইহাই ছিল, তাহার চরিত্রের বিশেষত্ব। যখন আমি হাঁটিয়া সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করিতে যাইতে পারিলাম, সে আমার কাপড় ও গামছা নিয়া সঙ্গে সঙ্গে যাইত এবং স্নানের পর ছাড়া কাপড়খানি কাচিয়া লইয়া আসিত। এক-দিন আমি যখন স্নান করিতেছি, তখন দুটি ফিরিঙ্গি ছেলে বন্দুক নিয়া নদীর ওপারের জঙ্গলে শিকার করিবার জন্য নদীর ধারে আসিল। সুবর্ণরেখার প্রবল স্রোতে তাহারা কিছুতেই তাহাদের ডিঙ্গি ভাসাইতে পারিতেছিল না, নরেন সকৌতুকে সেই ব্যর্থ চেষ্টা দেখিতেছিল, তাহার হাত দুটি কাজে লাগাইবার জন্য যেন সে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। আমাকে মিনতি করিয়া বলিল, "মা, আমি যাব?" আমি প্রথমে মত দিই নাই, পরে বার বার তাহার "যাই না মা?" শুনিয়া বলিলাম, "যা"। তখনই সে দুরন্ত ছেলের মত ছুটিয়া গেল এবং একবার মাত্র ঠেলিয়া দিতেই নৌকা বহুদূরে ভাসিয়া গেল, আবার নরেনকেই সাঁতার দিয়া নৌকা ধরিয়া আনিতে হইল।

কলিকাতায় ফিরিয়া আসিবার পর আমরা নিকিশিপাড়ায় একটা বাড়িতে ছিলাম, নরেন সেখানেও সর্বদা আসিত, তখন দেখিতাম তাহার হাসিভরা মুখ গম্ভীর ও চিন্তাচ্ছন্ন; আসন্ন ঝড়ের আগে যেমন আকাশের ভাব হয়। বস্তুত ইহার পরই ঝড় উঠিল। গার্ডেনরীচের ডাকাতিতে সে গ্রেপ্তার হইল, আবার বসন্ত হইয়াছে এই ছলনায় বাড়িতে অন্তরীণ হইবার সুযোগ লইয়া পলাইয়া গেল। ইহার আগে আমি যখন কিছুদিন পুরী ছিলাম, তখন পুরীতেও সে মাঝে মাঝে আমার কাছে আসিত, যতীনবাবুরা তখন সদলে বালেশ্বরে ছিলেন। সম্ভবত নরেন সে সময় বালেশ্বরেই ছিল।

ইহার পর ঘটিল বালেশ্বরের সেই দারুণ দুর্ঘটনা। নরেন সেই সময় হইতে একেবারে হারাইয়া গেল। করাচীতে যখন কংগ্রেস হয়, তখন সে নাকি সেখানে গোপনে আসিয়াছিল। তাহার পর ধরা পড়িয়া জেলে ছিল।

জেল হইতে খালাস হইবার পর আবার যখন কলিকাতায় আসিল, তাহার স্ত্রী এলেন, তখন তাহার সঙ্গে ছিল। গৌরাঙ্গ প্রেস বাড়ির উপর তলায় তাহারা থাকিত এবং প্রতিদিন সস্ত্রীক আমাদের রাধাকান্ত জীউর বাড়িতে আসিয়া খাওয়া দাওয়া করিত। সে সময় একদিন সে বলিয়াছিল, "মহাত্মাজী নাকি তাহাকে দলে লইতে চাহিতেছেন।" এই সময় লেডী বসুর আমন্ত্রণে একদিন তাঁহার বাড়িতেও গিয়া-ছিল।

মানবেন্দ্রনাথের সমস্ত জীবনটাই যেন একটি ঘূর্ণিঝড়। দেরাদুনে অকস্মাৎ একদিন সেই ঝড় শান্ত হইয়া গেল। তাহার বিপ্লবী জীবনের সহিত আর এক ভালবাসাময় জীবন যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়াছিল।

চক্রদত্ত

বর্তমানকে আণবিক যুগ বলা যায়। বৈজ্ঞানিকরা ভাল-মন্দ সব কিছুতেই এ্যাটমের প্রয়োগ করতে চেষ্টা করছেন। এখন অনেক কারখানায় এই এ্যাটমের সাহায্যে যন্ত্রপাতির বিভিন্ন রকমের মাপ-জোখ নেওয়া হচ্ছে। এর মধ্যে তেজস্ক্রিয় লোহার সাহায্যে রেলের ইঞ্জিনের পিস্টন তৈরী উল্লেখযোগ্য। এই নতুন ধরনের তৈরী পিস্টনের সুবিধা হচ্ছে যে, এটা কি পরিমাণে ক্ষয় হচ্ছে, সেটা খুব সহজেই মাপা যায়। এর আগে এই ক্ষয়ের পরিমাণ মাপবার জন্য বহু উপায় বার করবার চেষ্টা করা হয়েছিল। বর্তমানে ক্ষয় মাপবার উপায় হচ্ছে—ঘর্ষণের ফলে যেটুকু লোহা ক্ষয়ে যায়, সেটা পিস্টনের সঙ্গে লাগান তৈলাধারে এসে জমা হতে থাকে। কিছুক্ষণ বাদে বাদে তেল বার করে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা হয় যে, কতটা পরিমাণ লোহা ক্ষয়ে গেছে। অবশ্য এটা মাপা হয় তেজস্ক্রিয় লোহার মাপে। এর আগে পিস্টনের ক্ষয় মাপতে গেলে ইঞ্জিন থেকে এই অংশ খুলে নিয়ে পরীক্ষা করে আবার সেই অংশ ঠিক জায়গায় লাগাতে হত। আর এখন যে কোন সময় ইঞ্জিন থেকে অংশ না খুলেই এটা সহজেই মাপা যায়।

*

ল্যাবরেটরীতে কাজ করতে গেলে অনেক সময় এ্যাপ্রন প'রে কাজ করতে হয়। এ্যাপ্রন পরার দরুণ কাপড়-জামা কিছুটা পরিষ্কার রাখা যায়। কারখানায় যারা কাজ করে, তাদেরও অনেক সময় এ্যাপ্রনের দরকার হয়। অবশ্য এদের এ্যাপ্রন কাপড় দিয়ে তৈরী না করে অন্যরকম জিনিস দিয়ে তৈরী করা হয়। এই সব এ্যাপ্রন কাপড়ের সঙ্গে রজন আর কাচ মিশিয়ে তৈরী করা হয়। তৈরী করার পর ৩।৩২ থেকে ¼ ইঞ্চির বেশী পুরু হয় না। আর সমস্ত এ্যাপ্রনটার ওজন খুব বেশী হলেও ৩ পাউণ্ডের মত হয়। এই সব এ্যাপ্রন দরকার হয় যে সব কারখানায় লোকদের এমন সব যন্ত্রের সামনে কাজ করতে হয়, যেখান থেকে ধাতুর টুকরো খুব জোরে ছিট্‌কে পড়তে থাকে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই এ্যাপ্রন প'রে থাকলে ৮ ফুট দূর থেকে রিভলবারের গুলী কোন লোককে জখম করতে পারে না।

নতুন ধরনের এ্যাপ্রন প'রে লোকটি নিশ্চিন্ত হয়ে কাজ করছে

*

ডাক্তাররা অনেক সময় বলে থাকেন যে, বাতশূলের ব্যথার চিকিৎসা করা সম্ভব হয় না। কারণ এর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ভাল ওষুধ আজ পর্যন্ত বের হয়নি। ডাঃ রুডলফ জেইগার এক নতুন ধরনের সহজ চিকিৎসার কথা বলেছেন। তিনি বলেন যে, যে স্থানে এই ব্যথা দেখা দেবে, তার নিকটের নার্ভকেন্দ্রে কয়েক ফোঁটা ফুটন্ত গরম জল ইন্‌জেকসন করে দিলে ব্যথা সেরে যাবে। ডাঃ জেইগার বলেন যে, অবশ্য ব্যথা যে নার্ভকেন্দ্র থেকে আরম্ভ হচ্ছে, ঠিক সেই কেন্দ্রে ইন্‌জেকসনটি করতে হবে। ব্যথা সারার কারণ হচ্ছে গরম জল এই কেন্দ্রের কোষগুলি নষ্ট করে দেয় বলে। তিনি বলেন যে, এই রকম চিকিৎসায় দেখা গেছে যে, এ ধরনের ব্যথা সম্পূর্ণরূপে নিরাময় হচ্ছে।

*

কোটিজেনে একটি জনপ্রিয় ওষুধ। এই ওষুধের সাহায্যে যত রকমের বাত আছে, তা সম্পূর্ণভাবে নিরাময় করতে পারে। এখন দেখা যাচ্ছে, এই ওষুধ সর্বপ্রকার চর্মরোগেও উপকারী। ডাক্তাররা পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, যে সব চর্মরোগের জন্য রোগীর জীবনহানি হবার সম্ভাবনা, এমন সব রোগ এই কোটিজেনের সাহায্যে একেবারে সেরে গেছে। আরও একটা সুবিধা এর যে, খুব বেশীদিন ব্যবহার করার ফলে রোগীর শরীরে কোনরকম প্রতিরোধের ক্ষমতা জন্মায় না—ফলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সমান মাপের ওষুধ ব্যবহার করা চলে। এমন কি রোগ কমবার সঙ্গে সঙ্গে ওষুধের মাত্রাও কমিয়ে দেওয়া যায়।

*

বড় বড় শহরে লোকসংখ্যা এত বেশী বেড়ে চলেছে যে, অনেক সময় বসবাসের বাড়িই পাওয়া মুশকিল হয়। এই অসুবিধা খানিকটা দূর করবার চেষ্টা করা হয় অনেক তলাওয়ালা বাড়ি তৈরী করে। অবশ্য আজকাল প্রায় সব তলাওয়ালা বাড়িতে লিফ্‌টের বন্দোবস্ত আছে—সেই জন্য ওপর নিচে করবার কষ্টটা ওপরতলা-বাসীদের ভোগ করতে হয় না বলা যায়। কিন্তু যে সমস্ত বাড়িতে এই সুবিধা নেই তাদের কতবার যে ওপর নিচে করতে হয় তার খবর ভুক্তভোগীরাও বোধ হয় রাখেন না। কিন্তু এই বাধ্য হয়ে ওপর নিচে করায় যে কি লাভ সেটা কয়েকজন বৈজ্ঞানিক প্রকাশ করেছেন। তাঁদের মতে এই সমস্ত লোকেরা যে কোন একজন ভাল দৌড়বিদের চেয়ে কিছু কম মেহনৎ করেন না। দেখা গেছে যে সাধারণভাবে হাঁটলে একজন লোক প্রতি মিনিটে প্রায় ২১,০০০ ক্যালরী শক্তি পোড়ায়। লাঙল চালায় যারা তাদের প্রায় দু গুণ লাগে। সাইকেল চালালে প্রায় ৬,৩০০ ক্যালরী লাগে। আল্‌গা মাটি খুঁড়তে প্রায় ৭,৫০০ ক্যালরী লাগে। আর ওপর নিচে করতে ১৫,০০০ ক্যালরী দরকার হয়।

বৃষ্টি পড়ে

গোবিন্দ চক্রবর্তী

বৃষ্টি পড়ে—ঘুরে ঘুরে
জলতরঙ্গের রঙ্গে, অর্কেস্ট্রার সুরে
গঞ্জে, গ্রামে, জনপদে, শহরে-নগরে;
বৃষ্টি পড়ে
লণ্ডনে, মিশরে—
বৃষ্টি পড়ে দেশে-দেশে, দেশান্তরে, মহাদেশ জুড়েঃ
মালয়, সিয়ামে, চীনে—অনুরাধাপুরে
সিলনের; মিলনের মন্ত্র প'ড়ে—
ভারতবর্ষেও কবে বৃষ্টি পড়ে ঝরে!

পরিচিত প্রাচীন নিয়মেঃ
জল থেকে বাষ্প ওঠে, বাষ্পে মেঘ জমে;
র'য়ে র'য়ে
সেই মেঘ একদিন নামে বৃষ্টি হ'য়ে,
বৃষ্টি নামে বিগলিত করুণাধারায়—
নীল নদে, হোয়াংহোতে, রাইনে কি গঙ্গা-যমুনায়
ঘোলা জল ফুলে পাক খায়;
তারপর—মাটি ও পাথরে
পলি পড়ে, থরে থরেঃ
শস্যের সম্ভার হাসে প্রান্তরে-প্রান্তরে।

ধরণীর স্নেহের ধারণা
মূর্ত হ'য়ে জাগে বুঝি এই শস্যকণা—
মুঠো মুঠো পাকা সোনা
শাদা, কালো, লাল কিম্বা হলুদ মাটিতে;

তবুও ফৌজ থাকে শ্যেনদৃষ্টি ব্যারাকে, ঘাঁটিতে
সকল দেশের; থাকে পুলিস-দালাল—
সুচতুর সূক্ষ্মতন্তু চক্রান্তের জাল
হানা দিতে, লুঠে নিতে আর কার মাটি ও ফসলঃ
বারবার যুদ্ধ যার অনিবার্য ফল;

আগুন ছিট্‌কে আসে অকারণে ইউরোপ থেকে এশিয়ায়—
পৃথিবীটা জ্ব'লে জ্ব'লে ছাই হ'য়ে যায়।

ছাই পৃথিবীর
বুকের উপর তবু মেঘ করে, বৃষ্টি পড়ে আবার নিবিড়—
মূর্ছা ভাঙে সভ্যতার, স্বপ্ন নামে, জমে ওঠে সুখময় নীড়।
আবার মাঠের শস্য ঘরে ওঠে খামারে-গোলায়ঃ
শান্তির প্রার্থনা জাগে মন্দিরে-গির্জায়—
মানুষেরা শান্তি চায়
সর্ব দেশে, পাহারার গড়ে পঞ্চায়েৎঃ
দিগন্তে কপোত ওড়ে শ্বেত।

তবু ত বুলেট বেঁধে নিরীহ ডানায়—
ধ্যানের ধারণাগুলি
তবু কেন, তবু কেন টুটে-ফুটে যায়!
বৃষ্টি নামে, ভেজে মাটি, তবু মাঠ বাঁজা
আগুনের বমি করে—যেন রাত ঝাঁ-ঝাঁ
দুপুরেও; ভয়-ভয় জল বা কি স্থল—
আকাশ-ওলটানো বৃষ্টি, তথাপি শীতল
কিছুতে না হয় বসুন্ধরা।
যন্ত্রের অলিভতরু যাতনায় চায় মনমরা!

বৃষ্টি ঝরে পরিচিত প্রাচীন নিয়মে—
টোকিও, স্টক্‌হল্‌ম্‌, রোমে
হাজার বছর আগে ঝরেছে যেমন;
হাজার বছর এই পৃথিবীর পথ হাঁটে পুরোনো জীবনঃ
সেই ত' পুরোনো মেঘ, পুরোনো বৃষ্টির ফোঁটা
আসে-যায় মানুষের চেনা প্রয়োজনে;
এবার নামুক বৃষ্টি
চেতনার গাঢ়গূঢ় সোপানে, গহনে।

রূপকথা

নন্দদুলাল সরকার

তোমাকে দেবো আমি সাগর কল্লোল
নদীর ছলছল উন্মুখর
রাতের তারা জ্বলা নীরবে কথা বলা
আকাশ, সুমধুর ঝিল্লিস্বর।

সাজাবো প্রাঙ্গণ প্রভাতী অঙ্গন
রক্ত করবীর রক্তিমায়
দুপুর ঝিলমিলে অপরাজিতা নীলে
স্বর্ণ সন্ধ্যার রূপকথায়।

ভিখারী এ-জীবন শীতের তরু,—তবু
হৃদয় দুর্মর ভালবাসার
শিকড় মাটি মাখা, আশায় বুক বাঁধা
দুচোখে ফাল্গুন জ্বলে আশার।

কী দেবো উপহার? কী দেবো যৌতুক?
আহত যৌবনে যন্ত্রণার
অনেক ইতিহাসে গেঁথেছি মালা,—তাই,
তোমাকে পরাবো সে কণ্ঠহার॥

শুভ কর্ম্মপথে
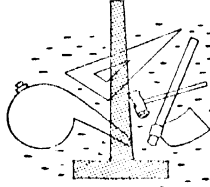
জন কল্যাণের সুদীর্ঘ পথ চিরদিনই দুর্গম। এই কল্যাণধর্মী রাষ্ট্রগঠনের যে বিরাট আদর্শে ভারত আজ উদ্বুদ্ধ, সেই মহামন্ত্রে অনুপ্রাণিত হয়েই পশ্চিমবঙ্গ অবিচল নিষ্ঠায় পূর্ণ সংগঠনের পথ সুগম ক'রে চলেছে। জনগণের একান্ত প্রয়োজনগুলি মেটাবার জন্য সকলক্ষেত্রেই অনুসরণ করা হচ্ছে সুপরিকল্পিত কর্মধারা। তারই ফলে আজ মঙ্গল অভিযানের পথ প্রশস্ত ও সরল। এখন আরো নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করবার সময় এসেছে। আজকের এই শুভদিনে তাই নতুন ক'রে নব উদ্যমে কাজ করবার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। চিরস্মরণীয়

২৬শে জানুয়ারী
সাধারণতন্ত্র-দিবসে

ভারতের কল্যাণ-সাধনে আমরা আবার নব উদ্যমে ব্রতী। আর সেই ব্রত উদ্‌যাপনের জন্যই গ'ড়ে তুলতে হবে

জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে পশ্চিমবঙ্গ-সরকার কর্তৃক প্রচারিত

৩৫

'বজ্জাতের ধাড়ি।' কে গুপ্ত বনমালীর দিকে তাকায়। 'ধরি মাছ না ছুঁই পানি। হুট করে সময় বুঝে চারু কেমন কেটে পড়ল দ্যাখ্।'

বনমালী কথা না বলে হিসাবের খাতায় চোখ রাখল।

'কি মশাই, আপনি চুপ করে আছেন কেন।'

শিবনাথ কিছু বুঝতে না পেরে কে গুপ্তর দিকে তাকিয়ে ছিল তাই এই প্রশ্ন।

'কি ব্যাপার?' হাসতে চেষ্টা করল শিবনাথ।

'ব্যাপার তো আপনাকে নিয়েই।' ঝাঁকড়া চুল সমেত মাথাটা নেড়ে গুপ্ত দেশলাই জেবলে সিগারেট ধরালে। দেশলাইটা চারু রায় ভুলে ফেলে গেছে।

'সে জন্যেই তো আপনাকে ডাকছিলাম।' এক গালে ধোঁয়া ছেড়ে কে গুপ্ত ঘুরে শিবনাথের দিকে সোজা হয়ে বসল। হুবলার কথা শুনে ওই-ই তো এতক্ষণ বেশি নাচানাচি করছিল। চারু।'

'কি রকম?' শিবনাথ ঢোক গিলল।

'কিরে বনমালী বল্ না কি বলছিল চারু। তোর নুন পেঁয়াজের হিসাব এখন রাখ্।'

'আমার কি গরজ। তুমি বল। এক বাড়িতে আছ তোমরা।'

কে গুপ্ত খুব করে কেশে হাতের সিগারেটের ছাই ঝাড়ল। কাশল কি হাসল মুখটা নোয়ানো বলে ঠিক বোঝা গেল না। মুখ তুলে বলল, 'হুবলার রিপোর্ট শুনে চারু আমায় বলে দ্যাট্ জেন্টেলম্যান মাস্ট বি এনাদার বেকার। ক্রাইসিস পিরিয়ড আরম্ভ হয়েছে। ইস্কুলের চাকরি করে কত আর মাইনে পাবেন মহিলা। হ্যাঁ, আপনার স্ত্রীর কথা বলছিল চারু। বলতে বলতে শালা হুট করে বলে কিনা এই বেলা তুমি একটা অ্যাটাম্পট নাও গুপ্ত, হয়তো ভদ্রলোক রাজী হবেন, হ্যাঁ আপনি। বলল বস্তি লাইফের ইতর ও জঘন্য দিকটা যেমন আছে, তেমনি একটা হোপ, আলোর দিকটাও থাকবে। এভ্রি ক্লাউড হ্যাজ ইটস সিলভার লাইনিং। মানে অশিক্ষিতা নিপীড়িতা মেয়ে যেমন থাকবে, তেমনি শিক্ষিতা উন্নতমনা যিনি এদের পথ দেখিয়ে নেবেন, তার জন্য মেয়ে চরিত্রের পার্ট করার স্কোপ তার মায়া-কানন বইতে আছে। তুমি একবার নক কর গুপ্ত। বহু ভদ্রঘরের মেয়ে আজ অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে এই কনসার্ন সেই কনসার্নের সঙ্গে কণ্ট্রাক্ট করে নানা বইয়ে নামছে। এন্ড দে আর আর্নিং এ লট। বলল শোভাবাজারের বিখ্যাত নাগ বংশের কে এক নগেন ডাক্তারের স্ত্রী সিনেমায় নেমে দু' মাসের মধ্যে লিনটন স্ট্রীটে বাড়ি কিনল, গাড়ি কিনল এবং স্বামীর জন্যে হ্যারিসন রোডের ওপর এত বড় ডিসপেন্সারী খুলে দিল। শোভাবাজারের কানাগলির নগেন ডাক্তারের কাছে মাগনা চিকিৎসা করাতেও কেউ ঘেঁষত না। এখন তারই বা কত নামডাক কী অসাধারণ হাতযশ। তুমি একবার বুঝিয়ে বল গুপ্ত তোমাদের শিবেন্দ্রলালবাবুকে।'

'আমার নাম শিবনাথ।' শিবনাথ গম্ভীর হয়ে বলল।

'অই একই কথা। টার্গেট ঠিক আছে। এতক্ষণ লাফালাফি করছিল চারু। আপনাকে আসতে দেখেই চুপ মেরে গেল। মানে দায়ের কোপ আপনার মাথায় আমাকে বসাতে বলে শালা সুর সুর করে কেটে পড়ল আর কি।' কথা শেষ করে কে গুপ্ত মুখের এমন ভঙ্গি করে হাসল যে, শিবনাথ না হেসে পারল না।

'তা সিনেমায় আজকাল বহু ভদ্রঘরের মেয়েরা নামছেন। নিন্দার কিছু নেই। অবশ্য এতে যোগ দেয়া না দেয়া ব্যক্তিগত রুচির ওপর নির্ভর করে। আমার স্ত্রী সম্পর্কে প্রস্তাব দিতে বন্ধুকে আপনি কিছু বললেন না?' শিবনাথ একটা চোখ ছোট করে কে গুপ্তর দিকে তাকায়।

'আমার বয়ে গেছে। তা ছাড়া সময় পেলাম কই। কথাটা তুলেই হারামজাদা আপনি আসার সঙ্গে সঙ্গে পিঠ দেখাল, দেখলেন তো।'

এতক্ষণ পর হিসাবের খাতা থেকে মুখ তুলে বনমালী হাসল।

'একবার জিজ্ঞেস করুন না শিববাবু বন্ধুর ওপর আমাদের গুপ্ত আজ এত খাপ্পা কেন।'

'কি ব্যাপার।' শিবনাথ অস্ফুটে বলল এবং একটা কিছু অনুমানও করল। কে গুপ্ত হঠাৎ কথা বলে না।

বনমালী বলল, 'আজ সকালে গুপ্ত ঘোলপাড়ায় গিয়েছিল। কিরণ নাকি পষ্টাপষ্টি বলে দিয়েছে কে গুপ্ত যেন ওবাড়ি না ঢোকে। অমল রাগ করে।'

'কেন, চারুবাবু কি সেখানে ছিলেন না?' শিবনাথ আড়চোখে কে গুপ্তকে দেখে পরে বনমালীর দিকে তাকায় ও ঠোঁট টিপে হাসে। 'এটা তো গুপ্তবাবুকে ইনসাল্ট করা হয়েছে।'

'চারু ছিল না মানে? কি হে গুপ্ত বল না। চারু কাল রাত্রেও ওখানে ছিল। সকালে কে গুপ্ত গিয়ে দেখে বিছানার ওপর গোল হয়ে বসে তিনজন মানে চারু, অমল আর কিরণ চা-রুটি ডিমের বড়া খাচ্ছে আরামসে আর খুব গল্পগুজব করছে।'

শিবনাথ চুপ করে রইল।

কে গুপ্ত অধোবদন। যেন কি ভাবছে। আঙ্গুলের ফাঁকে সিগারেটটা জ্বলছে।

'খাওয়া-দাওয়া নেই। উপোস থাকে গুপ্ত। তা ওদের কি উচিত ছিল না অন্তত একটা বিস্কুট এক কাপ চা খাইয়ে তারপর ধীরেসুস্থে সেখানে যাতে আর সে না যায় বলে দেওয়া। কিরণটা নাকি

বেড়ালের মত চোখ করে গুপ্তকে ধমক দিয়ে উঠেছিল।'

'কিরণের কিচ্ছু দোষ নেই। সব ওই চারুর চালাকি। যেভাবে শিখিয়েছে সে কিরণকে।' কে গুপ্ত শিবনাথকে বোঝাল, 'বুঝছেন মশাই, কিরণ আমাকে ভিতরে ভিতরে ভীষণ লাইক করে। এবাড়িতে থাকতে আমি ওর চোখ দেখে টের পেয়েছিলাম। 'আফটার অল সী ইজ নট এ ব্যাড গার্ল'।'

'অল্প হাসল শিবনাথ।'

'তা আপনি জিজ্ঞেস করুন না ওর কমিশনের কি হল।' বনমালী হাসল। 'আসল ব্যাপারের কি।'

বনমালীর কথায় শিবনাথ প্রশ্ন করল 'তা কিরণের সঙ্গে কিছু কন্ট্রাক্ট হয়েছে কি চারুবাবুর? লেখাপড়া? প্রথম বইয়ে নামছে আগাম এত টাকা? অমল রাজি আছে তো?'

'ওই তো চালাকি মশাই, চারু বলছে দেরি হবে। বলছে এখনই সে কথাটা তুলছে না। বলছে হয়তো সে এভাবে এখন কথা

তুলবেই না। এবং এ-দুটি স্বামী-স্ত্রীর জীবনের ওপর তার কেমন একটা পার্সন্যাল ইণ্টারেস্ট জন্মে গেছে। শুনুন মশাই শুনুন। মায়া। একটা সফ্‌ট কর্নার সৃষ্টি করেছে তার বুকে অমল সেদিন ঘোলপাড়ার ঘরে গিয়ে। কি না। চারুকে ঢিপ করে প্রণাম করে নাকি বলেছে গোঁয়ার অমল আপনি আমার বড় ভাই, অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়ে আমাদের রক্ষা করেছেন কাজেই আপনাকে অবিশ্বাস করব না আমি কিরণকে আপনার হাতে ছেড়ে দিচ্ছি যা-খুশি তা করুন।'

'হঠাৎ এত উদার? কেন চারু কি তখনই পকেট থেকে আর এক গোছা নোট তুলে অমলের হাতে গুঁজে দিয়েছিল নাকি?' শিবনাথ কে গুপ্তর চোখের দিকে তাকায়।

'আরে মশাই শেষ করতে দিন। নোট দেবে কেন। এবাড়ি থেকে বেরিয়ে তিনজন পঞ্চাননতলায় গিয়ে একটা রিক্সায় চেপেছিল।'

'একটা রিক্সা?' যেন কি প্রশ্ন করতে গিয়ে শিবনাথ আবার খানিকটা হাসল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, মশাই, আপনারা তো আর সঙ্গে ছিলেন না কেউ যখন ওরা ঘোলপাড়ায় যায়। আমি ছিলাম। সব তো চোখে দেখা।'

'তারপর?'

'আর কি রিক্সায় উঠেই চারু কিরণের হাতের উপর হাত রাখল।'

'অমল দেখতে পায়নি?'

'মশাই আপনার মাথায় কিছু নেই। দেখতে পেয়েই তো কিরণের মুখের দিকে অমল তাকিয়েছিল। আর কিরণও তখন এমনভাবে অমলের দিকে তাকায় যে দ্বিতীয়বার চোখ খোলেনি। রুমাল চাপা দিয়েছিল চোখে।'

'এখন?'

'এখনও সেই অবস্থায় আছে। কিরণ ধমক দেয় আর অমল কাঁদে। রিক্সার সেই ঘটনার পর থেকেই অমলটা বদলে গেছে। হাঁকডাক নেই। হাঁকডাক করবে কি। কিরণের চোখের দিকেই তাকাতে পারে না। ঘোলপাড়ার বাড়িতে নেমেই কিরণ রাত্রে চারুকে আর আমাকে খাওয়ার নেমন্তন্ন করল। দেখুন কেমন চালাক মেয়ে। এখানে থাকতে এসব কিছুই বোঝা যাচ্ছিল না।'

শিবনাথ ফ্যাল ফ্যাল করে কে গুপ্তর মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

বনমালী হেসে উঠল।

'সাবাস মেয়ে।'

শিবনাথ খুক করে হাসল।

'তা তোমার ওপর কিরণ আজ হঠাৎ অত চটল কেন। কাল বেসামাল কিছু করতে গিয়েছিলি নাকি।'

'তুই থাম রাস্কেল, তোর এই মগজে কিরণকে বোঝার দরকার নেই।' বনমালীর দিকে না তাকিয়ে কে গুপ্ত শিবনাথকে বোঝায়ঃ 'একসঙ্গে তিনটা পুরুষকে হাতে রেখে ঠাণ্ডা মাথায় চলার মেরিট ওই মেয়ে রাখে। আমি স্যাঙ্গুইন। কিরণ আমাকে অপছন্দ করে না।'

'কিন্তু তাড়াল তো শেষ পর্যন্ত।'

কে গুপ্ত এবারও বনমালীর দিকে তাকায় না। 'এটা চারুর চালাকি। বুঝলেন মশাই। কিরণকে দিয়ে ওই শালা বলিয়েছে স্বামী আর ও নিজে ছাড়া অন্য পুরুষের তার ঘরে ঢোকা নিষেধ।'

চারু এখন আপনাকে আর আমায় দিতে চাইছে না আর কি।' বনমালী মোটা গলায় হাসল।

'তা না দিক। তার পয়সা আছে আমি হিংসা করবার কে। কিন্তু আমায় ঠকানো কেন। আমার পাওনাটা মিটিয়ে দে আপদ চুকে যাক।'

'তা কিরণ যদি সিনেমায় না নামে তো আপনার কমিশন এখন পাওয়া যাবে কি।' শিবনাথ আকাশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল। যদিও এসব আলোচনায় আর বেশিক্ষণ লেগে থাকা তার ইচ্ছা করছিল না।

'মশাই, চারুই এখন নামতে দিচ্ছে না। বুঝলেন তো হারামজাদার ইণ্টারেস্ট এখন কোন্ দিকে। ধর্মের বোন! স্কাউণ্ড্রেলটা আমাকে বুঝিয়ে গেল এভাবে। আর ওদিকে হারামজাদী ওই বুলি ঝেড়ে অমলকে ব্লাফ দিচ্ছে। ধর্মের দাদা।'

'তোমার নসিবই খারাপ গুপ্ত, যেদিকে হাত বাড়াও পয়সা আর ওঠে না ওঠে ছাই।'

'যাকগে, আমি এখন চলি, কাজ আছে।' শিবনাথ বেঞ্চ ছেড়ে উঠতে চেষ্টা করতে গুপ্ত আবার হাত চেপে ধরল।

'তা, উঠছেন তো মশাই, কিন্তু সে-কথার কি হল?'

'কোন্ কথা?'

'ঐ যে চারু বলছিল?'

'ননসেন্স।' অস্ফুটে বলল শিবনাথ। কিন্তু এই পাগলের কথায় রাগ প্রকাশ করতে যাওয়া নির্বুদ্ধিতা চিন্তা করে সে অগত্যা মুখের হাসি ধরে রাখল। 'তা হুবলার মুখে আমাদের ঝগড়ার খবর পেয়ে চারুবাবু কি আমার স্ত্রী সম্পর্কেই কেবল বললেন। কেন রমেশ রায়ের পরিবার ছাড়া বাড়িতে কি আমার চেয়ে আর সকলের আর্থিক অবস্থাই ভাল যাচ্ছে, না ভালর দিকে? এবং তাদের ঘরেও তো বয়স্থা মেয়ে আছে।'

'কে আছে বলুন? চেহারাটা এখানে একটা বড় ফ্যাক্টার ভুলে যাচ্ছেন নাকি। আর যদি বলেন যে, চেহারা বা বয়সের দরকার নেই তো আমি দেখছি আপনার কথামতন মাস্টারের স্ত্রী, কি নাম, দ্যাট্ সেলিড ওয়োম্যান, মাদার অব এইটিন চিলড্রেন, লক্ষ্মীমণিকে চারুর বইয়ে নামাতে হয়, কাঁধমোটা ডাক্তারনীকে, প্রমথদের ঘরের আশী বছরের খনখনে বুড়িকে। আপনি হাসছেন। অথচ এদিকে, জানেন আপনি, হাজার রাত জেগেও যার কোমরে ব্যথা নেই, হাজার পাতে খেয়েও যার হাঁড়ি চাটা স্বভাব গেল না, দ্যাট হোর—কমলা এখান থেকে সরে পড়েছে। সুনীতিটাকে ভাগিয়ে নিয়ে গেল বাইরের একটা ছোকরা। প্রীতি, হ্যাঁ ভুবনের ড্যালোসী চষা মেয়ে সিনেমায় নামবে না। জানি না ওটার ছোট বীথিটা সাজগোজ করে হালে কোথায় বেরোতে আরম্ভ করেছে। এই তো হল গিয়ে ইয়াং ফেসেস মানে যারা নামবে, যাদের নামানো উচিত। অল্প বয়স হলেও বিধু মাস্টারের থ্যাবড়া নাকের মেয়ে দুটো কি ওঘরের বাচ্চা বৌটা, কি যেন নাম, রং ফর্সা হলে হবে কি, কপালটা উ'চু, খরগোসের কানের মত কান হিরণকে তো আর এ-বইয়ে নামিয়ে চারু লস দিতে পারে না, কাজেই—'

'একবার তো বন্ধু কাঁচকলা দেখিয়েছে
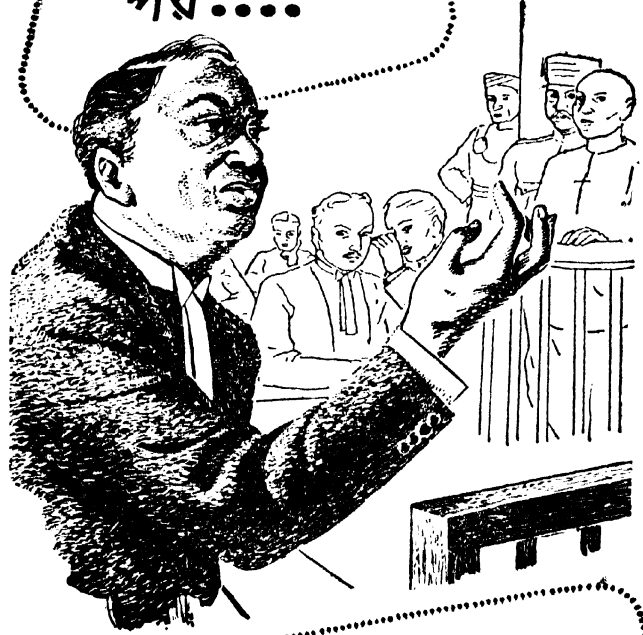
আবার কেন। ভদ্রলোক কাজে বেরোচ্ছেন আর তুমি তাঁকে ধরে রেখে আগরবাগর বকছ।'

'তুই চুপ কর সোয়াইন। তোর সঙ্গে কথা বলছি না। এ-লাইনের তুই বুঝিস কি।' কে গুপ্ত মাটিতে থু-থু ফেলে পরে শিবনাথের দিকে চোখ ফেরায়। 'কাজেই এবাড়ির রকমসকম দেখে এবং এই মাস্তর হুবলার রিপোর্ট পেয়ে চারু যে আমাকে প্রেস করবে আপনার কানে কথাটা তুলতে খুবই স্বাভাবিক। বলুন।'

'ননসেন্স, ইডিয়েট।' শিবনাথ আর একবার মনে মনে আওড়ে ঠোঁটে সূক্ষ্ম হাসি ঝুলিয়ে দিলে। 'তা তো বুঝলাম, তা কি আর বুঝি না। চেহারাটা একটা ফ্যাক্টার। তা, অবশ্য আমি খুব বেশি দেখিনি তাঁকে, কিন্তু তা হলেও আপনার হয়ে—হ্যাঁ, বীথির মা সম্পর্কে চারুবাবু কিছু চিন্তা করছেন না যে বড়? বেশ সুন্দর চেহারা মহিলার। তা ছাড়া অনেক দিন আপনার—'

শিবনাথ থামতে কে গুপ্ত মাথা নাড়ল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন চুপ করছেন কেন। তাছাড়া আমি অনেকদিন বেকার আমার স্ত্রী কিছু করেন না এই তো? তা বেকারকে বেকার বলতে অত হেসিটেট করছেন কেন। হা-হা।'

হেসে কে গুপ্ত বনমালীর দিকে ঘাড় ফেরায়। বনমালীর এদিকে এখন চোখ নেই। শতচ্ছিন্ন ময়লা কুটকুটে কাপড় পরা একটি মেয়ে,—মেয়ে না। কাদের ঘরের বৌ। সম্ভবত পাশের কোনো বস্তিতে থাকে, দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বনমালীকে ধারে এক পয়সার গুড় দিতে পীড়াপীড়ি করছে। কিন্তু বনমালী অটল। 'ধারে বিক্রী নেই ধার দেওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।' বলে সে দ্বিতীয়বার মুখ খোলেনি।

যুবতী বৌটি শেষটায় লজ্জা পেয়ে মাটির দিকে মুখ করে চুপ করে রইল।

'আরে গাধা দিয়ে দে—' কে গুপ্ত মস্তবড় একটা ঢোক গিলল। 'এক পয়সার গুড় ওমনি গেলে তোর দোকান কিছু ফেল পড়বে না। কি বলেন?'

শিবনাথ কিছু বলল না।

'আজ আর ধার দেবার ক্ষমতা নেই আমার।' বনমালী হিসাবের খাতায় মন দিতে দিতে বলল, 'বাপরে বাপ ধারের খদ্দেরের কামড়ানিতে মরলাম।

এ কোন রাজ্যে আছি।'

'রামরাজ্যে আছিস হারামজাদা।' কে গুপ্ত ধমকে উঠল। 'আমাদের মত ধারে খাওয়া খদ্দেররা এখানে আছে বলে তুই বেঁচে আছিস। আমরা ছাড়া আর কোন্ রাজা বাদশা তোর দোকানে আসে তেজ-পাতা আর শুকনো লঙ্কা কিনতে। কি বলেন মশাই?'

শিবনাথ দেখল বৌটি ডাগর চোখ আড় করে কে গুপ্তকে দেখছে। মন্দ না। রং খুব ফর্সা না হলেও চোয়াল ও চিবুকের গড়নটা অদ্ভুত। লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলল শিবনাথ।

'আরে দিয়ে দে হারামজাদা। এক পয়সার গুড় গেলে তোর করাবার কিছু লাটে উঠছে না। আপনিও বলুন না মশাই। বনমালী এমন পাষণ্ড হবে কেন।' কে গুপ্ত কনুই দিয়ে শিবনাথের হাঁটুতে গুঁতো দেয়। 'লোক বুঝে সময়মত ধারটার না দিলে আমরাই বা তোমাকে ভাল চোখে দেখব কেন।'

বনমালী কথা বলল না বা খাতা থেকে চোখ তুলল না এবং বৌটিও নড়ল না।

'আপনার কাছে একটা পয়সা আছে?' কে গুপ্ত শিবনাথের দিকে তাকাল।

'আছে।' শিবনাথ পকেট থেকে একটা ফুটো পয়সা তুলে কে গুপ্তর হাতে দিল।

'এই নে হারামজামা তোর দাম। আপনি নিয়ে নিন। দে, ওজন করে দিবি।' পয়সাটা বনমালীর দিকে ছুঁড়ে দিয়ে কে গুপ্ত হাত ঝাড়ল।

বনমালী গম্ভীরভাবে এক পয়সার গুড় একটা কাগজে জড়িয়ে বৌটির হাতে তুলে দিয়ে পয়সাটা বাক্সে ফেলল। বৌটি আর একবারও কে গুপ্তর দিকে না তাকিয়ে আস্তে আস্তে চলে গেল।

'কেমন দেখলেন মশাই।'

শিবনাথ কে গুপ্তর প্রশ্নের উত্তর দিল না। কে গুপ্তর ঘাড় ঘুরিয়ে আম গাছটার দিকে তাকিয়ে থাকার ধরন দেখে তার হাসি পাচ্ছিল। খাসা মেয়েটি, কার বৌ কে জানে।' কে গুপ্ত ঘাড় ফিরিয়ে লম্বা নিশ্বাস ছাড়ল।

'দশ নম্বর বস্তির সুকুমার নন্দীর স্ত্রী।' বনমালী খাতা থেকে মুখ তুলল। 'আগে তালতলায় ছিল। হুঁদু উকিল। ট্রামের তলায় পড়ে ঠ্যাং কেটে এখন এখানে সস্তা ঘরে এসে বাসা বেঁধেছে। ওকালতি করত মানে কাছারির বটগাছের পাতা গুনত।'

'তা কি আর বুঝি না।' কে গুপ্ত গলা খুলে হাসল। 'যার নেই পুঁজিপাটা সে আসে বেলেঘাটা। যত সব ঘাটের মরা এসে মাথা গুঁজছে খালধারে। তা, আমি ভাবছি, অন্য কথা।' গুপ্ত শিবনাথের দিকে তাকায়। 'কিরকম আনগ্রেটফুল মেয়েটা দেখলেন? আপনার কাছ থেকে পয়সাটা চেয়ে ওর গুড়ের দাম মেটালাম। কিন্তু একবার এদিকে মুখ ফিরিয়ে চোখ তুলে চেয়েই দেখল না।'

শিবনাথ না হেসে পারল না।

'লজ্জা পেয়েছে আর কি।' বনমালী নরম গলায় বলল, 'হুট করে তুমি শিববাবুর কাছ থেকে পয়সা চেয়ে নিয়ে গুড়ের দাম দেবে সুকুমারের বৌ ভাবতে পারেনি।'

'ভাবতে পারেনি কিন্তু হাত পেতে গুড়টা তো নিয়ে গেল।' ভেংচি কেটে কে গুপ্ত খিঁচিয়ে উঠল। 'তুই এক বজ্জাত আর ওই মাগি আর এক বজ্জাত। দুনিয়াটাই স্বার্থপর, বুঝেছেন মশাই, হাত বাড়িয়ে আমি আপনার কাছ থেকে নিতে পারলাম, কিন্তু আপনার দিকে তাকাতে আমার লজ্জা। আসলে ওটা হল গিয়ে ওর ভ্যানিটি। চেহারাটা একটু ভাল কিনা।'

যেন কি একটু সময় চিন্তা করল শিবনাথ। তারপর আস্তে আস্তে বলল. 'আপনার অনুমান হয়তো মিথ্যা না। কি একটা বইয়ে পড়েছিলাম যুবতী নারী যত খারাপ অবস্থায় থাকুক পরপুরুষের সামনে দাঁড়িয়ে আমি গরিব, তিনি বিত্তশালী এসব চিন্তা করে না বরং তার আগে সে অন্য কিছু ভাবে।'

'বলুন থামছেন কেন।'

'পুরুষটি আমার যুগ্যি কি অনুপযুক্ত এই বোধটাই, অর্থাৎ এই ইন্দ্রিয়গত চেতনাতেই মেয়েরা আগে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। আমি সেক্স-এর কথাই বলছি।'

'বলুন মশাই বলুন। নারী-চরিত্র সম্পর্কে এসব ভাল ভাল কথা, মানে সাইকোলজির মারপ্যাঁচগুলো বনমালী হারামজাদাকে একটু বুঝিয়ে দিন। আমিও তো এককালে এসব বইটই পড়তাম। এখন আর শালার কিচ্ছু মনেও নেই। অভাবে অভাবে মাথাটা থেঁতলে গেছে। ভয়ানক দেমাক বৌটার। নিজের ইয়ুথ, অঢেল রূপ সম্পর্কে তিনি ওভার কনশাস। আমি না হয় চুল দাড়ি লম্বা রেখে জামাকাপড় ছিঁড়ে না খেয়ে সুঁটকি লেগে একটা খচ্চরে পরিণত হয়েছি। কিন্তু, কিন্তু—আপনার দিকে তো ও একবার তাকাতে পারত। তা ছাড়া পয়সাটা আপনার পকেট থেকেই গেল।'

শিবনাথ চুপ করে রইল।

'কি যেন প্রশ্ন করছিলেন আমাকে?' চিন্তা করতে কে গুপ্তর তখনি মনে পড়ল। 'অ, বেবির মাকে সিনেমায় নামানোর কথা। অ্যাদ্দিনে তবু আপনি জিজ্ঞেস করলেন। চারু সাহস পায়নি।'

শিবনাথ তৎক্ষণাৎ বলল, 'না, আপনি সেদিন বলছিলেন কিনা। বেবি একটু বড় হলে ওকে কোনো বইয়ে নামাবেন।'

'তা তো বলেছিই, আমার সেই প্ল্যান বদলে ফেলেছি আপনি বুঝলেন কি করে। বেবি আমার মেয়ে। ডটারের ওপর ফাদারের রাইট বেশি। কাজেই ওকে দিয়ে আমি যা খুশি করাব। ইউ উইল সি।'

বুদ্ধি করে শিবনাথ প্রশ্ন করলঃ 'বেবির মা বুঝি রাজী হচ্ছেন না।'

'আলবৎ রাজী থাকতে হবে।' কে গুপ্ত চোখ পাকিয়ে উঠল। 'বেবি সম্পর্কে মাই ডিসিশেন ইজ ফাইন্যাল।'

লম্বা চুলে শীর্ণ হাত বুলিয়ে কে গুপ্ত মাথার এক গোছা শুকনো চুল পটপট টেনে তুলে ফেলল। একদলা থুথু ফেলল মাটিতে। 'ইয়াকি'?'

কে গুপ্তর মরা মাছের শাদা ফ্যাকাশে চোখে রক্তের ছিটা দেখা গেল।

শিবনাথ নীরব।

'মশাই, তিনি আই সি এস-এর বোন হতে পারেন। কিন্তু আমিও আমার সুদিনে, কি বলব, হ্যাঁ, রুপোর থালায় ভাত খাইয়েছি, সিল্ক আর সোনা দিয়ে মুখের হাসি নিভতে দিইনি। আজ দুদিনে আমার সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ।'

ঠোঁট টিপে হাসল শিবনাথ।

কি একটু চিন্তা করে ভুরু কুঁচকে বলল, 'আপনার শালা, হু যিনি আই সি এস, জীবিত আছেন কি?'

'হ্যাঁ, এখনো সার্ভিসে আছেন। আলিপুরে বাসা।'

শিবনাথ ইতস্তত না করে বলল, 'দিনকতক তিনি মানে আপনার ওয়াইফ সেখানে গিয়ে থাকলেই পারেন। অন্তত আপনার কিছু একটা সুবিধা না হওয়া পর্যন্ত। নিশ্চয়ই শ্যালক সরকারী চাকুরে। মোটা মাইনে পান। বোনকে দিন-কতক রেখে খাওয়াতে তাঁর কষ্ট নেই।'

'তাই বলি মশাই, ধর্মের বুলি আওড়ে কিরণ অমলকে ঠকাচ্ছে আর ধর্মের বুলি শুনিয়ে আই সি এস নবারুণ দাশ আমায় জব্দ করল।'

'কি রকম?' শিবনাথ প্রশ্ন না করে পারল না।

'ভোলা গিরির শিষ্য নবারুণ। সনাতন হিন্দু ধর্ম মেনে চলে। পতিই সতীর গতি। সুতরাং কে গুপ্ত বস্তিতে কষ্ট করবে আর বোন গিয়ে সেখানে বসে পরম সুখে ভাত খাবে এটা ভাইয়ের পছন্দ না। দুঃখটা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই শেয়ার করে নিক।'

'গুড আইডিয়া।' শিবনাথ না হেসে পারল না। 'তা নবারুণ আপনাকে অথবা

আপনার ওয়াইফ ও ছেলেমেয়েদের অসুবিধার কথা ভেবে মাঝে মাঝে কিছু পাঠায় তো। পাঠিয়েছে এপর্যন্ত কিছু টাকাপয়সা?'

'নট এ ফার্দিং।' কে গুপ্ত মাথা নেড়ে হাত পেতে বলল, 'দিন একটা বিড়ি দিন মশাই।'

'আমি বিড়ি খাই না।' শিবনাথ একটা সিগারেট তুলে কে গুপ্তর হাতে দিল।

'আইডিয়া তো আর নবারুণের মাথায় আসেনি। এসেছিল তার স্ত্রীর মাথায়। এ ডেঞ্জারাস ওয়োম্যান।' সিগারেট ধরানো শেষ করে কে গুপ্ত বলল, 'আমার সার্ভিস চলে যাওয়ার পর, মানে হ্যাঁ তারও মাস তিনেক পর, যখন ভাড়া চালিয়ে আর পার্ক স্ট্রীটের বাড়ি ধরে রাখতে পারলাম না, সেখান থেকে উঠে আলীপুরে সবাই দিনকতক ছিলাম। হরিবল্। কী রকম চেহারা করে রেখেছিল নবারুণ দাশের স্ত্রী আমাদের দেখে। মশাই সাত রাতও ঘুমোতে পারেনি। পাছে আমরা মাসের পর মাস সেখানে পড়ে খাই এই দুশ্চিন্তায়। তারপর বুঝি একসময় হঠাৎ মাথায় ভোলা গিরির বুদ্ধি এল, অর্থাৎ আমি একলা দিনকতকের জন্য নারকেলডাঙ্গার একটা টিনের ঘরে স্টোভে পাক করে খেয়ে সার্ভিসের চেষ্টা করব শুনেই মিনতির ডিকটেশন অনুযায়ী নবারুণ পরদিন বোনকে, হ্যাঁ আমার স্ত্রী সুপ্রভাকে ডেকে বলে দিল; এটা খারাপ দেখায়। তা ছাড়া আমাদের মনোহরপুকুরের মিত্র পরিবারে এমন দৃষ্টান্ত আজ অবধি কোনো মেয়ে রাখেনি। দশ হাজার টাকার মাইনে চাকুরে জামাই যেমন আছে, তেমনি চাকরি হারিয়ে দশ টাকা এর-ওর-তার কাছ থেকে কর্জ করতে বেরিয়ে কোলকাতার রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে জামাইর সংখ্যাও কম না। এ বাজারে। কিন্তু কোনো মেয়েই বাপের বাড়ি এসে পড়ে থেকে স্বামীর হীনতা দীনতার পরিচয় দেয়নি। দিচ্ছে না। বরং হ্যাঁ, রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরছে লোকের স্ত্রীও যখন মনোহরপুকুর রোডে বেড়াতে আসে স্বামী এই করছে সেই করছে বড়াই করেই বাপের বাড়ি এবং পাড়া মাত করে রাখে—হ্যাঁ, এরা বুদ্ধিমতী।'

'তা'লে তো আর বেবির মার সেখানে থাকা চলে না।' শিবনাথ মন্তব্য করল।

'মশাই হরিবল, আনবিলিভেবল আপনি ইমাজিন করতে পারবেন না নবারুণের ওয়াইফ, হ্যাঁ, ওই পেত্নীর মত রং খ্যাংড়া কাঠির মত খিটখিটে দেখতে লিলিটা কত বড় সেলফিশ কি ভয়ঙ্কর, তার আত্মপরজ্ঞান। গড্।'

'কি করেছিল?'

বড় নখ সমেত শুকনো শিরা বারকরা হাতটা শিবনাথের চোখের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে কে গুপ্ত বলল, 'একসঙ্গে খেতে বসে দেখতাম আমার ছেলেমেয়েদের এই এতটুকুন করে, একটুকরো ডিম, ওয়ান এইট্থ অব এন এগ্। আর ওর ছেলে ও মেয়েটাকে দিত আস্ত পুরো একটা করে ডিম। আমরা না বুঝতে পারি তাই আলুর সঙ্গে মিশিয়ে দিত। এমন পাজী বজ্জাত সেলফিশ দ্যাট্ ডটার অব বিচ্ মশাই।'

'তা ওর স্বামীর রোজগারের টাকা ওর ছেলেমেয়েকে তো একটু বেশি দেবেই।' বনমালী মন্তব্য করল।

বনমালীর কথায় কান না দিয়ে কে গুপ্ত শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'তাই ভাবি। ক'দিন আর আমরা ছিলাম শালার বাসায় আলীপুরে। প্রথম দিনই নবারুণের স্ত্রীর এই কান্ডটা দেখে আমি তাড়াতাড়ি খাওয়া ফেলে উঠে বাথরুমে ঢুকে চোখে জল দিয়েছিলাম মনে আছে। আর ভাবলাম তখন, আমার ছেলেমেয়েদের মাই ছাড়াবার পর এগারো-বারো বছর কি শীত কি গ্রীষ্ম এক কাপ দুধে আস্ত এক একটা ডিম ভেঙ্গে খাইয়ে প্রত্যেকটিকে বড় করে তুলেছি। ভীষণ কান্না পেয়েছিল সেদিন।'

'তা আর কি করবেন কষ্ট করে। দিন চিরকাল মানুষের সমান যায় না।' শিবনাথ চট্ করে বলল, 'এখন কষ্ট যাচ্ছে আবার হবে। আবার হয়তো ওরা—'

'হ্যাঁ ডিম খাবে দুধ খাবে।' কে গুপ্ত গাছের পাতার দিকে তাকাল: 'রোদ, হেলে গেছে। দিন তবে আর একটা বিড়ি।'

শিবনাথ সিগারেটের প্যাকেটটা আর পকেট থেকে বার করল না। একটু চুপ করে থেকে পরে প্রশ্ন করল; 'তা আপনার স্ত্রী তো লেখাপড়া নিশ্চয়ই জানেন। তিনি যদি—'

'বলুন থামলেন কেন।' কে গুপ্ত ঘাড় বাঁকা করল। রুক্ষ লম্বা চুলগুলো নিচে আবার হাতের আঙুল ঢুকিয়ে পট্ পট্ চুল ছিঁড়তে লাগল।

'না, পুরুষদের হুট্ ক'রে চাক[illegible] হচ্ছে না, কিন্তু নানা অফিসে নানা জায়[illegible] মেয়েরা আজকাল যেন একটু বে[illegible] চান্স পাচ্ছে। সুতরাং—' শিবনাথ থাম[illegible]

'মশাই সেদিক দিয়েও জব্দ হ[illegible] আমার কপাল।' কপালে আঙুল ঠু[illegible] কে গুপ্ত।

বনমালী ও শিবনাথ কথা বলল [illegible]

'ইংরেজি চিঠিপত্র আমার চেয়েও ভ[illegible] লেখে বেবির মা, তেমনি বাংলার [illegible] দখল। কিন্তু হলে হবে কি। ঐ [illegible] বললাম বংশ। নবারুণের মত ওর মাথ[illegible] মধ্যেও উঁচু মানী বংশের লম্বা লম[illegible] পোকা কিলবিল করছে। মশাই আমি [illegible] আর সাধে ঠেকেছি। বড়বাজারে এ[illegible] মেড়োর গদিতে চিঠিপত্র লিখে বিশ পঁচিশ ত্রিশ যাহোক মাসে পাওয়া যা[illegible] ঠিক হতে আমি নরাকেলডাঙ্গায় এক[illegible] একলা থাকব মনস্থ করে কোঠা নি[illegible] ছিলাম। কিন্তু নবারুণের বদমায়ে[illegible] বৌটার জন্যে সেই প্ল্যান যখন ভেস্[illegible] গেল অগত্যা সবাইকে নিয়ে এখানে এ[illegible] উঠলাম। উঁহু কিছুতেই রাজী করাতে পারলাম না। মিত্র বংশের মেয়েরা বাপ ভায়ের সংসারে থাক কি স্বামীর ঘরে থাক আজ অবধি কেউ চাকরি করতে নামেনি, সুতরাং তিনিও পারবেন না। কি, সিনেমায় নামার কথা? এটম বম্ব ফাটবে মশাই, আজ আমার ঘরে যদি আমি এই প্রস্তাব নিয়ে ওর কাছে যাই।'

'বাস্, তবে আর কি। এখন বসে বসে আঙুল চোষ।' বনমালী হাত নেড়ে গুড়ের মাছি তাড়াতে লাগল।

শিবনাথ কথা বলল না।

কুকুরটা আবার এক ফাঁকে এসে জুতোর পচা সুখতলাটা মুখে তুলে নিয়ে ছুটে পালাল।

'তাই মনে মনে ভাবি অভাগা যেদিকে চায়, কি জানি একটা বাংলা কবিতা আছে, সমুদ্র শুকিয়ে যায়। আমারও মশাই সেই অবস্থা। সুযোগ বুঝে নবারুণ এই কান্ডটা করল, সুবিধা পেয়ে চারু ধর্মতত্ত্ব শোনায় আর ঘরের তিনি—বললাম তো সব।' কে গুপ্ত একটা নিশ্বাস ফেলল।

'আচ্ছা আমি চলি'

'শুনুন শুনুন।'

কে গুপ্ত চেষ্টা করল কিন্তু শিবনাথ াত ধরতে দিল না। হাত ধরবে বুঝতে পরে সতর্ক হয়ে দূরে সরে, দাঁড়ায়। তক্ষণ বক্তৃতা করার পর গুপ্ত যে এবার আসল কথাটা মুখ থেকে ছাড়বে শিবনাথের তা-ও বুঝতে কষ্ট হল না। ঠোঁট টিপে হাসল সে। 'বলুন।'

'হবে আনা দুয়েক? আছে সঙ্গে কিছু খুচরো?' কে গুপ্ত অক্লেশে বলে ফেলল।

'আজ নেই।' শিবনাথ পরিষ্কারভাবে মাথা নাড়ল। চলে আসত সে। কিন্তু একটু আগে হুবেলার রিপোর্টের ওপর ভর করে তার আর্থিক অবস্থা সম্পর্কে জল্পনাকল্পনা এবং রুচি ও সিনেমা সম্পর্কে নানারকম আলোচনার প্রতিশোধ নেবার চরম মুহূর্তে উপস্থিত চিন্তা করে শিবনাথ হঠাৎ গলা বড় ক'রে বলল, মশাই, রোজ রোজ কি আর দানখয়রাত চলে, আমরা তো আর কিছু রাজা মহারাজ নই, খেটে খেতে হয়। চলি।'

'আহা সে কি আর বুঝি না।' কে গুপ্ত অল্প হাসল। 'সেই জনাই তো টাকা আধুলি চাইতে পারি না, ঐ দু'এক আনা দিন।'

'আমার কাছে নেই।' শিবনাথ হাঁটতে আরম্ভ করল।

'দিন দিন।' কে গুপ্তও উঠে শিবনাথের সঙ্গে চলল। 'চারটে পয়সা আপনার কাছে নেই আমি বিশ্বাস করি না।' বলে চলল কে গুপ্ত।

'তা কি আর নেই, কিন্তু আমার তো ট আছে, সিগারেট ফুরিয়েছে চা খেতে া।' শিবনাথ জোরে পা চালাতে চেষ্টা ল।

'দিন মশাই দিন।'

শিবনাথ কথা না বলে হাঁটে। কে গুপ্ত লম্বা পা ফেলে তার সঙ্গে এগোয়। শালী হারামজাদাকে সেই সকাল থেকে । বলে পারলাম না আদায় করতে এক মুড়ি, দুটো বাতাসা। বলে ফুরিয়ে ছ। অথচ আমি জানি মসুরডালের টার পাশে কালো হাঁড়িটায় কমসে অন্তত সের দশেক মুড়ি আছে। া কসাই শালা। দিন স্যার।'

শিবনাথ বিরক্ত হয়ে বলল, 'এভাবে ভিক্ষা করে ক'দিন চলবে? আমার কাছে এখন বিশেষ কিছুই নেই। আপনি কাইন্ডলি সরে যান।'

কে গুপ্ত করুণভাবে তাকায়।

'আরে মশাই আপনি দেখছি চারুর মতন বনমালীর মতন শক্ত হয়ে গেছেন। ওরা এমন হতে পারে। এবাড়িতে থাকে না। কিন্তু আপনি তো—দু'জন একটা উঠোনের ওপর আছি এক পাতকুয়ার জল পেটে পড়ে। আমি স্টার্ভ করছি, আপনার কি একটুও কষ্ট হয় না।' কে গুপ্ত শিবনাথের হাত ধরল। ঝাঁকুনি দিয়ে হাত ছাড়িয়ে নেয় শিবনাথ।

'কী মুশকিল। আরো দু'দিন আপনাকে আমি পয়সা দিয়েছি। আজ অবধি সেগুলি রিটার্ন করেন নি।' শিবনাথ আর না বলতে পারল না।

'হ্যাঁ তা করিনি মনে আছে। দ্যাট্ ডু আই আড্মিট।' ক্ষয়ে যাওয়া নোংরা দাঁতগুলি বার করে কে গুপ্ত বলল, লেট মাই সান ডাই, লেট মাই ডটার বি ইলোপ্ড, এন্ড রুইনড বাই দ্যাট্ রাসক্যাল্—হ্যাঁ, ক্ষিতীশ, লেট মাই ওয়াইফ, দ্যাট্ প্রাউড ওয়োম্যান, কমিট সুইসাইড,—তখন। সব দিক থেকে আমি পরিষ্কার হয়ে গিয়ে, বুঝলেন, দেন্ আই উইল বি অ্যাবল টু আর্ন। আর সেদিন আমি আপনাদের সকলের ঋণ শোধ করব হ্যাঁ টেক্ ইট ফ্রম মি। দিন স্যার আজ যা হয়।'

'পাগল পাগল।' শিবনাথ বিড় বিড় করে উঠল। 'ইউ গো।'

কিন্তু কে গুপ্ত নাছোড়বান্দা। আবার হাত বাড়িয়ে শিবনাথের হাত ধরতে চেষ্টা করল। শিবনাথ এক মুহূর্ত চারদিকে তাকিয়ে দেখে নেয়। কেউ কোথাও নেই। তারপর আর ইতস্তত না করে শক্ত কঠিন হাতে লোকটার হাড় বেরিয়ে পড়া শুকনো ঘাড় ধরে প্রচন্ড ধাক্কা মেরে দূরে ঠেলে সরিয়ে দিল। টাল সামলাতে না পেরে কে গুপ্ত রাস্তার ওপাশে কাঁটা-ঝোপের ওপর গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

'উঃ।'

একটা মনকাঁটা ফুটল কে গুপ্তর বাঁ হাতে। ডান হাত দিয়ে কাঁটাটা টেনে তুলে ফেলল যদিও।

'আপনি দেখছি ভয়ানক ক্রুয়েল মশাই, হার্টলেস।'

'গায়ে হাত দেওয়া কেন।'

'আমি আপনার হাত ধরেছিলাম। আমি কি আপনার হাত ধরতে পারি না।'

'না।'

'আমি আপনার নেক্সডোর নেবার।' কে গুপ্ত রীতিমত চিৎকার করে উঠল।

'তা আমি অস্বীকার করি না।' শিবনাথ গম্ভীর হয়ে উত্তর করলঃ 'তা হলেও আপনার এখন যা পজিশন এই অবস্থায় প্রতিবেশীর গায়ে হাত রেখে কথা বলা চলে না।'

'মশাই তাই বলুন। একটু বেটার পজিশনে আছেন সেই অহংকার। তা আমিও বলি আমার হরস্কোপ অলরেডি পাঠানো হয়ে গেছে। হ্যাঁ, বেবির মুখে শুনলাম কাল সুপ্রভা ওটা কাঠের বাক্স থেকে খুঁজে বার করে মিত্রদের গুরুদেব ভোলাগিরির কাছে পাঠিয়েছে। মশাই, আমারও এদিন থাকছে না। এখন উপার্জনের ক্ষেত্রে শনির দশা চলছে। কিন্তু কাটাব। ঠিক কাটিয়ে উঠে আপনাদের মতন দু'দশটা কেরানীকে দু'পকেটে ঢুকিয়ে আবার নিজের খাসকামরায় বসে আরামসে হুইস্কি টেনে সিগারেট ফুঁকে ফুঁকে মান্থলি, দু'হাজার ড্র করব। দ্যাট্ ডে উইল কাম এগেন।'

'ভাল।' মাথাটা নেড়ে শিবনাথ লম্বা পা ফেলে তাড়াতাড়ি হাঁটতে লাগল।

(ক্রমশ)

এক-এক সময় মনে হয়, অতিকায় একটা শ্লেটের মতো প'ড়ে আছে সমুদ্রটা পাহাড়ের পায়ের কাছে—নিথর, নিশ্চল। শুধু নীচের দিকে শিশু-হাতে আঁকাবাঁকা কয়েকটি শুভ্র রেখার টান পড়ছে!

সমুদ্রের ওপর হুমড়ি-খেয়ে-পড়া এই পাহাড়টার শীর্ষদেশে পূর্বদিকে মুখ করে দাঁড়ালে সমুদ্রের কোনো চাঞ্চল্যই চোখে পড়ে না, কানে ভেসে আসে না একটি ঢেউয়েরও ভেঙে পড়ার শব্দ, দিনের উদয় থেকে অস্ত পর্যন্ত এখানে বসে থাকলে আদিগন্ত একটা রঙের বিবর্তন চোখে পড়ে শুধু। আশ্চর্য সেই রঙ্! রাত-জাগা কুয়াশার অস্পষ্টতা ভেদ করে দেখা দেয় লাল-লাল আভার আভাষ, পর মুহূর্তেই সোনায় সোনায় যেন ভরে যায় চারিদিক, দিনের কর্মচাঞ্চল্য যত বাড়ে, গাঁয়ের পালতোলা নৌকাগুলো সার বেঁধে এগিয়ে গিয়ে যতই কতগুলো শুভ্র বিন্দুর সমষ্টিতে পরিণত হ'য়ে অবশেষে দৃষ্টির বাইরে বিলীন হয়ে যায়, ততই নীল হয়ে ওঠে সমুদ্রের রঙ, ফিকে নীল থেকে গাঢ় নীল, কখনো-সখনো এখানে-ওখানে তীর-থেকে-স্রোতে-টেনে-আনা বালির মিলনে কোথাও বা ঘোলাটে, কোথাও বা কেমন সবুজ-সবুজ, তারপরে সূর্য যত পশ্চিমে হেলে পড়ে, নৌকোর বিন্দু আবার যতই স্পষ্ট হ'য়ে দেখা দেয়, গাঢ় অতি গাঢ় হয়ে ওঠে সেই নীল রঙ্, ক্রমে সন্ধ্যার কালিমায় ঢেকে-যাবার আগে গোধূলি-বেলায় কয়েকটি মুহূর্তের জন্য আবার সোনা হ'য়ে যেন হঠাৎ-খুশী-হওয়ার চাঞ্চল্যে, পরক্ষণেই দুরন্ত লজ্জাব আরক্ত লালিমা, কালো রাত্রির আশ্লেষ আসন্ন।

সারাটা দিন পাহাড়ে-পাহাড়ে নেশাচ্ছন্ন একটা বন্য প্রাণীর মতই যেন কাটায় 'পাইড়তালি'। 'পাইড়তালি' শব্দটাকে 'পাহাড়তলী' বলে ভুল করার সম্ভাবনা, কিন্তু চলিত তেলেগুতে এ'নাম যার রাখা হয়, আমাদের দেশে সে 'ফেলুনা' বা 'ফেলু'। দেড়কুড়ি বয়স হতে চললেও সারা গাঁয়ের কাছে ও আজো 'ফেলুনা' বা 'পাইড়তলি' হয়ে রইল।—বুড়ো বাপ শুধু খুশী থাকলে মাঝে মাঝে 'পাড়ু' বা 'ফেলু' বলে ওকে ডাকে।

গাছপালা তেমন জন্মেনি এ পাহাড়ে, এদিকে-ওদিকে দু'একটা একক গাছ তপস্বীর মতো দাঁড়িয়ে আছে, সমস্ত পাহাড় জুড়ে শুধু লতাগুল্ম, সাদা হলদে আর বেগুনী রঙের খুব ছোট ছোট ফুল ফোটে মাঝে মাঝে,—পায়ের তলায় নির্দয় ভাবে পিযে ফেলে এক-এক-সময় উৎকট একটা আনন্দ পায় সে, পরমুহূর্তেই কিন্তু সেই দলিত ছিন্নবিচ্ছিন্ন নাম-না-জানা নিরপরাধ ফুলগুলির দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থাকে, কুলহারা লতা-মায়ের নির্বাক আর্তনাদ যেন তার একেবারে মর্মে গিয়ে আঘাত করে! বুনো শিকারীর বিচিত্র ধনুকের জ্যা-মুক্ত তীরের মতো ছিট্‌কে চলে আসে একেবারে পাহাড়ের চূড়ায়, একটা খাঁজ-কাটা গৈরিক পাথর লতার বেষ্টন থেকে আশ্চর্যভাবে নিজেকে আজো মুক্ত করে রেখেছে, সেই পাথরের ওপরে এসে ও ধপ্ করে বসে পড়ে। সামনে তাকায়, দিগন্ত থেকে চোখ ফিরে আসে পাহাড়ের নীচে। প্রথম-প্রথম উঁচু থেকে এভাবে নীচের দিকে দৃষ্টি ফেললে মাথা ঘুরে উঠ্‌ত আজকাল সয়ে গেছে, নিথর শ্লেটের নীচে যেখানে শুভ্র তরঙ্গে-তরঙ্গে পড়ছে বলিষ্ঠ রেখাপাত, সেইদিকে চেয়ে চেয়ে মনের মধ্যে আবার জেগে ওঠে একটা দুর্বোধ্য হিংস্রতা! মুহূর্তের পদস্খলন! যদি হঠাৎ সে গড়িয়ে

দেয় নিজেকে এখান থেকে? কিছুই না, অবিরাম তরঙ্গরেখায় শুধু মুহূর্তের বিঘ্ন ঘটবে। নীচে, পাহাড়ের গায়ে নিশ্চিন্ত নীড়ে শাবকদের মুখে খাবার তুলে দিতে দিতে হয়ত একমুহূর্তের জন্যই চমকে উঠবে 'সী-গাল্' পাখিরা,—হয়ত ডানা ঝটপটিয়ে একবার ঘুরে দেখে আসবে কী হ'লো কোথায়,—তারপরেই সব চুপচাপ। যথানিয়মে আবার পাহাড়ের পায়ে পায়ে ফিরবে শাদা ঢেউপরীরা, সন্ধ্যার মুখে আসবে মাছ-শিকার-করা তাদের গাঁয়ের ছোট ছোট নৌকার বিন্দু, ছাগলগুলো চরা শেষ করে গাঁয়ে ফিরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে তারই অপেক্ষা করবে কিছুক্ষণের জন্য, সাড়া না পেয়ে হয়ত শেষে নিজেরাই সারি সারি দল বেঁধে গাঁয়ে নেমে যাবে, ঘোর হয়ে আসবে সন্ধ্যা, নৌকো তীরে ভিড়তেই ঝাঁকা মাথায় ছুটে যাবে গাঁয়ের মেয়েরা, বুড়োরা জাল-কাঠি হাতে হাতজাল বুনতে বুনতে এগিয়ে এসে ঝাঁকার চারিদিকে উবু হয়ে সে দেখবে, কী কী মাছ পড়ল আজ, চার জন জেলে প্রকাণ্ড 'ছোরাচাপা' বা শার্ক' জাতীয় বিরাট মাছগুলি পরস্পরের বেঁধে ফেলা বৈঠার মাঝখানে দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে বিজয়ী সৈন্যদলের মতই নির্বাক হিমায় এগিয়ে যাবে ঘরের দিকে, আর র বুড়ো বাপ পাহাড়ের দিকে এগিয়ে সে তাকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে ডাকবে, কিন্তু কোনো উত্তর আসবে না, ছাগল-গুলো একে একে নেমে আসবে শুধু!

কিন্তু ঘটে না পদস্খলন। মুহূর্তের অন্যমনস্কতায় একটু অসাবধান হ'লেও র অভ্যস্ত পা শক্ত হ'য়ে মাটি আঁকড়ে কে, পড়তে দেয় না। লক্ষ্য করে একটা দাম খুশির হাওয়া জেগে ওঠে মনে, র এসে হাতের তেল্‌চুকচুকে পাচন-ড়িটা শিশুর মতই শূন্যে ছুঁড়ে আবার টে গিয়ে কুড়িয়ে নেয়। সমুদ্রের দিকটা ড়ে চলে আসে বিপরীত দিকে।

এখানে পাহাড়টা শেষ হয়ে নীচে মে গেছে। গাছপালা ঘেরা ছোট একটা সেখানে, বনের মধ্য থেকে সামনে ঠ গেছে আরেকটা পাহাড়, তারপরে রো পাহাড়, পাহাড়ের সারি। পায়েচলা টা খুব সরু পথ তার মধ্যে এঁকে-কে ক্রমশ বিলীন হ'য়ে গেছে। কোনো অজানা মেয়ের সিঁথির মতো পড়ে থাকা এই জনবিরল পথটি দিয়ে মাঝে মাঝে লোকালয়ে আসে পাহাড়ী মেয়েরা মাথায় জ্বালানী কাঠকুটোর ঝাঁকা বেঁধে পাহাড়ী ছেলেরা টুকিটাকি কতো-কি-জিনিস নিয়ে, বুনো হাঁস, খরগোস, টিয়া, পাহাড়ী সরু বাঁশ আঁটি বাঁধা। পত্তনের হাট থেকে ফিরে আসে বিকাল পড়তে না পড়তেই। হয়ত ছেলে আর মেয়ে হাত ধরাধরি করে গায়ে-গায়ে ঠেলাঠেলি করতে করতে উচ্চ-হাসির লহর তুলে। হয়ত ছেলেটির হাত ছাড়িয়ে পালাতে-পালাতে খসে গেছে মেয়েটির বুকের আঁচল, ছেলেটি সেই আঁচলটা খপ্ করে ধরে আকর্ষণ করতে থাকে, মেয়েটি বাহু দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় তার নিরাবরণ বুক, হাতের আড়াল দিয়ে লাজারুণ মুখ!...কিন্তু নিবীবন্ধন মুক্ত হবার আগেই ছিট্‌কে সরে আসে পাড়ু, দুর্বোধ্য একটা ক্রোধবহ্নিতে বুঝিবা অকারণ জ্বলতে থাকে সমস্ত শরীর, পাঁচনবাড়ি দিয়ে চঞ্চল ছাগশিশু-গুলিকে অনর্থক তাড়না করতে থাকে।

এক-একদিন ডানহাতটা হঠাৎ অসাড় হয়ে যায়, চেষ্টা করেও বেশ কিছুক্ষণ নাড়তে পারে না। এক-একদিন কণ্ঠও হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে আসে, কোনো স্বরই ফোটে না। ইচ্ছা থাকলেও হাতটা নাড়তে পারছে না, কথা বলতে গিয়েও বলতে পারছে না,—সে যে কী নিদারুণ নিঃসহায় অবস্থা, তা বলার নয়! সারা শরীর ঘামে ভিজে উঠছে, বুকের ভিতরটা ঢিপ্ ঢিপ্ করছে, সমস্ত মেরুদণ্ডে শির্‌শির্ করে কী যেন উঠছে নামছে—তীব্র আতঙ্কে বিহ্বল ভীরু পাখীর মতো স্তব্ধ হয়ে গেছে মন! বেশ কিছুক্ষণ পরে কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে অবরুদ্ধ আর্ত চীৎকার, ডান হাতটা আবার স্বাভাবিকভাবে নড়ে ওঠে। অবসন্ন-ভাবে বসে পড়ে গৈরিক পাথরটার ওপর! এরই জন্য গলায় তার কালো সুতো-বাঁধা বড়ো তামার মাদুলী, এরই জন্য সীমা-চলমে বছরে একবার গিয়ে মানসিক-করা মাথার চুল ফেলে দিয়ে মুণ্ডিত মস্তকে ঘরে ফেরা, এরই জন্য তার বুড়ো বাপের পত্তনে গিয়ে 'কনকলক্ষ্মী'মাকে নারিকেল উৎসর্গ করে কর্পূর আর ধূপ জ্বালিয়ে প্রতি সপ্তাহে পূজো দিয়ে আসা! কিন্তু এ অজ্ঞাত ব্যাধির উপদেবতা কী তাকে একেবারে ছেড়ে গেল? বেশ কিছুদিন ভালো থাকবার পর আবার শুরু হয়েছে উপদ্রব।

বছর কয়েক আগে সেই যে পত্তনের লোকেরা বলতে লাগ্‌লে, যুদ্ধ বেঁধেছে, সেই যে অতিকায় কলের পাখি গর্জন করতে করতে মাথার ওপর দিয়ে যখন তখন চলাফেরা করতে লাগল, সেই যে সরকারী বাবুরা বন্ধ করে দিলো তাদের সমুদ্রে গিয়ে মাছ ধরা, সেই যে আটক করল তাদের নৌকো, তাদের ছোট্ট গাঁয়ের লোকেরা পেটের দায়ে এদিক-ওদিক ছিটকে পড়ল, সরোজার মতো মেয়েও চলে গেল শহরে, সে এলো গাঁয়ের অন্য অনেকের মতই পত্তনের ডকে কাজ করতে, জাহাজ থেকে জিনিসের বোঝা ওঠানো-নামানোর কাজ। কত রকমের জিনিস! কখনো-সখনো জাহাজের খোল থেকে যুদ্ধের বোঝাও বটে। এই কাজ করতে করতেই একদিন ডকের সেই বুক-কাঁপানো বাঁশীটা আর্তকণ্ঠে চীৎকার করতে লাগল, অমনি যে-যেখানে পারল জাহাজ ছেড়ে পালাতে লাগল এদিক-ওদিক। কিন্তু হঠাৎ কোথা-থেকে কী হলো, একটা ভয়ানক শব্দ আর সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ চীৎকার! পরক্ষণেই মনে হলো, সমুদ্রটা ক্ষেপে গিয়ে যেন পত্তনটাকে একেবারে মুহূর্তে ভেঙেচুরে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, পাহাড়গুলি খসে খসে পড়ছে তার মাথার ওপরে! একথা সত্যি, হাস-পাতালে শুয়ে শুয়ে তার এক-একসময় মনে হতো, তার মাথাটাই নেই, পাহাড়ের চাপে একেবারে গুঁড়িয়ে গেছে! আর ডান হাত? প্রথমটায় ছিল অসহ্য বেদনা, পরে সেটা না থাকলেও বহুদিন হাতটা সে নাড়তে পারেনি।

যুদ্ধ-টুদ্ধ শেষ হয়ে গেল একদিন, আবার গাঁয়ের কিছু-কিছু লোক ফিরে এলো গাঁয়ে। তা বলে সরোজা যে হঠাৎ ফিরে আসবে, এ কেউ ভাবে নি। সঙ্গে গাঁয়েরই পুরানো এক ছেলে,—হাসান! তিনদিকে পাহাড়—একদিকে সমুদ্র, বিস্তীর্ণ বালুবেলার ওপরে শুকনো তালপাতার ছাউনী-ফেলা ছোট্ট তাদের গ্রাম। পাহাড় ধুয়ে মাটি নেমে এসে বালুর ওপর বিছিয়েছে মাটির আস্তরণ, সেইখানে নানারকম সব্জির ফসল বুনল

কেউ কেউ, আর সবাই অনেক খেটে ভাগের নিয়মে 'তেপ্পা' নৌকো আর জালে তৈরী করে শুরু করল মাছের ব্যবসা। হাসান যুদ্ধের সময় শহরে থেকে কাঠের মিস্ত্রীর কাজ শিখে এসেছে, ও ধরল তেপ্পাগুলোর মেরামতের কাজ। গাঁয়ে অনেকেরই আছে ছাগল, তার বাপেরও আছে, এই ছাগল চরানোর হাল্কা কাজটা নিতে হলো তাকে, তার ব্যাধিগ্রস্ত দেহ নাকি ভারি কাজের ভার আর সইতে পারবে না, ব'লে গেছে গাঁয়ের প্রধান বা কুলপেন্দার গুরুদেব—সেই জটাজুটধারী সন্ন্যাসীবাবা।

সন্ন্যাসীবাবা খুবই ভালো লোক। ক্ষুদ্র মন্দিরটার সামনে লণ্ঠনের আলোয় যখন সুর করে 'শ্রীরাম-কথালু' পড়েন, তখন চমৎকার লাগে পাইড়্তালির। 'বীজম্' বা চাল-এর দর হু হু করে বাড়ছে, মিলছেও না বীজম্, অন্যান্য জিনিসপত্রের দামও আগুন, হাহাকার পড়ে গেছে সারা গাঁয়ে,—সন্ন্যাসীবাবা বলেন, শ্রীরামে বিশ্বাস রাখো, বীজম্ না পাও, 'কর্‌রা প্যাণ্ডেলন্' (ট্যাপিওকার মূল) কিম্বা 'কন্দমূলম্' খেয়ে দিন কাটিয়ে দাও ধৈর্য ধরে, সুদিন অবশ্যই আসবে।

কুলপেন্দার নিতান্ত অনুগত হচ্ছে 'প্যাণ্টাইয়া' বা 'প্যাণ্টা'। সহজেই উৎসাহে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে, 'শ্রীরাম কথা' শুনে সবার আগে কেঁদে ভাসায়। আর ঠিক এব বিপরীত চরিত্র হচ্ছে হাসান। চুপচাপ সে সব শুনে যায় বসে বসে, কোনো মন্তব্য করে না। প্যাণ্টাইয়া গদগদকণ্ঠে হাতজোড় করে বলে ওঠে, প্রভু, সুদিন যে আসছে, এ আমরা বুঝব কী করে?

হাসান হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় এ-সময়, নীরবেই সভা ত্যাগ করে চলে যায়। মেয়েদের দিকে ভালো করে সেই সময় তাকালে দেখা যেতো, সরোজাও নিঃশব্দে চলেছে তার পিছনে পিছনে মন্ত্রমুগ্ধ কোনো আচ্ছন্ন জীবের মতো। সন্ন্যাসী একটু হেসে ততক্ষণে বলতে শুরু করেছেন, আমাকে বলতে হবে না কিছু, তোমরা তা নিজেরাই বুঝবে। কে যেন বলে ওঠে,—আর যে সহ্য হয় না প্রভু!

অন্য একজন বলে,—গাঁয়ে যারা ফিরে এসেছিল, আবার তারা চলে যাচ্ছে, গাঁ যে শ্মশান হয়ে যাচ্ছে, বাবা!

'বাবা' বললেন, কেন, তোমাদের মাছধরা?

লোকটী বলল, কয়জনের জাল আছে? কয়জনের আছে তেপ্পা! তা-ও বেশীর ভাগই মহাজনের কাছে বাঁধা। সারাদিন খেটে মাছ ধরে নিয়ে আসি, অমনি মহাজনের লোক এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, সুদ-হিসাব করে নিয়ে যায় ঝাঁকা থেকে প্রায় সব, বাকী যা থাকে তা দেবতার সেবার জন্য আলাদা করে রেখে কী-ই বা থাকে আমাদের জন্য?

ধমকে ওঠে প্যাণ্টা, এই, চুপ দেবতার কাছে ব'সে এ কী কথা? দেবতার সেবার জন্য মাছ?

—মাছ না হয়, মাছ বিক্রীর টাকাটা ত?

—চুপ চুপ!

সন্ন্যাসী হেসে দুটি হাত প্রসারিত করে ইঙ্গিতে বলেন সবাইকে নীরব হতে। বলেন,—আজ তোমাদের একটা খবর দেবো। পত্তনের আশেপাশের 'জালারী' বা জেলে-গাঁও থেকে যারা মাছ ধরতে গিয়েছিল আজ, তাদের মধ্যে অনেকেই অদ্ভুত এক ব্যাপার দেখে এসেছে,—কানাকানি পড়ে গেছে আজ সারা পত্তনে। কিন্তু এসব কথা আমার মুখে নয়, তোমাদের কুলপেন্দার মুখেই শোনা। এসব নিজের কানে শুনে এসেছে।

কুলপেন্দার বয়স অনেক হ'লেও দেহের বাঁধুনি ঈর্ষা করবার মতো। সন্ন্যাসী-বাবার পাশে এসে বসে বক্তৃতার ভঙ্গীতে সে যা বলতে লাগল, রুদ্ধ-নিঃশ্বাসে শুনতে লাগল সমাগত জনমণ্ডলী, বিশেষত প্যাণ্টার দুটি বিস্ফারিত চোখে যেন আর পলক পড়তে চায় না! এ কী সত্যি? অবিশ্বাসের কথা ভাবতেও হৃদকম্প হয়! বংশপরম্পরায় এ খবর তারা ছোট বেলা থেকেই শুনে আসছে! সূর্যের মতো, চন্দ্রের মতো, গ্রহতারার মতো এ সংবাদ অবিসম্বাদীরূপে সত্য এই মৎস্যজীবীদের কাছে! শুনতে শুনতে হাসি ফুটে ওঠে এই অভাবগ্রস্ত, অবহেলিত, বঞ্চিত লোকগুলির মুখে, জ্বলে ওঠে আশার আলো, মুহূর্তের জন্য মনে হয়, নিরাবরণ শিশুগুলিকে দিতে পারবে একটুকরো করে কাপড়, মুখে দিতে পারবে দু' বেলা বীজম্, মেয়েদের দিতে পারবে একখানা করে বাড়তি শাড়ি!

তাঁরা দেখা দেন কখন? যখন ফুলে-ফলে ভরে উঠবে দেশ, শস্যে শস্যে সারা-দেশ হয়ে উঠবে শ্যামলা, থাকবে না অভাব, আসবে না মারী, জাগবে না দুরন্ত ঝড় সমুদ্রদেবতার বুকে! স্রোতে ভেসে যাবে না তাদের 'তেপ্পানৌকো', জাল পাতলেই অজস্র রুপোর মতো ধরা পড়বে রুপোলী মাছ!......তীব্র উত্তেজনা আর কোলাহলের মধ্যে সভা ভেঙে যায়। সবারই প্রশ্ন, —কে দেখেছে! পত্তনের কোন্ ধারের জেলে পল্লীর লোক? রুপোর ছটায় তাদের চোখ কী অন্ধ হ'য়ে যায় নি? কেমন দেখতে তাঁদের? কীরূপে কী ভঙ্গীতে দেখা দিয়েছেন তাঁরা? জলের ওপর ভাসতে ভাসতে মাথা তুলেছিলেন, না, তীরে ব'সে নিচ্ছিলেন বিশ্রাম? কুলপেন্দাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে অজস্র লোকের অজস্র প্রশ্ন? মেয়েদের মধ্যেও ছড়িয়ে পড়ল কথাটা। ঘরের কাজ ফেলে তারাও ছুটে আসতে লাগল দলে দলে।

—কুলপেন্দা বলে,—রেশমের মতো কোঁকড়ানো কালো চুল কোমর ছাপিয়ে নেমে এসেছে, যারা দেখেছে তারা বলেছে —জলে সাঁতার দিতে দিতে মুখ তুললেন কতোবার! কী রূপ সেই কন্যাদের! যেন ঠিকরে পড়ছে! কোমরের নীচটা সোনালী আঁশ ঢাকা,—যেন হাজার হাজার সোনার মোহর গেঁথে লজ্জা নিবারণ ক'রে রয়েছেন!

সারা গাঁয়ে ফিসফিস আর কানাকানি। প্যাণ্টার ব্যস্ততাই সব থেকে বেশী। তবে সবই নিম্নকণ্ঠে। কন্যারা যখন দেখা দিয়েছেন, তখন নিশ্চয়ই এসেছেন কাছে কাছে —তারা যদি শুনতে পান? শুনে চটেও ত যেতে পারেন! তাই এ সব কথা জোরে বলা ঠিক না।

তার সেই গৈরিক পাথরটিতে বসে পাড়ুও ভাবছিল এ সব কথা। নীচের দিকে বারেবারে তাকাচ্ছিল, সেই রেশমের মতো এক কোমর কোঁকড়ানো কালো কেশের রাশি ত একবারও চোখে পড়ে না! পড়লে হাতজোড় করে ভিক্ষা চাইত, নিম্নদেশের পরিচ্ছদ থেকে ছিঁড়ে একটি মোহরও তাঁদের কেউ যদি তার দিকে ছুঁড়ে দিতো ত বড়ো কোনো ডাক্তারকে সে দেখাতো গিয়ে,—কেন এমন হয় তার মাঝে মাঝে? কথা বলতে বলতে হঠাৎ-ই

বলতে-না-পারা, হাত নাড়তে নাড়তে হঠাৎ না-নাড়তে-পারা?

সন্ধ্যা হয়ে আসতেই চমক ভাঙে, অবাধ্য ছাগ শিশুদের তাড়না ক'রে দলের সংগে মিলিয়ে দেয়, তারপরে নামতে থাকে ওদের পিছনে পিছনে, হাতে খালি খাবারের বাটিটা। ওর বুড়ো বাপ ততক্ষণে গাঁ পেরিয়ে পাহাড়ের দিকে এসে 'ডাক' দিতে থাকে,—পাড়ু-পাড়ু ... পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরতে থাকে নাম-শেষের স্বর বর্ণটা, উ-উ-উ!... মুখের কাছে হাত নিয়ে পাড়ুও সাড়া দেয়,—'নয়না!'......শোনা যায়, আ-আ-আ-!

গাঁয়ের ঘরে ঘরে উনুন জ্বালা ধোঁয়া পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছে, নামতে নামতে দেখতে পায় পাড়ু,—বালুবেলায় 'তেপ্পা'-গুলি উঠিয়ে রেখে জেলেরা চলে গেছে, মেয়েরা কেউ কেউ ঝাঁকা নামিয়ে পাইকার-দের সংগে তখনো দরদস্তুর করতে ব্যস্ত। গাঁয়ার আবছা আড়াল থেকে মেয়েদের গাঢ় লাল বা নীল শাড়িগুলো অতি অদ্ভুত-ই দেখায়! ওদের মধ্যে হয়ত সরোজাও আছে, দূর থেকে অবশ্য চেনা যায় না,—হতেও পারে, না-ও হ'তে পারে! মাছ-আসামাত্র কে একদিন ঝাঁকা নিয়ে গিয়ে নৌকোর কাছে উপস্থিত হয়, কিন্তু কে আনবে ওর জন্য মাছ? পরের মাছেই ভাগ বসায়। জগলুর বউ, কিম্বা গুরুলুর বউ, ওদের কাছে থেকে চেয়েচিন্তে ধার নেয়,—নিয়ে নিজে গিয়ে বিক্রী করে আসে 'ডলফিল নাক' পাহাড়টা পেরিয়ে নীচে নেমে খাড়ির ধারের পাইকারদের কাছে, ফিরতে ফিরতে ওর রাত হয়ে যায়! বিক্রীর পয়সা অবশ্য গুরুলুর কি জগলুর বউ ছাড়ে না, লাভের পয়সাটুকুই ওর সম্বল। কিন্তু তাতেই বা হয় কতো? অথচ, শাড়ির বাহার ত কম নয়! গাঁয়ের একেবারে প্রান্তে পাহাড়টা ঘেঁষে ঝুপড়ি বেঁধে ও থাকে,—ঝকঝকে করে দাওয়া নিকোয়, দোরের আলপনা আঁকে, মুরগীও পুষেছে গোটা কয়েক।

হাসানের সংগে ওর যে ঠিক কী সম্পর্ক,—তা' নানাভাবে ওদের লক্ষ্য করেও গাঁয়ের কেউ কোনো সিদ্ধান্তে এসে পৌছতে পারেনি। এখানে বলা কর্তব্য যে 'হাসান' হলেও ছেলেটা সবার মতই হিন্দু। ছোট থেকেই মহরমের দলে বাঘ সেজে নাচত বলে কী করে যে ওর ডাক-নাম হয়ে গেল 'হাসান', সে এক ইতিহাস। মহরমের সময়ে 'পিউড়ী'গুলো সারা গাটা হলদে করে নিতো, তারপরে ভূষো-কালি দিয়ে বাঘের গায়ের মতো কালো-কালো চাকাচাকা দাগ আঁকত,—কোমরের হলদে জাঙিয়াটা গায়ের রঙের সংগে একেবারে মিশে থাকত, কোমর থেকে ঝুলতো মানানসই খড়ের লেজ,—মুখখানা বিচিত্র রঙে বাঘের মুখের মতো আঁকা,--মহরমের ঢোলে কাঠি পড়ত, কড়্-কড়্-কড়্-কড়াং-কড়্-কড়্-কড়্-কড়াং! আর সে হাত দুটো থাবার ভঙ্গীতে দুলিয়ে-দুলিয়ে বাঘের শিকার-ধরার ভঙ্গীতে তালে তালে নাচত!......মহরমের সময়ে বহু হিন্দু 'জালারী' ছেলে ভিন্ন পাড়া থেকে বেরিয়ে এসে তাজিয়ার মিছিলের মধ্যে মিশে বাঘ সেজে নাচে, অন্ধ্রদেশে এ ঘটনায় কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। আবার হিন্দুদের পরবেও মুসলমান-ছেলেরা অনুরূপভাবে বাঘ সেজে নাচে,—কোনো দ্বিধা নেই।

গাঁয়ে ফিরে এসে হাসান তেপ্পা-মেরামত করে। কাজ-পাগলা ছেলে, লোকের সংগে কথা বলে কম, সারা দিনমান বালু-বেলায় হয় তেপ্পার 'কাঁঠা' তৈরী করছে, —নয় ত সারা গাঁ থেকে চাঁদা ওঠানো-পয়সায় তৈরী করা ভাগের বড়ো-নৌকোটাকে বালির ওপর উঠিয়ে নৌকোর খাঁজে খাঁজে দড়ি দিয়ে পাকানো খড় গুঁজে দিচ্ছে, কখনো বা নৌকোর নীচে বালির ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে-শুয়ে হাতুড়ি দিয়ে পেরেক ঠুকছে।

ওর এক বুড়ী মাসী ওর ঘর-সংসার দেখা-শুনা করে,—সে-ই আসে দুপুরে-বেলায় মাথায় ওর জন্য খাবারের বাটি বসিয়ে, কাছে ব'সে ওকে খাওয়ায়, কোন-দিন-বা আপন মনে গজগজ করে বুড়ী, বিয়েসাদি করবি না! কতকাল আর হাঁড়ি ঠেলবে আমি!

হাসান কিছু বলে না। কিন্তু পরদিন বুড়ী খাবার নিয়ে এসে বিস্ময়ে অবাক হ'য়ে যায়। আরেকটা বাটি থেকে গম্ভীর মুখে পা-ছড়িয়ে ব'সে খাবার খাচ্ছে হাসান, আর অদূরে চুপচাপ ব'সে আছে সরোজা!......বুড়ী ক্ষোভে-দুঃখে-রাগে চেঁচিয়ে উঠ্‌তে গিয়েও অতি কষ্টে নিজেকে সামলে নেয়, বড়ো ভয় করে বুড়ী ঐ হাসান ছেলেটাকে। রেগে মেগে যদি তাকে ঘর থেকেই দেয় বার করে? সে যাবে কোথায়? খাবে কী? দু'দুটি ছেলে তার যুদ্ধে গিয়ে ফিরে আসেনি,—কে আছে আর তার এই হাসান ছাড়া? কিন্তু তা' ব'লে ওই নষ্ট বজ্জাত একঘরে মেয়েটার হাতে খাবে শেষকালে হাসান, এই বা সহ্য হয় কী ক'রে? শুধু কি খাবার খাওয়া? আর কিছু নয়? বুড়ী কি জানে না কিছু? অথচ বলারও কিছু নেই,—ছেলেটাকে নানা কারণে ভয় করে সবাই, শুধু রাশভারী ব'লে নয়, শুধু দস্যি চেহারার জোয়ান ছেলে ব'লে নয়, —ও' না এলে এ গাঁয়ের মাছের ব্যবসা উঠে যেতো, নৌকো-মেরামতি করতো কে ওর মতো? তা'ছাড়া, শহর-ঘোরা ছেলে, ও' জানে-শোনে কতো? বাবুরা এলে তাদের সংগে ও-ই হাত-পা নেড়ে কথা বলে,—কুলপেদ্দা নিজে পর্যন্ত ওকে ঘাঁটাতে সাহস করে না। কেন, মনে নেই সেই পঞ্চায়েতীর কথা?

সরোজার গাঁয়ে ফিরে-আসার খবর শুনে সব থেকে খুশী হ'য়েছিল আমাদের 'পাইড়তালি' বা 'পাড়ু'। সঙ্গত কারণও ছিল সে খুশির। পাকাদেখা-পাঁতিপত্রের মতো এদেরও একটা ব্যাপার আছে। ছোট-বেলায় সম্বন্ধ ক'রে ছেলে ও মেয়ের বিয়ের মত একটা অনুষ্ঠান হয়, ঠিক বিয়ে নয়, বিয়ের অংগীকার। বড়ো হ'লে এই অংগীকার হয় কার্যে পরিণত, তখন বৃহত্তর অনুষ্ঠান দিয়ে বিবাহকে সামাজিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়।......সরোজার সংগে পাইড়তালির শৈশবে এই সম্বন্ধই হ'য়েছিল,—কিন্তু "পেল্‌লী" অর্থাৎ 'পাকাপাকি বিয়ে' হবার আগেই যুদ্ধের কালোছায়া পড়ে গ্রামের আকাশে,—সরোজার মা সরোজাকে নিয়ে আসে ওদের ঘরে, কিন্তু ওরাই তখন খেতে পায় না, অপর একটি প্রাণীকে খেতে দেবে কী? পাড়ু নিজে যায় পত্তনে কুলি খাট্‌তে, মায়ের হাত ধ'রে সরোজাও যায় শহরের জনারণ্যে হারিয়ে। সেই মা আর ফেরেনি, ফির্‌ল শুধু সরোজা। কিন্তু কেন?

'ডলফিল নাক'-পাহাড়টায় তখন ছাগল চরাতো পাড়ু। মাছের ঝাঁকা মাথায় নিয়ে নীল শাড়িটা প'রে ও' যখন

বুড়ো অশথ্-গাছটার ছায়া দিয়ে পশ্চিমের দিকে নেমে যাচ্ছিল, নিস্তব্ধ নির্জন পায়ে-চলা-সরু লাল পথটির ওপর মৃদু মৃদু বাজছিল ওর পায়ের মল দুটি, —ঝম্ঝম্—ঝম্ঝম্। পাড়ু ছুটে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল ওর সামনে। 'শ্রীরামের' কৃপায় 'অসুখ' হয়নি সে সময়, কণ্ঠও রুদ্ধ হয়নি, হাতটাও আড়ষ্ট হয়ে যায়নি, —ওর হাত দু' হাতে টেনে নিয়ে কতো-কী কথা বলেছিল, অশথ্গাছের ছায়ায় মুখোমুখি ব'সে সরোজাও ব'লেছিল বিহ্বলকণ্ঠে,—আমি ত তোর বউ, আমাকে ঘরে নে। তোর ঘরে থাকব ব'লেই ত গাঁয়ে এসেছি!

—সত্যি!

তার বুকে মুখ লুকিয়ে কেঁদে ফেলেছিল সরোজা, ব'লেছিল,—শীগ্গির বাপ্কে বল্, তোদের বাপ-বেটার ঘরে আমাকে বাতি জ্বালবার হুকুম দে। কিনে দে মোটা শাড়ি,—তোর দেওয়া শাড়ি পরে আমি এ' বাহারে শাড়ি ছুঁড়ে ফেলে দেবো!

—কে দিলো তোকে, এ' শাড়ি?

শক্ত হ'য়ে যায় যেন সরোজার সর্ব শরীর, বলে,—সেই বাঘটা।

—বাঘ!

—হাসান।

একটুক্ষণ চুপ থেকে পাড়ু ব'লেছিল —তবে গাঁয়ে যে কথা উঠেছে, সে সব সত্যি! বিয়ে ক'রেছিস্ হাসানকে?

—ছিঃ—ছিঃ!

পাড়ু বলে,—এসেই জগলুদের বাড়ি

ঠ্‌লি, হাসানের ঘরে উঠিস নি, সেটা বাই জানে। কিন্তু শাড়ি-টাড়ি......

ওর মুখে তাড়াতাড়ি হাত চাপা দয়েছিল সরোজা,—তোর মুখ দিয়ে যেন সব খারাপ কথা না বেরোয়,—হাসান দেবতা।

হেসে উঠ্‌ল পাড়ু, বলল,—এই ল্‌লি বাঘ, এখন বল্‌ছিস্‌ দেবতা!

—বনের বাঘকে পাহাড়ীরা 'দেবতা' লে, তা' জানিস? ও' আমার কাছে াঘও বটে, দেবতাও বটে।

ব'লেই ফিক্‌ ক'রে হেসে ফেলে মেয়েটা, বলে,—নারে তুই যা ভাবছিস্‌ তা নয়, ও আমাকে ছোঁয় না। শুধু ওঁৎ পেতে বাঘের মতো আড়ালে ব'সে আমার ওপর নজর রাখে। এই নজর থেকে তুই আমাকে বাঁচা। কেনই বা তা' করবি না, তুই না আমার বর?

কিন্তু বিয়ের কথায় উঠ্‌ল নানান্‌ গোল। বস্‌ল পঞ্চায়েৎ। সে পঞ্চায়েতীর কথা আজও ভোলেনি পাইড়তালি। একটা ভোজের প্রতিশ্রুতিতে মিটেই যাচ্ছিল সব, পঞ্চায়েৎ সরোজাকে একবাক্যে পাড়ুর বউ বলে রায়ও যাচ্ছিল দিতে,—ঠিক এমনি সময়ে ভিড়ের মধ্য থেকে উঠে দাঁড়ালো হাসান, বলল,—একটু দাঁড়ান, আমার একটা কথা বলার আছে। বাঘের মতোই ওকে দেখাচ্ছিল বটে সেই রাত্রে জ্বলন্ত মশালের আলোয়,—পাড়ুর বুড়ো বাপকে উদ্দেশ ক'রে ব'লে উঠ্‌ল,—যাকে বউ ক'রে ঘরে নিয়ে যাচ্ছ,—তার পুরানো কথাটা জেনে তারপরে তাকে বউ করো। কেননা, নেবার পরে কানাকানি শুনে যে ওকে হেনস্তা করবে, সে আমি সইব না!

পুরানো কথা?

—হ্যাঁ, পুরানো কথা একটা আছে। যুদ্ধের সময় পেটের দায়ে পত্তনে গিয়ে আমি ছুতোরের কাজ শিখ্‌তুম, তোমরা তা জানো। কাজ করি, হাতে বেশ পয়সাও আস্‌ছে,—আমি বাজে লোকের সঙ্গে মিশে ব'য়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এ মেয়েটাও যে ব'য়ে গিয়েছিল জানতাম না। এক-একটা রঙ্‌ মেখে যে-সব গলিতে মেয়েরা দাঁড়াতো, তারই এক গলিতে,—আমি এক রাত্রে অমনি একটি মেয়ের ঘরে ঢুকে দেখি,—ও',—ঐ সরোজা।

নিদারুণ একটা উত্তেজনা জাগল সভার মধ্যে,—কুলপেন্দা চেঁচিয়ে উঠ্‌ল,—এই আস্তে আস্তে, সবাই চুপ করো।

—আমি অনেক কষ্টে যাদের বাসা, তাদের টাকা-পয়সা খাইয়ে ওকে বার ক'রে ফিরিয়ে নিয়ে এসেছি গাঁয়ে। কেন জানো, ও গাঁয়ের নাম ডোবাচ্ছিল ব'লে! আমি ওকে প্রথমটায় চিনতে পারিনি। যখন জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার নাম কী? বলল,—সরোজা। চম্‌কে উঠ্‌লাম, জিজ্ঞাসা করলাম,—তোমার গাঁ? অম্লানবদনে ব'লে বস্‌ল,—এড়েডা। ও'পথে পা দিয়ে যে নাম-ধাম ভাড়াতে হয়, সেটা শিখ্‌তে পারেনি দেখে বুঝ্‌লুম, পিছুলে সবে এসেছে। একই গাঁয়ের ছেলে-মেয়ে আমরা, মনটা কেমন ক'রে উঠ্‌ল! পেটের জন্যই ত আমার কারখানায় হাতুড়ী পেটা, আর ওর রং মেখে দরজায় দাঁড়ানো!...... সব ছেড়ে ছুড়ে দুজনে শেষ পর্যন্ত চ'লে এলাম গাঁয়ে। ভাবলাম, আসাই দরকার!

শুরু হ'লো পঞ্চায়েতী কোলাহল। তারা ওকে সমাজে স্থান দিলো না, এমন কি গাঁয়েও না। উঠে দাঁড়ালো হাসান, বলল,—বেশ। তাই হবে। গাঁয়ের বাইরেই থাকবে ও'। মেয়েদের মধ্যে এক ধারে নতমুখী ব'সেছিল সরোজা, তার কাছে গিয়ে গম্ভীর কণ্ঠে ডাকল,—ওই, উঠে আয়।

মেয়েটি উঠে গেল ওর পিছনে-পিছনে। এবং আশ্চর্য কাণ্ড, এমন কাণ্ড সারা গাঁয়ের ইতিহাসে কেউ কখনো শোনেনি। গ্রাম ছেড়ে প্রায় পাহাড়ের কাছ ঘেঁষে একটা ফাঁকা জায়গা দেখে রাতারাতি ঘর তুল্‌তে বস্‌ল হাসান আর সরোজা। বড়ো-বড়ো চার পাঁচটা মশাল জ্বালিয়ে আনল তার ঘর থেকে হাসান, পুঁতে দিলো মাটিতে। অত রাত্রে তালগাছে উঠে কেটে আনল তালপাতা,—মাটি কাট্‌ল কোদাল দিয়ে। সকালেও চল্‌ছে ওদের কাজ, কুলপেন্দা এসে অবাক হ'য়ে বলল, —করছিস্‌ কী হাসান?

—ঘর দিচ্ছি তুলে। ভয় নেই,—ও তোমার গাঁয়ের সীমার বাইরে।

ইজারাদার খাজনা চাইতে আসবে না?

—সে বুঝব আমি। এ' আলাদা হিসাব, তোমার খাতায় উঠকো না।

এ' নিয়ে অবশ্য আর বিশেষ-কিছু হ'লো না, হাসানের ভয়েই সম্ভবত আর-কেউ উচ্চবাচ্য করল না। পাকা ইঁদারা থেকে খাবার জল নিতে গেলে মেয়েরা সোরগোল তুলেছিল প্রথম-প্রথম,—কিন্তু তা-ও হাসানের শাসানিতে নীরবতায় ডুবে গেল। ইঁদারাটা সরকার থেকে ক'রে দেওয়া,—সবারই অধিকার আছে ওর ওপরে, কেউ বাধা দিতে এলে থানা-পুলিস পর্যন্ত করবে হাসান।

আস্তে আস্তে নিভে এলো উত্তেজনার বহ্নি। অর্থনৈতিক সমস্যাটাই যেখানে প্রধান, সেখানে এ' ঢেউ কলরব করতে পারে কয়দিন? ব্যাপারটা ক্রমে সহজ হ'য়ে এলো গাঁয়ের লোকেদের কাছে। সরোজা যে গাঁয়ের বাইরে থাকে, বাইরের মেয়ে,—একথা কারুর মনেই রইল না,—যেন গাঁয়েরই সীমানা বেড়ে ওর তাল-পাতার খুপরীর আঙিনা পর্যন্ত চ'লে এলো। জগ্‌লুর বউ, গুরুলুর বউ,—ওদের কাছ থেকে মাছের বন্দোবস্ত নিয়ে রীতিমত জাতব্যবসাই শুরু করল জেলের মেয়ে।

কিন্তু গুরুতর পরিবর্তন ঘট্‌ল পাড়ুর মনে। সরোজা 'ডলফিল নাক' দিয়ে পত্তনে যায় ব'লে, ও' পাহাড় ছেড়ে দিয়ে গাঁয়ের এদিককার নির্জন পাহাড়টায় ছাগল চরাতে এলো পাড়ু। এসে পাহাড়ের অভিনব পারিপার্শ্বিকে নিজেকে যেন হারিয়ে ফেল্‌ল,—শিশুর মতো, বুনোর মতো কয়েকটি বন্য দিন কাট্‌ল একটা নতুন স্বাদে মগ্ন হ'য়ে। কিন্তু কয়দিন? হঠাৎ দেখা দিল সেই পুরানো অসুখটা।

ডলফিল নাকে যেদিন দেখা হয়,—ঝাঁকা মাথায় তেমনি মল ঝম্‌ঝম্‌ করতে করতে নীলশাড়ি প'রে যাচ্ছিল, পাড়ু পথে গিয়ে দাঁড়াতে কী গর্বভরেই না কথাগুলো বলেছিল মেয়েটা! ব'লেছিল, —পঞ্চায়েতের ভয়ে নিজের বউকে ঘরে তুলতে পারে না, খু-ব মরদ!

—পঞ্চায়েতের ভয় আমি করি না!

—তবে?

গম্ভীর কণ্ঠে পাড়ু ব'লেছিল,—তুই আছিস্‌ হাসানকে নিয়ে?

দুটি চোখ যেন মুহূর্তে ধ্বক্‌ ক'রে জ্বলে উঠ্‌ল সরোজার, বলল,—যদি থেকেই থাকি, তোর কী?

—এ গাঁয়ে সবার চোখের ওপর ওসব চল্‌বে না!

—ঈস্, আবার চোখ রাঙানো হ'চ্ছে! বুকের পাটা থাকে বলিস্ এ কথা হাসানকে! ব'লে দুম্‌দাম্ পা ফেলিয়ে গর্বভরেই এগিয়ে গিয়েছিল মেয়েটা!

এপাহাড়ে কয়দিন বেশ কেটেছিল,—কিন্তু বুকের ভিতরটা কীসের বেদনায় আবার গুমরে-গুমরে ওঠে! পাহাড়ী ছেলেমেয়েরা হাত-ধরাধরি ক'রে বনের পথ ধ'রে চলে যায়,—আর ওর বুকের মধ্যে যেন বাজ্‌তে থাকে মল্-পরা দু'টি চরণ-মঞ্জীর,—ঝম্‌ঝম্—ঝম্‌ঝম্! ......ঘর করতে ইচ্ছা যায় পাড়ুর,—কিন্তু কে তাকে মেয়ে দেবে? একে গরীব, তায় সারা গাঁয়ে রটনা হ'য়ে আছে তার এই বিচিত্র ব্যাধির কথা! দুর্বোধ ব্যাধির ভয় উপদেবতার ভয় হ'য়ে গাঁয়ের লোকগুলির চেতনাকে আচ্ছন্ন ক'রে থাকে,—এর মধ্যে তার মনের কথা বোঝবার লোক কোথায়? সরোজা ওদিকে একান্তে জিজ্ঞাসা করে হাসানকে,—পাঁক থেকে নিয়ে এলি, ঘর বেঁধে দিলি, এবার কী বিয়ে করবি?

হাসানের চোখে যেন মুহূর্তের জন্য ফুটে ওঠে বাঘের মতোই কোনো বন্য-পশুর লালসা-দীপ্তি, কিন্তু মিলিয়ে যায় পরক্ষণেই। যেমন নিষ্প্রাণ কণ্ঠে সে ওর সঙ্গে আলাপ করে, তেমনি কণ্ঠেই বলল, —বিয়ের অভাব কী? এ গাঁয়ের অনেকেই আমাকে মেয়ে দিতে রাজী।

হেসে ফেলে সরোজা বলে,—সে খবর কী জানি না? কুলপেন্দার মেয়ের সঙ্গে তোর সম্বন্ধ হ'চ্ছে, সে দেখতে আমার চেয়ে......

থাক্,—বাধা দিয়ে হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় হাসান, তারপরে দ্রুত চ'লে যায় ওর ঘরের আঙিনা ছেড়ে।

এক-একদিন মাছ এনে দেয়, চাল এনে দেয়, সব্জি এনে দেয়, মসলাপাতি এনে দেয়, বলে,—আমায় রেঁধে খাইয়ে আসবি দুপুরে।

আসে। কোন কোনদিন ভালো শাড়ি কিনে এনে দিয়ে বলে,—প'রে আয়।...... শাড়ি কেন, ছোট-খাট গয়নাও। কিন্তু ওর কথামতো সেজেগুজে বাইরে এসে দেখে,—সে নেই, কখন চ'লে গেছে!...... লোকটাকে কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারে না সরোজা। তার 'প্রথম বিয়ের বর' যদি তাকে না নেয়, ত, ও-ই তাকে বিয়ে করুক না কেন? কথাটা মনে হ'তেই শিউরে ওঠে, না—না, তা কী হয়? গাঁয়ে এসেছে যখন, তখন আর কিছু চলে না। অমঙ্গল হবে না গাঁয়ের?......কিন্তু গলায় একরাশ তাবিজ-বাঁধা লোকটাই বা তাকে অতো ঘৃণা করবে কেন? কী দোষ সে করেছে? মা ত প্রথমে তাকে কুপথে ঠেলেনি, প্রথমে ত ওদেরই ঘরে তাকে দিতে এসেছিল মা। শহরে না খেতে পেয়ে মরতে ব'সেছিল ব'লেই ত......। ভাবতে ভাবতে হঠাৎ-ই আরেকটা কথা মনে প'ড়ে যায়। তার সেই পাপের জন্যই কী হাসান অমন মুখ ফিরিয়ে থাকে? তা-ই হবে। এ কথাটা এতদিন তার মনে হয়নি কেন? সঙ্গে-সঙ্গেই একটা অব্যক্ত ক্রোধের জ্বালায় জ্বলে ওঠে সর্বশরীর! তার জন্যও দায়ী ঐ ছাগল-চরানো লোকটা! ও যদি বাপের সঙ্গে ঝগ্‌ড়া ক'রেও ওকে ঘরে যায়গা দিতো ত, কিছুতেই যেতো না সে শহরে। পাপ তাকে ছুঁতেও পারত না! কিন্তু এখনই বা তাকে নেয় না কেন? ও কী চায় ওর পায়ে সে মাথা কুটে মরুক! তা-ই যাবে সে! যাবে ওর ঐ পাহাড়টার চূড়ায়!

সত্যি সত্যিই একদিন চলে আসে সরোজা, সেই গৈরিক পাথরটার ওপর বসে থাকে। আর তাকে হঠাৎ ওখানে ওভাবে আবিষ্কার করে নিদারুণ বিস্ময়ে চমকে ওঠে পাড়ু। বলে, তুই এখানে কেন? কী হতে কী হয়ে যায়, পায়ে মাথা কুটে কাঁদতে এসে ওর কথা শুনে দপ করে জ্বলে ওঠে দর্পিতা মেয়েটি, উঠে দাঁড়ায়, শক্ত হয়ে বলে,—এটা তোর কেনা যায়গা নাকি? বেশ করব আসব!

পাড়ুরও উত্তেজনার সীমা থাকে না, বলে,—এটা আমার নয় বটে, তাবলে তোর হাসান-মহারাজেরও কেনা যায়গা নয়!

—দেখ্, হাসান-হাসান করিস্ না বলছি! তার পায়ের নখেরও যোগ্য তুই ন'স্।

—কী বললি! বড্ড বাড় বেড়েছে তোর নয়!

—বাড় তোরও কম বাড়েনি! হাসানকে দিয়ে তোর মুখ জুতিয়ে না ছিঁড়লে তুই সায়েস্তা হবি না।

বলেই তরতর করে নেমে যায় সরোজা। আর এদিকে নিষ্ফল ক্রোধে জ্বলতে থাকে পাইড়তালি, দুটো একটা পাথর কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়তে থাকে প্রাণপণ, কিন্তু কাঁপা-হাতের পাথর একটাও যায় না মেয়েটার ধার দিয়ে!

বেলা যেমন ক্রমশ বিষন্ন, ম্লান হয়ে আসে, ক্রোধবহ্নিও নিস্তেজ হয়ে নিভে আসে। তখন পাহাড়ে সেই গৈরিক পাথরের ওপরে বসে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে পাড়ু, ভাবে, কী হতে কী হলো! ওকে দেখে ভাবলাম, ওকে কাছে ডেকে নেবো, বলব, হাসানকে ছেড়ে আমার কাছে আয়, পঞ্চায়েৎ না মানলে আমরা ভিনগাঁয়ে চলে যাব, আমি তোর বর,—একথা তুই ভুলিস না!

বাড়ী এসে সরোজাও ভাবে ঠিক তেমনি করে। আমি রাগ করলাম কেন? আমি যদি ওর পায়ে কেঁদে পড়ি, ওর সাধ্য কি আমাকে ছেড়ে থাকবে! গাঁ তাড়িয়ে দেয়, ওর হাত ধরে না হয় চলে যাবে আবার পত্তনের দিকে, দিনমজুরী করে দিন কাটাবে, আর বড়ো হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ওর চিকিৎসা করাবে! সবাই বলে, ওর দেহে নাকি কী রোগ আছে! দিন-দিন চেহারা হয়ে যাচ্ছে না কী-রকম কী-রকম? যখন ভোরে ঐ অদূরের পথটি ধরে পাহাড়ে যায়, তখন লুকিয়ে লুকিয়ে দেখে না সে কোনদিন? কিন্তু ভোর বেলা ওর কাছে গিয়ে কথা বলতে ভয় হয়, যদি কেউ দেখে ফেলে? হয়ত গরীব বাপ-ব্যাটার ওপর নির্যাতন করবে পঞ্চায়েৎ। সব থেকে বড়ো কথা, হাসান যদি দেখে ফেলে? দুর্দান্ত লোক, খেপে গেলে কী-ই না করতে পারে সে! হাসানকে ভয় করে বইকি!

একদিন হাসানকে হেসে-হেসে বলে, তুই আমাকে শাড়ী-টাড়ী দিস কেন? সেই ক্ষণিকের জন্য চোখ তুলে বন্য লালসায় ওকে লেহন করা! তারপরেই স্তব্ধতা। একটু পরে বলে, গাঁয়ের অবস্থা দেখছিস? খেতে পাচ্ছে না লোকে!

—আর তুই আমাকে শাড়ী দিচ্ছিস 'গাজু' (হাতের চুড়ি) দিচ্ছিস।

আবার জ্বলে ওঠে দুটি চোখ, বলে, তোকে না গাঁ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল পঞ্চায়েৎ বসিয়ে? তোকেত তাড়ায়নি,

আমাকেই চাবুক কষিয়েছিল! কী চাই জানিস? গাঁয়ের সবাই তোর কাছে এসে হাত পাতবে! গাঁয়ের সবাই 'মূল' খেয়ে একবেলা কাটায়, তোর ঘরে আমি 'বীজম্' এনে রেখেছি!

—আমার ভয় করে! একা থাকি, যদি চুরি ডাকাতি হয়?

—চুরি ডাকাতি! ছোরাটা রেখেছি ত লুকিয়ে! আমার কাছেও একটা আছে। এই হাসানের চোখকে ফাঁকি দিয়ে কে তোর ঘরের দিকে এগোয়, একবার দেখব!

—কিন্তু কেন এসব!

একটু হাসে যেন হাসান, বলে, তোর আমি বিয়ে দেবো। হ্যাঁ, তোর বরের সংগেই আবার বিয়ে।

হেসে ওঠে সরোজা, আর তোর নিজের বিয়ে?

মুহূর্তে ম্লান হয়ে যায় সমস্ত মুখখানা, রাশভারী দুর্দান্ত লোকটাকে ভয়ানক অসহায় মনে হয়, কী করুণ, কী ব্যথাতুর! পায়ে পায়ে ওর কাছে সরে আসে সরোজা, ধীরে ধীরে ওর হাতটা হাতে তুলে নেয় উপযাচকের মতো, বলে, কাজ নেই। এ-ই বেশ।

—কেন!

—না-না!

হাতটা ছেড়ে ছুটে যেতে চায়, কিন্তু শক্ত করে ধ'রে থাকে হাসান, বলে,—পাইড়তালিকে তুই ভালবাসিস, আমি জানি।

বলেই ওকে ছেড়ে দেয়, বলে,—দেখ্, আমি ওর সংগে তোর বিয়ে দেবোই, যেমন করে পারি! আমি তোকে গাঁয়ে ফিরিয়ে এনেছি, তোর সুখ আমার না দেখলে চলে!

বলতে-বলতে গলাটা কেমন ধরে যায় হাসানের, একটু থেমে থেকে একটু সামলে নিয়ে বলে,—হয়েই যেতো বিয়েটা, পণ্ডায়েতির সময়ে হঠাৎ মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল ওসব কথা!

—তাতে কী হয়েছে?

ওর মুখের দিকে হাসান তাকিয়ে থাকে নিষ্পলক, অস্ফুট কণ্ঠে বলে, বরং তোকে দিতেই হবে।

বলতে বলতে চলে যায় আঙিনা থেকে, জোরে জোরে পা ফেলে!

মুরগীর ছানাগুলো পায়ের তলায় চাপা পড়বার ভয়ে চিক-চিক করতে করতে এদিক-ওদিক সরে যায়!

ঠিক এমন দিনেই শোনা যায় সেই কন্যাদের কাহিনী! সারা গ্রামে সাড়া পড়ে যায়, কানাকানি চলতে থাকে। বইতে থাকে একটা অদম্য উদ্দীপনার হিল্লোল! হাসান অবাক হয়ে সব দেখে, আর অদ্ভুত একটা অনুভূতি এসে তাকে আচ্ছন্ন করে। যে বুড়িরা ঘৃণায় কথাই বলত না সরোজার সংগে, তারা পর্যন্ত ওর ঘরে এসে বসে, কণ্ঠ নীচে নামিয়ে বলে, শুনেছিস?

—হ্যাঁ।

—পরনে নাকি সোনা! মোহর-আর মোহর!

বুড়োদের মধ্যে বৈঠক বসে। পত্তনের লোকদের কন্যাদর্শন হয়েছে, তাতে ওদের কী? ওদের কেউ যদি চোখে দেখতে পারত ত গাঁয়ের হতো কল্যাণ, দুঃখ হতো দূর। সন্ন্যাসী-বাবা রামায়ণের দুটো-একটা কাহিনীর তাৎপর্য ব্যাখ্যা করবার পর কন্যাদের কথা বলতে শুরু করেন। তাঁরা যখন এদিকে আসছেন, হয়ত দেখা দেবেন গাঁয়েও। চোখ রেখো সমুদ্রে। আর ঘরে ঘরে ঠিক রেখো শঙ্খ, ঘণ্টা। দেখা মিললে একটা নতুন কাপড়, একছড়া কলা, নারিকেল, ওসব একটা পিতলের থালায় করে ধূপদীপ জ্বালিয়ে অভ্যর্থনা জানাতে হয় তাঁদের, তবেই ত তাঁদের আশীর্বাদ পড়বে এগাঁয়ে।

উৎসাহে উদ্দীপ্ত হ'য়ে উঠে প্যাণ্টাইয়া বলে,—দেখা তারা দেবেনই, গাঁয়ের এই অবস্থা দেখে কখনো তাঁরা স্থির থাকতে পারেন! অবশ্য ভক্তিভরে যদি আমরা ডাকতে পারি!

সকালে উঠে তোলা জলে স্নান সেরে ঘরে এসে চুল আঁচড়াচ্ছিল সরোজা, গায়ে শুধু শাড়ীটা জড়ানো, তখনো 'রবিকা' (ব্লাউজ) পরা হয়নি, হঠাৎ মনে হলো, দরজার কাছে কে দাঁড়িয়ে আছে চুপচাপ। একবার কেঁপে উঠল বুকটা। চোর-টোর নয়ত? পরক্ষণেই কী মনে করে হেসে ফেলল সরোজা। হাসান এক-একসময় এসে অমনি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। পুরুষদের ব্যাপার বোঝা যায় না সময়-সময়। সন্দেহের বশেও হয়ত। 'রবিকা'টা হাতে নিয়ে আঁচলটা খসিয়ে দিয়ে বলে, দাঁড়া আসছি।

রবিকাটা প'রে আঁচলটা ঠিক করে বাইরে এসে দেখে, কোথায় হাসান? দ্রুত পায়ে আঙিনা পার হয়ে পাচনবাড়ি হাতে পাহাড়ের দিকে চলেছে পাইড়-তালি!......অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে

সরোজা। শেষ পর্যন্ত ও এলো ত ওর দরজায়! না-না, আর নয়, এখুনি যাবে সে পাহাড়ে, বলবে,—রাগ করিস না! আমার কোনো দোষ নেই! মাথাটাই খারাপ হয়ে যায়!......

একটু পরেই ঝোলা হাতে আসে হাসান, বলে, সারা গাঁটা যেন আজ ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে! দলাদলি নেই, ঝগড়া-ঝগড়ি নেই, নিন্দা-কুৎসা নেই, সবারই এক চিন্তা—কে প্রথমে দেখবে কন্যাদের!

—তা' ও-ঝোলায় কী?

—তরকারী আর ডাল। মাসি মুখ ঝামটা দিয়েছে কাল, আজ তুই রেঁধে নিয়ে গিয়ে আমাকে খাওয়াবি, কেমন?

—পত্তনে যাব না?

—শুকনো মাছের ঝাঁকা নিয়ে? থাক আজ, কাল যাস।

চলে যায় হাসান সমুদ্রের দিকে। আর অদ্ভুত একটা সুরে যেন আজ বাজতে থাকে প্রাণের মধ্যে! দেখা হলে কন্যাদের পায়ে প্রণাম জানিয়ে এই প্রার্থনাই সে করবে, তাবিজ পরা লোকটার শরীর ভালো করে দাও, আর কিছু চাই না।

উনুনে আঁচ দিয়ে বেরিয়ে পড়ে সরোজা, লঘু পায়ে দ্রুত উঠতে থাকে পাহাড়টা বেয়ে। একেবারে সেই গৈরিক পাথরটার কাছে গিয়ে থামে। নীচে নিথর সমুদ্র, ছাগলগুলি ইতস্তত চরছে, কিন্তু কোথায় লোকটা? ভালো করে তাকাতে তাকাতে হঠাৎ নজরে পড়ল পাহাড় চূড়ার অপরদিকে বনের দিকে চেয়ে প্রস্তর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছে সে।

ধীর পায়ে চুপিচুপি এগিয়ে এলো সরোজা, এভাবে তন্ময় হয়ে কী দেখছে ও? আর কোনদিকে চোখ নেই?... পিছন থেকে এসে বনের দিকে চোখ ফেলতেই লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল ওর মুখ। একটা ঝোপের আড়ালে একটি পাহাড়ী ছেলে আর মেয়ে। ছিঃ-ছিঃ! নির্লজ্জের মতো ওদিকে চেয়ে দেখছে কী লোকটা!

ছুটে চলে এলো সরোজা, আর পায়ের শব্দে চমকে উঠল পাড়ু। এত সকালে সরোজাকে সে এভাবে কল্পনাও করতে পারেনি। কিন্তু কী চায় ও? ও কি দেখা হলে তার সঙ্গে ঝগড়াই করবে? গৈরিক পাথরটার কাছে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে সরোজা, ওর কাছে সরে আসতে লাগল পাড়ু।

সরোজাই কথা বললে প্রথমে, আজ ভোরে হঠাৎ আমার দরজায় যে? চুপি চুপি চুরি করতে গিয়েছিলি বুঝি?

—চুরি! পাড়ু একটু হেসে বলতে গেল, হ্যাঁ, তোর মন চুরি! কিন্তু হায়রে, কথা ফুটল না, কণ্ঠ হঠাৎ অবরুদ্ধ হয়ে গেল! প্রাণপণে সে কথা বলতে চেষ্টা করছে, পারছে না, কণ্ঠের শিরা ফুলে উঠেছে, মুখচোখ লাল হয়ে গেছে, মুখের আকার হলো বীভৎস, ভয় পেয়ে চিৎকার করে দু-পা পিছিয়ে গেল সরোজা, বলে উঠল—অমন করছিস কেন! আমায় মারবি নাকি! বিস্ফারিত হয়ে গেল পাড়ুর চোখ, হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি ধরতে গেল ওকে—হাতটা হঠাৎ শক্ত অসাড় হয়ে গেল! ভয় পেয়ে আরও পিছিয়ে গেল সরোজা!...

সারাটা সমুদ্র তীরে যেন সমস্ত গ্রাম ভেঙে পড়েছে। প্যাণ্টাইয়ারই উল্লাস সব থেকে বেশী! উদ্ভ্রান্তের মতো ছুটতে ছুটতে নেমে এলো পাড়ু,—এক-দিকে, যেখানে তার নতুন তৈরি ছোট্ট নৌকোটায় হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল হাসান, সেইখানে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে পড়ল পাড়ু। হাসান বললে, অত অস্থির হচ্ছিস কেন? ধীরে ধীরে তাকিয়ে দেখ। ঐ যে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে ভাসছে আর ডুবছে! ক্রমেই দূরে নিয়ে যাচ্ছে! ঐ দেখ। নৌকোটা ঠেলতে ঠেলতে পাড়ু বলতে লাগল, নৌকোটা জলে নামা হাসান, সর্বনাশ হয়ে গেছে! পাহাড় থেকে পড়ে গেছে সরোজা!

—কী বললি!

কোনরকমে ওকে ব্যাপারটা বোঝালো পাড়ু, দুজনে মুহূর্তে নৌকোটাকে ভাসিয়ে ঢেউ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করল নিমজ্জমান দেহটার কাছে! তেমন ঢেউ ছিল না আজ—সহজেই নৌকো নিতে পারলো সমুদ্রে! থরথর করে হাতটা আজ কাঁপছে হাসানের, বৈঠা দিয়ে ঠিক-মত হাল ধরতে পারছে না সে!

পাড়ুরই চোখ পড়ল সবার আগে। রেশমের মতো একরাশ কালো চুলই বটে! চারিদিকে ছড়িয়ে ভাসছে আর ডুবছে! পাড়ু ঝাঁপিয়ে পড়বার আগেই তাকে গিয়ে ধরল হাসান। নৌকোটা একবার কাৎ হয়ে টাল সামলাতে-সামলাতে স্রোতে যেতে লাগল ভেসে, চীৎকার করে উঠল পাড়ু, ছেড়েদে ও যে তলিয়ে যাচ্ছে, দেখছিস না? ভাঙা ঢেউ পেরিয়ে গভীর জলে এসে পড়েছে, ঐ দেখ, ও যে ডুবে গেল!

বৈঠার শাসনবিহীন নৌকোটা দ্রুত অন্যদিকে ছুটে গেল। আবার দুজনে নৌকোটাকে আয়ত্তে এনে শুরু করল খোঁজার পালা। কিন্তু কাকে খুঁজবে?

অবশেষে অবসন্ন দুটি নির্বাক প্রাণী আসতে লাগল গ্রামের দিকে ঢেউ ঠেলে ঠেলে! তীরে তখন আবালবৃদ্ধবণিতার ভিড়! শঙ্খ বাজছে! সন্ন্যাসীবাবাকে ভিনগাঁয়ের শ্মশান প্রান্ত থেকে ডেকে আনতে লোক গেছে। কপালে ফোঁটা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে প্যাণ্টা, গলায় মালা দিয়ে কুলপেদ্দা, হাতে তার পেতলের থালা, নতুন শাড়ী, একছড়া কলা আর নারকেল। চেঁচিয়ে কী যেন বলতে গেল পাড়ু, কিন্তু মুখে হাত দিয়ে থামিয়ে দিলো হাসান, ধরা গলায় বলল, ওর খোঁজ কেউ করবে না, সবাই ভাববে নষ্ট মেয়ে আবার নষ্ট হয়েছে পত্তনে গিয়ে। কিন্তু ভাই, গাঁয়ের এই ছেঁড়া কাপড়-পরা আধপেটা খাওয়া লোকগুলির বিশ্বাস এখন ভাঙিস না। হয়ত বিশ্বাসের জোরে দুঃসময় কাটিয়ে উঠবে ওরা। ওরা জানুক, ওরা যা দেখেছে, সেটাই সত্যি। মৎস্যকন্যাই বটে।

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৫)

চার্লস চ্যাপলিনের প্রতিষ্ঠা এবং জনপ্রিয়তা মাঝখানে ঈষৎ কমে গিয়েছিল। তাঁর শত্রুপক্ষের অবিশ্রান্ত প্রচারকার্যই তার অন্যতম কারণ। আগের পরিচ্ছেদে তার খানিকটা আভাস দেওয়া হয়েছে। "গোল্ড রাশ"-এর পর "দী সার্কাস", মাঝখানে তিন বছরের ব্যবধান। এই তিন বছরের মধ্যে অন্যান্য কয়েকজন রঙ্গাভিনেতাও খানিকটা আলোড়ন সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছিলেন। হ্যারল্ড লয়েড আর বাস্টার কীটেনের নাম এ'দের মধ্যে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। জনকয়েক রঙ্গাভিনেতা আবার জুটি বেঁধে অভিনয় করতেন। দৃষ্টান্ত হিসেবে ওয়ালেস বীরি আর রেমন্ড হ্যাটন, এডমন্ড লোয়ে আর ভীক্টর ম্যাকলাগলেন, এবং স্ট্যান লরেল (কার্নো সম্প্রদায়ের সেই স্টান লরেল, চ্যাপলিন অসুস্থ হয়ে পড়লে যাঁকে প্রধান ভূমিকায় নামানো হত) আর অলিভার হার্ডির নাম করা যেতে পারে। সকলেই এ'রা সুন্দর অভিনয় করতেন, তবে শেষ পর্যন্ত টিঁকে আছেন মাত্র শেষের দু'জন। "দী সার্কাস" মুক্তিলাভের পর বোঝা গেল, যত ভাল অভিনয়ই এ'রা করুন না কেন, চার্লির সঙ্গে এ'দের কারও কোন তুলনাই হয় না। কাগজে-কাগজে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা হল "দী সার্কাস"-এর, সিনেমা-হলের সামনে সেই আগের মতই কিউ পড়ল আবার। সকলেই বুঝতে পারল, চ্যাপলিন তাঁর লুপ্ত প্রতিষ্ঠা আবার ফিরে পেয়েছেন।

"দী সার্কাস"-এর পর "সীটি লাইট্‌স"। মাঝখানে আবার সেই তিন বছরের ব্যবধান। ইতিমধ্যে এক বিরাট পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। পরিবর্তন নয়, বিপ্লব। সেই বিপ্লবের আঘাতে চিত্র-জগতের ভিত্তিমূল সুদ্ধ কেঁপে উঠল। চিত্র-ব্যবসায়ীরা হঠাৎ একদিন শুনতে পেলেন নির্বাক ছবি কথা কইতে শুরু করেছে। সেই যুগের—অর্থাৎ সবাক চিত্রের সেই প্রাথমিক পর্যায়ের দুখানি ছবির নাম করেছি, "দী জ্যাজ সীঙ্গার" আর "দী সীঙ্গিং ফুল"। এ দুটি বইয়ে শব্দ আর দৃশ্যের মধ্যে যে সুন্দর সঙ্গতিসাধন সম্ভব হয়েছিল তাতে স্পষ্টই বুঝতে পারা গেল যে, দীর্ঘকালের পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর অ-বাক চিত্রকে সবাক করে তুলবার একটা সুনির্দিষ্ট উপায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। ব্যস, তন্মুহূর্তেই সবাই বুঝে নিলেন, এই পরিবর্তনের সঙ্গে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিতে না পারলে আর ব্যবসা চালানো যাবে না। বড়-বড় চিত্র প্রতিষ্ঠানগুলি আর দেরি না করে উপযুক্ত যন্ত্র-সরঞ্জাম আনিয়ে নিয়ে সবাক চিত্র নির্মাণের কাজে লেগে গেলেন।

চিত্র-জগতে সে এক আমূল পরিবর্তনের সন্ধিলগ্ন। এবং তার প্রথম ধাক্কাতেই যে বিখ্যাত কত অভিনেতা আর অভিনেত্রীকে অভিনয়-জীবন থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করতে হল, তার আর কোনও লেখাজোখা নেই। এরকম একটা অবস্থার যে কখনও উদ্ভব হতে পারে, তা তাঁদের কল্পনাতেও আসেনি। দক্ষ সব অভিনেতা, সুন্দরী সব অভিনেত্রী,—একে একে তাঁরা বিদায় নিতে লাগলেন। কি না, তাঁদের কণ্ঠস্বর তেমন সুবিধের নয়। সবাক চিত্রে তাঁদের স্থান হবে না।

সেই সংকটকালেও কিন্তু পথভ্রষ্ট হলেন না চার্লি; স্থির করলেন, তিনি নির্বাক হয়েই থাকবেন। এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণে তিনি বিন্দুমাত্র দ্বিধা-গ্রস্ত হননি, আগে থাকতেই যেন সব স্থির হয়ে ছিল। কিন্তু তারই ফলে চতুর্দিকে গুজব রটে গেল যে, চার্লি চ্যাপলিনের কণ্ঠস্বরে নিশ্চয়ই কোনও ত্রুটি আছে, তা নয়তো সবাক হবার সুযোগ পেয়েও তিনি নির্বাক হয়ে থাকতেন না। কার্যত, বরাবরই তিনি সবাক চিত্রের বিরোধিতা করে এসেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, নির্বাক বলেই তাঁর চিত্রের এত ব্যাপক সমাদর। বিশ্বাস করতেন, তাঁর সৃষ্ট সেই ভবঘুরে চরিত্রটি, পৃথিবীর সর্বত্র—আমাজন নদীর তীরে, বেফিন উপসাগরের বালুকাবেলায় আর কঙ্গো নদীর অরণ্য-তটে—যে এক অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে, তাকে যদি সবাক করে তোলা হয় তো তার চারিত্রিক সর্বজনীনতাকে ক্ষুণ্ণ করা হবে। বন্ধুবান্ধবরা তখন বারংবার তাঁকে সবাক ছবি তৈরি করতে অনুরোধ জানিয়েছেন, সে-অনুরোধে তিনি কর্ণপাত করেননি। সমস্ত অনুরোধ, সমস্ত

চার্লি আর লীটা। মাঝখানে তাঁদের শিশু-পুত্র

চার্লি আর ভার্জিনিয়া। "সীটি লাইট্স"-এর একটি দৃশ্য

অনুনয় ব্যর্থ হল। চার্লি বললেন, "না। কথা বলার চাইতে আরও অনেক বেশী উন্নত শিল্পকলার আমি সন্ধান রাখি। মূলত আমি নির্বাক রঙ্গাভিনেতা। পঞ্চাশটা কথা বলেও যে অনুভূতিকে আমি ফুটিয়ে তুলতে পারব না, সামান্য একটু ভ্রূকুঞ্চনের মধ্য দিয়েই তা আমি প্রকাশ করতে পারব।"

চার্লি যে মিথ্যে বলেননি এবং জনসাধারণও যে নির্বাক চার্লিকেই চায়, হাতেনাতে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। রাশি রাশি চিঠি আসতে লাগল তাঁর কাছে; তাতে অনুরোধ জানান হয়েছে, চার্লি যেন নীরব থাকেন। এবং চার্লিও জানতেন, নীরব থাকলেই তাঁর সুবিধে। তাঁর দর্শক-সমাজ তো বিশেষ কোনো একটা দেশের মধ্যে, বিশেষ একটা ভূখণ্ডের ভৌগোলিক গণ্ডীর মধ্যে, সীমাবদ্ধ নয়। দেশে দেশে তারা ছড়িয়ে আছে। তাঁর ছবি সবাক না হলেও তাদের কিছু এসে যায় না। তাঁর ছবির পাত্রপাত্রীর মুখে বিশেষ কোনো একটা দেশের ভাষা বসিয়ে দেওয়া হয়নি বলেই বিভিন্ন দেশের দর্শকরা সেই নীরবতার শূন্যতাকে আপন আপন ভাষা দিয়ে পূর্ণ করে নিতে পারে। ইয়র্কশায়ারের কোন চিত্রগৃহে তাঁর ছবি যখন দেখানো হয়, সেখানকার দর্শকরা মনে করেন, তাঁর সৃষ্ট পাত্রপাত্রীরা যদি কথা কইত তো নিশ্চয়ই ইয়র্কশায়ারী ঢঙেই কথা কইত। আবার অ্যামেরিকার দর্শকদেরও সেই একই ধারণা। তাঁরা মনে করেন, চার্লির পাত্রপাত্রীরা যদি কথা কইত, সে-কথায় মার্কিনী টান থাকত, তাতে সন্দেহ নেই। চার্লির ছবি নির্বাক। নির্বাক, তাই সর্বভাষী। নীরবতার তুল্য আন্তর্জাতিক ভাষা যে আর দুটি নেই, পাঠকমাত্রেই সেটা স্বীকার করবেন। চার্লিও সেটা জানতেন। জানতেন, ভাষা নেই বলেই তাঁর ছবির ভাবরসকে সবাই পুরোপুরি গ্রহণ করতে পারছে। এইরকম অবস্থায়, তাঁর ছবিতে যদি বিশেষ কোনো একটা ভাষা জুড়ে দেওয়া হয় তো অন্যান্য ভাষার দর্শকদের তাতে অসুবিধে হবে। ধরা যাক, তাঁর পাত্রপাত্রীরা ইংরেজী ভাষায় কথা কইতে শুরু করল। ফলে কী হবে? চীনা এবং ভারতীয় দর্শক-সমাজের একটা বিরাট অংশ তাঁর ছবির কোনো অর্থই তখন বুঝতে পারবে না। ভাষাই সেখানে ভাবের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

অবশ্য এ-কথাও তাঁর অজানা ছিল না যে, কোন চিত্রগৃহে তাঁর ছবি দেখাবার সময় প্রোগ্র্যামের বাকী অংশ যদি সবাক চিত্র দিয়ে পূরণ করা হয় তো তাতে তাঁর নিতান্তই অসুবিধে ঘটবার আশঙ্কা। কিন্তু উপায় কি। সে ঝুঁকি তাঁকে নিতেই হবে। বছর কয়েক আগে ইংল্যাণ্ডে থাকতে এ নিয়ে একবার একটা কথা উঠেছিল। চার্লি তখন বলেছিলেন, ভাষার প্রয়োজনকে আমি স্বীকার করি না। ভাষাকে আমি অভিনয়-কলার পরিপন্থী বলেই গণ্য করি। ভাস্কর্য-শিল্পে যেমন রঙের কোনও প্রয়োজন হয় না, অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তেমনি কথার কোনও প্রয়োজন নেই। পাথরের তৈরি নারীমূর্তির গালে রুজের প্রলেপ দিতে যাওয়া যতখানি হাস্যকর, ছবির মুখে কথা বসানোও ঠিক ততখানিই হাস্যকর। চিত্রাভিনয় মানেই হল মূকাভিনয়। কথার আশ্রয় নিলেই তার ব্যঞ্জনাকে হত্যা করা হবে।" দিনে দিনে আরও প্রগাঢ় হয়েছে তাঁর প্রত্যয়, সঙ্কল্প আরও সুদৃঢ় হয়েছে। সবাক চিত্র নির্মাণের প্রস্তাব শুনে তাই তিনি বললেন, "কথার আশ্রয় নেব আমি? রেমব্রাঁকে তোমরা ঘর চুনকাম করার কাজে লাগাতে চাও?" হলিউডের সেই চূড়ান্ত হট্টগোলের মধ্যেও তিনি নীরব হয়ে রইলেন।

"দী সার্কাস"-এর কাজ শেষ হয়ে যাবার পর মাসখানেকের মধ্যেই "সীটি লাইট্স"-এর বিষয়বস্তুর একটা মোটামুটি খসড়া তিনি ঠিক করে নিয়েছিলেন। এক অন্ধ বালিকার প্রতি চার্লির সৃষ্ট সেই ভবঘুরে চরিত্রটির দুর্নিবার প্রেমই এ-বইয়ের বিষয়বস্তু। একে অবলম্বন করে অন্তত কুড়িটি গল্প দাঁড় করানো হল। কিন্তু এমনই খুঁতখুঁতে মানুষ তিনি, কোনো গল্পই তাঁর পছন্দ হতে চায় না। শেষ পর্যন্ত তারই মধ্য থেকে একটিকে তিনি বেছে নিলেন।

কাহিনী প্রস্তুত। এবারে মনোমত একটি নায়িকা চাই। অন্যান্য বইয়ের মত এ-বইয়ের নায়িকার জন্যও হয়তো মাসকয়েক ধরে অন্বেষণ চলত। কিন্তু কপাল ভাল, এবারে আর তার প্রয়োজন হল না। অকস্মাৎ তাঁর নায়িকার তিনি খোঁজ পেয়ে গেলেন। সে এক দৈব যোগাযোগ। চার্লি গিয়েছিলেন এক বক্সিং-এর অনুষ্ঠানে। বক্সিং দেখতে দেখতে হঠাৎ দেখেন, তাঁর ঠিক সামনেই সুন্দরী এক মেয়ে। সুন্দরী এবং শান্ত। সিদ্ধান্ত নিতে এবারে আর এক মুহূর্তও দেরি হয়নি চার্লির। এক নজর দেখেই তিনি স্থির করলেন, এই মেয়েকেই তাঁর "সীটি লাইট্স"-এর নায়িকার ভূমিকায় নামাতে হবে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, মেয়েটির নাম ভার্জিনিয়া চেরিল। এর আগে আর

কখনও অভিনয় করেনি। রঙ্গমঞ্চ অথবা চলচ্চিত্রে অভিনয়ের কোনও অভিজ্ঞতাই তার নেই। নেই তো বয়ে গেল। আর-সকলকে যেমন শিখিয়ে-পড়িয়ে নিয়েছেন, একেও নেবেন। খোঁজ করতে করতে আরও একটা খবর পেয়ে গেলেন চার্লি। দিন-কয়েক আগে শিকাগোতে এর বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটেছে। ক্যালিফর্নিয়াতে আসার উদ্দেশ্য আর অন্য কিছুই নয়, মানসিক যন্ত্রণাকে ভুলে থাকার জন্য দু'দণ্ড একটু বিশ্রাম নিতে এসেছে এই মেয়ে। অসুখী দাম্পত্য জীবনের যন্ত্রণা যে কী মর্মান্তিক চার্লি জানতেন। ভার্জিনিয়ার জন্য তাই যদি তিনি দুঃখবোধ করে থাকেন, তাতে বিস্ময়বোধের কোনও কারণ নেই।

সব কিছু তৈরি। চিত্রগ্রহণের কাজ এবারে শুরু হয়ে যাবে। ঠিক এই সময়েই চার্লির মা হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অনেক আগেই তাঁর স্বাস্থ্য অবশ্য ভেঙে পড়েছিল, কিন্তু ক্যালিফর্নিয়ায় এসে আবার একটু সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন। যে পরিপূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে চার্লি তাঁকে রেখেছিলেন, তাতে সুস্থ না হয়ে ওঠার কোনো কারণও ছিল না। অকস্মাৎ তাঁর অসুখ আবার বেড়ে যাওয়ায় চার্লি প্রায় দিশাহারা হয়ে পড়লেন। মাকে যতখানি ভালবাসতেন, চার্লি, এমন আর অন্য কাউকেই নয়। চার্লির কাছেই শুনেছি, জীবনে যদি একটি মেয়েকেও তিনি যথার্থ ভালবেসে থাকেন, মাকেই বেসেছিলেন।

লীলি—চার্লির মা—আর সেই তন্বী তরুণী নন এখন, আগের চাইতে অনেক ভারিক্কী হয়েছেন। কিন্তু তাতে তাঁর সৌন্দর্য কিছু হ্রাস পায়নি। চেহারায় বেদেনী মেয়েদের অল্প-একটু আদল আসে। সীডনি আর চার্লির বাড়িতে প্রায়ই বেড়াতে আসেন তিনি। দুই ছেলের সঙ্গে গল্প করেন দু'দণ্ড, তাদের নিয়ে মোটর করে বেড়াতে যান। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। স্টুডিওতে এই যে এত আসা-যাওয়া, এ শুধু দুই ছেলের জন্য। ছেলেদের টানে আসেন, নয়তো আসতেন না। হলিউডের সিনেমা-জীবনের কোনো উৎসব-অনুষ্ঠানে, কি কোনো পার্টিতে কেউ কখনও তাঁকে দেখতে পায়নি। এক-আধ সময়ে ইচ্ছে হল তো, চার্লির প্রথম পর্যায়ের এক-আধটা বই দেখলেন। তবে হ্যাঁ, নতুন কোনো ছবি তৈরি হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সকলের আগে মাকে সে-ছবি দেখিয়ে নিতেন চার্লি। মাস কয়েক আগে "দী সার্কাস" তাঁকে দেখানো হয়েছিল। ছবি দেখে আর কিছু বলতেন না লীলি, শুধু অনুযোগ করতেন যে, তাঁর ছেলেকে সবাই বড্ড বেশী খাটিয়ে নিচ্ছে। চার্লিকে সবাই খাটিয়ে নিচ্ছে! অতীত জীবনের সেই দুঃখ-দারিদ্র্যকে বোধ হয় ভুলতে পারেননি লীলি; বোধ হয় বুঝতে পারেননি যে, চার্লিকে আর এখন অন্যের হুকুম তামিল করতে হয় না। চার্লি এখন নিজেই নিজের মালিক।

"সীটি লাইট্স"-এর আর একটি দৃশ্য

আর্থিক ব্যাপারেই শুধু নয়, সর্ব ব্যাপারেই। একটা কথার এখানে উল্লেখ করি। চার্লিকে লীলি "রাজা" বলে ডাকতেন।

সীডনি একদিন তাঁর মায়ের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন। ছেলেকে দেখেই লীলি গিয়ে ভাঁড়ার ঘর থেকে গোটা-কয়েক আপেল আর কমলালেবু নিয়ে এলেন। সীডনির হাতে তুলে দিয়ে বললেন, "নে, খা। কী, খিদে নেই? তো পকেটে রেখে দে। খিদে পেলেই খেয়ে নিবি।"

আর-একদিনের কথা। ডাক্তার এসেছেন লীলির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে। রোগিণীর সঙ্গে কথাবার্তা হচ্ছে। কথায় কথায় সীডনির আর চার্লির প্রসঙ্গ উঠল। ডাক্তার বললেন, "এমন দুই হীরের টুকরো ছেলে থাকতে আপনার আবার দুঃখ কীসের। আপনার ছেলেদের গুণের কথা আর কত বলব, সকলের মুখেই তাঁদের সুখ্যাতি লেগে রয়েছে।"

শুনে শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন লীলি, তারপর বললেন, "ছেলে! আমার তো ছেলে নেই।"

"সে কি মিসেস চ্যাপলিন! আপনার দুই ছেলে চার্লি আর সীডনি তো এখন বিশ্ববিখ্যাত। আর আপনি বলছেন, আপনার ছেলে নেই? এমন ছেলের জন্যে তো আপনার গর্ব হওয়া উচিত।"

"না ডাক্তারবাবু, আমার ছেলে নেই।" অস্পষ্ট গলায় লীলি উত্তর দিলেন।

নার্স এতক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিল। ব্যাপার দেখে সেও কিছু কম বিস্মিত হয়নি। ডাক্তারবাবু চলে যাবার পর সে প্রশ্ন করল, "আপনি ও-কথা বললেন কেন মা? আপনার দুই ছেলে তো প্রায়ই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসেন।"

"আসে তো," লীলি বললেন, "কিন্তু বাছা, একটা বিপদ ঘটতে কতক্ষণ। কে জানে, হয়তো তাদের কোনও বিপদ ঘটেছে। কেউ হয়তো তাদের অনিষ্ট করতে চেষ্টা করছে।"

বেড়াতে বেরিয়ে, বলা নেই কওয়া নেই, গাড়ি থামিয়ে হঠাৎ রাস্তায় নেমে পড়তেন লীলি। একগাদা আইস-ক্রীম কিনে এনে রাস্তার ছেলেদের মধ্যে বিলিয়ে দিতেন।

সান্টা মনিকার সমুদ্রতীরে মার জন্যে যে বাড়ি করে দিয়েছিলেন চার্লি, কিছু-দিনের মধ্যেই মা সেখানে হাঁপিয়ে উঠলেন। জায়গাটা তাঁর ভাল লাগল না। সান ফার্নাণ্ডোতে আর-একখানি বাড়ি কিনে মাকে সেখানে নিয়ে আসা হল। জায়গাটা স্বাস্থ্যকর। সেখানে তিনি ধীরে-ধীরে সুস্থ হয়েও উঠছিলেন, হঠাৎ আবার নতুন এক উপসর্গ দেখা দিল। ডাক্তারের পরামর্শে গ্লেনডেলের এক হাসপাতালে পাঠানো হল তাঁকে। ব্যাপার দেখে চার্লি প্রথমটায় খুব ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। পরে যখন ডাক্তারদের কাছে শুনলেন, অসুখটা খুব কিছু গুরুতর নয় এবং উদ্বেগের কোনও কারণ নেই, তখন একটু শান্ত হলেন।

অসুখ কিন্তু বেঁকে দাঁড়াল। হাস-পাতালে এসে সেই রাত্রেই লীলি মূর্ছিত হয়ে পড়েন। ডাক্তারদের আশঙ্কা হল, মূর্ছা হয়তো না-ও ভাঙতে পারে।

তৎক্ষণাৎ খবর দেওয়া হল চার্লিকে। সীডনি তখন ইউরোপে। খবর পেয়েই চার্লি ছুটে এলেন। এসে দেখেন, মিসেস আলফ রীভ্স আর মিসেস ক্যারি (লীলির এক সঙ্গিনী) হাসপাতালের বাইরের হলে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছেন। ঘণ্টাখানেক সেখানে বসে রইলেন চার্লি। ডাক্তারদের সঙ্গে এক-আধটা কথাও হল। তাঁদের কাছেই তিনি শুনলেন, মিসেস চ্যাপলিনের মূর্ছা এখনও ভাঙেনি।

হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলেন চার্লি, গাড়িতে এসে উঠলেন। একবার ভাবলেন, পালিয়ে যাবেন। পালাবেন এই হাসপাতালের অসুস্থ অসুখী আবহাওয়া থেকে। এই নিরানন্দ পরিবেশের মধ্যে তাঁর মাকে তো মানায় না। না, মানায় না। হাসির হাওয়ায় দুঃখকে যিনি তুচ্ছ করে এসেছেন, সহস্র আঘাতেও যাঁর আনন্দ এতটুকু ম্লান হয়নি, সেই মাকেই তিনি জানেন। সেই মায়ের স্মৃতিটুকুকেই তিনি আঁকড়ে ধরে থাকবেন। তাঁর রোগপাণ্ডুর যন্ত্রণাক্লিষ্ট পরাভূত মূর্তির সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়াতে পারবেন না। তিনি পালাবেন। স্টীয়ারিংয়ে হাত রাখলেন চার্লি। পালাতে পারলেন না। অসহ্য এক অন্তর্দ্বন্দ্বে তিনি তখন বিপর্যস্ত। চোখ বেয়ে টপটপ করে জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। স্টীয়ারিংয়ে হাত রেখে সেইখানে, সেই একইভাবে, তিনি বসে রইলেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর ক্লান্ত পায়ে আবার এক সময় হাসপাতালে গিয়ে ঢুকলেন। ডাক্তার এসে বললেন, ইচ্ছে করলে মার কাছে গিয়ে বসতে পারেন তিনি। লীলির মূর্ছা তখনও ভাঙেনি। ঘণ্টা দুয়েক বাদে তাঁর জ্ঞান ফিরে এল একবার। শেষবার। চার্লির একখানা হাত তিনি নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিলেন। অস্ফুটস্বরে বললেন, "খোকা, আমার খোকা।" বুক ঠেলে কান্না উঠে আসছে। প্রাণপণে ঠোঁট কামড়ে বসে রইলেন চার্লি। একটা কথাও তিনি বলতে পারেননি।

হাসপাতাল থেকে যখন বেরিয়ে এলেন, তখন আর কিছু ভাববার মতন শক্তিও তাঁর নেই। জীবনের প্রতি যা-কিছু আকর্ষণ ছিল চার্লির, এক নিমেষেই তা ফুরিয়ে গিয়েছে। আচ্ছন্নের মত কয়েক পা হেঁটে গিয়ে ছোট্ট একটা রেস্তোরাঁয় এসে ঢুকলেন। কাপের পর কাপ কফি আসতে লাগল। কফির পেয়ালা সামনে নিয়ে সারারাত সেইখানে তিনি বসে রইলেন।

মায়ের শেষকৃত্যের ব্যবস্থা তিনি নিজের হাতে করেছিলেন। আলফ রীভ্সকে শুধু বলে দিয়েছিলেন যে, রিপোর্টারেরা এসে যেন ভিড় না জমায়। "ঈশ্বরের দোহাই, ওদের একটু দূরে সরিয়ে রাখো।" খবরের কাগজের অফিস থেকে ওদিকে মুহুর্মুহু টেলিফোন আসছে। আলফ আর কার্ল রবিনসন তাঁদের জানিয়ে দিলেন, মায়ের শেষকৃত্য সম্পূর্ণ অনাড়ম্বরভাবে সম্পন্ন হবে, এ নিয়ে হৈ-চৈয়ের কোনও প্রয়োজন নেই। সঙ্গে সঙ্গেই তাঁরা প্রশ্ন করলেন, অনুষ্ঠানটা কখন হচ্ছে। আলফ জানালেন, দুপুর দুটো নাগাদ। সকাল সাড়ে ন'টার মধ্যেই কিন্তু সমস্ত কাজ শেষ হয়ে গেল। ছোট্ট অনাড়ম্বর অনুষ্ঠান। চার্লির অন্তরঙ্গ কয়েকজন বন্ধু আর স্টুডিয়োর জনকয়েক কর্মচারী মাত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। অন্য আর কাউকেই তাঁরা খবর দেননি। মন্ত্রোচ্চারণ শেষ হবার পর তাঁরা সমাধি-ভূমির দিকে রওনা হলেন। সকলের পিছনে চার্লি।

সমাধি-ক্ষেত্রে পেঁছে তো সবাই স্তম্ভিত। লীটা গ্রে আর তাঁর মা কী করে যেন খবর পেয়ে গিয়েছেন। আগে থাকতেই সেখানে এসে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁরা। দু জনের পরনেই কালো পোশাক। সর্বনাশ, চার্লি এখন ও'দের দেখতে পেলেই তো হয়েছে। বন্ধুবান্ধবরা করলেন কি, লীটা আর তাঁর মাকে তাঁরা আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলেন। চার্লি যাতে না দেখতে পান তাঁদের। দেখতে চার্লি পেলেন না। শোকাচ্ছন্ন অবস্থায় মাথা নিচু করে এক পাশে তিনি দাঁড়িয়ে ছিলেন। একবারও তিনি মাথা তোলেননি।

পরে এ নিয়ে কাগজে-কাগজে ফলাও করে অনেক খবর ছাপা হয়েছিল। লীটার সেদিন ওখানে যাবার উদ্দেশ্য কী, অনেক গবেষণা হয়েছিল তা নিয়ে। চার্লির সঙ্গে কি তিনি একটা মিটমাট করতে চাইছিলেন? কয়েক মাস আগেই চার্লির সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে। সেই বিচ্ছেদের কি তিনি অবসান ঘটাতে এসেছিলেন?

চার্লির প্রথম ছেলের যেখানে সমাধি দেওয়া হয়েছিল, তার ঠিক পাশেই লীলির শেষ শয্যা রচনা করা হল। ছোট একটা পুকুর। পুকুরের পাড়ে নিঃসঙ্গ দুটি গাছ। সেই গাছের ছায়ায় পাশাপাশি দুটি সমাধি। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছিলেন লীলি। অনেক জ্বালা, অনেক যন্ত্রণা তাঁকে পার হয়ে আসতে হয়েছে। এই শান্ত পরিবেশে তিনি হয়তো তাঁর প্রার্থিত শান্তির সন্ধান পেয়ে থাকবেন। (ক্রমশ)

সাক্ষী
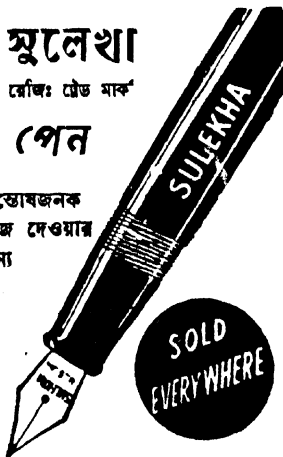
শংকর

সায়েব ঘড়ির দিকে চাইলেন। সবে মাত্র ন'টা। রবিবারের রৌদ্রঝরা সকাল। লনে গাছের তলায় শীতের স্নিগ্ধ রোদ যেখানে উঁকি মারছে তার খুব কাছেই আমরা সামনা-সামনি বসে। সবুজ বেতের চেয়ারের সঙ্গে ঘাসের রঙ এক হয়ে গেছে। কয়েকখানা চিঠি টাইপ করেছি, দূরে অন্য একটি গাছের আড়াল হতে কোন এক নাম-না-জানা পাখি মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। "মানুষের রসবোধ সবচেয়ে কম, না হ'লে পাখির গানে সূর্য যখন শিশিরের সঙ্গে খেলা করছে তখন তুমি ও আমি অকাট গদ্যের মতন কাজ করে চলি কেন।" সায়েব কলম বন্ধ করলেন, "ছুটির দিনে বেশী কাজ ভাল নয়। এখন বরং গল্প।"

আমি আনন্দে সায় দিয়ে টাইপ-রাইটার বন্ধ করি। "কাজে ফাঁকি দিচ্ছি একথা কাউকে বোল না"—কানের কাছে মুখ এনে কপট গাম্ভীর্যের সঙ্গে সায়েব বললেন, আমি হেসে ফেলি, "ও, বিনা ঘুষে রাজী নও। বেশ, বিপদে যখন পড়েছি তখন ঘুষ দেব। অরেঞ্জ না লাইম্ স্কোয়াশ?"

"দুই-ই সমান, তবে অরেঞ্জ স্কোয়াশ শুধু খেতে ভাল নয়, দেখতেও চমৎকার।"

"বাঃ, এই না হলে বাঙ্গালীর বুদ্ধি। একসঙ্গে রসনা ও চক্ষু পরিতৃপ্তির ব্যবস্থা। তোমার প্রাইজ পাওয়া উচিত লাণ্ড। জান তো আমাদের কুকের দেশ চট্টগ্রাম আর ইস্টবেঙ্গলের রান্না চীনেদের সঙ্গে পাল্লা দেয়।"

বেয়ারা অরেঞ্জ স্কোয়াশ রেখে যায়। গ্লাসে চুমুক দিয়ে বলি, "ঘুষ নেওয়া অপরাধ, জেল পর্যন্ত হতে পারে।"

"কোন ভাবনা নেই, সামনেই ব্যারিস্টার রয়েছে, আসামী পক্ষ সমর্থনে যা বলার আমিই বলব।"

সায়েব কিছুক্ষণ থামলেন, "ফৌজ-দারি কেসে বিলেতের সঙ্গে এখানকার অনেক তফাৎ। আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলি। লণ্ডনে কিছুকাল যে ব্যারিস্টারের কাছে কাজ শিখেছিলাম ফৌজদারি মামলায় তিনি প্রথিতযশা। বহু চাঞ্চল্যকর মামলায় আসামীদের খালাস করে তিনি খ্যাতি অর্জন করেছেন। এটর্নি'রা মক্কেলের সঙ্গে চেম্বারে আসতেন, অধিকাংশই গুরুতর অভিযোগ। আমার গুরু গম্ভীরভাবে বলতেন, "আজ কাগজপত্র রেখে যান আগামীকাল সন্ধ্যার আসবেন।" পরের দিন এটর্নি ও তাঁর জামীনে মুক্ত মক্কেল হাজির হলে ব্রীফের লাল ফিতেটা খুলতে খুলতে তিনি বলতেন, "আপনার নথিপত্র মনোযোগ দিয়ে পড়েছি। পুলিসের অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনে আপনার কি বক্তব্য?"

"কলকাতায় ব্যারিস্টারী আরম্ভ করার কিছুদিন পরই এক এটর্নি মক্কেল-সহকারে এলেন, ফৌজদারি মামলা। গুরুকে অনুসরণ করে আমিও এটর্নিকে পরের দিন দেখা করতে বললাম। দ্বিতীয় দিনে তাঁদের খুব গম্ভীর ভাবে বললাম, "কাগজপত্র সব দেখেছি, পুলিসের অভি-যোগও পড়লাম। এখন আপনার বক্তব্য কি?"

সঙ্গে সঙ্গে এটর্নি ও মক্কেল আঁতকে উঠে পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলেন। একটু পরে এটর্নি বিরক্তভাবে বললেন, "আজ্ঞে সেইটি জানবার জন্যেই তো এখানে আসা। আমার বক্তব্য কি হওয়া উচিত, খুনের সময় আসামী কোথায় ছিল, নিহত ব্যক্তির সঙ্গে তার কতখানি পরিচয় থাকা উচিত, সে-সব আপনাকেই ঠিক করতে হবে।"

অনেকদিন পরে কথা প্রসঙ্গে হাই-কোর্টের একজন ইংরেজ বিচারপতিকে এই গল্প বলেছিলাম। বিচারপতি শুনে বললনে, "আমি কিন্তু আরও লজ্জায় পড়েছিলাম। তখন পেশওয়ার হাইকোর্টে নতুন জজ হয়েছি। খুন, ডাকাতি, রাহাজানির মামলায় পেশওয়ার বোধ হয় ভারতবর্ষের এক নম্বর হাইকোর্ট। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় কৃতী আইনজ্ঞের সংখ্যা খুবই কম। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে ওখানকার এডভোকেট জেনারেলকে এর কারণ জিজ্ঞাসার লোভ সামলাতে পারলাম

না। এড্‌ভোকেট জেনারেল প্রথমে সঙ্কোচ বোধ করছিলেন উত্তর দিতে। শেষে বললেন,—"এর কারণ অতি জটিল। তবে এদেশের খুনী আসামী ও ডাকাতরা দেখেছে যে, বড় উকিল ব্যারিস্টারদের পিছনে টাকা খরচ করা অপেক্ষা জুরিদের দিকে নজর দিলে খরচ অনেক কম অথচ দ্রুত ও নিশ্চিত ফললাভ।"

চীনদেশের জুরিদের সততা সম্বন্ধে একটি মজার কাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁরা সোজাসুজি কোনো বে-আইনী অর্থ নেন না। তবে প্রথমদিনের মামলা শেষে যখন জুরি আদালত থেকে বার হবেন তখন রাস্তার উল্টোদিক থেকে মস্ত এক ছাতা নিয়ে অন্য একজনকে আসতে দেখা যাবে। এই ছাতাটি জুরিবাবুর সিগন্যাল। জুরি জিজ্ঞাসা করবে, "হ্যাঁ মশাই, আপনি কি পাগল? এই চমৎকার শুকনো দিনে ছাতা নিয়ে বেরিয়েছেন। ছাতাওয়ালা সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দেবে, "না মশাই, অত বোকা আমি নই, আমি আবহাওয়ার ব্যাপারে পণ্ডিত লোক। এখনই পাঁচ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি হবে, বাজি লড়ে যান পাঁচ হাজার ডলার।" জুরিবাবু রাজী হয়ে যান। পাঁচ মিনিটের মধ্যে কোথায় বৃষ্টি? ছাতাওয়ালা আড়চোখে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে পাঁচ হাজার ডলার জুরির হাতে তুলে দেয়।

সাক্ষীদেরও সুনামের অভাব নেই। টাকার পরিমাণ অনুযায়ী অনেকে ঠিক করে কি সাক্ষ্য দেবেন। তখন স্বদেশী বোমার যুগ। আলিপুর কোর্টে জজরা খুব সন্ত্রস্ত হয়ে খাস কামরা থেকে আদালত ঘরে যান। ইতিপূর্বে এই পথেই একজন জজের উপর বোমা ছোড়া হয়। খাস কামরা থেকে বেরিয়ে একদিন সকালে কোন জজ-সায়েব দেখলেন, পথে একটি লোক দাঁড়িয়ে। জজ-সায়েব মনে মনে ভয় পেলেন না এমন নয়। লোকটিব দুটি হাতই চাদরের ভিতর। তবুও যথাসম্ভব সাহস সঞ্চয় করে তিনি এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, "এখানে দাঁড়িয়ে কেন? এখনই তোমাকে পুলিসে দিতে পারি"। লোকটি কাঁদ কাঁদ। জজ-সায়েব তবুও সন্দেহমুক্ত হলেন না। "তুমি কোর্টে এসেছ কেন?" লোকটি উত্তর দিল, "সাক্ষী দিতে"। জজ-সায়েব সঙ্গে সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন, "কোন্ কেস্-এ বাদী বিবাদীর নাম কি?লোকটি অবাক হয়ে যায়। "আজ্ঞে যে কোন কেস্ স্যার, পার্টি পেলেই সাক্ষী দিতে পারি।" জজ-সায়েব কোনরকমে হাসি চেপে এজলাসে চলে গেলেন।

আলিপুরের সাক্ষীটির কথা শুনে বিখ্যাত হাস্যরসিক শ্রীনবদ্বীপ হালদারের বহুপরিচিত সাক্ষী গড়গড়া হাজরার কথা মনে পড়ে গেল। গড়গড়া হাজরার পেশা সাক্ষ্যদান ও তার জেরায় উকিলের বিপত্তিতে এককালে খুব আনন্দ পেয়েছিলাম।

সায়েব আমাকে হাসতে দেখে বললেন, "কিন্তু একজন সাক্ষীর কথা আমি কোনদিন ভুলব না। নরেন মণ্ডলের ঘটনা তোমাকে বলিনি?"

"না তো।"

তিনি আবার ঘড়ির দিকে চাইলেন, "লাঞ্চের এখনও এক ঘণ্টা দেরি।"

ব্যারিস্টারী আরম্ভ করার কয়েক বছর পরের ঘটনা। মফস্বলের দু একটি শহরে যাওয়া হলেও কলকাতার বাইরের বাংলাদেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয় তখনও নিবিড় নয়। তাঁর ড্রাইভার প্রভাত মণ্ডলের বাড়ি বরিশাল। ধর্মে খৃষ্টান হলেও গ্রামের চাষ আবাদেই তাঁদের জীবিকানির্বাহ।

একদিন দুপুরে সায়েব চেম্বারে কাজে ব্যস্ত হঠাৎ প্রভাত এসে কাঁদতে শুরু করল, "আমাদের সর্বনাশ হয়েছে।" সায়েব উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন, প্রভাতের কান্না থামিয়ে বহু কষ্টে যা জানা গেল, তাতে চিন্তিত হয়ে পড়া খুবই স্বাভাবিক।

বরিশালে প্রভাতদের পাশের গ্রামে কেবল হিন্দুদের বাস, হিন্দুরা নাকি তাদের দেখতে পারে না। শেষ পর্যন্ত হিন্দুরা নাকি দলবল নিয়ে তাদের আক্রমণ করে। আত্মরক্ষার চেষ্টায় অনেকে হতাহত। অথচ পুলিস প্রভাতদের গ্রামের অনেককে গ্রেপ্তার করেছে। নরহত্যা ও দাঙ্গার অভিযোগ।

প্রভাত কান্নায় ভেঙে পড়ে। "আমার কাকা, জেঠা, নিজের ভাই সবার ফাঁসি হয়ে যাবে। আমরা যে খৃষ্টান। হিন্দুরা কাউকে ছাড়বে না।"

অবশেষে প্রভাতকে সঙ্গে করে সায়েব বরিশালের সুখদা গ্রামে রওনা হলেন। সুখদা গ্রামকে বাইরের জগতের সঙ্গে সংযুক্ত রাখার জন্য কোন আধুনিক যান বাহনের ব্যবস্থা নেই। স্টিমারঘাট থেকে খাল বয়ে নৌকাযোগে মাইল পাঁচেক সেখান থেকে পাল্‌কি একমাত্র বাহন।

"ট্রেন থেকে বাংলাদেশের শস্যশ্যামল রূপ দেখেছি সত্যি। কিন্তু সে দেখা দূরের দেখা। সুখদার পথে পাল্‌কি থেকে বাংলাদেশকে অতি নিকট হতে দেখার প্রথম সুযোগ পেলাম। চালচলনে চাকচিক্য না থাকলেও একটি সরল নিরাভরণ স্নিগ্ধতা চারদিকে পরিব্যাপ্ত। পাল্‌কি দুলে দুলে চলে, আমার অদ্ভুত লাগে। সভ্যতার চরম শিখর হতে যেন আদিম যুগে ফিরে যাচ্ছি। বেহারাদের মুখে অস্পষ্ট গোঙানীতে ভয় পেয়ে থামতে বলি, জিজ্ঞাসা করি, তোমরা কি হয় খুব ক্লান্ত? তারা হাসতে থাকে। প্রভাত বলে, না সায়েব, ওরা মুখে অমন আওয়াজ করে তাতে ওদের বইতে সুবিধে হয়।"

গ্রামাঞ্চলের দিবাবসান আগতপ্রায়। একটি বিদেশীকে বহন করে পাল্‌কি চলেছে ক্ষেতের আলের উপর দিয়ে। সুখদা গ্রামের খুব কাছেই ডাক বাংলো। সেখানে যখন পাল্‌কি থামল সূর্য পৃথিবীর কাজ শেষ করে নিজের বাড়ি ফিরে গেছেন। দীর্ঘ ভ্রমণে সায়েব ক্লান্ত। তাই সময় নষ্ট না করে শয্যাগমন। চারিদিক ঘুটঘুটে অন্ধকার। একদল পোকা তাদের নাইট ক্লাবে কনসার্টে মগ্ন। হারিকেনের আলো।

ঘুম ভাঙলো মোরগের অবিশ্রান্ত ডাকে। সূর্যের আলো আকাশে ছড়িয়ে পড়েছে। সুপারি গাছগুলো যেন ঘুম থেকে উঠে রোদ পোয়াচ্ছে। বারান্দায় চেয়ারে বসে সায়েব দেখছিলেন একটি লোক কোমরে গামছা বেঁধে তরতর করে খেজুর গাছের মাথায় উঠে গেল। সেখানে লাল রঙের মাটির পাত্র ঝুলছে। স্নানের ডাক পড়েছে, সায়েব ভিতরে চলে গেলেন।

বন্ধ স্নানঘর থেকেও বেশ কিছু লোকের গলার শব্দ শোনা গেল। সুখদা গ্রামের অনেকে এসেছে। বাঙালী প্রথায় হাত তুলে নমস্কার জানিয়ে সায়েব সবার

ধ্যে এসে দাঁড়ালেন। কয়েকজন ভয়ে সরে সরে গেল, খুব কাছে গেলে পাছে সায়েব চটে যায়। দু' একজন ডাব এনেছে দেখে, "কোকোনাট স্যার, ভেরী গুড়, ভেরী সুইট"। সায়েব হেসে বলেন, বোঝাতে হবে না, কলকাতায় অনেক ডাব খেয়েছি। বিলেতেও পাওয়া যায়।"

দলের কয়েকজনের ডাক পড়ল। সেদিনের সব ঘটনা তাদের মুখে শুনতে হবে।

গ্রামের মোড়লদের চোখ বড় বড় হয়ে উঠে। "আমরা নিরপরাধ। পাশের গাঁয়ে হিন্দুদের বাস, সেখানে আমাদের ধীরেন ক বিঘে জমি কেনে কিন্তু হিন্দুরা আমাদের দেখতে পারে না। সকালে ধীরেনরা লাঙগল দিতে যাবার কিছু পরেই ওরা দল বেঁধে তেড়ে আসে। সঙ্গে লাঠি সোটা, আমাদের অনেকে জখম। পরের দিন পুলিস গাঁয়ের অর্ধেক লোককে গ্রেপ্তার করে চালান দিল। আমরা শুনলাম, হিন্দুদের কে একজন খুন হয়েছে। হিন্দু পুলিস, সে তো আমাদের ধরবেই, কিন্তু আমরা কিছুই জানি না।"

"আপনারা একদম কিছু জানেন না, কেমন করে সম্ভব?"

উপস্থিত সকলে সমস্বরে বলে উঠল, সত্যি আমরা নিরপরাধ। খৃষ্টানদের মানে কেউ দেখতে পারে না।"

সায়েব আবার বললেন, "দেখুন, আপনাদের আত্মীয় স্বজন যারা আজ জেলে তাদের বাঁচাতে হলে আমাকে সব কিছু জানতে হবে। হিন্দুদের একজন খুন হয়েছে, আপনাদের হাতে কোন অস্ত্র ছিল না, কি করে বিশ্বাস করি।"

সবাই ভয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে। তারা যে কিছু চেপে রাখতে প্রয়াসী, সায়েবের বুঝতে দেরি হয় না।

"সত্যকথা না বললে এ মামলায় আমি কিছুই করতে পারব না। হিন্দুরা দল বেঁধে মারতে এল, আপনারা নিরস্ত্র, অথচ তাদের একজনের মৃত্যু হলো—অবিশ্বাস্য। আসল ঘটনা আপনারা যদি না বলেন আমার সময় নষ্টের কোন প্রয়োজন নেই, আজকেই কলকাতায় ফিরব।"

ফিস্ ফিস্ করে বাঙলায় আলোচনা চলতে থাকে। এমন সময় পিছনের একটি ছেলের দিকে দৃষ্টি পড়ে। সে যেন সামনে আসতে চাইছে অথচ কয়েকজন তাকে জোর করে ধরে রাখছে। সায়েব তৎক্ষণাৎ ছেলেটিকে ডাকেন, সে কাছে এসে দাঁড়ায়। পিছনের এক বৃদ্ধ হঠাৎ কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে, "ও বাবা তুই যাস না। ও বাবা তুই যাস না।"

সায়েব আশ্চর্য। ছেলেটি পিছনে একবার ফিরে আবার সামনে তাকাল। সুঠাম ইস্পাতের মত চেহারা। বয়স বোধ হয় আঠারো। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণের দীর্ঘ শরীর যৌবনের দীপ্তিতে পরিপূর্ণ।

সবাইকে চলে যেতে বলে সায়েব ঘরে ঢুকে গেলেন, পিছনে ছেলেটি। নাম নরেন। ঘরের দরজা বন্ধ। পনের মিনিট, আধ ঘণ্টা, এবার দরজা খুলল। নরেনের হাত ধরে সায়েব বেরিয়ে এলেন। "পারবে তো বলতে"

"নিশ্চয়ই পারব"

"বাঃ এই তো স্পোর্টসম্যানের কথা"

ছেলেটি নমস্কার করে সামনে পা বাড়ায়।

"কিন্তু খুব সাবধানে। কোনরকমে প্রকাশ না হয়"

কিছুদিন পরের কথা। বরিশাল কোর্টে চাঞ্চল্য। তিল ধারণের স্থান নেই। কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার এসেছেন, ভয়ংকর মামলা। সবাই দেখতে চায় ব্যারিস্টাররা কেমন করে কেস্ করে। কাঠগড়ায় সতেরো জন আসামী, ঘোরতর অপরাধে অভিযুক্ত। প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড নিশ্চিত। দায়রা জজ এখনও আসেননি, চেয়ার খালি।

পঁয়ত্রিশ বছরের অভিজ্ঞ পাবলিক প্রসিকিউটর রজত সেন নিরামিষাশী, নদীতে স্নান ও দেবপূজা যাঁর নিত্যকর্ম। রজত সেন বলছিলেন, "বিধি বিমুখ! না হলে মানুষকে ফাঁসিকাঠে পাঠান আমার পেশা হবে কেন? আপনারা ভাগ্যবান। আমাদের হাত থেকে ছিনিয়ে পুণ্য অর্জন করেন।"

"পুণ্যবান না পাপের ভাগীদার আমরা? চুরি ডাকাতির অর্থে আমাদের জীবন ধারণ।"

হঠাৎ সবাই কথা বন্ধ করে। চেয়ারের পিছনের পর্দা সরিয়ে দিয়ে চাপরাসী সোজা হয়ে দাঁড়ায়। মচমচ জুতোর শব্দ। জজসায়েব ভিতরে ঢুকলেন। শান্ত সৌম্য অথচ তীব্র বুদ্ধিদীপ্ত

অবয়ব। বাঙালী ব্রাহ্মণ। পেস্কার জুরিদের নাম ধরে ডাক দিতে শুরু করে। বাছাই করা জুরি। ইংরেজ ব্যারিস্টারের জন্য তাঁদের সবাই ভালো ইংরেজী জানা অভিজ্ঞ ব্যক্তি।

পাবলিক প্রসিকিউটর রজত সেন মামলার উদ্বোধন করলেন, পুলিসের ঘোরতর অভিযোগ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা। গত দশই জানুয়ারী সুখদা গ্রামের একদল খৃষ্টান দলবদ্ধভাবে পাশের গ্রামের একটি হিন্দু পরিবারকে আক্রমণ করে। আসামীদের হাতে তীক্ষ্ণ ও বিপজ্জনক অস্ত্রশস্ত্র। হিন্দু ও খৃষ্টান পরিবারদের মধ্যে মনোমালিন্য অনেক দিনের। এই ঘটনার পূর্বে খৃষ্টানদে মধ্যে বহু গোপন বৈঠকের সং পুলিসের জ্ঞাত। রাতের আঁধারে তাদে অধিকাংশ কার্যকলাপ। হিন্দুদের বাড়ি কর্তা বাধা দিতে এসে নিহত হলে বাড়িতে তখন শুধু স্ত্রীলোকেরা, তাঁদে একজন শুধু বেরিয়ে আসেন আওয়া

শুনে। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষ-দর্শিনী ভদ্রমহিলাটিকেও সরকার পক্ষ সাক্ষ্য দেবার জন্য সময়মত আহ্বান করবেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির অমুক অমুক ধারায় এক, তিন ও সাত নম্বর আসামী অভিযুক্ত। ভারতীয় দণ্ডবিধির অমুক ধারার অমুক উপধারায় চার, ছয়, বার ও চৌদ্দ নম্বর অভিযুক্ত। এমন করে রজত সেন সতেরজন আসামীর বিরুদ্ধে সমস্ত অভিযোগ পাঠ করে গেলেন।

বক্তৃতায় যতি পড়ল। জজ-সায়েব চোখের চশমা নামিয়ে নথিপত্রের দিকে নজর দিলেন, জুরিরা তাদের সামনের কাগজে কি সব লিখল। জজ-সায়েব একে একে সমস্ত আসামীকে সম্বোধন করলেন, "তোমার বিরুদ্ধে যে সব অভি-যোগ এসেছে সে সম্বন্ধে কোন কিছু বলার আছে?" ধীরে ধীরে সবাই বলে, "না ধর্মাবতার, অভিযোগ মিথ্যা, আমরা নিরপরাধ।"

সাক্ষ্য শুরু হয়। অনেক সাক্ষী। কেউ খৃষ্টানদের সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রমাণে তার অভিজ্ঞতার বর্ণনা করে। কেউ কেউ হত্যাকাণ্ডের পর ঘটনাস্থলের বর্ণনা দেয়। দূর হতে তারা একটি দলকে পালাতে দেখেছে। তাদের মুখ চেনা সম্ভব নয় তবে তারা সুখদা গ্রামের দিকেই পালায়। ডাক্তার সাক্ষী দেন, কোন গুরুভার অস্ত্রের সাহায্যে আঘাত-জনিত মৃত্যু। আঘাতের কয়েক মিনিটের মধ্যে মৃত্যু বলেই মনে হয়। তবে দেহের অন্যান্য অংশেও সামান্য আঘাতের চিহ্ন বিদ্যমান। আরও অনেক সাক্ষী কাঠগড়ায় এলো, ঈশ্বরের নামে শপথ করে তাদের বক্তব্য জজ-সায়েবকে শোনানো হ'ল।

এবার প্রত্যক্ষদর্শিনীর সাক্ষ্য। পাবলিক প্রসিকিউটর রজত সেন জানালেন, "ধর্মাবতার, এবার এই নারকীয় ঘটনার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীকে আপনার সম্মুখে হাজির করব। তিনি পর্দানশীন হিন্দু রমণী।"

রাইমণি দেবী কাঠগড়ায় দাঁড়ালেন। রাইমণি দেবীর কিছুই দেখা যায় না। টানা ঘোমটা, যেন একটা শাড়ি ধীরে ধীরে সবার চোখের সামনে হাজির হ'ল। রাইমণি দেবীর ভয়ানক লজ্জা। অনেক প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকেন। আবার সাধতে হয় তখন আস্তে আস্তে উত্তর দেন। কোন প্রশ্ন মনঃপূত না হলে মাথাটা নড়ে ওঠে। চুড়ির ঠিনিঠিনি আওয়াজ হয়। রজত সেনের প্রশ্নপর্বের পর সায়েব উঠলেন। জেরা করতে হবে। একজন ইণ্টারপ্রেটার সায়েবের প্রশ্ন বাংলা করে সাক্ষীকে শোনান ও তাঁর উত্তর ইংরেজীতে জজ-সায়েবকে বলেন।

"রাইমণি দেবী, মৃত অঘোর রায় আপনার কে " সায়েব জিজ্ঞাসা করেন।

উত্তর—"আমার ভাসুর।"

"রাইমণি দেবী, আপনার বয়স কত?"

চুড়ির ঠিনিঠিনি আওয়াজ হয়, মাথাটা নড়ে ওঠে। ইণ্টারপ্রেটার বলে, ধর্মাবতার, উনি লজ্জা পেয়েছেন উত্তর দিতে চাইছেন না।

আবার প্রশ্ন, "রাইমণি দেবী, আপনার বয়স কত?"

আবার চুড়ির ঠিনিঠিনি। তবে উত্তর এল, "অনেক"।

"এই দাংগা যখন ঘটে তখন আপনি কি করছিলেন?"

"মুড়ি ভাজছিলাম।"

"তখন সময় কত?"

"আমাদের বাড়িতে ঘড়ি নেই।"

"তবু আন্দাজ।"

"সূর্য ওঠার ঘণ্টাখানেক পরে।"

রাইমণি দেবী ক্রমশ বললেন, ভয়ানক আওয়াজ শুনে তিনি বাইরে ছুটে আসেন। সত্তর-আশীজন লোক পাগলের মত ছুটে আসছে তাদের পাশের জমিতে। হাতে তাদের কতরকমের যন্তর। লাঠি-সোটা তো আছেই। একসংগে তাদের দেখেছেন তাই সকলের মুখ মনে রাখা সম্ভব নয়। তবে যারা কাছাকাছি ছিল রাইমণি দেবী তাদের মুখ ভোলেন নি।

"ওই যে ছ নম্বর আসামী, ওই আমার ভাসুরের হাত চেপে ধরে। চার নম্বর আসামী তাঁর চুলের মুঠিতে হাত দেয়। তিন নম্বর তখন লাঠি ঘুরিয়ে নাচছিল। দু নম্বর তার মুখে ঘুসি মারতে থাকে।" এসব রাইমণি দেবীর ছবির মত মনে আছে, খুব ভালভাবে মনে আছে। তারপর কোথা থেকে এক নম্বর আসামী তীরের মত ছুটে এল। হাতে তার কি একটা অদ্ভুত যন্ত্র। রাইমণি দেবী তার নাম জানেন না।

"সবাইকে সরিয়ে দিয়ে সে দুরন্ত পশুর মত সেই যন্ত্রটা দিয়ে আমার ভাসুরকে........." রাইমণি দেবী আর বলতে পারলেন না। কান্নার শব্দ শাড়ির আবরণ ভেদ করে কোর্ট-ঘরের সবার কানে এল। রজত সেন আত্ম-প্রসাদের হাসিতে পূর্ণ।

"রাইমণিদেবী, এবার আপনার সামনে একটি ছেলেকে হাজির করব।"

কোর্টের মধ্যে নরেনকে দেখা গেল। সে কাঠগড়ার খুব কাছে এগিয়ে এলো।

"ছেলেটিকে ভাল করে দেখুন, চেনেন কিনা।"

ঘোমটার ফাঁক হতে একটি তীব্র

দৃষ্টি নরেনের উপর এসে পড়ে। কিছুক্ষণ নীরবতা। "না, একে কখনো দেখিনি।"

"খুব ভাল করে দেখুন, সেদিনের ঘটনাস্থলে ছেলেটিকে দেখেছেন কিনা।"

"না দেখিনি।" রাইমণিদেবী দৃঢ়ভাবে জবাব দিলেন। সরকারপক্ষের সাক্ষ্য এই খানেই শেষ। লাঞ্চের পর সায়েব উঠলেন, "ধর্মাবতার, আমি মাত্র একটি সাক্ষী উপস্থিত করব।" জজ সায়েব চমকে উঠলেন, সরকারপক্ষে যেখানে পঁচিশজন সাক্ষী, সায়েবের মাত্র একজন? অসম্ভব। জুরিদের অবস্থাও তদ্রূপ।

"ইওর অনার, সাক্ষ্য গ্রহণের পূর্বে কয়েকটি কথা বলা প্রয়োজন। সাক্ষীর বক্তব্য অনেককেই চমকিত করতে পারে, অবিশ্বাস্য সন্দেহ আশ্চর্য নয়। এই মামলার আসল সত্য উদ্ধারের জন্য প্রথম হতে আমি আগ্রহশীল। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার এদেশে সব সময় প্রকৃত সত্যের প্রতি কোনপক্ষই যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করেন না। এদেশের বিচারকের পক্ষে তাই প্রকৃত সত্যকে মিথ্যা ও অভিভাষণের খাদ থেকে মুক্ত করা অতীব কঠিন এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অসম্ভব।"

নরেন কাঠগড়ায় দাঁড়াল। তার কঠিন দৃষ্টি, ভয়লেশহীন মুখাবয়ব।

"নরেন, এই হত্যাকান্ড সম্বন্ধে তুমি কি জান?"

"এই হত্যার জন্য দায়ি আমি নিজে, আমিই হত্যাকারী।" ঘরে যেন বাজ পড়ল। জজ সায়েব চমকে উঠলেন। জুরিদের ফোরম্যান নিজের অজান্তে বলে উঠলেন, "এ্যাঁ", রজত সেন কিংকর্তব্যবিমূঢ়।

"হ্যাঁ, আমিই খুন করেছি। সেদিন খুব সকালে আমার দুই কাকার সঙ্গে হিন্দুদের গাঁয়ে আমাদের নতুন জমিতে লাঙ্গল দিতে যাই। আমি নিজে চাষ করি না। শুধু শখ করে কাকাদের সঙ্গ নিই। সকালে খোলা জায়গায় ব্যায়াম আমার অনেক দিনের অভ্যাস। জমিতে এসে ছোট কাকা লাঙ্গল ধরলেন, মেজ কাকা হুঁকো টানতে লাগলেন। আমি একটু দূরে মুগুর ভাঁজতে থাকি। কিছুক্ষণ পরে মেজোকাকা লাঙ্গল ধরলেন, ছোটকাকার বিশ্রাম। জমির লাগোয়া যাঁদের বাড়ি সেই অঘোর রায় ছুটে এলেন। জমিতে লাঙ্গল চালানোয় তাঁর আপত্তি, এ জমির জন্য তিনি নাকি আগেই বায়না দিয়েছেন। ছোটকাকা মানতে রাজী নন। টাকা দিয়ে তাঁরা জমি নিয়েছে। কে আগে বায়না করেছিল তাতে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। ক্রমশ বচসা বেড়ে ওঠে। অঘোর রায় হঠাৎ ছোটকাকার পেটে সজোরে লাথি মারলেন। ছোটো কাকার চিৎকারে আমি দ্রুতবেগে ছুটে এলাম। অঘোর রায় ছোটোকাকার বুকের উপর বসে কাকার গলা টিপে ধরার চেষ্টা করছে। আমি আর সহ্য করতে পারলাম না, দুরন্ত রাগে কোন্ সময় ডান হাতের মুগুরটা অঘোরের মাথায় বসিয়ে দিয়েছি। অঘোর মাটিতে শুয়ে পড়তে সম্বিত ফিরে পেলাম। একি, কি করেছি! অঘোরের নাক দিয়ে রক্তের নদী বইছে। তার দেহ নিশ্চল। লাঙ্গল নিয়ে আমরা তিনজন দ্রুতবেগে পালালাম।

তারপর পুলিসের অনুসন্ধান। আমাদের গ্রামের প্রায় সবাইকে হাজতে নিয়ে যায় শুধু আমিই কেমন করে বাদ পড়ে যাই। আমি তখন পাশের গ্রামে বোনের বাড়ি।"

কোর্টঘর নিস্তব্ধ। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে হত্যাপরাধ স্বীকার, এর আগে কেউ দেখেনি। ছেলেটির আইনের হাতে পরিণামের কথা কল্পনা করে অনেকে শিউরে ওঠে। আহা রে, কতই বা বয়েস।

সায়েব আবার দাঁড়ালেন। "ধর্মাবতার, আমি আর কোনো সাক্ষী উপস্থিত করব না।" আসামীপক্ষের মামলা এইখানেই শেষ।

জজ জুরিদের দিকে চাইলেন। ধীরে ধীরে মামলার সব খুঁটিনাটি ব্যাখ্যা করার কর্তব্য তাঁরই, দোষী নির্দোষ নির্ধারণের ভার জুরিদের রুদ্ধদ্বার আলোচনার জন্য জুরিরা কোর্টঘর ত্যাগ করলেন। অধীর আগ্রহে সকলে প্রতীক্ষারত। তাঁদের ক[illegible] দেরী হবে কে জানে?

কিন্তু বেশী দেরী হয় না। মাত্র প[illegible] মিনিট। জুরিরা ফিরে এসেছেন, জুরিদে[illegible] ফোরম্যান উঠে দাঁড়ালেন। মিস্ট[illegible] ফোরম্যান, এন্ড দি জেন্টলমেন, অ[illegible] দি জুরি, হ্যাভ ইউ কাম টু এ ডিসিশন[illegible]

"ইয়েস ইওর অনার।"

....

"নট্ গিল্টি।" আসামীরা মুক্ত।

কোর্টের বাইরে সবার মুখে হা[illegible] এমন সময় নরেনের বাবা এগিয়ে এ[illegible] কাঁদতে আরম্ভ করে। "কিন্তু আমার সর্বনাশ হলো। নরেনের তো ফাঁসি হ[illegible] যাবে।"

সায়েব হাসলেন, "আমাদের সৌভ[illegible] আপনার ছেলে সেদিন পুলিসের হাতে পড়েনি। কিন্তু এখন কোন ভয় নেই। [illegible] মাত্র আসামীর স্বীকারোক্তির বলেই [illegible] শাস্তিবিধান আইনসঙ্গত নয়। [illegible] সাক্ষ্যেরও কোন সম্ভাবনা নেই। ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী রাইমণি[illegible] পূর্বাহ্নেই আদালতে বলেছেন নরে[illegible] ঘটনাস্থলে তিনি দেখেন নি।" সুতর

চিত্রগ্রীব

আর্টিস্ট্রী হাউসে ফণিভূষণের চারু ও কারু শিল্প প্রদর্শনী হয়ে গেল কয়েক-দিন আগে। যাঁরা গত বছর এবং এ বছর কলকাতার মিউজিয়মে শিশু উৎসব দেখেছেন, তাঁরা ফণি-ভূষণের চিত্রকলার সঙ্গে ইতিমধ্যেই

রাজপুত্র ও পক্ষীরাজ

পরিচিত হয়েছেন। চিলড্রেন্স লিট্‌ল থিয়েটারের মঞ্চসজ্জা ছিল এই ফণি-ভূষণেরই কীর্তি। ফরাসী চিত্রধারার একঘেয়ে অনুকরণে আঁকা ছবির প্রদর্শনী দেখতে দেখতে ক্লান্তি এসে গিয়েছিল। ফণিভূষণের এই খাঁটি দেশী শিল্পকলার প্রদর্শনীটি সত্যিই সে ক্লান্তি দূর করেছে। ঘরে ঢুকেই মনে হ'ল যেন কোন রূপকথার রাজ্যে এসে ঢুকেছি। এমন নন্দন রূপসৃষ্টি করতে এর আগে খুব কম শিল্পীকেই দেখেছি। বিদেশী চিত্র-ধারার অনুকরণ না করেও যে বলিষ্ঠ শিল্প সৃষ্টি করা যায়, তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত ফণিভূষণের চিত্রকলা।

রঙ্গীন ছবি, স্টেনসিল কাট, লুমি-প্রিণ্ট, চিকন কর্ম, প্ল্যাসটিকের ওপর নক্সা, সিমেণ্টের মূর্তি, পাটকাঠির মূর্তি, চিত্রিত কুলা প্রভৃতি সবশুদ্ধ প্রায় সত্তরটি শিল্পকর্ম প্রদর্শিত করা হয়েছিল। লুমি প্রিণ্ট জিনিসটি একটি নতুন গ্রাফিক আর্ট। ব্যাপারটি কি সংক্ষেপে বলি, প্রথমে কাঁচের উপর বা স্বচ্ছ প্ল্যাসটিকের উপর কালো কালী দিয়ে নক্সা করে নিতে হবে। তারপর ফটোর নেগেটিভ থেকে যেমন-ভাবে সূর্যরশ্মি অথবা আর্ক ল্যাম্পের সাহায্যে কাগজে ছাপা তোলা হয় ঠিক সেইভাবে ঐ নক্সাকরা কাঁচ বা প্ল্যাসটিক থেকে ছাপ তুলতে হবে। ঐ ছাপ ফটোর মত ইচ্ছানুযায়ী বড় বা ছোটও করা যায়। এই প্রণালীর নাম হ'ল লুমি প্রসেস। ফণিভূষণ আরও একটি নতুন জিনিস

দুয়োরাণী

দেখিয়েছেন তা হ'ল পাটকাঠির মূর্তি। একটু তফাৎ থেকে দেখলে মনে হয় ঠিক যেন হাতীর দাঁতের কাজ। ফণিভূষণ কোনও স্কুল বা কলেজ থেকে নিয়মিত-ভাবে শিল্পবিদ্যা আয়ত্ত করেননি। সেই

পুতুল-নাচ

কারণে কোন বিশেষ স্কুলের অঙ্কনরীতির ছাপ এঁর ছবি থেকে প্রকাশ পায় না। তবে কিছুটা যামিনী রায়ের প্রভাব এঁর উপর পড়েছে। প্রধানত বাঙ্গলাদেশের লোকশিল্পের দিকে এঁর ঝোঁক। কালী-ঘাটের পট, খেলনা ইত্যাদিই হ'ল এঁর অনুপ্রেরণার উৎস। আবার কিছু ছবি এঁকেছেন কাশীর বিশ্বনাথের গলির কাঠের খেলনার আকৃতির অনুসরণে যেমন, 'বাছুর', 'বাঘ', 'হস্তীশিশু' ইত্যাদি। রাজপুত চিত্রধারার সঙ্গে বাঙ্গলা-দেশের পটশিল্পের সংমিশ্রণ ঘটিয়েও কয়েকটি অতি মনোরম রচনার সৃষ্টি করেছেন। কয়েকটি ছবিতে চীনা ছবির

সাদৃশ্য আছে। এই প্রদর্শনীর বেশীর ভাগ ছবি শিশুদের আনন্দ দান করার জন্যই রচনা করা হয়েছে। "ছবির রেখা এবং রঙ এমন সরল হবে যা শিশুরা সহজেই অনুকরণ করতে পারবে, তবেই না শিশুদের মনে ধরবে সে ছবি"—এই লক্ষ্য ফণিভূষণ তাঁর ছবিতে সব সময় বজায় রেখে গেছেন। চিলড্রেন্স লিট্‌ল থিয়েটারের মঞ্চসজ্জার জন্য অঙ্কিত ছবির মধ্যে সবচেয়ে ভাল লাগল, 'লাল ঘোড়া', 'পাগলা ঘোড়া', 'ঘোড়সওয়ার', 'পুতুলনাচ',

গুহাভিমুখে

'হাতীসওয়ার,' 'দুয়োরাণী' 'আবোল তাবোলের একটি দৃশ্য' এবং 'ক্ষীরের পুতুলের একটি দৃশ্য'। ওয়াশ ছবিগুলির মধ্যে 'স্নানের ঘাট' এবং 'মা ও শিশু' সবচেয়ে বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'ধূমপান' নামক ছবির চরিত্রটির বাঁ হাতের চেটোটি বেমানান রকম ছোট হয়ে গেছে। তা ছাড়া তুলির আঁচড়েও দুর্বলতা ধরা পড়ে। এ ছবিটি এই প্রদর্শনীতে স্থান পাবার উপযুক্ত মোটেই হয়নি। ফণিভূষণের অসাধারণ কারিগরী প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়, তাঁর পাটকাঠির মূর্তিগুলি থেকে। বিশেষ করে কৃষক মূর্তিটির তুলনা হয় না। তবে সিমেণ্টের মূর্তি, 'স্তন্যপান' খুব নিপুণ হলেও অভিনব নয়। স্টেনসিল কাট ছবিগুলিও বেশ আনন্দ দান করে

ফণিভূষণ যে অসাধারণ শক্তিশালী শিল্পী সে কথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি। শিশুশিল্পে তাঁর দোসর নেই। বাঙলাদেশের চিত্রকলার নষ্ট গৌরব পুনরুদ্ধার করতে হলে এ ধরনের শিল্পীরও যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। দ্বিধাহীন অভিনন্দন ফণিভূষণের অবশ্যই প্রাপ্য।

* * *

বাঙলাদেশের কয়েকজন খ্যাতনামা শিল্পীর রেখাচিত্র সংগ্রহ ক'রে ইউনাইটেড স্টেটস অব ইনফরমেশন সার্ভিস একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইউসিস-এর অডিটোরিয়ম হলে। যাঁদের ছবি প্রদর্শিত করা হয়েছিল, তাঁরা হলেন, নন্দলাল বসু, গোপাল ঘোষ, প্রদোষ দাশগুপ্ত, ফণিভূষণ, মাখন দত্তগুপ্ত, রথীন মৈত্র, শুধা মুখোপাধ্যায়, রমনভাই ভগত, গারট্রুড সিংহ, সুনীলমাধব সেন, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাণকৃষ্ণ পাল এবং বর্ধমান ও কালীঘাটের কয়েকজন পটুয়া।

এই প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল নন্দলাল বসুর ছবিগুলি। গোপাল ঘোষ ও মাখন দত্তগুপ্তও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কালীঘাট ও বর্ধমানের পটুয়াদের অত্যন্ত সরল ছবিগুলি বেশ আনন্দদান করেছিল। কোনও বাঙালী যদি কষ্ট ক'রে বিদেশী ভাষা শিখে, সেই ভাষায় কবিতা লেখেন তা যেমন দাঁড়ায়, এখানে প্রদর্শিত 'এক্সপ্রেশনিস্ট' ছবিগুলি কতকটা সেই রকম। কয়েকটি এমন ছবিও প্রদর্শিত করা হয়েছিল, যা ৫।৬ বছরের শিশু কর্তৃক অঙ্কিত বললেও বোধ হয় দর্শকেরা আশ্চর্য হতেন না।

নিউইয়র্ক পাবলিক লাইব্রেরীর প্রিণ্ট এবং স্পেন্সর কালেকশন-এর কিউরেটর মিঃ কার্ল কুপ এই প্রদর্শনীর উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন। ইনি ভারতে এসেছেন এমন কিছু প্রাচ্য নক্সা বাছাই করে নিয়ে যেতে, যা স্ফটিক কাঁচের উপর এনগ্রেভ করা চলবে। আমেরিকার স্টুবেন গ্লাস কোম্পানী সেই ভার দিয়েছেন তাঁর উপর।

প্রবন্ধ-সাহিত্য

বৃষ্টি এল—প্রেমেন্দ্র মিত্র। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড। ১২, বঙ্কিম চাটুয্যে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম ২, টাকা।

খুব বেশী ভরসার কথা, বাঙলা ভাষার পাঠকসাধারণ সম্প্রতি সাহিত্য পাঠের দিকে একটু বিশেষভাবে ঝুঁকছেন। তার অর্থ, সাহিত্য পাঠের মান এমন একটা উন্নত স্তরে উঠছে যাতে অনুমান করা যায় সাহিত্যযশঃপ্রার্থী তথাকথিত লেখকরা আর হঠাৎ চমক-জাগানো নতুন কিছু দিয়ে খুব সহজে পাঠকদের ঠকাতে পারবে না। কবিতা বা কথা-সাহিত্য জনমনে আনন্দ দেয়, তাদের প্রবৃত্তিকে বিভিন্নরূপে উদ্বুদ্ধ করে, এ-সংবাদ সর্বজনবিদিত সত্য, কিন্তু পদ্য মানেই কবিতা নয়, কাহিনী মানেই কথাসাহিত্য নয়, এ-কথাটা সম্যকভাবে বুঝতে না পারলে সাহিত্যও মর্যাদা হারায়, পাঠকমনেরও বিভ্রান্তি ঘটে। সমালোচনা-সাহিত্য এ মান নির্ণয়ে খানিকটা সাহায্য করে সত্য, কিন্তু সাহিত্যের মূলে প্রকৃতিসন্ধান দেওয়া তার ক্ষুদ্র ক্ষমতার পক্ষে সম্ভব নয়। তাই, একদিকে যেমন কাব্যসাহিত্য গড়ে উঠতে থাকবে তেমনি অন্যদিকে যদি বিশদরূপে তার গতি-প্রকৃতির সন্ধান পাঠকসাধারণ না পায়, তবে সে-সাহিত্যের স্বরূপ নির্ধারণে তার অক্ষমতা সাহিত্যের গতিকেই এক সময়ে রুদ্ধ করে দেবে এবং এ-জন্যেই সে-সাহিত্য যত বেশী উন্নত হয়ে উঠেছে দেখা গেছে, তার পাশাপাশি সাহিত্যপ্রবন্ধ রচনা করে সাহিত্যিকরা তার গতিপ্রকৃতি বা তার স্বরূপ নির্ধারণের কাজেও সমানভাবে ব্যাপৃত থেকেছেন। ফলে, স্পষ্টই দেখা গেছে, উন্নত রুচিবোধ নিয়ে যে পাঠককুল সৎসাহিত্যকে চিনে নিতে পারে, প্রবন্ধসাহিত্যের সুষ্ঠু বিচারবোধ তাঁদের সেই উন্নত রুচিকে তৈরী করে তুলছে। নিজের দেশের দৃষ্টান্তই দেওয়া যাক। বঙ্কিমচন্দ্র একজন উঁচু দরের সাহিত্যিক ছিলেন, বলতে লজ্জা নেই, ইংরেজ আমলের শিক্ষিত প্রজা হয়েও, এ-সংবাদটা আমাদের জানতে অনেক বেশী দেরি হয়ে যেতো, বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই আমাদের যদি না জানিয়ে দিতেন উঁচু দরের সাহিত্য কাকে বলে। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাঙলা সাহিত্য ছিলো, কিন্তু সাহিত্য বিচার ছিলো না, তাই পুনরাবৃত্তির পুনরাবৃত্তিতে আমাদের সাহিত্য যত স্ফীতকায় হয়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছে, ক্রমশ উন্নততর স্তরে উঠে বিদগ্ধ সাহিত্য হয়ে ওঠার তত সুযোগ সে পায়নি। অথচ আশ্চর্য, সে-তুলনায় বঙ্কিম-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের আয়ু আজ পর্যন্ত যৎসামান্য হওয়া সত্ত্বেও তার অগ্রগতি তথা উন্নতি ঘটেছে ঢের বেশী। বলা বাহুল্য, সাহিত্য-জিজ্ঞাসাই এ-অঘটন ঘটিয়েছে। আসল কথা, সাহিত্য এবং সাহিত্য-প্রবন্ধ ভিন্ন পথগামী দুটি ধারামাত্র নয়, তারা একে অন্যের পরিপূরক।

সাহিত্য-প্রবন্ধ বা সাহিত্যালোচনা কেবলমাত্র যে কোনো একটি সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিরই সন্ধান দেয় তা-ই নয়, তার মান নির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ রুচিবোধেরও বিবর্তন ঘোষণা করে। তা যদি না হয়, তবে পৌনঃপুনিকতার মোহগর্ত থেকে সাহিত্যকে উদ্ধার করে পাঠকমনে সৎসাহিত্য পাঠের অনিবার্য আস্বাদন-স্পৃহাকে জাগিয়ে তোলা সম্ভব হতো না। জগৎ এবং জীবনকে নিয়ে যখন সাহিত্যের কারবার, তখন তাদের সূক্ষ্ম বা স্থূল পরিবর্তনও তার পরিক্রমার অধীন, এ-কথার সত্যতায় কারো আজ আর সন্দেহ নেই; কিন্তু কোনো কিছুরই আবয়বিক বা স্পর্শগ্রাহ্য পরিবর্তনে কোনো সাহিত্যের চরিত্র চিহ্নিত হয় না, হয় তার অন্তঃশীল প্রকৃতির ধারাপ্রবাহে। মোটামুটি সাহিত্য পাঠেই যাদের আনন্দ, এই প্রকৃতিটিকে অনুভব করা তাদের পক্ষে অসম্ভব। অথচ, কাব্যই হোক বা কথা-সাহিত্যই হোক, তারা সদর্পে রূপক হওয়ার ফলে তাদের আবেদন খানিকটা তির্যক এবং এই জন্যেই জগৎ এবং জীবনের সঙ্গে কোনো সাহিত্যের সত্যিকারের যোগাযোগটা কোনখানে কিংবা তা আদৌ আছে কিনা তার সন্ধান পাওয়া সেই নিতান্তই আনন্দলিপ্সু পাঠকের পক্ষে সম্ভব নয়। এমনকি, বললে বোধ হয় বাড়াবাড়ি হবে না, এই আনন্দও প্রকৃত রসাস্বাদনের ভগ্নাংশমাত্র। পাঠকমনে অবিভাজ্য আনন্দ-জাগানোর দিকথেকে আলোচনা-সাহিত্যের দায়িত্ব প্রায় সবখানি। তার বিশেষ সুবিধা এই যে, কাব্য বা কথাসাহিত্যের মতো তার আবেদন তির্যক নয় বরং স্পষ্ট আর সোজাসুজি। স্থূল হোক, সূক্ষ্ম হোক, কাব্য বা কাহিনীর অন্তর্লীন ভাবনাধারণা যখন আলোচনা-সাহিত্যের স্পষ্টবাদিতায় স্বচ্ছরূপে ধরা পড়ে, তখন আর তার আসল রূপটিকে চিনে নিতে কোনো পাঠকেরই কষ্ট হয় না। কিন্তু বিজ্ঞানের শিক্ষা যখন জগৎ ও জীবনের নিত্যপরিবর্তনশীলতাকে জানবার সুবিধা আমাদের দিয়েছে, আমরাও তখন সেই পরিবর্তনের সমকক্ষ হয়ে এগিয়ে চলেছি আমাদের রুচিবোধের ক্রমশ বির্তন সাধন করে। তাই, পরিবর্তমান প্রকৃতির সাহিত্যরূপকে চিনতে আমদের ভুল হয় না। সাহিত্যের আনন্দের ভোজে আলোচনা-সাহিত্যের ক্রিয়া-কাণ্ড নেপথ্যে হলেও, অখণ্ড আনন্দদানের কৃতিত্ব বস্তুত তারই।

সাহিত্য-প্রবন্ধ সম্বন্ধে একটু বিশদ আলোচনা করতে হলো কেবলমাত্র এই জন্যে নয় যে, প্রেমেন্দ্র মিত্রের সদ্যপ্রকাশিত 'বৃষ্টি এল' সংকলন গ্রন্থের অধিকাংশ রচনা সাহিত্য বা সাহিত্য সম্পর্কিত, তা ছাড়াও বড় কারণ হচ্ছে গ্রন্থের সবকয়টি রচনাই সুন্দর ও সার্থক। ভূমিকায় আলোচিত বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে বিচার করলে দেখা যাবে, যা মোটামুটি বিস্তৃতভাবে বলবার চেষ্টা করেছি, লেখক তার চেয়েও অনেক বেশী কিছু বলেছেন এবং আরও অনেকখানি ইঙ্গিতও দিয়েছেন মাত্র কয়েকটি প্রবন্ধেই। যে-কোনো একটি প্রবন্ধের দৃষ্টান্ত নিলেই এ-কথার সত্যতা প্রমাণিত হতে পারে।

> "শুধু স্বাচ্ছন্দ্যের দেশের দোষটাই বা ধরি কেন, সমস্ত দুনিয়াই তো এক পথের পথিক; কেউ একটু এগিয়ে কেউ সামান্য পিছিয়ে। শৃঙ্খলা বাড়ছে হয়তো, বাড়ছে স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা, শুধু ছোট হয়ে আসছে বুঝি মন, শেখানো বুলি আর ধরানো অভ্যাসের গাঁথা দেওয়ালে।
>
> সেই ছোট মনের বায়না মেটাতে খবরের কাগজের পাতার সংখ্যা বাড়ছে, আর আসল নয়, নকল সাহিত্যের কাগজও যে ছোট হতে শুরু করেছে আকারে, এটাও লক্ষ্য করার মতো। এ কাগজ অনায়াসে পকেটে ভরা যায়, এক হাতে পাতা উল্টে পড়া যায়। লেখাও তার চুটকি, ধৈর্যের পরীক্ষা করে না, পাঠকের বোধ-বিচারের দাবি তার সামান্যই।"

একেবারে প্রথম প্রবন্ধ থেকেই এ অংশটা নেয়া হয়েছে। মাত্র কয়েক পংক্তির সীমানার মধ্যে লেখক যে একটি বহু-বিস্তৃত পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যকে বিচার করে দেখতে চেষ্টা করেছেন এবং তার খাঁটি চেহারাটারও মোটামুটি একটা হদিশ দিতে পেরেছেন, আশা করি এ-কথাটা সকলেই মানবেন। এই সামান্য কয়েকটি উক্তির সীমা অতিক্রম করে পাঠকমন সহজেই অতীত সাহিত্যধারারও একটা হিসাব নিশ্চয়ই ঠিক করে নিতে বাধ্য হয়। তা না হলে সাম্প্রতিক সাহিত্যধারাকে চিনবার পক্ষে এই সামান্য

কয়েক পংক্তিই যথেষ্ট হতো না। (এই ইঙ্গিত-আভাস, বলা বাহুল্য, প্রেমেন্দ্র মিত্রের স্বাভাবিক রচনা-কৌশল।) কিন্তু এইখানেই যদি তিনি এ-প্রসঙ্গ শেষ করে দিতেন, তা হলে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর অপূর্ণতায় আমরা হতাশ হতাম; তা নয়, শেষ পর্যন্ত পরম মহত্ত্বের কাছে সর্বসমর্পণের আভাস দিয়ে সাহিত্যশিল্পেরই যেন জয়গান করেছেন তিনি ঃ

> "কোনো এক শতাব্দীর দারুমঞ্চের সভ্যতায় নাই বা রইলাম সুসংবাদরূপে আমরা মুদ্রিত; তার চেয়ে মহাকালের ব্যর্থ জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল জীবন-পিপাসা হয়েই যদি লুপ্ত হয়ে যেতে হয়, তাই যাব।"

একজন খাঁটি সাহিত্যিকের বোধ হয় এই-ই পরম মর্মবাণী।

কাল প্রবাহের সঙ্গে সাহিত্যধারার প্রাক্তন যোগাযোগটাই বড় কথা নয়, সে-সঙ্গে চলতি কাল এবং চলতি কালের ধ্যানধারণার হিসাব-নিকাশ নেওয়াও সাহিত্য-জিজ্ঞাসার অপরিহার্য অঙ্গ সন্দেহ কি। এবং সে হিসাব নিতে গিয়ে যদি কোনো ভুলত্রুটি বড় বেশী স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে যায়, কিংবা যদি ধরা পড়ে যে, কোনো আপাতবিশুদ্ধতার অন্তরালে এমন কোনো অনভিপ্রেত সংকেত উপ্ত হয়ে আছে, যা সম্ভাবিত পরিণতিতে সমগ্র সাহিত্যকেই একদিন কলঙ্কিত করে তুলতে পারে, তা হলে সাহসের সঙ্গে সত্য পথের নির্দেশ দিয়ে সেই অবাঞ্ছিত পরিণতির হাত থেকে সাহিত্যকে রক্ষা করতেই হবে। এ-কাজ সাহিত্যিক মাত্রেরই। প্রেমেন্দ্র মিত্র অকুণ্ঠিত চিত্তে সে-সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, সভা ও সাহিত্য প্রবন্ধে। সন্দেহ কি, এ-প্রবন্ধ পাঠের পর কেউ কেউ বিরক্তি প্রকাশ করবেন লেখকের প্রতি, কিন্তু বলে রাখা ভালো, তাতে লেখকের কিছুমাত্র ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, ক্ষতি তাদেরই, যারা সময় থাকতেও অন্যায় অজ্ঞানতাকে (বোধ হয় অসত্যকেও) মিথ্যা প্রশ্রয় দিয়ে ভবিষ্যৎকে আচ্ছন্ন করে রাখার সুযোগ দিচ্ছেন।

সাহিত্যিক-পরিচিতি প্রসঙ্গে এ সংকলনে যে-কয়টি রচনা স্থান পেয়েছে, এ-গ্রন্থের পক্ষে কেবল নয়, সাম্প্রতিক কালের বাংলা সাহিত্যের পক্ষেই তারা অমূল্য সম্পদ। পুনর্মূল্য নির্ধারণের নামে শরৎচন্দ্রের সাহিত্য সম্পর্কে কেউ কেউ আলোচনা করছেন আজকাল গ্রন্থে ও বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়। তাতে লক্ষ্য করেছি, অনেকেই যেন তাঁর প্রতি যথেষ্ট শ্রদ্ধাশীল নন, ফলে অনেক ক্ষেত্রে তিনি তাঁর প্রাপ্য সম্মানটুকু থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। অথচ শরৎচন্দ্র এবং আমরা এর ভিতর কালের ব্যবধান এমন কিছু বৃহৎ নয় যে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যেই আমরা তাঁর সম্বন্ধে একেবারেই ভিন্ন মত পোষণ করবো। মনে হচ্ছে, সমগ্রভাবে শরৎচন্দ্রকে বোঝার চেষ্টাই আমরা আজকাল করছি না। ব্যক্তিগত জীবনের দ্বৈত সত্তার মধ্য থেকে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের দ্বৈত-অভিব্যক্তিকে আবিষ্কার করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র তাঁর স্বকীয় দৃষ্টিভঙ্গীর প্রাঞ্জলতায়। এবং তাঁর ফলে শরৎ সাহিত্য সম্বন্ধে মীমাংসায় এসে তিনি পৌঁছেছেন, মনে হয়, সে সম্পর্কে সমস্ত ভ্রান্তি নিরসনের পক্ষে তাই সবচেয়ে সহজ এবং শেষ কথা ঃ

> "বহু মধুর সমাধানের আশ্চর্য ইঙ্গিত আমরা যেমন তাঁর কাছে পেয়েছি, তেমনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত যে সমস্ত সুতীক্ষ্ম প্রশ্ন সাহিত্য-জীবনে নির্ভীক-ভাবে তুলে ধরেছেন, তার কথা যদি আমরা ভুলে যাই, তা'হলে তাঁর স্মৃতির যথার্থ মর্যাদা আমরা দিতে পারবো না।"

সাহিত্যকে যিনি সত্যি-সত্যি শ্রদ্ধা করেন, সাহিত্যিককে প্রাপ্য মূল্য দিতে তাঁর কুণ্ঠার কারণ নেই। এই জন্যেই বিভূতিভূষণ প্রসঙ্গেও তিনি শ্রদ্ধাবনত, সহানুভূতিশীল।

বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সঙ্গে বেশী করে ঘনিষ্ঠ হয়েছি, তাদের সাহিত্য মারফৎ এবং তা মূল ইংরেজী আর ইংরেজী তর্জমায়। অন্যপক্ষে বাংলা দেশে এমন অনেক পাঠক আছেন, যাঁরা ইংরেজী বই পড়তে সুবিধা বোধ করেন না কিংবা ইংরেজী পড়তে পারেন না। ভাবতেও ভালো লাগছে, আমাদের দেশের সাহিত্যিকরা তাঁদের অবহেলা করে দূরে সরিয়ে রাখেননি। ফলে এই কয়েক বৎসরে প্রচুর সংখ্যক অনুবাদ-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ভাষায়। সে-সব মূল লেখকদের মধ্যে আছেন ডি এইচ লরেন্স আর সমরসেট মমও। নানা কারণে এ-দুজন লেখক ইংরেজী সাহিত্যে প্রথিতযশা, কিন্তু তাঁদের রচনা আমাদের দেশে বহুপঠিত হলেও এখনও বহু আলোচিত নয়। সুতরাং যাঁরা বাংলা অনুবাদের মাধ্যমেই তাঁদের চেনেন, তাঁদের সাহিত্যের চরিত্রবৈশিষ্ট্যও যখন তাঁদের জানা দরকার, তখন তাঁদের সাহিত্য সম্বন্ধেও বিশদ আলোচনা হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু শুধু তাই-বা কেন, আজ যখন তুলনামূলক মানদণ্ডে আমরা আমাদের দেশের সাহিত্যিকদেরও বিচার করি, তখন বিদেশী লেখকদের রচনা সম্বন্ধেও বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন আছে বৈকি। এ দুটি কারণেই প্রেমেন্দ্র মিত্রের আলোচনা-গুলি সময়োচিত এবং সঙ্গত হয়েছে। প্রসঙ্গত 'একটি স্বাক্ষর' প্রবন্ধটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই জন্যে যে, চেস্টরটন আমাদের দেশে বহু আলোচিত তো ননই, ব্যাপকভাবে পঠিত নন। অথচ ইংরেজী সাহিত্যের এই প্রতিভাবান দিকপাল সাহিত্যিকটিকে জানা যে-কোনো দেশের সাহিত্য-পাঠকদের প্রয়োজন। যতদূর মনে হয়, প্রেমেন্দ্র মিত্রই প্রথম তাঁকে আমাদের সঙ্গে আমাদের ভাষার মাধ্যমে পরিচিত করে দিলেন।

কয়েকটি ব্যক্তিগত প্রবন্ধকেও জায়গা দেওয়া হয়েছে এ-সংকলনে। সাধারণত এ-ধরনের রচনায় যে লঘু আমেজের কথা আমাদের আগে মনে আসে সে-আমেজের স্বাদ যদিও পাওয়া যায়, 'কুঁড়েমি' আর 'ভাবী কাগজের কৈফিয়ৎ'এ তথাপি স্বকীয় বিচার-বোধ দিয়ে তিনি সমাজকে এবং সাধারণ মানুষের মনকেও খুঁজে দেখতে চেষ্টা করেছেন। তার জন্য দু একটি কঠিন কথা উচ্চারণ করতেও তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি। প্রচলিত অনেক ধারণাকেই তিনি আঘাত করেছেন, কিন্তু বলেছেন বড়ো চমকপ্রদ ভাষায় ঃ দু-একটা দৃষ্টান্ত দেবার লোভ সম্বরণ করতে পারিলাম না ঃ

> "মহাকবিদের যৌবন-প্রশস্তি পড়ে যদি এই ধারণা আমাদের হয়ে থাকে যে, যৌবন মানে এমন একটা উচ্ছৃঙ্খল উন্মত্ততা, যার হ্রস্বদীর্ঘ অগ্রপশ্চাৎ জ্ঞান নেই এবং কোনো সংযম কোনো দায়িত্বের ধার যা ধারে না, তা'হলে সত্যিই আমাদের দুর্ভাগ্য। সত্যিকার যৌবনের সংযত শক্তির সঙ্গে যাদের কোনো দিন পরিচয় হয়নি, যৌবন সম্বন্ধে এই মিথ্যা কিম্বদন্তী তারাই রটনা করে এসেছে।" (হোলি)

> "মানুষের কল্যাণের চেয়ে স্নানের পুণ্য যদি বড়োও হয় মনে করি তবু মর্ত্যের প্রয়োজনে স্বর্গের শ্রেষ্ঠ সৌভাগ্যকে বিসর্জন দেবার কি সময় আসেনি।" (অর্ধোদয় যোগ)

প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে পরিচিত হননি এমন পাঠক বোধ করি বাংলা দেশে আজ আর কেউ নেই। কিন্তু তাঁর প্রবন্ধ-পাঠের সৌভাগ্য হয়তো সকলের ঘটেনি। এতদিন তিনি হঠাৎ কখনও কখনও এখানে-সেখানে বিক্ষিপ্ত-ভাবে কিছু কিছু প্রবন্ধ রচনা করে এসেছেন এবং সংখ্যায় তার এত কম যে, প্রবন্ধ লেখক হিসেবে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে অনুধাবন করার সুবিধাও হয়নি কিন্তু 'বৃষ্টি এল' কারো হাতে পড়লে তিনি অবাক হয়ে দেখবেন, গল্প বা উপন্যাসের

মতো প্রবন্ধ রচনার ব্যাপারেও তিনি নিজস্ব একটা ঢং (তাকে কৌশলই বলা সঙ্গত) আছে, যার দৌলতে পাঠকমন মুহূর্তে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়তে বাধ্য হয়। 'সাহিত্যের উপকরণ', 'খোকার খেলনা' কিংবা 'নির্জন বাস' প্রবন্ধ কয়টির রচনা-কৌশল বাংলা সাহিত্যে এর পূর্বে আর কোনো রচনায় দেখা গেছে বলে তো কই মনে পড়ে না।

শেষ কথা হলেও সবচেয়ে বড়ো কথা, সাহিত্যপাঠের প্রয়োজন মেটানোর আগে দরকার সাহিত্যশিক্ষার এবং 'বৃষ্টি এল' সে শিক্ষাই দেয়। ৫৪৮।৫৪

কিশোর সাহিত্য

পেনাঙ-এর পাহাড়ে—লেখকঃ শ্রীদক্ষিণা-রঞ্জন বসু। প্রকাশক ঃ বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লিমিটেড। দাম ঃ বারো আনা। পৃষ্ঠা ঃ ৫১।

ভারত মহাসাগরের বুকে একটা জলপদ্মের মত ফুটে উঠেছে ছোট্ট দ্বীপভূমি পেনাঙ। কাইচিয়া দম্পতী অবসর মুহূর্তগুলিকে চারপাশের অবারিত সমুদ্র আর সীমানাহীন আকাশের প্রীতি দিয়ে সরস করে নেবার জন্য এলেন পেনাঙে। তারপর একটি চারু দর্শন বাংলো ভাড়া করলেন জুলিয়ান হ্যারি নামে একজন ভদ্রলোকের কাছ থেকে। আশ্চর্যের ব্যাপার, বাংলো থেকে অদৃশ্য কণ্ঠের ছড়া ভেসে আসে।

অদৃশ্য কণ্ঠের রহস্য শেষ পর্যন্ত গ্রন্থি-মুক্ত হলো। ভৌতিক কোন ক্রিয়াকলাপ নয়। জুলিয়ান হ্যারিই জঙ্গু ডাকাতের সাহায্যে লোকলোচনের আড়ালে থেকে ছড়া কাটতেন; তারপর ভয়ে গত-চেতন ভাড়াটেদের জিনিস-পত্র লুঠ করতেন।

প্রাকযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর পেনাঙএর ছবি লেখক অপরূপ কলালাবণ্যে এঁকেছেন। লেখকের ভাষা সুন্দর; ঘটনা-গ্রন্থন মনকে একটা গতিশীল গল্প স্রোতের সঙ্গে পরিণতির দিকে টেনে নিয়ে যায়। সু-চেন, মিসেস কাইচিয়া, মুনিয়া চাকর চরিত্রগুলি মনে রাখার মত। মিঃ কাইচিয়ার সাহস কিশোর পাঠকের চেতনাকে নিঃসন্দেহে অভিভূত করে রাখবে। তবে গল্পের পরিণতি অনেকটা আকস্মিক মনে হয়। লেখক এ সম্বন্ধে একটু সচেতন থাকলে আরো সার্থকতা লাভ করতে পারতেন।

ছাপা, বাঁধাই, প্রচ্ছদ রহস্য কাহিনীর উপযোগী হয়েছে। ৫১০।৫৪

নাটক

সাতটা থেকে দশটা—শ্রীশম্ভুনাথ ভদ্র। প্রকাশক ঃ সোয়ান বুক্স। দাম এক টাকা।

- সাতটা থেকে দশটা। মাত্র এই তিনটি ঘণ্টা সময়ের বৃত্তরেখায় নাটকটির পরিকল্পনা। এই সামান্য সময়টুকুর মধ্যে বিভিন্ন আঘাতে আঘাতে একজন ব্রতী বিজ্ঞানসাধকের সাধনা বিধ্বস্ত হয়ে গেল। বৈজ্ঞানিক বিষয়বস্তু নিয়ে বাঙলা নাটকের এই আবির্ভাব একেবারে নতুন এবং সেজন্যই অভিনন্দনযোগ্য। কিন্তু বিষয়বস্তু যাই থাক না কেন, যখনই তাকে সাহিত্যের ধরাছোঁয়ার মধ্যে নিয়ে আসা হয়, তখনই পাঠকমানস একটি মূলগত রসসন্ধানে উন্মুখ হয়ে ওঠে। এই একাঙ্কিকায় বৈজ্ঞানিক গবেষণার গুরুভারের তলায় মাঝে মাঝে সেই রসফল্গু একেবারেই হারিয়ে গিয়েছে। নাটকের প্রাণবস্তু হচ্ছে সংলাপ। সংলাপ রচনায় নাট্যকারের কুশলতা আছে, কিন্তু কয়েক স্থানে অতিনাটকীয় ভাষণদোষ থাকায় নাটিকাটির সর্বাঙ্গ সুশোভন হয়ে উঠতে পারে নি। তবু রসলিপ্সু পাঠকের দরবারে নাটকখানি সমাদর পাবে বলেই বিশ্বাস। ৪৫৩।৫৪

মেয়েদের ব্যায়াম স্বাস্থ্য ও সৌন্দর্য; নীলমণি দাশ; আয়রণম্যান্ পাবলিশিং হাউস; ২, আমহার্স্ট রো, কলিকাতা-৯। দেড় টাকা।

মেয়েদেরও যে ব্যায়ামের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে, আলোচ্য পুস্তকটিতে সে সম্বন্ধে সুষ্ঠুভাবে আলোচনা করা হয়েছে। মেয়েদের উপযোগী ব্যায়ামের বিভিন্ন নিয়ম ও নির্দেশ এতে মিলবে। ছাপা ও বাঁধাই ভাল। ৫০৮।৫৪

নতুন জীবন—শ্রীসৌরীন্দ্রমোহন চট্টো-পাধ্যায়; সুলভ কলিকাতা লাইব্রেরী, ১০৪এ, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। মূল্য দু'টাকা।

পঞ্চাঙ্ক সামাজিক নাটক। "জমিদারী-প্রথা উচ্ছেদ" বিষয় নিয়ে রচনা। একদিকে জমিদার দুর্গাশঙ্কর, অন্যদিকে তারই নিপীড়িত প্রজাগণসহ কংগ্রেস কর্মী শিবনাথ। দুর্গাশঙ্কর চায় প্রজাদের শোষণ করতে, আর শিবনাথ চেষ্টা করে তাদেরকে মানুষের মত বাঁচিয়ে তুলতে। শেষ পর্যন্ত কিছু প্রজা দুর্গাশঙ্করের চক্রান্তে খাটে জেল, আর শিব-নাথও প্রাণ হারায় দুর্গাশঙ্করের পিস্তলের মুখে।

খুনের দায়ে পুলিশের হাতে এসে দুর্গা-শঙ্কর তার পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে পুত্র তারা-শঙ্করের হাতে শিবনাথের অনাথা বোন শিবানীকে তুলে দিয়ে। কিন্তু পুলিশ পারে না দুর্গাশঙ্করকে গ্রেপ্তার করতে। জমিদারী আভিজাত্য বজায় রেখে সে আত্মহত্যা করে বিষ খেয়ে।

চরিত্র চিত্রণ ও ঘটনা বিন্যাস সুন্দর। লেখক খুব সহজ ও সরল ভাষায় অভিনয়োপযোগী করে তুলেছেন নাটকটিকে। ৫৫৮।৫৪

প্রাপ্তি স্বীকার

আমরা নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানের নিকট হইতে সুদৃশ্য দেয়ালপঞ্জী পাইয়াছি—

ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিমিটেড, (ইঁহাদের একটি পকেট ডায়েরীও পাইয়াছি)। কে সি দাস লিঃ, রবিনসোমার এণ্ড কোং, কমলালয় ষ্টোরস লিঃ।

HVM. 234-X52 BG

আগামী সোমবার থেকে লণ্ডনে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের প্রধানমন্ত্রী-দের কনফারেন্স আরম্ভ হবে। এবারকার কনফারেন্সের সময়ে বিবিধ সামরিক সমস্যার আলোচনা প্রাধান্যলাভ করবে বলে শুনা যাচ্ছে। এই সব আলোচনা হয়ত কন-ফারেন্সের সাধারণ কর্মসূচীর অন্তর্গত না হয়ে পৃথকভাবে হবে, কারণ সব আলো-চনায় সব দেশের প্রধানমন্ত্রীদের সাক্ষাৎ-ভাবে অংশ গ্রহণ করার অসুবিধা আছে; যেমন পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে মধ্যপ্রাচ্য বা সুদূরপ্রাচ্যের আরক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে কমনয়েলথেরও অন্যান্য গভর্নমেণ্টের সঙ্গে একযোগে কোনো দায়িত্ব গ্রহণের বিষয় আলোচনা করা সম্ভব নয়, কারণ ভারত গবর্নমেণ্ট কোনো সামরিক চুক্তির সংস্রবে আসতে চান না। অথচ একথাও সত্য নয় যে ভারতবর্ষ ও বৃটিশ গবর্নমেণ্টের মধ্যে সামরিক বিষয়ে কোনো যোগাযোগ নেই। এখনো বহু বিষয়ে ভারতীয় সামরিক বিভাগ বৃটিশ সামরিক বিভাগের কাছ থেকে পরামর্শ ও শিক্ষাদি বিষয়ে অন্যান্য রকম সহযোগিতা নিয়ে থাকে, ভারতীয় বাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী বৃটিশ সামরিক কর্ম-চারীদের কোনো কোনো কনফারেন্সে যোগ দিতে আহূত হয়ে থাকেন। অন্যদিকে বৃটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষের ভারতের সামরিক ব্যবস্থাদির বিষয়ে ওয়াকিবহাল থাকায় সুযোগ রয়েছে। তবে ভারত গবর্ন-মেণ্ট কোনো দেশের সঙ্গে এমন কোনো সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ নন যার দ্বারা ভারত কোনো অঞ্চলে যুদ্ধ লাগলে তাতে যোগ দিতে বাধ্য থাকবে।

কমনওয়েলথএর অন্যান্য রাষ্ট্রগুলির মধ্যে বিশেষত "সাদা" রাষ্ট্রগুলির মধ্যে কিন্তু আরক্ষা ব্যবস্থা এবং তৎসংক্রান্ত পারস্পরিক দায়িত্বের বিষয় আলোচনাই মুখ্য স্থান নেবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাতে যোগ না দিলেও এসব বিষয়ে ভারত গবর্নমেণ্টের উদাসীন থাকাও সম্ভব নয়। আবার কমনওয়েলথ-এর অন্য দেশগুলি যা করছে বা যে যে ব্যাপারের সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে তার অনেক-গুলির সম্বন্ধে (যেমন S E A D O) ভারত সরকার প্রকাশ্য বিরুদ্ধমত দিয়েছেন।

কমনওয়েলথ-এর 'সাদা' রাষ্ট্রগুলির মধ্যে জাতি, দৃষ্টিভঙ্গী, আদর্শ ও নীতি-গত এক রকমের ঐক্য আছে যাতে তাদের একগোষ্ঠীভুক্ত থাকার অর্থ হয়। পশ্চিমা শক্তি ব্লকের সামরিক নীতির আওতায় থাকতে পাকিস্তান ও সিংহল গবর্নমেণ্টের বিশেষ আপত্তি দেখা যাচ্ছে না, সুতরাং তাদের সঙ্গেও বৃটেন, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি কমনওয়েলথভুক্ত রাষ্ট্রগুলির একটা বড়ো বিষয়ে সহযোগিতার অবসর আছে। কিন্তু ভারতের সঙ্গে কমনওয়েলথের মিল কোথায়? বর্ণ, আদর্শ ও ঘোষিত নীতি কোনো বিষয়েই তো ঐক্য নেই। ভারতবর্ষ তাহলে কমনওয়েলথ-এর মধ্যে আছে কেন? এ প্রশ্নের, সঠিক বুদ্ধির লোকের নিকট বোধগম্য কোনো উত্তর মিলা কঠিন।

বিভিন্ন আদর্শ ও নীতির অনুসরণ-কারী রাষ্ট্র ইউনো'র সদস্য আছে, সেই

রকম কমনওয়েলথেও থাকতে পারে, এ যুক্তির কোনো অর্থ নেই। ইউনো'র সঙ্গে কমনওয়েলথের কোনো তুলনাই হতে পারে না। কার্যত যাই হোক, ইউনো'র কতকগুলি নির্দিষ্ট লক্ষ্য আছে। (বিশ্বশান্তি রক্ষা ইত্যাদি), যেগুলিকে সকল সদস্যকেই অন্তত মুখে স্বীকার করে নিতে হয়। বড়ো রাষ্ট্রগুলি ইউনো'র নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করার চেষ্টা করে আসছে সন্দেহ নেই। কিন্তু স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টার সময়েও সদস্যদের ইউনো'র লক্ষ্যেরই দোহাই দিতে হয়। এমন কি ইউনো'র বাহিরে যখন জোট বাঁধা হয়। (যথা, NATO, SEADO ইত্যাদি) তখনও সেটা ইউনো'র লক্ষ্যের পরিপন্থী নয় বলে প্রমাণ করার প্রয়োজন হয়, যদিও একপক্ষের প্রমাণ অন্যপক্ষে স্বীকার করে না। কিন্তু যতই দ্বন্দ্ব চলুক লক্ষ্য সম্বন্ধে একটা ঐক্যের স্বীকৃতির উপর ইউনো'র অস্তিত্ব। কমনওয়েলথের সদস্য হিসাবে অন্য রাষ্ট্রগুলিও ভারতবর্ষের মধ্যে জাতিগত আত্মীয়তা, আদর্শ বা ব্যবহারিক নীতির (আন্তর্জাতিক সামরিক চুক্তি সম্পাদন, এ্যাটমিক অস্ত্রের ব্যবহার, ঔপনিবেশিক শোষণ ইত্যাদি ব্যাপারে) ঐক্য কোথায়? কী উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভারতবর্ষের কমনওয়েলথের ভিতরে থাকা আবশ্যক? কোন্ নীতি অনুসরণের জন্য ভারতবর্ষকে কমনওয়েলথের অন্য রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে (ইউনো'র বাইরে) একটা আলাদা গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে থাকা আবশ্যক? ভারতবর্ষ SEADO চায় না। NATO'র সঙ্গে কোনো রকম পরোক্ষ যোগের সম্ভাবনাও ভারতবর্ষের নিকট অপ্রীতিকর। পাকিস্থান ও আমেরিকার মধ্যে সামরিক সাহায্যদানের চুক্তি, পাকিস্থান ও তুর্কীর মধ্যে সামরিক চুক্তি, ইরাকের সঙ্গে তুর্কীর চুক্তি, এ সমস্তই ভারত সরকারের অনভিপ্রেত। SEADO'র শক্তিবর্ধনের জন্য মালয়ে সামরিক ব্যবস্থা দৃঢ়তর করার বন্দোবস্ত হচ্ছে। ভারতের ঘোষিত নীতির সঙ্গে এর কোনোটার মিল নেই। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবিদ্বেষমূলক নীতি ও অস্ট্রেলিয়ার 'সাদা অস্ট্রেলিয়া' নীতির উল্লেখ বাহুল্য মাত্র।

হতে পারে এতো জটিলতা সত্ত্বেও কোনো কোনো বিষয়ে বৃটেন বা কমনওয়েলথের অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করার অবসর আছে। কিন্তু সেজন্য কমনওয়েলথের ভিতরে থাকার আবশ্যকতা কী? অস্ট্রেলিয়া বা কানাডা বা বৃটেনের চেয়ে নিশ্চয়ই বর্মার সঙ্গে ভারতের মতের ও নীতির মিল বেশি, কিন্তু বর্মা তো কমনওয়েলথের বাইরে রয়েছে। সেজন্য কি বর্মার সঙ্গে সহযোগিতা করার কোনো অসুবিধা হচ্ছে? বরঞ্চ এটাই অত্যন্ত বিসদৃশ ব্যাপার যে বর্মা বা ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে যেখানে কোনো বন্ধন নেই, সেখানে বৃটেন, দক্ষিণ আফ্রিকা, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, কানাডার সঙ্গে ভারতের একটা কমনওয়েলথের বন্ধন রয়েছে। এই বন্ধন কেন?

ইহাতে নাকি কোনো ক্ষতি নেই, লাভ আছে। লাভটা কী সাধারণ বুদ্ধিতে বুঝা যায় না। সেইজন্য অনেকের মনে সন্দেহ হয় যে, ভিতরে হয়ত এমন কিছু আছে যা কর্তারা বাইরে পরিষ্কার করে বলতে চান না। এরূপ সন্দেহের অবকাশ থাকা বাঞ্ছনীয় নয়।

এই সম্পর্কে আর একটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। সম্প্রতি মাদ্রাজ কংগ্রেসে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে তাতে কোরিয়া, ইন্দোচীন প্রভৃতির কথা আছে। কিন্তু নৃশংস হত্যাকাণ্ড চলেছে সে সম্বন্ধে একটি কথাও নেই! ২৫।১।৫৫

উত্তমপুরুষ

[উপন্যাসের ভবিষ্যৎ]

বহু বছর আগে কোন বামপন্থী ইংরেজ প্রবন্ধলেখক বলেছিলেন, বুর্জোয়া-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ এবং বিশিষ্ট বিকাশ উপন্যাসে। উর্বশীর মত পুরা-কালের সঙ্গে সঙ্গে মহাকাব্যের গৌরব-শশীও অস্ত গেছে।

কথাটা সম্ভবত আংশিক সত্য মাত্র। এ-যুগে আর ইলিয়াড বা রামায়ণ লেখা হবে না এ-কথা যখন বলি, তখন বোধহয় এইটেই বোঝাতে চাই, ছন্দে লেখা হবে না। প্রাক্-মুদ্রাযন্ত্রযুগে সাহিত্যের প্রধান নির্ভর ছিল শ্রুতি, ছন্দ বা মিল স্মৃতিকে সাহায্য করত। ছাপাখানার যুগে গদ্যের বিস্মৃতি ভয় নেই; পদ্যের তুলনায় কৃত্রিমতামুক্ত, এটাও এর উপরি সুবিধে। মহাকাব্য এখনও টিঁকে আছে, পূর্বপুরুষ যেমন বেঁচে থাকে সন্ততিতে। আজকের মানুষের ধ্যান-ধারণা, সমস্যা-সংগ্রাম, আবেগ-অন্তর্দ্বন্দ্ব আর চিন্তাধারার সম্পূর্ণ আধার উপন্যাস, সেকালে মহা-কাব্য যেমন ছিল।

তবু পার্থক্য আছে বৈকি। ঐ ইংরেজ লেখক উদাহরণ হিসেবে দু' যুগের দু'টি বইয়ের নাম করেছিলেন। এক, অডিসি; দুই, রবিনসন ক্রুশো। এ দু'টির কাহিনীর জোড় বেশি নেই, কিন্তু দু'টির জীবন-দর্শন স্বতন্ত্র। ইথাকায় ফেরার পথে বিপর্যস্ত অডিসিউস জানতেন, তাঁর অদৃষ্ট একান্তই দৈবের হাতে, ভয় আর ভরসা দুই-ই দেবতা। রবিনসন ক্রুশো একেবারেই বণিক। সে প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে, দুস্তর সাগর পাড়ি দেয়, বাংলা দেশে হীরে কেনে, সাইবেরিয়া থেকে তিন হাজার চারশো পঁচাত্তর পাউন্ড, সতেরো শিলিং, তিন পেন্স নীট মুনাফা পকেটে নিয়ে বাড়ি ফেরে। ক্রুশোর মন বহির্মুখী, তার যাত্রাটাই বড়; অডিসিউস গৃহমুখী, পেনেলোপী তাকে অহরহ টানে। এই প্রথম শ্রেণীর মানুষই সাম্রাজ্য গড়ে। কিন্তু যদি বলি এই মানুষের স্বরূপ আবিষ্কার বিশ্লেষণ করেছে উপন্যাস, কথাটা পুরোপুরি ঠিক হবে না। মহা-কাব্যের কবিও এমন মানুষকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে, পুরুষাকার দিয়ে দৈবকে পরাস্ত করতে চেয়েছিল। দৃষ্টান্ত, কর্ণ। সমগ্র মহাভারতে এই কুলশীলমানহীন বীরচরিত্র একক, অনন্য।

উপন্যাস একান্তভাবে বুর্জোয়া সংস্কৃতির প্রসূন, অতএব এই সংস্কৃতির ধ্বংসের সঙ্গে এই শিল্পরূপটিও লোপ পাবে, উল্লিখিত ইংরেজ লেখক এই আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর ভয় ছিল, আগামী কালে শিল্পের মুখ্য বাহন হবে সিনেমা কেননা, সিনেমার রূপ আর বাণী দুই আছে। এ আশঙ্কা, সৌভাগ্যক্রমে, সত্য হয়নি। দু'টি বিশ্বযুদ্ধের (আমাদের দেশে অধিকন্তু পার্টিসন, মন্বন্তর ইত্যাদি) ফলে পুঁজি-জীবী সভ্যতার এখন জরার দশা, উপন্যাসেও গ্রহণের ছায়া পড়েছে, কিন্তু তাকে গ্রাস করেনি। মানুষ এখনও সংগ্রাম করে, তার নিজের দ্বিধার সঙ্গে, প্রতি-কূল বাইরের সঙ্গে, আঘাত পায়, ঘৃণা করে। আবার ভালবাসে। সে অব্যবস্থিত-চিত্ত যন্ত্রের জ্বালায় কখনো তারই একাংশ কৃষিমুখী, মারণাস্ত্রের ভয়ে বিজ্ঞান-বিরোধী, সামাজিক নিগড় ভাঙতে গিয়ে হয়ত বা একটা নৈরাজ্য তৈরী করে বসে। এই মানুষকে তুলে ধরার দুরূহ ব্রত এ-যুগের লেখকের। দুরূহ, কেননা লেখকও সমাজের অন্তর্ভুক্ত, যে সমাজ-ব্যবস্থা তিনি নিজেই মেনে নিতে পারছেন না, তার ভিতর থেকে বিষয়বস্তু বেছে শিব-সুন্দর শিল্পরূপ দিতে হবে, একী সোজা সঙ্কট।

তবু উপন্যাস পরাস্ত হয়নি। কারণ সিনেমার চেয়ে সাহিত্য কিছু বেশি পারে। শুধু এ্যাকসন নয়, সে পারে অন্তর্লোকের সন্ধান দিতে, ক্ষোভে-দুঃখে-সুখে-আনন্দে সম্পূর্ণ মানুষকে উপস্থাপিত করতে। সম্ভবত আগামী-কালেও পারবে, সুতরাং সিনেমা বা টিবি-রূপ ক্ষয়রোগে সাহিত্য একেবারে জীর্ণ হবে না।

* * *

সম্প্রতি প্রকাশিত দু'টি ইংরেজী গ্রন্থের উপলক্ষে কথাগুলি মনে পড়ল। দু'জন লেখক উপন্যাসের গতি-প্রকৃতি বর্ণনা এবং সংজ্ঞা নির্ণয় করতে চেষ্টা করেছেন। মিঃ ওয়াল্টার এ্যালেনের "The English Novel" বইটি এখনও দোখীন, আলোচনা পড়েছি। সমারসেট ম্যমের "Ten Novels and Their

Authors" বইটি পড়েছি। ম্যমের গল্পের প্রধান আকর্ষণ প্রসাদগুণ, সহজবোধ্যতা। প্রবন্ধেও সেটা পুরোপুরি হাজির। ফলে প্রফেসন্যাল প্রাবন্ধিক এই গ্রন্থপাঠে ঈর্ষান্বিত হবেন, সাধারণ পাঠক খুশী। রচনার সঙ্গে রচয়িতাকেও মিশিয়েছেন, ম্যমের বৈশিষ্ট্য এইখানে।

আপত্তি উঠতে পারে নির্বাচন নিয়ে। নিরবধিকাল এবং বিপুলা পৃথ্বী থেকে মাত্র দশটি নাম বেছে নিতে হলে কিছু অবিচার ঘটবে এটাই স্বাভাবিক এবং ঘটেছেও। অবিচার ম্যম শুধু অপরের, বিশেষত এশিয়ার, প্রতি করেননি, করেছেন নিজের উপরেও। অন্যথা তাঁর তালিকায় "Of Human Bondage" বইটির উল্লেখ দেখতুম। যাই হোক, ম্যমের বই থেকে জানা গেল পৃথিবীতে এ পর্যন্ত অন্তত দশজন উৎকৃষ্ট ঔপন্যাসিক জন্মেছেন এবং প্রত্যেকেরই কোন-না-কোন গ্রন্থে আত্মজীবনের ছায়া পড়েছে।

গোড়ার দিকে ম্যম পাঠকদের একটি সকৌতুক উপদেশ দিয়েছেন। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থেরও অনেকখানি বাদ-সাদ দিয়েই পড়তে হয়, খুশিমত পাতা উল্টে গেলেও ক্ষতি নেই। তবে কিনা, এটা একটা ফাইন আর্ট, একবার আয়ত্ত হলে আর ভয় নেই। শিকারী কুকুর যেমন শেয়ালের গন্ধ পায়, পাঠকও তেমনি আপনা থেকেই পাঠযোগ্য অংশের সন্ধান পাবেন। (বসওয়েল বলেছিলেন মহাপণ্ডিত জনসন সাহেবও নাকি মোটা পুঁথি পেলেই সবেগে পাতা উল্টে যেতেন, কিন্তু যেটুকু পড়বার, পড়েও নিতেন ঠিক)। প্রবন্ধের বইয়ে অসুবিধে নেই, কিন্তু গল্পের বইয়ের বেলায় টেক্‌-নিকটা সব সময় খাটে না, ম্যম নিজেই স্বীকার করেছেন। দোষটা পাঠকের চেয়ে বেশি লেখকের। তাঁরা ঠিক জায়গায় ঠিক ঘটনাটির কথা লিখতে প্রায়ই ভুলে যান, আগের কাজ আগে না সেরে পরে বিপত্তি ঘটান। এই ফরমায়েসের যুগে অবশ্য পাঠকের কাজ অনেক সময় সম্পাদক করেন, অমূল্য গ্রন্থরাজির সংক্ষিপ্ত এবং সুলভ সংস্করণ প্রকাশ করে। এতে সময় আর পয়সা দুই-ই বাঁচে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ম্যম্‌ প্রুস্তের একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম করে বলেছেন, এর বহু অংশ অবান্তর, আদ্যন্ত পাঠ না করলে বিন্দুমাত্র রসহানি ঘটে না। প্রসঙ্গক্রমে ম্যম বার্নার্ড শ'কেও খোঁচা দিতে ছাড়েননি। শ' কবে নাকি তাঁকে বলেছিলেন বৃটিশ দর্শকেরা নিতান্ত জড়বুদ্ধি, বিলেতে তাঁর নাটক জমেই না, অথচ জর্মনীতে শ'য়ের নাটকের অঙ্কে অঙ্কে হাততালি পড়ে। ম্যম সেদিন মুখ খোলেন নি, মনের কথা খোলসা করেছেন এতদিনে। বিলাতী থিয়েটারওয়ালাদের উপর শ'র কড়া হুকুম ছিল তাঁর নাটকের একটি শব্দেরও যেন নড়চড় না হয়, কিন্তু জর্মনীর প্রযোজকেরা প্রয়োজনমত নাটকের ছাঁটকাট করতেন। অভিনয়ের উপভোগ্যতাও শতগুণে বেড়ে যেত।

উপন্যাসেও উদ্দেশ্য নিয়ে ম্যম্‌ দু'চার কথা বলেছেন। পূর্বসূরীদেরও ছাড়েননি। উপন্যাস সামাজিক সালিশীর কাজ, প্রচলিত রীতিনীতি আইনকানুনের বিচার, এমনকি রাজনৈতিক সমস্যারও আলোচনা করবে, ওয়েলসের এই মন্তব্য উদ্ধৃত করে ম্যম একটুখানি সহাস্য টীকা যোগ করে বলেছেন, 'অথচ তাঁর নিজের নভেলগুলি প্রোপাগাণ্ডা, কেউ ওয়েলসকে একথা বললে তিনি তাকে তেড়ে মারতে আসতেন।'

উপন্যাসের লক্ষ্য কী, শিক্ষাদান না আনন্দ দান? যদি শিক্ষাদান হয় তবে, ম্যম দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন, এটা শিল্প নামেরও অযোগ্য। নভেল, তাঁর মতে গির্জার বেদীও নয়, বক্তৃতামঞ্চও নয়। নভেলকে যে-পাঠক সস্তায় জ্ঞানলাভের ক্লাশ ভাববেন, তিনিই ঠকবেন, কেননা ও-বস্তুটি কেবল বহু আয়াসেই লভ্য। গল্পের জ্যামের সঙ্গে জ্ঞানের পুরিয়াটুকু মিশিয়ে গিলে ফেলতে পারলে চমৎকার হত সন্দেহ নেই, কিন্তু তাতে জ্যামের স্বাদ আর পুরিয়ার জাত দুইই যেত।

ঔপন্যাসিক শুধু ঔপন্যাসিকই হবেন, ম্যমের এইমাত্র শর্ত। তাঁকে কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞ না হলেও চলে। একটিমাত্র চপে দাঁত বসিয়েই তিনি জানবেন মাংসের স্বাদ কেমন এবং কল্পনা ও দৃষ্টিশক্তি দিয়ে অপরকেও বোঝাতে পারবেন। এ কাজের জন্যে একটি আস্ত মেষ গলাধঃকরণের প্রয়োজন নেই। কিন্তু মাংস খেতে কেমন লিখতে গিয়ে তিনি যদি মেষপালন নিয়ে বক্তৃতা জুড়ে দেন এবং এগোতে এগোতে পশমশিল্পের ভবিষ্যৎ এবং অস্ট্রেলিয়ার রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে গিয়ে পৌঁছন, তবে কিন্তু পাঠকের মাত্র একটিই করণীয় থাকে—পাতা মুড়ে বইটি সরিয়ে রাখা।

আবাদী কংগ্রেস এইবার কর্মী-দিগকে দুর্নীতিমুক্ত হইয়া শুদ্ধ এবং পবিত্র হইবার প্রস্তাব গ্রহণ করিয়াছেন। বিশুখুড়ো বলিলেন—"এই প্রস্তাব মেনে নিতে কংগ্রেস-কর্মীদের কোন বেগ পেতে হবে না। লোকাচার বলে—প্রয়াগে মুড়ায়ে মাথা, পাপী যাক যথা তথা। তারপর মস্তক মুন্ডনে যদি আপত্তি থাকে, তবে তার চেয়েও সহজ বিকল্প ব্যবস্থা শাস্ত্রে আছে। শাস্ত্র বলে—অপবিত্র হোক, পবিত্র হোক কিম্বা

যে কেউ যে কোন অবস্থাগতই হোক না কেন, একবার মাত্র পুন্ডরীকাক্ষকে স্মরণ করলেই সে ব্যক্তি বাহ্য এবং অভ্যন্তরে শুচি হয়ে যায়, সুতরাং......

* * *

সমৃদ্ধিনগরের অন্য এক সংবাদে আমরা শুনিলাম যে, অনেকেই নাকি সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্যাটার্ন ভালো বুঝিতে পারেন নাই। খুড়ো বলিলেন—"এতে বোঝাবুঝির বিশেষ কিছু নেই,—চার ঘর উল্টো, চার ঘর সোজা, চার ঘর উল্টো, তারপর সামনে সুতো এনে এক ঘর জোড়া—এই তো সহজ প্যাটার্ন"!!

* * *

আগেকার দিনের গরুর গাড়ির বদলে বর্তমানে কংগ্রেসের মিছিলে **হাতী ব্যবহার করা হইতেছে**, আবাদীতেও তার ব্যতিক্রম হয় নাই। "জোড়া বলদ যদি কথা বলতে পারতো এবং তাদের যদি শ্রীকান্ত পড়া থাকতো, তাহলে তারা নিশ্চয়ই বলতো—অকৃতজ্ঞ রাম, দড়ি-ধরার প্রয়োজন কি তোমার একবারেই শেষ হইয়া গেছে"—**বলে** আমাদের শ্যামলাল।

* * *

কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুক্ত ধেবর বলিয়াছেন যে, মহিলাদের সমস্যা ভারতেরই নিজের সমস্যা। সুতরাং মহিলাদের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া আমাদের প্রত্যেকেরই কর্তব্য। —"মহিলা-দের সম্বন্ধে উদাসীন আমরা কখনোই নই। তাঁদের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে তড়াক করে লেডীস্ সীট আমরা ছেড়ে দিয়ে থাকি, আর না দিলেও কন্ডাক্টর কিম্বা সীট-বঞ্চিত দন্ডায়মান সহযাত্রীরা লেডীস্ সীট ছেড়ে দেওয়ার কথা আমাদের স্মরণ করিয়ে দেন। আসন দখল ছাড়া অন্য কোন সমস্যার কথা তো তাঁদের মুখে আমরা বড় একটা শুনিনে"—মন্তব্য করিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু আরো বলিয়াছেন যে, রাজনৈতিক নেতা হওয়ার চেয়ে রাজনৈতিক **কর্তা** হওয়ার দিকেই কর্মীদের ঝোঁক একটু বেশি বলিয়া পরিলক্ষিত হইতেছে। —কিন্তু নেতার শেয়ার মার্কেটে কোনদিন তেজী হওয়ার সম্ভাবনা নেই। ফটকা বাজারে রাজ-নৈতিক কর্তার শেয়ারেরই চাহিদা বেশী"—বলিলেন আমাদের এক সহ-যাত্রী।

* * *

শ্রীযুক্ত মোরারজী দেশাই কর্তৃক উত্থাপিত আন্তর্জাতিক ব্যাপার সংক্রান্ত প্রস্তাব সমর্থন করিতে গিয়া শ্রীযুক্ত রাজাজী মন্তব্য করিয়াছেন যে, ইহা যেন ঠিক দুইটি বাঁদরের জ্বলন্ত মশাল লইয়া পৃথিবীর ছাদে অবস্থানের মতো। দুই বাঁদরের মধ্যে ঝগড়া বাঁধিয়া গেলেই তাহারা পৃথিবীতে আগুন ধরাইয়া সমস্ত ছারখার করিয়া দিবে।—"লংকাদহন হয়েছিল ল্যাজে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে। পৃথিবীকে ছাই করে দিয়ে সেই ছাই-মুঠোকে সোনা-মুঠো করবার লোভে অগ্নিকান্ডের উস্কানি দিতে মানুষের অভাব নেই। বিপদ হলো সেখানেই এবং আরো বিপদ—চোরা কখনই ধর্মের কাহিনী শোনে না"।

* * *

শ্রীযুক্ত নেহরু বলিয়াছেন যে, বাজারে বিস্তর বই প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও কংগ্রেসকর্মীরা সে-সব বই পড়েন না, ফলে তাঁহারা এ যুগের ভাবধারা হইতে বঞ্চিত হইয়া আছেন। —"এ কাজটা অবশ্য পুন্ডরীকাক্ষ স্মরণ করার মতো এত সহজ নয়। তা ছাড়া

তাঁরা—লিখিব, পড়িব, মরিব দুঃখে—এই নীতিই বরাবর মেনে এসেছেন, সুতরাং এখন আবার "অ-য়" অজগর আসছে তেড়ে শুরু করা একটু কঠিন বৈকি"—মন্তব্য করিল আমাদের শ্যামলাল।

* * *

সাংবাদিকদিগকে গায়ের জোরে ধাক্কা দিয়া সরাইয়া দিয়া মহিলারা সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট স্থান দখল করিয়াছেন বলিয়া সংবাদও আমরা পাইয়াছি। শ্যামলাল সংক্ষেপে মন্তব্য করিল—"কে বলে মা তুমি অবলে"!

* * *

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম যে, আবাদীতে খাদ্য-পরিবেশন ব্যবস্থা বানচাল হইয়া পড়ায় অতিথিদের মধ্যে প্রথমে বিক্ষোভ এবং পরে খাদ্য সংগ্রহ নিয়া উচ্ছৃংখলতা পরিলক্ষিত হইয়াছে। —"তাঁরা হয়তো মনে করে-ছিলেন খাদ্য, বেকার-সমস্যা প্রভৃতি সংকটের প্রতিকারের আশ্বাসের সুদীর্ঘ ভাষণের অব্যবহিত পরেই আবাদী অন্নপূর্ণার মন্দিরে রূপান্তরিত হবে"—বলিলেন, জনৈক সহযাত্রী।

* * *

—শৌভিক—

শিশু রংমহলকে এবারে দেখা গেল মাত্র এই তিন বছরে পড়েই বড়োও যেমন হয়ে উঠেছে সেইসংগে কিন্তু নজরটাও ছোটমহল পেরিয়ে বুড়োমহলে গিয়ে ঢুঁ মারতে আরম্ভ করেছে। সাত দিনের উৎসবে বিশেষ করে এইটেই পড়লো নজরে। অর্থাৎ, এবারে এমনভাবে এমন করে এবং এমন রূপের উপাদান পরিবেশন করা হলো যার সবই মনে হলো ছোটদের দিয়ে বড়োদের মতো করে সাজানো। তাই যাদের আনন্দ পরিবেশন করার জন্য এই উৎসব তারা এবার পেয়েছে কম, যদিও যারা আনন্দ পরিবেশনে অবতরণ করেছে, তারা গুণের পরিচয় দিয়েছে অন্যান্য বারের চেয়ে বেশি। সত্যিই ছোটদের অনেকের মধ্যে ভবিষ্যৎ-প্রতিভার লক্ষণ বেশ পাওয়া গেল। এবারে ক'দিনের অনুষ্ঠানে প্রায় দেড় হাজার ছোট ছেলে-মেয়ে সূচীতে অংশ গ্রহণ করেন। মেয়েদের সংখ্যাধিক্যটা লক্ষ্য করার বিষয়। সব কদিন মিলিয়ে মনে হলো জনপঁচিশেকের বেশি ছেলে যোগদান করেনি। অবশ্য মেয়েদের স্কুলগুলি তাদের পরিবেশিত অংশে কোন ছেলের ভূমিকা থাকলে তা একজন মেয়েকে ছেলে সাজিয়ে যে কার্য সম্পন্ন করে নিয়েছে সেটা ঠিকই আছে। কথা হচ্ছে ছেলেদের স্কুলের নামমাত্র সংখ্যায় যোগদান নিয়ে; হঠাৎ দেখলে মনে হওয়া আশ্চর্যের নয় যে শিশু রংমহলে ছেলেদের বুঝি প্রবেশ নিষেধ।

* * *

সাতদিনের উৎসবে প্রথম পাঁচদিনের মধ্যে এবারকার যাকিছু নতুন আকর্ষণ পরিবেশিত হয়ে যায় এবং শেষের দুদিন হয় নির্বাচিত অংশাবলীর পুনরাবৃত্তি। শিশু রংমহলের নিজেদের দল, কুড়িটি সাধারণ শিক্ষালয়, আটটি নৃত্যগীত শিক্ষালয় এবং বাইরের তিনটি দল প্রায় ষাটটি বিভিন্ন সূচী পরিবেশন করেন, তার মধ্যে নাটিকা বা নৃত্যনাট্য মিলে চার-খানি। শিক্ষালয়ের প্রায় সবই গতবার যারা ছিল তারাই আছে, বাইরে থেকে এসেছে দার্জিলিং, ওড়িষ্যা ও বাঁকুড়ার একটি আদিবাসী দল। দু তিনটে সূচী ছাড়া কদিন দেখে মনে হলো উদ্যোক্তারা যেমন তেমনি অংশগ্রহণকারী দল, সকলেই এই উৎসবের মূল অর্থটাই ভুলে বসেছেন। সবাইকেই দেখা গেল বড়োদের তুষ্ট করার চেষ্টা। শুধু তাই নয়, সমগ্রভাবে অনুষ্ঠানটি এমন একটা রূপ পরিগ্রহ করে নিয়েছে যাতে দর্শকদের মনে এই ছাপটাই ধরে গিয়েছে যে, শিশু রংমহল শুধু বড়ো-দের জন্যেই নয়, একটা মস্ত বড়োলোকী ব্যাপারও। সহজে সর্বসাধারণের পক্ষে যোগদানে হয়তো আইনগত বাধা কিছু নেই, কিন্তু তবুও যে-কেউ ইচ্ছা থাকলেই যোগদান করতে পারে এ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পথে একটা অন্তরায় অনুভব করা যায়। শিশু রংমহলের প্রতিষ্ঠাতাদের মনে

যাদুঘরের প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত শিশু রংমহলের দ্বিতীয়-বার্ষিকী উৎসবে দার্জিলিং থেকে আগত শিশুশিল্পীদের নৃত্যানুষ্ঠান। দক্ষিণে উড়িষ্যা থেকে আগত শিশুশিল্পীদের 'সাক্ষী গোপাল' নৃত্যনাট্যের একটি অনুপম দৃশ্য। ফটো : মনো মিত্র

শিশুরই এ উদ্দেশ্য ছিল না এবং এখনও শিশুরই নেই, কিন্তু হয়তো তাদেরই অসতর্কতার ফলে বা অজ্ঞাতসারে কোন ফাঁক দিয়ে এই ভাবের একটা আবরণ এসে পড়েছে।

হাজার তিনেক দর্শকের জন্য আসন, তার মধ্যে অনুমান হাজার আসন শিশুদের জন্যে। শিশুদের মধ্যে বেশির ভাগই বাংলাভাষী। শিশু বলতে বছর বারো-তেরোর নীচের ছেলেমেয়েরা। কিন্তু দেখা গেল সূচীর বিবরণ ঘোষণার বেলায় প্রধানত ইংরেজী ভাষাই ব্যবহার করা হলো। প্রথম দিন এই নিয়ে কাগজে মন্তব্য বের হওয়াতেই বোধহয় ওর সঙ্গে বাংলাতেও ঘোষণার ব্যবস্থা করা হয়, কিন্তু 'ঐতিহ্য', 'নিদর্শন', 'পরিপ্রেক্ষী' প্রভৃতি এমন সব শব্দ ব্যবহৃত হয় যে সে-বাংলা ছোটদের কাছে ইংরেজীর চেয়ে কম দুর্বোধ্য নয়। স্পষ্টতই বোঝা গেল ঘোষণা যা করা হলো, তা ছোটদের উদ্দেশে নয়। তা যদি হতো তাহলে তাদের বোধগম্য ভাষা ও শব্দ ব্যবহার করাই সমীচীন হতো কারণ অনুষ্ঠানটি তাদেরই পরিতুষ্টির জন্যেই পরিকল্পিত। আরও ত্রুটির কথা উল্লেখ করা যায়। এবারে দেখা গেল নাচের প্রাবল্য। নাচ ভালো, ছোটদের তা শেখা দরকার এবং কতো জায়গায় কতো রকমের নাচ আছে, তাও তাদের দেখে নেওয়া ভালো, কিন্তু তাই বলে শুধু নাচ আর নাচ তার মধ্যে ওরা কতটুকুই বা মজা উপভোগ করতে পারে। আর মজাই যদি তারা না পেলো তাহলে তাদের শিক্ষা, জ্ঞান ও আমোদ পরিবেশনের পরিকল্পনার সার্থকতা কোথায়! পঞ্চম দিনের অনুষ্ঠানে স্পষ্টতই ছোটদের মধ্যে বিরক্তির ভাব লক্ষ্য করা গেল। সেদিন পর পর কেবল নাচ; ভারতের নানা জায়গার নানা রকমের নাচ—দার্জিলিং, ওড়িষ্যা, বাঁকুড়া, পাঞ্জাব, গুজরাট, অন্ধ্র, তামিলনাদ, মণিপুর, উত্তর ভারত, রাজস্থান, বাংলা প্রভৃতি নানা স্থানের বিভিন্ন সাজপোশাকের নাচ। যার কোনটির মধ্যে ছোটদের সরল মনের অনভ্যস্ততার সহজ অভিব্যক্তি ছিল না। এভাবটা কদিনের অধিকাংশ সূচীর মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়েছে। নাচ অবশ্য অনেক দলেরই বেশ ভালোই হয়েছে, বিশেষ করে দার্জিলিং, ওড়িষ্যা, কলকাতার সুরবীথি, বাণীবিদ্যা-বীথি, ডায়োসেশন, অভিনব ভারতী, হাওড়া গার্লস স্কুল, কমলা গার্লস স্কুল, শঙ্কর মিত্রের নৃত্য শিক্ষালয়, শিশুকলা কেন্দ্র প্রভৃতি আরও দলের কৃতিত্বের কথা উল্লেখ করা যায়। কিন্তু তাদের সে তারিফ বড়োদের চোখে, ছোটদের মনেও তার কি প্রভাব পড়েছে সেটা বিচার করে দেখা দরকার। ওরা খুব ফূর্তি পেয়েছে এমন

"জগদ্গুরু শংকরাচার্য"র নাম ভূমিকায় অভী ভট্টাচার্য

তো মনে হলো না। বরং তো ওদের কাছে বাটানগর কিণ্ডারগার্টেনের ছেলেদের ব্যান্ড টিকিটিকি সেজে বা প্রেসিডেন্সী গার্লস স্কুলের শেয়াল, বাঘ, ভাল্লুক, বাঁদর, জাম্বুবান, হাতি, গণ্ডার সেজে বা রথের মেলার বানর ও ভাল্লুকের নাচ; অথবা বালিকা শিক্ষাসদনের আলু, কড়াইশুঁটি, বেগুন প্রভৃতির পোষাকে আবির্ভাব বেশী আমোদ দিতে পেরেছে। তবে কিন্তু এই সব নাচের ছড়ার দিকটা সবক্ষেত্রে আবার ছোটদের সহজবোধ্য হয়নি।

* * *

প্রথম দিন পরিবেশিত হয় আন্তর্জাতিক সূচী। বাঙলা, হিন্দী, আর্মানী, মেক্সিকো, রুশ প্রভৃতি দেশের নাচ দেখানো হয়। কিন্তু সবেরই পিছনে ওদের দিয়ে একটা কিছু করানোর ভাব স্পষ্ট। গুণী ছেলেমেয়ে অনেকেই ওদের মধ্যে পাওয়া গেল, কালে যারা ভালো শিক্ষকতা পেলে হয়তো বড়ো বড়ো শিল্পী হয়ে উঠতে পারবে, কিন্তু শিশু রংমহলের আসরের শিশু দর্শকের কাছে বিচিত্র সাজ পোষাকের এক একটি দলের হাত-পা নাড়া ছাড়া আর কি আনন্দ আবার থাকতে পারে। এটা শুধু আন্তর্জাতিক সূচীর ক্ষেত্রেই নয়, অন্যান্য দিনের সূচী সম্পর্কেও একই কথা বলতে হয়। নাচ আর অ-সরল ছড়া দিয়ে ছোটদের কতটুকুই বা মন জয় করা যেতে পারে। শিশুসুলভ সাবলীলতা খুব কমই পাওয়া গিয়েছে, কিন্তু যেখানেই পাওয়া গিয়েছে, ছোটরা তা প্রাণভরে উপভোগ করেছে। মুরলীধর গার্লস স্কুলের 'ঘুড়ির লড়াই' ছড়ানৃত্যে 'ভোকাটা' বলে উল্টে পড়ে যাওয়া, কিম্বা 'চিঠি' ছড়া-নাটিকায় ক্ষুদে নাতির দাদুকে চকোলেট ঘুস দেওয়া, অন্ধ বালিকা বিদ্যালয়ের বছর চারেকের ক্ষুদে মেয়েটির নাচের ভংগী ও তাল গুলিয়ে ফেলে অকপটভাবে তার নিজের মতে কাজ করে যাওয়া, বা আগেকার "কুমড়ো পটাস" ইত্যাদি অংশগুলি ছোটদের নাচ-গানের চেয়ে অনেক বেশী আমোদ দিতে পেরেছে। আসলে ছোটরা যে ধরণের একশন্ দেখে আমোদ পায়, যে ধরণের কথাবার্তায় ওরা মজা পায়, তা খুব সামান্যই তারা এবারে পেয়েছে। ওড়িষ্যার মীনাক্ষী বা দার্জিলিং দলের সম্মিলিত নাচ, বা শুক্লা সেনের কথক নাচ ছোটদের মনে কি পরিমাণ রেখাপাত করেছে বিশ্লেষণ করে দেখা উচিত, যদিও বড়োদের হিসেবে ওদের নৃত্য-কৃতিত্বের মধ্যে অসাধারণত্বের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। সূচীতে বাঙলা অংশই বেশী এবং সেটা হওয়াও ন্যায্য ও স্বাভাবিক। কিন্তু কেবল যদি কথাপ্রধান জিনিসই পরিবেশিত হয়, তাহলে শুধু অবাঙলাভাষী কেন, বাঙালী ছেলেদের পক্ষেও ফূর্তিটা পূর্ণমাত্রায় জাগিয়ে তোলা যায় না।

* * *

শিশু রংমহলের তরফ থেকে উল্লেখযোগ্য দুটি নতুন নৃত্যনাট্য পরিবেশিত হয়—"রথের মেলা" এবং "মিঠুয়া"। এর মধ্যে "মিঠুয়া"র ওপরেই বেশী জোর দেওয়া হলেও ছোটদের দিক থেকে বরং "রথের মেলা" বেশী উপভোগ্য হয়েছে। মেলার নানা রকমের ফেরিওয়ালা, নাচিয়ে বেদেনীর দল, ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের রথ টেনে যাওয়া, সার্কাসের ভাঁড় আর তারের খেলা বেশ একটা পুলক আহরণের আবহাওয়া ফুটিয়ে তোলে। তারের খেলায়

ছোট্ট মেয়েটির ভংগী তো কদিন আগে চীনা প্রতিনিধি দলের নৌকা-চড়ার নৃত্য-ভংগীর মতোই চমৎকার কৃতিত্বের প্রকাশ। কথা বিশেষ নেই, কিন্তু এমন একশন্ রয়েছে, যা ছোটদের মনকে সে তার দিকে টেনে নিয়ে যায়। "মিঠুয়া" সম্পর্কে ঠিক এ-উক্তি করা যায় না। অভিনবত্বের দিক থেকে অবশ্য "মিঠুয়া" একটি অতি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৃষ্টি। রাস্তার ইলেকট্রিক পোস্ট, গ্যাস পোস্ট, টেলিগ্রাফ পোস্ট, টেলিফোন, ডাক বাক্স, ট্রাফিক সিগন্যাল পোস্ট, বিকন পোস্ট ইত্যাদির মানুষের মতো সজীব হয়ে ওঠার মধ্যে রূপকথার বিস্ময় ও পুলক এনে দিয়েছে। কিন্তু ওদের কথাবার্তা ও ক্রিয়াকলাপ কেমন যেন অন্যরকম, বুড়োটে ধরণের। মিঠু-রাণীর কাছে টেলিগ্রাফ পোস্টের আবেদন যে সে যেন তার বাবা, মেয়রকে বলে দেন লোকে যেন রাস্তার পোস্টের গায়ে পোস্টার না মারে। এধরণের কৌতুক

"ইয়াসমিন"-এর নাম ভূমিকায় বৈজয়ন্তীমালা
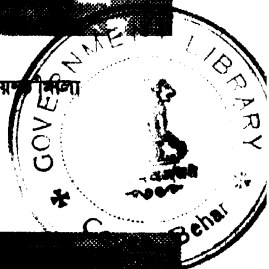
নতুন হিন্দী ছবি "দুনিয়া গোল হ্যায়" ছবিতে অনিতা গুহ ও করণ দীওয়ান

ছোটরা কিইবা উপভোগ করবে। তাছাড়া শেষটা একেবারে গোলমেলে ব্যাপার। পঙ্গু রুগ্না মিঠুরাণী রাতে জানলার ধারে মুখ বাড়িয়ে থাকে, আর তাকে আমোদ দেবার জন্যে জানলার ধারে এসে জমা হয় ল্যাম্প পোস্ট, ডাক বাক্স প্রভৃতিরা। আকাশ থেকে তারা আর চাঁদ মামাও নেমে আসে; মিঠুকে রাতের রাণী করে নাচগানে সবাই ওকে খুশী করতে চায়। দেখতে দেখতে সকাল হয়ে এলে, যে যার সব সরে পড়লো নিজের জায়গায়। মিঠুর যে কি হলো কিছুই বোঝা গেল না; তবে বই পড়ে জানা যায় যে, নিদ্রাহীনা মিঠু সেদিন চিরনিদ্রায় মগ্ন হয়ে পড়লো। কাঠামোটা রবীন্দ্রনাথের "ডাকঘর"-এর। ছোটদের জন্য এ বিয়োগান্তের অবতারণা কেন! সারা আবহাওয়াও একটা গুমোটে পরিবেশ। আর তারা পেলেই বা কি মিঠুয়ার কাহিনী থেকে? কেবল খানিকটা হতভম্ব হয়ে যাওয়া ছাড়া? অনেক আশা ছিল, গতবারের "সাত ভাই চম্পা" ও "অবন পটুয়া"-র পর ছোটরা আরও তৈরি জিনিস পাবে এবারে। হয়তো সেই চেষ্টা করতে গিয়েই শেষ পর্যন্ত যাদের জন্যে পরিবেশন, তাদের কথা আর মনে থাকেনি। অবশ্য বড়োদের চোখে পরিকল্পনার অভিনবত্ব চোখে পড়বেই এবং কলকাতার মঞ্চের ক্ষেত্রেও একটি বিশিষ্ট সৃষ্টি বলেও পরিগণিত হবে।

* * *

শিশু-রংমহল নব ভারতের একটা জাতীয় অঙ্গরূপে পরিণত হতে চলেছে, তাই উদ্যোক্তাদের দায়িত্ব ও বোধশক্তি দুই-ই কেবলমাত্র ছোটদের জন্যেই নিয়োজিত হওয়া উচিত। ছোটদের কাছে যা সহজে বোধগম্য হয়, সেই ধরণেরই জিনিস এমনভাবে পরিবেশিত হওয়া দরকার যা, যাতে অংশ গ্রহণ করতে পারে সমাজের সকল অবস্থার ছোটরা এবং যে কোন ভাষাভাষীর কাছেই সমান উপভোগ্যও হতে পারে। শিশু রংমহলের এই উৎসব সম্পর্কে শহরে গতবারের চেয়ে অনেক বেশী উৎসাহ পরিলক্ষিত হলো এবং তা হবার মতো যোগ্যতা শিশু রংমহল দেখিয়েওছে, কিন্তু উৎসাহ ছোটদের মধ্যে বর্ধিত হওয়ার দিকে না গিয়ে যদি বড়োদের মধ্যে সঞ্চারিত হতে থাকে তো সেটা ভালো লক্ষণ নয়, এবং তাতে শিশু রংমহলের উদ্দেশ্যও ব্যর্থ হবে। শিশু রংমহল দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে আজ ঠাঁই করে নিয়েছে, তাই তার পথের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্যেই সতর্ক করে দেওয়া গেল।

খেলার মাঠে

একলব্য

যুদ্ধের আগে সাগরপারের ক্রিকেট দল ঝে মাঝে ভারত সফর করলেও মহাযুদ্ধের বৈদেশিক ক্রিকেট দলগুলির ভারত রের ব্যবস্থা যেমন বার্ষিক অনুষ্ঠানে ড়িয়ে গিয়েছিল তেমন যুদ্ধোত্তর ভারতে দেশিক ফুটবল দলগুলির আনাগোনাও কম । তবে বৈদেশিক ফুটবল দলগুলির য়ের ছাপ ভারতের সব মাটিতে সমান তালে ড়েনি। ভারতীয় ফুটবলের তীর্থক্ষেত্র কাতার মাঠই বিদেশী ফুটবল পথিকদের ক্ষেপে বেশী ক্ষতবিক্ষত। যুদ্ধের আগে নে খেলে গেছে দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় টবল দল, চাইনিজ অলিম্পিক টীম, লিংটন কোরিন্থিয়ান' ও বার্মিজ ফুটবল কিন্তু মহাযুদ্ধের পর এক ১৯৫০ সাল ড়া প্রতি বছরই আমরা একটি কি দুটি রের টীমের খেলা দেখার সুযোগ পেয়েছি, কলকাতার মাঠে। ১৯৪৮ সালে বর্মা ও ন থেকে আসে একটি করে দল। সুইডেনের 'সিংবর্গ' ফুটবল ক্লাব আসে ১৯৪৯ লে। ১৯৫১ সালে সুইডেনেরই আর একটি কলকাতায় খেলে যায়—নাম 'গোটেবর্গ' । ১৯৫২ সালে বর্মা দলের পুনরাগমন । ১৯৫৩ সালে আমরা অস্ট্রিয়ার নজ এ্যাথলেটিক ক্লাব' ও জার্মাণীর নব্যাক কিকার্স' দলের খেলা দেখার গ পাই। এই বছর অর্থাৎ বিগত ফুটবল মে আমরা দেখেছি অস্ট্রিয়ার 'গ্রেজার লেটিক ক্লাব' ও সুইডেনের 'আলমায়া স ক্লাবের' খেলা। এবার রাশিয়ান টবল দলের খেলা দেখবার পালা। রাশিয়ার তীয় ফুটবল টীম আজ ভারতের অতিথি।

* * *

রাশিয়ার জাতীয় টীমের ভারত সফর পর্কে একটি কথা উঠেছে—ইতিপূর্বে যেসব খেলে গেছে তারা ছিল ভিন্ন ভিন্ন দেশের একটি ক্লাব মাত্র, একটি সমগ্র দেশের তীয় টীমের ভ্রমণ ব্যবস্থার এটা প্রথম না। কিন্তু একথা ঠিক নয়। ইতিপূর্বে ৯৩৬ সালে যে চাইনিজ দল কলকাতায় লে যায় তারা ছিল মহাচীনেরই জাতীয় লিম্পিক টীম। বিশ্ব অলিম্পিকে যোগ-নের জন্য বার্লিন যাত্রার পথেই তারা খেলে য়েছিল এখানে। ১৯৪৮ সালেও চাইনিজ লিম্পিক টীম লণ্ডন যাবার পথে এখানে লে গিয়েছিল। সুতরাং রাশিয়ান দলই দেশের প্রথম জাতীয় টীম নয়। হ্যাঁ, চাইনিজ দল খেলেছিল শুধু কলকাতায়। রা ভারতে একটি দেশের জাতীয় দলের এটা থম সফর-ব্যবস্থা বটে। রাশিয়া ও ভারতের যে তাই ফুটবল টেস্টেরও আয়োজন হয়েছে।

প্রথমে ঠিক ছিল রাশিয়ান দল ছয় হ ভারত সফর করবে। সেই অনুযায়ী মণার তালিকারও একটি খসড়া রচনা করা য়। পরে এই ভ্রমণ তালিকা পরিবর্তিত রে নূতন ভ্রমণ তালিকা রচনা করা হল। এ তালিকাও গেল বাতিল হয়ে, নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের টুর কমিটি পরে মস্কোর স্পোর্টস কন্ট্রোল কাউন্সিলের বিনা অনুমতিতে সাত সপ্তাহের এক ভ্রমণ তালিকা রচনা করলেন; কিন্তু ভারতের মাটিতে পা দিয়েই রাশিয়ান দলের লীডার এম মোসাকারকিন বললেন—'ওটি চলবে না, কাউন্সিলের বিনা অনুমতিতে একটি দিনও আমাদের ভারতে বেশী থাকা হবে না'। প্রমাদ গুণলেন নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের কর্মকর্তারা। মস্কোতে জরুরী তার করা হল। মস্কো নিরুত্তর। এম মোসাকারিন বললেন, মার্চ থেকেই আমাদের দেশের ফুটবল মরসুমের সুরু, সুতরাং পয়লা মার্চের মধ্যে আমাদের ভারত ত্যাগ করতেই হবে। সুতরাং আবার ভ্রমণ তালিকা পরিবর্তনের প্রয়োজন হল। এখনো অবশ্য পাকাপাকিভাবে ভ্রমণ তালিকা নির্দিষ্ট হয়নি, তবে কথা উঠেছে, আম্বালা, জব্বলপুর, পাটনা, শিলং ও জোড়হাট এই পাঁচটি শহরের খেলা নাকচ করা হবে। ভারতের রাশিয়ান দলের শেষ খেলা পর্যন্ত আমাদের দেশোয়ালী ব্যবস্থায় ভ্রমণ তালিকা পাকাপাকি হবে না বলেই মনে হয়। ঘরের ফুটবল ব্যবস্থায়ও আমাদের যেমন গলদ বাইরের দলের সঙ্গে খেলার আয়োজনেও তেমন গণ্ডগোল। ভারতের সব জায়গার ক্রীড়ামোদীই চায় রাশিয়ার জাতীয় ফুটবল দলের খেলা দেখতে, সব এসো-সিয়েশনই চায় তাদের সঙ্গে খেলতে। এস্থলে আম্বালা, জব্বলপুর, পাটনা, শিলং, জোড়হাট প্রভৃতি শহরের খেলা নাকচ না করে যেসব যায়গায় একাধিক বা দুইয়ের বেশী খেলার ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানকার খেলার সংখ্যা কমান যায় নাকি? গাছে চড়িয়ে দিয়ে মই কেড়ে নেবার মত বিভিন্ন এসোসিয়েশনকে লোভ দেখিয়ে এখন খেলা নাকচ করবার কোন অর্থ হয় না। হ্যাঁ, তবে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের কাছে এর অর্থ আছে বই কি! অপ্রধান শহরগুলিতে রাশিয়ান দলের খেলা থেকে অর্থাগমের সম্ভাবনা কম। প্রধান প্রধান শহরে একাধিক খেলার ব্যবস্থা হলেও এ আই এফ এফের কোষাগার পূর্ণ হবার সম্ভাবনা। আর একটি কথা, ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবসে রাশিয়ান দলের সফরের প্রথম খেলা হাজারী-বাগে অনুষ্ঠিত হবার কি কারণ থাকতে পারে। রাজধানী দিল্লীতে প্রথম খেলার ব্যবস্থা হল না কেন? রাজধানীতে খেলার ব্যবস্থা করলে এ আই এফ এফের সভাপতির নাম জড়িত করার অসুবিধা হত বোধকরি। হাজারীবাগের উদ্বোধনী খেলায় রাশিয়ান দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীপঙ্কজ গুপ্তের দলের সঙ্গে।

* * *

রাশিয়ান দলের খেলার পূর্বেই আমাদের
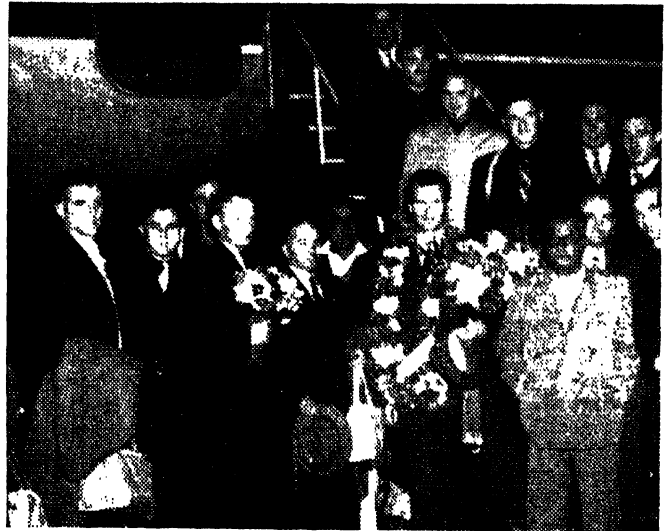
রাশিয়ান ফুটবল টীমের প্রথম দলটি দমদম বিমানঘাটিতে পেঁাছলে এই ফটো তোলা হয়

এ সপ্তাহের লেখা শেষ করতে হচ্ছে। তাদের খেলা দেখারও আমাদের এখন পর্যন্ত সুযোগ ঘটেনি। তবে যতদূর জানা গেছে রাশিয়ান ক্রীড়ামান খুবই উন্নত। সমগ্র সোভিয়েট রাশিয়ায় নিয়মিত ফুটবল খেলোয়াড়ের সংখ্যা প্রায় ৮ লক্ষ। কলকাতার ইষ্ট বেঙ্গল ক্লাব ১৯৫৩ সালে রাশিয়া সফরে গিয়েছিল। অনেক খেলাতেই ইস্ট বেঙ্গল ক্লাবকে সেখানে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে বহু গোলের ব্যবধানে। মস্কো ডায়নামোস, স্পার্টাক, কিয়েভ ডায়নামোস প্রভৃতি শক্তিশালী দল-গুলির খেলোয়াড় নিয়ে ভারত সফরকারী রাশিয়ান দল গঠিত। এদের অনেকেরই আন্তর্জাতিক খ্যাতি রয়েছে। সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সুগঠিত দেহ, ফুটবল প্রতিভায় ভাস্বর। সুতরাং রাশিয়ান দলের কাছ থেকে আমরা যে ফুটবল নৈপুণ্যের উন্নত কলা-কৌশল দেখতে পাব এবিষয়ে কোনই সন্দেহ নেই।

* * *

কলকাতার বাইরে পশ্চিমবঙ্গ এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ অনুষ্ঠানের আয়োজন রাজ্যের এ্যাথলেটিক স্পোর্টস ইতিহাসে এক নূতন ঘটনা। ২৪ পরগণা জেলা এসোসিয়েশন এবার রাজ্য এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ পরিচালনার ভার পেয়েছিলেন। তাঁরা কাঁচরাপাড়া রেলওয়ে স্পোর্টস মাঠে সাফল্যের সঙ্গে স্পোর্টস সম্পন্নও করেছেন। এই উপলক্ষে রাজ্যপাল ডাঃ এইচ সি মুখার্জিও শেষ দিনের অনুষ্ঠানে সেখানে পদার্পণ করেন বিজয়ী এ্যাথলীটদের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দেবার জন্য; কিন্তু রাজ্যপালের কলকাতায় কোন জরুরী কাজ থাকায় কয়েকখানা প্রশংসাপত্র বিলি করবার পরই তাঁকে যাত্রা করতে হয় কলকাতা অভিমুখে। সব প্রশংসাপত্র বিতরণ করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় না। কলকাতা ময়দানের মাননীয়েরা—যাঁরা এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের হর্তাকর্তা, তাঁরাও রাজ্যপালের সঙ্গে আসন ত্যাগ করেন—প্রশংসাপত্রের গাদা পড়ে থাকে টেবিলের উপরে, এ্যাথলীটরা দাঁড়িয়ে থাকেন ফাঁকা ময়দানে। শেষ পর্যন্ত ২৪ পরগণা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের তত্ত্বাবধানে প্রশংসাপত্র বিতরিত হয়। প্রশংসা-পত্র বিতরণের ভার এবং এ্যাথলেটিক স্পোর্টস পরিচালনা সূচীর পুস্তিকা প্রণয়ন কলকাতার মাননীয়েরাই হাতে রেখেছিলেন, বলা বাহুল্য, এই দুটি বিষয়ের গলদ ছাড়া এবারকার রাজ্য এ্যাথলেটিক স্পোর্টস অনুষ্ঠানে কোন খুঁৎ পাওয়া যায়নি। নিখুঁৎ ব্যবস্থাপনায় কাঁচরা-পাড়া রেলওয়ে স্পোর্টস মাঠটিকে পত্রপুষ্প ও পতাকাদিতে শোভিত করে বর্ণাঢ্য সুষমায় ২৪ পরগণা জেলা স্পোর্টস এসোসিয়েশন তিনদিনব্যাপী এ্যাথলেটিক স্পোর্টস সম্পন্ন করেন। অবশ্য পশ্চিমবঙ্গের এ্যাথলেটিকস মান নিম্নাভিমুখী, তাই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তীব্রতা অনুভূত হয়নি, কোন এ্যাথলীট রেকর্ডও সৃষ্টি করতে পারেন নি। অনেকগুলি বিষয় যে সময়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয়েছে, আন্তঃ কলেজ এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে অনেক এ্যাথলীট তার চেয়ে কম সময়ে দূরত্ব অতিক্রম করেছেন। সুতরাং ফেব্রুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে ইডেন উদ্যানে ভারতের জাতীয় এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে পশ্চিমবঙ্গের স্থান নিরূপণ করা কষ্টসাধ্য নয়।

* * *

আবাদীতে জাতীয় কংগ্রেসের শেষ দিনের অধিবেশনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু তাঁর সমবয়সী যে কোন ব্যক্তিকে চ্যালেঞ্জ করেছেন। খেলাধুলার ব্যাপারেই প্রধান মন্ত্রীর এই চ্যালেঞ্জ। প্রকাশ্য অধিবেশনে বুনিয়াদী

প্রাক্তন দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিংয়ের সঙ্গে স্পোর্টসম্যান নেহরু ব্যাডমিণ্টন র‍্যাকেট হাতে দাঁড়িয়ে আছেন

শিক্ষা সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করে, তিনি যখন শারীরিক যোগ্যতার উপর গুরুত্ব আরোপ করছিলেন তখন বলেন—"শারীরিক পরিশ্রমের ক্ষেত্রে আমি আমার সমবয়সী যে কোন ব্যক্তিকে পরাজিত করতে পারি, আমি একশ' মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করতে পারি, যে কোন লোকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সাঁতার কাটতে পারি, ঘোড়ায়ও চড়তে পারি, তবে অত্যন্ত দুঃখের কথা যে বিশ বা তিরিশ বছর আগে আমি যেমন কর্মঠ ছিলাম আজ আর তেমন শ্রমশীল নই।" আগের মত কর্মঠ নেই বলে শ্রীনেহরু দুঃখ করেছেন; কিন্তু আমাদের দুঃখ কেউ নেহরুর চ্যালেঞ্জ এ্যাকসেপ্ট না করায় একটা বড় স্পোর্টিং ইভেণ্ট ফলাও করে প্রকাশ করবার সুযোগ মাঠে মারা গেল। এদিক দিয়ে জেনারেল রিপোর্টাররা ভাগ্যবান। তাঁরা তবু নেহরুর চ্যালেঞ্জ প্রকাশ করবার সুযোগ পেয়েছেন; কিন্তু সে চ্যালেঞ্জ কেউ গ্রহণ না করলে ক্রীড়া সাংবাদিকরা করেন কি? কংগ্রেসের হীরক জয়ন্তী অধিবেশনে আবাদী ময়দানে একজনও প্রতিদ্বন্দ্বী খুঁজে পাওয়া গেল না যিনি নেহরুর স্পোর্টিং চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করেন। নেহরুর পুরনো সুহৃদ ডাঃ খান সাহেব এবং পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল গোলাম মহম্মদ দিল্লীতে এসেছেন, এঁরা যদি শ্রীনেহরুর স্পোর্টিং চ্যালেঞ্জ এ্যাকসেপ্ট করেন তবে দিল্লীর জুম্মা মসজিদ থেকে লালকেল্লা পর্যন্ত পাক-ভারত দৌড় প্রতিযোগিতার এক রাষ্ট্রিক আয়োজন হতে পারে। আমাদেরও একটা জমকালো খবর পরিবেশন করবার সুযোগ হয়।

বাস্তবিক এই বয়সে নেহরুর কর্মক্ষমতা তাঁর শরীরের শক্ত বাঁধুনীরই সাক্ষ্য দেয়। তিনি দৌড়, সাঁতার ও ঘোড়ায় চড়ার কথা বলেছেন, আমরা তাঁকে সেদিনও দিল্লীতে ক্রিকেট খেলে বন্যার্তদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে দেখেছি, আরও কিছু আগে দেখেছি প্রাক্তন দেশরক্ষা সচিব সর্দার বলদেব সিংয়ের সঙ্গে ব্যাডমিণ্টন খেলে আনন্দ পেতে। কর্মযোগী নেহরুর এই কর্মক্ষমতা, মনের এই তেজ এবং এই স্পোর্টসম্যান স্পিরিট চিরদিন বজায় থাক, এই কামনা করি।

* * *

"তুমি এত তাড়াতাড়ি খেলা ছাড়লে কেন?" কলেজের সহপাঠী এক বন্ধুর এই প্রশ্নের উত্তরে ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক বিজয় মার্চেণ্ট বলেছেন—"লোকে বলবে মার্চেণ্ট খেলা ছাড়ে না কেন, এ আমি চাইনি বলেই তাড়াতাড়ি খেলা ছেড়েছি।" ইংরেজীতে একটা কথা আছে—"নিজের মনের খুশীতে অবসর গ্রহণ করবে, জন-সাধারণের দাবীর অপেক্ষা রাখবে না।" মার্চেণ্টের উক্তি এই প্রবাদবাক্যেরই নামান্তর। বস্তুত ক্ষমতা থাকতে ক্ষমতা ত্যাগ করলেই ক্ষমতাশালীর মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। যার কোন ক্ষমতা নেই তার ক্ষমতা ত্যাগের কোন অর্থ হয় না। খেলার ক্ষেত্রেও এর কোন ব্যতিক্রম নেই। বিশ্ববন্দিত ক্রিকেট খেলোয়াড় ডন ব্রাডম্যান যখন ক্রিকেট খেলা ছেড়েছেন তখনও ক্রিকেট প্রতিভার উজ্জ্বল দীপ্তিতে তিনি ভাস্বর। শুধু ব্রাডম্যান কেন অস্ট্রেলিয়ার বহু ধুরন্ধর ক্রিকেট খেলোয়াড়ই এমনিভাবে তাদের প্রিয় খেলা থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন। এই যে মাইলপথের দৌড়বীর বিশ্বখ্যাত রজার ব্যানিস্টার স্পোর্টস ছেড়ে দিলেন, এখানেও এই একই মনোবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। কথা উঠতে পারে, অধিকতর ব্যাপক ক্ষেত্রে ব্যানিস্টারের প্রতিষ্ঠা অর্জনের সুযোগ রয়েছে, তাই তিনি স্পোর্টস ছেড়েছেন। কথা মিথ্যে নয়, কিন্তু ডাক্তারীর সঙ্গেও তো তিনি স্পোর্টস করতে পারতেন। তবে দুইদিকে সমান দৃষ্টি রাখতে পারবেন না বলেই তিনি স্পোর্টস ছেড়েছেন। ডাক্তারী বিদ্যায় প্রতিষ্ঠা

অর্জনের জন্য যেমন সাধনার প্রয়োজন, খেলাধূলায় পারদর্শিতা অর্জনের জন্যও প্রয়োজন তেমন সাধনার। কিন্তু আমাদের দেশে এই সাধনারই অভাব। না পড়েই পন্ডিত হতে চাই। সাধনা না করেই খেলায় পারদর্শিতা অর্জন করতে চাই আমরা।

মার্চেন্টের উক্তির সংগে আমাদের ক্রীড়া-পরিচালকদের মনোবৃত্তির কতটা পার্থক্য এই প্রসংগে তা আলোচনা করবার লোভ সম্বরণ করতে পারছি না। পাকিস্থানে ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড়রা তেমন সুবিধা করতে পারছেন না বলে কথা উঠেছে বিজয় হাজারে, হেমু অধিকারী ও মিডিয়াম ফাস্ট বোলার সুন্দররামকে ভারতীয় দলের শক্তি বৃদ্ধির জন্য পাকিস্থানে পাঠান হবে। ক্রিকেট-বৃদ্ধ হাজারে ও অধিকারীকে পাকিস্থানে পাঠাবার এ প্রয়াস কেন? অন্য দেশ হলে এরা এতদিন প্রতিযোগিতামূলক খেলা ছেড়ে তরুণ খেলোয়াড় তৈরীর কাজে নিজেদের নিয়োগ করতেন; কিন্তু এদেশে এরা এখনো খেলা তো ছাড়েননি, ক্রিকেট পরিচালকরাও এদের ছাড়তে চাইলেন না। হাজারে এবং অধিকারী যতই ভাল খেলুন না কেন তাঁদের পাকিস্থানে পাঠাবার কোন অর্থ হয় না। মহা অনিশ্চয়তাই ক্রিকেট খেলার বিশেষত্ব। পাকিস্থানে খেলতে গিয়ে তারাও যদি এক বলে আউট হয়ে যান ক্রিকেট পরিচালকদের চেয়ে তাঁদের মুখেই কালি পড়বে বেশী। তরুণ খেলোয়াড় সুন্দররাম, দীপক সোধনকে পাঠান যেতে পারে। অত্যগুলি স্পিন বোলার না পাঠিয়ে এদের আগেই পাঠান উচিত ছিল, দেরিতে হলেও এদের এখন পাকিস্থানে পাঠালে ক্রিকেট বোর্ড সুবিবেচনার কাজ করবেন।

* * *

ভারত ও চেকোশ্লোভেকিয়ার টেবিল টেনিস টেস্টে চেকোশ্লোভেকিয়া 'রাবার' লাভ করেছে। দুই দেশের মধ্যে পাঁচটি টেস্ট খেলার আয়োজন হয়, এর মধ্যে ইতিমধ্যেই চারটি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং চেক দল ৩—১ খেলায় এগিয়ে থেকে রাবার পেয়েছেন। কলকাতার শেষ টেস্ট খেলা বাকী। এখানে পূর্ব-ভারত চ্যাম্পিয়নশিপের পর শেষ টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হবে ৩০শে জানুয়ারী ইডেন উদ্যানের ইনডোর স্টেডিয়ামে। পূর্ব ভারত টেবিল টেনিসের খেলাও আরম্ভ হয়েছে এখানে। চেকোশ্লোভেকিয়ার ধুরন্ধর খেলোয়াড় আইভান আনদ্রিয়াদিজ ও ভ্যাকলার টেরেবা পূর্ব ভারত টেবিল টেনিসেরও প্রতিদ্বন্দ্বী। গত ২৪শে থেকে খেলা আরম্ভ হয়েছে, এর মধ্যে কয়টি খেলায় জয়লাভও করেছেন চেক খেলোয়াড়দ্বয়। আনদ্রিয়াদিজ ও টেরেবা ছাড়া ভারতের বহু কুশলী টেবিল টেনিস খেলোয়াড়ও কলকাতায় সমাগত। সুতরাং পূর্ব ভারত টেবিল টেনিস উৎসবের মধ্যে কলকাতার ক্রীড়ামোদীরাও ডুবে আছেন।

চেক-ভারত পঞ্চম টেস্টে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করছেন বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন রণবীর ভান্ডারী, হায়দরাবাদের কে রামকৃষ্ণ বাঙ্গলার খ্যাতনামা খেলোয়াড় কল্যাণ জয়ন্ত। ভান্ডারী ও রামকৃষ্ণ সিংগলসে এবং জয়ন্ত ও ভান্ডারী ডাবলসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ইতিপূর্বে বোম্বাই, হায়দরাবাদ ও মাদ্রাজ টেস্টে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন উত্তম চন্দ্রানা ও যতীন ব্যাস। ব্যাঙ্গালোর টেস্টে চন্দ্রানা ও নাগরাজকে নির্বাচিত করা হয়। ভান্ডারী, জয়ন্ত ও রামকৃষ্ণ টেস্টে আনদ্রিয়াদিজ ও টেরেবার নূতন প্রতিদ্বন্দ্বী। নিচে এ পর্যন্ত যে চারটি টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে তার ফলাফল দেওয়া হল।
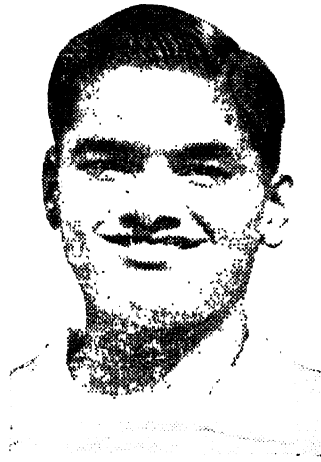
ভারতের হার্ডকোর্ট টেনিস চ্যাম্পিয়ন আর কৃষ্ণণ

প্রথম টেস্ট—বোম্বাই

সিংগলস—আইভান আনড্রিয়াডিজ (চেক) ২১—১৯, ১৯—২১ ও ২১—১৪ পয়েন্টে যতীন ব্যাসকে (ভারত) পরাজিত করেন।

উত্তম চন্দ্রানা (ভারত) ২১—১৬ ও ২১—১৭ পয়েন্টে ভি টেরেবাকে (চেক) এবং ২১—১৭, ২২—২৪ ও ২১—১৬ পয়েন্টে আইভান আনড্রিয়াডিজকে (চেক) পরাজিত করেন।

যতীন ব্যাস (ভারত) ২১—১৯ ও ২২—২০ পয়েন্টে ভি টেরেবাকে (চেক) পরাজিত করেন।

ডাবলস—আইভান আনড্রিয়াডিজ ও টেরেবা (চেক) ২১—১৩ ও ২১—১৯ পয়েন্টে যতীন ব্যাস ও চন্দ্রানাকে (ভারত) পরাজিত করেন।

দ্বিতীয় টেস্ট—হায়দরাবাদ

সিংগলস—আইভান আনড্রিয়াডিজ (চেক) ২১—১১ ও ২১—১১ পয়েন্টে যতীন ব্যাসকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ভি টেরেবা (চেক) ২০—২২, ২১—১৭ ও ২১—১৪ পয়েন্টে উত্তম চন্দ্রানাকে (ভারত) হারিয়ে দেন।

আইভ্যান আনড্রিয়াডিজ (চেক) ১৯—২১, ২১—১৯ ও ২১—১০ পয়েন্টে উত্তম চন্দ্রানাকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ভি টেরেবা (চেক) ২১—১১ ও ২১—১২ পয়েন্টে যতীন ব্যাসকে (ভারত) পরাজিত করেন।

ডাবলস—আনড্রিয়াডিজ ও টেরেবা (চেক) ২১—১৬ ও ২১—১৭ পয়েন্টে চন্দ্রানা ও ব্যাসকে (ভারত) পরাজিত করেন।

তৃতীয় টেস্ট—মাদ্রাজ

সিংগলস—আনড্রিয়াডিজ ২১-১৪ ও ২১-১২ পয়েন্টে উত্তম চন্দ্রানাকে পরাজিত করেন।

টেরেবা ২১-১৭ ও ২১-১৮ পয়েন্টে ব্যাসকে পরাজিত করেন।

আনড্রিয়াডিজ ২১-৯ ও ২১-৮ পয়েন্টে ব্যাসকে পরাজিত করেন।

টেরেবা ২১-১৯ ও ২১-১০ পয়েন্টে চন্দ্রানাকে পরাজিত করেন।

ডাবলস—আনড্রিয়াডিজ ও টেরেবা ২১-১৬ ও ২১-১৭ পয়েন্টে চন্দ্রানা ও ব্যাসকে পরাজিত করেন।

চতুর্থ টেস্ট—ব্যাংগালোর

সিংগলস—আনদ্রিয়াদিজ ২১-১০ ও ২১-৮ পয়েন্টে কে নাগারাজকে এবং ২১-১৩ ও ২১-১৮ পয়েন্টে উত্তম চন্দ্রানাকে পরাজিত করেন।

টেরেবা ২১-১৯ ও ২১-১৮ পয়েন্টে উত্তম চন্দ্রানাকে এবং ২১-১২ ও ২১-১২ পয়েন্টে কে নাগারাজকে পরাজিত করেন।

ডাবলস—আনদ্রিয়াদিজ ও টেরেবা ২১-১৭ ও ২১-৭ পয়েন্টে চন্দ্রানা ও চন্দোরকারকে পরাজিত করেন।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

১৭ই জানুয়ারী—আজ মাদ্রাজে কংগ্রেসের কার্য পরিচালনা কমিটির অধিবেশনে মোট দশটি খসড়া প্রস্তাব রচিত হয়। তন্মধ্যে দুইটিই সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিক পরিকল্পনা সংক্রান্ত।

আজ কলিকাতায় সর্বপ্রথম টেলিভিশন দেখান হয় এবং পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়ই টেলিভিশনে প্রথম বক্তৃতা দেন। ভারতে টেলিভিশনের ইহা দ্বিতীয় প্রদর্শনী। ইতিপূর্বে দিল্লীতে টেলিভিশন দেখান হইয়াছে।

১৮ই জানুয়ারী—আজ মাদ্রাজে কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশনের কার্যপরিচালনা কমিটির অধিবেশন শেষ হয়। অদ্যকার অধিবেশনে কৃষি সংস্কার ও পল্লী অঞ্চলে ঋণদান ব্যবস্থার উন্নতি, বুনিয়াদী শিক্ষা ও ভূদান আন্দোলন সম্পর্কিত তিনটি প্রস্তাবের খসড়া রচিত হয়।

১৯শে জানুয়ারী—প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু অদ্য আনুষ্ঠানিকভাবে শ্রী ইউ এন ধেবরের হস্তে কংগ্রেস সভাপতির কার্যভার অর্পণ করেন।

অদ্য আবাদীতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ৬০তম অধিবেশনের বিষয় নির্বাচনী সমিতির প্রথম বৈঠকে সমাজের সমাজতান্ত্রিক সংগঠন এবং সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির অধীনে জনকল্যাণমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যে নীতি অনুসরণ করা হইবে, তাহা বর্ণনা করিয়া পরস্পর সাপেক্ষ দুইটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

২০শে জানুয়ারী—কংগ্রেসের বিষয় নির্বাচনী সমিতি অদ্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা ও শক্তি বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন। প্রস্তাব সংক্রান্ত বিতর্কে যোগদান করিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু বলেন, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানে যে 'অসাধুতা' প্রবেশ করিয়াছে, সে সম্পর্কে উদাসীন থাকা উচিত নহে। এমনকি, প্রতিষ্ঠানের কোন কোন অতি বিশিষ্ট ব্যক্তিও অসাধুতা দোষমুক্ত থাকিতে পারেন নাই।

২১শে জানুয়ারী—অদ্য অপরাহ্ণ চার ঘটিকায় আবাদীতে শ্রী ইউ এন ধেবরের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের হীরক জয়ন্তী ষষ্ঠিতম অধিবেশন আরম্ভ হয়। 'বন্দে মাতরম্' সঙ্গীতের মধ্যে জাতীয় মহাসভার এই প্রকাশ্য অধিবেশন আরম্ভ হইলে কংগ্রেস সভাপতি শ্রীধেবর তিন লক্ষাধিক শ্রোতার সম্মুখে উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, বিশ্বশান্তি ও স্বদেশের প্রগতিকল্পে ভারতে এক বিপ্লব আনয়ন করিতে হইবে এবং এই বিপ্লব সাধনের জন্য কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে শক্তিশালী করিতে হইবে।

আজ কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনে তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে শ্রীনেহরু কর্তৃক উত্থাপিত সমাজতান্ত্রিক ছাঁচে সমাজ গঠন সংক্রান্ত প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। শ্রীনেহরু তাঁহার প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া এক নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। শ্রীনেহরু এই বিশ্বাস ব্যক্ত করেন যে, পূর্ণ স্বরাজের স্বপ্ন এবং অন্যান্য আরও বহু স্বপ্ন যেমন সফল হইয়াছে, তেমনি সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নও সফল হইবে।

এই অধিবেশনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটো ও ভারতস্থিত পাকিস্থানী হাই কমিশনার রাজা গজনফর আলী খান অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। মার্শাল টিটো একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণ প্রদান করেন।

আজ সকালে ভারতীয় এয়ার লাইনের একটি মালবাহী ডাকোটা বিমান গৌহাটি হইতে ১৪ মাইল দূরে বিধ্বস্ত হইয়াছে। বিমানের তিনজন যাত্রীই নিহত হইয়াছেন।

২২শে জানুয়ারী—অদ্য আবাদীতে প্রায় এক লক্ষ লোকের উপস্থিতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিবসের প্রকাশ্য অধিবেশনে আরও দুইটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। গৃহীত প্রস্তাবদ্বয়ের একটি আন্তর্জাতিক ব্যাপার সম্পর্কে এবং অপরটি অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ধেবর ওয়ার্কিং কমিটির ২০ জন সদস্যের মধ্যে ১৮ জনের নাম আজ ঘোষণা করিয়াছেন। শ্রী এস এন অগ্রবাল ও শ্রী কে পি মাধবন নায়ার জেনারেল সেক্রেটারী নিযুক্ত হইয়াছেন।

২৩শে জানুয়ারী—আজ ভারতের সর্বত্র নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর ৫৯তম জন্মদিবস উদযাপিত হয়। বিভিন্ন স্থানে জনগণ এই মহান নেতার প্রতি স্বতঃস্ফূর্তভাবে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন। আবাদীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ধেবর বলেন, নেতাজীর জন্মজয়ন্তী দিবসে আমরা এই সংকল্প গ্রহণ করিতেছি যে, রাজনৈতিক স্বাধীনতাকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতায় রূপায়িত করার যে আদর্শ তাঁহার ছিল, আমরা তাহাই অনুসরণ করিয়া চলিব।

কংগ্রেস ও ভারতে "নেহরু-যুগের" সূচনা করিয়া ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আবাদী অধিবেশন আজ রাত্রি ৭-৪৫ মিনিটে শেষ হইয়াছে। কংগ্রেস অদ্য 'পবিত্রতা রক্ষা ও শক্তিবৃদ্ধি', 'বুনিয়াদী শিক্ষা', 'নারী ও শিশুকল্যাণ', 'কৃষি সংস্কার ও পল্লী অঞ্চলে ঋণদান' প্রভৃতি নয়টি প্রস্তাব গ্রহণ করেন।

কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী বক্সী গোলাম মহম্মদ আজ আবাদীতে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের শেষদিনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেন যে, কাশ্মীর এখন ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ভারতের সহিত ইহার অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

১৭ই জানুয়ারী—দক্ষিণ মেরু বৃত্তে প্রস্তাবিত বৃটিশ অভিযানের নেতা বিশিষ্ট পদার্থ বিজ্ঞানী ডাঃ ভিভিয়ান ফুচ লণ্ডনে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন যে, দক্ষিণ মেরুকে এক পার্শ্বে রাখিয়া আমরা মেরুবৃত্ত অতিক্রম করিতে চাহি এবং তদুদ্দেশ্যে আগামী ডিসেম্বর মাসে আমরা বৃটেন হইতে যাত্রা করিব।

রাশিয়া আজ ঘোষণা করিয়াছে যে, আণবিক শক্তির উন্নয়নকল্পে প্রজাতন্ত্র চীন সহ পাঁচটি কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রকে সাহায্য দেওয়া হইবে।

১৮ই জানুয়ারী—ওয়াশিংটনের কস্টারিকা দূতাবাস হইতে প্রচারিত এক ইস্তাহারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, কস্টারিকায় বিদ্রোহী বাহিনীর মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া দেওয়া হইয়াছে। সরকারী সৈন্যরা এখন তাহাদিগকে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতেছে।

পিকিং বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, গণতন্ত্রী চীনের বিমান, নৌ ও স্থল বাহিনী যিকিয়াংশান দ্বীপটিকে সাফল্যের সহিত মুক্ত করিয়াছে। উক্ত দ্বীপটি চীনা জাতীয়তাবাদিগণের অধিকারে ছিল।

১৯শে জানুয়ারী—আজ আলজিরিয়ার অর্স পর্বত এলাকায় জাতীয়তাবাদী বিদ্রোহীগণের সহিত ফরাসী বাহিনীর প্রথম সংঘর্ষে উভয় পক্ষের মোট ছয়জন নিহত হয়।

২২শে জানুয়ারী—ফরমোজা এলাকায় দ্বন্দ্বের তীব্রতা বৃদ্ধির ফলে যে জটিল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে, উহার অবসান ঘটাইবার জন্য আজ ওয়াশিংটনে মার্কিন নেতৃবৃন্দ নেপথ্যে আলাপ-আলোচনায় নিযুক্ত হন। ম্যানিলার সংবাদে প্রকাশ, তিনখানা মার্কিন বিমানবাহী জাহাজ অদ্য সকালে ম্যানিলা উপসাগর হইতে ফরমোজা এলাকার দিকে যাত্রা করিয়াছে।

২৩শে জানুয়ারী—মার্কিন ৭ম নৌবহরের অধিনায়ক এডমিরাল আলফ্রেড প্রাইড অদ্য তাঁহার নিজস্ব পতাকাবাহী জাহাজ "হেলেনায়" আরোহণ করিয়া তাইপেতে (ফরমোজা) উপনীত হন।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষাণ্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
১৪ সংখ্যা
দেশ
শনিবার
২২ মাঘ ১৩৬১
DESH SATURDAY, 5th FEBRUARY 1955

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সর্বোদয় দিবস

৩০শে জানুয়ারী গান্ধীজীর সপ্তম বার্ষিক তিরোভাব দিবস। এই দিবসে আমরা তাঁহার পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে আমাদের শির শ্রদ্ধাবনত করিতেছি। গান্ধীজী মহামানব। মৃত্যুঞ্জয়ী তিনি। তিনি অভীঃ মন্ত্রের উদ্গাতা। কটিবাস-পরিহিত ভারতের এই অর্ধনগ্ন ফকীরের মুখ হইতে অগ্নিমন্ত্র উচ্চারিত হইয়া যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জীভূত সংকীর্ণতা এবং জীর্ণতার আবর্জনারাজী দগ্ধ হইয়া যায়। আসমুদ্র-হিমাচলে মানব-মুক্তির হোমানল-শিখা প্রজ্বলিত হয়। সেই আগুনের আবর্ত লীলায় পরাধীনতার অন্ধকার কাটিয়া গিয়া নবীন ঊষার অরুণ আলো ভারতের দিক্‌চক্রবালে ফোটে। গান্ধীজীর সমগ্র জীবনে সবিতার এই বরণীয় জ্যোতির উদ্বোধন এবং তাঁহার জীবনদানে বৃহৎ জীবনের জাগরণ, মানব-মহিমার প্রকাশ এবং বিলাস। এইভাবে জাতির অগ্রগতিতে সর্বোদয়ের সূচনা।

ব্রহ্মের সংস্পর্শের যে আনন্দ, অভয়ত্ব তাহারই স্বরূপ। সে আনন্দ পাইলে ভয়, শোক আসিবে কোথা হইতে? সাধক সর্বজীবের মধ্যে, সমস্ত বিশ্বের মধ্যে সে অবস্থায় অখিলাত্ম দেবতাকে দর্শন করেন এবং তাঁহার পূজায় আত্মনিবেদন করিয়া কৃতার্থ হন। এইখানেই জীবনের সার্থকতা বা পরমাগতি। মৃত্যুর ভিতর দিয়া এইভাবে অমৃতত্ব লাভ; সকলকে আপনার করিয়া পাইয়া পরার্থে প্রাণদানে সর্বার্থসিদ্ধি। ফলত মানুষের জীবন পবিত্র এবং দিব্য। ফুলের মতই তাহা সুন্দর ও মধুর। উপযুক্ত প্রতিবেশের অভাবে ইহা কোরকের আকারে অস্ফুট থাকে এবং অযত্নে হয়ত শুকাইয়া যায়। ফুটন্ত ফুলই দেবপূজায় প্রশস্ত। জীবন-পুষ্পকে পরার্থ-ভাবনায়, প্রেমের মহিমায় বিকশিত করিয়া দেবতার চরণে নিবেদন করাতেই পুষ্প-জীবনের চরম সার্থকতা। মহাপুরুষগণ জীবনের মূলের এই মাধুর্য-বীর্য তাঁহাদের সাধনার আদর্শে উদ্দীপ্ত করেন। আত্মবিস্মৃত মানুষের স্মৃতিকে তাঁহারা জাগান। গান্ধীজীর জীবন এমনই ফুলেরই মত বর্ণে, সুষমায়, গন্ধে, দিব্য-ছন্দে দেবতার পায়ে নিবেদিত হইয়াছে। যুগে যুগে জগতের মহাসন্ধিক্ষণে মহাপুরুষগণের এইরূপ অমর-জীবন বরণের খেলা আমরা দেখিয়াছি। ভূতভাবোদ্ভবকর তাঁহাদের এই আত্মোৎসর্গ মানুষের অন্তরের মহৎ ভাবনিচয়কে প্রস্ফুট করিয়াছে। মানুষ ফুলের ডালা সাজাইয়া দেবতার পূজা করিয়াছে এবং অমৃতলোকে অধিষ্ঠিত পুরুষেরা সেই পূজার আনন্দ আস্বাদন করিয়াছেন।

প্রকৃতপক্ষে এমন নিবেদাত্ম পুরুষেরাই জগতের প্রাণস্বরূপ। জীবন দিয়া তাঁহারা জীবনকে প্রতিষ্ঠা করেন। দুর্বল যাহারা, তাহারা আত্মাকে লাভ করিতে পারে না। পশু-জীবনের গ্লানি তাহাদিগকে মহাভয়ে আচ্ছন্ন রাখে। মানব-সমাজকে এই পশুত্ব হইতে মুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে মহামানবগণ আবির্ভূত হইয়া থাকেন। অন্ধকার হইতে তাঁহারা মানুষকে আলোকের রাজ্যে লইয়া যান। মুক্তির বাণী শুনাইয়া তাঁহারা আমাদিগকে আত্মমহিমা সম্বন্ধে সচেতন করিয়া তোলেন।

মহাত্মা গান্ধীর জীবন এবং বাণীতে সেই সনাতন সুরটিই ধ্বনিত হইয়াছে। ভারতের তত্ত্বদর্শী ঋষিগণ যে পরম সত্য প্রচার করিয়াছিলেন, তিনি সেই বাণীই অভিনব ছন্দে এবং দেশ ও কালোপযোগীভাবে আমাদের কাছে কীর্তন করিয়াছেন। এক আত্মাকে জানো, বহু কিছু জানিবার নাই; সকল কথার এক আত্মার অনুধ্যানই কর, ত্যাগের দ্বারা অমৃত আস্বাদন কর, কাহারো ধনে লোভ করিও না। গান্ধীজীর জীবন এই ঋষি-গীতিরই কাব্যময় রূপ।

বর্তমান সভ্যতার গতি ত্যাগের পথে নয়। এই সভ্যতা পরম গৃধ্নুতার প্রবৃত্তি লইয়া দুর্নিবার তৃষ্ণায় ছুটিয়া চলিয়াছে। মহাত্মা গান্ধী জীবন দিয়া এই ভ্রান্তি সম্বন্ধে মানব সমাজকে সচেতন করিয়াছেন। এদেশের ঋষিরা বলিয়াছেন, মহতের আবির্ভাব দুর্লভ। তাঁহারা আবির্ভূত হইলেও তাঁহাদিগকে লোকে ধরিতে পারে না, বুঝিতে পারে না; তথাপি তাঁহাদের জীবনের মূলীভূত বীর্য অমোঘ। গান্ধীজীর মহিমা জগৎ এখনও উপলব্ধি করিতে পারে নাই। আমরা তাঁহাকে নিজেদের মধ্যে একান্ত আপনার করিয়া পাইয়াছিলাম, আমরাই বা তাঁহাকে

কতটুকু বুঝিতে সমর্থ হইয়াছি? কিন্তু এই অল্প দিনের মধ্যেও গান্ধীজীর জীবনাদর্শ বিশ্বমানব-সভ্যতার ক্ষেত্রে অভিনব চিন্তার ধারাকে উন্মুক্ত করিয়াছে। মানুষ শ্বাপদের মনোবৃত্তি ছাড়িয়া মৈত্রীর পথে, পারস্পরিক বিরোধের সমাধান করিবার জন্য উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কোন মহাপুরুষই তাঁহার জীবদ্দশায় কিংবা তাঁহার তিরোভাবের এতটা অব্যবহিত পরবর্তীকালে গান্ধীজীর ন্যায় প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হন নাই।

স্বাধীন ভারত ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও মূলত গান্ধীজীর আদর্শকে অবলম্বন করিয়াই অগ্রগতির পথে চলিয়াছে। সমাজ-জীবন হইতে বৈষম্য বিদূরিত করিয়া সর্বজনীন উন্নতির মধ্যে সর্বোদয়ের যে আদর্শ নিহিত রহিয়াছে, ভারতের নীতি উত্তরোত্তর সেই ভিত্তির দিকেই সম্প্রসারিত হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে ভারতের মুক্তি-সাধনার রীতি এবং প্রকৃতি যাহাই হোক না কেন, দেশ এবং কালের উপযোগীভাবে তাহাতে বিভিন্নতা কিংবা বৈচিত্র্য হয়ত আছে, কিন্তু সর্বত্রই সর্বোদয়ের আদর্শ তাহার মূলে কাজ করিয়াছে। সে সাধনায় যাঁহারা জীবন দিয়াছেন, বৃহতের বেদনা এবং ভাবনাই তাঁহাদিগকে মৃত্যুর ভিতর দিয়া অমৃতের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। হিংসা বা অহিংসার প্রশ্ন এখন অবান্তর। বৃহতের জন্য এই ভাবনাই জাতির সর্বোদয়ের পথ। গান্ধীজীর স্মৃতিতে শ্রদ্ধানিবেদন করিতে গিয়া আমরা মুক্তি-সাধনায় আত্মদাতা ভারতের বীর সন্তানদের প্রতিও আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছি। শ্রদ্ধাই সত্যকে প্রতিষ্ঠা দেয়। জাতির বৃহত্তর স্বার্থে আত্মোৎসর্গের প্রতি এই শ্রদ্ধার ভাব সর্বোদয়-সাধনাকে সার্থক করিয়া তুলিবে। আমরা যদি ইহাকে ম্লান হইতে না দিই, তাহা হইলে আমাদের ভয় নাই, ক্ষয় নাই।

পাটনা রবীন্দ্র পরিষদ

১৯৪৮ সালে রবীন্দ্রনাথের কয়েক-জন অনুরাগীর উদ্যোগে পাটনায় রবীন্দ্র পরিষদ গঠিত হয়। পরিষদ এই কয়েক বৎসরে কবির জীবন-দর্শন এবং তাঁহার সাধনা সম্পর্কিত প্রচারের কাজে অনেকখানি অগ্রসর হইয়াছেন। পরিষদের কাজ বর্তমানে পাটনার 'হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ড' বিল্ডিংয়ে চলিতেছে। কাজ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যে পরিষদের সদস্যগণ পরিষদের একটি নিজস্ব ভবন নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতেছেন। এই ভবনে রঙ্গমঞ্চ এবং উপযোগী প্রেক্ষাগার থাকিবে। বাড়ি নির্মাণের জন্য জমি বিহার সরকারের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে; কিন্তু বাড়ি তুলিবার কাজ এখনও বাকী। এই উদ্দেশ্যে পরিষদ কবির অনুরাগিগণের নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন করিয়াছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ শুধু বাঙালী নহেন, তিনি সমগ্র ভারতের, প্রত্যুত সমগ্র বিশ্বের পক্ষে তাঁহার অবদানরাজী অমূল্য সম্পদ। তথাপি আমরা বাঙালী, আমাদের এ সম্বন্ধে দাবী বেশী। কবি আমাদের এই বাঙলাদেশের জল, মাটিতেই আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ইহা আমাদের সবচেয়ে বড় গর্ব—এই গর্বের উপর আমাদের সভ্যতা, সংস্কৃতি—সমগ্র ভারত এবং বিশ্বমানব সমাজের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। জাতীয়তাবাদী বাঙলা, যদি তাঁহার বিশিষ্ট জাতীয়তাবাদের সর্বভারতীয় আদর্শ আন্তঃপ্রাদেশিকতার ক্ষেত্রে সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে চায়, তবে কবির জীবনাদর্শ এবং তাঁহার সাধনা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্থায়ীভাবে যাহাতে সম্প্রসারিত হয়, এজন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ আমাদের গড়িয়া তুলিতে হইবে। বস্তুত কোন বাধাই এ পথে অন্তরায় সৃষ্টি করিতে পারিবে না। কবির অবদানের মূলীভূত প্রাণশক্তি এমনই প্রবল, উদার এবং অমোঘ। ফলত বিশ্বকবির উদ্দেশ্যে বৎসরের কয়েকটি দিনে সভা-সমিতি এবং তৎসম্পর্কে উৎসব-আড়ম্বর জমাইয়া তোলাই বড় কথা নয়। কবি আমাদের কাছে যে আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাকে সামগ্রিকভাবে সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সম্প্রসারণের দ্বারাই প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহার স্মৃতিপূজা সার্থক হইতে পারে। এই সম্পর্কে পাটনা রবীন্দ্র পরিষদের প্রচেষ্টা আমাদের পক্ষে আদর্শস্বরূপ। আমরা আশা করি, পরিষদ ভবন গঠনে তাঁহাদিগকে অর্থসাহায্য করিয়া তাহার সার্থকতা বিধানে দেশবাসী মুক্তহস্তে অগ্রসর হইবেন।

ভারত-পাকিস্থান মৈত্রী

পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল গোলাম মহম্মদের ভারত পরিদর্শন এবং ভারতের প্রধান মন্ত্রীর সহিত হৃদ্যতাপূর্ণ আলাপ-আলোচনায় ভারতীয় জন-সাধারণের মনে আশার সঞ্চার হইয়াছে। মিঃ গোলাম মহম্মদের সঙ্গে ডাঃ খান সাহেব থাকাতে এই আশার কারণ আরও বাড়িয়াছে। কিন্তু এই আশা সার্থকতা লাভের জন্য পাক-ভারত মৈত্রীর পক্ষে মৌলিক অন্তরায় কতটা বিদূরিত হইয়াছে, এ সম্বন্ধে আমাদের মনে যথেষ্টই সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে ঐক্যের কথা বলিয়াছেন, কিন্তু এই ঐক্যবোধ পাকিস্থানের রাষ্ট্রনীতিতে পারস্পরিক সৌহার্দমূলক বাস্তব রূপ দিতে সমর্থ হইবে কি, ইহাই প্রশ্ন। পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল কি ঐশ্লামিক রাষ্ট্র গঠনের উৎকট মোহ হইতে পাকিস্থানের রাজনীতিকে মুক্ত করিতে পারিবেন? যদি তাহা সম্ভব না হয়, পাকিস্থানের অ-মুসলমানদিগকে সর্বপ্রকার রাজনীতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদিগকে ক্রীতদাসে পরিণত করিবার মধ্যযুগীয় বর্বর-নীতিই যদি পাকিস্থানের ভবিষ্যৎকে নিয়মিত করে, তবে অন্যান্য ক্ষেত্রে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্য থাকা সত্ত্বেও আদর্শগত বিরোধ স্পষ্টই থাকিয়া যাইবে এবং সেই বিরোধকে কেন্দ্র করিয়া পাকিস্থানের রাজনীতিতে পরস্পর-প্রভুত্বস্পর্ধী উপদলীয় কূটচক্রও ক্রমাগত পাকিয়া উঠিবে। বস্তুত ভারত-পাকিস্থান মৈত্রীর পক্ষে ভারতের দিক হইতে কোন বাধাই নাই। বাধা পাকিস্থানের দিক হইতে এবং তাহা প্রগতিবিরোধী ভ্রান্ত নীতি হইতে উদ্ভূত, যাহা পাকিস্থানের নিজের পক্ষেও কল্যাণকর নহে।

চীনের উপকূলের নিকটবর্তী কতকগুলি দ্বীপের দখল নিয়ে পিকিং সরকার এবং মার্কিন-আশ্রিত কুমিনটাং-এর মধ্যে যে বোমাবাজি চলছে তার পরিণাম অনিশ্চিত। পিকিং সরকার এই দ্বীপগুলি এবং ফরমোজা হস্তগত করতে কৃতসংকল্প। আমেরিকা যদি চিয়াংকাইশেকের পছনে না থাকত তবে অনেক আগেই এ জায়গাগুলি পিকিং সরকারের হস্তগত হয়ে যেতো। কিন্তু আমেরিকা ফরমোজাকে কম্যুনিস্ট চীন সরকারের হাতের বাইরে রাখতে চায়। ফরমোজা রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমেরিকা চিয়াংকাইশেকের সঙ্গে একটা চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। কম্যুনিস্ট চীনের আক্রমণ থেকে ফরমোজা, পেসকাডোর দ্বীপসমূহ এবং অন্যান্য 'সংশ্লিষ্ট' অঞ্চলের রক্ষাকল্পে মার্কিন শক্তি প্রয়োগ করা যাবে, এ অনুমতিও প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার মার্কিন কংগ্রেসের কাছ থেকে নিয়ে রেখেছেন। এর জন্য মার্কিন ৭ম নৌবহরও তৈরী হয়ে আছে।

তবে মার্কিনী সরকারের ঘোষণার মধ্যে কিছুটা ইচ্ছাকৃত অস্পষ্টতা আছে। ফরমোজা ও পেসকাডোর সম্বন্ধে উক্তি স্পষ্ট। কিন্তু অন্যান্য 'সংশ্লিষ্ট' অঞ্চল বলতে কী বুঝায় তা পরিষ্কার নয়। চীন উপকূলের নিকটবর্তী যে-সব দ্বীপ বর্তমানে কুমিনটাংএর দখলে আছে তার সবগুলির রক্ষার জন্যই আমেরিকা সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত তা বলা যায় না। কিছুদিন পূর্বে পিকিং সরকার কুমিনটাংএর কাছ থেকে একটা দ্বীপ দখল করে নিয়েছেন। তাচেন দ্বীপাবলী থেকেও কুমিনটাং সৈন্য সরিয়ে আনার কথা হচ্ছে অর্থাৎ এই দ্বীপগুলি রক্ষা করাও আমেরিকা প্রয়োজনীয় মনে করে না। কেময় ও মাত্‌সু—এই দ্বীপ দুটি চীনের দুটি প্রধান বন্দরের মুখের কাছে। এই দ্বীপদুটি কুমিনটাংএর দখলে থাকা পিকিং সরকারের পক্ষে অত্যন্ত অস্বস্তিকর। পিকিং সরকার যদি এগুলি দখল করার জন্য জোর আক্রমণ করেন তবে মার্কিন সরকার তাতে বাধা দেবেন কি না সেটা ওয়াশিংটন অনিশ্চিত রেখেছে, যাতে পিকিংএর পক্ষে কর্তব্য নির্ধারণ সহজ না হয়। তবে বোধ হয় দরাদারির সুবিধার জন্য এ দ্বীপগুলি হাতে রাখা হচ্ছে যাতে এগুলির পরিবর্তে পিকিং সরকারের কাছ থেকে কিছু আদায় করা যায়। মোটের উপর উপকূলের নিকটবর্তী দ্বীপগুলি নিয়ে দরাদরি ও সওদা চলতে পারে। সুতরাং এইগুলি নিয়ে যে মারামারি চলছে তা বৃহত্তর যুদ্ধে পরিণত হতে পারে, এ আশংকা অত্যল্পই থাকত, যদি এ সব ব্যাপার পিকিং সরকারের ফরমোজা সম্পর্কিত দাবীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত না হোত। এই সব দ্বীপ এবং ফরমোজার উপর চীনের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হওয়া চাই; আমেরিকা যা করছে সে সমস্তই চীনের অভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপের সামিল—এ সব চলবে না। এই হচ্ছে পিকিং সরকারের দাবী।

ইউনোর সিকিউরিটি কাউন্সিলে নিউজীল্যাণ্ড যুদ্ধবিরতির জন্য একটা প্রস্তাব এনেছে। পিকিং সরকার সেটাকে একটা চালাকি বলে মনে করছেন। আমেরিকার স্বার্থ হচ্ছে ফরমোজা ও অন্য দ্বীপগুলির আধিপত্য যেমন আছে তেমন থাক। কিন্তু এই ভিত্তির উপর চীন যুদ্ধবিরতিতে কী করে স্বীকৃত হবে? চীন বলছে ফরমোজা এবং এই সব দ্বীপ পিকিং সরকারের হওয়া চাই। কুমিনটাংকে উচ্ছেদ করার পূর্ণ অধিকার পিকিং

রকারের আছে। সে অধিকারের কোনো প্রকার সংকোচন পিকিং স্বীকার করতে পারে না। তাই পিকিং সরকারের পক্ষে সোভিয়েট রাশিয়া সিকিউরিটি কাউন্সিলে নিউজীল্যান্ডের প্রস্তাবের পাল্টা একটা প্রস্তাব এনেছে। সোভিয়েট প্রস্তাবও যুদ্ধবিরতি চাচ্ছে কিন্তু তার ভিত্তি সম্পূর্ণ আলাদা। সোভিয়েট প্রস্তাব বলছে, মার্কিন গভর্নমেণ্ট চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কাজ—এ্যাগ্রেশন চালাচ্ছে এবং চীনের আভ্যন্তর ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছে; ফরমোজা অঞ্চল ন্যায়ত চীনের, সেখান থেকে অবিলম্বে সমস্ত মার্কিন সৈন্য-সামন্ত ও অন্যান্য সামরিক ব্যবস্থা অপসারিত করতে হবে।

দুই পক্ষের কথা ও উদ্দেশ্য এতো বেশি পরস্পরবিরোধী যে চট করে এগুলির মধ্যে একটা সামঞ্জস্য করা এবং সেই ভিত্তিতে যুদ্ধবিরতি ঘটানো সম্ভব নয়। এখনই সম্পূর্ণ যুদ্ধবিরতি না হলেও বৃহত্তর যুদ্ধের আশঙ্কা বৃদ্ধির উপশম অসম্ভব নয়। তাচেন দ্বীপপুঞ্জ থেকে মার্কিন নৌবহরের আওতায় কুমিনটাং সৈন্যসামন্ত সরিয়ে আনার সময়ে যদি পিকিং সরকারের সংগে কোনো সংঘর্ষ না বাধে তবে যুদ্ধ ব্যাপকতর আকার ধারণ করার সম্ভাবনা আপাতত অল্প, কারণ যদিও পিকিং সরকার ফরমোজা দখল করার সংকল্প ঘোষণা করেছেন, কিন্তু কার্যত পিকিং সরকার এখনই ফরমোজা আক্রমণ করতে অগ্রসর হবেন তা মনে করার কারণ নেই। সুতরাং একদিকে সিকিউরিটি কাউন্সিলে এবং তার বাইরে কথাবার্তা তর্কাতর্কি চলবে এবং অন্যদিকে যে-রকম মারামারি চলছে অনেকটা সেই রকমই চলবে অর্থাৎ একেবারে যুদ্ধনিবৃত্তিও হবে না, আবার বৃহত্তর যুদ্ধেও সহসা একপক্ষ অন্য পক্ষকে টেনে আনবে না— বোধ হয় পরিস্থিতি এখন কিছুদিন এই রূপ নেবে।

* * *

আরব লীগ ও আরব রাষ্ট্রগণের যৌথ নিরাপত্তা চুক্তির কাঠামো ভেঙে যাবার জোগাড় হয়েছে। ইরাক আলাদাভাবে তুর্কীর সংগে সামরিক চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে আরব রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে সামরিক সহযোগিতার যে চুক্তি আছে তার ভিত্তি নষ্ট করছে, ইরাক গভর্নমেণ্টের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করা হয়েছে। ইরাক গভর্নমেণ্টকে বলা হয়েছে যে তাকে তুর্কীর সংগে চুক্তির প্রস্তাব বাতিল করতে হবে, অন্যথা তাকে লীগ ছাড়তে হবে এবং যৌথ আরব নিরাপত্তা চুক্তিও ইরাকের পক্ষে প্রযোজ্য হবে না। ইরাক যদি তুর্কীর সংগে চুক্তি ত্যাগ করতে রাজী না হয় এবং স্বেচ্ছায় লীগও না ছাড়ে তবে তাকে লীগ থেকে বার করে দেওয়া হবে বলে শুনা যাচ্ছে। কারণ মিশর বলেছে যে ইরাককে রাখলে সে থাকবে না এবং অন্যান্য আরব রাষ্ট্র মিশরকে ছাড়তে চায় না। যেহেতু তারা ইজরেলের ভয়ে ভীত, তাদের আশংকা যে মিশর সংগে না থাকলে ইজরেলের সংগে তারা পেরে উঠবে না।

ইরাকের প্রধানমন্ত্রী তুর্কীর সংগে চুক্তি ত্যাগ করতে রাজী হবেন বলে মনে হয় না। তাঁর পাল্টা বক্তব্য হচ্ছে, অন্য আরব রাষ্ট্রগুলিরও ইরাকের পথ অনুসরণ করে তুর্কী, ইরাণ, পাকিস্তান, বৃটেন, আমেরিকার সংগে সামরিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হওয়া কর্তব্য। অন্য আরব রাষ্ট্রগুলির গভর্নমেণ্টের মধ্যেও যে এই মতের লোক নেই তা নয় তবে ইরাক যে-ভাবে পশ্চিমা ব্লকে যোগদান করল সেটা তাদের পছন্দ নয়। তারা আরব রাষ্ট্রগুলির একযোগে কাজ করার পক্ষপাতী। একযোগে কাজ করলে দরাদরি করার পক্ষেও বেশি সুবিধা হোত। তাছাড়া, আরব রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণ কোনো ব্লকে যোগ দেবার পক্ষপাতী নয়। সেদিক দিয়ে ইরাকের বর্তমান গভর্নমেণ্টের প্রতি জনসাধারণের আস্থা অতি অল্পই আছে। প্রকৃতপক্ষে মধ্য প্রাচ্যের কোনো গভর্নমেণ্টকেই জনপ্রিয় বলা যায় না। এই রকম সব গভর্নমেণ্টের সংগে চুক্তি করে আসল নিরাপত্তা কিছু বাড়ানো যায় কি? তবে যুদ্ধ লাগলে মধ্য প্রাচ্যের তৈলাঞ্চলগুলিকে যেন তেন প্রকারেণ কব্জাগত করে রাখতেই হবে, এই হচ্ছে উদ্দেশ্য, তাতে স্থানীয় জনসাধারণের সমর্থন থাক আর না থাক। গত যুদ্ধের সময়ে ইরাণ ও আরব রাষ্ট্রগুলির অবস্থা কী হয়েছিল সকলেই জানে। যাই হোক, ইরাক গভর্নমেণ্টের কাজে ইরাক ও মধ্য প্রাচ্যের অন্য আরো রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণ নিশ্চয়ই খুশী হয় নি। গোলমালের সম্ভাবনা আছে।

মাইকেল ও নীলদর্পণ

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

নীলদর্পণের কাহিনী যেমন নাটকীয় উহার ইংরাজী অনুবাদ লইয়া কলিকাতায় যে কাণ্ড হইয়াছিল তাহাও প্রায় তদ্রূপ নাটকীয়। এই দ্বিতীয় নাটকের আখ্যান আমরা প্রায় বিস্মৃত হইয়াছি—ইহার চরিত্রসমূহ ও ঘটনাবলীও মনে আমাদের কাছে অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছে। কিন্তু যে আখ্যান সুন্দর ও বাঙালীর পক্ষে কিছুটা গৌরবের সামগ্রী তাহাকে জিয়াইয়া রাখাই শ্রেয়। ইংরাজী নীলদর্পণের ইতিহাস বাস্তবিক, এক বিচিত্র ও চমকপ্রদ ইতিহাস। পৃথিবীর কোন সাহিত্যে একখানা গ্রন্থ লইয়া এত কাণ্ড হইয়াছে বলিয়া জানি না। বাঙলা-দেশে বহু গ্রন্থ রাজদ্রোহের অপরাধে বাজেয়াপ্ত হইয়াছে, একখানি নাটকের অভিনয় লইয়া হাইকোর্টে মামলা পর্যন্ত হইয়াছিল। আজ সারা ভারতবর্ষে যে Dramatic Performances Act বলবৎ তাহা সুরেন্দ্র-বিনোদিনী নাটকের অভিনয় উপলক্ষ্যেই বিধিবদ্ধ হয়। মারাঠী নাট্যকার খাডিলকলের 'কীচকবধ' লইয়া হাঙ্গামা হইয়াছিল কিন্তু মামলা হয় নাই। যাহা হউক নীলদর্পণের ইংরাজী সংস্করণ লইয়া যে সব নাটকীয় ঘটনা ঘটে তাহার সঙ্গে মাইকেলের সম্পর্কটিই এখানে আমাদের আলোচনার বিষয়। এ অনুবাদ যে মাইকেল-কৃত তাহাতে আজ আর কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু মাইকেলের এই অনুবাদ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্নই আজ পর্যন্ত অনালোচিত। এবং এ বিষয়ে নতুন অনুসন্ধানের বিষয়ও কম নয়।

নীলদর্পণ নাটকের ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশিত হয় ১৮৬১ সালে—মে মাসে। গ্রন্থখানিতে কেবল সালেরই উল্লেখ আছে। তবে ইহা যে মে মাসেই বাহির হয় তাহা ধরিয়া লইতে পারি। কারণ লং সাহেবের বিরুদ্ধে মামলায় ইংলিসম্যানের সম্পাদক ওয়ালটার ব্রেট বলেন যে ইংরাজী নীল-দর্পণ ২৭শে মে তাঁহার হস্তগত হইয়াছে। এই মামলার প্রধান বাদী ওয়ালটার ব্রেট এবং নাটকের মুখবন্ধে যে দুইজন ইংরাজ সম্পাদকের প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে ইনি একজন। সুতরাং এই বই তিনি যখন মে মাসের শেষের দিকে পাইয়াছেন তখন ইহা ঐ মাসেরই কোন তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে। মুদ্রাকর ক্লিমেণ্ট হেনরী ম্যানুয়েলও তাঁহার সাক্ষ্যতে বলেন যে, গ্রন্থখানি ছাপাইবার অর্ডার তিনি এপ্রিল কি মে মাসে পাইয়া-ছিলেন। তবে এপ্রিল মাসে যে ইহা বাহির হয় নাই তাহা প্রমাণ করা যায়। বইখানি বাংলা সরকারের ব্যবস্থায় ডাকে নানা স্থানে প্রেরিত হইতেছে এই অভি-যোগ করিয়া নীলকরদের তরফ হইতে Landholders and Commercial Association of British India-র সম্পাদক ফারগুসান বাংলা সরকারের

মাইকেল মধুসূদন দত্ত

NIL DURPAN,

OR

THE INDIGO PLANTERS' MIRROR.

A DRAMA,

TRANSLATED FROM THE BENGALI

BY A NATIVE.

EDINBURGH

MYLES MACPHAIL, 11 ST DAVID STREET

SIMPKIN MARSHALL, & CO, LONDON

MDCCCLXII
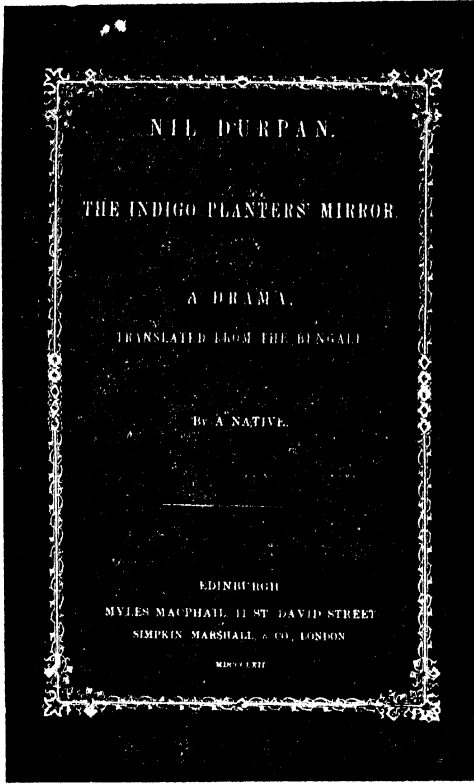
ইংলণ্ডে প্রকাশিত 'নীল দর্পণে'র ইংরেজি অনুবাদের দ্বিতীয় সংস্করণের প্রচ্ছদপট

সম্পাদক লাসিংটনকে যে পত্র দেন তাহার তারিখ ২৫শে মে, ১৮৬১। ব্রেটসাহেব বইখানা পাইয়াছিলেন প্রায় ঐ মাসেরই শেষভাগে সুতরাং উহা ঐ মাসেরই কোন তারিখে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তাহা হইলে এপ্রিল মাসের কোন সময়ে বা মে মাসের প্রথম দিকে মাইকেল নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করেন। অন্ততপক্ষে মার্চ মাসের পূর্বে যে লং সাহেব তাঁহাকে এই অনুবাদের ভার দেন নাই তাহা ধরিয়া লইতে পারি। ১৮৬১র ২৭শে ফেব্রুয়ারী লর্ড ক্যানিং এক পত্রে মন্তব্য করেন যে নীল প্রজার দুস্থতার জন্য প্রচলিত প্রথা যত দায়ী নীলকরগণ তত দায়ী নন। এবং ঐ বৎসরেরই ৪ঠা মার্চ নীলকর সাহেবদের প্রতিনিধি বড়লাট ক্যানিং-এর নিকট তাঁহাদের অভিযোগসমূহ পেশ করেন। ক্যানিং তখন নীলকরদের প্রতি যে সহানুভূতি প্রকাশ করেন তাহাতে রায়তের বন্ধু বাংলার ছোটলাট পিটার গ্র্যাণ্ট একটু বিব্রত বোধ করেন এবং এই ব্যাপার লইয়া দুই রাজপুরুষের মধ্যে যে পত্রালাপ হয় তাহাতে দুইজনের মতের ভিন্নতা পরিস্ফুট। এবং মনে হয় ঠিক এই সময়েই লণ্ডনে Brahmins and Pariahs নামে এক পুস্তিকায় গ্র্যাণ্ট সাহেবকে নীলকরের শত্রু বলিয়া আক্রমণ করা হয়। অর্থাৎ ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে নীলকর সাহেবরা তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এক নতুন অভিযান আরম্ভ করেন। ইহার পূর্বে পর্যন্ত ১৮৬০-এর সেপ্টেম্বর হইতে পরবৎসরের জানুয়ারী পুর্যন্ত সর্ব ব্যাপারে নীলকরেরই পরাজয় হইয়াছে। তাহা হইলে অনুমান করিতে পারি যে ১৮৬১-র এপ্রিল মাসের কোন সময়ে লং সাহেব নীলকরদের নতুন কর্মতৎপরতায় রায়তের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে ভীত হইয়া নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ প্রচার করিতে ইচ্ছা করেন। এবং তিনি এপ্রিল মাসের তৃতীয় সপ্তাহেই এই কার্যে অগ্রসর হন এবং মাইকেলকে অনুবাদের ভার দেন এই অনুমানের পক্ষে কিছু প্রমাণ পাই। কারণ এপ্রিল মাসের প্রথমার্ধেই ইংলণ্ডের ভারত সচিব চার্লস্ উড্ যে ইণ্ডিগো কমিশন রিপোর্ট ও তৎসম্পর্কে ছোটলাট গ্র্যাণ্টের মন্তব্য সমর্থন করিবেন তাহা বুঝা যায়। লং যে ঠিক এই সময়েই রায়তের দুঃখ ও নীলকরের উৎপীড়নের কথা ইংরাজ জনসাধারণকে শুনাইতে চাহিবেন ইহা স্বাভাবিক। কারণ উড্ ইণ্ডিগো কমিশন রিপোর্ট ও গ্র্যাণ্টের মিনিট গ্রহণ করিয়া নীলকরের বিরুদ্ধেই রায় দিয়াছেন দেখিয়া লং বিশেষ উৎসাহিত বোধ করিয়াছিলেন ধরিয়া লইতে পারি।

মাইকেল তখন বাংলাদেশের সর্বপ্রধান কবি। এপ্রিল মাসে তিনি যখন নীলদর্পণ অনুবাদ করেন তখন তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য (মে ১৮৬০), মেঘনাদবধ কাব্য প্রথম খণ্ড (জানুয়ারী ১৮৬১), শর্মিষ্ঠা নাটক (জানুয়ারী ১৮৫৯), একেই কি বলে সভ্যতা? (১৮৬০), বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ (১৮৬০), পদ্মাবতী নাটক (১৮৬০) প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে। মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় খণ্ড তখন মুদ্রিত হইতেছে অনুমান করিতে পারি। দুইখানি বাংলা নাটকের ইংরাজী অনুবাদও প্রকাশিত হইয়াছে—রত্নাবলী (১৮৫৮) এবং শর্মিষ্ঠা (১৮৫৯)। ইংরাজী নীলদর্পণের বৎসরেই ১২ই ফেব্রুয়ারী তিনি বিদ্যোৎসাহিনী সভায় অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের জন্য সম্বর্ধিত হইয়াছেন। কবি তখন পুলিস কোর্টের দোভাষীর কর্মে নিযুক্ত এবং ৬ নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোডে বাস করিতেছেন। অবশ্য নীলদর্পণের অনুবাদ এই বাড়িতেই

রচিত হয় বলিতে পারি না। নগেন্দ্রনাথ সোম তাঁহার মধুস্মৃতি গ্রন্থে বলিয়াছেন "ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট তারকনাথ ঘোষের ঝামাপুকুরস্থ বাসভবনে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন একরাত্রির মধ্যে নীলদর্পণের অনুবাদকার্য সমাধা করেন।" কবি যে এক রাত্রিতেই অনুবাদ শেষ করেন তাহা দীনবন্ধু মিত্রের পুত্র ললিতচন্দ্র মিত্রও তাঁহার History of Indigo Disturbance in Bengal গ্রন্থে বলিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ সোম আরও লিখিয়াছেন যে, "একজন নীলদর্পণ পাঠ করিয়া যাইতেছেন, আর মধুসূদন চেয়ারে বসিয়া টেবিলের উপরে অবিরত লেখনী সঞ্চালনে, ইংরাজিতে উহা ভাষান্তরিত করিয়া যাইতেছেন।

এখানে প্রশ্ন হইতেছে মাইকেলের হাতের এই ইংরাজি নীলদর্পণের পাণ্ডুলিপিই ক্যালকাটা প্রিণ্টিং এন্ড পাবলিশিং প্রেসে ম্যানুয়েল সাহেবের কাছে পাঠান হইয়াছিল কিনা। নীলদর্পণ মামলার বৃত্তান্ত পাঠে মনে হয় অনুবাদকের নাম গোপন রাখিবার উদ্দেশ্যে লং সাহেব ঐ পাণ্ডুলিপির একটি নকল নিজ হস্তে প্রস্তুত করেন এবং সেইটিই ছাপাখানায় পাঠান। এই পাণ্ডুলিপি মামলায় প্রদর্শিত হয় নাই—কতকগুলি প্রুফ অবশ্য ম্যানুয়েল তাঁহার সাক্ষ্য দিবার সময় দেখাইয়াছিলেন। এই প্রুফের সমস্ত সংশোধনগুলিই লং-এর হাতের সংশোধন। ইহা আদালতে প্রমাণিত হয়। ম্যানুয়েলের সাক্ষ্যের একটি উক্তি হইতে মনে হয় লং নিজে একখানি পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ম্যানুয়েল আদালতে বলেন :

"Long sent me portions of the copy from time to time."

এখানে অনুমান করিতে পারি যে, মাইকেল যখন সমস্ত নাটকখানি অনুবাদ করিয়া দিয়াছিলেন তখন কিস্তিতে কিস্তিতে কপি পাঠাইবার দরকার হয় না। লং মাইকেলের অনুবাদ পড়িয়া সংশোধন করিয়া ক্রমে ক্রমে পাণ্ডুলিপি ছাপাখানায় পাঠাইয়াছেন এরকম অনুমানও করিতে পারিতেছি না। কারণ আদালতে যে কয়টি সংশোধনের উল্লেখ হইয়াছে তাহা সবই পাণ্ডুলিপির সংশোধন—ছাপার সংশোধন নয়। মাইকেলের * অনুবাদের উৎকর্ষ সম্বন্ধে লংএর কোন সন্দেহ থাকিবার কথা নয়। ইতিপূর্বে কবির রত্নাবলী ও শর্মিষ্ঠা নাটকের ইংরাজী অনুবাদ বিশেষ প্রশংসা অর্জন করিয়াছে। অবশ্য আমি মনে করি না যে, মাইকেল ঠিক একরাত্রির মধ্যেই অনুবাদ শেষ করেন—ইহার মধ্যে কিছু অতিরঞ্জন আছে বলিয়া অনুমান করি। যাহা হউক ছাপাখানার পাণ্ডুলিপি এখন আর পাইবার উপায় নাই। ম্যানুয়েল তাঁহার সাক্ষ্যে বলেন যে, সে পাণ্ডুলিপি তিনি লংএর কাছেই ফেরৎ পাঠাইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় প্রশ্ন—মাইকেল কি মনোভাব লইয়া এই অনুবাদকার্য হাতে লইয়াছিলেন। ইহার জন্য তিনি পারিশ্রমিক গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা একেবারেই মনে হয় না। লং-এর মহৎ উদ্দেশ্যের প্রতি তাঁহার সহানুভূতি ছিল এবং নীল রায়তের দুঃখ ও ইংরাজ বণিকের উৎপীড়নের কথা প্রচারে সাহায্য করা দেশভক্ত বাঙালীর একান্ত কর্তব্য কবি ইহা বুঝিয়াই এই কাজ হাতে লইয়াছিলেন সন্দেহ নাই। তিনি তখন সরকারী কর্মচারী এবং যদিও ইংরাজী নীলদর্পণে অনুবাদকের নাম প্রকাশিত হয় নাই—A Drama translated from Bengali by a Native—শুধু ইহাই বলা হইয়াছে—এই কাজটি করিতে সম্মত হইয়া তিনি যে কিছুটা সাহসিকতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতেও সন্দেহ নাই।

তৃতীয় প্রশ্ন—এই অনুবাদের জন্য কবি সরকার কর্তৃক নিগৃহীত হইয়াছিলেন কিনা। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁহার দীনবন্ধু জীবনীতে বলিয়াছেন—"ইহার প্রচার করিয়া লং সাহেব কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সীটনকার অপদস্থ হইয়াছিলেন,। ইহার ইংরেজী অনুবাদ করিয়া মাইকেল গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন এবং শুনিয়াছি শেষে তাঁহার জীবন নির্বাহের উপায় সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" মাইকেল কিভাবে গোপনে তিরস্কৃত ও অবমানিত হইয়াছিলেন তাহা বোধ হয় আজ আর জানিবার উপায় নাই। ১৮৫৬

সালের আগস্ট মাসে মাইকেল পুলিস-কোর্টে কেরানী নিযুক্ত হন এবং উহার কিছু পরেই দোভাষীর পদে উন্নীত হন। ১৮৬২-র জুন মাসের নয় তারিখে তিনি ইউরোপ যাত্রা করেন। ইহার পূর্বে ঠিক কবে, কি অবস্থায় তিনি পুলিস কোর্টের কর্ম ত্যাগ করেন তাহা এখন পর্যন্ত জানা যায় না। ইউরোপ যাত্রার প্রায় ছয়মাস পূর্বে তিনি হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদকত্ব গ্রহণ করেন। তিনি কি পুলিশ কোর্টের চাকুরি ত্যাগ করিয়া এই নতুন কাজ লন—না ঐ কাজে বহাল থাকিতেই লন ইহা বুঝিতেছি না। এই বিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করিয়াছিলাম—কোন তথ্য পাই নাই। যাহা হউক মাইকেল নীলদর্পণ অনুবাদ করিবার অপরাধে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হইয়া-ছিলেন এবং এই ব্যাপারেই তিনি অবশেষে পুলিস কোর্টের চাকুরি ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন এ অনুমানের বিপক্ষে কোন যুক্তি আছে বলিয়া মনে করি না। বরঞ্চ এই অনুমানের পক্ষেই একআধটু কথা বলা যাইতে পারে। প্রথম কথা হিন্দু প্যাট্রিয়ট পত্রিকার সম্পাদক হইয়া মাইকেল ঐ পত্রিকায় কতগুলি গরম গরম প্রবন্ধ লেখেন। এইসব প্রবন্ধ অনুসন্ধান করিয়া একত্রিত করিবার উদ্যোগ চলিতেছে। এই সময়ে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত এক পত্রে কবি বলিতেছেনঃ—

"I would recommend your reading next Monday's issue. I am pretty certain you will recognise my first"!

এই first শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া অনুমান করা যাইতে পারে যে কোন কোন প্রবন্ধে কবি সরকার বা শাসক সম্প্রদায়কে কঠোর ভাষায় আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় কথা এই সময়ে মাইকেল নীল আন্দোলন বা সাধারণভাবে রাজনৈতিক আন্দোলন ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহও প্রকাশ করিতেন। নীল আন্দোলনের প্রধান নায়ক হরিশচন্দ্র মৃত্যুশয্যায় শুনিয়া মাইকেল রাজনারায়ণকে লিখিলেনঃ—

"His death would be a loss to the progress of independence of mind and thought"

বঙ্কিমচন্দ্র আরও বলিয়াছেন যে, নীলদর্পণের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া কবি "সুপ্রীমকোর্টের চাকুরি পর্যন্ত ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।" বাস্তবিকপক্ষে এখানে যে বঙ্কিম কোন্ চাকুরির কথা বলিতেছেন বুঝিতেছি না। মাইকেল কোনদিন সুপ্রীম কোর্টের চাকুরি করেন নাই। ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া কিছুকাল ব্যারিস্টারী করার পর তিনি হাইকোর্টের প্রিভি কাউন্সিল আপীলের অনুবাদ বিভাগের পরীক্ষক নিযুক্ত হন (জুন ১৮৭০)। ১৮৬২ সালে নীলদর্পণ মামলার প্রায় এক বৎসর পরে সুপ্রীম কোর্ট উঠিয়া যায় এবং হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয় (১লা জুলাই, ১৮৬২)। সুতরাং দেখিতেছি মাইকেল ইংলণ্ড যাইবার পূর্বে পুলিস কোর্টে চাকুরি করিতেন এবং ইংলণ্ড হইতে ফিরিয়া কিছুদিন হাইকোর্টে চাকুরি করিয়া-ছিলেন। তিনি সুপ্রীম কোর্টে কোনদিন চাকুরি করেন নাই। মনে হয় পুলিস কোর্ট স্থানে বঙ্কিম ভুলক্রমে সুপ্রীম কোর্ট লিখিয়াছেন। হাইকোর্টের চাকুরিও অবশ্য মাইকেল ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার কোন রাজনৈতিক কারণ ছিল এরকম অনুমানের পক্ষে কোন যুক্তি নাই।

তবে হাইকোর্ট যখন মাইকেলকে ব্যারিস্টাররূপে গ্রহণ করিতে অসম্মত হন তখন যে ইংরাজ বিচারপতিগণ নীল-দর্পণের ইংরাজী অনুবাদের কথা স্মরণ করিয়াই তাঁহার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি। প্রধান বিচারপতি বার্নিজ পিকক্ের মাইকেলকে ব্যারিস্টারের সনদ দিতে কোনই আপত্তি ছিল না এবং আরও চারজন বিচারপতি এবিষয়ে তাঁহাদের সম্মতি লিখিয়া জানাইয়াছিলেন। কিন্তু বিচারপতি ম্যাক্‌ফারসন ও জ্যাকসন আপত্তি করিলেন। জ্যাকসন সিভিল সার্ভিসের লোক—কোন কারণ দেখাইলেন না, শুধু বলিলেন—আমি এবিষয়ে কিছু অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে চাই। বিচার-পতি ম্যাকফারসন বলিলেনঃ—

"Mr. Datta's antecedent and former position as interpreter of the Calcutta Police Court are not suggestive of his being a person whom it is proper to admit.

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে,

পুলিস কোর্টে চাকুরি করবার সময়ই মাইকেল নীলদর্পণ অনুবাদ করেন। এবং এই ব্যাপারে একজন বিচারপতির মনোভাব বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সীটনকার তখন হাইকোর্টের বিচারপতি এবং তিনি মাইকেলকে সমর্থন করিয়া তিনবার তাঁহার ও লিপিবদ্ধ করেন। এই সীটনকারই রাজী নীলদর্পণের প্রচারে সহায়তা রিবার জন্য অপদস্থ হইয়াছিলেন এবং ইজন্য তাঁহাকে ত্রুটি স্বীকার করিতে য়াছিল।

ইংরাজী নীলদর্পণ ভারতবর্ষে মাত্র ও খণ্ড বিতরিত হইয়াছিল। অধিকাংশ ই বিলাতে রাজনৈতিক মহলের নানা াকের নিকট প্রেরিত হয়। তাঁহাদের ধ্য ব্রাইট, কবডেন, ডিজ্রেলি, গ্ল্যাড-ান প্রভৃতিও ছিলেন। সুপ্রীম কোর্টে : গ্রন্থের প্রকাশক লং-এর বিরুদ্ধে লা শুরু হয় ১৯শে জুলাই, ১৮৬১। শে জুলাই বিচারপতি ওয়েলস লংকে মাস কারাবাস ও এক হাজার টাকা মানায় দণ্ডিত করেন। কালীপ্রসন্ন ং আদালতে উপস্থিত থাকিয়া এই মানার টাকা প্রদান করেন। মহানুভব হিতৈষী বলিয়াই কালীপ্রসন্ন এই দান করিয়াছিলেন সত্য। তবে এক্ষেত্রে কেলের প্রতি শ্রদ্ধাও যে কিয়ৎ-মাণে তাঁহাকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল, ও অনুমান করিতে পারি। অনেক কল্পনা করিয়াছি, নীলদর্পণের ার সময় মাইকেল অনুবাদক হিসাবে ের নাম প্রকাশ করিতে ব্যস্ত হইয়াছেন তাঁহাকে নিরস্ত করিতেছেন—র বন্ধু কবিকে শান্ত করিবার জন্য অর্থ লইয়া আদালতে উপস্থিত ছেন। বিচারের শেষদিন দীনবন্ধু আদালতে অসংখ্য দর্শকের উপস্থিত ছিলেন। জেমস রুটলেজ ish Rule and Native Opinion India গ্রন্থে বলিয়াছেন—he present in court and ready change places with Mr. Long at had been possible."

মাইকেলও সেখানে উপস্থিত ৷ কি না, কে বলিবে?

রাজী নীলদর্পণের প্রচার এখানে ইলে ইংলণ্ডে ইহার একটি সংস্করণ এই সংস্করণ কলিকাতার কোন পাঠাগারে দেখি নাই। ব্রিটিশ মিউজিয়ামের গ্রন্থাধ্যক্ষের নিকট পত্র লিখিয়া জানিয়াছি, সেই গ্রন্থাগারে এই দ্বিতীয় সংস্করণের এক খণ্ড রক্ষিত আছে। সেখানে প্রথম সংস্করণেরও এক খণ্ড আছে। গ্রন্থাধ্যক্ষ মহাশয় আমাকে জানাইয়াছেন যে, দুই সংস্করণের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। এই দ্বিতীয় সংস্করণটি এডিনবোরার মাইলস্ ম্যাকফেল এবং লণ্ডনের Simpkin, Marshall যৌথভাবে প্রকাশ করেন। ব্রিটিশ মিউজিয়ামে এই গ্রন্থ আসিয়াছে ১৮৬২ সালের ২৪শে এপ্রিল। ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, এই সংস্করণটি লং-এর কারাবাসের পর প্রকাশিত হয়। বস্তুত নীলদর্পণ মামলার সময় গ্রন্থখানি ও সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতির মনোভাব লইয়া ইংলণ্ডের সংবাদপত্র মহলে বেশ একটু চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। লং-এর শাস্তির পর লণ্ডনের ডেলী নিউজ মন্তব্য করেন, "It was in truth as if the French clergy had prosecuted Moliere, or the Yorkshire school masters, the author of Nicholas Nickleby, or the Southern Planters, the author of Uncle Tom's Cabin.

বোধ হয়, এই দ্বিতীয় সংস্করণটিই চার্লস ডিকেন্স সম্পাদিত All the Year Round নামক পত্রিকায় সমালোচিত হয়। নগেন্দ্রনাথ সোম মধুস্মৃতি গ্রন্থে লিখিয়াছেন—'শুনিয়াছি, সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক Charles Dicknes তাঁহার সম্পাদিত All the Year Round পত্রে এই গ্রন্থের বিস্তর প্রশংসা করেন। সম্প্রতি ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে এই সমালোচনার এক ফটো আনাইয়াছি। প্রবন্ধটি দীর্ঘ, কিন্তু মোটেই প্রশংসাত্মক নয়। তাছাড়া ইহা ডিকেন্সের রচনা নয়। ঐ পত্র-পত্রিকায় ডিকেন্স যত প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহার এক তালিকা মুদ্রিত হইয়াছে। এই তালিকার মধ্যে এই প্রবন্ধের নাম নাই। প্রবন্ধটি ১৮৬১-র ৯ই নভেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়। ইহা কোন ভারতবিদ্বেষীর রচনা সন্দেহ নাই। অনুবাদ হিসাবে ইংরাজী নীল-দর্পণের উৎকর্ষ সমধিক। মামলার প্রথম দিন ইংলিসম্যানের সম্পাদক পক্ষের ব্যারিস্টার পিটারসন বলেন—

"The author might have been some Hindu, but the translation could never have been made by a Hindu but by an Englishman. মার্সম্যান' ফ্রেণ্ড অব ইণ্ডিয়া পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন:—

"In spite of all the disadvantages of a translation it is evidently written with talent.

কলিকাতায় নীলদর্পণের আর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল ১৯০৩ সালে নীলকরদের সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থের পরিশিষ্ট হিসাবে। কুমুদবিহারী বসু সম্পাদিত Indigo Planters and All About them নামে এই গ্রন্থখানিও আজ দুষ্প্রাপ্য। এই ইংরাজী অনুবাদের মূল্যে বোধ হয় বাঙালীর কাছে কম নয়। কারণ ইহার মধ্যে যে ইতিহাস, তাহা বাঙালীর পক্ষে গৌরবের ইতিহাস।

চক্রদত্ত

কাঁচের ওপর সূর্যের কিরণ কিংবা যে কোনওরকম আলো পড়লেই সেই আলো প্রতিফলিত হওয়ায় ঐ কাঁচের মধ্যে দিয়ে কোনও কিছু দেখা তো যায়ই না, উপরন্তু চোখ রীতিমত ঝলসে যায়। মোটরচালকদের এই অসুবিধা খুব বেশী ভোগ করতে হয়, এইজন্য মোটরের সামনের কাঁচের জানলাটির ওপরে সরান নড়ানর উপযোগী করে একটি হুড্ লাগান থাকে। হুড্‌টা প্লাস্টিক, অয়েল ক্লথ কিংবা খুব পাতলা কাঠের তৈরী হয়। কাঁচের মধ্য দিয়ে আলো এসে যখন চালকের দৃষ্টিপথে অসুবিধা ঘটায়, তখন সুবিধামত এই হুডটা নামিয়ে উঠিয়ে দিতে হয়। এতেও চালকের কম অসুবিধা হয় না। কারণ গাড়ি চালাবার
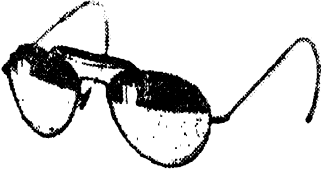
গাড়ি চালান নতুন ধরনের চশমা

সময় চালককে দুটি হাত দিয়েই স্টিয়ারিং ধরতে হয়, সুতরাং হুডের ব্যবস্থা করতে হলে চালানর অসুবিধা হয়। একটি নতুন রকমের চশমা এইসব মুশকিলের আসান ঘটিয়েছে। এটিকে "সান-গ্লাস"ই বলা হয়, কিন্তু এটি সাধারণ সান-গ্লাসের মত ঠিক নয়। এই চশমার ওপরের আধখানা পাতলা টিন আর নীচের দিকটা কাঁচ দিয়ে তৈরী। মোটরচালক এইরকম একটি চশমা প'রে থাকলে কোনওরকম আলোই আর মোটর-চালনার অসুবিধা ঘটাতে পারে না। চশমার অর্ধেক অংশ টিনের তৈরী হওয়ায় চোখে আলো পড়লেই প্রয়োজন-মত চোখটা শুধু একটু ওঠানো-নামানোতেই চোখ দুটিকে আলোর ঝলকানি থেকে বাঁচিয়ে শুধু দেখার কাজটুকু চালান যায়।

*

"অধিকন্তু ন দোষায়" কথাটি সর্ব-ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। প্রত্যেক মানুষের দেহেই কিছুটা রক্তের চাপ থাকা প্রয়োজন, কিন্তু এই চাপ বৃদ্ধি হলেই মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে, এমন কি মৃত্যুও ঘটতে পারে। শুধু বেড়ে যাওয়া নয়, কমে গেলেও মানুষ অসুস্থ হয়। "রক্তের চাপ" কথাটির সঠিক অর্থ সাধারণের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। "রক্তের চাপ" কথাটি বুঝতে গেলে দেহের মধ্যে রক্ত কিভাবে চলাচল করে, তার একটা ধারণা থাকা দরকার। মানুষের শরীরে ধমনী ও শিরার সাহায্যে রক্ত চলাচল হয়। হৃদযন্ত্র থেকে সর্বপ্রথম রক্ত ধমনীর সাহায্যে দেহের মধ্যে চলাচলের জন্য যায় এবং চলাচলের পর শিরার সাহায্যে হৃদযন্ত্রে পরিস্রুত হওয়ার জন্য ফিরে আসে। ধমনীর ওপর রক্তের চাপ বেশী পড়ে, কারণ হৃদযন্ত্র পাম্প করে খুব জোরে ধমনীর মধ্য দিয়ে ঠেলে পাঠায়। এই কারণে ধমনী রবারের নলের মত ফুলে যায়। এদিকে শিরার মধ্যে রক্ত ধীরে ধীরে বয়ে চলে বলে, ধমনীর মত শিরার কমা-বাড়ার দরকার হয় না। রক্ত চলাচলের জন্য সর্বাবস্থায় মানুষের শরীরে রক্তের একটা চাপ পড়েই। ধমনীর ওপর যে চাপ পড়ে, তাকেই "রক্তের চাপ" বলে। এই চাপের একটা মাপকাঠি আছে। নির্দিষ্ট মাপের চাপ পড়া পর্যন্ত স্বাভাবিক রক্তের চাপ বলতে পারি। ধমনীর ওপর যখন রক্তের চাপ কোনও কারণে বেশী পড়ে, তখনই "বেশী রক্তের চাপ" (হাই ব্লাডপ্রেসার) রোগের উৎপত্তি। ধমনীর রবারের মত কমা-বাড়ার ক্ষমতা যখন কমে যায়, তখন খুব জোর করে চাপ দিয়ে দিয়ে রক্তকে ধমনীর মধ্য দিয়ে পাঠাতে হয়। এই কারণেই বৃদ্ধ বয়সে যখন ধমনী শক্ত হয়ে যায়, তখনই এই রোগের কবলে পড়তে হয়। অনেক সময় আবার মানুষের শরীরে "কম রক্তের চাপ" (লো ব্লাড প্রেসার) হতে দেখা যায়। এতে রক্ত কম পরিমাণে ধমনীর ভেতরে দিয়ে চলার দরুণ ধমনীর ওপর স্বাভাবিক চাপও পড়ে না। অবশ্য এই কম রক্তের চাপ বেশী রক্তের চাপের মত এত মারাত্মক নয়—কারণ এখানে ধমনীর ভেতরটা শক্ত হয়ে যায় না। ফলে প্রয়োজনের সময় এর কমা-বাড়ার ক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায় না।

*

ছয়মাস বয়স থেকে শিশুর দাঁত ওঠা শুরু হয় এবং একে একে বত্রিশটি দাঁত উঠতে উঠতে শিশু যৌবনে পদার্পণ করে। সবচেয়ে প্রথমে সামনের দুটি দাঁত দেখা যায়, আর আক্কেল দাঁত ওঠে সবচেয়ে শেষে। পেষণ দন্ত দেখা দেয় বছর ছয়েক বয়সে। এই পেষণ-দন্তই দন্ত পংক্তির ভিত্তিপ্রস্তরস্বরূপ। পেষণ-দন্তগুলি যথাস্থানে যথাযথভাবে দেখা দিলে সমগ্র দন্ত পংক্তিটি সুসজ্জিত হয়ে উঠতে পারে। অনেক ক্ষেত্রে সমস্ত দাঁতই ওঠে না। কখনও কখনও দেখা গেছে যে, ছয় বৎসর বয়স থেকে পনের বৎসর বয়সের মধ্যেও পেষণ-দন্ত ওঠে না। এক্ষেত্রে দন্ত-পংক্তি সুন্দর বা সুসজ্জিত, হয় না। বর্তমানে ডাক্তারগণ এর বিকল্প ব্যবস্থা করেছেন। এঁরা বলেন যে, আক্কেল-দাঁতগুলি উঠিয়ে নিয়ে যদি পেষণ-দাঁতের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে পেষণ-দাঁতের অভাব পূরণ করা সম্ভব হয় এবং দাঁতের সারি সুন্দর ও সুসংবদ্ধ হয়।

*

পাকা বাড়ি গরম কালে খুব বেশী তেতে যায়—তার কারণ বাড়ি তৈরীর মাল-মশলা তাপকে বাইরে থেকে নিয়ে নিজের ভেতর জমা করে রাখে। এই সমস্ত মশলার মধ্যে একটা হচ্ছে বাড়ির ভেতরে এবং বাইরে রং-এর প্রলেপ। বর্তমানে এক ধরনের রং বের হয়েছে যেটা লাগালে বাড়ি, ঘর বাইরের তাপের চেয়ে অনেক বেশী ঠাণ্ডা করে দেবে। এই রং-এ ঠাণ্ডা হবার কারণ হচ্ছে যে, এতে এক বিশেষ ধরনের রঞ্জক থাকে যেটা তাপকে বাইরে ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করে।

ইতিহাসের মিছিল

ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস আজ সমগ্র পৃথিবীরই একটা ঐতিহাসিক ঘটনা এবং দিল্লীও ঘটনার মাহাত্ম্য উজ্জীবিত করে লার আয়োজনে অনেক কিছু র চেষ্টা করে আসছে গত ছর ধরেই। দিল্লীর প্রজাতন্ত্র সের পাঁচ মাইলব্যাপী শোভাযাত্রায় ভাবেই প্রায় সমগ্র ভারতকেই য়া যায়। ভারতের শৌর্য বীর্য, রের বহুধারা শিল্প-সংস্কৃতি যেন হাসের পাতা থেকে নেমে বিরাট ল করে সামনে দিয়ে এগিয়ে চলে যুগ-যুগান্তের পুঞ্জীভূত ইতিহাস। সবচেয়ে বেশী চোখে পড়ে দার মিছিলে। কোন ধারাবাহিক াসের কথা নয়, এই মহাদেশের অঞ্চলের এক-একটা সময়ের কটা ইতিবৃত্ত রূপায়িত হয়ে মিছিলের অঙ্গ হয়ে। কোনটিতে য়েছে দূরে অতীতের কোন ঘটনা; তে বা একেবারে চলতি ের কোন বিবরণ। সবেরই মধ্যে র রূপ, ভাব ও ঐতিহ্যের নিদর্শন। মিছিলেই সারা ভারতের অনেক- প্রতিভাত দেখতে পাওয়া যায়— ভারতের এক-একটি অধ্যায়।

ার প্রজাতন্ত্র দিবসের শোভাযাত্রায় া ঊনিশটি রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় পরিষদের দুটি বিভাগ যোগদান রাজ্যগুলির প্রায় প্রত্যেকেরই যার- অঞ্চলের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য তোলার দিকেই ঝোঁক দেখা কয়েকটি রাজ্য অবশ্য তাদের কৃষি বা শিল্পের প্রতীকী পরিবেশন করেছে। সেনা- া শেষ পংক্তিটি পার হয়ে যাবার জমকালোভাবে সাজানো ছবি পিঠ থেকে ধোসা আর সানাই প্রতীকী দৃশ্যের মিছিলের ঘোষণা করে যায়। লোকেও ঙ্গ উদ্গ্রীব হয়। ট্রাকটারে-

পশ্চিমবঙ্গ—চাঁদ সদাগরের বাণিজ্য তরীর মধ্যে খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর পরিবেশ রচনা করা হয়েছে
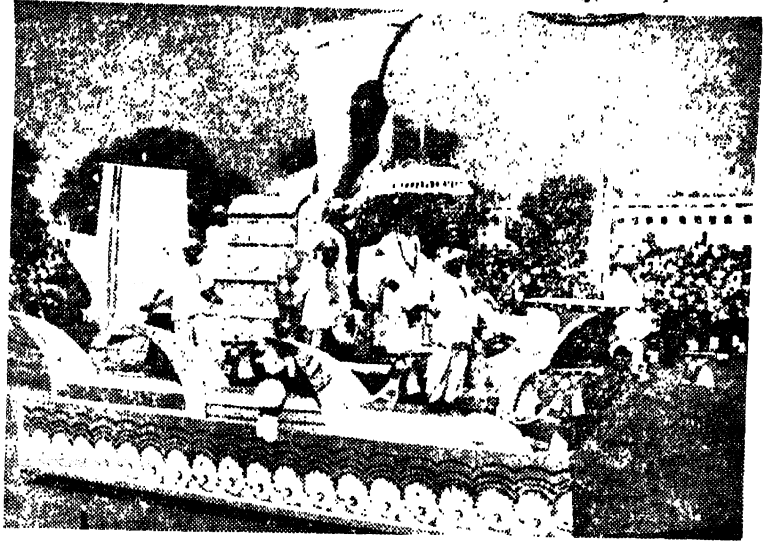
ওড়িষ্যা—রাজ্যের বিবিধ প্রকার লোকশিল্পের কারিগরদের পরিচয় এনে দেওয়া হয়েছে এই দৃশ্যশোভার সাহায্যে

টানা এক-একটি রাজ্যের কীর্তি একে একে এগিয়ে আসতে থাকে। সব প্রতীকী দৃশ্যের অন্তস্থিত ঘটনা বা কাহিনী সবায়ের পক্ষে হয়তো চট করে বুঝে ওঠা সম্ভব হয় না, কিন্তু বর্ণ ও শোভাময় বৈচিত্র্যের সমাবেশ দর্শকদের প্রত্যেকেরই দৃষ্টিকে অভিভূত করে দেয়। না বুঝলেও রাজ্যগুলির বৈশিষ্ট্য চোখে ধরা পড়েই। এমন বহুবর্ণময়, এমন বিবিধ প্রকৃতির ও রূপের, এমন বিভিন্ন ছন্দ ও ভঙ্গিময় শোভাযাত্রা পৃথিবীর আর কোন দেশে অনুষ্ঠিত হওয়া সম্ভব কি না সন্দেহ। পরিষ্কার ঝকঝকে আকাশ; স্বল্প উষ্ণ আবহাওয়া। কৌতূহলের সঙ্গে বিপুল দর্শকশ্রেণীর উল্লাস ওদের কলধ্বনির মধ্যে বাতাসকে মুখরিত করে তোলে। এই সব দৃশ্যের কোন-কোনটিতে স্ব স্ব আঞ্চলিক নৃত্য-গীতও পরিবেশিত হতে থাকে। এ বছরে নতুন যোগ হচ্ছে পণ্ডিচারি রাজ্য; ট্রাকটারটি দেখে দর্শকদের স্বতঃস্ফূর্ত হর্ষধ্বনি ওদের স্বাগত জানায়।

এক-একটি রাজ্য এক-এক রকমের বিষয়বস্তু পরিবেশন করেছে। পশ্চিম-বঙ্গের ট্রাকটারে ছিল চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যতরী মধুকর; তার মধ্যে রয়েছে সপ্তদশ শতাব্দীর সাজ-পোশাক-পরা যাত্রী ও নাবিক। গত বছরেও পশ্চিম-বঙ্গের ছিল ময়ূরপঙ্খী নৌকা, যাতে দেখানো হয় সংঘমিত্রার সিংহল যাত্রা। সিকিমেরটিতেও ছিল একেবারে সিকিমিদেরই নিজস্ব রীতিতে আঁকা কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রতীক। বহু প্রাচীন আমলের পোশাক-পরা দুই সৈন্য দুপাশে দাঁড়িয়ে; সঙ্গে ধর্ম-পতাকার সঙ্গে রয়েছে মাঝখানে ঘোরালো (জপচক্র) বসানো সিকিমের রাজ্য পতাকা।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন দেখায় এক মন্দিরে একটি উৎসবের দৃশ্য, যার মধ্যে দিয়ে কথাকলি নৃত্য ও পরিচ্ছদের সঙ্গে লোকের পরিচয় করিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। মাদ্রাজ পরিচিত করিয়ে দেয় তামিলের পুণ্যশ্লোকা মহিলা কবি অভ্‌ভাইয়ের সঙ্গে। শান্তির বাণী নিয়ে পরিক্রমা-রতা অভ্‌ভাই।
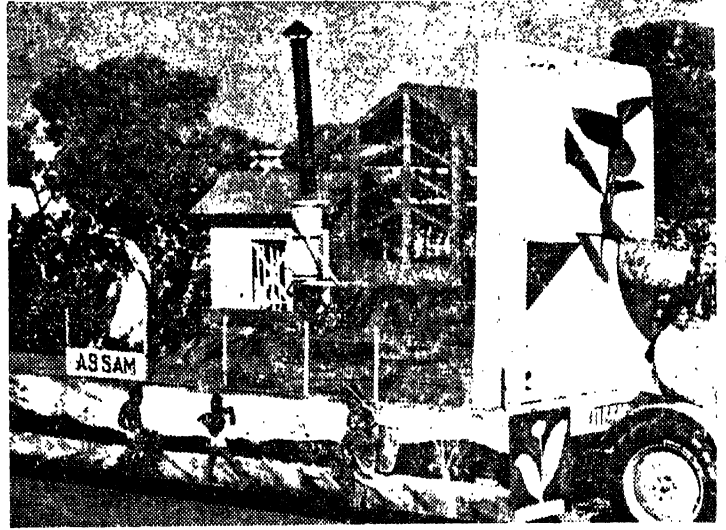
আসাম—আসামের প্রধান কৃষি সম্পদ চা বাগানের জীবনকে কেন্দ্র করে তৈরী দৃশ্যের একাংশ

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন—কথাকলি নৃত্যের কেন্দ্র ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন থেকে আসে মন্দিরের নাটমণ্ডপে কথাকলি নাচের একটি দৃশ্য

কাশ্মীর একটা আস্ত শিকারাই সামনে হাজির করে। শিকারাটির ভিতরে এবং নীচে তাকে ঘিরে কাশ্মীরী, ডোগরা, লডাকি প্রভৃতি যে-যার বিশিষ্ট উৎসব সজ্জায় বসে যার-যার অঞ্চলের গ্রাম্য বাদ্যযন্ত্র সহকারে লোকসংগীত পরিবেশন করে যায়।

মধ্যপ্রদেশ তাদের রাজ্যের কৃষি উৎপাদন সম্পর্কে একটি দৃশ্য রচনা করে। চাল, গম ও জোয়ারের ক্ষেতের মাঝখানে একটা উঁচু জায়গায় দাঁড়িয়ে এক মহিলার কাক তাড়াবার দৃশ্য। বিহার থেকে আসে ধুমকুড়িয়া, যার অর্থ 'অতিথিঘর'—ছোটনাগপুরের প্রাচীন আদিবাসী প্রতিষ্ঠান। হিমাচল প্রদেশ দেখায়, শীতকালে ওখানকার পল্লী-অঞ্চলের একটি দৃশ্য। আসামও তার রাজ্যের প্রধান উৎপাদন চায়ের একটা বাগানকেই রূপায়িত করে এনে দেয়।

হোলকারের মহীয়সী রাণী অহল্যা-বাঈয়ের প্রতিকৃতি নিয়ে আসে মধ্য-ভারতের ট্রাকটারখানি। রাজস্থান দেখায় পল্লীর এক শান্তিময় পরিবেশ। ও অঞ্চলের পোশাক-পরা এক রাখাল নিজের তৈরী বাঁশী বাজাচ্ছে, আর দূরে দেখা যাচ্ছে তার স্ত্রীকে পশম থেকে সুতো কাটতে। ওড়িষ্যা দেখায় তার রাজ্যের কারিগরদের। মণিপুর রাজ্যের দৃশ্যটিতে পাওয়া যায় হাতে কাপড় বোনার বিভিন্ন ধাপ; গত বছর আসামের ছিল এই বিষয়বস্তু। উত্তর প্রদেশও তাদের রাজ্যের জরির কাজ, চামড়ার তৈরী জিনিস, তালা, ছুরি-কাঁচি প্রভৃতি বিভিন্ন সামগ্রীর কারিগরদের ওপরে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বম্বের ট্রাকটারে পাওয়া যায় ও রাজ্যের শিল্পোন্নতির নিদর্শন। পূর্ব-পাঞ্জাব দেখায় বাখরা-নাঙ্গল পরিকল্পনাটির প্রতিরূপ। হায়দরাবাদ রূপায়িত করে ভারতের গঠন পরিকল্পনাসমূহে শিল্পীর ভূমিকা। দিল্লী সাফল্যের দৃষ্টান্ত দেখায় এভারেস্ট আরোহণের দৃশ্য সামনে তুলে ধরে। এরই সঙ্গের নানা রকমের রঙিন পোশাক-পরা স্ত্রী-পুরুষ নতুন
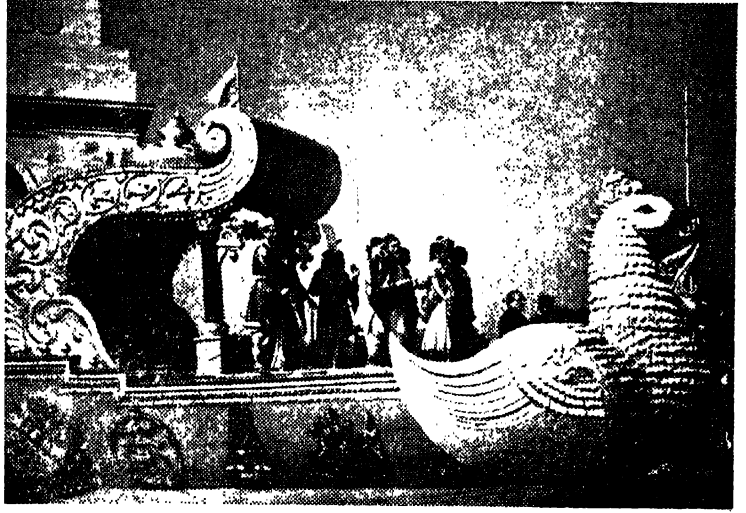
মাদ্রাজ—তামিলনাদের মহীয়সী মহিলা কবি আভোয়ারের শান্তির বাণী প্রচারে পরিক্রমার দৃশ্য
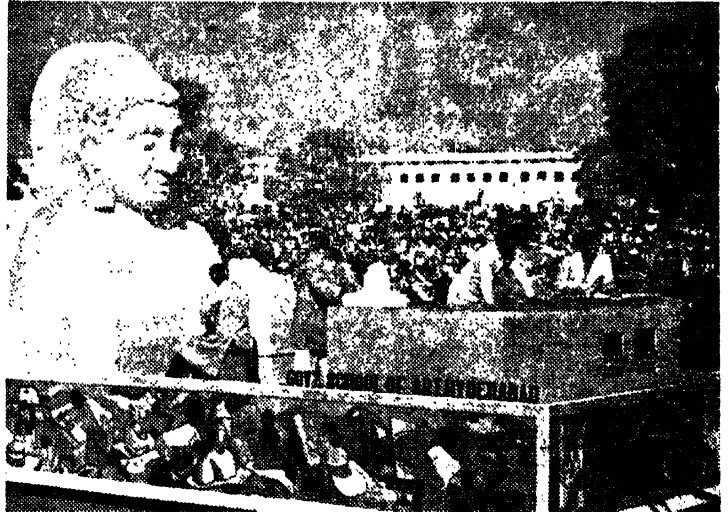
হায়দরাবাদ—দেশের উন্নয়নে স্থপতি ও অংকনশিল্পীদের ভূমিকা নিয়ে রচিত দৃশ্যটি সর্বজনের দৃষ্টি ও প্রশংসা অর্জন করে

ভারতের বিজয় যাত্রার প্রতীক হয়ে হাজির হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পরিষদের সেচ ও বিদ্যুৎ বিভাগ সেচ পরিকল্পনা দ্বারা যে সুফল পাওয়া যায়, তারই একটি প্রতিনিধিমূলক দৃশ্য পরিবেশন করে। কেন্দ্রীয় উৎপাদন বিভাগ দেখায় বত্রিশ ফিটের একটি মডেল জাহাজ ঠিক যার অনুরূপ একখানি জাহাজ বর্তমানে বিশাখাপট্নমে নির্মিত হচ্ছে। সবচেয়ে উল্লাস ধ্বনিত হয় পণ্ডিচারী রাজ্যের ট্রাকটারটি চোখে পড়তেই। ভারতীয় ও ইওরোপীয় পোশাক-পরা মেয়েদের মুখে ফরাসীতে সম্মেলক-গানের মধ্যে দিয়ে এ অঞ্চলে ভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে ফরাসী সংস্কৃতির সমন্বয়ের দিকটা পরিস্ফুট করে তোলে।

'ট্যাবলো'র সঙ্গেই কিন্তু ঐতিহ্যের শোভাযাত্রা নতুনভাবে সামনে উপস্থিত হতে থাকে। ঠিক তার পরই দিল্লীর ষোলটি বিদ্যালয়ের বিভিন্ন বয়সের ছেলে ও মেয়েদের এক শোভাযাত্রা। এর পরের দলটিও ছোট ছেলে-মেয়েদেরই নিয়ে, তবে এ-দলের ছেলে-মেয়েরা দেশের বিভিন্ন আঞ্চলিক পোশাকে সেজে রয়েছে। কতক অঞ্চলের উৎসব সাজ, কতক অঞ্চলের বা আটপৌরে। ভারতে এতো ভিন্ন ভিন্ন রকমের পোশাক যে আছে একজোটে তা দেখে অবাক হয়ে যেতে হয়। এদের পরই লোকনৃত্যের দলসমূহ। কতো বিচিত্র বর্ণময় সাজ-পোশাক তাদের। নানা অঞ্চলের লোক-নৃত্য শিল্পীরা রয়েছে। একদিক থেকে এসেছে কাশ্মীরী দল, আর একদিক থেকে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত অঞ্চলের নাগারা, ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন, মাদ্রাজ, পণ্ডিচারী, বম্বে, পেপসু, মধ্যভারত, সিকিম, মণিপুর, পাঞ্জাব, বিহার, উত্তর প্রদেশ, সৌরাষ্ট্র প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন আঞ্চলিক ঐতিহ্যের সরল অভিব্যক্তি। বাঙলা দেশের চিহ্ন তো এবারও দেখা গেল না। অতো সাজ আড়ম্বরের মধ্যে কিন্তু সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে হায়দরাবাদের দল; খালি গা, কোমরে
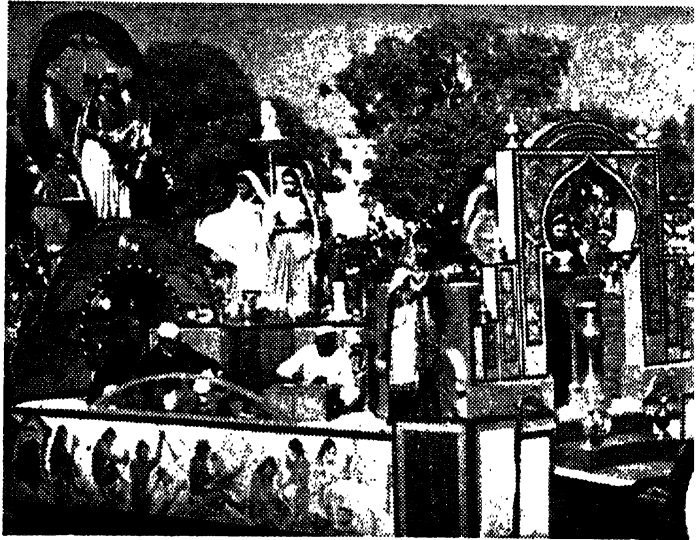
উত্তর প্রদেশ—জরির কাজ, চামড়ার কাজ প্রভৃতি রাজ্যের বিভিন্ন কারিগরিকে বর্ণ-ময় দৃশ্যে রূপায়িত করে হাজির করা হয়েছে

পূর্ব পাঞ্জাব—নতুন যুগের ইতিহাসকে সামনে উপস্থাপিত করা হয়েছে বাখরা-নঙ্গল পরিকল্পনার প্রতীকি দৃশ্য রচনার মধ্যে দিয়ে

কালো কাপড় জড়ানো, হাতে তীর-ধনু নিয়ে তাদের এক ধরনের রণনৃত্য। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, শিল্প-সৌন্দর্যের দিক থেকে হায়দরাবাদের 'ট্যাবলো'টিই ভারতীয় স্থাপত্য ও চিত্রাঙ্কনের ঐতিহ্যকে মূর্ত করে তোলায় সবচেয়ে প্রশংসা অর্জন করে।
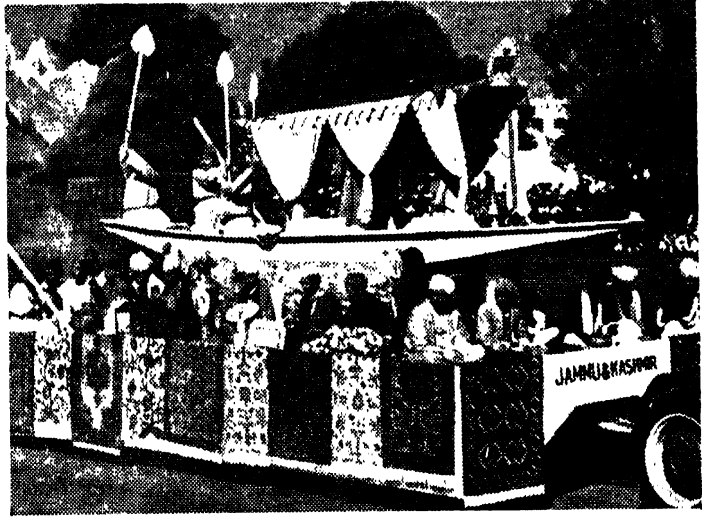
জম্মু ও কাশ্মীর—শিকারার প্রতিকৃতি; পটভূমিতে পার্বত্য শোভার দৃশ্য এবং চতুঃপার্শ্বে বিভিন্ন পোশাক পরিহিত অধিবাসীদের লোকগীতি

হিমাচল প্রদেশ—শীতকালের বেলাতে গ্রামাঞ্চলের কোন গৃহস্থ বাড়ীর সামনেকার রৌদ্রোজ্জ্বল প্রফুল্ল দৃশ্য

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৬)

মাতৃবিয়োগের আকস্মিক আঘাতে দীর্ঘ কয়েকটা মাস মুহ্যমান হয়ে রইলেন চার্লি। বাড়ি থেকে বড়-একটা বার হন না, স্টুডিয়োর কাজেকর্মে মন নেই,--তাঁর স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় যেন নিদারুণ একটা ছন্দপতন ঘটে গিয়েছে। সামলে উঠতে বেশ কয়েক মাস সময় লাগল। "সীটি লাইট্স"-এর খানিকটা অংশ ইতিপূর্বে তোলা হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু দৃশ্যগুলি তাঁর পছন্দ হয়নি। সেগুলোকে নিয়ে মাজাঘষা করলেন দিনকয়েক। তারপর আবার তাঁর কর্মক্ষেত্রে ফিরে এলেন। এ-বইয়ের ছোট্ট একটি ভূমিকায় জীন পোপ বলে একটি মেয়েকে নামান হয়েছিল। চিত্রজগতের স্বনামধন্যা অভিনেত্রী জীন হার্লোকে আপনারা সকলেই জানেন। জীন পোপেরই পরবর্তী জীবনের নাম জীন হার্লো।

"সীটি লাইট্স"-কে চার্লি বলেছেন "মিলনান্ত রঙ্গনাট্য"। মিলনান্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু তারই মধ্যে বেদনা-বিধুর একটি বিয়োগান্ত শিল্প-ভাবনারও স্পর্শ রয়েছে। এ-বই যখন প্রথম দেখান হয়, দর্শকদের মধ্যে অনেকেই তখন কান্না চেপে রাখতে পারেন নি। যে ভবঘুরে চরিত্রটিকে দেখবা-মাত্রই দর্শকদের মুখে হাসি ফুটে উঠত, দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে যে তাঁদের শুধু হাসিয়েই এসেছে, তাকে দেখেই তাঁরা এবারে কাঁদিলেন। পরবর্তীকালে, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, লক্ষ লক্ষ মানুষ তাকে দেখে অশ্রুমোচন করেছেন।

বইয়ের শুরুতে মফস্বল-শহরের ছোট্ট একটি জনসভার দৃশ্য। লোকজন এসে জমায়েত হয়েছে; কী, না একটি স্মৃতিস্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করা হবে। স্থানীয় এক ভদ্রলোক সুযোগ পেয়ে একখানা বক্তৃতাও শুনিয়ে দিলেন। বক্তৃতাটিকে যে-ভাবে কাজে লাগিয়েছেন চার্লি, তাতে বিস্মিত হতে হয়। এ-সব অনুষ্ঠানে সচরাচর যে-সব বক্তৃতা দেওয়া হয়ে থাকে, তার প্রতি তো বটেই, সবাক চলচ্চিত্রের প্রতিও চার্লির এক অন্তহীন বিতৃষ্ণা এখানে প্রকাশ পেয়েছে। ভদ্রলোক ওদিকে মুখ-হাত-পা নেড়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন, আর তাঁর ভঙ্গীগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শব্দযন্ত্রের সামনে এদিকে সারাক্ষণ একটা স্যাক্সোফোন বাজিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এলোপাথাড়ি বাজনা। বক্তা এক-একবার মুখ খোলেন, আর কথার পরিবর্তে দুর্বোধ্য কতকগুলি শব্দ বার হয়ে আসে। চার্লির পরিহাস-পদ্ধতির এখানে তারিফ না করে উপায় নেই।

বক্তৃতা শেষ হল। এবারে সেই স্মৃতি-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচনের পালা। কাপড় সরিয়ে নিতেই দেখা গেল, পাথরের উপরে তিনটি মূর্তি খোদাই করা রয়েছে। শিল্পী তাদের নামকরণ করেছেন "শান্তি ও সমৃদ্ধি"। একটি মূর্তি নারীর। উপবিষ্টা সেই নারীমূর্তির দুপাশে, একটু নীচে, দুই পুরুষ। পুরুষদের মধ্যে একজনের হাতে লম্বা একখানা তরোয়াল। তা তো হল, কিন্তু পাথরের তৈরী নারীমূর্তির কোলে কে একজন ঘুমিয়ে রয়েছে না? কে আবার, চার্লি। নিরিবিলি আশ্রয় পেয়ে চুপচাপ দু' দণ্ড ঘুমিয়ে নিচ্ছিলেন তিনি; ভাবতেই পারেননি যে, একটু বাদেই এই স্মৃতি-স্তম্ভের আবরণ উন্মোচন করা হবে। বক্তৃতার চোটে তাঁর ঘুম ভেঙে গিয়েছে। চোখ খুলে দেখেন, তাঁর সামনেই এক জনসভা। সভার উদ্যোক্তারা এদিকে হাত-পা নেড়ে ইশারা করছেন তাঁকে, নারীমূর্তির কোল থেকে তাঁকে নেমে আসতে বলছেন। নামতে গিয়ে পা পিছলে গেল চার্লির, এবং পড়বি-তো-পড় তিনি পুরুষমূর্তির তরোয়ালের উপরে গিয়ে পড়লেন। সভামঞ্চে ওদিকে জাতীয় সঙ্গীত শুরু হয়ে গিয়েছে। অনেক কষ্টে তরোয়ালের উপর থেকে নীচে নেমে এলেন চার্লি। একপাশে গিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, এমন সময় দেখেন, তাঁর ঠিক সামনেই কে যেন বুড়ো-আঙুল উঁচিয়ে ধরেছে। আঙুলটা আসলে একটি মূর্তির। কিন্তু চার্লি তাকে একজন দর্শক ঠাউরে নিয়ে মাপ চেয়ে সেখান থেকে সরে পড়লেন।

"সীটি লাইট্স" চিত্রে হকারদের সামনে চার্লি

"সীটি লাইট্‌স" বইয়ে এই ধরনের সূক্ষ্ম এক-একটি স্পর্শ আরও অনেক আছে। দৃষ্টান্ত হিসেবে, খবরের কাগজের হকাররা যেখানে তাঁকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করছে, সেই দৃশ্যটির উল্লেখ করা যেতে পারে। রাগে হিতাহিতজ্ঞান হারিয়ে দস্তানা খুলে নিয়েছেন চার্লি; দেখে মনে হয়, এক্ষুনি তাঁর সামনের হকারটির গালে তিনি একটি চড় কষিয়ে দেবেন। দিতে গিয়েও দিলেন না। তার বদলে করলেন কি, সামনের দোকানের শো-কেসে রাখা নগ্ন একটি মূর্তির দিকে সপ্রশংস দৃষ্টিতে তিনি তাকিয়ে রইলেন। এদিকে যার উপরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, সেটা যে ফুটপাথ নয়, একটা লীফ্‌টের সামনেকার ম্যাটবোর্ড, সেদিকে তাঁর খেয়ালই নেই। মূর্তিটিকে আর-একটু দূর থেকে দেখবেন বলে দু-পা পিছিয়ে এলেন চার্লি! পিছনেই লীফ্‌টের গহ্বর। চার্লি ওদিকে পিছিয়েই চলেছেন। দর্শকরা যখন আশঙ্কা করছেন, গহ্বরের মধ্যে তিনি আছড়ে পড়বেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই নীচের থেকে লীফ্‌টটা হঠাৎ উপরে উঠে এল। পরমুহূর্তেই দেখা গেল যে, লীফ্‌টের মধ্যে তিনি পা বাড়িয়ে দিয়েছেন, এবং বিস্ময়বিমূঢ় চার্লিকে নিয়ে লীফ্‌ট আবার নীচের তলায় নামতে শুরু করেছে। চট্‌ করে লীফ্‌ট থেকে বেরিয়ে এলেন চার্লি; বেরিয়ে এসেই লীফ্‌টম্যানকে তিনি বকাবকি শুরু করলেন। লীফ্‌টম্যানও ওদিকে রেগে আগুন। তার ভাবগতিক দেখে চার্লি বুঝলেন যে, এখানে বিশেষ সুবিধে হবে না। বুঝবামাত্রই তিনি সরে পড়লেন।

পরের দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়, রাস্তার ধারে বিরাট একখানা গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। ট্র্যাফিক-পুলিসের চোখে ফাঁকি দেবার জন্যে গাড়ির এ-পাশের দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে গেলেন চার্লি, এবং পরমুহূর্তেই ও-পাশের দরজা খুলে ফুটপাথে গিয়ে নামলেন। নামলেন গিয়ে এক অন্ধ ফুলওয়ালীর সামনে (ভার্জিনিয়ার দৃষ্টিশক্তি এমনিতেই খুব ক্ষীণ হওয়ায় অন্ধ ফুলওয়ালীর ভূমিকায় তাঁকে চমৎকার মানিয়ে গিয়েছিল; তাঁকে দেখে দর্শকদের কখনও মনে হয়নি যে, আসলে তিনি অন্ধ নন)। গাড়ির দরজা খোলার শব্দ শুনতে পেয়ে ফুলওয়ালী মনে করল, চার্লি একজন বিরাট বড়লোক। ফুলের ডালা হাতে নিয়ে চার্লির সামনে এসে দাঁড়াল সে। অন্ধ সেই মেয়েটিকে দেখে ভারী মায়া হল চার্লির। একটিই মাত্র ডলার তাঁর সম্বল। পকেট থেকে ডলারটি বার করে নিয়ে ফুলওয়ালীকে তিনি দিয়ে দিলেন। তারপর পা টিপে-টিপে তার পাশে গিয়ে বসলেন। সুন্দরী মেয়েটির পাশে নীরবে কিছুক্ষণ বসবার ইচ্ছে ছিল তাঁর। কিন্তু অদৃষ্ট! মেয়েটিতো আর জানে না যে, তার পাশে একজন বসে আছে। জলের বালতিটা চার্লির একেবারে মাথার উপরে সে উপুড় করে ধরল। ভিজে জামা-কাপড়ে শীতে কাঁপতে কাঁপতে চার্লি সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

ভার্জিনিয়া এবং চার্লি, "সীটি লাইটস"

সেই রাত্রের ঘটনা। নদীর ধারে গিয়ে আপন মনে ঘুরে বেড়াচ্ছেন চার্লি। হাতে একটি ফুল। হাঁটতে হাঁটতে ফুলের ঘ্রাণ নিচ্ছেন। এমন সময় অকস্মাৎ এক কোটিপতির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। কোটি-পতির তখন মত্ত অবস্থা। নেশার ঝোঁকে সে আত্মহত্যা করতে উদ্যত হয়েছে। হাতে লম্বা একগাছা দড়ি। দড়ির একপ্রান্তে বিরাট একটা পাথর বেঁধে আর-এক প্রান্ত নিজের গলায় জড়িয়ে নিয়ে সে নদীর মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে, এমন সময় বিদ্যুৎবেগে দৌড়ে এসে চার্লি তাকে বাধা দিলেন। তারপর যুক্তিতর্কের সাহায্যে তাকে বোঝাতে লাগলেন যে, আত্মহত্যা করাটা কোনও কাজের কথা নয়, নেহাৎই ছেলেমানুষি। মাতালের সঙ্গে তর্ক করা বড় সহজ ব্যাপার নয়, কিন্তু চার্লিও নাছোড়বান্দা। হাত-পা নেড়ে সেই মাতাল কোটিপতিকে তিনি বোঝাতে লাগলেন যে, নেশার ঝোঁকে আত্মহত্যা করলে সেটা তার পক্ষে নিতান্তই বোকামি হবে। বললেন, "বুঝতে পারছি ভাই, তোমার খুব দুঃখ হয়েছে। কিন্তু এ-দুঃখ তোমার থাকবে না। কাল সকালে পাখিরা আবার গান গাইবে (হাতের একটি মুদ্রার সাহায্যে উড়ন্ত পাখির গতিভঙ্গিমাকে তিনি চমৎকার ফুটিয়ে তুলেছিলেন), তা ছাড়া নারী আর সুরারও (এ দুটি পদার্থও চার্লি তাঁর হাতের দুটি ভঙ্গী দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন) কিছু অভাব নেই। সুতরাং আর যা-ই কর, আত্মহত্যা কর না।" কোটিপতির কিন্তু সেই এক গোঁ, আত্মহত্যা সে করবেই। নিচু হয়ে পাথরটাকে সে আবার তার দড়ির সঙ্গে বাঁধতে লাগল। চার্লি বুঝলেন, যুক্তিতর্ক দিয়ে বুঝিয়ে কোন লাভ হবে না। তখন শুরু হয়ে গেল ধস্তাধস্তি। ধস্তাধস্তির মধ্যে মাতালের গলা থেকে দড়ির ফাঁসটা খুলে গিয়ে কখন একসময় যে তাঁরই গলায় আটকে বসেছে, চার্লি তা বুঝতেও

"সীটি লাইট্স"-এর আর একটি দৃশ্য

পারেননি। যখন বুঝলেন, তখন আর সময় নেই। মাতাল ততক্ষণে পাথরটা তুলে নিয়ে নদীর মধ্যে ছুড়ে মেরেছে। পাথরের হ্যাঁচকা টানে চার্লিও গিয়ে জলের মধ্যে পড়লেন। ব্যাপার দেখে মাতাল তো হেসেই অস্থির।

শেষ পর্যন্ত সে নিজেই আবার চার্লিকে টেনে তুলল। তখন শুরু হল তাঁর পাথর ছোড়া-ছোড়া খেলা। একবার চার্লি গিয়ে জলের মধ্যে পড়েন, পরের বার সেই মাতাল। মাতাল জলে পড়লে চার্লি গিয়ে তাকে টেনে তোলেন, চার্লি জলে পড়লে মাতাল তাঁকে উদ্ধার করতে এগিয়ে আসে। দৃশ্যটি এতই মজার যে, হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। সে যাই হোক, মাতাল কোটিপতি ইতিমধ্যে একটু ধাতস্থ হয়েছে। চার্লিকে সে বলল যে, আত্মহত্যা না করে সে বাড়িতে ফিরে যেতে রাজী আছে, তবে চার্লিকেও তার সংগে যেতে হবে। বিলক্ষণ। কোটিপতির বাড়িতে গিয়ে আবার কিছুক্ষণ মদ্যপান চলল। চার্লির ঝুলঝুলে-পাতলুনের মধ্য দিয়ে কত মদ যে গড়িয়ে গেল, তার হিসেব নেই। কয়েক পাত্র পেটে পড়তেই কোটি-পতির হৃদয়ে আবার আত্মহত্যার সাধ উথলে উঠেছে। চার্লিকে সে বলল যে, নিজের উপরে সে বন্দুক চালাবে। চার্লি তাকে বাধা দিয়ে বললেন যে, তার চাইতে বরং বাইরে গিয়ে একটু ফুর্তি করা ভাল। এর পরেই একটি নাইট ক্লাবের দৃশ্য। চার্লি নিজেও ততক্ষণে মত্ত হয়ে উঠেছেন। নেশার ঝোঁকে খাবারের মেনুটাকেই তিনি সুর করে গাইতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু নেশার মধ্যেও তিনি ভোলেননি যে, কোটিপতি এই বন্ধুটিকে এখন হাতে রাখা দরকার। এক একটি চুরুট মুখে দিয়ে চার্লির দিকে তাকিয়ে তর্জনী সঞ্চালন করে সে, আর তৎক্ষণাৎ দেশলাই জ্বালিয়ে চার্লি তার চুরুট ধরিয়ে দেন। আহারের দৃশ্যটিও ভারী মজার। ঘরের ছাদ থেকে কাগজের শিকলি ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। সেই শিকলি যে চার্লির স্প্যাঘেটির সংগে জড়িয়ে গিয়েছে, চার্লি তা খেয়াল করেননি। খেতে খেতে হঠাৎ এক সময় তিনি বুঝতে পারলেন যে, স্প্যাঘেটির সংগে বেশ খানিকটা কাগজও তাঁর পেটে চলে গিয়েছে।

সারারাত ফুর্তি চালিয়ে সকালবেলা সেই কোটিপতির রোল্স রয়েসে চড়ে দুজনে বাড়ি ফিরছেন। কোটিপতির নেশা তখনও কাটেনি। চার্লি তার রোল্স রয়েসের দু-চারবার প্রশংসা করতেই গাড়িখানা সে চার্লিকে দান করল। রাস্তাঘাটে অল্প অল্প করে লোক জমছে। শ্রমিকরা সব কাজে চলেছে। তাদের মধ্যে রয়েছে সেই অন্ধ ফুলওয়ালী মেয়ে। হাতে ফুলের ডালা। রাস্তার মোড়ে তার নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে সে বসবে, ফুল বিক্রি করবে। মেয়েটিকে দেখেই চার্লি উতলা হয়ে উঠলেন। কোটিপতির সেটা নজর এড়াল না। সে বুঝতে পারল যে, মেয়েটিকে চার্লি ভালবাসেন। বুঝবামাত্রই চার্লির হাতে সে একতাড়া নোট তুলে দিল। সেই টাকা দিয়ে ফুলওয়ালীর সমস্ত ফুল কিনে নিলেন চার্লি। তারপর সেই মেয়েকে সদ্য-পাওয়া রোল্স রয়েসের ভিতরে এনে তুললেন। মেয়েটিকে তিনি গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেবেন। জীর্ণ একটি ঘর। সেইখানেই থাকে ফুলওয়ালী। সংগে থাকে তার ঠাকুমা। বাড়িটা চার্লি চিনে রাখলেন।

চার্লি যে বড়লোক, খুবই বড়লোক, সে বিষয়ে ফুলওয়ালীর মনে আর কোনও সংশয় রইল না। তা নইলে কি আর এত টাকার ফুল কিনতে পারে, এত বড় গাড়িতে চড়ে ঘুরে বেড়ায়। টাকা, আর গাড়ি—এর কোনওটার মালিকই যে চার্লি নন, মেয়েটি তা বুঝতে পারল না। গাড়ি থেকে আলতো হাতে মেয়েটিকে তার বাড়ির দোরগোড়ায় নামিয়ে দিলেন চার্লি; জিজ্ঞেস করলেন, আবার তাদের দেখা হবে তো? কৃতজ্ঞচিত্তে মেয়েটি বলল, "সে আপনার দয়া।" আনন্দে বিহ্বল হয়ে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে রইলেন চার্লি। হাতে ফুল। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফুলের ঘ্রাণ নিতে লাগলেন। তাঁর ঠিক মাথার উপরেই একটা জানালা। জানালার উপরে পাশাপাশি কয়েকটি ফুলদানী। অতর্কিতে একটা বেড়াল সেই জানালার উপরে লাফিয়ে পড়তেই একটা ফুলদানী স্থানচ্যুত হয়ে চার্লির মাথার উপরে এসে আছড়ে পড়ল।

রোল্স হাঁকিয়ে কোটিপতির কাছে আবার ফিরে চললেন চার্লি। পকেটে কিন্তু একটিও পয়সা নেই। যেতে যেতে দেখতে পেলেন, এক ভদ্রলোক তাঁর চুরুটে সুখটান দিয়ে শেষাংশটুকু রাস্তার উপরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন, আর এক বুড়ো ভিখিরী সেই উচ্ছিষ্ট চুরুট কুড়িয়ে নিতে ছুটে আসছে। স্বভাব যাবে কোথায়! চার্লি তাঁর রোল্স হাঁকিয়ে

বুড়ো ভিখিরীর আগে গিয়ে সেই চুরুটটিকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে নিলেন। তারপর মনের আনন্দে চুরুট টানতে টানতে গাড়ির মধ্যে এসে প্রবেশ করলেন আবার। বুড়ো ভিখিরী ফ্যালফ্যাল করে তাঁর অপসৃয়মান রোল্‌সের দিকে তাকিয়ে রইল।

কোটিপতি বন্ধুর কাছে ফিরে এলেন চার্লি। কিন্তু, হায়রে অদৃষ্ট, বন্ধু তাঁকে চিনতেই পারল না। কী করেই বা পারবে। নেশা কেটে গিয়েছে তার, সে এখন প্রকৃতিস্থ। চার্লির দিকে দৃকপাত না করে কোটিপতি তার রোল্‌স হাঁকিয়ে চলে গেল। আর চার্লি? ভগ্নহৃদয়ে তিনি দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু আগেই বন্ধুর কাছে গাড়িখানা তিনি উপহার পেয়েছিলেন। দু দণ্ডের সেই উপহার তাঁর হাতছাড়া হয়ে গিয়েছে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তিনি চুরুট চুষতে লাগলেন। সেই রাত্রেই বন্ধুর সঙ্গে আবার দেখা হল তাঁর। মদ টেনে বন্ধুর তখন টালমাটাল অবস্থা। চার্লিকে চিনতে, সুতরাং এবারে আর তার কোনও কষ্ট হল না। "ভাইরে, এতদিন কোথায় ছিলি" বলে চার্লিকে সে জড়িয়ে ধরল।

চার্লির সম্মানার্থে নাইট-ক্লাবে সে-রাত্রে পান-ভোজনের ঢালাও ব্যবস্থা হয়েছে। টেবিলের উপরে একটা হুইস্‌ল দেখতে পেয়ে সেটাকে তুলে নিলেন চার্লি; খোশমেজাজে সেটাকে বাজাতে শুরু করলেন। পাশেই বসে রয়েছে একটি মেয়ে। চার্লির দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য যেই না সে তাঁর গায়ে একটা হাত রেখেছে, আচমকা ঘাবড়ে গিয়ে হুইস্‌লটাকে তিনি গিলে ফেললেন। ভোজনের মাত্রা সে-রাত্রে একটু বেশীই হয়ে থাকবে। একটু বাদেই তিনি ঢেকুর তুলতে লাগলেন। তাতেই ঘটল বিপদ। এক একটা ঢেকুর তোলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে পেটের মধ্যে হুইস্‌ল বেজে ওঠে। পানকক্ষে তখন গান চলছে। বার বার বাঁশির শব্দে গানের ব্যাঘাত ঘটতে লাগল। গায়িকা তো চটে লাল। শ্রোতারাও মারমুখো হয়ে উঠল। বেগতিক দেখে ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন চার্লি, বাইরে বাগানের মধ্যে গিয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। সেখানেও নিস্তার নেই। তখনও থেকে থেকে তাঁর পেটের মধ্যে বাঁশি বেজে উঠছে। বাঁশির শব্দে প্রথমে একখানা ট্যাক্সি তাঁর সামনে এসে দাঁড়াল। অনেক কষ্টে ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে তিনি বিদায় করলেন। ট্যাক্সি যদিবা বিদায় হল, বাঁশির আওয়াজে পালে পালে কুকুর ছুটে আসতে লাগল তাঁর কাছে। চার্লিকে ঘিরে মহানন্দে তারা লেজ নাড়তে লাগল।

সে-রাতটা বন্ধুর বাড়িতেই কাটল। একই বিছানায় পাশাপাশি দুজনে ঘুমিয়ে রইলেন। সকালে ঘুম থেকে উঠে আবার সেই ফ্যাসাদ। নেশা কেটে গিয়েছে, বড়লোক বন্ধু আর এখন তাঁকে চিনতে পারছে না। চার্লিকে দেখে সে চটে আগুন। কোথাকার এক বেকার বাউণ্ডুলে, তার কিনা এত সাহস যে তাকে বন্ধু বলে দাবি করছে। শুধু তাই নয়, শতচ্ছিন্ন জামাকাপড় পরে তারই বিছানায় এসে রাত কাটিয়েছে। আর কোনও বাক্যব্যয় না করে চাকর-বাকর ডেকে এনে তৎক্ষণাৎ চার্লিকে সে গলাধাক্কা দিয়ে তার বাড়ি থেকে বার করে দিল। মনের দুঃখে, কী আর করেন, ফুলওয়ালীর কাছে ফিরে চললেন চার্লি। তার সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে গিয়ে দেখেন, তখনও সে আসেনি। অসুখবিসুখ করেনি তো? ফুলওয়ালীর বাড়ির কাছে গিয়ে দেখেন, বাড়ির মধ্য থেকে গম্ভীরমুখে একজন ডাক্তার বেরিয়ে আসছেন। জিজ্ঞেস করে চার্লি জানতে পারলেন যে, মেয়েটির অবস্থা খুব খারাপ; তাকে যদি সারিয়ে তুলতে হয় তো অনেক সেবা-শুশ্রূষার দরকার হবে। তার জন্য টাকা চাই। টাকা? টাকা তিনি কোথায় পাবেন? উপায়ান্তর না দেখে, অনেক চেষ্টাচরিত্র করে চার্লি একটা ঝাড়ুদারের কাজ জুটিয়ে নিলেন। জঞ্জাল সাফ করতে করতে হঠাৎ একদিন তাঁর চোখে পড়ল, রাস্তা দিয়ে একটা সার্কাসের দল চলেছে। সঙ্গে তাদের অনেক জন্তু-জানোয়ার। কয়েকটা হাতিও রয়েছে। হাতির হাতে চার্লিকে এ-বইয়ে ভীষণ নাকাল হতে হয়েছিল।

এইখানে একটা সাব-টাইট্‌ল দেখান হয়। তাতে লেখা রয়েছে, "বড়লোক বন্ধুর সাহায্য ছাড়া ভদ্রলোক সেজে থাকা বড় কঠিন কাজ।" সে যাই হোক, ঝাড়ুদারের কাজ করে যা কিছু পয়সা পান তিনি, তাই দিয়েই মেয়েটির জন্যে এটা-ওটা কিনে নিয়ে আসেন। মেয়েটির কাছে বসে গল্প করেন দু-দণ্ড। তাকে সান্ত্বনা দেন। খবরের কাগজে একদিন একটা খবর বার হল। তাতে জানান হয়েছে যে, ভিয়েনাতে একজন চিকিৎসক আছেন, অন্ধকেও তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারেন। মেয়েটিকে সেই খবর পড়ে শোনাতেই আনন্দে, উত্তেজনায় সে অস্থির হয়ে উঠল, "অন্ধকেও দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে পারেন তিনি? আমিও তাহলে দেখতে পাব? তোমাকে দেখতে পাব আমি? ভাবতেই আমার আনন্দ হচ্ছে।" আনন্দ কি চার্লিরই হচ্ছে না? মেয়েটি যে দৃষ্টি ফিরে পেতে চায়, সে শুধু তাঁকে দেখবে বলে। শুনে তিনি খুবই খুশী হলেন। একটু বাদেই কিন্তু হাসি নিভে গেল তাঁর। চার্লিকে সে দেখতে চায়। ভাল, খুবই ভাল। কিন্তু যে-মানুষটিকে সে কল্পনা করে রেখেছে, চার্লির সঙ্গে কতটুকু তার মিল? কতটুকু?

মিল থাক, আর না-ই থাক, মেয়েটির যাতে ঠিকমত চিকিৎসা হয়, তার জন্য টাকা তাঁকে জোগাড় করতেই হবে। কিন্তু সে যে অনেক টাকার ব্যাপার। অত টাকা তিনি কোথায় পাবেন। চার্লি ঠিক করলেন, তিনি বক্সিং লড়বেন। মুষ্টি-যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় হেরে গেলেও অনেক টাকা পাওয়া যায়, তিনি শুনে-ছিলেন। সুতরাং আর কালবিলম্ব না করে এক প্রতিযোগিতায় গিয়ে তিনি নাম

লিখিয়ে এলেন। (এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, "সীটি লাইট্স" চিত্রে মুষ্টি-যুদ্ধকে অবলম্বন করে কাহিনীর যে অংশটুকু গড়ে উঠেছে, চার্লির পূর্ব পর্যায়ের ছবি "দী চ্যাম্পিয়ন" অথবা "দী নক্‌আউট"-এর সঙ্গে তার কোনও-খানেই কোনও মিল নেই। পুনরুক্তির ত্রুটি এ বইকে স্পর্শ করতে পারেনি। "দী নক্‌আউট" বইয়ে পয়লা নম্বর মুষ্টিযোদ্ধার ভূমিকায় যে অভিনেতাটিকে নামানো হয়েছিল, তাঁর নাম হাঙ্ক ম্যান। "সীটি লাইট্স"-এও সেই হাঙ্ক ম্যানকেই নামানো হল বটে, কিন্তু আবেদনের সূক্ষ্মতা এবং বিন্যাসের সৌকর্যে এ-বইয়ের কাহিনী সম্পূর্ণ পৃথক একটি চরিত্র লাভ করেছে।)

লড়াইয়ের আসরে নেমে প্রথমেই খুব খানিকটা পাঁয়তাড়া করে নিলেন চার্লি, তারপর উদ্যোক্তাদের একজনের কানে কানে কী যেন বললেন। ভদ্রলোক তাঁকে বাইরে যাবার পথ দেখিয়ে দিতেই রিংয়ের ভিতর থেকে চার্লি বেরিয়ে এলেন। অতঃপর দু পা এগিয়েই কী ভেবে যেন ফিরে গেলেন আবার। হাত দুখানা সেই উদ্যোক্তাদের সামনে তুলে ধরলেন তিনি, গ্লাভ্‌স দুটোকে খুলে দিতে হবে। দস্তানা খুলে দেবার পর রিং থেকে বেরিয়ে এসে এক পেট জল খেয়ে নিয়ে আবার আসরে গিয়ে অবতীর্ণ হলেন।

চার্লির পক্ষের উদ্যোক্তা ইতিমধ্যে খবর পেয়েছেন যে, চার্লি একজন ফেরারী আসামী, পুলিশ তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। শুনেই তাঁর চক্ষুঃস্থির। তৎক্ষণাৎ তিনি শহর থেকে সরে পড়লেন। চার্লি এখন নিঃসঙ্গ। এমন কেউ নেই যে, তাঁকে একটু উৎসাহ দেয়। ওদিকে তাঁর প্রতিপক্ষ রিংয়ে নেমে হৈ-চৈ বাধিয়ে দিয়েছে। করুণ নয়নে তাকে একবার দেখে নিলেন চার্লি। ওই ষণ্ডা জোয়ানের একখানি ঘুষি খেলেই তাঁকে মাটি নিতে হবে।

পাশের দিকে তাকিয়ে দেখেন, এক নিগ্রো মুষ্টিযোদ্ধা বসে বসে সারা গায়ে একটা মরা খরগোশের থাবা বুলিয়ে চলেছে। কে জানে, হয়তো কোনও তুকতাক রয়েছে। নিগ্রোর কাছ থেকে খরগোশের থাবাটা চেয়ে নিলেন চার্লি, নিয়ে নিজের সর্বাঙ্গে সেই থাবাটাকে বুলোতে লাগলেন! কিন্তু কয়েক মিনিট বাদেই যে ভয়াবহ দৃশ্যটি তাঁর চোখে পড়ল, তাতে কয়েক মুহূর্তে তাঁর আর বাক্‌-স্ফূর্তি হল না। প্রতিপক্ষের ঘুষিতে ধরাশায়ী হয়েছে সেই নিগ্রো। অজ্ঞান অবস্থায় ধরাধরি করে তাকে রিং থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তবে আর খরগোশের থাবা বুলিয়ে লাভ কী। হাল ছেড়ে দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে তিনি রিংয়ের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন।

মিনিট কয়েক রেফারীর আড়ালে পালিয়ে পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করলেন চার্লি। সকলের অলক্ষ্যে আসরের উপর থেকে তিনি সূক্ষ্ম একটা তার ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, সেই তারটাকে তিনি আঁকড়ে ধরে আছেন। তারপর এক সময় সুযোগ বুঝে হঠাৎ একটা ঝুল খেয়ে অতর্কিতে তিনি তাঁর প্রতিপক্ষের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। সেই ষণ্ডা জোয়ানের পেটের উপরে এলো-পাথারি ঘা কয়েক বসিয়ে দিলেন চার্লি, রেফারীকেও রেহাই দিলেন না। লড়াইয়ের এই দৃশ্যটি ভারী মজার। শেষ পর্যন্ত চার্লিকেই অবশ্য ধরাশায়ী হতে হল।

চার্লির সেই কোটিপতি বন্ধুটি ইতিমধ্যে ইউরোপ ভ্রমণে গিয়েছিল। ফিরে এসে অকস্মাৎ একদিন চার্লির সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। বন্ধুটি তখন মত্তাবস্থায় এক রঙ্গালয় থেকে বেরিয়ে আসছে। চার্লিকে দেখতে পেয়েই সে বুকে জড়িয়ে ধরল। বলল যে, রাতটা তাঁকে তার ওখানেই কাটাতে হবে। বন্ধুর গাড়িতে চড়ে তার বাড়িতে চললেন চার্লি।

বাড়িতে পৌঁছে চার্লি তাকে সব খুলে বললেন। বললেন যে, ফুলওয়ালী মেয়েটির খুব অস চলছে। ভিয়েনাতে নিয়ে গিয়ে এব অপারেশনের ব্যবস্থা করালে যে মেয়ে তার দৃষ্টি ফিরে পেতে পারে, সেকথ চার্লি তাকে জানাতে ভুললেন না। খেয়ে বন্ধুর তখন দিলদরিয়া অবস্থ চার্লির হাতে কয়েক বাণ্ডিল নোট তু দিল সে। বলল, যত টাকা লাগে লাগু টাকার জন্যে কিছু আটকাবে না। এদিক হয়েছে কি, জনকয়েক চোর আগে থাকতে তাদের ঘরের মধ্যে ঢুকে বসে ছিল দুজনকে ঐরকম মত্তাবস্থায় দেখে পর্দা আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে ঘরের কিছু দামী আসবাবপত্র হাতিয়ে নিয়ে তার সরে পড়ল। যাবার আগে চার্লি আর তার বন্ধুর মাথায় ডাণ্ডা মেরে তাদের অজ্ঞান করে রেখে যেতেও তাদের ভুল হল না।

খানিক বাদে যখন জ্ঞান ফিরে এল কোটিপতি বন্ধুটি তখন স্বাভাবিক মানুষ, তার নেশা তখন ছুটে গিয়েছে চার্লিকে দেখে চিনতে পারল না সে। চাকরকে সে জিজ্ঞেস করল, "এ হতভাগা আবার কোত্থেকে এসে জুটল? কে এ?" চার্লির পকেটে তখন তাড়া-তাড়া নোট। সে-টাকা সেই বন্ধুটিরই দেওয়া। তাড়া-হুড়োর মাথায় চোরেরা সে-টাকার সন্ধান পায়নি। বন্ধুটি এদিকে চার্লিকেই চোর ঠাউরে বসল। চার্লি দেখলেন, গতিক খুব সুবিধের নয়। বন্ধুটি এক্ষুনি তার নোটের তাড়া আবার কেড়ে নেবে। মেয়েটির তাহলে চিকিৎসা হবে না। বন্ধু আর তার চাকরবাকরদের হাত থেকে টাকাগুলোকে বাঁচাবার জন্যে তাই ঘরময় তিনি ছুটোছুটি করে বেড়াতে লাগলেন। খবর পেয়ে ইতিমধ্যে পুলিস এসে হাজির হয়েছে। চার্লির কাছ থেকে নোটের বাণ্ডিল তারা কেড়ে নিল। চার্লি তখন বেপরোয়া। পুলিসের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে নোটের বাণ্ডিলটাকে আবার ছিনিয়ে নিলেন তিনি। তারপর ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে রাস্তায় গিয়ে নামলেন। প্রাণপণে দৌড়তে লাগলেন চার্লি। যে করেই হোক, সেই ফুলওয়ালীকে গিয়ে এই নোটের বাণ্ডিল পৌঁছে দিতে হবে। (ক্রমশ)

মিথ্যা
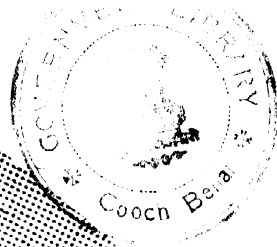
অনুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

কত বড় বাড়িটা। এক রকম ভয়ই করছিল কাজলের। চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ও থমকে থমকে হাঁটছিল। বাড়ি তো নয়, পা ফেলাই। টুটুল ভেতরে ঢুকতেই চাইল না। সত্যি, মেজদি যে এখন এতো বড়লোক, আগে অতোখানি আন্দাজ করতেই পারেনি কাজল। সাহস করে ভেতরে ঢুকে ও খেই হারিয়ে ফেলল যেন।

মুখোমুখি পড়ল বেলার। ভয়ে আর ভাবনায় কুঁকড়ে যাওয়া মিষ্টি একটা থমথমে মুখ। ওর কষ্টই হল না শুধু, হাসিও পেল। নরম সুরে জিজ্ঞেস করলে, কাকে চাই খুকী?

মেজদি। আমার মেজদি এখানে থাকে?

বুঝতে পারল বেলা। বললে, বস। ডেকে দিচ্ছি। তারপর বাণীর ঘরে ঢুকে খবরটা দিতে এল। বৌদি, তোমার বাপের বাড়ি থেকে ছোট বোন এসেছে দেখা করতে।

খবরটা শুনে ধড়মড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এল বাণী খুশীতে। এতোদিন বাদে হঠাৎ কে এল সেদেশ থেকে এদেশে?

ওম কাজল তুই! অনেক দিনের পর বাপের বাড়ির একটা চেনা মুখ ওকে সত্যিকারের খুশীতে ঝলমলিয়ে দিল। আয়।

মেজদিকে জড়িয়েই ধরতো কাজল। কিন্তু এই নতুন বাড়িতে, নতুন জায়গায় সাহস হল না। আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়েই রইল। শুধু হাসল একটুখানি, পাতলা দুটো ঠোঁট চিরে।

আয় না। আয়, ঘরে আয়। আয়, লজ্জা কি। ওর একটা হাত ধরে কাছে টেনে নিল বাণী। কখন এসেছিস রে?

এই তো এলাম। এতক্ষণে মুখ খুলল কাজল।

একাই এসেছিস?

না, টুটুলও আছে সঙ্গে।

টুটুল? কই? চারদিকে তাকাল বাণী।

ও বাইরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে রয়েছে মেজদি।

বাইরে? সে কি? কেন? কান্ড দেখ ছেলেটার।

ওর নাকি ভেতরে ঢুকতে খুব লজ্জা করছে। তাই আমাকে ঠেলে দিল।

টুটুলকে ধরে আনবার জন্যে একজন চাকরকে আদেশ করল বাণী। ওকে এক-রকম ধরেই আনল চাকরটা।

কিরে, রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলি কেন?

এমনিই।

খুব লজ্জা করতে শিখেছিস বুঝি আজকাল? আগে তো এতো লাজুক ছিলিনারে। বরং বেহায়া বলে মার কাছে রাতদিন বকুনি খেতিস।

চুপ করে রইল না টুটুল, বরং প্রতিবাদই করল। বারে, লজ্জা আবার কে করলে?

আচ্ছা, আচ্ছা। হাসল বাণী। এখন তবে আয়তো।

ছোট ভাইবোন দুটোকে আদরে নিজের ঘরে এনে বসাল। এদের এমনি করে আজ হঠাৎ পেয়ে ভারি ভাল লাগছে ওর।

ধবধবে সাদা বিছানা। এক কোণে দুই ভাইবোনে বসল জড়সড় হয়ে।

ভাল ক'রে বস না।

বিছানাটা যে খারাপ হয়ে যাবে। কাজল বলল।

তা হ'ক। আরাম ক'রে পা ছড়িয়ে বসতো। আজকাল তোরা ভারি শান্ত-শিষ্ট হয়ে গেছিস দেখছি।

টুটুল বললে, এখানে নতুন জায়গা, সব নতুন লোক। তাই—

তাতে তোদের ভয়টা কিসের? আমি তো রয়েছি। দেয়ালের কাছে এগিয়ে ফ্যানটা চালিয়ে দিল বাণী।

ঘরটার চারদিকে দুই ভাইবোনেই অবাক চোখ বোলাচ্ছে। কাজল জিজ্ঞাসা করল, এই ঘরটা তোর বুঝি মেজদি?

হ্যাঁরে।

এই বিছানাটায় তুই ঘুমোস?

হুঁ।

গ্র্যান্ড ঘরটারে।

প্রকাণ্ড আয়নাটায় পুরোই দেখা যায় টুটুলকে। ও সামনে এগিয়ে, পেছনে হেঁটে, নানা ভাবে নিজেকে দেখতে থাকে। এক সময়ে বললে, তুই খুব বড়লোকরে মেজদি।

হাসল বাণী। কি করে জানলি?

বারে, কত বড় বাড়িতে থাকিস। কত ভাল তোর ঘর।

ও, তাই। হাসিটাকেই বড় করল বাণী। আচ্ছা, তোরা আমার ঠিকানা কোথায় পেলিরে?

বারে, তুই সেই যে একটা চিঠি লিখেছিলি, তাতেই তো ঠিকানা লেখা ছিল। আমরা ঠিকানাটা টুকে রেখেছিলাম লুকিয়ে। কাজল জানালো।

হ্যাঁরে, সেই চিঠিটার কি হলরে? কেউ তো জবাব দিল না।

কি জানি।

বয়েস কম হলেও বুদ্ধি খুব কাজলের। প্রশ্নটা ও ইচ্ছে করেই এড়িয়ে গেল। বুঝতে কিন্তু পারল বাণী।

বাড়ির সবাই কেমন আছেরে?

ভাল।

আর বাবা? বাড়ির কথা মনে পড়লেই সবার আগে বাবার কথাই বার বার মনে পড়ে বাণীর।

বাবাও ভাল আছে।

বাবাকে তোরা যত্ন করিস তো?

হুঁ।

ছাই করিস। ভাল করে করবি। বাবার মত ভাল মানুষ! হঠাৎ থামে বাণী। দীর্ঘ-শ্বাস ফেলে বললে আবার, ছবির কি খবর?

ছোড়দি? টুটুল মুখ খুলল। খালি বই পড়ে ডিটেকটিভ। আর ঘুমোয়।

গানের স্কুলে যাচ্ছে তো?

সে তো কবে বন্ধ হয়ে গেছে।

কেনরে? অবাক হ'ল বাণী।

তিন মাসের মাইনে বাকি ছিল, তাই নাম কেটে দিয়েছে।

কারণ শুনে কিন্তু অবাক হল না বাণী। মাইনে ঠিকমত দিচ্ছে শুনলেই ও যেন বেশি অবাক হত। তার কষ্ট হল বৈকি, এ খবর শুনে। সত্যিই বেশ ভাল গায় মেয়েটা। এরি মধ্যে কত মিউজিক কম্পিটিশনে প্রাইজ পেয়েছে।

তিন মাসের মাইনে কত হবে রে?

কাজল বললে, তিরিশ টাকা।

তিরিশ টাকা। ব্যস্। হাসিই পেল বাণীর টাকার অঙ্ক শুনে। তিরিশ টাকা আজ কিছুই নয় ওর কাছে। অথচ ও বাড়িতে থাকতে তিরিশ টাকাই মনে হত তিন লাখ টাকার সমান।

ও আসে না কেন আমার কাছে? আসতে বলিস।

কি জানি। লজ্জা করে বোধ হয়।

লজ্জা আবার কিসের। হাসল বাণী।

তার হাসি দেখে কিন্তু হাসল না কাজল। একটু উসখুস করে বলল, জানিস মেজদি, বড়দা একদিন খুব মেরেছিল ছোড়দিকে।

কেন রে?

অশোকদাকে তো জানিস। হলদে রঙের দোতলা বাড়িটায় থাকে। অশোকদার কাছে বই আনতে আর গল্প করতে যায় কিনা ছোড়দি, তাই বড়দা বারণ করতো। ছোড়দি শুনত না। তাই মারল একদিন।

গেলে কি হয়?

বড়দা বলে, ছোড়দি এখন বড় হয়ে গেছে, অশোকদার ঘরে একলা সব সময় যাওয়া ঠিক নয়। খারাপ হয়ে যাবে।

খারাপ হয়ে যাবে! খারাপ হয়ে যাবে বরং ও-বাড়িতে বেশিদিন থাকলেই। আনন্দ যখন ও-বাড়িতে আসতো, বড়দাই সবার আগে এমনি করে পথরোধ করেছিল তার বেলাতেও। আনন্দ নাকি খারাপ করে দেবে বাণীকে। আশ্চর্য। আর বাড়িতে দিনরাত যে চীৎকার, মারামারি, ভায়ে ভায়ে ঝগড়া চলেছে, সেই কদর্য আবহাওয়ায় কেউ খারাপ হবে না? শুধু খারাপ হয়ে যাবে ভাল মন নিয়ে বাইরের কারুর সঙ্গে একটু বেশি কথা বললে, একটু বেশি হাসলে?

বুকটা ভরে উঠল বাণীর অনেকখানি বেদনায়, অদ্ভুত কালো চোখ আর অফুরন্ত কালো চুলের দুরন্ত মেয়েটার কথা ভেবে। ছবিই তো ছিল বাড়ির মধ্যে সবচেয়ে চঞ্চল আর উজ্জ্বল সবচেয়ে।

বাবা খুব বকাবকি করল বড়দাকে। অতো বড় বোনের গায়ে হাত তুলতে লজ্জা করে না? মা কিন্তু বড়দার দলে।

আর মেজদা?

মেজদা বলল, বাণীর মত এ মেয়েটাও বাড়ি থেকে পালিয়ে যাক, তাই-কি তোমরা চাও নাকি।

ও। কেমন উদাস হয়ে পড়ে বাণী।

জানিস, মার খেয়ে ছোড়দি কিন্তু একটুও কাঁদেনি, সমস্ত দিন গুম্ হয়ে বসেছিল।

কিন্তু আমার কাছে আসে না কেন ছবি? আমার সঙ্গে দেখা করে না কেন? ওকে আসতে বলিস তো।

বলব।

হ্যাঁ, ঠিক বলিস। বলিস, আমার সঙ্গে দু-চার দিনের মধ্যে দেখা না-করে যদি, তবে ওর সঙ্গে চিরকালের জন্যে আড়ি।

বলব রে।

হ্যাঁরে কাজল, বড়দা-মেজদার মধ্যে এখনো মারামারি হয় নাকি রে?

হুঁ। এইতো সেদিন, কি একটা কথা

নিয়ে ভীষণ হাতাহাতি হয়ে গেল। আমরা তো ভয়ে অস্থির। মেজদা রাগ করে বেরিয়ে গেল। তিনটে দিন বাড়ি আসেনি।

চুপ করে থাকে বাণী।

আর জানিস মেজদি, একদিন দুজন পাওনাদার বাড়িতে ঢুকে বাবাকে যা-তা গালাগাল দিয়ে গেল। বাবা একটা কথাও বললে না, শুধু চুপ করে শুনে গেল।

আর বড়দা মেজদা?

ওরা যে যার ঘরের মধ্যে চুপ করে লুকিয়ে রইলো। কেউ বেরলো না একবারও।

এসব আর শুনতে চায় না বাণী। শুনতে পারে না। শুধু বাবারই জন্যে ভারি কষ্ট হয় এক-এক সময়।

হ্যাঁরে, আমার কথা কেউ বলে?

কেউ না। তোর কথা উঠলেই মা বলে, ওর নাম করবে না কেউ। ও হতভাগী আমাদের বংশে কালী দিয়েছে। বড়দাও তাই বলে।

আর বাবা?

বাবা কোনো কথাই বলে না।

বাড়ির সবাই আমার ওপর খুব রেগে আছে, নারে?

হুঁ।

তোরাও তো?

দুই ভাইবোনে তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল। আমরা নই।

কেন রে? তোরা রাগিস নি কেন?

টুটুল বললে, তুই যে বড্ড ভাল মেজদি।

ভাল না হাতি। হাসল বাণী। কিন্তু তোরাও আমার ওপর রাগ করেছিস রে। নইলে এদ্দিন বাদে মেজদিকে মনে পড়ে।

তোর কথা রোজই মনে পড়ত রে। কিন্তু ভয় করত আসতে। মা কি বড়দা যদি জানতে পারে।

কি হবে জানলে?

খুব বকবে আর মারবে। তোর কথা বলতে বা তোর বাড়ি যেতে সব্বাই মানা করে দিয়েছে।

কেন রে?

তুই নাকি খারাপ মেয়ে।

শুনে কষ্ট হল না একটুও বাণীর। কেমন যেন মজাই লাগল।

কিন্তু তুই তো খুব ভাল মেয়ে। তুই কেন খারাপ হবিরে মেজদি?

কি জানি।

আচ্ছা মেজদি, তুইও তো আর বাড়ি যাস না।

আর কেউ হলে অন্য জবাব দিত বাণী। কিন্তু এদের বললে, ওখানে সবাই আমার ওপর রেগে, কি হবে বল গিয়ে।

সত্যিই, যাসনিরে তুই। সবাই তোকে বকুনিই দেবে খালি, কেউ তোর সঙ্গে ভাল ক'রে কথা বলবে না।

হাসল বাণী। ছোট্ট, একটুখানি। বিবর্ণ মনে হল সে হাসি।

আচ্ছা, আজ যে তোরা এলি হঠাৎ? বাড়ির কেউ যদি জানতে পারে, তাহলে কি হবে?

কাজল বললে, কেউ জানবে না। লুকিয়ে এসেছি আমরা। কিন্তু তুই যেন বলে দিসনিরে মেজদি। আচ্ছা, এবার যাই আমরা।

এরি মধ্যে যাবি কিরে?

বারে, কতক্ষণ বাড়ি থেকে বেরিয়েছি।

আচ্ছা, তবে খেয়ে যা কিছু। আর একটু বস।

কিছু খাব না। আমাদের ক্ষিধে নেই।

ক্ষিধে নেই? কি খেয়েছিস বাড়িতে?

অনেক কিছু।

আজকাল ভারি তুই মিথ্যে বলতে শিখেছিস তো কাজল। কতই তোরা খাস বাড়িতে, আমি কি তা জানি না? আজ ক' মাসই না-হয় ও-বাড়ি ছেড়েছি, এতো বছর তো ওখানেই ছিলাম।

চুপ করে রইল এবার কাজল। জবাব দিতে পারল না।

কাঁচের প্লেটে একগাদা মিষ্টি নিয়ে এলো বাণী। এতো খাবার, এতো রকমারি,— আর এতো ভাল ভাল। দেখে তো অবাকই দুই ভাইবোনে। আস্তে আস্তে ডাকল টুটুল, মেজদি।

কিরে?

এতো ভাল ভাল খাবার রোজ খাস তোরা?

হ্যাঁরে।

খানিকক্ষণের মধ্যেই খালি হয়ে গেল প্লেট। ওদের গোগ্রাসে গেলা দেখে সত্যিই কষ্ট হচ্ছিল বাণীর।

আরো খাবি নাকি রে?

না। কাজল ঘাড় নাড়ল। ওর দেখাদেখি টুটুলও।

খা না, লজ্জা কি। প্লেটটা আবার ভরে আনল বাণী।

খাওয়ার শেষে টুটুল ডাকল আবার, মেজদি।

কিরে?

ভয়ে ভয়ে বললে, একটা টাকা দিবি রে? ওরা কেউ দেয় না।

কি করবি টাকা নিয়ে?

বারে, কত কি কিনতে ইচ্ছে করে।

টাকা নয়, দুজনের হাতে দুটো নোট দিল পাঁচ টাকার। বলল, ইস্কুলের টিফিনের সময় রোজ কিছু কিছু কিনে খাস।

ওরা তো অবাক। হাঁ করে তাকিয়ে রইল।

গেট অবধি এলো ওদের সঙ্গে সঙ্গে বাণী।

যখনই ইচ্ছে করবে, আসবি। কেমন?

ওরা ঘাড় নাড়ল। ওদের চোখে জল চিক্ চিক্ করছে দুরন্ত খুশীতে, লক্ষ্য করল বাণী।

অনেক দিন বাদে ভারি ভাল লাগল আজকের বিকেলটুকু ওর। অনেক দিনের একগাদা চেনা সুর ওরা এখানে ছড়িয়ে গেল, মনটাকে ভরিয়ে গেল। বাড়ি ছেড়েছে ও অনেকদিন। বেশ কতকগুলো মাস হবে। আনন্দের হাত ধরে এক ঝিরঝিরে শীতের ভোরে ও ঘর ছাড়ল। সবাই ঘুমোচ্ছে তখন। কেউ জানল না। জানাতে চায়নি বাণী কাউকেও। জানলে ওরা বাধাই শুধু দিত, অপমানই করতো। জেনেও তারা তাই করেছে। ও নাকি ওদের বংশে কালি দিয়েছে। আজ কাজলের মুখে মার এ কথা শুনে দুঃখেও হাসি পেল তার। যেখানে মনের দাম নেই, সত্যির কোন জায়গা নেই, সে বংশকে মানে না বাণী। ও-বাড়ির ওপর একটুও মায়া নেই ওর। কি আছে ওখানে? একগাদা অভাব আর একরাশ কান্না। আর এই কান্না আর অভাবকে নিয়ে ওরা মজা করছে। ও-বাড়িতে তো বোবার মতই ছিল বাণী। আনন্দের হাত ধরে দুরন্ত দুঃসাহসে চলে এসেছে যে মেয়ে, সে শুধু নিজেরই ভাল করেনি—ভাল করেছে এদেরও। তবু ওরা গালাগালই দেবে বার বার, মন্দ অদৃষ্টকে ধিক্কার দেবে দিনরাত। ওখানে ভালবাসা নেই, তাই ভালবাসার আদরও নেই। তাই তো ঘর ছাড়ল বাণী ভালবেসে সত্যিকারের ঘর বাঁধতে। ওখানের কদর্য ক্লিষ্ট আবহাওয়া থেকে এক মেয়ে দুরন্ত দুঃসাহসে মুক্তি নিল। আনন্দকে ভালবাসে বাণী। তাই তো ওর হাত ধরে ঘর ছাড়তে একটুও ভয় হল না, বরং অনেক ভরসা পেল। এতখানি ভরসা এই পৃথিবীর খুব কম লোকই ওকে দিয়েছে। নাইবা হল আনন্দ বামুনের ছেলে। ওর মধ্যে যা আছে, অনেকেরই তা নেই।

ঘর ছাড়ার পর অনেকগুলো মাস। ঘরের কেউ এসে খোঁজ নিল না। না নিক। চায়ও না বাণী। অভিশাপ দিয়ে অভিমান আঁকড়ে ওরা থাকুক পড়ে। তবু মনটা মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যায় কেন! অভিমানে চোখ দুটোর নীল তারায় জল জমে ওঠে। কত সহজেই এতোদিনের ঘটনাকে এতো তাড়াতাড়ি ভুলে যেতে পারল ওরা। বেশি করে মনে পড়ে ও বাড়ির ভাল যারা, তাদের কথা। সবার আগে বাবা। অদ্ভুত ভাল লোক বাবা। ভালো এতো বলেই এতো কষ্ট পাচ্ছে বাবা। আর মনে পড়ে ছবিকে। অদ্ভু কালো চোখ আর অফুরন্ত কালো চুলে দুরন্ত মেয়েটা। দুর্বার প্রাণ-বন্যায় দুঃসহ। আর কাজল আর টুটুল। আদর আর আবদার ওদের, সবই মেজদি ঘিরে।

কিরে, কেমন আছিস?

ওমা, বড়দা। ঘর থেকে বাইরে এ অবাকই হয়ে গেল বাণী। এ্যাদ্দিন বা বড়দা যে নিজে আসবে এ যেন ভাবতে পারা যায় না।

ভালই। হাসল বাণী মিষ্টি একটু কতক্ষণ এসেছো?

এইতো। হাসল বড়দাও। তারপ নিজের থেকেই কৈফিয়তের সুরে বলে চলল, এই দিক দিয়েই যাচ্ছিলাম ভাবলাম দেখা করে যাই।

আশ্চর্য নরম মনে হচ্ছে আজ বড়দাকে। এতো নরম তো কখনো কোন দিন হয়নি বড়দা। তাইতো বিশ্বাস হচ্ছে না কথাগুলো। এতদিনে এ রাস্তায় বড়দা কি কোনদিনই পা দেয়নি? আজই এলো প্রথম আর আজই প্রথম মনে পড়ল বোনকে?

এ্যাদ্দিন বাদে তোমার দেখা করবার সময় হ'ল বড়দা?

সত্যিই তাইরে। তুই ভাববি, ই করেই তোকে এ্যাদ্দিন এড়িয়ে ছিল তা নয়। এতো কাজ পড়েছে অফিসে সময় এক্কেবারেই নেই। কি করি বল

অন্য কোন কারণে নয়, শুধু ভ বাসার টানেই বোনের সঙ্গে দেখা ক এসেছে বড়দা। এ কথা আর যেই বিশ করুক, বাণী কেমন ক'রে করবে?

এসো না বড়দা, ঘরে এসো।

বড়দাকে ঘরে এনে ফ্যানটা চালি দিল বাণী।

এই ঘরটা তোর বুঝি?

হ্যাঁ।

বেশ তো সাজানো গোছানো ঘর।

আঁচলটা বুকের ওপর জড়া জড়াতে একটু শুধু হাসল বাণী।

দেরি হোক তুমি তো তবু মনে ক এসেছো বড়দা। আর কেউ তো আসে আর কেউ তো এলো না।
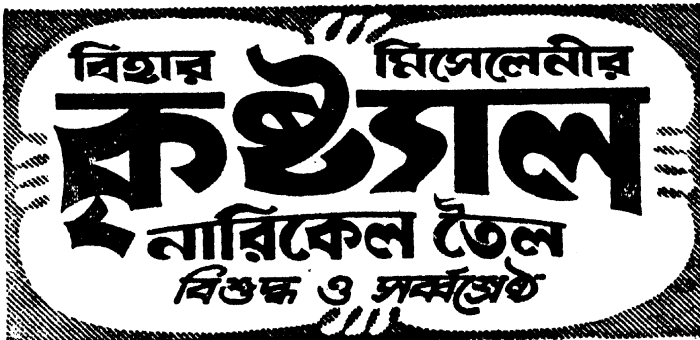
কি জানি। তবে আসবে রে।

কবে আর আসবে। আচ্ছা বড়দা, সবাই ভাল আছে তো?

হুঁ।

বাবা ভাল আছে?

আছে এক রকম।

তোমরা বাবাকে যত্নটত্ন করতো ভাল করে?

তুই নেই বলে, বাবার ঠিকমত আদর-যত্ন হবে না ভাবছিস? তা কেন? ছবি বাবাকে দেখে আর আমরা তো আছিই; বাবার জন্যে তুই মোটেই ভাবিসনি রে।

বড়দা কি ওকে খুশী করবার জন্যেই এইসব বলছে?

বাড়ির সবাই আমার ওপর খুব রেগেছে, না বড়দা?

না না, রাগবে কেন।

সত্যি, রাগেনি কেউ?

তুই কি পাগল হয়েছিস। রাগবে কেন? করেছিসটা কি তুই?

কিছুই করেনি বাণী। বড়দা বলছে এ কথা। সত্যিই এ এক অবাক কান্ড বৈকি। ওর আর আনন্দর মেলামেশায় বড়দাই সবার আগে প্রতিরোধের একগাদা পাঁচিল তুলেছিল, প্রতিবাদের একরাশ ঢেউ ছড়িয়েছিল। আনন্দকে বড়দাই এক-দিন করেছিল অপমান অকথ্য ভাষায়। সেই বড়দা এসব বলছে আজ। অবাক হবে না বাণী? এইতো ক'টা দিন আগে কাজলের মুখে ও বাড়িতে যে কাহিনী শোনা গেল, এতো একেবারেই তার উল্টো। তবে কি মিথ্যেই বলে গেছে ওরা? মিথ্যে নয়, বড়দার চেয়ে কাজলকেই অনেক বেশী বিশ্বাস করবে বাণী।

আনন্দ কই? ওকে তো দেখছি না।

বেরিয়েছে।

ওর কাছে মাফ্ চাইবার দরকার ছিল।

কেন বড়দা?

ওকে কত অপমান করেছি। বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতেও বলেছি। আর তোকেও তো কম গালাগাল দিইনিরে।

ওসব কথা থাক বড়দা।

থাকলে তো চিরকালই থেকে যাবেরে। বলা কোনদিনই হবে না।

নাইবা হ'ল বলা। বলতেই হবে তার কি কোন মানে আছে নাকি?

মানে আছে বৈকি।

কিন্তু এতো ভালো কি ক'রে হয়ে গেল বড়দা? ভীষণ অবাক লাগে বাণীর। এতোদিন যে-বড়দাকে সে চেনে, যে-বড়দাকে সে চিনতো, এতো মোটেই সে নয়। বিনয়ে বিগলিত এ এক আশ্চর্য নরম মানুষ। শুধু নরমই নয়, ক্ষমাও চাইছে বড়দা। এতোদিনের পর হঠাৎ হ'ল কি লোকটার? অনুতাপ, অনু-শোচনা না আর কিছু? তবু সহজে বিশ্বাস করতে আর যাকেই হ'ক, বড়দাকে হবে না কিছুতেই।

ও প্রসঙ্গ এড়িয়ে গেল বাণী। চা-টা কিছু খাবে না বড়দা?

আবার খাওয়া দাওয়া কেন? থাক্ মিছিমিছি কষ্ট করবি।

বারে, এতে কষ্ট আবার কি। হাসল বাণী। বসতো তুমি একটু। আসছি আমি।

খাবার নিয়ে ও ফিরল আবার। খাওয়া শেষ ক'রে উঠে দাঁড়ালো বড়দা যাবার জন্যে।

বাণী শোন। একটু উসখুস ক'রে ডাকল।

কি বড়দা?

ইয়ে, বলছিলুম কি, কিছু টাকা দিতে পারবিরে?

এতক্ষণে ও কাজের কথায় নামল। এইজন্যেই এতক্ষণ আশ্চর্যরকম ভাল হবার ভাণ। এইজন্যেই এতক্ষণ এতো বিনয়ের ভূমিকা। বোকা নয় বাণী। বুঝতে দেরি হবার কথাও নয়। কোনো একটা বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলে, হঠাৎ এতো বদলে যাওয়ার ছেলে বড়দা তো নয়। কি সহজভাবেই বড়দা টাকা চেয়ে বসল। একটুও দ্বিধা হল না, বিবেক একবারও খোঁচা দিল না। অথচ আনন্দর সঙ্গে মেলামেশার জন্যে সেদিন যারা ওদের আনাগোনার পথে পাঁচিল তুলেছিল, আনন্দকে বিয়ে করবার জন্যে যারা বাড়ির মেয়েকে বাড়িতে জায়গা দিতে চায়নি—তাদের দলে বড়দাই তো মুখ্য ভূমিকা নিয়েছিল। আশ্চর্য, বাণী বড়দার জায়গায় হলে কিছুতেই এমনি ক'রে টাকা চাইতে পারত না।

জানিস ত তুই বাড়ির অবস্থা। তোকে আর নতুন ক'রে কি বলব। বড়দা ওর মন ভেজাতে থাকে। এখন আবার টানাটানি আরো বেড়েছে। কিছুতেই কুলিয়ে উঠতে পারছি না।

জানে বাণী। আর জানে বলেই রাগ করতে পারল না। না বলে ফিরিয়ে দিতে পারল না। ঘর ছাড়লেও, ঘরকে ও ভোলেনি। ভোলা কি যায়? ঘরে যারা তাকে জায়গা দিল না, তারা এসেছে তারই ঘরে জায়গা নিতে। তবু বাণী রাগ করতে পারল না। চিৎকার ক'রে কথার হাজারো বিষ ছিটিয়ে সেদিনের অপমানের প্রতিশোধ নিতে পারল না। এতোদিনের ক্ষোভ, বিদ্বেষ আর অভিমান একটুও ভাষা পেল না আগুনের অঙ্গারের। আশ্চর্য সহানুভূতি আর বেদনায় ওরা জল হয়ে গলে গলে ঝরে পড়ল। এতে সবচেয়ে বেশি অবাক হ'ল

আর কেউ নয়, বাণী নিজেই—বাণী নিজেই।

কত টাকা চাই বড়দা?

কত টাকা। প্রশ্নটায় অবাক হ'ল সোমনাথ। বাণীর ঐশ্বর্যের ও যেন স্তিমিত হিসেব পেল। যা ইচ্ছে চাওয়া যায়, যা ইচ্ছে ও দিতে পারে। তবু লোভ ও সামলে নিল। বলল শুধু, দে কিছু।

কিন্তু বড়দাই শুধু নয়, দু'চার দিন পরে মাও এলো। অবাকই লাগে বাণীর। হঠাৎ হ'ল কি ও বাড়ির সকলের? এতোদিন দেখা করা দূরে থাক খোঁজও নেয়নি কেউ। ভুলেও কেউ খোঁজ নেবার দরকার মনে করেনি। এতোদিনের পর হঠাৎ কেন এই অন্তরঙ্গতার হিড়িক? মিটিয়ে দেয়া সম্পর্ক আবার ঝালিয়ে নেবার কেন এই দুরন্ত আগ্রহ?

'বেশ তো চেহারা হয়েছে তোর।' মা হাসলেন। আর হবেই বা না কেন। বড়লোকের বাড়ি, দিব্যি খাচ্ছিস দাচ্ছিস। কিচ্ছুর তো টানাটানি নেই।

হাসি বাণীরও পেল। বড়লোক বলে নয়, মার কথাগুলোর জন্যেই।

বাড়ির সবাই কেমন আছে মা?

আছে এক রকম। আমাদের আর থাকা না-থাকা।

আর বাবা? ও বাড়ির থেকে যে আসে তাকেই বাণী জিজ্ঞেস করে বাবার কথা। বাবার জন্যে মনটা ওর সব সময়েই ব্যাকুল হয়ে থাকে। ও বাড়িতে সত্যিকারের ভালো লোক ওই একজনই আছে। এই স্বার্থ আর হিসেবের পৃথিবীতে আশ্চর্য ভালো লোক।

তোর বাপও আছে কোনরকমে।

আমার কথা মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করে তো বাবা?

তা আর করবে না? তোর কথা কে না জিজ্ঞেস করে। তুই বাড়ি থেকে সেই যে গেলি, কি আর বলব তোকে, বাড়ির সব জলুস গেল।

শুনতে ভারি মজা লাগছে বাণীর। ও ছিল বাড়ির জলুস। আশ্চর্যই বটে। মা কি মুখে ক'রে মধু নিয়ে এসেছে?

আমি যেতে তোমরা তো খুশীই হয়েছো মা। মনে মনে বলেছ, যাক পাপ বিদেয় হয়েছে। নয় কি?

তুই? মা সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল। এ তোর রাগের কথারে। তোকে পাপ মনে করব।

সত্যিই তোমরা আমার ওপর রাগ করনি কি?

রাগ করব কেন? ক্ষেপেছিস।

ক্ষেপেনি বাণী। ক্ষেপে যদি থাকে, তো ওরাই। বড়দাও সেদিন তাই ব'লে গেল, মাও সেই কথাই বলছে। কিন্তু কাজল আর টুটুলের কাহিনী তো আলাদাই। ওদের এতদিনের রাগ হঠাৎ এই দু'চার দিনেই গলে জল হয়ে গেল নাকি?

আর যদি রাগ করেই থাকি, তা কি এতদিন পুষে রাখতে হবে। আর রাগ যদি করেই থাকি, তাই বলে তুইও কি রাগ করে বাড়িতে আসা-যাওয়া বন্ধ করে দিবি? পাগলি।

কথা কিছু বলতে পারল না বাণী। বোবা হয়ে গেছে। এ যেন অন্য মানুষ, এ যেন অন্য মা।

হ্যাঁরে, তোর শ্বশুরেরা তো বেশ বড়লোক দেখছি। আনন্দও তো বেশ ভালো উপায় করছে। কিছু টাকাকড়ি দে না।

টাকাকড়ি?

হ্যাঁ। জানিস তো তুই সংসারের অবস্থা। ওই তো তোর বাপের আয়। ওতে কি আর অতো বড় গুষ্ঠি চলে? জানিসই তো তোর বড় ভাই দুটো ধম্মের ষাঁড় হয়েছে। এক পয়সা উপায় করবার মুরোদ নেই, শুধু বাড়ি বসে বসে গিলবে।

জানে বাণী সবই। মা আর নতুন ক'রে জানাবে কি। তবু মাকে তো জানাতেই হবে, কারণ মা যে আজ মেয়ের কাছে হাত পাততে এসেছে। মন না ভেজালে যে কাজ হবে না।

পরশু বড়দা এসেছিল। বাণী জানাল।

এসেছিল নাকি? মার চঞ্চলতা ওর চোখ এড়াল না। কই, আমাকে তো বলেনি কিছু।

বলতে ভুলে গেছে বোধ হয়।

তাই হবে। হ্যাঁরে, কেন এসেছিল ও? এমনিই দেখা করতে। বললে, অনেকদিন দেখা হয়নি। তাই এলাম। কোথায় যেন চাকরি করে বড়দা, কাজ এতো বেড়েছে যে আসবার সময়ই পায় না।

এইসব বলেছে বুঝি হতভাগা? সব মিথ্যে কথা। চাকরি করে, না হাতি। একটা পয়সাও তো আসতে দেখি না। তা, টাকাকড়ি কিছু চাইল নাকি?

একটু ইতস্তত ক'রে বাণী বললে, না।

খবর পেয়েছে তুই এখন বড়লোক হয়েছিস, খুব টাকা হয়েছে—এখন দেখবি ঘন ঘন আসবে, মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে তোর মন ভেজাবে। তারপর একদিন টাকা চেয়ে বসবে। খবরদার দিবি না। ও টাকা কি সংসারের কাজে আসবে ভেবেছিস? ও হতভাগা নিজেই সব লুটেপুটে খাবে।

কিছু বলল না; চুপ করেই বাণী রইল। ও জানে, মা যা বলছে তা মিথ্যে নয়। বড়দাকে চেনে না কে? সেদিনের সেই টাকা সংসারের অভাবের কাঁদুনি গেয়ে নিজের খরচের জন্যেই বড়দা নিয়েছে। কিন্তু মা যে এসেছে আজ, সে তো ভালবাসার টানে নয়। বড়লোক মেয়ের কাছে কিছু টাকা বাগাবার জন্যেই এতো ভালমানুষ সেজে এসেছে। তবে মা বড়দার মধ্যে তফাৎটা খুব বেশী কোথায়? মা বললেন, কিরে, কিছু দিবিনিরে?

তারপর একদিন এলো ছবি। কাজল আর টুটুলকে সঙ্গে ক'রে এলো। ওর আসার পথের আশা নিয়ে ক'দিন থেকে তাকিয়ে থাকতো বাণী। সবাই এলো ওই মেয়েটাই এলো না শুধু। তবু ওর তো সবার আগে আসা উচিত। না ডাকতেই আসা উচিত। ও বাড়ির জঞ্জালে ও তো এক আশ্চর্য ফোটা গোলাপ।

আয়। বুকে জড়িয়েই ধরল ওকে বাণী। ব্যাপার তোর কি বলতো? ভুলে গেছিস নাকি আমাকে একেবারেই?

পাগল।

কিন্তু এই বুঝি তোর মনে রাখার নমুনা। একদিনও আসতে পারলি না। বাড়ির আর সবাই না হয় রাগ করে।

সোনি, কিন্তু তোর ব্যাপার কি শুনি? সিসনি কেনরে এ্যাদ্দিন?

এমনিই।

ওটা কোনো জবাবই নয়।

হেসে ফেলল ছবি। রাতদিন হাসে য়েটা। আর ভারি মিষ্টি হাসে।

সত্যিরে মেজদি। তোর ওপর একটুও নি রাগ করিনি। বিশ্বাস কর। না লই কি রাগ করা হ'ল।

তবে আজই বা এলি কেন?

তুই নাকি বলেছিস, দেখা না করতে ল আর কোনদিন আমার মুখ দেখবি । সত্যি নাকিরে?

সত্যিই তো। সেই ভয়েই বুঝি দেখা তে এসেছিসরে?

আবার চুপ ক'রে গেল বাণী।

কিন্তু আমাকে তোর ভয়টা সেরে? আমি মুখ না দেখলে, তোর তো ক্ষতিই তো হবে না। আমি ও র কেউ নই। আমি বংশের মান-মান নষ্ট করেছি। তাইতো তোরা মায় অপমান করে তাড়িয়ে দিলি।

এই মেজদি, কি সব বাজে বকছিস। কর না। হাত দিয়ে ওর ঠোঁট দুটোকে প ধরল ছবি।

আ, এই ছাড়। লাগছে যে।

আগে বল, ওসব যা তা কথা আর লি না।

আচ্ছা আচ্ছা। হেসে জানাল বাণী। পর, কেমন আছিস?

ভালই।

ভারি মিথ্যুক হয়েছিস দেখছি আজ-। কাজল আর টুটুল সব বলেছে য়ায়। ও বাড়িতে কেউ কি ভাল তে পারে নাকি। আবার বোবা হয়ে নার পালা ছবির। ও শাড়ির আঁচল-জড়াতে থাকে আঙ্গুলে।

বাড়ির আর সবাই ভাল আছেতো রে?

ভাল না হাতি। আরো বিশ্রী হয়ে ছ বাড়িটারে। বড়দা মেজদার রাতদিন ড়া আর মারামারি। টাকাকড়ি নিয়ে সঙ্গে বাবার খিটিমিটি বেড়েই ছে। কিন্তু বাবা আর কত করবে। সত্যিই, বাবা আর কত করবে। বড়দা দার চাকরি করা উচিত। করে তো চাকরি। যায়ও তো কোথায় দেখি। কিন্তু বাড়িতে তো এক পয়সাও আসতে দেখি না। যা পায়, নিজেরাই খরচা করে আর কি।

বাবার শরীর কেমনরে?

আছে এক রকম।

হ্যাঁরে, আমার নাম কেউ ক'রে কী?

কেউ না।

বাবাও না?

বাবা কিন্তু মাঝে মাঝে বলে। কাউকে নয়, আমাকেই বলে শুধু। একদিন বাবা কি বলছিল জানিস? বলছিল, সত্যিই যারা ভাল, তারা এ বাড়িতে থাকতে পারবে নারে। তাইতো বানু আমার চলে গেল।

হঠাৎ চোখ দুটো জলে ভরে এলো বাণীর। কোত্থেকে এই জলগুলো আসে। কেন যে আসে।

কিন্তু জানিস্ মেজদি, যেদিন কাজল আর টুটুল তোর ওখানে বেড়িয়ে আসার গপ্প করলো, তুই যে কত বড়লোক হয়েছিস তার বর্ণনা দিলো, সেদিন সবাইয়ের মুখ-চোখের চেহারার আশ্চর্য বদল দেখলাম। খুশীর চেয়ে সবাই অবাকই হ'ল বেশী। শুধু খুশী হ'ল একমাত্র বাবাই। কাজলকে আলাদা ডেকে কত কি জিজ্ঞেস করল।

কাজল সায় দিল, হ্যাঁরে মেজদি। তোর কথা কত কি জিজ্ঞেস করল। কেমন আছিস, আগের মত না মোটা হয়েছিস, এইসব। আরো জিজ্ঞেস করল, বাড়ির কার কার কথা তুই বলেছিস, আমাদের আদর যত্ন করেছিস কিনা।

বাণী চুপ ক'রে শুনে গেল সব। কিছু মন্তব্য করল না। একটু পরে বলল, বড়দা একদিন এসছিল। মাও একদিন।

অবাক হ'ল ছবি। তাই নাকি? কই, কেউ তো কিছু বলেনি।

ভুলে গেছে বোধ হয়।

ভুলে গেছে, না হাতি। তা কি বললেরে ওরা?

বললে, আমার মতো ভালো মেয়ে পৃথিবীতে বড় একটা হয় না। আমার ওপর কেউ রাগ করেনি। আমি নাকি কিচ্ছু অন্যায়ই করিনি। এইসব।

সব বাজে কথা। তুই যে বড়-মানুষ হয়েছিস, আগে তো এতটা কেউ জানত না। জানতে পেরেই হ্যাংলার মত ছুটে এসেছে। তোর অনেক টাকা হয়েছে কিনা, তাই অমনি তুই রাতারাতি ভাল হয়ে গেলি। সত্যি কি সেল্‌ফিস্ ওরা। বড়দা শুধু সেল্‌ফিসই নয়, বদমাসও। তুই সব বিশ্বাস করলি মেজদি?

বিশ্বাস তো করিনি। তবু শুনে গেলাম সব। তবু রাগ করতে পারলাম না। বাড়ি থেকে তাড়িয়েও দিতে পারলাম না।

কিন্তু ওরাই তো একদিন তোকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।

মৃদু হাসল বাণী। সেইজন্যেই আরো তাড়িয়ে দিতে পারলাম না। মনে হ'ল, এতে প্রতিশোধই নেওয়া হবে শুধু, আর কিছু নয়। বড়দা আর মা দুজনেই সংসারের অভাবের কথা বিনিয়ে বিনিয়ে শুনিয়ে টাকা চাইল।

দিলি টাকা?

দিলাম। কেন যে দিলাম, কে জানে। ওরা মিথ্যে হতে পারে, ওদের চাওয়াও হয়তো মিথ্যে, কিন্তু এটা তো ঠিক যে সংসারের অভাবের কথা মিথ্যে নয়।

তুই বড় ভালো রে মেজদি। তাই তো এতো কষ্ট পাস, তাই তো সবাই তোকে সহজেই ঠকায়।

হাসল বাণী। কে আবার ঠকালে রে?

মা বড়দাই। এখানে তোর কাছে মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে টাকা নিয়ে যাবে, আর বাড়ি গিয়ে তোর নামে যত নিন্দে করবে। অন্য জাতের ছেলের সঙ্গে বিয়ে ক'রে তুই বংশের নাম ডুবিয়েছিস। তোর মুখ দেখতে নেই। আরো কত কি।

হাসিটাকে বাণী টেনে চলে। বলুক রে বলুক। তুই তো জানিস, কত চেষ্টা করি, কিন্তু রাগ আমি কিছুতেই করতে পারি না। আর করলেও বেশীক্ষণ রাগতে পারি না।

কাজল তাড়া দিল, এবার বাড়ি চল রে ছোড়দি। অনেকক্ষণ হয়েছে।

হ্যাঁ চল।

বাণী ছবিকে আর একবার বুকে টেনে নিল। কাজল আর টুটুলের গাল টিপে আবার আদর করল।

আবার আসিস।

হ্যাঁরে হ্যাঁ, আসব।

বাবাকে একদিন আনিস না রে।

ভারি দেখতে ইচ্ছে ক'রে। কদ্দিন যে দেখিনি।

সবাই এলো, সবাই আসে। কিন্তু বাবা একদিনও এলো না। বাবার জন্যেই বড্ড মন কেমন করে বাণীর। ও বাড়িতে ওই একজন মানুষই আছে, আশ্চর্য ভালো, আশ্চর্য শান্ত। সব্বাইকেই জিজ্ঞেস করে বাণী বাবার কথা, আনতে বলে বাবাকে। আসতে বলে বাবাকে। তবুও তো এলো না বাবা। সত্যিই কেউ কি বাবাকে বাণীর কথা বলে না, বাণীর ডাক শোনায় না? মা আসে, বড়দা আসে। মেজদাও। ওদের তো চায় না বাণী। ওরা তো কেউ ভালবেসে আসে না, ওরা আসে টাকার লোভে। ওরা মন থেকে মিষ্টি কথা বলতে আসে না, ওরা আসে মিষ্টি কথার অভিনয় করতে। ওদের ওপর তবু রাগ হয় না বাণীর, জমে না আক্রোশ একটুও। দুঃখই হয়, বেদনাই জাগে। বাণী বড়লোক না হ'লে মা আর দাদাদের আসার এতো ঘনঘটা পড়ত না এতদিনের পর হঠাৎ। তখন আসত শুধু কাজল আর টুটুল। আসত ছবি।। এদের ভালবাসা সত্যিকারের। ওখানে এখনো স্বার্থের বিষাক্ত বিষ ছড়িয়ে পড়েনি। আর আসত বাবা। ওইসব মিথ্যে মানুষদের দলে বাবা নেই। বাবার মত মানুষদের দলই আলাদা। পৃথিবী থেকে ওদের দল দিন দিন কমে আসছে। কিন্তু তবু তো বাবা একদিনও এলো না।

এক অবসন্ন বিকেলে অবাক হয়ে গেল বাণী। তারপর একগাদা দুরন্ত খুশী ঝিকমিকিয়ে উঠল। বাবা এসেছে।

কেমন যেন রোগা হয়ে গেছে বাবা। এ ক'টা মাসেই কত যেন বয়েস বেড়ে গেছে মনে হচ্ছে। বাবার এই চেহারা দেখে বুকটা বেদনায় টনটনিয়ে উঠল ওর।

কেমন আছো বাবা? বাপের কাছে ঘেঁষে দাঁড়াল বাণী।

ভালই।

ভাল না হাতি। এই বুঝি ভাল থাকার নমুনা।

কেনরে? হয়েছেটা কি।

কি বিশ্রী চেহারা হয়ে গেছে তোমার। কত রোগা হয়ে গেছ।

চেহারা আর কতদিন ভালো থাকবে বল? বয়েস কি কম হল। মৃদু হাসলেন।

ওসব বাজে কথা শুনতে চাই না। ভারি তো বয়েস হয়েছে তোমার। কেউ বুঝি তোমাকে যত্ন করে না বাবা?

না না, করে তো। সবাই করে।

ঘোড়ার ডিম করে। আমি সব জানি। টুটুল আর কাজল সব বলেছে আমায়। ছবিকে আমি বলে দিয়েছি বাবা। ও এবার থেকে তোমার দেখাশোনা করবে।

ম্লান হাসলেন শিবনাথ। জবাব দেবার কিছু নেই বলেই হয়তো।

আচ্ছা বাবা, সবাই এলো তুমি তো একদিনও এলে না। আমার ওপর রাগ বুঝি তোমার এখনো যায়নি?

সবাই আসে বলেই আমি আসি নারে।

কেন বাবা?

ওরা আসে শুধু নিতেই। যারা কোনদিন কিছু তোকে দিল না—দিতে চাইল না, দিতে পারল না।

চুপ ক'রে রইল বাণী।

শিবনাথ লুকোনো একটা প্যাকেট বার করলেন। এই নে।

কি বাবা?

দেখতো খুলে।

তাড়াতাড়ি খুলে ফেলল বাণী প্যাকেটটা। সবুজ রঙের নরম একটা ফিনফিনে শাড়ি।

এ কার জন্যে বাবা?

তোরই জন্যেরে। সবুজ রং তোর তো ভারি পছন্দ, নারে?

হ্যাঁ। কত দাম নিল বাবা?

বারো টাকা ক' আনা দাম নিল যে।

এতো দাম দিয়ে মিছিমিছি কিনলে কেন? কি দরকার ছিল?

তোকে কোনদিন কিছুই দিইনিরে। বিয়েতেও কিছু দিতে পারলাম না। তাইতো কিনে আনলাম শাড়িটা।

কিন্তু আমি তো চাইনি কিছুই।

জানি। চাইতে তুই পারিস না, চাইতে তুই জানিস না। মেয়েমানুষের এ মস্ত বড় গুণরে। কিন্তু চায় না বলেই সে কি পাবে না কিছু? কেউ তাকে কিছুই দেবে না?

তুমি একটু দাঁড়াও বাবা।

শাড়িটা নিয়ে পাশের ঘরে গেল বাণী। বাবার দেয়া শাড়িটা পরে আবা[র] ফিরে এলো বাবার কাছে। ঘরে ঢুকে[ই] প্রণাম করল একটা।

কিরে, কি ব্যাপার?

এমনি। কতদিন তোমায় প্রণা[ম] করিনি।

ও। হাসলেন শিবনাথ। বুকে জড়িয়[ে] ধরলেন মেয়েকে।

ওর নীল চোখ দুটোর কোণে চিকচিক করছে জল।

একি, কাঁদছিস কেনরে? কি হয়েছে?

বারে, কি আবার হবে। হেসে ফেলল বাণী। মানুষ কি শুধু দুঃখতেই কাঁদে বাবা? খুব খুশী হলেও তো চোখ দিয়ে জল বেরোয়।

ঠিক। ঠিকই তো। ঘাড় নাড়লেন শিবনাথ। আচ্ছা, এবার চলিরে।

আবার আসবে তো?

নিশ্চয়ই। আসব বৈকি।

আসবে না হাতি। কত ডাকাডাকির পর তবে তুমি এলে। ভারি তুমি মিথ্যে বল বাবা।

দুরন্ত অভিমান হয়েছে মেয়েটার। শিবনাথ মৃদু হেসে ওর মাথার কালো চুলগুলোতে হাত বুলিয়ে দিলেন।

বাণী আবার ডাকল, বাবা।

কিরে?

একটু দাঁড়াও না।

দাঁড়ালেন শিবনাথ। বাক্স খুলে অনেকগুলো টাকার নোট ও বার করে আনল।

এই টাকাগুলো তুমি নাও।

কেনরে? এ টাকা কি হবে?

বারে, টাকার তো তোমার খুব দরকার বাবা।

টাকার দরকার? নাতো। কে বললে? পাগল।

হেসে হেসে এগিয়ে গেলেন শিবনাথ। অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল বাণী অনেকক্ষণ। মিথ্যে বলে গেল বাবা। মা আর দাদারা তো রোজই মিথ্যে বলে যায়। তবু দুটো মিথ্যের মধ্যে কত তফাৎ। বাবার দেয়া শাড়িটা খুলে ফেলল বাণী। আস্তে আস্তে ভাঁজ ক'রে রাখল। তারপর দু হাতে শাড়িটাকে বুকে চেপে ধরে অনেকক্ষণ কাঁদল।

উড়িষ্যার পুঁথির পাটা চিত্রণ

প্রভাতকুমার দত্ত

আজকালকার দিনে মুদ্রণ প্রথার অভূতপূর্ব উন্নতির দরুণ বইএর লাটের অনবদ্য সজ্জা চোখে পড়ে। মান বইএর বাজারের কথা ধরলে আজ-ন প্রকাশকেরা বিষয়বস্তুর তুলনায় দেহের বইএর প্রচ্ছদপট সুন্দর করে লার প্রতি বেশী নজর দেন। সত্যি বলতে কি প্রচ্ছদপটগুলি প্রায় ক্ষেত্রেই লোভনীয় হয় যে অনেক সময় ভিতরে আছে না দেখেই বই কিনতে ইচ্ছে করে। বশ্য বইএর প্রচ্ছদপটকে সুন্দর করে লার যে রীতি তাকে একেবারে আধুনিক ন করলে ভুল করা হবে। মুদ্রাযন্ত্র বিষ্কারের আগে যখন হাতে লেখা থির প্রচলন ছিল তখনও প্রচ্ছদপটকে নাভাবে মনোরম করে তোলার প্রচেষ্টা করা যেত। অবশ্য তা করা হোত আর তুলির সাহায্যে, যন্ত্র দিয়ে নয়। থির মলাটকে ছবি এঁকে সজ্জিত ার রীতিকেই পুঁথির পাটা চিত্রণ বলা য় থাকে। পাটা কথাটা ব্যবহৃত হয় জন্যে যে তখনকার পুঁথির মলাটগুলি ছিল কাঠের তৈরী। দুপাশে দুই পাটা এবং মাঝখানে পুঁথি যা সহজেই সুতো জড়িয়ে বেঁধে রাখা যায়। এই পদ্ধতিতে পুঁথির স্থায়িত্ব সম্পর্কেও নিশ্চিন্ত হওয়া চলে। সমগ্র পুঁথিটি হাতে লিখতে হতো বলে লিপিকারেরা পুঁথির মধ্যে বিশেষ চিত্র সংযোজন করতে পারতেন না। ফলে শুধু পুঁথির পাটাটিকে যতটা সম্ভব সুন্দর করে চিত্রশোভিত করা হোত। আর এই সমস্ত পাটা চিত্রণগুলি আজকাল যন্ত্রের সাহায্যে ছাপা বইএর মলাটের তুলনায় অনেকাংশে সার্থক শিল্পসৃষ্টি ছিল।

বাঙলাদেশের মত উড়িষ্যাতেও পুঁথির পাটা চিত্রণ অদ্ভুত সার্থকতা অর্জন করে। 'দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রচেষ্টার দরুণ বাঙলার চমৎকার পাটা চিত্রণগুলির সঙ্গে আজ আমরা পরিচিত; উড়িষ্যার পাটার কাজগুলি সম্পূর্ণ সংগৃহীত না হলেও যে দু'একটি নিদর্শন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়মে সংরক্ষিত আছে তা উন্নত দক্ষতার পরিচয় বহন করে। উড়িষ্যাতে অবশ্য রঙ দিয়ে আঁকা এবং কাঠের উপর খোদাই করা দুই ধরনেরই পাটা চিত্রণ লক্ষ্য করা যায়। তবে রঙীন পাটার প্রচলন বেশী। অঙ্কিত পাটা যেমন তেমনি খোদিত পাটাগুলিও নিজস্ব সৌন্দর্যে উজ্জ্বল। এ ধরনের পাটা সাধারনত প্যানেলের আকারে অর্থাৎ পাশাপাশি সজ্জিত মূর্তির পরিকল্পনার ভিত্তিতে সম্পন্ন করা হয়। খোদাই করা পাটায় প্রধানত মূর্তির সজ্জা থাকে দৃশ্যের অবতারণা এখানে করা হয় না। কাজ-গুলির রেখানির্ভর বলিষ্ঠ ভংগী, ছন্দো-

বদ্ধতা এবং সমগ্র পরিকল্পনার মধ্যে একটা সমতার ভাব মনকে সহজেই আকর্ষণ করে। সমস্ত পুঁথির পাটাতেই যে অঙ্কন-কাজ করা হয় তা মোটেই নয়। পুঁথি নানা ধরনের হয়। কোনটাতে ঔষধপত্রাদির দেশজ রীতির বর্ণনা থাকে; কোনটাতে জ্যোতির্বিদ্যা নিয়ে আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। এই সমস্ত পুঁথিতে সচরাচর কোন অঙ্কন কাজ থাকে না। বিভিন্ন পুঁথির মধ্যে বৈষ্ণব ধর্মসংক্রান্ত পুঁথিগুলি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। একথা বাঙলার ক্ষেত্রে যেমন সত্য উড়িষ্যার ক্ষেত্রে তেমনই। কারণ মহাপ্রভুর সুদীর্ঘকালের উপস্থিতির জন্য উড়িষ্যাতে বৈষ্ণব ভাব-ধারা ব্যাপকভাবে বিস্তৃত হয়। বৈষ্ণবধর্ম সংক্রান্ত পুঁথিতে প্রধানত রাধা-কৃষ্ণের লীলা-কাহিনীর বর্ণনা চোখে পড়ে। আমরা সকলেই জানি রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী ভারতীয় শিল্পীদের বিভিন্ন যুগে মহিম-ময় শিল্পসৃষ্টির সুযোগ যুগিয়েছে। এই কাহিনীর মাধুর্যই এমন যে এখানে শিল্পীরা তাঁদের প্রতিভা বিকাশের অফুরন্ত সুযোগ পেয়েছেন। কাজেই উড়িষ্যার লোকশিল্পীরা রাধা-কৃষ্ণ সংক্রান্ত পুঁথিগুলিকেই কেবলমাত্র অঙ্কনকার্যের দ্বারা শ্রীমণ্ডিত করেছেন। এখানে আরেকটা কথা বলা দরকার যাঁরা পুঁথির লিপিকার আর যাঁরা পাটার চিত্রকর তাঁরা এক লোক নন। বাংলাদেশে সূত্রধর অর্থাৎ কাঠের কাজ যাঁরা করেন তাঁরাই একাজ করে থাকেন। উড়িষ্যাতেও মোটামুটি এ জিনিস লক্ষ্য করা যায়। এই যে কার্য-বিভাগ এবং বৃত্তি হিসাবে পারদর্শিতা এ জিনিসটা শুধু পুঁথির বেলা নয় লোক-শিল্পের সমগ্র ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায়। এই কার্যবিভাগ ছিল বলেই লোকশিল্প এত মনোমুগ্ধকর।

আলোচ্য প্রবন্ধের সঙ্গে উড়িষ্যার পুঁথির পাটার একটি বিশিষ্ট নিদর্শন ছাপা হলো। এটি রাধা-কৃষ্ণ সংক্রান্ত এক পুঁথির পাটা। উড়িষ্যার লোক-চিত্রকলার সবগুলি মূল বৈশিষ্ট্যই এর মধ্যে প্রকাশিত। উড়িষ্যার চিত্রপদ্ধতি প্রধানত রেখানির্ভর। মডেলিং জিনিসটার স্থান এখানে গৌণ। এই কারণে মূর্তি-গুলির প্রত্যেকটাই অদ্ভুত সজীব ও গতি-চঞ্চল। এ ছাড়া মুখগুলিও নিজস্ব ব্যক্তিত্বসম্পন্ন। নিখুঁত অলঙ্করণের কাজ ও মজ্জাগত মাধুর্যও এখানে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। আর উড়িষ্যার রঙ ব্যবহারের বিশিষ্ট রীতি থাকায় অলঙ্করণ ও সজ্জা আরও ঐশ্বর্যময় রূপ ধারণ করেছে। উড়িষ্যায় সাধারণত লাল, হলদে, সবুজ, বেগুনি এবং কমলালেবুর রঙ ব্যবহার করা হয়। মূর্তির গায়ের রঙ হলদে হয়ে থাকে। চিত্রের আউটলাইন কালো রঙে করা হয় এবং সমগ্র চিত্রপরিকল্পনার গুণ বাড়ানোর জন্য লাল রঙ ব্যবহৃত হয়। উড়িষ্যার চিত্রপদ্ধতিতে বিশেষ করে পট ও পাটায় আমরা হিন্দুযুগের মিউরাল অর্থাৎ দেয়ালচিত্র এবং মুসলমান যুগের মিনিয়েচার পদ্ধতির এক সুষ্ঠু মিশ্রণ লক্ষ্য করি। ছবির চ্যাপ্টা গড়ন এবং খুঁটিনাটি অলঙ্করণের কাজের সংমিশ্রণ তারই প্রমাণ। উড়িষ্যার লোকচিত্রকলার যে বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা উল্লেখ করলাম তা প্রবন্ধের সঙ্গে প্রকাশিত 'কৃষ্ণ ও গোপী' চিত্রটিতে সহজেই খুঁজে পাওয়া যায়। মোট কথা উড়িষ্যা কেবল তার স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের জন্য প্রসিদ্ধ নয় পুঁথির পাটার মত অনবদ্য কাজগুলিও উড়িষ্যার শিল্পকলাকে আমাদের কাছে আদরণীয় করে তুলেছে। পুঁথির যুগ অতিক্রান্ত হয়ে আজ আমরা মুদ্রাযন্ত্রের ছাপা বইএর যুগে বাস করছি। কিন্তু তা হলেও পুঁথির এই সার্থক পাটা চিত্রণ অতীত যুগ থেকে পাওয়া আমাদের এক বিশিষ্ট সম্পদ।

৩৬

খুব মুশকিলে পড়ল সেদিন রুচি ময়নাকে নিয়ে। বাড়িতে তবু -হোক কেঁদেছে, বাপের ধমক খেয়ে নার চুপ করেছে। রাস্তায় বেরিয়ে নার কান্না থামতে চায় না।

েশ বড় মেয়ে। রুচির স্কুলে এই সের মেয়েরা স্কুল-ফাইন্যাল পরীক্ষার ো তৈরি হচ্ছে। প্রবর্ধমান জীবনের ণ্যে ভরপুর প্রায় ষোল বছরের একটি রের হাতে লাল মলাটের বর্ণবোধ আর কটা ভাঙ্গা শ্লেট যেমন বিসদৃশ কাছিল তেমনি ওর অবুঝ অশ্রান্ত া। খেলনা হারিয়ে শিশু যেমন দে। ব্যাপার কি?

রুচি প্রথমটায় কিছু বলল না।

বাস্-এ উঠে সুরো ফার্স্ট লেনের িত্রী চ্যাটার্জির সঙ্গে দেখা হয়ে ওয়ায় রুচি তার সঙ্গেই বেশি কথা াছিল। আর একজন টিচার। হাওড়ার ানো মেয়ে স্কুলের। রোজ এ পথে তে ফিরতে এই অঞ্চলের দু'চারজন ক্ষয়িত্রীর সঙ্গে রুচির পরিচয় হয়েছে। িত্রী একজন। অবশ্য দেখা হলে যে ব গুরুত্বপূর্ণ কথা হয় তাদের সঙ্গে ন না। বরং একই ধরনের প্রশ্ন, এক ষয় নিয়ে আলোচনা, যেমন : সাড়ে শটা বেজে গেছে? না আরো তিন িনিট বাকি। বাব্বাঃ কী ভিড় আজ স্-এ দেখছেন! পরশু যেন কিসের টি? পাব্লিক হলিডে তো? কি রান্না রলেন আজকে? কপির ডালনা কাঁচা গ ডাল। না মাছ আর সস্তা হবে না। াপনাদের ওধারটায় অসুখ-বিসুখ েছে কি? কমছে বাড়ছে কিছু বোঝা াচ্ছে না। রেশনিং উঠে যাচ্ছে কি? উঠলে বাঁচি। কি আজ আবার মুখ ভার কেন আপনার, কর্তার সঙ্গে রাগারাগি হয়েছে বুঝি? যতদিন না নিমতলায় যাচ্ছি রাগারাগি বন্ধ হবে না আমাদের মত লোকের সংসারে। অঢেল থাকতো। নাকে-মুখে গুঁজে দশটায় বেরিয়ে মেয়ে ঠেঙ্গাতে যেতে না হ'ত। ঘরে থেকে এটা-ওটা রান্না করে ধুয়ে-মুছে বিছানা-পাটি পরিষ্কার রেখে ছেলেমেয়েকে আদর করে কর্তার ঘরে ফেরা তক সংসার আগলে রাখতে পারতাম তো স্বামীর মেজাজ ভাল থাকত। এখন হয়েছে তার উল্টো। কাজেই ঝগড়া। আপনার বুঝি ওই একটি মেয়ে? আপনার? দুটি। আবার কবে?—রক্ষা করুন মহাশয়। ছটকুর পর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে অপারেশন করিয়ে ফেলেছি আপদ যাক্। আপনার হেলথ এফেক্ট করেনি? এখন পর্যন্ত তো দেখছি না হি-হি। আপনি?—কি করবেন ঠিক করলেন? সাহস পাচ্ছেন না। ছটকুর সময় এক দুধের পিছনে আমাকে পনর-বিশ টাকা হাতে ধরে গয়লাকে মাস মাস দিতে হয়েছিল। উঃ কী যে লাগত মিসেস রায়—মনে হত আমার এত কষ্ট ক'রে রোজগার করা টাকা জলে ফেলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, তবে কি বলবেন মেয়েকে উপোস রেখে মেরে ফেলতে চেয়েছিলাম। না তা করব কেন। ইচ্ছা হ'ত তিন পো'র জায়গায় দু' সের দুধ খাওয়াই রোজ। বলুন কোন্ মার এই ইচ্ছা না। হ্যাঁ, আগে পারত, তাদের বুকেও তখন দুধ জিনিসটার অভাব ছিল না। আজ বলুন মিসেস রায়, আমার আপনার বুকে ক' ছটাক দুধ থাকে। বেলা ন'টায় কাঁচা মুগ ডাল আর ভাত খেয়ে সারাদিন আড়াই শ' মেয়েকে তৈমুরলঙের বাবার জীবনী শিখিয়ে লসাগু গসাগু কষিয়ে বাড়ি গিয়ে সেই দু'খানা ঠাণ্ডা রুটি আর একটু বেগুন পালং খেয়ে যাদের দুধ শুকিয়ে গেছে তারা, তাদের অপারেশন করে রিস্ক্ দূর করা ছাড়া উপায় কি?

'উপায় কি।' গম্ভীর অস্পষ্ট ভঙ্গিতে রুচি হাওড়ার স্কুলের টিচার সাবিত্রী চ্যাটার্জির দিকে তাকিয়ে হাসল। তার সেই হাসি মিলিয়ে যেতে না যেতে আর একটা স্টপেজে ওঠে ইলা সেন। শুকনো শাদা কব্জিতে একটা কালো ব্যান্ড পরা ঘড়ি। চোখে রোদ ঠেকাবার কালো চশমা। 'কটা বাজলো, কটা বাজে মিসেস রায়।'

রুচির হাতঘড়ি তেল মাখাতে দোকানে দিয়ে রাখা হয়েছে। পয়সার অভাবে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে না।

সাবিত্রী চ্যাটার্জি তৎক্ষণাৎ নিজের কব্জির দিকে তাকিয়ে বলল, 'দশটা পনেরো মিস সেন।'

ইলা সেন একটু অনুকম্পার চোখে রুচির দিকে তাকাল। কাজেই সেদিনকার মত বৌবাজারের স্কুলের ইলা সেনের সঙ্গে রুচি আর কথাই বলতে পারল না। কিন্তু আলাপ থেমে থাকে না। 'আপনার স্বাস্থ্য কিন্তু এখনি ভেঙ্গে পড়ছে মিস সেন।'

'স্বাস্থ্য দিয়ে কি হবে?' ইলা সেন কচিপাতারং এক টুকরো রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। চোখের কালো ঠুলিটা সরালো। 'বাঃ বিয়ে-টিয়ে করবেন না? এইভাবে কাটবে জীবন?'

'বিয়ে করে কি হবে?' ইলা সেন ঠোঁট বাঁকা করল। এ-দেশে ইস্কুলের মাস্টারি করে মেয়েদের বিয়ে? তারপর সিঁকি দু'আনি হতে থাকবে? রক্ষা করুন মহাশয়।' রোগা পাংশুটে গালটাকে আর একটু ভেঙ্গে ইলা সেন রুচির পাশে বসা মঞ্জু সহ রুচির দিকে তাকিয়ে এমন কুৎসিতভাবে হাসল যে, রুচি সেদিকে তাকাতে সাহস পেল না। এক গাদা পুরুষের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে ইলা রড ধরে ঝুলছিল আর হাসছিল আর বাসের ঝাঁকুনিতে তার হাসি খানখান

হয়ে ভেঙে কাচের টুকরোর মত চার-ধারে ছড়িয়ে পড়ছিল। 'আপনি আমার চেয়েও চালাক। আমার চেয়েও সেয়ানা। আমি এখন ঠেকে শিখে সিকি দু'আনির রাস্তা বন্ধ করেছি। আপনি দেখছি—'

রুচির কপাল ভাল। সাবিত্রী চ্যাটার্জি'র কথা শেষ হবার আগে বাস স্টপেজে এসে দাঁড়ায়। শেয়ালদা। এই ধরনের আলোচনাটা বাড়তে বাড়তে অধিকাংশ দিনই এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছয় যে রুচির দু' কান গরম হয়ে ওঠে তখন। চুপ করে থাকে। চুপ থেকে অত্যন্ত সতর্ক চোখে সহযাত্রী পুরুষদের কানে কথাগুলি গেল কি না লক্ষ্য করতে চেষ্টা করে। আজও করত। কিন্তু তার আর দরকার পড়ল না। গাড়ি থামার সঙ্গে সঙ্গে ইলার হাসি ও সাবিত্রীর মুখ বন্ধ হল। রুচি তাড়া-তাড়ি মঞ্জু ও ময়নার হাত ধরে টুপ্ করে নেমে পড়ল।

এখন রুচির মেজাজ খানিকটা প্রসন্ন হবার কথা। কিন্তু আজ তা আর কপালে জুটল না। ময়না তখনো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

এই বেলা রুচি না বলে পারল না।

'তোমার যদি ইস্কুলে যেতে এত অনিচ্ছা তো বাড়িতে বাবাকে তা ভাল ক'রে বলনি কেন। এত বড় মেয়ে প্রাইমারি ক্লাসে ভর্তি হ'তে যাচ্ছ, যেখানে যাবে যে ইস্কুলে পড়বে লজ্জা করবেই—আমি বুঝতে পারছি না তুমি এত কাঁদা-কাটা করে কেন লেখাপড়া শিখতে এলে।'

জলভরা চোখে ময়না রুচির দিকে তাকায়। কালো স্থির চাউনি। বলতে কি, রুচি যেন একটু চমকে উঠল। সবটাই বর্ণবোধ না। সবটুকু নির্বোধ কান্না নয়।

রাস্তার দিকে তাকিয়ে ময়না চোখ মুছল। লাল ফোলা ফোলা চোখের দিকে তাকিয়ে রুচির মনে হ'ল এই কান্না আজ হঠাৎ তৈরী নয়। যেন এর আগেও ও কেঁদেছে। তার চোখের কোণে কালি দেখে রুচি নরম গলায় আস্তে আস্তে প্রশ্ন করল, 'তুমি কাঁদছ কেন?'

'আপনাকে বলে কি হবে।'

'আহা আমাকে বলতে আপত্তিই বা কেন। আমি তোমার মা'র বয়সী প্রায় হব। অনেক ছোট তুমি আমার চেয়ে। কি হয়েছে বলো।'

'রুনু।' মুখ নিচু করল ময়না।

রুচি হঠাৎ কথা বলল না। একটু ভাবল। কেননা কাল রাত্রে মুখ্যত তাদের পাশের ঘরের কে গুপ্তর ছেলের বিষয় নিয়ে শিবনাথের সঙ্গে তার বেশ খানিকটা ঝগড়া হয়েছে। তারপর আর এটাকে রুচি পাঁচটা কথা চিন্তা করে অবশ্য বাড়তে দেয়নি। কে গুপ্তর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে সবটা ব্যাপারই সে পাশ কেটে দাঁড়ানোর মত হয়ে শুনে এসেছে। সত্য মিথ্যা যাচাই করতে নিজে থেকে একটা প্রশ্নও করেনি।

তাছাড়া ভদ্রমহিলার কথাবার্তা রুচির ভাল লাগেনি। ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘশ্বাস ফেলা এবং প্রায় পনেরো মিনিট ধরে তার বাপের বাড়ির মনোহরপুকুর রোডের এক মিত্র বংশের সুনাম গৌরব মর্যাদা ও লক্ষ্মীশ্রীর বর্ণনা সে সুপ্রভা কড়িকাঠের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ঘরে ঢোকার পর রুচিকে বসতে বলা হয়নি। বলে বসাবে এমন জায়গাও ছিল না। সুপ্রভার মলিন শয্যার পাশে দাঁড়িয়ে রুচি কথা শুনছিল।

পিতৃবংশের বর্ণনা শেষ করে বেবির মা চোখ নামাল।

'এত বড় ঘরের মেয়ে এখন এভাবে কেন কষ্ট পাচ্ছে নিশ্চয় তার কোনো কারণ আছে।' বলে বেবির মা সাদা শীর্ণ বাঁ হাতখানা তুলে চোখের সামনে মেলে ধরে রেখা দেখেন। হাতের রেখা দেখতে রুচি মেয়েদের এই প্রথম দেখল। হাত দেখা হয়ে গেলে সুপ্রভা সেটা নামিয়ে আস্তে আস্তে নিজের চোখের ওপর রাখেন। চোখ ঢেকে দেন।

রুচি অস্বস্তি বোধ করছিল।

এভাবে আরো দশ মিনিট কাটে।

তারপর হাত সরিয়ে সুপ্রভা আবার কড়িকাঠের দিকে তাকান। সেদিকে চোখ রেখে দীর্ঘশ্বাস ফেলে আস্তে আস্তে বললেন, 'কাজেই আমি বিদ্রোহ করব না। এই দুঃখের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে গুরুদেব রুষ্ট হবেন। আমার স্বামী পাগল। আমার মেয়ে চায়ের দোকানে কাজ করছে, আমার ছেলে হাস-পাতালে শুয়ে আছে। থাকুক। অদৃষ্টে থাকলে রুনু ফিরে আসবে, না থাকলে আসবে না। শুনছি ওর গাড়ি চাপা পড়া নিয়ে নানারকম গল্প তৈরি হয়ে গেছে। বলাইর মেয়েটাকে ডাকিয়ে-ছিলাম। আসেনি। সম্ভবত বলাই আসতে দিচ্ছে না। আমি ময়নাকে কাঁদতে শুনেছি।' সুপ্রভা একবার থামলেন।

'কাজেই হ্যাঁ, আপনাকে ডেকে বললাম, এ বাড়িতে শিক্ষিতা বলতে আর কোনো মেয়ে নেই। অর্থাৎ আমার অক্ষমতা, আমার অসহায়তা, আমার দৈন্য বুঝতে পেরে অন্তত মুখের সহানুভূতি জানাবে এমন কেউ আছে কি না এখানে জানি না। নেই। সন্ধ্যাবেলা পাশের

ঘরের কোন্ বুড়ি খনখনে গলায় বলছিল, মা একবার কি ছেলেটাকে গিয়ে হাসপাতালে দেখে আসতে পারে না। কতটুকুন আর রাস্তা শেয়ালদা। শুনলাম। শুনে চুপ ক'রে রইলাম। হেঁটে যাব সে-ক্ষমতা আমার নেই। এই স্বাস্থ্য নিয়ে হাঁটতে গেলে আমি মাথা ঘুরে পড়ে যাব। ট্রাম-বাসে?'

সুপ্রভা বোধ করি এই প্রথম রুচির দিকে তাকিয়েছিলেন।

'না, কেবল ট্রাম-বাসে চড়তে আজ আমার লজ্জা করে যদি বলি তা হলে হয়তো মিথ্যা বলা হবে। আমার বাইরে মুখ দেখাতেই লজ্জা করে। পারব না। এখানে এসে অবধি আমি এ বাড়ির সদর কোনটা উঠে গিয়ে একবার চোখ মেলে দেখিনি। দেখব না। নরকপুরীতে এসেছি। গুরুদেবের ইচ্ছা না হওয়া পর্যন্ত থাকতে হবে এখানে। উঠে গিয়ে নিজে থেকে বেরোবার রাস্তা দেখব সেই দম্ভ, সেই স্পর্ধা আমি রাখিনি।'

অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছিল রুচি।

'আমায় ডেকেছেন কেন?'

এত দুঃখের মধ্যেও সূক্ষ্ম সলজ্জ একটা হাসি সুপ্রভার ঠোঁটে উঁকি দিয়েছিল যেন। সঙ্কোচ।

'আপনাকে বোন একটু কষ্ট করতে অনুরোধ জানাব। লজ্জা করে। আপনার সময়ের অভাব। স্কুলের খাটুনির পর বাড়ি ফিরে আবার সেই রাঁধাবাড়া। কখন যে কাল আপনি—'

রুচির দু'কান গরম হয়ে উঠছিল।

'বলুন কি করতে হবে।'

'একবার সময় করে হাসপাতালে যদি রুনুকে কাল দেখে এসে আমায় বলতে পারেন ও কেমন আছে।'

রুচি চুপ করে ছিল।

'যদি আপনার সময় হয়। আপনার কাজের ক্ষতি আমি করতে চাই না। এই নিন ভাই।' সুপ্রভার প্রসারিত ডান হাতে একটা দু' আনি।

রুচি ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছিল।

'বৌদির কাছ থেকে চেয়ে আমি রেখে দিয়েছিলাম। না এতে আপনার লজ্জার কিছু নেই। তাছাড়া আমি, আমার কানেও এসেছে, খুকির বাবার এখন চাকরি নেই। সামান্য একটা প্রাইভেট স্কুলে আছেন আপনি—'

'পয়সাটা রেখে দিন। আমাকেও শেয়ালদা পর্যন্তই বাস্-এ যেতে হয়। তারপর আর বাস্ লাগে না। হেঁটে একটু এগিয়ে গেলেই আমার স্কুল। কাজেই বাস্-এর জন্যে অতিরিক্ত পয়সা আপনাকে দিতে হবে না। কাল স্কুল থেকে ফেরার পথে দেখি যদি সময় পাই—'

'আচ্ছা এটা রাখুন তো। আমার জন্যে একটা কাজ করছেন। আপনার ছোট্ট মেয়েটাকে কি একটা কমলালেবু খেতে দিতে পারি না আমি। না বোন রাগ করবেন না, আপনি শিক্ষিতা। আমার হয়ে আপনাকে এই কাজটুকু করার জন্য কিছু মনে করবেন না বলেই আমিও বলতে সাহস পেলাম। আহা পয়সাটা কোথায় পড়ল দেখুন তো ভাই—'

হাত থেকে পয়সাটা বিছানার ওপর কোথাও পড়ে যেতে সুপ্রভা পাশ ফিরে ঘাড় কাত ক'রে যখন সেটা তালাস করেন রুচি সেই ফাঁকে ঘর থেকে বেরিয়ে আসে।

একটা ভাল কিছু করতে যাওয়ার দম্ভ নিয়ে সে স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া করে কে গুপ্তর স্ত্রীর কাছে গিয়েছিল। সেখানে বিপদের পুরোপুরি সর্বনাশের আগুনের ওপর শুয়ে মনোহরপুকুর রোডের বনেদী মিত্রবংশের মেয়ে সুপ্রভা অনুকম্পার চাপ চাপ বরফপিণ্ড লোকের মাথায় তুলে দেবে বলে যে অপেক্ষা করছে রুচির আগে জানা ছিল না।

বাকি রাত রুচি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোল। আজ সকালে উঠেও রুনুর কথা সে ইচ্ছা করেই ভুলে থাকতে চেয়েছে। যেমন শিবনাথ গোড়া থেকেই আছে। অবশ্য রুচির কারণটা স্বতন্ত্র। কেননা, যখনই প্রতিবেশীর দুঃখে মনে মনে সমবেদনা প্রকাশের চেষ্টা করেছে রুচি একটা দু' আনি—ক্ষয় পাওয়া ধার-গুলো ফ্যাকাশে বিবর্ণ পিতলের মুদ্রাটি তার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। আর মহিলার কথাগুলো মনে হয়েছে। খুকির বাবার চাকরি নেই শুনছি। প্রাইভেট স্কুলে চাকরি করে যৎসামান্য আয় আপনার। আহা কাজ সেরে ফিরে এসে বিকেলে আবার সেই হাঁড়ি-খুন্তি। কী কষ্টের জীবন, আমি, একলা আপনার কথা বলছি না। আপনাদের। বাংলা দেশের স্কুল টিচারদের। অত্যন্ত পুয়ের মাইনে। অথচ বেচারাদের দিয়ে কত গুরুত্বপূর্ণ কাজ করানো হচ্ছে। সত্যি বড্ড মায়া হয়।'

কথা শেষ করে সুপ্রভা কড়িকাঠ দেখছিলেন। আর রুচি চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখল ওপরের হাঁড়ি-খুন্তিতে ধুলোর পলাস্তারা পড়েছে। উনুনটা যেন কবে থেকে মাথা ভাঙ্গা হয়ে এখন পাঁচ-ছ'টি সদ্যোজাত শাবক সমেত মল্লিকার ঘরের ভাজা মাছ চুরি করে খাওয়া ও বাড়িশুদ্ধ লোকের মুখ ঝামটা খাওয়া সুন্দরী 'করবী'-র আশ্রয়স্থলে পরিণত হয়েছে।

একটি ঘরের ভাঙ্গা উনুনের ওপর সাতদিন ধরে বিড়াল চরছে দেখলে অন্য সময় রুচির বুক হাহাকার করে উঠত। কিন্তু কাল আর তা হল না। বরং ডানদিকের ঠোঁট দুটো ঈষৎ চেপে সে 'আচ্ছা চলি রাত বেশি হয়েছে' বলে বেরিয়ে এসেছে। অর্থাৎ এভাবে সে অহংকারী প্রতিবেশিনীর ওপর প্রতিশোধ নিয়েছে।

এখন ময়নার মুখে 'রুনু' নাম শুনে রুচি আবার চমকে উঠল।

'ও তো হাসপাতালে।'

'আমি হাসপাতাল যাব। কাছেই।'

কি একটু ভেবে রুচি বলল, 'কিন্তু তোমার বাবা তো তোমাকে তা বলেনি। যাচ্ছ স্কুলে। সত্যি কি না? তা ছাড়া' রুচি থামল। ময়না আবার চোখে আঁচল তুলেছে। হাতের বর্ণবোধটা ছিটকে নিচে মাটিতে পড়ল।

'ছি ছি কী মেয়ে তুমি, বার বার বই ফেলে দিচ্ছ!' রুচি বিরক্ত হয়ে নুয়ে বইটা তুলে আবার ময়নার হাতে গুঁজে দিলে। 'তা ছাড়া এখন তোমাকে আমি হাসপাতালে নিয়ে যাই তা তো হয় না! দশটা কুড়ি। সাড়ে দশটায় আমার ক্লাশ এসো।' শেয়ালদা স্টেশনের ঘড়ি দেখা শেষ করে রুচি ময়নার দিকে তাকাতে অবাক হয়ে গেল। টাই-সুট পরা বড় বেশি মার্জিত পরিচ্ছন্ন একটি ছেলে। যুবক ঠিক না কিশোরও নয়। সবে গোঁফের রেখা উঁকি দিয়েছে। দিচ্ছিল। কিন্তু নির্মম হয়ে তার ধারগুলোতে এখন থেকেই যেন ও ক্ষুর চালাতে আরম্ভ করেছে, রুচির অনুমান করতে কষ্ট হল না। মাথায় কালো কোঁকড়া চুল। কিন্তু সেখানেও ধারগুলো থাক্ ফেলে ফেলে নিয়মিত নানারকম যন্ত্রপাতি চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখে রুচি যেন ভিতরে ভিতরে একটু যন্ত্রণা অনুভব করল।

কিন্তু রুচির চেহারার ভাবান্তর লক্ষ্য করতে একটুও সময় নষ্ট না করে পার্ক স্ট্রীটের সন্তোষ পকেট থেকে সিগারেট-কেস্ তুলে সিগারেট বার করল। সিগারেট ধরিয়ে সে ময়নার দিকে কটমট ক'রে তাকায়।

'কী অদ্ভুত মেয়ে তুমি। দু'দিন পার করে এসেছ রুনুকে দেখতে?'

ময়না কথা বলছে না। কান্না থামিয়ে চোখ মুছছে। 'কাল বিকেলের দিকে এক-বার সেন্স ফিরে এসেছিল। দু'বার 'ময়না' 'ময়না' ডেকেছিল রুনু। আর তুমি বাড়িতে চুপটি ক'রে বসে আছ।'

ময়না এবারও নীরব। অধোবদন।

'বেবি গিয়ে কি তোমায় বলেনি?' রুচির দিকে সম্পূর্ণ পিছন ফিরে যেন তাকে রীতিমত উপেক্ষা করে সন্তোষ ময়নার মুখোমুখি দাঁড়ায়। 'কথা বলছ না কেন। কী, রুনু তোমায় ভালবাসত তো,—অথবা যদি বলি তুমি সাংঘাতিক-ভাবে রুনুর প্রেমে পড়েছিলে কথাটা কি মিথ্যা বলা হবে। আমি সব জানি। রুনু আমায় সব বলত। আমার বুজম্ ফ্রেন্ড ও। আমরা এক জায়গায় থেকে বড় হয়েছি। ক'দিন হয় ওরা পার্ক স্ট্রীট ছেড়ে কুলিয়া-টেংরার বস্তিতে গেছে।'

বড় বড় জলের ফোঁটা ময়নার গাল বেয়ে চিবুকের কাছে এসে জমতে লাগল।

সন্তোষ যেন খুব উত্তেজিত অস্থির হয়ে আছে, একটু চুপ থেকে আরো দু' একটা টান দিয়ে এতবড় সিগারেটটা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পকেট থেকে সুন্দর একটা রুমাল বার করে ঠোঁট মুছল।

'আমার কথার উত্তর দাও। জান, কাল সারা রাত আমার ঘুম হয়নি। কাল বিকেলেও যখন তুমি এলে না, আমি, রুনুর তো জ্ঞান নেই, এদের—আমার অন্য বন্ধুদের কাছে বলেছি যে, তুমি কতবড় ইনসিন্সিয়ার হ্যাঁ, প্রেমের ব্যাপারে। রুনু পাগলের মত ভালবেসেছিল, কিন্তু তুমি, —তোমার ভালবাসায় ফাঁক ছিল, ফাঁকি ছিল—এ্যাম আই নট্ ট্রু? উত্তর দাও। চুপ ক'রে কেবল কাঁদার কোন অর্থ হয় না।' ময়নার হাত ধরে সন্তোষ জোরে ঝাঁকুনি দিল। সন্তোষের ওপাশে দাঁড়িয়ে ছিল আর দু'টি ছেলে। সমবয়সী। সন্তোষের মত ওদেরও চক্‌চকে জুতো রঙিন টাই দামী কোট প্যান্ট পরনে।

'আহা লাগবে।' দুটি ছেলে এক সঙ্গে এগিয়ে এসে সামনে দাঁড়াল। 'মারধর করিস নে।'

সব শুনে দেখে রুচি হতভম্ব। একটা কথাও সে বলছিল না। কিন্তু এখন আর চুপ করে থাকতে পারল না।

'তোমরা কে?

'আমার নাম সন্তোষ। এরা আমার ফ্রেন্ড। জীবন অসিত। আমরা পার্ক স্ট্রীটে থাকে।'

'ময়নাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ?'

'হাসপাতালে। কেম্বেল হাসপাতালে রনু আছে। বাড়িঅলা ওকে গাড়ি চাপা দিয়েছে।'

'আমি জানি। শুনেছি।' রুচি আস্তে আস্তে বলল, 'এখন ও কেমন আছে?'

সন্তোষ এ-প্রশ্নের জবাব দিল না। পাশের আর একটি ছেলে রুচির দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল, 'আপনি কে—আপনাকে তো চিনতে পারছি না।'

'ইনি একজন স্কুল মিসট্রেস। কুলিয়া টেংরার সেই বস্তিতেই থাকে।' রুচির হ...
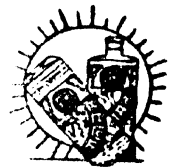
সন্তোষ বন্ধুর প্রশ্নের জবাব দেয় এবং এবারও সে রুচির দিকে তাকায় না, ময়নার সঙ্গে কথা বলে। 'উত্তর দাও। আমি জানতে চাই, তোমার মনে কি আছে।'

'বাবা আসতে দিচ্ছে না।' ময়না এই প্রথম জলভরা বড় বড় চোখ মেলে সন্তোষের দিকে তাকায়।

'আসতে দিচ্ছে না, পালিয়ে আসতে পারনি?' সন্তোষ মুখ খিঁচিয়ে উঠল। হি ইজ ডাইং আর বাড়িতে বসে তুমি সুখের ভাত খাচ্ছ।' এত জোরে সন্তোষ কথা বলছিল যে, আশে পাশে রাস্তায় লোক দাঁড়িয়ে পড়ে এমন। রুচির ভীষণ লজ্জা করছিল। দু-একজন এদিকে তাকিয়ে পর্যন্ত গেল।

'তুই বুঝতে পারছিস না সন্তু—বস্তিতে থাকে, লেখাপড়ায়ও তথৈবচ, ফরোয়ার্ড মেয়ে না। হয়তো বাপ ভয় দেখিয়েছে।

'দেখিয়েছে তা আমি জানি।' বন্ধুর দিকে না চেয়ে সন্তোষ বলল, 'আমি বেবির মুখে সব শুনলাম কাল। বাড়িঅলা গাড়ি চাপা দিয়েছে রুনুকে, কিন্তু রটাচ্ছে অন্য রকম।'

'আমার তো মনে হয়, লোকটা টাকা দিয়ে ময়নার বাবার মুখ বন্ধ করেছে। না হলে ময়না তো ঘটনার সময় ছিল। ওই তো একমাত্র উইটনেস।' আর একটি বন্ধু মন্তব্য করল।

'তা করুক টাকা দিয়ে ওর বাবার মুখ বন্ধ।' সন্তোষ মাথা ঝেঁকে উঠল। 'কিন্তু তাই বলে ওর কি উচিত চুপ করে থাকা। লভ্—এণ্ড দিস ইজ ইউর লভ্! অসভ্য মেয়ে, মূর্খ মেয়ে।' যেন সন্তোষ আবার ময়নার হাত ধরতে যায়। বন্ধুরা তাকে বাধা দিলে। ময়না চোখে আঁচল গুঁজল।

রুচি রীতিমত অপ্রস্তুত। অস্থির চোখে আর একবার সে স্টেশনের ঘড়িটা দেখল। বলাই তার সঙ্গে মেয়েকে স্কুলে পাঠিয়েছে। রাস্তায় এভাবে সন্তোষ ও তার বন্ধুদের উদয় হবে এবং ময়নাকে ধরে তারা হাসপাতালে রুনুর কাছে নিয়ে যেতে চেষ্টা করবে, সে ধারণা করতে পারেনি। অবশ্য রুনুকে দেখতেই ময়না অবিশ্রাম কাঁদছিল। এই অবস্থায় এখন তার কি করা উচিত, রুচি ভাবতে লাগল।

'কাল থেকে এ অবধি আমি তেত্রিশটা বাস এ্যাটেণ্ড করেছি। টেংরার, বেলেঘাটার। হ্যাঁ, এই স্টপেজে দাঁড়িয়ে। কত লোক নামল, কত লোক উঠল। কত মুখ দেখলাম। এণ্ড ইউ ডিড নট টার্ন আপ। রাস্কেল মেয়ে।'

থাক, এসে গেছে যখন, আর গালি-গালাজ করিসনে, ও তো এসেছেই ওর লাভারকে দেখতে।'

'না আসেনি।' সন্তোষ উত্তেজিত হয়ে বন্ধুদের দিকে তাকাল। 'তোরা দেখছিস ওর হাতে বই শ্লেট। উনি ইস্কুলে চলেছেন বাড়ির 'টিচার'টির সঙ্গে। আমি কি মিথ্যা বলছি। আপনি চুপ করে আছেন কেন।' সন্তোষ রুচির দিকে ঘাড় ফেরায়। 'আমি তো দেখলাম, বাস থেকে নেমেই আপনি ওকে স্কুলে নিয়ে যেতে টানাটানি করছিলেন। বলুন আপনি ময়নাকে ডাকছিলেন কিনা।'

রুচি লজ্জিত স্তব্ধ।

'ষড়যন্ত্র করে ওদের সেই বাড়িঅলা সমস্ত ঘটনাকে গোপন করার চেষ্টা করছে, অসিত, বুঝলি। কাল একবার আমি ও-পাড়ায় গিয়েছিলাম ময়নার খোঁজে। বাড়ির দরজা আগলে বসে থাকে একটা মুদি। আমি ময়নার কথা জিজ্ঞেস করতেই রাস্কেলটা বলল, এখানে নেই, ময়নার বাবা ময়নাকে মামার বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'তুই বাড়িতে ঢুকলি না কেন।'

'না, রুনু নেই। তাছাড়া রুনুর বাবা হ্যাঁ, কে গুপ্ত কোন সময়েই আমাকে ভাল চোখে দেখে না। মুদিদোকানের সামনেই তখন বসা ছিল। চোখ লাল করে আমায় বলল ভাগ্ এখান থেকে? যত সব বখাটে ছেলে। আমি আর করি কি, ফিরে এলাম। ভদ্রলোকের মাথা এখন আর ঠিক নেই, আমি জানি। তারপর বেবির মুখে তো সবই শুনলাম।'

'মুদিটা স্পাই। কে বাড়িতে ঢুকছে না ঢুকছে, সেদিকে কড়া নজর রাখছে, কি বলিস?' অসিত হাসল।

'তা ও নজর রাখুক না রাখুক, তাতে কিছু আসে-যায় না।'

সন্তোষের আর এক বন্ধু জীবন গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি শুধু ভাবছি সেই বাড়িঅলার কথা। কত বড় ব্রুট, কত বড় বদমায়েস। সকলের আগে ওই হারামজাদাকে শিক্ষা দেয়া দরকার।'

'শুনেছি তো বস্তির ধারেই ওর বাংলো।'

জামার আস্তিন গুটিয়ে অসিত তার ডান হাতটা ঢিল ছোড়ার মতন শূন্যে নেড়ে বলল, 'আমার তো এখনি ইচ্ছা করছে শালাকে গিয়ে দু'ঘা বসিয়ে দিয়ে আসি।'

'তা হয়তো বসানো যায়, কিন্তু আমার মাথায় এখন সেই চিন্তা নেই।' সন্তোষ গম্ভীরভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, 'আই এম থিংকিং অব দিস স্টুপিড গার্ল।' সন্তোষ ময়নার দিকে আবার কটমট করে তাকায়। 'হার্টলেস, আমি বলব। রুনু তোমায় ভালবাসত—ভালবাসার এই রিয়োয়ার্ড কেমন? সত্যি, ও গাড়ি চাপা পড়েছে বলে আমার যত বেশি না দুঃখ হচ্ছে তার চেয়ে অনেক বেশি লাগছে তোমার ব্যবহারে।' সন্তোষ থামল। ময়না চোখ থেকে কাপড় সরাল। নিথর নিঃস্পন্দ মূর্তি। এক সেকেণ্ড কি তারও একটু বেশি সময় স্থির অপলক চোখে সন্তোষের মুখের দিকে তাকিয়ে পরে তার হাত ধরে ময়না রীতিমত আর্তনাদ করে উঠল। 'আমি রুনুকে দেখতে এসেছি সন্তোষ, তুমি আমায় ওর কাছে নিয়ে চল। রুনুকে দেখতে না পেয়ে আমি যে কত কেঁদেছি, তুমি জান না। চল এখনি চল।' ময়নার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছিল। যেন সন্তোষের চোখের কোণায় জল দাঁড়িয়েছে। সুন্দর রুমালটা দিয়ে সে চোখ মুছে ধরা গলায় বলল, 'তুমি এদের, আমাদের বন্ধুদের জিজ্ঞেস কর, আজ সারা সকাল আমি কী বলেছি। হ্যাঁ, খুব খারাপ রিমার্ক করেছি তোমার সম্পর্কে।' ময়নার ঘাড়ের ওপর এবার কোমলভাবে হাত রাখল সন্তোষ। 'আমি সব সহ্য করতে পারি ময়না, প্রেমের অপমান সহ্য করতে পারি না। আজ আমাদের পার্ক স্ট্রীটের কোনো মেয়ে হলে আর তার লাভার যদি এভাবে হাসপাতালে শুয়ে থাকত, ও তাকে দেখতে না পেত তো পটাসিয়াম সায়নাড মুখে দিয়ে সুইসাইড করত। অবশ্য তুমি ততটা ফরোয়ার্ড না, আমি বেশ বুঝতে পারি। যে পরিবেশে তুমি আছ, তাতে তা না হবারই কথা, তোমাকে খুব দোষও

দিচ্ছি না। তুমি মনে রেখো, তোমার ও রুনুর প্রেমের ব্যাপারে আমি প্রথম থেকেই খুব ইণ্টারেস্টেড। রুনুকে জিজ্ঞেস করে দেখো। রাতদিন ও আমার কাছে তোমার গল্প করত, ওকি বেণীটা খুলে গেল কেন। থাক্ আর কেঁদো না।'

'আমি যাব, আমায় তুমি নিয়ে চল।'

'ময়না!' রুচি ডাকল।

'আপনি যান, আপনি স্কুলে চলে যান ময়না আমার সঙ্গে হাসপাতালে যাচ্ছে।' সন্তোষ ঘাড় ফেরায়।

'এভাবে এখন ওকে আমি ছেড়ে দিতে পারি না।' রুচি একটু শক্ত গলায় উত্তর করল। 'ওর বাবা আমার সঙ্গে ওকে স্কুলে পাঠিয়েছে, আজ ওর এ্যাডমিশন নেবার কথা।'

'হেল্ উইথ এ্যাডমিশন, হেল্ উইথ ইউর লেখাপড়া।' নাটকীয় ভঙ্গীতে শরীরে একটা ক্ষিপ্র মোচড় দিয়ে সন্তোষ রুচির দিকে ঘুরে দাঁড়াল। 'আপনার শরীরের রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে—আপনার, —আপনার জীবনে প্রেমের রক্তকমল কোনোদিনই ফুটেনি, তাই বোধ করি আজ এ অবস্থায় এখন এখানে আমাদের সামনে একথা বলতে পারছেন মিসেস। যান আপনি চলে যান।' বলে আর অপেক্ষা না করে সন্তোষ ময়নার হাত ধরে বাঁ দিকের পেভমেণ্ট ধরে দ্রুত হাঁটতে লাগল। সন্তোষের সঙ্গীরাও চলে যাচ্ছিল। কি ভেবে তারা একবার ঘুরে দাঁড়ায়। রুচির দিকে তাকিয়ে যেন তাকে সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গীতে অল্প হেসে অসিত বলল, 'যান আপনি আপনার স্কুলে চলে যান। পরের চাকরি করছেন, নিজের সংসার আছে, খামোকা এ-ব্যাপারে আমরা আপনাকে টানব না।'

'হয়তো আমরা থানা-পুলিশ করতে পারি। পারিজাতকে শিক্ষা দিতেই হবে। জানি না, শেষ পর্যন্ত সন্তোষের কি ইচ্ছা—তবে—' বিজ্ঞের মত মাথা নেড়ে জীবন বলল, 'প্রেমের ব্যাপারে সে অত্যন্ত সিরিয়স, সেণ্টিমেণ্টালও বলতে পারেন—আমাদের সকলের চেয়ে বেশি। এ জন্যেই ওকে এত ভাল লাগে। ম্যাট্রিকে গত বছর ও ফেল করল, কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করাই তো মানুষের জীবনের বড় কথা নয়। রবিঠাকুরের ইউনিভার্সিটির ডিগ্রী ছিল না জানেন। তেমনি সন্তোষও এগজামিনের খাতায় পার্টস দেখাতে পারেনি। কিন্তু যেখানে দেখাবার, সেখানে সে দেখিয়েছে। আপনার জানবার কথা নয়। সন্তোষ একটা প্রেমের উপন্যাস লিখেছে। বস্তির মেয়ে ময়না এবং পার্ক স্ট্রীটের ছেলে রুনুকে অবলম্বন করেই অবশ্য গল্প। সিনেমার এক প্রডিউসারকে বইটা অলরেডি দেখানো হয়ে গেছে। সম্ভবত এক্সেপ্টেড হবে। আর কি, তবেই সন্তোষ জীবনের একটা ধারা খুঁজে পেয়ে গেল। পেয়েই গেছে। আমার ত মনে হয়, পরীক্ষায় ফেল করাটাই ওর জীবনে আশীর্বাদ—'

বন্ধুর কথা থেমে গেল। ওধার থেকে সন্তোষ চিৎকার করে ডাকল, 'এই জীবন, অসিত! ওখানে দাঁড়িয়ে তোরা কি বকর বকর করছিস। অত্যন্ত একঘেয়ে স্টিরিও-টাইপ্ড, শিক্ষয়িত্রী-জীবন যার, তাকে ভালবাসার তত্ত্ব বুঝিয়ে লাভ কি—তোরা আচ্ছা ছেলেমানুষ, চলে আয়, আমাদের অনেক কাজ।'

ওরা চলে গেল।

'মা চল।' মঞ্জু ডাকছিল।

'চল মা।'

মঞ্জুর হাত ধরে রুচি সাবধানে রাস্তা পার করল। উল্টো দিকের ফুটপাথে উঠে বনমালীকে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে ভীষণ চমকে উঠল। মাথায় একটা লাল গামছা জড়ানো। রোদ ঠেকাতে কি। হাতে দুটো বনস্পতির টিন। দু বগলে পাঁচ-ছ'টা কাগজের বাক্স। দাঁত বের করে বনমালী, রুচির দিকে না যদিও, মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে হাসল। 'খুকি বুঝি মা'র সঙ্গে ইস্কুলে চলছিস। আমি বড়বাজার থেকে মাল কিনে ফিরছি।' ইত্যাদি সংক্ষেপে দু-একটা কথা সেরে ব্যস্ত হয়ে সে রাস্তার ওপারে বেলেঘাটার বাস-স্ট্যাণ্ডের দিকে ঊর্ধশ্বাসে ছুটে গেল।

রুচি সবটা বিষয় তার স্কুলের একজন মিসট্রেস বন্ধুকে বলতে তিনি বললেন, 'আপনি খামকা চিন্তা করছেন। আপনার দোষ কি। আপনাদের বাড়ির বলাইবাবুকে গিয়ে বলবেন, তার মেয়েকে নিয়ে যা-যা ঘটেছে। তিন-তিনটে যোয়ান ছেলের সঙ্গে গায়ের জোর বা মুখের তর্ক কোনোটাতেই আপনি পারেন না, পারা উচিত না। কাজেই এখানে আপনাকে দোষ দেয়া মিছা।'

উপদেশ পেয়ে রুচি কিছুটা শান্ত হ'ল।

হল, কিন্তু আজ এই প্রথম বেঞ্চির ওপর চুপচাপ বসে থাকা শান্ত মার্জিত স্নিগ্ধ চক্ষু বর্ণাঢ্য পোশাকে সজ্জিত শহরের ঊনিশটি মেয়েকে তৈমুরলঙের জীবনী পড়িয়ে শোনাবার সময় বারোঘর এক উঠোনের উগ্র উলঙ্গ ছবিটা মনে করে সে বড় বেশি চমকে উঠল। হ্যাঁ, সেই বাড়ির কমলা এক বিবাহিত ভদ্রলোকের সঙ্গে চলে গেছে, সুনীতি পালিয়েছে এক কুৎসিত ব্যাধিগ্রস্ত ছেলের সঙ্গে, নিরক্ষর ময়না কাঁদতে কাঁদতে ছুটে গেল হাসপাতালে তার মুমূর্ষু প্রেমিককে দেখতে। সেই বাড়ির বাসিন্দা রুচি। যেন ভাবতে বিস্ময় লাগে। এরা কি জানে এই কচি কোমল নিরীহ নিষ্পাপ মুখগুলি সুন্দর চোখ মেলে অসহায়ের মত যারা তাকিয়ে আছে তাদের একান্ত শ্রদ্ধার পাত্রী রুচিদির দিকে, তিনি কোথায় কোন নরক থেকে বেরিয়ে এসেছেন ওদের লেখাপড়া শেখাতে। অভিমানে রুচির দুচোখ এক সময় ভারি হয়ে উঠল। কিন্তু ভাবনার সেখানেই শেষ না। আর একটা ভাবনা, আরো কতগুলি কথা রুচির মনে অনেকক্ষণ ধরে উঁকিঝুঁকি মারছিল। টিফিনের ঘণ্টায় লাইব্রেরীর এক কোণায় বসে কৌটো থেকে মঞ্জুকে খাবার বের করে দিয়ে রুচি পার্ক স্ট্রীটের পরীক্ষায় ফেল-করা সন্তোষ ও তার বন্ধুদের কথা ভাবতে লাগল। আপনার রক্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। প্রেমের রক্তকমল কোনদিনই আপনার জীবনে ফুটল না। একঘেয়ে শিক্ষয়িত্রী জীবন। ময়নাকে বাধা দেবার আপনি কে? ভাবল রুচি, আর ক্লান্ত বিষণ্ণ চোখ মেলে জানালার বাইরে কড়ি-গাছটার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলল। শিবনাথের অনেকদিন চাকরি নেই। মোক্তারামবাবুর স্ট্রীটের বাসা ছেড়ে আজ কত দিন হয়ে গেল তারা আঠারো টাকা ভাড়ার বস্তির টিনের ঘরে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু আজকের মত এমন মন খারাপ তার কোনদিন হয়নি—দুর্দমনীয় আত্মধিক্কারে তার শরীর-মন আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

(ক্রমশ)

হেলেন গ্রুবার্টকে ভুল বুঝেছিলাম, তার জন্য আমি লজ্জিত। বেচারার প্রতি অন্যায় করেছি, কিন্তু আমারই বা দোষ কি বলুন? বাংলা ছোট গল্পের দৌলতে 'সঙ্করী'দের সম্বন্ধে যা জানতাম, সেই মাপকাঠিতেই হেলেনকে বিচার করেছিলাম।

লেডী টাইপিস্ট হেলেন গ্রুবার্টকে প্রথমে দেখি সায়েবের চেম্বারে। হেলেন সুন্দরী না হলেও কুৎসিত নয়, শ্যামাঙ্গী। হাতে অতি-আধুনিক রুচির ভ্যানিটি ব্যাগ, মুখে কয়েকটা ছোট ছোট কালো দাগ। ঠোঁটের রঙ প্রসাধনের কল্যাণে মা-কালীর জিভের মত লাল। পরিচ্ছন্ন বেশবাস, স্কার্টের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ কিংবা স্বচ্ছতায় শালীনতার আইন লঙ্ঘিত হয়নি। খেসারত আদায় করতে পারেন।

সায়েবের অনুমতি নিয়ে হেলেন সিগারেট ধরায়। রাঙা ঠোঁটে সাদা রেড এ্যান্ড হোয়াইট সিগারেট বিশ্রী দেখায়।

হেলেনের হাসি যেন কেমন লাগে। মনে হয়, শয়তানীতে ভরা। সারা দেহের কোথাও যেন স্নেহ-মমতা নেই। হেলেন গ্রুবার্ট মামলা করতে চায়, ক্ষতিপূরণের মামলা। কে একজন তাকে বছর খানেক প্রেম নিবেদন ক'রে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দেয়, এখন তার মতের পরিবর্তন হয়েছে। হেলেনকে সে ছাড়তে চায়, কিন্তু হেলেন তাকে ছাড়বে না। জলে নেমে এখন পিছিয়ে আসা চলবে না। আসতে হলে কিছু খরচ করতে হবে। হেলেন হি-হি করে হাসে। দশ হাজার টাকার ক্ষতি-পূরণের মামলা করবে সে ব্রীচ অফ প্রমিস অর্থাৎ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের মামলা। সেই-জনাই ব্যারিস্টারের কাছে আসা।

হেলেনের হাসিতে আমার কেমন ঘৃণা বোধ হয়। প্রেমের পথে এত চোরাবালি কে জানে? তারই কোন সুযোগ নিয়ে হেলেন কাউকে শোষণ করতে চায়। হেলেনের এককালের মনের মানুষ সুরজিত রায়ের জন্য দুঃখ হয়। বেচারা বোধ হয় পার্ক স্ট্রীটের উত্তরের জগতের সবকিছু জানে না, তাই জালে পড়েছে। হেলেন সেই জাল এখন গুটোতে চায়। কোর্টে মামলা করে দশ হাজার টাকা শুষে নেবে সে। চেম্বারে আসার আগেই বা কত নিয়েছে কে জানে।

ব্রীচ অফ প্রমিসের মামলা এদেশে বড় একটা হয় না। বিলেতে অবশ্য ভূরি ভূরি মামলা হয় এই নিয়ে। আইনের চোখে বিয়ে এক ধরনের কণ্ট্রাক্ট, একটা চুক্তি। কণ্ট্রাক্ট আইনে চুক্তি ভঙ্গ হলে চুক্তি ভঙ্গ-কারীকে মোটা খেসারৎ দিতে হয়। কোন এক ব্যক্তি একটি মেয়েকে বলল, তোমায় বিয়ে করব, মেয়েটি যে মুহূর্তে রাজী হয়ে সম্মতি জানালেন, অমনি দুজনের মধ্যে আইনের চোখে কণ্ট্রাক্ট হয়ে গেল। পরে ভদ্রলোকটি যদি অন্য কোন রমণীর আকর্ষণে পূর্বেকার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন, তাহলে ভদ্রমহিলা কোর্ট থেকে খেসারৎ আদায় করতে পারেন।

হেলেন গ্রুবার্টও ক্ষতিপূরণ চায়।

গুরুতর মানসিক আঘাত	৫০০০, টাকা
সমাজে সম্মান হানি	৩০০০, টাকা
ভবিষ্যতে অন্য স্বামী লাভের অসুবিধা	২০০০, টাকা
মোট	১০,০০০, টাকা

এ হিসেব হেলেনের নিজের তৈরী। সুরজিত রায়ের প্রত্যাখ্যানে রাতে তার ঘুম হয় না। ডাক্তার বলেছেন, এ গুরুতর নার্ভের ব্যাধি, তীব্র মানসিক আঘাতের ফল। এমন ক্ষতির জন্য পাঁচ হাজার টাকা অতি সামান্য। সমাজে অনেকে জেনেছে, হেলেন গ্রুবার্ট সুরজিত রায়ের বাগদত্তা, শীঘ্র ওরা স্বামী-স্ত্রী হয়ে ঘর করবে। বান্ধবীরা তাই জানে, মায়ের বন্ধুরাও তাই শুনেছেন। ইলিয়ট রোডের সোসাইটিতেও একথা অজানা নয়। সে সমাজে হেলেনের প্রতিপত্তি হানি হয়েছে। সবাই বলে, তোমাদের বিয়ে হচ্ছে কবে? এর জন্য তিন হাজার খুবই ন্যায়সঙ্গত। অন্তত হেলেনের মত তাই।

ভবিষ্যতে বিয়ের বাজারে তার স্বামী মেলা শক্ত হবে, কারণ সুরজিতের জন্য কত ছোকরাকে প্রত্যাখ্যান করেছে সে। দরকার হলে তাদের নাম দিতে পারে হেলেন। জন ফিলিপস, বব ডিক্সন, লায়নেল ডিকোস্টা কোর্টে সাক্ষ্য দিতে রাজী। এদের যে কোন একজনকে সে বিয়ে করতে পারতো, কিন্তু সুরজিতের জন্য সব নষ্ট হয়েছে। হেলেন গ্রুবার্ট নেহাৎ দয়া-পরবশ হয়ে এই ক্ষতির জন্য দু হাজারের বেশি চাইছে না।

মুখে একটু হাসি জাগিয়ে রেখে সায়েবকে হেলেন এসব বোঝাতে চেষ্টা করেছে। মুখের সেই হাসি আমার নোংরা মনে হয়েছে। আরও খারাপ লেগেছে হেলেনের বুড়ি মাকে। মায়ের রঙ আরও কালো। বয়সের স্রোতে গায়ের চামড়া কুঁচকিয়ে কিশমিশের মত দেখালেও রুজ ও লিপস্টিক ব্যবহারের আগ্রহ কমেনি। অথচ হাতের অনাবৃত অংশে তেলের অভাবে খড়ি উঠছে। বুড়ির একটি পা বোধ হয় অন্যটি অপেক্ষা সামান্য ছোট,

তাই চলার সময় দেহটা বেঁকিয়ে হাতের লাঠি এগিয়ে দিতে হয়। বুড়ির আগ্রহ ও উৎসাহ মেয়ের থেকে অনেক বেশি। মিসেস গ্রুবার্ট মেয়ের কাছেই থাকে, মেয়েকে আগলে বেড়ায়। বুড়ি হলদে দাঁতগুলো বার করে সায়েবকে আগ্রহে জিজ্ঞাসা করে, টাকার পরিমাণটা কিছু বাড়ানো যায় কি না।

হেলেন গ্রুবার্টের সব কিছু শুনে সায়েব বললেন, কেসের জন্য প্রমাণ চাই। সাক্ষীর প্রয়োজন হবে। সুরজিত রায় সত্যি বিয়ে করতে চেয়েছিল, তারও প্রমাণ দিতে হবে।

বুড়ি মিসেস গ্রুবার্টের মুখে একগাল হাসি। 'হুঁ-হুঁ, আমি আগে থেকেই জানি। যেদিন থেকে ও-ছোঁড়া হেলেনের পিছনে ঘুরছে, হেলেনকে বলেছিলাম, চিঠিপত্র কিছু হারিও না, যত্ন করে রেখে দিও। ওসব কাগজপত্র কখন দরকার লাগবে, কেউ জানে না।'

হেলেনের ভ্যানিটি ব্যাগটা ফুলে রয়েছে। ব্যাগের বোতাম টেপার আওয়াজ হয়। হেলেনের নধর নরম হাতখানি ব্যাগের ভিতর ঢুকে যায়। ভিতরে একরাশ চিঠির বাণ্ডিল, প্রিয়া হেলেনকে লেখা সুরজিত রায়ের চিঠি। একান্ত ব্যক্তিগত চিঠি। যে-চিঠি একদা গোপনে পাঠ করে হেলেন আপন মনে গুনগুনিয়ে উঠেছিল, আজ তাতে বাইরের পরশ পড়বে।

স্থিরভাবে হেলেন চিঠিগুলো সায়েবের দিকে এগিয়ে দিল। সন্ধানী দৃষ্টিতেও হেলেনের মধ্যে কোন সঙ্কোচের ভাব আবিষ্কার করা গেল না। পয়সার জন্য এরা সব পারে, আমার মনে হলো, 'চিঠিগুলো পড়ে দেখবেন' বলে হেলেন ও তার মা সেদিনের মত বিদায় নিল। উঁচু হিলের জুতোর খট খট আওয়াজ ক্রমশ লিফ্টের কাছে এসে মিলিয়ে যায়।

খান পঞ্চাশ চিঠি। আমার সামনে টাইপরাইটার, তার বাঁদিকে তারা শুয়ে আছে। প্রতিটি চিঠি টাইপ করতে হবে। টাইপ হলে সায়েব পড়ে দেখবেন। হাতের লেখা পড়ার অসুবিধা অনেক।

একটি প্রেম-কাহিনীর সম্পূর্ণ ইতিহাস লুকিয়ে রয়েছে এই চিঠির জঙ্গলে। সুরজিত রায়ের প্রাণের কথ আর হেলেনের সলজ্জ উত্তর ফসিল হ রয়েছে আমার সামনে। কল্পনা স্টেথিসকোপে আজও শোনা যেতে পা দুটি যুবক-যুবতীর উষ্ণ প্রাণের স্পন্দন নীল কাগজে ছোট ছোট হরফে লেখ সুরজিতের চিঠি। ওগুলো এখনও 'চিঠি একজনকে লেখা, একটি যুবকের একান ব্যক্তিগত চিঠি। আমি তাদের নকল করব একজনের পরম বিশ্বাসে লেখা চিঠি মৃত্যু হবে। ব্যারিস্টারের ব্রীফের ভিত পড়ে থাকবে তাদের মৃতদেহ। কোর্টে কেরানী নাকে চশমা লাগিয়ে চিঠির উপরে কালো কালিতে লিখবে এগজিবি নম্বর অমুক।

হেলেন গ্রুবার্টকেও ডাকতে হয়েছে সুরজিত রায়ের হস্তলিপি অদ্ভু ধরনের। বাইরের লোকের কাছে তা পাঠোদ্ধার অশোকলিপির পাঠোদ্ধারে কাজ থেকে সোজা হবে না। হেলেন গ্রুবার্টকে বলেছিলাম, 'যাই বলুন, এমন দুর্বোধ্য হাতের লেখা সহজে চোখে পড়ে না', হেলেন হেসে ফেলে। অফিস কামাই করে সে এসেছে চেম্বারে। সুরজিতের চিঠির প্রতিটি অক্ষরকে সে নিবিড়ভাবে চেনে, পড়ার অসুবিধা হলে হেলেন সাহায্য করবে আমাকে।

সুরজিতের চিঠি নীল কাগজের প্রথম পাতায় শেষ হয় না, পাতার পর পাতা চলে একই চিঠি। চিঠি থেকেই তুলে দিই। 'আমার দুষ্টু মেয়ে, এ-চিঠি চারের পাতায় পড়ল। টেবিলে বসে লিখতে হলে অনেক আগেই তোমার নরম ঠোঁটের উদ্দেশে একটি চুমা জানিয়ে ইতি টানতাম, কিন্তু বিছানায় আধশোয়া হয়ে নিশীথ রাতে চিঠি লেখায় সত্যি রোমান্স জাগে। সারা রাত আমি লিখে যেতে পারি, পাতার পর পাতা। যে-চিঠির আদি আছে, অন্ত নেই, শুরু আছে, শেষ নেই।......' চিঠির শেষ এখানেই নয়, আরও কয়েক পাতা গেছে। নীল কাগজের বুকে কালো কালির আঁচড়ে সুরজিতের আবেগ বাসা বেঁধেছে।

আমার হাসতে ইচ্ছে করে। সুরজিত অপাত্রে তার ভালবাসা দিয়েছে। এলিয়ট রোডের হেলেন তার প্রতিটি চিঠি সযত্নে রক্ষা করেছে। ভালবাসার জন্যে নয়,

আদালতের সম্ভাব্য দলিল হিসেবে। কিন্তু এসব ভাবার কোন অধিকার তো আমার নেই, আমি টাইপ করে যাব শুধু। যাকিছু বোঝার বুঝবে সুরজিত রায়, হেলেন গ্রুবার্ট আর তার মা।

হেলেনের হাতে পকেট-বুক সিরিজের রঙচঙে আমেরিকান উপন্যাস, সে পড়তে আরম্ভ করে—আমিও টাইপ শুরু করি। সুরজিতের লেখা প্রায়ই আটকায়। মেশিনের আওয়াজ বন্ধ হলেই মৃদু হেসে হেলেন মুখ তুলে চায়, চিঠির উপর ঝুঁকে অংশবিশেষ পড়ে দেয়। আবার মেশিন চলতে থাকে, হেলেন গ্রুবার্টও ফিরে যায় বইয়ের জগতে।

সময়ের অনুক্রমে চিঠিগুলো সাজিয়ে নিই। একটা নীল চিঠি, তারপরেই পাতলা কাগজে হেলেনের উত্তরের নকল। প্রতিটি চিঠির নকল রেখেছে হেলেন একটা ক'রে। কোন চিঠিই হাতে লেখা নয়।

"ডার্লিং,

টাইপ করা চিঠি পেয়ে রাগ কোর না। এ চিঠি হাতের লেখারই সমান। আমার টাইপ রাইটার মেশিনটি বড় ভালো। যন্ত্র হলেও সে আমার মনের কথা বোঝে। মনের কথা শোনার জন্য এতদিন শুধু ওই ছিল আজ তোমাকে পেয়ে তার দায়িত্ব কমল। তবু মনে হয় তোমার আমার দেওয়া-নেওয়ার মূক সাক্ষীরূপে ওকে রেখে দিই। ও আমাকে লজ্জা দেবে না, হিংসে করবে না।

সত্যি বলছি, তোমার চিঠি টাইপ করার সময় এক অনাস্বাদিত-পূর্ব রোমাঞ্চ অনুভব করি। সারাদিন কত চিঠি টাইপ করি কিন্তু তাতে থাকে ভিজে পাটের হিসেব, কিংবা চায়ের বাজার দর। 'ডিয়ার স্যার' ও ডিয়ার ম্যাডাম-এর মরুভূমিতে 'ডার্লিং' লিখতে বুকের ভিতর কেমন লাগে। কবে আসছ দেখা দিতে?

ইতি

তোমারই হেলেন"

হঠাৎ আমার মনে হয়, হেলেন গ্রুবার্ট নিজেই তো চিঠি কপি করতে পারে। হেলেনকে বলি, 'মিস্ গ্রুবার্ট, আপনি নিজে টাইপ করলে তো অনেক তাড়াতাড়ি হ'ত। লেখা পড়তে আপনার কোন অসুবিধা নেই।'

হেলেন মুখ তুলল। পলার হারের ছোট্ট লকেটটি দুলে উঠে কেন্দ্র থেকে সরে যায়। তার মুখ শুকিয়ে আসে, মনে হয় যেন ভয় পেয়েছে। কোন রকমে ঢোক গিলে বলে, 'হ্যাঁ, সত্যি তো, আমি নিজেই তো টাইপ করতে পারি, কিন্তু...' হেলেন কি যেন ভাবে। পরমুহূর্তেই বলে ওঠে, 'না-না, ওসব চিঠি আমি আর টাইপ করতে চাই না। না-না, ওসব আমি পারব না।'

কোন উত্তর না দিয়ে দুটো সাদা কাগজের মধ্যিখানে কালো কারবন দিয়ে অক্ষরের চাবি টিপতে শুরু করি। 'মাই সুইট লিটল্ হেলেনা......'

কাহিনীর শুরু পাঁচ বছর আগে। বল ডান্স। ঘরের কোণে নাচের বাদ্য শরীরে চাঞ্চল্য জাগাচ্ছে। অনেকে নাচছে। হেলেনের বান্ধবীরা নাচছে, তাদের ফিঁয়াসের সঙ্গে। হেলেন চুপচাপ সোফা থেকে তাদের অঙ্গভঙ্গী দেখে, মিসেস রেমঁ নীল আলোয় পিয়ানো ফর্টিতে সুরের মূর্ছনা তোলে। পার্ক স্ট্রীটের দাক্ষিণের এই সব সামাজিক উৎসবের সঙ্গে হেলেনের পরিচয় নেই। সবার অলক্ষ্যে সময়টা কাটাতে পারলে বাঁচে।

'আজকের রাতে চুপচাপ বসে থাকতে দিচ্ছি না। আসুন, যদি কোন না আপত্তি থাকে, আমরা দুজন......' হেলেন চমকে সামনের দিকে চায়। নিখুঁত ইভনিং ড্রেসে একটি যুবক ওকে ডাকছে। গোলাপী রঙ। হাসির মাঝে সাদা চকচকে দাঁতগুলো ঝিলিক দিচ্ছে। কী অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি! হেলেনের ভয় লাগে। নাচে তার তেমন অভ্যাস নেই। তালে ভুল হয়। বুড়ি মিসেস হিনিনের নাচের ইস্কুলে মাত্র দু মাস গিয়েছিল সে। মাইনে দিতে না পারায় আর যাওয়া হয়নি।

'এই যে আসুন, বসে রইলেন কেন?' হেলেন উত্তর খুঁজে পায় না, অথচ উত্তর না দেওয়া অভদ্রতা। হেলেনের বুকের মধ্যে কেমন করে ওঠে, ভদ্রলোক কি ভাববেন, নাচ না শিখে 'বলে' আসা। তবু সে উঠে দাঁড়ায়। কিছু বলার আগেই ভদ্রলোক তার বিশাল বাহু দিয়ে হেলেনকে যেন লুফে নিলেন, ওরা ফ্লোরে এসে দাঁড়িয়েছে।

'আমি সুরজিত রায়।'

'আমি হেলেন গ্রুবার্ট।'

'বাঃ চমৎকার নাম। প্যারিস নামে এখানে কেউ থাকলে আমাকে আপনার সঙ্গে নাচতে দিত না।' নাচের মধ্যে সুরজিত আস্তে আস্তে বলে।

'আমার কিন্তু ডান্স ভালো জানা নেই, কেমন ভয় লাগছে।' নাচের মধ্যে হেলেন ফিস ফিস করে বলে।

'হা ভগবান, এর জন্যেই বুঝি ফ্লোরে আসতে চাইছিলেন না। কোন ভাবনা নেই, আপনি তো আর কোন প্রিন্সের সঙ্গে নাচছেন না।' সুরজিত হেলেনকে আরও কাছে টেনে নেয়।

হেলেনের সর্বশরীরে এক অপূর্ব আনন্দের শিহরণ জাগে। সে কোন উত্তর দিতে পারে না, শুধু তালে তালে পা মিলিয়ে যায়। সুরজিতের পুরুষালী চেহারা, যেন সুঠাম ইস্পাত। প্রশস্ত বুক আর চওড়া কব্জি হেলেনের বেশ ভারি মনে হয়। হেলেনকে সে অনায়াসে মাটি থেকে ডল পুতুলের মত তুলে ফেলতে পারে।

হেলেনের সাথে সুরজিতের পরিচয়ের শুরু এমনিভাবেই। সুরজিতের বয়স বেশি নয়, হেলেনের সমবয়সী কিংবা সামান্য বড়। সুরজিত রায়ের ধমনীতে বাঙালী রক্ত আছে কিছু, কিন্তু শতকরা একশ ভাগ নয়। বাঙালী রক্তের সঙ্গে ওতপ্রোত আর এক জাতের রক্ত, তার

কিছুটা ভারতীয়, কিছুটা সাগর পারের। সুরজিত রায়ের বাবা বাঙালী খৃষ্টান। এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান বিয়ে করলেও ছেলের নামকরণে বাঙালী রীতি লঙ্ঘন ক'রে ডেভিড বা জন রাখলেন না। ওয়েলেসলীর সমাজে এমন নাম কেউ শোনে নি।

সুরজিত রায়ের চিঠি।

"প্রিয় মিস্ গ্রুবার্ট,

সেদিনের পরিচয়টা নষ্ট করতে চাই না, ট্যাক্সি থেকে নেমে শুভরাত্র জানানর আগে আপনিও তাই বলেছিলেন। আগামী শনিবার বিকেলে খুব ব্যস্ত থাকবেন নাকি? না হলে, চারটে নাগাদ পার্ক স্ট্রীটের রেস্তোরাঁয় আসলে আনন্দিত হব।

শুভেচ্ছা জানবেন।"

কয়েকদিন পরের চিঠি—

"প্রিয় মিস্ গ্রুবার্ট,

গত শনিবারের কয়েকটি ঘণ্টা মনে রাখার মত। আপনি সত্যি খুব ভাল গল্প বলতে পারেন। আপনার বাচন ভঙ্গীরও প্রশংসা না করে পারছি না। ফেরার পথে বৃষ্টি নেমেছিল, ভিজে যাননি তো? আমার কিন্তু জলে ভিজে ঠাণ্ডা লেগেছে মনে হয়। শরীরটা খুব সুস্থ বোধ হচ্ছে না।

শুভেচ্ছা জানবেন। ইতি,

সুরজিত রায়।"

"প্রিয় মিস্ গ্রুবার্ট,

আপনার চিঠিতে বড় আনন্দ পেলাম। শরীর নিয়ে আপনাকে কিছু না লেখাই উচিত ছিল। এমন কিছুই হয়নি, এখন আগেকার মতই অফিসে যাচ্ছি। ভাল কথা, আজ সকালে ঘুম ভাঙতে দেখি একটা ছোট্ট লাল টুকটুকে পাখি জানলায় বসে গান গাইছে। পাখিটার সাহস কম নয়। আগামী শনিবার নিশ্চয়ই দেখা হবে। ইতি"

শনিবারের অপরাহ্নে ওদের দেখা-সাক্ষাৎ বাড়তে থাকে। প্রথমে রেস্তোরাঁয়। ক্রমশ চৌরঙ্গী পাড়ায়, সিনেমায়। বহুদিন আগেকার ঘটনার প্রতিধ্বনি তুলে আমার টাইপরাইটার কাজ করে চলে। হেলেন গ্রুবার্ট কোন সময়ে উপন্যাস বন্ধ রেখে টেবিল থেকে পেন্সিলটা তুলে নিয়েছে। সামনের প্যাডে কতকগুলো বিচিত্র ছবি হেলেনের পেন্সিলের ডগা থেকে বেরিয়ে আসছে। খুব বৃদ্ধ এক এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান ভদ্রলোক। সঙ্গে রাস্তার শীর্ণ মৃতপ্রায় কুকুর।

এক চিঠি শেষ করে অন্য চিঠিতে হাত দিই। আমার ডান দিকে টাইপ-করা কাগজের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকে আর একটা নীল চিঠি টেনে নিই। ইতিমধ্যে চিঠির সুরের পরিবর্তন হয়েছে।

"ডার্লিং হেলেনা,

আমার সুইট হেলেনা, শোন, কোন সংবাদ দাওনি কেন? দু রাত আমার ঘুম নেই। তোমার ছোট ফটোটা বার করে যত দেখি তত অবাক হই, আবার দেখতে ইচ্ছে করে। কিছুতে তৃপ্তি নেই।

কে তোমার নাম রেখেছিল হেলেনা? বহু বর্ষ আগে তুমিই ট্রয় নগর ধ্বংস হবার কারণ হয়েছিল আর আজ আমার শান্ত জীবনে ঝড় এনেছ তুমি। দুষ্টু মেয়ে, এখন রাত কত জান? এই মাত্র আমার ক্লকে দুটো বাজল। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে।

এমন বাদলা রাতে দুজনে দেখা হলে কেমন মজা হোত......”

হেলেনের উত্তর টাইপ করতে কষ্ট হয় না। ঝরঝরে টাইপ করা।

“আমার বীরপুরুষ,

চিঠিতে অনেক অভিমান করেছ। রাগও হয়েছে বুঝতে পারছি। কিন্তু সত্যি যদি আমায় ভালবাসতে তবে চিঠি না লিখে নিজেই আসতে হেলেনের সন্ধানে, কিন্তু না এসে ভালই করেছ। অত সুখ আমার সহ্য হতো না।

হেলেনের রূপের বর্ণনা দিয়ে কেন লজ্জা দাও। সেদিনের বর্ষামুখর রাতে আমিও জেগে। বিজলীর সঙ্গে বজ্রের শব্দে বড় ভয় করছিল। তুমি থাকলে কিন্তু সত্যি বলছি আমার একটুও ভয় করত না।......”

কিছুকাল পরের আর একটি চিঠি। সঙ্গে কয়েকটা ফটো।

“দুষ্টু মেয়ে,

সেদিন বোটানিক্সে তোলা কয়েকটা ছবি পাঠালাম। ছবিতে তোমার হাসি বড় মিষ্টি লাগে, এক নম্বর ছবিটা এনলার্জ করাতে দিয়েছি। আমার টেবিলে সেটি থাকবে। তুমি হাসবে, আমি দেখব। তোমার সোনালী চুলের দিকে শুধু তাকিয়ে থাকব। এখানে কিন্তু তুমি লজ্জায় মুখ লুকোতে পারবে না।”

জেম ক্লিপে আঁটা ছবিটিও চিঠির সঙ্গে রয়েছে। হেলেন হাসছিল। আজকের হতশ্রী, ক্লান্ত বিগতবসন্ত হেলেন গুবার্ট নয়। সেদিনের হেলেনের দেহে যৌবনের ভরা জোয়ার, সদ্য-ফোটা ফুলের মত তাজা শরীর। হাওয়ায় অলকগুচ্ছ মুখরতা আর চোখে অষ্টাদশীর চঞ্চল মাদকতা। সে ছবি সুরজিত রায়কে যথেষ্ট আনন্দ দিয়েছে নিশ্চয়ই।

“আমাকে পাগল করা হেলেন,

ওগো পরীরাণী, এই মাত্র তুমি বিদায় নিয়েছ। আমার ঘাড়ি বলছে মাত্র দশ মিনিট কিন্তু মন বলছে কতদিন যেন তোমাকে দেখিনি। একদিন নয়, একমাস নয়, বহুকালের অদর্শন-বেদনা। তোমার ঘ্রাণ এখনো জড়িয়ে রয়েছে এ সবের বাতাসে, তাইতো এখনই লিখতে বসলাম। রজনীগন্ধার গুচ্ছটিকে তুমি বুকে নিয়েছিলে, আদর করেছিলে পরম আবেগে, তারাও উদাসভাবে গিয়ে যেন তোমায় খুঁজছে।

হেলেন, আজকের কথা ভুলব না। আমাকে সম্মানিত করেছ পরিপূর্ণ বিশ্বাস করে। হেলেন, আমি সে বিশ্বাসের সকল দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত।......”

সুরজিতের লেখা এরপর কেমন অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। পড়তে পারি না। চেষ্টা করেও বুঝতে পারি না সুরজিত কি বলতে চায় হেলেনকে। ছবি আঁকা ছেড়ে হেলেন জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চায়। সুরজিত রায়কে ‘পাগলকরা হেলেনের’ দিকে চিঠিটা এগিয়ে দিই। আমার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সে গোড়া থেকে চিঠিটা পড়তে থাকে। একবার শেষ করে বোধ হয় আবার পড়ে। আমার সময় নষ্ট হওয়ায় অস্বস্তি লাগে। শেষে চিঠিটা ব্যাগে পুরে ফেলে। এ চিঠিটা দরকার নেই টাইপ করার, এটা আমার কাছেই থাক। অন্য কোন কথা না বলে হেলেন আবার ছবি আঁকায় মন দেয়।

বেশ কয়েকটা চিঠির পর পুরী থেকে লেখা সুরজিতের চিঠিতে নজর পড়ল। পুরীর সমুদ্রতীরে সুরজিতের মনে হেলেনের মুখ বারবার উঁকি দিয়েছে। কেন? এ প্রশ্নের উত্তর তার জানা নেই।

পরের ডাকে উত্তর যায়, “এ আমার পরম সৌভাগ্য। অফিসে একদম ভাল লাগছে না, ছুটির পরও নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে হয়। কেন জানি না......”

চিঠিতে ক্রমশ ওরা মনের গোপনতম কথা প্রকাশ করে। ওরা দুজনে দুজনকে ভালবেসেছে। ওরা ঘর বাঁধবে, কিন্তু ইলিয়ট রোডে নয়। ওপাড়া থেকে বহু দূরে। টালিগঞ্জ কিংবা গড়িয়াহাটায়। সুরজিতের রোজগার ভালো, ডালহৌসীর এক পাটকলের অফিসে বড় চাকরি তার। সুরজিত হেলেনকে বিয়ের পর চাকরিতে থাকতে দেবে না। সে অফিসে গিয়ে কি করবে? তার থেকে সংসারের তদারকী অনেক ভাল।

সবাই জেনেছে ওরা স্বামী-স্ত্রী হবে, হেলেন গুবার্ট নতুন রূপে দেখা দেবে হেলেন রায়ের মধ্যে।

ডিসেম্বরের এক স্নিগ্ধ সন্ধ্যা। সুরজিতের পরনে ছাইরঙের স্যুট, গলায় প্রজাপতির মতন বো-টাই। নিখুঁত কামান দাড়ি, মুখে স্মিত হাসি। হেলেনেরও আজ নতুন বেশ। ঘিয়ে রঙের শাটিনের আঁট স্কার্ট বিজলী বাতিতে ঝলমল করছে। কোমরে একই রঙের প্লাস্টিকের বেল্ট। বুকের কাছে দুটি আধফোটা গোলাপ। হেলেন চোখ বোজে, কে যেন এগিয়ে আসছে। সে আরও কাছে এগিয়ে আসে। ধীরে ধীরে বুকের কাছে স্পর্শের অনুভব। হেলেন চোখ খোলে। সুরজিতের হাতে তার বুকের একটি গোলাপ।

“এ গোলাপ আজ হতে আমার” সুরজিত বলে।

হেলেন হেসে উত্তর দেয়, “ও তো গোলাপ কুঁড়ি। ফুল ফোটাবার যত্ন নিতে পারবে তো?”

ওরা আঙটি বদল করে। হেলেনের নরম হাতে সুরজিত নিজের প্রতিশ্রুতির চিহ্নস্বরূপ আঙটি পরিয়ে দেয়। হেলেন সলাজে আবার চোখ বোজে। মার্চের কোন এক সন্ধ্যায় চার্চের সামনে ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নামবে, প্রিয়জনের পুষ্প-বৃষ্টির মধ্যে ধীরে ধীরে বেদীর সামনে এসে দাঁড়াবে। সামনে পুরোহিত ধীরে ধীরে বলবে, “মৃত্যুর ক্রোড়ে আশ্রয় না পাওয়া পর্যন্ত আমরা পরস্পরের প্রতি বিশ্বস্ত থাকব।” এক মাসের ছুটিতে হনিমুন। গোপালপুরে অনুসী। হেলেন আর ভাবতে পারে না।

জানুয়ারীর মাঝামাঝি আবার একটি নীল চিঠি আসে। হেলেনের সুখ-স্বপ্নে বাধা পড়ে। সুরজিত রায় নিজে আসতে সাহস করেনি, তাই চিঠি পাঠিয়েছে। সুরজিতের চাকরি গেছে। যে চটকলের অফিসে তার চাকরি সায়েবরা তা বিক্রী করে দিয়েছে। নতুন মারওয়াড়ী মালিক সব কিছু পাল্টাতে চান। মাস-পয়লায় সুরজিতের হাতে কোন খাম আসবে না, যার ভিতর ছ-শ' টাকার কড়কড়ে দশ টাকার নোট।

সুরজিত রায় ভেঙে পড়েছে। হেলেনকে সে পাবে না। কোন সঞ্চয় নেই তার, যা পেয়েছে এতদিন, তাই খরচ করেছে সে। হেলেন রুমালে চোখ মুছতে মুছতে লেখে—

“কোন চিন্তা কোর না ডার্লিং। সব আবার ঠিক হয়ে যাবে। আবার তুমি চাকরি পাবে। শুধু আমাদের ঘর বাঁধতে একটু দেরি হবে। তাতে কি? আমি তোমার প্রতীক্ষায় থাকব। আজ না হয় কাল, কাল না হয় পরশু আমরা ঘর বাঁধবই।”

"ডার্লিং,

তোমার চিঠি বিশ্বাস হচ্ছে না। সত্যি কি তুমি আমার পুরোন হেলেনই থাকবে? আমার একান্ত নিজস্ব হেলেনা। আমিও প্রতীক্ষায় থাকব। নিশ্চয়ই থাকব। যতদিন প্রয়োজন... সুরজিতের চিঠি।

হেলেনের দিকে আড়চোখে তাকাই। ছবি আঁকা বন্ধ করে কোন সময় নিজের অজান্তে সে চোখ বুজেছে। টেবিলের উপর এক ঝাঁক চুলওয়ালা মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে।

সুরজিত চাকরির চেষ্টা করে। হেলেন নিজের খরচ কমানর চেষ্টা করে। তাকে আরও টাকা রোজগার করতে হবে। সুরজিতের কোন কষ্ট সে সহ্য করতে পারবে না।

আর একটা ছোট চাকরি জুটিয়েছে সে। শনিবার টার্ফ ক্লাবের কাউণ্টার থেকে রেসের টিকিট বিক্রী, মাসে সত্তর টাকার মত পাওয়া যাবে। শনিবারের বিকেলে দুজনে আর দেখা হয় না। সুরজিতের সময় আছে যথেষ্ট। ঐদিন হেলেনকে কাছে পেতে চায় সে। কিন্তু সাড়ে বারটা বাজলেই অফিস থেকে হেলেনকে ট্যাক্সিতে ছুটতে হয় রেস-কোর্সের দিকে।

বেশ কিছুদিন এমনিভাবে কেটে যায়। সুরজিত লেখে, চাকরি বোধ হয় আর জুটবে না। জীবন অসহ্য। হেলেন উত্তর দেয় "লক্ষ্মীটি ধৈর্য হারালে চলবে কেন? আমার যা কিছু উপার্জন সে তোমারই জন্য। সে টাকাকে তুমি এক মুহূর্তেও পরের ভেব না। আমি আরও কিছু রোজগারের চেষ্টা করছি। সুদিন এল বলে।"

সুদিনের প্রতীক্ষায় বছর গড়িয়ে যায়। হেলেনের চিঠি থেকে বুঝি, অতিরিক্ত পরিশ্রমে সে ক্লান্ত। শরীরের দীপ্তি, মনের সজীবতা কমে আসছে। রুক্ষ-জীবনের দেবতা ধীরে ধীরে হাস্য-মুখর, প্রাণ-চাঞ্চল্যে ভরা হেলেনকে গ্রাস করছে।

সুরজিতেরও আর ভাল লাগে না। এক প্লাস্টিক কোম্পানীতে সেলসম্যানের কাজ পেয়েছে সে। যা মাইনে তাতে ঘর-ভাড়া দিয়ে দুবেলা অন্ন সংস্থান হয় না। নিজেকে ভদ্রভাবে বাঁচিয়ে রাখতে যে অক্ষম, তার বিয়ের চিন্তা পাগলের কল্পনা মাত্র।

রবিবারের কোন বিকেলে ওদের দেখা হয়। সুরজিত আজকাল মিতভাষী, সহজে কোন কথা বলে না। রেস্তোরাঁয় চা খেতেও ইচ্ছা হয় না। বিল দিতে হবে হেলেনকে, সুরজিত জিজ্ঞাসা করে—আর কতদিন?

হেলেন কি উত্তর দেবে বুঝতে পারে না। সুরজিত যেন ছোট্ট ছেলে ক্ষিদের সময় খেতে চায়, কোন কিছু বুঝতে চায় না। তবু সুরজিতকে ওর ভাল লাগে ওকে আদর করতে ইচ্ছে করে। ওর ঘন কালো চুলের মধ্যে আঙ্গুল চালিয়ে দিয়ে বলতে ইচ্ছা করে, আর বেশীদিন নয়।

নাঃ। হেলেনকে কিছু করতেই হবে আর সামান্য মাইনে বাড়লেই তারা বিয়ে করবে, ঘর বাঁধবে। সুরজিত তারপর ভাল চাকরির চেষ্টা করতে পারবে।

ঢাকা অফিসের অফারটা সে গ্রহণ করবে। কোম্পানীর ঢাকা ব্রাঞ্চে একজন লেডি স্টেনো চাই। বছরখানেকের জন্য। মাইনে প্রায় ডবল, ফিরে আসার পর প্রমোশন সুনিশ্চিত। বেশ কিছুদিন তাকে সুরজিতের কাছ থেকে দূরে থাকতে হবে। কিন্তু উপায় কি? ঢাকা থেকে ফিরে ওরা বিয়ে করবে। একটা ছোট্ট ফ্ল্যাটে সব কিছু গুছিয়ে সংসার পাতবে।

ঢাকা থেকে লেখা হেলেনের চিঠির কপি আমার সামনে—

"মাই নটি ডার্লিং, মাই স্কিপার,

কয়েক ঘণ্টা আগেও দমদমে তোমায় দেখেছি অথচ এই ক'ঘণ্টায় কত দূরে চলে এসেছি। হোটেলের ব্যবস্থা অফিস থেকেই হয়েছে, ওয়াই ডবলু সিতে জায়গা না পাওয়া পর্যন্ত এখানেই থাকব।

এই মাত্র স্নান সেরে এসেছি, ঘর সাজাব দু একদিনের মধ্যে, এখন শুধু তোমার বড় ছবিটি ড্রেসিং টেবিলে বসিয়ে দিয়েছি। তুমি আমার খুব কাছে হাসছ, অথচ তুমি কত দূরে। সবই ভগবানের ইচ্ছা। নইলে এমন হবে কেন ডার্লিং, তবুও সময় সময় মন প্রবোধ মানতে চায় না। সুইট ড্রিম, ইতি

তোমারই হেলেনা।"

মাস কয়েক পরে হেলেনের চিঠি:—

"ডার্লিং,

আজকের ডাকে একটা সোয়েটার পাঠলাম কিছুদিন আগে পশমটা কিনি, চকোলেট রং তোমায় মানাবে ভালো। সামনে শীত তাই তাড়াতাড়ি বুনতে হলো। সোয়েটার গায়ে একটা ফটো তুলো। তার এক কপি আমায় পাঠাতে ভুলো না। তোমায় কতদিন দেখিনি কবে আবার এক সঙ্গে সিনেমা দেখে পার্ক স্ট্রীটের সেই রেস্তোরাঁয় বসব......"

চিঠির বাণ্ডিল পাতলা হয়ে এসেছে ঘড়িতে প্রায় চারটা বাজে। সুরজিতের চিঠি দ্রুত টাইপ করি—

"আমার হেলেনা,

সোয়েটার পেয়েছি ঠিক সময়ে। সময় মত উত্তর না দেওয়ার জন্য দুঃখিত, সোয়েটার এখনও পরিনি। কি হবে পরে? কে তাতে আনন্দ পাবে? ক্রমশ যেন জরাগ্রস্ত হয়ে পড়ছি। কতদিন এমন যাবে জানি না......"

হেলেনার উত্তর আসে—

"অত হতাশ হতে নেই। তুমি না পুরুষ। আর কয়েক মাসেই আমার ব্যাঙ্কে বেশ কিছু জমে যাবে। আমাদের সামনে অফুরন্ত আনন্দের দিন।......"

সুরজিতের চিঠি—

......কবে সে আনন্দের দিন আসবে? যখন আমরা বুড়ো হয়ে কবরে যাবার দিন গুনব? সব মিথ্যা,......তোমার টাকার প্রয়োজন নেই। ঢাকায় সময় নষ্ট না করে ফিরে এস। জীবনে যদি দুঃখ ও কষ্ট থাকে আমরা এক সঙ্গে তার সম্মুখীন হব......"

হেলেনের চিঠি—

"......এতদিন আমরা ভাগ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছি। শেষের দিনে ধৈর্য হারিও না, লক্ষ্মীটি। রাত পোয়াতে আর বেশী দিন নেই। হঠাৎ একদিন আমাকে কলকাতায় তোমার পাশে দেখতে পাবে। ......এখানে ঘড়ি সস্তা। তোমার জন্য একটা রোলেক্সের ঘড়ি কিনেছি, যাবার সময় নিয়ে যাব। রোজ এতে দম দিচ্ছি। ঘড়ি বন্ধ হওয়া ভাল নয়। চালু ঘড়ি নিজের হাতে তোমার মণিবন্ধে পরিয়ে দেব।......"

এর পরের কয়েকটি চিঠি দ্রুতবেগে শেষ করি। ছুটির সময় হয়ে এসেছে প্রায় পাঁচটা। হেলেন-সুরজিত পত্রাবলীর শেষ চিঠিটা তুলে নিই। সুরজিত রায়ের চিঠি। কিন্তু নীল কাগজে লেখা নয়, সাদা সাধারণ কাগজ। ছোট্ট চিঠি।

হেলেন হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে ধড়মড়িয়ে ওঠে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে বলে

"আই এম স্যরি। কোন্ সময় ঘুমিয়ে পড়েছি। কটা বাজে? সব শেষ তো?"

বলি, না প্রায় শেষ। এইটুকু বাকী।

"প্রিয় হেলেন,

এ চিঠি তোমায় আঘাত দেবে কিন্তু তার জন্য আমি দায়ী নই। তোমার অদূরদর্শিতার পরিণাম তোমাকেই ভোগ করতে হবে। সুদিনের প্রতীক্ষায় জীবনের আর একটি দিনও ব্যয় করতে আমি রাজী নই। অথচ তুমি বার বার আমাকে অপেক্ষা করতে বলেছ। কিছুদিন হোল আর একজন আমার জীবন আকাশে দেখা দিয়েছে, তার নাম নাই বা শুনলে। সে আমাকে অপেক্ষা করতে বলে না, আমাকে পাবার জন্য সে পাগল; সে দুঃখ পেতে রাজী। সে আমাকে পেলেই সন্তুষ্ট। ভাল ফ্ল্যাট, ভাল পোশাক, সামাজিক সম্মান, প্রতিপত্তি কিছুই চায় না। এই নির্মল ও নিঃস্বার্থ প্রেম আমার হৃদয় স্পর্শ করেছে। আমার জীর্ণ কুটিরে বধূরূপে তার আগমন হবে শীঘ্র। তুমি সুদিনের অপেক্ষায় রূপ যৌবন বাক্সে বন্ধ করে রাখ। যেদিন তোমার প্রতীক্ষিত 'সুদিন' আসবে, বাক্স খুলে দেখবে সব উবে গেছে কর্পূরের মত।

ইতি

সুরজিত।

মাসকয়েক পরে কোর্টে মামলা উঠেছে। সুরজিত রায়ের বিরুদ্ধে হেলেন গ্রুবার্টের দশ হাজার টাকার ক্ষতি-পূরণের মামলা। হেলেন গ্রুবার্ট ক্রোধের আগুনে জ্বলছে। অকৃতজ্ঞ সুরজিতকে যোগ্য শিক্ষা দেবে সে। যার জন্য সে অকাতরে সব কিছু দিয়েছে, সে প্রতিদানে দিল কী? বিশ্বাসের পরিবর্তে প্রবঞ্চনা! কাণ্ডজ্ঞানহীন দুর্বল চরিত্র সুরজিতকে বিবাহ না করে ভালই করেছে সে, হেলেন ভাবে। আদালতে তার সব সঞ্চয় খরচ করবে প্রয়োজন হলে। যে অর্থ তিলে তিলে নিজের রক্তে উপার্জন করেছিল সুরজিতের জন্য, সেই অর্থে সুরজিতকে সে ধ্বংস করবে। দশ হাজার টাকা কোথায় পাবে সুরজিত রায়? তার সর্বস্ব নীলামে যাবে। দেউলিয়া খাতায় নতুন নাম উঠবে—সুরজিত রায়। তখন কোথায় থাকবে তার নতুন প্রিয়া? কোথায় থাকবে তাকে বিবাহের স্বপ্ন? সেদিন সুরজিতকে আবার আসতে হবে হেলেনের দ্বারে। তখন? তখন পথচারী কুক্কুরের মত তাকে দূরে সরিয়ে দেবে হেলেন। সুরজিত রায়কে সর্বনাশের শেষ স্তরে না দেখা পর্যন্ত হেলেনের আত্মা শান্তি পাবে না।

আদালত-ঘরে কৌতূহলী দর্শকের ভিড়। এমন মজার কেস রোজ হয় না। ব্যারিস্টারের বাবুরা, উকিলের মুহুরী, এটর্নীর কোর্টের ক্লার্করা সব কটা বেঞ্চি দখল করে বসেছে। সায়েবের পিছনে দুটি চেয়ারে হেলেন ও তার মা। হলের অন্যদিকে একই সারিতে সুরজিত রায়। তার পাশে একটি কমবয়সী মেয়ে। হেলেন তার দিকে আড়চোখে চায়। মেয়েটির চোখে ছোট শিশুর নিষ্পাপ দৃষ্টি। হেলেন মনে মনে হাসে, বেচারাকে জগৎ সম্বন্ধে এখনও অনেক কিছু জানতে হবে।

মামলা শুরু হয়। সুরজিত রায়ের ব্যারিস্টার বললেন, "আমার মক্কেল বাদিনীকে বিয়ে করবেন বলেছিলেন সত্য, কিন্তু সে চুক্তি থেকে বাদিনী নিজেই সরে এসেছেন। অমুক তারিখে লেখা বাদিনীর চিঠিই তার প্রমাণ। তিনি হেলেনের চিঠি আদালতে পড়ে শোনান। সায়েব বললেন, একদম মিথ্যা। এটা চুক্তিভঙ্গ নয়, অভিমানের চিঠি। প্রেমের ব্যাপারে এরকম অভিমান খুবই স্বাভাবিক। সুরজিত রায়ের অমুক তারিখের চিঠি পড়লেই সেটা বোঝা যাবে। সায়েব সে চিঠি আদালতকে শোনান। সুরজিত রায় ইনিয়ে-বিনিয়ে হেলেনকে আদর জানিয়েছে সে চিঠিতে। বলেছে, অভিমান কোর না। চিঠি দিতে দেরি হওয়ার জন্য আমি ক্ষমা চাইছি। তারপর দুজনের পত্রালাপ পূর্বেকার মতই চলেছে। সুরজিত হেলেনকে বধূরূপে চেয়েছে। হেলেন লিখেছে, তোমাকে পতিরূপে পেলে আমি ধন্য।

পিছনের বেঞ্চে একজন ফিস ফিস করে বলে, "প্রবোধদা, ছোকরা কি বোকা দেখেছ। সব কিছু লিখে বসে আছে। সাধে কি আর শাস্ত্রে বলে শতং বদ মা লিখ।"

প্রবোধদা উত্তর দেয়, "ছুঁড়িটাও কম ওস্তাদ? সব চিঠি রেখে দিয়েছে।"

"রাখবে না। ওটাই তো ওদের ব্যবসা। ছেলেধরা পেত্নী।"

হেলেন-সুরজিতের প্রেমপত্রের নানান অংশে লাল পেন্সিলের দাগ পড়ে। সায়েব এক অংশ পড়ে শোনান। প্রতিবাদে ব্যারিস্টার সেন অন্য একটি পড়তে আরম্ভ করেন।

উপস্থিত দর্শকেরা আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে। হেলেনা মুখ নীচু করে বসে। সুরজিত কাঠগড়ার দিকে চায়, আর সুরজিতের পাশে নীল রঙের স্কার্ট-পরা মেয়েটি পরম বিস্ময়ে চারিদিকে তাকায়। সে কিছু বুঝতে পারে না। হেলেনকে তার দুর্জ্ঞেয় রহস্যময়ী বলে মনে হয়। সওয়ালের আগে হেলেন সাক্ষ্য দিয়েছে, সুরজিতকেও হেলেনের পরিত্যক্ত কাঠ-গোড়ায় দাঁড়াতে হয়েছে। হেলেনের বুড়ি মা সাক্ষ্য দিয়েছেন। তাঁর মেয়ের স্বাস্থ্য ভেঙে পড়েছে, দুশ্চিন্তায় তার রাতে ঘুম নেই। ডাক্তার সাক্ষ্যে বলেছেন, এই সব ক্ষেত্রে দুরারোগ্য মানসিক ও স্নায়বিক ব্যাধির উৎপত্তি হয়।

পুরো দুদিন মামলা চলল। তৃতীয় দিনে আবার সবাই কোর্টে উপস্থিত। রায়ের জন্য সবাই উদ্‌গ্রীব। সুরজিতের হাত ধরে সেই মেয়েটি আজও এক কোণে দাঁড়িয়ে। হেলেন তাকিয়ে দেখে। মেয়েটিকে আজ বড় সুন্দর দেখাচ্ছে। ঘিয়ে রঙের সার্জের স্কার্ট। গলায় নকল মুক্তোর মালাটি মাঝে মাঝে দুলে উঠছে। সুরজিতের হাত ধরে সে আজও সর্বকিছু অবাক হয়ে দেখছে। হেলেনের দিকেও মাঝে মাঝে আয়ত চোখে সে তাকাচ্ছে। সুরজিত গম্ভীর। হেলেন ওর দিকে তাকাতে ঘৃণা বোধ করে। তবু কোন্ দুর্নিবার আকর্ষণে হেলেনের দৃষ্টি সুরজিতের উপর পড়ে। সুরজিতের গায়ে রয়েছে সোয়েটার। একি এ যে সেই সোয়েটার। যেটি ঢাকা থেকে সে পাঠিয়ে-ছিল। সুরজিতকে ভালই মানিয়েছে।

জজ এসে আসনে বসলেন। হেলেন গ্রুবার্ট ভারসেস্ সুরজিত রায়। সুরজিত রায়ের হার হয়েছে। হেলেন গ্রুবার্টকে বিবাহ না করে সুরজিত চুক্তিভঙ্গ করেছে। ব্রীচ অফ প্রমিস। হেলেন গ্রুবার্টের দাবি ন্যায়সঙ্গত।

সুরজিত মাথা নীচু করে রইল। হিংস্র হাসিতে হেলেন সুরজিতের দিকে দৃষ্টি হানে। কিন্তু সেই মেয়েটির কোন পরিবর্তন নেই। পরম বিশ্বাসে সুরজিতের হাত ধরে সে দাঁড়িয়ে থাকে। আয়ত চোখ

মেলে চারিদিকে তাকায়, যেন এ-যুদ্ধের কিছুই তার জানা নেই।

হেলেনের মায়ের মুখে হাসি উছলে পড়ছে। বুড়ি লাফাতে লাফাতে কোর্টঘর থেকে বেরুবার সময় বলে, 'মেয়েকে কতবার বলেছি, বেশি টাকা দাবি কর, মেয়ে আমার কথায় কান দিল না। হুঁ-হুঁ, আমি জানি। যেদিন থেকে ছোঁড়া এসেছে, তখনই বলেছি, চিঠিপত্রগুলো যত্ন করে রাখিস, হুঁ-হুঁ।'

ভিড়ের মধ্যে হেলেনকে দেখতে পেলাম না। বোধ হয় আগেই চলে গেছে। তবে ধন্যবাদ না জানিয়ে চলে যাওয়ার অসৌজন্যতা আমার দৃষ্টি এড়ায় নি।

বুড়ি বলল, 'ডিক্রীটা তাড়াতাড়ি বার করে জারি করার ব্যবস্থা করতে হবে। যত তাড়াতাড়ি টাকা আদায় করা যায়, ততই ভাল।'

এটর্নি অমিয় চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'তার জন্য ভাববেন না, মামলায় যখন জিতেছি, সব তাড়াতাড়ি করে দেব।'

কয়েকদিন পরে মিস্টার চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার দেখা। তিনি চিৎকার করে বললেন, 'আরে মশাই, চেম্বারে যাব ভাবছিলাম। তাজ্জব ব্যাপার। মেয়েদের মন বোঝা ভার। মিস গুবার্ট লিখে পাঠিয়েছেন, ডিক্রী জারি করতে হবে না, ক্ষতিপূরণের টাকায় তাঁর কোন প্রয়োজন নেই। উনি নাকি শুধু মামলায় জিততে চেয়েছিলেন, তার বেশি কিছু নয়। কিছু বুঝতে না পেরে বাড়িতে চিঠি পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু বেয়ারা ফিরে এসেছে। উনি প্লেনে ঢাকায় চলে গেছেন।'

আলোচনা

পুরনো রেকর্ড সংগ্রহ

মহাশয়,

আপনার পত্রিকায় গানের আসরে শার্ঙ্গদেবের সময়োচিত ও মূল্যবান আলোচনার জন্যে বহু ধন্যবাদ। প্রসঙ্গক্রমে কিছু কিছু গায়কের কথা উল্লেখ থাকলেও নিয়মিত এই বিভাগে আগেকার বিখ্যাত গীতিকার ও শিল্পীদের সংক্ষিপ্ত জীবনকথা আরো আকর্ষণীয় হবে সন্দেহ নেই। ৯ই পৌষের পত্রিকার আসরে রেকর্ড সংগীতের মারফতে পুরাতন শ্রেষ্ঠ শিল্পীদের সাঙ্গীতিক স্মৃতি তাদের ভবিষ্যদ্বংশীয়দের সামনে তুলে ধরবার আবেদন সংগীতামোদী মাত্রেরই নিতান্ত প্রয়োজনীয় কাজ, একথা বলবার অপেক্ষা করা সত্যিকারের শোচনীয় ব্যাপার। এতে পূর্বসূরীদের স্মরণ করে নিজেদের সম্মান বাড়িয়ে তোলা হয় শুধু নয়, আধুনিক বাংলা গানের বিবর্তন ও পরিণতি সম্বন্ধে সম্যক ধারণালাভে এর প্রয়োজন বিশেষ। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কোন ঐতিহ্যের একটা গৌরবের দিক বিস্মৃত হওয়া পরম ক্ষতিকর। গানের আসরের শার্ঙ্গদেবের ভাষায় 'নতুন প্রচেষ্টার পূর্বে এই আদি প্রচেষ্টার সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা বিশেষ দরকার, তা না হলে সৃষ্টিতে পরিণতি আসা সম্ভব নয়।'

ঠিক একপুরুষ আগে না বলে আমাদেরই ছোট বেলাকার সুপরিচিত রেকর্ড শিল্পীদের নাম এরই মধ্যে ভুলে যেতে বসেছি আমরা। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ঘোষ, কে মল্লিক, ধীরেন দাস, হীরেন বসু, হরেন চট্টোপাধ্যায়, হরেন দত্ত, হরিপদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণচন্দ্র দে, অনাথ বসু, যুগল পাল, হৃদয়রঞ্জন রায়, হরিপদ রায়, নির্মলচন্দ্র বড়াল, গোপালচন্দ্র সেন, আব্বাসউদ্দিন, সুধামাধব সেনগুপ্ত, নীহারবালা, আঙ্গুরবালা, ইন্দুবালা, আশ্চর্যময়ী, মানিকমালা, বীণাপাণি, হরিমতী, রেণুবালা, দেববালা, প্রমোদা, অণিমা, হীরামতী, জ্ঞানপ্রিয়া, ঊষারাণী, সীতা, গোপালীবালা, কমলা (ঝরিয়া) প্রভৃতি ছিলেন তখনকার দিনের জনপ্রিয় শিল্পী। ভদ্র পরিবারের মেয়েদের নৃত্যগীত চর্চার এতো সুযোগ ছিল না সে-যুগে, মহিলা শিল্পীরা আসতেন সাধারণত বাঈজী দেবদাসী প্রভৃতি মধ্য থেকে। তাঁদের মধ্যে অনেকে অসামান্য শিল্প প্রতিভার সাহায্যে জনসাধারণের প্রভূত মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছেন। সঙ্গীতের ইতিহাসে তাঁদের শিল্পকুশলতা ও অবদান অস্বীকার করবার নয় কখনো। উচ্চাঙ্গ শিল্পীকুলের সঙ্গে এঁদের নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়। গ্রামোফোন কোম্পানীতে দুষ্প্রাপ্য বিবেচিত হলেও যে সমস্ত রেকর্ড অপেক্ষাকৃত পরের যুগের সে-গুলি সংগ্রহ করা যেতে পারে অল্প চেষ্টায়। গ্রামোফোনের আদি যুগের গাইয়েদের কিছু কিছু গানের রেকর্ড পাওয়াও কঠিন নয় একেবারে। এখনো পুরোন রেকর্ডের দোকানে বা বহু সম্পন্ন গৃহস্থের বাড়ীতে ব্ল্যাকলেবেল রেকর্ড অক্ষুণ্ণ অবস্থায় পাওয়া যাবে। আগেকার কোন কোন জীবিত বা মৃত গায়কের রেকর্ড অনুপম স্মারকবস্তু হিসেবে তাঁদের নিজেদের পারিবারিক এলবামে সযত্নে রক্ষিত থাকা অসম্ভব নয়। রেকর্ড সংগ্রহের বাতিক আছে এমন কিছু সংখ্যক সংগ্রাহক যে দুর্লভ এমন নয়। ব্যবসায়ী হিসেবে গ্রামোফোন কোম্পানী যে সকল রেকর্ডের বাজারে চাহিদা থাকেন না, তা বাতিল করে দিয়ে চালু গানের রেকর্ড বাজারে ছাড়েন। তবু পুরাতন স্টকে কিছু কিছু যা অবশিষ্ট ছিল, তা নষ্ট করা শেষ হয়েছে মাত্র ৪।৫ বছর আগে। চিঠিপত্রে অনুসন্ধান করার চাইতে স্টুডিওতে গিয়ে চেষ্টা করলে একেবারে বিফল হতে হতো না সে সময়। কিছুটা অভিজ্ঞতার ফলে আমি বলতে পারি এভাবে একটু চেষ্টা ও যত্ন নিলে পুরোন দিনের মূল্যবান শিল্পস্বাক্ষরগুলি অনেক পরিমাণে উদ্ধার করা যায়। আমার ব্যক্তিগত সংগ্রহে স্বর্গত লালচাঁদ বড়াল, খেয়ালীবাবু, শশীভূষণ দে, জমিরুদ্দিন খাঁ, দক্ষিণারঞ্জন গুহ, অভয়াপদ চট্টোপাধ্যায়, নারায়ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, চণ্ডীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ দত্ত, মাস্টার রাহিত, কালু কাওয়াল, পিয়ারু কাওয়াল, সোয়াই গন্ধর্ব, মৌজুদ্দিন, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ইমদাদ খাঁ, আব্দুল আজিজ খাঁ, গোবিন্দরাও টেম্বে, ইউসুফ খাঁ, আলিবক্স, তালিম হোসেন, বরকাতুল্লা খাঁ, অম্বালী খাঁ, কৃষ্ণভামিনী, বেদানা, বিনোদিনী, মিস দাস, গহরজান, বৃন্দাকিরণ, সরলা বাঈ, মালকাজান, মানদা, কুসুমকুমারী, পূর্ণকুমারী, তারাসুন্দরী, পান্নাময়ী, জোহরা বাঈ প্রমুখ আদি যুগের শিল্পীর যে সমস্ত কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতের রেকর্ড সংগৃহীত আছে, এ প্রচেষ্টায় তা সামান্যও সাহায্য করতে পারে ভেবে আশান্বিত হয়েছি। দেশ-এর এবং বিভিন্ন পত্রিকায় এ-নিয়ে আলোচনা হলে শিক্ষিত সমাজকে অবহিত করে তুললে। কোন সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান বা সঙ্গীতামোদীদের সমবেত উদ্যোগে একাজ যতো দ্রুত ও সহজে সম্ভব, কোন গবেষকের একক চেষ্টায় তা হতে পারে না। সঙ্গীত নাটক একাডেমী যেভাবে অগ্রসর হয়েছেন, তেমনি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রস্তাবিত পরিষদ এ ব্যাপারে অগ্রণী হলে দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হবে বলা বাহুল্য।

এই প্রসঙ্গে এও উল্লেখযোগ্য যে, এখনো যেসব প্রতিভাবান সঙ্গীতসাধক আমাদের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদের অমূল্য সাধনাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে চলেছি আমরা। যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, অমরনাথ ভট্টাচার্য, কালিপদ পাঠক, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়কৃষ্ণ সান্ন্যাল, শচীনদাস মতিলাল, বিভূতিভূষণ দত্ত, জ্ঞানকৃষ্ণ উপাধ্যায়, অনাথনাথ বসু, রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কাশীনাথ চট্টোপাধ্যায়, রাধাশ্যাম দাস, মিত্র ঠাকুর পরিবার ইত্যাদি বহু গুণীর নামোল্লেখ করা যেতে পারে, যাঁদের গান রেকর্ডে প্রচারিত হওয়া দরকার। আত্মবিস্মৃতি আমাদের সর্বনাশের মূলে একথা বুঝতে যতো দেরি হবে, ততো পরিতাপের কারণ বেড়ে চলবে বই নয়। ইতি,—শ্রীকোহিনূর কান্তি করণ, মেদিনীপুর।

গানের আসর

শাঙ্গর্দেব

"যেথা সুরসপ্তকে বাঁধিয়া বীণা
বাণী শুভ্রকমলাসীনা।"

বীণাবাদিনী সরস্বতীর অর্চনা সমাপ্ত হয়েছে। বহু প্রাচীনকাল থেকে বীণাবাদিনীর পূজো বাংলায় চলে আসছে এবং তাঁর বীণার একাধিক রূপও পরিকল্পিত হয়েছে। এই পরিকল্পনার বিশেষত্ব এই যে, সরস্বতীকরধৃত এক শ্রেণীর বীণার পর্দা নেই এবং তার একটি; আর অপর শ্রেণীর বীণায় পর্দা এবং তারের বাহুল্য বর্তমান। প্রথমোক্ত শ্রেণীর বীণাই মধ্যযুগের সরস্বতী মূর্তিতে প্রধানত প্রচলিত ছিল এবং এই বীণার রূপটি আমাদের বর্তমান একতারার মত। এই একতারা কিন্তু গোপীযন্ত্র নয়—এর আকৃতিতে বীণার রূপটি এখনও বর্তমান। অনেকেই হয়তো এক শ্রেণীর একতারা লক্ষ্য করে থাকবেন, যাতে পাকা বাঁশের ওপরে একটিমাত্র তার লাগানো এবং তার সঙ্গে সংযুক্ত একটি লাউ বা তুম্ব। শাস্ত্রে বীণার এই লাউকে 'তুম্ব' বলা হয়ে থাকে। এই একতারাটি আসলে এক রকমের বীণা এবং পূর্বে এই ধরনের তাবৎ যন্ত্রই 'বীণার' অন্তর্ভুক্ত ছিল। সরস্বতীর হাতে অপর এক ধরনের যে বীণা বিরাজ করত, তার নাম কচ্ছপী বীণা। এই কচ্ছপী বীণা অনেকটা সেতারের মত পর্দাবিশিষ্ট এবং একাধিক তার সংযুক্ত। শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'সরস্বত্যাস্তু কচ্ছপী'; কিন্তু তথাপি প্রাচীন বাংলায় কচ্ছপীর পরিবর্তে একতন্ত্রী বীণাই সরস্বতীর হাতে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছে।

মধ্যযুগের বাংলায়, অর্থাৎ দশম শতাব্দী থেকে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত যেসব বীণাবাদিনী সরস্বতীর মূর্তি দেখা যায়, তাতে যে ধরনের বীণা সংযুক্ত হয়েছে, সে খুব সরল এবং সহজ শ্রেণীর বীণা। এতে একটিমাত্র তার এবং একটি তুম্ব—সাধারণত এই তুম্বটি বীণাদণ্ডের ওপর দিকেই সংলগ্ন থাকত। বীণার দণ্ডটি বোধ হয় প্রায়ই পাকা বাঁশে প্রস্তুত হ'ত, তবে কাঠের ব্যবহারও ছিল। কিন্তু বাঁশের সুবিধা এই যে, একেবারে সুগোল এবং ফাঁপা বস্তুটি প্রকৃতির বহস্তনির্মিত অবস্থাতেই পাওয়া সম্ভব। এই বীণা একতন্ত্রী জাতীয় বীণার অন্তর্ভুক্ত। দণ্ডে পর্দার প্রয়োজন হ'ত না—হাতের টিপেই বাজানো চলত—অথবা অনেক সময় তানপুরার মত কেবল সুর

একতন্ত্রী বীণা হস্তে প্রাচীন সরস্বতী দেবীর মূর্তি

রাখা হত। এই জাতীয় কোন কোন বীণায় জোয়ারি থাকত এবং কোন কোনটিতে থাকত না। জোয়ারিযুক্ত বীণায় বাজাবার সময় তর্জনী ব্যবহার করা হত না, কেননা, মধ্যমাঙ্গুলিতে আকর্ষণ করলে রণনাত্মক স্থলে ধ্বনিটি সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। এখনো আমরা এই নির্দেশ মেনে তানপুরার প্রথম তারটিতে মধ্যমাঙ্গুলি দ্বারা আঘাত করে থাকি। জোয়ারিযুক্ত এই শ্রেণীর বীণা 'সকল' জাতীয় বীণার অন্তর্ভুক্ত। সঙ্গীত শাস্ত্রে 'কলা' বা 'জীবা' এই দুটি শব্দে জোয়ারি বোঝায়। এই 'কলা' বা 'জীবা' নাদকে সঞ্জীবিত করে থাকে। যেসব যন্ত্রে জোয়ারি থাকত না, তাদের বলা হত 'নিষ্কল'। এই সব যন্ত্র সুরের সূক্ষ্মতা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হত এবং আওয়াজ যাতে ভালভাবে প্রস্ফুটিত হয়, সেজন্য এসব যন্ত্রের তারে তর্জনী দ্বারা আঘাত করা হত। এখানে এটাও বলে রাখা উচিত যে, অনেক বীণা 'কোণ' বা বীণাবাদন দণ্ড দ্বারা না বাজিয়ে আঙুলের আঘাতেও বাজানো হত।

এই একতন্ত্রী বীণার একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল এবং এর একটি নাম ছিল ব্রহ্মবীণা। এই বীণা সম্বন্ধে শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

শ্রুতয়োঽথ স্বরা মূর্ছাস্তানা নানাবিধাস্তথা।
একতন্ত্রীবীণায়াং সর্বমেতৎ প্রতিষ্ঠিতম্॥
সমুদায়োঽস্তি নান্যত্র মতঙ্গোঽপ্যাহ তদ্‌যথা।
একতন্ত্র্যাং স্বয়মেবাস্তি সরস্বতীতি॥

—নান্যঃ—

অর্থাৎ একতন্ত্রী বীণাতে শ্রুতি, স্বর, মূর্ছনা, তান—এই সবই একসঙ্গে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং এই বীণাতে সাক্ষাৎ সরস্বতী বিরাজ করছেন। প্রাচীন বাংলার সরস্বতীমূর্তিগুলিতে এই একতন্ত্রীবীণা বিশেষ যত্নের সঙ্গে রচিত হয়েছে।

এই ধরনের যে সব একতন্ত্রী বীণা মধ্যযুগের বাংলায় বিশেষ পরিচিত ছিল তার মধ্যে একটি হল 'কপিলাস' অথবা 'কৈলাস' বীণা। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল এবং বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে এই বীণার যথেষ্ট উল্লেখ আছে।

শাস্ত্রে কপিলাসকে আদ্য বীণা বলা হয়েছে। এই জাতীয়-বীণাতেও সাধারণত সুপক্ক বংশদণ্ড ব্যবহৃত হ'ত। এর তার মাত্র একটি এবং এতেও পর্দা নেই। এতে বোধ হয় দুটি তুম্বী যোজনা করা হত। তারের সঙ্গে জোয়ারি থাকাতে বাজাবার সময় এতে তানপুরার মত একটি সুমিষ্ট

রণন পাওয়া যেত। এই বীণা ব্যবহৃত হত গানের সঙ্গে এবং কী ধরনের গান তাও শাস্ত্রে বলা হয়েছে। এই গানের নাম 'ক্ষুদ্রগীত'। ক্ষুদ্রগীত বলতে বোঝায় সেযুগের কাব্যসঙ্গীত।

"তাল ধাতুযুক্ত বাক্য মাত্র ক্ষুদ্রগীত" যে গান ধাতুযুক্ত অর্থাৎ আজকালকার স্থায়ী অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগের মত তৎকাল প্রচলিত কলিম্বারা নিবন্ধ এবং তালে গাওয়া হত তাকেই বলা হত ক্ষুদ্রগীত। ধ্রুবপদ এই ক্ষুদ্রগীতের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এই বর্ণনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, মধ্যযুগে প্রচলিত সাধারণ গানের সঙ্গে সহযোগিতার জন্য কপিলাস বীণার ব্যাপক ব্যবহার ছিল। আমার মনে হয় সে যুগের সরস্বতীর হাতে আমরা যে একতন্ত্রী বীণা দেখি সেটি এই কপিলাস ভিন্ন আর কিছু নয়। একটি তার এবং বংশদণ্ডে নির্মিত হলেও এই বীণা অতিশয় সুদৃশ্য। শাস্ত্রে এই বীণার যে বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া আছে তাতে রুপা, পিতল, কাঁসা প্রভৃতির যোগে যন্ত্রটিকে মনোহর এবং সুদৃঢ় করতে যে সব রকম প্রচেষ্টা করা হয়েছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ থাকে না।

ক্রমে এই কপিলাস বীণার রূপান্তর ঘটেছে। যখন আমাদের কাব্যসঙ্গীতে এই যন্ত্রের সহযোগিতার আর প্রয়োজন রইল না তখন এটিকে সঙ্গীতের অপর এক সম্প্রদায় গ্রহণ করলেন এবং এইভাবে এটি এখন একপ্রকার লোকগীতির অন্তর্ভুক্ত ভজনগানের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়। বাংলার বাইরেও এটি এক শ্রেণীর সন্ন্যাসীদের মধ্যে প্রচলিত আছে। দিন কয়েক আগে পথে যেতে যেতে দেখি এক সাধু ঠিক এই রকমের একটি যন্ত্র নিয়ে চলেছে। লোকটি বাঙালী নয়। যন্ত্রের নাম জিজ্ঞাসা করাতে সে বল্লে—"একে বলে একতারা, আসলে এর নাম 'তুম্বা'।" বলা বাহুল্য এই নামেতেই বীণার ঐতিহ্য রয়েছে। সাধুর দেশ নাসিক-এ।

এ গেল কেবলমাত্র একতন্ত্রী বীণার ব্যাপার। এ ছাড়াও বাংলায় মধ্যযুগে নানা প্রকার বীণা প্রচলিত ছিল। উদাহরণ-স্বরূপ 'সপ্তস্বরা', 'স্বরমণ্ডল', 'রুদ্র-বীণা', 'মধুস্রবা', 'যন্ত্র', 'পিনাকী', 'বল্লকী' এই সব বীণার নাম করা যেতে পারে।

মঙ্গলকাব্যে 'সপ্তস্বরা' বীণার বহুল উল্লেখ রয়েছে। এই বীণার যথাযথ বর্ণনা আমি খুঁজে পাই নি সুতরাং দৃঢ়তার সঙ্গে কিছু বলতে পারছি না, তবে সম্ভবত সাতটি তার ছিল বলেই এই যন্ত্রের নাম হয়েছে 'সপ্তস্বরা'। এক ধরনের সপ্ততন্ত্রী বীণাবাদিনীর পূজা নাকি যবদ্বীপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। সেটি হয়তো একদা বাংলায় প্রচলিত এই সপ্তস্বরা বীণা। এটি চিত্রাবীণারই নামান্তর কি না জানি না কেননা সপ্ত-তন্ত্রী বীণা বলতে সেযুগে চিত্রাবীণাকেই বোঝাতো।

'স্বরমণ্ডল' যন্ত্রটি মোগলযুগেও যথেষ্ট প্রচলিত ছিল। আমরা যেরকম বীণা সচরাচর দেখতে পাই স্বরমণ্ডলের আকৃতি সে রকমের নয়। এতে একটি ফ্রেমের ওপর অনেকগুলি তার সমান্তরালভাবে পর পর সাজানো থাকে এবং এক একটি তার এক একটি সুরে বাঁধা হয়। আইন-ই-আকবরিতে এই যন্ত্রের বর্ণনায় বলা হয়েছে যে, স্বর-মণ্ডল 'কানুন' নামক যন্ত্রের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত এবং এতে একুশটি তার আছে, তার মধ্যে কয়েকটি স্টীলের, কয়েকটি পিতলের এবং কয়েকটি তাঁতের। তারের মিজ্‌রাপ সহযোগে এই যন্ত্র বাজানো হয়। কানগুলি মোচড়াবার জন্য একরকম চাবি আছে, তাতে সূক্ষ্মভাবে সুর বাঁধতে সুবিধা হয়। বর্তমানে এ যন্ত্র বোধ হয় একমাত্র পাঞ্জাবে কিছুটা প্রচলিত আছে কলকাতায় যাঁরা ওস্তাদ গোলাম আলীর গান শুনেছেন তাঁরা তাঁর হাতে এই যন্ত্রটি লক্ষ্য করতে নিশ্চয়ই ভোলেন নি। বিদেশী সঙ্গীতজ্ঞগণ এই যন্ত্রকে Indian Dulcimer আখ্যা দিয়েছেন।

রুদ্রবীণা সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ বিখ্যাত সুতরাং এর বিশেষ পরিচয় সঙ্গীতজ্ঞদের কাছে বোধ করি নতুন করে দেবার প্রয়োজন নেই। রুদ্রবীণায় দুটি তুম্ব, মূলতন্ত্রী ভিন্ন লৌহতন্ত্রী এবং শ্রুতিতন্ত্রীও ছিল। এতে মোটমাট আঠারোটি পর্দা ছিল। এই বীণাকে অনেকে পরে রবাবে পরিণত হয়েছে বলে মনে করেন। আমার কিন্তু মনে হয় এই ধারণা ভ্রমাত্মক। রবাবও মধ্যযুগের বাংলায় রুদ্রবীণার সঙ্গেই ব্যবহৃত হত। প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্যে রবাবের উল্লেখ কম নয় এবং রবাব বাদনের চিত্রও আছে।

'মধুস্রবা'র অপর নাম 'মধুস্যন্দী'। এই বীণার উল্লেখ আছে বটে শাস্ত্রে কিন্তু কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

'যন্ত্র' নামক বীণার ব্যবহার বেশ ব্যাপক ছিল। বিভিন্ন মঙ্গলকাব্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। আইন-ই-আকবরি-তে এর যে বর্ণনা আছে, সেই অনুসারে জানা যায় যে, এই বাদ্যে দণ্ডের দুদিকে দুটি 'তুম্ব' এবং ষোলটি পর্দার ওপরে পাঁচটি তার ছিল।

'পিনাকী' বীণার সঙ্গে স্বয়ং মহাদেবের নাম জড়িত। এই বীণার আকৃতি তুম্বযুক্ত ধনুকের মত এবং এটি বাজানো হত ঘোড়ার লোমের ছড়ি দিয়ে।

'বল্লকী' নামক বীণার উল্লেখ থাকলেও তেমন বর্ণনা পাওয়া যায় না। এক জায়গায় দেখেছি, কেবলমাত্র লেখা আছে 'বল্লকী ষড়গুণা'। এটুকু থেকে যদি এই অনুমান করা যায় যে, এই প্রকার বীণায় ছটি তন্ত্রী ছিল, তাহলে সে অনুমান সংগত হয় কি না বলতে পারি না।

এইগুলি হল মধ্যযুগের বাংলায় বিশেষ পরিচিত এবং বিভিন্ন কাব্যাদিতে উল্লিখিত বীণা। এছাড়া শাস্ত্রে বাংলায় প্রচলিত আরও বহু প্রকার বীণার নাম পাওয়া যায়—যথা—আলাপিণী, কিন্নরী, বিপঞ্চী, জ্যেষ্ঠা, চিত্রা, ঘোষবতী, জয়া, হস্তিকা, কুব্জিকা, কূর্মা, সারঙ্গী, পরিবাদিনী, ত্রিসরী, শততন্ত্রী, নকুল, ঔদুম্বরী, রাবণহস্ত, ঘোণ, ইত্যাদি।

এখন কথা হচ্ছে, এসব বীণা গেল

কোথায়? সবই কি লোপ পেল? এর উত্তরে সঙ্গীতশাস্ত্রবেত্তা শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করে এ প্রসঙ্গ শেষ করি—

'তখনকার পরিভাষা অনুযায়ী তাঁত বা তার দিয়ে—বাজনার বাদ্যযন্ত্রের সাধারণ নামই ছিল 'বীণা'; বিশেষ করে কবি বা সাহিত্যিকের লেখায়। 'বীণা' নামে মাত্র একটি বা এক রকমের বাদ্য মনে করা হত না। এখনও ত বাংলা দেশে অনেক অনেক যন্ত্র আছে, যেগুলি তন্ত্রীবাদ্য খাতিরে বীণাই মনে করা যেতে পারে। তবুও এদেরকে 'বীণা' বলা হয় না। যথা, সারিন্দা' বাংলার পল্লীগ্রামাঞ্চলেই বিশেষ প্রচলিত; একতারা, দোতারা, তে-তারা, গোপীযন্ত্র, গাব্-গুবা-গুব্ (এটা একাধারে সুরের ও তালের যন্ত্র) ও সংগ্রহ মণিপুর-ত্রিপুরা, সিলেট অঞ্চলে প্রসিদ্ধ)। কন্তু—এগুলিকে আমরা এখন 'বীণা' বলিনে। সর্বভারত পক্ষেও ত সেতার, রোদ, সুরশৃঙ্গার, সুরবাহার, কানুন, সুরাজ বা বেহালাকেও এখন কেউ বীণা নাম দেয় না। ইউরোপের পিয়ানো, ম্যান্ডোলিন, ব্যাঞ্জো, প্রভৃতি তার বা তাঁতের যন্ত্রগুলিও—সঙ্গীত রত্নাকরের পরিভাষায় 'বীণা' শ্রেণীর মধ্যে পড়ে।'

অতএব দেখা যাচ্ছে, বীণাগুলি ঠিক লোপ পায়নি—অনেক ক্ষেত্রে রূপান্তর গ্রহণ করেছে অথবা নাম পাল্টেছে। পরিচয়ান্তরও ঘটেছে বৈকি অনেকটা। কালের ব্যবধানেই ঐ ব্যবধানের সংঘটন হয়েছে।

আসরের খবর

মাদ্রাজ মিউজিক একাডেমি

গত জানুয়ারী মাসে মাদ্রাজ মিউজিক একাডেমির অষ্টাবিংশতিতম কনফারেন্সে তপ্য সঙ্গীতজ্ঞকে সম্মানিত করা হয়েছে। এ'দের মধ্যে অধ্যাপক শাম্বমূর্তি ও শ্রীকৃষ্ণ আয়ার সঙ্গীত-আলোচনা-রসিকদের নিকট সুপরিচিত। ভারতীয় সুপ্রীম কোর্টের ভূতপূর্ব বিচারপতি পতঞ্জলী শাস্ত্রী বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছেন, দক্ষিণ ভারতে ভাষাগত বিরোধ যেন সঙ্গীতের ক্ষেত্রে প্রবেশ না করে। কনফারেন্সের সভাপতি ছিলেন বিদ্বান শ্রীযুক্ত সুব্রহ্মণ্য পিল্লেই। মিউজিক একাডেমির স্বনামধন্য কর্মী সুপণ্ডিত ডাঃ ভি রাঘবন এই অনুষ্ঠানে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন।

শ্রীসুব্রহ্মণ্য পিল্লেই কর্ণাটক সঙ্গীতের শীর্ষস্থানীয়দের অন্যতম। ইনি আন্নামালাই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষ। এছাড়া বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের বোর্ড এবং ভারতীয় বা প্রাদেশিক নানা সাঙ্গীতিক সমিতির সঙ্গে ইনি যুক্ত আছেন।

অধ্যাপক শাম্বমূর্তি মাদ্রাজের কুইন মেরী কলেজে সঙ্গীতের লেকচারাররূপে প্রবেশ করেন ১৯২৮ সালে। ১৯৩১-৩২ সালে তিনি জার্মানির মিউনিক স্টেট একাডেমি অফ মিউজিকে তুলনামূলক সঙ্গীত সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করেন। ১৯৩৭ সাল থেকে তিনি মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গীত বিভাগের অধ্যক্ষরূপে প্রতিষ্ঠিত আছেন। সঙ্গীতের শিক্ষা সম্বন্ধে ইনি বহু পুস্তক রচনা করেছেন এবং সঙ্গীতের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ব্যাপারে ইনি সমগ্র ভারতে একজন বিশেষজ্ঞ বলে স্বীকৃত। সঙ্গীত শাস্ত্রেও এ'র বিশেষ ব্যুৎপত্তি আছে।

শ্রীকৃষ্ণ আয়ার প্রথমে আইনজীবী ছিলেন, পরে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। মাদ্রাজে কংগ্রেসের বিভিন্ন সভায় এ'র গান একটি বিশেষ আকর্ষণ ছিল। কিছুকাল তিনি সংবাদসেবী ছিলেন। সঙ্গীত ছাড়া অভিনয়েও এ'র বিশেষ পারদর্শিতা আছে এবং ভরত-নাট্যও ইনি বিশেষ যত্নের সঙ্গে শিক্ষা করেন নটেশ মেলাত্তুর আয়ারের কাছ থেকে। মাদ্রাজ সঙ্গীত মহলে ইনি একজন বিশিষ্ট সমালোচক বলে খ্যাত। এ'র Personalities in Present Day Music' নামক গ্রন্থটি পাঠক মহলে আদৃত হয়েছে।

প্রবীণ সঙ্গীতজ্ঞ শ্রীশেষ আয়েঙ্গার এবং শ্রীআন্নাস্বামী ভগবত্তারও বিশেষভাবে সম্মানিত হন।

মাদ্রাজ আজ শুধু ব্যবহারিক সঙ্গীতেই নয়, সঙ্গীতের শাস্ত্রচর্চা এবং সঙ্গীত সাহিত্যও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। গত কয়েক বৎসর ধরে মাদ্রাজের বিভিন্ন স্থান থেকে ইংরেজিতে এবং সংস্কৃতে যেসব গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, তার জন্য মাদ্রাজ সারা ভারতের সঙ্গীতজ্ঞগণের কাছ থেকে অকুণ্ঠ সাধুবাদ পেয়ে আসছে।

সবিনয় নিবেদন,

আলোচনা

গত ১২ সংখ্যা 'দেশে' গানের আসরে ওস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান লিপিবদ্ধ করে সঙ্গীত-জগতে প্রচার সম্বন্ধে যা লিখেছেন, তা খুবই মূল্যবান। এ বিষয়ে আপনারা যে প্রথম দৃষ্টিপাত করেছেন, সেজন্য ধন্যবাদ জানাই। এ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানাতে চাই। সুদীর্ঘ জীবন ধরে তিনি যে বিচিত্র রাগ-রাগিণী সৃষ্টি করেছেন, তা আজ ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে হাজার হাজার টাকার প্রয়োজন। এত টাকা ব্যয় করে তাঁর নিজের পক্ষে ছাপানো সম্ভব নয়। তাছাড়া তিনি এসব ছাপানোর ঘোর বিপক্ষে। কারণ বই পড়ে এ বিদ্যা আয়ত্ত করা যায় না। তার চেয়ে তিনি শেখানো শ্রেয় মনে করেন। তাঁর আড়াই

হাজার শিষ্যের মধ্যে যে পাঁচজন সত্যকার গুণী শিষ্য বলে স্বীকৃত হয়েছেন, তাঁদের মধ্যে রয়েছেন তাঁর কন্যা শ্রীমতী অন্নপূর্ণা (রবীন্দ্রশঙ্করের স্ত্রী)। তাঁকেই তিনি উত্তরকালে এইসব পান্ডুলিপির উপযুক্ত উত্তরাধিকারিণী ভাবেন। তবে আমাদের মনে হয়, তাঁর জীবিতকালে এসব প্রকাশ হওয়া খুবই প্রয়োজন, নইলে সংগীতের জগতে তাঁর দান কতখানি, তা অপ্রকাশ্যই রয়ে যাবে চিরদিন।

বর্তমানে এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর পক্ষে সংগীত সম্মেলনে এবং সভা-সমিতিতে নিজের অভিজ্ঞতা ও সুর-জগৎ সম্বন্ধে বলা সম্ভব হবে কিনা জানি না; তবে কেউ যদি তাঁর বাড়িতে সত্যিকার আগ্রহ নিয়ে শুনতে যান তিনি কখনো নিরাশ হবেন না।

সভা-সমিতিতে তিনি প্রায়ই বলে থাকেন যে, সংগীতবিদ্যা তিনি অল্পই শিখেছেন। তাঁর একথা হয়তো শুধু মামুলী বিনয় নয়; কারণ অন্যান্য ওস্তাদদের চেয়ে তিনি একেবারে স্বতন্ত্র এবং তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীও আলাদা। সুরের মধ্যে তিনি খোঁজেন খোদাকে, সে খোঁজা অনন্ত বলেই তাঁর মনে হয়—এ শিক্ষা অসমাপ্ত। তিনি নিজেই বলেন—"ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়েও আমি কোন সুরকে আয়ত্ত করতে পারি না। তারা শুধু আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে, ধরা দেয় না।" এ তাঁর অন্তরের কথা, বিনয় নয়।

বিনীতা—
সাইদা খানম, জয়নাগ রোড, ঢাকা।

চিত্রগ্রীব

চিলড্রেন্স লিটল থিয়েটারের উদ্যোগে কয়েকদিন আগে একটি অতি মনোরম ছোটদের আঁকা ছবির প্রদর্শনী হয়ে গেল। কলকাতা মিউজিয়ামের বাগানে ছোট্ট সামিয়ানা খাটিয়ে এই প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন শ্রীমতী রাণু মুখোপাধ্যায়। উদ্যোক্তাদের লক্ষ্য ছিল, যাতে কোনও শিল্পীর প্রতি অবিচার না হয়। ছবিগুলি সাজান-গোছানোয় কোন ত্রুটি ছিল না বটে, কিন্তু নাম তালিকার পুস্তিকা না থাকায় দর্শকরা একটু অসুবিধে বোধ করেছিলেন। শিল্পীদের বয়স অনুযায়ী ছবিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছিল। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণী হ'ল যথাক্রমে ৫ থেকে ৭ বছর, ৮ থেকে ১০ বছর এবং ১১ থেকে ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত। সব সমেত ১৮টি স্কুল এবং শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা ছবি পাঠিয়েছিল।

শিশুরা স্বভাব-শিল্পী। হাতে কাগজ-পেন্সিল পড়লেই ঝটপট ছবি এঁকে ফেলে। এদের আঁকিবুকি বড়দের কাছে অর্থশূন্য লাগে বটে, কিন্তু মন দিয়ে বোঝবার চেষ্টা করলে দেখা যায়, ঐসব আঁকিবুকি, তাদের ক্ষুদ্র জীবনে যে সরল এবং নিষ্পাপ চিন্তাধারা গড়ে উঠে, তারই অভিব্যক্তি,—এতে কোথাও কৃত্রিমতার ছাপ থাকে না। এরা বড়দের বাঁধাবাঁধি নিয়মের ধার ধারে না এবং প্রত্যেকেই স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। বিদেশীরা বলে থাকেন, ভারতীয় শিল্পীদের নাকি যথেষ্ট রসবোধ নেই। কিন্তু ছোটদের সম্বন্ধে এ বদনাম দেওয়া চলে না। কৌতুকপ্রিয়তায় এবং কল্পনা-

ঘোড়সওয়ার—ডি এন কানয়, বয়স ৯

প্রবণতায় এদেশের শিশুরা অন্য যে কোন দেশের শিশুদের সমকক্ষ, সে প্রমাণ বার বার পাওয়া যায়।

সামিয়ানার মধ্যে ঢুকেই মনে হ'ল যেন কোন স্বপ্নরাজ্যে এসে প্রবেশ করেছি। অদ্ভুত বর্ণ সমারোহ এবং বিচিত্র রেখার খেলা দেখতে দেখতে তন্ময় হয়ে গিয়েছিলাম। অ্যানাটমির নিয়মের সঙ্গে এদের কোন সম্বন্ধ নেই, অথচ প্রত্যেক ছবির চরিত্রগুলি অত্যন্ত জীবন্ত। এত সজীবতা বড়দের ছবিতে কদাচিৎ মেলে। এদের মধ্যে কে বেশী ভাল এবং কে কম ভাল, সে কথা বলা খুব শক্ত। এরা সকলেই ভাল। তবে লক্ষ্য করলাম, যত বয়স বেড়েছে ছবিও তত স্বতঃস্ফূর্তি হারিয়ে কষ্ট-কল্পিত হয়ে পড়েছে। ৫ থেকে ৭ বছর বয়সীদের ছবির মান আশাতীত উন্নত মনে হ'ল। সবচেয়ে স্ফূর্তি পাওয়া যায় এই শ্রেণীর শ্যামলী গুপ্তের 'ম্যাঁও ম্যাঁও' এবং 'বন্ধু পুষি' দেখে। নীনা গুপ্তের 'কাঠ-বিড়ালী', বেলা সরকারের 'রাজমিস্ত্রী', এল ডি দাগের 'গ্রাম্য-দৃশ্য', অঞ্জু চৌধুরীর 'শিশুদের পার্ক', রমেশ ডালমিয়ার 'আগুন লাগা বাড়ী', এ কে বয়ানওয়ালার 'হলদে পাখী' এবং সুললিত সিংহের 'ঝড়' উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া ইলা চৌধুরী, শীলা চৌধুরী, মনোহর সাঠিয়া এবং অরনিমা চাকলাদারের ছবিও খুব ভাল লেগেছে। নিম্নলিখিত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ছবি এসেছিল।

মণ্টেসারী স্কুল (বাটা), জগৎবন্ধু ইন্সটিটিউশন, মিত্র ইন্সটিটিউশন, হিন্দী হাইস্কুল, সেভ দি চিলড্রেন্স কমিটি, বিশ্বভারতী, সেণ্ট জন্স ডায়াসেশন স্কুল, সিটী কলেজ স্কুল, চণ্ডিচরণ মণিমেলা,

কুঁয়ার ধারে
বি বি শরমা, বয়স ১৩

গরুর গাড়ী
কে কে আগরওয়াল, বয়স ১৩

মুরলীধর বালিকা বিদ্যালয়, রামকৃষ্ণ মিশন, কেশব অ্যাকাডেমী, তরুণ সঙ্ঘ পাঠাগার, বালীগঞ্জ গভর্নমেণ্ট স্কুল, সাখাওয়াৎ মেমোরিয়াল স্কুল, সাউথ সাবার্বান স্কুল, বালিকা শিক্ষা সদন এবং সি এল টি আর্ট ট্রেনিং সেণ্টার।

*　　*　　*

কয়েকদিন আগে মার্কিন শিল্পী ডেনিয়েল ডিকার্সন-এর একটি চিত্র-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন ইউনাইটেড স্টেটস ইনফরমেশন সার্ভিস তাঁদের অডিটোরিয়াম হল-এ। ডেনিয়েল ডিকার্সন ফুলব্রাইট বৃত্তি লাভ করে ভারতে এসেছেন। এ'র ১১টি তৈলচিত্র এবং ১৪টি স্কেচ প্রদর্শন করা হয়েছিল। শিল্পী বয়সে তরুণ হলেও এ'র দৃষ্টিভঙ্গি রীতিমত পরিণত। প্রদর্শিত প্রত্যেক ছবিরই বস্তু-চরিত্র ভারতীয় কিন্তু ছবিগুলিতে কোথাও ভারতীয় চিত্রকলার ছাপ নেই। এ'র তৈলমাধ্যমব্যবহারশৈলী এখানকার অনেক ধুরন্ধর শিল্পীর পক্ষেও শিক্ষণীয়। যে স্কেচগুলি টাঙান হয়েছিল সেগুলি প্রায় সব ক'টিই বড় তৈলচিত্রের প্রাথমিক নক্সা। যতদূর সম্ভব স্বল্প রেখায় 'স্পট ড্রইঙ' ক'রে নিয়ে তা কিভাবে পরে বড় তৈলচিত্রে রূপান্তরিত করতে হয় সে সম্বন্ধে, যে সব ছাত্রছাত্রীরা এই প্রদর্শনীটি দেখেছেন, তাঁরা যথেষ্ট জ্ঞান লাভ করেছেন আশা করি। সম্পূর্ণ কল্পনাসম্ভূত কোনও রচনা লক্ষ্য করলাম না। অবশ্য প্রত্যেক গঠনকেই অল্প-বিস্তর বিকৃত করে শিল্পী অ্যাবসট্র্যাক্ট রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। এই বিকৃত গঠন থেকেও স্পষ্ট বোঝা যায় অ্যানাটমি সম্বন্ধে ইনি পূর্ণাঙ্গ জ্ঞানের অধিকারী। কোন স্টিললাইফ ছবি প্রদর্শন করা হয়নি। মনে হয় সক্রিয় বিষয়বস্তু রচনাতেই ডেনিয়েল স্বতঃস্ফূর্তি বোধ করে থাকেন। তৈল চিত্রগুলির মধ্যে দুর্বল রচনা একটিও চোখে পড়েনি। খুমচাওয়ালা (১) এবং নৃত্যরত বালক দুটির ছবিটি (৬) বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এ ছাড়া গরুর গাড়ী (৫), হাওড়ার পুল (১১), রুগ্ন শিশু (৭) এবং বাজারের ছবিটি (৩) উল্লেখযোগ্য।

ডেনিয়েল ডিকার্সন হ'লেন স্মিথ কলেজ, ম্যাসাচুসেটস-এর আর্টিস্ট-ইন-রেসিডেন্স।

বোম্বাই

চিত্রসেন

জাহাঙ্গীর আর্টগ্যালারীতে 'বম্বে আর্ট সোসাইটি'র ৬৪তম বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনীতে এবার মাত্র ২৭৪টি রচনা স্থান পেয়েছে। গত বছর ৯৫৪টি রচনা প্রদর্শিত হয়েছিল। বিভিন্ন শিল্পীরা এই প্রদর্শনীতে ১০৬৪টি রচনা দাখিল করেছিল, কিন্তু বিচারকদের নিকট

ইউথ—প্রভা আগে

৭৯০টি নিদর্শন প্রদর্শনের অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। সবশুদ্ধ তেলরঙে ৬০টি ছবি, জলরঙে ১১০টি, গ্রাফিক আর্ট রেখাচিত্র, উডকাট প্যাস্টেল চিত্র ইত্যাদি ৩০টি, ফটোগ্রাফ ৪৮টি ও ভাস্কর্য ২৬টি স্থান পেয়েছে। এবছর নির্বাচনে বিশেষ কড়াকড়ি অবলম্বন করা হয়েছিল। প্রদর্শনীতে শ্রেষ্ঠ রচনার জন্য সোসাইটির সুবর্ণ পদক ও ১৫০ টাকার স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীর পুরস্কার পাবার উপযুক্ত কোন রচনাই মনোনীত না হওয়াতে এবছর আর এই পুরস্কারটি দেওয়া হয়নি। রৌপ্য পদক পেয়েছেন—জলরঙ চিত্রে শ্রী এল ভি শেনভী তাঁর 'Temple' (১২৯) ও 'Weekly Bazaar' (১৩৯) ছবির জন্য; ভাস্কর্যে শ্রী এমডাভিয়েরওয়ালা কাষ্ঠনির্মিত 'Water carrier' মূর্তিটির জন্য (২৬৯); ফটোগ্রাফীতে শ্রী কে এন রুস্তমজী 'Winter Tracery' ফটোর জন্য (২০২)। ব্রোঞ্জ পদক পেয়েছেন—গ্রাফিক আর্টে শ্রী এস ডাভে 'কৃষ্ণলীলা' (৬৬) উডকাট ছবির জন্য; ভাস্কর্যে শ্রী এম ভি ওয়াঘ্ 'Torso' (২৫২); ফটো-গ্রাফীতে ডাঃ এস কুপার 'Rippling Reflections'এর জন্য। তেলরঙ চিত্রের জন্য কোন শিল্পীই সোসাইটির কোন পদক পায়নি। তবে বিভিন্ন বিভাগে অর্থ পুরস্কার অনেকেই পেয়েছে।

চারুকলায় বম্বে আর্ট সোসাইটি শহরের সর্বাধিক প্রাচীন ও সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান। স্যার কাওয়াসজী জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে এই সোসাইটি আজ ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আর্ট প্রতিষ্ঠান বলে পরি-গণিত হয়েছে এবং এর সভ্য-সংখ্যাও অন্যান্য সমিতির তুলনায় অধিক। এই সব কারণেই এ'দের বাৎসরিক চিত্র-প্রদর্শনীটির গুরুত্ব অনেক। এদিককার প্রবীণ ও নবীন বহু শিল্পীই এতে যোগ দেয় এবং চিত্রকলার গতি কোন্ দিকে তারও একটা অনুমান করা যায়।

এ বছরের প্রদর্শনীটিকে অনেকেই আশানুরূপ উচ্চস্তরের হয়নি বলে মনে করলেও বেশ Interesting চিত্র-প্রদর্শনী হয়েছে বলা চলে। হাওয়া কোন্ দিকে বইছে, তাও বোঝা গেল। চিত্রকলার নির্বাচনে ও শ্রেষ্ঠত্ব বিচারে সব সময়ই মতদ্বৈধতা দেখা দেয় এবং বিচারকদের বিবেচনার বিরুদ্ধে কিছু না কিছু বলা যায়, সেইজন্যই সে বিষয়ে কিছু না লেখাই ভাল। তবে বিচারক সমিতির মধ্যে ২।১ জন 'Working Artist'এর নাম দেখলাম। এ'দের রচনা প্রদর্শনীতে না থাকলেও আমার মনে হয় চিত্রপ্রদর্শনীর বিচারকরূপে এ'দের না নেওয়াই ভাল। বিচারক সমিতিতে শুধু যে শিল্পী ও শিল্প-সমালোচকদেরই নিতে হবে, তারও কোন কথা নেই। উপরন্তু বিভিন্ন বিষয়ের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদেরও নেওয়া উচিত—উদাহরণস্বরূপ সাহিত্যিক,

সংগীতজ্ঞ, মিউজিয়ামের অধ্যক্ষ, শিল্প-সংগ্রহকারী বা কোন সমঝদার, বৈজ্ঞানিক, এ'দের নেওয়া প্রয়োজন। প্রদর্শনীটি একবার ঘুরে আসার পর একটা ব্যাপার হৃদয়ংগম করলাম যে, বেশীর ভাগ শিল্পীই পাশ্চাত্যের অনুকরণে তথাকথিত 'আধুনিকত্ব' বর্জন করছেন, বিশেষ করে তরুণ শিল্পীরা। কয়েকজন শিল্পীর রীতি পদ্ধতি, আঙ্গিকে আধুনিক পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও সে উগ্রতা আর নেই। তাছাড়া Abstract Art-এও খুব কম শিল্পীই আকৃষ্ট হয়েছেন। বাবুরাও সাড'ওয়েলকার 'অশ্বমেধ' (২১) ছবিটিতে Abstract রচনার চেষ্টা করেছেন, যার রঙ ও প্যাটার্ন প্রীতিপ্রদ, কিন্তু তাঁর 'Silly Profusion' (২৬) ছবিটি ভাল লাগল না। কৃতী শিল্পী তরুণমোহন সামন্ত ইদানীং তাঁর রচনার ভোল পাল্টেছেন এবং এখন 'আধুনিক' ছবি করার দিকে পরীক্ষা চালাচ্ছেন। তাঁর পূর্বেকার পর্বের ছবিগুলির আবেদনে আকৃষ্ট হতে হত। এখনকার পর্যায়ের তাঁর ব্যর্থ রচনা 'Sea of Tobacco Smoke' (২১)। তামাকের ধোঁয়ার সেক্‌স বিচার করার মতই ছবিটিও 'ননসেন্‌-সিক্যাল'। কিন্তু তাঁর অপর ছবি 'Distant Mirrors', (৮) বেশ interesting. বিরাট ক্যানভাসে হলদে রঙের Background-এ দুই কোণায় নীল চেয়ারে বসে আছে দুইটি নারী, ঈজিপ্টের প্রাচীর চিত্রের মত আঁকা,

সুইঙ—মহেন্দ্র পাণ্ড্যা
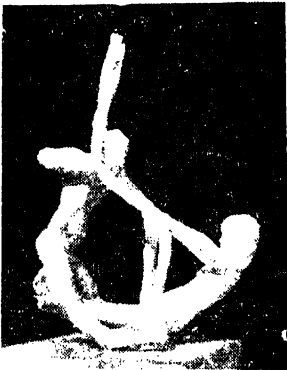
উয়োম্যান—এম এফ হুসেন

উপরে, বামপার্শ্বে দুলাইন Hieroglyph সম্বলিত। মধ্যস্থলের ফাঁকা হলদে জমিতে আবছা কয়েকটি নারীমূর্তি। সামন্ত এখনও নিজস্ব ধারা খুঁজে পাননি বলে মনে হয়। প্রদর্শনীতে 'আধুনিকত্ব' যাও-বা আছে, তা তেলরঙ চিত্রে, জলরঙে নেই। সেইজন্যই বোধ হয় কোন তেলরঙের ছবি পদক পাবার উপযুক্ত বলে বিবেচিত হয়নি। তাহলে, এদিকে শুভ-বুদ্ধির উদয় হয়েছে বলতে হবে। ইংলণ্ডের আন্তর্জাতিক ভাস্কর্যের প্রদর্শনীতে তার দিয়ে গঠিত 'Unknown Political Prisoner' মূর্তিটি যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, তার ঢেউ এখানকার শিল্পীদেরও প্রভাবান্বিত করেছে। প্রদর্শনীতে ভাস্কর্য বিভাগে তাঁর দ্বারা নির্মিত দুটি মূর্তি স্থান পেয়েছিল। কিন্তু চিত্রকলায় ইয়োরোপের নতুন আন্দোলন 'Abstracto-Concrete'এর প্রভাব এখনও যে কেন এসে পৌঁছায় নি বুঝলাম না।

এই প্রদর্শনীতে অন্যান্য প্রদেশের শিল্পীদের রচনা নেই বললেই হয়। এর একটা কারণ, বাইরের কোন শিল্পীদের ছবি সোসাইটি সোজাসুজি গ্রহণ করেন না, নিজেদের দায়িত্ব লাঘব করার জন্য। শহরের ২।৩ জন এজেণ্ট মারফৎ অন্যান্য প্রদেশের শিল্পীদের ছবি পাঠাতে হয়। এই ব্যবস্থায় অনেক শিল্পীই হয়ত ছবি পাঠাতে রাজী হননা এবং এজেণ্টরাও বোধহয় অন্যান্য প্রদেশের শিল্পীদের রচনা সংগ্রহ করতে ততটা উৎসাহী নন। ভবিষ্যতে প্রদর্শনীর উদ্যোক্তাদের এবিষয় আরও সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন ও অন্যান্য প্রদেশের শিল্পীদেরও এতে যোগ দেওয়া একান্ত আবশ্যক। স্থানীয় শিল্পী শ্রীনীহাররঞ্জন সেনগুপ্ত ও শ্রীকানাই কর্মকার প্রদর্শনীতে বাংলা দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা অলংকার প্রধান নীহার সেনগুপ্তের "Goddess Mahalaxmi" ও "হোলী" (১০৫ ও ১০৮) ও কানাই কর্মকারের দৃশ্যচিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য।

পোর্ট্রেট অংকন ইদানীং শিল্পীরা অবহেলা করেছে। স্যার কাওয়াসজী দুঃখ করে বলেন যে ভাল পোর্ট্রেট ছবিতে শিল্পীরা অধিক অর্থ উপার্জন করতে পারে অথচ এই শহরের পোর্ট্রেট ছবির চাহিদা শিল্পীরা মেটাতে পারে না। প্রদর্শনীতে বেশ কয়েকটি পোর্ট্রেট থাকলেও তেমন কিছু উল্লেখযোগ্য নয়।

গ্রাফিক আর্টে ও ভাস্কর্যে প্রদর্শনীর দৈন্যতা সব চাইতে বেশী। এরই মধ্যে

গরুর গাড়ি—শিল্পী রাওয়ল

অত্যন্ত শক্তিশালী রচনা শ্রী ডাঙের "কৃষ্ণলীলা" (৬৬) উড্‌কাট, লক্ষ্মণ পাইয়ের "গীত গোবিন্দ" রেখাচিত্র (৭২,৮০,৮২) আর জে নাথের "Mridanga Player" রেখাচিত্র।

জলরঙ বিভাগে মহিলা শিল্পীদের মধ্যে শ্রীমতী প্রভা আপ্পের "Youth" (১১৩) ও শ্রীমতী প্রফুল্ল যোশীর পাহাড়ী ছবির ধরনে "রাগ সারঙ্গ" ও রাগিণী তোড়ি (৯৪, ৯৫) বিশেষভাবে উল্লেখ-যোগ্য। শ্রী এস্ জি নিকম্‌এর তিনটি ছবিই আমার খুব ভাল লাগল, বিশেষ করে "Blue Girl" ছবিটি। নিকম্ যে একজন শক্তিমান শিল্পী এই তিনটি ছবিতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। ডি দালালের জলরঙে "বিরহোৎকণ্ঠিতা" ও তেলরঙে "Red Roofs" ছবি সার্থক রচনা। Child Art ও Kleeর সংমিশ্রণে আঁকা এম রাথোডের "Decision" ছবিটির (৯১) সহজ সরল আবেদনে মুগ্ধ হতে হয়। প্রখ্যাত শিল্পী হুসেনের "Woman" ছবিটি শক্তিশালী রচনা, রঙের বিন্যাস প্রীতিপ্রদ। ডি জি কুলকারণীর আধুনিক ধরনে "Yellow Kite"এর তুলনায় জল-রঙে "Mother of the field" ছবিটি চমকপ্রদ ও বাসোলী চিত্রকলার ধরণে আঁকা। কৃতী শিল্পী সাবান্ত্‌এর চমকপ্রদ ও বাসোলী চিত্রকলার ধরনে বৈচিত্র্য ও নতুনত্ব আছে।

গীতগোবিন্দ—লক্ষ্মণ পাই

ফটোগ্রাফী বিভাগ, ফটোগ্রাফারদের শিল্পী মনের বা কল্পনার কোন পরিচয় পেলাম না।
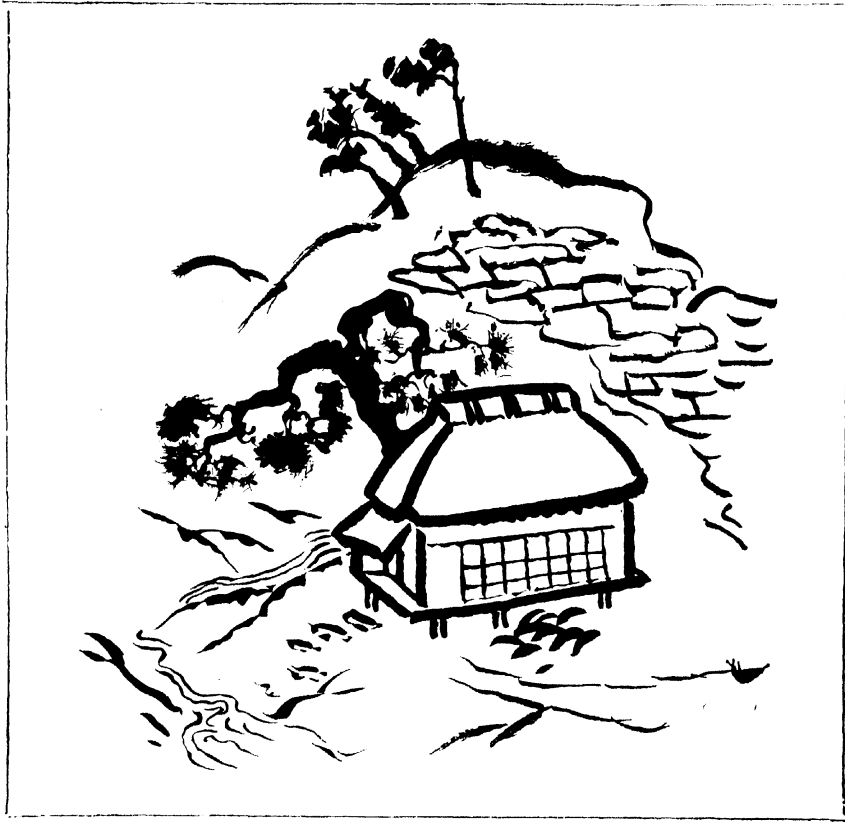
স্কেচ॥ শ্রীগোপাল ঘোষ

প্রেমের গল্প সংকলন

অষ্টাদশী—সাগরময় ঘোষ সম্পাদিত। ডি কে ব্যানার্জী এন্ড কোং, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম—৫৲ টাকা।

আঠারোটি প্রেমের গল্পের সংকলন অষ্টাদশী। সাম্প্রতিক কালের আঠারোজন কুশলী, প্রিয় লেখকের এক একটি করে প্রেমের গল্প এই সংকলনে স্থান পেয়েছে। লেখকদের মধ্যে রয়েছেন—সুবোধ ঘোষ, সতীনাথ ভাদুড়ী, বিমল মিত্র, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রতিভা বসু, সুশীল রায়, প্রভাত দেব সরকার, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়, নবেন্দু ঘোষ, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, রঞ্জন, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিমল কর, সমরেশ বসু, রমাপদ চৌধুরী, গৌরকিশোর ঘোষ।

"যে আঠারোজন কথাশিল্পীর রচনা এই গ্রন্থে পরিবেষণ করা হ'ল, তাঁদের রচনার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় বেশিদিনের নয়"—এই গ্রন্থের ভূমিকায় সংকলনের সম্পাদক আলোচনা প্রসঙ্গে বলেছেন, "দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরু থেকেই পাঠক মহলে স্বীকৃতি তাঁরা পেয়েছেন এবং তখন থেকেই তাঁদের খ্যাতি উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে।"

লেখক ও লেখা নির্বাচন সম্পর্কে সংকলনের সম্পাদকের আরও বক্তব্য এই যে, একমাত্র এঁরাই হলেন আধুনিক বাংলা কথা-সাহিত্যে নূতন রীতির সাধক, এমন কোন ধারণা বা দাবী প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা এই গ্রন্থ প্রকাশের প্রেরণা নয়। "কিন্তু পাঠক সমাজেরই মনের দাবী লক্ষ্য করে অনুভব করেছি যে, আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যেরই বিরাট ভান্ডার থেকে এমন কয়েকটি ছোটগল্পের এক সংকলন-গ্রন্থ পাঠকসমাজের কাছে উপস্থিত করার প্রয়োজন আছে, যার মধ্যে আধুনিকতম রীতির উৎকর্ষ, বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য খুব বেশি স্পষ্ট।" অর্থাৎ "এই গ্রন্থে সংকলিত আঠারোটি গল্পকে বাংলা আধুনিক কথা-শিল্পের আধুনিকতম উৎকর্ষের নিদর্শন বলা যায়।"

'অষ্টাদশী'র আঠারোটি গল্পেরই চরিত্র এক। সব কটিই প্রেমের গল্প হিসেবে চিহ্নিত। গল্পগুলির নির্বাচন প্রসঙ্গে ভূমিকায় যে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে —তার সামান্য একটি অংশ এই—"জীবনে প্রেমের আবির্ভাব, অভিব্যক্তি ও পরিণামই মানুষের আন্তরিক রূপকে সবচেয়ে বড় এবং সবচেয়ে বেশি বৈচিত্র্যে প্রকাশিত হবার সুযোগ দান করে।...এই প্রেমের প্রতিষ্ঠার পথও নানা সমস্যার বেদনায় বিঘ্নিত। এই প্রেম দেহজ কামনার সৌন্দর্যে সুন্দর, আচার বিচারে বিড়ম্বিত। এই প্রেম কোথাও বা আন্তরিক প্রীতিরূপে উৎসারিত এবং সুস্থির নিষ্ঠার আনন্দেই পরিতৃপ্ত আবার কোথাও বা প্রীতিহীন ও নিষ্ঠাহীন কামনার বিভ্রমে বিভ্রান্ত।...'অষ্টাদশী'র আঠারোটি গল্পে এই প্রেমতত্ত্বেরই রহস্যের অভিনব রূপায়ন এবং বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যায়।"

'অষ্টাদশী' সংকলন গ্রন্থ প্রকাশে ও লেখক নির্বাচনে মোটামুটি এই হল সম্পাদকের মনোভাব, মনোনয়ন নীতি এবং ব্যাখ্যা।

'অষ্টাদশী' সংকলনটির প্রকাশকে বর্তমান সমালোচক আধুনিকতম বাংলা গ্রন্থ প্রকাশের তালিকায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন।

প্রথমত এই জন্যে যে, কিছুকাল আগে বাংলা সাহিত্যে এমন একটা সময় এসেছিল যখন গল্প, উপন্যাস এমনকি কবিতাতেও নিছক ব্যঙ্গ বা শ্লেষের প্রয়োজন না ঘটলে প্রেমকে লেখার বিষয়বস্তু হিসেবে গ্রহণ করলে রচনা এবং রচয়িতার কৌলীন্য হানি হত। অল্প দু একজন ছাড়া 'প্রেম' বস্তুটিকে অধিকাংশ সাহিত্যিকই সচেতনভাবে বর্জন করতেন। শৌখিন বাসনা নিয়ে বিলাসিতা করার সামিল হয়ে উঠেছিল নরনারীর প্রেম।

বলতে কি, অনেক গালভরা রুক্ষ অসার যুক্তির শরশয্যা ছেড়েও পঞ্চশরকে বাংলা সাহিত্যে আবার উজ্জীবিত হতে দেখা যাবে, এ আশা ছিল না প্রায়। সৌভাগ্যবশত, গ্রীষ্মের রুক্ষতা, বর্ষার অন্ধকার শ্লেটরঙ আকাশ—সবকেই পরম অবহেলায় ভুলে গিয়ে হেমন্তের রোদ ছুঁয়ে ছুঁয়ে সেই আশ্চর্য বসন্ত আবার জেগে উঠেছে। জেগে উঠবেই, ঋতু বৈচিত্র্যের এই নিয়ম। যা অপ্রতিরোধ্য।

জীবনের বিস্তৃত আকাশপটে যৌবন ঋতুটিও অপ্রতিরোধ্য। শিশু বা কৈশোর অবস্থায় অপসরণ না ঘটলে, যৌবনকে বেয়নেট উঁচিয়ে হয়ত খোঁচা দেওয়া যায়—রোধ করা যায় না। আর যৌবন কি! জীবন চক্রের একটি শ্লথ, আবেগ-আকুল জ্ঞানবুদ্ধিহীন দুরন্ত আত্মপ্রসারের পর্ব, আত্মলোপের ঋতু। 'It is and it is not—'। হ্যাঁ আর নায়ের দ্বৈত-মিশ্রণে একটি আশ্চর্য ভাব যখন কূলে ভরা, তখনই সেই প্রেম এসেছে যা কাতর এবং সুন্দর। সাহিত্যে যাকে প্রকাশ করতে হয়েছে 'সখি কী পুছসি অনুভব মোয়'—এমন এমন বাক্য দিয়ে।

অতএব, প্রেমের প্রয়োজন শুধু জীবনে নয় সাহিত্যেও। যাঁরা মনে করেন জীবনের, যৌবনের প্রেমকে বাদ দিয়ে সাহিত্য সম্পূর্ণ নয়, আমি তাঁদের দলের। অষ্টাদশীর আঠারো-

জন লেখক এবং সম্পাদক—অন্তত বাঙলা সাহিত্যে প্রেমকে—প্রেমের গল্পকে আবার বাঁচিয়ে তুলেছেন—সসম্মানে আমন্ত্রণ করেছেন সাহিত্যের আসরে।

'অষ্টাদশী'র আঠারোটি প্রেমের গল্প—আধুনিক মানুষের মনে প্রেমের যে অদ্ভুত বিচিত্র উপস্থিতি এবং প্রকাশ তার রেখা-চিত্রকে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। সব চেয়ে আশ্চর্যের বিষয়, সব কটি গল্পই একে অপর থেকে রঙে, রূপে—গন্ধে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—তবু চারিত্রগতভাবে একটি ঐক্যকে রক্ষা করছে। উদাহরণ দিলে বলতে হয়, আঠারোটি ভিন্ন ভিন্ন বসন্তের ফুল—কিন্তু সব কটিই জাতে সেই ফুলই। আধুনিক নরনারী-জীবনের একটি বিশেষ মুহূর্তের মনন-বৈচিত্র্যের উৎকৃষ্ট উদাহরণ হয়ে থাকল 'অষ্টাদশী'। সুবোধ ঘোষের 'বৈদেহী'তে যে সংকলনের শুরু তার আরম্ভে যতখানি আকর্ষণ ততখানি আকর্ষণ গৌর-কিশোর ঘোষের 'তেরেজা বৌদি'তে—একথা হয়ত পাঠকমাত্রেই স্বীকার করবেন। তবে 'বৈদেহী'র অপরূপ বিভা, সব কটি গল্পকেই যে আলোকিত করেনি, এ ত বোঝাই যায়। এই সংকলনের একটি দুটি গল্পকে যথার্থ প্রেমের গল্প বলতেও হয়ত অনেকের বাধবে। যদিচ সেই দুটি একটি গল্পে প্রেম আছে—কিন্তু অতি নিঃসাড়ে।

'অষ্টাদশী' বাঙালী পাঠকের প্রিয় পুস্তক তালিকার অন্তর্ভুক্ত হবার যোগ্যতা অনায়াসেই অর্জন করেছে। বইখানি আগাগোড়া মার্জিত, শিষ্ট রুচির পরিচায়ক। এর প্রচ্ছদপটে আছে, শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর সুন্দর স্কেচ্। অঙ্গসজ্জা করেছেন শিল্পী অহিভূষণ মল্লিক। ছাপা, কাগজ এবং বাঁধাই চমৎকার।

গ্রন্থের শেষে লেখক পরিচিতি সংযুক্ত হয়েছে। পাঠকের কৌতূহল এর দ্বারা নিবৃত্ত হবে, তাঁরা খুশী হবেন।

'অষ্টাদশী'র প্রকাশক এবং সহযোগী সকলেই এই অনুপম সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য বাঙালী পাঠকের ধন্যবাদার্হ। অন্তত তাই হওয়া উচিত।

স্মৃতি-সংখ্যা

কবিতা (জীবনানন্দ-স্মৃতি সংখ্যা), পৌষ, ১৩৬১। সম্পাদক—বুদ্ধদেব বসু, সহকারী সম্পাদক—নরেশ গুহ। দেড় টাকা।

রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্য-সাহিত্যে জীবনানন্দ দাসের আবির্ভাবই বোধ হয় সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। বাংলা কবিতার যে চারিত্রিক পরিবর্তন তিনি ঘটিয়েছেন, তার তাৎপর্য বড় সামান্য নয়, এবং সেই পরিবর্তন তাঁর সমকালীন কাব্য সাধনার ক্ষেত্রে যে একটি নবতর—মহত্তর—পন্থার সন্ধান এনে দিয়েছে, সে-কথাও এখানে অসংকোচেই স্বীকার করা প্রয়োজন। দুঃখের কথা, তাঁর প্রতিভার সুষ্ঠু—সুতরাং নির্ভরযোগ্য—কোনও পরিমাপ এখনও হয়নি। সুখের কথা, ইদানীং সেই পরিমাপ-প্রচেষ্টার সূত্রপাত হয়েছে। জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে যাঁরা আগ্রহী, "কবিতা" পত্রিকার এই স্মৃতি-সংখ্যাটি হাতে পেয়ে তাঁরা তৃপ্তিবোধ করবেন।

জীবনানন্দ দাশ, কোবিদ্-কবি জীবনানন্দ, আমাদের কবি, যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার, জীবনানন্দ দাশের আস্তিকতা, জীবনানন্দ দাশের কবিতা এবং জীবনানন্দের জগৎ—মোট এই সাতটি প্রবন্ধে জীবনানন্দের কাব্য-ভাবনা এবং কবিকর্মের বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করেছেন বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অশোক মিত্র, অমলেন্দু বসু, অরুণকুমার সরকার, নরেশ গুহ এবং অশোকবিজয় রাহা। সকলেই এ'রা জীবনানন্দের অনুরক্ত, আগ্রহশীল পাঠক; লোকান্তরিত কবির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যও কয়েকজন পেয়েছিলেন। এ'দের আলোচনা থেকে জীবনানন্দের কবি-মানসের মূল লক্ষণগুলিকে চিনে নেওয়া সহজসাধ্য হবে, তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই।

অমিয় চক্রবর্তীর একটি চিঠি, জীবনানন্দের কয়েকটি কবিতা, কবির প্রতিকৃতি, পাণ্ডুলিপির প্রতিকৃতি, জীবনী-পঞ্জী, গ্রন্থ-পঞ্জী, প্রকাশিত কবিতার তালিকা এবং অন্যান্য কিছু কিছু প্রয়োজনীয় তথ্যের সমাবেশে "কবিতা" পত্রিকার এই স্মৃতি-সংখ্যাটির আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।"

জীবনী

পরিব্রাতা বিজয়কৃষ্ণ—ফাল্গুনী মুখোপাধ্যায় প্রণীত। দেবশ্রী সাহিত্যসমিধ; ৯৯-এ, তারক প্রামাণিক রোড, কলিকাতা—৬ হইতে শ্রীশচীন্দ্রনাথ রায় কর্তৃক প্রকাশিত মূল্য—৫, টাকা।

গ্রন্থকার সাহিত্যিক। শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর দিব্য জীবনের মাহাত্ম্য কীর্তনে তিনি সাহিত্যিকতার আধুনিক বিশিষ্ট রীতিতে পুস্তকখানি লিখিয়াছেন। এখানি যে গোস্বামীর জীবনী নহে, গ্রন্থকার নিজেই সে কথা বলিয়াছেন। প্রকৃত-পক্ষে শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণের ন্যায় মহা-মানবের জীবনী লেখা শুধু সাহিত্যিক বিচারের দিক হইতে সম্ভবও নয়। বিরাট, বিশাল রহস্যময়—সাধারণ মনোবুদ্ধির পক্ষে দুর্জ্ঞেয় সেই জীবন-লীলা। অতীন্দ্রিয় এবং অনাদিভাবে ব্যক্তির ভিতরেও অব্যক্ত সে তত্ত্ব অতি গূঢ়। স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ। ত্রিগুণকে উজ্জ্বল করিয়া তাহা ত্রিগুণাতীত, তুরীয়। বেদ-বেদান্ত-পুরাণের অন্তর্নিহিত পরমতত্ত্ব প্রজ্ঞানময় কৃপার আলোকে সেই লীলায় অখণ্ড এবং অনাময়। শাশ্বত ধর্মের সেখানে প্রতিষ্ঠা। ব্রহ্ম, আত্মা ভগবান, যোগ, জ্ঞান—ভক্তির সমন্বয়ে ও পূর্ণ স্বরূপ তত্ত্বের ঔজ্জ্বল্য গোসাইজীতে উদ্ভিন্ন হইয়াছে। সৃষ্টির সকল স্তরে—প্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চাতীত লোকে শ্রীভগবানের বিলাস গোসাইজীর লীলায় ব্যক্ত হইয়া হিন্দুর অধ্যাত্ম-সাধনার পূর্ণতা প্রকট করিয়াছে। গ্রন্থকারের লেখায় গোসাইজীর প্রবর্তক অবস্থার দিকই আমরা কিছুটা পাই। প্রকৃত প্রস্তাবে পরিব্রাতা বিজয়কৃষ্ণের সিদ্ধান্তসম্মত স্বরূপটি আমরা পুস্তকখানিতে পাই না।

বিভিন্ন চরিত্রের কীর্তন সম্পর্কে তিনি অনেক ক্ষেত্রেই সুরকে অতিমাত্র করিয়া তুলিয়াছেন, ইহাতে মূল বিচারের ক্ষেত্রে গোল ঘটিবার কারণ সৃষ্টি হয়। স্পষ্টভাবে ধারাটি ধরা যায় না। গুণগ্রাহিতা মন্দ নয়; কিন্তু রসানুভূতির সঙ্গে মিল রাখিয়া না চলিলে বিষয়বস্তু জমাট বাঁধে না। ব্রাহ্ম সমাজের সহিত গোসাইজীর সম্পর্কচ্ছেদের সঙ্গেই গ্রন্থের পরিসমাপ্তি অনেকটা ক্ষিপ্র এবং অপূর্ণ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু এই পটভূমিকার মধ্যেই গ্রন্থকারের লেখায় গোসাইজীর স্নিগ্ধ জীবনের চমকও মাঝে মাঝে খুলিয়াছে। গোস্বামী পরিবারের ইষ্ট দেবতা শ্যামসুন্দরের সঙ্গে গোসাইজীর অন্তরঙ্গ-লীলার রীতি-নৈপুণ্যের মনোময় সংযোগসূত্র বিস্তার

করিয়া গ্রন্থকার এই আলোচনা আদ্যোপান্ত রসধারায় উজ্জীবিত করিয়া তুলিয়াছেন। তথ্যের বিচার এই ক্ষেত্রে খুব বিচার্য নয়, তথাপি দুই একটি ক্ষেত্রে ভুল চোখে পড়ে। গ্রন্থকার "হরের্নামৈব কেবলং" তারক ব্রহ্ম নাম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, এস্থলে "হরেকৃষ্ণ" প্রভৃতি হওয়া উচিত ছিল। কালনায় ভগবান্ দাস বাবাজীর মন্দিরে উক্ত মন্ত্রই, কাগজের অক্ষরে নয়, কাঠের উপর খোদিত আকারে পূজিত হয়। ২২।৫৫

শ্রীখণ্ডের প্রাচীন বৈষ্ণব—শ্রীগৌরগুণানন্দ ঠাকুর কর্তৃক সংকলিত। শ্রীযশোদানন্দ ঠাকুর কর্তৃক শ্রীখণ্ড, বর্ধমান হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২৷৷০ টাকা। বোর্ডে বাঁধাই ৩৲ টাকা।

গ্রন্থকার পরমভক্ত এবং বৈষ্ণব। তাঁহার রচিত আলোচ্য গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ বৈষ্ণব সমাজের সর্বত্র সমাদরের সহিত গৃহীত হয়। এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হওয়াতে আমরা সুখী হইলাম। শ্রীগৌরাঙ্গ-দেবের অন্যতম অন্তরঙ্গ শ্রীনরহরি ঠাকুরের ভাবধারাকে ভিত্তি করিয়া গ্রন্থখানি লিখিত হইয়াছে। গৌর প্রেমরসোজ্জ্বল-বিভাবিত বিগ্রহ মূর্তি নরহরি। তাঁহারই কৃপায় গৌর-প্রেমের রসধারা একদিন শ্রীখণ্ড হইতে উৎসারিত হইয়া সমগ্র বাংলা দেশকে সঞ্জীবিত করিয়া তোলে। সেই সূত্রে রসানুভাবনায় বাংলার সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়—ভক্তি-প্রীতিময় গীতির ছন্দে বাংলার আকাশে ঝঙ্কার উঠে। গ্রন্থকার সমগ্র অন্তর দিয়া নরহরি ঠাকুরের অবদানের অন্তঃপ্রকৃতি এবং রসানুভূতির বিশ্লেষণ করিয়াছেন। মহাপ্রভুর লীলামাধুর্য বিস্তারের ভিতর দিয়া তিনি পরম ব্রহ্ম পুরুষের 'নিজ গূঢ় কার্যে'র স্বরূপটি উন্মুক্ত করিয়াছেন। তাঁহার বিচার এবং বিশ্লেষণে দার্শনিকতার জটিলতা বা কুটিলতা নাই; প্রত্যুত ভক্তি-রসোদ্ভাসিত চিত্তের উজ্জ্বল অনুভূতি এই আলোচনাকে সর্বত্র মধুর করিয়া তুলিয়াছে। রসরাজ্যের অতি গূঢ় রহস্যরাজী ভগবৎ-প্রীতির সেই জ্যোৎস্নালোক প্লাবনে পরিস্ফুট হইয়াছে। ফলত মননের ধারা আবর্তার্কিত সত্যের সংস্পর্শে দীপ্ত হইলেই তবে অভিব্যক্তি-রীতিতে এমন শক্তি খোলে। নরহরি ঠাকুরের পদাশ্রিত গ্রন্থকারের রচনায় সেই শক্তি এবং তেমন অনুভূতির আলোকের ঝলক খেলিয়াছে। গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত আস্বাদন করিতে আগ্রহ উদ্দীপ্ত হয়। মুকুন্দ, রঘুনন্দন, লোচন, শ্রীনিবাস, নরোত্তম ঠাকুর নরহরিকে কেন্দ্র করিয়া ইঁহাদের নাম-প্রেম বিতরণ লীলা এই গ্রন্থে মধুর ভাষায় কীর্তিত হইয়াছে। এই সঙ্গে শ্রীখণ্ডবাসী প্রাচীন বৈষ্ণব মহাজন-গণের জীবনী আস্বাদনে পুস্তকখানি পাঠে সকলেই প্রীতি লাভ করিবেন।

আচার্য বিনোবা—বিধুভূষণ দাশগুপ্ত প্রণীত। গ্রন্থকার কর্তৃক ই-৭৫, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, খাদিমণ্ডল, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

ভূদান যজ্ঞের ঋষি আচার্য বিনোবা ভাবের পবিত্র জীবন-কথা গ্রন্থকার অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন। শৈশবে মাতার নিকট হইতে অধ্যাত্ম-জীবনে অনুপ্রেরণা লাভ, কঠোর ব্রহ্মচার্য এবং তাঁর তপস্যার প্রভাবে নির্মল, উজ্জ্বল এই মহাপুরুষের ত্যাগময় জীবনের আদর্শ আমাদের চিত্তকে পবিত্র এবং উন্নত করে। আচার্য বিনোর পশ্চিমবঙ্গে পদার্পণ উপলক্ষে পুস্তকখানি রচিত। পুস্তকখানি পাঠে গান্ধীজীর আদর্শানুযায়ী সর্বোদয় সাধনার তাৎপর্য সহজেই উপলব্ধি করা সম্ভব হয়। এমন পবিত্র জীবনী পাঠে সকলেই উপকৃত হইবেন। ৮।৫৫

নাটক

শিবাজী—রেবতীকান্ত মৈত্র : 'গ্রন্থালয়', ৫৮।৪ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। দাম—৷৵০ আনা।

জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ করতে শিবাজীর অভ্যুত্থান-কাহিনী বহু কবি, লেখক ও নাট্যকারকে প্রেরণা দিয়েছে। আফজল খাঁর সঙ্গে শিবাজীর সাক্ষাৎকার ও 'বাঘনখ' নামক গুপ্ত অস্ত্রে আফজল খাঁর বিনাশ এবং উপসংহারে চারণকবি রামদাসের শিষ্যত্ব নিয়ে দেশমাতৃকার সেবাব্রত গ্রহণ করলেন শিবাজী, রামদাস-প্রদত্ত গৈরিক পতাকা হলো তার স্মারক। এই ঘটনাটুকুকে নিয়ে আলোচ্য নাটিকাটি রচিত হ'য়েছে কিশোরদের অভিনয়োপযোগী ক'রে। নাটিকাটি স্ত্রী ভূমিকা বর্জিত। আন্তরিকতার গুণে নাটিকাটি আবেদনশীল হ'য়েছে, ঘটনা সংস্থাপনও নাটকের পক্ষে অনুপযুক্ত হয় নি। ৪২৭।৫৪

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

দি লাস্ট ডেজ অব পম্পেই—শ্রীসুধীন্দ্র-নাথ রাহা।
শ্রীমতী—শ্রীহেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ।
গল্প কিছু নয়—শ্রীরামকৃষ্ণ গুপ্ত।
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্ব-নির্বাচিত গল্প—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ কর্তৃক ৩০, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।
দৃষ্টিকোণ—জ্যোতির্ময় রায়।
মেঘ ও চাঁদ—অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।
পিতামহ—বনফুল।
কর্মযোগী—শ্রীঅরবিন্দ।
দেখা দাও—শ্রীনীরদবরণ।
আদর্শ হিন্দী ব্যাকরণ ও অনুবাদ—শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়।
স্বপ্ন ও সাধনা—শ্রীসমর দে।
তটিনিকা—শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়।
অন দি ডল্গা—অনুবাদক—পরেশনাথ সান্যাল।
রোম থেকে রমনা—দেবেশ দাশ।
দুই বোন (১ম খণ্ড)—আলেক্স তলস্তয় অনুবাদক—দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।
মজুরি ও পুঁজি—কার্ল মার্কস।
মজুর দাম মুনাফা—কার্ল মার্কস।
শিক্ষা সমস্যার কয়েকটি দিক—শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ।
সাহিত্যিকী—ধীরানন্দ ঠাকুর।
ভাস্করের শ্রেষ্ঠ ব্যঙ্গ গল্প—ভাস্কর।
আগন্তুক—ননী ভৌমিক।
আমার জীবন (১ম খণ্ড)—শ্রীভারতী দেবী।
দক্ষিণ নায়ক—অরবিন্দ গুহ।
সভ্যতার জয়যাত্রা—শ্রীনীলরতন বন্দ্যো-পাধ্যায়।
পশ্চিমবঙ্গের কৃষির অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায়—নলিণাক্ষ বসু।
Netaji and the C.P.I.—Sitaram Goel.

—শৌভিক—

এ বছরের প্রথম চারখানি ছবি

মাঝখানে অনেকগুলো হঠাৎ-ব্যাপার উড়ে এসে জুড়ে বসায় এ বছরের নতুন মুক্তি বাঙলা ছবি চারখানির বিষয়ে আর আলোচনা হয়ে উঠতে পারেনি। 'নিষিদ্ধ ফল' দিয়ে বছরের উদ্বোধন হয়, তারপর আসে 'রিক্সা-ওয়ালা' এবং তারপর গত সপ্তাহে একসঙ্গে 'সাঁঝের প্রদীপ' ও 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে'। পরিতাপের বিষয় চারখানির কোনখানিই মান রাখার মতো ছবি হয়নি বা গত দেড় বছর ধরে বাঙলা ছবির ক্রম-বর্ধমান জনপ্রিয়তাকেও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যাবার মতো কিছু নিয়ে আসতে পারেনি। 'রিক্সাওয়ালা'-কে বাদ দিলে বাকি তিনখানি ছবিকে জনপ্রিয় করে তোলার চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায়, অন্তত কাহিনী ও শিল্পী নির্বাচনের দিক থেকে অবশ্যই। ছবির সাফল্য বিশ্লেষণ করে দেখা গিয়েছে সাহিত্যিক-দের রচনা লোকে বেশী পছন্দ করে। তাই এ ছবি তিনখানির কাহিনীর জন্য দেখা যায় প্রথিতযশা সাহিত্যিকদের রচনা থেকে চিত্রনাট্য গঠিত হয়েছে। 'নিষিদ্ধ ফল' লেখা প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের, 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে' অমৃতলাল বসুর এবং 'সাঁঝের প্রদীপ' প্রভাবতী দেবী সরস্বতীর। তাছাড়া ভূমিকায় জনপ্রিয় শিল্পীদের সমাবেশও ছবির আকর্ষণ-শক্তি যে অনেকখানি বাড়িয়ে দিতে পারে, সে বিষয়ে প্রযোজকদের চেষ্টার পরিচয় পাওয়া যায় ছবি তিনখানির ভূমিকালিপি অবলোকন করে। এখন যেসব অভিনয়-শিল্পীর নামের আকর্ষণে দর্শক ছুটে আসে তাদেরই অধিকাংশদের নিয়েই ভূমিকালিপি ক'টি গঠিত হয়েছে। কত-জনকে আবার সব ছবি কখানাতেই পাওয়া যায়। যেমন সবিতা-ভানু-অজিত-জহরের দল। ভানু তো এখন এমন যে পাশাপাশি চারটি চিত্রগৃহের চারখানি ছবিতেই তিনি বিরাজমান। অভিনয়শিল্পীর সংখ্যা কমে গিয়েছে বলে নয়, জনপ্রিয় শিল্পীদের নিয়ে ছবির জনপ্রিয়তা অবশ্যম্ভাবী করে তোলার জন্যেই এই ব্যবস্থা হয়। যেমন 'নিষিদ্ধ ফল'-য়ে পাওয়া যায় অসিতবরণ, জহর গাঙ্গুলী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অজিত চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গাপদ বসু, হরিধন, তুলসী চক্রবর্তী, নবদ্বীপ হালদার, আশু বোস, শ্যাম লাহা, রাজ-লক্ষ্মী, রাণীবালা, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, আশা দেবী প্রভৃতি। 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে'তে তো প্রধান চরিত্রই ভানু ও জহর রায়ের এবং ওদের সঙ্গে এতেও রয়েছেন সেই শ্যাম লাহা, অজিত চট্টোপাধ্যায়, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, রাজলক্ষ্মী; তফাৎ হচ্ছে গুরুদাস, পূর্ণিমা, শিশির মিত্র, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং খুচরো কজনকে নিয়ে। 'সাঁঝের প্রদীপ'-এর ভূমিকায়ও ভানু, তুলসী চক্রবর্তী, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, গুরুদাস, সুশীল রায় প্রভৃতি এই ক'জন তো আছেনই তাছাড়াও ওদের ওপরে রয়েছেন উত্তমকুমার, সুচিত্রা, ধীরাজ ভট্টাচার্য, মলিনা দেবী, ছায়া দেবী, ছবি বিশ্বাস, কানু বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ হরেন, সুমনা ভট্টাচার্য প্রভৃতি। ওদিক থেকে 'রিক্সাওয়ালা'র খামতি যথেষ্ট। ওতে নামের জোরে দর্শক টানার মতো শিল্পী বলতে কেবল তৃপ্তি মিত্রকেই যা ধরা যায়। তাছাড়া পর্দার নিয়মিত শিল্পীও ভূমিকালিপিতে কেবল শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, মাস্টার সুখেন, লীলাবতী আর সন্ধ্যা দেবী। বাকি আর কারুর নাম তেমন সুপরিচিত নয়, এমন কি নাম-ভূমিকাভিনেতা কালী বন্দ্যোপাধ্যায়ও নন, অনেককে তো নতুনই বলা যায়।

* * *

'নিষিদ্ধ ফল' এবং 'চাটুজ্যে-বাঁড়ুজ্যে'র অভিনয়শিল্পী অনেকে একই নন শুধু, ছবি দুখানির চেহারায়ও কিছু কিছু মিল আছে। যেমন ভানুদের নিয়ে দুটোতেই রয়েছে মেসের বেহায়া হুল্লোড়,

ডেম সিবিল থর্নডাইক ও সার লিউইস ক্যাসন—ইংলণ্ডের খ্যাত ও প্রতিষ্ঠাবান মঞ্চশিল্পী দম্পতি সম্প্রতি অস্ট্রেলিয়া পরিভ্রমণ সমাপ্ত করে কলকাতার নাট্যামোদীদের সমক্ষে আবির্ভাবের জন্য এসেছেন। সুদীর্ঘ-কাল ইংলণ্ডের মঞ্চে অভিনয় নৈপুণ্যের চরম উৎকর্ষের যে পরিচয় এ'রা দিয়ে আসছেন—পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের নাট্যামোদীদেরও তা উপভোগের সুযোগ করে দেওয়ার জন্যে বৃটিশ কাউন্সিল এই শিল্পী দম্পতির পরিভ্রমণ ব্যবস্থা করেছেন

দুটোরই ব্যাপার বিয়েকে কেন্দ্র করে যাতে ঘটক চরিত্রটির একটি মুখ্য অংশ। অবশ্য বিষয়বস্তু ও ভাবের দিক থেকে দুটির মধ্যে মিল কিছু নেই, যদিও দুটিরই কাহিনী পুরনো আমলের—ভাবে, বিষয়-বস্তুতে এবং চেহারায় সব দিক থেকেই এবং দুয়েরই লেখকও সেই সাবেকী যুগের। দুটিরই ক্ষেত্রে চিত্রনাট্য রচনায় যথাপ্রয়োজন স্বাধীনতা গ্রহণ করা হয়েছে; তাতে মূল রচনার বিস্তৃতিও হয়েছে আবার বিকৃতিও ঘটে গিয়েছে। আর 'নিষিদ্ধ ফল'-এর ক্ষেত্রে তো রীতিমতো কতকগুলো অশোভন ডেঁপোমি যোগ করে রুচি ও শালীনতা নিয়ে দিব্যি লোফালুফিই খেলা হয়েছে। প্রভাত মুখোপাধ্যায় যা ফেঁদেছিলেন পরিচ্ছন্ন রসের জিনিস করে নিয়ে, বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র তার চিত্রনাট্যে এবং পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় তার দৃশ্য বিন্যাসে সে জিনিসকে গাঁজিয়ে কটুগন্ধ তাড়িতে পরিণত করে হাজির করে দিয়েছেন। অতি বেহায়াপনার ঘটনা যতো। সরকারী খেতাবদুরস্ত পয়সাওয়ালা লোকের সমাজ সংস্কারের শখ নিয়ে শ্লেষ ছিল মূল কাহিনীর প্রতিপাদ্য, কিন্তু ছবিতে সেদিকটাতে উপলক্ষ্যের মধ্যে ঠেলে দিয়ে পত্নী সহবাস নিয়ে পিতার সঙ্গে নব-বিবাহিত পুত্রের বুদ্ধির দ্বন্দ্ব দেখিয়ে 'আড়িপাতা'-র সুড়সুড়ি জাগাবার মতো রঙ্গঘটনার সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। গল্পে যা ছিল অব্যক্ত ইসারা, ছবিতে সেই দিকটাই স্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত করে দেওয়া হয়েছে।

* * *

ছবিতে 'নিষিদ্ধ ফল' বলতে বেঁকিয়ে অর্থ করা হয়েছে স্ত্রীর সঙ্গে সহবাসের অনর্গল আকাঙ্খাকে। রায়বাহাদুর প্রফুল্ল মিত্র অল্প বয়সে ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী কিন্তু যথাক্রমে আঠারো ও চব্বিশ বছর বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত ওদের সহবাসের তিনি কড়া বিরোধী। তাই পুত্র হেমন্তর সঙ্গে চতুর্দশী নন্দ-রাণীর হৈ হৈ করে বিয়ে যেমন দিয়ে দিলেন তেমনি কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলেন ওদের দুজনের মুখ দেখাদেখি পর্যন্তও যাতে ঘটতে না পারে। ব্যবস্থা হলো ফুলশয্যার রাতেই বর-কনের ঘরের দরজা খুলে রেখে এবং পাহারার জন্য ভিতরে ঝি ও বাইরে চাকরকে শুইয়ে রেখে। হেমন্ত তার হাহুতাশ জানায় তার কলেজি সহপাঠীদের মেসে গিয়ে, আর নন্দরাণী আড়ালে চোখের জলে ভাসতে থাকে। গুরুদেব ভোলাদার পরামর্শে হেমন্ত অনেক চেষ্টা করে নন্দরাণীর সান্নিধ্যলাভের, কিন্তু রায়বাহাদুরের প্রিয় ভৃত্য নকুলের চুকলিতে সব বেফাঁস হতে থাকে। ভোলাদার শেষ পরামর্শ হলো রোমিওর মতো জানলায় সিঁড়ি খাটিয়ে জুলিয়েট নন্দরাণীর কাছে হাজির হওয়া। তাতেই ঘটলো কেলেঙ্কারি। পাঁচিল টপকে বাগানে ঢুকতে গিয়ে চোর বলে তাড়ার চোটে অস্থির। বন্দুক নিয়ে রায়বাহাদুর হাজির হলেন চোরের খোঁজে একেবারে পুত্রবধূর শয়নকক্ষে—নন্দরাণী মাটিতে 'মূর্ছিতা' হয়ে পড়ে আছে, আর চোরকে পাওয়া গেল তারই বিছানায় লেপের আড়ালে। রায়বাহাদুর লেপ তুলে দেখলেন চোর আর কেউ নয়, তাঁরই নির্দেশ-অমান্যকারী পুত্রবর।

* * *

কলম দিয়ে কাগজে যা লেখা যায়, ক্যামেরার চোখ দিয়ে তা সর্বক্ষেত্রেই দেখানো যে চলে না এ জ্ঞানটা চিত্রনাট্য রচয়িতা বা পরিচালকের নেই বলতে বাধছে। তার চেয়ে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের নামের আড়ালে নিজেদের অসংযমী মনের উসখুসানীকে ব্যক্ত করে নেওয়ার সুযোগকে কাজে লাগিয়ে নেওয়ার যুক্তিই অপেক্ষা-কৃত মানানসই বলে মনে হয়। এমন সব সরলভাবে বলা দ্ব্যর্থবোধক সংলাপ ব্যবহার করা হয়েছে যা লোকে আড়ালেই বলে থাকে। ফুলশয্যার রাতে বাপ গিয়ে ছেলে-বৌয়ের বিছানা দেখে আসছে ওরা চুপচাপ শুয়ে আছে কি-না; কিংবা বৌদিদিমণির সঙ্গে দেখা হলেই দাদা-বাবু চড়টা-চাপড়টা মারে বলে পুত্র ও পুত্রবধূ সম্পর্কে ভৃত্যের কাছ থেকে নালিশ শোনা, অথবা খাটের নীচে লুকিয়ে স্ত্রীর পা ভেবে হেমন্তর শ্বশুরের পা ধরে টানা; চোর ধরতে এসে পুত্রবধূর বিছানায় লেপের নীচ থেকে হাফপ্যাণ্ট পরা ছেলেকে আবিষ্কার প্রভৃতি যেসব ছ্যাঁচড়ামো কাণ্ড দেখানো হয়েছে কাগজের পাতায় পড়তে একরকম লাগতে পারে, কিন্তু পর্দাতে দেখায় অতি বেহায়াপনা। এবং সবচেয়ে বিস্ময়কর হচ্ছে এই সব নির্লজ্জতা দেখবার সুযোগ যে দুজনে করে দিয়েছেন তাদের মধ্যে চিত্রনাট্যকার বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র সাধারণত চিত্রনাট্য লিখেছেন পৌরাণিক বা ভক্তিমূলক ছবির, আর পরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায়ের কৃতিত্বের মধ্যে রয়েছে 'নিষ্কৃতি'-র মতো

সুপরিচ্ছন্ন শিল্পরসোত্তীর্ণ ছবিও। হাসি অবশ্য যথেষ্ট উপভোগ করা যায় কিন্তু সে হাসি নির্মল বা সরল নয়। গোড়ার দিকে বিন্যাসে সংলাপের পুনরাবৃত্তি ধরে দৃশ্যান্তর ঘটানোর পুরনো রীতি বেখাপ্পা লাগবে। আর এমনিতেও ঘটনার বাঁধুনীতে নাটকীয়তার জোর কম। বম্বের মতো চেঁচিয়ে এবং হেঁকে কথা বলার ঢঙ আর জহর গাঙ্গুলী খেয়ালী রায়বাহাদুরের ভূমিকায় থাকায় আর সবায়ের গলা তার সঙ্গে পর্দা মিলিয়ে রাখতে যে কোথায় চড়েছে তা সহজেই অনুমেয়।

*　*　*

চেঁচানি সত্ত্বেও জহর গাঙ্গুলীর তোষামোদপ্রিয় একরোখা খেয়ালী চরিত্র রায়বাহাদুরকে ভালো লাগবে। হেমন্তর ভূমিকায় অসিতবরণকে হাল্কা চরিত্রের অভিনয়ে সাবলীল ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। সহপাঠীদের উপদেষ্টা ভোলা-দার চরিত্রকে ভানু নিজের রসিক-ব্যক্তিত্বের জোরে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে থাকেন, নয়তো চেলাদের একজন কেউ হলেই তিনি বেশী সহজ হতে পারতেন। এক ধূর্ত ঘটকের চরিত্রে গঙ্গাপদ বসু টাইপ চরিত্র সৃষ্টিতে বেশ একটা বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেন। দেউড়ীর দরওয়ানরূপে তুলসী চক্রবর্তী অবাঙালী টাইপ চরিত্রের রূপায়নে তার সহজ অভিনয় উপভোগ করা যাবে। চরিত্র চিত্রণে আর আছেন নন্দরাণীর পিতার ভূমিকায় হরিধন; হাসির চরিত্র নয় তবুও হরিধন হাসাতেই চেষ্টা করেছেন। নবদ্বীপ এক মোসাহেব। আশু বোস কিন্তু বাবুর পেয়ারের চুকলিখোর ভৃত্য নকুলের চরিত্রটির প্রতি দর্শকদের রঙ্গকৌতূহল জাগিয়ে রেখে দেন। নন্দরাণীর চরিত্রে সবিতার অভিনয়ের মধ্যে একটা স্বাভাবিক কমনীয়তা বেশ ফুটে উঠেছে। হেমন্তর মা ও পিসিমার চরিত্রে যথাক্রমে রাণীবালা ও রাজলক্ষ্মী ওদের মতো কাজ চালিয়ে নিয়েছেন। ঘটকির চরিত্রে নিভাননী নজরে পড়বেন এবং প্রশংসা পাবেন আশা দেবী হেমন্ত ও নন্দরাণীর অবস্থার প্রতি সহানুভূতিশীলা বৃদ্ধা পরিচারিকার চরিত্রে। কলেজ মেসের দঙ্গলে অজিত জহর রায় প্রভৃতিও হাসি পাবার পরিস্থিতি গড়তে সক্ষম হয়েছেন। ছবিখানির কলাকৌশলের দিকটা বেশ ভালো, বিশেষ করে দেওয়জীভাইয়ের ক্যামেরার কাজ এবং সত্যেন রায়চৌধুরীর শিল্প নির্দেশ। শব্দগ্রহণ করেছেন জে ডি ইরাণী। নচিকেতা ঘোষের দেওয়া সুরের গানগুলি আলাদাভাবে ধরলে শুনতে মন্দ লাগবে না কিন্তু সঙ্গত বম্বের দিকে পা বাড়ানো, আর আবহসঙ্গীতও বাজে। গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের গানগুলি লেখা ভালো।

*　*　*

নিছক হাল্কা হাসির জিনিস 'চাটুজ্যে বাঁড়ুজ্যে'-রও মূল ব্যাপার বিয়েকে কেন্দ্র করে। পুরনো আমলের জিনিস এবং দরকার বুঝে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন করা হলেও এমন কিছু করা হয়নি যাতে ওর চেহারাটা এখনকার দৃষ্টি-ভঙ্গী ও রুচির সঙ্গে শোভন হয়ে উঠতে পারে। প্রচুর হাসবার সুযোগ পাওয়া যায় এবং অনেকটা নিষ্কলুষ হাসিও কিন্তু এমন খেলোভাবে পরিবেশিত যে দেখতে দেখতে একটা অতি বাজে জিনিস দেখার ছাপটা মন থেকে তাড়ানো যায় না। যেমন অতি কাঁচা হাতের চিত্রনাট্য রচনা, সেই সঙ্গে মিলেছে শিল্প ও নাটকীয় কল্পনা রহিত দৃশ্যবিন্যাস। আরও খেলো হয়েছে কলাকৌশলের দিকটার জন্যে। সবই সি টিমের কাজ। অথচ ভালো ছবি হওয়ার মালমশলা কাহিনীতে যথেষ্ট পরিমাণই ছিল, শুধু গুছিয়ে পরিবেশন করাই যা বাকি ছিল। কালীঘাটের এক আবাসি হোটেল হচ্ছে ঘটনাস্থল। ভবতারিণী হোটেলের মালিক চক্রবর্তী কিন্তু হোটেল চালায় ভব বা ভবি বা ভবতারিণী। হোটেলের নতুন বোর্ডার চাটুজ্যে কিন্তু তাকে ভবযন্ত্রণা বলে। চাটুজ্যে এসে যে ঘরখানা ভাড়া নেয় চক্রবর্তীর কাছ থেকে, ভব কিন্তু সেঘর তার আগেই ভাড়া দিয়ে বসেছে বাঁড়ুজ্যেকে। তবে সুবিধে হলো বাঁড়ুজ্যের। তার কাজ রাতে ছাপাখানায় এবং দিনে এসে সে ঘুমোয়, সন্ধ্যায় বেরিয়ে যায়। আর চাটুজ্যের রাধাবাজারে কাপড়ের দোকান, সকাল হলেই সে বেরিয়ে যায় এবং না গেলে ভব তাকে তাড়াহুড়া করে বের করে দেয়। একদিন কিন্তু চাটুজ্যে

আর বাঁড়ুজ্যের দেখা হয়ে গেল। প্রথমে ঘর নিয়ে তুমুল ঝগড়া, তারপর রাগ হয়ে গেল। সে সময়ে এলো এক ঘটক বিয়ের সম্বন্ধ নিয়ে। চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে দুজনেই ঝুঁকে পড়লো বিয়েতে। কিন্তু পাত্রী দেখে দুজনেই কাহিল। প্রায় প্রৌঢ়া বিরাটবপু নিস্তারিণী অগাধ সম্পত্তির অধিকারিণী হলেও বাঁড়ুজ্যে তো তাকে দেখেই ভিরমী গেলো, তবুও বাঁড়ুজ্যেকে দিয়ে বিয়ের চুক্তিপত্রে জোর করে টিপসই নেওয়া হলো। চাটুজ্যের অবস্থা তথৈবচ এবং তাকে দিয়েও জোর করে সই করিয়ে নেওয়া হলো। দুজনেই হলো বন্দী। ঐ বাড়িতেই ছিল নিস্তারিণীর সম্পর্কে দুই অনূঢ়া নাতনী, বিমলা ও কমলা। এরা চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যেকে দেখামাত্রই প্রেমে পড়ে যায় এবং রাত্রে ওদের দুজনকে বন্দীদশা থেকে মুক্ত করে দেয়। বিমলা ও কমলা আবার হোটেলের চক্রবর্তীরই দুই মেয়ে। নিস্তারিণী কিন্তু ছাড়বার পাত্রী নয়। হোটেলের খোঁজ করে পাইক পাহারা বসিয়ে নিজেই এলো বিয়ে করতে কনে সেজে। কিন্তু তার আগেই কমলা ও বিমলা পালিয়ে হোটেলে এসে চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যেকে বিয়ে করে নিয়েছে। নিস্তারিণী কিন্তু তাতেও হতাশ হলো না, বিয়ে সে করবেই এবং শেষপর্যন্ত সেই ঘটককে পাকড়াও করে তাকেই সাতপাক ঘুরিয়ে বিয়ে করে নিলে।

* * *

চিত্রনাট্যে ঘটনার উপস্থাপন অত্যন্ত এলোমেলো কোনদিকের একটা ব্যালান্স নেই। পেটাপেটি খেলার মতো চাটুজ্যে আর বাঁড়ুজ্যেকে নিয়ে পিঠোপিঠি ঘটনা। শেষের দিকে ঘটনার ধারাবাহিকতা রক্ষায় প্রচুর গোঁজামিল। হোটেলে ঘটক দেখে ভয় গিয়ে চক্রবর্তীর কাছে প্রস্তাব করলে তার মেয়ে দুটির জন্যে চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যেকে পাত্র নির্বাচিত করে নিতে। চক্রবর্তীকে ঠেলেঠুলে পাঠালে মেয়েদের আনতে; চক্রবর্তী জানালে ট্রেনের পথ, তবুও চাপে পড়ে হেঁটেই বেরিয়ে গেল। তারপর চক্রবর্তী একেবারে না-পাত্তা। অথচ চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে কমলা ও বিমলাকে পেলে নিস্তারিণীর কলকাতার বাড়িতে। তারপর থেকেই সব ড্যাস টেনে টেনে ঘটনার উপস্থিতি। তবুও হাসবার মতো ঘটনা চাটুজ্যে ও বাঁড়ুজ্যে রূপে জহর ও ভানু হোটেলে এসে ওঠার পর থেকে প্রচুর। অনেক সময় হাসতে হাসতে লুটোপুটিও খেতে হয়। ক্যাস্টর অয়েলে সাঁতলানো ডাল খেয়ে বোর্ডার-দের পেটের অবস্থা এবং তারপর পায়-খানার সামনে ক্যু দিয়ে দাঁড়িয়ে ছটফট করার মতো ঘটনায় হাসি আসলেও বড়ো খেলো ব্যাপার। অন্যত্র বাস্তবের চেয়ে কুমারী নিস্তারিণী দেবীর জোর করে পাইক লাগিয়ে বিয়ে করতে যাওয়ার মতো অসম্ভব ঘটনা, কিংবা বিমলা ও কমলার ট্রেন থেকে পালিয়ে পায়ে হেঁটে কালী-ঘাটে হাজির হয়ে নিজেদের থেকেই সটান বিয়েতে বসে যাওয়া, বা নিস্তারিণীর বাড়িতে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে শাড়ি

পরে চাট্‌জ্যে ও বাঁড়ুজ্যের ঐ অবস্থাতেই হোটেলে এসে পৌঁছনো ইত্যাদি ঘটনা অনেক ভব্য। পাত্রীর বেশে নিস্তারিণী দেবীর জোর করে চাট্‌জ্যেকে গান শোনানোর ব্যাপারটা তো রীতিমতো প্রেক্ষাগৃহে হুল্লোড়েরই সৃষ্টি করে। ভানু, জহর, আর দিগম্বরীর চরিত্রে রাজলক্ষ্মী না-হলে এই অতি অগোছালো ছবিখানির কোন দামই থাকতো না। অবশ্য ওরা এটিকে একেবারে স্ল্যাপস্টিক শ্রেণীর কমিক মাত্রাতেই পর্যবসিত করে দিয়েছেন; শ্লেষ বা ব্যঙ্গের দিকটা পরিহার করেই যাওয়া হয়েছে। কমলা ও বিমলার চরিত্রে মিতা চট্টোপাধ্যায় ও সবিতা চট্টোপাধ্যায় ছবির আকর্ষণ। তার চেয়ে বরং মেসের দঙ্গল যার মধ্যে পড়েন অজিত চট্টোপাধ্যায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্যাম লাহা, সুশীল রায় প্রভৃতি বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ভব ঝির চরিত্রে পূর্ণিমাকে মানায়না, অথচ গোড়ার দিকে এই চরিত্রটির ওপরেই ছিল গল্পের ভার বেশী। তেমনি গুরুদাসের অভিনয়ও চক্রবর্তী চরিত্রের ব্যতিক্রম, যেমন হয়েছে দিগম্বরের ম্যানেজারের চরিত্রে শিশির মিত্রের অসাড় অভিনয়। চিত্রনাট্য রচয়িতা গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু এবং পরিচালক বংশী আশ জমাটি হওয়ার প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ উপাদানকে অত্যন্ত হতচ্ছেদ্দ্যাভাবে পরিবেশন করে একটা ভালো সুযোগই নষ্ট করলেন—না ও'দের কৃতিত্বের দৌড়ই এই পর্যন্ত?

* *

'চাট্‌জ্যে বাঁড়ুজ্যে'-র চেহারার মধ্যে হেলাফেলা করে কাজ সারার ভাবটাই স্পষ্ট; পরিপাটি করে সাজাতে পারলে এই জিনিসই হতো অন্যরকম। হরেন্দ্রবাবু বা ইন্দু অধিকারীর যথাক্রমে আলোকচিত্রগ্রহণ ও শব্দগ্রহণে স্বাধীনভাবে কাজ নতুন, কিন্তু এ'দের কৃতি হয়ে উঠতে দেরী আছে। সংগীত পরিচালনায় সন্তোষ মুখোপাধ্যায় নতুন না হলেও কাজের দিক থেকে মোটেই কিছু দেখাতে পারেননি। গানের দিক থেকে একটা অভিনবত্ব হচ্ছে, যে যে চরিত্রে নেমেছেন তারা নিজেরাই তার গানগুলি গেয়েছেন। এইভাবে মিতা,

সবিতা, অজিত, শীতল প্রভৃতির গানও এতে শোনা যায়। তবে গান জমিয়েছেন রাজলক্ষ্মী কনে দেখার ঘটনায় আর ছবিরও ওটা এক হুল্লোড়ে অংশ।

* *

প্রযোজকরা এখন গল্প ও অভিনয়-শিল্পী নির্বাচনের ব্যাপারে বেশ সতর্কতার পরিচয় দিচ্ছেন। নাম-করা সাহিত্যিকদের লেখা গল্প নিচ্ছেন এবং যাঁদের দেখে লোকে খুশী তেমন সব শিল্পীদেরও সমাবিষ্ট করছেন, কিন্তু নজর দিচ্ছেন না উপাদানগুলিকে ঠিকমতো সাজিয়ে গুছিয়ে বিন্যস্ত করার জন্য পরিচালক আখ্যাত ব্যক্তিটির মনোনয়নে। অন্তত শ্রীলেখা পিকচার্স যে এই গাফিলতি দেখিয়েছেন তার প্রমাণ তাঁদের "সাঁঝের প্রদীপ"। নাম-করা এবং সুপ্রতিষ্ঠিতা সাহিত্যিকার লেখা গল্প নিয়েছেন তাঁরা; নাম-করা শিল্পীও নিয়েছেন একদল, কিন্তু পরিচালনার ভার এমন একজনের উপর ন্যস্ত করেছেন, যাঁর দু' একটি ছোট্ট ভূমিকায় অবতরণ ছাড়া ছবির ব্যাপারে আর কোন অভিজ্ঞতা আছে বলে জানা নেই; এবং জ্ঞানও যে নগণ্য তা ছবিখানি দেখে বুঝতে পারা গেল. অন্তত গল্পকে সামলাবার ক্ষমতা যে নেই সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ। তা না থাকায় এক গল্প দিয়ে আরম্ভ করে মাঝে আর এক গল্প হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছে। পুরনো আমলের ছেঁদো ব্যাপার যার মধ্যে এক-দিকে রয়েছে দুই শরিকের কোঁদল আর একদিকে রয়েছে শহুরেপানার কলঙ্ক। বেশ আরম্ভ হালকা ব্যাপার নিয়ে। পর-হিতব্রতী গ্রাম্য যুবক সুমন্ত এক সরিক, আর এক সরিক তার কাকা, খুড়তুতো ভাই ব্রজ আর কাকিমা থাকমনি। এদের মাঝেই হঠাৎ শহর থেকে নিজে মোটর হাঁকিয়ে এসে হাজির হলো থাকমনির বড়লোক বোন বালিগঞ্জের ব্যারিস্টারপত্নী কেটির কলেজে মেয়ে শাশ্বতী। সুমন্ত গান গায়, গ্রামের দরিদ্র লোকের সেবা করে। গানের ঝগড়া নিয়ে তার আলাপ হয়ে গেল শাশ্বতীর সঙ্গে। সুমন্তকে ভালো লাগল শাশ্বতীর। সুমন্তর কিন্তু বিয়ের কথা ঠিক ছিল প্রতিবেশী বৃদ্ধ রাম মিত্রের মেয়ে রাজ-লক্ষ্মীর সঙ্গে। ছেলেবেলায় একসঙ্গেই ওরা মানুষ এবং রাজলক্ষ্মী সুমন্তকে অনেক আগেই তার পতি বলে জেনে রেখেছে। কিন্তু মাঝে ঘটনা অন্য দিকে ঘুরে গেলো। সেই গ্রামে বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা অমল মিত্র এসে আস্তানা গাড়লে এবং সুমন্তকে দেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম ব্রতে দীক্ষিত করে তাকে বিয়ে থেকে নিবৃত্ত করলে। রুষ্ট রাম মিত্র এক বৃদ্ধ পাত্রের সঙ্গে রাজলক্ষ্মীর বিয়ে দিলে। কিছুদিন পর রাজলক্ষ্মী বিধবা হয়ে ফিরে এলো। সুমন্তর তাতে অনুশোচনার অন্ত রইল না। ইতিমধ্যে শাশ্বতীর সঙ্গে সুমন্তর ঘনিষ্ঠতা বেড়েছে। ওদিকে পুলিসও সুমন্তদের পিছু নিলে। সুমন্ত অবশ্য নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল এবং সে অমলের দল থেকে সরে আসতেও চেয়েছিল, কিন্তু পুলিস তখন ওদের ঘাটি আক্রমণ করে বসেছে। সুমন্ত ফেরার হলো এবং একদিন চুপিসাড়ে গ্রামে এসে নিজের সমস্ত বিলিয়ে বিবাগী হয়ে নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে গেলো।

* * *

আরম্ভতেই সুমন্ত আর তার কাকা-দের কোঁদল একটা আমুদে পরিবেশ গড়ে তোলে। সেই সঙ্গে একদিক থেকে সুমন্ত ও রাজলক্ষ্মীর ভবিষ্যৎ সম্পর্কের আশা এবং অপরদিকে শাশ্বতীর সুমন্তর ওপরে প্রণয়দৃষ্টি গল্পকে খানিকটা জমিয়েছিল, কিন্তু হঠাৎ কলকাতায় শাশ্বতীদের বাড়িতে তার দিদি স্বাতী আর দুর্বৃত্ত সুজিত সোমের প্রণয় অধ্যায় এনে ফেলে গল্পকে একেবারে ছত্রাকার করে দেওয়া হয়েছে। স্বাতীর প্রতি সুজিতের কপট প্রণয়; সুজিত সম্পর্কে সন্দিহান শাশ্বতীর দিদিকে সাবধান করে দেওয়া; পিতা ব্যারিস্টার বোসেরও শাশ্বতীর কথায় স্বাতীকে সতর্ক করার চেষ্টা; বেড়াবার নাম করে সুজিতের সঙ্গে স্বাতীর শিলিগুড়ি পলায়ন এবং সেখানে গোপন বিবাহ; খবর শুনে ব্যারিস্টার বোসের ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠা এবং তার স্ত্রী কেটির পাগল হবার মতো ভাব, ইত্যাদি একটা আলাদা পুরো গল্পই মাঝে প্রবেশ করিয়ে সুমন্তর প্রসঙ্গকে একেবারে তলিয়ে দিয়ে শেষে আবার যখন তাকে

তুলে আনা হয়েছে অনুতাপদগ্ধ এবং পলাতক বিপ্লবীর বেশে ততক্ষণে দর্শক-মন গল্পের ওপরে প্রায় সবটুকু আশা হারিয়েই বসেছে। যেটুকুও বা ছিল, সুমন্তকে বিবাগী করে দিয়ে গল্পকে বিয়োগান্ত করে তাও নিঃশেষ করে দেয়। এক এক করে অসংগতিগুলো ধরলে দীর্ঘ তালিকা হয়ে দাঁড়ায়, ছবি দেখার সময় যা মনে বিরক্তির উৎপাদন করে।

* * *

ছবিখানি দেখার জন্যে যে শেষ পর্যন্ত বসে থাকা যায়, তা কেবল অভিনয়-শিল্পীদের জন্যেই। সুমন্তর চরিত্রে উত্তম-কুমার, কাজেই শেষ পর্যন্ত তার কি হলো না দেখে উঠে আসা যায় না, সেটা উত্তম-কুমারের ব্যক্তিত্বের জন্য। তেমনি রাজ-লক্ষ্মীর চরিত্রে রয়েছেন সুচিত্রা—রাজলক্ষ্মীকে তো মাঝপথেই সুমন্তর সান্নিধ্য থেকে সরিয়ে দিয়ে দর্শকদের হতাশ করে দেওয়া হয়, তবুও শেষ পর্যন্তও সুমন্তর সংগে তার সংস্রব স্থাপনের একটা আশা লোকের থাকে। সুমন্ত দেখাও করে রাজলক্ষ্মীর সংগে, কিন্তু চিরতরে বিদায় নেবার জন্যে। এই বিয়োগান্ত শেষও অত্যন্ত হতাশাব্যঞ্জক ও নিরর্থক। অপর সরিক মহেশ রায়ের চরিত্রে কানু বন্দ্যোপাধ্যায়, তদীয় পুত্র ক্যাবলা ব্রজর চরিত্রে ভানু এবং গৃহিণীর চরিত্রে মলিনা দেবী না থাকলে ছবিখানি থেকে খানিকটা আমোদ আহরণ করা থেকেও বঞ্চিত হতে হতো। এ'রা তিনজনে খুবই জমিয়ে তোলেন। সুশীল রায় কিন্তু ভালো অভিনয় করে গিয়েছেন রাম মিত্রের চরিত্রে। ছবি বিশ্বাস ও ছায়া দেবী যথা-ক্রমে শাশ্বতীদের পিতা ও মাতার ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। ছবি বিশ্বাসের আবি-র্ভাবই সার, আর ছায়াদেবী কটকটে মেক-আপে উগ্র আধুনিকা 'সোসাইটি' গিন্নী মোটেই কোন টাইপ সৃষ্টি করতে পারেন নি। বিলেতফেরৎ 'ভিলেন' সুজিত সোমের চরিত্রে ধীরাজ ভট্টাচার্যের বাচন ও অভিব্যক্তি উপহাসের পর্যায়ে পড়ে। স্বাতীর চরিত্রে সুমনার দিক থেকেও দৃষ্টি সরিয়ে রাখতে ইচ্ছে হবে। আর, ওদের পুরো অধ্যায়টাই তো নিষ্প্রয়োজন। শাশ্বতীর চরিত্রে সবিতা চট্টোপাধ্যায় সুচিত্রার অনুপস্থিতিতে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন; অবশ্য ছবির আরম্ভই তাঁর আবির্ভাব নিয়ে। গুরুদাসের ছোট্ট এক ডাক্তারের চরিত্র। তুলসী চক্রবর্তী সুমন্তর অভিভাবক ভৃত্যের চরিত্রটিকে ভালো ফুটিয়েছেন। ডাঃ হরেন শাশ্বতীর পিতৃ-বন্ধু পুলিস অফিসার সুমন্তর সংগে মেলামেশা নিয়ে শাশ্বতীকে সাবধান করে দেয়। শিশির বটব্যালকে দেখা যায় বিপ্লবী অমল মিত্রের চরিত্রে। সুমন্তকে দলে নেওয়া বা নাম-করা বিপ্লবী নেতার কথা-বার্তা ইত্যাদির মধ্যে সে নাটকীয়তা নেই, তেমন পরিবেশও সৃষ্টি হয়নি।

* *

কলাকৌশলের দিকটা কোন রকমে কাজ চালানো গোছের। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টি, ঘরের জানলা দরজা খোলা, কিন্তু বাতির শিখাটি পর্যন্ত নড়ে না; বা ঝড়-জলের মধ্যে থেকে এলেও শুকনো পরিধান, এমনিধারা ঠিকে ভুল-ভ্রান্তি না খুঁজলেও চোখের সামনে এসে ধরা দেবে। সংগীতের দিকে সুমন্ত তথা উত্তমকুমারের মুখের দু'খানি গান ভালো লাগবে; মনে হলো সংগীত পরিচালক মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিজেরই গাওয়া। তা ছাড়া সংগীত, কণ্ঠ ও আবহ দুই-ই নিষ্প্রভ। ছবিখানির অন্যান্য সংগঠনকারিবৃন্দ হচ্ছেন চিত্রনাট্য মণি বর্মা, পরিচালনা সুধাংশু মুখো-পাধ্যায়, আলোকচিত্র দিব্যেন্দু ঘোষ, শব্দ-গ্রহণ পরিতোষ বসু ও শিল্প নির্দেশ মদন গুপ্ত।

* * *

একই গল্প "দো বিঘা জমীন" ও "রিক্সাওয়ালা"-র অবশ্য লেখাও একই লোকেরই, এবং এমন লোকের যে দেখে মনে হয়, যিনি পৃথিবীকে স্বাভাবিক, সুস্থ ও শোভনরূপে দেখেননি বা দেখাতে চান না। পৃথিবীতে বাঁচাটাই যে কতো বিড়ম্বনা এইটেই এ গল্পের প্রতিপাদ্য—অতি নিষ্ঠুর ও অমানুষিক জগত এটা। "রিক্সাওয়ালা"-র আসবার কথা ছিল "দো বিঘা জমিন"-এর আগেই, কিন্তু মাঝপথে গাড়ি থেমে ছিল অনেকদিন এবং মুক্তিলাভ করতে পেরেছে অনেক পরে। তাতে একটা সুবিধে হয়েছে এই যে, হিন্দী ছবিখানি শেষ পর্যন্তও যে অসহায় অবস্থার ছবি দাঁড় করিয়ে মনকে দারুণ নৈরাশ্যে ভরিয়ে তোলে, বাঙলা "রিক্সাওয়ালা" শেষটা একটু বদলে অন্তত এই আশ্বাস-টুকু এনে দিতে পেরেছে যে, অন্যায় উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করার কেউ না থাক দেশের গবর্নমেণ্ট আছে। তবে ওই আশ্বাসের জোরটা একেবারে শেষে অতি হঠাৎ এমনভাবে এনে ফেলা হয়েছে যে, স্পষ্টই ধরা পড়ে যে, ওটুকু না দিলে ছবিখানির বোধ হয় সেন্সরের হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভই দুষ্কর হতো।

* * *

বিষয়বস্তুই এমনি যে, ছবিখানিকে ভালো লাগাতে ইচ্ছে করবে না। কৃষিজীবী সেই শশীর গল্প। বাকি খাজনা শোধ করে জমি বাঁচাবার ধান্দায় কলকাতায় এসে অনন্ত নাকাল ভোগ; দুর্ঘটনায় প্রায় প্রাণ-সংশয়। ওদিকে স্ত্রীরও দুর্বিপাক; চাল বেচতে এসে চোরাকারবারী শয়তানের খপ্পরে পড়ে ইজ্জৎ ও প্রাণ দুই-ই বিপন্ন হলো তার। একমাত্র ছেলেটিরও দুর্ভোগের অন্ত নেই। "দো বিঘা জমীন"-এর সংগে তুলনামূলক বিচার এসে পড়া স্বাভাবিক এবং সে বিচারে "রিক্সাওয়ালা"য় ক'জনের অভিনয় ছাড়া আর সব দিকই অতি দীন বলে মনে হবেই। একটা অস্থির অগোছাল ভাবও চেহারায় পরিস্ফুট। অভিনয়ে নাম-ভূমিকায় কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁর স্ত্রীর ভূমিকায় তৃপ্তি মিত্রের অভিনয়ে শিল্প-কৃতিত্বের চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। শশীর বৃদ্ধ পিতার ভূমিকায় সুধী প্রধানও নজরে পড়বেন। ছোট ছেলেদের বটপালিসের দল বেশী অসংযত। তবে মানিককে মন্দ লাগবে না শশীর ছেলের ভূমিকায়। ছবিখানির বিভিন্ন বিভাগে আছেন কাহিনী রচনায় ও সংগীত পরি-চালনায় সলিল চৌধুরী; পরিচালনায় সত্যেন বসু; আলোকচিত্র গ্রহণে বিভূতি চক্রবর্তী; শব্দ গ্রহণে সত্যেন চট্টোপাধ্যায় ও লোকেন বসু এবং শিল্প নির্দেশে দিবাকর দত্ত।

ট্রামে-বাসে

একটি প্রশ্নের উত্তরে শ্রীযুক্ত নেহরু বলিয়াছেন যে, শান্তির পথে যুদ্ধই হইল সবচেয়ে বড় বিপজ্জনক ব্যাপার। —"যুদ্ধকে বিপদ মনে করেন হয়ত আপনি, হয়ত মনে করি আমি, কিন্তু বাটপাড়িয়া চোরাওয়ালারা তা নিশ্চয়ই মনে করেন না। যুদ্ধ না বাধা পর্যন্ত অশান্তিতে তাদের চোখে ঘুম নেই"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

ডাঃ খান সাহেব দিল্লী ত্যাগের প্রাক্কালে ক্রিকেটের ভাষায় মন্তব্য করিয়াছেন যে, দিল্লীতে তিনি
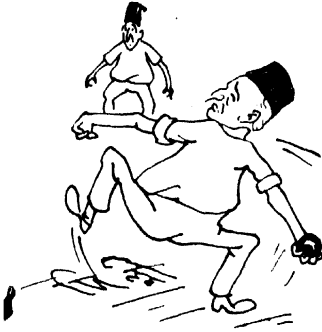
বল করিয়াছেন এবং ব্যাটও করিয়াছেন। তাঁহার মতে দিল্লীর পিচ্ নাকি খুব ভালো। —"অনেকে দিল্লীর পিচের প্রশংসা করতে রাজী নন। তাঁরা বলেন, দিল্লীতে বাউণ্ডারী করা নাকি খুব শক্ত, অথচ সাধারণ দর্শক বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন এই 'বাউণ্ডারীর' ওপর—" বলিলেন এক সহযাত্রী।

* * *

কমনওয়েলথ্ মন্ত্রি-সম্মেলনে ফরমোজার প্রশ্ন আলোচিত হইবে কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে নেহরুজী পরিহাস করিয়া বলিলেন—"নিশ্চয়ই হবে, আপনারা কি মনে করেন আমরা সেখানে ব্রিজ খেলতে যাচ্ছি?" শ্যামলাল বলিল —"তা যাচ্ছেন না, সেকথা আমরা জানি। তবে কথা হলো এই যে, খেলাধুলা একবারে বাদ দিয়ে শুধু কাজ আর কাজ করতে করতে জ্যাক্ নামক কোন এক ছেলে নাকি একদম ডাল্ মেরে গিয়েছিল!"

* * *

রিপাবলিক ডে অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে "সন্দেশ" প্রেরণ করিতে গিয়া রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ বলিয়াছেন যে, আমাদের নিকটবর্তী প্রতিবেশী পাকিস্তানের জন্য শুভ কামনা ছাড়া আর আমাদের কিছুই নাই। "কিন্তু পাকিস্তানের অনেকেই বলেন—শুধু কামনাই নয় গো হে দোস্ত, হে প্রিয়, মাঝে মাঝে এটা-সেটা ছেড়ে-ছুঁড়ে দিও"—সুর করিয়া বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

ভারতে অবস্থিত পাকিস্তানের হাইকমিশনার রাজা গজনফর আলি বলিয়াছেন যে, ভারত আর পাকিস্তান দ্রুতগতিতে একটি "মোড়ের" দিকে অগ্রসর হইতেছে। সংবাদটি শুনিয়া আমাদের জনৈক রেসুড়ে
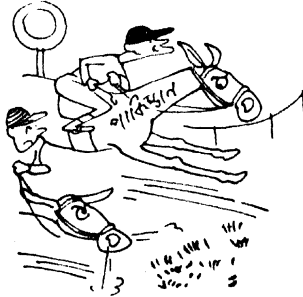
সহযাত্রী বলিয়া উঠিলেন—"বেণ্ডের মুখে বেশি দ্রুতগতিতে চলতে গিয়ে অনেক ঘোড়াই ওয়াইড হয়ে যায়। বাজি মারতে হলে স্ট্রেট্ চলতে হবে, তা রেলিং ধরেই হোক বা আউটসাইড দিয়েই হোক!"

* * *

রিপাবলিক ডে অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে কয়েম্বেটোর হইতে একটি জোর খবর পাওয়া গিয়াছে। শোনা গেল, এই দিনে কোন হেয়ারকাটিং সেলুনের মালিক বিনা-পয়সায় চুল কাটিতে এবং দাড়ি ছাঁটিতে রাজী হইয়া সাধারণের মধ্যে একটি নোটিশ দিয়াছিলেন। —"আবাদী কংগ্রেসে নিষ্পাপ হওয়ার প্রস্তাব প্রসঙ্গে আমরা গঙ্গাস্নান এবং মুণ্ডনের পরামর্শ দিয়েছিলাম। সেলুনের মালিক সেকথা স্মরণ করে নোটিশ দিয়েছেন কিনা জানিনে"—বলেন বিশুখুড়ো।

* * *

মার্শাল টিটো বলিয়াছেন যে, জগৎকে চমৎকৃত করিবার জন্য ভারতের ভাণ্ডারে অনেকরকম কৌশল আছে। —"আছে বৈকি; মার্শাল অনেক
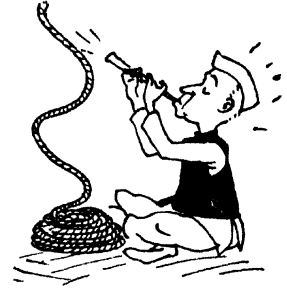
দেখে গেছেন, কিন্তু ভারতের Rope trick তো এখনো দেখেন নি"—বলিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

নবদ্বীপের একটি সংবাদে শুনিলাম, সেখানে একটি নিম-গাছ হইতে নাকি মধু নিঃসৃত হইতেছে। শ্যামলাল বলিল—"বহু পুরাতন ভাব, নব আবিষ্কার। স্বর্গত কবি সুকুমার রায় নিমগাছেতে সিম্ হতে দেখে হেসে খুন হয়েছিলেন। সিম্ হতে পারলে মধু ফলতে আর কতক্ষণ!!"

* * *

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম, জলপাইগুড়িতে একটি মুরগীর নাকি তিনটি পা হইয়াছে। —"আশ্চর্য সংবাদ সন্দেহ নেই। তবে এতে শঙ্কার কোন কারণ নেই। মুরগীর ঠ্যাং যত ইচ্ছা হোক, শুধু সাপের পাঁচ-পা না দেখলেই হলো"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

ক্রিকেটের বাঘ সিংহ এ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট-যুদ্ধের পাঁচটি খেলার মধ্যে ইংলণ্ড তিনটি খেলায় জয়লাভ করায় 'রাবার' লাভ করেছে। গতবার ইংলণ্ড নিজের মাটিতেই অস্ট্রেলিয়াকে টেস্ট-যুদ্ধে পরাজিত করে 'এ্যাসেসের' পুনরুদ্ধার করেছিল, এবারও 'এ্যাসেস' রাখলো নিজেদের অধিকারে। উপর্যুপরি দু' বছর নিজ ভূমিতে এবং বিদেশে টেস্ট-যুদ্ধের এই সাফল্য ক্রিকেট স্রষ্টা ইংলণ্ডের ক্রীড়াশৌর্যের পরিচায়ক। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার পাঁচটি টেস্ট খেলার মধ্যে এখনো একটি খেলা বাকি। সেই খেলার আর তেমন আকর্ষণ রইল না। চারটি খেলার মধ্যে

এ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট-যুদ্ধে উপর্যুপরি দু' বছরের 'রাবার' বিজয়ী ইংলণ্ডের অধিনায়ক লেন হাটন

খেলার মাঠে

একলব্য

ব্রিসবেন মাঠের প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া এক ইনিংস ও ১৫৪ রানে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেছিল ইংলণ্ডকে, কিন্তু তারপর সিডনী ও মেলবোর্ন ফ্রন্টের লড়াইয়ে ইংলণ্ড যথাক্রমে ৩৮ ও ১২৮ রানে অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে 'রাবার' লাভের জন্য হয়ে থাকে আশান্বিত। এডিলেডের ক্রিকেট রণাঙ্গনে 'রাবারের' প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে যায়। ইংলণ্ড ৫ উইকেটে পরাজিত করে অস্ট্রেলিয়াকে। চারটি টেস্টের কোন টেস্টই পুরো ৬ দিন খেলা হয়নি। ৫ দিনের মাথাতেই মীমাংসিত হয়েছে সব খেলা। এডিলেড মাঠের চতুর্থ টেস্ট ম্যাচের পূর্ণ বিবরণ হাতে আসবার আগেই সংবাদ পরিবেশন করতে হ'ল। এ সম্পর্কে আগামী সংখ্যায় আরও লিখবার ইচ্ছে আছে। নীচে সংক্ষিপ্ত স্কোর-বোর্ড দেওয়া হ'ল ঃ—

সংক্ষিপ্ত স্কোর-বোর্ড

অস্ট্রেলিয়া—১ম ইনিংস—৩২৩ (ম্যাডকস ৬৯, ম্যাকডোনাল্ড ৪৮, কিথ মিলার ৪৪, জনসন ৪১, হার্ভে ২৫, মোরিস ২৫; বেলী ৩৯ রানে ৩ উইঃ, এ্যাপলইয়ার্ড ৫৮ রানে ৩ উইঃ ও টাইসন ৮৫ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড—১ম ইনিংস—৩৪১ (হাটন ৮০, কাউড্রে ৭৯, কম্পটন ৪৪, বেলী ৩৮, ইভান্স ৩৭; বিনাউড ১২০ রানে ৪ উইঃ, জনসন ৪৬ রানে ২ উইঃ ও জনস্টন ৬০ রানে ২ উইঃ)

অস্ট্রেলিয়া—২য় ইনিংস—১১১ (ম্যাকডোনাল্ড ২৯, ডেভিডসন ২৩; টাইসন ৪৭ রানে ৩ উইঃ, স্ট্যাথাম ৩৮ রানে ৩ উইঃ ও এ্যাপলইয়ার্ড ১৩ রানে ৩ উইঃ)

ইংলণ্ড—২য় ইনিংস—(৫ উইঃ) ৯৭ (ডেনিস কম্পটন নট আউট ৩৪, মে ২৬, বেলী ১৫; মিলার ৪০ রানে ৩ উইঃ, জনস্টন ২৮ রানে ২ উইঃ)

(ইংলণ্ড ৫ উইকেটে বিজয়ী)

* * *

ইডেন উদ্যানের 'ইনডোর স্টেডিয়ামে' পূর্ব ভারত টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা শেষ হয়েছে, সেই সঙ্গে শেষ হয়েছে ভারত ও চেকোস্লোভেকিয়ার টেবিল টেনিস টেস্ট খেলা। কলকাতায় চেক-ভারত পঞ্চম টেস্টের আগে বোম্বাই, হায়দরাবাদ, মাদ্রাজ ও বাঙ্গালোরে যে চারটি টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়, চেকোস্লোভেকিয়া তার মধ্যে তিনটি টেস্টে জয়লাভ করায় ইতিপূর্বেই 'রাবার' লাভ করে। সুতরাং শেষ টেস্ট খেলায় আর কোন আকর্ষণ থাকবার কথা নয়। তবুও চেকোস্লোভেকিয়ার বিশ্বখ্যাত দুই ধুরন্ধর টেবিল টেনিস খেলোয়াড় আইভান আন্দ্রিয়াদিজ ও ভ্যাকলাভ টেরেবার সঙ্গে ভারতীয় খেলোয়াড়দের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখবার জন্য 'ইনডোর স্টেডিয়ামে' কম দর্শক সমাগম হয়নি। বিশ্ব টেবিল টেনিস ক্রমপর্যায়ে আন্দ্রিয়াদিজের স্থান দ্বিতীয়। টেরেবা একাদশ স্থানের অধিকারী। বলা বাহুল্য, আন্দ্রিয়াদিজ ও টেরেবা অনায়াস ভঙ্গীতে খেলেই শেষ টেস্টে ভারতকে পরাজিত করেছেন। আন্তর্জাতিক ডেভিস কাপের নিয়মানুযায়ী চারটি সিঙ্গলস ও একটি ডাবলসের খেলায় দুই দেশের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। তিন তিনটি সেটে এক একটি গেমের নিষ্পত্তি হয়েছিল। এর মধ্যে ভারত একটি গেমও পায়নি। সিঙ্গলসের খেলায় ভারতের অধিনায়ক রণবীর ভাণ্ডারী আন্দ্রিয়াদিজের কাছ থেকে এবং ডাবলসে ভাণ্ডারী ও জয়ন্ত আন্দ্রিয়াদিজ ও টেরেবার

বিশ্বের দুই নম্বর টেবিল টেনিস খেলোয়াড় আইভান আন্দ্রিয়াদিজ

কাছ থেকে একটি করে সেট লাভ করেছেন মাত্র। শুধু কলকাতার টেস্ট কেন, এক বোম্বাই ছাড়া আর কোন টেস্টেই ভারত চেকোস্লোভেকিয়ার কাছ থেকে কোন গেম পায়নি। বোম্বাইতে চেকোস্লোভেকিয়াকে হার স্বীকার করতে হয়েছিল ২—৩ গেমে। অবশ্য এখানে চেকোস্লোভেকিয়ার পরাজয় ঘটেছিল অনভ্যস্থ স্পঞ্জ র‍্যাকেটে খেলবার জন্য। তারপর আন্দ্রিয়াদিজ ও টেরেবা তাদের স্বভাবসিদ্ধ বৈশিষ্ট্য এবং অভ্যস্থ রবার মোড়া র‍্যাকেটে খেলেই একে একে চারটি টেস্টে ভারতকে পরাজিত করেছেন।

বিশ্বের অন্যতম কুশলী টেবিল টেনিস খেলোয়াড় আন্দ্রিয়াদিজের হাতে সব রকমের মা'র আছে। 'ব্যাক হ্যান্ডে' তিনি যেমন পটু, ফোর হ্যান্ডেও তেমন সিদ্ধহস্ত। চাপ মা'রে তার অসম্ভব জোর, আবার চাপ তোলেনও অনায়াসভংগীতে। মা'রের বন্যায় টেবিল কাঁপিয়ে তুলতে পারেন, আবার অসম্ভব স্লো খেলে প্রতিপক্ষকে পারেন বিব্রত করে তুলতে। সব রকমের খেলাতেই তাঁর আয়াসহীন প্রচেষ্টা। ক্রীড়া প্রতিভার উপরে রয়েছে আন্দ্রিয়াদিজের অসম্ভব বোধ শক্তি। যার ফলে তিনি প্রতিপক্ষের মনস্তত্ত্ব উপলব্ধি করে এক মুহূর্তে খেলার ধারার আমূল পরিবর্তন করতে পারেন। পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়নশিপেরই একটি ঘটনা। আন্দ্রিয়াদিজের সংগে খেলতে এলেন বাঙলার তরুণ খেলোয়াড় সরোজ ঘোষ। উদীয়মান খেলোয়াড় হিসেবে সরোজের নাম-ডাক কম নয়। অনমনীয় দৃঢ়তা এবং খেলার মধ্যে সাময়িক প্রতিভার ছাপ ফুটিয়ে সরোজ ঘোষ পর পর দুটি সেট লাভ করলেন বিশ্বের দুই নম্বরের খেলোয়াড় আইভ্যান আন্দ্রিয়াদিজের কাছ থেকে। পাঁচটি সেটে গেমের মীমাংসা। আর একটি সেট পেলেই চেক ধুরন্ধর হবেন পরাজিত। আন্দ্রিয়াদিজ বিচলিত, তার চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ভাব। পূর্ব ভারত টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্যোক্তাদের উৎকণ্ঠাও কম নয়। কারণ আন্দ্রিয়াদিজ হেরে গেলে 'ইনডোর স্টেডিয়ামে' আর লোক সমাগম হবে না। একেই তো আশানুরূপ দর্শক সমাগম না হওয়ায় তারা প্রমাদ গুনছেন। যাই হোক তৃতীয় সেটের খেলা আরম্ভ হল, সরোজ ও আন্দ্রিয়াদিজের মধ্যে, কিন্তু এ কোন খেলা? এ কি আগের সেই আন্দ্রিয়াদিজ। না আর কেউ! সেই আন্দ্রিয়াদিজই তো। স্বাস্থ্য-সমুজ্জ্বল প্রিয়-দর্শন খেলোয়াড়। কিন্তু খেলার এ কোন্ ধারা? আগের খেলার সংগে এ খেলার কোনই সামঞ্জস্য নেই। যেন টেবিল টেনিসের নতুন শিক্ষার্থী। ঠুক ঠাক করে বল মারছেন, কিন্তু এরই মধ্যে যখন মোক্ষম চাপ মা'রে পয়েণ্ট লাভ করছেন সরোজের কাছ থেকে তখন মনে হচ্ছে এ খেলা আন্দ্রিয়াদিজেরই উপযোগী। কখনো স্লো কখনও ফাস্ট গেম। সরোজকে এখন অনেক ছোট মনে হচ্ছে আন্দ্রিয়াদিজের কাছে। পর পর তিনটি সেট নিয়ে খেলায় জয়লাভ করলেন আন্দ্রিয়াদিজ। উদ্যোক্তারাও হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। আন্দ্রিয়া-দিজের খেলার এইটাই বিশেষত্ব। বোধ করি এই মনস্তাত্ত্বিক খেলাতেই তিনি লণ্ডনের ওয়েম্বলী স্টেডিয়ামে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ইচিরো ওগিমুরাকে পরাভূত করেছিলেন সোয়েদলিং কাপের খেলায়। আন্দ্রিয়াদিজের হাতের নানা মা'রের মধ্যে সেই মা'রগুলিই আমাদের ভাল লেগেছে, যে চাপ মা'রে তিনি প্রতিপক্ষকে একেবারে বোকা বানিয়ে পয়েণ্ট লাভ করেছেন। বিদ্যুৎ গতিতে হস্তচালিত র‍্যাকেট ধেয়ে

চেকোশ্লোভাকিয়ার খ্যাতনামা টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ভ্যাকলাব টেরেবা

আসছে বলের দিকে,—যেভাবে র‍্যাকেট হাতে ধরা রয়েছে, তাতে বল টেবিলের ডানদিকে পড়তে বাধ্য, অব্যর্থ এ চাপ তোলবার জন্য প্রতিপক্ষেরও সদাজাগ্রত তৎপরতা, তিনিও প্রস্তুত। কিন্তু দেখা গেল বল ডানদিকের টেবিলে না পড়ে টেবিলের বাঁদিকে মাথা কুটে চলে গেছে—প্রতিপক্ষের নাগালের বাইরে। চাপ মারবার সময় ত্বরিতে র‍্যাকেট ঘুরে গেছে আন্দ্রিয়াদিজের হাতের মধ্যে। বল আর র‍্যাকেটের মিলনক্ষণে র‍্যাকেট করেছে পার্শ্ব পরিবর্তন, তাই বলেরও গতির পরিবর্তন।

পূর্ব ভারত টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপে মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ন মিস উষা আয়েংগার

এ চাপ তোলা শিবেরও অসাধ্য। আন্দ্রিয়া-দিজের খেলার এ আর এক বৈশিষ্ট্য। টেবিল টেনিসের সুনিপুণ শিল্পী তিনি।

* * *

কলকাতায় পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়নশিপ এবং চেক-ভারত পঞ্চম টেস্ট খেলা যারা দেখেছেন, তারা অনেকেই আন্দ্রিয়াদিজের দোসর টেরেবার 'ফোর হ্যান্ডের' জোরালো চাপ মা'রের সুখ্যাতি করেছেন। সত্যই টেরেবার 'ফোর হ্যান্ডে' অসম্ভব জোর আছে। স্বাস্থ্যসমৃদ্ধ এবং সুগঠিত দেহ টেরেবার। তার সবল হাতের সজোর মার প্রতিরোধ করতে হিমসিম খেয়ে উঠতে হয়। গায়ে যত শক্তি আছে, সমস্ত হাতের মধ্যে সংহত করে টেরেবা তার মোটা রবারে মোড়া র‍্যাকেটের দ্বারা ছোট্ট ফাঁপা সেলুলয়েড বলে আঘাত করেন। কিন্তু ফোরহ্যান্ডের বা ব্যাকহ্যান্ডের চাপ মারের সময় আন্দ্রিয়াদিজকে এত শ্রম স্বীকার করতে হয় না। অনায়াসভংগীতেই চাপ মারেন আন্দ্রিয়াদিজ। পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়নশিপের অনুষ্ঠান কালে আন্দ্রিয়া-দিজ ও টেরেবা প্রতিদিনই প্রদর্শনী খেলায় অংশ গ্রহণ করেছেন। একদিন দুয়ের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে দেখা গেল টেরেবার সমস্ত জোরালো ফোরহ্যান্ডের চাপই আন্দ্রিয়াদিজ তুলে দিচ্ছেন আয়াসহীন প্রচেষ্টায়। কিন্তু আন্দ্রিয়াদিজের মা'র তুলতে টেরেবাকে বিব্রত হয়ে উঠতে হচ্ছে—টেরেবা প্রথম চাপ তুললেন, দ্বিতীয়ও তুললেন, কিন্তু তৃতীয় চাপ আর তুলতে পারলেন না। স্বল্প-বাক টেরেবার মুখ থেকে স্বগত উক্তির মত বেরিয়ে এল একটি কথা—'তেরিফিক'। ওটা Terrific-এরই নামান্তর। চেকের মুখে তেরিফিক শোনাল। এতেই বোঝা যায় আন্দ্রিয়াদিজের স্বভাবসুলভ মা'রের মধ্যেও কত জোর নিহিত থাকে। যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাবে অবশ্য আন্দ্রিয়াদিজের টেবিল টেনিস নৈপুণ্যের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়নি, তবুও কলকাতায় পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়ান-সিপ এবং পঞ্চম টেস্টের খেলায় আন্দ্রিয়াদিজ ও টেরেবা টেবিল টেনিসের যে কলাকৌশল দেখিয়ে গেছেন, তা অনেকদিন ক্রীড়ামোদীর স্মরণে থাকবে।

* * *

পূর্ব ভারত টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন-শিপে ভারতের অনেক গুণী ও কৃতী খেলোয়াড় কলকাতায় হয়েছিলেন সমাগত। অবশ্য আসেনও নি অনেক প্রতিভাবান খেলোয়াড়। না-আসার দলের মধ্যে জাতীয় চ্যাম্পিয়ন উত্তম চন্দ্রানা, ক্রমপর্যায়ে দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী যতীন ব্যাস, তিন নম্বরের খেলোয়াড় চন্দোরকার, চতুর্থ স্থানাধিকারী দিলীপ সম্পৎ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের মধ্যে হায়দরাবাদ চ্যাম্পিয়ন রামকৃষ্ণ, বোম্বাই রানার্স সোমায়া খ্যাতনামা বালু প্রভৃতির নাম করা যেতে

পারে। এদের সঙ্গে এসেছিলো হায়দরাবাদের শিশু প্রতিভা আজম আর বোম্বাই টেবিল টেনিসের বালকবীর ভোরা। এদের কারুরই এগারো বছরের কোঠা পার হয়নি। দুজনের মধ্যেই ভারতীয় টেবিল টেনিসের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে। এত অল্প বয়সে এরা টেবিল টেনিসে যে নৈপুণ্য আয়ত্ত করেছে, তা দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হতে হয়। হায়দরাবাদ চ্যাম্পিয়ন রামকৃষ্ণ এবং বোম্বাইয়ের দুই নম্বর খেলোয়াড় সোমায়া দর্শকদের যতখানি হতাশ করেছেন, দুই বালক খেলোয়াড়ের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্য দর্শকদের ঠিক ততখানি আনন্দ দিয়েছে। বাঙলার তরুণ খেলোয়াড় বি এন লাহিড়ী সোমায়াকে পরাজিত করেন, আর রামকৃষ্ণকে হার স্বীকার করতে হয় বাঙলার উদীয়মান খেলোয়াড় ই সলোমানের কাছে। এ দু'টি ফলাফলই অপ্রত্যাশিত। অবশ্য সলোমান, যার মধ্যে ভারতের টেবিল টেনিস কোচ,—বিশ্ব টেবিল টেনিসের গুরুজী ভিক্টর বার্না ভবিষ্যৎ বিশ্বজয়ীর প্রতিভা পরখ করেছেন, তিনি রামকৃষ্ণকে পরাভূত করবেন এতে আর আশ্চর্যের কি আছে। কিন্তু সলোমানের এ প্রতিভা তো সাধারণের অজ্ঞাত। বার্নার দৃষ্টিতেই তিনি ধরা পড়েছেন এবং অনু-শীলন ও অধ্যবসায়ের গুণে সলোমান যে বিশ্বজয়ী হতে পারেন, বার্না এ মন্তব্যও করে গেছেন। যাই হোক সলোমান অবশ্য পূর্ব ভারত চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করতে পারেন নি। প্যারালেল ফাইন্যালেও তিনি বেঙ্গল চ্যাম্পিয়ন ভান্ডারীর কাছে পরাজিত হয়েছেন, তবুও তরুণ সলোমানের খেলার মধ্যে দেখা গেছে টেবিল টেনিস নৈপুণ্যের দিব্যদৃষ্টি। প্রতিভাবান কুশলী খেলোয়াড়ের অনেক গুণই তার খেলার মধ্যে নিহিত আছে।

* * *

বালক খেলোয়াড়দ্বয় ভোরা ও আজমের খেলার কথা কিছু বলতে হলে এক কথায় বলতে হয় সুন্দর। অপূর্ব। ছোটর নৈপুণ্যে অভিভূত হয়ে বিচারবুদ্ধিতে মোহ জড়ান খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সম্পূর্ণ মোহমুক্ত হয়েই বলছি ভোরা ও আজম অপূর্ব টেবিল টেনিস নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, যে নৈপুণ্যের পরিচয় দেওয়া প্রতিভাবান কুশলী খেলোয়াড়ের পক্ষেই সম্ভব। টেবিলের উচ্চতা যাদের বুক পেরিয়ে গলা সমান উঠেছে, সেই টেবিলে তারা মা'রের ঝড় তুলে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। সেলুলয়েডের ছোট্ট ফাঁপা বল ঝড়ের মাঝে পড়ে এক র‍্যাকেট থেকে অন্য র‍্যাকেটে যাবার মুখে একবার করে টেবিল ছুঁয়ে যাচ্ছে। মাটি ছোঁবার যো নেই। দুদিকেই ছোট চোখের প্রখর দৃষ্টি। ৩৭ গ্রেনের হাল্কা বল একবার ছুটেছে হাওয়ার বেগে, পরক্ষণেই গতি মন্থর করে ঘুরপাক খেয়ে পড়ছে টেবিলের উপরে। কিন্তু 'স্পিন বলেও' পরাজিত হবার

বোম্বাই টেবিল টেনিসের বালক-বীর ভোরা ও হায়দরাবাদের শিশু প্রতিভা আজম (ডাইনে)

পাত্র নয় ভোরা-আজম। এমনিভাবে দুই বালক-বীরের খেলা দর্শকদের উন্মনা করে তুলেছে। কেউই হার স্বীকার করতে রাজী নয়। দর্শকরাও রাজী নয় কাউকে পরাজিত দেখতে। তারা দুজনকেই জয়ী দেখতে চায়। কিন্তু তাও কি সম্ভব? পাঁচটি গেমের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার পর ভোরা আজমকে পরাজিত করলেন ৩—২ গেমে। বোম্বাইয়ের বালকবীর হলো পূর্ব ভারত টেবিল টেনিসের জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন।

জাতীয় চ্যাম্পিয়ন উত্তম চন্দ্রাণা ভোরার শিক্ষাগুরু। ভোরার খেলার মধ্যেও চন্দ্রাণার ছাপ সুস্পষ্ট। চন্দ্রাণাও ন্যাটা খেলোয়াড়,

বাঙলার উদীয়মান টেবিল টেনিস খেলোয়াড় ই সলোমান

ভোরাও। চন্দ্রাণার মতই ভোরা মারমুখ লাফিয়ে উঠে বা হাতের চাপ মারতেই বেশী পটু। লাফিয়ে না উঠলে উঁচু বলে নাগাল পাওয়াও তার পক্ষে কষ্টকর। টেবিলের এক জায়গায় বল না মেরে চারি দিকে বল ছড়িয়ে খেলতেও ভোরা বেশ যত্নশীল। অপরদিকে আজমের কৃতিত্ব চ মা'রের চেয়ে চাপ তোলায়। অসম্ভব ধৈ শীল। নেচে নেচে খেলে আজম। কারণ এক আঙুলে ভর করে উঁচুতে উঠার সুবি হয়। মা'রেরও জোর বাড়ে। আজমের হা আছে একটি 'ফ্লিক' মা'র। ব্যাক হ্যান্ডের ও তৎপর চটকদার মা'র কশাঘাতের মত প্রতি পক্ষের টেবিলে অব্যর্থ পয়েন্ট এনে দে

ভোরা ও আজমের খেলার সম আন্দ্রিয়াদিজ স্থিরদৃষ্টিতে শিশু খেলোয়া দের প্রতিটি মা'র পরখ করছিলেন। খেল শেষে বললেন টেরেবা ও আমার চেয়ে এ অনেক ভাল খেলেছে। "কার খেলা ভা লাগল?"—এ প্রশ্নের উত্তরে আন্দ্রিয়াদি বললেন—"দু'জনেরই; কারো খেলাই খারা নয়। দুজনেই সুন্দর। দুজনেই অপূর্ব। টেরেবা ও আন্দ্রিয়াদিজের চেয়ে ভোরা আজম ভাল খেলেছে, আন্দ্রিয়াদিজের উক্তির মধ্যে অতিশয়োক্তি ছিল সন্দেহ নেই কিন্তু আন্দ্রিয়াদিজ ও টেরেবার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চেয়ে 'ভোরা-আজম' প্রতিদ্বন্দ্বিতা যে বেশ প্রাণবন্ত হয়েছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দে নেই।

টেবিল টেনিসের গুরুজী বার্না বলেছেন, ভারতের বালক খেলোয়াড়দের মধ্যে তিনি যে প্রতিভা পরখ করেছেন, বিশ্বে কোন দেশেই বালকদের মধ্যে সে প্রতিভ প্রত্যক্ষ করেননি। বিশ্ব টেবিল টেনি চ্যাম্পিয়নশিপে যদি জুনিয়র বিভাগে প্রতি দ্বন্দ্বিতা হয়, নিঃসন্দেহে ভারত বিজয়ী সম্মান অর্জন করবে।

* * *

পূর্ব ভারত টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়ন শিপে মহিলা বিভাগের খেলায় কোন নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া যায়নি। মিস উষ আয়েংগার মিস ই মোজেসকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন বটে, কিন্তু উষার খেলায় না ছিল নৈপুণ্য, না ছিল সাবলীলতা। ফোরহ্যান্ডের মাত্র একটি মা'র আছে উষার হাতে। তাও কালে ভদ্রে দেখা যায়। খেলায় উন্নতি করতে হলে উষাকে আরও যত্নশীল হতে হবে। করতে হবে অনু-শীলন। টেবিল টেনিসই একমাত্র খেলা যেখানে মেয়েদেরও সমান মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। ব্যাডমিন্টনে পুরুষের গেম ১৫ পয়েন্টে। মেয়েদের বেলায় ১১ পয়েন্ট। টেনিসে পুরুষদের খেলার মীমাংসা পাঁচ সেটে মেয়েদের বেলায় তিন সেট। টেবিল টেনিসেই একমাত্র সাম্যের গান গাওয়া হয়েছে। এখানে

পুরুষ নারীর কোন ভেদাভেদ নেই। সুতরাং মেয়েদেরও উচিত পুরুষের সংগে সমান তালে এগিয়ে যাওয়া।

* * *

ঢাকা ও বাওয়ালপুরের ম্যাটিং উইকেটে ভারত ও পাকিস্থানের দুটি টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর লাহোরের টার্ফ উইকেটেও পাক-ভারত তৃতীয় টেস্ট অমীমাংসিতভাবে শেষ হয়েছে। বাকি পেশোয়ার ও করাচীর টেস্ট খেলা। ঘাসের 'পিচে' খেলার ফলাফল নিষ্পত্তি হতে পারে বলে যারা আশা পোষণ করেছিলেন, লাহোর টেস্টের পর তারাও জয়-পরাজয় মীমাংসা সম্পর্কে নিরাশ হয়েছেন। ঘাসের 'পিচের' উপর ভারতের ছিল অনেক আশা, পাকিস্থানের ছিল আশঙ্কা। তারই ফলে পেশোয়ারে ম্যাটিং উইকেটে, কি টার্ফ উইকেটে খেলা অনুষ্ঠিত হবে এ নিয়ে এক সমস্যা দেখা দেয়। পাকিস্থানের আব্দার 'ম্যাটিংয়ে খেলবো।' ভারতের দাবী টার্ফ উইকেট। কিন্তু লাহোর টেস্ট এই সমস্যা সমাধানের পরম সহায়ক হয়েছে। এখন টার্ফ উইকেটে খেলতে পাক ক্রিকেট বোর্ডেরও আপত্তি নেই, ভারতেরও দাবীর প্রয়োজন শেষ হয়েছে।

লাহোর টেস্টের তৃতীয় দিনে বৃষ্টির ভয়ে 'পিচটিকে' ত্রিপলের দ্বারা আচ্ছাদিত করা হয়েছিল। কিন্তু পূর্ব ব্যবস্থা ছাড়া এটা ক্রিকেটের আন্তর্জাতিক নীতিবিরুদ্ধ। নীতি বিগর্হিত এই ব্যবস্থার জন্য ভারতের অধিনায়ক বিনু মানকড় এবং ম্যানেজার লালা অমরনাথ আপত্তি তুলেছিলেন। এবং 'প্রতিবাদ' পেশ করেই তারা খেলা আরম্ভ করেন। যে ত্রিপল দিয়ে উইকেট ঢাকা হয়েছিল, তাতে বড় বড় ছিদ্র থাকায় একদিকের 'পিচ'ও ভিজে চুপসে ওঠে। এতে ভারতের ব্যাটিংয়েও অন্তরায় সৃষ্টি করে। সুবিধা হয় পাকিস্থানের বোলারদের। 'পিচ' ঢাকবার যদি এতই প্রয়োজন ছিল, তবে ছিদ্রহীন ত্রিপল দিয়ে ঢাকলেই হত। যারা পরের ছিদ্র অন্বেষণের জন্য সদাই তৎপর, তাদের নিজের ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টি পড়ে না কেন?

যাই হোক লাহোর টেস্টে পাকিস্থানের বেশী কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গেছে। তারা সব সময়ই খেলেছে সুবিধাজনক অবস্থায় থেকে। পাকিস্থানের খ্যাতনামা ব্যাটসম্যান মকসুদ আমেদ এই টেস্টে মাত্র ১ রানের জন্য শতরান পূর্ণ করতে পারেন নি। মকসুদের সেঞ্চুরী পূর্ণ না হবার হতাশজনিত মনোব্যথায় নবাবশাহের এক বৃদ্ধ পাক নাগরিক পঞ্চত্বও লাভ করেছেন। রেডিওতে তিনি খেলার ধারা বিবরণী শুনছিলেন। মকসুদ শতরান লাভের মুখে এগুতে আরম্ভ করলে তিনি আনন্দে উল্লসিত হয়ে ওঠেন, কিন্তু ৯৯ রানের মাথায় মকসুদের ইনিংস শেষ হবার প্রায় সংগে সংগে বৃদ্ধের জীবনের ইনিংসও শেষ হয়ে যায়। ৯৯ রানের মাথায় মকসুদ আউট হবার নিদারুণ দুঃসংবাদ বৃদ্ধের কানে পেঁছিতেই তিনি অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। ডাক্তার এসে বলেন হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হওয়ায় বৃদ্ধের মৃত্যু হয়েছে। বেচারা বুড়ো বয়সে ক্রিকেটকে ভালবেসে প্রাণ হারালেন! বৃদ্ধের আত্মার শান্তির জন্য মকসুদের উচিত পরের টেস্টে শতরান পূর্ণ করা।

লাহোর টেস্টে ভারতের তরুণ উইকেট কিপার তামানে অসম্ভব দক্ষতার সংগে উইকেট রক্ষা করেছেন। প্রথম ইনিংসে পাকিস্থান দল ৩২৮ রান সংগ্রহ করেছে; কিন্তু এর মধ্যে 'অতিরিক্ত' রানের ঘরে কোন অংক লেখা হয়নি। দ্বিতীয় ইনিংসের ১৩৬ রানের মধ্যেও তামানে মাত্র দুটি 'বাই' রান দিয়েছেন। গুপ্তের একটি বল বিশ্রীভাবে লাফিয়ে ওঠার ফলেই এই দুটি 'বাই' রান হয়। তামানে বলটি ধরবার যথেষ্টই চেষ্টা করেছিলেন, ধরতে পারলে আলীমুদ্দিনকে স্ট্যাম্পড আউটও করতে পারতেন, কিন্তু মাঠ খারাপ হবার ফলে পারেননি। মোট ৪৬৪ রানের মধ্যে মাত্র দুইটি অতিরিক্ত রান হওয়া উইকেটকিপার তথা বোলারদের কৃতিত্বের পরিচায়ক সন্দেহ নেই। নীচে পাক-ভারত তৃতীয় টেস্টের সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড দেওয়া হল—

সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড

পাকিস্থান—১ম ইনিংস ৩২৮ (**মকসুদ** আমেদ ৯৯, ওয়াজির মহম্মদ ৫৫, **ইমতিয়াজ** আমেদ ৫৫, আলীমুদ্দিন ৩৮; গুপ্তে ১৩৩ রানে ৫ উইঃ, মানকড় ৬৫ রানে ২ উইঃ)।

ভারত—১ম ইনিংস ২৫১ (পি উমরিগর ৭৮, গোপীনাথ ৪১, মানকড় ৩৩, **পাঞ্জাবী** ২৭, পি রায় ২৩; মামুদ হোসেন ৭০ রানে ৪ উইঃ, ফজল মামুদ ৬২ রানে ৩ উইঃ, মীরন বক্স ৮২ রানে ২ উইঃ)।

পাকিস্থান—২য় ইনিংস (৫ উইঃ **ডিঃ**) ১৩৬ (আলীমুদ্দিন ৫৮, সুজাউদ্দিন ৪০; মানকড় ৩৩ রানে ৩ উইঃ, গুপ্তে ৩৪ রানে ২ উইঃ)।

ভারত—২য় ইনিংস (২ উইঃ) ৭৪ (গাদকারী নট আউট ২৭, মঞ্জরেকার নট আউট ২২; কারদার ২০ রানে ২ উইঃ)।

দেশী সংবাদ

২৪শে জানুয়ারী—আজ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ প্রসঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলার ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় যুবসমাজের উদ্দেশে বর্তমান যুগের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করিয়া দারিদ্র্য, অভাব এবং দুর্গতির কবল হইতে দেশকে মুক্ত করার ব্রতে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানান।

ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার উভয়েই কলিকাতায় ১২ হাজার দুঃস্থ ছাত্রের জন্য ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে তিনটি দিবা ছাত্রগৃহ প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা অনুমোদন করিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ আজ কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে উপরোক্ত ঘোষণা করেন।

২৫শে জানুয়ারী—পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ পাকিস্থানের সংযোগরক্ষা মন্ত্রী ডাঃ খান সাহেব ও পাকিস্থানের ভারতীয় হাই-কমিশনার ডাঃ মোহনসিং মেটা সমভিব্যাহারে আজ বিমান-যোগে নয়াদিল্লীতে পেঁাছিলে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন।

এই বৎসর প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ প্রখ্যাত দার্শনিক ও সাহিত্যিক ডাঃ ভগবান দাস এবং খ্যাতনামা ইঞ্জিনীয়ার ও রাজনীতিবিদ শ্রী এম বিশ্বে-শ্বরায়াকে ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সম্মানে (ভারত রত্ন) ভূষিত করিয়াছেন।

২৬শে জানুয়ারী—আজ ভারতের সর্বত্র ভারতীয় প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পঞ্চম-বার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। রাজধানী দিল্লী নগরীতে অদ্যকার প্রজাতন্ত্র দিবসের অনুষ্ঠানাবলীর কার্যসূচীর মধ্যে কেন্দ্রীয় সেক্রেটারিয়েট ভবন হইতে ঐতিহাসিক লালকেল্লা পর্যন্ত ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীর যথারীতি ৫ মাইল দীর্ঘ রুট মার্চ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আজ গোয়ায় অহিংস মুক্তি সংগ্রামের দ্বিতীয় পর্যায় আরম্ভ হয়। এই সময় গোয়ার সর্বত্র কর বন্ধ আন্দোলন শুরু হইলে পর্তুগীজ কর্তৃপক্ষ অনুমান দুইশত লোককে গ্রেপ্তার করেন বলিয়া গোয়া জাতীয় কংগ্রেসের সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদে জানা যায়।

২৭শে জানুয়ারী—পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ নয়াদিল্লীতে রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদের সহিত পৃথক পৃথকভাবে পাক-ভারত সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন।

সোভিয়েট-রাশিয়াস্থিত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী কে পি এস মেনন আজ বোম্বাইতে বলেন যে, প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বর্তমান বৎসর গ্রীষ্ম ঋতুর কোনও এক সময়ে সোভিয়েট রাশিয়া পরিদর্শনে যাইবেন।

২৮শে জানুয়ারী—প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে যোগদানের জন্য অদ্য বোম্বাই হইতে বিমানযোগে লন্ডন যাত্রা করেন।

২৯শে জানুয়ারী—পাটনায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের তিনদিনব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়। কমিশনের নিকট বিহার প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রতিনিধিগণ জানান যে, বিহারের বর্তমান সীমারেখার কোন প্রকার রদবদল করা উচিত নয়।

নয়াদিল্লীতে সরকারীভাবে বোম্বাইয়ের রাজ্যপাল পদে শ্রীহরেকৃষ্ণ মহতাবের নিয়োগ ঘোষণা করা হইয়াছে।

গতকল্য উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সম্পূর্ণানন্দ বারাণসীতে স্নানের ঘাটগুলির সংস্কার কার্যের উদ্বোধন করেন। প্রায় এক লক্ষ লোক এই অনুষ্ঠানে সমবেত হয়।

আজ ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন বিধান সভায় ত্রিবাঙ্কুর-তামিলনাদ কংগ্রেস দলের নেতা শ্রীচিদম্বরনাথ নাদার, রাজ্যের প্রজা-সমাজতন্ত্রী মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপন করিতে অসম্মত হওয়ায় প্রস্তাবটি বিবেচিত হয় নাই।

৩০শে জানুয়ারী—আজ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর মৃত্যু বরণের সপ্তম বার্ষিক দিবস। এই দিনটি শহীদ দিবসরূপে সমগ্র দেশব্যাপী পরম গাম্ভীর্যের সহিত উদ্‌যাপিত হয়। ভারত সরকারের নির্দেশমত এই বৎসর সর্বপ্রথম বেলা ১১টার সময় দুই মিনিটকাল নীরবতা অবলম্বন করিয়া শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়।

প্রজাতন্ত্র দিবসে গোয়ার রাজধানী পানজিমে সত্যাগ্রহ করায় মিস সেলেনা মনিজ এবং মিস দিনা আমনকারকে গ্রেপ্তার করিয়া থানায় লইয়া যাওয়া হয়। ইহার ফলে গোয়ায় দারুণ উত্তেজনার সঞ্চার হইয়াছে। এ পর্যন্ত গোয়ায় ২৭৫ জন সত্যাগ্রহী এবং অন্যান্যকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। সত্যাগ্রহীদের সহায়তা করার সন্দেহে বহু ব্যক্তিকে বেত্রাঘাত করা হয়।

গতকল্য রাত্রে বোম্বাইয়ে ভারতের ছয়টি বামপন্থী রাজনৈতিক দলের সংমিশ্রণে "ভারতীয় মজদুর কিষাণ পার্টি" নামে একটি নূতন রাজনৈতিক দল গঠিত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২৪শে জানুয়ারী—বিশ্ববিখ্যাত বৃটিশ বৈজ্ঞানিক অধ্যাপক জে বি এস হ্যালডেন আজ বলেন যে, ভারত যদি তাঁহাকে নাগরিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লয়, তাহা হইলে তিনি ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করিতে পারেন।

২৬শে জানুয়ারী—চীনের প্রধান মন্ত্রী মিঃ চৌ এন লাই আজ ঘোষণা করেন যে, চীন কোনক্রমেই অপর রাষ্ট্রের আক্রমণ বরদাস্ত করিবে না।

২৭শে জানুয়ারী—তাচেন দ্বীপ অঞ্চল হইতে জাতীয়তাবাদী চীনা সেনাগণকে অপসারণকালে বিমান হইতে তাঁহাদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য অদ্য ম্যানিলা ও ওকিনাওয়া হইতে দুই স্কোয়াড্রন মার্কিন বিমান ফরমোজায় উপনীত হইয়াছে।

মিশর, জর্ডান, সিরিয়া, লেবানন ও সৌদি আরব এই পাঁচটি আরব রাষ্ট্র প্রস্তাবিত তুর্কী-ইরাকী প্রতিরক্ষা চুক্তি বা অনুরূপ কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রজোটে যোগদান করিবে না বলিয়া অদ্য ঘোষণা করিয়াছে।

২৮শে জানুয়ারী—ফ্রান্সের প্রধান মন্ত্রী মঃ মেঁদে ফ্রাঁস প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরুর ফ্রান্স পরিদর্শনের প্রাক্কালে "হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ডের" নিকট প্রেরিত এক বাণীতে বলেন, "বিশ্বে শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করা আমাদের উভয় সরকারেরই লক্ষ্য—সমগ্র পৃথিবীর জনগণেরও উহাই একান্ত কামনা। কিন্তু তৎপূর্বে বিভিন্ন জাতির মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন।"

৩০শে জানুয়ারী—কায়রোতে আরব লীগ বৈঠকে ইরাক গত রাত্রে ঘোষণা করিয়াছে যে, ইরাকের পররাষ্ট্র নীতি বা প্রতিরক্ষার প্রশ্ন তাহারা অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সহিত আলোচনা করিতে বাধ্য নহে।

তাচেন দ্বীপ হইতে ২০ হাজার জাতীয়তাবাদী চীনা সৈন্য অপসারণের চূড়ান্ত পরিকল্পনা প্রণয়নের উদ্দেশ্যে প্রশান্ত মহা-সাগরস্থিত মার্কিন নৌবাহিনীর অধিনায়ক এডমিরাল ফেলিক্স স্ট্যাম্প অদ্য জেঃ চিয়াং কাইশেকের সহিত এক গোপন বৈঠকে মিলিত হন।

প্রতি সংখ্যা—।৶৹ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ ১৫ সংখ্যা

দেশ

শনিবার ২৯ মাঘ ১৩৬১

DESH SATURDAY, 12th FEBRUARY, 1955

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ

বিহারে জুলুমবাজী

বিহারে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের ভ্রমণ সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ এবং প্রেরণের জন্য কলিকাতা হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকার' নিজস্ব রিপোর্টার শ্রীযুত শিবদাস ভট্টাচার্য প্রেরিত হইয়াছিলেন। বিহারের পুলিস তাঁহাকে অশেষ রকমে বিড়ম্বিত করে। তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হয়, আটক করা হয়, অভিসন্ধিমূলকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র রাখিয়াছেন বলিয়া সন্দেহ করিয়া তাঁহার দেহ ও মালপত্র তল্লাসী করা হয়। অবশেষে তাঁহাকে জোর করিয়া কলিকাতাগামী ট্রেনে উঠাইয়া বিহার পুলিস তাহাদের উপর ন্যস্ত গুরুতর কর্তব্য সম্পন্ন করে। শ্রীযুত ভট্টাচার্য একজন প্রবীণ রিপোর্টার। অনেক সঙ্কট-জনক এবং প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তিনি সুষ্ঠুভাবে নিজ কর্তব্য সম্পাদন করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে নোয়াখালির অরাজক পরিস্থিতির উল্লেখ করা যাইতে পারে। কিন্তু স্বাধীন ভারতে, গণতান্ত্রিক আদর্শে সংগঠিত ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত বিহারে তাঁহাকে সাংবাদিকের কর্তব্য সম্পাদন করিতে গিয়া প্রাদেশিকতার প্রতিবেশে যে বিড়ম্বনা ভোগ করিতে হইল, সাম্রাজ্যবাদী বৃটিশের আমলে সাম্প্রদায়িক ধর্মান্ধতার উন্মাদনার মধ্যেও তিনি তেমন উৎকট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন বলিয়া আমাদের মনে হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীযুত ভট্টাচার্যের এই নির্যাতনের ব্যাপারে বিহার সরকারের দায়িত্বসম্পন্ন ব্যক্তিরাও যে সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তাঁহার বিবৃতিতে ইহা সুস্পষ্ট। কমিশনের বিহারে পদার্পণের পূর্ব হইতেই বিহারের সীমান্তবর্তী অঞ্চলে সরকার পক্ষের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্যোগে বাঙালীদের বিরুদ্ধে উত্তেজনামূলক প্রতিবেশ যেভাবে সৃষ্টি করা হয়, তাহাতে এই কাজে বিস্ময়ের কিছু নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে বিহার সরকার কমিশনের কার্যকে ব্যর্থ করিবার হীন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছেন। এই পরিচয় আমরা প্রতি-নিয়তই পাইতেছি। তাঁহাদের পুলিসের হাতে কলিকাতার পত্রিকার বাঙালী রিপোর্টারকে এইভাবে লাঞ্ছিত হইতে হইবে ইহা আদৌ প্রত্যাশিত নয়। কিছু দিন পূর্বে মধুপুরে বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ন্যায় বিশিষ্ট এবং পদস্থ ব্যক্তিকেও অপমানিত হইতে হইয়াছে। বিহারের এই ক্ষিপ্ততা ও উগ্রতা বিহারেই সীমাবদ্ধ রাখা এবং বিহারের পুলিসকে তাহাদের ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস হইতে মুক্ত করা কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে একান্ত কর্তব্য। একথা ইতিপূর্বেও বহুবার বলিয়াছি এবং সমগ্র ভারতের বৃহত্তর স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা পুনরায় তাঁহাদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করিতেছি। এমন গুন্ডামী প্রশ্রয় পাইলে যে কোন মুহূর্তে গুরুতর অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, ইহাই আমাদের আশঙ্কা।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নূতন রহস্য-মূলক উপন্যাস 'আদিম রিপু' আগামী সপ্তাহ হইতে 'দেশ' পত্রিকায় ধারাবাহিকরূপে প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক—'দেশ'

কবি করুণানিধান

বর্তমান বাঙলার প্রবীণ কবিদিগের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ জনপ্রিয় কবি করুণা-নিধান বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরলোকগমনে বাঙলার কাব্য সাহিত্যের বিশেষ একটি ঐতিহ্যের এক নিষ্ঠাবান্ সেবক তিরোহিত হইলেন। কবিকে একান্ত আপনার করিয়া পাইবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। তাঁহার মৃত্যুতে আমরা আত্মীয়জনের বিয়োগ ব্যথাই অন্তরে উপলব্ধি করিতেছি। রবীন্দ্রনাথের নিকট পরবর্তীকালের যে সকল প্রতিভাবান্ কবি রচনার রীতিতে দুরূহ অভিনবত্বের পরীক্ষার পরিবর্তে প্রচলিত রীতিতেই ভাব এবং কল্পনাকে প্রকাশ দান করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে করুণানিধানের নাম বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। করুণানিধান খোলা চোখেই সুন্দরকে দেখিয়াছেন এবং সহজ সারল্যেই মধুরের লীলাকে তিনি কাব্য-ছন্দে রূপ দিয়াছেন। তাঁহার কাব্য-রীতিতে কিংবা প্রয়োগনৈপুণ্যে বুদ্ধি-বৃত্তির সূক্ষ্মবিলাস রসকে সাধারণ বুদ্ধির পক্ষে দুরধিগম্য করিয়া তোলে

নাই; পরন্তু তাঁহার সৃষ্টি স্বতঃস্ফূর্ত উদার প্রভাবে মাধুর্যকে ব্যাপ্ত এবং দীপ্তরূপ দিয়াছে। করুণানিধান ভগবানে একান্ত বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন বাঙলার জল মাটির মানুষ, বাঙলার ভাবের ভাবুক। বাংলার অন্তরচ্ছন্দে সুন্দরের রূপটি তাঁহার মনে সহজভাবেই সাড়া দিয়াছে। তাঁহার বঙ্গমঙ্গল, প্রসাদী, ঝরাফুল, শান্তিজল, ধান-দূর্বা, শতনরী প্রভৃতি কবিতাগুচ্ছ বাঙলার কাব্য সাহিত্যকে ঐশ্বর্যান্বিত করিয়াছে। শেষ জীবনে কবি করুণানিধান গীতা-মাহাত্ম্য কীর্তনে অনুপ্রাণিত হন। বঙ্গবাণীকে তিনি বাঙলা দেশের সুলভ এবং সাধারণ পত্র, পুষ্প, ফলে ও জলে পূজা করিয়াছেন। তাঁহার আন্তরিক ভক্তিতে উপহৃত এই উপচার দেবীও স্মিত-হাস্যে এবং সমাদরের সহিত গ্রহণ করিয়া গীতার ভাগবতী বাণীর সার্থকতা বিধান করিয়াছেন। কবি করুণানিধানেনর অবদান বাঙলা সাহিত্যে অপরিম্লান মাধুরী বিস্তার করিবে। আমরা তাঁহার স্মৃতির উদ্দেশ্যে একান্ত শ্রদ্ধা নিবেদন করিতেছি।

পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নির্দেশক্রমে পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা সম্পর্কিত পরিসংখ্যান নির্ধারণ করিবার উদ্দেশ্যে কলিকাতায় ভারতীয় পরিসংখ্যান প্রতিষ্ঠানের উপর ভার দেওয়া হয়। এই নির্দেশ অনুসারে তাঁহারা কলিকাতার বেকারদের সম্বন্ধে রিপোর্ট প্রকাশ করিয়াছেন। এই রিপোর্ট অনুসারে কলিকাতায় পূর্ণভাবে বেকার অবস্থায় পতিতদের সংখ্যা ২,১৫,২০০। ইহা হইতেই পশ্চিমবঙ্গের মোটামুটি পরি-স্থিতির সম্বন্ধে ধারণা করা যাইতে পারে। এই বেকারদের মধ্যে মধ্যবিত্ত নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোকের সংখ্যাই বেশী। বাঙ্গালী যুবকেরা শারীরিক শ্রমে বিমুখ এবং তাহাদের মধ্যে কারিগরী জ্ঞানের অভাব, এইজন্যই তাহাদিগকে প্রধানত বেকার থাকিতে হয়। এমন যুক্তি আগে হয়ত চলিত কিন্তু বর্তমানে সে-যুক্তি যে আর চলে না, বেকার সমস্যা সম্পর্কিত এই তদন্তের ফলে তাহা স্পষ্ট-ভাবেই প্রকাশ পাইয়াছে। গবেষণার ফলে ইহাই জানা গিয়াছে যে, বেকারদের মধ্যে কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন যুবকদের সংখ্যা সামান্য নহে এবং ইহাদের অনেকে শারীরিক পরিশ্রমমূলক যে কোন কাজে জীবিকা সংস্থান করিবার জন্যও একান্তই আগ্রহী। রিপোর্টে এই সত্য প্রকাশ পাইয়াছে যে, কলিকাতা এবং উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলে যে ব্যবসা-বাণিজ্য-মূলক প্রতিষ্ঠান আছে, সেগুলিতে নিযুক্ত লোকের মধ্যে শতকরা ৩৭ জনই অবাঙ্গালী। ইহাদের মধ্যে শতকরা ৩৪ জন ভারতের অন্যান্য প্রদেশের অধিবাসী এবং শতকরা ৩ জন অভারতীয়। কলিকাতা এবং শহরতলী অঞ্চলে অবাঙ্গালী প্রতিষ্ঠানসমূহ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা সুস্পষ্ট। আমাদের ইহাতে আপত্তি নাই। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া যাঁহারা অর্থ ও বিত্ত অর্জন করিতেছেন, এই রাজ্যের প্রতিও তাঁহাদের কর্তব্য রহিয়াছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের কাজে অবাঙ্গালীদের নিয়োগ যদি বৃদ্ধি পায় তবে পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যাও বাড়িবে এবং সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবনের উপর তাহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে। শিল্পপতিদের এই বিষয়ে অবহিত করিয়া দেওয়া সরকারের পক্ষে বিশেষভাবে কর্তব্য। পশ্চিমবঙ্গের এই বেকার সমস্যা অত্যন্তই ব্যাপক; অধিকন্তু পূর্ববঙ্গ হইতে আশ্রয়প্রার্থীদের সমাগমে এই সমস্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। রাজ্য সরকারের পক্ষে এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। ভারত সরকারের পরিকল্পিত দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরি-কল্পনায় এ বিষয়টি বিশেষভাবে বিবেচিত হওয়া উচিত এবং উপযোগী ব্যবস্থা নির্ধারিত হওয়া কর্তব্য। বস্তুত পশ্চিম-বঙ্গের এই ব্যাপক সমস্যার সমাধানকল্পে রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এবং বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের মালিকদের এক হইয়া কাজ করিবার প্রয়োজন একান্তভাবে দেখা দিয়াছে।

কলিকাতায় সোভিয়েট প্রতিনিধি দল

রাশিয়ার সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি দল সম্প্রতি কলিকাতায় আগমন করিয়াছেন। পৌরজনগণের পক্ষ হইতে আমরা তাঁহা-দিগকে আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। প্রকৃতপক্ষে উভয় দেশের মধ্যে রাজনীতিক আদর্শ সম্বন্ধে মতভেদ যাহাই থাকুক,—সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাহার স্থান নাই। মানুষ হিসাবে মানুষের মিলিবার উদার ক্ষেত্র এই সংস্কৃতি। ভারতের ঐতিহ্য কোন দিনই এই ক্ষেত্রকে সঙ্কুচিত করে নাই। স্বাধীন ভারতও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সেই আদর্শেরই অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। ভারতের দ্বার কাহারো জন্যই রুদ্ধ নয়। বিভিন্ন জাতির সভ্যতা এবং সংস্কৃতির সমন্বয়ের ভিতর দিয়াই ভারত বিশ্বকে আপনার করিয়া আপনাকে সত্য করিয়া পাইতে চায়। সোভিয়েট প্রতিনিধিদের পশ্চিমবঙ্গ পরিদর্শনের ফলে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের সূত্রে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সৌহার্দ্য সুদৃঢ় হইয়া উঠিবে, আমরা ইহাই আশা করি।

সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার

বিহার সংস্কৃত পরিষদের বার্ষিক সমাবর্তনের ভাষণে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের ভূতপূর্ব প্রধান বিচারপতি শ্রীযুত পতঞ্জলি শাস্ত্রী সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা প্রসারের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ভারতে সাংস্কৃতিক স্বরাজ আজও প্রতিষ্ঠিত হয় নাই, তাহা করিতে হইলে সংস্কৃত শিক্ষার প্রসার বিশেষভাবে প্রয়োজন। সাংস্কৃতিক স্বরাজ বলিতে শাস্ত্রী মহাশয় ভারতীয় সভ্যতার মূল বৈশিষ্ট্যের আদর্শের প্রতিই সম্ভবত আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া-ছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকেই ভারতীয় সভ্যতার এই বৈশিষ্ট্যের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করিয়া থাকেন। কিন্তু এই বৈশিষ্ট্য বোধটি প্রধানত শিক্ষার উপর নির্ভর করে। এইদিক হইতে সংস্কৃত ভাষার সম্প্রসারণের গুরুত্ব অনেক-খানি রহিয়াছে। বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতের রাষ্ট্রগত সংহতির মূলে রহিয়াছে সংস্কৃত ভাষারই শক্তি। কারণ বিভিন্ন ভাষাগুলি প্রধানত সংস্কৃত হইতেই উদ্ভূত এবং সংস্কৃত ভাষার শক্তিতেই পরিপুষ্ট। সুতরাং সরকার এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

সিকিউরিটি কাউন্সিলের মারফৎ চীন উপকূলে যুদ্ধবিরতি ঘটানোর চেষ্টাটাকে পিকিং সরকার একটা ধাপ্পাবাজি বলে মনে করেন। কারণ এই চেষ্টার উদ্দেশ্য হচ্ছে মোটের উপর বর্তমান পরিস্থিতিকে বজায় রাখা। কিন্তু পিকিং সরকার চান পরিবর্তন অর্থাৎ সমস্ত উপকূলীয় দ্বীপ ও ফরমোজায় পিকিং সরকারের অধিকার স্থাপন। সুতরাং নিউজিল্যাণ্ডের প্রস্তাব অনুযায়ী সিকিউরিটি কাউন্সিলে যুদ্ধ-বিরতির প্রসঙ্গের আলোচনায় উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ পিকিং সরকার প্রত্যাখ্যান করেন, এটা আশ্চর্যের বিষয় নয়। তাছাড়া একটা গোড়ার প্রশ্ন রয়েছে। যে সিকিউরিটি কাউন্সিলে চীনের আসনে এখনও কুমিনটাং-এর প্রতিনিধি বসছেন সেখানে পিকিং সরকার ফরমোজার মামলা নিয়ে উপস্থিত হবেন, এটা সম্ভব নয়। সিকিউরিটি কাউন্সিলের আমন্ত্রণ পিকিং সরকার প্রত্যাখ্যান করবেন, এটা পণ্ডিত নেহরু আগে থাকতে আঁচ করেছিলেন বলেই তিনি কয়েকদিন পূর্বে লণ্ডনে বলেন যে, ফরমোজা ও তৎসংশ্লিষ্ট প্রশ্নাদির মীমাংসার জন্য সিকিউরিটি কাউন্সিলের বাইরে একটা আলোচনার ক্ষেত্র সৃষ্টি করা দরকার—ইন্দোচীনের সম্পর্কে যেমন জেনেভায় কনফারেন্স হয়েছিল সেই ধরনের একটা ব্যবস্থা দরকার। সিকিউরিটি কাউন্সিলের আমন্ত্রণ পিকিং সরকার প্রত্যাখ্যান করবেন, এটা নিউজিল্যাণ্ডের প্রস্তাবের সমর্থনকারীরাও হয়ত জানতেন। পিকিং সরকার শান্তি চান না, পিকিং সরকারের মনোভাব আক্রমণাত্মক—এরূপ প্রচারের সুবিধা হবে বলেও সিকিউরিটি কাউন্সিলে এই প্রস্তাব আনার একটা উদ্দেশ্য হতে পারে। যাই হোক, এখন প্রধান প্রশ্ন হচ্ছে চীন সরকার সিকিউরিটি কাউন্সিলের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাতে ব্যাপকতর যুদ্ধ লাগার সম্ভাবনা কি হঠাৎ আরো বাড়ল? তা কিন্তু মনে হয় না। পিকিং গভর্নমেণ্ট ফরমোজাকে 'মুক্ত' করার অভিযান না করা পর্যন্ত আমেরিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ সংঘর্ষ বাধবে

বলে মনে হয় না এবং বোধহয় সেরূপ অভিযানের জন্য চীন সরকার এখনও প্রস্তুত নন। অন্যপক্ষে ফরমোজা ও পেস-কাডোর ছাড়া চীনের উপকূলীয় অন্যান্য দ্বীপগুলি থেকে কুমিনটাং যদি বিতাড়িত হয় তবে তা ঠেকানোর জন্য আমেরিকা যুদ্ধে নামবে না। বরঞ্চ মনে হয় ফরমোজা ও পেসকাডোর দ্বীপগুলিকে হস্তগত করার জন্য যদি পিকিং সরকার আপাতত উদ্যত না হন তাহলে কুমিনটাং বিমান কর্তৃক চীন ভূখণ্ডের উপর যে মাঝে মাঝে বোমাবর্ষণ চলে আসছে সেটা আমেরিকা বন্ধ করিয়ে দিতে প্রস্তুত আছে। অবশ্য ফরমোজা না পাওয়া পর্যন্ত এবং ইউনো থেকে চিয়াং কাইশেকের প্রতিনিধির বহিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত পিকিং সরকার চুপ হচ্ছেন না। তবে এখনই ফরমোজা অধিকার করার চেষ্টার অর্থ হবে আমেরিকার সঙ্গে সাক্ষাৎভাবে যুদ্ধে লিপ্ত হওয়া। তার জন্য বোধহয় পিকিং সরকার প্রস্তুত নন। সুতরাং যুদ্ধ আপাতত ব্যাপক আকার ধারণ করবে না বলে আশা করা যায়। তাচেন দ্বীপাবলী কুমিনটাং-এর হাতে রাখার জন্য আমেরিকা চেষ্টিত নয়। তাচেন খালি করে 'ন্যাশনালিস্ট' চীনা সৈন্যরা চলে আসছে। মার্কিন সপ্তম নৌবহর তাদের আগলে নিয়ে আসছে তা না হলে পিকিং সর-কারের হাতে তারা ধ্বংস হোত। তাচেনে অন্তত ১৫ হাজার 'ন্যাশনালিস্ট' চীনা সৈন্য ছিল, এতগুলি চিয়াং কাইশেকের সৈন্য অক্ষতদেহে চলে যেতে পারছে তার কারণ পিকিং সরকার আমেরিকার নৌ-বহরের সঙ্গে সংঘর্ষে আসতে চাচ্ছে না।

* * *

মধ্যপ্রাচ্যের আরব রাষ্ট্রগুলির নিজেদের মধ্যে যে আত্মরক্ষা চুক্তি ছিল সেটা ভেঙ্গে গেল বলে বোধ হচ্ছে। তুর্কীর সঙ্গে ইরাকের সামরিক চুক্তিতে মিশরের ঘোরতর আপত্তি। মিশর বলে ইরাক যদি তুর্কীর সঙ্গে চুক্তিতে স্বাক্ষর করে তবে হয় ইরাককে আরব নিরাপত্তা চুক্তি থেকে বাদ দিতে হবে নয়ত মিশর নিজে বেরিয়ে যাবে। ইরাকের প্রধানমন্ত্রী নুরি পাশা সাফ জবাব দিয়েছেন যে, ইরাক তুর্কীর সঙ্গে যে-চুক্তি করতে যাচ্ছে সেটা সে ত্যাগ করবে তো না-ই, বরঞ্চ অন্য আরব রাষ্ট্রগুলিরও উচিত হচ্ছে ইরাকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা এবং তুর্কী ও পাকিস্তানের মতো খোলা-খুলিভাবে পশ্চিমা শক্তিদের দলে যোগ দেওয়া। প্রকৃতপক্ষে আরব রাষ্ট্রগুলির প্রায় প্রত্যেকটাই অল্পবিস্তর কোন না কোন পশ্চিমা শক্তির প্রভাবাধীন। তবে সকলে একজোট হয়ে কাজ করলে কিছু সুবিধা আছে। ইরাক আলাদাভাবে তুর্কীর সঙ্গে চুক্তি করাতে পশ্চিমা শক্তিদের সঙ্গে দরাদরিতে অন্যেরা দুর্বল হবে। তাহলেও ইরাকের ব্যবহার সম্বন্ধে অন্য সকলে একমত হতে পারছে না। শেষ-পর্যন্ত মিশর এবং তার সঙ্গে সৌদী আরব কেবল ইরাকের কার্যের সুস্পষ্ট নিন্দা করছে। সিরিয়া, জর্ডান এবং লেবাননের সুর বদলে গেছে। এরা শেষ-পর্যন্ত ইরাকের কাজকে কঠোর ভাষায় নিন্দা করতে রাজী হয় নি। এ থেকে আরব রাষ্ট্রগুলির আভ্যন্তর দুর্বলতার পরিমাণ কিছুটা বুঝা যায়। আসলে মধ্যপ্রাচ্যের বর্তমান আরব গভর্নমেণ্টের একটিও পশ্চিমা শক্তির প্রভাব থেকে মুক্ত নয়, তবে জনসাধারণের নিকট অন্য-রকম ভাব দেখানো দরকার হয়। আরব রাষ্ট্রগুলির প্রত্যেকটিই অত্যন্ত অনগ্রসর রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের সুখসুবিধা যা কিছু সবই মুষ্টিমেয় শাসকশ্রেণী ভোগ করে। সাধারণ লোকের অবস্থা খুবই খারাপ। তেলের খনির ইজারা থেকে বিদেশীর কাছ থেকে যে টাকা আসে তা উপরের থাকের কিছু লোকের ভোগ ঐশ্বর্যের বাসনা চরিতার্থ করে। গরীব ও বড়ো লোকের মধ্যে দুস্তর প্রভেদ থেকে যাচ্ছে। এ অবস্থায় শাসক শ্রেণীকে অনেক সময়ে দেখতে হয় যে তারা বিদেশীর হাতের পুতুল নয়, যাতে জনসাধারণের জাতীয়তা বোধটা অন্তত কিঞ্চিৎ তৃপ্ত পায়। কিন্তু এরকম গোঁজামিল সব সময়ে চলে না, তখন লোককে ডাণ্ডার ভয় দেখিয়ে ঠাণ্ডা করার ব্যবস্থা হয়। এই জন্য মধ্য প্রাচ্যের প্রায় কোথাও প্রকৃত গণতান্ত্রিক শাসন নেই, প্রায় সর্বত্রই খোলাখুলি বা পর্দার আড়ালে সামরিক শাসন চলছে।

* * *

ফরাসী পার্লামেণ্টে ভোটে হেরে মঃ মে'দে ফ্রাঁসের মন্ত্রিত্ব গেছে। মঃ পিনেকে প্রেসিডেণ্ট নূতন মন্ত্রিসভা গঠনের ভার দিয়েছেন বলে সংবাদপত্রে প্রকাশ। মঃ মে'দে ফ্রাঁস ইন্দো-চীনের যুদ্ধের অবসান ঘটানোর ব্যাপারে সাহস ও দৃঢ়চিত্ততার পরিচয় দিয়ে খ্যাতি অর্জন করেন। টিউ-নিসিয়াতেও তিনি শাসন সংস্কারের একটা পরিকল্পনা করেছিলেন, সেটা এখনো ফরাসী পার্লামেণ্টের অনুমোদন সাপেক্ষ। NATO'র মধ্যে জার্মানীকে গ্রহণ ও জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব তিনি ফ্রান্সের 'নিম্নতন পরিষদ' অর্থাৎ এ্যাসেম্বলীর দ্বারা পাশ করিয়ে নিয়েছেন, সিনেটের অনুমোদন এখনও বাকী। ফ্রান্সের অর্থনৈতিক অবস্থার সংস্কারের জন্য মঃ মে'দে ফ্রাঁসের অনেক কিছু করার ইচ্ছা ছিল কিন্তু সে কাজে হাত দেবার পূর্বেই তিনি ক্ষমতাচ্যুত হলেন। তিনি ইতিমধ্যে উল্লেখযোগ্য যে-কটা কাজ করেছেন তার প্রত্যেকটা করতে গিয়েই তিনি কিছু শত্রু সৃষ্টি করেছেন—যার যোগ ফলে পার্লামেণ্টে তাঁর হার হোল। মদের কারবারীরাও মঃ মে'দে ফ্রাঁসের উপর খুব চটেছিল কারণ অত্যধিক মদ্যপানে ফরাসী জাতির কিরূপ শারীরিক ও নৈতিক ক্ষতি হচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তিনি অত্যধিক মদ্যপানের বিরুদ্ধে একটা আন্দোলন সৃষ্টি করেন। মঃ মে'দে ফ্রাঁস ক্ষমতাচ্যুত হওয়াতে ফরাসী রাজনীতির এলো-মেলোভাব আরো বেড়ে গেল। তবে ঘটনাচক্রের আবর্তনে তিনি অনতিদূরে ভবিষ্যতে আবার ফ্রান্সের প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন, এ সম্ভাবনা যে নেই তা নয়।

৭।২।৫৫

রমন সমীপে কয়েক ঘণ্টা

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

বিজ্ঞান-জগতের সেরা ও দুর্লভ সম্মান নোবেল পুরস্কার পেয়ে পরাধীন ভারতবর্ষ ও সমগ্র এশিয়ার মুখ উজ্জ্বল করেন অধ্যাপক রমন। পৃথিবীর বিজ্ঞানমণ্ডলী কর্তৃক আবিষ্কারের মহান গৌরবে মণ্ডিত রমন এফেক্টের (Raman Effect) মূলকথা—বাস্তব অণুর সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের ফলে আলোক তরঙ্গের বিকৃতি বা দৈর্ঘ্যচ্যুতি। ১৮৯৯ খৃঃ লর্ড র‍্যালে দেখিয়েছিলেন বস্তুর অণুকে বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের শুদ্ধ আলো দিয়ে উদ্ভাসিত করলে যে আলো বিকীর্ণ হয়, তার দীপ্তি-উদ্ভাসী আলোক থেকে ক্ষীণতর হলেও তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বা কম্পন-দ্রুতি এক। সেই সঙ্গে উদ্ভাসী আলোর যে বিকৃতি ঘটতে পারে, তার একটা সম্ভাবনার কথা স্মেকাল, ক্রেমার্স, হাইসেনবার্গ প্রমুখ বৈজ্ঞানিক বলেছিলেন অঙ্কের যুক্তি দিয়ে। সেই সম্ভাবনাই সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে রমনের পরীক্ষায়। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে অধ্যাপক রমন র‍্যালে বিকীরণের মধ্যে এক অতি ক্ষীণ নতুন রশ্মির সন্ধান পেলেন, যার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য উদ্ভাসী আলোক থেকে আলাদা। পদার্থ ও রসায়ন বিজ্ঞানের বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে রমন এফেক্টের বহুমুখী প্রয়োগের ফলে অণু-রাজ্যের অনেক অজ্ঞাত তথ্যের সন্ধান মিলেছে।

গল্পে শুনেছি, রমন বলেছিলেন—"তিনি না থাকলে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার সুয়েজ খাল অতিক্রম করতো না।" খুবই সত্যি কথা, এশিয়ার মধ্যে তিনিই প্রথম বিজ্ঞানী, যিনি জগতের এই সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন। পরাধীন ভারতবর্ষের অজস্র অসুবিধার মধ্যে গবেষণা চালিয়ে জগতের এই বিরাট সম্মান অর্জন করা খুবই শক্ত কাজ। "রমন এফেক্ট" বিজ্ঞান-জগতের এক অতুলনীয় আবিষ্কার। ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী কৃষ্ণন বলেছেন, "বহুবাজারে যে বাড়িতে গবেষণা করে রমন এই বিরাট আবিষ্কার করেছিলেন, ভারতের বিজ্ঞানক্ষেত্রে সেই বাড়ির স্থান ইংলণ্ডের রাজনীতি ক্ষেত্রের ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের অনুরূপ। এই বাড়িটিকে সংরক্ষিত করে রাখা উচিত।"

বর্তমানে রমন ব্যাঙ্গালোরের এক-পাশে বিজ্ঞান-মন্দির গড়ে গবেষণায় নিযুক্ত আছেন। ছাই রঙের পাথরে তৈরী এই রমন ইনস্টিটিউট—ব্যাঙ্গা-লোরের অন্যান্য অট্টালিকার সঙ্গে যেন মিলিয়ে নির্মাণ করা হয়েছে। চারিদিকে ফুলের চারাগাছ রোপণ করা প্রচুর জমি—আমরা এসে পেঁৗছেছি বেলা প্রায় ৩টা হবে। দোতলা বাড়ি, সামনেই সিঁড়ি, সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেই ডানদিকে
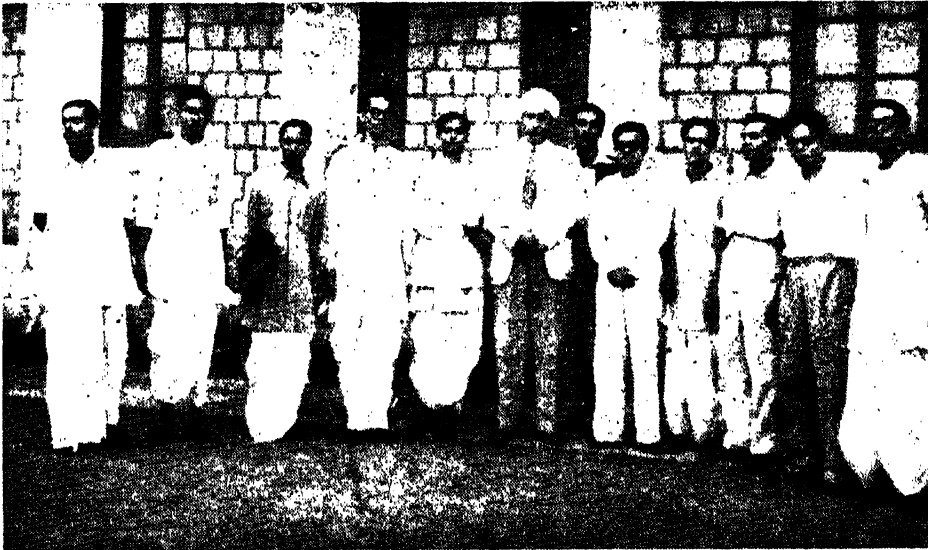
রমন সমীপে কলকাতা বিজ্ঞান কলেজ, রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ও ছাত্রবৃন্দ

"Lecture room" আর দু'পাশে চওড়া বারান্দা চলে গেছে। সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে স্বয়ং বিজ্ঞানাচার্য স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন। এই প্রথম দেখলাম রমনকে —পরণে সাহেবী পোশাক, মাথায় পাগড়ি। সমস্ত শরীরে দক্ষিণ ভারতীয় বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণরূপে বিদ্যমান—উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে তাঁর প্রতিভাদীপ্ত দু'টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চোখ। স্মিতহাস্যে প্রাচ্যের এই বিজ্ঞান সাধক আমাদের সাদর অভ্যর্থনা জানালেন।

প্রথমে আমরা গিয়ে বসলাম তাঁর Lecture room-এতে। চমৎকার ঘর, প্রত্যেকটি চেয়ার গদিতে মোড়া,—আসবাবপত্রে সুসজ্জিত। এই ঘরটির মজা হলো, ডায়াস থেকে খুব আস্তে বক্তৃতা দিলেও ঘরের যে কোন স্থান থেকেই স্পষ্ট শোনা যাবে। দেয়ালে 'রমন স্পেকট্রা'র কতগুলো ছবি টাঙানো। ঐ ঘরেই আলাপ প্রসঙ্গে রমন বললেন—তাঁর ভাগ্য অত্যন্ত খারাপ। এক এক ক'রে তাকে ছেড়ে দিতে হয়েছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, কালটিভেশন অব্ সায়েন্স এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান। নিজের খুশিমতো কাজ করবার জন্য তিনি তাই নির্মাণ করেছেন এই গবেষণা মন্দির—ইচ্ছে আছে জীবনের বাকী ক'টা দিন এখানেই গবেষণা করে কাটাবেন। ভারতের অন্য কোন স্থানে অন্য কোন কাজেই তিনি আর যেতে চান না। কেউ তাঁকে দেখতে চাইলে তাকে আসতে হবে সুদূর এই ব্যাঙ্গালোরে, যেখানে তিনি তাঁর নিজের গবেষণায় নিমগ্ন।

তারপর নিজে ঘুরে ঘুরে দেখালেন রমন ইন্‌স্টিটিউটের কয়েকটি কক্ষ। ল্যাবরেটরী নয়, যন্ত্রপাতী নয়—সেই সব কক্ষ পূর্ণ করেছে বিজ্ঞানীর বিচিত্র খেয়ালের অজস্র উপকরণ। কক্ষে আলমারীর মধ্যে অতি যত্নে রক্ষিত রয়েছে বিভিন্ন সামগ্রী—রমনের নিজস্ব সংগ্রহ। এই সংগ্রহকে বাতিক বলা অন্যায়, এ হলো স্বভাবজাত সংগ্রহ। অনুসন্ধিৎসু মনের বিরাট এক প্রতিচ্ছবি। আমরা রমন ইন্‌স্টিটিউটে যন্ত্রপাতি, ল্যাবরেটরী বা গবেষণা দেখতে যাই নি—গিয়েছিলাম রমনকে দেখতে। এই সংগ্রহের মধ্যেই পেলাম রমন চরিত্রের এক পরিপূর্ণ দিক।

প্রথমেই মিউজিয়াম—দু'টি কক্ষে সাজান রয়েছে অজস্র প্রজাপতি, কীট-পতঙ্গ আরো কত কি? নিজের সংগ্রহ-শালা দেখাতে বিজ্ঞানী খুশিতে বিভোর। সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন—ব্যাখ্যা করে দিয়েছনে প্রত্যেক বস্তুকে। মিউ-জিয়াম দেখার পর গেলাম গ্রন্থাগার পরিদর্শনে—বইয়ের সংগ্রহ খুব বেশী নয় কিন্তু নির্বাচন অতুলনীয়। বিজ্ঞানের প্রত্যেক শাখার ওপরেই সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ-গুলি সংগ্রহ করার চেষ্টা হয়েছে। যত্ন-নির্বাচিত পুস্তকগুলি যে কোন গবেষকের কাছে অতিপ্রয়োজনীয় ব'লে সর্বদাই বিবেচিত হবে। তারপর গেলাম তাঁর খনিজ ও পাথর সংগ্রহের বিভাগটিতে —এইটিই সংগ্রহশালার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শনী। দু'টি বিরাট কক্ষে সাজান রয়েছে অজস্র রকমের পাথর ও খনিজ দ্রব্য। বহুমূল্যবান হীরা, জহরৎ থেকে আরম্ভ ক'রে সাধারণ পাথর কোনটাই এই সংগ্রহশালার আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হয় নি। রমনের খ্যাতি পৃথিবীব্যাপী—বিভিন্ন দেশ থেকে তার গুণমুগ্ধ বন্ধুরা এই সংগ্রহশালার গৌরব বর্ধনের জন্য অনেক পাথর বা খনিজ দ্রব্য পাঠিয়েছেন। ব্রেজিল থেকে একটা পাথর এসেছে যা সৌন্দর্যে তুলনা-হীন। ঘুরে ঘুরে দেখেছি এই দু'টি কক্ষ—বুঝিয়ে দিয়েছেন রমন স্বয়ং।

এই সংগ্রহশালার সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় ও দ্রষ্টব্য বস্তু কয়েকটি আলোকবিচ্ছুরণকারী পাথর। দিনের আলো বা বৈদ্যুতিক আলো থেকে এই পাথরগুলি এক একটি বিশেষ রঙের রশ্মিকে ধরে রাখে এবং কিছু পরিমাণে বিকিরণ করে। এই বিকিরণ আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মির মাধ্যমে দেখা যায়। সংগ্রহশালার পাশেই অন্ধকার ঘর—সেখানেই থরে থরে সজ্জিত আছে এই অসামান্য পাথরগুলি। রমনের একজন সহকারী আমাদের ডার্ক রুমের মধ্যে নিয়ে গিয়ে আলট্রাভায়োলেট রশ্মির মাধ্যমে পাথরগুলি দেখালেন। কি অপরূপ শোভা!—এ যেন কোন এক সম্রাটের ধনভাণ্ডার থরে থরে সজ্জিত রয়েছে অমূল্যে মণিমাণিক্যে। বিভিন্ন রঙের সমন্বয়ে ঝলমল করছে পাথরগুলি। সংগ্রহশালার একটি কাঁচের ডিস্কে ছড়ান ছিল কয়েকটি পটাশিয়াম ক্লোরেটের ক্রিস্ট্যাল। ডিস্কটি ইচ্ছামতো ঘোরানো যায় এবং ঘোরানর সঙ্গে সঙ্গেই ক্রিস্ট্যাল-গুলির রঙ হয়ে যায় পরিবর্তিত। আলোর কোণগুলি পরিবর্তিত হয়েই ক্রিস্ট্যালের চাকচিক্য নষ্ট করে। রমনের বক্তৃতা শোনবার সৌভাগ্য আমাদের সেই-দিনই হ'লো—ক্রিস্ট্যালের রঙ পরিবর্তনের কারণ জানতে চাইতেই তিনি আমাদের Lecture room-এতে নিয়ে গিয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে কারণ বোঝাবার চেষ্টা করলেন।

শুনেছিলাম রমন নাকি দাম্ভিক কিন্তু

স্বল্প পরিচয়ে ধারণা হ'ল তিনি দাম্ভিক নন, স্পষ্টবক্তা। নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ সজাগ কিন্তু তা এতো বড়ো যে, আমাদের মতো সাধারণ লোকের কাছে দম্ভ ব'লে মনে হতে পারে। কথা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, কিছুদিন পূর্বেই শ্রীজওহরলাল নেহরু তাঁর সঙ্গে দেখা করতে সেখানে এসেছিলেন। গল্প প্রসঙ্গে রমন নেহরুকে বলেছিলেন, "ভবিষ্যতের ব্যাঙ্গালোর তার সামনেই বিরাজ করছে।" তখন রমনের সামনে ছিল রমন ইন্‌স্টিটিউটের গবেষণা কক্ষগুলি—অর্থাৎ আগামী ভবিষ্যতে রমন-ইন্‌স্টিটিউটের নামেই পরিচিত হবে আধুনিক ব্যাঙ্গালোর শহর, লোকে বলবে শেষ জীবনে রমন এখানে এসেই গবেষণা করেছিলেন। একে আপনারা দম্ভোক্তি বলতে পারেন কিন্তু এ হ'লো আত্মবিলাসরূপ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সত্যবাণী। রমনই একথা বলতে পারেন, তাঁর কাছে এই বিবৃতি দম্ভ নয়। আজও কোন লোক কর্ম প্রসঙ্গে ব্যাঙ্গালোরে গেলে আর কিছু দেখুক আর না দেখুক একবার অন্তত রমনের সঙ্গে পরিচয় করে আসে।

রমন ইন্‌স্টিটিউটে বর্তমানে গবেষণা করেন মাত্র পাঁচ ছয়জন ছাত্র। রমন বিশ্বাস করেন, সুদিন একদিন আসবেই যখন এই গবেষণাকারী ছাত্রের সংখ্যা আরও অনেক বেশী হবে। ভারতবর্ষের বিজ্ঞান গবেষণা সম্বন্ধেও কিছু কথা হলো, খ্যাতনামা বিজ্ঞানীদের সরকারী চাকরি গ্রহণ করাটা তিনি মোটেই সুনজরে দেখেন না। তাঁর মতে ছাত্র-গবেষকদের নিষ্ঠার চেয়ে অনেক বেশী নিষ্ঠার দরকার যিনি গবেষণা পরিচালনা করবেন। কিন্তু চিন্তাশীল অভিজ্ঞ বিজ্ঞানীরা যদি সকলেই অন্য কাজে নিযুক্ত থাকেন তাহলে নবীন ছাত্রদের সুপরিচালিত করবেন কারা?

রমন শুধু অমায়িক ভদ্রলোক নন—রসিকও। ইন্‌স্টিটিউট ভবনের চারিদিকে বেশ বড় বড় গাছ বাড়িটিকে চোখের আড়াল করে রেখেছে। একজন তাঁকে প্রশ্ন করলেন, "তিনি লুকিয়ে থাকতে চান ব'লেই কি এই ব্যবস্থা?" "মোটেই না" রমন উত্তর দেন, "পাছে কেউ নজর লাগায় তাই গাছপালা দিয়ে আড়াল করে রেখেছি। তাছাড়া পঞ্চাশ বছর পার হয়ে গেলে ভারতবর্ষের লোকেরা আগেকার দিনে বনে গিয়ে বাস করতো। আমার বনে যাবার সময় নেই তাই বনকেই এগিয়ে আসতে সুযোগ দিচ্ছি।" রমন ইন্‌স্টিটিউট থেকে একটা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। রমন দুঃখ করে বললেন, "পত্রিকা অনেক জায়গাতেই পাঠান হয় কিন্তু কেউ খুলে দেখেন না এখানে কি গবেষণা বা কাজ হচ্ছে। সবাই প্রাপ্তিস্বীকার করে পত্র দেন,—পত্রিকাটির মলাট বড়ই চমৎকার। আরও চমৎকার বিজ্ঞান মন্দিরের ফটোটি যেখানে তিনি গবেষণা করছেন।"

রমন ইন্‌স্টিটিউট দেখা শেষ ক'রে রমনের সঙ্গেই নীচে নেবে এলাম। এক তলায় সিঁড়ির পাশেই চোখে পড়লো একটি পাথরের মূর্তি—তলায় লেখা সি ভি রমন। কালো কাপড়ে ঢাকা মূর্তিটি—এখনো উন্মোচিত হয় নি। আমার মনে হ'লো ঐ কাপড়ের উন্মোচন হবে সেইদিনই যেদিন আবার নতুন করে রমন ইন্‌স্টিটিউটের সৌরভ সারা পৃথিবীময় ছড়িয়ে পড়বে, উজ্জ্বল করবে ভারতবর্ষের মুখ। সন্ধ্যা হয়ে এলো—বিদায় নেবার দেরি নেই। রমনকে সঙ্গে নিয়ে বাগানে একটা Group ফটো তুললাম। আবার এখানে আসবার জন্য আমাদের ঢালাও নিমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন বিজ্ঞানাচার্য। বাস-স্টপ্ অনেক দূর, পা যেন চলতে চায় না—গাছের আড়ালে আস্তে আস্তে ঢাকা পড়ে গেলো রমন ইন্‌স্টিটিউটের সুন্দর বাড়িখানি।

'শিক্ষাসত্র' বিদ্যায়তন

বিভূতিভূষণ চক্রবর্তী

উৎপত্তি ও পরিবর্ধন

১৯২৪ সালে গুরুদেব কতিপয় দরিদ্র ও অনাথ বালক নিয়ে শান্তিনিকেতনে "শিক্ষাসত্র" বিদ্যায়তনটি প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু কিছুদিন পরই এ বিদ্যায়তনটি শান্তিনিকেতন থেকে শ্রীনিকেতনে স্থানান্তরিত করতে হয়; কারণ শিক্ষাক্ষেত্রে গতানুগতিক পরীক্ষা ব্যবস্থাকে এড়িয়ে চলাই ছিল এ প্রতিষ্ঠানটির গোড়া-পত্তনের উদ্দেশ্য। প্রথমে এই বিদ্যালয়ে মাত্র ৫ জন কি ৬ জন ছাত্র ভর্তি হয়। এদের মধ্যে একজন খাসিয়া, একজন পূর্ববঙ্গের আর অবশিষ্ট ক'জন ছাত্র এল শ্রীনিকেতনের পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে।

শিক্ষাসত্র প্রতিষ্ঠা করবার সময় প্রতিষ্ঠাতার সম্মুখে ছিল তিনটি আদর্শ ঃ—

(ক) গুরুদেব চেয়েছিলেন ছাত্রদের প্রাকৃতিক এবং সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে নিকট সম্পর্ক স্থাপনের সব রকম সুযোগ-সুবিধা করে দিতে হবে।

(খ) ছাত্রগণ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের দৈনন্দিন প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব গ্রহণ করবে।

(গ) গঠনমূলক কার্যের মধ্য দিয়ে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করতে হবে। যেমন বাগান তৈরী, তাঁতের কাজ, কাঠের কাজ প্রভৃতি। বিদ্যালয়ের শিক্ষার বিষয়গুলো এইসব গঠনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত হবে। গুরুদেব মনে করেছিলেন তিনি তাঁর বিদ্যায়তনে প্রচার করবেন;

"An active vigour of work, the joyous exercise of inventive and constructive energies that help to build up character".

তাঁর শিক্ষার আদর্শকে প্রকৃত রূপদান করার জন্য তিনি প্রতিষ্ঠাবান্ শিক্ষাবিদ্‌দের এ কার্যে নিয়োগ করেন। সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার (এ'কে গুরুদেব আমেরিকা পাঠান কৃষিকার্য সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ করতে) প্রথম এই বিদ্যায়তনের ভারপ্রাপ্ত হন। অন্যান্য যাঁরা এই বিদ্যায়তনের ভারপ্রাপ্ত হন তাঁদের নাম নীচে দিচ্ছি।

আর্যনায়কম্, বর্তমানে ইনি হিন্দুস্থান তালিমিসঙ্ঘের সম্পাদক।

ডাঃ প্রেমচাঁদ লাল, কিছুকাল পূর্বেও আজমীর শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ছিলেন। সম্প্রতি পরলোকগমন করেছেন।

ডাঃ ধীরেন্দ্রমোহন সেন, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা বিভাগের সম্পাদক।

ডাঃ কে পি মুখার্জি, সিংহল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক।

শ্রীমতী মারজোরিসাইকস্।

শ্রীসুনীলচন্দ্র সরকার, বর্তমানে অধ্যাপক, বিনয়ভবন শিক্ষক-শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বিশ্বভারতী।

ডাঃ এস্ এন্ ব্রহ্মচারী।

একাজে মিঃ এল কে এলম্‌হার্স্ট পূর্ণসহযোগিতা করেন।

শিক্ষাসত্রের উদ্দেশ্য

শিক্ষাসত্রের উদ্দেশ্য ছাত্রদের নাগরিক জীবনের জন্য সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত করা। গুরুদেবের নিজের কথায় শিক্ষাসত্রের উদ্দেশ্য প্রকাশ করা যাক্;

"The primary object of an institution of this kind should be to educate one's limbs and mind not merely to be in readiness in all emergencies, but also to be in perfect tune in the symphony of response between life and the world."

গুরুদেব মনে করতেন, সৌন্দর্যবোধ আত্মপ্রকাশে সাহায্য করে এবং এই সৌন্দর্য আনন্দের উৎস। শিশুদের শিক্ষা ব্যাপারে এর প্রভূত প্রয়োজন আছে। এই সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করার জন্য প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের একান্ত প্রয়োজন আছে। এই কারণেই গুরুদেব শ্রীনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে শিক্ষাসত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। শিক্ষাসত্রের ছাত্রগণ শিক্ষা সমাপনের পর নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যাবে। এইসব ছাত্র পল্লীর গৃহে গৃহে তাদের সৌন্দর্যবোধ প্রচার করবে। এইভাবে গ্রাম্যজীবন উন্নত হবে।

গুরুদেব চেয়েছিলেন প্রকৃতির সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে এবং ছাত্রগণ কোনও একটি শিল্পকে বৃত্তিরূপে গ্রহণ করবে। গুরুদেব বলতেন;

"Their class work has not been wrenched away walled-in from their normal vocation, because it

ছাত্ররা অভিনয় করবে নিজেদের চিত্তবিনোদনের জন্য। তাই মঞ্চসজ্জার আয়োজন। নিজেদের লেখা নাটকই তারা অভিনয় করতে ভালবাসে

প্রার্থনারত ছাত্রদল

ছাত্রদের ড্রীল শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে

has been made a part of their daily current of life, that it easily carries itself by its onward flow".

শিক্ষাসত্রের ছাত্রগণ শিল্প বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণের জন্য শ্রীনিকেতনের শিল্পভবনে যাবে। ছাত্রগণ শিল্পভবন ভালোভাবে পরিদর্শন করবে এবং যে কোন একটি শিল্পকে তাদের শিল্পশিক্ষার বিষয়রূপে গ্রহণ করবে। শিক্ষাসত্রে শিল্প একটি বিশেষ স্থান অধিকার করে। এই বিদ্যায়তন জীবনকেন্দ্রিক। শিল্প জীবিকাযাপনের পন্থা।

গান্ধীজী এই বিদ্যায়তনটি পরিদর্শন করেন এবং তিনি একটি বিদ্যালয় স্থাপন করতে উৎসাহিত হন। গান্ধীজী ১৯৩৭—৩৮ সনে তাঁর পরীক্ষামূলক বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ করেন। শিক্ষাসত্রের ভাবধারাই বুনিয়াদী শিক্ষার গোড়াপত্তনে সাহায্য করে। গান্ধীজী চেয়েছিলেন ছাত্রগণ বিদ্যাশিক্ষার সংগে সংগে অর্থ উপার্জন আরম্ভ করবে। বিশ্বকবি কিন্তু সৌন্দর্যবোধের দিকেই বেশী লক্ষ্য দিয়েছেন; অন্যদিকে গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল অর্থনীতির দিকে।

ছাত্র, শিক্ষক এবং পরিচালন ব্যবস্থা

শিক্ষাসত্রে ২১জন ছাত্রের স্থান সংকুলান করা হয়। অল্প ছাত্র নেওয়ার কারণ ইত্যাদি নিম্নে উল্লিখিত হ'ল।

(ক) এটি হচ্ছে পরীক্ষামূলক বিদ্যায়তন। কেবল সেইসব অভিভাবকই এখানে ছেলেদের শিক্ষার জন্য পাঠাতেন যাঁদের এইরূপ বিদ্যায়তনের আদর্শে আস্থা আছে। সুতরাং ছাত্রসংখ্যা কম থাকা প্রয়োজন। অল্পসংখ্যক ছাত্র থাকলে বিদ্যালয়ের বিশেষ শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে শিক্ষাদান সম্ভব হয়।

(খ) যে সব ছাত্র বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্যকাল অতিবাহিত হবার পর নিজ নিজ গ্রামে ফিরে যাবে এবং গ্রামোন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ করবে কেবল সেই সব ছাত্রকেই ভর্তি করান হয়। এ সমস্ত ছাত্র কখনই চাকরিপ্রিয় হ'বে না।

(গ) এ বিদ্যায়তনটি আবাসিক; সুতরাং বেশীসংখ্যক ছাত্রের স্থান সংকুলান করা সম্ভব হয় না।

(ঘ) শিক্ষকগণকে প্রত্যেকটি ছাত্রের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে লক্ষ্য রাখতে হয়। ছাত্রগণ ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ থেকে আসে; সুতরাং প্রতিটি ছাত্রের জীবন বিশেষভাবে পরীক্ষা করা শিক্ষকগণের কর্তব্য।

(ঙ) শিক্ষকগণকে প্রাক্তন ছাত্রদের সংগে যোগাযোগ রাখতে হয়। বিশ্বাস করা যেতে পারে অল্পসংখ্যক পারদর্শী কর্মী অধিকসংখ্যক সাধারণ কর্মীর চেয়ে ভালো। শিক্ষাসত্রের ছাত্রগণ শিক্ষাসত্রের পাঠ্যকাল সমাপনের পর গ্রামে ফিরে যাবে। বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এ কাজে প্রয়োজনীয় সাহায্য করবেন এবং ছাত্রদের কাজে নির্দেশ দেবেন। সুতরাং ছাত্রসংখ্যা কম হওয়া দরকার।

এখানে আট বৎসরের বেশী বয়স্ক ছাত্রদের ভর্তি করা হয়। শিক্ষাকাল সাত বৎসর। নিকটবর্তী স্থানের ছাত্রদেরই ভর্তির ব্যাপারে প্রথম সুযোগ দেওয়া হয়। যে সমস্ত ছাত্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির প্রতি আকর্ষণ আছে এবং যারা বিদ্যাশিক্ষার পর গ্রামে ফিরে যাবে এবং গ্রামোন্নয়ন কার্যে আত্মনিয়োগ করবে কেবল তাদেরই ভর্তি হ'তে দেওয়া হয়।

এখানকার ছাত্রদের মধ্যে শতকরা ৯৫% জন ছাত্র আসে কৃষকশ্রেণী থেকে এবং অবশিষ্ট ছাত্র অন্যান্য শ্রেণী থেকে। এখানকার ছাত্রদের মধ্যে কোন জাতিভেদ নাই। সকল জাতির ছাত্র একত্র বাস করে এবং আহার করে। এইভাবে ছাত্রদের মধ্যে বিশ্বপ্রেম জাগ্রত হয়। এই বিদ্যায়তনের গোড়ার দিকে ছাত্রদের অর্থব্যয় করতে হ'ত না। কিন্তু কিছুদিন পর দেখা গেল অভিভাবকগণ এরূপ শিক্ষাকে হীন চক্ষে দেখতে আরম্ভ করেছেন। সুতরাং এর পর থেকে ছাত্রদের থাকবার ব্যবস্থা পরিবর্তন করতে হ'ল। ছাত্রদের বিদ্যালয়ের মাহিয়ানা বাবদ আধমণ করে চাউল জমা দিতে হ'ত। এটা অবশ্য নির্ভর করত ছাত্রদের আর্থিক অবস্থার উপর। দরিদ্র মেধাবী ছাত্রদের বিনাব্যয়ে পড়বার সুযোগ ছিল। কোন ছাত্রকে ভর্তি করলে তাকে একমাস পরীক্ষা করা হ'য়। যদি তাকে অনুপযুক্ত মনে করা হয় তাহ'লে তাকে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয় না। পূর্ণ নির্বাচনের পূর্বে তাকে চিকিৎসামূলক পরীক্ষা করা হয়। চিকিৎসক প্রতিটি ছাত্রের স্বাস্থ্যোন্নতির হিসাব রাখেন। কোন রকম শারীরিক অসুস্থতা দেখা গেলেই তাকে চিকিৎসা করা হয়। ছাত্র ও শিক্ষকগণ একই পল্লীতে বাস করে বলে ছাত্র-শিক্ষকের মধ্যে নিকট সম্পর্ক

প্রকৃতি-পরিচয় ও বিজ্ঞান শিক্ষা বাগানের কাজের সঙ্গেই চলে

বনভোজন ও পল্লীপর্যটন

স্থাপিত হয়। ছাত্র-শিক্ষক এমন নৈকট্যের মধ্যে বাস করে যে দেখে মনে হয় ছাত্র-শিক্ষক একই পরিবারভুক্ত। শিক্ষকগণ ছাত্রদের গৃহ পরিদর্শন করেন এবং গৃহের প্রয়োজনানুযায়ী ছাত্রকে শিক্ষা দেন। সুতরাং আমরা দেখ্‌ছি ছাত্রদের শিক্ষা কেবলমাত্র বিদ্যালয়েই নিবদ্ধ থাকে না।

কাজের ধরন

শিক্ষাসত্রে নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক নাই। ছাত্রদের কিছু পুস্তক দেওয়া হয়। ছাত্রদের যে সব বই ভালো লাগে নিজেরাই সে সব বই পড়ে ফেলে। যদি বই পড়তে কোন অসুবিধা হয় ছাত্রগণ শিক্ষকদের সাহায্য পায়। শিক্ষকগণ ছাত্রদের সঙ্গেই বাস করেন; সুতরাং শিক্ষকগণের সাহায্য ছাত্রগণ সর্বদাই পেতে পারে।

নিয়মানুবর্তিতা ছাত্রদের শিক্ষার প্রধান অঙ্গ। শিক্ষাসত্রে ছাত্রগণ নিম্ন-লিখিত কার্যতালিকা অনুসরণ করে।

ছাত্রগণ খুব ভোরে শয্যাত্যাগ করে। প্রাতঃকৃত্য সমাপনের পর প্রাতঃকালীন প্রার্থনায় সমবেত হয়। প্রার্থনার পর এক ঘণ্টা পড়াশুনা করে। এর পর প্রাতঃরাশ শেষ করে ছাত্রগণ তিনঘণ্টা কাজ করে। এই সব কাজের সময় শিক্ষকগণ প্রত্যেক ছাত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখেন। মধ্যাহ্নভোজের পর ছাত্রগণ এক ঘণ্টা বিশ্রাম করে। পুনরায় কাজ আরম্ভ হয়। ছাত্রগণ এক ঘণ্টা পড়াশুনা করে এবং শিল্প-ভবনে দুই ঘণ্টা শিল্প শিক্ষা করে। সন্ধ্যাবেলা প্রার্থনায় যোগদান করে। তারপর পড়বার ঘরে যায় এবং দেড় ঘণ্টা পড়াশুনা করে। রাত্রিকালীন ভোজনের পর ছাত্রাবাসের তত্ত্বাবধায়ক মহাশয় আসেন সারাদিনের কাজ সম্বন্ধে আলোচনা করতে।

এখানে ছাত্রগণ সব কিছু পর্য-বেক্ষণ করবার সুযোগ পায়। প্রত্যেক ছাত্রকে একখণ্ড করে জমি দেওয়া হয়। এই জমিতে ছাত্রগণ শাকসব্জি জন্মায়। এই কাজের মধ্যে তারা নিম্নলিখিত বিজ্ঞান শিক্ষা করে।

Geology, Entomology, Ornitho-logy.

ছাত্রগণ শ্রীনিকেতনের নিকটবর্তী নদীর soil erosion; বিভিন্ন প্রকারের পাথর প্রভৃতি ভালো করে পর্যবেক্ষণ করে ভূগোল শিক্ষা করে। সংবাদপত্র পাঠ করে এবং ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধ স্থান পরিদর্শন ক'রে ইতিহাসের জ্ঞান লাভ করে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের পরিদর্শকদের বাণী শুনেও ইতিহাসের জ্ঞান লাভ করে। ছাত্রগণ শ্রীনিকেতনের Dairy, Poultry এবং Pisciculture বিভাগ দেখে ঐ সব বিজ্ঞান সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারে। সাহিত্য ও চারুশিল্প সম্বন্ধে ছাত্রগণ জ্ঞানলাভ করতে পারে রবীন্দ্রভবন, কলা-ভবন এবং সংগীতভবন দেখে এবং শান্তিনিকেতনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদান ক'রে। এসবের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ জাগ্রত হয়। শাসনের মধ্য দিয়ে ছাত্রদের শৃঙ্খলা শিক্ষা দেওয়া হয় না। ছাত্ররা নিজেরাই শিখবে কোনটা ভালো এবং কোনটা মন্দ; কোন ব্যবহার সামাজিক এবং কোন ব্যবহার অসামাজিক; কোনটি বাঞ্ছনীয়, কোনটি অবাঞ্ছনীয়। এইভাবে তাদের মধ্যে আসে 'Esprit-de-corps বা team spirit এবং এইভাবে তারা এমন অভ্যাস গড়ে তোলে, যাতে পল্লীর গৃহে গৃহেও তারা মিলিতভাবে বাস করবার মনোভাব গঠন করতে পারে। ছাত্রদের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাবকে উৎসাহিত করা হয়। ছাত্ররা নিজেদের মধ্যে সমবেত 'বিচার-সভা' গড়ে তোলে। ছাত্রদের মধ্যে কেহ অন্যায় কাজ করলে এই বিচার-সভাই তার বিচার করে। বিচার-সভা কোন জটিল সমস্যার সমাধান করতে না পারলে শিক্ষক মহাশয়ের কাছে (যাঁদের তারা 'দাদা' বলে) উপস্থিত হয়।

শিক্ষকগণের মনোবিজ্ঞান জানা প্রয়ো-জন; যাতে তাঁরা মনোবিজ্ঞানের সাহায্যে সমস্যাপূর্ণ শিশুকে (Problem-child) ঠিকভাবে পরিচালিত ও শিক্ষিত করতে পারে। ছাত্রদের মধ্য থেকে মাসে একজন করে ক্যাপ্টেন ঠিক করা হয়। শিক্ষাসত্রের অন্তর্নিহিত কাজের জন্য ক্যাপ্টেনগণ দায়ী হয়। ছাত্রগণ একজন খাদ্য তত্ত্বা-বধায়ক এবং একজন ক্রীড়াপরিচালক নির্বাচিত করে। এই প্রকারে ছাত্রগণ বাল্য-কাল থেকেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে শিক্ষা করে। যখন ছাত্রগণ 'দলে' বাস করে তখন তারা একে অপরকে সাহায্য করে এবং নিজ নিজ কাজের দায়িত্ব গ্রহণ করে। ছাত্রগণ নিজেরাই খাদ্য পরিবেশন করে; নিজ নিজ বাসন পরিষ্কার করে এবং কখন

কখন নিজেরাই খাদ্য প্রস্তুত করে। উচ্চ-শ্রেণীর ছাত্রগণ বহির্জগতের এবং শ্রীনিকেতনের স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ করে 'দৈনিক' পত্রিকায় প্রকাশ করে। ছাত্রদের জন্য পৃথক পাঠাগার আছে।

রোগীর শুশ্রূষা করা এবং প্রথম চিকিৎসার ব্যবস্থা করা ছাত্রদের শিক্ষার অঙ্গ। যদি ছাত্রগণ সংবাদ পায় শ্রীনিকেতনের স্থানীয় সংবাদ সংগ্রহ ক'রে গণ স্বেচ্ছায় সেখানে রোগীর সেবা করতে অগ্রসর হয়।

ছাত্রগণ পল্লীসংগঠন বিভাগের সঙ্গে সহযোগিতা করে। এই প্রকারে সামাজিক কাজ করবার অভ্যাস ছাত্রদের মধ্যে বৃদ্ধি পায়। ছাত্রগণকে পল্লীতে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এইভাবে পল্লীর প্রকৃত চিত্রের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার সুযোগ ছাত্রগণ লাভ করে। ছাত্রগণের স্বাস্থ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা হয়। ছাত্রগণকে দৈনিক ব্যায়াম করতে হয়। ছাত্রগণের অভিনয় সঙ্ঘ এবং সাংস্কৃতিক সঙ্ঘ আছে। এর মধ্য দিয়ে তারা কলা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত হয়। বিদ্যালয়ের পাঠ্য বিষয়ে কোন প্রকার ধর্মীয় অনুশাসন নাই। বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধায়ক বিশ্ব-সৃষ্টির কারণ সম্বন্ধে আলোচনা করেন, মানবজীবনের উদ্দেশ্য কি এবং প্রকৃত সুখশান্তি কাকে বলে সে সম্বন্ধেও প্রশ্ন করেন। ছাত্রগণ নিজেদের সাধারণ জ্ঞান থেকে এ সব প্রশ্নের উত্তর দেয়। কোন বিশেষ চিন্তাধারাকে বিদ্যালয় থেকে অনুসরণ করতে বলা হয় না।

বাধাবিপত্তি ও সমস্যা

গুরুদেব বলেছেন;

"For me the obstacles were numerous. The tradition of the community which calls itself educated, the parent's expectations, the upbringing of the teachers themselves, the claim and constitution of the official university, were all overwhelmingly arrayed against the idea I had cherished".

ছাত্রগণের অভিভাবকগণ এইরূপ শিক্ষাব্যবস্থাকে ভুল বুঝেছেন। যে শিক্ষা ছাত্রগণকে কোন ডিগ্রি এনে দেয় না স শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে ময় লাগবে। এইরূপ অভিনব ধরনের শক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে জনসাধারণ পরিচিত য়। কথিত আছে একজন ছাত্রকে তার গ্রামের একজন বৃদ্ধলোক বলেছিল "তোমাকে শিক্ষাসত্রে মানুষ তৈরী না করে মুনিষ (মজুর) তৈরী করছে।" এই সব কারণে বিদ্যালয়ের অনেক ছাত্র পড়া ছেড়ে দেয়। অনেক ছাত্র আবার এই শিক্ষা ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে না পেরেও পড়া ছেড়ে দেয়।

অনেক ছাত্র আর্থিক সমস্যার জন্যও পড়া ছেড়ে দেয়। যদি এই সব ছাত্রকে বিনা অর্থব্যয়ে পড়বার সুযোগ দেওয়া হ'ত তাহ'লেও অনেকক্ষেত্রে অভিভাবকগণ ছাত্রদের বিদ্যালয়ে পাঠাতেন না; কারণ অভিভাবকগণ মনে করেন ছেলেরা বাড়ী থাকলে তাদের কাজে সাহায্য করতে পারে।

গৃহের অতিরিক্ত আকর্ষণের জন্যও অনেকে পড়া ছেড়ে দিয়েছে। ছাত্রগণ এমন একটি পরিবেশে বাস করে অভ্যস্ত যে তারা বাড়ী ছেড়ে বাইরে যেতে চায় না। নিম্নের তালিকা থেকে ছাত্রদের সংখ্যা এবং পড়া ছেড়ে দেওয়ার কারণ উপলব্ধি করা যাবে।

পড়া ছেড়ে দেওয়ার কারণ

বৎসর	সংখ্যা	শিক্ষাসত্রের শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য	অর্থসংকট	অতিরিক্ত কষ্ট	স্বাস্থ্য	গৃহের আকর্ষণ
১৯৪৪	১৩	৭	৪	১	১	—
১৯৪৫	১১	৩	১	১	১	৪
১৯৪৬	৬	—	২	২	—	২
১৯৪৭	১১	২	৬	১	—	—
১৯৪৮	১১	৩	৪	—	—	৪

বর্তমানে বিদ্যালয় ত্যাগ করে যাওয়ার সংখ্যা কমছে।

শিক্ষাসত্রের অগ্রগতি

নিম্নের তালিকা থেকে দেখা যাবে শিক্ষাসত্র তার নতুন আদর্শে কতখানি অগ্রসর হয়েছে।

বৎসর	কতজন ছাত্র পল্লী উন্নয়ন কাজে নিয়োজিত হয়েছে
১৯৪৪	৫ জন
১৯৪৫	৬ ,,
১৯৪৬	৭ ,,
১৯৪৭	৮ ,,
১৯৪৮	১১ ,,
১৯৪৯	১১ ,,

নিম্নের তালিকা থেকে দেখা যাবে কতজন ছাত্র স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়েছে এবং বিদ্যালয় থেকে যে শিল্পে বিশেষ শিক্ষালাভ করেছে সেই সব শিল্পের উপর নির্ভর করে জীবিকার্জন করছে।

বৎসর	সংখ্যা	কাঠের কাজ	তাঁতের কাজ	পুস্তক বাঁধাইয়ের কাজ	চামড়ার কাজ
১৯৪৪	১০	১	৫	১	৩
১৯৪৫	৩	—	—	—	৩
১৯৪৬	১	১	—	—	—
১৯৪৭	৪	১	২	—	১
১৯৪৮	৬	২	৪	—	—

শিক্ষাসত্রের শিক্ষকমণ্ডলী চেষ্টা করছেন পার্শ্ববর্তী অধিবাসীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন করতে এবং এই আদর্শ বিদ্যায়তনের মূল্য দেখাতে। ছাত্রগণ বিদ্যালয়তনের পাঠ সমাপন করে গ্রামে ফিরে যাচ্ছে এবং গ্রাম্য উন্নয়ন কার্যে নিজে-দের নিয়োজিত করছে। আমরা আশা করতে পারি, অদূর ভবিষ্যতে শিক্ষাসত্র বর্তমান বিক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন সাধনে অগ্রণী হবে এবং বিশ্বকবির স্বপ্ন বাস্তবরূপ লাভ করবে।

[জীবন কথা]

বাংলা সাহিত্যে জীবনী লেখার একটা রেওয়াজ কিছুকাল থেকে চালু হয়েছে। সুলক্ষণ, সন্দেহ নেই। আমরা, এতদ্দেশীয় ভদ্রলোকেরা, বিনয়ে তৃণসুনীচ, মুখ ফুটে নিজের কথা বলতেই চাইনে। কন্‌ফেশ্যান দূরে থাক, মামুলী আত্মকথা লিখতেও হাত সরেনা। কখনও সে-দুঃসাহস যদি-বা হয়, আপনাকে মাদুরের মত গুটিয়ে গুটিয়ে এক-কোণে সরিয়ে রাখি, আত্মকথাকে একেবারে আত্মার কথা, নৈর্ব্যক্তিকতার নির্যাস করে তুলি। ভয়, নিজেকে পুরুষং মহান্তং বলে না চালালে পাছে পাঠকের মোহান্ত ঘটে।

কবিকে তাঁর জীবনচরিতে পাওয়া ভার, রবীন্দ্রনাথ সখেদে বলেছিলেন। আমরা বলি তাতে ক্ষতি কী, ভিতরের মানুষটাকে চিনিয়ে দিতে তো কবির কাব্যগ্রন্থমালাই রয়েছে, জীবন কথায় না-হয় মানুষটাকেই একটু বেশী পাওয়া গেল। তিনি টোস্টের সঙ্গে মরিচগুঁড়ো পছন্দ করেন, না চিনি এত খুঁটিনাটি হয়ত জানতে চাইব না, তাঁর রোগভোগের বিবরণও হয়ত অরুচিকর বোধ হবে, কিন্তু এটুকু জানতে মন্দলাগবে না মানুষটা রাগী না রাশভারি, মুখচোরা না

উত্তমপুরুষ

প্রগল্‌ভ। লেখকের ব্যক্তিত্বকে জানলে লেখা বোঝাও সহজ হয়। আর, সমসাময়িক চোখে কোনো-কোনো জীবনীর সাহিত্যমূল্য যদি খাটোও ঠেকে, সামাজিক ইতিহাসের উপকরণ হিসাবে আজ থেকে পঞ্চাশ বছর পরে, একুশ শতকের প্রথম পাদে তার দাম চতুর্গুণ হবে।

বাংলাদেশে জীবনী লেখার মত জীবন এখন না হয় সংখ্যায় অল্প, সেকালে এমন ছিলনা। তবু যে-ক'টি জীবনী লেখা হয়েছে তা আঙুলে গোনা যায়। একই লোকের একাধিক জীবনচরিত বিরল, থাকলেও খুব কম লোকই তার খবর রাখে। (অধ্যাপক, গবেষকরা নমস্য, তাঁরা আমার হিসাবের বাইরে)। ইংরাজিতে ডিসরেলী, শেলী, নেপোলিয়ন বা গ্লাড্‌স্টোনের উপর যত জীবনী রচিত হয়েছে, যোগ দিলে তার সংখ্যা বাংলা সাহিত্যের সমবেত জীবনীর অন্তত দ্বিগুণ হবে।

বছর পঁচিশেক আগে তিন আনা সংস্করণের একটা সিরিজ বেরিয়েছিল। সে-সব পুস্তিকা শিক্ষা বিভাগের মহামান্য ডিরেক্টর বাহাদুরের পছন্দর দিকে লক্ষ্য রেখে লিখিত এবং একান্তভাবে স্কুলের ছাত্রদেরই পাঠ্য এবং পাচ্য। সাল তারিখের তফাৎ ছেড়ে দিলে সে-সব জীবনী আসলে যাবতীয় মহাপুরুষের কীর্তির গ-সা-গু— সমন্বয়ের জাঁতাকলে পড়ে স্যার গুরু দাসের সঙ্গে এব্রাহাম লিঙ্কনের, বিদ্যা সাগরের সঙ্গে উইলবারফোর্সের তারতম্য খুঁজে পাওয়া যেতনা। প্যারীচর সরকারের ফার্স্ট বুকের হাতী ও ব্যাঙে ছবির মত সব একাকার হয়ে যেত।

মাইকেল মধুসূদনের উপর যোগীন্দ্র নাথ বসুর জীবনী অন্য স্বাদের বই। তাতে মধুসূদনের দুর্বলতা একেবারে কম্বলচাপা পড়েনি,—বাঙালী সমাজ অশান্তচরিত্র এ লেখকের কথা স্মরণ করে আজও দীর্ঘশ্বা ফেলেন। রম্য-জীবনী লেখার চল হ জীবনী পড়ার পাঠকও জুটবে। হয় দু' একটা লিটল স্ট্রেচি, আঁদ্রে মোরো বাংলা দেশেও জন্মাবে। মহামানুষ তে শুধু মহান্ নন, মানুষও বটেন, তাঁ আঁকতে হলে তাঁর দুর্বলতাও দেখান চাই

সাহিত্য কেন

লখনউ সম্পর্কিত লেখাটিতে শুধু সম্মেলনের গঠনবিধি নিয়েই আলোচন করেছিলুম। অভিভাষণগুলির পরিচয় দি উঠতে পারিনি। বিস্তৃত আলোচনা পরিসর আজও নেই, তবু জানিয়ে রাখি 'সাহিত্য কেন' এ-প্রশ্ন লখনউতে উঠেছিল। অচিন্ত্যকুমার আকাশম আনন্দের সঙ্গে সাহিত্যের তারটি এ সুরে বেঁধে দিয়েছেন। হৃদয়ের কথা সাহিত্যের প্রাণবস্তু, তার উপজীব্য মানুষ ধুলো আর ধোঁয়া, কাঁটা আর কাদার কথ সাহিত্যে অবশ্যই থাকবে, সেই সঙ্গে নী আকাশের খবরও। 'দুটো জিনিসকে মেলাতে হবে। উদরের সঙ্গে হৃদয়, বুদ্ধির সঙ্গে কল্পনা, দেহের সঙ্গে আত্মা।... খণ্ডকালের সঙ্গে নিত্যকাল, কল্যাণের সঙ্গে সৌন্দর্য।'

কেন লিখি—এই সনাতন সাহিত্য-জিজ্ঞাসার জবাব অচিন্ত্যকুমার এক কথায় দিয়েছেন,—'নিজেকে ব্যক্ত করতে।' এ-ব্যাখ্যা সকলের মনঃপূত হবেনা, এ
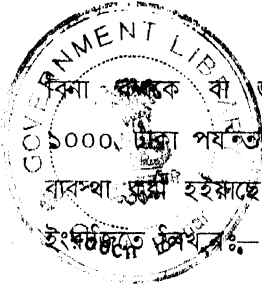
আশঙ্কা বুঝি তাঁরও ছিল, তাই প্রীতি-বাদীদের প্রতি লক্ষ্য করে বলেছেন, 'অনেকে বলবেন দেশের ভাল করবার জন্যে লিখি, লিখি সমাজের অব্যবস্থা উচ্ছেদ করতে, সংগ্রামের প্রেরণা যোগাতে। দেশের ভালো কে না চায়।...কিন্তু হিতকামীরা সবাই কি আর লেখে? না হিতকামীদের সব লেখাই সাহিত্য হয়?'

এই উক্তির সঙ্গে ম্যমের শিল্পদৃষ্টির গভীর মিল। ম্যম্ বলেছেন সাহিত্য Pulpit এবং Platform দুয়ের কোনটাই নয়—এ-কথা গতবারে উল্লেখ করেছি। কিন্তু ম্যমের মত সব মহলে গ্রাহ্য হবেনা, কেননা তিনি নাকি শিল্পীর সামাজিক দায়িত্ব সর্বত্র পালন করেননি। সুতরাং কিছুকাল আগে প্রকাশিত এরেনবুর্গের একটি পুস্তিকার উল্লেখ করব।

লেলিনগ্রাদের কোন ইঞ্জিনীয়ার একবার এরেনবুর্গকে পত্রযোগে এই প্রশ্নটি পাঠান: 'আমাদের জীবনের চেয়ে কথাসাহিত্য দুর্বল আর ফিকে,—কেন এমন হয় বলতে পারেন? সোভিয়েট সমাজের সঙ্গে জারের রাশিয়ার তুলনাই হয়না, তবু তখন মহৎ গ্রন্থাদি রচিত হয়েছে। আধুনিক অনেক বইও অবশ্য পড়তে ভালই লাগে, তবু তা হৃদয়কে ছোঁয়না, কিসের যেন অভাব, চরিত্রগুলি যেন সত্যিকারের মানুষ নয়।'

এই প্রশ্ন অগ্রণী সোভিয়েট লেখককে বিব্রত করে তুলেছে, সুচিন্তিত পুস্তিকাটিতে তিনি যে জবাব দিয়েছেন তা নিয়ে দেশ-বিদেশে নানা মহলে আলোড়ন-আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। আজকের রুশসাহিত্যে টলস্টয়, শেকভ্ বা গর্কি নেই, কিন্তু সেজন্যে এরেনবুর্গের আফশোসও নেই। কেননা বুর্জোয়া দেশগুলোরও তো একই অবস্থা। ফ্রান্সেই কি এখন বালজাক, স্তাঁদাল, হুগো, ফ্লবেয়র বা জোলা আছেন, না ইংলণ্ডে আছেন ডিকেন্স, বায়রন বা শেলী? তবে, দুয়ের মধ্যে তফাৎ আছে বৈকি। ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের যা হবার সব হয়ে চুকেবুকে গেছে, সেখানে দ্বিতীয় ডিকেন্স বা জোলা কস্মিনকালেও জন্মাবেনা। কিন্তু সোভিয়েট দেশে মহৎ সাহিত্য হতে বাধা কী? এরেনবুর্গ বলেছেন সেখানে রাষ্ট্র যে এখনও শিশু, নতুন সমাজমানস নতুন লেখকদের চো[illegible]রোপুরি ধরা পড়েনি। টলস্টয়-টুর্গেনিভ [illegible] প্রভৃতির আমলে সমাজের পরিবর্তন প্রায় হতই না, আপন কালে মানুষের স্বরূপ চিনতে তাঁদের অসুবিধে ছিলনা। কিন্তু সোভিয়েট-সমাজ একালের লেখকদের চোখের উপরে গড়ে উঠছে, এর আবেগের উৎস কোথায় তাঁরা ঠিক ঠাহর করতে পারছেন না।

সেই পুরনো আবেগ বা ইমোশনের কথায় ফিরে আসা গেল। শুধু বাইরের রূপ চিত্রিত করে ভালো রিপোর্ট তৈরী হতে পারে, হয়ত ঐতিহাসিক দলিলও, কিন্তু সাহিত্যসৃষ্টি করতে হলে মনের দরজায় ঘা দিতে হবে। ক্যামেরাম্যান বোতাম টিপলেই ছবি ওঠে, কিন্তু শিল্পীকে বহুক্ষণ ধরে তার মডেলের দিকে চেয়ে থাকতে হয়। কেন? সে যে অন্তরের ছবিটিও আঁকতে চায়।

এরেনবুর্গ এ-কথা স্বীকার করেছেন। ইস্পাত তৈরির রহস্য লেখকের চেয়ে কারখানার এক্সপার্টই ভালো বলতে পারবেন, চাষবাসের উন্নতির খবর কৃষি-বিদ্যায় পারদর্শীর কাছেই জানা যাবে, কিন্তু এমন জগৎ আছে যার খবর শিল্পীর চেয়ে কেউ বেশী রাখেনা,—মানুষের অন্তর্লোক। আমার প্রতিবেশীকে আমি চিনি। সে প্রত্যহ সকালে ওঠে, বাজারে যায়, অফিসে ছোটে—তার দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে রহস্য কিছু নেই। তার কাহিনী পাঠে কারও রুচি হবেনা। কিন্তু সেই সামান্য মানুষটিরই চিন্তার কথা যদি লিখতে পারি, তার দুঃখ, তার ভালবাসা, তার ত্রুটি, তার আকাঙ্ক্ষার কথা, তবে মুহূর্তেই সে অসামান্য হয়ে উঠতে পারে, তার আটপৌরে জীবনকথাও গভীর ব্যঞ্জনা পায়। সে যদি কারখানার মজুর হয়, তবে অবশ্যই কারখানার বর্ণনাও দেব। কিন্তু মানুষটিকে ফুটিয়ে তুলতেই যন্ত্রের কথা লিখব, যন্ত্রের কথা লেখার জন্যে মানুষটাকে টেনে আনব না।

এরেনবুর্গের বক্তব্যের সারাংশটুকুই বিবৃত করলাম। ব্যর্থতার মূল খুঁজতে গিয়ে তিনি যে অন্তর্লোকের কথা বারবার বলেছেন, পঞ্চেন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তুজগতের মতো তার রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলায় না বলেই তা চির-সাহিত্যের উপজীব্য। মূঢ় ম্লান মূক মুখে হয়ত একদিন ভাষা দেবার প্রয়োজন থাকবে না; কিন্তু সেদিনও শিল্পীর রূপধ্যান শেষ হবেনা, বেদনায় বিস্ময়ে সে সম্মোহিত কণ্ঠে উচ্চারণ করবে, 'মন চেয়ে রয় মনে মনে, হেরে মাধুরী।'

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ফুলওয়ালীর সঙ্গে গিয়ে দেখা করলেন চার্লি, তার হাতে সেই নোটের বাণ্ডিল তুলে দিলেন। বললেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সে যেন ভিয়েনায় চলে যায়। সেখানে গিয়ে অস্ত্রোপচার করালেই তার চোখের দৃষ্টি আবার ফিরে আসবে। আর অপেক্ষা করবার সময় নেই চার্লির, পিছন পিছন পুলিস ছুটে আসছে। ফুলওয়ালীকে অবশ্য সে কথা তিনি জানালেন না। শুধু বললেন যে, জরুরী একটা কাজ রয়েছে, এবারে তাঁকে বিদায় নিতে হবে। ভিয়েনা থেকে সে ফিরে এলেই তিনি এসে দেখা করবেন আবার।

রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই পুলিস এসে তাঁকে গ্রেপ্তার করল। তাঁকে এখন হাজতে নিয়ে যাওয়া হবে। চার্লির তাতে বিন্দুমাত্র দুঃখ নেই। যে-মেয়েকে তিনি ভালবাসেন, তার উপকার করতে পেরেছেন, এই আনন্দেই তিনি আত্মহারা। সিগারেটে শেষ টান দিয়ে একগাল ধোঁয়া ছাড়লেন চার্লি, তারপর সিগারেটের টুকরোটাকে রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই পুলিস হাজতে গিয়ে ঢুকলেন।

তারপর কয়েক মাস কেটে গিয়েছে। জেল থেকে মুক্তি পেয়েই তিনি মেয়েটির সঙ্গে দেখা করতে ছুটলেন। কই, তার সেই নির্দিষ্ট জায়গাটিতে তো সে ফুল বিক্রি করতে আসেনি। কোথায় গেল সে? পাগলের মত চার্লি তাকে খুঁজে ফিরতে লাগলেন। পরনে ময়লা তালিমারা পোশাক, রাস্তার বাউণ্ডুলে ছেলেগুলো তাঁকে দেখে ঠাট্টা করছে, তাঁর পিছু নিয়েছে। চার্লির সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। যে করেই হোক, সেই ফুলওয়ালীকে তিনি খুঁজে বার করবেন। শেষ পর্যন্ত তার সন্ধান পেলেন চার্লি। দেখলেন যে, মেয়েটি তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। অনেক পরিবর্তন হয়েছে তার। সে আর সেই দুঃস্থা ভিখারিণী নয়। রাস্তার ধারে সুন্দর একটি দোকান সাজিয়ে সে ফুল বিক্রি করছে।

বাউণ্ডুলে ছেলেগুলো পিছু নিয়েছে চার্লির, তাঁকে তারা জ্বালাতন করে মারছে। একজন এসে কাঁচি চালিয়ে তাঁর ট্রাউজার থেকে খানিকটা অংশ কেটে নিয়ে পালাচ্ছিল, চার্লি সেই ছেঁড়া টুকরোটাকে তার কাছ থেকে আবার ছিনিয়ে নিলেন। গম্ভীরভাবে সেই ছেঁড়া কাপড়ে নাক মুছে সযত্নে সেটিকে ভাঁজ করে এমনভাবে আবার পকেটে তুলে রাখলেন যেন সেটা তাঁর ট্রাউজারের ছিন্ন একটা অংশমাত্র নয়, তাঁর রুমাল।

মেয়েটি ওদিকে তার দোকানের জানলায় দাঁড়িয়ে সব দেখে যাচ্ছে। ছেলেগুলোর কাণ্ড দেখে সে হাসি সামলাতে পারছে না। চার্লিকে সে চিনতে পারেনি। সে জানে না যে, এই হতভাগ্য মানুষটির করুণাতেই সে আজ তার দৃষ্টি ফিরে পেয়েছে। সতৃষ্ণ নয়নে চার্লি তার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। দেখে মেয়েটি হাসল। তার এক সহকারিণীকে ডেকে বলল, "দ্যাখো, দ্যাখো, কীভাবে তাকিয়ে আছে লোকটা। বোধ হয় আমার প্রেমে পড়েছে

'সীটি লাইট্‌স' চিত্রে ভার্জিনিয়া এবং চার্লি

পাঠকের সে-কথা মনে থাকতে পারে। বড় দুঃখের সেই দুটি বছর। এ-যাত্রায় উপহার হিসেবে সেখানকার ছাত্রদের তিনি একটা সিনেমা-প্রোজেক্টর পাঠিয়ে দিলেন, সেই-সঙ্গে কিছু মিষ্টি। কাউকে সঙ্গে না নিয়ে কেনিংটনের সেই শৈশবস্মৃতি-বিজড়িত জায়গাগুলোতে গিয়েও ঘুরে বেড়ালেন কয়েকরাত। গেলেন পুরনো সেইসব মীউজিক হলে, যেখানে একদিন সামান্য একটা ভূমিকা পেলেও নিজেকে তিনি কৃতার্থ মনে করতেন। বারমন্সির স্টার থিয়েটর, স্ট্র্যাটফোর্ডের রয়্যাল থিয়েটর, মাইল এণ্ড রোডের প্যারাগন, ওয়েস্টমীনস্টার ব্রীজ রোডের ক্যাণ্টারবেরি হল, হক্সটনের হারউড'স ভ্যারাইটিজ আর হ্যাকনি রোডের ইংলিশ'স সীব্রাইট, একটা জায়গাও তিনি বাদ দিলেন না। হাঁটতে হাঁটতে খুব খিদে পেয়েছিল একদিন; ইচ্ছে হল, সেদ্ধ ইল্ মাছ খাবেন। ছোটবেলায় যেমন খেতেন। রাস্তার ধারের এক কফি-স্টলে ঢুকে পেট পুরে খেয়ে নিলেন চার্লি।

হলিউডের হট্টগোলে তিনি হাঁফিয়ে উঠেছিলেন। নিরিবিলি একটু অবসর যাপনের সামান্যতম অবকাশও সেখানে ছিল না। ইংল্যাণ্ডে এসে যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে এই যে এখানে এসে একা-একা কেনিংটনের এই রাস্তায় তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন, কেউ তাঁকে চিনতে পারছে না, কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে আসছে না,—এমন আশ্চর্য আনন্দ, এমন নির্মল নির্জনতা, আহা, অনেক দিন এর আস্বাদ তিনি পাননি। ভারী ভাল লাগত চার্লির। আবার এক-এক সময় এই নিঃসঙ্গতা যে তাঁর খারাপ লাগত না তাও নয়। ইচ্ছে হত, কেউ একজন অন্তত চিনুক তাঁকে, একজন অন্তত যেচে এসে একটু আলাপ করুক। কেউই আসত না। শেষে, নিরুপায় হয়ে, চার্লি একদিন করলেন কি, কফি-স্টলে ঢুকে কথায় কথায় এক খদ্দেরের কাছে নিজের পরিচয় দিয়ে ফেললেন। বললেন, "আমার নাম হয়ত আপনি শুনে থাকবেন। আমি চার্লি চ্যাপলিন।"

ভেবেছিলেন, নাম শুনেই লোকটা লাফিয়ে উঠবে। কিন্তু, কী আশ্চর্য, কিছুই তেমন হল না। অবিশ্বাসের গলায় লোকটা বলল, "তারপর? আর কিছু বলবেন?" চার্লি তো অবাক। বুঝলেন যে, লোকটা তাঁকে বিশ্বাস করেনি। বললেন, "বিশ্বাস করুন, সত্যিই আমি চার্লি।" মুচকি হেসে সে বলল, "সে তো আমিও।" অনন্যোপায় হয়ে চার্লি তখন উঠে দাঁড়ালেন। দাঁড়িয়ে হাসলেন একবার। সে-হাসি বিশ্ববিখ্যাত; পর্দার গায়ে সে-হাসি আপনারা অনেকবার দেখেছেন। তারপর এক পা পিছনে তুলে দিয়ে তাঁর সেই অপরূপ ভঙ্গীতে হেঁটেও বেড়ালেন কিছুক্ষণ। ভেবেছিলেন, এবারে অন্তত লোকটা তাকে বিশ্বাস করবে। করল না। সেয়ানা হেসে চার্লিকে সে বলল, "অন্তত হাজার জন ও-ভাবে হাসতে পারে, অন্তত দশ হাজার জন ও-ভাবে হাঁটতে পারে। এখানে ও-সব ধাপ্পাবাজি চলবে না।" চার্লির চারপাশে ততক্ষণে লোক জমতে শুরু করেছে। সবাই ধরে নিয়েছে, তিনি একজন ধাপ্পাবাজ। দেখতে-না-দেখতে ঠাট্টা টিটকিরি শুরু হয়ে গেল। একটু বাদেই এক কনস্টেবল এসে উপস্থিত। সব শুনে চার্লির কাঁধে হাত রেখে সে বলল, "ঢের হয়েছে বাপু, আর চালাকি করে কোনও লাভ নেই। এখন এখান থেকে সরে পড় তো।" চার্লির ততক্ষণে মোহভঙ্গ হয়েছে। আর কথা না বাড়িয়ে ট্যাক্সি ডেকে তিনি হোটেলে ফিরে এলেন।

টোকিওর এক জাপানী চা-চক্রে। চার্লি আর সীর্ডান, দুজনের পরনেই কিমোনো

ডোমিনিয়ন থীয়েটরে "সীটিলাইট্স"-এর সেদিন উদ্বোধন-অনুষ্ঠান। স্বয়ং চার্লি সেখানে উপস্থিত থাকবেন। চার্লি জানতেন, বিকেল থেকেই রাস্তায় লোক জমতে আরম্ভ হবে, তাঁকে দেখতে আসবে সবাই। একবার যদি ভিড়ের মধ্যে গিয়ে আটকে পড়েন, সহজে তিনি ছাড়া পাবেন না। সুতরাং তিনি করলেন কি, কাউকে কিছু না জানিয়ে, শো আরম্ভ হবার অনেক আগে বিকেল তিনটে নাগাদ সিনেমা-হলে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। সন্ধ্যা নাগাদ ভিড় জমতে আরম্ভ হল। যতদূর দৃষ্টি যায়, মানুষ আর মানুষ। কাতারে কাতারে তারা দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তা আটকে গিয়ে, যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে সে-এক ভয়াবহ অবস্থা। তার উপরে বৃষ্টি। বৃষ্টির মধ্যেই সবাই অপেক্ষা করছে। চার্লি আসবেন, তাঁকে দেখে তবে সবাই বাড়ি যাবে। তার আগে কেউ স্থান-ত্যাগ করবে না। তারা তো আর জানে না যে, তাদের ফাঁকি দিয়ে অনেক আগেই

চার্লি ভিতরে ঢুকে পড়েছেন। লাউড-স্পীকারে সে-কথা যখন সবাইকে জানিয়ে দেওয়া হল, তখনও কেউ নড়তে চায় না।

সিনেমা-হলের মধ্যে বসেই আহার পর্ব সমাধা করলেন, পোশাক পালটে নিলেন, তারপর—বই শুরু হবার খানিক বাদে—নিঃশব্দে এক সময় বার্নার্ড শ লেডি অ্যাস্টরের মাঝখানে এসে জায়গা নিলেন চার্লি। আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি সেদিন উপস্থিত ছিলেন। বই দেখে দর্শকেরা তো অভিভূত। হাসির বই দেখতে এসেছিলেন তাঁরা, "সীটি লাইটস" দেখে তাঁরা অশ্রু সংবরণ করতে পারেন নি। বই শেষ হবার পর সমস্বরে তাঁরা অনুরোধ জানালেন, চার্লিকে স্বয়ং এসে তাঁদের সামনে একবার দাঁড়াতে হবে, সশরীরে তাঁকে না দেখে তাঁরা বাড়ি ফিরবেন না। রঙ্গমঞ্চে এসে দাঁড়ালেন চার্লি। সেই বিরাট প্রেক্ষাগৃহের সামনে তাঁকে কী ছোটই যে দেখাচ্ছিল।

ডোমিনিয়ন থীয়েটর থেকে কার্লটন হোটেল। চার্লির সম্মানার্থে সেখানে এক ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে। থীয়েটরের খিড়কির দরজা দিয়ে গুটিগুটি বেরিয়ে এলেন চার্লি, অপেক্ষমান জনতার চোখে ধুলো দিয়ে কার্লটন হোটেলে গিয়ে পোঁছলেন। উইনস্টন চার্চিল এবং আরও অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি তাঁর জন্য সেখানে অপেক্ষা করছিলেন। চার্চিল সেদিন সুন্দর একটি বক্তৃতা দিলেন। আহারের পর নৃত্যানুষ্ঠান। চার্লির ট্যাঙ্গো নাচ দেখে মুগ্ধ হলেন সবাই। হাততালি আর থামতে চায় না।

একাধিক সুন্দরী মেয়ে সে-রাত্রে তাঁর নৃত্যসঙ্গিনী হয়েছিলেন। শুধু সে-রাত্রে কেন, তারপর বহু রাত্রেই। খবরের কাগজে এ-নিয়ে তখন অনেক গবেষণা হয়েছিল। নৃত্যসঙ্গিনীদের মধ্যে কাকে তিনি তাঁর তৃতীয় পত্নী হিসেবে গ্রহণ করবেন, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনার আর অন্ত ছিল না।

লণ্ডন থেকে বার্লিন। আগের বারে বার্লিনে তাঁকে তেমন কিছু অভ্যর্থনা জানান হয়নি, এ-যাত্রায় সে-লোকসান তাঁকে সুদে-আসলে পুষিয়ে দেওয়া হল। দশ বছরের ব্যবধানে অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে সেখানে, চার্লির সঙ্গে বার্লিনবাসীর অপরিচয়ের ব্যবধান ঘুচে গিয়েছে। কিন্তু, কয়েক মাস বাদেই, হিটলারের হাতে রাষ্ট্রক্ষমতা আসবার পর জার্মানীতে তাঁর সমস্ত ছবির উপরে আবার নিষেধাজ্ঞা জারি হল। হিটলার এবং চার্লির আকৃতিগত সাদৃশ্যই তার কারণ। এই সাদৃশ্যকে পরে তিনি তাঁর "দী গ্রেট ডিক্টেটর" বইয়ে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

বার্লিন থেকে ভীয়েনা, ভীয়েনা থেকে ভীনিস, ভীনিস থেকে ব্রাসেল্স, ব্রাসেল্স থেকে প্যারিস। ফরাসী প্রধান-মন্ত্রী ম' ব্রাঁয়া সেখানে তাঁকে নতুন একটি উপাধিতে ভূষিত করলেন, অফিসার অব দী লীজিয়ন অব অনার। প্যারিসে থাকতে ডীউক অব ওয়েস্টমীনস্টারের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল, দু জনে মিলে নর্মাণ্ডিতে গিয়ে কটা দিন শিকার করে কাটিয়ে দিলেন। এ-সব ব্যাপারে চার্লির যে খুব রুচি ছিল তা নয়। শিকার থেকে ফিরে এসেই দিন কয়েকের জন্য তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ-যাত্রায় বীয়ারিৎসে প্রিন্স অব ওয়েল্সের সঙ্গেও আলাপ হল চার্লির। দিনকয়েক বাদে দক্ষিণ ফ্রান্সে গেলেন। সীডনি তখন নাইসে এসে বসবাস করছেন। দু ভাইয়ের সেখানে মিলন হল। দিন কয়েক সমুদ্রের ধারে ঘুরে বেড়িয়ে সীডনিকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন সেণ্ট মরিৎসে (সুইজারল্যাণ্ডের প্রাকৃতিক দৃশ্য আর মনোরম পরিবেশ খুবই ভাল লেগেছিল চার্লির। বছর কয়েক বাদে অ্যামেরিকা থেকে বিদায় নিয়ে এই সুইজারল্যাণ্ডে এসেই তিনি ঘর বেঁধেছিলেন)। সুইজারল্যাণ্ড থেকে রোম, রোম থেকে নেপল্স। নেপল্সে গিয়ে জাহাজে উঠলেন। বেরোলেন বিশ্ব-ভ্রমণে।

জীবনের এই কটি মাসের কথা, এই কটি মাসের প্রতিটি মুহূর্তের কথা, চার্লির মনে আছে। প্রতিটি মুহূর্তই তাঁকে আনন্দ দিয়েছে, প্রতিটি মুহূর্তই তাঁর চোখের সামনে যেন এক নতুন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছে। জনতা থেকে এত দূরে, তবু এত কাছে। কয়েকটা দিনের নিঃসঙ্গতা, তার পরেই নতুন কোনও দেশ, নতুন কোনও বন্দর। এ অন্তহীন নির্জনতার মহাপারাবারে যে যেন কয়েকটি আশ্রয় ছড়িয়ে দিয়ে গিয়েছে।

মিশর, সিংহল, জাভা, টোকিও যেখানেই যান, বিপুল জনতা তাঁকে স্বাগত অভ্যর্থনা জানাতে এগিয়ে আসে, জাহাজঘাটায় ভিড় লেগে যায়। হোটেল পর্যন্ত ধাওয়া করে সবাই; ছবিতে যাঁকে দেখেছে, স্বচক্ষে স্বশরীরে তাঁকে তারা দেখবে।

টোকিওতে তাঁর হোটেলের বাইরে এমন ভিড় জমে গেল যে, তিনি আর রাস্তায় বেরোতে পারেন না। ঘণ্টা কয়েক নিজেদের ঘরের মধ্যেই আটকা রইলেন তাঁরা। চার্লি আর সীডনি। জানালা দিয়ে এক-একবার উঁকি দিয়ে দেখেন, ভিড় একটু কমেছে কিনা। কমবে কি, ক্রমেই আরও বেড়ে চলেছে। শেষপর্যন্ত নিরুপায় হয়ে তাঁরা করলেন কি, দালানের পিছন দিকটার রেন-পাইপ বেয়ে নীচে নেমে এলেন। তারপর খিড়কির দরজা দিয়ে উধাও। ফ্রেড কার্নোর দলে থাকতে লাফঝাঁপে তাঁরা এতই রপ্ত হয়েছিলেন, যে, রেন-পাইপ বেয়ে ওঠানামা করতে তাঁদের বিন্দুমাত্র কষ্ট হত না।

এই টোকিওতেই চার্লিকে হত্যা করার জন্য মারাত্মক রকমের একটা ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। অল্পের জন্য তিনি রক্ষা পেয়ে যান। জাপানে গিয়ে সেখানকার প্রধান-মন্ত্রী ইনুকাইয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার কথা ছিল চার্লির। সাক্ষাৎকারের দিন দুয়েক আগে সন্ত্রাসবাদী ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির জনকয়েক সদস্য গিয়ে প্রধান-মন্ত্রীকে হত্যা করে। চার্লিকেও তাঁরা হত্যা করবে বলে স্থির করেছিল; ভেবে-ছিল, চার্লি অ্যামেরিকান। চার্লিকে হত্যা করে অ্যামেরিকার সঙ্গে একটা যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়াই ছিল তাদের উদ্দেশ্য। সৌভাগ্যক্রমে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা ফাঁস হয়ে যায়। ব্ল্যাক ড্রাগন সোসাইটির জন-কয়েক সদস্য পুলিসের হাতে ধরাও পড়ল। আদালতে তারা তাদের অপরাধের কথা অস্বীকার করেনি। (ক্রমশ)

চক্রদত্ত

আজকাল সভ্যযুগের মানুষের ইতিহাসের পিছনে আরও কয়েকটি পৃষ্ঠা আছে। সেই আদিম যুগের মানুষের সম্বন্ধে আজকার সভ্য যুগের মানুষের কৌতূহলের সীমা নেই। আজ মানুষের মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে, ১৫ হাজার বছর আগে য়ুরোপ যখন সম্পূর্ণভাবে বরফে ঢেকে গিয়েছিল তখন য়ুরোপের মানুষ ও সভ্যতা কেমন করে রক্ষা পেয়েছিল। স্পেনের জনৈক পুরোহিত ফাদার জিসার কারবালো এই প্রশ্নের সমাধান বার করেছেন। ফাদার কারবালোর বয়স ৭৬ বৎসর। তিনি প্রায় তাঁর সমস্ত জীবনটাই স্পেনের উত্তর উপকূলের সান্টানডার নামক জায়গায় কাটিয়েছেন। সান্টানডার থেকে প্রায় ত্রিশ মাইল দূরে তিনি অনেকগুলি গুহা ও সুড়ঙ্গ আবিষ্কার করেছেন এবং এর মধ্যে থেকে তিনি তীরের ফলা, হাতের তৈরী নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি পেয়েছেন। এই গুহার দেওয়ালে সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা আছে দেখেছেন। এই সব জিনিসপত্র দেখে-শুনে ফাদার কারবালোর ধারণা হয়েছে যে, এই স্থানটি অতীতের সেই বরফের যুগের একটি শহর। এক একটি সুড়ঙ্গ, ভূমির নীচে প্রায় এক মাইল পর্যন্ত নেমে গেছে। কারবালো বলেন যে প্রায় তের হাজার বৎসর আগে সমস্ত য়ুরোপ যখন বরফে ঢেকে গিয়েছিল তখন একদল লোক ঘুরতে ঘুরতে এই গুহায় এসে আশ্রয় নেয়। এর মধ্যে স্ত্রীলোকেরা ঘরসংসার দেখা-শোনা এবং অস্ত্র শস্ত্র তৈরী করতো এবং পুরুষেরা সেইসব অস্ত্র নিয়ে শিকার সন্ধানে বাইরে ঘুরতো। এইভাবে ক্রমশ বহু ভ্রাম্যমান দল এসে এই গুহা ও সুড়ঙ্গে জমা হতে থাকে। ফলে এখানে বহুলোকের সমাবেশ হলো। তারপর রাজা নির্বাচন করে নিয়ে রীতিমত রাজত্ব গঠিত হলো। একশো বছরেরও বেশী দিন আগে এই গুহাটি প্রথম আবিষ্কৃত হয়েছিল। তারপর ১৮৮০ সাল পর্যন্ত এটির কথা লোকে ভুলে যায়। ১৯৫২ সালে ফাদার কারবালো সহসা এটির অস্তিত্ব জানতে পারেন। এইস্থানে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে হঠাৎ পুরাকালের রাজসিংহাসনে তাঁর ধাক্কা লাগে তখনই তিনি এই সব গুহা সম্বন্ধে সচেতন হন এবং এদের সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করতে থাকেন।

*

চোখের দৃষ্টিশক্তি কম হওয়ার জন্য চোখে অনেক সময় চশমা লাগাতে হয়।

ফ্যাশনেব্‌ল কানে শোনার যন্ত্র

ক্রমে চশমা লাগানটা যেন একটি ফ্যাশনে দাঁড়াল। কত রকমের শৌখিন চশমা লোকে ব্যবহার করে তার ইয়ত্তা নেই। শ্রবণশক্তি কম হওয়ার জন্যও অনেক সময় কানে যন্ত্র লাগাতে হয় কিন্তু কানের যন্ত্রটি এখনও ফ্যাশনের বস্তু বলে পরিচিত হয়নি। উপরন্তু যন্ত্রটিকে যতদূর সম্ভব গোপন রাখারই চেষ্টা করা হয়। আজকাল ফ্যাশন-দুরস্ত কানের যন্ত্র লাগাবারও ব্যবস্থা হয়েছে। চশমার ফ্রেমের সঙ্গে কানের যন্ত্রটি সংলগ্ন থাকে। বস্তুত ফ্রেমের ডাঁটি দুটি বেশ চওড়া করে এমনভাবে তৈরী করা হয় যে ঐ ডাঁটি দুটিই কানের যন্ত্রের কাজ করে। সুতরাং যাঁরা চশমা ও কানে শোনার যন্ত্র দুইই ব্যবহার করেন তাঁদের কানের জন্য আলাদা যন্ত্র ব্যবহার করতে হয় না। চশমার ডাঁটির মধ্যেই মাইক্রোফোন ব্যাটারি ইত্যাদি ভরা থাকে।

*

খাদ্যবস্তু সংরক্ষণের বহুবিধ উপায় প্রচলিত আছে। এক এক ধরনের বস্তু এক একটি উপায়ে সংরক্ষিত হয়। এ পর্যন্ত টোম্যাটো জেলী, জ্যাম করে রাখা বা চিনির রসে জড়িয়ে রাখার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আজকাল টোম্যাটো পাউডার করে রাখার ব্যবস্থা হচ্ছে। একটি বায়ুশূন্য আধারের মধ্যে সমস্ত টোম্যাটোগুলি রেখে পাম্প করে সমস্ত রস নিংড়ে বার করে নেওয়া হয়। এর পর যে তলতলে টোম্যাটো পড়ে থাকে সেগুলোর সঙ্গে শুকনো পাউডার মিশিয়ে আরও শুকিয়ে নেওয়া হয়। তার পর সেগুলোকে গুঁড়ো করে পাউডার তৈরী হয়। এদিকে রসটাকেও শুকিয়ে পাউডার করে ফেলা হয়। এই টোম্যাটো পাউডার পরে ইচ্ছামত জলে মিশিয়ে টোম্যাটোর জুস্‌ তৈরী করা যায়।

*

বৃষ্টি পড়লেই দৌড়াদৌড়ি করে জানালা দরজা বন্ধ করার ধুম পড়ে যায়। খুব ঝেঁকে হঠাৎ বৃষ্টি এলে সব দরজা জানালা এক সঙ্গে বন্ধ করা যায় না, ফলে দৌড়াদৌড়ি করা সত্ত্বেও ঘরদোর কিছু কিছু ভিজে যায়। নতুন ধরনের 'ওয়েদার-ভেন ভেনিশিয়ান' জানালাগুলিতে এ ধরনের অসুবিধা ভোগ করতে হয় না। জানালাগুলো রড্‌ দিয়ে তৈরী আর এই রডগুলোর মধ্যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ চালিত করা হয়। এমনভাবে ব্যবস্থা করা থাকে যে একবিন্দু বৃষ্টি এই রডের ওপর পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যুৎ প্রবাহ বন্ধ হয়ে যায় ফলে জানাগুলি বন্ধ হয়ে যায়। আবার বৃষ্টিপড়া বন্ধ হলে জল-বিন্দু শুকিয়ে গেলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হতে থাকে এবং জানালাগুলি খুলে যায়।

ইউরেনিয়াম

মহাশয়,

গত ৮ই মাঘ সংখ্যায় শ্রীকার্তিকচন্দ্র চক্রবর্তীর ইউরেনিয়াম সম্পর্কিত আলোচনাটির প্রতি আমাদের বিজ্ঞান কলেজের অনেকের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। বরোদায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে ডাঃ হোমী ভাবা আমাদের দেশে পরমাণু-শক্তি উৎপাদন সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে যে কথা বলেছিলেন বলে কার্তিকবাবু উদ্ধৃত করেছেন, তাতে কিছু অসঙ্গতি আছে। আমাদের বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডাঃ মণীন্দ্রমোহন চক্রবর্তীর (যিনি বরোদায় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন এবং ডাঃ ভাবার বক্তৃতা স্বকর্ণে শুনেছিলেন) সঙ্গে এই বিষয় আলোচনা করে জেনেছি, 'ইউরেনিয়াম আমাদের দেশে প্রচুর পাওয়া যায়' এমন কথা ডাঃ ভাবা বলেন নি। ডাঃ ভাবা যা বলেছিলেন তার মর্মার্থ হলো—আমাদের দেশে ইউরেনিয়ামের দু' একটি আকর আবিষ্কৃত হয়েছে, কিন্তু তাতে ইউরেনিয়ামের পরিমাণ অতি সামান্য। আমাদের দেশে যা প্রচুর পাওয়া যায়, তা হচ্ছে মোনাজাইট বালু যার মাঝে বর্তমান থাকে পরমাণুশক্তি গবেষণার অপর একটি উপাদান থোরিয়াম।

অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর প্রদত্ত ভাষণের উদ্ধৃত অংশটিতে কয়েকটি কথা বাদ পড়েছে। অধ্যাপক বসু যা বলেছিলেন, তা হলো 'আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইউরেনিয়ামের কোন বৃহৎ আকর এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি' (২ পৌষ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকা দ্রষ্টব্য)। অধ্যাপক বসুর এই উক্তির যাথার্থ্য ভারত সরকারের সাম্প্রতিক একটি ঘোষণার দ্বারাই প্রমাণিত হয়। ভারত সরকার সম্প্রতি একটি ঘোষণায় বলেছেন, উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইউরেনিয়ম আকরের সন্ধানকারী বা সংগ্রাহককে বিশেষ পুরস্কার প্রদান করা হবে। আমাদের দেশে যদি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর ইউরেনিয়াম পাওয়া যেত, এরকম ঘোষণার তা হলে কোন প্রয়োজন হত না। —রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতা—৬।

আলোচনা

আত্মস্মৃতি

মহাশয়,

গত ১লা মাঘের দেশ-এর পুস্তক-পরিচয় বিভাগে শ্রীসজনীকান্ত দাসের 'আত্মস্মৃতি'র আলোচনা প্রসঙ্গে নি, ম, বর্তমান বাঙলা সাহিত্যে আত্মজীবনীর যে-প্লাবনের উল্লেখ করেছেন, সে-সম্পর্কে আমি নি, ম-র সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত। আমিও নি, ম-র মতো 'আত্মজীবনীকে সাহিত্যকর্মের দূরূহতম শাখার অন্যতম বলে মনে করি।'

আমিও বর্তমান আত্মজীবনীর হাটে অক্ষম রচনার প্রাচুর্যে ব্যথিত। আত্মজীবনী বাঙলা সাহিত্যে নতুন সংযোজন কিছু নয়। অতীতে সুখপাঠ্য অনেক আত্মজীবনী রচিত হয়েছে, বাঙলা সাহিত্যের ভাণ্ডার পুষ্ট হয়েছে। কিন্তু বর্তমানে আত্মজীবনীর এই প্লাবন কেন?—এই প্রশ্ন স্বভাবতই পাঠকচিত্তকে ভাবিয়ে তোলে। বর্তমান নীরস বাঙালী জীবনে অতীত প্রাণপ্রাচুর্যের স্মৃতি-রোমন্থনের যুক্তিই এর একমাত্র সাফাই হয়তো নয়। নানা সমস্যায় সংকুল বাঙালীর বর্তমান জীবনে সুখ বা স্বস্তির অভাব হয়তো আছে; কিন্তু তাই বলে কি স্বীকার করতে হবে বাঙালী সাহিত্যিক আজ রচনার কোন উপাদান খুঁজে পাচ্ছেন না? আর, পাচ্ছেন না বলেই আত্মজীবনী রচনায় আত্মনিয়োগ করছেন? যে-কোনো সাহিত্যপাঠক স্বীকার করতে বাধ্য, আজ বাঙলা সাহিত্যে আগেকার চেয়ে অনেক বেশি বৈচিত্র্য এসেছে। তবু কেন আত্মজীবনী রচনার প্রয়াস দেখতে পাই প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের মধ্যে? এ কি তাঁদের সাহিত্য-জীবনের সালতামামি?

হয়তো কেউ-কেউ বলবেন, আত্মজীবনী রচনা অন্যায় কর্ম নয়। সাহিত্যিকের আত্মজীবনীতে আমরা তাঁর রচনার উৎসের প্রেরণার সন্ধান পেতে পারি। পেতে পারি সমকালীন ঘটনাবলীর প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয়। এক কথায়, সাহিত্যিকের সাহিত্যকর্মের পশ্চাদ্‌ভূমি হিসেবে তাঁর আত্মজীবনীতে আমাদের আগ্রহ অনিবার্য। এ-সমস্ত যুক্তি স্বীকার করেও বলা যায়, সাহিত্যিক যতক্ষণ পর্যন্ত সাহিত্যসৃষ্টি করছেন, ততক্ষণ পর্যন্তই সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর মূল্য। আত্মকথা বলার আমেজে তাঁর রচনা যদি সাহিত্যিক মান হারায় তবুও কি সে-আত্মজীবনী অবশ্যপাঠ্য? সাহিত্যিকের সন্তান-সংখ্যা জেনে আমার কী হবে? সাহিত্যিকের শরীরে কোন্ অংশে কখন ফোড়া হয়েছিল—এ-তথ্যে পাঠক কীভাবে উপকৃত হবেন? কোনো সাময়িকপত্রের প্রথম সংখ্যার বিজ্ঞাপনদাতাদের নাম জেনে পাঠকের তৃষ্ণার তৃপ্তি কী করে হতে পারে? বর্তমান আত্মজীবনীর প্লাবনে এরকম অনেক আবর্জনা ভেসে আসছে।

এ-আলোচনার আরো একটি দিক আছে। প্রকাশকদের এক চোখ থাকে পাঠকের রুচির দিকে, অন্য চোখ লেখকের দিকে। এতো-এতো আত্মজীবনী আজকাল প্রকাশিত হচ্ছে। এ থেকে অনুমান করা অন্যায় নয় যে, আত্মজীবনীর আগ্রহী পাঠকেরও কিছু অপ্রতুলতা নেই। পাঠক হিসেবে আমাদেরও তাই আত্ম-সমীক্ষা প্রয়োজন। আত্মজীবনীতে আমাদের কেন এত আগ্রহ? একটা কারণ হতে পারে, শিবনাথ-রবীন্দ্রনাথ-অবনীন্দ্রনাথ-আদি সাহিত্য-শিল্পীদের আত্মজীবনী উপভোগের পর পাঠকের লোভ বেড়েছে। এবং তা অসঙ্গত নয়। আর পাঠকের এই প্রবণতাই আত্মজীবনীর বর্তমান বান ডেকে এনেছে। পাঠকের এই দুর্বলতার কারণও কি বর্তমান নীরস জীবন? কৃতীর কৃতিতে আমাদের যত আগ্রহ, তার বেশি না হলেও সমান আগ্রহ স্বয়ং কৃতীতে, ব্যক্তি কৃতীকে ঘিরে। অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দর্শনভিক্ষুদের ওপর পুলিসের লাঠি চালাতে হয়। খেলোয়াড়দের অটোগ্রাফ-শিকারীদের ভিড়ের কথাও অবাস্তব নয়। এ প্রসঙ্গে আমার নিজের একটি ছোট্ট অভিজ্ঞতা নিবেদন করার লোভ সংবরণ করতে পারলুম না। রেডিও সঙ্গীত সম্মেলনের এক অধিবেশনে দিল্লীর সাপ্রু-হাউসে এক ভদ্রমহিলা সুনিপুণভাবে সরোদ বাজালেন। শুনতে পেলুম, আমার পার্শ্ববর্তী এক ভদ্রলোক বাজনার খুব তারিফ করলেন। তারপর শুনলুম, তাঁর সঙ্গিনী বলছেন, 'জানো, ও খুব বড়লোকের মেয়ে'। এ-হেন কৌতূহলের কারণ কী যদি কেউ অভিযোগ করেন, এ-মনোবৃত্তি রিক্ত মনের হীনমন্যতার পরিচায়ক, তবে কি আমরা তাকে হেসে উড়িয়ে দেব?

সাহিত্যিকদের কাছে আমাদের নিবেদন, সাহিত্যপদবাচ্য আত্মজীবনী রচনা করুন। আপনাদের জীবনদর্শনের কথা বলুন, দেশকে সমাজকে কী চোখে দেখেছেন সে-কথা বলুন।

পাঠকদের কাছে আমাদের অনুরোধ, অহেতুক কৌতূহল ত্যাগ করুন। শিল্পের মধ্যে শিল্পীকে পেতে চেষ্টা করুন। কৃতীর প্রতি নয়, কৃতির প্রতি মনোনিবেশ করুন। ইতি—জ্ঞানেশ পত্রনবীশ, জঙ্গীপুর কলেজ, মুর্শিদাবাদ।

বারো ঘর একটি উঠোন

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী

৩৭

সন্ধ্যা হব হব করছে। রমেশের চায়ের দোকানে এইমাত্র আলো জ্বালা হয়েছে। রমেশ নিজেই চিম্‌নিটা ঘষে মুছে পরিষ্কার ক'রে এবং আরো খানিকটা তেল লণ্ঠনে পুরে সলতে কেটে পরে তাতে আগুন ধরিয়ে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে এসে শিবনাথের পাশে বসল। শিবনাথের সামনে টেবিলের ওপর একটা শূন্য চায়ের বাটি। চা শেষ ক'রে সে সিগারেট ধরিয়েছে। শিবনাথ চিন্তান্বিত, চেহারা দেখে বেশ বোঝা যায়। এইমাত্র বাইরের একটি লোক বসে চা খাচ্ছিল। এবং সম্ভবত বাইরের লোকের সামনে কথা বলতে ইতস্তত বোধ করছিল বলে লোকটি বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রমেশ শিবনাথ দু'জনই চুপ ক'রে ছিল। হাত ধুয়ে রমেশ এসে পাশে বসতে শিবনাথ বলল, 'ইচ্ছা ছিল শালার মাথায় চাটি বসিয়ে দিই। স্ত্রী নিয়ে ঠাট্টা ইয়ার্কি আমি সহ্য করতে পারি না।'

'ওর মাথার ঠিক নেই বলছি তো। কি বলছিল আপনাকে?' রমেশ বিড়ি ধরায়।

'আমার স্ত্রীর সিনেমায় নামার ইচ্ছা আছে কিনা। তবে তার ফ্রেন্ড চারু রায়কে বলে এখুনি কণ্ট্রাক্ট সই করিয়ে দেয়।'

শিবনাথের কথা শুনে রমেশ অল্প শব্দ করে হো-হো করে হাসল। 'রসিক বটে। কে গুপ্ত পাগল হলে কি হবে এমনিতে রসজ্ঞান টনটনে।'

'একেবারে গলায় ধাক্কা দিয়ে আমি কাঁটাঝোপের ওপর ফেলে দিয়েছিলাম, এত রাগ হয়েছিল লোফারটার প্রস্তাব শুনে।'

'বেশ করেছেন। জুতো মারবেন শালাদের। যতসব বেকার বাউণ্ডুলে। ঘাটের মড়ারা এখানে এসে উঠেছে, বাড়িভাড়া দিচ্ছে না, দোকানে বাকি রাখছে, এদিকে কিছু বলতে গেলে বাবুদের অপমান।'

শিবনাথ চুপ করে রইল।

রমেশ আরো কিছুক্ষণ বিড়ি টেনে পরে শিবনাথের কানের কাছে মুখ নামিয়ে বলল, 'এটা কে গুপ্তর ওই শালা বন্ধু সিনেমার লোকটার উস্কানি। বুঝলেন না। কোনরকমে শুনে ফেলেছে আপনি বেকার। তারপর মাছির মত এসে জুটেছে।'

'আমার স্ত্রী এখনো সার্ভিসে আছেন এটা ভদ্রলোকের বোঝা উচিত।'

'সিনেমার লোক কি আর ভদ্রলোক হয় মশাই, টাকার গরমে সব শালা পাজী বদমায়েস দমবাজ বনে যায়।'

'না না চারুবাবুর দোষ নেই। সব বদমায়েসী কে গুপ্তর আমি টের পেয়েছি। এসব বলে খাতির দেখিয়ে আমার কাছে পয়সা ধার চেয়েছিল। ফলে উল্টা ফল হ'ল।'

'একটি পয়সাও ধার দেবেন না।' রমেশ চোখ বুজল। বিড়িতে শেষ টান দিয়ে মাথা নেড়ে বলল, 'সেই জন্যই বলছিলাম, আপনি চান্স নষ্ট করবেন না। অর্থাৎ বেশিদিন ইয়ে থাকাটা পারিবারিক শান্তির দিক থেকেও ভাল না। আপনি ভাববেন না যে, কালকে রাতে আপনারা স্বামী-স্ত্রীতে ঝগড়া করেছেন শুনে আজ আমি একথা বলছি। আমার সঙ্গে মল্লিকার রোজ ঝগড়া খিটিমিটি বেধেই আছে। পারিজাত তার স্ত্রীর সঙ্গে কেমন মাথা ফাটাফাটি করে সেদিন টের পেয়ে এসেছেন। সেসব কিছু না। আসল হ'ল এই, বুঝেছেন। এই থাকলে স্ত্রী কোন-মতেই পুরুষের অবশ থাকে না।' রমেশ দু'আঙুলে দিয়ে টাকা বাজাবার ইঙ্গিত করল।

'তা তো বটেই।' শিবনাথ গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'আপনি চলে যান। আপনাকে টুই-শনি দিতে যদি পারিজাতের স্ত্রী আপত্তিও করে আপনাকে অন্যভাবে সুবিধা করে দেবে সে। আপনি আজ তার একটু উপকার করতে পারলে এ তল্লাটে কোনদিন আপনার মার নেই। চাকরি করুন চাই না করুন।'

শিবনাথ আবার চিন্তান্বিত হল।

অর্থাৎ এই ব্যাপার নিয়েই সে বিকেলে রমেশের সঙ্গে পরামর্শ করতে ছুটে এসেছে। পারিজাত তাকে ডেকেছে। ব্যাপারটা ঘটেছে অবশ্য রুচির জন্যে। সকালে ও বলাইর মেয়ে ময়নাকে নিয়ে স্কুলে যায়। কিন্তু রাস্তায় শেয়ালদা নেমেই ময়না দু'তিনটে ছেলের সঙ্গে রুনুকে দেখতে হাসপাতালে চলে যায়। ময়না হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফেরেনি। কোথায় গেছে, কেউ বলতে পারে না। সম্ভবত সেই তিনটি বখাটে ছেলেই ওকে কোথায় আবার নিয়ে গেছে। রুচি কেবল মঞ্জুকে নিয়ে ঘরে ফিরেছে। বলাইর কাছে ঘটনাটা বলতেই সে তিন-লাফ দিয়ে বারোঘরের মস্ত উঠোন পার হয়ে শিবনাথের ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকে রুচিকে এবং সেই সঙ্গে শিবনাথকেও অপমান করতে চেয়েছিল। অবশ্য তা আর করতে পারেনি কেননা, তার আগেই শিবনাথ দরজার পাল্লা দুটো বন্ধ করে দেয়। বলাই রাগে ফুলতে ফুলতে এবং শিবনাথ ও তার স্ত্রীকে যাচ্ছে তা গালিগালাজ করতে করতে ছুটে বাড়ি থেকে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেছে। ঠিক তখন পারিজাতের সরকার মদন ঘোষ গিয়ে শিবনাথকে খবর দেয়। বাবু তাকে এখনি যেতে ডাকছেন।

'কি ব্যাপার?'

মদন ঘোষ কিছু বলতে পারেনি। কেবল কে গুপ্তর ঘরের দিকে একবার আড়চোখে তাকিয়ে চুপ করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেছে।

ব্যাপারটা কে গুপ্তর ছেলে সম্পর্কে শিবনাথের বুঝতে একটুও কণ্ট হয়নি। এবং তাকে এসব কিছুতেই পেত না যদি না আজ হাসপাতালে রুনুর সঙ্গে ময়নার দেখা হওয়ার ব্যাপারে রুচিও অংশত জড়িত না থাকত।

মূর্খ বলাইর ব্যবহারে রুচি ভয় পেয়ে গেছে। যদিও এ-ব্যাপারে ও কিছুই না। এমন সময় মদন ঘোষকে পাঠিয়ে পারিজাতের ডাক। এখনই দেখা করা যুক্তি-সংগত কিনা শিবনাথ প্রশ্ন করতে গম্ভীর মুখ করে রমেশ বলেছে, 'না এ-ব্যাপারে যে আপনার স্ত্রী কিছুই না পারিজাত একজনের কাছে আগেই খবর পেয়েছে। স্ত্রী সম্পর্কে আপনার ভাবনা নেই।'

'কে লোকটা। কার কাছে খবর পেল?'

'বনমালী।'

'ও তখন কি শেয়ালদায় ছিল?'

রমেশ মাথা নাড়ল।

'দোকানের মাল কিনে ফিরছিল বনমালী।'

শিবনাথ অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়।

ময়না ও রুনুর ব্যাপার নিয়ে বলাই তার স্ত্রীকে অপমান করেছে এবং কাল তাদের একটা সামান্য কাঁচের গ্লাশ ভাঙ্গা নিয়ে কে গুপ্ত শিবনাথের স্ত্রী সম্পর্কে বিশ্রী কথাবার্তা বলেছেন অবশ্য তার দরুণ সে কে গুপ্তকে কিভাবে গলাধাক্কা দিয়ে মাটিতে ফেলে দিয়েছিল ঘটনাটাও শিবনাথকে পুরোপুরি বলতে হ'ল।

সেই সূত্রেই রমেশ টাকাপয়সা, সংগতি, সহায় সম্বল, নিজের খুঁটির জোর রাখা নিয়ে এতক্ষণ শিবনাথকে বোঝাচ্ছিল।

'ধরুন পারিজাত যদি কোনো ব্যাপারে আপনার একটু সাহায্য চায় আমি বলব নিশ্চয় আপনার এগিয়ে যাওয়া উচিত।'

কিসের সাহায্য, কোন্ বিষয়ে শিবনাথ পরিস্কার বুঝতে না পেরেও খুব বেশি অস্বস্তি বোধ করল না। যেন কিছুটা আন্দাজ করেই চুপ করে রমেশের মুখের দিকে তাকিয়ে সে আরো কি বলে অপেক্ষা করে।

'আপনি কি পারিজাতের ওখানে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ,' রমেশ বলল, 'এই তো ফিরলাম। আপনি যান। আমাকেও বলছিল আপনার সঙ্গে দেখা হলেই পাঠিয়ে দিতে।'

শিবনাথ চুপ করে বাইরে অন্ধকারের দিকে চেয়ে রইল। রমেশ বলল, 'মান ইজ্জত, সম্ভ্রম সুখ সব থাকে পকেটে দুটি পয়সা থাকলে। ব্ল্যাক মার্কেট, মিছে কথা। আরে মশাই চারদিকেই যখন ভেজালের বাজার আমার মধ্যেও একটু আধটু ভেজাল রাখতে হবে বৈকি। না হলে বাঁচব কি ক'রে এই দুর্দিনে। চিন্তা করে দেখুন।'

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল। 'তাতো বটেই কে কাকে এখন—' সে থামল।

'সাচ্চা থেকে থেকে অমলটা নিজের স্ত্রীকে বেশ্যা বানাল শুনলেন তো।' রমেশ বলল।

এই গল্প শিবনাথই করেছে একটু আগে রমেশের কাছে। ঘোলপাড়ায় চারু কেমন আদরে আছে। আর এত করেও কে গুপ্ত কিরণের হাতে কেমন গলা ধাক্কা খেল। কারণ বেচারার পয়সা নেই।

'তবে আর কি। সংসারে মানুষের আগে কি দরকার চারদিক দেখে শিখেছেন যখন চান্স এলেই আগে নিজের শক্ত খুঁটি জোরদার করতে কারো দিকে তাকাবেন না এই আমার শেষ পরামর্শ।' হিস হিস করে রমেশ কথা বলছিল। তেমনি হিস হিস শব্দ হচ্ছিল দূরের একটা করাত কলে। তৃপ্তি-নিকেতনের চারদিকে চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে বেবিকে এবং ক্ষিতিশকে আজ একবারও দেখল না শিবনাথ।

রমেশ বলল, 'রাত আটটা সাড়ে আটটা নাগাদ পারিজাত কলকাতা থেকে ফিরবে। আর একটু অপেক্ষা করুন। আর একটু চা খাবেন?

তৃপ্তি-নিকেতন।

তেমনি উর্বশী-হেয়ার-কাটিং সেলুন। সন্ধ্যাবাতি লাগানো হয়েছে। এই মাত্র একটি খদ্দেরের মুখ কামিয়ে ক্ষুর ধুয়ে সাফ্ করে পাঁচু তোয়ালে দিয়ে হাত মুছছিল। যতক্ষণ খদ্দের ছিল আর একটা চেয়ারে উপবিষ্ট বিধু মাস্টার কথা বলছিল না।

হাত মোছা শেষ করে পাঁচু দরজায় এসে সিগারেট ধরাল। পাঁচু বাইরে রাস্তার দিকে চেয়ে সিগারেট টানছে লক্ষ্য করে বিধু মুখ খুলল। একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'না, আমি মন ঠিক ক'রে ফেলেছি। তুমি কালই আরম্ভ করে দাও পাঁচু।'

'আমি লুকিয়ে ছাপিয়ে ব্যবসা করব না। আমি চিটিংবাজ নই। তোমায় বললাম মাস্টার লোক জানাজানি হবে। এখন তুমি নিজে ভেবে দ্যাখ। কারবারে নেমে আমি লোক ঠকাতে রাজী নই।'

'না, আমি ঠিক করেছি।' মাস্টার দাড়ির জঙ্গলে হাত বুলিয়ে বলল, 'নিত্য অভাব সহ্য হয় না পাঁচু,—পেটে খেতে পাই না তো সুনাম ধুয়ে জল খাব নাকি। তুমি আরম্ভ করে দাও। কালই সাইনবোর্ডটা লিখিয়ে ফেল।'

পাঁচু ঘুরে দাঁড়ায়।

কাটা ঠোঁট খুলে হেসে বলে, 'আমায় যখন তুমি মালিশের ব্যবসায় নামতে সাহস দিচ্ছ আমিও তোমার সুবিধাটাই আগে দেখছি। তাই তো বলছি, এই চান্স নষ্ট করো না।'

'না না ঠিক আছে।' মাস্টার ঘাড় নাড়লঃ 'একটা আধলা ধার দেবার ক্ষমতা নেই তো কোন্ হারামজাদাকে আমি তোয়াক্কা করব। আমার পায়া আমাকে শক্ত করতে হবে খেয়ে বাঁচতে হবে।'

পাঁচু বোঝাল, 'দরকার হলে তুমি বারোঘরের আস্তানা গুটিয়ে ফেল। ছেলেমেয়েরা রোজগার আরম্ভ করলে কী দরকার তোমার ওই পচা বস্তিতে পড়ে থাকবার। একটু ভাল বাড়িতে—'

'তুমি?'

'আহা আমার কথা তো হচ্ছে না। আমি শালা কারবার শুরু করে তো কিছু আর রাজা হয়ে যাচ্ছি না। এটা আরম্ভ করছি তোমাদের দশজনের সুবিধার কথা ভেবে। গভর্নমেণ্ট যেমন গাঁয়ে গাঁয়ে কুটির শিল্প খুলে দেশের বেকার কমাবার প্ল্যান করছে। না হলে আমার শালা কি। কারবার খুলে লাখপতি হব না। আমি ওই শালা বিড়িই টানব আর বস্তির ঘরেই থাকব।'

একটু চুপ থেকে মাস্টার হাসল।

'তা আমি জানি। তুমি—তোমার মধ্যে আমি চিরকালই প্লেইন লিভিং এন্ড হাই থিংকিং জিনিসটা লক্ষ্য করে আসছি। রমেশের মতন নিত্যনতুন কুর্তাজামা জুতোমোজা পর না। তবে হ্যাঁ খাওয়া—তোমার ঘরেও খাওয়াটা অনেকদিনই রমেশের ঘরের চেয়ে ভাল হয়। হাবুলা বলছিল কাল আবার কাছিম এনেছিলে। খুব প্রোটিন ফ্যাট্ আছে ওতে। আই লাইক ইট।'

পাঁচু কথা বলল না।

'সেই কয়লাচোর বলাইও আজ আমাকে ঠাট্টা করে। আমার ঘরের হাঁড়ি তিনদিন চালের মুখ দেখছে না। কেবল মাসকলাই।'

পাঁচু চুপ করে সিগারেট টানে।

মাস্টার জীর্ণ ময়লা খুঁট দিয়ে একটা চোখের কোণা মুছল।

'লোকের খাওয়া পরা নিয়ে যারা এভাবে ঠাট্টা করে তারা কতখানি পশু, নরাধম একবার চিন্তা করে দ্যাখো পাঁচু।'

পাঁচু এবারও কিছু বলল না।

'থাকবে না। এসব ভ্যানিটি থাকে না। মানুষের আত্মম্ভরিতা স্ট্যান্ড করতে পারে না, একজন আছেন মাথার ওপর। গড্। শেখর ডাক্তার একদিন আমাকে ইন্সাল্ট করেছিল আজ তার ঘরের দুরবস্থা দ্যাখো।'

'বললাম তো, আর বক্তৃতায় কি হবে। চান্স যখন এসে গেছে এইবেলা কামড়ে ধরো। নাও, বাড়ি যাও আমি দোকান বন্ধ করব।'

হ্যাঁ, তোমার আবার ইয়ের সময় হয়ে পড়ে। না তোমার আর ইতস্তত করতে হবে না। তুমি সাইনবোর্ড টাইনবোর্ড লিখিয়ে ঠিকঠাক করে নাও। আমি রাজী। আমি আজই গিয়ে ওদের বোঝাব। দারিদ্র্যের সংগে আর মিতালী না।' ব'লে বিধু মাস্টার তখনই চেয়ার ছেড়ে ওঠে না। দোকানের বাইরে রাস্তার দিকে তাকিয়ে চুপ করে ভাবে। দূরে করাত-কলের হিস হিস শব্দ হয়। এত রাত্রেও সেই ঢাউস মাছিটা নর্দমা থেকে উঠে এসে বিধু মাস্টারের দাঁড়ির এক জায়গায় চুপ করে বসে আছে। পাঁচু দেরাজ টেনে চাবির গোছা বার করল।

আর সন্ধ্যা ঝুলছে 'সুরমা-লজে'—মিহির ঘোষালের বাড়িতে। তাঁর পরলোকগত স্ত্রীর নামে এ-বাড়ির নামকরণ। মিহিরবাবু কাল বীথিকে বলছিল। না হলে বীথি জানত না সুরমা কে, কি সম্পর্ক ওর এবাড়ির সংগে।

হ্যাঁ, এইমাত্র এখানে সন্ধ্যা নেমেছে। কালি-ঝুলি-মাখা লণ্ঠনের লালচে শিখা,—চারদিকে করাত-কল, সুরকি-কলের হিস্হাস ভুস্ভাস আওয়াজ, অফুরন্ত মশার গান আর কুকুরের ঘেউ-ঘেউ ও মোষের গাড়ির ক্যাঁচর ক্যাঁচর শব্দ নিয়ে এখানে সন্ধ্যা আসে না। বীথি পরশু দেখেছে, কাল দেখেছে, আজও দেখল। দেখল এবং অনুভব করল নিবিড় শান্ত পরিচ্ছন্ন দিবাবসানটি।

বাগানে পায়চারী করছিল বীথি। অদূরে সামনে একটি বেতের টেবিলে টিপয় রেখে দু'টো ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিয়েছে মিহির আর তার এক বন্ধু।

বীথির কোলে টুটুল। ঘুমিয়ে পড়েছে।

যেন এইবেলা ঘরে ঢুকে শিশুকে ঘুম পাড়াতে যাবে বীথি। কিন্তু মিহির কথা বলছিল বলে চট্ করে আর সে সরতে পারেনি। মিহির প্রশ্ন করছে আর পায়চারী করে করে বীথি আস্তে আস্তে কথাগুলোর উত্তর দিচ্ছে।

মিহিরকে এ দু'দিনে যা-হোক সহ্য হয়ে গিয়েছিল বীথির। কিন্তু তার বন্ধুর সামনে আড়ষ্টতা লজ্জা এবং অপরিচিত একটা ভয় কোনোমতেই কাটাতে পারছিল না।

'তোমাদের সেই বাড়িতে কি অনেক লোক?' বন্ধু প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ।'

'না তোমার সে-বাড়িতে থাকা সম্ভব না।' মিহির বলল, 'না, না আমাদের সমাজ এখনো এধরনের কাজকে স্বাভাবিক বলে নিতে পারছে না। সত্যি তো। এখানে আমার বাড়িতে রাত্রে থাকা সেটা—' মিহির থামল।

বীথি ঘাড় হেঁট করে জুতোর ডগা দিয়ে একটা ঘাসের শিষ ছুঁয়ে ছুঁয়ে অনুভব করছিল।

আর প্রায়ান্ধকার সেই মাঠে বীথির পা ঘাসের শিষ ও জুতোর ডগা ছুঁয়ে ছুঁয়ে লঘুপক্ষ প্রায় চোখে দেখা যায় না সাদামতন ছোট্ট প্রজাপতিটা তখনো উড়ছিল। সেই বিকেল থেকে উড়ছে।

'তবে কি ঠিক করলে?' মিহিরের বন্ধু এবার প্রশ্ন করল। 'তোমার গার্ডিয়ানদের তরফ থেকে কোনো আপত্তি আছে কি না?'

বীথি আস্তে আস্তে মাথা নাড়ল।

মিহির বলল, 'না, তা নেই।' বলে টিপয়ের ওপর থেকে সিগারেটের টিনটা কাছে টেনে নিল। পাখিরা ডাকছিল। হ্যাঙ্গারফোর্ড স্ট্রীটের ওপর বিস্তীর্ণ জমি নিয়ে মিহিরের বিরাট বাড়ির পিছনেও বড় বাগান। শেষ সীমানায় সারিবন্ধ বড় বড় কড়ি ও বাঁশ গাছ দাঁড়িয়ে আছে বলে সেদিক থেকে রোজ সন্ধ্যায় এমনি অজস্র পাখির কিচিরমিচির ভেসে আসে। অবশ্য এখনি ওরা চুপ করবে।

'তোমাদের ফ্যামিলিতে ক'জন মেম্বার?' অন্ধকারে মিহিরের বন্ধুর ভ্রূকুঞ্চন দেখা গেল না।

'অনেক।' মিহির সিগারেটের রাশি রাশি ধোঁয়া ছড়িয়ে শুকনো মোটা গলায় বলল, শুনলাম তো ওর ওপরে ও তলায় আরো অনেক ভাইবোন।'

তালুর গায়ে জিহ্বা ঠেকিয়ে মিহিরবাবুর বন্ধু অনুচ্চ সহানুভূতি-সূচক শব্দ করল।

'ব্লাডার,—দেয়ার লাইজ দি কজ অব অল আনহোপনেস মিজারিস মিসফরচুনস পোভার্টি—ডেস্ট্রাকশন। এমনি তো এখনো এদেশে আর্লি ম্যারেজের সংখ্যা বেশি!'

মিহির কথা বলল না।

বীথি আর ঘাসের বুকে পা ঠেকাল না।

'এক কাজ করো—' যেন কি একটা প্রস্তাব দিতে গিয়ে মিহিরের বন্ধু চুপ করল।

'কিছু করতে হবে না।' মোটা খস-খসে গলায় মিহির বলল, 'ওবাড়ি ছেড়ে দাও—বারোঘরের বারোভূতের আড্ডায় তোমাদের থাকা উচিত না। তোমরা শহরে চলে এসো। সেটাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে।'

'আমরা আগেও কোলকাতায় ছিলাম।'

'হ্যাঁ, তুমি তো বলছিলে দুপুর-বেলা। বাদুড়বাগান না কোথায়।'

'বৌবাজার।'

'দ্যাট্ উইল বি গুড্। নিজেরা রোজগার করবে একটু ভালভাবে থাকবে খাবে এতে আবার কার এত কথা শোনার ধৈর্য। তোমার দিদির আজ ক'বছর যেন টেলিফোনে?'

'তিন।'

'উঁহু—দ্যাট ইজ নট এ গুড্ জব্। াত ভাল চেহারায় এমন ওয়াণ্ডারফুল ফিগারে আরো ভাল আরো সম্ভ্রান্ত কাজের দরকার তোমার বোনের।'

আজ বিকেলে অফিস থেকে ফেরার সময় প্রীতি এখানে হয়ে গেছে। ছোট-বোনের নতুন কর্মস্থল ও কাজের রকমটা দিদি হয়ে তার একবার দেখা কর্তব্য বিবেচনা করেই প্রীতি এসেছিল।

মিহির তাকে যথোচিত সম্বর্ধনা করে চা ও প্লেটভর্তি মিষ্টি খাইয়ে ছেড়েছে। বীথির দিদিকে মিহিরের বন্ধু দেখেনি। সে পরে এসেছে।

'ওর চেয়ে নিশ্চয়ই আরো টল হবে ওর দিদি?' মিহিরের বন্ধু প্রশ্ন করল।

মিহির তাতে কান না দিয়ে বলল, ইউ ডু দ্যাট'—বুঝলে বীথি শহরতলী ছেড়ে আবার তোমরা ভিতরে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করো। আমি তোমাদের বাড়তি বাড়ি ভাড়া সম্পর্কেও কনসিডার করব, আজ ফিরে গিয়ে দিদি ও মাকে বলবে। এইবেলা ঘর খুঁজে নাও।'

বীথি ঘাড় নাড়ল। আর দাঁড়াল না। টুটুলকে নিয়ে ঘরে উঠে গেল। এবং একটু পর যখন বেরিয়ে এল দেখা গেল হাতে ওর ছোট ব্যাগ।

বীথি মাঠে নেমে ফটকের রাস্তাটুকু পার হয়ে বেরিয়ে যেতে মিহির একটা ছোট্ট নিশ্বাস ফেলল। পিছনের বাগানে পাখির কিচিরমিচির থেমেছে।

যেন অনেকটা নিজের মনে কথা বলল মিহিরঃ 'ওর প্রয়োজন টাকার, আমার প্রয়োজন স্নেহের—যত্নের—আন্তরিক সেবার। কী আশ্চর্য অসংলগ্নতা।'

মিহিরের বন্ধু অনেকক্ষণ কথা বলল না।

মিহির আবার আশ্চর্যভাবে,—যেন নিজের সঙ্গে কথা বলল।

'আশ্চর্য সাহস। বাপ মা ভাইবোনের মুখের ভাত জোগাড় করতে খুঁজতে খুঁজতে কোথায় এসে কি করে একটা কাজ জোগাড় করল তো!'

যেন আর চুপ থাকতে পারল না, অল্প হেসে বন্ধু এবার ইজিচেয়ার থেকে মাথা তুলল। 'তবে কি বলতে চাও ও নিজে এখানে খুঁজেপেতে এই পোস্ট ক্রিয়েট্ করল। তোমার দিক থেকে কোনো গরজ ছিল না—তোমার বাচ্চাটিকে দেখাশোনা করবার?'

'ইয়েস—আই ওয়াণ্টেড এ প্রফে-সন্যাল নার্স।' মিহির ভারি গলায় বলল, 'এখন দেখছি একেবারে কাঁচ অসহায় অদ্ভুতরকমের র—নভিস। আমার এক ডাক্তার বন্ধু জোগাড় করেছে। মেয়েটির সংসারের অবস্থা শুনলাম, শুনে আর না করি কি করে?'

বন্ধু আবার একটু সময় কথা বলল না। তারায় ভর্তি আকাশটার দিকে তাকিয়ে কি ভেবে পরে আস্তে আস্তে বলল, 'উঠি, চলি। বড্ড মিস্ করলাম। বড়টিকে দেখতে পারলাম না।' বলে চেয়ার ছেড়ে উঠতে উঠতে বন্ধু টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে তাতে অগ্নিসংযোগ ক'রে বিদায় নিল। চলে যাবার সময় বন্ধু ফটকের কাছে গিয়ে খুক করে যেন একটু কাশল—কাশল কি হাসল বুঝতে না পেরে মিহির চমকে উঠল। এবং যদি হেসেই থাকে তার কারণ কি একলা বাগানের অন্ধকারে ইজিচেয়ারে শুয়ে শুয়ে মিহির একটু সময় চিন্তা করল একটুক্ষণ। তার-পর আর কিছু ভাবল না। ধীর গম্ভীর গলায় রঘুনন্দনকে ডাকল। পুরোনো চাকর, অর্থাৎ সুরমার আমলের বুড়ো দীনদয়ালকে মিহির ছাড়িয়ে দিয়ে এই নতুন হিন্দুস্থানী ভৃত্যকে সংপ্রতি বহাল করেছে। রঘুনন্দন এসে সামনে দাঁড়াতে মিহির হিন্দীতে প্রশ্ন করল, 'নীলাঞ্জন-বাবু যখন কুঠিতে ঢোকে তুমি বলনি আমি বাথরুমে ছিলাম?'

'জি হ্যাঁ।' রঘুনন্দন মাথাটি কাত করে প্রায় কাঁধে ঠেকাল।

একটু সময় কি ভাবল মিহির। তারপর শক্ত গম্ভীর গলায় বলল, 'এরপর থেকে আমাকে জিজ্ঞেস না করে কোনো আদমিকে কোন বাবুলোককে ভিতরে ঢুকতে দেবে না।'

'বহুৎ আচ্ছা।' রঘুনন্দন আবার কাঁধে মাথা ঠেকাল। ভৃত্য চলে যাবার পরও মিহির বাগানের অন্ধকারে চুপচাপ শুয়ে থাকে। ভাবে।

সন্ধ্যা নেমে রীতিমত রাত হয়ে গেছে আর এক জায়গায়। হ্যাঁ খালধারে। পাগলাডিঙির পারঘাটের কাছে। একটা তেলেভাজার দোকানে। টিম টিম করে কেরোসিনের ডিবি জ্বলছে। দোকানের ভিতর অনেকটা জায়গা জুড়ে বাঁশের মাচা খাটানো। এবেলা আর উনুন ধরানো হয়নি। সকালের ভাজা ঠাণ্ডা ফুলুরী, বেগুনি এবং আরো দু'-এক পদ খাবার সাজিয়ে মাচার ওপর দোকানের মালিক হরিপদ দত্ত বসে আছে। ক্ষিতীশের বন্ধু। হরিপদর সঙ্গে ক্ষিতীশের একটু আত্মীয়তার লেশও আছে। ডিগবয়ে ক্ষিতীশের যে মামা চাকরি করে হরিপদ তার শালা। ক্ষিতীশের যেমন মন চাইছে না, তার দাদা অর্থাৎ রমেশ রায়ের দোকানে থাকতে তেমনি হরিপদও ভগ্নিপতির সুপারিশে পাওয়া ডিগবয় অয়েল কোম্পানীর চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে এসেছে স্বাধীন ব্যবসা করতে। এই তেলেভাজার দোকান খোলা ছাড়া

এখানে এসে আর বিশেষ কিছু সুবিধা করে উঠতে পারল না সে। দোকানের ভিতরে একধারে দু'টো বাঁশ আড়াআড়ি করে পোঁতা। একবার কয়লার দোকান আরম্ভ করবে বলে কাঁটা ঝোলাবার জন্য বাঁশ দুটো পোঁতা হয়েছিল। আগাম টাকা দিতে পারেনি বলে গুদাম থেকে কয়লা আর আসেনি।

বাঁশের মাচাটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে একটা কেরাসিন কাঠের বাক্স। বাক্সের ওপর ক্ষিতীশ বসে আছে চুপ করে। তার চেহারায় উত্তেজনা, অস্থিরতা এবং কিছুটা বিমর্ষতাও।

বাক্সটার পিছনে একটা ছোট জল-চৌকির ওপর চুপ করে বসে আছে বেবি। মাচা থেকে অনেক নীচুতে বসা বলে রাস্তা কি দোকানের চৌকাঠে দাঁড়িয়েও বেবিকে দেখা যায় না। তা ছাড়া ওর মুখটা দরজার বিপরীত দিকে বেড়ার দিকে ঘোরানো। ভিতরে ঢুকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বেবির একটা চোখ বোজা। যেন সেই চোখ দিয়ে ও ঘুমোচ্ছে। আর একটা চোখ খোলা। স্থির পলকহীন তার চাউনি। বেড়ার গায়ে চোখটা মেলে ধরে দুটো টিকটিকির শিকার ধরে খাওয়া দেখছিল ও এতক্ষণ। অত্যন্ত বিমর্ষ এবং গম্ভীর ওর মুখখানাও। দু'পা এগোলে প্রকাণ্ড বিল। হরিপদর দোকানের সামনে একটা শিশু অশথ গাছ। হরিপদর মাচায় বসে তা চোখে পড়ে। পশ্চিম আকাশে শুক্লা সপ্তমীর চাঁদ ঝুলছে। ফিনফিনে
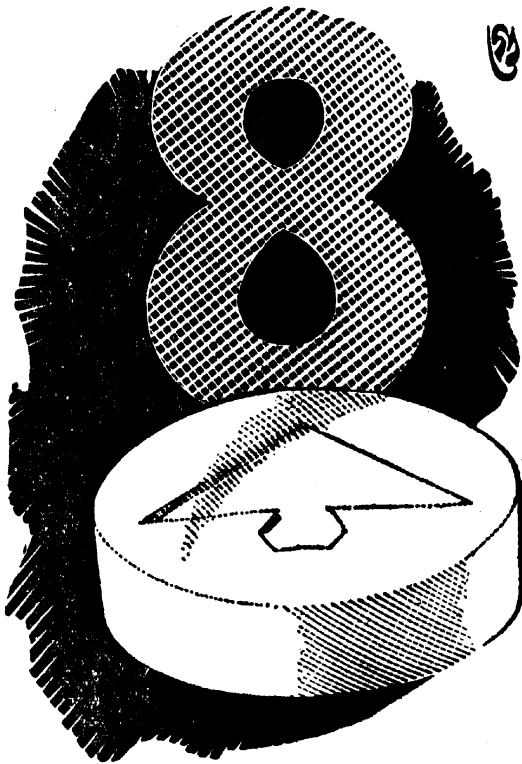
জ্যোৎস্নায় খাল ও বিলের জল চিক্‌চিক্ করছিল। আর ছিল দমকা হাওয়া। সেই হাওয়ায় খালধারের ধুলো উড়ছে, গাছের পাতা ঝরছে, হরিপদর দোকানের কেরোসিনের ডিবিটা বার বার নিভে যাচ্ছে। একবার আলো নিভে যাওয়ার পর অনেকক্ষণ হরিপদ আর আলো জ্বালেনি। ভূতের মত চুপ করে মাচার ওপর বসে বিড়ি টানছিল। ক্ষিতীশ অবশ্য সিগারেট টানছিল। দুজনের একজনের মুখেও তখন কথা ছিল না। মশার কামড়, নাকি হাওয়ার ঝাপটায় হঠাৎ দরজার বাঁশটা পড়ে যেতে ভয় পেয়ে বেবি অস্ফুট আর্তনাদের মত 'উঃ' ক'রে উঠল।

'ঝাঁপ' বন্ধ ক'রে দে হরিপদ।' ক্ষিতীশ বলল, 'রাত হয়েছে তেলেভাজা আর খাবে কে।'

হরিপদ কথা না বলে আলো জ্বালে। তারপর উঠে আধখানা ঝাঁপ নামিয়ে দিয়ে ডিবিটা তার আড়ালে রাখে। বাতির শিখা আর নড়ে না।

'নে, এইবেলা ভাল করে বুঝিয়ে বল্, আর বসে থাকবি কত। আমি দোকান বন্ধ করে ঘরে ফিরি, রাত হ'ল।'

'তুই বোঝা হরিপদ, তুই বুঝিয়ে কাঠের পুতুলের মুখে রা ফোটা। আমার সঙ্গে তো উনি ভাসুর সম্পর্ক পাতিয়েছেন।'

'না, আমার বোঝানোয় চলবে কেন। মিনমিনে গলায় হরিপদ বলল, 'তোমার জিনিস তুমি দেখবে।'

ক্ষিতীশ বেবির দিকে ঘাড় ফেরায়।

কালি জমে সলতের গায়ে ফুল জমেছিল। আর একবার আলো জ্বালতে হরিপদ আঙুলের টোকা দিয়ে সেটা ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার পর আলোটা এখন বড় মোটা হয়ে জ্বলছে। মাচার ওদিকটা ভাল দেখা যাচ্ছে। বেবির সামনে একটা শালপাতার ঠোঙা। তাতে এতগুলি তেলেভাজা। তেমনি পড়ে আছে। একটাও বেবি মুখে তোলেনি।

ক্ষিতীশ একটু সময় সেদিকে চেয়ে থেকে পরে হরিপদর দিকে ঘাড় ফেরাল।

'আমি বুঝিয়ে বুঝিয়ে জিহ্বা ভোঁতা করেছি। এখন তোমরা বোঝাও। যদি একটু চৈতন্য হয় নবাবজাদীর।'

'এই বেবি।'

বেবি মুখ নিচু করেছিল।

হরিপদ মোটা গলায় বলল, 'ক্ষিতীশ কি বলছে শোন্।'

ক্ষিতীশ আর একটা সিগারেট ধরাতে দেশলাইয়ের কাঠির প্রচণ্ড শব্দ করল। বারুদের গা ঠিকরে তার চোখের কাছে আগুন ছুটে যায়। তেমনি প্রচণ্ড শব্দ করে দেশলাইটা হরিপদর দিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে ক্ষিতীশ বলল, 'মা'র মাথায় ছিট। বাপটা বলা যায় রাস্তার পাগল। আর যে জন্যে তিনির মন নড়ছে না, পা সরছে না,—ভাই। তা ভায়ের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে পারিজাত। হ্যাঁ, বাড়িওলা। এই ঠ্যাং নিয়ে বেঁচে থাকলেও ঘরে শুয়ে থাকতে হবে, হাঁটতে হবে না। তারপর?'

হরিপদ বলল, 'পেট চালাতে তোমাকে চাকরি করতেই হবে। চায়ের দোকান হোক আর দুধের দোকান হোক।'

'বাড়িউলি মাসীর পাল্লায় পড়তে হবে' ক্ষিতীশ নাকের বিকট শব্দ বার করে সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ল। 'এখানে এই হালে রমেশ রায়ের দোকানে থাকলে গোল্লায় যেতে বেশিদিন লাগবে না। আমার কথা ফলে কিনা তুই চেয়ে দ্যাখ্ হরিপদ।'

একটা ঢোঁক গিলল হরিপদ। কথা বলল না। ফ্রকের ছেঁড়া অংশে বেবির মেরুদাঁড়ার কাছাকাছি পিঠের চামড়ায় এতবড় একটা মশা হুল ফুটিয়ে দিয়ে বসে আছে রক্ত টানছে। বেবি নড়ল না। ক্ষিতীশ দেখল, নড়াল না। দূর থেকে হরিপদ আর সেটা দেখে না।

'তোর তো একটা মত দিতে হবে। না হলে—' হরিপদ থামল।

বেবি তেমনি বেড়ার দিকে তাকিয়ে। বোজা চোখটাও এখন খোলা।

'না-ই বা হবে কেন।' ক্ষিতীশ গলা ঈষৎ চড়াল। 'অর্থাৎ পেটে ক্ষিদে মুখে লাজ। বেশ ক্ষিদে আছে, আমি টের পাই। আজ ক'মাস নেড়েচেড়ে দেখলাম তো।'

'কি কথা বল্ না।' হরিপদ একটা বড় ধমক দিল।

বেবির নাকের পাশটা একটু চিকচিক করে উঠল।

'ঢং।' ক্ষিতীশ নাক দিয়ে ধোঁয়া ছড়াল। 'মত। মত চাইছি আঠারো বছর হয়নি বলে। পুলিসে গোলমাল করবে রাস্তাঘাটে। নাবালিকা, কিন্তু হিন্দু আইনমতে সাবালিকা হয়েছে কিনা, তুই একবার লাটসাহেবের মেয়েকে গোপনে জিজ্ঞেস কর না হরিপদ।'

কথা না কয়ে হরিপদ বিড়ি ধরাল।

'বেশ তো, থাক্। বারো ভূতের সেই বাড়িতে থাকবি আর রমেশের দোকানে চা বানিয়ে পাড়ার লোককে খাওয়াবি। এই যদি তোর সুখের জীবন, কামনার হয় বল্। হ্যাঁ পষ্টাপষ্টি জানিয়ে দে আমি সরে যাই। আমার রাস্তা দেখি।'

বেবি ক্ষিতীশের দিকে এই প্রথম মুখ ফেরাল। নাকের ধারটা আর চিকচিক করছে না। 'তুমি ভীষণ মারধর করবে। তুমি যখন রাগ করবে কাণ্ডজ্ঞান থাকবে না। আমার সাহস হয় না।'

'হবে, হয়। দূর দেশে গিয়ে স্বামী-স্ত্রী হয়ে থাকার স্বাদ আলাদা। তখন কি আর এই ক্ষিতীশ ক্ষিতীশ থাকবে।' হরিপদ পোড়া বিড়িটাতে আর একটা কাঠি জেলে আগুন ধরায়।

'রমেশ তোর গায়ে হাত দিল বলে, কুত্তি।' ক্ষিতীশ আবার ক্ষেপে উঠল—'বলছি একবার হাওড়া না হয় শেয়ালদার টিকিট কেটে তো আগে ট্রেনে ওঠা যাক। ওই ছেঁড়া ফ্রক প'রে পরে পাঁচজনের চা বানানোর চেয়ে সম্মানজনক হবে না এটা, তোর মাথায় আসে না। আর নোংরাভাবে জীবন কাটানোর ইচ্ছা থাকলে বল অন্য সুরে কথা বলি।'

বেবি নীরব নত-নেত্র।

একটা জলের ফোঁটা এসে নাকের ডগায় ঠেকেছে। হু হু করে বিলের হাওয়া ঢুকছিল বলে হরিপদ বাকি আধখানা ঝাঁপও নামিয়ে দিল। পাগলা-ডিঙির ফাঁড়ি থানায় তখন ন'টার বেল বাজছে। (ক্রমশ)

মন্দ্রসপ্তক

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

একটি দীপ এখনো জ্বলে, নিভিয়ে দাও তাকে,
দিয়োনা, সাড়া দিয়োনা আর আলেয়া যদি ডাকে;
শিখার উপলক্ষ্যে যদি পতঙ্গের আশা
সাজায় কোনো মদির ভালোবাসা,
আলোকমালা ছিন্ন করো—জ্যোতির জিজ্ঞাসা
কিছুই নেই, তৃপ্ত সে যে আত্মসুখী থাকে—
অন্ধকার শুধিয়ে মরে, সাগরে খেয়া রাখে।

হৃদয়, তুমি তমিস্রার অথৈ নীল জলে
গিয়েছো ভ'রে, জোয়ারী নেই সেতারে ঝঙ্কার
জ্বালিয়ে দিয়ে কর্ণধার অন্ধকার চলে,
সুরের ভারে যখন হবে অবশ দুই ধার,
রাত্রি তোকে সহসা দেবে গভীর সম্মানঃ
সৌম্য এক যন্ত্রণার ইমনকল্যাণ।
কিছুই দেখা যাবে না আর, দুধারে মিশকালো,
হৃদয়, সেই সময় বুঝি এসেছে, এইবার
তৃতীয় আয়তনের আলো জ্বালো।

এই যে তুমি একুশবার ছুঁয়েছো শরতের
মেঘের স্রোতে মগ্ন কাশফুল,
শুভ্রতার কেন্দ্রে তুমি বৃত্ত হয়ে ফের
হেমন্তীর দীঘল এলোচুল
কুসুম দিয়ে ঘিরেছো, সেই মায়ার ঘনঘের
এখনো সে তো করেনি নির্মূল!

দিনের ছেলে মুকুল রাখে, রাতের মেয়ে ফল,
দুয়ার থেকে দুহাতে এসে সবার আয়োজন
হয়েছে তবু অন্তহীন তুহিন সমতল—
আরতি ক'রে এখুনি আঁকো তৃতীয় আয়তন;
যে-আলো ছিঁড়ে ইন্দ্রজাল আপাত দৃষ্টির
ছায়ার নিচে খদ্যোতের ধ্যানের ধুপ জ্বলে,
ভরসাভীরু আঙুল দিয়ে স্তিমিত ব্রততীর
প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন লিখে চলে,
ভিক্ষুনীর সাধন বোনে বৃক্ষবেদীতলে—
তিমিরদূতী সে-আলো নামে প্রদীপনেভা ঘরে,
প্রতীক্ষায় পঞ্চতপা তবুও পরাজিতা
যে-মেয়ে জাগে ক্ষমার মতো সজলসুস্মিতা,
মৃত্যুময়ী নদীর মতো সাগরে আয়ু ধরে,
তমসাতীরে দাঁড়িয়ে সেই শতাব্দীর সীতা—
দুয়ার খোলো ভোরের অভিমানী,
রাতের ঘরে এসেছে তোর ইমনকল্যাণী!

হৈমন্তী দুপুর

সাধনা চট্টোপাধ্যায়

হেমন্তের এ দুপুর যেন এক ছোট শান্ত নদী
ক্ষীণতম স্রোত নিয়ে ছোট ছোট ঢেউ ওঠে পড়ে
উচ্ছল বর্ষার পরে সমতলে নেমে শেষ অবধি
—ক্লান্ত হল; শ্রান্ত দেহ, ধীর গতি তাই।

তবুও শান্তি আছে নেই কোন ক্ষোভ,
অনেক বৃষ্টির ঝরণা—শিউলির সম্ভোগ,
শেষ করে—এ-নদীতে ঘুম এল—পরম তৃপ্তির।
গাছের-ছায়ায়-বসা বন্ধ চোখ একটি গাভীর
জাবর কাটার মতো।

বর্ষার শৈশবযুগ শরতের প্রাণবন্যা শেষে,
দুপুরের এ-নদীটি আলস্যের সরোবরে মেশে।
কাঁচা-মিঠে রুদ্দুরে গল্পের বই হাতে নিয়ে
কিছু ঘুম আর কিছু পড়া
হেমন্তের এ-দুপুরে এইটুকু কাজ যায় করা।

কাঠের সিঁড়িটা উঠে গেছে তেতলায়। জোরে পা ফেলে চললে শব্দ হয়। দপ্ দপ্, খপ্ খপ্। এক একজনের পায়ে এক একরকম শব্দ। অন্য কারোর কানে শব্দের পার্থক্যটা বাজে না, কিন্তু নির্ভুল শব্দ-তারতম্যটা বুঝতে পারে ভিনসেণ্ট। ভিনসেণ্ট বোস। ভিনসেণ্ট থাকে নিচের তলায় সিঁড়িটার পেছনে একটা অন্ধকার অভ্যন্তরে।

কখন থাকে, কখন থাকে না। কেউ জানে না। কেউ জানবার প্রয়োজন মনে করে না। থাকে যেন একটা কুকুর বা বেড়ালের মতো। সকলের চোখের পীড়া, না থাকলে কারোর মনেও পড়ে না। মনে পড়ে না বলেই খোঁজও পড়ে না তার। খোঁজ করবার কেই-বা আছে।

ক্বচিৎ কখনো একমাত্র আমি আসি তার কাছে। কখনো দেখা হয়, কখনো হয় না। আমি এসে যে তার কোন উপকারে লাগি, তা নয়। তবু আসি। আসি একটা আশ্চর্য আকর্ষণে।

ভিনসেণ্টের সংগে আমার প্রথম দেখা কফি হাউসে। বিকেলের একটা জম-জমাট আড্ডায়। চিত্ত সেন, শান্তি মিত্র, অমিয় মুখার্জী ও আমি কফি আর অমলেট সহযোগে জমে উঠেছি সাহিত্যের পরচর্চায়, এমন সময় ভিনসেণ্ট এসে হাজির।

আমি প্রথমটা অবাক হয়েছিলুম। কফি হাউসের মধ্যবিত্ত ন্যাকামির তীর্থ-স্থানে এমন পোশাক, এমন চেহারা দুর্লভ দর্শন। কাঁচা-পাকা চুল অবিন্যস্ত রুক্ষ রুক্ষ, খোঁচা খোঁচা দাড়ি-গোঁফ বেশ কয়েক সপ্তাহের বয়েস নিয়ে নির্বিরোধে বেড়েছে। লাল লাল দু'চোখ। ইস্ত্রিহীন ময়লা হাফসার্টটা এতো ছেঁড়া, পরাটাই হাস্যকর। সদ্য-সাবান-কাচা চটের মতো মোটা ধুতিটা হাঁটু ছাড়িয়ে নামে নি। পায়ে একরাশ ধুলো-ময়লা, জুতো-বিহীন।

এসে নমস্কার করলো চিত্তকে। নার্ভাস নার্ভাস চেহারা। পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে আবার নমস্কার করলো।

আমাদের পরচর্চার ঝাঁঝালো আলোচনাটা মুখ-থুবড়ে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। একটা বিস্মিত চমক আমাদের তিনজনের মনে। সার্কাসের ক্লাউনের মতো মনে হলো লোকটাকে। চিত্ত বিব্রত। তার ভ্রূ-রেখার মধ্যখানে কুঞ্চন জাগলো, জিজ্ঞেস করলো, 'আবার কী?'

'একটা কবিতা লিখেছি আজ। দয়া করে একটু পড়ে দেখবেন?'

'দেখি।'

ভ্রূ-কুঞ্চন নিয়েই চিত্ত পড়লো। তারপর এগিয়ে দিলো কাগজটা আমার দিকে। একদা আমি তরুণ-লিখিয়েদের মুখপত্র এক মাসিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলুম।

নতুন লেখক হলেই আমি কৌতূহলী হয়ে উঠি। সম্ভাবনা খুঁজি, মহৎ প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ পাওয়া যায় কিনা মমতা নিয়ে তার সন্ধান করি। বন্ধুরা তা জানে, তাই সকলে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো।

কবিতাটা গদ্যছন্দে। সাংঘাতিক গদ্য। দুর্ধর্ষ সব শব্দ। না হয়েছে পদ্য, না গদ্য, না কবিতা। কিম্ভূত-কিমাকার। পাগলের প্রলাপের মতো। হিজিবিজি, হযবরল। আমি নিঃশব্দে কাগজটা ফিরিয়ে দিলুম চিত্তকে, তারপর সেটা ঘুরে গেল শান্তি মিত্র ও অমিয় মুখার্জির হাতে। পড়ে সবাই নিঃশব্দে ফিরিয়ে দিল।

চিত্ত বল্লো, 'লিখে যান। আস্তে আস্তে হবে।'

'কিছু হয়নি এটা?'

'হবে। হবে। এতো ব্যস্ত কী।'

মনে হলো, অত্যন্ত নিরাশ হয়েছে লোকটি। যেন মস্ত একটা আশার সৌধ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়েছে তার। করুণ হয়ে উঠলো ক্লান্ত চোখের তারা। চোখের নিচের কালিতে আরো অন্ধকার নামলো।

বল্লে, 'আচ্ছা, নমস্কার। আবার একদিন দেখা করবো।'

লোকটি চলে গেল কফি হাউসের আর এক কোণায়। জমজমাট কয়টি কলেজীয় ছেলেমেয়ে। সেখানে গিয়ে একটা চেয়ারের পাশে দাঁড়ালো। হাসির হুল্লোড় উঠলো সেখানে, সে-ও হাসতে লাগলো কৃতকৃতার্থ ভঙ্গীতে।

আমরা চুপ করে অপেক্ষা করছিলুম। চিত্ত আরম্ভ করলো লোকটির গল্প। ফিলজফিতে এম-এ পাশ করেছে লোকটি দশ বছর আগে।

বিস্মিত আমি প্রশ্ন করলুম, 'সত্যি?'

'হ্যাঁ।' জবাব দিল চিত্ত। 'আজ কারোর বিশ্বাস হবে না, হয়ও না। মনে হয় অসম্ভব। তার কথায়বার্তায়, চাল-চলনে। আমার সঙ্গে পরিচয় ইউনি-ভার্সিটিতে, বাঙলায় এম-এ দেবার শখ হয়েছিল, তখন আমাদের সঙ্গে ক্লাশ করতো।'

লোকটির কাহিনী বিচিত্র। এম-এ পাশ করেও চাকরী করে না। ইস্কুল-মাস্টারী পেয়েছিল, নেয়নি। প্রফেসরী ছাড়া অন্যতর চাকরী করা নাকি তার পক্ষে অসম্মান। মুরুব্বিহীন নিচু সেকেণ্ড ক্লাশের প্রফেসরী পাওয়াটাও তো অসম্ভব। জোটেও নি। আসামের এক চা-বাগানে চাকরী করতেন দাদা, ক্লিষ্ট সংসার থেকে মাসে মাসে কিছু টাকা পাঠাতেন। রকমসকম দেখে তিনিও বন্ধ করে দিয়েছেন মাসোয়ারা। কে এমন অনর্থক সাহায্য করবে মাসের পর মাস। বেকার বাউণ্ডুলেকে কে পুষবে। সিঙ্গেল সীটেড রুম ছেড়ে সে মেসের একতলায় একটা স্যাঁতসেতে ঘর ভাড়া নিয়েছিল অল্প টাকায়। দু'-একটা ট্যুইশনি করতো তখনও। ঝোঁক চাপলো আবার এম-এ দেবে বাঙলায়। সাহিত্যিক যাবে সাহিত্য-মন্দিরে। ছাড়লো ট্যুইশনি, খোঁজ করতে লাগলো অফিস-ফ্যাক্টরীতে যুৎসই একটা চাকরী। মিললো না। আর এখন যা চেহারা হয়েছে না-খেয়ে না-খেয়ে, কে দেবে চাকরী।

জিজ্ঞেস করলুম, 'কি নাম?'

সশব্দে হেসে উঠলো চিত্ত। 'নাম? ভারী মজার নাম তার। ভিনসেণ্ট অনাদি বসু। অনাদি তুলে দিয়েছে এখন। ভিনসেণ্ট বোস বলেই সকলে ডাকে ভিনসেণ্ট ভ্যান গগ থেকে 'ভিনসেণ' নামটা বসিয়ে দিয়েছে তার স্ব-নামে ভ্যান গগের মতো নাকি তার জীবন।'

'যথা?' জিজ্ঞেস করলুম।

'কবিতা লেখে, ছবি আঁকে ভিনসেণ বোস। কবিতার নমুনা তো দেখলে ছবি আরো এক ডিগ্রী উঁচুতে। তব তার ধারণা, বিরাট প্রতিভা তার। আ কেউ বুঝতে পারছে না, কিন্তু একদি বুঝবে দেশ। একদিন জানবে তাকে দেবে প্রতিভার সম্মান। ভিনসেণ্ট ভ্যা গগের মতো। আজ দুঃখে পোড়-খাওয় জীবনটাকে অত্যুগ্র সাধনার মার্গে তুলে রেখেছে সে, শিল্পের সাধনা তো কষ্টে আগুনে, অপমানের আগুনে পুড়ে পুড়েই করে যেতে হবে।'

হেসে উঠলো চিত্ত। বন্ধুরাও সরস মন্তব্য জুড়ে ভিনসেণ্ট অনাদি বসুকে বিদ্রুপের শাণিত তরবারিতে বিঁধলো।

আমি অন্যমনস্ক হয়ে গেলুম। তার কবিতা আমার ভালো লাগে নি, তবু যেন তাকে পরমাত্মীয় মনে হলো। ভ্যান গগের প্রতি আমার অপরিসীম দুর্বলতা, তাঁর কাছে আমি জীবনের পরম পাঠ গ্রহণ করেছি, তাঁর জীবন আমাকে বিচিত্রভাবে আন্দোলিত করে। ভ্যান গগ। ভ্যান গগের সঙ্গে সত্যি একটু মিল আছে ভিনসেণ্ট বোসের। সত্যিই তো, মানুষকে বিচার করা, অনুভব করা কী এতোই সহজ। এতো সোজা প্রতিভাকে উপলব্ধি করা। তাহলে তো পৃথিবীটা সরল সুন্দর হয়ে যেত এক-নিমেষে, সকলের জীবনেই নামতো রজনীগন্ধার সুপবিত্রতা। অপরকে বুঝতে পারি না বলেই, অন্যকে ভালো-বাসতে পারি না বলেই তো জীবনের এতো দুঃখ, এতো গ্লানি, এতো অসম্মান। আমার, আপনার, সকলের। কেউ কাউকে বুঝতে পারি না বলেই।

আর প্রতিভাকে বিচার করবে কে? আজকের পাঠক? আগামীকাল এই বিচার তো সম্পূর্ণ উল্টো হয়ে যেতে পারে। জীবিতকালে ভ্যান গগের যে ছবির দাম কানা-কড়িও ছিল না, মৃত্যুর পর হাজার হাজার পাউণ্ডে লোকে তা

কেনেনি? কিনে অনুগৃহীত হয়নি, ধন্য হয়নি? ভিনসেণ্ট অনাদি বসুর লেখা বা ছবিও যে আগামীদিনের উত্তর-পুরুষরা কৃতজ্ঞতাচিত্তে গ্রহণ করবে না, কে তা বলতে পারে? সবচেয়ে বড়ো কথা, শিল্পীর নিজের আত্মবিশ্বাস। এতো দুঃখেও যদি তার বিশ্বাস টুটে গিয়ে না থাকে, তাহলে তার শক্তি অস্বীকার করবার সাধ্য কী।

লোকটির প্রতি আমি আকর্ষণ বোধ করলুম তখন থেকেই। বিকৃত-চরিত্র বলে নয়, অসাধারণ চরিত্র বলে। বিকৃতি মনে হবে সহজেই, যেমন হয়েছে চিত্তের, আশেপাশে আরো অনেকের। বিকৃতির কাহিনীটা চিত্ত বল্লো শেষাংশে।

ভিনসেণ্ট বোসকে দেখে বয়েসটা আন্দাজ করা শক্ত। ত্রিশ হতে পারে, পঁয়তাল্লিশ হতে পারে। অনশনজীর্ণ মুখে অসংখ্য রেখা, কোমলতা-কমনীয়তা-শূন্য। অবিন্যস্ত উদ্ধত চুলে কাঁচা-পাকা কুণ্ডলী, চোখের নিচে কালিমা।

চিত্ত বল্লে, 'ভিনসেণ্টের বয়েস ছত্রিশ। সার্টিফিকেট আমি দেখেছি, তাতে তাই লেখা। বুঝতেই পারছো বিয়ে হয়নি, ঘর বাঁধেনি। ক্রমশ যতো দিন যায়, সে বুঝতে পারছে বিয়েটা তার জীবনে ঘটবে না কখনো। বেঁচে থাকাটাই যার কাছে কণ্টকর, বিয়ে করবে কেমন করে। তাই বিকৃতি এসেছে তার চরিত্রে। য়ুনিভার্সিটি লাইব্রেরীতে গিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপলক চোখে তাকিয়ে থাকে মেয়েদের দিকে। পথে চলতে চলতে মেয়েদের ছুঁয়ে যাবার চেষ্টা করে, সুন্দরীদের অনুসরণ করে। একবার নাকি কিছু উত্তমমধ্যমও কপালে জুটেছিল এক পাড়ায়। তবু শোধরায় নি, সংশোধন হয়নি চরিত্রের। পারভার্সন এখন তার রক্তে গিয়ে মিশেছে।'

অনেকক্ষণ ধরে আমাদের আড্ডায় ভিনসেণ্টের কথা হলো। বিকৃতি, পাগলামি, সামাজিক ব্যবস্থা, জীবনের অপচয় নানানতর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনাও তার সংগে জড়িয়ে গেল। অবশেষে আমরা উঠলুম আড্ডায় ভংগ দিয়ে। তাকিয়ে দেখলুম তখনও ভিনসেণ্ট এ-টেবিল সে-টেবিল করছে। মুখে কৃতমন্য বিগলিত হাসি।

সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল বন্ধুরা। আমি তাদের থেকে সরে গেলুম কাজের ভাণ করে। বন্ধুরা চলে গেলে আবার গিয়ে বসলুম কফি হাউসে। দরজার কাছে, উইংগসের পাশে।

ভিনসেণ্ট আমাকে আকর্ষণ করছে। একশ' বছর আগেকার আর একটি মানুষের কথা আমার বারবার মনে পড়ছিল। সকলের কাছ থেকে অপমান কুড়িয়ে, ব্যর্থ-জীবনের পশরায় যে মহত্তম আনন্দের রূপরেখা তিনি রেখে গেছেন আমাদের জন্য, তার কৃতজ্ঞতায়ও কি মানুষকে আর একটু ভালোবাসতে পারবো না? সাদা চোখে যা দেখি, তার বাইরে আরও কোন অর্থ থাকতে পারে মানুষের, একথা বারবার ভুলে থাকবো?

অপেক্ষা করছিলুম ভিনসেণ্টের জন্য। সুযোগ এলো একটু পরে। ছেলেমেয়ের বড়ো দলটির সংগে সে চলে যাচ্ছিল, তাকে ডাকলুম। বসালুম একটা চেয়ারে।

বল্লুম, 'কফি খাবেন?'

'না, সারাদিন কিছু খাই নি। কফি ভালো লাগবে না।'

বল্লুম, 'তাহলে চলুন একটা হোটেলে। খেয়ে নিন। আমি আপনার জন্য অপেক্ষা করবো।'

'কেন?' সপ্রশ্ন বিস্ময় তার মুখে।

'আপনার আঁকা ছবি আমি দেখতে চাই।'

'কিন্তু সে তো আপনার ভালো লাগবে না। একেবারে যাচ্ছেতাই।'

'আজ যা যাচ্ছেতাই মনে হচ্ছে, আগামীকাল তা অপরূপও মনে হতে পারে দর্শকদের। কিছু বলা যায় কি?'

ব্যাকুল আগ্রহে আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরলো ভিনসেণ্ট। 'সত্যি বলছেন, সত্যি? তা হয়, তা হয়?'

বল্লুম, 'যাঁরা নতুন আলো এনেছেন পৃথিবীতে, প্রত্যেকের জীবনেই তো তা ঘটেছে।'

সেই মুহূর্তে আমরা বন্ধু হয়ে গেলুম। মনে হলো আমার ব্যবহারে সে এমন কিছু একটা পেয়েছে, যা তার কাছে প্রথম স্বাদের মতো। আস্তে আস্তে সে তার কথা বলতে লাগল। গোপন মনের পাঁপড়ি খুলে খুলে।

'জানেন, জীবনটা আমার একান্ত দুঃখের। আমার ছবি দেখে সবাই নাক উঁচু করে থাকে। কবিতা পড়তে চায় না। তবু আমি ছবি আঁকি, কবিতা লিখি। অপমান, লাঞ্ছনা, বেদনা মনের মধ্যে ধরে রাখি না। পদ্মপাতায় জলের মতো তা নিশ্চিহ্ন হয়ে ঝরে যায়। একটা নতুন ভংগী, নতুন কথা আমি প্রকাশ করতে চাই শিল্পরীতিতে। মানুষের জীবনে যা নতুন আনন্দের আলো ছড়াবে।'

সত্যি কথাই বলবো, তার শক্তিতে আমার যথেষ্ট বিশ্বাস হচ্ছিল না। তবু

মন দিয়ে শুনছিলুম তার কথা। কথা বলতে গিয়ে আবেগে সে শিউরে শিউরে উঠছিল, আমি তা লক্ষ্য করছিলুম। মনে হচ্ছিল, তার কবিতা আমার ভালো না লাগতেও পারে, কিন্তু ছবি তো তখনও দেখা হয়ে ওঠে নি।

ছবি দেখলুম তার মেসে গিয়ে। বড় বড় ক্যানভাসের ওপর অজস্র বিন্দুর বিশৃঙ্খল সমাবেশ। পেঁজা তুলোর মতো মাঝে মাঝে ফিকে রঙের ঢেউ। অনেকক্ষণ তাকিয়ে তাকিয়ে ছবির মানে বুঝতে লাগলুম। বোঝা গেল না।

ভিনসেণ্ট বল্লে, 'আঁকার একটা নতুন ভঙ্গী আমি আবিষ্কার করেছি। জানেন তো আজ পর্যন্ত যতো ছবি আঁকা হয়েছে সব শিল্পীর আবেগ দিয়ে জড়ানো অর্থাৎ তাঁদের মনে যে রূপ বা ভাব ছায়া ফেলেছে, তাই তাঁরা এঁকেছেন। কিন্তু তার পেছনে বৈজ্ঞানিক কোন ভিত্তি নেই। বিজ্ঞান বলে, অণু-পরমাণু হচ্ছে সব-কিছুর ভিত্তি। তাই বিন্দু বিন্দু দিয়ে আমি সব কিছু প্রকাশ করতে চেয়েছি, বিভিন্ন রঙের সাহায্য নিয়েছি আবেগ আর অনুভূতি তুলে ধরতে।'

ছবিগুলোর দিকে তাকিয়ে থেকে ভিনসেণ্টের কথা শুনছিলুম আমি। আমার বিদ্যেবুদ্ধি দিয়ে তার শিল্পরীতির অর্থ বা মাহাত্ম্য অনুভব করতে পারি না। যদি উত্তরকালে এই রীতির মহৎ কোন তাৎপর্য আবিষ্কৃত হয়, সেই মুহূর্তে আমার মনে হচ্ছিল, আমি খুশী হতাম। সংস্কারাবদ্ধ আমার বুদ্ধির পছন্দ-না-পছন্দের সীমা ছাড়িয়ে গিয়ে যদি এই দুঃখদীর্ণ লাঞ্ছনা-জীর্ণ জীবনের সাফল্য আসে, আমার সত্যিকারের খুশি হতে বাধবে না।

ছবি থেকে চোখ সরিয়ে আমি তাকিয়ে দেখতে লাগলুম তার 'নীড়ের' চেহারা। সিঁড়ির নিচে সংকীর্ণ অন্ধকার একটা জায়গা। হোয়াইট ওয়াশের ওপর ময়লা জমে জমে বিদঘুটে বিবর্ণ রঙ ধরেছে চারদিকে। লাইটের আলো এসে পড়ে না, একটা কুপির ব্যবস্থা ঠিক মাথার কাছটিতে। ছেঁড়া মাদুর, তেল-চিটচিটে একটা বালিশ, একটা ভাঙা টিনের সুট-কেশ। আর চারদিকে যেখানে যত জায়গা আছে, সর্বত্র সেই নতুন যুগের ছবি।

জিজ্ঞেস করলুম, 'কিছু করেন কি আপনি? চাকরি বাকরি?'

'না।' হাসল ভিনসেণ্ট। 'আমার চেহারা দেখেই সকলে দূর-দূর করে বিদায় দেয়।'

তাহলে কিভাবে চলে, আমি জিজ্ঞেস করতে চাইছিলুম। কিন্তু ভদ্রতায় বাধল। চুপ করে রইলুম।

সে নিজেই বল্লে, 'এবার কিছু একটা না রকলেই আর চলে না।' বলেই সে হাসল। তারপর উঠে রান্নাঘরের দরজায় গিয়ে ডাকল, 'সুবর্ণ, এক গ্লাস জল দেবে?'

একটি বিধবা মেয়ে, বোধ হয় মেসের ঝি, এক গ্লাস জল তুলে দিলো তার হাতে। আকণ্ঠ গিলে সুতৃপ্তির একটা ধ্বনি তুল্লো 'আঃ', তারপর বিধবা মেয়েটির দিকে হেসে বল্লে, 'বেশ ঠাণ্ডা জল।'

মেয়েটি কোন জবাব দিল না। গ্লাসটা নিয়ে রান্নাঘরে চলে গেল।

হঠাৎ জল চাওয়া আর ঘনিষ্ঠ হওয়ার ভঙ্গীটা একটু দৃষ্টিকটু লাগল আমার চোখে। মনে পড়ল চিত্তর গল্প। পারভার্শন মজ্জায় মজ্জায় মিশেছে। তবু কিছু মনে করলুম না, উন্মত্ত আবেগে শিল্পের পায়ে যার অঞ্জলিদান, তাকে একটু ক্ষমার চোখে দেখতে কার্পণ্য নাই বা করলুম।

কিন্তু ভিনসেণ্ট নিজেই কথাটা তুলে ধরল। সহাস্যে। কথাটা শুনে কিছুটা অবাক হয়েছি বটে, কিন্তু আর বিকৃতি-বোধের বেদনা রইল না।

কথাটা বললে খাটো গলায়। চুপি চুপি।

বল্লুম, 'তাই নাকি?'

একটু ভ্রূ কুঁচকে জিজ্ঞেস করল সে 'কেন কি দোষ?'

বল্লুম, 'না দোষ কিসের।'

'আমি তো ভালবাসি সুবর্ণকে। সেও বাসে। বিয়ে করতে আপত্তি কোথায়?'

সুবর্ণকে সে বিয়ে করবে। মেসের ঝি সুবর্ণ। কিন্তু সুবর্ণ তো নারী, যে কোন নারীর মতই তো তার মানুষের অধিকার। তাকে বিয়ে করবে ভিনসেণ্ট রেজিস্ট্রেশন হোক, কালীঘাটে পুরুত ডেকে হোক, যে কোনভাবে।

কফি হাউসে নার্ভাস নার্ভাস যে ভিনসেণ্টকে দেখেছিলুম, ডেরায় বসে তার অন্য চেহারা। দুর্গন্ধময় ময়লা ছেঁড়া বিছানায় বসে আছে সে। অন্ধকার স্যাঁত-সেঁতে কুঠরী। মনে হয় যেন সিঁড়ির দেয়াল যে কোন সময় লাগবে মাথায়। বিশৃঙ্খল কাগজপত্র বই ছবি তুলি ক্যান-ভাস সব চারদিকে ছড়িয়ে। তবু মনে হচ্ছিল তাকে, যেন এক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সিংহাসনে আসীন। মিটি মিটি হাসি চোখের কোণে।

ভালো লাগল আমার। হতদরিদ্র মানুষের হৃদয়েও একেবারে মুছে ম্লান হয়ে যায় না হৃদয়ের শিখা। হয়তো এমন কিছু আশ্চর্য জিনিস আছে আমাদের জীবনে, যেখানে প্রতিজনের জন্যে আলো দীপাবলীর উৎসব। সেই আলো দেখলুম ভিনসেণ্টের মুখে। খুশি হলুম।

বল্লুম, 'ভালই তো। ভালো যদি বেসেই থাকেন তাহলে মিলনে তা সার্থক হোক।'

উজ্জ্বল হয়ে উঠল ভিনসেণ্টের চোখ। বল্লে, 'আমাদের বিয়ের পরে দেখবেন আমি আরো ভাল ছবি আঁকবো, ভাল কবিতা লিখব।'

তারপর অনেকদিন দেখা হয়নি। শুনেছি চিত্ত বা অন্যান্য বন্ধুদের মুখে ভিনসেণ্টের কথা। তার সঙ্গে তাদের দেখা হয়েছিল এখানে ওখানে। কফি হাউসে বা পথে-ঘাটে। হেসেছে তারা। আমি চুপ করে থেকেছি। তাদের বলি নি ভিনসেণ্টের প্রাণচাঞ্চল্যের খবর। তার প্রাণপিয়াসা। শুধু মাঝে মাঝে মনে হত, তার সঙ্গে আমার দেখা হলে খুশি হতুম। শুনতুম তার নতুন খবর। তার নীড় বাঁধার স্বপ্নের সংবাদ। কিন্তু দেখা হত না তার সঙ্গে।

একদিন দেখা করতে গেলুম তার ডেরায়। দেখাও হলো। শুয়ে আছে সে। ময়লা তেল-চিটচিটে ছেঁড়া কাঁথা গায়ে জড়িয়ে। চোখে গভীর বিষণ্ণ শূন্যদৃষ্টি। সেদিনের কথা আমি ভুলতে পারি না। এমন ভয়ঙকর বিষণ্ণ শূন্যদৃষ্টি ভাষায় বর্ণনাতীত। ভয় লাগে দেখতে, প্রেতের মতো সর্বহারার মতো।

বল্লুম, 'কি ব্যাপার?'

'জ্বর হয়েছে।' শুয়ে শুয়ে সে বল্লে।

আমি যে এসেছি, তাতে যে সে খুশি হয়েছে এমন কোন আভাস নেই তার ব্যবহারে। সৌজন্যও নেই।

দেখলুম তাকে। দেখতে লাগলুম। উচ্ছৃঙ্খল কাগজ বই খাতা ডানা মেলে পড়ে থাকত তার পাশে, সে সব অদৃশ্য। ছবি রঙ তুলি ক্যানভাস ছত্রাকারে ছড়িয়ে ছিল, সব উধাও। শূন্যদৃষ্টি মানুষটার চারপাশটাও শূন্য।

বল্লুম, 'কি হলো ছবি বইপত্রের? সব গেল কোথায়?'

কিছুক্ষণ চুপ করে রইল সে। তারপর বল্লে, 'সব বিদায় করে দিলুম। জঞ্জাল বাড়িয়ে কি হবে? মেসের ঠাকুরকে দিয়ে দিয়েছি সব পুড়িয়ে ফেলতে।'

এমন কথা শুনবো আশঙ্কা করিনি। বল্লুম, 'এতদিনের সাধনা সব আগুনের তলায় গেল?'

'কি হবে, কি হবে লিখে, ছবি এঁকে? জীবন তো তার থেকেও বড়। নয় কি? সেই জীবনে আমি সর্বরিক্ত ব্যর্থ, ব্যর্থ।'

বড় সেণ্টিমেণ্টাল মনে হলো সেই মুহূর্তে। গাঢ় কণ্ঠ ভিনসেণ্টের, চোখের কোণায় জলের আভাস।

সিগরেট প্যাকেট থেকে একটা সিগরেট বার করে দিলুম। নিজেও ধরালুম। কিন্তু কথা বল্লুম না। হঠাৎ এমন কি হলো যাতে তার সর্বরিক্ততা, শুনতে বড় আগ্রহ। বিয়ের আগে, ভালোবাসার নিবিড়তম মুহূর্তে এমন গভীর নৈরাশ্যের বেদনায় কিছুটা চমকিত করল আমাকে। কিছু একটা ঘটেছে, অসাধারণ, তার প্রহারে প্রহারে ভিনসেণ্টের মনে এমন অশ্রুতরঙ্গ। কিন্তু সে-ই বলুক, বলুক তার মতো করে।

বল্লে, 'আপনি এসেছেন ভালই হয়েছে। নইলে দেখা হতো না আর।'

'কেন?'

'আমি চলে যাচ্ছি। চলে যাচ্ছি এই দেশ ছেড়ে আর কোথায়ও। যেখানে মন আছে, মমতা আছে, সহানুভূতি আছে।' আমার দিকে একবারও না তাকিয়ে সে বলতে লাগল।

'কিন্তু সুবর্ণ?' জিজ্ঞেস করলুম, 'সেও কি তাই বলে?'

বোবা বিষণ্ণ দুটো চোখ তুলে সে এবার তাকাল আমার দিকে। খোঁচা খোঁচা দাড়ি, পাণ্ডুর মুখ, হৃতরক্ত চেহারা।

বল্লে, 'সে চলে গেছে।'

'হঠাৎ!' অবাক হলুম আমি।

'সে জোচ্চর, ইতর, নচ্ছার। আমার অনেক কষ্টের একশ' টাকা তার কাছে রেখেছিলুম বিয়ের পরে দরকার হবে বলে, সেই টাকা নিয়ে সে পালিয়ে গেছে।'

সিগরেট প্যাকেটটা বাড়িয়ে বল্লুম, 'সিগরেট?'

'না থাকুক।' তার চোখের কোণে চিকচিক করছে কয়েক ফোটা জল। তারপর হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে গেল তার মুখ, মনে হলো যেন সহ্য করতে পারছে না মনের আবেগ। বল্লে, 'পালিয়ে গেছে এখানকার একটা উড়ে চাকরের সঙ্গে।'

কথা বল্লুম না।

'আশ্চর্য। সামান্য একটা চালচুলোহীন অশিক্ষিত চাকরের কাছে হেরে গেলুম আমি। আমার থেকেও তার অনেক বেশি দাম।'

কিসের জন্য তার বেদনা ঠিক বুঝতে পারলুম না। হার না হারানোর জন্যে। জীবনের হার না প্রিয়া হারানো। কার অপমান এসে রিক্ত করে দিল ভিনসেণ্টকে, তার সর্বত্যাগ তার সাধনার ভিত্তি নাড়িয়ে দিল।

তারপর অনেকদিন দেখা হয়নি। অনেক বছর। আমার জীবনে নানা দিনের মাথায় এসেছে নানান ঘটনার ফুল। দিনে দিনে পরিবর্তন ঘটেছে, গড়ে উঠেছে নতুন আমি। স্ত্রী ও কন্যা এসেছে সংসারে, বন্ধুদের পরিমণ্ডল সংকীর্ণ হয়েছে। ঘরের মধ্যে, নিজের কাজের মধ্যে বন্দী হয়েছি।

ভিনসেণ্টের খবর পাই নি অনেকদিন। ভুলেই গিয়েছিলুম তাকে। এমনি কতো মানুষই তো হারিয়ে যায় আমাদের

জীবন থেকে আমরা খেয়াল করতে পারি না, তার জন্যে দুঃখও অনুভব করি না।

বর্ধমান যাচ্ছিলুম একটা জরুরী কাজে। বড় ভিড়, ট্রেনের থার্ড ক্লাস কামরা। দুপুরের গরম, লোকের কলরব আর প্যাসেঞ্জার ট্রেনের মন্থর গজগমন-গতি। আমার মেজাজটা একটু রুক্ষ রুক্ষ। প্রত্যেক স্টেশনে থামছে ট্রেন, দাঁড়াচ্ছে দু' মিনিট চার মিনিট করে। দেড় ঘণ্টার পথ চলেছে তিন ঘণ্টায়। খবরের কাগজ বাসি হয়ে গেছে। লঘু একটা রসিকতার পত্রিকাও বহুবার পড়া হয়ে গেল। কিসে মন লাগাই, কিসে কাটাই একটু সময় আনন্দে, খুঁজে পাই না।

কান পেতে শুনছিলুম মাঝে মাঝে ফেরিওয়ালাদের চীৎকার। লজেন্স, বার-মিশেলী, তানসেনের গুলি, সব একঘেয়ে। ভিখিরীদের গানও সেই একই নাকি সুরের বীভৎস সঙ্গীতলহরী।

হঠাৎ কে চেঁচিয়ে উঠল কবিতা আবৃত্তি করে। তাকিয়ে দেখলুম। খাকি সার্ট ও হাফপ্যাণ্ট পরা। মুখে দাড়ি-গোঁফ, চোখে চশমা। অদ্ভুত পোশাক, ইংরেজি পোশাকের হাস্যকর বিদ্রূপ মনে হলো আমার কাছে।

কবিতা আবৃত্তি করতে লাগল সে সুর করে। অনেকটা রামায়ণ-মহাভারতের প্রাচীন রীতি পঠন-ভঙ্গীতে। একটা প্রকাণ্ড ব্যাগ ঝুলছে তার কাঁধে, আর গোটা দুই ছাপা চটি বই একহাতে।

চেঁচিয়ে সে আবৃত্তি করছে : 'শুনহ মানুষ ভাই, মার্কিন মুল্লুকের কথা মুক্ত-কণ্ঠে গাই। আইজেনহাওয়ার সে দেশেতে মস্ত বড়ো চাঁই, সর্বনাশা কালীর মতো নাচে ধাই ধাই॥' তারপর কটুকণ্ঠে যুক্ত-রাষ্ট্রকে গালাগাল, আইজেনহাওয়ার, ডালেস, ম্যাকার্থী কেউ বাদ যায় নি। তার সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে আরো কয়েকজন নানান দেশী রাজনীতিবীরদের।

আমি একটু চমকে গিয়েছিলুম মনে মনে। লোকটির রাজনীতিজ্ঞান দেখে। কবিতার মধ্য দিয়ে আধুনিক রাজনীতি ও কূটনীতির এমন ব্যাখ্যা ও ইঙ্গিত ছিল, যা আমাদের সাংবাদিকদের মধ্যেও অনেক সময় দুর্লভদর্শন।

অনেকেই কিনতে লাগল তার বই। ছ' পয়সার. কাব্য-রাজনীতি।

আমিও ডাকলুম, 'একটা দাও।'

কাছে এলে জিজ্ঞেস করলুম, 'কে লিখেছে এই কবিতা?'

বল্লেন, 'লেখা আছে বই-এর গায়ে।'

পড়লুম : শ্রীঅনাদি বসু এম এ। চিনতে পারলুম না কে এই লেখক।

সে বল্লে, 'চিনতে পারলেন না, আমি, আমিই লিখেছি।'

তাকিয়ে দেখলুম তার দিকে। চিনতে পারলুম না। মিটি মিটি হাসছে সে।

একটু পরে সে বল্লে, 'ভিনসেণ্টকে মনে আছে, কলকাতার, কয়েক বছর আগে।'

মনে পড়ল। দাড়ি-গোঁফ আর বিদ-ঘুটে পোশাকের আড়ালে চেনা গেল তাকে।

বিস্মিত হয়ে বল্লুম, 'আরে আপনি? চিনতে পারি নি তো। কি খবর আপনার? তারপর আর দেখা নেই।'

বল্লে সে, 'আপনাকে আমি দেখেই চিনেছিলুম। একই রকম আছেন দেখতে। এখন তো খুব নাম করেছেন।'

হাসলুম। 'তাই নাকি?'

বল্লে, 'যাবেন আমার বাড়ি? শক্তি-গড়েই থাকি। পরের স্টেশন। গেলে খুব খুশি হবো।'

মনে পড়ল সুবর্ণকে। মনে পড়ল কবিতা লেখা, ছবি আঁকা। কৌতূহল অনুভব করলুম খুব। সাধারণ গড্ডলিকার থেকে বাইরে অন্যরকম একটা জীবন। ট্রেনের ভিড়ে এই জীবনের কাহিনী শোনা যাবে না, নেমে বাড়ি গিয়ে আয়েশ করে শোনা যেতে পারে তার গল্প। হিসেব করলুম বর্ধমানের কাজ ও সময়। ঠিক করলুম যাব।

নামলুম শক্তিগড় স্টেশনে। কাঁধের ঝুলি নিয়ে নামল ভিনসেণ্ট।

জিজ্ঞেস রকলুম, 'কেমন চলে এই ব্যবসা?'

'ভাল। মাসে শ' দেড়েক টাকা লাভ থাকে। তবে পরিশ্রম একটু বেশি।'

'একটা অফিসে চাকরি নিলেও তো পারতেন।'

হাসল ভিনসেণ্ট। বল্লে, 'ফেরার পথে এর জবাব দেব।'

পূর্ব-বাংলার শরণার্থীদের একটা উপনিবেশ স্টেশন থেকে অদূরে একটা খোলা প্রান্তরে গড়ে উঠেছে। ছোট ছোট খুপড়ির ঘর, টিনের চাল, দরমার বেড়া। দু' লাইনে। তারই একটা বাড়ির সামনে আমাকে এনে দাঁড় করালো ভিনসেণ্ট। ডাকলো উচ্চকণ্ঠে, 'পটল, পটল।'

চার-পাঁচ বছরের একটা নগ্ন চপল ছেলে এসে কাঁধ জড়িয়ে ধরলো ভিনসেণ্টের। ব্যাগটাকে মাটিতে রেখে দু' হাতে ছেলেটাকে তুলে নিয়ে আকাশের দিকে একবার উঁচু করে ধরলো ভিনসেণ্ট, তারপর চুমোয় চুমোয় ভরে দিল তার মুখ।

হঠাৎ আমার পায়ের কাছে ছেলেটাকে বসিয়ে দিয়ে বল্লে, 'প্রণাম কর্, কাকাবাবু।'

ঢিপ করে প্রণাম করল ছেলেটা আমার পায়ে। তার চুলে হাতটাকে বুলিয়ে নিয়ে আমি একটু আদর করলুম তাকে।

আমাকে ডাকল ভিনসেণ্ট, 'আসুন।'

তাকে অনুসরণ করে একটা ছোট বাগানের পাশ দিয়ে গেলুম তার ঘরে। দরজা পেরোতেই চমকে উঠলুম, 'এতক্ষণে, এতক্ষণে এলেন বাবু। কতক্ষণ ধরে খিদেয় মরছি, গা ব্যথা করছে, কানছি বসে বসে। বাবুর এতক্ষণে আসার সময় হল। আড্ডাবাজ শয়তান কোথাকার। ভাতার এলেন, মরি মরি।'

কী সম্ভাষণ। কী কণ্ঠ। বিরক্ত বিস্ময়ে আমি তাকিয়ে দেখলুম ঘরের পাশে জানালার নিচে। ছোট একটা তক্তপোষে কাঁথা মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে একটা স্ত্রীলোক, মাথার একপাশ আগুনে পুড়ে গিয়েছিল একদা, সেখানে কুৎসিত ক্ষতচিহ্ন, চুল নেই। পোড়া দাগটা মাথার একাংশ থেকে ছড়িয়ে গেছে মুখের অর্ধেকখানি জুড়ে। একটা চোখ পুড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। ক্ষতচিহ্নের বীভৎসতা ছাড়িয়েও এমন কুৎসিত জঘন্য ভয়াবহ মনে হল স্ত্রীলোকটাকে, আমি চোখ ফিরিয়ে নিলুম।

ভিনসেণ্ট বল্লে চুপি চুপি, 'চিনতে পারছেন না, এই সুবর্ণ!' তারপর এগিয়ে গিয়ে বসলো তক্তপোষে, স্ত্রীলোকটির

হাতে হাত বুলিয়ে দিয়ে মৃদু কোমল গলায় বল্লে, 'একটু দেরি হয়ে গেল সুবর্ণ। মাপ করো। এক্ষুণি ভাত চড়িয়ে দিচ্ছি। তোমার জন্য কমলালেবু আর আঙুর নিয়ে এসেছি বর্ধমান থেকে। কলকাতা থেকে এক ডাক্তার এসেছেন তোমাকে দেখতে। আমার বন্ধু।'

'কই, কই ডাক্তার?'

বুঝতে পারলুম, এবার অনিবার্য ঘটনাচক্রে আমাকে এগিয়ে যেতে হবে, অভিনয় করতে হবে ডাক্তারের। একটু রাগও হল ভিনসেণ্টের উপর এবং যা ঘটছে, সমস্ত ঘটনার ওপর বিতৃষ্ণা।

তবু এগিয়ে গেলুম। বল্লুম, 'এই যে . তারপর অকারণেই জিজ্ঞেস করলুম, 'এখন কেমন আছো?'

'খারাপ, খারাপ। কী জঘন্য লোকের হাতে পড়েছি দেখতেই পাচ্ছেন।'

ঘৃণায় চোখটাকে সরিয়ে নিলুম। ভিনসেণ্টকে বল্লুম, 'আমার দেখা হল, এবার চলুন বাইরে যাই।'

বাইরে বেরিয়ে এলুম আমরা।

বল্লুম, 'আমাকে এগিয়ে দিন একটু। এবার স্টেশনে যাবো।'

বিকেলের ম্লান আলো এসে পড়েছে চারদিকে। আমার মনে হল, পান্ডুর বিবর্ণ চারদিক। নৈরাশ্যের বিষণ্ণতা আমার মনে পাখা উড়িয়ে গেল। ভাবলুম, ভিনসেণ্টের এই রূপ দেখার চেয়ে হয়তো না-দেখাই ভালো ছিল। তার আগেকার সর্বরিক্ততা যেন এর চেয়ে অনেক বেশি শোভন, অনেক বেশি সহনীয়।

হাঁটছিলুম ঘাসের ওপর দিয়ে নির্বাক স্তব্ধতায়। দুজনে। কঠিন, কঠিন মনে হল ভিনসেণ্টের মুখ।

হঠাৎ সে আমার দু'হাত জড়িয়ে ধরল। বল্লে, 'আপনাকে এনে অনেক কষ্ট দিলুম। আপনি হয়তো রাগ করলেন।'

'না-না। সে কী।'

'আপনাকে এখনও একটা কথা বলা হয়নি। সেই যে সুবর্ণ আমার একশ' টাকা নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল একটা চাকরের সঙ্গে, আপনার মনে আছে কি?'

'হ্যাঁ।'

'তারপর অনেকদিন দেখা হয়নি সুবর্ণের সঙ্গে। ঘুরে বেড়িয়েছি নানা জায়গায়, নানা রূপে। একদিন দেখা হয়ে গেল সুবর্ণের সঙ্গে বোলপুরে। একটা রাস্তায় বসে ভিক্ষে করছে।'

'কেন?'

'সেই চাকরটা কিছুদিন পরেই সুবর্ণকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। যাবার আগে দিয়ে গেছে আগুনে পোড়া মুখ আর একটা অবাঞ্ছিত ছেলে। আত্মহত্যা করে মরতে গিয়েছিল মেয়েটা। তাই পুড়ে গেছে মুখ আর শরীরের অনেকখানি জায়গা। আমি যখন দেখলুম, তখন তার শরীরের অবস্থা কাহিল। যক্ষ্মা এসে বাসা বেঁধেছে বুকে। নিয়ে এলুম তাকে রাস্তা থেকে এ-বাড়িতে। ছেলেটার নাম রাখলুম পটল। পটলকে তো আপনি দেখেছেন।'

শুনছি ভিনসেণ্টের কথা। বিকেল আরও ম্লান হয়ে অন্ধকারের ঘোমটা পরে নেমেছে দিগন্তরেখার কাছাকাছি গ্রামের বাড়ি আর গাছগুলিতে।

'সুবর্ণকে ভালো বেসেছিলুম, সে তো জানেন। আমার মনে হল, সুঠাম দেহ যে সুবর্ণকে দেখেছি, ভালোবেসেছি, পেতে চেয়েছি, কুৎসিত দেহের সুবর্ণ তো তারই পরিণত রূপ। দু' রূপে তো একই ব্যক্তি। ব্যক্তিকেই তো ভালোবেসেছি আমি, রূপকে নয়। তাহলে কুরূপ সুবর্ণকে পরিত্যাগ করা তো পাপ। কি বলেন?'

কী বলব আমি। চুপ করে আছি।

'সুবর্ণের শরীরটা খারাপ, তাই মেজাজটা বিশ্রী হয়ে উঠছে দিন দিন। আপনি ওকে মাপ করবেন, অনেক দুঃখ পেয়েছে সে, দুঃখে-দুঃখে এখন এমন কুৎসিত হয়ে গেছে। কিন্তু এই সুবর্ণকে পেয়ে আমি ফিরে পেয়েছি কবিতা। কবিতা লিখে এখন বিক্রি করি ট্রেনে ট্রেনে। কবিতা আজ আমাকে জীবিকা দিয়েছে।'

তাকালুম তার দিকে। মনে হল, যেন অনেকদূর থেকে কথা বলছে সে, চোখে তার অনেক দূরের মায়া।

'সুবর্ণকে ভালোবেসেছিলুম। আজ বাসি কিনা জানি না। একান্ত করে পেতে চেয়েছিলুম কবিতা, কবিতার জন্যে এখন সুবর্ণকে সহ্য করতে কষ্ট হয় না। ঠিক কী যেন বলতে চাই, জট পাকিয়ে যাচ্ছে। বুঝিয়ে বলতে পারছি না আপনাকে। আপনি তো লেখক মানুষ, ঠিক বুঝে নেবেন দয়া করে। ওই যে সিগন্যাল ডাউন হল লাইনে, এবার গাড়ি আসবে। চলুন যাই, টিকিটটা কিনে নেবেন।'

টিকিট কিনে গাড়িতে চেপে বসলুম। যতক্ষণ গাড়ি দাঁড়াল স্টেশনে, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল ভিনসেণ্ট আমার জানালার পাশে।

হুইসেল বাজল, গাড়ি আস্তে আস্তে চলতে শুরু করছে। গাড়ির সঙ্গে হাঁটছে ভিনসেণ্ট। তার হাতটা নিজের হাতের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে বল্লুম আস্তে আস্তে, 'আপনার মঙ্গল হোক।'

গাড়ি দ্রুত চলতে আরম্ভ করেছে। অন্ধকারের ঢেউ ভেঙে একচোখ জ্বালিয়ে ছুটছে ক্রুদ্ধ বাঘের মতো গর্জন করতে করতে।

আমি ভাবছিলুম ভিনসেণ্টের কথা। মনের মধ্যে অস্পষ্ট একটা প্রার্থনা গুঞ্জন করতে লাগল। অনুভব করছি প্রার্থনার শিরশির, কিন্তু বুঝতে পারছি না কী আমার প্রার্থনা। সুখ, সাফল্য, প্রেম, শান্তি, কি কামনা করছি আমি ভিনসেণ্টের জন্য। কি পাবে সে। কি পাবে জীবনে। জানি না।

সাগর-তীর্থ

সোমনাথ ভট্টাচার্য

সগর বংশ উদ্ধার হল। মহর্ষি কপিলের কোপানলে ভস্ম সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র দেবী সুরধুনীর পুণ্য স্পর্শ পেয়ে স্বর্গে গমন করলেন। সিদ্ধ হল ভগীরথের সুদীর্ঘ সাধনা। গঙ্গার আশীর্বাদ নিয়ে ভগীরথ রাজ্যে ফিরে গেলেন হৃষ্ট মনে। গঙ্গা সাগরের সঙ্গে মিলিত হলেন। আর সেই থেকে—

"মহাতীর্থ হইল সে সাগরসঙ্গম।
তাহাতে যতেক পুণ্য কে করে সে ক্রম॥
যে গঙ্গাসাগরে নর স্নান দান করে।
সর্বপাপে মুক্ত হয়ে যায় স্বর্গপুরে॥"

প্রয়াগও তীর্থ। সেখানেও আছে, 'প্রয়াগে মুড়িয়ে মাথা, মরগে পাপী যেথা সেথা।' কিন্তু পুণ্যের বিচারে গঙ্গাসাগরই বোধ হয় ভারতের সব সেরা তীর্থ। মহাতীর্থ। তাই 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার।' সমস্ত জীবনে গঙ্গাসাগরে একবার স্নানই যথেষ্ট। মকর সংক্রান্তির যোগে গঙ্গাসাগরে স্নান করলে নাকি কোটি গো-হত্যার পাপও স্খালন হয়।

মনে আছে, এখানকারই একজন পদস্থ ব্যক্তি কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, 'এদিকে তো স্যার আইন করে গো-হত্যা বন্ধ করবার আন্দোলন করছেন। কিন্তু গো-হত্যা পাপ না করলে তো আর এই নির্বান্ধব পুরীতে শখ করে হাওয়া খেতে কে আসবে বলুন। আর তখন আমাদের কি অবস্থা হবে ভেবে দেখেছেন।'

হাসির ছলেই কথাটা বলেছিলেন ভদ্রলোক। কিন্তু কোথায় যেন বিদ্রূপের একটা বাঁকা কটাক্ষ ছিল। সেদিন তাকে উত্তর দিতে পারিনি। শুধু মনে প্রশ্ন জেগেছিল, এত লক্ষ লক্ষ লোক তবে কিসের আশায় এত কষ্ট করে ছুটে ছুটে আসে? সবই কি নিরর্থক? সবই কি অন্ধ সংস্কার?

এ প্রশ্নের উত্তর পাইনি কারো মুখের কথায়। এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর শুধু দেখেছি লক্ষ লক্ষ স্নায়ীর মুখের প্রশান্তি আর তৃপ্তির মাঝে।

কলকাতা থেকে সাগরসঙ্গমের দূরত্ব খুব বেশী নয়। পঁচাশি থেকে নব্বই মাইলের মত। পুণ্যার্থীরা এ পথ অতিক্রম করেন বিভিন্ন উপায়ে। ভিন্ন ভিন্ন যানবাহনে। কলকাতার বিভিন্ন ঘাট থেকে স্টীমারে যাওয়া যায় সোজা। ঘণ্টা বারোর মত সময় লাগে। স্টীমারে চড়া ব্যয়সাপেক্ষ। তাই কাকদ্বীপ পর্যন্ত গিয়ে বাকী পথটা বোট, নৌকা বা ডিঙিতে অতিক্রম করেন বেশীরভাগ পুণ্যার্থী। এ পথটাই সনাতন। আর এ পথটাই বিপদসংকুল। এমনও শোনা যায় সাগরের প্রতি অতিরিক্ত ভীতির জন্যে অনেক পুণ্যার্থী নিজের শ্রাদ্ধশান্তি পর্যন্ত চুকিয়ে যান কাকদ্বীপেই। অবশ্য বর্তমানে এমন ঘটে ক্বচিৎ।

মাঝিকে জিজ্ঞেস করুন, কতক্ষণ সময় লাগবে। হাল চেপে ধরে মাঝি বলবে, 'তা কি আর সঠিক কওন যায় বাবু। লৌকো ওইলো গে' আপনের বাতাসের গুড়া। পালে বাতাস লাগলো তো কুথায় থ্যাকলো রিস্টিমার। তবে এ্যাঁ, পালে বাতাস যদি একবার খ্যালে আর সমুন্দুরে লিশানা যদি ঠিক থ্যাকে তবে লয় দশ গণ্টা। আর লিশানা যদি আরায়—।'

কথাটা থামিয়ে মুখে একটা অদ্ভুত শব্দ করবে মাঝি। এতেও আপনার বুক না কাঁপলেও সীমাহীন বড় গাঙে গিয়ে পীর বা আল্লার হাতে নৌকা ছেড়ে দিয়ে মাঝি-মাল্লারা যখন সমস্বরে উচ্চগ্রামে হাঁক তুলবে 'হরি হরি' কিংবা 'বদর বদর'

গঙ্গাসাগর মেলার একটি দৃশ্য

ভিক্ষাভাণ্ড হাতে বালকৃষ্ণ

তখন আপনি যত বড় সাহসীই হন না কেন, আপনার বুক কেঁপে উঠবেই।

কাকদ্বীপ থেকে নৌকায় উঠতে বেশ খানিকটা কাদা ভাঙতে হয় যেমন, সাগরদ্বীপে তেমনই নামতে হয় হাঁটুভর জলের মধ্যে। নৌকার আরোহী ছাড়া যারা স্টীমারে এসেছেন দামী টিকিট কিনে তাদেরও। তীর্থের ভোগ ধনী-দরিদ্র সকলকে সমানভাবেই পোহাতে হয়।

নামে কাকদ্বীপ দ্বীপ হলেও ভূগোলের সংজ্ঞায় 'চারিদিকে জল বেষ্টিত সাধারণ ভূখণ্ড নয়।' কিন্তু সাগরদ্বীপ দ্বীপ-ই। দ্বীপে নেমেই মনে হয় এ দ্বীপে বোধ হয় বসতি নেই। জন-বসতি আছে। তবে সেটা বেলাভূমি থেকে মাইল তিনেক দূরে। মহর্ষি কপিলের মন্দির দ্বীপের বালুকা-বেলার ওপর। ভাদ্র আশ্বিন মাসে সাগরের জল হানা দেয় মন্দিরের বেদীমূল পর্যন্ত। এই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই পৌষ মাসের মকর সংক্রান্তিতে বসে মেলা।

মহর্ষির মন্দিরের গঠন ভঙ্গীতে অসাধারণত্ব নেই কিছুই। এমন অনেক মন্দির দেখা যায় বাংলা দেশের পথের মোড়ে মোড়ে। মন্দিরের মধ্যে, মাঝখানে আছে মহর্ষির মূর্তি। তাঁর দক্ষিণে রাজা সগর ও বামে ভগীরথ। মন্দিরের পাশেই খোলা জায়গায় আছে সুন্দরবনের ব্যাঘ্র-দেবী বাঘেশ্বরীর মূর্তি আর সগর রাজার সেই বিখ্যাত অশ্বমেধের অশ্বের মূর্তি। সব মূর্তি ক'টিই পাথরের। পাথরের উপর লাল রং করা। প্রতি বৎসর সংক্রান্তির আগে মন্দির মেরামত করতে হয়। কলি ফেরাতে হয়।

সারা বছরে বড় জোর দিন কুড়ির মত সময় এই বালুময় বিশাল বেলাভূমি মুখরিত হয়ে ওঠে জন কোলাহলে। তারপর মন্দির এই বিশাল বেলাভূমি, সবই পড়ে থাকে গভীর নির্জনতায়। সাগরের ঢেউ এসে শুধু বন্ধুত্ব জানিয়ে যায়। ঝোপঝাড় গজায়। রাত্রে গো-বাঘ এমনকি মাঝে মাঝে দু-একটি নেকড়েও নির্ভয়ে রাত্রি যাপন করে যায় মন্দির চত্বরে। বেশ খানিকটা দূরে থেকে একজন পূজারী এসে কোনক্রমে নম নম করে পূজা সেরে যান। আষাঢ় থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত তিনিও আর আসতে পারেন না। জলের মধ্যে লুকিয়ে থাকে সারা বালুপ্রান্তর। সেই সময় পূজার ভার নেয় সাগর স্বয়ং। মাথা নুইয়ে সাগরের ঢেউ এসে কোটি কোটি প্রণাম জানিয়ে যায় মহর্ষির বেদীমূলে। উত্তাল ঢেউয়ে ঢেউয়ে গম্ভীর মন্ত্রধ্বনির আওয়াজ ওঠে।

মহর্ষির মন্দিরের উত্তরে কিছু দূরে আছে আরো দুটি ছোট ছোট আশ্রম। একটি আশ্রমে আছে কালীমূর্তি। আর একটি নাগা সন্ন্যাসীদের আশ্রম। এঁরা পূজা করেন শিবলিঙ্গ। এই আশ্রম দুটিতে সারা বছরই বাস করেন কয়েকজন পূজারী। পুণ্যার্থীরা স্নান ও মহর্ষির দর্শন সমাপন করে এখানেও দর্শন করে যান। কাঠের একটি সাঁকো পেরিয়ে এখানে আসতে হয়। কয়েক বছর আগে অতিরিক্ত ভিড়ের চাপে আগের দুর্বল সাঁকোটি ভেঙে ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটিয়েছিল। বর্তমানের কাঠের সাঁকোটি নতুনভাবে ও সুদৃঢ় করে তৈরী করা হয়েছে। তবুও খুব সাবধানে এখানকার ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

স্বামী কপিলানন্দকে নিয়ে মিছিল চলেছে

রাস্তার দু'পাশে উলঙ্গ নাগা সন্ন্যাসী

মকর সংক্রান্তিতে স্নান উপলক্ষেই এখানে মেলা বসে। এত বড় মেলা সারা ভারতে কয়েকটির বেশী বসে না। বলতে গেলে এই মেলাই সাগরসঙ্গমের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ। যদিও এ মেলার বৈশিষ্ট্য নেই কিছুই। বাংলাদেশের নিতান্ত অজ পাড়াগাঁর মেলাতে যা পাওয়া যায় এখানেও তার বেশী কিছুই মেলে না। শুধু আয়োজনটাই হয় বৃহৎ। পুণ্যার্থীরা স্নান সেরে দর্শনীয় যা কিছু দর্শন করে যাবার সময় মেলা দেখে যান। প্রয়োজন মত কেনেন-কাটেন। বলা বাহুল্য একটু বেশী দাম দিয়েই। কিন্তু তাতে এসে যায় না কিছুই। আনন্দের হাটে এসে কেউ তুলাদণ্ড ধরেন না।

মকর সংক্রান্তির দিন পনের আগে থাকতেই নির্জন সাগরদ্বীপে আস্তে আস্তে জনসমাগম হতে থাকে। প্রথমেই আসেন দোকানদাররা তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে। একটি, দুটি করে হোগলার চাল-দেওয়া ঘর উঠতে থাকে। তৈরী হয় ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডের অফিস, পোস্ট ও টেলিফোন অফিস, হাসপাতাল, ডাক্তারখানা, সবই হোগলার ঘর। সবই অস্থায়ী।

বভিন্ন সংঘ, পরিষদ এসে তাদের এলাকা ঘরে নেয়।

স্নানের দিন পাঁচ ছয় আগে থাকতেই পুণ্যার্থীরা আসতে থাকেন। এক বর্গ-মাইল মেলার এলাকা ছেয়ে যায় হোগলার রে ঘরে আর মানুষজনের মাথায় মাথায়। স্নানের দিন পর্যন্ত পুণ্যার্থীদের আসার বরাম থাকে না। হাজার হাজার ছোট বড় নৌকা সাগরের তীরে রীতিমত ব্যূহ রচনা করে। বহু কসরত করে আগন্তুক নৌকাকে এর মধ্যে দিয়ে জায়গা করে নিতে হয়। যাত্রিবহুল স্টীমার আসে একের পর এক। তাদের 'বার জলে' অপেক্ষা করতে হয়।

পুণ্যার্থী যারা আসেন, তারা অন্তত একটি রাত কাটিয়ে যান এখানে। মাথা গোঁজবার জন্য হয় তারা ভাড়া নেন ছোট ছোট ঘর, নয়ত নিজেরাই হোগলা কিনে মাথা গোঁজবার একটা আস্তানা করে নেন।

দোকানদার পুণ্যার্থী ছাড়াও আসেন হাজারে হাজারে সাধুসন্ন্যাসী। আর ভিখারী। সাধুসন্ন্যাসীরা ভস্ম মাখা শরীরে রাস্তার দুধারে ধুনি জ্বালিয়ে বসে যান। উলঙ্গ নাগা থেকে সবশ্রেণীর সাধুসন্ন্যাসীই আসেন। পুণ্যার্থীদের আকৃষ্ট করবার পন্থাগুলিও এদের ভিন্ন ভিন্ন।

সাধু-সন্ন্যাসী ছাড়াও রাস্তার দু-পাশে অন্ধ, খঞ্জ, বিকলাঙ্গ, কুষ্ঠ রোগ-গ্রস্ত ভিখারীদের ভিড় পড়ে যায়। এর মাঝেই আবার দেখা যায় শিশু ভোলানাথ কি বালকৃষ্ণ মন্থরগতিতে চলেছে ভিড়ের মধ্যে দিয়ে। বেশ লাগে দেখতে। কিন্তু যেই এরা সামনে এসে ভিক্ষাভাণ্ড এগিয়ে দেয়, তখনই হৃদয়ের কোন বেদনার তন্ত্রীতে টন টন করে টান ধরে। নিজের অগোচরেই পকেটের মধ্যে হাত চলে যায়। দিতে হয় যা হয় কিছু।

কিন্তু এ সাধুসন্ন্যাসী আর ভিখারী-দের জন্যেই আবার বিপন্ন হয়ে পড়ে লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর নিরাপত্তা। এরা না মানেন স্বাস্থ্যের কোন রীতিনীতি না মানে কিছু। মেলার বাইরেই পৃথক মলমূত্র ত্যাগ করার জায়গা নির্দিষ্ট করা আছে। এ সত্ত্বেও এঁরা যেখানে সেখানে মলমূত্র

অসংখ্য নৌকা এসে ভিড় জমিয়েছে সাগরের তীরে

ত্যাগ করেন। এমনও দেখেছি মেলার প্রধান রাস্তার ওপর রাত্রির নির্জনতায় এরা এই কাজগুলি করছেন। অসুবিধে কিছু নেই। বালি চাপা দিয়ে দিলেই হল। এই সমস্ত মলমূত্র পুণ্যার্থীদের পায়ে পায়ে ছড়িয়ে যায় সারা মেলায়। আর তার সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে সর্বনাশা সমস্ত রোগের বীজাণু। শুধুমাত্র সাধু-সন্ন্যাসী বা ভিখারী নয় অনেক পুণ্যার্থীও এ দোষে দুষ্ট।

আনন্দের কথা অন্যান্য বারের তুলনায় এবার মেলায় জনসমাবেশ বেশি হলেও বিভিন্ন সংঘ ও পরিষদের প্রচেষ্টায় কোন প্রকার রোগেরই প্রকাশ হয়নি। এ সার্থক প্রচেষ্টা ও উদ্যোগের পেছনে যারা আছেন, তাদের ধন্যবাদ জানাই।

স্নানের যোগ শেষ হলেই শুরু হয় ভাঙনের পালা। স্নান সেরেই অনেকে ঘরে ফেরার জন্য নৌকা বা স্টীমারে উঠে বসেন। তিন চার দিনের মধ্যেই সমস্ত পুণ্যার্থীরা ঘরের দিকে পা বাড়ান। আর এই সময়েই অবস্থা হয়ে ওঠে শোচনীয়। দিনে দিনে জমা ভিড় দু তিন দিনের মধ্যেই মেলা ছেড়ে যেতে

সাগরতীর্থের মেলার দৃশ্য

চায়। হৈ-হুল্লোড় মারামারি, শাপ-মন্যি, খিস্তি-খেউড়ের প্লাবন বয়ে যায়। তাছাড়া এতদিনকার জমা মলমূত্র থেকে দুর্গন্ধ উঠতে থাকে। আর্তনাদের মত লাউড-স্পীকারে শোনা যায়, 'আপনারা আজই মেলা ছেড়ে চলে যান। আপনাদের কাছে আমরা হাত জোড় করে অনুরোধ করছি। সমস্ত মেলা ভয়াবহ বীজাণুতে ভরে গেছে।' ইত্যাদি।

পুণ্যার্থীরা চলে গেলেও মেলা থাকে আরো দিন সাতেক। এ সময়ের ক্রেতা স্থানীয় জনসাধারণ। দোকানদাররা লাভ ছেড়ে তখন কোনরকমে জিনিসপত্র বেচে চলে যেতে চায়। সুতরাং পড়তির বাজারে স্থানীয় জনসাধারণের পড়তা পড়ে ভাল।

ফেরার সময়টা পুণ্যার্থীদের পক্ষে সত্যিই অত্যন্ত করুণ। আসার সময় আসা গেছিল একটা তীব্র আকর্ষণে। সে আকর্ষণ শেষ হয়েছে। মা গঙ্গা নিজের বুকে টেনে নিয়েছেন লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর সারা জীবনের জমান পাপ-তাপ, ক্লেদ। পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে। এবার ঘরের টান—সংসারের টান। নৌকা বা স্টীমার চলে ঢিকিয়ে ঢিকিয়ে। আর তখনই মনে হয়, এ পথ-টুকু যদি নিমেষে পার হওয়া যেত। পুণ্যার্থীদের এ অবস্থাটা ভারি চমৎকার ফুটে উঠেছে কবিগুরুর 'দেবতার গ্রাসে'।

কৌতূহল অবসান,
কাঁদিতেছে রাখালের গৃহগত প্রাণ
............জল শুধু জল
দেখে দেখে চিত্ত তার হয়েছে বিকল।

অনেক তীর্থের মত সাগরতীর্থে আসা সহজ নয়। কিন্তু তবু যিনি আসেন, সাগরসঙ্গমে স্নান করবার সময় বলেন, 'মা আবার যেন আসতে পারি।'

এমনও অনেককে দেখেছি যারা এই নিয়ে দশ-এগারবার এলেন ঐ তীর্থে। তিন থেকে পাঁচবার তো অনেকেই। কিসের আকর্ষণে যে তারা ছুটে ছুটে আসেন, তা তারা নিজেরাও জানেন না! শুধু পুণ্যার্থীদের সারা জীবনের কামনা থাকে—

"বাস করব নগরে।
মরব গিয়ে সাগরে॥"

আরতি রায়ের কথা লিখতে কেমন সংকোচ বোধ করছি। হাইকোর্টের বারান্দায় একদিন আরতির মা দুটি হাত ধরে বলেছিলেন, "বাবা, এ সব যেন কাগজে বার না হয়।" রিপোর্টারদের সন্ধানী দৃষ্টি থেকে আরতিকে আড়াল করে রাখতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছিল। বেচারার সুন্দর মুখের দিকে চেয়ে মনে হয়েছে, এমন মেয়েকেও ভাগ্য-দোষে আদালতে আসতে হয় আর অসংখ্য লোকের কুতূহলী চোখের সামনে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। খবরের কাগজে সে ঘটনার প্রকাশ ও প্রচার কাটা ঘায়ে নুনের ছিটের মতো।

প্রথম দিনে আরতি এসেছিল এটর্নি মিস্টার বদ্যিনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে, তার পিছনে ছিলেন এক মধ্যবয়সী বিধবা ভদ্রমহিলা। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এঁদের আসার কারণ এই সদ্যোযৌবনা, নিষ্পাপ-দৃষ্টি মেয়েটি। কুমারী মেয়ে, দুধের মত গায়ের রঙ। কোন নিপুণ চিত্রকর সূক্ষ্ম তুলিতে পরম যত্নে যেন টানা টানা ভুরু দুটি এঁকে দিয়েছেন; মখমলের মতন নরম তুলতুলে শাড়ির উপর ফারকোট পরা আরতি অবাক দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকাচ্ছিল। ইংরেজ গৃহস্থের বাড়িতে সম্ভবত এই প্রথম পদার্পণ।

আরতির মাও বয়সকালে নিশ্চয়ই সুন্দরী ছিলেন। গরদের চাদরের ভিতর হাত দুটি লুক্কায়িত। প্রথমে বুঝিনি, পরে লক্ষ্য করলাম তাঁর এক হাতে গেরুয়া রঙের ছোট্ট থলে। তারই ভিতর আঙুল ঢুকিয়ে তিনি মালা জপছেন, সঙ্গে সঙ্গে ঠোঁট নড়ছে অতি ধীরে। সকলকে বসতে দিয়ে জানালাম সায়েব এখনি আসছেন। আরতির মা চারিদিক দেখতে লাগলেন। টেবিলের উপর ভগবান বুদ্ধের ধ্যানস্থ মূর্তি, পাশেই পিতলের নটরাজ, প্রলয় নর্তনে মত্ত। দরজার পাশে আর একটি পর্দায় চীনা ড্রাগনের ছবি; প্রাচীন চীনা শিল্পকর্মের সুন্দর নিদর্শন। বদ্যিনাথ-বাবুর পাশের ছেলেটিরও বয়স বেশী নয়। তার অবয়বের সাদৃশ্য থেকে যে কেউ বলতে পারে ওরা ভাই বোন। আরতির মা ডাকলেন, "দেখ চাঁদু, এরা হিন্দু নয়, কিন্তু ঘর-সংসার কেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে।" চাঁদু আমার উপস্থিতিতে সংকোচ বোধ করে কোন উত্তর না দিয়ে মাকে ইঙ্গিতে থামতে বলে। সায়েব ঘরে ঢুকতেই সকলে চুপ।

আরতির মা হাত জোড় করে কাঁদ-কাঁদ স্বরে বাংলায় বললেন, "বাপ মরা মেয়ে, এর কষ্ট আমি আর দেখতে পারছি না। আপনাকে রক্ষে করতেই হবে।" সায়েব বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে তাকান। "কি হয়েছে? খুন জখমের মামলা নাকি?"

বৈদ্যনাথবাবু উত্তর দিলেন, "দাম্পত্য অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার মামলা করেছে একজন আরতির বিরুদ্ধে।"

চমকে সায়েব আরতির দিকে চাইলেন, সিঁথিতে সিঁদুর নেই, কে বলবে বিবাহিতা।

আরতির মা কান্নায় ভেঙে পড়া অবস্থায় বললেন, "সিঁদুর কপাল থেকে মুছে দিয়েছি। ওর বিয়ে হয়ে গেছে ভাবতেই বুকের ভিতরটা মুচড়ে ওঠে।"

আরতির সেদিকে লক্ষ্য নেই। সে একমনে দেওয়ালে টাঙানো ছবিগুলো দেখছে।

গোপন কোন আলোচনা হবে বুঝতে পেরে আমি বেরিয়ে গিয়ে সায়েবের শোবার ঘরে বসলাম। দরজা ভেজান, ভিতরে কথা চলছে। মাঝে মাঝে দু-একটি অংশ বিক্ষিপ্ত হয়ে ভেসে আসে। মিনিট কুড়ি কেটে গেছে, সায়েব আমাকে ভিতরে ডাকলেন।

"আপনারা সবাই পাশের ঘরে অপেক্ষা করুন।" সায়েব উপস্থিত সবাইকে বললেন, আরতি ছাড়া সবাই ঘর ছাড়ল। বদ্যিনাথ-বাবুও, তবে সম্ভবত অনিচ্ছা সহকারে।

"দোভাষীর কাজ করতে পারবে?"

আমি অবুঝের মত চেয়ে থাকি। দূরে সোফার এক কোণে আরতি মুখ নীচু করে বসে।

"আত্মীয়স্বজন সামনে থাকলে নিজের মনের কথা খুলে বলতে পারে না অনেকে। তাই সবাইকে বার করে দিয়েছি। মেয়েটির নিজের মুখ থেকে সব কিছু শোনা প্রয়োজন।"

"বদ্যিনাথবাবুও চলে গেলেন কেন?"

"কোন প্রশ্ন করলে মক্কেলের হয়ে উনিই উত্তর দিয়ে দেন, এই স্বভাব আরও বিপজ্জনক।"

"কোনো দিন দোভাষীর কাজ করিনি।"

"কোন চিন্তা নেই। আমি যা জিজ্ঞাসা করব, তোমাদের ভাষায় আরতিকে তা বুঝিয়ে দাও, তারপর ওর উত্তর বাংলা থেকে ভাষানুবাদ। ভাবানুবাদ নয় কিন্তু।"

"আরতি" সায়েব ডাকলেন।

আরতি যেন ভয় পেয়েছে, লজ্জাবতী লতার মত সংকুচিতা। তার দৃষ্টি মেঝেতে নিবদ্ধ।

"আরতীদেবী, আপনি ইংরেজী জানেন কিনা সায়েবকে বলুন।"

আরতি আমার মুখের দিকে করুণ-ভাবে চাইল। বাঙালী ঘরের মেয়ে, তার অবস্থা খানিকটা বুঝতে পারি। শেষে খুব আস্তে বলে, "না, সায়েবদের ইংরেজী বুঝি না।"

"বাঃ, এই তো কথা ফুটেছে," সায়েব সানন্দে বললেন।

"ইস্কুলে পাঠায় নি মা?"

"হ্যাঁ, ক্লাস নাইন।" আরতির উত্তর আমাকে অনুবাদ করতে হয় না।

আরতিকে বলি, "সায়েব বলছেন, এখানে কোন লজ্জা করবেন না। আপনার মা ভাই কেউ নেই, সুতরাং আপনার মনের ঠিক কথাটি সায়েবকে বলে দেবেন। তা হলেই সায়েবের পক্ষে কেস্ করা সহজ হবে।"

আরতি চুপ করে থাকে। চারিদিকে একবার চেয়ে দেখে, জানাশোনা কেউ আছে কি না। রুমালে চোখ মুছতে থাকে সে।

"Is her husband a beautiful person? Did she love him, after the marriage?

আরতিকে বাংলায় জিজ্ঞাসা করতে আমি নিজেই সংকোচ বোধ করি। অনেক নিষিদ্ধ আলোচনা সহজেই ইংরেজীতে করা যায়, কিন্তু নিজের মাতৃভাষায় একটি অপরিচিতা যুবতীকে বাংলায় জিজ্ঞাসা করতে কেমন বাধা আসে।

সায়েব জিজ্ঞাসু চোখে তাকান, "কি হোল? গো অন্ গো অন্। সময় নষ্ট ক'র না।"

আর এক মুহূর্ত সময় নষ্ট হলেই সায়েব রেগে যাবেন। যথাসম্ভব গাম্ভীর্য রক্ষা করে জিজ্ঞাসা করি, "আরতিদেবী আপনার স্বামীটি দেখতে কেমন? বিয়ের পর তাঁকে পছন্দ হয়েছিল?"

আরতি মাটিতে মিশিয়ে যেতে চাইল। লজ্জা ও ভয়ের যুগপৎ সংমিশ্রণে চোখ দুটি লাল হয়ে উঠল। রুমালে সেণ্ট ছিল, তাই চোখ মোছার সময় তার গন্ধ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। আরতি কোন উত্তর দেয় না।

"বলুন। লজ্জা কী? সায়েব আপনার দাদুর বয়সী।"

আরতি তবুও নিরুত্তর। বেচারা কান্নায় ভেঙে পড়েছে, "মা কোথায়? আমি মায়ের কাছে যাব।"

ঘড়ির দিকে চাইলাম, মিসেস বোস্টনের আসার সময় হয়েছে। সায়েব বললেন, "আজকের মতো থাক।"

আরতির মা শনিবারে আসবেন বলে বিদায় নেন। বাড়ির সামনে অপেক্ষমান ট্যাক্সিতে তাঁদের তুলে দিয়ে ফিরে আসি।

"মিস্টার ইণ্টারপ্রেটার, খুব ভাল কাজ করেছ। আরতি তোমাদের দেশের খাঁটি মেয়ে। প্রথম সংকোচ। অনেক মেয়েকে কলকাতায় প্র্যাকটিস আরম্ভর পর থেকে কাঁদতে দেখেছি, তাদের কেউ কেউ শেষ পর্যন্ত হাসিমুখে বিদায় নিয়েছে। কিন্তু অনেকেরই চোখের জল মোছাতে পারিনি।" সায়েবের কণ্ঠ কেমন উদাস।

ইতিমধ্যে মিসেস বোস্টন এসে গেছেন। বছর পঁচিশের রুপসী ও স্বাস্থ্য-বতী এ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়ে। ক্লান্ত মুখশ্রী। হাতের ভ্যানিটি ব্যাগটায় মাঝে মাঝে চাপ দিচ্ছেন।

"গুড্ ইভনিং মিসেস বোস্টন। সোজা অফিস থেকে আসা হচ্ছে নাকি?"

"হ্যাঁ, বাড়ি ঘুরে আসতে হলে পাছে দেরি হয়।"

"তাহলে চা মন্দ লাগবে না।"

ধন্যবাদান্তে মিসেস বোস্টন জানালেন চা পানে আপত্তি নেই।

চায়ের কাপ সামনে রেখে কথা চলে। মিসেস বোস্টনের কথায় ও ভাবে কোন জড়তা নেই। কে বলবে তার সঙ্গে সায়েবের এই প্রথম সাক্ষাৎ।

"বৈবাহিক ব্যাপারে আপনার উপদেশ প্রয়োজন।" মিসেস বোস্টন আরম্ভ করেন। তাঁর স্বরে দৃঢ়তা, স্বাধীন জীবনের সকল কিছু দুঃখ, দৈন্য, আঘাতের মধ্যে মাথা তুলে চলার শক্তির অভাব নেই সেখানে।

মিসেস বোস্টন টমাস ডাফ্ কোম্পানীর টেলিফোন অপারেটর। স্বামী বর্তমানে বিপথগামী, দুশ্চরিত্র। পোর্ট পুলিসের সার্জেণ্টের রোজগার কম নয়, কিন্তু সংসারে কোন সাহায্য করেন না। একটি-মাত্র ছেলের স্কুলের বিল তিন মাস বাকী। স্বামী অর্ধেক দিন বাড়ি ফেরেন না, ফিরলেও গভীর রাতে। তাঁর পরস্ত্রীতে আসক্তি পাড়ার কারও অজ্ঞাত নয়।

মিসেস বোস্টন অবিচলিতভাবে সব বলে গেলেন। স্বামীর সঙ্গে ঘর করা সম্ভব নয়, স্থির মস্তিষ্কে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত। "চরিত্রহীনতার প্রমাণ আমি পূর্বেই সংগ্রহ করে রেখেছি। তার কোন অসুবিধা হবে না। ছেলেটিকে আমিই কাছে রাখতে চাই। না হলে বেচারার পড়া-শুনা হবে না।"

ব্যারিস্টারকে কোন প্রশ্ন করতে হয় না। নিখুঁত কাজ, সব প্রস্তুত, কোন জটিলতা নেই। আইনের প্রাথমিক প্রয়োজন গুলি মিসেস বোস্টনের জ্ঞাত। তিনি বিদায় নেন।

আর আরতি? সে শুধু কাঁদে। প্রশ্নে নিরুত্তর।

কদিন পরে দেখি, আরতির মা সোফায় বসে হাসছেন। সায়েব ও আরতিতে খুব ভাব জমে গেছে। সায়েব খুব স্পষ্ট উচ্চারণ করে ইংরেজী বলছেন। আরতি ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে আনন্দের সঙ্গে কথা বলায় ব্যস্ত।

"এ বাচ্চা মেয়েটি কে?" দেওয়ালে

ঙানো ছবির দিকে আঙুল দিয়ে আরতি াবদারের স্বরে জিজ্ঞাসা করছে।

"আন্দাজ কর দেখি," সায়েব ছোট লের মতন বলেন।

"আপনার মেয়ে।"

"উঁহু, হোল না। আমার মেয়ে বা লে কিছুই নেই।"

"বলুন না কে।"

"মেয়েটি এখন অনেক বড় হয়েছে। ন্তু আমি যখন তাকে প্রথম দেখি, সে ইরকম ছোট্ট মেয়েটি ছিল। তখন থেকে মাদের দুজনে খুব ভাব। ও আমার ।" আরতি ও চন্দ্রশেখর দুজনেই সিতে লুটিয়ে পড়ে। কে বলবে ওরা মলা করতে এসেছে।

"তোমার বোন চেষ্টা করলে তোমার কে অনেক ভাল ইংরেজী বলতে পারে।" য়েব বলছিলেন চন্দ্রশেখরকে। আমাকে েই চেয়ারে ফিরে এলেন,—"আর গল্প । এই ভদ্রলোক কাজ করা না দেখলে ঙ্কর রেগে যান।"

কাজ আরম্ভ হয়। পরম বিশ্বাসে ও ভয়ে আরতি বলে যায় তার কাহিনী। কেও জিজ্ঞাসা করা হয় মাঝে মাঝে, নি উত্তর দেন। চন্দ্রশেখরও মাঝে মাঝে গ দেয়। দ্রুত-কথনের সঙ্গে দ্রুত-খনের পাল্লা চলে। ওরা বলে যায়, আমি ায় শর্টহ্যান্ডের ইকড়ি-মিকড়ি টানি।

একটি ছেলে ও মেয়ে রেখে আরতির বা রসময় মুখুজ্যে অসময়ে চোখ জলেও তাদের প্রতিপালনের মত অর্থ খে গিয়েছিলেন। একডালিয়া রোডের ড়িটিও খুব ছোট নয়। কিছুদিন আগে বললেন, "নিচের রাস্তার উপরের ঘর টো দোকান ঘরের জন্য ভাড়া দিলে হয়।" গজে বিজ্ঞাপন বার হয়। যাঁরা উত্তর লেন, তাঁদের মধ্যে অমল রায়ও ছিল। খে কালো চশমা ও দামী আদ্দির াবী পরে অমল রায় দোকান ঘর খতে এল। নিজের জন্য নয়, বন্ধুর য়াজন।

বন্ধুর দোকানে প্রায়ই আসত অমল। দের সঙ্গে পরিচয় জমে ওঠে। "এই যে , ভাল তো। মা কেমন আছেন?"

"চলুন না ভিতরে, একটু চা খেয়ে সবেন।"

নিঃসঙ্গ অভিভাবকহীন পরিবারে অমলের আবির্ভাব ওরা আশীর্বাদ মনে করে।

"মাসিমা, আপনাদের সমস্ত বাড়ির কোন প্রয়োজন নেই। নীচের বাকী দু'-খানা ঘর ভাড়া দিয়ে দিন, কিছু টাকা আসবে।"

"সত্যি বাবা, তোমার বুদ্ধি আছে। আমি ভাল বুঝি না।"

"না না মাসিমা, ও-সব বলে লজ্জা দেবেন না। বাবার চার পাঁচটা বাড়ি রয়েছে, উনি দিন রাতই ওই সব করছেন। ও'র অদম্য কর্মশক্তি। অফিস থেকে ফিরেই সংস্কারের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন।"

"উনি কি করেন?"

"ওহো বলতে ভুলে গেছি একদম, বাবা ইঞ্জিনিয়ার।"

আরতির মা ক্রমশ অমলের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। কর্পোরেশনের ট্যাক্স জমা দিতে হবে। কে যাবে? অমল। ভাড়াটিয়ারা কোর্টে মামলা করেছে। অমল উকিলের কাছে যায়। কোর্টে সাক্ষ্য দেওয়া? সেও অমল।

"জানেন মাসিমা, আমার নিজের বোন নেই, অথচ আরতি ভাল করে কথা কয় না। আমার সঙ্গে ঝগড়াই করে।"

"আরতি এদিকে একবার আয় না।" মা ডাক ছাড়েন।

"কী মা?"

"অমল এসেছে। আমাকে পুজোর বাসনপত্র মাজতে হবে। বেচারা চুপচাপ বসে থাকবে কেন? চায়ের জল চাপা।"

অমল আবার আসে। আরতির মা জিজ্ঞাসা করেন, "কি বাবা, মাস খানেক দেখা নেই।"

"পরীক্ষার পড়াশুনায় ব্যস্ত ছিলাম। আবার যা-তা পরীক্ষা নয় এম এ। গাদা গাদা বই মাসিমা।"

"বাঃ, শুনেও আনন্দ। এই ক'দিনে শরীর শুকিয়ে গেছে।"

"দিদু কোথায়?"

"দেখ দিকিনি। নিশ্চয়ই আরতির সঙ্গে ঝগড়া বাধাচ্ছে। ছেলে মেয়ে দুটোকে কিছুতেই বশে রাখতে পারি না।"

মাস কয়েক পরে বিরাট মিষ্টির ঝুড়ি হাতে অমল ঢোকে। "মাসিমা সুসংবাদ, পাশের খবর বেরিয়েছে।"

"বাঃ, সেজন্য তো আমি খাওয়াব তোমায়।"

"আরে মাসিমা আপনি না হয় খাওয়ালেন, কিন্তু আরতিরা ছাড়বে কেন? মাসিমা আপনাদের আশীর্বাদে রেজাল্ট ভালই হয়েছে। আর তিনটে নম্বর মাসিমা..."

"তিনটে নম্বরে কি হোল?"

"তিনটে নম্বর হলেই ফার্স্ট হয়ে যেতাম। জাস্টিস মুখুজ্যের মেয়ে আরাধনা আমাকে বিট করে দিল। জাস্টিস মুখুজ্যে আবার বাবার বিশেষ বন্ধু। ও'র অনেক দিনের ইচ্ছে আরাধনাকে আমি......।"

"তাই নাকি?"

"কতবার আমাকে বলেছেন সময় পেলেই আলীপুরে চলে আসবে। আমার ওসব মোটেই পছন্দ নয়। আরাধনা ওই রাগেই টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন ছেড়ে শুধু বই নিয়ে ডুবে থাকল।"

অমলের 'মাসিমা' অবাক হয়ে শোনেন।

"এমন সোনার টুকরো ছেলে কোথায় মেলে?"

"মাসিমা, চাঁদু আর আরতিকে সিনেমায় নিয়ে যাব। লাইট হাউসে ভাল বই হচ্ছে।"

মাসিমা আরতিকে যেতে বলেন। আরতি রাজী হয় না। "আমি যাব না। ভাল লাগে না।"

"তা কেন যাবে? পাড়ায় যত বাংলা বই হচ্ছে তার সবগুলিই তো দেখা চাই। লাইটহাউসে গেলে একটু আধটু ইংরেজী শেখা যাবে তা ভুলেও সেখানে যাবে না।"

সিনেমা দেখে ট্যাক্সিতে বাড়ি ফেরে। "আজ অমলদা যা খাওয়ালেন, ভারি চমৎকার রেস্টুরেণ্ট।"

"মাসিমা, এবার মিনার্ভায় ভাল বই এসেছে। চাঁদুর তো দেখা খুব প্রয়োজন। যত সব সায়েন্সের ব্যাপার। আই এস-সি তো শুধু বই পড়লেই চলবে না। বাইরের অনেক কিছু জানতে হবে। এই যে আমাদের অমিয় চাটুজ্যে ম্যাট্রিকে দুটো, আই এস-সি'তে তিনটা লেটার। কলেজের বই তিন মাসে শেষ করে এখন শুধু বাইরের বই পড়ছে।"

সন্ধ্যের সময় আবার ট্যাক্সি এসে দাঁড়ায়। আরতির হাতে এক থোক রজনীগন্ধা। 'অমলবাবু কিনে দিলেন। খুব সস্তায় ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডের সামনে বিক্রী হচ্ছিল।'

'এই যে দিদি, আরতির জন্য ওই সুন্দরপনা ছেলেটিকে জামাই করছেন?' পাশের বাড়ির ভদ্রমহিলা বেড়াতে এসে বললেন।

'কে বলল?' না বললেও বোঝা যায়। পাড়া শুদ্ধু সবাই জানে। কালকে কি পাকা দেখা ছিল? অত ফুলটুল নিয়ে গাড়ি থেকে নাবা হোল।

আরতির মা প্রথমে প্রতিবাদ করেছিলেন, কিন্তু পাড়ায় যেখানে যান, একই কথা। 'আরে বাবা লুকোচ্ছ কেন? নিজে অমল চায়ের দোকানে গল্প করছিল, আমার ছেলে চায়ের দোকানে শুনে এসেছে। আরতির সঙ্গে ওর নাকি ইয়ে চলেছে।'

আরতির মা নিজের নির্বুদ্ধিতা[য়] কাঁদতে চান। রসময় মুখুজ্যের বং[শে] এমন অপবাদ।

বৈদ্যনাথবাবু সায়েবের পাশেই ব[সে] ছিলেন। রসময় মুখুজ্যের মৃত্যুর পর[ও] তিনি পরিবারটিকে দেখে আসছেন। এইবার তিনি নিজেই বলতে শুরু করলেন।

আরতির মায়ের কাছে খবর পেয়ে[ই] তিনি দেখা করতে এলেন। আরতির মা কি করবেন বুঝতে পারছেন না। বৈদ্যনাথবাবুও বুঝতে পারেন না ব্যাপা[র] কতদূর এগিয়েছে।

অমল জানালো, সে আরতিকে বিয়ে করতে পারে তবে বাবা জানতে পারলে[ই] বিপদ। গোপনে শুভকর্ম সারতে হবে পরে মায়ের মাধ্যমে বাবাকে শান্ত কর[া] খুব শক্ত হবে না। আত্মীয়েরা না এলে[ও] বন্ধুরা অনেকেই উৎসবে আসবে।

'সিভিল ম্যারেজ আইনে বিয়ে রেজিস্ট্রার বাড়িতে এসে বিয়ে দিয়ে গেলেন,' বৈদ্যনাথবাবু বলে চললেন।

আরতির মা আত্মীয়স্বজনদের সবাইকে নিমন্ত্রণ করলেন। অনেকে গোঁড়া। অমল কায়স্থ, তিনি প্রথমে জানতেন না। ধার[ণা] ছিল ব্রাহ্মণ। না হলে জাস্টিস মুখুজ্যে[র] মেয়ে আরাধনার সঙ্গে......। বৈদ্যনাথ[বাবুর] প্রশ্নে প্রকৃত সত্য প্রকাশ পেল।

বিয়ের দিন রান্না অনেক হয়েছে অমলের বন্ধুরা আসবে। কিন্তু কোথা[য়] বন্ধুরা, কারুর দেখা নেই। অমল বলে[ন] 'কি জানি, সবাই বলেছিল আসবে।'

মেয়েকে সোনায় সাজিয়ে দিয়েছিলে[ন] আরতির মা। দান-সামগ্রীর কোন ত্রু[টি] রাখেন নি।

বিয়ের পর কনে-জামাই বিদায় নেওয়া[র] চিরাচরিত রীতি লঙ্ঘিত হল। কোথা[য়] যাবে তারা? ফুলসজ্জা পাতা হোল কনে[র] বাড়িতেই। রাশি রাশি ফুলে ঘর সাজানো নানা বর্ণ ও গন্ধের পুষ্পাভর[ণে] আরতিকেও একটি সদ্যবিকশিত পু[ষ্প] বলে মনে হচ্ছিল। মনের কোণের কাঁটা ঢাকার জন্যই বোধ হয় এত ফুলে[র] আয়োজন। কিন্তু ফুলের প্রলেপে ক[তদি]ন তাকে ঢাকা যায়? অবসন্ন দিনাবসা[নে] সকালের সদ্য-প্রস্ফুটিত ফুলের দ[শা]

ঘুমিয়ে আসে। কাঁটার প্রকাশ হয় নির্বার।

অমলেরও পরিবর্তন আরম্ভ হয় অতি ত। 'কিছু টাকা দিতে পার? বাড়ি ওয়া হচ্ছে না।' আরতি মাকে জানাতে আ পায়, নিজের গোপন সঞ্চয় তুলে য় স্বামীর হাতে।

'তুমি যে ব্যবসা করছিলে, সেখানে ও না তো?'

'তোমাকে ফেলে যেতে ইচ্ছে হয় না।'

'ছিঃ, লোকে বলবে কি।'

'আরতি, কিছু টাকা দিতে পার?'

'আমার নিজের তো কিছু নেই', রতি পরম দুঃখে উত্তর দেয়।

'বাজে কথা ছাড়। টাকা আমার চাই, য়ের কাছে চাও।'

আরতি চমকে ওঠে। তারপরে কোন য়ে উঠে যায় মায়ের কাছে টাকা আনতে।

'আমার কিছু টাকা প্রয়োজন।'

'তিন দিন আগে মায়ের কাছ থেকে শ টাকা দিয়েছি।'

'বাজে বকিও না।'

'বার বার হাত পাততে লজ্জা করে, মি পারব না।'

'লজ্জাবতী লতা হলে চলবে না। ড়ে পড়লে তোমার ঘাড় পারবে।'

আরতি কেঁদে ফেলে। বিছানায় মুখ কিয়ে চোখের জলে উপাধান ভিজিয়ে লে। মাকে বলতে ইচ্ছে হয় সব। কিন্তু কোচ এসে কণ্ঠ রুদ্ধ করে।

অমল ফেরে রাত দশটায়। আরতি রে মুখ ঢেকে চোখ বন্ধ করে থাকে। ট পাওয়ারের বাতি নিবিয়ে, নীলাভ মিত আলোর সুইচ টিপে দেয় অমল। আমার কাছে এসে দাঁড়ায় সে। আরতির ণা বোধ হয়। নীচ, অসভ্য লোক। ল মুখের চাদরটা সরিয়ে দিতে চেষ্টা রে। ঘৃণায় আরতির দেহ রি রি করে ঠে। অপবিত্র, পঙ্কিল স্পর্শ।

'রাগ হয়েছে বুঝি? মাপ চাইছি। টা বিশেষ ভাল ছিল না। বাবাকে নও রাজী করাতে পারিনি।'

আরতি নিশ্চল, পাথর।

অমল আবার ক্ষমা চায়। বারংবার আখ্যান সত্ত্বেও চুলের মধ্যে হাত বোলায়। 'লক্ষ্মীটি চোখ খোলো, দেখ কি এনেছি।'

আরতি আর পারে না। চোখ খোলে। তাজা রজনীগন্ধার শ্বেত-শুভ্র শীর্ণ মালা। আরতি ভুলে যায় সব কিছু। নীলাভ আলোর রাজ্যে বন্য ও উষ্ণ আলিঙ্গনে আরতির অন্তরের সঞ্চিত সকল অভিযোগ ও অপমানের তুষার গলে যায়।

রাত পোহায়। অমল যেন পুরোন দিনের অমল। আনন্দ ও হাসিতে পরিপূর্ণ। আরতি আনন্দ পায়। পূর্বে অহেতুক আশঙ্কায় নিজেকে জর্জরিত করার জন্য লজ্জা পায়।

'দেখুন মাসিমা'—সম্বোধনের ত্রুটি বোঝামাত্রই অমল লজ্জিত হয়ে সংশোধন করে, 'দেখুন মা, চাঁদুর জন্যে চমৎকার সুযোগ এসেছে। এমন সুযোগ রোজ আসে না। আমারই জানা-শোনা এক পাঞ্জাবীর বিরাট দর্জির দোকান। বেচারার বৌ মারা যাওয়ায় সব কিছু ছেড়ে এই মাসের মধ্যে চলে যেতে চায়। একেবারে চালু কারবার। মাত্র দশ হাজার টাকা। মাসে হাজার টাকা স্ট্যাণ্ডিং ইনকাম। দোকানের দাম দশ মাসেই উঠে যাবে।'

'কিন্তু অত টাকা কোথায় পাব? তুমি তো সব জান বাবা।'

'তার জন্য ভাবনা কি? কসবার বাড়িটা বন্ধক রাখলেই টাকা পাওয়া যাবে। মাসে মাসে দোকানের আয় থেকে শোধ দিয়ে দশ মাসের মধ্যে বাড়ি খালাস হয়ে যাবে।'

"শ্বশুরের বাড়ি বন্ধক দেওয়া অলক্ষ্মীর নিদর্শন।"

রাতে ষাট পাওয়ারের বাতি নিভে গিয়ে নীলাভ মৃদু আলোটা আবার জ্বলে ওঠে, সবকিছু অস্পষ্ট, অথচ মোহময় মনে হয় আরতির। অমল আবার পকেট থেকে মালা বের করে, শ্বেত-শুভ্র রজনীগন্ধা। নববধূ দেহ ও মনে পরিতৃপ্ত। স্বর্গরাজ্য থেকে স্বামী আবার তাকে পৃথিবীর মাটিতে টেনে আনে। 'তোমার মায়ের কোন বুদ্ধি নেই। থাকলে টাকাটা বার করতেন। আমি ব্যবসাটা নেব? তুমি কি বল?'

'চমৎকার হয়। প্রতিমাসে হাজার টাকা রোজগার।'

'হুঁ, কথাটা মন্দ নয়। অর্ধেক টাকা

জোগাড় হবে। বাকিটা গয়নাগুলো মাস পাঁচেকের জন্য বন্ধক দিলে......'

নববধূর মনে শিহরণ জাগে। ভয়ে কুঁকড়ে ওঠে। ষাট পাওয়ারের বাতিটা জ্বালিয়ে দিয়ে নিশ্বাস নিতে ইচ্ছা করে।

পরের দিন সকাল, 'মাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। কোনমতেই রাজী নন।' আরতি স্বামীকে বলে। স্বামী কোন উত্তর দেয় না। দুজনের মধ্যেকার ব্যবধান ক্রমশ বাড়ছে, আরতির মনে হয়।

অমল এই ঘটনার পর একেবারে পরিবর্তিত। টাকার কথা একদম তোলে না। সকালে ব্যাগ হাতে বেরিয়ে যায়, ফেরে সূর্য ডোবার অনেক পরে। খুব পরিশ্রম করছে ব্যবসার পিছনে।

একদিন বাড়ির সকলকে সিনেমা দেখিয়ে আনল। ট্যাক্সিতে বাড়ি ফেরার আগে কে সি দাসের দোকানে বিরাট ভোজ।

ষাট পাওয়ারের বাতি নিভে নীলাভ বাতি জ্বলে ওঠে। পকেট থেকে রজনীগন্ধার মালা বেরোয়। 'আজকাল বড় বেশি পরিশ্রম করছ। অমন সোনার মত রঙ রোদে পুড়ে কালো হয়ে যাচ্ছে।' আরতি বলে।

'হুঁ। ব্যবসার বাজার ভালই। বাবাও খানিকটা নরম হয়েছেন' অমলের উত্তর।

সপ্তাহ খানেক পর আরতির হাতে একশ' টাকা দিয়ে অমল বলে, 'মায়ের কাছ থেকে যা নিয়েছিলাম, ফিরত দিও।'

হাতে টাকা পেয়ে মা লজ্জিত। জামাইকে ভুল বুঝেছিলেন।

দিন কয়েক পরে খাবার সময় অমল বলল, 'মা সুখবর। শীঘ্রই আপনার মেয়েকে নিয়ে যেতে পারব। আজকে দিল্লী থেকে প্লেনে কাকা আসছেন, ভাবছি ওই সময় আরতিকে নিয়ে দমদম যাব। কাকা খুব উদার লোক। বাবা তাঁর সামনে কিছু বলতে পারবেন না। মাও তাই বলেছেন।'

বেলা চার'টায় ট্যাক্সি হাজির। আরতিকে এক ঘণ্টা ধরে সাজিয়েছেন মা। বেনারসী শাড়ি। গলায় অতি-আধুনিক ডিজাইনের হার। পরিপুষ্ট নিটোল হাতে চুড়ির গোছায় যেন লক্ষ্মী প্রতিমাটি। অর্ধেক ঘোমটা, পানে রাঙা অধর।

তবুও মায়ের মন, 'চাঁদুকে সঙ্গে নিয়ে যাবে?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, কোন আপত্তি নেই। বরঞ্চ ভালই হবে, একসঙ্গে যাওয়া যাবে" অমল আগ্রহে বলে।

শ্যামবাজারের মোড়ে শীতের সন্ধ্যা নেমে এল। ট্যাক্সি থামিয়ে অমল স্বারিকের দোকানের দিকে যায় এবং সন্দেশের চৌকো বাক্স হাতে ট্যাক্সিতে ফিরে আসে। ট্যাক্সি স্টার্ট নেয়। 'এই যাঃ। একটু থাম। কাকার জন্যে তো আরও কিছু নরম পাকের সুন্দেশ নিতে হবে। উনি কড়া

পাক একদম পছন্দ করেন না। আরেকবার যেতে হবে। চাঁদু ভাই, এবার তুমি......'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ নিশ্চয়ই।' পাঁচ টাকার নোট হাতে চাঁদু স্বারিকের দোকানের দিকে এগোয়।

'একটু পা চালিয়ে। প্লেনের সময়ের দেরি নেই।' অমল মুখ বাড়িয়ে বলল।

নরম পাকের সন্দেশ নিয়ে চাঁদু তাড়াতাড়ি ফিরে আসে। গাড়িটা কোথায়? এইখানেই তো ছিল। এগিয়ে গেল নাকি! চাঁদু চারিদিকে তাকায়, গাড়ি অদৃশ্য।

অধীর উৎকণ্ঠায় সেদিন কাটল। ভয়ে আরতির মার দেহে কাঁটা দিয়ে উঠল। একমাত্র মেয়ে তাঁর পিতৃহীনা। পরের দিন পুলিসে খবর। দারোগাবাবু হাসেন। 'আরে মশায়, বিয়ে-করা বউকে জামাই নিয়ে গেলে পুলিসে কি করবে?'

মাস পরিবর্তন হ'ল। কোনো সংবাদ নেই। চারিদিকে অনুসন্ধান চলে, সব ব্যর্থ।

দু মাস পরে বাড়ির সামনে আবার একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল, মা ছুটে গেলেন। একি? একি হয়েছে আরতির, কথা পরে, আগে ট্যাক্সির ভাড়াটা মিটিয়ে দাও।'

আরতিকে চেনা যায় না। শরীরে এক ফোঁটা মাংস নেই। পীতবর্ণের দেহ। পরনে নোংরা শাদা খোলের শাড়ি। হাতে একগাছি লোহা, আর কিছু নেই।

আরতি কোন কথা বলে না শুধু কাঁদে। ডাক্তার এল, পিঠে চাবুকের দাগ। গরম জলে ধুইয়ে পরিষ্কার করলেন। রক্তহীনতা রোগ। নার্ভাস ডিসঅর্ডার। ম্যালনিউট্রিশন তো আছেই।

বৈদ্যনাথবাবুও সময়মত এলেন। সেদিন ট্যাক্সি থেকে চাঁদুকে নামিয়ে দিয়েই গাড়ি ছুটে চলল সার্কুলার রোড ধরে। বিবেকানন্দ রোডে মোড় ফিরে সোজা হাওড়ার পুল। শেষ পর্যন্ত শালকিয়ার কোন এক বস্তির সামনে গাড়ি থামল। যা কিছু গয়না খুলে দিতে হোল। হাতের চুড় থেকে কানের দুল পর্যন্ত।

—'এসব আমি দেব না।'

'বোকামি করো না, রাত্রে কত গুণ্ডার কাছাকাছি থাকে। আমি সাবধানে রেখে দেব। কাল সকালেই আমরা চলে যাব ট্রেনে, দেওঘর। সেখানে বাবা-মা আছেন।'

শালকিয়ার বস্তিতে চব্বিশ ঘণ্টা কাটিয়ে সন্ধ্যায় হাওড়া স্টেশন, দেওঘর। কোথায় বাবা-মা? কেউ নেই। বাড়িটি শহর থেকে কিছু দূরে কুণ্ডায়। বোধ হয় পূর্বেই ঠিক ছিল। আরও কয়েকজন আছে, নিম্ন শ্রেণীর। 'চলহে রাণীসায়েবা হাঁড়ি ঠেলতে। এখানে কেউ তোমার মাইনে-করা ঝি নেই।' এক কুদর্শনা মধ্যবয়সী স্ত্রীলোক আরতিকে বলে। ঘুম থেকে উঠতে দেরি হওয়ায় একদিন তো চুল ধরে টেনে দিল সে।

"আমি মাকে একটা চিঠি লিখব।"

"অত মাতৃসোহাগে কাম নেই।" মেয়েটি দন্ত বিকশিত করে বলে। বন্দিনী জীবন। বহির্জগতের সঙ্গে কোন যোগাযোগ নেই।

সপ্তাহ কয়েক পরে পুনরায় হাওড়া স্টেশন থেকে বারাকপুর। ছোট্ট ফ্ল্যাট বাড়ি, বোধ হয় গয়না বিক্রীর টাকা ফুরিয়ে এসেছে।

"এর পরের ঘটনা বড় নোংরা, সায়েবকে বল ভদ্রঘরের ব্যাপার, এগুলো কোর্টে বলা চলবে না।" আরতির মা আমাকে বললেন।

সায়েব আগ্রহভরে চাইলেন।

কোনো এক সন্ধ্যায় অমলের সঙ্গে এক অবাঙ্গালী ভদ্রলোক এলেন, বয়স বত্রিশের কাছাকাছি। "আমার ব্যবসায়ের নতুন পার্টনার, ওঁকে অসন্তুষ্ট কোর না।"

ভিতরে সবাই কথাবার্তা বলে কিছুক্ষণ। হঠাৎ অমল উঠে গেল, ঘরে দুটি প্রাণী, চারিদিক নিঝুম। ভদ্রলোক ইঙ্গিতপূর্ণভাবে তাকালেন, আরও কাছে এগিয়ে এসে বসলেন।

"আমি চললাম, আমার রান্না আছে। আপনি বসবেন না ফিরবেন।"

আগন্তুক আশ্চর্য। দরজা খুলে আরতি আঙ্গুল দেখিয়ে দেয়। উত্তেজনায় সে ঘেমে উঠেছে। সেদিন রাতে অমল ফিরল দেরিতে। মধ্যবয়সী মেয়েটি ও অমলের হাতে নিগ্রহ চলল কদিন। সমস্ত দেহে আঘাতের চিহ্ন। চুলের মুঠির টানে ভয়ঙ্কর লাগে।

কয়েক দিন পর অমল কাছে ডাকে, 'কাল সন্ধ্যায় আমার পার্টনার আবার আসবে, এবার গোঁয়ার্তুমি করলে জীবন্ত কবর মনে থাকে যেন।"

সেই দিন সকালে দু আনা পয়সা সম্বল করে আরতি কি করে সকলের অলক্ষ্যে শ্যামবাজারে এসেছিল এবং সেখান থেকে ট্যাক্সি করে একডালিয়া রোড্। চিন্তা করলে আরতি শিউরে ওঠে।

কিন্তু অমল কম ধড়িবাজ নয়। প্রথমে উকিলের চিঠিতে শাসায়—আরতিকে ফিরিয়ে দেবার জন্য। এবার দাম্পত্য অধিকার প্রতিষ্ঠান জন্য হাইকোর্টে মামলা, নাবালিকা স্ত্রীর উপর স্বামীর অধিকার সর্বপ্রথম।

মামলা করার টাকা কোথায় পেল কে জানে? সম্ভবত তার অবাঙ্গালী পার্টনার দিচ্ছেন।

আরতির দিকে তাকালাম, কয়েক মাসে সে বেশ সুস্থ হয়ে উঠেছে। মায়ের আশ্রয় থেকে ফিরে যাবার ভয়ে কাঁদছে।

অমল দাবী করেছে, "আরতির মা প্রায়ই জামাইএর কাছে টাকা নিয়েছেন, শেষে টাকা দিতে না পারায় মেয়েকে নিজের কাছে আটকে রাখেন, আরতির বিয়ের সব কিছু খরচ অমলই দেয়। আরতির বর্তমান বয়স ষোল এবং আরও

টাকা আদায়ের উদ্দেশ্যে মেয়েকে আটকে রেখেছেন।"

সত্য ঘটনা লিপিবন্ধ করে আমরা উত্তর দিই।

অন্যপক্ষ জানায় সব মিথ্যা। অমল কোন দিন বলেনি সে এম এ পরীক্ষা দিয়েছে, তার বাবা ইঞ্জিনীয়ার। এসব উকিলদের বানানো।

"আরতি ফিরে আসার পর, আপনারা পুলিসে খবর দিয়েছিলেন?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

"না তো, লোক জানাজানির ভয়ে......"

"দেওয়া উচিত ছিল।"

"মামলা আরম্ভ হয়। কোর্ট ঘরে লোক ধরে না, আরতি বেঞ্চিতে কাঁদছে। তার মা ঘোমটা দিয়ে থলিতে ইষ্টনাম জপ করছেন। জজসায়েব দর্শকদের ঘরের বাইরে যেতে নির্দেশ দিলেন। নিতান্ত অনিচ্ছা সহকারে সকলকে বাইরে চলে যেতে হ'ল।

খানিক পরে বই আনতে লাইব্রেরীতে যাচ্ছিলাম, "এই যে স্যার, এত ব্যস্ত কেন?" ছোকাদা ডাকছেন। "মিত্তিরের কোর্টে ইণ্টারেস্টিং কেস্ হচ্ছে, তা আমাদের বার করে দিল! কোন এক বাঈ-এর মামলা, আরতি বাঈ। ফ্যাক্টটা মাইরী বোলো কিন্তু।"

"ছোকরা আছে ভাল, সব লাগ্‌তাই কেস্। শালা আমার সায়েবের শুধু আরবিট্রেশন ম্যাটার। একটুও রস কস নেই।" —আর একজন বললেন বিড়িতে জোর টান দিয়ে।

মামলা ক্রমশ খারাপের দিকে যাচ্ছিল। অমলের ব্যারিস্টার প্রমাণ করে দিলেন সিলিভ ম্যারেজের আগে হিন্দু-বিবাহ হয়েছিল এবং হিন্দু আইনই প্রযোজ্য। হিন্দুমতে বিবাহের এক সপ্তাহ পরে সিলিভ ম্যারেজের কোন মূল্য নেই।

সায়েব অবাক। হিন্দুবিবাহের কথা তিনি আগে জানতেন না। বৈদ্যনাথবাবু বলেননি

অবশ্য সাক্ষ্য প্রমাণের অভাব ছিল না। দীর্ঘ চারদিনের মামলার বিবরণে আইন-গত কচকচিই বেশী। নিষ্ঠুরতার অভি-যোগে জাস্টিস মিটার অমল রায়ের কেস ডিস মিস করলেন। স্ত্রী যেখানে দৈহিক নির্যাতনের আশঙ্কা করে সেখানে আদালত তাকে ফিরে যেতে বলতে পারেন না।

আরতি তার মাকে নিয়ে বিকেলে উপস্থিত। সায়েব হেসে বললেন, "তোমার আর কোন চিন্তা নেই, কেউ তোমাকে নিয়ে যেতে পারবে না।"

কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ আরতির মা সায়েবকে বাড়িতে নিমন্ত্রণ জানালেন।

"নিশ্চয়ই যাব, বেঙ্গলী ফুড্ আমি কখনও ছাড়ি না।"

একডালিয়া রোডের বাড়িতে আমরা ট্যাক্সি থেকে নামলাম, প্রায় আটটা। সায়েব ভিতরে গিয়ে বসলেন। টেবিলে বাঙ্গালী খানা। ভাত-ডাল, তরকারি, মাছ, সঙ্গে কাঁটা-চামচ, আমরা অবশ্য হাতে খাচ্ছি সায়েব অবাক হয়ে তাকান, "স্ট্রেঞ্জ, তোমরা এক হাতে কি তাড়াতাড়ি খাও আর আমরা দুহাতে মাছের কাঁটা বাছতে পারি না।"

বাঁধা কপির তরকারি সামান্য মুখে দিয়ে দেখেন ঝাল কিনা, সায়েব খেয়ে চলেন। মাঝে মাঝে আমাকে বলেন, "টেবিল ম্যানারে ভুল হলে বলে দিও।"

সামনে আরতির মা ঘোমটার আড়ালে। আরতি কোমরে আঁচল জড়িয়ে পরিবেশন করছে। "লিট্‌ল মোর"।

"আমাদের মা বোনদের এই নিয়ম, খেতে না পারলেও জোর করে খাওয়াবে" —আমি বলি।

হাত মুছে সায়েব বললেন, "আরেকবার দোভাষীর কাজ করতে হবে।"

আজকের রাতে আরতিকে দেখে কে বলবে, এই মেয়েটির উপর দিয়ে জীবনের নির্মম ঝড় বয়ে গেছে।

সায়েব চারিদিকে তাকালেন, দূরে উত্তরা অভিমন্যুর ছবির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ। 'আমি সত্যই দুঃখিত, এমন সুন্দরী টুকটুকে মেয়ে, জীবনে শান্তি পেল না। হিন্দু আইনে বিবাহ বিচ্ছেদ নেই, পুনর্বিবাহও সম্ভব নয় বিধবা ছাড়া। সমাজের বন্ধন মানুষের ক্ষুধার প্রতি উদাসীন।"

"আরতি, মাই ডিয়ার গার্ল, আমি তো বৃদ্ধ। তুমি তো সবে মাত্র জীবন শুরু করেছ। আমি হয়তো বেঁচে থাকব না কিন্তু হিন্দু সমাজেও আলোড়ন এসেছে। এমন দিন আসবেই যেদিন তুমি আর মুখ শুকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে না, আবার ঘর সংসার করবে মনের মত বরের সঙ্গে। সেদিন কিন্তু এই বুড়োটাকে ভুলো না।"

আরতি কোন কথা বলল না। উদাস-দৃষ্টিতে ধীরে ধীরে বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ায়। আকাশের অগণিত তারার দিকে তার দৃষ্টি।

কে জানে একডালিয়া রোডের সেই বাড়িটাতে আরতি আজও সেইদিনের প্রতীক্ষা করছে কিনা যেদিন হিন্দু আইনের পরিবর্তন হবে। সমাজ বলবে, তুমি মুক্ত।

চিত্রগ্রীব

ন্যাশনাল গ্যালারী অব ক্যানাডার হয়ে কলকাতার অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস কয়েকদিন আগে একটি ক্যানাডীয় চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়েছিল যাদুঘরে। ক্যানাডার বিশজন খ্যাতনামা শিল্পীর একত্রিশটি পেইণ্টিঙ সাজান হয়েছিল। কলকাতাবাসীরা ক্যানাডার চিত্রকলার সঙ্গে পরিচিত হবার বোধ হয় এই প্রথম সুযোগ পেলেন। সুতরাং ক্যানাডার চিত্রধারা সম্বন্ধে দু'একটি কথা বললে নিশ্চয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

জেমস উইলসন মোরিস ইউরোপ থেকে ১৯০০ সালে প্রথম ইম্প্রেশনিজ্‌মের আমদানী করেন। এই সময় থেকেই ক্যানাডায় আধুনিক ছবি আঁকার রেওয়াজ আরম্ভ হয় এবং বেশ কিছুকাল পর্যন্ত ইউরোপীয় চিত্রধারা এখানকার শিল্পীদের অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল। এর আগে পর্যন্ত সম্পূর্ণ অ্যাকাডেমীয় অঙ্কন-রীতিরই প্রচলন ছিল। কয়েকবছর পর কয়েকটি তরুণ শিল্পী বিদেশী প্রভাবে চিত্রাঙ্কনের বিরুদ্ধে আন্দোলন আরম্ভ করলেন এবং ১৯০০ সালে এঁরা 'গ্রুপ অব সেভেন' নামে একটি দল গঠন করলেন। এই গ্রুপ অব সেভেনের শিল্পীরা সম্পূর্ণভাবে ইউরোপীয় প্রভাব মুক্ত হতে পারেননি বটে তবে আন্তরিকভাবে চেষ্টা করেছিলেন এঁদের একটি জাতীয় চিত্রধারা গড়ে তুলতে। ক্যানাডার প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যকে ক্যানভাসে ফুটিয়ে তোলাই ছিল এঁদের লক্ষ্য। ক্রমশ এই দলটি অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়ে উঠতে লাগল এবং তরুণ শিল্পীরা একের পর এক এই দলে এসে যোগ দিতে লাগলেন। বর্ণকে অমিশ্রিত রঙে বিভক্ত করার ইম্প্রেশনিস্ট রেওয়াজ ক্রমশ লোপ পেয়ে গেল। এঁরা ঝোঁক দিলেন লাইন এবং প্যাটার্ন'এর দিকে। কিন্তু এই গ্রুপ অব সেভেন-এর প্রভাব খুব বেশী দিন স্থায়ী রইল না। ১৯৩০ সালের পর থেকে ক্যানাডীয় চিত্রধারার গতি বহুমুখী হয়ে প'ড়ল। অন্যান্য দেশের মত এখানেও সুররিয়ালিজ্‌ম, ক্ল্যাসিসিজ্‌ম, অটোম্যাটিজ্‌ম প্রভৃতি ইজ্‌মের আবির্ভাব হ'ল।

এই প্রদর্শনীর বেশীরভাগ ছবির বিষয়বস্তু প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী; পাহাড়, সমুদ্র, হ্রদ, অসমতল জমি, রেড ইণ্ডিয়ান-

টোটেম পোলস্
ই এইচ হল্‌গেট্
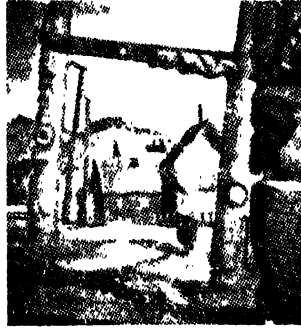
দের বাড়িঘর প্রভৃতি। ছবিগুলি খুব সুপরিকল্পিত এবং সুঅঙ্কিত। লরেন্স হ্যারিস অ্যাবসট্র্যাক্ট স্টাইল-এ কয়েকটি ল্যান্ডসকেপ এঁকেছেন, এগুলি মন্দ লাগে না। কিছু 'আধুনিক' ছবিও প্রদর্শন করা হয়েছিল তবে খুব উচ্চাঙ্গের মনে হল না। অ্যালেকজাণ্ডার কলভিল-এর 'উওম্যান, ম্যান অ্যাণ্ড বোট' ছবিটি সব চেয়ে চিত্তাকর্ষণ করে। সাদাকে বর্ণ হিসাবে এমনভাবে ব্যবহার করতে কদাচিৎ দেখা যায়। মলীল্যাম্ব বব্যাক-এর 'এ বেক শপ', পেগি নিকল ম্যাকলিওড-এর 'ওটাওয়া', হেনরী মেসন-এর 'স্টিল লাইফ' এডউইন হলগেট-এর 'টটেম পোলস' এবং গুডরিজ্ রবার্টস-এর 'লেক অক্সফোর্ড' উল্লেখযোগ্য। তবে মাত্র একত্রিশটি ছবি থেকে একটি দেশের চিত্র ধারা সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ জ্ঞান লাভ করা অসম্ভব। আরেকটি কথা, শিল্পী-পরিচিতির পুস্তিকাটিতে যে সব শিল্পী সম্বন্ধে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাঠ করলাম তাঁদের ছবি প্রদর্শনীতে দেখলাম না। এরই বা কারণ কি? নিম্নলিখিত শিল্পীদের ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল:

মলী ল্যাম্ব বব্যাক, ফ্র্যাঙ্কলিন, কারমাইকেল, এমিলী কার, এ জে ক্যাসন, প্যারাসকেভা ক্লার্ক, অ্যালেকজাণ্ডার কলভিল, এরিক গোল্ডবার্গ, লরেন্স হ্যারিস, প্রুডেন্স হেওয়ার্ড, এডউইন হলগেট, এডওয়ার্ড হিউগস, এ জ্যাকসন, আর্থার লিজমার, জে ম্যাকডোনাল্ড, পেগি নিকল ম্যাকলিওড, হেনরী মেসন, ডেভিড মাইল্‌ন্, গুডরিজ্ রবার্টস, সারা রবার্টসন ও কার্ল স্কেফার।

তরুণী, নর ও নারী আলেক্‌জেণ্ডার কল্‌ভিল্

দিল্লী
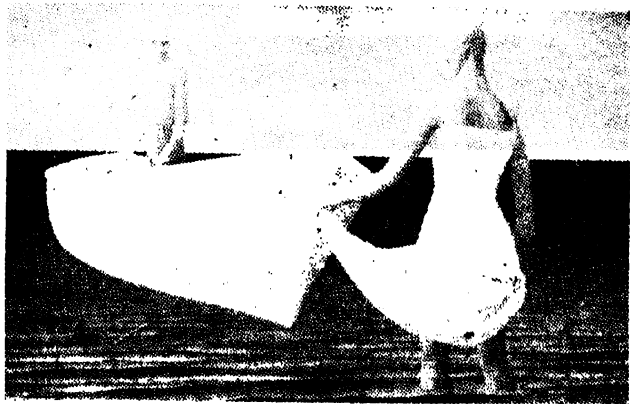
চিত্রপ্রিয়

কয়েকদিন পূর্বে তিনজন শিল্পী নয়াদিল্লীতে তাঁহাদের ব্যক্তিগত চিত্রপ্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেন। প্রথম শ্রীদীননাথ-ওয়ালী — ইঁহার প্রদর্শনী নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতি হলে অনুষ্ঠিত হয় ও সর্দার কে এম পানিক্কর ইহার উদ্বোধন করেন। দ্বিতীয়, অবিনাশ চন্দ্র—দিল্লী শিল্পী-চক্রের উদ্যোগে ইঁহার প্রদর্শনী ফ্রী ম্যাসনস্ হলে অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয়, শ্রীগুণেন গাঙ্গুলী। ইঁহার প্রদর্শনীও নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতি হলে অনুষ্ঠিত হয়।

দীননাথ ওয়ালী ইতিপূর্বে বোম্বাই শহরে তাঁহার প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তবে রাজধানীতে তাঁহার এই প্রথম প্রচেষ্টা। তিনি জলরঙ মাধ্যমে কাজ করেন ও এই প্রদর্শনীতে তিনি সর্বসমেত ১৫০ খানি চিত্র পেশ করেন। কাশ্মীরের বাসিন্দা হইলেও দীননাথ কলিকাতা গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলেই শিক্ষালাভ করেন। কাশ্মীরের অন্য নাম ভূস্বর্গ—সুতরাং শিল্পীদের মধ্যে অনেকেই কাশ্মীর হইতে উৎপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। তবে দীননাথ স্বয়ং যখন কাশ্মীরী তখন তিনি যে তাঁহার রূপ-রহস্যময়ী জন্মভূমির বিভিন্ন আলেখ্যই বিশেষভাবে চিত্রিত করিবার চেষ্টা করিবেন তাহা স্বাভাবিক। দীননাথ কাশ্মীরের বিভিন্ন ঋতুর বিভিন্ন রূপই রচনার মধ্য দিয়া ব্যক্ত করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। শুধু তাহাই নহে, কাশ্মীরের বিখ্যাত শহর ও অন্যান্য দ্রষ্টব্য বিষয়ে, এমন কি বিভিন্ন অধিবাসীদের জীবনযাত্রা পদ্ধতিও তিনি প্রকাশ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তবে এই প্রসঙ্গে দুইটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। কাশ্মীর-জীবনের বিভিন্ন কালের নানা আলেখ্য রচনা করিয়া শিল্পী সকলকে কাশ্মীরের একটি স্বাভাবিক, সঙ্ঘবদ্ধ ও সামগ্রিক রূপ দেখিবার সুযোগ দিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু শিল্পীর চোখে দেখিলে এহেন পরিচয়ের কতটা মূল্য আছে তাহা বলা কঠিন। কারণ, একথা সকলেই স্বীকার করিবেন যে সৃষ্টির মূলে আছে বৈচিত্র্য।

শ্রীনগরের গ্রাম
গুণেন গাঙ্গুলী

মনের গতি যেখানে সীমাবদ্ধ বা দৃষ্টি-ভঙ্গীর প্রখরতা যেখানে সঙ্কুচিত সেখানে বৈচিত্র্য থাকে না, এবং যেখানে বৈচিত্র্য নাই সেখানে জীবনের অন্যান্য লক্ষণের সন্ধান পাওয়া যাইলেও প্রাণের স্পন্দন মিলে না। কিন্তু কাশ্মীরের বাহিরেও প্রতিলিপির দিক দিয়া রনচাগুলির মূল্য হয়ত আছে। কিন্তু কাশ্মীরের বাহিরেও যে অন্য জগত আছে এবং সেই জগতের বিভিন্ন বস্তু হইতেও যে রস আহরণ করা যায় শিল্পী হিসাবে দীননাথের সে বিষয়ে অবহিত হওয়া প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, তাঁহার অঙ্কন-পদ্ধতি। দীননাথ কেবল-মাত্র স্বচ্ছ জলরঙ ব্যবহার করেন। একমাত্র

সূর্যাস্ত॥ অবিনাশ চন্দ্র

এহেন মাধ্যমে রচনা করা সত্যই অনেক সময় কঠিন হইয়া পড়ে, সুতরাং সেই দিক দিয়া তিনি প্রশংসার দাবী করিতে পারেন। তবে প্রাচীন ও প্রথাগত রীতিতে তিনি কাজ করিয়াছেন। রঙ-এর গভীরতা অঙ্কন পারিপাট্য ও বিশেষ করিয়া আলো-ছায়ার সংমিশ্রণের জন্য কয়েকখানি চিত্র সত্যই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দূরত্ব হিসাবে রঙ-এর তারতম্য, স্বচ্ছতা এবং বিশেষ করিয়া আলোছায়ার সুকৌশল সংমিশ্রণের জন্য 'মারখালের একাংশ,' 'গ্রামের গলি-পথ' এবং 'গ্রামের মন্দির' উল্লেখযোগ্য। দীননাথ জলরঙ মাধ্যমটিকে কৃতিত্বের সহিত আয়ত্ত করিয়াছেন সন্দেহ নাই, তথাপি বিষয়বস্তুর জন্যই হউক বা অনেকক্ষেত্রে লঘুবর্ণ প্রলেপের জন্যই হউক—কয়েকখানি রচনার মধ্যে বিশেষ কোনও আবেদনের সন্ধান পাওয়া যায় না। অন্যান্য চিত্রের মধ্যে 'চন্দ্রালোকে হাউস-বোট', 'পীর পাঞ্চালের পথে' ও 'শরৎ-কালে ঝিলাম'-এর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

* * *

অবিনাশ চন্দ্র স্থানীয় শিল্পী এবং এইটি তাঁহার তৃতীয় ব্যক্তিগত প্রদর্শনী। এই প্রদর্শনীতে তিনি সর্বসমেত ২৫ খানি চিত্র পেশ করেন। তৈল মাধ্যমে অঙ্কিত দুই একখানি নমুনা থাকিলেও অবিনাশ সাধারণত টেম্পেরাতেই কাজ করিয়া থাকেন। তাঁহার রচনাতে দুইটি বৈশিষ্ট্য চোখে পড়ে। প্রথমত তিনি ইম্প্রেশনিজ্‌ম রীতিতে প্রাথমিক অঙ্কন-কার্য করিয়া লন ও পরে গাঢ় ও উজ্জ্বল বর্ণসহযোগে সেইগুলিকে বিশিষ্ট রূপ দিবার চেষ্টা করেন। দ্বিতীয়ত তাঁহার বিষয়বস্তু। প্রাকৃতিক দৃশ্য যে তিনি রূপায়িত করেন নাই তাহা নহে দুই চারিটি রচনার মধ্য দিয়া শ্যামশোভা-সমন্বিত পর্বতাঞ্চলের বিশেষ কোনও অংশ অথবা গুল্মসমাচ্ছন্ন সর্পিল পথ-রেখার কিয়দংশের পরিচয় পাওয়া যায়। তথাপি শৈলশিখরের বিশিষ্ট রূপ অপেক্ষা কোনও শৈলাবাসের ক্রমোচ্চ পথ ও তাহারই উভয় পার্শ্বস্থ নানা আকারের আবাস শ্রেণী, বিশেষ করিয়া অন্ধকার রাত্রে আলোকমালা সজ্জিত প্রধান পথ বা হোটেলের সম্মুখভাগই এই শিল্পীকে

উৎপ্রেরণা দান করিয়াছে। তদ্পরি যথাযথ পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান ও বর্ণমনোনয়ন ক্ষমতার জন্য এহেন অধিকাংশ চিত্রের মধ্য হইতেই একটি স্বাভাবিক রূপে ফুটিয়া উঠিয়াছে। বাস্তবিকপক্ষে মাত্র সুনির্বাচিত ও গাঢ় বর্ণব্যবহারের জন্যই কয়েকটি চিত্র সত্যই চোখে পড়ে। উদাহরণস্বরূপ 'সূর্যাস্ত'-ও 'রাত্রিকালে ম্যাল'-এর নাম করা যাইতে পারে। তৈলচিত্রের মধ্যে 'মসজিদ' দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কারণ, নির্জন পরিবেশের জন্য চিত্রটির মধ্যে একটি বিশিষ্ট এবং গম্ভীর রূপ আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

প্রদর্শনীতে অবিনাশ কয়েকটি মূর্ত রচনারও নমুনা পেশ করেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ণচাতুর্য অথবা অঙ্কননৈপুণ্য কোনোদিক দিয়াই ইহাদের মধ্যে একটিও রসোত্তীর্ণ হয় নাই।

* * *

গুণেন গাঙ্গুলীও স্থানীয় শিল্পী। তিনি সর্বসমেত ৪৩ খানি চিত্র পেশ করেন—তন্মধ্যে ২১ খানি তৈল ও ১৬ খানি জলরঙ মাধ্যমে অঙ্কিত। এতদ্ব্যতীত কাষ্ঠ খোদাইয়ের ৫খানি নমুনাও দেখা যায়। ইহার রচনাগুলি লক্ষ্য করিলেই একটি কথা বিশেষ করিয়া মনে জাগে। শিল্পীমাত্রেই সাধারণত বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করিয়া যান এবং তাহাদের মধ্য হইতেই একদিন নিজস্ব পথটুকুর সন্ধান পাইয়া যান কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, মনোমত মাধ্যম অনুযায়ী কাজ করিবার সঙ্গে সঙ্গেই কোনো কোনো শিল্পী অন্য মাধ্যমে অঙ্কন করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারেন না। অবশ্য পরীক্ষামূলকভাবে যদি কেহ এইভাবে অগ্রসর হন তাহা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই কারণ তাহার মূলে থাকে নিত্য নূতন বস্তু সৃষ্টি করার প্রেরণা। কিন্তু স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় না দিয়া কেবলমাত্র মাধ্যম-বৈচিত্র্যের দিক দিয়া যদি কেহ চিত্ত বিনোদন করিতে চাহেন এবং সেই সঙ্গে সর্বসাধারণকেও এহেন চিত্রাবলী দেখিবার সুযোগ দান করেন তাহা হইলে তাঁহার বিচারবুদ্ধির ঠিক প্রশংসা করা চলে না। দুঃখের বিষয়, গুণেন গাঙ্গুলীও এই পর্যায়ে পড়েন। তাঁহার সমস্ত রচনা বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলে তাঁহার সুরুচিবোধের পরিচয় পাওয়া যায় না। তিনি তৈল ও জলরঙ মাধ্যমে চিত্র রচনা করিয়াছেন, কিন্তু জলরঙে রচিত চিত্রগুলির মধ্যে প্রত্যেকটিই যেরূপ দৃষ্টি আকর্ষণ করে তৈলচিত্রের মধ্যে অধিকাংশই সেইরূপ আবার চক্ষুকে পীড়া দেয়। বাস্তবিকপক্ষে প্রদর্শনীটি প্রদক্ষিণ করিলে একটি প্রশ্নই বার বার মনের মধ্যে উঁকি মারে—জলরঙের মধ্য দিয়া যে শিল্পী এতখানি মুনশীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন তৈলচিত্রগুলি কি সত্যই তাঁহারই রচনা?
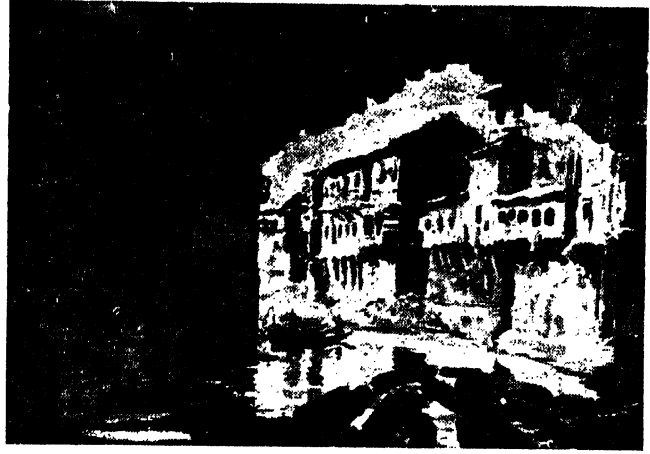
মার খালের একাংশ — দীনদয়াল ওয়ালী

একাধিক কারণে এই শিল্পীর জলরঙে অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। প্রথমত রচনাগুলি অতি পরিচ্ছন্ন; দ্বিতীয়ত শিল্পীর বর্ণ ও বিশেষ করিয়া তুলিকা ব্যবহার করিবার প্রণালী। তুলিকার মধ্য দিয়া শিল্পী যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন তাহা সত্যই সংক্ষিপ্ত কিন্তু তথাপি স্বকীয়তার গুণে যেন তাহা প্রাঞ্জল হইয়া উঠিয়াছে। সকলেই জানেন, ক্রমবিলীয়মান দূরত্ব-বোধ প্রকাশ করিবার কৌশল, নির্ভুল পরিপ্রেক্ষিতে জ্ঞান ও তদুপরি আলো-ছায়ার সুনিপুণ বিন্যাস করিবার ক্ষমতাই সাধারণত প্রাকৃতিক দৃশ্য অঙ্কন করিবার প্রধান উপাদান—তাহার উপর প্রয়োজন শিল্পীর নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিশিষ্ট রচনাধারা। অন্যান্য শিল্পীর ন্যায় বৃক্ষগুল্মসমাচ্ছন্ন শৈলশিখরের বিভিন্ন দৃশ্যও এই শিল্পীকেও আকৃষ্ট করিয়াছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাঁহারা যেখানে কেবলমাত্র এহেন দৃশ্যের প্রতিচ্ছবিই ফুটাইয়া তুলেন এই শিল্পী সেখানে মাত্র কয়েকটি সুনির্বাচিত লঘুবর্ণ ও স্বকীয় তুলিকা ব্যবহার প্রণালীর দ্বারা সেগুলির মধ্যে প্রাণ সিঞ্চন করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ "ঝিলামবক্ষে নৌকা", "কার্সিয়াংএর পথে", "শ্রীনগরের পথ", প্রভৃতি চিত্রের উল্লেখ করা যাইতে পারে। পরিচ্ছন্ন অঙ্কনরীতি ও আলোছায়ার স্নিগ্ধ ও সুকৌশল সমাবেশ প্রত্যেক রচনাটিকেই একটি স্বাভাবিক রূপ দান করিয়াছে। কাষ্ঠ খোদাই-এর যে কয়টি নমুনা প্রদর্শনীতে ছিল তাহার মধ্য হইতেও শিল্পীর রসবোধ ও বলিষ্ঠ প্রকাশভঙ্গিমার পরিচয় পাওয়া যায়। "গ্রামের দৃশ্য" ও "বাজারের পথে" সকলেরই চোখে পড়ে। এতদ্ব্যতীত "আমীরা কদল" (স্ক্যাপার বোর্ড) উল্লেখযোগ্য।

পূর্বেই বলিয়াছি, তৈলচিত্রগুলির মধ্যে অধিকাংশই রসোত্তীর্ণ হয় নাই। সত্য বলিতে কি, দুই তিনখানি ব্যতীত অবশিষ্ট চিত্রগুলি শিল্পী প্রদর্শনীতে পেশ না করিলেই ভাল করিতেন। অঙ্কনরীতির দিক দিয়া এই বিভাগে কেবলমাত্র "গল্পগুজব" চিত্রখানির নাম করা যাইতে পারে।

হিন্দী সাহিত্যের দিকপাল বৃন্দাবনলাল বর্মা

মহাশ্বেতা ভট্টাচার্য

একদা, আমাদের প্রতিবেশী প্রদেশ-গুলির সম্বন্ধে অজ্ঞতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তির কথা মনে পড়ছে। তিনি যা বলেছিলেন, তার সার হচ্ছে, আমরা ফরাসীজাতির দৈনন্দিন আচারব্যবহার আর ইংরেজদের খাদ্যাখাদ্য সম্বন্ধে অনেক জানি। কিন্তু ভারতবর্ষের সহোদর জাতিগুলির সম্পর্কে আমাদের অজ্ঞতা শোচনীয়।

প্রদেশের জাতি সম্পর্কে যে ঔদাসীন্য, সাহিত্যক্ষেত্রে তা বর্তানো উচিত নয়। আন্তঃপ্রাদেশিক সাহিত্য, অন্তত বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে প্রবল আগ্রহ দেখেছি গুজরাট ও মধ্যভারতে। বাংলার মানুষ হয়ে শ্রীযুক্ত বৃন্দাবনলাল বর্মার সম্বন্ধে আমার আগ্রহ কম ছিল না। শুনেছিলাম বুন্দেলখণ্ডের অনুর্বর কঠিন মাটির এই সুযোগ্য সন্তান, দীর্ঘদিনের অনুসন্ধিৎসু গবেষণায় ঝাঁসীর রাণীর সম্বন্ধে একখানি প্রামাণ্য উপন্যাস লিখেছেন। আরও শুনেছিলাম ঐতিহাসিক উপন্যাস রচনায় তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব। তাঁকে দেখবার বাসনা ছিল।

লাখিমপুরে হিন্দী-সাহিত্য-সম্মেলনে গিয়েছিলেন বৃন্দাবন বর্মা। ঝাঁসীতে ফিরতে দুইদিন দেরি হবে। দুইদিন কাটল ঝাঁসী শহরের পথে ঘাটে একশো বছরের যবনিকা উন্মোচনের প্রচেষ্টায়। ছিয়ানব্বুই বছর আগে ইংরেজ আক্রমণের সময় এবং ঝাঁসীর রাজলক্ষ্মী রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের ঝাঁসী-ত্যাগের পর থেকে শহরটি একইরকম আছে। সেই পথ, সেই ঘাট, সেই গোলা-বিধ্বস্ত ঘরবাড়ী। বুন্দেলখণ্ডের মানুষ আজও ঝাঁসীর পথে পথে টাংগা চালায়। শাক তরকারি বেচে, আর অবসরের ফাঁকে, দুপুরের বিশ্রান্তিতে, বুন্দেলখণ্ডী ভাষায় গল্প করে রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের। ঝাঁসীতে যদিচ তাঁর স্মৃতিরক্ষার কোনো ব্যবস্থা নেই, তবু ঝাঁসীর জনসাধারণই সেই পুণ্য স্মৃতির ধারক।

সন্ধ্যাবেলা দেখা হ'ল বৃন্দাবনলাল বর্মার সংগে। শহরের বাইরে ক্যান্টনমেণ্ট এলাকায় ছায়াচ্ছন্ন একটি বাড়ি। দেওয়ালে দুটি ছবি ঝুলছে, একটি মহাত্মা গান্ধী, অপরটি রবীন্দ্রনাথের। বুদ্ধি-উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ চেহারা, শাণিত চোখ, সাতষট্টি বছর বয়সেও চুলে ভাল ক'রে পাক ধরেনি, বৃন্দাবনলালের সঙ্গে আলাপ হ'ল। হিন্দী সাহিত্যজগতে তিনি দীর্ঘ-দিন ধরেই সুপ্রতিষ্ঠিত। ঘরে যতগুলি বই দেখলাম, তার মধ্যে বাংলা বইও দেখলাম। তাতে বিস্মিত হয়েছি বুঝে তিনি স্মিত হেসে জানালেন, রবীন্দ্রকাব্য বাংলাতে পড়বার আগ্রহে দীর্ঘদিন আগেই তিনি বাংলা ভাষা অধ্যয়ন করেছিলেন। হেসে বললেন—স্ব-ভাষায় কাব্য সাহিত্য পড়বার জন্যে শিখেছিলাম বাংলা, গুজরাটি। ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখতে শুরু করবার জন্যে শিখেছি মারাঠী, উর্দু। মাতৃভাষা আমার বুন্দেলখণ্ডী, আর লিখি আমি হিন্দীতে। চর্চার অভাবে বংলায় অবশ্য আজ অনভ্যস্ত হয়ে এসেছি, তবু পড়লে বুঝতে পারি। শীতের সন্ধ্যার মর্মরিত ঝাউগাছের পল্লবকল্লোলের পটভূমিকায়, ধীরে ধীরে আশ্চর্য এই মানুষটির পরিচয় শুনলাম।

দেশ তাঁর বুন্দেলখন্ড। ঝাঁসী যেদিন স্বাধীন মারাঠারাজ্য ছিল, রাণী লক্ষ্মী-বাঈ যখন ১৮৫৭ সালের পটভূমিকায় ঝাঁসীর শাসনভার হাতে তুলে নিয়ে-ছিলেন, সেদিন বৃন্দাবনলালের প্রপিতামহ আনন্দরাও ছিলেন ঝাঁসী রাজ্যের মৌরাণীপুর তহশীলের দেওয়ান। মনেপ্রাণে বুন্দেলখণ্ডের স্বাধীনতারক্ষায় জীবনপণ রেখে স্বদেশপ্রেমিক বীর আনন্দরাও, মৌরাণীপুরের ভার নিয়ে রইলেন, এদিকে ঝাঁসী ছেড়ে রাণী চলে গেলেন কাল্পীতে। দীর্ঘ আড়াই মাস অক্লান্ত সংগ্রামের পর গোয়ালিয়ারের যুদ্ধে তাঁর পতন হ'ল। সে সময় সমগ্র বুন্দেলখণ্ডে তরোয়ালের জোরে শান্তি-স্থাপনা করে, বিজয়গর্বে ইংরেজ ফৌজ, ঝাঁসীর পথে পথে যখন চলেছেন, আনন্দ-রাও বললেন—"প্রাণ থাকতে টিকমগড় থেকে বিনা প্রতিরোধে মৌরাণীপুর হয়ে ইংরেজ ফৌজকে ঝাঁসী যেতে দেব না।" ইংরেজের ভয়ে তখন সমস্ত দেশবাসী সন্ত্রস্ত। স্তম্ভিত হয়ে ইংরেজ সেনাপতি জানতে চাইলেন,—

"Why does he want to fight for a lost cause?"

আনন্দরাও জবাব দিলেন,—"রাণী মরগেই হোউনী, আনন্দরাও তো জীন্দা হ্যায়!" ব্রিটিশ বাহিনীর অগ্রগতি প্রতিরোধ

পেল মৌরাণীপুরে এসে। অসমসাহসের সঙ্গে লড়ে সম্মুখ যুদ্ধে প্রাণ দিলেন আনন্দরাও। বার্তা শুনে হিউরোজ বললেন,—

"We should be thankful that there are not many, who will die for a lost cause."

প্রপিতামহের এই কাহিনী বৃন্দাবন-লালকে চিরদিনই প্রেরণা যুগিয়েছে। এবং ভারবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রামে আনন্দরাও-এর আত্মাহুতি তাঁর মনে চিরন্তন কল্যাণউৎসের মতো প্রেরণা দিয়েছে, ভালবাসতে শিখিয়েছে পাহাড়-কাঁকর ঘেরা পরুবদর্শন তাঁর জন্মভূমি বুন্দেলখণ্ডকে। বুন্দেলখণ্ডের কথা বলতে বৃন্দাবনলাল সোৎসাহে, সশ্রদ্ধ-ভাবে বললেন,ঃ আমার মায়ের চেয়েও ওপরে। দেশ আমার মায়ের চেয়ে অধিক।

সাহিত্যসাধনার ইতিহাস তাঁর বিচিত্র। ললিতপুরের স্কুল থেকে ঝাঁসীতে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন দ্বিতীয় শ্রেণীতে। বোর্ডিংয়ে বন্ধু ছিল বাঙালীরা, বোর্ডিংয়ের বাইরে ছিল মহারাষ্ট্রীয়রা। সেই সময় তিনখানি নাটক লেখেন তিনি। সেই তাঁর সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত। হেসে বললেন—এলাহাবাদের ইণ্ডিয়ান প্রেসের ঘোষবাবু নাটকগুলিকে প্রকাশ করবার ইচ্ছা জানান। এবং লেখকের বয়স জেনে, উৎসাহ দিয়ে পঞ্চাশ টাকা পারিশ্রমিক পাঠিয়ে দেন। সেটা ১৯০৫ সাল। সেই নাটকগুলির মধ্যে একটির নাম মাত্র মনে পড়ছে ভাগ্-কা-ফের (ভাগ্যের ফের)। অন্য-গুলির বিষয়ে কিছুই মনে নেই। তবে সেই পঞ্চাশটাকা দিয়ে বন্ধুবান্ধব মিলে খুব আনন্দ করা গিয়েছিল।

সেই সময় বাংলা দেশে চলেছে সন্ত্রাস আন্দোলন। খুদিরামের ফাঁসি এবং কিছু-দিন বাদে জেলে নরেন গোস্বামীর হত্যা, সুদূর বুন্দেলখণ্ডের ছাত্রমহলেও সাড়া জাগিয়েছিল। অনুপ্রাণিত হয়ে সেই সময় বৃন্দাবনলাল, তিনখানি নাটক লেখেন। একখানি নাটক সেনাপতি উদল-এ, রাজ-নৈতিক হত্যাকে অভিনন্দন জানিয়ে লেখা হয়। লক্ষ্ণৌএর নবলকিশোর প্রেস বইখানি প্রকাশ করেন। যুক্তপ্রদেশের ছাত্র সমাজে ১৯০৮ সালে, আঠারো বছর বয়স্ক বৃন্দাবনলালের নাটকখানি অদ্ভুত-

শ্রীবৃন্দাবনলাল বর্মা

পূর্ব উৎসাহের সঞ্চার করে। ফলে পুলিস হস্তক্ষেপ করে। বইখানি যুক্তপ্রদেশে নিষিদ্ধ হয়ে যায়, এবং দীর্ঘদিন ধরে তাঁকে পুলিসের হাঙ্গামা পোহাতে হয়।

বৃন্দাবনলাল সেই সময় স্কুল ফাইন্যাল পাস করে, স্কলারশিপ পান। কিন্তু শরীরচর্চা, অস্ত্রশিক্ষা, এইসব দিকে ঝুঁকে প'ড়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেন। কিন্তু সাহিত্য চর্চার ঝোঁক, যা তখন একান্ত-ভাবে বাতিক বলে গণ্য হোত, তা তাঁর কাটল না। ১৯০৮ সালে তাঁর প্রবন্ধ, ধন-কা-সদুপযোগ কলকাতা থেকে এবং বুদ্ধচরিত আগ্রা থেকে প্রকাশিত হয়।

এই সময় তিনি গোয়ালিয়ার কলেজে ভর্তি হন। ১৯১৬ সালে ল পাশ করে বেরোন, এবং পারিবারিক চাপে, ঠিক করেন ল' প্র্যাকটিস করবেন। ১৯১৬ সাল থেকেই প্র্যাকটিশ শুরু করেন। ব্যবহারজীবী হিসেবে বৃন্দাবনলাল ঝাঁসীতে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিচিত্র তাঁর অভিজ্ঞতা। কিন্তু শত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তাঁর সাহিত্যসৃজন থেমে থাকেনি। এ পর্যন্ত তিনি দ্বি-শতাধিক ছোট গল্প লিখেছেন। বাইশটি নাটক এবং কুড়িটি সামাজিক ও ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখেছেন। ঐতিহাসিক উপন্যাসেই তাঁর দক্ষতা অসামান্য। কেননা তাঁর উপন্যাস শুধু উপন্যাসই নয়, ইতিহাসও বটে।

জীবনের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থেকে, বৃন্দাবনলাল যখন যে বিষয়ে উপন্যাস লিখেছেন, ঘটনাস্থলে গিয়ে বাস করেছেন, সেখানকার মানুষের সঙ্গে মিশেছেন, তাদের সঙ্গে থেকেছেন। মাতৃভূমি বুন্দেল-খণ্ডকে ভালো করে জানবার জন্য, দুর্গম তার সব অঞ্চলে পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন, বুন্দেলখণ্ডের অনুন্নত জাতিগুলি সম্পর্কে তাঁর চেয়ে গভীর জ্ঞান কম লোকেরই আছে। যুক্তপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ও মধ্যভারতের প্রায় সর্বত্র তিনি পায়ে হেঁটে ঘুরেছেন। শিকারে তাঁর অসীম আগ্রহ এবং বুন্দেলখণ্ডের অরণ্যবন সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান বিস্ময়কর। একাধিক-বার বাঘ, চিতা, কালোপ্যান্থার ও সাপের মুখে পড়েছেন। কখনো বন্দুকের সাহায্যে প্রাণ বাঁচাতে হয়েছে, কখনো এমনিই বেঁচে গেছেন। তিনি বললেন—ওরা তো মানুষ নয়। কাজেই ওরা অকারণ মানুষকে আক্রমণ করে না। মানুষ ওদের অকারণে হত্যা করেছে,

নির্মূল করেছে বসতিস্থান থেকে, কিন্তু মানুষের চেয়ে সত্যিই ওরা অনেক কম ভীতিপ্রদ।

কর্মজীবন থেকে অবসর গ্রহণ করে ঝাঁসীতে তিনি স্বাধীন প্রেস ও ময়ূর প্রকাশন গড়ে তোলেন। তাঁর ছেলে সত্যদেবের হাতে পড়ে এই প্রকাশনী ধীরে ধীরে বড় হয়। এবং তাঁর ছেলেই সযত্নে এক একটি করে তাঁর বই প্রকাশ করে তাঁকে ভারতীয় সাহিত্যের জগতে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সমসাময়িক হিন্দী-সাহিত্যক্ষেত্রে বৃন্দাবনজীর খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা অসামান্য।

বিন্ধ্যপ্রদেশের টিকমগড়ের রাজা তাঁকে একটি বনখণ্ড উপহার দিয়েছিলেন। বৃন্দাবনলাল সেখানে বসতি করিয়েছেন বুন্দেলখণ্ডী কিষাণদের। নিজের একটি বাড়ি আছে। সাধারণত সেখানে তিনি সাহিত্যসাধনায় ব্যাপৃত থাকেন। কিষাণদের জমিগুলি নিষ্কর। তাঁর বাড়ির প্রান্তে নদীতে তৃষ্ণার্ত চিতাবাঘ জল খেয়ে যায়, বর্ষার মেঘসঞ্চারে ময়ূরের ঝাঁক এসে নামে ছাদে। হরিণ সেখানে সুলভদর্শন। বৃন্দাবনলাল বললেন:— বুন্দেলখণ্ড আজও এতখানি অনুন্নত রয়েছে যে এইরকম একান্ত প্রাকৃতিক পরিবেশ, শহরের কাছেপিঠেই পাওয়া যায়। আমার গ্রামের নাম দিয়েছি শ্যামশ্রী।

রাজা মানসিংহ এবং গ্রাম্যললনা মৃগনয়নীর প্রণয়ের পটভূমিকায় রচিত তাঁর উপন্যাস 'মৃগনয়নী' সুবিখ্যাত। মধ্যযুগের সে দিন নেই, সে কাল নেই, শিল্পকুশলী, কলাবিদ্ এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা রাজা মানসিংহের তরোয়ালের ঝনঝনা আজ নীরব। মৃগনয়নীর হরিণচোখের চকিত চাহনী, আর কোমল চরণের নূপুরসিঞ্জন চিরদিনের জন্যে অপার্থিব লোকে নির্বাসিত। কিন্তু দুর্ভেদ্য গোয়ালিয়ার দুর্গের মানমহল, গুজারীমহল, যা মানসিংহ একান্তভাবে তাঁর প্রণয়িনীর জন্য করেছিলেন, তা আজও রয়েছে। আর সেই দিনকে পুনর্সৃষ্টি করেছেন বৃন্দাবনলাল তাঁর উপন্যাসে। যুক্তপ্রদেশ সরকার মধ্যভারত সরকার, এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে তিনি সেজন্য পাঁচ হাজার টাকা ও বিভিন্ন স্বর্ণ রৌপ্য পদক পেয়েছেন।

১৯৫২ সালে কাশী নাগরী প্রচারিণী সভার তরফ থেকেঃ "অচল মেরা কোই" সামাজিক উপন্যাসের জন্য প্রাপ্ত পুরস্কার তিনি আসাম বন্যায় দান করেন। ভারতীয় নারীদের প্রতি তাঁর অপরিসীম শ্রদ্ধা। বললেন—ভারতবর্ষের দরিদ্রতম একটি প্রদেশ বুন্দেলখণ্ডে আমি আজীবন কাটিয়েছি। সেখানে এবং সর্বত্র আমি দেখেছি, সমাজের বোঝা টানছে মেয়েরা। কি কঠোর পরিশ্রম, কি অসাধারণ আত্মত্যাগ আমি দেখেছি, যে কি বলব। সেই আন্তরিক শ্রদ্ধা আমার মনে মনে রূপ নিয়েছিল রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের মধ্যে। সেই মহীয়সী চরিত্রকে আমি শ্রদ্ধা জানাব কি করে অনেকদিন ভেবে পাইনি। দীর্ঘ চোদ্দবছর ধরে বুন্দেলখণ্ডের বিভিন্ন স্থান, বিভিন্ন ঘর, বিভিন্ন মানুষের মধ্যে থেকে রাণীর স্মৃতির প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধার, অসাধারণ ভালবাসা থেকে সেসব তথ্য পেয়েছি সংগ্রহ করেছি। তারপরে স্থির করলাম উপন্যাস লিখব।

একটু থেমে, অসাধারণ অথচ গভীর সরলতার সঙ্গে বললেন, মানুষের ভালোবাসা তো ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশিত। এই মাটিকে আমার বুন্দেলখণ্ডের কুমোর ভালবেসেছে, সে গড়েছে পুতুল, চাষা ভালোবেসেছে, সে ফলিয়েছে মকাই আর গেঁহু। আমিও তো এই মাটিরই মানুষ। তাই আমি ভাবলাম আমি লিখব উপন্যাস। আমার ভালোবাসা যদি নি-খাদ হয়, আমার মনে যদি শ্রদ্ধা থাকে, তো উপন্যাসের আধারেই তার ঠাঁই মিলবে। তাই বাহিনজী, আমি উপন্যাস লিখেছি। এর প্রত্যেকটি চরিত্র আমি কবর খুঁড়ে বের করেছি বিস্মৃতি থেকে। মন্দির মসজিদের পুরানো কাগজ। আর সেই দিনের মানুষের বংশধরদের বাড়িতে হানা দেওয়া, কিছু আমি বাকি রাখিনি।"

তাঁর "ঝাঁসি-কি-রাণী" উপন্যাসে তাই, অতীত ইতিহাস, বর্তমানে এসে দাঁড়িয়েছে। সেই মানুষ, সেই দিন, সেই কাল, ঝাঁসীর বিগত দিন, সবগুলিকে কঠোর সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে বৃন্দাবনলাল উপস্থাপিত করেছেন বর্তমানে।

আনন্দের বিষয়, এ বছর জানুয়ারী ১৯৫৫-তে কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে শ্রেষ্ঠ হিন্দী উপন্যাসের পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করেছেন, এই উপন্যাসখানির ওপর।

বৃন্দাবনলাল অবশ্য হিন্দী সাহিত্য-জগতে একান্ত সুপরিচিত। বাংলা সাহিত্যের প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধার কথা আগেই উল্লেখ করেছি। বঙ্কিমের শৈবলিনী চরিত্রের কথা তিনি পরম অনুভূতির সঙ্গে বললেন। শরৎচন্দ্রের সম্পর্কে তাঁর শ্রদ্ধা কম নয়। রবীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্গদার হিন্দী অনুবাদে তিনি ভূমিকা লিখেছিলেন। রবীন্দ্রকাব্য তাঁর কাছে একটি অফুরন্ত প্রেরণার উৎস। আশ্চর্য এই যে, আধুনিক বাংলাসাহিত্য সম্পর্কেও তাঁর জ্ঞান বা আগ্রহ কম নয়। বাংলার শিল্পীদের সম্বন্ধে তিনি খোঁজ রাখেন, এবং বাংলা গানের বিষয়ে তিনি, নজরুল, অতুলপ্রসাদ, (রবীন্দ্রনাথ তো বটেই) শুধু নয়, কান্তকবি রজনীসেন, গোবিন্দ রায়, মুকুন্দদাস, এ'দের গান সম্পর্কে জানতে চাইলেন। বললেন—এ'দের গান আজও বাংলায় গাওয়া হয় তো?"

জীবনের প্রতি একান্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে তাঁর বিশ্বাস। বললেনঃ নিরপেক্ষভাবে সত্যনিষ্ঠ না হ'লে জীবনকে সত্যিকারের মর্যাদা দেওয়া যায় না। সর্বত্র, প্রতিপদে, সত্যানুসন্ধানের প্রয়োজন আছে। আমি জানি না, আমি যা লিখেছি, তাতে কতখানি সত্যনিষ্ঠ হতে পেরেছি। কিন্তু আমি বরাবরই চেষ্টা করেছি।

যতক্ষণ কথা হল, তাতে পরিচয় হয়, আলাপ হয় না। তবু নানারকম অভিজ্ঞতার কথা বলে তিনি বিস্মিত ও মুগ্ধ করলেন। বললেন—আমার কর্মজীবনের দুটি বিচিত্র অভিজ্ঞতা শুনবেন! বরাবরই শুনে এসেছি ঝাঁসীতে একদা সাধারণ নাট্যশালা ছিল, আর নাচিয়েদের মধ্যে সেরা ছিল মোতিবাঈ, রূপ যার মুক্তোর মত স্নিগ্ধ, নাচে যে ছিল বুন্দেলখণ্ডের উর্বশী। ১১৫ বছরের বুড়ো এক সর্দার, যে ঝাঁসীর রাণীকে নিজে দেখেছে, তার কাছে গিয়ে আমি বসে থাকতাম। গল্প শুনবার লোভে। সে বলত, মোতিবাঈয়ের নাচ দেখতে সবাই যেত, তবু বাঈসাহেব যেতেন না। কিন্তু লড়াইয়ের দিনে, সেই মোতিবাঈ-ই যখন বাঈসাহেবের কাছে এসে

দাঁড়াল, নাচনেওয়ালী বলে বাঈসাহেব তাকে হটিয়ে দিলেন না। মোতিবাঈয়ের যে হাতের পাশে গোলাপফুল লজ্জা পেত, সেই হাতে সে বন্দুক চালাল, লড়াই করে মরল ইংরেজের সঙ্গে। কিন্তু এতো শুধু গল্প, এর ভিত্তি কোথায় ইতিহাসে? এমনি সময় একদিন ঝাঁসী শহরে, অরছা দরোজার পাশের একটি মসজিদের মালিকানা নিয়ে দুই দল এল। জানতে চাইলাম, এই মসজিদের মালিক কে? তারা বলল রাণীর কোন সহেলী। কে তার নাম জানি না। তারপর অনেক ভেবে, মনে পড়ল, গোয়ালিয়ারের সিন্ধিয়ার অধীনে ছিল ঝাঁসী শহর আর কেল্লা কত বছর ধরে। গোয়ালিয়ারে খুঁজে পাওয়া গেল সেই কাগজ আর তাতেই দেখলাম, ঝাঁসীর রঙ্গনাট্যশালার বিখ্যাত নটী মোতিবাঈকে গঙ্গাধর রাও ইনাম দিচ্ছেন অরছা-দরওয়াজার পাশের এই জমি। মসজিদ উঠবে তাতে। ভক্তজনের নিয়ত প্রার্থনায় তৃপ্ত হবে রাজনর্তকীর প্রাণ। কিন্তু কেন এই বিচিত্র ইচ্ছা? কেন সে ভূষণ চাইল না, অর্থ চাইল না, জাহগীর চাইল না? সেই কাহিনী তখন মিলল। সে এক অশ্রুসজল কাহিনী। সারাজীবন যে আনন্দ দিয়েছে হাজার মানুষকে, নিজের জীবনে সে ভাগ্যের হাতে শুধু বিড়ম্বনাই পেয়েছিল। তাই সংগ্রামের দিনে মোতিবাঈ অবহেলে জীবন দিতে এগিয়ে গিয়েছিল। রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের কোলে মাথা রেখে মৃত্যু হয়েছিল তার।

অপর অভিজ্ঞতাটি আরও বিচিত্র। একদা একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন। পরিচয়ে জানলাম, তিনি ঝাঁসীর রাণীর পৌত্র। লক্ষ্মীবাঈয়ের দত্তকপুত্র দামোদর রাওয়ের একমাত্র পুত্র। বললেন - আমার কয়েক লক্ষ গচ্ছিত টাকার ব্যবস্থা করে দিতে হবে। তখন জানলাম, ঝাঁসী ইংরেজ নিয়ে নেবার সময় রাজকোষের গচ্ছিত টাকা পাবার কথা ছিল দামোদর রাওয়ের, বয়ঃপ্রাপ্তি হলে। ইতিমধ্যে ১৮৫৭ সালের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে যোগ দিলেন ঝাঁসীর রাণী, মৃত্যু হল তাঁর। তখন দামোদর রাওয়ের বয়স বছর দশেক হবে। দামোদর রাও যুদ্ধে যোগ দেননি, এবং তাঁর সঙ্গে ইংরেজ সরকারের কোন বিরোধ ছিল না, তবু গচ্ছিত টাকা দামোদর রাও পাননি। লক্ষ্মণ রাওএর জন্য আমি অনেক চেষ্টা করেছিলাম, তবু কোন মীমাংসা হয়নি। ইন্দোরে টাইপিস্ট লক্ষ্মণ রাও, অথচ তাঁর ধারণা কোথাও তাঁর জন্যে গচ্ছিত আছে লক্ষাধিক টাকা। এ এক বিচিত্র অভিজ্ঞতা বই কি!"

এমনি ধারা খোসগল্প আর আলাপে সময়টুকু কেটে গেল। পরে অন্ধকারে ক্যান্টনমেন্টে ফিরতে ফিরতে দূরে ঝাঁসীর কেল্লায় আলোর নিশানা দেখা গেল। ঝাঁসীতে এসেছিলাম তীর্থযাত্রীর মন নিয়ে। দুর্গ দেখলাম, ঝাঁসীর পথঘাট দেখলাম, রাণী লক্ষ্মীবাঈয়ের নিত্য আরাধনা নন্দিত মহালক্ষ্মী মন্দির দেখলাম, রাজা গঙ্গাধর রাওয়ের স্মৃতি মন্দির দেখলাম, দেখলাম রাণীর থাকবার প্রাসাদ, যা দেখে টমাস্ লো' বলেছিলেন—most beautiful palace in India I had seen. হিউরোজ বলেছিলেন—Surprising still it is true, the king of Jhansi knew how to live. His palace is one of the best I have seen in India. সেই প্রাসাদে এখন ঝাঁসীর থানা। কোতোয়ালীর চৌকিদারদের নিত্য রন্ধনজনিত ধোঁয়াতে দেওয়ালের চিত্রাবলী মলিন, দরজার উপরের মূর্তিগুলি খসে পড়ছে, সেদিন নেই, সে থাকবার নয়। তবে জোর করে যেখানেই রাখা হয়েছে, সেখানেই তার চেহারা একান্ত করুণ। ইতিহাসের আকুতি একই—রাখতে হলে ভাল করে রাখো; নয় তো বিদায় দাও, পাঠিয়ে দাও বিস্মৃতির ওপারে, মাঝপথে রেখে বিড়ম্বিত করো না। এমনি করে দেখা যে ঝাঁসী, তা হয় তো পূর্ণ হোত না ঝাঁসীর মানুষ বৃন্দাবনজীকে না দেখলে। বুন্দেলখণ্ডের সুযোগ্য সন্তান, যিনি বুন্দেলখণ্ডকে ভালোবেসেছেন, ভালোবেসেছেন তার মানুষকে। বলেছেন—

মা-কি-মা হ্যায় ওহি বুন্দেলখণ্ড্।

ট্রামে-বাসে

এ কটি সংবাদ শিরোনামা—"মানভূমে যুদ্ধকালীন অবস্থার সৃষ্টি"।—"তর্জন-গর্জন অবশ্য আমরাও শুনিয়াছি। কিন্তু আমরা ঠিক্ যুদ্ধের কথা ভাবিনি। মনে হয়েছে গির বনের নিশ্চিহ্নপ্রায় সিংহ মশাইরা বুঝি সদলে বিহারে এসে

গর্জন করছেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

এ কটি সংবাদে প্রকাশ ভারতে চণ্ডীগড় নামক একমাত্র স্থানেই কোন ট্যাক্সের বালাই নাই। পৌর সংস্থায় একজন মাত্র কর্মীর তত্ত্বাবধানে দৈনন্দিন কার্যনির্বাহ হইতেছে।—"এক হিসেবে খুব ভালো; আমাদের গাজন যে বহু সন্ন্যাসীতেই নষ্ট করছেন"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

প্র সংগত প্রাণিসংরক্ষণ সমিতির বিবরণী মনে পড়িয়া গেল। শুনিলাম গন্ডার সিংহ প্রভৃতি জন্তু প্রায় নিশ্চিহ্ন হইয়া আসিলেও সৌভাগ্যবশত

বন্যগর্দভ নাকি এখনও টিকিয়া আছে।—"শুধু বন্য কেন নগরের গর্দভরাও ধনে-পুত্রে লক্ষ্মীলাভ করছে"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

রা শ্যান ফুটবল টিমের নেতা মঃ মশকারাকিন মন্তব্য করিয়াছেন যে, এই খেলা শিক্ষা করিবার জন্য বিদেশ হইতে বিশেষজ্ঞ আনিবার কোন প্রয়োজন নাই। বিদেশী বিশেষজ্ঞগণ স্থানীয় অবস্থার সঙ্গে সুপরিচিত নহেন বলিয়া তাঁহাদের প্রদত্ত শিক্ষা কার্যকরী না হইবারই কথা।—"ফুটবল খেলা সম্বন্ধে তাঁর এই অভিমত হয়ত সবাই মেনে নেবেন। কিন্তু রাজনৈতিক খেলা সম্বন্ধে ভারতে অবস্থিত রাশ্যার পরমবান্ধবরাও একবাক্যে বলবেন যে মশকারাকিন শুধু মস্করাই করেছেন। বৈদেশিক বিশেষজ্ঞ ছাড়া ফুটবলে হয়ত দু'পা চলে, রাজনীতিতে এক পা চলারও উপায় নেই"—মন্তব্য করিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

শ্রী যুক্ত জয়রামদাস দৌলতরামের অবসর গ্রহণ করার পর সর্দার পানিকরের নাকি আসামের গভর্নরের পদে নিযুক্ত হইবার কথা চলিতেছে।—"ভালোই হলো। কতদিন আগে শুনেছিলাম সর্দার পানিকর নাকি যোগাভ্যাসের ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। আসামের কাজিরংগার গভীর বন নিশ্চয়ই তাঁর যোগসাধনে সাহায্য করবে"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

শু নিলাম কলিকাতা কর্পোরেশন নাকি কলিকাতার নানারকম উন্নতি বিধানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট ছত্রিশ কোটি টাকা সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছেন। তাঁহাদের পরিকল্পনার তালিকায় উন্নতির যে যে ক্ষেত্রের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহার মধ্যে কলিকাতা স্টেডিয়ামও আছে। শোনামাত্র শ্যামলাল নাটকীয় ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিল—"ও নাম করো না উচ্চারণ!"

* * *

পা ক্ মহিলারা নাকি বহু বিবাহ বন্ধ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। বহু না হইলেও অন্তত এক স্ত্রী বর্তমানে স্বামী যাহাতে আবার বেগম-গ্রহণ করিতে না পারেন তাহার জন্য চেষ্টা করা হইতেছে।—"কিন্তু ফল এতে যে কী হবে বলা শক্ত। আমরা যতদূর জানি, একমাত্র বিয়ের ব্যাপারেই পাক্ স্বামীরা হিন্দুশাস্ত্রের একটি নীতি নিজেদের ছাঁচে ঢালাই করে মেনে নিয়েছেন—অর্থাৎ নাল্পে সুখমস্তি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

এ কটি সংবাদে প্রকাশ বৈদেশিক বণিকদের উদ্বৃত্ত মাখন দিয়া নাকি এইবার ভারতের ঘৃতের চাহিদা মেটানো হইবে।—"কিন্তু তাতে অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে কি? যেটেরার দিনে যে বিধি লিখে রেখে গেছেন—কপালে নেইকো ঘি, ঠক্ঠকালে হবে কি?"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

স রকারী এক বিবৃতিতে শুনিলাম যে, প্রায় দেড় লক্ষের উপর গ্র্যাজুয়েট নাকি চাকুরীর সন্ধানে ঘুরিয়া
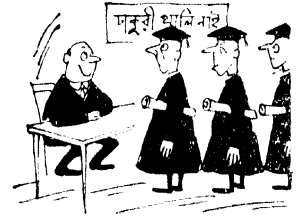
মরিতেছেন।—"এঁদের কেহই বোধ হয় জানেন না যে আমাদের নীতি হলো—মা ফলেষু কদাচন"—মন্তব্য করিলেন আমাদের জনৈক সহযাত্রী।

* * *

ব্রি টিশ নাট্যজগতের খ্যাতনামা অভিনেতা স্যার লিউস কাসন এক সাংবাদিক বৈঠকে মন্তব্য করিয়াছেন যে ভারতীয় নাটকে ভারতীয় ঐতিহ্য এবং পটভূমিকার উপরই বেশি গুরুত্ব আরোপ করা উচিত। আমাদের জনৈক সহযাত্রী মন্তব্য করিলেন—"আমরা স্যারের সঙ্গে একমত হতে পারছিনে বলে দুঃখিত। নাটক ভারতীয় হোক আর যাই হোক বিলিতি ধরনের হাসি এবং ফরাসী ধরনের কাশি দিতে না পারলে নাটকের দানা বাঁধার কোন সম্ভাবনাই যে নেই"!!

ছোট গল্প

তাস—সৈয়দ শামসুল হক। প্রকাশক—এসম্যান পাবলিশার্স, ১ গোবিন্দ দত্ত লেন, ঢাকা। দাম—২৲।

এখন পর্যন্ত এমন একটা রেওয়াজ চলছে, যাতে মনে হয় পাকিস্তানের সাহিত্যিকরা যেন নতুন ভাষায় লিখছেন, বাংলা সাহিত্য যেন তা নয়। আমরা একই ভাষায় কথা বলি, একই ভাষার মারফৎ সাহিত্য রচনা করি, অথচ 'পাকিস্তানী সাহিত্যিক' না বলে কেবলমাত্র বাঙালী সাহিত্যিক বলার বাধাটা যেন আজও কাটে উঠলো না। অথচ সেখানে নতুন লেখকরা বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যিক জাতির জন্য যে চেষ্টা এবং পরিশ্রম করছেন, সে উদ্যম এই পশ্চিম বাংলার তুলনায় বোধ হয় কিছুমাত্র কম নয়। সৈয়দ শামসুল হকের 'তাস' গল্প সংগ্রহ তার একটি সার্থক নিদর্শন।

লেখক বয়সে নবীন না প্রবীণ জানি না, কিন্তু প্রথম গল্প সংগ্রহেই তিনি যে ক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন, তাতে নিঃসন্দেহে বলা যায়, ভবিষ্যতে তিনি বাংলা সাহিত্যকে কিছু ঐশ্বর্য দিয়ে যেতে পারবেন। এ গ্রন্থে বিশেষ করে 'সম্রাট', 'তোকেয়ার মুখ' এবং 'তাস' গল্প কয়টি মনে রাখবার মতো। একটা জিনিস বড় ভালো লাগলো, লেখক খণ্ডিত দৃষ্টি নিয়ে সমাজকে দেখার চেষ্টা করেন নি কোথাও। সামাজিক বিপ্লবকেও যেমন তিনি ব্যাপকভাবে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন, তেমনি ব্যক্তিগত মনস্তত্ত্বকেও সমান সম্মান দিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হননি। দৃষ্টির এই প্রসারতাকে যদি লেখক বজায় রাখতে পারেন, তবে তাঁর উজ্জ্বলতর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পাঠক-সমাজ আশান্বিত হবেন।

তা ছাড়া ছোটগল্পের ফর্ম সম্বন্ধে লেখক সুস্পষ্ট একটি ধারণা যে পোষণ করেন, এ-গ্রন্থের সব কয়টি গল্পই তার প্রমাণ। অর্থাৎ কেমন করে গল্প বলতে হয়, তা তিনি জানেন। ৫৫৪।৫৪

অনুবাদ সাহিত্য

ক্যারি অন জীভস—পি জি ওডহাউস, অনুবাদক—শ্রীমণীন্দ্র দাশগুপ্ত। প্রকাশক—নবভারতী, ৫ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। দাম—৩।৷৹।

ইংরেজী সাহিত্যপাঠে অভ্যস্ত পাঠক-সমাজের কাছেই পি জি ওডহাউসের নাম অত্যন্ত পরিচিত। সরল হাস্যরস বিতরণ করে পাঠকদের আনন্দের সাহিত্য সৃষ্টি করা যে সম্ভব, তাঁর সব কয়টি গ্রন্থই তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। 'ক্যারি অন জীভস' সে-গ্রন্থমালার একটি উজ্জ্বল খণ্ড। যেহেতু আনন্দদানই

মুখ্য উদ্দেশ্য, সেহেতু ভাষাটিও লেখকের অত্যন্ত সহজ, তা না হলে সাধারণ পাঠককুল সহজে তাকে গ্রহণ করবে কেন। কিন্তু এ-সব গ্রন্থের অনুবাদকর্ম বড় সহজ নয়। অনূদিত ভাষার ওপরও প্রচুর দখল থাকা একান্তই প্রয়োজন, কারণ এ-ভাষা সাধারণতই idiom-এর ওপর নির্ভরশীল। 'ক্যারি অন জীভসে'র অনুবাদ পড়ে মনে হলো, অনুবাদকের সে-দখল সত্যই আছে। কারণ এমন সার্থক অনুবাদ হামেশা চোখে পড়ে না। কখনোই মনে হয় না যে, মূল রচনা পড়ছি না, একটি অনুবাদ গ্রন্থ পড়ছি মাত্র। যাঁরা কেবল বাংলা ভাষার মাধ্যমে সাহিত্য পাঠ করেন বা করতে ভালোবাসেন, তাঁদের কাছে এই অনূদিত গ্রন্থটি নিঃসন্দেহে আদৃত হবে। ৫৫৭।৫৪

ক্যাপটেনের মেয়ে—পুশকিন, অনুবাদক—ত্রৈলোক্য বিশ্বাস। প্রকাশক—দাশগুপ্ত ব্রাদার্স, লেডি উইলিংডন রোড, কলিকাতা ৩২। দাম—৩৲।

রুশ দেশের দিকপাল সাহিত্যিক পুশকিনের একটি বিখ্যাত উপন্যাস অনুবাদের জন্য নির্বাচন করে অনুবাদক তাঁর

সংরুচির পরিচয় দিয়েছেন সন্দেহ নেই। তার জন্য তিনি আমাদের ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। কিন্তু এই আনুবাদকর্মের জন্য সে-সঙ্গে যদি তাঁর প্রশংসাও করতে পারতাম, তবে আর দুঃখের কিছু ছিলো না। বাধ্য হয়েই বলতে হচ্ছে, সে অবকাশ তিনি রাখেননি। এমন ব্যর্থ অনুবাদ আজ আর সাহিত্যপাঠকদের কাছে বিতরণ করা সহজ নয়, কারণ সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্য এখন সার্থক অনূদিত গ্রন্থ-সম্ভারে রীতিমত ঐশ্বর্যবান। তবু বাংলা দেশের সাহিত্য পাঠকদের বলবো, পুশকিনের 'ক্যাপ্টেনের মেয়ে' উপন্যাসটি পড়ে দেখা উচিত। সম্প্রতি আধুনিক রুশ সাহিত্যের প্রচুর অনুবাদ প্রকাশিত হচ্ছে, সুতরাং 'ক্যাপ্টেনের মেয়ের' মধ্যে তাঁরা সে-সাহিত্যেরই প্রাক্তন রীতিনীতির কিছু সন্ধান হয়তো পাবেন।

প্রকাশকের প্রতি নিবেদন, পুস্তক-প্রকাশে আরও একটু যত্ন নেওয়া দরকার। ছাপার ভুল এত বেশী আর মারাত্মক যে, তা শুধু চোখের পীড়াদায়কই নয়, ছাত্রপাঠকদের পক্ষেও অত্যন্ত ক্ষতিকর। ৫৫৬।৫৪

জীবনী

Yogiraj Gambhira Nath:—শ্রীঅক্ষয়কুমার ব্যানার্জি এম এ প্রণীত। সাধু অভেদানাথ কর্তৃক গোরক্ষপুর, গোরক্ষনাথ মন্দির হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩৷৷০ আনা।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের বিগত অধিবেশনের দর্শন-শাখার সভাপতি ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজের দর্শন শাস্ত্রের ভূতপূর্ব অধ্যাপক এবং মহারাণা প্রতাপ ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ শ্রীযুত অক্ষয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত পুস্তকখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। যোগীরাজ গম্ভীরানাথ লোকোত্তর-চরিত্র মহাপুরুষ। এমন মহাযোগী যাঁহারা, তাঁহাদের জীবন সাধারণ লৌকিক জীবনের অনুরূপ নহে; কারণ শুদ্ধ মননের অপ্রাকৃত স্তরে তাঁহারা প্রতিষ্ঠিত। সাধারণ জীবনের বহু ঊর্ধ্বে তেমন জীবন দিব্যানন্দে বিধৃত এবং অব্যয় মহিমায় অনুস্যূত হইয়া ব্যবহারিক বিচারের পক্ষে অনধিগম্য হইয়া পড়ে। সুতরাং সাধারণত জীবনী বলিতে আমরা লৌকিক জীবনের ঘটনাবলীর বিচার, বিন্যাস বা আলোচনা বলিতে যাহা বুঝি, ইঁহাদের সম্বন্ধে তেমন জীবনী লেখা চলে না; কারণ তেমন তথ্যও পাওয়া যায় না। ফলত প্রাকৃত স্তরেও ইঁহারা অপ্রাকৃত, ধরা ছোঁয়ার মধ্যে আমরা সাধারণভাবে তাঁহাদিগকে যেভাবে পাই, তাহা অনেকটা প্রতীতি মাত্র। যে সব যোগ-সিদ্ধ মহাপুরুষের আবির্ভাবে ভারতভূমি ধন্য হইয়াছে, যোগীরাজ গম্ভীরানাথ তাঁহাদের মধ্যে অগ্রগণ্য। নিত্যযুক্ত আত্মসমাহিত তাঁহার দিব্য জীবনের মহিমার কিছু পরিচয় দিতে হইলে শ্রদ্ধিতচিত্তে অন্তর রাজ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইতে হয় এবং সেই পথে অনুধ্যানগত উজ্জ্বল অনুভূতির সাহায্যেই তেমন জীবনের উপর কিঞ্চিৎ আলোকসম্পাত করা সম্ভব হইতে পারে।

গ্রন্থকার দর্শন শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ব্যক্তি; কিন্তু পাণ্ডিত্যই এ ক্ষেত্রে যথেষ্ট নয়, তিনি সাধক পুরুষ। দার্শনিক বিচারের সহিত অধ্যাত্মানুভূতি এতদুভয়ের সংযোগে যোগী-রাজ গম্ভীরানাথের ভাগবত জীবনের গূঢ় রহস্যের সহিত তিনি প্রখর মনস্বিতা সংযোগে পুস্তকখানিতে আমাদের পরিচয় করাইয়া দিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাঁহার সে যত্ন সর্বাংশে সার্থক হইয়াছে।

অবতরণিকায় শৈব দর্শনের ক্রমবিকাশ, বিবর্তন এবং আগম শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত যোগবিদ্যার বিভিন্ন পর্যায় সম্বন্ধে গ্রন্থকার যে বিচার ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন, তাহা তাঁহার প্রকৃত পাণ্ডিত্য এবং দার্শনিক অনুসন্ধিৎসার পরিচায়ক। প্রকৃতপক্ষে এই দার্শনিকতা এবং যোগাঙ্গসমূহের নিগূঢ় রহস্য পটভূমিকা স্বরূপে অবলম্বিত হওয়াতেই যোগীরাজ গম্ভীরানাথের অধ্যাত্ম ঐশ্বর্য এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়াছে। এমন মহৎ জীবনী পাঠে জীবনে স্থায়ী কিছু পাওয়া যায়; প্রত্যুত কৌতূহল নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে সার্বভৌম উদার আদর্শে চিত্তবৃত্তির পরিস্ফূর্তি ঘটে। পুস্তকখানি শুধু ভারতে নহে, পরন্তু ইংরেজী ভাষায় লিখিত হওয়াতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সর্বাংশে সমাদৃত হইবার উপযোগী। বাঙলা ভাষায় ইহার অনুবাদ হওয়া উচিত। ৫৭২।৫৫

ধর্মগ্রন্থ

আত্মবোধ—জগদ্রাম রায় রচিত। শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল সংকলিত। শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৪।১, আশু বিশ্বাস রোড, কলিকাতা-২৫ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৸০ আনা।

একখানি প্রাচীন গ্রন্থ, অনূন শতাব্দ বর্ষ পূর্বে ইহা বিরচিত হয়। বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত ভুলই গ্রামে গ্রন্থকারের জন্ম হয়। গ্রন্থকার প্রদত্ত আত্মপরিচয়ে জানা যায় যে তিনি পুরুষানুক্রমে রামাই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধক ছিলেন। তাঁহার রচিত আলোচ্য গ্রন্থখানি অধ্যাত্মরূপক কাব্য। তিনি কাব্যখানিতে তাঁহার ইষ্টদেব শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপতত্ত্ব বিশ্লেষণ এবং তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্তন করিয়াছেন। নিত্য রসতত্ত্ব স্বরূপে তিনি ভগবানকে উপলব্ধি করিয়াছেন। তাঁহার ইষ্টদেব নিরাকার সাকারেতে যুক্ত হইয়া রাম। সীতা হ্লাদিনী শক্তি। রাম নামে দোঁহে স্থিতি, দুয়ে একাকার। রামচন্দ্র পরম পুরুষ। গ্রন্থকার এক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাধনার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন মনে হয়। তিনি নিজে শ্রীরামচন্দ্রের দাসী এই অভিমান পোষণ করিয়াছেন। 'রসরাজ, সীতারাম একাকারময়—পুরুষ ভাবেতে সেবা তার নাকি হয়'? সেবিকার অভিমানে এই সাধনার তাৎপর্য গ্রন্থকার অতি সুন্দর-ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। প্রগাঢ় রসানুভূতি তাঁহার লেখনী হইতে স্থানে স্থানে অমৃত

বর্ধিত হইয়াছে। রসিক সমাজে এমন গ্রন্থ বিশেষভাবেই সমাদৃত হইবে। প্রায় ৫৪ বৎসর পূর্বে গ্রন্থখানি প্রথমে প্রকাশিত হয়। এমন গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিয়া সংকলনকর্তা বাংলার ভক্ত এবং সাধক সমাজের ধন্যবাদ ভাজন হইবেন, সন্দেহ নাই। গ্রন্থের পাদটীকা দুরূহ তত্ত্বগুলির উপলব্ধির বিষয়ে বিশেষ সহায়ক হইবে। মনীষী গোপীনাথ কবিরাজ মহাশয়ের টিপ্পনীগুলি গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। ১২।৫৫

১। **অভ্যাসযোগ**—মূল্য ৩৲ টাকা

২। **দিনচর্য্যা**—মূল্য ১৸৹ আনা

৩। **দীক্ষা ও গুরুতত্ত্ব**—মূল্য ৸৹ আনা

শ্রীভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল প্রণীত। গুরুধাম ট্রাস্ট এস্টেটের পক্ষে শ্রীঅরুণকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক ৪।২, আশু বিশ্বাস রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থকার শ্রদ্ধাস্পদ সান্যাল মহাশয় পরম শাস্ত্রবেত্তা পুরুষ। তিনি আচার্য এবং উপদেষ্টা। তাহার রচিত গ্রন্থগুলি সাধক ও চিন্তাশীল সমাজের সর্বত্র সমাদৃত। অদৃষ্টবাদে অভিভূত কর্মবিমুখ সমাজকে কর্মের শক্তিতে জাগ্রত করাই 'অভ্যাসযোগের' উদ্দেশ্য। কর্মবিমুখতা ধর্ম নয়, অধর্মেরই তাহা পরিচায়ক। সাধনার বলে মানুষ মাত্রেই উচ্চাবস্থা লাভ করিতে পারে—এদেশের সব শাস্ত্রে ইহাই উপদিষ্ট হইয়াছে। অভ্যাসের দ্বারা শাস্ত্রোপদেশানুযায়ী উন্নত জীবন গঠন করিবার জন্য গ্রন্থকার সমাজকে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন এবং তাহার বিভিন্ন স্তরগুলিরও বিন্যাস করিয়াছেন। চিত্তশুদ্ধির উপরই তাহার উপদেশে গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে এবং কর্ম, ভক্তি, জ্ঞানযোগের সাধনাঙ্গ আলোচিত হইয়াছে। এই আলোচনার সর্বত্র গ্রন্থকারের প্রগাঢ় শাস্ত্রনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার মনস্বিতা তাঁহার যুক্তিরাজীকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। বর্তমান সমাজে এমন পুস্তকের বহুল প্রচারের প্রয়োজন রহিয়াছে।

দিনচর্য্যা গ্রন্থখানি প্রধানত বিদ্যার্থীদের জন্য লিখিত। গ্রন্থকার ধর্মভাবকে ভিত্তি করিয়া জীবনকে পরিচালনা করিবার জন্য সদাচারের নির্দেশ করিয়াছেন। ব্রহ্মচর্য এবং ইন্দ্রিয়-সংযমের উপর এক্ষেত্রে গুরুত্ব আরোপিত হইয়াছে। পরিশিষ্টাংশে কতকগুলি স্তোত্র, ধ্যান, প্রণাম, উপনিষদের বচন, মোহমুদ্গর এবং ভগদ্ভাবমূলক সঙ্গীত উদ্ধৃত হইয়াছে। পুস্তকখানি এদেশের তরুণদের নৈতিক জীবন গঠনের সহায়ক হইবে।

দীক্ষা ও গুরুতত্ত্বনামক পুস্তকখানিতে প্রশ্নোত্তরের ধারায় গুরুতত্ত্ব, সংগুরুর স্বরূপ, গুরুকরণের প্রয়োজনীয়তা প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পুস্তকখানি অনেকের ভ্রান্ত বিশ্বাস বিদূরিত করিতে সাহায্য করিবে। যাঁহারা প্রকৃত তত্ত্বান্বেষী তাঁহারা পুস্তকখানি পাঠে বিশেষ সাহায্য পাইবেন। ১০, ১১, ৯।৫৫

নাটক

মুস্কিল আসান—রাজেশ্বর ভট্টাচার্য। প্রকাশকঃ সাহানা প্রকাশ ভবন, ৩৩ হিদারাম ব্যানার্জি লেন। দামঃ দেড় টাকা। পৃষ্ঠা ৮৮।

'মুস্কিল আসান', 'কালার ঝকমারী', 'দাঠাকুরের হোটেল' মোট তিনটি একাংকিকার সংকলন। তিনটি নাটিকাতেই পরিচ্ছন্ন হাস্যরসের সন্ধান আছে। সংলাপও বেশ স্বচ্ছন্দগতি, চরিত্রসম্মত। কিন্তু যে অভাবের জন্য একাংকিকা তিনটি ঠিক কৌতুকরসের নাটকে পরিণতি লাভ করল না, সে অভাবটি হলো গল্পের শিথিল পরিকল্পনা। নাটকের গল্প হবে ঠিক অর্জুনের লক্ষ্যভেদের মত। তার লক্ষ্য নির্ভুল, তার গতি একটি সাবলীল ছন্দে অগ্রসরমান। একাংক তিনটিতে গল্পের ঘটনাগ্রন্থন শ্লথ হওয়ায় কৌতুক-নাটকের সব রকম সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও নাট্যরস জমে নি। ভবিষ্যতের নাট্যকার এদিকে সতর্ক হলে বিশেষ উপকৃত হবেন। ৫৫২।৫৪

রোমাঞ্চ কাহিনী

গুরুচরণ (দ্বিতীয় ভাগ)—শ্রীসরলরঞ্জন দাশগুপ্ত। দাশগুপ্ত ব্রাদার্সের পক্ষে শ্রীসুনীলরঞ্জন দাশগুপ্ত কর্তৃক পি-৩, শশীভূষণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে প্রকাশিত। দামঃ দু টাকা বারো আনা। পৃষ্ঠা ২৬৩।

আঠারো শ' ছিয়াত্তর খৃষ্টাব্দে ঝড়বিক্ষুব্ধ দৌলত খাঁর বাস্তব চিত্র। আখ্যানের কেন্দ্র-চরিত্র গুরুচরণ সাহসে, শক্তিতে বীর্যবান পুরুষ। রিয়ালিজিমের ও ঐতিহাসিক সত্যের প্রতি লেখকের নিষ্ঠা আর অনুরাগের পরিচয় রচনার বৈশিষ্ট্য। কিন্তু অজস্র বানান প্রমাদে পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় কণ্টকিত গ্রন্থখানি পাঠকের রসগ্রহণ ক্ষুন্ন করবে। রচনার মধ্যে প্রচুর অসঙ্গতি ও অসাহিত্যিক ঘটনার অবতারণা করেছেন লেখক। গ্রন্থের মধ্যে মধ্যে শিল্পরসহীন ছবি দেওয়ার প্রচেষ্টা নিতান্তই হাস্যকর। ৪৯১।৫৪

বিবিধ

পাকিস্থানে বাঙ্গালীর জাতীয়তা—এন এন সিংহ। প্রকাশক—বাঙ্গালীর জাতীয় পরিষদ, ৪৮ বৈঠকখানা রোড, কলিকাতা ৯। মূল্য—৩৸৹।

রাষ্ট্রনৈতিক বিপর্যয়ে বাংলা দেশ আজ দ্বিখণ্ডিত। কিন্তু বহু বর্ষের ঐতিহ্যধারায় যে ভাষা যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিলো,

বাইরের আরোপিত কোনো শাসনক্ষমতাই তাকে বিভক্ত করতে সক্ষম নয়। তাই পাকিস্থানে ভাষাকে উপলক্ষ করে, সাহিত্য-সংস্কৃতিকে উপলক্ষ্য করে বারবার নব-নব উন্মেষ হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি। এবং এ-স্ফুলিঙ্গ-গুলোকে হেলায় অস্বীকার করা অসম্ভব বলেই এই ব্যাপক সমস্যাকে নিয়ে লেখক বিস্তৃত আলোচনায় অবতীর্ণ হয়েছেন। এ-সম্বন্ধে তিনি যেমন গভীরভাবে চিন্তা করেছেন, রচনা পদ্ধতির প্রতি যদি তেমন আন্তরিক মনোযোগ রাখতেন, তাহলে সর্ব-শ্রেণীর পাঠকের কাছেই এ-গ্রন্থ সমান আদরের বস্তু হতে পারতো। কিন্তু বলতে বাধা নেই তাঁর ভাষার জড়তা তাঁর বক্তব্যকে আগাগোড়াই অত্যন্ত কঠিনভাবে আড়ষ্ট এমন কি দুর্বোধ্য করে রেখেছে। তবু লেখকের চিন্তাধারা এবং প্রকাশের প্রচেষ্টাকে গ্রহণ করতে আজকের দিনের বিপন্ন বাঙালী মাত্রেই কুণ্ঠিত হবেন না, ভরসা করি।

৫২৮।৫৪

পশ্চিমবঙ্গের কৃষির অবনতির কারণ ও উন্নতির উপায়—শ্রীনলিনাক্ষ বসু এল এজি প্রণীত; মূল্য দশ আনা; প্রাপ্তিস্থান—১০বি রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা—৯।

পশ্চিমবঙ্গে জমিদারী প্রথার অবসান আসন্ন এবং উহার পর এই রাজ্যের কৃষি ব্যবস্থা কি উপায়ে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা যায় তদ্বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তব্য নির্ধারণে ব্যাপৃত রহিয়াছে। এই সময়ে শ্রীযুত বসু প্রণীত উপরোক্ত পুস্তিকাখানির প্রকাশ খুব সময়োচিত হইয়াছে। শ্রীযুত বসু জেলা কৃষি অফিসার হিসাবে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া কৃষি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন তাহাই এই পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। তাঁহার মতে এদেশ ট্রাক্টর সাহায্যে চাষের উপযোগী নহে। বর্তমানে দেশে নির্বিচারে যে ভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহৃত হইতেছে তাহার অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধেও তিনি সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়াছেন। এক্ষণে যে ধারায় দেশে সেচকার্য পরিচালিত হইতেছে তিনি তাহারও পরিবর্তনের পক্ষপাতী। জাপানী প্রথায় চাষেরও তিনি পক্ষপাতী নহেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষি বিভাগ শ্রীযুত বসুর এইসব অভিমত সম্বন্ধে বিচার বিবেচনা করিয়া কার্যে প্রবৃত্ত হইলে অনেক ভুল ভ্রান্তির হাত হইতে রক্ষা পাইবেন। গ্রন্থকার পুস্তিকার প্রারম্ভে পশ্চিমবঙ্গে কৃষির অবনতি সম্বন্ধে যে সব মৌলিক তথ্য পরিবেশন করিয়াছেন তাহাও কৃষি বিভাগের কর্তব্য নির্ধারণে বিশেষ সহায়তা করিবে বলিয়া আমরা মনে করি।

জীবন সাধনের পথে—স্বামী আত্মানন্দ। প্রকাশক: স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ, ২১১, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা—১৯। দাম: এক টাকা। পৃষ্ঠা ১০৩।

মানবজীবন একটি বিরাট সাধনার পাদ-পীঠ। আত্মসংযম, পবিত্রতা ও সংকল্পের দৃঢ়তায় জীবনচর্যার উন্মেষ হয়। বর্তমান কালের পৃথিবী জড়বাদ ও 'হিডোনিজমে'র সংকীর্ণ বৃত্তরেখায় বন্দী। ফলে, বস্তুবাদের ঊর্ধ্বে একটি চিন্ময় সাধনলোকে যে বিশ্বাস ও তপশ্চারণের মধ্যে মানসমুক্তির আশ্বাস আছে, আজকের মানুষের কাছে তা বিস্মৃত-প্রায়। ভারতবর্ষের সাধনার পথ অনন্তকাল ধরে দেহ থেকে আত্মার দিকে, খণ্ড থেকে পূর্ণের দিকে, সংকীর্ণ থেকে ভূমার দিকে প্রসারিত। স্বামী আত্মানন্দ এই জড়বাদ-ক্ষুব্ধ মুহূর্তে আত্মসন্ধানের পথে ভারতীয় আদর্শের দীপালোকে জ্বালিয়েছেন। কেবল-মাত্র নীতি ও উপদেশ নয়, আত্মদর্শনের মধ্যে যে উপলব্ধি—তার মধ্যেই পরিপূর্ণ মানুষের বিকাশ। স্বামী আত্মানন্দ তারই দিক-নির্দেশ করেছেন। বর্তমান পৃথিবীতে রাজনীতি ও অর্থনীতির শায়কে ভগ্নপক্ষ পাখীর মত যে সমস্ত মানুষ শান্তির তৃষ্ণায় পাণ্ডুর, স্বামীজীর রচনা তাদের চঞ্চুপুটে অমৃতপাত্র তুলে ধরবে।

৫৬১।৫৪

প্রাপ্তি স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

মীরকাশিম, মমতাময়ী হাসপাতাল, রঘু ডাকাত—মন্মথ রায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা (১৪শ খণ্ড)—শ্রীঅনিল-বরণ রায়।

মনের অন্তরালে—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক।

হাসিখুসির মেলা—সমর চট্টোপাধ্যায়।

সাত-সাতুতে—ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত।
স্বপ্নতরী—বিজ্ঞান।

গীতি-অর্ঘ—সত্যর্ষি শ্রীশ্রীমৎ যোগ-জীবনানন্দ স্বামী।

যাত্রা হ'ল শুরু—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

চীনা শিল্পের কথা—প্রভাতকুমার দত্ত।

আভাস—শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

ভ্রম সংশোধন

গত সংখ্যা দেশ পত্রিকার ৫৬ পৃষ্ঠার পাদপূরণে যে স্কেচটি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা আচার্য নন্দলাল বসু কর্তৃক অঙ্কিত।

—শৌভিক—

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের দ্বিতীয় বার্ষিকী

স্বাধীনতা লাভের পর গত ক'বছর ধরে দেশের প্রকৃত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের

রাণী রাসমণি চিত্রে শ্রীরামকৃষ্ণের ভূমিকায় গুরুদাস

প্রতি তীব্র চেতনা দেখা দিয়েছে। দিকে দিকে নানাভাবে তার প্রকাশের লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করেছে। এমন কি বাণিজ্যক্ষেত্রেও এই চেতনার বিকাশ দেখা দিচ্ছে। বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানরাও দেখা গেল বিজ্ঞাপনরূপে যে দেওয়ালপঞ্জী বিলি করছেন তাতেও আজকাল থাকছে সাংস্কৃতিক কোন না কোন বিষয়ের চিত্র-প্রতিভূ। কেউ ছাপাচ্ছেন অজন্তা-ইলোরার ফ্রেস্কোর কোন অংশ, কেউ হয়তো সারনাথ-মহাবলিপুরমের মঠ-মন্দিরের ছবি; কোন দেওয়ালপঞ্জীর গায়ে রয়েছে হয়তো কোনারকের মূর্তির ছবি, আবার কোনটার বা ভরতনাট্যম কিংবা মণিপুরী অথবা কথাকলি বা কথক নাচের কোন ভঙ্গী। এই চেতনাই আবার অন্যদিকে বিকসিত হয়ে উঠছে ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত-নৃত্যের সম্মেলন অনুষ্ঠানে, যা আজ সংখ্যাতীত হয়ে উঠেছে। আগে যেখানে ক্ল্যাসিকাল গান বাজনার নাম শুনতেই লোকে শত হস্তেন দূরে সরে থাকতো, রেডিও বন্ধ করে দিয়ে নিষ্কৃতির হাঁফ ছাড়তো, আজ লোকের আগ্রহভরে শুধু প্রতীক্ষাই নয়, উলটে ক্ল্যাসিকাল সঙ্গীত শোনা বা রাতের পর রাত জেগে রীতিমতো অর্থব্যয় করে সম্মিলনে বসে থাকাটাই ফ্যাশন হয়ে দাঁড়িয়েছে। যাদের ভালো লাগে তারাও যান, আবার যাদের ভালো লাগতো না তারাও যান ভালো লাগাবার চেষ্টা করতে। আসলে দেশের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-সমূহের প্রতি মমতা জেগে ওঠারই এইসব লক্ষণ। এই মমতা থেকেই জাগ্রত হয় আদর ও শ্রদ্ধার ভাব।

* * *

দেশের নিজস্ব ঐতিহ্যের প্রতি চেতনা অবশ্য কেবলমাত্র ক্ল্যাসিক্যালের ওপরই নিবদ্ধ নেই। দেশের মানুষের জীবনযাত্রার সঙ্গে জড়িত বহুধা শিল্প-লালনগুলিকেও নতুনভাবে উৎসাহিত করে তোলার দিকেও বেশ নজর পড়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার রীতিমতো উৎসাহ দিয়ে লোকশিল্প, লোকনৃত্য ও লোক-সঙ্গীতকে পুনরুজ্জীবিত করে দেশের জনসাধারণের জীবনের মধ্যে আবার ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে থাকার ব্যবস্থায় যত্নবান হয়েছে। গণতন্ত্র দিবসে দিল্লীর উৎসব তার প্রমাণ। তেমনি আবার বেসরকারীভাবেও ক্লাসিকাল সঙ্গীত-নৃত্য প্রসার প্রচেষ্টার মতো লোকনৃত্য ও লোক-সঙ্গীতের পুনরুজ্জীবন ও প্রসারের দিকে বেশ ঝোঁক দেখা দিয়েছে। এই ঝোঁকের খানিকটা অবশ্য দেখা দিয়েছিল যুদ্ধের আমলে, তবে তখন তার পিছনে ছিল রাজনীতিক উদ্দেশ্য। তখন দেখা যেত কোন বিশেষ বিশেষ লোকসঙ্গীত ও লোকনৃত্যকে প্রকাশের মাধ্যমরূপে ব্যবহার করে রাজনীতিক মত গঠন ও প্রচারের কাজে লাগানো হতো। এই অসাংস্কৃতিক কাজ এখনও তেমনিই চলছে। কিন্তু তাছাড়াও লোকশিল্পের বিভিন্ন পদকে নিছক সাংস্কৃতিক মাধ্যমরূপে বাঁচিয়ে তোলার দিক থেকেও চেষ্টা চলেছে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনী 'রাইকমল' অবলম্বনে নিউ থিয়েটার্সের ছবিতে নবাগতা কাবেরী বসু ও চন্দ্রাবতী

এমনি একটি প্রচেষ্টা বলা যায় বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনটিকে। ক্ল্যাসিকালের মতো লোকশিল্প নিয়ে নাড়াচাড়া করা দেশের ওপরতলার মানুষদের যে ফ্যাশান হয়ে দাঁড়িয়েছে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন ঠিক সেদিক দিয়ে যাচ্ছে না। সত্যিই লোকশিল্প, লোকসঙ্গীত-নৃত্যাদির সাংস্কৃতিক লক্ষণগুলিকে যারা সাধারণ জনগণের মধ্যে তুলে ধরতে চান, যারা লোকশিল্পসম্পদকে লোকের চেতনার মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দিতে চান এমনিই একটি সাহিত্যিক ও শিল্পানুরাগীর দল গত বছর প্রথম বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত করেন। কোন রাজনীতিক উদ্দেশ্য নিয়ে তো নয়ই, এমন কি কোন ব্যবসায়িক উদ্দেশ্যও তাদের নেই। যার ফলে গত বছরের অনুষ্ঠানে বেশ কিছু টাকা তাদের লোকসান দিতে হয়েছে। সম্মিলনীর উদ্যোক্তাদের উদ্দেশ্য অবশ্য আছে। সে সম্পর্কে তারা বলেনঃ—

তাদের পরিকল্পনার পিছনে দুটি উদ্দেশ্য সতত ক্রিয়াশীল। এক, লোকসঙ্গীত, লোকনৃত্য, লোকশিল্প প্রভৃতি বাংলা দেশের বিভিন্নমুখী লুপ্তপ্রায় লৌকিক শিল্পগুলির পুনরুজ্জীবন; দুই, আধুনিক বাংলার শিল্প ও সাহিত্যান্দোলনের সঙ্গে তাদের অন্বিত করে বাংলা সংস্কৃতির এক অখণ্ড যৌগিক রূপ দান। লোকশিল্পের চর্চা ও পুনঃপ্রচলন প্রয়াসের অর্থ এই নয় যে, আমরা পুরাতন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ফিরে যেতে চাইছি। আমাদের অভিপ্রায় সম্পূর্ণ ভিন্ন। আমরা মনে প্রাণে বিশ্বাস করি একথা যে, আধুনিক বাঙ্গালীর যত সংস্কৃতির কখনও সত্যিকার প্রাণদান হবে না, যদি না গড়ে জাতীয় ভাবোদ্যোতক বিভিন্ন লুপ্তপ্রায় লোকশিক্ষাগুলির সঙ্গে তার আত্মিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই

নিয়ে আমাদের সামনের শ্রেষ্ঠ প্রেরণার উৎসস্থল হল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্ত। রবীন্দ্রনাথ সমৃদ্ধ লোক-সংস্কৃতির ভাণ্ডার থেকে দুহাতে উপকরণ আহরণ করেছিলেন। লোকশিল্পের প্রাণ-শক্তি স্বতঃস্ফূর্তি ও সহজিয়া ভাবের আদর্শের দ্বারা রবীন্দ্র সাহিত্য বিশেষ-ভাবে অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রসংগীতে এই প্রভাব সব চাইতে বেশী স্পষ্ট। বলা বাহুল্য, আধুনিক চিন্তন মনন কল্পনার সঙ্গে খাঁটি দেশজ সংস্কৃতির সমন্বয়ের শ্রেষ্ঠ সুফল রবীন্দ্রনাথে প্রত্যক্ষ করার পর এযুগের পটভূমিতে লোকসংস্কৃতি চর্চার উপযোগিতা সম্পর্কে সকল দ্বিধা সন্দেহের নিরসন হওয়া উচিত।

* * *

"এবারকার অধিবেশনে উভয় বঙ্গের লোকশিল্পের রকমারী নমুনা পরিবেশনের আয়োজন করা হয়েছে। বাউল, ভাটিয়ালী, মুর্শিদ্যা, মারাফতী, গম্ভীরা, জারি, সারি, টুসু, ঝুমুর প্রভৃতি লোকসংগীত; ছৌ, করম, গম্ভীরা, রাইবেঁশে, সারুল, সাঁওতালী, মণিপুরী প্রভৃতি লোকনৃত্য; কথকতা, রামায়ণ গান, পাঁচালী, কবিগান, তর্জা, যাত্রা, পুতুলনাচ, প্রভৃতি বিভিন্ন লোকশিক্ষার সহায়ক অনুষ্ঠান; পালা কীর্তন, খণ্ড-কীর্তন, কালীকীর্তন ও রামপ্রসাদী; বিভিন্ন ধরনের প্রাচীন বাংলা গান এবারকার বিশেষ আকর্ষণ। এসকল অনুষ্ঠানের অনেকগুলি গতবারেও ছিল, তবে এবার অনেক উন্নততর রূপে পরি-বেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। লোক-সংগীত ও প্রাচীন ধারার বাঙলা গানের পাশে পাশে আধুনিক পর্যায়ের বাংলা গানকেও অনুষ্ঠানসূচীর অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্বভাবতই এই খাতে দ্বিজেন্দ্র-লাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, কাজী নজরুল ইসলাম, দিলীপকুমার ও অন্যান্য কতিপয় প্রখ্যাত আধুনিক সুরকারের গানকে বিশেষ মর্যাদার স্থান ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। ধ্রুপদী এবং লৌকিক—রবীন্দ্র-নাথের এই দুই ধারার গানেরই পরি-বেশনের যথাযোগ্য ব্যবস্থা থাকবে। উল্লিখিত সুরকারদের রচিত আধুনিক পর্যায়ের বাংলা গান সঙ্কুচিত অর্থে লোক সংস্কৃতির পরিচয়বাহী না হতে পারে, কিন্তু সেগুলি যে অখণ্ড বঙ্গীয় সংস্কৃতির কতিপয় শ্রেষ্ঠ সুরকুসুম, সে বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না।

* * *

"সংগীতাংশে এবারকার অধিবেশনের আর একটি প্রধান আকর্ষণ হ'ল উচ্চাঙ্গ রাগসংগীতের দুই দিবসব্যাপী অনুষ্ঠান।

এ সপ্তাহে মুক্তিপ্রাপ্ত হিন্দী ছবি 'মিলাপ'-য়ের নায়ক ও নায়িকা —দেব আনন্দ ও গীতাবালি

'রাজকন্যা' চিত্রে স্মৃতি বিশ্বাস

শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীতারাপদ চক্রবর্তী, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, পণ্ডিত রবিশঙ্কর, শ্রীপরিতোষ শীল, শ্রীঅনাথনাথ বসু, শ্রীশচীন দাস 'মতিলাল', শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকালীপদ পাঠক, শ্রীধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীনিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমণ্টু বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী বিজনবালা ঘোষ দস্তিদার, শ্রীমতী কৃষ্ণা গঙ্গোপাধ্যায়, শ্রীবীরেন বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকানাই দত্ত, ওস্তাদ কেরামত খাঁ প্রমুখ বাঙলার একাধিক বিখ্যাত রাগসঙ্গীত-শিল্পী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে স্বীকৃত হয়েছেন। লক্ষ্য করার বিষয় শিল্পীরা সকলেই বাঙালী এবং ব্যাপক এবং গভীর অর্থে বঙ্গ-সংস্কৃতির উপাসক। বহিরাগত শিল্পী দ্বারা যোগ্য বাঙালী শিল্পীর স্থল পূরণের অনুচিত প্রয়াসকে আদৌ এক্ষেত্রে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে না।"

"সম্মেলনের ঘোষিত উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষা করে আমরা অধিবেশনে বহুসংখ্যক সঙ্গীত ও সঙ্গীতধর্মী অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। কিন্তু তার থেকে একথা যেন কেউ মনে না করেন যে, প্রমোদ বিতরণেই এ সম্মেলনের সকল তৎপরতা নিঃশেষিত। সম্মেলনের প্রতিটি অনুষ্ঠানের পেছনে একটি উদ্দেশ্য-মূলকতা আছে, আছে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা। আর তা যে আছে তার প্রমাণ, সম্মেলনের আনন্দ-অনুষ্ঠানের ফাঁকে ফাঁকে একাধিক বক্তৃতা ও আলোচনার আয়োজন। শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীসুকুমার সেন, শ্রীসুবোধ সেনগুপ্ত, শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী আব্দুল ওদুদ, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীবুদ্ধদেব বসু, শ্রীশান্তিদেব ঘোষ, শ্রীসরসীকুমার সরস্বতী, শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন প্রমুখ কয়েকজন বঙ্গ-সংস্কৃতির বিশিষ্ট সেবক বাঙলার লোক ও বিদগ্ধ সংস্কৃতির নানাবিধ বৈশিষ্ট্যের দিক তাঁদের আলোচনার মধ্য দিয়ে পরিস্ফুট করে তোলবার চেষ্টা করবেন। গত দু'শ বছরের বাঙলা সাহিত্যের পরিচিতিমূলক একটি সাহিত্য-চক্রের অনুষ্ঠান এইক্ষেত্রে বিশেষ মনোযোগ দাবী করতে পারে।"

* * *

"সম্মেলনের মূল তৎপরতার অনুপূরক হিসাবে গত বৎসরের ন্যায় সম্মেলন মণ্ডপের এবারও একটি প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। গ্রামীণ শিল্পীদের তৈরী মৃৎ ও দারু শিল্পের রকমারী নমুনা পট, কাঁথা, আলপনা, সরা, কুলা ও পিঁড়িচিত্র, বেত ও বাঁশের নানাবিধ শিল্পকাজ, পুরাতন পাটা ও পুঁথি, কিছু কিছু পুরাতন স্থাপত্যের ভগ্নাবশেষ প্রদর্শনীতে উপস্থিত করা হবে। জনসাধারণের কাছ থেকে আশানুরূপ সমর্থন ও আনুকূল্য পেলে প্রদর্শনীটিকে একটি স্থায়ী সংগ্রহশালায় রূপান্তরিত করবার ইচ্ছা আমাদের আছে।

* * *

"সম্মেলনের তৎপরতা সম্বৎসরের একটি বিশেষ সময়ের একটি বিশেষ অধিবেশনের আয়োজনেই সীমাবদ্ধ, এমন মনে করবার হেতু নেই। প্রকৃত প্রস্তাবে, এ তৎপরতা সারা বৎসরই পরিব্যাপ্ত। সম্মেলনের তরফ থেকে মাঝে মাঝেই অনুষ্ঠানাদির আয়োজন করা হয়ে থাকে। এবার লোকসঙ্গীতের দুটি চিত্তাকর্ষক অনুষ্ঠান এই খাতে বিশেষ তৎপরতার কারণ হয়েছিল। এর একটিতে পূর্ব-বঙ্গের কতিপয় প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত-শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। অন্যদিকে শ্রীহট্টের লোকসঙ্গীত পরিবেশন করা হয়। এই জাতীয় অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে একটি বিশেষ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এই যে এতে করে উভয়বঙ্গের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক বৃদ্ধি হয়, দৃঢ়তর হয়। আমরা বাঙলা সংস্কৃতির অখণ্ডত্বে বিশ্বাসী। রাজনৈতিক কারণে বাঙলা দেশের মানচিত্রের বিকার ঘটেছে, কিন্তু মানচিত্র অক্ষুণ্ণ আছে। অন্তত এমন চিত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে আমরা সর্বসাধ্য উপায়ে প্রযত্ন করব। সেই কারণেই বৃহত্তর এবং প্রান্তিক বঙ্গদেশের যেমন মানভূম এবং মণিপুরের, সংস্কৃতিতেও আমরা বঙ্গসংস্কৃতি হিসেবে উপস্থিত করতে দ্বিধা করিনি। সাম্প্রদায়িক ভেদ কোনও ক্ষেত্রে স্বীকার্য নয়, বিশেষ শিল্পসংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক ভেদ আদৌ আমরা স্বীকার করি না। এই দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের চৈতন্যে ওতপ্রোত যে, বাঙলা ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি এক ও অবিভাজ্য। অদূরদর্শিতার ফলে বাঙলার হৃদয় কখনও যদি দ্বিধাবিভক্ত হয়, তার চাইতে বড় বিপর্যয় কল্পনা করা যায় না।"

—না নেত্য নয়, আমি দেখছি, প্রিয়নাথ গর্জন ক'রে উঠলো। জগদীশ মাস্টারের মনে হ'লো প্রিয়নাথ নয় তার ভিতরের হাকিমই বুঝি চীৎকার ক'রে উঠলো। খানাতল্লাসীর গন্ধে উগ্র সাব-জজী মন।

তালার বালাই নেই। টানতেই ডালা শুদ্ধ খুলে গেলো। ছেঁড়া কাপড, পুরোনো বইয়ের গোছা, কাগজে মোড়া ছাতা, যতো রাজ্যের জঞ্জাল। টেনে টেনে প্রিয়নাথ বাইরে ফেলতে লাগলো।

জগদীশ মাস্টার খুব সাবধানে জানলার গরাদ ধ'রে দাঁড়ালেন। টলমল করছে পা দুটো। চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা।

প্যাঁটরার জিনিস প্রায় শেষ। সোজা হ'য়ে দাঁড়াবার আগেই প্রিয়নাথ কি দেখে আবার ঝুঁকে পড়লো। কাপড়ে মোড়া ছোট্ট একটা মোড়ক হাতে ক'রে টান হ'য়ে দাঁড়ালো।

—বাঃ, এর মধ্যে প্যাকিং হ'য়ে গেছে। আর একটু দেরি হ'লেই একেবারে হাওয়া। মাধবী ঠোঁট বেঁকিয়ে হাসলো। তীক্ষ্ণ হাসি। ছুরির ফলার মতন। অস্থি মজ্জাই শুধু নয়, শিরা-উপশিরাও টুকরো টুকরো ক'রে দেয়।

প্রিয়নাথ মোড়কটা জগদীশ মাস্টারের চোখের সামনে তুলে ধরলো, মাস্টার মশাই, ছি, ছি, আপনার এই প্রবৃত্তি।

রাস্তা থেকে এনে ঠাঁই দিলাম, সে দেনা বুঝি এমনি ক'রেই শোধ করতে হয়।

কথার সংগে সংগে প্রিয়নাথ মোড়ক খুলতে আরম্ভ করলো। চোদ্দ গণ্ডা ন্যাকড়া জড়ানো। পাঞ্চালীর বস্ত্র-হরণের সামিল। সব শেষে আবার কাগজ। মাধবী এগিয়ে এসে প্রিয়নাথের পাশে দাঁড়ালো। গায়ে গা লাগিয়ে।

প্রিয়নাথ স্ত্রীর দিকে চেয়ে চোখ কুঁচকে হাসলো। একেবারে বমাল গ্রেপ্তার। বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা।

কাগজটা ছিঁড়ে ফেলেই প্রিয়নাথ থ'। লকেট নয়, ছোট্ট কৌটো। রুপোর ব'লেই যেন মনে হ'লো। কার শখের নস্যির কৌটো।

ঝুঁকে পড়ে মাধবী দেখলো। প্রিয়-নাথের দিকে চেয়ে বললো, এ আবার কার চোরাই মাল?

জগদীশ মাস্টার নির্বাক নিস্পন্দ।

কিন্তু প্রিয়নাথের মনে পড়লো। একটু একটু ক'রে। একি আজকের ঘটনা। কত যুগ হ'য়ে গেলো। উল্টে-পাল্টে প্রিয়নাথ দেখলো। কোন সন্দেহ নেই। সেই জিনিসই। নিচের ছোট্ট আঁচড়টুকু পর্যন্ত রয়েছে।

প্রিয়নাথের কাকা রেবতীবাবুর শখের জিনিস। একেবারে হাত ছাড়া করতেন না। সর্বদা পকেটে পকেটে। প্রিয়নাথও তক্কে তক্কে ছিলো। যেমন ক'রেই হোক সরাতে হবে, নয়তো মান থাকবে না ক্লাসে। বাংলায় প্রথম হ'তে জগদীশ মাস্টার পিঠ চাপড়ে বলেছিলেন, প্রিয়, ব্যাকরণে একেবারে পুরো নম্বর, একটু আঁচড় বসাতে পারিনি খাতায়। ফুল মার্কস। তারপর কি গুরু দক্ষিণা দিচ্ছিস বল? একদিন তোদের বাড়ি গিয়ে পেট পুরে খেয়ে আসবো। বাবাকে ব'লে রাখিস।

হঠাৎ প্রিয়র কি মনে হ'য়েছিলো কে জানে। বোধ হয় জগদীশ মাস্টারের হাতের কালো মরচে পড়া টিনের কৌটটা দেখেই খেয়াল হ'য়ে থাকবে। হেসে বলেছিলো, মাস্টার মশাই, কি বাজে নস্যির কৌটো ব্যবহার করেন, আমি রুপোর কৌটো এনে দেবো আপনার জন্য।

জগদীশ মাস্টারের মুখ খুশীতে ভরে উঠেছিলো। এক গাল হেসে ছিলেন, দিস বাবা। বেশ ভালো। একটা কৌটা। তোরা দিবি না কে দেবে।

কিছু সময় লেগেছিলো। রেবতী যেন ব্যাপারটা আঁচ ক'রেই কে আঁকড়ে ধরেছিলেন। সকাল বি সন্ধ্যা সংগে সংগে। রাত্রিবেলা বিছা তলায়। এক তিল কাছ-ছাড়া কিন্তু একদিন সুযোগ জুটে গে কৌটো পাঞ্জাবীর পকেটে, রেবতী সার্ট গায়ে চড়িয়ে বেরিয়ে গেলেন। তিল দেরি নয়। এদিক ওদিক পকেটে হাত ঢুকিয়ে কৌটো তুলে নি প্রিয়নাথ সোজা দৌড়। একেবারে স্কু এসে থেমেছিলো।

জগদীশ মাস্টার অনেকক্ষণ ধ ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখেছিলেন। চমৎকার জিনিস। যেমন চকচকে, তেম গড়ন। টিফিনের পয়সা জমিয়ে দামী জিনিস কেন দিতে গেলি প্রি গরীব মাস্টারের এত দামের নস্যিদা লোকে যে ঠাট্টা করবে।

কৌটোটা নেড়ে চেড়ে দেখতে দেখ হঠাৎ জগদীশ মাস্টারের চোখে প ছিলো, হ্যাঁরে প্রিয়, নতুন জিনিসট এমন আঁচড় কাটলি কি ক'রে?

—পকেটে ছুরি ছিলো মাস্ট মশাই, দৌড়ে আসতে গিয়ে বাজার কাছে পড়ে গিয়েছিলাম, তাতেই বে হয় আঁচড় পড়ে গিয়ে থাকবে। প্রিয়না সংগে সংগে উত্তর দিয়েছিলো।

এখনও রয়েছে সেই আঁচড়। স চুলের মতন। হাত বুলোলে তবে বো যায়। এত দিনেও ঠিক রয়েছে।

মুখ তুলেই প্রিয়নাথ বিব্রত। জানলা গরাদ ধ'রে চুপচাপ মাস্টার মশা দাঁড়িয়ে। পাথরের মুর্তির মতন নিঃশ্বাসের শব্দ নয়, একটু কাঁপছে ন শরীর। খানাতল্লাসীর অপেক্ষা করছেন পাওয়া গেছে চোরাই মাল। নস্যি কৌটোর দিকে দেখে প্রিয়নাথ আবা জগদীশ মাস্টারের দিকে চাইলো। ন আঁচড় শুধু নস্যির কৌটোটার ওপরই মানুষটার মুখে .কোথাও কোন আঁচ পড়েনি। সরু চুলের মতন কো দাগও নয়।

একলব্য

ক্রিকেট মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার ঐতিহাসিক ক্রীড়াযুদ্ধকে কেন্দ্র করে সারা ক্রিকেট বিশ্বে আলাপ আলোচনা, গুজব গবেষণা এবং উৎসাহ উদ্দীপনার যে ঢেউ উঠেছিল, ইংলণ্ড 'রাবার' লাভ করবার পর স্বাভাবিকভাবেই তা নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশের মধ্যে টেস্ট ক্রিকেট খেলার ব্যবস্থা থাকলেও অ্যাংলো অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট ক্রিকেটের মর্যাদা এবং আকর্ষণ অনন্য। এই দুটি দেশই হচ্ছে টেস্ট ক্রিকেটের পথিকৃৎ। কালের কোন এক অখ্যাত অধ্যায়ে এই দুই দেশের মধ্যে প্রথম টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ক্রিকেটের পুঁথিপত্র ঘেঁটে তার হদিস পাওয়া মোটেই কষ্টসাধ্য নয়, কিন্তু সেদিনের টেস্ট খেলার আয়োজন ছিল নিতান্তই সামান্য। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এবং সমারোহের মাধ্যমে সেই টেস্ট খেলা আজ এক বিরাট ক্রীড়ানুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। ইংলণ্ড হচ্ছে ক্রিকেটের জন্মভূমি। এই খেলার প্রতি ইংলণ্ডবাসীর অকৃত্রিম অনুরাগের কথাও সর্বজনবিদিত। ইংলণ্ড যেখানেই রাজ্য বিস্তার করেছে, সেখানেই সঙ্গে নিয়ে গেছে ক্রিকেটকে,—সেখানকার মাটিতেই পুঁতেছে উইকেট। তাই ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত সমস্ত দেশ অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ভারত এবং সিংহলেও ক্রিকেট খেলা ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে অস্ট্রেলিয়ার গুরুমারা বিদ্যা শিখতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না। ইংলণ্ডের কাছ থেকেই ক্রিকেট খেলা শিখে নিয়ে অস্ট্রেলিয়া হারাতে আরম্ভ করে ইংলণ্ডকে। অল্পদিনের মধ্যেই ইংলণ্ডের চেয়ে অস্ট্রেলিয়া বেশী পটু হয়ে ওঠে ক্রিকেট খেলায়। তাই ক্রিকেট স্রষ্টা ইংলণ্ড ও ক্রিকেট খেলায় অগ্রগণ্য অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলার মর্যাদা অনন্য।

* * *

১৮৬১ সালে ইংলণ্ডের একটি ক্রিকেট দল সর্বপ্রথম অস্ট্রেলিয়া সফর করলেও সেই দলের সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার যে খেলা হয়, সেই খেলা আনুষ্ঠানিকভাবে টেস্ট খেলার স্বীকৃতি লাভ করে না। ১৮৭৬—৭৭ সালে জেমস লিলিহোয়াইটের নেতৃত্বে যে পেশাদার ক্রিকেট দল অস্ট্রেলিয়া সফর করে, সেই দলের খেলাই সরকারীভাবে টেস্ট মর্যাদা লাভ করে। ১৮৭৬—৭৭ সাল থেকে আরম্ভ করে এই বছর অস্ট্রেলিয়ার এডিলেড মাঠের চতুর্থ টেস্ট পর্যন্ত ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে মোট টেস্ট খেলা হয়েছে ১৬৭টি। এর মধ্যে ইংলণ্ড জয়লাভ করেছে ৬০টি খেলায়—অস্ট্রেলিয়া বিজয়ী হয়েছে ৬৯ খেলায়, ৩৮টি খেলায় জয়পরাজয়ের নিষ্পত্তি হয়নি, অর্থাৎ ড্র হয়েছে ৩৮টি খেলা। ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে এপর্যন্ত অনুষ্ঠিত ১৬৭টি টেস্ট যুদ্ধ উপলক্ষে খেলাধুলার ইতিহাসে যে কত অধ্যায় রচিত হয়েছে এবং এই খেলাগুলির মধ্যে দুই দেশের দিকপাল এবং ধুরন্ধর খেলোয়াড়দের কত স্মৃতি বিজড়িত ঘটনা মাখানো রয়েছে, তা বলে শেষ করা যায় না। এ ইতিহাস শুধু দীর্ঘই নয়, বিচিত্রও বটে।

* * *

ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার এ পর্যায়ের সব
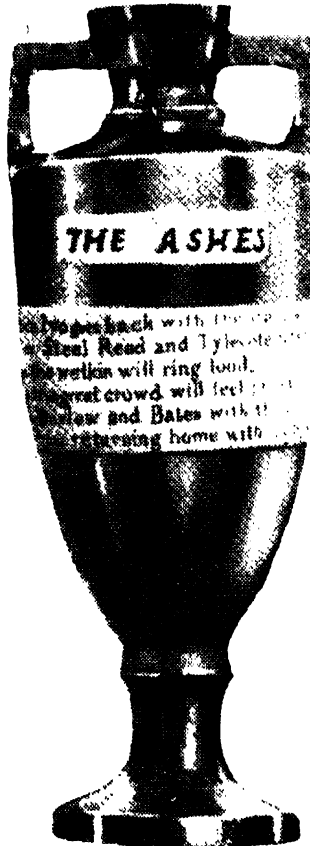
এ্যাংলো অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট ক্রিকেটে সম্মানের প্রতীক 'এ্যাসেস' বা ভস্মাধার

খেলা এখনো শেষ হয়নি। একটি টেস্ট খেলা এখনো বাকি। এই খেলা ব্যতিরেকেই ইংলণ্ড লাভ করেছে 'রাবার' এবং অধিকারে রেখেছে 'টেস্ট' খেলার শ্রেষ্ঠ সম্মান 'এ্যাসেজ'। বাকি খেলায় পরাজয় ঘটলেও ইংলণ্ডের ক্ষতি বৃদ্ধির বিশেষ কারণ নেই। দীর্ঘ ১৯ বছর পরে গতবার নিজ ভূমিতে তারা অস্ট্রেলিয়াকে হারিয়ে 'এসেজের' পুনরুদ্ধার করেছিল—এবারও এ্যাসেজ অধিকারে রেখে তাদের ক্রিকেট মাঠের হৃত গৌরবের পুনরুদ্ধার করলো। শেষ টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভের কোনও সম্ভাবনা দেখি না। অবশ্য মহা অনিশ্চয়তাই ক্রিকেট খেলার বিশেষত্ব। তবুও মনে হয় অস্ট্রেলিয়া খেলার মনোবল এবং ক্রীড়া প্রতিভার অনেক কিছুই হারিয়ে ফেলেছে;—অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের কোথাও যেন ঘুণও ধরেছে। প্রাক-যুদ্ধের ক্রিকেটসমৃদ্ধ অস্ট্রেলিয়ার ক্রীড়াশৌর্য দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরও অটুট ছিল। যুদ্ধোত্তর ক্রিকেটেও তারা বার বার ইংলণ্ডকে পর্যুদস্ত করে পরাজিত করেছে। ১৯৪৬ এবং ১৯৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়া এবং ইংলণ্ডে পাঁচটি পাঁচটি করে উভয় দেশের মধ্যে যে ১০টি টেস্ট খেলা অনুষ্ঠিত হয়, তার মধ্যে একটি খেলাতেও জয়লাভ করতে পারেনি ইংলণ্ড,—অপরদিকে অস্ট্রেলিয়া জয়লাভ করে ৭টি টেস্টে। ১৯৫০—৫১ সালের টেস্ট খেলাতেও অস্ট্রেলিয়ার প্রাধান্য অটুট ছিল, কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিশ্ববন্দিত ক্রিকেট প্রতিভা ডন ব্র্যাডম্যানের অবসর গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটে দুর্দিন দেখা দিয়েছে। ব্যাডম্যানোত্তর যুগেই অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেটের দীন অবস্থা। অবশ্য ১৯৫০-৫১ সালেও ব্র্যাডম্যান অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়কত্ব করেননি। প্রতিভাদীপ্ত ক্রিকেট জীবনেই অবসর গ্রহণ করেছেন তিনি। তবুও ব্র্যাডম্যানের সঙ্গে পূর্বে খেলার অভিজ্ঞতায় এবং ব্র্যাডম্যানের মন্ত্রশিষ্য হ্যাসেটের অধিনায়কত্বে সে বছরও অস্ট্রেলিয়া ৪টি টেস্ট খেলায় জয়লাভ করেছিল, কিন্তু গতবার ইংলণ্ডে একটি টেস্ট খেলাতেও জয়লাভ করতে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। এবারও তাদের খেলায় চরম বিপর্যয় দেখা যাচ্ছে। বাস্তবিকপক্ষে ব্র্যাডম্যানের একক প্রতিভা অস্ট্রেলিয়ার ক্রিকেটকে যতখানি সমৃদ্ধ করে গেছে, কোন দেশের কোন খেলোয়াড়ের একক প্রতিভা সেই দেশের খেলাকে এতখানি সমৃদ্ধ করেছে কিনা সন্দেহ। অবশ্য ভারতীয় হকিতে ধ্যানচাঁদ, ইংলণ্ড টেবিল টেনিসে ভিক্টর বার্না বা আমেরিকার মুষ্টিযুদ্ধা জো লুই ব্র্যাডম্যানের মতই ক্রীড়াক্ষেত্রের ব্যতিক্রম। কিন্তু এই ধরনের প্রতিভাবান খেলোয়াড় তো বিশ্বে বেশী জন্মগ্রহণ করে না। সারা বিশ্ব খুঁজে মাত্র দুই একজনেরই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। এক ব্র্যাডম্যানের অভাবেই বা অস্ট্রেলিয়ার আজ এ অবস্থা হবে কেন? এপর্যায়ে এক প্রথম

এ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্ট যুদ্ধের 'রাবার' বিজয়ী অধিনায়ক লেন হাটন হর্ষোৎফুল্ল অবস্থায় আংগুলের দ্বারা চার্চিলের 'ভি' অর্থাৎ 'ভিক্টরী' সংকেত দেখাচ্ছেন

টেস্ট ছাড়া পরের তিনটি টেস্টেই অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটিং বিপর্যয় প্রত্যক্ষ করা গেছে। এর মধ্যে এডিলেড মাঠের চতুর্থ টেস্ট ছাড়া আর সব টেস্ট খেলারই আলোচনা করা হয়েছে। এডিলেড মাঠে খেলার যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল, তাতে অস্ট্রেলিয়ার জয়লাভও অসম্ভব ছিল না। অন্ততঃ ইতিপূর্বে এঅবস্থায় তারা বহুবার ইংলণ্ডকে পরাজিত করেছে। প্রথম ইনিংসের খেলায় মাত্র ১৮ রানে অগ্রগামী ইংলণ্ড দল। চতুর্থ দিন অস্ট্রেলিয়া দ্বিতীয় ইনিংসে ব্যাটিং আরম্ভ করে দিনের শেষে ৩ উইকেটে ৬৯ রান সংগ্রহ করলো। অপ্রত্যাশিত-ভাবে তিনটি উইকেট পড়ে গেলেও তাদের হাতে থাকে ৭টি উইকেট আর দুইদিন সময়। খেলায় জয়লাভ করতে না পারলেও অস্ট্রেলিয়া এই অবস্থায় পরাজয়ের হাত থেকে অব্যাহতি পেতে পারত। কিন্তু পঞ্চম দিনের সূচনায় তাদের ব্যাটিংয়ে শোচনীয় বিপর্যয় দেখা গেল। মাত্র ১৪ মিনিটের মধ্যে ১৪ রান করতেই তারা হারালো আর পাঁচটি উইকেট। এঅবস্থায় ম্যাচ বাঁচানো অসম্ভব। ১১১ রানে অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় ইনিংস শেষ হবার পর ইংলণ্ড ৫ উইকেট হারিয়ে জয়লাভের জন্য প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে। ৬ দিনের খেলা ৫ দিনের মাথায় শেষ হয়ে যায়। ইংলণ্ড লাভ করে 'রাবার'।

* * *

পঞ্চম দিনের সূচনায় যেভাবে অস্ট্রেলিয়ার উইকেট পড়তে আরম্ভ করেছিল, বুঝি ১৮৮২ সালে এইভাবেই পড়েছিল ইংলণ্ডের উইকেট এবং তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছিল 'এ্যাসেস' কথাটির। তারপর থেকে দুই দেশের মধ্যে এই 'এ্যাসেস' বা 'ছাই' নিয়ে যুদ্ধের ক্ষেত্রে অধিকতর তীব্রতা এবং অধিক প্রতি-দ্বন্দ্বিতা পরিলক্ষিত হয়ে আসছে। কিভাবে 'এ্যাসেস' কথাটির সৃষ্টি হয়েছিল, এখানে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

১৮৮২ সাল। ইংলণ্ডের 'ওভ্যাল' মাঠে ইংলণ্ড ও অস্ট্রেলিয়ার নবম টেস্ট খেলা। ১৮৭৬ সাল থেকে এপর্যন্ত দুই দেশের মধ্যে যে ৮টি খেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে, তার মধ্যে অস্ট্রেলিয়া জিতেছে ৪টি খেলায়, ইংলণ্ড দুটিতে, বাকী দুটি খেলায় জয়পরাজয়ের মীমাংসা হয়নি। সুতরাং নবম প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইংলণ্ডের বড় আশা, অস্ট্রেলিয়াকে পরাজিত করে। আগের বছর চারটি খেলার মধ্যে তারা একটি খেলাতেও জিততে পারেনি। নবম টেস্টে জয়লাভের পথও ইংলণ্ডের পক্ষে অনুকূল হল। টসে জিতে অস্ট্রেলিয়া প্রথম ব্যাটিং করে সংগ্রহ করলো মাত্র ৬৩ রান। ইংলণ্ডের প্রথম ইনিংস শেষ হলো ১০১ রানে। দ্বিতীয় ইনিংসে অস্ট্রেলিয়া ১২২ রানের বেশী সংগ্রহ করতে পারলো না। সুতরাং মাত্র ৮৫ রান করতে পারলেই ইংলণ্ড বিজয়ীর সম্মান অর্জন করতে পারে। এখানে বলে রাখা ভাল যে, উইকেটের অবস্থা মোটেই ভাল ছিল না। তাই কোন পক্ষই সন্তোষজনক রান সংগ্রহ করতে পারেনি। তবুও যেখানে মাত্র ৮৫ রান করতে পারলেই জয় অনিবার্য, সেখানে সেই রান সংগ্রহ করা ইংলণ্ডের পক্ষে মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। জয়-লাভের আশায় ইংলণ্ডের বুক ফুলে উঠলো। ৫০ রান তুলতে তারা দুইটি উইকেট হারালো। জয়লাভের জন্য আর প্রয়োজন মাত্র ৩৫ রানের। হাতের ৮টি উইকেট তখনো অটুট। সুতরাং জয় অনিবার্য। জয়লাভের আশায় 'ওভ্যাল' মাঠের দর্শকরা আনন্দে উৎফুল্ল। ইংলণ্ড খেলোয়াড়-দের চোখে মুখে আত্মতৃপ্তির আনন্দ। জয়তো হাতের মধ্যে প্রায় এসে গেছে। ৩৫ রান করতে আর কতক্ষণ। জয়লাভ নিশ্চিত জেনে দর্শকদের অনেকে মাঠ ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাস অলক্ষ্যে তাদের হাতছানি দিয়েছিল, এটা তাদের জানা ছিল না। ৫০ রানের মাথায় আউট হলেন ইংলণ্ডের অন্যতম কৃতী ব্যাটস-ম্যান উলেট। ৫৩ রানের মাথায় আরও একটি
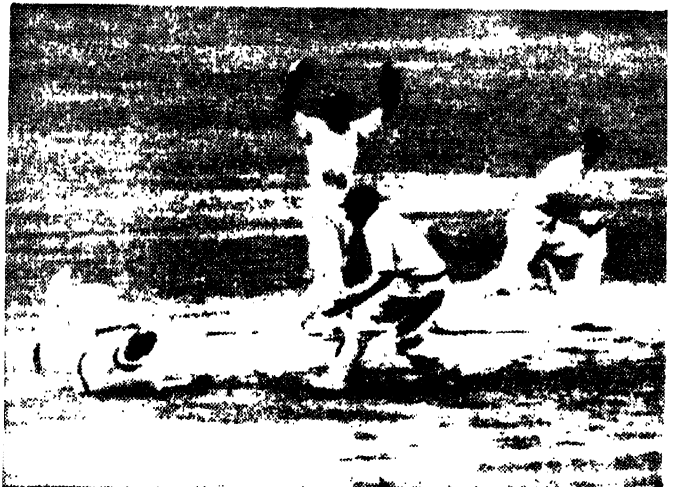
এ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান চতুর্থ টেস্টে রণ আর্চার এক হাতে একটি দুরূহ ক্যাচ লুফে ইংলণ্ডের কৃতী ব্যাটসম্যান পিটার মে-কে আউট করছেন

উইকেট। বয়েলের বলে ক্যাচ তুলে গ্রেস ধরা পড়লেন ব্যানারম্যানের হাতে। বাকি ৬টি উইকেট। ইংলণ্ডের অসম্ভব সতর্কতা। সর্বনাশা বোলার স্পোফোর্থ আর বয়েলের বলে লুকাস লিটলটন জুটি মাটি কামড়ে পড়ে আছেন। ব্যাট তুলবার নাম নেই। স্পোফোর্থ আর বয়েল দুজনে উপর্যুপরি ১২টি মেডেন পেলেন। ব্যাটস-ম্যানকে প্রলুব্ধ করবার জন্য স্পোফোর্থ লোফ্‌ফা লোফ্‌ফা বল দিতে আরম্ভ করলেন। স্পোফোর্থের ফন্দিতে ধরা পড়লেন লিটলটন। মেরে খেলতে গিয়ে ৬৬ রানের মাথায় বোল্ড আউট হলেন তিনি। ইংলণ্ডের হাতে তখনো ৫টি উইকেটে, জয়লাভের জন্য প্রয়োজন ১৯ রানের। লুকাসের সঙ্গে খেলতে এলেন স্টীল। স্পোফোর্থের বল দিয়ে তখন যেন আগুন বেরুচ্ছিলো। সেই আগুনে ইংলণ্ডের বাকি সব উইকেটই পুড়ে যেতে পারে এমন সম্ভাবনা। অপরদিক থেকে বয়েলও বল করছিলেন অমিতবিক্রমে। মারাত্মকভাবে বল করে মাত্র ৯ রানের মধ্যে স্পোফোর্থ ইংলণ্ডের আরও তিনটি উইকেট দখল করলেন। স্টীল, মরিস ও রীড পর পর আউট হলেন। একে একে নিভিছে দেউটি। ইংলণ্ড সমর্থকদের মুখ তখন পাংশুবর্ণ। তবে কি জয়লাভ করতে পারবে না ইংলণ্ড! বাকি ২টি উইকেট, আর প্রয়োজন ১০ রানের। নবম উইকেটে বার্নেস খেলতে এসে মাত্র দুই রান করবার পর প্যাভিলিয়নে ফিরে গেলেন। হারাধনের আর একটি ছেলে বাকি। স্পো-ফোর্থের বলের মুখে এও কি হারিয়ে যাবে? আর ৮ রান করা সম্ভব হবে না ইংলণ্ডের? মাঠে তখন প্রবল উত্তেজনা। গেল গেল সব গেল। ক্রিকেটস্রষ্টা ইংলণ্ডের ক্রিকেট গর্ব [illegible] ধূলিতে লুটিয়ে গেল! উত্তেজনার

এাডলেড মাঠে এ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান চতুর্থ টেস্টে ইংলণ্ডের উদীয়মান ব্যাটস্‌ম্যান কাউড্রে মরিসের 'হিটে' আহত হবার পর তার সহ খেলোয়াড়রা তাকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাচ্ছেন

বশে এক দর্শক গ্যালারীর উপর থেকে নীচে পড়ে গেলেন, তাকে আর জীবন্ত অবস্থায় পাওয়া গেল না। কয়েকজন দর্শক চকোলেট মনে করে হাতের ছাতার বাট চুষতে আরম্ভ করলেন। স্কোরার ভুলক্রমে স্কোর-বইতে এমনসব কথা লিখতে আরম্ভ করলেন যার অর্থ তার নিজের কাছেই বোধগম্য নয়।

সি টি স্টাডের সঙ্গে যখন ইংলণ্ডের শেষ খেলোয়াড় পীট খেলতে এলেন তখনো ইংলণ্ডের জয়ের জন্য ৮ রান বাকি। কিন্তু স্পোফোর্থের অগ্নিবর্ষী বলের বিরুদ্ধে এই জুটি ১ রানের বেশী করতে পারলো না। প্রবল উত্তেজনার মধ্যে ৭ রানে খেলায় জয়-লাভ করলো অস্ট্রেলিয়া। ইংলণ্ডের মাটিতে টেস্ট খেলায় প্রথম পরাজয় স্বীকার করলো ইংলণ্ড। এই পরাজয়ের বেদনা ইংলণ্ডের বুকে যে কতখানি বেজেছিলো, পরের দিন খবরের কাগজের পাতায় তার প্রমাণ পাওয়া গেল। তখনকার ইংলণ্ডের বিখ্যাত পত্রিকা 'স্পোর্টিং টাইমস' শোকসূচক কালো বর্ডারের মধ্যে লিখলো—

**"In affectionate remembrance
of
English cricket
which died at the Oval
on
29th August, 1882
Deeply lamented by a large circle
of sorrowings friends and
acquaintances
R. I. P.
N.B. The body will be cremated
and the Ashes taken to Australia."**

পরের বছর আইভো ব্লাজ, যিনি পরে লর্ড ডার্নলে নামে অভিহিত হন, তার নেতৃত্বে ইংলণ্ড দল অস্ট্রেলিয়ায় খেলতে যায়। প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়া ৯ উইকেটে জয়লাভ করলেও পরের দুটি টেস্টে ইংলণ্ড বিজয়ী হয়ে 'রাবার' লাভ করে। তৃতীয় টেস্ট খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে একদল অস্ট্রেলিয়ান মহিলা ক্রিকেট স্টাম্পগুলি পুড়িয়ে ছাই করে ফেলেন। পাঁচ ইঞ্চি উঁচু একটি মৃৎপাত্রে ভর্তি সেই ছাই তাঁরা আইভোকে উপহার দিয়ে 'ভস্মাধারটি' ইংলণ্ডে নিয়ে যাবার জন্য
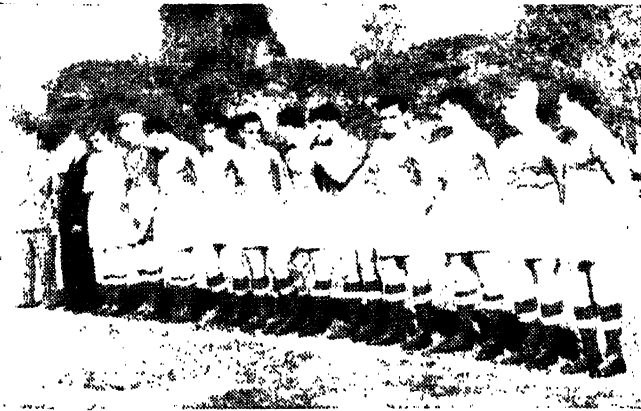
হাজারীবাগে রাশিয়ান ফুটবল দলের প্রথম খেলার পূর্বে রাশিয়ান দলের এই ফটো তোলা হয়

শাহাগঞ্জে ডানলপ কোম্পানীর স্পোর্টস শেষে চ্যাম্পিয়ন এ্যাথলীট এল সি বিশ্বাস মিসেস জ্যাকসনের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন

অনুরোধ করেন। ভস্মাধারটির গায়ে নীচের কথাগুলি লিখে দেওয়া হয়।

'When Ivo goes back with the urn, the urn
Studds, steel, Read and Tylecote return, return,
The welkin will ring loud,
The great crowd will be proud
Seeing Barlow and Bates with the urn, the urn
And the rest coming home with the urn."

লর্ড ডার্নলে এই ছাইভরা পাত্রটি ইংলণ্ডে নিয়ে যান এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত স্মৃতি হিসাবে নিজের কাছে রাখেন। ডার্নলের মৃত্যুর পর ১৯২৮ সালে মেরিলীবোর্ন ক্রিকেট ক্লাবকে (এম সি সি) ভস্মাধারটি দান করা হয়। আজও মেরিলীবোর্ন ক্লাবে ভস্মাধারটি সযত্নে রক্ষিত আছে। ইংলণ্ড অথবা অস্ট্রেলিয়া যে দলই 'রাবার' লাভ করুক, তারা সত্যি সত্যিই কিন্তু ছাই ভরা পাত্রটি পায় না। 'এ্যাসেস' লাভ করা একটি চলতি সম্মানের কথা ছাড়া কিছুই নয়।

* * *

রাশিয়ান ফুটবল দল ভারতে পেণছবার পর দিল্লীর প্রথম টেস্ট খেলা নিয়ে এ পর্যন্ত ৬টি ম্যাচ খেলেছে। এই ছয়টি খেলাতেই তারা ভারতীয় দলগুলির বিরুদ্ধে গোল করেছে মোট ৩৭টি। অপরদিকে রাশিয়ান দলের বিরুদ্ধে কোন ভারতীয় খেলোয়াড়ই এপর্যন্ত কোন গোল করতে পারেননি। এর থেকেই বোঝা যায় রাশিয়ান টীমের আক্রমণ ও রক্ষণ বিভাগ কত শক্তিশালী।

কলকাতায় রাশিয়ান দলের খেলার উদ্যোগ আয়োজন চলছে। এই শক্তিশালী দলের তিনটি ফুটবল ম্যাচকে কেন্দ্র করে মার্চের প্রথমে কলকাতা ময়দান ফুটবলের উন্মাদনায় ভরে উঠবে সন্দেহ নেই। রাশিয়ান দলের খেলা দেখার টিকিট সংগ্রহের জন্য ফুটবলপ্রিয় কলকাতার ক্রীড়ামোদিরা এখন থেকেই যথাস্থানে তদ্বির তাগাদা আরম্ভ করেছেন। বলা বাহুল্য ক্যালকাটা মাঠে রাশিয়ান দলের খেলার ব্যবস্থা হলে খেলা-পাগল বিরাট দর্শকশ্রেণীর অর্ধেকও খেলা দেখার সুযোগ পাবে না। ইডেন উদ্যানে রাশিয়ান দলের খেলার যে প্রস্তাব উঠেছে তা ফলপ্রসূ হলে বহু লোকই এই বিদেশী শক্তিশালী ফুটবল দলের উন্নত কলাকৌশল প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ পাবে। রাশিয়ান দল এই পর্যন্ত ভারতে যে কয়টি খেলায় অংশ গ্রহণ করেছে তার ফলাফল ও গোলদাতার নাম নীচে দেওয়া হলঃ—

হাজারীবাগে

রাশিয়ান দল (৭) ঃ ফেডারেশন সভাপতির দল (০)
(তাতুসিন—৩, আইভোনোভ—২, নেত্তো—১ ও সাইমোনিয়ান—১)

বারাণসীতে

রাশিয়ান দল (৪) ঃ নিখিল ভারত একাদশ (০)
(আইভোনোভ, কুজনেৎসভ, সাব্রভ ও স্ট্রেলৎস্ভ)

লক্ষ্ণৌতে

রাশিয়ান দল (৯) উত্তর প্রদেশ (০)
(তাতুসিন—২, আইভোনোভ—৩, সেনিকভ—১, সাইমোনিয়ান—১, নেত্তো—১ ও এ্যালিয়েন—১)

দিল্লীতে

রাশিয়ান দল (৬) ঃ প্রধান সেনাপতির দল (০)
(সাইমোনিয়ান—২, তাতুসিন—১
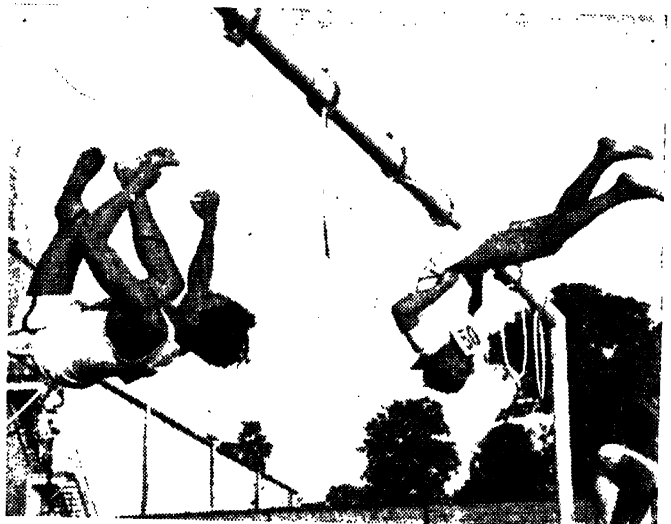
শাহাগঞ্জে অনুষ্ঠিত ডানলপ স্পোর্টসে প্রতিবন্ধক প্রতিযোগিতার এক চমৎকার দৃশ্য

জোহানেসবার্গে ইংলণ্ডের খ্যাতনামা এ্যাথলীট ক্রিশ চ্যাটওয়ের ৩ মাইল দৌড়ের শেষ সীমায় পেণীছবার দৃশ্য

ও নেভো—১)
শিয়ান দল (৯) ঃ চীফ্ কমিশনারের একাদশ (০)
স্টেলংসভ—৩, আইভোনোভ—২,
জনোৎসভ—১, রিজাস্কর্ন—১,
জ্ভ—১ ও কারপভ—১)
শিয়া (৪) ঃ ভারত (০)
কুজনেৎসভ—৩ ও ভয়নভ—১)

* * *

কলকাতার ইডেন উদ্যানে ভারতের তীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান বাঙ্গলার খেলাধুলার তিহাসে এক স্মরণীয় ঘটনা। ১৯৩৮ সালে লা পার্কে জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের পর লকাতায় জাতীয় এ্যাথলেটিক এবং খেলা-লার ব্যবস্থা হয়নি। দীর্ঘ ১৬ বছর পর কলকাতায় এই ক্রীড়ানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। তাই ১১ই, ১২ই ও ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভারতের প্রায় ৪ শত পুরুষ ও মহিলা এ্যাথলীটদের দৌড়, লাফ, ঝাঁপ, বর্শা ছোঁড়া, গোলা ছোঁড়া এবং নানা খেলাধুলায় ইডেন উদ্যান নব প্রাণস্পন্দনে সজীব হয়ে উঠবে। জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন রাজ্যের পুরুষ ও মহিলা এ্যাথলীটের হিসাব দেওয়া হলঃ—

রাজ্য		পুরুষ	মহিলা
পশ্চিমবঙ্গ	...	৫৪	১৩
উড়িষ্যা	...	১৮	৮
পেপসু	...	১৮	—
কোলাপুর	...	৭	—
বিহার	...	৭	১
পাঞ্জাব	...	২৫	—
মহীশূর	...	১১	৪
বোম্বাই	...	১০	১১
রাজপুতানা	...	১৭	৪
ত্রিবাঙ্কুর কোচিন	...	৬	—
হায়দরাবাদ	...	৭	৪
মাদ্রাজ	...	১৭	১
দিল্লী	...	৩৮	১৫
উত্তর প্রদেশ	...	১৪	১
মধ্য ভারত	...	৬	৬
সার্ভিসেস	...	৬৭	—
মধ্য প্রদেশ	...	১	২
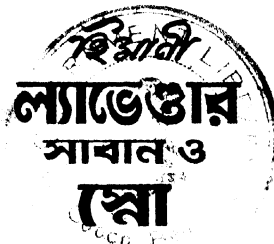
দেশী সংবাদ

৩১শে জানুয়ারী—পুরুলিয়ার সংবাদে প্রকাশ, রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের আগমনের প্রাক্কালে সমগ্র মানভূম যুদ্ধকালীন অবস্থার অনুরূপ আকার ধারণ করিয়াছে। কারণ তথায় উৎকট বাঙ্গালী বিদ্বেষ প্রচার চরমে পেঁৗছিয়াছে।

আজ পাটনায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট বিহারের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীকৃষ্ণ সিংহ, অর্থমন্ত্রী ডাঃ অনুগ্রহনারায়ণ সিংহ এবং অপর তিনজন মন্ত্রী সাক্ষ্য প্রদান করেন।

১লা ফেব্রুয়ারী—ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি শ্রী ইউ এন ধেবর অন্ধ্র সফরে যাইবার পথে আজ বিমানযোগে দমদম বিমানঘাটিতে পেঁৗছিলে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জানানো হয়।

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু ও সর্দার কে এম পানিকর আজ পূর্ণিয়ায় পেঁৗছিলে বিহারের অংশ-সমূহের উপর বাঙ্গলার দাবীর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। কমিশন আজ পূর্ণিয়ায় ৬টি দলে ৪২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করেন। কমিশনের সমক্ষে সাক্ষ্যদানকালে অধিকাংশ ব্যক্তিই পূর্ণিয়ার এক ইঞ্চি ভূমিও বাঙ্গলায় যাওয়া উচিত নহে—এই মন্তব্য প্রকাশ করিয়া পশ্চিমবঙ্গের দাবীর বিরোধিতা করিয়াছেন।

২রা ফেব্রুয়ারী—ইণ্ডিয়ান এয়ার লাইনস কর্পোরেশনের একটি দিল্লীগামী নৈশ যাত্রি-বাহী ডাকোটা বিমান গতকল্য শেষ রাত্রে নাগপুরে বিমান বন্দরের নিকট বিধ্বস্ত হইয়াছে। ইহার ফলে বিমানের ১০ জন আরোহীরই মৃত্যু হইয়াছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবহন দপ্তরের ডেপুটি সেক্রেটারী শ্রী সি পার্থসারথি এবং সংসদ সদস্য শ্রীভাওরাও বোরকার আরোহীদের মধ্যে ছিলেন.

মধ্যপ্রদেশের ভিলাই অঞ্চলে রাশিয়ার আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যে আপাততঃ দশ লক্ষ টন কাঁচা লৌহপিণ্ড উৎপাদনের উপযোগী একটি ইস্পাত কারখানা স্থাপনের জন্য আজ নয়াদিল্লীতে ভারত ও সোভিয়েট সরকারের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে।

আজ কিষেণগঞ্জে একদল বাঙ্গালী রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদানকালে দাবী করেন যে, কিষণগঞ্জ ও ইহার সন্নিহিত অঞ্চলসমূহ পশ্চিমবঙ্গভুক্ত হওয়া উচিত।

৩রা ফেব্রুয়ারী—গতকল্য অপরাহ্নে ঝরিয়া হইতে প্রায় ১৫ মাইল দূরে অবস্থিত মডেল ধর্মবাদ কোলিয়ারীর একাংশ এবং সন্নিহিত এলাকা ধসিয়া পড়ার ফলে ১০ জন খনি শ্রমিক নিহত ও ৮ জন আহত হইয়াছে। উক্ত সন্নিহিত এলাকায় শ্রমিকদের বাসগৃহ ছিল।
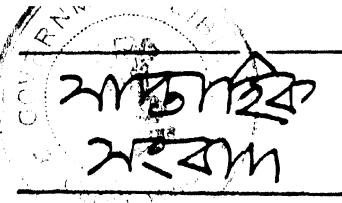
আজ নয়াদিল্লীতে বিশ্ব আবহ সংস্থার এসিয়া আঞ্চলিক সমিতির প্রথম সম্মেলন আরম্ভ হয়। কেন্দ্রীয় পরিবহন মন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেন।

পশ্চিমবঙ্গে বেকার সমস্যা সম্পর্কে ১৯৫৩ সালে যে অনুসন্ধানকার্য হয় তাহার রিপোর্টের দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছে। এই রিপোর্টে জানা যায় যে, কলিকাতায় পূর্ণ সময়ের জন্য কর্মপ্রার্থীর সংখ্যা ৩ লক্ষ ৬৮ হাজার ৬ শত।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—বঙ্গ-বিহার সীমান্তে রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সফর সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য কলিকাতা হইতে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রবীণ স্টাফ রিপোর্টার শ্রীশিবদাস ভট্টাচার্যকে পাঠানো হইয়াছিল। বিহার পুলিশ তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়া সাড়ে তিন ঘণ্টাকাল আটক রাখে এবং তারপর পুলিশ প্রহরায় তাঁহাকে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তনে বাধ্য করা হইয়াছে।

কাছাড় হাইলাকান্দীতে পুলিশের কৌশলে আন্তঃপ্রাদেশিক ছেলেধরা দল বলিয়া কথিত একটি দল ধরা পড়িয়াছে এবং উহাদের হাত হইতে কতকগুলি অপহৃত বালককে উদ্ধার করা হইয়াছে।

৫ই ফেব্রুয়ারী—অদ্য রাত্রি ১০ ঘটিকায় শান্তিপুরে স্বাস্থ্যনিবাসে প্রকৃতির দুলাল কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় ৭৮ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি গত এক সপ্তাহকাল যাবৎ বার্ধক্যজনিত নানা রোগে ভুগিতেছিলেন।

৬ই ফেব্রুয়ারী—গতকল্য শনিবার সন্ধ্যায় ঝরিয়া হইতে ১২ মাইল দূরে ব্রাউরা-কাঁকানি লিমিটেডের আমলাবাদ কয়লা খনিতে ভূগর্ভে বিস্ফোরণের ফলে দুইজন খনি অফিসারসহ মোট ৫৫ জন নিহত হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা করা হইতেছে। স্থানীয় উদ্ধারকারীদল এ পর্যন্ত ৪২টি মৃতদেহ উদ্ধার করিয়াছে.

বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে অদ্য পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ইণ্টালী কেন্দ্রের উপনির্বাচন সম্পন্ন হয়। এই কেন্দ্রে ভোট-দাতার সংখ্যা ৬১ হাজারের অধিক; তন্মধ্যে গড়ে শতকরা ৫০ জনেরও অধিক ভোট দান করেন বলিয়া অনুমিত হয়।

বিদেশী সংবাদ

৩১শে জানুয়ারী—আজ লণ্ডনে সপ্তাহ-ব্যাপী কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলন আরম্ভ হইয়াছে।

১লা ফেব্রুয়ারী—নিরাপত্তা পরিষদে ফরমোজা সম্পর্কিত আলোচনায় যোগদানের জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারস্কোয়েল্ড কম্যুনিস্ট চীনের নিকট আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করিয়াছেন।

মস্কো বেতারে ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনাবলী সোভিয়েট ইউনিয়নে রুশ ভাষায় এই সর্বপ্রথম প্রকাশিত হইবে।

২রা ফেব্রুয়ারী—লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রী সম্মেলনে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু বলেন যে, বিশ্বের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদদের হাইড্রোজেন ও আণবিক অস্ত্রশস্ত্রের বিলোপ সাধনের জন্য কাজ করা উচিত।

রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারী জেনারেল মিঃ দাগ হ্যামারস্কোয়েল্ড অদ্য আণবিক শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার সম্পর্কে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হইবার জন্য পৃথিবীর ৮৪টি দেশের নিকট আমন্ত্রণলিপি প্রেরণ করিয়াছেন।

৩রা ফেব্রুয়ারী—ফরমোজার যুদ্ধবিরতি সম্পর্কে নিউজিল্যাণ্ডের প্রস্তাব সম্বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদের আলোচনায় যোগ দিবার জন্য রাষ্ট্রপুঞ্জ চীনকে যে আমন্ত্রণ জানাইয়াছিল অদ্য চীন তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছে।

৪ঠা ফেব্রুয়ারী—বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন অদ্য কমন্স সভায় বলেন যে, চীনের নিকটবর্তী জাতীয়তাবাদী চীনের অধিকৃত দ্বীপসমূহে নিজেদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কম্যুনিস্ট চীন যদি চেষ্টা করে, তবে উহার ফলে বর্তমান অবস্থায় "শান্তি ও নিরাপত্তা বিপন্ন হইবার মত অবস্থার উদ্ভব হইবে।"

৫ই ফেব্রুয়ারী—আজ লণ্ডনে বৃটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে ফরমোজা সম্পর্কে একটি কমনওয়েলথ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেন, ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু এবং কানাডার প্রধান মন্ত্রী মিঃ লুই সেণ্ট লরেণ্ট।

৬ই ফেব্রুয়ারী—চীনের মূল ভূভাগ সন্নিহিত তাচেন এলাকা হইতে কুওমিণ্টাং সৈন্যগণকে অপসারণের জন্য মার্কিন ও চীনা জাতীয়তাবাদী নৌবহর অদ্য ফরমোজা হইতে যাত্রা করে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
১৬ সংখ্যা
দেশ
শনিবার
৭ ফাল্গুন ১৩৬১
DESH SATURDAY, 19TH FEBRUARY, 1955.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভা এবং পরিষদে রাজ্যপালের অভিভাষণ লইয়া বিতর্কের উপসংহার ঘটিয়াছে। বিধান-মণ্ডলীর উদ্বোধনকালীন অভিভাষণে রাজ্যপালের বক্তৃতার ভিতর দিয়া সাধারণত রাজ্যের অবস্থার সামগ্রিক স্বরূপ ও তৎসম্পর্কিত বিভিন্ন নীতির নির্দেশ থাকে। এইদিক হইতে এ বিতর্কের মূল্য আছে। রাজ্যপাল তাঁহার অভিভাষণে আমাদিগকে অনেক আশার কথা শুনাইয়াছেন। বিভিন্ন বিভাগের কাজের তথ্যগত পরিসংখ্যান উপস্থিত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, পশ্চিমবঙ্গ নানাদিক হইতে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে। তাঁহার বিবৃতির অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। আমাদের শুধু বক্তব্য এই যে, তাঁহার উপস্থাপিত চিত্র অনেকটা অতিরঞ্জিত বলিয়া আমরা মনে করি। পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক অবস্থার কতকটা উন্নতি সাধিত হইয়া থাকিলেও জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনের উপর তাহা প্রভাব বিস্তার করে নাই। খাদ্য সমস্যার কথাই এ সম্পর্কে প্রধান বিবেচ্য হইয়া দাঁড়ায়। এই সমস্যার অনেকটা সমাধান হইয়াছে ইহা সত্য; কিন্তু রাজ্যে লক্ষ লক্ষ নরনারী আজও পর্যাপ্ত এবং পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে প্রপীড়িত রহিয়াছে। গভর্নমেণ্টের নানাবিধ চেষ্টা সত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ আশানুরূপ পরিমাণে আসিয়া দাঁড়ায় নাই। এখানকার কৃষকদের দারিদ্র্য অপরিসীম। সরকার প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তার এবং মাধ্যমিক শিক্ষার উন্নয়নের গুরুত্ব উপলব্ধি করা সত্ত্বেও শিক্ষার উপযুক্ত সুবিধা লাভ না করাতে রাজ্যের সর্বত্র অসন্তোষের ভাব বিদ্যমান। সর্বোপরি দেশের বেকার সমস্যা। ইহার সমাধানের পথ তো হয়ই নাই, পরন্তু গভর্নমেণ্টের দিক হইতে চেষ্টা সত্ত্বেও উত্তরোত্তর এই সমস্যা জটিল আকার ধারণ করিতেছে। ফলত কয়েকটি উন্নয়ন পরিকল্পনার হিসাব দেখাইলেই দেশের লোকে এরূপ অবস্থায় আশ্বস্ত হইতে পারে না। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমবঙ্গ নানাদিক হইতেই বর্তমানে সংকটজনক অবস্থার মধ্যে পতিত। এ প্রদেশের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় অর্থনৈতিক সংকটে আজ ধ্বংসের পথে বসিয়াছে। সুতরাং উল্লাস বোধ করিব কি দেখিয়া? এই অবস্থা হইতে পশ্চিমবঙ্গকে উদ্ধার করিতে হইলে সুগঠিত পরিকল্পনা লইয়া সরকারকে কার্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে এবং সেগুলির যথা-সম্ভব সত্বর বাস্তবরূপ দানে প্রবৃত্ত হওয়াও প্রয়োজন। এজন্য সরকার পক্ষের যেরূপ সংকল্পশীলতা, জনসেবার জন্য আন্তরিকতা এবং সজাগ কর্তব্যবুদ্ধি, সেইরূপ জনসাধারণের সহযোগিতাও আবশ্যক। বাস্তবিকপক্ষে সরকার যদি তাঁহাদের কর্মনীতিতে জনগণের প্রতি সংবেদনশীলতাকে নিষ্ঠাবুদ্ধির দ্বারা পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে পারেন, তবে জনগণের সহযোগিতাও তাঁহারা লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, আমাদের ইহাই বিশ্বাস। বস্তুত সরকারী কর্মতৎপরতার পরিবেশে আমলাতান্ত্রিক আভিজাত্যের আমেজ এবং জনচিত্তের সংযোগ-চেতনার অভাবে আজও সমাজ-জীবনে সরকারী পরিকল্পনানুযায়ী কর্ম-সাধনা একান্ত উদ্দীপনা সৃষ্টি করিতে সক্ষম হইতেছে না।

বিহারের মারাত্মক মতি

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশন কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। এখানে তিনদিন কমিশনের অধিবেশন হয়। অতঃপর তাঁহারা উড়িষ্যায় গমন করেন। পশ্চিম-বঙ্গে কমিশনের কাজ এখনও শেষ হয় নাই। তাঁহারা পরে আবার আসিবেন এবং সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গের কয়েকটি জেলাও পরিভ্রমণ করিবেন। কমিশন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষের কথা বিশেষ প্রণিধানের সহিত শুনিয়াছেন এবং অত্যন্ত প্রীতিপূর্ণ প্রতিবেশের মধ্যে তাঁহারা কর্তব্য পালনে সমর্থ হইয়াছেন, এজন্য আমরা সুখী হইয়াছি। কমিশনের কার্য সম্পর্কে বিহারের নজিরে পশ্চিম-বঙ্গে হৈ-হুল্লোড় দেখা যায় নাই, কমিশনের সদস্য হিসাবে পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এজন্য সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে কমিশনের কাজ সম্বন্ধে বিহারে বাঙলা ভাষা এবং বাঙালীদের বিরুদ্ধে যে প্রতিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছিল, তাহার অনিষ্টকারিতা উপলব্ধি করিবার উপযুক্ত মস্তিষ্ক বাঙালীর আছে এবং এই সম্পর্কে লোক-সংঘর্ষ সৃষ্টি করা শুধু অনর্থকর

নয়, পরন্তু অনাবশ্যক, বাঙালী ইহাও বোঝে। কমিশন বিভিন্ন প্রদেশে গিয়াছেন ও যাইবেন। কিন্তু আমাদের খুবই বিশ্বাস, বিহারে কমিশনকে যেরূপ কমিশনকে যেরূপ উত্তেজনাপূর্ণ এবং উত্তেজনাপূর্ণ এবং উদ্‌ভ্রান্ত অভিনন্দনের উৎকট বিপাকের মধ্যে গিয়া পড়িতে হইয়াছিল অন্য কোনও প্রদেশে তেমন বিপর্যয়কর ব্যাপার তাঁহাদিগকে দেখিতে হইবে না। বিহারে বাঙলাভাষীদের প্রতি যে অবিচার, জোর-জুলুম, তাঁহাদের প্রতি যে অন্যায় আচরণ, অপমান ও লাঞ্ছনা কমিশনের কাজের সম্পর্কে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-সভাপতির বিবৃতিতে সেগুলির যাথার্থ্য স্পষ্টতর হইয়াছে। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-সভাপতির বর্তমানে বিহারে যাওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করেন নাই। এইরূপে বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর এমনই অবাঞ্ছিতভাবে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুত অতুল্য ঘোষ বিহারে গমন করেন। বিহার কংগ্রেসের পক্ষ হইতে শ্রীযুত ঘোষের প্রতি অবশ্য যথেষ্ট সৌজন্য প্রদর্শিত হয়। কিন্তু তাঁহার প্রতি সৌজন্য একান্তই ব্যক্তিগত ব্যাপার; তাঁহার পদ-মানকে মামুলী মর্যাদা দান। বস্তুত ব্যক্তিগত সৌজন্যের এই আবরণ বিহারের বাঙলা ভাষাভাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেস-সভাপতির দৃষ্টি আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই। বিহারে বাঙলাভাষাভাষীর বিরুদ্ধে বর্তমানে কিরূপে সন্ত্রাসমূলক পরিবেশ সৃষ্টি করা হইয়াছে, শ্রীযুত ঘোষ সে চিত্র উন্মুক্ত করিয়াছেন। বিহার কংগ্রেসের সভাপতি এ সম্বন্ধে সত্যকে চাপা দিবার চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু বিহারের রাজ্যপালের বিধানমণ্ডলীর উদ্বোধন-বক্তৃতায় অনেকটা পরোক্ষভাবে হইলেও সে সত্য স্বীকৃত হইয়াছে। কয়েক শত বৎসর ধরিয়া যাঁহারা এই সকল অঞ্চলে বসবাস করিতেছেন, আজ তাঁহারা বিহারী হিন্দী-ভাষীদের দৃষ্টিতে অপরাধী। তাঁহাদের দের অপরাধ এই যে, তাঁহারা বাংলাভাষী। ভারত রাষ্ট্রের নায়কদের দৃষ্টি আমরা এইদিকে আকৃষ্ট করিতেছি। তাঁহারা সময় থাকিতে বিহারের এই উন্মাদনা সংযত করুন। বাংলাভাষা এবং বাংলার সংস্কৃতির উপর আঘাত করিতে গিয়া বিহার সমগ্রভাবে ভারতের মূলে কুঠারাঘাত এবং স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রীয় আদর্শকে কলঙ্কিত করিতে উদ্যত হইয়াছে। জাতীয়তাবাদী বাংলা এজন্য বিশেষ বেদনা বোধ করে।

প্রধানমন্ত্রীর অভিজ্ঞতা

সাম্রাজ্য মন্ত্রণাসভায় যোগদান করিয়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী দেশে ফিরিয়াছেন। সম্প্রতি লণ্ডনে একটি বক্তৃতায় তিনি বলিয়াছেন, বর্তমানে জগতের গতি এতই দ্রুত হইয়া পড়িয়াছে যে, মানুষ চিন্তার অবসর পাইতেছে না। বাস্তবিকপক্ষে নিত্য-নূতন পরিবর্তনের ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে মানুষের মন শুধু ফাঁকিতে গিয়া পড়িতেছে। একদিক হইতে কথাটার দার্শনিক সত্যতা অনেকেই উপলব্ধি করিবেন। অন্যদিক হইতে সমভাবে এই কথাও বলা যাইতে পারে যে, বর্তমানে যাহারা মানবজাতির ভাগ্য পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহারা পরের চিন্তাতেই যেন বেশী বিব্রত। কোন দেশ বা জাতি যে নিজেদের চিন্তা নিজেরা করিবে সেটুকু অবসর নাই। বিশ্ব-জগতের হিতার্থীরা অযাচিতভাবে তাহাদের চিন্তাভার নিজেরা জোর করিয়াই ঘাড়ে লইবেন। বাস্তবিকপক্ষে জগদ্ব্যাপী পরার্থপরতার এমন উৎকট প্রতিযোগিতা মানবসমাজে ইতিপূর্বে দেখা গিয়াছে কি না সন্দেহ। ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে সাম্রাজ্য মন্ত্রণাসভায় গিয়া একক অবস্থায় পড়িতে হয়। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার কোন প্রস্তাবই গৃহীত হয় নাই। কারণ সাম্রাজ্য মন্ত্রীরা মার্কিন শক্তিগোষ্ঠীর প্রভাবেই প্রভাবিত। নিরপেক্ষভাবে বিশ্বশান্তির সম্বন্ধে চিন্তা করিবার অবসর তাঁহাদের নাই। এরূপ অবস্থায় সাম্রাজ্যের সঙ্গে রাজনীতিক স্বার্থ-সম্পর্ক স্কন্ধে বহন করিয়া ভারতের প্রকৃতপক্ষে কোন কল্যাণ সাধিত হইতেছে কিনা, এ প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে।

ধনী ও দরিদ্রের জীবন-দর্শন

আচার্য বিনোবা ভাবে বালেশ্বরের একটি বক্তৃতায় দারিদ্র্যের গুণগান করিয়াছেন। এদেশের প্রাচীন মুনিঋষি হইতে আরম্ভ করিয়া মনীষীদের অনেকের মুখেই আমরা এমন কথা শুনিয়াছি। কিন্তু এ সম্বন্ধে একটা প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে। পুণ্যময় জীবন বলিতে অজ্ঞানতা অবশ্যই বুঝায় না এবং কর্ম করিলেই জীবন পুণ্যময় হয় কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের কারণ আছে; কারণ পশুও কর্ম করে। প্রকৃতপক্ষে কর্মের মূলে যদি আত্মোপলব্ধি অর্থাৎ ত্যাগের প্রবৃত্তি এবং সেবার আনন্দ যুক্ত থাকে তবে সেই ক্ষেত্রেই জীবন পুণ্যময় হওয়া সম্ভব। ভারতের শতকরা ৭০ জন লোক কৃষিজীবী। সুতরাং সাধারণত তাহারা দরিদ্র; কিন্তু সেই হেতু ইহাদের জীবন পুণ্যময়, একথা বলা সমীচীন হইবে বলিয়া মনে হয় না। তবে অজ্ঞানতাবশত ইহারা পাপের নৈতিক দায়িত্ব হইতে অনেকটা মুক্ত। অপরপক্ষে যাহাদের জন্য তাহাদের এই দারিদ্র্য তাহারা সে দায়িত্ব এড়াইতে পারে না। তাহারা প্রকৃতই পাপী। তাহারা কৃতঘ্ন, তাহারা অমানুষ। অথচ পুণ্যের ঢাক বাজাইয়া ইহারাই চলে। প্রকৃতপক্ষে এইসব ধনগর্বী ব্যক্তি দরিদ্রদের প্রতি মাঝে মাঝে কৃপার যে ক্ষুদ কণা বিতরণ করে, তাহাতেও তাহাদের মানুষের মর্যাদা হানিকর নীচাশয়তাই লুক্কায়িত থাকে। প্রকৃতপক্ষে দারিদ্র্য বাঞ্ছনীয় এবং দারিদ্র্যের জীবন পুণ্যময়ও নহে। যদি তাহাই হইত, তবে যাহারা অপরের মুখ হইতে অন্নমুষ্টি কাড়িয়া লইয়া স্ফীতোদর হইতেছে, তাহারাও প্রত্যেকে পুণ্যাত্মা বলিয়া বিবেচিত হইত। ভারতের সভ্যতা এবং সংস্কৃতিতে সে মর্যাদা ইহাদের কোনদিনই দেওয়া হয় নাই। কিন্তু ধর্মের নামে এই দুষ্প্রবৃত্তির সঙ্গে গোঁজামিল দিবার একটা মিথ্যাচার সমাজ-জীবনের উপর আপতিত হইয়া এদেশের অগ্রগতির পথ অবরুদ্ধ করিয়াছে। ইহার ফলে আজ পঞ্জীভূত দারিদ্র্যের ভার সমাজ-জীবনের উপর চাপাইয়া অধর্ম এখানে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। আজ এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য আবেদন আসিয়াছে। মনুষ্যত্বেরই এই দাবী। দারিদ্র্যের মহিমা কীর্তন করিতে গিয়া আমরা যেন এই সত্য বিস্মৃত না হই।

ঘণ্টা বাদে সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী মিঃ নিকিটা ক্রুশেভ সুপ্রিম সোভিয়েটের সম্মুখে মার্শাল বুলগানিনকে প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করার প্রস্তাব উপস্থিত করেন। বলা বাহুল্য, কোনো ডেপুটি অন্য কোনো নাম উত্থাপন করেন নি এবং মিঃ ক্রুশেভের প্রস্তাব সর্ব-সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

মিঃ ম্যালেনকভ কি স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করলেন, অথবা তাঁকে সরানো হোল? বোধ হয় দুই-ই অংশত সত্য। মিঃ ম্যালেনকভ তাঁর পদত্যাগপত্রে লিখেছেন যে, তিনি নিজের কর্মদক্ষতা ও অভিজ্ঞতার অভাববোধ থেকেই পদত্যাগ করছেন। প্রায় দু বছর প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকার পরে এরূপ অজুহাত দেওয়া একটু অদ্ভুত লাগবে সন্দেহ নেই। তবে প্রধানমন্ত্রী হিসাবে মিঃ ম্যালেনকভের সাফল্য যে খুব বেশী কিছু একটা হয়েছে তাও বলা যায় না। সুতরাং তাঁর নিজের সম্বন্ধে এরূপ ভাব প্রকাশের মধ্যে কোনো আন্তরিকতা নেই, জোর করে তাঁকে দিয়ে এসব কথা বলানো হয়েছে—ঠিক এরকম মনে করা ভুল হবে। মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্ব থেকে স্ট্যালিন মিঃ ম্যালেনকভকে বড়ো করে তুলছিলেন—অনেকটা সেই টানেই স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে মিঃ ম্যালেনকভ প্রধানমন্ত্রীর আসন পেয়ে যান যদিও তাঁর বয়স অন্য নেতাদের তুলনায় কম ছিল। তারপর প্রায় দু বছর গেছে। এই সময়ের মধ্যে সোভিয়েটের আভ্যন্তর এবং বৈদেশিক নীতিকে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। সব ব্যাপারে মিঃ ম্যালেনকভের নেতৃত্ব হয়ত সফলতার পরিচয় দিতে পারেনি এবং তিনি সেটা নিজেই হয়ত অনুভব করেছেন।

তবে এর আড়ালে ক্ষমতার লড়াইও যে চলেছে সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। প্রশ্ন হচ্ছে, তার রকমটা কী। যে-লড়াইয়ের পরিণাম হচ্ছে একপক্ষের নিঃশেষ বিলোপ, এটা সেইরকম লড়াই (বা তার প্রথম পর্ব) বলে মনে করার যথেষ্ট কারণ দেখা যাচ্ছে না। ক্ষমতা ভোগের দিক থেকে মিঃ ম্যালেনকভ অনেকখানি হটে গেলেন সন্দেহ নেই কিন্তু যে-পতনের পরিণাম কম্যুনিস্টদের

গত সপ্তাহে মিঃ জর্জি ম্যালেনকভের জায়গায় মার্শাল বুলগানিন সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের প্রধানমন্ত্রীর পদে নিযুক্ত হয়েছেন। ৮ই ফেব্রুয়ারী সুপ্রিম সোভিয়েটের (রাশিয়ার পার্লামেণ্ট) সভায় মিঃ ম্যালেনকভের পদত্যাগপত্র পড়ে শোনানো হয় এবং বিনা আলোচনায় সর্বসম্মতিক্রমে" গৃহীত হয়। আড়াই

ভাষায় "লিকুইডিশন" এটা সে-রকম পতন নয়। এটা ক্লাশ থেকে বার করে দেওয়া নয়, প্রথম বেঞ্চ থেকে দ্বিতীয়, তৃতীয় কি চতুর্থ বেঞ্চে গিয়ে বসতে বলার মতন। মিঃ ম্যালেনকভ অন্যতম উপ-প্রধানমন্ত্রী হয়ে সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের মন্ত্রিমণ্ডলের ভিতরেই থাকছেন এবং কম্যুনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরোর সদস্যপদও তিনি হারান নি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিজেদের মধ্যে একটা বুঝাপড়ার ভিত্তিতেই এই পরিবর্তন সাধিত হয়েছে যদিও তার মধ্যে কারো কারো বা কোনো কোনো দলের ক্ষমতা বৃদ্ধি বা হ্রাসের প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্ট্যালিনের মৃত্যুর পরে ম্যালেনকভ, বেরিয়া ও মলোটভের প্রাধান্য দৃষ্ট হয়। কয়েক মাসের মধ্যেই কিন্তু বেরিয়া খতম হলেন। কম্যুনিস্ট পার্টির সেক্রেটারী হিসাবে মিঃ ক্রুশেভের বিরাট ক্ষমতা থাকলেও লোকচক্ষে সেটা ততটা প্রকট হয়নি। কিন্তু বর্তমানে মিঃ ক্রুশেভের ক্ষমতা সর্বাধিক না হ'লেও একেবারে "পহেলা বর্গের", সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, যদিও তিনি সাক্ষাৎভাবে গভর্নমেণ্ট অর্থাৎ মন্ত্রিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত নন। ক্ষমতার দিক থেকে নূতন প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিনকে মিঃ ক্রুশেভের পর্যায়ে ফেলা যায়। নবনিযুক্ত দেশরক্ষা মন্ত্রী মার্শাল জুকভ এবং পররাষ্ট্র সচিব মিঃ মলোটভের স্থানও এঁদের পিছনে হলেও বোধ হয় কাছাকাছি।

মন্ত্রিমণ্ডলীতে পরিবর্তনের দ্বারা সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের আভ্যন্তর বা বৈদেশিক নীতির কোনো পরিবর্তন সূচিত হচ্ছে কিনা, এ প্রশ্ন নিয়ে অনেক জল্পনা কল্পনা চলছে। মিঃ ম্যালেনকভ তাঁর পদত্যাগপত্রের ভিতরেই কৃষি এবং ভারি শিল্পের সম্বন্ধের কথা যেভাবে উল্লেখ করেছেন তা থেকেই বুঝা যায় যে, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সোভিয়েট রাষ্ট্রের কর্ণধারদের মধ্যে একটা বিতর্ক চলছিল। মিঃ ম্যালেনকভের আমলে কিছুকাল জনসাধারণের ব্যবহার্য খাওয়া-পরার জিনিস তৈরীর উপর একটু বেশি ঝোঁক গিয়েছিল। কিন্তু আবার ভারি শিল্পের উপরই ঝোঁক পড়েছে। পাছে লোকে মনে করে যে, নেতাদের মধ্যে এই নিয়ে এখনও মতভেদ আছে, সেইজন্য মিঃ ম্যালেনকভ তাঁর পত্রে ভারি শিল্পের প্রসারের প্রয়োজনীয়তার কথা বিশেষ করে উল্লেখ করেছেন।

ভারি শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সমর বিভাগের কথা স্বতঃই মনে আসে। তার উপর প্রধানমন্ত্রীর পদে মার্শাল বুলগানিনের ও দেশরক্ষা মন্ত্রীর পদে মার্শাল জুকভের নিয়োগ দেখে মনে হতে পারে যে, রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি একটা বিশেষ মোড় নিচ্ছে। কিন্তু মিঃ ম্যালেনকভের জায়গায় মার্শাল বুলগানিন প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন বা মার্শাল জুকভ দেশরক্ষা মন্ত্রী হয়েছেন বলেই যে বৈদেশিক নীতির একটা বিশেষ পরিবর্তন হবে তা মনে করার কারণ নেই। যে-পরিবর্তন হচ্ছে বা হতে পারে তা অবস্থার উপর নির্ভর করছে, মন্ত্রিবিশেষের উপর নয়। আবার অনেকে ভাবছেন যে, মন্ত্রিমণ্ডলীতে যে-পরিবর্তন হলো তা'তে সমর বিভাগের জোর বেড়ে গেল। কিছু বাড়তে পারে, কিন্তু সেটা তেমন কিছু বড়ো ব্যাপার নয় কারণ সোভিয়েট রাশিয়ায় সমর বিভাগ, গভর্নমেণ্ট এবং কম্যুনিস্ট পার্টির পারস্পরিক যোগাযোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। একটা থেকে আর একটা কখনই একেবারে আলাদা ছিল না, সর্বত্রই পার্টির প্রভাব বর্তমান।

* * *

সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট প্রস্তাব করেছেন যে, ফরমোজা প্রশ্নের মীমাংসার জন্য একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স ডাকা হোক। কনফারেন্সের আহবায়ক হবে রাশিয়া, বৃটেন এবং ভারতবর্ষ। স্থান হবে সাংহাই অথবা নয়াদিল্লী। এই কনফারেন্সে আহূত হবে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, সোভিয়েট, ভারতবর্ষ, ফ্রান্স, বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান এবং সিংহল। এই প্রস্তাব সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট বৃটিশ গভর্নমেণ্টকে জানিয়েছেন। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বলেছেন যে, কুমিনটাংকে বাদ দিয়ে ফরমোজার প্রশ্ন আলোচনার জন্য কোনো কনফারেন্স করা যেতে পারে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো তা'তে কিছুতেই রাজী হবে না। যাই হোক, এই প্রস্তাব নিয়ে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ও সোভিয়েটের মধ্যে এখনও মতের আদান-প্রদান চলছে।

শীঘ্র কোনো মীমাংসা হবার সম্ভাবনা নেই, তবে আশার বিষয় এই যে, ফরমোজা নিয়ে ব্যাপক যুদ্ধের সম্ভাবনাও আপাতত দেখা যাচ্ছে না। তাচেন দ্বীপাবলী যেমন কুমিণ্টাং ছেড়ে চলে এসেছে, তেমনি চীন উপকূলের নিকটস্থ অন্য দ্বীপগুলিকেও যদি পিকিং সরকারের হস্তগত হতে দেওয়া হয় এবং কুমিণ্টাং বিমানবহর চীনের উপর উৎপাত করা থেকে নিবৃত্ত হয় তবে ধীরে সুস্থে ফরমোজার প্রশ্ন নিয়ে কথাবার্তা চলতে পারে। ফরমোজার দাবী পিকিং সরকার কিছুতেই ছাড়ছেন না কিন্তু ফরমোজা থেকে চীনের কোনো বিপদের আশঙ্কা নেই, এটা যদি পিকিং সরকার অনুভব করতে পারেন তবে তাঁরা ফরমোজার জন্য আমেরিকার সঙ্গে যুদ্ধে নামার কথা নিশ্চয়ই ভাববেন না।

১৫।২।৫৫

মণিপুরী মহারাসে নৃত্যাভিনয়

শান্তিদেব ঘোষ

মণিপুরী সমাজে প্রচলিত "মহারাস" হল একটি বড় সামাজিক উৎসব। এই উৎসবটি প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মীপূর্ণিমার পরের পূর্ণিমায়। মণিপুরী সমাজের নৃত্য-গীত ও অভিনয়ের প্রাচীন ধারার যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তা এই উৎসব উপলক্ষেই সেই রাত্রিতেই দেখা যায়। "মহারাস" দেখার পর উঁচুদরের মণিপুরী নাচের আর বিশেষ কিছু দেখার বাকি থাকে বলে মনে করি না।

এই উৎসবটির প্রথম প্রবর্তক মণিপুরের বিখ্যাত নৃপতি মহারাজ "ভাগ্যচন্দ্র"। ইনি আরো তিনটি নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁকে কখনো বলা হত "জয়সিং", কখনো "কর্তাসিং" ও কখনো "চিংতোমখাম্বা"। এঁর রাজত্বকাল হল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধ। এঁরই রাজত্বকালে শ্রীচৈতন্য প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম মণিপুরে বিশেষ প্রাধান্য লাভ করে। সিংহাসন আরোহণের পূর্বে বেশ কয়েক বছর, মহারাজ ভাগ্যচন্দ্র. দেশ থেকে পালিয়ে গিয়ে আসামের এক রাজার অতিথি হয়ে ছিলেন। পরে আসামের সেই রাজার সাহায্যে রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন এবং মণিপুরের রাজা হয়ে সিংহাসনে বসেন। শোনা যায়, আসামের সেই রাজার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিয়ে তিনি তাঁদের বন্ধুত্বকে আরো ঘনিষ্ঠ করেছিলেন।

মহারাসের এই উৎসবটির প্রবর্তনের একটি গল্প মণিপুরী সমাজে প্রচলিত আছে। মহারাজ 'ভাগ্যচন্দ্র' যখন "কাণ্ডিপুর" নামে এক অঞ্চলে বাস করতেন তখন এক রাত্রে তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে, গোবিন্দ যেন স্বয়ং এসে তাঁকে বলছেন, "রাজা, তুমি রাজসুখে বাস করে আমাকে ভুলে গেছ। আমি নিকটবর্তী ভানুমুখ পাহাড়ে কাঁঠাল অপেক্ষা করে আছি।" পরদিন ভাগ্যচন্দ্র পাহাড়ে লোক পাঠালেন কাঁঠাল গাছের খোঁজে, কিন্তু অমাত্যরা অকৃতকার্য হয়ে ফিরে এল। সেই রাত্রে আবার শ্রীকৃষ্ণ রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, "পাহাড়ে নিজে এসে আমাকে পূজা দাও, তার পরে খোঁজ কর, অন্যের দ্বারা একাজ হবে না।" পরদিন প্রত্যূষে পাত্রমিত্র সহ মহারাজ পর্বতে গেলেন। শ্রীকৃষ্ণের পূজা শেষ করে কিছু দূর অগ্রসর হতেই একটি কাঁঠাল গাছ তাঁর চোখে পড়ল। তিনি তাকেই শ্রীকৃষ্ণ আদিষ্ট গাছ স্থির করে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে স্তুতিবাদ করলেন। তাঁর আদেশে যখন গাছ কাটা হলো, তখন দেখা গেল গাছ থেকে রক্ত ঝরছে। সেই রক্তে রাজা নিজের মাথার পাগড়ী রাঙিয়ে নিলেন। গাছটি সম্পূর্ণ কাটা হলে সেটিকে রাজধানীতে আনা হল। রাজধানীর খ্যাতনামা শিল্পীকে রাজা তাঁর স্বপ্নে দেখা কৃষ্ণমূর্তির অনুকরণে কাঠের মূর্তি গড়তে আদেশ করলেন। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা উপলক্ষেই তিনি সেই বৎসর অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লাপূর্ণিমাতে

॥ ১ ॥

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় হইতে বাংলা দেশে, বিশেষত কলিকাতা শহরে, মানুষের জীবনের মূল্য খুবই কমিয়া গিয়াছে। পঞ্চাশের মন্বন্তরে আমরা জীবনমৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য করিয়া ফেলিয়াছিলাম। তারপর জিন্না সাহেবের সম্মুখ সমর যখন আরম্ভ হইল, তখন আমরা মৃত্যু দেবতাকে একেবারে ভালবাসিয়া ফেলিলাম। জাতি হিসাবে আমরা যে টিকিয়া আছি, সে কেবল মৃত্যুর সঙ্গে সুখে স্বচ্ছন্দে ঘর করিতে পারি বলিয়াই। বাঘ ও সাপের সঙ্গে আমরা আবহমান কাল বাস করিতেছি, আমাদের মারে কে?

সম্মুখ সমরের প্রথম অনলোদ্গার প্রশমিত হইয়াছে; কিন্তু তলে তলে অঙ্গার জ্বলিতেছে, এখানে ওখানে হঠাৎ দপ করিয়া জ্বলিয়া আবার ভস্মের অন্তরালে লুকাইতেছে। কলিকাতার সাধারণ জীবনযাত্রায় কিন্তু কোনও প্রভেদ দেখা যায় না। রাস্তায় ট্রাম-বাস তেমনি চলিতেছে, মানুষের কর্মতৎপরতার বিরাম নাই। দুই সম্প্রদায়ের সীমান্ত ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে হৈ হৈ দুমদাম শব্দ ওঠে, চকিতে দোকানপাট বন্ধ হইয়া যায়, রাস্তায় দুই চারিটা রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া থাকে। সুরাবর্দি সাহেবের পুলিস আসিয়া হিন্দুদের শাসন করে, মৃতদেহের সংখ্যা দুই চারিটা বাড়িয়া যায়। কোথা হইতে মোটর ভ্যান আসিয়া মৃতদেহগুলিকে কুড়াইয়া লইয়া অন্তর্ধান করে। তারপর আবার নগরীর জীবনযাত্রা পূর্ববৎ চলিতে থাকে।

ব্যোমকেশ ও আমি কলিকাতাতেই ছিলাম। আমাদের হ্যারিসন রোডের বাসাটা যদিও ঠিক সমর সীমানার উপর পড়ে না, তবু যথাসাধ্য সাবধানে ছিলাম। ভাগ্যক্রমে কয়েক মাস আগে ব্যোমকেশের শ্যালক সুকুমার খোকাকে ও সত্যবতীকে লইয়া পশ্চিম বেড়াইতে গিয়াছিল, তাই সম্মুখ সমর যখন আরম্ভ হইল, তখন ব্যোমকেশ 'তার' করিয়া তাহাদের কলিকাতায় ফিরিতে বারণ করিয়া দিল। তদবধি তাহারা পাটনায় আছে। ইতিমধ্যে সত্যবতীর প্রবল পত্রাঘাতে আমরা বার দুই পাটনা ঘুরিয়া আসিয়াছি; কারণ আমরা যে বাঁচিয়া আছি, তাহা মাঝে মাঝে স্বচক্ষে না দেখিয়া সত্যবতী বিশ্বাস করিতে চাহে নাই।

যাহোক, খোকা ও সত্যবতী নিরাপদে আছে, ইহাতেই আমরা অনেকটা নিশ্চিন্ত ছিলাম। রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় নিজের প্রাণরক্ষার চেয়ে প্রিয়জনের নিরাপত্তাই অধিক বাঞ্ছনীয় হইয়া ওঠে।

যেদিনের ঘটনা লইয়া এই কাহিনীর সূত্রপাত সেদিনটা ছিল দুর্গাপূজা এবং কালীপূজার মাঝামাঝি একটা দিন। দুর্গাপূজা অন্যান্য বারের মত যথারীতি ধুমধামের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে এবং কালীপূজাও যথাবিধি সম্পন্ন হইবে সন্দেহ নাই। আমরা দুজনে সকালবেলা খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছিলাম, এমন সময় বাঁটুল সর্দার আসিল। তাহাকে সেলামী দিলাম। বাঁটুল এই এলাকার গুণ্ডার সর্দার; বেঁটে নিটোল চেহারা, তৈলাক্ত ললাটে সিঁদুরের ফোঁটা। সম্মুখ সমর আরম্ভ হইবার পর হইতে বাঁটুলের প্রতাপ বাড়িয়াছে, পাড়ার সজ্জনদের গুণ্ডার হাত হইতে রক্ষা করিবার ওজুহাতে সে সকলের নিকট সেলামী আদায় করে। সেলামী না দিলে হয়তো কোনদিন বাঁটুলের হাতেই প্রাণটা যাইবে এই ভয়ে সকলেই সেলামী দিত।

সেলামীর জুলুম সত্ত্বেও ব্যোমকেশের সহিত বাঁটুলের বিশেষ সদ্ভাব জন্মিয়াছিল। আদায়তসিল উপলক্ষে বাঁটুল আসিয়া উপস্থিত হইলে ব্যোমকেশ তাহাকে চা সিগারেট দিত, তাহার সহিত গল্প জমাইত; শত্রুপক্ষ ও মিত্রপক্ষের কূটনীতি সম্বন্ধে অনেক খবর পাওয়া যাইত। বাঁটুল এই ফাঁকে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসঙ্গ তুলিত। যুদ্ধের পর মার্কিন সৈনিকেরা অনেক আগ্নেয়াস্ত্র জলের দরে বিক্রি করিয়া চলিয়া গিয়াছিল, বাঁটুল সেই অস্ত্র কিছু সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিল, এখন সে তাহা আমাদের বিক্রি করিবার চেষ্টা করিত। বলিত, 'একটা রাইফেল কিনে ঘরে রাখুন কর্তা। আমরা তো আর সব সময় সবদিকে নজর রাখতে পারি না। ডামাডোলের সময় হাতে হাতিয়ার থাকা ভাল।'

ব্যোমকেশ বলিত, 'না বাঁটুল, রাইফেল আমাদের দরকার নেই। অত বড় জিনিস লুকিয়ে রাখা যাবে না, কোন্ দিন পুলিস খবর পাবে আর হাতে দড়ি দিয়ে বেঁধে নিয়ে যাবে। তার চেয়ে একটা পিস্তল কি রিভলবার যদি জোগাড় করতে পার—'
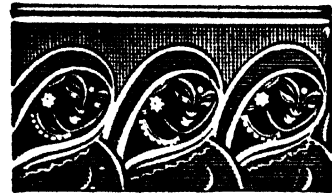
বাঁটুল বলিত, 'পিস্তল জোগাড় করাই শক্ত বাবু। আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব—'

বাঁটুল মাসে একবার আসিত।

সেদিন যথারীতি সেলামী লইয়া বাঁটুল আমাদের অভয় প্রদানপূর্বক প্রস্থান করিলে আমরা কিছুক্ষণ ম্রিয়মানভাবে সাময়িক পরিস্থিতির পর্যালোচনা করিলাম। এভাবে আর কতদিন চলিবে? মাথার উপর খাঁড়া ঝুলাইয়া কতকাল বসিয়া থাকা যায়? স্বাধীনতা হয়তো আসিতেছে, কিন্তু তাহা ভোগ করিবার জন্য বাঁচিয়া থাকিব কি? সম্মুখ সমরে যদি বা প্রাণ বাচে, কাঁকর ও তেঁতুল বিচির গুঁড়া খাইয়া কতদিন বাঁচিব? ব্যোমকেশের হাতে কাজকর্ম কোনও কালেই বেশী থাকে না, এখন একেবারে বন্ধ হইয়াছে। যেখানে প্রকাশ্য হত্যার পাইকারি কারবার চলিতেছে, সেখানে ব্যোমকেশের রহস্য-ভেদী বুদ্ধি কাহার কাজে লাগিবে?

আমি বলিলাম, 'ভারতীরে ছেড়ে ধর এইবেলা লক্ষ্মীর উপাসনা।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ রাত দুপুরে ছোরা বগলে নিয়ে বেরোও, যদি দু'চারটে কালা বাজারের মক্কেলকে সাবাড় করতে পার, তাহলে আর ভাবতে হবে না। যে সময়-কাল পড়েছে, বাঁটুল সর্দারই আমাদের আদর্শ হওয়া উচিত।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, 'কথাটা মন্দ বলনি, যুগ-ধর্ম'ই ধর্ম। কিন্তু কি জানো, ও জিনিসটা রক্তে থাকা চাই। খুনই বল আর কালা-বাজারই বল, পূর্বপুরুষদের রক্তের জোর না থাকলে হয় না। আমার বাবা ছিলেন স্কুল মাস্টার, স্কুলে অঙ্ক শেখাতেন আর বাড়িতে সাংখ্য পড়তেন। মা ছিলেন বৈষ্ণব বংশের মেয়ে, নন্দগোপাল নিয়েই থাকতেন। সুতরাং ওসব আমার কর্ম নয়।'

ব্যোমকেশের বাল্য ইতিহাস আমার জানা ছিল। তাহার যখন সতরো বছর বয়স, তখন তাহার পিতার যক্ষ্মা হয়, মাতাও সেই রোগে মারা যান। আত্মীয়-স্বজন কেহ উঁকি মারেন নাই। তারপর ব্যোমকেশ জলপানির জোরে বিশ্ববিদ্যা সমুদ্র পার হইয়াছে, নিজের চেষ্টায় নূতন জীবন-পথ গড়িয়া তুলিয়াছে। আত্মীয়-স্বজন এখনও হয়তো আছেন, কিন্তু ব্যোমকেশ তাহাদের খোঁজ রাখে না।

কিছুক্ষণ বিমনাভাবে কাটিয়া গেল। আজ সত্যবতীর একখানা চিঠি আসিতে পারে, মনে মনে তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছি।

খট্ খট্ খট্ খট্ কড়া নাড়িয়া উঠিল। আমি উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিলাম।

ডাক পিওন নয়। তৎপরিবর্তে যিনি দ্বারের বাহিরে দাঁড়াইয়া আছেন, বেশবাস দেখিয়া তাঁহাকে স্ত্রীলোকই বলিতে হয়। কিন্তু সে কী স্ত্রীলোক! পাঁচ হাত লম্বা, তদনুপাতে চওড়া, শাল-প্রাংশু আকৃতি; পালিশ করা আবলুশ কাঠের মত গায়ের রঙ; ঘটোধ্নী, নিবিড় নিতম্বিনী, স্পষ্ট একজোড়া গোঁফ আছে; বয়স পঞ্চাশের ওপারে। তিনি আমার দিকে চাহিয়া হাস্য করিলেন; মনে হইল হারমোনিয়মের ঢাকনা খুলিয়া গেল।

তিনি রামায়ণ মহাভারত হইতে বিনির্গতা কোনও অতি-মানবী কিনা ভাবিতেছি, হারমোনিয়ম হইতে খাদের গভীর আওয়াজ বাহির হইল, 'আপনি কি ব্যোমকেশবাবু?'

আমি দ্রুত মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিলাম। ব্যোমকেশের সহিত মহিলাটির কি প্রয়োজন জানি না, কিন্তু আমি যে ব্যোমকেশ নই, তাহা অকপটে ব্যক্ত করাই সমীচীন। ব্যোমকেশ ঘরের ভিতর হইতে মহিলাটিকে দেখিতে পায় নাই, আমার অবস্থা দেখিয়া উঠিয়া আসিল। সেও অভ্যাগতকে দেখিয়া ক্ষণেকের জন্য থতমত খাইয়া গেল, তারপর সৎসাহস দেখাইয়া বলিল, 'আমি ব্যোমকেশ।'

মহিলাটি আবার হারমোনিয়মের ঢাকনা খুলিলেন, বলিলেন, 'নমস্কার। আমার নাম মিস ননীবালা রায়। আপনার সঙ্গে আমার একটু দরকার আছে।'

'আসুন।'

খট্ খট্ জুতার শব্দ করিয়া মিস ননীবালা রায় ঘরে প্রবেশ করিলেন; ব্যোমকেশ তাঁহাকে চেয়ারে বসাইল। আমি ভাবিতে লাগিলাম, এরূপ আকৃতি লইয়া ইনি কখনই ঘরের ঘরণী হইতে পারেন না, স্বামীপুত্র ঘরকন্না গৃহস্থালী ইঁহার জন্য নয়। বিয় নামের অগ্রে 'মিস্' খেতাবটি দাম্পত্য সৌভাগ্যের বিপরীত সাক্ষ্য [illegible] ইহা কি? জেনানা ফাটকের জমাদারণী? [illegible] অতটা নয়, শিক্ষয়িত্রী? বোধ হয় না। লে[illegible] ডাক্তার হইতেও পারে—

পরক্ষণেই ননীবালা নিজের পরিচয় দিলেন। দেখিলাম বেশী ভুল করি নাই। তিনি বলিলেন, 'আমি পাটনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ধাত্রী ছিলাম, এখন রিটায়ার করে কলকাতায় আছি। একজনের কাছে আপনার নাম শুনলাম ঠিকানাও পেলাম। তাই এসেছি।'

ব্যোমকেশ গম্ভীরমুখে বলিল, 'কি দরকার বলুন।'

মিস ননীবালার চেহারা যেরূপ জবরদস্ত, আচার আচরণ কিন্তু সেরূপ নয়। তাঁহার হাতে একটা কালো রঙের হ্যান্ড-ব্যাগ ছিল, তিনি সেটা খুলিবার উপক্রম করিয়া বলিলেন, 'আমি গরীব মানুষ, ব্যোমকেশবাবু, টাকাকড়ি বেশী আপনাকে দিতে পারব না—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'টাকাকড়ির কথা পরে হবে। কি দরকার আগে বলুন।'

ননীবালা ব্যাগ বন্ধ করিলেন, তারপর সহসা কম্পিত স্বরে বলিয়া উঠিলেন, 'আমার ছেলের বড় বিপদ তাকে আপনি রক্ষে করুন ব্যোমকেশবাবু—।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ তাঁহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, 'আপনার—ছেলে!'

ননীবালা একটু অপ্রস্তুত হইলেন, বলিলেন, 'আমার ছেলে—মানে—আমি মানুষ করেছি। অনাদিবাবু তাকে পুষ্যি-পুত্তুর নিয়েছেন—'

ব্যোমকেশ বলিল, 'বড় প্যাঁচালো ব্যাপার দেখছি। আপনি গোড়া থেকে সব কথা বলুন।'

ননীবালা তখন নিজের কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার গল্প বলার শৈলী ভাল নয়, কখনও দশ বছর পিছাইয়া কখনও বিশ বছর আগাইয়া বহু অবান্তর প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া যাহা বলিলেন, তাহার জট ছাড়াইলে এইরূপ দাঁড়ায়—

বাইশ তেইশ বছর আগে মিস ননী-বালা রায় পাটনা হাসপাতালের ধাত্রী ছিলেন। একদিন একটি যুবতী হাস-

তালে ভর্তি হইল; অবস্থা খুবই খারাপ দুরিসির সহিত নানা উপসর্গ; তার পর পূর্ণগর্ভা। যে পুরুষটি তাহাকে আনিয়াছিল, সে ভর্তি করিয়া দিয়াই অদৃশ্য হইল।

যুবতী হিন্দু নয়, বোধ হয় আদিম জাতীয় দেশী খৃষ্টান। দুই দিন পরে সে একটি পুত্র প্রসব করিয়া মারা গেল। পুরুষটা সেই যে উধাও হইয়াছিল, আর ফিরিয়া আসিল না।

এইরূপ অবস্থায় শিশুর লালন-পালনের ব্যবস্থা রাজ সরকার করেন। কিন্তু এক্ষেত্রে ননীবালা শিশুটির ভার লইলেন। ননীবালা অবিবাহিতা, সন্তানাদি নাই, শিশুটি বড় হইয়া তাঁহার পুত্রের স্থান অধিকার করিবে এই আশায় তিনি শিশুকে পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন। শিশুর নাম হইল প্রভাত রায়।

প্রভাতের বয়স যখন তিন-চার, তখন ননীবালা হঠাৎ একটি ইন্সিওর চিঠি পাইলেন। চিঠির সঙ্গে দুই শত টাকার নোট। চিঠিতে লেখা আছে, আমি জানিতে পারিয়াছি আমার ছেলে তোমার কাছে আছে। তাহাকে পালন করিও। উপস্থিত কিছু টাকা পাঠাইলাম, সুবিধা হইলে আরও পাঠাইব।—চিঠিতে নাম দস্তখৎ নাই।

তারপর প্রভাতের বাপের আর কোনও সংবাদ পাওয়া যায় নাই। লোকটা সম্ভবত মরিয়া গিয়াছিল। ননীবালা বিশেষ দুঃখিত হইলেন না। বাপ কোনও দিন আসিয়া ছেলেকে লইয়া যাইবে এ আশঙ্কা তাঁহার ছিল। তিনি নিশ্চিন্ত হইলেন।

প্রভাত বড় হইয়া উঠিতে লাগিল। ননীবালা নিজের ডিউটি লইয়া থাকেন, ছেলের দেখাশুনা ভাল করিতে পারেন না; প্রভাত পাড়ার হিন্দুস্থানী ছেলেদের সঙ্গে রাস্তায় রাস্তায় খেলা করিয়া বেড়ায়। তাহার লেখাপড়া হইল না।

পাড়ায় এক মুসলমান দপ্তরীর দোকান ছিল। প্রভাতের যখন ষোল-সতেরো বছর বয়স, তখন সে দপ্তরীর দোকানে কাজ করিতে আরম্ভ করিল। প্রভাত লেখাপড়া শেখে নাই বটে, কিন্তু সে বয়াটে উচ্ছৃঙ্খল হইয়া গেল না। মন দিয়া নিজের কাজ করিত, ধাত্রীমাতাকে গভীর ভক্তিশ্রদ্ধা করিত।

এইভাবে তিন চার বছর কাটিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে অনাদি হালদার নামে এক ভদ্রলোক পাটনায় আসিলেন। অনাদিবাবু ধনী ব্যবসাদার। তাঁহার ব্যবসায়ের বহু খাতা বহি বাঁধাইবার প্রয়োজন হইয়াছিল, তিনি দপ্তরীকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। দপ্তরী প্রভাতকে তাঁহার বাসায় পাঠাইয়া দিল। অনেক খাতা-পত্র, দপ্তরীর দোকানে সব বহন করিয়া লইয়া যাওয়া সুবিধাজনক নয়। প্রভাত নিজের যন্ত্রপাতি লইয়া অনাদিবাবুর বাসায় আসিল এবং কয়েক দিন ধরিয়া তাঁহার খাতা বহির মলাট বাঁধিয়া দিল।

অনাদিবাবু অকৃতদার ছিলেন। প্রভাতকে দেখিয়া বোধ হয় তাঁহার ভাল লাগিয়া গিয়াছিল, তিনি একদিন ননী-বালার বাসায় আসিয়া প্রস্তাব করিলেন তিনি প্রভাতকে পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিতে চান।

এতবড় ধনী ব্যক্তির পোষ্যপুত্র হওয়া ভাগ্যের কথা; কিন্তু ননীবালা এক কথায় প্রভাতকে ছাড়িয়া দিতে রাজি হইলেন না। প্রভাতও মাকে ছাড়িতে চাহিল না। তখন রফা হইল, প্রভাতের সঙ্গে ননীবালাও অনাদিবাবুর সংসারে থাকিবেন, নারী-বর্জিত সংসারে ননীবালাই সংসার পরি-চালনা করিবেন।

ননীবালা হাসপাতালের চাকরি হইতে অবসর লইলেন। অনাদি হালদারও কর্ম-জীবন হইতে প্রায় অবসর লইয়াছিলেন, তিনজনে কলিকাতায় আসিলেন। সে আজ প্রায় দেড় বছর আগেকার কথা। সেই অবধি তাঁহারা বহুবাজারের একটি ভাড়াটে বাড়ির দ্বিতলে বাস করিতেছেন। যুদ্ধের বাজারে ভাল বাসা পাওয়া যায় না। কিন্তু অনাদিবাবু তাঁহার বাসার পাশেই একটি পুরাতন বাড়ি কিনিয়াছেন এবং তাহা ভাঙিয়া নূতন বাড়ি তৈরি করাইতেছেন। বাড়ী তৈরি হইলেই তাঁহারা নূতন বাড়িতে উঠিয়া যাইবেন।

অনাদিবাবুর এক বড় ভাই ছিলেন, তিনি কলিকাতায় সাবেক বাড়িতে বাস করিতেন। ভায়ের সহিত অনাদিবাবুর

সম্ভাব ছিল না, কোনও সম্পর্কই ছিল না। ভাই প্রায় দশ বছর পূর্বে মারা গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দুই পুত্র আছে—নিমাই ও নিতাই। অনাদিবাবু কলিকাতায় আসিয়া বাসা লইলে তাহারা কোথা হইতে সন্ধান পাইল এবং তাঁহার কাছে যাতায়াত শুরু করিল।

ননীবালার মতে নিমাই ও নিতাই পাকা শয়তান, মিটমিটে ডান, ছেলে খাওয়ার রাক্ষস। কাকা পোষ্যপুত্র লইলে কাকার অতুল সম্পত্তি বেহাত হইয়া যাইবে, তাই তাহারা কাকাকে বশ করিয়া দত্তক গ্রহণ নাকচ করাইতে চায়। অনাদিবাবু ভ্রাতুষ্পুত্রদের মতলব বুঝিয়া কিছুদিন আমোদ অনুভব করিয়াছিলেন, কিন্তু ক্রমে তিনি উত্যক্ত হইয়া উঠিলেন। মাস কয়েক আগে তিনি ভাইপোদের বলিয়া দিলেন তাহারা যেন তাঁহার গৃহে পদার্পণ না করে।

নিমাই ও নিতাই কাকার বাসায় আসা বন্ধ করিল বটে, কিন্তু আশা ছাড়িল না। অনাদিবাবু প্রভাতকে একটি বয়ইের দোকান করিয়া দিয়াছিলেন; কলেজ স্ট্রীটের এক কোণে ছোট্ট একটি দোকান। প্রভাত লেখাপড়া শেখে নাই বটে, কিন্তু সে বই ভালবাসে; এই দোকানটি তাহার প্রাণ। সে প্রত্যহ দোকানে যায়, নিজের হাতে বই বিক্রি করে। নিতাই ও নিমাই তাহার দোকানে যাতায়াত আরম্ভ করিল। বই কিনিত না, কেবল চক্ষু মেলিয়া প্রভাতের পানে চাহিয়া থাকিত; তারপর নীরবে দোকান হইতে বাহির হইয়া যাইত।

তাহাদের চোখের দৃষ্টি বাঘের দৃষ্টির মত ভয়ানক। তাহারা মুখে কিছু বলিত না, কিন্তু তাহাদের মনের অভিপ্রায় প্রভাতের জানিতে বাকি থাকিত না। প্রভাত ভালমানুষ ছেলে, সে ভয় পাইয়া ননীবালাকে আসিয়া বলিল; ননীবালা অনাদিবাবুকে বলিলেন। অনাদিবাবু এক গুর্খা নিয়োগ করিলেন, যতক্ষণ দোকান খোলা থাকিবে, ততক্ষণ গুর্খা কুকরি লইয়া দোকান পাহারা দিবে।

ভ্রাতুষ্পুত্র যুগলের দোকানে আসা বন্ধ হইল। কিন্তু তবু প্রভাত ও ননীবালার ভয় দূর হইল না। সর্বদাই যেন দুজোড়া অদৃশ্য চক্ষু তাঁহাদের উপর লক্ষ্য রাখিয়াছে, তাঁহাদের গতিবিধি অনুসরণ করিতেছে।

তা ছাড়া আর একটা ব্যাপার লইয়া বাড়িতে অশান্তি দেখা দিয়াছে। একটি মেয়েকে দেখিয়া প্রভাতের ভাল লাগিয়াছিল; মেয়েটি পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু একটি পরিবারের মেয়ে, খুব ভাল গান-বাজনা জানে, দেখিতে সুন্দরী। কোন এক সভায় প্রভাত মেয়েটিকে গান গাহিতে শুনিয়াছিল এবং তাহার কথা ননীবালাকে বলিয়াছিল। অনাদিবাবু প্রভাতের জন্য পাত্রী খুঁজিতেছিলেন, ননীবালার মুখে এই মেয়েটির কথা শুনিয়া বলিলেন, তিনি নিজে মেয়ে দেখিয়া আসিবেন এবং পছন্দ হইলে বিবাহ দিবেন।

অনাদিবাবু মেয়ে দেখিয়া আসিলে[ন] এবং বলিলেন, এমেয়ের সঙ্গে প্রভাতে[র] বিবাহ হইতে পারে না। তিনি কোন কারণ প্রদর্শন করিলেন না, কিন্তু নন[ী]বালার বিশ্বাস, এব্যাপারে নিমাই [ও] নিতাইয়ের হাত আছে। সে যাই হো[ক] ইহার পর হইতে ভিতরে ভিতরে যে একটা নূতন গণ্ডগোল শুরু হইয়াছে ননীবালা ভীত হইয়া উঠিয়াছেন। বর্তমা[ন] ডামাডোলের সময় প্রভাতের যদি কোন দুর্ঘটনা হয়? যদি গুন্ডা ছুরি মারে নিমাই ও নিতাইয়ের অসাধ্য কাজ নাই এখন ব্যোমকেশবাবু কোনও প্রকারে প্রভাতের জীবনরক্ষা করুন।

(ক্রমশ)

বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্রজীবন

ভবতোষ দত্ত

বঙ্কিমজীবনীতে শচীশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র নাকি হাতে-খড়ির দিনই সমগ্র বর্ণমালা আয়ত্ত করেছিলেন। বাল্যকালে রামপ্রাণ সরকার তাঁর শিক্ষক নিযুক্ত হলেন। পণ্ডিত মশায়ের শিক্ষাদান পদ্ধতিতে বঙ্কিম খুব তৃপ্ত ছিলেন বলে মনে হয় না। ছাত্রের মেধার সঙ্গে তিনি ঠিক তাল রেখে চলতে পারতেন না। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন—"সঞ্জীবচন্দ্রও রামপ্রাণ সরকারের হস্তে সমর্পিত হইলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরা আট দশ মাসে এই মহাত্মার হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিয়া মেদিনীপুর গেলাম।" তখন বঙ্কিমের বয়স ছয় বৎসর। তাঁর পিতা সেখানে ছিলেন ডেপুটি কালেক্টর। মেদিনীপুরে পুত্রকে তিনি ইংরাজি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন।

তারপর সেখান থেকে ফিরে এলেন। ১৮৪৯ খৃষ্টাব্দে সাড়ে এগারো বৎসর বয়সে বঙ্কিমচন্দ্র ভর্তি হলেন হুগলী কলেজে। এখানে তিনি প্রায় সাত বৎসর কাটিয়েছিলেন। এই কলেজ থেকেই তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পড়তে গিয়েছিলেন। এখানেই তাঁর প্রথম রচনার সূত্রপাত হয়। তাঁর এই সব রচনা প্রকাশিত হত ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকায়।

ছাত্র হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত কৃতি ছিলেন। কলেজে সাত বৎসর তিনি কৃতিত্বের সঙ্গেই সব পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কলেজে তখন দুটি ভাগ ছিল—জুনিয়ার এবং সিনিয়র। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তখনও স্থাপিত হয়নি। শিক্ষা পরিচালনা করতেন 'কাউন্সিল অব এডুকেশন'। বঙ্কিমচন্দ্রের জুনিয়র পরীক্ষা হয়েছিল ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। শুধু হুগলী কলেজের নয়, অধীন স্কুলের থেকে অন্যান্য ছাত্ররাও পরীক্ষা দিয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র অধিকার করেছিলেন শীর্ষ-স্থান। স্কুল জীবনের চার বছরের মধ্যে একবার মাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের ফল আশানুরূপ হয় নি। ১৮৫২-র পরীক্ষায় হুগলী কলেজের ছাত্রদের ফল হয়েছিল শোচনীয়। তাদের নম্বর গড়ে ছিল এগারো আর কৃষ্ণনগরের ছাত্রদের নম্বর গড়ে ছিল আটাশ। এ রকম অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়ে সকলেই বিস্মিত হয়ে গেলেন। অধ্যক্ষ মশায় ভেবে চিন্তে রিপোর্ট লিখলেন, বাংলা রচনার ভাষা সম্বন্ধে পরীক্ষক মশায়ের একধরনের পক্ষপাতিত্ব ছিল বলেই ফল এ রকম খারাপ হয়েছে! পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সে বৎসর ছিলেন পরীক্ষক। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ছিলেন বলে সংস্কৃতশব্দ-বহুল রচনাই আদর্শ রচনারীতি বলে মনে করতেন। তাঁর মনোমত রচনা হয়নি বলেই তিনি পরীক্ষার্থীদের প্রতি বিরূপ হয়েছিলেন। (K Zachariah : History of Hoogly College 1836-1936. p. 53) আমাদের কিন্তু মনে হয় অধ্যক্ষ মশায়ের এ ধারণাটা ঠিক নয়। বঙ্কিমচন্দ্র সেই সময় মোটেই সরল বাংলা লিখতেন না। বিদ্যাসাগরই বি-এ পরীক্ষার সময় বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলার খাতা দেখেছিলেন। সে-পরীক্ষায় বঙ্কিমচন্দ্র সসম্মানেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন।

১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজ ত্যাগ করে প্রেসিডেন্সী কলেজে আসেন আইন পড়বার জন্য। হুগলী কলেজ থেকে তিনি ২০, টাকার সিনিয়ার স্কলারশিপ পেয়েছিলেন। পরবৎসরই তিনি আইন বিভাগ থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়েছিলেন। এতেও তিনি উত্তীর্ণ হলেন প্রথম বিভাগে। ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন বিখ্যাত ব্যক্তি বঙ্কিম-চন্দ্রের সহযোগী পরীক্ষার্থী ছিলেন—কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। এঁরা সকলেই প্রথম বিভাগে পাশ করেছিলেন।

আইন অধ্যয়নের সময়েই বঙ্কিম-চন্দ্রের মনে আর একটি সংকল্পের উদয় হল। নবস্থাপিত কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় বি-এ পরীক্ষার প্রবর্তন করেছে। পর বৎসরই বঙ্কিম এই পরীক্ষা দিলেন। তাঁর সঙ্গে আর একজন মাত্র পরীক্ষার্থী ছিলেন, যদুনাথ বসু। বি-এতে ছিল ছটি বিষয়—ইংরাজি-গ্রীক-ল্যাটিন, সংস্কৃত-বাংলা-হিন্দী-উড়িয়া, ইতিহাস-ভূগোল, গণিত-দর্শন, প্রাকৃতিক ইতিহাস-পদার্থ বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্বনীতি। এদের মধ্যে পাঁচটি বিষয়েই দুজনে কৃতিত্বের সঙ্গে পাশ করেও সাত নম্বরের জন্য ষষ্ঠ বিষয়টিতে বাধা পেলেন। মেণ্টাল অ্যাণ্ড মরাল সায়েন্স-এর পরীক্ষক ছিলেন পাদ্রী ডাফ। সিণ্ডিকেটের অনুমোদনে তাঁরা দুজনেই উত্তীর্ণ হলেন। তাঁরাই হলেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্র্যাজুয়েট।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম গ্রাজুয়েটকে আর যোগ্যতা প্রমাণ করবার জন্য আইন পড়তে হোল না। বঙ্কিমচন্দ্র যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট নিযুক্ত হলেন। পরে চাকুরী করবার সময়ে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে আইন পরীক্ষা দিয়েছিলেন। দ্বিতীয়বার অধ্যয়নের সময় বঙ্কিমচন্দ্রের সহপাঠী ছিলেন অক্ষয়চন্দ্র সরকার, যদিও তখনও তাঁরা ঠিক বন্ধু হয়েছেন কিনা বলা যায় না। অক্ষয়চন্দ্র এই সময়ের কথা লিখেছেন—

প্রেসিডেন্সী কলেজের আইনের তৃতীয় শ্রেণীতে বঙ্কিমচন্দ্রকে আমাদিগের

সহাধ্যায়ী পাইয়া আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করিলাম। কিন্তু—এই গৌরব! একটা কিন্তু পড়িল। এখন যেখানে সিটি কলেজ, তাহার পশ্চিমধারের তেতালা বাড়ি হইতে অর্থাৎ আপনার বাসাবাড়ি হইতে আরদালীকে দিয়া ছাতা ধরাইয়া বঙ্কিমচন্দ্র প্রেসিডেন্সী কলেজের আইন-শ্রেণীর গ্যালারীতে আসিয়া উপস্থিত হইতেন। সুন্দর, সুশ্রী গঠন পাতলা পাতলা দেহ, উন্নত নাসিকা, উজ্জ্বল চক্ষু, ঠোঁটের আশে পাশে একটু হাসি আছে। কিন্তু সেই হাসির সঙ্গে আছে প্রবল গরিমা-জ্ঞান। আসেন এক পার্শ্বে বসেন, চুপ করিয়া বসিয়া থাকেন, কাহারও সহিত কথা কহেন না। তৎকালিক সংস্কৃতাধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য মহাশয়, তিনিও ঐ তৃতীয় শ্রেণীতে আইন শিক্ষা করেন। অধ্যাপক বলিয়া সাহেব শিক্ষক উঠিয়া গেলে, তাঁহার অনুরোধে আমাদের রেজেস্টরী লইতেন। কৃষ্ণকমলবাবু প্রথম নামটি ধরিয়াছেন কি, বঙ্কিমবাবু অমনি উঠিলেন—তাঁহার কানের কাছে গিয়া চুপি চুপি বলিলেন "আমাকে উপস্থিত লিখে লইবেন, মহাশয়!" কৃষ্ণকমল বলিলেন, "আচ্ছা"। অমনি বঙ্কিমচন্দ্র গোলদিঘীর ধার দিয়া, ছাতা ধরাইয়া, সটানে সমানে চলিয়া গেলেন। আমাদের কাহার সহিত তখন বঙ্কিমবাবুর আলাপ হয় নাই। সেইটুকুই যা-কিছু কিন্তু। থাকুক 'কিন্তু', তখন বুঝিয়াছিলাম, এখনও বুঝিতেছি বঙ্কিমচন্দ্র আমাদিগকে গৌরবান্বিত করিয়াছেন। (অক্ষয়চন্দ্র সরকার—পিতাপুত্র)

কিন্তু এটা পরবর্তী কালের কথা। হুগলী কলেজে অধ্যয়নকালে আমাদের বিশেষ করে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁর সাহিত্যচর্চা। অধ্যয়ন-কর্মে কৃতিত্ব দুর্লভ নয়; কিন্তু তাঁর প্রতিভার প্রথম উন্মেষই আমাদের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করে। তাঁর এই সময়ের রচনা ঠিক সাহিত্য নয়, বালক-সাহিত্যিকের উদ্যম বলেই এগুলির মূল্য।

তিনি যে সময়ে হুগলী কলেজে প্রবেশ করেন, তার পূর্বে থেকেই সেখানে সাহিত্যের একটি নিবিড় পরিবেশ সৃষ্টি হচ্ছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বিখ্যাত ছাত্র ছিলেন দ্বারকানাথ মিত্র। দ্বারকানাথ পরে হাইকোর্টের জজ হয়েছিলেন। হরচন্দ্র ঘোষ 'ভানুমতী চিত্তবিলাস' লিখে বাংলা নাট্যসাহিত্যের সূচনা করেছিলেন। তা ছাড়া ছিলেন গঙ্গাচরণ সরকার—অক্ষয়চন্দ্র সরকারের পিতা। বঙ্কিমচন্দ্র যে শুধু সাহিত্যের ঐতিহ্যই লাভ করলেন, তা নয়, কলেজের বাহিরেও বৃহত্তর সাহিত্য ক্ষেত্রেও তিনি পদক্ষেপ করলেন। কবিতা রচনা করে তিনি রংপুরের জমিদার রমণীমোহন চৌধুরী এবং কালীচরণ রায়চৌধুরীর নিকট থেকে পুরস্কার পেয়েছিলেন। সংবাদপ্রভাকর পত্রিকাতেই কবিতা আহ্বান করা হয়েছিল। সেই পত্রিকাতেই কবিতাটি প্রকাশিত হয়েছিল।

সে যুগে বাংলা সাহিত্যের চর্চা ছিল খুবই সীমাবদ্ধ। বঙ্কিমচন্দ্র নিজেই এ প্রসঙ্গে লিখেছেন—

"বাঙ্গলা সাহিত্যের তখন বড় দুরবস্থা। তখন প্রভাকর সর্বোৎকৃষ্ট সংবাদপত্র। ঈশ্বর গুপ্ত তরুণবয়স্ক লোকদিগকে উৎসাহ দিতে বিশেষ সমুৎসুক ছিলেন। হিন্দু পেট্রিয়ট যথার্থই বলিয়াছিলেন, 'আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে অনেকে ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য।' কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের প্রদত্ত শিক্ষার ফল কতদূর স্থায়ী বা বাঞ্ছনীয় হইয়াছে তাহা বলা যায় না। দীনবন্ধু প্রভৃতি উৎকৃষ্ট লেখকের ন্যায় এই ক্ষুদ্র লেখকও ঈশ্বর গুপ্তের নিকট ঋণী। সুতরাং ঈশ্বর গুপ্তের কোন অপ্রশংসার কথা লিখিয়া আপনাকে অকৃতজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিতে ইচ্ছুক নহি। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করিতে পারি না যে, এক্ষণকার পরিণাম ধরিতে গেলে ঈশ্বর গুপ্তের রুচি তাদৃশ বিশুদ্ধ বা উন্নত ছিল না, বলিতে হইবে। তাঁহার শিষ্যেরা অনেকেই তাঁহার প্রদত্ত শিক্ষা বিস্মৃত হইয়া অন্য পথে গমন করিয়াছেন। বাবু রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতির রচনামধ্যে ঈশ্বর গুপ্তের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। কেবল দীনবন্ধুতেই কিয়ৎ পরিমাণে তাঁহার শিক্ষার চিহ্ন পাওয়া যায়।" (রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুরের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা)।

তখন যাঁরা ইংরেজি শিক্ষার সংস্পর্শে আসছিল, তাঁরাই বাংলায় কবিতা রচনা করে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেবার চেষ্টা করত। ইংরাজি কবিতার শক্তি ও মর্যাদা সম্পর্কে অবহিত হয়ে বাংলা ভাষাতেই অনুরূপ সৃষ্টি করবার ইচ্ছা জাগত। সেকালের নব্যশিক্ষিতেরা বাংলা ভাষাকে সানুরাগ দৃষ্টিতে দেখিতেন না তা ঠিক, বঙ্কিমচন্দ্র নিজে প্রথম উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম ইংরেজিতে করেছিলেন। কিন্তু তাঁর বাল্য রচনা ইংরাজিতে নয়, বাংলায়। দীন বাংলা ভাষায় তিনি যা থেকে পাঠ্য কিছু রচনা করতে পারবেন—এ ধরনের একটা গর্ব প্রচ্ছন্ন থাকা অস্বাভাবিক বলে মনে হয় না। সংবাদপ্রভাকরে কবিতা পাঠানোয় সে মনোভাব আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য নয়।

সেই সময় দ্বারকানাথ অধিকারী ছিলেন কৃষ্ণনগর কলেজের ছাত্র। দ্বারকানাথ সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখ সর্বদাই হ'ত শ্রদ্ধাপূর্ণ। দ্বারকানাথের অনেক কবিতা সংবাদপ্রভাকরে বেরিয়েছিল। তাঁর কবিতার বিষয়ও ছিল বিচিত্র। সুধীরঞ্জন নামে তাঁর কবিতার একখানি বইও প্রকাশিত হয়েছিল। লেখকের স্বহস্ত-নামাঙ্কিত এই বই কৃষ্ণনগর কলেজ লাইব্রেরীতে আছে। কবিতা লিখে ঈশ্বরচন্দ্রের থেকে প্রশংসা পেয়েছিলেন দীনবন্ধু এবং রঙ্গলাল। দীনবন্ধুর একটি কবিতা—'জামাইষষ্ঠী' এতই পাঠকপ্রিয় হয়েছিল যে, এর জন্যেই সেই সংখ্যার প্রভাকর দুবার ছাপতে হয়েছিল। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, দীনবন্ধুর 'মানবচরিত্র' নামে কবিতাটি তরুণ বঙ্কিমকে এতই মোহিত করেছিল যে, বৃদ্ধ বয়সেও তার থেকে তিনি কিছু কিছু আবৃত্তি করতে পারতেন। সংবাদপ্রভাকরে এই লেখকদের মধ্যে হুগলী কলেজের একদল ছাত্র ছিল বিশেষ উদ্যোগী। এরা প্রায়ই গদ্যে পদ্যে রচনা পাঠাত। কলেজের পরিচালন ব্যাপারেও বেনামীতে এদের লেখা প্রকাশিত হ'ত। হুগলীর অধ্যক্ষ কার সাহেবের একাধিক সমালোচনা ছাপা হয়েছিল।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী বুধবার সংবাদপ্রভাকরে শ্রী ব চ চ-র নামে যে কবিতাটি প্রকাশিত হয়, সেটাই বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম মুদ্রিত কবিতা বলে

অনুমান করা হয়। কবিতার প্রথম চার লাইন এইরকম—

চন্দ্রাস্য সহাস্য করে উষাকালে সতী।
প্রিয়করে করি করে, কহে পতি প্রতি॥
প্রিয়া প্রতি তার, করিছে উত্তর।
চরণে চরণে দেয়, উত্তর সত্বর॥

—কবিতার শেষে প্রভাকর সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন—"উক্ত ছাত্রের বয়স অত্যল্প কিন্তু এই পদ্য অতি প্রবীণ কবির রচনার ন্যায় উত্তমরূপে রচিত, এজন্য সকলেই তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান করিবেন।"

এর পর থেকে বঙ্কিমচন্দ্র মাঝে মাঝেই পদ্যচর্চা করতেন কখনও ব চ চ কখনও অষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায় নামে। ১৮৫২-র ২৬শে মার্চ যে কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, তার প্রথম দুই লাইনঃ

তুমুল সংগ্রাম করি দুরন্ত হেমন্ত।
অশান্ত বসন্ত করে হইলেন অন্ত॥

—কবিতার শেষে সম্পাদক মন্তব্য করেছিলেন "উক্ত পদ্যের কোন কোন চরণ সংশোধন করত প্রকটন করিলাম। প্রথম রচনার সূচনাতেই বোধ হইতেছে এই ছাত্র সুপাত্র বটেন, কারণ যাহা লিখিয়াছিলেন তাহাতে ছন্দাদির দোষ হয় নাই, সুতরাং চালনার পথে চরণ চালনাপূর্বক যত চরণ করিবেন ততই শক্তিদেবীর প্রসন্নতা লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু আপাততঃ যে নমুনা দেখাইলেন ইহার পর নমুনা সহ চালাইলেও বড় হানি হইবে না ফলে নমুনার অপেক্ষা সেরা যেন না হয় কেননা এ রসের অধিক বাড়াবাড়ি করিয়া ছড়াছড়ি করিলে চড়াচাড়িরাও লজ্জা পাইতে পারে।
—প্রং সম্পাদক।

উক্ত কবিতার নীচে নাম ছিল "শ্রীঅষ্টমাবতার চট্টোপাধ্যায়। হুগলি কলেজের ছাত্র।" এ'কে বঙ্কিমচন্দ্র বলেই মনে হয় যদিও বঙ্কিমরচনাবলীর সম্পাদক এই কবিতাটিকে স্থান দেননি।

আদিরসাত্মক রচনা বেশি না লেখাই ভালো, এই উপদেশ দেওয়ার পরে পরবর্তী সংখ্যাতেই ঈশ্বর গুপ্ত আবার সতর্কতা উচ্চারণ করেন। হুগলী কলেজের ছাত্রদের সাহিত্যচর্চার আতিশয্য দেখে ঈশ্বর গুপ্ত লেখেন—

"হুগলি কলেজের অনেক ছাত্র এইক্ষণে পদ্য রচনায় অনুরাগি হইয়াছেন ইহা অত্যন্ত সুখের বিষয় বটে কিন্তু এই সুখের ব্যাপারে গুরুতর এক দুঃখের ঘটনা হইয়াছে। কারণ তন্মধ্যে অধিকাংশ ছাত্র কেবল নামের নিমিত্তই ব্যাকুল হইয়াছেন...সে দিন দিনই নয় যেদিন আমরা ডাকযোগে উক্ত কলেজের বালকবৃন্দের প্রেরিত তিন চারি খানা পত্র প্রাপ্ত না হইয়া থাকি তাহার মধ্যে যে যে পত্রে কোন সমাচার থাকে সেই সেই পত্র করস্থ হওন মাত্রেই পত্রস্থ করণে ক্ষণকাল বিলম্ব করি না এবং জ্ঞানবর্ধক, চিত্ত-তোষক, দেশহিতজনক প্রবন্ধপুঞ্জ যাহা পদ্যে রচিত থাকে তৎপ্রকাশেও অত্যন্ত আহ্লাদিত হই...কিন্তু যে সকল পত্রে কেবল কবিতা থাকে নানা হেতুতে তাহার অধিকাংশই প্রায় অপ্রকটিত রাখিতে হয়, অনেকেই কেবল আদ্যরস বর্ণনা করেন, সে রস অতি সুমধুর রস হইয়াও কালক্রমে বিরস হইতেছে কেননা অধিক পাঠক

তাহা পাঠ করিতে লজ্জা বোধ করেন... কাহারো লেখায় ছন্দের দোষ, কাহারো মিলের দোষ, কাহারো ভাবার্থের দোষ, গদ্য লেখা শোধন করা অতি সহজ, পদ্যের শোধন সেরূপ নহে অত্যন্ত কঠিন...। হুগলি কলেজের ব চ চ ছাত্র পাত্র ভাল বটেন, তাঁহার কবিতা অনেকের অপেক্ষাই উত্তম হয়, কিন্তু খেদের বিষয় এই যে অদ্যাবধি আদ্যরস ভিন্ন অন্য কোন রসের পদ্য প্রেরণ করেন নাই...।" (সংবাদ প্রভাকর, ২৭শে মার্চ, ১৮৫২)।

বঙ্কিমচন্দ্র সমাচারদর্পণেও কবিতা পাঠিয়েছিলেন। সমাচারদর্পণ বাংলা-ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এই পত্র প্রকাশের গৌরব অর্জন করেছেন। কিন্তু সমাচারদর্পণের প্রতিদ্বন্দ্বীর অভাব ছিল না। পাদ্রীদের মতামত এদেশীয়দের সর্বদা রুচিকর হ'ত না। তাছাড়া ইংরেজিগন্ধী বাংলা বলেও এই পত্রিকা উপহসিত ছিল। ঈশ্বর গুপ্ত বহুবার একে আক্রমণ করেছিলেন।

একবার বঙ্কিমচন্দ্র কোনো কারণে প্রভাকরের প্রতি অপ্রসন্ন হয়ে সমাচার-দর্পণকে আশ্রয় করেন। যতদূর মনে হয় বঙ্কিমচন্দ্রের কোনো লেখা সম্পাদক মশায় প্রকাশ করেননি বলেই বঙ্কিমচন্দ্র রুষ্ট হয়েছিলেন। রূঢ় ভাষা প্রয়োগ করে তিনি একটি পত্রাঘাত করেছিলেন। এর পর তিনি কবিতা পাঠালেন সমাচার-দর্পণে। বালক বঙ্কিমের দুর্ভাগ্য, সমাচারদর্পণও আবার মুদ্রণের সময় কবতাটির কিছু অঙ্গহানি ফলে রসহানি করে বসে। বঙ্কিমচন্দ্র সমাচারদর্পণের ওপর অধিকতর ক্রুদ্ধ হয়ে আবার সংবাদ প্রভাকরেই এই বিষয়ে এক চিঠি লেখেন। সমাচারদর্পণের সমালোচনা প্রভাকর-সম্পাদক হৃষ্টচিত্তেই সবিস্তারে প্রকাশ করলেন। বঙ্কিমের ত্রুটিও মার্জনা করলেন। পরে বঙ্কিমের কবিতাও প্রকাশ করতে লাগলেন। সমাচারদর্পণের সমালোচনা করে বঙ্কিমের চিঠিটা সংবাদ-প্রভাকর থেকে (১০ই মার্চ, ১৮৫২) উদ্ধৃত করে দিলাম—

শ্রীযুত প্রভাকর সম্পাদক
মহাশয় সমীপেষু।

যথাবিহিত সম্মানপুরঃসর নিবেদন-মেতৎ অত্র অকিঞ্চন মূঢ়তা প্রযুক্ত তল্লিখিত পত্রে প্রেরিত পত্রাদি অপ্রকাশ বিষয়ে কিঞ্চিৎ রূঢ় ভাষা প্রয়োগ হইয়াছিল, এইক্ষণে কৃতাপরাধী দয়াবীর সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। পত্র প্রকাশেই সন্তুষ্ট থাকিবেক।

সংপ্রতি সমাচারদর্পণ সম্পাদক মহাশয় আমার বিশেষ হানি করিয়াছেন। মহাশয়ের আশ্রয়ে তদ্বিপক্ষে লেখনী ধারণ করিতেছি, অনুকম্পা সম্পাদনে আশ্রয় প্রদান করিবেন, অর্থাৎ নিম্নলিখিত বিষয় প্রভাকরে প্রকটনে পরম বাধিত করিবেন।

দর্পণ।

"দর্পণ পারা-হারা হইলে" কোন বস্তুর প্রতিবিম্ব সুন্দররূপে দৃষ্ট হয় না।

"শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়" (পাদ-টীকায় 'My own name' —লেখক) অস্মন্নাম ইত্যঙ্কিত মৎকরণক অনুবাদিত বিষয় ৪৪ সংখ্যক দর্পণে প্রকটিত হইয়াছিল। সম্পাদক সাহেবের সংশোধনের গুণেই হউক বা মুদ্রাঙ্কণের দোষেই হউক, সেই অনুবাদের উল্টা শ্রী হইয়াছে, তাহা পাঠমাত্র দন্তে কপাট লাগিবেক, আর অন্য পাঠ থাকিবেক না।

দর্পণের ৩৫২ পৃষ্ঠায় চতুর্থ স্তম্ভে তাহার প্রথম চরণ নিম্নপ্রকার প্রকাশ হইয়াছে।

বিষয়ে রিক্ত হয়া স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে।

সম্পাদক মহাশয় আপনি ও পাঠকগণ সুপণ্ডিত বটেন, ইহার অর্থ কি বলিতে পারি না, আপনারা কহিবেন যে ইহা প্রকৃত nonsense আরো ত্রয়োদশ অক্ষরে পয়ার কখন শুনিয়াছেন? আমি প্রথম চরণে লিখিয়াছিলাম,

বিষয়ে বিরক্ত হয়ে স্নিগ্ধ কুঞ্জবনে॥

কিসে কি হইয়াছে দেব গঠিতে বানর হইয়াছে। অপিচ নবম পংক্তিতে।

অভিমানেতে জন্মে, যে প্রশংসা বায়।

ত্রয়োদশাক্ষরে পয়ার। আরো honour অর্থ কি অভিমান এবং অভিমানে কি প্রশংসা জন্মায়? আমি লিখিয়াছিলাম,

তুচ্ছ মান হতে জন্মে যে প্রশংসা বায়।

ভাল। ভাল।

অন্যান্য দোষের তালিকা ৪ পংক্তিতে "মহাপ্রেম" পরিবর্তে "নিত্যপ্রেম" হইবেক।

১০ পংক্তিতে "মলয়াতে" "মলয়াজ" হইবেক।

১১ পংক্তিতে "পুষ্প" পরিবর্তে "পুষ্পে" হইবেক।

অতএব দর্পণ সম্পাদককে অনুরোধ করি যে, আগত সংখ্যায় ভ্রম সংশোধন করিবেন, এবং ভবি...... এই প্রকার না হয় এমত............বেন ইত।

পুনশ্চ.........

দশ.........

—বঙ্কিমচন্দ্রের পত্রটি সবটা উদ্ধার করতে পারিনি কারণ সংবাদ প্রভাকরের লেখা অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কৌতূহলী পাঠক এই সম্পর্কে শনিবারের চিঠি, ১৩৩৮, পৃ ২৮৯—৯১ দেখতে পারেন।

ছাত্রাবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্রের আরো কবিতা সংবাদ প্রভাকরে বেরিয়েছিল। এই কবিতা প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের মন্তব্যগুলি বিশেষ লক্ষ্যণীয়। ঈশ্বর গুপ্তের উপদেশ বঙ্কিমচন্দ্র খুবই মান্য করতেন। ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যসংগ্রহ প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেছেন অকৃত্রিমভাবেই।

ছাত্রদের সাহিত্য চর্চার উৎসাহকে ঈশ্বর গুপ্ত স্নেহভরে পোষণ করতেন। তার আর একটি দৃষ্টান্ত, কবির লড়াই। কৃষ্ণনগরে দ্বারকানাথ, কলকাতায় দীনবন্ধু আর হুগলীতে বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে মাঝে মাঝে কবির লড়াই চলত। অবশ্য সে-লড়াই দর্শকবেষ্টিত হয়ে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে উপস্থিত কাব্যরচনা নয়। সংবাদ প্রভাকরে এই কবিতা-যুদ্ধ হ'ত। দ্বারকানাথ বঙ্কিমকে বলতেন চাট্টা কবি, দীনবন্ধুকে বলতেন শহুরে কবি। দীনবন্ধু আবার পাল্টা দ্বারকানাথকে বলতেন বুনোকবি। শচীশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রত্যক্ষভাবে এই যুদ্ধে নামতেন না।

একবার তিনজনেই এক সঙ্গে কবিতা লিখে পাঠালেন সংবাদ প্রভাকরে। সম্পাদক ঘোষণা করলেন, যাঁর লেখা শ্রেষ্ঠ বিবেচিত হবে, তিনি পুরস্কার পাবেন। পুরস্কার সেবার পেয়েছিলেন দ্বারকানাথ!

গুরুর আশ্রয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের ছাত্র-জীবনে সাহিত্যচর্চা হয়েছিল অবাধ। শোনা যায়, ঈশ্বর গুপ্তই নাকি তাঁকে গদ্য লিখতে উপদেশ দিয়েছিলেন। তাঁর প্রথম গদ্য রচনায় অবশ্য বৈশিষ্ট্য কিছুই ছিল না; ঈশ্বর গুপ্তের প্রভাবেই তা প্রভাবান্বিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যতেই আপন ভাষা খুঁজে পেলেন। সে-ঘটনা ছাত্রজীবনের পরের।

কবি করুণানিধান

হরপ্রসাদ মিত্র

রবীন্দ্র-শিষ্যদের মধ্যে প্রবীণতম কবি করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর জন্মস্থান শান্তিপুর ও পিতার কর্মস্থান পঞ্চকোটের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রেরণায় প্রথম কাব্য-রচনা শুরু করেছিলেন। তাঁর পিতা নৃসিংহ-চন্দ্র ছিলেন শিক্ষক। স্বর্ণকুমারী দেবী সম্পাদিত 'ভারতী' ও জ্ঞানদা-নন্দিনী দেবী সম্পাদিত 'বালক' পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন নৃসিংহচন্দ্র। পিতার সাহিত্যপ্রীতি, বিবেকানন্দের জ্ঞান ও কর্মের আদর্শ, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কীর্তির অমেয় আবেদন এবং প্রকৃতির রূপ-লাবণ্যের অনিবার্য প্রভাব—এই চতুর্যোগের ফলে করুণানিধানের কবিত্বের সম্ভাবনা দেখা গিয়েছিল ১৮৯৬ থেকে ১৯০২ সালের মধ্যে। বেনোয়ারীলাল গোস্বামী, অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, দেবেন্দ্র-নাথ সেন, অক্ষয়কুমার বড়াল প্রভৃতি সাহিত্য-সেবকের আনুকূল্যে প্রথম জীবনের আর্থিক দুঃখকষ্টের মধ্যেও তিনি সাহিত্যচর্চা অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন।

'বঙ্গমঙ্গল' (১৩০৮), 'প্রসাদী' (১৩১১), 'ঝরা ফুল' (১৩১৮), 'শান্তি-জল' (১৩২০), 'ধান-দূর্বা' (১৩২৮), 'শতনরী' (১৩৩৭—হেমচন্দ্র বাগচী সম্পাদিত; ১৩৫৫—কালিদাস রায় সম্পাদিত) ইত্যাদি কাব্যগ্রন্থের কবি করুণানিধানের গুণগ্রাহী বন্ধু কালিদাস রায় মহাশয় 'শতনরী'র ভূমিকায় লিখে-ছিলেন:—

"জাগ্রৎ সক্রিয় সতর্ক দৃষ্টিতে আমরা যে মাধুরী লাভ করি—তাহাতে ক্লান্তি আসিলেই আমাদের অবসন্ন মন কিছুক্ষণ স্বপ্নমাধুরী উপভোগ করিয়া অলস আনন্দ পাইতে চায়। এই স্বপ্নমাধুরী আমরা কাব্যেও পাইতে পারি,—এই মাধুরী প্রধানত 'রূপে' ফুটিয়াছে করুণা-নিধানের রচনায় আর 'ধ্বনিতে' ফুটিয়াছে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতায়।"

করুণানিধানের আর একজন অনুরাগী কবি মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'ভাষা ও ছন্দের অমোঘ সৌষ্ঠবে'র কথা উল্লেখ করেছেন—'শব্দ ও ছন্দগত রূপোল্লাসে'র দৃষ্টান্ত দিয়েছেন।

সম্প্রতি করুণানিধানের লোকান্তর-প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কবিতার আরো আলোচনা শুরু হয়েছে। আশা করা

যায়, এই বিষাদব্যাহত স্মৃতিপূজার লগ্নে নানা আলাপ-আলোচনার আয়োজনে করুণানিধানের কবিতাবলীর মূল বিশেষত্ব সম্পর্কে আলোকপাত ঘটবে।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে তাঁর রীতিগত নৈকট্যের কথাটি ভিত্তিহীন নয়। আবার, মোহিতলাল তাঁর সম্বন্ধে ঐ যে বলেছিলেন, "জন্ম হ'তে সঁপিল যে নিখিলের রূপ-নারায়ণে",—সে উক্তিটিও পূর্বোল্লিখিত মন্তব্যের পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়,—'সঁপিল' ক্রিয়াপদটি সার্থক,—করুণানিধানের প্রসঙ্গে নিঃসন্দেহে আংশিকভাবে সার্থক।

কিন্তু নিজেকে জগতের রূপলাবণ্যে সমর্পণ করাটাই কবির মোক্ষ নয়। শুধু রূপ থেকে অরূপের অপরূপ স্তব্ধতায় ডুবে গেলে চলবে না। জগৎকে ছুঁয়ে থাকা চাই। পাঠকের দেশ-কাল, পাঠকের রুচি-আদর্শ, কানের আগ্রহ, মনের স্বভাব, যুগের বিশেষত্ব, জীবনের খসড়া ইত্যাদি ব্যাপার তাঁর ধারণার মধ্যে অবশ্যই থাকা চাই। অর্থাৎ রূপ দেখে, রূপে আত্ম-সমর্পণ করে তাঁকে পুনরায় বেরিয়ে আসতে হবে পাঠকের পরিচিত শব্দ-অর্থ-ছন্দ-অলঙ্কার-এর জগতে। ফিরিয়ে দিতে হবে উপলব্ধির বিস্ময় ও বেদনা। এবং এই ফিরিয়ে দেবার সামর্থ্য থেকেই দেখা যাবে তাঁর প্রকৃত ক্ষমতার নিদর্শন,—বলা বাহুল্য, কবি-ক্ষমতার নিদর্শন।

'জ্যোসনা', 'অফুট', 'অনুরাগের হাসনু হেনা', 'আঁখিহীন', 'টুটে', 'উদ্ধারিলে' ইত্যাদি সাবেক কালের পদ্য-ঘেঁষা শব্দ তাঁর লেখায় ছড়িয়ে আছে প্রচুর পরিমাণে। বঙ্কিম, রামেন্দ্রসুন্দর, আশুতোষ, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি মনীষীর নামে কবিতার সংখ্যাও কম নয় এবং এইসব কবিতায় মৌলিকতাহীন শব্দ-মালার ছন্দ-বিন্যাস ছাড়া অনেকক্ষেত্রে আর বাড়তি কিছুই নেই। যেমন, নিচের দৃষ্টান্তটিতে:—

পাসরি প্রাণের হাসি আছে যারা
মরমে মরিয়া,
জীবনের উপবন গেছে খর
কণ্টকে ভরিয়া,
জ্বালায়ে পঞ্জরতলে হিংসার
প্রলয়-হুতাশন—
ধূসর শ্মশান-মাঝে ঘোরে সদা
প্রেতের মতন
ডেকেছ তাদের তুমি, তারা যে
তোমার সহোদর,
হরষের সোম-রসে জুড়ায়েছ
বিশুষ্ক অধর।

কবি দ্বিজেন্দ্রলাল রায় সম্পর্কে এই পদ্যাংশটি মসৃণ বটে, কিন্তু তেমন কোন শিল্প-সমৃদ্ধি বা উপলব্ধির সম্পদ এতে ধরা দেয়নি। এই কবিতাতেই 'মায়া-কন্দুক', 'প্রেম-চন্দ্রকান্ত-প্রভা', 'পূর্ণ দধি-সমুদ্রের ঊর্মিশঙ্খ' ইত্যাদি ব্যাপার আছে। শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্বাচিত হবার পরে করুণানিধান লিখেছিলেন :—

বঙ্গবাণীর মণি-মন্দির স্বপ্নদ্রষ্টা যিনি
অজিত যাঁহার কীর্তিকলাপ তাঁরি
পদরেখা চিনি'
তাঁহারি মতন হও মহাজন, পুরাও
দেশের সাধ
প্রসন্ন তব ভাগ্য-দেবতা, পেয়েছ
আশীর্বাদ।

স্পষ্টই দেখা যায়, এরকম রচনা উঁচুদরের কবিতার নমুনা নয়। এসব কথা যে কোন পদ্য-লেখকের পক্ষেই লেখা দুঃসাধ্য নয়। আর, করুণানিধানের এই শ্রেণীর টুকরো টুকরো রচনার কথা আলোচনা করে লাভ নেই; কারণ, অল্প মূল্যে কবিতা পূর্ণ আয়তনেও যেমন অসার্থক, টুকরো নমুনাতেও তেমনি অধিক ক্ষেত্রেই অপাঠ্য। কবিদের মধ্যেও অব্যবস্থিত-চিত্ত কবি আছেন। করুণানিধানের রচনায় অব্যবস্থিত কবিচিত্তের প্রকাশ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। তাঁর বর্ণনমূলক কবিতায় প্রসঙ্গের গতি আছে,—কাহিনী-মূলক রচনায় গল্পের বেগ না থাক, তরঙ্গ আছে,—'চণ্ডীদাস', 'কুণাল-কাঞ্চন' 'বাদশাজাদী' প্রভৃতি লেখা কিছুকাল আগেও বাঙলার কবিতানুরাগী পাঠকের অল্পবিস্তর সমর্থন পেয়েছে। কিন্তু করুণানিধানের বিশেষ প্রবণতার লক্ষণ আছে অন্যত্র। মাঝে মাঝে কবিতার কলাকৌশলের কারিকুরির দিকে তাঁর ঝোঁক দেখা যায়। 'কুণাল-কাঞ্চন'-এ এক টুকরো গান জুড়ে দেওয়া হয়েছে,—'শ্রীক্ষেত্রে'-নামের লেখাটিতে প্রথম দুই স্তবকের সঙ্গে পরবর্তী স্তবকগুলির ছন্দ-প্রবাহের এবং শব্দ-পুরুত্বের মসৃণ যোগ আছে বটে, কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ দত্তও বোধ হয় এরকম শব্দ-সমারোহ এমন পরিপূর্ণ অভিধানসর্বস্বতার ঝোঁকে পাঠকের দিকে নিক্ষেপ করতে কুণ্ঠিত হতেন। 'শ্রীক্ষেত্রের' শুরুতেই শোনা গেল :—

ভো মহার্ণব, নীল ভৈরব
গর্জদ্-জলভঙ্গে,
দূর অম্বুদ-মন্দ্র সমান
তুলিতেছ কার বন্দনা-গান?
নক্তন্দিব উদ্বোধনের
দুন্দুভি বাজে রঙ্গে।

এই কবিতাতেই রবীন্দ্রনাথের ভক্ত কবি মধুসূদন দত্তের ভাষায় বলেছেন :—
ইন্দিরা আজি উঠিবেন বুঝি
কক্ষে অমৃতপাত্র!

'তরলোজ্জ্বল ফেনিলোচ্ছল পন্নগ-ফণ-নৃত্য', 'জগন্নিধান পুরুষোত্তম' ইত্যাদি গুরু বচনে শ্রীক্ষেত্র হয়ে উঠেছে কাব্যামোদীর পক্ষে নিষিদ্ধ প্রদেশ। 'চিত্রকূটে'তেও ছন্দের রূপগত কারিকুরি আছে। 'বসন্ত-অভিসার'-এ আছে হলন্ত ধ্বনির উৎসব-সমারোহ। অন্তরাবেগের প্রকৃতির সঙ্গে সর্বত্র শব্দের সঙ্গতি রক্ষার শিল্পবোধ তাঁর ছিল না, একথা বড়ো রূঢ় শোনায় বটে, কিন্তু কথাটা অমূলক নয়। 'শান্তিপুর' কবিতাটি এই কারণেই রসের বহুবিঘ্ন-কণ্টকিত শ্রুতিতর্পণের দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

তোর নীলাকাশ, তোরই বাতাস,
তোর ফলে মা তোর জলে
পড়ছে গলে আনন্দেরই ননী,
তোর মরকত-রতন-বিথার-বিচিত্র
ওই শাদ্বলে

গিইছি থুয়ে আমার চোখের মণি।

ফলে-জলে আনন্দের ননী গলে পড়ছে,—এ ছবি অদ্ভুত ছবি। কিন্তু সে কথা যাক। করুণানিধানের ভাষা ও ছন্দের 'অমোঘ সৌষ্ঠব' যে তাঁর কবিতাবলীর সর্বত্র চোখে পড়ে না, একথা নানা দৃষ্টান্ত থেকেই বোঝা যায়। এ বিষয়ে উদাহরণ বাড়িয়ে যাওয়া দুঃসাধ্য নয়। মোহিতলাল তাঁর 'দ্বিপ্রহরে', 'বাসনা', 'হিমাদ্রি', 'রেবা' প্রভৃতি কবিতা থেকে পূর্বোক্ত 'সৌষ্ঠবে'র নিদর্শন দেখিয়েছেন। বস্তুত সেই সব দৃষ্টান্তে করুণানিধানের শব্দ ও ছন্দগত রূপোল্লাসের সমর্থন আছে। মোহিতলাল তাঁর শব্দ প্রয়োগের আলোচনাসূত্রে শব্দের বর্ণ-গন্ধ-সুর, এই তিন উপাদানের কথা তুলে মন্তব্য করেছেন যে, "তাঁহার কাব্যে

রাধা ও কৃষ্ণ সহ সখীরা

মহারাসলীলা উৎসবের প্রবর্তন করেন। এই ঘটনাটি ঘটেছিল ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে। শ্রীমদ্‌ভাগবত গ্রন্থের দশম স্কন্ধের ২৯শ অধ্যায় থেকে ৩৩শ অধ্যায় পর্যন্ত বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিকাদের লীলা অনুসরণ করে উৎসবে নৃত্যাভিনয় হয়। শোনা যায়, অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা একাদশী থেকে বিগ্রহের পূজা উপলক্ষে পাঁচ রাত ধরে রাস নৃত্যের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস, জয়দেব প্রভৃতি মহাজনগণের পদাবলী সাজিয়েই এই রাসের গান গাওয়া হয়। কথিত আছে যে, মহারাজের মাতৃদেবী "মাই-চলা কুমুদিনী" পুত্রের নির্দেশমত ওস্তাদের সাহায্যে প্রথম "ভঙ্গীবারেং" নাচটি তৈরি করেন এবং রাজবাড়ির মেয়েদের শিখিয়ে দেন।

মণিপুরের জনসাধারণের বিশ্বাস যে, মহারাসের নাচ গান বাজনা সাজ পোশাক যে নিয়মে তাদের মধ্যে আজও প্রচলিত, তা ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের নির্দেশেই নিখুঁতভাবে করা হয়েছিল। কথিত আছে যে, মহারাজকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ স্বপ্নে ঐ নির্দেশ দিয়েছিলেন, মহারাজ হুবহু সেই নির্দেশ পালন

পদ্ধতির এতটুকুও অদল-বদল করা নিষিদ্ধ। যে তা করবে তার অমঙ্গল হবে বলে মণিপুরীদের বিশ্বাস। ঐ উৎসবের নাচে যদি কোন মেয়ের এতটুকুও ত্রুটি ঘটে, তবে শ্রীকৃষ্ণের অভিসম্পাতে তাকে নাকি চিরজীবন পুত্রহীনা হয়ে থাকতে হয়। শোনা যায়, মহারাজ 'ভাগ্যচন্দ্র' মহারাসের নাচগুলি কি রকম তাল, ছন্দ ও ভঙ্গীতে হবে তা-ও পাকাপোক্ত নিয়মে বেঁধে দিয়ে গিয়েছিলেন। এই সব নাচগুলির নানা প্রকার নামকরণও তিনি করে গিয়েছিলেন। যেমন 'চালি', 'ভাংগীপারেং', 'খুবুমপারেং', 'বৃন্দাবনীপারেং', 'গোষ্ঠ-বিন্দাবলীপারেং' ইত্যাদি।

নিয়মের এতটা কড়াকড়ি ছিল বলেই আগেকার দিনে মহারাসের প্রায় ১ মাস আগে থেকে প্রতিদিন বিকেলে মহড়া বসত, ত্রুটিহীন করার একান্ত আকাঙ্ক্ষায়। আজকাল সর্বত্র এতটা সতর্কতার পরিচয় পাওয়া যায় না। ভুল-ত্রুটি উৎসব দিনের অভিনয়ে যে হয়েছে তাও দেখেছি।

রাসপূর্ণিমার রাত্রি ছাড়া কখনো কখনো অন্য সময়ে মহারাসের অভিনয়

নৃত্যাভিনয় মানত করে। অর্থাৎ শুভ বা মঙ্গল হলে এই নৃত্যাভিনয়ের যাবতীয় খরচ গ্রামবাসীদের হাতে তুলে দেয়। তারা এক রাত্রি অভিনয়ের ব্যবস্থা করে।

ভাগ্যচন্দ্র প্রবর্তিত এই নৃত্যাভিনয় প্রথা ঠিকমত যাঁরা বহন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে "মৈস্তার সিং", তাঁর পুত্র "খোক চোং অংগহাল", "হুইদ্রমঝুল মচা", "হুইদ্রমরুদ্রসিং" ও "খুমুলম্বা" ছিলেন বিখ্যাত। গত যুগের সেই ধারা বর্তমানে যাঁরা ঠিকমত বহন করে চলেন তাঁদের মধ্যে "অমুবাসিং" ও "আতম্বা-সিং" প্রসিদ্ধ। এঁরা উভয়েই আজ বৃদ্ধ। ৭০ বৎসরের উপর এঁদের বয়স তবুও এঁরা এখনও ছাত্রছাত্রীদের নৃত্য শিক্ষাদানে পটু। "অমুবাসিং" কয়েক বৎসর উদয়শঙ্করের দলে গুরুরূপে কাজ করেছিলেন। "আতম্বাসিং" রবীন্দ্রনাথের জীবিতকালে বছর খানেক শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেন। বর্তমানে উভয়েই ভারত সরকার প্রতিষ্ঠিত ইম্ফলের নৃত্য বিদ্যালয়ের প্রধান গুরুরূপে নিযুক্ত।

এই নৃত্যাভিনয়ের স্থান হচ্ছে মণিপুরী গ্রামের নাটমন্দিরটি। প্রা[য়] প্রত্যেক গ্রামেই একটি গোবিন্দের মন্দির ও সঙ্গে একটি আটচালা বিরাট মণ্ডপ থাকা চাই। সাধারণত গ্রামবাসীরা মুষ্টিভিক্ষার দ্বারাই এই মন্দির ও নাটমন্দির গড়ে তোলে। গ্রামের অবস্থানুসারে নাটমন্দির আকারে বড় বা ছোট হয় সর্বত্রই দেখা যায় বড় বড় কাঠের থামের উপরে টিনের চালার দ্বারা এই নাটমন্দির তৈরি। চালার ঠিক মাঝখানে গোলাকার স্থানেই অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। উঁচু আটটি কাঠের বা বাঁশের খুঁটি সেই গোলাকার স্থানটিতে সমান দূরত্বে পোঁতা হয়। খুঁটির উপরের মাথাগুলি একটির সঙ্গে অপরটি কাঠের বা বাঁশের ডাণ্ডা দিয়ে যুক্ত। অবস্থাপন্ন গ্রামবাসীরা নানা রকম রঙ্গীন নক্সাকাটা কাপড় বা কাগজ দিয়ে এই খুঁটিগুলিকে বিচিত্র আকারে সাজায়। বেত গাছের

প্রধানত কোথাও প্রকৃতির রূপরাশি—শব্দচিত্রে, কোথাও বা সেই রূপ-সম্ভোগের আনন্দ—ছন্দলীলায়, উৎসারিত হইয়াছে।" বলা বাহুল্য, মোহিতলাল এই মন্তব্যটিও নানা উদাহরণ দিয়ে সমর্থন করেছেন। কবিতার সমালোচনা সমালোচকের ভালো লাগার আন্তরিকতা থেকেই সম্ভব হয়। অর্থাৎ যে কবিতা পাঠকের অন্তরে আবেদন জাগায়, সেই কবিতা সম্পর্কেই ভাষা-ভাব-রীতি-ফল ইত্যাদি বিশ্লেষণের মেহনত পোষায়। করুণানিধানের কবিতাও আবেদনবাহী সন্দেহ নেই। কিন্তু সর্বত্র নয়। মোহিতলাল 'স্বপ্নলোকে' কবিতাটির বিশেষ প্রশংসা করেছেন। কোনো কোনো সমালোচক তাঁকে স্বপ্নরসের কবি আখ্যা দিয়ে তারিফ করেছেন। কিন্তু পক্ষপাত-হীন রসিকের মনে 'স্বপ্নলোকে' সত্যিই তেমন কোনো আবেদন জাগায় না। ফুল-অপ্সরী-জ্যোৎস্না-গিরিদরী-স্বপ্ন ইত্যাদির সমাবেশ ঘটলেই অনুভূতির একক বিশেষত্ব প্রমাণিত হয় না। 'স্বপ্নরস'—কথাটাই শ্রুতিমোহন! কবিতা সত্যিই সার্থক হয় তখন, যখন তা কান-মন দুয়েরই স্বীকৃতি লাভ করে। এদিক থেকে বরং 'মোহিনী' কবিতাটি 'স্বপ্নলোকে'-র চেয়ে সার্থকতর। রবীন্দ্রনাথের 'নিদ্রিতা', 'সুপ্তোত্থিতা' ('সোনার তরী') প্রভৃতি লেখার সঙ্গে করুণানিধানের তথাকথিত এই 'স্বপ্নরস' যদিচ কার্যকারণ সূত্রে বা প্রভাব-প্রভাবিত সম্পর্কে স্পষ্টই জড়িত, তবু রবীন্দ্রশিষ্য নামে প্রসিদ্ধ, রবীন্দ্র-কালীন কবির পক্ষে এ রকম অনুকরণ অমার্জনীয় নয় এবং 'মোহিনী' কবিতাটি মোটামুটি মন্দ হয়নি। কিন্তু অনুভূতির মৌলিকতা নেই এ সব লেখায়। বরং করুণানিধানের এ এক রকম মর্জি বলা চলে:—সত্যেন্দ্রনাথের শব্দ সম্মোহন, রবীন্দ্রনাথের অমোঘ আকর্ষণ—এই দুই প্রবল সত্যের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুসাধ্য অনুশীলনেই তিনি মন দিয়েছিলেন। শুধু তিনিই নন, নজরুল ইসলামের অভ্যুদয়ের আগে কেবল যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ছাড়া অন্যান্য সমপন্থীরা তো অল্প-বিস্তর সেই একই লক্ষ্যে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। কুমুদরঞ্জন মল্লিক ছিলেন এঁদের মধ্যে একমাত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি। অজয়ের স্রোত আর উজানীর চর তাঁকে দুর্গের মতো আশ্রয় দিয়েছে এবং তিনি প্রসন্ন সমর্পণে সেই অবরোধ স্বীকার করে নিয়েছেন। প্রমথ চৌধুরী সমকালীন হলেও প্রবীণতর ব্যক্তি এবং তিনিও ছিলেন বিশেষ স্বাতন্ত্র্যবান। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের ভক্ত এই কৃষ্ণ নাগরিক কবি বলেছিলেন:—

> কবিতার যত সব লাল নীল ফুল
> মনের আকাশে আমি সযত্নে ফোটাই।
> তাদের সবারি বন্ধ পৃথিবীতে মূল
> মনোঘুড়ি বন্দ হলে ছাড়িনে লাটাই!

তথাকথিত 'স্বপ্নরসের' বিরুদ্ধে তিরস্কার আছে বীরবলের এই উক্তিতে। তৎসত্ত্বেও স্বপ্ন-ঘেঁষা কবির কলম রোখা যায়নি।

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত 'ফুলের ফসলে' লিখেছিলেন:—

> এক যে আছে কুজ্ঝটিকার দেওয়াল-ঘেরা কেল্লা
> মৌনমুখী সেথায় নাকি থাকে!
> মন্ত্র পড়ে বাড়ায় কমায় জোনাক-পোকার জেল্লা
> মন্ত্র পড়ে চাঁদকে সে রোজ ডাকে!
> তুঁত-পোকাতে তাঁত বুনে তার জানলাতে দেয় পর্দা,
> হুতোম প্যাঁচা প্রহর হাঁকে দ্বারে;
> ঝর্ণাগুলি পূর্ণ চাঁদের আলোয় হয়ে জর্দা
> জলতরঙ্গ বাজনা শোনায় তারে!

কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর তিরস্কারের পরিসীমার বাইরে বেঁচে আছে সত্যেন্দ্র-নাথের এই কবিতা। এতে স্বপ্ন আছে, মনোঘুড়ি বন্দ হয়েছে বটে, কিন্তু কবি লাটাই ছাড়েননি। কবি-কল্পনার রাশ বাগিয়ে ধরেছে কবির ভেতরের প্রজ্ঞা-দৃষ্টি। শব্দ ও ছন্দের কুহক কবির

অনুভূতিকে সমীহ করে সার্থক হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথের কীর্তিমালার প্রাচুর্যে এবং রমণীয়তায় সম্মোহিত হয়ে সেকালের কবিরা কখনো এগিয়েছেন রবীন্দ্র ভাবনার বিভ্রান্ত অনুকরণে, কখনো আবার সত্যেন্দ্রনাথের শব্দ-ছন্দ-কলাকৌশলের টানেই তাঁরা বেশি আবিষ্ট বোধ করেছেন। মাঝে মাঝে পুরোনো কালের বৈষ্ণব কবিতা তাঁদের কা'রও কা'রও কলমে ভর করেছে, আর দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রমথ চৌধুরীর দল হাস্য-পরিহাস-কটাক্ষে আপন-আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। কিন্তু মৌলিক অনুভূতির জন্য যে মৌলিক মনন-উদ্ভাবন-উপলব্ধির দরকার সেই আয়োজন ছিল না রবীন্দ্রেতর কবিদের সামাজিক পারিবারিক-ব্যক্তিগত অস্তিত্বে। করুণা-নিধানের পক্ষেও একথা নিঃসন্দেহে স্বীকার্য। ফলে, অব্যবস্থিত মনন-কল্পনার দৌরাত্ম্য তাঁর বহু আলোচিত 'স্বপ্নরসের' কবিতাগুলিও এড়িয়ে যেতে পারেনি। দেবেন্দ্রনাথ সেন-এর কথা প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য। শ্রী Robin Goodfellow স্বাক্ষরে তিনি তাঁর 'গোলাপগুচ্ছের' 'হারজিৎ' কবিতার নিচে মন্তব্য করেছিলেনঃ—

"বঙ্গের নবীন কবিদিগের যিনি শিরোমণি ও নেতা তাঁহার লেখার অনুকরণে এই কবিতাটি লিখিয়াছি। কিন্তু অনেকের দশা যাহা হইয়াছে আমারও তাহাই হইল। আমি শপথ করিয়া বলিতে পারি, আমার কবিতাটিতে অর্থের নামগন্ধ নাই; মাথাল ফল—শূন্যে কলসি।"

অনুকরণ ও অব্যবস্থিত ভাবনার প্রসঙ্গ স্থগিত রেখে করুণানিধানের সহজ প্রবণতার বিষয়টি অনুসন্ধান করলে দেখা যায় যে প্রকৃতির নিরালা আশ্রয় খুঁজে খুঁজে কবিতা লিখতে অথবা কবিতায় নিরালা প্রকৃতির কথা বলতে তিনি ভালোবাসতেন। বকুল, শিউলি,—শ্যামা, দোয়েল,—মাঠের কোণ, নদীর ভাঙন প্রভৃতি নৈসর্গিক প্রসঙ্গে তাঁর আগ্রহ ছিল। 'বনের কোণে'—কবিতাটিতে তিনি বলেছেনঃ—

এইখানে এই অনেক দূরে পথ ভুলিনু
তার নূপুরে,
সুনয়নীর ময়োমণির চিরগোপন
ইশারাতে!

'দুম্‌কারাণী'-তে আবার বলেছেনঃ—

চির-যুগের কান্তা আমার, প্রাণ-প্রতিমা,
বাঞ্ছিতা,
চিনি তোমার সীঁথির মণি, শিথিল
বেণীর নীল ফিতা।

এবং নিসর্গ সৌন্দর্যের এ রকম আরো অনেক স্বীকৃতি তাঁর নানান লেখায় ছড়িয়ে আছে। আর প্রকৃতির ফুল-পাখি-নদী-বন-পাহাড়ের রূপ প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রে এক একটি নারী মূর্তিতে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। শান্তিপুর-পঞ্চকোট মিলে মিশে একাকার হয়ে যে রম্যতা সৃষ্টি করেছে, সে রম্যতা ধরণীর বিশেষ কোনো আঞ্চলিক শোভার নির্দিষ্টতাবাহী নয়। সেই নদী-বন-মাঠের পটে যে নারী মূর্তি দেখা দিয়েছে, সে নারীও কল্পলোকের তিলোত্তমা,—কখনো বালিকা, কখনো যুবতী,—'আব্-ছায়া সে বেড়ায় ঘুরে' ডাক দিয়ে যায় চেনা সুরে',—

"দু'টি কালো আঁখির কটাক্ষে সে
পূর্ণিমাকে ভুলিয়েছে,
ঘাটে জল-ভরণে মৌ-যমুনা গুলিয়েছে।"

অবশ্য করুণানিধানের এই মর্জিও স্থায়ী নয়। প্রকৃতির প্রসঙ্গে এগিয়ে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের মতো নানা পরিচয়ের তালিকা তৈরি করবার নমুনা আছে তাঁর 'শান্তিপুর' কবিতায়। হরিদ্বার, বৃন্দাবন, দেওঘর দেখেও তিনি তালিকা বেঁধেছেন। কিন্তু মাঝে মাঝে তাঁর এই আর এক রকম খেয়াল দেখা দিয়েছে। সেই সব খেয়ালের বশেই ঝাপসা কল্প দৃশ্যের পটে ফুটে উঠেছে ঝাপসা এক পটেশ্বরীর মূর্তি। যেন জলভরা চোখের সামনে ধরা দিয়েই মিলিয়ে গেছেন চকিতে! পঞ্চকোটের শালবন আর রাঙা মাটি তিনি স্পষ্ট চোখে দেখেছেন, শান্তিপুরের স্থান মাহাত্ম্য তাঁর সজ্ঞান স্মরণের সামগ্রী, কিন্তু এই অনন্যা তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের বাঞ্ছিতা। রোমান্টিক ভাবস্পন্দনের বেগে বাইরের দৃশ্যলোক ঝাপসা হয়ে গেছে। তথাপি গভীর সুরে গভীর কথা শোনাবার অবকাশ পাননি তিনি। তাঁর সাধনায় ক্লান্তি ছিল না। কিন্তু অদৃশ্য সিদ্ধিদাতা বহুজনের বহু সাধনার ধারা থেকেই এক একটি বিস্ময়ের ঢেউ তোলেন। তাঁর চোখে সমগ্রতার প্রতীক্ষা। বিশের শতকে রবীন্দ্রনাথের কীর্তিতেই আমাদের সাহিত্যের সে রকম সমগ্রতা দেখা দিয়েছে। তবু রবীন্দ্র শিষ্য সমকালীন কবিরাও তুচ্ছ নন। তাঁদের সার্থকতা বিশেষ বিশেষ মর্জিতে, কৌশলে ভঙ্গিতে। মর্জির বিচারে করুণানিধান ছিলেন ক্লাসিক ও রোম্যান্টিক মনোভঙ্গির সঙ্গমভূমির কবি। একদিকে রবীন্দ্রনাথ, —অন্যদিকে দ্বিজেন্দ্রলাল-প্রমথ চৌধুরী সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতি কবির বিচিত্র সাধনার ধারা,—করুণানিধানের কাব্যরচনায় এই দুই সত্যেরই সজ্ঞান স্বীকৃতি আছে।

শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের সূচনা

শ্রীসরলাবালা সরকার

স্বামী মাধবানন্দ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের যে জীবনী লিখিয়াছেন, (vide Life of Sri Ramkrishna, Published in the year 1925) সেই গ্রন্থে যাঁহাদিগকে লইয়া 'শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ' প্রথম গঠিত হয় তাঁহাদের নাম দেওয়া হইয়াছে (৭২৭ পৃঃ)। সেই নামগুলি এইঃ—নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন, কালী, শশী ও শরৎ। ইহা ভিন্ন আরও কয়েকটি ছেলের নাম পাওয়া যায়, ইঁহাদের নাম সারদা, হরি, তুলসী ও গঙ্গাধর। ইঁহারা সকলেই ঠাকুরের অসুখের সময় সেবা করিয়াছিলেন এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের ইঁহারাই প্রথম সন্ন্যাসী সন্তান।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে শ্রীরামকৃষ্ণদেবের অসুখ প্রথম ধরা পড়ে। চিকিৎসার জন্য ভক্তগণ ব্যাকুল হইয়াছিলেন, কিন্তু প্রায় সকলেই অর্থহীন ও অল্পবয়স্ক। যাহা হউক, তাঁহারা চেষ্টা করিয়া প্রথমে দুর্গাচরণ মুখার্জির স্ট্রীটে একখানি ছোট বাড়ি ভাড়া করিয়া দক্ষিণেশ্বর হইতে ঠাকুরকে কলিকাতায় নিয়া আসেন।

ইহার পর শ্যামপুকুর স্ট্রীটে গোকুল ভট্টাচার্যের বৈঠকখানার ঘরটি ভাড়া নিয়া সেইখানে ঠাকুরকে লইয়া যাওয়া হয়, সেই বাড়িতে তিনি তিন মাস ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকারের চিকিৎসায় ছিলেন। এই সময় নরেন্দ্রনাথ প্রায় দিবারাত্র তাঁহার কাছে থাকিতেন—কালী এবং শশীও তাঁহার সহযোগিতা করিতেন।

বস্তুত এই তিনটি ছেলেকে লইয়াই শ্রীশ্রীঠাকুরের রুগ্নশয্যার পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের প্রথম সূচনা হয় এবং নরেন্দ্রই ছিলেন এই সেবকদলের নেতা।

ইহার পর কাশীপুরের বাগানবাড়ি। কলিকাতার উপকণ্ঠে কাশীপুরে বড় রাস্তার ধারে শ্রীগোপাল ঘোষের বাগান বাড়ি। এতদিন ঠাকুরের অসুখের গুরুত্ব তত বুঝা যায় নাই, কিন্তু এখন সকলেই দারুণ উৎকণ্ঠিত হইয়াছেন, সুতরাং অনেকেই তাঁহার নিকটে আসিতেছেন। ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দের শেষে ডিসেম্বর মাসে ঠাকুর এই বাড়িতে আসেন। শ্রীশ্রীমা ঠাকুরাণীও ঠাকুরের পথ্য প্রভৃতি প্রস্তুত করিবার জন্য কাশীপুরে আসিয়াছেন। লাটু, বুড়ো, গোপাল ও তারক দিবারাত্র ঠাকুরের কাছে আছেন এবং অন্যান্য তরুণ ভক্তগণ নরেন্দ্র, রাখাল, বাবুরাম, নিরঞ্জন, যোগীন, কালী শশী ও শরৎ ইঁহারাও সকলেই প্রায় সব সময় তাঁহার নিকটে আছেন, বিশেষ প্রয়োজন ভিন্ন কেহই অন্যত্র যান না।

রুগ্নশয্যা ও রোগীর পরিচর্যা ঠাকুরের আনন্দময় সংস্পর্শে এ নিরানন্দ ভাবটি কাহারও মনে আসে না; ঠাকুর তাঁহার সন্তানদিগকে এই সুযোগে যেন নিবিড়ভাবে কাছে টানিয়া লইয়াছেন, তাঁহাদের ভবিষ্যৎ জীবনের প্রেরণা ও শক্তি যেন অহরহ তাঁহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়াছেন।

ঠাকুরের দেহত্যাগের পর এই তরুণ ভক্তদল আর বাড়ি ফিরিয়া যাইতে চাহিলেন না, অথচ কাশীপুরে থাকাও সম্ভব নয়। কেননা বাড়ির ভাড়া আশী টাকা। এত টাকা ভাড়া দিবার সঙ্গতি ছেলেদের নাই, আর গৃহী ভক্তগণ এতদিন যথাসাধ্য অর্থসাহায্য করিয়াছেন, এখন অনেকেই আর টাকা দিতে ইচ্ছুক নন। ঠাকুরের পুণ্য অস্থি ও শয্যা প্রভৃতি লইয়া ছেলেরা এখন যায় কোথায়?

সেই সময় 'অস্থি' লইয়া ত্যাগী যুবকগণের সহিত গৃহী ভক্তগণের কিছু মতান্তর হইয়াছিল। শ্রীরামচন্দ্র দত্ত পরম ভক্ত, তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, কাঁকুড়গাছিতে তাঁহার যে বাগানবাড়ি আছে সেখানে ঠাকুর পদার্পণ করিয়াছিলেন। সেইখানেই ঠাকুরের পুণ্য অস্থি রক্ষিত হউক। তিনি সেখানে পূজো প্রভৃতির ব্যবস্থা করিবেন। নতুবা এই গৃহহীন তরুণদল, যাহাদের নিজেদেরই কোন আস্তানা নাই তাহারা এই 'অস্থি' লইয়া কোথায় রাখিবে। নরেন্দ্রনাথের এ প্রস্তাবে কোন আপত্তি ছিল না কিন্তু অন্যান্য যুবক ভক্তগণ এ প্রস্তাবে সম্মতি দিলেন না। সুতরাং অস্থির কিছু অংশ কাঁকুড়গাছির যোগোদ্যান নামক বাগানে সমারোহে সমাধিস্থ করা হইল, বাকী অংশ ঠাকুরের সন্তানগণ নিজেদের জন্য রাখিয়া দিলেন

এইজন্য যে, ঠাকুরের প্রতীকস্বরূপ ইহা তাঁহাদের সাধনার অনুপ্রেরক হইবে।

রাখিয়া তো দিলেন, কিন্তু রাখিবেন কোথায়? সর্বত্যাগী এই তরুণদল, যাঁহাদের মাথা গুঁজিবার কোন আশ্রয় নাই, আহারের সংস্থান নাই, টাকাকড়িও নাই যে বাড়িভাড়া করিয়া সকলে সেই বাড়িতে একত্রে বাস করিবেন। বস্তুত যথারীতি সন্ন্যাস গ্রহণ না করিলেও তাঁহারা তখনও সন্ন্যাসীই ছিলেন।

নরেন্দ্রনাথ স্বর্গীয় প্রমদাচরণ মিত্রকে একখানি দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন, সেই পত্রে ১।২।৩ দিয়া ১২ দফায় তখনকার অবস্থা জানাইয়াছিলেন। তাহার প্রথম আরম্ভ এইরূপঃ—

১। "প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছি যে, আমি শ্রীরামকৃষ্ণের গোলাম, তাঁহাকে 'দেই তুলসীতিল এ দেহ সমর্পিণু' করিয়াছি। * * * তাঁহার বাক্য আপ্ত-বাক্যের ন্যায় আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

২। "আমার উপর তাঁহার নির্দেশ এই যে, তাঁহার দ্বারা স্থাপিত এই ত্যাগী-মণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব। ইহাতে যাহা হইবার হইবে, স্বর্গ বা নরক অথবা মুক্তি যাহাই আসুক,—লইতে রাজী আছি।

৩। "তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার ত্যাগী সেবকমণ্ডলী যেন একত্রিত থাকে এবং তজ্জন্য আমি ভারপ্রাপ্ত। অবশ্য কেহ কেহ এদিক ওদিক বেড়াইতে গেল যে আলাদা কথা—সে বেড়ানো মাত্র—তাঁহার মত এই ছিল যে,—যিনি পূর্ণ সিদ্ধ,—এক তাঁহারই ইতস্তত বিচরণ সাজে। যতক্ষণ তাহা না হয়, এক জায়গায় বসিয়া সাধনে নিমগ্ন থাকাই উচিত। * * *

৪। "অতএব উক্ত নির্দেশক্রমে তাঁহার সান্ন্যাসীমণ্ডলী বরাহনগরের একটি পুরাতন জীর্ণ বাড়িতে একত্রিত আছেন। এবং সুরেশচন্দ্র মিত্র ও বলরাম বসু নামক তাঁহার দুইটি গৃহস্থ শিষ্য তাঁহাদের আহারাদি নির্বাহ এবং বাড়িভাড়া দিতেন।"

এই বাড়ির ভাড়া ছিল দশ টাকা, বলরামবাবু ও সুরেশবাবু সেই বাড়ির ভাড়া দিতেন। সুরেশবাবু সুবিধামত জমী কিনিবার জন্য ১০০০৲ টাকাও দিয়াছিলেন এবং পরে আরও কিছু দিবেন বলিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৯০ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বলরামবাবুর দেহান্তর হয় এবং তাহার অল্পদিন পরে ঐ খৃষ্টাব্দের ২৫শে তারিখে সুরেশবাবুও পরলোকগমন করেন। নরেন্দ্রনাথ যে রাত্রে সুরেশবাবু পরলোকগমন করেন তাহার পরের দিনই এই পত্রখানি লিখিয়াছিলেন। বলরামবাবুর বাড়ি বসিয়াই তিনি এই পত্র লেখেন।

জরাজীর্ণ ভাঙ্গা বাড়ি, তাহাতেই তাঁহারা চার বৎসর সাধন, ভজন ও তপস্যায় কাটাইতেছেন। কেহ কেহ ইহার মধ্যে বাহিরেও গিয়াছেন, কিন্তু আবার এখানে আসিয়াই একত্রে মিলিত হইয়াছেন। বাড়িটিকে বলা হইত বরাহনগর মঠ। ইহার পূর্বে অবশ্য ভূতের বাড়ি বলিয়া এই বাড়ির একটা বদনাম ছিল, কিন্তু এই সংসারত্যাগী যুবকগণ ইহাতে আশ্রয় লওয়ায় ইহার নাম হইয়াছে, বরাহনগর মঠ। একটি ভাল ঘর দেখিয়া সেইখানেই ঠাকুরের অস্থি ও ছবি রাখা হইয়াছিল, সেইটিই ইঁহাদের পূজার ঘর। শশী ঠাকুর পূজা অর্চনার ভার লইয়াছিলেন এবং অন্য সকলেই মাঝে মাঝে মঠ ছাড়িয়া তীর্থে অথবা বাহিরে যাইতেন কিন্তু শশী একদিনের জন্যও ঠাকুরের এই সেবার ভার ছাড়িয়া বাহিরে যান নাই।

অতি কষ্টেই তাঁহাদের দিন চলিত, যদিও সে কষ্টকে তাঁহারা কষ্ট বলিয়াই মনে করিতেন না। হয়তো কোনদিন কেবল নুন আর ভাত, অথবা তেলাকুচা পাতা সিদ্ধ আর ভাত ইহাই ঠাকুরকে নিবেদন করিবার জন্য জুটিত, আবার কোনদিন হয়তো নুনও জুটিত না। ভিক্ষা করিয়া লইয়া ঠাকুরের ভোগ দিতেন ও সকলে মিলিয়া ভাগ করিয়া প্রসাদ পাইতেন। আবার কোনদিন উপবাসেই কাটিত, সেদিন সকলে মনের আনন্দে ধ্যানে মগ্ন হইয়া থাকিতেন, ক্ষুধা তৃষ্ণা বোধ কিছুই থাকিত না। কাপড়ও বেশী ছিল না, এজন্য সকলে ভিক্ষা করিবার জন্য বাড়ির বাহির হইতে পারিতেন না; বাহির হইবার উপযোগী কাপড়খানি পরিয়া যদি কেহ বাহিরে যাইতেন, অন্য আর এক ভ্রাতা বিনা বস্ত্রেই ঘরের ভিতর

দিন কাটাইতেন, **ইহাই রামকৃষ্ণ সংঘের** যুবকদিগের প্রাথমিক জীবন-তপস্যা।

রামকৃষ্ণ-সন্তানগণ একমন একপ্রাণ; স্বামীজী তাঁহাদের অগ্রণী ও প্রেরণা দাতা। অপূর্ব এই প্রেমের পরিবার, একদিকে নাই কোনই বন্ধন, অপরদিকে এক অপার্থিব প্রেমের প্রবাহে সকলে যেন মিলিয়া মিশিয়া এক হইয়া গিয়াছেন।

বাবুরামের বাড়ি ছিল কলিকাতার উপকণ্ঠে আঁটপুর নামক গ্রামে। বাবুরাম মাঝে মাঝে মাতৃদর্শন করিতে যাইতেন, সেই সময় একদিন বাবুরামের মা সকল ছেলেকেই আঁটপুরে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। এই নিমন্ত্রণ পাইয়া নরেন্দ্রনাথ খুশীই হইলেন এবং সকলে আঁটপুরে গেলেন নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে।

তখন ডিসেম্বর মাসের কাছাকাছি। আঁটপুর পল্লীগ্রাম, সেখানে দারুণ শীত; বাবুরামের জননী ঠাকুরের ভোগের জন্য রন্ধন করিলেন, সন্তানবৃন্দ প্রসাদ পাইয়া সমস্ত দিন ঠাকুরের প্রসঙ্গে পরমানন্দে দিন কাটাইলেন। রাত্রে কাঠ-কুটা সংগ্রহ করিয়া ধুনি জ্বালাইয়া সেই ধুনির পার্শ্বে বসিয়া ধ্যানে মগ্ন হইলেন সেই তরুণ ব্রহ্মচারীর দল। এই সময় নরেন্দ্রের মনে এক প্রবল আবেগ উপস্থিত হইল। ব্রাহ্মমুহূর্তে তিনি সকলকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "এস ভাই, আজ আমরা এই পবিত্র অগ্নি সাক্ষী করিয়া প্রতিজ্ঞা করি, আমরা আজ হইতে ঠাকুরের নির্দেশ ধারণ করিয়া তাঁহারই নির্দিষ্ট পথে চলিব, আর আমরা সংসারে ফিরিয়া যাইব না।" সকলেই আন্তরিকভাবে অগ্নি সাক্ষী করিয়া সেই প্রতিজ্ঞা করিলেন। এইভাবে শ্রীরামকৃষ্ণ সংঘের ভিত্তি স্থাপিত হইল।

কিন্তু বিধিমত সন্ন্যাস গ্রহণ তখনও বাকি ছিল। যদিও প্রকৃতপক্ষে তাঁহারা শ্রীগুরু রামকৃষ্ণদেবের নিকটেই সন্ন্যাস দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু যথারীতি বিরজা হোম করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ তখনও সম্পন্ন হয় নাই। সুতরাং স্বামীজীর নেতৃত্বে এইবার তাঁহারা সেই বিধিপূর্বক সন্ন্যাস গ্রহণ সম্পন্ন করিলেন। বিরজা হোমের হোমাগ্নিতে পূর্বের সমস্ত সংস্কার, নাম ও উপাধি বিসর্জন দিয়া গেরুয়া ধারণ ও নবজন্ম গ্রহণে নূতন নাম গ্রহণ করিলেন। তাঁহাদের নাম এখন এইরূপ হইল।

১। নরেন্দ্র—স্বামী বিবেকানন্দ (সর্বত্র ইনি স্বামীজী নামেই খ্যাত হইয়াছেন)
২। রাখাল—স্বামী ব্রহ্মানন্দ
৩। বাবুরাম—স্বামী প্রেমানন্দ
৪। যোগীন—স্বামী যোগানন্দ
৫। নিরঞ্জন—স্বামী নিরঞ্জনানন্দ
৬। শশী—স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ (দাক্ষিণাত্যে ইনি পতিত উদ্ধার-কার্যে জীবন সমর্পণ করেন)
৭। কালী—স্বামী অভেদানন্দ (রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠের প্রতিষ্ঠাতা)
৮। বুড়ো-গোপাল—স্বামী অদ্বৈতানন্দ (ইনিই একমাত্র তরুণ দলের ভিতর বয়োবৃদ্ধ ছিলেন)
৯। শরৎ—স্বামী সারদানন্দ (উদ্বোধন মঠের প্রতিষ্ঠাতা ও মায়ের দারোয়ান নামে খ্যাত)
১০। তারক—স্বামী শিবানন্দ (ইঁহার অপর নাম মহাপুরুষ মহারাজ, ইনি ছিলেন মঠের গৃহস্থালীর তত্ত্বাবধায়ক)
১১। লাটু—স্বামী অদ্ভুতানন্দ (রামদত্তের হিন্দুস্থানী বালক ভৃত্য, পরে মায়ের সেবায় নিযুক্ত হন)
১২। হরি—স্বামী তুরীয়ানন্দ
১৩। তুলসী—স্বামী নির্মলানন্দ
১৪। সারদা—স্বামী ত্রিগুণাতীত
১৫। গঙ্গাধর—স্বামী অখণ্ডানন্দ
১৬। সুবোধ—স্বামী সুবোধানন্দ (ইনি "খোকা মহারাজ" নামে পরিচিত ছিলেন)
১৭। হরিপ্রসন্ন—স্বামী বিজ্ঞানানন্দ

এই নামের তালিকায় যাঁহারা রহিয়াছেন, তাঁহারাই ঠাকুরের সন্ন্যাসী সন্তান কি না, এ সম্বন্ধে কিছু কিছু মতভেদ আছে। স্বামী মাধবানন্দ ১৯২৫ খৃঃ অব্দে 'লাইফ অব শ্রীরামকৃষ্ণ' নামে ইংরেজিতে ঠাকুরের যে জীবনী প্রকাশ করেন, সেই গ্রন্থের ৭৫৬-৭৫৭ পৃষ্ঠায় ঐ সতেরো জনকেই ঠাকুরের সন্ন্যাসী-শিষ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। আবার রোমাঁ রোলাঁ কর্তৃক লিখিত একখানি শ্রীরামকৃষ্ণ-জীবনী মায়াবতী

আশ্রম হইতে বাহির হয়, স্বামী বিশ্বেশ্বরানন্দ সেখানি প্রকাশ করেন। তাহাতে অন্য সকলেরই নাম আছে, কেবল স্বামী ত্রিগুণাতীতের নাম নাই। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিরজানন্দ মায়াবতী আশ্রম হইতেই স্বামী বিবেকানন্দের একখানি জীবনী বাহির করেন, তাহাতে অন্য সকলের নাম আছে—কেবল স্বামী বিজ্ঞানানন্দের নাম নাই। সুতরাং মনে হয় ভুলক্রমেই এই নাম দুটি পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

এবার প্রমদাচরণ মিত্রকে লিখিত স্বামীজীর পত্রের পরের অংশ হইতে কিছু আলোচনা করিব।

ঠাকুরের দেহ দাহ করা হয় ইহা নরেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ছিল না, তিনি লিখিয়াছেন;—

> নানা কারণে ভগবান রামকৃষ্ণের শরীর অগ্নিতে সমর্পণ করা হইয়াছিল। এই কার্য যে অতি গর্হিত তাহার আর সন্দেহ নাই। এক্ষণে তাঁহার ভস্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে উহা গঙ্গাতীরে কোন স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিলে উক্ত মহাপাপ হইতে কথঞ্চিৎ বোধহয় মুক্ত হইব। উক্ত অবশেষ এবং তাঁহার গদির ও প্রতিকৃতির মঠে (অর্থাৎ বরাহনগর মঠে) প্রতিদিন পূজা হইয়া থাকে।
>
> * * *

ইহার পর নরেন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন—

> পূর্বোক্ত দুই মহাত্মার (অর্থাৎ সুরেশবাবু ও বলরাম বাবুর) ইচ্ছা ছিল যে গঙ্গাতীরে একটি জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অস্থি সমাহিত করা হয় এবং তাঁহার শিষ্যবৃন্দও তথায় বাস করেন এবং সুরেশবাবু তজ্জন্য ১০০০, টাকা দিয়াছিলেন এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন; কিন্তু ঈশ্বরের গূঢ় অভিপ্রায়ে তিনি গত রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলরামবাবুর মৃত্যুসংবাদ আপনি পূর্ব হইতেই জানেন এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায়, কিছুই স্থিরতা নাই। * * * তাঁহারা সন্ন্যাসী, তাঁহারা এই ক্ষণেই যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত; কিন্তু তাঁহাদিগের এই দাস মর্মান্তিক বেদনা পাইতেছে। ভগবান রামকৃষ্ণের অস্থি সমাহিত করিবার জন্য গঙ্গাতীরে একটু স্থান হইল না ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

কেবল স্থানের জন্যই কি? তাহাও নয়। স্বামীজী মনে প্রাণে উপলব্ধি করিয়াছিলেন, ঠাকুরের আবির্ভাব এবং তাঁহার ত্যাগী সন্তানদল সংগ্রহের ভিতর এক বিশেষ উদ্দেশ্য নিহিত আছে। তাঁহার পত্রের অপর এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "যাঁহার জন্মে আমাদের বাঙ্গালীকুল পবিত্র ও জন্মভূমি পবিত্র হইয়াছে—যিনি এই পাশ্চাত্ত্য বাক্‌ছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্য অবতীর্ণ হইয়াছিলেন— তিনি এইজন্যেই অধিকাংশ ত্যাগী শিষ্যমণ্ডলী University men হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধন ভূমির সন্নিকটে তাঁহার কোন স্মরণচিহ্ন হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে?"

তিনি ঐ পত্রে আরও লিখিয়াছিলেন, "যদি বলেন, আপনি সন্ন্যাসী, আপনার এ সকল বাসনা কেন?"—আমি বলি, আমি রামকৃষ্ণের দাস—তাঁহার নাম, তাঁহার জন্ম ও সাধনভূমিতে দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে ও তাঁহার শিষ্যগণের সাধনের অনুমাত্র সহায়তা করিতে যদি আমাকে চুরি ডাকাইতি করিতে হয়, আমি তাহাতেও রাজি। আপনাকে পরমাত্মীয় বলিয়া জানি, আপনাকে সকল বলিলাম। এই জন্যই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম।" (প্রব্রজ্যা হইতে ফিরিয়া আসিবার পর এই পত্র লিখিত হয়)

বাংলাদেশ ও বঙ্গভূমি! শ্রীশ্রীঠাকুরের আবির্ভাবে কি গৌরব লাভ করিয়াছে—এই দুর্ভাগা দেশ! স্বামীজী তাঁহার পত্রে লিখিয়াছেন, "যদি বলেন যে, কাশী আদি স্থানে আসিয়া সাধন করিলে সুবিধা হয়, আপনাকে বলিয়াছি যে, তাঁহার জন্মভূমে এবং সাধনভূমে তাঁহার সমাধি হইবে না, কি পরিতাপ! বঙ্গভূমির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। ত্যাগ কাহাকে বলে এদেশের লোক স্বপ্নেও তাহা ভাবে না, কেবল বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরতা ও স্বার্থপরতা এদেশের অস্থি মজ্জা ভক্ষণ করিতেছে। ভগবান এদেশে বৈরাগ্য ও অসংসারিত্ব প্রেরণ করুন।" * *

তিনি এই পত্রের অন্য স্থানে লিখিয়াছেন, "আমার প্রভুর জন্য এবং প্রভুর সন্তানদিগের জন্য আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নহি। * * আমার বিবেচনায় যদি এই অতি অকপট, বিদ্বান্, সৎকুলোদ্ভব যুবা সন্ন্যাসীগণ স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামকৃষ্ণের Ideal ভাব লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে আমাদের দেশের "অহো দুর্দৈবম্।"

কী সেই মহান্ আদর্শ যাহার জন্য এত ব্যাকুলতা, এত সাধনা? একটিমাত্র কথাতেই স্বামীজী তাহার উত্তর দিয়াছেন, "তোমরা সব মানুষ হও। দেশের সর্বশ্রেণীকে মানুষ হইবার জন্য সাহায্য কর।" ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে ২৩শে অক্টোবর লণ্ডনে 'দি ওয়েস্টমিনিস্টার গেজেটের' সম্পাদক স্বামীজীকে যখন জিজ্ঞাসা করেন, শ্রীরামকৃষ্ণদেব একটি সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন কিনা। তাহার উত্তরে স্বামীজী বলেন, "না, সাম্প্রদায়িকতা ও গোঁড়ামীর জন্য যে ব্যবধান সৃষ্টি হইয়াছে তাহা দূর করিবার জনাই তাঁহার সমস্ত জীবন ব্যয়িত হইয়াছিল।

"No, his (Sri Ramkrishna's) whole life was spent in breaking down the barriers of sectarianism and dogma. He formed no sect. Quite the reverse. He advocated and strove to establish absolute freedom of thought. (vide complete works of Swami Vivekananda, Vol. V Third edition published in 1924 page 116)"

"মানুষ মাত্রই মানুষ এবং যত মত তত পথ" শ্রীরামকৃষ্ণ মিশন এই বার্তাই বহন করিয়া আনিয়াছেন। স্বামীজী বলিয়াছেন, "জীবনে একমাত্র সার সত্য আছে তাহা স্বার্থত্যাগী প্রেম।" ত্যাগের উদ্ভব যদি প্রেমে না হয় তবে সে প্রেমের বা ত্যাগের সার্থকতা কোথায়? তাই স্বামীজীর উক্তিতে আমরা পাই,

> "সর্বভূতে সেই প্রেমময়,
> প্রাণ মন শরীর অর্পণ কর সখা এ সবার পায়।
> বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর?
> জীবে প্রেম করে যেইজন সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।"

৩৮

নিভৃত কক্ষে দুজনের আলোচনা হচ্ছিল। কি নিয়ে আলোচনা বুঝবার উপায় নেই। প্রায় ফিসফিস করে তারা কথা বলছে। পারিজাতের সুদৃশ্য টেবিলের একধারে রক্ষিত সবুজ টুপি-পরা একটা ল্যাম্প জ্বলছে। দেয়ালের ঘড়ির দিকে একবার চোখ তুলে শিবনাথ তাকিয়ে দেখল এগারোটা দশ। কিন্তু রাত গভীর হ'ল বলে সে বিন্দুমাত্র ব্যস্ততা বা চঞ্চলতা প্রকাশ করছে না। বরং আরও স্থির সংযত হয়ে পারিজাতের মুখের দিকে তাকিয়ে তার শেষ প্রস্তাব শুনল। শুনে মাথাটা একটু দুলিয়ে অল্প হেসে সে পারিজাতকে আবার যেন কি বোঝাতে পারিজাতের চোখ দুটি উৎফুল্ল হয়ে উঠল। 'দ্যাট্স রাইট। ঠিক আছে। তা হলে আপনি,—আপনাকে আমি আর ধরে রেখে কষ্ট দিই না। যান এইবেলা ঘরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া করে শুয়ে পড়ুন—অনেক রাত হ'ল।'

'না, তেমন আর কি রাত' শিবনাথ আরো দু' মিনিট স্থির হয়ে বসে থেকে কি একটু চিন্তা করে পরে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। পারিজাতও চেয়ার ছেড়ে উঠল।

'আপনার সঙ্গে টর্চ নেই। সরকার মশায়কে কি বলব আলোটা নিয়ে রাস্তাটা একটু দেখিয়ে দিক—'

শিবনাথ ব্যস্ত হয়ে বলল, 'না না না কিছু দরকার হবে না। কতটুকুন রাস্তা। তাছাড়া বেশ জ্যোৎস্না আছে।'

বারান্দা এমন কি সিঁড়ি পর্যন্ত পারিজাত শিবনাথের সঙ্গে এল।

'আর আপনাকে কষ্ট করতে হবে না।' শিবনাথ বলল।

'আচ্ছা, গুডনাইট।' পারিজাত হেসে উত্তর করল।

'গুড নাইট।'

আজ পারিজাতের ড্রয়িং রুম ছাড়া আর কোন কামরায় আলো নেই। বাড়িটাও বড় বেশি চুপচাপ। পুরো আড়াই ঘণ্টা শিবনাথ এখানে কাটিয়েছে। একবারও দীপ্তির গলার স্বর বা শিশুদের কলরব শোনা যায়নি। না, ওরা এখানে নেই। কেন নেই কোথায় গেছে শিবনাথ জানে। পারিজাত সবই তাকে বলেছে। বস্তুত পারিজাত যে এমন অন্তরঙ্গ হতে পারে শিবনাথের আগে ধারণা ছিল না। অবশ্য মাত্র এক দিনের আলোচনার পর দীপ্তিও খুব অন্তরঙ্গ হতে পেরেছিলেন। শিবনাথ তার পরিচয় পেয়েছে। কিন্তু তাঁর স্বামী পারিজাত লোকের সঙ্গে আরো বেশি আত্মীয়তা এবং বন্ধুত্ব করতে পারেন। জানেন। শিবনাথ তার একাধিক প্রমাণ পেল। পৃথিবীর সকল লোকের সঙ্গেই পারিজাত তা করে কিনা শিবনাথের মনে প্রশ্ন জাগল এবং যাদের সঙ্গে সেটা সম্ভব হয় না তাদের মধ্যে কি কি ত্রুটি আছে বা থাকতে পারে প্রকাণ্ড কলাপসিবল গেট পার হয়ে রাস্তায় নামতে নামতে শিবনাথ চিন্তা করল। হয়তো অন্যদিন পারিজাতের কম্পাউন্ডের বাইরে এসে ঘাড় ফিরিয়ে সে বাংলোর একটা নির্দিষ্ট কক্ষের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলত। কিন্তু আজ আর শিবনাথ তা করল না। করার প্রয়োজন বোধ করল না। বরং ঘরে গিয়ে কতক্ষণে সে রুচির সঙ্গে মিলিত হবে এবং ভয়ংকর জরুরি কথাগুলি তাকে জানাবে, সেই তাগিদে লম্বা লম্বা পা ফেলে সে রীতিমত ছুটতে লাগল। কিছুক্ষণ আগে সন্ধ্যার দিকে রমেশের সঙ্গে কথা বলার পর এমনি ব্যস্ত চঞ্চল হয়ে সে পারিজাতের সঙ্গে দেখা করতে ছুটে এসেছিল। কিন্তু তখনকার ব্যস্ততার মধ্যে উদ্বেগ ছিল, উৎকণ্ঠা ছিল এবং অজানিত একটা ভয়, আশঙ্কা। এখন আর তা না। একটা নিশ্চিন্ততা, তৃপ্তি সন্তোষ এবং যাকে বলে 'মনের জোর' নিয়ে সে স্ত্রীর কাছে যাচ্ছে। রায় সাহেবের আমবাগানের চৌহদ্দি পার হল শিবনাথ। তাদের পাড়ার খোয়া ঢালা অসমান পথ এসে গেল। ডান দিকে করাত-কল। বাঁ দিকে রমেশের চায়ের দোকান। দোকান বন্ধ হয়ে গেছে। হয়তো বনমালীর দোকানও এতক্ষণে বন্ধ হয়ে গেছে। শিবনাথ ভাবল। মাথা ভাঙ্গা নিষ্পত্র কাফেলা গাছের গুঁড়ির কাছে এক-জায়গায় ঠাসাঠাসি করে দাঁড় করানো এত-গুলি ঠেলাগাড়ি দেখে সে চমকে উঠল। অবশ্য গাড়িগুলি দাঁড় করিয়ে রাখার মধ্যে চমৎকার একটা শৃঙ্খলা ও মিল ছিল। দৈর্ঘ্যে প্রস্থেও সবগুলি গাড়ি সমান। ঠেলার দঙ্গল পার হয়ে শিবনাথ বাদাম গাছের তলায় এসে গেল।

'কে?'

'আমি গুপ্ত।'

পদক্ষেপ আরও দ্রুত এবং দীর্ঘ করবার জন্য শিবনাথ প্রস্তুত হয় কিন্তু কে গুপ্ত বাধা দিল। শিবনাথের হাত ধরল না, রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দু' হাত দুদিকে প্রসারিত করে দিয়ে বলল, 'এক সেকেণ্ডে স্যার,—আপনার জন্য একটা ব্রিলিয়াণ্ট নিউজ নিয়ে বসে আছি।'

পাগল না, লম্বা চুল দাড়ি এবং ছেঁড়া ঝুল বার হওয়া সার্টে কে গুপ্তকে ভূতের মত দেখাচ্ছিল। হাঁটু অবধি সার্টের তলায় আর কোন কাপড়চোপড় আছে বলেও মনে হল না। শীর্ণ শুকনো লম্বা পা দুটোকে দুটো কাঠ বলে মনে হচ্ছিল। জায়গাটা এখন খুবই নির্জন। চাঁদ হেলে পড়াতে জ্যোৎস্নাও মরে এসেছে। দুটো জোনাকি পোকা বাদাম গাছের কাণ্ড ঘিরে নাচানাচি করছিল। শিবনাথের গা-টা কেমন সিরসির করে উঠল। কিন্তু ভীরু সে নয়। দু হাতের মুঠ দৃঢ়বদ্ধ করে গম্ভীরভাবে বলল, 'রাস্তা ছেড়ে দিন। আমার তাড়াতাড়ি আছে।'

'তা আছে আমি অস্বীকার করছি কি—না আগে কোনদিন করেছি।' আগের মত গলায় ততটা শ্লেষ নেই, বরং স্বরটা করুণ। কারণ বুঝতে পেরে শিবনাথ নিজের মনে হাসল। 'না-তা আর অস্বীকার

করবেন কি ক'রে। বলুন আপনার ব্রিলিয়াণ্ট খবর।'

'ডাক্তার পালিয়েছে। এই মাত্র একটা ঠেলার ওপর লটবহর চাপিয়ে চুপি চুপি পাড়া ছেড়ে সরে গেল।'

'কোন্ ডাক্তার?'

'শেখর মশায়, শেখর ডাক্তার। দ্যাট মেটিরিয়ামেডিকা স্পেশ্যালিস্ট—আমাদের সুনীতির বাবা গো।'

'হঠাৎ?'

কে গুপ্ত নাকে হাসল।

'মশায় আপনি,—আপনাকে এসব খবর দিয়েও সুখ নেই। কেন পালিয়েছে বুঝতে পারছেন না? পথেঘাটে মাঠে সবাই এখন শেখরকে আঙ্গুলে দেখিয়ে বলছে তার মেয়ে সিফিলিস রুগীর সঙ্গে পালিয়ে গেছে—হা-হা, ডাক্তারের মেয়ের ভি-ডি পেসেণ্টের সঙ্গে পালানো, একেবারে সাংঘাতিক ব্যাপার যে! তার এ-তল্লাটে প্র্যাকটিস করাই মুশকিল হয়ে পড়েছে। তাড়াতাড়ি পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে এখান থেকে সরে গিয়ে শেখরতো বুদ্ধিমানের কাজই করেছে।'

'মানে বারোঘরের আর একটা ঘর খালি হ'ল। ভাল। প্রভাতকণার চিৎকারে আপনার আর মাথা ধরবে না।' শিবনাথ এই প্রথম শব্দ করে হাসল। 'শুনলাম আপনার খবর, এইবেলা দয়া করে রাস্তাটা ছাড়ুন।'

কিন্তু কে গুপ্ত সরে দাঁড়ানো বা হাত গুটোবার কোন লক্ষণ দেখাল না। 'মশাই হাম্বাগটা রাতদিন এপিডেমিক ইয়ার এপিডেমিক ইয়ার করে খুব লাফাত, হ্যাঁ, বোগাস ওষুধ মানে স্রেফ জল খাইয়ে লোকের পয়সা লুটবার ফিকিরে ছিল, কেমন হল তো,—কন্যারত্নটি তার ঘরেই এপিডেমিক রেখে বেরিয়ে গেল। নসিব। আমরা লম্ফঝম্ফ করলে হবে কি, যা লেখা আছে কপালে তা খণ্ডন করা যায় না, অ্যাম আই রং, বলুন?

'হ্যাঁ, খুব হয়েছে, সরে দাঁড়ান।'

'রিয়্যালি, আপনি সর্বদাই এমন চটে থাকেন। এখন তো পয়সা চাইছি না বা আপনার গায়ে হাত দিচ্ছি না, তবে কেন—'

'কেন আরো কোনো মজাদার খবর আছে নাকি? চট করে বলে ফেলুন।' শিবনাথের ইচ্ছা নেই এত রাত্রে আর ওর সঙ্গে ধাক্কাধাক্কি করে।

মুহূর্তকাল শিবনাথের ঘাড়ের ওপর দিয়ে সামনের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে কে গুপ্ত পরে থুঁতনি নামায়। 'আচ্ছা, আপনি তো ওদিক দিয়েই এইমাত্তর এলেন, মানে রমেশের দোকানের পাশ দিয়ে, দোকান খোলা দেখলেন?

'আমি তাকাইনি।' বিরক্ত হয়ে শিবনাথ বলল। তারপর কি ভেবে প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ এত রাত্রে চায়ের দোকান? কি ব্যাপার?'

'না বেবির আসবার কথা। এখনো আসছে না। বারোটা প্রায় বাজে কি বলেন।'

'হবে।' নিস্পৃহ গলায় শিবনাথ উত্তর করল 'আমি ঘড়ি দেখিনি, আপনি কাইণ্ডলি একটু পাশ কেটে দাঁড়ান।'

না সরে বরং আর একটু ঘন হয়ে এসে দাঁড়াতে চেষ্টা করল গুপ্ত। শিবনাথ সতর্ক হয়।

'না না আমি আপনার হাতটা ত আর ধরব না। বাপরে বাপ তখন যা অর্ধচন্দ্রটা দিলেন, মনে আছে।' কে গুপ্ত মৃদু গলায় হাসল। 'না বেবির কথা জিজ্ঞেস করছিলাম কেন, ও এসে আমায় কিছু পয়সা দিয়ে যাবার কথা। ক্ষিতীশ নাকি আজ ওকে একটা টাকা দেবে বলেছে। এখন বুঝতে পারছি না টাকাটা পেল কি পেল না। আর আসছেই না বা কেন। সেই কখন থেকে এখানে বসে আছি।'

'দুপা এগিয়ে গিয়ে দেখুন না দোকান খোলা কি বন্ধ, বেবি সেখানে আছে কি নেই।'

গুপ্ত মাথা নাড়ল।

'আমি শালা ওখানে গিয়ে এখন ঘুর-ঘুর করলেই ক্ষিতীশ হারামজাদা টের পেয়ে যাবে বেবির কাছে কিছু চাইছি। বুঝলেন না? তখন আর ওকে পয়ইটিও ছোঁয়াবে না।'

'তাই নাকি, বেশ মজা তো।' শিবনাথ ঠাট্টার ভঙ্গিতে হাসল। 'আপনার মেয়ে। বাপকে এক আধটু দিয়ে থুয়ে থাক ক্ষিতীশের বুঝি ইচ্ছা না?'

'আরে মশাই, সেকথাই তো বলছিলাম। অথচ দেখুন, বেবির মা কিছু চেয়েছে টের পেলে রমেশ ক্ষিতীশ দুই হারামজাদাই একেবারে দানসত্র খুলে বসে। এক কাপ চায়ের জায়গায় তিন কাপ চা একটা বিস্কুট চাইলে চারটে বিস্কুট, এত এত চিনি, বোতল ভর্তি কেরোসিন, কয়লা কাঠ। আমি কি টের পাই না খুব টের পাই। কিন্তু আমার বেলায়—' কে গুপ্ত হাতের বুড়ো আঙ্গুলটা নাড়ল।

'কেন আপনার সঙ্গে রমেশ ক্ষিতীশের ঝগড়া আছে নাকি। বেবির ওখানে যাওয়া নিয়ে ইদানিং আপত্তি করেছিলেন কিছু?'

'নেভার। আমি এ-সম্পর্কে আজ পর্যন্ত একটা কথাও বলিনি। না মশাই না সেসব কিছু না। সেই সেক্স হি-হি।' কে গুপ্ত ছেলেমানুষের মত হেসে উঠল। 'বেবির মা যদি টিনের সব বিস্কুটও খেতে চায়, ক্ষিতীশ আপত্তি করবে না। এক টুকরোর জন্যে আমি হাত বাড়ালেই শালা তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে। তেমনি ওর দাদাটি।'

'বুঝলাম, সরুন, রাস্তা দিন।'

'যেমন তখন।' কে গুপ্তর হাসি ও কথা বন্ধ হল না। 'গুড় কিনতে এসেছিল মাগিটা। চাইতেই হুট ক'রে আপনি পয়সাটা পকেট থেকে বার করে দিলেন,—তারপর আমি যখন পয়সা চাইলাম, সুন্দর একটি গলাধাক্কা, হি-হি।'

'ননসেন্স।' শিবনাথ গুপ্তর একটা হাত ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল এবং দ্রুত হাঁটতে আরম্ভ করল।

'রাগ করলেন নাকি, অফেন্স নিলেন? আমি একজাম্পল হিসাবে কথাটা বললাম শুধু—শুনুন শুনুন।' গুপ্ত পিছন থেকে ডাকে।

'চুপ রাস্কেল।' শিবনাথ ঘাড় ফিরিয়ে গর্জন করে উঠল। নুয়ে মাটি থেকে কি একটা তুলে নেয়। 'আর এক পা এগোলে এই ইট দিয়ে আমি তোমার মাথা ভেঙ্গে দেব। পাগল বদমায়েস।'

ইটের ভয়ে গুপ্ত আর অগ্রসর হয় না।

'বাপরে বাপ। একটুতে এমন ভায়লেণ্ট হয়ে ওঠেন। আমি শালা পেনিলেস, কিন্তু আপনি দেখছি একেবারেই হার্টলেস—ক্রুয়েল।'

কে গুপ্তর কথাগুলো শিবনাথের কানে যায় না। ততক্ষণে সে ফিকে জ্যোৎস্নার সঙ্গে দূরে মিলিয়ে গেছে। হাওয়ায় একরাশ শুকনো পাতা ঝরঝর করে কে গুপ্তর মাথায় পিঠে ঝরে পড়ে।

(ক্রমশ)

আমাদের পাঠ্যপুস্তক

শীলভদ্র

পাঠ্য-পুস্তক ছাড়া লেখা-পড়া সম্ভব, আজকাল একথা আমরা ভাবতে পারি না। কিন্তু ভারতবর্ষে পাঠ্য-পুস্তকের প্রচলন বেশী দিন হয়নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে ইংরেজদের চেষ্টায় নিয়মিতভাবে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ আরম্ভ হয়। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্রদের প্রয়োজনে অধ্যাপকরা নানা বিষয়ে বই লিখতে আরম্ভ করেন। কিন্তু এ কাজ এমন গুরুত্বপূর্ণ যে, অধ্যাপকদের অবসর সময়ের প্রচেষ্টার উপর নির্ভর করা চলল না। পৃথকভাবে সর্বাত্মক প্রচেষ্টার প্রয়োজন দেখা দিল। তার ফলেই ১৮১৭ সালের জুলাই মাসে প্রতিষ্ঠিত হলো ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি। বিদ্যালয়ে ব্যবহারের উপযোগী সস্তা পাঠ্যপুস্তক প্রকাশ করা ছিল এই সমিতির উদ্দেশ্য। কিছুসংখ্যক পুস্তক বিনামূল্যে বিতরণও করা হতো। সমিতির পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন তদানীন্তন সরকার। ক্যালকাটা স্কুল বুক সোসাইটি ভারতে সর্বপ্রথম সুপরিকল্পিতভাবে পাঠ্যপুস্তক রচনা আরম্ভ করেন।

এর পূর্বে শিক্ষার্থীর উপযোগী বই রচিত হতো না। মূল গ্রন্থ আচার্য সহজ করে বুঝিয়ে দিতেন। পুঁথির সংখ্যা যথেষ্ট ছিল না। নকল করবার অনুমতি পাওয়াও কঠিন ছিল। অনেক আচার্যই ছিলেন বিদ্যার পুঁজিপতি। পুঁথি যথেচ্ছভাবে নকল করবার অনুমতি দিলে জ্ঞান অবাধে ছড়িয়ে পড়বে; আচার্যদের মর্যাদা তাতে ক্ষুণ্ণ হবার আশংকা। তাই আচার্য মুখে মুখে ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতেন। পাঠ্যপুস্তক প্রচলনের পূর্বে কান ছিল শিক্ষা অর্জনের প্রধান ইন্দ্রিয়; এখন হয়েছে চোখ। আচার্যের ব্যাখ্যা শুনে ছাত্রকে বিষয়টি উপলব্ধি করতে হতো এবং মনে রাখতে হতো। এইজন্যই তখন মুখস্থের উপর জোর দেবার রীতি ছিল। এখনকার মতো সর্বদা হাতের কাছে বই থাকত না যে, দরকার হলেই দেখে নেওয়া যাবে।

মুদ্রাযন্ত্রের প্রসারের পর থেকে নানা ধরনের বই প্রকাশিত হতে লাগল। শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে রচিত বিভিন্ন বিষয়ের বই তাদের মধ্যে অন্যতম। প্রথমে পাঠ্যপুস্তকের মান নির্দিষ্ট করবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। একই ইতিহাসের ক্লাশে হয়তো দশ জন ছাত্র দশখানি ভিন্ন ভিন্ন পাঠ্যপুস্তক নিয়ে যেত। শিক্ষক দশ জনকেই পৃথকভাবে পাঠ বুঝিয়ে দিতেন।

বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হবার পর পরীক্ষার মান নির্দিষ্ট হলো। ব্যবহারিক জীবনে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার মূল্য বাড়বার সংগে সংগে সর্বত্র একই মানের পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের প্রয়োজন অনুভূত হলো। শুধু মানের সমীকরণ নয়; কিভাবে উন্নত ধরনের পাঠ্যপুস্তক রচনা করা যায়, তাও একটি বড় প্রশ্ন। প্রচলিত পাঠ্যপুস্তকগুলি পরীক্ষা করে পাঠ্যপুস্তকের উন্নতির উপায় নির্ধারণের জন্য ভারত সরকার একটি কমিটি নিয়োগ করেছিলেন। ১৮৭৭ সালের ১০ই অক্টোবর কমিটি তাঁদের রিপোর্ট সরকারের নিকট পেশ করেন। এই কমিটিতে বাঙলার প্রতিনিধি ছিলেন কৃষ্ণদাস পাল। প্রত্যেক প্রদেশে স্থায়ীভাবে টেক্সট বুক কমিটি গঠনের প্রস্তাবটা ছিল প্রধান সুপারিশ। বাঙলা দেশে অবশ্য একটি কমিটি আগে থেকেই ছিল। ১৮৭৫ সালের ১৩ই অগাস্টের এক সরকারী প্রস্তাব অনুসারে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল "For the examination of educational text-books for the minor and vernacular scholarship course".

এই কমিটিতে ছিলেন ঃ

রাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর—সভাপতি
বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র
বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায়
মিঃ এ ডব্লু গ্যারেট।

পাঠ্যপুস্তকের গুণাগুণ বিচারের জন্য এরূপ বিখ্যাত বিদ্যোৎসাহীদের সহায়তায় কাজ আরম্ভ হওয়া সত্ত্বেও আজ প্রায় আশী বৎসর যাবৎ টেক্সট বুক কমিটি যে কাজ করেছেন তা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। জাতির জীবনে অন্যান্য ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হলেও পাঠ্যপুস্তকের বর্তমান অবস্থায় লেখক, শিক্ষক এবং প্রকাশক কেউ সন্তুষ্ট নয়। শিক্ষার ক্ষেত্রে পাঠ্য-পুস্তকের স্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অথচ পরিতাপের বিষয় যে, চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি এ বিষয়ের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হয়নি।

দীর্ঘ আশি বছরের মধ্যে পাঠ্য-পুস্তকের মান উল্লেখযোগ্যরূপে উন্নীত না হবার কারণ কি? মান উন্নয়নের জন্য প্রকৃত চেষ্টার অভাবটাই প্রথম কারণ। বৃটিশ আমলে টেক্সট বুক কমিটি লক্ষ্য রাখত বৃটিশের স্বার্থবিরোধী কোন কথা যেন পাঠ্যপুস্তকে স্থান না পায়। উন্নত

মানের পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য কতকগুলি পূর্ব-শর্ত পালনের প্রয়োজন। সেদিকে শিক্ষা বিভাগের দৃষ্টি পড়েনি। পাঠ্যপুস্তক লিখতে বসে কেউ গবেষণা করতে পারে না। শিক্ষাবিষয়ক গবেষণার ফলাফল হাতের কাছে থাকা চাই। এই গবেষণার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে পাঠ্যপুস্তক লেখা হলেই উদ্দেশ্য সার্থক হতে পারে।

যেমন ধরা যাক, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাঙলা পাঠের পুস্তক; একটির সঙ্গে আর একটির প্রভেদ বড় একটা চোখে পড়ে না। এর জন্য লেখককে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ নির্দিষ্ট কোনো মানের অভাবে তাঁকে অনেকটা অনুমানের উপর নির্ভর করতে হয়। য়ুরোপ-আমেরিকায় শিক্ষা-বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন শ্রেণীর ও বয়সের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা করে শব্দের তালিকা প্রস্তুত করেছেন। পাঠ্যপুস্তকের লেখক সেই তালিকা থেকে দেখতে পাবেন সপ্তম শ্রেণীর জন্য কোন্ শব্দগুলি ব্যবহার করতে হবে এবং অষ্টম শ্রেণীর জন্যই বা কোন্ শব্দগুলি উপযোগী। আমাদের দেশে মাতৃভাষা পড়ানো সম্বন্ধে এ ধরনের উল্লেখযোগ্য কোনো গবেষণা হয়েছে বলে জানা নেই। সাহিত্যপত্রের ভাষার মান সম্বন্ধে যদি বা একটু যত্ন নেওয়া হয়, ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান প্রভৃতি পত্রের ব্যবহৃত বাঙলা ভাষা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ছাত্রদের পক্ষে কঠিন ও নীরস হয়ে পড়ে। ইংরেজী পাঠের পুস্তক থর্নডাইক, ওয়েস্ট প্রভৃতি শিক্ষাবিদদের সংকলিত শব্দতালিকা অনুসরণ করে লিখিত হলেও ত্রুটি থেকে যায়। কারণ এসব তালিকা সংকলন করা হয়েছে ইংরেজী যাদের মাতৃভাষা সে সব ছাত্রদের পরীক্ষা ক'রে। আমাদের দেশের জন্য ভিন্ন তালিকা প্রয়োজন।

পাঠ্যপুস্তক রচনার জন্য দুটি বিষয় বিবেচনা করা দরকার। প্রথম সিলেবাস বা পাঠক্রম স্থির করতে হবে। তারপর সেই সিলেবাসকে শিক্ষার্থীর উপযোগী করে ভাষায় রূপ দেওয়া চাই। দীর্ঘকালের সুপরিকল্পিত গবেষণা ছাড়া এ দুটির একটি কাজকেও বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। আজকাল শিক্ষকদের শিক্ষা দেবার উপর জোর দেওয়া হয়েছে। অথচ শিক্ষার বনিয়াদ যার উপর নির্ভর করে, সেই গবেষণার সুষ্ঠু ব্যবস্থা নেই।

আমাদের বিদ্যালয়ের সিলেবাসের ত্রুটি এতই সুস্পষ্ট যে শিক্ষার সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ নেই তাঁদেরও তা চোখে পড়বে। পাঠ্যপুস্তকের মূল উদ্দেশ্য সম্বন্ধে অবহিত না থাকার জন্যই সিলেবাস ত্রুটিপূর্ণ হয়। পাঠ্যপুস্তক পড়াবার উদ্দেশ্য কী? বিদ্যালয়ে কয়েক পাতা বাঙলা পড়লে, কিংবা কণ্ঠস্থ করলেই কি বাঙলা শেখা হবে? তা যদি না হয়, তাহ'লে কেন পড়ানো হয়? এ কথার উত্তর এই যে, শিক্ষক এমনভাবে পড়াবেন যে, ছাত্রের মনে সে বিষয় আরো পড়বার জন্য ঔৎসুক্য জাগবে, সে শিখবে কি করে সাহিত্য এবং অন্যান্য বিষয় পড়তে হয়। অঙ্কের বইয়ে অনুশীলনীর পূর্বে যেমন ছাত্রদের সাহায্য করবার জন্য কষে-দেওয়া উদাহরণ থাকে, বিদ্যালয়ের পাঠও তেমনি। বিদ্যালয়ের বাইরে স্বাধীনভাবে বিদ্যাচর্চা কি করে করতে হয় পাঠ্যপুস্তক পড়ানো তারই উদাহরণ।

এই মাপকাঠি দিয়ে সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর বাঙলা পাঠ্যপুস্তক বিচার করলে ত্রুটি ধরা পড়বে। বাঙলা পাঠ্যপুস্তক সংকলন গ্রন্থ। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী প্রভৃতির গদ্য রচনা এবং কৃত্তিবাস থেকে কালিদাস রায় পর্যন্ত কবিদের কবিতা এখানে স্থান পায়। কোনো কোনো সংকলক তাঁদের নির্বাচনকে আরো আধুনিক কাল পর্যন্ত টেনে এনেছেন। সমস্ত বইটি উল্টে-পাল্টে ধারণা জন্মে এটি যেন বাঙলা এম-এ সিলেবাসের ক্ষুদ্র সংস্করণ। বাঙলা সাহিত্যের সকল প্রসিদ্ধ লেখক তাঁদের বিচিত্র রচনার নমুনা নিয়ে এখানে উপস্থিত। সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা সাহিত্যের এই বৃহৎ পরিধি এবং বৈচিত্র্য উপলব্ধি করতে অক্ষম। বিভিন্ন রচনাশৈলীর জগা-খিচুড়ি বর্তমান বাঙলা সাহিত্য স্বাধীনভাবে পড়ে বুঝতে সাহায্য করে না। বিদ্যালয়ে পাঠ্যপুস্তকের রচনায় যে বাঙলা পড়ানো হয় বিদ্যালয়ের বাইরে সংবাদপত্র, সাহিত্যপত্র এবং আধুনিক লেখকদের ভাষা তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। একজন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক কর্তৃক সংকলিত বহুল প্রচারিত অষ্টম শ্রেণীর বাঙলা পাঠ্যপুস্তকে 'চলতি' ভাষায় রচনার একটি নিদর্শনও দেওয়া হয়নি। এভাবে বাঙলা পড়ানোর ফলে বাঙলা সাহিত্যের ক্ষতিই হচ্ছে। ইংরেজী পাঠ্যপুস্তকে কিন্তু এমন হয় না। সেখানে একটি রচনাশৈলী থাকে। ডিকেন্সের রচনা থেকে একটি অংশ দিলেও ভাষা মার্জনা করে দেওয়া হয়।

আমাদের দেশের কর্তৃপক্ষ পাঠ্যপুস্তকের সিলেবাস এমনভাবে তৈরি করেন যে, লেখকদের সামান্যই স্বাধীনতা

নানা রকমের ফ্ল গাছের ডালপালা দিয়ে ঢেকে দেয়। এই গোলাকার মণ্ডটিকে এরা শ্রীমদ্‌ভাগবতের রাসমণ্ডলরূপে কল্পনা করে নেয়। এর বাইরে চারিদিকে দর্শকদের বসবার স্থান।

মহারাস অনুষ্ঠানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ হল এই রকমের। রাত দশটার পর অনুষ্ঠানের আরম্ভ করাই হল নিয়ম। প্রথমে একদল খোল ও বড় বড় কাঁসার করতাল বাজিয়ে একদল পুরুষ মণ্ডলে প্রবেশ করে। তাদের খালি গা, মাথায় ধপ্‌ধপে সাদা পাতলা চাদরের বড় পাগড়ি। এই পাগড়ি বাঁধার কায়দাটিও এদের নিজস্ব। এ ধরনের পাগড়ি ভারতে অন্যত্র চোখে পড়ে না, পরনে থান ধুতি, সামনে কোঁচা লম্বা করে ঝোলান। কোমরের ডানদিকে বেরিয়ে থাকে। ক্ষত্রিয় জাতির পরিচয়স্বরূপে সাদা পৈতে জড়ানো। গলায় তুলসীর মালা। কপালে চন্দনের তিলক ও ফোঁটা, সর্বাঙ্গে হরিনামের ছাপ। যাবতীয় উৎসবে খোল বাজিয়েরা সব সময়ে এই সাজেই সেজে থাকে। এদেশে বাংলাদেশের মত মাটির খোল কীর্তনে বা নৃত্যে একেবারেই ব্যবহৃত হয় না। সবই কাঠের তৈরী। বাংলা খোলের তুলনায় আকারে ছোট। মন্দিরগুলি কাঁসার তৈরি, আকারে বাংলার যে-কোন করতালের চেয়ে অনেক বড়, দেখতে বাটির মত, ওজনে অনেক ভারি। এই মন্দিরার পিছনের ফুটো দিয়ে মেয়েদের বেণীর মত, বা চুলের 'ফুৎনার' মত মোটা করে কালো কিম্বা লাল সুতোর বিনুনী ঝুলিয়ে দেয়। মন্দিরাগুলি দুই হাতে মুঠো করে ধরে একসঙ্গে এক সারিতে দাঁড়িয়ে যখন নানাভাবে বাজিয়ে বাজিয়ে অঙ্গভঙ্গী করে, তখন ঐ বিনুনীর নানাপ্রকার দোলা বা খেলা দেখতে ভারি সুন্দর লাগে। বড় মন্দিরার এই নাচটিও একটি অভিনব নাচ।

বাজিয়েরা প্রথমে এসে মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে। তখন আর একজন একটি থালাতে প্রদীপ, ধান, দূর্বা ইত্যাদি সাজিয়ে এনে তাদের সামনে ধরে। বাজিয়েরা একে একে সেই অর্ঘ্য থেকে আশীর্বাদী ফুল ধান-দূর্বা গ্রহণ করে মাথায় রাখে। অর্ঘ্যবাহক তার সঙ্গে কিছু

পুংচোলমা বা পালাপুংচোলম্‌ নাচের ভঙ্গিতে খোল ও বড় মন্দিরা বাদকের দল

বাজিয়েদের হাতে দেয়। এর পরে তারা উঠে দাঁড়িয়ে খোল করতাল সহযোগে বাজনা শুরু করে। কিছুক্ষণ বাজনার পরে তারা খুব চড়া ও মিহি সুরে গান ধরে। অনেকক্ষণ ধরে নানা তালে গান, বাজনা, নাচ করে তারা রাসমণ্ডল থেকে বিদায় নেয়, নমস্কার ক'রে।

খোল বাজিয়েরা কেবল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বাজায় না, তারা এর সঙ্গে অপূর্ব একটি নাচ দেখায়। এই নাচের নাম হল "পালাপুংচোলাম্‌" বা "পুংচোলম্‌"। অত্যন্ত শ্রমসাধ্য ও দুরূহ এই নাচটি। যুবকরা ছাড়া বয়স্করা পারে না। খোলের তালের ছন্দে যে অভিনব দেহভঙ্গি ও পদচালনা দেখায়, তার তুলনা নেই। এটি হল প্রকৃত তাণ্ডব নাচ এবং প্রাণ-মাতানো। এ নাচের তালগুলি খুব কঠিন। তার কয়েকটির নাম হল "জয়াদিকতাল", "দশকুশ", "কোকিলাপ্রিয়", "উজ্জ্বল" ইত্যাদি। খোল বাজনা ও মন্দিরার নাচের সঙ্গে "তালইরা" ও "ধুমেলইরা" নাম দুটি নাম যুক্ত আছে। বাজিয়েদের এই অনুষ্ঠানটি শেষ হতে প্রায় দু' ঘণ্টা সময় নেয়।

এর পর শুরু হয় আসল অভিনয়, গল্প অনুসরণ করে। শিক্ষক, অর্থাৎ মহারাস পরিচালনার দায়িত্ব যাঁর উপরে, তিনি বাজিয়ে ও একদল বয়স্ক গায়িকা-একদিকে বসেন। গায়িকাদের হাতে একই রকমের ছোট মন্দিরা। গানের সময় নিজেরাই বাজায়। এই গানের দলে আর কোন বাজনা দেখিনি। গানের মেয়েদের কাঁধ থেকে বুক পর্যন্ত পাতলা উড়নি জড়ানো। বুক থেকে প্রায় হাঁটুর নীচ পর্যন্ত মণিপুরী তাঁতে তৈরী নানা নক্সাকাটা রঙীন লুঙ্গি শক্ত করে পরা। চুল টান করে বাঁধা। কপালে, নাকে, বৈষ্ণবদের রীতি অনুযায়ী নানা রকমের চন্দনের ছাপ। প্রধান শিক্ষকের সাজ-পোশাক পুরুষ বাজিয়েদের মত। আরম্ভে একটি উদ্বোধনের বাজনা হয়। তার পরে থাকে গানে গুরুবন্দনা, ভাগ্যচন্দ্র মহারাজের কথা ও বৃন্দাবনের বর্ণনা। কয়েকবার সংস্কৃত শ্লোকও সুরে আবৃত্তি করা হয়।

উদ্বোধন হলে পরে গানের সঙ্গে নাচের ভঙ্গিতে রাসমণ্ডলে প্রবেশ করল সখি "বৃন্দা"। সে ঢিমালয়ের নাচে মণ্ডলের চারিদিকে ঘুরে ঘুরে এই কথা জানিয়ে গেল যে, আজ মহারাসের রাত্রি, কৃষ্ণ আসলে তাঁকে কিভাবে তাঁরা সেবা করবে। মূল গায়িকা দলের সঙ্গে মাঝে মাঝে বৃন্দাও গান করল। এখানে বলে রাখা দরকার যে, গায়িকার দলকে মণিপুরীরা "সূত্রধর" বলে। আসলে গায়িকারা সংস্কৃত নাটকের মত সূত্র-

থাকে। বিলেতে একটা বিষয় পড়াবার জন্য বিভিন্ন শিক্ষক বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেন এবং সেভাবে বইও লেখা হয়। কিন্তু এখানে লেখকদের হাত-পা বাঁধা। নির্দিষ্ট গণ্ডীর বাইরে কিছু করবার নেই। পড়ানোর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা পুস্তকে লিপিবদ্ধ করবার সুযোগ পাওয়া যায় না। সিলেবাস অপরিবর্তনীয় না হলে উৎসাহী বিচক্ষণ শিক্ষকরা শিক্ষণ-বিদ্যায় পরীক্ষা-নিরীক্ষার সুযোগ পেতেন এবং এই অভিজ্ঞতা পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নত করতে সাহায্য করত।

শিক্ষা সংক্রান্ত পুস্তক প্রকাশে বিশেষজ্ঞ প্রকাশক প্রতিষ্ঠানের অভাবটাও উন্নত মানের পাঠ্যপুস্তক রচনার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। য়ুরোপ আমেরিকায় 'এডুকেশানেল পাবলিশার্স'দের শিক্ষার প্রসারের জন্য যথেষ্ট দান রয়েছে। আমাদের দেশের পাঠ্যপুস্তক মনোনয়নের প্রথাটা অত্যন্ত অনিশ্চিত। তথ্য ও ভাষার ভুলে কণ্টকিত বই অনুমোদিত হয়ে বিদ্যালয়ে পড়ানো হচ্ছে দেখেছি। আবার আপাতঃদৃষ্টিতে ভালো মনে হয়েছে, এমন বইও বাতিল হয়ে যায়। মনোনয়নের ব্যাপারটাকে তাই অনিশ্চিত লটারীর মতো মনে হয়। সম্ভ্রান্ত প্রকাশকদের অনেকে সেজন্য পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে আগ্রহান্বিত নন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফাট্‌কাবাজ প্রকাশকদের নিকট পাণ্ডুলিপি নামমাত্র মূল্যে বিক্রী করে দিতে হয় বলে লেখকরা পাঠ্যপুস্তকের মান উন্নত করবার জন্য পরিশ্রম করতে উৎসাহ বোধ করেন না।

আমাদের বিদ্যালয়ের সিলেবাসে দেখতে পাই তথ্য ও নীতি শেখাবার ঝোঁক। সাহিত্যপত্রেও এর ব্যতিক্রম নেই। অথচ প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভাষা শিক্ষা। ভাষাজ্ঞান জ্ঞানের রাজ্যে প্রবেশের ছাড়পত্র। স্বাধীনভাবে পড়ে বোঝবার ক্ষমতা জন্মালে যে-কোনো বিষয় আয়ত্ত করা সহজ হয়। আমাদের দেশে যত ছাত্র বিদ্যালয়ে ভর্তি হয় তার এক সামান্য অংশ বিদ্যালয়ের পড়া শেষ করবার সুযোগ পায়। বেশীর ভাগ ছাত্র কিছু-দূর পড়ে ঘরে ফিরে যায়। সেই সঙ্গে যদি ভাষার মোটামুটি জ্ঞানটা নিয়ে যেতে পারে তাহ'লে পুনরায় নিরক্ষরতায় ডুবে যাবার আশঙ্কা থাকে না।
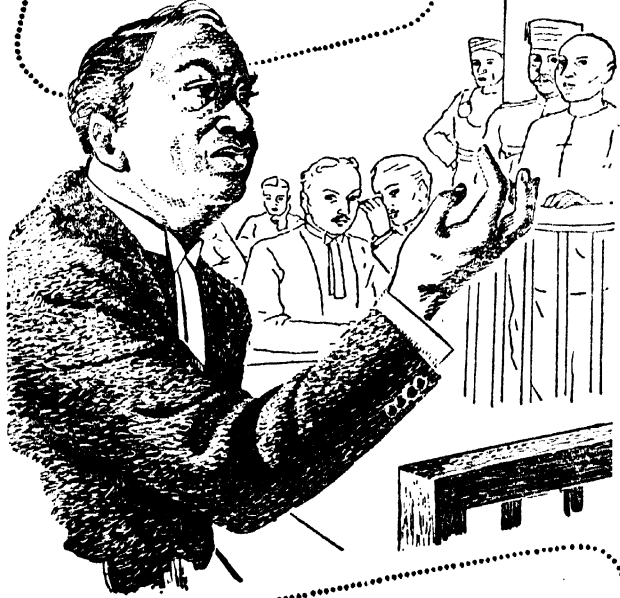
কেউ কেউ প্রস্তাব করেছেন যে, পাঠ্য-পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশের দায়িত্ব গভর্নমেণ্ট গ্রহণ করলে ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর হবে বলে আশা করা যায়। এ আশা পূর্ণ হবে বলে ভরসা করা চলে না। সরকারের তরফ থেকে কিছু কিছু চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু সে চেষ্টা শিক্ষার মানকে প্রভাবান্বিত করবার মতো সাফল্য লাভ করেনি। লাল ফিতার পরিবেশ নিরন্তর নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার অনুকূল নয়। গভর্নমেণ্ট শিক্ষা সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার ব্যবস্থা করে শিক্ষার মান উন্নয়নে সাহায্য করতে পারেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষণের সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ আছে, যাঁরা শিক্ষা ও শিক্ষার্থীর নানাবিধ সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত, পাঠ্যপুস্তক রচনার ভার তাঁদের উপরেই থাক। সোভিয়েট রাশিয়ার সর্বকিছুই রাষ্ট্রায়ত্ত। সেখানেও পাঠ্যপুস্তক রচনার দায়িত্ব একটি দপ্তরের উপরে থাকে না। শিক্ষা-বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির (Academy of Educational Sciences) গবেষকরা বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক এবং প্রসিদ্ধ মনোবিজ্ঞানীদের সহযোগিতায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেন। বিশেষ কোনো ব্যক্তি বা দপ্তরের উপর নির্ভর না করে শিক্ষা সম্বন্ধে যাঁদের অভিজ্ঞতা আছে তাঁদের সমবেত চেষ্টায় পাঠ্যপুস্তক লেখা হয়। প্রথম পাঠ রচনার বেলাতেও এই যত্নের ত্রুটি হয় না।

পাঠ্য পুস্তকের গুণ বিচারের প্রধান মাপকাঠি এই তিনটি : (১) লেখকের বিশেষ শিক্ষা, অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষার দার্শনিক ভিত্তি সম্বন্ধে তাঁর মতামত; (২) পুস্তকের বিষয়বস্তুর প্রকৃতি এবং উপযুক্ত কোনো শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে বিষয়বস্তু সন্নিবেশ করা হয়েছে কি না; (৩)পুস্তকের ছাপা, ছবি, কাগজ, বাঁধাই ইত্যাদি।

লেখকের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা বিচার করবার সময় আমরা বিদ্যালয়ে পড়ানোর সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ আছে কিনা, তা ভেবে দেখি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত অধ্যাপক বই লিখলে সমাদর হবে; উচ্চ বিদ্যালয়ে ছাত্র পড়াবার কোনো অভিজ্ঞতা না থাকলেও কিছু যায় আসে না। পুস্তক মনোনয়নের জন্য যে বিচারক সভা গঠিত হয় তার মধ্যেও কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরাই প্রাধান্য লাভ করে থাকেন। বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে যাঁদের প্রত্যক্ষ যোগ নেই তাঁদের পুস্তক শিক্ষার মান কতটুকু উন্নত করতে পারে তা ভাববার বিষয়। যোগ্য শিক্ষকরা উপযুক্ত মর্যাদা না পেয়ে নিরুৎসাহ হয়ে পড়েন। এজন্যই আমাদের বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের পড়াবার নিজস্ব পদ্ধতি কদাচিৎ দেখা যায়। একই বিষয় বিভিন্ন পদ্ধতিতে শেখানো চলে। এই পদ্ধতি সম্বন্ধে একমাত্র শিক্ষকরাই ওয়াকিবহাল হতে পারেন এবং তাঁদের পড়াবার বিশিষ্ট রীতি অনুসরণ করে পাঠ্যপুস্তক রচনাও শিক্ষকদের পক্ষেই সম্ভব।

বাঙলা বই-এর মুদ্রণ-পারিপাট্য এমন উৎকর্ষ লাভ করেছে যে, প্রকাশকরা যত্নবান হলে পাঠ্যপুস্তক ছাত্রদের নিকট আকর্ষণীয় এবং তাদের চোখের পক্ষে স্বাস্থ্যকর করে তোলা যেতে পারে। কিন্তু লাভের অংশ বাড়াবার জন্য তাঁরা তা করেন না। প্রকাশকরা মনোনয়নের জন্য যখন বই দেন তখন ছাপা, কাগজ ইত্যাদির মান যথাসম্ভব ভালো করবার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু পুস্তক মনোনীত হয়ে গেলে ব্যয়সংকোচের ব্যগ্রতায় সেই মানকে নিচু করতে বাধে না।

১৮৭৭ সালে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত পাঠ্যপুস্তক অনুসন্ধান কমিটির রিপোর্টে কৃষ্ণদাস পাল যে মন্তব্য করেছিলেন তা আজকের দিনেও সত্য। তিনি বলেছিলেন :

"So long as the position of the teachers are not raised, it would be hopeless to expect an improvement in the quality of teaching and without such improvement all labour in the production of good school-books would be practically thrown away".

শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতি না হলে ভালো পাঠ্যপুস্তক রচনার চেষ্টা বৃথা। সত্যিকার ভলো পাঠ্যপুস্তক রচনায় শিক্ষকরাই সবচেয়ে বড় অংশ গ্রহণ করবেন। কারণ তাঁদের মতো বিদ্যালয়ের শিক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষরূপে যুক্ত আর কে আছে? কিন্তু এর জন্য শিক্ষকদের ভদ্রভাবে জীবন ধারণের মতো আর্থিক সঙ্গতির ব্যবস্থা করা চাই। নিজেদের বৃত্তি সম্বন্ধে গৌরববোধ থাকাও প্রয়োজন; তা না হ'লে কোনো ভালো কাজ করা যায় না। গৌরববোধ জাগবার মতো পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে হবে।

সরকারী দপ্তর অথবা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদের পক্ষে কাগজে-কলমে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক রচনা সম্ভব হলেও তাকে ফলদায়ী করবার জন্য যোগ্যতা-সম্পন্ন শিক্ষকের প্রয়োজন। পাঠ্য-পুস্তকের পৃথক মূল্য কিছু নেই, পড়ানোর পদ্ধতির উপরেই তার মূল্য। পুস্তকের পাঠ শিক্ষার্থীরা যাতে আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে এবং এ বিষয় আরো পড়বার জন্য আগ্রহান্বিত হয়, উপযুক্ত শিক্ষক তা দেখবেন। ভালো পাঠ্যপুস্তক রচনা এবং ভালো করে পড়ানো পরস্পর নির্ভরশীল। একটিকে অবহেলা করলে আর একটির উদ্দেশ্য সফল হবে না। অপেক্ষাকৃত নিম্ন মানের পাঠ্যপুস্তকও ভালো শিক্ষকের গুণে কার্যকরী হতে পারে। কিন্তু অসন্তুষ্ট, অভাবগ্রস্ত শিক্ষকের হাতে পড়লে প্রথম শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তকও ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা। ভালো পাঠ্যপুস্তক নেবানো টর্চের মতো। উপযুক্ত শিক্ষকের স্পর্শে তা জ্ঞানের প্রদীপ হয়ে জ্বলে উঠতে পারে। কিন্তু সে স্পর্শ জীবন্ত হওয়া চাই।

ছেঁড়া পাতা

শংকর
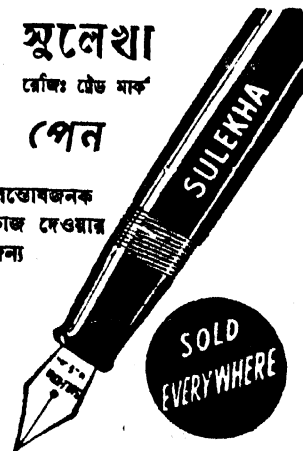
টেম্পল চেম্বারে সায়েবের ঘরে একটি র‍্যাকে অসংখ্য পুরোন কাগজে জমা হয়ে আছে। অনেক পুরোন কেসের ব্রীফ বাণ্ডিল বাঁধা হয়ে থাকে থাকে সাজান, উপরের ধুলো থেকে সহজেই বলা যায় বহুদিন সেখানে কোন হাত পড়েনি। মামলার শেষে অনেক কাগজপত্র লাল ফিতে দিয়ে বেঁধে আমিও মাঝে মাঝে সেখানে রেখে দিয়েছি। আইনপাড়ায় কোন কাগজ কেউ নষ্ট করে না, সব যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়, কখন কাজে লেগে যাবে কেউ জানে না।

এই পুরোন কাগজের পাহাড় থেকে স্থানচ্যুত হয়ে কেমন করে একটা ছেঁড়া পাতা মেঝেতে এসে পড়েছিল লক্ষ্য করিনি। বেয়ারা মোহনচাঁদ সেটি আমার টেবিলে তুলে দিয়ে বলল, 'বাবু আপনার কোন কাগজ পড়ে গেছে।'

ধুলো ঝেড়ে নিছক কৌতূহলের বশেই ময়লা কাগজটাতে চোখ বোলাতে লাগলাম। বড়লাটের কাছে ক্ষমা ভিক্ষার আবেদন। কোন এক রবীন্দ্র কলিতার বাবা মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের কাছে সন্তানের হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করছেন, প্রথম পাতা থেকে আর কিছু বোঝা গেল না। রবীন্দ্র কলিতা সম্বন্ধে জানার আগ্রহটা বোধ হয় সেই কারণেই আরও বেড়ে গেল। সায়েবের ব্যাগের ভিতর কাগজটা সযত্নে রেখে দিলাম। সময় মত তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যাবে।

সুযোগও এসে গেল। এক রবিবারে সমস্ত দুপুর ও বিকেলের কিছুটা কাজ করে আমরা চায়ের টেবিলে বসেছিলাম। অনেক কাজ করেছি। ব্যাগ থেকে ছেঁড়া কাগজটা বার করে সায়েবের দিকে এগিয়ে দিলাম, 'এই কেসটা সম্বন্ধে কিছু জানার ইচ্ছা ছিল, তাই ব্যাগে রেখে দিয়েছিলাম।'

'তুমি কি প্রাচীন পুঁথিপত্র নিয়ে গবেষণা করছ নাকি', সায়েব হেসে বললেন।

বাধ্য হয়ে কাগজটা পাবার ইতিহাস তাঁকে খুলে বললাম। কয়েক মিনিট ধরে কাগজটা মনোযোগ দিয়ে পড়লেন তিনি। 'বহুদিন আগেকার কথা, কিন্তু বেশ মনে আছে', চায়ের কাপটা নিজের দিকে টানতে টানতে তিনি বললেন।

'কেন? কী হয়েছিল?' তাঁর দিকে আরও ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করলাম।

ম্লান হেসে সায়েব বললেন, 'সে গল্প অন্যদিনে শুনলে ভাল হয়, শুধু শুধু আজকের চায়ের আসরটাকে নিরানন্দ করে তুলতে চাই না আমি।'

আমার কৌতূহল তখন মনের মধ্যে জেঁকে বসেছে। বললাম, 'পুরোন দিনের কথায় দুঃখ পাবার কিছু নেই। আমি এখনই শুনতে প্রস্তুত আছি।'

চায়ের কাপে আর একটা চুমুক দিয়ে সায়েব বাইরের খোলা মাঠের দিকে তাকালেন। বিকেলের পড়ন্ত রৌদ্রে গাছের ছায়াগুলো ক্রমশ আরও শীর্ণ ও লম্বা হচ্ছে। দুজন মালি ঘাসকাটা কল দিয়ে একমনে ঘাস কাটছে, আর ঘরের ভিতর আমরা দুজন মুখোমুখি বসে। সায়েব বলতে লাগলেন—

অনেক দিন আগেকার কথা, চট্টগ্রামে গিয়েছিলাম এক ক্রিমিন্যাল কেসে। দিন সাতেক থাকার দরকার, দায়রা জজের আদালতে কেস। একদিন সন্ধ্যায় ওখানকার স্থানীয় এক উকিল আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, সঙ্গে একটি বৃদ্ধ ভদ্রলোক। মাথার চুল প্রায় সমস্ত শাদা হয়ে এসেছে, মুখে খোঁচা খোঁচা শাদা দাড়ি। চোখগুলো কোটরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে।

ভদ্রলোক নিজে ভাল ইংরিজী জানেন না। সঙ্গের ছোকরা উকিলটিই বললেন, 'নিরুপায় হয়েই খগেনবাবু আপনার কাছে এসেছেন। ওঁর বড় ছেলেটিকে আপনিই বাঁচাতে পারেন।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোকটি ছলছল চোখে এগিয়ে এসে আমার হাতটা চেপে ধরলেন।

'রাজনৈতিক অপরাধের মামলা' উকিল বাবু বললেন।

খগেনবাবুর বড় ছেলে রবীন্দ্র কলিতা। নামটা অসমীয়া মনে হলেও ও'রা আসলে বাঙ্গালী ও চট্টগ্রামের অধিবাসী।

সাব-পোস্ট মাস্টার খগেনবাবু এক বছর রিটায়ার হয়েছেন। পেনশনের সামান্য টাকায় সংসার চলে না। যা কিছু সঞ্চয় মেয়ের বিয়েতে প্রায় শেষ হয়ে গেছে। রবীন্দ্রের আশায় দিন কাটছে, ছেলে বড়ো হয়ে রোজগার করবে। বছর আঠার বয়স, দীর্ঘ সুঠাম দেহ। ইস্কুল ছেড়ে কলেজে ঢুকেছে। পড়াশুনায় ভাল ছেলে। বাপমায়ের অগাধ বিশ্বাস, সে সংসারের মুখোজ্জ্বল করবে।

গভীর রাতে ডাকাডাকিতে একদা খগেনবাবুর ঘুম ভেঙ্গে গেল। দরজা খুলে দেখলেন লাল পাগড়িতে বাড়ি ঘিরে ফেলেছে। রাগতস্বরে তিনি বললেন, 'আমি সরকারের পেনশন হোল্ডার, আমার বাড়িতে রাত্রে হামলা কেন?'

পুলিস অফিসারটি বললেন, 'আপনার ছেলে রবীন্দ্র কলিতাকে চাই।'

খগেনবাবু অবাক। 'আপনি নিশ্চয় ভুল করেছেন। আমার ছেলে নিতান্ত বালক, ইস্কুল ছেড়ে সবে কলেজে ঢুকেছে।'

'আজ্ঞে ভুল আমাদের সহজে হয় না।' পুলিস অফিসারটি বিছানা থেকে ঘুমন্ত রবীন্দ্রকে তুলে নিজের গাড়িতে তুললেন।

পরের দিনই খগেনবাবু থানায় গেলেন। স্বদেশী কাজে সন্দেহজনক গতিবিধির জন্য পুলিস বহু ছেলেকে হাজতে এনেছে, রবীন্দ্র তাদেরই একজন।

এনকোয়ারী শেষ হতে সময় লাগবে। ইতিমধ্যে জামিনও চলবে না। সপ্তাহখানেক থানায় যাতায়াত করলেও ছেলের সঙ্গে মাত্র একদিন দেখা হয়েছিল। কোর্টে কেস ওঠার অপেক্ষায় ছিলেন খগেনবাবু।

কিন্তু একদিন ভোরে আবার কড়ানাড়ার শব্দে তিনি দরজা খুলে দেখলেন, দুই লরী বোঝাই পুলিস সমেত দারোগা এসেছেন, সঙ্গে তল্লাসী পরোয়ানা। সমস্ত বাড়ি তছনছ করে যেখানে যা পেল খুলে দেখল, কিছু বই ও কাগজ সঙ্গে নিল তারা। খগেনবাবু স্তম্ভিত। কিন্তু পুলিস অফিসারটি যাবার আগে বললেন, 'গতকাল সন্ধ্যায় আপনার ছেলে হাজতের মধ্যে একজন দারোগাকে খুন করেছে।'

উকিলটি থামলেন। 'আপনি যে মামলা করছেন, ঠিক তারপরেই ওই কোর্টে রবীন্দ্রের কেসটা উঠবে।'

ভদ্রলোকের মুখের দিকে চেয়ে আমি আর না বলতে পারলাম না। 'আপনার ছেলের কেসটা করেই কলকাতা ফিরব।'

পরের দিনই রবীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করার জন্য থানায় গেলাম। ডেপুটি সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিসকে আগেই খবর দিয়ে দেখা করার অনুমতি নিয়ে রেখেছিলাম। বাইরে পুলিস দাঁড়িয়ে, ঘরের ভিতর আমি রবীন্দ্র কলিতার জন্য অপেক্ষা করছি। একটু পরেই সে এল। নিতান্ত বালক, গোঁফের রেখা পর্যন্ত স্পষ্ট হয়নি। বড় বড় চোখদুটি দীপ্তিতে পূর্ণ। চুলগুলো ঢেউ খেলান।

আমি বললাম, 'রবীন্দ্র, তোমার কেসটা আমি করব ঠিক করেছি।'

সে কিন্তু গম্ভীরভাবে বলল, 'আপনাকে ধন্যবাদ, কিন্তু কোন প্রয়োজন নেই। আমি জানি আমি ঠিকই করেছি, এবং ফলাফল জেনেই করেছি।'

'তুমি নিজেই খুন করেছ রবীন্দ্র?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

'হ্যাঁ, আমি তো সবাইকে বলেছি, আমিই হত্যা করেছি।' সে নির্ভীকভাবে বলল, আঠার বছরের ছেলের এত মনোবল কোনদিন দেখিনি।

'রবীন্দ্র, অবুঝ হতে নেই। আমি আবার আসব। ইতিমধ্যে মনস্থির করা চাই।' আমি সেদিনের মত বিদায় নিলাম।

পরের দিন কোর্ট থেকে সোজা গেলাম থানায়, রবীন্দ্র আবার এসে দাঁড়াল। প্রথমে আমরা সাহিত্য, খেলাধুলা ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করলাম। রবীন্দ্র বেশ কথা বলছিল। বিদায় নেবার কিছু আগে আসল প্রসঙ্গের অবতারণা করলাম, 'রবীন্দ্র, তোমার মামলা দিন কয়েকের মধ্যেই কোর্টে উঠবে।'

এক মুহূর্তের মধ্যে সে গম্ভীর হয়ে উঠল। 'আমি নিজেই খুন করেছি। রাগের মাথায় খুন করিনি, ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করেই শয়তানটাকে শাস্তি দিয়েছি।'

রবীন্দ্রকে বোঝালাম, 'ধীর মস্তিষ্কে কাজ করতে হবে, আমাকে কেসটা তৈরি করার সুযোগ দাও।' কোন উত্তর না দিয়েই সে ভিতরে চলে গেল।

তার বাবা সব শুনে কাঁদতে লাগলেন; 'আপনাকে কিছু করতেই হবে। ওর মাথায় নিশ্চয়ই ভূত চেপেছে, নইলে প্রাণের মায়া করে না।'

পরের দিন আবার গেলাম রবীন্দ্রকে দেখতে। সঙ্গে চকোলেট ও বিস্কুট নিয়ে গিয়েছিলাম। দুজনে আনন্দ করে ভাগাভাগি করে সেগুলো খেতে লাগলাম। সে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, 'টেগোরের কিছু পড়েছেন?'

আমি বললাম, 'তাঁর যে-সব বই ইংরিজীতে অনুবাদ হয়েছে প্রায় সব পড়েছি। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ও আছে। জোড়াসাঁকোতে টেগোরের বাড়িতে অনেকবার গেছি।'

রবীন্দ্র খুব আগ্রহের সঙ্গে শুনল, 'আমাদের দুজনের একই নাম, যদিও আমি কবি নই।'

আমি হেসে উঠলাম। কিন্তু আজ সময় নষ্ট করলে চলবে না। তার হাত চেপে ধরে বললাম, 'তোমার বাবা ও মায়ের কেঁদে কেঁদে কী অবস্থা হয়েছে জান না, তাঁদের মুখ চেয়েই আমি রোজ এখানে আসছি।'

রবীন্দ্র আবার গম্ভীর হয়ে উঠল। কোথায় মিলিয়ে গেল তার মুখের হাসি। আর একটা চকোলেট এগিয়ে দিলাম তার দিকে, সে নিল না।

আমি বললাম, 'রবীন্দ্র, অন্তত আসল ঘটনাটি আমাকে বুঝিয়ে বল।' কেন জানি না কোন আপত্তি করল না সে।

'ওই শয়তান দারোগাটাকে আমরা

অনেক দিন ধরে খুঁজছিলাম। লোকটা মানুষ নয় পশু। ওর ধারণা ছিল রুলের গুঁতো ও আঙ্গুলে পিন ফুটিয়ে যে-কোন স্বদেশীওয়ালাকে ঘায়েল করা যায়। অনেক দিন ধরে বিভিন্ন থানায় বুটের ধাক্কায় লোককে, জর্জরিত করে এসেছে। কোন প্রমাণ না পেয়ে স্বীকারোক্তির আশায় আমাদের উপর তার সবরকম ওষুধ ব্যবহার করছিল সে। ভাতে কাঁকর বোঝাই করে দিচ্ছিল পশুটা। শেষের দিকে, সমস্ত দিনে এক গ্লাস মাত্র জল বরাদ্দ। আমার অন্য বন্ধুরা ইতস্তত করছিল, কিন্তু আমি নিজের কর্তব্য ঠিক করে নিলাম। সবার অলক্ষ্যে একটা থান ইট জোগাড় করে রেখেছিলাম। শয়তানটার সাহস এমন বাড়ল যে, একাই রুল কাঠ নিয়ে আমার সেলে ঢুকে পড়ল একদিন। আমিও সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম, পুরো থান ইটের এক ঘায়ে মাথাটা থেঁতলে গেল।' রবীন্দ্র পায়চারি করতে লাগল. 'আমি মোটেই দুঃখিত নই।'

যে কেস-এ চট্টগ্রাম এসেছিলাম, সেটি শেষ হওয়ার ঠিক পরেই জেলা জজের কোর্টে রবীন্দ্রের মামলা আরম্ভ হল। ক্ষণিক উত্তেজনার বশে হত্যা বলে প্রমাণ করার ইচ্ছা ছিল আমার। আইনের চোখে কালপেবল হোমিসাইড ও মার্ডারের পার্থক্য অনেক। পূর্বাহ্নে চিন্তা করে ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করার নাম মার্ডার। আর ক্ষণিক উত্তেজনার প্ররোচনায় কোন আঘাতজনিত মৃত্যুর জন্য অপেক্ষাকৃত লঘু শাস্তি হয়ে থাকে। আইনের ভাষায় এর নাম কালপেবল হোমিসাইড নট এমাউন্‌টিং টু মার্ডার। যদি প্রমাণ করতে পারি মৃত দারোগাটির অমানুষিক দুর্ব্যবহারে রবীন্দ্রের বয়সী কোন যুবকের পক্ষেই শান্ত থাকা সম্ভব নয়; ধৈর্যের শেষ বাঁধও একদিন ভেঙ্গে পড়ল এবং সেই উত্তেজনার মুহূর্তে উন্মত্তের মত সে দারোগাকে আঘাত করে এবং সেই আঘাতে তাঁর মৃত্যু নিতান্ত আকস্মিক। তবে আট দশ বছরের বেশী জেল হবে না।

কিন্তু কিছুই সম্ভব হল না। কোর্টে বিসমক্ষে রবীন্দ্র বলল যে, তার কৃত-কর্মের জন্য সে মোটেই দুঃখিত নয় বরং অন্যায়ের প্রত্যুত্তর দিতে পারায় সে তৃপ্ত। সবাই চমকে উঠে তার দিকে তাকিয়ে রইল। জজও বিশ্বাস করিতে পারছিলেন না, বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইলেন তিনি রবীন্দ্র কলিতার দিকে। আমিও হতাশ হয়ে চুপচাপ এক কোণে বসে রইলাম, কিছুই করার নেই। কোর্টে তিল ধারণের স্থান নেই, রবীন্দ্রের বাবা ফুঁপিয়ে কাঁদছেন। আমার জুনিয়র সেই তরুণ উকিলটি তাঁকে কোর্টের বাইরে নিয়ে গেলেন।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যে মামলা শেষ। বিচারাধীন থাকা কালে রাজকর্মচারীকে হত্যার অপরাধে রবীন্দ্র কলিতার মৃত্যু-দণ্ডের আদেশ দিয়ে জজ সাহেব জানতে চাইলেন রবীন্দ্রের কোন বক্তব্য আছে কিনা, রবীন্দ্র বলল, 'হ্যাঁ, আমার কিছু বলার আছে।'

কোর্ট ভর্তি লোক তার দিকে তাকিয়ে রইল। আদেশপত্রে সইয়ের জন্য কলমটা দোয়াতে ডুবিয়ে জজ সায়েবও আসামীর মুখের দিকে চাইলেন। আসামীর কাঠ-গড়া থেকে জজের দিকে মুখ ফিরিয়ে সে বলল, 'দারোগা বিপদভঞ্জন দত্তকে খুন করে আমি মোটেই দুঃখিত নই। বরং আনন্দিত'। ঘরে যেন বজ্রাঘাত হল। আঠারো বছরের রবীন্দ্র কলিতার মুখ ঘৃণায় বিকৃত হয়ে উঠল। এক মুহূর্তের জন্যও তার গলা কাঁপল না।

চট্টগ্রামের কাজ তো শেষ হল। বিদায় নেবার আগে রবীন্দ্রকে শেষবারের মত দেখতে গেলাম। বেলা প্রায় পাঁচটা তখন। একবার ইচ্ছা করল, চলে যাই, দেখা করে কোন লাভ নেই, যা হবার তা হয়ে গেছে। কিন্তু রবীন্দ্রকে না দেখে উঠতে পারলাম না। ভিতরের তালা খোলার আওয়াজে বুঝলাম রবীন্দ্রকে পুলিস নিয়ে আসছে আমার সামনে। ভাবতে লাগলাম, প্রথমে কী বলব তাকে, কেমন অবস্থায় আছে সে।

কিন্তু কোন পরিবর্তন হয়নি তার। তেমনি হাসিতে ভরা মুখ। তবুও আমার চোখ তুলতে সাহস হচ্ছিল না, কোন রকমে বলতে গেলাম, 'রবীন্দ্র, আমি সত্যি...'

আমাকে বাধা দিয়েই চোখদুটো বড় করে বলল, 'চকোলেট এনেছেন তো?'

কোটের পকেট থেকে চকোলেটের

ঠোঙাটা এগিয়ে দিতেই ছোট্ট ছেলের মত একসঙ্গে দুটো চকোলেট মুখে পুরে দিল সে।

ফুটবল খেলা দিয়ে আমাদের আলোচনা আরম্ভ হল। নিজের সম্বন্ধে কোন কথা রবীন্দ্র তুলতেই দিল না। কোন মন্ত্রবলে সে যেন ওই প্রসঙ্গটা ভুলে গেছে।

'ত্রিশ বছরে ভারতবর্ষে কত লোক দেখলাম। কিন্তু রবীন্দ্রকে আজও ভুলতে পারলাম না। আঠার বছরের ছেলে, অথচ জীবনের সব আকর্ষণকে যেন জয় করে ফেলেছে।' সায়েব আস্তে আস্তে বলে চলেছেন, বাইরে অন্ধকার হয়ে এসেছে। জিজ্ঞাসা করলাম, 'আলোটা জ্বালিয়ে দেব?' তিনি বারণ করলেন, 'সব সময় আলো ভাল লাগে না। এই তো বেশ আছি।'

'তারপর?' আমি জিজ্ঞাসা করলাম।
'তারপর আমরা অনেক আলোচনা করলাম।'

রবীন্দ্র আরও বলল, বাবার অজান্তে বছর খানেক ধরেই সে কাজ করছিল। কত দিন গোপনে ইস্কুল থেকে পালিয়ে সে ক্লাবে গেছে। কোথায় কোন ক্লাব সেসব বলেনি।

'তোমার বৃদ্ধ বাবা-মায়ের কথাও ভেবে দেখা উচিত ছিল।' আমি বললাম, 'সংসারের অবস্থা কেমন হয়েছে নিশ্চয়ই জানো।'

রবীন্দ্র ম্লান হাসল, 'আমার পরেও তো একটি ভাই রয়েছে, এবারে ম্যাট্রিক দেবে।' সে থামল। 'আপনারা কলকাতায় থাকেন, যদি দয়া করে কিছু করে দেন, অনর্থক আমার জন্য এখানে কয়েকটা দিন নষ্ট করে গেলেন।'

রবীন্দ্র ও আমি সামনাসামনি বসে কথা বলছিলাম, কিন্তু দুজনের মধ্যে লোহার রেলিংয়ের দুস্তর ব্যবধান। দুটো রেলিং-এর মধ্য দিয়ে আমি হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। জনৈক পুলিস অফিসার একটু আগেই বলে গেছেন, 'আমি দুঃখিত, কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের পর আরও পনের মিনিট কেটে গেছে।' রবীন্দ্র ঝাঁকুনি দিয়ে করমর্দন করল আমার সঙ্গে।

কলকাতায় ফেরার কয়েক দিন পরেই অর্ধ উন্মাদ অবস্থায় রবীন্দ্রের বাবা চেম্বারে হাজির। স্টেশন থেকেই সোজা চেম্বারে চলে এসেছেন, হাতে একটা চামড়ার সুটকেস।

'কোনো খবর না দিয়েই হঠাৎ কলকাতায় চলে এলেন, কী ব্যাপার?'

'বাড়িতে টিকতে পারলাম না, অসম্ভব।' খগেনবাবু কপালে হাত দিয়ে বললেন, মিনিটখানেক ফ্যালফ্যাল করে দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে তিনি নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না, কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন। 'রবির মা প্রায়ই ফিট হচ্ছেন। ছেলেটাকে কোনরকমে প্রাণে রক্ষা করা যায় না?' কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে মুছতে চামড়ার স্যুটকেসটা টেবিলের উপর তুললেন তিনি। পকেট থেকে চাবি বার করে ডালাটা খুললেন। এককোণ থেকে জামা কাপড় সরিয়ে একটা কাপড়ের পুঁটলি বার করলেন খগেন্দ্র কলিতা। অতি যত্নে কম্পিত হাতে বাঁধন খুলতে কয়েক গাছা সোনার চুড়ি বেরিয়ে পড়ল। আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'ওর মায়ের শেষ সম্বল। ওইগুলো আমাকে দিয়ে জোর করে পাঠিয়ে দিলেন, আপনাকে কিছু করতেই হবে।'

আমি নির্বাক হয়ে বসে রইলাম। কি করতে পারি?

'আপনারা বড় ব্যারিস্টার, আপনারা ইচ্ছে করলেই ছেলেটাকে বাঁচাতে পারেন।' রবীন্দ্রের বাবা আবার কাপড়ের খুঁটে চোখ মুছতে লাগলেন।

হাইকোর্টে আপীল ফাইল করা হল। পরের দিনই। খগেনবাবু কলকাতায় রয়ে গেলেন কিছুদিনের জন্য।

জেল থেকে রবীন্দ্রের চিঠিও পেয়েছি। সেনসার করা চিঠি, এককোণে রবার স্ট্যাম্পে সেই কথাই লেখা আছে। রবীন্দ্র লিখেছে সে ভালই আছে। এখন আর চালে কাঁকর নেই, রীতিমত সুখাদ্য। ভগবান তাকে বিশ্বাস ও বল দিয়েছেন, কোন কিছুতেই সে ভয় পায় না।

আরও একটা চিঠি এল, বাংলায় ঠিকানা লেখা। সুধাংশু কর, এডভোকেট, আমার সঙ্গে তখন বসত।

............সায়েব
বড় ব্যারিস্টার,
কলকাতা হাইকোর্ট

ঠিকানাটাও আমাকে ইংরিজী করে সেই শোনাল। আঁকা বাঁকাভাবে রবীন্দ্রের মা লিখেছেন, জজেদের যেন আমি বুঝিয়ে বলি ছোট ছেলে বুঝতে পারেনি। ভগবানের কাছে আমার মঙ্গলের জন্য তিনি দিনরাত প্রার্থনা করছেন।

প্রার্থনা করেও কিছু হল না। আপীলে আইনের যুক্তি বিশেষ কিছুই দেখাতে পারলাম না। তবুও ঘণ্টাখানেক আর্গুমেণ্ট করলাম। দুজন জজ মন দিয়ে শুনলেন আমার বক্তব্য। সরকারী পক্ষের উকিলও তাঁর বক্তব্য উপস্থিত করলেন তাঁদের সামনে। জজেরা রায় দিলেন এই কেসে লঘুতর শাস্তি দেওয়ার কোন যুক্তি নেই।

'এখন উপায়?' রবীন্দ্রের বাবা জিজ্ঞাসা করলেন।

হঠাৎ অন্ধকারকে বিদেয় করে ঘরের আলো জ্বলে উঠল। সায়েব সুইচের দিকে ঘাড় ফেরালেন। দেওয়ান সিং কোন কাজে বাইরে গিয়েছিল, ফিরে এসেই আলো জ্বালিয়ে দিয়েছে। 'দেওয়ান, আলোটা নিভিয়ে দাও, আজ কোন কাজ করব না। অন্ধকারে বেশ আছি,'। সায়েবের কথায় দেওয়ান আলো নিভিয়ে দিল। ক্ষণিকের আলোয় বিরক্ত হয়ে রাত্রি যেন আরও খানিকটা অন্ধকার মুখ থেকে ফুঁ দিয়ে ঘরের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে গেল।

'সরি ফর দিস ইনটাররাপসন', সায়েব আবার আরম্ভ করলেন।

বড়লাটের কাছে একটা আবেদন করে দেখব ভাবলাম। ডিসেম্বর মাস, বড়লাট ওই সময়ে কলকাতায় আসেন প্রতিবার। পাতা পনের লিখেছিলাম, আবেদনপত্র খগেনবাবু সই করলেন। যে পাতাটা আজ আমাকে দেখালে ওটা তারই কপি।

বেলভেডিয়রে বড়লাটকে ঘটনাটা বুঝিয়ে বললাম। অতি সামান্য বয়স আসামীর, প্রায় বালক। প্রাণদণ্ড মকুব করে অন্য যে কোন শাস্তি দিন। মন দিয়ে আমার কথা শুনে তিনি বললেন, 'আচ্ছা ভেবে দেখি। রাইটার্স বিল্ডিং ও গবর্নরের উপদেশ না নিয়ে আমার পক্ষে কিছু করা সম্ভব নয়।'

বললাম, 'নিশ্চয়ই। তবে আসামীর বৃদ্ধ পিতার একমাত্র অনুরোধ ছেলেটির প্রাণরক্ষা হয় যেন।'

কয়েক দিন পরে আবার খোঁজ নিলাম। গভর্নমেণ্ট এখনও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি।

খগেন কলিতা রোজ এসে বসে থাকেন চেম্বারে, কখন উত্তর আসে ঠিক নেই। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'বাড়িতে সমস্ত খবর পাঠাচ্ছেন তো?'

তিনি ঘাড় নাড়লেন, 'রোজ একটা করে চিঠি ছাড়ি।'

টেম্পল চেম্বারে খগেন্দ্র কলিতার নামে শেষ পর্যন্ত সেই বহুপ্রতীক্ষিত চিঠিটা এলো। অন হিজ ম্যাজেস্টিস সার্ভিস মার্কা খামে আষ্টেপৃষ্টে লাল-লাল শীলমোহর। খগেনবাবু তখনও চেম্বারে আসেননি। ও'রই নামে চিঠি বলে নিজেও খুলতে পারলাম না। অস্থির

আবেগে চেয়ার ছেড়ে পায়চারী করছি কখন তিনি আসবেন। অন্যদিন দশটার মধ্যেই খোঁজ নিতে আসেন, অথচ সাড়ে দশটা হয়ে গেল আজ।

ভাবতে ভাবতেই তিনি এসে গেলেন। 'আপনার চিঠি এসে গেছে' ক্র্যাফ্‌ট কাগজের মোটা খামটা এগিয়ে দিলাম তাঁর দিকে। হাত-পা কাঁপছে তাঁর, প্রথম চেষ্টায় খামটা ছিঁড়তেই পারলেন না, শরীরের সকল শক্তি যেন উঠে গেছে। দ্বিতীয়বারের চেষ্টায় চিঠিটা খাম থেকে বেরিয়ে এল। তাঁর কোটরে ঢোকা স্তিমিত চোখ দুটোতে যেন প্রাণের বন্যা এসেছে। কী লিখেছে?

ব্যর্থ, সব প্রচেষ্টা ব্যর্থ। বড়লাট এই কেসে হস্তক্ষেপ করতে অনিচ্ছুক।

খগেনবাবু চিঠিটা আবার পড়লেন। তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে বারবার পড়লেন। চিঠিটা ভাঁজ করে পকেটে রেখে ঝাপসা চোখে বোবার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন। আমি কোন কথা বলতে পারলাম না। তিনি বেরিয়ে গেলেন, আমাকেও যেতে হল। এগারটার সময়, কোর্টে কেস ছিল।

এর কিছুদিন পরেই রবীন্দ্র কলিতার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা কার্যকরী হয়, খবর পেয়েছিলাম।

সায়েব চুপ করলেন।

ছেঁড়া কাগজটা টেবিলে পড়ে রয়েছে। তাকে কেন্দ্র করেই আমরা অনেক বছর আগে ফিরে গিয়েছিলাম।

আমি চেয়ার থেকে উঠতে যাচ্ছিলাম। 'দাঁড়াও', সায়েব বললেন, 'এখনও সব শেষ হয়নি।'

'আরও কিছু বাকি আছে?'

অন্ধকারে তাঁর মুখটা ভাল করে দেখতে পেলাম না। তবে শুনতে পেলাম তিনি বলছেন, 'রবীন্দ্র কলিতার কাহিনী এখানে শেষ হলেও তার পরিবারের সঙ্গে আরও কিছুদিন সংযোগ রাখতে হয়েছিল আমাকে'—

জেল থেকে শেষ চিঠিতে রবীন্দ্র লিখেছিল, মরতে সে একটুও ভয় পাবে না। আমি যেন তার সম্বন্ধে অহেতুক চিন্তা না করি। তবে সম্ভব হলে মাঝে মাঝে যেন বাড়ির খবর নিই, বিশেষ করে ছোট ভাইটার কোন ব্যবস্থা যদি সম্ভব

রবীন্দ্রের শেষ অনুরোধ আমি ভুলিনি। শোকোচ্ছ্বাস কিছুটা কমবার পরই খগেন্দ্রবাবুকে লিখে দিলাম, ম্যাট্রিক পরীক্ষার পরই তাঁর ছোট ছেলে অমরেন্দ্রকে যেন আমার কাছে পাঠিয়ে দেন।

তিনি উত্তরে লিখলেন, অমরেন্দ্রর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমি চিন্তা করছি বলে তিনি কৃতজ্ঞ। তবে এইটুকু ছেলে বিদেশ বিভুঁয়ে একা থাকতে পারবে কিনা সন্দেহ।

আমিও জোর করে লিখে দিলাম, কম বয়স থেকেই একটু সাহসী হওয়া ভাল, তাছাড়া কলকাতায় আমি নিজে তার দেখাশোনা করব।

পরে বুঝেছি, খুব ভুল করেছিলাম এই চিঠি লিখে।

লাল রঙের চামড়ার স্যুটকেস হাতে শিয়ালদহ স্টেশনে অমরেন্দ্র একদিন নামল। সেখান থেকে মিডলটন স্ট্রীটের বাড়িতে নিয়ে গেলাম তাকে।

দেখতে সে অনেকটা রবীন্দ্রের মত। বড়বড় দুটি চোখ, ফুলো ফুলো গাল। ভারি লাজুক কিন্তু মুখে হাসি ভরেই আছে। দুজনে খুব ভাব জমে উঠল।

অমরেন্দ্রকে শ্রীরামপুরে উইভিং কলেজে ভর্তি করে দিলাম। পাস করতে পারলে ভাল চাকরি হয়ত করে দিতে পারব। ওখানকার হোস্টেলও বেশ পরিষ্কারপরিচ্ছন্ন। আমি প্রায়ই দেখতে যেতাম অমরেন্দ্রকে। সেও আসত প্রতি রবিবার আমার কাছে, একবার স্পোর্টসে অনেক প্রাইজও পেল। লেখাপড়াও করছিল ভালভাবে। প্রথম বছরের শেষে অমরেন্দ্র দেশ থেকে ঘুরে এল কিছুদিনের জন্য।

কোর্ট থেকে সবেমাত্র ফিরে চায়ের টেবিলে বসেছি টেলিফোন এল। অমরেন্দ্র কলিতা সাংঘাতিক অসুস্থ, আমাকে এখনই যেতে হবে।

গিয়ে দেখলাম অমরেন্দ্রের বিছানার পাশে একজন ডাক্তার, রক্ত বমি হচ্ছে প্রায়ই, ডাক্তার বললেন, 'এক্স-রে না নিয়ে কিছুই বলা যাবে না।

কলকাতায় মেডিকেল কলেজ থেকে যখন শুনলাম, টি বি, এডভান্সড স্টেজ। আমি স্তম্ভিত।

মদনাপল্লী যক্ষ্মা নিবাসে টেলিগ্রাম পাঠালাম, আর একটি চট্টগ্রামে খগেন্দ্র কলিতাকে। দিন কয়েকের মধ্যে তিনি এলেন, আমি মাথা নীচু করে রইলাম। অমরেন্দ্রকে কলকাতায় আনার সব দায়িত্ব আমার। তার খাওয়া দাওয়ার কোন ত্রুটি রাখিনি, তবুও এই রোগ।

মদনাপল্লীর পথে হাওড়া স্টেশনে একটা রিজার্ভ কামরায় ওদের তুলে দিয়ে এলাম। সপ্তাহ খানেক পরেই খগেনবাবু চলে এলেন। তাঁর মুখে শুনলাম অমরেন্দ্র একটু ভাল। চট্টগ্রামের ট্রেনে উঠে খগেনবাবু আমাকে বললেন, "এক কুক্ষণে আমার সঙ্গে আপনার দেখা হয়েছিল, নইলে চিরদিন আপনার বোঝা হয়েই রইলাম। পূর্ব জন্মে কোন অপরাধ করেছিলাম, নইলে এত শাস্তি পাব কেন।'

সান্ত্বনা দান নিরর্থক। নীরবে দাঁড়িয়ে রইলাম, ট্রেন ছেড়ে দিল।

মদনাপল্লী থেকে অমরেন্দ্র প্রায়ই চিঠি লিখত—দেহ ক্রমশ দুর্বল হয়ে আসছে, মাথা ঝিমঝিম করে। উঠে বসতে গেলেই বমি আসে। ওখানকার ডাক্তারও লিখলেন তিন মাসের চিকিৎসায় কিছুই হয়নি। দিন ঘনিয়ে আসছে; বড় জোর এক মাস। পরের চিঠিতে ডাক্তার লিখলেন 'রোগী নিজে লিখতে অক্ষম, কিন্তু আমাকে বারবার বলছেন আপনাকে লিখতে, যেন তাঁর দেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন। নিজের দেশে তিনি মরতে চান, আপনার কাছে তাঁর এই শেষ অনুরোধ।'

চট্টগ্রামের পথে শিয়ালদহ স্টেশনে তাকে শেষ দেখলাম। স্ট্রেচারে একটা কঙ্কাল পড়ে রয়েছে। প্রায় সংজ্ঞাহীন আমাকে চিনতে পারল না। তবুও আনন্দ আমার, তার দেশে ফেরার শেষ ইচ্ছা হয়ত পূর্ণ হবে। কাছে গিয়ে ডাকলাম 'অমরেন্দ্র, চিনতে পার আঙ্কলকে?' কোন উত্তর এলো না।

তার শেষ ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল দেশে ফেরার সাতদিন পরেই অমরেন্দ্র কলিতা তার দাদার কাছে ফিরে গিয়েছিল।

• • • •

এবার আলোটা জ্বালিয়ে দিলাম আধ ছেঁড়া কাগজটা টেবিলে শুয়ে আমাদের দুজনের দিকে যেন ড্যাব ড্যাব করে তাকিয়ে আছে।

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(২৮)

বিশব-পরিভ্রমণ সমাপ্ত হল, চার্লস চ্যাপলিন হলিউডে ফিরে এলেন। ইউনাইটেড আর্টিস্টস্ প্রতিষ্ঠানের বড়কর্তা তখন জো শেনক্। চার্লির তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধু। হলিউডে প্রত্যাবর্তনের দিন কয়েক বাদে এই জো শেনকের প্রমোদ-তরণীতে বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তিনি হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন, অকস্মাৎ সেখানে পলেট গডার্ডের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। আলাপ থেকে অন্তরঙ্গতা। পরিচয় থেকে প্রণয়। কিন্তু পলেটকেই যে বিবাহ করবেন চার্লি, পরবর্তী বইয়ে পলেটকেই যে তিনি নায়িকার ভূমিকায় নামাবেন, তখনও তা কেউ বুঝে উঠতে পারেনি।

তন্বী, সুন্দরী, স্বর্ণকুন্তলা। তা ছাড়া, চার্লির সঙ্গে তাঁর আকৃতিগত সাদৃশ্যও খানিকটা ছিল। চার্লির মতই তিনি খর্বাকৃতি। পলেটের বয়স তখন ২৩ বছর। এর আগে আর যে-দুটি মেয়েকে চার্লি বিবাহ করেছিলেন, দুজনেই তাঁরা পলেটের চাইতে ছোট; পলেটের পরে যাঁকে বিবাহ করেছেন, তিনিও। অভিনয়ে পলেট অনভিজ্ঞা নন। চার্লির সঙ্গে দেখা হবার আগে চলচ্চিত্রে আর রঙ্গমঞ্চে বছর কয়েক তিনি অভিনয় করেছেন। তার আগে ছিলেন জীগ-ফিল্ড-সম্প্রদায়ে। জীগফিল্ডের "নো ফুলিং" আর "রায়ো রিটা" বই দুটিতে নেচে আর গান গেয়ে খানিকটা সুখ্যাতিও তিনি পেয়েছিলেন। চলচ্চিত্রের মধ্যে এখানে "এ কীড ফ্রম স্পেন"-এর উল্লেখ করা যেতে পারে। এ-বইয়ে তাঁর সহ-অভিনেতা ছিলেন এডি ক্যান্টর। এ-সবই তাঁর প্রথম জীবনের কথা।

পলেট গডার্ডের আসল নাম পলিন লেভি, এবং আসলে তিনি স্বর্ণকুন্তলা নন, কৃষ্ণকেশী। শখ করে চুলে তিনি

গান্ধীজী ও সরোজিনী নাইডুর সঙ্গে চার্লি

অভিনয় দর্শনরত চার্লি ও পলেট গডার্ড

সোনালী কলপ লাগাতেন। চার্লি এত সব জানতেন না। জানার পর তিনি বলে দিলেন, কলপ মাখা চলবে না, কালো চুল কালোই রাখতে হবে। চার্লির সঙ্গে যখন আলাপ হয়, পলেট তখন কী-একটা বইয়ে অভিনয় করবার জন্য হল্ রোচের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিলেন। খেসারত হিসেবে হল্ রোচকে কিছু টাকা দিয়ে পলেটকে তাঁর চুক্তির বন্ধন থেকে ছাড়িয়ে আনলেন চার্লি। তারপর শুরু হল তাঁর শিক্ষা-দানের অধ্যায়। কীভাবে কথা বলতে হয়, কীভাবে অভিনয় করতে হয়, শিখিয়ে ...য়ে পলেটকে তিনি নিজের হাতে গড়ে ...। স্থির করলেন, পরবর্তী বইয়ে ... তিনি নায়িকার ভূমিকায়

...র দিনকয়েক দুজনকে এক ...নান জায়গায় দেখা যেতে লাগল। চার্লি, সেইখানেই পলেট, যেখানে সেইখানেই চার্লি। সুতরাং গুজব ...় পড়তেও খুব দেরি হল না। ...নতেই হলিউড একটু গুজববিলাসী ...গা। তার উপরে স্বয়ং চার্লস চ্যাপলিন যখন তার কেন্দ্রস্থল, তখন তো আর কথাই নেই। তখন-তখনই অবশ্য তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হননি, বিয়ে হতে বছর কয়েক দেরি হয়েছিল। চার্লি ইতিমধ্যে তাঁর পরবর্তী বই "মডার্ন টাইম্‌স"-এর কাজে হাত দিয়েছেন।

এ-বইয়ের বিষয়বস্তু কী হবে, বিদেশে থাকতেই মনে-মনে চার্লি তার একটা খসড়া করে রেখেছিলেন। বার্লিনে থাকতে আইনস্টাইনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। মানুষ এবং যন্ত্রের পারস্পর সম্পর্ক নিয়ে সেই বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর সঙ্গে তাঁর সবিস্তার আলোচনা হয়েছিল। এ যে-সময়কার কথা বলছি, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে তখন মন্দা চলছে, বেকার-সমস্যা তার মারমূর্তি নিয়ে দেখা দিয়েছে। যন্ত্র-সভ্যতাই কি তার জন্য দায়ী? এ-বিষয়ে আইনস্টাইনের মতামত জেনে নিয়ে চার্লি চ্যাপলিন লন্ডনে চলে এলেন। গান্ধীজী তখন লন্ডনে। চার্লি তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। গান্ধীজী ছিলেন যন্ত্র-সভ্যতার বিরোধী। যন্ত্রের প্রসার ঘটলে আধুনিক কালের উপর তার কী মারাত্মক প্রতিক্রিয়া ঘটবার আশঙ্কা রয়েছে, গান্ধীজীর কাছে জেনে নিলেন চার্লি; ভেবে দেখলেন, এই বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করেই একটি ছবি তোলা যেতে পারে। এই সাক্ষাৎকার থেকে যে অভিজ্ঞতা তিনি অর্জন করলেন, "মডার্ন টাইম্‌স"-এ তাকে তিনি খুব সুন্দরভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন।

কাহিনী রচনা শেষ হল। এবারে শুটিং। আগেই ঠিক করা ছিল যে, এটিও নির্বাক বই হবে। বই শেষ হতে বেশ কিছুদিন সময় লাগবার কথা। চিত্রশিল্পে সবাক যুগের প্রবর্তনা হবার পর যে ইতিমধ্যে দশ-দশটি বছর অতি-ক্রান্ত হয়ে যাবে, চার্লি সে-কথা জানতেন। জানতেন যে, দর্শক-সমাজ ততদিনে সবাক চিত্র দেখতেই অভ্যস্ত হয়ে উঠবেন। অভ্যাসটা পাকা হয়ে গেলে নির্বাক বই তাঁদের ভাল না লাগবারই কথা। আর-সবাই যখন শব্দ-যন্ত্রের সাহায্য নিচ্ছে, চার্লি যদি তখন নির্বাক একটি বই নিয়ে আসরে এসে হাজির হন তো সকলে মনে করবে, সময়ের সঙ্গে তাল রেখে তিনি এগিয়ে আসতে পারেননি, তিনি পিছিয়ে পড়েছেন। মনে করবে, তিনি প্রাচীন-পন্থী, তিনি ভীরু। এ-সবই চার্লি জানতেন। জেনেও তাঁর আদর্শকে তিনি বিসর্জন দেননি। যার যা খুশি মনে করুক, যার যা খুশি বলুক, নির্বাক ছবিই তিনি তুলবেন। "মডার্ন টাইম্‌স"-এ দু-এক জায়গায়, বিশেষ করে গানের ব্যাপারে, অবশ্য তিনি শব্দ-যন্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন। কিন্তু সে-শুধু শব্দ-যন্ত্রকে ঠাট্টা করবার জন্যই। আমি তখন হলিউডে। এ নিয়ে তাঁর সঙ্গে সেই সময় সবিস্তার আলোচনাও আমার হয়েছে। সে-সব আলোচনায় আমি স্পষ্ট বুঝতে পেরে-ছিলাম যে, এ-ব্যাপারে তাঁর নিজের মনে কোনও দ্বিধা অথবা সংশয় নেই। "মডার্ন টাইম্‌স" সম্পর্কে অনেক কথাই আমাকে তিনি বললেন। এক-আধটা দৃশ্যের অভিনয় করেও দেখিয়েছিলেন।

একদিনের একটি ঘটনার কথা বলি। রাত হয়েছে। তাঁর গাড়িতে করে আমরা ক'জন এক হোটেলে চলেছি। চার্লি, আমি আর পলেট। গাড়িতে বসে-বসেই চার্লি তাঁর ছবির কাহিনীটা আমাকে

আবৃত্তির দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার ঘটনা দর্শকের মনে সহজে ভেসে ওঠে। মূল শিক্ষক বা পরিচালককে বলে "রাসধারী"। বৃন্দা থালায় প্রদীপ সাজিয়ে আরতি করার ভঙ্গিতে নাচল। সেই সঙ্গে মাঝে মাঝে প্রদীপের উপর ধূপ ছড়াতে লাগল। রাসমণ্ডলের চারিদিকে খুঁটির গায়ে ছোট ছোট মশালের মত কিছু গোঁজা ছিল, প্রদীপের আলোতে তা জ্বালিয়ে দিল। অর্ঘ্যপাত্র থেকে চন্দনজল ছড়াল মণ্ডলের নানা দিকে। তার সঙ্গে একটি সখিও পরে এসে নাচে যোগ দিল।

উপরের অংশটির শেষেই দেখলাম কৃষ্ণ সাজে প্রবেশ করলো একটি ১২।১৩ বছরের ছেলে। মণ্ডলের প্রবেশের পথে সে বসেছিল। মণ্ডলের একপাশে রাখা ছিল বাঁশীটি। কৃষ্ণ সেটি ডান হাতে তুলে নিয়ে, বাঁ হাতে পরনের লাল ধুতির খুটটি ধরে, বাঁশীটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঢিমা-লয়ে একটি নাচ শেষ করে মঞ্চের একদিকে পাতা রঙগীন গামছার উপরে বংশীবাদন ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে গেল।

কৃষ্ণের মাথায় ময়ূরপাখা লাগানো "চূড়া"। এরই নীচে মাথার উপরে থাকে "নাহুং"। "লেইত্রেং" নামে একটি গয়না কপালের উপর গোল করে বাঁধা। তার পরেই থাকে "কোক্‌নাম"। পিছনে চুল ঢাকবার গয়নাকে "সাম্‌খুমবাগী" বলে। শরীরের দুই পাশে কাঁধ থেকে ঝোলানো থাকে দুটি নক্সাকাটা তিন-কোণা মোটা কাপড়ের গয়না। নাম "খোয়াল"। কাঁধের পিছনে থাকে "কোয়াং লিক্‌ফাং"। হাতে গয়না তিন জায়গায় তিন প্রকার। কৃষ্ণের কোমরের উপরে থাকে "ধরা"। সামনের দুই পায়ের মাঝে ঝুলতে থাকে "খাংজেং"। খালি গায়ের উপর নানা প্রকার মালা থাকে। পরনে মাল-কোঁচা-মারা রঙগীন কাপড়। বাংলাদেশের যাত্রার কৃষ্ণের মত পিছনে কোন নীল কাপড় ঝোলাতে দেখিনি।

কৃষ্ণবেশে বালকটি দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গেই রাসমণ্ডলের ঠিক বাইরে, দর্শকদের মধ্য থেকে চারদিকে সংখ্যার সমান ভাগে ভাগ করে একদল সখী উঠে দাঁড়ালো। এরা যে কখন দর্শকদের মধ্যে এসে জায়গা নিয়েছে তা আগে লক্ষ্যই করিনি। হঠাৎ পূব-দক্ষিণ কোণ থেকে একক গলার চড়া সুরে মেয়ের গান শুনে তাকিয়ে দেখি, দুটি সুসজ্জিত সখি দাঁড়িয়ে। প্রথমটি কৃষ্ণের দিকে লক্ষ্য করে ...

পরে অপর কোণের আর একটি স[...] উঠে দাঁড়িয়ে একইভাবে আর একটি গ[...] ধরল কৃষ্ণের দিকে চেয়ে। এইভাবে বা[...] সব দিকে একটি করে গান গাইল একক[...] করে সখী। 'সূত্রধর' বা গায়িকার [...] এই সময় চুপ করে ছিল। গান শেষ হ[...] খোলের বোলের সঙ্গে নাচের তালে তা[...] সখীরা মণ্ডলে প্রবেশ করলো। এ[...] সকলে একসঙ্গে গলা মিলিয়ে না[...] সঙ্গে গান গাইল মণ্ড ঘুরে ঘুরে। দ[...] গানের শেষেই রাধা সাজে একটি ১০।[...] বছরের বালিকা মণ্ডলে প্রবেশ করে[...] উত্তর-পশ্চিম কোণের সখীদের সঙ্গে[...] সব সমেত ১৪ জন সখীর সঙ্গে র[...] মণ্ডলে একত্র হলেন। গানে, নাচে, সা[...] পোশাকের কারুকার্যে ও রঙের বৈচি[...] রাসমণ্ডল জমে উঠলো।

রাধা ও সখীদের সাজ এক রকমে[...] এবং রঙের, নক্সার বৈচিত্র্য ও জাঁকজম[...] খুব। কোমর থেকে পা পর্যন্ত থা[...] ঘাগরা, তাকে বলে "কুমীর"। হাতে গা[...] যে সব গয়না দেখা যায়, তার সবই [...] মোটা কাপড়ের উপরে কিম্বা মে[...] চটের উপরে কাঁচের মালা, চুমকী, রাং[...] ভেল্‌ভেটের মত লাল, সবুজ কাপ[...] পাতলা চাক্‌তি, আয়নার মত কাঁচ বসি[...] তৈরী। এই ঘাগরাটির তলার দিকে চও[...] একটি ডিজাইন থাকে, গায়ে থাকে আয়[...] বসানো ফুলের মত নক্সা। ঘাগরা[...] নীচের দিকে একটি লোহার তার গে[...] করে লাগানো আছে বলে ঘাগরার কা[...] সব সময় গোল হয়ে ছড়িয়ে থা[...] পায়ের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে না। না[...] সময় পায়ের কোন ভঙ্গিও বোঝা যায় [...] এই ঘাগরা পশ্চিম ভারতের মত ল[...] কাপড়ের কুঁচি দিয়ে তৈরি ঘাগরা ন[...] ঘাগরাটি নিয়ে মাটিতে বসতে বেশ এব[...] অসুবিধা ঘটে, কারণ ঘাগরা চারিদি[...] গোল হয়ে ফুলে থাকে। এই ঘাগর[...] উপরে আর একটি ধপ্‌ধপে স[...] পাতলা কাপড়ে তৈরী জরির প[...] লাগানো ঘাগরা দেখা যায়। চওড়া [...] ফুটের মত। কোমরেই বাঁধে। মণিপু[...] ভাষায় এর নাম "পচুয়াল"। চুল চু[...] করে, মাথার উপর ঈষৎ বাঁদিকে হেলি[...]

সংক্ষেপে শুনিয়ে যাচ্ছিলেন। এ-ব্যাপারে চার্লির নৈর্ব্যক্তিকতা বড় সামান্য নয়। ছবির নায়ক-নায়িকার কথা বলতে গিয়ে কক্ষনো "আমি" অথবা "আমরা" তিনি বলেন না, বলেন "সে" অথবা "তারা"। তাঁর এই নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা আমি জানতাম। কিন্তু আমি যে জানতাম, পলেট সেটা জানতেন না। তিনি ভাবলেন, চার্লির কথা থেকে গল্পটা আমি ঠিক বুঝে উঠতে পারব না। চার্লি ও-দিকে আপন-মনে গল্প বলে চলেছেন। বলতে বলতে নায়ক-নায়িকার প্রসঙ্গে এসে যেই না বলেছেন "তারা", পলেট তাঁকে বাধা দিলেন। বাধা দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, "বুঝতে পেরেছেন তো? 'তারা' মানে 'আমরা'।"

শান্ত গলায় চার্লি বললেন, "না পলেট, 'তারা' আর 'আমরা' এক নই। আমরা চলেছি রোলস-রয়েস হাঁকিয়ে। আর তারা, অর্থাৎ আমার নায়ক-নায়িকা, স্বপ্নেও কখনও মোটরগাড়ি হাঁকিয়ে হোটেলে খানা খেতে যাবার কথা ভাবতে পারে না। হ্যাঁ, যে-কথা বলছিলাম, আমার সেই নায়িকা তখন......"

আবার বাধা দিলেন পলেট। বললেন, "'তারা' আর 'আমরা' এক লোক কিনা জানি না; কিন্তু তোমার ওই নায়িকা আর আমি কিন্তু একই লোক। দুজনেই আমরা সমান কপাল নিয়ে জন্মেছি।"

কথাটা পলেট মিথ্যে বলেননি। পলেটের চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই চার্লি তাঁর নায়িকা-চরিত্র কল্পনা করে নিয়েছিলেন।

সে-রাত্রে আমরা গিয়েছিলাম ট্রোকাডেরো নৈশ ক্লাবে। গল্প বলতে-বলতে মাঝপথে একটা ছেদ পড়েছিল। খাওয়া-দাওয়া শেষ হবার পর আবার তিনি গল্প শুরু করলেন। কাহিনীর বাকী অংশ। বলতে-বলতে বাধা পড়ল ফের। পলেটের সঙ্গে তাঁকে ট্যাঙ্গো নাচতে হবে। নাচ শেষ করে টেবিলে ফিরে এসে আবার তিনি আমাকে গল্প শোনাতে বসলেন। সে তো শুধু গল্প নয়, দৃশ্যের পর দৃশ্যের আনুপূর্বিক বর্ণনা। হাত, চোখ আর ভুরুর সামান্য এক-একটি ভঙ্গীতে সেই বর্ণনা আরও

'মডার্ন টাইমসে' চার্লস চ্যাপলিন ও পলেট গডার্ড

সরস, মনোরম হয়ে উঠছে। একটি দৃশ্যের কথা বলতে গিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন চার্লি, সে-দৃশ্যে কিভাবে হাঁটবেন, কয়েক পা হেঁটে আমাকে দেখিয়ে দিলেন। তারপর শুরু হল গান। চাপা গলায় "মডার্ন টাইমস"-এর একটি গান শোনাচ্ছেন আমাকে,—হঠাৎ খেয়াল হল, অন্যান্য টেবিল থেকে উঠে এসেছে সবাই। উঠে এসে ভিড় করে তাঁকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তৎক্ষণাৎ তিনি নীরব হয়ে গেলেন। আমার সৌভাগ্য বলতে হবে, তার আগেই তাঁর গান শেষ হয়ে গিয়েছিল। সে-এক কিম্ভূত গান। ফরাসী, জর্মন, ইটালিয়ান এবং আরও পাঁচ-সাতটা ভাষার শব্দ তাতে রয়েছে। সব মিলিয়ে দুর্বোধ্য। তবে কিনা চার্লিও তাকে দুর্বোধ্য রাখতেই চেয়েছিলেন।

"সীটি লাইটস" তৈরি হবার পর ইতিমধ্যে দীর্ঘ পাঁচটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। সাধারণভাবে চলচ্চিত্র-জগতে তো বটেই, রঙ্গচিত্রের ক্ষেত্রেও এ পাঁচ বছরে কম পরিবর্তন ঘটে যায়নি। রঙ্গচিত্রও তখন সবাক হয়ে উঠেছে। প্রতিভাবান জনৈক রঙ্গাভিনেতার সেই সময়ে আবির্ভাব ঘটেছিল। তাঁর নাম ডব্লু সি ফীল্ডস। এ-নাম আপনারা সকলেই শুনে থাকবেন। ফীল্ডসের বাক্‌ভঙ্গী ছিল মন্থর, ভাষা গুরুগম্ভীর। সেই 'ধৃষ্টদ্যুম্ন' ভাষায় জীবন সম্পর্কে নানা-রকমের ভাষ্য আউড়ে যেতেন তিনি, শুনতে ভারী মজা লাগত। ঠিক এই সময়েই আবিষ্কৃত হল কার্টুন-চিত্র। এবং তারই ফলে চিত্র-জগতে ওয়াল্ট ডীসনি এক অসামান্য সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন। তাঁর তৈরি কার্টুন-চিত্র আপনারা সকলেই দেখেছেন। মীকি মাউস, মীনি মাউস, ডোনাল্ড ডাক্ আর গুফি, জন-প্রিয়তার বিচারে চ্যাপলিনের সৃষ্ট ভবঘুরে-চরিত্রটির সঙ্গে এরা সমানে টেক্কা দিয়ে চলেছে। সবাক চিত্রের সেই দ্রুত উন্নতির যুগে শক্তিশালী এইসব প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে কীভাবে তিনি এঁটে উঠবেন, বলাই বাহুল্য, চ্যাপলিনকে তখন এই কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কিন্তু ভীত হননি তিনি, সংশয়ে কাতর হয়ে পড়েননি। শান্ত চিত্তে

তিনি তাঁর নতুন বই "মডার্ন টাইম্‌স"-এর শ্যুটিং শুরু করলেন।

এ-বইয়ের প্রথম দৃশ্যেই তাঁর তীক্ষ্ম শিল্পবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। দৃশ্যটা আর কিছুই নয়, একপাল ভেড়া ঠেলাঠেলি করতে-করতে সামনে এগিয়ে আসছে। খানিক বাদেই ফেড-আউট করে দিয়ে দেখানো হয়, একদল শ্রমিক কারখানার কাজ করতে চলেছে। পরিহাসটা এখানে কারো না-বুঝতে পারার কথা নয়। শ্রমিক-দের মধ্যে রয়েছেন চার্লি।

কারখানায় চার্লির কাজ হচ্ছে বল্টু লাগানো। শুধুই বল্টু লাগানো, ব্যস, আর কিছুই নয়। সারাদিন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে বল্টু লাগিয়ে যেতে হয়। সামনেই কনভেয়র-বেল্ট। সেই বেল্টে বাহিত হয়ে নির্মীয়মান যন্ত্রটির সামান্য একটা অংশ চার্লির সামনে দিয়ে চলে যায়, আর চট্‌পট্‌ তিনি তাতে একটা বল্টু লাগিয়ে দেন। এ-কাজ তাঁকে খুব দ্রুত সারতে হয়, একটুখানি অমনোযোগী হলেই বল্টুটা ঢিলে থেকে যাবার সম্ভাবনা। দু হাতে দুটো রেঞ্চ্‌ নিয়ে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন, আর ক্রমাগত বল্টু লাগিয়ে চলেছেন। বৈচিত্র্যহীন, একঘেয়ে, ক্লান্তিকর কাজ। ক্রমান্বয়ে এই একই কাজ করে যাবার ফলে তাঁর মস্তিষ্কে কিছু গোলযোগ ঘটে গিয়েছে। এই বিরক্তিজনক দৃশ্যটির মধ্যেও যে হাসির উপাদান রয়েছে, চার্লি সেটা বুঝতে পেরেছিলেন। ছোট্ট একটা ঘটনার কথা বলি। বল্টু লাগাতে সামান্য দেরি হয়ে গিয়েছে চার্লির, কনভেয়র-বেল্ট তাঁর সামনে থেকে সরে যাচ্ছে। লাফিয়ে সামনে এগিয়ে গিয়ে বল্টুটাকে শক্ত করে বসাতে যাচ্ছেন তিনি, পাশের এক শ্রমিকের সঙ্গে তাঁর সংঘর্ষ ঘটল। পা পিছলে কনভেয়র-বেল্টের উপরে গিয়ে তিনি হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। পরমুহূর্তেই দেখা গেল, কনভেয়র-বেল্টে বাহিত হয়ে তিনি এক মর্মান্তিক পরিণতির পথে এগিয়ে চলেছেন।

অনেক কষ্টে তাঁকে উদ্ধার করা হল। তার দিন কয়েক বাদেই বিপদ ঘটল আবার। আর-একটি মেশিনে কাজ করতে গিয়ে চার্লি আর তাঁর এক সহকর্মী মেশিনের চাকায় আটকে গেলেন। সে এক ভয়াবহ কাণ্ড।

কারখানার মালিকের মাথায় এদিকে খেয়াল চেপেছে, যে-করেই হোক, শ্রমিকদের কর্মদক্ষতা আরও বাড়িয়ে তুলতে হবে। উৎপাদনের হার বৃদ্ধি করতে হবে। কী করে সম্ভব হবে তা? মালিক অনেক ভেবেচিন্তে ঠিক করলেন, শ্রমিকদের টিফিনের সময়টা তিনি কমিয়ে দেবেন। টিফিন খেতে সবাই বাইরে চলে যায়, অনেকখানি সময় নষ্ট হয় তাতে। তার বদলে এমন একটা যন্ত্র আবিষ্কার করা যদি সম্ভব হয়, শ্রমিকদের কাছে গিয়ে যা তাদের খাবার খাইয়ে দেবে, তা হলে অনেক সময় বেঁচে যাবার কথা। যে-কথা সেই কাজ। দেখতে না-দেখতে কারখানার মধ্যে আমদানি করা হল সেই যন্ত্র। কাজে লাগাবার আগে যন্ত্রটাকে একবার পরীক্ষা করে নেওয়া দরকার। কার উপরে পরীক্ষা করা হবে? বলাই বাহুল্য, চার্লির উপরে। ব্যস্‌, চার্লিকে নিয়ে সেই যন্ত্রের মধ্যে বসিয়ে দেওয়া হল। যন্ত্রের গায়ে সারি-সারি কাঁটা, চামচ আর তোয়ালে সাজানো রয়েছে। বোতাম টিপলেই যন্ত্রের ভিতর থেকে লোহার দুটো হাত বেরিয়ে আসে, কাঁটা-চামচে খাবার তুলে নিয়ে শ্রমিকদের খাইয়ে দেয়। আহার-পর্বের প্রথম কয়েক মিনিট তো নির্ঝঞ্ঝাটে কাটল, তারপরেই ঘটল বিপদ। কোথায় কী-একটা কল বিগড়ে গিয়েছে, কাঁটাচামচগুলো এলোমেলো হয়ে চার্লির গায়ের উপরে এসে আছড়ে পড়ছে, সুপের বাটিটা চার্লির মুখ পর্যন্ত এসে আর পৌঁছল না, বাটি উলটে গিয়ে তাঁর শার্টের মধ্যেই ঝোল গড়িয়ে পড়ল, সারা মুখ তরকারিতে মাখামাখি, সে-এক বীভৎস ব্যাপার। তারপরেই দেখা গেল, রাশীকৃত নাট-বল্টু এসে খাবারের পাত্রের মধ্যে গড়িয়ে পড়ছে, আর যান্ত্রিক কাঁটা-চামচ সেই নাট-বল্টুগুলোকে কুড়িয়ে এনে চার্লির মুখের মধ্যে গুঁজে দিচ্ছে। যন্ত্রের

কবল থেকে বেরিয়ে আসবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছেন চার্লি, কিন্তু কিছুতেই তিনি বেরিয়ে আসতে পারছেন না। কাঁটা-চামচগুলি ওদিকে সমানে খাইয়ে চলেছে তাঁকে, শার্টের মধ্যে তখনও সমানে ঝোল গড়িয়ে পড়ছে।

সময়-সংক্ষেপের ব্যবস্থা তো ব্যর্থ হল, মালিক তখন আর-এক ফন্দী আঁটলেন। তাঁর ধারণা, শ্রমিকদের কাছে সব সময় যদি তিনি উপস্থিত থাকতে পারেন তা হলে ভয় পেয়ে আরও দ্রুত কাজ করবে তারা। কিন্তু একই সময়ে তো আর তাঁর পক্ষে সব জায়গায় উপস্থিত থাকা সম্ভব নয়। তাই তিনি করলেন কি, কারখানার ঘরে-ঘরে একটা করে পর্দা খাটিয়ে দিলেন। আগে থাকতেই মালিকের একটা চলচ্চিত্র তুলে নেওয়া হয়েছে। সারাক্ষণ সেই চলচ্চিত্র এখন পর্দার গায়ে প্রতিফলিত করে দেখানো হয়। পর্দার গায়ে মুখ নাড়ছে তাঁর প্রতিকৃতি, শ্রমিকদের তিনি ধমকাচ্ছেন, উৎপাদনের মাত্রা আরও বাড়িয়ে দিতে বলছেন। শ্রমিকরা যে-ঘরে গিয়ে সিগারেট খায়, জামা-কাপড় পালটায়, সেখানেও পর্দার গায়ে মালিকের চলচ্চিত্র। চার্লি একবার নিরিবিলি একটু সিগারেট খাবার জন্য সেখানে এসে ঢুকেছিলেন, মালিকের ছবি দেখেই আঁতকে উঠে তিনি বেরিয়ে এলেন। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, প্রাণান্তকর সেই আবহাওয়ার মধ্যে কাজ করতে করতে তিনি পাগল হয়ে গিয়েছেন। দু হাতে দুটো রেঞ্চ নিয়ে কারখানাময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছেন তিনি। ছুটতে ছুটতে থেমে দাঁড়ান এক-একবার, রেঞ্চ ঘুরিয়ে আপন-মনে নৃত্য করেন খানিকক্ষণ, তারপরেই আবার ছুটতে থাকেন। কারখানার সমস্তগুলো সুইচ তিনি এক সঙ্গে টিপে দিয়েছেন; হাতের সামনে যা-কিছু পাচ্ছেন, রেঞ্চ দিয়ে এ'টে দিচ্ছেন চার্লি। ফোরম্যানের নাক, ইলেক্‌ট্রিক প্লাগ, কোনও কিছুই বাদ যাচ্ছে না। এক ভদ্রমহিলা সে-দিন কারখানা পরিদর্শনে এসেছিলেন। অকস্মাৎ চার্লির সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে যেতেই চার্লি তাঁর জামার বোতামের উপর রেঞ্চ চালিয়ে দিলেন। তারপর আবার ছুটতে লাগলেন তিনি। তাঁর চোখের সামনে সবকিছুই তখন বল্টুতে পরিণত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হল।

রোগ সেরে গেল চার্লির, এবং যথাসময়ে হাসপাতাল থেকে তিনি বেরিয়েও এলেন। বেরিয়ে এসে শুনলেন, যে-কারখানায় তিনি কাজ করতেন, সেখান থেকে তাঁকে ছাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। চাকরির খোঁজে তিনি তখন এম্‌প্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জের সামনে গিয়ে লাইন দিয়ে দাঁড়ালেন। মাস কয়েক চেষ্টার পর চাকরি যদি বা একটা জুটিয়ে নিলেন, এমনই তাঁর কপাল, নতুন কর্মস্থলে গিয়ে কাজে যোগ দেবার ঘণ্টা কয়েক বাদেই তিনি শুনত পেলেন, ধর্মঘট ঘোষণা করা হয়েছে। কারখানা থেকে বেরিয়ে এলেন

চার্লি। রাস্তায় পৌঁছে দেখেন, সামনে দিয়ে একটা লরি চলেছে। চুপি-চুপি লরির পিছনে উঠে পড়লেন তিনি। এখন হয়েছে কি, সেই লরির মধ্যে ছিল কিছু বিস্ফোরক পদার্থ। খানিক বাদেই কী-করে তাতে আগুন ধরে গিয়ে বিস্ফোরণ ঘটল অকস্মাৎ, আর সঙ্গে সঙ্গেই লরির উপর থেকে তিনি মাঝরাস্তায় গিয়ে ছিটকে পড়লেন। বিপদের সংকেত হিসেবে লরির পিছনে যে লাল-পতাকা ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল, সেটাও রাস্তার উপরে ছিটকে এসে পড়েছে। লাল পতাকাটা হাতে তুলে নিয়ে প্রাণপণে চার্লি সেটাকে ঘোরাতে লাগলেন। ভেবে-ছিলেন, পতাকা দেখিয়ে লরির চালকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন; ইতিমধ্যে ধর্মঘটী শ্রমিকদের মিছিল যে তার পিছনে এসে পৌঁছেছে, তিনি তা টেরও পাননি। চার্লির হাতে লাল-পতাকা দেখে কর্তৃপক্ষের ধারণা হল, ধর্মঘটী শ্রমিকদের তিনি নেতা। পুলিস এসে গ্রেপ্তার করল তাঁকে, হাজতে নিয়ে ঢোকাল।

বিচারে কয়েক মাস জেল হয়ে গেল চার্লির। কারাগারে থাকতে হঠাৎ একদিন তাঁর চোখে পড়ল, জনকয়েক বন্দী সেখান থেকে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। চার্লি গিয়ে বাধা দিলেন তাদের। সব শুনে কর্তৃপক্ষ তো তাঁর উপরে মহা খুশী। পুরস্কার হিসেবে চার্লির সেলে তাঁরা নানান রকমের সুবিধে করে দিলেন। চার্লি ভেবেছিলেন, জেলের মধ্যেই তিনি সংসার পেতে বসবেন। তা-ই বসতেন হয়তো, কিন্তু দু দিন যেতে-না-যেতেই খবর এল, তাঁর কাজে সন্তুষ্ট হয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁকে মুক্তি দিয়েছেন। জেলের মধ্যেই বরং আরামে ছিলেন চার্লি; জেল থেকে বেরিয়ে তাঁর মনে হল যেন এক নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে কেউ তাঁকে এক অকূল সমুদ্রের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে।

অনেক কষ্টে আবারও তিনি একটা চাকরি জুটিয়ে নিলেন। জাহাজ মেরা-মতির কাজ। সেইখানে সেই জাহাজঘাটায় হঠাৎ একদিন পলেটের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। তিন কুলে কেউ নেই, জাহাজঘাটায় এসে হাত-সাফাই করে মেয়েটিকে জীবিকা নির্বাহ করতে হয়। সেদিনও একই উদ্দেশ্যে জাহাজে এসে উঠেছিল। তারপর কিছু রুটি আর কলা হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়বার সময় পুলিসের হাতে ধরা পড়ে। অনেক কষ্টে পুলিসের হাত থেকে সে ছিটকে বেরিয়ে এসেছে। চার্লি ওদিকে ভুল করে ভাঙা একটা জাহাজকে জলে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। ডক থেকে জলে গিয়ে পড়তে-না-পড়তেই জাহাজটা ডুবে যায়। সঙ্গে-সঙ্গেই তাঁর চাকরি খতম হয়ে গিয়েছে। এর চাইতে কারাগারে যে তিনি অনেক বেশী সুখে ছিলেন, সে বিষয়ে চার্লির আর এখন বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই। রাস্তা দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তিনি ভাবছেন, কী করে আবার জেলে ফিরে যাওয়া যায়, এমন সময় পলেটের সঙ্গে দেখা। একটু বাদেই পুলিস এসে আবার গ্রেপ্তার করল পলেটকে। পলেটের বদলে তাঁকেই যাতে গ্রেপ্তার করা হয়, তার জন্য অনেক চেষ্টা করলেন চার্লি, পুলিসকে তিনি নানান-ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করলেন যে, পলেট নয়, তিনিই আসলে জাহাজ থেকে রুটি আর কলা চুরি করেছিলেন। কিন্তু পুলিস তাঁর কথায় বিশ্বাস করল না, পলেটকেই তারা গ্রেপ্তার করে নিয়ে চলল। চার্লি তখন করলেন কি, গটগট করে সামনের রেস্তোরাঁয় গিয়ে উঠলেন, দামী দামী সব খাবার নিয়ে আসতে বললেন, তারপর খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে ওয়েটারকে জানিয়ে দিলেন যে, তাঁর পকেটে একটিও পয়সা নেই। এবারে তো আর তাঁকে গ্রেপ্তার না করে কোনও উপায় নেই। পলেটের সঙ্গে একই ওয়াগনে ঢুকিয়ে পুলিস তাঁকে হাজতে নিয়ে চলল। ওয়াগনে বসে পলেটের সঙ্গে অনেক কথা হল তাঁর। পলেটকে তিনি বোঝালেন যে, ভালই হল, জেলে গিয়ে তাঁরা সুখে ঘরসংসার করবেন, রাস্তায় রাস্তায় এইভাবে আর তাঁদের ভেসে বেড়াতে হবে না। পরমুহূর্তেই তাঁর মনে পড়ল যে, জেলে তাঁদের এক সঙ্গে থাকতে দেওয়া হবে না, দু-জনকে দু-জায়গায় নিয়ে রাখা হবে। তবে আর জেলে যাওয়া কেন। পলেটের হাত ধরে চলন্ত ওয়াগন থেকে তিনি রাস্তার উপরে লাফিয়ে পড়লেন।

(ক্রমশ)

শার্ঙ্গদেব

যাত্রাওয়ালা গোপাল উড়ে

গত কয়েক মাস ধ'রে গানের আসরে কিছু ভারি ভারি গদ্যবন্ধের অবতারণা করা হয়েছে। অবশ্য বিষয়গুলিও ছিল বেশ ভারি-ভুরি। ক্রমাগতই নানা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর—উ'চুদরের সুর-তাল, নিয়ে ব্যাপার;—কাজে কাজেই আমাদের আলোচনাও বেশ খানিকটা উ'চু ধাপে উঠেছে। গানের কনফারেন্সগুলো এবার একে একে শেষ হয়ে এলো,—শীতেরও অবসান। সরস্বতীপুজোর পর থেকে সরকারীভাবে বসন্তকাল পড়েছে। অতএব মনটা এবার খুশির হাওয়ায় উড়ে উড়ে আড়-খেমটা গেয়ে বেড়াচ্ছে।

কিন্তু "আড়-খেমটা" শুনেই আমাদের পিউরিটান পাঠক-সম্প্রদায় ভুরু কু'চকে তীব্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করবেন না। ও নামটা যেমনই হোক্ ওর ধরনটা কিন্তু খুব ইতর নয়। বহু বহু নির্দোষ, নিটোল, রসাল এবং মধুর গান আছে এই আড়-খেমটা চালে। এক সময় এই আড়-খেমটারই একটি যুগ ছিল। খুব সরল সুন্দর কোমল ভঙ্গীতে এইসব গান গাইতেন না এমন সুরশিল্পী খুব কমই ছিলেন সে যুগে,—অবশ্য পাষাণহৃদয় ওস্তাদি-পন্থীরা ছাড়া। তাঁদের কথা নিশ্চয়ই স্বতন্ত্র কেননা, তাঁদের মর্মে আঘাত হানতে হলে হয়তো তিন-সপ্তকব্যাপী গমক প্রকম্পিত বিরাটকায় তান-শেল নিক্ষেপ করবার প্রয়োজন হতে পারে কিন্তু সেই সব দিঙ্-নাগাচার্যদের আজ দূরে থেকেই নমস্কার করে মাপ চাইছি।

এই চালের গানে যাঁরা মোহিত হয়েছেন, এমন কি নিজেরা এই ভঙ্গীতে গান রচনা করেছেন,—তাঁদের মধ্যে রয়েছেন স্বয়ং কবিগুরু। তাঁর "হেলা ফেলা সারা বেলা একি খেলা আপন সনে", "দুজনে দেখা হ'ল মধু যামিনীরে", "ও কেন চুরি করে চায়" প্রভৃতি গানের মত সুললিত আড়-খেমটা চালের গান বাংলার সঙ্গীতে বিরল। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের বাল্যকালে এই শ্রেণীর গানের একটি প্রাবল্য ছিল। খুব সহজ সরল অল্প দু-চার কথায় অনেকখানি ভাব ভরে দেওয়া সাদামাটা কালাংড়া কিম্বা সিন্ধু-খাম্বাজে রচিত গানগুলি প্রাণে যেন মধু বর্ষণ করত।

তালের দিক থেকে আড়-খেমটাকে একতালার রূপান্তর বলা যায় অথবা দাদরার রকমফেরও বলা যেতে পারে। আড়-খেমটার "আড়ি" বলতে যেটুকু বোঝায় সে হ'চ্ছে গানটা ধরবার সময় ঠিক প্রথম মাত্রায় না ধরে দুটো মাত্রা ছেড়ে দিয়ে তৃতীয় মাত্রায় ধরা এবং মাঝে মাঝে আড়ির সৃষ্টি করে একটি ছন্দ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা। উদাহরণস্বরূপ একটি প্রাচীন গানের এক অংশ উদ্ধৃত করিঃ—

০ ০ শূ	ণ্য প্রা ণে	চ লে ০	গে ল ০
০ ০ ন	য় নে তা রূ	অ ০ শ্রু	জ ল ০

সুরের দিক থেকে দেখলে এই ধরনের গানকে টপ্পার পরিণতি বলা যায় কেননা বহু আড়-খেমটা রীতিমত টপ্পার ভঙ্গীতে গাওয়া হয়ে থাকে।

আড়-খেমটা ভঙ্গীটি অবশ্য নিধু-বাবুর সময়ে তেমন প্রাধান্য লাভ করেনি। তখনকার দিনে টপ্পা বিলম্বিত তালেই গাওয়া হত। তারপর ধীরে ধীরে আড়-খেমটার এ চালটি প্রচলিত হল প্রসিদ্ধ যাত্রার অধিকারী গোপাল উড়ের সময় থেকে। বর্তমান আড়-খেমটা ভঙ্গীর প্রবর্তন বলতে গেলে গোপাল উড়েই করে যান এবং এর প্রকৃষ্ট পরিণতি হয় তাঁর বিদ্যাসুন্দর পালার গানগুলিতে। একমাত্র এই রসসৃষ্টির গুণেই গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা আমাদের সঙ্গীতের ইতিহাসে বিখ্যাত হয়ে আছে। বিদ্যা-সুন্দর পালার বহু গানে আড়-খেমটার নানা ভঙ্গী দেখা যায় এবং সেগুলি এতই রসোত্তীর্ণ হয়েছিল যে, পরবর্তীকালে তার সুর এবং ভঙ্গী বিভিন্ন গানের সঙ্গে মিশে আড়-খেমটাকে আমাদের গানে

সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়ে গেছে। গিরিশ ঘোষের নাটকের বহু গানেও এই ভঙ্গীটি যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে।

বাংলা গানের একটি বিশেষ ধারার প্রবর্তক গোপাল উড়ের জীবনকাহিনী অল্প যেটুকু পাওয়া যায় তা থেকে বোঝা যায় লোকটি বিশেষ প্রতিভাবান্ এবং যে সুযোগ তাঁর জীবনে এসেছিল তার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার তিনি করেছিলেন। তা ছাড়া ভিন্নভাষী একজন লোকের পক্ষে বাংলা ভাষায় এতটা দক্ষতা অর্জন করাও বড় কম কথা নয়। বাংলা গানের ইতিহাসে গোপাল উড়ের একটি গৌরবজনক স্থান আছে এই কারণে যে, তাঁর স্বকীয়তা আমাদের সঙ্গীতে একটি যথার্থ সৌন্দর্য প্রদান করেছে যার প্রভাব একদা বহু-বিস্তৃত হয়েছিল।

প্রায় আঠারো'শ তিরিশ-প'য়ত্রিশ সালের কথা। বউবাজারে তখন যাত্রা-গানের আসর খুব জমজমাট। দলে অনেক বড়লোক, বউবাজারের মতিলাল পরিবার, বাঁড়ুজ্যে গোষ্ঠী এবং ধরদের বাড়ির অনেক বাবু এইসব আসর সরগরম করতেন। অনেকেই ছিলেন কৃতবিদ্য। শোনা যায়, "টেলিমেকস্"-এর অনুবাদক রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় মশাই সখী সেজে আসর মাত করতেন। দলের মধ্যমণি ছিলেন রাধামোহন সরকার। তিনিই গড়ে তুলেছিলেন "বিদ্যাসুন্দর" যাত্রার প্রথম পালা। অনেকের মতে এই বিদ্যা-সুন্দর পালাই বাংলায় প্রথম শোখীন যাত্রা। এটা অবশ্য ঠিক নয়, তবে এটা সত্যি যে, বিদ্যাসুন্দরের মত এমন নামকরা পালা এর পূর্বে আর আত্মপ্রকাশ করেনি।

রাধামোহনের তখন বয়স অল্প, বিলক্ষণ টাকা এবং যাত্রার শখ প্রচুর। অতএব সারাদিন যাত্রার বৈঠক চলত। এখান ওখান থেকে অভিনেতা সংগ্রহ করার চেষ্টাও কম ছিল না। ভাল গলা পেলেই তাকে ধরে এনে একবার "ট্রায়াল" দেওয়া ছিল অবশ্য কর্তব্য। দিনের বেলায় এইসব ব্যাপার আর রাত্তিরে চলত আসল আখড়াই অর্থাৎ বড় রকমের রিহার্সেল।

উৎসাহটা সবাইকারই খুব প্রবল। দুপুরবেলা বৈঠক জমেছে। সব আয়োজনই প্রস্তুত, কিন্তু অভাব হচ্চে একটি নিখুঁত সুরেলা গলার। উৎকৃষ্ট অভিনেতার বা গায়কের অবশ্য অভাব নেই কিন্তু তবু আরো ভালো হ'লে যেন যাত্রাটা পুরোপুরি খুলত—এমনি ভাব-খানা। বাবুরা নানা চিন্তা এবং আলোচনায় মশগুল, এমন সময় পথে এক ফেরিওলার গলা শোনা গেল "চাঁপাকলা, —চাই চাঁপাকলা"। দলের একজন প্রধান মাতব্বর বিশ্বনাথ মতিলাল সেই আওয়াজ শুনেই লাফিয়ে উঠলেন। চাঁপাকলার জন্য নয়—গলাটা যেন তাঁর কানে হঠাৎ মধুবর্ষণ করল। এমনি মিষ্টি গলারই খোঁজ খবর চলছিল তখন। বিশ্বনাথ মতিলাল তৎক্ষণাৎ হাঁক পাড়লেন—"ওরে কে আছিস রে, 'গান্ধার' বলেছে, চাঁপা-কলাওলাকে ধরে আন"। সঙ্গে সঙ্গেই লোকজন গিয়ে ধরে নিয়ে এল চাঁপাকলা-ওলাকে। ছেলেটির বয়স অল্প—বড় জোর আঠারো-উনিশ। দেখতে খাটো, ছিপ-ছিপে গড়ন, রং ফর্সা। মেয়েদের পার্টে খাসা মানাবে। বাবুদের মনে ধরে গেল কলাওলা ছোকরাকে।

"কি নাম হে তোমার?"

"আজ্ঞে গোপাল।"

"বাড়ি কোথায়?"

"কটক জেলার জাজপুর গ্রামে"

"ও বাবা এ যে আবার উড়িষ্যাবাসী" —একটু নিরুৎসাহ হ'লেও বাবুরা হাল ছাড়েন না—"বাংলা বলতে কইতে তো ভালই পার দেখছি।"

"আজ্ঞে তা পারি।"

"তা তোমার গলাটি তো খাসা,—এক "চাঁপাকলা" ডাকেই ধ'রে ফেলেছি। বলি গান টান জানা আছে তোমার?"

এইবার ঘরের দিকে চেয়ে গান বাজনার নানা সাজ-সরঞ্জাম দেখে আসল ব্যাপারটা বুঝতে গোপালের বিলম্ব হয় না। কিন্তু গান টান যেমনই জানুক এ সুযোগ ছাড়বার পাত্র সে নয়। একটু লাজুক ভঙ্গীতে উত্তর দিল—"আজ্ঞে তেমন কি আর জানি, তবে আপনাদের আশীর্বাদে চেষ্টা করলে—"

"হ্যাঁ হ্যাঁ হবে বৈকি, নিশ্চয় হবে।" বাবুরা বিলক্ষণ উৎসাহিত হয়ে ওঠেন— "তা তোমার আর কে আছে হে? বলি বিয়ে টিয়ে করেছ নাকি?"

লজ্জিত গোপাল উত্তর দিল—"সেটি অনেক দিনই হয়ে গেছে আজ্ঞে।"

তাতেও কোন বাধা ঘটল না। সেকালে যে কোন লোকেরই বিয়ে করার দরুণ কোন বিপত্তি ঘটত না। সবই ঠিক ঠাক হয়ে গেল এবং সেইদিন থেকেই কলার

ব্যাপারী গোপাল উড়ে চাঁপাকলা থেকে একেবারে ললিতকলার ব্যাপারে প্রমোশন পেয়ে গেল।

বাবুরা কিন্তু গোপালকে ট্রেনিং দিয়েছিলেন চমৎকার। ঝাড়া দুটি বচ্ছর বৈঠকের ওস্তাদ হরিকিষণ মিশ্রের কাছে হিন্দুস্থানী সংগীতে তালিম নিলে গোপাল। ইতিমধ্যে সে দলের সবাইকার চেয়ে সেরা গুণী হয়ে উঠেছিল,—পার্ট শুনলে ধরবার উপায় নেই যে, সে উড়িয়া, এমনি তার দখল হয়েছিল বাংলা ভাষায়। বেশভূষায় চালচলনে গোপাল একেবারে বাঙালী বনে গেল। বসে বসে যাত্রা-গানের রিহার্সেল দিয়েই গোপাল মাইনে পেত দশ টাকা। সেকালে এই মাইনে বড় কম নয়।

দুটি বছর ধরে বহু পরিশ্রম এবং বহু যোগাড়যন্তরের পর রাধামোহন সরকারের বিদ্যাসুন্দর যাত্রার অভিনয় আরম্ভ হ'ল। প্রথম অনুষ্ঠান রাজা নবকৃষ্ণের বাড়িতে—বিরাট ব্যাপার, বহু সম্ভ্রান্ত জনসমাগম, তেমনি বনেদী ব্যবস্থা। আলোয় আলোয় আসর একেবারে স্বপ্নপুরী। প্রভূত শিষ্টাচার-পরিবেশিত বাবুরা তাকিয়া ঠেস দিয়ে বিশ্রম্ভালাপের সংগে যাত্রা উপভোগ করছেন,—চিকের আড়ালে গৃহিণীরা পরিচারিকাদের সংগে যাত্রার দলের ছোকরাদের চেহারা নিয়ে আলোচনা করছেন,—এমন সময় মালিনীবেশী গোপালের প্রথম আবির্ভাব ঘটল। কী চেহারা, কী গান আর কী "এ্যাক্টিং"! বাবুরা রসবিহ্বল, গৃহিণীরা আনন্দে আত্মহারা,—ইতরজনের তো কথাই নেই। গোপালের তো একেবারে জয়জয়কার, আর রাধামোহনকে সবাই ধন্য ধন্য করতে লাগল। কোনো ছেলে কি এমনি নিখুঁতভাবে মেয়েদের অভিনয় করতে পারে! হ্যাঁ একখানা তালিম বটে! সাবাস্ রাধামোহন সরকার। সংগে সংগে গোপালের বেতন দশ থেকে একেবারে পঞ্চাশ! ভাবুন একবার ব্যাপারখানা।

রাধামোহন নিজে আরও দুবার যাত্রার ব্যবস্থা করেছিলেন খুব ধুমধাম করে,—একবার হাটখোলার দত্তবাবুদের বাড়িতে আর একবার সিমুলিয়ার ছাতুবাবুর বাড়িতে। লক্ষাধিক টাকা তিনি কেবল এইসব যাত্রার ব্যাপারেই খরচ করেছিলেন।

তারপর একদিন দীপ নিবল। রাধামোহন মারা গেলেন মাত্র চল্লিশ বৎসর বয়সে।

প্রভুর মৃত্যুতে গোপাল একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক হারালেন বটে, কিন্তু ক্ষতি তাতে তাঁর বিশেষ হয়নি। সরকার পরিবারের ঔদার্যে গোপাল যাত্রার সমস্ত আসবাব, সাজ-সরঞ্জাম পেয়ে গেলেন এবং এবারে দল গড়লেন নিজের মনের মতন করে। বিদ্যাসুন্দর পালা সম্পূর্ণ নতুন করে তৈরি করলেন তিনি—গান বাঁধলেন নিজের সুরে। এইটিই হচ্চে গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর পালা। এর সব কিছুই তাঁর নিজস্ব সৃষ্টি। অবশ্য রাধামোহনের পালার গানগুলি কিছু উচ্চাংগের ছিল—গোপাল তাকে হাল্কা করে আনলেন কিন্তু গতানুতিক ধারা বর্জন করে একটা সজীব নতুন ভংগীর প্রবর্তনও এই সংগে করতে সক্ষম হ'লেন তিনি। এইখানেই তাঁর প্রধান কৃতিত্ব।

নিজের দল নিয়ে গোপাল যাত্রা চালিয়েছিলেন আরও দশ বছর। যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন তিনি। যতদিন বেঁচে ছিলেন অপর কোন যাত্রার দল তাঁকে হারাতে পারেনি। তবে বাঁচেননি বেশিদিন। তাঁর প্রভুর মত তিনিও ছিলেন স্বল্পায়ু। চল্লিশের কোঠায় পা দেবার সংগে সংগেই তাঁর মৃত্যু হয়। তিনি ছিলেন নিঃসন্তান।

গোপাল উড়ের বিদ্যাসুন্দর যাত্রা সাহিত্যের দিক থেকে অকিঞ্চিৎকরই বলতে হবে। স্থানে স্থানে রুচির প্রশংসাও করা যায় না। তেমন উৎকৃষ্ট পরিমার্জনা এই ধরনের একজন অভিনেতার কাছ থেকে আশাও করা যায় না, তবে ওরই মধ্যে দু একটি গান মন্দ উতরোয়নি রচনার দিক থেকে। কিছু উদ্ধৃত করা যাক—

ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার
চার দিকে মালঞ্চ বেড়া
ভ্রমরেতে গুণ গুণ করে
কোকিলেতে দিচ্ছে সাড়া।
ভ্রমরা ভ্রমরী সনে
আনন্দিত কুসুম বনে
আমার এই ফুলবাগানে
তিলেক নাই বসন্ত ছাড়া।

খাম্বাজ

যাবনা যাবনা মালঞ্চে।
এমন করে দুসন্ধে কি প্রাণ বাঁচে।
যাব সেই বকুলতলা
কুড়িয়ে ফুল আজ গাঁথিব মালা, সাজাব ডালা
যা বলে বলবে রাজবালা
ভাগ্যে মোর যা আছে।
যাব সেই বাঁধা ঘাটে নানাজাতি কুসুম ফোটে
যে পায় সে লোটে
বুক ফাটে তো মুখ ফোটে না,
মরি মনের আপশোষে।

কি করি উপায় সখি বিহনে সেই গুণমণি
ব্যাকুলা হতেছে মন মণিহারা যেমন ফণী।
কি ক্ষণে সে দেখা দিল মন প্রাণ হরে নিল
এবে কোথা লুকুইল চিত্তচোর চূড়ামণি।
এনে দে সেই চিত্তচোরে রাখি তারে চিত্র করে
চিত্তপট কারাগারে চোরে দণ্ড দিই এখনি।

কায় কব মনেরি কথা মনোব্যথা মনই জানে
অবলা সরলা বালা কতই জ্বালা সয় গো প্রাণে।
বিষম প্রতিজ্ঞা করি অন্তরে গুমরে মরি
লাজে প্রকাশিতে নারি দিবানিশি যায় রোদনে।

ভোলা সে কি কথার কথা প্রাণ যে প্রাণে গাঁথা
শুকাইলে তরু কভু ছাড়ে কি জড়িত লতা।
ভেবে দেখ বিনোদিনী লক্ষান্তরে দিনমণি
জলে ভাসে কমলিনী, ছাড়া থাকে কেবা কোথা।

সহজ সরল সুরের দিক থেকে এবং নতুন গীতভংগীর দিক থেকেই গোপালের রচনার মূল্য নির্ধারণ করা হয়। বাংলার সংগীতে গোপালের এই প্রভাবটিই চিরস্থায়ী হয়ে আছে। এমন এক সময় ছিল যখন "ঐ দেখা যায় বাড়ি আমার চারদিকে মালঞ্চবেড়া" গানটি লোকের মুখে মুখে ফিরত। এই সুরে এবং এই ঢঙে কত গান যে পরে রচিত হয়েছে বলা যায় না। আজও যাঁরা সুপ্রাচীন হয়েছেন তাঁদের এই গানটি স্মরণ করিয়ে দিলে হয়তো অনেক দিনের পুরাতন স্মৃতি মনে পড়ে যাবে। বার্ধক্যস্খলিত কণ্ঠে হয়তো ওই লাইনটি একবার গাইতেও চাইবেন তাঁদের অনেকে।

প্রেম

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

বেলা যায়!
ক্লান্ত দিন আঁধার রাতের কোলে
ঢলে পড়লো ভালবাসার সোহাগে।
এমনি হয়,
শীতের প্রেমে বাঁধা পড়ে বসন্ত,
জীবন ভালবাসে মৃত্যুকে
তুমি—তুমিও ভালবাসো আমাকে।

তুমি ভালবাসো আমাকে
কাছে এলে,
ছায়া ঘনায় তোমাকে ঘিরে
তোমার ফুটন্ত রূপ ম্লান হয়ে উঠে
ক্রমে মিশে যায়,
সূর্যাস্তের গোধূলির আলোর মত;
আমার অন্ধকারে।

চেয়ে দেখি,
বিষাদে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে।

প্রেম ? আমার প্রেম
অজন্তার ছবির মতো
বহু শতাব্দীর স্মৃতিভারে নিস্তব্ধ।
আর নিরশ্রু নয়ন নির্ণিমেষ
নিথর।

জিজ্ঞাসা কর,
দোলনায় ঘুমন্ত শিশু
আর কবরে চিরনিদ্রিতদের
জিজ্ঞাসা কর,
বলবে, প্রেমের ভাষা নেই।

২৮।১।৫৩

সে তোমার হাসি

শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

হঠাৎ বসন্তে কবে রাকাদীপ্ত চামেলির বনে
উচ্ছ্বাস উঠিয়াছিল দক্ষিণ পবনে
ঝরেছিল শুভ্র ফুলরাশি,
সে তোমার হাসি॥

হঠাৎ কোটালে কবে উন্মথিত মত্ত পারাবার
জ্যোৎস্নার মর্মরে গাঁথা সৈকতে তাহার
ছুঁড়েছিল স্বচ্ছ শুক্তি রাশি,
সে তোমার হাসি॥

ইন্দ্রের বিলাসলগ্নে সুখ স্বর্গপুরে
পুরূরবা স্মৃতিদষ্ট উর্বশীর বিভ্রান্ত নূপুরে
যে-চমক উঠিল উদ্ভাসি,
সে তোমার হাসি॥

রিক্তপদ্ম মানসের অশ্রুর স্ফটিকে
মধ্য রজনীর চন্দ্র তন্দ্রাহীন চাহি অনিমিখে
যে শুভ্রতা তুলিছে বিকাশি,
সে তোমার হাসি॥

রজনীগন্ধার দণ্ডে যে পেলব চিক্কণ আবেশ
মূর্ছিত জ্যোৎস্নার মতো রচি পরিবেশ
দিব্যকান্তি দেয় পরকাশি,
সে তোমার হাসি॥

পরম প্রণয় ক্ষণে ছিন্নগ্রন্থি মুক্তাহার দ্যুতি
স্তিমিত বাসর ক্ষেত্রে বাসনার যূথী
মুহুর্মুহু তোলে যে উচ্ছ্বাসি,
সে তোমার হাসি॥

বাণীর মুকুটলগ্ন দিব্যবিভা শ্বেত শতদলে
কবির প্রতিভাস্পর্শে যে আলোক ঝলে
প্রকাশের আর্তিতে উল্লাসি,
সে তোমার হাসি॥

আমার বিস্মৃতি তলে চৈতন্যের গোপন প্রবাহে
কোথা হ'তে পড়ে আলো, জ্বলে ওঠে তাহে
গুচ্ছ গুচ্ছ জ্যোতিঃকুন্দরাশি,
সে তোমার হাসি॥

তোমার অস্তিত্ব সুধা বিগলিয়া তরল ধারায়
শিশিরান্ত হিমানীর প্রবাহিনী প্রায়
ঝরাইছে ফুল্ল ফেনরাশি,
সখী, সে তোমার হাসি॥

লণ্ডনে ভারতীয় শিশুদের ছবি

শিশু হাতের কাছে যা পায়, তাই দিয়ে ছবি আঁকে। এর জন্যে তার না লাগে নানারকম রং-তুলি, না প্রয়োজন হয় বাঁধাধরা আঙ্গিকের। আর ছেলেবেলায় নিজের মনের ছাপকে নানারকম রং ও রেখার আঁকিবুকি কেটে রূপ দেবার চেষ্টা করেনি, এমন ছেলে বা মেয়ে বোধ হয় একটিও নেই। কিন্তু তাদের সেই এলোমেলো ভাবনাকে গুছিয়ে তুলি টানবার ও রং মেশাবার কায়দা দেখিয়ে দিলে যে অতি চমৎকার ফল পাওয়া যায়, তারই পরিচয় পেয়েছি সম্প্রতি লণ্ডনের একটি প্রদর্শনী দেখে। রয়েল ইণ্ডিয়া, পাকিস্তান এণ্ড সিলোন সোসাইটি ইম্পিরিয়াল ইনস্টিটিউটে পেণ্টিংস্ এণ্ড ক্র্যাফ্‌টস ফ্রম ক্লাসরুমস্ অব দি ঈস্ট নামে একটি প্রদর্শনী খুলেছেন। ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি পর্যন্ত এ প্রদর্শনী চলেছিল।

এই সোসাইটির সদস্য মিঃ রিচার্ড কারলাইন ১৯৫২ সালে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বহু স্কুল কয়েকমাস ধরে দেখে বেড়ান এবং তখন থেকেই এমন একটি প্রদর্শনীর কল্পনা চলছিল। এ বিষয়ে তিনটি দেশের হাই-কমিশানও যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

হিন্দু মেয়ে
—নীনা অগ্রবাল ১৩
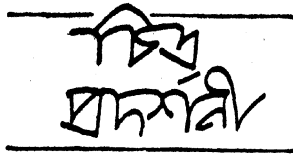
ভালুক নাচ
—বীরেন এইচ পাতিল ৭

তিন দেশের ছেলেমেয়েরা ১২ শ'র ওপর হাতের কাজ—প্রধানত পেণ্টিং পাঠিয়েছিল। তার মধ্যে শ' পাঁচেক বেছে নিয়ে দেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে। ভারতের প্রেরিত ছবি ও নক্সার সংখ্যা তার মধ্যে ২০৬টি—সেইগুলিরই উল্লেখ করছি। একথা ভাবলে ভুল হবে যে, সর্বভারতের ছোটদের সকল যোগ্য কাজের নিদর্শন এখানে আছে। প্রধানত কয়েকটি বিখ্যাত বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের ছবিই সংগ্রহ করা হয়েছে—তার সঙ্গে আছে শংকরস্ উইকলীতে প্রকাশিত কিছু ছবি। কিন্তু এই সীমাবদ্ধ সংকলন থেকেই ভারতের ছোটদের শিল্পরুচির উৎকর্ষের পরিচয় মিলবে।

এইসব শিল্পীর বয়স ৩ থেকে ১৮ বছর। ৩ বছরের শিশুর কচি হাতের রেখা দেখে মনে হয় বয়সের স্বল্পতা তুচ্ছ করে মানসিক পরিণতিতে। এরা অনেক এগিয়ে গেছে আর তুলি ধরতে শিখছে পাকা হাতে। ৩ বছরের ডি সুরীর 'টাইগার' এই প্রদর্শনীর পোস্টার হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে—সবুজ বাঁশের বনে হলুদ রঙের ডোরা-কাটা বাঘ। কে সেন নামে একটি বাঙালী ছেলের দুটি ছবি আছে যথাক্রমে ৩ ও ৪ বছরে আঁকা—পোর্ট্রেট এবং 'স্কুল-টীচার'। সরু সরু রেখার অজস্রতার মধ্য দিয়ে বক্তব্য সেখানে স্পষ্ট। ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ানের সমালোচক এক্ষেত্রে প্রখ্যাত জার্মান শিল্পী পল ক্লী-র কথা উল্লেখ করেছেন। পল ক্লী বলেছিলেন,—'I do not wish to represent man as he is, but only as he might be'—৩ বছরের শিল্পীও বোধ হয় তাই ভাবে।

১৩ বছরের রঞ্জন সেনের (সম্প্রতি দিল্লীতে যার ব্যক্তিগত প্রদর্শনী হয়ে গেল) দুটি ছবি এখানে এসেছে। ৯ বছরে আঁকা গার্লস্ পোর্ট্রেট-এ শুধু একটি ছোট মেয়ের মুখ ধরা পড়েনি, তার চোখের দৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিরাসক্ত মনটির ছায়াপাত হয়েছে। ৬ বছরের কবিতা চক্রবর্তীর ছবির সংখ্যাই সর্বাধিক। ৬টি ছবিতে কবিতা ঘরোয়া জীবনের ছবি 'ক্যালকাটা কুকিং'—ইত্যাদি এঁকেছে। এই সঙ্গে মুদ্রিত নীনা অগ্রবালের (১৩) ছবিটিও উল্লেখযোগ্য। একটি সাধারণ ব্রাউন পেপারের ওপর পাতলাভাবে রং চালিয়ে এই প্রসাধনরতা—'হিন্দু গার্ল'-এর ছবিটি আঁকা হয়েছে। বম্বের আরেকটি মেয়ে আর গারদি আঙ্গুল দিয়ে রং লাগিয়ে একটি মুখ ফুটিয়ে তুলেছে, যা উল্লেখযোগ্য। এছাড়া মেয়েদের ছবির মধ্যে ডায়েনা রো (১১)র থ্রী ফিশারউইমেন, দি টাইগার এবং এইচ উবেরয় (১১)'র দি ফার্নইয়ার্ড ও এলিফ্যাণ্ট প্রোসেশন কৃতিত্বের পরিচায়ক।

ছেলেদের ছবির সংখ্যা মেয়েদের চেয়ে বেশী। বম্বের পি ডির্ভেটিয়া (১০)'র মণিপুরী মৃদঙ্গবাদকের ছবিটি তুলির টানে ও রঙের নির্বাচনে বলিষ্ঠ রচনা। হরেন ভকীলের (৯) কাঁথিয়াওয়াড়ী নৃত্য ছবিটির রেখার মধ্যে পটচিত্রের প্রভাব আছে মনে হয়। বি কারিয়া-র (১৩) 'ব্রাহ্মণ' স্বাভাবিক প্রতিকৃতি রচনার দিক দিয়ে বেশ ভাল। ইন্দর মোহনের (১৪) 'ম্যান উইথ ফ্লাওয়ার'এ মুখের কাঠিন্যের সঙ্গে ফুলের কোমলতা বেশ কনট্রাস্ট সৃষ্টি করেছে। দুলাল মণ্ডলের (১৩) 'দি লেসন্' ও এ কে চট্টোপাধ্যায়ের (১৫) কলকাতার মসজিদ উল্লেখযোগ্য। রঙের বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে রামচন্দনীর 'ষাঁড়' এবং জ্যোতি

রূপার ছোটখাট অলঙ্কার গোঁজা থাকে। সখীদের গায়ে থাকে আঁটসাট নীল, কালো বা লাল রংএর ব্লাউস, নাম হল "ফুরিৎ"। মাথার উপর থেকে পাতলা উড়ানি দিয়ে মুখ ও কাঁধ সব ঢেকে দেয়। এত পাতলা সুতোয় তা তৈরী যে, তার ভিতর দিয়ে বাইরের সবই দেখা যায়। আজকাল বেণী রচনা ও মুখ চাদরে আবৃত করার রীতি উঠে যাচ্ছে।

সখীরা রাধাকে নিয়ে নাবল। তারপর নিজেরা কয়েকজনে মিলে চামর হাতে নিয়ে দুলিয়ে দুলিয়ে অনেকক্ষণ নাচল। কৃষ্ণের সামনে সকলে বসল। গানের মাঝে সাধারণ ভাষায় সামান্য কথাও বলল। রাধা-কৃষ্ণকে সকলে মিলে বরণ করল। শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধান হল। তখন সখীরা কৃষ্ণবিরহের গান ধরল। এইভাবে নাচের পর নাচ, গানের পর গান অনেকক্ষণ ধরে চলার পর রাত্রির শেষ দিকে মিলনের দৃশ্য দেখানো হল রাধা ও কৃষ্ণকে একসঙ্গে দাঁড় করিয়ে, এবং আসর ভাঙবার আগে দর্শকদের মধ্যে বহু স্ত্রী-পুরুষ ভিড় করে এসে সাক্ষাৎ দেবতারূপে বালক কৃষ্ণ ও বালিকা রাধাকে ভক্তি জানাতে লাগল সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে পদধূলি নিয়ে।

রাসের অভিনয় ও নাচগান প্রথম ঘণ্টা দুয়েকের পর আমাদের মত বাইরের দর্শকদের কাছে খুবই একরকমের মনে হবে। কিন্তু মণিপুরী সমাজ তাদের ধর্মের অঙ্গ হিসেবে একে দেখে বলে এতটুকু ক্লান্তি বোধ করে না। দেখেছি, গান শুনতে শুনতে ভাবাবেগে কতজনে গলা ছেড়ে কেঁদে উঠেছে, কতজনের চোখ জলে ভরে গেছে, কতজন আবেগের সঙ্গে শিক্ষকের সামনে গিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করে তারা যে মুগ্ধ হয়েছে, সে কথা জানিয়েছে। কখনো ভাবাবেগে নিজের গায়ের ভাল চাদরটি শিক্ষককে উপহার দিল তাও দেখেছি।

মণিপুরী মেয়েদের গানের গলা অত্যন্ত মধুর। গলা যেমন উঁচুতে চড়ে, তেমনি মিষ্টি ও বলিষ্ঠ। সাবলীল তানে গান গেয়ে যায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা তার সঙ্গে নাচও চলছে, কিন্তু কোথাও ক্লান্তি প্রকাশ পায় না। মণিপুরী সমাজের নিয়ম অবিবাহিত মেয়েদেরই গ্রহণ করা হয়। এদের এরা বলে 'লৈসবী'। শোনা যায়, এই রাসের কৃষ্ণচরিত্র মেয়েদেরই অভিনয় করতে হতো, কিন্তু আজকাল তার ব্যতিক্রম অনেকখানেই দেখা যায়।

আজকাল যে-ক'টি প্রাচীন নাচ ভারতে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে তার মধ্যে উত্তর ভারতের কথক ও মণিপুরী, দক্ষিণের কথাকলি ও ভারতনাট্যমের কথাই আমরা সকলে জানি। এদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে পরস্পরের তালে, ভঙ্গিতে, মুদ্রার ব্যবহারে যথেষ্ট পার্থক্য রয়েছে। কথাকলি ও ভারতনাট্যম নাচের দিক থেকে এক আদর্শে চালিত হলেও ভারতনাট্যমের মত বিচিত্র ছন্দবহুল পদচালনা কথাকলিতে নেই। কথাকলি যাত্রার মত বহুজন সমাবেশে অভিনয়ের নাচ। ভারত নাট্যম হল মেয়েদের একলার নাচ। উত্তর ভারতের কথকও একলার নাচ। সঙ্গে অভিনয় থাকলেও মুদ্রার আতিশয্য নেই, দক্ষিণ দেশের মত। মুদ্রাভিনয়ের জটিলতা কথকে নেই বটে, কিন্তু এতে আছে নিজস্ব পায়ের কাজ। ছন্দবৈচিত্র্যের নাচ হিসেবে কথককে বোধ হয় সব নাচের অগ্রণী বলা যেতে পারে। মণিপুরী নাচে কোনটারই আতিশয্য নেই। মুদ্রা ব্যবহারের জটিলতা ও পায়ের ছন্দের কাজ উল্লিখিত অন্য নাচগুলির তুলনায় অতি সামান্য। মুদ্রা বা পায়ের কাজের জটিলতার দিকেই এরা যায় নি। নাচে এরা পা, হাত, দেহ ও মাথার একত্র চালনার একটি সহজ সামঞ্জস্য ফোটাবার চেষ্টা করে। মহারাসের অভিনয়ে নানা-প্রকার পদাবলী গানের সঙ্গে সখী বা রাধা যখন নাচে, তখন প্রায়ই দেখা যায়, নাচিয়েরা ভঙ্গির পর ভঙ্গি হাত, পা, দেহের ছন্দোবদ্ধ গতিতে করে যাচ্ছে। গানের প্রত্যেক পংক্তিতে সে কথা প্রকাশ পাচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, এই নৃত্যভঙ্গির সঙ্গে তার কোন যোগ নেই। সেগুলি তৈরি কেবলমাত্র গানের তাল বা ছন্দের সঙ্গে মিলিয়ে। আমার মনে হয়, প্রাচীন শাস্ত্রের 'নৃত্ত' ও 'নৃত্য' শব্দের যথাযথ ব্যাখ্যা বোধ হয় বর্তমান ভারতের দক্ষিণের কথাকলি, ভারতনাট্যম ও উত্তরের মণিপুরী নাচের তারতম্যের মধ্যে

যাঁরা আসামের বৈষ্ণবদের অথবা শংকরদেব প্রচারিত বৈষ্ণবধর্মের কেন্দ্র-স্বরূপ নানা "মঠের" বা সত্রের নৃত্যাভিনয় দেখেছেন, তাঁরা মণিপুরী নাচের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রে সেই সব নাচের মিল দেখতে পাবেন। অনুমান করি, এর কারণ এক হতে পারে এই যে, মহারাজ "ভাগ্যচন্দ্র" যখন আসামের রাজার অতিথিরূপে আত্মগোপন করেছিলেন, তখন সেখানে আসামের ঐ নাচ দেখার সুবিধা তাঁর হয়েছিল। পরে বৈবাহিক-সূত্রে যখন আসামরাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ হয়, তখন হয়তো সেখানকার নাচিয়েরা তাঁকে মণিপুরের বৈষ্ণব উৎসবগুলিকে নতুনভাবে সাজাতে সাহায্য করেছিল। কারণ ভাগ্যচন্দ্র মহা-রাজই বর্তমানে প্রচলিত মণিপুরী বৈষ্ণব সমাজের বড় বড় উৎসবগুলিকে নতুন করে সাজিয়েছিলেন। অথবা বলা চলে যে, মণিপুরের দেশী নাচের সঙ্গে তিনি আসামের বৈষ্ণবদের নাচ মিশিয়েই মণি-

সাহীর 'ভিলেজ ফায়ার' ইত্যাদি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এন আহমেদের (৯) 'মুসলমান ভদ্রলোক' এবং এ হাসানের (৯) 'মুসলিম মহিলা' কৌতুকজনক রচনা। এ প্রসঙ্গে একটা কথা মনে হল, তালিকায় ছেলেমেয়েদের নামের পাশে 'বাঙালী' বা 'পাঞ্জাবী' বিশেষত হিন্দু বা মুসলিম ইত্যাদির উল্লেখ দৃষ্টিকটু। ছোট শিল্পীদের এইভাবে প্রাদেশিক ও ধর্মগত বিভাগে ফেলার কি কোন প্রয়োজন ছিল?

নাটকীয় বা মর্মান্তিক ঘটনা কাঁচা মনে যে ছাপ রেখে যায়, তারই প্রমাণ ১৩ বছরের দেবেন্দ্র কুমারের দিল্লী-দাঙ্গার ছবি। জীবজন্তুর প্রতি ছোটদের টানের পরিচয় সুন্দরভাবে ফুটেছে বীরেন পাতিলের ভাল্লুক নাচের ছবিতে।

বিষয়বস্তু নির্বাচন থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের রীতি-নীতি, পারিবারিক জীবন ও বেশবাশের পরিচয় পাওয়া যায়। আর প্রায় সকল ছবিতেই শিশু ও কৈশোরের উদ্ভাবনী প্রতিভা ও প্রখর শিল্পচাতুর্য প্রকট হয়েছে। ভারতের সংস্কৃতির প্রভাব বহু যুগ ধ'রে প্রবাহিত হয়ে এসেছে, তারও প্রমাণ মেলে।

তরুণ ঘোষ

হাঙ্গারীর লোকশিল্প

গত ১২ই ফেব্রুয়ারী থেকে আশুতোষ কলেজের হলঘরে হাঙ্গারীয় লোকশিল্পের একটি প্রদর্শনী শুরু হয়েছে। ভারতীয় ললিতকলা অ্যাকাদেমীর পৃষ্ঠপোষকতায় এই প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এখানে প্রদর্শিত সব কিছুই কারুশিল্প। এগুলিকে তিনটি বিভাগে ভাগ ক'রে সাজানো হয়েছে। হলঘরে ঢুকেই প্রথমে চোখে পড়ে খোদাইকর্ম, তারপর বয়নশিল্প, এমব্রয়ডারী ও পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সবশেষে পোড়ামাটির বাসনপত্র। হাঙ্গারীর লোকশিল্প-প্রসার সম্বন্ধে সঠিক 'খোঁজ-খবর পাওয়া যায় অষ্টাদশ শতকের পর থেকে। তার আগে কি অবস্থা ছিল, সে হিসাব মেলা মুশকিল। প্রায় দু'শ বছরের পুরাতন কারুশিল্পের নমুনাও এখানে কিছু কিছু রাখা হয়েছে।

খোপার বাহার

কারুকার্যখচিত চেয়ারের পৃষ্ঠদেশ

ওখানকার পশুপালকরা তাদের অবসর সময়ে নানানরকম শিল্পকর্ম করে থাকে এবং বংশপরম্পরায় এদের মধ্যে একেকটি বিশেষ ধরনের শিল্পকর্মের সাধনা চলে আসছে। কাঠের উপর বা শিঙের উপর যে সব খোদাই-এর কাজ প্রদর্শিত হয়েছে, সেগুলি সবই ঐ পশুপালকগণ কৃত। নিজেদের জীবনযাত্রা অথবা চারণ-কবি কথিত বীরপুরুষদের কাহিনী অবলম্বনেই এরা খোদাই-নক্সা করে থাকে। অধুনা লতাপাতা, পশুপাখি প্রভৃতি নক্সারও প্রচলন হয়েছে। এইসব অলংকরণ দেখা যায় ফটক, তোরণ, সাধারণ ব্যবহারের বাসনপত্র, জোয়াল, বিদা ইত্যাদি জিনিসপত্রের উপর। চামড়ার কাজেও এরা খুব পটু।

বয়নশিল্প, সূচিশিল্প এবং পোশাক-পরিচ্ছদ বিভাগটি খুব আকর্ষণীয়। লিনেন জাতীয় কাপড় আজও মেয়েরা ঘরে বুনে থাকে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এমব্রয়ডারীর প্যাটার্ন'ও বদলে গেছে। একেক যুগে একেক রকম প্রভাবে প'ড়ে ফর্ম এবং রঙের পরিবর্তন ঘটেছে। জাঁকজমকপূর্ণ পোশাক এবং এমব্রয়ডারীর জন্য 'মাত্যো' জাতির খুব সুনাম আছে। সংখ্যায় এই মাত্যোরা খুবই কম। মাত্র দুটি গ্রামে বুদাপেস্তের উত্তর-পূর্ব কোণে এদের বসবাস। মাত্যো রমণীদের মধ্যে গোড়ায় কেবলমাত্র লাল রঙেই এমব্রয়ডারী করার প্রচলন ছিল, কিন্তু ইদানীং বহুবর্ণ নক্সার রেওয়াজ হয়েছে। 'প্যালক'রা হ'ল পাহাড়ী জাতি। এরাও বহু প্রাচীনকাল থেকে এদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য বজায় রেখে আসছে। এদের নানা ধরনের মেয়েদের মাথার টুপি লক্ষ্য করবার মত। এমব্রয়ডারীর কাজেও এরা খুব চৌকস, তবে এদের মধ্যে পাড়জাতীয় নক্সারই বেশী প্রচলন মনে হ'ল। কালো জমির উপর শাদা এমব্রয়ডারীর কাজ

কাঠের পুতুল নির্মাণরত বৃদ্ধ

মাটির তৈরী নানা ধরণের পাত্র

'সারকজ'বাসীদের মত এমন আর কেউ করতে পারে না। সারকজ পরগণাটি ড্যানিউব নদীর দক্ষিণে অবস্থিত।

সারকজের রমণীরা বয়ন-শিল্পেও অত্যন্ত পারদর্শী। বুদাপেস্ত অঞ্চলে 'তুরা' বলে যে, এমব্রয়ডারীর প্রচলন আছে, তা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গোড়ায় এ জিনিসটি সম্পূর্ণ সাদা সুতোয় বোনা হ'ত। আজকাল প্যাটার্ন অনেক সরল হয়ে গেছে বটে, কিন্তু বর্ণবহুল হয়ে 'তুরা' অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়ে উঠেছে। এ ছাড়া 'সমোগী', কাপুভার', 'হোভলী' 'লাকোচা', 'সিওয়াগার্দ' এবং 'কলোচা অঞ্চল এমব্রয়ডারী শিল্পকর্মের জন্য প্রসিদ্ধ। কলোচাবাসী রমণীদের প্রাচীর-চিত্রণ আরেকটি দর্শনীয় জিনিস। রেলওয়ে স্টেশন, শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির দেওয়ালে এবং সাধারণ বাসভবনেও এই প্রাচীর-চিত্রণ দেখা যায়। হাঙ্গারীর 'ফ্রীজ-কোট'-এর নাম হয়ত অনেকেই শুনে থাকবেন। কয়েকরকম ফ্রীজ-কোট এখানে প্রদর্শন করা হয়েছে। এটি পুরুষদের পোশাক। উৎসব উপলক্ষে পরবার জন্য যে সব ফ্রীজ কোট তৈরী হয় তার উপর নানারকম রঙবেরঙের এমব্রয়ডারী করা হয়ে থাকে। এবং এই সব এমব্রয়ডারী বেশীরভাগ সময় পুরুষ মানুষেরাই করে থাকে। মেষচর্ম নির্মিত কয়েকটি জ্যাকেট-এর নমুনাও প্রদর্শিত হয়েছে। এগুলি ওখানকার গ্রামাঞ্চলে খুব জনপ্রিয়।

কারুকার্যখচিত মৃন্ময় পাত্র তৈরী করার রেওয়াজ হাঙ্গারীর চাষী পরিবারদের মধ্যেই সবচেয়ে বেশী। ঊনবিংশ শতকের শেষে এদের কারিগরি চরম উৎকর্ষে পৌঁছেছিল। তারপর পোরসেলেন নির্মিত এবং কারখানায় প্রস্তুত পাত্রাদির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় প'ড়ে এই শিল্প ক্রমশ নষ্ট হয়ে আসছিল, কিন্তু আবার দু-একজন কুম্ভকার তাদের নষ্ট-গৌরব পুনরুদ্ধার করবার জন্য উঠে-প'ড়ে লেগেছে। কয়েকটি কারখানাতেও পুরাতন ধরনের নক্সা এবং গঠন অনুসরণ করে বাসনপত্র তৈরী করা হচ্ছে। সেবেসচিয়েন জেরেণ্ডার এইসব কুম্ভকারদের মধ্যে অন্যতম।

নক্সা এবং গঠনে মৃৎপাত্রগুলির সঙ্গে এদেশীয় জিনিসের খুব সাদৃশ্য আছে; উত্তরপ্রদেশে চুনার অঞ্চলে এই ধরনের মৃৎশিল্প দেখা যায়। তবে হাঙ্গারীয়ানদের অলংকরণ আরও জমকালো। 'নাদুদভার' এবং 'সুজেনটিস' অঞ্চলে কালো রঙের যে ধরনের পাত্রাদি প্রস্তুত হয়, আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা হামেশাই সেই ধরনের মাটির বাসন ব্যবহার করে থাকি—যথা, কুঁজো, কলসী ইত্যাদি।

বয়ন-শিল্পেও লক্ষ্য করলাম অনেক প্যাটার্ন-এর সঙ্গে এদেশীয় নক্সার খুব সাদৃশ্য আছে। কাশ্মীর এবং তিব্বতের বহু প্যাটার্ন-এর সঙ্গে কয়েকটি কাজ আশ্চর্যরকম মিলে যায়। সব দেখেশুনে মনে হয় লোক-শিল্পীদের রুচিবোধ সব দেশেরই প্রায় একরকম। কোন্ কোন্ অঞ্চলের কি কি শিল্প এবং তা কিভাবে ব্যবহৃত হয়, সে বিষয় অত্যন্ত সরলভাবে মানচিত্র এবং ফটোগ্রাফের সাহায্যে বোঝানো হয়েছে। এ ধরনের বিদেশী লোক-শিল্পের প্রদর্শনী সম্ভবত এই প্রথম। ললিতকলা অ্যাকাদেমী হাঙ্গারীয় লোক-শিল্পের সঙ্গে পরিচয় লাভ করার সুযোগ উপস্থাপিত করে জনসাধারণের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন। ভবিষ্যতে এই ধরনের প্রদর্শনীর আরও ব্যবস্থা হবে আশা করি।

প্রদর্শনীটি ২০শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত খোলা আছে, প্রতিদিন বেলা ১০টা থেকে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত। —চিত্রগ্রীব

And God said, Let there be light, and there was light.'—ইচ্ছাময়ের ইচ্ছে হ'ল আলো হোক্, তো, হ'ল আলো। দিল্লীর ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে নৃত্য-উৎসবের মহলায় নাচের ফাঁকে ফাঁকে যখন দল-বদলের জন্য আলো নিভ্‌ছিল তখন ইচ্ছাময়ের কী ইচ্ছে হচ্ছিল জানিনে, তবে সমবেত দর্শকনারায়ণের দিল্ যে সমস্বরে আকুলী-বিকুলী করছিল—let there be light বলে, সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি। তবু তো সেদিন 'জনসমাবেশ' তেমন হয়নি। হবার কথাও নয়, কারণ, সেদিনের অনুষ্ঠানটা ছিল সাজ-মহলার, মানে, 'ড্রেস-রিহার্সালে'র। সাধারণ্যে সেটার প্রচার ছিলো না তাই। তাতেও স্টেডিয়ামের একটা দিক তো বেশ ভরাভর্তি। তা'ছাড়া আমরা জনকয়েক, কেউ ফটো তুলতে, কেউ বা আমার মত নক্‌শাদারী করতে একেবারে নাটমঞ্চের ধার ঘেঁষে দাঁড়ানোর পরোয়ানাও পেয়ে গেছলুম এবং খবরদারি করবার জন্যও জনকয়েক ছিলেন সেখানে।

সিংহ-শিকারী

আমাদের মাথার ওপর ঢালাও চাঁদোয়া—সেটা তারার চুম্‌কি বসানো আকাশের। নাটমঞ্চের ওপরে কিন্তু বাস্তবিক চাঁদোয়া খাটানো। আর তাতে পঁচিশ চাদের রোশ্‌নাই পঁচিশ কি পঁয়ষট্টি গুণে দেখিনি, তবে নেপথ্য-ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কয়েক সারি প্রমাণ পূর্ণচন্দ্র সাইজের বিজলী বাতির আলো জ্বলে উঠল—যেন 'ধাঁধিয়া নয়ন'। চেয়ে দেখি, ওপরে চাঁদ নিচে চাঁদ। নাচিয়েদের চেহারায়, সাজসজ্জায় আর গয়নায়, ঠিক্‌রে-পড়া আলোয় একেবারে 'চাঁদে চাঁদে মাখামাখি'। তাকে সেকেলে আদিখ্যেতায় চলন্ত 'চাঁদের হাট' বলুন কিংবা একেলে কাব্যি কোরে হাসনুহানার মালঞ্চে হাওয়া-লাগা রোশ্‌নিবাগ বলুন, ব্যাপারটা প্রায় তাই। রঙচড়িয়ে বলার বাড়াবাড়ি ঠেক্‌ছে তো? হক্ কথা। এটুকু আঁচ উত্তাপ না পেলে পাঠকজনের কল্পনার আল্‌বোলায় মৌতাতের কল্কেটি ধরবে কেমন করে? বেশ, কল্পনাকে আল্‌-বোলা বল্‌তে আপত্তি হয় তো ধরুন সেটা কাশ্মীরী-কাজ-করা ছবির ফ্রেম। আর সেই ফেরেমে একটার পর একটা ছবি এঁকে দিই সেদিনকার সেই নাচ-মুশায়েরার। এক একটি প্রদেশ থেকে

গোয়া

পেপসু

এসেছেন এক একদল নাচিয়ে। (একাধিকও এসেছেন কোনো কোনো স্থান থেকে) ঘোষণা হয়, আলো জ্বলে, শুরু হয় নাচ, তাদের পালা শেষ হয় আবার আঁধার নামে স্টেজে—(মঞ্চ আঁধার করে নেমে যান তাঁরা—একথাও বলতে পারেন) আবার নতুন একদলের উদয় হয় স্টেজ আলো করে। উদয়টা কিন্তু নিঃশব্দসঞ্চার হয় না সব সময়। নানারকমের বাদ্যিবাজনা তাঁদের আবির্ভাব সূচনা করে। কোনো দল হয়ত রঙ্গপ্রবেশ করলেন মৃদঙ্গ মর্দলের তালে তান্ডবনৃত্যে, আবার কোনো দল এলেন রিণি রিণি মঞ্জীরশিঞ্জিনীর লাস্যে বাঁশীর সঙ্গীতমূর্ছনায়।

নির্বিশেষ থেকে বিশেষে আসি।

শুনলুম নেপথ্য ঘোষণার আকাশ-বাণী। জ্বলল আলো। শোনা গেল জয়ঢক্কার ডিণ্ডিম আর দেখা গেল নাগরা-পাগড়ি আর ঘাঘরা-ওড়নার বিচিত্র রঙের তুফান তুলে নাচছে রাজস্থানের কিন্নর-কিন্নরীরা। তাদের নাচের স্থায়ীভাবটা বীররসের। সেটা মনে ভালো করে ধরতে না ধরতেই আবার 'আঁধার নামিল মঞ্চে'। মিনিটখানেকের আঁধারে চোখের-দেখাটা মনে ভালো করে বসতে না বসতেই আর একদলের আবির্ভাব, হয়তো তাঁরা পণ্ডিচেরী থেকে এসেছেন। চার্চ-এর সঙ্গীতের সঙ্গে সংযত-গম্ভীর উপাসনা-নৃত্য নিয়ে। এইটেই অনিবার্য অসুবিধে। যেমন কোনো বিশেষ রান্না বা বিশেষ রস ভালো করে চেখে ওঠা যায় না ভূরিভোজের আয়োজনে। আদি ও অকৃত্রিম লোকনৃত্য

মধ্যপ্রদেশ

ছাড়া হাল আমলের এবং হাল ফ্যাশানের নাচগানও ছিলো কিন্তু তাকে লোকনৃত্য বা সংগীতের থেকে আলাদা করে চিনে নেওয়ার অসুবিধে ছিলো না। মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, আসাম আর হিমাচল প্রদেশের নৃত্যে সেই আদিম এবং আরণ্য সভ্যতার রোমান্সটা বজায় রয়েছে, সৌরাষ্ট্র, কর্ণাটক, কাশ্মীর কি পেপসুর নাচে যেমন মধ্যযুগের ছোঁয়াচ। আর অতি আধুনিক রঙ আর ঢঙ দেখলুম গোয়ার নাচের ছাঁদে। তাঁদের গরম বাজনা আর তরল লাস্যে সাগরপারের ছাপটা প্রকট। সেটাকে ফিরিঙ্গিয়ানা বলে নিন্দে না করে হিস্পানী কালচারের ছোঁয়াচ লাগা আধুনিক দেশী নাচের জাতে ওঠাতে

পারা যায়। পণ্ডিচেরীর দলের বেশভূষাও তো পুরোপুরি বিলিতি, কিন্তু, উপাসনা-সঙ্গীতের সহযোগিতায় তার একটা শান্ত সৌম্য আবেদন ছিলো, যার জন্য বোধ করি তাঁরা গোয়ার নাচিয়েদের মত বিশেষ শ্রেণীর দর্শকদের শীৎকারে সম্বর্ধিত হননি।

স্টেজে আলো নেভে, আবার জ্বলে ওঠে। নাচের দুলবদল আর পালা বদল হয়। সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনেরও হাওয়া বদল হয়ে যায় অজানিতে। দেখছেন মধ্য-ভারতের আদিবাসী নৃত্য। মাথায় মস্ত শিঙের মুকুট। তার থেকে ঝালর নেমে মুখটা দেখা যায় কি যায় না। হাতে প্রকাণ্ড বর্শা। গাইয়ে বাজিয়েদেরও বেশভূষা বিচিত্র। মাদলের তালে তাদের নাচ দেখতে দেখতে যে চলে গেছেন বিন্ধ্যপর্বতের কাছাকাছি কোনো আরণ্য-জনপদে। সে পালা যেই চুকল আর মিনিটখানেকের অন্ধকার কাটল, দেখলেম জোব্বা আঁটা আর পায়জামা পরা হিমাচলের গন্ধর্ব আর নাকে কানে গলায় গয়নায় মোড়া (সোনা কিম্বা চাঁদি দুই-ই রয়েছে, ওজনেও বেশ ভারিভুরি) গন্ধর্ববধূ। ভাবছেন মুশৌরীর কাছাকাছি কোথাও অথবা টেহরী গাড়োয়ালের কোলে কোনো পাকদণ্ডীর বাঁকে থমকে দাঁড়িয়ে গেছেন মজা দেখতে।

প্রত্যেক দেশের নাচে যে তাদের জাতীয় চরিত্রের বিশেষ দিকটা ফুটে উঠেছে—সেটা একটু দেখলেই বেশ

পণ্ডিচেরী

কাশ্মীর

অনুভব করা যায়। পেপ্সু (Patiala and East Punjab States union থেকে এসেছেন যাঁরা তাঁদের চেহারায়, চরিত্রে, সাজে বাজনায় একটা উদ্দাম উদ্দীপনার ভাব। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে নাচের লয়ও সমান দ্রুত। এ ব্যাপারে সবচেয়ে মজা করেছে হায়দ্রাবাদের দল। যথারীতি অন্ধকারের অবকাশ। আসন্ন নাচের প্রত্যাশায় দর্শকদল নিঃশব্দে উদ্‌গ্রীব অপেক্ষায়। চারদিক সুনসান —দূরে শিয়ালের ডাকে শহরতলীর সীমানা আর রাত্রির প্রহর যুগপৎ চিহ্নিত। হঠাৎ প্রচণ্ড রাইফেল-মার্কা আওয়াজ! মিলিটারী কণ্টকিত স্টেডিয়ামে একটা কিছু অনর্থের আশঙ্কা করছি এমন সময় ঝুমুর, মাদল আর নানান ধরনের বাজনার মিশ্র গুঞ্জরন ক্রমে উদ্দাম হয়ে উঠল মঞ্চের ওপর। আলো জ্বললে দেখা গেল—লুঙ্গিপরা আস্তিন গুটানো একদল "মেছুয়াবাজার হতে পালোয়ান চারজন" মার্কা চেহারার লোক যুদ্ধযাত্রার ভঙ্গীতে মঞ্চারোহণ করছেন। তাঁদের হাতে নানা ধরনের প্রাচীন ও আধুনিক আয়ুধ, আকাশে উদ্যত রাইফেল এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিটির দুই হাতে প্রচণ্ড বেগে আস্ফালিত নিষ্কোশিত অসি। তাঁদেরি এক কুলবৃদ্ধকে (অন্ধ বলেই মনে হল) এগিয়ে আনা হল মাইক্রোফোনের সামনে। বৃদ্ধের কোমরে বাঁধা বেশ মোটা একগোছা ঝুমুর। গানের তালে যেই কোমর ঝাঁকান ঘুঙুরে আওয়াজ ওঠে আর তারই তালে তালে বাজে নানান রকমের বাজনা বাদ্য। তিনি দুর্বোধ্য ভাষায় গান অথবা আবৃত্তি করতে লাগলেন এবং সেই সঙ্গে তাল রেখে চলতে লাগল স্টেজের ওপর খাপ খোলা তরোয়াল হাতে খুন-গরম-করা উদ্দাম নৃত্য। রীতিমত রাজাকারী কারবার।

ঠিক তারপরেই উঠলেন মণিপুরী কিন্নর কিন্নরীরা নাটমঞ্চে। ছিল নাটমঞ্চ হয়ে উঠল রাসমঞ্চ। হায়দ্রাবাদের হানাদারী হামলার পর এ'দের নৃত্যলাস্যের আশ্চর্য কমনীয়তা যেন বেশি করে অনুভব করা গেল। এই বৈষম্য আর বৈপরীত্যের মধ্যেই রয়েছে সেদিনের সেই নৃত্যোৎসবের মজাটা। মজা ছাড়াও এই

মণিপুরী মূর্চ্ছনা

ক' ঘণ্টায় শিখলুম অনেক কিছু। ইতিহাসের আভাস পেলুম। ভূগোলের গোলমালটা অনেকখানি সহজ হল। আর ঐ যে 'আসমুদ্রহিমাচল' বলে আকণ্ঠবিস্তৃত কথাটা। ওটাকে এতদিন মুখস্থ করেছি ব্যাকরণের পাতায় সমাস-বিন্যাসের উদাহরণ হিসেবে আর আউড়েছি এখানে সেখানে একটা বড় কিছু বোঝাবার জন্য। সেটা যে কত বড় তা মালুম হোল ঐ নাটমঞ্চের ধারে বসে। আসমুদ্র-হিমাচলই বটে। বম্বে গোয়া পণ্ডিচেরীর সমুদ্রতট কাশ্মীর থেকে কামরূপজোড়া হিমালয়ের কোল, কাছাড় থেকে কাথিয়া-বাড় সবখান থেকেই ছুটে এসেছেন গুণিজন তাঁদের গুণপণার পরিচয় দিতে শুধু দিতে নয়, নিতেও, এই নাচের আসরে। পরিচয়ে বাধা তো দুস্তর—মানে ভাষা-না-বোঝার অসুবিধে। কণ্ঠ্য-ওষ্ঠ্য-তালব্যের যে ভাষা তার হাস্তে অবশ্য এ অপরিচয়ের সমুদ্রে পানি মেলবার কথা নয়। তবে, অন্যরকমের ভাষাও একটা রয়েছে; সেটা নাচের ভাষা। করাঙ্গুলির মুদ্রা আর চোখমুখের ইশারাইঙ্গিতে যে ভাও বাতানো হয় তাতে পুরো ভাব বুঝতে কিছু ঘাটতি থাকলেও অভাব ঘটেনি শিল্পী কিংবা দর্শকশ্রোতাদের মধ্যে।

তথ্য এবং তত্ত্বকথার বাড়াবাড়ি

হায়দরাবাদ হানাদার

রাজস্থান

হয়ে যাচ্ছে বুঝছি। তাই কলমের লাগাম টান্‌তে হচ্ছে।

একটি অবিচ্ছিন্ন জমজমাট (সেটা অবশ্য অবিমিশ্র নয়) আসরে দাঁড়িয়েছিলুম কয়েক ঘণ্টা। মঞ্চের ধার-ঘেঁষা অতি-সান্নিধ্যের এই অসুবিধেটুকু হজম করতে হয়েছিল। শেষটা কিন্তু ব্যাপারখানা করুণ হয়ে উঠ্‌ল। পালা যত জমজমাট আমরা দর্শকজনও তত। নৃত্যরসে যতটা শৈত্যবশে তার চেয়ে ঢের বেশি মরু-দেহলীর আকাশে সুদুর্লভ মেঘ অবসন্ন শীতের কয়েকটা দিন একটানা অকাল-বর্ষায় ভিজিয়ে সবে ক্ষান্ত হয়েছে। সকালে ঝিরিঝিরি, দুপুরে মেঘমেদুর। এই সন্ধেয় সবে মেঘমুক্তি। তাই মাথার ওপর আশমান আর পায়ের তলার জমিন হিমবিকীরণের প্রতিযোগিতা চালিয়েছিল। অথচ আসর ছাড়তে পারি না বেরসিক অপবাদ ভয়ে।

মন বলে 'রহো রহো', আর হিমে হিমায়মান দেহ বলে 'রাম কহো'! শরীরের তাগিদটাই জিতল, চলে এলুম প্রাণের দায়ে। শেষের গোটাকয়েক আইটেম দেখা হ'ল না। তবুতো প্রাণে বাঁচলুম এবং সেই সঙ্গে আপনারা পাঠককুল বাঁচলেন নাচ-মোচ্ছবের তথ্য পরিবেশনের এই একটানা মনোটোন থেকে।

বাড়ি বদলে

বিমল কর

আজ কিছুদিন ধরে নিজেকে সান্ত্বনা দিচ্ছি এই বলে যে, এ জায়গাটা ভাল, এ বাড়িটা। দু' মাস আগে যখন বেহালায় যাই, তখন, প্রথম প্রথম নিজেকে নানাভাবে প্রবোধ দিয়েছি। সে-বাড়ির মাথার দিকের জানালা খুললেই পুকুর। জলে মোবিল-তেলের রঙ ধরানো; আশেপাশে বাঁশ ঝোপ, জামগাছ আর ডাবগাছ। পাড়ার লোকে পুকুরপাড়ে ছাই, এঁটো-কাঁটা আবর্জনা ফেলে ফেলে ডাঁই করেছে। হাওয়ায় সারাক্ষণ সেই ময়লা উড়ছে, হাঁস মুরগী কাক চড়ুইয়ে ঠোঁট ঠোকাঠুকি ক'রে মাছের আঁশ, ডিমের খোসা অনবরতই ছড়িয়ে যাচ্ছে এখানে ওখানে, দুটো কুকুর অষ্টপ্রহর সেখানে মোতায়েন। দৃশ্যটা অস্বস্তিকর, জায়গাটা অস্বাস্থ্যকর ব'লেই। কাজেই মাথার দিকের জানালার নিচের কপাট দুটো বন্ধ রাখতে হ'ত সারাদিনই; ওপরের পাটটা খোলা থাকত। আর সেই ওপর-জানালা দিয়ে গাছের পাতা আর আকাশ দেখতাম আমি। তখন, মনে মনে এই সান্ত্বনা ছিল—কলকাতা শহরে এমন করে আকাশ দেখা যায় না। এমনভাবে গাছের পাতা হাতের নাগালে ধরা দেয় না। জায়গাটা গ্রাম্য; মশা মাছির দশাশই স্বাস্থ্য, (আমার ক্ষুদ্রমতি কন্যার ধারণায় সে মশক-কুল 'ফড়িং'), তাদের সংখ্যাধিক্যও প্রচুর যন্ত্রণাদায়ক তাদের উৎপাত—তবু বলতে কি আমি নিজেকে প্রত্যহই এই ব'লে প্রবোধ দিয়েছি যে, কলকাতায় হয়ত এত মশা নেই, কিন্তু তা ব'লে কলকাতার গলি-চাপা অন্ধকার, একটি পায়রা-খোপ ঘরের এক ইঞ্চি ঘনবর্গ পরিমাণ বাতাসে কয়েক শ' হাজার মারাত্মক আধি-ব্যাধির বীজাণু অপেক্ষা এই মশা—বেহালার মশা মন্দ কি এমন! ম্যালেরিয়ার মশা ওরা নয়—বড় জোর ফাইলেরিয়ার হতে পারে। তা হোক। সব সুবিধে কোথায় পাওয়া যায়। বেহালার বাজারে যে রকমটি ফ্রেস ভেজিটেবল, টাট্‌কা মাছ—(মেছো-মেছোনী যে মাছের জীবনীশক্তি জানাতে হাঁক দিয়ে বলে, নিয়ে যান বাবু ঝোলের মধ্যে লেজ নাড়বে—) এমনটি আর কলকাতায় পাচ্ছ কোথায়! বেহালা লাইনের ট্রামে চড়লে খুদে পায়, পুষ্পক রথও ছার তার কাছে, আর কি-বা পথ, রেড রোডের গা বেয়ে, রেস কোর্সের মাঠ ছুঁয়ে ছুঁয়ে, ডায়মণ্ড-হারবার রোডের বুক চিরে যেন একটা ইস্পাতের ঝকঝকে ফিতে ছড়িয়ে রয়েছে। লোক গিজ্‌গিজ বিশ্রী ভিড় নেই, অন্তত বেশির ভাগ সময়েই নেই—উঠতে পারলে বসা যায় এবং বসতে পারলে ঘুমনো চলে। অতএব জায়গাটা ভাল এবং বাড়িটাও মন্দ নয়।

দিন কতক মনের এই প্রত্যয় নিয়ে কাটান গেল। কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই কেমন ক'রে না-জানি সে-প্রত্যয়ের তাপ-অঙ্ক ম্যালেরিয়া জ্বর ছাড়ার মতন দ্রুত নামতে লাগল। মশার উৎপাতটা হঠাৎ অসহ মনে হ'ল, ঘরটার সর্বত্রই ড্যাম্পের চিহ্ন সহসা যেন দেওয়াল ফুঁড়ে ফুঁড়ে বেরিয়ে এল, সময় বুঝে একটা ভেগানিন্‌ ট্যাবলেট বেহালার এক-পাল্লাওয়ালা ডাক্তারখানাগুলোর কোথাও পেলাম না। স্ত্রী বললেন, সর্বনাশ, ওষুধ পাওয়া যায় না এমন জায়গা! রাতবিরাতে দরকার পড়লে ডাক্তারও পাবো না। দরকার নেই বাপু এখানে থেকে। তুমি অন্য বাড়ি দেখো।

বাড়ি খোঁজাটা তখন থেকেই জরুরী হয়ে উঠল। আমিও প্রমাদ গুনছিলাম। রাত্রে বাড়ি ফিরতে পথে আলো পাই না, রাস্তাময় খেঁকি কুকুর। তাড়া না করলেও যে পরিমাণ গর্জন করে তাতেই রীতিমত ভয়ে ভয়ে থাকি। আর বলতে কি, বেহালার অমন ফ্রেস মাছ, তরি-তরকারী, অমন আরামদায়ক ট্রাম-জার্নি সব কিছুই বিস্বাদ লাগতে লাগল। পুকুর, গাছ, মাছ কিছুতেই আর মন টানতে পারে না। এক সময় বন্ধু-বান্ধবের আড্ডার চোটে কাজকর্ম হ'ত না ব'লে ঠিক যে পরিমাণ আত্মধিক্কার জন্মাত, এখন বন্ধুবান্ধবহীন হয়ে ঠিক সেই পরিমাণ হাহাকার করতে লাগলুম মনে মনে। বিদ্যাপতির রাধা মাধবকে দেখতে না পেয়ে মনের মধ্যে যে নিদারুণ শূন্যতা অনুভব করেছিলেন, সখাকুলের সংসর্গ হারিয়ে আমি তার চেয়ে কিছু কম মুহ্যমান হইনি, অন্তত সে-সময় তা নিজে বেশ অনুভব করেছিলাম।

চেষ্টায় কি না হয়। খঞ্জের পক্ষে অপরের পিঠে চড়ে আরামে নদী পার হওয়ায় সম্ভব। মিথ্যে বলবো না, বন্ধুদের চেষ্টাতেই আমিও বাড়ি খোঁজার দুস্তর পরিশ্রমকে অনায়াসেই পাশ কাটিয়ে একটা বাড়ি পেয়ে গেলাম আবার। আচমকা। উত্তর কলকাতার উপকণ্ঠে।

এখন সেই বাড়িতে। এ বাড়িও বেশ নিরিবিলি, ফাঁকা। মাথার দিকের জানালা খুললে অবশ্য পুকুর দেখা যায় না, (যদিচ ক' পা হাঁটলে দীর্ঘ দীঘিকা, পানায় ভরা) কিন্তু কোনও এক নিশ্চুপ কলকারখানার ফেন্সিংওয়াল ডিঙিয়ে নিম, আম, কাঁঠাল গাছ মাথা উঁচিয়ে থাকে। সেখানে কাক, শালিখ, চড়ুই। ঘরের সামনে দেড় ফুটের উঁচু বারান্দা, নীচে খানিকটা জমি, কোথাও ঘাস কোথাও ন্যাড়া।

এ-বাড়ির সুখ এই, খুব ছোট, হ'লেও যতক্ষণ বাড়ির মধ্যে আছি ততক্ষণ রাজত্বটা একেবারেই আমার একা। সেখানে কোন ভাগীদার নেই। রান্নাঘরের এঁটো ছড়াতে ছড়াতে কেউ হাঁটে না, কপি আর চায়ের পাতায় ডাঁই করে না বারো শরিকের উঠোন। আপনার মাথার ওপর বাইরে থেকে জানালার আধখানা কি পুরোটা

আটকে কোনও ঊর্ধ্ববাসী অথবা বাসিনীর ধুতি শাড়ি ঝোলে না। অর্থাৎ নিম্নে থেকেও ঈশ্বরের অসীম কৃপায় খানিকটা রোদ আলো পাওয়া যায়, অন্তত এযাবৎ তাই যাচ্ছে।

কত সুবিধে এখানে এসে, এই নতুন বাড়িতে এসে, আমি এখন শুধু তারই হিসেব করছি। বেলা আটটা পর্যন্ত বিছানায় গড়াগড়ি দিয়েও বাজার করতে যাওয়া চলে। হাতের নাগালে বাজার। যাও আর এসো। কি পাবে না-পাবে তার কথা ধর্তব্য নয়। কেননা আহারের প্রতি নজর দেবে ভোজনবিলাসীরা। আমরা হচ্ছি বাক্যবিলাসী। আমাদের বাক্য নিয়ে কথা। তাতেই মন ভরে। আর এ-বাড়ি এমন যে, বাকপটু বন্ধুরা সব রয়েছেন হাঁক-পাড়া দূরত্বের মধ্যেই। আশে পাশেই। তাঁরা আছেন এই যথেষ্ট নয়, তাঁরা অনুরাগের আকর্ষণে আসছেন; আমিও যাচ্ছি। কাজেই এ স্বর্গ বেশ গুলজার হয়ে আছে।

আর সুবিধে বাস। সে ত কাছেই। দু' মিনিট পুরো হাঁটতে হয় কি হয়-না। বাস, বাজার যদি কাছে হ'ল তবে আর বাকি থাকে কি!

বাকি থাকে বইকি। এবার ধীরে ধীরে বেশ বুঝতে পারছি।

বুঝতে পারছি এ বাড়িতে জলকষ্ট প্রচুর। বলবেন হয়ত, বাড়ি যখন ভাড়া করেন, তখন মশাই সেটা কি ভেবে দেখেন নি? সত্যি বলতে কি, অত ভেবে দেখিনি, তলিয়ে বুঝি নি। ঘরে দোরে চৌবাচ্চায় জলের পাইপ লাগানো আছে দেখেছিলুম, কাজেই জল যে আছে এ ত অবধারিত সত্য। ধোঁয়া দেখলে যেমন আগুনের অস্তিত্ব সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হওয়া চলে তেমিন নিঃসন্দেহ হয়েছিলুম এ-ক্ষেত্রেও। কিন্তু দেখা গেল, পাইপ থাকলেও জল নেই। বাড়ি যাঁর তিনি বললেন, পাইপটা খারাপ হয়ে গেছে তা হ'লে। মিস্ত্রী দিয়ে ঠিক করিয়ে দেব। মিস্ত্রী এল দিন দশেক পরে। তবু জল নেই। টিউবওয়েলের সঙ্গে রীতিমত যুদ্ধ চলছে আমাদের। বললাম, কই মশাই জল? উনি বললেন, লো প্রেশার। দাঁড়ান ব্যবস্থা করছি।

ব্যবস্থাটা হল না এখনও। আশায় আছি হবে। আর সেই সঙ্গে আরও আশায় আছি, আমাদেরই রাজত্বের একটি ঘর দখল করে ভদ্রলোকের যে শ' খানেক বস্তা সিমেণ্ট ডাঁই হয়ে আছে, একদিন তা শূন্য হবে। শূন্য হচ্ছে এখনই। সিমেণ্টের গুঁড়ো উড়ছে রোজই। দু' একটা কুলী দরজা খুলে বস্তা বের করছে একটি কি দুটি করে প্রায় প্রত্যহই। অতএব, আজ হোক কাল হোক, ভবিষ্যতে কোনও এক সকালে সিমেণ্টের গুঁড়ো যে আর উড়বে না—এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ।

এসব থেকে এমন ধারণা অবশ্য করা উচিত হবে না যে, আমার অবস্থা ফুটন্ত কড়াই থেকে একেবারে গনগনে আগুনে ছিটকে এসে পড়ার মতন। কেউ কেউ ইঙ্গিতে এমন একটা আভাস দিলেও আমি তার ঘোরতর প্রতিবাদ করি। বলি, চিরকাল কি আর জল না এসে থাকবে, না সিমেণ্ট উড়বে। তা ছাড়া ও'রা—আমার একমাত্র ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী যাঁরা এবং যাঁদের এই বাড়ি—তাঁরা সুজন। ঘরের কুকুরটাকে শেকলে বেঁধে রাখেন, রেডিয়োটা বাজান যেন চাপা-গলায় ঘরের মধ্যে কেউ গান করছে, দুরন্ত মেয়েটা ও'দের ঘরে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যখন-তখন তবু কী নির্বিকার তাঁরা দরকারে অবেলায় চায়ের জল গরম করে দেন—ভদ্রতম প্রতিবেশীর এর চেয়ে উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আর কী হতে পারে। অতএব, সামান্য যা অভাব-অভিযোগ, তাকে অত আমল দিয়ো না।

তবু, ভয় হয় মাঝে মাঝে। ভয় হয়, এ বাড়ির ওপর এখনো যে অটুট আস্থা আছে তা কতকাল থাকবে। দেখা গেছে—অন্তত আমি ত দেখলুম, কোনও বাড়িতে ঢুকে প্রথম প্রথম যে সুবিধেগুলো স্বস্তি ব'লে মনে হয়, পরে কিছুকাল কাটার পর সেই স্বস্তির চেয়ে অস্বস্তিগুলো ঢের বেশি প্রখর হয়ে দেখা দেয়।

আমার ধারণা, এটা বোধ হয় মানুষের স্বভাবই। প্রথম প্রথম যা ভাল, যতটা ভাল, পরে সেই ভাল আর ততটা নয়। বিয়ে করা বউকে নিয়ে বাসরঘর কী ফুলশয্যার রাত্রে যত বুক দুরু দুরু, এক বছর পরে সেই তেমন রাত্রেও বুক আর কাঁপে না কেন এতটুকু! কারণ বিচারটা আসে পরে, আগে নয়।

বাড়ি বদল আসলে তাই কিছুই নয়, শহুরে মানুষের খুঁতখুঁতে মনের ছটফটানি। আমরা যারা শহরে থাকি, বিত্তহীন, স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে সংসার-জীবন যাপন করছি, নিছক আশ্রয়ের জন্যে ভাড়াটে ঘর খুঁজি। ঘর যে না-পাই তা নয়; ঘর পাই। টেবিল চেয়ার তক্তাপোশ হাঁড়ি কুঁড়ি সাজিয়ে গুছিয়ে বসি সেখানেই, সেই পায়রা-খোপ ঘরেই। কিন্তু গায়ে বসলেও মনে বসি না।

মন অন্য জিনিস। দশ ফুটের দেওয়ালে তাকে ঘেরা যায় না। সেই মন আকাশ চায়, গাছ চায়, পাতা পাখি ফুল চায়। ঘাসে শুতে তার যত সাধ, নদীর চরে হাঁটতেও তার তত আগ্রহ।

অথচ যে জীবন আমাদের, আমাদের এই কলকাতাবাসীদের, আমাদের কী আছে, কতটুকু আছে। হাত বাড়িয়ে এক মুঠো বুনো তুলসীর পাতা ছেঁড়ারও স্বাধীন সুখ নেই।

আসলে মানুষ একটা বিরাট খুঁত-খুঁতুনি নিয়ে জীবন কাটায়। কি পেলাম তার হিসেব তার কাছে বড় নয়, কি পেলাম-না তার হিসেব করেই মন মুষড়ে পড়ে থাকে।

একথা অন্তত আমি বিশ্বাস করি, আমরা প্রতিনিয়তই মনে মনে নিজেদের সাজ বদলাতে চাই, নিজেদের সাজানো জীবনকে। প্রজাপতির গায়ে যত রঙ তত রঙ আমার নেই, কিন্তু তত রঙ আমার হোক। Let, all be mine!

আমার মধ্যে আমি বেশিক্ষণ বেশি-দিন সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। পারি না ব'লেই এই অন্বেষণ। কি খুঁজছি তা জানি না, তার রূপ অজানা। কিন্তু ক্ষোভটা মনে কাঁটার মতন বিঁধে রয়েছে। বাড়ি নিছক একটা রূঢ় প্রতীক। বাড়ির বদলে বন হ'লে, নিত্য নতুন বন খুঁজতাম। যদি হ'ত আকাশ, নিত্য নতুন আকাশ খুঁজতাম।

যতটুকুন আকাশ, বাতাস, আলো সুখ নিয়ে আছি, তার চেয়ে যে অনেক বেশি আমাদের কামনা। নিত্য এই কামনা যেন নিঃশব্দে আঁচড় দিচ্ছে। এ ঘর নয় অন্য ঘর, এ জানালা নয়—আরও বড় জানালা—যেখান দিয়ে চাঁদ গলে আসবে, দু' এক ঝলক হাওয়া নয়, হু হু হাওয়া—যে হাওয়ায় আশ্চর্য স্বাদ আর গন্ধ।

জীবনী

মধুস্মৃতি—নগেন্দ্রনাথ সোম। প্রাপ্তি-স্থান—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্নওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা।

বাংলার সাহিত্যরসিক সমাজে 'মধুস্মৃতি' অপরিচিত নহে। এই গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল বাংলা ১৩২৭ সনে; সুদীর্ঘ কাল পরে, অর্থাৎ প্রায় ৩৪ বৎসর পরে ১৩৬১ সনের ভাদ্রে গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ লাভ করিয়াছে। 'মধুস্মৃতি' নামে আখ্যাত কবি মাইকেল মধুসূদনের এই জীবনী-গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ হইবার পর গ্রন্থটি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া সাহিত্যরসিকের পক্ষে অলভ্য হইয়া থাকায় সাহিত্যেরই ক্ষতি হইয়াছে বলিতে হইবে। মধুস্মৃতির মত একটি আদর্শ সাহিত্য নিদর্শন দীর্ঘ ৩৪ বৎসর ধরিয়া অপ্রকাশিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে, ইহাতে এই দুঃখকর সত্যই প্রমাণিত হয় যে, পুস্তক প্রকাশের ব্যবসায়িক রীতি-নীতি দেশের সাহিত্যগত প্রয়োজনের সহিত শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলে না। তাহা না হইলে, এইরূপে সুলিখিত, শিক্ষাপ্রদ, অতুচ্চ বর্ণনাগৌরবে মণ্ডিত এবং বাংলার সাহিত্যিক সাধনার পক্ষে অপরিহার্য একটি গ্রন্থ দীর্ঘকাল ধরিয়া লুপ্তাবস্থা লাভ করে কেন? যাহাই হউক, বহুজনের আকাঙ্ক্ষিত এবং প্রিয় গ্রন্থ সেই মধুস্মৃতি পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে, ইহা সাহিত্যপ্রিয় সকলের পক্ষে সুসংবাদ।

মধুসূদনের কবিজীবন শুধু একজন বিরাট প্রতিভাধর কবির রচনাকীর্তির জীবন নহে। মধুসূদনের কবি প্রতিভার বিবর্তন এবং কাব্যসাধনা বাংলার সাংস্কৃতিক জীবনেরই একটি বিপুল পরীক্ষার ইতিহাস। মাইকেলের কবিমনের প্রকৃতি ভারতীয় ক্লাসিক এবং পাশ্চাত্ত্য ক্লাসিকের সমন্বিত মিলনের সৃষ্টি। মধুসূদনের কাব্য ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সাহিত্যে উদার বিপ্লবের প্রথম অর্জিত উপহার। পশ্চিমের কাব্যলোকের বিচিত্র ঐশ্বর্য আহরণ করিয়া কবি কিভাবে এবং কি ভংগীতে ভারতের কাব্যমনোভূমিতে নূতন রূপের সম্ভার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা শুধু গবেষকের কৌতূহলের বিষয় নহে, তাহা বাংলার প্রতি সাহিত্যকর্মী শিল্পীর পক্ষে জ্ঞাতব্য বিষয়।

মধুস্মৃতি যে কবির জীবনের আখ্যায়িকা, সেই কবির জীবনও নাটকীয় বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ। গ্রন্থে বর্ণিত কবির জীবনের আখ্যায়িকা তাই মনোরম উপন্যাসেরও অধিক এবং চমৎকারিতায় আকীর্ণ নাটকেরও অধিক উপভোগ্য। সাহিত্যের শ্রেয়-প্রেয় বিচারে অনেক প্রশ্নের মীমাংসা এই গ্রন্থেরই মধ্যে পরিবেশিত অজস্র তথ্য ও ঘটনার মধ্যে আপনি ব্যক্ত হইয়াছে। মধুসূদন এবং তাঁহার বন্ধুবর্গের মধ্যে আলাপিত পত্রসমূহের উদ্ধৃতাংশগুলি সমালোচনা-সাহিত্যেরই যথার্থ উৎকর্ষের দৃষ্টান্তস্বরূপ।
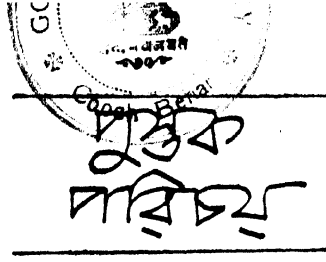
গ্রন্থটি নানা মূল্যে মূল্যবান। মধুসূদনের রচিত প্রথম কাব্যকীর্তি, ইংরাজী ভাষায় রচিত কাব্য 'ক্যাপটিভ লেডি' এই গ্রন্থে সম্পূর্ণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। পরিশিষ্টে প্রদত্ত প্রায় শতপৃষ্ঠাব্যাপী পত্রাবলীর উদ্ধৃতি আর একটি মূল্যবান সংযোজন। মধুসূদনের সমকালীন বাঙালী মনস্বীদিগের বহু দুষ্প্রাপ্য প্রতিকৃতিও এই গ্রন্থের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

গ্রন্থকারের প্রতি বাঙালী সমাজ অপরিশোধ্য কৃতজ্ঞতার ঋণ স্বীকার করিবে। সুদীর্ঘকালের নিষ্ঠা পরিশ্রম ও অধ্যবসায়ের দ্বারা গ্রন্থকার মধুজীবনের অজ্ঞাতপূর্ব নানা ঘটনা ও তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই গ্রন্থে সন্নিবেশ করিয়াছেন। কবি মধুসূদনের কল্পনা অনেক মধু সংগ্রহ ও সঞ্চয় করিয়া গৌড়জনের আনন্দের জন্য সুধাময় কাব্যমধুচক্র রচনা করিয়া গিয়াছে। গ্রন্থকারও মধুকরের মত নিষ্ঠা লইয়া ও শ্রম স্বীকার করিয়া মধুজীবনের বিবরণ সংগ্রহ করিয়াছেন। পরলোকগত গ্রন্থকার নগেন্দ্রনাথেরও পরিচয় এই গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, যাহার মধ্যে এক কৃতী জীবনীকারের অনন্যসাধারণ প্রতিভারও পরিচয় পাওয়া যায়।

মধুস্মৃতি জীবনী গ্রন্থ বটে, কিন্তু এই গ্রন্থে আলোচনা-রীতির একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। লেখক প্রধানতঃ মধুসূদনের এক একটি কাব্য ও কবিতার রচনার ইতিহাস বিবৃত করিয়াছেন এবং সেই বিবরণের মধ্যে কবির জীবনকথা প্রসংগরূপে স্থান পাইয়াছে। কোন্ ঘটনার কারণে, কিসের প্রয়োজনে কোন্ অবস্থায়, কি উদ্দেশ্যে কবি তাঁহার কাব্য ও কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার ইতিহাস বিবৃত করিয়া গ্রন্থকার মধুসূদনের জীবনকাব্যেরই একটি রূপ রচনা করিয়াছেন। কাব্য রচনার বিবরণের সংগে সংগে কবির পারিবারিক এবং অন্যান্য ব্যক্তিগত ঘটনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এই কারণে গ্রন্থটি বস্তুতঃ কবিত্বেরই একটি ঐতিহাসিক সন্দর্ভ হইয়া উঠিয়াছে।

বলা বাহুল্য, এই গ্রন্থ বাংলার প্রত্যেক সাহিত্য-পাঠকের সুহৃদ্ বলিয়া বিবেচিত ও সমাদৃত হইবে।

চিকিৎসা-বিজ্ঞান

চিকিৎসা জগৎ—রজত জয়ন্তী সংখ্যা। ডাঃ রামচন্দ্র অধিকারী সম্পাদিত চিকিৎসা-বিষয়ক পত্রিকা। ২৭-সি, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

ডাঃ অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত "চিকিৎসা জগৎ' সুযোগ্য সম্পাদনায় পরিচালিত হইয়া চিকিৎসা বিজ্ঞানের পঁচিশ বৎসরের অগ্রগতির সহিত পাঠকসমাজের পরিচয় ও চিন্তার যোগ অক্ষুণ্ণ রাখিতে সক্ষম হইয়াছে, ইহা পত্রিকার পক্ষে সাফল্য সার্থকতা এবং গৌরবের বিষয়। চিকিৎসা জগৎ-এর রজত জয়ন্তী সংখ্যার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হইয়াছে, 'আমাদের জাতীয় ভাষা বাংলায় আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের তথ্যসমূহ স্বল্পব্যয়ে চিকিৎসকগণের মধ্যে প্রচার করাই' এই পত্রিকার উদ্দেশ্য ছিল। সম্পাদকীয় অভিজ্ঞতায় ইহাও উপলব্ধ হইয়াছে যে, "অধিকাংশ ইংরাজী অভিজ্ঞ চিকিৎসক বাংলা ভাষায় নিজ অভিজ্ঞতাপ্রসূত মত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া বাংলা ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতেছেন। বাংলায় বৈজ্ঞানিক তথ্য প্রকাশের ইতিহাসে ইহা বিশেষ আশার কথা।"

নিঃসন্দেহেই ইহা আশার কথা। চিকিৎসা জগতের রজত জয়ন্তী সংখ্যার সুলিখিত
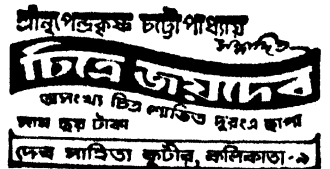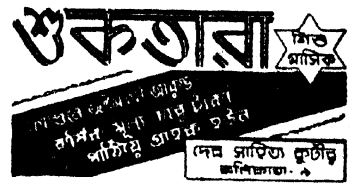
প্রবন্ধগুলিই প্রমাণিত করে যে, বাংলার চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা এবিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব দাবী করিতে পারেন। বাংলায় বৈজ্ঞানিক সন্দর্ভ রচনায় শুধু উপযুক্ত বাংলা পরিভাষার অভাব নহে, দুরূহ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব এবং তথ্য প্রকাশের উপযোগী ভাষাভঙ্গীরও অভাব অনুভূত হইয়াছে। স্বয়ং চিকিৎসকগণই এই প্রয়োজনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষাকে উপযুক্ত প্রকাশক্ষমতায় উন্নত করিবার প্রয়াস না করিলে বাংলা ভাষা বৈজ্ঞানিক চিন্তা ভাব ও তথ্য প্রকাশের উপযোগিতা দ্রুত লাভ করিতে পারে না। ভাষাগত এই প্রয়োজন 'চিকিৎসা জগৎ'-এর অনুরূপ অল্পসংখ্যক বৈজ্ঞানিক পত্রিকার সাহায্যে অনেকখানি চরিতার্থ হইতেছে।

চিকিৎসা জগৎ-এর রজত-জয়ন্তী সংখ্যায় প্রায় ত্রিশটি প্রবন্ধ পরিবেশিত হইয়াছে। লেখকগণ চিকিৎসক এবং তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই বিশেষজ্ঞরূপে বিখ্যাত। ব্যাধি ও নিরাময় তত্ত্বের দুরূহ বিষয়গুলি প্রত্যেকটি প্রবন্ধে প্রাঞ্জলভাবে বিবৃত ও ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায় যে, পত্রিকাটি তাহার প্রথম উদ্দেশ্যেরও চেয়ে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। কারণ, প্রবন্ধগুলি শুধু চিকিৎসা বিজ্ঞানী-দিগেরই প্রয়োজনের এবং চিন্তার সহায়ক নহে, সাধারণের পক্ষেই সব চেয়ে বেশি সহায়ক। পত্রিকাটির প্রচার শুধু চিকিৎসক সমাজের মধ্যে সীমিত থাকিলে তাহাতে পত্রিকাটির উপকারিতা সম্যক্ সার্থকতা লাভ করিবে না। সাধারণের মধ্যে পত্রিকাটির বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। ব্যাধির কারণ, প্রতিষেধক রীতিনীতি, প্রতিকার এবং চিকিৎসা সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞান এবং আধুনিকতম আবিষ্কার-গুলির পরিচয় সম্বন্ধে জনশিক্ষার প্রসারও বস্তুতঃ ব্যাধিনিরোধের অন্যতম প্রতিষেধক ব্যবস্থা। সেই দিক দিয়া চিকিৎসা-জগৎ একটি আদর্শ শিক্ষামূলক পত্রিকা। ভাল ছাপা, ভাল কাগজ ও ভাল ছবি, এই বিশেষ সংখ্যার সৌষ্ঠবও প্রশংসনীয়।

কিশোর-সাহিত্য

চিত্রবিচিত্র—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্ব-ভারতী, ৬।৩, দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা—৭। মূল্য সাত সিকা; শোভন সংস্করণ তিন টাকা।

রবীন্দ্রনাথ ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য 'সহজ পাঠ' রচনা করার সময় ছোটো-দের আনন্দ দেবার উপযোগী এমন কতকগুলি কবিতা রচনা করেন যা 'সহজ পাঠ' বইতে ব্যবহার করা হয়নি। সেসব সুন্দর ও চিত্তা-কর্ষক কবিতা এতদিন অপ্রকাশিত ছিল। সেই সব অপ্রকাশিত কবিতার সঙ্গে 'সহজ পাঠে'র কবিতা মিলিয়ে, সেইসঙ্গে কবির অপরিচিত ও অল্পপরিচিত আরো-কিছু কবিতা সাজিয়ে বিশ্বভারতী এই বই প্রকাশ করেছেন।

দুই রকম সংস্করণের বই প্রকাশ করে বিশ্বভারতী ভালো কাজ করেছেন। সচিত্র মলাটে বাঁধা ও ভিতরে শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত অনেকগুলি চিত্র সম্বলিত—এই শোভন সংস্করণ ছাড়াও, সুলভ সংস্করণে ভিতরের ছবি বাদ দিয়ে সুন্দর মলাটটি ব্যবহার করা হয়েছে।

এই বই বাংলাদেশের কিশোরদের কাছে যে খুবই আদরের হবে, সে বিষয় আমরা নিশ্চিত। তারা রবীন্দ্রনাথের অনেকগুলি অজানা কবিতার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবে।

কবিতা-

গানের গান : শ্রীনলিনীকান্ত গুপ্ত : শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী : এক টাকা।

গ্রন্থখানির ভূমিকায় বলা হয়েছে, "'গানের গান' বাইবেলে হতে গৃহীত সুবিখ্যাত Song of Solomon বা Song of Songs. আমাদের দেশে বৈষ্ণব পদাবলী যেমন আদরের জিনিস—ভক্ত সাধকদের এবং কাব্যরসিকদের মনে—ইউরোপেও তেমনি সলোমনের গান।" কথাটা খুবই সত্যি এবং ইউরোপেই শুধু নয়, অন্যান্য ভূখণ্ডেও এর সমাদর ঘটেছে। বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্গে এর তুলনাটা এই কারণে সার্থক যে, মূলত ধর্মাশ্রয়ী হয়েও এর সাহিত্যরসের কোনও হানি হয়নি, ধর্ম-বিশ্বাসের সম্ভাব্য পার্থক্য সত্ত্বেও সর্বদেশের এবং সর্বকালের কাব্যরসপিপাসু পাঠকমাত্রেই এর মধ্যে এক অনির্বচনীয় সৌন্দর্যের সন্ধান লাভ করবেন।

সলোমনের গান-এর ভাষান্তরণে শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত যথেষ্টই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। বাংলা দেশের পাঠকদের পক্ষ থেকে তাঁকে ধন্যবাদ জানাই। ৬১।৫৪

সপ্তপদী : শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত : শ্রীকিঙ্করমাধব সেনগুপ্ত কর্তৃক ৪৫।১বি, বিডন স্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে প্রকাশিত : চার টাকা।

মানব-হৃদয়ের চিরন্তন আনন্দ-বেদনা আর স্বপ্ন-সাধকে অবলম্বন করে রচিত কবিতার সমষ্টি এই 'সপ্তপদী'। লেখক শ্রীযুক্ত কালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত কাব্যক্ষেত্রে নবাগত নন, দীর্ঘদিন যাবৎ তিনি কাব্য সাধনায় ব্রতী রয়েছেন, বাংলাদেশের কাব্য-পাঠক-মহলের তিনি পরিচিত মানুষ। 'সপ্তপদী'র কবিতাগুচ্ছ পাঠ করলে তাঁর কবিপ্রকৃতির মোটামুটি একটা সন্ধান মেলে। আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তিনি প্রাচীনপন্থী। এখনকার কালে এ আঙ্গিকের আর তেমন সমাদর নেই। না থাক; তাঁর কবিতার যা ভাববস্তু, পাঠক-মহলে তার সমাদর ঘটবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ২৬৩।৫৪

১। **জীবন-খাতা**—ধরণীধর চট্টোপাধ্যায়। শ্রীগিরিজাশঙ্কর চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ১৯, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬ থেকে প্রকাশিত। (দাম লেখা হয়নি।)

২। **স্বপ্নমায়া**—শ্রীকমলাকান্ত চক্রবর্তী। প্রকাশক—শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। ঠাকুরপাড়া রোড, নৈহাটি, ২৪-পরগণা। মূল্য এক টাকা।

৩। **উন্মেষ**—শ্রীসুবোধচন্দ্র ঝা। প্রবাসী বঙ্গ ভারতী। মিল এরিয়া, জামসেদপুর—৭। দাম বারো আনা।

৪। **ভাঙ্গা বেহালা**—শ্রীলক্ষ্মণকুমার

পুরের বর্তমান নৃত্যাভিনয়ের গোড়া পত্তন করেন।

মণিপুরের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল, দল বেঁধে গোল হয়ে বৃত্তাকারে এরা নাচে। এমন কি শ্রীকৃষ্ণ যখন একলা নাচেন তখনও দলবদ্ধ নাচের রীতিতেই তাঁকে মণ্ডলে ঘুরতে দেখি। বৃত্তাকারের দলবদ্ধ নাচ হল প্রায় সব দেশের দেশী নাচের অর্থাৎ যাকে আমরা আজ বলি লোকনৃত্য, তার একটি বিশেষ রূপ। ভারতনাট্যম, কথাকলি ও কথকে যেমন সামনে এগিয়ে পিছিয়ে নর্তকী বা নর্তককে নাচতে দেখি, এই পদ্ধতি মণিপুরের নাচে দেখা যায় না। দলবদ্ধ জনসাধারণের নাচের আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল এই যে, গানের পংক্তি বা প্রত্যেক শব্দ ধরে কখন কোথাও নাচিয়েরা অভিনয় করে না। সুর ও ছন্দে মিশে সমগ্রভাবে গানটিতে যে রস প্রকাশ পায়, নাচের সময় দেহের ছন্দে তার সঙ্গে মিল থাকলেই নাচিয়েরা খুশী। একটু আগেই মণিপুরী রাসের গানের সঙ্গে নাচ ও অভিনয়ের যে বর্ণনা করেছি, তাতে এই উক্তির সমর্থন পাওয়া যাবে। মণিপুরী নাচে সাধারণত দুই রকমের অঙ্গুলের ভঙ্গি বা মুদ্রা দেখি। কখনো কখনো বিশেষ কোন শব্দার্থ হাতের ভঙ্গিতে নাচিয়েরা প্রকাশ করে বটে, কিন্তু সে হাতের মুদ্রা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত ভঙ্গিরই নকল। হাতের ভঙ্গিতে মণিপুরীরা শব্দার্থের একটু ইঙ্গিত দেয় মাত্র। এদের নাচকে লিরিক কবিতার সঙ্গে তুলনা করা চলে। কেবল আভাসে ইঙ্গিতে গানের মূল ভাবটি প্রকাশ করাই যেন এই নাচের প্রধান কাজ।

আজকাল অনেক মণিপুরী নর্তক, কথাকলি, ভারত নাট্যম ইত্যাদি নাচের প্রভাবে মণিপুরী নাচেও বিস্তারিতভাবে মুদ্রার ব্যবহারের চেষ্টা করেছেন। এবং এ কথাও প্রচার করতে চেষ্টা করছেন যে, মণিপুরী নাচেও বরাবরই নানা রকমের অর্থপূর্ণ মুদ্রার চলন ছিল। কিন্তু একথা ঠিক নয়। আসামের সত্রের বৈষ্ণবদের নাচে যতটুকু মুদ্রার ব্যবহার আছে মণিপুরে তাও নেই। মণিপুরী নাচে বিস্তারিত মুদ্রাভিনয় নেই বলে তাকে ভারতনাট্যম বা কথাকলির মত করে সাজাতেই হবে এ যুগের নতুন শিক্ষকদের এই মনোভাবের কোন কারণ ও যুক্তি খুঁজে পাই না।

মণিপুরী সমাজ বাঙ্গালী বৈষ্ণবদে কাছে উচ্চাঙ্গের কীর্তনের ঢং সুরে তা ভাল করেই শিখেছিল। নাচের সম সেই সব গান আজও তারা নৈপুণ্যে সঙ্গে তান, মান, লয়ে গেয়ে থাকে তাদের খোল বাদকেরা কীর্তনের ছো বড় নানারকম তালের দুরূহ ক অনায়াসেই হাতে প্রকাশ করে থাকে কিন্তু সেই তাল বা তার ছন্দ যেভা তারা নাচে প্রকাশ করে তার সঙ্গে কথ কলি কথক বা ভারত নাট্যমের প্রভে উল্লেখযোগ্য। কথাকলি, কথক, ভার নাট্যমের নর্তক বা নর্তকীরা তাদে প্রত্যেক ছন্দোবদ্ধ শব্দকে পায়ের আঘা প্রকাশ করে। মণিপুরীরা সেই ছন্দ প্রকাশ করে সর্বাঙ্গ দিয়ে। অর্থাৎ তা বাদ্যের বোলের জটিল ছন্দকে কে পায়ের আঘাতে প্রকাশের চেষ্টা তাদে মধ্যে নেই। তারা ছন্দের মূল ঝোঁ গুলিকে পা ও সমগ্র দেহের একত্র গতি ফুটিয়ে তোলে। অথবা বলা চলে তাদে নৃত্যের ছন্দোময় ভঙ্গীকে এই দুরূহ তালের ছন্দোবদ্ধ মূল ঝোঁ সঙ্গে তারা সাজিয়ে নেয়।
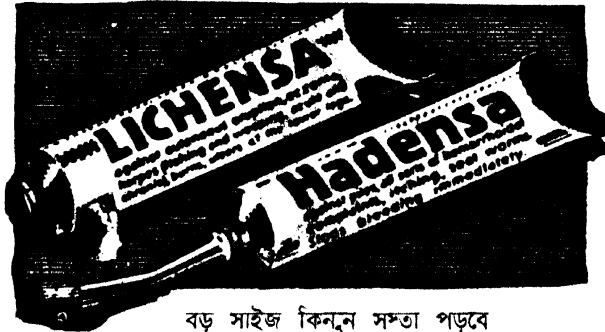
বিশ্বাস। প্রকাশ করেছেন শ্রীবিমলেন্দু বিশ্বাস। ৩ কৃষ্ণ লাহা লেন, কলিকাতা—১২। দাম দু টাকা বারো আনা।

৫। **কল্লোলী**—শ্রীসুধাংশুকিরণ ঘোষ। স্বারিকা প্রেস পাবলিকেশনস্, উত্তর-বাংলা শিলিগুড়ি থেকে শ্রীসুধীরকুমার বিশ্বাস কর্তৃক প্রকাশিত। দাম এক টাকা চার আনা।

৬। **নির্ঝর-সংগীত**—প্রোজ্জ্বল নীহার ভারতী। প্রকাশক শ্রীগৌরচন্দ্র চক্রবর্তী। ৩।১ এম্, ছিদাম মুদি লেন, কলিকাতা—৬। দাম এগারো আনা।

৭। **তটিনিকা**—শ্রীকালীচরণ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, কৃষ্ণনগর, নদীয়া। দাম এক টাকা।

রবীন্দ্রনাথেরই কল্যাণে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার বৃহদংশ আজ আত্মশক্তি সম্পর্কে সচেতন হয়ে উঠেছে, একথা স্বতঃসিদ্ধ। সে এখন তার কৈশোর পর্যায় থেকে বেরিয়ে এসে বিচিত্ররূপময়। এখনো যদি এমন কেউ থাকেন যিনি বয়সোচিত বিবর্তনের এই কথাটি বিস্মৃত হয়ে অবিবেকী পদ্যরচনার অভ্যাসে পাঠকচিত্ত অস্বস্তিগ্রস্ত করে তোলেন, তাঁকে কিভাবে আমরা গ্রহণ করবো, এ প্রশ্নের মীমাংসা মেলেনা। অথচ ভাবলে স্তম্ভিত হতে হয়, এরকম পদ্যলেখক আজো এক নন্, বরং অনেক এবং কাব্য-রসবুদ্ধি সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন সাধারণ পাঠকের কাছে বিভ্রান্তির সূত্রে প্রবেশপত্র সংগ্রহ করে এ'রা অপ্রতিহত থেকে যেতে পারেন।

উপরে উল্লিখিত সাতটি বইয়ের মধ্যে প্রত্যেকটিতেই একমাত্র সর্বপ্রথম কাব্য-গ্রন্থটির ব্যতিক্রম মেনে নিয়ে 'অনবধানযোগ্য' কথাটি সযত্নে প্রযুক্ত হতে পারে। স্বর্গত এই কবির রচনাবলী থেকে তাঁর মৃত্যুর পর সম্পাদিত বইটির সর্বত্র এক আগ্রহী শ্রোতার মুখ দেখা যায়—যাঁর কাছে নিজস্বতা অপেক্ষা প্রিয় কবিদের প্রতিধ্বনি করে যাওয়াই মুখ্য। ছন্দব্যবহারে ইনি প্রত্নরীতির পথচারী হয়েও কাবিকৃতি না হোক প্রবণতায় প্রায়শই সত্যেন্দ্র-নাথ দত্তের সমীপবর্তী হতে চেয়েছেন। 'মরণ' শীর্ষক কবিতার শেষ দুটি পংক্তি সত্যেন্দ্র-নাথের কবিতা থেকে গৃহীত হলেও তাৎপর্য অপরিবর্তিত থেকে গেছে। প্রসংগের দিক দিয়ে তিনি রবীন্দ্রকাব্যের আদি অধ্যায়, বিশেষত 'মানসী'র যুগে নিজের অধিষ্ঠান-ভূমি খুঁজে নিয়েছেন। সেই ধারা ও ধরন অব্যাহত রেখে এই কবি পরিবহনের মৌল নিপুণতা পরিহার করে সংবেদনকেই স্বরচনার লক্ষণ হিসেবে দেখেছেন। তাঁর স্বগতসাধনা লোকচক্ষুর প্রত্যক্ষতা কামনা করেনি, নিভৃত রসায়নেই তৃপ্ত থেকেছে। 'কবি-পরিচিতি'তে গিয়ে ধরণীধরের আবাল্য সহচর শ্রীকালীকিঙ্কর সেনগুপ্ত যে কথা বলেছেন তার আড়ালে কবির ঘনিষ্ঠ একটি ব্যক্তিত্বের আস্বাদ পাই; আর তা-ই বোধহয় 'জীবন-খাতা' পড়ার সবচেয়ে বড় পুরস্কার।

'জীবন-খাতা'র লেখককে অনুধাবন করলে সহজেই বোঝা যায় বহুবিধ আদর্শ তাঁকে আকর্ষণ করেছে। শুধু বর্জিত নিষ্প্রাণ প্রকরণের পক্ষপাতী হওয়ার ফলেই সম্ভবত তাঁর প্রয়াস পরামর্শের কাজ করে।

'উন্মেষ' পড়লে স্বতশ্চঞ্চল কল্পনায় উন্মুখ একজন পথিকের ছবি দেখতে পাই। এছাড়া কোনো নবত্ব —এমনকি প্রাচীন সম্পদের সারাংশও চোখে পড়লো না। এর অব্যবহিত পরবর্তী বইতে অসার্থক করুণ রস অর্থাৎ হাস্যরসের প্রচুর নমুনা পাওয়া যাবে। pathosএর অভাবে Bathos এ-গ্রন্থের নামকরণ থেকে আরম্ভ করে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত।

'নির্ঝর-সংগীতে' 'উর্বশী-বিদায়' নামক কাব্যনাটিকা প্রচেষ্টা অনুসরণ করে সততার আবেদন ধরা পড়ে।

তরল আঙ্গিকে লিখিত হলেও সরল ভক্তিনির্ভর আত্ম-উৎসর্জন 'তটিনিকা'য় সহজ-গোচর। প্রচ্ছদ চিত্রণ আকর্ষণীয়।

সবশেষে আবার একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, রবীন্দ্রনাথ বাংলাদেশে কবিতা লেখার কাজটি অসীমদুরূহ করে গিয়েছেন।

৪৩৮।৫৪, ৫৬৫।৫৪, ৪১৫।৫৪, ৪৪৭।৫৪, ৫৬৬।৫৪, ৫৫৫।৫৪, ১৬।৫৫

রাজকন্যা—শ্রীগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক শ্রীবিমল সেন, ৩৩বি কালীঘাট রোড, কলিকাতা—২৫। মূল্য দেড় টাকা।

নানান্ সাময়িকীতে প্রকাশিত কবিতা-বলীর সূত্রে 'রাজকন্যা'র কবির নাম পূর্বশ্রুত। বিশেষ করে তাঁর গত বছরের একাধিক কবিতায় প্রশংসার্হ যে নিপুণতা দেখা গিয়েছে তাতে তাঁকে অত্যন্ত প্রতিশ্রুতিময় মনে হয়। এ'র কবিতায় ভাববন্ধ ও চিত্রকল্প স্বাভাবিক ও সুসংগত। যথার্থই আন্তরিক হওয়ার ফলে একটি প্রসাদগুণ এ-বইয়ের প্রায় সবখানেই প্রকীর্ণ। তবে কোনো-কোনো কবিতায় অন্য কয়েকজন স্বকালবর্তী কবি প্রতিফলিত, আর বোধহয় এ কারণেই তাঁর স্বকীয় চরিত্রস্বরূপ এখনো অপ্রতিষ্ঠিত। তবু আশা করবার, মনে রাখবার সম্ভাবনা এখানে উপস্থিত। তাঁকে আমাদের অভিনন্দন জানালাম, তাঁর কাছে আমরা প্রত্যাশী রইলাম।

৪৬৮।৫৪

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

দেশান্তরের নারী—শ্রীসাধনা বিশ্বাস

যারা হারিয়ে গেল—শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

খৃষ্টানুসরণ—অনুবাদক শ্রীসাবিত্রী-প্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়

কূটজ—মাহমুদ

বিশ্ব সাহিত্যে নোবেল পুরস্কার—সুধাংশু সরকার ও রমাপ্রসাদ দাস

স্মৃতিরংগ—তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়

নীল ভুঁইয়া—অমিয়ভূষণ মজুমদার

নরকে এক ঋতু—র‍্যাঁবো। অনুবাদক লোকনাথ ভট্টাচার্য

আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তাধারা—সুরেন্দ্র-নাথ চট্টোপাধ্যায়

শান্তি সংস্থাপনের পথে অসংযত ভাষা ব্যবহার করা কখনই উচিত নয়—এই কথা বলিয়াছেন শ্রীযুক্ত নেহরু। —"আমরা বলি শুধু ভাষা নয়, কাব্য চর্চায় অসংযত বিষয়বস্তু নির্বাচনও দোষাবহ। নেহরুজী পড়েছেন কিনা জানিনে, কিন্তু বিহারের জনৈকা উদীয়মানা তরুণী কবির "জারা হ'স্ লেও" কবিতাটি পাঠ করে আমরা হাসবো কি কাঁদবো বুঝতে পারিনি"—মন্তব্য করিলেন এক সহযাত্রী।

* * *

ভারতের পররাষ্ট্র নীতি সম্বন্ধে আলোচনা হইতেছিল। আমাদের জনৈক সহযাত্রী বিশুখুড়োকে প্রশ্ন করিলেন—"চীন, জাপান, রাশ্যা, জার্মানী, ইউ কে, ইউ এস এ প্রভৃতি পররাষ্ট্র সম্বন্ধে ভারতের নীতি সমর্থনযোগ্য এ কথা সবাই বলেন। আমরা অতশত বুঝিনে, কিন্তু সবাই যখন বলছেন ভালো, তখন আমরাও ভালোই বলছি। কিন্তু একটি মাত্র পররাষ্ট্র সম্বন্ধে ভারতের নীতি সত্যিই আমাদের

বুদ্ধির অগোচর, সেই পররাষ্ট্র হলো বিহার। খুড়ো এ সম্বন্ধে কী বলেন?" বিশুখুড়ো বিমূঢ়ের মতো তাকাইয়া আমতা আমতা করিতে লাগিলেন, সঙ্গে সঙ্গে আমরাও !!

* * *

মালেনকভের আকস্মিক পদত্যাগের সংবাদে সবাই বিস্মিত হইয়াছেন।—"আমরা হইনি, বরং রাশ্যার প্রগ্রেসিভ নীতিবাদে আমরা সাধুবাদ জানাচ্ছি। পদচ্যুতি এবং তার পরবর্তী অধ্যায়ে প্রাণত্যাগ যেখানে প্রায় চিরাচরিত

নীতি, সেখানে পদত্যাগ প্রগ্রেসিভ নীতি বই কি"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

মালেনকভের পদত্যাগ সম্বন্ধে সংবাদ কীভাবে সংবাদপত্রে পরিবেশন করা হইবে সে সম্বন্ধে রাশ্যান সরকারী নীতি একটি বিবৃতির আকারে ঘোষণা করা হইয়াছে।—"ব্যক্তিস্বাধীনতার ঝাণ্ডাধারীদের এতে ক্ষুব্ধ হওয়ার কোন কারণ নেই, এটা Working Journalist-দের প্রতি সরকারী দরদ মাত্র"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের অধিবেশন পশ্চিমবঙ্গ সেক্রেটারিয়েট ভবনে বৃহস্পতিবার অপরাহ্ন হইতে আরম্ভ হইয়াছে।—"আমরা ফলাফল জানবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম। তবে অধিবেশনটা একবারে বিষ্যুদের শেষ ভরা বারবেলাটায় আরম্ভ না করলেই বোধহয় ভালো হতো।"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

ভারতে পরিভ্রমণরত রাশ্যান সাংস্কৃতিক মিশনের অধিনায়ককে ম্যালেনকভের পদত্যাগ সম্বন্ধে তাঁর মতামত কী প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলিয়াছেন যে, হাজার হাজার মাইল দূরে কী ঘটিতেছে সে সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ করা শক্ত।—"কিন্তু হাজার হাজার মাইল দূরে যা-ঘটছে তার খবর এখানে আমাদের অনেকেরই নখদর্পণে,—বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন !!"

* * *

মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ মুদালিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়কে জীবনে Right philosophy চর্চা করিতে বলিয়াছেন।—"কিন্তু 'বামদর্শন' সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার কথাটাও তিনি বলে রাখলে ভালো করতেন" বলে শ্যামলাল।

* * *

বিধান সভায় পশ্চিমবঙ্গ উন্নয়ন কর্পোরেশন বিল গৃহীত হইয়াছে। বিরোধী দলের বিতর্কের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে, উন্নয়ন ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের মৃত্যু অনিবার্য।—"মৃত্যু সম্বন্ধে ডাক্তারের অভিমত আশা করি বিরোধী দলও মানবেন।

তবে তাঁরা বোধহয় উন্নয়নের কাজটা বিলের বদলে ক্রেন্ দিয়ে চালাবার পক্ষপাতী ছিলেন"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ যাত্রীদের জন্য আলো, পাখা, স্নানের জল প্রভৃতির সুবিধা দানের আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।—"রেল ভ্রমণটা অবশ্য আগের মতো পা-দানে বাদুড়-ঝোলা হয়েই চলতে থাকবে"—বলিলেন বিশুখুড়ো।

পরম উদ্দীপনাময় একটি জীবনী চিত্র
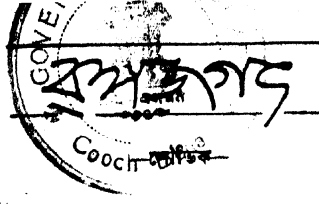
একেবারে হাল আমলের কোন ঐতিহাসিক চরিত্রের জীবনী-চিত্র তোলার কথা হলেই মনে সংশয়ের উদয় হয়। ছবিখানার সাফল্য সম্পর্কে সংশয়ের চেয়ে যার কাহিনী নিয়ে ছবির উপকরণ তারই হেনস্তা হওয়ার আশংকা জেগে ওঠে। আগে থেকেই আন্দাজে একটা ধারণা পোষণ করাটা সমীচীন হয়তো নয়, কিন্তু এতাবৎকাল যতো জীবনী-চিত্র পরিবেশিত হয়েছে তাদের মধ্যে দু' একটির ক্ষেত্রেই পূর্বধার্য আশংকা অমূলক প্রতিপন্ন হয়েছে। চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠানের তোলা সদানুক্ত "রাণী রাসমণি" ছবিখানিকে এই ব্যতিক্রমের একটি বলেই শুধু নয় পরম উদ্দীপনাময় জীবনী-চিত্র হিসেবে ভারতীয় চলচ্চিত্রের একটি অনিন্দ্য সৃষ্টি বলেও অভিহিত করা যায়। শতখানেক বছরের ভেতরকার কথা, তেমন বয়েসী কাউকে পেলে তো একটা প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণই পাওয়া যেতে পারতো। এতো কাছের মানুষ যে তার জীবনীতে সিনেমার খাতিরে মন-গড়া বিসদৃশ কিছু প্রবিষ্ট করিয়ে ছবি গড়ে তুললে পার পাবার যো-টি থাকতো না। ছবিখানিতে রাণী রাসমণিকে পুণ্যশ্লোকা, আর্ত ও দুর্বলের রক্ষয়িত্রী, শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষিকা, সমাজ সংস্কারক ও ধর্মের পালনকর্ত্রী এমন কি মহীয়সী রূপেই উপস্থাপিত করা হয়েছে যাকে দেখে স্বতই শ্রদ্ধা উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে, মন প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে আপ্লুত ভক্তিতে মন মাখামাখি হয়ে ওঠে—দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সেবায়েৎ গদাধর ঠাকুরের পরমপুরুষ রামকৃষ্ণত্বে উপনীত হওয়ার অধ্যায়টি দেখে যা রাণী রাসমণির জীবনের পুণ্যতম কীর্তিরূপে অক্ষয় হয়ে আছে। বস্তুত দর্শকমনে গেঁথে থাকার জোরের কথা বলতে ছবিখানির শেষাংশের এই অধ্যায়টি একটা অভূতপূর্ব অতীন্দ্রিয় ভাবজগতের সঙ্গে দর্শকের অনুভূতির সংস্পর্শ ঘটিয়ে দেয়। নিজেকে সম্পূর্ণ ভুলে ছবির মধ্যে ডুবে যাবার এমন দৃষ্টান্ত চলচ্চিত্রের ইতিহাসে খুব বেশী স্মরণ করা যায় না।

* * *

রাণী রাসমণির বালিকা বয়েস থেকে গল্পের আরম্ভ। চাষীর ঘরের মেয়ে, বাপের কাছে শিক্ষায় রামায়ণে তার অন্ধ-ভক্তি। স্বপ্নে সে রামকে দেখে; সখীর জ্বর ভালো করার জন্য প্রার্থনা করে, সখী ভালো হয়ে ওঠে। গোড়াতেই এই অলৌকিক ব্যাপার পরবর্তী অংশ সম্পর্কে সংশয় জাগিয়ে তোলে, কারণ সংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের ওপরে খুব একটা শ্রদ্ধার ভাব সবায়ের না জাগবারই কথা। তারপর হঠাৎ জানবাজারের যুবক জমিদার মোসাহেব সমভিব্যাহারে নৌকা-বিহারে বেরিয়ে গঙ্গার ঘাটে স্নানরতা বালিকা রাসমণিকে দেখে তাকে পছন্দ করে একেবারে রাজরাণীর পদে অধিষ্ঠিতা করে দেওয়ার ঘটনাও ছবির ওপরে তখনো পর্যন্ত মন বসবার বিশেষ তেমন টান অনুভব করা যায় না। গতিও শ্লথ। তার ওপর বিবাহের প্রীতি সম্মিলনীতে প্রিন্স

বিমল রায়ের 'আমানৎ'-এ চাঁদ ওসমানী

দ্বারকানাথ ঠাকুর ও রাজা রামমোহন রায়কে নববধূর হাতে প্রীতি উপহার দেবার জন্য ক্ষণিকের জন্যে হলেও এমন নির্লিপ্ততার সঙ্গে হাজির করা হয় যে, দেখে দস্তুরমতো একটা ছেলেমানুষী কাণ্ড বলে প্রতীয়মান হয়ে পড়ে। এরই প্রায় সঙ্গে সঙ্গে সাধুর আবির্ভাব এবং রাধামাধবের বিগ্রহ দিয়ে বাতাসে অন্তর্ধান

অলৌকিক ঘটনাসম্পন্ন কোন একটা পৌরাণিক ছবির ছাপটাই প্রায় দৃঢ়ভাবে মনে ধরিয়ে দেবার উপক্রম হয়। কিন্তু এর পরই গল্পের মোড় ফিরতে থাকে। এখান থেকে গল্পকে একেবারে টেনে আনা হয়েছে রাণী রাসমণির প্রায় যৌবনোত্তর কালে। এ অধ্যায়ে রাণী রাসমণিকে পাওয়া যায় আদর্শ পতিব্রতা, স্বদেশী-ভাবাপন্না ভক্তিপ্রাণা জায়া ও জননীরূপে। তিনটি কন্যার বিবাহ হলো। পুত্র না থাকায় তৃতীয় জামাতা মথুর বিশ্বাসকে ঘর-জামাই করে রাখলেন। মথুর কলেজে-পড়া 'আধুনিক' ছেলে; রাসমণির কাছে থেকে ক্রমে তার দেশের ধর্ম ও সংস্কৃতিতে দীক্ষা হতে লাগলো। সংসার ভালোই চলছিল, হঠাৎ বিলেতে রাজা রামমোহনের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে জমিদার রাজচন্দ্র দাস শোকে আকুল হয়ে উঠলেন। এর পর দ্বিতীয় শোক পেলেন তাঁর প্রিয়তমা কন্যা, মথুরের পত্নী করুণার অকাল-বিয়োগে। দুটি আঘাত সহ্য করতে না পেরে রাজচন্দ্র হঠাৎ একদিন মৃত্যুমুখে পতিত হলেন। এর পরই রাণী রাসমণির অতুল কীর্তিসমূহের অবতারণা।

* * *

প্রথমে পাওয়া যায় রাণী রাসমণিকে ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রামী তেজস্বী নারীরূপে। মাতাল গোরা সৈন্যরা দল বেঁধে বাড়ি চড়াও করতে নিজে তরবারি হাতে তাদের বাধা দিতে এগিয়ে যাওয়া। পুজোর বাজনাতে আপত্তি করায় সাহেবদের সমুচিত শিক্ষাদান এবং জেলেরা গঙ্গায় মাছধরা থেকে বঞ্চিত হওয়ায় কোম্পানীকে জব্দ করে জেলেদের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া প্রভৃতি ঘটনাবলী তেজস্বিতার সঙ্গে এক কূটনীতিসম্পন্না নারীকে পাওয়া যায়, যার প্রতিটি কথা ও চাল বেশ একটা উদ্দীপনার সঞ্চার করে দেয়, একটা প্রাণের স্পন্দনে মন ভরে ওঠে। এর পরই দক্ষিণেশ্বরের মন্দির প্রতিষ্ঠা। রাসমণির গৃহদেবতা রঘুনাথের বিগ্রহ চুরি হয়ে যাবার ফলে তিনি মহাশক্তির উপাসনায় ব্রতী হলেন। একদিন অন্নপূর্ণা স্বপ্নে দেখা দিয়ে রাসমণিকে কাশীতে আসার নির্দেশ দিলেন। পথিমধ্যে নৌকায় আবার স্বপ্নাদিষ্ট হলেন বাঙলা দেশেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করার জন্য। দক্ষিণেশ্বরে মন্দির নির্মিত হয়ে ভবতারিণী প্রতিষ্ঠিতা হলেন। শুধু তাই নয়, শাক্ত, শৈব ও বৈষ্ণব সকলেই যাতে একত্র উপাসনা করতে পারেন, সেজন্যে দ্বাদশ মন্দির নির্মাণ করে শিব ও রাধা-কৃষ্ণ স্থাপন করলেন। কিন্তু বাধা এলো। মন্দিরে অন্নভোগের ব্যবস্থা থাকায় কোন ব্রাহ্মণই পুজো করতে রাজী হলেন না। অনেক খুঁজে মথুর শেষে ঝামাপুকুর টোলের রামকুমার চাটুজ্যের কাছ থেকে বিধান পেলেন এবং তাঁকেই পূজারী নিয়োজিত করলেন। রামকুমারের সঙ্গে এলেন তাঁর আধ-পাগলা ভাই গদাধর। রাসমণির জীবনের এই থেকে আর এক অধ্যায়ের সূচনা।

* * *

পাগল গদাধরকে দেখামাত্রই রাসমণি কেমন যেন আকৃষ্ট হয়ে পড়েন। সবাই খেয়ে চলে গেল, কিন্তু গদাধর এক পয়সার মুড়ি খেয়ে গঙ্গার ধারে বসে আকুল হয়ে মায়ের নাম গান করতে থাকেন। দাদা জিগ্যেস করতে বললেন, সবের মধ্যে "কেমন যেন আমি আমি গন্ধ।" রাসমণি বুঝলেন। গদাধরের সঙ্গী ভাগ্নে হৃদয়ও এসে রইলো মন্দিরে। গদাধরের জন্য তারও নাকালের অন্ত নেই। কোথায় কখন যে চলে যায়, খুঁজে বের করতে তার হয়রানি কম নয়। মাঝরাতে দেখে গদাধর বিছানায় নেই, খুঁজতে বেরিয়ে দেখে গদাধর বনের মধ্যে উলঙ্গ হয়ে কালী নাম জপ করছেন। এইভাবে চলতে থাকে। হঠাৎ রামকুমারকে দেশে যেতে হলো। পুজোর ভার পড়লো গদাধরের ওপরে। গদাধর আকুল হয়ে কালীর দর্শন পাবার জন্য গঙ্গার কাদায় লুটোপুটি খেতে থাকে; ঠিকমতো পুজো করে না, এমনিধারা নালিশ গেলো রাণীর কাছে। রাসমণি নিজে এলেন তদন্ত করতে। গদাধর ভবতারিণীকে সাজাতে গিয়ে নিজের অঙ্গকে সাজাচ্ছেন; ভবতারিণীর মুখে ভোগ তুলে দিতে গিয়ে নিজের মুখে দিচ্ছেন। সকলে মারমুখো হয়ে উঠলো, কিন্তু রাসমণি তাঁর মধ্যে দেখতে পেলেন তাঁর রামচন্দ্রকে। পঞ্চবটি ঘেরবার জন্য মন্দির-সেরেস্তার কর্মচারীরা গদাধর ঠাকুরকে বাঁশ, দড়ি, কাটারি দিলে

না। গঙ্গার স্রোতে বাঁশ-দড়ি ভেসে এলো। এমনিধারা একটার পর একটা অলৌকিক ঘটনা দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরে ঘটে যেতে লাগলো। গদাধর কালীর দর্শনে বিফল হয়ে স্বহস্তে মুণ্ডচ্ছেদ করে আত্মহত্যায় উদ্যত হলেন; ভব-তারিণীর মূর্তি ফেটে দিব্যজ্যোতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, তারই মধ্যে থেকে গদাধর কালীর সাক্ষাৎ পেয়ে মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করলেন। রাণী রাসমণি গদাধর ঠাকুরের মধ্যে একাধারে রাম ও কৃষ্ণের সমন্বয় দেখলেন। জগতের কাছে রাম-কৃষ্ণকে পরিচিত করিয়ে দেবার অপার সৌভাগ্য অর্জন করে রাণী রাসমণি দেহত্যাগ করলেন।

* * *

ঠিকভাবে ধরতে গেলে রাজচন্দ্র দাসের মৃত্যু পর্যন্ত ছবি চলে আসে অত্যন্ত ঢিমে তালে, অনুভূতি ঠিকমতো জমবার সুযোগ পায় না। ঘটনার মধ্যেও ধারা-বাহিকতার যোগ বিচ্ছিন্ন। তবুও সর্ববিষয়ে এবং সর্বজনের মধ্যে একটা আন্তরিকতার স্পর্শ পাওয়া যায়। আর পাওয়া যায় রাণীর চরিত্রে মলিনা দেবীর মধ্যে একটি মহীয়সী চরিত্রের আভাস—যা পূর্ণমাত্রায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে রাজচন্দ্রের মৃত্যুর পর নিজের হাতে জমিদারী আসা থেকে। রাসমণির প্রতিটি কথা, প্রতিটি কাজ উদ্দীপনায় মনকে ভরিয়ে তোলে। প্রাণে একটা সাড়া এনে দেয়। তারপর দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার পর গদাধরের আবির্ভাব মুহূর্ত থেকেই একটা সম্মোহনী প্রভাব সারা প্রেক্ষাগৃহে পরিব্যস্ত হয়ে দর্শকদের এমন তন্ময় করে রেখে দেয়, যার তুলনা অতি বিরল। আর এর জন্যই গদাধরের ভূমিকায় গুরুদাসের ব্যক্তিগত কৃতিত্বই সবচেয়ে অভিনন্দনযোগ্য। এ যেন অভিনয়ই নয়। সত্যিই এক পরম-পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়ায় অচিন্ত্যনীয় অভিজ্ঞতা। আবির্ভাব থেকে শেষ দৃশ্যটি পর্যন্ত গদাধর ভাবে আপ্লুত করে আবেগকে উথলে রেখে দেন। গুরুদাসের এ কৃতিত্বকে অনন্যসাধারণ বললেও যেন কম বলা হয়।

* * *

ছবিতে ঘটনাস্থল নিবদ্ধ থেকেছে রাণী রাসমণির গৃহ এবং দক্ষিণেশ্বরের মধ্যে। তৎকালীন সমাজের সঙ্গে কোন যোগ পাওয়া যায় না। জীবনী-চিত্রের ক্ষেত্রে এটা চিত্রনাট্য রচনা ও পরিচালনা দুদিকেরই দুর্বলতা। তবে এক্ষেত্রে ও দুর্বলতাটা ধরা পড়ে না রাসমণিরূপিণী মলিনা দেবী এবং গদাধর চরিত্রে গুরুদাসের জন্যেই। কারণ ও'দের দুজনের ব্যক্তিত্ব দর্শকের দৃষ্টিকে চরিত্র দুটির ওপর এমনি নিবিষ্ট করে রেখে দেয় যে, দোষ-ত্রুটিগুলো এমনিতেই আড়ালে ঢাকা পড়ে যায়। তা নয়তো যে একদল উচ্ছৃঙ্খল বন্দুকধারী রাসমণির গৃহে হানা দেয়, তাদের চেহারাই এমনি যে, আর যাই হোক ইংরেজ গোরা সৈন্য বলে চালানো বিসদৃশ লাগতো; আর পৌরাণিক কাহিনীর মতো অলৌকিক যেসব ঘটনা দেখানো হয়েছে, সেসবও দর্শক-মনে ধরিয়ে দেওয়া সম্ভব হতো না। সাজপোশাক, চেহারা এবং অন্যান্য এদিকে-ওদিকে বৈসাদৃশ্যের অভাব নেই; কিন্তু সবই ঘটনাবলী থেকে উৎসৃত ভাবাবেগে তলিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কোন ত্রুটিকে মনে করে রাখা আর হয়ে ওঠে না। বরং ছবি শেষ হতে মন ভাবে এমনি পরিপূর্ণ হয়ে থাকে যে, জীবনের একটি পরম লাভকে পাওয়ার আনন্দে ছবির সংগঠনকারীর প্রত্যেককেই অভিবাদন জানাবার জন্য মন উৎসাহিত হয়ে ওঠে। ঠিক আর পাঁচটা ছবির পাশে ফেলে খুঁটিয়ে বিচার করতে মন প্রবৃত্ত হয় না। অভিনয়ে মলিনা দেবী ও গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের শিল্পী-জীবনেই শুধু নয়, পর্দার অস্তিত্বকালের মধ্যে স্মরণীয় হয়ে থাকার মতো কৃতিত্ব তো দেখিয়েছেনই। তাছাড়া, রাজচন্দ্রের চরিত্রে ছবি বিশ্বাস কিংবা মথুরের চরিত্রে অসিতবরণও বেশ উদ্দীপ্ত অভিনয় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। অন্যান্য চরিত্র-চিত্রণে আছেন—পাহাড়ী সান্যাল, অনুপকুমার, জীবেন বসু, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, হরিধন, অজিতপ্রকাশ, মণি শ্রীমানী, বিভূ, বেচু সিংহ, আদিত্য ঘোষ, শিবকালি চট্টোপাধ্যায়, নির্মল রায়, উৎপল দত্ত, মিহির ভট্টাচার্য, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, শিখারাণী, সুদীপ্তা রায়, শ্যামলী, নিভাননী, ঝর্ণা, রেখা চট্টো-পাধ্যায় প্রভৃতি। এ'দের যে যতোই ছোট চরিত্রে যতো ক্ষণিকমাত্রও আবির্ভূত হয়ে থাকুন, একটা প্রভাবের ছাপ পাওয়া যায় সকলের অভিনয়ে, যে প্রভাবটা অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য অলৌকিক ঘটনাবলীকেও সহজভাবে গ্রহণ

করে নিতে বাধ্য করে।

* *

কলাকৌশলের দিকে সবচেয়ে কৃতিত্ব পাওয়া যায় বিদ্যাপতি ঘোষের আলোকচিত্রগ্রহণে। দীর্ঘকাল পর এই কৃতী কুশলী কাজে হাত দিয়েই বেশ ভাবোদ্ভূত কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সবচেয়ে তাঁর কৃতিত্ব দেখা যায় গদাধর চরিত্রটির ওপর আলোকসম্পাতে—পরমপুরুষের দিব্যজ্যোতি এমনভাবে উদ্ভাসিত করে রেখে দেন, যার মধ্যে কৃত্রিমতার কোন আভাস পাওয়া যায় না। শব্দগ্রহণ সংলাপের ক্ষেত্রে কয়েক জায়গায় জড়ানো অস্পষ্টতা, তবে গানগুলি তোলা হয়েছে বেশ ভালোভাবে। গানগুলির গাওয়াও ভালো। আর গদাধরের মুখে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ও সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠের পাঁচখানি শ্যামা-সংগীত তন্ময়তা বাড়িয়ে তোলে। শিল্প-নির্দেশে কার্তিক বসুর কৃতিত্বের দিকও উল্লেখযোগ্য; সে আমলের পরিবেশটা তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন বেশ। গোপালচন্দ্র রায়ের কাহিনী অবলম্বনে চিত্রনাট্য ও সংলাপ রচনা করেছেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ও কালিপ্রসাদ ঘোষ। পরিচালনা করেছেন কালিপ্রসাদ ঘোষ এবং "বিদ্যাসাগর"এর এই প্রবীণ পরিচালক জীবনী-চিত্রকে আরও মহিমময় করে উপস্থিত করে দেওয়ার জন্য অভিনন্দনীয়। অন্যান্য কুশলীদের মধ্যে আছেন সুরযোজনায় অনিল বাগচী, শব্দযোজনায় নৃপেন পাল, সম্পাদনায় রবীন দাস এবং তত্ত্বাবধানে সমর ঘোষ।

বাঙলা রহস্যমূলক ছবি

বাঙলায় রহস্যমূলক ছবির প্রবর্তক না হলেও, সুসাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র "কালোছায়া" থেকে রসগ্রাহ্য ছবি পরিবেশন করে এদিকে দর্শকদের একটা রুচি গড়ে ওঠায় সহায়তা করেছেন। তাছাড়া ছবি তিনি যেমনই পরিবেশন করে থাকুন, কাহিনী ও চরিত্রের পরিকল্পনার মধ্যে বৈচিত্র্য কিছু না কিছু এনে দেনই। তাঁর নবতম সৃষ্টি "ডাকিনীর চর"-এর মধ্যে কাহিনীগত বৈচিত্র্যটাই অত্যন্ত স্পষ্ট। একটা গুপ্তধন উদ্ধারের গল্প। ছবির গোড়াতেই একটা উপক্রমণিকার অবতারণা। চারশো বছর আগে বাঙলার উপকূলের এক দ্বীপে হার্মাদ জলদস্যুরা এক জমিদার-কন্যাকে হরণ করে নিয়ে যায়, সেই সঙ্গে সিন্দুক-ভর্তি বিস্তর অলঙ্কার সম্পদ। অলঙ্কারগুলি একটা গহ্বরে লুকিয়ে রেখে দস্যু-সর্দার তার দুই সঙ্গীকে হত্যা করে নিজের হাতের চামড়ার কব্জি-বন্ধে সিন্দুকের অবস্থিতির গোপন স্থানটির একটা নক্সা ছকে রাখে; কিন্তু তারপরই সে বন্দিনী জমিদার-কন্যার হাতে নিহত হয়। এর পর যবনিকা উঠলো চারশো বছর পর এক রঙ্গালয়ের সাজঘরে। তরুণী ইলাকে নর্তকীর পেশা অবলম্বন থেকে নিবৃত্ত করার জন্য এলো তার দাদা ও দ্বিজেনের বন্ধু অতুল। জানা গেল, জীবন সংস্থানের আর কোন উপায় না পেয়েই ইলা এ পথে পা বাড়িয়েছে। অতুলের সঙ্গে তর্ক করলেও ইলা ফিরে এলো, অভিনয়ে অবতরণ না করেই। সংসারের খরচ চালাবার জন্য এবার সে তার গৃহের আসবাবপত্র বিক্রী করতে গেলো। এই পর্যন্ত কাহিনীর ভূমিকা। আসল কাহিনী আরম্ভ এই থেকে।

* * *

ইলা যেসব জিনিস বিক্রী করতে গেলো, তার মধ্যে ছিলো চারশো বছরের পুরনো পারিবারিক সম্পত্তি, এক হাতের একটি কব্জি-বন্ধ। পুরনো সামগ্রীর দোকানে অদ্ভুত চেহারার ডাঃ সামন্ত সেটি দেখে ইলার কাছ থেকে কিনে নিলে। একথাটি শুনে অতুল উত্তেজিত হলো, কারণ তারও পারিবারিক সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে অনুরূপ একটি কব্জি-বন্ধ। কব্জি-বন্ধের ভিতর দিকে এক জায়গার আধখানা একটা নক্সা, বাকিটা অর্ধেক নক্সা ইলা কর্তৃক বিক্রীত কব্জি-বন্ধটিতে। দুটি জোড়া দিতে পারলে গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়া যায়। অতুল তার বন্ধু সমীরকে এক দেওয়ান সাজিয়ে ডাঃ সামন্তর কাছ থেকে কব্জি-বন্ধটি উদ্ধারের চেষ্টা করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেল। উল্টে ডাঃ সামন্তই অপর কব্জি-বন্ধটির সন্ধান পেয়ে গেলো। ডাঃ সামন্ত গুণ্ডা লাগালে অতুলের পিছনে। একদিন উত্যক্ত হয়ে অতুল কব্জি-বন্ধটি নদীতে ফেলে দিলে। ডাঃ সামন্ত নিয়োজিত চর সেটি তুলে এনে দেয়। ওদিকে ইলা আর দ্বিজেন তাদের বাড়ির কব্জি-বন্ধটি উদ্ধারের জন্য গোপনে ডাঃ সামন্তর গৃহে হানা দেয়, কিন্তু ধরা পড়ে যায়। ডাঃ সামন্ত ওদের অবস্থা দেখে যেন কৃপাপরবশ হয়েই কব্জি-বন্ধটি ফিরিয়ে দিলে তাদের হাতে। অতুল তার কব্জি-

বন্ধ ফেলে দেবার আগে নক্সার নকল রেখে দিয়েছিল এবং ডাঃ সামন্তও যে নকল না রেখে ইলাদের কব্জি-বন্ধটা ফিরিয়ে দিয়েছিলো, তেমন মনে করার কারণ নেই। কাজেই অতুলরা জায়গাটির খোঁজ নেবার জন্য প্রথমে দ্বিজেনকে পাঠালে। দ্বিজেন ফিরে আসার পর অতুল, সমীর, দ্বিজেন এবং ইলাও চললো অভিযানে। একটা দ্বীপ ওদের গন্তব্যস্থল, যাকে লোকে বলে ডাকিনীর চর। এক বৃদ্ধ আর তার তরুণী নাতনী কুসুম ছাড়া আর তৃতীয় কোন লোকের বাস নেই সেখানে। অতুলরা যাবার পর সেখানে ডাঃ সামন্তরও উপস্থিতি জানতে পারা গেল। অতুল, দ্বিজেন ও সমীর তিন-জনে তিনদিকে বেরিয়ে পড়লো গুপ্ত-ধনের খোঁজে। হঠাৎ সমীর এক জায়গায় বালি ধসে এক গহ্বরের মধ্যে পড়ে পা ভাঙলো; সেইখানেই ছিল গুপ্তধন। দ্বিজেন এসে সমীরকে উদ্ধার করে নিয়ে গেল। সেই রাত্রে আহত সমীর ও ইলাকে তাঁবুতে রেখে অতুল ও দ্বিজেন যাত্রা করলে গুপ্তধন উদ্ধার করতে। মাঝপথে দ্বিজেন টর্চ ফেলে আসার কথা জানালে এবং অতুলকে দাঁড় করিয়ে রেখে বন্দুকটা নিয়ে নিজে ফিরে চললো টর্চ আনতে। হঠাৎ বন্দুকের শব্দ এবং দ্বিজেনের আর্তস্বর শুনে অতুল এগিয়ে গিয়ে মাটিতে রক্তের দাগ দেখলে; দ্বিজেনকে পেলে না। এদিকে ডাঃ সামন্ত এসে সমীরকে সাবধান করে দিয়ে গেলো, তারপরই সমীর অজ্ঞাত ব্যক্তির গুলীতে নিহত হলো। ডাঃ সামন্ত আসার পর ইলা বেরিয়ে পড়েছিল এবং সে এসে হাজির হয় কুসুমদের বাড়িতে। সামনে দিয়ে একজন গা-ঢাকা দিয়ে বেরিয়ে যায়, কুসুম জানায়, সে ব্যক্তি তার দাদু। ইলা কুসুমকে সঙ্গে নিয়ে গুপ্তধনের গহ্বরে গিয়ে প্রবেশ করে। সেখানে ডাঃ সামন্তও হাজির; কুসুমের দাদু আখ্যাত লোকটিও গুপ্তধন উদ্ধারে রত। তারপর এলো কুসুমের সত্যিকারের দাদু এবং আবিষ্কৃত হলো দাদুর রূপ-সজ্জাধারী ব্যক্তিটি দ্বিজেন। অতুলও এসে পড়লো এবং তারই গুলীতে দ্বিজেন নিহত হলো। সবাই ফিরছে ডাঃ সামন্তের স্টিমারে। কোথা থেকে যে ব্যাপার কি দাঁড়ালো, ডাঃ সামন্তই সেটা ব্যাখ্যা করে দিলে। জানা গেল দ্বিজেন প্রথমবার ডাকিনীর চরে এসে গুপ্তধনের ভাগ দেবার লোভ দেখিয়ে কুসুমের দাদুকে হাত করে। পরে সকলে আসবার পর সমীর গুপ্তধনের সন্ধান পাওয়ায় তাকে সে হত্যা করে।

* * *

ডাঃ সামন্তকে পুরনো জিনিসের দোকানদার একজন খ্যাতনামা প্রত্নতত্ত্ববিধ বলে পরিচয় করে দিলেও অপর কব্জি বন্ধটি উদ্ধারে তার আচরণ দেখে গল্পের আসল ভিলেন বলে মনে হয়েছিল; কিন্তু শেষকালে সে গুপ্তধন নিজের দখলে পেয়েও অতুল ও ইলার যুগ্ম-হাতে তুলে দিয়ে নিজেকে এক অতি মহৎ চরিত্রের

'চিত্রাঙ্গদা' ছবিতে মিতা চট্টোপাধ্যায় ও লক্ষ্মী রায়

খেয়ালী লোক বলে প্রতিপন্ন করে দিলে। সেটা গোড়া থেকে ডাঃ সামন্তকে উপলক্ষ্য করে রহস্য জমিয়ে তোলার পক্ষে সুবিধে করে দিলেও গল্পের এবং চরিত্রের সঙ্গতির দিক থেকে মিল খায় না। অপর কব্জি-বন্ধটি উদ্ধার নিয়ে একদিকে ইলাদের এবং অপরদিকে ডাঃ সামন্তর মধ্যে চালবাজীর প্রতিযোগিতাটা রহস্যকে বেশ ঘনিয়ে তোলে। কিন্তু তারপর চরে পেঁছে গুপ্তধন উদ্ধার পর্যন্ত ঘটনায় রহস্যের সে আঁচটা অনেকখানি স্তিমিত হয়ে যায়। তার কারণ আগে পরস্পর প্রতিপক্ষ দলের চালচলনটা সর্বক্ষণ ছিল দর্শকের দৃষ্টির সামনে। ওরা কে কাকে কিভাবে প্যাঁচে ফেলতে চায়, এই বুদ্ধির পাল্লার মধ্যে ছিল উত্তেজনা সৃষ্টির উৎস। কিন্তু চরে আসার পর ডাঃ সামন্ত প্রায় উহ্যই হয়ে পড়লো। ওখানে বলতে গেলে অতুলদেরই দল। দ্বিজেন যে পরোক্ষে অন্য পথ ধরেছে, তার সামান্য আভাসও পাওয়া যায় না, তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত। তাছাড়া আসল ভিলেন যে দ্বিজেন, ডাঃ সামন্ত নয়, পরিণতির ঘটনা সে চমক ভাঙিয়ে দেবার মতো পর্যাপ্ত নাটকীয় হতে পারেনি। চরে এসে পৌঁছনর আগে পর্যন্ত গল্পের বিন্যাসে রস ও রহস্য দুই-ই পরিবেশিত হয়ে এসেছে। চরে এসে ভাসা ভাসা আধালিপ্ত ঘটনা গল্পকে দর্শকের কাছে দুর্বোধ্য করে দেয়, আর দুর্বোধ্যতা রহস্য সৃষ্টির বিষম অন্তরায়। শেষে স্টিমারে ডাঃ সামন্ত কর্তৃক দীর্ঘ বিবৃতির সাহায্যে ঘটনাবলী ব্যক্ত করিয়ে দেওয়াতে রহস্যের উদ্ঘাটন হয় বটে, কিন্তু সে চমকটা কোথায় তখন? আর চমকপ্রদ কিছু একটা দিয়ে পরিণতি না টানলে রহস্যমূলক কাহিনী কোন ছাপই রেখে যেতে পারে না।

• • • •

আমাদের এখানে রহস্যমূলক ছবি তোলার একটা প্রধান অন্তরায় যথাযথ পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার মতো কলা-কৌশলের কৃতিত্বের অভাব। কোনরকমে কাজ চালিয়ে নেওয়ার চেয়ে বেশী কৃতিত্ব পাওয়া যায় না। এসব ছবিতে মুখের চেয়ে আলোছায়ার মুখরতাই বেশী কার্যকরী হয়; গল্পের পরিবেশ সেদিক থেকে কম সহায়তাই পেয়েছে। কতক গুলো ব্যাপার বিসদৃশতার পর্যায়ে পড়ে। যেমন গোড়াতেই আষ্টেপিষ্টে দড়ি দিয়ে বাঁধা অপহৃতা জমিদার-কন্যার অবলীলাক্রমে বাঁধন-মুক্ত করে ফেলা বা দানবাকৃতি হার্মাদ দস্যুকে অতি সহজে ছুরিকাঘাতে নিহত করা; কিংবা নিশীথ রাতে গুপ্তধনের উদ্ধারে বেরিয়ে অনেকখানি এগিয়ে টর্চ ফেলে আসার ছুতো ইত্যাদি; তবে গল্পকে টেনে নিয়ে গিয়েছে বলতে গেলে একা ডাঃ সামন্ত; চরে পেঁছে অধিকাংশক্ষণই ছবিটির আড়ালে থাকলেও তার জন্য দর্শক-মনে কৌতূহলটা জেগে থাকে। এটা চরিত্রাভিনেতা ধীরাজ ভট্টাচার্যের আর একটি অসাধারণ অভিনয়-নৈপুণ্যের পরিচয়। পুরনো জিনিসের দোকানে লাঠি ঠক ঠক করতে করতে মসি-মুখো নিথর একটা সটান চেহারা নিয়ে হাজির হওয়ামাত্রই একটা অদ্ভুত বৈচিত্র্যের প্রতি দর্শক-মনকে আকৃষ্ট করে নেন। তার ওপর তাঁর ধীরে ধীরে কথা বলা, আগে থেকেই প্রতিপক্ষের সব ফন্দী ফাঁস করে অবাক করে দেওয়া, ওর চালচলনের স্থির ও দীপ্ত ভঙ্গী দর্শকমনের ওপরে একটা প্রভাব বিস্তার করে নেয়। চরিত্র-চিত্রণে ধীরাজ ভট্টাচার্য এবারও বৈচিত্র্যের সঙ্গে স্মরণীয় নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। অন্যান্যের অভিনয় ঠিক অতোটা উঁচু পর্দায় গিয়ে পৌঁছতে না পারলেও একটা সঙ্গতি রক্ষা করে গিয়েছে। শিল্পীদের মধ্যে আছেন—বিপিন মুখোপাধ্যায়, ধীরাজ দাস, বিজয় বসু, শশাঙ্ক সোম, মণি শ্রীমানী, নমিতা সিংহ, সবিতা চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি। অজিত চট্টোপাধ্যায়, জহর রায়, পাপু মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি ডাকিনীর চরের পথে এক জায়গার এক হোটেলের বেকার একদল যুবকদের একটি দৃশ্যে খানিকটা হাল্কা রসের আমোদ পরিবেশনে সক্ষম হন।

* * *

দুখানি গান আছে, প্রেমেন্দ্র মিত্রেরই লেখা এবং চমৎকার লেখা, কিন্তু পরিবেশনটা ঠিক হয়নি। ছবিখানির সংগঠনকারিবৃন্দ হচ্ছেন রচনা, প্রযোজনা ও পরিচালনায় প্রেমেন্দ্র মিত্র; আলোকচিত্রগ্রহণে বঙ্কু রায়, শব্দগ্রহণে সমর বসু, সুরযোজনায় পবিত্র চট্টোপাধ্যায় ও শিল্পনির্দেশে রবি ঘোষ এবং প্রফুল্ল মল্লিক।

খেলার মাঠে

একলব্য

দীর্ঘ ১৬ বছর পর এবার কলকাতায় ভারতের জাতীয় অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করা হয়েছিল। ইডেন উদ্যানের রণজি স্টেডিয়ামে জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্যে এবং বিশেষ সাফল্যের সঙ্গে জাতীয় অ্যাথলেটিকের এই মহা অনুষ্ঠান শেষও হয়ে গেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ১৯৩৮ সালে যখন শেষবার কলকাতায় জাতীয় খেলাধূলার অনুষ্ঠান হয়েছিল তখন তার নাম ছিল ভারতীয় অলিম্পিক অনুষ্ঠান। ১৯৫৩ সাল পর্যন্তও জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের সঙ্গে 'অলিম্পিক' কথাটি জড়িত ছিল; কিন্তু আন্তর্জাতিক অলিম্পিক সংস্থার নির্দেশ অনুযায়ী 'অলিম্পিক' কথাটি ব্যবহার করা সম্ভবপর নয় বলে পূর্বের অলিম্পিক অনুষ্ঠান আজ জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে রূপান্তরিত হয়েছে। জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানেও যেসব খেলাধূলার ব্যবস্থা ছিল সেগুলিকে একে একে ছেঁটে বাদ দিয়ে এখন যে অবস্থায় আনা হয়েছে তাকে আর কোন মতেই জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান বলা চলে না। তাই এখন নাম হয়েছে জাতীয় অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ। ভারতের অলিম্পিক অনুষ্ঠানের সঙ্গে ফুটবল ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলাধূলার ব্যবস্থা পূর্বেও ছিল না, এখনো নেই। এসব প্রতিযোগিতার জাতীয় অনুষ্ঠানের ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা আছে। টেনিস, টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টন ও নিজ নিজ পৃথক সত্তায় কৌলিন্যের মর্যাদা লাভ করেছে। শুধু সাঁতার, ওয়াটারপোলো, কপাটি, কুস্তি, ভারোত্তোলন, জিমন্যাস্টিকস, বাস্কেট, ভলি প্রভৃতি স্বল্প ব্যয়ের খেলাধূলো জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানের অন্তর্ভুক্ত ছিল। এখন অ্যাথলেটিক স্পোর্টসের সঙ্গে এক কপাটি আর জিমন্যাস্টিকস ছাড়া আর সব খেলাধূলোকেই পৃথক করে দেওয়া হয়েছে. এমনকি সাইকেল চালনাও আর অ্যাথলেটিকসের সঙ্গে জড়িত নেই। সাইকেল রেসেরও এখন পৃথক আয়োজন। তাই গত বছর দিল্লীর জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠানে সেখানে দেড় হাজার প্রতিযোগীর সমাগম হয়েছিল, সেখানে কলকাতার অনুষ্ঠানে এবার চারশ'র বেশী প্রতিযোগীর সমাগম ঘটেনি। তবুও কপাটি ও জিমন্যাস্টিকস নিয়ে জাতীয় অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপের গুরুত্ব এবং বিরাটত্ব অনস্বীকার্য। অ্যামেচার অ্যাথলেটিক ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত প্রায় সমস্ত রাজ্যই এই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন স্থান হতে এসেছিল শক্তিধর অ্যাথলীটবৃন্দ। একমাত্র দীপবর্তিকা প্রজ্বলিত করা ছাড়া অলিম্পিকের নিয়মনিষ্ঠায় জাতীয় অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপের অনুষ্ঠান সম্পন্ন করা হয়। উদ্বোধন ও সমাপ্তির বিচিত্র পরিবেশ এবং উন্নত অ্যাথলেটিক মান এবারকার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপকে সাফল্যমণ্ডিত করে তুলেছে।

* * *

এবারকার অনুষ্ঠানে নূতন রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ১৮টি বিষয়ে। একটি বিষয়ে দুইজনের পূর্ব রেকর্ড অতিক্রমের বিষয় হিসাবের মধ্যে ধরলে পূর্বতন রেকর্ড ভঙ্গকারী অ্যাথলীটের সংখ্যা দাঁড়ায় উনিশ— এর মধ্যে ছয়টি বিষয়ের রেকর্ড এশিয়ান রেকর্ড অপেক্ষাও উন্নত। এশিয়ান রেকর্ড বলতে এশিয়ান গেমের রেকর্ডকেই বুঝায়। অর্থাৎ দিল্লী ও ম্যানিলায় এশিয়ান গেমে যেসব বিষয়ে রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ৪ বছরের ব্যবধানে এশিয়ান গেমের অনুষ্ঠান। এই ৪ বছরের মধ্যে এশিয়া ভূখণ্ডের বিভিন্ন স্থানে কত রেকর্ডের ভাঙ্গাগড়া হচ্ছে তার হিসাব কে রাখে? সুতরাং এশিয়ান গেমের মান অনুসারেই এশিয়ান রেকর্ড বলা হচ্ছে। অলিম্পিক রেকর্ড সম্পর্কেও এই কথা। অলিম্পিকেরও আয়োজন ৪ বছরের ব্যবধানে। তবে বিশ্ব রেকর্ডের কোন বালাই নেই। বিশ্বের যে কোন জায়গায় যে কোন অনুমোদিত ক্রীড়ানুষ্ঠানে বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। অবশ্য সব রেকর্ডই আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের অনুমোদন সাপেক্ষ। কলকাতায় জাতীয় অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথম স্থান অধিকারী এবং রেকর্ড সৃষ্টিকারী প্রতিযোগীদের অ্যাথলেটিক মানের সঙ্গে বিশ্ব অলিম্পিক বা এশিয়ান অ্যাথলেটিক মানের পার্থক্য বোঝাবার জন্য এই সংখ্যায় তুলনামূলক হিসাব প্রকাশ করা হচ্ছে। এর থেকে
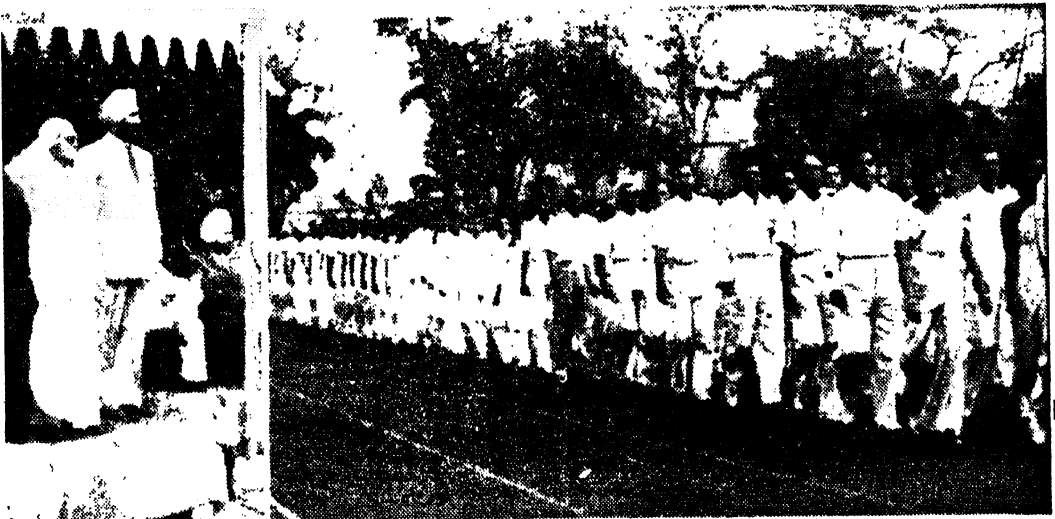
রনজি স্টেডিয়ামে জাতীয় অ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জি অ্যাথলীটদের মার্চপাস্টে অভিবাদন গ্রহণ করছেন

আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের এ্যাথলেটিক মান সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

* * *

ভারতের এ্যাথলেটিক মান বলতে এই উপ-মহাদেশের সামরিক এ্যাথলেটিক মানই বুঝায়। সার্ভিস টীম এবার নিয়ে উপর্যুপরি পাঁচ বছর দলগত চ্যাম্পিয়নশিপের পুরস্কার 'স্যার ডোরাব ট্রফি' লাভ করেছে। পুরুষদের বিভাগে প্রতিষ্ঠিত ১৬টি নূতন রেকর্ডের মধ্যে ১৪টি রেকর্ডের অধিকারী সামরিক বিভাগের এ্যাথলীটবৃন্দ। এর মধ্যে সার্ভিস টীমের অধিনায়ক শক্তিধর এ্যাথলীট পরদুমন

হাতুড়ী ছোড়ায় নূতন ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী দেবীদয়াল 'বিজয়মঞ্চে' দাঁড়িয়ে আছেন। দ্বিতীয় স্থানের অধিকারী হরদেব সিং ও পূর্ব রেকর্ড ভেঙেগ দিয়েছেন

সিং একাই দুইটি রেকর্ড করেছেন—'সট পাট' আর 'ডিসকাস'। প্রথম স্থান অধিকারীর পাঁচ পয়েণ্ট, দ্বিতীয় স্থানাধিকারীর তিন এবং তৃতীয় স্থানাধিকারীর এক; পয়েণ্ট লাভের এই হিসাব অনুযায়ী সার্ভিস টীম লাভ করেছে ১৪৬ পয়েণ্ট আর তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী পেপসু লাভ করেছে মাত্র ১৯ পয়েণ্ট। এর থেকেই বোঝা যায় ভারতের সাধারণ এ্যাথলেটিক মানের সঙ্গে সামরিক এ্যাথলেটিক মানের কত পার্থক্য। বেসামরিক এ্যাথলীটদের মধ্যে পাঞ্জাবের এ্যাথলীট জগদেব সিং ৪০০ মিটার হার্ডলে এবং বোম্বাইয়ের দৌড়বীর লেভি পিণ্টো ২০০ মিটার দৌড়ের হিটে নূতন রেকর্ড করেছেন—যদিও পিণ্টো ২০০ মিটারের ফাইন্যালে রেকর্ড করতে পারেন নি। মহিলা বিভাগে যে দুইজন রেকর্ড করেছেন তাঁরা একজন বোম্বাইয়ের এবং একজন উড়িষ্যার অধিবাসিনী। অবশ্য এঁদের শারীরিক শক্তির সবটুকুই বোম্বাই বা উড়িষ্যা থেকে আহৃত নয়। সাগরপারের কিছুটা শক্তিও এঁদের মধ্যে রয়েছে। ৮০ মিটার হার্ডলে রেকর্ড করেছেন বোম্বাইয়ের মিস ভায়োলেট পিটার্স আর বর্শা ছোঁড়ায় রেকর্ড করেছেন উড়িষ্যার মিস এলিজাবেথ ডেভেনপোর্ট। ডেভেনপোর্ট বিহারেরই এ্যাথলীট। বিহার থেকে মহিলা টীম পাঠাবার সম্ভাবনা না থাকায় তিনি উড়িষ্যা থেকে নাম পাঠান।

এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে ডেকাথলন এবং ম্যারাথন বিজয়ীর সম্মান অনন্য। ডেকাথলন অর্থাৎ দশটি বিষয়ে অর্জিত পয়েণ্টের শ্রেষ্ঠত্ব বিজয়ী প্রতিযোগীকে চৌকস এ্যাথলীটের সম্মান দান করা হয়। এই দশটি বিষয়ের মধ্যে রয়েছে—১০০, ৪০০ ও ১৫০০ মিটার দৌড়, ১১০ মিটার হার্ডল, দীর্ঘ ও উচ্চ লম্ফ, পোলভল্ট, ডিসকাস এবং বর্শা ও গোলা ছোড়া। অর্থাৎ সমস্ত বিষয়েই তাঁর শারীরিক যোগ্যতা পরিমাপ করা হয়। ১০০ মিটার দৌড়ে যিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন, ১৫০০ মিটারে তাঁর প্রথম স্থান অধিকারের সম্ভাবনা নেই। শর্ট, মিডল এবং লং ডিসট্যান্স দৌড়ের জন্য পৃথক পৃথক গুণের প্রয়োজন। কোনটায় প্রয়োজন স্বল্প সময়ের তীব্র গতিবেগ, কোনটায় প্রয়োজন অধিকক্ষণ শ্রমসহিষ্ণুতা। একই এ্যাথলীটের পক্ষে এই গুণাবলী আয়ত্ত করা সম্ভব নয়। আবার লাফের ক্ষেত্রেও সেই কথা। উঁচু লাফের বিজয়ী দীর্ঘ লাফে বিজয়ী হতে পারেন না, পোলভল্টেও তাঁর বিজয়ী হবার সম্ভাবনা নেই। বর্শা ছোঁড়া, গোলা ছোঁড়া, ডিসকাস ছোঁড়ার ক্ষেত্রেও ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি এবং ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রয়োজন। হাতের জোর থাকলেই সব রকমের থ্রোইং ইভেণ্টে সাফল্য অর্জন করা যায় না, বাহুবলই ডিসকাস, বর্শা বা গোলা ছোঁড়ায় সাফল্য অর্জনের একমাত্র অস্ত্র নয়। এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের ফলাফল শারীরিক পটুতার এমন নিদর্শন যার থেকে প্রতিযোগীর গতিবেগ, কৌশল, শ্রমশীলতা, অধ্যবসায়, টেম্পারেমেণ্ট, ধৈর্যশীলতা সব কিছু পরিমাপ করা যায়। এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রকাশ করবার এবং বিশ্ববরেণ্য হবার সুযোগও রয়েছে প্রচুর। আজ জনি উইসমূলার জেসি আওয়েন্স, পাভো নুর্মি, এমিল জেটোপেক, গর্ডন পিরি, জন ল্যাণ্ডি এবং রজার ব্যানিস্টারের নাম কে না জানে। প্রথমে স্কুল কলেজ বা ক্লাবের এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কর। তারপর কর রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপে। রাজ্য চ্যাম্পিয়ানশিপের পর জাতীয় প্রতিযোগিতায়। সাফল্য লাভ করলে এগিয়ে যাও এশিয়ার দরবারে। তারপর ঝাঁপিয়ে পড় বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতা অলিম্পিকে। উত্তরোত্তর সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে তোমার নামও ছড়িয়ে পড়বে বিশ্বমাঝে। তবে এর জন্য সাধনার প্রয়োজন, সংযমের প্রয়োজন, প্রয়োজন অবিচলিত নিষ্ঠার। কয়েকমাস আগে অলিম্পিক পোলভল্ট চ্যাম্পিয়ন ই রিচার্ড ভারত সফরে এসেছিলেন। বাঙলার এ্যাথলীটদের সামনে তিনি

৮০ মিটার হার্ডলের রেকর্ড সৃষ্টিকারী মহিলা এ্যাথলীট ভায়োলেট পিটার্স

বলে গেছেন—১৪ ফুট ৮ ইঞ্চি লাফাবার পর দেহ বিজ্ঞানী ডাক্তার এবং ক্রীড়াবিদেরা মন্তব্য করেছিলেন রিচার্ড ক্ষমতার শেষ সীমায় পেঁছে গেছেন। কারণ পোলভল্টার হিসাবে তাঁর দেহের উচ্চতা বেশী নয়। কিন্তু রিচার্ড এই মন্তব্যে বিচলিত না হয়ে আরও উচ্চতা অতিক্রমের জন্য কঠোর সাধনায় ব্রতী হন। ১৪ ফুট ৮ ইঞ্চি থেকে ১৫ ফুট পেঁছুতে তাঁর প্রায় তিন বছর সাধনার প্রয়োজন হয়। এই সময়ে তিনি প্রতিদিন ছয় সাত ঘণ্টা করে নিয়মিত অনুশীলন করেছেন। তাই রিচার্ড বলেছিলেন, জন্মগত প্রতিভা নিয়ে কেউ জন্মগ্রহণ করে না। সাধনার দ্বারা তাদেরকে জগৎপূজ্য হতে হয়। কত অধ্যাবসায়, কত সংযম, কত সাধনা, কত চেষ্টার ফলে জেটোপেক, গিল ডডস, প্যাডি ও'ব্রায়েনের মত এ্যাথলীট তৈরী হয়েছে তা

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্বপ্রকাশিতের পর)

"ওয়ান এ. এম."-এর পর "দী কাউণ্ট"। এ-বইয়ে এরিক ক্যাম্বেল এক দরজির ভূমিকায় নেমেছিলেন। চার্লি তাঁর সহকারী। বইয়ের গোড়াতে দেখতে পাওয়া যায় যে, এরিক ক্যাম্বেল চটে গিয়ে চার্লিকে তাঁর চাকরি থেকে বরখাস্ত করে দিয়েছেন। তার পরের দৃশ্যেই এরিক এক জায়গায় গিয়ে একখানি চিঠি কুড়িয়ে পান। চিঠিখানা জনৈক কাউণ্টের লেখা। তিনি তাতে এই বলে দুঃখ জানিয়েছেন যে, কোনও এক ধনী মহিলার (এডনা) নিমন্ত্রণে উপস্থিত থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। এরিক ঠিক করলেন, তিনি নিজেই সেই কাউণ্ট সেজে নেমন্তন্নের আসরে গিয়ে হাজির হবেন।

যে কথা, সেই কাজ। কিন্তু নেমন্তন্নে গিয়ে যে-ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হল, তাঁকে দেখেই তো এরিকের চক্ষুস্থির। চার্লি। সেই বাড়িরই এক ভৃত্যের সঙ্গে তিনি দেখা করতে এসেছেন। জাল-কাউণ্ট অর্থাৎ এরিক তো প্রথমে তাঁকে জ্যান্ত মানুষ বলেই চিনতে পারেননি, ভেবেছিলেন একখানা ছবি। চিনতে পারার পর চার্লির কাছে তিনি কাতরভাবে অনুরোধ জানালেন, তাঁর আসল পরিচয়টা চার্লি যেন ফাঁস করে না দেন, তিনিও যেন তাঁর সেক্রেটারি সেজে নেমন্তন্নের টেবিলে গিয়ে বসেন। চার্লি অতঃপর সেই জাল-কাউণ্টের জাল-সেক্রেটারি হয়ে ঘুরতে লাগলেন।

এর পর উপর্যুপরি কয়েকটি মজার ঘটনা ঘটতে দেখা যায়। ডিনার-টেবিলে এরিকের প্লেট থেকে স্প্যাঘেটি অদৃশ্য হয়ে যাওয়া, নাচের হলের মসৃণ মেঝের উপরে চার্লির বারংবার আছাড় খাওয়া, শেষ পর্যন্ত হাতের ছড়িখানাকে ঝাড়-লণ্ঠনের গায়ে আটকে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবার চেষ্টা করা, দেখতে দেখতে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যায়।

পরের বইখানার নাম "দী পনশপ।"

"পনশপ" চিত্রে চার্লি

আগের বইগুলির তুলনায় এ-বই আরও ভাল। এ-কথা বলবার কারণ এই যে, হাস্যরস সৃষ্টির ব্যাপারে এ-বইয়ে চার্লির উর্বরা কল্পনাশক্তির আরও প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। চার্লি নেমেছিলেন বন্ধক-ব্যবসায়ীর সহকারীর ভূমিকায়। প্রথম দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়, ভারিক্কী চালে তিনি দোকানে এসে ঢুকলেন, দেয়ালে টাঙানো ক্যালেণ্ডার দেখে হাতের ঘড়িটাকে মিলিয়ে নিলেন, একপাশে রাখা একটা জয়ঢাকের উপরে হাতের ছড়িখানাকে তুলে রাখলেন, মাথার উপরে দোদুল্যমান ক্যানারির খাঁচার মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন তাঁর গোল টুপিটাকে; তারপরে—হ্যাঁ তারপরে দর্শকরা যখন আরও মারাত্মক রকমের চালচলনের জন্যে তৈরি হয়ে রয়েছে—দরজার সামনে টাঙানো পিতলের তিনটি গোলককে তিনি পালিশ করতে লেগে গেলেন। মইয়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছেন চার্লি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টালমাটাল অবস্থায় পালিশ করছেন। তার সেই ভারসাম্য বজায় রেখে কাজ করবার দৃশ্যটি ভারী সুন্দর। সামনেই দাঁড়িয়ে আছে দুজন কনস্টেবল। চার্লির দোলানির সঙ্গে সঙ্গে নিজেদের অজ্ঞাতে তারাও মাথা দোলাচ্ছে। একবার এদিকে, একবার ওদিকে। এ-বই যিনি দেখেছেন, দৃশ্যটি তিনি ভুলতে পারবেন না।

পরের দৃশ্যে দর্শকদের হাস্যস্রোত আরও দুর্বার হয়ে ওঠে। কে একজন তার অ্যালার্ম ক্লকটিকে বন্ধক দেবার জন্য দোকানে এসে ঢুকেছে। ঘড়ির উপরে স্টেথোস্কোপ বসিয়ে বিজ্ঞ ডাক্তারের মত চার্লি সেটিকে একবার পরীক্ষা করে নিলেন, তারপর সেই ঘড়ির কাঁচের উপর আঙুল দিয়ে টোকা মারলেন কয়েকবার, ড্রিলিং মেশিন লাগিয়ে কয়েক জায়গায় গোটাকতক ছ্যাঁদা করে নিয়ে অতঃপর একটা টিন কাটবার যন্ত্র দিয়ে ঘড়ির ঢাকনাটিকে খুলে ফেললেন। খুলে ফেলে সতর্ক ভঙ্গীতে বার কয়েক তার ভিতরকার গন্ধ শুঁকে নিলেন চার্লি, ম্যাগনিফায়িং গ্লাসের বদলে টেলিফোনের মাউথপীসটা চোখে লাগিয়ে নিলেন, ঘড়ির মধ্যে তেল ঢাললেন খানিক, তারপর ডেণ্টিস্টদের ফরসেপ হাতে নিয়ে পটাপট্ গোটাকয়েক কলকব্জা খুলে নিলেন। ঘড়ির স্প্রীংটাকে আলাদা করে নিয়ে এমনভাবে সেটাকে মাপতে লাগলেন যেন সেটা সূক্ষ্ম একটা স্প্রীং নয়, কয়েক গজ রীবন মাত্র। খানিকটা অংশ কেটে বাদ দিয়ে দিলেন তার থেকে, আবার তার উপরে তেল ঢাললেন খানিক, তারপর সব কিছুকে একত্র করে খদ্দেরের টুপির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন।

"ওয়ান এ. এম." ছবিতে দৃশ্যবৈচিত্র্য তেমন কিছু ছিল না, এ-বইয়েও নেই। মোটামুটি একই জায়গায় অভিনয় চলতে

এই সব মহা শক্তিধরের জীবনী আলোচনা করলে জানা যায়। ও'ব্রায়েন ঘণ্টার পর ঘণ্টা ১৬ পাউণ্ড ওজনের লোহার বল ছ'ুড়ে চলেছেন। বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই, আহার-নিদ্রার চিন্তা নেই। এমিল জেটোপেককে বিরামহীনভাবে দিনে ৫৫ মাইল করে দৌড়তে দেখা গেছে। তবেই তো তিনি অক্ষয় কীর্তি স্থাপন করেছেন দূরপাল্লার ম্যারাথন দৌড়ে। ম্যারাথন দৌড়ের পথ পরিক্রমার দূরত্ব ২৬ মাইল ৩৮৫ গজ। বিরামহীনভাবে এই দীর্ঘপথ দৌড়ে পার হওয়া কতখানি শ্রম সহিষ্ণুতার প্রয়োজন তা সহজেই অনুমেয়। তাই ম্যারাথন বিজয়ীর সম্মানও অনন্য। ম্যারাথনে জেটোপেকের বিশ্ব রেকর্ড ২ ঘণ্টা ২৩ মিনিট ৩.২ সেকেণ্ড। এবার কলকাতায় সার্ভিস টীমের গুরুচরণ সিং ২ ঘণ্টা ৩৯ মিনিট ১৫.৫ সেকেণ্ডে ম্যারাথনে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। তবুও তিনি রেকর্ড করতে পারেন নি। ম্যারাথনে ভারতীয় ও এশিয়ান রেকর্ডের অধিকারী পেপসুর ছোটা সিং। তার সময় ২ ঘণ্টা ৩৩ মিনিট ২১.৪ সেকেণ্ড। ম্যারাথন যেমন দূরপাল্লার দৌড় প্রতিযোগিতা তেমন দূরপাল্লার হাঁটা প্রতিযোগিতা হচ্ছে ৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ। ৫০ কিলোমিটার হচ্ছে ৩১ মাইল ১২০ গজ। সার্ভিস টীমের সিপাই রাঘবীর সিং এই ভ্রমণ প্রতিযোগিতায় নূতন রেকর্ড করেছেন। অবশ্য কয়েক সপ্তাহ আগে সার্ভিস স্পোর্টসে লক্ষ্মণ সিং রাঘবীরের চেয়েও কম সময়ে দূরত্ব অতিক্রম করেন। লক্ষ্মণ সিংয়ের রেকর্ড এখনো অনুমোদন সাপেক্ষ। লক্ষ্মণ সিংয়ের রেকর্ড গৃহীত হলে স্বাভাবিকভাবেই রাঘবীরের রেকর্ড নাকচ হয়ে যাবে।

এ্যাথলেটিক ছাড়া জিমন্যাস্টিকসেও সার্ভিস চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছে। জাতীয় কপাটি প্রতিযোগিতার পুরুষ এবং মহিলা উভয় বিভাগেই বোম্বাই সাফল্য অর্জন করেছে। পুরুষদের ফাইনালে বোম্বাই ১৯—৭ পয়েণ্টে বাঙলাকে এবং মহিলাদের ফাইনালেও বোম্বাইয়ের মহিলা টীম ৭১—১৮ পয়েণ্টে বাঙলাকে পরাজিত করে।

* * *

এইবার জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপ পরিচালক সংস্থা যাদের খেলাধুলার সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে দুর্নামের বোঝা ক্রমেই বেড়ে উঠছে—তারা কিন্তু জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় যথেষ্ট প্রশংসা অর্জন করেছেন। ফুটবল, ক্রিকেট, হকি প্রভৃতি খেলাধুলার চেয়ে এ্যাথলেটিক স্পোর্টস পরিচালনা করা অনেক শক্ত। মাঠের মাপজোপ করা, সাজ-সরঞ্জাম ও জিনিসপত্র যোগাড় করা প্রভৃতি নানা সমস্যা আছে এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে। তারপর বিভিন্ন রাজ্যের তিনশতাধিক এ্যাথলীট এবং কর্মকর্তার থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করাও কম কথা নয়। বাইরের এ্যাথলীট এবং কর্মকর্তাদের থাকা খাওয়ার সুন্দর ব্যবস্থাই করেছিলেন বাঙলার ক্রীড়া সংস্থা। রণজি ষ্টেডিয়ামের ভিতরেই এ্যাথলেটিক ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। বোম্বাই-মাদ্রাজ-দিল্লী-কোলাপুর-পেপসু-পাঞ্জাব-বিহার-উড়িষ্যা মধ্য ভারত-মধ্য প্রদেশ-উত্তর প্রদেশ-মহীশূর-রাজপুতনা-ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন প্রভৃতি রাজ্যের

সার্ভিস টীমের অধিনায়ক শক্তিধর এ্যাথলীট পরদুমন সিংয়ের 'গোলা' ছোঁড়ার দৃশ্য। 'গোলা' ছোঁড়া এবং ডিসকাস ছোঁড়ায় পরদুমন নূতন রেকর্ড করেছেন

এ্যাথলীটরা ভিন্ন ভিন্ন ক্যাম্পে পেয়েছিলেন প্রত্যেকের জন্য গদিওয়ালা একখানি করে স্প্রিংয়ের খাট। খাবার জন্যও ক্যাণ্টিনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। চারদিনব্যাপী ক্রীড়ানুষ্ঠানের বিভিন্ন দিনে এই ক্যাণ্টিন থেকে এ্যাথলীটদের বিভিন্ন খাদ্য পরিবেশন করা হয়েছে। এ্যাথলীটদের কাছ থেকে থাকা এবং খাওয়া সম্বন্ধে কোনই অভিযোগ পাওয়া যায়নি। বরং প্রশংসাই করেছেন সবাই আরামপ্রদ ব্যবস্থাপনার। জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপের অন্যান্য খুটিনাটি বিষয় আলোচনার আরও ইচ্ছে আছে। স্থানাভাবের জন্য আজ এখানেই শেষ করতে হচ্ছে।

ফলাফল :—

১০০ মিটার দৌড় (১০৯ গঃ ১ ফুঃ)

বিশ্ব রেকর্ড—জে সি আওয়েন্স (ইউ এস)—১৯৩৬; এইচ ডেভিস (ইউ এস), এল বি লাবিচ (পানামা), এইচ ইউয়েল (ইউ এস)—১৯৪৮; ই ম্যাকডোনাল্ড বেলী (গ্রেট ব্রিটেন)—১৯৫১; —১০.২ সেঃ।

অলিম্পিক রেকর্ড—ই টোলান (ইউ এস) —১৯৩২; জে সি আওয়েন্স (ইউ এস)—১৯৩৬; হ্যারিসন ডিলার্ড (ইউ এস)—১৯৪৮; —১০.৩ সেঃ।

এশিয়ান রেকর্ড—এ খালিক (পাকিস্থান) ১৯৫৪; ১০.৫ সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—এল পিণ্টো (বোম্বাই) —১০.৬ সেঃ—**প্রথম** পিণ্টো—১০.৯ সেঃ

২০০ মিটার দৌড় (২১৮ গঃ ২ ফুঃ)

বিশ্ব রেকর্ড—এম প্যাটন (ইউ এস) ১৯৪৯—২০.২ সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—জে সি আওয়েন্স (ইউ এস) ১৯৩৬; এ স্ট্যান্ডফিল্ড (ইউ এস) ১৯৫২—২০·৭ সেঃ

এশিয়ান রেকর্ড—শরিফ বাট (পাকিস্থান) —১৯৫৮—২১·৬ সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—এল পিণ্টো (বোম্বাই) —২১·৭ সেঃ; **প্রথম**—পিণ্টো—২১·৯ সেঃ

৪০০ মিটার দৌড়—(৪৩৭ গঃ ১ ফুঃ)

বিশ্ব রেকর্ড—ভি জি রডেন (জামাইকা) —১৯৫০—৪৫·৮ সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—ভি জি রডেন (জামাইকা)—১৯৫২; ৪৫·৯ সেঃ

এশিয়ান রেকর্ডঃ—আগাকী কাউজী (জাপান) ১৯৫৮—৪৮·৫ সেঃ

পূর্বতন ভারতীয় রেকর্ড—যোগীন্দার সিং (সার্ভিস) ৪৮·৫ সেঃ **প্রথম**—যোগীন্দার সিং ৪৮ সেঃ (নূতন ভারতীয় রেকর্ড)।

৮০০ মিটার দৌড় (৮৭৫ গজ)

বিশ্ব রেকর্ড—আর হারবিগ (জার্মাণী) ১৯৩৯—১ মিঃ ৪৬·৬ সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—এম জি হুইটফিল্ড (ইউ এস) ১৯৪৮ ও ১৯৫২—১ মিঃ ৪৯·২ সেঃ

এশিয়ান রেকর্ড—মুরোয়া যোশী তাকা (জাপান) ১৯৫৮—১ মিঃ ৫৪·৫ সেঃ

পূর্বতন ভারতীয় রেকর্ড—সোহন সিং (সার্ভিস)—১ মিঃ ৫৪·২ সেঃ—**প্রথম**—সোহন সিং—১ মিঃ ৫২·৫ সেঃ (নূতন ভারতীয় রেকর্ড)।

১৫০০ মিটার দৌড় (১৬৪০ গঃ ১ ফুঃ)

বিশ্ব রেকর্ড—জে ল্যান্ডি (অষ্ট্রেলিয়া) ১৯৫৪—৩ মিঃ ৪১·৮ সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—জে বার্থেল (লুক্সেম-বার্গ) ও আর ম্যাকমিলন (ইউ এস এ)—১৯৫২—৩ মিঃ ৪৫·২ সেঃ

এশিয়ান রেকর্ড—চোহ উন চিল (কোরিয়া) ১৯৫৮—৩ মিঃ ৫৬·২ সেঃ

পূর্বতন ভারতীয় রেকর্ড—চাঁদ সিং (পেপসু) ১৯৪৪ ৪ মিঃ ৪·২ সেঃ। **প্রথম**—মাখন সিং (সার্ভিস) **৩ মিঃ ৫৮·২** (নূতন ভারতীয় রেকর্ড)।

৫০০০ মিটার দৌড় (৩ মাঃ ১৪৮ গঃ)

বিশ্ব রেকর্ড—এমিল জেটোপেক (চেকো-শ্লোভেকিয়া) ১৯৫৪—১৩ মিঃ ৫৭·২ সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—জেটোপেক (চেকোঃ) ১৯৫২—১৪ মিঃ ০·৬ সেঃ।

এশিয়ান রেকর্ড—ইলো ও সামু (জাপান) ১৯৫৮—১৫ মিঃ ০·২ সেঃ।

ভারতীয় রেকর্ড—রোনাক সিং (পাঞ্জাব) ১৯৩৬—১৫ মিঃ ৯·৪ সেঃ। **প্রথম**—ডালু-রাম (সার্ভিস) ১৫ মিঃ ৩৬·৬ সেঃ।

১০,০০০ মিটার দৌড় (৬ মাঃ ৩৭৬ গজ)

বিশ্ব রেকর্ড—জেটোপেক (চেকো-শ্লোভেকিয়া) ১৯৫৪—২৮ মিঃ ৫৪·২ সেঃ।

অলিম্পিক রেকর্ড—জেটোপেক (চেকো-শ্লোভেকিয়া) ১৯৫২—২৯ মিঃ ১৭ সেঃ।

এশিয়ান রেকর্ড—চোই চাং শিখ (কোরিয়া) ১৯৫৪—৩৩ মিঃ ০·৬ সেঃ।

পূর্বতন ভারতীয় রেকর্ড—বুটা সিং (সার্ভিস) ১৯৫৫—৩১ মিঃ ৪১·৬ সেঃ। **প্রথম**—বুটা সিং (সার্ভিস) **৩১ মিঃ ১৮·২** সেঃ (নূতন ভারতীয় রেকর্ড)।

৩০০০ মিটার স্টিপল চেজ (১ মাঃ ১৫২১ গজ)

বিশ্ব এবং অলিম্পিক রেকর্ড—এইচ এ্যাসেনফেল্টার (ইউ এস) ১৯৫২—৮ মিঃ ৪৫·৪ সেঃ।

এশিয়ান রেকর্ড—তাকাশী সুসুমু (জাপান) ১৯৫৪—৯ মিঃ ১৫ সেঃ।

পূর্বতন ভারতীয় রেকর্ড—মুনুস্বামী (সার্ভিস) ১৯৫৪—৯ মিঃ ৩০·৪ সেঃ। **প্রথম**—ডালুরাম (সার্ভিস) ৯ মিঃ ২৪ সেঃ (নূতন ভারতীয় রেকর্ড)

১১০ মিটার হার্ডল

বিশ্ব রেকর্ড—আর এ এ্যাটলসে (ইউ এস) ১৯৫০—১৩·৫ সেঃ

অলিম্পিক রেকর্ড—হ্যারিসন ডিলার্ড ও জে ডেভিস (ইউ এস) ১৯৫২—১৩·৭ সেঃ

এশিয়ান রেকর্ড—সারোয়ান সিং (ভারত) ১৯৫৪—১৪·৭ সেঃ

বর্শা ছোড়ায় নূতন রেকর্ডের অধিকারিণী এলিজাবেথ ডেভেনপোর্টের বর্শা ছোড়ার দৃশ্য

পূর্বতন ভারতীয় রেকর্ড—সারোয়ান সিং (সার্ভিস) ১৯৫৪—১৫ সেঃ। **প্রথম**—শ্রীচাঁদ সিং (সার্ভিস) ১৪·৯ সেঃ (নূতন ভারতীয় রেকর্ড)

৪০০ মিটার হার্ডল

বিশ্ব রেকর্ড—ওয়াই লিটুজেভ (ইউ এস) ১৯৫৩—৫০·৪ সেঃ।

অলিম্পিক রেকর্ড—সি মুর (ইউ এস) ১৯৫২—৫০·৮ সেঃ

এশিয়ান রেকর্ড—মির্জা খাঁ (পাকিস্থান) ১৯৫৪—৫৪·১ সেঃ।

পূর্বতন ভারতীয় রেকর্ড—জগদেব সিং (পাঞ্জাব) ১৯৫৫—৫৪·৩ সেঃ। **প্রথম**—জগদেব সিং (পাঞ্জাব) ৫৩·৬ সেঃ (নূতন ভারতীয় রেকর্ড)

১০,০০০ মিটার ভ্রমণ (৬ মাঃ ৩৭৬ গজ)

বিশ্ব রেকর্ড—ভি হার্ডমো (সুইডেন) ১৯৫৪—৪২ মিঃ ৩৯·৬ সেঃ।

অলিম্পিক রেকর্ড—জে মাইকেলসন (সুইডেন) ১৯৫২—৪৫ মিঃ ২·৮ সেঃ।

এশিয়ান রেকর্ড—মহাবীর প্রসাদ (ভারত) ১৯৫১—৫২ মিঃ ৩১·৪ সেঃ।

ভারতীয় রেকর্ড—হরনায়েক সিং (সার্ভিস) ১৯৫৪—৫০ মিঃ ২৬·৬ সেঃ। **প্রথম**—হরনায়েক সিং (সার্ভিস) ৫০ মিঃ ৪৫·৬ সেঃ

৫০ কিলোমিটার ভ্রমণ (৩১ মাইল ১২০ গজ)

বিশ্ব রেকর্ড—এ রোকা (হাঙ্গেরী) ১৯৫৩—৪ ঘঃ ২৬ মিঃ ১৮·২ সেঃ।

অলিম্পিক রেকর্ড—জি দর্দোনি (ইটালী) ১৯৫২—৪ ঘঃ ২৮ মিঃ ৭·৮ সেঃ

এশিয়ান রেকর্ড—বক্তোয়ার সিং (ভারত) ১৯৫১—৫ ঘঃ ৪৪ মিঃ ৭·৪ সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—লক্ষ্মণ সিং (সার্ভিস) ১৯৫৫—৪ ঘঃ ৫০ মিঃ ৪০·৪ সেঃ (অননুমোদিত)। **প্রথম**—রাঘবীর সিং (সার্ভিস) ৫ ঘঃ ৩ মিঃ ৪৭·২ সেঃ।

৪×১০০ মিটার রিলে

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—ইউ এস এ (টীম—জে সি আওয়েন্স, আর মেটকাফে, এফ ড্রাবার ও এফ সি ওয়াইকফ) ১৯৩৬—৩৯·৮ সেঃ

এশিয়ান রেকর্ড—জাপান (১৯৫৪) ৪১·২ সেঃ

ভারতীয় রেকর্ড—পাঞ্জাব (১৯৩৬) ও সার্ভিস (১৯৫২)৪৩ সেঃ। **প্রথম**—সার্ভিস ৪৩·১ সেঃ।

৪×৪০০ মিটার রিলে

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—জামাইকা (টীম—উইণ্ট, লেয়িং, ম্যাকেনলী ও রডেন) **১৯৫২—৩ মিঃ ৩·৯ সেঃ**

এশিয়ান রেকর্ড—জাপান ১৯৫৪—৩ মিঃ ১৭·৪ সেঃ।

ভারতীয় রেকর্ড—পাঞ্জাব ১৯৫৪, ৩ মিঃ ২২·১ সেঃ। **প্রথম**—সার্ভিস ৩ মিঃ ২২ সেঃ (নূতন ভারতীয় রেকর্ড)

ম্যারাথন দৌড়—(২৬ মাইল ৩৮৫ গজ)

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—এমিল জেটোপেক (চেকোশ্লোভাকিয়া) ১৯৫২—২ ঘঃ ২৩ মিঃ ৩·২ সেঃ

এশিয়ান রেকর্ড—ছোটা সিং (ভারত) ১৯৫১—২ ঘঃ ৪২ মিঃ ৫৮·৬ সেঃ।

ভারতীয় রেকর্ড—ছোটা সিং (পেপস্) ১৯৫৩—২ ঘঃ ৩৩ মিঃ ২১·৪ সেঃ। **প্রথম**—গুরুচরণ সিং (সার্ভিস) ২ ঘঃ ৩৯ মিঃ ১৩·৬ সেঃ।

উচ্চ লম্ফ

বিশ্ব রেকর্ড—ডব্লিউ ডেভিস (ইউ এস এ) ১৯৫২—৬ ফিঃ ১১½ ইঞ্চি।

অলিম্পিক রেকর্ড—ডব্লিউ ডেভিস (ইউ এস এ) ১৯৫২—৬ ফিঃ ৮½ ইঞ্চি।

এশিয়ান রেকর্ড—অজিত সিং (ভারত) ১৯৫৪—৬ ফিঃ ৪½ ইঞ্চি।

ভারতীয় রেকর্ড—মেহেঙ্গা সিং (পেপস্) ও অজিত সিং (পাঞ্জাব) ৬ ফিঃ ৩½ ইঞ্চি। প্রথম—দয়াল সিং (সার্ভিস) ৬ ফিঃ ৪ ইঞ্চি (নূতন ভারতীয় রেকর্ড)।

দীর্ঘ লম্ফ

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—জে সি আওয়েন্স (ইউ এস এ) বিশ্ব—২৬ ফিঃ ৮¼ ইঃ। অলিম্পিক—২৬ ফিঃ ৫½ ইঞ্চি।

এশিয়ান রেকর্ড—তেজিমা মাসাজি (জাপান) ১৯৫১—২৩ ফিঃ ৫½ ইঞ্চি।

ভারতীয় রেকর্ড—ভাগ সিং (১৯৫৫)—২৩ ফিঃ ৩½ ইঞ্চি (এখনো অননুমোদিত)। প্রথম—সাদিলাল (সার্ভিস) ২৩ ফিঃ ১½ ইঞ্চি।

হপ স্টেপ ও জাম্প

বিশ্ব রেকর্ড—স্কির্বাকোভ (রাশিয়া) ১৯৫২—৫৩ ফিঃ ২½ ইঞ্চি।

অলিম্পিক রেকর্ড—এ ফেরেরা ডা'সিলিভা (ব্রেজিল) ১৯৫২—৫২ ফিঃ ৬¾ ইঃ।

এশিয়ান রেকর্ড—লিমুরা যোসিও (জাপান) ১৯৫১—৪৯ ফিঃ ৯½ ইঞ্চি।

ভারতীয় রেকর্ড—এই রেবেলো (মহীশূর) ১৯৪৮—৫০ ফিঃ ২ ইঞ্চি। **প্রথম**—রাখের সিং (সার্ভিস) ৪৭ ফিঃ ২ ইঞ্চি।

পোল ভল্ট

বিশ্ব রেকর্ড—সি ওয়ারমারডাম (ইউ এস) ১৯৪২—১৫ ফিঃ ৭¾ ইঞ্চি।

অলিম্পিক রেকর্ড—আর রিচার্ডস (ইউ এস) ১৯৫২—১৪ ফিঃ ১১¼ ইঞ্চি।

এশিয়ান রেকর্ড—এস ব্যাওকাচি (জাপান) ১৯৫১—১৩ ফিঃ ৬ ইঞ্চি।

ভারতীয় রেকর্ড—কে জর্জ (সার্ভিস) ১৯৫৩—১২ ফিঃ ৩ ইঞ্চি। **প্রথম**—ভগবান সিং (সার্ভিস), ১২ ফুঃ ৩ ইঞ্চি।

লৌহগোলক নিক্ষেপ (ওঃ ১৬ পাউণ্ড)

বিশ্ব রেকর্ড—ডব্লিউ ও'ব্রায়েন (ইউ এস) ১৯৫৪—৬০ ফিঃ ১০ ইঞ্চি।

অলিম্পিক রেকর্ড—ও'ব্রায়েন (ইউ এস) ১৯৫২—৫৭ ফিঃ ১½ ইঞ্চি।

এশিয়ান ও ভারতীয় রেকর্ড—পারদুমন সিং—এশিয়ান ৪৬ ফিঃ ৪½ ইঞ্চি, ভারতীয়—৪৭ ফিঃ ১¼ ইঞ্চি। **প্রথম**—পারদুমন সিং (সার্ভিস) ৪৭ ফিঃ ১০½ ইঞ্চি (নূতন ভারতীয় ও এশিয়ান রেকর্ড)।

ডিসকাস নিক্ষেপ (ওঃ ৪ পাঃ ৬ ২/৫ আঃ)

বিশ্ব রেকর্ড—এফ গর্ডিয়েন (ইউ এস) ১৯৪৯—১৮৬ ফিঃ ১১ ইঞ্চি।

অলিম্পিক রেকর্ড—এস ইনেস (ইউ এস) ১৯৫২—১৮০ ফিঃ ১½ ইঞ্চি।

এশিয়ান রেকর্ড—পরদুমন সিং (ভারত) ১৯৫৪—১৪২ ফিঃ ৩½ ইঞ্চি।

ভারতীয় রেকর্ড—মাখন সিং (সার্ভিস) ১৯৫৩—১৪০ ফিঃ ৮ ইঞ্চি। **প্রথম**—পরদুমন সিং (সার্ভিস) ১৪৯ ফিঃ ৬½ ইঞ্চি (নূতন ভারতীয় রেকর্ড)।

বর্শা নিক্ষেপ

(লম্বা ৮ ফিঃ ৬ ইঃ, ওজন ১ পাঃ ১২¾ আঃ)

বিশ্ব রেকর্ড—এফ হেল্ড (ইউ এস এ) ১৯৫৩—২৬৩ ফিঃ ১০ ইঞ্চি।

অলিম্পিক রেকর্ড—সি ইয়ং (ইউ এস এ) ১৯৫২—২৪২ ফিঃ ½ ইঞ্চি।

এশিয়ান রেকর্ড—মহম্মদ নওয়াজ (পাকিস্থান) ১৯৫৪—২১০ ফিঃ ১০½ ইঞ্চি।

ভারতীয় রেকর্ড—পার্শ্ব সিং (পাতিয়ালা) ১৯৫১—১৮৫ ফিঃ ৪½ ইঞ্চি। **প্রথম**—অবতার সিং (পেপস্) ১৮৪ ফিঃ ৯ ইঞ্চি।

হাতুড়ী ছোঁড়া (ওঃ ১৬ পাউণ্ড)

বিশ্ব রেকর্ড—এম আর কিনভনোসভ (রাশিয়া) ১৯৫৪—২০৭ ফিঃ ৯½ ইঞ্চি।

অলিম্পিক রেকর্ড—জে সেরমার্ক (হাঙ্গেরী) ১৯৫২—১৯৭ ফিট)।

এশিয়ান রেকর্ড—কোজিমা যোশিও (জাপান) ১৯৫৪—১৭৭ ফিঃ ½ ইঞ্চি।

পূর্বতন ভারতীয় রেকর্ড—সোমনাথ (পাতিয়ালা) ১৯৪৬—১৫৩ ফিঃ ৮ ইঞ্চি। **প্রথম**—দেবীদয়াল (সার্ভিস) ১৬২ ফিঃ ৫ ইঞ্চি (নূতন ভারতীয় রেকর্ড)।

এ্যাথলেটিকসে বিশ্ব, অলিম্পিক, এশিয়ান ও ভারতীয় রেকর্ডের তুলনামূলক ফলাফলের বাকী অংশ ও মহিলা বিভাগের ফলাফল আগামী সংখ্যায় প্রকাশ করা হবে।

বাঙ্গলার মহিলা কপাটি টীম। ফাইন্যালে এরা বোম্বাইয়ের কাছে হেরে গেছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

দেশী সংবাদ

৭ই ফেব্রুয়ারী—আজ সকালে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ডাউন লক্ষ্ণৌ-কাসগঞ্জ প্যাসেঞ্জার ট্রেনখানি বেরিলী হইতে ১৬ মাইল দূরে ভোজীপুরা ও সাইখালের মধ্যে এক গুরুতর দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ায় তিনজন নিহত ও ১৮ জন আহত হইয়াছে।

আজ কলিকাতা কর্পোরেশনের সভায় বিভিন্ন ক্ষেত্রে নগরীর উন্নয়নের জন্য ৩৬ কোটি টাকা ব্যয়ের এক উন্নয়ন পরিকল্পনা দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করার নিমিত্ত ভারত সরকারের নিকট প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিঃ ভাঃ বৈষ্ণব সম্মেলনের তিন দিনব্যাপী অধিবেশনে গৌরমণ্ডলের তীর্থস্থানগুলির সংস্কার সাধন, কীর্তন ও বক্তৃতার মাধ্যমে বৈষ্ণব ধর্মের প্রচার এবং মহাপ্রভু শ্রীশ্রীচৈতন্য-দেবের নামে একটি বৈষ্ণব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। নবদ্বীপের পার্শ্ববর্তী গ্রাম বিদ্যানগরে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

৮ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার ইণ্টালী নির্বাচন কেন্দ্রের উপনির্বাচনে কলিকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখোপাধ্যায় কংগ্রেসপ্রার্থীরূপে নির্বাচিত হইয়াছেন। শান্তিপুর নির্বাচন কেন্দ্রের উপনির্বাচনেও কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রীহরিদাস দে বিপুল ভোটাধিক্যে নির্বাচিত হইয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি আজ রাজ্য বিধানসভা ও বিধান পরিষদের যুক্ত অধিবেশনে আনুষ্ঠানিক ভাষণের মধ্য দিয়া রাজ্য বিধানমণ্ডলীর বাজেট অধিবেশনের উদ্বোধন করেন। রাজ্যপাল তাঁহার ভাষণে বেকার সমস্যা, পল্লী উন্নয়ন এবং উদ্বাস্তু পুনর্বাসন সমস্যার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী—বিচারপতি শ্রী জি এস রাজাধ্যক্ষ আজ বোম্বাইয়ে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৫৮ বৎসর হইয়াছিল। ভারত সরকার সংপ্রতি তাঁহাকে ব্যাঙ্ক কর্মচারী বিরোধ সম্বন্ধে সালিশ নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

আজ নয়াদিল্লীতে রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ সাংবাদিকদলের নিকট রেলওয়ের উন্নতি পরিকল্পনা ব্যাখ্যা করিয়া বলেন যে, আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে ভারত ইঞ্জিন নির্মাণে আত্মনির্ভর হইয়া উঠিবে। আগামী এপ্রিল মাস হইতে ইণ্টার ক্লাস উঠিয়া যাইবে বলিয়া তাঁহারা ঘোষণা করেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী—রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সদস্য পণ্ডিত হৃদয়নাথ কুঞ্জরু এবং সর্দার কে এম পাণিকর কলিকাতায় পৌঁছিলে সম্বর্ধিত হন। কমিশন আজ কলিকাতায় প্রতিবেশী রাজ্যসমূহের বঙ্গভাষী অঞ্চলসমূহের পশ্চিমবঙ্গভুক্তির দাবী সম্পর্কে সাক্ষ্য গ্রহণের কাজ আরম্ভ করেন। এই দিন ভারত সভা, পশ্চিমবঙ্গ আইনজীবী সমিতি, হাইকোর্ট বার এসোসিয়েশন, বঃ প্রাঃ হিন্দু মহাসভা, পঃ বঙ্গ প্রজা সমাজতন্ত্রী দল এই পাঁচটি সংস্থার পক্ষ হইতে কমিশনের নিকট সাক্ষ্যদান করা হয়।

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপত্তম থানু পিল্লাই আজ রাজপ্রমুখের নিকট তাঁহার মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র পেশ করেন।

ভারতীয় রেলওয়েসমূহের দক্ষতা নির্ধারণ সংস্থা সম্প্রতি ভারত সরকারের নিকট একটি রিপোর্ট দাখিল করিয়া ভারতীয় রেলওয়ে-সমূহকে ৬টি অঞ্চলের পরিবর্তে ৮টি অঞ্চলে বিভক্ত করার সুপারিশ করিয়াছেন।

১১ই ফেব্রুয়ারী— অদ্য অন্ধ্রের বিধানসভার সাধারণ নির্বাচন আরম্ভ হয়। এই দিন ভোট গ্রহণের প্রথম দিনে ২৪ লক্ষ ভোটদাতার মধ্যে শতকরা ৬৫ হইতে ৭০ জন নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করেন।

আজ কলিকাতায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণের দ্বিতীয় দিবসে পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, বঙ্গীয় জাতীয় বণিক সভা প্রভৃতি ছয়টি সংস্থার প্রতিনিধিমণ্ডলীর সাক্ষ্য ও অভিমত গৃহীত হয়। এই দিন কমিশনের সম্মুখে বিহারে লোকগণনার তারতম্য বিশ্লেষণই বিশেষ প্রাধান্য পায় বলিয়া জানা যায়।

১২ই ফেব্রুয়ারী—কলিকাতায় রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের সাক্ষ্য গ্রহণের শেষ দিবসে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় কমিশনের নিকট রাজ্য সরকারের দাবী উত্থাপন ও উহার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় রাজ্যপালের উদ্বোধনী ভাষণ সম্পর্কে আলোচনার দ্বিতীয় দিবসে বিরোধীপক্ষের সদস্যগণ সরকারের বিভিন্ন বিভাগে দুর্নীতি, স্বজন পোষণ প্রভৃতি বিভিন্ন অভিযোগ উত্থাপন করেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ধেবর আজ কানপুরে বলেন যে, কংগ্রেস দেশের বেকার সমস্যা এবং দারিদ্র্য, এই দুইটি গুরুতর সমস্যার সমাধান করিবার জন্য দৃঢ়-সঙ্কল্প হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে কংগ্রেস দল সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে।

৮ই ফেব্রুয়ারী—সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী মঃ মালেনকোভ আজ পদত্যাগ করেন। তাঁহার স্থলে মার্শাল বুলগানিন সুপ্রীম সোভিয়েট কর্তৃক সর্বসম্মতভাবে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন। মার্শাল বুলগানিন মালেনকোভ মন্ত্রি-সভায় সহ-প্রধানমন্ত্রী ও দেশরক্ষা সচিব ছিলেন। মঃ মালেনকোভ তাঁহার পদত্যাগপত্রে দেশের কৃষি ব্যবস্থার গলদের জন্য নিজের অপরাধ স্বীকার করেন।

৯ই ফেব্রুয়ারী—মার্শাল জুকভকে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এবং মঃ মালেনকোভকে অন্যতম সহকারী প্রধান মন্ত্রী ও বিদ্যুৎ উৎপাদন বিভাগের মন্ত্রী নিযুক্ত করা হইয়াছে।

সিন্ধুর চীফ কোর্ট অদ্য ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্থান গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া বে-আইনী হইয়াছে। পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্র-মন্ত্রী জেঃ ইস্কান্দার মীর্জা প্রভৃতির নিয়োগও বে-আইনী ও সংবিধান বিরোধী বলিয়া আদালত ঘোষণা করিয়াছেন।

১০ই ফেব্রুয়ারী—ওয়াশিংটনে দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়া চুক্তি সংস্থাযুক্ত রাষ্ট্রসমূহের প্রতিনিধিবর্গ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিস্ট সম্প্রসারণ রোধকল্পে সম্মিলিত ব্যবস্থা সম্পর্কে একমত হইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

গতকল্য সুপ্রীম সোভিয়েটের একটি ঘোষণায় বলা হইয়াছে যে, ইউরোপ, এশিয়া এবং অন্যান্য স্থানে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তাহার প্রতি বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা সোভিয়েট রাশিয়া তাহার কর্তব্য বলিয়া মনে করে। ঐ পরিস্থিতির ফলে ইউরোপে নূতন করিয়া যুদ্ধ বাধিবার আশঙ্কা রহিয়াছে এবং যুদ্ধ বাধিলে বিশ্ব-যুদ্ধও অবশ্যাম্ভাবী হইয়া পড়িবে।

১২ই ফেব্রুয়ারী—ফরমোজা সমস্যার সমাধানকল্পে এই মাসে সাংহাই বা নয়াদিল্লীতে দশটি রাষ্ট্রের এক বৈঠক আহ্বান প্রস্তাব রাশিয়া উত্থাপন করিয়াছে। অদ্য মস্কো বেতারে এই সাংবাদটি প্রথম ঘোষণা করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, এই সম্মেলনের আমন্ত্রয়িতা হইবে বৃটেন, রাশিয়া, ভারতবর্ষ এবং আমন্ত্রিত হইবে চীন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ব্রহ্ম, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্থান ও সিংহল।

১৩ই ফেব্রুয়ারী—চীনা কম্যুনিস্ট বাহিনীর অগ্রগামী দল অদ্য সকালে তাচেন দ্বীপে অবতরণ করিয়াছে। দ্বীপে অবতরণের অব্যবহিত পরেই তাহারা সেখানে প্রজাতন্ত্রী চীনা সরকারের পতাকা উত্তোলন করে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বা[illegible]ক—২০, [illegible]ক—১০,

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
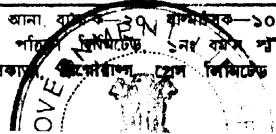
সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব

১৮৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে ভগবান্ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের আবির্ভাব। যুগধর্ম-প্রবর্তক ঠাকুরের এই আবির্ভাব-তিথি শুধু এদেশের পক্ষেই নয়, সমগ্র জগতের পক্ষে স্মরণীয়। সত্যধর্মকে প্রতিষ্ঠা করিবার উদ্দেশ্যেই ঠাকুর আমাদের মধ্যে আসিয়াছিলেন। ধর্মের নামে বহুবিধ কুসংস্কারের গ্লানি আমাদের সমাজ-জীবনকে বিপর্যস্ত করিয়া ফেলিয়াছিল; জন্ম, ঐশ্বর্য এবং পান্ডিত্যের অভিমান জাতির নরনারীকে ক্লিষ্ট ও পিষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে স্পর্ধায় স্বেচ্ছাচার এবং অনাচার শির উন্নত করিয়াছিল। সাধারণ মানুষের মনের মূলে কোন আশ্রয় ছিল না। জাতির এমনই দুর্দিনে ঠাকুর এখানে অবতীর্ণ হইলেন। এদেশের আঁধার দিক্‌চক্রবালে নবীন ঊষার আলো ফুটিল। ভারতের সুপ্ত আত্মা শ্বেত-শতদলের মত দল মেলিল, গন্ধ ছড়াইল। ঠাকুরকে পাইয়া জাতির প্রাণ-শক্তি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। সর্বাত্মস্নপন ঠাকুরের দিব্য সে জীবন লীলা। বিশ্ব মানবতার ব্যাপ্তি-চেতনায় দীপ্ত সেই চিৎঘন মূর্তি। ভারতের সংস্কৃতি এবং সভ্যতার বৈশিষ্ট্যের কথা আমরা আজকাল অনেকভাবে শুনিতে পাইতেছি। বিদেশের ধার-করা পথে আমরা চলিব না, নিজেদের সংস্কৃতির অনুকূলরূপে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা দেশকে গড়িয়া তুলিব ইত্যাদি। কিন্তু শুধু রাজনীতির কতকগুলি সূত্র আওড়াইয়া সমাজ-জীবনে এই সব পরিবর্তন সাধন করা সম্ভব নয়; প্রত্যুত এজন্য প্রাণময় জীবন্ত আদর্শে কর্মশক্তিকে জাগাইয়া তোলা প্রয়োজন হইয়া পড়ে। ঠাকুরের দিব্য লীলা সর্বজনীনভাবে সমাজে সেই শক্তি উদ্দীপ্ত করিতে সমর্থ। আমাদের সমাজ-চেতনা এবং রাষ্ট্র-সাধনার মূলে প্রাণরস সঞ্চার করিয়া সেবা এবং ত্যাগের আনন্দে প্রাচুর্যের প্রতিষ্ঠা এবং স্বাচ্ছন্দ্য তিনিই বিধান করিতে পারেন। শুধু অনুমানের উপর প্রাণের শক্তি খোলে না, বস্তুত আদর্শকে ব্যক্তি, সমাজ এবং রাষ্ট্র-জীবনে কার্যকর করিতে হইলে তাহার প্রাণময় একটি রূপ প্রত্যক্ষ করা প্রয়োজন। তাহার সংস্পর্শে ভাবের একটি প্রভাব বুদ্ধি-বিচারের সংস্কার কাটাইয়া অন্তরে জাগে, এবং মন প্রসারিত গতিবেগ পায়। ভগবৎ-কৃপার ইহাই তত্ত্বকথা। কৃপা প্রজ্ঞানময় পরিস্ফুটতায় আসিলেই লীলা। লীলার অনুধ্যানে সমাহিত মন উজ্জ্বলতা লাভ করে এবং তখন দৃষ্টি বদলাইয়া যায়। ঠাকুরের আবির্ভাব তিথি আমাদের অজ্ঞানতা বিদূরিত করুক। আমরা যেন জাতির নরনারী সকলের মধ্যে অখিলাত্ম দেবতাকে উপলব্ধি করিয়া তাঁহাদের সেবায় জীবন ধন্য করিতে পারি এবং ত্যাগের পথে জীবনকে সত্য করিয়া পাই।

পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যা

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় এই রাজ্যের বিপুল বেকার-সমস্যার গুরুত্ব অভিব্যক্ত করিয়া তাহার সমাধানের জন্য কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকৃষ্ট করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। এই প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, পশ্চিমবঙ্গে বেকার-সমস্যা অত্যন্ত জটিল এবং ভয়াবহ। কেন্দ্রীয় গভর্নমেণ্টের আর্থিক ও অন্যান্য শ্রেণীর সাহায্য না পাইলে এইরূপ গুরুত্বপূর্ণ সমস্যার সমাধান করা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং ভারত সরকার যেন পশ্চিম-বঙ্গে দুর্গাপুর, কল্যাণী ইত্যাদি অঞ্চলে ব্যাপকভাবে শিল্পের প্রসারে সাহায্য এবং রেলবিভাগসহ সমস্ত বিভাগের শূন্য পদের একটা অংশ পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুদের জন্য সংরক্ষিত রাখিবার ব্যবস্থা করেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তরফ হইতে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট উপস্থাপিত এই আবেদন তাঁহাদের সহানুভূতি জাগাইতে সমর্থ হইবে কি না বলা কঠিন। বস্তুত কেন্দ্রীয় সরকার যদি দুর্গাপুর প্রভৃতি অঞ্চলে একাধিক বৃহদাকার শিল্প-কারখানা স্থাপন করেন এবং এই সব অঞ্চলে পোড়া কয়লার কারখানা জাতীয় কতিপয় কারখানা স্থাপনে যদি তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে অর্থ দিয়া ও অন্যভাবে সাহায্য করেন, তাহা হইলে পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যার জটিলতা অনেকটা হ্রাস পাইবার সম্ভাবনা ঘটে। সম্প্রতি সোভিয়েট রাশিয়ার ইস্পাত-বিশেষজ্ঞ দল মধ্যপ্রদেশের বিলনোরে ইস্পাতের কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী

হইয়াছেন। শোনা যায়, তাঁহারা পশ্চিমবঙ্গের দুর্গাপুরকেও বৃহদাকার ইস্পাতের কারখানা স্থাপনের উপযুক্ত বলিয়া অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। বর্তমানে বৃটিশ ইস্পাত-বিশেষজ্ঞগণের সাহায্যেও ভারতে আর একটি বৃহদাকার ইস্পাতের কারখানা স্থাপনের জন্য কথাবার্তা চলিতেছে। এই সব প্রস্তাব অনুযায়ী একটি কারখানা যদি দুর্গাপুরে স্থাপিত হয়, তবে পশ্চিমবঙ্গের বেকার-সমস্যার ভার কতকটা লাঘব হইতে পারে। আশা করা যায়, অন্তত এতদিন পরেও পশ্চিম-বঙ্গ সরকারের এই আবেদন ভারত সরকার সহানুভূতির সহিত বিবেচনা করিবেন। পশ্চিমবঙ্গের অন্তত ১০ লক্ষ লোক আজ বেকার, এ অবস্থার প্রতিকার না হইলে বাঙালী জাতি ধ্বংস পাইবে।

পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু সমাগম

ভারত ও পাকিস্থানের মধ্যে পারস্পরিক মৈত্রীর ভাব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে, উভয় রাষ্ট্রের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের মুখে আমরা এইরূপ কথা শুনিতে পাইতেছি। বাস্তব অবস্থার বিচারে কিন্তু এই সিদ্ধান্ত সমর্থিত হয় না। গত কয়েক মাস হইতে পূর্ববঙ্গ হইতে আগত উদ্বাস্তুর সমাগম বাড়িয়া চলিয়াছে। সম্প্রতি এই সংখ্যা তিনগুণ দাঁড়াইয়াছে। ইহার মূলে পূর্ববঙ্গের আর্থিক সংকট রহিয়াছে, কেহ কেহ এইরূপ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু পিতৃপুরুষের ভিটামাটি ছাড়িয়া যাহারা পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে, তাহাদের নিকট অর্থনীতিক অবস্থা এখানেই বা এমনকি উজ্জ্বল? পরন্তু এখানে আসিয়া দুর্গতির তাহাদের অন্ত নাই। সুতরাং শুদ্ধ অর্থনীতিক কারণেই উদ্বাস্তু সমাগম বৃদ্ধি পাইতেছে, ইহা মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের রাজনীতির অব্যবস্থিত অবস্থা সেখানকার সংখ্যা-লঘু সম্প্রদায়ের মনে নিদারুণ নৈরাশ্যের সঞ্চার করিয়াছে। কখন কোন্ দল বড় হইবে এবং কোন্ দল কি নীতি ধরিয়া দাঁড়াইবে, কিছুই নিশ্চয়তা নাই। পাকি-স্থানের রাষ্ট্রনীতি সর্বজনীন স্বার্থের বা অধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। পূর্ববঙ্গের বিগত সাধারণ নির্বাচনে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে অশ্বস্তির ভাব ফিরিয়া আসিতেছিল। লীগের সাম্প্রদায়িকতামূলক নীতি উৎখাত হইল, এমন একটা ধারণা উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে সৌহার্দ্য প্রতিষ্ঠার পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল; কিন্তু পাকিস্থানের শাসকগোষ্ঠীর পাক-চক্রে সব উল্টাইয়া যায়। পূর্ববঙ্গের মুসলমান জনসাধারণের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের প্রতি সদ্ভাবের কোন মূল্যই কার্যতঃ সেখানে নাই। প্রভুত্বপ্রয়াসী শাসক-গোষ্ঠীই দেশের সর্বময় কর্তা এবং সাম্প্রদায়িকতা তাঁহাদের হাতের অস্ত্র। পুনর্বাসনসচিব শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না এবং পাকিস্থানের স্বরাষ্ট্রসচিব জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা যুক্তভাবে আগামী মাসে পূর্ববঙ্গ সফর করিবেন স্থির হইয়াছে। উভয় রাষ্ট্রের মন্ত্রীদের এমন মিলিত সফর আগেও হইয়াছে; কিন্তু শাসন বিভাগের উচ্চস্তরে পারস্পরিক সৌহার্দ্যের এই রীতি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনের গভীর স্তরে কতটা স্পর্শ করিতে সমর্থ হইবে, এ বিষয়ে আমাদের সন্দেহ আছে। প্রকৃতপক্ষে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তাহাদের রাজনীতিক অধিকার হইতে বঞ্চিত জীবনের গ্লানি হইতে যতদিন মুক্ত হইতে না পারিবে, ততদিন পর্যন্ত সেখানে তাহাদের পক্ষে আশ্বস্তির প্রতিবেশ গড়িয়া ওঠা অসম্ভব।

ধর্মের কাহিনী

চক্রবর্তী শ্রীরাজাগোপাল আচারী তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাজনীতিক। সম্প্রতি তিনি বিশ্বের প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি-সঙ্ঘকে সম্বোধন করিয়া অভীঃ মন্ত্রের মাহাত্ম্য কীর্তনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাজাজীর মতে ভবিষ্যতের পরোয়া না করিয়া আণবিক এবং পরমাণবিক বোমাগুলি নষ্ট করিয়া ফেলাই ইঁহাদের পক্ষে উচিত্। কিন্তু আত্মরক্ষার উপায়? প্রকৃতপক্ষে আত্ম-রক্ষার একান্ত প্রয়োজনের তাগিদে পড়িয়াই মার্কিনগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র-নিচয় প্রাণপণে বিশ্ববিধ্বংসী অস্ত্র প্রস্তুতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। রাশিয়া আণবিক অস্ত্র বর্জনের দাবী তুলিলেই ইহারা অনর্থ বোঝেন এবং কম্যুনিস্টদের কূটনীতিক দুরভিসন্ধির পরিচয় পান। এই প্রলয়াস্ত্র গাদা করিয়া কে কতটা বড় পাহাড় তুলিয়াছে বুঝিবার উপায় নাই, তবে উভয়ে উভয়েরই উপর এই বিষয়ে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করিতেছেন। রাজাজী বলিতেছেন, আত্মরক্ষার পক্ষে ব্যবহারিক অস্ত্রের যেরূপ প্রয়োজন রহিয়াছে, সেইরূপ নৈতিক অস্ত্রের মূল্যও সেক্ষেত্রে কম নয়। মানুষ যতদিন অসভ্য ছিল, ততদিন নৈতিক অস্ত্রের মূল্য তাহারা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয় নাই, বর্তমানে মানব সভ্যতার উচ্চশিখরে সমারূঢ় হইয়াছে, এখন তাহার মূল্য উপলব্ধি করা উচিত। রাজাজীর এই যুক্তির মূল্য পাশ্চাত্ত্যের রাজনীতিকরা কতটা উপলব্ধি করিবেন, এ বিষয়ে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহের কারণ রহিয়াছে। কারণ, নীতি-কথা আওড়াইতে তাঁহাদের কোন পক্ষই কম যান না। মার্কিনীগোষ্ঠী তো স্পষ্টই বলিতেছেন, বিশ্বশান্তি বজায় রাখিবার জন্য বোমার পাহাড় গড়িয়া তোলা দরকার, যেন কেহ যুদ্ধ করিতে সাহস না পায়। এ অবস্থায় রাশিয়াই নিশ্চিন্ত থাকিবে কি ভরসায়? প্রত্যুত পারস্পরিক ভীতির এমন মানসিক বিকারই যে বিশ্বের সর্বত্র বিপর্যয় সৃষ্টি করিতেছে, এই বিচার করিবার মত সময় কোথায়? বিশ্বের সর্বত্র মহাভয়ের বিস্তৃতিই যদি সভ্যতার নিরিখ হয়, তবে বর্তমান জগৎ সভ্যতার সর্বোচ্চ চূড়ায় অধিষ্ঠিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ফলতঃ ভয়ই বর্তমানে শান্তির পথে একমাত্র ভরসা। বিশ্বরাষ্ট্রনীতির কূটচক্রের গতিতে এই সত্য নিতান্তই সুস্পষ্ট।

দু পক্ষই নিজেকে শান্তিকামী বলে প্রচার করছে। সংগে সংগে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতিও চলছে অবিরাম। সম্প্রতি সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট প্রস্তাব করেছেন যে, ইউনো একটি বিশ্ব সম্মেলন আহ্বান করুক, যার উদ্দেশ্য হবে হাইড্রোজেন ও অ্যাটম বোমা নিষিদ্ধ করা এবং এই সব বোমা, যা তৈরী হচ্ছে, নষ্ট করে ফেলা এবং অন্যান্য অস্ত্র ও সৈন্যসামন্ত সম্বন্ধে এই স্থির করা যে, ১৯৫৫ সালের ১লা জানুয়ারী যে-দেশের যে ব্যবস্থা ও সামরিক ব্যয়ের যে বরাদ্দ ছিল, তার উপরে কেউ যেতে পারবে না। পশ্চিমা শক্তিদের ধারণা যে, হাইড্রোজেন বোমা ও অ্যাটমিক অস্ত্রাদি ত্যাগ করলে সোভিয়েট ব্লকের তুলনায় তারা দুর্বল হয়ে পড়বে, কারণ অন্যান্য বিষয়ে সোভিয়েট ব্লকের সমরশক্তি—বর্তমান ও সম্ভাব্য সৈন্যবাহিনীর সংখ্যা ইত্যাদিতে—অনেক বেশি। এইগুলি কমিয়ে আনা ও কমিয়ে রাখার ব্যবস্থা না হলে পশ্চিমা শক্তিরা হাইড্রোজেন বোমা ও অ্যাটমিক অস্ত্রাদি ত্যাগ করতে রাজী নয়।

এ বিষয়ে দুই পক্ষ একমত হতে পারছে না। ইউনো'র একটি নিরস্ত্রীকরণ কমিশন অনেককাল থেকেই এই মত-বিরোধের দরুণ কিছুই করতে পারে নি। এই সপ্তাহে লণ্ডনে এই কমিশনের একটা বৈঠক হবার কথা। তাতে যদি দুই পক্ষের মধ্যে মতের পার্থক্য অনেকখানি কমে, তবে হয়ত সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের প্রস্তাবিত বৃহত্তর কনফারেন্স আহূত হতে পারে। কিন্তু সে সম্ভাবনা এক-রকম নাই বললেই চলে। কারণ পশ্চিমা শক্তিরা সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের আন্তরিকতায় বিশ্বাস স্থাপনের কোনো লক্ষণ দেখাচ্ছে না। তাদের ধারণা, পশ্চিমা শক্তিদের আপেক্ষিক বল-হ্রাস সংঘটনই সোভিয়েট গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য, সোভিয়েট গভর্নমেণ্ট চেষ্টা করছেন, অন্ততপক্ষে যাতে পশ্চিমা ব্লকের দেশ-সমূহে জনমত দ্বিধাগ্রস্ত হয় এবং জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের আয়োজন ব্যাহত হয়। পশ্চিমা শক্তিদের মুখপাত্রগণ বলছেন যে, একদিকে রাশিয়ার নূতন প্রধান মন্ত্রী মার্শাল বুলগানিন হাই-ড্রোজেন ও অ্যাটম বোমা ত্যাগের প্রস্তাব করছেন, কিন্তু অন্যদিকে সোভিয়েট পররাষ্ট্র সচিব মঃ মলোটভ বলছেন যে, হাইড্রোজেন বোমা তৈরী ব্যাপারে রাশিয়া আমেরিকার পিছনে পড়ে নেই, বরঞ্চ এগিয়ে গেছে। রাশিয়ার দেশরক্ষা বিভাগের ব্যয়ের বরাদ্দও আগের চেয়ে বেশি হয়েছে। অবশ্য রাশিয়া বলবে, যতদিন পর্যন্ত পশ্চিমা শক্তিরা হাই-ড্রোজেন ও অ্যাটমিক অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করে যাচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত রাশিয়াকেও আত্মরক্ষার জন্য তাই করে যেতে হবে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই যে, দুই পক্ষই বলছে যে, অ্যাটমিক যুদ্ধ উভয়ের পক্ষেই, এমনকি, শান্ত মানব জাতির পক্ষেই আত্মঘাতী হবে। সংগে সংগে কিন্তু এক পক্ষ আর এক পক্ষের উপর জয়ী হবার আশা প্রকাশ করে বড়াই করতেও পিছ-পা নয়। সম্প্রতি মিঃ মাও-সে-তুং পর্যন্ত আমেরিকার উদ্দেশে এরকম কথা বলেছেন। অ্যাটমিক যুদ্ধে মানব জাতি ধ্বংস হয়ে যাবে, এই আশঙ্কা যাঁরা প্রকাশ করেছেন, তাঁরাই আবার শত্রু ধ্বংস করে যুদ্ধে জয়ী হবার আশা কেমন করে করছেন, বুঝা যায় না। প্রকৃতপক্ষে কারো মনোভাব ঠিকমতো বুঝার উপায় নেই, হয়ত কর্তারা নিজেরাই বুঝছেন না।

যাই হোক, শান্তি চাই, শান্তি চাই বলে চিৎকারের সংগে সংগে যুদ্ধের জন্য সকলে প্রস্তুত হচ্ছে। কিছুদিন যাবৎ কাগজে এই প্রস্তুতির খবরই প্রাধান্য লাভ করেছে। লণ্ডনে কমনওয়েলথ প্রধান মন্ত্রীদের সম্মেলনান্তে যে সরকারী বিবৃতি দেওয়া হয়, তা থেকে বুঝা যায় যে, কমনওয়েলথের বিভিন্ন দেশের মধ্যে সামরিক শক্তির সংযোগ ও সংহতির আলোচনাই এবার সবচেয়ে বেশি হয়। অবশ্য ভারতবর্ষ কোনো সামরিক প্যাক্টের সংগে জড়িত নয়। সুতরাং পণ্ডিত নেহরু

হয়ত সব আলোচনার মধ্যে ছিলেন না। কিন্তু অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণের সময় সামরিক সহযোগিতার আলোচনাতেই প্রধানত ব্যয়িত হয় বলে মনে হয়। যাই হোক, কমনওয়েলথ কনফারেন্সের পরেই বৃটিশ গভর্নমেণ্ট ঘোষণা করেন যে, বৃটেন হাইড্রোজেন বোমা তৈরীর কাজ শুরু করতে যাচ্ছে।

এদিকে আগামীকাল (২৩শে ফেব্রুয়ারী) থেকে ব্যাংককে SEADO'র মিটিং আরম্ভ হচ্ছে, তাতে ম্যানিলা চুক্তির স্বাক্ষরকারী আটটি দেশের (আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, থাইল্যাণ্ড ও পাকিস্থান) পররাষ্ট্র সচিবগণ উপস্থিত হচ্ছেন। SEADOকে নখদন্তসম্বলিত করার ব্যবস্থা অবলম্বনই বর্তমান ব্যাংকক সম্মেলনের উদ্দেশ্য। মধ্য প্রাচ্যের সামরিক আত্মরক্ষার আয়োজন সম্পর্কেও সংবাদের অপ্রতুলতা নেই। তুর্কীর সঙ্গে ইরাকের সামরিক চুক্তি হতে যাচ্ছে। তুর্কীর সঙ্গে পাকিস্থানের যোগ পূর্বেই স্থাপিত হয়েছে। তুর্কী NATO'র গণ্ডির মধ্যে। পাকিস্থান সাক্ষাতভাবেও মার্কিন সামরিক সাহায্যের সূত্র দ্বারা আবদ্ধ। সুতরাং সকলে একই মাল্য বাঁধনে বাঁধা পড়েছে।

ইরাক একলা তুর্কীর সঙ্গে চুক্তি করতে যাওয়ায় মিশর চটেছে। আরব লীগের সদস্যদের মধ্যে সৌদী আরবও ইরাকের কার্য সমর্থন করে নি, কিন্তু আরব লীগের অন্য রাষ্ট্রগুলি ইরাক যে-টানে তুর্কীর সঙ্গে চুক্তি করতে যাচ্ছে, সে-টান এড়াতে পারবে বলে বোধহয় না। তুর্কীর প্রেসিডেন্ট বর্তমানে পাকিস্থান বেড়াতে এসেছেন। করাচীর সংবাদে প্রকাশ, মধ্য প্রাচ্যের আত্মরক্ষা সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে পাকিস্থানী নেতাদের আলোচনা চলছে এবং সম্ভবত সিরিয়া, জর্ডান, লেবানন ও ইয়েমেন শীঘ্রই তুর্কী-ইরাক-পাকিস্থানের দলে এসে যোগ দেবে। এর পরে সৌদী আরব ও মিশর কতদিন গোসা করে থাকতে পারবে বলা যায় না।

ব্যাংকক যাওয়ার পথে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ ইডেন মিশরে কর্নেল নাসেরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। মিশরের রাগ দূর করার চেষ্টা তিনি অবশ্যই করেছেন, যদিও যেভাবে মধ্য প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলিতে ক্রমশ বৃটিশ প্রভাবের উচ্ছেদ হয়ে মার্কিন প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে, তাতে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নিশ্চয়ই খুব খুশী নন। ইরানে বর্তমানে মার্কিন প্রভাবেরই প্রাধান্য। তুর্কী, পাকিস্থান ও মধ্য প্রাচ্যের অন্য আরব রাষ্ট্রগুলিও ক্রমশ মার্কিন প্রভাবের আওতায় চলে যাচ্ছে। বৃটেনের পক্ষে এটা কষ্টদায়ক হলেও এর সঙ্গে মানিয়ে চলা ছাড়া তার গত্যন্তর নেই।

* * *

গত ২৪শে অক্টোবর তারিখে পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল একটি ঘোষণা দ্বারা পাকিস্থান কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্ব্লী ভেঙে দেন। কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্ব্লীর সভাপতি মৌলবী তমিজুদ্দিন খান এই ঘোষণা বেআইনী হয়েছে বলে সিন্ধুর চীফ কোর্টে আবেদন করেন। চীফ কোর্টের প্রধান বিচারপতি ও অন্য চারজন জজের একটি ফুলবেঞ্চ রায় দিয়েছেন যে, গভর্নর জেনারেলের ঘোষণা বেআইনী হয়েছে, কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্ব্লী ভেঙে দেবার ক্ষমতা গভর্নর জেনারেলের নেই। জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা প্রভৃতি যে পাঁচজন কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্ব্লীর সদস্য না হয়েও মন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছিলেন, তাঁদের নিয়োগও বে-আইনী হয়েছে বলে কোর্ট রায় দিয়েছেন। কোর্ট আদেশ দেন যে, এই পাঁচজনার মন্ত্রিত্ব করার অধিকার নেই। কোর্ট আরও আদেশ দেন যে, পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট ও মন্ত্রিমণ্ডলী যেন আবেদনকারী মৌলবী তমিজুদ্দিন খানকে কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্ব্লীর সভাপতির অধিকার অনুযায়ী কাজ করতে কোনো রকম বাধা না দেন।

সিন্ধু চীফ কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে পাকিস্থান গভর্নমেণ্ট ও মন্ত্রীরা পাকিস্থানের ফেডারেল কোর্টে আপীল করেছেন। আপীলের শুনানী না হওয়া পর্যন্ত সিন্ধু চীফ কোর্টের আদেশ পালন স্থগিত রাখার জন্য আবেদনও করা হয়েছে। আজ (২২শে ফেব্রুয়ারী) সেই আবেদনের শুনানীর তারিখ। মূল আপীলের শুনানীর দিন ১লা মার্চ ধার্য হয়েছে। চীফ কোর্টের রায় প্রদানের পরেই মৌলবী তমিজুদ্দিন খান ঘোষণা করেছেন যে, ৭ই মার্চ কনস্টিটুয়েণ্ট অ্যাসেম্ব্লীর অধিবেশন হবে। বলা বাহুল্য, সেটা নির্ভর করছে ইতিমধ্যে ফেডারেল কোর্টের বিচারে কী হয়, তার উপর।

২২।২।৫৫

২

ব্যোমকেশ চোখ বুজিয়া ননীবালার অসংবদ্ধ বাক্যবহুল উপাখ্যান শুনিতেছিল, উপাখ্যান শেষ হইলে চোখ মেলিল। বিরক্তি চাপিয়া যথাসম্ভব শিষ্ট-ভাবে বলিল,—'মিস্ রায়, এ ধরনের ব্যাপারে আমি কী করতে পারি? আপনার সন্দেহ যদি সত্যিও হয়, আমি তো আপনার ছেলের পেছনে সশস্ত্র প্রহরীর মত ঘুরে বেড়াতে পারি না। আমার মনে হয় এ অবস্থায় পুলিসের কাছে যাওয়াই ভাল।'

ননীবালা বলিলেন,—'পুলিসের কথা অনাদিবাবুকে বলেছিলুম, তিনি ভীষণ রেগে উঠলেন; বললেন—এ নিয়ে ঘাঁটা-ঘাঁটির দরকার নেই, তোমাদের যদি এতই প্রাণের ভয় হয়ে থাকে পাটনায় ফিরে যাও।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তাহলে আর কি করা যেতে পারে আপনিই বলুন।'

ননীবালার স্বর কাঁদো-কাঁদো হইয়া উঠিল,—'আমি কি বলব ব্যোমকেশবাবু, আপনি একটা উপায় করুন। প্রভাত ছাড়া আমার আর কেউ নেই—আমি অবলা স্ত্রীলোক—' বলিয়া আঁচলে চোখ মুছিতে লাগিলেন।

ননীবালার চেহারা দেখিয়া যদিও কেহই তাঁহাকে অবলা বলিয়া সন্দেহ করিবে না, তবু তাঁহার হৃদয়টি যে অসহায়া রমণীর হৃদয় তাহা স্বীকার করিতে হয়। পালিত পুত্রকে তিনি গর্ভের সন্তানের মতই ভালবাসেন এবং তাহার অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অতি মাত্রায় ভীত হইয়া পড়িয়াছেন। আশঙ্কা হয়তো অমূলক, কিন্তু তবু তাহা উপেক্ষা করা যায় না।

কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে ননীবালার অশ্রু-বিসর্জন নিরীক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ হঠাৎ রুক্ষস্বরে বলিল,—'ভাইপো দুটো থাকে কোথায়?'

ননীবালা আঁচল হইতে আশান্বিত চোখ বাহির করিলেন, বলিলেন,—'তারা নেবুতলায় থাকে। আপনি কি—?'

'ঠিকানা কি? কত নম্বর?'

'তা তো আমি জানি না, প্রভাত জানে। আপনি কি তাদের কাছে যাবেন ব্যোমকেশবাবু? যদি আপনি ওদের খুব করে ধম্‌কে দেন তাহলে ওরা ভয় পাবে—'

'আমি তাদের ধম্‌কাতে গেলে তারাই হয়তো উলটে আমাকে ধম্‌কে দেবে। আমি তাদের একবার দেখব। দেখলে আন্দাজ করতে পারব তাদের মনে কিছু আছে কি না। তাদের ঠিকানা প্রভাত জানে? প্রভাতের ঠিকানা, অর্থাৎ আপনাদের বাড়ির ঠিকানা কি?'

'বাড়ির নম্বর ১৭২।২, বৌবাজার স্ট্রীট। কিন্তু সেখানে বাড়িতে আপনি না গেলেই ভাল হয়। অনাদিবাবু—'

'অনাদিবাবু পছন্দ না করতে পারেন। বেশ, তাহলে প্রভাতের দোকানের ঠিকানা বলুন।'

'প্রভাতের দোকান—ঠিকানা জানি না—কিন্তু নাম জীবন প্রভাত। ওই যে গোলদীঘির কাছে, দোরের ওপর মস্ত সাইন বোর্ড টাঙানো আছে—'

ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, ক্লান্ত শুষ্ক স্বরে বলিল,—'বুঝেছি। আপনি এখন আসুন তাহলে। যদি কিছু খবর থাকে জানতে পারবেন।'

ননীবালা বোধ করি একটু ক্ষুণ্ণ হইয়াই প্রস্থান করিলেন। ব্যোমকেশ একবার কড়িকাঠের দিকে চোখ তুলিয়া বলিল,—'জগতের মাঝে কত বিচিত্র তুমি হে, তুমি বিচিত্র রূপিনী!'

সেদিন সায়ংকালে ব্যোমকেশ একটি শারদীয়া পত্রিকা লইয়া নাড়াচাড়া করিতে-ছিল, হঠাৎ পত্রিকা ফেলিয়া বলিল,—'চল একটু বেড়িয়ে আসা যাক।'

সম্মুখ সমর আরম্ভ হইবার পর হইতে আমরা সন্ধ্যার পর বাড়ির বাহির হওয়া বন্ধ করিয়াছিলাম, নেহাৎ দায়ে না ঠেকিলে বাহির হইতাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, 'কোথায় বেড়াতে যাবে?'

সে বলিল,—'জীবন প্রভাতের সন্ধানে।'

দুটি মোটা লাঠি জোগাড় করিয়া রাখিয়াছিলাম, হাতে লইয়া দুজনে বাহির

হইলাম। ননীবালার উপর ব্যোমকেশের মন যতই অপ্রসন্ন হোক তাঁহার কাহিনী ভিতরে ভিতরে তাহাকে আকর্ষণ করিয়াছে।

গোলদীঘি আমাদের বাসা হইতে বেশী দূরে নয়, সেখানে পৌঁছিয়া ফুট-পাথের উপর এক পাক দিতেই মস্ত সাইন-বোর্ড চোখে পড়িল। দোকানটি কিন্তু সাইনবোর্ডের অনুপাতে ছোটই বলিতে হইবে। সাইনবোর্ডের তলায় প্রায় চাপা পড়িয়া গিয়াছে। রাস্তার ধারে একটি ঘর, তাহার পিছনে একটি কুঠুরি। সদরে দ্বারের পাশে বেঁটে এবং বঙ্কিম চক্ষু গুর্খা দণ্ডায়মান।

দোকানে প্রবেশ করিলাম; গুর্খা একবার তির্যক নেত্রপাত করিল, কিছু বলিল না। দেখিলাম ঘরের দেয়ালগুলি কড়িকাঠ পর্যন্ত বই দিয়া ঠাসা; তাহাতে ঘরের আয়তন আরও সংকীর্ণ হইয়াছে। তাকের উপর একই বই দশবারোটা করিয়া পাশাপাশি সাজানো। বিভিন্ন প্রকাশকের বই, নিজের প্রকাশন বোধ হয় কিছু নাই। আমার বইও দুই তিনখানা রহিয়াছে।

কিন্তু দোকানদারকে ঘরে দেখিতে পাইলাম না, কাউণ্টারে কেহ নাই।

কাউণ্টারের পেছনে কুঠরির দরজা ঈষৎ ফাঁক হইয়া আছে। ফাঁক দিয়া যতটুকু দেখা যায় দেখিলাম তাহার মধ্যে একটি ছোট তক্তাপোশ পাতা রহিয়াছে এবং তক্তাপোশের উপর বসিয়া একটি যুবক হেঁটমুখে বইয়ের মলাট বাঁধিতেছে। মাথার উপর আবরণহীন বৈদ্যুতিক বালব, চারিদিকে কাগজ পিজবোর্ড লেইয়ের মালসা কাগজ কাটিবার ভীষণ দর্শন ছোরা প্রভৃতি ছড়ানো। তাহার মধ্যে বসিয়া যুবক তন্ময়চিত্তে মলাট বাঁধিতেছে।

ব্যোমকেশ একটু জোরে গলা খাঁকারি দিল। যুবক ঘাড় তুলিল, ছেঁড়া ন্যাকড়ায় আঙুলের লেই মুছিতে মুছিতে আসিয়া কাউণ্টারের পিছনে দাঁড়াইল; কোনও প্রশ্ন করিল না, জিজ্ঞাসু নেত্রে আমাদের পানে চাহিয়া রহিল।

এইবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিলাম। বাঙলা দেশের শত সহস্র সাধারণ যুবক হইতে তাহার চেহারার বিশেষ কোনও পার্থক্য নাই। দেহের দৈর্ঘ্য আন্দাজ সাড়ে পাঁচ ফুট, গায়ের রঙ তামাটে ময়লা; মুখ ও দেহের কাঠামো একটু শীর্ণ। ঠোঁটের উপর গোঁফের রেখা এখনও পুষ্ট হয় নাই; দাঁতগুলি দেখিতে ভাল কিন্তু তাহাদের গঠন যেন একটু বন্য ধরনের, হয়তো আদিম মাতৃরক্তের নিদর্শন। চোখের দৃষ্টিতে সামান্য একটু অন্যমনস্কতার আভাস, কিন্তু ইহা মনের অভিব্যক্তি নয়, চোখের একটা বিশেষ গঠনভঙ্গী। মাথার চুল ঈষৎ রুক্ষ ও ঝাঁকড়া, চুলের যত্ন নাই। পরিধানে গলার বোতাম খোলা ঢিলা আস্তিনের পাঞ্জাবি। সব মিলিয়া যে চিত্রটি তৈয়ারী হইয়াছে তাহা নিতান্ত মামুলী ও বিশেষত্বহীন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনি জীবন-প্রভাতের মালিক প্রভাতকুমার রায়?'

যুবক বলিল,—'আমার নাম প্রভাত হালদার।'

'ও—হ্যাঁ—ঠিক কথা। আপনি যখন অনাদিবাবুর—' ব্যোমকেশ একটু ইতস্তত করিল।

'পুষ্যিপুত্তুর।' প্রভাত নির্লিপ্তকণ্ঠে ব্যোমকেশের অসমাপ্ত কথা পূরণ করিয়া দিল, তারপর ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিল,—'আপনি কে?'

'আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী।'

প্রভাত এতক্ষণে একটু সজীব হইয়া ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিল, তারপর আমার দিকে দৃষ্টি ফিরাইল।

'আপনি তাহলে অজিতবাবু?'

'হ্যাঁ।'

ব্যোমকেশকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া প্রভাত আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, সসম্ভ্রম আগ্রহে বলিল,—'নমস্কার। আমি আপনার কাছে একবার যাব।'

'আমার কাছে!'

'হ্যাঁ। অমার একটু দরকার আছে। আপনার ঠিকানা—?'

ঠিকানা দিয়া বলিলাম,—'আসবেন। কিন্তু আমার সঙ্গে কী দরকার থাকতে পারে ভেবে পাচ্ছি না।'

'সে কথা তখন বলব।—তা এখন কি চাই বলুন। আমার কাছে নতুন বই ছাড়াও ভাল ভাল পুরোনো বই আছে; পুরোনো বই বাঁধিয়ে বিক্রি করি। সে সব বই অন্য দোকানে পাবেন না।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপাতত আপনার কাছে নিমাই আর নিতাইয়ের ঠিকানা নিতে এসেছি।'

প্রভাত ব্যোমকেশের দিকে ফিরিল কয়েকবার চক্ষু মিটিমিটি করিয়া যেন এ নূতন প্রসঙ্গ হৃদয়ঙ্গম করিয়া লইল তারপর বলিল,—'নিমাই নিতাইয়ে ঠিকানা? তারা থাকে—' প্রভাত ঠিকা দিল, মধু বড়াল লেনের একটা নম্বর কিন্তু আমরা কেন নিতাই ও নিমাইয়ে ঠিকানা চাই সে বিষয়ে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করিল না।

'ধন্যবাদ।'

'আসুন। আমি কিন্তু একদিন যাব।'

'আসবেন।'

দোকান হইতে বাহির হইলাম। তখনও বেশ বেলা আছে; শীতের সন্ধ্যা নারিকেল ছোবড়ার আগুনের মত ধীরে ধীরে জ্বলে, সহজে নেভে না। ব্যোমকেশ বলিল,—'চল, নিমাই নিতাইকে দেখে যাই। কাছেই তো।' কিছুক্ষণ চলিবার পর বলিল,—'প্রভাত নিজেই বই বাঁধে পুরোনো বিদ্যে ছাড়তে পারেনি। ছেলেটা কেমন যেন মেদামারা—কিছুতেই চাড় নেই।'

বললাম,—'আমার সঙ্গে কী দরকার কে জানে?'

ব্যোমকেশ চোখ বাঁকাইয়া আমার পানে চাহিল, বলিল,—'তা এখনও বোঝোনি? তোমার বই ছাপতে চায়। বোধ হয় প্রোথিতযশা কোনও লেখক ওকে বই দেননি। এখন তুমি ভরসা।'

বলিলাম,—'প্রোথিতযশা নয়—প্রথিত-যশা।'

সে মুখ টিপিয়া হাসিল; বুঝিলাম ভুলটা ইচ্ছাকৃত। বলিলাম,—'যাহোক তবু ওর বই ছাপার দিকে ঝোঁক আছে। লেখা-পড়া না জানলেও সাহিত্যের কদর বোঝে। সেটা কম কথা নয়।'

ব্যোমকেশ খানিক চুপ করিয়া রহিল, তারপর যেন বিমনাভাবে বলিল,—'প্যাঁচা কয় প্যাঁচানী, খাসা তোর চ্যাঁচানি।'

আজকাল ব্যোমকেশ আচমকা এমন অসংলগ্ন কথা বলে যে তাহার কোনও মানে হয় না।

মধু বড়ালের গলিতে উপস্থিত হইলাম। গলিটি আজিকার নয়, বোধ করি

"ঈজি স্ট্রীট" চিত্রে প্রার্থনানুষ্ঠানের দৃশ্য

থাকে (কীস্টোন কোম্পানীর ছবিগুলিতে কিন্তু আর কিছু না থাক, দৃশ্যবৈচিত্র্য খুব থাকত। দৌড়ঝাঁপ, লাফালাফি, এসব তো ছিলই। কিন্তু সেই প্রাথমিক পর্যায় চার্লি তখন পার হয়ে এসেছেন)। "ওয়ান এ. এম."-এর মতই এ বইয়েও দেখা যায় যে, আপাতনির্জীব প্রাণহীন বস্তু-জগতের আক্রমণের ভয়ে সব সময়েই তটস্থ হয়ে রয়েছেন চার্লি, প্রাণপণে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছেন। সে-বইয়ে ছিল শয্যার শত্রুতা, এ-বইয়ে ঘড়ির। তবে চার্লির গতিভঙ্গিমা এখানে আরও সুন্দর, আরও ছন্দোময়। তার পদক্ষেপের ছন্দ এখানে আরও কাব্যময় হয়ে উঠেছে, প্রায় নর্তকের পদচ্ছন্দের মত। এ-বইয়ে হাসি তো আছেই, কিন্তু হাসিই শুধু নয়, তার চাইতে বেশী কিছু আছে। আছে সুন্দর ছন্দোবিন্যাস, আছে সৌন্দর্য; এমন কি জীবন সম্পর্কে বিশেষ এক ধরনের দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীরও এখানে সন্ধান পাওয়া যায়। আর তার সমস্ত কিছুর মধ্য দিয়ে মানবিক অনুভূতি-গুলিকে এতই সূক্ষ্মভাবে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন যে, দেখে বিস্ময় না মেনে উপায় থাকে না।

এর পরের দুখানি বই অবশ্য এতটা তাৎপর্যময় নয়, তবে হাস্যরসের এই দেখা দিয়েছে। "বিহাইন্ড দী স্ক্রীন"-এ কীস্টোন স্টুডিয়োকে খানিকটা ঠাট্টা করেছেন চার্লি। এতে তিনি দেখিয়েছেন, এক প্রযোজকের মাথায় এই রকমের উদ্ভট একটা খেয়াল চেপেছে যে, দর্শকদের হাসাবার জন্যে ছবির অভিনেতাদের দিয়ে তিনি খুব খানিকটা পচা-ফল ছোড়াছুড়ি করিয়ে নেবেন। জনৈক অভিনেতার সেটা পছন্দ হল না, তিনি বেঁকে বসলেন। চার্লি এ-বইয়ে মঞ্চ-সহকারীর (ডেভিড) ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন, আর এরিক ক্যাম্বেল সেজেছেন তাঁর উপরওয়ালা (গলিয়াথ)। এরিকের আদেশে চার্লিকে এগারখানা চেয়ার কাঁধে বয়ে নিয়ে যেতে হচ্ছে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন এরিক। তিনি তাঁকে বিন্দুমাত্র সাহায্য করছেন না। মাঝে মাঝে শুধু চড়া-গলায় হুকুম দিচ্ছেন, আর লাথি কষাচ্ছেন। খানিক বাদেই চার্লিকে চুপচাপ বসে একটি ভালুকের ছাল পরিষ্কার করতে দেখা যায়। ছালের উপরে খানিকটা হেয়ার টনিক ঢেলে দিলেন তিনি, তারপর শাম্পু করে সেই মৃত ভালুকের চুল আঁচড়াতে লেগে গেলেন। সর্বশেষে শুকনো তোয়ালে নিয়ে এসে পরম অনুরাগে ভালুকের মুখ মুছিয়ে দিলেন।

এই সময়কার বিখ্যাত ছবিগুলির করা যেতে পারে। এ-বইয়ের কাহিনী অংশটি বেশ সযত্নবিন্যস্ত; তা ছাড় সামাজিক দোষ-ত্রুটিগুলির সংগ সমালোচনায় বইখানি আরও তাৎপর্যম হয়ে উঠেছে।

এ-বইয়েও চার্লি এক ভবঘুরে ভূমিকায় নেমেছেন। প্রথম দৃশ্যেই দেখত পাওয়া যায়, উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরতে ঘুরতে তিনি এক গির্জায় এসে ঢুকলেন অর্থ-সংগ্রহের জন্য গির্জার প্রবেশপথে যে বাক্সটি বসান ছিল, অন্যের অলক্ষে সেটিকে হাতিয়ে নিলেন চার্লি। তারপ প্রার্থনানুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এত আকস্মিকভাবে তাঁর হৃদয়ের পরিবর্ত ঘটল যে, সেখান থেকে বেরিয়ে আসবা সময় বাক্সটিকে তিনি আবার যথাস্থানে রেখে দিয়ে এলেন।

পরের দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যা আবারও তিনি উদ্দেশ্যহীনভাবে ঈজি স্ট্রীট দিয়ে এগিয়ে চলেছেন। শহরে এটা সবচাইতে কুখ্যাত রাস্তা, সব সময়ে এখানে দাঙ্গাহাঙ্গামা লেগে থাকে দেখতে-না-দেখতে নতুন করে একা হাঙ্গামা বেধে গেল। পুলিস এসেছে কিন্তু সুবিধে করে উঠতে পারছে না উল্টে গুণ্ডারাই তাদের ঠেঙিয়ে দিচ্ছে এক একজন পুলিস জখম হয়, আর স্ট্রেচারে করে তাকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

পুলিস বাহিনীর পক্ষে এসে যো দিলেন চার্লি, হেলমেট মাথায় দিয়ে ঈজি স্ট্রীট ধরে এগিয়ে চললেন। খানিক এগিয়েই গুণ্ডাদলের সর্দারের (এরিক ক্যাম্বেল) সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল সর্দারের গায়ে দৈত্যের মতন শক্তি, সেই শক্তির পরিচয় দেবার জন্য সে একটা ল্যাম্পপোস্ট বাঁকিয়ে ফেলে তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে। চার্লি করলেন কি অতর্কিতে তার পিঠের উপরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তারপরই সর্দারের মুখটিকে ল্যাম্পের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন তিনি, দিয়ে গ্যাসের টিউবটাকে খুলে দিলেন। মাঝে মাঝে সর্দারের নাড়ি পরীক্ষা করেন, নাড়ি বুঝে গ্যাসের সরবরাহ বাড়িয়ে-কমিয়ে দেন। খানিক

জব চার্নকের সমসাময়িক। দু' পাশের বাড়িগুলি ইষ্টক-দন্তুর, পরস্পরের গায়ে ঠেস দিয়া কোনও ক্রমে খাড়া আছে।

একটি বাড়ির দরজার মাথায় নম্বর দেখিয়া বুঝিলাম এই বাড়ি। জীর্ণ বটে কিন্তু বাঁধানো দাঁত চুলে-কলপ দেওয়া বৃদ্ধের মত বাহিরের ঠাট বজায় রাখিবার চেষ্টা আছে। সদর দরজা একটু ফাঁক হইয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া সরু গলির মত একটা স্থান দেখা গেল। লোকজন কেহ নাই।

আমাকে অনুসরণ করিতে ইঙ্গিত করিয়া ব্যোমকেশ ভিতরে প্রবেশ করিল। সুড়ঙ্গের মত পথটি যেখানে গিয়া শেষ হইয়াছে সেখানে ডান দিকে একটি ঘরের দরজা। আমরা দরজার সামনে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

আবছায়া একটি ঘর। তাহাতে অসংখ্য আসবাব ঠাসা; আলমারি টেবিল চেয়ার সোফা তক্তাপোশ, নড়িবার ঠাঁই নাই। সমস্ত আসবাব পুরানো, একটিরও বয়স পঞ্চাশের কম নয়; দেখিলে মনে হয় ঘরটি পুরাতন আসবাবের গুদাম। তাহার মাঝখানে রঙ-চটা জাজিম-পাতা তক্তাপোশের উপর বসিয়া দুইটি মানুষ বন্দুক পরিষ্কার করিতেছে। দু'নলা ছর্‌রা-বন্দুক, কুঁদার গায়ে নানাপ্রকার চিত্র বিচিত্র আঁকা দেখিয়া মনে হয় বন্দুকটিও সাবেক আমলের। একজন তাহার যন্ত্রে তেল লাগাইতেছে, অন্য ব্যক্তি নলের ভিতর গজ চালাইয়া পরিষ্কার করিতেছে।

মানুষ দুটির চেহারা এক রকম, বয়স একরকম, ভাবভঙ্গী একরকম; একজনের বর্ণনা করিলে দুজনের বর্ণনা করা হইয়া যায়। বয়স ত্রিশের আশে পাশে, দোহারা ভারি গড়নের নাড়ুগোপাল চেহারা, মেটে মেটে রঙ, চোখের চারিপাশে চর্বির বেষ্টনী মুখে একটা মোঙ্গলীয় ভাব আনিয়া দিয়াছে, মাথার চুল ছোট এবং সমান করিয়া ছাঁটা। পরিধানে লুঙ্গি ও ফতুয়া। তফাৎ যে একেবারে নাই তা নয়, কিন্তু তাহা যৎসামান্য। ইহারাই যে নিমাই নিতাই তাহাতে তিলমাত্র সন্দেহ রহিল না।

আমরা দ্বার পর্যন্ত পৌঁছিতেই তাহারা এক সঙ্গে চোখ তুলিয়া চাহিল। দুই জোড়া ভয়ঙ্কর চোখের দৃষ্টি আমাদের যেন ধাক্কা দিয়া পিছনে ঠেলিয়া দিল। তারপর যুগপৎ প্রশ্ন হইল,—

—'কি চাই?'

কড়া সুর, শিষ্টতার লেশমাত্র তাহাতে নাই। আমি অসহায়ভাবে ব্যোমকেশের মুখের পানে চাহিলাম। ব্যোমকেশ সহজ সৌজন্যের সহিত বলিল,—'এটা কি অনাদি হালদারের বাড়ি?'

ক্ষণকালের জন্য দুই ভাই যেন বিমূঢ় হইয়া গেল। পরস্পরের প্রতি সপ্রশ্ন দৃষ্টিপাত করিয়া সমস্বরে বলিয়া উঠিল,—'না।'

ব্যোমকেশ আবার প্রশ্ন করিল,—'অনাদিবাবু এখানে থাকেন না?'

কড়া উত্তর—'না।'

ব্যোমকেশ যেন লজ্জিত হইয়া বলিল,—'দেখছি ভুল ঠিকানা পেয়েছি। এ বাড়িতে কি অনাদিবাবুর কোনও আত্মীয় থাকেন? আপনারা কি—?'

দুই ভাই আবার দৃষ্টি বিনিময় করিল। একজন বলিল,—'সে খবরে কী দরকার?'

'দরকার এই যে, আপনারা যদি তাঁর আত্মীয় হন তাহলে তাঁর ঠিকানা দিতে পারবেন।'

উত্তর হইল,—'এখানে কিছু হবে না। যেতে পারেন।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে তাহাদের পানে চাহিয়া রহিল, তারপর একটু বাঁকা সুরে বলিল,—'আপনাদের বন্দুক আছে দেখছি। আশা করি লাইসেন্স আছে।'

আমরা ফিরিয়া চলিলাম। দুই ভ্রাতার নির্নিমেষ দৃষ্টি আমাদের অনুসরণ করিল।

বাহিরে আসিয়া হাঁফ ছাড়িলাম,—'কি অসভ্য লোক দুটো।'

বাসার দিকে ফিরিয়া চলিতে চলিতে ব্যোমকেশ বলিল,—'অসভ্য নয়, সাবধানী। এখানে এক জাতের লোক আছে তারা কলকাতার পুরোনো বাসিন্দা; আগে বড় মানুষ ছিল এখন অবস্থা পড়ে গেছে; নিজেদের উপার্জনের ক্ষমতা নেই, পূর্ব পুরুষেরা যা রেখে গিয়েছিল তাই আঁকড়ে বেঁচে আছে। পচা বাড়ি ভাঙা আসবাব ছেঁড়া কাঁথা নিয়ে সাবেক চাল বজায় রাখবার চেষ্টা করছে। তাদের সাবধানতার অন্ত নেই; বাইরের লোকের সঙ্গে মেশে না, পাছে ছেঁড়া কাঁথাখানি কেউ ফাঁকি দিয়ে নেয়। দু' চারটি সাবেক বন্ধু ও আত্মীয় ছাড়া কারুর সঙ্গে ওরা সম্পর্ক রাখে না; কেউ যদি যেচে আলাপ করতে যায় তাকে সন্দেহ করে, ভাবে বুঝি কোনও কু-মৎলব আছে। তাই অপরিচিত লোকের প্রতি ওদের ব্যবহার স্বভাবতই রূঢ়। ওরা এক সঙ্গে ভীরু এবং কটুভাষী, লোভী এবং সংযমী। ওরা অদ্ভুত জীব।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'এ দুটি ভাইকে কেমন দেখলে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ননীবালা দেবী মিথ্যে বলেন নি। এক জোড়া বেড়াল; তবে শুকনো বেড়াল নয়, ভিজে বেড়াল।'

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'ওদের দ্বারা প্রভাতের অনিষ্ট হতে পারে তোমার মনে হয়?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'ঘরের বেড়াল বনে গেলে বন-বেড়াল হয়। স্বার্থে ঘা লাগলে ওরাও নিজ মূর্তি ধারণ করতে পারে।'

সন্ধ্যা ঘন হইয়া আসিতেছে, রাস্তার আলো জ্বলিয়াছে। আমরা দ্রুত বাসার দিকে অগ্রসর হইলাম। (ক্রমশ)

প্রম্পটার

সুনন্দা গুহ

মস্তবড় একটা হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙে মশা তাড়ালো অনাদি। স্টেজের দড়িদড়ার কাছে গা-হাত-পা দুমড়ে বসেছিল কানাই। কানাইয়ের পায়ে একটা ধাক্কা দিল অনাদি—'একটা বিড়ি দে তো। চোখটা অ্যায়সা টেনে আসছে।'

ধাক্কা খেয়ে অস্ফুটস্বরে একটা গালাগাল আবৃত্তি করলে কানাই। একটা বিড়ি এগিয়ে দিতে দিতে বল্লে, 'তোমার কি অনাদিদা, বসে বসে দুটো পার্ট বলে দিচ্ছ বই তো নয়। খাটিয়ে নেয় এই শালা কানাইকে। ওঠ্‌বোস করতে করতে আর লাইট ঠিক করতে করতে ঘুম আমার সব নিশ্চিন্দিপুর—!'
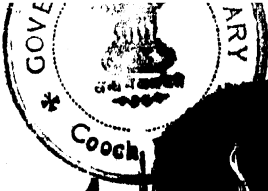
বিড়িটা ধরিয়ে নিয়ে অনাদিও সায় দিল। 'সেকথা সত্যি। আমরা তো আর অ্যাক্টো করছি না। আমাদের বেলায় চা নেই খাবারও নেই, অথচ খাটুনিতে চার-গুণ। সবচেয়ে দুঃখ লাগে কি এ্যাদ্দিনে আমাদের নাম পর্যন্ত কেউ জানলে না রে। আমরা না থাকলে এদিকে বিজলী থিয়েটারের গণেশ ওল্টাতো। এসব ভগবানের মার বুঝেছিস?'

কানাই রাগে গরগর করতে থাকে—'আমি একদিন লাইট না দিলে সব ম্যাসাকার। অথচ দুদিন জ্বর হয়েছিল বলে কামাই করেছি, অমনি দুদিনের মাইনে কেটে নিলে—হারামজাদা ম্যানেজার।'

'এক একদিন ইচ্ছে করে কাজ ছেড়ে দেব বুঝলি', অনাদি কানাইকে বোঝায়, 'কিন্তু তারপরে দেখি আমি আছি বলে বাবুসাহেবরা তবু পার্ট বলতে পারছেন, নইলে মুখস্থ করে বলতে হলে সকলের দাঁত পড়ে যাবে না? আমার প্রম্পটিং ছাড়া কাউকে তো এ থিয়েটারে দাঁড়াতে দেখলাম না—তাই কেমন একটা মায়া পড়ে গেছে। ছাড়তে পারিনে।' কানাইকে কিন্তু বোদ্ধার মত দেখা যায় না, চরম তিক্ততায় তার কণ্ঠে ধিক্কার ফেনিয়ে ওঠে 'দুত্তোর মায়া।'

অনাদি আরেকটু ঘনিয়ে আসে। ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতার সুরে আপনমনেই বলে, 'জানিস কানাই, সেদিন ম্যানেজার-বাবু নিজে বলে গেছেন, অনাদি তোমার একটা পয় আছে, তুমি না এলে সেদিন প্লে জমতেই চায় না, পার্ট বলতে পারে না হিরোয়িন। তোমাকে আমরা বেস্ট প্রম্পটিংয়ের জন্যে একটা মেডেল দেবো শিগ্‌গিরই। এই সবের জন্যেই আমি আর কামাইটা করি না, জানলি।'

কানাই, অন্যদিকে ফিরে মুখ ভ্যাংচায়। মনে মনে বলে, 'কোন্ জন্মে খেয়েছে ঘি—এখনও সেই গপ্পেই গেল।

ইণ্টারভ্যাল শেষ হবার সংকেতধ্বনি

শোনা যায়। অনাদি বই নিয়ে টুল ছেড়ে দাঁড়ায়। লক্ষ্মণ ওরফে সুশান্ত স্টেজে ঢোকবার মুখে একবার অনাদির কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর মিনতির সুরে বল্লে, 'অনাদিদা আজ একটু জোরে—নেশার ঘোরে মাথাটা কেমন যেন গুলিয়ে গুলিয়ে যাচ্ছে।'

সীতাবেশিনী মন্দা রং-করা ভ্রূ তুলে হাসতে আরম্ভ করলো, 'নেশা হয়ে গেল এত অল্পে?'

সুশান্ত একটা মুখভঙ্গি করলো—তারপর দ্রুতবেগে স্টেজে ঢুকে পড়লো। ফুটলাইটগুলো জ্বলে উঠলো। পাশ থেকে সবুজ ফেডলাইট দিল কানাই। অনাদি প্রম্পট্ করতে আরম্ভ করলো, ভদ্রে—'

লক্ষ্মণ অভিনয় করছে। অতিরিক্ত নেশায় ওর পা টলছে। চোখ রক্তাভ। অনাদি সাবধানে প্রম্পট করতে লাগলো। লক্ষ্মণের পশ্চার অনুযায়ী নিজে উইংসের ভেতর ঘুরতে ঘুরতে জোরালো গলায় পার্ট বলে দিতে লাগলো। ঝোঁকের মাথায় থামলো। আবেগের উক্তিতে গলায় বাষ্প ভরে নিল—এমনি করে লক্ষ্মণকে নেপথ্য হতে পাদপ্রদীপের সামনে বাহবা কুড়োবার সুযোগ করে দিতে লাগলো অনাদি।

কিন্তু হঠাৎ এক জায়গায় তাল কেটে গেল সীতার। পার্ট ভুলে গেছে।

খানিকটা সরে এল উইংয়ের কাছে। কান্নার ভান করে দাঁড়িয়ে শুনে নিল খানিকটা তারপরেই সজোরে কেঁদে উঠে পার্ট করতে আরম্ভ করলে,

'বৎস দুর্ভাগিনী আমি—'

রাত দুটোর সময় অভিনয় শেষ করে উঠে দাঁড়ালো অনাদি। এতক্ষণ অবিচ্ছিন্ন প্রম্পট করে করে ওর গলাটা জ্বালা করছে। মাথার মধ্যে অনিদ্রার একটা ক্লেশ মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণ হয়ে উঠছে। প্রথম প্রথম এই প্রম্পটারের চাকরীতে বড়ই কষ্ট হ'ত অনাদির। থিয়েটারের আলোগুলো সমস্ত রাত ওর চোখে দাপাদাপি করে বেড়াতো। উইংসের রুদ্ধ অপরিসরে আর থিয়েটারের ক্লেদাক্ত আবহাওয়ায় ক্লান্তিতে ওর সমস্ত মন ভেঙে পড়তে চাইতো। তখন ঘুম আর শ্রান্তি এড়াবার জন্য পান-বিড়ি ছেড়ে এক আধ পাঁট ধেনোও টানতে হ'ত মাঝে মাঝে। এখন অভ্যাস হয়ে গেছে। স্তিমিত আলোয় চোখকে নিরর্থক পীড়িত করে বইয়ের অক্ষরগুলো পর্যন্ত ওর অনেক সময় দেখতে হয় না। অনেক পার্টই মুখস্থ হয়ে গেছে ওর। ঠিক সময়-মত বড় বড় স্পীচগুলো নামকরা অভিনেতাদের মতই এমন কি তাদের চেয়েও ভাল একটানা যান্ত্রিক অভ্যাসে বলে যেতে পারে অনাদি। থিয়েটারে আলোগুলো ওর স্নায়ুকে আর অনাবশ্যক উত্তেজিত করে না। রাত জাগাও আগেকার মত অত্যাচার মনে হয় না। তবু থিয়েটার শেষ করে ফিরবার সময় ওর চোখ জ্বালা করে আড়ষ্ট পিঠের ব্যথা মরতে চায় না। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোতে চায় না কতক্ষণ। তবু অনাদির খুব খারাপ লাগে না, আগেকার মত পচাইয়ের উগ্র উত্তেজনা পান না করলেও থিয়েটারের ঘরের আলো আর জনতা, নট আর নটী, সব মিলিয়ে একটা মৃদু শিহরণ ওর স্নায়ুগুলোকে গুণটানা ধনুর ছিলার মত টান করে রাখে। নিজেকে অকস্মাৎ খুব দরকারী মনে হয় ওর—যেন সম্পূর্ণ থিয়েটারের সমস্ত চরিত্রের একক অভিনেতা ও।

তবু রাত প্রায় শেষ করে বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনাদির আফশোষ হয়। আরও অন্তত দুটো ঘণ্টা রাত যদি বেশী পেতো। এখনি কালপুরুষ কত নীচে নেমে এসেছে, এখনই ভোর হয়ে আসবে—আর এই মধ্যযাম আর শেষ প্রহরের অবশিষ্টাংশে কতটুকু আর রমাকে পাবে অনাদি কতটুকুই বা ঘুমোবে?

অধিকাংশ রাত্রিই রমা ঘুমিয়ে থাকে। পাশে খাবার ঢাকা। মাদুরের ওপর এলায়িত ওর অনবধান সৌন্দর্য দেখতে কি ভাল লাগে অনাদির। কিন্তু কড়া নাড়তেই রমা শশব্যস্তে উঠে বসে, তারপর সাবধানী হাতে নিজেকে খুব যত্ন করে আবৃত করে তবে ও দরজা খোলে, এমন কি ভ্রূ অবধি টেনে ঘোমটা দিতেও কখনও ভোলে না।

'ঘুমুচ্ছিলে?' লোভীর মত ওর মুখের অনাবৃত অংশের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করে অনাদি।

রমা এখনও স্বীকার করতে লজ্জা পায়—লজ্জিত হেসে সে ঘাড় নাড়ে—'কি করব তবে?'

'কেন প্রথম প্রথম যেমন আমার জন্য পথ চেয়ে বসে থাকতে, তেমনি থাকলেই পারো।' অনাদি জামা ছাড়তে ছাড়তে ঠাট্টা করে।

আর সেই নব-বিবাহের উচ্ছ্বাস স্মরণ করিয়ে দিতেই রমা একেবারে আপাদমস্তক রাঙ্গা হয়ে ওঠে। 'কি যে বল। অসভ্য।'

ততক্ষণে অনাদি খেতে বসে। পাশে বসে চুপ করে খাওয়া দেখে রমা। আগে নিজেও খেতো ও। বিয়ের পর প্রথম দু-মাস সত্যি ও প্রোষিতভর্তৃকার মত পথ চেয়ে বসে রাত জাগতো। কিন্তু এখন অনাদি নিজেই ওকে বলেছে খেয়ে নিতে—'তোমার তো অভ্যেস নেই। কাজ নেই।'

রমা কিছুতেই মানতে চায়নি। ওর শান্ত নিবিড় কালো চোখ তুলে অবুঝের মত বলেছে, 'সে হবে না—না।' অনাদি তখন ওর বিদ্রোহী ঠোঁট দুটোকে বন্ধ করে দিতে দিতে বলেছে, 'না লক্ষ্মী তোমার কষ্ট হলে যে আমার কষ্ট হয়।'

জনশ্রুতি রমাকে অনাদি একটু অতিরিক্ত ভালবাসে, অতিরিক্ত প্রশ্রয় দেয়; কিন্তু খাওয়া শেষ করে বিছানায় বসতে বসতে রমার অতল কালো চোখের দিকে তাকিয়ে অনাদির মনে হয়, ও চোখের ভালবাসার নিবিড়তাকে কত ভালবেসে কতটুকু আর যোগ্য প্রতিদান দিতে পারবে সে?

রমা বিছানার পাশে এসে বসলো, তারপর লাজুক হেসে বল্লো, 'আজ কি পালা হলো?'

রমার কপোত-কোমল হাতটা কপালে এনে রাখলো অনাদি, তারপর বল্লো, 'আজ একটা চমৎকার বই হল, সীতা। জানো, দেখেছো কখনো?'

রমা মাথা নাড়লো, তারপর একবার চকিতে চোখ তুলে বল্লো—'আজ দেখাবে না?'

চট্ করে উঠে দাঁড়ালো অনাদি। রোজই ওকে এই ব্যাপারটা করতে হয়। রমার দিকে তাকিয়ে বল্লো, 'কোন্‌টা শুনবে বল—দুর্মুখ যখন এসে সীতাকে নির্বাসন দিতে বলছে, রামের তখনকার পার্টটা? না লক্ষ্মণের সীতা বিসর্জন?'

রমা অল্প হাসিতে ওর লাবণ্যে ঢলোঢলো ঠোঁট ভরে বল্লো, 'রামচন্দ্রটা করো।'

গলাটা এতক্ষণ প্রম্পট করে চিরে গেছে, মাথাও যেন ছিঁড়ে পড়তে চাইছিল অনাদির; তবুও সব শ্রান্তি মন থেকে ঝেড়ে ফেললো। তারপর ঠিক রামচন্দ্রের ভঙ্গিতে হঠাৎ সিংহাসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়, নিদারুণ খেদে মুখে অসীম আর্তি ফুটিয়ে আরম্ভ করে, 'দুর্মুখ—দুর্মুখ—'

শুনতে শুনতে উত্তেজনায় রমার নাক স্ফুরিত হতে থাকে —আবেগে বিস্ফারিত অনাদিকে দেখে মনে হয়, যেন রমাকে নির্বাসন দেবার মর্মান্তিক ক্ষোভে অনাদি উন্মাদ কান্নায় এখনই ভেঙে পড়বে। দু-চোখের ধারায় ওর ভাষাতীত মমতাকে প্রকাশ করে রমা। দুঃসহ ব্যথায় রামচন্দ্র কখনও মাথার চুল ছিঁড়ছেন, কখনও বা বুকে করাঘাত করছেন, তারপর রাজ-মর্যাদার পুঞ্জীত অসহায়তায় আর অক্ষমতায় সিংহাসনে মুখ গুঁজে বসে পড়েন রামচন্দ্র।

পার্ট শেষ করে ভগ্নপাখা শ্রান্ত বিহঙ্গের মত অনাদি রমার বুকে আশ্রয় নেয়। খুব বেশী দরদ আর বেদনা ঢেলে রমা ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, তারপর নরম আর তপ্ত করে তোলে ওর শরীরের সমস্ত পেশী। এক সময় অন্ধকারে অনাদির বুকে মুখ গুঁজে বলে, 'তুমি নিজে কেন পার্ট কর না।'

শুনে অনাদির বুক ভরে গেল, রমার মুখখানাকে নিজের মুখের কাছে জোর করে তুলে এনে বল্লো—'আমি? দ্যাখো তো আমার এই কন্দর্পকান্তি, তাও বলছো?'

এবার রমা ভয়ানক রাগ করলো, 'তুমি খারাপ দেখতে? একটু সেজে বেরোলে তোমাকে কেমন সুন্দর লাগে। সত্যি গো, তুমি কেন পার্ট কর না? দেখো তুমি কত ভাল করবে এখনকার রামচন্দ্রের চেয়ে।'

অনাদি খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। এ স্বপ্ন সেও দেখে। নেপথ্যের ছায়ালোকে নির্বাসিত প্রম্পটারেরও সাধ জাগে রঙ্গমঞ্চের নীহারিকা-আলোয় উদ্ভাসিত হতে। কারণ ও ভাল করেই জানে, ওই মাতাল সুশান্তর চেয়ে, ওই অহংকারী বীরেনের চেয়ে ও ভাল পার্ট বলে। অনাদি পার্টের অর্থ বোঝে, ওর উচ্চারণ জড়তাহীন, সুস্পষ্ট—আর তাছাড়া ওর মধ্যে যে সত্যিকার অভিনয় প্রতিভা আছে। এ যেন প্রত্যহ অনুভব করেছে অনাদি। অথচ এ স্বপ্ন পূরণের কোন পথ নেই তার।

ম্লান হেসে রমাকে সে বল্লো, 'আমাকে কেন পার্ট দেবে, রমারাণী বলেছে বলে? কিন্তু প্রম্পটার কি কখনও পার্ট বলে?'

রমা তারস্বরে প্রতিবাদ করলো 'দেবে, নিশ্চয়ই দেবে। তুমি শুধু একবার করে দেখাও না গো ম্যানেজারবাবুকে।'

কিন্তু অনাদি তো রমার মত পাগল নয়, তাই রমার নিবিড় চোখের দিকে তাকিয়ে সে হাসলো, 'আমার বয়ে গেছে ম্যানেজারকে দেখাতে। ব্যাটা উজবুক একটা, ও কিবা বোঝে অ্যাক্টিংয়ের। তার চেয়ে আমি শুধু আমার রমারাণীকে করে দেখাবো। শুধু তুমি আর আমি দেখবো আমাদের থিয়েটার, কেমন? সোহাগে আর সহানুভূতিতে রমা খানিকক্ষণ চোখ বুজে আবিষ্ট হয়ে রইল, তারপর দু-বাহুতে অনাদির কণ্ঠ বেষ্টন করে অনেক কাছে সরে এলো সে, কানে কানে বলো—'আচ্ছা!'

কথাটা কিন্তু অনাদি ভুল্ল না। বারে বারে ওর মনে একঝাঁক ভ্রমরের মত সেই আশা, সেই প্রার্থনা ধ্বনিত হতে লাগলো। স্টেজের ওপর রামচন্দ্রের ভূমিকায় নিজেকে কল্পনা করে দেখলো ও, খুব ভাল লাগলো ওর। আরশিতে কতবার ফিরিয়ে ফিরিয়ে দেখল মুখ। একটু ভেঙে যাওয়া চোয়াল জাগানো বলিষ্ঠ মুখ। চোখ দুটি বেশ বড় বড়। কিন্তু চোখের নীচে গভীর দুশ্চিন্তার কালি। ঠোঁটের দিকটা পুরু অনাদির, কিন্তু মেকাপে এতই কি খারাপ লাগবে অনাদিকে?

পরের দিন হঠাৎ কানাইকে বলে ফেল্লো অনাদি 'কালকে তোর বৌদি একটা ভারী মজার কথা বলেছে জানিস?'

কানাই উৎকর্ণ হ'ল।

'আমি ওকে ঘরে পার্ট করে দেখাচ্ছিলাম। তা দেখে ও আমাকে একেবারে দুটি হাতে ধরে পড়লো— তুমি কেন পার্ট কর না'—অনেক হাসলো অনাদি, শেষে যোগ করলো 'মেয়েমানুষের বুদ্ধি।'

কানাই খানিকক্ষণ এক দৃষ্টিতে অনাদির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর হঠাৎ হাসতে শুরু করলো—হাসতে হাসতে প্রায় লুটিয়ে পড়ে বল্লো, 'মাইরি! তুমি করবে রামচন্দ্রের পার্ট? আরে ছ্যা, তাহলে কেউ থিয়েটার দেখতে আসবে ভাবছো?'

অনাদি হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর শান্ত-গলায় বল্লো, 'চেহারাই তো সব নয়, পার্ট করা হ'ল অন্য জিনিস।'

কানাইয়ের হাসি কিন্তু বারণ মানলো না—'আরে দূর, উইং থেকে মিন মিন করলেই পার্ট শেখা হ'ল নাকি। তোমার মাথাটা বৌয়ের কথায় বিগড়ে গেছে অনাদিদা।'

আহত-মুখে অনাদি বল্লো, 'অনেকেই অনেক জিনিস করতে পারে। আমি কখনও সুযোগ পাইনি তাই, নইলে পার্ট করা এমন কঠিন আর কি?'

পাশ দিয়ে ঝি ক্ষান্তমণি যেতে যেতে থমকে দাঁড়ালো—'কি? কে পার্ট করবে?'

কানাই একবার অনাদির অন্ধকার মুখের দিকে আড়চোখে চেয়ে বল্লো, 'অনাদিদার সখ হয়েছে এবার হনুমান সাজবে থিয়েটারে, আর তোমাকে করবে চেড়ী।'

ক্ষান্তমণি গালে একটা আঙুলে

ঠেকিয়ে পটে আঁকা ছবির মত স্থির হয়ে গেল—'তুমি পার্ট করবে? অ্যাঁ? আগো কালে কালে কতই হ'ল, পুলি-পিঠের ল্যাজ গজালো!' চপল হাসিতে ভেঙে পড়লো কানাই আর ক্ষান্তমণি।

অনাদি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মনে হ'ল অপমানে ওর বুকটা জ্বলে খাক হয়ে যাবে। ওর শান্তমুখে ছাই-চাপা আগুনের ক্রোধ থমথম করতে লাগল; কিন্তু ততক্ষণে বেল পড়ে গেছে। বই হাতে নিয়ে ছুটতে হ'ল উইংসের পাশে। অভিনয় শুরু হ'ল।

বাড়ি ফেরার পর অনাদির মুখের দিকে তাকাতেই রমার চোখ উদ্বেগে অধীর হয়ে উঠলো, 'কি হয়েছে গো?'

অনাদি ঠোঁটটা কামড়ে ধরলো, তারপর মুখ ফিরিয়ে বল্লো—'কিচ্ছু না। থিয়েটার দেখবে?'

'খেয়ে নাও আগে।' রমা একটু অবাক হয়েই অনুরোধ করলো।

'না, আগে দেখ'—অনাদি জামাটা ছাড়বার পর্যন্ত সময় নিল না। 'আজকে কিন্তু বলতে হবে দেখে কেমন লাগলো—কেমন? মিছেমিছি বলবে না যেন?' রমা আশঙ্কিত ব্যথিত চোখ মেলে তাকালো।

প্রফুল্লের শেষ সিন করতে লাগলো অনাদি। মদ্যপ যোগেশের ভূমিকায় শেষ দৃশ্যে মর্মান্তিক বেদনানিহত বিলম্বিত অনুতাপ। অনাদি মনের সমস্তটুকু দরদ ঢেলে অপূর্ব নিপুণতায় অভিনয় করতে লাগলো—ওর আহত আত্মমর্যাদা যেন এই একমাত্র অভিনয়ের মধ্যে মুখর হয়ে উঠল। অনেকদিন এমন অনবদ্য অভিনয় করেনি অনাদি। পার্ট শেষ করে অন্যদিনের মত ছুটে এসে রমার কাছে আশ্রয় চাইল না অনাদি, স্থির-দৃষ্টিতে চাইল রমার মুখে।

রমার চোখ দিয়ে দরদর করে জল ঝরে পড়ছে। তারই মধ্যে অহংকারে আনন্দে ওর মুখ উদ্ভাসিত। ওর হর্ষ প্রীতি গৌরবে বিস্ফারিত চোখের অভিনন্দনে অনাদির বুকের জ্বালাটা একটু জুড়িয়ে এল। এতক্ষণে সে হাসলো; হেসে বল্লো 'আমাকে যদি পার্ট করতে দিত রমা আর তুমি যদি আমার সামনে বসে থাকতে, আমি স্টেজ মাৎ করে দিতে পারতাম।'

রমা সবলে ওর দু হাত বুকের মধ্যে জড়িয়ে নিয়ে রুদ্ধ আবেগে বললে, 'তুমি যদি একটিবার করতে, নিশ্চয়ই আর কাউকে এর পর নাম করতে হ'ত না। তুমি দেখো।'

গভীর আবেগে রমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে উজ্জ্বল চোখে অনাদি বল্লে, 'মণি তাতে তুমি খুশী হবে?

'আমি?' রমা এর চেয়ে বেশী আর কিছু বলতে পারলো না। কিন্তু ওর দীর্ঘ পক্ষ্মান্বিত চোখের দিঘিতে চোখ ডুবিয়ে ম্লান হাসলো, 'প্রম্পটারকে কে পার্ট দেবে, বল?'

তা পার্ট করুক বা না করুক থিয়েটার দেখাতে পরম উৎসাহ অনাদির। অনেক চেষ্টা করে তাই সেদিন একটা পাস জোগাড় করেছে অনাদি। কতদিন ধরে ওর সাধ রমাকে ওদের থিয়েটার দেখাবে। এত ভালবাসে রমা থিয়েটার দেখতে।

তাড়াতাড়ি করে তাই আজ খাওয়া দাওয়া সেরে নিল রমা। ওর তোরঙ্গ খুলে রমার জন্য নিজেই শাড়ি বাছতে বসে অনাদি, বের করে একখানা গভীর নীল মুর্শিদাবাদী সিল্ক। স্বামীর সেই সোহাগ সর্বাঙ্গে জড়িয়ে সীমন্তে সিঁদুরের সুগোল ফোঁটাটি এঁকে ফিরে দাঁড়াল রমা। তারপর ঈষোন্নত ঘোমটার অতল থেকে কালো চোখ তুলে বল্লো, 'হয়েছে, দ্যাখো!' ম্লান হারিকেনের আলোয় সেই সুতনুকা বধূর দিকে চেয়ে চোখে পলক পড়লো না অনাদির, কোন অসীম সৌভাগ্য দিয়ে সে দাবী করবে এই প্রেমের কাজলে অবগাঢ় নয়ন দুটির অধিকার? আর গভীর আন্তরিক ক্ষোভে অনাদি ভাবলো তখন কালো-হরিণ-চাউনীর পরিবর্তে রমাকে সে কিই বা দিতে পারলো?

থিয়েটারেও খাতির করলো সবাই। ক্ষান্তমণি নিজে এসে রমাকে হাতে ধরে ভেতরে বসাতে নিয়ে গেল। অনাদি ঢুকলো এসে স্টেজে। এখনও অনেক সময় বাকী আছে। একটু তাড়াতাড়ি এসে গেছে ওরা। বইটা হাতে নিয়ে টুলে বসে থাকতে থাকতে অনাদির দু চোখ জড়িয়ে এলো।

ওপরে একটা মৃদু গোলমাল শোনা গেল। কয়েকটা ত্রস্ত পদক্ষেপ। হঠাৎ ম্যানেজারবাবু নীচে নেমে এলেন। শশব্যস্তে উঠে দাঁড়ালো অনাদি। ম্যানেজারবাবু সেদিকে দ্রূক্ষেপ করলো না। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁর মুখ শুকিয়ে গেছে, কণ্ঠে দুশ্চিন্তার ভগ্নাশা। অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার নৃপেনবাবুর দিকে হতাশ চোখে তাকালেন তিনি 'কি করা যায় নৃপেন, সুশান্ত আসেনি এখনও। বাড়িতেও পাওয়া গেল না ওকে।

নৃপেনবাবুরও মুখে দুশ্চিন্তার রেখা, 'মন্দাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে?' ম্যানেজার হাতে একটা অধৈর্যের ভঙ্গি করলেন, 'সব, সবাইকে। কেউ খোঁজ দিতে পারলো না। যতসব দায়িত্বজ্ঞানহীন মাতাল, কোথায় মদ গিলে পড়ে আছে, কে জানে?

'সর্বনাশ, তবে থিয়েটার হবে কি করে আজ!' নৃপেনবাবু উদ্বেগে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।' সুশান্তর পার্ট এখন করবে কে? ধীরেশ নেই?'

'কোথায় ধীরেশ?' প্রচণ্ড রাগে ম্যানেজার ফেটে পড়লেন, 'আর থাকলেই বা কি, আধ ঘণ্টায় অতবড় পার্ট মুখস্ত করতে পারে কেউ?'

হঠাৎ অনাদির দিকে চোখ পড়তে নৃপেনবাবু চাঁদ হাতে পাওয়া মুখ করলেন। 'কেন ভাল প্রম্পট করলে ধীরেশ পারবে নাই বা কেন? লক্ষ্মণের তো খুব বড় পার্ট নেই।'

প্রম্পটীং?' ম্যানেজার ভেংচে উঠলেন,

'তা তুমি নেমে দেখ না। প্রম্পটিংয়ে পারা যায় কিনা—যত সব অদ্ভুত কথা!'

কেমন করে কথাটা বল্লো কে জানে রুদ্ধশ্বাসে বলে ফেল্লো প্রম্পটার 'আমি যদি লক্ষ্মণ সাজি?'

'তুমি?' ম্যানেজার বিস্ময়ে স্থির হয়ে গেলেন 'তুমি কি করে পারবে?

'যদি, চেষ্টা করি।' অনাদি অস্বাভাবিক সংযমের সঙ্গে বল্লো 'আমার তো পার্ট মুখস্তই আছে।'

কিন্তু নৃপেনবাবু সে কথা পরম অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে উড়িয়ে দিলেন, 'আরে নাঃ এসব ফাজলামো নয় তো।'

অনাদির মুখ আস্তে আস্তে নিভে গেল।

ম্যানেজার খানিকক্ষণ ওর প্রতিজ্ঞাদৃঢ় মুখের দিকে চেয়ে রইলেন। তারপর সরে গিয়ে নীচু গলায় খানিকক্ষণ পরামর্শ করলেন নৃপেনবাবুর সাথে। শেষকালে বল্লেন 'তাহলে অনাদি একবার চেষ্টা কর। দেখো বাপু আজ আমার সম্মান তোমার হাতে।'

অনাদি প্রথমে নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলো না। থিয়েটার! লক্ষ্মণের ভূমিকায়? রমার সামনে! ওর জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ সাধ। ওর জীবনের অভাবনীয় সুবর্ণ লগ্ন। হয়তো, হয়তো আজ এক রাত্রির অভিনয় ওর সমস্ত জীবনের মোড় ফিরিয়ে দিতে পারে—এক নিমেষে উত্তীর্ণ করাতে পারে অভিনেতার পরম গৌরবের ভূমিকায়।

কিন্তু পারবে তো? মেকাপরুমে দ্রুতহাতে মেকাপ হতে হতে আয়নাওয়ালা দেয়ালে নিজেকে দেখতে পেলো অনাদি—মাথায় দীপ্তিমুকুট, গায়ে জরির পোশাক; আগুল্ফাবিলম্বিত তরবারি। কিন্তু মেকাপের নীচেও ও মুখ শীর্ণ মলিন দেখালো—। যদি না পারে!

পনেরো মিনিট ও ড্রেসিংরুমে রিহার্সাল দিল, ওর হৃদয়ের সর্বশ্রেষ্ঠ আবেগ দিয়ে অভিনয় করলো—। খারাপ হবার কোনই আশঙ্কা নেই। এবং কে জানে, ভাবতে গিয়ে রোমাঞ্চ হলো অনাদির হয়তো সুশান্তর চেয়েও ভালই ওৎরাবে অভিনয়। অন্তত পার্ট ভুলে যাওয়ার প্রশ্ন ওর পক্ষে অবান্তর, সুশান্তর মত মদ খেয়ে টং হয়ে নেই অনাদি। মোটামুটিভাবে দাঁড়িয়ে বলে আসতে পারলেই তো জয় জয়কার। কিন্তু শুধু কথাগুলো বলে আসতেই চায় না অনাদি। আজ ওকে অভিনয় করতে হবে। অসাধারণ বাসনায় উজ্জ্বল সে। আজ যেন সহস্র হাততালিতে রঙ্গমঞ্চ ভেঙ্গে পড়ে উল্লাসে, ব্যাকুল আনন্দে। রমার সমস্ত প্রেমের যোগ্য উপহার হয় যেন আজ। ও জানে রাজবেশে স্টেজের ওপর ওকে দেখে রমার চোখ বিস্ময়ে আবেগে স্ফুরিত হয়ে উঠবে, করতালিমুখর রঙ্গমঞ্চ থেকে কতখানি গৌরবে ও সেই অভিনয় শুনবে—অনাদি আর ভাবলো না, অনাদি আর ভাবতে পারছে না!

বেল পড়লো—ধীরে ধীরে ড্রপ উঠলো আশ্চর্য মর্যাদাদীপ্ত পায়ে ঢুকলো লক্ষ্মণ —সাথে রামচন্দ্র—প্রশ্ন করছেন রামচন্দ্র। লক্ষ্মণ কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল —ফুটলাইটের কড়া আলো ওর ভাঙ্গা চোয়ালের ওপর পড়লো—মাথার ওপর বহু শক্তির ইলেকট্রিক বাল্ব। লক্ষ্মণের ঠোঁট নড়লো—কথা বললো না। রামচন্দ্র উসখুস করছেন—প্রম্পটার গলা বাড়ালো—ম্যানেজার তাড়া দিচ্ছে—ভূতে পাওয়ার মত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল লক্ষ্মণ। তীব্র আলোর উন্মুক্ত যবনিকায় অসংখ্য অগণ্য আগ্নেয় চোখ ওর মুখে তীব্র ধিক্কারে আছড়ে পড়েছে। অনাদি সেই রাশি রাশি চোখের মধ্যে প্রাণপণে দুটি ভালবাসা আর মমতায় টলোমলো চোখ খুঁজলো। ম্লান হারিকেনের আলোয় যে চোখের উৎসাহে ওর অভিনয় প্রতিভা আগুনের মত জ্বলে উঠতো সেই বিপুল কালো দুটি চোখ খুঁজতে সমস্ত মনোযোগ নিয়োগ করলো অনাদি।

কিন্তু সেই নির্মম অনাত্মীয় জনতার মধ্যে প্রীতি গৌরবে ক্ষমাসিঞ্চিত কোনও চোখ আজ ওকে অভিনন্দিত করলো না।

জনতা চঞ্চল হল, মৃদু গুঞ্জনে হল ভরে উঠলো—তারপর করতালিতে আর জন্তুর ডাকে সমস্ত রঙ্গমঞ্চ মুখর হয়ে উঠলো। সমস্ত পার্ট ভুলে গিয়ে বিবর্ণ মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অনাদি। তার সেই চরম ব্যর্থতা আর মূঢ়তাকে ধিক্কার দিয়ে, ওর সমস্ত স্বপ্নসাধকে কঠিন আঘাতে ভেঙ্গে দিয়ে জড়প্রায় অনাদি প্রম্পটারের সামনে এবার সশব্দে যবনিকা নেমে এল।

অবনীন্দ্রনাথের শেষের কাজ

ছোট একটি পিউরীর ফোঁটা যে কি অসম্ভব সত্য, কি অদ্ভুতভাবেই না সে-ফোঁটা দেখা শোনা জগতের বাস্তবতাকে আঁকড়ে ধরতে পারে, তা অবনীন্দ্রনাথের 'সাঁওতালী মেয়ে' ছবিটি দেখলে বোঝা যায়। ছোট ফোঁটা দিয়ে বিরাট অস্তিত্বকে ধরার রহস্য একমাত্র তাঁরই জানা ছিল। এইরূপে কোথাও ফিরোজা, কখনও লাল, ক্বচিৎ সবুজে পরিদৃশ্যমান সমস্ত কিছুরই মূল কথাটি অবনীন্দ্রনাথ আমাদের চোখের সামনে ধরে দিয়েছেন; রঙ এখানে একধারে যেমন বাস্তবতাকে আনে, তেমনি সেই সঙ্গেই চিত্রের অন্তর্নিহিত কাব্যকে উল্লেখ করে। এই সূত্রে বলা যায়, বহুদিন পূর্বে প্যারিস শহরে অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর শিষ্যদের ছবির এক প্রদর্শনী হয়; ছবিগুলি দেখে এক সমালোচক মন্তব্য করেন যে, 'স্টুডিও পত্রিকার অস্পষ্ট ছাপা ছবিগুলির রঙই ভারতীয় চিত্রকরদের একমাত্র প্রেরণা এবং সেই সঙ্গে তিনি উপদেশও যথেষ্ট দিয়েছিলেন। এখানে বলা যেতে পারে যে, ওখানকার লোকেদের তখন জোরদার রঙের উপর ভালবাসা জেগেছিল এবং তাছাড়া সচরাচর তৈল-রঙ-করা বড় বড় ছবি দেখাই তাঁদের অভ্যাস। ফলে হঠাৎ এইরূপ আকারের জলরঙ ছবিকে এলো বলে বোধ হবেই। ছোট আকারের ছবিতে রঙ ব্যবহার করা যে অত্যন্ত কঠিন কাজ, তা অন্তত যাঁরা ছবি আঁকেন, তাঁরা স্বীকার করতে বাধ্য। রঙকে ছোট ছবিতে বহু দিক থেকে বিচার করে আরোপ করতে হয়।

এই প্রদর্শনীর খুব ছোট ছোট ছবি অনেকগুলিই আছে, ধরা যাক, ৫৬নং ছবি 'মনাডিকান্ট' এটির সম্ভবত মাপ হচ্ছে ৪''×২''। এইটুকু ছবি যে কি বিরাট হয়ে দেখা দেয়, তা না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। দরবেশের প্রতিকৃতিটি দু-একটি দ্রুত কমলালেবু রঙের টানেই ফুটে উঠেছে। এছাড়া পিছনের ঘোর কৃষ্ণাভ লাল রঙের ব্যবহার চিত্রকরের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছে। এ-ছবিকে কোন লোকই মিনিয়েচর শ্রেণীভুক্ত করতে সাহস করবেন না, তার কারণ এ-দরবেশের নিশ্বাস এখনও ফুরায়নি—এভাবে ফুটানোর কুশলতা এক এবং মিনিয়েচরের কুশলতা আর এক। ছোট ছবির মধ্যে, ১০নং 'আননোন্' দুটি আলেখ্য, আকারে ডাক-টিকিটের থেকে কিছু বড়, তার মধ্যে একটি, যেটি বাঁ দিকে, সে মুখখানি যেন বা পাথরের, এইরূপেই মনে হয়। মুখের ভাব, আকার নিজস্ব ধর্ম, সমস্ত কিছু এইটুকুর মধ্যে কি করে যে ফুটিয়ে তোলা যায়, সে কথা যাঁরা বহুদিন ধরে আঁকছেন, তাঁরাও ভেবে ঠিক পাবেন না। মুখের উপরে সাদাটে রঙের বিস্ময়কর আরোপ হাই লাইট হিসাবে ব্যবহার করা

ফকির
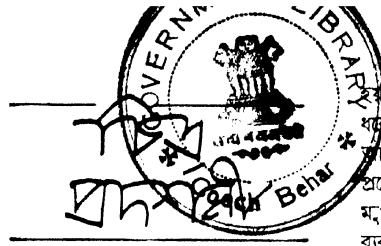
হয়নি, কারণ ভারতীয় চিত্রকররা বহুদিন ধরেই একথা জানেন যে, চিত্রের মধ্যেই আলো আছে—সূর্যকে টেনে আনার আর প্রয়োজন নেই। এই সাদাটে রঙের ব্যবহার মুখখানি শুধু নিপট করার জন্যেই ব্যবহার করা হয়েছে।

মধু সিরিজের ছবিগুলিও ছোট ছোট। ছবিগুলি আঁকার রীতি অদ্ভুত; কখনও মনে হয়, সেই সনাতন পদ্ধতিতে আঁকা, আবার কখনও মনে হয় এক নূতন পন্থার উদ্ভাবন করেছেন। ইতস্তত রঙের ব্যবহার তুলির টানের ফের সত্যই বিস্ময়কর। রীতিই এখানে সব কথা নয়, সব কথা হচ্ছে প্রচ্ছন্ন কাব্য প্রকাশ। ঠিক-ঠিক রঙের ছোঁয়ায় এক অজানিত দূরত্ব ছবিতে ছবিতে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। আমরা সাধারণত জানি যে, যথার্থ সৌন্দর্য-বোধ তথা কাব্যবোধ মাটি, কাঠ, পাথর, কাগজের দৃঢ়তা ভেদ করে আসতে গিয়ে অন্য রূপ পরিগ্রহ করে, কিন্তু মধু সিরিজের ছবিগুলি দেখলে বোঝা যায় যে, কাগজের দৃঢ়তা কতগুলি সুসংযত টানে ভেঙে গেছে, সম্যক কাব্যবোধ প্রকাশিত হয়েছে।'

অবনীন্দ্রনাথ যে কত মিডিয়মে, কত পদ্ধতিতে তাঁর কাব্য উপলব্ধিকে রূপ দিয়েছেন, তার পরিচয় এ-প্রদর্শনীতে পাওয়া যায়। একথা সত্য যে, তাঁর সারা জীবন কেটেছে শুধু পরীক্ষায়, শুধু সন্ধানে। যে কাব্য তিনি তিলে তিলে অনুভব করেছিলেন, তাকে কি উপায়ে, যথার্থভাবে রূপ দেওয়া যায়, সে চিন্তা তাঁকে সমস্ত সময় জাগিয়ে রেখেছিল। কখনও জলরঙ, কখনও অয়েল,—কত দিশী পন্থা তো আছেই, তাছাড়া তুলি রঙের ব্যবহার, পূর্বদেশীয় রীতি, রকমারি কায়দা তিনি কাজে লাগিয়েছিলেন। একদা মনে পড়ে, খদ্দরের পাঞ্জাবি আঁকাতে গিয়ে খানিকটা খদ্দরের ছাপ দিয়ে দিলেন, এ-কথায় কোন সূত্রেই মনে করবার যো নেই যে, হোকুসাই তাঁর প্রেরণা। এখানে যে সকল ছবি আছে, তাতে কাগজের ব্যবহার অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। মাটি, কাঠ, পাথর ইত্যাদির গুণে যেমন রূপভেদ হয়ে থাকে, তেমনি কাগজও যে চিত্রশিল্পে নিজস্ব গুণ দিয়ে
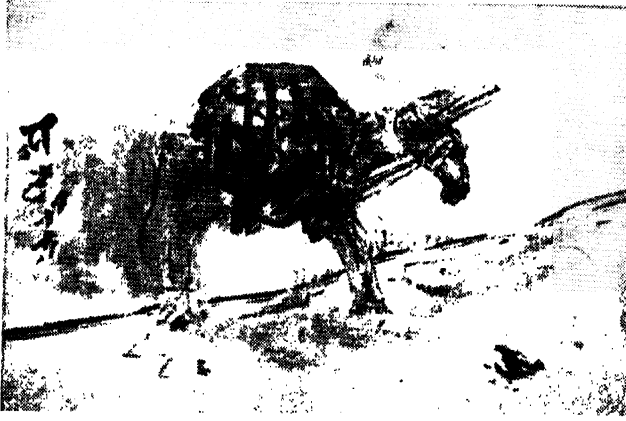
গাধা

রূপ ভেদ করতে পারে, সেকথা সত্যই আশ্চর্যের। বহুদিন যাবৎ কাগজের সাদাকে শিল্পীরা ব্যবহার করেছেন, কিন্তু তার কতকগুলি নিজস্ব স্বভাব আছে, তার এরূপভাবে ব্যবহার কদাচিৎ দেখা যায়, অবশ্য পূর্বদেশে কিছু কিছু এ বিষয়ে কাজ হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ কাগজকে অদ্ভুতভাবে ব্যবহার করেছেন। যথা 'উপানন্দ' ২৫নং, এটি পেস্ট বোর্ডে আঁকা (লেখা আছে উড)। কতক জ্যামিতিক টান, কিছুটা ফিরোজা—তার পর চোখে পড়ে পেস্ট বোর্ডের গা'কে তুলির ধরন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এরূপ চাতুর্য তাঁর বহু ছবিতেই আছে। যথা ৫৮নং 'ওয়াইন, য়ুওমান এণ্ড ওয়র'। এই ছবিটি তেল-রঙের। এখানে ছবির জমি ছেড়ে জামা হয়েছে এবং ফলে জমির বুটিতে বুটিদার জামা হয়ে গেছে, আবার এই ছবিতেই দেখা যাবে রঙের নিঃসংকোচ ছোট ছোট পোঁচ, কোথাও হাই লাইট এবং এই সমস্ত মিলিয়ে ছবির আদত ভাবটি ফুটিয়ে তুলেছেন।

নেপালী কাগজের উপর কাজ অনেক-গুলিই এ-কাগজের উপর আঁকা 'ধোপার গাধা'। কিঞ্চিৎ থাড়াই জমির দিকে একটি গাধা তার বোঝা নিয়ে চলেছে। এ ছবিটির ড্রইং, তুলির দুর্ধর্ষ টান, গাধাটিকে ঘিরে লাল আঁচড়—সব কিছুই আমাদের আকৃষ্ট করে। পাকা হাতের পদ্ধতির খেলা এক উচ্চ মার্গে পেঁীছেছে এবং সেই সঙ্গে কাব্যরসও আপন পথ পেয়েছে। বহুদিন পূর্বে তাঁর আঁকা 'অন্তিম যাত্রা' ছবির উটকেও মনে পড়ে। সেখানে যে বেদনা ফুটেছিল, এখানেও সেইরূপ বেদনাই পরিস্ফুট হয়েছে। আর একটি বিষয় এই ছবিতে লক্ষ্য করার আছে, সে হচ্ছে অবনীন্দ্রনাথের রসবোধ। গাধার অবস্থা দেখে একটি পাখি, সম্ভবত মুরগি, প্রাণভয়ে পালাচ্ছে। এই পাখি কালোতেই আঁকা তবু মনে হয় ওটা যেন অন্য আর এক রঙের খোঁচ। এ ছবি এক অপূর্ব রহস্যের সৃষ্টি করেছে, একথা নিঃসন্দেহ বলা যায়।

মধু সিরিজের মিনিয়েচার

৬৪নং—সাঁওতালী মেয়েটি লিনেন ফিনিশ কাগজে (কাপড়েও হতে পারে) আঁকা। এ-ছবির কাজ অন্যরূপ, সূক্ষ্ম তুলির কাজ এ-ছবিতে নেই। শুধু রঙ আর মোটা মোটা লাইন—একটু কচি কলাপাতা, ঈষৎ লাল এবং কৃষ্ণ পিঙ্গলে আর মোটা মোটা টানে সাঁওতালী মেয়ে ফুটে উঠেছে। তার সেই অদ্ভুত চোখ, কোল জাতীয় ঠোঁট, গালের ভাঁজ, কোন কিছুই বাদ পড়েনি। এর পরেই চোখে পড়ে ১৪নং ফ্লাওয়ার 'ফেস'। কাগজের গুণ কিভাবে সহায়তা করেছে, রঙকে প্রসঙ্গত টেনে নিলেও, চিত্রের আঙ্গিক কোথাও ব্যাহত হয়নি রঙ চুপসেছে, একথা মনে হলেও সেইখানেই আমরা থেমে যাই না অথবা অন্য রঙ আমাদের থামতেই দেয় না। গোলাপী রঙ, কিছু পানাসবুজ ক্রমে আমাদের একটি ফুলের সামনে নিয়ে যায়। ৩৬নং 'স্টাডি অফ এ ফেস' ছবিটি নেপালী কাগজে(?) করা বাদামী আর ফ্যাকাশে নীলে একটি দৃঢ় চরিত্রের ছবি। ছবিটির চারিদিকে অনেকটা সাদা ছেড়ে দেওয়া হয়েছে এবং ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় আলেখ্যটি এত উজ্জ্বল যে, জলরঙের ছবিতে খুব অল্পই চোখে পড়ে।

৫১নং 'ফ্লাওয়ার অফারিঙস' ফিরোজা রঙের ব্যবহার এবং ৬৫নং 'পিকক' ছবি কচি কলাপাতা ও অল্প বেগুনী ধোয়ানী, তার রঙ ব্যবহারের অসম্ভব দক্ষতার পরিচয় দেয়।

একাডেমি অফ ফাইন আর্টসকে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করার জন্য আমরা ধন্যবাদ জানাই, সেই সঙ্গে একথাও বলা প্রয়োজন যে, ছবিগুলিকে ভদ্রভাবে সাজাবার কলাকৌশল সম্পর্কে কিঞ্চিৎ সচেতন হলে দর্শকদের অন্তত অনেক সুবিধা হয়।

—কমল মজুমদার

মহিলাদের চিত্রপ্রদর্শনী

কয়েকদিন আগে গভর্নমেণ্ট ইণ্ডাস্ট্রিয়াল মিউজিয়ম-এ ক্যালকাটা আর্ট সোসাইটির পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় ৭০ জন মহিলা শিল্পীর একটি চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল। সবসুদ্ধ ১৯৪টি ছবি প্রদর্শন করা হয়। মেয়েদের ছবির আলাদা

করে প্রদর্শনী করার সার্থকতা কি বুঝলাম না। চিত্রাঙ্কনে মহিলারা কি সত্যিই পিছিয়ে আছেন! এ'রা যদি বিশেষ কোনও একটি গোষ্ঠীভুক্ত হতেন তা হলেও বুঝতাম, এ'দের পরীক্ষা নিরীক্ষা জনসাধারণের দৃষ্টি গোচরে আনবার জন্য প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু দেখলাম ছবিগুলি বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত এবং নানান ধারায় অঙ্কিত। 'মহিলা শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত' এই লেবেল লাগিয়ে এখনও পৃথকভাবে ছবি প্রদর্শন করার প্রয়োজন আছে, এ যুক্তি সমর্থন করতে পারলাম না। প্রদর্শনীটির মান খুব উন্নত ধরনের হয়নি। ত্রুটিপূর্ণ সংকলনই বোধ হয় এর কারণ। কয়েকটি ছবি আদৌ দর্শনীয় নয়। বিশেষ করে ইন্দুরাণী সিংহের 'ইন এ বাই লেন' ছবিটি রীতিমত দৃষ্টিকটু। আজকাল মেয়েদের মধ্যে অনেকেই 'ন্যুড' আঁকছেন এবং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখতে পাই যৌন চেতনা উদ্দীপক ছবির সৃষ্টি করতে পারলেই এ'রা মনে করেন কৃতকার্য হয়েছেন। কোন কোন ফরাসী শিল্পীর ছবি থেকে অশ্লীলতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু সে সব ছবি সুকুমার শিল্প হিসাবে এতই সমৃদ্ধ যে ঐ অশ্লীলতা সহজেই উপেক্ষা করা যায়। কিন্তু 'ইন এ বাই লেন'-এর মত ছবি থেকে অপবিত্রতাটুকু বাদ দিলে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকে না।

শানু লাহিড়ীর ছবিগুলি ভাল তবে ছবিগুলির নিচে কোনও ফরাসী শিল্পীর স্বাক্ষর থাকলেই মানান সই হ'ত। সুধা মুখোপাধ্যায় অঙ্কিত ছবিগুলি থেকে শিল্পীর বয়স অনুমান করা খুব শক্ত; মনে পড়ে কিছুদিন আগে ঐ ধরনের কয়েকটি ছবি শিশুদের চিত্র প্রদর্শনীতে দেখেছিলাম। শীলা অডেন তাঁর স্বকীয় বৈশিষ্ট্য অক্ষুন্ন রেখেছেন। বিশেষ করে তাঁর 'নোয়াজ আর্ক' ছবিটি চমৎকার। এক্সপ্রেশনিস্ট কায়দায় কমলা রায়চৌধুরীর 'স্টিল লাইফ' রচনাটি প্রীতিকর। এলেন শী যথেষ্ট প্রখ্যাত শিল্পী এবং তিনি স্বীয় মান বজায় রেখেছেন। ফতেমা ফয়জলভায়ের পুষ্পগুচ্ছ রচনাগুলি অপূর্ব লাগল। কি রঙ বিন্যাসে, কি আঁচড়ে তিনি নিজেকে রীতিমত পরিণত শিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হয়েছেন। এমন মনোরম বর্ণবহুল রচনা আজকাল ক্রমশই বিরল হয়ে পড়ছে। ভাস্কর্যে কিরণ বড়ুয়া কৃত মূর্তিগুলি সবচেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। বিশেষ করে 'হ্যাপি পেয়ার' নামক বানর যুগলের মূর্তিটি খুবই আনন্দদায়ক। ইন্দু লাঘেতের 'আনন্দময়ী' এবং 'নিগ্রোহেড'ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভারতীয় চিত্র ধারায় অঙ্কিত ছবির মধ্যে খুব আকর্ষণীয় কিছু চোখে পড়ল না। সবই চলন সই গোছের এবং ছবিগুলি থেকে শিল্পীর স্বাক্ষর মুছে দিয়ে সব ক'টি ছবি অনায়াসেই একজন শিল্পীর অঙ্কন বলে চালিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কোনও ছবির মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করলাম না।

Its very calmness and detachment leaves one cold. It is too exquisite, too inhuman ......It is made of lines as subtle as silken thread blown on paper and tones as elusive as smoke of cigarettes.

'টাইম অ্যান্ড টাইড' পত্রিকার চিত্র-সমালোচক এরিক নিউটনের প্রাচ্য শিল্প সম্বন্ধে এই মন্তব্যটি এখানে প্রদর্শিত ভারতীয় চিত্রগুলি সম্বন্ধেই ঠিক প্রযোজ্য। এই বিভাগে হাসিরাশি দেবীর 'রাতের চাঁদ', সরমা ভৌমিকের 'গ্রুপ অব উইমেন উইথ চিলড্রেন', এবং সরলা মাথুরের 'বধূ বরণ' অপেক্ষাকৃত উন্নত মনে হ'ল।

ছাত্রীদের মধ্যে সত্যিকার প্রতিভা লক্ষ্য করলাম না। কয়েকজনের মধ্যে প্রতিভা থাকলেও, যে কোন কারণেই হোক, তা পূর্ণ বিকাশ লাভ করতে পারছে না। স্কেচ ছবিগুলি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বটে কিন্তু খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় অ্যানাটমি সম্বন্ধে শিল্পীদের জ্ঞান অত্যন্ত কম। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য শিল্পী হলেন বিজয়া মুখোপাধ্যায়, গীতা দাশ, গৌরী দত্তরায়, প্রতিভা টনডন, শান্তি বসু রায় এবং শিউলী ভট্টাচার্য।

—চিত্রগ্রীব

বোম্বাই

জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে দুইটি চিত্রপ্রদর্শনী এক সঙ্গে হয়ে গেল। প্রথমটি মহিলা শিল্পী শ্রীমতী গার্ডনার লুইস-এর একক চিত্র প্রদর্শনী, অপরটি "অভিনব কলা কেন্দ্র"র সভ্যদের চিত্র প্রদর্শনী। মিসেস লুইস শিল্পীরূপে ছদ্ম নামে পরিচিত এবং সে নাম ভি ভি কোয়েনু। তাঁর প্রদর্শনীতে সব সুদ্ধ ৮০টি রচনা প্রদর্শিত হয়েছিল। তার মধ্যে তেলরঙ ও গুয়াশ ৫৬টি, প্যাস্টেল ও চারকোল-এ প্রতিকৃতি ৪টি, জলরঙে ৮টি ও সাদা চতুষ্কোণ টালির উপর আঁকা ১২টি ছবিও ছিল। দুইটি ছবি ছাড়া আর সমস্তই অত্যন্ত বাস্তবধর্মী মনোভাবে আঁকা, এমন কি ফটোগ্রাফীকেও হার মানায় আর একেবারে ঝকমকে রঙের মেলা। ছবির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য অসাধারণ। ফুল, জীবজন্তু, পাখি, প্রাকৃতিক দৃশ্য, স্টিল লাইফ, প্রতিকৃতি ইত্যাদি কত কি।

বাস্তবধর্মী ছবিগুলি আঁকায় মুনশীয়ানার প্রশংসা না করে পারা যায় না। ইংলিশ স্কুল'-এর ধরনে আঁকা সব ছবি, যাতে হৃদয় বা মনের কোনই স্থান নেই।

সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা অভিনব কলাকেন্দ্রের সভ্যদের বেশীর ভাগ রচনাই প্রদর্শনের অযোগ্য। তথাকথিত "বেঙ্গল স্কুল" ও আচার্য নন্দলালের প্রভাব সর্বত্র বর্তমান, কিন্তু বেশী ভাগ ক্ষেত্রেই তা হয়ে দাঁড়িয়েছে অত্যন্ত দুর্বল ও নিকৃষ্ট অনুকরণ আর ছবির বিষয়-বস্তুও সেই একঘেয়ে, কোনই বৈচিত্র্য নেই। ভারতীয় পদ্ধতিতে আঁকা বহু শিল্পীর ছবিতে দেখি সেই একই বিষয়বস্তুর সমাবেশ হয় রামায়ণ মহাভারতের কোন ঘটনা, নয় "প্রসাধনরতা" জাতীয় কোন ছবি। বিরাট বিশ্বের দিকে তাকিয়ে দেখলে ও সব ছাড়াও কত কি যে আঁকবার আছে তা এরা এখনও খুঁজে নিতে পারছে না। এদের ছবি একঘেয়ে লাগার একটা কারণও তাই এবং এই রকম অনুকরণকারীদের জন্যই তথাকথিত বেঙ্গল স্কুলের প্রতি অনেকের বিতৃষ্ণা এসে গেছে। ৮৫টি ছবির মধ্যে খুবই কৌতূহলোদ্দীপক ও ভাল লাগল শ্রী এম পাণ্ডিয়ার ছবি কটি বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের জন্যই। যেমন—'Anyhow we must accomodate our guests,' একটিমাত্র ঘরে বহু স্ত্রীপুরুষ শিশু ঘুমিয়ে আছে, এদিকে সেদিকে, যা হামেশাই হয় আজ-কালকার দিনে শহরের ছোট বাসায়। অপর ছবিটি 'Beggers on Eclipse day'. তাছাড়া প্রদর্শনীতে আর কিছু উল্লেখ-যোগ্য পেলাম না।

'ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক যুক্ত আলোকচিত্র প্রদর্শনীটি'র ছবির মান অন্যান্য আলোকচিত্র প্রদর্শনীর চাইতে অনেক বেশী। এই অঞ্চলের ছয়টি বিভিন্ন 'আলোকচিত্র সংঘ' মিলিত হয়ে, এই প্রদর্শনীর আয়োজন করে, যাতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের তোলা ২৩৭টি আলোকচিত্র ছিল। বহু বিচিত্র বিষয়-বস্তু ছিল এই সব ছবির। সব কটিই কিন্তু কেমন যেন সাজানো গোছানো ভাবে তোলা, মেকানিক্যাল্। টেক্‌নিক্ কম্পো-জিশন ও অন্যান্য সব কিছুতেই হয়ত কোন ত্রুটি নেই, তবুও এই সব ছবি কেমন যেন অবাস্তব, প্রাণের স্পন্দন নেই। এই কারণেই বিভিন্ন আলোকচিত্র প্রদর্শনীর ছবি আমার ভাল লাগে না। সমস্ত ছবি-গুলির মধ্যে মাত্র দুটি ছবি এখনও মনে পড়ে, তা হচ্ছে একজন চীনাশিল্পীর তোলা। ছবি দুটিকে মনে হয় চীনা কালিতে আঁকা সাদাকালো দুইটি চিত্রকলা, একটিতে গাছের ডালে পাখি বসে আছে, অপরটিতে দুজন লোক মাছ ধরছে। কোনো বিশেষ টেক্‌নিকে শিল্পী আলোক-চিত্রে চীনা ছবির কমনীয়তা নিয়ে এসেছেন।

এর পর আরও একটি চিত্র প্রদর্শনী হল, দুজন বিদেশী মহিলার, লেডী কে ও তাঁর কন্যা মিসেস্ প্যাজেট-হর্বলিন্। প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন স্যার কাওয়াসজী। এঁরা দুজনেই শখের শিল্পী, সেইজন্য বেশী কিছু আশা করিনি। লেডী কে'র প্রাকৃতিক দৃশ্যচিত্রগুলি অত্যন্ত মামুলী। তাঁর কন্যার আঁকা ছবির বেশী ভাগই প্যাস্টেল ও জলরঙে আঁকা প্রতিকৃতি। কোনই বিশেষত্ব নেই।

এই প্রসঙ্গে এখানকার পত্রপত্রিকায় চিত্র প্রদর্শনীর সমালোচনার দীনতা সম্বন্ধে কিছু বলতে হল। এর মধ্যে বম্বে আর্ট সোসাইটির বাৎসরিক চিত্র প্রদর্শনী ও অন্যান্য আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী হয়ে গেল, কিন্তু কোন কাগজেই এ বিষয় কোন কিছু ছাপা হল না। শিল্প সমালোচকরাও নীরব। হঠাৎ এরই মধ্যে মিসেস্ লিউস্-এর অতি সাধারণ প্রদর্শনীর এক শিল্প সমালোচনা বেরোল বিখ্যাত ইংরাজী দৈনিকপত্রে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে অথচ আমার কাছে এই ছবিগুলির একমাত্র আখ্যা হতে পারে 'Pot Boiler' বলে। বিদেশীরাই এখান-কার চিত্রকলার জগতের কলকাঠি এখনও নাড়ছেন। পক্ষপাতিত্বকারী এই সব শিল্প সমালোচকদের লেখা সাধারণ দর্শকদের ধোঁকা দেয়, বিভ্রান্ত ও প্রভাবান্বিত করে। আরও লক্ষ্য করছি, গুণী ভারতীয় শিল্পীদের প্রদর্শনীর খবর সংবাদপত্রে স্থান না পেলেও, এইসব বিদেশী শিল্পীর Pot-Boilerগুলির জন্য সংবাদপত্রে ডঙ্কা জোরেই বাজে; দুঃখের কথা যে, পত্রিকাগুলি ভারতীয়দেরই পরিচালনাধীন।

—চিত্রসেন
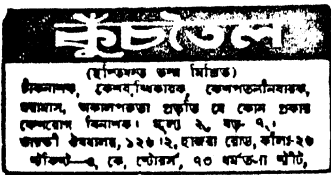
ঈজি স্ট্রীট তো স্তম্ভিত। অত বড় একটা গুন্ডাকে এইভাবে ঠান্ডা করে দেওয়া তো আর সহজ ব্যাপার নয়। চার্লির প্রতিপত্তি খুব বেড়ে গেল সকলের কাছে। রাতদিন তিনি এখন ঈজি স্ট্রীটে টহল দিয়ে বেড়ান, লক্ষ্য রাখেন কোথাও অন্যায় কিছু ঘটছে কিনা। একদিন এইভাবে ঘুরতে ঘুরতে তাঁর চোখে পড়ল, একটি মেয়ে এক খন্ড মাংস চুরি করে পালাচ্ছে। তার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন চার্লি। কিন্তু মেয়েটির দুর্দশার কাহিনী শুনে তাঁর মন ভিজে গেল। মাংস চুরির জন্যে তাকে তো তিনি কিছু বললেনই না, উল্টে নিজেই কিছুটা সবজি চুরি করে নিয়ে এসে তাকে দিয়ে দিলেন। খানিক বাদে দেখতে পাওয়া যায়, চার্লি এক বস্তিবাড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে আছেন। এক দরিদ্র দম্পতি তাদের দশটি সন্তান নিয়ে এখানে কায়ক্লেশে দিনাতিপাত করে। একটিমাত্র ঘর; সেইখানেই তারা খায়, ঘুমোয়। রোগা ছেলেমেয়েগুলির দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন চার্লি, তাদের অসহায় পিতাকে একবার দেখলেন। তার সামনে গিয়ে তার হাতের মাসল পরীক্ষা করে দেখলেন চার্লি; তারপর নিজের হাত থেকে পুলিশ-ব্যাজটাকে খুলে নিয়ে তার হাতে পরিয়ে দিলেন। ছোট্ট এই দৃশ্যটিতে ভারী সুন্দর একটি করুণ রসের ছোঁয়া লেগেছে।

মীউচুয়ালের হয়ে আরও তিনখানি ছবি তিনি তৈরি করেছিলেন। তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছবি "দী ঈমিগ্র্যান্ট"। পরবর্তী-কালে মহত্তর যে-সব বই তিনি তুলেছেন, এই বইয়ের মধ্যেই তার খানিকটা আভাস পাওয়া যায়।

প্রথম দৃশ্যে দেখা যায়, একদল লোক তাদের জন্মভূমি ত্যাগ করে জাহাজযোগে অ্যামেরিকায় চলেছে। অ্যামেরিকায় গিয়ে তারা বসবাস করবে। চার্লিও তাদের মধ্যে আছেন। জাহাজের মধ্যে তাদের খাওয়ার দৃশ্যটি খুব উপভোগ্য। সবাই দলে খেতে বসেছে, এমন সময় ঢেউয়ের দোলানিতে তাদের খাবার-প্লেটগুলি টেবিল থেকে ছিটকে বেরিয়ে গেল। ছিটকে যাবার পূর্ব-মুহূর্তেও সবাই

"দী ঈমিগ্র্যান্ট" চিত্রের শুটিংয়ের ফাঁকে দুই ভাই (সীডনি আর চার্লি) বসে বিশ্রাম করছেন

নিচ্ছে, এ-দৃশ্যটি কারও ভুলে যাবার কথা নয়।

পরের দৃশ্যটিতে দেখতে পাওয়া যায়, আশ্রয়প্রার্থীদের মধ্যে এক বৃদ্ধা আর তার মেয়ে (এডনা) বসে বসে অশ্রুমোচন করছে। কান্নার কারণ, এক জুয়ারী তাদের পয়সাকড়ি সব লুটে নিয়েছে। চার্লি করলেন কি, আর একজনকে ঠকিয়ে কিছু পয়সা নিয়ে এলেন। সমস্ত পয়সাই এডনার অলক্ষ্যে তার পকেটে ঢেলে দিলেন তিনি। তারপরেই তাঁর মনে হল, সমস্ত পয়সাই এডনাকে দিয়ে দেওয়া ঠিক হল না, কিছুটা অংশ তাঁর নিজের জন্য রেখে দেওয়া উচিত ছিল। তখন এডনার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিয়ে যেই না আবার অল্প কিছু পয়সা বার

চক্রদত্ত

"কেন ফুল ফোট তুমি কেন যাও ঝরে?" দুনিয়ার মানবের চিরন্তন প্রশ্ন। এই ক্ষণস্থায়ী ফুলকে চিরস্থায়ী করে রাখার জন্য মানুষের চেষ্টার অন্ত নাই। ডাচ দেশে উইলিয়ম বেকার নামে একটি লোক একটি ছোট্ট গ্রামে বাস করতেন। নানা রকম জন্তু জানোয়ারের মৃতদেহ বৈজ্ঞানিক প্রথায় সংরক্ষিত করা তার একটি শখ ছিল। জীবজন্তু সংরক্ষণ করতে করতে একদা তাঁর উদ্ভিদ জগতের প্রতি দৃষ্টি পড়ে। জগতের সুন্দর সুন্দর ফুলগুলি চিরস্থায়ী করে রাখার শখ তার মনে জাগে। এই বিষয়ে তিনি দশ বৎসর যাবৎ গবেষণা করেন। দশ বৎসর পরে তিনি সাফল্য লাভ করেন। গাছপালার রস, অন্যান্য কয়েকটি রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে তিনি একটি তরল পদার্থ তৈরী করেন। যে সব গাছ বা ফুল তিনি সংরক্ষণ করতে চান সেগুলিতে এই পদার্থ ইনজেক্ট করেন এবং দেখা যায় যে, ঐ ইনজেকশন দেওয়া গাছ ও ফুল জীবন্ত গাছ ও ফুলের মতোই সজীব ও সতেজ থাকে। এইভাবে ফুলদানিতে বহুকাল ফুল রেখে দেওয়া যায়।

*

কবি গেয়েছেন, "খুলিও হৃদয়-দ্বার খুলিও"। বৈজ্ঞানিক এই উক্তির বাস্তব রূপ দিয়েছেন। জনৈক রাশিয়ান প্রফেসর ক্রুসোভস্কি মাথার খুলির কিছুটা অংশের বদলী কোন কৃত্রিম মাথার খুলির ব্যবহার আবিষ্কার করেন। কৃত্রিম অংশটি প্লাস্টিকের চাদর দিয়ে তৈরী হয়। প্রফেসর ক্রুসোভস্কি লক্ষ্য করে দেখেছেন যে, এই কৃত্রিম খুলির মধ্য দিয়ে রক্ত চলাচল ইত্যাদি সমস্ত কিছুই স্বাভাবিকভাবে হতে থাকে। এই ব্যাপারটি লক্ষ্য করে প্রফেসর সিনিৎস্যা হৃদযন্ত্রের সামনে একটি কৃত্রিম কাঁচের স্বচ্ছ জানলা লাগানর ব্যবস্থা করেছেন। এর দ্বারা হৃদযন্ত্রের মধ্যের সমস্ত ক্রিয়া কর্ম বিনা অস্ত্রোপচারে স্বচ্ছন্দে পরিলক্ষণ করা যায়। এই জিনিসটা তিনি প্রথম একটি কুকুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখেন। আরও পরীক্ষা নিরীক্ষার পর যদি এই ব্যবস্থার প্রচলন হয় তাহলে মানুষের খুবই উপকার হয়। তাহলে এই হৃদয়ের জানলা দিয়েই হৃদযন্ত্রের অবস্থা পরিলক্ষণ করা যায়। হৃদযন্ত্রের স্পন্দন সহজেই লক্ষ্য করা যাবে। সহসা অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে না।

*

"দ্রাক্ষা ফল টক" কথাটি শুধু মাত্র ধূর্ত শৃগালের উক্তি নয়। বাস্তবিক পক্ষে দ্রাক্ষা ফল মাত্রই অম্ল মধুর। খুব মিষ্ট আঙ্গুরের মধ্যেও টক রস থাকে। আঙ্গুরের মধ্যে যে পদার্থটি বর্তমান থাকার দরুণ অম্লরসের উৎপত্তি, সেই পদার্থটি আজকাল রং করার কাজে লাগান হচ্ছে। দ্রাক্ষা রস পান করলেই মনে একটু রঙের আমেজ লাগে কিন্তু বস্তু জগতেও যে এই রং ধরান যায় এটি নতুন তথ্য। বৈজ্ঞানিকগণ পরীক্ষা করে দেখেছেন যে,

এই বিকটদর্শন জীবটি মৎস্যকুলের অন্তর্গত। ভারত মহাসাগরে দেখা যায়। জীববিজ্ঞানীরা এর নাম দিয়েছেন বৃশ্চিক-মৎস্য। কারণ জীববিজ্ঞানে বৃশ্চিক যে গণের অন্তর্ভুক্ত এটিও তাই। দেখতে বিছের মতনই শুধু নয়, এদের ধারাল পাখনাতেও বিষ থাকে। দেখতে ভয়াবহ হলেও ভোজ্য দ্রব্য হিসেবে অতি উপাদেয় এই বৃশ্চিক-মৎস্য। লণ্ডনের অলিম্পিয়াতে জলচর জীবদের যে প্রদর্শনী হচ্ছে তাতে এই উপাদেয় জীবটিকে রাখা হয়েছে

এই অম্ল রসের উৎপাদক বস্তুটি ঈষৎ হরিদ্রাভ, এর নাম ন্যারিঞ্জিন। ন্যারিঞ্জিনের কোনও স্বাদ নেই। কমলালেবুর মধ্যে হেস্‌পারিডিন বলে যে পদার্থটি আছে অনেকটা সেই ধরনের। এটা লাল-হলুদে রং করার কাজে লাগে। অবশ্য ন্যারিঞ্জিন দিয়ে সব কিছু বস্তু রং করা যায় না। আপাতত সরু পশম ও সিল্ক রঙাবার জন্য ন্যারিঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। এখন এই ন্যারিঞ্জিন দিয়ে কাঠ রং করার ব্যবস্থাও হচ্ছে। এই রংয়ের স্থিতিস্থাপকতা খুব বেশী। খুব চড়া রোদেও এই রং চটে যায় না, তাছাড়া এটা খুব সহজেই জলে গলে যায় আর রংটা খুব চক্ষুপীড়াদায়ক হয় না।

আলোচনা

'ভারতের প্রথম জাতীয় নাট্যোৎসব'

মহাশয়,

'দেশ' সাপ্তাহিকে ভরত দত্ত লিখিত বিস্তৃত ও সুচিন্তিত "ভারতের প্রথম 'জাতীয়' নাট্যোৎসব" প্রবন্ধটি সম্পর্কে কয়েকটি বিষয়ে সম্পূর্ণ একমত হ'তে পারলুম না।

জাতীয় নাট্যোৎসবে যেমন ভারতীয় প্রাচীন প্রচলিত পদ্ধতির নাটক—বাঙলার যাত্রা, মথুরার রাসধারি, উত্তর প্রদেশের রামলীলা, মহারাষ্ট্রের ললিতা, গুজরাটের ভাবি, অন্ধ্রের বুরাকথা বা কচিপুদি নাটক ইত্যাদি অভিনীত হওয়া উচিত ছিল, তেমনি ইংরেজ আমলের ইউরোপীয় পদ্ধতিতে মঞ্চে অভিনীত নাটক যা আজ দেড়শ বৎসরের উপর এদেশে চলেছে তা (আধুনিক বলা চলে কি?) বিজাতীয় বলে বিমুখ হলে বাস্তবতাকেই উপেক্ষা ক'রতে হয়। জাতীয় জীবনে ইতিহাস তার ছায়া রেখে যাবেই। তাই নাট্যাভিনয় বলতে আজ আমরা মঞ্চে দৃশ্যপট, পর্দা, আলোক-সম্পাত ইত্যাদির সাহায্যে অভিনয়কেই বুঝে থাকি এবং অন্যান্য অভিনয় পদ্ধতির মত এটাও আমাদের জাতীয় নাট্য-পদ্ধতির অঙ্গ-স্বরূপ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রাচীনপন্থীরা যেমন ভারতীয় ঐতিহ্যপূর্ণ নাটক পদ্ধতির পুনরুজ্জীবন করবার চেষ্টা করবেন এবং ভবিষ্যতে জাতীয় নাট্যোৎসবেও তার স্থান হওয়া উচিত—তেমনি প্রগতিপন্থী এবং উদারপন্থীরা নানা দেশ-বিদেশের মঞ্চের কলাকুশল আয়ত্ত করে যদি জাতীয় নাটকাভিনয়ে প্রয়োগ করেন তাতে কোন মারাত্মক ত্রুটি হবে বলে মনে হয় না। সংস্কৃতির আদান-প্রদান, গ্রহণ-বর্জনের মধ্যেই ত সজীব ও সক্রিয় মনের পরিচয় এবং প্রগতির ইঙ্গিত। ভারতীয় সংবিধানে স্বীকৃত ১৩টি ভাষায়, সংস্কৃত ও ইংরেজী নিয়ে ১৫টি ভাষায়, ভারতের প্রত্যেক অঞ্চলেরই নাটক দল নিয়ে "জাতীয় নাট্যোৎসব" হয়েছে।

গত জাতীয় নাট্যোৎসবে ১৫টি ভাষায়, ২২টি নাটক অভিনীত হয়েছে। তাতে প্রায় ৮০০ অভিনেতা-অভিনেত্রী যোগ দিয়েছিলেন। এক এক দলে গড়ে ৪০ জন করে শিল্পী ছিলেন। অর্থাভাব ও স্থানাভাবের দরুণ ৮০০ জন শিল্পীকেই একসঙ্গে মাসাধিককাল নাট্যোৎসবে দিল্লীতে রাখা সম্ভব হয়নি। দলে দলে নাট্য সম্প্রদায় এসে নির্দিষ্ট দিনে অভিনয় করে গেছেন। এই যাওয়া আসার মধ্যে ২।৩ দিন দিল্লীতে থাকাকালীন একদল আর একদলের নাটক দেখবার সুযোগ পেয়েছেন এবং নাট্যোৎসবে এক মাস প্রতি রবিবার প্রাতে নাটক সম্বন্ধে আলোচনার যে আসর বসেছে তাতে যোগ দিতে পেরেছেন।

নাট্যোৎসবের উদ্যোক্তা হিসেবে সঙ্গীত-নাটক-একাদামী মাত্র ১০,০০০৲ টাকা সাহায্য করেছে। নাট্যোৎসবে প্রায় মোট ৬৫,০০০৲ টাকা খরচ হয়েছে। বাকী টাকা নাট্যোৎসবের ব্যবস্থাপক দিল্লী নাট্য সঙ্ঘকে টিকিট বিক্রী, দান সংগ্রহ করে ব্যবস্থা করতে হয়েছে। এখানে প্রশংসার সঙ্গে উল্লেখ করতে হয়, আসাম, মণিপুর, উড়িষ্যা ও হায়দরাবাদ গভর্নমেণ্ট রাজ্য নিজ নিজ নাট্যদলকে অর্থ সাহায্য করেছে। অন্যান্য রাজ্যও আশা করব ভবিষতে এই বিষয়ে উদাসীন থাকবে না।

জাতীয় নাট্যোৎসবের জন্য নাটক নির্বাচনে বিভিন্ন ভাষায় মৌলিক রচনা, যার মধ্যে সেই ভাষাভাষীর সামাজিক জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় মেলে এমন নাটক গ্রহণ করা উচিত। বিশ্ববিশ্রুত ইংরেজী নাটকের ভাণ্ডার ছেড়ে গ্রীক নাটকের ইংরেজী অনুবাদ "ওডিপাস্ রেক্স" মৌলিক উর্দু নাটক ছেড়ে Sharidon-এর "The Rival"-এর উর্দু ভাষ্য "নয়ী রোশনী" নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ হয়েছিল। এটা অবাঞ্ছিত। একই কাহিনী অবলম্বনে বিভিন্ন ভাষায় নাটক অভিনয়, যেমন গত নাট্যোৎসবে আসামী "সোনিত কুমারী", তেলেগু "উমা পরিণায়ম্"—মনঃপূত নয়। আজকের দিনে ভারতীয় নাট্যোৎসবে স্ত্রী চরিত্রে পুরুষের অবতরণ আপত্তিকর। নাট্যোৎসবে শিশুদের নাটকেরও একটি বিশেষ স্থান থাকা দরকার। অভিনয় ও নাটক সম্বন্ধে আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় নাট্যোৎসবে সাজ-সজ্জার, মুখোশ, নানা যন্ত্রপাতি ও নাটক সম্বন্ধে গবেষণামূলক বইয়ের প্রদর্শনী হওয়া উচিত। জাতীয় নাট্যোৎসব বাৎসরিক হবার কথা শোনা যাচ্ছে। ভাল কথা। কিন্তু প্রতি বৎসরই এই উৎসব দিল্লীতে না হয়ে কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, লক্ষ্ণৌ ইত্যাদি শহরে ঘুরে ঘুরে হওয়া উচিত। ইতি—অজয়কুমার গুপ্ত, নিউ দিল্লী।

লালন শা'র গান

মহাশয়,

বাংলার বাউল লালন শা ফকিরের সম্বন্ধে আপনার পত্রিকায় কিছু আলোচনা ইতিপূর্বে দেখেছি। শিলাইদহ এবং ছেঁউড়িয়া গ্রামে একাধিকবার বেড়াতে গিয়ে বসে বসে শা ভক্তদের বহু গান শুনেছি। পরে জেনেছি যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং পরে মহম্মদ বরকতুল্লা ঐ সকল গানের বেশির ভাগই সংগ্রহ করেছেন এবং প্রকাশ করেছেনও।

কোনও এক রবিবারের বৈকালে সম্ভবতঃ সময়টাও বর্ষার আগেই—গিয়েছি শাহজীর আখড়ায় গান শুনতে। গান শুনলাম, সবই দেহতত্ত্ব এবং শুনলাম সাঁইজীরই রচনা। কোনো লেখা নেই। ভক্তদের মুখে মুখেই চলে আসছে। আমি নিজে লিখে নিতে চাইলাম, তাতে অস্বীকৃতি। পরে অনেক বলায় একাধিকবার গানটি গেয়ে শুনাল এক ভক্ত। সেই গানটা বড় সুন্দর আর বড় হৃদয়স্পর্শী। যদি গানটি কোথাও না সংগৃহীত হয়ে থাকে, তাহলে আপনি ওটাকে রক্ষার এবং প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করলে সমাজ ও দেশ উপকৃত হবে নিশ্চয়ই। গানটি তুলে দিচ্ছি। ইতি—

ভবদীয় দেবরঞ্জন বিশ্বাস

চাতক-স্বভাব না হ'লে
অমৃত মেঘের বারি
(শুধু) কথায় কি মেলে।

চাতক জাতির এমনি ধারা
তৃষায় জীবন যায়রে মারা,
তবু অন্য বারি খায় না তারা
থাকে, মেঘের জল ব'লে

মেঘে কত দেয়রে ফাঁকি,
তবু চাতক মেঘের ভুখী,
ঐ রূপেতে রাখলে আঁখি
অধর-চাঁদ মেলে।

আমার মন হ'য়েছে পবন গতি
উড়ে বেড়ায় দিবারাতি।
সাঁই লালন বলে গুরুর প্রতি
সদা রয় না মন, ভোলে।

সুর

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

মধুর সুরের ছায়া ছুঁয়ে গেলো মন;—
ঝকঝকে হীরের মতো রোদের আসন
ঘাসের বুকের 'পরে আঁকা।
আর, দূরে দিগন্তের দিকে আঁকাবাঁকা
একটি পাহাড়ী পথ গিয়েছে হারিয়ে।
পাইনের বন আর ঝর্ণা, নদী সমস্ত ছাড়িয়ে
যতোদূরে যাও,
তোমার দৃষ্টির থেকে সে পথ উধাও!

ফিরে এসে ফের যদি বসো তুমি নিজের টেবিলে,
জানালার কাচ থেকে আকাশের নীলে
দেখতে পাবে রেণু রেণু আলোর আগুন,
মনে হবে ফুলের ফাল্গুন
একটি মেয়ের মতো এসেছে তোমার ছোটো ঘরে।
সারা শরীরের ছন্দ কাঁপে তার চোখের সাগরে,
মুক্তো-মানিকের মতো চোখে আলো জ্বলে—
উন্মুখর নদীর সুরে যখন সে কিছু কথা বলে!

যখন ভোরের ভালোবাসা
মুছে নেয় রাতের কুয়াশা—
জ্বালে আলো, বাঁধে কোনো সুর;
তখন, তখন বহুদূর—
মাঠ-ঘাট দিগন্ত পেরিয়ে
কে যেন এখানে আসে কবিতার প্রতিশ্রুতি নিয়ে।

ভাবনার বোবা বুজরুকি
দু'হাতে সরিয়ে আমি সকালে চায়ের মুখোমুখি
বসে আছি চোখ-কান খুলে,
মনে হলো কেউ যেন কোমল আঙুলে
ছবি আঁকে ছন্দের ছায়ায়;
মুগ্ধ মমতায়
সুরের সংকে বাঁধে এই দিন, মধুময় দিন!
হঠাৎ ঘোষণা শুনি ঃ
শ্রীমতী শিশিরকণা বেতারে বাজায় ভায়োলিন্।

ঘুম

আনন্দ বাগচী

চম্পক জাগলো না, অন্ধকার ঘরখানা তার
সূর্যের ভিখারী ছিল গতকাল, পলাশ ভোরের
পথ চেয়ে, সব শেষ, চম্পক জাগবে না আর;
তারার লণ্ঠনে আর তেল নেই, এখন চোরের
মত লঘু পায়ে হাঁটে শেষ রাত। প্রলাপী বাতাসে
ফাল্গুন ছোঁড়ে না সেই অন্ধ-শর, মৃগয়া-ক্লান্ত সে।

দুপুরের অজস্র ঘুমে ঘুমিয়েছে যে যৌবন, তাকে
বারে বারে নাম ধ'রে পারুল দিদিই নাকি ডাকে।
স্বপ্নচুর এস্‌প্ল্যানেড্ ব্যস্ততার লালদীঘিময়
এখনো কি তার নামে চুপি চুপি জমেছে সময়?

হৃদয়টা প্রতারক, মাঝে মাঝে বানানো কথায়
চম্পক মিত্তিরের মনকে ভুলাতে বুঝি চায়।
ঘরের দেওয়ালে এলো আজ ফের কান্নার সকাল
মৃত্যু সেও ভালো ছিল, চম্পকের চাকরি গেছে কাল॥

৩৯

রুচি ধড়মড় করে উঠে বসল। আলো জ্বালল। দেখা গেল শিবনাথের মুখে হাসি।

'কি ব্যাপার?'

'সেসব কিছুই না।'

'ময়না কোথায়? হাসপাতালে ওরা ওকে নিয়ে গিয়েছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে ছোঁড়াগুলো থানায় ডাইরী করতে সাক্ষী হিসাবে ময়নাকে নিয়ে গেছে এরকম কিছু আভাস দিলে কি পারিজাত-বাবু? আমি বাড়ি ফিরতে না ফিরতে বলাই যেমন রাগারাগি করল, আর ওদিকে রায় সাহেবের ছেলে সরকারকে পাঠিয়ে তোমায় ডেকে নিয়ে গেল। ভাবলাম—কি জানি।'

'আরে দূর পাগল। হ্যাঁ, কথাটা বলল বটে পারিজাত। সেরকম কিছু হলেও পারিজাত ঘাবড়াতো না। একসঙ্গে তিনটে থানার ছোট ও বড় দারোগার মুখ বন্ধ করার মত তার টাকা আছে।'

শিবনাথ বিছানার একপাশে বসল। 'শোন বলছি। খুব মজা হয়েছে। এমন-ভাবে সবটা ঘটনার মোড় ফিরবে, পারিজাতও ভাবেনি। আমায় ডেকে নিয়ে এতক্ষণে ব্যাপারটা বলল। ওয়াণ্ডারফুল!' শিবনাথ সিগারেট ধরাতে পকেটে দেশলাই খোঁজে। রুচি এইমাত্র আলো জেলে দেশলাই হাতে নিয়ে বসে আছে। শিবনাথের হাতে সেটা তুলে দিয়ে বলল, 'তা পারিজাতের মামলা ভালর দিকে যাক কি খারাপের দিকে, তাতে আমাদের অবশ্য খুব একটা না ভাবলেও চলে। ওর টাকা আছে যখন, সব অবস্থাতেই সে নিরাপদ। আমার ভয় সেই ছেলে-গুলোকে দিয়ে। আমি ময়নাকে তখন হাসপাতালে যেতে নিষেধ করেছিলাম, এটার না অন্য অর্থ ধরে নিয়ে ওরা পারিজাতকে জব্দ করবার জন্য থানায় আমার নামটাও রিপোর্টে ঢুকিয়ে দেয়। আমি পারিজাতের দলের।'

শিবনাথ সিগারেট টানতে টানতে শব্দ না করে হাসে।

'রুনুর ব্যাপার শুনে আমার প্রথমটায় অবশ্য খুবই কষ্ট হয়েছিল। হ্যাঁ, কাল। কিন্তু তারপর, তুমি নিষেধ করেছিলে বলে না, অনেকগুলো কারণে অ্যাকসিডেণ্টের সত্য-মিথ্যা প্রমাণ করার দায়িত্ব মাথায় নিতে পারলাম না।'

শিবনাথ তথাপি নিঃশব্দে হাসে।

রুচি সেটা লক্ষ্য করেই যেন একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে বলল, 'সবচেয়ে বড় কথা, এ ব্যাপার নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার এবং ছুটোছুটি করার মতন সময় আমার একেবারেই নেই। দশটা-পাঁচটা ইস্কুলে পড়াতে হয়। ইস্কুল থেকে এসেও ঘরের এটা-ওটা করতে হয়, দেখতে হয়, পরের দিন বাজার খরচের পয়সা রাখলে আমার ইস্কুলে যাবার পয়সা মজুর দুপুরের দুধ-সুজিটুকুন এবং রাত্রে যাহোক তিনটে মুখের অন্তত দুখানা রুটি ও একটু ডাল-তরকারি যোগাড় রাখার চিন্তা নিয়ে যার ঘুমোতে যেতে হয়, তার পক্ষে আদর্শ-টাদর্শ রক্ষা করা হয় না বললেই চলে—অন্তত এই অবস্থায় মানুষ পারে না।'

শিবনাথ এবার শব্দ করে হাসল।

'অর্থাৎ, ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলতে চাইছ, যার স্বামী বেকার, তার পক্ষে পরোপকার করতে যাওয়াও বিপদ,—হা-হা, পরের ভাল করতে এখন আর আমার নিষেধ না, আমাদের আর্থিক অবস্থাটাই বড় রকমের বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এই তো?'

'যাকগে, এসব কথা দিয়ে কি হবে। রাত হয়েছে। তুমি খাবে না?'

শিবনাথ সেকথার উত্তর দিল না।

'না কি মহিলা কাল বাস ভাড়া সেধেছিল পর থেকে এ ব্যাপারে তোমার মন খারাপ?'

রুচি চুপ করে রইল। বিকেলে আজ বলাই যখন গণ্ডগোল করছিল, কথায় কথায় রুচি শিবনাথকে রুনুর মা'র ব্যবহারের কথাটা বলে ফেলে। যার জন্য রুনুকে দেখতে যাওয়ার ব্যাপারে সে খুব বেশি একটা উৎসাহবোধ করছিল না। ভেবেছিল স্কুল থেকে ফেরার পথে সময় পেলে একবার দেখে আসবে এবং ময়নাও তখন তার সঙ্গে হাসপাতালে যাবে।

'কি কথা বলছ না যে?' শিবনাথের ঠোঁটে আবার সেই শব্দহীন সূক্ষ্মহাসি।

'কি আর বলব।' রুচি চোখ তুলল। 'আমার কথা হচ্ছে, ভাল করার মধ্যে যেমন থাকতে পারলাম না, তেমনি মন্দ কিছুতেই আমি নেই, সেটাই চাইছি। ময়নাকে হাসপাতালে যেতে দেব না, এ ধরনের ইচ্ছা আমার কোন সময়েই ছিল না। সেই ছেলেগুলো না উল্টো বুঝে আমাকেও ষড়যন্ত্রের মধ্যে জড়ায় সে ভয় করছিলাম।'

'কিসের ষড়যন্ত্র, কোথায় ষড়যন্ত্র।' শিবনাথ মাথা নাড়ল। 'সেকথাই তো তোমায় বলতে তাড়াতাড়ি ছুটে এলাম। বড় মজার ব্যাপার হয়েছে রুচি।'

'কি?'

'আদর্শের কথা বলছিলে না? হা-হা, যার আদর্শ রাখবার কথা, সেই সব নড়চড় করে দিলে, আমি তুমি করব কি?'

'কি রকম?' রুচি একটা বড় ঢোক গিলল। 'কার কথা বলছ?'

'তোমার সেই ময়না।' শিবনাথ সিগারেটে শেষ টান দিয়ে জ্বলন্ত টুকরোটা জানালার বাইরে অন্ধকার উঠোনে ছুঁড়ে ফেলল। সারা বাড়ি আজ বড় নীরব। যেন সব ক'টা ঘর ঘুমে থমথম করছে! শিবনাথ নীচু গলায় বলল, 'খবর নিয়েছ কি। ময়না এতক্ষণে ঘরে ফিরেছে।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না—কেন শেষ পর্যন্ত কি করেছে ও?' রুচি অস্বস্তিবোধ করছিল।

'অবশ্য আর একটা আদর্শ রাখতেই ও এমনটি করল। না, ময়নার দোষ নেই।

তাছাড়া শেষ পর্যন্ত যা ও করেছে, আমি তো প্রশংসাই করি।'

'পরিষ্কার করে সব খুলে বল তো কি ব্যাপার? তুমি এত কথা কা'র কাছে শুনলে। ময়নার সংগে তোমার দেখা হল কখন—সেই ছেলে তিনটি কি—'

'বলছি সব বলছি শোন, এত অস্থির হলে চলবে কেন।' শিবনাথ আবার সিগারেট ধরাতে চায়, কিন্তু রুচির চোখে চোখ পড়তে নিবৃত্ত হয়। 'আমার সংগে ময়না বা রুনুর বন্ধুদের দেখা হয়নি। সব পারিজাতের কাছে শুনলাম। কি যেন নাম ছেলে তিনটির? সন্তোষ, জীবন, অসিত। এরা সব মস্ত বড় বড় লোকের ছেলে। সন্তোষের বাবা ভিয়েনার পাশ-করা প্রকান্ড বড় ইঞ্জিনীয়ার, অসিতের বাবা কলকাতার নামকরা ব্যারিস্টার, জীবন ছোঁড়ার বাবা কেবল এই শহর বলে না, তুমি বলতে পার—ইন্ডিয়ার মধ্যে ওয়ান অব দি বেস্ট হার্ট-স্পেশালিস্টস। হ্যাঁ, যেমন নাম, তেমনি তাঁর পয়সা। ডক্টর মধুসূদন নাগ।'

'তারপর?'

'এবং তিনি পারিজাতের একজন বিশেষ বন্ধু।'

রুচি হাঁ করে শিবনাথের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা শুনছিল। বলল, 'মধুসূদন, নিশ্চয়ই পারিজাতের সমবয়সী নন, যার এত বড় ছেলে জীবন। আমি তো দেখেছি।'

'তাই বলে কি তিনি পারিজাতের বন্ধু হতে পারেন না। তা তুমি ধরেছ ঠিক। সিনিয়র লোক। আসলে মধুসূদনের সংগে পারিজাতের বাবার—হ্যাঁ, আমাদের রায় সাহেবেরই বন্ধুত্বটা, কিন্তু অন্য দিক থেকে তিনি এখন পারিজাতের বিশেষ ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছেন। বলছি।'

শিবনাথ আর ইতস্তত না করে নতুন সিগারেট ধরাল।

ডক্টর নাগ তিনজনকে পাকড়াও করলেন সার্কুলার রোডের ওপর। হ্যাঁ, ওরা ময়নাকে সংগে নিয়ে ক্যাম্বেল হাস-পাতালের দিকে যাচ্ছিল। ঠিক তখন নিজের গাড়িতে করে মধু-সূদনও সেদিক দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলেন। আর দুটি ছেলে এবং একটি মেয়ের সংগে জীবনকে এভাবে হঠাৎ রাস্তায় দেখে তিনি অবাক। গাড়ি থামিয়ে তাদের কাছে ডাকলেন। তাদের লীডার সন্তোষের মুখে সব শুনে মধুসূদন মাথা নাড়লেন—জিহ্বায় কামড় দিলেন: 'তোমরা ছেলেমানুষ। ভেতরের খবর কিছু জান না। জানবার কথাও না। পারিজাতের সংগে আমার—আমাদের একটা নতুন সম্পর্ক দাঁড়িয়েছে। হ্যাঁ, আমি পলিটিক্সের কথা বলছি। খুব সামনেই ইলেকশন। আজ পারিজাতবাবু ও'র এলাকা থেকে রিটার্ন হন, এই আমাদের সকলের ইচ্ছা এবং চেষ্টাও। কেন আমাকে এখন তোমরা প্রশ্ন করবে না।'

মধুসূদন চোখ বুজে ছেলেদের বুঝিয়েছেন। 'রাজনীতি অত্যন্ত প্যাঁচালো জিনিস।'

'ওরা বুঝি বলছিল, পারিজাত একটি ছেলেকে গাড়ি চাপা দিয়ে, সেটা এখন চেপে যাচ্ছে?' রুচি প্রশ্ন করল।

শিবনাথ ঘাড় নাড়ল। 'সন্তোষের ইচ্ছা ছিল তখনি থানায় গিয়ে সব ব্যাপার ফাঁস করে দেয় এবং খবরের কাগজে রিপোর্ট পাঠায়।'

'ডক্টর নাগ বাধা দিলেন?'

'না দিয়ে উপায় ছিল না, কেননা, এভাবে পারিজাতবাবু এখন এক্সপোজড হয়ে পড়লে ইলেকশনে অপজিট পার্টি-গুলো এটাকে সুন্দরভাবে কাজে লাগাবে।'

'সন্তোষের দল তাই মেনে নিলে?'

'বলছি, হুট্ করে কি তরুণের দল তা মানতে চায়। সন্তোষ মধুসূদনের প্রস্তাব শুনে মাথা নেড়ে বলছিল—আপনার যুক্তি একদিক থেকে সত্য জ্যেঠামশাই। আপনাদের পার্টির ইন্টারেস্টে আমরা হয়তো এটাকে ওভারলুক করব। কেননা, অ্যাকসিডেন্ট ইজ অ্যাকসিডেন্ট। ধরে নিলাম, ইচ্ছা করে তিনি রুনুকে গাড়িচাপা দেননি এবং এটা সত্য, কলকাতা শহরে রাতদিন বহু লোক এভাবে চাপা পড়ে কেবল ইনজিউরড না, মারাও যাচ্ছে অনেক। সব সময় যে গাড়ি চালায়, তার দোষ না-ও হতে পারে। কিন্তু একে এখন আমরা কি বলে বোঝাই। ওতো রাজনীতি বুঝবে না। দেখুন কেমন কাঁদছে।'

'ময়নার কথা বলছিল বুঝি সন্তোষ?' রুচি অল্প হাসল।

'হ্যাঁ' শিবনাথও ঠোঁট টিপল। বলছিল, জ্যেঠামশাই, রুনুর জন্যে আমি যত না বেশি মুভড্ হয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশি লাগছে এর অবস্থা দেখে, আমার চোখে রীতিমত জল আসছে।' রুমাল দিয়ে চোখ মুছে সন্তোষ পরে ডক্টর মধুসূদনকে বলে, আমি অত্যন্ত সেণ্টিমেণ্টাল, হ্যাঁ লভ এফেয়ার্সে, আবার তেমনি কড়া রুনু হয়তো বাঁচবে না, কিন্তু এর, এ কোমল মেয়েটির প্রেম এভাবে ধুলিসা করে দিলেন আপনাদের পারিজাতবাব তার জন্য তিনি কি ক্ষতিপূরণ দেবে এটাই আমার এখন জিজ্ঞাস্য—কি বলি তোরা, জীবন, অসিত? শুনে জীব অসিত মাথা নেড়েছিল।'

'কি বললেন ডক্টর নাগ তার উত্তরে রুচি সকালে ছেলেটির আরো পরি পেয়েছিল। হেসে শিবনাথকে বল 'দু-দুবার তিনি ম্যাট্রিকে ফেল করে এ সিনেমার জন্যে প্রেমের গল্প লিখছে

'তা, কার কোন্‌দিকে প্রতিভা, বলতে পার না রুচি। এই ছেলেই একদিন নামকরা একজন নভেলিস্ট নাট্যকার না হবেন, তা তুমি কি করে ব

রুচি চুপ করে রইল।

'যাকগে, এখন ডক্টর নাগ—হ্যাঁ, তো বলি রুচি, জিনিয়স যাঁরা, তাঁরা বড় সব বিষয়ই এমন সুন্দরভাবে টে করতে পারেন, যা হয়তো কোনদিন অ কল্পনাও করতে পারি না। যখন সম সমাধান হয়ে গেল তখন ভাবি কত সহজ কত বেশি স্বাভাবিক। পারি আমায় সেকথাই তখন বলছিল। র কথা শুনেই মধুসূদন ময়নার দিকে তা এবং গাড়ির জানালা দিয়ে হাত বা তার মাথায় তা রেখে একটু সময় চুপ পরে আস্তে আস্তে বুঝিয়েছেন,— কখনো মরে না। আকাশ বাতাস ব বালি ঘাস ফুল পশু পাখি পোকা শরতের রোদ শ্রাবণের ধারা চৈত্রের শ পাতা এমন কি এখানে শহরের এই গরম পেভমেণ্টের চলমান কলমুখর জ স্রোতের মধ্যে সে বেঁচে আছে বেঁচে যদি তুমি তাকে বাঁচিয়ে রাখতে তোমার বাঁচিয়ে রাখার ইচ্ছার মধ্যেই প্রাণ তার স্পন্দন। রুনু যদি না-ও ব

'এত সব কঠিন কথা ময়না বু

'বোঝালেই বোঝে। তেমন করে তুমি আমি বোঝাতে পারব কি।' শিবনাথ পায়-চারি করছিল। রুচির সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'অত্যন্ত বড়লোক তাই এত উদার মন আর কী ফ্রি কথাবার্তা। ময়নার হাত ধরে বললেন, এই যে আমাদের সন্তোষ, তোমার ভালবাসার কান্না দেখে এই মাত্র চোখের জল ফেলল, সেই জলের ফোঁটার মধ্যে প্রেম নতুন করে জীবন পেল,—জিজ্ঞেস কর ওকে একবারটি। কেমন হে সন্তোষ?'

'তারপর?' রুচি এবার শব্দ ক'রে হেসে ফেলল।

'না, না, হেসো না। কথা হচ্ছে যে কেমন চমৎকারভাবে তিনি মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিলেন সেটা একবার চিন্তা কর।'

'জিজ্ঞেস করেছিল ময়না সন্তোষকে তা?'

'তা আর জিজ্ঞেস করতে হয় না। কোন মেয়েই করে না। বলতে কি সন্তোষের দিকে ওর তাকানো দেখেই তো ডক্টর নাগ বুঝে ফেলেছিলেন।'

'হার্ট স্পেশ্যালিস্ট কি না।' রুচি মন্তব্য করল।

'কাজেই মামলার সেখানেই আদ্ধেক নিষ্পত্তি।' শিবনাথ হাসল। 'বাকিটা চুকল হাসপাতালে রুনুর বেড্-এর পাশে। ডক্টর নাগ মুমূর্ষু ছেলেটিকে একবার দেখে আসতে তাদের হাসপাতালে পাঠিয়েছিলেন যদিও। কিন্তু ময়না সেখানে গিয়ে কি দেখল। তুমিও ইমাজিন করতে পার। এতটুকুন মেয়ে। তার কল্পনা কতদূর যেতে পারে, নিজের মনের ওপর কণ্ট্রোলই বা কতটা, হ্যাঁ ধৈর্য সাহস বিচারবুদ্ধির প্রশ্নও আছে। অক্সিজেনের চোঙ লাগানো ফুলে ওঠা রুনুর বিকৃত চেহারা দেখে ময়না ভয় পেয়ে প্রায় চিৎকার করে উঠেছিল। সন্তোষ জীবন ওরা ওকে তাড়া-তাড়ি হাসপাতাল থেকে বাইরে নিয়ে আসে।'

'ও বুঝি ভেবেছিল বারোঘরের উঠোনে পাড়ার রাস্তায় কপি ক্ষেতে রুণু যেমনটি ছিল এখনও তার সেই চেহারা আছে, অবিকল সেরকমই গিয়ে দেখতে পাবে?'

'এক্জ্যাক্টলি সো।' শিবনাথ মাথা নাড়ল। এবং হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এসে ময়না বলছিল সেখানে ওষুধের গন্ধটাই তার অসহ্য লাগছিল, না হলে আরো কিছুক্ষণ সে থাকতে পারত। শুনে সন্তোষ তাড়াতাড়ি ছুটে গিয়ে বৌবাজারের মোড় থেকে একটা গোলাপের তোড়া কিনে নিয়ে যায়। সেটা ময়নার হাতে তুলে দিয়ে বলছিল, এটা কতক্ষণ শুঁকতে থাক হাসপাতালের বিশ্রী ওষুধবিষুধের গন্ধ-গুলো নাক থেকে সরে যাক।'

রুচির হাসি ঘরের সিলিং পর্যন্ত পৌঁছত, মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তা দমন করল।

'হ্যাঁ', শিবনাথ গম্ভীর হয়ে বলল, 'তুমি একবার ভেবে দেখ জীবন ও মৃত্যু সামনে দাঁড়িয়ে যখন হাত বাড়িয়ে একটি মেয়েকে ডাকে তখন কার দিকে ছুটে যাওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক,—আর অই বয়সে যখন প্রথম ফুল ফোটার স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করে, পাখির গান শুনে চমকে ওঠে।'

রুচি কিছুক্ষণ কথা বলল না। চুপ করে জানালার অন্ধকার দেখে। যেন হঠাৎ কি ভাবছিল সে।

'কথা বলছ না কেন। ময়না কি ভুল করেছে? তাকে তুমি দোষ দিতে পার না।' শিবনাথ রুচির শরীর ঘেঁষে দাঁড়ায়।

'যাকগে গল্প তো শেষ হ'ল। গণ্ডগোল যখন মিটেছে আপদ গেছে। জামাকাপড় ছাড় হাত মুখ ধুয়ে নাও।' রুচি শিবনাথের জন্যে ঠাঁই ক'রে দিতে উঠে দাঁড়ায়।

শিবনাথ অবাক হবার ভান করে বলল, 'গল্প শেষ মানে? অর্ধেক তো হ'ল। বাকি আধখানা শুনবে না? গল্পের যেখানে ক্লাইমেক্স, কাহিনীর মধ্যমণি হয়ে যে দাঁড়িয়ে আছে, তার কথাই যে এখনো বলা বাকি।' বলে শিবনাথ মিটিমিটি হাসে।

'কার কথা, কে আবার এ গল্পের মধ্যমণি হয়ে আছে?' রুচি ফ্যালফ্যাল ক'রে স্বামীর দিকে তাকায়।

'তুমি।'

'তার মানে?' রুচি প্রথমটায় স্তম্ভিত। তারপর সামলে নিয়ে হেসে বলল, 'তুমি কি এতক্ষণ পারিজাতের বাংলোয় ছিলে? কিছু খেয়েটেয়ে আসনি তো। ও বুঝেছি দীপ্তি খুব ঘটা করে চা-টা খাইয়ে দিয়েছে তাই মাথা খারাপ করে এখানে এসে আবোলতাবোল বকছ, কেমন?'

'তাই।' শিবনাথ গম্ভীর হয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'এই বেলা তুমি খেতে দাও। আস্তে আস্তে সব বলছি।'

এ-ঘরের খাওয়া শেষ হতে রাত একটা বাজল। কেরাসিন ফুরিয়েছে। তাই আর হ্যারিকেন জ্বালিয়ে রাখা সম্ভব হ'ল না। কিন্তু তা বলে দু'জনের আলাপ বন্ধ নেই। অত্যন্ত জরুরি বিষয়। মশারির অন্ধকারের মধ্যে বসে দু'জন কথা বলছিল।

'ডক্টর নাগ বিকেলে চা খেতে নেমন্তন্ন করলেন এদিকে সন্তোষের দলকে আর ওদিকে পারিজাতকে। একটা ভুল বোঝাবুঝি হয়েছিল। সেটা দূর না হওয়া পর্যন্ত বুড়ো নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। কখনো জীবনের দিকে কখনো আসিতের দিকে এবং বেশির ভাগ সময় ময়না ও সন্তোষের দিকে তাকিয়ে টাক-পড়া পাকা মাথা নেড়ে তিনি বোঝালেন। যাক পারিজাত একটা ভুল করেছে। কিন্তু সেই তুলনায় সে কতটা ভাল করেছে তা কি দেখতে হবে না। কুলিয়া টেংরার জঙ্গল ময়লা মশামাছির মধ্যে নিজে বাস করে সে জায়গাটা ডেভলাপ করার জন্যে চেষ্টা করছে। রাস্তা, পাকা ড্রেন, ইলেক্‌ট্রিক,—সব হবে। স্কুল, লাইব্রেরী, ক্লাব, এমনকি ও-পাড়ায় একটা হাসপাতাল খোলার স্কীমও সে নিয়েছে। এখন কোন্ এক কে গুপ্তর ছেলে অন্ধকারে রাস্তায় অসাবধানে চলতে গিয়ে তার গাড়ির তলায় চাপা পড়েছে বলে যদি তোমরা হৈচৈ আরম্ভ ক'রে দিতে তো বাস্তবিক সেটা অত্যন্ত দুঃখের হ'ত। হ্যাঁ, ব্যাপারটা হাশ্‌আপ্ করতে চাওয়ার উদ্দেশ্য জেল-জরিমানা এড়ানো নয়, একটা বড় প্রজেক্ট, কতগুলো সুন্দর স্কীম নষ্ট না হয় সেটাই আসল কথা। দুষ্ট লোক বিরোধী দল এর সুযোগ নিয়ে কী না করতে পারে।'
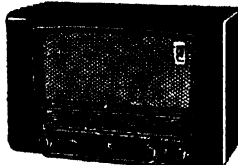
'কি বললে ওরা, ছেলেরা?'

'ছেলেরা তখন চুপ ছিল। বিশেষ অসাবধানে চায়ের বাটি ঠোঁটের কাছে তুলতে গিয়ে ময়না এতটা চা নিজের শাড়িতে ফেলে দিতে সন্তোষ পকেট থেকে রুমাল বার করে তাড়াতাড়ি তা মুছে দিতে ব্যস্ত ছিল। পারিজাত বলছিল যদি জখম হওয়ার ফলে রুনু সারাজীবনের জন্যে ক্রিপ্‌লড হয়ে থাকে বা মারা যায় তো সে যে-কোন এমাউণ্ট, হ্যাঁ, ক্ষতিপূরণ হিসাবে কে গুপ্ত বা তার স্ত্রীকে টাকা দিতে প্রস্তুত আছে।'

'এটা ভাল প্রস্তাব।' রুচি বলল, 'যাকগে, তা এর মধ্যে আমার প্রসঙ্গ আবার কখন উঠল বলছ না তো?'

'বলছি', শিবনাথ মৃদু হাসল। 'ক্ষতিপূরণের কথা উঠতে সন্তোষ মুখ তোলে। স্মার্ট ছেলে। হেসে পারিজাতের দিকে তাকিয়ে বলছিল, তা আপনি এ-ব্যাপার নিয়ে যা খুশি তা করুন, আমাদের আর এখন অন্য কোন ডিমান্ড নেই কেবল একটি ছাড়া। শুনে পারিজাত হেসে বলছিল, বেশতো সেটা কি বল, আমি এখনই পূরণ
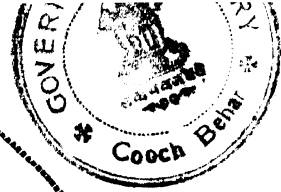
করি। ডক্টর নাগ হাসছিলেন। কেননা, সন্তোষ এর আগেই তার দাবির কথা তাঁকে জানিয়ে রেখেছিল। এবার ডক্টর নাগ পারিজাতের কাছে সন্তোষের আসল পরিচয় দেন। সাহিত্যিক। গল্প উপন্যাস লিখছে। রাজনীতিটিতির চেয়ে শিল্প সংস্কৃতির দিকে ঝোঁক বেশি। সে চাইছে পারিজাতের পাড়ায় মেয়েদের যে সমিতিটা আছে, সেটা অর্গানাইজ করার ভার তাকে দেয়া হোক। কেবল মেয়েদের জন্যে না ছেলেরাও তাতে থাকবে। ওটাকে সে আরো বড় করবে সুন্দর করবে। কেবল ক্যারম, লুডো খেলা খানকয়েক বই ও সেলাই রান্নার মধ্যে সীমাবদ্ধ না রেখে ব্যাপক অর্থে কালচারেল এসোসিয়েশন বলতে যা বোঝায় দীপ্তি-সঙ্ঘকে সেরকম একটা কিছুতে রূপ দেয়া তার ইচ্ছা।'

ভারি তো উৎসাহ দীপ্তি-সঙ্ঘের জন্যে।' রুচি খুক করে হাসল। 'পার্ক-স্ট্রীটের' ছেলের কুলিয়া-টেংরার বস্তি পাড়ায় এসে সমিতি করা?'

শিবনাথ রুচির হাতে চাপ দেয়।

'উৎসাহের মূলে কে বুঝতে পারছ না।'

'কে?' প্রশ্ন করে পরক্ষণে রুচি বুঝতে পেরে মাথা নাড়ল এবং রীতিমত শব্দ ক'রে হাসল। 'খুব স্বাভাবিক, অষ্ট-প্রহর ময়নার সঙ্গে মেলামেশা করার সুযোগ না হলে পাওয়া যাচ্ছে না যে।'

শিবনাথের গলায় চাপা হাসি।

'ওই তো বয়স প্রেম করার, প্রেমের জন্যে যে-কোন অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াতে এতবড় লোকের ছেলের আটকাচ্ছে না।' একটু থেমে শিবনাথ বলল, 'তা হলেও আমি,—আমার খুব ভাল লাগছে ছেলেটিকে পারিজাতের মুখে শুনছি পর থেকে।'

'পারিজাত রাজী আছে?'

'নিশ্চয়। এই সমিতি মারফৎ নাইট স্কুল হবে, ফ্রি রিডিং রুম হবে, চেরিটেবল ডিস্পেন্সারী খোলা হবে, কুড়িটা চরকা আসছে; শাকসব্জি এবং ফুলের চাষের মডেল বাগান করার জন্যে সন্তোষ পারিজাতের কাছে তিন বিঘা নিষ্কর জমি পর্যন্ত অলরেডি চেয়ে ফেলেছে।'

'আর? সমিতি কৃষি সংস্কৃতি সমাজ-সেবা সব রকমের কাজে হাত দেবে দেখছি।'

'নিশ্চয়।' শিবনাথ রুচির হাসিতে যোগ না দিয়ে গম্ভীর হয়ে বলল, 'গান্ধী, জয়ন্তী, রবীন্দ্রজয়ন্তী ইত্যাদি থেকে আরম্ভ করে বছরের একেবারে সবচেয়ে ছোট ফাংশনটাও সে এসে গেলে পর আর বাদ দিতে দেবে না, ম্যাজিক ল্যাণ্টার্নের সাহায্যে সাধারণ স্বাস্থ্য-রক্ষা, ডিসিপ্লিন, নার্সিং, সেফটি ফার্স্ট, সিভিক সেন্স ইত্যাদি নিয়ে রোজ সন্ধ্যায় পাড়ার লোককে বক্তৃতা শোনাবার ব্যবস্থা থাকবে, হাতে লিখে কাগজ বার করা হবে, ছবি আঁকার নাচের গানের গল্প কবিতা লেখার কম্পিটিশন, ডিবেটিং ক্লাব—অতটুকুন ছেলে কী না করতে চাইছে!'

রুচি মুখ থেকে আঁচল সরায়। অন্ধকারে শিবনাথ দেখল না অনুভব করল।

'তুমি সবটাই ঠাট্টা ক'রে উড়িয়ে দিতে চাইছ। ডক্টর নাগ সিরিয়স পারিজাত সিরিয়স।'

'আহা ঠাট্টার কি শুনলে।' গম্ভীর হয়ে গেল রুচি। 'তা ময়নার তো এই সবে বর্ণবোধ আরম্ভ হয়েছে, ছেলেদের দিকটা সন্তোষ চালিয়ে নিতে পারবে, মেয়েদের দিকটা চালাবার মতন তেমন উপযুক্ত কেউ আছে কিনা, ভাবছিলাম,,—ছেলেমেয়ে নিয়ে যখন সমিতি।'

'কেন, তুমি?' রুচির হাতে হাত রাখল শিবনাথ।

'ঠাট্টা রাখ।' হাত সরিয়ে নিলে রুচি।

'মোটেই ঠাট্টা না।' শিবনাথ আর স্ত্রীর হাত ধরতে চেষ্টা করল না। 'পারিজাত বলছিল ডক্টর নাগের সামনে দাঁড়িয়ে সন্তোষ রীতিমত বক্তৃতা করছিল তখন। শেয়ালদা স্টেশনে ময়নাকে নিয়ে তোমার সঙ্গে একদিকে যেমন ঝগড়া করেছে তেমনি অন্যদিকে দেখেছে সে তোমার শান্ত শ্রী কল্যাণী মূর্তি। তখনই আইডিয়াটা তার মাথায় এসেছিল। আর্টিস্ট ছেলে। বলছিল ময়না ও রুনুর প্রেম থেকে সে আবেগ উন্মাদনা পাচ্ছে আর তোমাকে সকালবেলা এতটা সামনাসামনি দেখেছে পর থেকে সে পেল প্রেরণা শক্তি। এ-পাড়ায় এসে তোমাদের মধ্যে একটা কিছু না করা পর্যন্ত স্থির থাকতে পারছে না। পারিজাতকে সন্তোষ বলছিলঃ রুনুর ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে বারোঘরের বাড়ির সেই টিচারটিকে আমি হঠাৎ দুটো কটুকথা বলে ফেলেছি, তখন আমার মাথায় আর এক ঝোঁক ছিল, ময়নাকে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে এলাম পর একটু একটু করে সেই সুন্দর শান্ত পরিচ্ছন্ন মুখখানা আবার ভীষণ মনে পড়তে লাগল। আমার অনুতাপ হচ্ছিল।'

একটু থেমে শিবনাথ বলল 'এবং ময়নাকে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তোমার সম্পর্কে আরো নানারকম প্রশ্ন করল সে, কোন্ ইস্কুলে তুমি এখন আছ, কি রকম মাইনে-টাইনে পাও, আর কোন কাজ কর কিনা, বাড়িতে পুষ্যি ক'টি। ভয়ঙ্কর শ্রদ্ধা হচ্ছিল তোমাকে দেখে এবং—

'তারপর?' হঠাৎ রাগটা প্রকাশ করল না রুচি। যেন দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে হাসছে, তেমনি গলার সুর বার ক'রে বলল, 'পারিজাত কিছু বলেছে তার উত্তরে?'

'আমি অলরেডি ঠিক করে রেখেছি। তাঁকে সমিতির সেক্রেটারি করা হবে। বললেই রাজী হবেন। আমার বাড়ির একজন রেস্‌পেক্টেবল ভাড়াটে। তা ছাড়া তাঁর স্বামী শিবনাথবাবুর সঙ্গেও আমার ইদানিং আলাপ পরিচয় হয়েছে। সুতরাং তাঁকে খুব সহজেই পাওয়া যাবে আশা করছি। ডক্টর নাগকে এই এসিওরেন্সই দিলে পারিজাত।'

রুচি কথা বলল না।

মশারির ভিতরটা থমথম করছিল। বাইরে মশককুলের ক্রুদ্ধ গর্জন ছাড়া আর শব্দ ছিল না।

'সন্তোষ বলছিল ইদানিং একটা ইংরেজি ফিলমে একজন স্কুল মিস্‌ট্রেসকে নাকি সে দেখেছে। তিনি অবশ্য খুব বড়-লোকের মেয়ে ছিলেন। কোনরকম টাকা-পয়সা না নিয়ে গরিব ছেলেমেয়েদের কেবল ইস্কুলে নয় বাড়িতে গিয়েও পড়াতেন। চিরকুমারী ছিলেন। তাঁর প্রেমিক যুদ্ধে মারা যান। পরে তিনিও যুদ্ধে চলে যান। সেখানে তাঁর কাজ ছিল আহত মুমূর্ষু সৈনিকদের সেবা শুশ্রূষা করা। সন্তোষ অভিভূত হয়েছিল মেয়েটির একদিকে স্নেহ মমতা প্রেম আর একদিকে ত্যাগ তিতিক্ষা সহিষ্ণুতা মাখা স্নিগ্ধ চোখ দু'টি দেখে। তার খুব ইচ্ছা, ডক্টর নাগকে বলছিল, এব পর সে যে-বইয়ে হাত দেবে এরকম একটি চরিত্র আঁকবে। বলতে কি, কমলাক্ষী গার্লস স্কুলের টিচারকে দেখেছে পর থেকে, এখন আর কল্পনা মিশিয়ে মূর্তি তৈরী না, পারিজাত যদি এলাও করে, তবে তাঁকে নিয়ে সে আরো বড় কাজ, ভাল কাজে হাত দিতে পারে, হ্যাঁ এতক্ষণ যেসব কাজের কথা বললাম। মোটের ওপর তোমাকে দেখে সন্তোষ খুব ইনস্‌পিরেশন পাচ্ছে।'

'বখাটে ছেলে।' রুচি রাগ করেও রাগ করতে পারল না। 'ও এসব বলল পারিজাত তোমায় বলল বুঝি, রাত বারোটা পর্যন্ত সেখানে বসে থেকে এই নিয়ে জল্পনাকল্পনা করে এলে, রাজী হয়ে এসেছ?'

'সব নিয়ে সব সময় রাগারাগি করলে তো আর দুনিয়া চলে না।' শিবনাথ অল্প হাসল। 'বলতে কি ট্যুইশনির জন্যে সেদিন যখন প্রার্থী হয়ে পারিজাতের বাংলোয় গিয়েছিলাম করুণা, অনুকম্পা ছিল তার চোখে, কথায়। আজ দেখলাম পারিজাত সম্পূর্ণ বদলে গেছে। কত ইন্টিমেট্ কী ভীষণ ইন্টারেস্ট তার আমাদের সম্পর্কে! —হ্যাঁ, রাত বারোটা পর্যন্ত সেখানে বসে থেকে আমি কেবল বাজে গল্প করে এসেছি। শোন, তুমি যে সেই নতুন স্কুলের চাকরির জন্যে পিটিশন পাঠিয়েছিলে পারিজাত কাল সেখানে চিঠি দিচ্ছে। কুড়ি টাকা না। আরো দশ অর্থাৎ প্রায় ত্রিশ টাকা বেশি মাইনে। সেই স্কুলের সেক্রেটারি পারিজাতের হাতের লোক। কেমন, গল্পের ক্লাইমেক্সে এসে গেছি তো?'

'তোমার? তোমার একটা কিছু সুবিধাটুবিধার কথা বলেছে তো?' রুচি আবার দাঁতে দাঁত ঠেকিয়ে হাসল।

'আমার সম্পর্কে তোমাকে ভাবতে হবে না।' গম্ভীর গলায় শিবনাথ বলল, 'তোমাকে নিয়েই এতক্ষণ কথা হচ্ছিল, তোমার জন্যে—'

শিবনাথ থামল।

'কি বল। চুপ ক'রে গেলে কেন!' রুচি চাপা নিশ্বাস ফেলল। 'শোন, আমার জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না, তোমার পারিজাতবাবুকে বলবে আমার চাকরির ব্যাপারে তিনি যেন কোনরকম রেকমণ্ডেশন লেটারটেটার না পাঠান। তুমি কি শোবে না?'

'এত রাগ করছ তুমি।'

চার্লস চ্যাপলিনের স্টুডিয়োর বহির্ভাগ

করে নিচ্ছেন, অন্যেরা এসে তাঁকে ধরে ফেলল।

এডনা অবশ্য সবই বুঝতে পেরেছিল। চার্লিকে সে ছাড়িয়ে আনল। কৃতজ্ঞতায় তার দুই চোখ তখন জলে ভরে উঠেছে। জাহাজ এসে অ্যামেরিকায় পৌঁছল। সামনেই স্ট্যাচু অব লিবার্টি। সেইদিকেই তাকিয়ে আছে আশ্রয়প্রার্থীরা। তাদের সমস্ত হৃদয় আশায় আনন্দে কৃতজ্ঞতায় পূর্ণ হয়ে উঠেছে। একটু বাদেই তাদের উপরে কর্তৃপক্ষের শাসন শুরু হয়ে গেল। জন্তু-জানোয়ারদের যেভাবে খোঁয়াড়ে আটকে রাখে, সেইভাবে ঠাসাঠাসি করে জাহাজের এক কোণে আটকে রাখা হল তাদের। এক্ষুনি তাদের তীরভূমিতে নামতে দেওয়া হবে না। সেইখানে সেই জনতার মধ্যে দাঁড়িয়ে চার্লি হঠাৎ স্ট্যাচু অব লিবার্টির দিকে ফিরে তাকালেন। দৃশ্যটা যে অত্যন্তই তাৎপর্যময়, তাতে সন্দেহ নেই।

তীরভূমিতে অবতরণের দিনকয়েক পরের ঘটনা। রাস্তা দিয়ে হাঁটিতে হাঁটিতে চার্লি হঠাৎ একটা ডলার কুড়িয়ে পেয়েছেন। সেটাকে পকেটে পুরে তিনি একটা রেস্তোরাঁয় গিয়ে ঢুকলেন। সেখানে এডনার সঙ্গে দেখা হল তাঁর। এডনা আজ নিঃসঙ্গ। তার রুমালের কালো বর্ডার দেখে চার্লি বুঝতে পারলেন, এডনার মা মারা গিয়েছেন। আনন্দ সঞ্চারের চেষ্টা করলেন। খাবারের জন্য অর্ডার দিতে গিয়ে তাঁর চোখে পড়ল, খানিক দূরেই হেড-ওয়েটার একজন খদ্দেরকে ধরে খুব ঠ্যাঙাচ্ছে। ব্যাপার কী, না বীল মেটাতে গিয়ে দশ সেণ্ট কম পড়ে গিয়েছে তাঁর। সঙ্গে সঙ্গেই নিজের পকেটে হাত দিলেন চার্লি। সর্বনাশ। তাঁর নিজের পকেটেও যে সেই ডলারটা নেই। পকেটের মধ্যে একটা ছ্যাঁদা। কুড়িয়ে-পাওয়া পয়সা সেই ছ্যাঁদার মধ্য দিয়েই কোথাও পড়ে গিয়েছে।

খদ্দেরদের মধ্যেই একজন কুড়িয়ে পেয়েছে সেই ডলার। একগাল হেসে ডলারটা সে ওয়েটারের হাতে তুলে দিয়ে নিজের বীল মেটাচ্ছে। মেটাতে গিয়ে তার হাত থেকেও সেই ডলার হঠাৎ মেঝেতে পড়ে গেল। চার্লি দেখলেন, মেঝেতে পড়ামাত্রই ওয়েটার তার পা দিয়ে ডলার চেপে ধরেছে। চার্লি জানেন, ও অর্থ তাঁরই। তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন, কী করে তাঁর পয়সা ফিরিয়ে পাওয়া যায়। এই নিয়ে তিনজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি লেগে গেল। এ দৃশ্যটি খুব উপভোগ্য। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, ওয়েটারই সেটা পেয়েছে। ডলারটা হাতে নিয়ে সে দেখল, সেটা অচল! এত কাণ্ডের পর এই পরিণতি! কাহিনীর দিক থেকে এটি মপাসাঁর "দী নেকলেস" গল্পের সঙ্গে একাসনে স্থান পাবার খানেই শেষ করে দেওয়া হয়নি, অ[...] কয়েকটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তার [...] স্মৃতিকে আরও তীক্ষ্ম, তীব্র করে তো[...] হয়েছে। চার্লি তখনও বসে বসে চি[...] করছেন, কী করে রেস্তোরাঁর [...] মেটাবেন। এমন সময় সেখানে [...] শিল্পী এসে প্রবেশ করলেন। চার্লিদে[...] টেবিলে এসে বসলেন তিনি, চার্লি [...] এডনার সঙ্গে খানিকক্ষণ আল[...] সালাপের পর বললেন, চার্লি যদি কি[...] মনে না করেন তো খাবারের দামটা তি[...] দিয়ে দেবেন। তা কী করে হ[...] পকেটে পয়সা না থাকা সত্ত্বেও চা[...] বললেন, অসম্ভব; খাবারের দাম তি[...] দেবেন। দুজনেই দাম দিতে চান। [...] পর্যন্ত শিল্পী ভদ্রলোক করলেন [...] চার্লির কথাই মেনে নিলেন। ওয়েটা[...] দেবার জন্য টেবিলের উপর কিছু টি[...] টীপস রেখে দিয়ে রেস্তোরাঁ থে[...] বেরিয়ে গেলেন তিনি। চার্লি এখ[...] মহা ফাঁপড়ে পড়েছেন। তিনি [...] ভদ্রতার খাতিরে খাবারের দাম দি[...] চাইছিলেন, তা বলে যে সত্যিই [...] পর্যন্ত তাঁকেই দাম দিতে হবে, তা কি[...] ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। তার[...] বীল আসতে তিনি দেখেন, খাবারের [...] দাম ধরা হয়েছে, শিল্পী ভদ্রলোক [...] চাইতে কিছু বেশী পয়সাই টীপ[...] হিসেবে রেখে গিয়েছেন। আর কো[...] কথাটি না কয়ে টীপ্‌স-এর পয়[...] নীচেই তিনি বীলখানিকে গুঁজে দিলে[...]

চার্লির আর দুখানি বইয়ের [...] "দী কিওর" আর "দী অ্যাডভেঞ্চারা[...]" এ দুটি বইয়েও হাসির খোরাক কি[...] কম নেই। বিশেষ করে শেষ বইটি[...] খুবই মজার কয়েকটি দৃশ্য আছে। এ[...] দৃশ্যের বর্ণনা দিই। ককটেল পা[...] গ্লাসে গ্লাসে মদ পরিবেশন করে যা[...] হচ্ছে। চার্লির গ্লাস শূন্য। [...] গ্লাসকে পূর্ণ করা যায় কী ক[...] নিজের গ্লাসটিকে একটু এগিয়ে দি[...] পাশের ভদ্রলোকের গ্লাসের স[...] একটা ঠোক্কর খাইয়ে দিলেন চা[...] অমনি তাঁর গ্লাস থেকে বেশ খানি[...] মদ চলকে এসে চার্লির গ্লাসে পড়[...]

'নিশ্চয়ই। আমাকে দিয়ে দীপ্তি-রাণীর পদসেবা করাতে তোমার চোখে ঘুম নেই। তাই বলছিলাম ক' বাটি চা আজ খেয়ে এসেছ তাঁর হাতে। খুব কড়া চা ছিল, কেমন না! গরম হয়ে এসে আমাকে জ্বালাতন করছ। সমিতির সেক্রেটারি হবে। যদি ফের আর কোন দিন—'

'এই, শোন।' শিবনাথ স্ত্রীর হাত ধরল।

উত্তেজনায় রুচি কাঁপছিল।

'চিরকাল কি তুমি আমাকে এমন উপেক্ষা করবে, আমার কথার কোনো দাম নেই?' শিবনাথ শক্ত স্থির গলায় বলল, 'দীপ্তি ছিল না। ও-বাড়িতে সে নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'তা জানা যায়নি। তবে সেই ব্যারিস্টার প্রাইভেট টিউটার মণ্টু ব্যানার্জির সঙ্গে যে যাচ্ছে একথা দীপ্তি স্বীকার করে গেছে। আজ সকালে উঠে পারিজাত বিছানায় রেখে যাওয়া দীপ্তির লেখা একখানা চিঠি পেল।'

'বাচ্চাগুলো?' রুচির গলা দিয়ে হঠাৎ

স্বর ফ্টেছিল না। 'শেষ পর্যন্ত ভদ্রমহিলা পালিয়ে গেল!'

'তাতে পারিজাত একটুও বিচলিত না। হ্যাঁ, সেকথাও আমায় বলছিল। অত্যন্ত শক্ত নার্ভ। ছেলেমেয়েগুলোকে বালিগঞ্জে আজ দুপুরে পারিজাত তার বাবার কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে। এখানে থাকলে কাঁদাকাটি করবে বলে। ওখানে দাদুর কাছে নাকি ওরা ঠাণ্ডা থাকবে।'

'আর কি বলছিল? তা হলে পারিজাতবাবু আজ নানাভাবে ডিস্টার্বড। ছি ছি দীপ্তি—'

'কিচ্ছু না। বললাম তো, অন্যরকম ছেলে সে। একটু দুঃখ করা, দীর্ঘশ্বাস ফেলা, কি স্ত্রীর এই কাজের জন্যে কোন রকম আক্রোশ পোষণ করা, উঁহু আমি এসবের বিন্দুবিসর্গও তার মধ্যে দেখলাম না। বরং হেসে বলল, সে স্বাভাবিকভাবেই এটাকে নিয়েছে এবং ঈশ্বরের আশীর্বাদ যে, সামনে ইলেক্‌শন আসছে, এখন কাজ করার জন্যে অফুরন্ত সময় পাবে, এনার্জি পাবে। স্ত্রী যতদিন কাছে ছিল সে ভীষণ অসুখী ছিল বিব্রতবোধ করত পদে পদে।'

রুচি চুপ।

'কাজেই দীপ্তির উৎসাহে আমার উৎসাহ আর সেই লোভে তোমাকে সমিতিতে টেনে নিয়ে যাচ্ছি,—নিশ্চয় এ ধারণা এই ভুল বিশ্বাস এখন তোমার ভাঙ্গল।'

'আমি কি জানি, আমি কি জানতাম যে রায়সাহেবের ছেলের বৌ আর ওখানে নেই। তোমার তো আগেই বলা উচিত ছিল। এতবড় ঘটনা।'

'এটা একটা ঘটনাই না। হ্যাঁ পারিজাতের চোখে। কাজেই আমরাও এটার কোনরকম ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি না। এখানে কাজ বড়। পুরো তিন ঘণ্টা আলাপের মধ্যে পাঁচমিনিটও নিজের স্ত্রীর কথা অর্থাৎ এই ব্যাপার নিয়ে পারিজাত আমার সঙ্গে কথা বলেনি। তুমি শুনলে বিশ্বাস করবে? সবটাই ছিল ময়নার রুনুর ডক্টর নাগ সন্তোষ সমিতি এবং তোমার কথা,—'

রুচি অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল।

'বলো।' একটু অসহিষ্ণু গলায় শিবনাথ বললে, 'সন্তোষ অবশ্য প্রস্তাব দিয়েছে যে, যদি রুনু মারা যায়, তবে তার নামেই সমিতির নামকরণ হবে। এখন না। পরে। পারিজাত রাজী হয়েছে। কাল পরশু একটা ফর্ম্যাল সেরিমনি ক'রে তোমাকে সমিতির সেক্রেটারিশিপ দেওয়া হচ্ছে।—বলো, কথা বলছ না যে। উত্তর দাও। কাল সকালে পারিজাতকে গিয়ে আমার কথা দিয়ে আসতে হবে।'

যদি ঘরে আলো থাকত তো শিবনাথ দেখতে রুচির ঠোঁটে এই প্রথম সূক্ষ্ম হাসি উঁকি দিয়েছে। আস্তে আস্তে বলল, 'নিছক শো যখন হচ্ছে না, রিয়েলি ওরা কিছু করতে চান, আমি কনস্ট্রাকটিভ কাজের কথা বলছি, তো আমার আপত্তি নেই।'

'আমায় বাঁচালে, আঃ।' শিবনাথ স্ত্রীকে বেষ্টন করে তার কপালে দীর্ঘ চুম্বন এঁকে দিলে। দূরে কোথায় একটা রাতজাগা পাখি ডেকে উঠল। বাইরে নিঝুম নিঃসাড় উঠোনে সম্ভবত রমেশ রায়ের কুকুরটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠল। আর শোনা যায় প্রমথদের ঘরে খনখনে বুড়ির গলাঃ হরি হরি! মেয়ের দুঃখে বারোঘরের ভিটে ছেড়ে দিয়ে প্রভাতের হাত ধরে ডাক্তার কোথায় গিয়ে উঠবে কে জানে।'

'দেশান্তরী হয়েছে দিদি দেশ ছেড়ে গেল হি হি।' পাশের ঘরে মল্লিকা হেসে জবাব দেয়। 'কুচুটে কুলোকের জায়গা এবাড়িত নেই তোমায় কি আমি আগেই বলিনি।'

শিবনাথের কানের কাছে মুখ নিয়ে রুচি বলল, 'হাসপাতালে রুনুকে দেখতে গিয়ে ওষুধের গন্ধ ময়নার সহ্য হ'ল না, শেষটায় সন্তোষের কিনে দেওয়া গোলাপ শুঁকে—

'একেবারে ছেলেমানুষ। ওকে দোষ দেয়া যায় কি। সবুজ কাঁচা লতা অন্ধকার মড়া ডাল ছেড়ে আলোর দিকে নতুন শাখাটা পেলে জড়িয়ে ধরে তুমি কি দেখনি। তা ছাড়া এমন একটা আর্টিস্ট ছেলের পাল্লায় পড়েছে।'

'তা-ও বটে।' রুচি আর হাসল না। 'কিন্তু সন্তোষের সব কথা শুনে সত্যি এখন আমার খুব ভাল লাগছে। সুন্দর আইডিয়া। কত আর বয়স। তখন তো কথাবার্তা শুনে চালচলন দেখে মনে হয়েছিল বুঝি গুণ্ডা, একেবারে বাজে ছেলে। বাঃ! খুব প্রগ্রেসিভ আউটলুক আর চমৎকার কাজের ছেলে হবে মনে হচ্ছে।'

'তোমার সঙ্গে থাকলে আরো ভাল হবে। তাই তো বার বার বলছিল আমাকে পারিজাত।'

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

জেমস্ গোল্ড

শংকর
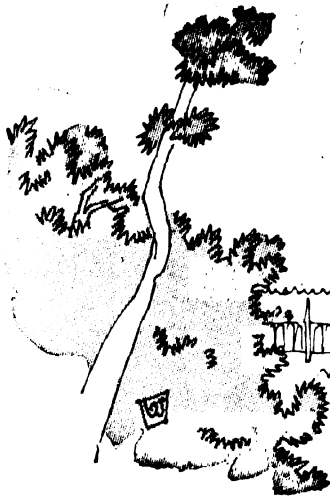
হাইকোর্টের কাছে যাঁদের যাতায়াত আছে তাঁদের অনেকেই দেখে থাকবেন ঠিক একটার সময় প্রায়ই ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটে রিকশার ঠনঠন আওয়াজ হয়। লাঠির উপর দুটি হাতের ভর দিয়ে রিকশায় একটি বিমর্ষমুখ আরোহী; ছেঁড়া প্যান্ট, ছেঁড়া শার্ট, পায়ে শতচ্ছিন্ন কেড্স্ জুতো। কোনো বাড়ির সামনে রিক্সা থামিয়ে সায়েবটি ভিতরে ঢুকে যান, বেরিয়ে এসে আবার রিক্সা। একটু এগিয়ে অন্য কোনো অফিসের সামনে তিনি নেমে পড়েন।

আবার কখানো যুগলে আবির্ভাব হয়। যেমন বুড়ো সায়েব, তেমনি বুড়ি মেম। মেমের গায়ের রঙ নিকষ কালো। স্কার্টটি কতদিন যে ধোপার বাড়ি যায়নি ভগবান জানেন। কাছে গেলেই বোঁটকা গন্ধে দেহ ঘুলিয়ে ওঠে। পায়ে কোনো মোজা নেই, ধুলো কাদাতে বোঝাই। হাতে ভ্যানিটি ব্যাগের পরিবর্তে চটের রেশন থলি।

মেমসায়েবকে দেখে সবাই মুচ্কি হেসে পালাবার চেষ্টা করে। শুধু টেম্পল্ চেম্বারের সিঁড়ির নীচের পান-ওয়ালা বিশ্বনাথ গলাটা পরিষ্কার করে বলে, "গুড্ মর্ডিং মেম সাব, গুড্ মর্ডিং, লাট সাবকে সাথ গভর্নমেন্ট হাউসমে আপকো যো খানা থা......।" রাগে ও অপমানে কাংস্যবিনিন্দিত কণ্ঠে মেম-সায়েব পানওয়ালার ঊর্ধ্ব ও অধস্তন সাতপুরুষের উদ্দেশ্যে সুমিষ্ট সম্ভাষণ বর্ষণ করতে থাকেন। "এ মেম সাব কসুর মাফ কিজিয়ে। আপকে ওয়াস্তে খুদ লাট সাব এক সিগ্রেট ভেজা হায়।" পানওয়ালা একটা সিগারেট বার করে নাড়াতে থাকে। এবার মেম সায়েবের ক্রোধাগ্নিতে শান্তিজল পড়ল। একরকম ছুটে গিয়েই পানওয়ালার হাত থেকে সিগারেটটা ছিনিয়ে নিয়ে সামনের গ্যাস পোস্টে বাঁধা দড়ির আগুনে ধরিয়ে নেন।

মেম সায়েবের সামনে পড়লেই মুশকিল। আপনাকে হাতছানি দিয়ে ডাকবেন, একটু আড়ালে এনে চুপি চুপি বলবেন, বাবু, ক্যান ইউ স্পেয়ার ফোর অ্যানাস?" আপনি যদি চুপ করে থাকেন, "অল রাইট, টু অ্যানাস্ উইল ডু।"

এই বুড়োটি একদিন লাঠি ভর করে কাঁপতে কাঁপতে চেম্বারে এলেন, সঙ্গে মিস্টার জেকব, সায়েবের পরিচিত অনেক-দিনের পুরোন এটর্নি।

মিস্টার জেকব সায়েবকে বললেন, "আমার নতুন মক্কেল মিস্টার জেমস্ গোল্ড।"

ছেঁড়া শার্টের বোতামটা লাগাতে লাগাতে মিস্টার গোল্ড বললেন, "আমি একটু প্রাইভেটে কথা কইতে চাই।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়", আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

মিনিট কুড়ি ধ'রে ভিতরে তিনজনে কথাবার্তা চলল। মিস্টার জেকবের প্রতিবাদে গোল্ড একবার চড়া গলায় বললেন, "না না।"

এমন সময় সায়েব আমাকে ভিতরে ডাকলেন। "মিস্টার গোল্ডের ঠিকানাটা লিখে নাও।"

"আমার ঠিকানায় চিঠি দিলেই চলবে", মিস্টার জেকব বললেন।

"আমি মক্কেলের ঠিকানা সর্বদাই রাখি, যদি হঠাৎ কিছু......" সায়েব বললেন।

মিস্টার গোল্ড একটু ইতস্তত করে বললেন, "ওই তো লিখে নিন,...... স্যালভেশন হোম।"

ঠিকানা খাতায় লিখে নিলাম। মিস্টার গোল্ড খাতাটার দিকে চেয়ে রইলেন, "অনেক দিনের পুরোন খাতা।"

"অ্যাড্রেস বুক যত পুরোন, তত তার আভিজাত্য। আমি ইণ্ডিয়াতে আসা থেকে এই খাতাটি ব্যবহার করছি।"

"হ্যাঁ", গোল্ড বললেন, "খাতাটি দেখেই চিনেছি।"

আমরা অবাক। "আপনি এ খাতা দেখেছেন আগে?"

"নাঃ বাজে কথা থাক", গোল্ড বললেন।

"No no, Mr. Gold, that sounds interesting" সায়েব বললেন।

"আমাকে চিনতে পারছেন না?"

"ঠিক......ঠিক মনে করতে পারছি না", সায়েব লজ্জিতভাবে বললেন।

"আপনার খাতাটা দিন" গোল্ড আমার হাত থেকে খাতাটা নিয়ে নিলেন। মিনিট পাঁচেক 'জি' অক্ষরের মধ্যে খুঁজতেই বেরোল, "এই যে দেখুন" খাতাটা তিনি সায়েবের দিকে এগিয়ে দিলেন।

"জেমস ফ্রেডারিক গোল্ড

....

....

ডিঃ সাহারানপুর,

ইউনাইটেড প্রভিন্স।"

"মনে পড়েছে, মনে পড়েছে", সায়েব বলে উঠলেন। "অনেকদিন আগেকার কথা। কিন্তু একদম চেনা যায় না।"

"আমি অবশ্য প্রথমেই পেরেছি", গোল্ড ম্লান হাসল।

মিস্টার জেকব বললেন, "আমরা আবার আসব দিনকয়েক পরে। ফী কত মোহর লাগবে জানিয়ে দেবেন।"

ও'রা দুজনেই চলে গেলেন। আমি অবুঝের মত সায়েবের দিকে চেয়ে রইলাম।

"এই অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ভদ্রলোকটিকে আপনি আগে চিনতেন?"

"অ্যাংলো ইন্ডিয়ান?"

"কেন? মিস্টার গোল্ড--"

সায়েব গম্ভীরভাবে বললেন, "জেমস গোল্ডের শিরায় শতকরা একশ ভাগ ইংরেজ রক্ত।"

"কিন্তু মিস্টার গোল্ডের বউ তো মিশ্‌কালো যিনি টেম্পল চেম্বারের তলায় মাঝে মাঝে ভিক্ষা করেন।"

"জেমস্ গোল্ডের বউ? আগে যখন জানতাম গোল্ড তখন অকৃতদার, আর আজও আমাকে বলে গেল সে সংসারে একা।"

"মিঃ গোল্ডকে কয়েক সপ্তাহ ধরেই রিকশায় চড়ে যাতায়াত করতে দেখেছি।"

"হুঁ, টাকা থেকেও মানুষ পথের ভিখারী হতে পারে। গোল্ডকে চিনতেই পারিনি, এখন মনে পড়ছে।"

বছর পনের আগের কথা। সাহারানপুর জেলা কোর্টে এক বড় মামলায় আমি ব্রীফ্ পেয়েছিলাম। এখানকার এটর্নি বলে দিয়েছিলেন, ওখানে থাকবার কোন অসুবিধা হবে না। মক্কেলের বিরাট বাড়ি আছে। জেমস গোল্ড স্টেশনে এসেছিলেন, সংগে বিরাট অস্টিন গাড়ি। গোল্ডের বাড়ির সামনে যখন গাড়ি থামল আমি অবাক, বাড়ি বলা চলে না—প্রাসাদ।

সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলা। "এ বাড়ি আপনার নিজের মতো মনে করে নেবেন। সংসারের খুঁটিনাটি আমি একদম বুঝি না। চাকর বাকরদের হুকুম করলেই সব পেয়ে যাবেন।" গোল্ড এক সময় বলে গেলেন।

দামী আসবাবপত্রে প্রতিটি ঘর বোঝাই। হাতীর দাঁতের কাজ, বিখ্যাত চিত্রকরদের পেন্টিং,—বিলেতের অনেক লর্ড পরিবারকে লজ্জা দিতে পারে।

দিন পাঁচেক ছিলাম সাহারানপুরে। প্রতিদিন বিকেলে ফিটন গাড়িতে কাছাকাছি কোন গ্রামের মধ্যে বেড়িয়ে এসেছি।

বিশাল ডাইনিং হলে আমরা মাত্র দুটি প্রাণী। খাওয়ার সময় গোল্ড গল্প করতেন, শুধু মামলার গল্প। জীবনে মামলা ছাড়া সে যেন কিছু জানে না। "আমার কাকার সংগে মামলা করেছি, বোনের সংগে এখনও কেস্ ঝুলছে। তিন কাজিনের বিরুদ্ধে ডিক্রী একবার পেয়েছি। নিজে উকিল না হলেও আইনের কোন কিছু জানতে বাকী নেই।" মাছ ধরা, ছবি আঁকা, গলফ খেলার মত মামলা করাই গোল্ডের নেশা।

কথা প্রসংগে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। "বাড়িটা কতদিনের পুরোন? অনেক যত্নে সব কিছু সাজান।"

"এ বাড়িতে আমি মাত্র বছর খানেক রয়েছি। এক বুড়ির কাছ থেকে কিনেছিলাম, এক জায়গায় বেশীদিন থাকতে আমার ভাল লাগে না। বছর খানেক পরে হয়ত বাড়ি কিনে অন্য কোথাও চলে যাব, কিছুই ঠিক নেই।"

আরও জানলাম, তাঁর কোন সংসার বন্ধন নেই। অলস অবসরে মদ্যপান ও উচ্ছৃংখলতায় পূর্ণ জীবন। মামলা ছাড়া আর কিছু করেন না। পিতৃপুরুষের সঞ্চিত ধনই নির্ভর।

ভারতবর্ষের সংগে গোল্ডদের অনেক দিনের পরিচয়, জেমস্-এর মুখেই শুনেছিলাম। মামলা শেষে কলকাতায় ফিরে এসেছি। গোল্ডের কোন খবর রাখিনি এই পনের বছর।

আবার আজ দেখা। কঙ্কালসার বৃদ্ধ গোল্ডকে তুমিও দেখলে, সে আজ পথের ভিখারী।

"কিন্তু কেন?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কিছুদিন আগে কোন গোপন কারণে গোল্ডের বিরুদ্ধে এক পরোয়ানা বার হয়, জীবনে বহু কুকর্মের অংশীদার গোল্ড নিখোঁজ হলেন। কিন্তু সরকার ছাড়লেন না। ফেরারদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবার বহু উপায় তাঁদের আছে। গোল্ডের বিরুদ্ধে সরকার তার সেই উপায়ের চরম ব্যবহার করলেন। গোল্ডের মাথায় বজ্রাঘাত। তার সমস্ত সম্পত্তি এখন সরকারী হেফাজতে, এমন কি ব্যাংকের তিন লাখ টাকাও তাঁরা ফ্রীজ করেছেন। গোল্ডের চেকের আজ আর কোন মূল্য নেই। লক্ষপতি জেমস্ গোল্ড কপর্দকশূন্য জেমস্ গোল্ড হয়ে স্যালভেশন হোমে দিন কাটাচ্ছেন।"

এটর্নি জেকব এসেছিলেন পরামর্শ নিতে, সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা আইনসংগত হয়েছে কিনা।

গোল্ড এলেন কয়েকদিন পরে লিফ্‌ট থেকে ঘর পর্যন্ত আসতেই ধুঁকছেন। শতছিন্ন হাফ শার্টের নীচু অংশটা দিয়ে নিজের মুখ মুছে নিলেন গোল্ড। "মিঃ—, টাকা আমার চাই আমার টাকা আমি ভোগ করতে পারব না?"

সায়েব সান্ত্বনা দিয়ে বললেন "মিস্টার গোল্ড, অধৈর্য হলে চলবে কেন?"

দু একটা কথার পর গোল্ড চলে গেছেন। কিছু পরেই দেখি তাঁর সঙ্গিনী মহিলাটি দরজা থেকে উঁকি মারছেন "মিস্টার গোল্ড চলে গেছেন?"

"কি ঝঞ্ঝাট, আর ভাল লাগে না এইখানে থাকবে বলে মিনসে চলে গেছে?" রাগে গজ গজ করতে করতে মহিলাটি বেরিয়ে গেলেন।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই আবার গোল্ড

লেন, সঙ্গে মিস্টার জেকব। ভিতরে ন্য কোন এটর্নির সঙ্গে সায়েব কথা ইছেন, গোল্ড তাঁর নড়বড়ে দেহ নিয়ে পিতে কাঁপতে আমার সামনের চেয়ারে লেন।

"এক ভদ্রমহিলা আপনাকে খ‍ুজতে সেছিলেন।"

"মিস্ ফিগিন নিশ্চয়ই", রাগে গোল্ড তে দাঁত ঘষতে লাগলেন, "কতবার বসে য়েছি বাইরে রাস্তায় অপেক্ষা করতে, বুও কথা শোনা হয় না।"

মিস্টার জেকব আমাকে ইশারা করে টোমিট করে হাসতে লাগলেন।

আরেকদিন সাড়ে দশটার সময় ম্বারে এসেই গোল্ড গম্ভীর মুখে জ্ঞাসা করলেন, "মিস্ ফিগিন আর াসেনি তো?"

"না না, তিনি আর আসেননি।"

"আবার যদি আসে আমাকে বলে বেন।"

ভিতরে ঢুকে গোল্ড সায়েবের হাতে কটা চেক দিলেন, "মিস্টার জেকব এই চিশ টাকার চেক পাঠালেন, উনি লাঞ্চের র আসবেন। উনি না আসা পর্যন্ত খানে বসতে পারি?"

"নিশ্চয়", সায়েব বললেন। গোল্ড সে রইলেন, সায়েব নিজের কাজ করে লেন।

"আপনার গোটাকয়েক পুরোন শার্ট াওয়া গেলে বড় উপকার হতো। ঠান্ডাটা শ পড়তে আরম্ভ করেছে।"

"হ্যাঁ, অনেক জামা পড়ে আছে। াপনার কাজে লাগলে আনন্দ পাব। লই নিয়ে আসব।"

"টাকাটা উদ্ধারের কোন আশা াছে? সত্যি করে বলুন", গোল্ড জ্ঞাসা করলেন।

"চেষ্টা করে দেখতে হবে। আমরা থমেই ইউ পি গভর্নমেন্টকে নোটিশ য়ে চিঠি পাঠাচ্ছি।"

মামলার টাকা কোথা থেকে এবং কমন করে আসছে গোল্ডের কাছে সায়েব নে স্তম্ভিত। মিস্টার জেকব ব্যারি-টারের ফি ও আনুসঙ্গিক খরচা নিজেই বেন। পরিবর্তে প্রায়ই নানা কাগজে ই করিয়ে নেন, কালকেই পঞ্চাশ হাজার াকার হ্যান্ডনোটে গোল্ড সই করেছেন।

"মিঃ গোল্ড, কি ভয়ঙ্কর ফাঁদে পা দিচ্ছেন বুঝেছেন কী? গভর্নমেন্টের কাছ থেকে টাকা উদ্ধার হলেও এক কপর্দকও আপনার ভোগে আসবে না। মাকড়সার মত জাল পেতে অনেক অসাধু এ পাড়ায় বসে আছে।" সায়েব বললেন।

গোল্ড চমকে উঠলেন, "আমার সঙ্গে কথা হয়েছে টাকাটা পেলে দশ হাজার টাকা মিস্টার জেকবকে দেব। উনি আর কিছু চাইবেন না।"

"ক'খানা সাদা কাগজে এখন পর্যন্ত সই করেছেন?"

"ঠিক মনে নেই, তবে অন্তত পাঁচটা।"

অসহ্য ক্রোধে সায়েব পায়চারী করতে লাগলেন। "আরও আগে আমার জানা উচিত ছিল।"

"মিঃ জেকব বলেছিল, এসব যেন আপনার কানে না যায়।"

গোল্ডকে তখনকার মত বিদায় দিয়ে সায়েব পায়চারী করতে লাগলেন। "মানুষের বিপদের সুযোগ নিয়ে জেকবের মত লোকেরা সব করতে পারে।"

প্রদীপের নীচের অন্ধকারই সর্বাপেক্ষা গাঢ়। জীবনের অনেক ক্ষেত্রেই এই উক্তি প্রযোজ্য। সায়েব অস্থির হয়ে উঠলেন।

"গোল্ডের কেসে আমি কোন ফী নেব না, আমি অন্য এটর্নির ব্যবস্থা করছি।"

যথাসময়ে জেকবকে সায়েব জানিয়ে দিলেন, তার কারচুপি ধরা পড়ে গেছে এবং এই প্রবঞ্চনা তিনি বরদাস্ত করবেন না। জেকব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন, "আপনি ফী নিয়ে কাজ করবেন। মক্কেলের সঙ্গে আমি কি করছি তাতে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই।"

"মিঃ জেকব, এই বয়সে আমি অন্যায়ের নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করে সন্তুষ্ট থাকতেও রাজী নই।"

মিস্টার জেকবও দমবার পাত্র নন। তাঁর কর্তব্য সম্বন্ধে অন্য কারও অযাচিত উপদেশ শুনতে তিনি মোটেই আগ্রহান্বিত নন, সায়েবকে জানিয়ে দিলেন।

জেকবকে শেষ পর্যন্ত নরম হতে হ'ল যখন তিনি বুঝলেন যে, প্রয়োজন হ'লে সায়েব সমস্ত বিষয়টি হাইকোর্টের গোচরে আনবেন। দিনকয়েক পরে চেম্বারে কয়েকটি কাগজের টুকরোয় আগুন জ্বলে উঠল। কালো ছাইগুলোর দিকে বাঁকা চোখে জেকব তাকিয়ে দ্রুত-বেগে বেরিয়ে গেলেন।

গোল্ড বেশ কিছুক্ষণ সায়েবের দিকে চেয়ে রইলেন। "আপনার ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব মনে হয় না।"

"টাকাটা উদ্ধার না হলে আপনার কোন উপকারই হোল না, সুতরাং কৃতজ্ঞতার প্রশ্নই ওঠে না।"

"কতদিন সময় লাগবে বলতে পারেন?" গোল্ড জিজ্ঞাসা করলেন।

"বেশীদিন লাগবে না", সায়েব প্রবোধ দিয়ে বললেন।

কয়েকদিন পরেই গোল্ড্ এসেছেন আবার। লাঠির উপর ভর করে জীর্ণ দেহটা কোনরকমে টেনে এনে বেঞ্চিতে হাঁপাতে লাগলেন। দারিদ্র্য ও বার্ধক্য এক সঙ্গে যেন তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে নেমেছে। চোখের কোণে ঘন কালো রেখা ক্লান্ত মুখচ্ছবিকে আরও অন্ধকার করে তুলেছে।

সায়েব নেই, কোর্টে গেছেন।

"কখন ফিরবেন?" হতাশ হয়ে গোল্ড জিজ্ঞাসা করলেন।

"চারটের আগে নয়", আমি বললাম।

দেয়ালের র‍্যাকে থাকে থাকে সাজান ল' রিপোর্টারগুলোর দিকে গোল্ড উদাস নয়নে চেয়ে রইলেন।

সায়েবের কাছে শুনেছি এসব রিপোর্টারের মধ্যেই গোল্ড বংশের অনেক কাহিনী লুকিয়ে আছে। অনেকদিন ধরে গোল্ডরা মামলা করে আসছে।

এক শতাব্দী আগের 'মুরস ইণ্ডিয়ান রিপোর্টার'এও গোল্ডদের অন্তত গোটা পাঁচেক মামলার খবর পাওয়া যাবে।

গোল্ড কখনো আমাদের সংগে বিশেষ কথা বলতেন না। নেটিভদের সংগে সম্পর্ক সম্বন্ধে তিনি একটু বেশী সচেতন এবং আমাদের কাছে আত্মাভিমান প্রকাশের কোন ত্রুটি করতেন না। কোন কিছু জানবার থাকলে সোজা সায়েবের কাছে চলে যান।

সায়েব না থাকায় বোধ করি দু'চারটে কথা বললেন আমার সংগে।

"এটর্নি পাড়ার সংগে আমাদের অনেকদিনের পরিচয়" গোল্ড নিতান্ত তাচ্ছিল্যের সংগে বলে যাচ্ছিলেন। "ব্যারিস্টারদের পিছনে লাখ লাখ টাকা খরচ করেছি আমরা। বাবু, তুমি তার কিছুই বুঝবে না। তোমার সায়েবকে জিজ্ঞাসা কোরো আমার কেসের জন্য কতবার আইন পাল্টিয়েছে।" তারপর মুখটা বিকৃত করে বললেন, "বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? জস্টিস্ আমীর আলীর জাজমেণ্টের কপি এখনও আছে আমার কাছে। কোন্ ব্যারিস্টার আমার কেস করেনি?—ল্যাংফোর্ড জেমস, এল পি পিউ, এস এন ব্যানার্জী, এন এন সরকার—" গোল্ড খানিকটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করলেন, "এই যে তোমার সায়েব মামলা করছেন, টাকাটা পেলেই প্রতিটি পাই মিটিয়ে দেব। এসব তোমার সায়েব বুঝবেন, তোমাকে বলে লাভ নেই। আমি এখন উঠি।"

নতুন এটর্নি কয়েকদিন পরে জানালেন, মামলা ছাড়া গত্যান্তর নেই। গভর্নমেণ্ট সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করতে অস্বীকার করেছেন।

গোল্ডের আফসোসের শেষ নেই। এতগুলো টাকা......তিন লাখ টাকা ব্যাংকে অথচ একটা পয়সা নেই, উত্তেজনায় দেহটা থর থর করে কাঁপে। ধিক্কারে সমস্ত মুখটা বিকৃত হয়ে ওঠে।

কেস্ ফাইল করলেন মিঃ বৈদ্যনাথ লাহা, গোল্ডের নতুন এটর্নি।

কিন্তু গোল্ডের আর দেখা নেই। দিন দশেকের মধ্যে টেম্প্ল্ চেম্বারে এলেন না, যেখানে প্রায় রোজই আসতেন। একদিন দরজার কোণ থেকে মিস্ ফির্গিন আবার উঁকি মারলেন। হাতে ময়লা রেশন ব্যাগ, "সায়েবের সংগে দেখা করব।"

"মিঃ গোল্ডের খবর কি? এ পাড়ায় একদম আসছেন না।"

"আপনারা জানেন না?"

"না তো, কী হয়েছে?"

"প্যারা-টাইফয়েডে হাসপাতালে পড়ে আছেন। কাল জ্বর প্রায় ছেড়ে গেছে। বুড়োর এদিকে নেই, আবার আপেল আর বেদানা খাবার ইচ্ছে হয়েছে। আমি কোথায় এসব জিনিস প্যাব বলুন তো?"

মিস্ ফির্গিনের হাতে পাঁচটা টাকা দিয়ে সায়েব বলে দিলেন, "খুব সাবধানে থাকে যেন। কেস্ সম্বন্ধে কিছু জানতে চাইলে বলবেন, কাজ এগুচ্ছে।"

"আমি কেন ছাই ঘুরে মরি, আমার কি দায়।" গজ গজ করতে করতে মিস্ ফির্গিন চলে গেলেন।

সায়েব আমাকে ভিতরে ডাকলেন, "এ কেস্ কতদিন লাগবে কোন ঠিক নেই। বুড়ো গোল্ড এ টাকা দেখে যেতে পারবে মনে হয় না।"

"এক এক সময় মনে হয় যেন গোল্ড বংশের সম্পদ অভিশপ্ত। বহুপুরুষের সঞ্চিত অর্থের সংগে অভিশাপও জড়ো হয়েছে। যতদূর জানি, এ সম্পদ সম্পূর্ণ সৎপথে উপার্জিত নয়। ভগবানের বিচারে একটা রহস্যময় বৈচিত্র্য আছে। জীবনের আদালতে কখনো কখনো পরিহাসচ্ছলে বহু যুগের সঞ্চিত অপরাধের শাস্তি তিনি একজনকে দিয়ে থাকেন।" সায়েব হাসলেন। "নাঃ আমরা বড্ড বেশী দার্শনিক হয়ে পড়েছি।"

কিছুদিন পরে গোল্ড আবার এলেন। কঙ্কালসার দেহটাকে হঠাৎ দেখলে ভূতের মতন মনে হয়। সায়েবের সংগে গোপনে কোন আলোচনা হয়। কয়েকদিন দুজনে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা চল কোন ব্যাপারে।

শনিবারে হাইকোর্টে কোন কেস্ না। চেম্বারে একটু দেরীতে এ সায়েব। আমাকে ভিতরে আস বললেন। "একটা উইল টাইপ কর হবে", সায়েব বলে চললেন, আমি নিলাম।

দীস্ ইজ দি লাস্ট উইল টেস্টামেণ্ট অফ............উলভারহ্যামটা গোল্ড পরিবারের মাইকেল গোল্ডের সন্তান, অকৃতদার, অপুত্রক জে ফ্রেডারিক গোল্ডের শেষ উইল। ভা বর্ষের অভিভাবকহীন শিশুদের জন্য চার লক্ষ টাকার সম্পত্তি যেন ব্যয়িত

আমাকে অবাক দেখে সায়েব রহস্য ভাবে হাসলেন। "বহু কষ্টে র করিয়েছি। জীবদ্দশায় মামলার নিষ্প সম্ভাবনা খুব কম। ভবিষ্যতে সৎকার্যে ব্যয়িত হলেও গোল্ডের অ শপ্ত আত্মা হয়ত শান্তি পাবে।"

মোটা নীল কাগজে কম্পিত জেমস্ গোল্ড সই করেছেন। সই ক বিশেষ ইচ্ছা ছিল মনে হয় না। কে উইলটা খামে পুরে সায়েবের দিকে এ দিয়েই গোল্ড জিজ্ঞাসা করলেন, " পাবার কি কোন আশা নেই। আমার রয়েছে—অথচ আমার এই ক

অসুস্থ দেহে রোজ লাঠিতে ভর গোল্ড চেম্বারে আসতেন, দিন দিন দু বল দেহে এতদূরে আসার কোন প্রয়ো নেই। ধুঁকতে ধুঁকতে বেঞ্চিতে আমার দিকে চেয়ে বলতেন, " মর্নিং।" নিজের গল্প শুরু কর আজকাল—পুরোন দিনের গল্প। আ কল্পনার পাখা উড়িয়ে সেই অতীতে যাবার প্রচেষ্টা। যেদিন কেউ ভ পারত না গোল্ডবংশের কোন স বিত্তহীন অবহেলিত হয়ে কলকাতার পথে ঘুরে বেড়াবেন।

"জান বাবু, রবার্ট ক্লাইভ উই গোল্ডের উপর কীরকম নির্ভর করে ক্লাইভের অনেকগুলো চিঠি আমি দিয়েছি। ইণ্ডিয়ানদের সেসব কো দেখাব না। সময়মত পুড়িয়ে যে

বে।" গোল্ডের খেয়াল নেই তাঁর শ্রোতা কজন ইণ্ডিয়ান।

গোল্ড বর্ণনা করে যান। উইলিয়ম গোল্ডের পর কলকাতার রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছেন ডগলাস গোল্ড। পথিভরা সভয়ে একধারে সরে দাঁড়াচ্ছে। সামনে কোন গরুর গাড়ি রাস্তা জুড়ে রয়েছে। ডগলাস গোল্ড বাক্যব্যয়ে বিশ্বাস করেন না। হাতের চাবুক নেমে আসে গারোয়ানের পিঠের উপর। রাস্তা পরিষ্কার, ডগলাস গোল্ডের ঘোড়া লাফাতে লাফাতে অদৃশ্য হয়ে যায়।

উত্তেজনায় গোল্ডের গলা কাঁপতে থাকে। আমি নীরবে শুনে যাই। জীবনের নির্মম রথচক্রে নিষ্পেষিত একটি হতভাগ্যের ক্ষণিক স্বপ্নপরিক্রমায় বাধা দিতে কেমন করুণা হয়।

আরেকদিন টেম্পল চেম্বারের সামনে ভিড় দেখে এগিয়ে গেলাম। গোল্ড কুৎসিত গালিগালাজ করছেন। কে নাকি তাঁকে ধাক্কা দিয়ে চলে গেছে। "কোনো ম্যানার জানে না ইণ্ডিয়ানরা।" মিস্ ফিগিন হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, ভিড় ঠেলে আমার কাছে এগিয়ে এসে বললেন, "বাবু, প্লিস্ ডোণ্ট মাইণ্ড। একটা সিকি দাও, মিস্টার গোল্ডকে রিকশায় চড়িয়ে নিয়ে যাই। একে দিনকাল খারাপ।"

আমি একটা রিকশা ডেকে দিলাম। গোল্ড তখনও রাগে ফুলছে। গলা ফাটিয়ে চিৎকারের চেষ্টা করছেন কিন্তু অবাধ্য দেহটা মনের আদেশ পালন করতে অক্ষম। মিস্ ফিগিনের হাতটা জোরে সরিয়ে দিলেন গোল্ড। "বুড়ি ফিরিঙ্গী জ্বালাতন করিস নি।"

মিস্ ফিগিনও রাগে হিন্দীতে বাক্য-বর্ষণ আরম্ভ করলেন, "তা বলবে না মিন্সে। রোজকার রিকশাভাড়া কিভাবে জোটাই জান না তো।" গোল্ডকে কোন রকমে রিকশাতে বসিয়ে রেশনের থলি দিয়ে মিস্ ফিগিন চোখ মুছতে থাকেন, রিকশাওয়ালা দুবার ঘণ্টি ঠুকে চলতে আরম্ভ করল।

হাইকোর্টে জেমস্ গোল্ড হেরে গেলেন। সুপ্রীম কোর্টে শেষ চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে সায়েব প্রায় হত-চৈতন্য গোল্ডকে সান্ত্বনা দিলেন।

"সত্যিই চেষ্টা করবেন বলুন, না হলে এখান থেকে আমি যাব না।"

"যখন কথা দিয়েছি নিশ্চয়ই করব।" সায়েব বললেন।

কয়েক সপ্তাহ পরে পার্ক স্ট্রীটের পুরোন সমাধিক্ষেত্রে গিয়েছিলাম। স্যর উইলিয়ম জোন্সের উপর একটি অসমাপ্ত প্রবন্ধের সর্বশেষ উপকরণ সংগ্রহের জন্য। সূর্য প্রায় ডুবতে বসেছে। সমাধিক্ষেত্রে ঢুকেই মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। ছোট বড় অসংখ্য স্তম্ভ নীরবে শতাব্দীর ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। কেউ প্রবল প্রতাপ শাসক, কেউ নৌবহরের সেনাপতি, কেউ বা সামান্য ব্যবসায়ী। সকলেই নিদ্রামগ্ন একান্ত নির্জনে। কাছে গিয়ে অনেকগুলি স্তম্ভ স্পর্শ করলাম। আজ কোন ভয় নেই, গোরা সৈন্যরা প্রভুকে রক্ষার জন্য তেড়ে আসবে না। সেনা-পতিকে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্য কেউ নেই, তাই নিজের বুকের উপর ফলকটিই ভরসা।

স্যর উইলিয়ম জোন্সের সমাধিপাশে দাঁড়ালাম। তে-কোণা বিরাট সৌধ, অনেকটা পিরামিডের মত। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি বহু শাস্ত্রজ্ঞ স্যর উইলিয়ম এশিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা।

একটু দূরেই গোল্ডকে হঠাৎ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আমি অবাক। কাছে এগিয়ে গেলাম সঙ্গে সঙ্গে। "তুমি এখানে কেন?" রাগতস্বরে গোল্ড জিজ্ঞাসা করলেন।

বুড়োর অসৌজন্যে আমার মাথাটা গরম হয়ে উঠল। "তার কৈফিয়ৎ আপনাকে দেবার কোন ইচ্ছা আমার নেই।"

গোল্ডকে পিছনে রেখে আমি চলে আসছিলাম, আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।

গোল্ড আমাকে ডাকলেন, "বাবু, বাবু, একবার শুনে যাও।" তারপর নিজেই আমার কাছে ছুটে এলেন, "বাবু, কিছু মনে কোর না, এসো সবার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই।"

"কার সঙ্গে পরিচয় করব, এখানে তো অন্য কেউ নেই।"

গোল্ড হাসলেন, "এসো না তাঁরা শুয়ে আছেন।"

ঝোপ ঝাড় ভেঙে আমরা প্রধান গেটের কাছে এলাম। রাস্তা পেরিয়ে অন্য একটি সমাধিক্ষেত্রে এসে দাঁড়ালাম। আঙুল দিয়ে গোল্ড একটা সৌধ দেখিয়ে দিলেন। অনেক পুরোন, অযত্নে মলিন হয়ে এসেছে। বড় ফলকটা কোনরকমে পড়লাম—

Here lies in Perfect Peace
William Robert Gold
One of the most devoted and gallant officers
of the Hon'ble company

'ঈস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অন্যতম কর্মচারী, নির্ভীক যোদ্ধা স্ত্রীপুত্রের প্রতি পরম স্নেহশীল উইলিয়ম রবার্ট গোল্ড' এক শতাব্দীর নিদ্রা সমাপ্ত করে আর এক শতাব্দীর নিদ্রায় মগ্ন। ১৭৩০ সালে উলভারহ্যামটনে জন্ম, বিশ বৎসর বয়সে ভারতবর্ষে আগমন।

পাশেই আর একটি ফলক। 'এলিজাবেথ গোল্ড, মর্ত্যজগতে উইলিয়মের শয্যাসঙ্গিনী, পতিগতপ্রাণা, স্নেহশীলা জননী এলিজাবেথ গোল্ড স্বামী অপেক্ষা দশ বৎসরে কনিষ্ঠা। কিন্তু পরম করুণাময় জগৎপিতা উইলিয়মের পূর্বেই তাঁকে ডেকে পাঠালেন।'

ইশারায় গোল্ড আরও কয়েকটি ফলক দেখালেন—ডগলাস, ডেভিড ও চার্লস গোল্ড।

উলভারহ্যামটনের গোল্ড পরিবারের বংশধারা সে যুগের কলকাতার স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়া ও মহামারীর মধ্যেও অব্যাহত গতিতে রয়েছে বুঝতে পারলাম। সে ধারা এক শতাব্দী অতিক্রম ক'রে আরেক শতাব্দীতে পড়েছে। গম্বুজওয়ালা সমাধিটিতে আরও অনেকে রয়েছেন। নেপিয়ার গোল্ড, সিন্থিয়া গোল্ড, রিচার্ড গোল্ড, রেভিনিউ বোর্ডের অন্যতম সদস্য হ্যারল্ড গোল্ড, হার ম্যাজেস্টির সৈন্যবাহিনীর সুযোগ্য কর্নেল স্টুয়ার্ট গোল্ড।

অবাক হয়ে একটি পরিবারের শতাব্দীর ইতিহাস লক্ষ্য করছিলাম। গোল্ডকে ডাকতে যাচ্ছিলাম, তাড়াতাড়ি কাছে এগিয়ে এসে মুখে আঙুল দিয়ে খুব সন্তর্পণে বললেন, "খুব আস্তে, ও'রা ঘুমোচ্ছেন, ঘুমের ব্যাঘাত হবে।"

সমাধি থেকে একটু দূরে এসে দাঁড়ালেন, চারিদিকে চেয়ে দেখলেন, যেন তাঁর পিতৃপুরুষরা কথাগুলো শুনে না ফেলে, "গোল্ডদের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন কি জান? তারা সব এক সঙ্গে ঘুমিয়ে থাকবে, এলাহাবাদ, মাদ্রাজ আর আফ্রিদী সীমান্ত যেখানেই থাক মৃত্যুর পর তারা পার্ক স্ট্রীটের এই কোণে আসতে চায়।"

প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে, মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শ যেন এখানকার আকাশে বাতাসেও অনুভব করতে লাগলাম।

"গোল্ডদের সবচেয়ে বড় স্বপ্ন এই সমাধিতে শেষ আশ্রয় মিলবে।" আধো অন্ধকারে তাঁর স্বরে এক অনির্বচনীয় বেদনার সুর ধরা দিচ্ছিল। "কিন্তু সে হবার নয়। আমার উইলটা তোমাদের কাছেই আছে। তা'তে লেখা আছে কলকাতা থেকে অনেক দূরে আমাকে যেন মাটি দেওয়া হয়। এর অন্যথা যেন না হয়।"

"কেন? উলভারহ্যামটনের গোল্ডদের শেষ বংশধর জীবনের দিবাবসানে পিতৃপুরুষদের পাশে কেন স্থান পাবেন না?"

গোল্ড রেগে উঠলেন। চাপা গলায় বললেন, "সে বুঝবার ক্ষমতা ভগবান নেটিভদের দেননি।"

"উইলিয়ম গোল্ডের বংশে কলঙ্ক লেপন না করলে তোমাদের সুখ হবে না আমি জানি। কিছুতেই নয়। কী লিখবে আমার স্মৃতি-ফলকে? স্যালভেশন হোমের জেমস্ গোল্ড এখানে শুয়ে আছেন। খুব মজা হবে, না? কিছুতেই নয়। আমি অত বোকা নই।" সন্ধ্যা নেমে এসেছে। গোল্ড আরও ভিতরে হাঁটতে লাগলেন। অন্ধকারে সাপ কিংবা বিছে থাকা আশ্চর্য নয়, কিন্তু তাঁর খেয়াল নেই। গতিক সুবিধে নয়, আমি সমাধিক্ষেত্র থেকে বেরিয়ে এলাম।

সুপ্রীম কোর্টে মামলা করা হয়নি শেষ পর্যন্ত। কাগজপত্র তৈরী হবার আগেই স্যালভেশন হোমে গোল্ডের মৃত্যু সংবাদ মিস্ ফিগিন চেম্বারে পেণছে দিয়েছিলেন।

পল্লী বিশ্ববিদ্যালয়

লেনার্ড কে এলম্‌হার্স্ট

[শ্রীনিকেতনের বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে শ্রীযুক্ত লেনার্ড কে এলম্‌-হার্স্ট শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। শ্রীযুক্ত এলম্‌হার্স্ট ইংল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ্‌ এবং কৃষি-অর্থনীতি-বিশারদ্‌। ইংল্যাণ্ডের ডেভনশায়ারে তাঁর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ডার্টিংটন হল আজ দেশবিদেশের গুণিজনের শ্রদ্ধা অর্জন করেছে। শ্রীযুক্ত এলম্‌হার্স্ট রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বাংলাদেশেও গ্রামের কাজের পথ তৈরি করে গেছেন। শ্রীনিকেতনের প্রতিষ্ঠা একরকম তাঁর হাতেই হয়। ৩৩ বছর আগে শ্রীযুক্ত এলম্‌হার্স্ট রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে এসে শ্রীনিকেতনের কাজ গড়ে তোলেন। শুধু নিজের হাতে কাজ করেই নয়, বহুদিন ধরে শ্রীনিকেতনের ব্যয়ভারের বৃহত্তর অংশটি তিনিই বহন করেন। এখনও তিনি দূরে থেকেও এর কাজের সঙ্গে সংযোগ রাখেন। শ্রীযুক্ত এলম্‌হার্স্ট ভারত সরকারের বিভিন্ন কাজেও এদেশে বহুবার এসেছেন। বর্তমানে ভারত সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রুরাল হায়ার এডুকেশন পরিদর্শন সমিতির অধ্যক্ষ হয়ে এদেশে এসেছেন। গত ৬ ফেব্রুয়ারী শ্রীনিকেতন বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে তিনি শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন। নিম্নের বক্তৃতাটি শান্তিনিকেতনে প্রদত্ত একটি ভাষণের অনুলিখন।]

আমায় যখন পল্লী অঞ্চলের বিশ্ব-বিদ্যালয় গঠনের পরিকল্পনায় এদেশ পরিদর্শনে ডাকা হল, আমি প্রথমেই নিজেকে প্রশ্ন করলাম—"রুরাল ইউনি-ভার্সিটি" জিনিসটা কী? রুরাল কথাটা ত' বুঝি কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় বলতে কী বোঝায়? সেকথা ভাবতে গিয়ে মনে হল বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ হচ্ছে অতীতের অভিজ্ঞতার ফল আহরণ করা এবং তার সাহায্যে বর্তমানের সমস্যা মেটান এবং ভবিষ্যতকে গড়ে তোলা।

ভারতবর্ষে সাড়ে পাঁচ লক্ষ গ্রাম। তারা পড়ে আছে পিছনে। শহরগুলো ভয়ানক বেগে অতিদ্রুত এগিয়ে চলেছে। এর ফল ভীষণ। তাই গ্রাম অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা উঠেছে। আমি পরিদর্শনের সময় বিভিন্ন বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের জিজ্ঞেস করলাম—কতজন গ্রামের ছেলেমেয়ে আসে পড়তে? তাঁরা বল্লেন—অনেক। জিজ্ঞেস করলাম—বিদ্যালয় ছেড়ে দেবার পর তারা কী করে? তারা কি গ্রামে ফিরে যায়? বল্লেন—"কেউ না।" গ্রামের শক্তির এটা একটা প্রচণ্ড ক্ষয়। এরা ফেরে না, তার কারণ আছে। সেটা সাইকোলজিকাল। এরা গ্রামে মেলামেশার সঙ্গী পায় না, সেরকম বুদ্ধিদীপ্ত সমাজ পায় না। তাদের বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োজনীয় চর্চার সুযোগ নেই। লাইব্রেরী নেই, শহরের মত ভাল বক্তৃতার ব্যবস্থা নেই যাতে তাদের মন সমৃদ্ধতর হতে পারে। এছাড়া, শহরে বসে এরা টিউশনী করেও অনেক বেশি আয় করতে পারে। ডাক্তারদের বেলাও ঠিক একই ব্যাপার। এর ফলে, গ্রামগুলি তাদের সবচেয়ে ভাল ছেলেমেয়েদের এইসব বিদ্যালয়ে, শহরে পাঠিয়ে দিচ্ছে, কিন্তু তাদের কাউকে ফিরে পাচ্ছে না। তাই পল্লী অঞ্চলে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ প্রয়োজন। গ্রামের ছাত্ররা গ্রামে ফিরে গিয়েও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ রাখতে পারবে। তাতে তাদের জ্ঞানের চর্চারও সমৃদ্ধি দেখা যাবে। আপাতত গ্রামগুলি আধুনিক শিক্ষা ও জীবনযাত্রার নানা সুবিধার অভাবে পাঁচ হাজার বছর আগেকার আচার ব্যবহার, যন্ত্রপাতি নিয়ে মহেঞ্জদাড়োর আমলে পড়ে আছে। গ্রাম-বাসীরা এগোতে পারছে না। তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, তাদের টেনে তুলতে পারে। এই উন্নতি ঘটাতে হবে আধুনিক জীবনের নানা উপকরণ দিয়ে, যদি শুধু আদর্শবাদে তা না হয়।

শ্রীযুক্ত এল কে এলম্‌হার্স্ট

ভারতবর্ষে পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় নামে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে। কিন্তু অধিকাংশেরই এ নামের অধিকার নেই। 'ওদের বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, তবে আমরাই বা একটা করি না কেন, আমরাও ত ওদের মতই বড়'—এই হল এসব বিদ্যালয়ের গড়ে ওঠার পিছনের মনোভাব। তাছাড়া পল্লী বিশ্ববিদ্যালয় নামটা থাকায় সরকারের কাছ থেকে টাকা আদায়েরও সুবিধা হয়। তবে এর থেকে গ্রামের মনের একটা পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রামের লোকেরা ভাবছে—আমাদেরই বা নিজের বিশ্ববিদ্যালয় থাকবে না কেন? এর ফলে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান অন্তত গড়ে উঠেছে, তারা গ্রামের কাজে লাগছে—অবশ্য বিশ্ববিদ্যালয় নাম এদের দেওয়া চলে না।

আমি এইসব প্রতিষ্ঠানের কর্তাদের জিজ্ঞেস করলাম—গ্রামের প্রধান সমস্যা কী? তাঁরা বল্লেন, হাইজীন, ইকনমি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, সোশ্যালজি—এর অভাব। শুনে আমি ভাবলাম—হাইজীন—তার মানে শুধু রোগ নয়। স্বাস্থ্যরক্ষার প্রতি একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী, স্বাস্থ্যের দর্শন। পূর্ণ মনুষ্যত্ব। কথাটা মন্দ নয়। এছাড়া, ভারতের গ্রামে রোগ ও শারীরিক স্বাস্থ্যের সমস্যাও রয়েইছে।

ইকনমি—তার মানেও শুধু অর্থ-নীতি বা খাদ্য নয়। একটা বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী তৈরি করা—যেমন ইনস্যুরেন্স পলিসি যে করবে তার প্রয়োজন বুঝতে পারে এমন মনোভাব তৈরি করা। ইকনমি কথাটার উৎপত্তি যে দুটি কথা থেকে, তাদের মানে হল সমগ্র গৃহস্থালীর রীতিনীতি ও নিয়ম। শুধু টাকার কথা নয়। তাছাড়া, ভারত কৃষিজীবী দেশ। এখন তার ইণ্ডাস্ট্রিও গড়ে উঠেছে। কিন্তু এখনও এই দুটি বিচ্ছিন্ন। শহর ও গ্রাম বিচ্ছিন্ন। তাই সংযোগ পরিবহনেরও প্রয়োজন।

শিক্ষা—মানুষ তার জীবনের নানা প্রয়োজন মেটাতে নানা উপকরণ পেয়েছে, নতুন নতুন আরও পাচ্ছে। এখন এত সবের কোন্ উপকরণটা প্রয়োজন; এই বাছাইয়ের প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। উত্তর হল, সেই উপকরণ যে-উপকরণ গ্রামবাসীদের তাদের অবস্থার ওপর একটা জোর এনে দেয়, অধিকার এনে দেয়। রোগ, অর্থাভাব ও অন্যান্য নানা অসুবিধে দূর করে। শহরের নানা সুবিধে, নানা আরাম থেকে গ্রাম বঞ্চিত।

সংস্কৃতি—সংস্কৃতি বা কালচার বলতেই বা কী বোঝায়? কালচার কথাটা বড় গণ্ডগোলের। এক অল্প-বয়সের ছোকরা এক সময় কুলটুর, কুলটুর করে আমাদের আতঙ্কিত করে তুলেছিল। তবে সংস্কৃতি সম্বন্ধে বলতে গেলে প্রথমেই বলতে হয় সংস্কৃতি আমাদের দেয়। চিন্তার ক্রিয়াশীলতা, সৌন্দর্যের অনুভূতি (সমস্ত জগৎ এবং প্রকৃতির সৌন্দর্য) এবং মানুষের হৃদয়াবেগের প্রতি সহানুভূতি।

সোশ্যালজি—সমাজ-বিজ্ঞান হল বিজ্ঞান রাজ্যের দুয়োরাণী। এর প্রতি আগ্রহ কম এবং এর জন্য খরচ করা হয় সবচেয়ে কম। বিজ্ঞানের অন্যসব শাখা হাতে হাতে মাপজোখ ক'রে তাদের কার্যক্ষমতা প্রমাণ করতে পারে। কিন্তু সমাজবিজ্ঞানের ত এই মাপজোখের সুবিধে নেই। আমরা আবার হাতে হাতে ফল না পেলে খুশী হই না। সমাজ-বিজ্ঞান মানুষের মনের নানা রাজ্যের পরিচয়চিত্র আঁকতে চেষ্টা করে। বিজ্ঞানের অন্য শাখার লোকেরা তাই একে বিজ্ঞান বলে এক পংক্তিতে স্থান দিতে চায় না—বলে, ও ত প্রফেট, গণৎকার, বিজ্ঞান নয়।

কিন্তু পদার্থবিদ্যার বিজ্ঞানীরা তাঁদের জ্ঞানানুসন্ধিৎসার দ্বারা আণবিক বোমা তৈরি করতে পারলেও, একথা কিছুতেই বলতে পারছেন না, কেন সেই বোমা ফেলে কেউ কেউ মানুষ মারতে চায়। তা যদি পারত, তবে কত ভাল হত। বিজ্ঞানরাজ্যের সিণ্ডারেলা সমাজ-বিজ্ঞান এই অন্তর্দৃষ্টির সন্ধানী। মানবমনের বিচিত্র কর্মপ্রণালী সে ভাল করে জানতে চায়। কেন একদল মানুষ আরেক দলকে মারতে চায়, কেন হিংসা প্রতিহিংসা। এর উত্তর সে খুঁজে বের করতে চাইছে। কেন গ্রামবাসীরা মহেঞ্জ-দাড়োর প্রাচীন প্রথা আজও আঁকড়ে ধরে থাকতে চায়, আবার এরই মধ্যে একটা পরিবর্তনের প্রেরণাই বা আসে কী করে? সমাজবিজ্ঞানের এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করার প্রয়োজনীয় কাজ রয়েছে। গ্রামবাসীদের মনের নানা ক্রিয়ার মধ্যে কোন্‌টাকে ঠিকভাবে চালনা করে আরও বাড়িয়ে তোলা প্রয়োজন, তা নির্ণয় করা যাবে সমাজবিজ্ঞানের সাহায্যে।

গ্রামবাসীরা এক সঙ্গে গ্রামে থেকেও নিজেদের মধ্যে বিচ্ছিন্ন, কোন যোগাযোগ রাখে না। এই ব্যবধান দূর করতেও এই বিজ্ঞানের প্রয়োজন। গ্রামের কামনা, অভাব প্রকাশ করার ক্ষমতাও আনবে এই বিজ্ঞান।

গ্রামের উন্নতির জন্য গ্রামবাসীদেরই চেষ্টা করতে হবে। আত্মশক্তি। তারা নিজেরাই যাতে নিজেদের সমস্যা মেটাতে সচেষ্ট এবং সক্ষম হয়, এই কাজই কর্তব্য। ন্যাশনাল এক্সটেন্সিভ সার্ভিস হল একটা প্রাথমিক চিকিৎসা, এটাই সব নয়। বিশ্ববিদ্যালয়ে এই গবেষণা চলতে পারে, কীভাবে এই আত্মশক্তির চেতনা এবং ইচ্ছে গ্রামবাসীদের মধ্যে হতে পারে তা নির্ণয় করা। যেমন ধর ডাক্তার। ভারতে প্রতি গ্রামে একটি ডাক্তার দিতে হলে, এখন যা অবস্থা, তাতে ২৫০ বছর সময় লাগবে। এদেশেরই একটি প্রতিষ্ঠান গ্রামের অল্পবয়সী বিধবাদের কিছু কিছু শিখিয়ে নিয়ে সাময়িকভাবে কাজ চালাচ্ছে। এই নারীচিকিৎসকরা গ্রামে ফিরে যায়, আবার মাঝে মাঝে ঐ প্রতিষ্ঠানে এসে কিছুদিন কাজ শিখে যান। গ্রামের খুব তাড়াতাড়ি অনেক ডাক্তার প্রয়োজন, সে হিসেবে এই ব্যবস্থা খুবই ভাল। এতে করে ঐ বিধবাদেরও উপার্জনের পথ তৈরি হচ্ছে। এছাড়া আরও সমস্যা আছে, যেমন ধর, ফ্যামিলি প্ল্যানিং। বিজ্ঞানের প্রতি ভারতে এখনও প্রবল অবিশ্বাস রয়েছে। অনেকেই মহেঞ্জদাড়োর যন্ত্রই চান—ফোর্ড গাড়ি নয়। বিজ্ঞানও যে মঙ্গলকাজে লাগতে পারে, এ বিশ্বাস নেই। তাই বলছি, চিন্তার সক্রিয় প্রবাহ সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। মহাপুরুষদের একেকটা কথা অন্ধভাবে এদেশে অনেকেই অনুসরণ করে। যেমন গান্ধীজীর পর আজ অনেক ক্ষুদে গান্ধীজীর আবির্ভাব হয়েছে। গান্ধীজীর কথার মানে না বুঝেই, এ'রা আত্মনির্ভরতা, চরকা ইত্যাদি বুলি আউড়ে চলেন, জপ ক'রে চলেন। গান্ধীজীর মন অত্যন্ত বেগবান, সক্রিয় মন। তিনি তাঁর কথার এই অন্ধ অনুসরণ চাননি। তিনি একেকটা কথা কী অবস্থায়, কোন্ সময়, কী প্রসঙ্গে, কোন্ পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলেন তা মনে না রেখে শুধু মন্ত্র জপার মত বলে গেলে লাভ হবে না। প্রতি যুগ বিশেষ সমস্যা নিয়ে আসে, তার সমাধানও নতুন উপায়ে, বিশেষ উপায়ে।

তোমরা এখানে রয়েছ, শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন এক সঙ্গে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন একটি আরেকটির পরিপূরক, যেন গাড়ির দুইটি চাকা। মনে পড়ছে,—আমার তখন অল্প বয়স, আমি আমেরিকায় কৃষিবিদ্যার ছাত্র। হঠাৎ একদিন এক টেলিগ্রাম এল—"অবিলম্বে নিউইয়র্কে আমার সঙ্গে দেখা কর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।" দেখা হতে বল্লেন, "তুমি শুনেছি কৃষিকাজ এবং গ্রামের কাজে উৎসাহী। আমার একটি শিক্ষায়তন আছে। তার চতুষ্পার্শ্বে গ্রাম, কিন্তু তবুও সেই গ্রামগুলি থেকে তা বিচ্ছিন্ন। তার জ্ঞানচর্চার ফল থেকে তার পাশের গ্রামগুলি সম্পূর্ণ বঞ্চিত। আমি তা চাই না। তুমি আসবে? আমি এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে গ্রামের কাজও শুরু করতে চাই।" তক্ষুণি তাঁর সঙ্গে আসতে বল্লেন। আমি পরে তাঁর কাজে যোগ

য়তো গ্লাসে-গ্লাসে ঠোক্কর খেয়ে াকবে। এবং, যেন অসাবধানতার দরুণই াটা হয়েছে, মুখেচোখে এইরকমের একটা নরীহ ভাব ফুটিয়ে তুলে পার্শ্ববর্তী দ্রলোকের কাছে ক্ষমাও চেয়ে নিলেন ার্লি। তারপরই তিনি মদের গ্লাসে মুক লাগালেন। আর একটি দৃশ্যের থা বলি। নাচের হলের উপরতলায় বসে ার্লি আর এডনা নাচ দেখতে দেখতে রফ চুষছেন। হঠাৎ একটুকরো বরফ ার্লির ঢিলেঢালা ট্রাউজারের মধ্যে ঢুকে গল। বরফের টুকরোটা যে তাঁকে কী ন্ত্রণায় ফেলেছে, তা তাঁর মুখভঙ্গী দেখেই স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। সে যাই হোক্ অনেক কষ্টে তো সেই টুকরোটাকে তিনি ট্রাউজারের থেকে বের করে দিলেন, খন সেটা উপরতলা থেকে নীচতলায় য়ে পড়ল। এবং পড়বি তো পড়, ড়ল গিয়ে এক ভদ্রমহিলার পোশাকের ধ্যে। পোশাকের মধ্য থেকে সেটাকে র করে দেবার জন্যে প্রায় পাগল হয়ে ঠলেন সেই মহিলা; কিন্তু যতই হাত পা ছাঁড়েন, যতই চ্যাঁচান, কিছুতেই আর সটা বেরোয় না। পাশের ভদ্রলোক যেই সেটা বার করে দেবার জন্যে হাত াড়িয়েছেন, ভদ্রমহিলা তাঁর গালের উপরে চার্কিতে একটি চড় কষিয়ে দিলেন।

চার্লির এই ছবিগুলিতে শিল্প-সৌন্দর্য তো ছিলই, সেইসঙ্গে ছিল ক্ষ্মতা। আর ছিল হাস্যরসের সঙ্গে করুণরসের এক অপরূপ সংমিশ্রণ। এত-দিন শুধু অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত জন-সাধারণেরই প্রশংসা তিনি পেয়েছেন; শিক্ষিত মার্জিত রুচির মানুষরাও এবারে াঁর সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে উঠলেন। আগে—কীস্টোন স্টুডিওর আমলে—এ'রা াঁর অভিনয়কে শস্তা ভাঁড়ামি বলে ভাবতেন। তাঁরাই এখন তাঁর ভক্ত হয়ে ঠলেন। শুধু তাই নয়, সেইসব পুরানো দিনের ছবিগুলিকেও এখন প্রশংসা করেন াঁরা। তবে, এ-কথাও তাঁরা বলেন যে, াঁর শেষের দিকের ছবিগুলির মধ্যেই াঁর শিল্পবুদ্ধির মহত্ত্ব আরও পরিপূর্ণ-ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বলেন যে, এইসব ছবিই তাঁকে অমর করে রাখবে। ডী ডব্লু গ্রীফিথের ছবির দিকেও তখন নজর পড়েছে সকলের। চলচ্চিত্র সম্পর্কে আগে যাঁদের বিন্দুমাত্রও উৎসাহ ছিল না, তাঁরাও তখন নিয়মিতভাবে গ্রীফিথের ছবি দেখতে যাচ্ছেন। চলচ্চিত্রের নাম শুনলেই আগে তাঁরা নাসিকাকুঞ্চন করতেন, সেই বিতৃষ্ণার ভাবটা তখন কেটে গিয়েছে।

আর চার্লি? তাঁকে দেখবার জন্যে তো সবাই তখন উন্মত্তপ্রায়। বিখ্যাত সব ব্যক্তিরাও হলিউডে এসে ভাবতেন, 'চ্যাপলিনের দর্শন মিলবে তো!' প্যাডেরভ্স্কি, লীওপোল্ড গডোভস্কি আর মেলবা—হলিউডে এসেই চ্যাপলিনের সঙ্গে তাঁরা দেখা করেছিলেন। কিছুদিন বাদে এলেন হ্যারি লডার। সীডনি চ্যাপলিন তখন হলিউডে একটা বিমান-কোম্পানি চালু করেছেন। খানিকটা পড়ো জমির উপরে তিনি তার বিমান-অবতরণের জমি তৈরি করে নিয়েছিলেন। হলিউডের যে অঞ্চলটিকে এখন ক্যাথে সার্কল বলা হয়, সেইখানেই ছিল তাঁর বিমান-ঘাটি। হ্যারি লডারকে একরকম জোর করেই তাঁর বিমানে তুলে নিয়েছিলেন তিনি, আকাশ-পথে ক্যাটালিনা দ্বীপ থেকে ঘুরিয়ে এনেছিলেন। লডার প্রথমে রাজী হননি, কিন্তু সীডনি নাছোড়বান্দা। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে দুজনের খানকয়েক ছবিও তিনি তুলিয়েছিলেন। বেলজিয়ামের রাজা অ্যালবার্ট এসেও দেখা করেছিলেন চার্লির সঙ্গে। এবং, বলাই বাহুল্য, তাঁকেও সীডনি রেহাই দেননি। সীডনির বিমানে চেপে তাঁকেও গিয়ে ক্যাটালিনা থেকে ঘুরে আসতে হয়েছিল।

(১৩)

মীউচুয়ালের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল চার্লির, তার মেয়াদ উত্তীর্ণ হতে বছর পাঁচেকেরও বেশী সময় লেগে গেল। উত্তীর্ণ হতে যখন আর সামান্য কয়েকদিন বাকী, মীউচুয়াল থেকে চার্লির কাছে প্রস্তাব করা হল, তাঁদের হয়ে যদি আরও কিছু ছবি তিনি তোলেন তো এখন থেকে তাঁর মাইনের পরিমাণ দ্বিগুণ করে দেওয়া হবে। সপ্তাহে চার হাজার পাউণ্ড, আর নয়তো বারখানা ছবির জন্য এককালীন দশ লক্ষ পাউণ্ড। যে-ব্যবস্থায় তাঁর অভিরুচি।

একই সময়ে আর একটি প্রতিষ্ঠান তাঁর কাছে প্রস্তাব পাঠালেন, বারখানা নয়, আটখানা ছবির জন্যেই তাঁরা দশ লক্ষ পাউণ্ড দিতে রাজী আছেন। প্রতিষ্ঠানটির নাম ফার্স্ট ন্যাশনাল। চিত্র-পরিবেশনার ক্ষেত্রে এ'রা নবাগত হলেও এ'দের সঙ্গেই চুক্তিবন্ধ হলেন চার্লি। আর্থিক দিক থেকে অবশ্য তাঁর তেমন কিছু সুবিধে হল না। তার কারণ, আগে থাকতেই চার্লিকে এ'রা বলে রেখেছিলেন যে, চার্লির তোলা কোনও ছবির দৈর্ঘ্য যদি দু রীল হয় তো (মীউচুয়ালের ছবিগুলি সাধারণত দু রীলেরই হত) তার ব্যয়ভার চার্লিকেই বহন করতে হবে; কোম্পানী থেকে, ছবির দৈর্ঘ বেড়ে গেলে, রীলপিছু আরও তিন হাজার পাউন্ড দেওয়া হবে, তার বেশী নয়। তবে হ্যাঁ, এর ক্ষতিপূরণ বাবদ ছবির একটা লভ্যাংশ চার্লিও পাবেন। এ-ব্যবস্থা মেনে নিতে চার্লির যে কোনও দ্বিধা হয়নি তার কারণ এই যে, ছবির নির্মাণ-ব্যবস্থায় এতে করে তাঁর স্বাধীনতা আরও বেড়ে গেল। কে জানে, নির্মাণ-ব্যাপারে পরিপূর্ণ দায়িত্ব হয়তো তিনি একদিন নিজের হাতেই তুলে নিতে পারবেন। শুধু পরিবেশনের দায়িত্ব থাকবে অন্যের হাতে, তা ছাড়া আর সমস্ত ব্যাপারেই তিনি স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারবেন হয়তো। কোন্ ছবিতে কত টাকা ব্যয় করা হবে, কোন্ ছবির দৈর্ঘ্য কতখানি হবে, কী কী উপাদানে ছবি তৈরি করবেন তিনি, এ-সব ব্যাপারে তখন আর তাঁকে পরমুখাপেক্ষী হয়ে বসে থাকতে হবে না।

(ক্রমশঃ)

দিলাম। তখন 'বড়মা'র (শ্রীহেমলতা ঠাকুর) কাছে বাংলা শিখি। একদিন গুরুদেব জিজ্ঞেস করলেন, "এলম্‌হার্স্ট, তোমার বাংলা কতদূর এগোল।" বল্লাম, "ভেরি, পুওর!" গুরুদেব বল্লেন, "ব্যস্‌। ঐ হয়েছে। তোমার আর বাংলা শিখে দরকার নেই। মিশনারীরাও ঐ ভুল করেছে। তারা নিজেরা দেশী ভাষা শিখে নিয়ে, নিজেরাই সব কাজ করেছে। এদেশের লোকদের কিছু করতে শেখায়নি। তুমিও বাংলা শিখে গেলে নিজেই কাজ করবে। ছেলেরা কিছু শিখবে না। তুমি ওদের শেখাও, ওদের দিয়ে কাজ করাও।"

শ্রীনিকেতনের শুধু গ্রামের সঙ্গে সম্বন্ধ গড়লেই চলবে না। গ্রামের মন যত উন্নত হবে, তারা ততই তার খাদ্য চাইবে। তখন সেই চাওয়া মেটাতে হবে। শান্তিনিকেতনে তোমরা প্রাচীন জ্ঞান ও ঐতিহ্যের চর্চায়, দেশবিদেশের সংস্কৃতির চর্চায়, সেই ভান্ডার পূর্ণ করে রাখবে। প্রাচীনের থেকে প্রেরণা গ্রহণ করবে এবং তা জোগাবে তোমরাই। তোমরা যে জ্ঞানের আহরণ করছ, ঐ গ্রামবাসীদের তা ব্যবহার করতে দাও। তোমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের চর্চা শুধু পুনরাবৃত্তিতে প্রবর্তিত না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। কলাভবনে যে শিল্প গড়ে উঠছে, তা প্রাচীনের পুনরাবৃত্তি হবে না। প্রাচীন শিল্পের প্রেরণা নিয়েই তা নূতন পথে গড়ে উঠবে। তোমাদের শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনে এক অসীম সুযোগ ও সমৃদ্ধি রয়েছে যা অন্য কোন বিশ্ব-বিদ্যালয়ে নেই। একদিকে আধুনিক সংস্কৃতির উন্নত রূপ, আরেকদিকে গ্রাম-বাসীদের সঙ্গে আত্মীয়তা। তোমাদের এখানে শিল্প ও সঙ্গীতের চর্চাও চলছে। এরও প্রয়োজন পরিমাপের অতীত। আমাদের হৃদয়াবেগের শতকরা মাত্র ৫ ভাগ কথায় প্রকাশ পায়, মনোবিজ্ঞানীরা এই কথাই বলেন। কথা যখন অক্ষম হয়, তখন কখনও সংগীত, কখনও মৌনশক্তি আমাদের গভীরতম হৃদয়াবেগ প্রকাশ করতে পারে। কথায় অপ্রকাশিত এই শতকরা ৯৫ ভাগ হৃদয়াবেগের প্রকাশ-পথ চাই। তার অভাব আছে বলেই মনের ওপর ভীষণ চাপ পড়ে। ইংল্যান্ড, আমেরিকায় মনোব্যাধি খুব বেশি, তার কারণ, আধুনিক জীবনেরই এটা একটা মস্ত সমস্যা। শিল্প ও সংগীত এই অবরুদ্ধ আবেগের ভার থেকে আমাদের মুক্তি দিতে সক্ষম। সেই উপায়ে আমাদের সুস্থ রাখতে পারে। আধুনিক মনো-বিজ্ঞান, ফ্রয়েড্‌, ইয়ুং কিছুটা সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানের সাহায্যে এই ভার লাঘব করতে। গুরুদেব, শেক্‌স্‌পীয়র, গ্যেটে কথার প্রকাশে যতটা ভার লাঘব করা যায়, করে গেছেন। এখন শিল্প, সংগীত ও নৃত্যের প্রয়োজন—এই প্রয়োজন পশ্চিমের মনোচিকিৎসার কয়েকটি প্রতিষ্ঠানও বুঝেছেন।

আমি আগে যা বল্লাম, সেকথা মনে রেখ, "এ্যাক্টিভিটি অফ থট্‌", "চিন্তার বেগবান ক্রিয়াশীলতা"র অত্যন্ত প্রয়োজন। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতন একটি লক্ষ্যের দিকে দুই পথে এগিয়ে চলবে। তোমাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা আছে, দ্বন্দ্ব আছে—যেমন ফুটবল খেলার মাঠে—তাও চাই। কিন্তু শান্তিনিকেতন তার জ্ঞান, শিল্প ও সংস্কৃতির ভান্ডার বাড়িয়ে চলুক। শ্রীনিকেতন সেই জ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রবাহ গ্রামের মধ্যে ছড়িয়ে দিক।"

বৃন্দাবন

শ্রীমালতী গুহরায়

বৃন্দাবন হিন্দুর শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র। ভক্ত ও ভগবানের প্রেমের লীলার অমর কাহিনী বৃন্দাবন আপন বুকে করে ধরে রেখেছে। তার আকাশে, বাতাসে, বৃক্ষে, লতায়, জলে, স্থলে এমন কি প্রতিটি ধূলিকণায় ভক্ত ও ভগবানের অপরূপ প্রেমলীলার স্মৃতি জড়ানো। বৃন্দাবনের লক্ষ্যই হচ্ছে প্রেম ও মৈত্রীর মধ্য দিয়ে ঈশ্বরোপলব্ধি।

ভারতবাসীর মর্মের কথা ধর্মেই গাঁথা। বিদেশী সভ্যতার আমদানীতে ভারতের উপরকার খোলসটায় কিছু পরিবর্তন দেখা গেলেও তার অন্তরে একটা চিরন্তন ধর্মের সুর যেন ফল্গু-নদীর মতই সর্বদা বয়ে যায়। নানা মত ও নানা পথ হয়তো সাময়িকভাবে তাকে বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল করে, কিন্তু ভগবৎ-প্রেমের সেই চিরন্তন সুরটি একদিন না একদিন ভারতবাসীকে আকর্ষণ করেই। সেই হচ্ছে ভারতবাসীর প্রকৃত পরিচয়।

ভগবৎপ্রেমের সেই সুরটি একদিন বেজেছিল এই বৃন্দাবনে। সে সুর হচ্ছে নররূপী নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণের মনমোহিনী বাঁশীর সুর। যে সুরে সবাইকে ঘরছাড়া হয়ে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হ'তে হয়েছিল। সে সুর শোনামাত্র সংসারীর সংসারবোধ লুপ্ত হ'ত। ভগবৎপ্রেমে, কৃষ্ণপ্রেমে তারা ভুলে যেতো আপন আপন পুত্র পরিবার, স্বামী স্ত্রী, পিতা, কন্যা ইত্যাদি পার্থিব সম্পর্কীয় আত্মীয়দের। সে সুরে আবালবৃদ্ধবনিতার অন্তর যেন আনন্দে নৃত্য করতো।

সে স্বর্গীয় সুর বেজেছিল শ্রীকৃষ্ণের বাঁশী থেকে। সাধারণ একটি বাঁশেরই বাঁশী। কিন্তু তার থেকে যে সুর বেরুতো তা অসাধারণ এক মূর্ছনা তুলে মানুষের অন্তরের দরজায় আছড়ে পড়তো। সে সুরের মূর্ছনায় যে ভাবের ঢেউ উঠতো, ভারতের দেশ দেশান্তর গিরি গহ্বর পর্যন্ত তা ছড়িয়ে পড়তো। সে সুরকে কোন দেশ কাল বা দূরত্বের ব্যবধান আটকে রাখতে পারেনি। যতদিন পর্যন্ত বৃন্দাবন থাকবে, যতদিন বৃন্দাবনের ভক্তরা থাকবেন ততদিন পর্যন্ত তাঁদের হৃদয়ে সে সুর বাজবে। তাঁরা তাঁদের অন্তর দিয়ে সে সুর ধরে রাখবেন।
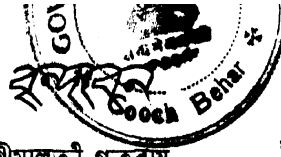
বৃন্দাবনবাসীদের সে সুর ডেকেছিল 'আয়' 'আয়' ব'লে। তাই সে সুরে তারা সাড়া দিয়েছিল পার্থিব সব কিছু ভুলে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নরদেহে আবির্ভূত হয়েছিলেন সে সুরলহরী তাদের শোনাবেন ব'লে। সে ছিল ভগবানেরই আহ্বান। তাই তো ভক্তেরা সব ছুটতে পেরেছিল আপনহারা হয়ে সেই বাঁশীর পেছন পেছন সেই বংশীবাদক শ্রীকৃষ্ণকে একান্তে
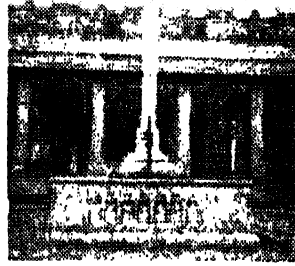
সোনার তালগাছ

পাবে বলে। পার্থিব সব কিছুই তাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।

বৃন্দাবনবাসী ভক্তেরা তাঁদের আপন-হারা প্রেমের বন্ধনে শ্রীকৃষ্ণকে বাঁধতে চেয়েছিলেন; আর শ্রীকৃষ্ণকেও তাই ভক্তের ভগবান হয়ে আটকে যেতে হয়েছিল ব্রজ-বাসীদেরই মধ্যে তাদেরই প্রেমের আকর্ষণে। ভক্তি আর প্রেম ছিল ব্রজ-বাসীদের পূজা বা আত্মনিবেদনের অর্ঘ্য। তাদের সেই নিষ্কলুষ প্রেম ও ঐকান্তিক ভক্তিকে ভগবান উপেক্ষা করতে পারেননি সেই জন্যে তাদেরই অনুক্ষণের সাথী হয়ে, তাদেরই ব্রজের রাখাল হয়ে বৃন্দাবনে শত লীলা প্রকট করে গেছেন।

আজ তাই বৃন্দাবন মহাপবিত্র; শ্রেষ্ঠতীর্থস্থান। বৃন্দাবনের ধূলিকণাও বৃন্দাবনবাসীর কাছে মাথার মানিক, পবিত্র রজঃ। বৃন্দাবনের অলিতে গলিতে প্রশস্ত রাজপথের সর্বত্র আজও প্রকৃত ভক্তমাত্রেই তাঁদের প্রেমের দেবতার দর্শন স্পর্শ পান। তাঁরা আজও তাঁর নূপুর-ধ্বনি শোনেন, আজও তাঁদের কানে তাঁদের শ্যামের বাঁশী বাজে। তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের শত লীলাকাহিনী সেখানকার বন উপবন কুঞ্জ, বিগ্রহ, মন্দির, তমালতরু ও যমুনার তট ইত্যাদির মধ্যে জীবন্ত লীলাক্ষেত্র ক'রে রেখে দিয়েছেন। তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ আজও তাঁদের কাছে সে সবের মধ্যে নিত্য লীলা করেন।

এহেন বৃন্দাবন দর্শনের সুযোগ এসে গেল একদিন অপ্রত্যাশিতভাবেই। হঠাৎ বহুবর্ণিত বহুকথিত ভগবৎলীলার প্রত্যক্ষ সাক্ষী বৃন্দাবন যাবার ব্যবস্থা হতেই মন যেন আনন্দে নেচে উঠলো। যখন আমরা বৃন্দাবন উদ্দেশ্যে রওনা হই, গ্রীষ্মকালের ধূসর আকাশ দিগন্ত বিস্তৃত হয়ে দ্বিপ্রাহরিক বিশ্রামোদ্দেশ্যে আলস্যে গড়াগড়ি দিচ্ছিলো। আমরা রওনা হলাম আলীগড় থেকে মোটরে। গাড়ি ছুটলো ঝড়ের গতিতে ঝড়ো হাওয়া তুলে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমের লীলাভূমির দিকে। বিশ্রামে ব্যাঘাত পেয়ে ধূসর আকাশ যেন তার রোষাগ্নিতে আমাদের পুড়িয়ে দিতে চাইছিল কিন্তু বৃন্দাবনের আকর্ষণে আমরা প্রকৃতির রোষকষায়িত লোচনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করেই এগিয়ে চললাম।

আশে পাশের মাঠগুলিতে সবুজের পরশ বড়ই কম। বড় বড় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কিছু গাছ যেন কেমন নুয়ে পড়া। পাতাগুলি তাদের কেমন কাঁটার মত দেখতে। শুনলাম, রাজপুতানার 'থর' মরুভূমি নাকি এগিয়ে আসছে এদিক পানে বছরে এক মাইল গতিতে। তাই গাছেদের আকৃতি ও প্রকৃতি চলেছে বদলে, নূতন আবহাওয়া উপযোগী। শুনে বড়ই দুঃখ হ'ল। আবার অবিশ্বাসও এলো মনে। মরুভূমি এগিয়ে এসে তার নীরস নিষ্ঠুর হাতে নিষ্পেষণ করবে শ্রীকৃষ্ণের আবাল্য লীলাক্ষেত্রকে, স্পর্ধা তো কম নয়!

শুনলাম, সরকার পক্ষ থেকে নাকি যথেষ্ট চেষ্টা করা হচ্ছে মরুভূমির এই এই করাল স্পর্শ থেকে এসব অঞ্চলকে

রক্ষা করতে। কিন্তু মনে মনে ভাবি, কলিকালে ভক্তের ভক্তি কি এতই অচল? আর তাছাড়া যাঁর আকর্ষণে, যাঁর স্মৃতি নিয়ে লক্ষ লক্ষ ভক্ত তাঁদের প্রাণভরা ভক্তি নিয়ে দেশদেশান্তর থেকে ছুটে আসেন, সেই তিনিও কি রক্ষা করবেন না তাঁর প্রিয় লীলাক্ষেত্রকে?

বৃন্দাবন পৌঁছেই কিন্তু আমার এ সন্দেহের অবসান হ'ল। মনমোহন শ্যামসুন্দর যে প্রেমের বাঁশী বাজিয়ে ভক্তের হৃদয় মন সরস করেছিলেন, যাঁর জন্য তাঁরা তাঁদের পার্থিব বাসনা কামনা, স্বজনে অনুরাগ পর্যন্ত তুচ্ছ করতে পেরেছিল; আজ সে ভক্তহৃদয় কোথায়? মন্দিরে মন্দিরে ঐশ্বর্যের ও দানের পরাকাষ্ঠা দেখলে ভক্তহৃদয়ের ভক্তির উচ্ছ্বাসেরই কতকটা পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু কারুকার্যখচিত চক্ষুতৃপ্তি-কারী মন্দির আর শিলাময় স্বর্ণালংকার-ভূষিত দেব বিগ্রহই কি সব? ভক্তের ভক্তহৃদয় কি শুধুই মন্দির রক্ষা, মন্দির মার্জনা, ভোগারাতি ও বিগ্রহের সজ্জা নিয়েই থাকবে? নারায়ণ যে শুধু শিলায় নন, মূর্তিতে নন, প্রস্তরে নন, তা দেখাতেই তো শ্রীকৃষ্ণ জন্ম নিয়েছিলেন নররূপে। রাম এসেছিলেন অবতার হয়ে মানুষেরই বেশে, বুদ্ধদেব যীশু রাম-কৃষ্ণদেব মহম্মদ সকলেই তাঁদের নরদেহের মধ্যেই করেছিলেন নারায়ণত্ব বা দেবত্বের প্রকাশ। আর একমাত্র বুদ্ধ ও রামচন্দ্র ছাড়া কেউ জন্মাননি বড় ঘরে ধনৈশ্বর্যের প্রাচুর্যে।

নরেই যদি নারায়ণ, তবে আজ বৃন্দা-বনের পথে ঘাটে, অলিতে গলিতে এত দৈন্য এত দুঃখ এত দুর্দশা কেন? একটি পয়সা বা অর্ধপয়সার জন্য ক্ষুধার্ত লালায়িত দরিদ্রের অভিযান আমায় ঐ পথে আসতে দেখা মরুভূমির এগিয়ে আসার অর্থ ধরিয়ে দিল যেন। মানুষের হৃদয় প্রেমে ভালবাসায় পূর্ণ করার যে শিক্ষা অবতাররূপে নরদেহে আবির্ভূত হয়ে শ্রীকৃষ্ণ শিখিয়ে গিয়েছিলেন আজ সে প্রেমের অপমৃত্যু ঘটেছে। মানুষের হৃদয় মরুভূমিতে পূর্ণ হয়েছে। সেখানে দয়া নেই, মায়া নেই, শুধু মাত্র নামযশ, অর্থগৃধ্নুতাই সব। কাজেই মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতির পরিবর্তনের সংগে সংগে বহির্প্রকৃতি সর্বগ্রাসী হয়ে এই ভগবদ্‌প্রেমের লীলাক্ষেত্রের দিকে ছুটে আসতে চাইছে।

মন্দিরে মন্দিরে পুরোহিতরা তাঁদের সুসজ্জিত দেব দেবী বিগ্রহ সাজিয়ে নিয়ে বসে রয়েছেন। তদ্গত হয়ে সেই বিগ্রহের কৃপাভিক্ষার জন্যেই নয়, বরং বিগ্রহকে পেছনে রেখে সম্মুখপানে ভক্তসম্প্রদায়ের আগমন প্রতীক্ষায়। দলে দলে পান্ডারা ধরে নিয়ে আসছে যাত্রীদের, ভক্তদের। পূজারী তাদের হাতে ফুল বেলপাতা তুলসীপাতা তুলে দিচ্ছেন প্রসাদী নির্মাল্য হিসেবে, আর এগিয়ে দিচ্ছেন একটি ডালা অর্থাৎ 'ভক্তি করে এসে যদি থাক
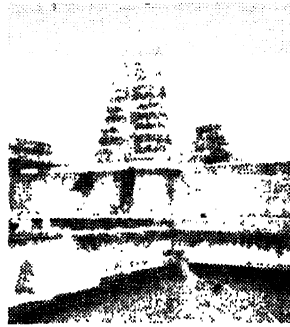
গজকচ্ছপ যুদ্ধস্থান : রঙ্গজীর মন্দির

তো অর্ঘ্য বাবদ কিছু দাও; সোনা রূপা তাম্রমুদ্রা যার যা খুশি।'

কোথাও বা সাজান রয়েছে বিরাট পিতলের ঝকঝকে একখানা থালা, পাশেই টাকা রাখবার মস্ত একটা বাক্স। পূজারী বসে রয়েছেন লাল কাপড়ে বাঁধান লম্বা-মত একটি সুতোয় জড়ান খাতা নিয়ে। কে কি রকম দান দিলে ভোগ চড়ে, খাতায় নাম ওঠে, পূজা নিবেদন সাধু-সন্ন্যাসীর ভোগ হয় ইত্যাদি বলছেন সালংকারে সমাগত যাত্রীদের। শ্রোতাদের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠছে। কেউ বা অন্যমনস্ক হয়ে উসখুস করতেও থাকেন, যেন পূজারী আর কারুর সংগে কথা কইছেন। তারপর দুই-চার পয়সা থেকে দু-চার টাকা পর্যন্ত যার যেটুকু দেয়, ঝনাৎ করে ঐ পেতলের থালায় ফেলে বিগ্রহের উদ্দেশ্যে প্রণাম করে তাঁদের শত কামনা বাসনা তাঁকে জানিয়ে বিদায় নেন।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে তাদের কথা কানে আসে যতসব বুজরুক পুরুতগুলি। খালি পয়সা আর পয়সা! ঠাকুরের মন্দির! ঠাকুর কি কারুর কাছে কে কত পয়সা দেবে না দেবে সে হিসেবে কৃপা করেন? তাঁর কাছে টাকাই বা কী, আর গিনি মোহর মাটির তালই বা কী! সবই সমান।

কেউ বিবেচনা করে না, এ পুরুতরা খায় কি? কী করে বাঁচে? তাদেরও তো স্ত্রী আছে পুত্র আছে, আত্মীয় কুটুম্ব সব আছে। তাদের ভরণপোষণ তো এরাই করে। তাছাড়া এত বড় বড় বিশাল মন্দির পরিষ্কার রাখা, চার পাঁচবার দেব-বিগ্রহের ভোগারতি নানা উৎসবেরেই বা খরচ কত? এই মন্দির দরজা তারাই তো আগলে পড়ে রয়েছে বলে আজ ভক্ত যাত্রীরা এসে তাদের অভীষ্ট দেবতার দর্শন পান। এরা যদি পেটের দায়ে মন্দির ছেড়ে অন্য কোথাও খাবার সংস্থানের চেষ্টায় যায়, তবে এসব মন্দির আর মন্দিরই থাকবে না, অরণ্য হয়ে উঠবে। এইটুকু ভাবতে পারলেও মন যে প্রশান্ত হয়ে ওঠে! বৃন্দাবনের বৃন্দাবনত্ব, তীর্থের তীর্থত্ব বজায় রয়েছে এইসব পুরোহিত সম্প্রদায়ের জন্যই তো! অবশ্য একমাত্র যাত্রীদের দান অবলম্বন করেই মন্দিরের এত বিশাল খরচ চলতে পারে না, চলেও না। এর পেছনে ধনী সম্প্রদায়েরও দান থাকে যথেষ্ট! কিন্তু যেসব ভক্ত যাত্রীদের সমাগম তীর্থস্থান-গুলিতে হয়, তাঁরা যদি তীর্থ করতে এসে আপন আপন ঘরসংসারের অভাব-বোধটাকে সংগে করে না এনে বাসন-কোসন, কাপড় জামা, শখ শৌখীনতার জিনিসের প্রতি নজর কমিয়ে তার একাংশও দানের জন্য ব্যয় করেন, তবে মন্দিরগুলিই যে শুধু ঝলমলিয়ে ওঠে, তা নয়, গরীব দুঃখীর দুঃখও অনেক কমে। তা না করে তাঁরা হয়তো রূপোর থালায় রকমারি ফল মিষ্টি সাজিয়ে মোটা মোটা ফুলের মালা গেঁথে সিল্ক বেনারসী পরে মন্দিরে পূজা নিবেদন করেন। ঠাকুর দালানে তামার থালায় প্রণামী পরে দুই চারটি টাকা আর পূজো অন্তে পথে গরীব দুঃখীর হাতে একটি বা আধটি পয়সা। তাইতেই তো

পুরোহিতদের এত ইনিয়ে বিনিয়ে বলতে হয় আর গরীব ভিখারীরা ডাকাতের মত ঘিরেও ধরে। তীর্থস্থানের নরনারায়ণ ধুলোয় লুটোয় আর শিলানারায়ণ নির্বিকারে চিত্তে ভোগ নিবেদন দেখেন।

যাই হোক অতি অল্প সময় হাতে নিয়েই আমরা বৃন্দাবন এসেছি, সব খুঁটিয়ে দেখার ইচ্ছেটুকুও আছে। তাই একজন গাইড বা পান্ডা সঙ্গে করে চলি। সে আমাদের পরম যত্নে মোটামুটি বৃন্দাবনের মন্দির দর্শন করিয়ে চলতে চলতে তার অভিজ্ঞতাপ্রসূত কাহিনী বলতে থাকে।

আঁকাবাঁকা গলি রাস্তা পেরিয়ে আমরা বিশাল এক বহু প্রাচীন বাড়ির কাছে এসে থামি। 'আসুন' বলে পান্ডা ঠাকুর আগে আগে চলে। সিঁড়িতে উঠে উপরে চলতে দেখি, দেয়ালের এদিকে ওদিকে সব দিকেই প্রায় গোছা গোছা ত্রিশ চল্লিশ কি তার বেশী লাঠি; দ্বশি দিয়ে গুচ্ছাকারে বাঁধা অবস্থায় ঝুলছে। এরকম কত যে লাঠি তার ইয়ত্তা নেই। কিছু ময়ূরের পালকও অমনি গুচ্ছাকারে বাঁধা অবস্থায় এদিকে সেদিকে দেখা গেল। চলতে চলতেই শুনি এটিই নাকি নন্দ ঘোষের বাড়ি, কৃষ্ণসখা বলরামের শৈশবলীলাক্ষেত্র। বাড়িটি যে খুবই প্রাচীন তা দেখেই বোঝা গেল বেশ—শক্ত মজবুত ধরনের। আরো বহু প্রাচীন হবার ক্ষমতাও রাখে।

ভিতরে রয়েছে নন্দ ঘোষ তার স্ত্রী, বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের মূর্তি দিয়ে সাজানো একখানা ঘর। এইটিই মন্দির। এই মন্দির ঘরের প্রবেশ দরজায় দেখলাম তামার বালার যেন এক পাহাড়। কৌতূহল মাথা তুলবার সাথে সাথেই পূজারী বিশ্লেষণ করলেন, যাত্রীরা নাকি নানা — তীর্থধাম ঘুরে এসে এখানে এসব দান করে। চার-ধাম পূর্ণ হলে দেয় লাঠি, দুইধাম না তিনধাম ঘুরে এলে ঐ তামার বালা। ময়ূরপুচ্ছগুলির ইতিহাস জানা গেল না। বললেন না পুরুত ঠাকুর কিছু, আর আমরাও জিজ্ঞাসা করলাম না। কেননা সময় কম দ্রষ্টব্য অনেক, কথায়ও কথা বাড়বে। তাছাড়া আমাদের বকবকানি পান্ডাঠাকুর তো সাথেই রইলেন। কিছু
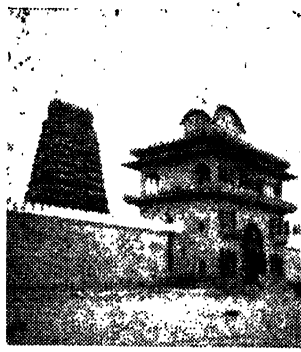
রঙ্গজীর মন্দিরের প্রবেশদ্বার

প্রশ্ন না করতেই হাত-পা নেড়ে অনর্গল বকে যাচ্ছেন, প্রশ্ন করলে তো কথাই নেই। রকম দেখে মনে হয় বৃন্দাবন শহরটির আনাচে কানাচে কোথায় কি আছে তার দ্বাদশ পুরুষের ইতিহাসসহ সব কিছুই ও'র কণ্ঠস্থ।

মন্দিরের পুরোহিত আমাদের সকলকে ঐ মন্দির সম্মুখ করে স্থির হয়ে বসতে বললেন। আমরা তার নির্দেশ মতই বসলাম। এবার তিনি একখানা খাতা হাতে বলতে লাগলেন মন্দিরের তীর্থমহিমা, কটাকা দিলে কি হয় না হয়। আমরা আমাদের যা দেবার সম্মুখে রাখা তাম্রপাত্রে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম প্রণাম সেরে। পুরোহিত আমাদের হাতে একটু প্রসাদ তুলে দিলেন। রকম দেখে মনে হল এ প্রসাদ সর্বসাধারণের জন্য বোধ হয় নয়, দক্ষিণানুপাতে।

এবার আমরা এসে পেঁৗছলাম

গোবিন্দ মন্দির

যমুনাতটে। যমুনা দেখে ছোট্টবেলায় অনেক শোনা একটি গানের প্রথম কলিটি বারে বারে মনে হতে লাগলো—

—যমুনে, এই কি তুমি সেই যমুনে
প্রবাহিনী।
ও যার বিশাল তটে রূপের হাটে,
বিকাত নীলকান্ত মণি।

যমুনার প্রবাহ কৈ? দুকুল ছাপানো মনভরানো চোখ জুড়ানো রূপ কৈ? এত দূরেই বা সরে গেছেন কোন্ অভিমানে? এ যে বিশাল তটভূমিই মাত্র সার। শুকনো খট্‌খট্ করছে ঘাটের বাঁধানো সিঁড়িগুলি। ধারে কাছেও জল নেই। বেশ খানিকটা দূরে চিক্‌চিক্ করছে জল, পড়ন্ত সূর্যের আলোর রেখা পড়ে। ওপারের দৃশ্য সুন্দর। বইয়ে পড়া সাধুর আশ্রম ও হরিণ ময়ূরের খোঁজে চোখ মেলে ধরলাম; কিন্তু কিছুই দেখতে পেলাম না। এপারেই সন্ন্যাসী কয়েকজন শুয়ে রয়েছেন এখানে সেখানে; একটি কমণ্ডলু ও একটি চিম্‌টা মাত্র সম্বল করে। অসীম নীল আকাশে উদাস তাঁদের দৃষ্টি। দেখে কেমন যেন মায়া হ'ল। প্রশ্নও জাগলো মনে, যে অমূল্য রতনের সন্ধানে ঘর-সংসারের সর্ব প্রলোভন, শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য তুচ্ছ করে এই অসীম কৃচ্ছ্রতো বরণ করে এঁরা পড়ে রয়েছেন সর্বজনত্যক্ত হয়ে, পেয়েছেন কি সে রতন? পেয়েছেন কি তাঁদের পরমদেবতার সেই মঙ্গলাশীষ, সেই কৃপা?

আশে পাশে দেয়ালে দুই তিনটা খোঁড়ল খুঁড়ে কয়েকজন বসে রয়েছে। সিন্দুর চন্দন মাখিয়ে কী সব দেবদেবী তৈরী করে। এরাও যাত্রীদের ডাকছে পুণ্যের প্রলোভন দেখিয়ে পয়সা দিতে। এরা যেন জানে, সংসারীদের চলার পথের আলোই হচ্ছে প্রলোভন। কাজেই ডেকে চলেছে 'এসো এখানে মনসা রয়েছেন, শীতলা রয়েছেন, পয়সা দিয়ে প্রমাণ করে যাও, পুণ্য হবে।'

কাছেই একটি ফুলওয়ালী বসে মালা গাঁথছে আপন মনে। এর কোন হাঁকডাক নেই। এর যেন জানা আছে, ঠাকুরকে যার মালা পরাবার সাধ হবে সে কিনবেই। এক ঝুড়ি ফুল যোগাড় করে ছুঁচ সুতো নিয়ে সে তার মালা গেঁথে চলেছে। একটি মালা মাত্র দুটি পয়সা।

অথচ মালাটির পেছনে তার কত না পরিশ্রম। একটি একটি করে ফুল সংগ্রহ আর একটি একটি করে গাঁথা। কোন একটি শিলাখণ্ডে সিঁদুর লেপে বসে থাকা নয়। এই ফুলওয়ালীকে বারোটা পয়সা দেবার উদ্দেশ্যেই আমরা ছয়টি মালা কিনে নিলাম ওর কাছ থেকে।

তারপর এলাম একটি সুশ্রী বাঁধানো ঘাটে। এই ঘাটটির এপাশে ওপাশেও এমনিতর বাঁধানো আরো ঘাট। এটি হচ্ছে কালিয়দমন ঘাট। সেই কালনাগিনীর অত্যাচারে প্রপীড়িত ব্রজবাসী ও গোকুলের গাভী রক্ষা করতে শ্রীকৃষ্ণ নাকি এখান থেকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন কাল-নাগকে ধ্বংস করতে।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে বেশ লাগলো। কাহিনীর মধ্যে কল্পনার রংই থাক্, বা প্রকৃত সত্যই থাক্ বিচারে আমার প্রয়োজন ছিল না। শ্রীকৃষ্ণের ঝাঁপিয়ে পড়া দৃশ্যটি যেন কল্পনার ছবিতে ভেসে উঠলো। তারপর চীরঘাট। সেখানে গোপিনীদের পরীক্ষা করতে শ্রীকৃষ্ণ তাঁদের পরিধানের বস্ত্র লুকিয়ে রেখেছিলেন গাছের ডালে, তারা যখন সবাই বিবস্ত্র হয়ে স্নানে নেমেছিলেন। জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে শুনে আসছি এ কাহিনী। এ সেই গাছ, আর এই সেই ঘাট! সেই যমুনার তীর!

গাছের ডালে ডালে লাল নীল হলদে গোলাপী সবুজ ইত্যাদি নানা রং-এর কাপড়ের টুকরো বাঁধা রয়েছে। গাছের নীচে রয়েছে একজন স্ত্রীলোক বেশ উঁচুমত বেদীর ধরনে বাঁধানো একটা জায়গায়। তার সম্মুখে একটা পাত্রের মধ্যে থরে থরে ঐ ধরনের টুকরো কাপড় সাজানো রাখা রয়েছে। সেও ডাকছে যাত্রীদের সকলকে, পাঁচ আনা থেকে পাঁচ সিকে পর্যন্ত যার যা খুশি পয়সা দিয়ে ঐ এক এক খণ্ড বস্ত্র কিনে ঐ গাছের ডালে ঝুলিয়ে দিয়ে যেতে। তাতেও নাকি পুণ্যি হবে। গাছটার গুঁড়ির দিকে সিমেণ্টে চরণচিহ্ন আঁকা রয়েছে। ঐ স্থানটুকুতেই পা রেখে নাকি শ্রীকৃষ্ণ গাছে চড়তেন। ওখানে হাত দিয়ে স্পর্শ করে যার যা ইচ্ছা টাকা পয়সা নিবেদন করতে হয় যাত্রীদের। তাতে পুণ্যি হয়। এ তথ্য বাংলে দেবার জন্যও একজন লোক ব'সে।

দাঁড়িয়ে দেখছি। সকলেই প্রায় ঐ পাণ্ডাদের কথামতই কাজ করছে। একটি টুক্‌রো কাপড় কিনে গাছের ডালে বেঁধে দিচ্ছে, আর সিমেণ্টে আঁকা চরণচিহ্ন ভক্তিভরে প্রণাম করে পয়সা নিবেদন করছে। পুতুলখেলার মত ঐটুকু একটা রঙীন কাপড়ের টুক্‌রো গোপিনীদের বস্ত্র মনে করে গাছের ডালে বাঁধবার কোনই উৎসাহ পেলাম না। কিন্তু সঙ্গী সঙ্গিনীদের অসন্তুষ্টির ভয়ে ঐ সিমেণ্টে বাঁধানো চরণচিহ্ন দুটিতে হাত বুলিয়ে কপালে ঠেকালাম। মনে মনে ভাল করেই জানি, শ্রীকৃষ্ণ চরণচিহ্ন এটি নয়, তবু

বিড়লা মন্দিরের অভ্যন্তরের একটি শ্বেত পাথরের হস্তীমূর্তি

আজকের দিনে এখানে দাঁড়িয়ে তাঁর চরণ স্মরণ করেই প্রণাম করলাম।

তারপর এলাম বংশীবট। এখানে নাকি শ্রীকৃষ্ণ তাঁর মনোমোহন বাঁশী বাজিয়ে জগৎ মুগ্ধ করেছিলেন। সে বাঁশীর ধ্বনি ধ্যানমগ্ন যোগীরা আজও শুনতে পান। মধুর নাকি সে বাঁশী।

তারপর দেখলাম অক্ষয়বট। এর যে কত বয়স হবে, কবে এ জন্মেছিল তার হিসেব কেউ দিতে পারে না। এর একটি ডাল ভেঙ্গে গেলে নাকি ঠিক সেখান থেকেই আর একটি ডাল বেরিয়ে শূন্য স্থানটি পূর্ণ হয়ে থাকে। এ বটের কোন ক্ষয় নেই। তাই-ই এর নাম অক্ষয়বট।

সত্যি সত্যিই ভাল করে লক্ষ্য করে দেখলে যেন অবিশ্বাস করার উপায় নেই। এরা যে কত প্রাচীন তা এদের জরাপলিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গে যেন লেখা রয়েছে। ভাবতেও কত ভাল লাগলো যে শ্রীকৃষ্ণকে এরা দেখেছে, তাঁর মনোমোহিনী বাঁশী এরা শুনেছে; তাঁর কত শত লীলাকাহিনীর এরা নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে। এদের যদি কথা বলবার শক্তি থাকতো তবে কত কথাই না এরা বলতে পারতো। কিন্তু প্রকৃতির বিচিত্র নিয়মে এদের দেহ আছে, জীবন আছে, বৃদ্ধি ও পরিণতিও আছে। শোনা যায়, অনুভূতিও নাকি আছে কিন্তু তাহলে কি হবে? আজন্মই এরা মূক। বাতাসের সঙ্গেই একমাত্র মর্মর ধ্বনিতে এরা যে কথা কয় তা মানুষের কানেই পেঁৗছে, কোন অর্থের আভাস দেয় না।

এমন একদিন ছিল, যখন গাছেদের ক্লীব জগতের জীব বলেই ধরা হ'ত। এদের প্রাণের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও মানুষের কোন ধারণা ছিল না। বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র জানিয়ে গেছেন, প্রমাণ করে গেছেন যে, এরা সত্যিই ক্লীব নয়। এদের রীতিমত মানুষের মতই প্রাণ আছে। এরা বাঁচে, মরে, খায়, ঘুমায়। হয়তো বা এমন দিনও আসবে, যখন এদের পাতার মর্মরধ্বনি থেকে ভাষার অর্থও আবিষ্কৃত হয়ে যাবে।

যমুনার তীরে এইসব ঘাটবাঁধানো স্মৃতিবহুল দৃশ্যগুলি মনের মধ্যে নানা-রকম ভাবের উদ্রেক করে মন যেন কোথায় উড়িয়ে নিল। চল্‌তে চল্‌তে গাছের খোঁড়লে পাথরের দেয়ালের গায়ে সিঁদুর চন্দন লেপ্টান ঐ একই ধরনের নানা মূর্তি ও তার সম্মুখে পূজারীদের ইনিয়ে বিনিয়ে নানা আবেদন নিবেদন যেন পুণ্যবিক্রেতার চীৎকার বলে মনে হল। সঙ্গে সঙ্গেই মনে হলো ভগিনী নিবেদিতার কথা।

..Left The Stone and Thou shalt find me, cleave the wood and there am I.........

সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের প্রকাশ সর্বত্র। আকাশে, বাতাসে, জলে, স্থলে, ঘাটে ও পটে। নদনদী, পর্বত, অশ্বত্থমূলে, বটবৃক্ষ পর্যন্ত কিছুই বাদ নেই। ভক্ত যেখানে যেভাবে তাঁকে ডাকে, তিনি সে স্থানে সেভাবেই তার কাছে নিজেকে ধরা দেন। ভগিনী নিবেদিতা তো ছিলেন বিদেশিনী, তিনিই গভীর শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়তেন হিন্দুর নানাত্বের মধ্যে এক মহান্ একত্বের সন্ধান লক্ষ্য ক'রে। অভিভূত হয়ে নিজের প্রগাঢ় শ্রদ্ধাও জানিয়ে গেছেন সর্বঘাটে সর্বপটে।

সীমার মধ্যে অসীমের প্রকাশ দেখতে পেতেন তিনি। আর আমি হিন্দুনারী, আবাল্য এই ধর্মসংস্কারেই মানুষ, আমার মধ্যে দ্বিধা সন্দেহ এসে কেমন কচুরী-পানার মত আমাকে ঢেকে ফেললো। হয়তো বা পূজারীদের পয়সা রোজগারের জন্য এত নানা প্রলোভন দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে বলার ধরন দেখেই এত সহজে বিরক্তি এসে পড়ে। শিলাময় দেবস্থানে শিলায় দেবতা না দেখে দেবতাতেই শিলা দর্শন করি। যেখানে আমাদের দানের ইচ্ছা সেখানে আমরা দুহাতে বিলাতে পারি, আনন্দও পাই, কিন্তু জবরদস্তি করে আদায় করবার চেষ্টা দেখলেই হাত গুটিয়ে মুঠি হয়ে আসে। একটি পয়সাও গলতে চায় না। দেব দ্বিজে ভক্তিও তাই আমাদের উড়ু উড়ু হয়।

এরপর আমরা এলাম নিকুঞ্জবনে। ঢুকতেই এক দোকানী চেঁচিয়ে উঠলো, 'দু' পয়সার ছোলা নিয়ে যান, বাঁদরদের খিলাবেন, 'পুণ্যি হোবে'। 'পুণ্যি হোবে' কথাটা বারে বারে শুনে এত বিরক্ত হয়ে গেছি যে, তার কথায় কান না দিয়েই আমরা সরাসরি নিকুঞ্জবনের দরজায় ঢুকলাম। বিস্তৃত কুঞ্জের চারপাশে দেয়াল দিয়ে ঘেরা, ঢুকবার জন্য বিশাল দরজা। ঢুকতে ঢুকতেও দোকানীর আহ্বান কানে যেতে থাকলো। থাকি লক্ষ্মৌ, বাঁদরদের খিলালেই যদি পুণ্যি হয় তাহলে আমাদের আর বৃন্দাবন পর্যন্ত আসার দরকার হতো না; স্বশরীরেই স্বর্গে যেতাম। এ হতভাগা বাঁদরেরা এত খাওয়া গত কয়েক বছর ধ'রে খেয়েছে, যার নাকি কোন বর্ণনা করা চলে না। খাবার জিনিসপত্র, চাল, ডাল, ফল, তরকারি, রাঁধা ভাত ডাল, এসব তো খেয়েইছে; বই, অষুধপত্র, জামা কাপড়, পর্দা মশারী পর্যন্ত চিবিয়ে খেয়েছে, ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে দফা রফা করেছে। এখন বৃন্দাবন এসে পয়সা খরচ করে আবার সেই হতভাগাদেরই খিলিয়ে নূতন করে পুণ্য সঞ্চয়ের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠলাম।

'বাঁদর খিলিয়ে পুণ্যি আমরা চাই না' বলে আমরা ফটক পেরিয়ে নিকুঞ্জবনে পা দিলাম। সম্মুখেই দেখি, বিরাট এক বাঁদরের দল। আমাদের সঙ্গে পাণ্ডা-ঠাকুর রয়েছেন তাই ঘাবড়ালাম না। তিনি চল্‌লেন আগে, আর আমরা তাঁর পিছনে। আমার শাশুড়ীর হাতে কাগজের একটা বড় মোড়কে ছিল কয়েক টাকার ভাঙানো খুচরো পয়সা। একটা দুম্বো বাঁদরের নজড় এড়ালো না তা। সে অবলীলাক্রমে হে'টে এসে তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল সেটা। সব্বাই আমরা হাউ মাউ করে উঠলাম। কাঁচা করকরে অতগুলি পয়সা! গোটা পাঁচেক টাকার হবে। তার দুটো পয়সা এইমাত্র আমরা বাঁদর খিলাবার ছোলা না কিনে বাঁচিয়েছি। অল্প কিছু পয়সাই পথে ভিখিরিদের দেওয়া
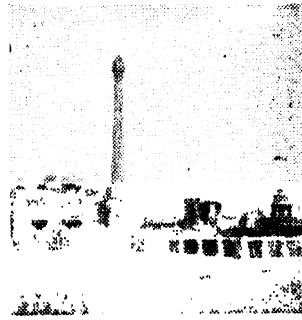
বিড়লা মন্দিরের সম্মুখভাগ পার্শ্বে রথের দৃশ্য

হয়েছিল। কুঞ্জবন শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র! এখানে এত বিষয়াসক্ত মন নিয়ে ঢুকেছি বলেই হয়তো তিনি কৌশলে আমাদের এ শিক্ষা দিয়ে দিলেন; যেমন নাকি গোপিনীদের বস্ত্রহরণ করে অকপট ঈশ্বরভক্তি শিখিয়েছিলেন।

বাঁদর হতভাগা পয়সার মোড়কটা নিয়ে একটা কাঁটা ঝোপের মধ্যে চলে গিয়ে দাঁতে সেটা ছিঁড়তেই পয়সাগুলি ছড়িয়ে পড়লো। তারই মুঠি মুঠি তুলে দুচারটা বাঁদর মিলে ছোলা বাদামভাজা চিবুবার মত চিবুতে লাগলো।

চোখের সামনে পয়সাগুলির দুর্দশা দেখছি আর গা চড়্‌চড়্ করছে। অথচ কোন উপায়ই নেই কিছু করবার। আমরা যখন সকলে মিলে অসহায়ভাবে এই দৃশ্য দেখছিলাম, আরো একটি মস্ত ধামসী বাঁদরী হাল্কা পায়ে হে'টে এসে আমাদের দলের মধ্যেই একজনের ভুঁড়ি টিপে দেখতে লাগলো। এ ব্যাপারটাও আবার এতই আচম্‌কা হ'ল যে, বুঝে উঠতেই যেন খানিকটা সময় গেল। বাঁদরীটা বোধ হয় ভেবেছিল আমাদের সঙ্গিনীর ভুঁড়ির মধ্যে খাদ্যজাতীয় কিছু লুকানো রয়েছে, তাই সে টিপে টিপে দেখতে লাগলো। অবশেষে আশায় নিরাশ হয়ে তার পরিধানের শাড়িখানাই দাঁত দিয়ে টেনে টেনে ছিঁড়তে লাগলো। আবারো আমরা কাঁই কাঁই করে চেঁচিয়ে উঠলাম ভয়ে। আশে পাশের বাঁদরগুলি আবার তাই দেখে আমাদের আরো ভয় দেখাবার জন্য দাঁত খিঁচিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে কিচির মিচির করতে লাগলো।

এ বাঁদরেরাই তো রাবণের মত প্রবল পরাক্রান্ত যোদ্ধাকেও ঘায়েল করেছিল. লঙ্কা পুড়িয়ে ছারখার করেছিল। এদের সঙ্গে সম্মুখযুদ্ধে এগোতে কেউ বড় একটা সাহস পেলাম না। অসহায় হয়ে পাণ্ডাঠাকুরকে খুঁজছি, কিন্তু তিনি একদম উধাও। চটে মটে কাঁই হচ্ছি. এমন সময় তিনি কোথা থেকে হন্তদন্ত হয়ে এলেন। বগলে তাঁর সেই লম্বা লাঠি, আর দুই হাতে দুইটি ছোলার ঠোঙা। তিনি এসেই একটি ঠোঙার ছোলা সব ছিটিয়ে দিলেন জমিতে: আর অন্যটিকে গামছা ঢাকা দিয়ে রেখে দিলেন আরেক হাতে। বাঁদরগুলি যেন ম্যাজিকের মত ছিটকে পড়ল চারদিকে, ঐ ছড়ানো ছোলাগুলি খুটে খেতে।

আমাদের বুকের ঢিপ্‌ঢিপানি তখনো থামেনি. তাই নিয়েই রওনা হলাম পাণ্ডা-ঠাকুরের পেছন পেছন। আর তিনি লুকানো ছোলা সঙ্গে করে লাঠি ঠক্‌-ঠক্ করতে করতে চললেন আগে আগে। গায়ে পায়ের ঝিরঝিরানি কাঁপনি তখনো বেশ রয়েছে, গলা বুকও কেমন শুকনো শুকনো। অথচ একটি গ্লাশ জলেরও ভরসা নেই কাছে কিনারে।

যাই হোক, একটু আত্মস্থ হয়ে আবার চারদিকের দৃশ্যপটে মন দিলাম। মাথার ঘন চুলের ফাঁকে সরু সিঁথির মতই সরু পায়ে-চলার একটি রাস্তা এ'কে বে'কে ঘন ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে চলে গেছে। শুনেছিলাম, কুঞ্জবন রাধাকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র। এখানে নাকি কোন গাছ-পালাই মাথা উ'চু করে থাকে না, সবই

পদানত আশ্রিতের মত শ্রীকৃষ্ণপদরেণু স্পর্শের জন্য ভূমিতে লুটিয়ে থাকে। সত্যিই মনে হ'ল তা। সাপের মত জড়ান জড়ান গাছের গুঁড়িগুলি সর্বাঙ্গে বয়সের ছাপ লাগিয়ে কোমর বাঁকা করে যেন ঝুঁকে পড়ে রয়েছে। ভারি ভাল লাগল দেখতে। মনটা কল্পনার রাজ্যে যেন উড়ে চলে গেল। যাঁকে উদ্দেশ করে বৃক্ষলতা এই আভূমি-প্রণতি জানাচ্ছে চক্ষু যেন ব্যগ্র হয়ে তাঁকেই দরশনের জন্য খুঁজে বেড়াতে লাগল। বড় সুন্দর একটা অনুভূতি যেন হৃদয়-মন ছেয়ে ফেলল। তাই নিয়েই চলতে থাকি।

এক জায়গায় একটা কুণ্ড। পাণ্ডা-ঠাকুর বললেন, 'এটা হোচ্ছে ললতা সোখীর কুণ্ডু। ললতা সোখীর যোখোন তৃষ্ণা পেয়েছিলো, শ্রীকৃষ্ণ তোখোন আপোন হাঁতের বাঁশী দিয়ে এখানটায় খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে তাঁকে পানি পিলিয়ে-ছিলেন।" তারই কাছে দেখলাম, একটি গাছ বেশ সযত্নে সুরক্ষিতাবস্থায় রাখা। তারই খোঁড়লে খানিক জলও রাখা। ঐ ললিতা কুণ্ডের জল। পাণ্ডামতও একজন কাছে দাঁড়ানো। তিনি বললেন, ওটা নাকি তমাল গাছ। গাছের জায়গায় জায়গায় সত্যিই যেন সুস্পষ্ট হাতের আঙুলের ছাপ। আর তা একদম কালো পাথরের মত লাগছে দেখতে। শুনলাম, শ্রীকৃষ্ণ নাকি মাখন খেয়ে এই গাছের এখানে সেখানে হাত মুছতেন। আর তাঁর শ্রীহাতের পরশে সেই সেই জায়গা শালগ্রাম শিলা হয়ে রয়েছে।

হাত দিয়ে ঘষে ঘষে, নখ দিয়ে খুঁটে খুঁটে দেখলাম, সত্যি সত্যি শিলা বলেই যেন মনে হ'ল। তমাল গাছ আর যমুনা স্মরণ করলেই শ্রীকৃষ্ণকে মনে পড়ে। তাঁর লীলাপ্রসঙ্গের সর্বত্র যেন এরা অচ্ছেদ্য সম্পর্কে ঘেরা।

নিকুঞ্জবনে একখানি ছোট মন্দির আছে। বেশ চকচকে তকতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ভেতরে রাধারাণী, শ্রীকৃষ্ণ, ললিতা ও বিশাখা সখীর মূর্তি। মন্দিরের দরজার গোড়ায় একটি ঝোলানো দোলনায় শ্রীকৃষ্ণমূর্তি শোয়ান। লম্বা একটি রশি ঝুলছে ঐ দোলনা থেকে। যাত্রীদের ঐ মন্দিরে গিয়ে বসতে হয় আর ঐ রশি ধরে দোলা দিয়ে শ্রীকৃষ্ণকে সাক্ষাৎ সেবা করার সৌভাগ্য অর্জন করতে হয়। এই সেবা অর্জনেও পুণ্য হয়। অবশ্য তার জন্যেও স্বতন্ত্র দক্ষিণার ব্যবস্থা।

পুরোহিত ঠাকুর বললেন, এ কুঞ্জবন ও মন্দির যে কোন এককালেই শ্রীকৃষ্ণের লীলাক্ষেত্র ছিল তাই নয়, এখনো তাঁর মাহাত্ম্যে কানায় কানায় ভরা। সন্ধ্যা সাতটা সাড়ে সাতটায় বিগ্রহকে স্নানারতি দিয়ে ভোগ নিবেদন করে দুটি খিলি পান সাজিয়ে রেখে, পরদিন সকালে মুখ ধোবার জন্য দাঁতন ও এক ঘটি জল পর্যন্ত গুছিয়ে রেখে পাণ্ডারা দরজা বন্ধ করে নাকি চলে যান নিজের বাড়িতে। আর মন্দির-দরজা খোলা হয় পরদিন সকালে। এই রাত্রির সময়টুকু রাধারাণী শ্রীকৃষ্ণের সেবাভার নিজের হাতে তুলে নেন। এই সময়টা শ্রীকৃষ্ণের বিশ্রাম সময় ও রাধারাণীর সেবার সময় জেনে কুঞ্জে মানুষ তো দূরের কথা কীট পতঙ্গ পশু পাখী পর্যন্ত কিছুই থাকে না। কুঞ্জবন একেবারে শান্ত নিস্তব্ধ হয়ে যায়।

রাধারাণী যে সত্য সত্যই শ্রীকৃষ্ণের সেবায় রত থাকেন, এ যে শুধু কল্পিত কাহিনী নয় আর শ্রীকৃষ্ণও যে বাস্তবিক এখনও এ কলিযুগে পর্যন্ত এ কুঞ্জবনের আকর্ষণ ত্যাগ করেন নি, তার প্রমাণ পাওয়া যায় পরের দিন সকালে মন্দির-দরজা খুললে। ঘটিতে নাকি জল থাকে না, দাঁতন ভেঙে পড়ে থাকে, বিছানা ওলট-পালট, দেখেই বোঝা যায় কেউ ব্যবহার করেছে। এ ধরনের সব চিহ্নই প্রমাণ করে দেয় রাধাকৃষ্ণ অতীত যুগের অতিমানব-মানবী নন, তাঁরা সাক্ষাৎ দেব-দেবী, তাঁদের লীলা বোঝা মানুষের সাধ্য নয়। অনেকে নাকি এ কাহিনীতে সন্দেহ করে গভীর রাত্রিতে কুঞ্জবনে প্রবেশ করতে গিয়ে মৃত্যুবরণ পর্যন্ত করেছে। দেহধারী শ্রীকৃষ্ণের লীলক্ষেত্রে বিদেহী কৃষ্ণ এখনো লীলা করেন, এ তথ্য মনুষ্য-বুদ্ধির অগোচর হলেও এই নাকি সত্যি। পরদিন কিছু দর্শনী দিলে এর চাক্ষুষ প্রমাণ দেখা যায়।

শ্রীকৃষ্ণ আজও রাধারাণীর সেবা নিতে যেখানে নিত্য আসেন, সেই বৃন্দাবনধামের আনাচে কানাচে তো শুধু আনন্দেরই হিল্লোল বইবার কথা! কিন্তু এই কুঞ্জে ঢুকতে ও কুঞ্জ থেকে বের হতে যে দুঃখ-দারিদ্র্যের দৃশ্য চোখে পড়ে, তাই যেন অন্তরে পীড়া দেয় বার বার। দয়াময় মধুসূদন কি শুধু রাধারাণীর সেবা নিতে নিভৃত রজনীতেই এ কুঞ্জে আসেন, আর ভোরের আলো না ফুটতেই চুপিসাড়ে পালিয়ে যেতে পারেন? 'রাধে গোবিন্দ' যাদের মুখের বুলি, তাদের ডাকে কি একবারও ফিরে তাকান না? থমকেও দাঁড়ান না? তাঁর একটিমাত্র কৃপাকটাক্ষ হলেই যে তাদের চিরমুক্তি হয়ে যায়, অন্ধের অন্ধত্ব, খঞ্জের খঞ্জত্ব ও চিরদুঃখীর দুঃখ মুহূর্তে জন্মের মত ঘুচে যায়।

আবারো সঙ্গে সঙ্গে মনে হয়, ভগিনী নিবেদিতার কথা। কতই না সহজ সরল বিশ্বাসে ভারতের সর্বতীর্থমাহাত্ম্য গ্রহণ করেছিলেন ঐ বিদেশিনী নারী সন্দেহমুক্ত শুভ্র পবিত্র অন্তরে। পাণ্ডার কথা বিশ্বাস করতে আমিও তো চাই, এখনো আমাদের দেশে কত সহস্র সহস্র লোকেই তা করে। কিন্তু ভগবানের লীলা-ক্ষেত্রে এত দৈন্য এত দুর্দশা, এ যেন কিছুতেই মন মানতে চায় না। বৃন্দাবনের তাহলে অসাধারণত্ব, মাহাত্ম্য কোথায়?

আবার উঠি। তারপর আসি নিধু-বনে। এখানেও অমনি লুটিয়ে পড়া গাছের সারি। ছোট্ট ছোট্ট গোল গোল দানা ফলে ভর্তি। শুনলাম, এগুলিই নাকি মুক্তো-ফল। ললিতা বিশাখা সখী নাকি এ ফল নিয়ে কত খেলা খেলেছেন কত সাজে সেজেছেন ও সাজিয়েছেন রাধারাণীকে। সবুজ সবুজ ছোট্ট ছোট্ট দানা। এককালে পেকে নাকি মুক্তোফলের মত দেখতে হয়। থলো থলো গাছে ভরে থাকে, ভারি সুন্দর দেখায়। এখন তো সবুজের বেশ ধরে পাতার সঙ্গে মিশিয়ে আছে আত্ম-স্বরূপ গোপন করেই যেন। লক্ষ্য না করলে বুঝবারও উপায় নেই।

এখানে রয়েছে বিশাখা কুণ্ড। জল-গুলি শেওলা সবুজপানা। কুণ্ডটি বেশ গভীর মনে হ'ল। আরো রয়েছে কয়েকটি সুন্দর সমাধি। চারদিকটায় বেশ শান্ত মনোরম পরিস্থিতি। অন্তিম শয়নে শান্তিতে বিশ্রাম নেবার উপযুক্ত স্থানই বটে! এরই একটি হচ্ছে সুবিখ্যাত গায়ক তানসেনের সমাধি।

বৃন্দাবন শহরটি একটি ছোটই শহর।

ঘুরে ফিরে যা দেখলাম, তাতে মনে হয় এটি একটি মন্দিরেরই শহর। রাধা-গোবিন্দেরই মূর্তি নানাভাবে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে, ভিন্ন ভিন্ন নামে। একই বহু আবার বহুই এক, তারই স্মৃতি বহন করে বৃন্দাবন। সকল মূর্তির মধ্য দিয়ে ব্রজবাসী তাদের ব্রজের রাখালকেই শ্রদ্ধা জানায়।

কলকাতার মত এখানেও যেন সর্ব-ভারতের মিলনস্থান। নানা ভাষাভাষী, নানা পোশাকের মেলা। ভারতেরই বিভিন্ন প্রদেশবাসী সব। ক্রিশ্চান আমেরিকানও আছে। মন্দির বলতেও শুধু হিন্দু মন্দির নয়, গীর্জা মসজিদ বৌদ্ধমঠ সবই রয়েছে। রাস্তাগুলি পরিষ্কার, মন্দির-গুলিও নিত্য মার্জনায় পরিচ্ছন্ন পরি-পাটি। বেশ যেন একটা শুচিশুদ্ধ ভাব।

বৃন্দাবনের বড় বড় মন্দিরগুলিতে ঢুকলেই দালানের মেঝেতে চতুষ্কোণ মার্বেল পাথরের টুকরোতে কত যে অগুনতি নাম খোদাই করা, তার ইয়ত্তা নেই। কিছু টাকা এককালীন দান দিয়ে নিজের নিজের বা প্রিয় আত্মীয়স্বজনের নাম খোদাই করে অমর হবার চেষ্টা করেছেন সবাই। উত্তরকালে তাঁদের নাতি-পুতিরা এলে হয়তো এগুলি দেখবে, তাঁদের নাম স্মরণ করবে, তাঁদের আত্মার জন্য প্রার্থনাও জানাবে।

এর মধ্যে বাঙালীর নাম যে কত, তার কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। বৃন্দাবনের অনেক মন্দিরই নাকি বাঙালীর দানে পুষ্ট। বাঙলার বাঙালী শ্রীশ্রীচৈতন্য মহা-প্রভু তো বর্তমান বৃন্দাবনের একরকম জন্মদাতা। কেননা, শ্রীকৃষ্ণের পরে বৃন্দাবন ক্রমশ বন-জঙ্গলেই পরিণত হতে থাকে। 'বৃন্দার'-'বন' কথা হ'তেই বৃন্দাবনের উৎপত্তি। বৃন্দা অর্থে শ্রীকৃষ্ণের সখী বৃন্দা গোপিনীরা।

চৈতন্যদেব তাঁর ভাবসমাধিতে যে যে স্থানে যে সব লীলামাহাত্ম্য ছিল বলে জানতে পেরেছিলেন, সে অনুসারেই সে সব স্থান নির্দিষ্ট হয়ে বর্তমান নামানু-করণ হয় ও বর্তমান বৃন্দাবন গড়ে ওঠে। সে আজ প্রায় পাঁচ শ' বছর আগের কথা। ১৫১৪ খৃঃ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেব বলভদ্রকে সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণপ্রেমে আত্মভোলা হয়ে সুদূর বাংলা দেশ ছেড়ে শ্রীকৃষ্ণধাম বৃন্দাবনে প্রথম এসেছিলেন।

বৃন্দাবনের ক্রমোন্নতি অবশ্য পরে তাঁরই গোস্বামী ভক্তেরা করেছিল। বৃন্দাবন শহরটি চৌরাশী ক্রোশ বিস্তৃত। বৎসরের কোন একটা সময় ভক্তসন্ন্যাসীরা পদব্রজে এই চৌরাশী ক্রোশ পরিক্রমা করেন। তাকেই ব্রজ-পরিক্রমা বলে।

বৃন্দাবন ভারতবর্ষের ভক্তিযুগের সাক্ষ্য দেয়। বৃন্দাবনের লীলায় ভক্তি, খেলায় ভক্তি। বৃন্দাবনের ইতিহাসের পাতায় পাতায় ভক্তিরস ছড়ানো। ভক্তিই বৃন্দাবনের আসল ভিত্তি। নইলে বৌদ্ধ মুসলমান ইংরেজ ইত্যাদি নানা দেশীয় বিদেশীয় প্রভুত্বের মধ্য দিয়ে 'বৃন্দার'-'বন' আজ বৃন্দাবন হয়ে সগৌরবে আপন অস্তিত্ব ও পুণ্যস্মৃতি বজায় রাখতে পারত না।

পুরাণে নাকি শ্রীরাধা সম্বন্ধে এক আধবার ছাড়া বিশেষ কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। শ্রীকৃষ্ণ ও গোপিনীদের সম্বন্ধেই উল্লেখ দেখা যায় বেশী। কাজেই অনুমান হয়, রাধাকৃষ্ণের যুগলমিলন ভক্তহৃদয়েরই কল্পনা। মাতা অবর্তমানে সন্তানের উদ্ভব সম্ভব নয়, পিতারও সঠিক ধারণা হয় না। কাজেই পিতৃরূপী নারায়ণ শ্রীশ্রীমধু-সূদনকে পূজা করে ভালবেসে ভক্তহৃদয় তৃপ্ত হয়নি, মাতৃ অভাব বোধ করেছিল। তাই হয়তো রাধার আবির্ভাব। কিন্তু আমরা শ্রীকৃষ্ণকে একক শক্তিতে সাধারণত

কোথাও বড় একটা প্রকাশ দেখি না। রাধাকৃষ্ণ এই যুগ্মমূর্তিই আমাদের কাছে সর্বাধিক পরিচিত। কাজেই শ্রীরাধাকে কেবলমাত্র ভক্তহৃদয়ের কল্পনা বলে ভাবতেও আমরা কেউ তৃপ্তিবোধ করি না।

শ্রীকৃষ্ণের বংশধর শূরসেন নাকি তাঁর মথুরায় রাজত্বকালে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি রক্ষা করার জন্য তাঁর লীলাসংক্রান্ত এক এক জায়গার এক এক নাম দিয়েছেন। সেই সময়ই নাকি বহু বিগ্রহ তৈরি হয় ও মন্দিরে মন্দিরে শহর মন্দিরময় হয়ে ওঠে। শূরসেনের রাজকীয় প্রভাব ও রাজৈশ্বর্য ভাণ্ডারে বৃন্দাবনের স্থাপত্য নিদর্শনরূপ মন্দিরগুলি গড়ে ওঠা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু পাণ্ডা ঠাকুরদের বাচনিক যা জানলাম তাতে মনে হল, প্রতিটি মন্দিরের পেছনে বিভিন্ন ব্যক্তির অকুণ্ঠ দান রয়েছে।

গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন এই তিনটি মন্দিরই বহু প্রাচীন। এই তিন মন্দির দর্শন করে দর্শনার্থী যাত্রীরা অন্য সব মন্দির দেখতে ছোটে। মুসলমান রাজত্বে সম্রাটদের রোষদৃষ্টি থেকে বৃন্দাবনের মন্দিরগুলিও বাদ পড়েনি। সেই জন্য গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনমোহন ইত্যাদি বিগ্রহগুলি নিরাপত্তার জন্য জয়পুরের মহারাজা জয়পুরে নিয়ে রাখেন।

গোবিন্দের মন্দিরটি বড়ই সুন্দর। মন্দিরের ভিতর প্রশস্ত চত্বর, বিরাট দালান। পরিবেশ অতি শান্ত ও মনোরম। সকলেই ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে গোবিন্দের কৃপালাভ করার জন্য তাঁর নামগান, জপ ও ধ্যানে ন্যস্ত। মন্দিরে ঢুকতে ভারি সুন্দর একটি পবিত্র ভাবে মন আবিষ্ট হয়। মনের সব ক্লেদ যেন ধুয়ে মুছে যায়, অন্তর তৃপ্তিতে ভরে ওঠে। মন্দিরটির কারুকার্যেও একটি পবিত্র গাম্ভীর্য, যেন চিত্তাকর্ষণ করে। বেশ প্রশান্ত বিশালতা যেন চারদিকে ছড়িয়ে রয়েছে। শোনা যায়, এই মন্দিরটি সাত তলা ছিল। সর্বোচ্চ তলার গম্বুজে প্রতি সন্ধ্যায় বিরাট ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালানো হতো। আর দিল্লী থেকে তা লোকে পরিষ্কার দেখতে পেতো। হিন্দুমন্দির এভাবে সগৌরবে মাথা উঁচু করে রাজধানী দিল্লী পর্যন্ত তার নিশানা দেখাবে, সম্রাট ঔরংগজেবের তা অসহ্য বোধ হয়। প্রবল আক্রোশে তাই তিনি এর উপরার্ধ চারটি তলা নষ্ট করে ফেলেন। বৃন্দাবনের মন্দির যেন বৃন্দাবনেই সীমাবদ্ধ থাকে, সে যেন আর বৃন্দাবনের উপরে মাথা তুলতে না পারে, এ ব্যবস্থা না করা পর্যন্ত তাঁর কোন শান্তি ছিল না।

গোবিন্দের মন্দিরের সৃষ্টিকর্তা নাকি রূপ গোস্বামী। শোনা যায়, তিনিই এই জায়গায় প্রথম গোবিন্দের পূজো শুরু করেন বিগ্রহ স্থাপন করে। পরে মানসিংহ এই স্থাপত্য শিল্পের ভারতীয় নিদর্শনরূপ এই সুন্দর মন্দিরটি নিজ অর্থে তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন।

শেঠের মন্দির। এটিও একটি বিশাল মন্দির। বিরাট উঁচু প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। বাইরে দূর থেকে এর এক অপরূপ শ্রী যাত্রিমাত্রকেই মুগ্ধ করে। আশে পাশে ময়ূর-ময়ূরী স্বচ্ছন্দ গতিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মন্দিরের কারুকার্য বড়ই সুন্দর। দক্ষিণ ভারতের অনুকরণ বলেই মনে হ'ল। এ মন্দিরের বিগ্রহের নাম রঙ্গজী। সেইজন্য এই মন্দিরকে রঙ্গজীর মন্দির বলা হয়। লক্ষ্মীচাঁদ শেঠের দুই ভাই এই মন্দির নিজব্যয়ে তৈরি করেন। মন্দিরের প্রাঙ্গণে একটি বিশাল স্বর্ণস্তম্ভ। এটিকেই সোনার তালগাছ বলা হয়। গাছের মাথায় পাতা ফল কিছুই নেই। গাছের গুঁড়িও গাছের মত মোটেই দেখতে নয়, শুধুই একটি স্তম্ভবিশেষ। তবু যে একে তালগাছ বলা হয়, তার কারণ হচ্ছে এটি তালগাছের মতই সোজা আর লম্বা বলে। আমার যেন মনে হলো লম্বায় সচরাচর যে তালগাছ আমাদের চোখে পড়ে, এ স্তম্ভটি তার চেয়েও অনেকটাই উঁচু। এটি আগাগোড়া পুরু সোনার পাতে তৈরী। দূরে থেকে ঝকমক করে। এর ভেতরে নাকি চন্দন কাঠ, ওপরটাকুই শুধু সোনার পাতে মোড়া। এই সোনার তালগাছের প্রতিষ্ঠায় অর্থপ্রাচুর্যের কথা সংগে সংগে মনে হতে চায়।

পাশেই চতুষ্কোণ একটি দীঘি। টলমল করছে পরিষ্কার নীল জল। চারদিকটা বাঁধান। সিঁড়িগুলি মস্ত লম্বা লম্বা, সুন্দর দেখতে। এর নাম নাকি গজকুণ্ড। পুরাণবর্ণিত গজকচ্ছপের যুদ্ধকাহিনীর সংগে এর স্মৃতি জড়ানো। তাই এখানে প্রতি বৎসর কোন একটা বিশেষ সময় কাঠের হাতী ও কচ্ছপ তৈরি করে জলে ভাসিয়ে গজ-কচ্ছপ যুদ্ধের পুনরাভিনয় করা হয়। প্রতি বৎসর চৈত্র মাসে এখানে একটি খুব বড় মেলা হয়। তার নাম শেঠের মেলা। বহু নাকি লোকসমাগম হয়, আনন্দের হাট বসে।

আরেকটি দেখলাম কাঁচের মন্দির। নানা চিত্র বিচিত্রিত কারুকার্য করা কাঁচেরই তৈরী মন্দির। মন্দিরটি দোতলা নানা রকম রংচং-এর কাঁচ। আয়নাওয়ালা কাঁচও রয়েছে তাতে। কাঁচেরই যেন ছড়াছড়ি। আরাধ্য দেবতাকে তুষ্ট করতে আর সংগে সংগে নিজেকেও সকলের স্মরণপথে রাখতে মানুষের কী আগ্রহ কী অসীম চেষ্টা! মন্দিরটির কারুকার্যে ও বিভিন্ন

চক্রদত্ত

লোহার জিনিসপত্র অব্যবহার্যভাবে কিছুদিন থাকলেই মরচে পড়ে যায়। বিশেষত যন্ত্রপাতির যে সব নাট-বলটু সচরাচর খোলা-পরান হয়না সেগুলোতে প্রায়ই মরচে ধরে আর এইসব মরচে ধরা বল্টু খোলা খুবই শক্ত ব্যাপার। নতুন একটি রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে কয়েক মিনিটের মধ্যে মরচে পরিষ্কার করে, ঐগুলো সহজেই খোলা যায়। এই পদার্থটির নাম "এরোসল"। মরচে ধরা
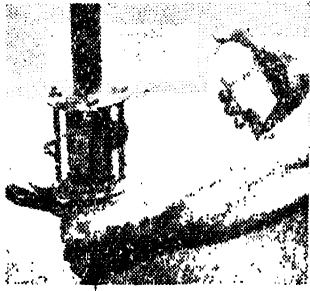
'এরোসল' স্প্রে করে মরচে ধরা নাটবল্টু পরিষ্কার করা হচ্ছে

বল্টুর ওপর স্প্রে করলে কুয়াসার মত সৃষ্টি হয় এবং ঐ কুয়াসা নাট-বল্টুর ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে মরচেগুলো নষ্ট করে ফেলে। তখন খুব সহজেই ওগুলো খোলা যায়। "এরোসল" যে শুধু সাময়িকভাবেই উপকার করে তা নয়, একবার এরোসল স্প্রে করলে জিনিসগুলোর ওপর একটা পাতলা আবরণ পড়ে যায় ফলে আর ওগুলোতে মরচে ধরেনা।

*

কাঁচ ক্ষণভঙ্গুর পদার্থ, সাধারণভাবে এই কথাই আমরা জানি। অবশ্য অ-ভঙ্গুর কাঁচের জিনিসও আবিষ্কৃত হয়েছে এবং নিতান্ত হঠাৎই আবিষ্কার করা গেছে। যেমন আকস্মিকভাবে আবিষ্কার হয়েছিল গুডইয়ারের "ভলকা-নাইজড্ রবার", নোবেলএর "ব্লাস্টিং জেলাটিন" এবং ব্রেরলীর "স্টেন্‌লেশ ষ্টীল"। ১৯০৩ সালে এডোয়ার্ড বেনিডিক্‌টাস তার ল্যাবরেটরী

একটি ফ্লাস্ক মাটিতে পড়ে যায় এবং তিনি আশ্চর্যের সঙ্গে লক্ষ্য করেন যে, ঐ ক্ষণভঙ্গুর পদার্থটি একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়নি। ফ্লাস্কের গায়ে যে কাগজটি ছিল সেইটি পড়ে তিনি দেখেন যে, ফ্লাস্কের মধ্যে এসিটন-সেলুলয়েডের একটি সলিউশন ছিল। এসিটন উবে গিয়ে ঐ আধারের ভেতর দিকে সেলু-লয়েডের একটি পাতলা আস্তরণ পড়ে। এডোয়ার্ডের ডায়রীতে দেখা যায় যে, তিনি লিখেছেন হাত থেকে ফ্লাস্কটি পড়ে যাওয়ার পর তিনি সেটা মাটি থেকে তুলে নিয়ে দেখেন যে ফ্লাস্কটা আড়াআড়িভাবে ফেটে গেছে কিন্তু কোনও একটি শক্তির দ্বারা টুকরোগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে খসে না পড়ে পরস্পর জোড়া আছে। এর পর তিনি তার ল্যাবরেটরীতে ফিরে যান এবং পরের দিনই "নিরাপদ কাঁচের" আবিষ্কার হয়।

*

ডাঃ ওয়ালেশ মিণ্টো বলেন যে, পোলিও মাইলাইটিস্ রোগে আক্রান্ত হওয়া এবং রোগের প্রকোপের তারতম্য রোগীর গায়ের, চুলের এবং চোখের রংএর ওপর কিছুটা নির্ভর করে। তাঁর ধারণা যে, মানুষের দেহের চামড়ার তলার রঙের তারতম্যের ওপর এ রোগের আক্রমণ নির্ভর করে। তিনি ১১৮৩টি রোগী পর্যবেক্ষণ করে দেখেছেন যে, ওদের মধ্যে একটির সোনালী চুল, ফর্সা রং ও নীল চোখ ছিল। সতেরটি রোগীর বাদামী চোখ ও সোনালী চুল ছিল। বাকী ১১৬৫ জনের চুল ও চোখের রং বাদামী কিংবা কালো ছিল। ডাঃ মিণ্টোর মতে ফর্সা মানুষদের ওপর ও রোগের প্রকোপ কম হয়। তাঁর

ফর্সা রোগী চিরকালের মত অক্ষম হয়ে গিয়েছেন। ডাঃ মিণ্টো আরও বলেন যে, তাঁর এই মতবাদ বিশেষত ককেকাস ও শ্বেত-জাতির পক্ষে প্রযোজ্য।

*

শ্বেতকায় জাতিরা সব সময় অশ্বেতকায় জাতিকে কিঞ্চিৎ ঘৃণার দৃষ্টি দিয়ে দেখে। আজকের দুনিয়ায় মানুষ যখন সুসভ্যতার আলোকে সমুজ্জ্বল বলে গর্ব অনুভব করছে, তখনও কিন্তু শ্বেতকায় জাতিরা এই বর্ণবিদ্বেষ ভুলে যেতে পারছে না। আফ্রিকা, আমেরিকা প্রভৃতি সর্বত্রই শ্বেতকায় জাতিরা অশ্বেতকায় জাতিকে সর্বতোভাবে দুবে রাখার জন্য সদা যত্নবান। এমন কি লেখাপড়ার ব্যাপারেও এদের বর্ণ-বিদ্বেষের ব্যতিক্রম নেই। দিনে দিনে এই বিদ্বেষের রূপ উগ্র হয়ে উঠছে। আজ এরা বিজ্ঞানের বলে অশ্বেতকায় জাতি নির্ণয় করার চেষ্টা করছে। শিশুদের মধ্যেই পরীক্ষা কার্য চালান হচ্ছে, কারণ অশ্বেতকায় জাতির শিশুদের শ্বেতকায় জাতির শিশুদের মধ্য থেকে ভিন্ন করে ভিন্ন রকম স্কুলে পড়ানোর ব্যবস্থা হবে। শুধু চোখে দেখেই এই তারতম্য ধরা পড়ে না, বিশেষত যারা বর্ণশংকর, তাদের তো সহজে বোঝাই যায় না। তাই বিজ্ঞানের বলে পরীক্ষা করে দেখা হবে কোন্ শিশুর মধ্যে কতখানি অশ্বেতকায় রক্ত মিশেছে। "ফটো ইলেকট্রিক রিফ্লেকশন মিটার" নামক যন্ত্রের সাহায্যে দেহের চামড়া পরীক্ষা করে দেখা হবে। কিছুটা দেহের অনাবৃত অংশের চামড়া আর কিছুটা পোশাকে ঢাকা অংশের চামড়া পরীক্ষা করার ব্যবস্থা হয়েছে। অনাবৃত অংশের জন্য কপালের মাঝখানটা আর আবৃত অংশের জন্য হাতের কনুয়ের নীচের দিকের যে অংশে লোম নেই এবং যেটা বন্ধুর নয়, সেই রকম জায়গার চামড়া নির্ধারিত করা হয়েছে। সাধারণভাবে ছেলে ও মেয়ের মধ্যে ছেলেদের চামড়া বেশী কালো হয়, কারণ তারা বেশীক্ষণ রোদে থাকে। অবশ্য এই তারতম্য কপালের চামড়া

ধাতুর ছড়াছড়িতে মনে হ'ল কত অর্থব্যয় করলে এ ধরনের একটি মন্দির সম্ভব! কাঁচের মন্দির জীবনে এই প্রথম দেখলাম। সম্পূর্ণ নূতন ধরনেরই বটে!

তারপর শাহজীর মন্দির। আমাদের লক্ষ্ণৌরই এক লালা কুন্দলাল নাকি এই মন্দির নির্মাণ করিয়েছেন। এটিও ভারতীয় শিল্পকলার এক অপূর্ব নিদর্শন। মনে হ'ল দোতলাই। আমরা বেলা সাড়ে তিনটেয় এ মন্দিরে আসায় মন্দিরের দরজা বন্ধ ছিল। এটা বিগ্রহের বিশ্রাম সময়, সঙ্গে সঙ্গে পুরোহিত-পাণ্ডাদেরও। অত বড় বিশাল মন্দির অথচ জনমানবের নামগন্ধও নেই। মন্দির যেন ঘুমিয়েই আছে সত্যি। আমাদের পায়ের নীচের সান বাঁধানো রাস্তা একদম আগুন গরম। আমরা পা টিপে টিপে পালিয়ে আসি। আসতে আসতে অবশ্য এদিকে সেদিকে অনুসন্ধানী দৃষ্টি ফেলি। সময় এতই কম যে, আর যে এ মন্দির দেখতে আসতে পারব, এ ভরসা নেই বললেই চলে। এ এক বিশালই মন্দির। দালানটির জাঁকজমক, যেন তাকিয়ে দেখবার মত। অতি প্রশস্ত সিঁড়িগুলি দেখে লক্ষ্ণৌর ইমামবাড়ার কথা মনে হয়। এতেই বোঝা যায়, এ লক্ষ্ণৌরই লোকেদের কাজ। এই মন্দিরটির সঙ্গে একটা ছোটখাটো ইতিহাসও জড়িয়ে আছে।

বিশাল মন্দিরটি শ্বেত পাথরের। কিন্তু সিঁড়ি, চত্বর, দেওয়াল সব কিছু লাল সিমেণ্ট বা পাথরের তৈরী। মোট-কথা শ্বেতপাথরের নয়। শ্বেতপাথরের মন্দিরটির সঙ্গে যেন কিছু অসামঞ্জস্য আছে বলে মনে হয়। শোনা যায় শাহজীর খাজাঞ্চী নাকি শাহজীকে মন্দিরটি তৈরী হয়ে যাবার পর বুদ্ধি দিয়েছিলেন যে, এরকম উৎকৃষ্ট শ্বেতপাথরে সব কিছু করা হলে অসাধারণ খরচ পড়বে। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার মন্দিরটি যখন শ্বেতপাথরের হয়েছে তখন বাকী সব লাল সিমেণ্ট বা —অনুরূপ অন্য কিছু দিয়ে করলে অনেকটাই সস্তায় কাজ হবে। শাহজী খাজাঞ্চীর কথামত তাই করবার নির্দেশ দেন। এ মন্দির ওভাবে তৈরী হবার পরই খাজাঞ্চীর দুইটি চক্ষু নষ্ট হয়ে যায় এবং পা দুটিও নাকি খোড়া হয়ে যায়। শেষ জীবন পর্যন্ত তিনি আপন কুপরামর্শ বা বিষয়াসক্ত দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য অনুশোচনা করে কাটান।

এই পর্যন্ত দেখেই আমরা ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত বোধ করতে লাগলাম। স্থির হ'ল কিছু খেয়ে আবার মদনমোহনের মন্দির ও অন্য দু'চারটি মন্দির দেখতে যাওয়া হবে। কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় অন্য। আমাদের ভাগ্নেটির প্রবল জ্বর এল। কাজে কাজেই আমাদের বৃন্দাবন দর্শন ঐখানেই সমাপ্ত করতে হ'ল। কাজেই খাবার জন্য দোকান থেকে কিছু মিষ্টি কিনে আমরা জায়গা খুঁজতে লাগলাম কোথায় বসে একটু খাওয়া যায়। খেয়েই রওনা দিতে হবে। খাবার কেনাপর্ব সহজেই হয়ে গেলেও একটা পরিষ্কার জায়গা খুঁজে বের করাই কঠিন হয়ে দাঁড়ালো। যেখানেই যাই একপাল ভিক্ষুক সঙ্গ নেয়। তাদের বিতরণ করে খাবার সাধ্য নেই। কেননা একে তো তারা দলে অত্যন্ত ভারি; তার উপর খাবার বণ্টন করতে শুরু করলে এ দল যে কত বড় হয়ে উঠবে তারও কোন ঠিক ঠিকানা নেই। এদের সকলকেই পয়সা দেওয়া হ'ল বটে, কিন্তু তবু ওদের সামনে মণ্ডা মিঠাই মুখে গুঁজবার কোনমতেই প্রবৃত্তি হ'ল না।

আমরা স্থির করলাম সেই মথুরা বৃন্দাবনের রাস্তায় যে নয়নাভিরাম বিরলা মন্দিরটি দেখে এসেছি, সেখানে ইন্দারা রয়েছে, জলের ব্যবস্থাও হবে; আর তার চতুর্দিকেই অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাজেই সেখানে একটা জায়গা বেছে খাওয়াও যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মন্দিরটিও আর একবার দেখা যাবে।

বিড়লার এই মন্দিরটিও বড়ই সুন্দর। দীর্ঘ বিস্তৃত জমি নিয়ে তৈরী। মর্মর পাথরের তৈরী। মন্দিরের হলঘরটি বিশাল। তাতে স্নিগ্ধ প্রশান্ত মনোরম একটি পরিবেশ। সহজেই মন স্থির হতে পারে বলে মনে হ'ল। দিল্লীর বিড়লা মন্দিরেরই ছোটখাটো সংস্করণ। তবে অতটা জাঁকজমকশীল নয়। হলঘরের দেয়ালের নীচের দিকে গীতা ভাগবৎ ইত্যাদি নানা ধর্মগ্রন্থের সারবাণী ছাপার অক্ষরে শ্বেত পাথরের ফলকে লেখা রয়েছে। মুনি ঋষি থেকে শুরু করে বুদ্ধদেব শ্রীকৃষ্ণ রামচন্দ্র হনুমানজী

সকলেরই মূর্তি আঁকা রয়েছে নিখুঁত-ভাবে। দেখে মনে হয় জীবন্ত প্রতিমূর্তি যেন। দেয়ালের ওপরাংশে ফ্রেসকো পেণ্টিং রয়েছে মস্ত বড় বড়। তাও সবই ধর্মমূলক উপাখ্যান থেকে নেওয়া। মানুষের মনের মধ্যে যাতে এসব চিত্র সহজে গেঁথে যায়, তার থেকে সে প্রেরণা পায় অমৃতত্বপথের সন্ধানে প্রবৃত্ত হতে, এই হয়তো এই সবের মূল উদ্দেশ্য। মন্দিরের বিগ্রহ হচ্ছেন শ্বেতপাথরে তৈরী নারায়ণ। শঙ্খ, চক্র, গদা পদ্মধারী। চারিদিক নিস্তব্ধ। সত্যি যেন একটা শান্তির হাওয়া বইছে চারিদিকে। চঞ্চলতা ব্যস্ততা কোলাহল কিছুই নেই কোথাও। বারে বারে মনে হ'তে লাগলো শান্তির স্থান, তীর্থস্থানই বটে।

মন্দির দালানের চারপাশে সবুজ ঘাসের মাঠ। মন্দিরের ডানপাশে একদিকে একটি পাথরে গড়া রথ। ঘোড়া দুটি তার বিশাল বপুবিশিষ্ট, সবল ও সতেজ, বলিষ্ঠ তাদের গড়ন আর প্রাণবন্ত তাদের ভঙ্গী। দেখে মনে হ'ল দরজায় যেন রথ দাঁড়িয়ে আর শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে ঢুকেছেন, এখুনি বেরুবেন বলে রথ তাঁর প্রতীক্ষা করছে। ঘোড়াদুটিকে তাই আলগা করে দেওয়া হয়নি।

মর্তের মর্তবাসী কিন্তু এমনি চতুর যে তার রথচক্র করে রেখেছে ভারি পাথরের, এবং রথ আর ঘোড়া সব কিছুকেই দিয়েছে জমিতে গেঁথে। যেন চট্ করেই শ্রীকৃষ্ণ পালাতে না পারেন—ঐ মন্দিরেই তাহলে থাকবেন ভক্তহৃদয়ের নারায়ণ হয়ে।

বড়ই সুন্দর স্মৃতি নিয়ে আমরা বৃন্দাবন ছাড়লাম। মথুরা হয়ে রাত্রি দশটায় এসে আমরা আলীগড় পৌঁছি। আসতে আসতে মনে হ'ল বৃন্দাবন যেন সদর দরজা খুলে এক ঝলক তার ভুবন-মোহন রূপ দেখিয়ে দিল আমাদের। বড়ই কম সময়ের জন্য গিয়েছিলাম; প্রাণ-ভরে ভাল করে সে রূপ উপভোগ করার সময় সুযোগ হয়নি। যেটুকু দেখেছি তাতেই আনন্দে তৃপ্তিতে ভরে উঠেছে মন। অত তাড়াতাড়ি বিদায় নিতে অন্তর যেন চাইছিল না। তবু ফিরতে হ'লোই আমাদের, ফিরতে হবেই, তাই। খোলা দরজার ফাঁকে বৃন্দাবন যেন ফিস্ ফিস্ করে চুপি চুপি বলে দিল 'আবার আসিস্'। বাতাসে ভর করে ভেসে এসে-ছিল সেকথা আমার কানে, আমার প্রাণে। জানি না কবে আবার সে আহ্বানে সাড়া দিতে ছুটতে পারবো। দ্রুতগতিতে আমাদের মোটর ছুটে চলেছিল। এমনই বিহ্বল হয়ে পড়েছিলাম, যে 'আবারো আসবো' এ কথাটি প্রত্যুত্তরে বলে আসা হলো না, এই যেন মনে হতে লাগলো আসার পথে বারে বারে।

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

পুলিসের ওয়াগন থেকে পালিয়ে চার্লি আর পলেট একটা ভাঙা-বাড়িতে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। আগে যে ঘরে কুকুর থাকত, সেইটে হল তাঁদের শয়নকক্ষ। তাতে তাঁদের দুঃখ নেই; পরস্পরকে কাছে পেয়ে তাঁরা তখন এতই আনন্দিত যে মনে হল, তাঁরা স্বর্গে এসে আশ্রয় পেয়েছেন। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে চার্লি দেখেন, বাড়ির কাছেই একটা পুকুর। চার্লির তখন ইচ্ছে হল একটু সাঁতার কাটবেন। অনেক পাঁয়তারা কষে পুকুরে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লেন চার্লি। তারপরেই তাঁর চক্ষুস্থির। ইঞ্চি জলের নীচে এক-হাঁটু কাদা। সারা গায়ে কাদা মেখে তিনি ডাঙায় উঠে এলেন।

দিনকয়েক ঘোরাঘুরির পর একটা চাকরিও তাঁর জুটে গেল। মনোহারী দোকানে পাহারাদারের কাজ। দরজায় তালা-চাবি লাগিয়ে মালিক তাঁর বাড়িতে চলে যাবার পর সারারাত দোকানের বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তাঁকে মালপত্র পাহারা দিতে হবে। মহা-উৎসাহে চার্লি কাজে লেগে গেলেন। একদিন তাঁর সাধ হল, পলেটকে নিয়ে এসে দোকানের মালপত্র-গুলো সব দেখিয়ে দেবেন। গোপনে পিছনদিককার একটা দরজা দিয়ে মাঝ-রাত্তিরে তিনি দোকানের মধ্যে গিয়ে ঢুকলেন। সঙ্গে পলেট। দোকান তখন ফাঁকা। কেউ কোথাও নেই। জিনিস-গুলো শুধু পড়ে রয়েছে। সেই বিপুল ঐশ্বর্য-সম্ভারের মধ্যে পলেটকে নিয়ে তিনি ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। দামী দামী সব খাট-আলমারি, চেয়ার-টেবিল, মেয়েদের সব পোশাক-পরিচ্ছদ, ঝকঝকে সব ফার-কোট। দামী একটা ফার-কোট হাতে তুলে নিয়ে সস্নেহে পলেটের গায়ে জড়িয়ে দিলেন তিনি, নরম একটা বিছানার উপরে নিয়ে শুইয়ে দিলেন। তারপর আনন্দের আবেগে, স্থানকাল ভুলে গিয়ে, দোকান-ঘরের মধ্যে তিনি স্কেট করে বেড়াতে লাগলেন (প্রসংগত উল্লেখযোগ্য, পাহারাদারের ভূমিকায় এর আগেও তিনি নেমেছেন, ছবিতে স্কেট করাও তাঁর এই প্রথম নয়। তবে এ-দুয়ের সমন্বয় এর আগে আর কখনও হয়নি)। প্রথমে চোখ খুলে, তারপর চোখ বেঁধে। চোখ বেঁধে স্কেটিং করতে গিয়ে তাঁর প্রায় মারা পড়বার উপক্রম হয়েছিল। বারান্দার একটা জায়গায় রেলিং ধসে গিয়েছে। চার্লি সেটা জানতেন না। দেয়ালে ধাক্কা খেয়ে অল্পের জন্য তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেন।

স্কেটিং শেষ করে পলেটের কাছে ফিরে এসে গল্প করছেন, এমন সময় দরজা খোলা পেয়ে একদল ডাকাত এসে ঢুকল। চার্লি প্রথমটায় তাদের বাধা দিতে গিয়েছিলেন। তারপর যখন শুনলেন যে, চিরদিনই তারা কিছু ডাকাত ছিল না, আগে তারা এক কারখানায় কাজ করত, সেখান থেকে চাকরি যাওয়ায় রোজগারের আর অন্য কোনও উপায় খুঁজে না পেয়ে এখন দস্যুবৃত্তি অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছে, তখন আর তিনি তাদের কিছু বললেন না। উল্টে আরও এতই দয়া হল তাঁর যে, ডাকাতির ব্যাপারে তিনি তাদের সাহায্য করতে লাগলেন। মালিক সেটা বুঝতে পেরে তাঁকে জেলে পাঠালেন।

পলেট এদিকে এক ক্যাবারেতে চাকরি জুটিয়ে নিয়েছেন। হোটেলে যেসব খদ্দের আসে, তাদের মনোরঞ্জনের জন্যে তাঁকে নাচতে হয়। জেল থেকে মুক্তি-লাভের পর চার্লিও সেখানে এসে ওয়েটারের কাজে ভর্তি হয়ে গেলেন। ক্ষুধার্ত এক ভদ্রলোককে খাদ্য পরিবেশন করতে যাচ্ছেন তিনি, কিন্তু নাচিয়েদের ভিড় ঠেলে কিছুতেই এগিয়ে আসতে

'মডার্ন টাইম্স'-এর একটি দৃশ্য

"মডার্ন টাইম্‌স"-এ উন্মাদ শ্রমিকের ভূমিকায়

পারছেন না, এই নিয়ে ভারী মজার একটি দৃশ্য রয়েছে এখানে। এক-এক পা এগিয়ে আসেন চার্লি, আর নাচিয়েদের গুঁতো খেয়ে তাঁকে তিন পা পিছিয়ে যেতে হয়। হাতে একখানা রেকাবি, তার উপরে ডাক-রোস্ট। ধাক্কা খেয়ে রেকাবির উপর থেকে ডাক-রোস্ট ছিটকে বেরিয়ে গেল, কিন্তু মাটিতে পড়বার আগেই একজন নাচিয়ে এসে লুফে নিল সেই মাংসখণ্ড। হাতে হাতে ঘুরতে ঘুরতে শেষ পর্যন্ত যার হাতে গিয়ে পৌঁছল, সে আবার চার্লির দিকে ছুঁড়ে মারল সেটাকে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে সেটা ঝাড়-লণ্ঠনের উপরে গিয়ে পড়ল। সেখান থেকে সেই ডাক-রোস্ট কুড়িয়ে এনে চার্লি যখন খদ্দেরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, সময়মত খাবার না পেয়ে খদ্দের তখন রেগে আগুন হয়ে আছেন।

এ যাত্রাতেও চাকরি যেত চার্লির। কিন্তু গেল না। ক্যাবারের পুরুষ-গাইয়েটি সেদিন কাজে আসেনি। এখন উপায়? মালিক শুনেছিলেন যে, চার্লি একটু-আধটু গাইতে পারেন। অনন্যোপায় হয়ে চার্লিকেই তিনি গান গাইতে পাঠালেন। ব্যাপার দেখে চার্লির ততক্ষণে নাড়ী ছেড়ে যাবার উপক্রম হয়েছে। কী গান গাইতে হবে, কীভাবে গাইতে হবে, কিছুই তিনি জানেন না। পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন পলেট। চটপট পলেটের কাছে গানটা একবার শুনে নিলেন চার্লি, তারপর পেন্সিল দিয়ে নিজের শার্টের হাতায় সেটাকে টুকে নিলেন। ভেবেছিলেন, শার্টের হাতা দেখে দেখে গান গেয়ে যাবেন, কিন্তু এমনই কপাল তাঁর, গাইতে গাইতে যেই না একটু হাত নেড়েছেন, হাতাটা অমনি ঝুলে পড়ল। কী আর করেন চালি, বানিয়ে বানিয়ে তিনি গাইতে লাগলেন। হলিউডের সেই নাইট-ক্লাবে এই গানই তিনি আমাকে শুনিয়েছিলেন। সে এক বিচিত্র উদ্ভট গান। ছ'-সাতটা ভাষার শব্দ তাতে রয়েছে। সব মিলিয়ে দুর্বোধ্য। গান শেষ হবার পর শ্রোতাদের হাততালি আর থামতে চায় না। আনন্দে গলে গিয়ে চার্লি যখন ভাবছেন, আর একখানা গান শুরু করে দেবেন, এমন সময় বলা নেই, কওয়া নেই, পুলিস এসে ঢুকল। তারা খোঁজ পেয়েছে, পলেট এখানে চাকরি করে। পলেটকে তারা গ্রেপ্তার করতে এসেছে।

পুলিসের চোখে ধুলো দিয়ে পলেটকে নিয়ে আবার উধাও হয়ে গেলেন চার্লি। বইখানির শেষ দৃশ্যে দেখা যায়, হাতে হাত রেখে দূর দিগন্তের দিকে তাঁরা এগিয়ে চলেছেন।

ওয়াল্ট ডীসনির কার্টুন-চিত্র তখন অত্যন্তই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে। সুতরাং চার্লিকে যখন বলা হল, নীউইয়র্কের চিত্রগৃহে তাঁর "মডার্ন টাইমস্‌" বইখানি দেখানোর আগে ডোনাল্ড ডাকের একটি কার্টুন-ছবি দেখিয়ে নেওয়া হবে, সঙ্গত কারণেই তিনি আপত্তি জানাতে পারতেন। আপত্তি তিনি জানাননি। অত্যন্ত শান্ত চিত্তেই এই চ্যালেঞ্জটিকে তিনি গ্রহণ করলেন। চ্যাপলিনের ছবি দেখে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল সবাই। তারপর মাস কয়েক ধরে দর্শক-মহলে শুধু "মডার্ন টাইম্‌স-এর আলোচনাই চলতে লাগল। ডোনাল্ড ডাকের সামান্য একটা উল্লেখও কেউ করেনি।

জনকয়েক সমালোচকের সেই সময় মনে হয়েছিল, "মডার্ন টাইম্‌স"-এর মধ্যে খানিকটা সাম্যবাদী ভাবনা-বুদ্ধি প্রচ্ছন্ন রয়েছে। কারখানার বিভিন্ন দৃশ্য, বেকারদের প্রতি চার্লির সহানুভূতি এবং সেই মজার দৃশ্যটি, চার্লি যেখানে লরি থেকে ছিটকে-পড়ে-যাওয়া লাল পতাকাটি হাতে তুলে নিয়েছেন, এসব তাঁদের ভাল লাগেনি। তীব্রতম ভাষায় বইখানির তাঁরা নিন্দে করলেন। কেউ কেউ আবার মনে করলেন, উৎপাদনের ব্যাপারে নিখুঁত কর্মদক্ষতা অর্জনের জন্য সোভিয়েট সরকারকে সেই সময় যে উন্মাদনায় পেয়ে বসেছিল, "মডার্ন টাইম্‌স"-এ সেই উন্মাদনাকেই ব্যঙ্গ করা হয়েছে। রাশিয়ানরা এ-বই পছন্দ করেনি। কনভেয়র-বেল্টের সেই দৃশ্যগুলি যখন দেখানো হয়, রুশ দর্শকরা তখন একটিও কথা বলেননি। চুপচাপ তাঁরা বসে ছিলেন। এই নীরবতা অর্থহীন নয়। উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যাপারে সোভিয়েট রাশিয়ায় তখন কনভেয়র-বেল্ট পদ্ধতির উপর যথেষ্টই গুরুত্ব আরোপ করা হ'ত।

এ বিষয়ে চ্যাপলিনের বক্তব্য কী, জানতে আপনাদের আগ্রহ হতে পারে।

তাই তাঁর বক্তব্যের খানিকটা অংশ এখানে উদ্ধৃত করছিঃ

"অনেকের ধারণা, আমার শিল্পকর্মের একটা সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে। আসলে কিন্তু নেই। সমাজ-সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামাবার কোনও প্রয়োজনই নেই আমার, ওসব বড় বড় ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার জন্য বড় বড় নেতারা সব রয়েছেন। আমি চাই আমার দর্শকদের মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে তুলতে, তাঁদের আনন্দ দেওয়াই আমার প্রধানতম উদ্দেশ্য। ......এ-বইও আমি সেই একই উদ্দেশ্য নিয়ে তুলেছি। আমার মনে হয়েছিল, মানবজীবন যেন বড় বেশী সংকীর্ণ, ছক-কাটা হয়ে পড়ছে, মানুষ যেন যন্ত্রে পরিণত হতে চলেছে। সেই অস্পষ্ট ভাবনাকেই এ বইয়ে আমি একটা স্পষ্ট অবয়ব দেবার প্রয়াস পেয়েছি। .....আমি যা বলতে চেয়েছি, তা কারো অজানা নয়। একটা কারখানার কথা আমি নিজেই জানি, ঘন ঘন বাথরুমে গেলে শ্রমিকদের সেখানে ছাঁটাই করে দেওয়া হয়। দোকান-কর্মচারীদের দুর্দশার কথাও আপনারা জানেন নিশ্চয়ই; মালিকদের জুলুমে সর্বদাই তাঁরা তটস্থ থাকেন। মালপত্রের আশানুরূপ কাটতি না হলে সে দোষ কর্মচারীর, কোনরকম কৈফিয়ত না শুনেই তাঁকে ছাঁটাই করে দেওয়া হবে। ব্যাপারটা যেন একটা স্বতঃসিদ্ধ নিয়মে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। এ সবই আপনারা জানেন। সেই জানা ব্যাপারটাকেই আমার ছবিতে যদি আমি একটু বিদ্রূপ করে থাকি, তো এমন কিছু অন্যায় করিনি এবং তার জন্য আমাকে আপনারা দোষও দিতে পারেন না।"

হীটলারের হাতে ক্ষমতা আসার পর চ্যাপলিনের কোনও বই-ই জার্মানিতে প্রবেশাধিকার পায়নি। "মডার্ন টাইমস্"ও পেল না। ইটালিতেও এ বইয়ের উপরে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হল। এর আগের বছর মুসোলিনি আবিসিনিয়ার উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। হীটলারের তিনি তখন ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রায় সর্ব ব্যাপারেই হীটলারকে তিনি অনুসরণ করে চলতেন। চার্লিকে জানান হল, জার্মানি আর ইটালি, এ দুটি দেশের কোনওটিতেই তাঁর ছবি দেখাতে দেওয়া হবে না; শুনে তিনি বললেন, "ডিক্টেটরদের বোধ হয় ধারণা হয়েছে, আমার এই বইখানিতে আমি সাম্যবাদী আদর্শের সপক্ষে কিছু বলেছি। এর চাইতে ভিত্তিহীন ধারণা আর কিছুই হতে পারে না। নিষেধাজ্ঞার খবর পেয়ে আমি অবশ্য বিস্মিত হইনি। এই-রকমটাই যে ঘটবে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর থেকে তা আমি অনুমান করতে পেরেছিলাম। কিন্তু বলে রাখা দরকার, দর্শকদের একটু আনন্দ দেওয়া ছাড়া এ-বই তোলার অন্য কোনও উদ্দেশ্য আমার ছিল না। এ বইয়েও সেই একই ভবঘুরে চরিত্রটির সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। ১৯৩৬ সালের ঘটনা-পরিবেশে চরিত্রটি যে রকমের চেহারা নিতে পারে, ঠিক সেই চেহারাতেই এখানে তাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে। আমি অভিনেতা; রাজনৈতিক কোনও উদ্দেশ্য আমার নেই।"

"মডার্ন টাইমস্" তুলতে ব্যয় হয়েছিল প্রায় তিন লক্ষ পাউণ্ড। লাভও অনেক হয়েছিল। তবে "দী গোল্ড রাশ", "দী সার্কাস", আর "সীটি লাইটস্"-এর তুলনায় লাভের অংকটা এবারে কিছু কম।

চার্লি আর পলেট

(২৯)

ঠিক কবে যে পলেটকে বিয়ে করে-ছিলেন চার্লি, বলা সম্ভব নয়। আসল তারিখটা—এক চার্লি আর পলেট বাদে—কেউই বোধ হয় জানেন না। বিয়ের আগে আকস্মিকভাবেই চার্লির একদিন একটা ভবিষ্যদ্বাণীর কথা মনে পড়ে গেল। মনে পড়ল, বহু বছর আগে—তিনি তখন কার্নো সম্প্রদায়ের সঙ্গে ইংল্যাণ্ডের নানান জায়গায় অভিনয় করে বেড়াচ্ছেন—এক বেদেনী তাঁর ভাগ্যগণনা করে বলে-ছিল যে, চতুর্থ বিবাহে তিনি সুখী হবেন। তার আগে তিন-তিনবার বিয়ে করে তাঁকে দুঃখভোগ করতে হবে। তৃতীয়বার বিবাহ করবার পূর্বমুহূর্তে তাই দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন চার্লি। দ্বিধাটা যে কতক্ষণ ছিল, বলা শক্ত।

"মডার্ন টাইমস্"-এ পলেট নেমে-ছিলেন নায়িকার ভূমিকায়, আগেই সে-কথা বলেছি। চার্লির বইয়ে এই তাঁর প্রথম অভিনয়। বইখানি মুক্তিলাভ করবার পর দুজনে একসঙ্গে দূরপ্রাচ্য ভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। এর আগে চার্লি নিজে সেই বিচিত্র ভূখণ্ডের নানান জায়গা দেখে এসেছেন। এবারে ইচ্ছে হল, পলেটকেও সেখান থেকে ঘুরিয়ে আনবেন। অনেকের ধারণা, সফরে বেরবার আগেই তাঁরা বিবাহ-পর্বটা চুকিয়ে নিয়েছিলেন; আবার অনেকে বলেন যে, সিঙ্গাপুরে গিয়ে তাঁরা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। খবরের কাগজে এই দুরকমের খবরই তখন বেরিয়েছিল। চার্লি তার কোনওটিকেই সমর্থন করেননি, প্রতিবাদও না। ১৯৪০ সালের আগে অবশ্য পলেটকে তাঁর স্ত্রী বলে উল্লেখ করেননি চার্লি। এর কিছুকাল বাদেই তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়।

পলেটকে নিয়ে চার্লি আর একটি-মাত্র ছবি তৈরি করেছিলেন, "দী গ্রেট ডিক্টেটর"। বিবাহ-বিচ্ছেদের পরেও পলেট তাঁর অভিনেত্রী-জীবনের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেননি। প্রথম জীবনে চার্লির বইয়ে নায়িকার ভূমিকায় নেমে পরে যাঁরা তাঁকে পরিত্যাগ করেছেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র পলেটই পরবর্তীকালে খ্যাতি অর্জন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

লীটাকে বিয়ে করে দুটি পুত্রসন্তান লাভ করেছিলেন চার্লি, পাঠকদের তা

নিশ্চয়ই মনে আছে। লীটার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে গেলেও ছেলে দুটির সঙ্গে তাঁর ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়নি। তারা এখন বড়সড় হয়েছে, ইস্কুলে যায়, ছুটিছাটায় বাবার কাছে বেড়াতে আসে। বাবাকে তারা ভারী ভালবাসত। বাবার কাছে এসে ছুটির দিনগুলি যে কী আনন্দে কাটত, এখনও তারা ভুলে যায়নি। শৈশবের সেই রঙিন মুহূর্তগুলি তাদের স্মৃতির ঝাঁপিতে এখনও সমান উজ্জ্বল হয়ে আছে। তাদের কাছেই আমি শুনেছি, অত আনন্দ জীবনে আর কখনও তারা পায়নি। আর চার্লিও তেমনি। এমনিতে তিনি কর্মব্যস্ত মানুষ, কিন্তু ছেলেরা কাছে এলেই সমস্ত কাজকর্ম তিনি ভুলে যেতেন। ভুলে যেতেন যে তিনি বাবা, তাঁর বয়স অনেক বেশী। সবকিছু ভুলে গিয়ে ছেলেদের সঙ্গে তিনি খেলায় মেতে যেতেন। খেলা আর বেড়ানো। সমুদ্রতীরে গিয়ে নৌকো ভাড়া করে ভেসে পড়তেন তিনি। সঙ্গে দুই শিশু। তাদের যত আনন্দ, চার্লির আনন্দ তার চাইতেও বেশী। তারপর বাড়িতে ফিরে এসে খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে দুই ছেলেকে সামনে বসিয়ে তিনি গল্প বলতেন। তার কতক গল্প মায়ের কাছে শোনা, কতক গল্প বানানো। একদিনের একটা ঘটনা তাদের এখনও মনে আছে। চার্লি সেদিন সমুদ্রতীরে গিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বেড়াতে বেড়াতে দেখেন, নির্জন একটা বাড়ি; অনেকদিন ধরে বাড়িটা নাকি খালি পড়ে রয়েছে। তৎক্ষণাৎ চার্লির মাথায় একটা ফন্দি খেলে গেল। ফিরে এসে তাঁর সেক্রেটারিকে তিনি বললেন, পরদিন সে যেন গোপনে বাড়িটার মধ্যে গিয়ে বসে থাকে। ফিসফিস করে দুজনের মধ্যে আরও অনেক কথা হল। কী কথা হল, একটু বাদেই পাঠকরা সেটা বুঝতে পারবেন।

পরদিন সকালে দুই ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে যথাসময়ে তিনি হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন। সমুদ্রতীরে গিয়ে ঘুরে বেড়ালেন খানিকক্ষণ। বেড়াতে-বেড়াতে সেই নির্জন বাড়িটার সামনে গিয়ে হাজির। চার্লি বললেন, "এই যে বাড়িটা দেখছ, এটা হচ্ছে হানাবাড়ি। এখানে একটা ভূত থাকে।" শুনে ছেলেরা তো হেসে কুটিপাটি। ধেৎ, বাবার যেমন কথা; ভূত বলে আবার কিছু আছে নাকি? চার্লি বললেন, "বেশ, বিশ্বাস না হয় তো চল, ভিতরে গিয়ে দেখিয়ে আনি।" বলে ছেলেদের সঙ্গে নিয়ে তিনি ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন। ব্যাপার দেখে দুই বীরপুরুষের মুখ তৎক্ষণে শুকিয়ে গিয়েছে। বিলক্ষণ ঘাবড়ে গিয়েছে তারা। কিন্তু বাবাকে তো আর তা বলা যায় না। আর তা ছাড়া, বাবা যে তাদের ভয় দেখাবার জন্য বানিয়ে বানিয়ে গল্প বলছে না, তারই বা প্রমাণ কী। এলোপাথারি প্রশ্ন করে করে চার্লিকে তারা অস্থির করে তুলল। "হ্যাঁ বাবা, তুমি জানলে কী করে? নিশ্চয়ই আমাদের ভয় দেখাচ্ছ। ঐ তো, বাড়ির মধ্যে সব টেবিল চেয়ার দেখা যাচ্ছে। লোকগুলো কোথাও বেড়াতে গিয়েছে, আর অমনি তুমি এটাকে ভূতের বাড়ি বানিয়ে দিলে। নিশ্চয়ই বানিয়ে বলছ। তাই না? কী বাবা, কথা কইছ না যে?" চার্লি বললেন, "আমি জানি এটা ভূতের বাড়ি। এখনও যদি তোমাদের বিশ্বাস না হয়তো হাতেনাতে প্রমাণ দিতে পারি।" বলে তিনি সদর-দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন, বললেন, "আমি যদি এই দরজার উপরে তিনবার টোকা দিই তো ভিতর থেকে ভূতও তিনবার টোকা দিয়ে তার উত্তর দেবে। কী, টোকা দেব?"

বলে কি। যত ভয়, কৌতূহল তার দ্বিগুণ। নিশ্বাস চেপে ছেলে দুটি বলল "বেশ তো, দাও।" চার্লি বললেন, "থাক গে, তোমরা আবার ভয় পেয়ে যাবে। তার চাইতে বরং ফিরে যাওয়া যাক।" গোড়া থেকেই ছেলেদের মনে সন্দেহ ছিল, বাবা নিশ্চয়ই মিথ্যে কথা বলছে। এখন তাঁর এই দ্বিধা দেখে তাদের সাহস আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। বলল "না। টোকা তোমাকে দিতেই হবে। কই দিচ্ছ না যে? দাও টোকা।" মনে-মনে এক প্রস্থ হেসে নিয়ে চার্লি বললেন, "বেশ কিন্তু আগে থাকতেই বলে রাখছি, আমার কিন্তু কোনও দোষ নেই, আমি তোমাদের সাবধান করে দিয়েছি। এখন যদি তোমরা ভয় পেয়ে যাও তো আমি জানি না।" বলে তিনি দরজার উপর হাত রাখলেন, বললেন, "এখনও ভেবে দ্যাখো, টোকা দেব?"

ছেলেরা নিরুত্তর।

টক্ টক্ টক্। দরজার গায়ে তিনবার টোকা দিলেন চার্লি। কিন্তু ভিতর থেকে টোকা দিয়ে কেউ তার উত্তর দিল না। এটাও চার্লির একটা কারসাজি। সেক্রেটারিকে তিনি বলে দিয়েছিলেন প্রথম টোকার সে কোনও উত্তর দেবে না।

ছেলেরা তো আর অতশত জানে না। হেসে তারা লুটিয়ে পড়ল। বলল, "উত্তর যে পাওয়া যাবে না, তা আমরা আগে জানতাম।" চার্লি বললেন, "প্রথমবার উত্তর পাওয়া গেল না বলেই যে ভূত নেই একথা তোমাদের কে বলল। ভূতটা হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। তোমরা তো জানো ভূতেরা দিনে ঘুমোয়, রাত্রে জাগে। কাল সারারাত ভূতটা নিশ্চয়ই নানান জায়গায় গিয়ে সবাইকে ভয় দেখিয়ে বেড়িয়েছে এখন ঘুমোচ্ছে হয়তো।"

"বেশ তো, আবার টোকা দাও তাহলে

ওকে জাগিয়ে তোলো। ভূত না দেখে আজ আমরা ফিরব না।"

আবার টোকা দিলেন চার্লি। আস্তে আস্তে, বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে। তারপর উত্তরের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগলেন।

টক্ টক্ টক্। উত্তর পাওয়া গিয়েছে। শব্দটা যে ভিতর থেকেই এল, তাতে আর কোনও সন্দেহ নেই। ছেলেদের দিকে ফিরে তাকালেন চার্লি। আর তাদের সেই হম্বি-তম্বি নেই, মুখ শুকিয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করেছে। কিন্তু চার্লিরই তো ছেলে, ভাঙে তবু মচকায় না। বলল, তারা নিজেরা একবার টোকা দিয়ে দেখতে চায়। প্রথমে বড় ছেলে চার্লি, তারপর ছোট ছেলে সীডনি। প্রথমে তিন টোকা, তারপর চার, তারপর পাঁচ। সীডনি ভেবেছিল, ভিতরকার টোকাটা তাদের টোকার প্রতিধ্বনি হয়তো। কিন্তু না। যতবারই টোকা দেয় তারা, ভিতর থেকে তিন-টোকায় তার উত্তর আসে। অনেক কষ্টে চার্লি সেদিন তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে এনেছিলেন।

ব্যাপারটা কিন্তু সেইখানেই চুকে যায়নি। বাবাকে কিছু না জানিয়ে সেই-দিন বিকেলেই দুইভাই আবার সেই হানা-বাড়িতে গিয়ে হাজির। শুধু টোকা শুনে কী হবে, ভূতটাকে স্বচক্ষে একবার দেখে আসা দরকার। দরজায় গিয়ে টোকা দিল তারা। উত্তর নেই। বড় ভাই চার্লি বলল, ভূতটা আবার হয়তো ঘুমিয়ে পড়েছে। ছোট সীডনি বলল, ঘুম থেকে ওটাকে তুলতে হবে। আবার টোকা। উত্তর নেই। অনেক ধাক্কাধাক্কি, অনেক ডাকাডাকি করেও যখন কোনও সাড়া পাওয়া গেল না, তখন ঠিক হল, তরা বাড়ির ভিতরে গিয়ে ঢুকবে।

ঢুকবে তো, কিন্তু কী করে। দরজার সামনে তালা ঝুলছে। খিড়কির দরজাও বন্ধ। আর কোনও পথ খুঁজে না পেয়ে জানালা ভেঙে তারা ভিতরে গিয়ে ঢুকল। কোথায় ভূত! সারা বাড়ি খাঁ খাঁ করছে। টেবিল উলটে, চেয়ার ভেঙে, বিছানা-বালিশ ছিঁড়ে ফালাফালা করে সন্ধ্যার আগেই দুই ভাই আবার বাড়ি ফিরে এল। যেমন পাজী ভূত, তেমনি তাকে তারা শিক্ষা দিয়ে এসেছে। ব্যাটাকে এখন থেকে ছেঁড়া-বিছানায় ঘুমোতে হবে।

দিন কয়েক বাদে চার্লির কাছে এক-খানা চিঠি এসে হাজির। চিঠি পড়েই তাঁর চক্ষুঃস্থির। বাড়ির মালিক কোথায় যেন বেড়াতে গিয়েছিলেন, সম্প্রতি ফিরে এসেছেন। ফিরে এসে দেখেন, তাঁর অবর্তমানে তাঁর বাড়িতে ঢুকে কারা যেন আসবাবপত্র ভেঙেচুরে দিয়ে গিয়েছে। খোঁজ নিয়ে তিনি জানতে পেরেছেন যে, চার্লির দুই ছেলেই এর জন্য দায়ী। তারা নাবালক, সুতরাং চার্লিকেই এর ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। চিঠির সঙ্গে একটা বিলও পাঠিয়ে দিয়েছেন ভদ্রলোক। বিলের অঙ্কটা দেখে চার্লির দুই চোখ কপালে উঠল।

ছেলেদের উপরে ক্রোধের আর সীমা রইল না। বড় ছেলে চার্লির উপর ততটা নয়, যতটা ছোট ছেলে সীডনির উপর। চার্লিটা বরং একটু গোবেচারা গোছের, কিন্তু সীডনি একটা দস্যু। দিনে-দিনে তার দৌরাত্ম্য যেন বেড়েই চলেছে। সেক্রেটারিকে ডেকে বললেন, "ইস্কুলের ঠিকানায় এক্ষুনি সীডনিকে একটা চিঠি লিখে দাও। বেশ কড়া করে লেখো। জানিয়ে দাও যে, ক্ষতিপূরণের টাকাটা ওর হাত-খরচার থেকে মাসে-মাসে কেটে নেওয়া হবে।" দু'দিন বাদেই চার্লির রাগ অবশ্য জল হয়ে গেল। হাত-খরচা আর কাটা হয়নি।

পলেট যে ক'বছর চার্লির কাছে ছিলেন, ছেলে দুটিকে নিয়ে তিনিও মাঝে-মাঝে বেড়াতে বেরতেন। সেই সময় এইচ জি ওয়েল্‌স একবার তাঁদের বাড়িতে বেড়াতে আসেন। সীডনির জন্যে এনে-ছিলেন মস্ত বড় একখানি ছুরি, দেখতেও ভারী সুন্দর। ছুরিখানা সে যত্ন করে রেখে দিয়েছে। এই অস্ত্রটির সাহায্যে শৈশবে যে সে কতজনের কত ক্ষতি করে বেড়িয়েছে, তার আর কোনও লেখাজোখা নেই।

১৯৩৯ সালে যুদ্ধ বাধল। বড় ছেলে চার্লির বয়স তখন চোদ্দ, সীডনির তেরো। বছর দুয়েক বাদে অ্যামেরিকা যুদ্ধে নামল। দুভাই তখন স্থির করল, তারা যুদ্ধে যাবে। অত কম বয়সে সাধারণত কাউকে যুদ্ধে নেওয়া হয় না, কিন্তু সে-কথা শুনেছে কে। চেষ্টাচরিত্র করে সৈন্য বাহিনীতে তারা ঢুকে পড়ল। শুনে চার্লি খুব গৌরব বোধ করলেন বলাই বাহুল্য, কিন্তু ভয়ও পেলেন খুব। দুই ছেলে তাঁর কাছে বিদায় নিতে এসেছে। দিন কয়েক বাদেই তাদের বিদেশ যাত্রা করতে হবে। চার্লির চোখের জল আর বাধা মানতে চাইছে না। দুই ছেলেকে সামনে বসিয়ে তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন। অনেকক্ষণ ধরে অনেক উপদেশ দিলেন তাদের। বললেন, অচেনা কোনও কিছুকে তারা যেন স্পর্শ না করে। বলা তো যায় না, শত্রুরা হয়তো পথেঘাটে ফাঁদ পেতে রেখেছে। যেটাকে তারা একটা বল মনে করছে, আসলে সেটা হয়তো বোমা। ছুঁলেই হয়তো ফেটে যাবে। শুনে দু' ভাই তো হেসেই আকুল। বাবার যেমন কথা। হাসতে হাসতে দেখে, বাবার দুই চোখ থেকে টসটস করে জল পড়ছে। হাসি থেমে গেল তাদের। অনেক বুঝিয়ে বাবাকে তারা শান্ত করল। বলল যে, অচেনা জায়গায় গিয়ে কীভাবে চলাফেরা করতে হবে, সে সব বিষয়ে সবকিছুই তাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুনে চার্লি বললেন, "তা হোক। সাবধানের মার নেই। খুব সাবধানে থেকো তোমরা"

(ক্রমশ)

সম্প্রতি ট্রাম-কর্মীরা অকস্মাৎ একদিন বিনা নোটিশে ট্রাম বন্ধ করিয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সাফাই গাহিলেন যে, ইহা ধর্মঘট নয়, তাঁহাদের ন' দফা দাবী না মিটাইবার প্রতিবাদ মাত্র। —"পরিষ্কার, অতি পরিষ্কার। ধর্মঘট করা হলো না, অথচ ট্রামও বন্ধ হলো, আবার ঝি'কে মেরে বৌকেও শেখানো হলো"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

আমাদের ট্রামে-বাসের হরেকরকম আলোচনায় মহিলারা অ-বলাই হয়ে থাকেন। কিন্তু বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন, এই দিনে ট্রাম-কর্মীর কর্ম-বিরতি প্রসঙ্গে জনৈকা মহিলা যাত্রী বলিলেন—"বৌকেই যদি শেখাতে হয়, তাহলে ঝি'কে মেরে কেন, একদিন তাঁরা ট্রাম চালিয়ে যাত্রীদের থেকে যদি পয়সা না নেন, তাহলেই তো ন' দফা দাবীর প্রতিবাদ হয়।" আমরা মহিলাটির মন্তব্য শুনিয়া আবার নূতন করিয়া প্রলয়ংকরী বুদ্ধির কথা স্মরণ করিলাম!!

* * *

এক সংবাদে প্রকাশ যে, দশটি মাত্র হাইড্রোজেন বোমা দিয়া পৃথিবীর সমগ্র মানবজাতিকে সমূহ বিপদের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া যায়। —"আমরা এ কৃতিত্বের তারিফ করতে পারলাম না, হয় বোমা প্রস্তুতকারীরা কামারের এক ঘা-এর মতো একটি বোমা তৈরী করুন, নয়তো দশটির বদলে কুড়িটি বোমা ব্যবহার করুন। মোদ্দা কথা হলো পৃথিবী ধ্বংস করা। আগেকার অসভ্য যুগে বড় জোর নিজের নাক কেটে অন্যের যাত্রা ভঙ্গ করা হতো, এবারে নিজে মরে যদি সবাইকে না মারতে পারি, তবে কী আর সভ্যতার এতো বড়াই!"

* * *

বিগত ১৯৫০ সালে গয়াতে নাকি "মুর্খমণ্ডলী" নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হইয়াছিল। এই মণ্ডলীর সভাপতিকে মহামুর্খ আখ্যা দেওয়া হইয়াছিল, কিন্তু সংবাদে প্রকাশ যে, মহামুর্খ মহাশয় সম্প্রতি কিয়ৎ পরিমাণ জ্ঞানার্জন করিয়া মণ্ডলীর আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিয়াছেন। মুর্খগণ সভাপতির আসনের জন্য একটি মহামুর্খ খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন! —"সত্যি কথা বলার সাহস আজকাল দুর্লভ না হলে খবরের কাগজে একটিমাত্র বিজ্ঞাপন দিলেই অসংখ্য মহামুর্খের সন্ধান পাওয়া যেতো"—বলিলেন খুড়ো।

* * *

কলিকাতার পুলিস ইন্সপেক্টার জেনারেলের গৃহে শুনিলাম সম্প্রতি এক দুঃসাহসিক চুরি হইয়া গিয়াছে। —"বাঘের ঘরে ঘোগ তাহলে নেহাৎ কথার কথা নয়"—বলিলে[ন] আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাজ্য পালের বক্তৃতায় failure o[f] welfare Plan-এর সন্ধান পাইয়াছে[ন] বিরোধীদলের জনৈক সদস্য। আমাদে[র] জনৈক ঘোড়দৌড় রসিক সহযাত্র[ী] বলিলেন—"এ সংবাদ ঠিক জানিনে, ত[বে] হালে মাঠে welfare Lady যে ফেল করেছেন তা জানি এবং বেশ ভালো করে জানি।"

* * *

ইডেন উদ্যানে এথ্‌লিট্‌দের খেল ধুলায় দৌড় প্রতিযোগিত ভারতীয় রেকর্ড ভঙ্গের সংবাদ আম

পাইয়াছি। —"পাক-ভারত টে খেলাতেও ভারত দৌড়ে রেকর্ড স্থাপ করেছেন, একটি খেলায় তিন-তিনজ রান-আউট"—বলে আমাদের শ্যামলা

* * *

ইভগেন্ডা-কেম্‌পালার সংব জানা গেল যে, সেখানক ভারতীয় অধিবাসীরা বর আমদা সম্বন্ধে সরকারী বিধিনিষেধের বিরু সম্মিলিত প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছে —"এ প্রতিবাদ আমরাও সমর্থন ক বিধি-নিষেধটা বর আমদানী সম্বন্ধে হয়ে বরং নিত্‌-বর আমদানী সম্ব হলে কারু কিছু বলবার থাকে না' বলিলেন এক সহযাত্রী।

* * *

অন্য এক সংবাদে শুনি ছাব্বিশ বৎসর বয়সের স্ত্রী বারো বৎসর বয়সের স্বামীর বিরু এক খোরপোষের মামলা দা করিয়াছেন। —"বারো হাত কাঁকু তের হাত বিচি হলে এ-ই হয় মা-লক্ষ এই হয়"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো
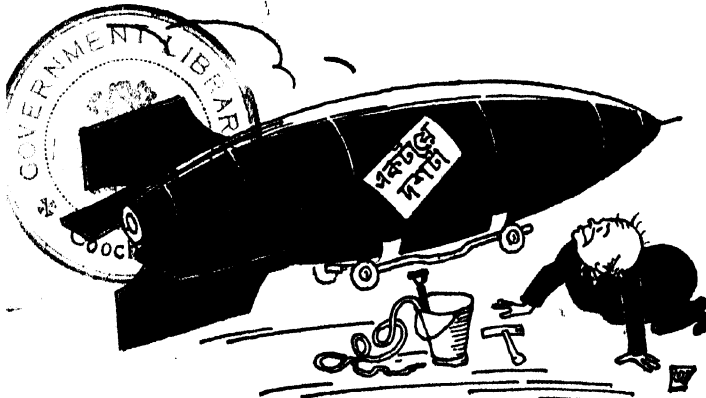
গল্প সংকলন

প্রতিভা বসুর স্বনির্বাচিত গল্প—ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। মূল্য—চার টাকা।

আধুনিক কথাসাহিত্যে যে কয়জন মহিলা খ্যাতি অর্জন করেছেন, শ্রীপ্রতিভা বসু তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। আলোচ্য গ্রন্থখানি তাঁর কয়েকটি গল্পের সংকলন। গল্পগুলি নির্বাচন করেছেন লেখিকা নিজে। স্বনির্বাচিত গল্পে সব সময়েই যে লেখক-লেখিকার সেরা গল্প-গুলো স্থান পায়, তা নয়। কারণ কি সূত্রে কোন্ রচনার সঙ্গে যে তাঁদের মমতা জড়িয়ে গেছে, সে সম্বন্ধে তাঁরা নিজেরাই হয়তো সচেতন নন্। ফলে এমন হওয়া আশ্চর্য নয় যে, যে রচনাগুলো তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা নয়; নিজেরা নির্বাচন করতে গিয়ে সেগুলোরও কিছু তাঁরা বাছাই করে ফেলেন। লেখক-লেখিকার মনের যে অনুষঙ্গ তাঁদের রচনার সঙ্গে জড়িয়ে থাকে, কোন সাহিত্যরসিকের নির্বাচনে তা থাকা সম্ভব নয়। তবু স্বনির্বাচিত রচনা-সংগ্রহেরও সার্থকতা আছে। রসজ্ঞ পাঠক তা থেকে লেখক-লেখিকার মেজাজ ও মানসিকতার আঁচ করতে পারেন। সাহিত্য-উপলব্ধির ক্ষেত্রে তাও কম লাভ নয়।

বর্তমান গ্রন্থে লেখিকার মাধবীর জন্য, অনর্থক, নিরুপমার চোখ, পরিশেষ, সুমিত্রার অপমৃত্যু, বিচিত্র, বালুচর প্রভৃতি বারটি গল্প স্থান পেয়েছে।

শ্রীপ্রতিভা বসুর গল্পের বিষয়বস্তুতে বা রচনাশৈলীতে চমকপ্রদ কিছু নেই। অতি-পরিচিত পরিবেশে, সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে গল্পগুলো লেখা, লেখিকার ভাষাও অনাড়ম্বর ও স্বচ্ছন্দ গতি। সব মিলিয়ে লেখিকার গল্পগুলো একটা সুখাস্বাদ্য স্নিগ্ধতা লাভ করেছে।

সমস্ত গল্পের আলোচনা সম্ভব নয়, কোন গল্পের বিস্তৃত আলোচনা করাও আমাদের উদ্দেশ্য নয়। দু' একটি গল্পের দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবো মাত্র।

'মাধবীর জন্য' গল্পটিতে অশোকের ভুল তার নিজের জীবনে ও বকুলের জীবনে যে করুণ ব্যর্থতার সৃষ্টি করেছে, তা মনকে স্পর্শ করে। 'অনর্থক' গল্পে সমীরের বেদনা দাম্পত্যজীবনে তৃপ্ত মণির কাছে অনর্থক হলেও সমীরের জীবনে তার অর্থের গভীরতা কত তার পরিচয় আছে তার অসমাপ্ত পত্র-খানার মধ্যেই। 'পরিশেষ' গল্পটিকে লেখিকার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প বলে আমাদের মনে হয়েছে। মানুষের সৃষ্ট বন্ধন মানুষের জীবনে যে কি বিপর্যয়ের সৃষ্টি করতে পারে 'সুমিত্রার অপমৃত্যু' গল্পে সুমিত্রার লিখিত কাহিনীতে তা লেখিকা ভালভাবেই ফুটিয়ে

তুলেছেন। সংকলিত গল্পগুলির কোন কোনটিতে বাঁধুনির শিথিলতা থাকলেও অধিকাংশ গল্পই সুনির্বাচিত ও লেখিকার বৈশিষ্ট্য-প্রকাশক। যাঁরা ছোট গল্প পড়তে ভালবাসেন, তাঁরা বইখানা পড়ে খুশী হবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

বইয়ের বহিঃসৌষ্ঠব ও মুদ্রণপারিপাট্য প্রশংসনীয় ও রুচিসম্মত। কাগজ ও বাঁধাই ভাল। ৪১৭/৫৪

ছোট গল্প

শ্বেত কমল—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। প্রকাশকঃ কুমারিকা, ৩০, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৯। দাম ৩॥০।

'বাইশে শ্রাবণ', 'মর্গ', 'তিমিরাভিসার', 'কালনেমি', 'অধিকার', 'জন্মভূমিশ্চ', শ্বেত-কমল', 'হাত' ও 'ঘাসবন'—এই নয়টি ছোট-গল্প নিয়ে খ্যাতনামা লেখকের আলোচ্য গল্প-গ্রন্থটি সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে।

এই বইয়ের অন্যতম উল্লেখযোগ্য গল্প আমাদের মনে হয়েছে, 'বাইশে শ্রাবণ'। কবি-গুরুর মৃত্যুতিথিকে স্মরণ করে একটি তরুণী

ছাত্রীর জীবনকে মহীয়ান ও সুন্দরতর করে তুলবার কামনার সংগে বর্তমান ভেঙে-পড়া নিম্নমধ্যবিত্ত-জীবনের অনিবার্য অধোগতি আর কুশ্রীতার যে শোচনীয় সংঘাত সৃষ্টি করেছেন লেখক,—তার বেদনা হৃদয়কে স্পর্শ না করেই পারে না। 'শ্বেত-কমল' গল্পটিও একটি দরিদ্র ছাত্রের কাহিনী, অন্তস্পর্শী। 'মর্গ' গল্পটিও মধ্যবিত্ত জীবনের শোচনীয় 'লাসকাটা-ঘর'-এর কথা। 'তিমিরাভিসার' গল্পটিতেও ক্ষতবিক্ষত মধ্যবিত্ত জীবনের ট্রাজেডীর সুর।

মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা—বেদনা ও দারিদ্র্যকে বহু লেখকের মতো নারায়ণবাবুও তাঁর বহু গল্পের উপজীব্য হিসাবে নিয়েছেন, —অর্থনৈতিক ঝঞ্ঝা কীভাবে মধ্যবিত্ত সমাজের সব-কিছুকে ওলোট-পালট করে দিয়েছে,—সেই ভাঙনের কথা অবশ্যই সাহিত্যিককে বলে যেতে হবে, এবং সেটাকেই বলা যেতে পারে চিরাচরিত পথ। নারায়ণবাবু কিন্তু মাঝে মাঝে এই পথের বাইরে এসে নতুন জীবনের কথাও শুনিয়েছেন,—'ঘাসবন' গল্পটি তেমনি এক নতুন জীবনের কথায় সমৃদ্ধ। বারেন্দ্রভূমির রুক্ষ লালমাটির এক বিস্তৃত জনবিরল প্রান্তর, আলাদ-গোক্ষুর সাপের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র এক বিচিত্র বন্য পরিবেশ এই গল্পটির পটভূমি। নিপুণ চিত্রকরের মতো তিনি এ গল্পের যে বিস্তৃত পটভূমি এ'কেছেন, সৃষ্টি করেছেন যে অপরূপ উদ্দাম এবং নিষ্ঠুর প্রেম-কাহিনী,—তার সমাপ্তি প্রচণ্ড রূঢ় হলেও মনে হবে, যেন এই রুক্ষ ভয়াল পট-ভূমিকায় বুঝি সবই সম্ভব! লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী এ গল্পে চরম উৎকর্ষতায় এসে উত্তীর্ণ হয়েছে বলা চলে।

'হাত' গল্পটি রচনাশৈলীতে মনোরম, কিন্তু প্রকৃত ঘটনাটির বাস্তবতার দিক থেকে সন্দেহের অবকাশ সৃষ্টি করে।

বইটির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ সুন্দর।

৪৭৬।৫৪

হলুদে বাড়ী (২য় সংস্করণ)—নরেন্দ্রনাথ মিত্র। প্রকাশকঃ টি কে ব্যানার্জি এণ্ড কোম্পানী, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা —১২। দাম ২৸০।

আধুনিক বাংলা ছোট গল্প-রচনার ক্ষেত্রে নরেনবাবুকে সিদ্ধ লেখক বলা চলতে পারে। জীবনের থেকে মন, আবেগের থেকে দরদ, প্রকৃতির থেকে মানুষ,—এই-ই সাধারণত বড়ো হয়ে দেখা দেয় নরেনবাবুর গল্পে,—সূক্ষ্ম মনোবিশ্লেষণ, দুরন্ত দরদ আর সাধারণ সুখদুঃখ আনন্দ-বেদনায়-মথিত মানুষ —এই তিনের সংমিশ্রণে তিনি যে অপূর্ব রসের উৎসারণ ঘটাতে পারেন, তা শুধু সিদ্ধ ছোটগল্প লেখকের পক্ষেই বুঝি সম্ভব!

আলোচ্য গ্রন্থটি এগারোটি ছোটগল্পের একটি সঞ্চয়ন। নরেনবাবু আজ ছোটগল্পের যে [illegible]

তার সম্যক পরিচয় সর্বক্ষেত্রে অবশ্য নেই, কিন্তু আজকের নিপুণ কথাকারকে ঠিকমতো বুঝতে হলে তাঁর পূর্বের এই রোমান্টিক গল্পগুলি পড়া আবশ্যক। বিশেষ করে আলোচ্য গ্রন্থের 'যৌথ' গল্পটি শুধু নরেন্দ্র-সাহিত্যের কেন, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের একটি সম্পদ। একটি পঙ্গু শিল্পীর অব্যক্ত প্রেম-চেতনার যে অপূর্ব বিকাশ এখানে উদ্ঘাটিত করেছেন লেখক,—তার আবেদন দেশ-কালের সীমাকেও অতিক্রম করে গেছে বলে আমাদের বিশ্বাস।

'হলুদে বাড়ি', 'পুনরুক্তি', 'যযাতি' 'কুমারী শুক্লা', 'মালঞ্চ' গল্পগুলি মনোরম বইখানার ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদ-পরিবেশ চমৎকার।

৫২৫।৫৪

মনের অন্তরালে—সত্যেন্দ্রনাথ মৌলিক প্রকাশকঃ ইউনিভার্স পাবলিশিং কনসার্ন ১।১।১বি হাজরা রোড, কলিকাতা। দাম এক টাকা বারো আনা।

তিনটি গল্পের সংকলন। 'মনের অন্তরালে' 'উদয়াস্ত', আর 'রতনমণি'। প্রথম গল্পটি নামানুসারে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে।

রবিরাজত্বের মধ্যাহ্ন থেকে আজ উত্তর রবীন্দ্র যুগেও বাঙলা সাহিত্য ছোট গল্পের পরিমিত ক্ষেত্রে অজস্র পরীক্ষা দিয়ে আসছে এবং তারই ফলে বাঙলা ছোটগল্প সার্থক সাফল্যের মর্যাদা পেয়েছে। আশ্চর্যের বিষয় আজকের যুগের কোনো কোনো ছোটগল্পকার বাঙলা সাহিত্যের এই গৌরবময় ধারাটির কথা বিস্মৃত হন। এবং পূর্বসূরীদের রচনা সম্বন্ধে কোন সশ্রদ্ধ অনুধাবনের প্রচেষ্টা না করেই গল্প লিখতে বসেন। কাজেই সে রচনা পাঠকের কাছে হয়ে ওঠে অসুখকর, অপাঠ্য। পাঠকের ধৈর্যকে তা পীড়িত করে তোলে। 'মনের অন্তরালে'র গল্প তিনটিকে ছোটগল্প কি উপন্যাস—কোন পর্যায়েই টেনে তোলা যায় না। গল্প তিনটি উপন্যাসগন্ধি ছোটগল্প; কি ছোটগল্পের ছাপমারা ছোট উপন্যাস। গল্প বলার ভঙ্গিতে কোন মুনশীয়ানার পরিচয় নেই। বক্তব্যে বৈচিত্র্য নেই আর ভাষায় নেই চমক। গল্পের শুরু ও শেষ একটি নির্জীব কৌতূহলের শীতলতায় নিঃসাড়। তবু এর মধ্যে 'উদয়াস্তে'র পরিকল্পনা প্রাক্-প্রভাত-কুমার যুগের হলেও তার সহজ করুণরসে একটি স্বচ্ছন্দ আবেদনের রেশ পাওয়া যায়। গ্রন্থটির অঙ্গসজ্জা অনুল্লেখ্য।

৪৪।৫৫

উপন্যাস

যাত্রা হ'ল সুরু—অমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশকঃ প্রাচী পাবলিশার্স। ৮ডি দমদম রোড। দামঃ আড়াই টাকা। পৃষ্ঠা ১৮০।

'যাত্রা হ'ল সুরু' উপন্যাসখানি জীবনের একটি অন্তরঙ্গ দিকের উপর আলোকপাত করেছে। রাজনীতি ও অর্থনীতির পাশা খেলায়

‘পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা’

সচ্চিদানন্দ হোড়

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টের পর ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ইতিহাসে র্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য দিন হইতেছে ১লা বেম্বর, ১৯৫৪। এই তারিখে ভারতের ক হইতে ফরাসী অধিকারের শেষ হ্নটুকুও অবলুপ্ত হইল। এক ঐতি- াসিক অনুষ্ঠানের ভিতর দিয়া ফরাসী রকারের প্রতিনিধিরা ভারত সরকারের তিনিধিদের হস্তে ফরাসী অধিকৃত ারতের—পণ্ডিচেরী, কারিকল, ইয়ানম বং মাহে—শাসনভার অর্পণ করিলেন বং ২০৩ বর্গমাইল ভূখণ্ড ও ৩ লক্ষ ০ হাজার অধিবাসী ‘ভারতের বৃহত্তর রিবারের’ সহিত যুক্ত হইলেন। ভারত রকারের তরফ হইতে পণ্ডিচেরীর নসাল-জেনারেল শ্রীকেওয়াল সিং এই ঞ্চলসমূহের চীফ কমিশনার নিযুক্ত ইয়াছেন। ভারতের পঞ্চম ফরাসী উপ- িবেশ চন্দননগর গত ২রা অক্টোবর শ্চিমবঙ্গের সহিত যুক্ত হইয়াছে এবং গলী জেলার একটি মহকুমা হিসাবে র্তমানে শাসিত হইতেছে। ফরাসী ারতের রাজধানী হইল পণ্ডিচেরী এবং থানে একজন শাসনকর্তা বা গভর্নর- নারেল আছেন এবং তিনি কয়েকজন প-শাসনকর্তা বা গভর্নরের সাহায্যে ই অঞ্চলগুলি শাসন করেন। দ্বিতীয় শ্বযুদ্ধের অবসানের পর এই ভূখণ্ড- লি স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন লাভ করে বং নিজেদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দ্বারা উনিসিপাল ‘শাসনকার্য’ পরিচালনার যোগ পায়। ভারতের স্বাধীনতালাভের র জাতীয় সরকার অন্যান্য বৈদেশিক ভগুলিকেও—ফরাসী, পর্তুগাল,— টশের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবার দেশ দেন। ভারত সরকার এই ত বৈদেশিক অধিকার সম্বন্ধে তাহার ত ঘোষণা প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারত নির্দিষ্টকালের জন্য কোন বিদেশী কে তাহার বুকে রাজত্ব করিতে দিতে
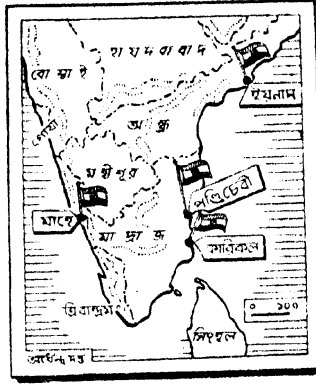
নীতি পরিচালিত হইবে শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের পথে, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ভিতর দিয়া নয়। কারণ ভারত বিশ্বাস করে যে পৃথিবীর যে কোন সমস্যারই সামাধান বন্ধুত্বপূর্ণ আলাপ আলোচনার ভিতর দিয়া সম্ভবপর। এদিকে ফরাসী সরকার জিদ ধরেন যে, এই অঞ্চলগুলির অধিবাসীদের মতামত গ্রহণ এরূপক্ষেত্রে একান্ত প্রয়োজন এবং গণ-ভোটের প্রস্তাব করেন। সেই অনুসারে গত ১৯৪৯ সালের ১৯শে জুন চন্দননগরে যে গণ-ভোট হয় তাহাতে ৭,৪৭৩ জন ভারতভুক্তির পক্ষে এবং ১১৪ জন বিপক্ষে ভোট দেন। এই গণভোটের ফলাফল দেখিয়া ফরাসী সরকার বিশেষ বিচলিত হইয়া পড়েন এবং অন্য চারিটি উপনিবেশে সন্ত্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করিয়া গণভোট গ্রহণের অনুপযুক্ত আবহাওয়ার সৃষ্টি করেন। এই চারিটি উপনিবেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে দুই দেশের ভিতর দীর্ঘদিন আলাপ আলোচনা চলে কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন ফল ইহাতে হয় নাই। ইত্যবসরে ফ্রান্সে মন্ত্রিত্বসংকট দেখা দেয় এবং মঃ পিয়ারে মেঁদেস ফ্রাঁস, মঃ পিনের স্থলে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। ইহার পরই ফরাসী সরকারের বৈদেশিক নীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা যায়, এবং ইন্দো-চায়না সমস্যা সমাধানে এই পরিবর্তনের প্রভাব সুপরি- স্ফুট হইয়া উঠে। ইহার কিছুদিন পর ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সেক্রেটারী শ্রী আর কে নেহরু ফরাসী সরকারের সহিত আলাপ আলোচনা চালাইবার জন্য প্যারিসে যান, কিন্তু কোন সন্তোষজনক ফল লাভ হয় না। এদিকে ফরাসী ভারতের অধিবাসীরা ফরাসী নাগপাশ ছিন্ন করিবার জন্য দুর্বার আন্দোলনের সৃষ্টি করেন এবং এই আন্দোলনের রূপ এত ভীষণ আকার ধারণ করে যে, সেখানকার প্রধান রাজ-

বাইরের জীবনে আজ অজস্র জটিলতা। কিন্তু বাইরের জীবনের অন্তর্লীনে যে হৃদয়ধর্মের সত্যটি আত্মগোপন করে রয়েছে, লেখকের দৃষ্টি সেদিকেই প্রসারিত। ছোট ছোট আনন্দ, ছোট ছোট বেদনা সাধারণ মানুষের জীবনে চিরকাল ধরে সারেঙ্গীর সুরের মত বেজে চলেছে—লেখক তাদেরই সাহিত্যভাত করেছেন। আজকাল অধিকাংশ উপন্যাস পড়তে পড়তে মনে হয়, এ 'রিপোর্টাজ'। কিন্তু লেখক সাধারণ জীবনের সংবাদকে উপন্যাসের স্তরে তুলে আনতে সক্ষম হয়েছেন।

কাহিনীর মধ্যে কিছু কিছু অতি-নাটকীয় পরিবেশ সৃষ্টি করা হয়েছে। সেগুলো চমক দিলেও সংগতি রক্ষা করতে পারে নি। সংলাপ অনেক স্থলেই ত্রুটিময়। চরিত্রানুগ হয়নি। মানস বর্ণনা ও সিচুয়েশন রচনার মধ্যে একটি সাবলীল কারুকর্মের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রমীলা-সুপ্রিয়ার মানস দ্বন্দ্বটি চিরকালীন। প্রিয়নাথ, ভবতারণ, যোগেশ চরিত্রগুলি সুন্দর বৈশিষ্ট্য নিয়ে, বিচিত্র বিস্ময়ের মধ্যে ফুটে উঠেছে।

উপন্যাসটি স্বাদুপাঠ্য। অঙ্গসজ্জা মধ্যম।

৪৯।৫৫

ব্যঙ্গ রচনা

সাত-সাতুতে — নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত। প্রকাশকঃ সেনগুপ্ত ট্রাস্ট, পি ৯৬, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা। দাম ঃ সাত সিকা। পৃষ্ঠাঃ ৯৯।

আধুনিক সাহিত্যকে যাঁরা অজস্র ঝড়-তুফানের মধ্যে গভীর মমতায় লালন করে এসেছেন, ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সেই সব অগ্রগামী সাহিত্যসাধকদের নামমালায় এক উজ্জ্বল মধ্যমণি। বিভিন্ন রচনার মধ্যে আধুনিক সাহিত্যের স্বপক্ষে তিনি কঠিনশপথ সেনাপতির ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

ইদানীং সেকালের সমরশ্রান্ত সাহিত্য-সেনাপতি বহুদিন লেখনী স্তব্ধ রেখেছিলেন। তাঁর সাম্প্রতিক রচনা 'সাত-সাতুতে'। 'সাত-সাতুতে' আধুনিক কালের রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর তীব্র শ্লেষাঘাত। বিভিন্ন মতবাদপুষ্ট দল-উপদল, স্বার্থসন্ধানী বিদুষকের আগমনে রাজনীতির আকাশ ভারাক্রান্ত। লেখক ছদ্মনামের আড়ালে তাদের রেখে ব্যঙ্গের পাশুপত বাণ নিক্ষেপ করেছেন। রচনার সর্বত্রই একটি কুশলী সমরনায়কের পরিচয় পাওয়া যায়। ফকীর সাহেব, প্রেমানন্দজী, ফয়েজুদ্দিন, চট্টলা, মিস টৌরিবল, বিশালবুদ্ধি, ভালচাঁদ ইত্যাদি অজস্র চরিত্রমালা সমাজের কোন স্তর আলোকিত করে রেখেছে, তা পরিষ্কার ধরা পড়ে যায়। কেবল নীরস তত্ত্বব্যাখ্যা নয়, সাহিত্যের 'কেলাইডোস্কোপের' মধ্য দিয়ে একটি তীক্ষ্ণরঙ রাষ্ট্রের দিকে তিনি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

৪৬।৫৫

বিবিধ

স্তব কবচমালা—শ্রীমৎ কুমারনাথ সুধাকর কর্তৃক সংশোধিত এবং গোপালদাস মুখোপাধ্যায় কর্তৃক সংগৃহীত। প্রকাশকঃ সংস্কৃত প্রেস ডিপোজিটারী, ৩০, কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা—৬। দাম তিন টাকা।

এতে কৃষ্ণস্তোত্র, দেবীস্তোত্র, শ্রীরামস্তোত্র প্রভৃতি স্তোত্র ও নানাবিধ পুজামন্ত্র এবং নবগ্রহ-স্তোত্র প্রভৃতি সংগৃহীত ও সযত্নে পরিবেশিত হয়েছে। ধর্মার্থীদের ব্যবহার্য অধিকাংশ স্তোত্র একত্রে থাকায় তাঁদের বিশেষ সুবিধা হবে, বলে মনে হয়। ছাপা, বাঁধাই ভালো,—গ্রন্থের আকারটিও ছোট, পকেটে রাখা যায়।

৫।৫৫

সাহিত্যিকী—ধীরানন্দ ঠাকুর। প্রবর্তক পাবলিশার্স, ৬১, বহুবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দাম ২৲।

সাহিত্যের মূল ভাব আর আদর্শকে কেন্দ্র করে বিভিন্ন প্রবন্ধের মাধ্যমে তাঁর সাহিত্য-চিন্তাকে আলোচ্য গ্রন্থে প্রকাশিত করেছেন লেখক। রবীন্দ্র-প্রভাবিত বিচার ও প্রকাশভঙ্গী হলেও চিন্তার গভীরতা লেখকের আছে, ভাষাও ভালো; বিশেষ করে 'সাহিত্য প্রচার' ও 'সমালোচনা-সাহিত্য' নিবন্ধ দুটিতে তাঁর বক্তব্য-বিষয় পাঠকসাধারণের কাছে বিশেষ প্রণিধানযোগ্য হয়ে উঠবে বলে মনে হয়।

ছাপা, বাঁধাই ও অনাড়ম্বর প্রচ্ছদপট উল্লেখযোগ্য।

২৪।৫৫

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

নোংরা হাত—জাঁ-পল সার্ত্র। অনুবাদক শিবনারায়ণ রায়

কাঁচের কুজন—শ্রীমৎ স্বামী সিন্ধানন্দ সরস্বতী

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—মূল, অন্বয় ও পদ্যানুবাদ—শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বপনবুড়োর শিশু-নাট্য—স্বপনবুড়ো

পদসঞ্চার—নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

রিক্তরাহী—শ্রীসুখরঞ্জন মৈত্র

দুষ্ঠফল চিকিৎসা—শ্রীপ্রভাকর চট্টোপাধ্যায়

নরসিংহ দত্ত কলেজ পত্রিকা—নিবারণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

—শৌভিক—

ছবি না 'ভূখা মিছিল?'

দৈনন্দিন জীবন-সমস্যায় ব্যতি-ব্যস্ত উত্যক্ত এবং বিমূঢ় মানুষের পিছনে একপাল নিঃস্ব, দীর্ণ বিক্ষুব্ধ দারিদ্র্যের হাহাকার লেলিয়ে দেওয়ার সার্থকতা কিছু থাক বা না থাক, এটা কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে জীবনকে নৈরাশ্যের ছায়ায় অবগুণ্ঠিত করে রাখার মতো বিষয়বস্তু পেলেই যেন চলচ্চিত্রকুশলী ও শিল্পীবৃন্দ চুটিয়ে তাদের প্রতিভা বিকশিত করার প্রেরণা পান। 'দো বিঘা জমীন'-ই তো তার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। অনেকটা তেমনিই নানাদিকের বলিষ্ঠ প্রতিভার দীপ্তি নিয়ে এবারে হাজির হয়েছে এম পি প্রডাকসন্সের 'অনুপমা'। এ যেন প্রায় চৌদ্দ হাজার ফিটের একটা দীর্ঘ ভূখা মিছিল। এদের মধ্যে রয়েছে ভগ্নস্বপ্ন নৈরাশ্যভরা মানুষের দল যারা কথায় কথায় পৃথিবীতে বেঁচে থাকাটাই একটা দারুণ বিড়ম্বনা বলে মনে করে; দারিদ্র্যের ঈর্ষায় যারা মনকে জর্জরিত করে ফেলেছে; মহৎকে স্বীকার করে নিতে যারা সন্ত্রস্ত; সন্দেহ ও অমঙ্গলের আশঙ্কায় সদাই আতঙ্কিত; আর রয়েছে অর্থনীতিক মুক্তির পথযাত্রী নিপীড়িত নারীত্ব। এক একটা চরিত্র এক একটা সমস্যার প্রতীক। নাটকীয় তীব্রতার মধ্যে মিছিলের আর্তরব আর জীবনের প্রতি বিদ্বেষধ্বনি প্রবল আবেগে দর্শক-মনকে উদ্বেলিত রেখে দেয়। মধ্যবিত্ত ঘরের কথা; চাকরিই যাদের একমাত্র লক্ষ্য ও সম্বল এবং স্বাধীন পেশার কথা ভাবতে ধোবিখানা খোলার বেশী দূরে মনকে ঠেলে নিয়ে যেতে পারে না যারা। এরা অনেক স্বপ্ন ও আশার পিরামিডে চড়ে উচ্চশিক্ষা সমাপ্ত করে। তারপর চাকরি না পাওয়ার নৈরাশ্যে ভেঙে খানখান হয়ে যায়। আরও সমস্যা রয়েছে সংসারের—কুসংস্কারের সমস্যা, অবিদ্যার সমস্যা। এককথায়, সংসারে যতো রকমের ঝামেলা থাকতে পারে তার সবগুলোকে একজোট করার নাম হয়েছে 'অনুপমা'—এক স্বস্তিহীন, সান্ত্বনাহীন নিরবচ্ছিন্ন নিরাশা।

*   *   *

মাত্র হাজার আড়াই টাকার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড নিয়ে সেকেণ্ডমাস্টার শিবশংকর অবসর গ্রহণ করতেই সংসারের ভিত ধ্বসে পড়লো। বড়ো ছেলে অবনী এম-এ পাশ বেকার; অনেক আশা ছিল তার ওপরে। বড়ো মেয়ে কল্যাণীও বি-এ পাশ করার পর সর্টহ্যাণ্ড টাইপিং শিখছে। কিন্তু মা মহামায়া দেবীর আপত্তি মেয়ের চাকরি করতে যাওয়াতে। কল্যাণী বাল বিধবা। তৃতীয় সন্তান অনূঢ়া শান্তার লেখাপড়া হয়নি। তারপরেও দুটি শিশু। শিবশংকর মারা যাবার পর অবস্থা আরও চরমে পৌঁছবার উপক্রম হলো। চাকরি না পেয়ে অবনী এক ধোবিখানা খুললে, কিন্তু ঘরের সব পুঁজি লোকসান দিয়ে ঘরেই এসে বসতে হলো তাকে। শিবশংকরের ছাত্র নরেন এদের সাহায্য করতে চাইলে কল্যাণীর চাকরির জোগাড় করে দিয়ে। মহামায়ার জন্মগত সংস্কারে বাধলো মেয়েকে চাকরি করতে দিতে। কিন্তু অভাবের সঙ্কটকে তা না হলে কিছুতেই রোখা যায় না দেখে শেষপর্যন্ত মহামায়া চাকরি করাতে বাধা দিলে না। নরেনদেরই অফিসে কল্যাণী চাকরি করে। সংসার চলতে লাগলো। একদিন হঠাৎ অবনী এনে হাজির করলে সুধাকে তার বৌ পরিচয় দিয়ে। দু'বছর আগেই অবনী সুধাকে জীবনসঙ্গিনী করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, কিন্তু চাকরি না জোটায় পেরে ওঠেনি। হঠাৎ চিঠি পেলে সুধার—তার আশ্রয়দাতা মামা ও মামী সম্পত্তির লোভে এক যক্ষ্মা রোগীর সঙ্গে সুধার বিয়ে দিতে চায়। তাই অবনী সুধাকে সটান বাড়িতে এনে তুললে। কল্যাণী আদর করে ঘরে তুললে নববধূকে। তার একার রোজগারেই সংসার চলছে। নরেন ও কল্যাণীর পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ অবনীর অজানা ছিল না। উদার মন নিয়ে অবনী ওদের বিয়ের কথা পাড়লে মহামায়ার
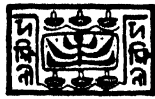
কাছে; ফনিনীর মতো গর্জে উঠলো মহামায়া। এ অনাচার হতে দেবে না সে। কল্যাণীর বুক ভেঙে দিয়ে মহামায়া কঠিন শপথ করিয়ে নিলে, আর সেই সঙ্গে শান্তাকে এগিয়ে দিলে নরেনের দিকে। তারপর কল্যাণীর জীবনে একটার পর একটা আঘাত আসতে লাগলো। শান্তার ঈর্ষাপরায়ণ মন কল্যাণী সম্পর্কে সকলকে বিরূপ করে তুলতে লাগলো। দারিদ্র্যের ঈর্ষা বেকার অবনীকেও হীনমনা করে তুললে। সেও কল্যাণীর রোজগারের অন্নকে দয়ার দান মনে করে ঝগড়া করে একদিন সুধাকে নিয়ে বস্তীতে গিয়ে উঠলো। ওদিকে অফিসে ছাঁটাইয়ের ব্যাপার নিয়ে নরেনও কল্যাণীর ওপর তীব্র বিরূপ হয়ে উঠলো আর সেই সঙ্গে অবনীর কুঁড়েতে নতুন পরিস্থিতিতে নরেন ও শান্তা অনেক কাছাকাছি এসে গেল। কল্যাণীর নামে অনেক কথা রটতে লাগলো। ঠিক সেইসময়ে অফিসে স্ট্রাইক ঘোষিত হলো। মা-ভাইবোনদের কথা ভেবে সকল যুক্তিকে এড়িয়ে কল্যাণী ওদের দল থেকে নিজেকে দূরে রেখে দিল। কল্যাণীর এই দুর্বলতার সুযোগ নিতে চাইলে বড়োসাহেব। স্ট্রাইকের নায়ক নরেনকে খুন করার ষড়যন্ত্রে কল্যাণীকে জড়িয়ে ফেলতে চাইলে মোটা টাকার লোভ দেখিয়ে। আর পারলে না কল্যাণী তার নারীত্বের মর্যাদা, তার প্রেমকে জলাঞ্জলি দিতে। বড়ো সাহেবের মুখের ওপরে জবাব দিয়ে অফিস ত্যাগ করে এলো কল্যাণী। স্ট্রাইক ভাঙার পথ না পেয়ে কর্তৃপক্ষ আপোষ করলো দাবীর সব শর্ত মেনে নিয়ে, কিন্তু ছাঁটাইয়ের তালিকায় পড়লো একমাত্র কল্যাণী। এতোদিনে নরেন ও তার সহকর্মীরা কল্যাণীকে চিনতে পারলে। শান্তার হীন কুটিলতাও ধরা পড়লো; মুখ দেখাবার কোন পথ না পেয়ে শান্তা আত্মহত্যা করলে। কল্যাণীর জীবনের সব আশা, স্বপ্ন, আদর্শ ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। সেও চাইলে নিজেকে সবার কাছ থেকে সরিয়ে রাখতে। কিন্তু ছোট ভাইবোন দুটি ওকে জড়িয়ে ধরে চলার পথ রুখে দাঁড়ালো। অবনীও তার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করতে আবার ফিরে এলো বাড়িতে। আর সেই সঙ্গে এলো নরেন তার সহকর্মীদের নিয়ে কল্যাণীর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করতে। সহকর্মীরা একজোটে কল্যাণীর ছাঁটাই রোধ করে দিয়েছে। নরেন হাত পেতে দাঁড়ালো কল্যাণীর সামনে।

*   *   *

অত্যন্ত বলিষ্ঠ নাটকীয় সৃষ্টি 'অনুপমা'। বাস্তবের সঙ্গে তফাৎ জীবনেরও গল্প নয়, কিন্তু গোড়া থেকেই শুধু আশা ও স্বপ্নভঙ্গের একটা ধারাবাহিক বিবরণ; একটানা কেবল বিমর্ষতারই সুর। দুবার মাত্র একটু উদ্দীপ্ত হবার মতো বলিষ্ঠ মনের পরিচয় পাওয়া যায়—একবার, লোভী মামা-মামীর গ্রাস থেকে সুধাকে উদ্ধার করে তাকে অবনীর বিয়ে করা এবং শেষে বিভ্রান্ত বীতশ্রদ্ধজীবন কল্যাণীর সামনে সব বাধা ও সংস্কার মুক্ত হয়ে নরেনের হাত পেতে দাঁড়ানো। কাহিনীর রীতিতে এখানে মিলনও সূচিত হয়েছে, এবং পরদিন যখন আবার ওদের দুজনকে একসঙ্গে অফিসে যেতে দেখা যায় তখন গল্পটিকে মিলনান্তক বলে অভিহিতও করা যায়। কিন্তু কেবলই লক্ষ্যহীন, উদ্‌ভ্রান্ত হতাশ জীবন যতো সব। মনকে চাঙা করে তোলার মতো কিছুই পায় না দর্শক। কাহিনীকার সুশীল জানা তার বক্তব্য খুব জোরের সঙ্গেই পেশ করতে

পেরেছেন। মনকে উদ্বেলিত করে তোলার মতো নাটকীয় মুহূর্তও যথেষ্ট; তদুপরি রয়েছে চমৎকৃত হবার মতো যেমন, তেমনি হৃদয়কে বিদীর্ণ করার মতো ধারালো সংলাপ। 'সূর্যগ্রাস' উপন্যাস থেকে কাহিনীটি অবলম্বন করা হয়েছে। গল্পের উপস্থাপন ও বাঁধুনীর মধ্যেও অসাধারণত্বের পরিচয় প্রতি পদে সুস্পষ্ট। অগ্রদূত গোষ্ঠি ছবিখানির পরিচালনায় অনন্যসাধারণ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। আর সেই সঙ্গে, এক সঙ্গীতাংশ ছাড়া, কলাকৌশলের আর সমস্ত দিকও সমান তালে কৃতিত্ব ফুটিয়ে গিয়েছে। কেবল বিষণ্ণ প্রকৃতির বিষয়বস্তুর কথা বাদ দিলে 'অনুপমা'-কেও 'দো বিঘা জমীন'-এর মতোই একটি যুগান্তকারি সৃষ্টি বলে অভিহিত করা যায়।

* * *

ছবিখানিতে সবচেয়ে বিস্ময়কর নৈপুণ্যের ছাপ ফুটে উঠেছে অবনী, কল্যাণী, সুধা ও মহামায়া চরিত্রগুলির অভিনয়ে, যে ভূমিকাবলীতে আছেন যথাক্রমে উত্তমকুমার, অনুভা গুপ্তা, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় ও সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়। এদের সমগ্র শিল্পী জীবনেরই শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব শুধু নয়, ভারতীয় পর্দায় অভিনয়োৎকর্ষের একটা নতুন মান নির্ধারণ করে দেবার মতো অত্যন্ত শক্তিশালী শিল্পসৌকর্য হিসেবেও এদের কৃতিত্ব স্মরণীয় হয়ে থাকবে। নরেনের চরিত্রে বিকাশ রায়ও প্রভাবিত করার মতো অসাধারণ অভিনয়নৈপুণ্য প্রকাশ করেছেন। অন্যান্য চরিত্রগুলির অভিনয়েও বেশ একটা উঁচু পর্দার কৃতিত্ব উপলব্ধি করা যায়। বিভিন্ন চরিত্রে আছেন অনুপকুমার, যমুনা সিংহ, নীতিশ মুখোপাধ্যায়, জহর গাঙ্গুলী প্রভৃতি। ছোট ছোট কটি ভূমিকাতে আছেন সলিল দত্ত, কৃষ্ণধন, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, প্রীতি মজুমদার, সন্ধ্যা দেবী প্রভৃতি। কলাকুশলীদের মধ্যে আছেন আলোকচিত্রগ্রহণে বিজয় বসু, শব্দগ্রহণে যতীন দত্ত, সঙ্গীত পরিচালনায় অনুপম ঘটক, গান রচনায় গৌরিপ্রসন্ন মজুমদার, শিল্পনির্দেশে সুধীর খান ও সম্পাদনায় সন্তোষ গাঙ্গুলী।

কবিতা-ভবন নাট্য পরিষদের 'দালিয়া'

বুদ্ধদেব বসু প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য সংস্থা কবিতা-ভবন'এর নতুন একটি উদ্যোগ কবিতা-ভবন নাট্য পরিষদ গত ১২ই ফেব্রুয়ারী তাঁদের প্রথম প্রচেষ্টারূপে সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ হলে রবীন্দ্রনাথের 'দালিয়া' পরিবেশন করেন। পরিষদটির প্রতিষ্ঠাত্রী প্রতিভা বসু এবং 'দালিয়া'র পিছনে রয়েছে দীর্ঘ প্রায় বারো বছরের অবিচ্ছিন্ন নাট্যানুরক্তির ধারাবাহিক দৃষ্টান্ত। প্রথমে ১৯৪৩-এ কবিতা-ভবনের উদ্যোগে শ্রীরঙ্গমে বুদ্ধদেব বসুর 'কালো হাওয়া' অবলম্বনে পরিবেশিত হয় 'মায়া-মালঞ্চ'। ক'বছর বিরতির পর ১৯৫১ সালে শ্রীমতী বসু রবীন্দ্রনাথের 'লক্ষ্মীর পরীক্ষা' প্রস্তুত করে নিজেদের আত্মীয়-বন্ধুদের সামনে বাড়ির উঠোনে মঞ্চস্থ করেন। পরের বছর মহাজাতি সদনে রবীন্দ্র-সপ্তাহ উপলক্ষে পুনরায় নাটকখানি একই শিল্পী সমন্বয়ে পরিবেশিত হয়। ১৯৫৩-তে ঐ স্থানেই তিনি মঞ্চস্থ করেন রবীন্দ্রনাথের 'গৃহপ্রবেশ'। ১৯৫৪-র গ্রীষ্মকালে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে রবীন্দ্রনাথের 'শেষরক্ষা' পরিবেশন করেন দুবার এবং দ্বিতীয়বারের অভিনয়লব্ধ অর্থ কবি হেমচন্দ্র বাগচীর চিকিৎসার্থে প্রদান করা হয়। এর পরই কবিতা-ভবন নাট্য পরিষদের সৃষ্টি এবং তারই এই প্রথম নিবেদন 'দালিয়া'। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিভা বসু তাঁর এই নিবেদনের মুখবন্ধে যে উদ্দেশ্য ব্যক্ত করেছেন, তা আর পাঁচটা শৌখিন দলের কথারই পুনরাবৃত্তি। যেমন—পরিষদ কোন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান নয়; তাঁদের আকাঙ্ক্ষা, একটা আনন্দকর অনুষ্ঠান গড়ে তোলা, যাঁরা এর সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন, তাঁদেরও পক্ষে, যাঁরা দর্শক হয়ে সমাগত হবেন, তাঁদেরও পক্ষে।' তাছাড়া বাঙলা ভাষায় নাট্যকলার ক্রমবিকাশে সহায়তা দানের আশাও তাঁরা লালন করেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীমতী বসু সাহিত্য জগতের সঙ্গে রঙ্গমঞ্চের বিচ্ছেদের কথা উল্লেখ করে বলেছেন, পরিষদ চেষ্টা করবে, এই দুই জগতের মধ্যে একটা ক্ষীণ সেতু নির্মাণ করে দিতে। নিজেদের অপ্রচুর ক্ষমতার কথাও শ্রীমতী বসু উল্লেখ করেছেন। অত্যল্প সম্বল তাঁদের, অভিনেতারা প্রায় সকলেই ছাত্রছাত্রী এবং যাঁরা এর সঙ্গে জড়িত রয়েছেন, তাঁদের সকলেরই অবসরকালীন অতিরিক্ত শ্রম দ্বারা এই অনুষ্ঠান সাধিত হচ্ছে।

* * *

ভালো উদ্দেশ্যেই কবিতা-ভবন নাট্য পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে বলতে পারা যায় এবং একথাও ঠিক যে, বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসুর মতো সাহিত্যগুণীদের সংস্রব যার সঙ্গে, তার ওপরে রসিক-

জনের দৃষ্টি আকর্ষিত হবেই। কিন্তু একথাটা মনে রাখা দরকার যে, 'বাড়ির উঠোনে আত্মীয়-বন্ধুদের আসর পেরিয়ে সাধারণ্যে প্রকাশ্য অভিনয়ে নামলে তখনকার দর্শকদের কাছে 'সম্বল অতাল্প' কিংবা 'অভিনেতারা ছাত্রছাত্রী' অথবা 'সকলের অবসরকালীন শ্রম দ্বারা গঠিত অনুষ্ঠান' ইত্যাদি দোহাইগুলোর কোন আবেদনই থাকে না, আর অমন আবেদন না করাই ভালো। কারণ সময় নষ্ট করে নির্বিকারচিত্তে বিরক্তি খরিদ করার মতো দর্শক পাওয়া সোজা নয়। সেদিনও 'দালিয়া' অভিনয়ের সময়ে এই সব আবেদনের মর্যাদা দিতে সব দর্শকই যে প্রস্তুত নন, কারুর কারুর অসহিষ্ণু মন্তব্যাদি থেকে তা হয়তো উদ্যোক্তারা অনুভবও করতে পেরেছেন। আর একটা বড়ো কারণ, সেদিন দর্শকরা যে দিক থেকে সবচেয়ে বেশী চমৎকৃত হবার আশা নিয়ে গিয়েছিল, অর্থাৎ একখানি সুলিখিত নাটক পাবার, সেই আশাটাই তাঁদের ভেঙে যায়। এটা ঠিক, রবীন্দ্রনাথের এই ছোট্ট গল্পটি একখানি পূর্ণাঙ্গ বড়ো নাটক হবার মতো যথেষ্ট উপাদানযুক্ত নয় এবং নাট্যরূপদাতা বুদ্ধদেব বসু ও প্রতিভা বসুকে মূল গল্পের কাঠামোটুকুর মধ্যেই যা কিছু করতে হয়েছে। কিন্তু তাই বলে পরিণত নাট্য-মুহূর্ত কোথাও গড়ে তোলা যেতো না, এমন নিস্তেজ রচনাও নয় মূল গল্পটি। নাটকের গড়নটা বেতার-নাট্যের মতো, কেবল কথা আর কথা। 'অতাল্প সম্বল' বলে মুখবন্ধে যে বিনয় প্রকাশ করা হয়েছে, সেটাও ঠিক নয়। কারণ সাজ-পোশাক এবং ঘটনাস্থল বলতে একটিমাত্র হলেও তার অঙ্গশোভায় বড়ো কম জমক আরোপিত হয়নি। বস্তুত নাটকখানির মধ্যে ঐসবই চোখে পড়ে। নয়তো এক জায়গায় দাঁড়িয়ে কেবল সংলাপই আওড়ে যাওয়া, আর তার মধ্যেও 'র'এর জায়গায় ধারাবাহিকভাবে 'ড়' উচ্চারণ করে শ্রোতাদের পীড়ন করার সামিল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সংলাপসর্বস্ব নাটকে আবৃত্তির দিকটাই প্রধান, কিন্তু সেইটেই হয়েছে অভিনয়ের দুর্বল দিক।

*   *   *

ছটি দৃশ্যের নাটকখানির আখ্যানবস্তু প্রণয়ঘটিত। আওরংজেবের অত্যাচারে তিন কন্যাকে নিয়ে শা সুজা পালিয়ে আসে আরাকানে। কিন্তু আরাকানরাজ এই তিন কন্যার সঙ্গে তার পুত্রদের বিবাহ দেওয়ার প্রস্তাব করতে শা সুজা তা প্রত্যাখ্যান করলে। আরাকানরাজ মেয়ে তিনটিকে জলে ডুবিয়ে মারার চেষ্টা করায় তাদের একজন আত্মহত্যা করলে, দ্বিতীয় জুলিখাকে উদ্ধার করলে তার পিতার বিশ্বস্ত কর্মচারী রহমৎ সেখ, আর তৃতীয় আমিনাকে শা সুজা জলে ভাসিয়ে দেবার পর এক বৃদ্ধ জেলে তাকে কুড়িয়ে নিয়ে তিন্নি নামে মানুষ করতে থাকে। একদা

রহমৎ সেখের সহায়তায় জুলিখা তার ভগিনীকে খুঁজে পেয়ে তার কাছে এসে রইলো। তিমির ভালবাসতো বন্য যুবক দালিয়াকে। দালিয়া ওদিকে তার বোনকে আরাকানরাজের ওপর প্রতিহিংসা নেবার জন্য তীক্ষ্ন করে তুললো। কিন্তু প্রতিশোধ নেবার যখন সুযোগ এলো, তখন উদ্ধত ছুরিকাহস্তে আমিনা চিনতে পারলে যাকে সে হত্যায় উদ্যত, সে-ই তার পরম অভিলষিত দালিয়া।

* * *

কেবল মুখের বিবৃতিতে ঘটনার বিবরণ প্রকাশিত হয়েছে এবং মাত্র চার পাঁচটি চরিত্র নিয়ে। ফলে শোনা ও দেখা দুয়ের মধ্যেই একঘেয়েমী। তিমির চরিত্রে দময়ন্তী বসুর এবং বৃদ্ধ ধীবরের চরিত্রে পরিতোষ সোমের অভিনয়ই যা খানিকটা উপভোগ্য হয়েছিল। বাকি শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মীনাক্ষী বসু, শোভেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুনীতি বসু প্রভৃতি। নাটকখানি পরিচালনা ও মঞ্চসজ্জা করেন সৌরেন। গান বা আবহ-সংগীত মোটেই ব্যবহৃত হয়নি।

খেলার মাঠে

একলব্য

সম্প্রতি কলকাতায় অনুষ্ঠিত জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ সম্পর্কে গত সপ্তাহে সাধারণভাবে আলোচনা করা হয়েছে। ভারতের সমস্ত রাজ্যের কৃতী এ্যাথলীটদের এই মিলিত স্পোর্টস অনুষ্ঠানের অনেক খুঁটিনাটি বিষয় গত সপ্তাহে আলোচনা করা সম্ভব হয়নি। এ সপ্তাহে মহিলা বিভাগের তুলনামূলক রেকর্ডের খতিয়ানের সঙ্গে কিছু কিছু আলোচনা করবার প্রয়াস পাচ্ছি।

জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগীরা তিন দিন ধরে ইডেন উদ্যানে দৌড়, লাফঝাঁপ করলেও বস্তুত অনুষ্ঠানের স্থায়িত্বকাল ছিল পাঁচ দিন। প্রথম দিন কলকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখার্জি এ্যাথলেটিক ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। পরের দিন পশ্চিম বাঙলার রাজ্যপাল ডাঃ হরেন্দ্রকুমার মুখার্জির পৌরোহিত্যে ক্রীড়ানুষ্ঠানের উদ্বোধন করা হয়। এই দিন কিন্তু কোন খেলাধুলা বা স্পোর্টসের বিষয় অনুষ্ঠান তালিকায় স্থান পায়নি। শুধু আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন সম্পন্ন করা হয়। অলিম্পিকের নিয়মনিষ্ঠায় জাতীয় সংগীত, সামরিক বাদ্যের ঐকতানে এ্যাথলীট ও কর্মকর্তাদের মার্চপাস্ট, পতাকা উত্তোলন, উদ্বোধনের ঘোষণা বাণী পাঠ, এ্যাথলীটদের অংগীকার, শান্তির দূত পারাবত আকাশে উড়ান প্রভৃতি বিষয় এই দিনের অনুষ্ঠানতালিকায় স্থান পায়। পরের তিন দিন ধরে চলে এ্যাথলেটিকসের প্রতিদ্বন্দ্বী জিমন্যাস্টিকস আর কপাটি খেলা।

* * *

জাতীয় ক্রীড়ানুষ্ঠান এবং এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতি বছর পর্যায়ক্রমে অলিম্পিকের অনুকরণে এবং নিয়মনিষ্ঠায় সম্পন্ন হয়ে আসছে। অলিম্পিকের জন্ম গ্রীসে। গ্রীকরা অলিম্পিক অনুষ্ঠানকে ধর্মীয় অনুষ্ঠান বলে মনে করতো। অলিম্পিক অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে তারা সূর্যরশ্মি থেকে অগ্নি প্রজ্বলিত করে সেই অগ্নিকে সাক্ষী রেখেই ন্যায়-নিষ্ঠা, সত্য-ধর্ম ও পারস্পরিক প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলার শপথ গ্রহণ করতো। এর পর শুরু হতো পাঁচ দিনব্যাপী অলিম্পিক ক্রীড়ানুষ্ঠান। কুচকাওয়াজ, মিছিল, পূজা অর্চনা, রথচালনা, দৌড়, লাফঝাঁপ, মুষ্টিযুদ্ধ, কুস্তি, গানবাজনা, ভোজের ব্যবস্থা প্রভৃতি। আমাদের দেশে পূজা অর্চনায়

রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জি জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপের উদ্বোধন করবার পর শান্তির প্রতীক এক ঝাঁক শ্বেত পারাবত আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়

যেমন উপাসনা, যাগযজ্ঞ, হোম, বিবাহাদি অনুষ্ঠানে যেমন অংগীকারের বিধি আছে, অলিম্পিকেও তেমন বিধি আছে খেলাধুলার জ্যোতির্ময় রূপের আরাধনা ক'রে ক্রীড়ামাধুর্যের শাশ্বত সত্যকে স্বীকার করবার। তাই দেখতে পাই পতাকার নীচে বেদীমূলে দাঁড়িয়ে দেশের একজন সম্মানিত এ্যাথলীট সমস্ত এ্যাথলীটের প্রতিনিধিরূপে প্রতিজ্ঞা করছেন খেলাধুলায় নিয়ম মেনে প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করবার, আর অন্য সমস্ত দলের অধিনায়ক নিজ নিজ দলের পতাকা অবনমিত করে দেখাচ্ছেন সেই প্রতিজ্ঞার প্রতি তাদের অন্তরের শ্রদ্ধা। পারাবত আকাশে উড়িয়ে দেবার মধ্যেও দেখতে পাই দিকে দিকে শান্তির বাণী প্রচার করার সুমহান প্রয়াস। পারাবত শান্তির দূত। খেলাধুলার উদ্দেশ্য শুধু খানিকটা দৌড়ঝাঁপ বা দেহমনের উন্নতি সাধন নয়—ক্রীড়াসাফল্যের আত্মতুষ্টির মধ্যেও ক্রীড়ানুষ্ঠানের সার্থক রূপ খুঁজে পাওয়া যায় না। পরস্পরের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তোলা এবং সৌভ্রাত্রের বন্ধন দৃঢ় করাও ক্রীড়ানুষ্ঠানের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে সৌভ্রাত্র বন্ধনের সুযোগ কোথায়? গ্রীস দেশে যখন অলিম্পিকের সৃষ্টি হয়েছিল, তখন গ্রীস ছিল শতধা বিভক্ত। বিভিন্ন খণ্ডের রাজাদের মধ্যে স্বার্থের সংঘর্ষে যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকতো। অগণিত দলপতি ও ছোট ছোট রাজাদের স্বার্থের সংঘাতে সমস্ত গ্রীসেই ছড়িয়ে পড়েছিল যুদ্ধের লেলিহান অগ্নিশিখা। অত্যাচার উৎপীড়ন আর লাঞ্ছনায় গ্রীসের আপামর জনসাধারণের জীবনই দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সর্বজনীন খেলাধুলার মধ্য দিয়েই যুদ্ধোন্মাদ সেই গ্রীসে হয়েছিল শান্তির পুনঃপ্রতিষ্ঠা। তাই অলিম্পিক ক্রীড়াপ্রতিযোগিতার সৃষ্টির ইতিহাস হচ্ছে অশান্তি ও অমংগলের মধ্যে শান্তি ও মংগল প্রতিষ্ঠার ইতিহাস। তাই জাতীয় অলিম্পিক খেলাধুলার সঙ্গে দেশের মংগল ও শান্তি কামনার আনুষ্ঠানিক কর্মসূচী জড়িত হয়ে আছে।

* * *

কলকাতায় জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে একমাত্র অগ্নি প্রজ্বলিত করা ছাড়া অলিম্পিকের কোন অনুষ্ঠানই বাদ দেওয়া হয়নি। রাজ্যপাল ডাঃ মুখার্জি প্রতিযোগিতার উদ্বোধনের ঘোষণাবাণী পাঠ করবার পর উদ্যোগী রাজ্য বাঙলার অধিনায়ক কমল চ্যাটার্জি ধীরে ধীরে বেদীর উপর আরোহণ করলেন। সমস্ত এ্যাথলীটের প্রতিনিধিরূপে তিনি অংগীকার করলেন "We swear that we will take part in the XXth National Athletic Championship Meet, 1955 in fair competition respecting the regulations which govern them, and with the desire to participate

"...in the true spirit of sportsmanship for the honour of our country and for the glory of sport". অর্থাৎ "দেশের সম্মান এবং খেলার গৌরবের জন্য আমরা প্রকৃত খেলোয়াড়সুলভ মনোবৃত্তি নিয়ে এবং খেলার নিয়মকানুনের প্রতি অবিচলিত আস্থা রেখে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য বিংশ জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে যোগদানের জন্য অঙ্গীকার করছি।" কমল চ্যাটার্জির অঙ্গীকারের সময় যোগদানকারী সমস্ত রাজ্যের অধিনায়ক নিজ নিজ দলের পতাকা হস্তে বেদীটিকে ঘিরে দাঁড়ান এবং পতাকা অবনমিত করে প্রতিজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। এই সময় তোপধ্বনির মধ্যে যোগদানকারী রাজ্যগুলির নাম আকাশের বুকে ফুটে ওঠে। একদিক থেকে শান্তির দূত একঝাঁক শ্বেত পারাবত আকাশে উড়িয়ে দেওয়া হয়। মাঠের অপর প্রান্তে নানা রঙের বেলুন উড়তে আরম্ভ করে। সামরিক ঐকতানের মধ্যে এ্যাথলীটরা ধীরে ধীরে অনুষ্ঠান ক্ষেত্র সেদিনের মত ত্যাগ করেন।

এ্যাথলেটিক স্পোর্টসের তিন দিনই কেটেছে উৎসাহ উদ্দীপনার মধ্যে। কলকাতার স্পোর্টসের সাধারণত দর্শকের ভীড় দেখা যায় না, কিন্তু জাতীয় এ্যাথলেটিক স্পোর্টসে এবার যেমন দর্শক সমাগম দেখা গেছে, এদেশের স্পোর্টস ইতিহাসে তা সত্যই অভূতপূর্ব। স্কুলের তরুণ ছাত্রদেরই উৎসাহ ছিল বেশী। শক্তিমান এ্যাথলীটদের এক একটি রেকর্ড সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিপুল করতালি ধ্বনিতে ইডেন উদ্যান মুখরিত হয়ে উঠেছে। বিজয়ী এ্যাথলীটদের পুরস্কৃত করবারও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। একটা বিষয়ের চূড়ান্ত মীমাংসার পরই প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থানাধিকারী তিনজন এ্যাথলীট 'বিজয় মঞ্চের' দিকে এগিয়ে যান,—অপরদিক থেকে ফুলের মালা হাতে এগিয়ে আসেন তিনটি কুমারী মেয়ে। তারা বিজয়ী এ্যাথলীটদের মাথায় পরিয়ে দেন ফুলের মালা। তারপর কখনো বি ও এ-র সভাপতি, কখনো আই ও এ-র সভাপতি, কখনো কোন পুরনো দিনের দিকপাল এ্যাথলীট তাদের হাতে তুলে দেন বিজয়ীর পুরস্কার আর কৃতিত্বের সনদ। 'বিজয় মঞ্চে' দণ্ডায়মান সুগঠিত দেহ, স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল শক্তিমান এ্যাথলীটদের বেণী পাকানো শিরে ফুলের মালা চমৎকার দেখাচ্ছিল।

* * *

জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নসিপের সমাপ্তি দিবসের অনুষ্ঠানও খুব হৃদয়গ্রাহী হয়। স্পোর্টস শেষ হবার পর সুমধুর সামরিক বাদ্যের তালে তালে এ্যাথলীটদের মার্চ পাস্টে ভারতীয় অলিম্পিক এসোসিয়েশনের সভাপতি পাতিয়ালার মহারাজা অভিবাদন গ্রহণ করেন। তারপর পুরুষ ও মহিলা এ্যাথলীট বাহিত এমেচার এ্যাথ-

জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নশিপে দশ হাজার মিটার দৌড়ের রেকর্ড সৃষ্টিকারী এ্যাথলীট বুটা সিংয়ের মাথায় ফুলের মালা পরিয়ে দেওয়া হচ্ছে

লেটিক ফেডারেশনের পতাকাটি মহারাজার হাতে অর্পণ করা হয়। আগামী বারের অনুষ্ঠানের জন্য এটি গচ্ছিত থাকে মহারাজার কাছে। বিলীয়মান সূর্যের শেষ রশ্মিরেখার সঙ্গে সঙ্গে এ্যাথলীটরা ধীরে ধীরে অনুষ্ঠানক্ষেত্র ত্যাগ করেন। এক মহা আড়ম্বরপূর্ণ ক্রীড়ানুষ্ঠানের পর যবনিকা পড়ে।

কলকাতায় জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নসিপের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে খেলাধুলার অবদান সম্পর্কে এক চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন। ফোর্ট মণ্ডল কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে এবং শ্রীধীরেন দে এবং শ্রী পি ডি দত্তর ব্যবস্থাপনায় একটি পৃথক 'হলে' এই চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। শুধু খেলাকে কেন্দ্র করে পোস্টার প্রদর্শনীর এই ব্যবস্থা কলকাতা তথা ভারতে প্রথম বলেই মনে হয়। ইতিপূর্বে এধরণের আয়োজন হয়েছে বলে শোনা যায়নি। পোস্টার প্রদর্শনীর বিন্যাস করতে গিয়ে ফোর্ট মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি ভারতের খেলাধুলার ইতিহাসকে আটটি ভাগে ভাগ করেছেন। বৈদিক যুগে মুনি ঋষিদের সময় থেকে স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত খেলাধুলার কোন ঘটনাই তাঁরা বাদ দেননি। যে আটটি বিষয়ে প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তার কিছু পরিচয় দিচ্ছি। (১) বৈদিক যুগে খেলার স্থান, (২) শারীরিক গঠন এবং স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য, (৩) সিপাই বিদ্রোহের পূর্ব পর্যন্ত খেলাধুলার অবস্থা, (৪) স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে খেলাধুলার সম্পর্ক, (৫) ক্রীড়া সাংবাদিকতা এবং বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের ক্রীড়া পত্রিকা, (৬) কোন কোন আধুনিক খেলাধুলার কুফল, (৭) খেলাধুলার সুষ্ঠু পরিচালনার বর্তমান সমস্যা এবং (৮) আমাদের কর্তব্য এবং ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা।

বলা বাহুল্য, ফোর্ট মণ্ডল কংগ্রেস কমিটি তথা শ্রী দে ও শ্রী দত্তর বহু আয়াসসাধ্য চিত্র প্রদর্শনীর এই আয়োজন প্রচারের অভাবেই হোক আর অন্য যে কোন কারণেই হোক আশানুরূপ জন-আকর্ষণ লাভ করেনি। শিক্ষণীয় এবং দর্শনীয় অনেক কিছুই প্রদর্শনীতে স্থান পেয়েছিল অবশ্য একথাও সত্য, অল্প সময়ের মধ্যে উদ্যোক্তারা প্রদর্শনীকে সর্বাঙ্গসুন্দর করতে পারেননি। তবুও তাদের এই প্রথম প্রচেষ্টা অকুণ্ঠ প্রশংসার দাবী রাখে, এবিষয়েও কোন সন্দেহ নেই।

অতীত যুগে পাশা বা দাবা খেলার মাধ্যমে একটা দেশ বা রাজ্যের ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হবার ঘটনা বিরল নয়। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পূর্বে দ্রৌপদীকে পণ রেখে পাণ্ডবদের পাশা খেলার প্রতিযোগিতার কথা সর্বজনবিদিত। রামায়ণে বর্ণিত 'হরধনু' ভঙ্গের কাহিনী বা মহাভারতে স্বয়ম্বর সভায় অর্জুনের 'লক্ষ্যভেদের' ঘটনাও ক্রীড়ানৈপুণ্যের অন্তর্ভুক্ত। বাণের সাহায্যে কৌরব ও পাণ্ডবদের অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের কূপ থেকে লৌহ বল তোলার ঘটনাও ধনুর্বিদ্যার কলানৈপুণ্য। বৈদিক যুগের এইসব ঘটনাকে কেন্দ্র করেই পোস্টার প্রদর্শনী এগিয়ে গেছে। সিপাই বিদ্রোহের পূর্ব

জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নসিপে মহিলাদের ডিসকাস ছোঁড়ায় প্রথম স্থানের অধিকারিণী মহীশূরের ডিনা টমাসের ডিসকাস ছোঁড়ার দৃশ্য

থেকেই ভা[illegible] হত। অসি[illegible], মশাল দৌড়, [illegible] ধুলোর অন্তর্ভুক্ত ছিল। [illegible] অভিভাবকরে [illegible] রুদ্ধ। আমলানী [illegible] ইংরেজের [illegible] যুবক [illegible] না। বিভিন্ন সঙ্ঘ, সমিতি প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠিত হল কুস্তির আখড়া। স্বাধীনতা মন্ত্রে দীক্ষিত দেশ সেবকেরা সংগোপনে এবং ধীরে ধীরে যুব আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলতে লাগলেন। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে যাঁরা প্রাণ হারিয়েছেন, তাঁদের অনেকেই ব্যায়ামানুশীলন ও খেলাধুলোর মধ্য দিয়ে সঞ্চয় করেছেন সংগ্রাম ক্ষমতা, একথা তাদের জীবন কাহিনীর মধ্যেই পাওয়া যায়। পোস্টার প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা ভারতের এই বীর সন্তানদের আলেখ্যই জনসাধারণের সামনে তুলে ধরেছেন, যারা খেলার ছলে নিজেদের হৃৎপিণ্ড উপড়ে দিয়ে হয়েছেন মৃত্যুহীন।

* * * *

গত সপ্তাহে জাতীয় এ্যাথলেটিকের পুরুষ বিভাগের ফলাফল প্রকাশ করা হয়েছে। এসপ্তাহে মহিলা বিভাগের ফলাফল প্রকাশ করা হল।

মহিলা বিভাগ

১০০ মিটার দৌড়

বিশ্ব রেকর্ড—মার্জোরি জ্যাকসন (অস্ট্রেলিয়া) ১৯৫২—১১·৪ সেঃ।

অলিম্পিক রেকর্ড—এইচ স্টিফেনস (ইউ এস এ) ১৯৩৬—১১·৪ সেঃ।

এশিয়ান রেকর্ড—এ নাম্বু (জাপান) ১৯৫৪—১২·৫ সেঃ।

ভারতীয় রেকর্ড—মেরী ডি'সুজা (বোম্বাই) ১৯৫৪—১২·৩ সেঃ। **প্রথম**—শীলু মিস্ত্রী (বোম্বাই) ১২·৬ সেঃ।

২০০ মিটার দৌড়

বিশ্ব রেকর্ড—মার্জোরি জ্যাকসন (অস্ট্রেলিয়া) ১৯৫২—২৩·৪ সেঃ।

অলিম্পিক রেকর্ড—মার্জোরি জ্যাকসন (অস্ট্রেলিয়া) ১৯৫২—২৩·৭ সেঃ।

এশিয়ান রেকর্ড—ওকামটো কিমিকো (জাপান) ১৯৫৪—২৬ সেঃ।

ভারতীয় রেকর্ড—মেরী ডি'সুজা (বোম্বাই) ১৯৫২—২৬·১ সেঃ। **প্রথম**—মেরী ডি'সুজা (বোম্বাই) ২৬·২ সেঃ।

৮০ মিটার হার্ডল

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—এস বি ডি'লা হান্ট (অস্ট্রেলিয়া), বিশ্ব—১০·৯ সেঃ। অলিম্পিক (১৯৫২)—১০·৯ সেঃ।

এশিয়ান রেকর্ড—ইয়ামটো মিচিকা (জাপান) ১৯৫৪—১১·৭ সেঃ।

পূর্বতন ভারতীয় রেকর্ড—ভায়োলেট পিটার্স (বোম্বাই) ১৯৫৪—১২·৫ সেঃ। **প্রথম**—ভায়োলেট পিটার্স (বোম্বাই) ১২·১ সেঃ (নূতন ভারতীয় রেকর্ড)।

৪×১০০ মিটার রিলে

বিশ্ব রেকর্ড—ইউ এস এস আর (টীম—তুরভো, স্কিনোভা, খির্নিকিনা ও কালাসনিকোভা) ১৯৫৩—৪৫·৬ সেঃ।

অলিম্পিক রেকর্ড—ইউ এস এ (টীম—ফ্যাগস, জোনস, মোর, হার্ডি) ১৯৫২—৪৫·৯ সেঃ।

এশিয়ান রেকর্ড—ভারত ১৯৫১—৪৯·৫ সেঃ।

ভারতীয় রেকর্ড—বোম্বাই—১৯৫৪ ৫২·২ সেঃ। **প্রথম**—বাঙলা (নীলিমা ঘোষ, রুথ আইজ্যাক, নমিতা ঘোষ ও [illegible] ক্যাচাটুর) ৫২·৩ সেঃ।

উচ্চ লম্ফ

বিশ্ব রেকর্ড—এ চুডিনা (রাশিয়া) ১৯৫৪—৫ ফিট ৮ ইঞ্চি।

অলিম্পিক রেকর্ড—ই ব্রাণ্ড (সাউথ আফ্রিকা) ১৯৫২—৫ ফিঃ ৫¾ ইঞ্চি।

এশিয়ান রেকর্ড—এম ক্রাউচ আহুভ (ইসরাইল) ১৯৫৪—৫ ফিঃ ১ ইঞ্চি।

ভারতীয় রেকর্ড—উনা লায়নস (পাঞ্জাব) ১৯৪০—৪ ফিঃ ১১¾ ইঞ্চি।

দীর্ঘ লম্ফ

বিশ্ব রেকর্ড—ওয়াই উইলিয়ামস (নিউ জিল্যাণ্ড) ১৯৫৪—২০ ফিঃ ৭½ ইঞ্চি।

অলিম্পিক রেকর্ড—ওয়াই উইলিয়ামস (নিউ জিল্যাণ্ড) ১৯৫২—২০ ফিঃ ৫¾ ইঞ্চি।

এশিয়ান রেকর্ড—সুগিমুরো কিয়োকো (জাপান) ১৯৫১—১৯ ফিঃ ৫ ইঞ্চি।

ভারতীয় রেকর্ড—সি ব্রাউন (বোম্বাই) ১৯৫৪—১৭ ফিঃ ৫ ইঞ্চি।

লৌহ গোলক নিক্ষেপ (ওঃ ১২ পাঃ)

বিশ্ব ও অলিম্পিক রেকর্ড—গ্যালিনা জিবিনা (রাশিয়া) ১৯৫৪—বিশ্ব ৫৪ ফিঃ ১½ ইঞ্চি; অলিম্পিক—১৯৫২—৫০ ফিঃ ১½ ইঞ্চি।

এশিয়ান রেকর্ড—যোসিনো টয়োকো (জাপান) ১৯৫৪—৪০ ফিঃ ৪½ ইঞ্চি।

ভারতীয় রেকর্ড—এম ডি ইয়েটস (ইউ পি) ১৯৪১—৩১ ফিঃ ১০½ ইঞ্চি। **প্রথম**—

নৈতিক দল 'সোস্যালিস্ট পার্টি' এবং ইহার নেতা মঃ গবার্ট, যিনি এতদিন ভারতভুক্তির বিরুদ্ধে প্রচারণা করিতেছিলেন, তিনি এবং তাঁহার পার্টি দুর্বার গণশক্তির নিকট নতি স্বীকার করিয়া ভারতভুক্তির স্বপক্ষে প্রচারকার্যে অবতীর্ণ হন। গণ-আন্দোলনের নিকট মঃ গবার্ট এবং তাঁহার 'সোস্যালিস্ট পার্টি'র এই পরাজয় এবং রাজনৈতিক 'ডিগবাজী লক্ষ্যনীয়। সন্ত্রস্ত ফরাসী সরকারও ভারতস্থ ফরাসী রাষ্ট্রদূত কাউণ্ট অস্ট্রো-রগ মারফৎ ভারত সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সঙ্গে পুনরায় আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করেন এবং নীতি হিসাবে এই সমস্ত উপনিবেশগুলির

শ্রীকেওয়াল সিং

ভারতভুক্তির দাবীর যথার্থতা স্বীকার করেন। কিন্তু ফরাসী সংবিধানের নজির তুলিয়া বলেন যে, এই হস্তান্তরের পূর্বে সেখানকার অধিবাসীদের মতামত গ্রহণের প্রয়োজন। তদনুসারে ফরাসী ভারতের 'মিউনিসিপাল কাউন্সিলের নির্বাচিত প্রতিনিধিরা গত ১৮ই অক্টোবর 'কিঝুরে' এক কংগ্রেসে মিলিত হন এবং ১৭০—৮ ভোটে ভারতের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ইহার পর গত ২১শে অক্টোবর ভারত এবং ফরাসী সরকারের প্রতিনিধিরা দিল্লীতে এক চুক্তিপত্রে

পণ্ডিচেরীস্থিত ভারতীয় কন্সাল অফিসের ভাইস-কন্সাল শ্রী এস জে উইলফ্রেড

স্বাক্ষর করিয়া এই অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং তদনুসারে ১লা নবেম্বর হইতে এই অঞ্চলগুলির শাসনভার আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতের হস্তে অর্পণ করা হয়। ফরাসী ভারতের মোট ভূখণ্ডের পরিমাণ ২০৩ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ ২০ হাজার। এই উপনিবেশগুলির শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মোট বাৎসরিক ব্যয়ের

শ্রী ডি এস মেথুস। পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে, ইয়ানানের নবনিযুক্ত চিফ সেক্রেটারী

পরিমাণ ছিল ৬৩ লক্ষ টাকা, ইহা[র] ভারত সরকার পূর্বতন এক সন্ধি[র] অনুসারে দিতেন ১২ লক্ষ টাকা, [ফরাসী] সরকার দিতেন ৭ লক্ষ টাকা এবং [বাকী] ৪৪ লক্ষ টাকা স্থানীয় অধিব[াসীদের] নিকট হইতে রাজস্ব হিসাবে এব[ং] আফিম, গাঁজা প্রভৃতির উপর শুল্ক হিসাবে আদায় করা হইত।

এইবার আমরা ফরাসী [ভারতের] ভূখণ্ডগুলির—চন্দননগর, পণ্[ডিচেরী,] কারিকল, ইয়ানাম এবং মাহের ই[তিহাস] আলোচনা করিব।

(১) চন্দননগর: বৃটিশ [আমলে] বাঙলাদেশের রাজনৈতিক আন্দো[লন] এবং বৈপ্লবিক কার্যকলাপের পী[ঠস্থান] চন্দননগর কলিকাতা হইতে ১৬ [মাইল] উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গা নদীর দক্ষিণ [তীরে] অবস্থিত। ১৬৭৬ খৃষ্টাব্দে ফ[রাসীরা] সর্বপ্রথম এখানে একটি 'কুটির' [স্থাপন] করে এবং ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে তদা[নীন্তন] মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবের [নিকট] হইতে এক সনদবলে ৩ই বর্গ[মাইল] পরিমিত এই স্থানের উপর কর্তৃত্ব [লাভ করে।] ফরাসী ভারতের শাসনকর্তা [ডুপ্লের] সময়েই চন্দননগরের প্রভূত সমৃদ্[ধি হয়] এবং ইহা একটি বন্দর হিসাবে স্ব[খ্যাতি] লাভ করে। ১৭৫৭ সালে [ইংরেজ] নৌ-সেনাপতি ওয়াটসন চন্দননগর অ[ধিকার] করেন, ইহার পর আরও দুইবার [চন্দন]নগর বৃটিশ অধিকারে আসে। [১৮১৫] খৃষ্টাব্দের সন্ধির শর্ত অনুসারে এই[স্থান] ফরাসীদের অর্পণ করা হয়। পণ্ডি[চেরীর] শাসনকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীনে একজন [উপ-]শাসক এখানকার শাসনকার্য পরি[চালনা] করিতেন। চন্দননগরের মোট ভূ[খণ্ডের] পরিমাণ ৩ই বর্গমাইল এবং লোক[সংখ্যা] ২৬,০০০।

(২) পণ্ডিচেরী: ফরাসী ভ[ারতের] রাজধানী হইল পণ্ডিচেরী। ইহা [একটি] উৎকৃষ্ট সামুদ্রিক বন্দর। মাদ্রাজ [হইতে] ১২২ মাইল দক্ষিণে ভারতের দক্ষিণ[-পূর্ব] উপকূলে (করমণ্ডল উপকূলে) পণ্[ডিচেরী] অবস্থিত। মাদ্রাজের 'আর্কট' [জেলা] ইহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। [১৬৭৪] খৃষ্টাব্দে ফরাসীরা 'জিঞ্জির' শাসন[কর্তার] নিকট হইতে এই ভূখণ্ড ক্রয় করে

ই জে ডেভেনপোর্ট (উড়িষ্যা) ৩০ ফিঃ ১০২ ইঞ্চি।

ডিসকাস নিক্ষেপ

বিশ্ব রেকর্ড—এন ডাম্বাজে (রাশিয়া) ১৯৫৪—১৮৭ ফিঃ ১২ ইঞ্চি।

অলিম্পিক রেকর্ড—এন রোমাস্কোভা (রাশিয়া) ১৯৫২—১৬৮ ফিঃ ৮২ ইঞ্চি।

এশিয়ান রেকর্ড—যোসিনো টয়োকো (জাপান) ১৯৫৪—১৪০ ফিঃ ৭২ ইঞ্চি।

ভারতীয় রেকর্ড—এম গিলবার্ট (বোম্বাই) ১৯৫২—৯২ ফিঃ ১০২ ইঞ্চি। **প্রথম**—মিনা টমাস (মহীশূর) ৯০ ফিঃ ৬২ ইঞ্চি।

বর্শা নিক্ষেপ

বিশ্ব রেকর্ড—এন কোনজিভা (ইউ এস এ) ১৯৫৪—১৮২ ফিট।

অলিম্পিক রেকর্ড—ডি জেটোপেকোভা (চেকোশ্লোভাকিয়া) ১৯৫২—১৬৫ ফিঃ ৭ ইঞ্চি।

এশিয়ান রেকর্ড—কুরিহারা আকিকো (জাপান) ১৯৫৪—১৪৪ ফিঃ ৬২ ইঞ্চি।

পূর্বতন ভারতীয় রেকর্ড—ই জে ডেভেন-পোর্ট (বিহার) ১৯৫৪—১০৬ ফিঃ ৭ ইঞ্চি। **প্রথম**—ই জে ডেভেনপোর্ট (উড়িষ্যা) ১১৩ ফিট (নূতন ভারতীয় রেকর্ড)।

* * *

ভারত ও পাকিস্থানের তিনটি টেস্ট খেলা অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর পেশোয়ারে চতুর্থ টেস্ট খেলাও অমীমাংসিত-ভাবে শেষ হয়েছে। চতুর্থ টেস্টে একজন মাত্র ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। ইনি হচ্ছেন ভারতের খ্যাতনামা খেলোয়াড় পলি উমরিগর। এ টেস্টে ভারতই সুবিধাজনক অবস্থায় ছিল। পাকিস্থান বেশ একটু বিপাকে পড়ে ভারতের বিরুদ্ধে নেগেটিভ বোলিং করতে আরম্ভ করে। উদ্দেশ্য রাণও সংগ্রহ করতে পারবে না সময়ও অতিবাহিত হবে। আর যদি জোর করে রাণ করতে চেষ্টা কর উইকেট হারাবে। বলা বাহুল্য ক্রিকেটের এটা বিধি নয়। কিন্তু লোক বিপাকে পড়লে করে কি? তাই পাকিস্থানও নেগেটিভ বোলিংয়ের আশ্রয় নিয়ে ম্যাচটি রক্ষা করেছে। নীচে সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড দেওয়া হইল:—

পাকিস্থান—১ম ইনিংস—১৮৮ (ওয়াকার ৪৩, সুজাউদ্দিন ৩৭, ওয়াজিত ৩৪, মকসুদ ৩১: গুপ্তে ৬৩ রাণে ৫ উইঃ, ফাদকার ১৯ রাণে ২ উইঃ)।

ভারত—১ম ইনিংস—২৪৫ (উমরিগর ১০৮, মঞ্জরেকার ৩২; খান মহম্মদ ৭৯ রাণে ৪ উইঃ)।

পাকিস্থান—২য় ইনিংস—১৮২ ইমতিয়াজ ৬৯, মকসুদ ৪৪ হানিফ ২১; মানকড় ৬৪ রাণে ৫ উইঃ, ফাদকার ৪২ রাণে ২ উইঃ)।

ভারত—২য় ইনিংস (১ উইঃ) ২৩।

(খেলা অমীমাংসিত)

দেশী সংবাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারী — ত্রিবাঙ্কুর-কোচিনে কংগ্রেস পুনরায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছে। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন বিধানসভার কংগ্রেস দলের নেতা শ্রী পি গোবিন্দ মেননের নেতৃত্বে পাঁচজন সদস্য লইয়া গঠিত এই মন্ত্রিসভার সদস্যগণ আজ আনুগত্যের ও মন্ত্রগুপ্তির শপথ গ্রহণ করিয়াছেন।

১৫ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ও অর্থমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় আজ রাজ্য বিধানসভায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ১৯৫৫—৫৬ সালের বাজেট পেশ করেন। উক্ত বাজেট হইতে দেখা যায় যে, আগামী বৎসর রাজ্য সরকারের রাজস্ব খাতে ১৭ কোটি ১২ লক্ষ ৪১ হাজার টাকা ঘাটতি দাঁড়াইবে।

গতকল্য গভীর রাত্রে হাওড়ার নন্দীবাগান বাই লেনের এক বাড়িতে আগুন লাগায় সমগ্র পরিবারের সাতজন গুরুতররূপে দগ্ধ হয় এবং হাসপাতালে ভর্তি হইবার পর এই হতভাগ্য পরিবারটির ছয়জন আজ মারা যায়। অবশিষ্ট একজনের অবস্থা খুবই সংকটজনক। শীতের হাত হইতে নিজেদের রক্ষার জন্য এই দুঃস্থ পরিবারটি ঘরে একটি উনুন রাখিয়াছিল এবং তাহা হইতেই আগুন লাগিয়া এই দুর্ঘটনা ঘটে বলিয়া অনুমান করা হইতেছে।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—ভারতে আসিয়া বসবাস করিবার জন্য পূর্ব পাকিস্থানের প্রায় ৬০ হাজার পরিবার দরখাস্ত করিয়াছে এবং ঐ দরখাস্তগুলি পূর্ব পাকিস্থানস্থ ভারতীয় কর্তৃপক্ষের বিবেচনাধীন আছে বলিয়া জানা গিয়াছে। ঐ পরিবারগুলির লোকসংখ্যা প্রায় ৩ লক্ষ।

কেন্দ্রীয় উৎপাদনমন্ত্রী শ্রী কে সি রেড্ডী বোম্বাইয়ে বলেন যে, আসামে তৈলের যে নূতন নূতন উৎসের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে তৈল-চাহিদার শতকরা ২৫ ভাগ মিটানো যাইবে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় কলিকাতা কর্পোরেশনের বিধিবদ্ধ মেয়াদ তিন বৎসর হইতে চার বৎসরে বৃদ্ধি করিয়া কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল (সংশোধন) বিল গৃহীত হয়।

কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ঢেবর উত্তর প্রদেশ হইতে আসাম যাইবার পথে আজ কলিকাতায় আগমন করিলে শিয়ালদহ ষ্টেসনে তাঁহাকে বিপুল সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ঢেবর আজ তেজপুরে আসাম রাজনৈতিক সম্মেলন উদ্বোধন প্রসঙ্গে বলেন যে, ভারতের ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রচনাকালে তাঁহারা অন্ধভাবে অন্যান্য দেশের অনুসরণ করিবেন না। পরন্তু ভারতের ঐতিহ্য অনুসারেই তাঁহারা দেশকে গঠন করিবেন।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ নয়াদিল্লীতে

প্রত্যাবর্তন করিয়া সাংবাদিকগণের নিকট বলেন, অবস্থা যদিও গুরুতর, তথাপি অদূর ভবিষ্যতে ফরমোজার ব্যাপারে যুদ্ধের ন্যায় কোন অবস্থা দেখা দিতে পারে বলিয়া আমি মনে করিনা।

গোয়া জাতীয়তাবাদী দলের কতিপয় সত্যাগ্রহী আজ শাবন্তবাদী এলাকা হইতে গোয়ায় প্রবেশ করে এবং সেখানকার অরণ্যের বৃক্ষচ্ছেদন করিয়া বন সত্যাগ্রহ আরম্ভ করে।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিমবঙ্গের ভয়াবহ বেকার সমস্যা সমাধানের উদ্দেশ্যে রাজ্য সরকারকে আর্থিক ও অন্যাবিধ সাহায্যদান, দুর্গাপুর ও কল্যাণীতে মূল শিল্প প্রতিষ্ঠা এবং কেন্দ্রীয় সরকারের চাকুরিতে উদ্বাস্তুদের অগ্রাধিকার দিবার ব্যবস্থা করিতে ভারত সরকারের নিকট সনির্বন্ধ অনুরোধ জানাইয়া কংগ্রেস পক্ষ হইতে উত্থাপিত একটি বে-সরকারী প্রস্তাব আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান-সভায় গৃহীত হইয়াছে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—মোরাঘাট চা-বাগানে পুলিশ ও শ্রমিকের মধ্যে এক সংঘর্ষের ফলে একজন শ্রমিক নিহত ও ৮ জন কনস্টেবল আহত হইয়াছে। পুলিশ উত্তেজিত শ্রমিক জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিবার জন্য গুলী চালায়।

আজ কলিকাতায় সেনেট হলে বঙ্গীয় প্রাদেশিক মেডিকাল সম্মেলনের চতুর্দশ বার্ষিক অধিবেশন আরম্ভ হয়। ডাঃ এ কে বসু সম্মেলনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন।

নয়াদিল্লীতে সরকারীভাবে জানা গিয়াছে যে, ২৬শে ফেব্রুয়ারী করাচীতে ভারত-পাকিস্থান কার্য-পরিচালন কমিটিতে ভারত ও পাকিস্থানের ২৩৬টি অমীমাংসিত বিরোধের আলোচনা হইবে।

২০শে ফেব্রুয়ারী—দেশের স্বাধীনতার জন্য উদ্বাস্তুগণ যে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ঢেবর অদ্য ধুবড়ীতে এক বৃহৎ জনসমাবেশে বক্তৃতাকালে ভাবাবেগকণ্ঠে তাহা উল্লেখ করেন।

নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস পার্লামেণ্টারী পার্টির সাধারণ সভায় বক্তৃতাকালে প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বলেন, ফরমোজার অচল অবস্থা বিশ্বের পক্ষে গুরুতর এবং শেষ পর্যন্ত কি ঘটিবে, কেহই তাহা বলিতে পারে না।

বিদেশী সংবাদ

১৪ই ফেব্রুয়ারী—পশ্চিম জার্মানীর নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত আণবিক বিজ্ঞানের বিশিষ্ট প্রফেসার অটো হান বেতার বক্তৃতাকালে বলেন যে, মানবজাতি নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে দ্রুত আগাইয়া চলিয়াছে। তিনি বলেন যে, একটি মাত্র আধুনিক হাইড্রোজেন বোমা বার্লিন, লণ্ডন কিংবা নিউ ইয়র্ক শহর ধ্বংস করিতে পারে।

মৌলানা আক্রাম খাঁ গতকল্য পূর্ব পাকিস্থান প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী—মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব মিঃ চার্লস উইলসন এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, আণবিক অস্ত্রের ক্ষেত্রে আমেরিকা রাশিয়াকে ছাড়াইয়া গিয়াছে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

মার্কিন আণবিক শক্তি কমিশনের সভাপতি মিঃ লুই ষ্ট্রস তাঁহার রিপোর্টে বলেন যে, গত মার্চ মাসে প্রশান্ত মহাসাগরে যে হাইড্রোজেন বোমার বিস্ফোরণ ঘটানো হয়, উহার ফলে প্রায় ৭৫০০ বর্গ মাইল স্থান তেজষ্ক্রিয়ার দ্বারা সংক্রামিত হইয়া উঠে।

১৭ই ফেব্রুয়ারী—বৃটেন হাইড্রোজেন বোমা উৎপাদনের কাজ আরম্ভ করিবে বলিয়া স্থির করিয়াছে।

মিশরের প্রধান মন্ত্রী লেঃ কর্নেল নাসেরের সহিত আলোচনান্তে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ কায়রো হইতে বিমান যোগে নয়াদিল্লী যাত্রা করেন।

১৮ই ফেব্রুয়ারী—নেপালাধীশ ত্রিভুবন চিকিৎসার জন্য ইউরোপে থাকায় যুবরাজ মহেন্দ্র বিক্রম আজ সকালে নেপালের রিজেণ্টের পদ ও কার্যভার গ্রহণ করিয়াছেন।

চীনের মূল ভূখণ্ডের নিকটবর্তী সমুদ্রে এক প্রচণ্ড সংগ্রামে জাতীয়তাবাদী চীনের বিমান ও নৌবাহিনী কম্যুনিস্টদের আটটি সৈন্যাবতরণকারী জাহাজ ও পাঁচটি গানবোট নিমজ্জিত করিয়াছে বলিয়া দাবী করিয়াছে।

রাশিয়া অদ্য রাত্রিতে অস্ত্রোৎপাদন হ্রাস এবং আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার ব্যবহার নিষিদ্ধ করার জন্য এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করিতে রাষ্ট্রপুঞ্জকে অনুরোধ করিয়াছে।

১৯শে ফেব্রুয়ারী—বেলুচিস্থানের রাজধানী কোয়েটা শহরে অদ্য কয়েকবার ভূকম্পন অনুভূত হয়। এই ভূকম্পনের ফলে ১৪ জন নিহত ও ৩০ জন আহত হইয়াছে।

২০শে ফেব্রুয়ারী—জাতীয়তাবাদী চীন ঘোষণা করিয়াছে যে, ফরমোজার সর্বোত্তর ঘাটি নানচিশানের ১৩ মাইল দূরে কম্যুনিস্ট সেনাবাহিনী চারিটি ছোট ছোট দ্বীপ দখল করিয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—।৵ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

কংগ্রেসের আদর্শ

কংগ্রেস-সভাপতি শ্রীযুত ধেবরের আসাম পরিদর্শন সম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীযুত ধেবর আসামের সর্বত্র জনসাধারণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হইয়াছেন এবং বহু জনসভায় তিনি বক্তৃতা করিয়াছেন। শ্রীযুত ধেবর গান্ধীজীর আদর্শে নিষ্ঠাবান্ পুরুষ। তাঁহার ব্যক্তিগত জীবন তিনি সেই আদর্শে পরিচালিত করিয়া থাকেন। আসামের বিভিন্ন স্থানের জনসভায় তিনি তাঁহার বক্তৃতায় আরাম-বিলাসের প্রতিবেশ ছাড়িয়া কংগ্রেসসেবীদিগকে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়াছেন। তাঁহার নির্দেশ এই যে আরামকে হারাম মনে করিতে হইবে এবং সকলকে গঠনমূলক কাজ সম্পন্ন করিবার উদ্দেশ্যে কঠোর শ্রমে প্রবৃত্ত হইতে হইবে। কংগ্রেস-সভাপতির মতে শ্রেণীবিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠাই কংগ্রেসের লক্ষ্য, কিন্তু শ্রেণী-সংগ্রামের পথে তাঁহারা এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করিতে চাহেন না। কংগ্রেস-সভাপতি কংগ্রেসের লক্ষ্য সমাজতান্ত্রিক আদর্শ পরিস্ফুট করিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছেন, হরিজনদের সন্তান-সন্ততিরা যেদিন রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্র প্রসাদ অথবা পণ্ডিত নেহরুর আসনে সমাসীন হইতে সমর্থ হইবে, ভারতের স্বাধীনতা সেইদিন সার্থক হইবে এবং আমরা সেদিন লাভ করিব প্রকৃত স্বরাজ। ফলত কংগ্রেস বহুদিন হইতেই সাম্যের এই আদর্শকে নীতি স্বরূপে গ্রহণ করিয়াছে। আরাম-বিলাসের জীবন পরিত্যজ্য এবং সেবা ও ত্যাগের আদর্শে কঠোর শ্রমের জীবন বরণ করিয়া লওয়ার নৈতিক মহত্ত্বের কথাও আমরা নূতন করিয়া শুনিতেছি না। কিন্তু এইসব সত্ত্বেও আমাদের রাজনীতিক সাধনায় এবং সমাজ-জীবনে কায়িক শ্রমের মর্যাদা বিশেষ বৃদ্ধি পাইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বাস্তবিক পক্ষে শাসন-বিভাগ এবং সমাজে আরাম-বিলাসের আকর্ষণ সমানভাবেই রহিয়াছে এবং নেতাদের মুখে শ্রমের এই ধরনের আন্তরিকতাবিহীন ফাঁকা কথার মহাত্ম্য কীর্তন শুনিয়া কঠোর শ্রমে যাহাদের জীবন যাপন করিতে হয়, তাহারা প্রকৃত সান্ত্বনা পাইতেছে না। আর্থিক বৈষম্যই ইহার মূল কারণ। বস্তুত রাজনীতিক্ষেত্রে এবং সমাজ-জীবনে যাহারা উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত তাঁহারা আর্থিক যে সব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতেছেন, শ্রমিকদের ভাগ্যে তাহা জুটিতেছে না। প্রত্যুত নেতৃবর্গের ব্যাখ্যাত মাহাত্ম্যপূর্ণ শ্রমের পথে জীবিকা অর্জনকারীদিগকে সমাজের নিম্নস্তরে পড়িয়া থাকিতে হইতেছে এবং আরাম-বিলাসে অভ্যস্ত আভিজাত্যবর্গের দ্বারা তাহারা ক্লিষ্ট ও পিষ্ট হইতেছে। বৈদেশিক আমলাতান্ত্রিক শাসনের অবসান ঘটা সত্ত্বেও সামাজিক এবং শাসন-বিভাগীয় প্রতিবেশে সাধারণের জীবনযাত্রার মধ্যে এই বৈষম্য আজও দূর হয় নাই। ফলত আর্থিক এই বৈষম্য যতদিন বিদূরিত না হইবে ততদিন পর্যন্ত নেতাদের মুখে শ্রমের নৈতিক মর্যাদামূলক এই সব উক্তি এবং বিবৃতি জনসাধারণের কাছে কোনই গুরুত্ব লাভ করিবে না এবং আর্থিক বৈষম্যজনক অসন্তোষের ভাব ক্লিষ্ট এবং পীড়িত জনসমাজে বিক্ষোভের কারণও সৃষ্টি করিবে।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

খ্যাতনামা কথা-সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশংকর রায়ের সাহিত্য-বিষয়ক মৌলিক রচনা 'সাহিত্যে সংকট' আগামী সংখ্যা হইতে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

—সম্পাদকঃ দেশ

ডাঃ হেলেন কেলার

ডাঃ হেলেন কেলার বর্তমানে ভারত ভ্রমণে ব্যাপৃত আছেন। তাঁহার খ্যাতি জগতের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। আমরা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষ হইতে এই মনস্বিনী মহিলাকে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। ডাঃ হেলেন কেলারের বয়ঃক্রম যখন ১৯ মাস মাত্র সেই সময় হইতে তিনি দৃষ্টি এবং শ্রুতিশক্তি হইতে বঞ্চিত হন। বাক্‌শক্তি হইতেও তিনি বঞ্চিত হইয়াছিলেন। ২৫ বৎসর চেষ্টার ফলে তিনি এই শক্তি পুনরায় লাভ করেন। দৃষ্টি এবং শ্রুতিশক্তি হইতে

বঞ্চিত থাকিয়াও ডাঃ হেলেন বুদ্ধিবৃত্তির প্রাখর্যের প্রভাবে অসামান্য শক্তির অধিকারিণী হইয়াছেন। মননের মহিমায় তাঁহার অনুভূতি—উদার আধ্যাত্মিক সংযোগগত প্রত্যক্ষতার বল তাঁহার অন্তরে জাগাইয়া তুলিয়াছে। ফলত মনের মূল তাঁহার উজ্জ্বল হওয়াতে তিনি অন্তরে ইন্দ্রিয়গত জ্ঞানের মৌলিক অখণ্ডতা উপলব্ধি করিয়াছেন। ডাঃ কেলারের ভারত পরিভ্রমণে এদেশের অবস্থার প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইবে, আশা করা যায়। ভারতে মূক, অন্ধ, বধির ইহাদের সংখ্যা সামান্য নয়। কিন্তু তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা এবং স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের উপযোগী বিশেষ কোন ব্যবস্থাই এখানে নাই। এই পশ্চিমবঙ্গে এই সম্পর্কে দুই একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান আছে এবং সে কয়েকটিও যথাযোগ্যভাবে পরিচালিত হয় না। অথচ এই সব দুর্গত নরনারীদের প্রতি কর্তব্য রাষ্ট্রের সম্যক্‌ভাবেই রহিয়াছে। মানবতার দিক হইতেও ইহাদের সম্বন্ধে সচেতন হওয়া প্রত্যেক দেশবাসীরই উচিত। ডাঃ হেলেন কেলারের ন্যায় শক্তি এবং মনীষা লাভ করা অবশ্য সকলের পক্ষে সম্ভব নয়। কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা থাকিলে এই শ্রেণীর বিকলেন্দ্রিয় নরনারীরাও যে অবস্থার প্রতিবন্ধকতা অনেকটা অতিক্রম করিতে পারেন, এ সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। মানবতার এই দাবীর দিকে আজও আমাদের রাষ্ট্র এবং সমাজের দৃষ্টি সম্যক্ আকৃষ্ট হইতেছে না, ইহা অত্যন্ত লজ্জার কথা এবং দুঃখের বিষয়।

পুস্তকের বিক্রয়কর

বিক্রয়কর সম্পর্কে নানাদিক হইতেই অভিযোগের কারণ আছে। কারণ এই কর ক্রেতাদিগকে দিতে হয়। সুতরাং তাহাদের উপরই গিয়া চাপ পড়ে। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সমাজের বর্তমান আর্থিক দুর্গতির মধ্যে এই কর তাহাদের ক্লেশ বৃদ্ধি করিতেছে, একথা নিঃসন্দেহেই বলা চলে। এই রাজ্যে বিক্রয়কর হইতে পুস্তকও রেহাই পায় নাই। পুস্তকের উপর, বিশেষ করিয়া স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকগুলি বিক্রয়করের আওতা হইতে মুক্ত হউক, জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই দাবী বহুদিন হইতেই করা হইতেছে। ফলত যে সকল দেশে বিক্রয়কর বলবৎ আছে, সেই সকল দেশেও পুস্তকের উপর বিক্রয়কর ধার্য করা হয় না এবং রাষ্ট্রনীতির নিয়ামকগণ শিক্ষার প্রসারের গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াই এক্ষেত্রে বিবেচনা বুদ্ধির পরিচয় দিয়া থাকেন। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণ করিতেছেন অথচ স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকের বিক্রয়কর তাঁহারা বলবৎ রাখিতেছেন। সরকারী অভিপ্রায় ও কর্মনীতির মধ্যে এক্ষেত্রে সামঞ্জস্য কোথায়, এ প্রশ্ন স্বভাবতই উঠে। স্কুল কলেজের পাঠ্য পুস্তকের উপর হইতে বিক্রয় কর অবিলম্বে রহিত করা একান্তই উচিত; শুধু তাহাও নয়, সাধারণ সাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক পুস্তক হইতেও এই কর তুলিয়া দেওয়া দরকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিষয়টির গুরুত্ব সম্বন্ধে বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া পুস্তকের উপর ধার্য বিক্রয়কর অবিলম্বে প্রত্যাহার করিবেন, আমরা ইহাই আশা করি।

নেহরু-আলী বৈঠক

আগামী ২৮শে মার্চ দিল্লীতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলীর আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। কাশ্মীর সমস্যাই এই আলোচনার প্রধান বিষয় হইবে শোনা যায়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী সেদিন আমাদিগকে এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, বর্তমানে ভারত-পাকিস্থান বিরোধ মীমাংসার অনুকূল প্রতিবেশ সৃষ্টি হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে কাশ্মীরের পরিস্থিতি বর্তমানে যে আকার ধারণ করিয়াছে তাহাতে ভারতের পক্ষে নূতন করিয়া এ সম্বন্ধে কিছু বলিবার আছে আমাদের ইহা মনে হয় না। কাশ্মীরের জনসাধারণের দাবীই ভারতের দাবী এবং ভারতের পক্ষ হইতে তাহার অন্যথা আচরণ করিবার উপায় নাই। কাশ্মীরের জনসাধারণ তথাকার ব্যবস্থা পরিষদের ভিতর দিয়া তাহাদের দাবী সুস্পষ্টভাবেই ব্যক্ত করিয়াছে। পাকিস্থান সেই দাবী এখন সরলভাবে স্বীকার করিয়া লইলেই সব গোল চুকিয়া যায়। সে উদ্দেশ্য এই আলোচনায় কতটা সিদ্ধ হইবে, জানি না। আমরা এ সম্বন্ধে শুধু আশাই পোষণ করিতে পারি। কিন্তু কাশ্মীরের প্রশ্নই একমাত্র প্রশ্ন নয়। এই সম্পর্কে পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু সমস্যার কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তু আগমন অদ্যাপি বন্ধ হয় নাই। সম্প্রতি পূর্ববঙ্গের তিন লক্ষ নরনারী উদ্বাস্তু হইয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিয়াছেন। এইভাবে উদ্বাস্তু সমাগমে ভারতের উপর, বিশেষভাবে নানা সমস্যায় বিপর্যস্ত পশ্চিমবঙ্গের উপর ক্রমাগত চাপ পড়িতেছে; ইহার জন্য দায়ী কে? পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগ পাকিস্থান সরকারের অব্যবস্থার ফলেই ঘটিতেছে, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু আর কতকাল ধরিয়া এই খেলা চলিবে? এই বাস্তুত্যাগের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য পাকিস্থান সরকারকে অসঙ্কোচে আহ্বান করিবার সময় আসিয়াছে। আজ দৃঢ়তার সঙ্গে বলিতে হইবে যে, পূর্ববঙ্গ হইতে যাঁহারা চলিয়া আসিয়াছেন বা আসিবেন, তাঁহাদের পুনর্বসতির জন্য প্রয়োজনীয় ভূমি পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন পূর্ববঙ্গের এলাকা হইতে ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভারত পাকিস্থানের সঙ্গে সদ্ভাব এবং সৌহার্দ্যই সর্বদা কামনা করে, কিন্তু পাকিস্থান সরকারের শাসন ব্যবস্থা ভারতকে ক্রমাগত বিপন্ন অবস্থার মধ্যেই লইয়া চলিয়াছে। উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সদ্ভাব স্থায়ী করিতে হইলে, ইহার প্রতিকার সাধন করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

গত সপ্তাহে ব্যাংককে SEADO'র প্রথম কাউন্সিল বৈঠক হয়ে গেল। ম্যানিলা চুক্তির স্বাক্ষরকারী আটটি দেশের পররাষ্ট্রসচিবই উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে সামরিক উপদেষ্টাদেরও যথোপযুক্ত সমাগম হয়েছিল। বৃটেনের পক্ষে মিঃ ইডেনের সঙ্গে চীফ অব দি ইম্পিরিয়াল জেনারেল স্টাফ ফিল্ড-মার্শাল হার্ডিংও উপস্থিত ছিলেন। এঁরা অবশ্য ব্যাংককের বৈঠক সেরে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং সুদূর প্রাচ্যস্থিত বৃটিশ কর্মচারীদের বাৎসরিক আলোচনা সভায় উপস্থিত থাকার জন্য সিঙ্গাপুরে আসেন। ফিল্ড-মার্শাল হার্ডিং মালয়ে কম্যুনিস্ট গেরিলাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কী রকম চলছে তাও পরিদর্শন করবেন। মিঃ ইডেনের আগামীকাল (বুধবার) স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পথে দিল্লীতে পৌঁছবার কথা। দিল্লীতে মিঃ ইডেন পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে কথাবার্তা বলবেন। SEADO কনফারেন্সের কথা এবং মিঃ ডালেসের সঙ্গে ফরমোজা সমস্যা সম্পর্কে নূতন কোনো কথা হয়ে থাকলে তাও মিঃ ইডেন পণ্ডিত নেহরুকে হয়ত জানাবেন। ইতিমধ্যে মিঃ ডালেস ব্যাংকক থেকে রেঙ্গুনে এসে বর্মার প্রধানমন্ত্রী ইউ নু'র সঙ্গে দেখা করে ইন্দোচীনে লাওস্, ক্যাম্বোডিয়া ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম ঘুরে ম্যানিলায় যাচ্ছেন। সেখানে সুদূর প্রাচ্যস্থিত মার্কিন কূটনৈতিক কর্মচারীদের একটা বৈঠক আছে।

ব্যাংককের কনফারেন্সে ঠিক হয়েছে যে, ব্যাংককেই SEADO'র প্রধান দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হবে। আগামী এপ্রিলে SEADO'র সামরিক উপদেষ্টারা ম্যানিলায় মিলিত হয়ে সলাপরামর্শ করবেন, তারপর তাঁরা ব্যাংককে মিলিত হবেন। অতএব SEADO'র উদ্দেশ্য সাধনের জন্য কী ধরনের সামরিক ব্যবস্থা হবে সেটা ক্রমশ প্রকাশ্য। SEADO'তে বর্তমানে মাত্র তিনটি এশিয় দেশ যোগ দিয়েছে—পাকিস্তান, থাইল্যাণ্ড ও ফিলিপিনস। বাকী পাঁচটি হচ্ছে—আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড। কিন্তু এশিয়ার বাইরের দেশগুলিই হচ্ছে SEADO'র আসল খুঁটি, অবশ্য তার মধ্যে সর্বপ্রধান হচ্ছে আমেরিকা এবং তারপর বৃটেন। SEADO'র নামে কোনো আলাদা সৈন্যবাহিনী খাড়া করা হবে বলে মনে হয় না। তবে প্রয়োজনকালে SEADO'র অঞ্চলে যাতে একসঙ্গে কাজ চলতে পারে তার জন্য নিশ্চয়ই সামরিক সহযোগিতার ব্যবস্থা হবে। থাইল্যাণ্ড, ফিলিপিনস ও প্যাকিস্তানে তো মার্কিন সামরিক উপদেষ্টার দল এখনই রয়েছে। মালয়ে বৃটিশ ঘাটিকে আরো জোরালো করার ব্যবস্থা হচ্ছে। নিউজিল্যাণ্ড ও অস্ট্রেলিয়া মালয়ে কিছুসংখ্যক ভূ-সৈন্য এনে রাখবে বলে কথা হচ্ছে। মিঃ ডালেস ব্যাংককে বলেছেন যে, গত মহাযুদ্ধের সময়ে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে আমেরিকার নৌ শক্তির সংহতি যখন সব-চেয়ে বেশি হয়েছিল—এখন নাকি তার চেয়েও বেশি। মিঃ ডালেস আশ্বাস দিয়েছেন যে, কম্যুনিস্ট আক্রমণ হলে এই শক্তি তৎক্ষণাৎ তার বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হবে। কম্যুনিস্টদের অন্তর্ভেদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধেও SEADO তৎপর হবে বলে ব্যাংককে স্থির হয়েছে অর্থাৎ SEADO অঞ্চলের কোনো দেশে যদি কম্যুনিস্টরা ভিতর থেকে গভর্নমেণ্ট দখল করার চেষ্টা করে তবে তাও ব্যাহত করা SEADO'র কাজ হবে। এই সম্পর্কে লাওস, ক্যাম্বোডিয়া ও বিশেষ করে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম নিয়ে গুরুতর আন্তর্জাতিক বিতর্ক উপস্থিত হবার সম্ভাবনা রয়েছে। ইন্দোচীনের যুদ্ধ-বিরতি সম্পর্কিত জেনেভা চুক্তি অনুসারে ১৯৫৬ সালে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের একীকরণের উদ্দেশ্যে সাধারণ নির্বাচন হওয়ার কথা। কিন্তু SEADO কোনরকমেই দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিস্ট কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হতে দিতে চায় না।

এদিকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের যেরকম আভ্যন্তর অবস্থা তাতে নির্বাচন হলে বর্তমান গভর্নমেণ্টের টিকে থাকা অত্যন্ত অনিশ্চিত। আমেরিকা অবশ্য টাকাকড়ি, মালপত্তর ঢেলে দিচ্ছে কিন্তু তাতে শেষ-পর্যন্ত অবস্থার কতটা উন্নতি হয় বলা যায় না। অথচ ভিয়েৎমিনকে আর দক্ষিণে এগুতে দিলেও সর্বনাশ। জেনেভা চুক্তির পরেই মিঃ ডালেস যে-সব উক্তি করেন তা থেকেই বুঝা গিয়েছিল যে, দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে কিছুতেই কম্যুনিস্টদের হাতে ছেড়ে দেয়া হবে না। অন্যদিকে যুদ্ধ করে উত্তর ভিয়েৎনামকে কম্যুনিস্ট-দের হাত থেকে ছিনিয়ে আনার প্রশ্নও নেই। সুতরাং জেনেভা চুক্তির অব্যবহিত পরেই আমরা এই আশংকা প্রকাশ করে-ছিলাম যে, ভিয়েৎনামের যে ভাগ হোল সেই ভাগ অনির্দিষ্টকালের জন্য থাকবে, ১৯৫৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের দ্বারা সমগ্র ভিয়েৎনামে এক গভর্নমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হবার কোন সম্ভাবনা নেই। অর্থাৎ কোরিয়ায় যা অবস্থা হয়েছে, ভিয়েৎ-নামেরও তাই হবে। কিন্তু দক্ষিণ কোরিয়ার আভ্যন্তর অবস্থার মতো যদি SEADO'র আশ্রিত দেশগুলির অবস্থা থাকে তবে কম্যুনিজমের হাত থেকে বেঁচেই বা ঐসব দেশের মানুষের কী লাভ হবে? দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার হয়েছে উভয়সংকট।

* * *

জাপানের সাধারণ নির্বাচনে কোনো দলই সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করতে পারে নি। প্রধানমন্ত্রী হাতোয়ামার ডেমোক্রেটিক পার্টিই সবচেয়ে বেশি আসন লাভ করেছে —১৮৬টি কিন্তু মোট আসনের সংখ্যা হচ্ছে ৪৬৭। মিঃ ইয়োশিদার সঙ্গে ঝগড়ার ফলেই লিবারেল পার্টি ভেঙ্গে মিঃ হাতোয়ামার নেতৃত্বে ডেমোক্রেটিক পার্টি তৈরী হয় এবং মিঃ ইয়োশিদা গদিচ্যুত হন। অনতিবিলম্বে সাধারণ নির্বাচন করতে হবে এই শর্তে সোস্যালিস্টদের সমর্থনে মিঃ হাতোয়ামা মিঃ ইয়োশিদার জায়গায় প্রধানমন্ত্রী হন। সাধারণ নির্বাচনে লিবারেল পার্টি ১১১টি আসন পেয়েছে। সোস্যালিস্টরা দুভাগে বিভক্ত—বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী। বামপন্থীরা ৮৯ এবং দক্ষিণপন্থীরা ৬৭টি আসন—অর্থাৎ সোস্যালিস্টরা মোট ১৫৬ আসন পেয়েছে। সোস্যালিস্টরা বলেছিল যে, নির্বাচনের পরে তাদের দুই দল এক হয়ে যাবে। নির্বাচনের পূর্বে যদি তারা এক হতে পারত তাহলে নির্বাচনের ফল তাদের পক্ষে আরো ভালো হোত বলে সকলের ধারণা। কম্যু-নিস্টরা মাত্র দুটি আসন পেয়েছে, স্বতন্ত্র প্রার্থী এবং আর সব দল মিলে পেয়েছে ১২টি আসন।

সবচেয়ে বড়ো দলের নেতা হিসাবে মিঃ হাতোয়ামাই প্রধানমন্ত্রী থাকবেন বলে ধরা যায় কিন্তু পার্লামেণ্টের যে-অবস্থা তাতে নীতির দিক দিয়ে জোড়াতালি দিয়ে তাঁকে চলতে হবে। ডেমোক্রেটিক ও লিবারেল উভয় দলের নেতারাই জাপানের পুনরস্ত্রীকরণের পক্ষ-পাতী কিন্তু বর্তমান অবস্থায় সোস্যা-লিস্টরা তো বটেই, সাধারণ লোক পুনরস্ত্রীকরণ চায় না। সেজন্য এবিষয়ে মিঃ হাতোয়ামাকে ধীরে চলতে হবে। মিঃ ইয়োশিদা একান্তভাবে মার্কিন-ঘেঁষা ছিলেন। মিঃ হাতোয়ামা আমেরিকাকে না ছেড়ে চীন ও রাশিয়ার সঙ্গে লেনদেনের সম্পর্ক স্থাপিত করতে উৎসুক। বিশেষ করে চীনের সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের জন্য তিনি অত্যন্ত আগ্রহশীল, কারণ জাপানী মালের বিদেশী বাজার যদি না বাড়ানো যায় তবে জাপানের আর্থিক সংকট মিটবে না।

আমেরিকা সেইজন্য চিন্তিত। জাপান যদি কম্যুনিস্ট ব্লকের সঙ্গে কাজকারবার আরম্ভ করে তবে প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে বর্তমানে মার্কিন-নীতি ক্রমশ বিপ[illegible] হবে। ব্যাংককে মিঃ ডালেস জাপানে[illegible] সম্বন্ধে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন। কি[illegible] জাপানকে যদি কম্যুনিস্ট ব্লকের কা[illegible] থেকে দূরে রাখতে হয় তবে তা[illegible] অকম্যুনিস্ট বিদেশী বাজারের আ[illegible] অনেক বেশি অংশ দিতে হবে। তা দি[illegible] গেলে হয় আমেরিকা অথবা বৃটেনকে কিছু জায়গা ছাড়তে হয়। সেইখানেও হয়ে[illegible] মুশকিল। আমেরিকা বলছে দক্ষিণ-পূ[illegible] এশিয়ার বাজারের ভাগ জাপানকে আ[illegible] দেয়া উচিত। তাতে বৃটেনের ক্ষতি বৃটেন বলে, দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকা[illegible] জাপানী মালকে মার্কিন কিছু জায়[illegible] ছেড়ে দিলেই জাপানের সংকট অনেক[illegible] নিবারিত হয়। এ মামলার ফয়সালা সহ[illegible] নয়। তবে জাপানকে আর্থিক সাহায্য [illegible] দিয়ে মার্কিন সরকারের গত্যন্তর নেই অবশ্য সে সাহায্যের দ্বারাই জাপানে[illegible] সমস্যা মিটবে তাও আশা করা যায় না।

১।৩।৫৫

আত্মত্যাগ নয়, আত্মরক্ষাই ধর্ম

বার্ট্রাণ্ড রাসেল

হাইড্রোজেন বোমা আবিষ্কারের পর থেকে কম্যুনিস্ট এবং কম্যুনিস্ট-বিরোধী ব্লকের বিবাদ শুধু যুদ্ধ-ব্যবসায়ীকেই নয়, সমস্ত বিশ্বের মানুষকেই গভীর শঙ্কা আর উদ্বেগের মধ্যে ফেলেছে।

প্রতিটি হাইড্রোজেন বোমা তেজষ্ক্রিয় মেঘের সৃষ্টি করে। বাতাসের গতির স্রোতে তারা ভেসে চলে। তারপর ভস্ম অথবা বৃষ্টির রূপ ধরে এই সাক্ষাৎ মৃত্যু মাটিতে নেমে আসে।

এই বোমা যদি বেশী করে বিস্ফুরিত হতে থাকে, তা হলে, যে সব বিজ্ঞানীর মতামতকে আমরা শ্রদ্ধা করি, মূল্য দিই, তাঁরা আশংকা করছেন যে, সমগ্র মানব জাতিই হয়ত ধ্বংস হয়ে যাবে। কারণ তেজষ্ক্রিয় মেঘ সীমান্তের বাধা গ্রাহ্য করবে না।

প্রত্যেক ব্লকই যত পারছেন, যত তাড়াতাড়ি পারছেন, এই সব বোমা তৈরীর কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন। আমেরিকানরা, রাশিয়ানরা, চীনারা সদম্ভে ঘোষণা করছেন, এই বোমা দিয়েই তাঁরা যুদ্ধ জয় করবেন।

কিন্তু এই দম্ভ অর্থহীন। হাই-জন বোমা ফাটিয়ে কোনও জয়ই ব নয়। এই জাতীয় যুদ্ধ থেকে ও সরকার বা কোনও জাতিই ঈপ্সিত লাভ করবেন না। যারা এই বিষয়ে জ্ঞ সেই সব বিজ্ঞানী, যুদ্ধবিদ্ া জানেন। শুধু জনসাধারণ একথা া না আর সরকারগুলো জেনেও একথা ত চায় না।

বিভিন্ন ব্লকের সরকারকে আবার এক নর অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। ও এক পক্ষ হয়ত হাইড্রোজেন বোমা-ধর অবতারণা করবে না বলে ঘোষণা ন, কিন্তু অপর পক্ষ কোনও উচ্চবাচ্য ন না। তারপর চলল এ পক্ষের সঙ্গে পক্ষের কূটনৈতিক প্যাঁচ কষাকষি। যদি এই মনকষাকষি দূর করতেই হয় তবে তার সূত্রপাত ঐ দুই ব্লকের কোনও এক-পক্ষের দ্বারা সম্ভব নয়। এ কাজ আরম্ভ করতে পারে এক বা একাধিক নিরপেক্ষ দেশ। যে দেশ আত্মমর্যাদার দোহাই তুলবে না, যে দেশ শত্রুর মধ্যে বিভীষিকা সৃষ্টি

করতে চায় না, তেমন দেশই পারে এ কাজের উদ্বোধন করতে।

কোনও এক নিরপেক্ষ সরকারের উদ্যোগে যদি এক রিপোর্ট তৈরী করা যায় আর সেই রিপোর্টে হাইড্রোজেন বোমা-যুদ্ধের অসারতা যদি দুই ব্লকের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া যায়, তবেই এ অচলাবস্থার অবসান ঘটতে পারে

আমার মনে হয়, এ কাজ করবার পক্ষে উপযুক্ত অবস্থা একমাত্র ভারতেরই আছে। ভারত একদিকে যেমন কম্যুনিস্ট চীনের সঙ্গে সৌহার্দ্যসূত্রে আবদ্ধ অন্যদিকে আবার কমনওয়েলথের সদস্য হওয়ায় পশ্চিমী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যেও তার খাতির যথেষ্ট। আমি দেখতে চাই যে, ভারত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী আর যুদ্ধবিদ্‌দের নিয়ে একটা ছোট কমিশন বসিয়েছেন, সেই কমিশন বিশ্বের অন্যান্য বিজ্ঞানী ও যুদ্ধবিদ্‌দের মতামত সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে এমন এক রিপোর্ট তৈরী করেছেন, যাতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে হাইড্রোজেন বোমা-যুদ্ধ হবে নিতান্ত উন্মাদের কাজ।

আমার ইচ্ছা এই যে, ভারত সরকার এই রিপোর্ট পূব আর পশ্চিম এই দুই দিকের সরকারগুলোর কাছে পাঠিয়ে এর উপর মতামত প্রকাশ করতে তাঁদের কাছে অনুরোধ জানাবেন। আমি আশা করব, এই পথেই দুটো ব্লককে বোঝান যাবে যে যুদ্ধ করে কারও উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না। যদি একবার একথা বোঝান যায়, তখন পরস্পরের মধ্যে আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে বিবাদের কারণগুলো দূর করবার প্রচেষ্টা সম্ভব হবে।

আমি যে কমিশনের কথা বলেছি, তা পারদর্শী হওয়া উচিত, আর হওয়া উচিত নৈকষ্য নিরপেক্ষ। তা, ভাবে বা ইঙ্গিতেও যেন কারোও প্রতি বিন্দুমাত্র পক্ষপাত না দেখায়। কোনও ব্লকের পক্ষে জয়ী হওয়া সম্ভব এমন আশাও যেন এই কমিশন কারো মনে সঞ্চার না করে।

আমি বলেছি, কমিশনের সব সদস্যই ভারতীয় হবে অথবা এমন জাতি থেকে সদস্য নিতে হবে যার নিরপেক্ষতা সম্পর্কে কেউ সন্দিহান হবে না। না হলে আবার নানারকম দোষারোপ শুরু হবে। আমি শুনেছি, আমার প্রস্তাবে আপত্তি উঠেছে। আপত্তি উঠেছে এই বলে যে, ভারতে নাকি এই বিষয়ে অভিজ্ঞ লোক পাওয়া যাবে না। এর মধ্যে সত্যতা কোথায়, আমি তা খুঁজে পাইনি। আমার মনে হয়, কমিশনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারনার ফলেই এসব কথা বলা হচ্ছে। এই কমিশনের কাজ হবে অনেকটা বিচারকের মত। এমন সব সদস্য এই কমিশনে থাকবেন যাদের কাজ হবে সাক্ষীদের কাছ থেকে সত্যটুকু বের করে নেওয়া। আসল সাক্ষীকে জেরা করা আর তাদের জবাবের মধ্য থেকে যাচাই করে সত্য সংগ্রহ করার মত জ্ঞান থাকলেই চলবে। এর জন্যে কমিশনের সদস্যদের কোনও বিশেষ

বিষয়ে বিরাট পণ্ডিত হবার প্রয়োজন নেই।

আবার অন্য ধরনের আপত্তিও শ্‌নেছি। বলা হয়েছে, যেহেতু বিষয়টি প্রত্যেক সরকারেরই গোপনীয় অতএব এ সম্পর্কে কমিশন প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করতে পারবে না। এর মধ্যে অবশ্য কিছুটা সত্য আছে তবে তা এমন নয় যে তাকে গুরুত্ব দিতে হবে। ঘাতক আমাদের ফাঁসিতে ঝোলাবে না শূলে চড়াবে সে খবরটা দেয়নি বলে আমরা চুপচাপ বসে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করতে পারিনে। হাইড্রোজেন বোমা সম্পর্কে এত প্রচুর তথ্য আছে যে গোপন খবর বের না করেও রিপোর্ট তৈরী করা যায়।

এমনও অনেক লোক আছেন, যাঁরা ভাবেন, সংশিলষ্ট ক্ষমতাশালী পক্ষগুলো যদি চুক্তি করে যে হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহার করব না, তাহলেই বোধ হয় বিষয়টার নিষ্পত্তি হয়ে যায়। এটা একেবারে নিছক কল্পনা। যত চুক্তিই স্বাক্ষরিত হোক না কেন, যে মুহূর্তে যুদ্ধ বাধবে, সেই মুহূর্তেই সে সব চুক্তি নস্যাৎ করে বিবদমান শক্তিগুলো প্রাণপণে হাইড্রোজেন বোমা বানাতে শুরু করবে। মানুষের সামনে মাত্র একটা আশাই আছে, তা হচ্ছে যুদ্ধ আর লাগতে না দেওয়া। যখন এই যুদ্ধে কোন পক্ষেরই কোন লাভ নেই, তখন হয়ত বা এ বিষয়টা উভয় পক্ষের সরকারকে বোঝান সম্ভব হবে।

আর এ কাজ সেই সরকারই করতে পারে যাকে কোন পক্ষই নিজের কোলে টানতে পারেনি, যে সরকার নিস্বার্থ আছে, নিরপেক্ষ আছে। ভারতই একমাত্র সে কাজের উপযুক্ত। ভারত উভয় পক্ষকেই বলতে পারে, স্বীকার কর, যুদ্ধ দিয়ে তোমাদের সমস্যার সমাধান হবে না। এই বিষয়ে অগ্রসর হবার অধিকার একমাত্র ভারতেরই আছে। আবার যদি এক মহাযুদ্ধ বাধে তাহলে শুধু যুদ্ধবাজরাই নয়, যারা যুদ্ধ চায় না তারাও ধ্বংস হবে।

যদি একবার বোঝান যায় যে, হাইড্রোজেন বোমা নীতি নির্ধারণের উপায় হিসাবে যুদ্ধকে অকেজো করে ফেলেছে, তাহলে মানুষের চিন্তা ভাবনার উপর থেকে এক বিরাট ভার নেমে যাবে। তখন অন্যান্য আরও যে সব পন্থা আছে, সমস্যা সমাধানের উপায় হিসেবে সেগুলোকে কাজে লাগান আর অসম্ভব বলে মনে হবে না। নিরস্ত্রীকরণের ব্যবস্থা করাও একেবারে অসম্ভব হবে না। বর্তমানে যেখানে যেখানে যে যে বিষয়ে উভয় পক্ষে প্রচণ্ড বিরোধ দেখা দিয়েছে, সে সম্পর্কে একটা চুক্তি করা হোক যে, সে সব বিষয় যেমন আছে আপাতত তেমনই থাক। ভবিষ্যতে সেগুলোর মিটমাট হবে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে। অথবা উভয় পক্ষের শ্রদ্ধা অর্জন করবে এমন ট্রাইব্যুনাল বা মধ্যস্থদের দ্বারা সে সব বিরোধের মীমাংসা করা হবে।

হাইড্রোজেন বোমা একটা বিভীষিকা। কিন্তু এই বোমাই হয়ত মানুষকে যুদ্ধ বাধাতে বিরত করতে বাধ্য করে প্রকারান্তরে শাপে বর হয়ে দাঁড়াবে। আজ আত্মত্যাগের আদর্শ বিসর্জন দিতে হবে আজকের আদর্শ হবে আত্মরক্ষা। অন্যকে ধংস করে কি ফল, সে ধ্বংসের হাত থেকে যখন নিজেরও পরিত্রাণ নেই।

এই সহজ সরল সত্যটি এই স সরকারের চোখের সামনে তুলে ধরতে হবে। এটা ওদের দৃষ্টি এড়িয়ে গিয়েছে আমার মনে হয় ভারত এ কাজ পারবে আর যদি পারে, যদি ভারত সফল হ এ কাজে, তবে চিরকাল মানুষ ভারতকে আশীর্বাদ করবে।

স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে অনুবাদ।

৩

পরদিন সকালবেলা ব্যোমকেশ সংবাদপত্র পাঠ শেষ করিয়া কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া বেড়াইল, তারপর বলিল, 'নেই কাজ তো খৈ ভাজ। চল অনাদি হালদারকে দর্শন করে আসা যাক। ভাইপোদের দর্শন পেলাম, আর খুড়োকে দর্শন করলাম না, সেটা ভাল দেখায় না।'

বলিলাম,—'ভাইপোদের কাছে তো খুড়োর ঠিকানা চেয়েছিলে। খুড়োর কাছে কি চাইবে?'

ব্যোমকেশ হাসিল,—'একটা কিছু মাথায় এসেই যাবে।'

বেলা সাড়ে ন'টা নাগাদ বাহির হইলাম। বৌবাজারের নম্বরের ধারা কোন্‌দিক হইতে কোন্‌দিকে গিয়াছে জানা ছিল না, নম্বর দেখিতে দেখিতে শিয়ালদহের দিকে চলিয়াছি। কিছুদূর চলিবার পর ফুটপাথে বাঁটুল সর্দারের সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'কি বাঁটুল, এ পাড়াটাও কি তোমার এলাকা?'

বাঁটুল তৈলাক্ত মুখে কেবল হাসিল, তারপর পাল্টা প্রশ্ন করিল,—'আপনারা এ পাড়ায় এলেন যে কর্তা? কিছু দরকার আছে নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'হ্যাঁ। ১৭২।২, নম্বরটা কোন্‌দিকে বলতে পার?'

বাঁটুলের চোখে চকিত সতর্কতা দেখা দিল। তারপর সে সামলাইয়া লইয়া বলিল, '১৭২।২ নম্বর? ঐ যে নতুন বাড়িটা তৈরি হচ্ছে, ওর পাশেই।'

আমরা আবার চলিতে আরম্ভ করিলাম। কিছুদূরে গিয়া ফিরিয়া দেখি বাঁটুল তখনও ফুটপাথে দাঁড়াইয়া এক-দৃষ্টে তাকাইয়া আছে, আমাকে ফিরিতে দেখিয়া সে উল্টো মুখে চলিতে আরম্ভ করিল।

আমি বললাম,—'ওহে ব্যোমকেশ, বাঁটুল—'

সে বলিল, 'লক্ষ্য করেছি। বোধ হয় ওদের চেনে।'

আরও খানিকদূর অগ্রসর হইবার পর নূতন বাড়ির সম্মুখীন হইলাম। চারিদিকে ভারা বাঁধা, মিস্ত্রীরা গাঁথুনির কাজ করিতেছে। একতলার ছাদ ঢালা হইয়া গিয়াছে, দোতলার দেয়াল গাঁথা হইতেছে। সম্মুখে কণ্ট্রাক্টরের নাম লেখা প্রকাণ্ড সাইনবোর্ড। কণ্ট্রাক্টরের নাম গুরুদত্ত সিং। সম্ভবত শিখ।

বাড়ি পার হইয়া একটি সংকীর্ণ ইঁট-বাঁধানো গলি, গলির ওপারে ১৭২।২ নম্বর বাড়ি। দোতলা বাড়ি, সদর দরজার পাশে সরু এক ফালি দাওয়া; তাহার উপরে তাহারই অনুরূপ রেলিং-ঘেরা ব্যাল্‌কনি। নীচের দাওয়ায় বসিয়া এক জীর্ণকায় পলিতকেশ বৃদ্ধ থেলো হুঁকায় তামাক টানিতেছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি হুঁকা হইতে ওষ্ঠাধর বিমুক্ত না করিয়াই চোখ বাঁকাইয়া চাহিলেন।

ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'এটা কি অনাদি হালদারের বাসা?'

বৃদ্ধ হুঁকার ছিদ্র হইতে অধর বিচ্ছিন্ন করিয়া খিঁচাইয়া উঠিলেন,—'কে অনাদি হালদার আমি কি জানি! এ আমার বাসা—নীচের তলায় আমি থাকি।'

ব্যোমকেশ বিনীতস্বরে বলিল, 'আর ওপরতলায়?'

বৃদ্ধ পূর্ববৎ খিঁচাইয়া বলিলেন,—'আমি কি জানি! খুঁজে নাওগে। অনাদি হালদার! যত সব—' বৃদ্ধ আবার হুঁকায় অধরোষ্ঠ জুড়িয়া দিলেন।

বৃদ্ধ হঠাৎ এমন তেরিয়া হইয়া উঠিলেন কেন বোঝা গেল না। আমরা আর বাক্যব্যয় না করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিলাম। লম্বাটেগোছের একটি ঘর, তাহার একপাশে একটি দরজা, বোধ হয় নীচেরতলার প্রবেশদ্বার; অন্যদিকে এক প্রস্থ সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গিয়াছে।

সংখ্যারূপে প্রকাশ করা হইবে।

আমরা সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিব কি না ইতস্তত করিতেছি, এমন সময় সিঁড়িতে দুম্ দুম্ শব্দ শুনিয়া চোখ তুলিয়া দেখি ইয়া লম্বা-চওড়া এক সর্দারজী বাঁকের মোড় ঘুরিয়া নামিয়া আসিতেছেন। অনাদি হালদারের বাসা সম্বন্ধে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, কারণ ইনি নিশ্চয় কন্ট্রাক্টর গুরুদত্ত সিং। তাঁহার পরিধানে মখমলী কর্ডুরয়ের পাৎলুন ও গ্যাবারডিনের কোট, দাড়ি বিনুনি করা, মাথায় কান-চাপা পাগড়ী। দুই বাহু মুগুরের মত ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি নামিতেছেন, চক্ষু দুটিও ঘুরিতেছে। আরও কাছে আসিলে তাঁহার দাড়ি-গোঁফে অবরুদ্ধ বাক্যগুলিও আমাদের কর্ণগোচর হইল। বাক্যগুলি বাঙলা নয়, কিন্তু তাহার ভাবার্থ বুঝিতে কষ্ট হইল না—'বাঙালী আমার টাকা দেবে না! দেখে নেব কত বড় অনাদি হালদার, গলা টিপে টাকা আদায় করব। আমিও পাঞ্জাবী, আমার সঙ্গে লারে-লাপ্পা চলবে না—' সর্দারজী সবেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

ব্যোমকেশ আমার পানে চাহিয়া একটু হাসিল, নিম্নস্বরে বলিল,—'অনাদি-বাবু দেখছি জনপ্রিয় লোক নয়। এস দেখা যাক।'

সিঁড়ির ঊর্ধ্বপ্রান্তে একটি দরজা, ভিতর দিকে অর্গলবদ্ধ। ব্যোমকেশ কড়া নাড়িল।

অল্পকাল পরে দরজা একটু ফাঁক হইল, ফাঁকের ভিতর দিয়া একটি মুখ বাহির হইয়া আসিল। ভেট্‌কি মাছের মত মুখ, রাঙা রাঙা চোখ, চোখের নীচের পাতা শিথিল হইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। শিথিল অধরের ফাঁকে নীচের পাটির দাঁতগুলি দেখা যাইতেছে।

রাত্রিকালে এরূপ অবস্থায় এই মুখ-খানি দেখিলে কি করিতাম বলা যায় না, কিন্তু এখন একবার চমকিয়া স্থির হইলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'অনাদি বাবু—?'

মুখটিতে হাসি ফুটিল, চোয়ালের অসংখ্য দাঁত আরও প্রকটিত হইল। ভাঙা ভাঙা গলায় ভেট্‌কিমাছ বলিল,— 'না, আমি অনাদিবাবু নই, আমি কেষ্ট-বাবু। আপনারাও পাওনাদার নাকি?'

'না, অনাদিবাবুর সঙ্গে আমাদের একটু কাজ আছে।'

এই সময় ভেট্‌কি মাছের পশ্চাতে আর একটি দ্রুত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, —'কেষ্টবাবু, সরুন সরুন—'

কেষ্টবাবুর মুণ্ড অপসৃত হইল, তৎপরিবর্তে দ্বারের সম্মুখে একটি যুবককে দেখা গেল। ডিগডিগে রোগা চেহারা, লম্বা ছুঁচালো চিবুক, মাথার কড়া কোঁক্‌ড়া চুলগুলি মাথার দুই পাশে যেন পাখা মেলিয়া আছে। মুখে একটা চট্‌পটে ভাব।

'কি চান আপনারা?'

'অনাদি বাবুর সঙ্গে দেখা করতে চাই।'

'কিছু দরকার আছে কি? অনাদিবাবু বিনা দরকারে কারুর সঙ্গে দেখা করেন না।'

'দরকার আছে বৈ কি। পাশে যে বাড়িটা তৈরি হচ্ছে সেটা বোধহয় তাঁরই। ওই বাড়ি সম্বন্ধে কিছু জানবার আছে। আপনি—?'

'আমি অনাদিবাবুর সেক্রেটারি। আপনারা একটু বসুন, আমি খবর নিচ্ছি। এই যে, ভেতরে বসুন।'

আমরা সিঁড়ি হইতে উঠিয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম। যুবক চলিয়া গেল।

ঘরটি নিরাভরণ, কেবল একটি কেঠো বেঞ্চি আছে। আমরা বেঞ্চিতে বসিয়া চারিদিকে চাহিলাম। সিঁড়ির দরজা ছাড়া ঘরে আরও গুটিতিনেক দরজা আছে। একটি দিয়া সদরের ব্যালকনি দেখা যাইতেছে, অন্য দুটি ভিতর দিকে গিয়াছে।

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর দেখিলাম ভিতর দিকের একটি দরজা একটু ফাঁক করিয়া একটি স্ত্রীলোক উঁকি মারিল। চিনিতে কষ্ট হইল না— ননীবালা দেবী। তিনি বোধহয় রান্না করিতেছিলেন, বাহিরে লোক আসার সাড়া পাইয়া খুন্তি হাতে তদারক করিতে আসিয়াছেন। আমাদের দেখিয়া তিনি সভয়ে চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন। ব্যোমকেশ নিজের ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া তাঁহাকে অভয় দিল। ননীবালা ধীরে ধীরে সরিয়া গেলেন।

অন্য দরজা দিয়া যুবক বাহির হইয়া আসিল।

'আসুন।'

যুবকের অনুগামী হইয়া আমরা ভিতরে প্রবেশ করিলাম। একটি ঘরের দরজা ঠেলিয়া যুবক বলিল, 'এই ঘরে অনাদিবাবু আছেন, আপনারা ভেতরে যান।'

ঘরে ঢুকিয়া প্রথমটা কিছু ঠাহর হইল না। ঘরে আলো কম, আসবাব কিছু নাই, কেবল এক কোণে গদির উপর ফরাস পাতা। ফরাসের উপর তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিয়া একটি লোক আমাদের দিকে তকাইয়া আছে। আধা অন্ধকারে মনে হইল একটা ময়াল সাপ কুণ্ডলী পাকাইয়া অনিমেষ চক্ষে শিকারকে লক্ষ্য করিতেছে।

চক্ষু অভ্যস্ত হইলে বুঝিলাম, ইনিই

অনাদি হালদার বটে; ভাইপোদের সঙ্গে চেহারার সাদৃশ্য খুবই স্পষ্ট। বয়স আন্দাজ পঞ্চাশ; বেঁটে মজবুত চেহারা, চোখে মেদমণ্ডিত মোঙ্গলীয় বক্রতা। গায়ে বেগুনি রঙের বালাপোষ জড়ানো।

আমরা দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া ছিলাম। অনাদিবাবু স্তিমিত নেত্রে চাহিয়া রহিলেন। কিছুক্ষণ এইভাবে কাটিবার পর ব্যোমকেশ নিজেই কথা কহিল, বলিল,—'আমরা একটু কাজে এসেছি। ইনি অজিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ববঙ্গ থেকে সম্প্রতি এসেছেন, কলকাতায় বাড়ি কিনে বাস করতে চান।'

অনাদিবাবু এবার কথা বলিলেন। আমাদের বসিতে বলিলেন না, স্বভাব-রুক্ষ স্বরে ব্যোমকেশকে প্রশ্ন করিলেন,—'তুমি কে?'

ব্যোমকেশের চক্ষু প্রখর হইয়া উঠিল, কিন্তু সে সহজভাবে বলিল,—'আমি এ'র এজেন্ট। জানতে পারলাম আপনি পাশেই বাড়ি তৈরি করাচ্ছেন, ভাবলাম হয়তো বিক্রী করতে পারেন। তাই—'

অনাদিবাবু বলিলেন,—'আমি নিজে বাস করব বলে বাড়ি তৈরি করাচ্ছি, বিক্রী করবার জন্যে নয়।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'তা তো বটেই। তবে আপনি ব্যবসাদার লোক, ভেবেছিলাম লাভ পেলে ছেড়ে দিতে পারেন।'

'আমি দালালের মারফতে ব্যবসা করি না।'

'বেশ তো, আপনি অজিতবাবুর সঙ্গে কথা বলুন, আমি সরে যাচ্ছি।'

'না, কারুর সঙ্গে বাড়ির আলোচনা করতে চাই না। আমি বাড়ি বিক্রি করব না। তোমরা যেতে পার।'

অতঃপর আর দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। এই অত্যন্ত অশিষ্ট লোকটার সঙ্গ আমার অসহ্য বোধ হইতেছিল, কিন্তু ব্যোমকেশ নির্বিকার মুখে বলিল,—'কিছু মনে করবেন না, বাড়িটা তৈরি করাতে আপনার কত খরচ হবে বলতে বাধা আছে কি?'

অনাদিবাবুর রুক্ষ স্বর আরও কর্কশ হইয়া উঠিল—'বাধা আছে। —ন্যাপা! ন্যাপা! বিদেয় কর, এদের বিদেয় কর—'

সেক্রেটারি যুবকের নাম বোধকরি ন্যাপা, সে দ্বারের বাহিরেই দাঁড়াইয়া ছিল, মুণ্ড বাড়াইয়া ত্বরান্বিত স্বরে বলিল—'আসুন, চলে আসুন—'

মানসিক গলা-ধাক্কা খাইয়া আমরা বাহিরে আসিলাম। যুবক সিঁড়ির মুখ পর্যন্ত আমাদের আগাইয়া দিল, একটু লজ্জিত হ্রস্বকণ্ঠে বলিল,—'কিছু মনে করিবেন না, কর্তার আজ মেজাজ ভাল নেই।'

ব্যোমকেশ তাচ্ছিল্যভরে বলিল,—'কিছু না। —এস অজিত।'

রাস্তায় বাহির হইয়া আসিলাম। ব্যোমকেশ মুখে যতই তাচ্ছিল্য দেখাক, ভিতরে ভিতরে উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছে তাহা তাহার মুখ দেখিলেই বোঝা যায়। কিছুক্ষণ নীরবে চলিবার পর সে আমার দিকে চাহিয়া ক্লিষ্ট হাসিল, বলিল,—'দু'রকম ছোটলোক আছে—অসভ্য ছোটলোক আর বজ্জাত ছোটলোক। যারা বজ্জাত ছোটলোক তারা শুধু পরের অনিষ্ট করে; আর অসভ্য ছোটলোক নিজের অনিষ্ট করে।'

জিজ্ঞাসা করলাম,—'অনাদি হালদার কোন শ্রেণীর ছোটলোক?'

'অসভ্য এবং বজ্জাত দুইই।'—

সেদিন দুপুরবেলা আহারাদির পর একটু দিবানিদ্রা দিব কিনা ভাবিতেছি, দ্বারের কড়া নড়িয়া উঠিল। দ্বার খুলিয়া দেখি ননীবালা দেবী।

ননীবালা শঙ্কিত মুখ লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন। ব্যোমকেশ ইজিচেয়ারে ঝিমাইতেছিল, উঠিয়া বসিল। ননীবালা বলিলেন,—'আজ আপনাদের ও-বাড়িতে দেখে আমার বুকের রক্ত শুকিয়ে গেছল। অনাদিবাবু যদি জানতে পারেন যে আমি—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বসুন। অনাদিবাবুর জানবার কোনও সম্ভাবনা নেই। আমরা গিয়েছিলাম তার নতুন বাড়ির খরিদ্দার সেজে। সে যাক, আপনি এখন একটা কথা বলুন তো, অনাদি হালদার কি রকম লোক? সোজা স্পষ্ট কথা বলবেন, লুকো ছাপার দরকার নেই।

ননীবালা কিছুক্ষণ ড্যাবডেবে চোখে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর বাঁধ-ভাঙ্গা বন্যার মত শব্দের স্রোত তাঁহার মুখ দিয়া বাহির হইয়া আসিল,—'কি বলব আপনাকে ব্যোমকেশবাবু—চামার! চামার! চোখের চামড়া নেই, মুখের রাশ নেই। একটা মিষ্টি কথা ওর মুখ দিয়ে বেরোয় না, একটা পয়সা ওর ট্যাঁক থেকে বেরোয় না। টাকার আণ্ডিল, কিন্তু আঙুল দিয়ে জল গলে না। এদিকে উন থেকে চুণ খসলে আর রক্ষে নেই, দাঁতে ফেলে চিবোবে। আগে একটা বামুন ছিল, আমি আসবার পর সেটাকে ছাড়িয়ে দিয়েছে; এই দেড় বছর হাঁড়ি ঠেলে ঠেলে আমার গতরে আর কিছু নেই। কি কুক্ষণে যে প্রভাতকে ওর পুষ্যিপুত্তুর হতে দিয়েছিলুম! যদি উপায় থাকত হতচ্ছাড়া মিনষের মুখে নুড়ো জেবলে দিয়ে পাটনায় ফিরে যেতুম।' এই পর্যন্ত বলিয়া ননীবালা রণক্লান্ত যোদ্ধার মত হাঁপাইতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'কতকটা এই-রকমই আন্দাজ করেছিলাম। প্রভাতের সঙ্গে ওর ব্যবহার কেমন?'

ননীবালা একটু থমকিয়া বলিলেন,—'প্রভাতকে বেশী ঘাঁটায় না। তাছাড়া প্রভাত বাড়িতে থাকেই বা কতক্ষণ। সকাল আটটায় দোকানে বেরিয়ে যায়, দুপুরবেলা আধঘণ্টার জন্য একবারটি খেতে আসে, তারপর বাড়ি ফেরে একেবারে রাত নটায়। বুড়োর সঙ্গে প্রায় দেখাই হয় না।'

'বুড়ো দোকানের হিসেবপত্র দেখতে চায় না?'

'না, হিসেব চাইবার কি মুখ আছে, দোকান যে প্রভাতের নামে। বুড়ো প্রথম প্রথম খুব ভালমানুষী দেখিয়েছিল। প্রভাতকে জিগ্যেস করল—কী কাজ

করবে? প্রভাত বলল, বইয়ের দোকান করব। বুড়ো অমনি পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে দোকান করে দিলে।'

'হুঁ। —ন্যাপা কে? বুড়োর সেক্রেটারি?'

ননীবালা মুখ বাঁকাইয়া বলিলেন,—'সেক্রেটারি না আরও কিছু—বাজার সরকার। কড়্‌কড়্‌ করে ইংরিজি বলতে পারে তাই বুড়ো ওকে রেখেছে। বুড়ো নিজে একবর্ণ ইংরিজি জানে না, ব্যবসার কথাবার্তা ওকে দিয়ে করায়, চিঠিপত্র লেখায়। তাছাড়া বাজার করায়, হাত-পা টেপায়। সব করে ন্যাপা।'

'ভারি কাজের লোক দেখছি।'

'ভারি ধূর্ত লোক, নিজের কাজ গুছিয়ে নিচ্ছে। দু'পাতা ইংরিজি পড়েছে কিনা।'

বুঝিলাম, প্রভাত ইংরেজি জানে না, ন্যাপা ইংরেজি জানে তাই ননীবালা তাহার প্রতি প্রসন্ন নয়।

ব্যোমকেশ বলিল,—'আর কেষ্টবাবু? তিনি কে?

'তিনি কে তা কেউ জানে না। বুড়োর আত্মীয় কুটুম্ব নয়, জাত আলাদা। আমরা আসবার আগে থাকতে আছে। মাতাল মদ খায়।'

'তাই নাকি? নিজের পয়সাকড়ি আছে বুঝি?'

'কিচ্ছু নেই। বুড়ো জুতো জামা কিনে দেয় তবে পরে।'

'তবে মদ পায় কোথা থেকে?'

'মদের পয়সাও বুড়ো দেয়।'

আশ্চর্য! এদিকে বলছেন আঙুল দিয়ে জল গলে না—'

'কি জানি ব্যোমকেশবাবু, আমি কিছু বুঝতে পারি না। মনে হয় বুড়ো ওকে ভয় করে। কেষ্টবাবু মাঝে মাঝে মদ খেয়ে মেজাজ দেখায়, বুড়ো কিন্তু কিচ্ছু বলে না।'

'বটে।' ব্যোমকেশ চিন্তাচ্ছন্ন হইয়া পড়িবার উপক্রম করিল।

ননীবালা তখন সাগ্রহে বলিলেন,—'কিন্তু ওদিকের কি হল ব্যোমকশবাবু? নিমাই নিতাইকে দেখতে গিছলেন নাকি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—গিয়েছিলাম। ওরা লোক ভাল নয়। খুড়ো আর ভাইপো'দের এ বলে আমায় দ্যাখ্ ও বলে আমায় দ্যাখ্। উচ্ছের ঝাড়, ঝাড়ে মূলে তেতো।'

ননীবালা ভীতকণ্ঠে বললেন,—তবে কি হবে? ওরা যদি প্রভাতকে—।'

ব্যোমকেশ ধীরস্বরে বলিল,—ওরা প্রভাতকে ভালবাসে না, তার অনিষ্ট চিন্তাও করতে পারে। কিন্তু আজকাল-কার এই অরাজকতার দিনেও একটা মানুষকে খুন করা সহজ কথা নয়, নেহাৎ মাথায় খুন না চাপলে কেউ খুন করে না। নিমাই আর নিতাইকে দেখে মনে হল ওরা সাবধানী লোক, খুন করে ফাঁসির দড়ি গলায় জড়াবে এমন লোক তারা নয়। আর একটা কথা ভেবে দেখুন। অনাদি হালদার যদি পুষ্যিপুত্তুর নেবার জন্যে বদ্ধ-পরিকর হয়ে থাকে তাহলে একটা পুষ্যি পুত্তুরকে মেরে লাভ কি? একটা গেলে অনাদি হালদার আর একটা পুষ্যিপুত্তুর নিতে পারে, নিজের সম্পত্তি উইল করে বিলিয়ে দিতে পারে। এ অবস্থায় খুন খারাবি করতে যাওয়া তো ঘোর বোকামি। বরং—'

ননীবালা বিস্ফারিত চক্ষে প্রশ্ন করিলেন,—'বরং কী?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বরং অনাদিবাবুর ভালমন্দ কিছু হলে অনেক সমস্যার সমাধান হয়।'

ননীবালা কিছুক্ষণ নীরবে চিন্তা করিলেন, মনে হইল এই সম্ভাবনার কথা তিনি পূর্বে চিন্তা করেন নাই। তারপর তিনি উৎসুক মুখ তুলিয়া বলিলেন,—'তাহলে—প্রভাতের কোনও ভয় নেই?'

'আপনি নিশ্চিন্ত হতে পারেন, এ ধরনের বোকামি নিমাই নিতাই করবে না। তবু সাবধানের মার নেই। আমি একটা প্ল্যান ঠিক করেছি, এমনভাবে ওদের কড়্‌কে দেব যে ইচ্ছে থাকলেও কিছু করতে সাহস করবে না।'

'কি—কি প্ল্যান ঠিক করেছেন ব্যোমকেশবাবু?'

'সে আপনার শুনে কি হবে। আপনি আজ বাড়ি যান। যদি বিশেষ খবর কিছু থাকে আমাকে জানাবেন।'

ননীবালা তখন গদগদ মুখে ব্যোমকেশকে প্রচুর ধন্যবাদ জানাইয়া প্রস্থান করিলেন। অনাদি হালদারের দ্বিপ্রহরে দিবানিদ্রা দিবার অভ্যাস আছে, সেই ফাঁকে ননীবালা বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছেন; বুড়া যদি জাগিয়া উঠিয়া দেখে তিনি বহির্গমন করিয়াছিলেন তাহা হইলে কৈফিয়তের ঠেলায় ননীবালাকে অন্ধকার দেখিতে হইবে।

অতঃপর আমি ব্যোমকেশকে জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কী প্ল্যান ঠিক করেছ? আমাকে তো কিছু বলনি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'বাড়িতে পোস্ট-কার্ড আছে?'

'আছে।'

'বেশ, পোস্টকার্ড নাও, একখানা চিঠি লেখ। শ্রীহরিঃ শরণং লিখতে হবে না, সম্বোধনেরও দরকার নেই। লেখ—'আমি তোমাদের উপর নজর রাখিয়াছি।'—ব্যস, আর কিছু না। এবার নিমাই কিম্বা নিতাই হালদারের ঠিকানা লিখে চিঠিখানা পাঠিয়ে দাও।'

(ক্রমশঃ)

বিপরীত চৌধুরী

বিপরীত চৌধুরীর গল্প শুনিয়েছিলেন মিস্টার মিত্র। মিস্টার মিত্র, র পুরো নাম শশধর মিত্র, বম্বে বি সি আই রেলওয়ের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী। কি করে বিপরীত চৌধুরীর কথা উঠল সেটা বলতে গেলে কটু ভূমিকার প্রয়োজন। গোড়া থেকেই নুন তা'হলে।

উইলসন ড্যাম গিয়েছিলাম আমরা আউটডোর শ্যুটিং করতে। উঠেছিলাম ড্যামের ওপর চমৎকার বাংলোবাড়িতে, যেটাকে বলা হয় ফার্স্ট ক্লাস বাংলো। ফার্স্ট ক্লাস বাংলো সত্যি ফার্স্ট ক্লাস। একদিকে শান্ত গরুর মতো কাজলকালো ভরপেয়ালা জল, আর অন্যদিকে পাগলা ষাঁড়ের মতো গর্জনমন্দ্রিত প্রস্রবণ। মাঝখানে একবাগান ফুলের হাসি নিয়ে সুন্দর এই বাংলোটা। এখানে উঠে প্রথমেই আলাপ হল বাংলোর, প্রতবেশী মিঃ মিত্রের সঙ্গে। সাতদিনের ছুটি নিয়ে কর্মব্যস্ত বম্বে থেকে পালিয়ে এসেছেন বিশ্রামের আশায়। প্রথম দিন শুধু মৌখিক আলাপ হল। নিজেদের জিনিসপত্র গুছোতেই অর্ধেক রাত্রি গড়িয়ে গেল, তখন কারুর সঙ্গে গল্প করবার অবস্থা নয়। পরদিন সকালেই শ্যুটিংএ বেরিয়ে পড়লাম আমরা। মিঃ মিত্র তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেননি। সকালে যখন বেরোলাম তখন পরিষ্কার আকাশ ছিল, কিন্তু যেই লোকেসানে গিয়ে ক্যামেরা সাজিয়ে বসলাম, অম্নি হঠাৎ একরাশ মেঘ এসে ঢেকে দিল আকাশ। রোদ্দুরের আশায় বসে রইলাম আমরা। এক একবার মনে হচ্ছিল মেঘ কেটে গেল বুঝি। একটা দুটো রিহার্সালও হয়ে গেল, কিন্তু এক মিনিটের জন্য সূর্য একগাল হেসেই মেঘের ঘোমটা টেনে ফের চোখআড়াল। সারাদিন কেটে গেল এমনি। আমাদের প্রতীক্ষা বৃথা গেল। একটা সটও নিতে পারলাম না। হতাশ হয়ে রাজ্যের ক্লান্তি নিয়ে ফিরে এলাম আমরা। তখন সন্ধ্যার শাড়িতে তারার চুমকি বসানো শুরু হয়ে গেছে। অস্পষ্ট একটা কুয়াশা সদ্যসজল চাউনীর মতো ঝাপসা করে দিচ্ছে সব কিছু। বেশ একটু ঠাণ্ডার আমেজ বাতাসে। যে যার ঘরে গিয়ে প্রথমেই ভালো করে চান করে নিলাম। তারপর বারান্দায় বেতের চেয়ার পেতে গুলজার হয়ে বসলাম সবাই চা নিয়ে। এমন সময় মিঃ মিত্র তাঁর রিলে গাড়ির সর্বাঙ্গে ধুলো ছিটিয়ে ফিরে এলেন কোথাও থেকে, আমাদের পরিচালক—মিঃ পরাঞ্জপে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। —এই যে মিঃ মিত্র আসুন, কোত্থেকে এলেন ?

গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন, —গিয়েছিলাম রান্‌ধা ফল্‌স দেখতে। তারপর, আপনাদের শ্যুটিং কেমন হল ? —মিঃ মিত্র এসে আয়েশ করে বসলেন একটা চেয়ার টেনে।

—আর বলবেন না। শ্যুটিং করতে পারলাম না আজ।

—কেন? —মিঃ মিত্র চুরুট ধরালেন।

পরাঞ্জপে হেসে তাঁর স্ত্রীর দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন—এঁর জন্যে।

সবাই হেসে উঠলাম। মিঃ মিত্র কিছু বুঝতে না পেরে অবাক হয়ে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। পরাঞ্জপে স্ত্রীকে বললেন, বলো না, মিঃ মিত্রকে তুমিই বলো।

মিসেস পরাঞ্জপে কপট রাগে স্বামীর দিকে কটাক্ষ হেনে বললেন,—সকাল থেকে আমাকে কেমন খেপাচ্ছে দেখো না। জানেন মিঃ মিত্র, কাল সারাদিন মেঘলা গেছে। বিকেলে যখন আমরা বেরুচ্ছিলাম তখন ক্যামেরাম্যান মিস্টার গুঞ্জন বলছিলেন, 'কাল যদি এমনি ওয়েদার থাকে তাহলে তো শ্যুটিং করার বারোটা বেজে যাবে।' কথা শুনে সবাই কেমন একটু ভাবনায় পড়ে গেল। তখন আমি জোর দিয়ে বলেছিলাম,—আমি বলছি কাল মেঘটেঘ থাকবে না, কালকে একেবারে চনমনে রোদ থাকবে, ভাবনার কিছু নেই। কিন্তু আজ তার উল্টো হয়েছে। রোদ দূরে থাক কালকের চাইতেও বেশী মেঘ ছিল আজ। ওদের শ্যুটিং সব মাটি। সেই থেকে ওদের ইউনিটসুদ্ধ আমাকে গঞ্জনা দিয়ে চলেছে। আমি বলেছি বলেই নাকি উল্টো হয়েছে।

সবাই আরেক প্রস্থ উচ্চৈস্বরে হেসে উঠলাম। মিঃ মিত্র হাসলেন না। চুরুটে লম্বা একটা টান দিয়ে বললেন, আশ্চর্য, মানুষ যে কত বিচিত্রও হয়। সবাই চুপ করে মিঃ মিত্রের কথার মানে বোঝবার চেষ্টা করি। শেষপর্যন্ত, নায়িকা শীলাবতী প্রশ্নই করে বসলেন, আপনি হঠাৎ সিরিয়াস হয়ে গেলেন যে। সিরিয়াস? মিঃ মিত্র বললেন,—না সিরিয়াস নয়, হঠাৎ পুরোন একজনের কথা মনে পড়ে গেল। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে করবে না, কিন্তু সব সত্য। তাই বলছিলাম, মানুষ কত বিচিত্রও হয়। রিয়েলী, ইট ইজ এ স্ট্রেঞ্জ স্টোরী।

স্টোরী,—মিঃ পরাঞ্জপে বললেন,—বলুন না যদি আপত্তি না থাকে। উই উইল এঞ্জয় ইট্।

মিঃ মিত্র জবাব দিলেন না। চোখ বুঁজে খানিকক্ষণ কি ভাবলেন। তারপর ধীরে ধীরে বলতে শুরু করলেন।

—তাঁর নাম ছিল বিপরীত চৌধুরী।

বলে সবার মুখের ওপর দিয়ে চোখ বুলিয়ে গেলেন মিঃ মিত্র। —'অদ্ভুত নাম, তাই না? না, এটা ওর আসল নাম নয়, এ নামকরণ পরে করা হয়েছিল। আসল নাম ছিল রমেন চৌধুরী কিন্তু এ নাম বলতে গেলে কেউই জানতো না। কিন্তু বিপরীত চৌধুরী বললে, এক ডাকে সারা হাটখোলা চিনত। এ নামকরণের, বলা বাহুল্য, কারণ ছিল। সব সময় দেখা গেছে উনি যা হবে বলে ঘোষণা করতেন, ঠিক তার উল্টো হয়েছে। ছোটবেলা থেকেই নাকি এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখা গেছে। ফুটবল ম্যাচে বিপরীত চৌধুরী যে দল জিতবে বলত অপরপক্ষ সে ম্যাচে নিঃসন্দেহে জয়ী হত। ইলেকশনে যাঁর নাম করত, দেখা যেতো অতিরিক্ত কম ভোট পাওয়ায় সে বেচারার জামানত বাজেয়াপ্ত হয়ে গেছে। হাটখোলার প্রিয়নাথ কেবিনে জোর আড্ডা হতো আমাদের। প্রিয়নাথ কেবিনের চেহারা আন্দাজ করতে পারেন। চার পাতার দৈনিক, হাতলভাঙ্গা কাপ, ছাতাধরা কেক, তেঠেঙ্গে টেবিল আর শুঁড়ভাঙ্গা গণেশ। এখানে বসেই আমরা রাজাউজীর মেরেছি, রেসের টিপ্‌স নিয়ে গজল্লা করেছি আর, মাপ করবেন, ফিল্মের অভিনেত্রীদের স্ক্যাণ্ডাল আউড়েছি। এক কথায়, পাড়ার রেস্তোরাঁয় যা হয় প্রিয়নাথ কেবিনে ঠিক তাই হত। এখানে আমরা রাত্তিরে দরজা এঁটে ফ্লাশও খেলেছি। বিপরীত চৌধুরী এ দলের একজন সভ্য। ফ্লাশে বরাবর ও হারতো না। তবে যা বলতো তার উল্টোটাই সচরাচর ঘটত। যখন ব্লাইণ্ড চাল চেলে বলত,—এই জগার কাছে নির্ঘাৎ বাদশার পেয়ার। দেখা যেতো জগার তাস বাজে, কিন্তু রবীনের হাতে বিবির পেয়ার, যদিও কাঁটায় কাঁটায় বাদশা নয়। বলা বাহুল্য, সে বোর্ড রবীনই পায়। নামটা ক্রমশ যেন বেশী করে খাপ খেয়ে যাচ্ছে। দিনকে দিন বিপরীত চৌধুরীর নাম জানল সবাই। সবাই জানে পয়সা দিয়ে হেড টেল করলে বিপরীত চৌধুরী যা বলবে তা কক্ষনোই হবে না। শেষ পর্যন্ত এমন হয়ে গেল যে, আমরা যে কোন ব্যাপার সমাধান করতে হলে বিপরীত চৌধুরীকে জিজ্ঞেস করতাম। যুদ্ধে কে জিতবে, মল্লিক আর রায়দের মামলায় কে জিতবে, সাহাদের মেয়ে মণিকার বিয়ে রতন দত্তের সঙ্গে হবে কিনা, টেস্টে অস্ট্রেলিয়া জিতবে কি এম সি সি ইত্যাদি যতরকম প্রশ্ন সম্ভব। অবাক কাণ্ড বিপরীত চৌধুরী যা বলতে লাগল উল্টোটা ঠিক ঠিক ঘটে যেতে লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীত চৌধুরী নিজে ক্ষেপে গেল। একটা অন্ধ ভয় বাসা বাঁধল ওর বুকে, তবে কি সত্যি ওর জিভ এমন, এমন অপয়া ও। রুদ্ধ আক্রোশে বিপরীত চৌধুরী ক্রমে তিরিক্ষি মেজাজী হয়ে উঠল। একদিন গজাননের টুটি টিপে ধরেছিল বিপরীত চৌধুরী বলে খেপানোর অপরাধে। অনেক কষ্টে ছাড়ানো হয় ওকে।

ব্যাপারটা আমার ভালো লাগল না। এ সব ধারণা মিথ্যে। নেহাৎই ঘটনাচক্রে এভাবে বেচারীর কাঁধে চাপিয়ে ভুল একটা বিশ্বাসের শেকড় গাড়াতে আমার ভয়ানক আপত্তি। মজার ছলে আমিও যে খেপাতাম না তা নয়, আর এমন অদ্ভুত ঘটছে বলে অবাক হতামও একটু, তবে ব্যাপারটা আমি কখনো সিরিয়াসলি নিইনি। কিন্তু লক্ষ্য করলাম বিপরীত চৌধুরী সিরিয়াস হয়ে উঠছে। বিপরীত চৌধুরীকে আমি একটু বেশীই ভালোবাসতাম বোধ হয়। তাই অন্য বন্ধুদের উদ্বিগ্ন না করলেও আমাকে একটু ভাবিয়ে তুলল।

দুর্ভাবনা বেড়ে গেল যেদিন বিকেলে

উস্কুখুস্কু চুলে এসে ও হঠাৎ দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল আমার ঘরে।

কি ব্যাপার চৌধুরী? কি হয়েছে? —আমার স্বরে রীতিমতো উৎকণ্ঠা।

—আর সহ্য হচ্ছে না মিত্তির, তুই একটু উপায় করে দে ভাই, নইলে আমি পাগল হয়ে যাবো।

পাশে বসে আমি সমবেদনায় হাত রাখলাম পিঠে,—খুলে বল ভাই কি হয়েছে?

আজ,—বলতে গিয়ে দু'চোখ জলে ভরে এল বিপরীত চৌধুরীর,—আজ আমি বাসন্তীর গায়ে হাত তুলেছি।

হাত তুলেছিস?—আমি বিমূঢ় হয়ে গেলাম। বাসন্তী চৌধুরীর স্ত্রীর নাম। শুধু স্ত্রীর নাম বললে কিছু বলা হয় না, বাসন্তী ওর সবকিছু। ভালবাসতে অনেক দেখেছি, কিন্তু চৌধুরী বৌকে যেমন ভালবাসতো সে ভালবাসা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। সে ভালবাসার কাছে ভালবাসা কথাটা যেন বিদ্রূপ বলে মনে হত। সেই বাসন্তীর গায়ে হাত তুলেছে বিপরীত চৌধুরী। কতখানি ক্রোধে এ অসম্ভব সম্ভব সে শুধু আমিই জানি। অনেকক্ষণ চুপ করে ওর নিঃশব্দ কান্না দেখলাম। তারপর বললাম,—কেন, কেন তুই—

জানিস মিত্তির,—বাধা দিয়ে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল বিপরীত চৌধুরী,—বাসন্তী পর্যন্ত আমাকে মনে করে আমি, আমি, অলক্ষণে। আমার জিভ দিয়ে যা বেরোয় তার উল্টোটাই হয়, আমি অপয়া। আমাকে এ মিথ্যে অপবাদ থেকে বাঁচা ভাই, নইলে আমি এ কলঙ্কের অশান্তিতে জ্বলে যাবো, মরে যাবো আমি।

৩

ধীরে ধীরে সমস্ত ঘটনা জানাল বিপরীত চৌধুরী। ওদের একমাত্র সন্তান [illegible]র বছরের মেয়ে রুমার খুব জ্বর হয়েছে। [illegible]াড়িতে গিয়ে অমন জ্বর দেখায় চৌধুরী নিজেও দুর্ভাবনায় পড়েছিল। কিন্তু বাসন্তীর দুশ্চিন্তা আরো বেশী।

—জ্বর যে বাড়ছে, কি হবে, হোমিওপ্যাথী ওষুধে হবে না, তুমি বড় ডাক্তার ডাকো,—অনুনয় জানালো বাসন্তী।

অত ভাববার কি আছে। দেখো না সবে তো ওষুধ খেয়েছে,—চৌধুরী আশ্বস্ত করে।

—না, আমার বড্ড ভাবনা হচ্ছে।—বাসন্তীর ভাবনা কমে না।

আমি বল্‌ছি ভালো হয়ে যাবে, বিশ্বাস করো চিন্তা করবার কিছু নেই।

আর যাবে কোথায়! হঠাৎ সামনে যেন যমদূত দেখেছে এমনি আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল বাসন্তী। দু'হাতে রুমাকে টেনে নিল কাছে, যেন চৌধুরী নইলে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর হিস্টিরিয়া রোগিণীর মতো চেঁচিয়ে উঠল,—তুমি বলছ ভালো হবে, তুমি বলছ? মারবে, মেরে ফেলবে তুমি রুমাকে, তোমার মুখ দিয়ে যখন বেরিয়েছে তখন আর রক্ষে নেই। দূর হও, দূর হও তুমি সামনে থেকে। —উঃ, সে কি চিৎকার। আর সহ্য করতে পারেনি চৌধুরী। প্রচণ্ড জোরে এক চড় কষিয়েছে বাসন্তীর গালে। তারপর বাসন্তীর আতঙ্কবিস্ফারিত চোখের দিকে একবার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়েই বেরিয়ে এসেছে বাড়ি থেকে।

সমস্ত কাহিনী শুনে একটা শীতল ভয়ের ঢেউ খেলে গেল আমার মেরুদণ্ড বেয়ে। ক্রমশ ব্যাপারটা ভীতিপ্রদ হয়ে দাঁড়াচ্ছে সন্দেহ নেই। কোথাকার জল কোথায় দাঁড়াবে কে জানে, এ বিশ্রী সন্দেহের আওতা থেকে বাঁচাতে হবে ওকে। অনেক ভেবে বললাম,—এই বাজে ধারণাকে দূর করতে হলে প্রমাণ দিতে হবে। সবার কাছে এমন প্রমাণ দেখাতে হবে যে তুই যা বলিস তার উল্টো হয় না, ঠিকও হয়। একবার দু'বার যদি দেখানো যায় ঠিক হয় ব্যাস্ তখন এই মিথ্যের কলঙ্কের মেঘ কেটে যাবে।

—কিন্তু—

কিন্তু টিন্তু নয়,—আশ্বাস দিলাম আমি,—এমনি কয়েকটা প্ল্যান করতে হবে যাতে তুই যা বলবি তা হবেই হবে।—বেশ খানিকক্ষণ পায়চারি করলাম আমি।—দি আইডিয়া, চেঁচিয়ে উঠলাম—সিলভার উইংস। —সিলভার উইংস? —চৌধুরী ধরতে পারল না।

হ্যাঁ, সিলভার উইংস। এ রোববারের রেসে সিলভার উইংস প্রিন্সেস প্লেটে সিওর উইন। এ টিপস একেবারে ঘোড়ার মুখ থেকে পাওয়া।

রবার্টস সাহেবের খবর, একেবারে খাঁটি। সূর্য পশ্চিমে উঠতে পারে কিন্তু সিলভার উইংসকে ঠেকাতে পারবে না কেউ। তুই এটা সর্বত্র প্রচার করে দে যে, তুই সিল্‌ভার উইংস ধরছিস। ব্যাস, দেখ তোর কথা ফলে কিনা।

শুনে উজ্জ্বল হয়ে উঠল বিপরীত চৌধুরীর মুখ। প্রিয়নাথ কেবিন জানল বিপরীত চৌধুরী সিলভার উইংস ধরছে, সঙ্গে সঙ্গে ওরা সবাই ঠিক করল রু প্রিন্সেস। হাটখোলার কোন রেসখেলিয়ে সিলভার উইংসের নামও করল না।

রেসের দিন। ঘোড়া ছুটল। সিলভার উইংস একের পর এক সবাইকে পিছে ফেলে চলল এগিয়ে। বিপীত চৌধুরীর কি উল্লাস, ঐ উইনিং পোস্ট এসে গেল, কিন্তু একি, উইনিং পোস্টের আধ ফার্লং দূরে এসে লেজ তুলে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল সিলভার উইংস। এ যে অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু টেরিবল্ আপসেট। গণ্ডোলা বেরিয়ে গেল আগে, বেরিয়ে গেল সব ঘোড়া। বিপরীত চৌধুরী মাঠের মধ্যেই বসে পড়ল মাথায় হাত দিয়ে।

এরপর সাতদিন প্রিয়নাথ কেবিনের সব গল্প হল বিপরীত চৌধুরীকে নিয়ে। এ'রকম কাণ্ড হবে স্বপ্নেও ভাবিনি আমি। কিন্তু ভেঙে পড়লে চলবে না। নতুন প্ল্যান ভাবতে শুরু করলাম আমি। ঠিক। এইবার আর হার নয়।

—শোন্, এবার যে প্ল্যান করেছি তাতে তোর দুর্নাম ঘুচবেই ঘুচবে।

জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো চৌধুরী। খুব যে বিশ্বাস হচ্ছে মনে হল না।

বললাম—আই এফ এ ফাইনাল এসে গেছে। ডারহাম আর কে আর আর। তুই এক কাজ কর, প্রিয়নাথ কেবিনের বন্ধুদের কাছে বল শীল্ড নেবে ডারহাম আর হাজরা ক্লাব, বারোয়ারীতলায়, অফিসপাড়ার বন্ধুদের বল শীল্ড নেবে কে আর আর। ফাইনালে দু'দলের একদল তো জিতবেই, ব্যাস, একদলের কাছে তোর কথা সঠিক বেরোবেই। কেমন বুদ্ধি?—

বিপরীত চৌধুরী দুহাতে আমার হাত জড়িয়ে ধরল। সত্যি ভাই, তোর বুদ্ধির তুলনা হয় না। এইবার আমার দুর্নাম ঘুচবেই। আর ভয় নেই। আনন্দে আবেগে চকচক করে উঠল চৌধুরীর চোখ। যেন আমি জিয়নকাঠি তুলে দিয়েছি হাতে, প্রাণভোমরা কৌটো দিয়েছি ওকে।

কিন্তু এবার হিমালয়ের চিড় ধরল আমার সমস্ত মনের জোর ভেঙে গেল অবাক হবেন শুনে, সেই বছর ডারহাম আর কে আর আর দুবার পর পর ড্র করল, আর তৃতীয়বার ঝগড়া করে খেলল না। আই এফ এ শীল্ড ফাইনাল প্রথমবার অমীমাংসিত রয়ে গেল। খেলার নিষ্পত্তি হল না।

এতবড় ধাক্কার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না আমি, অতবড় অসম্ভাব্যতার জন্য প্রস্তুত ছিল না বিপরীত চৌধুরীও। এ যে কত বড় আত্মগ্লানি বিপরীত চৌধুরী না হলে বুঝতে পারবেন না আপনারা। তারপর-মিঃ মিত্র থামলেন একটু,—এইবার আমি গল্পের উপসংহারে চলে এসেছি। নিভে যাওয়া চুরুটটা ধরালেন আবার মিঃ মিত্র দু'টো কাঠি নষ্ট হল। বুঝলাম, ভেতরে ভেতরে উনি যথেষ্ট উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। চোখদুটো রক্তাভ।

—এ'ও হয়তো সহ্য করতে পারত চৌধুরী। কিন্তু রুমা যখন সেই জ্বরের বিছানায় শেষ পর্যন্ত টাইফয়েডে মারা গেল তখন আর সইতে পারল না। মৃতা মেয়েকে কোলে নিয়ে নাগিনীর মতো হিংস্র চোখে স্বামীর দিকে তাকিয়ে বলেছিল বাসন্তী,—তুমি ওকে মেরেছ, তুমি খুন করেছ রুমাকে।

আদালতে পরবর্তী ঘটনার সাক্ষী ওদের চাকর গোপীর জবানিতে জানা গেছে।

কি বললি,—বিপরীত চৌধুরীর চোখ ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ঝলসে উঠলো, —আমি খুন করেছি? আমি? না, করিনি। আমি রুমাকে খুন করিনি। তবে করব, তোকে। এই হাত দিয়ে খুন করব তোকে। পৃথিবীর কেউ তোকে বাঁচাতে পারবে না। কেউ না। আমার কথা এইবার ফলবে।—এক লাফে ও ঝাঁপিয়ে পড়ল বাসন্তীর ওপর। দু'হাতে টিপে ধরল ওর গলা। —জেনে যা, আমি যা বলি তাও ফলে, তা'ও ঠিক হয়। আমি বলেছি তোকে খুন করব, এই করছি খুন। প্রমাণ দিচ্ছি আমার কথাও সঠিক হয়, আমার মুখে যা বেরোয় তার উল্টোই শুধু ঘটে না। একবারের মতো অন্তত আমার কথা ফলেছে জেনে মর,আমার এ অপবাদ, এ দুর্নাম মিথ্যে।—বাসন্তীর চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছিল, সেই যন্ত্রণাময় চাউনি এক সময় নিথর হয়ে গেল। চাকর বন্ধ দরজার বাইরে অবিরাম করাঘাত করে যখন লোক ডেকে আনল তখন সব শেষ। কেউ একজন ডাক্তারও ডেকে এনেছিল। চৌধুরী ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করল চুপি চুপি, —দেখো তো ডাক্তার, সত্যি সত্যি মারা গেছে, না এখনো বে'চে আছে। পরীক্ষা শেষে ডাক্তার রায় দিল মৃতা। প্রচণ্ড অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল বিপরীত চৌধুরী। জিতে গেছি ডাক্তার। ঘুচে গেছে দুর্নাম, বে'চে গেছি আমি। আমি যা বলি তার উল্টো হয় বলতে তোমরা। এই দেখো, সে কথা আমি মিথ্যে প্রমাণিত করেছি। আমি বলেছিলাম ওকে আমি খুন করব। আমি তাই করেছি। কই, এবার বাঁচাও তোমরা। উল্টোটা কেমন হয় দেখাও। দাঁড়িয়ে দেখছো কি, অ্যাঁ? কি, এখনো বিশ্বাস হচ্ছে না তোমাদের? বিশ্বাস হচ্ছে না?

......সে দৃশ্য আমি দেখিনি। কিন্তু যাঁরা দেখেছে বর্ণনা করতে আজো তারা শিউরে ওঠে।—মিঃ মিত্র চুরুটটা ছ'ুড়ে ফেলে দিলেন,—হ্যাঁ, যা ভাবছেন তাই। বিপরীত চৌধুরী এখন রাঁচীতে। অনেকবার ভেবেছি দেখা করতে যাবো, কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাইনি। যেতে পারিনি। —মিস্টার মিত্র হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন,—মাপ করবেন। আমার একটা জরুরী চিঠি লিখতে হবে এক্ষুনি, আমি উঠছি।—তাড়াতাড়ি উঠে এলোমেলো পা ফেলে নিজের ঘরে চলে গেলেন মিঃ মিত্র। আমরা চুপ করে রইলাম।

সেই ভয়াটে নিঃশব্দতার মধ্যে শুধু উইলসন ড্যাম গর্জন করে চলল একটানা।

তৃতীয় পুরুষ

শিবরাম চক্রবর্তী

এসেছিলে তুমি বটে।   তবুও তুমি তো আসো নাই,
নিকটে এসেও যেন থেকেছিলে কতই না দূরে।
আমিও তো গিয়েছিনু কতোবার আলোছায়া ঘুরে,
তোমার পাশেই গেছি, পাবো বলে'......বৃথা বাসনাই!
ছিলে না তোমার কাছে তুমি। আমি গেছি আমাকে ছাড়াই।

এলাম গেলাম মোরা নিজেদের না নিয়ে যে সাথে,
পেলাম না কারো দেখা। কে বুঝি বা রহিলো তফাতে?

যখন এলেন তিনি তোমাকে তাঁহার সাথ করে'......
তখনি এলে তো তুমি, এলে যে আমার কাছাকাছি।
যখন গেলাম আমি, আগে তাঁর মোলাকাত করে',
গেলাম তোমার কাছে, তুমিও বেরুলে সাথে সাথে।
তখনি মোদের দেখা হোলো সেই মুহূর্ত-বেলাতে।

যখন গেলাম মোরা দুজনে দোঁহার হাত ধরে,
গেলাম তাঁহার কাছে.....দেখি শুধু দুজনাই আছি॥

এসপ্লানেড

শিবদাস চট্টোপাধ্যায়

এক রাস্তা লোক—
কায়ক্লেশে সোজা শিরদাঁড়া—
কেন্দ্রভ্রষ্ট, ঘোরেফেরে আনন্দ-কাঙাল।
কেউ সিদ্ধিতে উজ্জ্বল—
ঈশ্বরকে ইহলোকে বহুবার ব্যবহার ক'রে;—
লজ্জাহত কেউ
রফা করে জীবনের সর্বনিম্ন ধাপে।
কেনাবেচা চলে
রূপো আর রূপে
বাঁকাচোখ রমণী এমনি কিছু চায়,
স্তন্যপায়ী মানবক—
লালসায়
দু' হাত বাড়ায়।

বাহির আকাশ
কাশফুল মেঘে ঢাকা—
যেন কা'কে ডাকে
বন্দর যেমন ক'রে ডাকে
জাহাজকে—
উচ্ছৃঙ্খল রাতে।

গানের আসর

শার্ঙ্গদেব

বাংলার সংগীতে ফাল্গুন পূর্ণিমা—
খেতরির জন্মোৎসব

বাংলার সংগীতে ফাল্গুন পূর্ণিমার একটি বিশেষ গৌরবজনক ঐতিহ্য রয়ে গেছে। এই ফাল্গুন পূর্ণিমাতেই পদাবলী কীর্তনের সুসম্বন্ধ রূপটি প্রথম আত্ম-প্রকাশ করে খেতরির মহোৎসবে। প্রসিদ্ধ গরাণহাটি কীর্তনের প্রতিষ্ঠা এই ফাল্গুন পূর্ণিমা তিথিতেই সুসম্পন্ন হয়। সমগ্র ভারতে ফাল্গুন-পূর্ণিমা নানাজনে নানা-ভাবে পালন করেন, আমরা এই আসরে আজ পবিত্র পদাবলী কীর্তন প্রচারের ইতিবৃত্তটি শ্রদ্ধার সংগে স্মরণ করি।

পদাবলী গায়নের সূত্রপাত বোধ হয় মহাপ্রভু নিজেই করে যান। নবদ্বীপে কাজী-দলন উপলক্ষ্যে যে নৈশ নগরকীর্তন তিনি বের করেছিলেন তাতে গেয়েছিলেন,

"তুয়া চরণ মন লাগহুঁ রে।
শারঙ্গধর তুয়া চরণ মন লাগহুঁ রে॥"

এর পরে নীলাচলে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে গাইলেন—

"সেই তো পরাণনাথ পাইনু।
যাহা লাগি মদন দহনে ঝুরি গেনু॥"

এইসব গানে পদাবলী কীর্তনের স্পর্শ পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু এটুকুই—এর বেশী যে পরিচয় আমরা পাই তা নাম-কীর্তন। মহাপ্রভুর জীবিতকালে নাম-কীর্তনেরই প্রাধান্য ছিল। প্রকৃত পদাবলী কীর্তনের প্রতিষ্ঠা করলেন নরোত্তম ঠাকুর, মহাপ্রভুর তিরোধানের কিছুকাল পরে।

ঠাকুর শ্রীল নরোত্তম রাজসাহীর অন্তর্গত গড়ের-হাট (গরাণহাট) পরগণার খেতরির গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। সম্ভবত শ্রীচৈতন্যের তিরোধানের অল্পকাল আগে বা পরে তাঁর জন্ম হয়। এঁরা ছিলেন সেকালের "রাজা" উপাধিধারী জমিদার। বাল্যকাল থেকেই রাজপুত্র নরোত্তম সংসার বিরক্ত সুতরাং "রাজ" উত্তরাধিকার গ্রহণ না করে সেটি তিনি অর্পণ করলেন তাঁর পিতৃব্যপুত্র সন্তোষদত্তের ওপর। এই সন্তোষ রায়ই খেতরির বিরাট মহোৎসবের সমস্ত আয়োজন সুচারুরূপে নিষ্পন্ন করেন।

নরোত্তম যৌবনে গৃহত্যাগ করে বৃন্দাবনে আসেন। এখানে তিনি শাস্ত্রাধ্যয়ন করেন শ্রীজীব গোস্বামীর কাছে এবং শ্রীলোকনাথ গোস্বামীর কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তারপর গৌড়মন্ডলে ফিরে এসে আবার নীলাচলে যাত্রা করেন।

নীলাচলে নরোত্তম স্বপ্ন দেখলেন—রথাগ্রে শ্রীচৈতন্য গণসহ কীর্তন করছেন এবং তিনি একান্তে দাঁড়িয়ে বিহ্বল হয়ে সেই কীর্তন এবং নৃত্য উপভোগ করছেন। তারপর—

"নরোত্তম চেষ্টা দেখি প্রভু প্রেমাবেশে।
দুটি হাত ধরি কিছু কহে মৃদুভাষে॥
অলৌকিক গীতবাদ্য করিবে প্রকাশ।
যাহার শ্রবণে হৈবে সভার উল্লাস॥
দেখিতে পাইবে যবে করিবে কীর্তন।
ঐছে সভাসহ মুঞি করিব নর্তন॥
মোর মনোবৃত্তি গীতবাদ্যে ব্যক্ত হৈবে।
পরম রসিক সাধু সদা আস্বাদিবে॥"
(নরোত্তম বিলাস)

এই বলে শ্রীচৈতন্য তাঁকে গৌড়ে ফিরে যেতে আদেশ করলেন।

নরোত্তম খেতরিতে ফিরে এসে পাঁচটি বিগ্রহের সংগে স্বপ্ন-নির্দেশ অনুযায়ী প্রাপ্ত শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি স্থাপন উপলক্ষ্যে এক মহোৎসবের আয়োজন করলেন। গৌড়মন্ডলে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সর্বত্র আমন্ত্রণপত্র গেল যে খেতরিতে ফাল্গুন-পূর্ণিমায় বিগ্রহ স্থাপন উপলক্ষ্যে এক মহোৎসবের আয়োজন করা হয়েছে—তাঁরা যেন অবশ্যই এই মহোৎসবে উপস্থিত হন। এইটিই খেতরির মহোৎসব নামে খ্যাত।

যথাসময়ে খেতরি গ্রাম বহু বিশিষ্ট বৈষ্ণব সমাগমে মুখরিত হয়ে উঠল। সংকীর্তন স্থল মন্দিরসংলগ্ন গৌরপ্রাঙ্গণ অপূর্ব চন্দ্রাতপে আবৃত—চারদিকে শত শত মাল্যবেষ্টিত কদলীবৃক্ষ রোপিত হয়েছে। নানাদেশ থেকে গায়ক, বাদক, নর্তক এসে সমাগত হয়েছেন এবং তাঁরা তাঁদের সংগীতে কিছু কিছু অগ্রিম পরিচয় প্রদান করছেন। ইতস্তত বহু মাল্যকার মাল্যগ্রন্থনে নিযুক্ত। বহুলোক একাগ্র মনে চন্দন ঘর্ষণে রত। পবিত্র চন্দন গন্ধে সমগ্র খেতরি গ্রাম আমোদিত। এইসব মাল্যচন্দন শত শত বৈষ্ণবের অংগশোভা বর্ধন করবে। শুক্লাচতুর্দশীর রাত এইভাবে উৎসাহে, আনন্দে অতিবাহিত হ'ল।

পরদিন "শ্রী ফা ল্গু ন পৌ র্ণ মা সী"। বৈষ্ণবগণ প্রত্যূষে শ্রীমন্দিরে সমাগত হলেন। তাঁদের কপালে তিলক, বাহু, বক্ষ নামাংকিত এবং পরিধানে নবীন বস্ত্র। প্রথমে অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হল। বহুবিধ বাদ্যসংযোগে বেদ মন্ত্রোচ্চারণে সভাস্থল মুখরিত হয়ে উঠল এবং সাড়ম্বরে আরাত্রিক ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হল। ভোগ সমাপনের পর সমাগত শিষ্টজন প্রসাদী মাল্যচন্দন পেয়ে পুলকিত হলেন। এইভাবে বিগ্রহ

স্থাপনকার্য সমাপ্ত হলে বৈষ্ণবগণ নরোত্তমকে সংকীর্তন আরম্ভের অনুমতি প্রদান করলেন।

প্রথমে দেবীদাস ধীরে ধীরে মর্দল বাদন আরম্ভ করলেন। বল্লভদাস তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। গৌরাঙ্গদাস মন্দিরায় অপূর্ব মাধুর্যের অবতারণা করলেন। এইভাবে বাজনা কিছু জমে উঠলে গোকুল-দাস অনিবন্ধ গীত আরম্ভ করলেন।

"অনিবন্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ॥
আলাপে গমক-মন্দ্র-মধ্য-তার স্বরে।
সে আলাপ শুনিতে কেবা, বা ধৈর্য ধরে॥"
(ভক্তি রত্নাকর)

অনিবন্ধ গীতালাপ সমাপ্ত হলে শ্রীখণ্ডবাসী রঘুনন্দন গণসহ নরোত্তমকে আলিঙ্গন করে খোল-করতালে মাল্যচন্দন স্পর্শ করলেন। নরোত্তম তাঁকে প্রণাম করে নিজে নিবদ্ধ গীত আরম্ভ করলেন। নিবদ্ধ গীতের প্রারম্ভে গৌর-চন্দ্রিকা।

"শ্রীরাধিকা ভাবে মগ্ন নদীয়ার চান্দ।
সেই ভাবময় গীত রচনা সুছান্দ॥"
(ভক্তি রত্নাকর)

গৌরগুণগীতারম্ভেই সকলে আনন্দে অধৈর্য হয়ে পড়লেন, তার ওপর যখন গৌরচন্দ্রিকা সমাপনান্তে নরোত্তম শ্রীরাধা-কৃষ্ণের বিলাস অর্থাৎ পদাবলী ধরে লীলা-কীর্তন আরম্ভ করলেন তখন সমগ্র মহোৎসবে একটি পুলকের আলোড়ন দেখা গেল। ভক্তগণ পুলকে উচ্ছ্বসিত হয়ে শ্রীস্বরূপ দামোদরের কথা স্মরণ করতে লাগলেন। মহাপ্রভু শেষ জীবনে স্বরূপের কাছে ভক্তিরসসম্পন্ন উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শুনতেন—সেই স্বরূপই যেন স্বয়ং নরোত্তমের কণ্ঠে অধিষ্ঠিত হয়েছেন।

ক্রমে সকলেই যখন অপূর্ব সঙ্গীত-রসে পরম বিহ্বল—আত্মবিস্মৃত, সেই সময় "গণসহ অধৈর্য হইলা গোরারায়।" নরোত্তম নীলাচলে যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা সফল হ'ল। হঠাৎ সম্বিৎ পেয়ে সকলে যেন দেখলেন মহাপ্রভু গণসহ অবতীর্ণ হয়ে মণ্ডলী বন্ধনে সেই নৃত্যে যোগদান করেছেন। তখন সকলেই বিভোর হয়ে সেই নৃত্যোৎসবে মেতে উঠলেন। এইভাবে আত্মবিস্মৃত নৃত্য চলতে লাগল; কিন্তু "গণসহ সঙ্কীর্তনে প্রকটিলা যৈছে। অকস্মাৎ প্রভু অদর্শন হৈলা তৈছে।" আর মহাপ্রভুর অন্তর্ধানের সঙ্গে সঙ্গে সকলে আবার বাহ্যজ্ঞান ফিরে পেলেন নৃত্য আর জমল না মহাপ্রভুর অদর্শনে সকলেই অবসন্ন। তখন আবার উৎসাহ সঞ্চারের জন্য নিত্যানন্দপত্নী জাহ্নবী ঈশ্বরী মন্দিরের বিগ্রহে ফাগ প্রদান করে ফাগ খেলার সূত্রপাত করলেন। ফাগ খেলা সমাপ্ত হতে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সান্ধ্য আরাত্রিকের পর শ্রীগৌরাঙ্গের পুণ্য জন্মাভিষেক সম্পন্ন হ'ল। অতঃপর যেসব গায়ক নানাদেশ থেকে এসেছিলেন তাঁরা পূর্ণচন্দ্রালোকে গৌরপ্রাঙ্গণে বসে নানা-বিধ গান আরম্ভ করলেন।

"হইল প্রভুর অভিষেক সমাধান।
ক্রমে গান বাড়ে নহে গানের বিরাম॥
গানানন্দে নিমগ্ন হইয়া অতিশয়।
পোহাইলা নিশি কৈছে কিছু না জানয়॥"
(ভক্তি রত্নাকর)

এইভাবে খেতরির মহোৎসবে পুণ্য ফাল্গুনী পূর্ণিমা তিথি সম্পূর্ণ সঙ্গীতানুষ্ঠানের ভিতর দিয়ে উদ্‌যাপিত হল।

নরোত্তমবিরচিত এই যে লীলাকীর্তন এইটিই "গরাণহাটি কীর্তন" নামে পরিচিত। গড়েরহাট বা গরাণহাট পরগণার নামানুসারেই এই কীর্তনের নামকরণ হয়েছে।

এই বর্ণনা থেকে এটা বোঝা যাবে যে সেকালের প্রবন্ধাদির নিয়ম অনুসারেই সংগঠিত হয়েছে প্রাচীন কীর্তন। ধ্রুবপদে যেমন আলাপের পরে গানের নিয়ম তেমনি এই কীর্তনেও আলাপের পর গীত সম্পাদিত হয়েছিল। গানের আগে খোল-করতাল প্রভৃতি সহযোগে একটা জমাট বাজনার পরিকল্পনাও সম্মেলক গীতের পূর্বে আসর জমানোর পদ্ধতি হিসাবে চমৎকার। এতে একটি সঙ্গীতের আব হাওয়া সৃষ্ট হয়। এই বাজনার সঙ্গে তালের বোল উচ্চারণ করাও নিয়মসঙ্গত ছিল। এই বোল উচ্চারণকে বলা হ[illegible] "পাট"।

প্রাচীন কীর্তনে দুটি রীতি সামঞ্জস্য সাধিত হয়েছে। একদিকে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আদর্শ অনুযায়ী অনিবন্ধ এবং নিবন্ধ পদের গা[illegible] আপরদিকে লোকরীতি অনুযা[illegible] বাহুল্য বর্জন। প্রধানত এই সঙ্গীতান

ষ্ঠানে খোল, মন্দিরা, করতাল এই কয়েকটি বাদ্যই ব্যবহৃত হয়েছিল। বীণা জাতীয় উচ্চাঙ্গের বাজনা দিয়ে কীর্তনকে জাতে তোলা হয়নি। এই সংগীত প্রতিষ্ঠায় নরোত্তম এত দক্ষতা দেখিয়েছিলেন যে এটি তাঁর নিজ সৃষ্ট সংগীত বলেই অভিহিত হয়েছে।

নরোত্তম প্রবর্তিত সংগীত প্রসঙ্গে একটি কথা পরিষ্কারভাবে বোঝা দরকার। সেটি হচ্ছে এই যে প্রাচীন পদাবলীর গায়ন এবং কীর্তনে ব্যবহৃত এই সকল পদাবলীর গায়ন পদ্ধতির মধ্যে প্রভেদ ছিল বিস্তর। পদাবলীর মূল প্রবন্ধ-রূপ ছিল স্বতন্ত্র। কিন্তু কীর্তনে যখন পদাবলীর ব্যবহার হ'ল তখন তার রীতিটা কীর্তনের বিশেষ রীতির সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া হ'ল অতএব কীর্তনে প্রচলিত পদাবলীর রূপ থেকে মূলপদাবলীর রূপ সম্বন্ধে বিচার করলে ভুল হবে।

নরোত্তম যখন কীর্তনে নবরীতির প্রবর্তন করলেন তখন সমগ্র উত্তর ভারতে সংগীত নিয়ে একটা আলোড়ন চলেছে। পূর্বপ্রচলিত বিভিন্ন প্রবন্ধ সংগীত ক্রমেই নির্দিষ্ট পন্থা থেকে বিচ্যুত হ'য়ে এমন অবস্থায় এসে পড়েছে যে সেগুলির একটি রীতিসম্মত সংগঠন বিশেষ প্রয়োজন হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই প্রেরণা থেকেই ধ্রুবপদ সংগীতের উদ্ভব। নরোত্তম যখন তাঁর সংগীতে নতুন রূপ প্রদান করছেন তখন ধ্রুবপদেরও অভ্যুদয় হচ্ছে এবং এই সব নবরীতি তিনি তাঁর সৃষ্টিতে প্রয়োগ করেছেন এইটা প্রাচীন কীর্তনের রূপ দেখলে অনায়াসেই অনুমান করা যায়। তবে এই জিনিসটা অনুকরণ নয় এবং ধ্রুবপদের আদর্শই যে তিনি নিয়েছেন এটাও জোর করে বলা যায় না কেননা এবিষয়ে কোন উল্লেখ শাস্ত্রাদিতে নেই। আসলে যে প্রেরণার বশে ধ্রুবপদ প্রবন্ধ সংগঠিত হয়েছে সেই প্রেরণা থেকেই কীর্তনের উদ্ভব হয়েছে। নরোত্তম সে যুগের প্রচলিত প্রবন্ধাদির কতিপয় বিশিষ্ট রীতি নিয়ে তাঁর সংগীতের প্রবর্তন করলেন। তবে, এ বিষয়ে ধ্রুবপদের রীতি তাঁর ওপর কিঞ্চিৎ প্রভাব বিস্তার করেও থাকতে পারে। বলা বাহুল্য নরোত্তম পশ্চিমাঞ্চল পরি-ভ্রমণের সময় ভারতীয় সংগীতের বিবিধ বৈচিত্র্যের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন এবং এই অভিজ্ঞতা কীর্তন সংগঠনের কাজে লাগিয়েছিলেন।

কীর্তনে উচ্চাঙ্গ সংগীতের রূপবন্ধ কিছু সংযোগ করলেও নরোত্তম ভক্তি-রসাত্মক সংগীত হিসাবে তার যে ঐতিহ্য ছিল তাকে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন করেন নি। কীর্তনের যথানির্দিষ্ট গায়ন-প্রথা তিনি সর্বথা বজায় রেখেছিলেন এবং উচ্চাঙ্গের বাদ্যযন্ত্রাদিও কীর্তনে অনুমোদন করেন নি। অথচ এই কারণে কীর্তনের নিজস্ব রস-মাধুর্যের কোন তারতম্যও ঘটেনি। এই সব দিক থেকে বিচার করলে নরোত্তমকে প্রথম শ্রেণীর সুরকারগণের মধ্যে অগ্রগণ্য বলা যায় এবং বলতে গেলে তিনিই মধ্য যুগে বাংলার প্রথম শিক্ষিত এবং প্রবন্ধ সুরকার।

আসরের খবর

দক্ষিণী

দক্ষিণীর কর্তৃপক্ষ তাঁদের বর্তমান শিক্ষা-ভবনের সন্নিকটে ১, দেশপ্রিয় পার্ক ওয়েস্ট ভবনটি তাঁদের গৃহ-নির্মাণ তহবিল থেকে ক্রয় করবেন বলে ঠিক করেছেন এবং আগামী ২৫শে বৈশাখ ঐ নূতন ভবনে আনুষ্ঠানিকভাবে গৃহপ্রবেশ করবেন বলে স্থির করেছেন।

দক্ষিণীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে ১৯৪৮ সালে। গত সাত বছরের মধ্যে তাঁরা সরকারী সাহায্য না নিয়েই যে সাফল্য অর্জন করেছেন তা প্রশংসনীয়।

আগামী ৮ই, ১০ই, ১১ই ও ১২ই এপ্রিল দক্ষিণীর গৃহনির্মাণ তহবিলের সাহায্যার্থে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যবহুল গীতিনাট্য "বাল্মীকি-প্রতিভা" নিউ এম্পায়ারে মঞ্চস্থ হবে।

মহাশয়,—

আপনার পত্রিকায় "গানের আসর" রচয়িতা পুরাতন গ্রামোফোন রেকর্ড সংগ্রহের যে নির্দেশ দিয়াছেন সেই সূত্রে এই পত্র আপনাকে লিখিতেছি।

আমাদের বাড়িতে বহুসংখ্যক রেকর্ড ছিল, আগেকার দিনের, গ্রামোফোন কোম্পানীর একপাঠে ছাপবার যুগের। সব আমার জন্মের পূর্বেকার, অর্থাৎ চল্লিশ বছরের আগেকার। সম্প্রতি ছুটিতে বাড়ি আসিয়া দেখিলাম অযত্নের দরুণ প্রায় বেশীর ভাগ রেকর্ডই নষ্ট

হইয়া গিয়াছে। যাহা আছে এখনও, তাহার একটি তালিকা এইসঙ্গে পাঠাইলাম। প্রাচীন গাইয়ে এবং প্রাচীন বাঙলা গান সম্পর্কে আমাদের মনে এখনও যথেষ্ট আগ্রহ এবং খানিকটা গর্ব আছে। এইসব সংগীত যদি জীয়াইয়া রাখা যায় তাহা হইলে সত্যই একটি কাজের কাজ হইবে। ইতি—শ্রীসান্ত্বনানন্দ সেনগুপ্ত, পাটনা।

পুরাতন রেকর্ডের তালিকা

১। তুমি কাদের কুলের বৌ (ভৈরবী)—লালচাঁদ বড়াল; ২। হরি তোমাতে আমাতে (ভৈরবী)—পুলিনবিহারী মিত্র; ৩। বিফল জনম বিফল জীবন (ভৈরবী)—ব্রজেন চক্রবর্তী; ৪। গোটে হতে আইল—বেদানা দাসী; ৫। বাজাওয়ে চিকণ কালা (খাম্বাজ-দাদরা)—বেদানা দাসী; ৬। মাতালের গোপালদা (কমিক)—গোপালচন্দ্র সিংহ; ৭। কমিক—গোপালচন্দ্র সিংহ; ৮। যদি পরাণে না জাগে (খাম্বাজ-ঠুংরি)—বেদানা দাসী; ৯। কেমনে বল ভালো না বেসে (খাম্বাজ-কাওয়ালী)—বেদানা দাসী; ১০। আজু রজনী হাম ভাগে (ঠুংরি)—বেদানা দাসী, আমি-আমি বলে কেন প্রাণে (ভীমপলশ্রী)—বেদানা দাসী; ১১। যদি এসেছ এসেছ (ইমন ভূপালী)—নগেন্দ্রবালা দাসী; ১২। আজ কেন কালী কদম্বের (ঝিঁঝিট খাম্বাজ)—দ্বিজেন বাগচী; ১৩। তোমার বিরহ সহে (ভৈরবী)—গহর জান; ১৪। কাঁদায়ে কারে বল (কাওয়ালী)—কিরণবালা; ১৫। সানাই (আশোয়ারী)—তালিম হোসেন; ১৬। উঠো গো ভারতলক্ষ্মী (সিন্ধু)—সত্যভূষণ গুপ্ত; ১৭। আগডুম-বাগডুম-ঘোড়াডুম—মন্মথ রায়; ১৮। তুমি সন্ধ্যার মেঘমালা (ইমন কল্যাণ)—সত্যভূষণ গুপ্ত; ১৮। "আমার জন্মভূমি" (ধন-ধান্যে পুষ্পে-ভরা)—ক্যালকাটা ইভ্নিং ক্লাব; ২০। যমুনে এই কি তুমি সেই যমুনা (কীর্তন)—পূর্ণকুমারী, কি মধুর সুরে বাঁশী (পিলু-বারোয়া)—পূর্ণকুমারী; ২১। নেবুতলা ঐকতান (ইমন একতালা); ২২। ক্ল্যারিওনেট (সিন্ধু খাম্বাজ)—রাজেন চ্যাটার্জি; ২৩। আমার সাধ না মিটিল (সাগিয়া)—জ্ঞানেন্দ্রনাথ বসু; ২৪। আজি লো সজনী প্রেমের (কেদারা)—দ্বিজেন বাগচী; ২৫। কেন যামিনী না যেতে জাগালে না (রবীন্দ্র)—দ্বিজেন বাগচী; ২৬। গোকুলে গোপনে শ্যাম (ভৈরবী)—দ্বিজেন বাগচী; ২৭। আমারে আসতে বলে (সিন্ধু মিশ্র)—লালচাঁদ বড়াল; ২৮। এখনও তারে চোখে দেখিনি (বেহাগ খাম্বাজ)—দ্বিজেন বাগচী; ২৮। তোরা কে মালা নিবি আয় (জংলা-কাশ্মীরী-খেমটা)—বেদানা দাসী; ৩০। পাখী এই কি গাহিলি গান্তে (সিন্ধু খাম্বাজ)—দ্বিজেন বাগচী; ৩১। মরমে মরম যাতনা (খাম্বাজ)—বেদানা দাসী; ৩২। ওমা কেমন মা তা কে জানে (সিন্ধু খাম্বাজ)—লালচাঁদ বড়াল; ৩৩। আমার আর কিছু ভালো (সুরট-কাওয়ালী)—লালচাঁদ বড়াল; ৩৪। এমন দিন কি হবে তারা (সিন্ধু)—বিজয়-গোপাল লাহিড়ী; ৩৫। প্রলয় পয়োধী জলে (মুলতানী)—মহেন্দ্র ব্যানার্জি; ৩৬। ওহে ফুলসর আমাদের (মিশ্র)—সত্যবালা ও বিন্দুবালা; ৩৭। গীয়ারা মুবারোলী (ইমন ভূপালী)—বিনোদিনী দাসী; ৩৮। প্রাণ আর বাঁচে কেমনে (বারোয়া-পিলু)—বিনোদিনী দাসী; ৩৯। বারে বারে যে দুখ দিয়েছ (খাম্বাজ)—দ্বিজেন বাগচী; ৪০। চন্দন-চর্চিত নীলকলেবর (খাম্বাজ)—মহেন্দ্র ব্যানার্জি; ৪১। কেমনে কাটাব সারারাতি (দুর্গাদাস)—সুশীলা দেবী; ৪২। শ্মশান ভালোবাসিস বলে (খাম্বাজ)—চারুবালা; ৪৩। মনের বাসনা শ্যামা (ভূপালী)—লালচাঁদ বড়াল; ৪৪। "বন্দে-মাতরম্" (মল্লার-কাওয়ালী)—রাজেন্দ্রনাথ বসু; ৪৫। কি রূপ হেরি হরি (বাগেশ্রী)—লালচাঁদ বড়াল; ৪৬। সে মুখ কেন অহরহ ("রাণা প্রতাপ")—মানদাসুন্দরী দাসী; ৪৭। মথুরাবাসিনী মধুর-হাসিনী (কীর্তন)—শ্রীমতী অমলা দাস (মিস দাস); ৪৮। এ জনমের সঙ্গে কি সই (কীর্তন)—শ্রীমতী অমলা দাস (মিস্ দাস); ৪৯। কেমন করে গান করহে (মিশ্র খাম্বাজ)—ব্রজেন গাঙ্গুলী; ৫০। আজ প্রণমি তোমারে চলিব (বিভাস)—ব্রজেন গাঙ্গুলী; ৫১। হোলি খেলব সবার সনে (হোলি)—সুধামাধব সেনগুপ্ত; ৫২। আজ ফাগুনে এলে কি শ্যাম (হোলি)—সুধামাধব সেনগুপ্ত; ৫৩। বরণ করে নেব তোমায় (খাম্বাজ)—সুধামাধব সেনগুপ্ত; ৫৪। সেদিন সেই সাঁঝের হাওয়া (খাম্বাজ)—সুধামাধব সেনগুপ্ত; ৫৫। আয় রে বসন্ত ("চন্দ্রগুপ্ত")—সুবাসিনী; ৫৬। আমি চেয়ে থাকি দূরে ("পরপারে")—সুবাসিনী; ৫৭। সুন্দরী রাধে আও হে (ভৈরবী-গোবিন্দদাস)—শ্রীমতী অমলা দাস (মিস দাস); ৫৮। এ ভরা বাদর মাহ ভাদর (মল্লার-বিদ্যাপতি)—শ্রীমতী অমলা দাস; ৫৯। কোথা প্রাণসখা (কীর্তন)—মাস্টার মদন; ৬০। সন্ধ্যা সমীরে থরে থরে (পূরবী)—মাস্টার মদন; ৬১। আর ত যাব না লো সই—সুধামাধব সেনগুপ্ত; ৬২। যমুনাতে আর ত' যাব না—সুধামাধব সেনগুপ্ত; ৬৩ আমার রাধা নামে সাধা বাঁশী ("জয়দেব")—গ্রামোফোন থিয়েট্রিক্যাল পার্টি; ৬৪। কা তরে তুই কাঁদিস্ ("জয়দেব")—গ্রামোফোন থিয়েট্রিক্যাল পার্টি।

৪০

বেলা দশটা। না আরো বেশি। রোদ কড়কড়ে হয়ে গেছে। উঠোনের মাটি গরম হয়ে উঠল বলে। বাড়ির লোকজন কিছু কমেছে। তাই শাড়ি সায়া লুঙি চাদর বাইরের দড়িতে কম ঝুলছে। বেশ ফাঁকা ঠেকছে উঠোনটা। যেন অনেকটা জায়গা পেয়ে মাস্টারের ঘরের হাবুলা, হাবুলার ছোট নেপ্‌লো, প্রমথদের ঘরের গোপ্‌লো, ভুবনের ঘরের শম্ভুচরণ বিষ্ণুচরণ এবং এ-বাড়ি ছাড়াও পাড়ার সমবয়সী গুর্খা চন্দন পল্টু ইত্যাদি মিলিয়ে প্রায় দশবারটি ছেলে হাতে একটা করে মানকচুর ডগা নিয়ে নিশানের মত সেগুলো শূন্যে নেড়ে হৈ হৈ চিৎকার ক'রে বারো ঘরের উঠোনের চারদিক ঘুরে ঘুরে খেলছে। আর সেই শোভাযাত্রার সঙ্গে ঘুরছে মাছির ঝাঁক। এবং সকলের পিছনে লেজ নেড়ে নেড়ে, যেন ছেলেদের পায়ের সঙ্গে পা মিলিয়ে ঘুরছে রমেশের ঘাড়-মোটা কালো ভুশভুশে রঙের কুকুর ভোম্বল। ভোম্বলের পিঠে এতবড় একটা ঘা। দু'তিন ডজন মাছি সেই ঘা কামড়ে থেকে ভোম্বলের পিঠে চড়ে শোভাযাত্রার সঙ্গে ঘুরছে। এমন সময় কে একজন বারো ঘরের উঠোনে ঢুকে রমেশের ঘরের দরজার সামনে কি একটা ভারিমতন জিনিস ধুপ্ করে মাটিতে ফেলল। ছেলের দল চম্‌কে উঠল, মাছির ঝাঁক ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, লেজ নাড়া বন্ধ রেখে এক সেকেন্ড স্থিরভাবে তাকিয়ে ভোম্বল বড় কচ্ছপটাকে দেখল। চার পা দড়ি দিয়ে বাঁধা। গলা বার করে পিট্‌পিট্ চোখে বারোঘরের উঠোন দেখছে। পিঠে হলুদ সবুজ চাকা চাকা দাগ। কিন্তু কচ্ছপটাকে সবচেয়ে বেশি চমকে দিল তেমনি হলুদে সবুজে ছোপ দেওয়া ও তার ওপর ফিকে লাল ডোরাকাটা চমৎকার শাড়ি পরা মল্লিকা। ঘামছে। এইমাত্র উনুন থেকে কি যেন ভাজা শেষ করে বেরিয়ে এসে ওর টকটকে লাল রং চার-হাত গামছাখানা দিয়ে মুখ মুছছে। কচ্ছপ দেখে মল্লিকার চোখ কপালে উঠল। 'কে পাঠাল?'

'কর্তাবাবু।'

বত্রিশটা দাঁত বের করে বাজারের আলুর গুদামের গোমস্তা শশী মল্লিকার নরম লাল মুখখানা দেখছিল। 'আরো দু'জন বাবুর খাবার নেমন্তন্ন করছেন এই বেলা। আমি গিয়ে আলু আর আদা পেঁয়াজ পাঠিয়ে দিচ্ছি।'

'তুমি ওটাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাও শশী। আর কর্তাবাবুকে গিয়ে বল আর কোথাও ভোট-বাবুদের রেঁধে গিয়ে নেমন্তন্ন খাওয়াক। আমার কোমরে এত তেল নেই হাতে এত জোর নেই, বেলা বারোটার সময় কচ্ছপ কেটে মাংস রাঁধতে বসি। ওমা মা আমি কোথায় যাব গো।' তীব্রস্বরে মল্লিকা আর্তনাদ করে উঠল। 'আমার মরণ নেই, আমার কলেরা হয় না, আমার গলায় ডাকাতের দল দা বসায় না!'

ছেলেরা তো বটেই, শশি, ভোম্বল, মাছিগুলো এবং নবাগত কচ্ছপটাও মল্লিকার সুন্দর চোখের দিকে, নরম ঘেমে ওঠা মুখের দিকে কতকক্ষণ ফ্যাল্ ফ্যাল্ তাকিয়ে থাকে।

পারিজাতের ইলেকশনের ব্যাপারেও তার আর পাঁচটা কাজের মত রমেশ কাল থেকে পরিশ্রম করছে ভোটার জোগাড়ের চেষ্টায় লোকের সঙ্গে মেলামেশা বন্ধুত্ব এবং নিমন্ত্রণ করে খাওয়াবার দিকে মনো-যোগ দিয়েছে। কাল দুপুরেও কে কে জানি রমেশের ঘরে খেয়ে গেল। মল্লিকা আলু-কড়াইশুঁটি দিয়ে ইলিশের ঝোল আর বেগুন সিম দিয়ে কই মাছ, কপির ডালনা আর কাঁচালঙ্কা দিয়ে লাউমুগ রেঁধেছিল। আপত্তি করেছিল এতসব পদ করতে। আজ এখন এই ভরদুপুরে এসেছে কাছিম।

'তা আমার কি হবে ভোটারবাবুদের রেঁধে খাইয়ে। পারিজাত জিতলে দু'শো পাঁচশ ঘরে আসবে না দু'চার বিঘা জমি বাড়বে? অই খাটুনি সার। আঙুল ছোঁয়াবে তোমাদের রমেশ দাদাকে। উঁহু। রোজ রোজ আমি বেলা তিনটে অবধি উনুন গুঁতিয়ে শরীর অঙ্গার করতে পারব না। যাও বলে দাওগে। কোথায় গেছেন বাবু বাজার সেরে? চায়ের দোকানে? এই তো আজ পেট ব্যথা পিঠ ব্যথা। তবু খাওয়া আর খাওয়ানো কমছে না। পেত্নী দৃষ্টি না ফেললে শনি ঘাড়ে না চাপলে কারো এমনধারা মতি-গতি হয়? অ্যাঁ। আমার মরণ নেই কেন গো, আমার কপালে এই সুখ!'

মল্লিকা ফর্সা লাল গামছা দিয়ে চোখ ঢাকল। হাতের যোলটা সোনার চুড়ি রিনঠিন ক'রে উঠল।

প্রমথর দিদিমাকে শেষ রাত থেকে কফে কাবু করে ফেলেছে। তেমন গলা বাড়িয়ে কথা বলতে পারল না। জানালার একটা পাল্লা খুলে বিষণ্ণ চোখে চেয়ে রইল। বিধু মাস্টারের স্ত্রী লক্ষ্মীমণিরও শরীরের অবস্থা ভাল না। শেষ রাত থেকে আজ আবার তলপেটের দিকটা টন্‌টন করছে টাটাচ্ছে। একরকম বেদনাই বলা যায়। তাই ঘরে চুপচাপ শুয়ে। ভুবনের স্ত্রী এক ছেলেকে নিয়ে প্রীতি-বীথি অফিসে বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতায় একটা বাড়ির খোঁজ করতে বেরিয়ে গেছে। রুচি বেরিয়ে গেছে স্কুলে। প্রভাতকণা, কিরণ, কমলা তো নেইই।

কাজেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে একলা হিরণকে মল্লিকার কান্না শুনতে হ'ল এবং দু'টো একটা সহানুভূতির বাক্যও ছাড়তে হল শেষ পর্যন্ত।

'লক্ষ্মীর সংসারে দিদি রান্না খাওয়ার বেলা-অবেলা কি। কড়াই-খুন্তি, ডেকচি-হাতা, থালা-ঘটি আর তোমার সোনার চুড়ির বাদ্যি-বাজনা যদি অষ্টপ্রহর বাজে,

ঈশ্বর থামতে না দেয় তো করবে কি। এত বড় কাছিম এ দিনে ক'জনের ঘরে আসে। নেমন্তন্ন করে চার পদ রেঁধে বাইরের লোককে খাওয়াবার ক্ষমতা ক'টা লোকের আছে। বড় যে মরণ চাইছ।'

শুনে মল্লিকা চোখ থেকে গামছা সরাল। হিরণের দিকে তো তাকালই পরে চোখ দুটো তেরছা করে পাঁচু ভাদুড়ির ঘরের দিকে তাকাল। যশোদাকে দেখা যাচ্ছে না। রমেশ রায়ের দরজায় দশ সের ওজনের কচ্ছপ দেখে তাড়াতাড়ি সামনের পাল্লা দুটো বন্ধ করে দিয়েছে যশোদা ও চুপ করে আছে বাড়ির বাকি ঘরগুলো টের পায়।

এখন গলা কাটি কি দিয়ে। তুমি তো বৌ বলে খালাস, চুড়ির বাজনা, হাতা-খুন্তি, থালা-গেলাসের বাজনা বাজাও। কাটারি দিয়ে এত বড় জন্তুর গলা পিঠ আমি মেয়েমানুষ আলগা করতে পারি!' মল্লিকা এবার অল্প হেসে হিরণের দিকে তাকায়।

প্রমথর দিদিমা খনখনে গলার কফ অতি কষ্টে সরিয়ে আস্তে আস্তে মাথা দুলিয়ে বলল, 'কাটারি দিয়ে সুবিধা হবে না বৌ, কুড়ুল দিয়ে কচ্ছপ মহারাজের পিঠের শক্ত চারাটি খুলে ফেল।'

বুঝি কুড়ুল আনতে মল্লিকা ঘরে ঢুকেছিল, শশী গোমস্তা ফাঁক বুঝে বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল। চরম সুযোগ উপস্থিত দেখে ছেলের দল, মাছির ঝাঁক ও ভোম্বল কচ্ছপটার কাছে তাড়াতাড়ি সরে গিয়ে জলের জীবটির সবুজ হলুদে মেশানো পিঠের চমৎকার চক্রগুলো দেখছিল।

এমন সময় কে এসে সংবাদ দিল জানা গেল না। অবশ্য দরকারও নেই তাকে জানবার। খবরটাই এখানে বড়। যেমন আগুনের হলকা ছড়িয়ে দিতে দমকা হাওয়া বয়, গাছপালা ভেঙে দিতে অরণ্যে ঝড় ওঠে, ভূমিকম্পে জগত-সংসার দুলে ওঠে তেমনি সেই ভীষণ সংবাদ শুনে মস্ত উঠোন কেঁপে উঠল, রোয়াক দরজা জানালা টিন টালি কড়িকাঠ সমেত বারো কামরার জাহাজ বাড়ি টলমল করতে লাগল। শোরগোল উঠল। আর্তনাদ শোনা গেল। ভয়। বিস্ময়। একটু সময়।

তারপর সমস্ত বাড়ির শোরগোল. আতঙ্ক ও কান্না। এক জায়গায় একটা দরজায় কেন্দ্রীভূত হয়। খবর শুনে মল্লিকা কেঁদে আছাড় খেয়ে মাটিতে পড়ল, তারপর মূর্ছা গেল।

রমেশ রায়কে কেটে ফেলেছে। ক্ষিতীশের দায়ের কোপে তার দাদা রমেশের ইহলীলা শেষ। হ্যাঁ, তাদের চায়ের দোকানে। এইমাত্র। তৃপ্তি-নিকেতনের মেজেয় রক্তগঙ্গা বইছে।

না, মল্লিকাকে শুশ্রূষা করতে মাছিটাও যেন আর উঠোনে রইল না। সব রাস্তায়। মেহেদির বেড়া ঘেঁষে বড় কাঁঠাল গাছটার গুঁড়িতে যেখানে বাড়ির সব জঞ্জাল জমে ও কিছু বেওয়ারিশ ইঁট ফেলে রাখার দরুণ উঁচু টিলার মতন হয়ে আছে তার ওপর উঠে দাঁড়ায় হিরণ, যশোদা, ময়না, ময়নার মা, প্রমথর মা, প্রমথর ছোট মাসি, পাশের বস্তির সুকুমার নন্দীর স্ত্রী এবং আরো পাঁচ-সাতটি বৌ-ঝি। গাছের নিচে সমান জায়গাটায় পেটের বেদনা নিয়ে কাতরাতে কাতরাতে গিয়ে দাঁড়ায় লক্ষ্মীমণি, কফাশ্রিত খনখনে বুড়ি, লাঠি ভর দিয়ে দু'বার আছাড় খেয়ে কোনরকমে ভুবনও গিয়ে দাঁড়াল, এমন কি যার ঘরের বার হওয়া নিষেধ, বসন্ত-রোগী বিমল হালদার বিছানা ছেড়ে উঠে বাইরে না গিয়ে পারল না। সকলের দৃষ্টি সামনের দিকে। ওখান থেকে দেখা যায় কি রমেশের চায়ের দোকান? বাদাম-তলার ওদিকটায় খোয়া-ঢালা সরু রাস্তাটা একটু বেশি বেঁকে গেছে। তিন নম্বর বস্তির টিনের চালাটা অতটা ঝুলে না পড়লে পরিষ্কার দেখা যেত কাফেলা গাছের ওধারে তৃপ্তি-নিকেতন। তিন মিনিটের পথ। কিন্তু সেই সাংঘাতিক জায়গায় যেতে কারো সাহস হচ্ছে না। কিছুদূর এগিয়ে বড় নর্দমার মুখের কাছে ভিড় করে দাঁড়িয়ে আছে ছেলে-ছোকরার দল। রমেশ রায়ের ঘেয়ো কুকুরটাও সেই অবধি গিয়ে দাঁড়িয়ে আছে লেজ নাড়া বন্ধ রেখে সামনের দিকে তাকিয়ে আছে।

অবশ্য ভয়টা এ বাড়ির লোকের বেশি। বারো ঘরের একজন বাসিন্দা খুন হয়েছে। রমেশের চেহারাটা সকলের চোখের সামনে ভাসছিল। এখন খুন হবার পর না-জানি লোকটার চোখ-মুখ কেমন হয়ে আছে চিন্তা করে তাদের হাত-পা যেন ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। যশোদার হাত ধরে আছে হিরণ, লক্ষ্মীমণির কাপড়ের খুঁট ধরে প্রমথদের ঘরের বুড়ি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে রীতিমত কাঁপছিল। ভুবন লাঠি ভর দিয়ে আর দাঁড়িয়ে থাকতে না পেরে এখন ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। বিমলের গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। একটা কথা সরছে না তার মুখ দিয়ে। হতভম্ব। স্থির সব।

কিন্তু তাই বলে কি আর মানুষ চায়ের দোকানের দিকে যাচ্ছে না। অন্য বাড়ির মানুষ। ভিন্ন পাড়ার মানুষ। ঊর্ধ্বশ্বাসে সব ছুটছে। কি ক'রে যে খবরটা এর মধ্যে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে পড়ল সেটাই আশ্চর্য। এধার থেকে যেমন যাচ্ছে তেমনি খালের ওধার থেকে লোক আসছে। রমেশ রায় খুন হয়েছে। ছোট ভাই ক্ষিতীশ রমেশকে খুন করেছে। বলছিল সব। বলতে বলতে নারকেলডাঙ্গা, কাদাপাড়া, বিবিবাজার, পামারবাজার রোড, মুন্সিবাজার, ওধারে পাগলাডাঙ্গি বাঁধ-তলা, চিনাবাজার থেকে পর্যন্ত লোক আসতে লাগল কুলিয়া-ট্যাংরার 'তৃপ্তি-নিকেতনে'র দিকে।

ভিড় থেকে সরে গিয়ে কাফেলা গাছের ওপাশটায়, রাত্রে যেখানে ঠেলা-গাড়িগুলো জড়ো ক'রে রাখা হয়, একটা সিগারেট ধরিয়ে পাঁচু ভাদুড়ি বিধু মাস্টারের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, 'এইমাত্তর বাক্সের কারখানার সাধনের মুখে শুনলাম ও নাকি বেলা ন'টা পর্যন্ত দোকানে ছিল। কে গুপ্তর মেয়েটাকে দোকানে রেখে রমেশ রায় বাজার করতে বেরিয়েছিল।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাজার থেকে ফিরে আসা পরই তো এ-ব্যাপার।' বিধু গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল।

'কাল দুপুর থেকে ক্ষিতীশ দোকানে ছিল না এবং বাড়িতেও আসেনি।'

'না। ক'দিন থেকেই খুব রাগারাগি করছিল দাদার সঙ্গে। শুনলাম লোকে মুখে। এখন শুনছি। শালার দোকানে যে আমি পেচ্ছাব করতেও যাই না।' বলে পাঁচু চুপ করল। বিধুও চুপ করে রইল ভিড় দেখতে লাগল। দোকানের দরজার কাছে দু'জন পুলিস দাঁড়িয়ে আছে কাজে সেখান পর্যন্ত কেউ যেতে পারছে না আবার যেন কে এল। দোকানের সামনে

থেকে পুলিস লোকজন হঠিয়ে দিচ্ছে। হ্যাঁ, আর একটা পুলিসের গাড়ি। এবার আর শুধু লাল পাগড়ি না, সাদা টুপি, সাদা পোশাক-পরা সার্জেণ্ট এসে গেছে।

'সব আসবে সার্জেণ্ট, দারোগা, ইন্সপেক্টর,—একটা তাজা মানুষ খুন হয়েছে এ কি আর—' প্রায় দম বন্ধ করে বিধু বলল, 'কত এন্‌কোয়ারি কত স্টেটমেণ্ট জবানবন্দী নেয়া হবে একবার দ্যাখো না।'

'তা নিক না। তোমার আমার কি।' যেন একটু বিরক্ত হয়ে পাঁচু ফিসফিসিয়ে বলল, 'যেমন শালা চিটিংবাজ ছিল আক্কেল হয়েছে, খুব হয়েছে, বেশ করেছে ক্ষিতীশ। একটা কাজের মত কাজ করেছে।'

'কিন্তু লোককে চিট্ করতো বলে তো আর ক্ষিতীশ ওকে খুন করেনি। কারণটা যে গুরুতর।'

ভিন্ন পাড়ার লোক এসে হঠাৎ পাশ ঘেঁসে দাঁড়াল বলে পাঁচু কথা বলল না। বললেও অবশ্য ক্ষতি ছিল না। কেননা, এর মধ্যে সবাই জেনে গেছে। কি ক'রে এর মধ্যেই এত সব জানাজানি হয়ে গেল তা দিয়ে দরকার নেই। রমেশের গলায় ক্ষিতীশ কেন দা বসায় সেটাই বড় কথা। হ্যাঁ খুনের কারণ। বাজার সেরে রমেশ যখন দোকানে ঢোকে তখন দোকানে খদ্দের কেউ ছিল না। একটু অবসর পেয়েই পর্দার ওদিকটায় বসে বেবি এক কাপ চা তৈরী করে খাচ্ছিল। রমেশ সরাসরি সেখানে চলে যায়। বাজার থেকে ফেরার পর রমেশকে খুব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল। যেন কোথায় সে কি শুনে এসেছে। দোকানে ঢুকেই সে চোখ লাল করে বেবিকে নানারকম জেরা করতে আরম্ভ করে। তারপর মেয়েটার গায়ে হাত দেয়। এমন সময় পাগলের মত কোথা থেকে ছুটে এসে দোকানে ঢুকে ক্ষিতীশ পিছন থেকে এক কোপে রমেশের গলা আলগা করে দেয়। না, ক্ষিতীশ পালিয়ে যায়নি। সেই রক্তমাখা দা হাতে করে সে তৎক্ষণাৎ থানায় চলে গেছে। খুন দেখে ভয়ে চিৎকার করতে করতে বেবি দোকান থেকে বেরিয়ে সামনের কারখানায় গিয়ে ঢুকেছিল।

'পাপে বাপকেও ছাড়ে না।' ভিন্ন পাড়ার লোকটা সরে যেতে বিধু বলল, 'রমেশটা যে তলে তলে কে গুপ্তর মেয়েটার সঙ্গে এসব করার মতলবে ছিল মাঝে মাঝে আমার ডাউট হত। কেননা, ইদানিং ও একটু বেশি সময় দোকানে থাকত, তুমি কি লক্ষ্য করনি পাঁচু।'

'বেশ হয়েছে। হারামজাদার খুব বাড় হয়েছিল।' সিগারেটের টুকরোটায় শেষ টান দিয়ে পাঁচু সেটা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। 'আরে আমরা শালা ওপেনলি বেশ্যাপাড়ায় যাই। কিন্তু এ যে,—শুনলাম ক্ষিতীশ নাকি থানায় গিয়ে বড় দারোগাকে তাই বলেছে। পাশবিক অত্যাচার করতে চেয়েছিল রমেশ কে গুপ্তর নাবালিকা মেয়ের ওপর। তাই তাকে সংসার থেকে সরিয়ে দিল।'

'গড্। বুঝলে পাঁচু। মাথার ওপর একজন আছে, যে সব অন্যায়ের বিচার করে সব পাপের শাস্তিবিধান করে। আমরা তো আর এটা সব সময় মনে রাখি না। বেবিকেও কি অ্যারেস্ট করা হয়েছে? শুনলাম কে যেন বলল?'

মাথা নেড়ে পাঁচু বলল, 'জানি না।'

মিনমিনে গলায় বিধু বলল, 'ওর স্টেটমেণ্টের ওপর এখন অনেক কিছু নির্ভর করছে। ক্ষিতীশ থানায় গিয়ে সারেণ্ডার করেছে যদিও। এটা—' কথা বন্ধ হ'ল। ভিন্ন পাড়ার মানুষ পিছনে।

আর একটু দূরে, যেখানে খোয়া-ঢালা রাস্তাটা একটা পড়ো জমির গা ঘেঁষে সোজা বড় রাস্তায় গিয়ে মিশেছে, কাঁড়গাছের নিচে দেখা গেল পারিজাতের চকচকে সবুজ গাড়িটা দাঁড়িয়ে। পারিজাত ভিতরে বসে কথা বলছে। গাড়ির দরজার সামনে বারোঘরের দুজনকে দেখা গেল। বলাই ও শিবনাথ।

সেখান থেকেও রমেশ রায়ের চায়ের দোকানের দরজা দেখা যাচ্ছে।

শিবনাথ একটু সময় সেদিকে চোখ রেখে পরে ঘাড় ফিরিয়ে পারিজাতের দিকে তাকায়।

'ডেড্-বডি কি এখনি মর্গে নিয়ে যাবে?'

'দেরি হবে।' পারিজাত শিবনাথের দিকে তাকায় না। জানালার বাইরে রৌদ্র-খচিত আকাশের দিকে চোখ ফিরিয়ে আস্তে আস্তে বলল, 'অনেকের স্টেটমেণ্ট নিতে হচ্ছে, এখন আবার একটা পুলিসের গাড়ি এল না?'

বলাই মাথা নাড়ল।

'পুলিস কারখানায় ঢুকেছে। শুনলাম ওখানে দারোয়ান ম্যানেজার সবাইকে কি সব জিজ্ঞাসাবাদ করছে।'

'তা তো করবেই।' পারিজাত এবার শিবনাথের দিকে তাকাল। 'বাড়িতেও যাবে, মানে আমি আপনাদের আট নম্বর বস্তির কথা বলছি।'

'আমাদের কারোর কোনরকম স্টেট-মেণ্ট নেবে কি?' যেন চিন্তান্বিত দেখাচ্ছিল শিবনাথকে।

'না।' পারিজাত মৃদু হাসল। 'মনে তো হয় না,—সম্ভবত বাড়িতে রমেশ রায়ের ওয়াইফের স্টেটমেণ্ট নেবে।'

'বৌবি যখন এর মধ্যে আছে কে গুপ্তর পরিবারকেও তো কিছু জিজ্ঞাসা-বাদ করতে পারে, কি বলেন স্যার?'

পারিজাত বলাইর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসল। 'তা পারে।'

শিবনাথ দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'রমেশ রায়ের মুখটা চোখের ওপর ভাসছে।'

পারিজাতও একটা নিশ্বাস ফেলল।

'ব্রাইট কেরিয়ার ছিল। ব্যবসা-বাণিজ্য এটা-ওটা সবই সুন্দর বুঝত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এমন একটা নেস্টি ব্যাপারে—কষ্ট হয়।' কথা শেষ করে পারিজাত আবার আকাশ দেখে।

'আপনার কাজকর্মের খুব ক্ষতি হ'ল?' শিবনাথ প্রশ্ন করল। একবার চোখ বুজে কি যেন একটা চিন্তা করল পারিজাত, তারপর শিবনাথের চোখে চোখ রেখে গম্ভীরভাবে মাথা নেড়ে বলল, 'খুব বেশি না। ইলেকশন সম্পর্কে বলছেন তো। ও অবশ্য নিজে থেকেই খাটছিল। বাবার সময়ও খুব খেটেছিল। না এসব ব্যাপারে সব সময় তার হেল্‌প পেয়েছি, পাচ্ছিলাম আমরা। ধাপার বাজার টেংরার ওদিকটায় বেশ ইনফ্লুয়েন্স ছিল রমেশের। তা অ্যাক্‌সিডেণ্ট তো আছেই, করা কি—' থেমে চোখ বুজে আবার একটু কি ভেবে নিয়ে পরে পারিজাত শিবনাথ এবং বলাই দু'জনের মুখের ওপর চোখ বুলিয়ে স্বচ্ছ গলায় হাসল। 'এখন আপনাদের হেলপ নেব আপনাকে বলাইচরণকে পেয়ে গেছি যখন আমি আর চিন্তা করি না।'

শিবনাথ এবং বলাই দু'জনের চেহারাই উজ্জ্বল হল। বলাই মাথা নেড়ে বলল, 'লোকটার সব ভাল ছিল, ওই একটু চরিত্তির দোষে সব গেল। কে গুপ্তর ডবকা মেয়েটা যেদিন চায়ের দোকানে ঢুকেছিল সেদিনই আমি মনে মনে বলছিলাম এর ইহ-পরিণাম অতি সাংঘাতিক।'

বলাইর বাঙলা শব্দ-প্রয়োগ শুনে শিবনাথের হাসি পাচ্ছিল, কিন্তু সামলে নিল।

অল্প হেসে পারিজাত বলল, 'তোমাকে কিন্তু রমেশ যথেষ্ট সাহায্য করত।'

'তা করত, তা কিছুটা করেছে আমি অস্বীকার করব না স্যার। রমেশ এখন পরলোকগামী, তার নিন্দা করা পাপ। কিন্তু ক্ষিতীশ হালে বৌবিটাকে নিয়ে দাদার সঙ্গে এমন খিটিখিটি করত, পরশু থেকে তো ও একরকম দোকান ছাড়া, ভাগের টাকাপয়সা দিয়ে দাও আমি ডিগবয় চলে যাই, কেবল এই বুলি। তা আমি রমেশকে বলছিলাম ওই হারামজাদী ছুঁড়িটাকে বিদায় কর দোকান থেকে। গণ্ডগোলের মূলে তিনি। ওই পাপ দোকানে না থাকলে কি আজ রমেশের এমন অপমৃত্যু হত, কি বলেন শিববাবু।'

গম্ভীরভাবে শিবনাথ মাথা নাড়ল।

'আরো গণ্ডগোল হবে, আমি বলছি। সমথ কন্যা তো আমারও আছে। আমি কি মেয়েকে ছাড়া ছাগল গাইয়ের মত বাড়ির বাইরে ছেড়ে দিই। বৌবিটা কোথায় না যায়। রাতবেরাতে বাজারে-দোকানে মাঠে-ঘাটে ঘুরছে আমি দেখি। মেয়ে জাত তার ওপর সর্বনাশা বয়েস। ও এ-তল্লাটে থাকলে আরো আগুন লাগাবে। ভাই ভাইকে কেটেছে, ছেলে বাপকে কাটবে আপনারা দেখুন না। আমি বলছিলাম কি স্যার—' বলাই উত্তেজিত চাপা গলায় পারিজাতের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'ওই পাপ বাড়ি থেকে কালই তুলে দিন। বাপ তো রাস্তার পাগল ঘরে থাকে না। কে গুপ্তর পরিবারকে আপনি সরকার মশাইকে দিয়ে একবার ভাল করে বলান। শুনছি তিনির ভাই আলীপুরের হাকিম। বুঝিয়ে বললে চলে যাবে।'

'কোথায় আর যাচ্ছে, অনেক বলা হয়েছে, সবাই ভদ্রলোক, জোরজুলুম করতেও কেমন লাগে। পারিজাত গম্ভীর হয়ে গেল। একটু পর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, 'না আমিও এ-বাড়ি সম্পর্কে প্ল্যান ঠিক করে ফেলেছি। এমনিও তো তিন-চার ঘর চলে গেছে। রমেশের ফ্যামিলিও এর পর নিশ্চয় আর থাকছে না। কাল বনমালীর কাছে ইনফরমেশন পেলাম ভুবনের মেয়েরাও নাকি শহরে ঘর খোঁজাখুঁজি করছে। সরকারকে আমার বলা আছে নতুন ভাড়াটে কেউ আট নম্বর বস্তিতে এসে উঠতে চাইলে যেন না করে দেয়। ঘর খালি নেই।'

শিবনাথ অল্প হাসল।

'আমি তাই লক্ষ্য করছি। নার্স চলে গেল, অমল চলে গেল, ডাক্তার উঠে গেল অথচ আর ভাড়াটে আসছে না। মদন ঘোষ সব কটা ঘরে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছে।'

'তাই।' পারিজাত বলল, 'আরো দু'চার ঘর উঠে যাবে ঠিকই। আপনারা দু-চার জন যাঁরা থাকবেন তাঁদের জন্যে টেম্পোরারী একটা ব্যবস্থা করে দিয়ে আমি ওখানে পাকা বাড়ি তুলব। একটা দুটো করে আমার সব ক'টা বস্তি সম্পর্কে এই প্ল্যান করা আছে। কেন, আপনাকে কাল আমি কিছুটা আইডিয়া দিয়েছি শিবনাথবাবু?'

শিবনাথ মাথা নাড়ল।

বলাইর চেহারা হাসি-হাসি হয়ে গেল। 'খুব ভাল হয় স্যার। আমার স্ত্রী তো পরশু থেকে এমন বায়না ধরেছে। পাকা বাড়ি দেখ, পাকা বাড়ি খোঁজ। আমি অবশ্য বলেছি রায় সাহেব কি পারিজাতবাবু এখানে বস্তি রাখবে না। ভাড়া দিতে পারে না অনেকে। খামকা লোকসান। লাভ নেই বাণিজ্যে গণ্ডগোল সার। মিছা বললাম?'

পারিজাত বলাইর দিকে চেয়ে ঠোঁট টিপে হাসল এবং সমর্থনের ভঙ্গিতে ঘাড়টা ঈষৎ কাত করল। পারিজাত কে হাসছে শিবনাথের বুঝতে কষ্ট হয় না বলতে কি, একটু ঈর্ষার দৃষ্টিতেই [illegible] বলাইর গায়ে নতুন সিল্কের জামাটা দিকে আড়চোখে তাকাল। যেন কাল রা[illegible] জামাটা তৈরি করিয়ে এনেছে। কি আ[illegible] সকালেও হতে পারে। পারিজাত বল[illegible] 'যাকগে, আপনাদের দু-চারটা ফ্যামিলি একটা সুবিধামতন জায়গায় সিফ্‌ট করি এ টিনের বাড়ি আমি খুব শিগগি[illegible] ডিমলিশ করে দিচ্ছি।'

'তাই করুন। আমারও মনে [illegible] এসব বস্তি না রাখা ভাল। যত [illegible] আনডিজায়ারেবুল এলিমেণ্ট এসে [illegible] বাঁধছিল। জায়গাটার ইমপ্রুভমেন্টে জন্যে; ওই যে বলাই বলছিল, এসব প[illegible]

তুলে দেয়া উচিত।' শিবনাথ একটু টেনে হাসল।

'বিধু মাস্টারটার চুল চেহারা, কাপড়-চোপড়ের যা জঘন্য অবস্থা হয়েছে আমার তো ওকে দেখলেই মাথা ঝিম্‌ঝিম করে। আমার স্ত্রী কাল রাত্রে বলছিল, বারো-ঘরের বাড়িতে যদি এ বৎসর ব্যাধিট্যাধি লাগে তো ওই পরিবারটার জন্যেই লাগবে। মাস্টারের মেজ ছেলেটা, কি যেন নাম শিববাবু, হুবলা। কাল ধাপার বাজারে মেছুনিরা কুঁচো চিংড়ির ডালা থেকে এইটুকুন এইটুকুন কাঁকড়া বেছে ফেলছিল। পচা ভুশভুশে গন্ধ ছাড়ছিল। কাকগুলো পর্যন্ত ছোঁয়নি। হারামজাদা দিব্যি সব ক'টা তুলে নিয়ে এল। পেঁয়াজ দিয়ে ভেজে রাত্রে কলাই সিদ্ধর সঙ্গে চালিয়েছে। কলেরা হবে না কেন আপনি বলুন একবার স্যার।'

পারিজাত মৃদু হাসল। 'মরুক গে। কলেরা ভ্যাক্‌সিন নিয়ে ফেল। আপনি নিয়েছেন তো?'

শিবনাথ ঘাড় কাত করল। 'আমি এসব বিষয়ে অত্যন্ত পার্টিকুলার। অনেক দিন আগেই কর্পোরেশন অফিসে গিয়ে নিজে গরজ করে ওয়াইফ এবং মেয়েটা সহ ওই কাজটা সেরে এসেছি। সাবধানের মার নেই।'

'অ্যাক্‌জেক্টলি সো।' পারিজাত স্টিয়ারিং-এ হাত রাখল। রমেশের দোকানের ওদিকটায় চোখ বুলিয়ে ছোট্ট হাই তুলে বলল, 'যাকগে, আপনারা রেডি হন। আমি কাল-পরশুর মধ্যেই প্রিলি-মিনারি মিটিংটা ডাকছি। সন্তোষ ওরা কালকের কথা বলছিল। আমি একদিন সময় চেয়েছি। কিছু ইনভিটেশন কার্ড ছাপানো দরকার। আমার হল-ঘরটা একটু পরিষ্কার করাতে হয়। সরকার মশায়কে অবশ্য বলে রেখেছি,— আর হ্যাঁ,' পারিজাত বলাইর চোখের দিকে তাকাল। 'পরশুর ফাংশনে তোমার ময়নাকে কিন্তু গান গাইতে হবে। ও তো আগে সুন্দর গানটান গাইত দীপ্তির সমিতিতে যখন আসতো, চর্চা রেখেছে কি?'

চোখমুখ উজ্জ্বল ক'রে বলাই বলল, 'দেখি বলে। ক'টা মাস তো আমি আর ওদিকটায় নজর দিতে পারছিলাম না স্যার। এবার ভেবেছি একটা অর্গান কিনে দেব।'

'গুড্।' অস্ফুট উচ্চারণ করে পারিজাত গাড়িটাকে একবার একটু পিছনের দিকে নিয়ে তারপর মোচড় দিয়ে বাঁ-দিকে ঘুরিয়ে সুপারি ও জলপাই গাছের নিচে দিয়ে সরু রাস্তাটা ধরে সোজা বাংলোর দিকে ছুটল। বলাই ও শিবনাথ ফ্যাল্‌ফ্যাল করে কতক্ষণ সেদিকে চেয়ে রইল।

রমেশ খুন হওয়ার পর বারোঘরের বস্তি তো বটেই, সমস্ত পাড়াটা যেন কেমন ঝিম মেরে ছিল। একটা থমথমে বিষণ্ণতা, চাপা-চাপা ভাব। এর ওর সঙ্গে মেলামেশা করতে, ভিন্ন বাড়ির দরজায় যেতে এমন কি পাশের ঘরের রকে বসে প্রতিবেশীর সঙ্গে কথা বলতেও যেন লোক কেমন আটকা বোধ করছিল। সবাই কেমন সঙ্কুচিত সন্ত্রস্ত হয়ে চলাফিরা করছিল। ক্ষিতীশের কি 'ফাঁসি' হবে? না বেবির জবানবন্দীতে পুলিসের 'বিশ্বাস' হচ্ছে না। আরো 'ইনকুয়ারী' হবে। খুনের পিছনে কি আরো 'মানুষ' আছে? 'ঠাণ্ডা রক্তে' খুন না কি 'গরম রক্তে' খুন! ক্ষিতীশ এত বড় 'দা'

কোথায় হুট্ করে পেল। কে 'সাপ্লাই' করেছিল? বেবিকে হাজত থেকে কবে ছাড়া হবে। না দা-টা বেবিই 'ফ্রকের' তলায় করে দোকানে কয়লার নিচে লুকিয়ে রেখেছিল। আগে-ভাগে? এই অস্ত্র ক্ষিতীশের হাতে না উঠে রমেশের হাতে উঠতে পারত না কি ইত্যাদি চাপা গলার ফিসফিস আওয়াজে কুলিয়া-টেংরার বাতাস দূষিত ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বাহাত্তর ঘণ্টার মধ্যেই পারিজাত আবহাওয়া সম্পূর্ণ পাল্টে দিয়েছিল। হ্যাঁ, সংস্কৃতি-সম্মেলন। পাড়ার ছেলে-বুড়ো, স্ত্রী-পুরুষ, বিদ্বান-মূর্খ সকলেই সেদিন পারিজাতের প্রশস্ত লনে সামিয়ানার তলায় এক একটি আসন দখল করে বসতে পেরেছিল। হল-ঘরে এত লোকের জায়গা হবে না চিন্তা করে বাইরে সামনের সবুজ মাঠে চাঁদোয়া খাটিয়ে প্রত্যেকটা খুঁটি দেবদারু পাতা ও খেজুর পাতায় মুড়ে নিশান গুঁজে ও প্রবেশদ্বারে লাল সালুর গায়ে সাদা কাপড় দিয়ে 'কুলিয়া-টেংরা কৃষ্টি-বাসর' লিখে পারিজাত সন্তোষের দল, ময়না এবং রুচি সকলকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে বসালো।

এ পাড়ার নিমন্ত্রিতরা তো ছিলেনই, ওদিক থেকে পারিজাতের আরামবাগের সেই জার্মানি রাশিয়া ফেরৎ বন্ধু বিশিষ্ট জননেতা শশাঙ্ক বাগচী, ডক্টর মধুসূদন নাগ, সন্তোষের বাবা মা এদিক থেকে রুচির স্কুলের কয়েকজন টিচার সন্তোষের পার্ক স্ট্রীট, বালিগঞ্জ এবং এণ্টালির বন্ধুরা, সন্তোষের বোন, বোনের সখীরা, অসিতের বোন ও বোনের সখীরা উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানকে সুন্দর সফল ক'রে তুললেন। ডক্টর নাগ মঙ্গলাচরণ করলেন, অসিতের বোন উদ্বোধনী সংগীত গাইল, সভাপতি শশাঙ্ক বাগচী 'সংস্কৃতি' বলতে কি বোঝায় তা তাঁর ভাষণে চমৎকারভাবে বিশ্লেষণ করে সমবেত সকলকে মুগ্ধ করলেন। 'অশিবকে অসুন্দরকে অকল্যাণকে অবিদ্যার পাপকে দারিদ্র্যের গ্লানিকে চিরতরে বিসর্জন দেবার মহতী ব্রত নিয়ে এই সংস্কৃতি বাসর আপনাদের মধ্যে জন্ম নিল। অকুণ্ঠ আত্মত্যাগ অপরিসীম প্রেম অপরিমেয় নিষ্ঠা অমিত উদ্যম এবং অ-শেষ সাহস নিয়ে আপনারা সমিতির প্রচেষ্টাকে সার্থক জয়যুক্ত ক'রে তুলবেন এবং সমাজকে, জাতিকে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করবেন আমার এই কামনা।' ভাষণ শেষ হবার পর করতালিধ্বনিতে আসর মুখরিত হ'ল। মৃদু গুঞ্জন ক'রে অনেকেই বলাবলি করলেন কণ্টিনেণ্টাল ঘুরে আসা এত বড় লোকটার এই দীর্ঘ বক্তৃতায় একটা 'ইংরেজী' শব্দ নেই। কী অদ্ভুত দখল বাঙলা-ভাষার ওপর। কী চমৎকার বলার ভঙ্গী।

এর পর অনুষ্ঠানের যেটা সবচেয়ে প্রধান অংশ। অর্থাৎ রুচিকে সম্পাদিকার পদ গ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ করা—সুন্দর সংক্ষিপ্ত একটি বক্তৃতা করে পারিজাত তা আরম্ভ করল। আজ আর টাই স্যুট না। পাঞ্জাবি ধুতি চাদরে পারিজাতকে অতি সুন্দর দেখাচ্ছিল। রুচি এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তার প্রত্যুত্তরে ছোট্ট কয়েকটি কথায় এবং তাতে অসতর্কতাবশত দুটো ইংরেজী শব্দ মিশিয়ে ফেলে কাঁপা গলায় বক্তৃতা করল। 'এই সীমিত শক্তি নিয়ে এতবড় আদর্শকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলা সহজ না বলে আজ আমিও আপনাদের সকলের সহযোগিতা ও শুভেচ্ছা কামনা করছি।' শেষদিকে আর ইংরেজি শব্দ ছিল না তাই শিবনাথের চেহারা আবার উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল। বস্তুত আনন্দে গর্বে আজ তার বুক ফুলে উঠেছিল। মালার স্তূপ জমল রুচির সামনে কোলের ওপর। সন্তোষ ও তার বন্ধুদের সঙ্গে রুচি বসেছিল। মালাগুলো পরে সে একটা একটা করে সবাইকে বিলিয়ে দিয়েছিল অবশ্য। অনুষ্ঠান শেষ হবার আগে অর্থাৎ সকলের শেষে সাহিত্যিক সন্তোষ সমিতির পক্ষ থেকে কর্মিদের সকলের হয়ে তার চমৎকার ভাষায় বক্তৃতা করল। 'আমরা দল বুঝি না, আমরা রাজনীতি জানি না,—মুক্ত আকাশের নিচে নতুন দিনের সূর্যের কিরণসম্পাত ললাটে নিয়ে তরুণের দল তরুণীর দল হাত ধরাধরি করে আজ যে অভিযান সুরু করলাম তার শেষ কোথায়, সমাপ্তি কোথায় জানি না। নদীর তরঙ্গের মত লাভক্ষতির হিসাব না নিয়ে মহাসমুদ্রের দিকে অর্থাৎ জাতিগঠনের বিরাট সাধনার দিকে কেবল অগ্রসর হতে থাকব। আমাদের এই গতি, এই বেগ এই উচ্ছলতা আজ এক কল্যাণীকে এক দেবীকে পেয়ে স্ফীততর হয়ে উঠলো। রুচিদির প্রেরণায় নির্দেশনায় আমরা যে কত কাজ করতে পারব, তা এখনি বলে মাননীয় অতিথিদের, বন্ধুদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না, —ফলেন পরিচিয়তে।' আবার করতালি-ধ্বনি। ময়না সমাপ্তি সঙ্গীত গাইল। সন্তোষের দেবী কল্যাণী কথাগুলির সময় রুচির চেহারার পরিবর্তনটা শিবনাথের চোখে সবচেয়ে বেশি ধরা পড়ল। বস্তুত সবাই রুচিকে ওপর থেকে দেখছিল, দেখছিল তার বাইরের রূপ। আজ এখানে একজন বিশিষ্ট কর্মকর্তা শিবনাথ। এ-কাজে সে-কাজে বার বার তাকে ছুটতে হচ্ছে, পারিজাতের সঙ্গে এটা-ওটা নিয়ে পরামর্শ করতে হচ্ছে; কিন্তু তা হলেও থেকে থেকে এক এক সময় চুপ করে সে স্ত্রীর দৃষ্টি, হাসি তার কথা বলার প্রত্যেকটি ভঙ্গি নিরীক্ষণ করে মুগ্ধ এবং বিস্মিত হচ্ছিল। কমলাক্ষি গার্লস স্কুলের একটি সেকেণ্ড টিচার উপযুক্ত সময়ে উপযোগী পরিবেশে যে কতখানি বদলে যেতে পারে, তা সে আজ রুচিকে দেখে বুঝলে। অথচ আজ সকালেও ওর সঙ্গে শিবনাথের হাল্কা-মতন ঝগড়া হয়ে গেছে। শিবনাথ অবশ্য ঠাট্টা করে বলেছিল, জাতে স্ত্রীলোক— তাই রুচির মনের ক্ষুদ্রতা ধরা পড়ে গেছে। দীপ্তি নেই, কাজেই স্বামীর কোনরকম চিত্তচাঞ্চল্য ঘটবার আশঙ্কা নেই। নিশ্চিন্ত হবার পর সে কাজ করতে পা বাড়াল। তার কর্মের আদর্শটা নিতান্তই শর্তসাপেক্ষ। এখন সেই ঝগড়ার কথা তার মনে আছে কিনা পত্র-পুষ্পশোভিত প্যাণ্ডেলের একটা কোণায় বসে কাজের স্কীম নিয়ে রুচি যখন আলোচনায় মগ্ন ছিল, একবার ছুটে গিয়ে প্রশ্ন করতে শিবনাথের ভয়ঙ্কর ইচ্ছা হচ্ছিল। যদিও তার সুযোগ এবং সময় পেল না শিবনাথ। আমের মুকুলের গন্ধ ও মিষ্টি হাওয়া নিয়ে পারিজাতের লনে ফাল্গুনের সুন্দর অপরাহ্ন শেষ হয়ে যখন সন্ধ্যা নামল, তখন অনুষ্ঠানও শেষ হ'ল।

তখনও পারিজাত ভীষণ ব্যস্ত,

শিবনাথ ব্যস্ত। শশাঙ্ক বাগচী ডক্টর নাগ এ'রা একে একে বিদায় হচ্ছেন। সঙ্গে থেকে শিবনাথও রাস্তায় দাঁড় করানো তাঁদের এক একটা গাড়ির দরজা পর্যন্ত যাচ্ছে। মনে মনে ভাবছিল, এখনি সে অবসর হবে সবাই তো প্রায় বিদায় হলেন, রুচি অবশ্য তখনও খুব বেশি ব্যস্ত হয়ে সন্তোষ ও সন্তোষের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলছিল। এমন সময় হঠাৎ একটি পরিচিত মুখ দেখে শিবনাথ চমকে উঠল।

'আপনি?'

চারু রায় হাসল।

'আমি তো প্রথম থেকেই আছি।' তার হাতে ক্যামেরা। 'ভিড়ের মধ্যে লক্ষ্য করেন নি। একখানা কার্ড পেয়েছিলাম। বোধ করি পারিজাতবাবুর জমিদারী এলাকায় আমার স্থায়ী কর্মকেন্দ্র বলে আমিও এখানকার একজন সেই সুবাদে নিমন্ত্রণ পেলাম।' কথার শেষে চারু মেয়েদের মত হাসল। চারুর কথা বলার ভঙ্গিতে শিবনাথ মুগ্ধ হ'ল। গর্বিত ভঙ্গিতে সে প্যাণ্ডেলের দরজায় সন্তোষের বোন, অসিতের বোন এবং আরো দু-একটি মেয়ের হাত ধরে দাঁড়ানো রুচির দিকে একবার দৃষ্টি ঘুরিয়ে হেসে চারুর দিকে তাকায়। 'কেমন লাগল?'

'অদ্ভুত। চলুন ওধারে গিয়ে একটু গল্প করি।'

চারু শিবনাথের হাত ধরল।

বস্তুত শিবনাথও পরিচিত, বলতে গেলে বন্ধুস্থানীয় এমন একটি লোককে এতক্ষণ পর পেয়ে হাল্কা নিশ্বাস ফেলল। পারিজাত এবং বিশিষ্ট অভ্যাগতদের মধ্যে থেকে তেমন মন খুলে কথা বলতে না পারার দরুণ সে অস্বস্তিবোধ করছিল বৈকি। 'চলুন—ও এখনি ফিরবে কিনা কে জানে।' আর একবার রুচির দিকে তাকিয়ে অস্ফুটস্বরে একবার শিবনাথ বলল, তারপর আর অপেক্ষা না করে চারুর হাত ধরে রাস্তায় নামল। পারিজাত তখন ডক্টর নাগের সঙ্গে ইলেকশন সম্পর্কে জরুরি কথা বলতে বলতে মন্থরগতি গাড়িটার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে অনেকদূর চলে গেছে। তাতে শিবনাথ একটু অন্যদিকে সরবার সুযোগ পেল। সবচেয়ে বড় কথা এতসব সম্ভ্রান্ত লোকের সামনে সে মোটেই সিগারেট খেতে পারেনি।

'আপনি দেখছি মশাই সর্বঘটেই আছেন।' চারুর প্রসারিত প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে শিবনাথ হাসল।

'ভাল-মন্দ নিয়ে আমার মায়া-কানন। আপনাকে অনেকদিন আগেই বলেছি। বস্তিজীবনের দুঃখ-দারিদ্র্য, অশিক্ষা, দুর্নীতির অন্ধকার যথেষ্ট ঢোকানো হয়েছে বইয়ে। কিন্তু আলোর ইঙ্গিত, সভ্যতা-সংস্কৃতি আশার কোন আভাস যদি পাই, তবে সেই চিত্র কি গ্রহণ করব না? সেই ছবি তো আজ পেয়ে গেলাম। হা—হা।'

শিবনাথ চারুর লাইটার থেকে সিগারেট ধরাতে ধরাতে কথাগুলি রীতিমত উপভোগ করল। 'গুড্। সেই লোভেই বুঝি চুপটি করে লুকিয়ে বসে থেকে এতক্ষণ সব শুনছিলেন?' বলে সে শব্দ করে হাসল।

'ওয়াণ্ডারফুল! কি যেন নাম সেই ছেলেটির। সন্তোষ। সুন্দর বক্তৃতা দিল। কী চমৎকার আইডিয়া। অতটুকুন ছেলে।'

'খুব ভাল লাগল কথাগুলো?' শিবনাথ প্রশ্ন করল।

'খুব।'

যেন আর একটা কি প্রশ্ন করবার জন্য শিবনাথের জিহ্বা নড়ে উঠছিল। কিন্তু নিবৃত্ত হ'ল। মুখের ধোঁয়াটা বার করে দিয়ে বলল, "কনস্ট্রাকটিভ কাজের প্ল্যান শুনলেন সন্তোষের। ওর আবার অন্য গুণও আছে। হ্যাঁ সাহিত্যিক, আর্টিস্ট। সিনেমার জন্যে অলরেডি একখানা বই লিখে ফেলেছে।'

'তাই নাকি।' চারু রীতিমত লাফ দিয়ে উঠল। 'তবে তো ওর সংগে আমার পরিচয় হওয়া দরকার।'

'হবে হবে।'—শিবনাথ হাসি হাসি চেহারা করে বলল, 'ওর সংগে ওদের সকলের সংগে, আই মিন কৃষ্টি-বাসরের সমস্ত সভ্য-সভ্যার সংগে আমি আপনাকে আজ ইন্‌ট্রোডিউস করিয়ে দিচ্ছি। ভিড়টা কমুক।'

রমেশের তালাবন্ধ চায়ের দোকান ডাইনে রেখে সুপারি ও জলপাইতলার সরু পথ ধরে দুজন অগ্রসর হয়।

'আপনার গাড়ি কোথায়?'

'ভিড়ের মধ্যে আনা সম্ভব হয়নি। বড় রাস্তায়। চলুন সেদিকে যাচ্ছি।'

গাড়িটা ঠিক জায়গায় আছে দেখে নিশ্চিন্ত হয়ে চারু শিবনাথের হাত ধরে আবার হাঁটতে লাগল। 'অনগ্রসর অঞ্চল এটা। এখানে এরা—' শিবনাথ এবার রুচির কথা উল্লেখ করতে ইতস্তত করল না। 'এখানে এরা ক'জন তরুণ-তরুণী শিল্প-সংস্কৃতি এবং সমাজসেবার আদর্শ নিয়ে কাজ করবে শুনে পারিজাত রাজী হ'ল। তৎক্ষণাৎ আমাকেও রিকোয়েস্ট করে পাঠাল রুচি দেবীকে এসোসিয়েশনের সেক্রেটারিশিপ নিতে হবে। আমি দেখলাম, এটা এখন আর নিছক শো না, দেখলাম যে, এরকম একটা কিছু হওয়া দরকার। বুঝতেই পারছেন, প্রগ্রেসিভ আউটলুক আছে এমন সব লোক যদি এগিয়ে না যায়—' শিবনাথের কথা থেমে গেল। গল্প করতে করতে ক্যানাল সাউথ রোডের এক জায়গায় এসে দু'জন থমকে দাঁড়ায়।

উর্বশী হেয়ার-কাটিং সেলুনের আজ অপরূপ সজ্জা। দরজার দু'দিকে কলা-গাছ ও মঙ্গলঘট বসানো। দেবদারু পাতায় মুড়ে দেওয়া হয়েছে চৌকাঠ। ঝালর ঝুলছে নিশান উড়ছে। লাল নীল সবুজ হলুদ ইলেকট্রিক-বাল্‌বের মালা প'রে পাঁচু ভাদুড়ির দোকান পথচারীদের যেন হাতছানি দিয়ে ডাকছে।

'কি ব্যাপার?' শিবনাথ অস্ফুটে বলল।

'দেখতে পাচ্ছেন না।' চারুর চোখে আগে পড়েছে সেলুনের মাথায় দোতালার বারান্দায় ঝোলানো চকচকে নতুন প্রকাণ্ড একটা সাইনবোর্ড। চারু আঙুল তুলে দেখাতে শিবনাথ ঘাড় তুলল। তারপর শব্দ করে হেসে উঠল। 'আই সি। ভাদুড়ি তা হ'লে আজই ম্যাসেজ ক্লিনিক স্টার্ট দিলে।'

'হ্যাঁ স্যার, আজ দিনটা ভাল। আমি পাঁজি দেখে দিয়েছি। অত্যন্ত অসপিশাস ডে। আসুন আসুন।'

চমকে উঠল শিবনাথ। বিধু মাস্টার দোকান থেকে বেরিয়ে এসে তার হাত ধরে ফেলেছে। একটু বিরক্ত হয়ে শিবনাথ হাতটা ছাড়াতে চেষ্টা ক'রে চারুর দিকে তাকাল। বিধু এবার চারু রায়ের হাত ধরল। 'আসুন স্যার। পাঁচু ভায়া একটা নতুন কনসার্ন ওপেন করল একবারটি এসে দেখুন। আপনাদের কো-অপারেশন সিম্পেথি সে আশা করে বৈকি।'

দরজায় দাঁড়িয়ে পাঁচু শিবনাথকে ডাকল।

'আসুন স্যার, সিগারেট খেয়ে যান।'

অগত্যা চারুর হাত ধরে শিবনাথ ভিতরে ঢুকল। দু'জনকে দু'টো চেয়ারে বসতে দিয়ে বিধু মাস্টার বলল, 'সে-কথাই এতক্ষণ পাঁচুকে বলছিলাম। ওদিকে পারিজাত সংস্কৃতি কালচার সোস্যাল ওয়েলফেয়ার ক'রে লাফাচ্ছে। কিন্তু আসলে কাজ কতটুকু হচ্ছে বা হবে। আসলে এটা হ'ল, মানে আমি আজকের ফাংশনের কথাই বলছিলাম, পারিজাতের ওটা একটা ইলেকশন-স্টান্ট ছাড়া আর কিছু না। কি বলেন আপনি।' বিধু চারুর মুখের দিকে তাকাল। চারু শুধু হাসল, কথা বলল না। শিবনাথ গম্ভীর হয়ে থেকে পাঁচুর প্রসারিত হাত থেকে সিগারেট তুলে নিল। সিগারেট ধরানো শেষ করে তেমনি গম্ভীর গলায় বলল, 'এটা,—যার যেমন চিন্তাধারা। কি আর বলব। আমি তো মনে করি ভাল কাজ সব সময়ই ভাল। ইলেকশনের নামেও যদি কিছু কাজ হয়ে যায় আপত্তি কি।'

যেন বিশেষ সন্তুষ্ট হ'ল না শিব-নাথের কথা শুনে। বিধুমাস্টার চুপ ক'রে দরজার বাইরে তাকায়। এবার পাঁচুর দিকে

চেয়ে মুচকি হেসে পরে শিবনাথ এক চোখ ছোট করে মাস্টারের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলঃ 'কানুকে ঢুকিয়ে দিয়েছেন তো ম্যাসেজ ক্লিনিকে?'

বিধু মাস্টার মাথা নাড়ল।

'কানু মানে? আমি তো মমতা সাধনাকেও ঢুকিয়ে দিলাম।' হতভম্ব হয়ে শিবনাথ বিধুর মুখের দিকে চেয়ে রইল।

'কি, আপনি খুব অবাক হলেন। কেন আপনাকে কি অনেকদিন বলিনি আমার এসব প্রেজুডিস নেই। ডিগনিটি অব লেবার কথাটার মূল্য আমি খুব বেশি দিই। হ্যাঁ, সে কথাই এতক্ষণ পাঁচু ভায়াকে বলছিলাম। সংস্কৃতি ওয়েলফেয়ার করে পারিজাতের দল খুব লাফাচ্ছে, কিন্তু রিয়্যালি একটা কাজের মত কাজ করল আজ আমাদের ভাদুড়িই। একটা ইন্ডাস্ট্রি তো বটেই। দুটো গরিবের ছেলেমেয়ের প্রভিশনের ব্যবস্থা হয়ে গেল এখানে। ইজ্ দ্যাট নট্ সো?'

শিবনাথ আর না হেসে পারল না।

'তা মমতা সাধনাকে ম্যাসেজ ক্লিনিকে তো ঢোকালেন। ওদের মা মানে আপনার স্ত্রী আপত্তি করেননি তো? তিনি তো আবার—'

'ও, আপনি ওদিকে ব্যস্ত ছিলেন বলে খবর জানেন না, দুপুরে ভীষণ পেইন ওঠে সাধনার মা'র। তাড়াতাড়ি পাঁচুর কাছ থেকে একটা টাকা চেয়ে নিয়ে রিক্‌শায় করে হাসপাতালে রেখে এলাম। এম্বুলেন্স ডাকার সময় ছিল না। আপত্তি? হ্যাঁ, হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে যখন শুনবেন তখন একটু মুখ-ভার—তা আপত্তি আর শোনে কে। বৎসরান্তে একটি নতুন মুখ নিয়ে হাসপাতাল থেকে ফিরে এসে তিনি অনেক ঋগড়াই আমার সঙ্গে করেছেন এপর্যন্ত। এবার সেরকম কিছু করলে আমি ঠিক মাথাটি ফাটিয়ে দেব। দাড়ির জঙ্গলের কাছে ঢাউস মাছিটা উড়ুউড়ু করছিল। বিধু হাত তুলে সেটাকে তাড়িয়ে দেবার একটুও চেষ্টা করল না। এমন সময়, বিস্ময়ের ওপর বিস্ময়, ওপর থেকে খট্-খট্ শব্দ ক'রে একটি লোক নিচে নেমে এল। চারু এবং শিবনাথ কে গুপ্তকে দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেল। আজ আর বেশভূষা তেমন নোংরা না। বরং সুন্দর একটা সার্ট গায়ে একটা রংদার লুঙি কে গুপ্তর পরনে পায়ে নতুন চটি এবং হাতে খেউড় বাঁধা একখানা খাতা। কে গুপ্তর দাড়িগোঁফ কামানো।

'হ্যালো, কি ব্যাপার।' কে গুপ্ত চারুকে দেখে সামান্য হাসল। কিন্তু চারু বা শিবনাথের তরফ থেকে তেমন সাড়া-শব্দ না পেয়ে সে সোজা পাঁচুর সামনে চলে গেল এবং খাতা খুলে কি যেন তাকে বোঝালো। পাঁচু মাথা নাড়ে। 'হ্যাঁ, আপনাদের বিলিতি আফিসের হিসাব আমাদের দিশি দোকান আফিসের হিসাব সবই একরকম—মূলে সব এক। হা-হা।' কথা শেষ ক'রে পাঁচু হাসল। পাঁচুর প্যাকেট থেকে একটা সিগারেট তুলে কে গুপ্ত চারু বা শিবনাথের দিকে আর একবারও না তাকিয়ে আবার বাঁ-দিকের বারান্দার ঝোলানো সিঁড়ি বেয়ে খট্‌খট্ ক'রে ওপরে উঠে গেল।

বিধুমাস্টার শিবনাথের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী রকম দুরবস্থায় পড়েছিল লোকটা জানেন তো। তাই বলছিলাম, এই সমাজের জন্যে কিছুই করবে না পারিজাত।' হাতের বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বিধু মুখটাকে বিকৃত করল। 'কেবল কথার ফুলঝুরি। রিয়্যালি যদি কারো হার্ট থেকে থাকে, দুটো লোকের উপকার করার, দুটো লোককে বাঁচাবার ইচ্ছা যদি কারো থাকে তো এ তল্লাটে আমি পাঁচু ছাড়া আর কাউকে দেখি না। ড্রিংক করে ভাদুড়ি ইয়ে বাড়ি যায়, কিন্তু তার অন্তঃকরণ যে কত উদার আমি প্রত্যেক স্টেপে তার পরিচয় পাচ্ছি। না খেয়ে লোকটা মরে যাবে দেখে পাঁচু ডেকে কে গুপ্তকে এখানে প্রভাইড করল। তা ছাড়া হিসাবপত্র দেখারও একজন লোক চাই। এবং ক্লিনিক যখন চালু হবে বেবিকেও এখানে নিয়ে আসা হবে। কে গুপ্তরও তাই ইচ্ছা। পুলিসের হাঙ্গামাটাও ক'দিনে মিটে যাবে। ক্ষিতীশ রমেশকে খুন করেছে, তার জন্য তো আর বেবিকে দায়ী করতে পারবে না।'

শিবনাথ বলল, 'কে গুপ্তর স্ত্রী কি বেবিকে এ কাজে এলাউ করবে?'

'আলবৎ করবে।' বিধুমাস্টার রীতিমত ধমক দিয়ে উঠল। 'না করে গুপ্ত স্ত্রীকে বলেছে, সে যেখানে খুশি চলে যাক। ডটারের ওপর ফাদারের রাইট বেশি। গুপ্ত নিজে এই কনসার্নে আছে। এখন এখানে বেবি চাকরি করলে ওকে চোখে চোখে রাখতে পারবে এবং দুটো পয়সাও উপায় করা হবে, বলছিল কে গুপ্ত একটু আগে আমাকে। আমি তার স্পিরিটের প্রশংসা করি।'

'আচ্ছা উঠি আমরা এখন। চারু উঠে দাঁড়াল।

'চলি, দেখা হবে মাঝে মাঝে।' শিবনাথ বিধু এবং পাঁচুর দিকে তাকিয়ে আসন ছেড়ে উঠল।

রাস্তায় নেমে শিবনাথ বলল, 'আপনার মায়া-কানন বইয়ের আরো কিছু মালমশলা পেয়ে গেলেন, হা-হা।'

চারু সেই হাসিতে যোগ দিল না। গম্ভীর হয়ে বলল, 'না, মশাই এসব যথেষ্ট হয়েছে। দুঃখ-দারিদ্র্যের চিত্র বেশি দিতে গেলে ছবি অনাবশ্যক দীর্ঘ একঘেয়ে হয়ে পড়বে। লোকের ধৈর্য থাকবে না। তা ছাড়া আজকের ফাংশন বিশেষ করে রুচি দেবীর অমন সুন্দর স্পীচটার জন্যে আমাকে অতিরিক্ত কয়েক শ' ফুট রীল স্পেয়ার করতেই হবে।' শিবনাথ সপ্রশংস দৃষ্টিতে চারুর মুখের দিকে তাকিয়ে অল্প অল্প হাসে। অদূরে অনেক লটবহর নিয়ে একটা ঠেলাগাড়ি চলেছে। পিছনে একটা রিক্‌শায় দুটি মেয়ে। শিবনাথ দুজনের খিলখিল হাসির শব্দ শুনে চমকে ঘাড় ফেরায়। বারো ঘরের বাড়ির প্রীতি-বীথি। চারু রায়কে দেখে না কি তাকে দেখে দুবোন এমনভাবে হাসছে, শিবনাথ ঠিক বুঝতে পারে না।

সমাপ্ত

প্রীতির নিদর্শন

সমীরকুমার মৈত্র

লাহোরে ভারত-পাকিস্তান তৃতীয় ক্রিকেট টেস্ট ম্যাচ উপলক্ষে ভারতীয় জনসাধারণের সুবিধার জন্য যাতায়াতের বাধা বহুল পরিমাণে হ্রাস করে পাকিস্তানের সরকারী কর্তৃপক্ষ যে উদারতা দেখিয়েছেন তার কথা ভারতীয় ক্রীড়ামোদীরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করবেন। ক্রিকেটে বিন্দুমাত্র উৎসাহিত নন এমন অনেকে শুধু মাত্র লাহোর যেতে পারার সুযোগ ক'রে দেবার জন্য অকুণ্ঠ ধন্যবাদ জানাবেন ক্রিকেটকে আর তার উদ্যোক্তাদের। আর ভারতবর্ষের বিশ সহস্র মানুষ পাকিস্তানের জনসাধারণের কাছ থেকে যে সৌজন্য ও অভ্যর্থনা লাভ করেছেন তা তাদের স্মৃতিতে চির উজ্জ্বল হয়ে থাকবে।

লাহোরে ভারতীয় জনসাধারণকে সেখানকার সাধারণ মানুষ যে সাদর অভ্যর্থনায় আপ্যায়িত করেছে তা এতই হৃদয়গ্রাহী আর মর্মস্পর্শী যে, দূরে বসে তাকে বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে না হবার যথেষ্ট কারণ আছে। কেননা, এমন ঘটনা অভূতপূর্ব। ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগের পর থেকে আজ পর্যন্ত এমন কোন ঘটনার নজির পাওয়া যাবে না ইতিহাসের পাতায়। ভারতীয় সাধারণের আশংকা, দ্বিধা, ভয় নিমেষে দূর হয়েছে, কল্পনাই যেন সত্য রূপ নিয়ে দেখা দিয়েছে।

......বাসে করে ফিরছিলাম ওয়াগা-সীমান্ত থেকে। বাসভর্তি লোক—প্রত্যেকে আপনার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে চলেছেন। এরই মধ্যে জনৈক শিখ ভদ্রলোক মন্তব্য করলেন, "লাহোরমে তবিয়ৎ খুশ কর্ দিয়া"—এটা যে শুধু সর্দারজীর কথা তা নয়, যে অগণিত মানুষ এবার লাহোর গিয়েছে এটা তাদের প্রত্যেকেরই মনের কথা!

২৯শে জানুয়ারী খেলা শুরু। অমৃতসর থেকে থ্রু স্পেশ্যাল ট্রেন রওনা হোলো। পাকিস্তানে প্রবেশ করার পরও সেখানকার সীমান্ত স্টেশনে গাড়ি থেকে নেমে টিকিট করার প্রয়োজন নেই। কয়েকজন চেকার এলেন বিভিন্ন কামরায়, টিকিট দেওয়া শুরু হলো; বাকী রইলেন যাঁরা তাঁদের লাহোরে গিয়ে টিকিট নিলেই চলবে। "পাক্ ভারত মৈত্রী জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিতে দিতে গাড়ি লাহোরে প্রবেশ করল। সেই মৈত্রীর ডাকে পাকিস্তানের মানুষ যেভাবে সাড়া দিয়েছেন তা একেবারেই কল্পনাতীত।

......লাহোরের বোঝাই বাসে কোন-মতে দাঁড়িয়ে চলেছি—এক সর্দারজী উঠলেন এসে গাড়িতে। অমনি শুরু হলো আপ্যায়ন; যাত্রীদের মধ্য থেকে একজন দাঁড়িয়ে তাঁর বসার জায়গা করে দিলেন। বল্লেন—"হিন্দুস্তান থেকে এসেছেন—আপনি আমাদের মাননীয় অতিথি (মেহ্মান); দাঁড়িয়ে যাবেন সেটা কী করে হয়!" পাঞ্জাবের শিখেরা কোনদিন স্বপ্নেও ভাবতে পারেনি যে, আবার তারা লাহোরে প্রবেশ করতে পারবে আর পারলেও এম্নি অভ্যর্থনা মিলবে! এ যে ১৯৪৭-এর একেবারেই বিপরীত!

আর আদর কিছু কুড়িয়েছেন এবার সর্দারজীরা! তাঁদের পরিচয় লেখা তাঁদের মুখে—তাই খাতির তাঁদেরই একচেটিয়া। আমাদের শ্মশ্রুগুম্ফমণ্ডিত মুখে তো আর লেখা থাকে না ভারতীয় কি পাকিস্তানী!

মজার ব্যাপার হলো ৩০ তারিখে! খেলা দেখতে এসে টিকিট না পেয়ে অনেককেই হতাশ হয়ে চলে যেতে হয়। পুলিস সৌজন্য দেখালো, দুজন সর্দারজীকে বিনা টিকিটে ভেতরে যাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে। তখন মুখ-মোড়াদের তরফ থেকে জানানো হ'লো তাদের অপরাধ কি প্রকাশ করা হোক। না হয় তাদের মুখের উপর মার্কা মারা নেই—তাই বলে কী আর তাঁরা ভারতীয় নন! শেষ পর্যন্ত এক দঙ্গল ভিতরে প্রবেশ করলেন পাশপোর্ট দেখিয়ে।

লাহোরের 'আনারকলি' বাজার দিয়ে ঘুরছি, পথঘাট চিনি না। একজন পথ-চারীকে বল্লাম—ভদ্রলোক শুধুমাত্র পথই যে দেখালেন তাই নয়, সমস্ত খুঁটিনাটি তো বল্লেনই এমন কি টাঙ্গাওয়ালাকে কত দিতে হবে তাও বলে দিলেন। আর টাঙ্গাওয়ালা বিনয়ে তাঁকেও ছাড়িয়ে গেলো; বল্লে—"আপনারা খোদাতালার মেহেরবাণীতে এখানে পায়ের ধূলো দিয়েছেন, আপনারা পরমপূজ্য মেহ্মান। খুশী হয়ে যা দেবেন তাই যথেষ্ট। আপনাদের কাছ থেকে পয়সা নিচ্ছি এটাই যথেষ্ট ক্ষোভের এবং লজ্জার!"

বাজারে চায়ের দোকানীরা জোর করে সর্দারজীদের হাত ধরে বসিয়ে চা দিয়ে আপ্যায়িত করছে, রাস্তার ফলওয়ালা মুফতে দু' চারটে ফল খাওয়াচ্ছে মেহ্মানদের এ যদি নিজের চোখে না দেখতাম তো অতিরঞ্জন আখ্যা দিতাম। যে আতিথেয়তা আর সৌহার্দের চিত্র এবার দেখলাম, অন্য কারো মুখে তা শুনলে হয়তো অবিশ্বাস্য ব'লেই উড়িয়ে দিতাম।

অমৃতসরে ফিরে পরিচিত মহলে এই নিয়েই আলাপ হচ্ছিলো। বন্ধুদের মধ্যে একজন বল্লেন—সরকারের তরফ থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিলো, নাগরিকদের প্রতি বিশেষভাবে ভালো ব্যবহার করার জন্য ভারতীয়দের প্রতি। হয়তো সত্যি। নির্দেশ দেওয়া হয়ে থাকতে পারে কিন্তু আন্তরিকতা আর শুভবুদ্ধি ছাড়া শুধু মাত্র উপরের নির্দেশে কী এমন আপ্যায়ন সম্ভব! যে ভদ্রলোক আমাকে ঘুরে ফিরে শালামার বাগ আর শাহী মসজিদ দেখালেন বর্ষার জলে ভিজে, তিনি কী কেবলমাত্র উপরের নির্দেশেই তা করলেন? আমার অন্তত তা মনে হয় না।

এই ঘটনা আবার প্রমাণ করল পাকিস্তানের সাধারণ মানুষও আমাদের মতই বাইরের দশজনের সঙ্গে প্রীতি ও শুভেচ্ছার সম্পর্কই বজায় রাখতে চায়। উত্তেজনার মুহূর্তে বা প্ররোচনার বশে হয়তো বা ভুল করে হানাহানির পথে পা বাড়ায় কিন্তু সেটাই তার একমাত্র রূপ নয়। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ এবার পাওয়া গিয়েছে লহোরে—প্রতিটি বৃহৎ ক্ষুদ্র ঘটনার মধ্যে!

এই প্রীতির বন্ধন আরো দৃঢ় হোক—ভবিষ্যৎ বিশ্বযুদ্ধের করাল ছায়ার অন্ধকারে দিগন্ত যখন আচ্ছন্ন তখন এই মৈত্রী উদ্ভাসিত করুক নতুন আলোক-রশ্মি—ভেদাভেদ দূর হয়ে এক নতুন সম্পর্ক গড়ে উঠুক এই দুই মহান্ দেশের জনসাধারণের মধ্যে!

স্বামীজীর গুরু ভ্রাতৃবৃন্দ

শ্রীসরলাবালা সরকার

বরানগরের যে বাড়িতে এই তরুণ সন্ন্যাসীগণ আশ্রয় লইলেন, এখানে সেই বাড়ির কিছু বর্ণনা দিতেছি।

বাড়ীটি ছিল মুন্সীদের বাড়ি, এত ভাঙ্গা যে, তাহার সকল অংশ ব্যবহার করা হইত না। বাড়ির সম্মুখে একটি উঠান, উঠানটি ছিল স্তূপাকার মাটিতে ভর্তি। পশ্চিমদিকে দোতলায় উঠিবার একটা সিঁড়ি, সিঁড়িটা যদিও ভাঙা, কিন্তু উপরে উঠা যায়। এই সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া দোতলার বারান্দা। উত্তরদিকে একটি ঘর, সেই ঘরটিকে কাপড় টাঙাইয়া তিনভাগে ভাগ করিয়া ব্রহ্মানন্দ স্বামী, যোগানন্দ ও অভেদানন্দ, তিনজন সাধন-কুঠরী করিয়াছিলেন। এই ঘরের সম্মুখের দালানটি কাঠের গরাদ দিয়া ঘেরা ছিল, মেঝে উঠিয়া খোয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, ছাদের বরগা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, বাঁশের ঠেক্‌না দিয়া কোনমতে ছাদকে রক্ষা করা হইতেছে। ইহার পরে যে ঘরটি সেইটিকেই ঠাকুরঘর করা হইয়াছিল। এই ঘরটি অপেক্ষাকৃত ভাল ও তাহার ভিতরের দিকে আরও একটি দরজা ছিল।

ভিতরের দিকেও ছিল একটি বড় দালান, দালানের পূর্বদিকে খড়খড়িওয়ালা জানালাও ছিল, কিন্তু খড়খড়ি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। এই দালানের পশ্চিমদিকে একটা বড় ঘর, সেই ঘরে পাতা থাকিত প্রথমে চেটাইয়ের মাদুর ও তাহার উপর একটি ছেঁড়া সতরঞ্চি, এইটিই হইল শয়নগৃহ।

ঠাকুরঘর করার সম্বন্ধে অনেকেরই আপত্তি ছিল, কিন্তু শশীমহারাজ (স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ) সে সব আপত্তি গ্রাহ্য করেন নাই। ঠাকুরের 'অস্থি' রহিয়াছে এবং তাহাই তাঁহার প্রতীকস্বরূপ। এই বাড়িতে আসিয়া অবধি শশীমহারাজ পূজার কার্য লইয়া থাকিতেন এবং তাহাই ছিল তাঁহার ধ্যান ও ধারণা। তাঁহার সমস্ত গুরুভাইরা মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণে গিয়াছেন, কিন্তু তিনি একদিনের জন্যও ঠাকুরসেবা ও নিয়মিত অর্চনা ছাড়িয়া কোন স্থানে যান নাই। অতি সহজ সেই পূজার পদ্ধতি। আলমবাজারের নানা বাগান হইতে ফুল সংগ্রহ করিয়া আনিতেন এবং "জয় গুরুদেব, শ্রীগুরুদেব" এই মন্ত্র বার বার উচ্চারণ করিতেন। দেয়ালে টাঙানো ছবিগুলির সম্মুখে হাতের ধূপদানীটি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ঐ একই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া বার বার প্রণাম করিতেন। ঠাকুরের অর্চনাও ঐ একই মন্ত্রে করিতেন।

আহারের ব্যবস্থাও ছিল অতি যৎসামান্য, নুন ও লঙ্কা-সিদ্ধ জলের টাক্‌না দিয়া মুষ্টিভিক্ষার চাল সিদ্ধ করিয়া তাহাই খাওয়া হইত। সেই জলে কোন কোনদিন দু-চারটি তেলাকুচার পাতাও থাকিত। রাত্রে খানকতক রুটি করা হইত।

মশারি ছিল দুটি, একটি বড় ও আর একটি ছোট, বেননা ভয়ানক মশার উৎপাত। বালিশের বদলে চাটাইয়ের নীচে এক একখানি ইঁট রাখা হইত। প্রথমে দারুণ শীতে বিনা গাত্রবস্ত্রে পরস্পর ঘেঁষাঘেঁষি করিয়া শীত কাটাইতেন, পরে বলরামবাবু চারখানি উলের গরম কাপড় দিয়াছিলেন, তাহার পর খানকতক কম্বলও জুটিয়াছিল।

পরিধানের কাপড় ছিঁড়িয়া গেলে বাড়ির ভিতর অনেক সময় সকলে সম্পূর্ণ উলঙ্গ হইয়াই থাকিতেন, কিন্তু তামাক খাওয়াটা বাদ যাইত না। নিজেরাই পায়খানা পরিষ্কার করিতেন। পায়খানা ছিল দোতলায়, সুতরাং উলঙ্গ সাধুর দল পায়খানার সম্মুখে বসিয়া তামাক টানিতে টানিতে নানা আলোচনায় মাতিয়া যাইতেন। স্বামীজীর ভ্রাতা শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত "মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান" নামক পুস্তকে বরানগর মঠের মঠবাসী সাধুদের জীবযাপনের একটি সজীব চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সে চিত্রটি অপূর্ব চিত্র।

কিন্তু স্বামীজীর মনে যে সংকল্পটি সদাসর্বদা জাগ্রত ছিল, তাহা তিনি এক মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হন নাই। প্রমদাদাস মিত্রকে লিখিত পত্রে সেই সংকল্পের কথাই তিনি উল্লেখ করিয়াছিলেন,—দক্ষিণেশ্বরের মন্দিরের কাছাকাছি গঙ্গাতীরে কিছু স্থান সংগ্রহ এবং সেখানে ঠাকুরের পুণ্য অস্থির সমাধিদান। আর ঠাকুরের ত্যাগী সন্তানগণের স্থায়ী আশ্রয়ের জন্য একটি মঠ স্থাপন, ইহাই ছিল তাঁহার বিশেষ সংকল্প।

বরানগরের ভাঙ্গা বাড়িটি যদিও কয়েক বৎসর ধরিয়া মঠরূপে গণ্য হইয়া আসিতেছে, কিন্তু বরাবর এই বাড়িতে থাকা চলিবে না, তাহা তিনি জানিতেন; কিন্তু তাঁহার ইচ্ছামত স্থান সংগ্রহ করিতে গেলে যে অর্থের প্রয়োজন, কোথায় সে অর্থ?

এই অস্থায়ী মঠ হইতে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে মঠ যখন আলমবাজারে স্থানান্তরিত হয়, তখন মঠ সম্বন্ধে কিছু কিছু নিয়ম করা হইয়াছিল, তাহার পর নীলাম্বরবাবুর বাগানবাটীতে থাকার

সময় মঠ সম্বন্ধে স্বামীজী বিস্তারিত নিয়মাবলী প্রণয়ন করেন এবং সেই নিয়মাবলীই এখনও বেলুড় মঠের পরিচালক। এই নিয়ম সম্বন্ধে আমরা পরে বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিব।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে স্বামীজী প্রব্রজ্যায় বাহির হন। ইহার পূর্বে তাঁহার গুরুভাইরাও মাঝে মাঝে তীর্থভ্রমণে বাহির হইতেন। তাঁহার যাইবার কিছুদিন পরে বাবুরাম মহারাজ, কালী মহারাজ ও শরৎ মহারাজ ইঁহারা তিনজনে পুরীধামে যান। ইঁহারা ফিরিয়া আসিবার পর তুলসী মহারাজ (স্বামী নির্মলানন্দ) ও কালী মহারাজ হাঁটাপথে কেদারনাথ ও বদ্রিনারায়ণ যাত্রা করিবেন মনস্থ করিয়া মায়ের আশীর্বাদ লইবার জন্য প্রথমে জয়রামবাটী গেলেন ও শ্রীশ্রীমার পাদপদ্মে প্রণাম করিয়া কেদারবদ্রীর পথে রওনা হইলেন। এদিকে শরৎ মহারাজ, হরি মহারাজ ও ঠাকুরের গৃহী-শিষ্য শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল ইঁহারাও হাঁটাপথে তীর্থভ্রমণে বাহির হইলেন। বৈকুণ্ঠনাথ সান্যাল 'সান্যাল মহাশয়' নামে ভক্ত-সমাজে পরিচিত ছিলেন, ইনি নামে গৃহী হইলেও প্রকৃত-পক্ষে সন্ন্যাসীই ছিলেন। গঙ্গাধর মহারাজও (স্বামী অখণ্ডানন্দ) তিব্বতের পথে যাত্রা করিলেন।

স্বামীজীও এই সময় তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়া বৃন্দাবনধাম পর্যন্ত গিয়াছিলেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে স্বামীজী একবার বদ্রিনারায়ণ যাইবার জন্য বাহির হইয়াছিলেন, কিন্তু সে বার তাঁহার বদ্রিনারায়ণ পর্যন্ত যাওয়া হয় নাই, হাতরাস্ স্টেশনে তথাকার স্টেসন-মাস্টার শ্রীশরচ্চন্দ্র গুপ্ত মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয় এবং সেই পরিচয়ই অল্প-দিনের মধ্যে গুরু-শিষ্য সম্বন্ধে পরিণত হয়। এই শরচ্চন্দ্রই স্বামীজীর প্রথম শিষ্য, সন্ন্যাস গ্রহণের পর ইঁহার নাম হয় স্বামী সদানন্দ এবং ইনি ভক্তগোষ্ঠীতে "গুপ্ত মহারাজ" নামে পরিচিত ছিলেন।

বিবেকানন্দ হাতরাস হইতে বদ্রি-নারায়ণ যাইবার জন্য যখন হৃষীকেশের দিকে রওনা হইলেন—শরৎচন্দ্রও কর্মত্যাগ ও সংসার ত্যাগ করিয়া তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন; কিন্তু হৃষীকেশে আসিয়া প্রবল জ্বরে আক্রান্ত হইয়া পীড়িত হইয়া পড়িলেন দেখিয়া স্বামীজী তাঁহাকে লইয়া আবার হাতরাসেই ফিরিয়া আসেন এবং পরে তিনি নিজেও পীড়িত হন, এই সমস্ত কারণে তাঁহার সে যাত্রা কেদারবদ্রী যাওয়া হয় নাই।

শশী মহারাজ ছাড়া অন্য সকলেই এইরূপে নানা তীর্থে গিয়াছিলেন, আবার ফিরিয়া আসিতেন বরানগরের মঠ বাড়িতে। এইখানে শশী মহারাজ,—গুরুর অর্চনাই যাঁহার সর্বতীর্থ ভ্রমণ—তিনি ঠাকুরের সেবা লইয়া তাঁহাদের ফিরিবার অপেক্ষায় রহিতেন।

স্বামী ব্রহ্মানন্দ (রাখাল মহারাজ) ছিলেন এই ভ্রাতৃমণ্ডলীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, তিনি কাহাকেও কোন আদেশ না দিলেও সকলেই তাঁহার আদেশের অপেক্ষায় থাকিতেন, এমন কি স্বামীজী পর্যন্ত তাঁহার নিকট আদেশানুবর্তী কনিষ্ঠ ভ্রাতাই ছিলেন। স্বামী ব্রহ্মানন্দও খোকা মহারাজ অর্থাৎ স্বামী সুবোধা-নন্দকে সঙ্গে লইয়া তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন এবং কখনও পদব্রজে, কেহ টিকিট করিয়া দিলে মাঝে মাঝে রেলে করিয়া গির্ণার পাহাড়, ওঙ্কারধাম, আবু-পাহাড় প্রভৃতি হইতে বোম্বে ও দ্বারকা ঘুরিয়া বৃন্দাবনে আসেন; তখন কালী, শরৎ, হরি ও তুলসী এবং সান্যাল মহাশয় ইঁহারা পাঁচজনে হৃষিকেশে ছিলেন। তাঁহারা পায়ে হাঁটিয়াই তীর্থভ্রমণ করিতে-ছিলেন, কিন্তু হৃষিকেশে আসিয়া কালী মহারাজ এত অসুস্থ হইয়া পড়েন যে, আর পায়ে হাঁটিয়া চলা সম্ভব হইল না, তাঁহাকে রেলগাড়িতে করিয়া কাশী আনিতে হইল।

এই কালী মহারাজ ছিলেন বালক-কাল হইতেই কঠোর তপস্যার একান্ত অনুরাগী, এই জন্য তাঁহাকে কালী-তপস্বী বা কালী-বৈদান্তীও বলা হইত। ইঁহার পরবর্তী জীবনে ইনি ধর্ম প্রচারকার্যে বেশীরভাগ সময় আমেরিকাতেই অতিবাহিত করিয়াছিলেন ও শ্রীরামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ প্রতিষ্ঠাতা স্বামী অভেদানন্দ নামে বিখ্যাত হইয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজীর নিকট ইনি চিরদিনই ছিলেন একান্ত অনুরাগী জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতৃ-পরায়ণ কনিষ্ঠের মত।

যখন ইঁহারা অসুস্থ কালী মহারাজকে কাশী লইয়া আসেন, তখন স্বামীজী গাজিপুরে ছিলেন। গাজিপুরে পবহারী বাবা থাকিতেন, তাঁহারই দর্শনের জন্য তিনি গাজিপুরে গিয়া-ছিলেন এবং কালী মহারাজের অসুস্থ হইবার সংবাদ শুনিয়া কাশী চলিয়া আসেন।

এই তরুণ সন্ন্যাসীদল এইভাবে ভারতবর্ষের সমস্ত তীর্থই ভ্রমণ করেন। যে সকল তীর্থ অতি দুর্গম, সেখানেও তাঁহারা পদব্রজে গিয়াছেন। হস্তে কপর্দক মাত্রও নাই, হয়তো দুই তিনদিন আহার জুটিত না, হয়তো অসুস্থ অবস্থায় আশ্রয় অভাবে গাছতলাতেই পড়িয়া থাকিতে হইত, তথাপি তাঁহাদের আনন্দ কোন অবস্থাতেই ম্লান হইত না।

> সুর মন্দির তরুমূলে নিবাস,
> শয্যা ভূতল, অজিন বাস,
> সর্ব-পরিগ্রহ-ভোগ ত্যাগ,
> কস্য সুখ ন করোতি বিরাগ?"

শঙ্করাচার্যের এই উক্তি তাঁহাদের জীবনে পরিপূর্ণভাবেই সার্থকতা লাভ করিয়াছিল।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দে যখন বলরামবাবু ও সুরেশবাবু উভয়েই দেহত্যাগ করিলেন, তখন তাঁহাদের স্বেচ্ছাদত্ত সাহায্য বন্ধ হইয়া গেল। এই ঘটনার পর ১৮৯০

খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে স্বামীজী সমস্ত ভারতবর্ষ পর্যটন করিবার জন্য বাহির হন। তিনি তাঁহার গুরুভাইদের সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এবার আমি চললুম। শক্তি-সংগ্রহের প্রয়োজন হয়েছে। যে শক্তিতে লোকের মনের ভাব বদ্‌লাতে পারা যায়, সেই শক্তি যতদিন না অর্জন করতে পারি, ততদিন ফিরবো না।"

জননী সারদামণি তখন ছিলেন হাওড়া জেলার ঘুসড়ি নামক স্থানে। এই স্থানটি গঙ্গাতীরে। কলিকাতা হইতে গঙ্গা পার হইয়া এখানে পৌঁছিতে হয়। স্বামীজী মাকে প্রণাম করিয়া তাঁহার আশীর্বাদ লইবার জন্য সেইখানেই গেলেন। মা তাঁহার মাথায় হাত দিয়া মনে মনে ঠাকুরকে স্মরণ করিলেন, ঠাকুরের কাছে সন্তানের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য কি প্রার্থনা জানালেন, তিনিই তা জানেন; কিন্তু স্বামীজীর মনে হল তিনি যা চেয়েছিলেন, তিনি যেন সেই মুহূর্তেই পেয়ে গিয়েছেন।

পথে বাহির হইলেন স্বামী বিবেকানন্দ,—নিঃসম্বল এক পর্যটক। সেই দিনের সেই ছবিটি যদি আজ আমরা মনে মনে ধ্যান করিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে আমাদের মনের সম্মুখে উদিত হয় দীর্ঘাকৃতি গৌরবর্ণ এক গৈরিকধারী মূর্তি, নয়নে অপূর্ব দীপ্তি, সর্বাঙ্গে যেন দৃঢ়সঙ্কল্পজনিত বীর্য প্রস্ফুরিত হইতেছে।

স্বামীজী পশ্চিমের পথ ধরিয়া চলিলেন, সঙ্গে আছেন মাত্র একজন গুরুভাই গঙ্গাধর মহারাজ (স্বামী অখণ্ডানন্দ)।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দের আগস্ট মাসে স্বামীজী ও অখণ্ডানন্দ ভাগলপুরে পৌঁছিয়া শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। ইনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী, কিন্তু স্বামীজীর মুখে হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া প্রকৃত হিন্দুধর্মের মর্ম অনুভব করিলেন। ভাগলপুরে নাথনগরে যে জৈন-মন্দির আছে, সেখানে অনেক জৈন-সাধু একত্রিত হন, স্বামীজী সেখানে গিয়া তাঁহাদের সহিত ধর্মালোচনা করিতেন, জৈন সাধুগণ ইহাতে বিশেষ আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। সকল ধর্মের প্রকৃত তাৎপর্য যে অভিন্ন ইহা স্বামীজীর সহিত ধর্মালোচনায় প্রত্যেকেই অনুভব করিতেন,—তিনি যে কোন ধর্মাবলম্বীই হউন।

গঙ্গাধর মহারাজ বৈদ্যনাথধামে গিয়া বৈদ্যনাথ দর্শন করিবার জন্য ইচ্ছুক দেখিয়া তাঁহাকে লইয়া স্বামীজী বৈদ্যনাথে গেলেন। তখন রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বৈদ্যনাথে বাস করিতেছেন, স্বামীজী এক দিন ও এক রাত্রি তাঁহার গৃহে অতিবাহিত করেন। পরিপাটি ও পরিচ্ছন্ন একতল গৃহ, সম্মুখে গোলাপ ফুলের বাগান। শুভ্রকেশ, প্রশান্ত মূর্তি গৃহস্বামী প্রসন্নহাস্যে সাধুকে অভ্যর্থনা করিলেন এবং উভয়ে ধর্মালোচনায় নিমগ্ন হইয়া গেলেন। স্বামীজী এই আলোচনার সময় একটিও ইংরাজী শব্দ ব্যবহার করেন নাই, কেননা ভারতীয় ঋষিগণের অভিমতের বিষয় আলোচনায় পাশ্চাত্য শব্দ ব্যবহার তাঁহার মতে অসঙ্গত বোধ হইয়াছিল।

বৈদ্যনাথ হইতে স্বামীজী গঙ্গাধর মহারাজকে সঙ্গে লইয়া কাশী আসিলেন এবং প্রমদাবাবুর বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করিলেন। স্বামীজী এই সময় এইভাবে তাঁহাকে নিজের সংকল্পের কথা বলেন—

I shall now leave Kashi, but shall never return until I have burst upon society like a bomb-shell and it will follow me like a dog. (The life of the Swami Vivekananda Vol. II Page 100)

"আমি এখন কাশী ছেড়ে যাচ্ছি, যতদিন না সমাজের বুকের উপর বোমার মত ফেটে পড়তে পারি এবং সমাজকে কুকুরের মত আমার অনুসরণ করাতে পারি ততদিন আর কাশী ফিরছি না।" স্বামীজীর এই উক্তিতে একধারে হিন্দু-সমাজের ব্যবহারিক দুর্নীতির উপর দারুণ বিতৃষ্ণা, অপরদিকে আত্মপ্রত্যয় সুস্পষ্ট হইয়াছে। তাঁহার প্রত্যেক উক্তিই ছিল এইরূপ তেজদৃপ্ত ও সুস্পষ্ট, অথচ অহমিকার ছায়া মাত্রও তাঁহার মনে ছিল না।

কাশী থেকে অযোধ্যা, অযোধ্যা থেকে নৈনিতাল, নৈনিতালে শ্রীযুক্ত রামপ্রসন্ন ভট্টাচার্য নামক এক বাঙ্গালী ভদ্রলোকের আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তিনি সেখানে কয়েকদিন থাকেন।

নৈনিতাল হইতে চলিলেন বদরিকার পথে। দুর্গম পথ, প্রায়ই জনশূন্য ও জঙ্গলের পথ। নিঃসম্বল দুই যাত্রী পদব্রজে চলিয়াছেন সেই পথে। জঙ্গলের ভিতর কে তাঁহাদের ভিক্ষা দিবে, কাজেই দিনের পর দিন অনাহারেই পথ চলিতে হইয়াছে। এইভাবে তিনদিন পথ চলিবার পর আলমোড়ার কাছাকাছি আসিয়া স্বামীজী এমন দুর্বল ও অবসন্ন হইয়া পড়িলেন যে, জঙ্গলের ধারে একটি কবরের কাছে অর্ধমূর্ছিতভাবে পড়িয়া গেলেন। তাঁহার তখন এমন অবস্থা যেন সেই মুহূর্তেই প্রাণ বাহির হইয়া যাইবে। ভাগ্যক্রমে সেখানে কবররক্ষক একজন মুসলমানের আস্তানা ছিল, সে তাঁহাকে খাইবার জন্য একটি শশা দিয়াছিল,

তাহাতেই সে যাত্রা তাঁহাদের প্রাণরক্ষা হইয়াছিল।

গঙ্গাধর মহারাজ ইতিপূর্বে একবার আলমোড়া আসিয়াছিলেন, তিনি অম্বা দত্তের বাগানবাড়ির কথা জানিতেন, সেখানে পর্যটক সাধুগণের আশ্রয়স্থান আছে। তিনি স্বামীজীকে সেইখানে লইয়া গেলেন। আলমোড়ায় বদ্রীশা থুলঘোড়িয়া নামে এক ভদ্রলোক থাকিতেন, ইনি সাধু-সন্ন্যাসী দেখিলেই নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিতেন। তারক মহারাজের সঙ্গে ইঁহার বিশেষ হৃদ্যতা ছিল। স্বামীজী যখন আলমোড়ায় আসিলেন শরৎ মহারাজ ও সান্ন্যাল মহাশয় তখন আলমোড়াতেই ছিলেন এবং বদ্রীশার গৃহেই আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। বদ্রীশা স্বামীজীর আগমনের কথা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে ও গঙ্গাধর মহারাজকেও নিজের বাড়িতে লইয়া গেলেন।

পার্বত্যসৌন্দর্যমণ্ডিত এই আলমোড়া, স্বভাবতঃই এখানে মনে ভগবৎভাবের উদ্দীপনা হয়। সাধুসন্ন্যাসীগণ এখানে গুহায় থাকিয়া তপস্যা করেন। স্বামীজীও কিছুদিন ধ্যান ও তপস্যায় যাপন করিবার জন্য একটি পর্বতের গুহায় আশ্রয় লইয়াছিলেন। পরে আবার বদ্রীশার বাড়িতে আসিয়া সকলে একত্রে মিলিত হইলেন এবং চারিজনে গাড়োয়ালের দিকে যাত্রা করিলেন।

কিন্তু স্বামীজীর দেহ পথশ্রমে ভগ্ন হইয়া পড়িয়াছিল, গাড়োয়াল হইতে হিমালয়ের পথে কর্ণপ্রয়াগ নামক স্থানে পৌঁছিয়াই তিনি পীড়িত হইয়া পড়িলেন এবং একটু সুস্থ হইয়াই আবার সঙ্গীগণের সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া রুদ্রপ্রয়াগে চলিলেন। পথে আবার তাঁহার জ্বর হইল, কিন্তু সেই জ্বর গ্রাহ্য না করিয়া তিনি হাঁটিয়া চলিলেন। বেশীদূর যাইতে না যাইতেই জ্বর এমন বাড়িয়া গেল যে আর অগ্রসর হওয়া সম্ভব হইল না।

রুদ্রপ্রয়াগে তখন চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা ছিল না। সেখানকার সরকারী আমিন চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু জানিতেন তিনিই চিকিৎসার ভার লইলেন। কিন্তু জ্বর মোটেই কমিল না, তখন সেই আমিনই নিজের ব্যয়ে একখানি ডাণ্ডি ভাড়া করিয়া তাঁহাকে শ্রীনগর পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন, তাঁহার গুরুভাইরা ডাণ্ডির সঙ্গে সঙ্গে হাঁটিয়া চলিলেন।

শ্রীনগরে গিয়া অলকানন্দার তীরে একটি কুটীরে তাঁহারা আশ্রয় লইলেন। কুটীরটি একেবারে নদীর উপরে এবং চারিদিকের দৃশ্যও অতি মনোরম। এই কুটীরেই কিছুদিন আগে স্বামী তুরীয়ানন্দ (হরি মহারাজ) অবস্থান করিয়া তপস্যা করিয়াছিলেন। সেই কথা শুনিয়া স্বামীজী আনন্দিত হইলেন। এখানে আসিয়া স্বামীজীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইল, তখন তিনি তাঁহার কুটীরে যাঁহারা আসিতেন তাঁহাদের সঙ্গে ধর্মালোচনা আরম্ভ করিলেন। সেখানকার একজন শিক্ষক, যিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি স্বামীজীর নিকট হিন্দুধর্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া পুনরায় হিন্দুধর্মে ফিরিয়া যান।

স্বাস্থ্যের উন্নতি হইলেই স্বামীজী গাড়োয়ালের রাজধানী তেহ্‌রীর দিকে যাত্রা করিলেন, গঙ্গাধর মহারাজ প্রভৃতিও তাঁহার সঙ্গেই চলিলেন। তেহ্‌রিতে সাধুদের থাকিবার জন্য গঙ্গার ধারে একখানি ঘর ছিল, সেই ঘরে তাঁহারা সদলে আশ্রয় লইতেন এবং মাধুকরী করিয়া দিন কাটাইতে লাগিলেন। পশ্চিমা সাধুরা গৃহস্থগণের বাড়ি যখন ভিক্ষার জন্য যাইতেন তখন বাড়ির দরজায় দাঁড়াইয়া "নারায়ণ হরি" উচ্চারণ করিয়া নিজের উপস্থিতি জানাইতেন, গৃহস্থ তাঁহাদের নিজেদের জন্য প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রী হইতে কিছু রুটির টুকরা ভাজি অথবা ডাল ভিক্ষা দিয়া দিতেন। এইরূপভাবে তিন চারি বাড়ি ঘুরিয়া উদর পূরণ করিবার মত খাদ্য পাইলে তাঁহারা অপর কোন বাড়ি যান না, এইরূপ ভিক্ষাকে "মাধুকরী" বলে। মাধুকরী দিনে একবার মাত্র করাই নিয়ম, সুতরাং রাতে তাঁহারা অনশনে থাকিতেন।

তেহ্‌রিতে থাকিবার সময় তেহ্‌রির মহারাজার দেওয়ান শ্রীযুক্ত রঘুনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সহিত স্বামীজীর পরিচয় হয়। ইঁহার বিশেষ অনুরোধে স্বামীজী কিছুদিন তেহ্‌রিতে ছিলেন, কিন্তু ইতিমধ্যে অখণ্ডানন্দ স্বামী অসুস্থ হইয়া পড়াতে চিকিৎসার জন্য তাঁহাকে দেরাদুন যাইতে হইল, এজন্য সে যাত্রা তাঁহাদের কেদারবদরী যাওয়া হইল না।

স্বামী তুরীয়ানন্দ তখন দেরাদুনের কাছেই রাজপুর নামক গ্রামে ছিলেন দেরাদুনের পথে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হইল, ইহাতে সকলেই আনন্দিত হইলেন। তেহ্‌রির দেওয়ান দেরাদুন হাসপাতালের সিভিল সার্জন ডাক্তার ম্যাক্‌লারেনের নামে একখানি অনুরোধপত্র দিয়াছিলেন সেই পত্র পাইয়া ডাক্তার সাহেব বিশেষ যত্নে গঙ্গাধর মহারাজের চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং সেই সঙ্গে স্বামীজী শরৎ মহারাজ এবং সান্ন্যাল মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে বন্ধুত্বে আবদ্ধ হইয়া

ছিলেন। তাঁহাদের নিকট ঠাকুরের জীবনের ঘটনাবলী শুনিয়া ডাক্তার ঠাকুরের শিষ্য-গণের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল হইয়াছিলেন।

এখানে স্বামীজী হৃদয় বসু নামক তাঁহার একজন কলেজের সহপাঠীর সাক্ষাৎ পান, ইনি খ্রীষ্টীয় ধর্ম অবলম্বন করিয়া-ছিলেন, এজন্য তাঁহার বাড়িতে প্রায়ই অনেক খৃষ্টান ধর্মপ্রচারক আসিতেন। স্বামীজী সেখানে তাঁহাদের সহিত আলোচনায় যোগ দিতেন, তাহাতে তাঁহারা খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে স্বামীজীর গভীর জ্ঞান দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন।

গঙ্গাধর মহারাজ একটু সুস্থ হইলেই স্বামীজী তাঁহাকে এলাহাবাদে একজন বন্ধুর বাড়িতে পাঠাইয়া দিলেন। সান্যাল মহাশয় তাঁহার সঙ্গে গিয়া তাঁহাকে সাহারাণপুর পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া আবার দেরাদুনে ফিরিয়া আসিলেন ও সকলে একত্র হইয়া হৃষিকেশে রওনা হইয়া গেলেন।

হৃষিকেশে আসিয়া তাঁহারা ঝাড় ও ঘাস দিয়া ছাওয়া একখানি ঘরে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হৃষিকেশে গঙ্গার ধারে এইরকম অনেক ঘর আছে, পরিব্রাজক সাধু আসিয়া তাহাতে যতদিন ইচ্ছা বাস করিতে পারেন। স্বামীজী এখানে আসিয়া আবার অসুস্থ হইয়া পড়িলেন এবং অসুখ এত বাড়িয়া গেল যে তাঁহার জীবনসংশয় বলিয়া মনে হইল।

নদীর চরে খড়ের ঝুপড়ি ঘর,—

চিকিৎসার কোন উপায়ই নাই, স্বামীজীর গুরুভাইরা ও সান্যাল মহাশয় বিষম চিন্তিত হইলেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এক-জন সাধু ঔষধ দিয়া সে যাত্রা স্বামীজীকে আরাম করেন।

স্বামীজী যেমন একটু সুস্থ হইলেন, অমনি বাহির হইয়া পড়িবার জন্য প্রস্তুত হইলেন এবং বলিলেন, "আমি একা যাইব, কেহ আমার সঙ্গী হইও না।" স্বামীজীর ইচ্ছায় বাধা দিবার কাহারও সাধ্য ছিল না, সুতরাং তাঁহারা মর্মাহত হইয়াও আপত্তি করিলেন না। স্বামীজী চলিয়া গেলেন; ব্রহ্মানন্দ স্বামী তখন কনখলে ছিলেন। তাঁহারা সেখানে গিয়া তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন এবং সকলে একত্রে সাহারাণপুরে গিয়া উকীল বঙ্কুবিহারী বাবুর আতিথ্য গ্রহণ করিলেন।

সেখানে গিয়া বঙ্কুবিহারীবাবুর নিকট তাঁহারা জানিতে পারিলেন যে, স্বামীজী মিরাট গিয়াছেন এবং গঙ্গাধর মহারাজকেও সঙ্গে নিয়া গিয়াছেন এবং ডাক্তার ত্রৈলক্যবাবুর বাড়িতে উঠিয়াছেন। এই সংবাদ পাইয়াই ব্রহ্মানন্দ স্বামী সদলে মিরাট রওনা হইলেন।

মিরাটে গিয়া সকলে একত্র হইলেন, মিরাট যেন আনন্দের নিকেতনে পরিণত হইল। প্রথমে ব্রহ্মানন্দ স্বামী প্রভৃতি শ্রীযুক্ত যজ্ঞেশ্বর বাবুর বাসায় উঠিয়া-ছিলেন, (এই যজ্ঞেশ্বর বাবুই পরে সন্ন্যাস দীক্ষা নিয়া ভারত ধর্ম মহামণ্ডলের স্বামী জ্ঞানানন্দ নামে পরিচিত হন) পরে শেঠজীর বাগানবাড়িতে সকলেই একসঙ্গে রহিলেন। এই সময় বুড়ো গোপাল দাদাও (স্বামী অদ্বৈতানন্দ, ঠাকুরের শিষ্যগণের মধ্যে ইনিই প্রবীণ ছিলেন) আসিয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইলেন।

মিরাটে তিনমাস সকলে একসঙ্গে ধ্যান, জপ ও শাস্ত্র আলোচনায় বেশ আনন্দেই কাটাইলেন, কিন্তু স্বামীজী আর এভাবে সময় কাটাইতে চাহিলেন না, প্রিয়জন সঙ্গে আনন্দে সময় কাটাইবার তাঁহার এখন অবসর নাই। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারীর শেষাশেষি তিনি তাঁহার গুরুভ্রাতাগণকে দৃঢ়ভাবে জানাইলেন যে, "এবার আমি একা যাব, তোমাদের কাহাকেও সঙ্গে নেব না, তোমরা কেহ আমার অনুসরণ কোর না।" এই বলিয়া দণ্ড ও কমণ্ডলু হাতে লইয়া দিল্লী রওনা হইয়া গেলেন।

তাঁহারাও আর মিরাটে থাকিতে পারিলেন না, স্বামীজী-হীন নিরানন্দ স্থান ত্যাগ করিয়া তাঁহারাও দিল্লী রওনা হইলেন এবং সেখানে গিয়া শ্রীযুক্ত শ্যাম-লাল দাস শেঠের বাড়ি স্বামীজী আছেন জানিয়া তাঁহার নিকটে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

এইভাবে তাঁহাদের উপস্থিত হইতে দেখিয়া স্বামীজী হাসিতে লাগিলেন। বোধহয় আনন্দিতও হইয়াছিলেন। বিবেকানন্দগত-প্রাণ তাঁহার এই সব গুরু-ভ্রাতা, কি করিয়া তিনি তাঁহাদের উপর কঠোর হইবেন? তবু তাঁহাকে কঠোর হইতেই হইল। তিনি দিল্লীত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন, এবং বিশেষ করিয়া তাঁহাদের এই অনুরোধ করিয়া গেলেন যে, তাঁহারা যেন তাঁহার আর অনুসরণ না করেন।

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

(৩০)

মডার্ন টাইমস্"-এর পর "দী গ্রেট ডিক্টেটর"। গ্রেট ব্রিটেন যুদ্ধে নামার অনেক আগে—১৯৩৯ সালের ১লা জানুয়ারি তারিখের মধ্যেই এ-বইয়ের মোটামুটি একটা পরিকল্পনা চার্লি ঠিক করে নিয়েছিলেন। তিনি বুঝতে পেরে-ছিলেন হীটলারকে নিয়ে যদি বই তুলতে হয়, সবাক বই তুলতে হবে। তার কারণ, হিটলার-চরিত্রের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য হল গলাবাজি। নির্বাক বই তুলতে গেলে হীটলারের চরিত্রটিকে ঠিক ফুটিয়ে তোলা যাবে না।

"দী গ্রেট ডিক্টেটর" তাঁর প্রথম সবাক চিত্র। দর্শক-সমাজ এই প্রথম তাঁর গলা শুনতে পেলেন। যাঁদের ইংরেজী-জ্ঞান খুব বেশী নয়, তাঁরাও যাতে তাঁর কথা-বার্তা ঠিকমত বুঝতে পারেন, তার জন্য এ-বইয়ে তিনি খুব ধীরেসুস্থে কথা কয়েছেন; সহজসরল ইংরেজী, বুঝতে না-পারার কোনও কথা নয়। আর-একটা কথা, এই প্রথম তিনি দ্বৈত ভূমিকায় অবতীর্ণ হলেন। প্রথম ভূমিকাটি এক নির্যাতিত ইহুদী নাপিতের, দ্বিতীয় ভূমিকাটি স্বয়ং হীটলারের। বইখানিতে অবশ্য সেই উগ্রচণ্ড ডিক্টেটরকে কোথাও হীটলার বলে উল্লেখ করা হয়নি, তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে আডেনয়েড হীঙ্কেল; কিন্তু হীঙ্কেল যে আসলে কে, সেটা বুঝে নিতে কোনও কষ্ট হয় না। হীটলারের মতন গলায় হীটলারের মতই তিনি চেঁচিয়েছেন; মুদ্রাদোষগুলিও বাদ যায়নি।

হীটলারের তর্জনগর্জনগুলিকে ঠিক-মত ফুটিয়ে তুলবার জন্য জার্মান-ঘেঁষা অদ্ভুত সব শব্দ প্রয়োগ করা হয়েছে। এমনিতেই শুনতে খুব মজা লাগে, তার উপর দোভাষীকে দিয়ে সেইসব শব্দের যে তর্জমা করিয়ে নেওয়া হয়েছে, তাতে হাসতে-হাসতে পেটে খিল ধরে যায়। একটি দৃশ্যের এখানে উল্লেখ করতে পারি। হীটলারের ভূমিকায় চ্যাপলিন বক্তৃতা-মঞ্চে এসে দাঁড়িয়েছেন, শ্রোতাদের চিৎকারে আর জয়ধ্বনিতে কানে তালা লেগে যাবার উপক্রম। চ্যাপলিন তাঁর একখানা হাত সামনে এগিয়ে দিলেন। উদ্দেশ্য দ্বিবিধ। এক, নাৎসী কায়দায় অভিবাদন জানানো; দুই, শ্রোতাদের কোলাহল বন্ধ করা। তারপর শুরু হল তাঁর বক্তৃতা। খুব খানিকক্ষণ চেঁচিয়ে নিয়ে তিনি বললেন, "ডেমোক্রাসিয়া স্টাংক্ (দোভাষীঃ অর্থাৎ কিনা, গণতন্ত্রের শবদেহ থেকে এখন দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে), লিবার্টাড স্টাংক্ (দোভাষীঃ অর্থাৎ কিনা স্বাধীনতা অতি কদর্য জিনিস), ফ্রী স্প্র্যাকেন্ স্টাংক্ (দোভাষীঃ অর্থাৎ কিনা বাক্-স্বাধীনতার চাইতে আপত্তিকর আর কিছুই হতে পারে না)। সারা পৃথিবীতে টোমানিয়ার মতন এত বড় সৈন্যবাহিনী, এত দুর্ধর্ষ নৌশক্তি আর কারো নেই। কিন্তু তাই বলেই আমাদের হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না; আরও ত্যাগস্বীকার করতে হবে আমাদের, আরও কষে কোমর বাঁধতে হবে।" পাশেই বসে আছেন স্থূলোদর গোয়েরিং। হীটলারের নির্দেশ শুনে উঠে দাঁড়ালেন তিনি, এবং আরও কষে যেই কোমর বাঁধতে গিয়েছেন, পটাং করে তাঁর বেল্ট ছিঁড়ে গেল।

হীটলারের ভূমিকায় চার্লি, "দী গ্রেট ডিক্টেটর"

প্রথম-প্রথম হীটলারের বক্তৃতা বেশ বুঝতে পারা যাচ্ছিল। কিন্তু ক্রমেই তিনি উত্তেজিত, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছেন। ক্রমেই তাঁর তর্জন-গর্জন আরও বেড়ে যাচ্ছে। উন্মত্ত আক্রোশে তিনি চেঁচাচ্ছেন এখন; কী যে বলছেন, কিছুই আর বুঝতে পারা যাচ্ছে না। বক্তৃতার তোড়ে মাইকটাও আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ছে। দর্শকদের চোখের সামনে থেকে হীটলারের চেহারাটাকে এই সময়ে ধীরে ধীরে মিলিয়ে দেওয়া হয়; দেখা যায়, হীটলারের জায়গায় বিরাট একটা গরিলা এসে দাঁড়িয়েছে, অন্ধ ক্রোধে সে বুক চাপড়াচ্ছে। সেই ভয়ানক বক্তৃতা একসময় শেষ হল। হীটলার ঘুরে দাঁড়ালেন, মঞ্চ থেকে এবারে তিনি বিদায় নেবেন। এদিকে হয়েছে কি, শ্রোতাদের মধ্যে পরিচিতা এক ভদ্রমহিলাকে দেখতে পেয়ে গোয়েরিং তাঁর আসন ছেড়ে তাঁকে অভিবাদন জানাতে আসছিলেন। ফুয়রার যে তাঁর ঠিক পাশেই এসে দাঁড়িয়েছেন, গোয়েরিংয়ের সেদিকে লক্ষ্য নেই। উঠে দাঁড়াতেই হীটলারের সঙ্গে তাঁর সঙ্ঘর্ষ ঘটল, এবং মঞ্চের উপর থেকে হীটলার একেবারে মাটিতে গিয়ে আছড়ে পড়লেন। দাঁড়িয়ে উঠে খুব খানিকক্ষণ চেঁচালেন তিনি, তাতেও তাঁর রাগ পড়ল না। তখন করলেন কি, গোয়েরিংকে যে-সব মেডেল উপহার দিয়েছিলেন, এগিয়ে গিয়ে তাঁর জামা থেকে পটপট করে সেগুলোকে ছিঁড়ে নিতে লাগলেন।

অনুষ্ঠান শেষ হয়েছে। এবারে হীটলারের ফটো তোলা হবে। হীটলারের দিকে ছোট্ট একটি শিশুকে এগিয়ে দেওয়া

হল। শিশুকে কোলে নিয়ে ফটো তোলালে সবাই খুব খুশী হবে। ভাববে যে, রাষ্ট্র-নায়ক হিসেবে এত কঠোর হলে কি হয়, আসলে তাঁর অন্তঃকরণ খুব কোমল। অগত্যা বাচ্চাটিকে তিনি কোলে তুলে নিলেন। ফটো তোলা শেষ হবার সঙ্গে-সঙ্গেই বিরক্ত ভঙ্গীতে বাচ্চাটিকে আবার ফেরত দিলেন হীটলার। যে হাতে তাকে কোলে নিয়েছিলেন, সাবান-জলে সে-হাত ধুয়ে ফেললেন।

একটু বাদেই গোয়েবল্‌সের আবির্ভাব। জনান্তিকে হীটলারকে তিনি খবর দিলেন যে, জনসাধারণের পেটে অন্ন নেই যে-কোনও মুহূর্তে তারা বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে। আসল সমস্যাটা যদি তাদের ভুলিয়ে রাখতে হয় তো অন্য-কোনও উপলক্ষ্যের পিছনে তাদের লেলিয়ে দেওয়া দরকার। কাদের বিরুদ্ধে? সে-পরামর্শও গোয়েবল্‌স দিলেন। বললেন যে, ইহুদী-দের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষেপিয়ে তোলা হোক। তা হলে আর কারও কিছু বলার থাকবে না।

পরের দৃশ্য ইহুদী-পাড়া। বইয়ের নায়িকা হানা (পলেট গডার্ড) সেখানে থাকে। দুঃস্থ অনাথ মেয়ে। প্রথম মহা-যুদ্ধে তার বাপ-মা মারা গিয়েছেন। হঠাৎ দেখতে পাওয়া গেল, জার্মান সৈন্য-দল ইহুদী-পাড়ায় এসে প্রবেশ করেছে। হানাদের বাড়ির জানালা-দরজা ভেঙে, রাস্তার দোকান-পাট লুঠ করে, হানার গায়ে পচা টম্যাটো ছুঁড়ে তারা চলে গেল।

চার্লিও এই ইহুদী-পাড়ারই বাসিন্দা। স্মৃতি-ভ্রংশ রোগে আক্রান্ত হয়ে বছর কয়েক হাসপাতালে ছিলেন তিনি, সম্প্রতি সেখান থেকে পালিয়ে এসেছেন। ইহুদী-পাড়ায় আগে তাঁর একটি সেলুন ছিল। হাসপাতাল থেকে পালিয়ে এসে দেখেন, তাঁর দোকানঘর মাকড়শার ঝুলে বোঝাই হয়ে রয়েছে। দেখে তো তিনি অবাক। মাঝখানে বছর কয়েক যে তিনি এখানে ছিলেন না, সে-সব তাঁর মনে নেই। ঘরদোর পরিষ্কার করে, সাদা জ্যাকেটটি গায়ে চড়িয়ে তিনি খদ্দেরের আশায় বসে আছেন, এমন সময় জার্মান সৈন্যরা তাঁর দোকানে এসে ঢুকল। দোকান-ঘরের জানালায় 'ইহুদী' শব্দটি লিখে দিয়ে তারা চলে যাচ্ছিল। লেখাটাকে চার্লি মুছে দিতেই তারা চার্লির উপরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ধস্তাধস্তির মধ্যে একজন একটা লাথি কষিয়ে দিল তাঁকে, চার্লিও তাঁর রঙের পোচরাটা তার মুখের উপরে এক-বার বুলিয়ে দিলেন।

সময়ের বিচারে এ-বইয়ের কাহিনী অনেক আগেই শুরু হয়েছে। প্রথম মহা-যুদ্ধের অন্তিম পর্যায়ের পটভূমিকায় এর সূত্রপাত। ইহুদী-পাড়ার সেই সেলুন থেকে চার্লিকে তখন জোর করে যুদ্ধে নিয়ে যাওয়া হয়। মাথায় বিরাট একটা হেলমেট, সেই অবস্থায় তাঁকে 'বীগ

ইহুদী নাপিতের ভূমিকায় চার্লি, "দী গ্রেট ডিক্টেটর"

বার্থা'র পাশে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। 'বীগ বার্থা' দূরপাল্লার কামান। গোলা দেগে চার্লিকে এখন পঁচাত্তর মাইল দূরে নোৎরদেম গির্জাকে উড়িয়ে দিতে হবে। কামান চালিয়ে দেখা গেল, গোলাটা মাত্র গজখানেকের বেশী এগোয়নি। জ্বলন্ত সেই গোলাটা মাটিতে পড়ে ছটফট করছে। তারপরেই একটা মারাত্মক ছুঁচো-বাজির মতন সেটা চার্লিকে তাড়া করে বেড়াতে লাগল। সে এক ভয়াবহ কাণ্ড।

প্রথম দিককার এই দৃশ্যগুলির একটিতে দেখা যায়, দয়াপরবশ হয়ে চার্লি এক আহত বৈমানিককে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছেন। বৈমানিকের নাম শুল্‌ৎস। জরুরী খানকয়েক চিঠি যথা-স্থানে পৌঁছে দেবার জন্য চার্লিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বিমান চালিয়ে যাচ্ছিলেন। অকস্মাৎ তিনি আহত হয়ে পড়েন। কীভাবে বিমান চালাতে হয়, চার্লি তা জানেন না। না জানলে কী হয়, আহত বন্ধুকে সাহায্য করার জন্য তিনি তখন এতই উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন যে, বন্ধুকে সরিয়ে দিয়ে তিনি নিজেই ককপীটের মধ্যে গিয়ে বসলেন। বিমানখানা তখন চিত হয়ে মাটির দিকে নেমে আসছে। ভিতর থেকে চার্লি তা বুঝতে পারেন নি। তাঁর ধারণা, সূর্যটাই নীচের দিকে নেমে গিয়েছে, তাঁরা ঠিকই আছেন। বোতল থেকে জল গড়িয়ে পড়ে যখন 'উপর' দিকে এগিয়ে চলল, তখন হুঁশ হল চার্লির। হাত থেকে ঘড়িটা খুলে নিয়ে দেখেন, সেটাও 'উপর' দিকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু তখন আর কোনও উপায় নাই। একটু বাদেই বিমানখানা মাটির উপরে এসে আছড়ে পড়ল। দুজনের কেউই অবশ্য প্রাণে মারা পড়লেন না, কিন্তু সেই মারাত্মক আঘাতে চার্লির স্মৃতিশক্তি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গেল। রণাঙ্গন থেকে তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। বছর কুড়ি সেখানে তিনি ছিলেন। তারপর পালিয়ে এসেছেন। তারপর যা-যা ঘটেছে, সে-কথা আগেই বলেছি।

সেলুনের মধ্যে জার্মান সৈন্যদের সঙ্গে যখন তাঁর হাতাহাতি চলছে, সেই-সময়ে হঠাৎ শুল্‌ৎস সেখানে এসে উপস্থিত। চার্লি একদিন তাঁর প্রাণরক্ষা করেছিলেন, শুল্‌ৎসের তা মনে আছে। শুল্‌ৎস আর এখন একজন সামান্য মানুষ নন, নাৎসিদের তিনি একজন নেতা। সেলুন থেকে সৈন্যদের সরিয়ে দিয়ে চার্লিকে তিনি বললেন, "আমাকে তুমি চিনতে পারছ না? গত যুদ্ধে তুমি আমার প্রাণরক্ষা করেছিলে। কী আশ্চর্য, তুমি যে ইহুদী, তা আমি জানতাম না। আমার ধারণা ছিল, তুমি আর্য, এরিয়ান।" মাঝ-খানের কয়েক বছরে যে-সব পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে, চার্লি তার কিছুই জানেন না। শুল্‌ৎসের কথায় হকচকিয়ে গিয়ে তিনি বললেন, "এরিয়ান! না, আমি এরিয়ান নই, আমি হচ্ছি ভেজিটেরিয়ান। মাছ-মাংস আমি খাই না।"

পরের দৃশ্যে হীটলারের প্রাসাদ।

হীটলার এবং মুসোলিনী, "দী গ্রেট ডিক্টেটর"

প্রথমে একজন শিল্পী তাঁর কাছে এলেন, তারপর একজন ভাস্কর। একজন তাঁর ছবি আঁকবেন, আর-একজন গড়বেন তাঁর মূর্তি। দু'জনকে খানিকক্ষণ সময় দিয়ে হীটলার চিঠি লিখতে বসলেন। চিঠি লেখা শেষ হয়েছে, এবারে খামের মুখ বন্ধ করতে হবে। পাশেই দাঁড়িয়ে আছে এক ভৃত্য। সে তার জিভ বের করতেই, জিভের উপর খামটাকে একবার বুলিয়ে নিলেন হীটলার, তারপর খামের মুখ এ'টে দিলেন। ততক্ষণে এক বৈজ্ঞানিক তাঁর ঘরে এসে ঢুকেছেন। নতুন এক-রকমের পোশাক আবিষ্কার করেছেন তিনি; পোশাকটা এতই শক্ত যে, তার মধ্যে বুলেট বিদ্ধ হবার কোনও আশঙ্কা নেই। উত্তম, তা হলে তো একবার পরীক্ষা করে দেখা দরকার। স্বয়ং বৈজ্ঞানিককে সেই পোশাক পরিয়ে দিয়ে হীটলার তাঁর উপরে গুলী চালালেন। সঙ্গেসঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ল তাঁর মৃতদেহ। বিরক্তিভরে হীটলার বললেন, "নাঃ, এতে কাজ চলবে না।" তারপর পরীক্ষা হল একটা প্যারা-সুট টুপি। এবারকার ফলাফলও সমান ভয়াবহ। পাশেই দাঁড়িয়ে আছেন গোয়েরিং। চটে গিয়ে হীটলার তাঁকে বললেন, "যাও, এইভাবে আর আমার সময় নষ্ট কোরো না।" অতঃপর এলেন গোয়েবল্‌স! তিনি এসে জানালেন, রোজ যে হাজার-হাজার লোককে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে, বন্দী-শিবিরে তাদের জায়গা দেওয়া যাচ্ছে না। তা ছাড়া, বন্দীদের খাবারের সঙ্গে যে কাঠের গুঁড়ো মিশিয়ে দেওয়া হয়, তা নিয়েও সেখানে আপত্তি উঠেছে। শুনে হীটলার তো চটে লাল। তিনি বললেন, "বন্দীদের গিয়ে বল যে, সব-চাইতে মিহি কাঠের গুঁড়ো তাদের খেতে দেওয়া হয়।"

পরের দৃশ্যে দেখা যায়, চার্লি তাঁর সেলুনের মধ্যে এক ইহুদী খদ্দেরের দাড়ি কামাচ্ছেন। খদ্দেরটির নাম জীকেল। পলেট মেঝে সাফ করছেন। কাজ করতে-করতেই কথাবার্তা চলছে তাঁদের। সেই যে জার্মান সৈন্যরা এসে হানা দিয়েছিল, তারপর আর নতুন করে ইহুদীদের উপরে কোনও অত্যাচার চালানো হয়নি। তাই নিয়েই তাঁরা আলোচনা করছেন। আসলে, হীটলার যে এখন অস্ট্রিয়া আক্রমণের পরি-কল্পনা নিয়ে ব্যস্ত আছে, তা তাঁরা জানেন না। দর্শকরা কিন্তু জানেন। তার কারণ, হীটলার আর গোয়েবল্‌সকে এ-নিয়ে তাঁরা পরামর্শ করতে শুনেছেন। পরামর্শের সেই দৃশ্যটিতে হীটলারের চরিত্রকে যে আশ্চর্য নৈপুণ্যে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তাতে বিস্মিত হতে হয়। গোয়েবল্‌স তাঁকে বুঝিয়েছেন যে, আর কিছুদিন বাদেই তিনি সারা পৃথিবীর অধীশ্বর হবেন। শুনে হীটলার তো লোভে, উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছেন। সামনেই ছিল একটা প্লোব। প্লোবটাকে হাতে তুলে নিয়ে আনন্দে তিনি নেচে নিলেন খানিকক্ষণ। তারপর সেটাকে নিয়ে লোফালুফি খেলতে লাগলেন। কখনো সেটাকে জড়িয়ে ধরেন, কখনো লাথি মারেন, কখনো দমাদম ঘুষি বসিয়ে দেন। একটু বাদেই সেটা ভেঙে চৌচির হয়ে গেল। এত সুন্দর ব্যালে চার্লির খুব কম বইয়েতেই আছে।

শুধু হিটলারের ভূমিকাতেই নয়, ইহুদী নাপিতের ভূমিকাতেও চার্লির নাচের একটি দৃশ্য রয়েছে। হাঙ্গারীয় বাজনার তালে তালে তিনি হাত ধুয়ে নিয়ে তোয়ালেতে হাত মুছলেন, স্ট্রপারের গায়ে ক্ষুরটাকে ঘষে নিলেন বারকয়েক, ধারটা ঠিকমত হয়েছে কি না দেখবার জন্যে একজন খদ্দেরের চুল কেটে নিলেন একগুচ্ছ, খদ্দেরের মুখে সাবান মাখালেন, দাড়ি কামালেন, তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে দিলেন, টুপিটাকে সামনে এগিয়ে ধরলেন তাঁর, তারপর পয়সার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিলেন। আর এই সমস্ত কিছুই করলেন বাজনার নাচে-তালে। গোটা দৃশ্যটির মধ্যে যে অপরূপ একটি নৃত্য-চ্ছন্দ ধরা দিয়েছে, কারো পক্ষেই তা কখনো বিস্মৃত হওয়া সম্ভব নয়।

অস্ট্রিয়া আক্রমণে দেরি হয়ে যাওয়ায় হীটলার ওদিকে শুল্‌ৎসের উপরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছেন। তিনি আদেশ দিলেন, অবিলম্বে যেন শুল্‌ৎসকে গ্রেপ্তার করে বন্দিশিবিরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তাঁকে যে গ্রেপ্তার করা হবে, শুল্‌ৎস সেটা আগেই জানতে পেরে গিয়েছিলেন। সময় থাকতেই তিনি গা ঢাকা দিলেন। কর্তৃপক্ষের ধারণা হল, ইহুদীপাড়ায় গিয়ে তিনি লুকিয়ে আছেন। সঙ্গে-সঙ্গেই ইহুদীদের উপরে আবার অত্যাচার আরম্ভ হয়ে গেল। অকস্মাৎ চার্লি একদিন দেখেন, জার্মান সৈন্যরা তাঁর দোকানে এসে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। চার্লি আর পলেট ছাদে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ঠিক করলেন, সুযোগ পেলেই তাঁরা অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে যাবেন, সেখানে গিয়ে নতুন করে সংসার পাতবেন আবার। পালাবার আগে হঠাৎ শুল্‌ৎসের

সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। হীটলারের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পুরনো একটা সেলারের মধ্যে তিনি লুকিয়ে বসে আছেন।

শুল্ৎস ঠিক করলেন, হীটলারকে হত্যা করতে হবে। হীটলারের বিরুদ্ধে গোপনে-গোপনে ইহুদীদের তিনি সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলতে লাগলেন। গড়ে উঠল একটা গুপ্ত সমিতি। দিন কয়েক বাদে সেই গুপ্ত সমিতির এক সভায় স্থির করা হল যে, সদস্যদের মধ্যেই কেউ একজন হীটলারকে হত্যা করবার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। কার উপরে দেওয়া হবে এই ভয়াবহ দায়িত্ব? লটারি করে সেটা ঠিক করা হবে। সদস্যদের সামনে বড় একটা কেক এগিয়ে দেবেন পলেট। কেকের মধ্যে আগে থাকতেই একটা পয়সা ঢুকিয়ে রাখা হবে। তারপর সদস্যরা সেই কেকের এক-এক টুকরো কেটে নেবেন। যাঁর টুকরোর মধ্যে পয়সা থাকবে, তাঁকেই নিতে হবে হীটলারকে হত্যা করবার দায়িত্বভার। এদিকে পলেট করেছেন কি, একটার বদলে অনেকগুলো পয়সা সেই কেকের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছেন। এক-একজন এক-এক টুকরো কেক কেটে নেন, আর সঙ্গে-সঙ্গেই শিউরে ওঠেন। প্রত্যেকেই তাঁর কেকের টুকরোটিকে পাশের লোকের প্লেটে চালান করে দেবার চেষ্টা করছেন। চার্লি তো তিন-তিনটে পয়সা স্রেফ গিলে ফেললেন। এক-একবার ঢেকুর তোলেন, আর পয়সাগুলো তাঁর পেটের মধ্যে ঝন্-ঝন্ করে বেজে ওঠে। ভারী মজার এই দৃশ্যটি।

হীটলার জানতে পারলেন যে, তাঁকে হত্যা করবার জন্য একটা ষড়যন্ত্র চলছে। সঙ্গে-সঙ্গেই সারা দেশ জুড়ে শুল্ৎস আর চার্লির তল্লাসি শুরু হয়ে গেল। সীমান্ত অতিক্রম করে দু'জনে পালাতে চেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। অতর্কিতে সৈন্যদল গিয়ে বন্দী করল তাঁদের, বন্দী-শিবিরে নিয়ে এল। পলেট আর জীকেল (সেলুনের সেই ইহুদী খদ্দের) ততক্ষণে নিরাপদে অস্ট্রিয়ায় গিয়ে পোঁছেছেন। কিছুকালের জন্য তাঁরা এখন নিশ্চিন্ত।

অস্ট্রিয়ার উপরে আক্রমণ চালাতে গিয়ে এদিকে আবার আর এক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন হীটলার। সমস্যাটা অপ্রত্যাশিত। মুসোলিনি (এ-ভূমিকায় নেমেছিলেন জ্যাক ওকি, চেহারার সাদৃশ্য লক্ষণীয়) নাকি সীমান্ত অঞ্চলে ব্যাপকভাবে সৈন্য-সমাবেশ শুরু করে দিয়েছেন। দিনকয়েক এখন তাঁকে একটু খুশী রাখা দরকার। হীটলার তাই তাঁকে বার্লিনে আমন্ত্রণ জানালেন। ব্যাপারটা নিয়ে মুসোলিনির সঙ্গে তিনি আলোচনা করতে চান। মুসোলিনি আসছেন, তাঁকে সম্মান দেখাবার জন্য রেল-স্টেশনের প্ল্যাটফর্মের উপরে লাল কার্পেট বিছিয়ে রাখা হয়েছে। ইঞ্জিন-ড্রাইভারকে বলে দেওয়া হয়েছে, এমনভাবে তাকে গাড়িটা এনে স্টেশনে ঢোকাতে হবে, মুসোলিনির কামরাটা যাতে ঠিক কার্পেটের সামনে এসে থামে। গাড়ি শান্ট্ করতে-করতে সে-বেচারা গলদধর্ম। ছোট্ট এই ব্যাপারটার মধ্যে হাস্যরসের যে উপাদান রয়েছে, চার্লি তাকে চমৎকার কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন।

দুই ডিক্টেটর পরস্পরের সামনে এসে
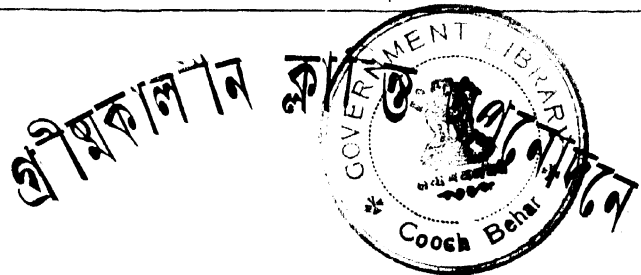
"দী গ্রেট ডিক্টেটর"-এর আর-একটি দৃশ্যে পলেট এবং চার্লি

দাঁড়ালেন। করমর্দনের আগে পরস্পরকে স্যালুট করলেন তাঁরা। ভংগীগুলো এতই নিষ্প্রাণ যে মনে হয়, তাঁরা রক্তমাংসের মানুষ নন, দুটি যন্ত্র। এবারে তাঁদের ফটো তোলা হবে। ব্যস, অমনি তাঁদের বন্ধুত্বের মুখোস খসে পড়ল। পরস্পরকে কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে দুজনেই সামনে মুখ বাড়িয়ে দেবার চেষ্টা করছেন; দু'জনেরই ইচ্ছে, তাঁর নিজের ছবিটা অন্যের চাইতে একটু ভাল উঠুক। পরের দৃশ্যে হীটলারের প্রাসাদ। দু'জনের মধ্যে এখন আলোচনা চলবে। মুসোলিনির প্রতিপত্তি যে তাঁর চাইতে অনেক কম, সেটা তাঁকে বুঝিয়ে দেবার জন্যে হীটলার করলেন কি, নিচু একটা চেয়ার তাঁর দিকে এগিয়ে দিলেন। নিজে বসলেন উঁচু চেয়ারে। মুসোলিনি খুব ক্ষুব্ধ হলেন, বলাই বাহুল্য, কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ করলেন না। চেয়ারটাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে তিনি ডেস্কের উপরে গিয়ে বসলেন। শুধু তাই নয়। তাঁর পাশেই ছিল হীটলারের একটা আবক্ষ প্রস্তর-মূর্তি। সেই মূর্তির গায়ে দেশলাই ঠুকে তিনি সিগারেট ধরিয়ে নিলেন। নাপিতের কাছে দাড়ি কামাবার সময় দু'জনের এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা তার চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছল। যে-চেয়ারে বসে দাড়ি কামানো হচ্ছে, ইচ্ছে-মতন সেটাকে উঁচু-নিচু করে নেওয়া চলে। যে-যার নাপিতকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তাঁর চেয়ারটাকে আরও উঁচু করে দেওয়া হোক। উঁচু হতে-হতে হীটলার প্রায় ছাদের কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেছেন; কিন্তু সেদিকে তাঁর খেয়াল নেই। চেয়ারটাকে আর একটু উঁচু করে দিতেই ছাদের সংগে ধাক্কা খেলেন তিনি, টাল সামলাতে না পেরে মাটির উপরে এসে আছড়ে পড়লেন। এই দৃশ্যটিতে তো বটেই, অন্যান্য কয়েকটি দৃশ্যেও চার্লির পূর্ব-পর্যায়ের কয়েকটি ছবির খানিকটা আদল খুঁজে পাওয়া যায়। স্থূলাংগী মিসেস মুসোলিনির সংগে হীটলারের নাচের দৃশ্যটিও কীস্টোন স্টুডিওতে তোলা ছবির কথা মনে করিয়ে দেয়।

শেষ পর্যন্ত একটা আপোষ-রফা হল দু'জনের মধ্যে। আপোষের ভিত্তিতে 'চুক্তিপত্র রচনা করা হয়েছে; তাতে সই করে দিয়ে পরস্পরকে তাঁরা আলিংগন করলেন। তার একটু বাদেই খবর পাওয়া গেল, চার্লি আর শুল্‌ৎস বন্দী-শিবির থেকে পলায়ন করেছেন।

(ক্রমশ)

টেলিফোনটা বাজছিল অনেকক্ষণ ধরে, ওটা আমার টেবিলেই থাকে। ভিতরে সায়েবের কাছে নোট নিচ্ছিলাম। খাতা-পেন্সিল সেখানে রেখে দিয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এসে ফোনের রিসিভার তুলে নিলাম। "সিটি ওয়ান-সেভেন-টু-ফোর?" ওপাশ থেকে একটি মেয়েলী কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল। ওপাশকে জানিয়ে দিলাম তাঁর ভুল হয়নি। ওপাশ থেকে আবার বলা হলো, "আমি ডক্টর মিত্র কথা বলছি। আপনার সায়েবের সঙ্গে কখন দেখা হতে পারে?" ডক্টর মিত্রকে দেখা করার সময় জানিয়ে সেটা সায়েবের ডাইরীতেও লিখে রাখলাম।

টেলিফোনে কথার শেষে কতবার এমনিভাবে ডাইরীতে দিনক্ষণ লিখে রেখেছি, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটের জীবনে, টেলিফোনের মাধ্যমে কত আলাপের সূত্রপাত হয়েছে। ফোনের অজানা, অচেনা লোকটি হাজির হয়েছেন তাঁর সমস্যার বোঝা নিয়ে। সায়েব চেষ্টা করেছেন সাহায্য করার, আমি নেপথ্যে দাঁড়িয়ে নীরবে দেখে গেছি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। কেউ জিতেছে, কেউবা হেরে গেছে, আশা সফল হয়নি। তারা বিদায় নিয়েছে ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীট থেকে; সম্ভবত তাদের পায়ের চিহ্ন ওপাড়ায় আর পড়বে না, তাদের সকলকে মনে রাখতে পারিনি, অপরিচয় থেকে পরিচয় যেমন আকস্মিকভাবে হয়েছিল, বিস্মৃতির গতি তত দ্রুত না হলেও ধীরে ধীরে সে নেমে এসেছে মনের মাঝে।

আবার অনেকে আজও স্মৃতিপটে জ্বল জ্বল করছেন। তাঁদের মুখগুলো অতি স্পষ্টভাবে চোখের সামনে ভেসে ওঠে, চোখ, মুখ, কপালের প্রতিটি রেখা মনে পড়ে যায়। ডাইরী লিখিনি কোনদিন, ধরে রাখিনি দৈনন্দিন ঘটনার রোজনামচা। কিন্তু কোনো আফসোস করি না সেজন্য, হয়ত ভালই হয়েছে। আমার অগোচরে মন যাকে ভালো বুঝেছে, তাকেই সযত্নে সঞ্চয় করে আজ প্রয়োজনীয় কিংবা অপ্রয়োজনীয় বস্তুর বাছাই করার কর্তব্য থেকে আমাকে নিষ্কৃতি দিয়েছে।

ডক্টর শেফালি মিত্র প্রথম দিন চেম্বারে কিভাবে এসেছিলেন, একটুও ভুলিনি। চোখে চশমা, মণিবন্ধে কালো সিল্কের ব্যাণ্ডে খুব ছোট্ট একটি ঘড়ি। বর্ণ উজ্জ্বলশ্যাম হলেও স্নিগ্ধ। অতি সাধারণ সরু কালোপাড়ের শাড়ি পরেছিলেন ডক্টর শেফালি মিত্র। দোহারা চেহারা, হাতে স্টেথসকোপ নিয়ে চেম্বারে ঢুকলেন তিনি।

ডক্টর মিত্রের চিকিৎসা জগতে সুনাম আছে। তাঁর চেম্বারে মাসিমাকে নিয়ে আমি গিয়েছিলাম একবার। শাড়ির উপর সাদা অ্যাপ্রন পরে রোগী দেখছিলেন তিনি। টেম্পল চেম্বারে প্রথম দর্শনেই তাঁকে চিনতে পারলাম।

তাঁকে চেয়ার এগিয়ে দিয়ে সায়েব

হেসে বললেন, "বসন ডক্টর মিত্র। উকিল ডাক্তারদের গমনাগমনটা সাধারণত এক তরফা হয়। ডাক্তারের চেম্বারে যেতে প্রায়ই বাধ্য হই, ছোটখাট রোগবিরোগ তো লেগেই আছে। ডাক্তারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বোধ আমার সেইজন্য খুবই সজাগ।"

ডক্টর মিত্র ম্লান হেসে টেবিলের উপরে স্টেথসকোপটা রাখলেন, "আচ্ছা বলতে পারেন মেয়ে কার?"

শর্টহ্যান্ডের নোটবুক হাতে আমি পাশে বসেছিলাম। প্রশ্ন শুনে ডক্টর মিত্রের মুখের দিকে তাকালাম। মেয়ে কার —আইনের প্রশ্ন না হেঁয়ালি? শাস্ত্রবাক্য মনে পড়ে গেল—নারী প্রথম জীবনে পিতার, যৌবনে স্বামীর এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন।

সায়েব বললেন, "আপনার প্রশ্নের অর্থ ঠিক বুঝতে পারলাম না। আইনের চোখে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে প্রত্যেক মেয়েই স্বাধীন।"

ডক্টর মিত্র একটু কেসে গলা পরিষ্কার করে বললেন, "আমি নিজেও কিছু বুঝে উঠতে পারছি না। অন্তরাত্মা জানেন জাহানারা আমারই। কিন্তু আইনে নাকি অন্যরকম লেখা আছে। সত্যি নাকি, আপনি ঠিক করে বই-টই দেখে বলুন। আপনি যে ফী চাইবেন দেব, কিন্তু জাহানারাকে আমার চাই।"

বিলেত-ফেরৎ ডক্টর শেফালি মিত্রকে এমন ভাবাবেগে কথা বলতে দেখে আমি অবাক। জাহানারার জন্য তিনি ভয় পেয়েছেন।

"কে এই জাহানারা?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমি দুঃখিত, কিছু মনে করবেন না। আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম, আসল ঘটনার বর্ণনা না করেই প্রশ্নের উত্তর চাইছি।" নিজেকে সংযত করে নিলেন ডক্টর মিত্র, তিনি বেশ লজ্জা পেয়েছেন।

"জাহানারা আমার মেয়ে, তার পুরো নাম জাহানারা প্যাটেল।"

শেফালি মিত্রের মেয়ে জাহানারা প্যাটেল! বিস্মিত হলেও অত্যন্ত সহজ-ভাবে সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার মেয়ে?"

শেফালি মিত্র গম্ভীরভাবে বললেন, "জাহানারা আমাকে মা বলে জানে, আমি তাকে গর্ভে ধরিনি সত্য, কিন্তু নিজের মেয়ের মতনই তাকে মানুষ করেছি।" তাঁর এলোমেলো কথায় সমস্ত ঘটনাটি আরও হেঁয়ালিপূর্ণ হয়ে উঠছে বলে মনে হলো।

সায়েবেরও অনুরূপ অবস্থা। তিনি নিজেই বললেন, "আপনার সম্পূর্ণ ইতিহাস আমার গোড়াতেই শোনা প্রয়োজন। জাহানারা সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।"

ডক্টর মিত্র লজ্জিত হলেন, "ঠিক বলেছেন। ইতিহাসটা এলোমেলোভাবে বর্ণনা করে লাভ নেই।" তিনি সায়েবের দিকে চেয়ে রইলেন।

"আজ থেকে অনেক বৎসর আগে আমি একজন ইহুদীকে বিয়ে করি, আমি তখন শেফালি মিত্র নই, শেফালি সলোমন। আমার স্বামীর কাঠের ব্যবসা, তাঁকে বেশ ধনী বলা চলতে পারে। কিন্তু ফ্যান, ফোন, শাড়ি সব থেকেও আমাদের কোন শান্তি ছিল না।

আমি নিজে ডাক্তার, তবে বিশেষ প্র্যাকটিস করতাম না। করার প্রয়োজন ছিল না এবং স্বামীও বিশেষ পছন্দ করতেন না যে, আমি দিনরাত ডাক্তারীতে মেতে থাকি।

কিন্তু অশান্তি সেজন্য নয়, কারণ অন্য।

বছর কয়েকের মধ্যে আমার কোন সন্তান হলো না। বড় বড় কয়েকজন ডাক্তারকেও দেখালাম। তাঁরা সকলে এক-মত—আমার সন্তান হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।"

ডক্টর শেফালি মিত্র আস্তে আস্তে ভেবে ভেবে কথা বলায় শর্টহ্যান্ড নোট-বুকে অনায়াসে লিখে যাচ্ছিলাম।

"তারপর?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

"তারপর বিবাহ বিচ্ছেদ। মিস্টার সলোমন বেশী বয়সে আবার বিয়ে করে-ছিলেন, আমি সংবাদ পেয়েছিলাম।

মিস্টার সলোমন ব্যবসাসূত্রে রেঙ্গুনে যেতেন মাঝে মাঝে, আমিও তাঁর সঙ্গে রেঙ্গুনে গিয়েছি কয়েকবার। জানাশোনা হয়ে গিয়েছিল কিছু কিছু। ওখানকার এক মেয়েদের হাসপাতালে চাকরি খালি ছিল। মাইনে কম হলেও কাজটা ছাড়লাম না। হাসপাতালের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে প্রাইভেট প্র্যাকটিসও কিছু কিছু করতে লাগলাম। আউট ডোরে কত রকমের লোক আসে—চীনা, বার্মিজ, ভারতীয়। কিছু কিছু বাঙালীর সঙ্গে দেখা হতো। মাতৃ সদনটির সুনাম আছে রেঙ্গুনে।

ওইখানেই সোফিয়া প্যাটেলের সঙ্গে প্রথম দেখা। রক্তহীন, ফ্যাকাসে, শীর্ণ দেহ। চোখের কোণে কালো রেখা। মুখের ম্লান হাসিটুকু ছাড়া জীবনের আর কোন লক্ষণ নেই।" ডক্টর শেফালি মিত্র হাতের স্টেথ্‌সকোপটা নাচাতে নাচাতে বলতে লাগলেন, আমি লিখে চললাম দ্রুতবেগে।

সোফিয়া প্যাটেলের রোগ নির্ণয় করলেন শেফালি মিত্র—"অ্যানিমিয়া। বছর তেইশ বয়স। অস্থিসার দেহে বড় বড় চোখদুটি বেমানান মনে হয়। ডক্টর মিস শেফালি মিত্র কোন্ সময়ে ভালবেসে ফেলেছেন সোফিয়াকে। সপ্তাহে একদিন সে আউট ডোরে আসে। ডক্টর মিত্র সেই দিনটির জন্য অপেক্ষা করে থাকেন। অন্য রোগীদের ফেলে রেখে তাকে পরীক্ষা করেন, ওষুধ দেন। সুন্দর ইংরিজী বলে মেয়েটি। দুজনে গল্প হয়, ডক্টর মিত্র ভুলে যান আরও রোগী বাইরে অপেক্ষা করছে। তারপর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও বিদায় দিতে হয়। সোফিয়াকে দরজা পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসেন তিনি।

নতুন রোগিনী ডাক্তারকে একদিন চা-এ নিমন্ত্রণ করলেন। ডাক্তার খুবই আনন্দের সঙ্গে তাঁদের বাড়িতে গেলেন। কয়েক ঘণ্টা ধরে গল্প করে শেষ পর্যন্ত চা ছাড়া রাত্রের খাবার পালা সাঙ্গ করে তিনি বাড়ি ফিরলেন।

তারপর সোফিয়ার আউট ডোরে যাওয়া বন্ধ হলো, রোগ যে সেরে গেল তা নয়, শেফালি মিত্র নিজেই রোগিণীর বাড়িতে আসেন। দুজনে খুব ভাব নিঃসঙ্গ প্রবাস জীবনে সোফিয়ার মত বন্ধু পেয়ে ডক্টর মিত্রের আনন্দের সীমা নেই।

কিন্তু রোগ প্রশমনের কোন লক্ষণ নেই। ডক্টর মিত্র পরাজিত হতে প্রস্তুত নন। বড় ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে তিনি চিকিৎসা চালাতে লাগলেন।

সোফিয়া মুসলমান। তাঁর স্বামীর সামান্য চাকরি, সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবার, স্বামীও বেশ মিশুক। ডাক্তারের প্রতি তাঁর কৃতজ্ঞতার শেষ নেই। তিনি প্রায়ই বলেন, 'আপনার সঙ্গে দেখা না হলে সোফিয়ার কি হতো জানি না।'

যা হোক, সোফিয়া অবশেষে সুস্থ হয়ে উঠলেন। শেফালি মিত্র এর সকল কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। সম্পূর্ণ সেরে উঠে সোফিয়া নিজের হাতে রান্না করে ডাক্তারকে খাওয়ালেন। খাওয়াদাওয়া শেষ করে তাঁরা তিনজন সামনা সামনি বসেছিলেন। শেফালি মিত্রের মনটা সামান্য খারাপ, সোফিয়া ভাল হয়ে গেছে, তাঁর প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল।

খুব খুশী মনে সে-রাতে ডক্টর মিত্র কিন্তু বিদায় নিলেন। সোফিয়া তাঁর দুটি হাত ধরে বলেছেন, রোগ ফুরোলেই নটে গাছটি মুড়োল যেন না হয়। "তোমাকে আসতেই হবে, এখন আর ডাক্তার-রোগী সম্পর্ক নয় কিন্তু! আমার জোর বেড়ে গেছে। সমান সমান ক্ষমতা, আমরা দুজনে বন্ধু।"

তাঁরা দুজনে সত্যই বন্ধু। সোফিয়া সাধারণ মেয়ে, কোন উচ্চশিক্ষা পাননি, তবুও শেফালি মিত্রের শ্রেষ্ঠ বান্ধবী। সোফিয়ার বাড়িতে প্রায়ই আসেন ডক্টর মিত্র। হাসপাতালের বদ্ধ আবহাওয়ায় মাঝে মাঝে হাঁফিয়ে উঠতে হয়, তখন বেশ লাগে সোফিয়ার সঙ্গে ঘর-সংসারের ছোটখাট খুঁটিনাটি নিয়ে আলোচনা করতে। সোফিয়ার হাতের রান্নাও ভাল। ডাক্তারী ছেড়ে শেফালি মাঝে মাঝে রান্নাঘরে এপ্রেণ্টিসগিরি করেন। তেল-নুন-লঙ্কার পরিমাণ নিয়ে তর্ক হয়।

দুজনের মনের কথা চাপা থাকে না। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখের কথা সোফিয়াকে খুলে বলেন শেফালি মিত্র। নিঃসঙ্গ জীবনের বেদনার বোঝা খানিকটা হাল্কা হয়ে যায়। রুগ্ন দেহ সোফিয়া ডক্টর শেফালি মিত্র অপেক্ষা মনে অনেক সুস্থ ও সবল। সোফিয়া তাঁকে অনুপ্রেরণা দেয়, দেয় খানিকটা মানসিক সান্ত্বনা।

সোফিয়ার শরীর আবার খারাপ হয়েছিল। দেহে যে মাংস লেগেছিল, ক্রমশ তা অদৃশ্য হতে লাগল। মুখের রক্তাভা, চোখের দীপ্তিও কমতে লাগল। স্টেথসকোপটা কান থেকে খুলতে খুলতে শেফালি মিত্র রোগিণীর স্বামীকে একদিন বললেন।

"এবার আরও সাবধান হতে হবে। প্রেগনেন্সি।"

মাস কয়েক ধরে শেফালি মিত্র যে যত্ন ও সেবা করলেন, চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। সোফিয়ার স্বামী প্রায়ই বলতেন, 'আপনার ঋণ কোনদিন শোধ করতে পারব না, আল্লার দয়ায় আপনার মত বন্ধু পেয়েছে আমার স্ত্রী।'

সোফিয়াও বিছানায় শুয়ে তাঁকে দেখলে হাতটা তুলে নাড়ান, ম্লান মুখখানি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। বিছানার খুব কাছে চেয়ারটা এগিয়ে নিয়ে শেফালি বসেন। গল্প হয় দুজনে, কখনো বই পড়েন তিনি, সোফিয়া শুনে যান।

ভাবী মায়ের থেকেও ডাক্তারের আগ্রহ উদ্দীপনা বেশী। ভাবী মাকে কতরকমের উপদেশ দেন তিনি। বলেন, 'কোনরকম অনাচার না হয় যেন। মনে থাকে যেন শরীরটা এখন তোমার একার নয়।'

কিছুদিন পরে শেফালি মিত্রকে আরও আনন্দিত মনে হলো। সোফিয়ার খুব কাছে বসে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে তিনি বললেন, 'সোফিয়া, নতুন খবর আছে।'

ভাবী মা উৎকর্ণ হয়ে থাকেন। 'কী খবর?'

শেফালি স্নেহভরে সোফিয়ার একটি হাত ধরে বললেন, 'যতদূর মনে হয়, একজন নয়, ওরা দুজনে আসছে।'

'যমজ?' সোফিয়া উত্তেজনায় বিছানায় উঠে বসলেন।

পরের দিন শেফালি আবার যথা-সময়ে সোফিয়াকে দেখতে এলেন। হাস-পাতালে সারাদিনের পরিশ্রমে দেহ ও মন ক্লান্ত। রুমালে মুখ মুছতে মুছতে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছ?'

দুষ্টুমি ভরা হাসি দিয়ে সোফিয়া উত্তর দিলেন, 'ভালই আছি। খুব ভাল আছি।'

তারপর সোফিয়া যা বললেন শেফালি মিত্রের অবচেতন মনে সে কামনা ঘুমিয়ে ছিল। তবুও প্রথম ধাক্কায় তিনি কেঁদে ফেললেন, বিশ্বাস হচ্ছিল না কিছুতেই। সোফিয়া স্বামীর সংগে পরামর্শ করেছেন, যমজ ছেলে হলে তার একটি শেফালি নিতে পারেন। জীবন বেঁচেছে তাঁরই করুণায়। কোন কিছুতেই ঋণ পরিশোধ হবে না, তাছাড়া দুটি সন্তান মানুষ করা সোফিয়ার রুগ্ন দেহে সম্ভব হবে না।

যমজ সন্তানই এলো শেষ পর্যন্ত। একটি ছেলে, একটি মেয়ে। বিনিদ্র কয়েকটি রাত শেফালি মিত্রের কাটল অর্ধ চেতন সোফিয়ার বিছানার পাশে। হাস-পাতালের বড় ডাক্তার বললেন এবার বিপদ কেটে গেছে।

'সুস্থ হয়ে নতুন মা বাড়ি ফিরে এলেন।'

ডক্টর শেফালি মিত্র চেম্বারে বসে বলে যাচ্ছিলেন।

আমার হঠাৎ খেয়াল হলো কাহিনীর মধ্যে এমন ডুবে গেছি যে, কোন্ ফাঁকে লেখা বন্ধ হয়ে গেছে।

'সব লিখে নিচ্ছ তো?' সায়েব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন। ডক্টর মিত্রের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনি বলে যান।'

"আমার বর্ণনা হয়তো একটু দীর্ঘ হচ্ছে, কিন্তু আমি আপনাকে সব বলতে চাই। আপনি তবেই বুঝতে পারবেন, কে অন্যায় করছে।" ডক্টর মিত্র সায়েবের মুখের দিকে সম্মতির জন্য তাকালেন।

"নিশ্চয়ই আপনি যা বলতে চান বলুন।"

"সোফিয়া কথা রেখেছিল, মেয়েটি আমাকে দিয়ে দিল সে।" শেফালি মিত্র আবার বলতে লাগলেন।

সোফিয়া কিন্তু একটি শর্ত আরোপ করেছিল, 'মেয়ের নাম আমি নিজেই দিয়েছি জাহানারা, ও নাম পরিবর্তন করবে না,' সে বলেছিল।"

ডক্টর মিত্র মোটেই আপত্তি করেন নি। ছোট্ট ফুলের মত মেয়েটি বুকে করে তিনি বাড়ি ফিরে এসেছেন।

আট মাসের মেয়ে জাহানারা প্রথম কয়েকদিন কেঁদেছিল, পরে সব ঠিক। আয়া রেখেছেন ডক্টর মিত্র। পেরেম্বুলেটরে জাহানারাকে বসিয়ে প্রতি সন্ধ্যায় অন্য কাজ বন্ধ রেখে নিজে বেরিয়েছেন পার্কে।

জাহানারা হাঁটতে শিখেছে। শেফালির চিন্তা বেড়েছে। সবাইকে বলে বেড়ান, "আমার নিশ্বাস ফেলার সময় নেই, মেয়ের এটা করতে হবে, ওটা করতে হবে। মেয়ে নাকি খুব দুষ্টু, কিছুতেই আয়ার কাছে ঘুমোবে না। আমাকে সময় মত বাড়ি ফিরতেই হবে।"

মেয়ের দৌরাত্ম্যে সোফিয়ার কাছে যাওয়া কমিয়ে দিলেন ডক্টর মিত্র। দু'-এবার মেয়েকে নিয়েই ওখানে গেছেন তিনি। জাহানারা সোফিয়াকে 'মাসি' বলে ডাকে।

ডক্টর মিত্রের সমস্ত হৃদয়টা ধীরে ধীরে জাহানারা গ্রাস করল

কিছুদিন পরে রেঙ্গুণে এক ভয়ঙ্কর দাঙ্গা বাঁধল। দাঙ্গায় অনেকে প্রাণ হারাল, লুঠ তরাজ কম হলো না।

দাঙ্গা থামতেই ডক্টর মিত্র কলকাতায় চলে এলেন। রেঙ্গুনে বাস আর নিরাপদ নয়। কলকাতায় চেম্বার খুললেন ডক্টর মিত্র।

সোফিয়াও আর রেঙ্গুনে থাকলেন না, ফিরে গেলেন বোম্বাই। সেখানে তাঁর স্বামী যে চাকরি পেল, মাইনে অনেক কম। কিন্তু উপায় কী?

শেফালি ও সোফিয়ার পত্রালাপ এই গোলমালেও বন্ধ হয়নি। জাহানারার ছবি পাঠিয়েছেন শেফালি বোম্বাইতে।

একটু বড় হয়ে জাহানারাকে দিয়ে চিঠি লিখিয়েছেন, "মাই ডিয়ার আণ্টি, তুমি কেমন আছ?"

'আণ্টি' উত্তর দিয়েছেন, "সোনা মেয়ে, আমরা ভাল আছি। তোমার ম্যামি লিখেছেন, তুমি নাকি খুব ভাল মেয়ে, শুনে আমরা খুব খুশি হয়েছি।"

ইংরিজী শেখাবার জন্য গভর্নেস রেখেছেন ডক্টর মিত্র।

কলকাতার সেরা মিশনারী কন্‌ভেণ্টে জাহানারা পড়তে যায়। নিজে গাড়িতে চড়ে মেয়েকে স্কুলে রেখে আসেন; ছুটির আগে গেটের কাছে গাড়িতে বসে থাকেন শেফালি মিত্র। ঘণ্টা পড়ার একটু পরেই মেয়ে লাফাতে লাফাতে এগিয়ে আসে। হাত থেকে বইগুলো নামিয়ে নিয়ে মেয়েকে পাশে বসান তিনি। ড্রাইভার গাড়ি ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন, "মুখটা শুকিয়ে গেছে, খুব রোদে ঘুরেছ নিশ্চয়।"

জাহানারা রাস্তার দুদিকে তাকাতে তাকাতে বলে, "না মা, আমি একটুও রোদে ঘুরি না, রোদে ঘুরলে যে রঙ কালো হয়ে যায়, আমাদের ক্লাসের নমিতা বলেছে।"

ডক্টর মিত্র লোভ সামলাতে পারেন না, জিজ্ঞাসা করেন, "রঙ কালো হলে কী হয়?"

জাহানারা সন্দিগ্ধভাবে তাকিয়ে বলে, "আহা তুমি যেন জান না, রঙ কালো হলে বিয়ে হবে না।"

শেফালি মিত্র হাসতে হাসতে মেয়েকে বুকে জড়িয়ে ধরেন। "এর মধ্যে খুব চালাক হয়ে গেছ।"

বাড়ি ফিরেই সোফিয়াকে চিঠি লিখেছেন তিনি। জাহানারার দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি বর্ণনা করতে ভোলেন না তিনি। "তোমার মেয়ে তোমার মতই হয়ে উঠছে ক্রমশ, যে কোন মানুষের মন পাঁচ মিনিটেই সে জয় করে নিতে পারে। জাহানারার ভিতরে আমি সহজে কল্পনা করতে পারি ছোট বেলায় তুমি কেমন ছিলে।"

চোদ্দ বছরে পড়ল জাহানারা আর আমারও "কপাল মন্দ হতে বসেছে।" ডক্টর শেফালি মিত্র একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লেন।

"কেন?" প্রশ্নটা অনিচ্ছা সত্ত্বেও মুখ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। আমার কাজ শুধু লিখে যাওয়া, যা কিছু জিজ্ঞাস্য সায়েব জেনে নেবেন। কিন্তু গল্পের ঝোঁকে জিজ্ঞাসা করে ফেলেছি।

শেফালি মিত্র ম্লানমুখে বলতে লাগলেন, "মাসখানেক আগে সোফিয়া চিঠি লিখেছিল, তার স্বামী কলকাতায় আসছেন, কয়েকদিনের কাজে।"

উত্তরে আমি লিখলাম, "তুমিও চলে এস কলকাতায়, কতদিন দেখা নেই। আমার বাড়িতে অনেক ঘর খালি পড়ে আছে, কোন অসুবিধা হবে না।"

তারপর একদিন হাওড়া স্টেশন থেকে সোফিয়া ও তার স্বামীকে নিয়ে এলাম। কতদিন পরে দেখা। প্ল্যাটফরমেই আনন্দে সোফিয়া আমাকে জড়িয়ে ধরল। জাহানারাকে বাড়িতে এসেই ডাকলাম। সেও ছুটে এল, জিজ্ঞাসা করল, "কেমন আছ আণ্টি।"

জাহানারা, সোফিয়া ও আমি এক-সংগে সিনেমায় গেলাম বেশ কয়েকবার। বোটানিকাল গার্ডেনে ফিস্ট হলো এক রবিবার। জাহানারার কনভেণ্ট দেখিয়ে আনলাম সোফিয়াকে। পিয়ানো বাজিয়ে শোনাল জাহানারা, দেখাল তার নিজের আঁকা রঙগীন ছবি। আণ্টিকে একটা বাঁধান ছবি উপহার দিয়েছে সে।

আতিথেয়তার কোন ত্রুটি রাখিনি তবুও সোফিয়া কেমন গম্ভীরভাবে থাকে। কারণ প্রথমে বুঝতে পারিনি। আমাকে সরিয়ে দিয়ে জাহানারার সংগে কথাবার্তা বলতে চেষ্টা করেছিল সে। আমি কোন আপত্তি করিনি, ভেবেছি এমনি গল্প হচ্ছে, আর কিছু নয়।

কিন্তু জাহানারার বাবা সেদিন আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে গেলেন। সোজা-সুজি বললেন, "জাহানারাকে এবার আমরা নিয়ে যেতে চাই। এতদিন দেখা-শোনা করেছেন, সেজন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।"

মাথাটা কেমন ঘুরে উঠল প্রথমে। মনে হলো এখনই মেঝেতে লুটিয়ে পড়ব। "এ সব কথার অর্থ?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

সোফিয়া আড়ালে দাঁড়িয়েছিল এত-ক্ষণ। কাছে এগিয়ে এসে সে বলল, "আমার মেয়ে আমি ফেরত চাই; অতি সরল অর্থ।"

আমি সহ্য করতে পারলাম না। তখন বার করে দিয়েছি দুজনকে। বলেছি "হোটেলে গিয়ে থাক। আমার বাড়িতে জায়গা হবে না।"

ওরা চলে গেলে, রাগটা একটু কমল। অত কঠিন কথা না বললেই হতো। কিন্তু আপনিই বলুন, আমার রাগ করাটা অন্যায় হয়েছে?" শেফালি মিত্র জিজ্ঞাসা করলেন।

"গতকাল পুলিস এসেছিল আমার বাড়িতে। জাহানারার সমস্ত খবর নিয়ে গেল। ওরা নাকি থানায় খবর দিয়েছে।

আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। বড় ভয় লাগছে।

আজ সকালে আবার এক এটর্নির চিঠি পেয়েছি। আমাকে সত্বর জাহানারাকে তার বাবা মায়ের কাছে পাঠিয়ে দিতে লিখেছে।

কিন্তু জাহানারা......জাহানারাকে আমি কেন দেব? সে তো আমারই মেয়ে......" উত্তেজনায় শেফালি মিত্রের স্বর থরথর করে কাঁপছে।

"আমি আইনের কিছু জানি না। আমাকে কী করতে হবে বলুন। জাহা-নারাকে আমি এত বড় করে তুলেছি। তাকে আমি ছাড়তে পারব না।......আমি পাগল হয়ে যাব......।" শেফালি মিত্র, কলকাতার প্রথিতযশা ডক্টর শেফালি মিত্র রুমালে চোখ মুছতে লাগলেন।

"টাকার জন্য কোন ভাবনা নেই। আপনি বলুন, জাহানারা কি আমার নয়?" রুমালে আবার চোখ মুছলেন তিনি।

"রেঙগুনে জাহানারাকে যখন আপনি প্রথম নিয়ে এলেন তখন কোন লেখাপড়া হয়েছিল কী? লিখিতভাবে দত্তক গ্রহণ করাটাই সাধারণ রীতি।"

শেফালি মিত্র উদ্বিগ্ন কণ্ঠে বললেন, "না কোন লেখাপড়া তো হয়নি।" হঠাৎ রেগে উঠলেন তিনি, "কিন্তু কাগজে লেখাটাই সব? মুখের কথার কোন মূল্য কি নেই আপনাদের আইনে? কোন কিছু লেখা নেই বলে ওরা জাহানারাকে নিয়ে যাবে?" শেফালি মিত্রের মুখ লাল হয়ে উঠেছে।

"এত উতলা হবেন না ডক্টর মিত্র। আইনকে রেল ইঞ্জিনের মত একটা নির্দিষ্ট

লাইন ধরে যেতে হয়। মুখের কথায় বিশ্বাস করা সব সময় সম্ভব হয় না।" সায়েব প্রবোধ দিলেন।

সামান্য চিন্তা করে তিনি আবার বললেন, "আপনার পক্ষে অনেক কিছুই বলবার আছে। তবে জাহানারার বাবার কেস্ খুব দুর্বল বলা যায় না। জাহানারা এখনও নাবালিকা। নাবালিকার অভিভাবকত্ব নিয়েই দুপক্ষের টাগ-অফ-ওয়ার। জাহানারার বাবা কোর্টে মামলা করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে যেতে পারে। অথবা হাইকোর্টে আমরাই আবেদন করতে পারি জাহানারার অভিভাবকত্বের জন্য।"

শেফালি মিত্র বললেন, "আর অপেক্ষা করতে চাই না, আমরাই আগে কোর্টে কেস করি।"

এটর্নির নাম বলে দিলেন সায়েব। তাঁর কাছে প্রথমে যেতে হবে, কেস ফাইলের প্রাথমিক কাজগুলো করবেন তিনি।

চেয়ার থেকে উঠে পড়লেন ডক্টর শেফালি মিত্র। স্টেথসকোপটা টেবিল থেকে তুলে তিনি সায়েবকে বললেন, "আপনার অনেক কেসের গল্প শুনেছি। আমার বিশ্বাস আছে আপনার উপর। জাহানারাকে ওরা যেন ছিনিয়ে না নেয়।"

শেফালি মিত্র চলে গেলেন। নোট বুকের পাতাগুলো উল্টিয়ে দেখছিলাম আমি। শেফালি মিত্রের হৃদয়ের কথা শর্ট-হ্যাণ্ডের আঁকাবাকা টানের মধ্যে ধরে রেখেছি।

ঘড়িতে চারটে বাজে। সায়েব বললেন, "এবার যাওয়া যাক।"

আমার নোটবুকের দিকে তাকিয়ে কোন কথা বললেন না, শুধু একটু হাসলেন।

হাইকোর্টে মামলা ফাইলের পর ডক্টর মিত্র মাঝে মাঝে চেম্বারে আসতেন। নমস্কার জানিয়ে বলতাম, "সায়েব ভিতরে আছেন, চলে যান।"

তিনি কিন্তু মাঝে মাঝে আমার কাছে এসে দাঁড়াতেন, "আপনারা তো এ লাইনে রয়েছেন, আইনের কিছু কিছু বোঝেন, আচ্ছা, জাহানারাকে আমি রাখতে পারব না?"

যতদূর জানি অতি কঠিন মামলা। তবু হেসে বলতাম, "আপনি ভাববেন না। জাহানারার আসল মা আপনিই।"

তিনি একটু সাহস পেতেন। "আমার ছবির এলবাম এনে একদিন দেখাব আপনাদের কতটুকু মেয়েকে বুকে করে এনেছিলাম। সেবারে ভয়ানক নিউমনিয়ার মত হলো ওর। তখন কোথায় ছিল ওর আপন মা। এত যদি ভালবাসা কলকাতায় এসে মেয়ের সেবা করলেন না কেন? আমি বলে রাখলাম, আপন মায়ের হাতে পড়লে জাহানারা ছ' মাস বাঁচবে না। বলুন আমি অন্যায় বলছি?"

"নানা একশবার সত্যি। এ সব আমার তো ভালভাবেই জানা আছে।" আমি বলতাম।

ইতিমধ্যে কেসের কাজ এগোচ্ছে। জাহানারার বাবা প্রতিবাদ জানিয়েছেন যে তাঁর মেয়ের অভিভাবক তিনিই হবেন, বাইরের লোকের কোন অধিকার নেই সেখানে।

প্রত্যুত্তরে শেফালি মিত্র এফিডেভিটে আপন বক্তব্য জানিয়েছেন।

সায়েব শেফালি মিত্রের বাড়িতে গেলেন একদিন। বললেন, "আপনার মেয়েকে ডাকুন, একটু গল্প করে যাই।" জাহানারার সঙ্গে দেখা করে ফিরে এসেছেন তিনি।

নেপথ্যের সকল প্রস্তুতি শেষে মামলা উঠল কোর্টে। বিচক্ষণ বিচারক হিসাবে জজসায়েবের ব্যারিস্টার মহলে প্রচুর সুনাম।

জাহানারার বাবার পক্ষেও বড় ব্যারিস্টার। তিনি জাহানারাকে মাবাপের কাছে ফেরত দিতে চান।

সায়েব বললেন, "জাহানারাকে তার বাবা ও মা ডক্টর মিত্রকে দিয়ে দেন।"

অপর পক্ষ সঙ্গে সঙ্গে কাগজপত্র চেয়ে বসলেন। কিন্তু কোন কাগজপত্র নেই, আমরা জানি। তখন ওরা বললেন, "জাহানারাকে ভালবাসতেন ডঃ মিত্র, এবং তার মায়ের শরীর অসুস্থ হওয়ায় জাহানারাকে নিজের কাছে রেখে দিয়েছিলেন শেফালি মিত্র। মেয়ের ভরণ-পোষণের খরচের জন্য তাঁরা কয়েকবার টাকা পাঠাতে চেয়েছেন কিন্তু শেফালি মিত্র টাকা নিতে চাননি।"

তাঁরা আরও বললেন, মুসলমান আইনে মেয়ের স্বাভাবিক অভিভাবিকা মা, সুতরাং জাহানারার অভিভাবক তার বাবা ও মা।

সায়েব বললেন, তাঁরা অভিভাবকের কর্তব্য করেননি।

ওঁরা উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই করা হয়েছে। অসংখ্য চিঠিতে মেয়ের সংবাদ নিয়েছেন তাঁরা। অনেক দূরে বাস ও আর্থিক অনটনের জন্য সব সময় চাক্ষুষ দেখা হয়নি। কিন্তু মেয়ের অভিভাবকত্ব তাঁরা কোনদিন ত্যাগ করেননি। মেয়েকে এক স্কুল থেকে অন্য স্কুলে ভর্তির সময় তাঁদের অনুমতি নেওয়া হয়েছে। ডক্টর মিত্র জাহানারাকে নিয়ে দুবার সমস্ত ভারতবর্ষ ভ্রমণে বেরিয়েছেন, দুবারই অনুমতির জন্য ডক্টর মিত্র চিঠি দিয়েছেন।"

সায়েব উত্তরে বললেন, "অনুমতির জন্য চিঠি দেননি ডঃ মিত্র। দিয়েছিলেন সাধারণ সংবাদ হিসেবে। যাঁরা তাঁকে মেয়েটি দিয়েছেন, মেয়ের খবরাখবর তাঁদের মাঝে মাঝে জানানোটা ডঃ মিত্র কর্তব্য মনে করেছেন।"

শেফালি মিত্র রোজ কোর্টে এসে বসে থাকতেন। দেড়টায় লাঞ্চের জন্য জজসায়েব উঠে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে সবাই উঠে পড়লেন কিন্তু ডক্টর মিত্র নিজের চেয়ার ছেড়ে উঠলেন না। তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "খেতে যাবেন না?"

ডক্টর মিত্রের চোখ ছল ছল করছে। "আমার খেতে ইচ্ছে নেই। কেমন বুঝছেন বলুন?" তিনি জিজ্ঞাসা করলেন।

"রায় না বেরোনো পর্যন্ত কেউ বলতে পারে না কী হবে। অযথা চিন্তা করবেন না। কিছু খেয়ে আসুন।"

তবু গেলেন না তিনি। বললেন, "খেতে গেলেই বমি হয়ে যাবে। এখানেই বসে থাকি।"

লাঞ্চ শেষে আবার কোর্ট বসল। তর্কযুদ্ধ পুনরায় আরম্ভ হলো।

অপরপক্ষের ব্যারিস্টার বললেন, বাবা কিংবা মায়ের অভিভাবকত্বের দাবী অনস্বীকার্য। একমাত্র কোন ঘোরতর অপরাধ বা ত্রুটি প্রমাণিত হলেই তাঁদের অপসারিত করে অন্য কোন অভিভাবক নিযুক্ত করা যেতে পারে। ডক্টর মিত্রের এমন কোন অভিযোগ আছে কি যে জাহানারার বাবা চরিত্রহীন, মদ্যপ, উচ্ছৃংখল বা অভিভাবক হিসেবে অযোগ্য?

সায়েব বললেন, "না, জাহানারার বাবার

বিরুদ্ধে সেরকম কোন অভিযোগ আমাদের নেই।"

"তবে কোন্ অপরাধে জাহানারার মা এবং বাবা নিজের মেয়েকে পাবেন না?"

"আমরাও একই প্রশ্ন উত্থাপন করছি। চোদ্দ বছর ধরে নিজের সকল স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে পালন করে শেফালি মিত্র আজ জাহানারাকে হারাবেন কেন?" সায়েব উত্তর দিলেন।

"আপনারা এতদিন পরে কেন মেয়েকে ফেরত চাইছেন?" সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন।

"আমরা মেয়ের বিয়ে দিতে চাই, এবং অল্পবয়সেই। জাহানারাকে যে ধরনের শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে তাতে সে একটি পুরো মেম সায়েব বনে যাবে। কোনদিন ঘর-সংসার করতে পারবে না।" অপর পক্ষ উত্তর দিলেন।

সায়েব বললেন, "মাই লর্ড, নাবালিকার মঙ্গলের জন্যই অভিভাবকের প্রয়োজন। যতদিন না বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে নিজের মঙ্গলামঙ্গলের জ্ঞান জন্মায় ততদিন অভিভাবক তাঁকে ঠিক পথে চালিয়ে নিয়ে যাবেন। এক্ষেত্রেও জাহানারার ভবিষ্যতই আমাদের একমাত্র চিন্তার বিষয়। বাবামার কাছে থাকা তার ভবিষ্যতের পক্ষে শ্রেষ্ঠ হলে আপনি জাহানারাকে নিশ্চয়ই তাঁদের কাছে ফেরত দেবেন।"

তার পর তিনি একে একে দেখালেন চোদ্দ বছর ধরে জাহানারা প্রাচুর্যের পরিবেশে লালিত-পালিত হয়েছে। হঠাৎ কোন পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় নয়। ভাল স্কুলে লেখাপড়ার সুযোগ পাচ্ছে সে এবং ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে মনে মনে সে যে ছবি এ'কেছে বাবামার কাছে থাকলে সেটি কোন দিন বাস্তবে রূপান্তরিত হবে না।

জজ সায়েব বললেন, "আমি নিজে জাহানারার সঙ্গে কথা কইতে চাই।"

জাহানারা কোর্ট রুমে এল। সাদা সিল্কের সালোয়ার পরা ফুটফুটে মেয়ে। চাঁপা ফুলের রঙ। চুলে লাল সাটিনের রিবন, হাতে লেডিজ্ রিস্টওয়াচ। জজ-সায়েব জাহানারাকে নিজের বসার ঘরে নিয়ে গেলেন। দরজা বন্ধ, অন্য কারও প্রবেশ নিষেধ।

ডক্টর মিত্র কোর্ট ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন, উত্তেজনায় ছটফট করছেন তিনি। আমাকে বললেন, "আমার বুক ঢিপ ঢিপ করছে। জাহানারাকে জজসায়েব কি জিজ্ঞাসা করবেন?"

"বলা শক্ত। কিন্তু জাহানারা আপনার বিরুদ্ধে কিছু বলবে না নিশ্চয়।" আমি বললাম।

ডক্টর মিত্র একটু মনোবল পেলেন বোধ হয়, "হুঁ, জাহানারা আমাকে খুব ভালবাসে।" ভ্রূকুঞ্চন করলেন তিনি কিছুক্ষণের জন্য। "তবে কিছুই বলা যায় না, হয়ত......"

মিনিট চল্লিশ পরে জজসায়েব ফিরে এলেন কোর্টে। বললেন, "চল্লিশ মিনিট সময় নেওয়া আমার উচিত হয়নি। কিন্তু জাহানারার সঙ্গে আমার এমন ভাব হয়ে গেল যে, একটা ছোট্ট গাল পর্যন্ত শুনে নিয়েছি এই ফাঁকে।" কোর্টের সবাই হেসে উঠলেন জজসায়েবের কথায়।

অবশেষে পাঁচদিনব্যাপী যুদ্ধের অবসান হলো। ডক্টর মিত্র আমাদের সঙ্গে টেম্পল চেম্বারে এলেন। চোখ দেখেই বোঝা যায় রাতে ঘুম হচ্ছে না তাঁর। আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন বুঝছেন, সত্যি করে বলুন।"

"কালকেই রায় বেরিয়ে যাবে। যুদ্ধ সায়েবও কম করেননি। সুতরাং দেখা যাক।"

পরের দিন সকালেই চেম্বারে এলেন ডক্টর মিত্র, সঙ্গে জাহানারা। চুলে আজ নীল রঙের ফিতে। বুকের কাছে হানি-কম্ব করা অর্গাণ্ডির ফ্রক, হাতে একখানা বাংলা বই।

"তুমি বাংলা জান?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম

"বাঃ আমি তো ম্যামিকে প্রায়ই বাংলা পড়ে শোনাই।"

যথাসময়ে আমরা হাইকোর্টে ছ' নম্বর ঘরে হাজির হলাম। জজসায়েব এলেন একটু পরেই। সামনের সারিতে ব্রীফ হাতে বসেছেন। পাশেই বিপক্ষের ব্যারিস্টার, অনেক পিছনে একটা চেয়ারে

শেফালি মিত্র। আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন বুঝছেন?" উত্তেজনায় তাঁর হাত কাঁপছে। জাহানারাকে চেম্বারে রেখে এসেছেন। সেখানে সে ছবির বই পড়ছে।

জজসায়েব তাঁর রায় পড়তে লাগলেন। দু' পক্ষের বক্তব্যগুলি তিনি বিশদভাবে আলোচনা করলেন। তারপর জাহানারার চোদ্দ বছরের জীবনের দীর্ঘ ইতিহাস, এমন কি তার জন্মের পূর্বে রেংগুনে ডক্টর মিত্র ও সোফিয়ার পরিচয় কাহিনী বর্ণনা করতে লাগলেন তিনি।

সে কাহিনী আমাদের জানা আছে ভালভাবেই। আমরা শুধু অপেক্ষা করছি তাঁর সিদ্ধান্তের জন্য। শেফালি মিত্র সামনের চেয়ারটায় হাত দিয়ে জজের মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। উত্তেজনায় হাতটা তখনও মাঝে মাঝে কেঁপে উঠছে। ভাবছেন, ফলাফলটা আগেই বলে দিতে পারতেন জজসায়েব।

জজসায়েব গার্ডিয়ানস্ এণ্ড ওয়ার্ডস্ এ্যাক্ট-এর চুল-চেরা বিশ্লেষণ করছেন। আমি একবার শেফালি মিত্র এবং আর একবার জাহানারার বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে আছি। সোফিয়া আসেননি কোর্টে। বুশ সার্ট ও প্যাণ্ট পরে জাহানারার বাবা পাথরের মত দাঁড়িয়ে রয়েছেন। শেফালি মিত্র চেয়ারটা আরও সামনে এগিয়ে নিলেন।

জজসায়েব টাইপ-করা জাজমেণ্ট পড়ে যাচ্ছেন,—মামলাটা বিচিত্র। জাহানারার কোন সম্পত্তি বা গচ্ছিত অর্থ নেই। সুতরাং নাবালিকার অভিভাবকত্বের জন্য যাঁরা কোর্টে মামলা করতে এসেছেন তাঁদের কোন বৈষয়িক স্বার্থ নেই। তাঁরা দুজনেই জাহানারাকে ভালবাসেন, আর কিছু নয়। ফলে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া আমার পক্ষে আরও কঠিন হয়ে পড়েছে। জাহানারার বাবা ও মাকে অভিভাবকত্ব হতে বঞ্চিত করার মত কোন দোষ খুঁজে পাচ্ছি না অথচ মেয়ের প্রতি আদর্শ পিতামাতার কর্তব্য তাঁরা নিশ্চয়ই পালন করেন নি। অপরদিকে ডক্টর শেফালি মিত্রের ব্যারিস্টার যে কথা বলেছেন, তাঁর মক্কেল হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে জাহানারাকে পালন করছেন।

জাহানারার বাবা ও মা সামাজিক প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন। বেশী লেখাপড়া শেখা, তাঁরা ভাল চক্ষে দেখেন না এবং কম বয়সে বিয়ে দেওয়ার পক্ষপাতী তাঁরা।

আমার মনে হয়, এই দোটানায় জাহানারার ভবিষ্যত আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয়। তার সংগে আমি এ বিষয়ে আলোচনা করেছি। বালিকা হলেও পৃথিবীর খানিকটা বোঝার মত বুদ্ধি তার হয়েছে। জাহানারার সংগে কথা বলে আমি মুগ্ধ হয়েছি। ক্লাসে ফার্স্ট হয় সে। ভবিষ্যতে সে মস্ত বৈজ্ঞানিক হতে চায়, জগতকে জানবার আগ্রহ আছে প্রচুর। ডক্টর মিত্রকে সে মা বলে, এবং তাঁকে ছেড়ে যেতে চায় না সে, শুধু তাই নয়, এখনই বিয়ে করার কোন ইচ্ছা নেই তার। বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে আমাকে ছোটখাট বক্তৃতা শুনিয়েছে সে।

সুতরাং জাহানারার অভিভাবকরূপে ডক্টর মিত্রকেই আমি দায়িত্ব দিলাম, তবে আশা করি, মেয়েকে বাবা মার সংগে তিনি মেলামেশা করতে দেবেন মাঝে মাঝে, কেননা তাঁদের স্নেহের মূল্যে যথেষ্ট।

জজসায়েব কাগজ বন্ধ করে হাসতে লাগলেন। আনন্দে শেফালি মিত্রের চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল। খুব খুশী তিনি। প্রায় নাচতে নাচতে কোর্ট ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন তিনি। মজা করে আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "আমাকে তো অনেকবার প্রশ্ন করেছেন, এখন আপনি কেমন বুঝছেন বলুন?"

"তখন আমার মাথা ঠিক ছিল না। এখন আবার প্রশ্ন করছি, ক'সের সন্দেশ খেতে পারেন বলুন।" আমরা দুজনে হাসতে লাগলাম।

জাহানারাকে নিয়ে ডক্টর মিত্র চেম্বারে এলেন। সায়েব বসেছিলেন, মেয়েকে কোলে বসিয়ে অনেকক্ষণ গল্প করলেন শেফালি মিত্র। মেয়েকে নিয়ে আমার কত মুশকিল দেখছেন তো?"

সায়েব হেসে বললেন, "এবার মুশকিল আসান হয়ে গেল।"

জাহানারা চুপচাপ কথাবার্তা শুনছিল "আপনার মেয়ে আমার কাছে চুপ করে থাকে, কিন্তু জজের কাছে খুব কথা বলেছে। আমি কি অন্যায় করেছি।"

ঘাড়টা নীচু করে জাহানারা বলল, "না না।"

"আর না না, বেশ দেখতে পাচ্ছি", সায়েব উত্তর দিলেন।

"আপনাকে দেখলে ওর লজ্জা লাগে", ডক্টর মিত্র বললেন।

"তা নয়, আমি যে বুড়ো হয়ে গেছি, মাথায় একটিও চুল নেই। তাই হয়তো ......নাঃ বলব না। জজসায়েবকে বিয়ে করার বিরুদ্ধে ও যেভাবে বলেছে, আমার মনে মনে খুব ইচ্ছে হলেও, বলতে সাহস হচ্ছে না।" আমরা সকলেই হাসিতে ফেটে পড়লাম। লজ্জায় চোখ বুজে জাহানারা বলল, "ধ্যাৎ।"

জাহানারার হাত ধরে শেফালি মিত্র বেরিয়ে গেলেন।

দক্ষিণ ভারতে কয়েকদিন

খগেন দে সরকার

[আবাদি কংগ্রেস]

জ**ওহরলাল** নেহর্ রেগে আগ্নন। টিটো, মার্শাল টিটো, য্গো-শ্লাভিয়ার প্রেসিডেণ্ট মার্শাল টিটো কোথায় ?

ব্যাপারটা ঘটল সত্যম্র্তিনগরে কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশনের প্রথম দিনে, ১শে জান্য়ারী সন্ধ্যে বেলায়। সত্যাবাদির উপর নেতাদের বক্তৃতা চলছে যথারীতি। আলোর রোশনাই, অভিনব মণ্ডপ সজ্জা, আর লোকে লোকারণ্য।

নেহর্ বসেছিলেন বক্তৃতা মঞ্চের এক ধারে। একজন এসে খবর দিয়ে গেলেন, মার্শাল টিটো এসে গেছেন। নেহর্ উঠে গেলেন তাঁকে অভ্যর্থনা করে আনার জন্যে বক্তৃতা মঞ্চসংলগ্ন ব্হৎ মণ্ডপের অন্দরদিকের প্রবেশপথে। দাঁড়িয়ে আছেন তো দাঁড়িয়েই আছেন। এক মিনিট, দ্ মিনিট, তিন মিনিট—কোথায় টিটো, মার্শাল টিটোর পাত্তা নেই। নেহর্ বারবার প্রশ্ন করছেন, 'Where is he?'

আশেপাশে কেউ-কেটা যে-কজন ছিলেন, তাঁদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল কিনা জানা যায়নি। কিন্তু দেখা গেল হঠাৎ সকলের মস্তকে প্রবল কণ্ড্য়ন ব্যাধির এপিডেমিক। দশ মিনিট গেল, অথচ যাঁর এক্ষ্ণি পেঁাছানোর কথা সেই মান্য অতিথিবর টিটো এখনো এলেন না। কী ব্যাপার! ওদিকে কানের এত কাছে ক্রুদ্ধ থেকে ক্রুদ্ধতর সেই প্রশ্নস্বরঃ Where is he? লোকজন ছ্টলো এদিকে ওদিকে। মণ্ডপে টেলিফোন ছিল, সেই ছিদ্রপথে ঘন ঘন স্নায়্-প্রকাশী 'হ্যালো, হ্যালো'।

তোপের ম্খে তখন প্রথমেই পড়লেন শ্রীরামনাথ গোয়েংকা, সংবাদপত্র-শিল্পাধীশ। নেহর্ তাঁকে নিলেন এক চোট। কী, এ-সব কি তামাসা? আর, এই কি সেই অতিথিকে অভ্যর্থনা করবার রকম? এখানে লোক, ওখানে লোক, হাঁটবার রাস্তার যেখানে সেখানে যদ্চ্ছা বসে ভলাণ্টিয়ারদের দল। Is this the way to welcome him? গোয়েংকা সাহেব দেঁাড়ে পালালেন। তারপরেই সামনে পড়লেন রাজস্ব সচিব দেশম্খ আর বাণিজ্য-শিল্প সচিব কৃষ্ণমাচারী। Where is Tito? Why did you call me then? যঃ পলায়তি সে দ্-একটা হোঁচোট খেলেও সাময়িকভাবে 'জীবতি'। এই নীতিতে পরম আস্থা দেখালেন নেহর্র আশেপাশে যে-কজন নেতা অথবা কর্মাধ্যক্ষ ছিলেন, মাত্র একজন ছাড়া। তিনি হলেন অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক, কর্মকুশল শ্রী ভেংকট-রমন, এম-পি। মাথা নিচু করে সমস্ত ঝড় মাথা পেতে নিলেন কিন্তু নেহর্র সঙ্গ ছাড়লেন না। হয়ত কোন কারণে আসতে বিলম্ব হচ্ছে, নিশ্চয়ই এক্ষ্ণি এসে যাবেন, খোঁজ নেওয়া হচ্ছে, ইত্যাদি। But don't call me any more। এই বলে নেহর্ গট্মট্ করে চলে এলেন বক্তৃতা মঞ্চের পাশে তাঁর জায়গায়।

কিছ্ক্ষণ পর দেখা গেল মার্শাল টিটো এসেছেন, সঙ্গে ওঁর নিজের লোক-জন। কয়েকজন য্গোশ্লাভ সাংবাদিক ও একজন ক্যামেরাম্যান এবং মাদ্রাজের গভর্নর শ্রীশ্রীপ্রকাশ।

যা জানা গেল তাতে ব্যাপারটা হয়ে-

আবাদি কংগ্রেসের প্রবেশ তোরণের সামনে বিপ্ল জন সমাবেশ

তালিবনরাজিনীলা

সুসজ্জিত লণ্ঠনের মালা

ছিল এই। কিছু সময় হাতে আছে জেনে গভর্নর শ্রীপ্রকাশ টিটোকে নিয়ে মোটরে আবাদি দেখিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। তাই পেঁছুতে বিলম্ব হয়ে গেল। শুধু ভুলটা এই হয়ে গেল যে, লিস্টির বাইরে ছোটোখাটো পরিক্রমার সংবাদটা ঐ আসল লোকটাকে জানান হয়নি।

আবাদি-সত্যমূর্তিনগরের এই ক্ষুদ্র ঘটনা অনেকেরই চোখে পড়েনি। না পড়বারই কথা। আবাদির একুশে জানুয়ারী একটা মস্ত দিন। সেদিনকার বহু অসাধারণত্বের ঠেলাঠেলিতে অসাধারণদের অনেক সাধারণতা হয়ে গেছে কোণ-ঠাসা। কিন্তু অবিস্মরণীয় ঐ একুশে জানুয়ারী।

অনেকের হয়ত ধারণা আবাদি আর সত্যমূর্তিনগর একই জায়গার নামের হেরফের। মাদ্রাজ থেকে আবাদি বারো মাইল পশ্চিমে আর সেখান থেকে সত্যমূর্তিনগর আরো দুই মাইল, এবং নেতাদের বসবার মণ্ডপটি আরো এক মাইল। প্রায় কল্যাণী আর কাঁচরাপাড়া আর কি।

আবাদি কংগ্রেসের তাৎপর্য আছে, তা নিয়ে ভারিক্কি গবেষণা হয়েছে এবং হয়ত আরো হবে। কিন্তু জানতুম না যে, "আবাদি" নামটার উচ্চারণেও রয়েছে তাৎপর্য। জানা গেল মাদ্রাজে অভ্যর্থনা সমিতির দপ্তরে গিয়ে।

আমরা গিয়ে জানালুম, সাংবাদিকদের ও ফটোগ্রাফারের admit card চাই এবং সেই প্রসঙ্গে আবাদির নামটা দু'একবার উচ্চারণও যে না করতে হল তা নয়। এবং স্বভাবতই সেটা আমরা করেছি বাঙালি-সুলভ ব্যঞ্জনবর্ণের নম্রতায় এবং সোজা-খাড়া স্বরবর্ণে : পরিস্কার 'আবাদি'। একজন তামিলভাষী কর্মকর্তা হেসে জ্ঞাপন করলেন, বাঙালীর সাংঘাতিক উচ্চারণ-দোষ। 'আবাদি' নয়, ওটা হচ্ছে—আমার কানে এখনো বাজছে এবং বাজনাটার স্বরলিপি গিয়ে দাঁড়ায় এই—"আয়োডি" (দ্রুত লয়ে জিবের এক ঠেলায় উচ্চারণ শেষ করতে হবে)। ধীরে ধীরে, জমিদারী চালে, দোলানো ধুতি-পাঞ্জাবির নম্রতা যোগ দিয়ে 'আবাদি' বলেছেন কি ও-টার অর্থ গেল বদলে। তখন তার মানে হল 'মুশকিল,' 'ট্রা-আবুল্-অ', বললেন সেই তামিলভাষী কর্মকর্তা। পরে, হাড়ে হাড়ে আমরা অনেকে বুঝলুম সেই ভদ্রলোক আর কিছু না হন, ভবিষ্যৎবক্তা বটেন। 'আয়োডি' আমাদের কাছে উচ্চারণেও রয়ে গেল 'আবাদি' এবং কর্মক্ষেত্রেও হয়ে দাঁড়াল এক মুশকিলের জায়গা।

মাদ্রাজ শহর থেকে আবাদির বা[...] মাইল পাকা রাস্তা দেখতে দেখতে চ[...] যায়। দুপাশে মধ্যবিত্ত পরিবারের বা[...] ঘর, কয়েকটা কলকারখানা, মাঝে ম[...] ধানের খেত। আর যেদিকেই চোখ যে[...] যায় সেইদিকেই অগুনতি তাল গা[...] স্তম্ভরাজি। ছাঁটা, ঝোপরা-মাথা কৃষ্ণ[...] গাছগুলো দল বেঁধে দাঁড়িয়ে, যেন ক[...] বেঁধেছে এক এক জায়গায় এক এ[...] তাল-পরিবার—বাপ, দাদা, নাতি, না[...] সব একসঙ্গে। আর সব পরিবা[...] সকলেই দেখতে অবিকল একরকম, এ[...] কি জোট বেঁধে দাঁড়াবার ভঙ্গিটাও। [...] থেকে আরম্ভ করে মাদ্রাজ প্রদে[...] (পশ্চিম অংশটা বাদে) যেখানেই যান [...] কেন, এরা আপনার সাহচর্য ছাড়বার [...] ওদের বাদ দিলে দক্ষিণ ভারতের কে[...] landscape সম্পূর্ণ হবার নয়। আ[...] সময় মনে হয়েছে, প্রদেশের মানুষগু[...] সঙ্গেও রয়েছে ঋজু, সহিষ্ণু কৃষ্ণক[...] কর্কশ গাছগুলোর অপূর্ব সাদৃশ্য। যেন দক্ষিণ ভারতের স্বাক্ষর।

মাদ্রাজের অন্যান্য জায়গার [...] আবাদিও লালমাটির দেশ। জমি [...] নিচু, ঢেউ-তোলা। অনেকটা বাঙলা দে[...] বীরভূম জেলার মত। দু'একখানা ই[...] একতালা বাড়ি, একটি বাংলো, ব[...]

র টালির ব্যারাক-ঘর, গেরুয়া ধূলি-
রিত পেটা রাস্তা, কিছু গাছ-গাছড়ার
প আর ইলেক্‌ট্রিক আলো—এই নিয়ে
দল আবাদি। ঐ অঞ্চলে গত যুদ্ধের
য়ে ছিল মস্ত বড় এক সামরিক
স্তানা। তারপর বাড়ি-ঘরগুলো
হত হচ্ছিল Malayan Emmigra-
n Centre হিসেবে। অনেক মাদ্রাজী
াক যেত সিংগাপুর-মালয়ে। তারা
নে কয়েকদিন থেকে সরকারি কাগজ-
াদির ব্যবস্থা করে সাগর পাড়ি দিত
রের বনে কাজের জন্যে। সে-সব এখন
হয়ে গেছে। (আগেকার তৈরি বাড়ি-
গুলো ছাড়া, কংগ্রেসের উপলক্ষে
বশ্যি তৈরি হয়েছিল, যেমনি অন্যান্য
গ্রেস-স্থানেও হয় অনেক টিনের
াঘর।)

রাত এগারোটায় ওখানে পেঁছেই
ম পরিচয় হল যে 'আয়োডি' 'আবাদি'
। আমাদের টেলিফোন করতে হবে
কোথায় এবং সেটা যে-কোনো
ণে-ই হোক করতে হবে রাত বারোটার
গে। বাস্‌ থেকে নেমে আমরা দুজন
বাদিক বেরোলাম এক দুরূহ কাজের
নে : আবাদির বড়ো ডাকঘর
থায়? ছুটে ছুটে গায়ে ঘাম এল,
দকে ঘড়ির কাঁটাও এল সাড়ে এগারো-
। ডাকঘর রয়ে গেল মায়ামৃগ।
তায় লোকজন আছে, পাহারায় আছে
র্দিয়ার, কিন্তু যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ
তাদের শতকরা পঁচানব্বইজন না
নে ইংরিজি, না জানে হিন্দী। শুধু
মিল—এবং সেই ভাষার একটি বর্ণও
মরা জানি না!

—ব্রাদার! বড় ডাকঘরটা কোথায়?
াস্ট অফিস কিধর্‌ হ্যায় জী? হা
তাস্মি! —দু'একজন যারা প্রশ্নটা
ঝলো, তারা জানে না ডাকঘর কোথায়।
যে স্রেফ্‌ আধঘণ্টা ঘুরে একজন
াশয়ের দয়ায় গিয়ে পেঁছলাম, ডাক-
র নয়, টেলিফোন অফিসে। অবিশ্যি
মাদের কাজ হয়ে গেল।

এ-তো না হয় রাত্রি বেলার কথা,
নুয়ারি আঠারো। পরদিন, কট্‌কটে
নের বেলায় আমাদের ফটোগ্রাফার
হীমশাই ও মাদ্রাজের একজন বাঙালী
দ্রলোক, দুজনের লেগেছিল পুরো এক-
ঘণ্টা খুঁজে পেতে আবাদীর রেল
ইস্টিশানে পেঁছতে। সেই ভাষা বিভ্রাট!

বাঙলা দেশে অনেকের ধারণা যে
মাদ্রাজের কুলিমজুর, রিক্‌শাওয়ালা,
এমন কি মাদ্রাজের বোবা লোকেরাও
ইংরিজি বলে। স্রেফ্‌ ভুল। বড়জোর
yes sir, no sir; অধিকাংশই না বোঝে
ইংরিজি, না বোঝে হিন্দী। অবিশ্যি
পয়সা নেবার বেলায়, ঐ চারআনার জায়গায়
'ওয়ান্‌ রুপি সার', ঐটুকু ইংরিজি
শুনেছি ওদের অনেকের মুখে, হোল্ড-
অল্‌টা একবার ছুঁয়েছে কি না ছুঁয়েছে।

প্রয়োজনে একটা যুক্তি আছে যা
অকাট্য এবং যা রাজনৈতিক নেতা অথবা
সংখ্যাবিদ্‌দের তোয়াক্কা রাখে না।
মাদ্রাজে না গেলে বোঝা যায় না সর্ব-
ভারতীয় একটা ভাষার একটা national
language কী ও কতটুকু প্রয়োজন ও
সেটা যত শীঘ্র যত বেশি লোকে আয়ত্ত
করতে পারে তত ভাল।

এই ভাষা বিভ্রাট শুধু বাইরে নয়,
আবাদিতে subjects committee-র
অধিবেশনেও গিয়ে হাজির। অপ্রত্যাশিত
নয়।

বেশ সাজান একটা মণ্ডপ, কয়েক
হাজার লোক ধরতে পারে। ভেতরটা
তিন-রঙা কাপড়ে মোড়ানো। ইয়া মোটা-
সোটা গণ্ডা কয়েক তাকিয়া পরমালস্যে
পড়ে আছে নেতাদের শ্বেত-বসনী মঞ্চে।
এবং সবচাইতে চমৎকার লেগেছে চোখে
মণ্ডপের প্রবেশদ্বার ও সামনের facade-
টার রূপসজ্জা। খাঁটি দক্ষিণ ভারতীয়।
চীনে লণ্ঠনের মত দেখতে, একরকম
লম্বা, ফাঁপা নক্সা-কাটা কাপড়ে মোড়া
গোলাকৃতি জিনিস ঝুলিয়ে দেওয়া
হয়েছে প্রবেশপথের চৌকাঠের উপরে ও
আশেপাশে। দলবেঁধে কি একাকী তারা
ঝুলছে বাতাসে। জানলুম, ওটা সব
উৎসব উপলক্ষে ব্যবহার হয়, এবং কোনো
কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে ভিতরে আলোও
দেওয়া হয়। (গবেষণার বস্তু এই চীনে-
লণ্ঠন কোত্থেকে এল। চীন আমাদের
কাছ থেকে নিয়েছে কি আমরা চীন থেকে
নিয়েছি' প্রাচীনকালে চীনের সঙ্গে
দক্ষিণ ভারতের যাতায়াত, ব্যবসা-বাণিজ্যটা
বেশ ছিল।)

অধিবেশন শুরু হল উনিশে সকাল
নটায়। জওহরলাল নেহরুকে অনেকে
অনেক কিছু হয়ত করতে দেখেছেন—
ঘোড়ায় চড়েন, সাঁতরান, বাচ্চাদের সঙ্গে

কংগ্রেস অধিবেশনে মার্শাল টিটো ও শ্রীশ্রীপ্রকাশ

হৈহৈ রৈরৈ করেন, দুহাতে মানুষ ঠেলে ভিড়ের ভিতর ঢুকে যান। কিন্তু সজোরে লাথি মারতে দেখেছেন কি?

বিষয় নির্বাচনী কমিটির অধিবেশনের শুরুতে উনি মঞ্চের একপাশ থেকে আসছেন বক্তৃতা দেওয়ার জায়গায়। ফরাস-পাতা মঞ্চের উপর নানা জায়গায় নানা ভঙ্গীতে হাত-পা ছেড়ে শুয়ে আছে সেই সব তাকিয়া-বালিশদের দল। যেটা পায়ের কাছে পড়ল সেটাকেই নেহরু মারছেন লাথি এবং যতগুলো হেঁটে আসতে সামনে পড়ল, সবগুলোকে এমনি করে ডাইনে বাঁয়ে হটিয়ে এলেন মাইকের সামনে। জানি না, নেতাদের যাঁরা দিব্যি আরামে তাকিয়া ঠেস্ দিয়ে বসেছিলেন, তাঁরা মানে-টা বুঝে উঠলেন কি-না। 'আরাম হারাম হ্যায়' এই কথাটিই বলা হয়তো ছিল এর উদ্দেশ্য।

উনিশ, কুড়ি দুই দিন বিষয় নির্বাচনী কমিটি ও একুশ, বাইশ, তেইশ তিনদিন প্রকাশ্য অধিবেশন। অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের উপর (সব নিয়ে তেরোটি) বক্তৃতা হল, প্রধানত যাঁরা পেশ করলেন এবং যাঁরা সমর্থন করলেন তাঁদের। আলোচনা যে হয়েছে একথা বলা ঠিক হবে না, একটি প্রস্তাব ছাড়া। সে যাক্। কিন্তু ভাষা? সব মিলে গুটি কয়েক: ইংরিজি, হিন্দী, উর্দু, তামিল, তেলেগু, মালয়ালম্। যেন সেই Tower of Babel! বেশ অনুভব করা গেল যাকে বলা যায় linguistic nationalism। যিনি ইংরিজি জানেন, তিনি সেই ভাষায় বলছেন না; বলছেন হিন্দী অথবা হিন্দুস্থানীতে। অমনি সেটা হয়ে যায় অবোধ্য হাজার হাজার মদ্রবাসীদের কাছে। তাঁরা তখন গল্পগুজবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন এবং অনিচ্ছাতেও ধুম পড়ে যায় একটা বিশ্রী গণ্ডগোলের। তেমনি আবার কেউ হয়ত বলছেন তামিলে আর অমনি সেই ভাষার পরিধি থেকে বাদ পড়ে গেল কয়েক হাজার লোক। অথচ তিনি ইংরিজি জানেন, যদিও হিন্দী জানেন না, অথবা বক্তৃতা করার মত জানেন না।

যথা তামিলে ভাষণ দিলেন শ্রীভেংকটরমন, অভ্যর্থনা সমিতির সম্পাদক। এক সময় তাঁকে জিজ্ঞেস করলুম: "আপনি তো ভাল ইংরিজি জানেন; তা'হলে ঐ তামিলে' বল্লেন কেন?" তিনি যা উত্তর দিলেন, তা'তে আমার চক্ষু স্থির, রোয়াকি ঢং-এ বলতে গেলে ট্যারা হয়ে গেলুম।

তিনি বল্লেন—ও'রা কেন হিন্দীতে বলছেন? তাঁরা কি জানেন না যে, আমাদের শতকরা নিরেনব্বুইজন হিন্দী বুঝতে পারেন না? সুতরাং আমিই বা আমার নিজেদের লোকদের ভাষা কেন বলব না?

মাদ্রাজের পল্লীনারী

ঐ-তেই হয়ে গেল ভাষার প্রাদেশিকতার অঘোষিত অদৃশ্য পাঞ্জা কষাকষি। ত্রিবাংকুরের এক মহাশয় চোস্ত ইংরিজিতে ভাষণ দিলেন দু' একবার, তারপরেই হঠাৎ চালালেন মালয়ালম্। যদিও ভাষাটা বুঝলেন মাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন। আরেকজন ভাবলেন, আমার তেলেগু কী দোষ করল, তামিলভাষীরা যদি তামিল চালাতে পারেন। চল্‌ল 'উ-কার'-ময় তেলেগু। হিন্দীর তো কথাই নেই, পিছনে যখন শাসনতন্ত্রের খুঁটি আছে। একমাত্র বাঙালী, গুজ-রাতি, মারাঠী ও অসমীয়রা প্রাদে[illegible] ভাষা জোর করে চালানোর চেষ্টা করেন[illegible]

প্রথম প্রথম নেহরু হিন্দীতে ব[illegible] সেটার একটা সংক্ষিপ্ত-সার ইংরিজি[illegible] বলেছেন। পরে আর দু' একবার ইংরি[illegible] অংশটা বাদ দিয়েছেন, হয়ত সম[illegible] বিবেচনায়। মৌলানা আবুল কা[illegible] আজাদ পেশ করেছিলেন অতি-গুরুত্বপূ[illegible] সেই প্রস্তাব—"Socialistic Patte[illegible] of Society"। বল্লেন হিন্দুস্থানী[illegible] উর্দু শব্দের ডোজ্‌টা কমের দিকে রে[illegible] ভারতীয় সমাজের ক্রমবিকাশ, কংগ্রে[illegible] আদর্শ ধাপে ধাপে কী হয়েছে [illegible] বর্তমান যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষ[illegible] জন্য সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠ[illegible] প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বুঝিয়ে বল্লে[illegible] বল্লেন: এই আদর্শ, কংগ্রেসের এ-যা[illegible] যে আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল, সেটারই [illegible] ব্যাখ্যাসূচক স্তর, যা কিনা আজ [illegible] কল্যাণের জন্য আবশ্যক। আরো ব[illegible] ছিলেন: 'সোশ্যালিজম্' ও 'সো[illegible] লিস্টিক্ প্যাটার্ন অব স্টেট্' এক [illegible] নয়। পরে নেহরুজীও এটাকে [illegible] করার চেষ্টা করেছেন।—সোশ্যালি[illegible] অনেক রকম হ'তে পারে: রাশি[illegible] সোশ্যালিজম্, চীনের সোশ্যালি[illegible] ইত্যাদি। ভারতবর্ষে হবে ভারতের নি[illegible] ধারাকে বজায় রেখে এবং অন্যান্য দে[illegible] যা ভালো সেগুলো নিয়ে, ভার[illegible] আপনার সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

দুঃখের বিষয়, মৌলানার [illegible] হিন্দুস্থানীতে হওয়ায় বহু লোক [illegible] বুঝতে পারেনি। এবং সত্যি কথা ব[illegible] গেলে, মৌলানা অথবা নেহরু কেউ-ই স্পষ্ট করে ঐ পার্থক্যটা বো[illegible] পারেননি। (বাঙলা থেকে আগত এ[illegible] মহিলা প্রতিনিধি শ্রীমতী মায়া ব্যা[illegible] এক সংশোধনীতে প্রস্তাব করেছিলেন 'সোশ্যালিস্টিক প্যাটার্ন অব স্টেট' না[illegible] সোশ্যালিস্ট সোসাইটি' বলা হোক।)

প্রকাশ্য অধিবেশনের প্রথম [illegible] একুশে, এই প্রস্তাব পেশ করেছি[illegible] স্বয়ং নেহরু। নেহরু এবং মৌ[illegible] কংগ্রেসের এই ঐতিহাসিক, মোড়-ফে[illegible] প্রস্তাবের যে ব্যাখ্যা করেছেন [illegible] একটা কথা মনে হয়েছে। ও'রা মা[illegible] বাদে বিশ্বাস করেন না। শ্রেণী স[illegible]

অথবা 'Force as the basis of the state'—এ-সবের উপর ও'দের আস্থা নেই। কিন্তু ও'রা যখন সমাজের ক্রম-বিকাশকে ব্যাখ্যা করেছেন তখন বারবার মনে হয়েছে যে, মার্কসীয় ব্যাখ্যা থেকে সেটা খুব বেশি পৃথক্ নয়। কিন্তু আসল যেটা ও'রা দুজনেই জোর দিয়ে বলেছেন সেটা হ'ল এই যে, ব্যক্তিগত ধন ও রাষ্ট্রায়ত্ত ধন একই কালে নিযুক্ত থাকতে পারে জাতির ধন বৃদ্ধির কাজে। রাষ্ট্র প্রয়োজন মত ব্যক্তিগত ধন-নিয়োগ অথবা পরিচালনার উপর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা রাখতে পারে এবং তাদের কাজ-কর্ম করতে হবে দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার চৌহদ্দির ভিতর।

জোরদার আত্মবিশ্লেষণীয় আলোচনা হল, যে-প্রস্তাবকে সংক্ষেপে বলা হ'ত 'Purity Resolution'। পুরোটা হলঃ 'Purity & Strengthening of Organisation'। পনেরোজন প্রতিনিধি অংশ গ্রহণ করলেন। তার ভিতর ছিলেন নেহরু, সভাপতি ধেবরজী, মোরারজী দেশাই, ত্রিবাংকুরের মাধব মেনন, কাকা-সাহেব ও গ্যাড্‌গিল।

প্রাচীন এই সংগঠন কংগ্রেস স্থান করে নিয়েছে অগণিত মানুষের মনে এবং জনগণ এই সংস্থার উপর আশা রাখে। কিন্তু কিছুকাল যাবত সংগঠনের কার্যা-বলীতে দেখা দিয়েছে নৈতিক ও সামাজিক অবনতির লক্ষণাদি। এগুলো শক্ত হাতে দূর করতে হবে, সাংগঠনিক নির্মলতা ও শৃংখলা বজায় রাখতে হবে। —এই ছিল মোটামুটি প্রস্তাবের বক্তব্য।

চট্ করে যেন ময়ূরাক্ষী বাঁধের দরজা খুলে গেল। একের পর এক প্রতি-নিধিরা—বাঙলার, বোম্বাইর, উত্তর প্রদেশের, মহারাষ্ট্রের, ত্রিবাংকুরের—জমানো নালিশের পোঁট্‌লা খুলে লেগে গেলেন আত্ম-সমালোচনায়।

তাঁদের কথাটা সব মিলিয়ে এইঃ কিছু কিছু স্বার্থপর লোক ঢুকে গেছে সংগঠনে এবং তারা পয়সার জোরে সংগঠনকে হয় কব্জাগত করেছে, না হয় করতে চাইছে। প্রতিনিধি নির্বাচনে আছে দুর্নীতি কোনো কোনো জায়গায় এবং কর্মাগ্রহী নওজোয়ানদের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না। উপরন্তু, যাঁরা মন্ত্রী হচ্ছেন অথবা প্রাদেশিক কংগ্রেসের পরি-চালক পদ পাচ্ছেন, তাঁরা নিজেদের অত্যন্ত বড় মনে করেন, জীবনযাত্রা করেন অতি উ'চু মানের এবং সাধারণ সদস্য অথবা জনগণের সংগে তাঁরা হারিয়ে ফেলছেন যোগসূত্র।

বাঙলার কালী মুখার্জি মশাই তো ঝাড়লেন দস্তুর মতো এক বোমা। বল্লেন, কোনো এক স্থানে প্রতিনিধি নির্বাচন উপলক্ষে মদ্যাদি বিতরণ করা হয়েছে। মৌলানা সাহেব প্রশ্ন করলেনঃ কোথায়, বাঙলা দেশে?—আজ্ঞে না, বিহারে—। আর যায় কোথায়! বিহারী সদস্য কয়েকজন গল্পগুজব স্থগিত রেখে তড়াক করে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ জানালেন।

সাড়ে তিনশোর মত প্রতিনিধিদের ভিতর মাত্র একজন বেরুলো যিনি প্রস্তাবটাকে সমগ্রভাবে বিরোধ করলেন। তিনি হাওড়ার কৃষ্ণকুমার চ্যাটার্জি মশাই। —হাটে এই হাঁড়ি ভাঙা কেন। কিছু দোষ থাকতে পারে তাই বলে এইভাবে নিজেদের নিন্দে নিজেরাই করব? এই হবে যে, অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি এসব ফলাও করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করবে। —জবাব দিলেন নেহরু হিন্দীতে, এ'কে আর উত্তর প্রদেশের অলগুরায় শাস্ত্রীকে। —তাহলে কি আমাদের ঘোমটার ভিতর থেকে কাজ করতে হবে? দোষ যদি থাকে সেটা আমরা প্রকাশ্যে সমালোচনা করব এবং আত্মসমালোচনা না করলে আমরা দোষ শোধরাব কী করে? দুর্নীতি বড় বড় লোকদের ভিতরও ঢুকেছে—আর কাঁহাতক সহ্য করা যায়? —(কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি থেকে একটা Standing com-mittee এ-সবের একটা কিনারা করবার জন্য নিযুক্ত হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছিল; হয়ত শিগ্‌গীর হয়ে যাবে। ধেবরজী বলেছিলেন যে, প্রায় সমস্ত প্রদেশ থেকে গাদা গাদা অভিযোগ কংগ্রেস কর্তৃপক্ষের কাছে এসেছে।)

কিন্তু ইতিমধ্যে আমাদের প্রাণ হাঁপিয়ে ওঠার জোগাড়। এ জিনিসটা খ্যাত যে, মদ্রবাসীরা অতীব কর্মকুশল। কাজ, সেটা যা-ই হোক, করতে তাঁরা ভালবাসেন। যাঁর যেটুকু কাজ সেটুকু তাঁরা করেন, ভ্রূ কুঁচ্‌কে নয়, ভাল মনে। কিন্তু এ-কথা মনে হয়েছে যে, সামগ্রিক-ভাবে পরিকল্পনা করবার শক্তিতে ওদের কিছু অভাব আছে।

নানা প্রদেশের হাজারো লোক এসেছে আবাদিতে। পোশাকে-আশাকে, খাওয়া-দাওয়ার রুচিতে আর ভাষা বৈচিত্র্যে আবাদি যেন ভারতের ছোট্ট একটি প্রতিকৃতি। কিন্তু কী কারণে জানিনে, আবাদির বন্দোবস্ত হল মাত্র নিরামিষের —দক্ষিণ ভারতীয় লংকা-গোলা তে'তুলে ডাল-ভাত, ইড্‌লি, ধোসা আর ঘোল

এবং গুজরাতি ডাল-ভাত-ঘ্যাট-পুরি-পাঁপর-ঘোল। কোনো ব্যবসায়ীকে কোনো খাবারের দোকান খুলবার অনুমতি দেওয়া হয়নি, অন্যান্য সব কংগ্রেসে যা হয়ে এসেছে। শুনলুম, প্রথমদিকে কথা হয়েছিল মাদ্রাজের মস্ত এক caterer-এর সঙ্গে। পরে তাদের নাকি বলা হল যে, খাবার-দাবারটা তারা জোগান দিক, কিন্তু চালাবে অভ্যর্থনা সমিতি। তারা রাজি হয়নি। অভ্যর্থনা সমিতিই ঘাড়ে নিল দায়িত্ব।

সামান্য ক্রুদ্ধ হওয়ার অনুমতি পেলে বলি, কর্তৃপক্ষ মাদ্রাজী ভাষা এবং তেমনি অনুপাদেয় ও অস্বস্তিকর মাদ্রাজী খাদ্য আমাদের বহু লোককে গিলতে বাধ্য করেছেন। যারা গা'য়ে ফুঁ দিয়ে বেড়ান তাঁদের না হয় লংকা-তে'তুল-ভোজের শখ সাজতে পারে। কিন্তু আমাদের মত হীনজনদের, যাদের রোজ খাটতে হচ্ছিল বারো থেকে চৌদ্দ ঘণ্টা (শারীরিক ও মানসিক), তাদের ঐ ডিমটা, মাছটা, মাংসটা না হ'লে কী করে চলে। দু-একবেলা চোখ বুঁজে চালানো যায়; তাই বলে পাঁচদিন! তদুপরি, ঐ নিরামিষ মানে 'ডাক-সাঁইটে, নিরামিষ' with vengence! ঐ শেষ নয়। এই শুরু।

চা খাবো না অথচ সাংবাদিকতা করব, এহেন নির্দয় কথা কখনো শুনেছেন? আবাদিতে ঘড়ি ধ'রে মাত্র দু' বেলা চা অথবা কফি। লাইন দিয়ে টিকিট কিনে, ঘড়ি ধ'রে দুপুরের ও রাত্রির খাবার। সেটা করবার জন্যে যখন রাজনৈতিক বৈঠকের বিরতি হয়, আমাদের তখন মরি-বাঁচি কাজ আরম্ভ। ঘণ্টা কয়েক মন দিয়ে সব শুনতে হবে। কড়া নজর রাখতে হবে, একই সঙ্গে, নেতারা মঞ্চে কী করছেন না করছেন। তারপর যেমনি বিরতি হল, অমনি তাড়াহুড়ো লেখবার। অতঃপর, পাকা দুটি মাইল হে'টে গিয়ে ও-গুলোকে দিতে হবে পোস্টাফিসে তারের জন্যে। পরিশ্রান্ত ও উদ্বিগ্ন মনে যখন ফেরা গেল, ততক্ষণ খাবারের নির্ধারিত সময় পার। অন্যান্য কংগ্রেসের মত বাইরে দোকান নেই যে, কিনে খাওয়া যাবে। দু-একটা দোকান ছিল (চা, পাঁউরুটি) আবাদির সীমানার বাইরে—তা-ও দেড় মাইলের ধাক্কা। হাঁটতে হাঁটতে গে'টে বাত ধরে যাওয়ার কথা। পোস্টাফিস্—দু' মাইল; খাবার দোকান—ঐ দেড় মাইল; টিকিট কিনে অফিসিয়াল্ খাবার—আধ মাইল; প্রকাশ্য অধিবেশনের সত্যমূর্তিনগর—তিন মাইল; রেল স্টেশন—দু' মাইল। কর্তৃপক্ষের নিষেধানুযায়ী ভাড়া-নেওয়া কোনো গাড়ি-ঘোড়া আসতে দেওয়া হয়নি। সুতরাং, যত শীঘ্র কাজ সারা চাই ততো শীঘ্র পা' চালাতে হবে—নান্য পন্থা। ঈষৎ স্থূলকায় আমার এক সহকর্মীর চোখ দু'টো যখন তখন ছল্‌ছল্ করে উঠত।

এমনি অবস্থায় এল একুশে জানুয়ারি—প্রকাশ্য অধিবেশনের প্রথম দিন। কর্তৃপক্ষ ঠিক করেছিলেন যে, নিজেদের লোক-জন, প্রতিনিধি, কর্মিবর্গ ও নিমন্ত্রিতদের ছাড়া কাউকে আবাদি ঢুকতে দেবেন নাঃ সব্বাইকে সোজা যেতে হবে সত্যমূর্তি-নগর। কিন্তু কে শোনে ধর্মের কাহিনী। সকাল থেকে দুপুর নাগাদ আবাদির রাস্তাঘাট যেন কলকাতার ধরমতলা অথবা চিৎপুর অথবা বড়বাজার। কে কা'কে রোখে! বাইরের লোকেরা টিকিট কিনে মুহূর্তে ফুৎকার দিয়ে উড়িয়ে দিল সমস্ত রান্না করা খাবার। গুজরাতি ভোজনশালার সামনে কিউ করে বে-কিউ করে হাজার খানেক লোক; ঘোষিত হল খাবার আছে মাত্র পঞ্চাশ জনের। ওদিকে ইড্‌লি-সম্বর্-রসম্ স্থানে (দক্ষিণী ভোজনশালায়) গণ্ডগোল। দু হাজার ভলান্টিয়ার জুতো দেওয়া হয়নি বলে স্ট্রাইক্ করে বসে আছে। (শুনেছি, ওটার ভিতর কী করে যেন ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ প্রশ্ন ঢুকে গিয়েছিল। ওদিকে ক্ষুধার্ত এক জনতা জোর করে টিকিট ঘরের দরজা ভেঙে জিনিসপত্র লণ্ডভণ্ড করে খাবারের টিকিট সংস্থান করছে, যদিও খাবারের টিকিও দেখা যাচ্ছিল না। চারদিকে যেন এক নিনাদঃ ম'য় ভুখা হু'। আমাদের মতো বহু কংগ্রেস প্রতিনিধি ও কর্মিরও সে-বেলা উপোস দিয়ে বেলা দুটো নাগাদ হাজির হতে হয়েছিল সত্যমূর্তিনগরে।

প্রকাশ্য অধিবেশনের উপবেশন স্থানে পেঁৗছনও এক কম বিভ্রাট নয়। যেদিকে তাকানো যায় শুধু লোক আর লোক। ঢেউ-তোলা উ'চুনিচু লালচে মাটির পথ-ঘাট-প্রান্তর যেন সজীব হয়ে চলতে আরম্ভ করেছে—সমস্ত-ব্যক্তি-প্রাণ মিলে হঠাৎ সৃষ্টি হয়েছে বিরাট এক সমষ্টি-প্রাণ।

কি কিশোরী, কি যুবতী, কি বৃদ্ধা মদ্রবাসিনীরা সকলেই পরে রঙিন শাড়ি এবং প্রায় সব খোঁপায় বা বেণীতেই গোছা গোছা ফুল। হয়ত রঙের বাহার দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করে তাদের সৌষ্ঠব সুষমা-হীন, কৃষ্ণকায়া দেহবল্লরী। বস্তুত কোনো এক জায়গায় অতো অসুন্দর নারী কুলের অতো বড় সমাবেশ দক্ষিণ ভারতে পূর্ব ও পূর্ব-দক্ষিণ অঞ্চল ছাড়া চোখে পড়বার কথা নয়। (বাঙালী, সিংহলী মালাবারী মেয়েরাও সাধারণত কালো কিন্তু তারা লাবণ্যময়ী কৃষ্ণকলি, শুধু কৃষ্ণকায়া নয়।) অন্ধকার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে উঠতে হঠাৎ আলোকোদ্ভাসি জানালা দেখলে যেমন মনে হয়, তেমনি মনে হয়েছে ওদের মাঝে দৈবাৎ যখ আবির্ভাব হত চোখ ঝলসানো রূপ লাবণ্যময়ী কোনো রমণী। অতি গৌরাঙ্গী, নাতিদীর্ঘকায়া, রূপবতী শুনলুম, ওরা নাকি দক্ষিণ ভারতে বিশিষ্ট কয়েকটি গোষ্ঠীসম্ভুতা, য নায়ার, আয়েংগার।

পুরুষদের পরনে সাদা লুঙ্গি, শা অথবা পাঞ্জাবী, একটি সযত্নে ভাঁজ ক চাদরের সরু ফালি অথবা তোয়ালে কারণে অকারণে হাফ্ প্যান্টের ম লুঙ্গিকে দুভাঁজ করে হাফ্-লুঙ্গি ক ফেলে। কিন্তু সাধারণ লোকেরা পোশা আশাকে অবিলাসী ও মিতব্যয়ী। বাঙাল দের মতো মিহি-ফিন্‌ফিনের উপর অ নজর নেই।

সুসজ্জিত বিরাট অ্যাম্ফিথিয়েটা তিনশো-চুরাশী ফিট্ লম্বা প্রধান প্রবে দ্বারে উঠেছে ছিয়াত্তর ফিট্ উ'চু পি বোর্ডের তৈরি রাঙানো গোপুরম্। ও দুপাশে জড়ো করা হয়েছে দক্ষি ভারতের মন্দির স্থাপত্যের নানা কাঠামে মনে হল, পল্লভ্, চোল ও বিজয়নগর তিনটি ধারারই কিছু কিছু ছিল। স মূর্তিনগরের ঘেরা চারপাশে রাখা হয়ে সমস্ত প্রাক্তন কংগ্রেস সভাপতি আলেখ্য।

কোন্ প্রবেশদ্বার দিয়ে সত্যমূ নগরের ভিতরে ঢুকব সেও এক সমস —ব্যাপার। এটা কি প্রেসওয়ালা

রজা? না, সামনে কোথাও হবে।—এক-জন বললেন, সাত নম্বর গেট্। কোথায় সাত! বহু কিছু আছে, মসজিদের মতো তোরণ আছে, গীর্জার মতো তোরণ আছে, কোন্ সালে কে সভাপতি ছিলেন দিব্যি বড় বড় হরফে লেখা আছে, কিন্তু কোনো গেটেই আর নম্বর নেই। প্রায় সমস্তটুকু পথ পরিক্রমা করে শেষে অনুমতি পাওয়া গেল একস্থানে। আর পনেরো মিনিট দেরী হলেই হয়েছিল আর কি! কারণ তখন থেকেই আরম্ভ হল দর্শকদের অভিযান। হাজার হাজার লোক বেড়া অতিক্রম করে দৌড়ে লাফিয়ে আসছে সামনের মঞ্চের যতো কাছে সম্ভব। মুহু-মুহু সিটি বাজছে চারদিক থেকে ভলান্টিয়ারদের। ওদিকে কয়েক শো লোক এসে গেল মঞ্চের কাছাকাছি। সমস্ত দিকে অভিযান আর প্রকাশ্য অনুপ্রবেশ।

ডাক পড়ল পুলিসের। তারা গিয়ে মঞ্চের দিকে অত্যুৎসাহী অভিযানকারীদের থামালো। কিন্তু তারা না-হটে যে যার মতো সেইখানেই বসে পড়ল, রাস্তাঘাট বন্ধ করে। বিশ্রী একটা ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কির মরশুম! আর তার ভিতরে পড়ে গেলেন দেখলুম অনেক প্রতি-নিধি। তাঁদের অবস্থা বর্ণনা না করাই ভাল। আরম্ভ হওয়ার ঘণ্টা দুয়েক পরে জনতা এক দমকে দখল করে নিল প্রেসের লোকদের বসবার জায়গাও। আমরা সব পালালুম মঞ্চের দিকে এবং পরদিন থেকে নেহরুর অনুগ্রহে আমাদের স্থান হল প্রেসসংলগ্ন মণ্ডপে।

অর্ধবৃত্তাকার মণ্ডপ সেই চীনে-ধরনে সজ্জিত। পেছনের দেয়ালে গান্ধীজীর জীবন থেকে চিত্রাদি। একটা পার্থক্য নজরে পড়ল। আবাদির রূপ-সজ্জাকে নেহরুও প্রশংসা করেছেন এবং প্রশংসনীয় ছিলও বটে, বিশেষ করে প্রধান তোরণটি। রাত্রে তো কথাই নেই। নানান্ রঙের আলোতে উৎসবপুরী। কিন্তু সব মিলিয়ে কেমন যেন মনে হয়েছে যে রূপ-সজ্জায় যে আর্ট সে-টা যেন ঐ মাস্টারের আর্ট। অন্যান্য কয়েকটা কংগ্রেসে (যেমন কল্যাণীতে) শান্তি-নিকেতনের শিল্পীদের সজ্জা কিম্বা আবাদিতে যে সংযত রূপ-লাবণ্য থাকত, আবাদিতে তা ছিল না বিশেষ করে মণ্ডপে আঁকা ছবিগুলোতে। গাদা গাদা রঙের টিন উজাড় করা হয়েছে—যেন সিনেমা হাউসের বা'র-দেয়ালে আঁকা বিজ্ঞাপনী ছবি।

সেই জনসমুদ্রকে উদ্দেশ করে বক্তৃতা করলেন যুগোস্লাভ ভাষায় মার্শাল টিটো। ইংরিজিতে অনুবাদ করলেন ওঁরই নিজের দোভাষী। (যুগোস্লাভ ভাষা কানে বেশ মিষ্টি লাগল।) টিটো তাঁর শুভেচ্ছা জানালেন; জানালেন, ভারতের ভবিষ্যতে তাঁর আছে প্রগাঢ় আস্থা। তিনি নিজেকে সুখী মনে করছেন যে ভারতবর্ষ এগিয়ে যাচ্ছে সমাজতন্ত্র গঠনের দিকে। বল্লেন, তাঁর নিজের দেশ যেমন ছিল, তেমনি ভারতবর্ষেরও আজ একান্ত প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য।

সকলেরই জানা কথা যে নেহরু ঐ কথা বারবার বলে আসছেন, আবাদিতেও বলেছেন ঃ বিসর্জন করো প্রাদেশিকতা, সাম্প্রদায়িকতা আর জাতিভেদ।

অন্যান্য কংগ্রেসের নেহরু আর আবাদির নেহরুর মধ্যে বেশ তফাৎ। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করায় ১৯২৯-এর লাহোর কংগ্রেস যেমন ইতিহাসে গুরুত্বময়, সমাজতন্ত্রের আদর্শ গৃহীত হওয়ায় আবাদি কংগ্রেসও তেমনি। সমস্তগুলো প্রস্তাবই এক অদৃশ্যসূত্রে গাঁথা, সব যেন ঐ সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনাদর্শের পরিপূরক এবং যদ্দুর জানা গেছে নেহরুর নিজস্ব হাতের ছাপ নিয়ে এবং তাঁর প্রতিভার রূপ দিয়েই দেওয়া হয়েছিল প্রস্তাবগুলোর একক বাঁধুনি। মনে হল, এবার ঢিলে-ঢালা দিয়ে কাজ করতে রাজি নন্। তিনি নিজে আলো-চনার রাস্তা দেখিয়েছেন সবগুলো প্রধান প্রস্তাবে। আদর্শানুরাগী হিসেবে 'সমাজ-তান্ত্রিক সমাজ' গঠনের প্রস্তাবে, অর্থ-নীতিজ্ঞ হিসেবে "Economic Policy" প্রস্তাবে, সংগঠক হিসেবে 'Purity' প্রস্তাবে—ইত্যাদি। দ্বিতীয় পঞ্চসালা পরিকল্পনার ধারা, নারী সমাজের স্থান, শিশুকল্যাণ, অনুন্নত জাতিদের উন্নত করা, জাতিভেদ ইত্যাদি বিসর্জন এবং কংগ্রেস পার্টি গঠন—সমস্ত আলোচনায় নেতৃত্ব দিয়েছেন। আবাদি কংগ্রেস আর নেহরুকে আলাদা করে দেখা যায় না। নেহরুর প্রতিভা সর্বত্র।

প্রস্তাব পেশ, প্রস্তাব সমর্থন করেছেন বৈকি অনেকেঃ মৌলানা সাহেব, মোরারজী দেশাই, হরেকৃষ্ণ মহতাব, রাজাজী, পন্থজী ও আরো অনেকে। ক্ষমা চেয়ে বলতে হয় ও'রা অনেকেই শুধু প্রস্তাবের ভাষাটা এদিক ওদিক করে বক্তৃতা করেছেন। সহজ ও সরল করে বোঝাবার বা স্বমতে বিশ্বাসী করাবার প্রয়োজনীয়তা তাঁরা যেন আবশ্যক মনে করেন নি। কিন্তু যখনই সে-প্রয়োজন হয়েছে তখনই মাইকের সামনে নেহরুর মুখ। সব জায়গায়, সমস্ত নেতাদের অভিব্যক্তিতে নেহরুর ব্যক্তিত্ব, নেহরুর ভাষা। ১৯৫৫-র নেহরুকে মনে হয় তাঁর "আত্মজীবনীর" পাতা থেকে উঠে-আসা পুরোনো দিনের নতুন নেহরু।
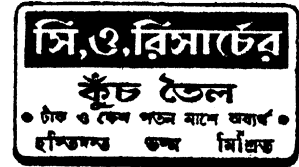
কংগ্রেস পার্টির ইতিহাসে, আবাদি থেকে আরম্ভ এই নেহরু-অধ্যায় (ওরফে সমাজতান্ত্রিক অধ্যায়) কী রূপ ও কী স্থান লাভ করবে ভারতবর্ষে, নির্ভর করবে অনেকাংশে কংগ্রেস পার্টির গঠনে। নেহরু সুভাষ নন। সাংগঠনিক কার্যে গত কয়েক বছর ওঁর মস্ত সহায়ক ছিলেন কিদোয়াই সাহেব। অধুনা একাজে হয়ত তিনি অনেক ভরসা রাখেন ধেবরজীর উপর। একমাত্র ভবিষ্যৎ দেবে উত্তর যে কংগ্রেস পার্টি কতটুকু হোমোজিনিয়স্ হতে পারবে এবং প্রাদেশিক নেতৃবর্গ কতটুকু কার্যে পরিণত করতে পারবে নেহরুর উপদেশঃ "Give up bossism. Go to the people. work."

এই সূত্রে বলা যায় মাদ্রাজের কর্ণধার দুজন ব্যক্তির কথাঃ মুখ্যমন্ত্রী কামরাজ নাডার (উচ্চারণ 'নাদার' নয়) ও প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি কাক্কাজী। কামরাজ সত্যি কাজের লোক। নেহরু ওঁকে বলেছিলেনঃ 'আশ্চর্য মানি, একই সঙ্গে সব স্থানে মনে হয় তুমি উপস্থিত।' পোশাক-আশাক অতি সাধারণ মাদ্রাজীর মত, কিন্তু মাদ্রাজীর অনুপাতে অনেক লম্বা, পেটা জোয়ান। রাস্তা চলতে আগু-পিছু না আছে সেপাই সান্ত্রী, না আছে এই-হট্-যাও ভাব। একদিন দেখা গেল, স্ত্রীপুত্র নিয়ে দিব্যি এক গাছতলায় ঘাসের উপর বসে, অনেকেই সেদিন যেমন বসেছিল।

কাক্কা-জীর সুনামও অমনি, সাধারণ কংগ্রেস সদস্য অথবা লোকজনের সঙ্গে বেঞ্চির উপর বসে আলাপ-আলোচনা করতে লজ্জা অনুভব করেন না। অনুন্নত সম্প্রদায়ের লোক এবং ইনি সভাপতি হওয়ার পর থেকে উগ্র, সম্প্রদায়-ব্যাধিগ্রস্ত বুড়ো 'নাইরার'-এর দলে ('দ্রাবিড় কাড়াগাম') বেশ ভাঙন আরম্ভ হয়েছে শুনেছি। আসল কথা, এই দুজনের কেউ-ই, অনেকের মতে, ivory tower-এ বাস করেন না, এবং সাধারণ লোকের সঙ্গে সংযোগ হারাননি। মোটা গদির আরাম কেদারায় গা' এলিয়ে এ্যায়-কৌন্-হ্যায় ভাব নেই।

কল্যাণী কংগ্রেসের সঙ্গে আবাদির এক বিষয়ে অদ্ভুত সাদৃশ্য ছিল, সেটা হ'ল traffic jam, একুশে তারিখ। গোটা দুই থেকে ওটা শুরু। রাস্তা-ঘাট পুলিস কর্তারা এক-মুখো করেছেন কিন্তু রাস্তায় গাড়ির উপর কড়া নজর রাখার বন্দোবস্ত হয়নি। ফলে শত শত মোটর গাড়ি এ ওকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়ার বাসনায় সৃষ্টি হ'ল দিনের বেলায় motorists' nightmare। একজন মাদ্রাজী ভদ্রলোক বল্লেন, তিনি শহর থেকে আবাদির উদ্দেশ্যে রওনা হন বেলা তিনটেয়। গিয়ে পেঁছুলেন রাত্রি ন'টায়, মাত্র চৌদ্দ মাইল পথ যদিও। ভি-আই-পি-দের যাওয়া আসার জন্যে রাস্তাঘাট আগে থেকে রিজার্ভ করে রাখার নিয়মটিও সেদিনের গাড়ির ফ্যাসাদ খানিকটা বাড়িয়েছিল, শোনা গেছে।

প্রকাশ্য অধিবেশনের শেষের দু'দিন, বাইশে ও তেইশে, একুশের অনুকরণ করেনি। লোকের ভিড় কমে গেল, খাবার জিনিসের অভাব হয়নি, traffic jam-ও হয়নি। অধিবেশনের শেষ ভাষণ হ'ল নেহরুর, ইংরিজিতে। পশ্চাতে ফেলে-আসা সংগ্রাম ও শহীদদের দিনগুলো; ইতিহাসের বুক কাঁপিয়ে যাত্রা; বৈচিত্র্যময়, বিরাট, মনোহর ভারত আর তাঁর ছত্রিশ কোটি সন্তানের বিশাল ভবিষ্যৎ ছবি আঁকলেন নেহরু। কিন্তু ছবি-আঁকাটা কল্যাণীর সমাপ্তি-ভাষণের মতো উতরাতে পারেনি। কানে চিরদিন বাজবে কল্যাণীর সেই ভাষণ—a piece of magnificient literature৲ যদিও একই সুরে আরম্ভ হয়েছিল, তবুও আবাদির ভাষণ অতো ভাল হয়নি। (হিন্দির চাইতে ইংরিজি নেহরু অনেক ভাল বলেন। হিন্দি ভাষণে ওঁকে শব্দ খুঁজতে হয়, এমন কি অনেক সময় হাত ও কাঁধের ভঙ্গি দিয়ে বাক্য পূরণ করতে হয়)।

তেইশে রাত্রিতে শেষ পাঁচদিনের এই রাজসূয় পর্ব। রাত দশটা নাগাদ আমাদের কাজকর্ম যখন শেষ হল, তখন হঠাৎ মনে হল নিজেদের ভিতরে কী যেন কোথায় fuse হয়ে গেল; হঠাৎ করে যেন সব হয়ে গেলুম আলসে।

ক্যাম্পে ফিরে এসে আমাদের মতো মুসাফিরদের পাত্তাড়ি গুটোনোর পালা এবং সাব্যস্ত হল সেই রাত্রেই পালাতে হবে মাদ্রাজ শহরে। তা না হলে সকাল থেকেই লেগে যাবে ঘর-মুখো ভিড়। কিন্তু চৌদ্দ মাইল রাস্তা সুটকেস্ হোল্ডঅল্ প্যাঁটরা নিয়ে রাত এগারোটায় কী করে যাওয়া যাবে। গাড়ি বলতে যা আছে সে-সব অন্য লোকের। অভ্যর্থনা সমিতির লোকের সঙ্গে টেলিফোনে কথা হল। —না, রেলের আর আশা নেই। দুঃখিত, এখন কোনো বাস্-ও যাচ্ছে না, অত্যন্ত দুঃখিত।

অনেককে টেলিফোন করা হল, ইস্তক কামরাজজীকে। উপরের স্তরের কাউকেই পাওয়া গেল না—সকলেই গেছেন cultural performance-এ। প্রায় হোল্ডঅল্ আবার খুলতে যাওয়ার জোগাড়, হঠাৎ একজনের মাথায় অপূর্ব এক তরঙ্গ ঝল্কে গেল এবং আবার টেলিফোন করা হল। অভ্যর্থনা সমিতির এক নম্বরে। —দেখুন, আমরা কোলকাতার কয়েকটি কাগজের প্রতিনিধিরা কথা বলছি। খুব দরকার। আমাদের আজ রাত্রেই মাদ্রাজ পেঁছুতে হচ্ছে।

But very sorry, I don't think we can arrange—you see it is too late to have any transport. To morrow will be all right.

কিন্তু দেখুন, আমরা সব্বাই যাচ্ছি অন্ ইলেক্শন কভার করতে এবং আজ রাত্রে মাদ্রাজ না পেঁছুলে সকালের গাড়ি পা[illegible] না। ধেবরজী ওখানে সভা করতে যাচ্ছে[illegible] জানেন তো?"—

মোক্ষম অস্ত্র এবং লক্ষ্যভেদ। একা[illegible] মিথ্যার আশ্রয় নিতে হল, উপায় ছিল না বাঙলা দেশের লোক হয়ে জানব না [illegible] বৈবাহিক কার্য সমাধার পর অতি অবাঞ্ছি[illegible] ও অভাজন হয়ে থাকে বরপক্ষে[illegible] লোকেরা?

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত আলোকচিত্রগু[illegible] শ্রীবীরেন সিংহ কর্তৃক গৃহীত।

১৫, পার্ক স্ট্রিট-এ আর্টিস্ট্রীর নিজস্ব ভবনে এ'দের বাৎসরিক প্রদর্শনী হয়ে গেল কয়েকদিন আগে। এ বছরের প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ।

পরম্পরাগত লোকশিল্প এবং আধুনিক ব্যবহারিক শিল্পের নানা রকম নমুনা প্রদর্শন করা হয়েছিল। প্রদর্শনী কক্ষে ঢুকেই চোখে পড়ল দুটি শতরঞ্জি। একটির নক্সা পুরাতন রাজপুত চিত্রের অনুসরণ এবং আরেকটি শ্রীমতি অমিনা লোধী কৃত একটি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট পেইণ্টিঙ-এর অনুসরণে। নিঃসন্দেহে, প্রথম শতরঞ্জিটিই অনেক বেশী আকর্ষণীয়। অধুনা পিকাসো, মাতীজ, পল ক্লী-র মতন আধুনিক শিল্পীদের পেইণ্টিঙ অনুসরণে ইউরোপ-এও কার্পেট ইত্যাদির নক্সার প্রচলন হয়েছে। কিন্তু এই সব শিল্পীদের চিত্রকলা এ'দের সম্পূর্ণ নিজস্ব বুদ্ধি-দীপ্ত চিন্তাধারার অভিব্যক্তি এবং সাধারণ দর্শকের কাছে এগুলি একেবারেই দুর্বোধ্য। এ'রা যাকে pleasing form মনে করেন অন্যের কাছে সেগুলি তেমন 'প্লিজিং' নাও ঠেকতে পারে। সুতরাং বিক্রয়ের উপযোগী করতে হলে ব্যবহারিক সামগ্রীর, সকলের কাছে যা প্রীতিকর মনে হয় সেই ধরনের নক্সা হওয়াই উচিত নয় কি? নরবাহাদুর গুরুঙ কৃত টেরাকোটা মূর্তিগুলি অত্যন্ত আকর্ষণীয় লাগল। পুরানো আমলের এবং 'আধুনিক' ঘেঁষা আকৃতির সংমিশ্রণে এগুলি অপূর্ব সৃষ্টি। সেরামিক শিল্পে 'ভাস্কর'ও বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। পুরাতন কাঁথা ও বয়ন-শিল্পের নমুনাগুলিকে খুব অমূল্য সংগ্রহ বলা গেল না।

দ্বিতীয় কক্ষে মহারাষ্ট্রীয় ছুতোর মিস্ত্রী কৃত 'ডিভান' জাতীয় আসনটি অসাধারণ কাঠখোদাই শিল্পের নিদর্শন। মনুষ্য মূর্তি এবং পুষ্পসমন্বিত নক্সা-গুলি সেকালের ভারতীয় প্রস্তর-খোদাই শিল্পকে স্মরণ করিয়ে দেয়। কিন্তু এর সংগে গদি হিসাবে 'ডানলপ' কোম্পানীর 'ফোম কুশন' খুব স্বস্তিকর লাগল না। মুঘল আমলের প্রকাণ্ড একটি পিতলের পরাতকে কফি টেবল-এ রূপান্তরিত করে, তার চার পাশে আন্দামান কাষ্ঠ এবং বেত নির্মিত চেয়ার সাজিয়ে বেশ একটি রুচি-শীল ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। বর্মা টীক-এর বদলে অপেক্ষাকৃত সস্তা আন্দা-মান কাষ্ঠ ব্যবহার যথার্থই সুপরিকল্পনা। স্টেজের উপর প্রকাণ্ড বড় বড় অদ্ভুত গঠনের কয়েকটি টেরাকোটা অশ্ব প্রত্যেক দর্শককেই আকর্ষণ করে। শুনলাম ওগুলি বাঁকুড়া জেলার কোনও এক অখ্যাত গ্রাম থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। হুকার আকৃতি অনুসরণে 'ল্যাম্প স্ট্যাণ্ড' গঠন করার বুদ্ধিটি অভিনব বটে! এ ছাড়া এই কক্ষে প্রদর্শিত পটচিত্র, জয়পুরের পিতল শিল্প এবং কয়েকটি পুরাতন টেরাকোটা মূর্তি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তৃতীয় কক্ষে কিছু বইপত্র এবং কয়েকটি ক্যালেণ্ডার ডিজাইন প্রদর্শন
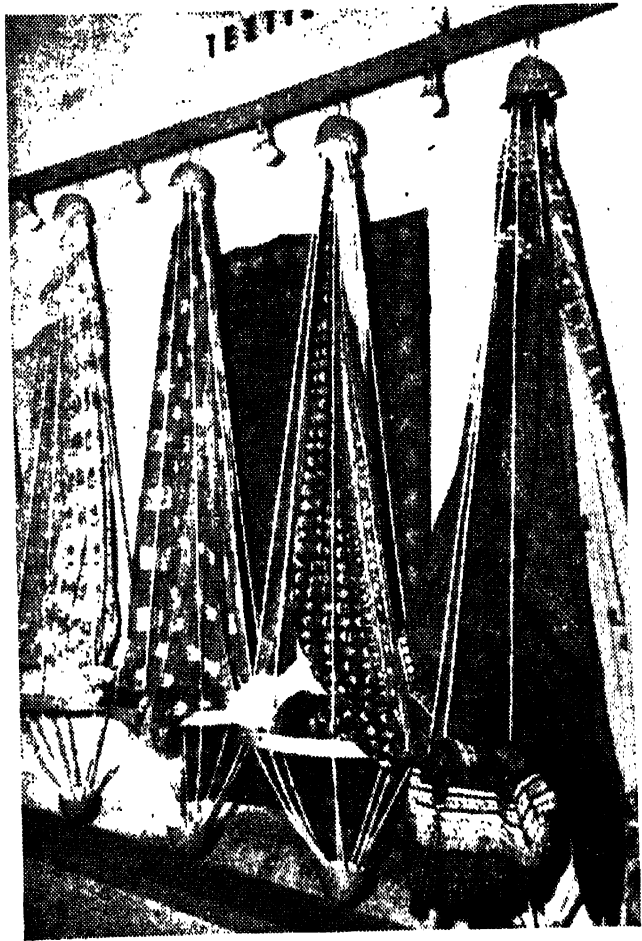
বয়ন-শিল্পের কয়েকটি নিদর্শন

করা হয়। বই-এর মধ্যে চীনা বইগুলিই সব চেয়ে জমকালো। শীতলপাটি বা খদ্দরের মলাটওয়ালা দেশী বইগুলিও মন্দ নয়। চীনাদের মতন এদেশেও ব্রোকেডেড সিল্ক-এ বাঁধাই করে বই প্রকাশ করা সহজেই চলতে পারে। ক্যালেন্ডার ডিজাইনের মধ্যে অতি চমৎকার সুকুমার শিল্পের কয়েকটি নমুনা চোখে পড়ল এবং প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রতাপ-চন্দ্র দেব যে শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে কোনই সন্দেহ নেই।

চতুর্থ এবং পঞ্চম কক্ষে ছাপা ক্যালেন্ডার, ফটোগ্রাফ, মেটাল বক্স কোম্পানী কৃত পত্রাদি, প্রেস-লে-আউট, বিজ্ঞাপন পুস্তিকা প্রভৃতি প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শিত দ্রব্যগুলিই যথেষ্ট পরিচিত হওয়া সত্ত্বেও সাজানো গোছানোর অভিনবত্বে চোখে নতুন লাগে, এর জন্য আর্টিস্ট্রীর কর্তৃপক্ষ অবশ্যই প্রশংসা দাবী করতে পারেন। এই সঙ্গে এঁরা যদি কিছু কিছু আন্তর্জাতিক ব্যবহারিক শিল্পের নমুনাও প্রদর্শন করতেন তা হলে স্থানীয় শিল্পী-দের পক্ষে এদেশের মান সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা করা সহজ হ'ত এবং ভবিষ্যতে তাঁরা এই মান আরও উন্নত করতে সচেষ্ট হতেন।

ফটোগ্রাফ প্রদর্শনী

পি এ বি-র ব্যবস্থাপনায় ১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এ তৃতীয়, আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফ প্রদর্শনী চলছে। কোনও আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীর পক্ষে ১ নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এর একতলার চারখানি ঘর যথেষ্ট প্রশস্ত বলে মনে হয় না। স্থান সংকুলান না হওয়ায় নিশ্চয় অনেক প্রদর্শনযোগ্য ছবিও বাতিল করতে হয়েছে।

যাই হোক, নিঃসন্দেহে বলা যায়, গতবারের তুলনায় এবারের মান, অনেক না হলেও কিছুটা উন্নত। চল্লিশটি বিভিন্ন দেশ থেকে ১৪৪০ খান ছবি এসেছে, তার মধ্যে ৪০৯ খান ছবি বাছাই ক'রে প্রদর্শন করা হয়েছে। এই নির্বাচনে বিচারক-মণ্ডলী যথেষ্ট বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছেন। একেবারে অযোগ্য ছবি একটিও চোখে পড়ল না। ভারতবর্ষের ২৩২ খান ছবির মধ্যে মাত্র ১০ খান প্রদর্শনযোগ্য সাব্যস্ত হয়েছে। খুবই পরিতাপের বিষয়।

লক্ষ্য করলাম অনেক ফটোগ্রাফ-এ, বিশেষ ক'রে রঙীন বিভাগে, পেইন্টিং-এর এফেক্ট আনবার চেষ্টা হয়েছে। একজন চিত্রকর কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দু চারটি তুলির আঁচড়ে যা ফুটিয়ে তুলবেন ঠিক সেই এফেক্ট ফটোগ্রাফ-এ আনতে হ'লে যথেষ্ট সময় তো লাগেই তা ছাড়া প্রচুর অর্থব্যয়ে নানান রকম বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করতে হয়। কিন্তু একটি অঙ্কিত চিত্র আর্ট হিসাবে যে সমাদর লাভ করে, 'ইভেৎ', 'স্টিলেবেন', 'স্পেসেস ইন টু ওয়ার্লডস', 'প্রাইমারী কিউবস অ্যান্ড রিলেটিভ ফর্মস', 'জেমস হুইটনী লুকস ইনসাইড' প্রভৃতি ফটোগ্রাফ কি সেই মূল্য দাবী করতে পারে? অবশ্য টেকনিক-এর বাহাদুরী স্বীকার করতেই হবে। দুটি বা তিনটি নেগেটিভ-এর সাহায্যে সৃষ্ট একরঙা রচনাগুলি নামকরণে এবং কম্পোজিশন-এ পুরোপুরিই সুররিয়া-লিস্ট ধর্মী বলা চলে। একটি ছবিতে চৈনিক চিত্রকলারও সাদৃশ্য এসেছে। 'এ মাস্টার অব দি আর্টস,' 'ডাঃ ডিচটার,' 'ড্রইঙ,' 'ইম্প্রেশন,' 'পোরট্রেট স্টাডী,' 'হুররা' এবং 'অ্যাড এ ড্যাশ অব কলর' এই সাতটি ছবি পুরস্কার লাভ করেছে। সব মানুষের পছন্দ অপছন্দ এক রকম হয় না, সেই হিসাবে অল্পবিস্তর মতভেদ থাকলেও দক্ষতার বিচারে বেশীর ভাগ পুরস্কার যথাযোগ্য পাত্রেই অর্পিত হয়েছে আমাদের বিশ্বাস।

অ্যাডলফ রসির 'ইম্প্রেশন' ছবিটির সঙ্গে এডুয়ার্ড মানে বা অগস্ট রেনোয়ার ইম্প্রেশনিস্টধর্মী পেইন্টিঙ-এর সাদৃশ্য আছে; সম্ভবত সেই কারণেই ছবিটির নামকরণ হয়েছে 'ইম্প্রেশন'। যে যে দেশের ফটোগ্রাফ সেই সেই দেশের ভাষাতে ক্যাটালগ-এ নাম ছাপা হয়েছে, ফলে অনেক নামেরই মানে বোঝা অসাধ্য। অবশ্য 'নামে কি এসে যায়' ছবি চোখে ভাল লাগলেই হ'ল।

খ্যাতনামা আন্তর্জাতিক ফটোগ্রাফ-শিল্পীদের রচনা দেখার সুযোগ দান করে পি এ বি নিঃসংকোচে, ফটো তোলা যাঁদের নেশা এবং ফটো দেখতে যাঁরা ভালবাসেন তাঁদের সকলেরই ধন্যবাদ দাবি করতে পারেন। প্রদর্শনীটি ৬ই মার্চ পর্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৫টা থেকে ৯টা অবধি জনসাধারণের জন্য খোলা আছে। প্রবেশ-মূল্য তিন আনা।

চিত্রগ্রীব

নয়াদিল্লী

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে দুইটি উল্লেখ-যোগ্য প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। প্রথমটি ভারতীয় প্রেস ফটোগ্রাফারস্ অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় বার্ষিক ফটোগ্রাফ প্রদর্শনী ও দ্বিতীয়টি চীনশিল্প ও কারুকলা প্রদর্শনী। দুইটি প্রদর্শনীই নিখিল ভারত শিল্প ও চারু-কলা সমিতি হলে অনুষ্ঠিত হয় ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সমক্ষে ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন দুটিরই উদ্বোধন করেন।

প্রত্যুষ হইবামাত্র চা-পান করিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা সংবাদপত্র পড়িতে শুরু করি এবং বিশেষ করিয়া বিভিন্ন ফটো-গ্রাফগুলি মনোযোগ সহকারে দেখিতে থাকি কিন্তু জগতের নানাবিধ গুরুতর ও প্রয়োজনীয় সংবাদের অন্তরালে থাকিয়া যাঁহারা অনেক সময়ে ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এমন কি কখনও কখনও জীবন বিপন্ন করিয়া নানা বিষয়ের ফটোগ্রাফ তুলিয়া সংবাদপত্রের শোভা ও আমাদের চিত্তবিনোদন করেন তাঁহাদের কঠিন ও জটিল জীবনযাত্রার বিষয়ে আমরা কখনই চিন্তা করি না। সুতরাং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন ফটোগ্রাফার দ্বারা নানা উপলক্ষে গৃহীত এই ফটোগ্রাফগুলি হইতে একদিক দিয়া আমরা যেরূপ তাঁহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সম্যক পরিচয় পাই অন্যদিক দিয়া আবার সেইরূপ এইগুলির মধ্য দিয়া আমরা আমাদের চক্ষের সম্মুখে সমসাময়িক ঘটনাগুলিরই পুনরাবৃত্তি দেখিতে পাই। শুধু তাহাই নহে, অনেক ফটোর মধ্য দিয়া আমরা কোনো কোনো ক্যামেরা শিল্পীর কল্পনা ও কর্মকুশলতার পরিচয় পাই।

প্রদর্শনীটি তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়—সংবাদবৈচিত্র্য, বিশেষ বিষয়বস্তু (Feature) ও ক্রীড়াকৌতুক। প্রকৃত-পক্ষে সংবাদবিভাগের বৈচিত্র্য দেখিয়া সত্যই বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। কারণ পুরাতন হইলেও এই বিভাগের চিত্র-গুলির মধ্য দিয়া সত্যই যেন নূতনত্বের

এক পাঞ্জাবী পরিবারের মধ্যে ড্যানি ক্যে
মিসেস ভিরাওয়ালা

ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যথা—"গৃহে প্রত্যাবর্তন" (ভি গণপতি—ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, মাদ্রাজ), "এক্সপোজার" (স্ট্যানলি ফার্ডিনাণ্ডস—ইণ্ডিয়ান এক্সপ্রেস, বোম্বাই), "ইন আন্‌কন্‌ভেন্‌শ্যানাল মুড" (তারক দাস—অমৃতবাজার পত্রিকা, কলিকাতা) ও 'ঝড়ের পূর্বে' (অজিত সোম—হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড, কলিকাতা)।

বিশেষ বিষয়বস্তু বিভাগে মৌলিক চিন্তাধারা ও উৎকৃষ্ট নমুনার পরিচয় পাওয়া যায় বটে তবে দুঃখের বিষয় তাহার সংখ্যা অতি অল্প। তাহার উপর, অধিকাংশ ফটোর মধ্যেই নূতনত্বের কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। তথাপি দৃষ্টিভঙ্গী ও কর্মকুশলতার জন্য যে কয়খানি চিত্র চোখে পড়ে তাহাদের মধ্যে ক্ষীরোদ রায়, প্রীতি চক্রবর্তী ও অজিত সোম গৃহীত কয়েকটি ফটোর উল্লেখ করা যায়।

সকলেই জানেন যে অন্যান্য উপলক্ষ অপেক্ষা ক্রীড়া-কৌতুক ক্ষেত্রে ফটোগ্রাফারকে অধিক পরিমাণ সজাগ থাকিতে হয়। বাস্তবিকপক্ষে ক্রীকেট ফুটবল অথবা কুস্তি মুষ্টিযুদ্ধ—প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তাঁহাকে প্রতিটি মুহূর্ত ক্যামেরা হস্তে উদ্‌গ্রীব হইয়া অপেক্ষা করিতে হয়। এবং যিনি বিশিষ্ট কোনো দৃশ্য সুকৌশলে ক্যামেরায় তুলিয়া লইতে পারেন তিনিই সবিশেষ প্রশংসা লাভ করেন।

[স]ন্ধান মিলে। এই বিভাগটি প্রদক্ষিণ [ক]রিলে মনে হয় যেন একের পর এক একটি ঘটনা পুনরায় চক্ষের সম্মুখে ঘটিয়া [য]াইতেছে। সফররত প্রধানমন্ত্রী মোটরের [পা]দস্থলে দণ্ডায়মান থাকিয়া দুই পার্শ্বস্থিত জনতার নিকট হইতে শ্রদ্ধা ও [অ]ভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন, বিদেশ হইতে [আ]গত কোনও বিশিষ্ট প্রতিনিধিদল [ম]হাত্মা গান্ধীর সমাধির উপর পুষ্পাঞ্জলি [অ]র্পণ করিয়া শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতেছেন, [আ]ইনভঙ্গকারী জনতার উপর পুলিস [য]ষ্টিহস্তে আক্রমণ করিতেছে, পাকি[স্ত]ানের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ্ আলীকে [বি]রাট জনতা সম্বর্ধনা জানাইতেছে অথবা [ড্য]ানি ক্যে অপরিচিত পাঞ্জাবী পরিবারের মধ্যে একান্তভাবে মিশিয়া গিয়া নিতান্ত অনভ্যস্ত হস্তে এদেশের ঢোলক বাজাইতেছেন এক কথায় নানা বিষয়ের নানাচিত্র এই বিভাগের মধ্যে একত্রিত হইয়া সমগ্র পৃথিবীর সমসাময়িক ঘটনাগুলিকে যেন একটি অচ্ছেদ্য বন্ধনে গ্রথিত করিয়া দিয়াছে।

এই বিভাগের ফটোগুলি যাঁহারা তুলিয়াছেন তাঁহাদের অধিকাংশই ভারতের নানা সংবাদপত্রের সহিত সংশ্লিষ্ট, সুতরাং তাঁহারা যে অতিশয় দক্ষতার সহিত ক্যামেরার সদ্ব্যবহার করিয়াছেন সন্দেহ নাই—তথাপি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী ও যথার্থ মুহূর্তে চিত্রগ্রহণ করিবার ফলে কয়েকটি ফটোগ্রাফী বিশেষ-

চীন শিল্প ও কারুকলা

বিভিন্ন দেশের সহিত সাংস্কৃতিক সম্পর্ক দৃঢ়তর করিবার জন্য চীনবাসীদের একটি সমিতি আছে। সেই সমিতি ও নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতির উদ্যোগে দিল্লীতে চীন শিল্প ও কারুকলা প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান হয়। এই প্রদর্শনী অ্যাকাডেমী অব ফাইন আর্টস-এর উদ্যোগে ৬ই মার্চ হইতে কলিকাতার যাদুঘরে উন্মুক্ত হইতেছে।

একাধিক কারণে এই প্রদর্শনীটি উল্লেখযোগ্য। প্রথমত সাম্প্রতিককালে এত বিরাট ও অভিনব কারুকার্যখচিত বিভিন্ন দ্রষ্টব্য বস্তুর একত্র সমাবেশ ইতিপূর্বে দেখা যায় নাই। দ্বিতীয়ত বর্তমানে যতগুলি প্রদর্শনী দিল্লী শহরে অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে তাহাদের মধ্যে

পুতুল নাচ : চীনা কারুকার্য প্রদর্শনী

কোনোটিই এত জনপ্রিয় হয় নাই। কারণ প্রতিদিন ন্যূনপক্ষে দুই হাজার দর্শক এই প্রদর্শনীতে পদার্পণ করিয়াছেন— এমন কি অনেকে একাধিকবারও আসিয়াছেন, তৃতীয়ত, প্রাচীনকাল হইতে চীন ও ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের ফলে সকলেই এই প্রদর্শনীটিকে যেন একটি বিশেষ আত্মীয়তার মধ্য দিয়া গ্রহণ করেন।

চীন দেশের কারুকার্য প্রাচীনকাল হইতেই সুপরিচিত। জন্মভূমির প্রতি অপরিসীম মমতার জন্য চীনবাসী নানা মৌলিক শিল্প ও কারুকার্যের উদ্ভাবন করেন ও সেই উদ্ভাবনশক্তি নানা মাধ্যমের ভিতর দিয়া প্রকাশ পায়। চীন-দেশের কারুকার্যের মধ্যে মৃৎ, পোর-সিলিন, রেশম ও সূচীশিল্প এবং প্রস্তর কাষ্ঠ ও গজদন্ত খোদাইশিল্প বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রদর্শনীটি অতি সুচারুভাবে সজ্জিত করা হয় ও বিভিন্ন ভাগে ভাগ করিয়া চারিটি গ্যালারীতে দ্রষ্টব্য বস্তুগুলি সুন্দরভাবে রাখা হয়—যথা (১) মৃৎ ও পোর্সিলিন শিল্প (২) রেশম শিল্প (৩) সূচি শিল্প (৪) বস্ত্রমুদ্রণ শিল্প (৫) কারপেট (৬) গালার কারুকার্য (৭) ব[illegible] ও তালপাতার সূক্ষ্ম কারুকার্য (৮) প্রস্তর, কাষ্ঠ ও গজদন্তের মূর্তি খোদাইশিল্প এবং (৯) ধাতব কারুকা[illegible]
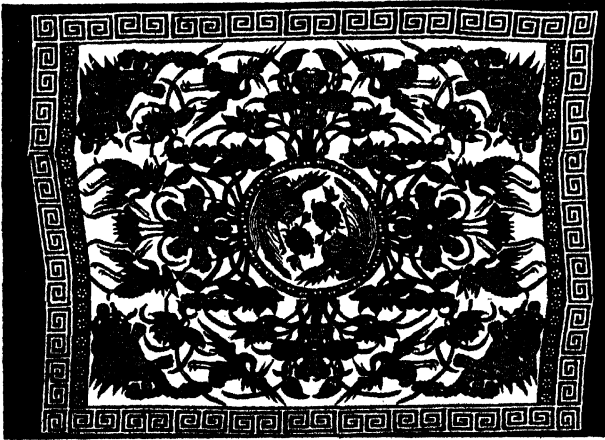
প্রায় চারি হাজার বৎসর পূর্বে চী[illegible] দেশে সর্বপ্রথম রঙীণ মৃৎশিল্পের পরি[illegible] পাওয়া যায়। পরে দেশের জীবনপদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন রীতি ও আকারের প্রচলন হয়। প্রদর্শনীতে রক্ষিত কিয়াংসু, কোয়াং-টাং, আনউই, হুনান, সাং টুং ও কাংসি প্রদেশে তৈয়ারী প্লেট, জার, ফুলদানী প্রভৃতি দেখিলে চীন-বাসীর উদ্ভাবনী শক্তি ও কারুকার্য নিপুণতা দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। খৃষ্টপূর্ব দুইশত বৎসর পূর্বেই চীন দেশের মৃৎশিল্প বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে গড়িয়া উঠে ও পোরসিলিন শিল্পের আবির্ভাব হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগেই অত্যধিক উজ্জ্বল সাদা ও নীল পোর-সিলিন দেখা যায় ও ক্রমশ চীনদেশের মৃৎ ও পোর্সিলিন শিল্প নিজ বৈশিষ্ট্যে গুণে সমগ্র বিশ্ব দরবারে আপন স্থান অধিকার করে। মধ্য চীনে অবস্থিত কিয়াংসি প্রদেশের চিংটেচেন শহর পোর-সিলিন শিল্পের জন্য সুপরিচিত, এবং মিং রাজ্যকাল হইতেই এই শহরটির খ্যাতি চতুর্দিকেই ছড়াইয়া পড়ে। পোর-সিলিনের যে কয়েকটি নমুনা ছিল তাহা-দের মধ্যে প্রত্যেকটিই উজ্জ্বলতা, বর্ণ চাতুর্য ও সমাপ্তি-সম্পূর্ণতার (fini-shing touch) দিক দিয়া অপূর্ব।

শোনা যায় চীনদেশেই সর্বপ্রথ[illegible] রেশমশিল্পের উদ্ভব হয়। প্রথম শতাব্দী হইতেই এখানে ব্রোকেড্ বুনন ও না[illegible] পরিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়। হা[illegible] চো, সুচো, নানকিং ও চেংটু প্রদেশগুলি ব্রোকেডের জন্য বিখ্যাত। রেশম শিল্পে বহু নমুনা প্রদর্শনীতে ছিল এবং না[illegible] বর্ণ ও জটিল কারুকার্যের জ[illegible] প্রত্যেকটিই চোখে পড়ে। বিশেষ করি[illegible] বুননের মধ্য দিয়া যে কয়খানি [illegible] অঙ্কিত ছিল তাহার তুলনা খুব ক[illegible]

বস্ত্রমুদ্রণ শিল্পের নমুনা

পক্ষীদম্পতি (মৃৎশিল্প)

মনে। চীন দেশের সূচিশিল্পও সর্বজন-বন্দিত। প্রকৃতপক্ষে সপ্তম শতাব্দী হইতেই চীনদেশে সূচিশিল্প প্রচলন হয়। পরে এই শিল্প দুই দিক দিয়া আত্মপ্রকাশ করে—প্রথম বালিশের ওয়াড়, বিছানার চাদর ইত্যাদির উপর নানা চিক্কণ কারুকার্য দেখা যায় ও দ্বিতীয়, নানা সুন্দর চিত্র ও প্যাটার্ন এহেন সূচিশিল্পের মধ্য দিয়া প্রকাশিত হয়। হুনান প্রদেশের চাংসা ও কিয়াংসু প্রদেশের সুচো সূচিশিল্পের প্রধান কেন্দ্র। সাদা ও রঙীন সূচিশিল্পের বহু নমুনাই দেখা যায় এবং প্যাটার্ন ও কারুকার্যের দিক দিয়া প্রত্যেকটিই সুরুচির পরিচায়ক।

তবে কাষ্ঠ, প্রস্তর ও গজদন্ত খোদাইয়ের যে নিদর্শনগুলি প্রদর্শনীতে ছিল তাহা সত্যই অপরূপ। সকলেই জানেন যে, চীনবাসীর হাতের কাজ অতীব সুন্দর—এমন কি অনেকে এহেন কার্যের পরিচয়ও হয়ত পাইয়াছেন। কিন্তু কারুকার্য যে কত সূক্ষ্ম ও বিচিত্র হইতে পারে তাহা নমুনাগুলি না দেখিলে বুঝা সম্ভব নহে। খোদাইয়ের মধ্য দিয়া একটি কাষ্ঠখণ্ডের উপর একটি প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনা করা হইয়াছে, তাহার মধ্যে একদিকে যেমন বৃক্ষপত্ররাজির প্রতিটি শিরা পর্যন্ত স্বাভাবিক আকারে ফুটিয়া উঠিয়াছে অন্যদিকে তেমন বিভিন্ন রেখা বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়া এক একটি শৈলখণ্ডের বিভিন্ন আকার ও গভীরতা অতি প্রাঞ্জলভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। গজদন্ত কারুকার্যগুলিও অপূর্ব। এইগুলির মধ্য দিয়া চীনবাসীর অমানুষিক ধৈর্য, পরিশ্রম ও সূক্ষ্ম কারুকার্য নিপুণতার যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা সমগ্র পৃথিবীতে দুর্লভ বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। "স্যালাড পাতা" ও বিশেষ করিয়া "নৌকা"-র মধ্যে যে অতি সূক্ষ্ম অথচ জটিল জালিকার্যের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা অতুলনীয়। প্রস্তরখোদাই সম্বন্ধেও একই কথা খাটে। বাস্তবিকপক্ষে কেহ পরিচয় না দিলে বিচিত্র কারুকার্যশোভিত ও নানা লতা পাতাসজ্জিত বিভিন্ন ফুলদানী বা অন্যান্য নমুনাগুলি দেখিলে বুঝা যায় না যে এগুলি প্রস্তর মাধ্যমে তৈয়ারী। অন্যান্য বিভাগের নমুনাগুলির কথা না হয় ছাড়িয়াই দিলাম—মাত্র মৃৎশিল্প, প্রস্তর, কাষ্ঠ ও গজদন্ত খোদাইয়ের নিদর্শনগুলি দেখিলেই চীনজাতির অসামান্য রুচিবোধ, ধৈর্য, পরিশ্রম ও কারুকুশলতার সম্যক পরিচয় পাওয়া যায়।

এই বিশিষ্ট প্রদর্শনীটি একবার নহে, দুইবার নহে বহুবার দেখিয়াছি এবং যতবারই দেখিয়াছি ততবারই চীনজাতির উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিয়াছি। প্রদর্শনীতে শুধু দেখিবার বস্তুই নাই, জানিবার ও শিখিবার বহু শিল্প নমুনা আছে। সর্বসাধারণের নিকট অনুরোধ তাঁহারা যেন সপরিবারে এই প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করেন—কারণ, ইহার মধ্য হইতে তাঁহারা যে কেবলমাত্র আনন্দই আহরণ করিবেন তাহা নহে, উপরন্তু তাঁহারা একটি বিশিষ্ট জাতির বিভিন্ন শিল্পধারার পরিচয় পাইবেন।

চিত্রপ্রিয়

রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্রপ্রসাদ লোকসভার উদ্বোধনী ভাষণে স্বদেশ এবং পররাষ্ট্র সম্বন্ধে ভারতের নীতির সাফল্যের কথা উল্লেখ করেন।—কিন্তু অনেকেই সবিনয়ে তাঁর এই উক্তির প্রতিবাদ করছেন। তাঁরা বলেন যে, বাইরে কোঁচার পত্তনের তারিফ করলেও, ভেতরের ছুঁচোর কেত্তন যেন কেমন বেসুরো লাগছে"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধীদলের জনৈক সদস্য মন্তব্য করিয়াছেন যে, মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় প্রকাশ্যে গণতন্ত্রের রীতিনীতি লঙ্ঘন করিতেছেন।—"অপ্রকাশ্যে গণতন্ত্রের রীতিনীতি লঙ্ঘন করার কায়দা ডাঃ রায় এখনো সড়গড় করতে পারেন নি বলেই বোধহয় ধরা পড়ে গেলেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

রেলওয়ের বাজেট প্রসঙ্গে আমরা খবর পাইলাম যে, দেড়শত মাইল পর্যন্ত ভ্রমণের জন্য যাত্রীদের টিকিটের মূল্যে বৃদ্ধি করা হইবে।—"বিনা টিকিটে ভ্রমণের যাত্রীদের সংখ্যা এই অনুপাতে কতটা বৃদ্ধি হবে সে খবর অবশ্য আমরা এখনো পাইনি"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

কংগ্রেসের জন্য আদায়ী পঞ্চাশ হাজার টাকা আসাম প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির হাতে প্রত্যর্পণ করিবার সময়
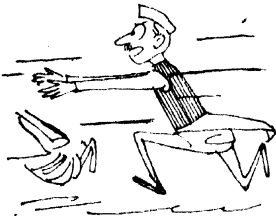
কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুক্ত ধেবর রহস্য করিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে, প্রকাশ্য দিবালোকে তাঁহার টাকা ছিনাইয়া লওয়া হইল।—"তিনি অবশ্য রহস্যই করলেন,

কিন্তু সর্বসাধারণের কল্যাণে আদায়ী চাঁদা জমা দেওয়ার সময় কারু কারু মনে যে কথাটা জাগে সেটা ঠিক রহস্য নয়" !!

* * *

চিকিৎসক সম্মেলনে হাতুড়ে চিকিৎসা নিবারণের জন্য একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। বিশুখুড়ো বলিলেন,—"প্রস্তাব উত্তম সন্দেহ নেই, কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসকের ফিজ সংগ্রহ

করতে গিয়ে অন্য রোগ সারলেও অনেকে মাথার রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েন। সেই অবস্থায় তাদের একমাত্র গতি হাতুড়ে, নয়তো মানৎ-চিকিৎসা। এ সমস্যার একটা সমাধান যদি চিকিৎসকেরা করে দিতে পারতেন তাহলে একটা কাজের কাজ হতো"।

* * *

সম্প্রতি অনুষ্ঠিত চিকিৎসক সম্মেলনের সভাপতি মহাশয় মন্তব্য করিয়াছেন যে, আমাদের দেশে প্রতি দেড় হাজার অধিবাসীর মধ্যে চিকিৎসকের সংখ্যা মাত্র একজন।—"কিন্তু গোপাল ভাঁড়ের পরিসংখ্যান ছিল অন্যরূপ, তিনি, বলতেন রোগীর চেয়ে চিকিৎসকের সংখ্যাই বেশি। তাঁর এই কথার প্রমাণ তিনি হাতেনাতেই দিয়েছিলেন মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে।

* * *

নবদ্বীপের খবরের পর জানা গেল কানপুরে নাকি একটি নিমগাছ হইতে অনবরত মধু ঝরিয়া পড়িতেছে।—"এবারে আরো কয়েকটি নিমগাছ এবং এই সঙ্গে কিছু পরিমাণ দুধের গাছ উৎপন্ন না হওয়া পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা কাগজেপত্রেই থেকে যাবে। শ্রীযুক্ত নন্দ কথাটা ভেবে দেখবেন"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

বিহারের অর্থমন্ত্রী শ্রীযুক্ত কৃষ্ণবল্লভ সহায় পশ্চিমবঙ্গের সংবাদপত্র এবং এই সঙ্গে তার অধিবাসীদের বিহারের বিরুদ্ধে সমালোচনা এবং বিদ্বেষ প্রচারের তীব্র নিন্দা করিয়াছেন।—"বিহারের তরুণী কবির 'জারা হঁস্‌লেও' কবিতা পড়ে আমরা হাসতে পারিনি, এবারে অর্থমন্ত্রী মশাই সত্যিই হাসালেন। ছুঁচের বিরুদ্ধে চালুনির অভিযোগটি সত্যিই বেশ রসোত্তীর্ণ হয়েছে" !!

* * *

বার্মিংহামে বাস্‌কর্মীরা সম্প্রতি ধর্মঘট করিয়াছেন এবং তাহাদিগকে অশ্বেতকায়দের সঙ্গে কাজ করিতে বাধ্য করা হইলে ভবিষ্যতে আরো ধর্মঘট করিবেন বলিয়া শাসাইয়াছেন-

"আফ্রিকার হুক্কা হুয়া শুনে বিলাতে নীলবর্ণ শৃগাল যে তারস্বরে হুক্কাহুয়া করবে এ আর বিচিত্র কী"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

ঐতিহাসিক কাহিনী

অবিস্মরণীয় মুহূর্ত—শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং লিঃ, ৯৩, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা—৭। দাম ৩৷৷০ আনা।

"সমগ্র বিশ্বের ইতিহাসে দেখেছি, এক একটি অপরূপ মুহূর্ত, যে-মুহূর্তের মধ্যে একটা যুগের স্বপ্ন সত্য হয়ে উঠেছে, একজন মানুষের মধ্য দিয়ে যে মুহূর্তে লক্ষ লক্ষ মানুষের মূক বাসনা সার্থক হয়ে উঠেছে, যে মুহূর্তে সভ্যতার রথ একদিনে এক শতাব্দীর পথ পেরিয়ে গিয়েছে। সমস্ত সভ্যতার ইতিহাস হল প্রাণের সূত্রে গাঁথা এইসব দিব্য মুহূর্তের মালা। সেইসব অবিস্মরণীয় মুহূর্তের ছোট্ট বাতায়নের ভেতর দিয়ে আজকের পৃথিবীর বিচিত্র সাধনা-গুলিকে দেখতে চেষ্টা করেছি।"

'অবিস্মরণীয় মুহূর্ত' গ্রন্থটির বক্তব্য বিষয় সম্পর্কে লেখকের অভিমত উক্ত অংশে প্রকৃষ্টরূপে ব্যক্ত হইয়াছে। মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে কতকগুলি "দিব্য মুহূর্তে"র আবির্ভাব ঘটিয়াছে বৈকি, অন্তত সেই মুহূর্তগুলিতে এক একটি সুমহান ভাব একটি বা দুইটি মানুষের জীবনের মধ্য দিয়া উদ্ভাসিত হইয়াছে। এই মুহূর্তগুলি দেশ কাল ঐতিহ্য সভ্যতার অগ্রগতি প্রভৃতির কেন্দ্রীভূত দর্পণস্বরূপ। সাধারণের পক্ষে এমন দিব্যমুহূর্তের খোঁজ পাওয়া কঠিন। অবিস্মরণীয় মুহূর্ত সে অভাব পূর্ণ করিবে।

নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ প্রবীণ লেখক। তাঁহার নিজস্ব ভাষাশৈলী, আবেগসুন্দর বাক্যসজ্জা এবং গ্রন্থটির ভাব-পরিকল্পনা—বাঙালী পাঠককে যথেষ্ট আনন্দ দিবে। 'একজন সত্যিকারের রাজা' 'দক্ষিণ মেরুতে একদা' 'একটি পেনীর জন্য', 'একলা চল রে' প্রভৃতি আখ্যায়িকা-গুলি চমৎকার।

বইটির অঙ্গসজ্জা, মুদ্রণ পারিপাট্য সুন্দর। ৩৫৯।৫৪

রচনা সংকলন

বঙ্কিম বাণী—শ্রীবিনয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য সংকলিত। প্রকাশক—বিবুলি ও পোল কোম্পানী। ১২, কালিদাস সিংহ লেন, কলিকাতা—৯। মূল্য—৪৷৷০।

এ যুগের পাঠকদের কাছে বঙ্কিমচন্দ্রের সুবিপুল সাহিত্যকীর্তির ঘনিষ্ঠ পরিচয়লাভ সম্ভব নয়। বঙ্কিম-রচনাবলী পাঠের আগ্রহই আজ কমে এসেছে, বাংলা সাহিত্যের ক্রমোন্নতি ও দ্রুত অগ্রগতিই এর অন্যতম কারণ। বাংলা সাহিত্যের যাঁরা প্রথম ও প্রধান স্রষ্টা বঙ্কিম-চন্দ্র তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সাহিত্যের মধ্য দিয়ে জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে কি বলতে চেয়েছেন তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় রয়েছে আলোচ্য সংকলন গ্রন্থে। সুতরাং এ যুগে সাহিত্যের প্রতি যাঁর কিছুমাত্র উৎসাহ আছে তাঁর পক্ষে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাবলী আদ্যোপান্ত পড়া সম্ভব না হলেও এই গ্রন্থের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারার খানিকটা পরিচয় পাবেন। গ্রন্থকার বহু পরিশ্রম স্বীকার করে চৌদ্দটি উপন্যাস ও সমসংখ্যক রচনাবলী থেকে মণি-মুক্তার মত বাণী আহরণ করেছেন এবং তা বিভিন্ন বিষয়-শিরোনামে বর্ণানুক্রমে সাজিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সব উক্তিই যে বাণীর পর্যায়ে উঠেছে তা বলা যায় না। তবু গ্রন্থখানি কাছে থাকলে আমাদের জীবনের নানা প্রশ্ন ও সমস্যা সম্বন্ধে বঙ্কিম-

চন্দ্রের মতামতগুলি যাচাই করে নেওয়া যায় এবং বঙ্কিমচন্দ্রের যুগে বাঙালী জীবনের মূল্যবোধ কি ছিল, আজকের যুগে তা থেকে কতদূরে আমরা সরে এসেছি, সেটুকুও বিচার করবার সুযোগ ঘটে। বইখানি আকারে ডবল ক্রাউন, পৃষ্ঠা সংখ্যা আড়াই শ'। সেই তুলনায় সাড়ে চার টাকা দাম অত্যন্ত বেশী বলেই মনে হয়। ৫৩৮।৫৪

অনুবাদ সাহিত্য

মুক্তির আহ্বানে। ভিক্টর ক্রেভশেঙকো। অনুবাদঃ অমলেন্দু দাশগুপ্ত, প্রাচী প্রকাশন। ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা—১। দাম—১৷৷০ আনা।

রাশিয়ান উচ্চপদস্থ কমিউনিস্ট কর্মচারী ভিক্টর ক্রেভশেঙকো আমেরিকায় নিজ কাজে বহাল থাকবার সময় সোভিয়েট একনায়কত্বের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠেন এবং সোভিয়েট মতবাদগুলি সম্পর্কে ঘোরতর সন্দিগ্ধ হয়ে নিজ কর্মভার থেকে পদত্যাগ করে আত্মগোপন করেন। তিনি বলেছেন, 'দীর্ঘ দিনব্যাপী কমিউনিস্ট আমলাতন্ত্রের সঙ্গে জড়িত কোন উচ্চপদস্থ কমিউনিস্টের পক্ষে এরকম হঠকারিতা সম্ভব নয়। আমার অন্তরের অন্তঃস্তলে কোথায়ও এর উৎস রয়েছে; ধীরে ধীরে সবার অজ্ঞাতে তা বেড়ে উঠেছে।'

একনায়কতন্ত্রী রাজত্বের কঠিন নাগপাশ থেকে মুক্তি পাবার আশায় ভিক্টর ক্রেভশেঙকো বিদেশে আত্মগোপন করে তাঁর অভিজ্ঞতা-জনিত বিবরণী আত্মজীবনীর মত করে লেখেন। 'I Choose Freedom' এই নামে বইটি প্রকাশিত হয়। বইটি প্রকাশিত হবার পর ভয়ানক চাঞ্চল্য পড়ে যায়। ক্রেভশেঙকোকে দেশদ্রোহী, গুপ্তচর বলে অভিযুক্ত করে এক পক্ষ। এই বই নিয়ে মামলা মোকদ্দমাও ঘটে গেছে।

বইখানির মধ্যে অতিরঞ্জন কিছু আছে কি-না তা যেমন জোর করে বলা যায় না, তেমনি এটিকে সম্পূর্ণ মিথ্যা বিবরণী এমন মনে করবারও কারণ নেই। বরং পড়তে পড়তে মনে হয়, হয়ত, এটিই প্রকৃত সোভিয়েট জীবন ও রাজনীতির চিত্র! মুক্তির আহ্বানে এক নিঃশ্বাসে পড়ার মতন বই। যাঁরা ওদেশের অভ্যন্তর মতিগতি সম্বন্ধে উৎসাহী এ-বইটি তাঁদের পড়া প্রয়োজন। বাংলায় অনুবাদ করেছেন অমলেন্দু দাশগুপ্ত। সুন্দর হয়েছে সে অনুবাদ। (৮৬১।৫৪)

দুই বোন—আলেক্সি তলস্তয়। অনুবাদ—দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিঃ, কলিকাতা—১২। দাম ৫৲ টাকা।

আলেক্সি টলস্টয় যদিও এখন আর ইহলোকে নেই তথাপি রুশ সাহিত্যে যে নতুন স্রোত দেখা দিয়েছে দেশের নতুন সমাজ ব্যবস্থার তালে তাল মিলিয়ে, সাহিত্যের সেই আধুনিক যুগের একজন বিশিষ্ট, শক্তিশালী লেখক। 'অগ্নিপরীক্ষা' তাঁর এক বিরাট গ্রন্থ। তিন খণ্ডে এই গ্রন্থ সমাপ্ত। প্রথম খণ্ড 'দুই বোন'। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে ফেব্রুয়ারী বিপ্লব পর্যন্ত সময় এ খণ্ডের ঘটনাকাল। জারতন্ত্রী রাশিয়ার বুদ্ধিজীবিদের বিভ্রান্তি ও প্রশ্নকে মুখ্যত এই খণ্ডে গ্রহণ করা হয়েছে। বলা বাহুল্য, আধুনিক রুশ সাহিত্যের যাঁরা অনুরাগী তাঁরা গ্রন্থখানি আগ্রহভরেই পড়বেন। আর যাঁদের মনে প্রথম থেকেই এ যুগের সোভিয়েট সাহিত্য সম্পর্কে একটা সন্দেহ আছে, যাঁরা সাহিত্য বিষয়ে অন্য এক বিশেষ আদর্শে বিশ্বাসী তাঁরা গ্রন্থখানি অনেক ধৈর্য ধরে পড়ার পরও হয়ত আশানুরূপ তৃপ্ত হতে পারবেন না। তবে একথা বলা যায়, শক্তিমান লেখকের লেখা পড়ায় কিছুটা আনন্দ আছে বৈকি।

দুই বোনের অনুবাদ বড় আড়ষ্ট হয়েছে বলে বর্তমান সমালোচকের ধারণা। চলতি ভাষায় আরও সাবলীল হতে পারত এই অনুবাদ। একটা স্বচ্ছন্দ গতি পাওয়া যায় না বলে পড়তে পড়তে ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। গ্রন্থের ছাপা, বাঁধাই চমৎকার। (২৯।৫৫)

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

হরিপদ মাস্টার—সুনীল দত্ত।

ইউরোপের অগ্নিকোণে—বিমল ঘো (মৌমাছি)।

মরিয়ম—গোলাম কুদ্দুস।

ভারত শাসনতন্ত্র সার—অভিজ্ঞ শিক্ষক

নতুন নায়িকা—শান্তিরঞ্জন বন্দোপাধ্যায়

দাস্য মধুর—শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

দর্শনের ইতিবৃত্ত (২য় পর্ব)—মনোরঞ্জ রায়।

মুখর লণ্ডন—শ্রীসুধীরঞ্জন মুখোপাধ্যায়

—শৌভিক—

পুতুল নাচে "রামায়ণ"

ঠিক পুতুলকে নাচানো নয়, মানুষেরই পুতুল সেজে পুতুলের আড়ষ্টতার মধ্যে নাচের ছন্দ যোগ করে 'রামায়ণ' পালা দেখানোর যে একটি অভিনব শিল্পসৃষ্টি করে গিয়েছেন স্বর্গত শান্তি বর্ধন এ হচ্ছে সেইটিই। এ সপ্তাহে ৫ই মার্চ থেকে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে এই পুতুলনাচ প্রদর্শিত হবে। মাস কয়েক পূর্বে এই বিষয় নিয়ে একটি বিশেষ প্রবন্ধ দেশে প্রকাশিত হয়েছিল। ভারতের নৃত্য-বাদ্য ঐতিহ্যকে একেবারে নতুনভাবে পরিবেশন করার এক যুগান্তকারী প্রচেষ্টা এই 'রামায়ণ' পালাটি। কলকাতায় পালাটির প্রদর্শন অবশ্য এই প্রথম হবে, তবে গত দু'বছর ধরে বম্বে, দিল্লী এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে পালাটি দেখানো হয় এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু, ডাঃ রাধাকৃষ্ণণ প্রমুখ মন্ত্রীবৃন্দ যেমন, তেমনি সকলস্থানের বিশিষ্ট শিল্পী, শিল্পরসিক ও সাংবাদিকবৃন্দ এতো উচ্ছ্বসিতভাবে এর প্রশংসা করেছেন যে তার ঢেউ সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছে। এ পর্যন্ত দেড় শতাধিক বার প্রদর্শনী হয়েছে এবং যে সকল স্থানে দেখানোও হয়নি সেসব জায়গাতেও এই পরম শিল্পকীর্তিটি সম্পর্কে রসিক মহলে প্রভূত কৌতূহল দেখা যায়। শান্তি বর্ধনের এই সৃষ্টি-কাহিনী প্রায় কিংবদন্তীর মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসারের হিসেবে বাতিল হয়ে যাওয়া একজন পঙ্গু মানুষের যে অদম্য উৎসাহ ও শিল্পচেতনা এই পালাটি সৃষ্টির সঙ্গে জড়িত রয়েছে তার মধ্যে একটি অসাধারণ সৃজনী-প্রতিভার আধারে রয়েছে ভারতীয় ঐতিহ্যের মহান রূপকে সামনে তুলে ধরার এক অভীপ্সা। আর সেটা যে কতোটা দুর্বার ছিল তা উপলব্ধি করা যায় যখন শোনা যায় যে এই 'রামায়ণ' পরিকল্পনা ও রূপায়নকালে শান্তি বর্ধন ছিলেন রুগ্ন, পঙ্গু। যক্ষ্মায় আক্রান্ত হয়ে দুটি বৎসর স্বাস্থ্যনিবাসে কাটিয়ে শান্তি বর্ধন ফিরে আসেন উত্থানশক্তি রহিত অবস্থা নিয়ে। সেই অবস্থায় তিনি প্রতিষ্ঠিত করেন লিটল ব্যালে গ্রুপ। নাচে উৎসাহী ছেলেমেয়েদের ছোট একটি দল; আর্থিক সম্বল বলতে নিঃস্বতা। কিন্তু শিল্প সাধনায় তাদের প্রাণে সাড়ার অভাব ছিল না। আশ্রমিকদের মতো তারা স্বাবলম্বী হবার চেষ্টা করেছে; নিজেরাই নিজেদের যাবতীয় কাজ করে নিয়েছে, তা সে রান্না-খাওয়ার ব্যবস্থার দিক থেকে যেমন, তেমনি নাচের সাজ পোশাক মুখোস তৈরীর দিক থেকেও। আবার পালার অনুষ্ঠানেও যেমন তেমনি তার যাবতীয় ব্যবস্থাপনায়ও। একটা নতুন আদর্শে লিটল ব্যালে গ্রুপ উদ্দীপিত হয়ে ওঠে। 'রামায়ণ'-এর প্রথম প্রদর্শনী রসিক মহলকে চমকিত ও চমৎকৃত করে দেয়; একটা

আলোড়নও এনে দেয় সঙ্গে সঙ্গেই। প্রথম সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে শান্তি বর্ধন পরের পালাটিতেও ভারতীয় ঐতিহ্যকে আর একভাবে পরিবেশনে তৎপর হয়ে ওঠেন। এবার তিনি পরিকল্পনা করেন পঞ্চতন্ত্রের নৃত্যনাট্য রূপ, রূপদানও প্রায় তিনি সম্পূর্ণই করে এনেছিলেন; কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার প্রকাশ্য পরিবেশন তিনি দেখে যেতে পারেননি, তার আগেই তিনি কালের ডাকে চলে যান। লিটল ব্যালে গ্রুপ আজ তার আদর্শকে বয়ে নিয়ে চলেছে; শান্তি বর্ধনের মহান শিল্প প্রতিভাকে বাঁচিয়ে রাখতে তাঁরা দৃঢ়সংকল্প। কলকাতায় লিটল ব্যালে গ্রুপের এই হবে প্রথম আগমন। প্রধানত 'রামায়ণ'ই পরিবেশিত হবে, তবে সুযোগ ঘটলে 'পঞ্চতন্ত্র'র প্রদর্শনীও অনুষ্ঠিত হবার সম্ভাবনা আছে। কলকাতার শিল্পরসিকরা ভারতীয় নৃত্য-সঙ্গীত ঐতিহ্যের একটি নতুনতর প্রয়োগের সঙ্গে পরিচয় লাভের সুযোগ পাবেন।

রবীন্দ্রনাথের চিত্রজীবনী

বম্বে থেকে খবর বেরিয়েছে প্রযোজক-পরিচালক বিমল রায় এই বছরেই রবীন্দ্রনাথের জীবনী অবলম্বনে একখানি ছবি তোলায় উদ্যোগী হয়েছেন। খবরটি প্রকাশিত হয় বিমল রায় ভারতীয় চলচ্চিত্র প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাশিয়া ভ্রমণ করে আসার প্রায় অব্যবহিত পরেই। এই সম্পর্কে মোটামুটি যা জানা গিয়েছে তা হচ্ছে এই যে, এই ছবিখানি তোলা হবে রুশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে একটা যৌথ প্রচেষ্টারূপে যাতে যাবতীয় কাঁচা ফিল্ম এবং রঙীণ ছবি তোলার সরঞ্জামাদি ও প্রসাধনের ভার থাকবে রাশিয়ার ওপরে এবং ছবির জন্য আর যা কিছু কাজ করতে হবে বিমল রায় সংস্থাকে। বলা বাহুল্য, ছবিখানি তোলা হবে ভারতেই। ইতিমধ্যে বিমল রায় লণ্ডনের প্রাক্তন হাই কমিশনার এবং অধুনা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী ভি কে কৃষ্ণমেননের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে তিনি এবিষয়ে আলাপ করবেন জানিয়েছেন। বিদেশের সঙ্গে কোন-রকম যৌথ পরিকল্পনা করতে হলে তার জন্য ভারত গভর্নমেন্টের অনুমোদন দরকার। সুতরাং বিমল রায়ের উদ্যোগকে উৎসাহিত বা অনুমোদিত করার শেষ দায়িত্ব হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী নেহরুর। বলা যায় না, পণ্ডিত নেহরুর কাছে রবীন্দ্র-নাথের জীবনী-চিত্র তোলার অনুমোদন পাওয়া যাবে কিনা, কিন্তু এ উদ্যোগকে কার্যকরী করে তোলার আগে কয়েকটি কথা বলবার আছে।

* * *

প্রথমত রবীন্দ্রনাথ দৈহিক অনুপস্থিত থাকলেও তাঁর প্রত্যক্ষ প্রভাব ও স্পর্শ এমন পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে যে, সকলের অনুভূতি তাতে অভিভূত হয়ে রয়েছে। সে অনুভূতি অতি অল্পেতেই বিপর্যস্ত ও আহত হবার সম্ভাবনা রয়েছে যদি

চিত্ররূপায়নে সামান্য কোন ত্রুটিও ঘটে যায়। লক্ষ লক্ষ লোকের মনে রবীন্দ্রনাথ এমন জীবন্ত হয়ে রয়েছেন যে, উপন্যাস বা নাটকের অপ্রাকৃতিক আবেগের ঢেউয়ে তাঁর জীবনীর সঙ্গে পরিচিত হওয়াটা তাদের কাছে এক মহা বিড়ম্বনার সামিল বলে প্রতিভাত হবে। এ সম্ভাবনাটা মহাত্মা গান্ধীর প্রস্তাবিত জীবন চিত্র-কাহিনী সম্পর্কেও রয়েছে। তবে এ সমস্ত জীবনী-চিত্র নির্মাণের একটা দিক রয়েছে ভারতের বাইরের দেশসমূহে প্রচার নিয়ে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনীর উপকরণ নিয়ে একটা মহাভারতই রচনা করা যায় যা সম্পূর্ণ ভাবে দেখাতে গেলে খান-কয়েক ছবিতেও কুলোবে না। কাজেই বিমল রায়কে একখানি ছবির মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে দেখাতে গেলে তাঁর জীবনের কোন একটা দিকেরই রূপায়নে নিবদ্ধ হতে হবে। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, সেটা কোন্ দিক?—এবং রাশিয়া যেকালে এছবির প্রতি ঝোঁক দিচ্ছে তখন এমন অনুমান করা বোধহয় অসমীচীন হবে না যে রবীন্দ্রনাথের "রাশিয়ার চিঠি" এছবির অনেকখানি অথবা প্রধান অংশ হয়তো অধিকার করবে। অর্থাৎ, সেক্ষেত্রে ভারতীয় প্রযোজকের সৌজন্যে রাশিয়া প্রাচ্যের দেশসমূহে এবং হয়তো প্রতীচ্যেরও অনেক জায়গায় তার দেশের হয়ে বেশ জোরালো প্রচারকার্য চালাবার সুযোগ পেয়ে যাবে। এটা অনুমানের কথা;

"আজাদ"-এর নায়িকা মীনাকুমারী

হয়তো ছবিখানি একেবারে ভিন্নরকম-ভাবেই পরিকল্পিত হয়েছে। কিন্তু আগে থেকে এসব ধরনের ছবির ক্ষেত্রে সম্ভাব্যতা ও অসম্ভাব্যতাগুলি যেমন মনে হয় প্রকাশ করে দেওয়া দরকার বলেই এই আলোচনাটির অবতারণা করতে হলো।

চলচ্চিত্র সম্পর্কে পণ্ডিত নেহরু

ভারতীয় চিত্র-প্রযোজকদের সেন্সরের বিরুদ্ধে বহুবিধ অভিযোগ ও অনুযোগের একটা মুখের মতো জবাব দিয়েছেন সেদিন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু। দিল্লীতে গত রবিবার চলচ্চিত্র জ্ঞানী-গুণী

ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসকে
গৌরবমণ্ডিত করবে!
৪ঠা মার্চ
সার্থক কাহিনী
রহস্য-রোমাঞ্চের
অপরূপ সমাবেশ
আর
কলা-কৌশলের
সর্বাত্মক কৃতিত্বের
প্রোজ্জ্বল স্বাক্ষর
পক্ষীরাজ ষ্টুডিওর
(কোয়িম্বাটোর)
নিবেদন
দিলীপকুমার · মীনাকুমারী অভিনীত
আজাদ
প্রযোজনা ও পরিচালনাঃ
এস·এম·এস·নাইডু
সঙ্গীতঃ-
সি·রামচন্দ্র
গীতি ও সংলাপ —রাজেন্দ্রকৃষ্ণ
আলোকচিত্র নিয়ন্ত্রণ—শৈলেন বসু
সহভূমিকায়—প্রাণ - বদ্রীপ্রসাদ - রণধীর - শাম্মী - নাজির - অচলা সচদেব - রাজমেহরা - ওমপ্রকাশ প্রভৃতি
প্যারাডাইস - ভারতী - রূপবাণী - অরুণা
বঙ্গবাসী (হাওড়া) - পিকাডিলি (সালকিয়া) - স্বপ্না (চন্দননগর)
সন্তোষ (বেলেঘাটা) - ৫ই মার্চ থেকে—শ্রীলক্ষ্মী (কাঁচরাপাড়া) - শ্রীকৃষ্ণ (জগদ্দল) - চম্পা (ব্যারাকপুর)
সর্বত্রই ২-৩০, ৫-৪৫ ও ৯টায় প্রদর্শনী সুরু হইবে
রাজশ্রী পরিবেশিত
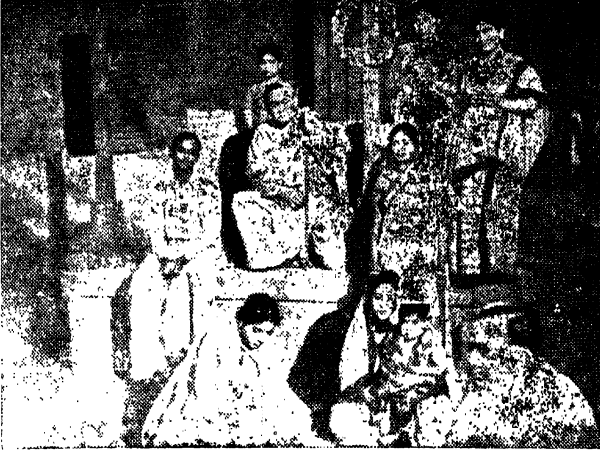
সবিতা পিকচার্সের 'দত্তক' চিত্রে নিঃসন্তান গীতার (সন্ধ্যারাণী) দত্তক-গ্রহণের একটি মর্মস্পর্শী দৃশ্য

সভার উদ্বোধন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী চলচ্চিত্র শিল্পের প্রশংসা করে বলেন, একেবারে ফাঁকা থেকে নিজের উদ্যোগে চলচ্চিত্রশিল্প গড়ে উঠেছে এবং উল্লেখ-যোগ্য উৎকর্ষের ছবিও মাঝে মাঝে প্রস্তুত হয়েছে। আবার কতক ছবির বিরুদ্ধে যে সমালোচনা করা হয় তাও অযৌক্তিক নয়। তিনি বলেন, কতক লোকে অবাধে যা ইচ্ছে তাই করে যাবে রাষ্ট্র তা হতে দিতে পারে না। দৃষ্টান্ত দিয়ে পণ্ডিতজী বলেন, আণবিক বোমা যদি খুব সস্তায় পাওয়া যায় তাহলে সবাইকে কি পকেটে একটা করে আণবিক বোমা নিয়ে ঘুরতে দেওয়া যায়? ব্যক্তিগতভাবে তিনি যে কড়া সেন্সর পছন্দ করেন না সেকথা জানিয়ে পণ্ডিতজী বলেন, কিন্তু যখন এমন একটা শিল্পের কথা ওঠে, জন-সাধারণকে প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করায় যে শিল্পের ক্ষমতা দেশের সমস্ত সংবাদ-পত্র ও সমস্ত গ্রন্থ একজোট হলে যা হয় তার চেয়েও বেশী, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রকে বাধা দেবার জন্যে এগিয়ে আসতেই হয়। সংগীত নৃত্যাদি প্রতিভাকে চেপে দেওয়ায় তিনি বিশ্বাসী নন, কিন্তু তাই বলে কোন সামাজিক দুর্নীতিকে বাড়তে দেওয়া যায় না। যেমন, যুদ্ধের পক্ষে প্রচার চালাতে দেওয়া যায় না। "ভারতে যুদ্ধ-প্রচার হতে দিতে আমি চাই না।" তবে গভর্ন-মেণ্ট কখন কোনখানে বাধা দেবে তার একটা নির্দিষ্ট সীমারেখা টেনে রাখা দরকার; সেটা বসে আলাপ-আলোচনার দ্বারা ঠিক করা যায়। কিন্তু তা নিয়ে হৈ চৈ তোলার কোন মানে হয় না। প্রমোদ-করের যৌক্তিকতা সম্পর্কে পণ্ডিতজী বলেন, প্রমোদের ওপর কেন যে কর ধার্য করা হবে না তার তিনি কোন কারণ পান না, তবে কি পরিমাণ কর ধার্য হবে সেটা স্বতন্ত্র কথা।

* * *

সেন্সরের বিরুদ্ধে নিয়ত অভিযোগ-কারী বম্বের চিত্রপ্রযোজকরা পণ্ডিতজীর স্পষ্ট কথার এবারে কি জবাব দেবেন দেখা যাক। কিন্তু বম্বাই ছবির দুর্নীতিমূলক
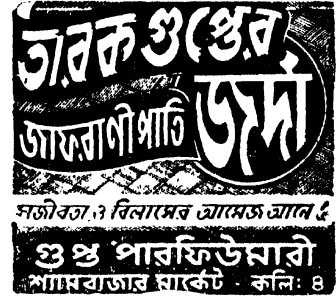
"রাইকমল"-এ কাবেরী বসু। ছবিখানি দোল পূর্ণিমায় মুক্তিলাভ করছে

উপাচারের কথা যে প্রধানমন্ত্রীর কানেও পৌঁচেছে এইটাই তো চিত্র-প্রযোজকদের লজ্জিত হবার যথেষ্ট কারণ। দুর্নীতি-মূলক, অসামাজিক ও অভারতীয় ছবি যে তৈরী হয় এবং যথেষ্ট সংখ্যাতেই সে কথা অস্বীকার করা বা চেপে রেখে দেওয়া সম্ভব নয়। জনসাধারণ যে বম্বাই ছবির ওপরে উত্যক্ত ও অশ্রদ্ধেয় হয়ে উঠেছে ছবির উত্তরোত্তর জনপ্রিয়তা হারানোই তার সবচেয়ে বড়ো দৃষ্টান্ত। বম্বের ছবি লোকের মনের স্বস্তি, সৌন্দর্যবোধ ও আনন্দকে নষ্ট করে দিচ্ছে সবদিক থেকেই। লোকের সেই অস্বস্তির লক্ষণের কথাই প্রধানমন্ত্রী জানিয়ে দিতে চেয়েছেন ভারতের প্রযোজকদের। এখন তাঁরা প্রধানমন্ত্রীর উক্তির অন্তর্নিহিত নির্দেশ মতো ছবি তুললেই দেশের ও দশের কাছ থেকে আবার শ্রদ্ধা ফিরে পাবেন। এই প্রসংগে বিদেশী ছবির পরিবেশকরাও যেন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ভালোভাবে প্রণিধান করেন। তাঁদের ছবি মারফৎ ডাকাতি, রাহাজানি, খুন, সশস্ত্র হিংসাত্মক কার্য এবং আরও বহুবিধ অপরাধের ও শালীনতাবিহীনতার যে পশরা এদেশের চলচ্চিত্রহাটে ছেড়ে দিচ্ছেন তা ভারত স্বাধীন হবার পর দেশের মতিগতি ও ধ্যানধারণার কথা বিবেচনা করে আগেই বন্ধ করে দেওয়া উচিত ছিল। সেদিন তা তাঁরা করেননি; আজ প্রধান-মন্ত্রীর সাবধানবাণীর পরও যদি তাঁরা সেই মতো না চলেন তাহলে বিদেশী ছবি আমদানী ব্যাপারে আরও কড়া ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে; একেবারে বন্ধও যদি হয় তো তা হোক। একটা কথা অবশ্য জানতে হবে যে, যুদ্ধ প্রচারের সহায়ক ছবি ভারতে তৈরী হয়নি, হয়ও না—ওধরনের সব ছবিই বিদেশ থেকে আমদানী এবং বছরের শেষে সংখ্যায় তা অনেকগুলিই হয়ে দাঁড়ায়। পণ্ডিতজীর স্পষ্ট নির্দেশ যে, "ভারতে যুদ্ধ-প্রচার হতে দিতে আমি চাই না"—একথাটা সেন্সর বোর্ড কড়াভাবে মেনে চলবেন কি?

সম্পাদক—**শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন** সহকারী সম্পাদক—**শ্রীসাগরময় ঘোষ**

৩৬ কোটি নরনারীর সেবা

ভারতীয় বণিকসভার বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অভিভাষণ প্রদানকালে প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু শিল্পপতিগণকে এদেশের ৩৬ কোটি নরনারীর সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইতে বলিয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী তাঁহাদিগকে একথা সুস্পষ্ট ভাষাতেই জানাইয়া দিয়াছেন যে, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে শিল্পপতিদের নিরঙ্কুশ অধিকার পরিচালনার দিন অতীত হইয়া গিয়াছে, ভারতে উহা কোনক্রমেই আর চলিবে না। ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্বার্থকে জনসাধারণের স্বার্থে আজ বলি দিতে হইবে। যদি এই আদর্শে জাতির সংগঠন কার্যক্রম পরিচালিত হয় তাহা হইলে শিল্পপতিগণের উদ্যম এবং সরকারী উদ্যম—জাতি গঠনের এই দুইটি ধারাই এক হইয়া যাইবে। তিনি বলিয়াছেন, সরকার এই উদ্দেশ্যেই তাঁহাদের সব পরিকল্পনা নিয়ন্ত্রিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। শিল্পপতিগণকে সরকারী সেই পরিকল্পনার মূল নীতির সঙ্গে মিল রাখিয়া চলিতে হইবে। দেশের জনসাধারণের মনোভাবের মর্যাদা এইভাবেই রক্ষা করিতে হইবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উক্তির যাথার্থ্য আমরাও স্বীকার করি। সমগ্রভাবে জনসাধারণের উন্নতি সাধনের জন্য তাঁহার প্রচেষ্টার আন্তরিকতা সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই ওঠে না। খাদ্য-সমস্যার সমাধান হওয়াতে দেশের লোকের মনে আশার ভাব অনেকটা সঞ্চার হইয়াছে এবং আত্মপ্রত্যয় জাগ্রত হইয়াছে একথাও সত্য। কিন্তু এই ভাবটির স্থায়িত্ব বিধান করিতে হইলে এবং ইহা বলিষ্ঠ করিয়া তুলিতে হইলে সরকারী নীতি শুধু সুবিবেচিত হইলেই চলিবে না, পরন্তু সেই নীতির সার্থকতা বিধানে কার্যক্রমের গতিও ত্বরান্বিত করা প্রয়োজন। দেশের অবস্থা রাতারাতি পরিবর্তন করা সম্ভব নয়; ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, যাদুবিদ্যার মত এক্ষেত্রে অঘটন ঘটানো সম্ভব নয়। একথা খুবই সত্য, কিন্তু সরকারী বিচার-বিবেচনার পাকে পড়িয়া মূল লক্ষ্যটি অস্পষ্ট হইয়া না পড়ে, এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে জাগে। প্রকৃতপক্ষে আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাবুদ্ধি সরকারী নীতির ফলে কতটা দেশের সমাজ-জীবনে চেতনা প্রদীপ্ত করিয়া তুলিবে, তাহার উপরই সমগ্র জাতির উন্নয়ন পরিকল্পনার অগ্রগতির দ্রুততা অনেকখানি নির্ভর করে, কারণ, সেই পথেই জনসাধারণের সহানুভূতি এ ক্ষেত্রে জাগ্রত করিতে সমর্থ হইবে। এইভাবে সরকারকে সমর্থনের জন্য জনগণ যদি সংহত হইয়া দাঁড়ায়, তবে শিল্পপতিগণের মতিগতিও বাধ্য হইয়া সরকারী আদর্শের দিকে সম্প্রসারিত হইবে। নতুবা সুদীর্ঘকাল যাহারা দেশের লোককে শোষণ করিয়া নিজেদের প্রবৃত্তি পরিপুষ্ট করিতে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা সহজে নিষ্কাম কর্মের সাধক হইবে এবং বিশ্বপ্রেমের মহিমায় তাহাদের চিত্ত বিগলিত হইবে, এমন আশা করা কঠিন।

রেল ভাড়ার নূতন ব্যবস্থা

রেল বিভাগের মন্ত্রী ঘোষণা করিয়াছেন যে, তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে ৫০ মাইল পর্যন্ত ভ্রমণে বর্ধিত হারে ভাড়া দিতে হইবে না। রেল বাজেটের মূল প্রস্তাবে দীর্ঘপথ যাত্রীদিগকে সুবিধা দিয়া কম দূরের যাত্রীদের ভাড়ার হার বৃদ্ধি করা হইয়াছিল। বলা বাহুল্য, এই ব্যবস্থায় দরিদ্র জনসাধারণের প্রতি সুস্পষ্টই অবিচার করা হইয়াছিল। কারণ দরিদ্র জনসাধারণ বেশীর ভাগই অল্প দূরের যাত্রীদের অন্তর্গত। যাঁহারা ধনী তাঁহারা বর্তমানে দূরে যাত্রার জন্যই রেলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, অল্প দূরে যাইতে হইলে মোটর তাঁহাদের আছে এবং মোটরে আশ্রয় গ্রহণ করাতেই আরাম বেশী। সরকারী হিসাবে দেখা যায়, এদেশের শতকরা ৯০ জন যাত্রী অল্প দূরের এবং মাত্র শতকরা ১০ জন দূরপথের যাত্রী। রেলমন্ত্রীর পুনর্বিবেচনার ফলে দরিদ্র যাত্রীদের প্রতি অবিচারের লাঘব হইয়াছে, ইহা সুখের বিষয়; কিন্তু এই সুবিধা আরও কিছুদূর দূরত্বের জন্য সম্প্রসারিত করা উচিত ছিল। কলিকাতার উপকণ্ঠবর্তী অঞ্চলের যাতায়াতে সুবিধার জন্য হাওড়া লাইনের কিছুটা বৈদ্যুতিক শক্তি প্রযুক্ত হইবে, কিন্তু এই ব্যবস্থা শিয়ালদহ লাইনেও একই সঙ্গে অবলম্বন করিলে ভাল হইত। রেলপথে ভিড়ের জন্য এই লাইনের ডেলী প্যাসেঞ্জারকে অদ্যাপি যে অবর্ণনীয় দুর্দশা ভোগ করিতে হয়, তাঁহারা ইহার যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিবেন। রেলমন্ত্রীর বিবৃতিতে প্রকাশ পাইয়াছে যে, বারাসত-বসিরহাট লাইনকে ব্রডগেজ লাইনে পরিণত করিবার জন্য

জরিপের পরিকল্পনা হইয়াছে মাত্র এবং দ্বিতীয় আশ্বাস, লিঙ্ক রেলওয়ে নির্মাণের প্রস্তাব এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে। জরিপের কাজের ব্যবস্থা হইবে, এই ব্যবস্থার পর বিবেচনা, তদুপরি রেলপথ নির্মাণ, তারপর ট্রেন চালনার ব্যবস্থা, সুতরাং বারাসত-বসিরহাট লাইনের সুব্যবস্থা হওয়ার এখনও অনেক বিলম্ব। আসাম লিঙ্ক লাইনের অব্যবস্থার প্রতীকারও ভবিষ্যতের গর্ভে। জনসাধারণ এই অবস্থায় আশ্বস্ত হইতে পারিবে না।

কম্যুনিস্টদের পরাজয়

অন্ধ্ররাজ্যের নির্বাচনে কম্যুনিস্ট দলের পরাজয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। নির্বাচনের ফলে সেখানকার আইন সভায় দল হিসাবে কম্যুনিস্টদের অস্তিত্ব পর্যন্ত আতঙ্কিত হইয়া উঠিবে এতটা অনেকেই ধারণা করিতে পারেন নাই। কারণ এই রাজ্যে কম্যুনিস্টদের ঘাটি পাকা বলিয়াই সাধারণের বিশ্বাস ছিল। কম্যুনিস্টদের এই পরাজয়ের মূলে তাঁহাদের নিজেদের অবলম্বিত অবিবেচিত নীতিই এতদিনে কাজ করিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আত্মশ্লাঘা অবশ্য নিন্দনীয়; কিন্তু আত্মপ্রত্যয় বস্তুটি নিন্দনীয় নহে। ফলত আত্মপ্রত্যয়ের উপর ভিত্তি করিয়াই জাতির সংহতি বোধ গঠিত হয় এবং এই আত্মপ্রত্যয়বোধ জাতির সভ্যতা এবং সংস্কৃতির মূলে থাকে। কম্যুনিস্টদের নীতিতে প্রধান দোষ ঘটিয়াছে এই যে, জাতি আত্মপ্রত্যয় বোধকে ক্রমাগত আঘাত করিয়াছে, জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মর্যাদাবুদ্ধির একান্ত অভাব এবং বিদেশী মতবাদের অত্যধিক আনুগত্য তাহাদিগের প্রতি জাতির সহানুভূতি শিথিল করিয়া দিয়াছে। কোন সভ্য জাতি নিজেদের নিন্দা ক্রমাগত শুনিতে চায় না, বিশেষ-ভাবে নিন্দাকারীরা যদি তাহাদের কোন সমস্যারই সমাধান করিতে সমর্থ না হন কিংবা তেমন পথ অবলম্বন করিয়া না চলেন, তবে জাতি তাহাদের প্রতি অশ্রদ্ধ হইয়া উঠিবে ইহা স্বাভাবিক। অন্ধ্রের সাম্প্রতিক নির্বাচনে স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে যে, তথাকার কম্যুনিস্ট দল শহর, পল্লী, উচ্চ, মধ্য, কৃষক শ্রমিক সমাজের কোন সম্প্রদায়েরই সমর্থন লাভ করিতে পারেন নাই। নির্বাচন পরিদর্শনে কম্যুনিস্টরা উপযুক্ত ব্যবস্থা করিতে পারেন নাই বলিয়া যে অন্ধ্রে তাঁহাদের এমন বিপর্যয় ঘটিয়াছে, এমন নয়। প্রকৃত প্রস্তাবে দলের নীতির মূলে গলদ থাকাতেই তাঁহারা পরাজিত হইয়াছেন। ভারত জুলু বা হটেনটটের দেশ নয়; এদেশের সুদীর্ঘকালের সংস্কৃতি রহিয়াছে, কম্যুনিস্টরা পরানুকরণ-স্পৃহায় অন্ধ হইয়া এ সত্যকে উপেক্ষা করিয়াছেন। জাতির প্রতি মমত্ববোধের অভাবে তাঁহাদের অবলম্বিত এই নীতি তাঁহাদেরই পতনের কারণ ঘটাইয়াছে।

মহাপ্রভুর প্রেমধর্মের আদর্শ

মহাপ্রভুর আবির্ভাব-উৎসব উপলক্ষে কলিকাতায় পৌর-জনসাধারণের বিপুল আগ্রহ ও উৎসাহ পরিদর্শনে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ইহাকে বাঙালীর পুনর্জাগরণের পরিচয়স্বরূপে উপলব্ধি করিয়া আশান্বিত হইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে জগতের পরিস্থিতি বর্তমানে যে অবস্থায় আসিয়া পেঁাছিয়াছে, তাহাতে প্রেম এবং মৈত্রীর পথ অবলম্বন করা ব্যতীত মানব সমাজের বাঁচিবার পথ নাই। হিংসা ও অহিংস স্বরূপগত সূক্ষ্ম দার্শনিক হিসাবে প্রবৃত্ত না হইয়াও সোজাসুজি একথা বলা চলে যে, হিংসা বা বলপ্রয়োগ মূলক নীতির উদ্দেশ্য যেমনই হোক্ না কেন, সে পথে চলিতে গেলে মানব জাতির ধ্বংস অনিবার্য। রাষ্ট্রগত বৃহৎ ক্ষেত্রেই হিংসার নীতি বর্জনীয়, সমাজ বা ব্যক্তিজীবনে তাহার স্থান অদ্যাপি রহিয়াছে, এমন কথা মনে হইতে পারে, কিন্তু নৈতিক আদর্শের মূলে সামগ্রিক চেতনা জাগাইবার মত আন্তরিকতা যদি না থাকে, তবে তাহা বলিষ্ঠ হইয়া উঠে না। প্রেম এবং মৈত্রী ভারতের সংস্কৃতি ও সাধনার ধর্ম এবং মানবধর্মের ভিত্তি এইখানে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবে বাঙলাদেশে এই পরম সত্য প্রদীপ্ত হয়। সমাজ-জীবনে সকল স্তরে সাম্যবোধ জাগে। কবির ভাষায় "বাঙালীর হিয়া অমিয় মথিয়া নিমাই ধরেছে কায়া।" মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রেমধর্মের আদর্শে সামাজিক বৈষম্য বিদূরিত করিয়া অখণ্ড আত্মীয়তার প্রতিবেশে মনুষ্যের মহত্ত্ব পরিস্ফূর্ত হইবার প্রেরণা পায়। আমাদের সমাজ-জীবনে সেই আদর্শ সত্য করিয়া তুলিতে হইবে কারণ মানবসেবার উপর সমাজের সমধিক গুরুত্ব দান করা প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। বস্তুত মহাপ্রভুর প্রবর্তিত প্রেমধর্মকে আমরা অনেকটা বাস্তব জীবন হইতে বিচ্ছিন্ন বস্তু করিয়া তুলিয়া শুধু মানসিক বিলাসের পর্যায়ে লইয়া ফেলিয়াছি। কিন্তু প্রেম এইরূপ পরিচ্ছিন্ন পদার্থ নয়। আমাদের জীবন ও আচরণে সেবার ভাবটি যদি সঞ্চারিত না হয়, জাতির পতিত, অবজ্ঞাত, আর্ত, অজ্ঞ, দরিদ্রের প্রতি বেদনা বৈপ্লবিক চেতনায় আমাদের অন্তর যদি উত্তপ্ত না করে, তবে মহাপ্রভুর আদর্শের কথা আমাদের উচ্চারণ করা সাজে না। সামাজিক এবং আর্থিক বৈষম্যগত আভিজাত্যের সম্বন্ধে সতর্ক ও সচেতন স্বার্থ-কেন্দ্রিক দৃষ্টি সেই আদর্শ হইতে আমাদিগকে বিচ্যুত রাখিতেছে ইহা উপলব্ধি করা আবশ্যক। মহাপ্রভুর অসাম্প্রদায়িক এবং উদার সার্বভৌম প্রেমের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সেই দৃষ্টি হইতে আমাদিগকে মুক্ত হইতে হইবে এবং ইহাও বোঝা দরকার যে সেই আদর্শ অনুসরণ করিবার উপরই আমাদের রাষ্ট্রীয় এবং সামাজিক সমৃদ্ধি ও সমন্বয় বিশেষভাবে নির্ভর করে জাতির সুপ্ত আত্মার জাগরণ সেই প্রেমের সোনার কাঠির স্পর্শের অপেক্ষা করিতেছে

বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মিঃ এ্যান্টনী ইডেন SEADO কনফারেন্সে যোগ দেবার জন্য ব্যাঙককে যাবার পথে যথাক্রমে কায়রোতে এবং করাচীতে মিশরীয় ও পাকিস্থানী নেতাদের সঙ্গে কথাবার্তায় কিছু সময় যাপন করে যান। ব্যাঙকক থেকে ফেরার পথে মিঃ ইডেন দিল্লীতে পণ্ডিত নেহরু এবং বাগদাদে ইরাকী প্রধানমন্ত্রী নুরি পাশার সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। মিঃ ইডেন ও পণ্ডিত নেহরুর মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছে সেটা প্রকাশ করা হয়নি। তবে কাগজী সংবাদদাতাদের ধারণা যে, ব্যাঙককে মিঃ ডালেস ও মিঃ ইডেনের মধ্যে ফরমোজা অঞ্চল সম্পর্কে যেসব কথাবার্তা হয়েছে বিশেষ করে সেগুলির সম্বন্ধেই পণ্ডিত নেহরুর সঙ্গে মিঃ ইডেন আলোচনা করেছেন, কারণ ফরমোজা অঞ্চলে শান্তি স্থাপনের চেষ্টায় বৃটিশ ও ভারত গভর্নমেণ্ট অনেকটা একযোগে কাজ করছেন যদিও এ ব্যাপারে উভয়ের মত ঠিক এক নয়। ফরমোজার প্রশ্ন সম্পর্কে আলোচনা অবশ্যই হয়েছে, কিন্তু অন্যান্য গুরুতর প্রশ্নও আলোচিত হয়েছে সন্দেহ নেই। SEADO'র ফলাফল সম্বন্ধে ভারত গভর্নমেণ্টের বহুবিঘোষিত আশঙ্কা দূর করার চেষ্টা নিশ্চয়ই মিঃ ইডেন করেছেন। তাছাড়া মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতির বিষয়ে আলোচনা অবশ্যই হয়েছে, কারণ সেদিকেও ঘটনার যেরূপ গতি দেখা যাচ্ছে তাতে নিঃসন্দেহে ভারত গভর্নমেণ্টের চিন্তার কারণ আছে।

ফরমোজা সম্পর্কে ব্যাঙককে মিঃ ডালেস ও মিঃ ইডেনের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছে তাতে নাকি মার্কিন ও বৃটিশ মতের পার্থক্য কিছুমাত্র কমে নি। বৃটিশ গভর্নমেণ্টের এ মত নয় যে চীনকে বিনাশর্তে ফরমোজা দিয়ে দেয়া হোক। ফরমোজার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বৃটিশ গভর্নমেণ্ট নিশ্চয় করে কোনো কথায় এখন আবদ্ধ হবার পক্ষপাতী নন। ফরমোজা চীনকে দিয়ে দেবার কথা বৃটিশ গভর্নমেণ্ট বলেন না, মার্কিন গভর্নমেণ্টের নিকট সে-কথা তোলার প্রশ্নই উঠে না। তবে

ফরমোজা কোনো দিনই চীনের হবে না, এরকম কথাও বৃটেন বলতে চায় না। একথার উপরে চীনের সঙ্গে কোনো আপস মীমাংসার আলোচনার প্রবর্তন করা দুরূহ। বৃটিশ গভর্নমেণ্ট মনে করেন যে, চীনের উপকূলের নিকটবর্তী দ্বীপগুলি থেকে যথা মাটসু এবং কেময়—ন্যাশনালিস্ট চীনা সৈন্য সরিয়ে এনে দ্বীপগুলিকে কম্যুনিস্ট চীনকে ছেড়ে দেয়া উচিত, তাহলেই যুদ্ধবিরতির পথ সুগম হবে।

মাটসু ও কেময় দ্বীপপুঞ্জ সম্বন্ধে আমেরিকা এখনো স্পষ্ট করে কিছু বলতে বা করতে চাচ্ছে না। কম্যুনিস্ট চীন যদি মাটসু ও কেময় জোর করে দখল করার চেষ্টা করে, তবে আমেরিকা সাক্ষাৎভাবে সেটা ঠেকাবার চেষ্টা করবে কিনা, এ প্রশ্নটিকে মার্কিন গভর্নমেণ্ট একটা অনিশ্চয়তার আবরণে ঢেকে রেখেছে, যা থেকে মনে হয় মাটসু ও কেময় ছাড়া-না-ছাড়া এখন প্রধানত একটা দরাদরির ব্যাপার যদিও মার্কিন-চিয়াং সম্বন্ধের সঙ্গেও এর যোগ আছে। মাটসু ও কেময় ত্যাগের প্রতিক্রিয়া ফরমোজার ন্যাশনালিস্ট চীনা গভর্নমেণ্টের মনোবলের উপর কিরূপ হবে মার্কিন গভর্নমেণ্ট তাও ভাবছেন। মাটসু ও কেময় ত্যাগ করার একটা বড়ো ফল এই হবে যে, ন্যাশনালিস্ট চীনারা কম্যুনিস্ট গভর্নমেণ্টকে সরাবার জন্য একদিন চীনে ফিরে যাবে বলে যে আস্ফালন করে, তার অন্তঃসারহীনতা একেবারে খুলে দেখানো হবে এবং ইউনো'তে চীনের নাম করে চিয়াং কাইশেকের প্রতিনিধিকে স্থান দেবার ক্ষীণতম অজুহাতও থাকবে না। তবে চিয়াং কাইশেক কর্তৃক চীন আক্রমণের পরিকল্পনা যে মার্কিন গভর্নমেণ্টের নিকট প্রশ্রয় পাবে না, এমন কি চিয়াং যদি চীন আক্রমণের চেষ্টা করেন, তবে মার্কিন গভর্নমেণ্ট সেটা অন্যায় আক্রমণ—এ্যাগ্রেশন বলে মনে করবেন—এমন আভাসও প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের একটি সাম্প্রতিক উক্তি থেকে পাওয়া গেছে। সুতরাং এখন আসল প্রশ্ন হচ্ছে ফরমোজার স্বত্বাধিকার নিয়ে এবং চিয়াং কাইশেক ও তাঁর দলবলদের নিয়ে কী করা।

পিকিং গভর্নমেণ্টের দাবি হচ্ছে ফরমোজা তাঁদের সম্পত্তি, জোর করে ফরমোজা দখল করে নেয়ার অধিকার তাঁদের আছে, আমেরিকা ফরমোজা অঞ্চলে বসে সে অধিকার প্রয়োগে বাধা দিচ্ছে, আমেরিকার নৌবহর, সৈন্যসামন্ত ফরমোজা অঞ্চল থেকে সরে গেলে ফরমোজাকে সঙ্গে সঙ্গে মুক্ত করা হ'ত। ভারত গভর্নমেণ্টের মতেও ফরমোজার ন্যায্য স্বত্ব চীনের। পিকিং গভর্নমেণ্টেরই ফরমোজার কর্তৃত্ব প্রাপ্য, তবে ধীরে সুস্থে শান্তিপূর্ণ উপায়ে মামলার ফয়সালা হওয়া উচিত। যুদ্ধকালীন কায়রো-ঘোষণায় যাই বলা হয়ে থাক না কেন বৃটিশ গভর্নমেণ্ট এখন আর ফরমোজাকে কম্যুনিস্ট চীনের হাতে তুলে দিতে ইচ্ছুক নন। আপাতত আমেরিকা ফরমোজা অঞ্চল ছেড়ে যেতে রাজী হবে সে সম্ভাবনাও নেই এবং তার জন্য আমেরিকাকে পীড়াপীড়ি করতেও বৃটিশ গভর্নমেণ্ট চান না, তবে ভবিষ্যতে ফরমোজার নিরপেক্ষীকরণের দিকে বৃটিশ গভর্নমেণ্টের ঝোঁক। ইতিমধ্যে চীনের উপকূলের নিকটবর্তী দ্বীপগুলি থেকে ন্যাশনালিস্ট চীনাদের সরিয়ে আনা হোক বৃটিশ গভর্নমেণ্ট আমেরিকাকে এই নীতি গ্রহণ করতে বলছেন।

আমেরিকা মাটসু ও কেময় কম্যুনিস্টদের হাতে ছেড়ে দিতে রাজী হতে পারে, কিন্তু ফরমোজা ও পেসকাডোর দ্বীপাবলীকে মার্কিন প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্গত করে রাখতে আমেরিকা বদ্ধপরিকর। মাটসু ও কেময় ছেড়ে দেবার পরেও পিকিং গভর্নমেণ্ট ফরমোজা দাবী করতে থাকবেন এবং ফরমোজার উপর চড়াও হবার হুমকি দিতে থাকবেন—এই সম্ভাবনা সামনে রেখে মার্কিন গভর্নমেণ্ট বিনা শর্তে মাটসু ও কেময় ছাড়তে চান না। ফরমোজার উপর কম্যুনিস্ট চীনের স্বত্বাধিকারের ভিত্তিতে কোনো আপস আলোচনা করতে মার্কিন গভর্নমেণ্ট রাজী নন। অন্য দিকে ফরমোজার উপর স্বত্বাধিকারের ভিত্তির উপর ছাড়া পিকিং গভর্নমেণ্টের পক্ষেও আপসের কথা বলা বা যুদ্ধবিরতিতে স্বীকৃত হওয়া কঠিন।

ব্যাপারটা তর্কের দিক দিয়ে যেমন রন্ধ্রহীন বলে মনে হয় কার্যত ঠিক তেমন নাও হতে পারে। চীনা ন্যাশনালিস্টরা যদি মাটসু ও কেময় ছেড়ে দিয়ে আসে এবং ন্যাশনালিস্ট বোমারু আক্রমণ বন্ধ হয়, তবে পিকিং সরকার মুখে নাই বলুন ফরমোজার উপর তাঁরা আক্রমণ করতে অগ্রসর হবেন না। কারণ আমেরিকা যদি ফরমোজাকে রক্ষা করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করে, তবে চীনের পক্ষে বর্তমান ফরমোজা জয় করা সম্ভব নয় এবং কোনরূপ চেষ্টা করলে বৃহৎ যুদ্ধ লেগে যাবে, তার জন্যও নিশ্চয়ই চীন প্রস্তুত নয়। সুতরাং চীনের উপকূলের নিকটবর্তী সব দ্বীপগুলি পিকিং গভর্নমেণ্টকে ছেড়ে দেবার পর এবং ন্যাশনালিস্ট চীনারা যদি চীনের উপর বোমাবর্ষণ থেকে বিরত হয়, তবে আপনা থেকেই যুদ্ধবিরতি হতে পারে।

* * *

ইরাকের সঙ্গে তুরস্কের সামরিক চুক্তিতে চটে গিয়ে মিশর সিরিয়ার সঙ্গে একটা চুক্তি করেছে। এই শেষোক্ত চুক্তি তুরস্কের প্রতি অমিত্রভাবদ্যোতক এবং এর দ্বারা তুরস্ক ও তার প্রতিবেশী সিরিয়ার মধ্যে বন্ধুত্বের সম্বন্ধ ক্ষুণ্ণ হবে বলে তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ওদিকে ইরাক, তুরস্ক ও পাকিস্থান অন্য আরব দেশগুলিকে কাছে টানার চেষ্টা করছে। ইতিমধ্যে আবার ইজরেলি ও মিশরীয় সীমান্তে দুইপক্ষের মধ্যে একটা সংঘর্ষ হয়ে অনেক মিশরীয় সৈন্য মারা গেছে। আরব দেশগুলিতে এই কারণে ইজেরেলের বিরুদ্ধে নূতন করে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়েছে যার সুযোগ নিয়ে মিশর গভর্নমেণ্ট ইরাক-তুর্কী চুক্তির উপর এই বলে আন্দোলন চালাচ্ছেন যে, তুরস্ক ইজরেলের বন্ধু, সেই তুরস্কের সঙ্গে চুক্তি করে ইরাক আরবদের ক্ষতি করছে, ইরাক-তুর্কী চুক্তির পরেই ইজরেলিদের এই রকম আক্রমণের উদ্দেশ্য হচ্ছে মিশর যাতে ইরাক-তুর্কী চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন না করে তার জন্য চাপ দেয়া, ইত্যাদি। মজা হচ্ছে আবার এই যে গাজাতে ইজরেলি-মিশরীয় সংঘর্ষের পরে ইরাক মিশরকে সামরিক সাহায্য দিতে চেয়েছে। এই সব উল্টাপাল্টা কান্ড সত্ত্বেও ইংগ-মার্কিন মহল আশা করছে যে ক্রমশ তুরস্ক, পাকিস্থান, ইরান এবং আরবরাষ্ট্রগুলিকে একসূত্রে বেঁধে একটি মধ্যপ্রাচ্য আরক্ষা সংস্থা গড়ে তোলা যাবে। এ বিষয়ে মিঃ ইডেন পণ্ডিত নেহরুকে কী বলে গেলেন জানতে কৌতূহল হয়।

৭।৩।৫৫

সাহিত্যে সংকট

অন্নদাশঙ্কর রায়

১

শরৎচন্দ্র স্মরণ

প্রথমেই স্মরণ করি তাঁকে, যাঁর নামে এই বক্তৃতা। শরৎচন্দ্র যখন জনপ্রিয় ছিলেন না, তাঁর লেখা পড়ে বড়রা যখন বিস্মিত ও তপ্ত তখন আমরা ছেলেরা ছিলুম তাঁর ভক্ত। এ ভক্তি অনেক দিন পর্যন্ত গোঁড়া ভক্তি ছিল। বড়রা এক হিসাবে গোঁড়া। আমরা ছেলেরা আরেক হিসাবে গোঁড়া। তার পর এমন এক সময় এলো যখন বড়দের গোঁড়ামি চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গোঁড়ামি। গোঁড়া ভক্তি গিয়ে তার জায়গায় রইল শুদ্ধ ভক্তি।

দেশশুদ্ধ লোক এখন তাঁকে ভক্তি করছে। এ ভক্তি এখন ভারতব্যাপী। বাঙলার বাইরে তাঁর গ্রন্থের বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। সেসব পড়ে অবাঙালীরাও তাঁকে আপন করে নিয়েছেন। একবার একজন প্রশ্ন করেছিলেন, "আচ্ছা, শরৎবাবুর বই কি বাঙলা ভাষায় তর্জমা হয়েছে!"

হাঁ, এরই নাম দিগ্বিজয়। শরৎচন্দ্র দেশকে অতিক্রম করেছেন। অন্তত প্রদেশকে। এখন তিনি ভারতীয় সাহিত্যিক। আধুনিক কালের ভারতীয় সাহিত্যিক।

২

দেশ এবং কাল

সাহিত্যের নামকরণ হয় দেশের নামে, যেমন পুত্রের নামকরণ হয় পিতৃকুলের নামে। কিন্তু সাহিত্যের আরও একটা নামকরণ সম্ভব। সেটা কালের নামে। সন্তানের যেমন মাতৃকুলের নামে।

আধুনিক বাঙলা সাহিত্য একদিক থেকে বাঙলা দেশের সাহিত্য। তেমনি আরেক দিক থেকে আধুনিক কালের সাহিত্য। দেশ যেমন প্রধান কালও তেমনি প্রধান। কালকে অপ্রধান মনে করা ঠিক নয়। তাকে অপ্রধান মনে করলেও সে তার ছাপ রেখে যায় দেহে মনে। আধুনিক কালকে আমরা বিদেশী বা পাশ্চাত্ত্য বলে বহুদিন উপেক্ষা করেছি। তার সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করিনি, করলে অত্যন্ত কুণ্ঠার সঙ্গে করেছি। এর কারণ আমাদের পরাধীনতা। পরাধীন মানুষের অপমানবোধ একান্ত প্রখর। আত্মসম্মানের খাতিরে আমরা অতীতকেই আপনার ভেবেছি, বর্তমানকে ইংরেজের বা পাশ্চাত্ত্যের। যাকে আধুনিক বলে চিহ্নিত করা উচিত তাকে বৈদেশিক বলে গণনা করেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের "শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় স্মারক বক্তৃতা" হিসেবে গত ১৯শে, ২০শে ও ২১শে জানুয়ারি তারিখে দ্বারভাঙ্গা হলে পঠিত এই সন্দর্ভ ধারাবাহিকভাবে দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, লেখক কয়েক স্থানে তাঁর এই সন্দর্ভের পরিমার্জনা ও পরিবর্তন ঘটিয়েছেন।

এখন তো পরাধীনতার গ্লানি অপনীত হয়েছে। এখন এসেছে আধুনিক কালের সঙ্গে সম্বন্ধ স্বীকার করার সময়। আমাদের সাহিত্য বাঙলা সাহিত্য, কিন্তু সেই সঙ্গে আধুনিক কালের সাহিত্য। তার দুই কুল। দেশের পরিচয় তো সকলে জানে। কালের পরিচয় নেওয়া যাক। যে কালে আমরা বাস করছি সে কাল সব দেশের সাহিত্যের উপর ছাপ রেখে যাচ্ছে। যে সব ভাবনাকে আমরা মনে করেছি বিশেষ করে আমাদের দেশের ভাবনা সে সব ভাবনা চীন থেকে পেরু পর্যন্ত সব দেশের লোকের ভাবনা। দেশগত বৈশিষ্ট্য আছে নিশ্চয়, কিন্তু কালগত বৈশিষ্ট্যও কম নয়। সেইজন্যে একটু কালপরিক্রমা করলে মন্দ হয় না।

কালের চাকা সারা পৃথিবীময় ঘুরছে। তার কেন্দ্র কিন্তু পশ্চিম ইউরোপ। ভবিষ্যতে হয়তো ভারতবর্ষ হবে। কিংবা রাশিয়া। কিন্তু আপাতত পশ্চিম ইউরোপকে তার প্রাপ্য গুরুত্ব দিতে হবে। আমার বক্তৃতা বাঙলা সাহিত্যকে বাদ দিয়ে নয়। কিন্তু আধুনিক কালই আমার আলোচনার বিষয়। পশ্চিম-মুখো না হয়ে আমার উপায় নেই।

৩

সঙ্কট : জীবনে

সঙ্কট শব্দটা লোকে যখন তখন ব্যবহার করে। অন্নসংকট বস্ত্রসংকট ইত্যাদি কত রকম সংকট। কিন্তু এর প্রকৃষ্ট প্রয়োগ হচ্ছে রোগীর যখন জীবনমরণ সমান অনিশ্চিত। যখন ডাক্তার বলে যান ক্রাইসিস চলছে।

অবশ্য এই একমাত্র প্রয়োগ নয়। মানুষের জীবনে যেমন রোগ আছে তেমনি আর্থিক ভাবনা আছে। আছে আত্মিক অশান্তি। আছে নৈতিক দোটানা। সেইজন্য আমরা বলি, আমার এখন আর্থিক ভাবনা সংকট বা আত্মিক সংকট বা নৈতিক সংকট।

ব্যক্তির মতো জাতিরও নৈতিক সংকট বা আত্মিক সংকট উপস্থিত হয়। আর্থিক সংকট তো সুপরিচিত। জাতির মতো সভ্যতারও সংকট দেখা দিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ সভ্যতার সংকট নিয়ে তাঁর মৃত্যুর অল্প দিন আগে আলোচনা করে গেছেন। সভ্যতা এখানে মানব সভ্যতা। এর সংকট সম্বন্ধে টলস্টয় মানুষকে সতর্ক করে দিয়ে গেছেন। রবীন্দ্রনাথের পরেও সতর্কতাবাণী উচ্চারণ করেছেন বহু মনীষী।

মারণাস্ত্র নির্মাণের কৌশল এখন যেখানে গিয়ে ঠেকেছে তাতে মরণের সম্ভাবনাই জীবনের সম্ভাবনার চেয়ে বেশী। যে কোনো দিন মহামারী বেধে যেতে পারে। এবার যে বোমা পড়বে আণবিক বোমা তার কাছে কিছু নয়। সভ্যতা এখনো টিকে আছে, কিন্তু ক'দিন টিকবে তা কেউ বলতে পারে না। আশাটাও আশার ছলনা হতে পারে। তবু হাল ছেড়ে দেওয়া যায় না। যতক্ষণ শ্বাস ততক্ষণ আশ, ততক্ষণ চেষ্টা।

এ ছাড়া প্রত্যেক দেশেই অসন্তোষ

ভিতরে ভিতরে জমছে। সুখীদের চেয়ে দুঃখীদের সংখ্যাই বেশী, এমন কি খোদ রাশিয়াতেও। বিপ্লব সুখীদের রাতারাতি দুঃখী করতে পারে, কিন্তু দুঃখীদের রাতারাতি সুখী করতে পারে না। কোটি কোটি লোক সামরিক ভার বহন করতে বাধ্য হচ্ছে সব দেশে। ফলে তাদের ভোগসম্ভারে টান পড়ছে। আমেরিকার কুবের ভান্ডারও অফুরন্ত নয়। আভ্যন্তরিক অসন্তোষ সংকটকে ঘোরালো করেছে।

৪

সংকট : সাহিত্যে

মানুষের জীবনে আজ সংকট। তা বলে সাহিত্যে সংকট কেন হবে। ইতিহাসে কত বার সংকট এসেছে, সাহিত্যে তো আসেনি। আবার সাহিত্যে যখন সংকট দেখা দিয়েছে জীবনে দেখা দেয়নি।

ঠিক। কিন্তু এবারকার সংকট বাইরের জীবনে নয়, ভিতরের জীবনেও—যা নিয়ে সাহিত্য। মাথার উপর ডেমোক্রেসির খড়্গ ঝুলছে। যুদ্ধ। পায়ের তলায় বাসুকির ফণা নড়লে ভূমিকম্প ঘটবে। বিপ্লব। এই অস্বস্তিকর অবস্থায় আপনি শ্বাস রুদ্ধ হয়ে আসে। কে কী লিখবে। কে কী পড়বে। যারা মন্দির গড়ত তারা দু'শো বছর হাতে রেখে গড়তে বসত। আজকের মানুষের হাতে দু'শো বছর দূরের কথা দু'শো মাসও নেই। এরা তাড়াহুড়ো করে যা গড়ে তা মন্দিরের মতো দেখতে, কিন্তু দেবযোগ্য নয়।

সাহিত্য হচ্ছে অমৃত, দেবভোগ্য। তার আয়োজন দীর্ঘকাল ধরে চলে। লেখার আগে দেখা, শেখা, ভাবা, ধ্যান করা। এর জন্যে সময় লাগে অনেক। লেখাও কলম কালি আর কাগজের ব্যাপার নয়। প্রাণসঞ্চার। জীবন্যাস। এরজন্যেও সময় লাগে। যার হাতে অনন্ত কাল সেই লিখতে বসে উচ্চ কোটির সাহিত্য। উচ্চাঙ্গের সঙ্গীত কি পনেরো মিনিটে হয়।

লেখক বা পাঠক কেউ সময় দিতে পারে না, মন দিতে পারে না। স্থায়ী জিনিস হবে কী করে। হবে কার জন্যে। গত ত্রিশ চল্লিশ বছরে পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় যে সব গ্রন্থ লেখা হয়েছে তাদের মধ্যে ক্লাসিক হয়েছে বা হবার যোগ্যতা রাখে এমন বই আঙুলে গোনা যায়। কিংবা তাও নয়।

সবচেয়ে প্রবল যে মনোভাব সেটা কঠিন তিক্ত সীনিকাল ও পেসিমিস্টিক। হৃদয় অসাড়, মন অসুস্থ, আত্মা আছে কি নেই। প্রথম মহাযুদ্ধ মোহমুদ্গরের কাজ করে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের জন্যে মোহ খুব বেশী অবশিষ্ট ছিল না, তাই মোহভঙ্গের প্রশ্ন ওঠে না। বিপ্লবের একটা মোহ ছিল, সেটা কোনো কোনো মহলে এখনো বিদ্যমান, কিন্তু সাহিত্যিক মহলে বড় একটা নেই।

৫

সংকটের সূচনা

সংকট ঘনাচ্ছে অনেক কাল থেকে। কম করে ধরলেও ষাট বছর, যখন থেকে চলছে এক হাতে যুদ্ধের অন্য হাতে বিপ্লবের প্রস্তুতি। আরো আগে থেকে—প্রায় পঁচাত্তর বছর আগে থেকে—টলস্টয় চেতাবনী দিচ্ছেন যে যুদ্ধ আসছে, বিপ্লব আসছে, যদি এড়াতে চাও তো জীবনযাত্রা বদলাও, সাহিত্যের ধারা বদলাও।

কিন্তু কেন এমন হলো?

অষ্টাদশ শতকের শেষ ভাগে যখন শিল্পবিপ্লব শুরু হয়, মানুষ বিজ্ঞানের দৌলতে সর্বশক্তিমান হবার স্বপ্ন দেখে তখন গ্যয়টে রচনা করেন তাঁর ফাউস্ট। শয়তান মানুষকে সর্ব শক্তির প্রতিশ্রুতি দিচ্ছে, বিনিময়ে চাইছে মানুষের আত্মা। মানুষ কী করবে? সর্বশক্তিমান হবে, না আত্মাসম্বিত হবে? ফাউস্ট শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করল। তার মধ্যে একটু ফাঁক রেখে দিল। তুমি আমাকে যা দেখাবে যা দেবে তাতে যদি আমার বিন্দুমাত্র সন্তোষ জন্মায় তাতে যদি আমি আসক্ত হই তা হলেই আমার আত্মা তোমার হবে।

> "Comfort and quiet!—no, no!
>   none of these
> For me—I ask them not—
>   I seek them not.
> If ever I enter upon the bed
> of sloth
> Lie down and rest, then be
>   the hour, in which
> I so lie down and rest, my
>   last of life....
> If ever time should flow so
>   calmly on,
> Soothing my spirits into such
>   oblivion,
> That in the pleasant trance I
>   would arrest,
> And hail the happy moment
>   in its course,
> Bidding it linger with me....
> ..then throw me into fetters—
> Then willingly do I consent
>   to perish."
>
> (Goethe: Faust Part 1)

শেষ পর্যন্ত ফাউস্টের আত্মা ফাউস্টেরই রইল, মাঝখান থেকে এলো সমস্ত ঐশ্বর্য, যাবতীয় ভোগ। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ফাউস্ট জিততে থাকল শয়তান হারতে থাকল। টলস্টয় দিব দৃষ্টিতে দেখতে পেলেন শয়তান অ[illegible] সহজে ছাড়বে না। সামনে বিপদ। কিন্[illegible] ফাউস্ট তা মানবে কেন? সে তো এ[illegible] দিনের জন্যেও সন্তুষ্ট হয়নি, বিশ্রা[illegible] করেনি। তার দৃঢ় বিশ্বাস সে ঐশ্বর্য পাবে আত্মাও রাখবে।

সংকটের আদি বলতে গেলে শা[illegible] মুগ্ধ ফলিতবিজ্ঞানের ও মুনাফালুব্ধ ম[illegible] মূলধনের যোগাযোগে শিল্পবিপ্লব য[illegible] আরম্ভ হয় তখন। অর্থাৎ অষ্টাদ[illegible] শতাব্দীর শেষভাগে। কিন্তু ঊনবি[illegible] শতাব্দীর শেষভাগেই মালুম হয় যে [illegible] সংকটের কারণ। তাও সকলের কাছে ন[illegible] টলস্টয়ের মতো অল্প কয়েকজনের কাছে আর সকলে তখন প্রগতির স্বপ্নে বিভো[র] এঁরা যাকে মনে করেন সংকটের নি[illegible] ওঁরা তাকে মনে করেন প্রগতির বিধান।

অধিকাংশের চোখ ফুটল প্রথম ম[হা]যুদ্ধের সময়। যাঁদের চোখ তাতেও ফ[োটেনি] না তাঁদের চোখ ফোটাল রুশ দে[শের] বিপ্লব। এর আগে এত বড় যুদ্ধও [illegible] হয়নি, এত বড় বিপ্লবও আর হয়[নি]। ফাউস্টের আত্মা কি তখন তার নি[জের] এক্তারে ছিল, না শয়তানের এক্তা[রে]।

৬

মোহভঙ্গ

সাধারণের বিশ্বাস ছিল যুদ্ধের [পর] আসছে নতুন জীবন, নতুন পৃথিবী। [illegible] লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে যা এলো যুদ্ধোত্তর বিশৃঙ্খলা, মুদ্রাস্ফীতি, [illegible]

দুর্ভিক্ষ, দুর্নীতি, কর্মহীনতা, গৃহাভাব, দুরারোগ্য ব্যাধি। কতক লোকের পৌষ মাস, অধিকাংশের সর্বনাশ। যারা হারল তাদের দুর্গতির সীমা রইল না,' যারা জিতল তারাই বা এমন কী ভোগ করল। জাতীয় ঋণ পর্বত প্রমাণ। ট্যাক্স জোগাতে জোগাতে প্রাণান্ত। সর্বত্র শ্রমিক ধর্মঘট। ঝি চাকর পাওয়া যায় না চড়া মজুরি না দিলে।

কিন্তু এসব খুচরো দুর্ভোগ তো আসল নয়। লোকে স্বপ্ন দেখত বিজ্ঞানের কল্যাণে সকলের কপালে সব কিছু জুটবে। কই, তেমন কিছু তো দেখা গেল না। স্বপ্নভঙ্গ হলো। এই স্বপ্নভঙ্গটাই আসল। প্রগতি তা হলে শান্তিতে হবার নয়। অশান্তিতেও কি হবার! বিজ্ঞান তা হলে লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটায়, লক্ষ লক্ষ লোককে বিকলাঙ্গ করে! বিজ্ঞানের উন্নতি সত্ত্বেও আরো বেশী লোক বেকার! এই দুঃখদৈন্যের পরিবর্তে এমন কী পাওয়া গেল! এই যে ক্ষতিটা হলো এর পূরণ কী!

এতকাল একটা ধারণা ছিল যুদ্ধ-বিগ্রহে অপদার্থরাই মারা যায়। দুর্বলরাই কাটা পড়ে। যোগ্যতমের উদ্বর্তন। কিন্তু দেখা গেল সব চেয়ে জোয়ান সব চেয়ে বলবান ছেলেরাই ফৌত হলো। একটা আস্ত জেনারেশন হারিয়ে গেল। তাই তো, এমন তো কথা ছিল না। এ যে মনে হচ্ছে অযোগ্যতমের উদ্বর্তন।

না, আর যুদ্ধ চাইনে। কিন্তু যে ভাবে সন্ধিপত্র তৈরী হলো তা দেখে কারো সন্দেহ রইল না যে আর একটা যুদ্ধের সম্ভাবনা পনেরো আনা।

ওদিকে শ্রমিক শ্রেণীতে অসন্তোষ জমাতে থাকল। যাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না, তাদেরি দেশে কিনা সাধারণ ধর্মঘট। কোনো কোনো দেশে ছোটলোক-দের আর বাড়তে দেওয়া যায় না বলে রাতারাতি ডিক্টেটর গজালেন। ধর্মঘটীদের পিটিয়ে ঢিট করে দিলেন। আর যা যা করলেন তার ফলে গণতন্ত্রের দম বন্ধ। অথচ যুদ্ধ করা হয়েছিল গণতন্ত্রের নিরাপত্তার জন্যে। এই তার পরিণতি।

এমনি এক এক করে এক একটা মোহ ভাঙে। শয়তানের সঙ্গে চুক্তি করে ফাউস্ট যা করায়ত্ত করেছিল তার অনেক-খানি করভ্রষ্ট হয়। যারা মরল তারা বৃথা মরল। যারা বাঁচল তারা বৃথা বাঁচল। মরারও যেমন কোনো সার্থকতা নেই বাঁচারও তেমনি কোনো সার্থকতা নেই। অতীতের আদর্শগুলিকে ব্যঙ্গ করে মহৎ চরিত্রদের মহত্ত্বের মুখোশ খুলে একদল লেখক যা করলেন তা নাম debunking। নতুন কোনো আদর্শ বা মহৎ দৃষ্টান্ত সামনে তুলে ধরা হলো না। চার দিকে ভাঙন। বাইরেও, ভিতরেও। পরিবার ভাঙছে, শ্রেণী ভাঙছে, সমাজের কাঠামো ভাঙছে। কাজ করতে চাও কাজ পাবে না, কাজ যদি বা জুটল মনের মতো হবে না। জীবিকার জন্যে যে সময়টা কাটালে সেটা যেন জীবন থেকে কাটা গেল। জীবনের জন্যে তা হলে বাকী রইল কী? অবসর কাল। অবসর কালে দেখলে অবসাদ আর ক্লান্তি। সীরিয়াস কিছু করতে যাওয়া মানে মোমবাতি দু'দিক থেকে পোড়ানো। হালকা জিনিস দিয়ে আবার ঐ সময় ভরানো। ওটাও জীবন নয়। জীবন তা হলে কোথায়!

তার পর অন্যে অসুখী হবে তুমি সুখী হবে, এতেই বা কোন সুখ! এ তো আরো লজ্জার কথা। তুমি যে বেঁচে আছ এরজন্যে তুমি লজ্জিত। কেননা তোমার চেয়ে যোগ্যতর যারা তারা অকালে মারা গেছে। এর মধ্যে ন্যায় কোথায়। একটা অপরাধবোধ বা sense of guilt বিবেকের ঘরে বাসা বাঁধল। বিবেকের দংশন সহ্য হয় না, মরতে সাধ যায়। এর নাম মৃত্যু সাধ বা death wish।

> "Endure what life God gives
> and ask no longer span;
> Cease to remember the de-
> lights of youth, travel-
> wearied aged man;
> Delight becomes death-longing
> if all longing else be
> vain....
> Never to have lived is best,
> ancient writers say;
> Never to have drawn the
> breath of life, never to
> have looked into the eye
> of day;
> The second best's a gay good-
> night and quickly turn
> away."
> (Yeats: Oedipus at Colonnus)

মৃত্যু সাধ সমস্তক্ষণ মানুষকে মৃত্যু-সচেতন করে, মৃত্যু নিয়ে ব্যাপৃত রাখে। বিশ্ববিধানে মৃত্যুর নিশ্চয় একটা স্থান আছে, কিন্তু যুদ্ধোত্তর যুগের মানুষ তাকে তার চেয়ে বেশী স্থান দেয়, বিশেষ করে সেই সব দেশের যেখানে জীবনকে নিয়ে বা সমাজকে নিয়ে নতুন কোনো পরীক্ষা চলছে না, যেখানে বিপ্লব ঘটেনি, বিপ্লবকে হাড়ে হাড়ে ভয়। (ক্রমশ)

মধ্য-ফাল্গুনে

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আজও সে যাকে পায়নি, এই জীবনে তাকে পাওয়া
হবে না বুঝি, হল না বুঝি তার;
আকাশ হল মলিন, মনে শীতের প্রেত-হাওয়া
জাগাল হাহাকার;
কবে যে তার সাঙ্গ হবে ব্যর্থ পথ-চাওয়া
সে কবে, কবে আর?

হৃদয়ে তার অন্ধকার, পৃথিবী নিঝঝুম
বিফল তার সকল বৈভব;
ভাঙে না তার বসন্তের অন্তহীন ঘুম
জাগে না কলরব;
কপালে যার আঁকেনি কেউ প্রেমের কুমকুম
ব্যর্থ তার সব।

মাঘের শেষ, এখনও এই মধ্য-ফাল্গুনে
বাতাসে বাজে শীতের হাহাকার;
কৃষ্ণচূড়া-কিংশুকের কান্না শুনে-শুনে
ভাঙেনি ঘুম যার
কবে সে জেগে উঠবে তোর গানের গুনগুনে
সে কবে, কবে আর?

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মুসোলিনীর সঙ্গে বোঝাপড়া হয়ে যাবার দিনকয়েক বাদেই হীটলার অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করে বসলেন। সেই সময়ে তিনি একদিন নৌকোয় চেপে বুনোহাঁস শিকার করতে বেরিয়েছেন। বন্দুকের আওতার মধ্যে এক ঝাঁক বুনো হাঁস দেখতে পেয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে হীটলার বললেন, "আক্রমণ যদি করতেই হয় তো এ-ই তার শুভমুহূর্ত, এর পরে আর সময় পাওয়া যাবে না।" শুনে একটা বুনোহাঁস প্যাক প্যাক করে হেসে উঠল। চটে গিয়ে বন্দুক চালালেন হীটলার এবং টাল সামলাতে না পেরে জলের মধ্যে পড়ে গেলেন। এদিকে হয়েছে কি, জার্মান সৈন্যরা তখন সেই ঝিলের চারপাশে জঙ্গলের মধ্যে চার্লি আর শুল্ৎসকে খুঁজে বেড়াচ্ছিল। বন্দুকের শব্দ শুনে জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল তারা, চেহারার সাদৃশ্যে বিভ্রান্ত হয়ে হীটলারকেই সেই পলাতক ইহুদী নাপিত ঠাউরে নিয়ে তাঁকে তারা গ্রেপ্তার করে বসল। জিজ্ঞেস করল, "শুল্ৎস কোথায়?" হীটলারের তখন জবাব দেবার ক্ষমতা নেই, মারের চোটে তাঁর মাথা ঘুরছে। ফ্যাল ফ্যাল করে তিনি তাকিয়ে রইলেন।

অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ যে শুরু হয়ে গিয়েছে, চার্লি আর শুল্ৎস সে-কথা জানতেন না। বন্দী-শিবির থেকে পালিয়ে তাঁরা অস্ট্রিয়ার দিকেই রওনা দিয়েছিলেন। ইচ্ছে ছিল, সেখানে গিয়ে তাঁরা আশ্রয় নেবেন। মাঝপথে জার্মান সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়ে গেল। সৈন্যরা ভাবল, হীটলার স্বয়ং বোধহয় রণাঙ্গনের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে এসেছেন। চার্লি আর শুল্ৎসকে তারা মহা সমাদরে একটা গাড়ির মধ্যে নিয়ে তুলল। ব্যাপার দেখে চার্লি তো হতভম্ব। ভীরু গলায় জিজ্ঞেস করলেন, "এ কোথায় যাচ্ছি আমরা?" পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলেন এক জার্মান সৈন্যাধ্যক্ষ। তিনি বললেন, "আপাতত আপনি অস্ট্রিয়াকে আক্রমণ করতে যাচ্ছেন।"

চতুর্দিকে ট্যাংক আর সাঁজোয়া গাড়ি। মুহুর্মুহু গোলা ফাটছে। সেই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে চার্লিকে একটা প্ল্যাটফর্মের উপরে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হল। সামনে মাইক্রোফোন। তাঁকে এবারে বক্তৃতা দিতে হবে। বক্তৃতা দেবেন কি, চার্লির হাত-পা ততক্ষণে হিম হয়ে গিয়েছে। চাপা গলায় শুল্ৎস বললেন, "যা হোক, দু-চার কথা বলে ফেল, নয়তো এরা ছাড়বে না।" কাঁপা-কাঁপা গলায় চার্লি তখন শুরু করলেন। কিন্তু যা বললেন, হীটলারী আদর্শের তা সম্পূর্ণই পরিপন্থী। বললেন, "ইহুদী, অ-ইহুদী, ভদ্র, অভদ্র, সাদা আর কালো, প্রত্যেককেই আমি সাহায্য করতে চাই। কাউকেই আমি ঘৃণা করতে চাই না। পৃথিবীতে প্রত্যেকেরই জায়গা আছে। আমাদের জীবনকে আমরা সুন্দর করে গড়ে তুলতে পারতাম। পারিনি, তার কারণ, সৌন্দর্যের পথটাকে। আমরা হারিয়ে ফেলেছি। লোভের তাড়নায় মানুষের আত্মা আজ বিষাক্ত হয়ে উঠেছে। যে যন্ত্র-সভ্যতা আমাদের সমস্ত অভাবের অবসান ঘটাতে পারত, আমাদের অভাব সে আরও বাড়িয়ে দিয়েছে।" বক্তৃতা দিচ্ছেন চার্লি, কিন্তু বলবার আর কোনও কথা খুঁজে পাচ্ছেন না। তাঁর সমস্ত হৃদয়-মন তখন হানার চিন্তায় অস্থির হয়ে রয়েছে। উপসংহারে তিনি বললেন, "হানা, তুমি এখন কোথায়? হানা, তুমি যেখানেই থাকো, ভয় পেয়ো না। আকাশের দিকে চোখ তুলে দেখো, মেঘ সরে যাচ্ছে, আকাশ আবার আলোয় ভরে উঠছে। এতদিন আমরা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে ছিলাম, সেই অন্ধকারের রাজ্য থেকে এবারে আমরা এক নতুন পৃথিবীর স্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছি।"

"দী গ্রেট ডিক্টেটর"-এর শুটিং যুদ্ধের আগেই শুরু হয়েছিল বটে, কিন্তু ১৯৪০ সালের অক্টোবর মাসের আগে এ-বই

গ্রেট ডিক্টেটর'-এ চার্লির স্বপ্ন ও আশার একটি দৃশ্য

'গ্রেট ডিক্টেটর'-এর আর একটি দৃশ্যে হিটলারের শিশুপ্রীতির নিদর্শন

মুক্তিলাভ করতে পারেনি। এযাবৎ যত বই চার্লি তুলেছেন, তার মধ্যে এ-বই তুলতেই তাঁর সবচাইতে বেশী অর্থব্যয় হয়েছিল। সমালোচকরা অবশ্য বইখানি দেখে খুব খুশী হননি। তাঁরা বললেন, এ-বই বড্ড বেশী সীরিয়াস। অ্যামেরিকা তখনও যুদ্ধে নামেনি। অনেকেই তখন ভেবেছিলেন যে, চ্যাপলিন তাঁর এই বইয়ে নিরপেক্ষতার সীমারেখা লঙ্ঘন করেছেন। জনসাধারণ অবশ্য বইখানি দেখে খুবই খুশী হলেন। তারই অনিবার্য ফলস্বরূপ বহু দেশে এ-বইয়ের উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়। কেউ বা নিষিদ্ধ করলেন জার্মানীর ভয়ে, কেউ বা নিরপেক্ষতার অজুহাতে। শেষোক্ত শ্রেণীর দেশগুলির মধ্যে এখানে আর্জেণ্টিনার উল্লেখ করা যেতে পারে। চ্যাপলিন সে-বছর শ্রেষ্ঠ অভিনেতা বলে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। তবে তার পুরস্কার তিনি গ্রহণ করেননি।

এ-বই সম্পর্কে চ্যাপলিনের নিজের অভিমত কি, পাঠকদের সে বিষয়ে কৌতূহল থাকতে পারে। চ্যাপলিন বলছেন, "এর আগে আরও অনেক বই আমি তুলেছি। দর্শকরা সে-সব বই দেখে প্রাণভরে হেসেছেন। এবারে ইচ্ছে হল, আমার বক্তব্য তাঁদের আমি শোনাব। এতদিন তাঁরা ছিলেন দর্শক, শুধুই দর্শক। এবারে শ্রোতাও। এ-বই আমি ইহুদীদের জন্যে তুলেছি। আমি চেয়েছিলাম, পৃথিবীতে সৌজন্য আর করুণার পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটুক। আমি কমিউনিস্ট নই। আমি সাধারণ মানুষ। যে অন্যায় প্রভুত্ব আজ পৃথিবীর দেশে দেশে তার থাবা বাড়িয়ে দিয়েছে, তার থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে এ-দেশ একটি সত্যিকারের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে উঠুক, শুধু এইটুকুই আমি চাই।"

(৩১)

"দী গ্রেট ডিক্টেটর"ই চ্যাপলিন-গডার্ড জুটির শেষ বই। এর কিছুদিন বাদেই তাঁদের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। চার্লির ইচ্ছে ছিল ডী এল্ মারের "রীজেন্সি" উপন্যাসখানিকে অবলম্বন করে একখানি বই তুলবেন, পলেটকে নামালেন তাঁর নায়িকার ভূমিকায়। বইখানির চিত্রনাট্য রচনার কাজ যখন খানিকটা এগিয়েছে, এমন সময় তিনি বুঝতে পারেন যে, যুদ্ধ আসন্ন। "রীজেন্সি"র কাজ বন্ধ রেখে তখন তাঁকে "দী গ্রেট ডিক্টেটর"-এর কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। চ্যাপলিন ভেবেছিলেন, জরুরী কাজগুলি চুকিয়ে দিয়ে তারপর আবার "রীজেন্সি"র চিত্রনাট্য রচনায় হাত দেবেন। ইতিমধ্যে পলেটের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যাওয়ায় গোটা পরিকল্পনাটাই তাঁকে বিসর্জন দিতে হল। এ-বই যদি তুলতেন চার্লি তো অন্তত একদিক থেকে বইখানা উল্লেখযোগ্য হয়ে থাকত। উল্লেখ্য বিষয়টা হল এই যে, এ-বই তাঁর নিজের লেখা নয়। এ-যাবৎ যত বই তিনি তুলেছেন, লেখক তিনি স্বয়ং। "রীজেন্সি"র সম্পর্কে আর একটি কথার উল্লেখ করা যেতে পারে। চ্যাপলিনের ইচ্ছে ছিল, এ বইয়ে তিনি নিজে কোনও ভূমিকা গ্রহণ করবেন না। নিজে অভিনয় করেননি, এ রকম বই তাঁর আর মাত্র একটিই আছে, "এ উয়োম্যান অব প্যারিস"। সে বইয়ে একটিমাত্র দৃশ্যে তাঁকে দেখা যায়। দেখা গেলেও চেনা যায় না।

চ্যাপলিনের পরবর্তী ছবি "মঁসিয়ে ভেদ্যু।" ১৯৪৭ সালে এ-ছবি মুক্তিলাভ করে। মাঝখানে সাত বছরের ব্যবধান। এ সাত বছরে অন্য আর কোনও বই তিনি তোলেননি। তোলা সম্ভবও ছিল না। কেন, সেই কথাই বলছি। প্রথমত, পলেটের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে যায়; দ্বিতীয়ত, দুই ছেলে যুদ্ধে যোগদান করে; তৃতীয়ত এবং এইটেই সবচাইতে বড় কারণ, যুদ্ধের কয়েক বছর অ্যামেরিকার বিভিন্ন স্থানে তাঁকে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে হয়। তাঁর বক্তৃতায় তিনি দাবি তুলেছিলেন, অবিলম্বে একটি দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টি করতে হবে। ব্রিটেনের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের নেতৃবৃন্দ তখন যেসব কথা বলেছেন, চ্যাপলিনের বক্তব্যের সঙ্গে তার মূলত কোনও তফাত ছিল না; কিন্তু—প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য—যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবার পর সারা অ্যামেরিকায় চ্যাপলিনের বিরুদ্ধে যখন আন্দোলন আরম্ভ করা হয়, তাঁর বিরুদ্ধপক্ষের নেতারা তখন তাঁর যুদ্ধকালীন বক্তৃতাগুলির অপব্যাখ্যা করতে লাগলেন। তাঁরা বলে বেড়াতে লাগলেন, চ্যাপলিন যে দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির দাবি তুলেছিলেন, তার কারণ অন্য কিছুই নয়, কমিউনিস্ট-প্রীতি। স্বার্থান্বেষী এইসব লোকেরা ভুলে গিয়েছিলেন যে,

যে-সময় চ্যাপলিন দ্বিতীয় রণাঙ্গন সৃষ্টির কথা বলেছিলেন, রাশিয়া তখন মিত্রপক্ষেরই অন্তর্ভুক্ত। এবং শুধু চ্যাপলিন নয়, স্বয়ং উইনস্টন চার্চিল, ফ্রাঙ্কলিন ডী রুজভেল্ট এবং লর্ড বীভারব্রুকও তখন রাশিয়ার বীরত্বের প্রশংসা করে বক্তৃতা দিয়েছেন। শুধু যে রাশিয়ার প্রশংসা করেছেন তা নয়, স্বয়ং স্ট্যালিনেরও প্রশংসা করেছেন।

বছর কয়েক ধরেই চ্যাপলিন-বিরোধী মনোভাবের লক্ষণগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই যে, বিরোধিতা, এর কারণ কী? একটা কারণ এই হতে পারে যে, যখনই তাঁকে অ্যামেরিকার নাগরিকত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়েছে, সে অনুরোধ তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন। অনেকেই এতে ক্ষুন্ন হয়েছিলেন, তাতে সন্দেহ নেই।

দ্বিতীয় কারণটা আরও মারাত্মক। হলিউডে তাঁর বিরুদ্ধে একটা চক্রান্ত গড়ে উঠেছিল। এটা কিছু অস্বাভাবিক নয়। তাঁর শক্তি, তাঁর সামর্থ্য, তাঁর ঐশ্বর্য (অর্থের তিনি কখনও অপচয় করেননি, সঞ্চিত অর্থকে চিত্রশিল্পে বিনিয়োগ করে তার অংকটাকে তিনি ক্রমেই আরও বাড়িয়ে গিয়েছেন), তাঁর প্রতিষ্ঠা এবং সর্বোপরি তাঁর সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় পেয়ে অনেকেই তখন ঈর্ষার আগুনে জ্বলে মরছিলেন। চ্যাপলিনের বিরুদ্ধে তাঁরা নানারকমের গুজব রটাতে আরম্ভ করে দিলেন। চিরকালই চার্লি একটু নিরিবিলি থাকতে ভালবাসেন, নিতান্ত প্রয়োজন না হলে বড় একটা কারও সঙ্গে মেশেন না। গুজব ছড়াবার ব্যাপারে তাতে সুবিধেই হয়ে গেল। আসল মানুষটিকে কেউ চেনে না, সুতরাং যা কিছু তাঁর সম্পর্কে শোনে, তা-ই বিশ্বাস করে নেয়। শিল্প-সাধনা এবং জীবনচর্যার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সঙ্গে চ্যাপলিনের যে অনেকখানিই পার্থক্য রয়েছে, সেকথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। শিল্প-সাধনার মাধ্যমে সেই পার্থক্যের যে পরিচয় পাওয়া গেল, সারা পৃথিবী তাঁকে সম্মান জানিয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, ব্যক্তি-জীবনেও যে তিনি পৃথক, এইটে ভাবতেই সবাই বিচলিত, বিমূঢ় বোধ করল। এক্ষেত্রে তাঁর পার্থক্যকে কেউ স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করতে পারল না।

সাধারণ মানুষের সঙ্গে নানান ব্যাপারে তাঁর পার্থক্য রয়েছে। মেয়েদের সম্পর্কে সাধারণ মানুষের যে মনোভাব, চ্যাপলিনের মনোভাব তার থেকে স্বতন্ত্র। "মাই ওয়ান্ডারফুল ভিজিট" বইয়ে এ বিষয়ে যেসব মন্তব্য তিনি করেছেন, তার থেকেই বোঝা যায়, অন্যান্য মানুষের সঙ্গে তাঁর পার্থক্যটা ঠিক কোথায়। একাধিক বিবাহ আজ অবশ্য অস্বাভাবিক কিছু

চার্লস চ্যাপলিন, উনা ও'নীল ও তাঁদের চারটি সন্তান। সিডনিও রয়েছেন মধ্যে

নয়; হলিউডের খবর যাঁরা রাখেন, তাঁরা অবশ্যই জানেন যে, বারংবার বিবাহ আর বারংবার বিচ্ছেদই এখন সেখানে স্বাভাবিক নিয়ম হয়ে উঠেছে। এ ব্যাপারে লর্ড বায়রনের সঙ্গে চার্লস চ্যাপলিনের অনেকখানি মিল খুঁজে পাওয়া যাবে।

চ্যাপলিন অস্বাভাবিক মানুষ। এবং অস্বাভাবিক মানুষের সম্পর্কে রমাঁ রলাঁর উক্তিটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রমাঁ লিখেছেন, "অস্বাভাবিকতাই যখন কারো শক্তি আর সৃষ্টির উৎস হয়ে ওঠে, তখন তাকে আর অস্বাভাবিকতা বলা উচিত নয়, বলা উচিত অতি-স্বাভাবিকতা।" ডেনিস ফন্তে' আবার এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলছেন, "কোনো মানুষকে মহামানব বলে মেনে নিতে আমাদের আপত্তি হয় না, কিন্তু একই সঙ্গে আমরা আশা করি যে, যেমনটি আমরা চাই, ঠিক তেমনটিই তিনি হবেন। আমরা চাই যে, আমাদের চাইতে আরও অনেকখানি তিনি এগিয়ে যাবেন, কিন্তু যাবেন আমাদেরই পথে। তিনি পৃথক বলেই তাঁকে আমরা সম্মান করি; আবার দেখে অবাক হই যে, তিনি ঠিক আমাদের মতো নন। এ বড় বিচিত্র মনোভাব।"

পলেট গডার্ডের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে যাবার পর এবং উনা ও'নীলের সঙ্গে বিবাহ হবার আগে, জোন ব্যারি নাম্নী একটি মেয়ের সঙ্গে চার্লির যোগাযোগ হয়েছিল। এই যোগাযোগকে উপলক্ষ্য করে চার্লির নামে নানান রকমের কুৎসা রটানো হয়। মেয়েটির বাড়ি ব্রুকলীনে, চিত্রাভিনয়ের সুযোগ লাভের জন্যে সে হলিউডে এসেছিল। ইউনাইটেড আর্টিস্ট-এর টীম ডুর‍্যান্ট তখন চ্যাপলিনের সঙ্গে তার আলাপ করিয়ে দেন। আলাপ করে চ্যাপলিনের মনে হল, ঠিকমত শিখিয়ে-পড়িয়ে নিতে পারলে তাঁর পরবর্তী বইয়ে একে একটা সুযোগ দেওয়া যাবে। অভিনয় শিক্ষার জন্য মেয়েটিকে তিনি ম্যাক্স রেনহার্টের কাছে পাঠিয়ে দেন। কিন্তু মাস কয়েক যেতে না যেতেই মেয়েটির ব্যবহারে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠলেন। তার হাবভাবে তিনি স্পষ্টই বুঝতে পারলেন যে, অভিনয় নয়, এ-মেয়ের অন্য কোনও অভিসন্ধি রয়েছে। তৎক্ষণাৎ তাকে বিদায় করতে চেয়েছিলেন চার্লি, কিন্তু মেয়েটিও তখন মরিয়া। চার্লি বুঝলেন, সহজে এর হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে না। শেষ পর্যন্ত তাঁকে পুলিসের সাহায্য নিতে হল। এর এক বছর বাদে, ১৯৪৩ সালের অক্টোবর মাসে, জোন ব্যারির একটি মেয়ে হয়। আদালতে গিয়ে জোন ব্যারি দাবি জানান যে, চার্লিই এ-মেয়ের পিতা। চার্লি সে-দাবি সরাসরি অস্বীকার করলেন। এবং রক্ত-পরীক্ষায় প্রমাণিত হল, চার্লির কথাই সত্য। মামলায় জিতেও চার্লি জানিয়ে দিলেন, মামলার পিছনে জোন ব্যারির যা-কিছু খরচা হয়েছে, তিনি তা দিয়ে দিতে রাজী আছেন।

এই মামলার চার মাস আগে—১৯৪৩ সালের জুন মাসে—বিখ্যাত নাট্যকার ইউজেন ও'নীলের কন্যা উনা ও'নীলের সঙ্গে চার্লির বিবাহ হয়। এ তাঁর চতুর্থ

বিবাহ। বিবাহের সময় উনা ছিলেন অষ্টাদশী; আর চার্লির বয়স তখন চুয়ান্ন, অর্থাৎ উনার ঠিক তিনগুণ। বয়সের এতখানি পার্থক্য সত্ত্বেও এ-বিবাহ তাঁর পক্ষে পরিপূর্ণ সুখের কারণ হয়েছে। এর আগে আরও তিনবার বিবাহ করে-ছিলেন চার্লি, কিন্তু একবারও তাঁর দাম্পত্য জীবন আনন্দময় হয়ে উঠতে পারেনি। এই প্রথম তিনি সুখের মুখ দেখলেন। উনা অভিনেত্রী নন, গৃহিণী। এবং গৃহিণীই তিনি থাকতে চান। এর আগে আর যে তিনটি মেয়েকে চার্লি তাঁর স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের কেউই তাঁর সংসারের দায়িত্ব নিতে চাননি। তাঁদের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অভিনেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ, এবং চার্লি ছিলেন সেই উদ্দেশ্য সাধনের একটা উপায় মাত্র। উনা অভিনেত্রী হতে চাননি, সুন্দর একটি সংসার তিনি চেয়েছিলেন। নিজের হাতে সেই সংসার তিনি গড়ে তুলেছেন। ইউজেন ও'নীলের তিনি প্রথম পক্ষের কন্যা। বিমাতার সংসারে তিনি হয়তো অশান্তি পেয়েছিলেন। হয়তো সেই কারণেই শান্তিপূর্ণ একটি সংসার তিনি কামনা করে থাকবেন। সে-কামনা তাঁর পূর্ণ হয়েছে। বিবাহের পরমুহূর্তেই চার্লির সংসারের বিরাট দায়িত্বভার তাঁকে গ্রহণ করতে হয়। উনা তখন নিতান্তই বালিকা-বয়সী। কিন্তু বয়স অল্প হওয়া সত্ত্বেও দায়িত্ব পালনে তাঁর কোনও কুণ্ঠা দেখা দেয়নি। ছেলেমেয়েদের তিনি সযত্নে মানুষ করে তুলছেন। চার্লির প্রতিও তাঁর মমতার অন্ত নেই। স্বামীকে তিনি সদা-সর্বদাই আগলে-আগলে রাখেন, যেননা তাঁর কাজের কোনও ব্যাঘাত হয়। চার্লিকে যদি কেউ কোনও খবর পাঠাতে চান, সে-খবর উনার মারফতে পাঠাতে হবে। চার্লি হয়তো কোনও কারণে বিব্রত হয়ে রয়েছেন, সেদিন আর কারো পক্ষে তাঁর কাছে যাবার উপায় নেই। উনাই যেতে দেবেন না। স্টুডিয়ো থেকে ডাক এসেছে। আসুক। কাজের ক্ষতি হচ্ছে। হোক। "আজ আর ও'কে বিরক্ত করা চলবে না", সেক্রেটারিকে বলে পাঠালেম উনা, "সবাইকে জানিয়ে দিন যে, দিন দুয়েক ও'র এখন বিশ্রাম নেওয়া দরকার। যদি কোনও জরুরী কথা থাকে, আমাকে জানাতে পারেন, এ-নিয়ে আমিই বরং ও'র সঙ্গে কথা কয়ে দেখব।" চার্লি বিশ্ববিখ্যাত মানুষ, এবং উনা তাঁর স্ত্রী। সুতরাং শুধু যদি একটু ইচ্ছে করতেন উনা, তো তাঁকে নিয়েও অনেক হৈ-চৈ হতে পারত। কিন্তু উনার তাতে সায় নেই। এই সেদিন একজন সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসে-ছিলেন। উদ্দেশ্যটা আর কিছুই নয়, চার্লির শিল্প-সাধনা এবং সংসার-জীবন সম্পর্কে উনার কাছ থেকে গুটিকয়েক খবর সংগ্রহ করা। উনা তাঁদের বলে দিলেন, "আমি তাঁর স্ত্রী। আর কিছু আমার বলার নেই।" এ থেকে কেউ তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে একটা ভুল ধারণা করে বসবেন না। উনা শিক্ষিতা, রুচিশীলা মহিলা। অত্যন্তই মার্জিত তাঁর মন। গ্রন্থ পাঠে তাঁর অসীম আগ্রহ, গ্রন্থ-সংগ্রহেও তাঁর আগ্রহের অন্ত নেই। চার্লি আর উনাকে একত্রে যাঁরা দেখেছেন, তাঁরাই স্বীকার করবেন যে, দাম্পত্য জীবনের এক নিরবচ্ছিন্ন আনন্দের মধ্যে তাঁরা মগ্ন হয়ে রয়েছেন। (ক্রমশ)

৪

কয়েকদিন কাটিয়া গিয়াছে।

ননীবালা আর আসেন নাই। প্রভাত ঘটিত ব্যাপার অঙ্কুরেই শুকাইয়া গিয়াছে মনে হয়। কেবল বাঁটুল সর্দারের সঙ্গে একবার দেখা হইয়াছিল। বাঁটুল আসিয়াছিল একটি রিভলবার আমাদের গছাইবার জন্য। উচিত মূল্যে পাইলে হয়তো কিনিতাম, কিন্তু ছয়শত টাকা দিয়া ফ্যাসাদ কিনিবার শখ আমাদের ছিল না। ব্যোমকেশ বাঁটুলকে সিগারেট দিয়া অন্য কথা পাড়িয়াছিল।

'১৭২।২ বৌবাজার স্ট্রীটের কাউকে চেনো নাকি বাঁটুল?'

'আজ্ঞে চিনি।'

'অনাদি হালদারকে জানো?'

'আজ্ঞে।'

'সেও কি তোমার—মানে- -খাতক নাকি?'

বাঁটুল একটু হাসিয়াছিল, অর্ধদগ্ধ সিগারেটটি নিভাইয়া সযত্নে পকেটে রাখিয়া একটু গম্ভীর স্বরে বলিয়াছিল,—'অনাদি হালদার আগে চাঁদা দিত, কয়েক মাস থেকে বন্ধ করে দিয়েছে; এখন যদি ওর ভাল-মন্দ কিছু হয় আমাদের দায়-দোষ নেই।—কিন্তু আপনারা ওকে চিনলেন কি করে? আগে থাকতে জানা-শোনা আছে নাকি?'

'না, সম্প্রতি পরিচয় হয়েছে।'

বাঁটুল অতঃপর আর কৌতূহল প্রকাশ করে নাই, কেবল অপ্রাসঙ্গিকভাবে একটি প্রবাদ-বাক্য আমাদের শুনাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিয়াছিল,—'জলে বাস করে কুমীরের সঙ্গে বিবাদ করলে ভাল হয় না কর্তা।'

কালীপূজার দিন আসিয়া পড়িল। সকাল হইতেই চারিদিকে দুম্‌দাম্‌ শব্দ শোনা যাইতেছে। সেগুলি উৎসবের বাদ্যোদ্যম কিম্বা সম্মুখ সমরের রণ-দামামা তাহা নিঃসংশয়ে ঠাহর করিতে না পারিয়া আমরা বাড়িতেই রহিলাম।

সন্ধ্যার পর দীপমালায় নগর শোভিত হইল। রাস্তায় রাস্তায় গলিতে গলিতে বাজি পোড়ানো আরম্ভ হইল; তুবড়ি আতস বাজি ফানুস রঙমশাল, সঙ্গে সঙ্গে চীনে পট্‌কা দোদমা। পথে পথে অসংখ্য মানুষ নগর পরিদর্শনে বাহির হইয়াছে; কেহ পদব্রজে, কেহ গাড়ি মোটরে। মাথার উপর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার খাঁড়া ঝুলিতেছে, কিন্তু কে তাহা গ্রাহ্য করে! হেসে নাও দু'দিন বই তো নয়।

আমরা বাড়ির বাহির হইলাম না, জানালা দিয়া উৎসব শোভা নিরীক্ষণ করিলাম। এজন্য যদি কেহ আমাদের কাপুরুষ বলিয়া বিদ্রূপ করেন আপত্তি করিব না, কিন্তু বলির ছাগশিশুর ন্যায় গলায় ফুলের মালা পরিয়া নির্বোধ আনন্দে নৃত্য করিতে আমাদের ঘোর আপত্তি।

রাত্রি গভীর হইতে লাগিল। মধ্য-রাত্রে কালীপূজা, উৎসব পুরাদমে চলিয়াছে। আমরা যদিও শক্তির উপাসক নই, বুদ্ধির উপাসক; তবু মা কালীকে অসন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায় আমাদের ছিল না। রাত্রে পলান্ন সহযোগে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিয়া শয়ন করিলাম।

রাত্রি শেষ হইবার পূর্বেই যে প্রভাত ঘটিত ব্যাপার সাপের মত আবার মাথা তুলিবে তাহা তখনও জানিতাম না।

একেবারে ঘুম ভাঙিল রাত্রি সাড়ে তিনটার সময়। চারিদিক নিস্তব্ধ, জানালা দিয়া বেশ ঠাণ্ডা আসিতেছে। আমি পায়ের তলা হইতে চাদরটা গায়ে জুত করিয়া জড়াইয়া আর এক ঘুম দিবার ব্যবস্থা করিতেছি এমন সময় উৎকট শব্দে ঘুমের নেশা ছুটিয়া গেল।

কে দুদ্দাড় শব্দে দরজা ঠেঙাইতেছে। শয্যায় উঠিয়া বসিয়া ভাবিলাম, সম্মুখ সমরের সীমানা আমাদের দরজা পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে, আজ আর রক্ষা নাই। মোটা লাঠিটা ঘরের কোণে দণ্ডায়মান ছিল, সেটা দৃঢ়মুষ্টিতে ধরিয়া শয়নকক্ষ হইতে বাহির হইলাম। যদি মরিতেই হয় লড়িয়া মরিব।

ওদিকে ব্যোমকেশও লাঠি হাতে নিজের ঘর হইতে বাহির হইয়াছিল। সদর দরজা মজবুত বটে কিন্তু আর বেশীক্ষণ নয়, এখনই ভাঙিয়া পড়িবে। আমরা দরজার দু'পাশে লাঠি বাগাইয়া দাঁড়াইলাম।

দুদ্দাড় শব্দ ক্ষণেকের জন্য একবার থামিল, সেই অবকাশে একটি ব্যগ্র কণ্ঠ-স্বর শুনিতে পাইলাম—'ও ব্যোমকেশ বাবু—একবারটি দরজা খুলুন—'

আমরা বিস্ফারিত চক্ষে পরস্পরের পানে চাহিলাম। পুরুষের গলা, কেমন যেন চেনা-চেনা। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল—'কে তুমি? নাম বল।'

উত্তর হইল,—'আমি—আমি কেষ্ট দাস—শিগ্‌গির দরজা খুলুন—'

কেষ্ট দাস! সহসা স্মরণ হইল না, তারপর মনে পড়িয়া গেল। অনাদি হালদারের বাড়ির কেষ্টবাবু!

ব্যোমকেশ বলিল,—'এত রাত্রে কী চান? সঙ্গে কে আছে?'

'সঙ্গে কেউ নেই, আমি একা।'—

মাত্র একটা লোক এত শব্দ করিতে-ছিল! সন্দেহ দূর হইল না। ব্যোমকেশ আবার প্রশ্ন করিল,—'এতরাত্রে কী দরকার?'

'অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে। দয়া করে দরজা খুলুন। আমার বড় বিপদ।'

হতভম্ব হইয়া আবার দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। অনাদি হালদার—!

ব্যোমকেশ আর দ্বিধা করিল না, দ্বার খুলিয়া দিল। কেষ্টবাবু টলিতে টলিতে ঘরে প্রবেশ করিলেন। কেষ্টবাবুর চেহারা আলুথালু, ভেট্‌কি মাছের মত মুখে ব্যাকুলতা। তদুপরি মুখ দিয়া তীব্র মদের গন্ধ বাহির হইতেছে। তিনি থপ্‌ করিয়া একটি চেয়ারে বসিয়া পড়িয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন—'অনাদিকে কেউ গুলি করে মেরেছে। সত্যি বলছি আমি কিছু জানি না। আমি বাড়িতে ছিলাম না—'

ব্যোমকেশ হাত তুলিয়া বলিল, '—ও কথা পরে হবে। আগে আমার একটা কথার জবাব দিন। আমাকে আপনি চিনলেন কি করে? ঠিকানা পেলেন কোত্থেকে?'

কেষ্টবাবু কিছুক্ষণ জবুথবু হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাঁহার ভাবভঙ্গীতে একটু ভিজা-বিড়াল ভাব প্রকাশ পাইল। অবশেষে তিনি জড়িত স্বরে বলিলেন,—'সেদিন আপনারা আমাদের বাসায় গিছলেন, আপনাদের দেখে আমার সন্দেহ হয়েছিল। তাই আপনারা যখন ফিরে চললেন তখন আমি আপনাদের পিছু নিয়েছিলাম। এখানে এসে নীচের হোটেলে আপনার পরিচয় পেলাম।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ স্থির নেত্রে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'হুঁ, আপনি দেখছি ভারি হুঁশিয়ার লোক। অনাদি হালদারের কাঁধে চেপে থাকেন কেন?'

কেষ্টবাবু বলিলেন,—'আমি—অনাদির ছেলেবেলার বন্ধু—দুরবস্থায় পড়েছি—তাই—'

'তাই অনাদি হালদার আপনাকে খেতে পরতে দিচ্ছিল, এমন কি মদের পয়সা পর্যন্ত যোগাচ্ছিল। খুব গাঢ় বন্ধুত্ব বলতে হবে।—যাক, এবার আজকের ঘটনা বলুন। গোড়া থেকে বলুন।'

কেষ্টবাবু কিছুক্ষণ অপলক চক্ষে ব্যোমকেশের পানে চাহিয়া রহিলেন, তারপর ঈষৎ করুণ স্বরে বলিলেন,—'আপনি দেখছি সবই জানেন। কিন্তু সত্যি বলছি আমি অনাদিকে খুন করিনি। আজ বিকেল বেলা—মানে কাল বিকেল বেলা অনাদির সঙ্গে আমার ঝগড়া হয়েছিল। আমি বলেছিলুম, আজ কালীপুজো, আজ আমাকে পঞ্চাশ টাকা দিতে হবে। এই নিয়ে তুমুল ঝগড়া। অনাদি আমাকে দশটা টাকা দিয়ে বলেছিল—এই নিয়ে বেরিয়ে যাও, আর আমার বাড়িতে মাথা গলিও না।'

'কে কে আপনাদের ঝগড়া শুনেছিল?'

'বাড়িতে ননীবালা আর ন্যাপা ছিল। নীচের তলার ষষ্ঠীবাবুও ঝগড়া শুনেছিল। বারান্দায় বসে তামাক খাচ্ছিল, আমি নেমে আসতে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল—মাথার ওপর দিনরাত শুম্ভ-নিশুম্ভের যুদ্ধ চলেছে—কবে যে পাপ বিদেয় হবে জানি না।'

'তারপর বলুন।'

'তারপর রাত্রি আন্দাজ একটার সময় আমি ফিরে এলাম। এসে দেখি—'

'রাত্রি একটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?'

'আপনার কাছে লুকোব না, শুঁড়ির দোকানে বসে মদ খেয়েছিলাম—জুয়ার আড্ডায় জুয়া খেলে তিরিশ টাকা জিতেছিলাম—তারপর একটু এদিক ওদিক—'

'হুঁ। বাসায় ফিরে কী দেখলেন?'

'বাসায় ফিরে প্রথমেই দেখি নীচের তলায় ষষ্ঠিবাবু হুঁকো হাতে সিঁড়ির ঘরে পায়চারি করছে। আমাকে দেখে বলে উঠল—ধম্মের কল বাতাসে নড়ে। কিছু বুঝতে পারলাম না। সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখি—সিঁড়ির দরজা ভাঙা!

'ঘরে ঢুকে দেখলাম বেঞ্চির ওপর প্রভাত আর ন্যাপা বসে আছে, ননীবালা দেয়ালে ঠেস্‌ দিয়ে মেঝেয় বসেছে। আমাকে দেখে তিনজনে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল, যেন আগে কখনও দেখেনি। আমি তো অবাক। বললাম—একি, তোমরা বসে আছ কেন? কারুর মুখে কথা নেই। তারপর ন্যাপা হঠাৎ লাফিয়ে উঠে আমার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে উঠল,—কেষ্টবাবু, এ আপনার কাজ। আপনি কর্তাকে খুন করেছেন!

'খুন! আমার তো মাথা ঘুরে গেল। জিগ্যেস করলাম—কে? কোথায়? কেউ উত্তর দিল না। শেষে প্রভাত বলল—ঐ ব্যাল্‌কনিতে গিয়ে দেখুন।

'রাস্তার ধারের ব্যাল্‌কনিতে উঁকি মারলাম। অনাদি পড়ে আছে, রক্তারক্তি কাণ্ড। বুকে বন্দুকের গুলি লেগেছে দেখে আমার ভির্মি যাওয়ার মত অবস্থা। মেঝেয় বসে পড়লাম। মাথার মধ্যে সব গুলিয়ে যেতে লাগল।

'তারপর কতক্ষণ কেটে গেল জানি না। ওরা তিন জনে চাপা গলায় কথা কইছে, কি করা উচিত তাই নিয়ে তর্ক করছে। ওদের কথা থেকে বুঝতে পারলাম, সন্ধ্যের পর ওরা কেউ বাড়ি ছিল না, একা অনাদি বাড়িতে ছিল। রাত্রি বারোটা নাগাদ ওরা ফিরে এসে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সাড়া পেলে না। অনেকক্ষণ ধাক্কাধাক্কির পর ওদের ভয় হল, হয়তো কিছু ঘটেছে। ওরা তখন দরজা ভেঙে বাসায় ঢুকে দেখল ব্যাল্‌কনিতে অনাদি মরে পড়ে আছে।

'আমার মাথাটা একটু পরিষ্কার হলে আমি বললাম—তোমরা আমাকে দোষ দিচ্ছ কেন—আমি অনাদিকে খুন করব কেন? অনাদি আমার অন্নদাতা বন্ধু—। ন্যাপা লাফিয়ে উঠে বলল—ন্যাকামি করবেন না। আমি যাচ্ছি পুলিসে খবর দিতে। এই বলে ছুটে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

'আমার ভয় হল। পুলিস এসে আমাকেই ধরবে, ওরা সাক্ষী দেবে আমার সঙ্গে অনাদির ঝগড়া হয়েছিল। আমি আর সেখানে থাকতে পারলাম না, উঠে পালিয়ে এলাম। কোথায় যাব কিছুই জানি না; রাস্তায় নেমে আপনার কথা মনে পড়ল।'—

কিছুক্ষণ কথা হইল না, কেষ্টবাবু যেন ঝিমাইয়া পড়িলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিলাম ঝিমানোর মধ্যে তাঁহার অর্ধ-নিমীলিত চক্ষু দুটি বার বার ব্যোমকেশের মুখের উপর যাতায়াত করিতেছে।

ব্যোমকেশ হঠাৎ বলিল,—'আপনি তাহলে অনাদি হালদারকে খুন করেন নি!'

কেষ্টবাবু চমকিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিলেন,—'অ্যাঁ! না ব্যোমকেশবাবু, আমি খুন করিনি। আপনিই ভেবে দেখুন, অনাদিকে খুন করে আমার লাভ কি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'অনাদি হালদার আপনাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল।'

কেষ্টবাবু বলিল,—'সে ওর মুখের কথা, রাগের মুখে বলেছিল। আমাকে সত্যি সত্যি তাড়িয়ে দেবার সাহস অনাদির ছিল না।'

'সাহস ছিল না! অর্থাৎ আপনি অনাদি হালদারের জীবনের কোনও গুরুতর গুপ্তকথা জানেন?'

কেষ্টবাবু কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন, তারপর ধীরে ধীরে বলিলেন,—'অনাদির সব গুপ্তকথা আমি জানি, তাকে আমি ফাঁসিকাঠে লট্‌কাতে পারতাম। কিন্তু ও কথা এখন থাক, যদি দরকার হয় পরে বলব, ব্যোমকেশবাবু। এখন আমাকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচাবার একটা ব্যবস্থা করুন।'

ব্যোমকেশ একটু চিন্তা করিয়া বলিল,—'আপনাকে যদি বাঁচাতে হয় তাহলে কে সত্যি খুন করেছে সেটা জানা দরকার। ঘটনাস্থলে যেতে হবে।'

কেষ্টবাবু শঙ্কিত হইলেন, স্খলিত-স্বরে বলিলেন,—'আমাকেও যেতে হবে?'

'তা যেতে হবে বৈ কি। আপনি না গেলে আমি কোন্ সূত্রে যাব?'

'কিন্তু—সেখানে পুলিস বোধহয় এতক্ষণ এসে পড়েছে—'

ব্যোমকেশ কড়া সুরে বলিল,—'আপনি যদি খুন না করে থাকেন আপনার ভয়টা কিসের?—অজিত, তৈরী হয়ে নাও, আমরা তিন জনেই যাব।'

কেষ্টবাবু বিহ্বলভাবে বসিয়া রহিলেন, আমরা বেশবাস পরিধান করিয়া তৈয়ার হইলাম। বসিবার ঘরে ফিরিয়া আসিলে কেষ্টবাবু চেয়ার হইতে কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন,—'ব্যোমকেশ-বাবু, আপনার বাড়িতে একটু—হে হে—মদ পাওয়া যাবে? একটু হুইস্কি কিম্বা ব্র্যান্ডি—?' হাতে পায়ে যেন বল পাচ্ছি না।'

ব্যোমকেশ বিরক্ত হইয়া বলিল,—'আমি বাড়িতে মদ রাখি না। —আসুন।'

(ক্রমশ)

চক্রদত্ত

ব্যাংকে যারা টাকা জমা রাখেন তারা যখন একসংগে সকলেই টাকা তুলতে আরম্ভ করেন তখন এটা ব্যাংকের পক্ষে দুঃসময়ই বল্‌তে হয়। ব্যাংকের এই অবস্থাটিকে 'রান' বলা হয়। ন্যাশনাল টিউবারকিউলোসিস্‌ এসোসিয়েশন অথবা টি বি ব্যাংকের পক্ষে "রান" হওয়াটা সুসময় বলেই ধরা হয়। টি বি ব্যাংক থেকে যখন এই রোগের ব্যাসিলাই-এর চাহিদা খুব বেড়ে যায় তখনই বোঝা যায় যে, বৈজ্ঞানিকরা এই সাংঘাতিক রোগটি সম্বন্ধে বিশেষ সচেতন এবং এ সম্বন্ধে বহু গবেষণা চলছে। টি বি ব্যাংকের ১৯৫৩ সালের হিসাবানুসারে দেখা যায় যে, প্রায় নয়টি দেশ থেকে ১৭২ বার এই রোগজীবাণু চেয়ে পাঠানো হয়।

*

জাপানে যখন সর্বপ্রথম অ্যাটম বোমা পড়ে তখন প্রত্যেক দেশই অ্যাটম বোমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় উদ্ভাবন করতে থাকে। সুইডেন কতকগুলি আশ্রয় তৈরী করেছে অ্যাটম বোমার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। পাহাড়ের নীচে কিংবা মাটির নীচে বেশীর ভাগ আস্তানা তৈরী করেছে। সমুদ্রের নীচেও এইরকম আশ্রয়-স্থল তৈরীর চেষ্টা চলছে, এবং এরা আশা করে যে, ১৯৬০ সালের মধ্যেই সমুদ্রের নীচের প্রথম আস্তানাটি তৈরী হবে। এটা লম্বায় ৫০০ ফুট চওড়ায় ৬০ ফুট এবং ১০৫ ফুট উঁচু। এই ধরনের একটি আস্তানাতে তারা তাদের সবচেয়ে বড় একটি যুদ্ধ জাহাজ অনায়াসেই রাখতে পারে। ভবিষ্যতে এরা সুইডেনের বাল্টিক সমুদ্রোপকূলের দ্বীপে এইরকম আরও অনেক আস্তানা তৈরী করবে। সমুদ্রের মধ্যে এই ধরনের আশ্রয়স্থল তৈরী করতে খরচ খুবই কম হবে কারণ সমুদ্রের মধ্যে যে সব পাহাড় পর্বতের স্বাভাবিক গুহা ও ঘোগ আছে সেইগুলিই অল্প বিস্তর সংস্কার সাধন করে আশ্রয় তৈরী হবে।

*

অ্যাকোয়ারিয়ামে মাছ রাখার শখ যাদের আছে তাদের এইসব মাছ রক্ষণা-বেক্ষণের জন্য অনেক কিছুই জানতে শিখতে হয়। অ্যাকোয়ারিয়ামটি বেশ সাজিয়ে গুছিয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে মাছ ছেড়ে রাখা হয় কিন্তু ক্রমশ মাছেদের মলমূত্র ও খাবারের টুকরা টাকরা জমে জলটা অপরিষ্কার হতে থাকে। সংগে সংগে এইগুলো তুলে ফেলতে পারলেই ভাল হয় কিন্তু জলের মধ্যে হাত ডুবিয়ে তুলতে গেলেই জলের মধ্যে আলোড়নের সৃষ্টি হওয়ায় মাছেদের ক্ষতি হয়, তাছাড়া অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যে ঝিনুক, শামুক, পাথর, গাছপালা ইত্যাদি যেসব জিনিস সাজান গোছান থাকে সেগুলিও এলো-মেলো হয়ে যেতে পারে। অ্যাকোয়ারিয়ামের মধ্যের যে জিনিসটি তুলতে হবে একটি
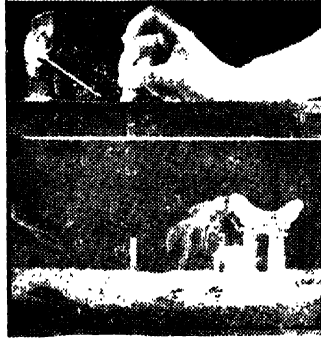
খুব সাধারণ উপায়ে অ্যাকোয়ারিয়াম পরিস্কার করা হচ্ছে

লম্বা কাচের দু'দিক খোলা নলের ওপর দিকটা আংগুল দিয়ে চেপে ধরে ঐ জিনিসটির ওপর রেখে আংগুলটি ছেড়ে দিলেই ঐ স্থানের জলটার সংগে সংগে ময়লাও নলের মধ্যে ঢুকে আসবে তখন আবার মাথাটা আংগুল দিয়ে চেপে ধরে জল ও ময়লা সুদ্ধ নলটি উঠিয়ে নিতে হবে। এইরকমে খুব সাধারণ উপায়ে অ্যাকোয়ারিয়াম পরিষ্কার রাখা হয়।

*

কোনও পরিবারের প্রত্যেকটি ছেলে মেয়ে যখন পড়াশোনা শুরু করে তখন তাদের প্রত্যেকের পেন্সিল জোগান এবং সে সব পেন্সিল সর্বদা কেটে সীস্‌ বার করে দেওয়া ছেলেমেয়েদের পিতামাতার পক্ষে এক দুরূহ কাজ হয়ে পড়ে। পার্কার কলম কোম্পানী যে সব নতুন রকম পেন্সিল বার করছে তাঁতে আর ছুরি বা ব্লেড্‌ দিয়ে পেন্সিল কেটে সীস্‌ বার করতে হবে না—এতে তরল সীসে ভরা থাকবে। অবশ্য এটাকে তরল সীসে বলা হয় না গ্রাফাইট্‌ বলা হয়। নতুন ধরনের পেন্সিলটির মধ্যে তরল গ্রাফাইট ভরা একটি টিউব থাকবে। লম্বায় চওড়ায় এটি সাধারণ পেন্সিলের সীসের মতই হবে। পেন্সিলের মুখে একটি বিন্দুর মত আকার থাকবে সেইখান থেকে গ্রাফাইট বার হয়ে লেখা হবে। একটি সাধারণ পেন্সিলে যতটা লেখা যায় গ্রাফাইটের পেন্সিলে তার চেয়ে ছয়গুণ বেশী লেখা হবে। একটি সাধারণ পেন্সিলের শেষে অন্তত দু' ইঞ্চি মত লম্বা অবস্থাতেই ফেলে দিতে হয়। কারণ খুব ছোট হয়ে গেলে ছুরি দিয়ে কাটা যায় না। গ্রাফাইটের পেন্সিলে এরকম অসুবিধা নেই কারণ এতে কাটার হাংগামা নেই আর গ্রাফাইটের শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত লেখা যায়। তাছাড়া ছোট ছেলেমেয়েদের পক্ষে ছুরি বা ব্লেড দিয়ে পেন্সিল কাটতে গিয়ে হাত কেটে ফেলার ভয়ও থাকবে না।

*

ফ্লিবীটিস্‌ নামে এক রকম রোগ আছে। এ রোগে মানুষের মৃত্যুও ঘটে থাকে। "ফ্লবীটিস" রোগের অর্থ হলো-শরীরের মধ্যের শিরাগুলি ফুলে ওঠে ফলে ফুসফুসে রক্ত জমে যায়। এর জন্য মৃত্যু ঘটে। স্বাভাবিক অবস্থায় এ রোগ ধরা খুবই মুশকিলের কথা। বর্তমানে একটি সাধারণ পরীক্ষার দ্বারাই রোগ নির্ণয় করা হয়। এই রোগ নির্ণয়ের জন্য "স্ফিগমোম্যানোমীটার" নামে একটি যন্ত্রের সাহায্যে রক্তের চাপ পরীক্ষা করতে হয়। স্ফিগমোম্যানোমীটারের সংগে নিউম্যাটিক কাফ নামে যে অংশ থাকে সেটি রোগীর পায়ের গুলে অথবা জানুদেশে জড়িয়ে দিতে হয় এবং আস্তে আস্তে সেটা ফোলাতে হয়। যদি রোগ সত্য সত্যই "ফ্লিবীটিস" রোগ হয়ে থাকে তাহলে যন্ত্রের কাঁটাটি যখন ৬০ থেকে ১৫০এর মধ্যে নড়াচড়া করতে থাকে তখন রোগী শরীরে ব্যথা অনুভব করে। স্বাভাবিক অবস্থায় ১৮০ নম্বরের নীচে কাঁটাটি থাকলে রোগী কোনও অস্বস্তি বোধ করে না। ডাক্তারদের মতে ৩৫০ রোগীকে এভাবে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এ পদ্ধতি কোন ভুল পথে চালিত করে না।

দশ নম্বর কোর্ট

শংকর

দশ নম্বর কোর্টেই জগদীশবাবুর সঙ্গে আলাপ। গোলগাল মোটা-সোটা ভদ্রলোকটি, মুখে অমায়িক হাসি। গলাবন্ধ সুতির কোট পরে যখন বসে থাকেন বাঙ্গালী বলে মনে হয় না ঠিক যেন কোন মারোয়াড়ী ব্যবসাদার। কিন্তু ব্যবসা উনি করেন না। পাবলিক প্রসিকিউটর মিস্টার পি কে রায়ের মুহুরি, আইন বাজারে খাতিরও আছে। কিন্তু এমন অমায়িক ভদ্রলোক খুব কম দেখেছি। আমার সঙ্গে দেখা হলেই পিঠে চাপড় দিয়ে বলবেন "চল চা খেয়ে আসা যাক।" আইনপাড়ায় জগদীশবাবুর পয়সায় কতবার চা খেয়েছি হিসেব রাখিনি, রাখলে আমার ভদ্রতা বোধ সম্বন্ধে অনেকেই সন্দেহ প্রকাশ করতেন। কিন্তু আমার কোন দোষ নেই, আমি চায়ের দাম দিতে গেলেই জগদীশবাবু বলতেন, "হাজার হোক বয়সে তো বড়, দোকানে মানটা নাই বা নষ্ট করলে। লোকে বলবে এক ফোঁটা একটা ছেলে বুড়োর চায়ের দাম দিচ্ছে।"

জগদীশবাবুকে কতদিন বলেছি, "আমি আর এক ফোঁটা ছেলেটি নেই, এ পাড়ার একটি ঝানু 'বাবু'তে দাঁড়িয়েছি। তিনি স্বীকার করেন নি, কাঁধে হাত দিয়ে বলেছেন, "আইনপাড়াতে আর কিছু না শেখ, বাক্যবুলিতে ওস্তাদ হয়ে গিয়েছ।" অন্য মুহুরিরা বলতেন, "লোকটার দেমাক আছে। আমাদের সঙ্গে ভাল করে কথা কয় না।" কিন্তু কেন জানি না, আমাকে দেখলেই পান চিবোতে চিবোতে হাসতে হাসতে তিনি বলতেন, "এই যে শ্রীমান, এসে গেছ। চেম্বারে ফাঁকি দিয়ে এখানে পালিয়ে আসা হয়েছে। দশ নম্বর ঘরে তোমার যে কেন ভাল লাগে জানি না। আমি তো মাঝে মাঝে হাঁপিয়ে উঠি। সমস্ত জীবনটা দশ নম্বরেই কেটে গেল। তোমরা তবু আছ ভালো, নানান কোর্টে ঘুরে বেড়াবার সুযোগ পাও!"

তর্ক করতে আমার খুব ভাল লাগে। বললাম, "আমার ইচ্ছে হয় দিনরাত দাঁড়িয়ে থাকি দশ নম্বরে। মানুষ কিছুতেই সন্তুষ্ট নয়, হলে এই ঘর ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে চাইতেন না।"

মোটা হাতটা দিয়ে আমার পিঠে একটা থাবড়া মারলেন তিনি। "ও, দুষ্টুমি করা হচ্ছে? ওরে আমিও তো সন্তুষ্ট থাকতে চাই", এবার তিনি বেশ গম্ভীর, "কিন্তু পারি কই?"

"কিছু মনে করবেন না জগদীশদা, কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে কথা বলিনি। কখনো আপনাকে মুখ ফুলিয়ে বসে থাকতে দেখিনি। রায় সায়েবের সঙ্গে কোন গোলমাল হয়েছে? তিনি কিছু বলেছেন?"

ম্লান হেসে তিনি বললেন, "না, রায়সায়েব আমার দেবতার মত লোক। কিছুই হয়নি। তবু মনে হয়, এ ঘরে যদি কোন দিন না আসতাম কোন দিন দুঃখ হতো না।"

জগদীশবাবুর সঙ্গে আমার পরিচয় আজকের নয়। মিস্টার রায় তখনো পাবলিক প্রসিকিউটর হননি। জগদীশ-বাবু এত মোটা ছিলেন না। দশ নম্বরে দিনরাত না বসে থেকে মাঝে মাঝে অন্য কোর্টে বেড়াতে যেতেন। আজকাল তো চা খাওয়ার সময় ছাড়া ওখান থেকে একটি পা-ও নড়বেন না। দশ নম্বর ঘরের স্মৃতির সঙ্গে জগদীশবাবু অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে গেছেন। হয়ত আমার দুর্বলতা, কিন্তু তাঁকে ছাড়া দশ নম্বর কোর্টকে এবং দশ নম্বর কোর্ট ছাড়া তাঁকে কিছুতেই কল্পনা করতে পারি না।

অনেক দিন আগে ব্যারিস্টারের বেঞ্চিতে বসে ছোকাদার সঙ্গে গল্প কর-ছিলাম। তাঁকে বলছিলাম, "এই বেঞ্চিতে বসে থাকলে প্রতি মিনিটে গল্পের খোরাক পাওয়া যায়। কত রকম লোকের আনা-গোনা চলে চোখের সামনে।"

ছোকাদা ঘাড় নেড়ে বললেন, "পরম-হংসদেবের সেই সাধুর গল্প শুনেছিস তো? যে বলেছিল সামনে এগিয়ে যা, তারপর প্রথমে তামার খনি, আরও সামনে

রূপোর খনি এবং আরও এগিয়ে সোনার খনি পাওয়া গেল। আমি পরমহংস নই, সুতরাং বিশ্বাস হবে না। কিন্তু আমিও বলছি তোকে সামনে এগিয়ে যা, অনেক কিছুর সন্ধান পাবি।"

ছোকাদাকে কোনদিন অবিশ্বাস করিনি। বার লাইব্রেরীর বারান্দা ধরে তাই সোজা এগিয়ে গিয়েছি। প্রথমে বার এসোসিয়েশন, আরও এগিয়ে কাঠের পোল পেরিয়ে হাইকোর্টের আরেক অংশ, দশ নম্বর কোর্ট। সামনে পুলিসের ভিড়, থম-থমে ভাব—দায়রা কোর্ট। মূল আদালতের সঙ্গে যেন কোন আত্মার সম্বন্ধ নেই, তাই অস্পৃশ্যের মত আসল বাড়ি থেকে দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

দশ নম্বর ঘরের সামনে থমকে দাঁড়াই। দরজায় পুলিস রয়েছে। ভিতরে ঢুকতে দেবে তো? না কোন বাধা নেই। অন্য কয়েক জনের সঙ্গে আমিও ভিতরে ঢুকে পড়লাম। বিরাট হলঘর। মনে হয় যেন অতি প্রাচীন। জনকয়েক সার্জেণ্ট অতি সন্তর্পনে পা ফেলে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আকারের তুলনায় লোকজন খুব বেশী নেই ঘরটিতে।

দরজা থেকে অনেক দূরে বিচারকের আসন। মস্ত বড় এক পুরোন আমলের চেয়ারে তাঁকে দেখা যাচ্ছে। তাঁর পোশাক অন্য জজেদের মত কালো নয়, টকটকে লাল। পাশেই লম্বা সারিতে জুরীদের আসনে আট-ন'জন চোখে-চশমা গম্ভীর মুখ ভদ্রলোক।

দূরে একটা মস্ত কাঠের খাঁচার ভিতর ঝাঁকড়া চুল আর গালভর্তি দাড়ি সমেত একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। দর্শকরা তার দিকে এমনভাবে চেয়ে দেখছে, যেন চিড়িয়াখানার খাঁচায় বন্দী সুন্দরবন থেকে নতুন আনা বাঘ—দেখার মজা খুব থাকলেও খাঁচা ভেঙ্গে বেরিয়ে আসার ভয় আছে। এ লোকটাও খাঁচা ভেঙ্গে ফেলতে পারে ইচ্ছে করলে, দৈত্যের মত চেহারা।

জজসায়েবের রক্তরাঙ্গা পোশাকে কালো মোটা ফ্রেমের চশমাটা জ্বলজ্বল করছে। ঘরটির কোণে কোণে অন্ধকার জড়ো হয়ে রয়েছে, সকাল দশটা না সন্ধ্যা ছ'টা বোঝা দায়। গাটা ছমছম করতে থাকে।

একজন সাক্ষী কাঠগোড়ায় দাঁড়িয়ে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন। ডাক্তারী কথা সব বোঝা যায় না—রিগর মর্টিস, থোরাক্স। কালো গাউন-পরা প্রশ্নকর্তাও যেন ডাক্তারী শাস্ত্রে পণ্ডিত, অবলীলাক্রমে ডাক্তারকে চ্যালেঞ্জ করছেন।

গলাবন্ধ কোট পরে এক ভদ্রলোক আমার সামনে দাঁড়িয়েছিলেন, তিনিই জগদীশবাবু, তখন জানতাম না। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, "আসামী কে?"

ভদ্রলোক আমাকে আড়চোখে দেখে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, "কার্তার সিং। বাস ড্রাইভার কার্তার সিং বালীগঞ্জে রাত বারোটায় জোড়া-খুনের দায়ে ধরা পড়ে। বেটারা জানের মায়া করে না। কোনো উকিল দেয়নি মশাই। শেষ পর্যন্ত কোর্ট থেকে আমার সায়েবকে কেস্‌টা করতে বলায় উনি ডিফেন্ড করছেন।"

"ওর কে কে আছে? আত্মীয়স্বজন কেউ নেই এখানে?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

"কে জানে মশায়, বেটার সাতকুলে কেউ আছে মনে হয় না। বেটারা সেই ভোরে বাস চালাতে আরম্ভ করে আর রাত এগারটা পর্যন্ত নিস্তার নেই। মধ্যিখানে শুধু দুবার পেটপুরে মাংস রুটি টেনে নেয়। বাসই ওদের ঘরবাড়ি, রাত্রেও বাসে ঘুমোয়।"

"কেস্ কেমন মনে হচ্ছে?"

"আমি কি মশাই গনৎকার? কার্তার সিং তো হাজতে আমার সায়েবকে বলেছে ওকে মিথ্যে ক'রে মামলায় জড়িয়েছে। এসব মামলায় তদ্বিরই সব। সাক্ষীসাবুদ কে যোগাড় করবে মশাই?"

প্রায় সাড়ে এগারটা বাজে। বার লাইব্রেরী থেকে বই নিতে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, আর দেরি করা যায় না। সায়েব চেম্বারে অপেক্ষা করছেন, তাই চলে আসতে হলো। কিন্তু চেম্বারে ফিরেও কার্তার সিং-এর ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া চুল ও লাল চোখকে ভুলতে পারলাম না। পৌনে চারটের সময় বার লাইব্রেরীতে বই ফেরৎ দেওয়ার অছিলায় দশ নম্বর কোর্টে ফিরে এলাম। দরজা ভেজান ছিল, ভিতরে ঢুকে দেখি কোর্ট জনমানবশূন্য। জজসায়েব, জুরি, উকিলবাবু কেউ নেই। কার্তার সিং-এর খাঁচাও খালি, কেবল গোটাকয়েক পায়রা বেআইনীভাবে ভিতরে প্রবেশ করে ঝটাপটি করছে। কোন ভয়, কোন সম্ভ্রমবোধ নেই তাদের। জজসায়েবের চেয়ারে বসে বকুম-বকুম শব্দ করে আবার কার্তার সিং-এর খাঁচার উপর ভারিক্কি চালে বসে রইল, আমার দিকে নজর দেওয়ার কোনো প্রয়োজনই বোধ করল না তারা। চারটের আগে কেস বন্ধ হয়ে গেল কি করে, বুঝতে পারলাম না।

জিজ্ঞাসা করার মত কাউকে না পেয়ে বেরিয়ে আসছিলাম, এমন সময় গলাবন্ধ কোট-পরা ভদ্রলোকটির সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। "ভালই হলো, আপনাকে খুঁজে-ছিলাম।"

"চারটের আগেই কোর্ট বন্ধ হয়ে গেল কেন?" আমি ভদ্রলোককে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেস্ তো খানিকক্ষণ আগেই শেষ হয়ে গেছে। কার্তার সিং-এর পনের বছর জেল।"

বোকার মত আমি জিজ্ঞাসা করে ফেলেছিলাম, "আপনার সায়েব কার্তার সিংকে বাঁচাতে পারল না?" তিনি হেসে

ফলালেন। "বাঁচাবার মালিক তো আমরা নই, সব ওই ওপরের ভদ্রলোকের খেলা"—ভদ্রলোকটি আঙগুলটা এমনভাবে উপরের দিকে তুললেন যে, মাথার ছাদ ফুঁড়ে আকাশের ওধারে যিনি থাকেন, তাঁর কথাই বলা হচ্ছে বুঝতে কণ্ট হলো না। আঙগুলটা নামিয়ে আমাকে প্রায় আধ-মিনিটকাল নিরীক্ষণ করলেন তিনি। "ক্রিমিন্যাল কেসে আপনার খুব আগ্রহ দেখছি। সকালে এসেছিলেন, আবার এবেলায় এলেন। আমার নাম জগদীশ বোস, তবে স্যর জগদীশ নই", জগদীশবাবু উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। হাসির ঝড় শান্ত হলে জিজ্ঞাসা করলেন, "আপনার নাম কি? কোথায় কাজ করেন?"

নাম-ধাম ও পরিচয় দিতেই জগদীশবাবু আমার হাতটা চেপে ধরলেন। "আরে তুই নাকি? আপনার সায়েবের সঙ্গে আমার সায়েবের খুব ভাব। আমাদের আসল আলাপ তাহলে অনেক দিনই হয়ে আছে, শুধু পরিচয় নেই, এই যা।"

সেই থেকেই আলাপ।

জগদীশবাবু বলেছিলেন, "সময় পেলেই আসবেন মশায়।"

সময় পেলেই ছুটে যেতাম তাঁর কাছে। হাইকোর্টের সঙ্গে জগদীশবাবুর অনেক দিনের পরিচয়, বিশেষ করে এই দশ নম্বর কোর্টের নাড়িনক্ষত্র তাঁর জানা আছে। তিনি একদিন বলছিলেন, "দেখুন এই দশ নম্বর কোর্টে টাকাকাড়ির কোন কাজ নেই। দশ হাজার কিংবা কুড়ি হাজার টাকার ডিক্রী নয়। আট, দশ কিংবা চোদ্দ বছরের জেল তো মশাই হামেশা হচ্ছে। কখনও যাবজ্জীবন কারাদণ্ড।"

আমি অবাক হয়ে শুনছিলাম। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড!

জগদীশবাবু অবিলম্বিতভাবে বলছিলেন, "ওইখানে থামলেও বা কথা ছিল। কখনও বা......নাঃ থাক।" জগদীশবাবু থেমে গেলেন।

"কেন বলুন না, বেশ ইচ্ছিল তো" তাঁকে বললাম।

"না, থাক। সে-সব শুনিয়ে ছোট ছেলের মন খারাপ করিয়ে দিতে চাইনা।" তিনি সস্নেহে আমার দিকে চাইলেন। "সর্বনাশা ঘর এটা। কত লোককে ভয় পাইয়ে দেয়। ঠিক নয়? এই যে আমি, আজ না হয় সয়ে গেছে। কিন্তু প্রথম যখন এসেছিলাম?" কথা থামিয়ে পকেট থেকে পান বার করলেন, আমাকেও একটা দিলেন।

আবার আরম্ভ করলেন, "এই দশ নম্বর কোর্টেই প্রথম থেকে কাজ। রাত্রে ঘুমের ঘোরে চমকে উঠতাম। ভয় লাগত। চোর-ডাকাত, খুন-খারাপী যত সব নোংরা ব্যাপার, অথচ ওই খাঁচায় ঢুকলেই আসামীগুলো নেতিয়ে পড়ে। মনটা ঝিমিয়ে যেত। কিন্তু ওই যা বলছিলাম, সব সাময়িক ব্যাপার। ক্রমশ সব সয়ে যায়, আপনারও যাবে।" জগদীশবাবু আমাকে আশ্বাস দিলেন।

"যত পারেন দেখে যান", জগদীশবাবু আর একদিন বলছিলেন। "শুধু দেখে যান। আজকাল কেসও অনেক বেড়েছে। কলকাতা শহরে ফৌজদারী মামলা অনেক হচ্ছে। আর কত রকমের মামলা, কত বিভিন্ন পদ্ধতিতে খুন। বুঝলেন মশায়, নেহাৎ গোবেচারা লোকগুলো দা কিংবা তলোয়ার দিয়ে খুন করে। এখন বৈজ্ঞানিক উপায়ে কাজ। খুন-জখম, নোট জাল থেকে পকেটমারা পর্যন্ত সায়েন্সের ব্যাপার, ধরা শক্ত। কিন্তু ধরা পড়লেই পুলিস কোর্ট এবং তাঁরা বাছাই করে কিছু এখানে পাঠিয়ে দেন। একদিন সকালের দিকে আসবেন কোর্ট বসার আগে, গোড়া থেকে একটা কেস দেখলে ভাল লাগবে।"

ঠিক দশটায় দশ নম্বরে জগদীশবাবুর সঙ্গে বেঞ্চিতে বসলাম একদিন। তখনও বিশেষ কেউ আসেনি। টেবিল চেয়ার সব খালি, নাটক আরম্ভ হবার পূর্বে রঙ্গমঞ্চ যেমন দেখায়। বেলা সাড়ে দশটায় কয়েকটি পুলিস অফিসার ঢুকে পড়লেন ঘরের মধ্যে। নীচে রাস্তায় তাঁদের কালো রঙের বিরাট গাড়িটা গর্জন-শেষে খানিকটা ধোঁয়া ত্যাগ করে থেমে গেছে। কোটপরা দু-একজন কর্মচারীও হন্তদন্ত হয়ে এসে নিজেদের কাজ আরম্ভ করলেন, আরও কয়েকজন ভদ্রলোক উকিলদের জন্য রক্ষিত চেয়ারগুলো দখল করে বসলেন। বন্ধ দরজাটা হঠাৎ খুলে গেল। সারি বেঁধে কারা যেন আসছেন।

সামনের লোকটির হাতে ন্যায়দণ্ড, পিছনে লাল পোশাকে জজসায়েব। তাঁর পিছনে আর একজন, জগদীশবাবু বলে দিলেন সামনের লোকটি শেরিফ। জজসায়েবের পাশে তাঁরাও আসন গ্রহণ করলেন। এমন সময় এক ভদ্রলোকের তারস্বর চারিদিকের দেওয়ালে প্রতিধ্বনিত হলো—ইয়া ইয়া ইয়া, অল্ পার্সনস্ দোজ হ্যাভ্ এনিথিং টু ডু উইথ মাই লর্ড দি জাস্টিস প্রিজাইডিং ওভার দীজ সেশনস্ কাম নিয়ার এণ্ড গিভ্ ইওর অ্যাটেনশন। ঘোষকের কণ্ঠস্বর এক অশ্রুতপূর্ব শব্দ-ঝঙ্কারের সৃষ্টি করে। তোমরা এস। কাছে এস। মাই লর্ড দি জাস্টিস দোষী-দের দণ্ডবিধান করবেন, তোমরা এস।

খাঁচার মধ্যে একজনকে এতক্ষণে দেখতে পাওয়া গেল। একে একে ন'জন জুরিও শপথ গ্রহণ করে তাঁদের নির্দিষ্ট আসনে বসলেন। তাঁরা বাইরের লোক—কেউ অফিসের কেরানি, কেউ স্কুল-মাস্টার, কেউ বা অধ্যাপক। সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে তাঁরাই বিচার করবেন আসামী দোষী অথবা নির্দোষ। মামলা আরম্ভ হতেই আমি ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম, চেম্বারে ফিরতে হবে।

জগদীশবাবু বলে দিলেন, "আবার আসবেন মশায়।"

তারপর কতদিন কেটে গেছে। জগদীশবাবু আমাকে 'মশায়' বলা ছেড়ে দিয়েছেন। সম্বোধনটা আপনি থেকে তুমি, তুমি থেকে শ্রীমানে পর্যবসিত হয়েছে শেষ পর্যন্ত। জগদীশবাবুর সায়েব মিস্টার রায় আসামী পক্ষ ছেড়ে
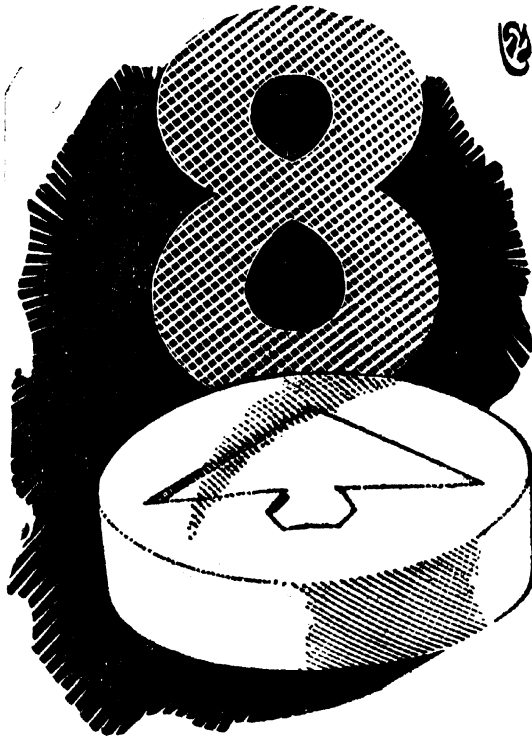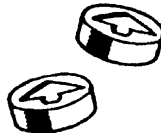
দরকারের প্রসিকিউটরের কাজ নিয়েছেন। য লোক আগে আইনের হাত থেকে আসামীকে ছিনিয়ে আনতেন, তিনিই আজ তাকে দোষী প্রমাণে ব্যস্ত। মিস্টার রায়কে কতবার কোর্টে দেখেছি, আমাকে দেখলেই মৃদু হেসে চোখটা টিপে যেতেন তিনি। পঞ্চাশ পেরিয়ে গেছেন বেশ কয়েক বছর। টাক আর চুল নিজেদের মধ্যে আপসে ভাগ বাঁটোয়ারা করে মাথাটা পার্টিশন করে নিয়েছে।

জগদীশবাবু কিন্তু একটুও পালটাননি। "এই যে শ্রীমান, অনেকদিন আসা হয় না কেন? চল একটু চা খেয়ে আসা যাক।" জগদীশবাবুর সঙ্গে চা খেয়ে এসেছি। একদিন অভিমান করে বললাম, আমিই শুধু আপনার কাছে আসি। আপনি তো টেম্পল চেম্বারে আসেন না একবারও।"

ছেলে বটে, সবকিছু হিসেব করে রেখেছে। আচ্ছা, যাব।" জগদীশবাবু হেসে বললেন। কথা রাখতে টেম্পল চেম্বারে জগদীশবাবু সত্যি একদিন এলেন। আমার আনন্দের সীমা নেই। সায়েব ভেতরে ছিলেন। তিনি হঠাৎ বেরিয়ে এলেন। হ্যাললো শংকর, আজ যেন খুব খুশী মনে হচ্ছে।"

"অনেক কষ্টে আজ এঁকে আনতে পেরেছি।" জগদীশবাবুর পরিচয় দিলাম সেই সঙ্গে।

"কেমন আছে পি কে," সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন। "আমরা অনেক দিনের বন্ধু। দশ নম্বরে দুজনে একসঙ্গে অনেক কেসও করেছি।" জগদীশবাবুর সঙ্গে অনেক কথা বললেন তিনি।

"পাবলিক প্রসিকিউটরের মুহুরি হতে কেমন লাগছে, জগদীশবাবু?" আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

গম্ভীর হয়ে উঠলেন তিনি, "বেশ ছিলাম আগে। এখন খাতির বেড়েছে কিন্তু শান্তি নেই। ভাল লাগছে না"। জগদীশবাবু কোন কারণ বললেন না, আমারও জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না।

জগদীশবাবুর খোঁজে দশ নম্বরে আবার গিয়েছি কিছু দিন পরে। এবার খাঁচার মধ্যে বছর পঁয়তাল্লিশের একটি শীর্ণ লোক, লোকটি বাঁ হাতে নিজের চোখ দুটি ঢেকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

"বুড়ো বয়সে ভীমরতি, নচ্ছার", জগদীশবাবু নিজেই বলছিলেন।

"কিসের কেস?"

"থ্রি সেভেনটি এইট।"

"সে আবার কি, এতদিন তো শুধু ফোর-টোয়েণ্টি জানতাম।"

"থাক্ আর জেনে দরকার নেই," জগদীশবাবু আমাকে বললেন। তারপর নিজের মনে বললেন, "আহা নিষ্পাপ অবোধ শিশু।"

লোকটি তখনও মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। দূরের বেঞ্চিতে একটি আট দশ বছরের মেয়েকে কোলে করে একটি হিন্দুস্থানীয় ভদ্রমহিলা। পাশেই আর একটি মহিলা, ঘোমটায় সব ঢাকা, ঠিক যেন কলা-বৌ। বয়স কত, বাঙ্গালী না হিন্দুস্থানী ভদ্রমহিলা। পাশেই আর একটি ময়লা শাড়ি হলেও লাল পাড়টা জ্বল জ্বল করছে। দশ নম্বর কোর্টে কেমন একটা থমথমে ভাব।

জুরিরা নিশ্চয়ই তাঁদের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিয়েছেন। কেননা জজ সায়েব খাঁচার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন "প্রিজনার অ্যাট দি বার, তুমি এক জঘন্য অপরাধে অভিযুক্ত......জুরিরা একবাক্যে তোমাকে অপরাধী সাব্যস্ত করেছেন।..... সৌভাগ্যের বিষয় সমাজে তোমার মত অপরাধী বেশী নেই তোমার দশ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড......।"

কিন্তু বিচারকের কণ্ঠস্বর হঠাৎ কার কান্নার মধ্যে ডুবে গেল। চমকে ঘাড় ফেরালাম। ঘোমটার ভিতর থেকে মহিলাটি ডুকরে কাঁদছেন। আসামী তখনও মুখ ঢেকে দাঁড়িয়ে আছে। সাদা পোশাকে দুজন সার্জেণ্ট তাকে ঘিরে দাঁড়াল। অবগুণ্ঠিতা মহিলাটি অশ্রু সংবরণের ব্যর্থ চেষ্টা করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন, আসামীও অন্য দরজা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল কয়েক মুহূর্তের মধ্যে।

এডভোকেটের কালো গাউনটা হাতে জড়াতে জড়াতে মিস্টার রায় চেয়ার ছেড়ে উঠতেই জগদীশবাবু তাঁর হাত থেকে

ব্রীফটা নিয়ে নিলেন। দশ নম্বর ঘরের অন্যতম নায়ক মিস্টার রায়ের নিষ্ক্রমণ পথের দিকে তাকিয়ে রইলাম। উদাস নয়নে পুরু লেন্সের চশমার ভিতর দিয়ে মিস্টার রায় যখন শিশুর মত চেয়ে থাকেন, কে বলবে ইনি ক্রিমিন্যাল বারের মুকুটমণি। তাঁর হাত থেকে আসামীর নিষ্কৃতি স্বপ্নের ব্যাপার। নিপুণভাবে জাল পেতে তিনি ধীরে ধীরে গুটিয়ে আনেন। অকাট্য যুক্তিতে জুরিদের সামনে আসামীদের অপরাধগুলি তুলে ধরেন—সোনা চোর......ডাকাত......ব্যাংক লুটের সর্দার......জালিয়াত। আমি আর তাঁকে ক'বার দেখেছি, দেখেছেন জগদীশবাবু আর ওই সাদা পোশাকের কটা চোখ অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সার্জেণ্টটি। সে জানে খাঁচার ভিতর থেকে আসামীরা কেমন সন্ত্রাসে মিস্টার রায়ের দিকে চেয়ে থাকে। সে জানে মিস্টার রায়ের কেসে কতবার তাকে খাঁচা খুলে বলতে হয়েছে, 'তুমি মুক্ত'; আর কতবার তাকে ধীরে ধীরে রিভলবার বেল্টের সামান্য স্পর্শ অনুভব করে আসামীকে ঘিরে দরজার দিকে যেতে হয়েছে।

"এ সপ্তাহে একটা আসামীও খালাস পায়নি।" জগদীশবাবু খুব গর্বের সঙ্গেই বললেন।

"প্রত্যেকটা কেসে সাক্সেস।" পিঠে একটা চাপড় বসিয়ে দিলেন তিনি। "চল একটু চা খেয়ে আসা যাক্।"

দুহাতে পয়সা রোজগার করছেন জগদীশবাবু। কিন্তু আজকাল সারাক্ষণ শুক্নো মুখে বসে থাকেন। সর্বদাই কোন চিন্তা মনে লেগে আছে। জগদীশবাবু অকৃতদার, সুতরাং সংসারের ঝামেলা প্রায় কিছুই নেই। রামজী হাজরা লেনে তাঁর পৈতৃক বাড়িতে অন্য ভাইদের সঙ্গে থাকেন। ভাইপোর অন্নপ্রাশনে সেখানে নেমতন্ন খেয়ে এসেছি। বাড়ির অবস্থা বেশ ভালই।

"এখন রায় সায়েবের বাড়িতেই থাকছি। অনেক কাজকর্ম, মাঝে মাঝে বাড়ি যাই।" জগদীশবাবু বললেন।

"কিন্তু সবসময় কিছু যেন চিন্তা করছেন মনে হয়।"

তিনি হাসলেন, "বেশ ছিলাম আগে। এখন মোটেই ভাল লাগে না। সায়েব যেন কি রকম হয়ে পড়ছেন। আমি বলে রাখলাম, বেশী দিন বাঁচবেন না। আমি বুঝে উঠতে পারছি না।" জগদীশবাবু মাথাটা নাড়লেন।

"আমরা তো বাইরে থেকে কিছু বুঝি না।" আমি বললাম।

"ভিতর থেকে আমি ঠিক বুঝি," জগদীশবাবু উদাসভাবে বললেন। "অন্য কিছুতে গোলমাল নেই। যত নষ্টের গোড়া মার্ডার কেস। ওনার মাথা ঠিক থাকে না। রাতে ঘুম নেই। মাঝরাত পর্যন্ত বাড়ির বারান্দায় পায়চারী করেন। কেউ কাছে গেলে তেড়ে ওঠেন। পাতে ভাত পড়ে থাকে খেতে পারেন না। অনিদ্রার ফলে চোখগুলো লাল হয়ে থাকে। এমন করলে লোক বাঁচে? কিন্তু কেন এমন হয়?" জগদীশবাবু বুঝতে পারেন না। "মন্ত্র-শক্তি? উঁহু। কিংবা হলেও হতে পারে।"

তাঁকে বোঝালাম, "আপনি অযথা ভাবছেন। আসলে হয়ত কিছুই নয়।"

কিন্তু আমার প্রবোধবাক্যে কিছুই হয়নি, মাসখানেক পরে জগদীশবাবুর চেহারা দেখেই বুঝলাম, দেহটা আরও শুকিয়ে গেছে। আমাকে দেখেই চায়ের দোকানে নিয়ে গেলেন। চায়ে চুমুক দিয়ে বললেন, "ভাল লক্ষণ নয়। আমার মাথা গুলিয়ে উঠছে।" জগদীশবাবুকে কোন দিন এত উতলা দেখিনি। "কাউকে বোল না, তোমাকে গোপনে বলছি।" জগদীশ-বাবু বলতে লাগলেন—"সেদিন তখন সন্ধ্যে সাতটা হবে, রায়সায়েব বই পড়ছেন। আমি চুপচাপ বসে আছি। বাইরে অঝোরে বৃষ্টি নেমেছে। এমন সময় বাইরের দরজা ঠেলে একটি মেয়ে সোজা ভিতরে ঢুকে পড়ল। ঘোমটায় কিছুই দেখা যায় না, এক-বার শুধু নাকের রুপোর নথটি দেখতে পেলাম। বাইরে রিক্সা দাঁড়িয়ে, বৃষ্টির জলে ভিজে কাপড়টা দেহের সঙ্গে সাপটে লেগে রয়েছে। মেয়েটি প্রথমেই আচমকা সায়েবের পা জড়িয়ে ধরল। "আপনাকে বাঁচাতেই হবে।" তিনি কোন রকমে পা-টা ছাড়িয়ে নিলেন। "আমার স্বামী খুনের আসামী।"

"জগদীশ" রাগে রায়সায়েবের গলা কাঁপছে। "এখনই, এইমুহূর্তে চলে যেতে বল।" তাঁর চোখ দুটো আগুনের মত জ্বলছে।

"খুব বে-আইনী কাজ করতে এসে ছেন, এখনি চলে যান," আমি বললাম।

মেয়েটি তবুও নড়ল না, বলতে লাগল। "আপনার দয়ায় একটি সংসার রক্ষে পাবে......"

দাঁতে দাঁত চেপে রায়সায়েব আমাকে ডাকলেন, "জগদীশ"।

মেয়েটি চমকে উঠে একপা পিছিয়ে গেল। কয়েক মুহূর্তের দোমনার পর সে আবার এগিয়ে গেল, রায়সায়েবের দিকে কিন্তু সভয়ে আবার দরজার কাছে সরে গেল সে। ঘোমটার ভিতর থেকে সরু গলায় বলল, "বাইরে যে বৃষ্টি পড়ছে"।

"তবুও যেতে হবে এবং এখনই" আমার আগেই রায়সায়েব বলে দিলেন।

মেয়েটি বেরিয়ে গেল। বৃষ্টি পড়ছে আরও জোরে। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে মাঝে মাঝে। প্রচণ্ড শব্দে কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল। হঠাৎ রায়সায়েব চেয়ার থেকে তড়াক করে উঠে পড়লেন। "জগদীশ, মেয়েটাকে ডাক"।

"কোথায় ডাকব স্যার? সে অনেক ক্ষণ চলে গেছে।"

"না না ওসব জানি না। এখনি ডাকো। কেন তাকে যেতে দিলে।"

"আপনিই তো বললেন।"

কিন্তু রায়সায়েব শুনলেন না। বৃষ্টির মধ্যে খোঁজ করতে বেরিয়ে পড়লাম। রাস্তায় একটা কুকুর পর্যন্ত নেই। হেড-লাইট জেলে একটা মোটর অন্ধকারের বুক চিরে হুস করে বেরিয়ে গেল।

মিনিট দশেক জলে ভিজে যখন ফিরলাম, তিনি তখন পায়চারী করছেন। "তাকে খুঁজে পেলাম না স্যার"। রায়-সায়েব আমার কথা শুনতে পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই। চোখটা বন্ধ করে বললেন, "বেশ, ভাল কথা। কিন্তু কেন খুঁজে পেলে না"। আমি আরও ভয় পেলাম। চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছি। উত্তর মনে আসছে না।

হঠাৎ যেন ঘুম থেকে জেগে উঠলেন রায়সায়েব। হাহা করে হাসতে লাগলেন তিনি। "কি আবোল তাবোল বকছিলাম। এঃ একেবারে ভিজে নেয়ে গেছ।" এতক্ষণে আমার দিকে নজরের সময় হলো। "এখনি জামা-কাপড় ছেড়ে এস, নইলে অসুখ বাধিয়ে বসবে।"

জগদীশবাবু দুঃখের সঙ্গে বললেন, "এমন লোকের সঙ্গে কাজ করা

ঝকমারি,......অন্য সময় কোন গোলমাল নেই। কিন্তু মার্ডার কেসে সব উল্টে যায়। সমস্ত রাত ধরে কেস তৈরী করবেন। অথচ ভোর পাঁচটায় ওঠা চাই। সাড়ে পাঁচটায় ঘোড়ার গাড়িতে কাশীমিত্তিরের ঘাট। আমিও সঙ্গে যাই। স্নান করি। কপালে চন্দন তিলক কেটে বাড়ি ফিরেই পুজোতে বসেন—পাক্কা একঘণ্টা গৃহদেবতা রাধা-গোবিন্দ জিউ-এর সেবা।

এসব লোকের এ লাইনে আসা উচিত হয়নি।" জগদীশ নিজের মনে বললেন।

আবার দশ নম্বরে গেছি।

খাঁচায় জালিয়াত গণপতি চাটুজ্যে। দশ টাকার নোটের ছাপাখানা খুলেছে বাড়িতে। গণপতির পক্ষে বড় এড্‌ভোকেট রায়সায়েবের সঙ্গে জোর যুদ্ধ চালাচ্ছেন।

খাচায় ঝিমুচ্ছে বাবরি চুলওয়ালা, রোগা গণপতি চাটুজ্যে।

মামলায় ফল কী হবে, আন্দাজ করতে ইচ্ছে হয়। গণপতি চাটুজ্যে হয়ত জালিয়াত নয়, খালাস পেয়ে যাবে। কিংবা দশটি বৎসর শ্রীঘর। কেউ বলতে পারবে না কী হবে। জগদীশবাবু থাকলে আমরা ভাগ্য পরীক্ষা করতাম, দুটো আঙ্গুল কপালে ঠেকিয়ে এনে আমার মুখের সামনে ধরবেন, আমি একটা আঙ্গুল ধরব। উনি বলবেন, "নাঃ বেটা এ যাত্রা ফক্কা পেয়ে গেল।" জগদীশবাবু কোর্টে নেই।

বেরিয়ে এলাম। উটের মত লম্বা ও রোগা গণপতি চাটুজ্যে খাঁচায় দাঁড়িয়ে রইল।

"ক্রিকেট খেলার মত গ্লোরিয়স আন-সার্টেনটি। অনিশ্চয়তা।" সায়েব আমাকে কবার বলেছিলেন। "জুরিরা কি মত দেবে বলা যায় না। কতবার সুফল আশা করে নিরাশ হয়েছি। কখনও ঠিক উল্টো।"

একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছিলেন—

"ঐ দশ নম্বর ঘরেই অনেক দিন আগে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। এখানকার এক হাসপাতালের দুজন ঝড়ুদার আসামী। নরহত্যার অভিযোগ।

দুপক্ষের মামলা শেষে জজ জুরিদের দিকে চেয়ারটা সামান্য ঘুরিয়ে নিলেন, এক ঘণ্টা ধরে সমগ্র মামলাটি যখন বিশ্লেষণ করা শেষ হলো ফলাফল আন্দাজ করতে পারলাম সহজেই। জুরিরা ভিতরে চলে গেলেন, নিজেদের মধ্যে আলোচনার জন্য। সারাদিনের পরিশ্রমে মন অবসাদে পূর্ণ। হাসপাতালের একদল ঝাড়ুদার কোর্টে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তারাই চাঁদা তুলে মামলার খরচ চালাচ্ছে। কিন্তু কোন আশা নেই, আমি বেরিয়ে এলাম।

শীতের অকাল সন্ধ্যা গাঢ়ভাবে নেবে এসেছে। হাইকোর্টের অন্য কোথাও লোক-জন নেই। ক্লান্তিতে দেহ আর চলতে চায় না। সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রীটও প্রায় জনমানব শূন্য। কোনরকমে অনিচ্ছুক দেহটা টানতে টানতে টেম্পল চেম্বারের লিফ্‌টে এসে দাঁড়ালাম।

চেম্বার বন্ধ। চাবি দিয়ে দরজা খুলে ভিতরে সুইচ হাতড়াতে লাগলাম, শেষ-পর্যন্ত একটা আলো হাই তুলে আড়মোড়া ভেঙ্গে জ্বলে উঠল। গাউনটা টেবিলে পড়ে রইল। সমস্ত দিনের ঘনীভূত ক্লান্তিতে টেবিলে মাথা রেখে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি বুঝতে পারিনি। আচমকা ঘুমে ব্যাঘাত পড়ল। টেম্পল্ চেম্বারে কাঠের সিঁড়ি বেয়ে কারা যেন উন্মাদ বেগে ছুটে আসছে। ক্রমশ শব্দ আরও কাছে এগিয়ে আসছে। অজানা আশঙ্কায় মনটা ভরে উঠল। ড্রয়ার থেকে রিভলবার বার করব

কিনা ভাবছি। ধুপ ধাপ, দুদ্দাড় শব্দ প্রায় উপরে এসে গেছে। একদল লোক বন্যার জলের মত আমার ঘরে ঢুকে পড়েছে। ঢুকতে বারন করলাম, কেউ শুনল না, হঠাৎ বুঝতে পারলাম আমার পায়ের ধুলো মাথায় স্পর্শ করছে। "আমরা দুজনে ছাড়া পেয়েছি" একজন ঝাড়ুদার হিন্দীতে বলল।"

সায়েব অবাক হয়ে গেছেন, জুরিরা অপ্রত্যাশিতভাবে আসামীদের মুক্তি দিয়েছেন।

জগদীশবাবুকে বলেছি এ-গল্প।

"আমিও দেখেছি অনেকবার। জীবন ও মৃত্যু কখনও কখনও একটা সুতোর উপর ঝুলে থাকে।" জগদীশবাবু বলেছিলেন,

লোভ সামলাতে পারলাম না। "আচ্ছা কতবার মৃত্যুদণ্ড দিতে শুনেছেন আপনি?" জিজ্ঞাসা করে বসলাম জগদীশ-বাবুকে।

"সে কি আর গুনে রেখেছি ভাই।" জগদীশবাবু মনে মনে হিসেব করতে লাগলেন। "ঠিক বলতে পারছি না। কিন্তু অনেকবার হবে।"

"চল চা খেয়ে আসি।" তিনি বললেন।

"একটু পরে খাওয়া যাবে, এখন গল্প হোক।"

"তবে একটা পান খাই।" পান চিবোতে লাগলেন জগদীশবাবু, পান চিবোন থেমে গেল কিছুক্ষণের জন্য। আবার আরম্ভ হলো একটু পরে, যেন কিছু ভাবছিলেন।

"তুমি তো রাজ্যের খবর রাখ। হয়ত বলতে পারবে, মৃত্যুদণ্ডের পর আসামী-দের কোথায় নিয়ে যায়, মাঝে মাঝে জানতে ইচ্ছা হয়, তুমি কিছু জান?"

আমি কিছুই জানতাম না। জগদীশ-বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিতে পারিনি।

কিন্তু অনেকদিন পরে জানবার সুযোগ পেয়েছিলাম। জানতে পেরে প্রথমেই জগদীশবাবুর কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু তখন কোথায় জগদীশ-বাবু? আচ্ছা ঘটনাটা বলে নিই আগে, তারপর সেকথায় আসা যাবে।

টেম্পল চেম্বারে একটি পোস্টকার্ড এসেছিল, ইংরিজীতে লেখাঃ—

আলীপুর সেণ্ট্রাল জেল

ডিয়ার মিঃ—

আমি মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী। আপনি দয়া করিয়া অন্ততঃ একবার দেখা করিতে আসিবেন। আপনার জন্য আমি পথের দিকে তাকাইয়া থাকিব। আসা চাইই। ইতি—

রাম সিং

চিঠিটা পড়েই সায়েব আলীপুরে ফোন করলেন। "শংকর, আমরা লাঞ্চের পরই সেণ্ট্রাল জেলে যাব।"

আলীপুর জেলের গেটের সামনে আমরা যখন গাড়ি থেকে নামলাম, প্রায় দুটো। সায়েবকে অভিবাদন জানিয়ে দ্বার-রক্ষী সার্জেণ্টটি লৌহ-কপাট উন্মুক্ত করলেন। একটা বড় খাতায় আমাদের নাম ও ঠিকানা লিখতে হলো।

"মিঃ—, আপনি কি এখনই দেখা করতে চান?"

"হ্যাঁ, তাহলে ভালই হয়।"

সার্জেণ্টের সঙ্গে আমরা চললাম। সামনে আর একটি বিশাল লৌহ-কপাট। পাশে একটি ঘণ্টা। এবার আসল রাজ্য। অনেকগুলি লোক খালি গায়ে কাজ করছে। কেউ মাটি কোপাচ্ছে, কেউ ডাল ভাঙছে। অনেকে কাজ বন্ধ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে রইল। আমরা সার্জেণ্টকে অনুসরণ করে আরও এগিয়ে এলাম। দুপাশে লাল রঙের ছোট ছোট বাড়ি। প্রতিটি বাড়ির সামনে সশস্ত্র প্রহরী। শেষপর্যন্ত একটি বাড়ির সামনের সান্ত্রী সার্জেণ্টকে স্যালুট জানাল। বাইরে লেখা—"Condemned Ward."

আমরা ভিতরে ঢুকে পড়লাম। দুটি ঘর, স্বল্প পরিসর। প্রথমটি ফাঁকা কেউ নেই, অন্যটিতে একটি দীর্ঘ দেহ পশ্চিমা পায়চারী করছে। কাঁধে পইতে, পরনে সাদা রঙের টার্কিস তোয়ালে। আমার বুকের ভিতর কেমন ঢিপ্ ঢিপ্ করতে থাকে।

"রাম সিং, তুমি যাঁকে চিঠি লিখে-ছিলে তিনি এসেছেন," সার্জেণ্ট বলল।

রাম সিং তাড়াতাড়ি বন্ধ গেটের রেলিঙের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের বাইরে একটি মাটির কুঁজো। হাত বাড়িয়ে জল গড়িয়ে নেওয়া যায়।

"আমাকে আপনি এবারের মত খালাস করে দিন। আর কক্ষণো করব না।" রাম সিং হিন্দীতে এমনভাবে বলতে লাগল, সায়েব যেন ইচ্ছা করলেই দরজা খুলে তাকে মুক্তি দিতে পারেন। ভাঁটার মত লাল লাল দুটো চোখ নিয়ে রাম সিং আমাকে বলল, "আমি ইংরিজী জানি না। সায়েবকে দয়া করে একটু বুঝিয়ে বলুন।"

জেলের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ইতিমধ্যে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন। সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন, "কিসের কেস?"

"এক সঙ্গে তিনটে খুন। বড়বাজারে কোন এক ধনী ব্যবসায়ীর পরিবারের দরোয়ান ছিল রাম সিং। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীকে বাড়িতে রেখে মালিক গিয়েছিলেন পাটনায়। একদিন গভীর রাতে রাম সিং মালিকের স্ত্রীর শোবার ঘর থেকে বেরোতে গিয়ে অন্য তিনজন কর্মচারীর কাছে ধরা পড়ে গেল। "কি হচ্ছিল ওই ঘরে? আমরা সব বুঝতে পেরেছি। গত রাতেও তোমাকে ওই ঘর থেকে বেরোতে দেখেছি। কর্তা-বাবু ফিরে আসুক।" পরদিন সকালে ঐ তিনজন কর্মচারীর মুণ্ড ও ধড় বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পাওয়া গেল। রাম সিং ফেরার। তিন মাস পরে উত্তর প্রদেশ পুলিসের হাতে রাম সিং ধরা পড়ল। রক্তাক্ত খাঁড়ায় রামসিংএর আঙ্গুলের ছাপ পাওয়া গেছে।

হাইকোর্ট সেসনসে মৃত্যুদণ্ড।

অফিসারটি বললেন, "কাগজপত্র অফিসে আছে দেখতে পারেন।"

রাম সিং আবার হিন্দীতে বলল, "আমাকে এবারের মত বাঁচিয়ে দিন। আমার আড়াই শ' টাকা দেশে আছে। লিখলেই পাঠিয়ে দেবে।"

সায়েবের প্রশ্নে অফিসারটি আর বললেন, "রাম সিংএর আপীলও নাকচ হয়েছে। এমন কি করুণাভিক্ষার পিটি-শনেও কোন ফল হয়নি।"

রাম সিংকে সায়েব জিজ্ঞাসা করলেন

"আমার কাছে তোমায় কে চিঠি লিখতে বলেছে?"

"মেজর সাব বোলা।"

"মেজর সাব! Who is this major he is refering to?"

সার্জেণ্ট বলল, "মেজর রোশনলাল, ঐ পাশের ঘরটিতে ছিলেন।"

সঙ্গে সঙ্গে মেজর রোশনলালের কথা মনে পড়ে গেল। খবরের কাগজে ঐ মামলার রিপোর্ট রোজ পড়েছি।

[illegible] ইয়ার নোজ থ্রোটের ডাক্তার মেজর রোশনলাল। দু'তিনটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের জন্য দায়ী মেজর রোশনলাল। লেকের জলে মৃতদেহের কিছু অংশ ফেলতে গিয়ে যিনি ধরা পড়ে গেলেন।

"[illegible] মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত সেই মেজর রোশনলালই ওই ঘরটিতে ছিলেন, আর, তাঁর ফাঁসি হয়ে গিয়েছে।" সার্জেণ্ট বলেছিল।

"অদ্ভুত নার্ভের লোক মেজর রোশনলাল। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত ভেঙে পড়েন নি। কিন্তু ফাঁসির মঞ্চে উঠে রোশনলাল দাঁতে দাঁত চেপে বলেছিলেন, you know I am a Hindu আমি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করি। আমার মৃত্যুর জন্য যারা দায়ী, তাদের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্য আমি লক্ষ লক্ষ বার এই পৃথিবীতে ফিরে আসব।" সার্জেণ্ট বলেছিলেন।

পাশের ঘরটার দিকে আবার চাইলাম। সেটি সত্যি সত্যি খালি।

"মেজর সাব বলে গেছেন আপনাকে চিঠি লিখতে"। রাম সিং আবার বলল।

আমার অনভ্যস্ত হৃৎপিণ্ডটা দ্রুত-গতিতে বাজনা বাজাচ্ছে। যেন নিঃশ্বাস নিতেও কষ্ট হচ্ছে।

রাম সিং-এর দিকে শেষবারের মত জেল সায়েব বললেন, "আমি সত্যি দুঃখিত। কিন্তু আর কিছুই করার নেই।"

আমরা বেড়িয়ে আসতে আসতে শুনলাম, রাম সিং তখনও বলছে, "কিন্তু এবারের মত আমাকে বাঁচিয়ে দিন, আর কখনও করব না।"

জগদীশবাবুকে এ গল্প বলা হয়নি, শুনলে তিনি আনন্দিত হতেন। পিঠে একটা চাপড় দিয়ে বলতেন, "বাঃ, কত খবর যে তুমি যোগাড় করতে পার।" তার পরেই বলতেন, "চল চা খেয়ে আসি। পাঞ্জাবীর দোকানের দুটো সিঙ্গাড়া একস্ট্রা।"

কিন্তু তবু বলতে পারিনি। শুধু দশ নম্বরের খালি বেঞ্চিটার দিকে তাকিয়ে থেকে মনটা উদাস হয়ে গেছে।

সেণ্ট্রাল জেলে যাবার অনেক আগে ট্রামের চাকায় দুটি পা হারিয়ে মেডিক্যাল কলেজে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

সে আলোচনা থাক। লিখতে গেলেই চোখটা ঝাপসা হয়ে ওঠে। কাগজপত্র দূরে সরিয়ে দিতে ইচ্ছে করে। মনে হয় ব্যারিস্টারের বাবুর ধাতে সহ্য হবে না। গরীবের ঘোড়া রোগ।

আবার মনে পড়ে যায় দশ নম্বরের কথা। জগদীশবাবু তখন যদি জানতেন, সে সব আমি কোনদিন লিখব, হয়ত রেগে যেতেন কিছুই বলতেন না কিংবা খুশি হয়ে পাঞ্জাবীর দোকানে চারখানা সিঙ্গাড়া একস্ট্রা।

দশ নম্বর কোর্টের বেঞ্চিতে বসে আমরা দুজনে কত মামলা দেখেছি। জগদীশবাবুকে জিজ্ঞাসা করেছি, "মিস্টার রায়ের খবর কি?"

"আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। তিন দিন কোর্টে আসছেন না।"

"কেন?"

"সেদিন এক মার্ডার কেসে পনের বছরের জেল হল। রায়সায়েব কেমন যেন হয়ে গেছেন। বাড়িতে কারুর সঙ্গে কথা বলেন না। ভোর চারটেয় স্নানে বেরিয়ে যাচ্ছেন, আমাকে না নিয়েই। তারপর দু ঘণ্টা ধরে রাধা গোবিন্দের পুজো হচ্ছে। কিন্তু শরীরে এত অত্যাচার সইবে কেন?" জ্বর হয়েছে।"

কয়েকদিন পরে আবার সব ঠিক। মিস্টার রায়কে কোর্টে কেস করতে দেখেছি পূর্ণোদ্যমে। আমাকে দেখে তিনি মৃদু হেসেছেন।

কিছুদিন পরে মিস্টার রায়কে মস্ত এক কেসে দিনের পর দিন দশ নম্বর কোর্টে ব্যস্ত থাকতে হয়েছে। কোন্ পক্ষ জিতবে বলা কঠিন। বিষ প্রয়োগে ভ্রাতৃহত্যার অপরাধে অভিযুক্ত কলকাতার কোন সম্ভ্রান্ত জমিদার। হত্যাকাণ্ডটি ঘন রহস্যের মেঘে আবৃত। কিন্তু মিস্টার রায় কোন রহস্যের অন্ধকার থাকতে দেবেন না।

জগদীশবাবু বললেন, "এমন পরিশ্রম করলে লোকটা বাঁচবে না।"

"কি বলছেন জগদীশবাবু, এসব কথার কোন অর্থ নেই।" আমি বললাম।

"অর্থ হয় না?" জগদীশবাবু ভাবতে লাগলেন। "সত্যিই তো কোন অর্থ হয় না। নিত্য পূজা,—নিরামিষাশী — মার্ডার কেস্—" জগদীশবাবু বিড়-বিড় করতে থাকেন।

আসামী পক্ষের ব্যারিস্টার শক্তি মুখার্জি সওয়াল করছেন। হে জুরি-বৃন্দ, আইন বলে শত-সহস্র অপরাধী ব্যক্তি মুক্তি পাক, কিন্তু একটি নিরপরাধ

যেন শাস্তি না পায়। কোন হীন ষড়যন্ত্রের ফলে আমার মক্কেল আপনাদের সম্মুখে অভিযুক্ত। গত চার দিন ধরে আপনাদের নিশ্চয়ই বোঝাতে পেরেছি আসামী নিরপরাধ।"—

শক্তি মুখার্জির পর জজসায়েব জুরিদের কাছে মামলা বিশ্লেষণ করছেন। জাজেস চার্জ টু দি জুরি। দশ নম্বর ঘরের সমস্ত আলো জ্বলে উঠেছে। জজসায়েব বলে চলেছেন..."এক অতি কঠিন ও রহস্যজনক মামলায় আপনারা জুরিরূপে উপস্থিত। সরকারপক্ষ অভিযোগ প্রমাণে সমর্থ হয়েছে কি না, ধীর-মস্তিষ্কে বিচার করবেন।......সর্বশেষে মনে করিয়ে দিই আইনত শুধুমাত্র সন্দেহের বশে কোন ব্যক্তির শাস্তি লাভ অবাঞ্ছনীয়।

ন'জন জুরি ধীরে ধীরে কোর্ট থেকে বেরিয়ে গেলেন। জজসায়েবও ভিতরে চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে কোর্টের গুঞ্জন বাড়ল।

জগদীশবাবু বললেন, "শেষ পর্যন্ত দেখে যাও, আর তো বেশি দেরি নেই।"

মিস্টার রায় চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে রয়েছেন। মিস্টার শক্তি মুখার্জি আসামীর সঙ্গে কি সব কথা বলতে লাগলেন।

জগদীশবাবু বললেন, "চল চা খেয়ে আসি।"

হেস্টিংস স্ট্রীটে পাঞ্জাবীর দোকানে চা ও সিঙ্গাড়া খেয়ে মিনিট কুড়ি পরে আমরা ফিরে, এলাম জুরিরা এখনও ফেরেন নি। মিস্টার রায় শক্তি মুখার্জির সঙ্গে কথা বলছেন।

এক ঘণ্টা শেষ হয়ে গেল। জুরিরা ফিরলেন না। দু ঘণ্টা......তিন ঘণ্টা। জগদীশবাবু ও আমি বাইরের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বেশ শীত শীত লাগছে। অন্য কোথাও লোকজন নেই। কে যেন যাদুমন্ত্রে এই কলহাস্যমুখর বিশাল রাজপুরীকে নির্জন পাষাণপুরীতে পরিবর্তিত করেছে।

রাত আটটা। জুরিরা এখনও এলেন না। সকলের দৃষ্টি জুরিদের জন্য নির্দিষ্ট প্রবেশপথের দিকে। দরজাটা এবার সামান্য দুলে উঠল। বোধ হয় জুরিরা ফিরছেন। নাঃ, লাল তকমা-পরা জজসায়েবের চাপরাসীটা শুধু উঁকি মেরে গেল।

খাঁচার মধ্যের আসামী পাথরের মত দাঁড়িয়ে।

"এত দেরি হচ্ছে কেন? কি এত আলোচনা হচ্ছে।"

"আরে মশাই বর্ডার লাইন কেস।"

প্রায় নটা। শীতটা আরও বেড়েছে। দশ নম্বর কোর্টের ঘড়ির পেণ্ডুলামটা বাঁদিক থেকে ডান দিক ও ডান দিক থেকে বাঁদিকে যাতায়াত করছে।

মৃদু গুঞ্জন উঠল, "আসছে আসছে।"

হ্যাঁ এবার সত্যিই জুরিরা আসছেন। পিছনের দরজাটা আস্তে আস্তে খুলে গেল। ওই তো জুরিরা ঢুকছেন। প্রথমেই ফোরম্যান। এক, দুই, তিন, চার......

মিনিট খানেকের মধ্যেই জজসায়েবের লাল পরিধান দেখা গেল। সমস্ত ঘরটিতে অশরীরী নিস্তব্ধতা। শুধু বুকের স্পন্দনগুলো শোনা যাচ্ছে।

ঘোষক রাত্রের স্তব্ধতা ভঙ্গ করে প্রশ্ন করছেন, মিস্টার ফোরম্যান এণ্ড জেণ্টলমেন ইন দি জুরি, হ্যাভ ইউ কাম টু ইওর ডিসিশন......আপনারা কি কোন সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছেন?

"হ্যাঁ ধর্মাবতার......"

বুকের ভিতর বাজনাটার বেগ যেন বেড়ে যাচ্ছে।

"আর ইউ ইউন্যানিমস্?" আপনারা কি সকলে একমত?

অনেকগুলি চোখ এক সঙ্গে জুরিদের দিকে তাকিয়ে আছে।

"হ্যা ধর্মাবিতার, আমরা সকলেই একমত।"

এটা সিনেমা হল নয়, তবু অসংখ্য যন্ত্রের ঐকতানে সৃষ্ট আবহসঙ্গীত যেন কানে আসছে। মিস্টার রায় তাকিয়ে আছেন। মিস্টার শক্তি মুখার্জি আগ্রহের আতিশয্যে চেয়ার ছেড়ে প্রায় দাঁড়িয়ে উঠেছেন। খাঁচার আসামীও যেন আরও কাছে এগিয়ে আসতে চায়।

"আসামী দোষী না নির্দোষ?"

আবহসঙ্গীতের শব্দঝঙ্কার যেন সহস্রগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে।

"দোষী......"

সকল গুঞ্জন মুহূর্তে স্তব্ধ।

জজসায়েব চক্ষু কুঞ্চিত করে এক মিনিট কি যেন ভাবলেন। কিন্তু তিনি প্রস্তুত হয়েই এসেছেন। বাঁদিকের পকেট থেকে জিনিসটা বার হলো, কালো টুপি।

জগদীশবাবু আমার হাতে মৃদু চাপ দিলেন। "হয়ে গেল।"

"প্রিজনার এট দি বার......" জজসায়েব ধীরে ধীরে বলে চললেন......শেষ কথাটা আজও মনে পড়ে......টু বি হ্যাঙগড্ বাই নেক্ আনটিল ডেড্।"

চরম দণ্ড।

সাদা পোশাকের সার্জেণ্ট দণ্ডিতের পাশে এসে দাঁড়াল।

প্রায় সবাই চলে গেছে। জগদীশবাবু তখনও বসে। উত্তেজনায় তাঁর সর্বদেহ কাঁপছে। "এবার......এবার কি হবে, রায় সায়েব।"

মিস্টার রায় কেমন হয়ে গেছেন। মাতালের মত চোখ দিয়ে শূন্য খাঁচাটির দিকে তাকিয়ে আছেন। "বাড়ি চলুন স্যার। অনেক রাত হয়েছে।" জগদীশবাবু মিস্টার রায়ের হাতটা ধরে বললেন। মিস্টার রায়ের খেয়াল নেই। তিনি জগদীশের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে আছেন। বাহ্যজ্ঞানহীন লোকের মত জগদীশবাবু মিস্টার রায়কে ধরে নিয়ে গেলেন। আমাকে দেখতে পর্যন্ত পেলেন না।

অবাক হয়ে ভাবছি, এ কি রহস্য? কেন মিস্টার রায় এমন হয়ে পড়েন, ক্ষুধিত ব্যাঘ্রের মত হিংস্রতা সহ তিনি ঝাঁপিয়ে পড়েন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরম অবসাদে টলে পড়েন। কেন এমন হয়?

কোন সদুত্তর খুঁজে পাইনি। অনেক ভেবেছি। কিন্তু সব নিষ্ফল। রহস্যের দ্বার উন্মুক্ত হয়নি।

আমার সকল জিজ্ঞাসায় ছেদ টেনে দিয়ে দশ নম্বর ঘরের বিশাল দরজাটা ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে গেল। রাত অনেক।

ধূলি মুঠি কাপড়

সমরেশ বসু

ফাল্গুন মাস। পথ চিনতে হয়নি, বঙ্গোপসাগরের বুকের বাতাস আপনি ছুটে এসেছে শহরের বুকে। দূর বন মাতিয়ে, অনেক ঝরাপাতা ঠোঁটে নিয়ে গুন্ গুন্ করতে করতে এসেছে প্রাসাদ-পুরীতে। নাম নিয়ে এসেছে নতুন ফুলের, কথা নিয়ে এসেছে নতুন গানের। অনেক ধুলো উড়িয়ে এসেছে ঝকঝকে আকাশের গায়ে। সেই ধুলোর গায়ে রৌদ্র কণা এঁকে দিয়েছে অনেক রংএর রংঝালর। ছাদের আলসেয়, কার্নিশে, খিলানে, জানালায় বাতাসের ফিসফিসানি কি এক গূঢ় খুশীর কথা বলছে চাপা স্বরে।

জামা কাপড় পরতে পরতে পাশের ঘরে গুন্‌গুন্ করছে অমলা। গুন্‌গুন্ করছে ওর সেই প্রিয় গানখানি, ওহে সুন্দর, মরি মরি!'

বেরুতে হবে সময় হয়ে গেছে। এ ঘর থেকে প্রমথ তাড়া দিয়েছে অনেকবার। তাড়া দিয়ে এখন মোহমুগ্ধ শূন্য দৃষ্টিটা মোটা লেন্সের ভেতর থেকে মেলে দিয়ে চুপ করে গেছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অমলার গুনগুনানি শুনছে আর ফিস্-ফিস্ করছে নিজের মনে, 'তোমায় কী দিয়ে বরণ করি, ওহে সুন্দর!' প্রমথর সারা মুখে একটা চাপা খুশীর আবেগ ছড়িয়ে পড়ে। গানটি অমলার প্রিয় নয় শুধু। ওর ধ্যান সঙ্গীত। সাত বছর ধরে ওই গানটি ছাড়া আর বুঝি কোন গানই গায়নি অমলা। সাত বছর আগে, এক সভায় সভাপ.ত বরণ করেছিল অমলা ওই গানটি গেয়ে। রাজনীতি সমাজ ও সংস্কৃতি আসরের জ্ঞানীপুরুষ, অন্যদিকে লক্ষ্মীর বরপুত্র সেই সভাপতি। অথচ নিরহংকারী, আত্মভোলা, প্রশংসাকুণ্ঠিত সুপুরুষ। সেই সভাপতি প্রমথ পুর-কায়স্থ। প্রমথ নিজেই।

হঠাৎ দমকা বাতাসে দরজার একটা পাল্লা শব্দ করে বন্ধ হয়ে গেল। প্রমথ একটু চমকে উঠল। বলল, 'কই, হল তোমার?'

জবাব এল, 'যাচ্ছি গো! বড্ড যে হাওয়া!'

প্রমথ অবাক হয়ে বলল, 'হাওয়া! হাওয়া তো তোমার কি?'

খুশী—চাপাগলায় কপট বিরক্তিভরা চাপা স্বর শোনা গেল, 'বড্ড জ্বালাতন করছে যে!'

হাওয়ার জ্বালাতন? এসব বিষয়ে প্রমথ অমলার তুলনায় একটু অপটু। তাই এক মুহূর্ত অবাক হয়ে পর মুহূর্তে হেসে উঠল। বলল, 'ভারী বেয়াদপ্ হাওয়া তো? যাব নাকি?'

আর্ত কপট স্বর ভেসে এল, 'আজ্ঞে না মশাই, আসতে হবে না।'

প্রমথ বলল, 'তবে দক্ষিণের জানালাটা দাও না বন্ধ করে।'

খুশীর সুরে খানিকটা বিদ্রূপ চলকে উঠল অমলার গলায়, 'বয়ে গেছে। না হয় একটু বেসামাল হয়েই বেরুব।'

বলতে বলতেই বেরিয়ে এল সে। এক ঝলক আলোর মত। সন্ধ্যার ঘোরে এক-রাশ সন্ধ্যাকলির মত। সাজেনি, সাজেও না সে কোনদিন। কিন্তু অমলার রূপই অপরূপ। না সেজেও অনেক সাজে ভরা, সেটুকু আছে তার ষোল আনা। অল্প দামের একখানি মাধবী রংএর তাঁতের শাড়ি পরেছে। চুল বেঁধেছে এলো করে। নিরলঙ্কার হাতে শুধু ছোট্ট একটি সোনার হাত ঘড়ি। কানে দুটি ফুল। একহারা ছিপছিপে বলা যেত অমলাকে। হঠাৎ দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু ঈষৎ নম্রতা ও গুটি কয়েক বলিষ্ঠ ঢেউ তাকে ভারী ও ভরাট করে তুলেছে।

পাশে দাঁড়িয়ে প্রমথ। একটু মেদ-বহুল। সেটুকু তার দীর্ঘ দেহে মানিয়ে গেছে। মাজা মাজা রংএর উপরে তার সারা দেহ ঘিরে একটা সতর্ক বুদ্ধি উঁকিমেরে আছে যেন। চোখ দুটি একটু বেশী দীপ্ত, তীব্র, অনুসন্ধিৎসু। হাসলেও তার মুখের একটা বিচিত্র আড়ষ্টতা কখনো দূর হয় না। সেজন্য তাকে ভাবুক বলে মনে হয় সবসময়।

বলল, 'কই, বেসামাল দেখছি না তো?'

সামনে এসে যেন লজ্জিত হয়ে পড়ল অমলা। আড় চোখে তাকিয়ে একটু বিচিত্র হেসে বলল, 'দেখতে পাচ্ছো না, সে বুঝি আমার দোষ?'

মোটা লেন্সের আড়ালে প্রমথর চোখ দুটি আরও দীপ্ত হয়ে উঠল। কাছ ঘেঁষে বলল, 'মনে মনে হয়েছে বুঝি?'

'ভাগ্!' বলে একটু নিঃশব্দে হাসল অমলা। সর্ সর্ করে এক ঝলক হাওয়া ঢুকল ঘরে। বলল, 'চল, দেরী হচ্ছে।'

প্রমথ যেন চমকে উঠল। বলল, 'হ্যাঁ চল। একটা কথা, মজা দেখেছ? ফাল্গুন মাস পড়েছে, কর্পোরেশনের এখনো ঘুম ভাঙেনি। পক্স হয়ে দু' চারটি মরলে, তারপর তারা ভ্যাকসিনেশন অভিযান শুরু করবে। তুমি ওটা একটু কোট্ করে নাও। পিতৃমাতৃহীন শিশু সংঘে যেন আগামীকালই সব ছেলেকে ভ্যাকসিনেট্ করা হয়, সেটা বলতে হবে। ভুলে না যাই।'

এই খুশীর গোধূলি-মুখে শ্রদ্ধার হাল্কা গাম্ভীর্য নেমে এল। প্রমথ'র দিকে এক মুহূর্ত বিস্মিত প্রশংসাভরে তাকিয়ে থেকে অমলা বলল, 'সত্যি, কী সজাগ মন তোমার। মন তোমার ওই সংঘের ছেলেদের কাছেই পড়েছিল দেখছি।'

নোটবুকে টুকে নিয়ে নীচে নেমে এল তারা। মস্ত বড় বাড়ি। ঊনবিংশ শতাব্দীর এক বিশাল প্রমোদভবন। আজকে নিঃশব্দ এক জনহীন রাজপুরী। নীচের তলাটা খাঁ খাঁ করছে। দুটি চাকর আছে। কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না। বাগানটি একসময়ে হয়তো খুবই ভাল ছিল। এখনো ফুল আছে। অনেক টব আছে। পাম আর শুপারী দুলছে হাওয়ায়। কলমের আম আর লিচু ঘিরে আছে চার-দিক থেকে। তবু যেন কেমন শ্রীহীন। ওদিকে বিশেষ নজর নেই প্রমথর।

গেট খুলে বেরুতে যাবে। একটি ছেলে নমস্কার করে দাঁড়াল। অপরিচিত। একটি চিঠি প্রমথর হাতে দিয়ে বলল, 'কুঞ্জদা' পাঠিয়েছেন।'

প্রমথ চিঠি খুলল। নমস্য কুঞ্জদা। রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রবীণ নেতা। লিখছেন, 'সর্বেশ্বরকে তোমার মনে আছে নিশ্চয়ই? সে পাকিস্তানের জেলে রয়েছে এও জানো। তার স্ত্রী আর দুটি বাচ্চা নিয়ে এখানে এসেছেন। দায়িত্বটা আমার। তোমার আর অমলার আশ্রয়ে উনি আপাতত মাস-খানেক থাকুন, এই আমার ইচ্ছে। তোমাদের মতামত জানাবে। সেই বুঝে কাল সকালেই ব্যবস্থা করব।'

পুনশ্চ দিয়ে লিখেছেন, 'নিপীড়িত মা ও শিশুদের নিয়ে তোমার বক্তৃতাগুলি আমি সব শুনেছি, শুনছি। মায়েদের প্রতি তোমার এই অগাধ শ্রদ্ধা, শিশুদের প্রতি তোমার চওড়া শীতল বুকখানির স্নেহা-শ্রয় স্মরণ রেখে নারীরা তোমাকে চিরদিন আশীর্বাদ করবেন, ছেলেরা তোমায় মাথায় করে রাখবে চিরদিন। ধন্য ভাই! সত্যি বলতে কি, সর্বেশ্বরের স্ত্রীপুত্রকে দেখে কেন যেন তোমার কথাই মনে হল আমার।'

গৌরবের আনন্দে এবং কুণ্ঠায় লজ্জিত হয়ে উঠল প্রমথ। চিঠিটা বাড়িয়ে দিল অমলার হাতে। অমলা পড়ল। শেষের কথাগুলি পড়তে পড়তে প্রমথর দিকে উচ্ছ্বসিত হয়ে তাকাল সে। পড়া হয়ে গেলে দু' চোখ ভরে আবার দেখল সে প্রমথকে। বোধ হয় তার সেই প্রিয় গানটি গুঞ্জরিত হচ্ছিল, মনের মধ্যে।

প্রমথ বলল, 'বল।'

অমলাঃ 'বলব আবার কি। কুঞ্জদা লিখেছেন যখন, নিশ্চয়ই আসবেন।'

প্রমথ বলল, 'আমি ও তাই ভাবছিলাম।' ছেলেটির দিকে ফিরে বলল, 'পাঠিয়ে দিতে বলবেন। কুঞ্জদা'কে বলবেন, বেরুবার মুখে চিঠি লিখে জবাব দিতে পারলাম না।'

ছেলেটি নমস্কার করে চলে গেল।

সভায় যাওয়ার মুখে কুঞ্জদার চিঠি-খানি তাকে যেন নতুন করে সম্বর্ধনা জানাল। অমলা জিজ্ঞেস করল, 'সর্বেশ্বর-বাবু-কে? কখনো শুনিনি তো?'

প্রমথ বলল, 'বলছি, গলিটা পার হয়ে নিই।'

গলিটা পার হওয়া, সত্যি এক অদ্ভুত ব্যাপার। তারা যখন হেঁটে পার হয় গলিটা, তখন চারদিক থেকে পড়ে অনেক উঁকি-ঝুঁকি। অনেক ফিসফিসানি গুঞ্জন করে দরজায় জানালায়। ঠাট্টা বিদ্রূপ করে নয়। সকলের কৌতূহল ছিল অনেকখানি, বিস্মিত শ্রদ্ধা ছিল তার চেয়ে বেশী। এ দম্পতিটির প্রেম নিয়ে, কার্যকলাপ ও আদর্শ নিয়ে রীতিমত আলোচনা হয় পাড়ার মধ্যে। ওদের কেউ কোনদিন আলাদা, একলা বেরুতে দেখেনি। বেরোয় না ওরা। তার জন্যে কেউ ভিকনেমি কাটে না। বরং সকলেই বেশ খুশী আর শ্রদ্ধা পোষন করে। পাড়ার রকবাজ ছেলে-বুড়োরাও চুপ করে যায় ওদের দেখলে। যাদের মন্তব্য শোনা থেকে কেউ নিস্তার পায় না। একলা একটা মেয়ে তো দূরের কথা, কোন দম্পতিও নয়। ওরাও চুপ করে থাকে। আড়ালে বলাবলি করে, "শালা একেই বলে বড়লোক'

'মাইরি! লোকে যারে বড় বলে...'

—হ্যাঁ, জোড়া যদি বাঁধতে হয় তো, এই রকম।'

'এদিকে খুব টাকা! কিন্তু বোঝা যায়?'

মেয়েরাও নানা রকম বলে। দীর্ঘ-নিশ্বাস পড়ে বৈ কি।

প্রমথ গায়ে মাখে না। মাখলেও বুঝতে দেয় না। অমলার বড় লজ্জা করে। নতুন বিবাহিতার মত সলজ্জ চাপা হাসি

কাঁপতে থাকে ঠোঁটের কোণে। কুমারী মেয়ের মত লোকচোখের আড়ষ্টতা জড়িয়ে রয়েছে ওর সর্বাঙ্গে। কোন কোন মেয়ে বউয়ের সঙ্গে তার অল্লাপ আছে। তাদের দিকেও সে তাকাতে পারে না চোখ তুলে। স্বামীর সঙ্গে যাওয়ার লজ্জাটুকু কাটিয়ে উঠতে পারেনি আজো। পাড়াতে নয়, পাড়াতেও। তবুও ঘরে বাইরে তারা এক-সঙ্গে। অথচ চার বছর কলেজে পড়া মেয়ে। 'ওহে সুন্দর, মরি মরি!' গেয়ে সে এক-দিন মরেছিল। কিন্তু সেই কুমারী মেয়েটি ছায়ার মত ফিরছে তার পিছে পিছে। তার এই সাতাশ বছরের সাত বছর ধরে। তার রক্ত কোষের রংএর মালায় সে যেন আজো বাঁধা পড়ে আছে।

বড় রাস্তায় এসে পড়ল তারা। ফাল্গুনের সন্ধ্যায় ভিড়বহুল রাস্তা। গাড়িগুলিতে এখনো অফিস ফেরতাদের ভিড়। দৌড়িয়েদের ভিড় পথে ও স্টপেজে। দোকানে দোকানে আলো জ্বলছে এখন একটি একটি করে। মোড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ছে দিশেহারা বাতাস।

অমলা বলল, 'বললে না সর্বেশ্বরের কথা?'

প্রমথ বলল, 'তবে চল হেঁটেই যাই।' তারপরে বলল অনেক কথা। সর্বেশ্বরের কথা।

বলল, 'কলেজে পড়ি তখন। সতেরো বছর বয়স। সর্বেশ্বরও পড়ে। সে আমাকে রাজনীতিতে দীক্ষা দিল। টেনে নিয়ে গেল একটা গুপ্ত দলে। আমাদের বাড়ির আব-হাওয়া চিরকালই খুব খারাপ, তোমাকে বলেছি। একটা জঘন্যতম ফিউডল পাপের বাসা ছিল বাড়িটা। বাবা সারাদিন বাড়ি থাকতেন, বাইরে থাকতেন সারারাত। মা সারাদিন মামাদের বাড়ি থাকতেন, রাত্রে ফিরে আসতেন মামাদের সঙ্গে। মামাদের দু' একজন বন্ধুও থাকতেন সঙ্গে। সকলে মিলে অনেক রাত্রি পর্যন্ত চালাতেন গল্প, তাস খেলা। সবচেয়ে আশ্চর্য ব্যাপার, এঁরা আবার সমাজে ছিলেন খুব গণ্য-মান্য! এর মাঝে আমি! আমার ছিল পড়া, খাওয়া, স্কুলে যাওয়া, মাস্টারমশাইয়ের সঙ্গে বেড়ানো, আর সমস্ত বাড়িটার উপর একটা অন্ধ বিদ্বেষ নিয়ে ভূতের মত ঘোরা। তার থেকে আমাকে মুক্তি দিল সর্বেশ্বর। তারপর সর্বেশ্বরের সঙ্গে জেল খেটেছি বছর খানেক। জেল থেকে বেরিয়ে বারো বছর একসঙ্গে ছিলাম আমরা। রাজনীতি আর পড়া, দুটোই চলেছিল একসঙ্গে। বাড়িতে বাবা মা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু চেষ্টা করেও তাঁরা আর সময় করে উঠতে পারেননি, এত ব্যস্ত ছিলেন নিজেদের নিয়ে। এক বছরের মধ্যে মারা গেলেন দুজনেই।......বারো বছর পর সর্বেশ্বর চলে গেল ঢাকায়। বাড়ি ওর ওইদিকেই রাজনীতির ক্ষেত্র হিসাবে ওইটাই বেছে নিল ও। সর্বেশ্বর চলে যেতে আমাকেও কাজের ক্ষেত্র পাল্টাতে হল। আর দেখা হয়নি তার সঙ্গে। দল ভেঙ্গে গেছল অনেক আগেই, কিন্তু নতুন অনেক দল হয়েছিল। বিশেষ কোন দলে যাইনি আর। তবু কাজ করে চলেছি। আর......

প্রমথ থামল। অমলা তাকাল সপ্রশ্ন ব্যথিত চোখে। ব্যথা তার প্রমথর জীবন সংগ্রামের কথা ভেবে। বলল, 'আর?'

প্রমথ হঠাৎ অমলার দিকে চোখ ফিরিয়ে বলল, 'পেলাম তোমাকে।'

বাতাসে আঁচল উড়ছে অমলার। চুল এলো হয়ে পড়েছে আরও। ফাল্গুনের রাস্তায় রাস্তায় ঘরবিমুখ মানুষের ভিড়।

অমলা বলল, 'অতি তুচ্ছ ঘটনা।'

—'না, সব চেয়ে বড় ঘটনা। আর কিছু চাইনে, তোমাকে ছাড়া।' গলার স্বরটা কেমন গোঙ্গানির মত শোনায় প্রমথর। চোয়াল ও চিবুকের মাংসপেশী কাঁপতে থাকে থরথর করে। কেমন অস্বাভাবিক আর উদ্দীপ্ত দৃষ্টি হয়ে ওঠে তার। ওই কথাটা এমনি করেই বলে সে। তার সমস্ত শক্তি দিয়ে। কেন?

কেমন যেন লাগে অমলার। একটা চাপা কষ্ট হতে থাকে তার বুকে। আর এত ভালবেসে মরা বুকে নিজের অজান্তে একটি দরজা খোলে। খুব ছোট্ট দরজা। সে দরজাটা যেন প্রতিদিনের, প্রতি পলের ভালবাসা দিয়ে তৈরী রুদ্ধশ্বাস বেড়া থেকে একটু মুক্তি চায়। একটু, একটু-ক্ষণের জন্য। তার ভালবাসার সুখটুকু আকাশ ভরে ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য।

পর মুহূর্তেই আবার তা হারিয়ে যায়। কথা বলে তাড়াতাড়ি। নইলে কষ্টটা ধোঁয়ার মত কুণ্ডলী পাকাতে থাকে। বলে, 'মিছে কথা তোমার। আমাকে ছাড়াও তুমি কত কি চাও।'

চমকে ওঠে প্রমথ। চমকায় সে একটু বেশী। তারপর হেসে ওঠে। তেমনি আড়ষ্ট হাসি। বলে, 'অ্যাঁ?—হ্যাঁ—তা......

খুশী হয়ে ওঠে অমলা। খুশী হয়, এইটুকু চায় সে। প্রমথর তাকে ছাড়া আরও কিছু চাওয়া আর এমনি করে বলা। এটুকু যেন তারই প্রেমের জয়গান।

পরদিন বেলা প্রায় ন'টা। পড়ার ঘরে কাগজ পড়ছিল দুজনেই, অমলা আর প্রমথ। চা পর্ব শেষ হয়েছে। চাকর এসে সংবাদ দিল, নীচে একটি মহিলা এসেছেন। সঙ্গে দুটি বাচ্চা।

অমলা উঠল। তাড়াতাড়ি কাপড়টি একটু গোছ করে নীচে নেমে গেল। প্রমথও এল পিছনে পিছনে।

সিঁড়ির নীচেই, অতি সাধারণ একটি মেয়ে। একহারা শ্যামাঙ্গিনী, মাথায় অল্প ঘোমটা দেওয়া। চোখগুলি বড় বড়। ঠোঁট দুটি অল্প ফোলা। হাসিটি ভারী মিষ্টি। মিষ্টি ও ব্যথিত। কোলের ছেলেটি মায়ের মতই, কিন্তু বলিষ্ঠ। ঘাড় কাৎ করে তীব্র অনুসন্ধিৎসা নিয়ে তাকিয়ে আছে অমলা আর প্রমথর দিকে, আর পা দোলাচ্ছে। কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে একটি মেয়ে। মেয়েটি ফর্সা, মাথা ভরতি চুল। চোখ দুটি শান্ত। সব মিলিয়ে দৃশ্যটি বড় করুণ।

অমলা কাছে এসে বলল, 'আসুন। ওপরে চলুন। কে নিয়ে এল।'

সর্বেশ্বরের স্ত্রী বলল, 'একটি ছেলে। পৌঁছে দিয়েই চলে গেল।'

'ও!' অমলা প্রমথর দিকে চেয়ে একটু হাসল। প্রমথ তার মোটা লেন্সের আড়ালে ডুবে যাওয়া চোখ দুটো নিয়ে যেন কোন

শূন্যে তাকিয়েছিল। বোধ হয় ভাবছিল সর্বেশ্বরের কথা।

অমলা জিজ্ঞেস করল, 'আপনার নামটা কি ভাই, বলুন।'

সলজ্জ হেসে বলল সর্বেশ্বরের স্ত্রী, 'আরতি।'

'আরতিদি!' বলে অমলা হেসে উঠল। উভয়পক্ষেরই পরিচয়ের কোন প্রয়োজন ছিল না। কেবল অমলা হেসে বলল, 'ইনি আপনার স্বামীর বন্ধু।' বলে প্রমথকে দেখিয়ে আবার একবার হেসে উঠে বলল, 'আগে আপনাদের থাকার বন্দোবস্ত করি। ওপরে চলুন।'

আরতি বলল, 'যাচ্ছি। কিন্তু আমার সব সময় নীচে থাকতে পারলে ভাল হয়।'

অমলা অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

সস্নেহগলায় একটু কপট ঝাঁজ দিয়ে

বল, 'এই যে ছেলে, ভয়ংকর শান্ত কি । কখন পড়ে গিয়ে হাতপাগুলি ভেঙে-চুরে ঠিক করে রাখবেন, তার ঠিক ।'

ছেলেটির পা দোলানি একটু বাড়ল। ড়চোখে তাকাল অমলার দিকে। হেসে লল অমলা। প্রমথর দিকে তাকিয়ে ল, 'তা'হলে?'

প্রমথ বলল, 'ওঁর যেরকম সুবিধে ......'

দু'এক কথার পর নীচে থাকাই স্হত হল। প্রমথ অমলার উপর সব ভার য়ে উঠে গেল ওপরে। আরতিকে নিয়ে, ড়ি দিয়ে নেমেই দক্ষিণ মুখো ঘরে য়ে ঢুকল অমলা। খোকা ততক্ষণে লের মধ্যে ঘষতে আরম্ভ করেছে নামার ।

আরতি বলিল, 'আপনাদের কথা একবার শুনেছি ওঁর মুখে।'

ওঁর অর্থাৎ সর্বেশ্বরের মুখে। জ্জত হল অমলা। এদের কথা মাত্র কাল ছে তাকে প্রমথ। সে জিজ্ঞেস করল, মন আছেন সর্বেশ্বরবাবু?'

আরতি বলল, 'দু' মাস আগে থেকে। নানানখানায় ভুগছে। ওখানে উ দেখবার নেই, তাই চলে আসতে লে। কষ্ট দেব আপনাদের!'

একটু ম্লান হেসে প্রসঙ্গ পরিবর্তন ল আরতি। বলল, 'আপনাদের কথা দার মুখেও শুনেছিলাম। বলছিলেন, দর লক্ষ্মীর ভান্ডার অফুরন্ত, কিন্তু নন বড়লোক একবার দেখে এসো। পনাদের দুজনেরই গুনগানে কুঞ্জদা' ক্ষারে পঞ্চমুখ।'

বলে সে অমলার চোখে চোখে কাল। মুগ্ধদৃষ্টি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে াল অমলার সর্বাঙ্গে। বলল, 'সত্যি, পনি কী সুন্দর!

একটু রংএর ছোপ লেগে গেল অমলার মুখে। পরমুহূর্তেই আরতি কিত চোখে অমলার আপাদমস্তক দেখে, াছ ঘেঁষে বলে উঠল, 'একটা কথা ভাই কছুই জানিনে, তাই জিজ্ঞেস করিনি। ছেলেপুলে আছে তো?'

রংএর ছোপ পেরিয়ে, চকিতে কি একটা চলকে যেন ছড়িয়ে পড়ল অমলার মুখে। মুখ থেকে কল্‌কল্‌ করে ছড়িয়ে গেল সারা শরীরের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ভারী হয়ে উঠল চোখের পাতা। কোন রকমে, নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানাল, 'না'।

না? যেন এর চেয়ে বিস্ময়ের আর কিছু নেই। তার সহজ জীবনযাত্রার এই বিস্ময়টুকুই রীতি। কয়েক মুহূর্ত অবাক থেকে বলল, 'সাত বছরেও নয়।' কেন ভাই? এই বিশাল পুরীতে, লক্ষ্মীর এ অফুরন্ত ভান্ডারে—?'

বুকের মধ্যে যেন খিল ধরে গেল অমলার। কেন কেন করে, 'কেন' কাঁটায় কণ্টকিত হয়ে উঠল সর্বাঙ্গ। এক অভূতপূর্ব লজ্জায় ও অস্বস্তিতে, আরতির দৃষ্টির সামনে দাঁড়াতে পারল না সে আর। কোন রকমে 'আসছি' বলে বেরিয়ে গেল। তর্‌তর্‌ করে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে থমকে দাঁড়াল।

একি কথা! কী যে কথা! ওমনি করে তার দিকে চেয়ে, এমনি করে কোন মেয়ে তো তাকে কোনদিন বলেনি। সাত বছর, বিশালপুরীতে, লক্ষ্মীর অফুরন্ত ভান্ডারে...। কেন? কেন, অমলা তার কি জানে? কোনোদিন কি মনে হয়েছে? কোনোদিন, কোনো কারণে। কি জানি! কোন্‌ দিন, কিভাবে, কেমন করে, মনে এসেছে কি না, সে জানে না।

একটা তীব্র খুশীর লজ্জায় বিচিত্র ছিছিংকার বেজে উঠল তারে তারে। তারি মধ্যে একটা কষেবাঁধা সুর তারে বেজে উঠল টং টং করে। কী একটা যেন ছুটে বেড়াচ্ছে সারা গায়ে। নিজের নিটোল হাত দুটি তুলে এক মুহূর্ত দেখে ঢুকে গেল প্রমথর ঘরে। প্রমথই জানে সব।

প্রমথ মুখ তুলে তাকাতেই হেসে মুখ ফিরিয়ে নিল অমলা। আশ্চর্য! কী লজ্জা যে করছে! সুপ্তোত্থিতের মত জিজ্ঞেস করল প্রমথ, 'কি হয়েছে?'

সারা মুখে রক্ত ছুটে এল নতুন করে। তাকিয়ে হেসে আবার মুখ ফিরিয়ে নিল নিঃশব্দে। আলমারীর কাঁচ ঘষতে লাগল ফিরে।

প্রমথর উদ্দীপ্ত চোখের মণি দুটো যেন ডবল হয়ে আটকে রইল লেন্সের গায়ে। মুখের কয়েকটা রেখা কেঁপে উঠে আড়ষ্ট হয়ে গেল। যেন হাসছিল, সংশয়ের হাসি। সাত বছরের প্রথম বছরে এক রহস্য উন্মোচনে এমনি করে হেসেছিল অমলা। কাছে এসে বলল,— 'কি হয়েছে অমলা?'

অমলা প্রমথের মস্ত হাতখানি তুলে ঢেকে দিল নিজের মুখ। ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'কী যে বলেন আরতিদি।'

যেন ভীত গলায় জিজ্ঞেস করল প্রমথ, 'কি বলেন?'

চকিত কটাক্ষে এক বিচিত্র ঝিলিক দিয়ে বলল অমলা, 'জানিনে যাও।'

বলেই হেসে আবার লঘুপায়ে চলে গেল দরজার কাছে, 'আমি ওঁকে ডেকে নিয়ে আসছি ওপরে চা খেতে।

ঘুরে আবার তর্‌তর্‌ করে নেমে গেল নীচে। স্তব্ধ প্রমথ, আধো-অন্ধকার লাইব্রেরী ঘরে মস্ত একটা পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল। কয়েক মুহূর্ত পরে কুঁচকে উঠল ভ্রুজোড়া।

অমলা নীচে গিয়ে চাকরকে বলল, ওপরের শোবার ঘরে সবাইকে চা দিতে। আরতির ঘরে ঢুকল মাথা নীচু করে। তাড়াতাড়ি খুকীর হাত ধরে বলল, 'ওপরে চলুন, আগে চা খেয়ে নেবেন।'

অস্বস্তি হচ্ছিল আরতির। কি একটা অপরাধের কুণ্ঠাবোধ এসেছে তার মনে। অমলার এড়িয়ে যাওয়াটুকু চোখ এড়াল না তার।

চায়ের আসরে কথা হল সর্বেশ্বরের, পাকিস্তানের অবস্থার। তারপরে চান-খাওয়া। গোছানো হয়েছে নীচের ঘর। যতটা সম্ভব বাসযোগ্য করে বিছানা পাতা হয়েছে।

সরাটা দিন এ বাড়ির বাগানে ঝিরি-ঝিরি শব্দে হাওয়া বইল। প্রমথ দেখল, এক বিচিত্রময়ীরূপে অমলা তার কাছ দিয়ে বার বার হেসে হেসে গেল। আরতি দেখল তার এড়িয়ে যাওয়া। আর অমলা রাশীকৃত লজেন্স বিস্কুট করল জড়ো। তা' দেখে খুকী পেল লজ্জা। আর খোকা বলল, 'তুমি খুব ছুন্ডল আলু ভালো।'......বিকেলে প্রমথ আর অমলা গেল নিখিল বঙ্গ মাতৃ ও শিশু সঙ্ঘের অফিসে। একজন সেক্রেটারী, অন্যে কার্যকরী সমিতির সভ্যা।

পরদিন চায়ের পাট শেষ করে যখন আরতির সঙ্গে নীচে নেমে এল অমলা, তখন আরতি বলল, 'কালকে আমার উপর খুব রাগ হয়েছে, না?'

ভারি সুন্দর আর করুণ হয়ে ওঠে আরতির চোখ দুটো। সারাটি দিন কালকে আরতির দিকে চোখ তুলতে পারেনি অমলা। কুমারীর মত এক নতুন লজ্জা বেড়াচ্ছিল লুকিয়ে। আজো তাই লজ্জায় লজ্জায় এসেছিল। অবাক হয়ে বলল, 'কেন?'

আরতি বলল, 'জানতুম না, তাই জিজ্ঞেস করেছিলুম। কেমন ভারি আর সুন্দর চেহারাটি, তাই। নষ্ট-টষ্ট হয়ে গেছে বুঝি?'

আবার সেই কথা! লাল হয়ে উঠল অমলার মুখ। উষ্ণ তরঙ্গ কিলবিল করে এল কানের কাছে। এ কথায় বাধা দিতে চাইল একবার। পারল না। নিঃশব্দে মাথা নেড়ে জানাল, 'না।'

বুঝি চকিতে একটা কালো ছায়া ঘুরে গেছল অমলার মুখের উপর দিয়ে। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে আরতি বলল, 'একেবারেই নয়, না? বুঝেছি। তাই হয়। যেখানে অনেক আছে, সেখানে বুক খালি। যেখানে অনেক খালি, সেখানে বুক ভরা।' বলে একটু হেসে নিজের ছেলেমেয়েকে সস্নেহ ইঙ্গিতে দেখিয়ে বলল, 'এই দেখুন না। বুক ভরে পেয়েছি, রাখতে পারব কি না জানিনে। আবার বলল, 'প্রমথবাবুর কষ্টও কম নয়।'

মনের মধ্যে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত চমকে উঠল অমলা। আরতির কথার অন্তর্নিহিত অর্থ, অমলা বন্ধ্যা। বন্ধ্যা!' অদৃশ্য বিষধরের চকিত দংশনের মত একটা তীব্র ব্যথা ধরে গেল বুকে। মনের মধ্যে নিঃশব্দে গুমরে উঠল, না না না। তবু মুখভাব অবিকৃত রেখে বলল, 'রান্নার কথা বলে আসি।'

বলে বেরিয়ে এসে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল ওপরে। প্রমথর ঘরের দিকে বাঁক নিতে গিয়ে ছুটে গেল শোবার ঘরে। বিছানায় পড়ে হাঁপাতে লাগল। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিল মুখে। এলো খোঁপা গেল খুলে। গলার কাছে যেন কি একটা ঠেলে আসতে লাগল।

একটু পরে এলোমেলো বেশে এসে দাঁড়াল আয়নার সামনে। দাঁড়িয়ে, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগল নিজেকে। যেন কোনদিন দেখেনি এর আগে। দেখতে দেখতে একবার আঁচল খসালো, আবার জড়ালো। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল নিজের সর্বাঙ্গ। আর ফিস্‌ফিস্ করে উঠল, 'আছে, আছে অনেক আছে।' দেখে দেখে হাসল, ঠোঁট কামড়াল। কিন্তু সেই বিষ-দংশনের জ্বালাটা ধীরে ধীরে ছড়াতে লাগল কেবলি। দপ্‌দপ্ করে জ্বলতে লাগল রক্তকোষের মধ্যে।

কী আর এমন কথা! তবু কী যে কথা! তার জীবনের বাঁধা বীণার তার-গুলি সব ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছড়িয়ে কুঁকড়ে গেল যেন। তার অনেক কাজে অনেক বড় সাত রঙা মুখে যেন ছিটিয়ে দিয়েছে কালি। তার নারীত্বকে করুণা করেছে আরতিদি। ধনে মানে অনেক আছে, তবু বুক খালি। সাত বছরে নষ্ট হয়নি তবে? তার সব শূন্য। তার শূন্যতায় প্রমথর কষ্ট।

বিস্মিত ভয়ে তাকাল আবার আয়নার বুকে। তাকিয়ে চোখ বুজে হাসল। আবার চোখ খুলে হেসে উঠল ছোট্ট মেয়েটির মত। চোখ ঘুরিয়ে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ইস্! নেই যেন!' তবু জ্বালাটা তো জুড়োতে চায় না।

নিঃশব্দে এসে দাঁড়াল প্রমথর ঘরে। নিঃশব্দে, কিন্তু আশ্চর্য! প্রমথ যেন হাওয়ায় টের পেল। টেবিল থেকে মুখ তুলে তাকাল যেন ঘুমভাঙা চোখে!

খোলা চুল, এলানো বেশ অমলার। টিপে টিপে হাসছে অন্যদিকে চেয়ে। আবার লজ্জা এসে জড়িয়ে ধরছে। নতুন বেশ, নতুন রকম। সাত বছরের প্রথম বছরের চেয়ে বিচিত্রতর।

দিবানিশি কাজ ও চিন্তার গৌরবে আঁকা প্রমথর মুখের রেখাগুলি কেঁপে গেল বারকয়েক। উৎকণ্ঠিত গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

ভ্রূ কাঁপিয়ে ফিরে তাকাল অমলা। আচমকা অভিমান স্ফুরিত ঠোঁটে, বিদ্যুৎ কটাক্ষে বিঁধিয়ে দিল প্রমথকে। আবার কোন কথা না ব'লে ফিরিয়ে নিল মুখ। এগিয়ে গেল দরজার দিকে। প্রমথ ডাকল। ফিরল অমলা। গম্ভীর হয়ে উঠেছে প্রমথ। চিন্তার বাষ্পে ঢেকে গেছে প্রায় মুখটা। সীরিয়াস্ হয়ে উঠেছে। যেন ধরাই পড়ল না আর অমলার এ বিচিত্রতর রূপে। একখানি কাগজ বাড়িয়ে বলল, 'সুইডেন থেকে চিঠি এসেছে, মার্চে ওদের মাতৃসংঘের মহাসম্মেলনে। তুমি একটা অভিনন্দনপত্র খস্‌ড়া করে ফেল, পাঠিয়ে দেব আজকার ডাকেই।'

খচ্ ক'রে লাগল অমলার বুকে। আর কিছু জিজ্ঞেস করল না প্রমথ। তার নীরব জিজ্ঞাসা ও চাহনিতে আর কোন কৌতূহল নেই প্রমথর। কোন কৌতূহল, কোন কথা, একটু হাত ধরা? এ কি অবজ্ঞা, না অবুঝপনা! খচ্ ক'রে লাগল, টন্‌টন্ ক'রে উঠল বুকের মধ্যে। কিছু সে বলত, প্রমথর কাছে, তার গায়ে গায়ে লেপ্‌টে, ফিস্‌ফিস্ করে। কিন্তু মাতৃ-সংঘের কাজে কী অদ্ভুত বিভোর সে।

কাগজটা নিল সে হাত বাড়িয়ে। প্রমথর নির্দেশ সে অমান্য করবে, তেমন মন নয় তার। তেমন হৃদয় নয়। সে যে প্রমথ, তার সব শূন্যতাকে ভরে দেওয়ার মালিক।

তবু সাত বছরে, আজকের সবটাই নতুন। তার এমনি করে আসা। প্রমথর এমনি করে নির্বিকারে কাজ তুলে দেওয়া।

দুর্জয় অভিমানের বিদ্যুৎ কটাক্ষে প্রমথর দিকে তাকিয়ে কাগজ নিয়ে বসল সে। কাজ করতে করতে বারবার চোখ তুলে দেখল কাজে ডুবে যাওয়া প্রমথকে। আর চিঠি লিখল সুইডেনের মাতৃসংঘকে। অভিনন্দন জানাল শিশু সংঘের সম্মেলনকে। গুন্‌গুন্ করে উঠল আপন-মনে। 'ওহে সুন্দর মরি মরি!'......সেই ধ্যান-সঙ্গীত।

বাতাস দুর্জয় হয়ে উঠতে লাগল। এতদিনের ঝিরিঝিরি বাতাসে একটা পাগলামির লক্ষণ দেখা দিতে লাগল। অনাদরে পড়ে থাকা বাগানটার লিচু গাছে ফল ধরতে লাগল, বোল ধরতে লাগল আমগাছে। বাদামগাছটা শূন্য হ'তে লাগল, আর একদিকে ভরতে লাগল নতুন পাতায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রমোদ-ভবনটি দুলতে লাগল হাওয়ায়।

নীচের ঘরটায় সব সময় কিচির মিচির। মা ছেলেমেয়ের ছোট্ট সংসারটি সব সময় কলরবমুখর। আরতি কখনো উদাস হয়ে পড়ে। তার উদাস প্রাণের অথৈ জলে একলা খোকার দাস্যিপনাই অনেকখানি। উদাস সে থাকতে পারে না।

দিন যায়। কাজ চলে ঠিক প্রমথর আর অমলার। কাজ চলে, প্রত্যেহ জোড় বেঁধে বেরোয়। কিন্তু আশ্চর্য। সেদিনের ভাবটা আর দূরে হ'ল না। প্রমথ শুধু কাজের কথা বলে, অন্য কথা বলে। গানের কথাও বলে, আদর করে, ভালবাসে, অনর্গল ভালবাসা। শুধু একটি কথা বলে না। অমলা তেমনি অভিমানক্ষুব্ধ চোখে তাকিয়ে দেখে প্রমথকে। দেখে তার বিশাল শরীরটা আর অন্ধকার মুখটা।

তবু কি একটা কথা, সেই কথাটি তারা কেউ বলে না। সেই কথা, যে কথা বাতাসে বাতাসে তাদের কানে কানে ফিরছে, ছড়িয়ে আছে চোখে মুখে। সেই কথা, যে না বলা কথা তাদের সাত বছরের সুরে বেসুর ধরিয়ে দিয়েছে, আলগা ক'রে দিয়েছে, সরিয়ে দিয়েছে। ঘিরে দিয়েছে রুদ্ধশ্বাস ধোঁয়ার বেষ্টনী দিয়ে।

এত যে বেসামাল হয়ে বেরুল অমলা, কোন সামাল দিতে তো হেসে হেসে আসে না প্রমথ। নয় তো, যদি বা সে দিত দড়াম্ ক'রে সেই দক্ষিণের জানালাটা বন্ধ করে। এসব কি সেই নিজের অজান্তে খুলে যাওয়া বুকের ছোট্ট দরজাটি। নিরঙ্কুশ রুদ্ধশ্বাস প্রেমের আলিঙ্গন থেকে ছুটে গিয়ে খুসীটুকু ছড়িয়ে দেওয়া আকাশে আকাশে।

নীচে যায় অমলা। কম যায়। দেখা হয় আরতির সঙ্গে, কথাও হয় অনেক। ছেলেটা তাকে বলে, 'আম্‌লামাছি।' বলে, 'আম্‌লামাছি তোমাল্ কোলে ঠাকবো।'

খোকা কোলে ওঠে। বুকে পড়ে ধামসায়। ধামসায়, আরো কিছু চায়। ওর মায়েরটা ছাড়াও। অমলার মনে হয়, তারহীন তানপুরাটায় বাজে শুধু ঠক্ ঠক্ করে। সে পালায়, পালিয়ে বেড়ায়।

কখনো নীচে আসতে গিয়ে শুধু

দাঁড়িয়ে থাকে সিঁড়ির কোণে। শোনে ওদের কথা। কখনো হয় তো আরতি পড়ায়, 'খোকা, বল্‌তো, একে চন্দ্র...

একে চন্ড।

দুয়ে পক্ষ।

'ডুয়ে পথ।' পরমুহূর্তেই খোকার নতুন চৈতন্যোদয় হয়। বলে, 'একে চন্ড কি মা?'

আরতি বলে, 'একটা চাঁদ, ওই যে আকাশে থাকে।'

খোকা বলে, 'টুই যে বলিছ্‌, ছেই চাঁডটা আমি। আমি টো চাঁড।'

'হ্যাঁ, তুমি আমার চাঁদ।'

'আল্‌ ডিডি?'

'আমার ফুল।'

'আল্‌ কি?'

'আর? আমার পড়ে পাওয়া ধন।'

খোকা হাসে খিল্‌ খিল্‌ ক'রে। রক্তে রক্তে চোরা বান আসে অমলার। ঝিম্‌ ধরে যায় মাথায়, টলে সর্বাঙ্গ। বুকের থেকে একটা অসহ্য যন্ত্রণা ঠেলে ওঠে গলার কাছে।

কখনো খুকী অদ্ভুত কথা বলে, 'আমরা যদি না হতুম?'

'তবে মরে যেতুম।'

'তবে যে তুমি বল, কেন আমরা এলুম।'

'বলি, তোরা যে বড় হতভাগ্য।'

খুকী বলে, 'অমলামাসীর ছেলে হবে না মা?'

'না।'

'কেন?'

'কি জানি।'

তারপর একেবারে নীরব হয়ে যায় সব। তখন আরতি দুজনকে বুকে নিয়ে নিশ্চুপ হয়ে থাকে। অমলা নিঃশব্দে ছুটে যায় ওপরে। কখনো বাগানে। কি যেন আছে শরীরের গুপ্ত কোষে কোষে। বাঁধা আছে, মুক্তি চায়।

প্রমথ দেখেও দেখে না। বলেও বলে না। তার সোহাগ সম্ভোগের পালে কখনো বাতাসের অভাব হয় না, ছেদ পড়ে না কাজে।

একদিন থমকে দাঁড়াল অমলা। স্ক্রু দিয়ে কে যেন এঁটে দিল পা দুটো সিঁড়ির নীচে, ঘরের কোণে।

খোকা বলছে, 'বল্‌ না মা, কি কলে পেলি আমাডের?'

আরতি বলে, 'হেসে হেসে, কেঁদে কেঁদে...

খুকী বলে, 'সেই গল্পটা বলো না মা।'

আরতি বলে, 'কোন্‌টা? রাজকন্যের? আচ্ছা, চুপ করে শোন তবে।'

ফিরতে গিয়ে ও দাঁড়াল অমলা। আরতির গলা শোনা গেল, 'এক রাজা, তার এক কন্যে। রাজকন্যের বড় অসুখ। খায় না, দায় না, লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁদে। রাজা ভাবে, রাণী ভাবে, মন্ত্রী ভাবে, কোটাল ভাবে, রাজ্যময় সংবাদ রটে। ওঝা আসে, বদ্যি আসে, রাজকন্যের অসুখ আর সারে না। কি হ'ল, কি হ'ল? শেষে রাজা গিয়ে কন্যেকে জিজ্ঞেস করল, 'তুমি বল মা, কি হ'লে তোমার অসুখ সারে। কি তোমার চাই।' রাজকন্যে ফুঁপিয়ে বলল, 'আমার ধুলোমুঠি কাপড় চাই।'...ও! ধুলো মুঠি কাপড় চাই? এই কথা? রাজা হাসে, রাণী হাসে, রাজ্যময় সবাই হাসে। রোগ ধরা পড়েছে। দিকে দিকে ঘটক ছুটল, বাজনা বাজল। রাজকন্যের বিয়ে হ'ল। লোক লস্কর, খাওয়া দাওয়া কত কি! দশমাস দশদিন বাদে রাজকন্যের ছেলে হ'ল, হামা দিতে শিখল। ছেলে নতুন কাপড় পরে, ধুলোয় পড়ে খেলল, গড়াগড়ি দিল। সেই কাপড় বুকে নিয়ে রাজকন্যে বলল, 'এই যে আমার ধুলোমুঠি কাপড়, এতদিনে পেলুম।' রাজকন্যে যে ছেলে চেয়েছিল!'

শুনে হাসি ধরে না খোকা খুকীর। ওইখানে দাঁড়িয়ে টলতে লাগল অমলা। বুকে হাত দিয়ে নিঃশব্দে পালিয়ে গেল সে। নিশি পাওয়া রাত্রিঞ্চরীর মত ছুটে গেল বাগানে। দু' হাতে বুক চেপে বসল ঝোপে, তাকিয়ে দেখল নিজের কোলের দিকে। নিশিঘোরে চলে এল আবার ওপরে। রাজকন্যা কাঁদছে বুকের মধ্যে। আয়নার সামনে একবার দাঁড়িয়ে চলে এল প্রমথর ঘরে।

সব বাধা পেরিয়ে, সব অভিমান ছেড়ে, সমস্ত লজ্জা ছাড়িয়ে এসে বসল প্রমথর কাছে, গায়ে গায়ে। রক্ত ছুটে এল প্রমথর মুখে। একটা ঠাণ্ডা হিম স্পর্শ কিলবিল ক'রে উঠে এল তার শিরদাঁড়া বেয়ে। কেমন যেন চাপা আতঙ্কে থম্‌ থম্‌ করে উঠল মুখটা। কিছু জিজ্ঞেস করতে পারল না।

অমলা ফিস্‌ফিস্‌ ক'রে বলল, 'একটা গল্প শুনবে?'

শ্বাসরুদ্ধ নির্বাক প্রমথ। লেন্সের আড়ালে চোখ দুটো শবের মত নিষ্পলক।

অমলা ফিস্‌ফিস্‌ করে বলে গেল রাজকন্যার গল্প। বলল, 'রাজকন্যে ধুলিমুঠি কাপড় চেয়েছিল।'

প্রমথর উত্তেজিত হাতের ঠেলা লেগে একটা ভারী শব্দ করে পড়ে গেল লোহার পেপারওয়েট। সে উঠে দাঁড়াল। লেন্স্‌ দুটো গগল্‌সের মত কালো দেখাল। সে যেন আততায়ীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার উদ্যোগ করল। চাপা তীব্র গলায় বলল, 'আমি চাইনে।'

যেন জানত অমলা। তবু চিত্রার্পিতের মত অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল প্রমথর দিকে। রক্তশূন্য ফ্যাকাসে হয়ে উঠল মুখটা। সেই না-বলা কথা বলাবলি করল তারা আজ পরস্পর। আর সাতটা

বছর যেন ভেঙেগ পড়া পাহাড়ের মত ধ্বসে গেল হুড়মুড় করে।

চোখ দুটো অন্ধ হয়ে এল অমলার। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল, 'কেন, কেন গো?'

একটুও ব্যথা লাগল না প্রমথর। চোখের জল কয়েক ফোঁটা অ্যাসিডের মত জ্বালিয়ে দিল তার বুকটা। তীব্র ঘৃণা ফুটে উঠল তার মুখে। আশ্চর্য! কোন্ অন্ধগুহায় সঞ্চিত ছিল এত ঘৃণা। বলল, 'চাইনে এ তুচ্ছ চাওয়া। এতবড় পৃথিবী, এত অসংখ্য চাওয়া, তার মধ্যে এ অপরিহার্য নয়।'

আরও উত্তেজিত হয়ে উঠল প্রমথ। যেন তার সেই অযাচিত বস্তু ঘিরে ধরেছে তার সর্বাঙ্গে। বারবার তাকে ঝেড়ে ফেলার মত করে বলল, 'চাইনে। ঘৃণিত নোংরা...।

ঘৃণিত! নোংরা! অমলার কানে যেন তীক্ষ্ম শলাকা খোঁচাতে লাগল। যেন তার জীবনটাকে, তার সমস্ত সত্ত্বাকে, তার সমস্ত অধিকারকে আঘাতে আঘাতে ঝেড়ে ফেলতে লাগল প্রমথ। কেন? কী লজ্জা! কী ভয়ংকর লজ্জা, অবহেলা, অপমান! কেন বলতে গেল সে। কেন বলাবলি হল।

প্রমথ বেরিয়ে গেল। চারপাশ থেকে ঘিরে এল আলমারীগুলি। অনেক বই, অনেক রকম দর্শন, সমাজ, শিক্ষা, শাস্ত্র। তার মাঝে ধুলো মুঠি কাপড়কে ছিন্নভিন্ন করে সমস্ত বইগুলি যেন ব্যঙ্গ ক'রে হাসছে। প্রমথর নাম ছাপা বই। দেয়ালে হাসছে লণ্ডনের শিশুদের একটা প্রকাণ্ড ছবি।

তবু রক্ত কণায় কণায় দোলা তো থামে না।

তবু প্রাত্যহিক জীবনে ছেদ পড়ল না কোথাও। ভাঙ্গন ধরল না কোন রাত্রির বুকে। ফাল্গুন গিয়ে এল চৈত্র। পাগলা বাতাসে ঘূর্ণীর লক্ষণ। চৈতালী ঘূর্ণী। এক মাস চলে গেছে। কুঞ্জদা' লোক পাঠিয়ে অন্যত্র নিয়ে গেছেন আরতিকে। আশীর্বাদ করেছেন প্রমথ আর অমলাকে। আরতি যাওয়ার সময় কেঁদেছে। ছোট্ট মেয়েটি বিদায় নিয়েছে করুণ হেসে। ছেলেটি কোল ধামসেছে, 'আম্লো মাছিকে' সারা গায়ে আদর করে চুমো খেয়ে গেছে। রক্তের মধ্যে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বালাটা বাড়ছে, বড় হয়ে একটা মূর্তি ধরেছে।

একেবারে নিঃসঙ্গ হয়ে গেছে সারা বাড়িটা। এত নিঃসঙ্গ, এত ফাঁকা তো কোনদিন ছিল না। ঝোড়ো হাওয়া যে এবাড়িটার গায়ে এমন শব্দ করে মরে, তা তো আগে শোনা যায়নি।

রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে অমলা তার সেই পুরনো স্বরটাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করল। বলল, 'বাড়িটা কি ফাঁকা!'

প্রমথ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, চিরদিনই ছিল।'

—'চিরদিনই থাকবে?'

প্রমথ দৃঢ়স্বরে বলল, 'হ্যাঁ। এই তো আমি চেয়েছিলুম, তুমি আজ সব ভুলে যাচ্ছো।'

ঃ কি চেয়েছিলে?'

ঃ এই নিঝুমতা, আমার এই স্টাডি-রুম, যে স্টাডিরুমের কথা বলাবলি করে সারা কলকাতার লোক। ফিউডল ভাঁড়ামির শিকড় উচ্ছেদ করে আমি আমার এক জ্ঞান-তপস্যার আশ্রম করতে চেয়েছিলুম এটা। যেখান থেকে এই সমাজের স্তরে স্তরে ছড়িয়ে পড়ব আমি। আমার শিক্ষা, আমার কাজ'...

ঃ আর আমি?'

ঃ তুমি আমার সঙ্গিনী, সহধর্মিণী।'

ঃ তোমার কোন্ সঙ্গের, কোন্ ধর্মের?'

ঃ আমার কাজের—'

ঃ আর তোমার দেহের।'

স্তব্ধ হ'ল প্রমথ। তার মুখের আড়ষ্ট রেখাগুলি তীক্ষ্ম নিষ্ঠুর হয়ে উঠল। একটু থেমে বলল, 'তাই। দেহকে তো বাদ দেওয়া যায় না।'

কে যেন কালি ছিটিয়ে দিল অমলার মুখে! তীব্র গলায় বললঃ 'বাদ দিতে হয় শুধু তার ফলকে। তোমার এই অফুরন্ত ভাণ্ডারে গলা টিপে মারতে হয় তাকে, অপমান করতে হয়।'

বাষ্পরুদ্ধ হ'ল অমলার গলা। প্রমথ বলল, 'না। কে না জানে, আমি আজ ছড়িয়ে আছি হাজারো শিশুকে নিয়ে, হাজারো মায়েদের নিয়ে। দেশের সেই ফলকে নিয়েই আমার দিবানিশি কাজ।'

এতদিন এত ক'রেও আজ অমলা বলল, 'তা'তে আমার কি? আমি কি পেলুম?'

ঃ যা আমি পেয়েছি।'

ঃ তুমি যা পেয়েছ, আমি যে তার কিছুই বুঝিনে। আমি তোমাকে সব দিয়েছি। আমার সব নিয়ে তুমি আমাকে কিছুই দাওনি। তোমার আমার এই প্রতিদিনের নিষ্ফল দেহ কিছুই নয়, কিছুই দাওনি তুমি।

প্রমথ অস্থিরভাবে ঘৃণাভরে বলে উঠল, 'সবই দিয়েছি। ওটা দেওয়ার কিছু নয়।'

ফিস্‌ফিস্ ক'রে চাপা গলায় বলল অমলা, 'কেন নয়? তোমার মাতৃসংঘে আর একটি মা বাড়বে। তোমার শিশু সমিতিতে একটি নতুন নাম লেখা হবে।'

'না।' তীব্র ঝাঁজালো গলায় হিংসিয়ে উঠব প্রমথ, 'এখানে আর কিছু থাকবে না। এখানে, এই বাড়িতে, এই ঘরে, তোমার আর আমার মাঝখানে—'

—শুধু তোমার কাছে আমি......?'

কথাটা শেষ করতে পারল না অমলা। ঝড়ের বেগে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

বাইরে চৈত্র বাতাসের হাহাকার। রাত্রিটা কোথায়, কোন্ অন্ধকারে বুক চেপে কাঁদছে।

সমস্ত চৈত্ররাত্রিগুলি কেঁদেছে মাস ভরে। রাত্রে শোবার ঘরে প্রমথ পায়চারি করেছে একলা। দিনে দিনে তার মূর্তিটা যেন আরও বড়, বিশাল শক্তিশালী হয়ে উঠেছে ঘরের মধ্যে। ঘাড়ের পাশের মাংস-পেশীগুলি হয়ে উঠেছে আরও সবল শক্ত। নিঃশব্দে ফুঁসছে কেবলি।

পাশের ঘরের অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে থেকেছে অমলা। শীর্ণ হয়েছে। কালি পড়েছে চোখের কোলে। তবু অপমান-কালো মুখ নিয়ে দিনের বেলা সে বেরিয়েছে প্রমথর সঙ্গে, কাজ করেছে, খেয়েছে। শুধু যে রাত্রির চেহারা করাল হয়ে উঠেছে তার কাছে, সেই রাত্রির কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারেনি। সাতবছরের সমস্ত রাত্রি তাকে ব্যঙ্গ করেছে। সাত বছর ধ'রে তার নারীত্ব মিটিয়েছে একটা বোবা ক্ষুধা। ক্লীব-বাসরের অভ্যাসের দাসী হয়ে সে ফিরেছে এতদিন মহা আনন্দে। আশ্চর্য! কী অদ্ভুতভাবে আজ সমস্ত ব্যাপারটা তার আসল চেহারা নিয়ে দেখা দিয়েছে। তার চাওয়া, চাইতে যাওয়া এক ভয়াবহ লজ্জাকে শাড়ির ফাঁস দিয়ে হত্যা করতে চাইছে। অন্ধকারের মধ্যে সমস্ত বাড়িটা একটা ভয়ংকর মূর্তি ধ'রে এসে দাঁড়ায় তার সামনে। সেখানে ঘোরাফেরা করতে দেখে, তার না-দেখা প্রমথর বাবাকে, মাকে, মামা আর তার বন্ধুদের। তারপর চমকে আতঙ্কিত চোখে দেখে তার সামনে এক মূর্তি। তার চোখ নেই, মুখ নেই, মাথায় চুল নেই। শুধু বিশাল ভয়ংকর মূর্তি। অস্ফুট আর্তনাদ করে চেয়ে দেখে, সে মূর্তি প্রমথর। পোশাক বদলে এসেছে সেই পুরনো জীবটা। সে শুধু সর্বগ্রাসী আলিঙ্গনে অমলাকে নিঃশেষ করে দিতে চায়।

অন্ধকারে নিজের বুকে হাত বুলোয় অমলা। বুকে, পেটে, তার সর্বাঙ্গে। বিচিত্রানুভূতি জাগে তার শরীরে আর মনে হয়, সমস্ত রক্ত বুকে জমে বিন্দু বিন্দু হয়ে ক্ষরে পড়ছে।

প্রমথ প্রতীক্ষা করছিল আর জ্বলছিল তীব্র ঘৃণায়। সে আশা করছিল, তার যুক্তি ও পৌরুষের কাছে আত্মসমর্পণ করবে অমলা। গাইবে তার বুকের কাছে এসে, 'ওহে সুন্দর! মরি মরি! কিন্তু প্রতীক্ষা যত দীর্ঘ হচ্ছিল, ততই বাঁধ ভেঙে পড়ছিল তার। নিষ্ফল আক্রোশে ফুলছিল।

বিকালে তৈরী হ'ল না অমলা বেরুবার জন্য। ঝিমিয়ে পড়া বাতাসের বৈশাখী বিকাল। গাছপালাগুলি সব থমকে গেছে। একটা নিস্তব্ধতা নেমে আসছে চারদিক থেকে। গুমোট আর অন্ধকার ভিড় করে আসছে যেন।

প্রমথ অস্থিরভাবে পায়চারি করছিল। সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু আজ প্রত্যহের বিকালেও ছেদ পড়ছে।

হঠাৎ বাতাস উঠল। বড় রাস্তার ট্রামের ঘর্ঘরানি গোঁ গোঁ ক'রে ধেয়ে এসে ধাক্কা দিল কানের কাছে। প্রমথ আক্রোশে অচৈতন্য অস্থির পায়ে এসে দাঁড়াল অমলার কাছে।

ঃ বেরুবার সময় হয়েছে।'

অমলা শান্ত গলায় জবাব দিল, 'জানি। তুমি যাও। আমি একলা যাব।'

অসহ্য ক্রোধে ভয়ংকর হয়ে উঠল প্রমথর মুখ। বলল, 'না, তা যাওয়া হবে না।'

চকিত দৃপ্ত ভঙ্গিতে মাথা তুলল অমলা, 'কেন?'

কেন? কেন? চোখের লেন্স দুটো নীলচে ইস্পাতের মত ঝকঝকিয়ে উঠল। —'কোনদিন যাওনি। সাতবছরের প্রতিটি দিন, এই সন্ধ্যায়'—

সাতবছরের প্রতিটি দিন! কান্নাচাপা গলায় ফিস্‌ফিস্ ক'রে উঠল অমলা, 'প্রতিটি দিন তুমি ভুলে গেছ, আমি একটা মেয়ে।'

ঃ হ্যাঁ, নক্কারজনক, আদিম, ভাল্‌গার একটা মেয়ে।'

কঠিন হয়ে উঠল অমলার মুখ। ঠোঁটে ঠোঁট টিপে জোর করে নীরব রইল সে। প্রমথ তীব্র চাপা গলায় গর্জন করে উঠল, 'আজকের অযোগ্য, রুচিহীন। যখন মেয়েরা খুঁটে খেয়ে বাঁচতে চাইছে, বাঁচার জন্য ছুটেছে—'

—'হ্যাঁ, বাঁচার জন্য।' তীব্র গম্ভীর গলায় বলে উঠল অমলা, 'কিন্তু মেয়ে হয়ে একজন মেয়ের মত করে। তুমি আমার সে অধিকারটুকুও মানোনি। বলো না, বলো না তুমি আজকের মেয়েদের কথা।'

কিন্তু বিদ্বেষে অন্ধ, কালা প্রমথ বলে চলল, 'আর তুমি, খেয়ে, পরে, একটা পুরুষের সামনে নিলর্জের মত।'

'......কানে আঙুল দিয়ে তীব্র আর্তনাদ করে উঠল অমলা, 'ব'লো না, ব'লো না। বড় নিলজ্জ। মেয়ে হয়ে এত লজ্জা আর সইতে পারিনে, পারিনে।'

বলে সে তড়িৎপায়ে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এই মুহূর্তে স্তব্ধতার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল বাইরের ঝড়ের শব্দ। ধুলোর ঝড় আর অন্ধকার। মেঘের গর্জন আর বাতাসের শাসানি। দুজনেই স্তব্ধ নির্বাক। বাক্‌হীন প্রমথ, ভীত আতঙ্কিত লেন্স দুটো দিয়ে তাকিয়ে রইল অমলার দিকে। তার প্রতি রাত্রের সেই লালসাতৃপ্ত চোখ, যে চোখ ওই দেহ লেহন করতে না পেলে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। আর যেন চিনতে পারছে না অমলাকে। বাতাস ঢুকছে ঘরে! লন্ডনের শিশুদের ছবিটা যেন খিল্‌খিল্ করে হাসতে লাগল তার আর অমলার মাঝখানে এসে। দু' হাত শূন্যে ছুঁড়ে দিয়ে সে বলে উঠল, 'না, না, পারব না।'

কি যেন বলল অমলা ফিস্‌ফিস্ ক'রে। ছিটকে বাইরে গিয়ে দরজাটা টেনে দিল দড়াম্ ক'রে শব্দটা প্রতিধ্বনিত হল, তারপর হারিয়ে গেল হাওয়া।

সাত বছর আগে একদিন যে গান গেয়ে ঢুকেছিল এ বাড়িতে, সে গান গাওয়া তার শেষ হল না। ওহে সুন্দর, মরি মরি! সুন্দর থেকে সুন্দরতরকে চেয়েছিল সে। হে সুন্দর। কী সুন্দর।

কী সুন্দর তুমি।

দুরন্ত ঝড়, আঁধি বইছে। বাগানটা লুটোচ্ছে। হাট করে খুলে আছে গেটটা। চাকরটা বড় বড় চোখে হা করে চেয়ে দেখছে অমলাকে। ওপরে সেই দরজাটায় একটুও শব্দ নেই।

গলির রকে ছেলেগুলি থাকলে বলত, 'আরে শালা! জোড়া যে ভাঙা দেখছিরে!'

আসামের মিরি উপজাতি
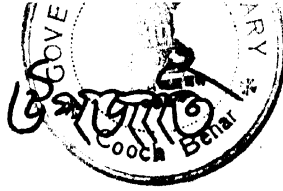
খরস্রোত, স্বচ্ছধারা ব্রহ্মপুত্রের ধারে ও নদীর বিভক্ত জলধারার মাঝে বড় বড় দ্বীপে আসামের মিরি উপজাতির ছোট ছোট গ্রাম। সভ্য সমাজের অতি ব্যস্ত কোলাহলমুখর জীবনযাত্রার থেকে দূরে দুর্গম স্থানে বসবাস করায় এখনও মিরিরা তাদের বহু পুরাতন সুন্দর সুস্থ রীতি নীতি ও সংহত সমাজ ব্যবস্থাকে বাঁচিয়ে রাখতে পেরেছে।

কিছুদিন আগে জোরহাট ও উত্তর লখিমপুর জেলার মধ্যে বালুচর দিয়ে ঘেরা মাজুলি দ্বীপের ভেকালিমুক গ্রামে কয়েকদিন কাটাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। জোরহাট থেকে নৌকা করে দ্বীপে এসে নামলাম। সেখান থেকে মাইল সাতেক হাঁটা পথে যেতে হবে। বালুচরের পাশ দিয়ে শুকনো নালা পার হয়ে চললাম। বর্ষাকালে বরুণদেবের বর্ষণপুষ্ট এইসব নদী নালা জীবন্ত রূপ ধারণ করলে মিরিগ্রামকে যে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করে ফেলে তা ভালভাবেই বুঝলাম। বালির উপর দিয়ে চলছি, শত চেষ্টা করেও গতি-বেগকে বিশেষ বাড়াতে পারিনি।

গ্রামের সীমারেখার কাছাকাছি যখন এসে পৌঁছলাম, সূর্য তখন অস্ত যায় যায়। খুঁটির উপর মাচানের আকারের লম্বা মিরিদের ঘরের চাল ও সমস্ত দিন মাঠের কাজ করে গৃহাভিমুখী কৃষকের দলকে দেখলাম। সব থেকে কিন্তু দেখতে ভাল লাগল সুন্দর ও স্বাস্থ্যবান্ মিরি শিশুদলকে। দুর্বোধ্য ভাষায় অসম্ভব রকম জীবন প্রাচুর্যে তারস্বরে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। অপরিচিত বহিরাগতকে গ্রামে ঢুকতে দেখেই তাদের খেলাধুলো, গোলমাল সব নিমেষে থেমে গেল; অত্যন্ত গাম্ভীর্যের সঙ্গে আমাদের দিকে সবাই দেখতে লাগল। ক্লান্ত অবসন্ন দেহে গ্রামের মোড়লের বাড়িতে গিয়ে উঠলাম। অস্পষ্ট কুয়াশার বহু ঊর্ধ্বে নির্মল মেঘমুক্ত আকাশে তারার মেলা বসেছে, আর দূরে হিমালয় থেকে কনকনে ঠান্ডা বাতাস হিমস্পর্শ দিয়ে যাচ্ছে।

গ্রামের পরিধি জনসংখ্যার অনুপাতে বড়; বাড়িঘর দূরে দূরে। মিরিরা ঘর তৈরী করে মোটা খুঁটির মঞ্চের উপর; সুতরাং ঘর জমি থেকে অনেকখানি উঁচু। লম্বা আটচালা ঘর, মাঝে দেওয়াল দিয়ে ছোট ছোট কুঠুরি বানিয়েছে, যাতায়াতের জন্যে রয়েছে সামনে অপ্রশস্ত পথ। ঘরের ভিতরটা তকতকে, ঝকঝকে। মিরিরা নিজেরাও বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। কিন্তু ঘরের নীচে ময়লা জল জমা হয়ে রয়েছে, তাইতে আবর্জনা স্তূপ পচছে এবং শুয়োর ও মুর্গীর পাল তারি মধ্যে পরমানন্দে খাবার সন্ধান করছে। জানোয়ার ও পাখি রাখার ব্যবস্থা ঘরের নীচেই, সুতরাং চারদিক নোংরা হয়ে থাকে।

সমস্ত গ্রামের মধ্যে মাচানের তলায় আবর্জনা স্তূপ ছাড়া আর কোনও নোংরা জিনিস চোখে পড়ে নি। মিরিদের জীবন-যাত্রার পরিচয় যতটুকু পেয়েছিলাম, তাতে অসৌন্দর্য, মলিনতা কোথাও দেখিনি। মেয়েদের স্বাস্থ্যে, পরিচ্ছদে একটা শান্ত শ্রী ফুটে উঠে, আর ব্রহ্মপুত্র, আশেপাশের শ্যামলিমা এবং দূরে দিকচক্রবালে হিমালয় পাহাড়, সব মিলিয়ে পরিবেশ বড় মধুর। তাই গ্রামের বহু বয়স্কদের সঙ্গে এ প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। গ্রামের মধ্যে আবর্জনা যে পরিচ্ছন্ন জীবনে অসঙ্গতি সৃষ্টি করছে, তা কেউ মানতে চাইল না। শিক্ষিত যুবকদের মধ্যে এ সম্বন্ধে সচেতনতা আছে, কিন্তু তারা এখনও কিছু করে উঠতে পারে নি।

প্রথম দিন মিরি বাড়িতে ঢুকে তাদের জীবনযাত্রার ধারা লক্ষ্য করার চেষ্টা করলাম; সঙ্গে একজন পথপ্রদর্শক ও দোভাষী সব সময়ে থাকত। সকালে যখন আমরা ঘুরতে বেরুলাম, তখন পুরুষদের প্রায় কাউকেই দেখতে পেলাম না, সবাই মাঠে বেরিয়ে গিয়েছে। মেয়েরা বাড়ির সামনে উঠোন ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করছে। কেউ কেউ শুয়োর, মুর্গি খুলে দিয়ে তাদের খাবার দিচ্ছে। নদী থেকে জলও আনতে যাচ্ছে। উৎসাহী মৎস্য শিকারিণীর দল গিয়েছে অনেক দূরে

ব্রহ্মপুত্র নদের মধ্যস্থলে অবস্থিত ক্ষুদ্র দ্বীপ মিরি উপজাতির বাসভূমি। এরোপ্লেন হইতে গৃহীত ফটো

শস্য বাছাইয়ের কাজে মিরি রমণী

নদীর উজানে বাঁশের ফাঁদ দিয়ে মাছ ধরতে। তাছাড়া জঙ্গল থেকে শুকনো কাঠ-কুটো, ফল-মূল সংগ্রহ করে আনতে হবে। যারা বাড়ি থাকল, তারা ঢেঁকিতে ধান ভানতে লাগল।

মেয়েদের এ সমস্ত কাজে সাহায্য করতে হবে, শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পূর্ণ তাদেরি উপর। সাত থেকে বার বছরের মেয়েদের পিঠের সঙ্গে ছোট ছেলেমেয়ে বাঁধা রয়েছে। জীবন্ত বোঝা নিয়ে মেয়েরা ছুটে ছুটে ফাই-ফরমাশ খাটছে। যারা আরও কর্মঠ, কাজের ফাঁকে, অবসর পেলে নিজেদের গাছের কাপাস নিয়ে তকমা (তকলি) কাটছে। মাঝে মাঝে বাহকের দল বাঁধন খুলে শিশুদের বের করে নিয়ে তাদের সঙ্গে খেলা আরম্ভ করে দিচ্ছে। খেলার মধ্যেও অভিনবত্ব আছে। বাচ্চা খেলতে চাইছে না, অবিরাম তার-স্বরে চেঁচাচ্ছে, তবুও খেলা থামছে না। এত বড় প্রলয়কান্ড ঘটতে দেখেও মা কিন্তু মোটেই বিচলিত নয়। সন্তানের দায়িত্ব ভাবী গৃহিণীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে একান্ত নিশ্চিন্ত।

পুরুষের থেকে নারীরা অনেক বেশি কর্মঠ, ছোটো মেয়েদের সঙ্গে সমবয়সী ছেলেদের কাজের কোনও তুলনা করাই চলে না। সমস্ত দিন ধরে কিশোরীর দল ভবিষ্যৎ গৃহিণীপণার তালিম হাতে-কলমে দিচ্ছে। কিশোর বালক তখন কিন্তু দিগন্তপ্রসারী মাঠের মধ্যে গরু ও মহিষের পাল নিয়ে পরম আনন্দে সময় কাটাচ্ছে। হৃষ্টপুষ্ট মহিষের উপরে চড়ে চলছে দৌড় প্রতিযোগিতা। সঙ্গে রয়েছে 'পেঁপে'র ডালের বাঁশি। বাঁশির মিঠে আওয়াজের সঙ্গে নিজেদের তৈরী অদ্ভুত

বৃদ্ধা মিরি রমণী তার দৌহিত্রীকে 'মিরিজিন' বোনার কাজ শিখিয়ে দিচ্ছে

নাচও রাখালের দল নাচে। সব থেকে আনন্দ পায় প্রতিবেশীর ফলের বাগানের উপর চড়াও করে। তারপর ব্রহ্মপুত্রের হিমশীতল খরস্রোতে স্নান ও সাঁতার আরম্ভ হয়। কয়েক ঘণ্টা ধরে জলের সঙ্গে মল্লযুদ্ধ, অশান্ত নদীর ঘূর্ণি এবং অবিশ্বাস্য টান তাদের কাছে বড় পরিচিত। নির্ভয়ে, নিশ্চিন্তে প্রকৃতির উদার, উন্মুক্ত পরিবেশে মিরি যুবক জীবন-সংগ্রামে যোগ দেয়। ছোট বয়স থেকে বিপদের মধ্যে বেড়ে উঠেছে, সুতরাং তাকে সহজে কাবু করা যায় না। মেয়েরা কিন্তু কর্মব্যস্ত, কৈশোরে গৃহিণীপণার ব্যস্ত প্রস্তুতিতে একটু বেশি বুদ্ধিমান, বেশি গম্ভীর হয়ে উঠে।

বিয়ের পর ঘরের অধিকাংশ কাজের দায়িত্ব বধূকেই নিতে হয়। ঘরদোরের কাজ ছাড়াও মাঠের চাষবাসেও সাহায্য করতে হয়। ধান কাটা, মাড়াই, গোলাজাত করার সময় পরিবারের সবাইকেই মাঠে যেতে হয়—খুব বুড়োবুড়ি, অসুস্থ ও শিশুর দল ছাড়া।

দুপুর বেলা মাঠের কাজ থেকে ছুটি নিয়ে সবাই বাড়ি ফিরে আসে। খাবার তৈরী। উপকরণ সামান্য, ভাত আর মাছ (সেদ্ধ বা ঝলসানো); সঙ্গে কাঁচা লঙ্কার প্রাচুর্য ও সামান্য লবণ। সামান্য কিছু তরি-তরকারি পাওয়া যেতে পারে। ডাল হয় কালে ভদ্রে। পরিমিত ব্যঞ্জন দিয়ে আহারের পর কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ঘরে-তৈরী পচাই মদ 'আপঙ্গ' চাই-ই। তারপর আবার মাঠের পথ ধরে কৃষকেরা কাজে চলে যাবে। গৃহকর্ম শেষ হয়ে যাবার পর মেয়েরা বসবে তাঁতের পাশে। নিজেদের হাতে-কাটা সুতো দিয়ে তারা তৈরী করবে মিরিজিন—নরম তুলোর তোশক। মিরি কুটীরশিল্পের সব থেকে সুন্দর সৃষ্টি এই মিরিজিন—সমস্ত পূর্ব বাংলা ও আসামে এক সময়ে বিশেষ সমাদৃত ছিল।

সন্ধ্যায় অস্তগামী সূর্য কিরণে বালুস্তূপের পাশে ব্রহ্মপুত্রের প্রশস্ত জলধারা সজীব হয়ে উঠে। আর বহু দূরে হিমালয় পর্বতমালার নামগোত্রহীন শিলা-রাশি অস্পষ্ট আলোকে অদ্ভুত আকার ধারণ করে গোধূলির সাথে কৃষকের ঘরে ফিরে আসার সময় হয়ে আসে। মেয়েরা কিছুক্ষণ আগেই ঘরের পথে চলে গিয়েছে।

তাদের অনেক কাজ করতে হবে। ফিরবার পথে শুকনো জ্বালানি কাঠ এবং আপঙ্গ তৈরী করার জন্যে বন থেকে 'তারা এক্রম' ও কলাপাতা সংগ্রহ করে নিয়ে যেতে হবে। ঘরদুয়োর পরিষ্কার করে মেয়েরা গেল নদীতে স্নান করতে, সঙ্গে শিশু ও কিশোরের দলও চলল। দিনের কাজ সেরে পুরুষরাও নদীর জলে বহুক্ষণ ধরে স্নান করে পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন অবস্থায় বাড়ি ফেরে। ফিরে এসে উঠোনে বা শীতের দিন হলে আগুনের কুণ্ডকে ঘিরে বসে জমাট আড্ডা। বন্ধুবান্ধবের দলও এই সময় বেড়াতে আসবে। বহুক্ষণ ধরে গল্প-গুজব, অবিশ্রান্ত ধূমপান এবং প্রচুর আপঙ্গ পান চলবে। আপঙ্গ আনতে দেরি হলে আর রক্ষে নেই, বকে ঝকে অনর্থ বাধিয়ে দেবে গৃহকর্তা। আগেকার দিনে নাকি রোষ বেশি হলে সহধর্মিণীকে এই সময় কিঞ্চিৎ প্রহার দেবার বিধি ছিল, তবে আত্মরক্ষার জন্যে স্ত্রীর প্রত্যাঘাতকেও সমাজ নিষিদ্ধ করেনি।

বৃহত্তর দেশের সাধারণ অর্থনৈতিক অবস্থা মিরিদের জীবনকেও নিয়ন্ত্রিত করে। তাদের কৃষি-ব্যবস্থার ধারা যৌথ, ফলে সামাজিক শ্রেণীবৈষম্যের সৃষ্টি হয়নি। সবাই খেয়ে পরে একরকম থাকে, সেখানে ভিখারী নেই। ছেলেমেয়েদের মেলা-মেশার ব্যাপারে কোনও সামাজিক বিধি-নিষেধ নেই। বিবাহের পূর্বে পূর্বরাগ সমাজ-স্বীকৃত। ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী যুবক-যুবতী নিজেরাই স্থির করবে। বিশেষ কোনও কারণ না থাকলে তাদের স্বাধীন নির্বাচনে সমাজ হস্তক্ষেপ করে না। সমাজে বিবাহ প্রস্তাব উত্থাপনের রীতিতে অভিনবত্ব আছে। যুবক প্রণয়িনীর উদ্দেশ্যে নিজের গৃহকর্তার হাত দিয়ে সুপারি ও এক ভাঁড় আপঙ্গ পাঠিয়ে দেয়। এ উপহারের অর্থ মিরি সমাজে সুবিদিত, কন্যাপক্ষ যদি তা গ্রহণ করে, তবে তাদের বিবাহ স্থির হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়।

সমাজপতি ও অভিভাবকদের মতানৈক্য ও বিরোধিতার ফলে বিবাহ ভেঙ্গে গেলে, পালিয়ে গিয়ে গোপনে বিবাহের রীতিও প্রচলিত। আগে থেকে ব্যবস্থা করে প্রেমিক প্রেমিকা গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। কদিন পরে ফিরে এসে ঘোষণা করে যে,

মিরি বালিকাটি তকলি কাটছে, পিঠে ঘুমিয়ে আছে তার ছোট্ট ভাই

স্বামী-স্ত্রীরূপে তারা বসবাস করেছে। সমাজ এ বন্ধনকে অন্য রীতিতে বিবাহের মর্যাদা দান করে। বহু যুবক-যুবতী খরচের দায় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে এমনি করে পালিয়ে গিয়ে বিবাহ করে। বিবাহ উৎসবে ভূরিভোজ এবং অপর্যাপ্ত আপঙ্গ পানের ব্যবস্থা আছে। এত বড় খানাপিনার খরচ যোগাবার জন্যে যুবককে বহু পরিশ্রমে সযত্নে অর্থ সঞ্চয় করতে হয়।

বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার রীতি আছে। গ্রামের মাতব্বরদের কাছে সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করতে হবে যে, চরম পন্থা গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা আছে। বিপথগামী স্বামী স্ত্রীকে অবৈধ আচরণ করতে সমাজ দেবে না, সামাজিক অনুশাসনের দৃঢ়তা এ বিষয়ে সকলকেই মানতে হয়। বিবাহ বিচ্ছেদের পর সন্তান সাধারণত মায়ের কাছেই থাকে, কিন্তু তাদের উপর পিতারও অধিকার আছে। পুত্র-সন্তানকে পিতাই সাধারণত নেয়। মেয়ে নিয়ে লাভ নেই। বিবাহ হয়ে যাবার পর কন্যা অন্য বাড়িতে চলে যাবে, বৃদ্ধ পিতাকে আর দেখাশুনা করতে পারবে না।

পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয় ছেলেরা। সকলের অংশ সমান, তবে বড় ভাই অভিভাবক হবে। সম্পত্তি ভাগ করার প্রয়োজন হলে "গাঁও বড়ার" নেতৃত্বে সভা বসবে মাতব্বরদের। সেইখানে সকলের সম্মতি নিয়ে ভাগ বাঁটোয়ারা হবে। এসব ব্যাপারের মীমাংসা তারা নিজেরাই করে, আইন আদলতের আশ্রয় নেয় না।

মিরিরা হিন্দু, কিন্তু তাদের আচার,

ব্যবহার, পূজো পাঠের মধ্যে বহু বৈদিক রীতি ও অদ্ভুত ধরনের নিজস্ব উপ-জাতির ধ্যান, ধারণা সংমিশ্রিত। "আম্লাগ-পুচ্ছ" উৎসবে সূর্য, চন্দ্র ও পূর্বপুরুষের পূজো হয়। দেবতার উদ্দেশ্যে অর্পিত হয় বরাহমাংস ও আপঙ্গ। জ্যেষ্ঠের দল গোল হয়ে বসে মন্ত্র উচ্চারণ করেন তাঁদের উৎসর্গের কথা জানিয়ে। সন্ধ্যের সময় বুড়ো বুড়ীর দল সুন্দর সজ্জায় সজ্জিত হয়ে বহুক্ষণ ধরে নাচবে। এই উৎসবে যুবক যুবতীর দল নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবে। দেবপূজো অর্চনায় যোগদানের অধিকার তাদের নেই। কিন্তু, ভোজের সময় এ দূরত্ব থাকবে না; আহারে ও পানে সবাই একই সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ করে খেতে বসবে।

মিরি সমাজের সব থেকে বড় উৎসব "ডাবু"। বছরে দুবার এ উৎসবের আয়োজন হয়। উপাস্য দেবতা ভগবান "নিরঞ্জন নিরাকার"। নবান্নের দিনে বাংলার কৃষক যেমন শস্য, সম্পদের জন্য দেবতাকে নতুন ধানের অর্ঘ্য নিবেদন করে, এ উৎসবের মূল উদ্দেশ্য সেইরকমই। তার সঙ্গে ভূত, প্রেত প্রভৃতি উপদ্রবী দৃষ্টিশক্তি বিতাড়নের প্রার্থনাও দেবতার কাছে করা হয়। যুবকের দল খুব ভোরে জ্বলন্ত মশাল ও বাঁশ নিয়ে দল বেঁধে গ্রাম প্রদক্ষিণ করতে বেরোবে। প্রতিটি বাড়ির দেওয়ালে বাঁশের লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে মন্ত্র উচ্চারণ করবেঃ

চিল্লা পাক্কে নোলুক রামনাম
কিনামুম লাবাম দাগবুম।

সভ্যজগতের আলোকপ্রাপ্ত মিরি পুরুষ

—আমরা তোমার গৃহের সমস্ত ভূত, প্রেত ও অনিষ্টকারী শক্তিদের তাড়িয়ে দিচ্ছি, আর তারি সঙ্গে তোমার দুঃখ কষ্টও।

প্রতিটি পরিবার মোরগ অথবা ডিম এই দলের হাতে দেবে। গ্রামের মধ্যে বেদীমূলে সমস্ত উপহার একত্র করা হবে। তারপর "নিরঞ্জন নিরাকারের" উদ্দেশ্যে মন্ত্রপূত মুর্গি বলি দেওয়া হবে। বলির মন্ত্রের সহজ বাংলা অনুবাদঃ

"পিতা চন্দ্র, মাতা সূর্য, তোমরা দেখ ও শোন! বৃক্ষ, লতা, বেতস, নদী ও ভূমি! তোমাদের সকলের সাক্ষাতে আমরা আজ নিরঞ্জন নিরাকারকে (কারাসিং কারতক) এইসব উৎসর্গ করছি যাতে গ্রামের সমস্ত অকল্যাণকর শক্তি দূর হয়।"

এই উৎসবের দিনে গ্রামের প্রতিটি প্রবেশপথের ধারে বাঁশের সঙ্গে বেত ঝুলিয়ে রাখা হয়। অনিষ্টকারী অপ-দেবতার দলকে গ্রামে প্রবেশ নিষেধের বিজ্ঞপ্তি এইভাবে জানিয়ে দেওয়া হয়। পূজো পাঠ হয়ে যাবার পর বলির মাংস ও মদ্য সকলে মিলে খায়। উৎসবের পর পাঁচদিন পর্যন্ত সবাই ব্রত নেয় যে, অশুদ্ধ বা অপবিত্র কোনও জিনিসও কদিন তারা খাবে না। সে ব্রত নিষ্ঠার সঙ্গে সবাই উদ্‌যাপন করে।

মিরিদের ভাষার কোনও লিখিত রূপ নেই। সুতরাং প্রাথমিক স্কুলেও মিরি ছেলেমেয়েদের শিক্ষা অসমীয়া ভাষার মাধ্যমে দেওয়া হয়। অসমীয়া শিক্ষক, অসমীয়া সরকারী কর্মচারী এবং অন্যান্য কর্মকর্তাদের সংস্পর্শে মিরি সমাজের উপর অসমীয়া সংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রভাব পড়ছে। ভারতবর্ষে সব রাজ্যেই কমবেশী পরিমাণে উন্নত, অগ্রসর সংখ্যাধিক্য সমাজের ভাষা, রীতি, নীতি সংখ্যাল্প উপজাতিদের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, জীবনযাত্রাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে। মিরিদের মধ্যে তাই পোশাক পরিচ্ছদে অসমীয়া ধারার প্রসার দেখতে পাওয়া যায়। নিজেদের বর্ণবৈচিত্র্যে অতুলনীয়, উজ্জ্বল সারং ছেড়ে দিয়ে অসমীয়াদের পোশাকে মিরি রমণী এখন নিজেকে আচ্ছাদিত করতে ভালবাসে। পুরুষ-স্ত্রীর মিলিত নৃত্য একই কারণে লোপ পাচ্ছে।

মিরিরা নিজেদের বিশিষ্ট পুরো-কাহিনী প্রায় ভুলে গিয়েছে। রামায়ণ, মহাভারতের কাহিনীই বিকৃতরূপে তারা বলে। ফেরার পথে আমার সহযাত্রী ও পথপ্রদর্শক ছিল একজন মিরি যুবক। সে কলেজে পড়ছে, বাইরের জগৎকে দেখছে ও তার সম্বন্ধে জানছে। মিরিদের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ধারা নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল। তার বড় আশা যে, তাদের নিজের ভাষায় অসমীয়া লিপিতে সে পাঠশালার অঙ্ক, ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি লিখবে। মিরি ছেলেমেয়েরা নিজেদের মাতৃভাষায় পাঠশালায় লেখা পড়া শিখুক এটা তার বড় ইচ্ছে। ব্রহ্মপুত্রের ধার দিয়ে আসার সময় সে-কথা শুনে জিজ্ঞাসা করেছিলামঃ তোমার মত কি আর কেউ এ সম্বন্ধে ভাবছে? উত্তর পেলামঃ হ্যাঁ —অনেকে। শিক্ষিত মিরি যুবকের দল নিজেদের বিস্মৃতপ্রায় সংস্কৃতি আবার পুনরুদ্ধার করতে চায়।

কবে তা হবে নিশ্চয় করে বলতে পারব না।*

[শ্রীসুনীল জানার ডায়েরী অবলম্বনে শ্রীনিখিল মৈত্র কর্তৃক লিখিত ও আলোকচিত্র শ্রীসুনীল জানা কর্তৃক গৃহীত]

কলকাতায় পাউলিং

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৫৪ সালের রসায়ন শাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত সুপরিচিত বিজ্ঞানী অধ্যাপক লাইনাস পাউলিং এসেছিলেন কলকাতায়। ভারত সরকারের বিশেষ আমন্ত্রণক্রমে দেড় মাসকাল ভারত সফর তাঁর কলকাতাতেই শেষ হলো। জানুয়ারী মাসের প্রথম ভাগে বরোদার বিজ্ঞান কংগ্রেসে যোগদান করে তিনি যে পরিভ্রমণ শুরু করেছিলেন তা সমাপ্ত করে ১৫ই ফেব্রুয়ারী, মঙ্গলবার যাত্রা করছেন ব্যাংককের পথে। প্রথমে ব্যাংকক তারপর জাপান, তারপর হনলুলু হয়ে সোজা ক্যালিফোর্নিয়া অর্থাৎ স্বস্থানে।

পাউলিং সাহেব আসবেন কলকাতাতে বিজ্ঞান কর্মী মহলে একটু হৈ চৈ পড়বে বৈকি। সাগ্রহে সবাই দিন গুণছে কবে দেখা পাবে এই স্বনামখ্যাত রাসায়নিকের। অবশেষে দিন হলো সমাগত, ১০ই ফেব্রুয়ারীর বৈকালে বিজ্ঞান কলেজের ল্যাবরেটরীর ফিজিক্স হলে আর তিল ধারণের স্থান নেই। অধ্যাপক পাউলিং সেদিন ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির আমন্ত্রণে প্রোটীনের গঠন প্রণালীর উপর এক বক্তৃতা দেবেন। কলকাতার বিজ্ঞানী মহলে তাঁর এই প্রথম বক্তৃতা—তাই ভিড় হয়েছে প্রচন্ড। সম্প্রতি আর কোন বিজ্ঞানীকে দেখবার জন্য অথবা তাঁর বক্তৃতা শুনবার জন্য এইরকম ভিড় কলকাতায় হয়নি। সেদিনকার বক্তৃতায় অগণিত সংখ্যায় সমবেত হয়ে কলকাতার বিজ্ঞানীমন্ডলী অধ্যাপক লাইনাস পাউলিং-এর অসাধারণ জনপ্রিয়তার এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর রেখে গেলেন। এই প্রথম দেখলাম পাউলিং সাহেবকে—সুন্দর, সুপুরুষ, প্রশস্ত ললাট, সমগ্র আনন উদ্ভাসিত হয়ে রয়েছে দীপ্তিদীপ্ত দুটি চক্ষুর অত্যুজ্জ্বল আলোকে। সেদিনকার সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডাঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ তাঁর সাদর আহ্বানে অধ্যাপক পাউলিং এগিয়ে এলেন মঞ্চের দিকে, বক্তৃতা হলো শুরু।

অধ্যাপক লাইনাস পাউলিং কলকাতাতে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়ান্সের রসায়ন শাস্ত্রের কোচবিহার অধ্যাপকের সম্মান স্বীকার করে আরও তিনটি বক্তৃতা দেন। বিষয় যথাক্রমে বিভিন্ন যৌগিক পদার্থ, মিশ্র ধাতু এবং প্রোটীনের গঠন প্রণালী। তাঁর গম্ভীর কন্ঠের অতুলনীয় বাচনভঙ্গী সজীব করে তুলেছিল বিজ্ঞানের এই বিষয়গুলির প্রাণস্পন্দনকে। মুগ্ধ বিস্ময়ে উপলব্ধি করেছিলাম তাঁর এই অননুকরণীয় বিশ্লেষণক্ষমতার অসামান্য পরিচয়। প্রতিটি সভায়ই উপস্থিত ছিলাম কিন্তু ঘনিষ্ঠভাবে মিশবার সুযোগ পেলাম সেদিন প্রথম যখন মাস্টার মহাশয়ের (অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়) সঙ্গে এই বিদেশী অধ্যাপক আমাদের গবেষণাগার পরিদর্শনে এলেন। দুই অধ্যাপক শুরু করলেন আলোচনা আর আমি একে একে দেখাতে লাগলাম আমাদের গবেষণাগারে প্রস্তুত বিভিন্ন পদার্থগুলি। ইতিমধ্যেই ফণীদা (ডক্টর ফণী দত্ত) আমার সঙ্গে অধ্যাপক পাউলিং-এর পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন—গবেষণাগারে সকলের মাঝে ভালোভাবে আলাপ করা যায় না তাই অধ্যাপক পরদিন সকাল সাড়ে ৯টায় তাঁর সঙ্গে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে দেখা করতে জানালেন আমন্ত্রণ।

ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অফ সায়েন্স-এর গবেষণাগারে আলোচনারত অধ্যাপক পাউলিং এবং অধ্যাপক শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়

ঠিক কাঁটায় কাঁটায় ৯টা বেজে পঁচিশ মিনিটে গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে এসে পৌঁছলাম—সঙ্গে আশুতোষ কলেজের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক বন্ধুবর শ্রীঅসিত রায় এবং মিসেস পাউলিং-এর জন্য আনা একটা বাংলা বই ও ফুলের তোড়া। হোটেলের সামনেই দেখি ডাঃ দত্ত এবং সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজের রসায়নের অধ্যাপক রেভাঃ ফাদার বেকার দাঁড়িয়ে। কি ব্যাপার! ফাদার বেকার এসেছেন আমাদের মতোই অধ্যাপক পাউলিং-এর সঙ্গে আলাপ করতে আর ফণীদা অপেক্ষা করছেন মিসেস পাউলিংকে কলকাতার কয়েকটি বিশেষ স্থান দেখাতে নিয়ে যাবার জন্য। অধ্যাপক পাউলিং আজই রাত্রে কলকাতা পরিত্যাগ করে ব্যাংকক যাত্রা করছেন তাই আরও কয়েকজন শিক্ষাবিদ এসেছেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। অগত্যা এবার আমি কি করব? একা পাবার সুযোগ আর বোধহয় মিলল না। ফণীদা বললেন, "চলো মিসেস পাউলিংকে কলকাতা দেখিয়ে আনি।" সেই ভালো, অধ্যাপককে এখন একা পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার, তার বদলে পাউলিং ঘরণীর সঙ্গেই আলাপ করি।

সকলে মিলে উপস্থিত হলাম অধ্যাপক পাউলিং-এর কক্ষে—তিনি তখন বিজ্ঞান কলেজের অধ্যাপক ডাঃ শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন। আমাদের দেখেই অমায়িক বিজ্ঞানী

ডঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের মর্মরমূর্তির সহিত পাউলিং দম্পতী। বামদিক হইতে দণ্ডায়মানঃ অধ্যাপক শান্তিরঞ্জন পালিত, ডঃ ফণী দত্ত, অধ্যাপক শ্রীবাস্তব, ডঃ অক্ষয়ানন্দ বসু। চেয়ারে উপবিষ্টঃ অধ্যাপক সরকার, ডঃ মেঘনাদ সাহা, অধ্যাপক লাইনাস পাউলিং, মিসেস পাউলিং, অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়

দাঁড়িয়ে উঠে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। ওদিকে দেখি মিসেস পাউলিং কলকাতা পরিভ্রমণের জন্য প্রস্তুত, আমিও যাব তাঁদের সঙ্গে তাই অধ্যাপককে আমার ইচ্ছা জানালাম। তিনি বললেন, "আমি তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করতে চাই। যাই হোক বেড়িয়ে ফিরতে তোমাদের বেলা ১২টা হবে তখন এক সঙ্গে বসা যাবে।"

তৎক্ষণাৎ সানন্দে সম্মতি দিলাম—এতো আমার পরম সৌভাগ্য। বন্ধুবর অসিত রায়ের ক্যামেরা উদ্যত হয়েই ছিল, কয়েকটি ছবি তোলার পর আমি, ফণীদা আর মিসেস পাউলিং যাত্রা করলাম কলকাতা পরিদর্শনে। হোটেলে যখন আবার ফিরে এলাম তখন বেলা সওয়া বারটা হবে, দেখি ডাঃ পাউলিং আমার জন্যই অপেক্ষা করছেন। এইখানেই আর সকলে বিদায় নিলেন—কক্ষমধ্যে মুখোমুখি বসলাম আমি আর দিগ্বিজয়ী বিজ্ঞানী অধ্যাপক লাইনাস পাউলিং। বহু কথা হলো—আমার সম্বন্ধে, তাঁর সম্বন্ধে, ভারতবর্ষ সম্বন্ধে, আমার স্মৃতিপটে এই আলোচনার মাধ্যমে আঁকা রইলো এক অবিস্মরণীয় চিত্র। মাত্র ১ ঘণ্টা আমি তাঁর সঙ্গে একা কাটাবার সৌভাগ্য অর্জন করেছিলাম—মনে হয় এই সময়ের প্রতি মুহূর্তই আমার জীবনের মহামূল্যবান সম্পদ।

প্রথমে আমি প্রশ্ন করলাম, "কেমন লাগছে আপনার, আমাদের এই শহরটাকে?"

"বিরাট প্রশ্ন করে বসেছ তুমি।" অধ্যাপক পাউলিং উত্তর দিলেন। "যেখানেই যাই এই একটা প্রশ্ন সবাই করে বিশেষ করে সাংবাদিকেরা। কিন্তু এই চার দিন তো বক্তৃতা দিতেই কেটে গেল, কিই বা দেখলাম, জানলাম যে মতামত প্রকাশ করব?"

এইবার ভদ্রলোক আমাকেই জেরা করতে শুরু করেন, "কি কর তুমি? ডাঃ দত্ত বলেছিলেন লেখোটেকো, তাই কি তোমার জীবিকা?"

অগত্যা নিজের গুণকীর্তন নিজেকেই করতে হয়, খুলে বলতে হয় সব কিছু। বিশুদ্ধ রসায়ন থেকে আরম্ভ করে রসায়নেতিহাসের কথা কিছুই বাদ দিই না।

"তুমি রসায়নের ইতিহাস সম্বন্ধে লিখছো কিন্তু Journal of the Chemical Education of America এতে লেখা পাঠাও না কেন?"—আবার প্রশ্ন।

সবিনয়ে জানাই—সায়ান্স এ্যান্ড কালচার আমাদের দেশের পত্রিকা তাই সেখানেই রচনা প্রকাশ করতে পছন্দ করি।

কিন্তু পাউলিং সাহেব ঠিক এই উত্তরে খুশী হলেন না। বললেন, "তোমার দেশের বিজ্ঞানেতিহাস আমরা সবাই জানতে ইচ্ছুক; কিন্তু সায়ান্স এ্যান্ড কালচার সব জায়গায় পাওয়া যায় না। জারনাল অফ কেমিক্যাল এডুকেশন এতে লিখলে সমগ্র দুনিয়ার লোক পড়তে পারবে। সায়ান্স এ্যান্ড কালচারে দা[ও] খুবই ভাল; কিন্তু এবার থেকে মাঝে মা[ঝে] জারনাল অফ কেমিক্যাল এডুকেশন এতে লেখা পাঠিও। আচ্ছা তুমি তো বাংলা লেখ—তোমাদের ভাষায় বিজ্ঞানের বিভি[ন্ন] শব্দের প্রতিশব্দ আছে তো?"

আমি বললাম, "আমাদের দেশে এখ[ন] সব কিছুই প্রস্তুতির পথে। সাহি[ত্যে] আমাদের ভাষা যতই শক্তিশালী হোক [না] কেন, বিজ্ঞান রচনার বিষয়ে এখনও দুর্বল। বিজ্ঞান বিষয়ক সমস্ত পরিভাষা এখন[ও] ভালো তৈরী করা যায়নি তাই আমি ব্যক্তি গতভাবে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ইংরাজি ক[থা] বাংলা অক্ষরে লেখা পছন্দ করি।"

অধ্যাপক পাউলিং বললেন, "বিজ্ঞানে[র] চরিত্র আন্তর্জাতিক এবং তার প্রকা[শ] ভঙ্গিমাও তাই আন্তর্জাতিক হও[য়া] একান্ত প্রয়োজন। পরিভাষা তৈরী ক[রা] অত্যন্ত কঠিন কাজ—সব সময়ে ম[নে] রাখতে হবে ভাষাই যেন আবার জগতে[র] বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গে আমাদের সংযো[গে] বাধার সৃষ্টি না করে। অবশ্য তোমাদে[র] পরিভাষা কিরকম সাফল্য অর্জন কর[েছে] তা তুমি আমার চেয়ে বেশী ভাল বোঝ।"

"আর একটা জিনিষ আমার খুব ভা[ল] লাগে না",—অধ্যাপক আবার বলতে আর[ম্ভ] করেন। "সব দেশেই দেখছি রসায়নে[র] বহু ছাত্রই পদার্থ বিদ্যায় খুব ওয়াকিবহা[ল] নয়। এটা খুবই খারাপ চিহ্ন, কার[ণ] বর্তমান জগতে পদার্থ আর রসায়ন বিদ[্যা] আলাদাভাবে চলতে কিছুতেই পারে না। আমার মনে হয় আজকের দিনে রসায়নে[র] প্রত্যেক গবেষকেরই কোয়ান্টাম মেকানিক[্স] সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।"

মহা বিপদে পড়লাম, আমি এ[সে]ছিলাম অধ্যাপককে কিছু প্রশ্ন করত[ে]

ন্তু তিনিই আমাকে প্রশ্নাঘাতে জর্জরিত রে তুললেন। আমাদের দেশ সম্বন্ধে নারকম প্রশ্ন করে উপলব্ধি করার চেষ্টা রলেন ভারতবর্ষের বর্তমান রূপ। বশেষে প্রশ্নবাণ থেকে রক্ষা পেলাম সেস পাউলিংএর দয়ায়। তিনি বললেন, ব্যানার্জী, তুমি তো তোমার লেখা বাংলা ই আমাদের উপহার দিয়েছ; কিন্তু এ বই মি বুঝবো কি করে? তুমি বরং লিফর্নিয়াতে গিয়ে আমাদের পড়ে ঝিয়ে দিও।"

আনন্দের সঙ্গে বললাম, "এতো আমার সৌভাগ্য। আমেরিকাতে গেলে তোমার ছে ঘুরে আসবার চেষ্টা নিশ্চয়ই করব।" ড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি সওয়া একটা জে। যাই হোক ওঁদের আর দেরি রান চলে না—লাঞ্চের সময় পেরিয়ে গেল লে। অধ্যাপক পাউলিং আমাকে দরজা র্যন্ত এগিয়ে দিলেন, বারে বারে বলে দিলেন বিকেলবেলা তাঁদের সঙ্গে বেড়াতে বার জন্য নিশ্চয়ই যেন আসি। বিকেল-লো তাঁরা বিজ্ঞান কলেজ হয়ে পরেশ-থের মন্দির দেখতে যাবেন। লীফটে রে নেবে এলাম নীচে, মনে তখনও সছে পাউলিং সাহেবের কথা,—আজকের দিনে পদার্থ বিদ্যা ছাড়া রসায়ন শাস্ত্র কপাও অগ্রসর হতে পারে না। কোচবিহার অধ্যাপক বক্তৃতামালার শেষ দিনে অধ্যাপক শিশিরকুমার মিত্র বলেছিলেন, "অধ্যাপক লাইনাস পাউলিং কেবলমাত্র রসায়ন পদার্থবিদ্ অথবা পদার্থ রাসায়নিক নন, তিনি এই উভয়ের মধ্যেই ব্যাপ্ত হয়ে য়েছেন।" অর্থাৎ ক্ষুদ্র এই গন্ডীর ইরে বিশাল বিজ্ঞান সাম্রাজ্যের তিনি এক থার্থ অধিবাসী।

বিকেলবেলা বিজ্ঞান কলেজ, পরেশ-থের মন্দির ঘুরে পাউলিং দম্পতিকে য়ে আমরা সেন্ট্রাল এভিনিউর কফি উসে গিয়ে বসলাম। উদ্দেশ্য কফি-নের সঙ্গে কিছু গল্পগুজব করা। খ্যায় আমরা ছয় জন,—আমি, অধ্যাপক পাউলিং, মিসেস পাউলিং, ডাঃ ফণি দত্ত, শ্রীঅজিতশঙ্কর ভাদুড়ী এবং মিসেস ভাদুড়ী। কফি এলো—আমি অধ্যাপকের কাপে দুধ ঢেলে দিতে গেলাম। তৎক্ষণাৎ তিনি বাধা দিলেন—কফির সঙ্গে তাঁরা দুধ বা চিনি খান না। আমাদের কাপে দুধ বা চিনি মেশান দেখে তাঁরা প্রশ্ন করলেন, "এতো চিনি আমরা কেন খাই? এতো তো কফির স্বাদ ও গন্ধ নষ্ট হয়ে যায়।"

গম্ভীরভাবে বললাম,—"আমাদের দেশে প্রচুর চিনি উৎপন্ন হয়, সুতরাং এই চিনি গ্রহণ করার অনেকখানি দায়িত্ব আমাদের নিজেদের নিতে হয়েছে।"

হেসে উঠে বিজ্ঞানী বললেন,—"তাহলে একটু চিনি আর দুধ দাও, তোমাদের মতো করে খেয়ে দেখে দায়িত্বের অংশ নিই।"

রাত তখন দশটা হবে—আমরা আবার জমায়েত হয়েছি গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলেতে। ফোন করে জানা গেছে প্লেন ১ ঘণ্টা ২০ মিনিট লেট, আমরা নিশ্চিন্তে অপেক্ষা করছি গাড়ির জন্য। হঠাৎ আমাদের মধ্যেই একজন অধ্যাপক পাউলিংকে প্রশ্ন করলেন, অদূরে ভবিষ্যতে তাঁর আবার ভারতবর্ষে আসার সম্ভাবনা আছে কিনা।

"না", অধ্যাপক উত্তর দেন। ল্যাবরেটারী ছেড়ে বাইরে থাকা তিনি মোটেই পছন্দ করেন না। এই কয়েকমাস পরিভ্রমণের ফলে তাঁর গবেষণার বহু ক্ষতি হয়ে গিয়েছে তাই দেশে ফিরে তিনি সম্পূর্ণভাবে নিজের কাজেই আত্মনিয়োগ করতে চান। অধ্যাপকের সঙ্গে ডাঃ ফণি দত্তের আরও অনেক আলোচনা হলো। ভারতবর্ষে একজন theoretical chemistryর অধ্যাপক আনার বিষয়ে অধ্যাপক পাউলিং ডাঃ দত্তকে বহু মূল্যবান পরামর্শ দিলেন।

গাড়ি এসে পড়লো, পাউলিং দম্পতিকে নিয়ে আমি, ইন্ডিয়ান কেমিক্যাল সোসাইটির সম্পাদক ডাঃ সুশীল মুখার্জি এবং ডাঃ কর্মকার যাত্রা করলাম দমদমের দিকে। বিদায় কলকাতা—স্বনামধন্য বিজ্ঞানী অধ্যাপক লাইনাস পাউলিং আজ তোমার বুক থেকেই ভারতবর্ষের কাছে বিদায় গ্রহণ করবেন। দমদমে বিমান ঘাটিতে গাড়ি প্রবেশ করতে দেখি ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায় এবং ডাঃ বরোদা চট্টোপাধ্যয় ভারত ত্যাগের প্রাক্কালে নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত এই বিখ্যাত বিজ্ঞানীকে বিদায় সম্ভাষণ জানাবার জন্য অপেক্ষা করছেন।

প্লেনের কিছু দেরি আছে; কিন্তু আমাদের গাড়ি এইবার ফিরে যাবে বলে অনিচ্ছা সত্ত্বেও পাউলিং দম্পতির কাছে আমাকে আর ডাঃ কর্মকারকে বিদায় নিতে হল। গভীর স্নেহভরে অধ্যাপক লাইনাস পাউলিং আমার সাথে করমর্দন করে বললেন,— "যুবক, তোমার ভবিষ্যত সুন্দর হোক, সফল হোক, তুমি জীবনের সর্বক্ষেত্রে সগৌরবে উত্তীর্ণ হও, এই প্রার্থনা করি।"

রাত তখন সাড়ে বারটা। স্তব্ধ অন্ধকারের বুকে শিহরণ জাগিয়ে গাড়ি ছুটে চললো কলকাতার দিকে। বিদায় অধ্যাপক—তোমার সান্নিধ্যে আসার স্মৃতিময় এই পরশটুকু আমার মনের আনন্দকোণে চিরকাল বিরাজ করবে।

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফটোগুলি শ্রীঅসিত রায় কর্তৃক গৃহীত

'কোথায় পাব তারে—'

পঙ্কজ দত্ত
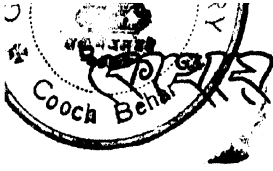
হারানো আত্মার খোঁজ পড়েছে এবার। কয়েকশত বৎসর আগে বিদেশী শাসনের প্রকোপে আতঙ্কে হারিয়ে যাওয়া সেই আত্মা। আজ স্বাধীনতা লাভের পর বড়ো দরকার হয়েছে তাকে খুঁজে সংস্থানে অধিষ্ঠিত করে দেওয়ার। তা না হলে দেশের লোকের আসল পরিচয়টাই চাপা পড়ে থাকে বিস্মৃতির অতলে; শুধু তাই নয়, ভর করে দাঁড়াবার পাটাতনটা পায়ের তলা থেকে সরেই থেকে যায়। তাই আজ লোকের মন ছুটছে দিকে দিকে পরিচয়ের ভিতটাকে সামনে টেনে নিয়ে আসার জন্যে। নিজেদের জানতে হবে, জানাতে হবে বাইরের লোকের কাছে। নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের সূত্রগুলোকে চিনে নিতে হবে। তা নয় তো, নিজের দেশকে নিজের মতো করে গড়ে তোলার জোরটা আর থাকে না। তাই আজ আত্মার বিভিন্ন অবলম্বনগুলো জাঁকিয়ে উঠেছে একে একে। লোকে তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পেতে চাইছে নিজেরই অস্তিত্বের সুর-ধারাটা। চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য নাটক প্রভৃতির প্রদর্শনীতে আজকাল লোক আর ধরে না। নিজের দেশের মাহাত্ম্যকে উপলব্ধি করার যে কোন সুযোগকেই লোকে আঁকড়ে ধরতে চাইছে। নতুন ইতিহাস তৈরীর দিনে নিজেকে দেশেরই মতো করে গড়ে তোলার তাগিদ এসে পৌঁচেছে সবায়ের মনে— নিজেকে দেখবার এবং আর পাঁচজনকে দেখাবার। শিল্প, সাহিত্য, সঙ্গীত, নৃত্যাদির মহিমা লোকের সামনে তুলে ধরার একটা দুর্দম উৎসাহ দেখা দিয়েছে সারা দেশময়। দেশের লোক নিজেদের ঐতিহ্যকে যাতে চিনতে পারে তার জন্য কতো সম্মিলনী, কতো প্রদর্শনীরই অনুষ্ঠান হয়ে চলেছে সর্বত্র। বিদেশী শাসনের চাপে দীর্ঘকালের লুকনো ঐতিহ্য কতো বিস্ময় ও কতো পুলকই না এনে হাজির করছে। ঠিক এমনিই অভিজ্ঞতা লাভ করা গিয়েছে ষোলদিনব্যাপী অনুষ্ঠিত বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনে। বিরাট সম্মেলন, যার মধ্যে সমগ্র বাঙলার ভাব ও রূপ দুই-ই অজস্র ভঙ্গিমায় পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

বাঙলার একান্ত নিজস্ব ঐতিহ্যের বহুধা প্রকাশ এমন একজোটে পাওয়া যায়নি কখনও, পাওয়া সম্ভবও হতো না এই সম্মেলন না হলে। এর পিছনে রয়েছে সাহিত্যিক বা সাহিত্যানুরাগী একদল সুধীজনের চেষ্টা। বাঙলার যুগ যুগের সাধনার প্রতি বাঙালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করাই তাদের উদ্দেশ্য। বাঙলার প্রাণধর্মের বৈশিষ্ট্যটা উপলব্ধি করার একটা বিরাট সুযোগ এনে দেয় এই বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন। এমনি ধারা সুযোগই দেশের লোকের ব্যক্তিত্ব গড়ে তোলার পরম সহায়ক। এবারে হলো দ্বিতীয় প্রচেষ্টা।

বীরভূমের বাউল পূর্ণচন্দ্র

বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলন গত বছর ঠিক এ সময়েই অনুষ্ঠিত হয় প্রথম। এবারে ১৫ই ফেব্রুয়ারী থেকে ২রা মার্চ পর্যন্ত অনুষ্ঠান চলে। কথা ছিল পনেরো দিনের অধিবেশন হবার, কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পিবৃন্দ অনিবার্য কারণে নির্ধারিত দিনে এসে পৌঁছতে না পারায় তাদের জন্যেই অতিরিক্ত দিনটির ব্যবস্থা করতে হয় এবং তা করা যুক্তিযুক্তও হয়েছিল। পাকিস্থানী শিল্পিবৃন্দ বহু অসুবিধা সত্ত্বেও যোগদান করে সম্মেলনকে পূর্ণাঙ্গ করে তুলতে সহায়ক হন, আর সম্মেলন তাতে একটা আন্তর্জাতিক রূপও লাভ করার সুযোগ পায়।

ভারতের অন্য কোথাও আঞ্চলিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য পরিবেশনের এমন বিপুল আয়োজন কখনো হয়েছে বলে জানা নেই। বাঙলার নিজস্ব মাটি থেকে উৎসৃত ভাব ও শিল্পধারার যেমন সমাবেশ এখানে ছিল, তেমনি বাঙলার সাংস্কৃতিক ধারার সঙ্গে একাত্ম প্রতিবেশী রাজ্যেরও শিল্প নিদর্শন প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ছিল। যেমন, মণিপুর ও মানভূমের শিল্পিদল। মণিপুরের ওপর প্রভাব নবদ্বীপের; ওদের নাচ গানের সুর ও ভাষার সঙ্গে তা জড়িয়ে রয়েছে। মানভূমের ওপরে প্রভাব কৃত্তিবাস আর কাশীরামের। বঙ্গ সংস্কৃতির প্রসারের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত।

প্রাচীন ও আধুনিক দু' আমলেরই শিল্পপ্রকৃতি ছিল সম্মেলনের সূচীর মধ্যে। ক্ল্যাসিকালও ছিল আবার লোকশিল্পও ছিল। অবশ্য ক্ল্যাসিকালটা ঠিক বাঙলার উৎপত্তি নয়; কিন্তু বাঙলার মাটিতে এসে ও একটা স্বতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে। সম্মেলনে কয়েক শ' বছরের এদিককার একটা ধারাবাহিক সাধনার রূপ পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। তাছাড়া ভারতের মূল ক্ল্যাসি-কাল ধারার সঙ্গীতও বহুল পরিমাণেই পরিবেশিত হয় বাঙালী শিল্পীদের দিয়ে। এছাড়া ছিল সাহিত্যিকদের আলোচনা। এইভাবে বাঙলার সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের একটা সর্বময় রূপ দর্শনেরই পরম সুযোগ হাজির করে দেওয়া হয়। অজস্র বৈচিত্র্য ভরা সেই রূপ।

লোকশিল্পের বহু প্রকাশভঙ্গী—তবে সবই কাব্য ও সুর প্রধান। বস্তুত বাঙলার

মালদহের গম্ভীরা

[illegible] দেখাবার চেয়ে শোনাবার [illegible] বেশী। তাই নাচের দিক থেকে [illegible] ঐতিহ্য বাঙলার মাটি [illegible] হয়নি। মানভূমের বাঙালী [illegible] ছৌনাচের আখ্যানভাগ বাঙলা [illegible] অনুসরণে গঠিত হলেও নাচের [illegible] এবং মুখোশপরা সাজ-[illegible] দাক্ষিণাত্যের কথাকলি জাতীয় [illegible] সাদৃশ্যই পরিলক্ষিত হয়। আর [illegible] নাচ তো একেবারে আলাদা [illegible]। বীরভূমের রায়বেশেকে নাচের [illegible] ভঙ্গী বলাই সমীচীন: [illegible] অবশ্য আছে, কিন্তু সে লালিত্য [illegible] আমার বাউলের নাচও ঠিক নৃত্য [illegible] পড়ে না, ওটা ভাবোৎফুল্লতার [illegible] বিশেষ এবং পৌনপৌনিকতার [illegible]। মালদহের গম্ভীরার নাচের [illegible] ঐ একই লক্ষণ। সাঁওতালি নাচেও [illegible] বাঙলার নিজস্বতার লক্ষণ নেই। [illegible] নিজস্ব একটা নৃত্যধারা সবে গড়ে [illegible] সেটা হলো রবীন্দ্র কাব্য ও সঙ্গীতকে অবলম্বন করে। যে নৃত্য [illegible] বিভিন্ন ক্ল্যাসিকাল ও লোক-[illegible] একটা সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে নিজস্ব [illegible] ও ব্যক্তিত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছে, [illegible] হয়েছে, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ক্ষেত্রে। [illegible], সম্মেলনে রবীন্দ্র সঙ্গীত ও নৃত্য যথেষ্টই ছিল।

কথা ও সুরে সমন্বিত ভাবপ্রকাশ ভঙ্গীকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। একটা শ্রেণী ধরা যায় আউল, বাউল, ফকিরী, কীর্তন, ভাটিয়ালী, গাজি, বিচ্ছেদী মারফতি, সত্যপীরের গান জারি, সারি, ভাওয়াইয়া প্রভৃতি গান; দ্বিতীয় শ্রেণীতে ধরা যায় কথকতা, পাঁচালী গান, পদাবলী কীর্তন, রামায়ণ গান, কালী-কীর্তন প্রভৃতি; আর তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ে কবিগান, তরজা, যাত্রা, গম্ভীরা প্রভৃতি। এ সবই বাঙলার মাটিতে বাঙলার আলো-হাওয়ায় সৃষ্ট এবং লালিত। এছাড়া আর একটা শ্রেণী আছে, যাতে পড়ে বাইরে থেকে আনা উপাদানকে বাঙালী করে নেওয়া। যেমন, টপ্পা বা খেমটা জাতীয় গান, বা এক জাতীয় কীর্তন, রামপ্রসাদী, শ্যামা-সঙ্গীত, ধর্ম-সঙ্গীত ইত্যাদি যাদের ওপরে ক্ল্যাসিকাল সুরের প্রভাব রয়েছে।

ষোল দিনের অধিবেশন প্রতিদিনই পরম আনন্দের মধ্যে দিয়ে জানবার তথ্য ও তত্ত্বও বেশ পরিবেশন করে গিয়েছে। দেখা গেল, বাঙলার জীবনধারার সকল ক্ষেত্রেই গান অতি ব্যাপকভাবে প্রসারিত ও প্রচলিত রয়েছে। ক্ষেতের চাষীর মুখে গান, রাখালের মুখে গান, মাঝির মুখে গান, ভিক্ষুক, ফকির, সন্ন্যাসী, বৈরাগী; গৃহের নানা কাজের মধ্যে, ধর্ম-প্রচারের আসরে; রাষ্ট্র ও সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তির মুখে; আধ্যাত্মিক নেতার মুখে; কোন একটা আন্দোলনের সঙ্গে সর্বত্রই গান একটা অনিবার্য অঙ্গ হয়ে মিশে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুল-প্রসাদ, রজনীকান্ত প্রভৃতির গান তো আছেই, এমন কি রাজা রামমোহন, স্বামী বিবেকানন্দ প্রভৃতিও গান লিখেছেন, গেয়েছেন এবং গানকে ভালোবেসে গিয়েছেন। শ্রীচৈতন্য, রামপ্রসাদ, রামকৃষ্ণ প্রভৃতির কথা তো স্বতন্ত্রই। তাঁরা

২৪ পরগণার ভর্জা-আসরে অন্নদা ও নন্দরাণী

'ভানুসিংহের পদাবলী' নৃত্যগীতানুষ্ঠানের একটি দৃশ্য

গানকেই ভাবপ্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম করেছিলেন। আবার এও দেখা যায় যে, কয়েকশত বছর থেকে বছর পঞ্চাশ আগে পর্যন্তও বাঙলা গানে ক্ল্যাসিকাল সুরের প্রয়োগই প্রচলিত রীতি ছিল। তখনকার আমলের যে সব গান সম্মেলনে পরিবেশিত হয়, তার সবই ক্ল্যাসিকাল ঘেঁষা। রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানগুলির সুর ক্ল্যাসিকাল পর্যায়েই পড়ে। এই ক্ল্যাসিকাল ধারা এসেছে এবং লালিত হয়েছে মুখ্যত নগরবাসী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের সহায়তায়। রামমোহনের প্রিয় গান "আমায় কোথায় আনিলে" কিংবা বিবেকানন্দের "নাহি সূর্য নাহি জ্যোতি" বা "রূপে রূপে নাম বরণ" প্রভৃতি গানগুলির সুর পূর্ণমাত্রায় ক্ল্যাসিকাল। তবে তফাৎ হচ্ছে যে, গানের ভাব ও ভাষার সঙ্গে খাপ খাওয়ার মতো সুর প্রযুক্ত হয়েছে; সুরের ঝোঁক মেটাবার জন্য কথা জুগিয়ে যাওয়া নয়। ক্ল্যাসিকাল সুরের চর্চা অনেক আগে থেকেই বাঙলা দেশে হয়ে আসছে এবং তার অবলম্বনে বাঙলার কবিরা একটা বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করে গিয়েছেন। দেখা গেল, টপ্পার চালটা পাঞ্জাব থেকে এনে বাঙলায় তার একটা নতুন রূপ খুলে দেওয়া হয়েছে। গত শতাব্দীর বাঙলা গানের সুরে টপ্পার প্রাবল্য লক্ষ্য করার সুযোগ পাওয়া গেল সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে পরিবেশিত প্রাচীন বাঙলা গানগুলির মধ্যে। আর দেখা গেল, বাঙলা গানে আধ্যাত্মিক ভক্তি বা দেশাত্মবোধক বিষয়বস্তুই শুধু পরিবেশিত হতো; তা সে মনীষীদের রচনাতেও যেমন, নিরক্ষর গ্রাম্যলোকের রচনাতেও তেমনি।

ক্ল্যাসিকাল পর্যায়ে যে সব গান ধরা হয় তার সবই বৈঠকী প্রকৃতির। ভাবের সঙ্গে তার যোগ থাকলেও মাটির স্পর্শ কম, তাই গ্রামের মাঠে, নদীতে তার প্রচলন হয়নি। গ্রাম নিজের পরিবেশ মতো কাব্য সুর সৃষ্টি করেছে এমন কথা ও ছন্দ দিয়ে যা গীত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই শ্রোতার একেবারে মনের অন্তস্তলে গিয়ে পৌঁছয়। পরিবেশনের টেকনিকও এক একরকমের গড়ে উঠেছে। যেমন বাউলের নিজস্ব ভঙ্গী। আলখাল্লা পরা, মাথায় চুড়া; ডান হাতে একতারা, বাঁদিকে কোমরে বাঁয়া ডুগি বাঁ হাত দিয়ে বাজে, আর পায়ে ঘুঙুর বা ঘাড়ুর। মুখে গান হচ্ছে এবং তার সংগত হচ্ছে দু' হাতে দুটি আলাদা বাজনা এবং পায়ে আর এক বাজনা। কখনও বা ডুগি বাঁয়া আর একতারার স্থান নেয় গুপীযন্ত্র। এ টেকনিক বাঙলার বাউল ছাড়া আর কোথাও আছে বলে জানা নেই। তেমনি গানের কথা ও সুরের মধ্যেও রয়েছে একটা বৈশিষ্ট্য। বাউল একটা স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বই গড়ে নিতে পেরেছে। এবছরেরও সম্মেলনে বীরভূমের বিখ্যাত বাউল নবনীগোপাল তাঁর ছেলে পূর্ণচন্দ্রকে নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। বাঁধা মণ্ডপে পরিবেশিত হবার জিনিস নয় কিন্তু পিতা ও পুত্র সমবেত শহরের হাজার কতক লোককে যেভাবে মুগ্ধ ও তন্ময় করে তোলে তা শ্রোতাদের মনে এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা হয়েই অনুরণিত হতে থাকবে। নবনীগোপালের গলায় সেই বিখ্যাত গান "আয় কে যাবি রে, আমার গোরাচাঁদের হাসপাতালে নদীয়াপুরে" কেমন চমৎকার একটা উচ্চাঙ্গ ভঙ্গীর সাহায্যে লোককে ভাবমগ্ন করে তোলা। ওর মুখে হরিভক্তির আর একখানা গান, উত্তমচাঁদ গোঁসাইয়ের রচনা "হরি আমার প্রেমের প্রেমিক, বড়ো প্রেম ভালোবাসে" সহজ ও সরল কথার অতি বাক্তি চট্ করেই আবেগ সৃষ্টি করে দেয়। নবনীগোপাল নিজের একটি রচনা থেকে শোনালেন, "এই যে আজব সহর লহর বানাইলে কোনজন"। গানখানি সম্পূর্ণ হচ্ছে:

এই যে আজব সহর লহর বানাইলে কোন জন
বান্দা আমার মন

এক জায়গাতে রেখেছে গো জল আর আগুন
সেই সহরের চালাচ্ছে কল দুজনা তার সাথী
আর দুজনা সহায় হয়ে দুইপাশে জ্বালে বাতি
মণি কোঠায় আটাদল রত্ন বেদী তার উপর
তার উপরে বিরাজ করে চিনতে নারে কোন
জন
বান্দা আমার মন

সেই সহরের খোলা তালা সে তালা কেউ
ভাবো না

তালা ভেঙে চোর ঢুকিলে কোন দিনে দিবে হানা
কেউ ভেবো না অয়তন চোরে করে অন্বেষণ
কমনে দিয়ে লয়ে যাবে সেই সহরের বস্তুধন
সেই সহরের আচ্ছাই নদী কোন বিধাতায়
যায় সে

(নবনী ক্ষেপা বাউল বলে)
নদীর ভাব না জেনে তার নদীতে ডুবে খাপ
খায় সে

ভাসা যাওয়া সে পথে
ভজন সিদ্ধি হয় সে পথে
আপনা হতে তার হাতেতে যাই মরণ
বান্দা আমার মন।

নবনীগোপালের ছেলে পূর্ণচন্দ্রের গলায় একটা সম্মোহনী শক্তিই যেন

ছে। অদ্ভুত মিষ্ট স্বর, আর দরদ-। ওর গলায় "গুণী কওনা কথা, গুণে মানব করেছ" এমন গান কাতায় কেউ কখনো শোনেনি। কথা সুরের মিষ্টতায় এবং সাবলীল স্বচ্ছন্দে গীতে শ্রোতাদের পুলকে নিমগ্ন রেখে। সুরের সঙ্গে কথার মধ্যেও কোমল ন্য তার একটি উদাহরণঃ

মন্ন যেমন বেণী তেমনি রবে
চুল ভিজাবো না (বেণী ভিজাব না)
নামবো জল ছড়াবো
জল তো ছোঁব না।
উদার আধার পাথার
করি আনাগোনা।
লাগবো ভোগী নবো না
নী গো
নীরা পাড়ের সাজন সীঁথি
তবু আমি হাতে ছোঁব না॥
সাই রসরাজ বলে শুনগো নাগরী
রূপের যাই বলিহারি
হবে না সতী না হব অসতী
তবু আমি পীত ছাড়ব না॥

এমনিধারা অনায়াসে লোকের মনে পীড়িতের সরল অনাড়ম্বর ভঙ্গী। নের সঙ্গে ফকিরি গানের সামঞ্জস্য। সম্মেলনে এবার ফকিরি গান রিবেশন করেন গোবিন্দ দাস ও সুন্দর। এদের ভবের মানুষের বর্ণনা নানি বেশ জমে উঠেছিল। হাওড়ের ন্যঃ

মনজাবের মানুষ হয় যে জনা
দেখলে যায়রে চেনা,
তোর আঁখি দুটি ছলছল
মৃদু হাসি বদনখানা
সদাই রে তার শান্ত গতি
নির্জনেতে করে গতাগতি
সে করে মত্ত সাধনা
তার কাম নদীতে চর পড়েছে
প্রেম নদীতে জল ধরে না
ফলের আশা করে না সে
ফুলের মধু পান করে সে
সেই তো রসিক জনা। ইত্যাদি

নিরক্ষর লোকেও সহজেই এসব গানের ভাব গ্রহণ করতে পারে এবং গাওয়ার গুণে এমন পরিবেশ সৃষ্ট হয় যে, শ্রোতারা অভিভূত না হয়ে পারে না।

ভাব ও কণ্ঠের দরদে পূর্ববঙ্গের অতুল লোকগীতির ঐশ্বর্যের কিছু কিছু নিদর্শন পরিবেশন করেন নির্মলেন্দু চৌধুরী, মুরতাজ আনোয়ার এবং পূর্ব-বঙ্গ থেকে আগত আব্বাসউদ্দীন আহমেদের নেতৃত্বাধীন শিল্পিবৃন্দ। কথা ও সুরে আবেগকে উথলে তোলার এমন ক্ষমতাপন্ন লোকগীতি আর কোথাও আছে কিনা জানা নেই, হয়তো নেই। ওখানকার মাঝির গান, রাখালের গান, গাজীর গান যেমন ভাবময় জগতে মনকে টেনে নিয়ে যায়, তেমনি দৈনন্দিন জীবনে রঙের লহর নিয়ে আসে নৌকা বাইচের মতো উল্লাসের গান। একদিকে রয়েছে "বন্ধু"-র খোঁজে গৃহত্যাগী রাখালের বিচ্ছেদী গান, আবার তার সঙ্গে রয়েছে "রঙের নাও, রঙের বৈঠায়" রঙ্গে রঙ্গে বেয়ে নৌকা বাইচের গান একটা অদ্ভুত প্রাণোচ্ছলতা এনে দেয় শ্রোতাদের মনে। নৌকা-বাইচের আর

বাঁকুড়ার ছৌ নাচের দল

মালদহের গম্ভীরায় কালীনৃত্য

গাজির গানে নির্মলেন্দু চৌধুরী কণ্ঠ ও ভঙ্গীর দিক থেকে পল্লীগীতির একজন অতিগুণী শিল্পী বলে পরিগণিত হবার যোগ্যতা দেখিয়েছেন। আব্বাসউদ্দীন আহমেদ এক সময়ে কলকাতার অতি জনপ্রিয় শিল্পীদেরই একজন ছিলেন। ভিন্ন রাষ্ট্র থেকে আসার বাধা বিপত্তি কাটিয়ে তিনি গত বছরের চেয়ে বেশী শিল্পী নিয়ে আসেন এবং ভাটিয়ালি, বিচ্ছেদী, সারি, জারি প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের গ্রাম্যগীতি অনেকগুলি পরিবেশন করে সমবেত সুধীমণ্ডলীকে অপার আনন্দ দান করেন। গান ছাড়া লোক-নৃত্য ও গীতি সমন্বয়ে কবি জসিমুদ্দিন রচিত নৃত্যনাট্য "বেদের মেয়ে" অভিনয় করিয়েও প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন। ভিন্ন রাষ্ট্র হলেও ওদের গানের সঙ্গে এখানকার একটা আঁতের টান রয়েছে এবং বাঙলা ভাষা যতোদিন থাকবে সেই টানটাও অবিচ্ছিন্ন থেকে যাবে।

ত্রিনাথ বা তিননাথের আরাধনা বা দেহতত্ত্বগান পূর্ববঙ্গের আধ্যাত্মিক পর্যায়ের লোকসঙ্গীতের মধ্যে বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। সম্মেলনে অবশ্য পূর্ণ-মাত্রায় সে-গান পরিবেশনের সুযোগ না পেলেও এর ভঙ্গী-বৈশিষ্ট্য এবং ভাব ও ভাষার নিদর্শনটা ধরতে পারা গিয়েছে। গোড়াতেই হচ্ছে ত্রিনাথের গুণগানঃ

"এলো রে ত্রিনাথ ঠাকুর জগতে
আত্মগুরু তামেশা হৈল কলিতে
কলিতে হরি সর্বময়

প্রাচীন বাংলা গানের আসরে কালীপদ পাঠক, বিজয়গোপাল মুখোপাধ্যায় ও অমর ভট্টাচার্য

পূবেতে পাগলের আশ্রয়
শম্ভুচাঁদ হইয়াছেন উদয়।
ডেমরা ভোলা সিদ্ধেশ্বরী
ঐ দেখ ধামরায় মাধব রথেতে
শুন মন তোমারে বলি
ঢাকায় আছেন ঢাকেশ্বরী
কলকাতায় কালী,
মুক্তাগাছায় রাজেশ্বরী
ঐ দেখ অন্নপূর্ণা কাশীতে।”

ত্রিনাথের গুণগানের পরে কেন তার জন্য উৎসব এবং ত্রিনাথকে অগ্রাহ্য করলে যে ভয়াবহ কাণ্ড ঘটবে তার গানঃ

সারাদিন গেলে তিননাথের
নাম লইও সাধুভাই
দিন গেলে তিন্নাথের নাম লইও।
সারাদিন হইলো রে ভাই গৃহবাসের গান
সন্ধ্যা হইলে লইও তিন্নাথের নাম।
আমার ঠাকুর তিন্নাথ যে করিবে হেলা
হাত পাও শুকাইয়া যাবে
চক্ষে নামবে ডেলা
আমার ঠাকুর তিন্নাথ যে করিবে হেলা
কোলের ছেলে কাইড়া নিবে
পড়বে বিষম জ্বালা
আমার ঠাকুর তিন্নাথ যার বাড়িতে যায়
ধনে জনে মঙ্গলে রেখে সংসারে বাড়ায়।
আমার ঠাকুর তিন্নাথ কিছু নাহি চায়
ভক্তিভাবে ডাক দিলে তার বাড়িতে যায়।
আমার ঠাকুর তিন্নাথ জগতেরই গুরু
যে যাহা বাঞ্ছা করে বাঞ্ছা কল্পতরু।
ইত্যাদি

সরল বিশ্বাসী মানুষকে একদিক থেকে অনিষ্টের ভার এবং অপর দিক থেকে সংসারের বৈভব উন্নতির প্রতি প্রলুব্ধ করা। তারপর রয়েছে পূজার উপচারঃ

(ও) তিন পয়সাতে হয় যার মেলা
কলিতে তিন্নাথের মেলা।
এক পয়সার গাঁজা দিয়া
তিন কলকি সাজাইয়া
গাঁজায় মারছে পড়ছে দম
ভোবম্ ভোবম্ বোম ভোলা।

বাকী দু পয়সার মধ্যে এক পয়সার পান সুপারি, আর এক পয়সা দিয়ে তেল কিনে তিনটি বাতিতে সভা উজ্জ্বল করা। এই হলেই ত্রিনাথের পূজা করা যায়। সম্মেলনে ত্রিনাথের এই গান পরিবেশন করেন ভূপেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ও সম্প্রদায়। তাছাড়া দেহতত্ত্বও শোনান :

“আমার একটি কলসীর ন’টি ছিদ্র
কেমনে রাখি জল।
আমি এক মুখেতে ঢালি পানি
পাই না কোন ফল।
চক্ষু কর্ণ নয় দরজা বন্ধ যদি করি
আমার মন হইয়া যায় উচাটন
অমনি পথ ধরি।
একই পথের আসা যাওয়া
ঠাকুর সনে সংকীর্তনে পাই যেন
একটু বল।
আমার আয় হইতে খরচ বেশী
হায় কি করি বল।
দুই দরজা বন্ধ রাখি ভদ্রতার খাতিরে
অভদ্রর গুপ্ত রাস্তা ঐ দুইটার ভিতরে
সব দরজা বন্ধ করলে দম ফেটে যাব মারা
এক নিমেষে আত্মারাম অমনি খাঁচা ছাড়া
জোর করিস্ না ও ভুল সাধন পথে চল।”

ভাবের দিক থেকে একই হলেও এদিককার দেহতত্ত্বের গানের সুরে আর উর্ধ্বতে পূর্ববঙ্গীয় গানের সুরের ছোঁয়া পাওয়া গেল। তবে তত্ত্ব প্রচারের ভাষার সারল্য দুয়েরই ক্ষেত্রে লক্ষ্য করার বিষয়। গ্রাম বাঙলার কবি-গান, তরজা প্রভৃতি আর এক ভঙ্গীর জিনিস। মনোরঞ্জনের সঙ্গে শিক্ষালাভের, জ্ঞান অর্জনের প্রচুর উপাদান এক বৈঠকে বসেই লাভ করার অত্যন্ত প্রকৃষ্ট টেকনিক। আর অবাকও হয়ে যেতে হয় কবিয়ালদের প্রতিভা দেখে। বেদ পুরাণাদি যেন কণ্ঠস্থ, সমাজ ও রাষ্ট্রের সব খবরই যেন ওদের হাতের তালুতে; শব্দবিভক্তি ও সমাস প্রকরণ তো ওদের কাছে ছেলে খেলার মতো, তার ওপরে রয়েছে বিবিধ সুর ও ছন্দের ওপরে অশেষ দখল। অত্যন্ত গুরু গম্ভীর বিষয়কেও সরল কথার ছন্দে এমন চমৎকার-ভাবে ব্যক্ত করে যায় যে অতি নিরক্ষর লোকের পক্ষে সম্যক অর্থ ও ভাব উপলব্ধি করে আনন্দ ও জ্ঞানলাভে কোনই অসুবিধা ঘটে না। কবি-গান ও তরজাতে দুটি পক্ষ থাকে; এক পক্ষ প্রশ্ন করে এবং অপর পক্ষ তার উত্তর দান করে। এক পক্ষ অপর পক্ষকে কথার মার প্যাঁচে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। এদের এই প্রতি-যোগিতার মধ্যে ওদের সঙ্গে দর্শক-শ্রোতাও উত্তেজনা লাভ করে। কবি গানে এবারে ছিলেন বাঙলার শ্রেষ্ঠ কবিয়াল মুর্শিদা-বাদের সেখ গুমানি দেওয়ান এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিতে নামেন ফরিদপুরের নারায়ণচন্দ্র সরকার। পূর্ববঙ্গের কবিয়ালের সঙ্গে এই প্রথম যোগাযোগ বলে সেখ

গুমানি প্রথমে নারায়ণচন্দ্রকেই আসরে নামাতে অনুরোধ করলেন। আখর গাইবার জন্য সঙ্গে কজনকে নিয়ে নারায়ণচন্দ্র প্রথমে গাইলেন মুণ্ডমালিকের বন্দনা গান। তারপর নিবেদন করলেন "দেশের দুখের কথা, দুখহরা তারা তোর চরণে জানাই।" মুখে মুখেই কবিতা রচনা করে খরচ করে স্কুল কলেজে পড়বার পর শেষে চাকরির উমেদারী; সাবেকি আচার ঠাকুরদার মৃত্যুর পর জলাঞ্জলি দিয়ে খাওয়া-পরার আচার ভঙ্গ করার জন্য ব্যঙ্গোক্তি। এখন লোকের কাছে

> নেই সে পার্বণের ক্রিয়াকাণ্ড
> অসাড়ের কাজ গয়ায় পিণ্ড
> ...দের শ্রীক্ষেত্র বৃন্দাবন কাশী।
> গেল বেলপাতা আর তুলসী পাতা
> চা-পাতার আদর বেড়েছে বেশী॥

এর পরই নারায়ণচন্দ্র এলেন, আসল কথায়। সারদামনি বিলাপ করে বলছেন রামকৃষ্ণকে ঃ

> তুমি রামকৃষ্ণ পরমহংসে
> পবিত্র করেছ বংশ
> তুমি অজ্ঞানকে করলে ধ্বংস
> জ্ঞানের সাধনায়
> প্রভু যখন আমায় করলে বিয়ে
> করেছ বেদের মন্ত্রে অঙ্গীকার
> কেন এলে বিদেশে কোন দোষে
> করলে পরিহার
> আছে শাস্ত্রমতে চার আশ্রম
> গার্হস্থ্য তার সর্বোত্তম
> ব্যতিক্রম কেন করলে তার॥
> তোমার মা থাকলে কালি মন্দিরে
> কও, আগে কারে দিবে নমস্কার

এই হলো নারায়ণচন্দ্রের প্রশ্ন। নিজেই তিনি সারদামণির ভূমিকা নিলেন এবং সেখ গুমানিকে তার পতি রামকৃষ্ণ বলে অভিহীত করলেন। প্রশ্নটা আরও বিশদভাবে ব্যাখ্যা করে শেষে নারায়ণচন্দ্র বঙ্গভূমির বন্দনা করে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অভিনন্দন জানিয়ে বললেন কলকাতায় কবি-গান সময়ের জন্য বেশী সময় ধরে গাওয়া যায় না বলে অসুবিধা হয়। বস্তুত সাত আট ঘণ্টার কমে এক একটা আসর শেষ হয় না। তাই তারা ঃ

> "সময়ের সঙ্গে রেখে তাল
> দুজনে লাগাবো গোলমাল
> কিন্তু এই গোলমালের মধ্যেই মাল।"

পরিশিষ্টে নারায়ণচন্দ্র প্রতিপক্ষের
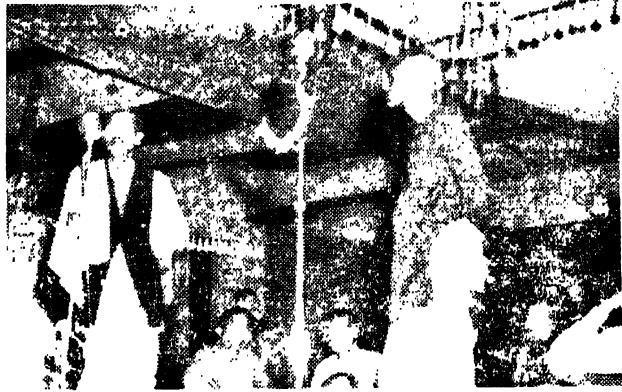
কবিগানের আসরে শেখ গুমানি ও নারায়ণচন্দ্র সরকার

নামটা গোমানি দেওয়ান ধরে নিয়ে তার অর্থ করলেন গো + মানি এবং দেও + আন। এর মধ্যে বেশ কটাক্ষপাত রয়েছে। সেখ গুমানি এরপর উঠে প্রথমেই বন্দনা করলেন ভগবানের, "বিশ্বের পতি তোমাকে মোরা করি প্রণিপাত", তারপর মায়ের স্তরে গাইলেন "সোনার ভারত নাম পূর্ণ লক্ষ্মীর ধাম" বন্দনা, তারপরের ধাপে কলকাতার বন্দনা ঃ

> "কলিকাতা
> কলিযুগে তুমি ধাতা।...
> কলিকাতা সহরেশ্বরী
> নব অব ধ্বংসধারী..."

এরপর সম্মেলনের কর্তৃপক্ষের প্রতি গাইলেন। তারপর শোনালেন কবি গানের ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত ঃ

> "কবিগান বাঙলা দেশে
> বহুদিন হতে চলে আসে
> ত্রয়োদশ শতাব্দী তখন
> দেশে সনাতন ধর্ম যখন

তারপর সেখ সাহেব বর্ণনা করলেন কবি-গানের বিষয়বস্তুর ক্রমপর্যায়। গোড়ায় ছিল পৌরাণিক উপাদান তারপর এক সময়ে তা রাজনীতিক ও সামাজিক বিষয়ে পরিবর্তিত হয়। তাকে রামকৃষ্ণ সাজতে হচ্ছে বলে সেখ সাহেবের বড়ো ভাবনা ঃ

> "আমি মোসলেমের ছেলে গো
> আমার ঐ কারণে ভাবনা এলো।
> ত্রেতাযুগে ছিলেন রাম
> কৃষ্ণ হন দ্বাপরে
> রামকৃষ্ণ নাম ধরেন কলিকাতা সহরে
> সে নাম কেমন করে ধরবো
> ঐ ভাবনায় ভেবে গো।
> একি গাধার গলায় ঘণ্টা গো
> সেই রামকৃষ্ণকে আমারে সাজায়..."

আধুনিক শিক্ষা দুরন্ত এবং সেই সঙ্গে নিরক্ষর লোকের পক্ষেও উপভোগ্য রস সঞ্চার করে নানা রকমের উপমা দিয়ে
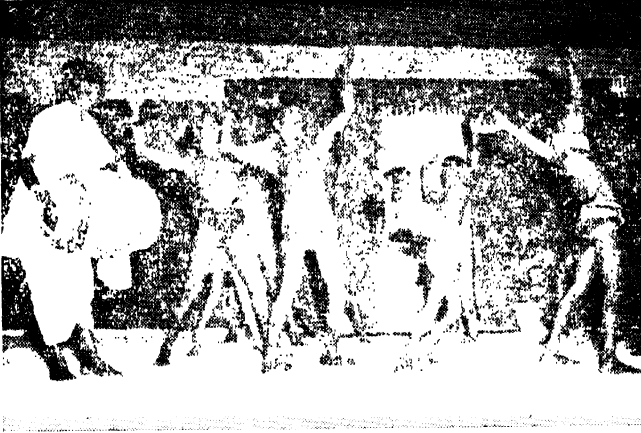
বীরভূমের রাইবেশে নর্তক

ছড়া কেটে যাওয়ার অদ্ভুত কৃতিত্ব সেখ সাহেবের। নারায়ণচন্দ্রের নাম নিয়েও তিনি ঠুকলেন এক প্রশ্ন এবং নারায়ণচন্দ্র তার ধর্ম তুলে যে কটাক্ষ করেছিলেন তারও জবাব দিলেন এই বলে যে রাজনীতিক কারণে বাঙলা ভাগ হলেও বাঙলার সংস্কৃতি ভাগ হতে পারে না কাজেই "তুমিও কবি, আমিও কবি, তোমাতে আমাতে এক জাত"। তারপর দিলেন নারায়ণচন্দ্র তথা সারদামণির প্রশ্নের উত্তর। বললেন বিয়ে করলে স্ত্রী হয় অর্ধ অঙ্গ, কাজেই যার কাছে অর্ধ অঙ্গ বাঁধা তার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয় কি করে? আর আগে প্রণাম সম্পর্কে বললেন ব্যবহারিক জগতে গর্ভধারিণীর চরণ আগে পূজবো, আধ্যাত্মিক জগতে পূজবো দিগম্বরীর চরণ।" এরপর আবার নারায়ণচন্দ্র উঠলেন। এবং শেষে আবার সেখ গুমানি। কয়েকঘণ্টা দোল দিয়ে কেটে গেল কেউই বুঝতে পারলে না। তরজায় আবীরা দাসী ও নৈহাটির অন্নদা মন্ডলও এমনি আনন্দে মাতিয়ে রাখেন শ্রোতৃবৃন্দকে। মালদহের গম্ভীরা শিবের স্তব গান উপলক্ষ্যে হলেও এখানে যা পরিবেশিত হয় তা রাজনীতিক প্রচারের এক বাহন-রূপেই কাজে লাগানো দেখা গেল। আর তাও হাল আমলের রাজনীতির কথা নয়, প্রাক স্বাধীনতা যুগের দুঃখ কষ্টের বিবরণকে এখনকার আমলে টেনে নিয়ে আসা। তবুও এর একটা বিশিষ্ট ভঙ্গী আছে; বিশেষ করে মাছ ধরা বা মুখোশ নাচে। কথকতা, রামায়ণ গান, পাঁচালী গান প্রভৃতির মধ্যেও লোকের মনোরঞ্জনের সঙ্গে জ্ঞান বিস্তারের যে টেকনিক দেখা যায় তার মধ্যেও বাঙলার বৈশিষ্ট্য উপলব্ধি করা যায়। এবং আজও যে এই উপাদানগুলি লোককে যে কিভাবে তন্ময় করে তোলার শক্তি রাখে তা সম্মেলনের কদিনই দেখা গিয়েছিল। পাঁচালী গায়ক

পূর্ববাংলার লোকসংগীতে নির্মলেন্দু চৌধুরী

জ্যোতিষ বিশ্বাস, রামায়ণ গায়ক বাঁকুড়ার মৃত্যুঞ্জয় চক্রবর্তী ও দ্বিজপদ গোস্বামীর কথকতার যে আবেদন শক্তি যন্ত্রের মাধ্যমে প্রমোদ বিতরণ করার শক্তির চেয়ে অনেক বেশী তীব্র এবং সোজা।

এ প্রবন্ধে সম্মেলনে পরিবেশিত লোক সংস্কৃতির দিকটাই উল্লেখিত হলো, যার সঙ্গে মাটির যোগ সরাসরি। তাছাড়া ক্লাসিকাল গীত, বাদ্যও প্রচুর পরিবেশিত হয়েছিল এবং নাম করা বাঙালী শিল্পীদের বহুজনে তাতে যোগদানও করেছিলেন— সেটা হলো বঙ্গ সংস্কৃতির আর একটা ধারা। লোকসংগীত ও নৃত্যাদির যে বিবরণ এ প্রবন্ধে দেওয়া হলো তা আজ লুপ্ত হতে বসেছে। কিন্তু অনেক যুগের সাধনা ও সেবাতে ঐ সব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ-ভঙ্গীগুলি গড়ে উঠেছে, এক একটা টেকনিক সৃষ্টি হয়েছে। সে টেকনিক আজও কাজে আসে। তাই সেগুলো বাঁচিয়ে রাখারও দরকার এবং এ বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কর্তব্যই বেশী; তাদের উচিত এখনও যারা বাউল, কবি গান, তরজা, যাত্রা, কীর্তন, পালাগান প্রভৃতির লোক সংগীত, নৃত্য ও অভিনয়াদির গুণী ব্যক্তি রয়েছেন তাদের বৃত্তি দিয়ে অপরকে শেখানোর ব্যবস্থা করে দেওয়া, যাতে শিল্পভঙ্গী বা টেকনিকগুলো লুপ্ত হয়ে না যায়। কারণ এই সবের মধ্যে দিয়েই সমাজ ও মানুষ নিজের পরিচয় গড়ে তোলার সুযোগ পায়; দেশের মাটির সঙ্গে সম্পর্কটা অবিচ্ছিন্ন রাখতে পারে।

পরিশিষ্টে বঙ্গ সংস্কৃতি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের অভিবাদন জানাতে হয় এই বিপুল সমাবেশের জন্য। ব্যবস্থাপনার মধ্যে সামান্য কিছু কিছু ত্রুটি হয়েছে, কিন্তু এতো বিরাট ব্যাপারে তা হওয়া অসম্ভব নয়, তবুও শৃঙ্খলার সঙ্গেই ষোল দিনেরই অধিবেশন সম্পন্ন হয়েছে। যার জন্যে শ্রোতা ও দর্শকদের শান্ত আচরণও সাফল্যলাভে কম সহায়ক হয়নি। অন্যান্য সম্মেলন অপেক্ষা স্বতন্ত্র এর পরিবেশ। নিজের সত্ত্বাকে খুঁজে পাবার মনটাই সারা সম্মেলনে যেন পরিব্যাপ্ত হয়েছিল।

সর্পগন্ধা

সুকুমার বসু

ভারতীয় বনৌষধির খ্যাতি সুপ্রাচীনকাল থেকেই। এই খ্যাতি ভারতের চতুর্সীমা ছাড়িয়ে দেশ-দেশান্তরে ছড়িয়ে পড়েছিল এবং ভারতীয় বনৌষধির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল বিদেশীদের। সাম্প্রতিককালে ভারতের বনৌষধি সর্পগন্ধা বহির্ভারতে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেছে এবং এই বনৌষধিটিকে নিয়ে গবেষণাও চলেছে যথেষ্ট। সর্পগন্ধার এই সমাদরের হেতু হলো রক্তচাপ হ্রাসে এর বিস্ময়কর কার্যকারিতা।

সর্পগন্ধার দ্রব্যগুণের প্রতি বিদেশীয়রা আকৃষ্ট হয়েছেন সম্প্রতি, কিন্তু আমাদের দেশের আয়ুর্বেদ-চিকিৎসকেরা এই বনৌষধির মধ্যে নানা ভেষজগুণের পরিচয় পেয়েছিলেন বহুকাল পূর্বেই। সর্প-দংশন, অনিদ্রা, পেটের পীড়া ও মস্তিষ্ক বিকৃতির প্রতিষেধক হিসেবে সর্পগন্ধার ব্যবহার এদেশে চলে আসছে সুদীর্ঘকাল থেকে। এদেশে বিভিন্ন ভাষায় এই বনৌষধিটি বিভিন্ন নামে পরিচিত। সংস্কৃতে এর নাম সর্পগন্ধা ও চন্দ্রিকা, বাংলায় ছোট চাঁদড়, হিন্দীতে নাকুলী, তেলেগুতে পাটলাগন্ধী এবং মালাবার অঞ্চলের ভাষায় চুবান্না অকিল-পোরী। সর্পগন্ধা নামটি সম্বন্ধে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। কাহিনীটি হলো সাপ-নেউলের লড়াইয়ে নেউল যখন সাপের বিষে জর্জরিত হয়ে পড়ে, তখন বনের ভেতর ছুটে গিয়ে এই গাছের পাতা সে চিবিয়ে খায়, ফলে সাপের বিষের কোনো প্রতিক্রিয়া আর হয় না তার ওপর। এই কাহিনীর সত্যতা সম্বন্ধে কোনো প্রমাণ অবশ্য পাওয়া যায় না।

সর্পগন্ধাকে ইংরাজীতে বলা হয় রাউলফিয়া সারপেনটিনা। ষোড়শ শতাব্দীতে লিওনার্ড রাউলফ নামে একজন জার্মান উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী বনৌষধির সন্ধানে এশিয়া ও আফ্রিকা সফরকালে এই গাছটি প্রথম খুঁজে পান বলে তাঁর নামানুসারে রাউলফিয়া এবং এর শেকড় দেখতে অনেকটা সাপের মতো বলে সারপেনটিনা নাম দেওয়া হয়।

বাংলা, বিহার, দেরাদুন, পূর্ব ও পশ্চিমঘাট অঞ্চল, হিমালয়, কাশ্মীর, নেপাল, সিকিম, আফগানিস্থান, সিংহল প্রভৃতি স্থানে সর্পগন্ধার গাছ প্রচুর পাওয়া যায়। বাংলাদেশে হাওড়া, হুগলী ও বর্ধমান জেলায় ছায়াপূর্ণ জঙ্গলে এই গাছ জন্মায়। শিবপুরের বোটানিক্যাল গার্ডেনে এই গাছ প্রচুর আছে।

সর্পগন্ধা ছোট সূক্ষ্ম লোমযুক্ত গুল্ম। এক ফুট থেকে তিন ফুট পর্যন্ত উঁচু হয়। কখনও বা লতিয়ে অপর গাছে ওঠে। এর ত্বক শাদা। পাতা তিন ইঞ্চি থেকে সাত ইঞ্চি পর্যন্ত লম্বা হতে দেখা যায়। ফুল হয় লালচে বা গোলাপী রঙের। ফল জোড়া জোড়া বা এক একটি জন্মায়, রং কালো। ফুল হয় গ্রীষ্মে আর ফল হয় বর্ষাকালে। এর শেকড়ই ঔষধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। শেকড়ের ব্যাস হয় দুই ইঞ্চি থেকে তিন ইঞ্চি এবং প্রান্তভাগ হয় ছুঁচালো।

সর্পগন্ধার দ্রব্যগুণ হচ্ছে স্নায়বিক শিথিলতা এনে রক্তের চাপ কমিয়ে দেওয়া এবং উত্তেজিত স্নায়ুকে স্নিগ্ধ করা। এছাড়া, রোগীকে ঘুম পাড়ানোর গুণও এর আছে। ১৮১০ সালে গ্রেসহফ্ নামে এক জার্মান বিজ্ঞানী সর্পগন্ধার দ্রব্যগুণের রাসায়নিক পরীক্ষা করে তাতে উপক্ষার (উদ্ভিদ থেকে নাইট্রোজেনবিশিষ্ট যে জৈব ক্ষার পাওয়া যায়) আছে ধরতে পেরেছিলেন। এর প্রায় দেড়শো বছর পরে ১৯২৯ সালে সর্পগন্ধার সম্যক্ গবেষণা আরম্ভ হয় এবং এর শেকড় থেকে কয়েকটি উপক্ষার ও একটি রজন জাতীয় জিনিস পাওয়া যায়। স্নায়বিক স্নিগ্ধতা ও রক্তচাপের হ্রাস হয় এই উপক্ষার কয়টির জন্যে, কিন্তু ঘুম আনে এই রজন জাতীয় পদার্থটি। এই উপক্ষারগুলির নাম দেওয়া হয়েছে আজমালিন, আজমালিনিন, আজমালিসিক, সার্পেন্টাইন ও সার্পেন্টাইনিন। আজমালিন নাম দেওয়া হয় দিল্লীর গান্ধী আয়ুর্বেদিক কলেজের প্রতিষ্ঠাতা হাকিম আজমল খাঁর সম্মানার্থে। আজমল খাঁ সর্পগন্ধার শেকড় থেকে কয়েকটি মূল্যবান হাকিমী ঔষধ প্রস্তুত করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে, সর্প-দংশন, অনিদ্রা, পেটের পীড়া ও উন্মাদ রোগে সর্পগন্ধার শেকড় ভেষজরূপে ব্যবহৃত হয়ে আসছে বহুকাল আগে থেকেই। কিন্তু রক্তচাপ হ্রাসের জন্যে সর্পগন্ধার ব্যবহারবিধি মাত্র ২৫ বছর আগে শুরু হয়। ১৯৩১ সালে দু'জন ভারতীয় বিজ্ঞানী সলিমুজ্জামান সিদ্দিকী ও রফৎ হুসেন সিদ্দিকী (এঁরা উভয়েই এখন পাকিস্তানের অধিবাসী) এই বিষয়ে প্রথম গবেষণা করেন। সর্পগন্ধার শেকড় থেকে তাঁরা পাঁচটি নতুন উপক্ষার স্ফটিক আকারে বিশ্লেষণ করেন। চার বছরব্যাপী তাঁরা এই গবেষণায় ব্যাপৃত ছিলেন এবং তারপর বিষয়ান্তরে মনোনিবেশ করেন।

প্রায় ওই একই সময়ে কলিকাতার প্রখ্যাত কবিরাজ পরলোকগত গণনাথ সেন এবং ডাঃ কার্তিকচন্দ্র বসু রক্তচাপাধিক্য রোগে সর্পগন্ধার শেকড় থেকে প্রস্তুত ভেষজ প্রয়োগ করে এর অত্যদ্ভুত গুণাবলীর পরিচয় পান এবং পৃথিবীর সকল দেশের চিকিৎসকদের তাঁরা এই অতুলনীয় বনৌষধিটি ব্যবহার করে দেখবার জন্যে অনুরোধ জানান। তার ফলে কলিকাতার স্কুল অব ট্রপিক্যাল মেডিসিন, গ্লুকোনেট ল্যাবরেটরী এবং লখনৌ-এর কেন্দ্রীয় ভেষজ গবেষণা মন্দির প্রভৃতি ভৈষজ্য বীক্ষণাগারে এই বনৌষধি সম্বন্ধে গবেষণা চলে এবং প্রমাণিত হয় যে, রক্তচাপাধিক্য রোগের ক্ষেত্রে এই ভেষজটি বাস্তবিকই বিশেষ গুণসম্পন্ন। কলিকাতার ট্রপিক্যাল স্কুলে তদানীন্তন অধ্যক্ষ কর্নেল রামনাথ চোপরার পরিচালনাধীনে সর্পগন্ধার কার্যকারিতা সম্বন্ধে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা শুরু হয় এবং ১৯৪০ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞান ও চিকিৎসা বিষয়ক ভারতীয় পত্রিকাগুলিতে এই সম্পর্কিত গবেষণার অগ্রগতির সংবাদ প্রকাশ হতে থাকে।

সিদ্দিকীদ্বয়ের পর সর্পগন্ধার রসায়ন সংক্রান্ত গবেষণা ভারতে পুনরায় আরম্ভ হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশুদ্ধ রসায়ন বিভাগে। ডাঃ অসীমা চট্টোপাধ্যায়ের সুদক্ষ পরিচালনায় বর্তমান লেখক এই বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং বর্তমানেও করছেন। এই গবেষণার ফলে সর্পগন্ধার শেকড়ে তিনটি নতুন উপক্ষার আবিষ্কৃত হয়েছে—তাদের নাম রাউলফিনিন, সারপিন, সারপিনিনি। বর্তমান গবেষকদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি ভেষজ প্রস্তুতকারক বৈদেশিক প্রতিষ্ঠান সর্পগন্ধার কার্যকারিতার রাসায়নিক সূত্র অনুসন্ধানের চেষ্টা করছেন। এই সব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে

সর্পগন্ধা

উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সিবা ফার্মা লিমিটেড, স্যানডোজ লিমিটেড, এলি লিলি অ্যান্ড কোং এবং রিকার ল্যাবরেটরী। এই প্রতিষ্ঠানসমূহে এবং অপরাপর বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের প্রভূত গবেষণার ফলে সর্প-গন্ধার শেকড়ে আজ পর্যন্ত কুড়িটি নতুন উপক্ষারের সন্ধান পাওয়া গেছে। সিবা ফার্মা লিমিটেডের ডাঃ এমিল স্কিটলার ও তাঁর সহকর্মীরা 'রিসার্পিন' নামে একটি নতুন উপক্ষার সম্প্রতি আবিষ্কার করেছেন। 'সার্পাসিল' নামে বিক্রীত ভেষজে এই উপক্ষারটি ব্যবহৃত হয়। সর্পগন্ধার স্নায়ু স্নিগ্ধকর ক্ষমতার মূলে এই উপক্ষারটি আছে বলে এর আবিষ্কারকেরা দাবি করেন।

সর্পগন্ধার বিভিন্ন উপক্ষারের ভৈষজ্য গুণ পরীক্ষা করে দেখা গেছে, কয়েকটি উপক্ষার যেমন আজমালিন, সার্পেনটিনিন ইত্যাদি রক্তচাপ কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি করে, পক্ষান্তরে রাউলফিনিন, সার্পেনিন, সার্পেনটিন প্রভৃতি কয়েকটি উপক্ষার রক্তচাপ হ্রাস করে। স্কিটলারের রিসার্পিনের স্নায়ু স্নিগ্ধকর ক্ষমতা অত্যধিক কিন্তু ঘুম পাড়ানোর ক্ষমতা অল্প। এই উপক্ষারটির কিঞ্চিৎ পরিমাণ উত্তেজক প্রতিক্রিয়া আছে এবং ক্রমাগত ব্যবহার করলে কিছুটা দুর্বলতা, ক্লান্তি ও ঝিমনো ভাব সৃষ্টি করে।

রক্তচাপাধিক্য চিকিৎসায় সর্পগন্ধার শেকড়ের বিস্ময়কর কার্যকারিতার দরুণ বিদেশে এর চাহিদা অত্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। একমাত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই এই বনৌষধিটি বর্তমানে টন টন রপ্তানি হচ্ছে। কমপক্ষে চারটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান এই গুল্মের সাহায্যে কোনও না কোন ভেষজ প্রস্তুত করেন।

বর্তমানে সর্পগন্ধাজাত সার্পাসিল, রাউডিকসিন, রাউইললয়েড ও রিসার্পিন এই চারটি পেটেন্ট ঔষধ পৃথিবীর সর্বত্র লক্ষ লক্ষ রোগীর চিকিৎসায় ব্যবহৃত হচ্ছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রক্তচাপের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয় যদিও, তবে হঠাৎ উত্তেজনার ফলে মানসিক বিকারেও এই পর্যায়ের ঔষধ ব্যবহার করা হয়। এ ছাড়া নিদ্রাকারক হিসেবেও সর্পগন্ধাজাত ঔষধের ব্যবহার আছে।

সবশেষে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন মনে করি যে, আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে সর্পগন্ধা সম্পর্কে যে সব তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে তার দ্বারা এটাই প্রতিপন্ন হয় যে, প্রাচীন কালের ভারতীয় আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে সর্প-গন্ধার স্নায়ু স্নিগ্ধকারক ও অবসাদক ক্রিয়া সম্বন্ধে যা দাবি করা হয়েছিল তা যথার্থই সত্য। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে প্রায় ২০০ বছর আগে ভারতীয় আয়ুর্বেদ চিকিৎসকেরা রসায়ন ও ভৈষজ্যতত্ত্বীয় গবেষণার আধুনিক পদ্ধতির সাহায্য ছাড়া কত সূক্ষ্ম ও সুনিপুণভাবে মানব-দেহের ওপর এই বনৌষধিটির কার্যকারিতা পর্যবেক্ষণ করতে পেরেছিলেন যে, এর দ্রব্যগুণ সম্বন্ধে যা তাঁরা লিখে গেছেন আধুনিককালের বৈজ্ঞানিক গবেষণাতেও তা সমর্থিত হয়।

নখদর্পণ

উত্তমপুরুষ

গোয়েন্দা গল্প

ভুলেও ভাববেন না, একটি রোমহর্ষক হত্যা বৃত্তান্ত আপনাদের শোনাতে বসেছি। সে-ক্ষমতা আমার নেই, অভিসন্ধিও না। কিছুকাল আগে কোন ইংরেজী পত্রিকায় বিদেশী গোয়েন্দা-গল্পের ধারা নিয়ে রচিত একটি নিবন্ধ চোখে পড়ে। তখনই ভেবেছি, বাংলার রহস্য-কাহিনীর উপর একটি আলোচনা ফাঁদে বসলে কেমন হয়, কেননা আমাদের সাহিত্যের এ-ধারাটি সমালোচকের উপেক্ষিত কিন্তু শীর্ণ নয়। সম্প্রতি একত্রে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আদিম রিপু' উপন্যাসের তিন কিস্তি পড়বার পরে ইচ্ছাটি বিশেষ বলবতী হয়েছে।

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, ডিটেকটিভ্ গল্প আমি পড়ি, সাগ্রহে সংগ্রহ করি এবং একা একা যদি দীর্ঘপথ রেলে পাড়ি দিতে হয়, তবে প্রিয় বন্ধু স্ট্যানলী গার্ডনারকে সহচর করতে ভুলি না। একটা সস্তা শ্লেষ-ব্যবহারে কারও যদি আপত্তি না হয়, তবে সগর্বে বলি, আমি একজন ঘোরতর আগাথা খৃষ্টিয়ান। [illegible]টেমানও বলতে পারতুম, কিন্তু প্রবীণ ও পণ্ডিতেরা ভ্রূকুটি করবেন। যদিও একাদশীর দিন ডুবে ডুবে জল খাওয়ার মত লুকিয়ে গোয়েন্দা-গল্পের পাতা উল্টান না, এমন নীরস-নীরেট বিদ্যারত্ন আমি একটিকেও চিনিনে।

সীরিয়স উপন্যাসের মত স্বেদ-রোমাঞ্চ-পুলক ইত্যাদি যার কুল-লক্ষণ, সেই ডিটেকটিভ্ নভেলও আমাদের দেশে বিদেশ থেকে আমদানী। প্রধান সরবরাহ-কারী অবশ্য ইংলণ্ড। গত বিশ-পঁচিশ বছর ধরে বাংলা ভাষায় ঝুড়ি ঝুড়ি গোয়েন্দা-বই বেরিয়েছে, কিন্তু খুব কম বইয়েরই প্লট নিজস্ব। আমাদের সমাজ বা পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কহীন এ-সব গ্রন্থের গোয়েন্দারা সাধারণত অলৌকিক শক্তিধর, বজ্রসমুৎকীর্ণ মণিতে সূত্রের মত তাঁদের অবাধ গতিবিধি, পরমায়ুও অখণ্ড। পিস্তলের গুলি যদি কেবলি কান ঘেঁষে বেরিয়ে যায়, তাহলে গোয়েন্দা হয়ত বাঁচে, কিন্তু গল্প বাঁচে না। উন্নত ধরণের ইংরেজী ডিটেকটিভ্ উপন্যাসে শুধু অপরাধী 'ধরবার' সবিস্তার বর্ণনাই থাকে না, চরিত্রচিত্রণ এবং মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণও থাকে, এবং তার ভিত্তি বৈজ্ঞানিক।

বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যের প্রথম স্মরণীয় নাম, পাঁচকড়ি দে। একদা 'নীল-বসনা সুন্দরী' 'মনোরমা' প্রভৃতির আদর ছিল সর্বত্র, অত্যুচ্চনামা অভিজাত ঘরের কথা অবশ্য বলতে পারিনে। তবে সাধারণ পাঠাগারে যে কাড়াকাড়ি পড়ে যেত, এ আমি নিজেই দেখেছি। কোন-কোন সমা-লোচক রুমেলিয়ার স্রষ্টাকে ফরাসী লেখক এমিল গেবোরিয়োর পাশাপাশি বসিয়ে-ছিলেন। তাঁর প্লটে বিদেশী প্রভাব হয়ত ছিল, কিন্তু ঘটনাবিন্যাস ছিল সম্পূর্ণ নিজস্ব, অপরাধী আর গোয়েন্দার মধ্যে ঘটত চতুরে-চতুরে কোলাকুলি—রুদ্ধশ্বাস পাঠকদের কীহয়-কীহয় কৌতূহল শেষ পৃষ্ঠা অবধি বজায় থাকত।

বাংলা গোয়েন্দা-সাহিত্যের আদি-পর্বের আলোচনায় প্রিয়নাথ সেনের "মালঞ্চ" পত্রিকার "দারোগার দপ্তর" বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তবে এই সিরিজের গল্পগুলি মৌলিক নয়, কোনান ডয়েলের সার্থক হোমস্ কাহিনীগুলির ধুতি-পরানো তর্জমা। জনপ্রিয়তা থেকে বঞ্চিত না হলেও সাহিত্যিক স্বীকৃতি এ-সব কাহিনীর জোটেনি, এবং অনিবার্যভাবে এদের মহানির্বাণ ঘটেছে। আর অনিত্য জনমনোরঞ্জিকার কথা যখন উঠল, তখন সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা-বার্ষিকী, অর্থাৎ পঞ্জিকায়, বিজ্ঞাপিত গ্রন্থমালাই বা বাকি থাকে কেন। এদের মূল ইংরেজী 'সিক্সপেনী থ্রিলর' বা চার আনার গঞ্জিকা। লেখকেরা মারলে হাতী, নবাব বা লাখোপতিই মারতেন, লুটতে হলে লুটতেন ভাণ্ডার—বোম্বাগড়ের রাজার অন্দরমহলে ছুটতেন। মুদী-ছাত্র, কেরানি-তরুণীর—এ'রাই পাঠক—গায়ে আঁচটিও লাগত না, এ'রা পড়ে খুশী হতেন, বলতেন সাধু, সাধু।

পাঁচকড়ি দে-র সমসাময়িক আর এক-জন লেখকের নাম যদুনাথ ভট্টাচার্য। পুলিশ কর্মচারী এই ভদ্রলোক কয়েকটি মৌলিক গোয়েন্দা-গল্প লিখেছিলেন। তাঁর কাহিনী আপন অভিজ্ঞতাপ্রসূত, এবং গ্রাম্য পরিবেশে রচিত। যে-জীবনকে আমরা জানি, চিনি, তারই গণ্ডীর মধ্যে তিনি অপরাধের ছবি এঁকেছিলেন। অংকনে সততা ছিল, চটক ছিল না; হয়ত সেই জন্যেই গৌড়জনের চিত্ত থেকে তিনি এমন নিঃশেষে মুছে গেলেন। সন্ধানী পাঠক যদুনাথের রচনায় সেকালের কয়েকটি সার্থক পল্লীচিত্র পাবেন।

পরবর্তী যুগের গোয়েন্দা-কাহিনী-কারদের মধ্যে, শুধুমাত্র সংখ্যাগরিমাতেই দীনেন্দ্রকুমার রায় বোধ হয় প্রথম আসন পাবেন। 'রহস্য লহরী' এবং 'ষণ্ডামার্কের দপ্তর' সিরিজ দুটির গ্রন্থসংখ্যার সমষ্টি দুশোর কাছাকাছি। দীনেন্দ্রকুমার ছিলেন পাকা লিখিয়ে, একটি মনোহর রচনা-ভঙ্গীর অধিকারী। সব চেয়ে উল্লেখযোগ্য তাঁর সততা; তাঁর গোয়েন্দা-গল্পের সব কটিই সেক্সটন ব্লেক পর্যায়ের অনুবাদ, কিন্তু সে-কথা কোথাও লুকোনোর প্রয়াস দেখিনি—স্থান-কাল-পাত্র তিনি বিদেশীই রেখেছেন। পিকাডিলীকে কখনও চৌরঙ্গী বলে চালাতে চান নি। কখনও কখনও বাংলার পাশাপাশি মূল ইংরেজী বাক্যটিকে বন্ধনীর মধ্যে সম্পূর্ণভাবে উদ্ধৃত করতেও তাঁর সংকোচ ছিল না। রচনার ভাষা প্রাঞ্জল, এ যুগেও বহু অনুবাদকের অনুকরণীয়।

আক্ষেপ এই, দীনেন্দ্রকুমার অনু-বাদের জন্যে শস্তা ধরনের বিদেশী বই বেছে নিয়েছিলেন। দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা রবার্ট ব্লেক অশ্বত্থামার মতই অমর। বিলাতী প্রবাদ বলে বিড়ালের ন'টি প্রাণ, ব্লেকের ছিল অন্তত ন'শোটি। তাঁর রূপান্তর গ্রহণের শক্তিও অলৌকিক—কখনও তিনি চীনেম্যান, কখনো হাবসী। কুকুর বা ভল্লুকরূপে যে দেখা দেননি এই সৌভাগ্য। অবশ্য এমনটি যে হ'তে পারে না, তা নয়। লন চ্যানীকে যাঁরা নির্বাকযুগে ছবির পর্দায় দেখেছেন, তাঁদের কাছে ব্লেকের ছদ্মবেশে অবিশ্বাস্য বোধ হবে না। গল্প আছে, রুমানীয়ার রাণী একবার মার্কিন মুলুকে বেড়াতে যান। তখন হলিউডের কয়েকজন অভি-নেতা রহস্য করে বলেছিলেন, আগে পরীক্ষা করে দেখা হ'ক আগন্তুক সত্যিই রুমানীয়ার রাণী, না লন চ্যানী। অভ্যর্থনার বন্দোবস্ত পরে হবে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে হেমেন্দ্র-কুমার রায়ের কয়েকটি বইকে গোয়েন্দা-কাহিনী বলব কিনা বুঝতে পারছিনে। এগুলির বিষয়বস্তু ঠিক মামুলী চুরি-

ডাকাতি, খুনখারাপি নয়। অপরাধ এবং তদন্তুক অবশ্যই আছে, কিন্তু কাহিনী ক'টি আসলে ইংরেজীতে যাকে 'মিস্ট্রি' গল্প বলে, তাই। একটি গল্পে হেমেন্দ্র-বাবু তো গোয়েন্দা দিয়ে ভূতকেও ধরেছেন। মুখ্যাত সাহিত্যিকের রচনা বলে প্রসাদগুণে হেমেন্দ্রবাবুর সব গ্রন্থেই আছে, এবং যদিও সেগুলো ছেলেদের দিকে চোখ রেখে লেখা, তবু বয়স্কদেরও রীতিমত কৌতূহলাবিষ্ট করে। মুখ-বদলানো হিসেবে মাঝে মাঝে রহস্য-কাহিনী রচনায় হাত দিয়েছেন আরও অনেক প্রখ্যাত সাহিত্যিক, প্রসঙ্গক্রমে সৌরীন্দ্র মোহন মুখোপাধ্যায়, পরিমল গোস্বাম এবং নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের নাম করতে পারি, কিন্তু গোয়েন্দা-গল্পকে বাংলা সাহিত্যে কেউ যদি প্রকৃত সম্মানে শরিক করে থাকেন তো তিনি শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সত্যান্বেষী ব্যোমকে চরিত্রে অনেকে হয়ত খানিকটা শার্লক হোমস, খানিকটা হার্কুল পয়রোর ছা দেখতে পাবেন। কিন্তু ব্যোমকেশে ব্যক্তিত্ব তার নিজস্ব, আর গল্পের উত্ত পুরুষ অজিত শুধুই ওয়াটসন নয় ব্যোমকেশকে ঘিরে যাদের কাহিনী গ ওঠে তারাও জীবন্ত। এবং এ-রচ শুধু ভাষা-নৈপুণ্যে বিশিষ্ট নয় মানবতাবোধেও চিহ্নিত। ব্যোমকে কার্য-কারণের সম্পর্ক নিরূপণে বৈজ্ঞানি বুদ্ধিচাতুর্যে অনন্য। সমদর্শীর ম শরদিন্দুবাবু বহুর মধ্যে সন্দেহ বিত করে দিতে দিতে একেবারে পরিণা বিস্ময়ে উপনীত হন, কিন্তু ঘটনাবিন্যা কোথাও সম্ভবকে অতিক্রম করে না। এ টেকনিক আধুনিক শ্রেষ্ঠ বিদেশ গোয়েন্দা-গল্পে বহুলভাবে ব্যবহৃত এ শরদিন্দুবাবুর রচনা নিঃসন্দেহে তাদে সমকক্ষ। সাহিত্য-সমাজে তপশীলভু গোয়েন্দা-কাহিনীকে সত্যান্বেষীর প্র জলচল করেছেন। তাঁর লেখনী প্র না হলে—সৌভাগ্যক্রমে সে-রকম কো লক্ষণ এখনও নেই—সে হয়ত কালক্র কৌলীন্যও পাবে।

রহস্য-কাহিনীর আলোচনায় কয়েক নামই মাত্র করা গেল, এবং সব নাম হয় করা হল না। গতির কথা লিখতে গি প্রকৃতি একেবারে বাদ পড়ে গেল। তব এই অসম্পূর্ণ আলোচনারও প্রয়োজ ছিল। বহুর প্রিয় এই সরস শিল্পটিকে আমরা এতকাল একরকম জোর ক অন্তেবাসী করে রেখেছি, কথা-সাহিত্যে পরিক্রমায় অতি-উদার সমালোচনাও সযত্ন এর ছোঁয়া বাঁচিয়ে চলে যান। মুষ্টিমেয় রুচির বোঝা আমরা সকলের উপ চাপিয়েছি। কাব্য-নাটক ইত্যাদি তথ কথিত উঁচুদরের রচনায় ইংরেজেরা ক কৃতিত্ব দেখায়নি, তবু তারা সগৌরব শার্লক হোমসের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপ করে।

ছবি ও লেখা

মাসি: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। আড়াই টাকা।

একে তিন তিনে এক: অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এম সি সরকার অ্যান্ড সন্স লিঃ। ১৮, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। তিন টাকা।

দ্বিতীয় শৈশবে উপনীত হয়ে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ কলমকে তুলির মতো ব্যবহার করে শিশু সাহিত্যে যে নতুন একটি ছোট্ট জগতের সৃষ্টি করেছিলেন তা শুধু শিশু-চিত্তই জয় করেনি, বড়োদের কাছ থেকেও তা সানন্দ স্বীকৃতি পেয়েছে। ছবি-লেখাই এমন লেখার সঠিক বর্ণনা এবং এর প্রতি সাহিত্য-বিচারের পরিচিত কোনো মান প্রয়োগ করতে যাওয়াই নীরস মূর্খতার পরিচয় দেওয়া। মাসি-তে আছে তিনটি অধ্যায়, আর একে-তিন-তিনে-একে সতেরোটি। ছবির কথা বাদ দিলে একে বলতে হয় উচ্ছ্বসিত অসংবদ্ধতা। প্লটটা উপভোগ্য, উচ্ছ্বাসটা ছোঁয়াচে। কিন্তু আসলে ছবির কথাটাই প্রধান। "মাসি" পড়ে মাসির ছবি কি চোখের সামনে ভেসে ওঠে না? এমন মাসির আদর মার আদরের চেয়ে একটুও কম নয়।

বই দুটি পড়তে পড়তে কারো কারো মনে হবে যে, আরো ছোটো থাকলে এদের আরো ভালো লাগতো। অথবা বয়স আরেকটু বেশি হলে। এমন বোধহয় একজন পাঠকও নেই যার উপভোগ দুটির একটি কারণেও ব্যাহত হবে। সমালোচনা হোলো না। কিন্তু এমন বই যে সমালোচনা করবারই নয়। এমন বই পড়তে হয়, পড়ে উপভোগ না করে পারা যায় না, আর পড়বার অনেকক্ষণ পরেও উপভোগের আমেজ থেকে যায় মনের তয়খানায়। শিশুদের হাতে বই দুটি তুলে দেবার আগে শুধু একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন: পেসাদ, ছিরিপদ, ক্রেমশঃ, এসব কথা পরীক্ষার খাতায় লিখতে নেই। ৬৮ পৃষ্ঠায় মাসি বলছেন, "ছবিও যে লেখ্খার শামিল।" সত্য কথা—কিন্তু শুধু অবনীন্দ্রনাথের বেলায়। খোকার নয়, খোকার বাবারও নয়।

১।৫৫

ছোট গল্প

কয়েকটি গল্প—সুকুমার রায়। জিজ্ঞাসা, ১৩৩ এ রাসবিহারী এভিন্যু, কলিকাতা। দাম এক টাকা।

পাঁচটি ছোট গল্পের সংকলন। ইদানীং প্রায়ই ছোট গল্প সংকলনের বই হাতে পড়ে এবং তার ভিতর কয়েকটি বই বা গল্প বেশ উপভোগ্যও হয়েছে। কিন্তু পর পর কয়েকটি ছোট গল্প পড়ায় মনে হয়েছে বুঝি বা একই বই বার বার পড়ছি। কেননা বেশী ভাগ লেখকেরই অতি আধুনিক ভাষা এবং অতি

আধুনিক চিন্তাধারা একই ছাঁচে ঢালা। একটু বেশী আধুনিক ইংরাজী সাহিত্য পড়ে বা নাড়াচাড়া করে অনেকেরই কলমের ভিতর দিয়ে একটু বিদেশী ঢং এসে পড়ায় বাংলা সাহিত্যের কোথায় যেন একটু অভাব বা ত্রুটি থেকে যায়। এ ক্ষেত্রেও কতকটা তাই। সুকুমার রায় নূতন লেখক। সেইজন্যই একটু কৌতূহলের সঙ্গেই তাঁর লেখা পড়তে গিয়ে হতাশ হয়েছি। গল্পগুলির সুর এবং ঢং পরিচিত। যদিও ভাষার জোর আছে কিন্তু চিন্তাধারা অস্বাভাবিক থাকায় মাধুর্য হারিয়ে গেছে। 'মূল্যশোধ' ও 'অপসরণ' গল্প দুটিতে লেখক কি বলতে চেয়েছেন তা ঠিক বোঝা গেল না। ঔষধ ও ফুলশয্যা গল্পদুটির সাবলীল ছন্দ সুখপাঠ্য। আশা করা যায় যে, লেখক ভবিষ্যতে সাহিত্য ক্ষেত্রে তাঁর আরও লেখা দিয়ে পাঠককে আনন্দ দিতে পারবেন। বইটির ছাপা, বাঁধাই ও প্রচ্ছদপট সুন্দর।

৮৩।৫৫

কুসুমের স্মৃতি—অমরেন্দ্র ঘোষ; নব- ভারতী, ৫, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য দু'টাকা আট আনা।

এগারটি ছোটগল্পের সংকলন। লেখকের বিচিত্র অভিজ্ঞতার ছাপ অনেক রচনার মধ্যেই পরিস্ফুট। কিন্তু ওই পর্যন্তই। পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করবার কৌশল লেখকের এখনও

করায়ত্ত নয়। গল্পগুলির পরিণতি যেন হঠাতই এসে পড়ে, পড়ার পর মনে হয় কি যেন পেলাম না। আবার কাহিনীর মধ্যে একটা বক্তব্যকে হাজির করানর প্রয়াসে আর্টের মর্যাদাও অবহেলিত। মমত্ববোধ যতটুকু আছে বিস্তৃতি ও প্রকাশ সে পরিমাণে অনেক কম। তবে লেখকের ভাষার মধ্যে পূর্বের চইতে দৃঢ়তা ভাব বেশি এসেছে লক্ষ্য করলাম। আলোচ্য গল্প সঞ্চয়নে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে জীবনকে দেখবার প্রচেষ্টাটুকু ছাড়া ভাবধারা ও বিশ্লেষণের দিক থেকে বৈশিষ্ট্য তেমন কিছুই নেই। প্রথম গল্প দুটি যা পড়বার মত। ছাপা ও প্রচ্ছদপট ভালই।

৫৬২।৫৪

উপন্যাস

এক নজর—শশাঙ্ক ভট্টাচার্য, প্রাপ্তিস্থান—পি।৫২, বি কে পাল এভিনিউ, কলিকাতা। মূল্য আড়াই টাকা।

চাকুরি জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত একখানি উপন্যাস। এক নজরেই রচনার অপটুতা ধরা পড়ে। অনেক ছোটখাটো চরিত্র দৃষ্টি আকর্ষণ করলেও সমগ্রতার বিচারে অসার্থক। যে ধরণের প্রেম-কাহিনীকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে তা যে ইতিপূর্বে বহুবার সংব্যবহৃত। তাই নতুন লেখককে একটু অভিনবত্বের দিকে নজর দিতে অনুরোধ জানাই।

৫৬০।৫৪

কবিতা

স্বপ্নতরী—বিজ্ঞান। প্রকাশক—শ্রীমৎ নির্গুণ চৈতন্য ব্রহ্মচারী। শিবানন্দ যোগাশ্রম, মনসাগ্রাম, পোঃ—দশগ্রাম, জেলা—মেদিনীপুর। দাম—এক টাকা।

'স্বপ্নতরী'র কবিতাগুলির মধ্যে নিপুণ চিত্রকল্প কি দুরূহ শব্দ প্রয়োগের কোন চমক নেই; কিন্তু যে সম্পদে কবিতাগুলি সমৃদ্ধি লাভ করেছে, সে সম্পদ তাদের ভাব। কৃত্রিমতায় ভরা রাজনীতি ও অর্থনীতি বিধ্বস্ত এই জীবন থেকে ঊর্ধে একটি শান্তশ্রী আত্মার যে পরিমণ্ডল রয়েছে, কবির দেহমন সেই জগতের ধ্যানে বিভোর। ভক্তকবি আকাশে-বাতাসে পরমাত্মার কল্যাণময় স্পর্শ অনুভব করেছেন। এবং পাঠককে সেই স্বর্গীয়তার আনন্দে ভরে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন। তাই কবিতা শুধুমাত্র শব্দ ও ছন্দের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকেনি; একটি রূপাতীত ও অতীন্দ্রিয় সাধনার বেদীতে তারা নৈবেদ্য হয়ে গিয়েছে।

৪৭।৫৫

বর্ষ-পঞ্জী

হিন্দুস্থান ইয়ার-বুক, ১৯৫৫—শ্রী এস সি সরকার প্রণীত। প্রকাশক : এম সি সরকার এন্ড সন্স লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য ৪৲ টাকা।

আধুনিক মানুষ তথ্যের দ্বারা প্রভাবিত এবং পরিচালিত। কর্মের মধ্যে, বিলাসের মধ্যে, শিক্ষা, আলাপ-আলোচনার প্রতি পদেই নানা তথ্যের নজীর নিয়ে চলতে হয় মানুষকে। ভোরের খবরের কাগজ থেকে আরম্ভ করে রাত্রে বেতারের খবর শুনে শুয়ে পড়া পর্যন্ত কতো ব্যাপারই গোচরে আসে, কিন্তু পটভূমিকা জানা না থাকলে সব কিছু অনুধাবন করা সম্ভব হয় না। কোন্ দেশের রাজনীতিক, অর্থনীতিক ব্যবস্থা কেমন; কোথায় কি পাওয়া যায়; কোথায় কোন্ দেশ; কোন্ দেশের রাষ্ট্রিক কাঠামো কেমন; এমনিধারা ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, অর্থনীতিক তথ্যের সংকলন গ্রন্থ এখনকার শিক্ষিত লোকের হাতের কাছে রাখা অপরিহার্য এবং সে রকম কোন গ্রন্থের কথা উঠলেই গত তেইশ বছর ধরে প্রকাশিত হিন্দুস্থান ইয়ার-বুকের কথাটাই সবচেয়ে আগে মনে পড়ে। বিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিক নানা তথ্য, খেলাধুলা, সাহিত্য, সিনেমা প্রভৃতি আরও নানাদিকের জানবার অনেক বিষয় নিয়েই এই ৭৬৪ পাতার বিরাট সংকলন গ্রন্থ। এছাড়া দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবৃন্দের সংক্ষিপ্ত জীবনীও তথ্যান্বেষী মানুষ মাত্রেরই কাজে লাগবে।

(৮৫।৫৫)

বিবিধ

এরা কোথায়ঃ সংকলন—সমীরকুমার দাস ও ভজন দাশগুপ্ত; প্রাচী প্রকাশন—১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। দাম চার আনা।

আলোচ্য পুস্তিকাটিতে রুশ, বিপ্লবোত্তর কালে লেনিনের পর কম্যুনিস্ট পার্টির এক-নায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে যে সমস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি ও নেতাদের বিচারের প্রহসন (মস্কো বিচার ১৯৩৬-৩৮) বা গুপ্তভাবে হত্যা করা হয় তাঁদের অনেকেরই সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হয়েছে। শুধু রুশিয়াতেই নয়, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, হাঙ্গেরী, চেকোশ্লভাকিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলিতেও এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে দেখা গেছে এবং প্রতি ক্ষেত্রে রাশিয়ার কম্যুনিস্ট সরকারকেই দায়ী করা হয়েছে। নিরংকুশ ক্ষমতা লাভের জন্য মানুষের জিঘাংসাবৃত্তি কতখানি ভয়ংকর হতে পারে এইসব কাহিনীগুলিই তার সাক্ষ্য দেবে। ট্রটস্কি হত্যার বিবরণ যেমন বিস্ময়কর তেমনি মর্মান্তিক।

৪৭০।৫৪

Netaji and The C.P.I. Sita Ram Goel. Publishers: Society for Defence of Freedom in Asia. 12, Chowranghee Square, Cal. Price: Annas six.

এই ছোট পুস্তিকাখানির মধ্যে লেখক রাজনীতির একটি বিশেষ দিকের প্রতি

াকপাত করেছেন। নেতাজী সুভাষচন্দ্র ীয় মুক্তিযজ্ঞের এক প্রধান পুরোহিত। ুমারিকা থেকে শুরু করে তুষারভূমি ন্ত পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষের নতার জন্য তিনি তাঁর সাধনাকে একটি প পুষ্পাঞ্জলির মত নিবেদন করেছিলেন। এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি নেতাজীকে কুৎসায়, নানা বিরূপ মন্তব্যে হেয় র চেষ্টা করেছে। সুভাষচন্দ্রের মত র আরও বরেণ্য জননায়কদের কমিউনিস্ট অশ্রদ্ধেয় উক্তি বর্ষণ করতে দ্বিধা ন। দলগত মতকে প্রাধান্য দেবার জন্য উনিস্টদের অভিসন্ধি—এই-ই Netaji the CPI পুস্তিকাখানির প্রতিপাদ্য । নিজের যুক্তির স্বপক্ষে লেখক অজস্র পত্রিকা থেকে ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উদ্ধৃতি ার করেছেন। ৩৬।৫৫

Never Too Late: N. Roy. Publier: Orient Book Company, Shyama Charan De St. Cal. ce: Rupees three.

আমাদের দেশে জনশিক্ষার প্রসার আদৌ াপ্রদ নয়। জনসাধারণের বিরাটতম অংশটি ালোক থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে। অথচ কে অগ্রগতির পথে এগিয়ে নেওয়ার জন্য াই একমাত্র বাহন। এদেশে লোকগীতি লোক সংস্কৃতির মাধ্যমে শিক্ষাদানের একটি ন্দদায়ী প্রথা রয়েছে। কিন্তু তাতে ান পৃথিবীর দূরতম ক্রান্তির সংবাদ সে ায় অনুপস্থিত থাকে। প্রতি পলে পলে থিবী আজ পরিবর্তনমুখী। তার রাজ- তি, তার অর্থনীতি, তার সামাজিক কাঠামো ত কিছুই ওলটপালট হয়ে যাচ্ছে। সে ে একটি মোটামুটি ধরনের জ্ঞান না লে মানুষের পক্ষে কর্তব্য নির্ধারণ সম্ভব না। তাই আমাদের দেশের প্রাথমিক যসূচী হওয়া উচিত অশিক্ষাকে নির্বাসিত া। লেখক এই সমস্যার ওপর আলোক- ত করে একটি মূল্যবান সমাধানের ইঙ্গিত য়েছেন। দেশের দিকে দিকে বয়স্কশিক্ষার ন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়োজন হয়ে ড়েছে। লেখক শিক্ষাক্ষেত্রের দায়িত্বশীল দে অধিষ্ঠিত রয়েছেন এবং ব্যক্তিগত ভিজ্ঞতা থেকে বয়স্কব্যক্তিদের শিক্ষাদানের পদ্ধতি নির্দেশ করেছেন, তার অধিকাংশই মর্থনীয়। ২২২।৫৪

স্বপ্ন ও সাধনা: শ্রীসমর দে। প্রকাশক: শ্রীসমর দে ও শ্রীনীলিমা দে। ৪১।৬৪বি, রসা রোড সাউথ, কলিঃ। দামঃ আট আনা।

লেখক খ্যাতিমান রেখাশিল্পী। 'স্বপ্ন ও সাধনা' তাঁর একটি লঘুস্বাদ রচনা। আপাতলঘু হলেও অনেক স্থলে লেখক বেশ গুরু বক্তব্যের অবতারণা করেছেন। রচনার ভঙ্গিটি স্বচ্ছন্দ। পরিপাটি করে গুছিয়ে যান্ত্রিকভাবে লেখার চেয়ে রচনাটি আসর জমিয়ে রসিকজনের কাছে নিবেদন করার মত মনোরম। 'স্বপ্ন ও সাধনা'র সর্বত্র একটি সরস শিল্পী-মনের পরিচয় পাওয়া যায়। জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতে শিল্পীমনে যে প্রতিক্রিয়া ঘটে 'স্বপ্ন ও সাধনা' সেই প্রতিক্রিয়ার নানা রঙের রামধনুকে ধরে রেখেছে। দু'একটি অনুল্লেখ্য অসংগতি ছাড়া রচনাটি বেশ উপভোগ্য। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনা রবীন্দ্র গ্রন্থানুসারী। ১৫।৫৫

কৃষক সমস্যা: মুজফ্ফর আমেদ। প্রকাশক: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি লিমিটেড। ১২, বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিঃ। দামঃ আট আনা। পৃষ্ঠাঃ ৫৩।

ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এর জনসংখ্যার বিরাটতম অংশটিই কৃষিকর্মে নিযুক্ত। আবহমান কাল থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সমাজনৈতিক কারণে ভারতের কৃষিজীবন পৃথিবীর অন্যান্য দেশের উন্নত মানের স্তরে উপস্থিত হতে পারে নি। ফলে সাধারণ কৃষক প্রতিদিনের জীবনে নানা অন্তরায়ের সম্মুখীন হয়। মুজফ্ফর আমেদ একজন সক্রিয় কমিউনিস্ট নেতা এবং কৃষক সভার জন্মকাল থেকে এর সংগে জড়িত আছেন। 'কৃষক সমস্যা'র কতকগুলি মূলগত কারণ ব্যক্ত করতে তিনি শ্রেণী সংগ্রামে, ধনিক-প্রথার প্রবর্তন ইত্যাদি শিরোনামায় তাঁর বক্তব্য পেশ করেছেন। কৃষক আন্দোলনের সংগে যে সকল কর্মী বিশেষভাবে জড়িত আছেন তাঁদের পক্ষে একজন কমিউনিস্ট নেতার এই বিশেষ সমস্যাটিকে এই পুস্তিকায় কিভাবে বিশ্লেষণ করেছেন তা অবগত হবার সুবিধা হবে। ৪৭৪।৫৪

প্রাপ্তি-স্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

শ্রীশ্রীমৎপ্রভুপাদ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর মৌনী অবস্থার উপদেশ (২য় খণ্ড)—শ্রীশ্রীমৎস্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী।

অমৃত কুম্ভের সন্ধানে—কালকূট।

মালঞ্চ-মালা—মালাকার।

প্রাচীন কবির কাহিনী—শ্রীরবীন্দ্রকুমার বসু।

প্রবোধকুমার সান্যালের শ্রেষ্ঠ-গল্প—মিত্র ও ঘোষ ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

Current Affairs 1955—A. R. Mukherjee.

পূর্ণিমা—ভাস্কর।

অর্চনাপ্রিয়া—শ্রীহরিদাস মুখোপাধ্যায়।

মোপাসাঁর একাদশ—শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়।

শ্রমিক রাষ্ট্র বীমা পরিকল্পনা—শ্রীসুবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

ট্রামে-বাসে

অবিবাহিতদের উপর কর ধার্যের প্রসঙ্গে বিশুখুড়ো বলিলেন—"অবিবাহিতরা কি বলেন জানিনে, আমরা সবাই কিন্তু এটাকে চিনি বা কাপড়ের ওপর ট্যাক্সের মতো মনে করিনে। কিন্তু আমরা বলি, এতোই যখন হলো তখন মন্ত্রী মশাই বিবাহের চেয়ে বড়ো ব্যাপারের বরদের ওপর একটা সুপার ট্যাক্স বসিয়ে দিলে সরকারী ভাণ্ডার হয়ত রাতারাতি কুবেরের ভাণ্ডার হয়ে যেতো। আগামী বাজেটে অর্থমন্ত্রী মশাই কথাটা ভেবে দেখবেন আশা করি।"

* * *

আমেরিকা আর রাশ্যা কে কী পরিমাণ হাইড্রোজেন বোমা তৈয়ার করিতে সক্ষম হইয়াছে এই কথা শুনিয়া বার বার মনে হইয়াছে—দিন আগত
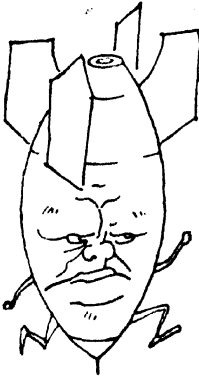
ঐ, বৃটেন তবু কই। তারপর অকস্মাৎ সে দিন স্যার চার্চিলের পার্লামেন্টারী ভাষণে শুনিলাম বৃটেনও নাকি এই বোমা তৈয়ার করিতেছে। সুতরাং? শ্যাম বলিল—"সুতরাং নারদ, নারদ!!"

* * *

মহিলাদের কোন কোন চাকরির অধিকার হইতে বঞ্চিত করবার প্রস্তাব চলিতেছে। শ্যামলাল বলিল—"এর জন্যে আইনের প্রয়োজন নেই। লেডিস্ সিট্ উঠিয়ে দিয়ে দশটা পাঁচটা করতে দিলে মেয়েরা বাপ্ বাপ্ বলে আপনা থেকেই চাকরিতে ইস্তফা দেবেন!"

* * *

পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলের জনৈক সদস্য নাকি সম্প্রতি "কাব্যি"-রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন।—"বোঝা গেল মুখ্যমন্ত্রী মশাই বড় ডাক্তার হলেও এ রোগের চিকিৎসা জানেন না"—বলেন এক সহযাত্রী।

* * *

শুনিলাম ইন্দো-পাক "বিরোধ" বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব *নাই, যা আছে তার নাম "সমস্যা" মাত্র!—"সুতরাং আর ভয় নেই। পাক্ বলবেন—তোমার জরু আমার জরু; আর আমার জরু আমারই জরু। জবাবে ভারত শুধু বলবেন—জী হ্যাঁ; ব্যস্, এক কথায় সমস্ত সমস্যার সমাধান"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।*

* * *

কংগ্রেস প্রেসিডেণ্ট শ্রীযুক্ত ধেবর তাঁর এক সাম্প্রতিক ভাষণে বলিয়াছেন যে, বাঙলা একদিন আলোক-বর্তিকা জ্বালাইয়া সবাইকে পথ দেখাই-য়াছে। খুড়ো বলিলেন—"এটা পৌরাণিক কাহিনী মাত্র। সভাপতি মশাই বর্তমানের ইতিহাস পড়লেই দেখতে পাবেন বাঙলা আজ পথে বসে পড়েছে।"

* * *

কলম্বোর এক সংবাদে শুনিলাম যে সেখানে চৌদ্দ বৎসর বয়সের কম চাকরবাকরদের শিক্ষার ভার নাকি মনিবকে লইতে হইবে।—"আমরা এই নীতি মানিনে; আমরা বরং বরাবর ঝিকে মেরে বৌকে শেখানোর শিক্ষাই লাভ করে এসেছি"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

পাবলিক সার্ভিস পরীক্ষার একটী প্রশ্নের উত্তরে জনৈক পরীক্ষার্থী নাকি বলিয়াছে যে, শ্রীযুক্ত নেহরু একজন

মহাজন।—"নেহরুজী কী হারে সুদ নেন সে কথাটা বলে দিলে উত্তরটা যুৎসই হতো, পাবলিকেরও উপকার হতো!"

* * *

শ্রীযুক্ত *গোবিন্দবল্লভ পন্থ তাঁর এক ভাষণে আভাস দিয়াছেন যে, দিল্লীর "শুষ্ক" এলাকায় পরিণত হওয়ার সম্ভাবনা আছে।—"সম্ভাবনা কেন, অর্থ-*

মন্ত্রী মশাইর বাজেটের পর রসকষ আর কোথাও এতটুকু আছে বলে তো আমাদের মনে হয় না"—বলিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

অন্ধ্রের নির্বাচন প্রসঙ্গে কংগ্রেসী সহযাত্রীরা যখন খুব আনন্দ প্রকাশ করিতেছিলেন, তখন একটি কিশোর সহযাত্রী সহসা বলিয়া উঠিলেন—"তা এমন আর কী হয়েছে, আমাদের ফুটবল টিমকে তো আপনারা হারাতে পারেন নি।" অমৃতম বাল ভাষিতম্ বলিয়াই আমরা কোন মন্তব্য করিলাম না।

রামায়ণের অভিনব রূপায়ণ

বম্বের লিটল ব্যালে ট্রুপের "রামায়ণ" নৃত্যনাট্যটি অভিনবত্বে এবং শিল্পবৈচিত্র্যে যে কি এক অচিন্ত্যপূর্ব সৃষ্টি গত সাত দিন ধরে কলকাতার সুধীজনের তা দেখবার সুযোগ হয়েছে। এর আগে রামায়ণকে অনেকে অনেক রকমভাবেই পরিবেশন করেছেন, নতুন নতুন টেকনিকেরও অবতারণা করতে পেরেছেন কেউ কেউ এবং তার মধ্যে কারুর কারুর পরিকল্পনা জনপ্রিয়তাও অর্জন করতে পেরেছে। সে প্রচেষ্টাগুলির প্রতি শ্রদ্ধার ভাব না হারিয়েও এক অতি পরম বিস্ময়কর শিল্পকৃতিত্বরূপে লিটল ব্যালে ট্রুপের এই "রামায়ণ" নৃত্যনাট্যটিকে সবায়ের ওপরে আসন দিতে হয়। সর্বাঙ্গীণ ও এক অদ্ভুত সৃষ্টি। অদ্ভুত পরিকল্পনা। সবই শ্রীযুক্ত শান্তি বর্ধনের প্রতিভার পরিচয় এবং এ প্রতিভার আর তুলনা পাওয়া যায় না। দেশের সব জায়গার সব শ্রেণীর সব বয়েস ও মনের মানুষের অন্তরের ওপরে সহজে ও স্বচ্ছন্দভাবে আধিপত্য বিস্তার করে নেবার এমন প্রমোদ পরিকল্পনা আর দেখা যায়নি। অথচ এর সবটুকুই একান্তভাবেই ভারতেরই শিল্পধারার নিজস্ব পরিচয়ে সমুজ্জ্বল। প্রথমত হচ্ছে আখ্যানবস্তু হিসেবে রামায়ণের কাহিনী; শহুরে হোক আর গ্রামাই হোক এদেশের আপামর জনসাধারণের মনের অঙ্গনে তার বাসা বাঁধা হয়েই আছে। দ্বিতীয়ত হচ্ছে, একটা মেলার অবতারণা যার একটি প্রমোদ-অঙ্গরূপে নৃত্য-নাট্যটির অবতারণা ঘটানো হয়। মেলার ওপরে মানুষ মাত্রেরই একটা সহজাত আকর্ষণ, সব দেশে সকল কালেই। এর পিছনে রয়েছে বহুপ্রকার মানব-চরিত্রকে একত্রে দেখতে পাওয়ার একটা অদম্য ঝোঁক। আর তৃতীয়ত হচ্ছে মানুষের বদলে চরিত্রগুলির চলাফেরার মধ্যে পুতুলের আড়ষ্ট ভঙ্গী, যা সঙ্গে সঙ্গেই মন ও কল্পনার ওপরে স্বপ্নরাজ্যের বিস্ময় ও পুলকের আস্তরণ পরিয়ে দেয়। রামায়ণ, মেলা আর পুতুল, তিনটিই আদিকাল থেকে এদেশের মানুষের আঁতের জিনিস। এই তিনের সমন্বয়ের পরিকল্পনাটাই অপূর্ব এবং যেভাবে সাজানো হয়েছে, তাতে প্রত্যেকটি জিনিসই মানুষের শিল্পপ্রকৃতির এক একটি অপরিহার্য অলঙ্কাররূপে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে।

* * *

আরম্ভতেই দেখা যায় মেলার একটি অংশ। একধারে পর্দাফেলা একটা তাঁবু; তার ভিতরে হবে পুতুল নাচ, ঢাক বাজিয়ে লোক ডাকা হলো দেখবার জন্য, ঠিক যেমন মেলাতে হয়। টিকিট কেটে লোক পর্দা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করলো; এসব নাচের ভঙ্গীতেই। তারপর এলো ভিতরের অংশ; এক এক করে অভিনেতার চরিত্রগুলির চিত্রপট সামনে বসিয়ে দর্শকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া হলো। তারপর সেই পটগুলিই যেন জীবন্ত হয়ে নড়েচড়ে সামনে আসতে লাগলো ঘটনার স্রোত বেয়ে। সূত্রধার

রূপজগৎ

—শৌভিক—

লিটল্ ব্যালে ট্রুপের 'রামায়ণ' নৃত্যনাট্যের একটি দৃশ্য

মাঝে মাঝে এসে ঘটনার বিবরণ গেয়ে যায়, তারপর সেই ব্যক্তিই দৃষ্টির মধ্যে থেকেই একপাশে সরে গিয়ে ঘটনা অনুযায়ী প্রতীকী দৃশ্যপট বদলে চললো। একটা বিচিত্র ছন্দোময় গতির মধ্যে সব নিবন্ধ; আশ্চর্যজনক সাবলীলতা। একটা অবিরাম ছন্দোস্রোতের ধারাতে একটার পর একটা ঘটনা সামনে আসতে থাকে। এক একটি চরিত্রের মুখোশ ও পোশাক এক একটি আলাদা আলাদা চরিত্রের পুতুলের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছে, তেমনি আবার ঘটনা ও ভাব অনুযায়ী এক একটি পুতুলের নড়াচড়ার অভিব্যক্তিও এক এক রকমের। অথচ সমগ্রভাবে চমৎকার ছন্দ মেলানো। দৃশ্যের মধ্যে এক বস্তুর সঙ্গে আর এক বস্তুর আপেক্ষিক দূরত্ব নিয়ে আসার কি চমৎকার পরিকল্পনা। যেমন, রাম-লক্ষ্মণ-সীতা নৌকা করে চলেছেন অযোধ্যা ছেড়ে। পুতুলের ভঙ্গীতে হাত-পা নেড়ে গতির একটা রূপ এনে দেওয়া হয়েছে এবং সেই সঙ্গে পথ অতিক্রমণ বোঝাবার জন্য সূত্রধার এক একটা গাছ হাতে করে সরিয়ে সরিয়ে বসিয়ে দিয়ে যান; চমৎকার একটা এফেক্ট সৃষ্টি হয় তাতে। নৃত্য রচনার অনন্যসাধারণত্বও সর্বথাই পরিস্ফুট। শেষে রাম-রাবণের যুদ্ধ-দৃশ্যটি তো ছন্দোগতিতে অনবদ্য কল্পনা। একদিকে রাম, লক্ষ্মণ, হনুমান ইত্যাদি, অপরদিকে রাবণ ও তার সাঙ্গপাঙ্গ—মঞ্চভর্তি চরিত্র। এক একজনের এক একরকম অভিব্যক্তি দেখতে দেখতে মনে হয় সমগ্র মঞ্চটাই যেন চোখের সামনে নাচছে তালে তালে। এমনিই একটা সম্মোহনী পরিবেশ গড়ে ওঠে। সাজপোশাকের বাহারের দিকে আর এক অনবদ্য আকর্ষণ সৃষ্টি হয়েছে; বর্ণ সমন্বয়ের একটা নতুন ছন্দ পাওয়া যায় ওর মধ্যে। সবই দেশেরই ধারা অনুসরণ করেছে, কিন্তু শিল্পীর কল্পনায় কি অপূর্ব মোহনীয় সাজ ফুটে উঠেছে! নাচ, সাজপোশাক, বাজনা সব মিলে একটা চমকে মন ভরিয়ে রেখে দেয় গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত এবং নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের একটা অনুভূতি মনকে অভিভূত করে রেখে দেয়।

* * *

এ দলের শিল্পীরা নামকরা কেউ নন। তাছাড়া নাচের বাঁধুনিই এমনি যে, ব্যক্তি-বিশেষের কৃতিত্ব চোখে পড়েনা; সমবেত প্রচেষ্টার সমগ্র রূপটাই চোখের সামনে ভেসে থাকে। কিন্তু শিল্পীদের সকলেই নাচের কঠিন ভঙ্গীগুলিকে আয়ত্ত করার যে পরিচয় দিয়েছেন, অতো নিখুঁত প্রকাশভঙ্গী দেখবার সুযোগ পাওয়া দুর্লভ ব্যাপার। কথায় এ "রামায়ণ" নৃত্য-নাট্যটির পূর্ণ পরিচয় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়, এটা শিল্পানুভব ও উপভোগের জিনিস। তবে এই কথা বলা যায় যে, স্বর্গত শান্তি বর্ধন পরিকল্পিত এই নৃত্য-নাট্যটিকে বর্তমান যুগেরই একটি শ্রেষ্ঠ শিল্প-সৃষ্টি বলে নির্দ্বিধায় অভিহিত করা যায় এবং প্রশংসা প্রসঙ্গে কোন বিশেষণেরই প্রয়োগ বাড়াবাড়ি বলে মনে হবে না। বর্তমানে দলে রয়েছেন সঙ্গীত পরিচালনায় ওস্তাদ আলাউদ্দীন

শ্রীমতী পিকচার্সের "দেবত্র" চিত্রের একটি দৃশ্যে গীতা সিং, সবিতা চট্টোপাধ্যায়, উত্তমকুমার, অনুপকুমার, সিপ্রা মিত্র, কানন দেবী ও অহীন্দ্র চৌধুরী

ার ভ্রাতুষ্পুত্র বাহাদুর হোসেন খাঁ; ান রচনা করেছেন দশরথলাল; মুখোশ ও সাজসজ্জা প্রস্তুত করেছেন আপ্পুনি ও গুলে; নৃত্য-শিল্পীদের মধ্যে আছেন আপ্পুনি, মনীষ, ছটু সিং, রাজদান, তীরথ, নরোনহা, অরুণ, নারায়ণ, যাদব, জ্ঞান, গুল, ক্ষমা, দেবকী, শর্মিষ্ঠা ও াঙ্গুলি এবং গান ও বাজনায় দশরথলাল, করাণীদকর, মীরা, মৃণাল, শ্যামা, ব্যোমকেশ, দান, হেমেন দাশগুপ্ত ও জিতেন দাশগুপ্ত। "রামায়ণ"এর রূপায়ণ হচ্ছে এদের মূল পালা; অবিরাম গতিতে প্রায় ঘণ্টা দেড়েক ধরে চলে এবং সময় যে কোথা দিয়ে পার হয়ে যায় বুঝতেই পারা যায় না। এছাড়া সূচীর প্রথমভাগে গুজরাটি ও হায়দ্রাবাদের ম্বাড়ি লোকনৃত্যও এ'রা দেখান। ভারি াবলীল প্রাণোচ্ছলতায় মন ভরে যায় দের নাচগুলি দেখে। এ নাচগুলি অন্যের দ্বারা আগেও দেখা গিয়েছে, কিন্তু এ'দের পরিবেশনে এ নাচগুলির মধ্যে নবীনত্বের যে সাড়া উদ্ভূত হয়েছে, তা আর কারও ক্ষেত্রে পাওয়া যায়নি বললে অত্যুক্তি হবে না। বড়ো শিল্প-সৃষ্টির প্রধান লক্ষণ হচ্ছে তার আবেদনের সর্বজনীনত্ব; সেটা "রামায়ণ"-এর ক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে। কেবলমাত্র ভারতীয়রাই নয়, বহু বিদেশীও এই অভিনব ব্যালেটির চমৎকারিত্বে মুগ্ধ হয়ে পঞ্চমুখে প্রশংসা করছেন।

গাল বাড়িয়ে চড় খাওয়া

চলচ্চিত্রের শিল্পীদের নিয়ে মাঝে মাঝে একটা হুল্লোড় সৃষ্টি করার একটা দুর্দম ঝোঁক কেন যে লোকের মনকে পেয়ে বসে, বুঝে ওঠা মুশকিল। সেবার 'হিন্দুস্থান সম্মিলনী', তারপর সেদিন 'ক্রিকেটবাজী' প্রভৃতি যে বিরুদ্ধ

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল, তার রেশ এখনও মিটতে না মিটতেই গত শনিবার অনুষ্ঠিত হলো 'নিখিল ভারত আধুনিক সংগীত সম্মেলন'। ঠিক আগের দুটির মতো অনুষ্ঠান নয়; এটা ছিল দুদিনের এক সংগীত সম্মেলন এবং চেহারা দেখিয়ে যাওয়া নয়, রীতিমত গান পরিবেশন করারই উদ্দেশ্য ছিল এই সম্মেলনের। তাই এখানে অভিনয় শিল্পীদের সমাবেশ ছিল না, ছিল গায়ক ও গায়িকাদের সমাবেশ, যাঁদের মধ্যে অধিকাংশই চলচ্চিত্রের প্লে-ব্যাক শিল্পী। শতাধিক শিল্পীকে দুদিনের সূচীতে অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং বলা বাহুল্য, প্রচারে বেশী ঢাক পেটানো হয় বম্বে থেকে আগত শিল্পীদের নামের ওপরে। বিজ্ঞাপনে বম্বের শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন মহম্মদ রফি, তালাত মামুদ, লতা মুঙ্গেশকর, গীতা রায়, মান্না দে ও হেমন্তকুমার এবং এ'রা সকলেই এসেও ছিলেন। তবে অনুষ্ঠান যা হলো তাকে 'নিখিল ভারত' বলেও আখ্যাত করা যায় না বা "আধুনিক" সংগীত সম্মেলন বলেও ধরা যায় না। কারণ এতে যোগদান করেন শুধুমাত্র বম্বে ও কলকাতার শিল্পীরাই; আর আধুনিকও নয় এই জন্যে যে, সম্মেলনে বেশীই ফিল্মী গান পরিবেশিত হলেও মীরা ও কবীরের ভজন এবং কিছু কিছু লোক গীতিও পরিবেশিত হয়। আবার নাচের দিক থেকে পরিবেশিত হয় ভারত নাট্যম ও কথক। কি ধরনের দর্শক-শ্রোতা সম্মেলনে এসেছিলেন, একটি দৃষ্টান্ত থেকেই তা বেশ উপলব্ধি করা গিয়েছিল। নাচের জন্য বম্বে থেকে আনানো হয়েছিল চিত্রাভিনেত্রী সিতারাকে। প্রথম দিনেই নাচতে নেমে সিতারা জানিয়ে দেন যে, তিনি ফিল্মী-নাচ পরিবেশন করবেন না, পরিবেশন করবেন ভারতের মহান

ক্লাসিক্যাল নৃত্য "কথক" এবং কলকাতার লোকের প্রকৃত শিল্পকলার প্রতি অনুরাগের যে কথা তিনি শুনেছেন, তাতে তাঁর নৃত্য সবাই মন দিয়ে দেখবেন বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন। তাল ঠিক থাকলেও সেতারার আলুথালু নৃত্যভংগীই হয়তো পছন্দ হলো না বলে দর্শকদের কাছ থেকে নাচ বন্ধ করার জন্য চীৎকার ও হাততালি পড়তে লাগলো মুহুর্মুহু। কিন্তু সেতারা ছাড়বার পাত্রী নন। কলকাতার দর্শক যে তাঁর অমন ক্লাসিক্যাল নৃত্য তারিফ না করার মতো নীচ রুচির পরিচয় দেবে তা তিনি বললেন, তিনি ভাবতেও পারেননি। তবুও তিনি ছাড়লেন না, ময়ূর নাচের ভংগী দেখিয়ে তবে তিনি ক্ষান্ত হলেন। পরদিন সেতারা এর শোধ তুললেন নিম্ন-রুচির আদি রসাত্মক নাচ পরিবেশন করে; তাতে কি হাততালি আর সিটির ধুম। কলকাতার রুচির গালে এমন করে কেউ থাপ্পড় মেরে যায়নি। তবে সিতারাকে ধন্যবাদ, কারণ এই জাতীয় সম্মেলনের কারা প্রকৃত পৃষ্ঠপোষক, তা তিনি চোখে আঙুল দিয়েই দেখিয়ে দিয়েছেন। এই ধরনের সম্মেলনকে আর প্রশ্রয় দেওয়া উচিত কি না, সেটাই এখন ভাববার বিষয়।

আরও একটা বিষয় বিচার করতে হয়। বম্বের শিল্পী বলেই তাঁরা মহা মহা গুণী এবং তাঁরাই প্রধান আকর্ষণ, এ প্রবৃত্তিটাও বাড়তে দেওয়া উচিত নয়। বহু অর্থ ব্যয় করে কর্তৃপক্ষ বম্বে থেকে ছ'জন শিল্পী আনিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে একমাত্র মহম্মদ রফি ছাড়া আর কেউই তারিফ পাবার মতো কৃতিত্ব দেখাতে পারেননি। আর সারা সম্মেলনের শ্রেষ্ঠ শিল্পী বলে যদি কারুর সম্মান প্রাপ্যই হয় তা একমাত্র সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের নামই করতে হয়। তাছাড়া সমগ্রভাবে ধরলেও সম্মেলনের মান রেখেছেন স্থানীয় শিল্পীরাই। তবে ওরই মধ্যে বেশ কয়েকজন আনাড়ীকেও চালিয়ে দেওয়া হয়েছে; হয়তো এ'রা ছিলেন বেশী খাতিরের লোক। কিন্তু কেনা টিকিটের শ্রোতারা তাদের চেঁচিয়ে তুলে দেবার চেষ্টাকে ধমকে থামিয়ে দেবার মাস্টারি-

'আরব কা সওদাগর' চিত্রে স্মৃতিকণা বিশ্বাস

পনাকে সমর্থন করা যায় না। গান ও নাচ ছাড়া কমিক পরিবেশনেরও ব্যবস্থা ছিলো—যাতে জহর রায়, শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় ও মণ্টু দাশগুপ্ত শ্রোতাদের কাছ থেকে প্রভূত প্রশংসা অর্জন করেন। অর্থাৎ আসলে এটি হয়েছিল একটি বিচিত্রানুষ্ঠান, সংগীত সম্মেলন নয়; তবে বিরাট আকারের এবং এক সিতারার কাছে থাপ্পড় খাওয়া ছাড়া অতি জঘন্য কিছু ঘটতে পারেনি, সম্ভবত বম্বের তারকারা সশরীরে উপস্থিত ছিলেন না বলেই।

*　　*　　*

বম্বের গায়ক-গায়িকারা কলকাতায় আসায় গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে গত ৭ই মার্চ তাঁদের এবং স্থানীয় শিল্পিবৃন্দকে এক চায়ের আসরে সম্বর্ধনা জানানো হয়। বম্বে থেকে আগত শিল্পীদের সকলেই এবং স্থানীয় শিল্পীদের অনেকে, তাছাড়া চিত্র-পরিচালক, প্রযোজক, সংগীত পরিচালক, চিত্র-সাংবাদিক প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। গ্রামোফোন কোম্পানীর পক্ষ থেকে সপত্নী জেনারেল ম্যানেজার মিঃ জে ই জর্জ; সহকারী ম্যানেজারদ্বয় মিঃ এইচ সিলাল ও তদীয় পত্নী এবং সকন্যা মিঃ কে চ্যাটার্জী; রেকর্ডিং অধিকর্তা মিঃ পি কে সেন আপ্যায়নে যত্নবান ছিলেন।

খেলার মাঠে

একলব্য

ভারত সফরের সমস্ত খেলায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে শক্তিশালী রাশিয়ান ফুটবল দল স্বদেশ অভিমুখে যাত্রা করেছে। ভারতে রাশিয়ান দল শুধু বিজয় সম্মানই লাভ করেনি, এদেশের মনও জয় করেছে ফুটবলের উন্নত কলা-কৌশল দেখিয়ে। দিল্লী, মাদ্রাজ, মহীশূর, হায়দরাবাদ, ব্যাঙ্গালোর, বোম্বাই, কলকাতা প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন ফুটবল কেন্দ্রে তিনটি আন্তর্জাতিক খেলা নিয়ে রুশ ফুটবল দল এদেশে ১৯টি খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে; এই ১৯টি খেলায় তারা গোল করেছে একশো'টি, আর তাদের বিরুদ্ধে গোল হয়েছে মাত্র চারটি, তিনটি অপ্রধান খেলায়। ভারতে সোভিয়েট ফুটবল খেলোয়াড়দের এই কৃতিত্বপূর্ণ বিজয় অভিযান এবং তাদের বিজ্ঞানসম্মত ছন্দোময় ক্রীড়া-চাতুর্য এই উপমহাদেশের ফুটবলপ্রিয় নাগরিকদের স্মৃতিপটে বহুদিন আঁকা থাকবে, সন্দেহ নেই। রাশিয়ান ফুটবল দলের ভারত সফরের ফলে দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের গ্রন্থিও দৃঢ়তর হয়েছে। এদেশে তারা কোন প্রতিযোগিতার খেলায় অংশ গ্রহণ করতে আসেনি, এসেছিল ভারতের নিমন্ত্রণে শুভেচ্ছা প্রণোদিত ফুটবল সফরে। আবার যাবার আগে প্রতি-নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেছে ভারতকে ফুটবল দল নিয়ে রাশিয়া সফরের জন্য। যাই হোক, সখ্যতা এবং পারস্পরিক প্রীতি বিনিময় ছাড়া রুশ দলের ফুটবল সফর থেকে ক্রীড়াক্ষেত্রে আমরা কিছু লাভ করেছি কিনা, এইটাই প্রশ্ন। আমি বলব রুশ দলের সফর থেকে আমরা অনেক কিছু লাভ করেছি। আন্তর্জাতিক ফুটবলের মানচিত্রে ভারতের স্থান কোথায় এ বিষয়ে যদিও আমরা ওয়াকিবহাল ছিলাম তবুও বিশ্বের শক্তিশালী ফুটবল দলগুলির অন্যতম রাশিয়ার ফুটবল দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নিজেদের ক্রীড়ামানের সঙ্গীণ অবস্থার কথা আরো ভালভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছি। আরও উপলব্ধি করতে পেরেছি—নিয়মিত অনুশীলন এবং সুপরিকল্পিত শিক্ষা পরিকল্পনায় কতখানি সুফল পাওয়া যেতে পারে। আর রাশিয়ান দলের নয়নাভিরাম ছন্দোময় ক্রীড়ানৈপুণ্য দেখবার সুযোগ, আমাদের উপরি পাওনা।

* * * *

সোভিয়েট রাশিয়ার যে দলটি এদেশে সফর করে গেল এদেরকে রাশিয়ার প্রকৃত প্রতিনিধিস্থানীয় শ্রেষ্ঠ দল বলা যায় না। শুভেচ্ছা সফরে কৃতী ও গুণী অনেক খেলোয়াড়ই আসেননি। হেলসিঙ্কি অলিম্পিকে যেসব খেলোয়াড় নিয়ে রাশিয়ার দল গড়া হয়েছিল তাদের দুজন খেলোয়াড় মাত্র এসেছিলেন এই দলের সঙ্গে। বেশীর ভা খেলোয়াড়ই ছিলেন বয়সে তরুণ। অব এর মধ্যে অনেকেই উঠতি খেলোয়াড় এ আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার অভিজ্ঞতা আছে অনেকের। তবুও এ দলটিকে রাশিয়া শ্রেষ্ঠ দল বলে অভিহিত করা যায় না। কি এই দলের খেলাতেই আমরা যে নৈপু প্রত্যক্ষ করেছি এতদিন ভারতের ফুটবল মা সে নৈপুণ্য অজ্ঞাত ছিল। কলকাতায় খেলা পূর্বে শত গোল পূর্ণ করবার জন্য রু দলের আর ৯টি গোল বাকী থাকে। এখা মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ও ভারতের সম্মিলি দলের বিরুদ্ধে তিনটি তিনটি হিসাবে সে ৯টি গোল করে তারা শত গোল পূর্ণ ক গেছে। একটি বেশী করেনি, একটিও ক করেনি। রুশ দলের ক্রীড়া ধারার সঙ্গেই যে এই গোলসংখ্যার সঙ্গতি। খুশি খেয়া মাফিক খেলায় যেন খেয়াল মাফিক গোল তার বেশী প্রয়োজন নেই। সতাই গোল করা যেন রুশদলের ক্রীড়াধারার কিছু বাহাদুর নয়। প্রতিপক্ষকে কাবু করে ওটা যে কো সময়ই করা যেতে পারে। তার আগে নিজে দের মধ্যে আদান প্রদানের রেওয়াজ কর পায়ের কায়দায় প্রতিপক্ষকে বোকা বানাও আধিপত্য বিস্তার কর সকল খেলোয়াড়ে উপর। প্রতিপক্ষের প্রতিটি খেলোয়াড়কে নজরবন্দী করে দাবার ঘরের মত ছক এঁকে এঁকে এগিয়ে যাও পারস্পরিক ছন্দোময় তালে বিপক্ষের গোল সান্নিধ্যে। তারপর গোল রক্ষককে অসহায় করে টুপ করে বলটি ঠেলে দাও গোলের মধ্যে, এই হচ্ছে রুশ খেলোয়াড় দের খেলার রীতি। ভারতীয় ফুটবলের প্রাণ কেন্দ্র এই কলকাতা ময়দানে সাগরপারের অনেক ফুটবল দলের খেলা দেখেছি; কিন্তু শক্তিশালী মোহনবাগান, পরাক্রান্ত ইস্টবেঙ্গল এবং যশস্বী খেলোয়াড় নিয়ে গড়া আরও শক্তিশালী ভারতীয় দলের এমন সঙ্গীণ অবস্থা কোনদিন দেখিনি, যেমন দেখেছি এদের সঙ্গীণ অবস্থা রুশ দলের বিরুদ্ধে। বাস্তবিকপক্ষে কি মোহনবাগান, কি ইস্ট-বেঙ্গল, কি সর্বভারতীয় দল কেউই রুশ দলের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে খেলাটিকে প্রাণবন্ত করতে পারেনি। প্রতিদিনই দুই দলের শক্তির তারতম্য এবং ক্রীড়াপদ্ধতির বিরাট পার্থক্য প্রকটভাবে ধরা পড়েছে দর্শকের চোখে। শীত প্রধান দেশের ফুটবল দলটি উষ্ণ আবহাওয়ায় খেলেও পরিশ্রম বোধ করেনি, আর ভারতের খেলোয়াড়রা ভারতের মাটিতেই নাজেহাল হয়ে উঠেছে শ্রমজনিত কাতরতায়।

* * * *

রাশিয়ান দলের খেলার গতিবেগ ছিল প্রখর অথচ সাবলীল। ঘাসের উপরে বল। বল আদান প্রদানের আয়াসহীন প্রচেষ্টা। বলের চামড়া আর বুটের চামড়ার মধ্যে যেন

ইস্টবেঙ্গল ও রাশিয়ার খেলার পূর্বে কলকাতার মেয়র শ্রীনরেশনাথ মুখার্জী রুশ খেলোয়াড়দের সঙ্গে করমর্দন করছেন

ভারত ও রাশিয়ার শেষ আন্তর্জাতিক খেলায় ভারতের গোলরক্ষক এস্ শেঠ সার্লানিকফের পায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে একটি বল বাঁচাচ্ছেন। সার্লানিকফ্‌কে শেঠের উপর দিয়ে লাফিয়ে পার হ'তে দেখা যাচ্ছে

...া আর চুম্বকের সম্বন্ধ। একে অপরকে আকর্ষণ করছে। হকি বলকে যেমন আকর্ষণ করেছে যাদুকর ধ্যানচাঁদের হকি স্টিক। ...টের খেলায় বল আয়ত্তের এমন দক্ষতা ইতি-পূর্বে এদেশের ফুটবলে আর চোখে পড়েনি। সবচেয়ে ভাল লেগেছে ঘাসের উপর দিয়ে চলমান বলের সঙ্গে স্থান পরিবর্তনশীল রুশ খেলোয়াড়দের ছন্দোময় গতি। এ গতি ছিল রূপে ও শৌর্যে ভরা, ফুটবল প্রতিভায় ভাস্বর। তবে রুশ খেলোয়াড়দের ক্রীড়া-পদ্ধতির সঙ্গে তাদের শুটিং ক্ষমতা সঙ্গতি-পূর্ণ নয় একথা স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হবে। শুটিংয়ের দিক দিয়ে তারা কিছু দুর্বল। সুরে আবেগ না থাকলে সঙ্গীত যেমন মধুর হয় না, তাল মান লয়ে ব্যত্যয় ঘটলে সুধাকণ্ঠের সঙ্গীত যেমন খাপ-ছাড়া লাগে, শিল্পীর নিপুণ তুলিরটানে দরদ না থাকলে ছবি যেমন প্রাণহীন হয়ে পড়ে তেমন সুকৌশলী রুশ খেলোয়াড়দের শুটিং দুর্বলতায় তাদের ছন্দোময় ফুটবল মাধুর্যও কতকটা ম্লান হয়েছে, সন্দেহ নেই। আবার তাদের পায়ে একেবারেই শট নেই, এ অপবাদ পুরনো স্কুলের দর্শকেরা অর্থাৎ যারা অতীত যুগের গোরা ফুটবল খেলোয়াড়দের প্রশংসায় পঞ্চমুখ তারাও দেবেন না। অনেকগুলি তীব্র শটও রুশ খেলোয়াড়দের করতে দেখা গেছে। অতীত যুগের গোরা খেলোয়াড়দের 'বিদ্যুৎগতি' শটের মত এ শটেও ছিল তীব্র গতি। রাশিয়ান দলের শুটিং অন্যান্য স্থানের ক্রীড়াপদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয় বলে অনেকে অতীতের শক্তিশালী গোরা দলের খেলার সঙ্গে রুশ দলের খেলার তুলনা করে অতীতকেই বড় করে দেখেছেন। কিন্তু এটা ভুললে চলবে না অতীত যুগের তেজোদৃপ্ত ফুটবল খেলা অনেকদিন আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায় নিয়েছে; তার স্থান গ্রহণ করেছে বিজ্ঞানসম্মত পারস্পরিক আদান প্রদানজনিত কলা-কৌশল। প্রতিপক্ষের নিপুণ গোল-রক্ষককে দূরের শটে পরাজিত করা পরম শক্তিধর খেলোয়াড়ের পক্ষেও সম্ভব নয়, যদি গোলরক্ষকের ত্রুটি না থাকে। হাওয়াভরা একটি চামড়ার বড় বল পায়ের শটে কত বেগে যেতে পারে? তাই বিশ্বের সর্বত্রই পার-স্পরিক আদান-প্রদানজনিত খেলায় গোল-রক্ষককে অসহায় করে গোল করবার প্রচেষ্টা। গত বিশ্ব অলিম্পিকে ভারত যুগোশ্লাভ দলের কাছে ১—১০ গোলে হার স্বীকার করেছিল। ১০টি গোলের মধ্যে যুগোশ্লাভের খেলোয়াড়রা তীব্র শট করে একটি গোলও করেননি। ভারতের 'কোচ' এবং খেলোয়াড়-দেরই এই উক্তি। যাই হোক অতীত কালের দুর্ধর্ষ গোরা দলগুলির তেজোদৃপ্ত ফুটবল খেলা দেখবার সৌভাগ্য আমার হয়নি। হয়তো সে খেলা আরো ভাল ছিল, আর না হয় অতীতের প্রতি মানুষের যে স্বাভাবিক মোহ আছে তার বশবর্তী হয়েই বর্ষীয়ান দর্শকেরা অতীতকে বড় করে দেখছেন। অতীতের সবই ভাল। আগের মানুষ ভাল ছিল, আগের খাদ্য খাবার ভাল ছিল, আগের খেলাও ভাল ছিল। আজ যদি কেউ নিজের হাতে গরু দু'য়ে

মোহনবাগানের বিরুদ্ধে রুশ দলের দ্বিতীয় গোল করবার দৃশ্য

নৈষ্ঠিক প্রক্রিয়ায় খাঁটি দুধ থেকে ঘি তৈরী করে তবে তার স্বাদ অতীতের ঘিয়ের স্বাদের মত হবে না, কারণ গরু তো অতীতের নয়, বর্তমানের। সুতরাং ঘিয়ের স্বাদ আগের চেয়ে খারাপ হতে বাধ্য। যাই হোক, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব থেকে কলকাতার মাঠে সাগর-পারের যেসব ফুটবল খেলা দেখার আমাদের সুযোগ ঘটেছে তার মধ্যে প্রফেশনাল সার্ভিস টীমের সঙ্গে রুশ ফুটবল দলের খেলার তুলনা করা যেতে পারে। বিশ্ববন্দিত খেলোয়াড় কার্টিস, কম্পটন, কেন্ডি জয়নারের খেলা আজও যেন চোখে ভাসছে। তবে সে খেলাতেও দলগত সংহতির চেয়ে ব্যক্তিগত প্রতিভা বেশী করে চোখে পড়েছিল। ফুটবল প্রতিভার ভাস্কর কার্টিস কম্পটনের সঙ্গে রুশ দলের অধিনায়ক ইগোর নেত্তোর প্রতিভারও তুলনা করা যেতে পারে। নেত্তো সত্যই ফুটবলের রূপদক্ষ শিল্পী। তার মাথার খেলা এবং পায়ের কায়দা বিশ্বের যে কোন শক্তিশালী ফুটবল দলের পরম সম্পদ। বাশাশকিন, ভইনফ, সিমোনিয়ান, ইলিন, সালনিকফ, তাতুশিচন কেউ কারো চেয়ে কম যান না। গত অক্টোবর মাসে ইংলণ্ডে মস্কো ডায়নামো দল ইংলণ্ডের জনপ্রিয় এবং শক্তিশালী ক্লাব আর্সেনাল টীমকে ৫—০ গোলে হারিয়ে দিয়েছিল। এই খেলা দেখে ইংলণ্ডের সমস্ত সংবাদপত্র এবং ক্রীড়া-সমালোচক ডায়নামো দলের খেলার অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন। "চার্লস বুকানস্ ফুটবল মন্থলী" নামক বিশিষ্ট ক্রীড়ামাসিকে সালনিকফের খেলা সম্পর্কে সমালোচক লেছেন—

—"In a life-time in football I have not seen better master of the arts of the game than inside-left Salnikov."

বিশ্ব ফুটবলের প্রাণকেন্দ্র ইংলণ্ডে রুশ খেলোয়াড়দের এই প্রশংসা নিশ্চয়ই অর্থহীন নয়। সালনিকফ ছাড়া ইয়াশিন, কুজনেৎসফ, কুজভস্কি, শারফ, ইলিন, রিজকিন প্রভৃতিও ডায়নামো দলের পক্ষে খেলেছিলেন। ভারতেও এরা খেলে গেছেন। সুতরাং রুশ খেলোয়াড়দের প্রশংসা শুধু আমরাই করছি না। ইতি-পূর্বেই আন্তর্জাতিক ফুটবলে এরা খ্যাতি এবং সমাদর দুই-ই লাভ করেছেন।

*   *   *

রুশ খেলোয়াড়দের শারীরিক গঠন ভারতীয় খেলোয়াড়দের চেয়ে এমন কিছু উন্নত নয়; নেত্তো এবং ইলিনকে তো কৃশ তনুই বলা যেতে পারে, কিন্তু অনুশীলন এবং অধ্যবসায়ের ফলে এই কৃশতনুতেও শ্রমশীলতার অপরিসীম শক্তি। খেলার সময় কোন খেলোয়াড়কে অযথা ধাক্কাধাক্কি করতেও দেখা যায়নি তাদের। মাথার বুদ্ধি এবং পায়ের নৈপুণ্যেই ফুটবল খেলেছে তারা, গায়ের জোরে খেলেনি। সোভিয়েট রাশিয়ায় পেশাদার ফুটবলের কোন অস্তিত্ব নেই। সাধারণ স্বাস্থ্য নিয়ে শুধু শখের জন্য খেলে

রুশ-ভারত তৃতীয় আন্তর্জাতিক খেলায় দুই দেশের অধিনায়ক আজিজ ও নেত্তো

তারা যদি ফুটবলে এতখানি উন্নতি করতে পারে, আমরাই বা পারবো না কেন? এ ভাববার বিষয়।

*   *   *   *

ভারতে রুশ দলের ফুটবল সফর কেন্দ্র করে অনেকে নানা রকমের রাজনৈতিক গবেষণা করেছিলেন। ৩০টি 'লাল জুজুর' ভয়ে সিংহল সরকার তো দিল্লীর দপ্তরে খবরদারী জানিয়ে দিলেন—রুশ খেলোয়াড়দের সিংহলে ঢুকবার 'ভিসা' যেন না দেওয়া হয়। কিন্তু ভারতে রুশ খেলোয়াড়দের আচার ব্যবহারে রাজনীতির তো গন্ধ পাওয়া যায়নি। তবে কলকাতায় একটি জিনিস লক্ষ্য করা গেছে। চ্যারিটি বা প্রদর্শনী খেলার অনুষ্ঠানে ভি আই পি-দের জন্য যে আসন নির্দিষ্ট থাকতো, তাতে আসীন থাকতেন মন্ত্রী-অমাত্যবর্গ, হাইকোর্টের জজ-ব্যারিস্টার, লালবাজার ও লালকুঠীর মাননীয়েরা। কিছু কিছু চিত্রতারকাও দেখা না গেছে এমন নয়। আর দেখা গেছে কংগ্রেস প্রধানদের। কিন্তু রুশ দলের খেলায় ভি আই পি আসনে সমাসীন মাননীয়দের মধ্যে এবার কিছু নূতন অতিথি দেখা গেছে, এঁরা হলেন কমরেড জ্যোতি বসু, মণিকুন্তলা সেন (কাউর), মুজফ্ফর আমেদ, মিসেস স্নেহাংশু আচার্য প্রভৃতি। খেলার আসরে এই সব কমরেডদের বিশেষ আগ্রহ আছে বলে আমাদের জানা ছিল না। রুশ দলের খেলার আয়োজনে এঁরা ফুটবল খেলায় আগ্রহী হয়ে উঠেছেন এটা আশার কথা। বিধান সভায় জ্যোতি বসুর দাপটে সরকার অনেক সময় কাহিল হ'য়ে পড়েন, বিধান সভায় এঁরা 'স্টেডিয়াম' নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করলে তবে কলকাতার দর্শকদের সহজে ফুটবল খেলা দেখবার স্বপ্ন সার্থক হলেও হতে পারে।

*   *   *   *

রুশ ফুটবল দল ভারতে যে ১১টি ম্যাচ খেলেছে তার ফলাফল ও গোলদাতাদের নাম নীচে দেওয়া হলঃ—

রাশিয়ান দল পরাজিত করেছে ঃ—

হাজারীবাগে—
ফুটবল ফেডারেশনের সভাপতির দলকে ৭—০ গোলে।

বারাণসীতে—
ফুটবল ফেডারেশন একাদশকে ৪—০ গোলে।

লক্ষ্ণৌতে—
উত্তরপ্রদেশ একাদশকে ৯—০ গোলে।

দিল্লীতে—
প্রধান সেনাপতির একাদশকে ৪—০ গোলে।
চীফ কমিশনারের দলকে ৯—০ গোলে।
প্রথম টেস্টে ভারতকে ৪—০ গোলে

ট্রইম্বলডেনের মহিলা বিভাগের টেনিস চ্যাম্পিয়ন মিস মোরীন কনোলী। কনোলীকে আর টেনিস খেলতে দেখা যাবে না। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে ইনি যে আঘাত পেয়েছিলেন, সেই আঘাতেই এ'র টেনিস খেলার পথ রুদ্ধ করেছে। মিস কনোলী শীঘ্রই পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছেন

ব্বলপুরে—

মধ্যপ্রদেশ প্রধান মন্ত্রীর দলকে ৫—২ গোলে।

াদ্রাজে—

মাদ্রাজ এফ এ একাদশকে ৬—১ গোলে।

ভারতীয় একাদশকে ৮—০ গোলে।

্রবেন্দ্রামে—

রাজপ্রমুখের একাদশকে ১১—০ গোলে।

্যাংগালোরে—

মহীশূর রাজ্য দলকে ৭—১ গোলে।

ভারতীয় একাদশকে ২—০ গোলে।

ায়দরাবাদে—

হায়দরাবাদ একাদশকে ৫—০ গোলে।

ভারতীয় একাদশকে ৬—০ গোলে।

াম্বাইতে—

বোম্বাই রাজ্য একাদশকে ১—০ গোলে।

দ্বিতীয় টেস্টে ভারতকে ৩—০ গোলে।

লকাতায়—

মোহনবাগানকে ৩—০ গোলে।

ইস্টবেঙ্গলকে ৩...০ গোলে।

তৃতীয় টেস্টে ভারতকে ৩—০ গোলে।

ঃ	জঃ	ড্রঃ	পরাঃ	স্বঃ গোল	বিঃ গোল
৯	১৯	০	০	১০০	৪

রুশ দলের গোলদাতা

রুশ দলের পক্ষে গোল করেছেন:—

স্ত্রেলৎসফ্—১৫টি, ইভানফ্—১৪টি, তাতুশ্চিন—১৩টি, সিমোনিয়ান—১৩, কুজনেৎসফ্—১১টি, সাল্নিকফ্—৫টি, শারফ্—৫টি, ভইনফ্—৫টি, ইসায়েফ্—৪টি, ফোমিন—৪টি, ইলিন—৩টি, নেত্তো—৩টি, কার্পফ্—২টি ও রিজার্কন—২টি।

* * * *

রুশ ফুটবল দলের ভারত ত্যাগের প্রায় সংগে সংগেই সোভিয়েট রাশিয়ার ভলিবল টীম ভারতে এসে পে'ছিচ্ছে। ১০ই মার্চ রাশিয়ান ভলিবল টীমের কলকাতায় পে'ছিবার কথা। রাশিয়ায় ফুটবলের পরই ভলিবলের স্থান। ফুটবলে যদিও তারা বিশ্ব জয় করতে পারেনি, ভলিবলে দু'বার তারা বিশ্বচ্যাম্পিয়ন আখ্যা লাভ করেছে। ১৯৫২ সালে মস্কোতে বিশ্ব ভলিবল চ্যাম্পিয়নশিপের আয়োজন করা হয়। ভারত সর্বপ্রথম এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করে। গ্রুপ প্রথায় ভারতকে ৬টি দেশের সংগে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছিল। এর তিনটি খেলায় তারা বিজয়ী হয় আর তিনটি খেলায় পরাজয় স্বীকার করে। ভারত হারিয়েছিল লেবানন, ইস্রাইল ও ফিনল্যান্ডকে আর হার স্বীকার করেছিল পোল্যান্ড, ফ্রান্স এবং চেকোশ্লোভেকিয়ার কাছে। চ্যাম্পিয়নশিপ নির্ণায়ক খেলায় রাশিয়া চেকোশ্লোভেকিয়াকে হারিয়েই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে। রুশ ভলিবল দলটি প্রায় এক মাস ভারত সফর করবে। কলকাতা, ত্রিবান্দ্রম ও দিল্লীতে তিনটি টেস্ট খেলা ছাড়া ভারতের বিভিন্ন শহরেও তাদের খেলার ব্যবস্থা হয়েছে। ১২ই ও ১৩ই মার্চ কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানে রুশ ভলিবল দলকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দেখা যাবে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় ভলিবল খেলার জনপ্রিয়তা। বিশ্ব ভলিবল প্রতিযোগিতায় মেয়েদের খেলা দেখবার জন্যও মস্কো ডায়নামো স্টেডিয়াম দর্শকে ভরে গেছে

দেশী সংবাদ

২৮শে ফেব্রুয়ারী—কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রী সি ডি দেশমুখ আজ সংসদে ১৯৫৫-৫৬ সালের বাজেট পেশ করেন। বাজেটে দেখা যায় যে, আগামী আর্থিক বৎসরে কেন্দ্রীয় সরকারের ৮ কোটি ৪৭ লক্ষ টাকা ঘাটতি পড়িবে। অর্থমন্ত্রী ঘাটতি পূরণের জন্য নূতন কর ধার্যের এবং কর বৃদ্ধির প্রস্তাব করিয়াছেন। চিনির উৎপাদন শুল্ক হন্দর প্রতি তিন টাকা বার আনা হইতে বাড়াইয়া পাঁচ টাকা দশ আনা করা হইয়াছে। অতি মিহি কাপড়ের উপর প্রতি গজে আড়াই আনা এবং অন্যান্য কাপড়ের উপর প্রতি গজে এক আনা উৎপাদন শুল্ক ধার্য হইয়াছে। পশমী কাপড়, সেলাই কল, বৈদ্যুতিক পাখা, কাগজ প্রভৃতির উপর উহাদের মূল্যের শতকরা ১০ টাকা নূতন উৎপাদন শুল্ক ধার্য হইয়াছে।

১লা মার্চ—কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ধেবর শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যা মনোনীত করিয়াছেন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের নিকট এতদ্‌রাজ্যের বেকার মেয়েদের জীবিকা সংস্থানের দাবী জানাইবার উদ্দেশ্যে আজ বিধান সভা ভবন অভিমুখে প্রায় তিন সহস্র নারীর এক শোভাযাত্রা পরিচালিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় জানান যে, তিনি আগামী ৯ই মার্চ উক্ত শোভাযাত্রীদের ৬ জন প্রতিনিধির সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্রস্তুত আছেন।

গত রাত্রিতে বেহিতয়ায় গ্রেট লায়ন সার্কাসের খেলা চলিবার কালে একটি সিংহী অকস্মাৎ খাঁচা হইতে বাহির হইয়া পড়ে এবং একজন স্ত্রীলোককে আক্রমণ করিয়া তাহার প্রাণনাশ করে।

২রা মার্চ—আজ কলিকাতা হইতে অনুমান ৩০ মাইল দূরে বাঁশবেড়িয়ায় একটি চটকলে শ্রমিকদের এক হাঙ্গামা সম্পর্কে পুলিশ গুলী চালায় এবং উহার ফলে চারিজন শ্রমিক আহত হয়। তন্মধ্যে একজন হাসপাতালে লইয়া যাইবার পথে মারা যায়।

বার্তাজীবিগণের ক্ষেত্রে ১৯৪৭ সালের শিল্প বিরোধ আইনের প্রয়োগ উদ্দেশ্যে তথ্য ও প্রচারমন্ত্রী কর্তৃক আনীত বিলটি সংসদে উত্থাপনের সাত দিনের মধ্যেই অদ্য রাজ্যসভায় সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

৩রা মার্চ—বৃটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার এন্টনী ইডেন আজ নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, ফরমোজা সংক্রান্ত বৈঠক সাফল্যমণ্ডিত করিতে হইলে তাহার ক্ষেত্র প্রস্তুত করিতে হইবে এবং সে কাজে ভারতও অংশ গ্রহণ করিতে পারে। স্যার এন্টনী ইডেন ব্যাংককে মিঃ ডালেসের সহিত আলোচনার পর দিল্লীতে আসিয়া প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত ফরমোজা সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করিতেছেন।

৪ঠা মার্চ—আজ রাজ্যসভায় একটি বে-সরকারী প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইয়াছে। ১৯৪৯ সালের ২৫শে জুলাই-এর পর পাকিস্থান হইতে যেসব উদ্বাস্তু ভারতে আসিয়াছে, তাহাদিগকে ভোটাধিকার দানের জন্য ভারত সরকারকে যথাশীঘ্র ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে উক্ত প্রস্তাবে অনুরোধ জানান হইয়াছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বাজেটের বিভিন্ন ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবী সম্পর্কে আলোচনাকালে বিরোধীপক্ষ এই রাজ্যে বিক্রয়কর আদায় ব্যবস্থার সমালোচনা করেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় জানান যে, পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিক্রয়কর আইন সংশোধন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

অদ্য লোকসভায় রেলমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী ঘোষণা করেন যে, সাধারণ ট্রেনে ৫০ মাইল পর্যন্ত যাত্রীদের ক্ষেত্রে ভাড়া বৃদ্ধি করা হইবে না।

১৯৫৫-৫৬ সালে ভারত সরকার পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তুদের জন্য ১৭ কোটিরও অধিক টাকা বরাদ্দ করিয়াছেন। পূর্ববর্তী আর কোন বৎসর এত অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ হয় নাই।

৫ই মার্চ—অন্ধ্র বিধানসভার ১৯৬টি আসনের মধ্যে মাত্র ৪৫টি আসনের ফল ঘোষিত হওয়া বাকী আছে। কিন্তু ইহার মধ্যে সংযুক্ত কংগ্রেসদল ১১৫টি আসন পাইয়া একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছে।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ নয়াদিল্লীতে ভারতীয় বণিক সমিতি সঙ্ঘের বার্ষিক অধিবেশনের উদ্বোধন উপলক্ষে বক্তৃতা প্রসঙ্গে ব্যবসায়ীদিগকে সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার আদর্শের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া যুগধর্মে অনুপ্রাণিত হইবার আহ্বান জানান।

আজ নয়াদিল্লীতে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে কংগ্রেস সভাপতি শ্রী ইউ এন ধেবর আবাদী কংগ্রেসের পর দেশের বিভিন্ন ঘটনার পর্যালোচনা করেন। তাঁহার মতে আবাদী কংগ্রেসে গৃহীত বিভিন্ন প্রস্তাব বিশেষ করিয়া সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেসের প্রতিশ্রুতিই অন্ধ্রে কংগ্রেসদলের বিপুল জয়লাভের কারণ।

৬ই মার্চ—কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের পবিত্রতা রক্ষা এবং উহার শক্তিবৃদ্ধি সম্পর্কে আবাদী কংগ্রেসে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় তাহা কা রূপায়িত করিবার পন্থা নির্ধারণকল্পে ৯ সদস্য লইয়া উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি কমি নিযুক্ত হইয়াছে। আজ নয়াদিল্লীতে কংগ্রে ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে এই কমিটি নিয করিয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়।

বিদেশী সংবাদ

১লা মার্চ—১৯৫০ সালে বৃটেনে আণবি শক্তি উন্নয়ন বিভাগে একটি পদে নিযু থাকিবার সময় ডাঃ ব্রুনো পণ্টিকর্ভো নিখো হইয়াছিলেন। অদ্য মস্কোর দুইটি সংবাদপ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে তিনি জানাইয়াছেন ঐ সময় হইতেই তিনি সোভিয়েট ইউনিয়ন কাজ করিতেছেন।

গাজা সীমান্ত এলাকায় ইস্রায়েলে সৈন্যদের আক্রমণে মিশরের সেনাবাহিনী একজন অফিসার ও ৩৬ জন নিহত হইয়া বলিয়া কায়রোতে সরকারীভাবে ঘোষণা ক হইয়াছে।

২রা মার্চ—নেপালের যুবরাজ মহে বিক্রম শাহ নেপাল মন্ত্রিসভা ভাঙ্গিয়া দিয়া ছেন এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রী এম পি কৈরালার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। যুবরাজ অদ বেতারযোগে রাজ্যের সর্বময় কর্তৃত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

চার্চিল সরকারের হাইড্রোজেন যুগের প্রতিরক্ষা নীতি কমন্স সভায় ৩০৩-২৬৩ ভোটে অনুমোদিত হইয়াছে। এতদ্দ্বারা ভবী আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের সম্ভাবনা সূচিত হইতেছে।

৫ই মার্চ—সোভিয়েট সংবাদ প্রতিষ্ঠান 'তাস' ঘোষণা করিয়াছেন যে, মার্কিন সাংবাদিক মিস আনা লুই ষ্ট্রং-এর বিরুদ্ধে সোভিয়েট ইউনিয়নে গুপ্তচর বৃত্তি ও অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের যে সকল অভিযোগ করা হইয়াছিল, সেগুলি ভিত্তিহীন। তাঁহাকে সর্বপ্রকার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইয়াছে।

৬ই মার্চ—সমগ্র বিশ্বে আণবিক ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ জনিত বিপদ সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানের জন মার্কিন বৈজ্ঞানিক সমিতি একটি স্পেশ্যাল কমিশন গঠন করিতে রাষ্ট্রপুঞ্জকে অনুরো জানাইয়াছেন।

করাচীর ওয়াকিবহাল মহলের একটি সংবাদে প্রকাশ, মার্চ মাসের শেষে পূর্ববঙ্গে পার্লামেন্টারী শাসনব্যবস্থা পুনঃ প্রবর্তি হইবে বলিয়া গতকল্য পাক মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে। জনাব আব হোসেন সরকারকে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত করা হইবে।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০৲, ষান্মাসিক—১০৲
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ
২০ সংখ্যা

শনিবার
৫ চৈত্র, ১৩৬১

DESH

SATURDAY, 19TH MARCH, 1955.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

উন্মাদের চেষ্টা—

গত ১২ই মার্চ নাগপুরে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপর আক্রমণের নিন্দনীয় চেষ্টায় দেশের সর্বত্র উদ্বেগ ও চাঞ্চল্যের সঞ্চার হইয়াছে। একজন রিক্‌শাওয়ালা পণ্ডিতজীর মোটরের পথ আটকাইয়া ছুরি হাতে গাড়িখানার পাদানের উপর লাফাইয়া ওঠে। লোকটা ধৃত হয়। পণ্ডিতজী দৈবক্রমে রক্ষা পাইয়াছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী এই ঘটনাকে উন্মাদের চেষ্টা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন এবং তিনি ইহাকে কোনও গুরুত্ব দেন নাই। কিন্তু তেমন লঘুভাবে এই ঘটনাটি উপেক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়। লোকটা সত্যই বিকৃতমস্তিষ্ক কিনা সে বিচার পরে হইবে; কিন্তু ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উপরে আক্রমণের উদ্যম যে হইয়াছিল, এক্ষেত্রে সে সত্য অস্বীকার করিবার উপায় নাই। সুতরাং ঘটনাটি খুবই গুরুতর। ফলতঃ পণ্ডিত নেহরুর জীবন শুধু ভারতের পক্ষে মূল্যবান নয়, বিশ্ববাসীর তিনি প্রিয়। তাঁহার নিরাপত্তার সম্বন্ধে সমধিক সতর্কতা গ্রহণ করা প্রয়োজন, এই নিন্দনীয় প্রচেষ্টার পর সকলেই ইহা উপলব্ধি করিবেন। ভারতের সর্বজনপ্রিয় প্রধানমন্ত্রী যে এই আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন এজন্য দেশবাসী মাত্রেই আশ্বস্ত হইবেন এবং শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার দীর্ঘ জীবন কামনা করিবেন।

প্রধানমন্ত্রীর হোলির অভিনন্দন

প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু হোলি উৎসব উপলক্ষে বিভিন্ন প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতিদের নিকট একটি অভিনন্দনবার্তা প্রেরণ করিয়াছেন। পণ্ডিতজী তৎসম্পর্কে তাঁহার বিবৃতিতে আবাদী কংগ্রেসে গৃহীত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা অবলম্বনে কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত বিশ্লেষণ করিয়াছেন এবং তাহা প্রতিপালনে কংগ্রেসের আন্তরিকতা ও দৃঢ়তার কথা উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার অভিমত এই যে, কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত এই নূতন নীতি বাস্তবক্ষেত্রে কার্যকর করিতে গিয়া কায়েমী স্বার্থ যদি অন্তরায়স্বরূপে দেখা দেয়, তবে সেগুলি দূর করিতে হইবে। কিন্তু সখ্য ও সহযোগিতার পথেই তাঁহারা এই কাজটি সম্পন্ন করিতে চান। একপক্ষে নিজেদের নীতি কার্যকর করিবার উদ্দেশ্যে দৃঢ়তা, অন্যদিকে কায়েমী স্বার্থের সহিত সহযোগিতার পথে সেই কাজ করিতে যাওয়া এই দুইয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া অগ্রসর হওয়াই কংগ্রেসের লক্ষ্য। গান্ধীজীর আদর্শও ইহাই ছিল এবং এই আদর্শই জাতীয় সংস্কৃতির অনুকূল। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর যুক্তিতে অবশ্য নূতনত্ব কিছু নাই। কিন্তু দেশবাসীর মনে এক্ষেত্রে এই প্রশ্ন জাগিবে যে, কংগ্রেস বিশেভাবে কংগ্রেসের আদর্শে পরিচালিত ভারত সরকার গান্ধীজীর নির্দেশিত সমাজোন্নয়নমূলক নীতি কোন কোনক্ষেত্রে শুধু আংশিকভাবেই অবলম্বন করিয়াছেন, সমগ্রভাবে নহে। ইহার ফলে কংগ্রেস দেশে যে নৈতিক পরিবেশ জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহা এই কয়েক বৎসরে অনেকটা ম্লান হইয়া পড়িয়াছে। অথচ একমাত্র আদর্শের পুনরুদ্দীপ্তির পথেই জনস্বার্থ এবং কায়েমী স্বার্থ এই দুইয়ের সংঘাত মৈত্রী ও সহযোগিতার পথে এড়াইয়া যাওয়া সম্ভব হইতে পারে। বিষয়টির মধ্যে জটিলতা বিশেষ কিছু নাই। ভারতের প্রধানমন্ত্রীও এই অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছেন। তিনি কংগ্রেস-কর্মীদিগকে জনসেবা এবং ত্যাগের আদর্শে সুদৃঢ়" হইতে অনুরোধ করিয়াছেন। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন, কংগ্রেসের মধ্যে দলবদ্ধ হইয়া কংগ্রেস কর্মীরা পদ, মান, প্রতিষ্ঠা আঁকড়াইয়া থাকিবেন কিংবা শাসনবিভাগীয় সরকারী কর্তৃত্বের সুবিধা উপভোগ করেন, এই প্রবৃত্তি হইতে কংগ্রেস কর্মীদিগকে মুক্ত হইতে ইহবে। বাস্তবিকপক্ষে আত্ম-বিশ্লেষণের প্রয়োজন কংগ্রেসকর্মীদের পক্ষে এখনও যথেষ্টই রহিয়াছে।

বিপন্ন পশ্চিমবঙ্গ

কেন্দ্রীয় উৎপাদন সচিব শ্রী কে সি রেড্ডি সম্প্রতি নিখিল ভারত যন্ত্রশিল্প সম্মেলনের বার্ষিক সভায় সভাপতিত্ব করিতে গিয়া পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান দুর্দশার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের বেকার সমস্যার কথা উত্থাপন করিয়া শ্রীযুত রেড্ডি বলেন, দেশ বিভাগই এই সমস্যার মূলে প্রধানত রহিয়াছে।

তিনি এই আশঙ্কাও প্রকাশ করেন যে, পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শেষ ব্যক্তিটি সীমান্ত অতিক্রম করিয়া না আসা পর্যন্ত ইহার সমাধান হইবে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার এই আশঙ্কা যে অমূলক নহে, ইহা সকলেই বুঝিতেছেন। ভারত-পাকিস্থান মৈত্রী ক্রমেই পাকা-পাকি, আমরা কর্তৃপক্ষের মুখে আজকাল মাঝে মাঝেই এমন কথা শুনিতে পাইতেছি; কিন্তু তাহা সত্ত্বেও পূর্ববঙ্গ হইতে পশ্চিমবঙ্গে উদ্বাস্তু সমাগম উত্তরোত্তর অত্যধিক হইয়া উঠিতেছে। গত কয়মাসে লক্ষাধিক নরনারী পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া পশ্চিমবঙ্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছে এবং গড়ে প্রতি মাসে প্রায় ৩০ হাজার নরনারী পশ্চিমবঙ্গে আসিতেছে। ফলত সমস্যা শুধু পশ্চিমবঙ্গেরই নয়। সমগ্রভাবে ভারত রাষ্ট্রের উপর এই অবস্থার প্রতিক্রিয়া ঘটিতেছে এবং দেশের অর্থ-নীতিক বিপর্যয়ের কারণ সৃষ্টি হইতেছে। অথচ কেন্দ্রীয় সরকার এই অবস্থার বিশেষ গুরুত্ব এখনও উপলব্ধি করিতেছেন বলিয়া মনে হয় না। প্রকৃতপক্ষে বহুদিন পরে একমাত্র শ্রীযুক্ত রেড্ডির মুখেই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের তরফ হইতে পশ্চিমবঙ্গের সম্বন্ধে সমবেদনার সুর আমরা শুনিতে পাইলাম। হৃদ্যতার সঙ্গে তিনিই আমা-দিগকে অতীত ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন, বলিলেন, পশ্চিমবঙ্গ আজ বিপন্ন অবস্থার মধ্যে পড়িয়াছে, সন্দেহ নাই, কিন্তু, এই অবস্থা তাহার থাকিবে না। বাঙ্গালী নিজেদের প্রাণশক্তির বলে পুনরায় পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। শ্রীযুত রেড্ডি এই আশ্বাস দিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনানু-সারে যে দুইটি ইস্পাতের কারখানা স্থাপনের কথা আছে, তাহার একটি পশ্চিমবঙ্গে সম্ভবত দুর্গাপুরে প্রতিষ্ঠিত হইবে দুর্গাপুর যাহাতে পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-বাণিজ্যের অন্যতম কেন্দ্র স্বরূপে পরিণত হয়, সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকার অবশ্য বহুদিন হইতেই আগ্রহান্বিত আছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি যে সেদিকে আকৃষ্ট হইয়াছে, কার্যত এমন পরিচয় এ পর্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

শস্ত্রের ভক্ত

ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ঐতিহ্য যাহারা অবগত আছেন, তাহারা এই সংগ্রামে ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্র-ব্যবসায়ীরা কিরূপ ভূমিকা অবলম্বন করে তাহা বিস্মৃত হন নাই। বিশেষভাবে স্বদেশী আন্দোলনের স্রষ্টা বাঙালীর পক্ষে সে কথা ভুলিবার নয়। নিতান্ত নিষ্ঠুর-ভাবে এবং নির্লজ্জভাবে ল্যাংকাশায়ারের এই বস্ত্র-ব্যবসায়ীরাই বাঙলার বস্ত্র-শিল্পকে গলা টিপিয়া মারিয়াছিল। আজ ভারতের বস্ত্র-ব্যবসায়ের সঙ্গে ল্যাংকাশায়ার প্রতিযোগিতায় আঁটিয়া উঠিতে পারিতেছে না বলিয়া সেখানে আর্তনাদ উঠিয়াছে। ব্রিটিশ পার্লা-মেণ্টের শ্রমিক-সদস্য হেরল্ড উইলসনের মতে ব্রিটিশ সরকার যদি অবস্থার প্রতিকার সাধন না করেন, তবে কয়েক মাসের মধ্যেই, এমন কি কয়েক সপ্তাহের ভিতরই ল্যাংকাশায়ারের বস্ত্র শিল্পের দারুণ সংকট দেখা দিবে। ল্যাংকাশায়ারের অভিযোগ এই, ভারতীয় বস্ত্র ব্রিটেনে বিনা-শুল্কে প্রবেশ করে, অথচ ব্রিটিশ বস্ত্রকে ভারতে আসিতে শতকরা ৬০, এমন কি ৮০ হারে শুল্ক দিতে হয়। বলা বাহুল্য, ভারতের প্রতি অনুগ্রহ-পরবশ হইয়া ভারতের বস্ত্র বিনা-শুল্কে লইতেছে, আমরা ইহা বিশ্বাস করি না। প্রত্যুত ভারত হইতে যে ধরনের বস্ত্র গ্রেট ব্রিটেনে রপ্তানি করা হয়, তাহা ল্যাংকা-শায়ারে উৎপন্ন বস্ত্র হইতে ভিন্ন শ্রেণীর। এক্ষেত্রে ইহাই উল্লেখযোগ্য যে, ল্যাংকা-শায়ারের এই ধরণের অযৌক্তিক আর্তনাদ সত্ত্বেও ভারত সরকার জোর গলায় এই কথা জানাইয়া দিয়াছেন যে, তাঁহারা আমদানী বস্ত্রের বর্তমান শুল্ক-হার পরিবর্তন করিবেন না। দেখা যাইতেছে, ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টও ভারত সরকারের অবলম্বিত নীতিরই সমর্থন করিয়াছেন। প্রকৃত-পক্ষে তাঁহারা বুঝিয়াছেন, ভারত আজ স্বাধীন, অধিকন্তু ভারতের জনশক্তি জাগ্রত। এরূপ অবস্থায় ভারতের স্বার্থে আঘাত করিতে গেলে নিজেদের স্বার্থই সর্বাধিক বিপন্ন হইবে। ফলে ব্রিটিশের বাজার ভারতে একেবারে বন্ধ হইতে পারে।

বিশ্ব-হিতৈষী বৈজ্ঞানিকের মৃত্যু

পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা স্যার আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিং পরলোকগমন করিয়াছেন। বিশ্ব-হিতৈষী এই বৈজ্ঞানিকের মৃত্যুতে জগতের সর্বত্র বিশেষ অভাব অনুভূত হইবে। প্রকৃত-পক্ষে আধুনিককালে চিকিৎসাজগতে মানব-হিতৈষণার ক্ষেত্রে স্যার আলেক-জেণ্ডার অপ্রতিদ্বন্দ্বী আসন অধিকার করিয়াছিলেন। বড় বড় আবিষ্কার এ যুগে আরও হয়ত অনেক হইয়াছে; কিন্তু ব্যথিত, পীড়িতকে রক্ষা করিবার উদ্দেশ্যে স্যার আলেকজেণ্ডারের আবিষ্কৃত জীবনৌষধির মূল্যের তুলনা নাই। স্যার আলেকজেণ্ডারের আবিষ্কার লক্ষ লক্ষ ব্যাধিতের অশ্রু মুছাইতেছে, মুমূর্ষুকে প্রাণ দিতেছে। পৃথিবীর বুকে মানুষের অস্তিত্ব যতদিন বিদ্যমান থাকিবে, পেনিসিলিন-আবিষ্কর্তা স্যার আলেকজেণ্ডার ফ্লেমিং বিশ্ব-হিতৈষী মনীষিবর্গের মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠপুরুষ-স্বরূপে পূজিত হইবেন।

সামরিক শিক্ষার সম্প্রসারণ

ভারত সরকার সামরিক শিক্ষা পরিকল্পনা সম্প্রসারিত করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে ২ শতটি শিক্ষা শিবির খোলা হইবে এইসব শিক্ষা-শিবিরে বার্ষিক ১ লক্ষ যুবককে এক মাসের জন্য সামরিক শিক্ষা দানের ব্যবস্থা থাকবে। শুধু যে দেশরক্ষার দিক হইতেই যে সামরিক শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে, ইহা নয়; বস্তুত সামরিক শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর দৈহিক ও মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পায় এবং সঙ্ঘবদ্ধভাবে সুশৃঙ্খলতার সঙ্গে কাজ করিবার অভ্যাস জন্মে। সমগ্র ভারতে মাত্র এক লক্ষ যুবকের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা প্রয়োজনের অনুপাতে নিতান্তই সামান্য। ইহা ছাড়া শুধু এক মাসের জন্য শিক্ষা ব্যবস্থায় স্থায়ী ফললাভের আশাও করা যায় না। অন্তত কিছুটা দীর্ঘকালের জন্য মাঝে মাঝে শিক্ষার ব্যবস্থা না থাকিলে শিক্ষার্থীরা যেটুকু শিখিবে, চর্চার অভাবে তাহাও নষ্ট হইবে।

গত রবিবার জ্যুরিখে নেপালের রাজা
ভুবন বীরবিক্রম পরলোক গমন করেন।
নি গুরুতর হৃদ্‌রোগে ভুগিতেছিলেন
ং চিকিৎসার জন্য য়ুরোপে গিয়ে-
লেন। তাঁর স্বাস্থ্যের যে অবস্থা হয়ে
ছিল তাতে তিনি ভালো হয়ে কবে
দেশে ফিরতে পারবেন বা আদৌ
রতে পারবেন কিনা সে সম্বন্ধে কিছু-
ল থেকে যথেষ্ট সন্দেহবোধ ছিল।
 মাসে তিনি যুবরাজ মহেন্দ্রবিক্রমকে
াপাতত' সমস্ত রাজকীয় ক্ষমতা প্রদান
রেন। রাজা ত্রিভুবনের মৃত্যুর পরে
হেন্দ্রবিক্রম নেপালের রাজা হলেন।

নেপালের ইতিহাসে রাজা ত্রিভুবনের
ম বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।
কশত বৎসর নেপালে রাণা প্রধানমন্ত্রীদের
র্বময় ক্ষমতা ছিল, রাজা প্রকৃতপক্ষে
াণশাহীর বন্দী ছিলেন। রাজা ত্রিভুবনের
ময়ে রাণাশাহীর অবসান ঘটল বিদ্রোহের
ভিতর দিয়ে। সে বিদ্রোহ হোল রাজায়
জায় মিলে। রাণাশাহীর বিরুদ্ধে যে
বিদ্রোহের আয়োজন হচ্ছিল তার প্রতি
তার সহানুভূতি ছিল। প্রধানমন্ত্রীর
ছে সে খবর পেঁছানোর পরেই রাজা
পরিবারে স্বীয় প্রাসাদ থেকে কোনো-
কমে বেরিয়ে এসে কাঠমাণ্ডুস্থিত
ারতীয় দূতাবাসে আশ্রয় নেন।
ঘটনা ১৯৫০ সালের ৬ই নভেম্বর
টে। রাণা-সরকার রাজাকে হস্তগত
রার অনেক চেষ্টা করলেন কিন্তু রাজা
াত্মসমর্পণ করতে রাজী হলেন না।
খন রাণা-সরকার রাজা ত্রিভুবনকে
সিংহাসনচ্যুত বলে ঘোষণা করে যুবরাজের
বর্তমান রাজার) এক শিশুপুত্রকে রাজা
রা হ'লো বলে প্রচার করলেন। রাজা
ত্রিভুবন দিল্লী আসতে চাইলে রাণা-
সরকার বাধা দেন এবং তিনি যাতে কাঠ-
মাণ্ডুর বাইরে যেতে না পারেন সেই চেষ্টা
করেন। শেষপর্যন্ত রাজা ত্রিভুবনকে
সপরিবারে দিল্লী আসতে দিতে রাণা-
সরকার বাধ্য হন। রাজার দিল্লীতে আসার
সঙ্গে সঙ্গেই নেপাল কংগ্রেসের নেতৃত্বে
সমগ্র নেপালে সশস্ত্র বিদ্রোহ আরম্ভ হয়।
রাণা-সরকার যখন বুঝলেন যে, পুরাতন
ব্যবস্থা আর চলবে না তখন তাঁরা আপস
করতে অগ্রসর হলেন। যুদ্ধ বন্ধ হলো।
রাজা ত্রিভুবন ১৯৫১ সালের ১৫ই
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত দিল্লীতে ভারত গভর্ন-
মেণ্টের অতিথি থেকে কাঠমাণ্ডুতে ফিরে
গেলেন এবং রাণাদের সঙ্গে নেপালী
কংগ্রেসের প্রতিনিধিসহ নূতন মন্ত্রিসভা
গঠিত হলো। জেনারেল মোহন সমশের
প্রধানমন্ত্রী থাকলেন। কিন্তু এই রাণা-
কংগ্রেস কোয়ালিশন ৮।৯ মাসের বেশি
টিকল না। ১৯৫১ সালের নভেম্বর মাসে
কেবল নেপালী কংগ্রেসের প্রতিনিধিদের
নিয়ে নূতন মন্ত্রিসভা নিযুক্ত হলো,
শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কইরালা প্রধানমন্ত্রী
হলেন। কিন্তু নেপালী কংগ্রেসের মধ্যে
ঝগড়াঝাঁটির ফলে ১৯৫২ সালের আগস্ট
মাসে এ মন্ত্রিসভাও ভেঙে যায়। তারপর

দশমাস কাল নেপালে কোনো মন্ত্রিসভা ছিল না। রাজা কয়েকজন 'কাউন্সিলরের' সহযোগে শাসন চালাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কইরালা নেপালী কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে এসে (অথবা বিতাড়িত হয়ে) আলাদা একটি দল করে আরো দু'একটি দলের সঙ্গে একটা জোট বাঁধলেন। ১৯৫৩ সালের জুন মাসে শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ আবার প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হলেন। কিন্তু ক্রমশ এই মন্ত্রিসভার মধ্যেও দলাদলি ও ঝগড়াঝাঁটি আত্মপ্রকাশ করল। মূল নেপালী কংগ্রেসের সঙ্গে তো মন্ত্রিসভার বিবাদ চলেইছিল, অন্যান্য দলও মন্ত্রিমণ্ডলীর বিরোধিতা করতে লাগল। জনসাধারণের মধ্যেও অসন্তোষ ক্রমশ বাড়তে লাগল, কারণ কোনো দিকেই মন্ত্রিমণ্ডলী কোন কৃতিত্ব দেখাতে পারেনি, বরঞ্চ দেশের অবস্থা ক্রমশই খারাপ হতে লাগল। মন্ত্রীদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াও শেষ পর্যন্ত চরমে উঠল, যার ফলে শাসন-ব্যবস্থা প্রায় অচল হবার মতো হলো। এর ভিতর নেপালী কংগ্রেস এক সত্যাগ্রহ আন্দোলন শুরু করে। সে আন্দোলন বেশিদিন চলে নি। আন্দোলনের দাবী-গুলি সম্পর্কে যুবরাজ কয়েকটি প্রতিশ্রুতি দেওয়ার পরে নেপালী কংগ্রেস আন্দোলন প্রত্যাহার করে, কিন্তু নেপালে অশান্তির অবসান হয় না। ইতিমধ্যে (গত জানুয়ারী মাসে) এ্যাডভাইসরী কাউন্সিলে বাজেট আলোচনাকালে মন্ত্রিমণ্ডলীর হার হয়। তখন শ্রীমাতৃকাপ্রসাদ কৈরালা মন্ত্রিমণ্ডলীর পদত্যাগপত্র পেশ করেন। ওদিকে য়ুরোপে রাজার পীড়া ক্রমশ বাড়তে থাকে। তিনি ফেব্রুয়ারী মাসে যুবরাজকে যাবতীয় রাজকীয় ক্ষমতা দান করেন। সমস্ত মিলে অবস্থাটা অত্যন্ত গোলমেলে হয়ে উঠে, এমনকি, শ্রীমাতৃকা-প্রসাদ কৈরালার পদত্যাগপত্র গৃহীত হোল কি হোল না, তা পর্যন্ত বুঝা যাচ্ছিল না।

যাই হোক, এখন যুবরাজ মহেন্দ্র বীর বিক্রম রাজা হয়েছেন এবং মনে হয়, শীঘ্র নেপালের পরিস্থিতি অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার হয়ে আসবে। রাজা মহেন্দ্রের বয়স ৩৪ বৎসর। পিতার অসুস্থতানিবন্ধন বৎসরাধিককাল যাবৎ ক্রমশ তাঁর উপর অনেক দায়িত্ব এসে পড়ছিল। এই সময়ের মধ্যে তিনি যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা ও কর্ম-কুশলতার পরিচয় দিয়েছেন বলে শুনা যায়। তাঁর জীবনযাত্রা আড়ম্বরহীন। সেইজন্য তিনি বেশ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন। বলা বাহুল্য, নেপালের যে অবস্থায় তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হলেন, সেটা খুবই একটা কঠিন অবস্থা। গত চার বছর ধরে রাজনৈতিক দলগুলির খেয়োখেয়ি ও লজ্জাহীন স্বার্থপরতার ফলে নেপালে গণতন্ত্রীদের যে ক্ষতি হয়েছে, তা সহজে পূরণীয় নয়। সাধারণ লোক রাজনৈতিকদের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়েছে। এরূপ অবস্থায় রাজার ক্ষমতা-বৃদ্ধির সুযোগ আছে সন্দেহ নেই। কিন্তু এই সুযোগ রাজা গণতান্ত্রিকতার অনুকূলেও ব্যবহার করতে পারেন এবং আশা করা যায়, রাজা মহেন্দ্র বীর বিক্রম যদি দূরদর্শী হন, তবে তিনি তাই করবেন। কারণ বর্তমান যুগে কোন স্থায়ী প্রতিষ্ঠা গণতান্ত্রিক ভিত্তির উপর ছাড়া লাভ করা সম্ভব নয়।

নেপালে গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যবস্থা যত শীঘ্র সম্ভব হওয়া উচিত। সেজন্য সাধারণ নির্বাচন ও বিধান পরিষদ গঠন আবশ্যক। নেপালের মতো দেশে সাধারণ নির্বাচন সম্পন্ন করা সহজ কাজ নয়, একথা ঠিক, কিন্তু যত দুঃসাধ্য বলে অনেকে ভাবে, তত দুঃসাধ্যও নয় এবং যদি ভাগে ভাগে করা যায়, তবে অপেক্ষা-কৃত সহজেই নিষ্পন্ন হতে পারে। সাধারণ নির্বাচন ও বিধান পরিষদ গঠন বর্তমান বৎসরের মধ্যে হয়ে যাওয়া উচিত। তাছাড়া যে সমস্ত সংস্কার অত্যাবশ্যক, সেগুলি এখনই আরম্ভ করা আবশ্যক, যাতে সাধারণ লোকের মনে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আশার উদ্রেক হতে পারে। তা না হলে নেপালের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে গভীর উদ্বেগের কারণ আছে।

বলা বাহুল্য, নেপালে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং জনসাধারণের সন্তুষ্টি বিধানের সমস্যার প্রতি ভারত উদাসীন থাকতে পারে না। এ বিষয়ে সর্বতোভাবে ভারতের আনুকূল্য নেপালের প্রাপ্য। প্রকৃতপক্ষে ভারত সম্পর্কে নেপালকে 'বিদেশ' বলেই ধরা যায় না, যদিও নেপালকে সাহায্য করার ব্যাপারে ভারত গভর্নমেণ্টকে সতর্ক থাকতে হবে, যাতে নেপালবাসীদের মনে না হয় যে, তাদের আত্ম-কর্তৃত্ব ক্ষুণ্ণ হচ্ছে। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এই রকম স[illegible] জাগিয়ে গোলমাল বাধানোর চেষ্টা [illegible] কোন দল করে আসছে।

* *

কথা ছিল, ভারত ও পাকিস্থা[illegible] মধ্যে যেসব অমীমাংসিত প্রশ্ন রয়ে[illegible] সেগুলির ও বিশেষ করে কাশ্ম[illegible] সমস্যার আলোচনার জন্য ২৮শে ম[illegible] দিল্লীতে উভয় গভর্নমেণ্টের প্র[illegible] মন্ত্রীদের বৈঠক হবে। হঠাৎ ১৪ই ম[illegible] রাত্রে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে প্রকাশ যে, [illegible] বৈঠক পূর্ব নির্দিষ্ট তারিখে হবে [illegible] এপ্রিল মাসে ব্যানডুং-এ এশীয়-আফ্রি[illegible] সম্মেলনের পর কোন তারিখে হবে। ২৮শে মার্চ তারিখের বৈঠক বাতিল করার কারণ হিসাবে বলা হয়েছে যে, উভয় রাষ্ট্রের প্রধান মন্ত্রীদের উপর বর্তমানে কাজের চাপ অত্যন্ত বেশি পড়েছে এবং তাছাড়া এখন দিল্লী ও করাচীতে উচ্চ-পদস্থ বিদেশী অতিথিদের আসবার কথা রয়েছে। কাজের চাপ হঠাৎ নূতন কী পড়ল? অন্তত ভারতবর্ষের দিক থেকে হঠাৎ নূতন কাজের চাপ কিছু পড়েছে বলে দেখা যাচ্ছে না। যে চাপ পড়বার তা আগে থাকতেই জানা ছিল। উচ্চপদস্থ বিদেশী অতিথি বলতে ব্যানডুং কনফারেন্সের আগে দুজনের আসবার কথা —বর্মার প্রধান মন্ত্রী এবং মিশরের প্রধান মন্ত্রী। মিশরের প্রধান মন্ত্রীর আসবার কথা ৮ই এপ্রিল। তার জন্য ২৮শে মার্চ তারিখ নেহরু-আলি সাক্ষাৎকারের কোন বাধা হতে পারে না। অবশ্য তার আগে ক্যাম্বোডিয়া থেকে একটি 'গুডউইল মিশন আসছে, কিন্তু তার জন্যও নেহরু-আলি বৈঠক স্থগিত করার বোধহয় প্রয়োজন ছিল না। অবশ্য পাকিস্থানে যেসব গোলমাল চলছে, তার জন্য মিঃ মহম্মদ আলির আসা মুশকিল হতে পারে তাছাড়া একটা কারণে হয়ত উভয় পক্ষই এখন সাক্ষাৎকার স্থগিত রাখতে চান কথাবার্তার পরে যদি দেখা যায় যে কাশ্মীর সমস্যা যেখানে ছিল, সেইখানেই থাকলো, তাহলে ব্যানডুং কনফারেন্সে উভয় পক্ষকেই লজ্জিত হয়ে থাকতে হবে

১৫।৩।৫৫

সাহিত্যে সংকট

অন্নদাশঙ্কর রায়

৭

নৈতিক অরাজকতা

যুদ্ধের পর সব দেশেই অব্যবস্থা চলতে থাকে, কোথাও বেশী কোথাও কম। দিনের পর দিন যদি মন্দের রাজত্ব চলে, বাধা দেবার কেউ না থাকে, সাজা দেবার কেউ না থাকে, তা হলে মানুষের নীতি-বোধ এলিয়ে পড়ে। 'দুর্নীতি', 'দুর্নীতি' বলে কিছু দিন খুব হৈ চৈ পড়ে, তার পর দুর্নীতিটাই নীতি হয়ে ওঠে।

সমাজ যখন সরল ছিল, লোকে যখন গ্রামে বাস করত, সকলের সঙ্গে সকলের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল, তখন দুর্নীতির উপর জনমতের মুঠি শক্ত ছিল। কিন্তু শিল্পবিপ্লবের ফলে গ্রাম উজাড় হয়েছে, অধিকাংশ মানুষ চলে এসেছে শহরে বা গড়ে তুলেছে নতুন নতুন শহর, সেখানে পাশের বাড়ির লোকের সঙ্গেও আলাপ পরিচয় নেই—এমন কি পাশের ফ্ল্যাটের লোকের সঙ্গেও না। নিকটতম প্রতিবেশী যদি সমাজবিরোধী চক্রান্ত করে, এক দিনে লক্ষ লোককে পথে বসায় বা তিলে তিলে মারে তা হলে তুমি আমি টের পাব না, টের পেলেও মুখ ফুটে বলতে পারব না। বড় জোর পুলিসে খবর দেব। পুলিস যদি প্রমাণ না পায়, আদালত যদি প্রমাণাভাবে খালাস দেয় তা হলে তুমি আমি নিরুপায়। হয়তো পাল্টা তোমার আমার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা বাধবে বা গুণ্ডা লাগবে। কেন, তোমার আমার এত গরজ কিসের? ক্ষতি যা হচ্ছে তা তো সমাজসুদ্ধ সকলের। কেবল তোমার আমার নয়। মাথা ঘামাতে হয় পার্লামেণ্ট ঘামাবে, গভর্নমেণ্ট ঘামাবে। ডাকঘরে একখানা বেনামী চিঠি লিখে ছেড়ে দাও। শাসিয়ে বলো, আসছে বার ভোট দেব না।

আসল কথা সমাজ তখনকার দিনে সাকার ছিল, এখন নিরাকার। কে যে কর্তা, কার কাছে গেলে যে প্রতিকার হবে তা শাসকরাও জানেন না। কত রকম আন্তর্জাতিক শক্তি সক্রিয়। সেগুলোও নিরাকার। সমাজ এখন দেশকেও অতিক্রম করে গেছে। কলকাতার মতো বিরাট শহরে সব দেশের লোক জড় হয়েছে। তাদের অনেকের ভারতের প্রতি আনুগত্য নেই, ভারতের সমাজের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক অতি ক্ষীণ। লণ্ডন নিউ ইয়র্ক প্যারিস—সর্বত্র ঐ রকম। একটা শিমুল গাছে যদি নানা দিগ্‌দেশাগত পাখি একসঙ্গে রাত কাটায় তবে কি তাদের সমাজবোধ থাকে? যে যার নিজের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব পাত্রমিত্র নিয়ে থাকে, রাষ্ট্রের উপর ছেড়ে দেয় রক্ষণের ভার, রাষ্ট্রকে কর জোগায়, মাঝে মাঝে সৈন্যদলে যোগ দেয়—ব্যস্, এই হলো সমাজের প্রতি দায়িত্ব। অধিকাংশ মানুষই ছিন্নমূল। একটা বাড়ি করলেই মাটিতে মূল লেগে যায় না। সকলের সঙ্গে সকলের অঙ্গাঙ্গী সম্বন্ধ থাকা চাই, সেটা অনুভব করা চাই। যুদ্ধের দিনে সেটা এক রকম মালুম হয়। শান্তির সময় কারো মনে থাকে না।

৮

ধর্মে অবিশ্বাস

ধর্মে সংশয় ও ধর্মে অবিশ্বাস এক কথা নয়। সংশয়ের ভাষা ও অবিশ্বাসের ভাষা আলাদা। সংসারীরা বলে, "ভগবান যে আছেন সে বিষয়ে আমি নিশ্চিত নই। অথচ ভগবান যে নেই এ বিষয়েও আমি অনিশ্চিত।" অবিশ্বাসীরা বলে, "ভগবান যে নেই এ বিষয়ে আমি সুনিশ্চিত।"

সংশয়ীরা বলে, "মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবন শেষ হয়ে যায় না একথা আমি নিশ্চিতভাবে জানিনে। অথচ মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে জীবন শেষ হয়ে যায় একথাও আমি নিশ্চিতভাবে জানিনে।" অবিশ্বাসীরা বলে, "মৃত্যুমাত্রেই জীবন শেষ হয়ে যায় একথা আমি সুনিশ্চিতভাবে জানি।"

সংশয়বাদ দর্শন বিজ্ঞানের পক্ষে অনুকূল। সংশয় মানুষকে নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকতে দেয় না, অন্বেষণ করায়। সারা জীবন ধরে অন্বেষণ চলে। অন্তিম মুহূর্তে মানুষ বলে যায়, "কতটুকুই বা জানা গেল। আরো জানতে হবে। আলো, আরো আলো।"

অবিশ্বাস মরণ মারণের পক্ষে অনুকূল। অল্প বয়সেই মানুষের প্রত্যয় জন্মায় যে কোথাও কিছু নেই, সব ফাঁকা ও ফাঁকি। কালকেই মরণ, অতএব আজ এসো, খাই দাই ফুর্তি করি। এই জীবনই শেষ, অনন্ত জীবন একটা অলীক ধারণা। ভোগবাসনা থেকে আমরাই সেটাকে বানিয়েছি। অপূর্ণ কামনাকে পূর্ণ করার অভিসন্ধি। আর ভগবান? সেও আমাদেরই মনগড়া। মৃত্যুভয় থেকে তার উদ্ভব। ভয় না থাকলে ভগবান থাকত না। ভগবানের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ভাবুকরা সংশয়-বাদী ছিলেন। বিনা প্রমাণে কিছুই বিশ্বাস

করতেন না, বিনা প্রমাণে কিছু অবিশ্বাস করতেন না, প্রমাণ খুঁজতে খুঁজতে সারা জীবন ভোর করে দিতেন। বিংশ শতাব্দীর গোড়াতেও সংশয়বাদের জের চলছিল। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধ এসে সব ওলট পালট করে দিয়েছে। তার পর থেকে সরাসরি অবিশ্বাস। অবিশ্বাসের জন্যেও তো যথেষ্ট প্রমাণ থাকা চাই। প্রমাণ কোথায় যে তুমি ভগবানে অবিশ্বাস করবে, অনন্ত জীবনে অবিশ্বাস করবে? প্রমাণ? ঐ যুদ্ধটাই প্রমাণ। এই দুর্গতিটাই প্রমাণ। মৃত্যু যে ঘোরতর বাস্তব। ভোগ বাসনা যে সম্পূর্ণ অতৃপ্ত। অতএব এসো, খাই দাই ফূর্তি করি। এই সব। আর সব আত্মপ্রতারণা।

ধর্মে সংশয় থেকে এক ধাপ এগিয়ে ধর্মে অবিশ্বাস পর্যন্ত আসা গেছে। একে ঠিক বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক মনোভাব বলা যায় না। এরা অন্বেষ্টা নয়। এরা কোথাও এক জায়গায় থামতে চায়। অবিশ্বাসও এক রকম থামা। এই থামাটা হচ্ছে ভোজনশালায় পানশালায় ভোগমন্দিরে। আজকের রাতটাই এরা বাঁচবে। কাল এদের ফাঁসি। এ হলো ফাঁসির খাওয়া। মৃত্যুই শেষ। তার পরে সব শূন্য। না আছে স্বর্গ, না নরক, না অনন্ত জীবন না ঈশ্বর।

ফাউস্ট কি তা হলে এইখানেই থামবে? হেমিংওয়ের নায়কের মতো নিশ্চিত জানবে যে সব শূন্য, তার পরে শূন্য? "He knew all was nada y pues nada (nothing and after that nothing)." তাই যদি হলো তবে শয়তান কি এবার তার আত্মা দাবী করবে না? করবে বই-কি। তার লক্ষণ চারদিকে। যত রকম বীভৎস বিভীষিকার গল্প, তথাকথিত কমিক চিত্র, পৈশাচিক নাট্য, এসব কিসের লক্ষণ। মানুষ যে এই পথের উপর বেঁচে আছে, ভাবতে গেলে স্তম্ভিত হতে হয়। অতি কুৎসিত অপরাধে দেশবিদেশ ছেয়ে যাচ্ছে। কারাগার তো ভরে যাচ্ছেই, পাগলা গারদও ভরে উঠছে। মানসিক ব্যাধি এখন কায়িক ব্যাধির মতো ব্যাপক। সাহিত্য এর একটা কারণও বটে, পরিণামও বটে। একাধারে কার্য ও কারণ। আজকের সাহিত্যে মস্তিষ্ক বিকৃতির ছোঁয়াচ লেগেছে। সেই সঙ্গে যৌনবিকৃতির।

৯

অচেতন

মানসিক ব্যাধির নিদান অন্বেষণ করতে করতে ফ্রয়েড আবিষ্কার করেন যে, চেতনলোকের পাতালে এক অচেতন লোক আছে। রোগী নিজেও সে কথা জানে না। রোগীর সঙ্গে যাদের সম্বন্ধ তারা তো জানেই না। স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায় ব্যাধির বীজ কোথায়। রোগীকে সম্মোহিত করে তার জবানবন্দী শুনে আশ্চর্য আশ্চর্য তথ্য উদ্ধার করা যায়। ফ্রয়েডের গবেষণা, য়ুঙের গবেষণা, য়্যাডলারের গবেষণা অচেতন মনস্তত্ত্ব বলে নতুন একটা বিদ্যার পত্তন করেছে। তার বয়স অল্প। তার সিদ্ধান্তগুলো এখনো সর্বস্বীকৃত নয়। ফ্রয়েড য়ুঙ ইত্যাদির মধ্যেও গভীর মতভেদ। তা সত্ত্বেও বহু মানসিক ব্যাধির চিকিৎসা এই পদ্ধতিতে চলছে। চিকিৎসা জগতে এটা একটা যুগান্তর।

মানবাত্মার ইতিহাসেও। চেতনলোকের পাতালে এক অচেতন লোক আছে যার প্রভাব চেতনলোকের উপর পড়ছে, এ যদি সত্য হয় তবে শুধু কি ব্যাধির বেলা সত্য? জীবনের অপরাপর ক্ষেত্রে সত্য নয়? আমাদের ভাবনা চিন্তা কল্পনা কামনা সব কিছুই কি অচেতনের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছে না? অনেকের বিশ্বাস মানব অন্তরের রহস্য ঠিকমতো বুঝতে হলে অচেতন লোকে অবতরণ করতে হবে। ফাউস্টকে যেতে হবে স্বর্গে নয়, পাতালে। এই পাতালযাত্রা। কিন্তু পশুর স্তরে নামা নয়। পশু তো ইনস্টিংক্ট চালিত। মানুষ [illegible] দ্বারা চালিত [illegible] নাম [illegible] কম-প্লেক্‌স। লিবিডো [illegible]।

অচেতনেরও আবার 'ব্যষ্টি [illegible]' ও 'সমষ্টি অচেতন' আছে। [illegible] সত্তার দুই প্রকার অচেতন [illegible] এসব অচেতনের শিকড় চলে গেছে [illegible] প্রাচীন কালে, জন্মের পূর্বে, পূর্বপুরুষেরও জন্মের আগে। হয়তো দু হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়েছে এমন কোনো পুরাণ কল্পনা বা myth পাওয়া গেল এ কালের একজনের স্বপ্নে। স্বপ্নের অর্থ সে নিজে তো জানেই না, [illegible] তাকে জানাতে পারে না, যারা পারত তারা দু' হাজার বছর আগে মারা গেছে। গবেষণা করতে করতে এর একটা খেই মিলল।

অচেতন মনস্তত্ত্ব সাহিত্যের উপর অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেছে। প্রাচীন গ্রীক নাটকের যে ব্যাখ্যা এতকাল প্রচলিত ছিল তার বদলে এসেছে এক অর্বাচীন ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যা প্রসারিত হয়েছে প্রাচীন কাব্যে, মধ্যযুগের নাটকে কাব্যে উপন্যাসে আধুনিক যুগের সাহিত্যের প্রত্যেক বিভাগে। কবিদের মনে কী ছিল এ দিন আমরা তার সন্ধান নিয়েছি। এখন নিচ্ছি তাদের মনের পাতালে অচেতনে কি ছিল তার সন্ধান। কবিরা যা গ?

...চেয়েছে তা প্রকাশ হয়ে পড়ছে। ...এই প্রকাশ কার্যটি কবিদের প্রতি ...বিচার নাও হতে পারে। কবিদের তো ...রক্ষার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে না।

একবার অচেতন মনস্তত্ত্বের সঙ্গে ...চিত হওয়ার পর যিনি যাই সৃষ্টি ...ছেন তার অঙ্গে এর ছাপ পড়ছে। ...এর সঙ্গে পরিচিত নন তাঁরাও যে ...হাওয়ায় নিঃশ্বাস নিচ্ছেন সে আব-...ওয়ায় এর অদৃশ্য কণিকা মিশিয়ে ...ছে। মার্শেল প্রুস্ত, জেমস জয়েস, ...স মান, কাফ্‌কা প্রভৃতির উপন্যাসে ...তন ও অচেতন এক প্রকার আলো ...আঁধারি রচনা করেছে। যেমন ...ভিতর দিয়ে রেলপথে যাওয়া ...না।

কিন্তু সাহিত্যে এর ব্যবহার রসোত্তীর্ণ ...শক্ত। ইতিমধ্যেই সাধারণ পাঠকের ...অন্তর্হিত হয়েছে। তবে আজকাল ...conscious,' 'inhibition,' 'split ...onality,' 'inferiority complex' ...কথাগুলো সকলের মুখে মুখে ...সুতরাং সাহিত্য থেকে একেবারে ...ও যায় না। অসুখের মূল যে ...পাতালে নেমে গেছে, সেখানে যে ...মানসের কুরুক্ষেত্র, সেখান থেকে ...নির্মূল না করলে যে তার হাত ...পরিত্রাণ নেই, কোনো ব্যাধি যে ...কায়িক নয়, কায়িকের পিছনে ...মানসিক ও মানসিকের পিছনে যে ...চেতন কাজ করছে, এ জ্ঞান ধীরে ধীরে ...জ্ঞানের সামিল হয়ে উঠছে। ...ছাড়া ফ্রয়েড প্রভৃতির কল্যাণে লোকে ...কথা মুখ ফুটে বলতে শিখছে, ভব্যতার ...চেপে রাখছে না, এর ফলে ...আলোচনা মোটের উপর স্বাস্থ্যকর ...ছে। সাহিত্য থেকে ক্রমশ জুজুর ভয় ...যাচ্ছে। "চুপ চুপ" নীতির জুজু।

সঙ্গে সঙ্গে মনে রাখা উচিত যে ...জীবনটা কেবল অসুখের বা সংঘাতের নয়। ...ও আছে, শান্তিও আছে, কিন্তু তার ...এই নতুন শাস্ত্রে নেই।

১০

প্রাগৈতিহাসিক

চেতনলোকের তলদেশে যেমন অচেতন ...লোক তেমনি ইতিহাসের মূলদেশে ...প্রাগৈতিহাসিক জগৎ। সকলে জানেন ...মোহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় খননকার্যের ফলে আমাদের ইতিহাস আরো অনেকদূরে পেছিয়ে গেছে। অর্থাৎ ইতিহাসের আরম্ভ আরো আগে ধরা হয়। তার চেয়ে পুরাতন কালের নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নেই, কিন্তু কিংবদন্তী রূপকথা ইত্যাদির মধ্যে তার রেশ পাওয়া যায়। ইউরোপেও খননকার্যের ফলে নিত্য নতুন আবিষ্কার ঘটছে। ইজিপ্ট এশিয়া মাইনর ইত্যাদি অঞ্চলে অবিরাম খনন চলেছে। আর চলেছে পুরাণ কিংবদন্তী রূপকথা ইত্যাদির অনুসন্ধান। এখনো কোনো কোনো অঞ্চলের অধিবাসী প্রাগৈতিহাসিক কালের অধিকার অতিক্রম করতে পারেনি। এদের পুরাণ কিংবদন্তী রূপকথা ইত্যাদিতে এক একটা প্রাগৈতি-হাসিক প্যাটার্ন এখনো অবিকৃতভাবে পাওয়া যায়।

এতদিন সাহিত্যিকদের পশ্চাদদৃষ্টি সীমাবদ্ধ ছিল গ্রীক ল্যাটিন সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন কাব্যনাটকে। এখন সীমানা আরো প্রসারিত হয়েছে। নৃতত্ত্ববিদদের গবেষণার ফল ইংরেজ সাহিত্যিকদের কাছে অন্য এক জগতের দরজা খুলে দিয়েছে। বিশেষত Frazer প্রণীত "Golden Bough" গ্রন্থ। সাহিত্যিকরা আদিকালের myth ও আদিমদের মধ্যে এখনো প্রচলিত myth আলোচনা করে নিজেদের কাব্য ও উপন্যাসের অঙ্গীভূত করছেন। সিম্বো-লিজম আসছে কত হারিয়ে যাওয়া বিশ্বাস বা অনুভূতি বা কল্পনা থেকে। টি এস এলিয়ট রচিত Waste Land এর একটি প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত। সেকালে রাজাকে মনে করা হতো রাজ্যের বা ভূমির স্বামী। রাজাই ভূমিকে উর্বরা করতেন। এই পুরোনো mythটিকে এলিয়ট নতুনভাবে কাজে লাগিয়েছেন। তেমনি আর একটি বিশ্বাস ছিল—এখনো আছে—নরবলি দিয়ে মৃতদেহ মাটিতে পুঁতে রাখলে অনুর্বর মাটিতে ফসল ফলে। এ যুগের যুদ্ধও তো নরবলি। যারা হত হচ্ছে তাদের দেহকেও তো মাটিতে পুঁতে রাখা হচ্ছে। তার থেকে কি নবজন্ম হবে না? এই mythটিও এলিয়ট নিয়েছেন।

"In the summer after the battle of Linden, the most sanguinary battle of the seventeenth century in Europe, the earth, saturated with the blood of twenty thousand slain, broke forth into millions of poppies, and the traveller who passed that vast sheet of scarlet might well fancy that the earth had indeed given up her dead."
(Frazer: Golden Bough)

"There I saw one I knew, and stopped him, crying: Stetson!
You who were with me in the ships at Mylae!
That corpse you planted last year in your garden
Has it began to sprout? Will it bloom this year?"
(Eliot: Waste Land)

আমারও কিন্তু মনে হয় প্রাগৈতি-হাসিক মানুষের মন হচ্ছে ভয়ংকরের রাজ্য। অচেতন লোকও তাই। এসব গোলোক-ধাঁধায় ঘুরে ফিরে কোনো মহৎ সত্যের সাক্ষাৎকার ঘটবে না। বিস্মৃতির অর্গল খুলে দিলে কত কী যে আসবে, যার আসার দরকার নেই বলেই তো বিস্মৃতি। আমরা ভুলি কেন। বাঁচতে চাই বলেই তো ভুলি। আমার ভয় হয় যে এর পিছনে মৃত্যু-কামনা বা death wish কাজ করছে।

(ক্রমশ)

জীবনানন্দ দাশের কবিতা

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

(এক)

জীবনানন্দ দাশের 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'* গ্রন্থটি বাংলা সাহিত্যের সাম্প্রতিক গ্রন্থাবলীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচিত হয়েছে। বিচারক ছিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের একাডেমী। বাংলা কবিতা যাঁরা নিয়মিতভাবে প'ড়ে থাকেন, আশা করি তাঁরা এই বিচার ও বিবেচনায় খুশী হবেন। রবীন্দ্রনাথের পর বাঙালী কবিতা-পাঠকের চিত্তে যদি কেউ প্রগাঢ় সাড়া এনে থাকেন তাহলে তিনি জীবনানন্দ দাশ। ভালো কবিতা লেখা আর ভালো কবি হতে পারা সম্ভবত এক কথা নয়। ভালো কবি উত্তরোত্তর ভালো কবিতা রচনা করে থাকেন। কবিতার ভালোত্ব রচনার সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিতে পারেন বা দিয়ে যান ভাল কবি। ভালোত্বটা হয়ত শুরুর সময় রচনার একটি বা দু'টি অঙ্গে মাত্র প্রকাশিত শুরু করে। কিন্তু শিল্প-কর্ম এমনই একটি ব্যাপার যাতে আন্তরিকভাবে ব্যাপৃত হলে শিল্পী ক্রমেই আত্ম-সংস্কার ও আত্মোন্নতি করে থাকেন। রবীন্দ্রনাথের পর আত্মোন্নতিতে যিনি সব চাইতে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, তিনি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। জীবনানন্দ দাশের আত্মোন্নতি-পরায়ণতা রবীন্দ্রোত্তর কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা এবং লক্ষণীয় বিষয়।

'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-গ্রন্থে জীবনানন্দ দাশের রচনার শুরু থেকে পূর্ণ পরিণতি পর্যন্ত বহু স্মরণীয় কবিতা সংকলিত হয়েছে। পাঠক হয়ত এই সংকলন হতে আপন-আপন রসগ্রাহিতার শক্তি অনুসারে পুনর্নির্বাচন করে অনেক দিন পর্যন্ত অনেক কবিতা পাঠ বা স্মরণ করে আনন্দ লাভ করবেন।

আনন্দ লাভের ও রস-গ্রহণের নিমিত্তেই সাহিত্যের পাঠক কবিতা-পাঠ করে থাকেন। রস ও আনন্দ আস্বাদনের কর্তা পাঠক-চিত্ত। তা বিতরণের কর্তা লেখক-চিত্ত। চিত্তোৎকর্ষ তাই লেখক পাঠক উভয়েরই থাকা দরকার। সাহিত্যের রস-গ্রহণের শিক্ষা যাঁর নেই, তাঁর চিত্ত অন্য শিক্ষায় উৎকৃষ্ট হতে পারলেই যে সাহিত্য-বোধে বা সাহিত্যের অন্তর্গত ভাব-গ্রহণে তা সমর্থ হবে এমন নয়। শিক্ষিত লোকমাত্রেরই যে সাহিত্য-বোধে অধিকার জন্মেছে একথা মনে করা ভুল। ভাব-বাহী সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ শাখা হ'ল কবিতা। ভাবের কারুকলায় খচিত থাকে কবিতার নানা অঙ্গ। ভাব-শিল্পের সঙ্গে যাঁর চিত্তের সম্পর্ক নেই, তাঁর রস-গ্রহণের শিক্ষাও নেই।

এই শিক্ষার অভাব রবীন্দ্রনাথের আমলে যেমন ছিল, এখন আর তেমন নয়। অভাব দূর হতে পেরেছে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাবে। রবীন্দ্রোত্তর কাব্যে পাশ্চাত্য-শিক্ষার প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট, সুতরাং সে কাব্যের রস উপলব্ধি করতে হলে এমন মনের প্রয়োজন যা পাশ্চাত্যের কাব্য-রস উপভোগ করতে সমর্থ। পাশ্চাত্যের কাব্য-রস নানা ধরনের পথ অনুসরণ করে প্রবাহিত। সে ধরনগুলো সম্পর্কে আমাদের ধারণা যতো অস্পষ্ট হবে ততোই সে ধরনের কবিতা আমাদের মনে দুর্বোধ্য বলে বিবেচিত হবে কিংবা অসার বলে প্রতিভাত হবে। প্রাচীন রস-শাস্ত্রের বোধ নিয়ে এখনকার রসের গতি-পরিণতির ধারা বুঝতে পারা দুঃসাধ্য। কবিতার ধরন যেমন বদলায় তেমনি তদন্তর্গত রসানুধাবনের ধারাও বদলায়।

জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলো থেকে রসানুধাবনের ধারা বদলাবার রীতিটা ধরে দেখানো যায়। অনেকেরই ধারণা ছিল, তিনি দুর্বোধ্য কবিতা লিখে থাকেন। এমন ধারণার হেতু বিচার করলে আমরা বলব যে তাঁর সৃষ্ট কল্পলোকের দরজার চাবি অনেক পাঠক বা সমালোচক হাতে পাননি। একজন কবিকে স্পষ্টত জানতে হলে কবি-ব্যক্তিত্বের সঙ্গেও কিঞ্চিৎ পরিচিত থাকা দরকার। ব্যক্তিত্ব অবশ্য কবিতা নয়, কিন্তু ব্যক্তিত্ব কাব্যাভাস স্ফুরিত করে। জীবনানন্দ দাশকে দেখে মনে হ'ত না যে তিনি প্রেমের কবিতা রচনা করতে পারেন। অন্তত, প্রেমের কবিতা লেখক যে মূর্তিতে পাঠক-চিত্তে উদ্ভাসিত হয়ে থাকেন সে মূর্তিতে জীবনানন্দ দাশকে দেখা যায়নি। তাঁর হাস্যময় মূর্তিতে ভাবা যেতো না যে এ ব্যক্তি প্রেমের কবিতা লেখক।

এখন প্রশ্ন হতে পারে: বস্তুত জীবনানন্দ প্রেমের কবিতা লেখক কি না। আমাদের ধারণা তিনি প্রেমিক কবি কিন্তু প্রেমের কবিতা লিখে যাননি। কথাটা বা ধারণাটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু আমরা যদি বলি যে তাঁর প্রেম-চিন্তা সম্পূর্ণতই কল্পলোকের প্রতি নিবেদিত তাহলে হয়ত অবিশ্বাসের দেয়াল খানিকটা ধসে যাবে। এমন কী চিন্তা কি সম্ভবপর—এখন এ-প্রশ্নে সন্দেহাকুল হওয়া যায়। তখনই পাশ্চাত্যের কবি-লোকের দিকে তাকিয়ে আমাদের বলতে হবে: ইতিপূর্বে বাংলা সাহিত্যে সম্ভবপর ছিল না। মানব চিত্তের প্রেম-রস মানব-লোকের বা দেবলোকের প্রতি ধাবিত হয় সচরাচর, অন্তত বাংলা-কবিতায় তাই হয়ে চলছিল, কিন্তু জীবনানন্দ দাশে দেখা গেল, প্রেম-রস কল্পলোকের পাত্রে ক্ষরিত হচ্ছে। রবীন্দ্রনাথের একজন কল্পলোক-বাসিনী ছিলেন, তিনি 'বিচিত্রা' হতে জানতেন কিন্তু জীবনানন্দের কল্পলোকের যিনি পাত্রী তিনি অদ্বিতীয়া। এই অদ্বিতীয়াকে গ্রহণ করে কবিচিত্ত ক্লান্ত কিন্তু ক্লান্তি-সচেতনতা সত্ত্বেও তিনি নিরুপায়। এ নকশার ক্লান্তিদাত্রী কাল্পনিক প্রেয়সী আইরিশ কবি ঈয়েট্‌সের রচনায় পাওয়া যায়। ইংরেজ-কবিরাও যখন রোমাণ্টিক জগতে বিচরণ করতে উৎসুক হন, তখন এমন একটি প্রেয়সীরই সঙ্গ কামনা করেন। ইনি একজন প্রাচীনা মহিলার প্রেতাত্মা। রোমাণ্টিক চিত্তে ইনি ভালো বিচরণ-ভূমি পেয়ে থাকেন। রবীন্দ্র-নাথের লীলাসঙ্গিনীর সতীন এই ভদ্র-

---

* জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা—প্রকাশক : নাভানা প্রিণ্টিং ওআর্কস্ লিঃ, ৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলিকাতা। মূল্য—৫্ টাকা।

না। কবিরা তাঁকে পান না, কেবলই যুগে যুগে পেয়ে পেয়ে হারান রীর মতো। সোর্বশী কল্পলোককে আর হারানোর ইতিহাসই নানন্দ দাশের কাব্যকলার মূল ধ্বনি। মূলধন বাংলা-কবিতায় সর্বপ্রথম নন্দ দাশই এনে দিলেন।

এই মূলধনের বা রসপুঞ্জের চেহারা নেই জীবনানন্দর কাব্য-পরিক্রমার অনেক ক্ষেত্রে তা পুঞ্জপুঞ্জ মেঘ, ক্ষেত্রে ম্লান চন্দ্রলেখা, অনেক পরিচ্ছন্ন নীলিমার মতো অকূল শেষ পর্যন্ত কয়েকটি আলোর বুদ্বুদ।

শরীরে সুর নীলিমা জ্ঞানের বীথি। তার চেহারা এ রকম ছিল ঃ

...প্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক ...স্পর্শে, হে অতন্দ্র ...কল্পলোক।" (নীলিমা—ঝরাপালক)

...শেষ দিককার হৃদয়ের তন্ত্রীর ...কথা বলছে ঃ

...গীত গান আলো রয়েছে,
অকালে
...হয়তো বা শাশ্বত যাত্রীর।"
(যাত্রী)

...রাখলে আমরা বুঝতে পারব যে ...নীলিমা থেকে পৃথিবীর প্রান- ...ছেড়ে অবতরণ করেছে। ...গীত নিম্নগ, রবীন্দ্রনাথের মতো ...নয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ...শ্রেষ্ঠদের এক্ষেত্রেই ব্যবধান ...গোড়া থেকে কিন্তু জীবনানন্দ ...ব্যবধান রচিত ছিল না। 'ঝরা- ...গ্রন্থের রচয়িতা হিসেবে যে ...কে পাওয়া যায়, তাঁর চিত্তে ...এবং নজরুল ইসলাম সক্রিয় ...সে সময়ে তাঁর স্বকীয়তা ...মিড' কবিতায় সর্বাধিক উচ্চারিত। ...নজরুল সহৃদয় হয়ে মানুষের ...ইতিহাসের সঙ্গে মনের মিতালি ...ব্যাপৃত হয়েছেন। তবে ইতিহাস- ...র জীবনানন্দর মন সায় দিয়েছে ...কবিদের মনোভঙ্গীর নকশায়। ...অবশ্য ভারত সম্রাটের তাজমহল ...আবেগ, কল্পনা ও চিত্তোৎকর্ষ ...করে পাশ্চাত্তের ধ্রুপদী রেনেসাঁসের ...কল্যাণানুভূতির একটি রূপ বাংলা ...দান করেছিলেন। 'পিরামিড' কবিতার সংবেদ্য রস 'তাজমহল' কবিতার অনুরূপ। জীবনানন্দ 'পিরামিড' কবিতায় বিষয়ান্তরে প্রস্থান করেও ভাব-বৃত্ত রবীন্দ্রনাথের মানসিক জগতের অন্তর্গত করেই রেখেছিলেন। তবু একটু ব্যবধান মানসিক চায়ও ছিল, যাকে বলা যায় ব্যবধানের বীজ।

রবীন্দ্রনাথ তাজমহলকে সম্রাট সাজাহানের এক ফোঁটা নয়নের জল বলে কল্পনা করেছেন। কর্তাই কীর্তির চাইতে বড়ো ছিল কবিগুরুর দৃষ্টিতে, কিন্তু কবি-গুরুর অবাধ্য ছাত্র জীবনানন্দ 'পিরামিড' নামক মিশরী সম্রাটদের কীর্তিতে 'স্বতন্ত্র স্বরাট' হিসেবে অবলোকন করেছেন। 'স্মৃতির শ্মশান'কে স্বরাট ভেবে জীবনানন্দ তাকেই সম্ভাষণ জানাচ্ছেন, কোনো মিশরী সম্রাট ফ্যারাওকে নয়। জীবনানন্দের দৃষ্টিতে স্মৃতি বড়ো, সৃষ্টিকর্তা বড়ো নয়। শিল্পই মহৎ, শিল্পী মহৎ নাও হতে পারেন। স্রষ্টা ত মানুষও হতে পারেন, যে মানুষ স্মৃতি ভুলে যায়। তাই জীবনা-নন্দ 'পিরামিড' কবিতায় তাঁর অপূর্ব চেতনা সোচ্চার করলেন ঃ

"মোদের জীবনে যবে জাগে পাতাঝরা
হেমন্তের বিদায়-কাকলি—
অশ্রুভেজা আঁখি দুটি মেলি
গড়ি মোরা স্মৃতির শ্মশান
দু'দিনের তরে শুধু; নবোৎফুল্ল মাধবীর গান
মোদের ভুলায়ে নেয় বিচিত্র আকাশে
নিমেষে চকিতে;"   (পিরামিড)

দলিত মথিত স্মৃতির প্রতি করুণার্দ্র হয়ে উঠল প্রাথমিক পর্যায়েই জীবনানন্দর হৃদয়। ভূমিষ্ঠ হল একটি শোকগীতিকার, যিনি করুণারস বিতরণে সমর্থ হবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন। বস্তুত রস হিসেবে জীবনানন্দর সম্পূর্ণ কাব্যালোক না কল্পলোক করুণ রসই সব চাইতে বেশি দান করেছে। এ ক্ষেত্রে তিনি রোমাণ্টিক শেলীর পাশাপাশি গিয়ে দাঁড়িয়েছেন এবং ক্ষণে ক্ষণে ঈয়েট্সের আমন্ত্রণ রক্ষা করেছেন।

(দুই)

প্রাণবাহী মানুষের নৃশংস আচরণ ইংল্যাণ্ডের প্রথম রোমাণ্টিক কবির দলে কোলেরিজের মতো আত্মার অভিশাপে বিশ্বাসী একজন অখ্রীষ্টান কবি তৈরী করে তুলেছিল। কোলেরিজের বিখ্যাত

'প্রাচীন নাবিক' গাথাকাব্য কাব্যস্রষ্টাকে রোমান্টিক দলে অবশ্য একটি বিশিষ্ট আসন দিয়েছে—কাব্য থেকে যে ধর্মটাকে বাদ দিয়ে দেখতে হয় এই জ্ঞান কিন্তু বাংলা-সাহিত্যের প্রথম পর্যায়ের কবিদের ছিল, যাঁরা গাথাকাব্য লিখে গেছেন। পূর্ব-বাংলার পাঠান-মুঘল আমলের কবিরা কোলেরিজের মতো দুঃসাহস দেখিয়েছিলেন ধর্মকে কাব্য থেকে বিসর্জন করে'। রবীন্দ্র-নাথ ধর্মভাবকে বিসর্জন করে চিত্ত-ভিত্তি তৈরী করেননি। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের অন্তর্ভুক্ত জীবনানন্দ ব্রহ্মাস্বাদসহোদর রস পরিত্যাগ করতে ইতস্তত করলেন না। মানুষের ইতিহাসে মনোযোগী হওয়ার ফলে জীবনানন্দ তথাকথিত অধার্মিক হতে পারলেন। তিনি যেন প্রেত লোকে বিশ্বাসী হয়ে শাপগ্রস্ত প্রেতাত্মাদের আর্তনাদ শুনতে পেলেন কোলেরিজের 'প্রাচীন নাবিকে'র মতো—এ প্রেতাত্মাদের জন্যে ব্রহ্ম-পিতা নেই। বুদ্ধদেব বসু যে দেবতায় বিশ্বাসী ছিলেন সে দেবতাও নেই। প্রেমেন্দ্র মিত্র যে রাজায় বিশ্বাসী ছিলেন সে রাজার রাজা সম্রাটও সেই প্রেত স্মৃতির প্রতাপে তুচ্ছ। কোলেরিজের মতো নিঃসঙ্গ পর্যায়ের রোমান্টিক হয়ে উঠলেন জীবনানন্দ দাশ 'ঝরা পালকে'র অধ্যায়ে। তিনি স্মৃতির ছবি কুড়োতে শুরু করলেন পুষ্পচয়িতার পবিত্র মন নিয়ে। সার্থক চয়ন দেখতে পেলাম আমরা 'ধূসর পান্ডুলিপি'র অধ্যায়ে। ধূসর পান্ডুলিপি শিলালিপি নয় অশোক মৌর্যের কিম্বা 'যুবনাশ্বে'র; বঙ্গীয় তালপাতার পুঁথি—হর্তুকীর জলে লোহা ভিজিয়ে হয়ত ধূসরাভ কালি তৈরী হয়েছে তার অক্ষর রচনার। বঙ্গীয় প্রাচীনতা সঞ্চয় করতে 'মৃত্যুর আগে' 'ঝরা পালকে'র পক্ষী-কবি কোথায় যাচ্ছেন? কোন্ দৃশ্যে? তা 'ধূসর পান্ডুলিপি'র একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা 'মৃত্যুর আগে'-তে এ ভাষায় ব্যক্ত ঃ

"আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার; কাবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল
জোনাকিতে ভরে গেছে; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে
চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে;"

শশাঙ্ক যে নিস্পৃহতায় জড়িত হয়ে এখানে পৌষের মাঠে এসে দাঁড়াল তার স্বর কতো প্রাচীন তা 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে'র পান্ডুলিপির পৃষ্ঠাগুলো খুলে জানা যায়। চন্দ্রস্ফীতিও গেছে, চন্দ্র-প্রতিপদও এসেছে বাঙালীর ফসলের ক্ষেতে, কিন্তু বিংশ-শতকের পল্লীতে চন্দ্রোৎসব নেই। চন্দ্র নিজেই অভিভুক্তিতে কাতর। ধান কাটা মাঠের হতশ্রী দৃশ্যে এসে স্মৃতির অস্পষ্ট ছবি কুড়োচ্ছেন জীবনে ভূমিষ্ঠ একটি মানব প্রাণ। কবিপ্রাণ জীবনানন্দের পৃথিবী পরিক্রমা শুরু হচ্ছে নদী উপত্যকায়, আন্তরিক ভগ্নাবশেষ খনন-ক্রমে। বুদ্ধি-জাত রসের নাম যদি 'বোধ' হয়ে থাকে তখনই তা কবির হৃদয়ে জন্ম নিয়েছিল। জাতকের চিত্তমুকুরে কুৎসিতের ছায়া প্রতিবিম্বিত হচ্ছে তখন। আর সেই কুৎসিত অক্ষরের ভীড় থেকে একটি সুন্দর 'নির্জন স্বাক্ষর'-ও তিনি তখনই আবিষ্কার করছেন। সে স্বাক্ষর কার? কোন্ মমতাজের, কোন্ ফ্যারাও-প্রেয়সীর? যারই হোক তিনি সেই সৌন্দর্য-স্মৃতি রক্ষা করতে চাইলেন, বললেন ঃ

"তুমি তা জানো না কিছু—না জানিলে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে
লক্ষ্য করে।" (নির্জন স্বাক্ষর)

অদ্বিতীয়া জীবন-সঙ্গিনীর প্রতিমা তৈরী করলেন মনে মনে কবি। এ প্রতিমার বাস্তব ভিত্তি হয়ত অসুন্দর কিন্তু কবির সত্তার মিশ্রণে এসে তা এমন ঃ

"কোনো এক মানুষের তরে
যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের
গভীর গহ্বরে
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে
এক মানুষীর মনে।" (ঐ)

গ্রীক দর্শন-জাত প্রেমকে আবিষ্কার করলেন জীবনানন্দ ভারতীয় মন খনন করে। কিন্তু 'নির্জন স্বাক্ষর' প্রেমের কবিতা নয়—প্রেম-বিষয়ক কবিতা মাত্র। প্রেমের মূর্তি নির্মাণ এবং পুরোহিতের মতো মন্ত্রপূজো সমাধা হয়েছে এই কবিতায়। তারপর 'অবসরের গান'-এ উল্ল্যাসিসের আফিংখোর সঙ্গী সাথীর মতো সার্সি'র বাগানে বসবাস করতে চেয়েছে কিম্বা হরিণ শিকারীর সঙ্গ নিয়েছে বাস্তব জীবনের অভিজ্ঞতার তিক্ত রস প... করবার নিমিত্ত। তিক্ত-কে তিক্ত বলার দুঃসাহস অভিব্যক্ত হয়েছিল তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতায়। কামভাবের সঙ্গী রতিরস মৃত্যুর পথ তৈরী করে এই দার্শনি... মনোভঙ্গী বৌদ্ধ ভারত থেকে আগ... এ ভঙ্গীর অভিব্যক্তি ছিল তাঁর 'ক্যাম্প' কবিতায় কিন্তু বঙ্গীয় সাধুসজ্জন কবিতাটিকে বুঝতে বা সহ্য করতে পারেননি। সাধুতার মুখোস খুলে দিয়েছিলেন সুতরাং কবি তাঁর 'শকুন' কবিতায়। কিন্তু শকুনীদের সঙ্গে সত... লড়াই করবার মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না বলে বাস্তবতা পরিহার করে তিনি শেলী ভাবে অনুভাবিত হতে চেষ্টা করলেন ঃ

"পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে," (স্বপ্নের হাতে)

যদিও 'ধূসর পান্ডুলিপি' জীবনানন্দকে কবি-যশ প্রচুর পরিমাণে দান করে... তবু আমরা বলব জীবনানন্দ-প্রতিভা... প্রকৃত বিস্তার হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে... 'বনলতা সেন' ও 'মহাপৃথিবী' গ্রন্থদ্বয়ে... অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলী রচনার কালে... একটি পরিব্রাজক প্রাণের সঙ্গ... অতি সাফল্যের সঙ্গে তিনি ... সময়ে করতে পেরেছিলেন ... আপন সত্তার সঙ্গে নিবিড়ভাবে ... বান্ধব-গ্রন্থি বন্ধন করেছেন। তাঁর ... শূন্যাকাশ খচিত হয়েছে অবশেষে ... প্রাণময় কবিসত্তায়, 'সাতটি তারার তিমি... গ্রন্থে।

পরিব্রাজকের বিচরণ কেন্দ্র ধান ... মাঠের 'জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ' ... বেবিলনে প্রস্থিত ঃ 'বেবিলনে একা ... এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর ... যেন'—কিন্তু সেখানে প্রস্থান ... জিজ্ঞাসার হাত থেকে ত্রাণ পাচ্ছেন ... তাই 'হাজার বছর ধরে' পথ হেঁটে ... ব্রাজক প্রাণ নাবিক বেশে 'নাটোরের বন... সেনে'র বৈদর্ভী সৌন্দর্যের মুখো... হয়েছেন। কিন্তু এখানেও "থাকে ... অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বন... সেন"। আলোর সন্ধান কোথায়? অন্ধকার ঃ

কিম্বা বিশ্বাসের সাফল্যে উত্তেজিত হয়ে কলকণ্ঠ হতে পারেননি। আমাদের স্বাধীনতার প্রদোষের কবি তাই জীবনানন্দ। জাতীয়তা বিচ্যুত দৃঢ়কণ্ঠ মনস্বী তিনি —সমালোচক তিনি, হৃদয়ের কারুশিল্পী তিনি। সহৃদয় ও সদর্থক কাব্যমূল্য তাঁর রচনায় এতো অধিক যে সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার প্রবাহ জীবনানন্দের কাব্যকলার উৎস থেকে নির্গত হয়ে ভাষায়, রূপকল্পে এবং সপ্রাণতায় কাব্যদেহ মণ্ডিত করছে।

'বলয়ের নিজ গুণ' বলতে কবি অন্ধকারকে বর্জন করে আলোর বলয় কল্পনা করেননি। চেতনার রূপ সার্তটি তারার বলয়ে গর্ভস্থ অন্ধকার নিয়ে তার কল্পনায় উদ্ভাসিত। চেতনার স্বকীয় আলোর গুণেই চিত্তগত পাপান্ধকার দূরীভূত হয় বলে জীবনানন্দ মনে করে গেছেন। এই গুণের বশেই উৎকৃষ্ট চিত্তের লক্ষণ প্রকাশ পায়। মৃত্যুকে অস্বীকার করায় সে চিত্ত এবং

"লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত
আমিষ গন্ধ ঠেলে
সময়ের সমুদ্রকে বার বার মৃত্যু থেকে
জীবনের দিকে যেতে বলে।"
(পৃথিবীতে এই)

(তিন)

'বনলতা সেন' ও 'মহাপৃথিবী'র অধ্যায়ে নরনারীর সম্পর্ক নিয়ে জীবনানন্দের মনে যে প্রশ্নমালা তরঙ্গ তুলেছিল·তার সমাধান করেছিলেন তিনি তখন ঈশ্বর-প্রেমের পরিবর্তে 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়' কল্পনা করে। কিন্তু এ প্রেম অচেতনতার অন্ধকারে যে পারিক্লিষ্ট চিত্র উপস্থিত করেছে সভ্যতার ইতিহাসে তা তিনি সামরিক যুগে লক্ষ্য করে ('নিরঙ্কুশ' ও 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য' কবিতাদ্বয় স্মরণীয়) মানব চেতনার প্রেমে নিবদ্ধ দৃষ্টি হয়েছেন। প্রেমিক কবি বলতে এ ধরনের চেতনা প্রেমিক কবি মানসের সাধক বোঝায় না। প্রেমের আবেগের সাধককেই প্রেমিক কবি বা প্রেম-চেতনার কবি বলা হয়। জীবনানন্দ যে প্রেম চিত্ততা কোনো কবিতায়ই প্রকাশ করেননি এমন নয়, কিন্তু তেমন রচনাতেও প্রেম দর্শনের দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। সে দর্শন গ্রীসীয় বা বৌদ্ধ। কিন্তু মানব চেতনার প্রেমে যখন তিনি মুগ্ধ হয়েছেন তখন গ্রীসীয় নাট্যকারের মনোভঙ্গী বা বৌদ্ধ মানবতার নবীনতর রূপ রেনেসাঁসের বা দান্তের মনোভঙ্গীর পাশ ঘেঁষে গেছেন। তবে দান্তের স্বর্গে বিশ্বাস বর্জন এবং পৃথিবীতেই ভালো হবার ও প্রায়শ্চিত্ত করবার আশা পোষণ তাঁর আপন বৈশিষ্ট্য বা স্বকীয় অর্জন। জীবনানন্দের এ বৈশিষ্ট্যে আমাদের নজর না থাকলে আমরা তাঁকে বাস্তববাদী কবি ভাবতে পারব না।

বাস্তবতা যে কল্পনার বিরোধী শক্তি নয়, এই সত্যটি জীবনানন্দ তাঁর রচনার রূপকল্প দ্বারা প্রমাণ করে গেছেন। তাঁর রূপকল্পের বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যায় নানারূপ আলোচনা হয়েছে। রূপকল্প কবির মগজের কারখানায় একটি দুর্লভ বস্তু নয়, সুতরাং রূপকল্পের উপর জোর দিয়ে কাব্য আলোচনা আমাদের বিচারে অসঙ্গত বলে মনে হয়। কাব্য-কথাগুলো বাচ্যাতীত রসের ব্যঞ্জনা দিতে সমর্থ কি না, সে বিচারের উপরই কাব্য-আলোচনা সার্থক ও অসার্থক হয়ে দাঁড়ায়। উদাহরণত আমরা জীবনানন্দের একটি পংক্তি পরীক্ষা করতে পারি। 'বনলতা সেন' কবিতায় নায়িকার কালো চুলের ব্যঞ্জনা দিতে কবি বলেছেন: "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"

রাত্রির সঙ্গে চুলের উপমা বা রূপ-কল্পনামাত্র যদি এ পংক্তিতে কাব্যকৃতি হত, তাহলে আমরা বলতাম যে কবি ব্যঞ্জনা-ধ্বনি ব্যবহার করতে পারেননি এবং বাচ্যাতিরিক্ত রস নিবেদনে অসমর্থ হয়েছেন। বিদিশা একটি প্রাচীন আর্য নগর। প্রাচীন নগরীর রাত্রি অন্ধকারের গভীরত্ব বোধ এনে যে চুলের কালোত্ব বাড়িয়ে দেবে তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু চুলের কালো-বরণকে বর্ধিত করবার একাধিক অভিপ্রায়ই কবির ছিল এ পংক্তিতে। আর্যত্বের বা আর্যরমণীর রাত্রি অন্ধকার পংক্তির বাচ্যাতিরিক্ত কৃষ্ণ রস। এই ব্যঞ্জনার জন্যেই পংক্তিটি যথার্থ কবিতার শক্তি করেছে।

অবশ্য এ-পংক্তির অপরিসর ও রস গ্রহণ ও আস্বাদন করা পাঠক উৎকর্ষের উপর নির্ভরশীল। আ প্রবেশে আনন্দ লাভের ব্যাঘাতও পারে কোনো কোনো পাঠকের মনে, বা অপরপক্ষে, আর্যতার সঙ্গ 'বিদিশা' ধ্বনিই অপ্রয়োজনীয় মনে পারেন। কিন্তু এ-পংক্তি থেকে কবি কবি চেতনাকে যদি আমরা উদ্ধার আনতে চাই, তাহলে শুধু অন্ধকা পরিমাপ করতে হবে। পরিমাপ পরি দিক থেকে আমরা আগেই করেছি, কার্যের দিক থেকে করিনি। জীবনান কারুকার্যের বর্ণনা সুদীর্ঘ প্রবন্ধ সা আমরা কবির অন্ধকারের কারু সম্পর্কে শুধু এ কথাটি বলতে চাই শূন্যগর্ভ নয়—জীবনের শুভ করবার জন্যে সচেষ্ট। শুনেছি কবি পল এলুয়া জীবনানন্দের অন্ধকারের উষ্ণ ভ্রূণের দিকে তাকিয়ে আনন্দের খবর, সন্দেহ নেই। তবে জীবনানন্দের 'স্থান থেকে' পংক্তি করে তাঁর কবিতার দিকে তাকাতে সব চাইতে বেশি আনন্দিত হতে একথাগুলোর সাম্যবোধ উপলব্ধি ক

"পটভূমি বার-বার পটভূমিচ্ছেদ
করে ফেলে আঁধারকে আলোর নি
আলোককে আঁধারের ক্ষয়
শেখায় শুক্র সূর্যে।"

অত্যন্ত সাধারণ স্থূলে সত্য দৃশ্যান্তরের খবর। কিন্তু সত্য কবির হাতের ছোঁওয়ায় যে স্থান পা তাঁর স্থানের মতোই জীবন্ত। সেই তাঁর কল্পলোক। সেই কল্প আগেকার দিনের মতো আবেগ-আকু হলেও একই পীঠস্থলীতে নিব জীবনানন্দ যে মনোভঙ্গীর বীজ কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন, মধ্য সে বীজের গাছ পত্রপুষ্পে শোভিত হ এবং শেষ অধ্যায়ে তা ধ্রুব সুফল দান গেছে। তাঁর পায়ের নীচের ভূমি সঞ্চরমান ছিল না—হৃদয়ও তাই ভূমিতেই স্নেহচ্ছায়া দান করেছে—সে হাজার বছরের পুরনো বাঙলাদে বনলতা সেন'।

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা

সুবোধ ঘোষ

বনভূমির নিভৃতে কলস্বনা এক স্রোতস্বিনীর নিকটে রক্তপাষাণের বুকের উপর কুহেলিকালীনা প্রতি সন্ধ্যায় পল্লবিত দ্রুমবাহু হতে লুটিয়ে পড়ে পুরটকর্ণিকার মত পীতমঞ্জরীর পুঞ্জ। নিবিড় অধরবন্ধ রচনা ক'রে সেই পুঞ্জীভূত কোমলতারই ক্রোড়ে নিশীথের প্রহর যাপন করে কেলিশ্রমালস মৃগ-দম্পতি। আর, প্রভাত হতেই মৃগদম্পতি যখন নবতৃণের গন্ধামোদে চঞ্চল হয়ে স্রোতস্বিনীর কূলে ছুটাছুটি ক'রে বেড়ায়, তখন বনপথের দুই দিক হতে উৎসুক নয়ন নিয়ে কীর্ণ মঞ্জরীর কোমলতায় আবৃত সেই রক্তপাষাণের নিকটে দেখা দেয়, বরযৌবনা এক ঋষি-কুমারী, কণ্ঠে তার গন্ধে আকুল স্ফুট কেতকীর মালিকা, এবং মদাঞ্চিততনু এক তরুণ ঋষি, বক্ষে তার মৃগমদবাসিত কুঙ্কুমের অঙ্কন। মহর্ষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভা ও ঋষি অষ্টাবক্র।

যেন দুর্বহ এক তৃষ্ণার বেদনা উৎসুক নয়নে বহন ক'রে ছুটে আসে মিলনোন্মুখ দুই জীবনের যৌবনান্বিত দুই স্বপ্নভার। কিন্তু ছুটেই আসে শুধু; আর এসেই সেই ক্ষুদ্র অথচ কঠোর রক্তপাষাণের বাধায় হঠাৎ আহত হয়। নিকটে এসেও যেন এক দুরূহ সুদূরতার শাসনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে দু'জনে। ভুলতে পারে না অষ্টাবক্র, সুপ্রভাও ভোলে না, দু'জনেরই জীবনের একটি কঠিন অঙ্গীকার দু'জনের মাঝখানে এই ব্যবধান আজও রচনা ক'রে রেখেছে।

ঋষি অষ্টাবক্র সস্পৃহ নয়নে তাকিয়ে থাকে দরোৎফুল্ল সরোরুহের মত সুপ্রভার বিকচ আননশোভার দিকে। আর, বিমুগ্ধা বনকুরঙ্গীর মত সমুত্তান নয়নভঙ্গীর নিবিড়সান্দ্র বিহ্বলতা নিয়ে অষ্টাবক্রের কুঙ্কুম-পিঞ্জরিত বক্ষঃপটের দিকে তাকিয়ে থাকে সুপ্রভা। তরুণ ঋষির সেই মৃদুশ্বাস-কম্পিত বক্ষের তরঙ্গিত আবেদনের উপর মাথা লুটিয়ে দিতে ইচ্ছা করে সুপ্রভার।

এবং সুপ্রভার ফুল্ল আননের রক্তিম সুষমা অধরাশ্লেষে পান ক'রে নিয়ে তৃপ্ত হতে ইচ্ছা করে অষ্টাবক্রের, বনবিটপীর কিশলয় যেমন প্রভাতের অরুণিত মিহিরলেখার রাগসুষমা পান ক'রে তৃপ্ত হয়।

কিন্তু এই ইচ্ছা নিতান্তই ইচ্ছা। বাসকতল্পের মত সুন্দর ঐ পুঞ্জায়িত মঞ্জরীর মদাকুল ইঙ্গিতে এই ইচ্ছা ক্ষণে ক্ষণে চঞ্চলিত হয়, কিন্তু এই চঞ্চলতা কোন ক্ষণেই জীবনের সেই অঙ্গীকারকে বিচলিত করতে পারে না।

অঙ্গীকার ক'রে কঠোর এক পরীক্ষাকেই জীবনে স্বীকার ক'রে নিয়েছে প্রেমিক অষ্টাবক্র ও তার প্রেমিকা সুপ্রভা। কে জানে কোন্ বিশ্বাসের দুঃসাহসে মহর্ষি বদান্যের কাছে এই অঙ্গীকার নিবেদন করেছে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা, শুধু স্বেচ্ছার অধিকারে কখনই পরিণয় বরণ করবে না ওদের দু'জনের জীবন। যদি কোন শুভ লগ্নে স্বয়ং মহর্ষি বদান্য সাগ্রহে সানন্দে ও সমন্ত্রসংস্কারে সুপ্রভাকে অষ্টাবক্রের কাছে সম্প্রদান করেন, তবেই সেই লগ্নে জগতের স্বীকৃতির মাঝখানে দাঁড়িয়ে মাল্যবিনিময় ক'রে মিলিত হবে ঐ কুঙ্কুম আর কেতকীর সুরভিত ইচ্ছা। তার আগে নয়, এবং জগতের কোন গোপন নিভৃতেও নয়।

তাই সুপ্রভা আর অষ্টাবক্র, দুই উৎসুক আকাঙ্ক্ষার ব্যাকুলতা যেন প্রতি প্রভাতের জাগ্রত আলোকের পথে এক স্বপ্নাভিসারে আসে, বননিভৃতের এই কলস্বনা স্রোতস্বিনীর নিকটে মঞ্জরী-কোমল একটি সান্নিধ্যের ছায়াটুকু মাত্র অনুভব ক'রে চলে যায়।

ঋষি অষ্টাবক্র ও কন্যা সুপ্রভার প্রণয়কলাপে বিস্মিত বিরক্ত ও ব্যথিত হয়েছেন মহর্ষি বদান্য। তিনি মনে করেন, এই প্রণয় প্রণয়ই নয়। বনেচর মৃগ ও মৃগীর মত নিতান্তই এক

আসক্তির তাড়নাকে জীবনের প্রেম ব'লে বিশ্বাস করেছে এক ঋষিকুমার ও এক ঋষিকুমারী। ঐ আগ্রহ আকালিক ঝটিকার মত বিচলিত যৌবনের উদ্‌ভ্রান্তি মাত্র; দক্ষিণমলয়ের মৃদুবিধুত নিঃশ্বাসের মত স্নিগ্ধ স্থিরসৌহার্দ্যের সঞ্চার নয়। ঐ চাঞ্চল্য লোষ্ট্রাহত সরসীসলিলের ছন্দোহীন উচ্ছলতা মাত্র; সুতরঙ্গিত ভঙ্গিমার মঞ্জুল বিঞ্জোলী নয়। ওদের মুখের ভাষা আসঙ্গকামনার মুখরতা মাত্র; প্রেমমহিমার কল্লোল নয়। দুই জনের দুই মুগ্ধ মুখচ্ছবি ও অধর-বিসর্পিত রক্তোচ্ছ্বাস দু'টি দাবানলদ্যুতি মাত্র; সুশান্ত জ্যোৎস্নারাগ নয়। এই আসক্তি সত্য হলেই পরিণয় লাভের অধিকার সত্য হয় না। এই আসক্তি প্রেম নয়, অনুরাগ নয়, দাম্পত্যের মিলনসূত্রও নয়।

স্মরণ করেন মহর্ষি বদান্য, অঙ্গীকার করেছে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা। কিন্তু কোন সত্য নেই ঐ অঙ্গীকারে। মনে করেন বদান্য, সেই অঙ্গীকার হঠাৎমোদে উদ্ধত দুই যৌবনের কৌতুকরঙ্গ মাত্র, মহর্ষি বদান্যের রোষ প্রশমিত করার জন্য যৌবন-চটুল দুই অভিসন্ধির চাটুভাষিত স্তুতি। বিশ্বাস হয় না, যে দুই আকাঙ্ক্ষা প্রতি প্রভাতে বননিভৃতের ক্রোড়ে গোপনাভিসারে এসে সান্নিধ্য লাভ করে, সেই দুই আকাঙ্ক্ষা কখনও কোন সংযমের অঙ্গীকারকে শ্রদ্ধা করতে পারে। আসক্তি কেমন ক'রে পাবে এই শক্তি? সন্দেহ করেন মহর্ষি বদান্য, এক কপট অঙ্গী-কারের অন্তরালে কৌতুকমদে মদায়িত এক ঋষিকুমারী এবং এক তরুণ ঋষির দেহ ক্ষণপুলকিত উদ্‌ভ্রান্তির অনাচার-কলুষে ক্লিন্ন হয়েছে। লোকসমাজের আশীর্বাদের জন্য কোন মোহ আর কোন শ্রদ্ধা নেই সেই দুই অবিধিপ্রগল্‌ভ আসক্তির প্রাণে।

যেন অভিশাপ বর্ষণের জন্য মহর্ষি বদান্যের কোপপীড়িত দুই চক্ষু খর দৃষ্টি বর্ষণ করতে থাকে। কিন্তু হঠাৎ দেখতে পেয়ে বিস্মিত হন বদান্য, তাঁর আশ্রমভবনের দ্বারোপান্তে নীরবে দাঁড়িয়ে আছে তরুণ ঋষি অষ্টাবক্র।

মহর্ষি বদান্য বলেন।—আমি জানি, তুমি কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছ অষ্টাবক্র। কিন্তু শুনে যাও, সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করবারও অধিকার তোমার নেই।

অষ্টাবক্র—কেন মহর্ষি?

বদান্য—কেতকীগন্ধবাসিত একটি কণ্ঠের আর কুঙ্কুমাঙ্কিত একটি বক্ষের আসক্তিময় প্রগল্‌ভতা আমার আশীর্বাদ পেতে পারে না।

অষ্টাবক্র—প্রগল্‌ভতা ব'লে ধারণা করছেন কেন মহর্ষি?

অষ্টাবক্রের প্রশ্নে আরও কুপিত হয়ে শ্লেষাক্ত স্বরে উত্তর দেন মহর্ষি বদান্য।—শিলাখণ্ড যেমন তরল হতে পারে না, শিশিরবিন্দু যেমন কঠিন হতে পারে না, আসক্তিও তেমনি কখনই অপ্রগল্‌ভ হতে পারে না।

অষ্টাবক্র—কিন্তু আপনি জানুন মহর্ষি, আপনারই ইচ্ছাকে সম্মানিত ক'রে আমরা দু'জনে যে অঙ্গীকার জীবনে গ্রহণ করেছি,সেই অঙ্গীকার কোন মুহূর্তেও আমাদের আচরণে অসম্মানিত হয়নি।

চমকে ওঠেন মহর্ষি বদান্য, তাঁর সন্দেহ ও বিশ্বাসের কঠিন হৃৎপিণ্ডেরই উপর যেন এক উদ্ধতের হঠভাষিত গর্বের আঘাত পড়েছে।

বদান্য বলেন—কিন্তু আমি জানি, একদিন না একদিন মিথ্যা হয়ে যাবে তোমাদের অঙ্গীকার, তোমাদেরই উদ্‌ভ্রান্ত আসক্তির কাছে।

অষ্টাবক্র—কখনই হবে না মহর্ষি।

তীব্রতর উষ্মায় তপ্ত হয়ে ওঠে বদান্যের কণ্ঠস্বর।—তবে শোন অষ্টাবক্র, বৎসরকাল পূর্ণ হবার পর আজিকার মত এমনই এক প্রভাতে আমার কাছে এসে যদি এই সত্য ঘোষণা করতে পার যে, তোমাদের অঙ্গীকার ঐ বননিভৃতের ভৃঙ্গগীতগুঞ্জরিত কোন মুহূর্তে বিচলিত হয়নি, তবেই আমি বিশ্বাস করবো, সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করবার অধিকার তুমি পেয়েছ।

অষ্টাবক্র—তারপর?

মহর্ষি—তারপর, আমি বিচার করবো, সুপ্রভার পাণি গ্রহণের অধিকার তোমার আছে কি না।

অষ্টাবক্র—আপনার ইচ্ছাকেই সশ্রদ্ধ-চিত্তে স্বীকার ক'রে নিলাম ঋষি।

হ্যাঁ, সত্যই আসক্তি। মনে মনে স্বীকার করে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা, মহর্ষি বদান্যের অনুমানে কোন ভুল নেই। কুমারী সুপ্রভা তার উষ্ণ নিঃশ্বাসবায়ুর চঞ্চলতার মধ্যে বক্ষের গভীর হতে উৎসারিত এক তৃষ্ণারই মর্মররোল শুনতে পায়। যেন তার শোণিতে সঞ্চারিত এক স্বপ্নের প্রাণ দোহদবেদনা বরণের জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে। বিশ্বাস করে সুপ্রভা, পিতা বদান্যের অভিযোগ মিথ্যা নয়। স্ফুট প্রসূনের নবপরাগের মত এক সুরভিত মোহ যেন তার সকলক্ষণের ভাবনাকে অবশ ক'রে রেখেছে। উদ্দল-কুসুমসুরভির মত কি-এক বাসনার শিহর তার অধরপুটে ক্ষণে ক্ষণে দুরন্ত প্রলোভ সঞ্চারিত ক'রে যায়। বিশ্বাস করে সুপ্রভা, এই তৃষ্ণার পরম তৃপ্তি দাঁড়িয়ে আছে তারই সম্মুখে, নাম যার অষ্টাবক্র, তরুণতরুর মত স্নিগ্ধদর্শন যে ঋষির কণ্ঠে কেতকীমালিকা অর্পণের জন্য সুপ্রভার মন তার স্বপ্ন জাগর ও সুষুপ্তির প্রতিক্ষণে উৎসুক হয়ে রয়েছে।

অষ্টাবক্রও সুপ্রভার কাছে অকপট ভাষায় নিবেদন করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করে না।—হ্যাঁ ঋষিনন্দিনী, ঐ বনমৃগদম্পতিরই জীবনের প্রতি সন্ধ্যার উৎসবের মত অধরবন্ধ রচনার জন্য আমার ধমনীধারায় এক স্বপ্নাতুর আকাঙ্ক্ষা ছুটাছুটি করে। আমি জানি, আমার সেই আকাঙ্ক্ষার সকল তৃপ্তির আধার তোমারই ঐ সুন্দর অধর। পরিমলগ্রাহিণী সমীরিকা তুমি, আমার যৌবনোত্থ বাসনার সৌরভভার তোমারই সমাদরে ধন্য হতে চায়। এই ক্ষিতিতলের এক নিভৃতের স্নেহে লালিত স্নিগ্ধ কেকা তুমি, আমার প্রাণের সকল তৃষ্ণার নীলাঞ্জন তোমারই আহ্বান অন্বেষণ ক'রে বেড়ায়। নিবিড়-সলিলা নিকুঞ্জসরিৎ তুমি, আমার সকল আকাঙ্ক্ষার হিল্লোল তোমারই কান্তি-সুধারসের অভিষেক নিতে চায়। স্বীকার করি সুপ্রভা, আমার বক্ষের কুঙ্কুমে আমার আসক্তিরই প্রাণ ছড়িয়ে রয়েছে।

কুণ্ঠাহত স্বরে প্রশ্ন করে সুপ্রভা।—কিন্তু এই কি প্রেম?

বিস্মিত হয় অষ্টঅবক্র।—জানি না, প্রেম নামে কোন্ আকাশসম্ভব আকাঙ্ক্ষার কথা বলছো ঋষিতনয়া।

সুপ্রভা—ক্ষমা করবেন ঋষি, আমি পিতা বদান্যেরই দুর্বহ ও দুঃখকর একটি চিন্তার প্রশ্ন আপনাকে নিবেদন করছি। শুধু তাই নয়, এই প্রশ্ন আমার নিজেরই জীবনের প্রতি আমার সংশয়কাতর মনের প্রশ্ন। নভোচারিণী বলাকার প্রাণ যে আকাঙ্ক্ষায় বিদ্যুন্ময় জীমূতের ধ্বনিত বক্ষের নিজ দেহের শোণিতধারায় বরণ করার জন্য ব্যাকুল হয়ে ওঠে, আমার প্রাণ সেই আকাঙ্ক্ষা নিয়েই আপনার দীপ্ত জীবনে হর্ষ বরণ করতে চায়। কোন সন্দেহ করি না ঋষি, আমার কণ্ঠমালিকার শতকীতে আমার আসক্তিই সুরভিত হয়েছে। কিন্তু এই আসক্তিই কি জীবনের কোন সুন্দর আকাঙ্ক্ষা?

অষ্টাবক্র—সুন্দর আসক্তি অবশ্যই জীবনের সুন্দর আকাঙ্ক্ষা।

সুপ্রভা বিস্মিত হয়।—সুন্দর আসক্তি?

অষ্টাবক্র—হ্যাঁ, সে আসক্তি দেহজ বাসনারই প্রসূত প্রসূন, কিন্তু দেহজ-বাসনার নিঃশ্রীক উল্লাস নয়। সে আসক্তি কখনো প্রগল্ভ হয় না। মহর্ষি বদান্য বোধহয় বিশ্বাস করেছেন, আমাদের কামনা উন্মাদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ক্ষুণ্ণ করবে আমাদের অঙ্গীকার।

বুঝতে না পেরে প্রশ্নাকুল দৃষ্টি তুলে নীরবে শুধু তাকিয়ে থাকে সুপ্রভা।

অষ্টাবক্র বলে।—বুঝতে পার না কি ঋষিনন্দিনী, নিকট হয়েও কী কঠিন বিধান স্বীকার ক'রে কী বিপুল সংযমে শান্ত হয়ে রয়েছে তোমার ও আমার আকাঙ্ক্ষা। ভুলে যাও কেন কুমারী, তোমাকে আজও আমি স্পর্শ করিনি? ভুলে যাও কেন সুপ্রভা, এইখানে কত বার ক্ষণে ক্ষণে বনসমীরণ উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছে, কিন্তু তোমার চিরঘনসংকাশ চিকুরের চারু স্তবক আর নিবিড় নীবিতটের ক্ষীনাংশুক মেখলা কখনও উদ্‌ভ্রান্ত হয়নি? তোমার কপোলের পত্রালীর চন্দন আমার প্রণয়পেশল বক্ষের কুঙ্কুমের দিকে তাকিয়ে শুধু স্ফুরিত পুলক সহ্য করেছে, তবু স্পর্শ গ্রহণ করেনি। যেন শাতকুম্ভের কান্তি দিয়ে রচিত দুটি কুম্ভ, পুষ্পহারের সলজ্জ বন্ধনের দৃঢ়তা তুচ্ছ ক'রে ললিত লাবণ্যভঙ্গে স্তবকিত হয়ে রয়েছে তোমার অভিরাম উরজশোভার বিহ্বলতা। তবু আমার লুব্ধ বক্ষ ও বাহু দস্যু হয়ে উঠতে পারে না সুপ্রভা। এই সংযম বরণ ক'রেই তোমার ও আমার আসক্তি সুন্দর হতে পেরেছে ঋষিকুমারী।

সুপ্রভা—আপনি এই যুক্তি দিয়ে কোন্ সত্য প্রমাণ করতে চাইছেন ঋষি?

অষ্টাবক্র—তুমি আমার এবং আমি তোমার; আমার ও তোমার জীবন পরিণয়সূত্রে মিলিত হবার অধিকার পেয়েছে।

অষ্টাবক্রের ভাষণে সুপ্রভা যেন তার জীবনের এক মধুর বিশ্বাসের জয়ধ্বনি শুনতে পায়। তবু এই বিশ্বাসের আনন্দ অনুভব করতে গিয়েও যেন হঠাৎ আর-এক ক্ষীণ সংশয়ের বেদনা বাষ্পায়িত হয়ে ওঠে সুপ্রভার আয়ত নয়নের কোণে।

সুপ্রভা ব্যথিত স্বরে বলে—তবু সংশয় হয় ঋষি।

অষ্টাবক্র—বলো, কিসের সংশয়?

সুপ্রভা—বদান্যতনয়া সুপ্রভার চেয়ে সুন্দরতর অধরের নারী এই জগতে কতই তো আছে।

অষ্টাবক্র—আছে, অস্বীকার করি না সুপ্রভা।

সুপ্রভা—ভয় হয় ঋষি, আপনার এই সুন্দর আসক্তি, আপনার বাসনাবিহ্বল দুই চক্ষু যে-কোন ক্ষণে যে-কোন বিম্বাধরার মুখের দিকে তাকিয়ে লুব্ধ ও মুগ্ধ হয়ে উঠতে পারে।

অষ্টাবক্র—পারে, অস্বীকার করি না প্রিয়া।

সুপ্রভা—সব চেয়ে বড় ভয় ঋষি,

আপনারই প্রিয়াতিপ্রিয়া এই সুপ্রভার মনও ঠিক এই ভুল ক'রে ফেলতে পারে।

অষ্টাবক্র—অসম্ভব নয়।

সুপ্রভা—এত ভঙ্গুরতা দিয়ে রচিত যে আসক্তির প্রাণ, সেই আসক্তি সুন্দর হলেই বা কি আসে যায় ঋষি? স্থিরতা-বিহীন সেই আসক্তির আমাদের জীবনে' পরিণয়ের বন্ধন হতে পারে না।

অষ্টাবক্র—সুন্দর আসক্তির প্রাণ তৃণশীর্ষের শিশিরের মত ভঙ্গুর নয় সুন্দরাননা। সেই আসক্তি নিষ্ঠায় কঠিন। পৃথিবীর কোন বিম্বাধরার মুখের দিকে তাকিয়ে আমার নয়ন মুগ্ধ হলেও আমার সেই মুগ্ধ নয়ন যে তোমাকেই অন্বেষণ করবে সুপ্রভা।

জ্যোৎস্নী যামিনীর সুধাধবলিত কিরণধারায় সুধৌতদেহিনী চক্রবাকীর নয়নের মত কোমল হয়ে ওঠে সুপ্রভার স্মিতায়ত নয়ন।—তা হ'লে এই কথা বলুন ঋষি; আমি আপনার আকাঙ্ক্ষার উৎসবে প্রয়োজনের এক প্রেয়সী মাত্র।

অষ্টাবক্র—তুমি শ্রেয়সী; আমি বিশ্বাস করি, তুমিই আমার আকাঙ্ক্ষার মহত্তমা তৃপ্তি। আমার এই বিশ্বাস মিথ্যা নয় বলেই আমার জীবনে তোমাকে আপন ক'রে নেবার অধিকার আমি পেয়েছি।

পূর্ণশশিপ্রভার মত পূর্ণ এক বিশ্বাসের জ্যোৎস্না সুপ্রভার প্রীত নয়নের নীলিমায় উদ্ভাসিত হয়। সুপ্রভা বলে—এই সত্যে কোন সন্দেহ নেই ঋষি। আমার প্রশ্নের সকল কুটিলতা ক্ষমা করুন। আমার মনে আর কোন প্রশ্ন নেই।

অষ্টাবক্র হাসে।—কিন্তু আমার একটি প্রশ্ন আছে সুপ্রভা।

সুপ্রভা—বলুন।

অষ্টাবক্র—বদান্যনন্দিনী সুপ্রভাও কি বিশ্বাস করে যে, এই জগতীতলের সকল যৌবনাঢ্য সুন্দরতার মধ্যে ঋষি অষ্টাবক্রের কুঙ্কুমাঙ্কিত বক্ষ অনিন্দ্যসুন্দরা সুপ্রভারও বিপুলপীবর বক্ষোজবাসনার শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি? যদি জানি সুরামা সুপ্রভার মন এই ধরণীর যে-কোন রমণীয়-চ্ছবি মুখের দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হলেও তৃপ্ত হতে চায় শুধু অষ্টাবক্রের আলিঙ্গনে, তবেই তোমাকে আমার জীবনে আহ্বান করবার অধিকার সম্পূর্ণ হয় সুপ্রভা।

সুপ্রভা—চন্দ্রকিরণে বিমুগ্ধা হয়েও চক্রবাকী কখনও চন্দ্রমার বক্ষ অন্বেষণ করে না ঋষি, অন্বেষণ করে তার একান্তের সহচর সেই প্রিয়কান্ত চক্রবাকেরই কণ্ঠ। বিশ্বাস করুন ঋষি, আমিও এই সত্যে বিশ্বাস করি যে, আমার কেতকীমালিকার আরাধ্য আপনি, স্বপ্ন আপনি, শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি আপনি। কিন্তু......।

সুপ্রভার কেতকীবাসিত জীবনের স্বপ্নই যেন এক অন্তহীন প্রতীক্ষার শঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। কবে সমাপ্ত হবে এই ব্যাকুলতার অভিসার? কেতকী-মালিকার তৃষ্ণা কি চিরকাল এইভাবে এক রক্তপাষাণের বাধায় স্তব্ধ হয়ে থাকবে? কবে শেষ হবে কঠোর অঙ্গীকারে শাসিত এই বেদনাবহনের ব্রত?

—কিন্তু আর কতদিন ঋষি? প্রশ্ন ক'রেই সুপ্রভার অভিমানভীরু যৌবনের বেদনা হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে দুই নয়নের প্রান্তে দুটি জললবমায়া রচনা করে।

—আজই শেষ দিন সুপ্রভা। অষ্টা-বক্রের কণ্ঠস্বরে উচ্ছল এক আশ্বাসের ভাষা হর্ষায়িত হয়। মনে পড়ে সুপ্রভার, পূর্ণ হয়েছে বৎসরকাল। এবং মনে পড়তেই দই নয়নপয়োবিন্দুর বেদনা জ্যোতিরুদ্ভাসিত রত্নকণিকার মত সুস্মিত হয়ে ওঠে। আজ এই প্রভাতেই পিতা বদান্যের কাছে গিয়ে সুপ্রভার পাণি প্রার্থনা করবে সুপ্রভারই কেতকীমালিকার বাঞ্ছিত অষ্টাবক্র।

বদান্য বলেন—সুপ্রভার পাণি গ্রহণের অধিকার তোমার নেই।

অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বর হঠাৎ দুঃসহ বিস্ময়ে ব্যথিত হয়ে ওঠে—অঙ্গীকার পালন করেছি, এই সত্য জেনেও প্রার্থনা কেন প্রত্যাখ্যান করছেন মহর্ষি?

বদান্য—নিতান্তই দেহসুখ লাভের অভিলাষে ব্যাকুল হয়েছে তোমাদের উভয়েরই মন, তাই বিবাহিত হবার সংকল্প গ্রহণ করেছ তোমরা।

অষ্টাবক্র—আপনার ধারণা মিথ্যা নয় মহর্ষি।

ঈষৎ শিহরিত ভ্রূকুটি সংযত ক'রে বদান্য বলেন—এই অভিলাষকেই আসক্তি বলে ঋষি।

অষ্টাবক্র—স্বীকার করি মহর্ষি।

বদান্য—আসক্তি সত্য হলেই পরিণয় লাভের অধিকার সত্য হয় না। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পরীক্ষা সহ্য করতে পারলেও আসক্তিকে কখনও প্রেম বলে স্বীকার করতে পারি না। মানব ও মানবীর জীবন বনেচর মৃগ ও মৃগীর জীবন নয়। আসক্তি দম্পতির মিলিত জীবনের প্রকৃত বন্ধনও নয়।

অষ্টাবক্র—প্রকৃত বন্ধনেরই প্রথম গ্রন্থি।

বদান্য—সে গ্রন্থি নিতান্তই ক্ষণ-ভঙ্গুর।

অষ্টাবক্র—স্বীকার করি না মহর্ষি।

বদান্য—আসক্তির নিষ্ঠা কয়েকটি মুহূর্তের পরীক্ষায় মিথ্যা হয়ে যায়, খর নিদাঘের কয়েকটি মুহূর্তে যেমন শুষ্ক হয়ে যায় ক্ষুদ্রজল গোষ্পদ।

অষ্টাবক্র—সুন্দর আসক্তি কখনও মিথ্যা হয় না মহর্ষি।

বদান্য—কি বললে অষ্টাবক্র?

অষ্টাবক্র—ঠিকই বলেছি মহর্ষি, সুন্দর আসক্তি তপস্বীর সংকল্পেরই মত নিষ্ঠায় অবিচল। সে আসক্তি সদানীরা তটিনীর বক্ষের মত চিররসে উচ্ছল, নীলাকাশের ক্রোড়ের মত বিপুল মায়ায় অভিভূত। সে আসক্তি পরিচুম্বনচতুর বাসন্ত দ্বিরেফের মনোবাসনার মত পুষ্পে পুষ্পে অবিরল তৃপ্তির উৎসব সন্ধান করে না। সে আসক্তি সন্ধান করে তারই শ্রেয়সীকে, মহত্তমা তৃপ্তিকে। সূর্য-সুখিনী জলনলিনীর কামনা কোনক্ষণেই দিগ্‌ভ্রান্ত হয় না মহর্ষি।

অষ্টাবক্রের মুখের দিকে জ্বালালিপ্ত দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে থাকেন বদান্য। সহ্য করতে পারেন না অষ্টাবক্রের এই অবিরল হঠভাষণ। দেহজ কামনার চাঞ্চল্যে উদ্‌ভ্রান্ত এক যৌবনবানের আসক্তি যেন গর্বে আত্মহারা হয়েছে, এবং প্রলাপ

বর্ষণ ক'রে বিদ্রূপ করছে ঋষিজীবনেরই এক নীতিকে।

নীরব হয়ে বসে থাকেন, এবং ভ্রূকুটিখিন্ন ললাটের রুক্ষতাকে নিজেরই হস্তের রূঢ় স্পর্শে পিষ্ট ক'রে চিন্তা করতে থাকেন বদান্য। যেন তাঁর মনেরই গোপনের এক প্রতিজ্ঞার কঠিনতা স্পর্শ ক'রে দেখছেন। না, এই তরুণ ঋষির চিন্তার ভয়ংকর ভুল এবং সেই ভুলেরই দর্পকে আর এক পরীক্ষায় চূর্ণ ক'রে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় নেই। কী রূঢ় বিশ্বাস, মানব ও মানবীর জীবনের পতি-পত্নী সম্বন্ধের প্রকৃত বন্ধনের প্রথম গ্রন্থি হলো আসক্তি! এই হঠবিশ্বাসের দুঃসাহসে এত মুখর হয়ে উঠেছে চটুল-চিত্তক এক ঋষিযুবা, এবং সেই দুঃসাহসকেই প্রেমাভিলাষের চেয়েও পবিত্র আকাঙ্ক্ষা বলে বিশ্বাস করেছে তাঁরই কন্যা সুপ্রভা। এই মিথ্যা বিশ্বাসের কপট উজ্জ্বলতায় উদ্ভাসিত আকাশের মোহ ধূলিসাৎ না ক'রে দিলে জীবনে প্রকৃত প্রেমের পথ ওরা কখনই চিনে নিতে পারবে না।

আর এক পরীক্ষা, কিরাতরচিত লতাজালের মত নয়নরম্য ও মায়াবিকরাল পরীক্ষা। সে পরীক্ষাকে স্বয়ং মহর্ষি বদান্যই বহুদিন আগে আয়োজিত ক'রে রেখেছেন। অষ্টাবক্রের সুন্দর আসক্তির উদ্ধত নিষ্ঠা চূর্ণ করার জন্য দূরান্তরের এক নিভৃতে রচিত প্রবল ও প্রগল্ভ এক ছলনা। কেলিকুতুকিনী প্রমদার কটাক্ষে শিহরিত, অবিধিবশা অবধূর লোল প্রলোভে লসিত, অনধীনা স্বৈরিণীর শীৎকারে শ্বসিত এক জগৎ, যে জগতের একটি মুহূর্তের উন্দামতার কাছে নতশির হয়ে লুটিয়ে পড়বে যে-কোন মানবের আসক্তির নিষ্ঠা।

এখান হতে অনেক দূরে, নগাধিপ হিমবানের তুহিনধবল শৈলপ্রদেশ ও রত্নাধিপ কুবেরের অলকাপুরীর অলকা-বলীমোহিত মহীধরমালারও উত্তরে মেঘ-সন্নিভ এক রমণীয় নীলবনে বাস করে প্রবীণা উদীচী। শুক্লাম্বরা, বিবিধ রত্নাভরণে ভূষিতা, এবং অপাররঙ্গপারঙ্গমা সেই বর্ষীয়সীর নিবিড় ভ্রূভঙ্গ যেন মদনমনোন্মদ বিভ্রম ধারণ ক'রে রয়েছে। উত্তর দিগ্‌ভূমির অনল অনিল ও সলিল হতে উদ্ভূত সকল মোহ প্রতিপালনের জন্য এই নীলবনে অধিষ্ঠান গ্রহণ করেছে স্বতন্ত্রা স্ববশা ও চিরকন্যকা উদীচী। সেই নীলবনের পল্লব-মর্মরে আসক্তির সঙ্গীত, বিহঙ্গের কলরবে আসঙ্গবাসনার আহ্বান; যেন অবিরল লিপ্সার নিঃশ্বাসে উচ্ছ্বসিত দ্বিতীয় এক অনঙ্গনিকেতন পথিকনয়নে মোহ সঞ্চারের জন্য মেঘসন্নিভ নীলবনের রূপ ধারণ ক'রে রয়েছে। প্রবীণা উদীচী মহর্ষি বদান্যের অনুরোধ সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেছে। শুনেছে উদীচী, তরুণ ঋষি অষ্টাবক্র বদান্যতনয়া সুপ্রভাকে তার আকাঙ্ক্ষার শ্রেয়সী বলে বিশ্বাস করে। আসক্তির একনিষ্ঠা সম্পর্ধকণ্ঠে ঘোষণা করেছে তরুণ এক ঋষি। শুনে হাস্য সম্বরণ করতে পারেনি উদীচী। সেই ঋষির কামনাকে একটি মদবিভ্রমের আঘাতে নিষ্ঠাহীন ক'রে দিতে কতক্ষণ? বহুদিন থেকে প্রস্তুত হয়েই আছে এবং প্রতীক্ষায় দিন যাপন করছে নীলবন-চারিণী উদীচী, কবে আসবে অষ্টাবক্র? সেই ভুল স্বপ্নের স্তাবক অষ্টাবক্র?

দূর উত্তরের গগনবলয়ের দিকে দৃক্‌পাত ক'রে মহর্ষি বদান্য যেন তাঁরই সংকল্পিত পরীক্ষার মূর্তিটাকেই একবার দেখে নিলেন। একবার সেই পরীক্ষার সম্মুখীন হলে আর ফিরে আসবে না অষ্টাবক্র। উদীচীর নীলবনঘন বিভ্রম-নিলয়ের মত্তসুখের অবিরল আলিঙ্গনে চিরকালের নির্বাসন লাভ করবে এই গর্বিত ঋষিযুবার আসক্তি। এবং মূঢ়া-কন্যা সুপ্রভাও এই সত্য উপলব্ধি করবে যে, আসক্তি খলশিখ অনলের মত নিজের নিষ্ঠা নিজেই দগ্ধ করে। আসক্তিকে জীবনের এক দিব্য প্রেমাভরণ বলে মনে ক'রে যে ভুল করেছে সুপ্রভা, ভেঙ্গে যাবে সেই ভুল।

দূরান্তরের নভোপটে কুবেরগিরির ধবলিত শিখর আপন শোভায় উদ্ধত হয়ে রয়েছে, কিন্তু তারও চেয়ে যেন বেশি উদ্ধত তরুণ অষ্টাবক্রের মস্তকে ফুল্ল-মল্লিকামোদে পুলকিত ধম্মিল্লের শোভা। অষ্টাবক্রের দিকে সহেল ভ্রূকুটি নিক্ষেপ ক'রে যেন এক উদ্ধত আসক্তিরই প্রতি নীরবে ধিক্কার বর্ষণ করলেন বদান্য।

বদান্য বলেন—আমার একটি প্রস্তাব আছে অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র—আদেশ করুন মহর্ষি।

বদান্য—কুবেরগিরির উত্তরে রমণীয় এক নীলবনে বাস করেন প্রবীণা উদীচী, চিরকন্যকা উদীচী। আমার ইচ্ছা, তুমি সেই নীলবনে উদীচীর নিলয়ে কয়েকটি দিবস ও রাত্রি যাপন ক'রে ফিরে এস।

অষ্টাবক্র—তারপর মহর্ষি?

বদান্য—যে-দিনের যে-ক্ষণে তুমি ফিরে আসবে, সেই দিনেরই সেই ক্ষণে আমি কন্যা সুপ্রভাকে তোমার কাছে সম্প্রদান করবো।

অষ্টাবক্রের নয়ন চকিত হর্ষে উজ্জ্বল হয়।—আশীর্বাদ করুন মহর্ষি।

বদান্য—এখনি আশীর্বাদ আশা কর কেন অষ্টাবক্র? সম্প্রদত্তা সুপ্রভার

পরিণয়মাল্য গ্রহণ ক'রে যে-ক্ষণে আমার সম্মুখে দাঁড়াবে তোমরা দু'জনে, সেইক্ষণে তোমাদের মিলিত জীবনকে আশীর্বাদ করবো আমি, তার আগে নয়।

অষ্টাবক্র শ্রদ্ধাভিভূতস্বরে নিবেদন করে।—স্বীকার করি মহর্ষি, আপনার আশীর্বাদ গ্রহণ ক'রে সেইক্ষণে ধন্য হবে আমাদের জীবনের পরিণয়। একটি অনুরোধ, এখনি আপনার আশীর্বাদ দান না করুন, একটি প্রার্থিত বর দান করুন মহর্ষি।

বদান্য—আমার কাছ থেকে এই মুহূর্তে কোন শুভেচ্ছা আশা করো না অষ্টাবক্র, সেই অধিকার এখনও তুমি পাওনি। যে-ক্ষণে আমার আশীর্বাদ লাভ করবে তোমাদের পরিণীত জীবন, সেই-ক্ষণে আমি তোমাদেরই মিলিত জীবনের প্রার্থিত বর দান করবো, তার আগে নয় অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র—তথাস্তু মহর্ষি, আপনার এই প্রতিশ্রুতিই আমার আজিকার যাত্রা-পথের মাঙ্গল্য।

হৃষ্টমানস অষ্টাবক্র সেইক্ষণেই উত্তর দিগ্‌দেশের অভিমুখে যাত্রা করলেন। মহর্ষি বদান্যের মনে হয়, এক যৌবন-বানের গর্বান্ধ আসক্তি নূতন এক মূঢ়তার আনন্দে চঞ্চলিত হয়ে চলে যাচ্ছে। এক মূর্খ শিশু সর্পের অহংকার নিজ বিষেরই জ্বালায় উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে নকুল-বিবরের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। আর ফিরে আসবে না অষ্টাবক্র। আশ্বস্ত হয়েছেন বদান্য।

কিন্তু তারপর? আশ্রমের প্রাঙ্গণের উপর অনেকক্ষণ নীরবে দাঁড়িয়ে থাকেন বদান্য, যেন আর একটি আশ্বাসময় ছায়া খুঁজছে তাঁর তাপিত চিন্তার ক্লেশগুলি। মূঢ়া কন্যা সুপ্রভারই পরিণামের কথা চিন্তা করেন বদান্য। নয়নমোহে উদ্‌ভ্রান্তা ঐ কেতকীরেণুকুতুকিনী কুমারীও যে তার আকাঙ্ক্ষার ভুল বুঝতে পারে না। কি হবে ওর জীবনের পরিণাম?

দেখতে পেলেন বদান্য, লতাগৃহের দ্বারোপান্তে দাঁড়িয়ে নববসন্তাগমে পুলকিত বনস্থলীর দিকে মুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে আছে সুপ্রভা। শাল রসাল ও শাল্মলীর কান্তিসমারোহের দিকে তাকিয়ে একটি তৃষ্ণা যেন সুস্মিত হয়ে রয়েছে।

হ্যাঁ, উপায় আছে, মহর্ষি বদান্য দুঃখিত-চিত্তে তাঁরই চিন্তার মধ্যে আর এক পরিকল্পনা আবিষ্কার করেন। তৃষ্ণা-চারিণী নারীর সম্মুখে এমনই এক শোভাময় নয়নোৎসব এনে দিতে হবে। অন্য কোন উপায় নেই।

চলেছে অষ্টাবক্র। সিদ্ধচারণসেবিত হিমালয়ে উপস্থিত হয়ে ধর্মদায়িনী বাহুদা নদীর পূতসলিলে স্নান করে অষ্টাবক্র। তারপর ধনপতি কুবেরের কাঞ্চনময় পুরদ্বারে এসে দাঁড়ায়। গন্ধর্বের বাদিত্রনিঃস্বন আর নৃত্যপরা অপ্সরার অবিরল মঞ্জীরশিঞ্জনে মুখরিত যক্ষ-ভবনের সমাদর গ্রহণ করে। তারপর কৈলাস মন্দর ও সুমেরু, একের পর এক সমুদয় পর্বত-প্রদেশ অতিক্রম ক'রে উত্তর দিগ্‌ভূমির প্রান্তে এসে দাঁড়ায়। বিস্মিত হয়ে দেখতে পায় অষ্টাবক্র, অদূরে এক নীলচ্ছায়াঘন কাননে স্ফুট কুসুমের উৎসব যেন মত্ত হয়ে বিচিত্র বর্ণরাগচ্ছটা উৎসারিত করছে। বিহগকূজনে কম্পিত হয়েও বায়ু যেন এক যৌবনময় বনলোকের নাভি-সুরভির ভার ধারণ ক'রে মন্থর হয়ে রয়েছে।

কাননের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অষ্টাবক্র। দেখে আরও বিস্মিত হয় অষ্টাবক্র, সেই অরণ্যক্রোড়ের নিভৃতে কুবেরনিলয়ের চেয়েও দীপ্ততর রত্নপ্রভায় ভাস্বর এক নিকেতন। নিকেতনের সম্মুখে মণিভূমিনিখাত সরোবর। পার্শ্ব-দেশে মন্দাকিনীর কলনিনাদিত প্রবাহের তটরেখা মন্দারকুসুমে অলংকৃত। স্তব্ধ নিকেতনের প্রবেশপথে মুক্তাজালময় তোরণের দিকে তাকিয়ে বিস্মিত অষ্টাবক্র ডাক দেয়।—আমি অতিথি।

অষ্টাবক্রের সেই আহ্বানে যেন উদ্দীপ্ত ফণিমণিরাগের মত চমকে ওঠে সেই অদ্ভুত নিকেতনের প্রভাময় শোভা। শুনতে পায় অষ্টাবক্র, নিকেতনের নীরবতা হতে যেন হঠাৎ ঝংকার দিয়ে জেগে উঠেছে সুপ্তিবিবশ কাঞ্চী কেয়ূর আর মঞ্জীরের উল্লাস। দেখতে পায় অষ্টাবক্র, তন্বী তড়িল্লতার চেয়েও চকিতলাস্যচপলা, মন্দাকিনীর জলমালাভঙ্গিমার চেয়েও তরলতরতনুভঙ্গে ছন্দায়িতা, সান্দ্রসিন্দুর-রেণুময়ী নবোষার চেয়েও সুনিবিড়স্মি[illegible] সাতটি যৌবনবতী দেহিনী যেন অল[illegible] এক স্মরতূণীরের ভিতর হতে হঠ[illegible] উৎক্ষিপ্ত হয়ে সাতটি পুষ্পবিশিখের ম[illegible] অষ্টাবক্রের বুকের কাছে এসে লুটি[illegible] পড়েছে।

বিস্ময়ে বিমুগ্ধ অষ্টাবক্রের দুই নে[illegible] যেন বিচিত্র এক সুখের বর্ণালী নর্তি[illegible] হতে থাকে। মায়ানিকেতনবাসিনী সাত[illegible] সুযৌবনা যেন সাতটি অঙ্গমাধুরী[illegible] অধীশ্বরীর মত অষ্টাবক্রের বিস্ময়কে ধ[illegible] করার জন্য সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে অপলক নয়নে দেখতে থাকে অষ্টাবক্র।

ক্ষামকটিতটে ক্ষীণনিনাদিনী কিঙ্কিণ[illegible] যেন মণিত রণিত করে, নিধুবনোৎসুক কে এই বনিতা?

লোল প্রাগল্‌ভ্যে অভীরু ভ্রূলতা বিলোল লালসা হানে; পীনপয়োধরভারে অলসা, কে এই ললনা?

বদন যেন সুষমাসদন, মদয়িত স্মরা-মোদনিদান, বিবশ বাসনা হাসে; রাকাশশি-মুখী রুচিরময়ী কে এই নারী?

অপাঙ্গে ভঙ্গিমা ঝরে, অনঙ্গে উন্মাদ করে, আসঙ্গ আহ্বানে উন্মুখিনী, রভসরঙ্গিনী কে এই অঙ্গনা?

কিবা গ্রীবাগৌরিমা, সিতমলয়জে অভিরামা; অনুপ রূপের অনল গোপন করে, কে এই রামা?

ক্ষণ ঈক্ষণে বহ্নি শিহরে, রাতুল অধরে তনুশোণিমার স্ফার জ্যোৎস্না স্ফুরে, মুনিমনোবনে প্রা[illegible] কে এই কামিনী?

অশাসিত যৌবন অশেষ উল্লাসে লসিত করে নিঃশ্বাস, নীবিবন্ধবিহীনা বিশ্লথবেণী ব্রীড়াবরহিতা তনুকা, কে এই ভামিনী?

তরুণ ঋষির নয়নে বিস্ময়। যেন বিগলিত ইন্দ্রধনুর মায়ানুরাগে রঞ্জিত কাদম্বিনীর সুষমা ভূতলে লুটিয়ে পড়েছে, এবং সেই সঙ্গে সাতটি খর-বাসনার বিদ্যুৎ। লীলাভঙ্গে চঞ্চল সেই সাত রূপসীর অবয়বশোভার দিকে তাকিয়ে অষ্টাবক্রের বিচলিত বক্ষের নিঃশ্বাসেরই সমীর মুগ্ধ হয়ে যায়।

মণিবলয়ের চকিত ঝঙ্কারে তরুণ ঋষির দুই উৎসুক শ্রবণ নন্দিত ক'রে সাত সুন্দরী অভিবাদন জানায়।—উত্তর

...ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী উদীচীর এই ...কেতনে প্রবেশ করুন বরেণ্য।

বংশীনাদে মোহিত তরুণ কুরঙ্গের ...ত দুর্নিবার কৌতূহলে অভিভূত ...ষ্টাবক্র সাত সুন্দরীর মঞ্জীরিত চরণের ...নি অনুসরণ ক'রে নিকেতনের ভিতরে ...বেশ করে, এবং দেখতে পায়, রত্ন-...র্যঙ্কের উপরে সমাসীন হয়ে রয়েছেন ...ক্লেশ্বরা এক বর্ষীয়সী। সীমন্তে ...ন্দুরের রেখা নেই, কিন্তু বিবিধ ...ময় আভরণে বিভূষিত দেহ। দেখে ...নে হয়, প্রবীণার আভরণের মধ্যে ...গতের সকল কলধ্বনির মুখরতা যেন ...ক উৎসবের প্রতীক্ষায় উদ্বিগ্ন হয়ে ...য়েছে।

...র্ষীয়সী বলেন।—আমি চিরকুমারী ...দীচী।

...ষ্টাবক্র—আমি ঋষি অষ্টাবক্র, মহর্ষি ...দের আদেশে আপনার ভবনের অতিথি ...তে চাই।

উদীচী—আমার সৌভাগ্য। আমি ধন্য ...য়ে যদি এই ভবনের অতিথি হয়ে ...নি আমার সমাদর গ্রহণ করেন।

অষ্টাবক্র—গ্রহণ করতে চাই চির-...মারী।

উদীচী—আমি প্রীত হব ঋষি, যদি ...মার সমাদরে আপনি প্রীতি লাভ ...রেন।

অষ্টাবক্র—প্রীতি লাভ করতে ইচ্ছা ...রি উত্তরদিগ্‌দেবী।

গ্রীবাভঙ্গে ঝঙ্কৃত হয়ে, স্মিতায়ত ...ধরের স্পন্দন মুক্তাপংক্তিরও চেয়ে ...জ্জ্বল দশনরেখার মৃদু দংশনে আহত ...য়ে উদীচী বলে।—আদেশ করুন ঋষি। ...লুন, কি চায় আপনার ঐ সুন্দর নয়নের ...স্ময়? আপনার প্রীতি সম্পাদনের ...ন্য উত্তরদিগ্‌ভূমির সকল প্রীতির সুধা-...রাসিতা উদীচী আপনারই কণ্ঠস্বরের ...কটি নির্দেশ শুধু শুনতে চায়।

অষ্টাবক্রের নিমেষবিহীন দুই নেত্রের ...বিড় বিস্ময় অকস্মাৎ চঞ্চল হয়। ...বীণার দুই ভ্রূবল্লী যেন দুটি বিলোল ...লজ্জা, আসক্তিরই এক অভিনব ভঙ্গি-...নোহর রূপচ্ছবি। বর্ষীয়সীর সেই ...ভঙ্গীর মধ্যে যেন কোটি মদিরাক্ষীর ...টাক্ষপীযূষ পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে।

নীরব অষ্টাবক্রের দুই নেত্রের কৌতূহলকে চমকে দিয়ে প্রশ্ন করে উদীচী।—বলুন ঋষি, কি চায় আপনার বক্ষের অন্তরালের ঐ ঝঞ্ঝায়িত নিঃশ্বাস, পুলকাঞ্চিত কপোল আর অধীর অধর-সন্ধি?

অষ্টাবক্র বলে—ক্ষণকালের মত আপনারই সান্নিধ্য চাই।

বিভ্রমসঞ্চারিণী বর্ষীয়সীর ভ্রূকৌতুকে যেন সফল স্বপ্নের আনন্দ বিপুল হর্ষে উৎসারিত হয়। হর্ষাকুল স্বরে প্রশ্ন করেন উদীচী।—শুধু আমারই সান্নিধ্য?

অষ্টাবক্র—হ্যাঁ চিরকুমারী।

সেই মুহূর্তে সাত সুন্দরীর চরণ-মঞ্জীরের ঝঙ্কারিত ধ্বনিও যেন ব্যাধবধূ-চিত্তের উল্লাসের মত হর্ষায়িত হয়। অষ্টাবক্রের অভিভূত মুখচ্ছবির দিকে, যেন এক পাশবদ্ধ বনকুরঙ্গেরই অসহায় মূর্তির দিকে সহেলচ্ছুরিত দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে হেসে ওঠে উদীচীর অনুচারিণী সাত সুন্দরী, পর মুহূর্তে কক্ষ হতেই চলে যায়।

মণিজ্যোতিবিহ্বল মায়াভবনের একটি একান্ত, যেন জগতের সকল লোকলোচনের শাসন হতে মুক্ত একটি নিভৃত, এবং সেই নিভৃতেরই অন্তরে মীনকেতুর নূতন কেতনের মত বিজয়াবহ আনন্দে চঞ্চল হয়ে ওঠে লীলাসঙ্গচতুরা এক বর্ষীয়সীর মসীনিবিড় ভ্রূপতাকা। উদ্‌ভ্রান্তির বন্ধনে রচিত একটি সান্নিধ্য। শুধু অষ্টাবক্র ও উদীচী, আর কেউ নয়। এই নিভৃতের আকাঙ্ক্ষাকে কোন প্রশ্নের স্পর্শে ব্যথিত করতে পারে, এমন কোন ছায়াও এখানে নেই।

উদীচী বলে—আমার সান্নিধ্য পেয়েছেন ঋষি, এইবার বলুন কি অভিলাষে বিহ্বল হয়ে রয়েছে আপনার কুঙ্কুম-পিঞ্জরিত বক্ষের স্বপ্নভার?

অকস্মাৎ, যেন নিজেরই বক্ষের তপ্ত নিঃশ্বাসের আঘাতে চঞ্চল হয়ে, পাবক-তাপে উত্তাপিত শিশুভুজঙ্গেরই মত ব্যথিত হয়ে নিবেদন করে অষ্টাবক্র।—স্নানোদক চাই কুমারী।

কলোচ্ছলা স্রোতস্বতীর মত তরল-হাস্যে শিহরিত হয় উদীচীর কণ্ঠস্বর।—স্নানোদকে শীতল হতে পারবেন না ঋষি। বলুন, কি চায় আপনার জ্বালানিঃসারী নিঃশ্বাসের ঝঞ্ঝা, স্ফুর অধরের সুশোণ রৌদ্র, আর বহু কেতকীর গন্ধে পীড়িত ভুজভুজঙ্গের হিল্লোল?

নীলবনের ছায়াঘন রহস্যের কুহরে লুক্কায়িত সেই মণিময় মায়াভবনের বাহিরে নীড়াগত বিহগের ক্লান্তকূজনস্বর শোনা যায়। সন্ধ্যা হয়েছে। অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্বর শিহরিত হয়ে যেন আবেদন করে।—সন্ধ্যাপূজার জন্য আসন চাই কুমারী।

হেসে ওঠেন ঝঙ্কারময়ী উদীচী।—এই রত্নপর্যঙ্কে উপবেশন করুন ঋষি।

চমকে ওঠে অষ্টাবক্র, এবং অপলক নেত্রে তাকিয়ে থাকে। উদীচী বলে।—এই তো যথার্থ আসন। উত্তর দিগ্‌ভূমির নীলবনের ছায়ায় আবৃত এই সুখময় জগতের সন্ধ্যাবন্দনার জন্য কর্কশ কুশতৃণে রচিত আসনের প্রয়োজন হয় না ঋষি। এই জগতের সন্ধ্যাও মন্ত্র স্তব আর জপ-মালায় বন্দিত হতে চায় না।

রত্নপর্যঙ্কের উপর উপবেশন করে অষ্টাবক্র। আরও সুন্দর হয়ে ওঠে উদীচীর দুই ভ্রূবল্লীর বিলোল অলজ্জা। বর্ষীয়সী উদীচীর কজ্জলমসিমদিরা দৃষ্টিও যেন নিবিড় সমাদর বর্ষণ ক'রে অষ্টাবক্রের বিচলিত চিত্তের তৃষ্ণাকে আশ্বাস দান করছে।

বিমুগ্ধ অষ্টাবক্র। নীলবনঘন অভিনব লালসার জগতে এক মায়াভবনের মণিপ্রদীপের প্রখর দ্যুতিনখরের স্পর্শে যেন উচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে অষ্টাবক্রের সকল স্মৃতির সৌরভ। মনেও পড়ে না অষ্টাবক্রের, ত্রিলোকের কোন উপবনের লতাচ্ছায়ে সুযৌবনা এক অনুরাগিণী নারীর অভিলাষ অষ্টাবক্রেরই জন্য নয়নে

অমেয় মায়া সঞ্চিত ক'রে রেখেছে। ভুলেই গিয়েছে অষ্টাবক্র, জীবনের কোন প্রভাত-বেলায় কোন বননিভৃতের একান্তে তরুণ তপনের আলোকে শ্রেয়সীর যৌবনগরীয়সী কান্তির কল্লোলিত সুষমাকে মহত্তমা তৃপ্তি বলে চিনতে পেরেছিল অষ্টাবক্র। অষ্টাবক্রের দুই চক্ষু হতে কেতকীরেণু-বাসিত এক ভঙ্গুর স্বপ্ন যেন বর্ষীয়সী লালসাময়ীর মদির ভ্রূলাস্যের একটি কঠোর আঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে।

আর একবার চমকে ওঠে অষ্টাবক্র। উল্লাসচপল অথচ নিবিড়কোমল এবং হর্ষায়িত এক স্পর্শের উৎসব যেন হঠাৎ এসে লুটিয়ে পড়েছে অষ্টাবক্রের বুকের উপর। উদীচীর উদ্যত দুই বাহু অকস্মাৎ মত্ত হয়ে আভরণমুখর মাল্যের মত ঝংকার দিয়ে কঠিন আলিঙ্গনে গ্রহণ করেছে অষ্টাবক্রের কুঙ্কুমবাসিত কণ্ঠ, যেন গরলপ্রগল্ভা ব্যালবধূর সন্তাপিত দেহ চন্দনতরুর দেহ জড়িয়ে ধরেছে। অষ্টাবক্রের দুই চক্ষুর বিবশ বিস্ময়ের সম্মুখে শুধু ভাসতে থাকে প্রবীণা কেলিকলা-নিপুণার মসীমদির ভ্রূভঙ্গীর বিলোল অলজ্জা।

উদীচী বলে—বলো ঋষি, সকল কুণ্ঠা অপহৃত ক'রে মুক্তকণ্ঠে বলো, উত্তরদিগ্-ভূমির সুন্দর সন্ধ্যার এই মধুরক্ষণে কি চায় তোমার যৌবনাঞ্চিত জীবনের আকাঙ্ক্ষা?

অষ্টাবক্র বলে।—তৃপ্তি চায় কুমারী।

উদীচী—সে তৃপ্তি এখানেই আছে ঋষি। এই রত্নপর্যঙ্কেরই পুষ্পশয্যার কোন নিশীথবিহ্বলতার বক্ষে সে তৃপ্তিকে অবশ্যই দেখতে পাবে, প্রতীক্ষায় থাক ঋষি।

অষ্টাবক্র—প্রতীক্ষায় থাকতে পারি, কিন্তু প্রতিশ্রুতি দাও চিরকুমারী, আমার আজিকার আকাঙ্ক্ষার কাঙ্ক্ষিত তৃপ্তিকে আমার চক্ষুর সম্মুখে এনে দেবে তুমি।

কুটিল হাস্য বিচ্ছুরিত ক'রে উদীচীর অধরপুট শিহরিত হতে থাকে।—প্রতিশ্রুতি দিলাম ঋষি। কিন্তু তুমি শপথ কর ঋষি, তোমার আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তিকে সম্মুখে পেলে তাকে জীবনের চিরসহচরী ক'রে নেবে।

অষ্টাবক্র—নেব, শপথ করলাম চির-কুমারী।

দূরে উত্তরের দিগ্বলয়ে অলক বলাহকে বিভ্রাজিত আকাশপটের দিকে তাকিয়ে মহর্ষি বদান্যের দুই চক্ষুর দৃষ্টির আক্ষেপ হঠাৎ হাস্যায়িত হয়ে ওঠে। সুন্দর আসক্তির গর্বে উদ্ধত সেই অষ্টাবক্র আর ফিরে এল না। অনুমান করতে পারেন বদান্য, এতদিনে সেই হঠ-ভাষী ঋষির সুখকামুক অভিলাষের এক-নিষ্ঠা এক কজ্জলমসীমদিরার ভ্রূভঙ্গের গরলে প্রলিপ্ত হয়ে নীলবনের একান্তে নির্বাসন লাভ করেছে।

দিবসের পর রাত্রি এবং রাত্রির পর দিবস, একের পর এক বহু দিবস-রাত্রি অতীত হয়েছে। বহু কুহেলিকালসা সন্ধ্যায় পুলকবধূর বনদ্রুমদেহ হতে শিথিল মঞ্জরীর ভার ভূতলে লুটিয়ে পড়েছে। যেমন রাকেন্দুবন্দিত রজনীর, তেমনি তরুণ তপনে নন্দিত প্রভাতের রশ্মিরাশি কলস্বনা স্রোতস্বিনীর দই তটের শিশির-সিক্ত তৃণভূমির বক্ষে হেসেছে। কিন্তু সেই সুন্দর আসক্তির মানুষ, সুপ্রভার কেতকী-মালিকার স্বপ্ন সেই অষ্টাবক্র সেই বনপথে আর আসে না। শুধু আসে আর ফিরে যায় সুপ্রভা। বৃথা প্রতীক্ষায় ব্যথিত হয় কেতকীমালিকার সুরভি। কোথায় গেল, কেন গেল, এবং কবে ফিরে আসবে সুপ্রভার কামনার বাঞ্ছিত সেই কুঙ্কুমিততনু ঋষি সুকুমার? কল্পনাও করতে পারে না সুপ্রভা, এবং বুঝতেও পারে না, সেই একনিষ্ঠ অভিলাষ কেমন ক'রে তারই শ্রেয়সীর অধরসুষমা না দেখতে পেয়েও শান্তচিত্তে দূরে সরে থাকতে পারে?

বদান্যের তপোবনস্থলীর উপান্তে এক লতাবৃত কুটীরের নিভৃতে মৃদুদীপ-শিখার দিকে তাকিয়ে বিহগের সান্ধ্য কূজন শোনে সুপ্রভা। কেতকীমালিকার সুরভি সুপ্রভার চিন্তাপীড়িত নয়নেরই মত জাগরণে যামিনী যাপন করে। প্রিয়া-বিচ্ছেদশঙ্কিতা চকোরীর মত চকিতশ্বসিত বক্ষের সন্দেহহিল্লোল শান্ত করার জন্য কুটীরের দ্বারোপান্তে এসে দাঁড়ায়। সুপ্রভার সমগ্র অন্তরই যেন উৎকীর্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু বৃথা, কোন প্রিয় পদধ্বনি, কোন গুঞ্জন, মৃদুতম কোন মর্মরও শোনা যায় না। কুঙ্কুমাঙ্কিত কোন বক্ষের বিহ্বল নিঃশ্বাস বদান্যতনয়ার কবরী-সৌরভ অন্বেষণের জন্য মৃদুল নিঃস্বন সঞ্চারিত ক'রে লতা-গৃহের দিকে আসে না।

অষ্টাবক্রের রহস্যময় অন্তর্ধান সুপ্রভার সকলক্ষণের ভাবনার আকাশে যেন এক মেঘমেদুরতা ঘনিয়ে রেখেছে। সবই সহ্য করতে পারে সুপ্রভা, শুধু সহ্য করতে পারে না একটি সংশয়। তীক্ষ্ণমুখ কুশসায়কের মত সেই সংশয় যখন সুপ্রভার কল্পনাকে বিদ্ধ করে, তখনই সবচেয়ে বেশি বিচলিত হয় সুপ্রভার অন্তরের প্রশান্তি। মনে হয়, সুন্দর অথচ কপট এক আসক্তির হঠভাষিত প্রতিশ্রুতি নিষ্ঠুর বিদ্রূপে সুপ্রভার কণ্ঠের কেতকীকে তুচ্ছ ক'রে চলে গিয়েছে। নয়নোপান্তে অদ্ভুত এক জ্বালাময় সিক্ততা অনুভব করে সুপ্রভা। মনে হয়,

অশ্রু নয়, তারই যৌবনের প্রথম অনুরাগে উদ্দীপ্ত বিশ্বাস যেন নিষ্ঠাহীন এক পৌরুষের চটুল কৌতুকলীলার আঘাতে মথিত হয়ে রুধিরবিন্দুর মত ফুটে উঠেছে।

এইভাবেই প্রতিক্ষণ সংশয়খিন্ন ভাবনার ভার নীরবে সহ্য ক'রে, আর সুপ্তিহীন নয়নের কৌতূহল নিয়ে প্রতি নিশান্তের আকাশে ও বনতরুশিরে নবোষার অরুণিত সঞ্চার লক্ষ্য করে সুপ্রভা। দীপ নিভিয়ে দেয়, স্নান সমাপন করে। পুষ্পে ও পরাগে প্রসাধিত তনুতে যেন এক নূতন আশার আবেশ ভরে ওঠে। বন-নিভৃতের এক রক্তপাষাণের নিকটে এসে দাঁড়ায় সুপ্রভা। দেখতে পায়, রক্তপাষাণের বক্ষের উপর কোমল দ্রুমমঞ্জরীর পুঞ্জ ছিন্নভিন্ন হয়ে রয়েছে, যেন পদাঘাতপীড়িত এক বাসকশয্যা। আসেনি অষ্টাবক্র, কে জানে ত্রিজগতের কোন্ বনলোকের নিভৃতে কোন্ স্রোতস্বিনীর কাছে এখন তৃষ্ণার্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সেই আসক্তির পুরুষ অষ্টাবক্র?

চলে যায় সুপ্রভা, এবং এক নিশান্তে লতাগৃহের দীপ নিভিয়ে দিয়েও চুপ করে বসে থাকে। ব্যর্থ অভিসারে শুধু চরণ ক্লান্ত ক'রে আর লাভ কি? অতনুতাপিত তনুর দুর্ধর তৃষ্ণা অধরে ধারণ করে ঐ রক্তপাষাণের কাছে ছুটে যাবার আর কিবা প্রয়োজন? সুপ্রভা যেন কল্পনায় তারই হতমান আকাঙ্ক্ষার শোণিম বেদনার দিকে অমেয় মায়ায় অভিভূত নয়নের করুণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে। মনে হয়, ব্যর্থ অভিসারে আহত তার যৌবনময় জীবনই যেন অধঃপতিত জ্যোৎস্নার মত ধূলিপুঞ্জের উপর পড়ে রয়েছে।

যেন এই অবহেলারই ধূলিময় মালিন্য হতে মুক্ত হবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে সুপ্রভার মন। আকাশের শেষ তারকা নিভেছে, বনতরুশিরে প্রভাময় ঊষাভাস দেখা দিয়েছে। স্নিগ্ধ স্নানোদকের জন্য অস্থির হয়ে ওঠে সুপ্রভার তাপিত দেহের তৃষ্ণাগুলি। লতাগৃহ হতে বের হয়ে আশ্রম-তড়াগের নিকটে এসে দাঁড়ায় সুপ্রভা।

তড়াগসলিলে দেহ নিমজ্জিত ক'রে স্নান করে সুপ্রভা। সুতনুকা সুপ্রভার অনাবরণ অঙ্গশোভা যেন মৃণালবন্ধনচ্যুত স্ফুট কোকনদের মত সলিলের শীতল সিক্ততায় লিপ্ত হয়ে তড়াগের বক্ষে হিল্লোলিত হতে থাকে। অকস্মাৎ চমকে ওঠে সুপ্রভা, দুই নেত্রে যেন নূতন এক বিস্ময়ে বিকশিত কৌতূহল অপলক হয়ে তড়াগতটের পুষ্পময় বীথিকার দিকে তাকিয়ে থাকে।

নবপ্রভাতের তরুণ আলোকে অরুণিত তটবীথিকায় পথিকের মূর্তি দেখা যায়। একজন নয়, দুই জনও নয়। অনেক জন। একে একে আসে আর আশ্রমস্থলীর প্রাঙ্গণের দিকে চলে যায়। সুন্দরদর্শন এক এক জন ঋষিযুবা। দেখতে পায় সুপ্রভা, কোন আগন্তুকের কপোলমণ্ডল যেন ঊষালোকে লিপ্ত ঐ পূর্বাকাশেরই মত নবীনযৌবনরাগে উদ্ভাসিত। কোন জনের বিশাল বক্ষঃপটে রক্তচন্দনের আলিম্পন, যেন পুষ্পহাস শাল্মলীর কান্তিচ্ছটা রম্যতর আশ্রয় লাভের লোভে সেই উন্নতকায় ঋষিযুবার বক্ষের উপর এসে লুটিয়ে পড়েছে। ইন্দীবরবিনিন্দিত দুই নীলনিবিড় নয়নে কী নম্র কামনার কল্লোল, কে ঐ তরুণ ঋষি? কুসুমস্রগাসক্ত কণ্ঠ আর স্মিত দশনদ্যুতি নিয়ে চলে যায় কে ঐ পুরুষবর, ঋতুরাজনীরাজিত রতিরাজোপম সুকান্ত?

সলিললীন দেহের স্নানোৎসুক চাঞ্চল্য সংযত ক'রে তড়াগকমলের মৃণাল আলিঙ্গন করে সুপ্রভা, যেন হিল্লোলিত কোকনদের প্রাণ এক আকস্মিক বিস্ময়ে বিবশ হয়ে গিয়েছে। কমলবনের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কমলাননা ঋষিকুমারী যেন সূর্যালোকিত এক স্বপ্নের দিকে তাকিয়ে আছে। মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে এক তৃষ্ণার কুসুম। কিংবা, সুপ্রভার সিক্তোজ্জ্বল ঐ দুই আভাময় নয়ন যেন যামিনীচারিণী এক চকোরীর চক্ষু, চন্দ্রালোকে লিপ্ত আকাশের দিকে তাকিয়ে তার বক্ষেরই উষ্ণশ্বাসময় অথচ মধুরায়িত এক বেদনার উৎসব লক্ষ্য করছে। দুঃসহ এই বেদনা, যেন স্ফুট কোকনদের সৌরভময় আকাঙ্ক্ষারই বক্ষে এক তৃষ্ণাকুল ঝঞ্ঝানিলের নিঃস্বন সঞ্চারিত হয়েছে।

অনেকক্ষণ, সুপ্রভার দেহ-মন যেন এক স্বপ্নেরই মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে থাকে। তারপর হঠাৎ দেখতে পায়, জনহীন হয়ে গিয়েছে তটবীথিকা। নূতন এক বিস্ময় ও বিমুগ্ধতার ভার বক্ষে বহন ক'রে লতাগৃহের দিকে ফিরে যায় সুপ্রভা।

—প্রস্তুত হও কন্যা।

লতাগৃহের দ্বারোপান্তে এসে আর-এক আকস্মিক রহস্যেরই আহ্বানে চমকে ওঠে সুপ্রভা। প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছেন মহর্ষি বদান্য; বলেন—প্রস্তুত হও সুপ্রভা, তুমি আজ পতি বরণ ক'রে ধন্য হবে। এই প্রভাতের শুভক্ষণে তোমারই জন্য স্বয়ংবর-সভা আহূত হয়েছে। জ্ঞানী গুণী ও প্রিয়দর্শন বহু ঋষিযুবা আমারই আহ্বানে আশ্রমোপবনে সমবেত হয়েছেন।

সুপ্রভার বিস্মিত ও বিমুগ্ধ নয়নের তৃষ্ণালস দৃষ্টি চকিত তড়িল্লেখার মত ক্ষণলাস্যে দীপ্ত হয়ে পরক্ষণেই সলজ্জ ঘনপক্ষ্মভারে অবনত হয়। মহর্ষি বদান্যের নেত্রে ফুটে ওঠে বিচিত্র এক
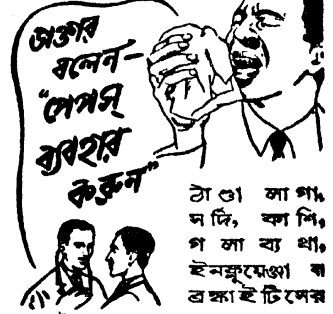
শ্লেষের ছায়া। সুপ্রভার উৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে এই সত্যই দেখছিলেন বদান্য, আসক্তির কেতকীও কেমন ক'রে আর কত সহজে নিষ্ঠা হারায়। জয়ী হয়েছে মহর্ষির চিন্তারই সেই রক্তপাষাণ-সদৃশ কঠিন তত্ত্ব, আসক্তি কখনই একনিষ্ঠা স্বীকার করে না।

কেতকীমালিকা হাতে তুলে নিয়ে প্রস্তুত হয়েছে সুপ্রভা। বনস্পতিময় উপবনের কাছে গিয়ে প্রিয়দেহ সন্ধানের জন্য আগ্রহের শিহর সহ্য করছে এক যৌবনবতীর দেহলতিকা। বনমৃগীরই মত শুধু দেহজ অভিলাষের আবেশে জীবনসঙ্গী বরণ করার জন্য উৎসুক হয়ে উঠেছে এক ঋষিতনয়ার চিত্ত। দুঃখিত হন বদান্য, ঋষির আশ্রমের শিক্ষায় লালিত হয়েও প্রেম ও অপ্রেমের প্রভেদ অনুভব করবার মত মনের অধিকারিণী হতে পারেনি তাঁর কন্যা। মনোময়ী নয়, নিতান্তই এক নয়নময়ী। যার মুখ দেখে মুগ্ধ হয় নয়ন, তারই কণ্ঠে দান করে জীবনের বরমাল্য।

দুঃখিত হয়েও চিন্তার গভীরে একটি হর্ষের সঞ্চারও অনুভব করছিলেন বদান্য। আসক্তি কখনও একনিষ্ঠা স্বীকার করে না, এই সত্য আজ স্বীকার করবে সুপ্রভা। সুপ্রভার জীবনের একটি মিথ্যা বিশ্বাসের মোহ সুপ্রভা আজ নিজের হাতেই চূর্ণ ক'রে দিতে চলেছে। আর সময় নেই, শুভলগ্ন উপস্থিত। বদান্য বল্লেন।—এস কন্যা।

মরালীর মত মৃদুলগতি, অথচ নয়নে খঞ্জনবধূর লোচনচঞ্চলতা, সুপ্রভা ধীর-সঞ্চারিত চরণে মহর্ষি বদান্যের ছায়া অনুসরণ ক'রে স্বয়ংবরসভার দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। কেতকীমালিকার সুরভিত ও বিমুগ্ধ তৃষ্ণা তৃপ্তি লাভের জন্য নূতন এক জগতের দিকে চলেছে।

নীলবনের মায়াভবনের মণিদীপিত কক্ষে রত্নপর্যঙ্কের উপর নিদ্রাভিভূত ঋষি অষ্টাবক্র। বাহিরে নিবিড় সন্তামসী রাত্রির অন্ধকার। পিকরবের শেষ ঝঙ্কারও ক্লান্ত হয়ে নীলবনের অন্ধকারে সুপ্তিময় স্তব্ধতার মধ্যে নীরব হয়ে গিয়েছে। কিন্তু সুপ্ত অষ্টাবক্র যেন এক জ্যোৎস্নাময় উপবনের শোভা দেখছে, আর শুনছে মধুর পিকধ্বনির সঙ্গীত। বক্ষঃপুটে সঞ্চিত সকল কামনার পরাগ, ধমনীধারার উচ্ছলিত সকল অনুরাগের শোণিমা এবং নিঃশ্বাসে আকুলিত সকল তৃষ্ণার সমীর যেন তৃপ্তি-রসরভসা এক অধরশোভাকে নিকটে পেয়েছে। দেখছে অষ্টাবক্র, চঞ্চল দক্ষিণ-সমীর প্রবল কৌতুকে শিথিলিত করেছে এক নিবিড় নীবিতটের নীলাংশুক মেখলা। এক ক্ষামকটিবতী বেপথুভঙ্গার বিগলিত বেণীবন্ধন। বহলচিকুরচ্ছায়ার ও বিপুলনয়নমায়ার এক উচ্ছ্বাসময়ী ছবি। সে নারীর পুষ্পহারের সলজ্জদৃঢ় শাসন দীর্ণ হয়ে গিয়েছে, সুশান্ত অভিসার-চারিণীর বক্ষোজ বাসনা যেন সুপীন বিহ্বলতা উৎসারিত ক'রে উৎসবের উৎসর্গ হবার জন্য উৎসুক হয়ে অষ্টাবক্রের বুকের কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। অষ্টাবক্রের স্বপ্নই সুরভিত হয়ে গিয়েছে। কি আশ্চর্য, সেই সুরভি এক কেতকী-মালিকারই সুরভি। অষ্টাবক্রের আকাঙ্ক্ষার মহত্তমা তৃপ্তি। সেই তৃপ্তিকে বক্ষোলগ্ন করার জন্য সাগ্রহে বাহু প্রসারিত করে অষ্টাবক্র। ভেঙে যায় স্বপ্নের আবেশ, চমকে জেগে ওঠে অষ্টাবক্র।

সেই মুহূর্তে এক হাস্যধারার সুস্বর-ধ্বনি ঝঙ্কার দিয়ে বেজে ওঠে।—আমি এসেছি ঋষি।

—কে তুমি? বিস্ময়ে কম্পিতকণ্ঠ অষ্টাবক্র প্রশ্ন ক'রেই দেখতে পায়, রত্ন-পর্যঙ্কের উপর তারই বক্ষের সান্নিধ্যে এসে বসে রয়েছেন উদীচী। বর্ষীয়সীর মূর্তি নয়, যৌবনরুচিরা ও সুচারুদেহিনী এক নবীনার নয়নমনোহারিণী মূর্তি। সেই ঝঙ্কারমুখর মণিময় আভরণের ভা[র] যেন ঝরে পড়ে গিয়েছে। তড়িল্লতারই ম[ত] নিরাভরণা এক সুন্দর বাহির লতিক[া] অনাবরণ তরুণতনুর লাস্য স্ফুরিত ক'[রে] অষ্টাবক্রের বুকের কাছে এসে লুটিয়ে পড়েছে। যেন খরকামনারই এক সুবর্ণ কশা।

—তুমি উদীচী? অষ্টাবক্রের কণ্ঠস্ব[র] আহত স্বপ্নেরই বেদনা কম্পিত হ[য়ে] থাকে।

—হ্যাঁ ঋষি, আমিই তোমার তৃপ্তি[...] অষ্টাবক্রের মুখের দিকে নয়নকিরণ বর্ষ[ণ] করে নীলবনের মায়া দিয়ে রচিত কামন[া]ময়ী তরুণী।

অষ্টাবক্র বলে! মিথ্যা বিশ্বা[সে] উদ্‌ভ্রান্ত হয়েছ উদীচী। তুমি আম[ার] তৃপ্তি হতে পার না।

উদীচীর খরনয়নের হর্ষ হঠাৎ আহ[ত] হয়।—সত্য স্বীকার কর ঋষি। তোমার তৃষ্ণাকাতর দুই চক্ষুর দৃষ্টি আমার এ[ই] দেহচ্ছবির দিকে নিবন্ধ ক'রে বল দে[খি] ঋষি, বিচলিত হয় না কি তোমার আসক্তি-ময় বক্ষের নিঃশ্বাস?

অষ্টাবক্র—বিচলিত হয়, অস্বীকার করি না উদীচী।

উদীচী—মুগ্ধ হয় না কি ঋষি?

অষ্টাবক্র—মুগ্ধ হয়, স্বীকার ক[রি] উদীচী। কিন্তু আমার এই বিচলি[ত] নিঃশ্বাসের তৃপ্তি তুমি নও। আমার এ[ই] বিমুগ্ধ চিত্তের তৃপ্তি তুমি নও। আমা[র] তৃপ্তি কেতকীরেণুপরিমলে সুরভিত হ[য়ে] আমারই প্রতীক্ষায় এই জগতের এ[ক] আশ্রমস্থলীর লতাবৃত কুটীরের নিভৃতে রয়েছে।

উদীচী—কে সে?

অষ্টাবক্র—মহর্ষি বদান্যের কন্যা সুপ্রভা।

উদীচী—সে কি এই উদীচীর চেয়ে[...]

ন্দরতর অধরের, মদিরতর ভ্রূভংগের ার খরতর নয়নপ্রভার নারী?

অষ্টাবক্র—না উদীচী, তবু এই সত্য তোমারই নীলবনঘন মায়ালোকের এই দীপ্ত ভবনের কক্ষে, তোমারই সমাদরে কামলীকৃত এই রক্তপর্যঙ্কে সুশয়ান ক স্বপ্নময় অনুভবের মধ্যে উপলব্ধি রেছি, সেই বদান্যকন্যা সুপ্রভাই আমার াকাঙ্ক্ষার মহত্তমা তৃপ্তি!

উদীচীর দৃষ্টি যেন বাহ্যু উৎসারিত রে।—আমি অতৃপ্ত?

অষ্টাবক্র—তুমি বান্ধবী।

অকস্মাৎ কম্র বিস্ময়ে নম্র হয় উদীচীর দৃষ্টি—কি বললে ঋষি?

অষ্টাবক্র—তৃষ্ণাকে তৃষ্ণায়িত কর, বাসনাকে দাও বহ্নি, অয়ি কৌলিকটাক্ষ-লক্ষ্মী তন্বী, তুমি মনোভব ভবনের শরদ্যুতিময়ী দীপ্তি। কামিজনচিত্ত কর পুলকিত বিপুল মধুর হর্ষে, তুমি ভুজংগময়ী প্রীতি। অভিলাষে কর উল্লসিত, নিঃশ্বাসে দাও ঝঞ্ঝা, তুমি মদবিলসিত উৎসব। তোমারই সমাদরে নিমন্ত্রিত আমার স্বপ্ন কেতকীরেণুর সুরভি বক্ষে ধারণ করার জন্য বাহু সারিত করেছে। ব্যাকুল করেছ, বিহ্বল রেছ, স্মিত জ্যোৎস্না ঝরিয়ে আমার নিবিড় নয়নপথে তুমিই তাকে ডেকে এনে চিনিয়ে দিয়েছ, যে আমার আসক্তির উপাসনা, মহত্তমা তৃপ্তি, শ্রেয়সী। তুমি বান্ধবী, অষ্টাবক্রের কৃতজ্ঞ অন্তরের শ্রদ্ধা গ্রহণ কর উদীচী।

উদীচীর দুই নয়নের পক্ষপল্লবে যেন কুহেলিকাপীড়িত এক শীতসন্ধ্যার বেদনা শিশির সঞ্চারিত করে। উদীচী বলে।—নীলবনলোকের এই চিরকুমারীকে যদি বান্ধবী বলে মনে ক'রে থাক ঋষি, তবে তাকে জীবনের চিরসঙ্গিনী ক'রে নাও। তোমাকে পতিরূপে বরণ করুক উদীচী।

অষ্টাবক্র—তা হয় না, ক্ষমা কর উদীচী।

উদীচীর কণ্ঠস্বর তীব্র আর্তনাদের মত বেজে ওঠে।—তোমার আসক্তিময় বক্ষের কঠিন নিষ্ঠার নিষ্ঠুরতা অন্তত এই মুহূর্তে বর্জন কর ঋষি, ক্ষণকালের প্রিয়ারূপে গ্রহণ কর উদীচীকে। তার পরে চলে যেও যেথা যেতে চায় তোমার আকাঙ্ক্ষা, আশ্রমবাসিনী সেই সুপ্রভাময়ী এক অমেয় মায়ার পূর্ণিমার কাছে।

অষ্টাবক্র—অসম্ভব, ক্ষমা কর, বিদায় দাও বান্ধবী।

—যাও! জ্বালাধ্বনির মত তীব্রস্বরে যেন ধিক্কার দিয়ে সরে যায় খরকামনার সুবর্ণকশা।

নীরবে এবং মাথা নত ক'রে চলেই যাচ্ছিল অষ্টাবক্র। কক্ষের অবারিত দ্বারের প্রান্তে এসে দাঁড়াতেই, পিছন হতে যেন চমকে ওঠে একটি অনুরোধ।—একবার থাম ঋষি।

দেখে বিস্ময় অনুভব করে অষ্টাবক্র, দাঁড়িয়ে আছে উদীচী, এক শান্তা স্নিগ্ধা স্মিতরুদিতার মূর্তি। প্রখর-প্রগল্‌ভা অলজ্জার মূর্তি নয়, যেন হিমবায়ুলাঞ্ছিতা এক বনলতিকা। নতমুখিনী উদীচীর কপোলে অশ্রুসলিলের রেখা। যেন অমল ধারাসলিলে গলে গিয়েছে সেই কজ্জল-মসিমদির ভ্রূভংগী।

অষ্টাবক্রের বিস্ময়কেই বিস্মিত ক'রে হেসে ওঠে উদীচী—ব্যথিত হয়ো না ঋষি, উদীচীর এই নয়নবারি বেদনার অশ্রু নয়, আনন্দেরই অশ্রু।

অষ্টাবক্র—আনন্দ?

উদীচী—হ্যাঁ ঋষি, জীবনে এই প্রথম নিষ্ঠায় সুন্দর এক আসক্তির কাছে পরাভূত হয়েছে নীলবনলোকের এক লালসাময়ীর অনিষ্ঠা। আমি তোমার পরীক্ষা।

অষ্টাবক্র—তুমি আমার শিক্ষা।

উদীচী—জয়ী তুমি।

অষ্টাবক্র—জয়দাত্রী তুমি।

জাগ্রত বিহগের ক্ষীণস্ফুট কলরব শোনা যায়। শেষ হয়েছে সন্তামসী রাত্রি। কক্ষের অবারিত দ্বারপথ অতিক্রম ক'রে বনপথের উপরে এসে দাঁড়ায় অষ্টাবক্র; এবং দূর দক্ষিণের গগনবলয়ের দিকে নেত্র সম্পাত ক'রে পথ অতিক্রম করতে থাকেন।

কার কণ্ঠে মাল্য দান করবে সুপ্রভা? শত প্রিয়দর্শনের মধ্যে প্রিয়তম বলে মনে হয় কার মুখ? কার কণ্ঠলগ্ন হলে তৃপ্ত হবে সুপ্রভা? কেতকীমালিকার সুরভিত স্পৃহা?

শুভক্ষণ উপস্থিত। স্বয়ংবর-সভায় পাণিপ্রার্থী বহু ঋষিযুবার সমাবেশ। যেন শত তরুণ তরুবরের বরতনুশোভায় বিনোদিত বাসন্ত প্রভাতের এক উপবন। সুপ্রভার কেতকীমালিকার সুরভিত স্পর্শ কণ্ঠাসক্ত করার জন্য বিচলিত চিত্তের আগ্রহ সহ্য করছে প্রবল পৌরুষে পেশল শত অভিলাষ। সেই শোভার দিকে তাকিয়ে মুগ্ধ হয়ে যায় বদান্যকন্যা সুপ্রভার নেত্রোত্থিত হর্ষ।

তবু স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সুপ্রভা। তার মুগ্ধ নয়নের দৃষ্টি হঠাৎ এক স্বপ্নের আবেশে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছে। সুপ্রভার কবরী কপোল আর অধরের উপর যেন কুঙ্কুমবাসিত একটি বক্ষ হতে তরঙ্গিত বাসনার নিঃশ্বাস এসে লুটিয়ে পড়ছে। সুপ্রভার স্বপ্নেরই বক্ষে ঝরে পড়ছে মৃগমদমোদিত কুঙ্কুমের উৎসব। কেতকীমালিকার উৎসারিত পিপাসার সুরভি তার পরমা তৃপ্তিকে বক্ষের নিকটে পেয়েছে! অষ্টাবক্র, আর কেউ নয়, মল্লিকা-পুলকিত ধম্মিল্লের গুরুগৌরবে গরীয়ান্ সেই অষ্টাবক্রেরই মূর্তি যেন ঋজুকান্ত বনস্পতির মত কামনাবিধুরা এক মাধবী-লতিকার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। এই তো সুপ্রভার যৌবনের সকল আকাঙ্ক্ষার উপাস্য, শ্রেষ্ঠ তৃপ্তি। সেই তৃপ্তিরই কণ্ঠে বরমাল্য অর্পণের জন্য সাগ্রহে বাহু প্রসারিত করে সুপ্রভা। ভেঙ্গে যায় স্বপ্নময় আবেশ। স্বয়ংবর

সভা হতে ছুটে চলে যায় সুপ্রভা, দাবানলভীতা মৃগবধূ যেমন কাননের লতাজাল ছিন্ন ক'রে ছুটে চলে যায়।

লতাগৃহের নিভৃতে ফিরে এসে কেতকীমালিকার উপর অশ্রুসিক্ত নয়নের চুম্বন অঙ্কিত ক'রে যেন ক্ষণোদ্‌ভ্রান্ত নয়নেরই জ্বালাকে শান্ত করতে চেষ্টা করে সুপ্রভা। কিন্তু হঠাৎ বাধায় ব্যথিতভাবে চমকে ওঠে। শান্ত লতাগৃহের নীরবতাকে চূর্ণ ক'রে মহির্ষ বদান্যের ভর্ৎসনা গর্জিত হয়।—এ কেমন আচরণ সুপ্রভা? আমারই ইচ্ছায় আহূত স্বয়ংবরসভাকে এইভাবে অপমানিত কেন করলে রীতিদ্রোহিণী কন্যা?

সুপ্রভা— ক্ষমা করুন পিতা, আমার জীবনে স্বয়ংবরসভার কোন প্রয়োজন নেই।

বদান্য—কেন?

সুপ্রভা—আমার কেতকীমালিকা জানে, কে আমার জীবনের সহচর হলে সবচেয়ে বেশি সুখী হবে আমার জীবন।

বদান্য—কে সে?

সুপ্রভা—আপনি জানেন পিতা, তার নাম অষ্টাবক্র।

তবু তারই নাম! বিস্মিত বদান্যের চিরকালের বিশ্বাসে কঠিন সেই তত্ত্বেরই গর্ব যেন কুলিশকঠোর একটি আঘাতে শিহরিত হতে থাকে। সেই অষ্টাবক্রেরই নাম উচ্চারণ করছে সুপ্রভা। নিতান্তই দেহজ অভিলাষে ব্যাকুল এক কেতকীমালিকার সৌরভে কি এতই নিষ্ঠার গৌরব থাকতে পারে?

বদান্যের ভর্ৎসনাময় ভ্রূকুটি হঠাৎ নীরবে হেসে ওঠে। জানে না সুপ্রভা, তার কেতকীমালিকার কামনার আস্পদ সেই অষ্টাবক্রের আসক্তির নিষ্ঠা যে এতক্ষণে নীলবনচারিণী এক লালসাময়ীর ঘনমসিময় ভ্রূভঙ্গের আঘাতে চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। কল্পনাও করতে পারে না সুপ্রভা, কেতকীমালিকার আশা মিথ্যা হয়ে এক দুঃস্বপ্নের জগতে মিলিয়ে গিয়েছে। সুপ্রভার কামনার এই নিষ্ঠা নিষ্ঠাই নয়, কঠিন মোহ মাত্র। সত্য অবহিত হলে এই কঠিন মোহ এখনি আর্তনাদ করে ভেঙ্গে যাবে।

বদান্য বলেন।—শোন কন্যা, তোমার মোহাবিমূঢ় নয়নতৃষ্ণার বাঞ্ছিত সেই অষ্টাবক্র এখন এক বর্ষীয়সী স্বৈরিণীর বিলাসলীলার বান্ধব হয়ে উত্তরদিগ্‌ভূমির নীলবনের নিভৃতে এক মায়াভবনের কক্ষে দিবস ও রাত্রি যাপন করছে। সে আর ফিরে আসবে না, ফিরে আসবার সাধ্য তার নেই।

—পিতা! সুপ্রভার কণ্ঠ ভেদ ক'রে করুণ আর্তনাদ উৎসারিত হয়, যেন অকস্মাৎ এক কিরাতের বিষসায়ক ছুটে এসে বিদ্ধ করেছে বনমৃগীর হৃৎপিণ্ড।

পর মুহূর্তে, বনমৃগীরই বাষ্পমেদুরিত করুণ নয়নের দৃষ্টি স্মিতহাস্যে উদ্ভাসিত হয় এবং মহর্ষি বদান্যের ভ্রূকুটি অকস্মাৎ এক বিস্ময়ের আঘাতে যেন নীরবে আর্তনাদ ক'রে ওঠে। লতাগৃহের দ্বারোপান্তে এসে দাঁড়িয়েছে এক আগন্তুক, মস্তকে মল্লিকামোদিত ধম্মিলের সেই উদ্ধত শোভা অনাহত, তরুণ ঋষি অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্রের স্মিতোৎফুল্ল মুখের দিকে তাকিয়ে বিস্ময়ে বিমূঢ় দুই অপলক চক্ষু তুলে সত্যই দেখতে থাকেন বদান্য, তাঁর এতদিনের বিশ্বাসের কঠিন তত্ত্ব মিথ্যা হয়ে গিয়েছে। সত্যই জয়ী হয়ে ফিরে আসতে পেরেছে এক আসক্তির গর্ব। সত্যই পরাভূত হয়েছে নীলবনের সন্তামসী রাত্রির মসী। সত্যই তপস্বীর তপস্যার মত অবিচল নিষ্ঠায় কঠিন এই আসক্তি। সত্যই সুন্দর এই আসক্তি। কিন্তু......।

কিন্তু এই আসক্তি কি সত্যই প্রণয়ের প্রথম সঙ্কেত, পতি-পত্নী সম্বন্ধের প্রথম হেতু, মিলনের প্রথম গ্রন্থি? মহর্ষি বদান্যের নেত্রে আর একটি কঠিন প্রতিজ্ঞার ছায়া দেখা যায়। যেন শেষবারের মত নির্মমতম এক পরীক্ষায় তাঁর এতদিনের বিশ্বাসের বক্ষ বিদীর্ণ ক'রে দেখতে ইচ্ছা করছেন বদান্য, সে বিশ্বাস সত্য না মিথ্যা। জানতে ইচ্ছা করছেন, দেহজ অভিলাষের সৌরভের মত ঐ আসক্তিরই বক্ষে কোন সত্যের গৌরব আছে কি না-আছে।

মহর্ষি বদান্য বলেন।—স্বীকার করি অষ্টাবক্র, সুপ্রভার পাণি গ্রহণের অধিকার তুমি পেয়েছে। এবং আমার প্রতিশ্রুতিও স্মরণ করি, সুপ্রভাকে তোমারই কাছে এই ক্ষণে সম্প্রদান করতে চাই।

স্নিগ্ধ এক হর্ষের জ্যোৎস্না ফুটে ওঠে সুপ্রভা ও অষ্টাবক্রের নয়নে। মহর্ষি বদান্যের সম্মুখে এগিয়ে আসে প্রীতিভা বিনত দুটি মূর্তি।

মহর্ষি বদান্য বলেন।—কিন্তু তোমা আর একটি প্রতিশ্রুতির কথা তোমা স্মরণ করিয়ে দিতে চাই অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র—বলুন মহর্ষি।

বদান্য—তোমরা আমার মন্ত্রসংস্ক পরিণীত হবার পর আমার আশীব গ্রহণ করে ধন্য হবে।

অষ্টাবক্র—অবশ্যই গ্রহণ করবো ও ধন্য হবো মহর্ষি।

বদান্য—কল্পনা করতে পার, আশীর্বাদ আমি দান করতে চাই?

অষ্টাবক্র—পারি না মহর্ষি।

বদান্য—আমি এই আশীর্বাদ দি চাই, তোমাদের দেহ মন ও প্রাণ হ আসক্তির শেষ লেশও লুপ্ত হয়ে যাব বল, প্রস্তুত আছ, গ্রহণ করবে ... আশীর্বাদ?

—মহর্ষি! অষ্টাবক্রের কণ্ঠে অভিশাপভীরু শঙ্কিতের সন্ত্রস্ত কণ্ঠস্বর শিউরে ওঠে। শিউরে ওঠে সুপ্রভার শান্ত কবরীভার, যেন তার সীমন্তেরই উপর দংশন দানের জন্য ফণা উদ্যত করেছে এক দুর্ভাগ্যের ভুজঙ্গ।

বদান্য বলেন—প্রতিশ্রুতির অবমাননা করতে চাও অষ্টাবক্র?

অষ্টাবক্র—চাই না মহর্ষি কিন্তু এ কেমন আশীর্বাদ? আপনি ভুল ক'রে আশীর্বাদের নামে অভিশাপ দান করতে চাইছেন। আপনার কাছ থেকে অভিশাপ গ্রহণ করবো, এমন প্রতিশ্রুতি আমি আপনাকে দান করিনি মহর্ষি।

বদান্য—তুমি বুঝতে ভুল করছো অষ্টাবক্র।

অষ্টাবক্র—আমার ভুল বুঝতে পারছি না মহর্ষি। আমি জানি অপরের জীবনে সুখ ও কল্যাণ আহ্বান করে যে বাণী, সেই বাণীই হলো আশীর্বাণী। কারও জীবনকে অসুখী করবার জন্য যে বাণী উচ্চারিত হয়, সে বাণী আশীর্বাণী নয়।

বদান্য—আমার এই আশীর্বাণী তোমাদের জীবনকে সুখী করবার জন্য শুভ ইচ্ছার বাণী। আসক্তি থাকবে না তোমাদের জীবনে, তার জন্য অসুখী হবে না তোমাদের জীবন। তৃষ্ণা না থাকলে তৃষ্ণাহীনতার জন্য কেউ দুঃখ অনুভ

করে না অষ্টাবক্র। ইচ্ছা না থাকলে অক্ষমতার ব্যথা কেউ বোধ করে না। অননুভূত অভিলাষ কখনও অতৃপ্তির ক্লেশ সৃষ্টি করে না। আসক্তি-হীন জীবন সুখেরই জীবন।

অষ্টাবক্র—কল্পনা করতে পারি না মহর্ষি, সে কেমন সুখের জীবন।

বদান্য—জলমীনের মনে ঐ মহাকাশের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নেই, যেহেতু মহাকাশের নীলিমা তার অনুভবে নেই। ঐ বনমধুকরের প্রাণে সুরলোকের পারিজাতের জন্য কোন তৃষ্ণার গুঞ্জরণ নেই, যেহেতু সে পারিজাত তার অনুভবে নেই। অরণ্য-মৃগের মনে সমুদ্রস্নানের জন্য কোন ক্রন্দন নেই, যেহেতু সলিলোচ্ছল সমুদ্রের রূপ তার স্বপ্নে অনুভবে ও কল্পনায় নেই। যার জন্য আসক্তি নেই, তার অভাবের জন্য অতৃপ্তিও নেই। আসক্তিহীন এই জীবন এক বেদনাহীন সুখের জীবন। বিশ্বাস করতে পারছো কি অষ্টাবক্র?

অষ্টাবক্র—বিশ্বাস করছি মহর্ষি।

বদান্য—তবে আমার আশীর্বাদ গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হও অষ্টাবক্র, দেহ মন ও প্রাণ হতে আসক্তিকে চিরজীবনের মত বিদায় দান করবার জন্য প্রস্তুত হও।

অষ্টাবক্র—কেন মহর্ষি? আপনি তো আজ এই সত্যেরই প্রত্যক্ষ পরিচয় পেয়েছেন যে, আসক্তিও নিষ্ঠায় সুন্দর হতে পারে।

বদান্য—আসক্তি সুন্দর হলেই বা কি আসে যায় অষ্টাবক্র? বিষসলিল স্নিগ্ধ হলেই বা কি? সে সলিল প্রাণের পানীয় হতে পারে না। খলপাবক হেমবর্ণ হলেই বা কি? সে পাবক গৃহদীপের আলোক হতে পারে না। মরুসমীর উচ্ছ্বসিত হলেই বা কি? সে সমীর নিকুঞ্জের হরিন্ময় আনন্দের বান্ধব হতে পারে না।

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভার জীবন, পরিণয়োৎসুক দুই সুন্দর বাসনা যেন আসন্ন এক শুভ বাসকোৎসবের দিকে তাকিয়ে চিতানলেরই উৎসব দেখতে থাকে। দুর্বহ অঙ্গীকারের বন্ধনে আবদ্ধ দুই অসহায়ের মূর্তি। বদান্য প্রশ্ন করেন।—নিরুত্তর কেন অষ্টাবক্র? বল, কি তোমাদের ইচ্ছা?

অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা পরস্পরের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে, অপলক স্নেহে অভিষিক্ত দুটি দৃষ্টি। অষ্টাবক্র যেন তার জীবনেরই আলিঙ্গন হতে স্খলিত এক কেতকীরেণুবাসিত স্বর্গের দিকে মায়াময় নেত্রে তাকিয়ে আছে। সুপ্রভার নয়নের শিশিরেও সেই অমেয় মায়ার সুষমা অভিনব এক মদিরতায় আরও নিবিড় হয়ে ওঠে। অষ্টাবক্রের কুঙ্কুম-পিঞ্জরিত বক্ষের উপর অলক্ষ্য চুম্বনধারার মত ঝরে পড়ে সুপ্রভার সিক্ত নয়নের দৃষ্টি। আসন্ন এক মৃত্যুর বজ্রনাদ শুনতে পেয়েছে, তাই যেন শেষবারের মত ভালবেসে বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে এক কুঙ্কুম আর এক কেতকীর আসক্তি।

মৃত্যু হবে আসক্তির, সত্য হবে শুধু মিলন, অদ্ভুত এই আশীর্বাদ সহ্য করবার জন্য হৃদয় কঠিন করতে চেষ্টা করে নবীন রসালসম যৌবনধর অষ্টাবক্র, চেষ্টা করে উপবনের সমীরপ্রিয়া লতিকারই মত সুরসতনুকা সুপ্রভা, কিন্তু পারে না।

বদান্যের আশীর্বাদ যেন দক্ষিণ পবনের বক্ষ হতে চন্দনগন্ধভার কেড়ে নিতে চায়। প্রজাপতির পক্ষপতাকায় থাকবে না বর্ণায়িত আলিম্পন, আর গোধূলি হারাবে আভা। আকাশ হারাবে নীলিমা, পুষ্প হারাবে সৌরভ, সমুদ্র হারাবে তরঙ্গ এবং যৌবন হারাবে আসক্তি? আসক্তিহীন সেই মিলন দুই নিঃস্ব রিক্ত চলকঙ্কালের বেদনাহীন সুখের মিলন। সে মিলন মিলনই নয়, সে জীবন জীবনই নয়। আসক্তিহীন সেই মিলনের বেদনাহীন সুখ এক মুহূর্তের জন্যও সহ্য করা যাবে না। তার চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

সুপ্রভার সেই দৃষ্টির ভাষা বুঝতে পারে অষ্টাবক্র এবং অষ্টাবক্রের সেই দৃষ্টির ভাষা বুঝতে পারে সুপ্রভা। সুস্মিত হয়ে ওঠে উভয়েরই ক্ষণবিষাদমধুর নয়নের দৃষ্টি, সে দৃষ্টি নূতন এক সঙ্কল্পের আলোকে উদ্ভাসিত।

অষ্টাবক্র বলে—আপনিও একটি প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করুন মহর্ষি। বলুন, আপনার মন্ত্রসংস্কারের পুণ্যে পরিণীত আমাদের জীবন আপনার ঐ আশীর্বাদ গ্রহণের পর আপনি আমাদেরই প্রার্থিত একটি বর প্রদান করবেন।

বদান্য—হ্যাঁ, মনে আছে। বল, কি বর প্রার্থনা করতে চাও তোমরা?

অষ্টাবক্র—আপনার আশীর্বাণী ধ্বনিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যেন আমাদের মৃত্যু হয়, এই বর পেতে চাই মহর্ষি।

চিৎকার ক'রে ওঠেন মহর্ষি বদান্য।—মৃত্যু চাও তোমরা?

অষ্টাবক্র—হ্যাঁ মহর্ষি।

নীরব, স্তব্ধ, শিলীভূত বৃক্ষেরই মত সুস্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন বদান্য, যেন এইবার তাঁর সেই বিশ্বাসের হৃৎপিণ্ডই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। আর আসক্তির গৌরব ঘোষণা ক'রে তাঁরই সম্মুখে দাঁড়িয়ে আছে মিলনোৎসুক কেতকী আর কুঙ্কুমের অপরাভূত দুই সঙ্কল্প।

মহর্ষি বদান্যের দুই চক্ষুর কঠিন দৃষ্টি হঠাৎ বাষ্পাসারে প্লাবিত হয়। সুপ্রভার কণ্ঠস্বর ব্যথিতভাবে চমকে ওঠে। —পিতা?

বিস্মিত অষ্টাবক্র ডাকে।—এ কি মহর্ষি?

মহর্ষি বদান্য বলেন।—নির্মম পরীক্ষায় প্রাণ আনন্দে গলে গিয়েছে অষ্টাবক্র, এই অশ্রু আনন্দেরই অশ্রু। স্বীকার করি সুপ্রভা, তোমাদের সুন্দর আসক্তিই সত্য। স্বীকার করি অষ্টাবক্র, আসক্তিই এই মর্ত্যের মানব ও মানবীর মিলিত জীবনের মালিকা, প্রকৃত বন্ধনের প্রথম গ্রন্থি।

সস্নেহ আগ্রহে সুপ্রভা ও অষ্টাবক্রের দুই পাণি সমন্বিত ক'রে মন্ত্র পাঠ করেন মহর্ষি বদান্য। তার পরেই আশীর্বাণী উচ্চারণ করেন।

—সুন্দর আসক্তির কুঙ্কুম ও কেতকীর জীবন চিরসুখী হোক্।

অষ্টাবক্র—আমাদের প্রার্থিত বর প্রদান করুন মহর্ষি।

বদান্য—বল, কি বর চাও?

অষ্টাবক্র—চাই আপনার পদধূলির স্পর্শ।

মহর্ষি বদান্যের চরণ স্পর্শ ক'রে প্রণাম করে অষ্টাবক্র ও সুপ্রভা। মহর্ষি বদান্য অষ্টাবক্র ও সুপ্রভার শির চুম্বন করেন।

৫

অনাদি হালদারের বাসায় যখন পৌঁছিলাম, তখন রাত্রি সাড়ে চারটা। কলিকাতা শহর দুপুর রাত্রি পর্যন্ত মাতামাতি করিয়া শেষ রাত্রির গভীর ঘুম ঘুমাইতেছে।

নীচের তলায় সদর দরজা খোলা। সিঁড়ির ঘরে কেহ নাই। ষষ্ঠীবাবু বোধ করি ক্লান্ত হইয়া শুইতে গিয়াছেন। সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া দেখিলাম, দরজার হুড়কা ভাঙা; কবাট ভাঙে নাই, হুড়কাটা ভাঙিয়া একদিকে ছিটকাইয়া পড়িয়াছে। আমরা ব্যোমকেশকে অগ্রে লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলাম।

আমরা প্রবেশ করিতেই ঘরে যেন একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। ঘরে কিন্তু মাত্র তিনটি লোক ছিল; ননীবালা, প্রভাত ও ন্যাপা। তাহারা একসঙ্গে ধড়মড় করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। ন্যাপা বলিয়া উঠিল—'কে? কে? কি চাই?' বলিয়াই আমাদের পশ্চাতে কেষ্টবাবুকে দেখিয়া থামিয়া গেল। ননীবালা থলথলে মুখে প্রকাণ্ড হাঁ করিয়া নিজের অজ্ঞাতসারেই উচ্চকণ্ঠে স্বগতোক্তি করিলেন—'অ্যাঁ, ব্যোমকেশবাবু!' তিনি আমাদের দেখিয়া বিশেষ আহ্লাদিত হইয়াছেন মনে হইল না। প্রভাত বুদ্ধিহীনের মত চাহিয়া রহিল।

ব্যোমকেশ ঘরের চারিদিকে একবার দৃষ্টি বুলাইয়া ননীবালার উদ্দেশ্যে বলিল,—'কেষ্টবাবু আমাকে ডেকে এনেছেন। পুলিস এখনও আসেনি?'

ননীবালা মাথা নাড়িলেন। ব্যোমকেশ ন্যাপার দিকে চক্ষু ফিরাইলে সে বিহ্বলভাবে বলিয়া উঠিল—'আপনি—ব্যোমকেশবাবু—মানে—'

ব্যোমকেশ বলিল,—'হ্যাঁ। ইনি আমার বন্ধু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন আমরা এসেছিলাম মনে আছে বোধ হয়। আপনি পুলিস ডাকতে গিয়েছিলেন না? কী হল?'

ন্যাপা কেমন যেন বিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, চমকিয়া উঠিয়া বলিল,—'পুলিস' হ্যাঁ, থানায় গিয়েছিলাম। থানায় কেউ ছিল না, একটা জমাদার টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। আমার কথা শুনে রেগে উঠল, বললে—যাও যাও, একটা হিন্দু মরেছে তার আবার এত হৈ-চৈ কিসের। লাশ রাস্তায় ফেলে দাওগে। আমি চলে আসছিলাম, তখন আমাকে ডেকে বললে—ঠিকানা রেখে যাও, সকালবেলা দারোগা সাহেব এলে জানাবো। আমি অনাদিবাবুর নাম আর ঠিকানা দিয়ে চলে এলাম।'

ক্ষেত্রবিশেষে পুলিসের অবজ্ঞাপূর্ণ নির্লিপ্ততা এবং ক্ষেত্রান্তরে অতিরিক্ত কর্তব্যবোধ সম্বন্ধে কোনও নূতনত্ব ছিল না; বস্তুত অভ্যাসবশেই আশা করিয়াছিলাম যে, পুলিস সংবাদ পাইবামাত্র ছুটিয়া আসিবে। ব্যোমকেশ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিল, তারপর মুখ তুলিয়া বলিল,—'কেষ্টবাবুকে আপনারা অনাদিবাবুর হত্যাকারী ব'লে সন্দেহ করেন। আমি তাঁর পক্ষ থেকে এই ব্যাপারের তদন্ত করতে চাই। কারুর আপত্তি আছে?'

কেহ উত্তর দিল না, ব্যোমকেশের চক্ষু এড়াইয়া এদিক ওদিক চাহিতে লাগিল। তখন ব্যোমকেশ বলিল,—'লাশ ব্যাল্‌কনিতে আছে, আপনারা কেউ ছুঁয়েছেন কি?'

সকলে মাথা নাড়িয়া অস্বীকার করিল।

আমরা তখন ব্যালকনিতে প্রবেশ করিলাম। দেয়ালের গায়ে বৈদ্যুতিক বাতি জ্বলিতেছিল, তাহার নির্নিমেষ আলোতে দেখিলাম অনাদি হালদারের মৃতদেহ কাত হইয়া মেঝের উপর পড়িয়া আছে, মুখ রাস্তার দিকে। গায়ে শাদা রঙের গরম গেঞ্জি, তাহার উপর বালাপোশ। বুকের উপর হইতে বালাপোশ সরিয়া গিয়াছে, গেঞ্জিতে একটি ছিদ্র; সেই ছিদ্রপথে গাঢ় রক্ত নির্গত হইয়া মাটিতে গড়াইয়া পড়িয়াছে। মৃতের মুখের উপর পৈশাচিক হাসির মত একটা বিকৃতি জমাট বাঁধিয়া গিয়াছে।

ব্যোমকেশ নত হইয়া পিঠের দিক হইতে বালাপোশ সরাইয়া দিল। দেখিলাম এদিকেও গেঞ্জির উপর একটি সুগোল ছিদ্র। এদিকে রক্ত বেশী গড়ায় নাই, কেবল ছিদ্রের চারিদিক ভিজিয়া উঠিয়াছে। বন্দুকের গুলি দেহ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে।

মৃতদেহ ছাড়িয়া ব্যোমকেশ উঠিয়া দাঁড়াইল, অন্যমনস্কভাবে বাহিরে রাস্তার দিকে তাকাইয়া রহিল। আমি হ্রস্বকণ্ঠে প্রশ্ন করিলাম,—'কি মনে হচ্ছে?'

ব্যোমকেশ অন্যমনে বলিল,—'এই লোকটাই সেদিন আমাদের সঙ্গে অসভ্যতা করেছিল—আশ্চর্য নয়?......মৃতদেহ শক্ত হতে আরম্ভ করেছে......বোধ হয় অনাদি হালদার রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে রাস্তায় বাজি পোড়ানো দেখছিল—' ব্যোমকেশ রাস্তার পরপারে বড় বাড়িটার দিকে তাকাইল—'কিন্তু গুলিটা গেল কোথায়? শরীরের মধ্যে নেই, শরীর ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে—'

ব্যোমকেশের অনুমান যদি সত্য হয় তাহা হইলে গুলিটা ব্যালকনির দেয়ালে বিঁধিয়া থাকিবার কথা। কিন্তু ব্যালকনির দেয়াল ছাদ মেঝে কোথাও গুলি বা গুলির দাগ দেখিতে পাইলাম না। বন্দুকের গুলি দেহ ভেদ করিয়া বাহির হইবার সময় কখনও কখনও তেরছা পথে বাহির হয়; কিম্বা অনাদি হালদার হয়তো তেরছাভাবে দাঁড়াইয়া ছিল, গুলি ব্যালকনির পাশের ফাঁক দিয়া বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু লাশ যেভাবে পড়িয়া আছে তাহাতে মনে হয়, অনাদি হালদার রাস্তার দিকে সম্মুখ করিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, বুকে গুলি খাইয়া সেইখানেই

বসিয়া পড়িয়াছে, তারপর পাশের দিকে ঢলিয়া পড়িয়াছে।

সামনে রাস্তার ওপারে ওই বাড়িটা। মাঝে ৭০।৮০ ফুটের ব্যবধান। হয়তো ওই বাড়ির দ্বিতল বা ত্রিতলের কোনও জানালা হইতে গুলি আসিয়াছে।

ব্যালকনিতে গুলির কোনও চিহ্ন না পাইয়া ব্যোমকেশ আর একবার নত হইয়া মৃতদেহ পরীক্ষা করিল। বালাপোশ সরাইয়া লইলে দেখিলাম, নিম্নাঙ্গে ধুতির কষি আল্‌গা হইয়া গিয়াছে, কোমরে ঘুন্‌সির মত একটি মোটা কালো সুতা দেখা যাইতেছে। ঘুনসিতে ফাঁস লাগানো একটি চাবি। ব্যোমকেশ চাবিটি নাড়াচাড়া করিয়া দেখিল, তারপর সন্তর্পণে খুলিয়া লইল; মৃতদেহের উপর আবার বালাপোশ ঢাকা দিয়া বলিল,—'চল, দেখা হয়েছে।'

বাহিরে তখনও রাত্রির অন্ধকার কাটে নাই। রাস্তা দিয়া শাক-সব্জি বোঝাই লরী চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। কলিকাতা শহরের বিরাট ক্ষুধা মিটাইবার আয়োজন চলিতেছে।

ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম, যে চারিজন লোক ঘরের মধ্যে ছিল তাহারা আগের মতই দাঁড়াইয়া আছে, কেহ নড়ে নাই। ব্যোমকেশ হাতের চাবি দেখাইয়া বলিল,—'মৃতদেহের কোমরে ছিল। কোথাকার চাবি?'

একে একে চারিজনের মুখ দেখিলাম। সকলেই একদৃষ্টে চাবির পানে চাহিয়া আছে, কেবল ন্যাপার মুখে ভয়ের ছায়া। অবশেষে ননীবালা বলিলেন,—'অনাদিবাবুর শোবার ঘরে লোহার আলমারি আছে, তারই চাবি।'

'লোহার আলমারিতে কি আছে? টাকাকড়ি?'

সকলেই মাথা নাড়িল, কেহ জানে না। ননীবালা বলিলেন,—'কি করে জানব। অনাদিবাবু কি কাউকে আলমারি ছুঁতে দিত? কাছে গেলেই খ্যাঁক্ খ্যাঁক্ করে উঠত—' প্রভাতের চোখের দিকে চাহিয়া ননীবালা থামিয়া গেলেন।

ন্যাপা অধর লেহন করিয়া বলিল,—'আলমারিতে টাকাকড়ি বোধ হয় থাকত না। কর্তা ব্যাঙ্কে টাকা রাখতেন।'

ব্যোমকেশ চাবি পকেটে রাখিয়া বলিল,—'আলমারিতে কি আছে পরে দেখা যাবে। এখন আপনাদের কয়েকটা প্রশ্ন করতে চাই।—বাড়িতে ঢোকবার বেরুবার রাস্তা ক'টা?'

সকলে ভাঙা দ্বারের দিকে নির্দেশ করিল,—'মাত্র ওই একটা।'

'অন্য দরজা নেই?'

'না।'

ব্যোমকেশ বেঞ্চির একপাশে বসিয়া বলিল,—'বেশ। তার মানে অনাদিবাবুর যখন মৃত্যু হয় তখন বাড়িতে কেউ ছিল না, বাইরে থেকে গুলি এসেছে। প্রভাতবাবু, আপনি বলুন দেখি, আপনি কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন?'

প্রভাত মাটির দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া কিছুক্ষণ তাহার অগোছালো চুলে হাত বুলাইল, তারপর চোখ তুলিয়া বলিল,—'আমি মা'কে নিয়ে বেরিয়েছিলাম আন্দাজ সাড়ে আটটার সময়।'

'ও—আপনারা দু'জনে এক সঙ্গে বেরিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ—মা সিনেমা দেখতে গিয়েছিলেন।'

'তাই নাকি?' বলিয়া ব্যোমকেশ ননীবালার পানে চাহিল।

ননীবালা বলিলেন,—'আমার তো আর সিনেমা দেখা হয়ে ওঠে না, ন' মাসে ছ' মাসে একবার। কাল ঐ যে কি বলে শেয়ালদার কাছে সিনেমা আছে সেখানে 'জয় মা কালী' দেখাচ্ছিল, তাই দেখতে গিছলুম। এ বাড়ির রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া আটটার মধ্যেই চুকে যায়, তাই রাত্তিরের শো'তে গিয়েছিলুম। প্রভাত বলল—'

ব্যোমকেশ তাঁহাকে থামাইয়া দিয়া বলিল,—'আপনারা যখন বেরিয়েছিলেন তখন বাড়িতে কে কে ছিল?'

প্রভাত বলিল,—'কেবল অনাদিবাবু ছিলেন। নৃপেনবাবু আটটার পরই বেরিয়ে গিয়েছিলেন।'

ব্যোমকেশ ন্যাপার দিকে ফিরিল—কিন্তু কোথায় ন্যাপা! সে এতক্ষণ ভিতর দিকের একটা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, কখন অলক্ষিতে অন্তর্হিত হইয়াছে।

ব্যোমকেশ সবিস্ময়ে ননীবালার দিকে ফিরিয়া হাত উল্টাইয়া প্রশ্ন করিল, ননীবালা অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া নীরবে দেখাইয়া দিলেন—ন্যাপা ওই দ্বার দিয়াই অন্তর্হিত হইয়াছে। ব্যোমকেশ তখন বিড়াল-পদক্ষেপে সেই দিকে চলিল; আমিও তাহার অনুসরণ করিলাম।

খানিকটা সরু গলির মতন, তারপর

একটা ঘর। আলো জ্বলিতেছে। আমরা উঁকি মারিয়া দেখিলাম, ঘরের এক কোণে একটা টেবিলের দেরাজ খুলিয়া ন্যাপা ভিতরে হাত ঢুকাইয়া দিয়াছে এবং অত্যন্ত ব্যগ্রভাবে কিছু খুঁজিতেছে। আমাদের দ্বারের কাছে দেখিয়া সে তড়িদ্বেগে খাড়া হইল এবং দেরাজ বন্ধ করিয়া দিল।

আমরা প্রবেশ করিলাম। ব্যোমকেশ অপ্রসন্ন স্বরে বলিল,—'এটা আপনার ঘর?'

ন্যাপা কিছুক্ষণ বোকার মত চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'হ্যাঁ, আমার ঘর।'

'আপনি না বলে চলে এলেন কেন? কি করছেন?'

ন্যাপা পাংশুমুখে হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল,—'কিছু না—এই—একটা সিগারেট খাব বলে ঘরে এসেছিলাম—তা খুঁজে পাচ্ছি না—'

খুঁজিয়া না পাওয়ার কথা নয়, সিগারেটের প্যাকেট টেবিলের এক কোণে রাখা রহিয়াছে। ব্যোমকেশ বলিল,—'ওটা কি? সিগারেটের প্যাকেট বলেই মনে হচ্ছে।'

ন্যাপা যেন আঁতকাইয়া উঠিল—'অ্যাঁ—! ও—হ্যাঁ—দেশলাই—দেশলাই খুঁজে পাচ্ছি না—'

ব্যোমকেশ একবার তাহাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া নিজের পকেট হইতে দেশালাই বাহির করিয়া দিল—'এই নিন।' ন্যাপা কম্পিত হস্তে দেশালাই জ্বালিয়া সিগারেট ধরাইল।

আমি ঘরের চারিদিকে একবার তাকাইলাম। ক্ষুদ্র ঘর, আসবাবের মধ্যে তক্তাপোশের উপর বিছানা, একটি দেরাজ-যুক্ত টেবিল ও তৎসংলগ্ন চেয়ার। ঘরে একটি গরাদ লাগানো জানালা আছে।

জানালাটা খোলা রহিয়াছে। ব্যোমকেশ তাহার সামনে গিয়া দাঁড়াইল, আমিও গেলাম। আকাশ ফরসা হইয়া আসিতেছে। জানালা দিয়া অর্ধ-সমাপ্ত নূতন বাড়িটা দেখা গেল। মাঝখানে গভীর খাদের মত গলি গিয়াছে।

'নৃপেনবাবু, আপনার বাড়ি কোথায়?'

ব্যোমকেশের এই আকস্মিক প্রশ্নে নৃপেন প্রায় লাফাইয়া উঠিল। সে টেবিলের কিনারায় ঠেস্ দিয়া সিগারেটে লম্বা টান দিতেছিল, বিস্ফারিত চক্ষে চাহিয়া বলিল—'বাড়ি—?'

'হ্যাঁ, দেশ। নিবাস কোথায়? কোন্ জেলায়?'

নৃপেন ভ্যাবাচাকা খাইয়া বলিল,—'নিবাস? চব্বিশ পরগণা, ডায়মণ্ড হারবার লাইনের খেজুরহাটে।'

ব্যোমকেশ জানালার দিক হইতে ফিরিয়া নৃপেনের পানে চাহিয়া রহিল, —বলিল,—'খেজুরহাট! আপনি খেজুর-হাটের রমেশ মল্লিককে চেনেন?'

নৃপেন দগ্ধাবশেষ সিগারেট ফেলিয়া দিয়া যেন ধূমরুদ্ধ স্বরে বলিল—'চিনি। আমাদের পাড়ায় থাকেন।'

'খেজুরহাটে আপনার কে আছেন?'

'খুড়ো।'

'বাপ নেই?'

'না।'

'ভাল কথা, আপনার পুরো নামটা কী?'

'নৃপেন দত্ত।'

ব্যোমকেশ নৃপেনের কাছে আসিয়া দাঁড়াইল, একটু ঘনিষ্ঠতার সুরে বলিল,—'নৃপেনবাবু, আপনাকে দেখে কাজের লোক বলে মনে হয়। আপনি কতদিন অনাদি-বাবুর সেক্রেটারীর কাজ করছেন?'

নৃপেন একটু ভাবিয়া বলিল,—'প্রায় চার বছর।'

'চার বছর? এতদিন টিকে ছিলেন?'

নৃপেন চুপ করিয়া রহিল।

'অনাদিবাবুর কেউ শত্রু ছিল কিনা আপনি নিশ্চয় জানেন?'

নৃপেন অসহায় মুখ তুলিল,—'কার নাম করব? যার সঙ্গে কর্তার পরিচয় ছিল তার সঙ্গেই শত্রুতা ছিল। ঝগড়া করা ছিল ওঁর স্বভাব।'

'বাড়ির সকলের সঙ্গেই ঝগড়া চলত?'

'সকলকেই উনি গালমন্দ করতেন। কিন্তু আমরা ওঁর অধীন, আমাদের চুপ করে থাকতে হত। কেবল কেষ্টবাবু মাঝে মাঝে—'

'প্রভাতকে অনাদিবাবু গালমন্দ করতেন?'

'ঠিক গালমন্দ নয়, সুবিধে পেলেই খোঁচা দিতেন। প্রভাতবাবু কিন্তু গায়ে মাখতেন না।'

'আচ্ছা, ওকথা থাক। বলুন দেখি কাল রাত্রে আপনি কখন বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলেন?'

'আটটার পরই বেরিয়েছিলাম।'

'ফিরলেন কখন?'

'আন্দাজ একটায়। ফিরে দেখলাম, ননীবালা দেবী আর প্রভাতবাবু দোর ঠেলাঠেলি করছেন।'

'আপনি আটটা থেকে একটা পর্যন্ত কোথায় ছিলেন?'

'সিনেমা দেখতে গিয়েছিলাম।'

'আপনিও 'জয় মা কালী' দেখতে গিয়েছিলেন?'

'না, আমি এলিটে একটা ইংরিজি ছবি দেখতে গিছলাম।'

'ও—অত রাত্রে ফিরলেন কি করে?'

'হেঁটে।'

লক্ষ্য করিলাম ব্যোমকেশের প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে নৃপেন অনেকটা ধাতস্থ হইয়াছে, আগের মত ভীত বিচলিত ভাব আর নাই। ব্যোমকেশ বলিল,—'চলুন এবার ও ঘরে যাওয়া যাক।' (ক্রমশ)

শ্রীসরলাবালা সরকার

স্বামীজী যাত্রা করিলেন রাজপুতানার পথে। এক হাতে কমণ্ডলু, আর এক হাতে এক দীর্ঘ যষ্ঠি। মুণ্ডিত মস্তক, পিঠে একটি ঝোলা। ইহাই তাঁহার পরিব্রাজক বেশ।

১৮৯১ খৃষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আলোয়ার পৌঁছিয়া সরকারী ডাক্তারখানার সম্মুখে একজন ভদ্রলোককে দেখিয়া তাঁহার বাঙ্গালী বলিয়া মনে হইল। পরিচয় লইয়া জানিলেন যে, তিনি বাঙ্গালীই বটে, নাম গুরুচরণ লস্কর এবং তিনিই সরকারী হাসপাতালের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার।

স্বামীজী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এখানে সাধুদের থাকিবার কোন আস্তানা আছে কি না। তাহাতে তিনি রাস্তার ধারে এক দোকান ঘরের সম্মুখে লইয়া গিয়া, সেই দোকানের দোতলার একখানি ঘর দেখাইয়া বলিলেন, "এই ঘরে সাধু-সন্ন্যাসীদের থাকিতে দেওয়া হয়।" স্বামীজী তখন সেই ঘরে গিয়া আশ্রয় লইলেন।

ইতিমধ্যে লস্কর মহাশয় শহরে গিয়া অনেককে বাঙ্গালী সন্ন্যাসীর আগমনের খবর জানাইয়াছেন, সেই খবর পাইয়া অনেকেই কৌতূহলী হইয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন; ইঁহাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয়ই ছিলেন এবং অনেক সম্ভ্রান্ত পদস্থ ব্যক্তিও ছিলেন।

অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনীয়ার পণ্ডিত শম্ভুনাথজী অল্পক্ষণ স্বামীজীর সহিত আলাপ করিয়া এত মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে আর সেই ঘরে থাকিতে দিলেন না, তখনই তাঁহাকে নিজের বাড়িতে লইয়া গেলেন। স্বামীজী যতদিন আলোয়ারে ছিলেন, প্রথম কয়েক দিন তাঁহারই বাড়িতে ছিলেন।

শম্ভুনাথজীর বাড়িতে স্বামীজীকে দর্শন ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রতিদিন জনসমাগম হইতে লাগিল এবং হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণই স্বামীজীর ভক্ত হইয়া উঠিলেন।

রামকৃষ্ণ মিশনের প্রথম হইতেই এই বিশেষত্ব আছে যে, তাঁহারা জাতিধর্ম-

নির্বিশেষে সকলকেই সমান হৃদ্যতার সহিত গ্রহণ করেন। ঠাকুর শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের একটি-মাত্র উক্তি—যেটিকে তাঁহার সকল উপদেশের সংক্ষিপ্ত সারও বলা চলে, সেটি এই যে, "যত মত তত পথ।" আর স্বামীজী তো তাঁহারই ভাবের ভাবুক, তাঁহারও সাধনার মূলমন্ত্র "জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর।"

স্বামীজীর ধ্যানের ভারতবর্ষ! সেই ভারতবর্ষ পর্যটনে তিনি বাহির হইয়াছেন। ভারতবর্ষের জনগণ—তাহার যে কোন শ্রেণী, যে কোন জাতি, যে কোন ভাষাভাষী, ধনী অথবা দরিদ্র, শিক্ষিত অথবা অশিক্ষিত, সকলেই তাঁহার পরমাত্মীয়। তাই তিনি কখনও বা কুটীরে আশ্রয় লইয়াছেন, আবার রাজপ্রাসাদে থাকিবার আমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন নাই।

আলোয়ার স্টেটের দেওয়ান তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া নিজের বাড়িতে লইয়া গেলেন, আলোয়ারের মহারাজা শ্রীমঙ্গল সিংহ এই সংবাদ পাইয়া স্বয়ং দেওয়ানের বাড়িতে আসিয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি দেওয়ানকে বলিলেন, দেওয়ান যেন স্বামীজীকে নিজের বাড়িতে আনিয়া রাখেন, ইহাতে তাঁহার সর্বদা স্বামীজীর দর্শনলাভের সুবিধা হইবে।

আলোয়ারে স্বামীজী প্রায় দুই মাস ছিলেন, এই সময় প্রতিদিনই তাঁহার কাছে জনতার অবধি ছিল না এবং তাঁহার নিকট শ্রীশ্রীঠাকুরের অপূর্ব জীবন-কাহিনী শুনিয়া সকলেই বিমুগ্ধ হইতেন।

আলোয়ার শহর হইতে ১৮ মাইল পাণ্ডুপেলী গ্রাম। সেখানে মহাবীরের মন্দির আছে। স্বামীজী হাঁটাপথে সেখানে গিয়া মহাবীর দর্শন করিয়া সেখান হইতে আবার ষোল মাইল পথ হাঁটিয়া টাহলা নামক স্থানে নীলকণ্ঠ মহাদেবের মন্দিরে গিয়া নীলকণ্ঠ দর্শন করিলেন। এখান হইতে আবার আঠারো মাইল হাঁটিয়া নারায়ণী গ্রামে দেবী দর্শন করেন। নারায়ণীর ষোল মাইল দূরে বেসরা গ্রাম, এখানে রেল স্টেশনে গিয়া রেলপথে জয়পুর রওনা হইলেন।

রেলে আলোয়ার হইতে আগত এক ফটোগ্রাফারের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। এই ফটোগ্রাফার স্বামীজীর সঙ্গে জয়পুর পর্যন্ত গিয়া জয়পুর স্টেশনে তাঁহার একটি ফটো নেন। মুণ্ডিত মস্তক পরিব্রাজক দণ্ডধারী স্বামী বিবেকানন্দ! সেই ফটোটিই এখন আমাদের জাতীয় সম্পদ।

স্বামীজী এই ভ্রমণকালে তাঁহার গুরু-ভাইদের তাঁহার সঙ্গ লইতে বারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু গঙ্গাধর মহারাজ স্বামীজীর জয়পুর আসিবার সংবাদ যখন পাইলেন, তখন তিনি আর আত্মসম্বরণ

করিতে পারিলেন না। তিনি দিল্লী হইতে জয়পুরে আসিলেন এবং সন্ধান লইয়া সরাসরি স্বামীজীর সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গুরু-ভাইকে এইভাবে আসিতে দেখিয়া স্বামীজী অবশ্য আনন্দিত হইয়াছিলেন, কিন্তু সে আনন্দ প্রকাশ না করিয়া তাঁহাকে দৃঢ়ভাবে ফিরিয়া যাইবার নির্দেশ দিলেন। সুতরাং গঙ্গাধর মহারাজকে আবার দিল্লী ফিরিয়া যাইতে হইল।

জয়পুরে স্বামীজী দু সপ্তাহ ছিলেন এবং এই দুই সপ্তাহ একজন পণ্ডিতের কাছে পাণিনি অধ্যয়ন করেন।

জয়পুর হইতে আবু পাহাড় ও সেখান হইতে আজমীর। আবু পাহাড় স্বামীজীর খুব ভাল লাগিয়াছিল, তাই আজমীর হইতে ফিরিয়া আর একবার আবু পাহাড়ে যান। এই আবু পাহাড়ে খেতরি বা ক্ষেত্রীর মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী মুন্সী জগমোহন লালের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয়।

খেতরির মহারাজাও এই সময় আবু পাহাড়ে আসিয়াছিলেন; দেওয়ানের কাছে স্বামীজীর কথা শুনিয়া তিনিও তাঁহাকে দর্শন করিতে যান। এই সাক্ষাতে রাজা এতই মুগ্ধ হইলেন যে, তাঁহাকে খেতরিতে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজার এই আগ্রহে স্বামীজী খেতরি গিয়া কিছুদিন তাঁহার প্রাসাদে ছিলেন। এই সময় মহারাজা তাঁহার কাছে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

স্বামীজীর জীবন-কাহিনীতে এই খেতরির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ভারতবর্ষ অসংখ্য রাজ্যে বিভক্ত এবং স্বামীজী ভ্রমণকালে সেই সব রাজ্যের অধিপতিগণের কাহারও কাহারও গৃহে আতিথ্যও গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু খেতরির রাজা ছিলেন তাঁহার শিষ্য এবং আপনার জন।

খেতরি অত্যন্ত নিষ্ঠাচারী প্রদেশ, রাজা নিজেও নিষ্ঠাচারী। স্বামীজী সেইখানে এক ডোমের হাতের তৈরী রুটি ভক্ষণ করেন। উপদেশ প্রার্থী লোকদের নিকট উপদেশ দিতে দিতে স্বামীজী এত তন্ময় হইয়া গিয়াছেন যে, দিন ও রাত্রি অনাহারে এবং অনিদ্রায় কিভাবে কাটিয়া যাইতেছে, সেদিকে তাঁহার চেতনাই নাই। সে সময় এক অস্পৃশ্য দরিদ্র উপদেশ শুনিতে শুনিতে অনবরত ভাবিতেছে, সাধুজীর অন্ন বা পানি কিছুই গ্রহণ করা হয় নাই। এই চিন্তায় নিজের অস্পৃশ্যতার কথাও ভুলিয়া গিয়া সে স্বামীজীকে নিজের প্রস্তুত খাদ্য দিতে সাহস করিয়া অগ্রসর হইয়াছিল এবং স্বামীজীও সমাদরের সহিত সেই খাদ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই সঙ্গে আর একটি ঘটনারও কথা মনে পড়িয়া যায়।

ঘটনাটি এইরূপঃ—স্বামীজী বৃন্দাবনের পথে চলিয়াছেন, আহার ও নিদ্রার অভাব তাঁহার ততটা মনে হইতেছে না, কিন্তু দারুণ ধূমপান পিপাসায় তিনি কাতর হইয়াছেন। এমন সময় দেখিলেন, পথের ধারে বসিয়া একজন তামাক খাইতেছে। স্বামীজী তাহাকে বলিলেন, "ভাইয়া, জেরা চিলাম তো পিলাও।" সে সন্ত্রস্ত হইয়া বলিল, "মহারাজ, হাম্ ভাঙ্গী হ্যায়।" 'ভাঙ্গী' অর্থাৎ মেথর। স্বামীজী এই কথা শুনিয়া আর তামাক না চাহিয়া চলিয়া গেলেন; বহুদূরে গিয়া তাঁহার মনে হইল, কেন তিনি তামাক না খাইয়াই চলিয়া আসিলেন? তখন তিনি সেই পথে আবার ফিরিয়া গেলেন, এবং ভাঙ্গীর হাতের তামাক খাইয়া যেন শান্তি পাইলেন।

এই কাহিনী গুরু-ভাইদের নিকট বর্ণনা করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন, "দেখলি তো, সংস্কার যেন আঠার মত মনের সঙ্গে লেগে থাকে, ছাড়ালেও ছাড়ে না। এদিকে তামাকের তেষ্টায় প্রাণ যাচ্ছে, আর যেই শুনলাম যে, সে ভাঙ্গী, অমনি অজান্তে মনের ভিতর চাড়া দিয়ে উঠলো সংস্কার, আর হলো না তামাক খাওয়া। আধ ক্রোশ পথ চলে এসে তখন হুঁশ হল। ভাঙ্গী? তাই আর তামাক নিতে পারলাম না? ছি, ছি, আমি না বিরজা হোম করে জাতি বর্ণ সব ভেদাভেদ পুড়িয়ে দিয়ে সন্ন্যেসী হয়েছি? তখনই ছুটে গেলাম সেই ভাঙ্গীর কাছে, বললাম, ভাইয়া, চিলাম মে আগ্ হ্যায় তে? জেরা দে দোও। তামাক খেয়ে তবে মনটা ঠান্ডা হল।"

আর খেতরির সেই ডোম! স্বামীজী বলিয়াছিলেন, কি অমৃতই যে সে আমাকে সেদিন খাওয়াল! স্বয়ং দেবরাজ যদি স্বর্গ থেকে নেমে এসে অমৃত দিতেন, তাও বোধ হয় এমন স্বাদ হত না।"

খেতরি মহারাজার বেতনভোগিণী কোনও গায়িকা যখন দরবারে গান আরম্ভ করিয়াছিল, স্বামীজী তখনই দরবার ছাড়িয়া যাইবার জন্য উঠিয়াছিলেন, এমন সময় গায়িকা অন্ধ সাধু সুরদাসের প্রণীত এই গানটি ধরিলঃ—

> প্রভু মোর অবগুন চিতে না ধরো,
> সমদরশী হৈ নাম তুহারো।
> এক লোহ পূজামে রহত হৈ
> এক রহো ব্যাধ ঘর পরো,
> পরশ কো সনমে দ্বিধা নহী হোয়
> দুহুঁ এক কাঞ্চন করো।
> এক নদী, এক নহর মৈলী নীর ভরো
> যব্ মিল যায় দোনো এক বরণ ভঁয়ো
> গঙ্গা নাম ধরো।
> এক ব্রহ্ম, এক মায়া
> কহত সুরদাস ঝগড়ো
> অজ্ঞানী কা মন্‌মে ভেদ হোয়ে,
> জ্ঞানী কাহে ভেদ করো।

গায়িকা বুঝিয়াছিল যে, সে রূপোপজীবিনী বলিয়া স্বামীজী তাহার সান্নিধ্য বর্জন করিতেছেন এবং তাহার ভজন শুনিতেও চাহিতেছেন না। স্বামীজীর এই আচরণের প্রতিবাদস্বরূপেই যেন সে গানটি গাহিয়াছিল। গানের তাৎপর্য এইরূপঃ—

"প্রভু, তুমি আমার অপরাধ গ্রহণ করিও না, কেননা, তোমার নাম সমদর্শী। ভাল ও মন্দ দুই তো তোমার কাছে সমান। একটি লোহা পূজার কার্যে ব্যবহৃত হয়, আবার আর একটি ব্যাধের ঘরে থাকিয়া জীব হিংসার কারণ হয়, কিন্তু স্পর্শ মণির মনে তো কোন দ্বিধা নাই, তিনি দুটি লোহাকেই স্পর্শ করিয়া সুবর্ণ করেন। একটি নদী নির্মল সলিলা, আবার আর একটি ময়লা জলের নালা।

এই দুই জলই যখন গঙ্গার সহিত মিলিত হয়, তখন একই বর্ণ ধারণ করে এবং গঙ্গা নামেই পরিচিত হয়। তাই সুরদাস ঝগড়া করিয়া অর্থাৎ দৃঢ়ভাবে বলিতেছেন, ব্রহ্ম ও মায়া দুই-ই অভিন্ন, অজ্ঞানী হয়তো ভেদ করিতে পারে, কিন্তু যিনি জ্ঞানী, তাঁহার মনে কেন ভেদবুদ্ধি আসিবে?"

গানটি যেন স্বামীজীকে লক্ষ্য করিয়া গাওয়া হইয়াছে, অর্থাৎ 'হে সন্ন্যাসী, তুমি তো অজ্ঞানী নও, তবে তোমার মনেও মাতৃরূপা স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে এ ভেদবুদ্ধি কেন?'

স্বামীজী এই গান শুনিয়া নিজের বিচারবুদ্ধি যে সাধুত্বের অভিমানে কিভাবে আচ্ছন্ন হইয়াছে, তাহা বুঝিয়া সেই শিক্ষাদাত্রীর প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাবান হইয়াছিলেন।

খেতরি ত্যাগ করিয়া স্বামীজী গুজরাটের দিকে রওনা হইলেন এবং আমেদাবাদ, কাথিওয়াড় ও ওয়ার্ধা হইয়া তিনি লিম্বডি রাজ্যে উপস্থিত হইলেন।

লিম্বডি একটি দেশীয় রাজ্য। ইহার কাছাকাছি জুনাগড়, ভোজ প্রভৃতি অনেকগুলি ছোট ছোট রাজ্য আছে। লিম্বডি আসিয়া স্বামীজী কিছু বিপদাপন্ন হইয়াছিলেন। তিনি যখন আশ্রয়ের স্থানের সন্ধান করিতেছেন, তখন একদল সন্ন্যাসী বেশধারী তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজেদের আস্তানায় লইয়া যায়। কয়েকদিন সেখানে থাকিবার পরই স্বামীজী বুঝিতে পারিলেন, ইহাদের মনে তাঁহার সম্বন্ধে কোন মন্দ অভিপ্রায় আছে। তাহারা রাত্রে স্বামীজীর ঘরে তালা বন্ধ করিয়া রাখিত এবং দিনেও যাহাতে তিনি অন্য কোথাও চলিয়া যাইতে না পারেন, সেজন্য দরজায় সর্বদা পাহারা থাকিত।

তাঁহাকে এইভাবে বন্দী করিয়া রাখিবার কারণ কি, স্বামীজী যখন তাহাদের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তখন তাহারা বলিল, তোমাকে দেখিয়া বুঝিয়াছি, তুমি ব্রহ্মচর্যপরায়ণ এবং বীর্যবান বালক-সাধু। আমাদের সিদ্ধাই লাভ করিতে হইলে তোমাকে আমাদের বিশেষ প্রয়োজন। এই বলিয়া তাহারা একটি অতি কদর্য প্রস্তাব করিল। স্বামীজী সে প্রস্তাব শুনিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

সেই বাড়িতে যেসব লোকের আসা-যাওয়া ছিল, তাহাদের সঙ্গে একটি বালক আসিত এবং সে স্বামীজীর বিশেষ অনুগত হইয়াছিল। স্বামীজী কাঠ কয়লা দিয়া একটি কাগজে সমস্ত ঘটনাটি লিখিয়া সেই ছেলেটির হাতে দিলেন যেন সে চিঠিখানি রাজার কাছে পৌঁছাইয়া দেয়। ছেলেটি চতুর ও সাহসী ছিল, সে সেই পত্র লইয়া গিয়া রাজদরবারে রাজার নিকট দিল। তাহার ফলে রাজার হস্তক্ষেপে স্বামীজী সেই ঘোরতর বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন।

এইভাবে লিম্বডির রাজার সহিত স্বামীজীর পরিচয় হইল। রাজা তখন তাঁহাকে রাজপ্রাসাদে আসিয়া বাস করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। স্বামীজী কয়েকদিন প্রাসাদে ছিলেন এবং রাজার অনুরোধে তথাকার পণ্ডিতগণের সঙ্গে সংস্কৃতে শাস্ত্রালোচনা করিয়াছিলেন।

লিম্বডি হইতে ভবনগর ও সিহোর হইয়া স্বামীজী জুনাগড় যান। জুনাগড়ের রাজার দেওয়ান বাবু হরিদাস বেহারীদাসের আগ্রহে তাঁহার আতিথ্য গ্রহণ করেন। সেখানেও প্রতিদিন সংস্কৃতে শাস্ত্রালোচনা ও রামকৃষ্ণদেবের জীবনী আলোচনা হইত এবং প্রতি সন্ধ্যায় দেওয়ান সাহেবের আবাস জনপূর্ণ হইত।

জুনাগড়ের কাছেই বিখ্যাত গির্নার পাহাড়। এই পাহাড় বহু সাধু-সন্ন্যাসীর সাধন স্থল। হিন্দু, জৈন এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতির ইহা একটি মিলন ক্ষেত্র, কেননা, প্রত্যেক ধর্মাশ্রয়ীর কারু শিল্প দেব-মন্দির এখানে রহিয়াছে। শিলালিপিতে অশোকের অনুশাসনও উৎকীর্ণ আছে। পাহাড়ের সর্বোচ্চ শিখরে দত্তাত্রেয় ঋষির পদচিহ্ন আছে। স্বামীজী এখানে একটি পাহাড়ের গুহায় কয়েকদিন তপস্যা করেন।

জুনাগড় হইতে ভোজ রাজ্যে আবার ফিরিয়া আসিয়া প্রভাসতীর্থে গমন করেন। প্রভাস হইতে জুনাগড়েই আবার ফিরিয়া আসেন এবং দেওয়ান বাহাদুরের নিকট পোরবন্দর যাইবার ইচ্ছা জানান। জুনাগড়ের দেওয়ান পত্রযোগে পোরবন্দরের দেওয়ানের নিকট এই সংবাদ জানাইলেন। স্বামীজী পোরবন্দরে পৌঁছিলেই তথাকার দেওয়ান সাহেব সসম্মানে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহাকে নিজের বাড়ি লইয়া গেলেন এবং মহারাজের সহিত পরিচয় করাইয়া ছিলেন। রাজাও তাঁহাকে নিজের প্রাসাদে আমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গেলেন।

পোরবন্দর পণ্ডিতমণ্ডলীর স্থান, স্বামীজী এখানে নয় মাস থাকিয়া রাজসভার শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত শ্রীযুত শঙ্কর পাণ্ডুরংএর কাছে পাণিনি, পাতঞ্জল, মহাভাষ্য ও অন্যান্য শাস্ত্র গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। সংস্কৃতে বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইবার জন্য তিনি এই নয় মাস সংস্কৃত চর্চা করেন, সঙ্গে সঙ্গে ফরাসী ভাষাও শেখেন। শঙ্কর পাণ্ডুরং স্বামীজীর অপূর্ব মেধা ও স্মৃতিশক্তি, অল্পায়াসে জটিল বিষয়-সমূহের তাৎপর্য গ্রহণ-ক্ষমতা এবং অসাধারণ অধ্যবসায় দেখিয়া চমৎকৃত হন।

তাঁহার কথপোকথনের মাধুর্য ও ভঙ্গী, বিশ্লেষণ পটুত্ব, ইংরাজী ভাষায় পাণ্ডিত্য এবং হিন্দু দর্শন সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান দেখিয়া পাণ্ডুরং তাঁহাকে পাশ্চাত্ত্যে গিয়া হিন্দুধর্ম প্রচারের জন্য উৎসাহিত করেন। স্বামীজীর মনেও আগে হইতেই সেরূপ কল্পনা ছিল, তিনি জুনাগড়ে শ্রীযুক্ত সি, এইচ পাণ্ডের কাছে তাঁহার সে অভিপ্রায় প্রকাশও করিয়াছিলেন, এখন পাণ্ডুরং-এর কথায় যেন বিশেষ একটি প্রেরণা পাইলেন।

১৮৯১এর শেষ হইতে ১৮৯২এর কয়েক মাস পর্যন্ত স্বামীজী পোরবন্দরে থাকেন। এই দীর্ঘসময়ের অধিকাংশ সময় তিনি ভবিষ্যৎ কার্যাবলীর প্রস্তুতির জন্য জ্ঞান আহরণে ব্যয় করেন। এখানে তাঁহার গুরুভাই সারদা মহারাজ (স্বামী ত্রিগুণাতীত) যিনি প্রায় চার বৎসর আগে বরাহ নগরের মঠ হইতে তীর্থভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন, হঠাৎ তাঁহার সঙ্গে দেখা হইয়া যায়।

স্বামীজী পোরবন্দরের রাজবাড়ির ছাদের উপর হইতে দেখিতে পাইলেন এক-দল সাধু রাজবাড়ির দিকে আসিতেছেন। তাঁহাদের মধ্যে একজনকে তাঁহার চেনা চেনা মনে হইল, কাছে আসিলে তিনি সারদা মহারাজকে চিনিতে পারিলেন।

সারদা মহারাজও স্বামীজীকে দেখিয়া যেমন আশ্চর্য হইলেন সেইরূপ আনন্দিতও হইলেন। তিনি স্বামীজীকে বলিলেন, এই চারি বৎসর তিনি নানা তীর্থে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন, এখন হিঙ্গলাজ তীর্থে যাইবার জন্য এই সঙ্গী সাধুগণের সঙ্গে পোরবন্দর আসিয়াছেন। ইঁহারাও হিঙ্গলাজ তীর্থে যাইবেন। হিঙ্গলাজ বড় দুর্গম তীর্থ। মরুভূমির মধ্য দিয়া অনেকটা পথ চলিতে হয় আর মরুভূমি পার হইতে হইলে উটের পিঠে ছাড়া পায়ে হাঁটিয়া যাওয়া চলে না। কিন্তু তাঁহারা উট ভাড়া করিবার টাকা পাইবেন কোথায়? তাঁহারা এখানে আসিয়া শুনিলেন একজন মহাবিদ্বান সাধু রাজার অতিথি হইয়া আছেন, তিনি আবার ইংরেজীও জানেন এবং তাঁহাকে খুব ভক্তি করেন। সেই সাধুকে ধরিয়া যদি রাজার কাছ হইতে হিঙ্গলাজ যাইবার জন্য সাহায্য পাওয়া যায় সেইজন্য তাঁহারা রাজবাড়িতেই আসিতেছিলেন। অবশ্য সাধুর বর্ণনা শুনিয়া সারদা মহারাজের স্বামীজীর কথাই মনে হইয়াছিল।

সেই বরাহনগরের ভাঙ্গাবাড়ি তেলকুচার পাতা সিদ্ধ দিয়া মুষ্টি ভিক্ষার অন্ন আর এই রাজপ্রাসাদে আতিথ্য! অবশ্য স্বামীজীর কাছে এই দুই অবস্থাই এক। যাহা হউক স্বামীজী রাজাকে অনুরোধ করিয়া তাঁহাদের হিঙ্গলাজ যাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আর একথাও বলিলেন তিনি একাই ভ্রমণ করিবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, হিঙ্গলাজ হইতে ফিরিয়া সারদা মহারাজ যেন তাঁহার অনুসরণ না করেন।

তাঁহারা বিদায় লইলে স্বামীজীও পোরবন্দর ছাড়িয়া রওনা হইলেন দ্বারকা তীর্থের দিকে।

দ্বারকা ধাম আরব উপসাগরের তীরে। এখানে শঙ্কর মতাবলম্বী সাধু অনেক আছেন। দ্বারকাকে 'ধাম' বলা হয়, কেননা আচার্য শঙ্কর তাঁহার প্রবর্তিত অদ্বৈতবাদকে দৃঢ়মূল করিবার জন্য যে চারিটি প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করেন, সে চারিটি 'ধাম' নামে পরিচিত হয়। উত্তরে হিমালয়ে অলকানন্দা তীরে জ্যোতির্মঠ বা যোশী মঠ, শ্রীক্ষেত্রে বঙ্গোপসাগরের তীরে গোবর্ধন মঠ দক্ষিণে মহীশূর রাজ্যে শৃঙ্গেরী মঠ এবং পশ্চিমে আরব সাগরের তীরে দ্বারকা মঠ, এই চারিটি মঠই চারিধাম নামে পরিচিত। এই মঠগুলি যেন ভারতবর্ষের চতুর্দিকে মহান্ অদ্বৈতবাদের রক্ষীস্বরূপ হইয়া বিরাজ করিতেছে।

স্বামীজী পদব্রজে চলিয়াছেন, অযাচিত ভিক্ষায় তাঁহার দিন চলে, হয়তো বা কোনদিন অনশন। এইভাবে এই নিঃসঙ্গ পরিব্রাজক পরমানন্দে চলিতে চলিতে দ্বারকায় উপস্থিত হইলেন। সারদা মঠের অধ্যক্ষ তাঁহাকে দেখিয়াই বুঝিলেন ইনি সাধারণ সন্ন্যাসী নন। তিনি তাঁহাকে সসম্মানে মঠে আহ্বান করিলেন। স্বামীজী এখানে কয়েকদিন থাকিয়া দ্বারকানাথ দর্শন করিয়া মধ্য ভারতের দিকে যাত্রা করিলেন।

স্বামীজী মাণ্ডবী ও নারায়ণ সরোবর হইয়া পাণিটক নামক স্থানে আসিলেন। সেখানে শ্রীমৃত্যুঞ্জয়ের মন্দির দর্শন করিয়া বরোদার দিকে চলিলেন। মন্দির মালায় অলঙ্কৃত এই ভারতবর্ষ, কত যুগের কত তপস্যা যেন রূপধারণ করিয়াছে এই সকল দেবায়তনে। তীর্থে তীর্থে হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ এবং মুসলমান সাধকদিগের ও সাধনার স্মৃতি চিহ্ন স্বরূপ এই সকল স্থান সমান আন্তরিকতার সহিত স্বামীজী দর্শন করিয়া পথ অতিক্রম করিয়াছেন? তাঁহার এই পর্যটন যেন সমগ্র ভারতের জনগণের সহিত আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনের অভিযান। এই বিশাল ভারতের দেশে দেশে কত না ভাষা, কত না সংস্কৃতি, বিভিন্ন আচার ও আচরণ। কিন্তু পরিব্রাজক তাঁহার মাতৃভূমি বাঙলা দেশকে ভুলিতে পারেন নাই। ভুলিতে পারেন নাই, গঙ্গাতীরের শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সেই সাধন স্থান দক্ষিণেশ্বরের মন্দির।

বরোদায় বরোদা রাজ্যের দেওয়ান বাহাদুর শ্রীযুক্ত মণিভাই তাঁহাকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, সেখান হইতে স্বামীজী খাণ্ডোয়া যান। খাণ্ডোয়ায় গিয়া একটি বাড়ির সম্মুখে এক বাঙালী উকীলের নাম লেখা দেখিয়া সেখানে তিনি গৃহস্বামীর জন্য অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। গৃহস্বামী শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় আদালত হইতে ফিরিয়া আসিবার সময় দেখিলেন এক সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রথমটা তিনি গ্রাহ্য করেন নাই, কেননা অনেক সাধুই তো এইভাবে ভিক্ষার্থী হইয়া আসেন, কিন্তু দুই একটি কথার পরেই বুঝিতে পারিলেন ইনি সে শ্রেণীর সাধু ন'ন। খাণ্ডোয়ার এই হরিদাসবাবুর বাড়িতে স্বামীজী তিন সপ্তাহ ছিলেন, সেখানকার অনেক বাঙালী সে সময় স্বামীজীকে দেখিবার জন্য হরিদাসবাবুর বাড়ি প্রতিদিনই আসিতেন। চিকাগো ধর্মমহাসভায় যোগ দিবার ইচ্ছার কথাও সে সময় স্বামীজী হরিদাসবাবুকে জানাইয়াছিলেন।

১৮৯২ সালের জুলাই মাসে স্বামীজী বোম্বাই রওনা হইলেন। হরিদাসবাবুর এক ভাই সে সময় বোম্বাই থাকিতেন। হরিদাসবাবু স্বামীজীকে বোম্বাই পর্যন্ত যাইবার একখানি টিকিট করিয়া রেলে তুলিয়া দিলেন এবং ভাইয়ের নামে একখানি চিঠিও দিলেন। সেই চিঠিতে তিনি ব্যারিস্টার হরিদাস ছবিলদাসের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য ভাইকে লিখিয়াছিলেন।

বোম্বাই গিয়া স্বামীজী ব্যারিস্টার সাহেবের সহিত পরিচিত হইলেন। তিনি তাঁহাকে নিজের বাড়ি লইয়া গেলেন। এখানে কয়েক সপ্তাহ থাকিয়া স্বামীজী বেদ অধ্যয়ন করেন এবং তাঁহার এক গুরুভ্রাতা স্বামী অভেদানন্দের সহিত এখানে তাঁহার দেখা হয়।

বোম্বাই হইতে পুণা, সেখানে গিয়া স্বনামধন্য বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয়ের সহিত তাঁহার পরিচয় হয়। তিলক মহা-

রাজের ন্যায় বেদজ্ঞ পণ্ডিতের সহিত পরিচয় হওয়াতে স্বামীজী নিজেকে ভাগ্যবান বলিয়া মনে করিলেন। তাহা ছাড়া একই জ্বলন্ত দেশানুরাগ উভয়ের মনেই প্রজ্বলিত ছিল, সেজন্য তাঁহাদের মনের সুরও যেন মিলিয়া গেল। বিশেষ করিয়া চিকাগো ধর্মসভায় যোগ দিবার প্রসঙ্গে তিলক খুবই উৎসাহ দিলেন।

এই সময় লিম্বডির মহারাজা—যিনি স্বামীজীকে ভ্রষ্ট-সাধুদিগের কবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন, তাঁহার সহিতও স্বামীজীর দেখা হয়। রাজা মহাবালেশ্বরে আসিয়াছেন সংবাদ পাইয়া স্বামীজী নিজেই গিয়া তাঁহার সহিত দেখা করেন। স্বামীজীর মন তখন চিকাগো যাইবার জন্য ব্যগ্র ছিল, সেইজন্য মহারাজা তাঁহার সঙ্গে লিম্বডি যাইবার জন্য বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিলেও স্বামীজী সে অনুরোধ রাখিতে পারিলেন না।

এই সময় বাংলা দেশে তাঁহার গুরু-ভাইরা বরাহনগরের মঠ হইতে আর একটি বাড়িতে উঠিয়া যান; কেননা বাড়িওয়ালা বাড়ি সারাইবেন বলিয়া তাঁহাদের বাড়ি ছাড়িয়া দিবার নোটিশ দেন।

প্রায় ছয় বৎসর এই বাড়িটি মঠ নামে পরিচিত হইয়া আসিতেছে এবং এই বাড়িতেই রামকৃষ্ণ সন্তানগণের সন্ন্যাস জীবনের আরম্ভ। কত তপস্যা, কত সাধন এবং কত বিগত আনন্দপরিপূর্ণ দিনের স্মৃতি এই বাড়িটির সহিত জড়িত রহিয়াছে। কিন্তু গৃহহীন সাধুর গৃহের জন্য মমতাই বা কি? বাড়ি ছাড়িবার সময় অধিকাংশ ভ্রাতৃবৃন্দই বাহিরে ছিলেন, কেবল তুলসী মহারাজ, বাবুরাম মহারাজ ও শশী মহারাজ এই তিনজন মাত্র বরাহ-নগর মঠে ছিলেন। তাঁহারা আলমবাজারে একটি বাড়ি ঠিক করিয়া ঠাকুরের পুণ্য অস্থি এবং তাঁহার ব্যবহৃত দ্রব্যাদি লইয়া সেইখানেই গেলেন। যাহা কিছু অন্যান্য জিনিস ছিল, তাহাও তাঁহারা নিজেরাই বহিয়া নিয়া গেলেন এবং এখন হইতে সেই বাড়িটিই আলমবাজার মঠ নামে পরিচিত হইল।

স্বামীজী তখন মহাবালেশ্বর হইতে বেলগাম নামক স্থানে গিয়াছেন ও সেখানে এক মারাঠী ভদ্রলোকের বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছেন। বেলগামের সাব-ডিভি-শনাল অফিসার শ্রীযুক্ত হরিপদ মিত্র মহাশয় সেই বাড়ি হইতে তাঁহাকে নিজের বাড়ি নিয়া যান এবং হরিপদবাবু সস্ত্রীক তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

স্বামীজী চিকাগো যাইবেন জানিয়া হরিপদবাবু চাঁদা করিয়া অর্থ-সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বামীজী তাঁহাকে বলেন, "বাবা, এখন নয়। এখন আমি রামেশ্বর যাব।"

বেলগাম থেকে মহীশূরে বাঙ্গালোর শহরে মহীশূর রাজ্যের দেওয়ান শেষাদ্রি-নারায়ণের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় হয়। দেওয়ান সাহেবের অনুরোধে প্রায় চারি সপ্তাহ স্বামীজী সেখানে থাকেন, সে সময় মহীশূরের বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত হিন্দু ও মুসলমান তাঁহার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। মহীশূররাজ শ্রীচাম-রাজেন্দ্র উদায়ার তখন রাজধানী মাইশোরে ছিলেন, দেওয়ান বাহাদুর মহারাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করাইবার জন্য স্বামীজীকে সেখানে লইয়া গেলেন এবং মহারাজা স্বামীজীর পাণ্ডিত্য দেখিয়া তাঁহার প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল হইলেন।

মহারাজা তাঁহার রাজদরবারে পণ্ডিত-মণ্ডলীর এক সভা আহ্বান করেন। দেওয়ান বাহাদুর সেই সভায় সভাপতি ছিলেন। ঐ সভায় বেদান্তদর্শন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। বহু পরস্পরবিরোধী ব্যাখ্যা ও মত লইয়া বিতর্কে পণ্ডিতগণ কেহই যখন কোন মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিতেছেন না, সেই সময় স্বামীজীকে আহ্বান করিয়া তাঁহারই উপর মীমাংসার ভার দেওয়া হয় এবং স্বামীজী এত সহজ ও সরল মীমাংসায় সেই পরস্পরবিরোধী মতগুলির মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাইয়া দিলেন যে, তাহাতে সকলেই চমৎকৃত হইয়া তাঁহাকে 'পণ্ডিত শ্রেষ্ঠ' বলিয়া অভিনন্দন করিলেন।

এই সময় স্বামীজী মহারাজার নিকট আমেরিকায় যাইবার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। স্বামীজী তাঁহাকে বলেন, "ভারতে বেদ-বেদান্তের ভিতর যে অমূল্য সম্পদ আছে, তাহা যদি পাশ্চাত্যবাসিগণকে দেওয়া যায় এবং তাহার পরিবর্তে পাশ্চাত্যের অর্থনীতি ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে যদি জ্ঞান অর্জন করা যায়, তবে উভয় পক্ষই লাভবান হবেন। সেইজন্য আমার ইচ্ছা চিকাগোর ধর্মমহাসভায় গিয়া সেখানে হিন্দুধর্ম সম্বন্ধে কিছু বলি।"

মহারাজা এই কথা শুনিয়া আমেরিকা যাইবার খরচ দিতে প্রতিশ্রুত হন। সেই সময় তিনি স্বামীজীর উপদেশবাণী এক-খানি ফনোগ্রাফের রেকর্ডে তুলিয়া লন। সেই রেকর্ডখানি মহীশূর রাজপ্রাসাদে সযত্নে রক্ষিত আছে।

মহীশূর হইতে কোচিন, কোচিন হইতে ত্রিবাঙ্কুর। ত্রিবান্দ্রামে মাদ্রাজের ডেপুটি অ্যাকাউন্টান্ট জেনারেল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়।

কন্যাকুমারী আর বেশী দূরে নয়। মাদুরায় বিখ্যাত মীনাক্ষীদেবীর মন্দির। এখানে রামনাদের মহারাজা সেতুপতির সহিত তাঁহার পরিচয় হইল। রাজা তাঁহাকে চিকাগো ধর্মমহাসভায় যাইবার জন্য সাধ্য-মত অর্থসংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন।

এবার তীর্থপর্যটনের শেষ। সমুদ্র-তীরে সেতুবন্ধ রামেশ্বর। রামেশ্বরের বিরাট মন্দির দেখিয়াই স্বামীজী ভাবে বিভোর ও ধ্যানে মগ্ন হইয়া গেলেন, তখন তাঁহার কিছুমাত্র বাহ্যজ্ঞান রহিল না। মন্দিরে ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির যদিও প্রবেশ নিষেধ, কিন্তু ব্রাহ্মণ দেবসেবকগণ সেই চিরাচরিত প্রথার কথা চিন্তা না করিয়া এই অপূর্ব সন্ন্যাসীকে সাগ্রহে মন্দিরের ভিতর লইয়া গিয়া শিবদর্শন করাইলেন এবং যথারীতি পূজাদি করাইলেন। জাতি সম্বন্ধে কোন প্রশ্নই তাঁহাদের মনে উঠিল না।

রামেশ্বরের দর্শন ও পূজার শেষে স্বামীজী পদব্রজে কন্যাকুমারী দর্শনে চলিলেন। অপূর্ব এই কুমারী গৌরীমূর্তি। ভারতবর্ষের একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে যেখানে ভারত মহাসাগর, বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগর এই তিন সমুদ্র একত্রে মিলিয়াছে, সেখানেই এই মহাতীর্থ ও মহিমাময়ী দেবীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

সমুদ্রস্নান সমাপন করিয়া যে প্রস্তর-খানির উপর বসিয়া স্বামী বিবেকানন্দ ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন, জলগর্ভস্থ সেই প্রস্তরখানি এখনও পাণ্ডারা যাত্রীদের দেখাইয়া বলে, "স্বামী বিবেকানন্দ এই পাথরে বসে ধ্যানস্থ হয়েছিলেন।"

কতো অজানারে

শংকর
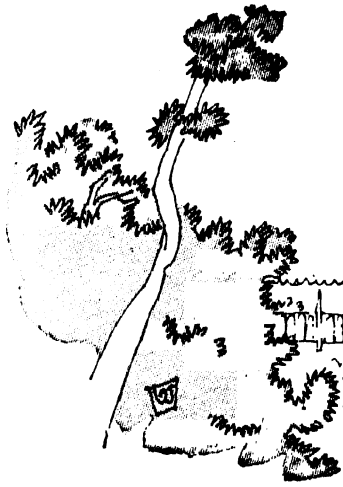
কতো অজানারে জানবার সুযোগ দুর্লভ, সন্দেহ নেই। এক পরম পুণ্য লগ্নে টেম্পল চেম্বারে এসেছিলাম। দেখতে পেয়েছি জীবনের কয়েকটা দিক। কোনো পরিশ্রম, কোনো অনুসন্ধান না করেই আকস্মিক গুপ্তধনের সন্ধান পেয়েছি। যেন আনমনে হাঁটার পথে আচমকা হোঁচট খেয়ে চেয়ে দেখলাম, পায়ের কাছে কলসী বোঝাই মোহর। আনন্দে লাফিয়ে উঠেছি। জমা হয়ে রয়েছে অসংখ্য জীবনের আখ্যান। গতানুগতিকতার নুড়িপাথরের স্তূপে হীরের মতো চকচক করছে বৈচিত্র্য ও সংঘাতময় জীবন।

গল্পকার বা শিল্পী নই আমি। মামুলি পড়াশুনা, আটপৌরে অন্তর্দৃষ্টি নিয়ে এ পাড়ায় এসেছিলাম। তাই মহত্তর মানবতা বা চিরন্তন মানুষের কোনো সত্য, যাদের দেখেছি, তাদের মধ্য থেকে নিংড়ে আনতে পারিনি। কিন্তু যৌবনের সন্ধিক্ষণে অজানা অচেনা মানুষের শোভাযাত্রা মনে যে ছাপ রেখে গেছে, সংসারের অসংখ্য ধোয়ামোছাতেও তারা অস্পষ্ট হয়নি।

রাণী মীরা, নিকোলাস ড্রলাস, ব্যারিস্টার বোস, শ্রীমতী সুনন্দা, মিস্ ট্রাইটন, হেলেন গ্রুবার্টকে যতো নিকট থেকে দেখছিলাম, আজ ততোদূরে সরে গেছেন তাঁরা। 'দেশ'-এর পাতায় গত চার মাস ধরে আমার স্মৃতির যে এলবাম তুলে ধরেছি, তার সব ছবি সমান উজ্জ্বল নয়। কিন্তু প্রতিটি ছবি মূল্যবান আমার কাছে। হৃদয়ের সঙ্গে স্মৃতির আঠায় জড়িয়ে রয়েছে তারা।

সব ক'টি আইনের গল্প। ব্যারিস্টারের বাবুর কাছে লোকে আইনের গল্পই আশা করে। আমিও করতাম একদিন। ছোকাদা ও জগদীশবাবুকে চেপে ধরতাম, গল্প শোনাও। উকিল, ব্যারিস্টার, এটর্নি, জজ, সাক্ষী, মক্কেলের গল্প বলো। তাঁরা বলতেন, সব সময় ভালো লাগে না। মাঝে মাঝে ঘর-সংসারের আলোচনা করে মুখ পালটিয়ে নিতে হয়।

তখন বিশ্বাস করিনি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আইনটা মুখ্য নয়, উপলক্ষ্য মাত্র। যাদের জন্য আইন তারাই প্রধান। এতোদিন ছিলাম ও পাড়ায় এক বিন্দু আইন শিখিনি, কিন্তু জীবনের অনেক শিক্ষা লাভ করেছি মক্কেলদের কাছে। আইনের বিশ্লেষণ তোলা থাক জজ ও ব্যারিস্টারদের জন্য। যা দেখেছি মানুষের মাঝে আমি তাতেই ধন্য। বিচারে গলদ কোথায়, কম খরচে আরও দ্রুত বিবাদ ফয়সলা করা যায় কিনা পণ্ডিতরা চিন্তা করবেন। ছোকাদার ভাষায় আমরা জিঞ্জার মার্চেণ্ট, জাহাজের খবরে লাভ নেই।

নদীর ধারে দাঁড়ালে আদার ব্যাপারীও মাঝে মাঝে জাহাজ দেখতে পায়। সায়েবের সান্নিধ্যে আমিও আইনকে দেখেছি। নেপথ্য থেকে প্রত্যক্ষ করেছি বিচার নাট্য। কোন্ ফাঁকে মক্কেলের জয় পরাজয়ের সঙ্গে জড়িয়ে গেছে নিজের সুখ দুঃখ। গোঁ চেপে গেছে, জিততে হবে। যে কোনো প্রকারে আমাদের মক্কেলের জিত চাই।

ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীট থেকে অনেক দূরে সরে গিয়ে আজ যখন পুরোনো দিনের হিসেব করি, প্রশ্ন জাগে আমাদের মক্কেলদের দাবি কি সকল সময়ে ন্যায়সংগত ছিল? অপরাধ তাঁদের কেউ কেউ নিশ্চয় করেছেন। অন্যায়ের সমর্থন করেছি পরোক্ষভাবে।

এ প্রশ্নের বিশ্লেষণ করেছিলেন সায়েব একদিন। বলেছিলেন, "মার্শাল হলের নাম শুনেছ নিশ্চয়—বিলেতের সর্বযুগের খ্যাতিসম্পন্ন ফৌজদারী ব্যারিস্টার। তিনি বলতেন, All my geese are swans, আমার সব কানা ছেলেই পদ্মলোচন। আসামীদের পক্ষ সমর্থন করতেন তিনি। ব্রীফ্ হাতে করলেই তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাতো, তাঁর মক্কেল নিরপরাধ।"

কেবল মার্শাল হল নয়, সব আইন-যোদ্ধাদের ক্ষেত্রে উপরের মন্তব্য প্রযোজ্য। সকলে পারে না। কিন্তু সায়েব পারতেন। ব্যারিস্টার হয়েও নিস্পৃহ হয়ে বিচার করতে পারতেন হাই কোর্টের

জীবনকে। তিরিশ বছর ধরে দেখেছেন হাই কোর্টকে। কাজ করেছেন। কতো কেস এলো, বিচার হয়েছে, রায় দিয়েছেন জজেরা, ল রিপোর্টের পাতায় বন্দী হয়ে আছে তার ইতিহাস, আর কিছুটা আছে সায়েবের মনে।

বলতে ভালোবাসতেন তিনি। বোঝবার বিদ্যে আমার নেই, তবু সময় পেলেই আমাকে বলতেন। আমিও শুনতাম। বেলা পড়ে আসছে। ফোর্ট উইলিয়ম থেকে যে দীর্ঘ সুঠাম দেহ নিয়ে সায়েব টেম্পল চেম্বারে এসেছিলেন, সে দেহ আর নেই। জীবন সায়াহ্নে দেহ দুর্বল হচ্ছে, ব্যাধি নয়, জরার আক্রমণে। মন কিন্তু পূর্বের মতো সবল, অনাবিল আনন্দে পরিপূর্ণ। অনেক দিন দেখছি তাঁকে। পরিবর্তন আসছে কোথাও। অতীতের কাহিনী বলতে পূর্বে এতো আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ঠিক ধরতে পারি না, হয়তো আমার মনের ভুল।

কেননা মাঝে মাঝে কৌতুকে উছলে ওঠেন তিনি। হয়তো বলেন, "চলো, পায়ে হেঁটে বেড়িয়ে আসি।"

গড়ের মাঠে ঘাসের ওপর দিয়ে আমরা হাঁটতে আরম্ভ করি। খেয়ালের বশে হাতের ছড়িটা মাঝে মাঝে মাটিতে ঠোকেন তিনি। একদল স্কুলের ছেলে ফুটবল খেলছে। দুদিকে ইঁট দিয়ে গোল তৈরী হয়েছে। দাঁড়িয়ে পড়েন সায়েব। বলেন, "বিনা পয়সায় ফুটবল খেলা দেখা যাক।"

বল নিয়ে ছেলেরা ছুটছে! একজনের পা থেকে বল কেড়ে নেবার চেষ্টা করছে অন্য একজন। আনন্দে মাটিতে ছড়ি ঠোকেন সায়েব, অন্য হাতটি রাখেন আমার কাঁধে।

আরও এগিয়ে যাই আমরা। ছেলেরা খেলছে দলে দলে। "আমারও ওদের দলে মিশে যেতে ইচ্ছে করছে, ছোটো বয়সের খেলায় অনেক আনন্দ।"

দমকা হাওয়ায় মাথার চুলগলো উড়ছিল। তাদের সংযত করে কিছু বলার আগেই, তিনি বলেন, "চলো, ফেরা যাক এবার।"

ফেরার পথে বিশেষ কথা হয় না। শুধু তিনি এক ফাঁকে জানিয়ে দেন, "ডবল চা খেতে হবে আজকে।"

চা-এর টেবিলে দেওয়ান সিংকে ডাক দিয়ে বলেন, "আজকে বেজায় খিদে লেগেছে।"

টোস্টে মাখন লাগিয়ে তার উপর খানিকটা জেলি ছড়িয়ে দেন। "এই মাখন আর জেলি নিয়ে আমার বাবা ও মায়ের মধ্যে ঝগড়া লাগতো। মা বলতেন, হয় মাখন না হয় জেলি নাও। গেরস্তর সংসারে দুটো চলে না। বাবা বলতেন, উঁহু এতে তোমার খরচ কমিয়ে দিচ্ছি। জেলি ও মাখন আলাদা খেলে দুটো টোস্ট লাগতো, একখানায় হতো না। লম্বা বেণী হাতে পাকাতে পাকাতে মা রেগে উঠতেন।"

"বেণী? ইংলণ্ডে বেণী রাখে মেয়েরা?"

"এখন বব ছাঁট। কিন্তু আমাদের মায়েরা সেকেলে মানুষ, ইয়া বড়ো বড়ো বেণী রাখতেন তাঁরা।"

উঠে পড়লাম চা খেয়ে।

কয়েক দিন পর চেম্বারে সায়েব বললেন, "আজকাল রোজ বেড়াতে যাচ্ছি সকালে।"

"কেমন লাগছে?" জিজ্ঞাসা করলাম।

"খুব ভালো, শরীরটা চাঙ্গা হয়ে ওঠে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের হাওয়ায়।"

শুনে আনন্দিত হয়েছি। হাঁটা-হাঁটিতে শরীরটা আরও ভালো থাকবে।

কেস্ ছিলো না সেদিন। একটার সময় চেম্বার থেকে চলে গেলেন তিনি। আমাকে বললেন, ঠিক সাড়ে চারটেতে ক্লাবে এসো, জরুরী কাজ আছে। (ক্লাবেই দুখানা ঘর নিয়ে থাকতেন তিনি।)

সকাল সকাল বাড়ি ফিরবো ভেবে-ছিলাম। কিন্তু হবে না। নিশ্চয় কোনো নতুন কেস্ আসছে।

ঠিক সাড়ে চারটাতে হাজিরা দিলাম। ঘরে ঢুকতেই সায়েব বললেন, "আমরা তোমার জন্য অপেক্ষা করছি।"

একটি রোগা ছেলে ময়লা জামা ও হাফ্ প্যাণ্ট পরে চেয়ারে বসে আছে। তার হাতে একটা রঙ্গীন ছবির ম্যাগাজিন। আমার দিকে একবার তাকিয়ে সে আবার ছবি দেখতে লাগলো।

ভয়ঙ্কর রাগ হলো আমার যখন সায়েব বললেন, এই ছেলেটির জন্যই আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ইংরিজি ভালো বোঝে না ছেলেটি, আমাকে দোভাষীর কাজ করতে হবে।

জরুরী কাজের এই নমুনা। রাগ গুমরে উঠেছিলো মনের মধ্যে। বাজে লোকের জ্বালাতনে বিরক্ত হয়ে উঠছি। দিন কয়েক আগে চেম্বারে মিসেস বার্ড এসেছিলেন, সঙ্গে গোটা তিনেক বাচ্চা। মিস্টার বার্ড লরি ড্রাইভার। মদের ঝোঁকে সেবারে লরির তলায় একটি ছেলে চাপা পড়লো। ছয় মাসের জেল। আপীল করেছিলেন সায়েব, কিছু হয়নি। স্বামী জেলে, মিসেস বার্ড চেম্বারে এসে বসে থাকেন। সংসার চলে না। একটা ছেলে কোলে শুয়ে থাকে, আর দুটো বেজায় ছটফটে। বড়টা টাইপ-রাইটার নিয়ে খট্ খট্ করতে আরম্ভ করে। তাকে আটকাতে গেলাম, ইতিমধ্যে অন্যটি র‍্যাক থেকে কাগজ বার করে ছিঁড়তে আরম্ভ করেছে। সায়েবকে বলেছি, কিন্তু তিনি খেয়াল করেন না।

"ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হয়েছে। বেড়াচ্ছিলাম, ও এসে আমার ছড়ি ধরে টানছিল। কথা বুঝতে পারিনি, তাই আজকে আসতে বলেছি।" সায়েব বললেন।

নাম বাসুদেব ধাড়া। বয়স পনেরো, দেখলে মনে হয় এগারো। শীর্ণ দেহের উপর মোটা মাথা, ঠিক যেন কাঠির ওপর আলুর দম। প্রশ্নোত্তরে জানলাম যশোর জেলায় বাড়ি। এখানে এক দর্জির দোকানে জামায় বোতাম লাগায় এবং পরিবর্তে খেতে পায় দুবেলা। থাকে আরও বড়ো জায়গায়—নিউ মার্কেট। দর্জির ব্যবসা ভালো চলছে না, তাই তাড়িয়ে দিয়েছে।

শুনে সায়েব বললেন, "হুঁ।"

মিনিট খানেক ভাবলেন তিনি তার-পর বললেন, "কিন্তু বড্ড রোগা, অল্ রাইট। শঙ্কর, ক্লাবের মেসিনে ওর ওজন নিয়ে এসো।"

"ছোটখাটো চাকরি খুঁজছে ও। ওজনে কী হবে?"

"না না ওজন নিয়ে এসো, আমার প্ল্যান আছে।"

বাহাত্তর পাউণ্ড।

"অনলি বাহাত্তর। সকালে......না

...লে হবে না। বিকেলে চা খেতে ...বে তুমি রোজ। ওজন বাড়াতে হবে।" ...দেবকে বললেন তিনি।

"চা খেলে ওজন বাড়ে?"

"না না, বাটার ও জেলিটা আমরা ...না কিছুদিন। যতদিন না বিরাশি ...ন্ড হচ্ছে।"

মুখটা কুঁচকে তিনি বললেন, "ঠিক ...ফেলেছি। ওয়েট না বাড়লে অন্য ...না চিন্তা করব না।"

বাসুদেব বিকেলে চা খেতে আসে ...। যাবার সময় সায়েব এক টাকা করে ...তাকে। শনিবারে দু'টাকা, রবিবারে ...হয় না বলে।

আর এক দিনের সন্ধ্যা। চা খেয়ে ...দেব চলে গেছে। টুকরো স্মৃতি-...নী শুনেছিলাম সায়েবের কাছে। ...তি দিয়েছিলেন অনেক দিন ...। কিন্তু সময় হয়ে ওঠেনি। সুযোগ ...মনে করিয়ে দিলাম সেদিন।

শনিবার দিন ক্লাবে গিয়েছি দেড়টার ...। বাসুদেব বসে আছে। সায়েব লাঞ্চে ...ছেন।

একটু পরেই ফিরলেন তিনি। দরজাটা ...করে ঠোঁটে আঙুল দিয়ে তিনি ...লেন, "চুপ।"

সন্তর্পণে এগিয়ে এসে ফিস্ ফিস্ ...রে বললেন, "বামাল সমেত পালিয়ে ...সেছি। ধরতে পারেনি।"

ভয় পেয়ে গেলাম। বামাল! মানে?

বললেন, "পকেটেই আছে।" তারপর ...কেট থেকে একটা আপেল বার হলো। ...ঞ্চ টেবিলে ডিসে দেওয়া মাত্রই চারি-...দিকে আড়চোখে তাকিয়ে টপ করে ...রিয়ে ফেলেছি।" তিনি আপেলটা ...সুদেবকে দিয়ে বললেন, "ঠিক হ্যায়, ...মিনিটে বেমালুম গায়েব করে দাও ...আপেলটা।"

হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা ধরে ...য়েছিলো সেদিন।

"খবরের কাগজ বিক্রী করবো ভাবছি," ...সুদেব একদিন সায়েবকে বললো।

বেজায় খুশী সায়েব। "এই তো চাই। ...চেষ্টা না থাকলে কিছু হয় না।"

জামা জুতো কিনে দিলেন তিনি। "স্মার্ট না হলে কেউ কাগজ কিনবে না।"

প্রথম দিন মুখ শুকনো করে ফিরলো বাসুদেব। সারাদিনে মাত্র দু'খানা বিক্রি হয়েছে। কাপে চা ঢাললেন সায়েব, বেশি করে দুধ দিয়ে এগিয়ে দিলেন বাসুদেবের দিকে। "প্রথম দিনে দু'খানা বিক্রি খারাপ নয়। তোমার কি মত, শংকর।"

"নিশ্চয়ই। ক্রমশ বাড়বে," উত্তর দিলাম।

ক্রেতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ কিভাবে করা যায়, সে বিষয়ে অনেক আলোচনা হলো। আধ ঘণ্টা ধরে উপদেশ দিলেন তিনি বাসুদেবকে।

কিন্তু পাঁচ খানার বেশি বিক্রি হয় না কিছুতেই। চা-এর টেবিলে বাসুদেবের বিক্রয়-সংখ্যা জানবার জন্য অধীর হয়ে বসে থাকি। "আজ ক'খানা?"

"চারটে।"

শুনে আমার মুখের দিকে তাকালেন তিনি। কপালটা কুঁচকে বললেন, "কাল রাত্রে ভাবছিলাম। কারণটা বুঝতে পেরেছি।"

"কি কারণ?"

"মোজা দরকার। আরও স্মার্ট হতে হবে, তবে বিক্রি বাড়বে।"

হাসি চেপে রাখতে বেশ কষ্ট হয়েছিল।

আসলে গ্র্যান্ড হোটেলের সামনে অনেক কাগজওয়ালার বাড়ি। নতুন লোককে ভালো চোখে দেখে না তারা। চোখ রাঙায়, অকারণে তেড়ে যায়। সায়েব কিন্তু নিরুৎসাহ হন না। বিকেলে চা-এর কাপ সামনে রেখে অপেক্ষা করেন। ক্রিকেট টেস্টের খবর নেওয়ার মতো ঘরে ঢুকতেই জিজ্ঞাসা করেন, "হাউ মেনি?",

শরীর ভালো যাচ্ছে না তাঁর। এক মাসে দুবার অসুখে পড়লেন তিনি। সম্পূর্ণ সেরে না উঠতেই মাদ্রাজ যেতে হবে। সেখানে একটি মামলা অনেকবার নানা অজুহাতে পিছিয়ে, এবার পাকা দিন পড়েছে।

যাবার আগে বাসুদেবকে দশটা টাকা দিয়ে তিনি বললেন, "দশ দিন পরে ফিরছি।"

মালপত্রের লাগেজ কম নয়। দু' ট্রাংক বই। হাওড়া স্টেশনে গেলাম। মাদ্রাজ মেল ছাড়তে দেরি আছে। সঙ্গে যাচ্ছে দেওয়ান সিং। বিছানা পেতে আধশোওয়া অবস্থায় বই পড়তে লাগলেন সায়েব। *আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম তাঁর ঠিক সামনে। কোন্ ফাঁকে জানলা দিয়ে দৃষ্টি চলে গিয়েছিলো বাইরে। হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে বুঝলাম, আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন তিনি।* বইটা মুড়ে রেখেছেন পাশে। চোখ নামিয়ে নিলাম।

"সাবধানে থেকো। চেম্বারের খবরা-খবর লিখো আমাকে। আমিও চিঠি দেবো।"

মাদ্রাজ মেল ছেড়ে দিলো। শেষ বগিটার পিছনের লাল আলোটাও মিলিয়ে গেলো ধীরে ধীরে।

চেম্বারে যাই রোজ। বেয়ারাকে সেখানে বসিয়ে হাইকোর্টে। বার লাইব্রেরীর সামনের বেঞ্চিতে বসে গল্প করি। বেঞ্চিতে অনেক নতুন মুখ। বিভূতিদার সঙ্গে প্রথম যাঁদের দেখেছিলাম, তাঁদের অনেকেই নেই। লোক পাল্টিয়েছে। কিন্তু রূপ পাল্টায়নি। ঠিক আগেকার মতো সব কিছু। মনে পড়ছিলো ছোকাদাকে, তাঁর কৈশোরে একই ছিল হাইকোর্টের রূপ। *আরও পিছনে কেমন ছিলো হাই-কোর্ট জানি না। কেউ লিখে যাননি তখন-কার কথা। সে যুগের বাবুদের জানতে ইচ্ছে করে। জানতে ইচ্ছে করে তাঁদের সায়েবদের। এই একই বেঞ্চিতে বাবুরা হয়তো বসে থাকতেন,* গল্প করতেন, হাসতেন, কাঁদতেন। বার লাইব্রেরীর ভিতরেও কোনো পরিবর্তন হয়নি। শুধু কেদারবাবুর কাজ বাড়ছে, নতুন বই আসছে প্রতি মাসে, র‍্যাকগুলো উঁচু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মইটাও বড় করতে হচ্ছে।

বাসুদেব এসেছিলো চেম্বারে। মাদ্রাজের খবর নিতে। চিঠি আসেনি এখনো।

চিঠি এলো কয়েক দিন পরে। পেন্সিলে লেখা দেওয়ান সিংএর চিঠি—সায়েবের শরীর ভালো নয়, কোর্ট থেকে লাঞ্চের আগে ফিরে এসেছেন গতকাল।

মনটা খারাপ। চেম্বারে হাজিরা দিয়ে হাইকোর্টে গেলাম। বারান্দায় দাঁড়িয়ে থেকে মক্কেলদের দেখছিলাম। চিনি না তাদের। কিন্তু তাদের মতো অনেককে দেখেছি। লোকটা হয়তো জিতবে, ফিরে যাবে আনন্দে। কিংবা ভাগ্যে রয়েছে দুঃখময় পরিণতি।

দুঃখের প্রতি স্বাভাবিক টান আছে নাকি আমার? প্রশ্ন করি নিজেকে। বেদনার উপলব্ধি আমার ভালো লাগে না। তাই বিষাদের মধ্যেও আনন্দ সন্ধানের চেষ্টা করেছি। যারা এসেছে এখানে আনন্দ নিয়ে আসেনি। সমস্যার সমাধানেও আনন্দ ফিরে পায়নি অনেকে। জিতটা হয়েছে হারের সামিল। কিন্তু আমরা অর্থাৎ বাবুদের বেদনার উপলব্ধি ক্ষণিকের। আমরা উপভোগ করি হাই কোর্টের প্রতি মুহূর্ত। কোর্টে কোমর বেঁধে ঝগড়া করে আমাদের সায়েবরা আমরা গল্প করি, বিড়ি চেয়ে খাই তদ্বিরের খবর নিই। সায়েবরা? তাঁরা মন্দ নেই। ঝগড়া-ঝাটিটা কোর্টের মধ্যে সেরে আসেন। বাইরে ভাই ভাই।

জজ সায়েবরা? বলতে পারবো না। দূরে থেকে সসম্ভ্রমে দেখেছি তাঁদের। এক এক সময় মনে হয়েছে মানুষ নন তাঁরা, অন্য কিছু। বিচারের দাঁড়ি-পাল্লায় ন্যায় অন্যায় ওজন করে চলেছেন সর্বদা। লিখেছেন পাতার পর পাতা, বই-এ ছাপা হয়েছে সে সব। দপ্তরীরা বাঁধিয়েছে। এক কপি কেদারবাবু সাজিয়ে রেখেছেন লাইব্রেরীতে। জজদের ছবি দেখেছি আইন বই-এর পাতায়, দেখেছি প্রধান বিচারপতির ঘরে। চিনি না অনেককে। একজনকে কিন্তু ভুল হয় না, ইতিহাসের পাতায় ছবি দেখেছিলাম তাঁর। তলায় লেখা ছিলো, স্যর ইলায়জা ইম্পে।

চেম্বারে তালা লাগিয়ে বাড়ি চলে গেছি। পরের দিন তালা খুললাম ঠিক সময়ে।

পিওন এসেছে। টেলিগ্রাম। দেওয়ান সিংএর টেলিগ্রাম। সায়েব চলে গেছেন— আর ফিরবেন না কোনোদিন। করোনারি থ্রম্বোসিস।

সেই দিনই আর একটা চিঠি পেলাম। সায়েব লিখেছেন নিজের হাতে—

"শংকর,

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে নার্সিং হোমে এসেছি। বিশেষ চিন্তা কোরো না। এখন বেশ ভালো মনে হচ্ছে। তবে কলকাতায় ফিরতে আরও কয়েক দিন দেরি হবে।

চিঠির উত্তর দিও, আর বাসুদেব কখানা কাগজ বিক্রি করছে জানাতে ভুলো না।

ভগবান তোমার মঙ্গল করুন।

ইতি"

শেষ। শেষ হয়ে গেছে কলকাতা হাইকোর্টের ইতিহাসের এক অধ্যায়। আমারও। চোখ বুজেছেন শেষ ইংরেজ ব্যারিস্টার। ইতি পড়েছে আমারও জীবনের এক অধ্যায়ে।

আর নয়। আইন পাড়ায় আর নয়। যেতে হবে অন্য কোথাও, অন্য কোনখানে।

শেষবারের মতো চেম্বারে দরজা বন্ধ করে ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটে দাঁড়িয়ে ছিলাম। মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে টেম্পল চেম্বার। স্মৃতির পর্দায় সিনেমা ছবির মতো অসংখ্য দৃশ্য ভেসে উঠছে।

বিভূতিদার হাত ধরে ওল্ড পোস্ট আপিস স্ট্রীটে আগমনের প্রথম দিনটি মনে পড়ছে। লাল রঙের হাইকোর্ট-বাড়িটার বিশালতায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভালোবাসতে পারিনি অচেনা জগৎকে—ছিল ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধার উপলব্ধি। তারপর পরিচয়ের সূর্যকিরণে ভয়ের মেঘ কেটে গেছে, কিন্তু শ্রদ্ধার বরফ গলেনি। ছোটো হয়ে এসেছে বিশাল প্রাসাদটি। একতলা, দু'তলা, তিন তলার প্রতিটি ঘর প্রতিটি থাম আমার চেনা। তবুও অজানা রয়ে গেছে চোদ্দ আনা। দু' আনা জানবার আগেই মেয়াদ ফুরিয়ে গেছে।

এ লেখার গোড়ায় যে কথা বলেছিলাম, সেটা আবার বলতে ইচ্ছে করছে। কিছুই বলা হয়নি।

ভাবিকালের কোনো ঐতিহাসিক ভারতের এই প্রাচীনতম ধর্মাধিকরণের প্রামাণিক ইতিহাস নিশ্চয় রচনা করবেন। ইতিহাসের উপাদান রয়েছে যথেষ্ট। হাইকোর্টের রেকর্ড রুমে জমা হয়ে রয়েছে অসংখ্য দলিল, অগণিত নথিপত্র। ভাবিকালের ঐতিহাসিক সেই স্তূপ থেকে উদ্ধার করবেন কতো অজানা তথ্য।

আমি ঐতিহাসিক নই। ইতিহাসের কোনো উপাদানও রেখে যেতে পারলাম না।

পূর্ণচ্ছেদ টানবার আগে একটি ছোট্ট কাহিনী মনে পড়ছে। সায়েবই বলেছিলেন আমাকে।

এই শতাব্দীর প্রারম্ভে একস্-রে ছবির এক প্রদর্শনীতে গিয়েছিলেন তিনি। বেজায় ভিড়, নতুন রশ্মির অবিশ্বাস্য ক্রিয়াকলাপ দেখতে এসেছেন অনেকে। সায়েবের পাশে দাঁড়িয়ে এক চীনা ভদ্রলোকও ছবি দেখছিলেন। সায়েবের বয়স তখন খুব কম। ভদ্রলোককে তিনি বলেছিলেন, "কী আশ্চর্য, দেহের প্রতিটি হাড় পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে।" দার্শনিকের গাম্ভীর্য সহ চীনা ভদ্রলোকটি উদাসভাবে বললেন, "হ্যাঁ, তা সত্যি। কিন্তু কেবল হাড়। এতে হৃদয় দেখা যায় না।"

ঠিকই বলেছিলেন চীনা ভদ্রলোকটি এবং আশা করি, আমিও অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে কেবল আইনের অন্তরস্থিত অস্থিকে খুঁজে বেড়ানোর অপরাধ করিনি।

সমাপ্ত

শার্ঙ্গদেব

সংগীতাচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তী

সম্প্রতি ভবানীপুর সংগীত সম্মিলনী গৃহে সংগীতাচার্য গিরিজাশংকর চক্রবর্তী মহাশয়ের একটি প্রতিকৃতি স্থাপিত হয়েছে। আমাদের সংগীত শিক্ষার প্রসারে গিরিজাশংকরের অপরিমিত উৎসাহের কথা স্মরণ করলে বিস্মিত হ'তে হয় এবং আজ বাঙলায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের যে নব আলোড়ন দেখা দিয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংগীত প্রেমিকের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অত্যন্ত সময়োচিত হয়েছে।

গত কয়েক বৎসর যাবত বাঙলায় উচ্চাঙ্গ সংগীতের যে প্রচলন হয়েছে তার মধ্যে কিছু নূতনত্ব আছে। এই গায়ন-রীতি ঠিক পূর্বরীতিকে অন্ধভাবে অনুসরণ করছে না—এর মধ্যে শিল্পীর একটা স্বকীয়তা এসেছে এবং এই স্বকীয়তা অনেক পরিমাণে পরিমার্জিত। আজকের দিনের শিল্পীরা, বিশেষ ক'রে বাঙালী শিল্পীরা দুরূহ এবং শ্রুতিকটু সংগীত শৈলী পরিহার করেন, কিন্তু তার মানে এ নয় যে তাঁরা সংগীতের দুরূহ শিক্ষার পথে অগ্রসর হ'তে অনিচ্ছুক—কাঁটার নিবিড় অরণ্য তাঁরা পরিশ্রম করেই ভেদ করেন, কিন্তু তুলে ধরতে চান সকল-কাঁটা-ধন্য-করা গোলাপ ফুলটিকেই। শিক্ষা যতই অগ্রসর হ'চ্ছে সৌন্দর্যবোধও ততই জাগ্রত হ'চ্ছে এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির প্রয়াসও ততই সুষ্ঠু পরিণতির দিকে চলেছে। এটিই এই যুগের বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হ'লে বহুশ্রুত হওয়া আবশ্যক। এই কারণেই এক যুগ পূর্বের শিল্পকৌশল সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল হয়েছে এবং আজকাল ভারতের প্রাচীন শিল্পীদের প্রায়ই আবার কলকাতার নানা আধুনিক আসরে দেখা যায়। অনেকের কণ্ঠেই আধুনিক প্রয়াসে প্রাচীন অলংকরণের কিছু প্রভাব দেখা যায় এবং এই দুটি পদ্ধতিতে মিলিয়ে একটি নূতন সৃষ্টির শিহরণে শ্রোতা পুলকিত হ'য়ে ওঠেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতে প্রাচীনের এই যে স্বীকৃতি এটি অত্যন্ত গৌরবের বিষয়।

গিরিজাশংকর যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেন তখনও উচ্চাঙ্গ সংগীতে একটি নব আলোড়নের সূত্রপাত হয়েছে। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভিক যুগের উচ্চাঙ্গ সংগীতের সঙ্গে পরিচয় লাভ করেন। উনবিংশ শতাব্দীর ধ্রুপদী রীতির প্রাধান্য তখনও বজায় আছে কিন্তু খেয়ালের বিকাশ এক নিজস্ব ভঙ্গী নিয়ে সগৌরবে আত্ম-প্রকাশ করছে এবং ঠুংরির আবহাওয়াটা

তখন একটু একটু করে জমাট হ'য়ে আসছে। বাঙলার কাব্য সংগীত ইতিমধ্যেই এক নিজস্ব রূপ নিয়েছে এবং সে রূপে প্রাচীন বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে বিভিন্ন নবীন প্রচেষ্টা অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে মিলিত হয়েছে। উচ্চাঙ্গ সংগীতে খেয়াল-ঠুংরির ভিতর দিয়ে যে প্রগতির সূচনা হয়েছে, গিরিজাশংকর সেই সূচনার যুগ থেকেই সংগীত জগতে প্রবেশ লাভ করেন।

বহুশ্রুত ব্যক্তি ছিলেন তিনি এবং উচ্চাঙ্গ সংগীতের বিভিন্ন ধারা, বিভিন্ন ঘরানার সঙ্গে ঘনিষ্টভাবে পরিচিতও ছিলেন। এর ফলে তিনি এই সব বিভিন্ন ধারা থেকে সংগীতে একটি সমন্বয় করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞতা থেকেই তিনি একটি চমৎ শিক্ষা ধারার প্রবর্তন করেন এবং শিক্ষায় তাঁর বহু ছাত্র পরবর্তীকা সংগীতে কৃতিত্ব লাভ করেছেন। বস্তু গিরিজাশংকর একজন শ্রেষ্ঠ সংগীত-গু বলেই পরিচিত ছিলেন। এক সময় ত কাছে কিছুকাল শিক্ষালাভ না কর সংগীত সাধকদের তৃপ্তি হ'ত না। পরিণ বয়স্ক থেকে তরুণ বয়স্ক পর্যন্ত সকলে অতি আগ্রহের সঙ্গে তাঁর কাছে শিক্ষাল করেছেন। তাঁর যুগে তাঁর মত জনপ্রি সংগীত-শিক্ষক আর ছিলেন কি সন্দেহ।

গিরিজাশংকরের প্রধান কৃতিত্ব এইখা যে তিনি সংগীতের কোন একটি বিশি ঘরানার মধ্যেই নিজেকে সীমাবদ্ধ ক' রাখেন নি। ভারতের নানা স্থানে প্রধ প্রধান ওস্তাদের সংস্পর্শে এসেছেন এ তালিম নিয়েছেন। এর ফলে তাঁর এম একটি সংগীত বোধ জাগ্রত হয় যা তাঁ সম্পূর্ণ একটি নিজস্ব বৈশিষ্ট্য প্রদান ক এবং তাঁর শিক্ষাধারার মধ্যে এই বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ ঘটেছিল। ঠুংরিতে তাঁর অসাধার পারদর্শিতার কথা সকলেই জানেন—খেয়ালও তাঁর কাছ থেকে শিখেছেন অনেকেই, কিন্তু ধ্রুপদী হিসাবেও তাঁর কৃতিত্ব কম ছিল না। বিষ্ণুপুর ঘর থেকে সেনীঘর পর্যন্ত ধ্রুপদী রীতি তিনি বিশেষ পরিশ্রম সহকারে শিক্ষা করেছিলেন। উচ্চাঙ্গ সংগীতের এই তিনটি শ্রেণীতেই শ্রেষ্ঠ শিক্ষা লাভ করবার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। তথাপি গিরিজাশংকরের যুগ হ'চ্ছে খেয়াল-ঠুংরির যুগ—বিশেষ করে বাঙলায় ঠুংরির প্রগতির মূলেই তাঁর প্রভাব বর্তমান।

এই প্রসঙ্গে প্রসিদ্ধ সংগীতগুরু বৌবাজারের নগেন দত্ত মহাশয়ের কথা মনে পড়ছে। খেয়াল এবং টপ্পার শিক্ষা-দানে তাঁর কৃতিত্বও বড় কম ছিল না, বিশেষ ক'রে টপ্পায়। টপ্পার ভাণ্ডার তাঁর ছিল অফুরন্ত এবং বাঙলা টপ্পা আর উর্দু টপ্পা পাশাপাশি গেয়ে তিনি দুটি রীতির বিশ্লেষণ করতেন। ব্যাপক সংগীতজ্ঞানের ফলে এই যে একটি নিপু

দৃষ্টিভঙ্গী, এই যে শিক্ষার্থীদের সঙ্গীতের মূল রসের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়া, এইটি প্রকৃত সঙ্গীতবোধ না হ'লে আসে না এবং বহু প্রচেষ্টায় স্বল্প কয়েক ব্যক্তির মধ্যে এই বোধ জাগ্রত হয়েছিল বলেই বিংশ শতকে বাঙলায় খেয়াল-ঠুংরি এবং ধ্রুপদের প্রচারে শৈথিল্য ঘটেনি পরন্তু উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত সম্বন্ধে একটি শিক্ষিত এবং পরিমার্জিত কৌতূহল জাগ্রত হয়েছে।

গিরিজাশঙ্কর ১৮৮৫ সালে মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ভবানীকিশোর চক্রবর্তী ছিলেন বহরমপুরের একজন প্রসিদ্ধ উকিল। জমীদার হিসাবেও তাঁদের স্বতন্ত্র পরিচয় ছিল।

ছেলেবেলা থেকেই গিরিজাশঙ্করের ছবি আঁকা তথা ললিতকলার প্রতি আকর্ষণ ছিল খুব বেশি। চিত্রাঙ্কণ বিদ্যার পারদর্শিতা লাভের জন্য তিনি কলকাতার গভর্নমেণ্ট আর্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন। এইখানে ছবি আঁকা এবং সংগীত সাধনা দুটোই বেশ ভাল রকম অগ্রসর হয়েছিল। মুর্শিদাবাদের বহু সম্ভ্রান্ত গৃহে গিরিজাশঙ্করের আঁকা তৈলচিত্র বা জলরঙের ছবি বর্তমান।

গিরিজাশঙ্করের প্রকৃত সঙ্গীত শিক্ষা আরম্ভ হয় আঠারো বৎসর বয়স থেকে। এই সময়ে সেকালের শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞ রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী কাশিমবাজারের মহারাজা মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত সঙ্গীতবিদ্যালয়ে গান শেখাচ্ছিলেন। গিরিজাশঙ্কর তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করলেন। আট বৎসরকাল তিনি গোস্বামী মহাশয়ের কাছে ধ্রুপদ ও খেয়াল শিক্ষা করেন। বিদ্যালয়ের প্রত্যেক বার্ষিক পরীক্ষায় তিনি সর্বোচ্চ স্থান অধিকার ক'রে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার লাভ করেছিলেন। রাধিকাপ্রসাদ তাঁকে যেমন স্নেহ করতেন গিরিজাশঙ্করও তাঁকে তেমনি শ্রদ্ধা ভক্তি করতেন। উত্তরকালে গোস্বামী মহাশয়ের প্রসঙ্গ উঠলেই গিরিজাশঙ্কর উৎসাহিত হয়ে গুরুর স্মৃতি কাহিনী বিবৃত করতেন।

বহরমপুরের শিক্ষা সমাপ্ত হ'লে তিনি লখনউবাসী এক মৌলবীর কাছে উর্দু এবং হিন্দী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করেন। খাঁটি উর্দুতে চমৎকার কথাবার্তা বলতেন তিনি। উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে সঙ্গীতে জ্ঞানার্জনের জন্য ঘুরে বেড়াবার সময় এই উর্দু-হিন্দীর জ্ঞান তাঁকে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। ঠুংরিতে খাঁটি উর্দু উচ্চারণ একটি শোনবার জিনিস—খুব কম লোকেরই এই উচ্চারণ ক্ষমতা থাকে। গিরিজাবাবু এই বিশুদ্ধ উচ্চারণ ভঙ্গী চমৎকারভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। বহরমপুরে গান শেখবার সময় তিনি মাঝে মাঝে কলকাতায় আসতেন। এখানে অনেকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হ'ত। একবার কলকাতায় এসে তিনি শ্যামলাল ক্ষেত্রী মহাশয়ের সঙ্গে পরিচিত হলেন। ক্ষেত্রী মহাশয় গিরিজাশঙ্করের কৃতিত্বে অত্যন্ত প্রীত ছিলেন এবং আজীবন তাঁকে পুত্রবৎ স্নেহের চক্ষে দেখেছেন। শ্যামলালবাবুর পৃষ্ঠপোষকতায় গিরিজাশঙ্কর সঙ্গীত শিক্ষার বহু সুযোগ লাভ করেছিলেন—শুধু কলকাতায় নয়, ভারতের নানা স্থানে।

শ্যামলাল ক্ষেত্রী মহাশয় গিরিজাশঙ্করকে গোয়ালিয়রের অদ্বিতীয় ঠুংরি গায়ক ভাইয়া সাহেব গণপৎ রাও-এর সঙ্গে পরিচিত করে দেন এবং এ'র শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি ঠুংরিতে বিশেষ ক্ষমতা অর্জন করেন।

ঠুংরিতে বিশেষত্ব অর্জনের আর একটি প্রধান সহায়ক হ'ল সেকালের শ্রেষ্ঠ ঠুংরি গায়ক মৌজদিনের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা। মৌজদিনের সঙ্গে ছিল তাঁর বন্ধুত্বের সম্পর্ক এবং তাঁর কাছ থেকে ঠুংরির বহু কলা-কৌশল তিনি আয়ত্ত করেন। বস্তুত ঠুংরি সম্বন্ধে একটা নতুন ধারণা যে তিনি মৌজদিনের কাছ থেকেই পান এবং ঠুংরিতে মৌজদিন যে তাঁর আদর্শস্বরূপ ছিলেন একথা গিরিজাশঙ্কর সানন্দে স্বীকার করতেন।

দিল্লীতে তিনি খেয়ালে তালিম নেন শ্রেষ্ঠ খেয়ালী মুজঃফর খাঁর কাছে। এ'দের ঘর বিশুদ্ধ খেয়ালের জন্য বিখ্যাত ছিল এবং এ'দের বৈশিষ্ট্য ছিল গমক এবং দুনী তানে। গিরিজাশঙ্কর এই দুনীতানটি অতি নিপুণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।

দিল্লী থেকে তিনি এলেন রামপুরে। তখন প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান হয়েছে। রামপুরে সেনী ঘরানার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ মহম্মদ আলী খাঁর কাছে তিনি ধ্রুপদ এবং ধামারে তালিম নেন। শুধু তাঁর কাছেই নয় নবাব ছম্মন সাহেব এবং উজীর খাঁর কাছেও হোরী-ধ্রুপদের তালিম নিয়েছিলেন। রামপুরে তাঁর সঙ্গীত শিক্ষার ব্যবস্থা করেন নবাব ছম্মন সাহেব।

রামপুর থেকে কলকাতায় ফিরলেন তিনি ১৯১৮ সালে। এরপর থেকে এগারো বৎসর তিনি হ্যারিসন রোডে শ্যামলাল ক্ষেত্রীর বাড়িতে স্থায়ীভাবে বাস করেন এবং ওস্তাদ বাদল খাঁর কাছে খেয়ালে তালিম নেন। ওস্তাদ ছোটে মুন্নে খাঁর কাছ থেকেও তিনি কিছু শিক্ষালাভ করেন। খেয়াল-ঠুংরিতে বিশেষত্ব অর্জন করলেও ধ্রুপদের চর্চা তিনি বরাবরই রেখেছিলেন। এই সময় মেবারের একজন ধ্রুপদীর সহায়তায় তিনি হোরী, ধ্রুপদ সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞানলাভ করেন।

১৯৪৮ সালে মে মাসে তাঁর মৃত্যু হয়।

গিরিজাশঙ্করের সমসাময়িক সঙ্গীতাচার্যদের অনেকেই আজ গত হয়েছেন। সেকালের সঙ্গীতসাধকগণকে কঠোর নিয়মে এবং বহু আয়াসে গান শিখতে হয়েছে,—ভ্রমণ করতে হয়েছে নানা প্রদেশে। আজকের রেডিও এবং সঙ্গীত সম্মেলনের যুগে যেটা সহজলভ্য হয়েছে সেকালে সেটা ছিল না—যথার্থ সঙ্গীত শিক্ষা যথার্থই পরিশ্রমসাধ্য ব্যাপার ছিল। এই উপলক্ষ্যে তাঁদের বিস্তীর্ণ অভিজ্ঞজতার ব্যাপক পরিচয় আমরা যদি পেতাম তাহলে সঙ্গীত জগতের অনেক নতুন খবর মিলত। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়ে উঠেনি—সঙ্গীত-জগতের বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিদের জীবন-কাহিনী আজ দুর্লভ। এ'রা শিষ্যাদি কম রেখে যাননি এবং তাঁদের মধ্যে বিত্তবান ব্যক্তির সংখ্যাও স্বল্প নয়, অথচ গুরুর জীবন-কাহিনী সঞ্চিত রাখবার প্রচেষ্টা তাঁদের মধ্যে দেখা দেয় নি। কিছুকাল পূর্বে রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী মহাশয়ের পরিচয় প্রদান করতে গিয়ে দেখি দু একটি পত্রিকায় অপটু এবং অপূর্ণ প্রবন্ধে কথঞ্চিৎ উল্লেখ ভিন্ন আর কোন তথ্যই পাওয়া যায় না, অথচ গোস্বামী মহাশয়ের কত যশ প্রতিপত্তিই না ছিল! আজ তাঁর একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনী মেলে না। এইভাবে গিরিজাশঙ্করের জীবনী পরিচয়ে এসেও ঠেকেছি—তাঁর সম্বন্ধে তথ্যাদিও এরই মধ্যে দুর্লভ হ'য়ে পড়েছে। এ'রা এক একটা যুগে সঙ্গীত জগতে আধিপত্য করে গেছেন—এ'দের জীবন-কাহিনী মানেই হ'চ্ছে বাঙলার সাঙ্গীতিক ইতিহাসের এক এক অধ্যায়ের পরিচয়। অতএব এই সব পূর্ণাঙ্গ জীবনী সংগ্রহের বিশেষ প্রয়োজন ঘটেছে। কিন্তু এই সংগ্রহের দায়িত্ব কে নেবে? এত কনফারেন্স আর জলসায় সহস্র সহস্র মুদ্রা ব্যয় হ'চ্ছে, আর এই সব ঐতিহাসিক প্রযত্নে কিছু ব্যয় হ'লে সে কি খুব বেশি হবে? আমাদের জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষার্থে অবিলম্বে এই কর্তব্যভার কোন দায়িত্ব-সম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের গ্রহণ করা উচিত একথা যে বলবার আবশ্যকতা হয়েছে এইটিই দুঃখের বিষয়।

রবীতীর্থের বসন্তোৎসব

গত রবিবার মহারাষ্ট্র নিবাস হলে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে রবিতীর্থ ও গীতাঞ্জলি সঙ্গীত-সংস্থা দুটির একীকরণ ও বসন্তোৎসব পালিত হয়। সভাপতি শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ নিজের ভাষায় গানের সাহায্যে ভাব প্রকাশের স্বাচ্ছন্দ্য বিষয়ে বক্তৃতা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতসমূহের উল্লেখ করেন। প্রধান অতিথি শ্রীশান্তিদেব ঘোষ সঙ্গীত সংস্থা দুটির একত্রিত হওয়ার অনুষ্ঠানকে স্বাগত জানান। রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রবীন্দ্র-সঙ্গীতে তান বিস্তার সহযোগে গীত হবার যে কথা বর্তমানে উঠেছে তা যুক্তিযুক্ত নয়। কারণ, তানের যদি প্রয়োজন হতো তাহলে রবীন্দ্রনাথ নিজেই তা করতেন। নানা রাগরাগিণী ও লোকসঙ্গীত থেকে সুর ছন্দ আহরণ করে রবীন্দ্রনাথ এমন একটি বিশেষ ধারার সঙ্গীত সৃষ্টি করেছেন যা একটা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল। তবে রবীন্দ্র-সঙ্গীতই একমাত্র সঙ্গীত এ মনোভাব নিয়ে অন্যান্য সঙ্গীতধারাকে অবজ্ঞা করা সংকীর্ণতারই পরিচায়ক হবে। রবীন্দ্রনাথ অন্য সঙ্গীত থেকে আহরণ করতে যে উদার মনের পরিচয় দিয়েছিলেন তেমনি উদার মন রবীন্দ্র-সঙ্গীত সাধকদেরও রাখতে হবে। বক্তৃতা অন্তে রবীন্দ্র-সঙ্গীত, নৃত্য ও আবৃত্তি সহযোগে বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরিচালনা করেন দ্বিজেন চৌধুরী ও সুচিত্রা মিত্র এবং গানে অংশ গ্রহণ করেন শান্তিদেব ঘোষ, দ্বিজেন চৌধুরী, সুচিত্রা মিত্র প্রভৃতি।

নূতন গানের রেকর্ড

সম্প্রতি হিজ মাস্টারস ভয়েস ও কলম্বিয়া কোম্পানী কতকগুলি সুন্দর সুন্দর রেকর্ড বাজারে প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার মধ্যে বাছাই করা রেকর্ড :—

হিজ মাস্টারস ভয়েস : প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইখানি আধুনিক গান (এন ৮২৬৪৭); ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুইখানি ধর্মমূলক গান (এন ৮২৬৪৮); দিলীপকুমার রায়ের জনপ্রিয়—'অরবিন্দ স্তোত্র' ও 'মাতৃ স্তোত্র' (এন ২৭৬৫৬); জগন্ময় মিত্রের দুইখানি আধুনিক গান (এন ৮২৬৪৩); সন্তোষ সেনগুপ্ত ও পূরবী চ্যাটার্জির দুইখানি রবীন্দ্র সঙ্গীত (এন ৮২৬৪৪); আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায় গীত দুইখানি শিশু গীতিকা (এন ৮২৬৪৬); সুপ্রীতি ঘোষের দুইখানি আধুনিক গান (এন ৮২৬৪৫) ও রণজিৎ রায়ের কমিক (এন ৮০১০১)।

কলম্বিয়া : ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের কণ্ঠে দুইখানি প্রেমের গান (জি ই—২৪৭৫৪); ক্রান্তি শিল্পী সংঘের "বাংলার রূপ" (জি ই—২৪৭৫৫); হিমাংশু বিশ্বাসের বাঁশী (জি ই—২৫৮২৮); পবিত্র চট্টোপাধ্যায়ের সেতার (জি ই—২৫৮২৭); হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের আধুনিক গান (জি ই—২৪৭৫২)। ইহা ছাড়া **'অগ্নি পরীক্ষা' ছবির তিনখানি রেকর্ড, 'মন্ত্রশক্তি' ছবির দুইখানি রেকর্ড।**

বনমানুষ গরিলা

অজয় হোম

আমাদের মধ্যে অনেকের ধারণা মানুষের আদি উৎপত্তি বুঝি বনমানুষ (Anthropoid apes) থেকে। ধারণাটা কিন্তু মোটেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। তবে লক্ষ লক্ষ বছর আগে মানুষ ও বনমানুষের আদি-জনক যে একই ছিল এটা সর্বসম্বাদী সত্য। খুব সম্ভবত ছোট লেজহীন বানর তিনি। লম্বা চওড়ায় অর্থাৎ চেহারায় অনেকটা আমাদের পরিচিত উল্লুকের (Gibbon) মতই ছিলেন—অন্তত পণ্ডিতদের ধারণা তাই। এই আদি-জনকটি থেকে যে শাখা-প্রশাখার উৎপত্তি হ'য়েছিল তার থেকে মানুষ বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ আলাদা ছাঁচে ঢেলে নিয়ে বর্তমান অবস্থায় এসে পেঁছেচে। বনমানুষ-গোষ্ঠী আমাদের যে দূর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতিভাই এটা স্বীকার ক'রতে অবশ্য বাধা নেই। চেহারা ও মানসিক বিচার-বুদ্ধির দিক দিয়ে মানুষের সঙ্গে এই গোষ্ঠীর মিল বড়ই প্রকট।

মানুষ যে বনমানুষ—গরিলা, শিম্পাঞ্জি, ওরাং-ওটান, এমন কি উল্লুক থেকে যে উৎপত্তি হ'তে পারে এই আদিম ভ্রান্ত বিশ্বাসকে জোরদার ক'রেছিলেন পাশ্চাত্তের দুই বিজ্ঞানী।

১৯১৫ সালে ক্লাটশ্চ্* অনেক গবেষণার পর পুরোকালীন চল্‌তি প্রবাদকে ভিত্তি ক'রে এই সিদ্ধান্তে এলেন যে, মানুষের উৎপত্তি হ'য়েছে তিন প্রধান বর্ণানুযায়ী জাতি (race) সাদা, কালো আর হলদে থেকে, যাদের আদি উৎপত্তি স্থল হ'ল তিন প্রজাতির বনমানুষ। অর্থাৎ গরিলা থেকে নিগ্রো বা কালো চামড়া, ওরাং-উটান থেকে মঙ্গোলীয় বা হলদে চামড়া, আর শ্বেত বা সাদা চামড়ার উৎপত্তি শিম্পাঞ্জি থেকে। যুক্তি দিলেন তিনি এই ব'লে যে, তিন প্রজাতির বনমানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অস্থিসমূহের সঙ্গে তিন চামড়ার মানুষের সাদৃশ্য এত নিকটতম যে, তাঁর এই সিদ্ধান্ত ছাড়া অন্য কোনরূপ সিদ্ধান্তে আসা খুবই কঠিন এবং অসম্ভবও।

ক্লাটশ্চ্-এর এই মতবাদকে প্রথমে কেউই বিশেষ আমল দেয়নি। কিন্তু ক্রুকশাঙ্ক* কতকগুলি এমন সব যুক্তির অবতারণা ক'রে সকলকে এমন বিভ্রান্ত ক'রে তুললেন যে, লোকে মনে ক'রল, ক্লাটশ্চ্-এর মতবাদ হয়ত সত্যি বা। তিনি দেখালেন, নিগ্রোরা বসে ঠিক গরিলার মতই একটা পা সামনের দিকে ছড়িয়ে, আরেকটার হাঁটু মুড়ে। ছবি ও ভাস্কর্যশিল্পে বুদ্ধদেবের পদ্মাসন মূর্তির নজির দিয়ে তিনি বাতলালেন মঙ্গোলীয়দের প্রতীক ভগবান বুদ্ধের মতই প্রায় ওরাং-উটান দুই হাঁটু মুড়ে বাবু হয়ে বসে, সুতরাং ওরাং-উটান মঙ্গোলীয়দের আদি-পিতা।

মুষ্টিমেয় কয়েকজন খাঁটি বিজ্ঞানীর কাছে ক্লাটশ্চ্ বা ক্রুকশাঙ্কের মতবাদ ও যুক্তি খুব দাম পেল না বটে, কিন্তু

* H. Klaatsch: Die Aurignac-Rasse und ihre Stellung in Stammbaum der Menschheit., Ztschrf. Ethnol., 42: 513-77 (1915).

* F. G. Crookshank: The Mongol in our Midst—a study of man and his three faces., London (1924).

সাধারণ মানুষ ও স্বল্পজ্ঞান বিজ্ঞানীদের যে বেশ কিছুটা বিভ্রান্ত ক'রে ছেড়ে দিয়েছিল তা'তে কোন সন্দেহ নেই। অবশ্য এখন আর এই ভুলকে সমর্থন করার কোন পথই নেই।

মনুষ্য-সদৃশ লাঙ্গুলহীন বানর বা বনমানুষ চারটি গণে (Genus) বিভক্ত—, শিম্পাঞ্জি, গরিলা, ওরাং-উটান ও উল্লুক। আমাদের আলোচ্য জীবটি হ'ল এই প্রবন্ধে গরিলা (Gorilla)। আফ্রিকার অধিবাসীদের ভাষায় গরিলা কথার অর্থ 'লোমশ বর্বর'।

বনমানুষ-গোষ্ঠীর মধ্যে গরিলাই হ'ল সবচেয়ে বিশালাকার, ভয়াবহ এবং মনুষ্য-সদৃশ। গায়ের কালো চামড়ার উপর ছোট ছোট কালো লোম। লোমে কিছুটা ধূসর ও হলদে-পাটকিলের সংমিশ্রণও আছে। হাত-পা'র দৈর্ঘ্যের তারতম্য খুব সামান্যই। গাছের ডালে চলাফেরা করে ব'লে হয়ত সামান্য কিছুটা বড়। এই কারণে এদের মানুষের মত দেখায়। স্ত্রী-পুরুষ এই দুই গরিলার ওজনের পার্থক্য খুব বেশী।

দিনের অনেকটা সময় গাছের উপর কাটালেও গাছের উপর চলাফেরায় বিশেষ কোন শ্রী নেই। গাছ অপেক্ষা মাটির উপর দিয়েই চলতে যে এরা অভ্যস্ত তা এদের হাত ও পায়ের পাতা দেখলে বোঝা যায়। হাত ও পায়ের পাতা বড়, আঙুল ছোট। গাছের ডাল এই কারণে ভাল ক'রে ধরতে পারে না। সেইজন্য গাছের মাঝামাঝি মোটা ডাল দেখেই ওঠে, আগডালে কখনই যায় না। মাটিতে বসে যে অভ্যস্ত সেটা এদের বিশাল চেহারা ও গুরু-ওজন লক্ষ্য করলেও বোঝা যায়। নিঃশব্দে দ্রুত দৌড়াতেও এরা খুব পটু।

মধ্য আফ্রিকার পশ্চিমাংশে ক্যামেরুনস্ ও গেবুনের গভীর জঙ্গলে (Gorilla gorilla), ট্যাঙ্গানাইকা হ্রদের উত্তরে কিভু হ্রদের পার্বত্যাঞ্চল (G. beringei) ও ইটুরি জঙ্গলে (G. gorilla rex_pygmaerum) এই তিনটি অঞ্চলে তিন জাতীয় গরিলার নিবাস। এদের মধ্যে ক্যামেরুনস্ ও গেবুনের গরিলাই আয়তনে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। অনেকের মতে পূর্বাঞ্চলের গরিলা (G. beringei) পশ্চিমাংশের অপেক্ষা বেশী শক্তিশালী। এদের বাসস্থান এত বিপদ-সংকুল গভীর জঙ্গলে যে, সেখানে মানুষের যাওয়া প্রায় অসম্ভবের পর্যায়েই পড়ে। এই কারণে স্বাভাবিক পরিবেশে কোনরূপ তথ্য নিরূপণ করা রীতিমত দুরূহ ব্যাপার।

বন্দী অবস্থায় পর্যবেক্ষণকারী, মনুষ্য-অগম্য জঙ্গলে সাহসী অনুসন্ধান-কারীর দল এবং দৈবাৎ দর্শন লাভ করেছেন যাঁরা, একমাত্র তাঁদের লিপিবদ্ধ বৃত্তান্ত হ'তেই এদের যা কিছু আচার-ব্যবহার ও জীবনযাত্রা প্রণালী জানা যায়।

স্বাভাবিক অবস্থায় এরা এত নীরবে প্রচ্ছন্নভাবে চলাফেরা করে যে, বেশীর ভাগ সময় ডাক শুনে বা পরিত্যক্ত বাসস্থান দেখে কেবল অস্তিত্বই অনুভব করা যায় চাক্ষুষ পরিচয় লাভ ভাগ্যে ঘটে না। বহু শিকারী ও পর্যটকের কপালে তাই-ই ঘটেছে। অনেক চেষ্টা ও কালক্ষয় ক'রেও সাক্ষাৎ লাভ হয়নি, অথচ সর্বদাই অনুভব করেছেন ও নজির পেয়েছেন তাঁদের আশে পাশেই আছে। এদের গুরু-ওজন ও বিশাল দেহ নিয়ে প্রচ্ছন্ন থাকার অসম্ভব ক্ষমতা প্রত্যেকেরই বিস্ময়ের উদ্রেক ক'রে থাকে।

ফলমূলই সাধারণত মুক্ত অবস্থায় এদের প্রধান খাদ্য। বন্দীদশায় ডিম ও মাংসের প্রতি অনুরাগ দেখে মনে হয়, জঙ্গলেও পাখীর বাসা থেকে ডিম ও পাখীর ছানা দুইই খেয়ে থাকে।

আফ্রিকার মানুষ-বানরের খবর প্রথম সভ্যজগতের কাছে উদ্ঘাটিত করে খৃস্ট-পূর্ব ৪৮০ বছর আগে হান্নো (Hanno) নামে এক কার্থেজবাসী। হান্নো উপ-নিবেশের খোঁজে ষাটটি অর্ণবপোত নিয়ে সমুদ্রপথে চলেছিল পশ্চিম আফ্রিকার তীর ধরে। জাহাজ থেকে দেখতে পেল তীরের অতি সন্নিকটে এক 'আগুনে নদী' (সম্ভবত ক্যামেরুনসের কোন আগ্নেয়গিরির লাভাস্রোত)। সেটা ছাড়িয়ে এসে আরেকটু এগিয়ে একটা দ্বীপ দেখে সেখানে নোঙর করে। এখানে কতকগুলি বন্য মানুষ দেখতে পেয়ে হান্নো তাদের ধরার জন্য ব্যগ্র হয়, কিন্তু তার সঙ্গীরা অনেক চেষ্টা ক'রেও কোন পুরুষকে ধরতে সক্ষম হ'ল না। বহু কষ্টে ক'টি স্ত্রীলোককে বন্দী করে বটে কিন্তু তাদের আঁচড়ানো কামড়ানো ও থি চানোর ঠেলায় মেরে ফেলতে বাধ্য হ হয়। হান্নো তাদের গায়ের লোমশ চাম ছাড়িয়ে দেশে এনে জুনোদেবীর মন্দি দান করে। মন্দিরের ভিতর সেগু সাজিয়ে রাখা হয়। পরে রোমবাস দ্বারা কার্থেজ নগর অধিকৃত হবার প এই ঘটনা এক ব্রোঞ্জ-ফলকে 'পেরিপেটা হান্নোনিস' (Peripatus Hannoni নামে লিপিবদ্ধ হয়। দোভাষীর কা হান্নো এই 'লোমশ বর্বর'দের না শুনেছিল 'গরিল্লি' (Gorillae) দু'হাজার বছর আগে কার্থেজবাসী যা গরিলা বলে জানত তা খুব সম্ভব শিম্পাঞ্জী বা তার কোন নিকট আত্মীয় —সত্যিকারের গরিলা নয়।

আধুনিক যুগে ১৮৪৬-৪৭ সালে এই বিশালকায় লাঙ্গুলহীন বানরের খবর প্রথম পাওয়া যায় বা পুনরুদ্ধার হয় আফ্রিকার দুই মিশনারী উইলসন ও স্যাভেজ-এর কাছ থেকে। তারপর বেশ কিছুদিন গরিলার ভয়াবহ শক্তি নিয়ে নানা রকমের গুজব বাজারে চলতে থাকে। এই গুজবের অবসান ঘটান দু চৈল্যু (P. Du Chaillu) নামে আমেরিকাবাসী এক পর্যটক। ১৮৬১ সালে তিনি তাঁর বই 'এক্সপ্লোরেশন এ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চারস ইন ইকোয়েটোরিয়াল আফ্রিকা'য় বলেন—

মানুষের গালগল্পের খোরাক যা তার বিশ্বস্তসূত্রে জেনেছে ব'লে প্রচার ক'রে থাকে তা নষ্ট করার জন্য আমি খুবই দুঃখিত কিন্তু এটাই ঠিক কথা যে গরিলা কোন রাস্তার পাশে গাছের উপর থেকে অতর্কিতে পথচারী কোন মানুষকে হাত বাড়িয়ে থাবা দিয়ে উপরে টেনে তোলার জন্য ঘাপটি মেরে বসে থাকে না বা তোলার পর সাঁড়াশীর মত লম্বা আঙুল দিয়ে গলা টিপেও মারে না কিম্বা গাছের ডাল ভেঙে ভীমের গদা তৈরী করে তাই দিয়ে হাতীকে পিটিয়ে নাজেহাল করে না; স্থানীয় জঙ্গলী লোকের ঘর থেকে মেয়েছেলে চুরি করে জঙ্গলেও পালায় না; অথবা গাছের উপর ডালপালা দিয়ে মজবুত বাড়ি বানিয়ে তার ছাদের উপর চেপে বসে থাকে না। হাজারে হাজারে দলবদ্ধ হয়ে যেসব আক্রমণের গল্প শোনা যায়, তার মধ্যে এক কণাও সত্যি নেই। আফ্রিকার গভীর নির্জন জঙ্গলে এদের বাস। গাছে খুব বেশী বা একদমই বাস করে কি না সন্দেহ। কারণ আমি সব সময় এদের মাটিতেই ঘোরাফেরা করতে দেখেছি। ফল বা বাদাম খেতে গাছের

'বুশম্যান'—শিকাগোর লিঙ্কন পার্ক চিড়িয়াখানার গরিলা। ১৯৫১ সালে বন্দীদশায় ইহার মৃত্যু হয়

উপর খুবই ওঠে, কিন্তু খাওয়ার পর সব সময়ে নেমেই আসে উপরে থাকে না। অন্যান্য বন্য জন্তুর হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য একমাত্র বাচ্চা গরিলারাই গাছের উপর ঘুমায়।

গরিলা বুনো আখের খুব ভক্ত। বিশেষ ভক্ত হচ্ছে আনারস পাতার ভিতরের সাদা অংশটা। বিভিন্ন টেপারী জাতীয় ফল, গাছের নরম মূল শিকড় ও এক রকমের শক্ত খোসা-ওয়ালা বাদাম তাদের খুব প্রিয়। এই বাদামের খোলা এত শক্ত যে, হাতুড়ি দিয়ে ভাঙ্গতেও বেশ বেগ পেতে হয়। কষের দাঁত দিয়ে এগুলিকে এরা ভাঙ্গে। নিরামিষাশী এই জীবটির শক্ত চোয়াল বোধ হয় এই কঠিন বাদাম ভাঙ্গার জন্যই সৃষ্টি হয়েছে। এই চোয়ালের শক্তি যে কত তার পরিচয় পাই আমার এক হতভাগ্য শিকারীর মাস্কেট বন্দুকের নল ক্ষিপ্ত এক পুং-গরিলার চিবিয়ে চেপ্টা করে ফেলাতেই।

দু চৈল্লুর এই বিবরণে বন্দুক চিবিয়ে চ্যাপ্টা করাটা বর্তমানে আশ্চর্য ঠেকলেও এটা মনে রাখতে হবে এই বিবরণী ৯৪ বছর আগেকার। তখন ইস্পাতের বন্দুক সৃষ্টি হয়নি। তখনকার বন্দুকের পাতলা নল শক্তিমান যে কোন পুরুষ হাতেই বেঁকিয়ে ফেলতে পারত। বিস্ময় জাগে ঐ খেলনার বন্দুক নিয়ে ভয়াবহ জন্তুটার সামনে দাঁড়ানোর কৃতিত্ব ও সাহসের কথা ভেবে। যদি প্রথম গুলিতে না মরে তবে গাদা বন্দুকের নলে গুলি আর বারুদ ভরার সময় কোথায়! এটা অতি সত্য যে, গরিলার সঙ্গে যে কোন ভাবে সাক্ষাৎ মানে জীবনমৃত্যুর সীমানায় দাঁড়ানো। দু চৈল্লুর গভীর জঙ্গলে এক বিকট বিশালাকার গরিলার সঙ্গে সাক্ষাতের বিশ্বাসযোগ্য এই বিবরণ বড়ই বিস্ময়কর—

হঠাৎ সমস্ত বনভূমি গরিলার গর্জনে পূর্ণ হয়ে উঠল। পরমুহূর্তে একটা ঝোপের মাথা নড়ে উঠে ফাঁক করে আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালো বিকটাকার এক পুরুষ গরিলা। চার হাত-পায়ে হামাগুড়ি দিয়ে দূর থেকে বনের ভিতর দিয়ে চুপিসাড়ে এসেছে দেখতে, তার রাজত্বে তাকে বিরক্ত করতে কাদের পদার্পণ ঘটেছে। আমাদের দলটি দেখতে পেয়ে দাঁড়িয়ে উঠে নির্ভয়ে আমাদের মুখের দিকে সোজা তাকালো। প্রায় বারো গজ দূরে সে দাঁড়িয়ে—এ দৃশ্য আমি জীবনে ভুলব না। উচ্চে প্রায় ছ' ফুট; বিশাল দেহ, প্রশস্ত বক্ষ, সুদৃঢ় মাংসপেশীতে পূর্ণ বলিষ্ঠ দুই হাত। উজ্জ্বল বড় ধূসর দুই চোখ। সেই চোখের দৃষ্টি নারকীয় ঘৃণায় পূর্ণ। মনে হল ভীতিপ্রদ কোন স্বপ্ন দেখছি যেন। ঠিক এইভাবে সাক্ষাৎ যমের মত আফ্রিকার জঙ্গলের রাজা আমার সামনে এসে দাঁড়ালো।......ওঃ তার মুখ কি কালো!

আমাদের দেখে বিন্দুমাত্র ভয়ের কোন লেশ তার মুখে পরিস্ফুট হল না। সটান দাঁড়িয়ে সে তার চওড়া বুকে দু' হাতে ঘুষি মারতে লাগল। ঘুষির আওয়াজ যেন গুরুগম্ভীর ঢাকের। ঢাকের বাদ্যির মাঝে মাঝে গর্জনের পর গর্জন। লড়ায়ের আহ্বান!

এই গর্জন অতি ভয়াবহ। আফ্রিকার জঙ্গলে ইতিপূর্বে এ ধরনের ডাক কখনও শুনিনি। গর্জনের আরম্ভটা ক্রুদ্ধ কুকুরের তীব্র এক চিৎকারের ন্যায়, তারপর গুরুগম্ভীর গড়ানো আওয়াজ—আকাশ ছাওয়া ঘন মেঘের দূরাগত বজ্রপাত যেন। সিংহের গর্জন শুনেছি, কিন্তু গরিলার ডাক তার চেয়ে অনেক বেশী গম্ভীর, তীব্র ও ভয়াবহ। এই ডাকের গভীরতা এত বেশী যে, মনে হল এর উৎস গলা বা মুখ নয়—আসছে পেটের ভিতর থেকে বুকের ভিতর দিয়ে।

আমরা সবাই আত্মরক্ষার্থে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। তার চোখ দিয়ে যেন আগুন ঠিক্‌রোচ্ছে।...কপালের উপর কদম ছাটের খাড়া এক ঝুঁটি। সেটা ঘন ঘন উঠছে আর নামছে। প্রতিটি মেঘগর্জনের সঙ্গে মুখব্যাদান।...বড় বড় শ্ব-দন্ত শোভিত দন্তরাজি বীভৎসতার চরম পর্যায়ে নিচ্ছিল। কুচকুচে সেই কালো মুখব্যাদানের তীক্ষ্ম দাঁতের পিছনে ভিতরে টক্‌টকে লাল জিভ, টাকরা ও মাড়ি এত অসামঞ্জস্যরূপে বিসদৃশ অনুভূত হল, তা আর ব্যক্ত করার নয়।...

মনে হতে লাগল—আধা মানুষ আধা জন্তু এ কোন এক স্বপ্নে দেখা নরকের প্রাণী—যে ধরনের ছবি পুরনো চিত্রবিদরা

নরকের ছবিতে এ'কে থাকেন। কিন্তু কদর্যতায় এই ভয়াবহ দৈত্যরূপী পিশাচের ধারে কাছেও কেউ কখনও আঁকেন নি। তাঁদের কল্পনাতেও আসবে না।

হেলে দুলে দু'এক পা এগিয়ে এল। বিশাল দেহকে ঠিকমত বহন করার পক্ষে পা দুটো অপেক্ষাকৃত ছোট ও দুর্বল। তাই এর হাঁটাটা এমন হেলে দুলে। দু' পা এগোবার পর সেই কদাকার ডাক দিল আবার।...আবার এগিয়ে এল। অবশেষে দাঁড়ালো এসে পাঁচ ছ' গজ দূরে। দুই হাত প্রসারিত করল আমাদের ধরার জন্য। পরক্ষণেই হাত দুটো গুটিয়ে রাগে বুকের উপর ঘুষি ঠুকে গর্জন করে উঠল। ওঃ কী আজানুলম্বিত বিশাল দুই হাত।...আর কালবিলম্ব করা উচিত নয় মনে করে গুলী ছ'ুড়লাম।...হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল।

আর্তনাদের সঙ্গে উঠল একটা অব্যক্ত গোঙানি—প্রায় মানুষের মতই কিন্তু কী পশুত্বেই না পূর্ণ। মুখ থুবড়ে পড়ার ধরনটা বুলেটের গুলী খেয়ে মানুষ যেমন পড়ে তেমনই। কয়েক মিনিট ছট্‌ফট্‌ করে কাঁপল। একটু উঠবার চেষ্টাও করল। পেশীর কম্পন আস্তে আস্তে স্তিমিত হয়ে এল। তারপর সব শান্ত—মৃত্যুর যবনিকা তার উপর নেমে গেছে।

এই হ'ল গরিলা জীবনের প্রথম বিশ্বাসযোগ্য নির্ভেজাল বিবরণ। এই বিবরণের উপর ভিত্তি ক'রে বৈজ্ঞানিকেরা অনেক প্রশ্ন তুললেন। আর এরপর বাজারে যত গরিলা বিষয়ক গালগল্প চালু ছিল তাই নিয়ে বহু গরম বাদানুবাদের সৃষ্টি হ'ল।

১৮৭৬ সালে জার্মান লোয়াঙ্গো পর্যটনের ডাঃ ফকেনস্টাইন সর্বপ্রথম জ্যান্ত গরিলার বাচ্চা ধ'রে ইউরোপে নিয়ে আসেন। বৈজ্ঞানিক কর্তৃক উদ্ভূত প্রশ্নের প্রায় সবই তখন মীমাংসা হ'ল। ডারুইন সাহেবের লাঙ্গুলহীন বানর নিয়ে বিবর্তনবাদের গবেষণায় বাজার তখন বেশ সরগরম।

২১শে জুন ডাঃ ফকেনস্টাইন তাঁর পর্যটনের সঙ্গীগণসহ লিভারপুলে পেঁাছান। গরিলা দেখতে ও তাঁকে সম্বর্ধনার জন্য বহুলোক জাহাজঘাটায় উপস্থিত ছিল। সেইখানে তিনি পেলেন বুড়ো ডারুইন সাহেবের অভ্যর্থনা সহ এক চিঠি। ৩০শে জুন গরিলা সহ তাঁরা বার্লিনে পেঁাছান।

গরিলা বাচ্চাটি ন'মাস মাত্র বেঁচেছিল বার্লিন একোয়ারিয়ম-এ। নাম ছিল ম'পুঙ্গু (M'Pungu)। লোয়াঙ্গো কোস্টের অধিবাসীরা গরিলাকে তাদের ভাষায় 'শয়তান' অর্থাৎ ম'পুঙ্গু বলে।

সাধারণত গরিলা ছোট ছোট দলেই বিচরণ করে। এই দলের সংখ্যা চার থেকে পঞ্চাশটি পর্যন্ত নিয়েও হ'য়ে থাকে। বয়স্ক পুং-গরিলাকে প্রায়ই একা একা ঘোরাফেরা করতে দেখা যায়। পশ্চিমাংশের গরিলারা পূর্বাংশ অপেক্ষা ছোট দলেই বাস করতে ভালবাসে। প্রতিটি ছোট দল একজন করে বয়ঃপ্রাপ্ত পুং-গরিলার অধীনে থাকে। বড় দলে গুটি কয়েক করে ধাড়ী পুং-গরিলা দেখা যায়। কোন কোন পর্যটক বলে থাকেন এই বড় দলগুলির সৃষ্টি হয় সাময়িকভাবে কতকগুলি পরিবারের একসঙ্গে বিচরণ করার ফলেই। পর্যটকদের এই উক্তির উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করা যায় না।

গুটি কয়েক মাদী গরিলা সমেত একটি ধাড়ী গরিলার যে দল দেখা যায় তার থেকে এই সিদ্ধান্তে এলে কোন ভুল হবে না যে গরিলারা স্বভাবতই বহুগামী। কখনও কখনও স্ত্রী-আধিক্য-দলে দুটি ধাড়ী গরিলাও দেখা যায়। তা দেখে দুটি পরিবার একত্র হয়ে চলছে ধরে নিলে ভুল হবে। খুব সম্ভব দ্বিতীয় পুরুষটি যৌনসম্পর্ক বিবর্জিত হয়ে প্রথমটির বশ্যতা ও আনুগত্য স্বীকার করে নিয়ে কেবলমাত্র সঙ্গী হয়েই আছে। এই ধরনের দল বেবুনদের মধ্যে খুব বেশী দেখা যায়।

টি এ বার্নস্‌ (১৯২২), বেন বারব্রিজ (১৯২৮), কার্ল ই এ্যাকলে (১৯২২), এ ই জেংকস্‌ (১৯১১), সি ডব্লু চোর্লে (১৯২৮), নেভিল এ ডাইসশার্প (১৯২৮), মার্টিন জনসন (১৯৩৬) প্রভৃতি প্রাণীবিদ যাঁরা গরিলার জীবনযাত্রা আফ্রিকার দুর্গম জঙ্গলে পর্যটন করে যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে লক্ষ্য করে এই মতই পোষণ করেন যে গরিলা অত্যধিক মাত্রায় বহুগামী। কিন্তু ই রাইখনো (১৯২০), হুগো ফন্‌ কোপেনফেলস্‌ (১৮৭৭) ও এফ আলভার্ডিস আবার ঠিক এর উল্টোটি বলেন—এরা স্বভাবত একগামীই।

রাইখনো-এর মতবাদের ভিত্তি হল তাঁর দৃষ্ট যত গরিলার বাসা তার ভিতর একটি ছাড়া বাকি সবই হয় একজনের না হয় দুজনের বাসযোগ্য। বাসার বর্ণ
তিনি তাঁর বই-এ * লিখেছেন—

সমস্ত গরিলা পরিবারই দু'টি বাসা
মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদি তৃতীয় বা দৈবাৎ চতু
বাসা দেখা যায়, তবে তা আয়তনে সর্বদা
ছোট হয়; কারণ সেগুলি বালক বা কিশো
গরিলার জন্য। এর থেকে আমরা এ
সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে, গরিলা বহুগা
নয়, একগামী। আর মস্তির সময় ছাড়া অ
কোন সময়েই এরা যৌনসংসর্গ না করে
স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে বসবাস করে। পূ
বয়স্ক না হওয়া পর্যন্ত গরিলা তার গু
জনের তত্ত্বাবধানেই থাকে; খুব সম্ভবত এ
ঘটে যতদিন না নিজের পরিবার খ'ুজে পা

রাইখনো তাঁর বই-এর আরেকস্থা
তাঁর দৃষ্ট সাতটি পাশাপাশি বাসার বর্ণন
মধ্যেও গরিলা যে একগামী তাঁর সে
যুক্তিকেই বলবৎ করার চেষ্টা করেছে
কিন্তু তিনি কোথাও পূর্ণবয়স্ক গরি
কেন যে কখনও কখনও একা বিচরণ ক
তার যুক্তি দেবার চেষ্টা করেন নি। তি
লিখেছেন—

দলটিতে ছিল চারটি বড় ও ২
বালক। অর্থাৎ দু'টি পরিবার রাত্রিযা
নিমিত্ত আস্তানা গেড়েছিল। আমার ক
একটি নর-গরিলা তিনটি মাদী নিয়ে বি
এটা অসম্ভবই ঠেকে। গরিলা যদি বহুগাম
হ'ত তবে আমরা প্রায়ই পূর্ণবয়স্কের তি
বাসা একটি পরিবারের মধ্যেই দেখ
পেতাম।

উগান্ডা পরিভ্রমণকালে চোর্লে '
অন উগান্ডা গরিল্লাজ' (১৯২৮)-এ
পূর্ণ বয়স্ক পুং-গরিলা, চারিটি পূ
বয়স্কা মাদী-গরিলা ও দু'টি শি
সন্তানসহ পার্বত্য অঞ্চলীয় এক গরি
পরিবার সম্বন্ধে উল্লেখ করেন—

ধাড়ী ধুসর-পিঠ গরিলাটার মেজাজ
কড়া বলে মনে হল। হঠাৎ দেখি, তার স
মধ্যে একটির মাথা থাবার মধ্যে ধরে হ্য
টানে কাছে এনে তুলে ধরে দশ গজ
ছ'ুড়ে ফেলে দিল। এ ধরনের কড়া
সত্ত্বেও স্ত্রীদের ভিতর তার প্রতি ভক্তি
বা স্নেহের অভাব দেখলাম না। বরঞ্চ উট
দুটো নর-গরিলা মাদীগুলোর কাছে এ
বেশী ঘে'ষবার চেষ্টা করাতে তারা ত
মেরেই তাড়িয়ে দিল। (পৃঃ ২৬৭-৬৮)

গরিলার বহুগামীত্ব থেকে আম
এ অনুমান করলে ভুল হবে না যে, এ

---

* E. Reichnow: Biologi
Beobachtungen an Gorilla
Schimpanse (1920), Sitz.
Naturforsch, Ferunde, Be
Pp. 1-40.

ভিতর মাদী অপেক্ষা নর-গরিলা খুব কমই জন্মগ্রহণ করে। আর এও মনে হয় বহুগামী ও একগামী দুইই হয়ত পাশাপাশি একই প্রজাতির মধ্যে বর্তমান। সর্বাধিক শৌর্যে বীর্যে সেই অঞ্চলে যদি সংখ্যায় নর-গরিলা বেশী থাকে তবে কারুর কারুর পক্ষে একগামী হওয়াটা কিছু বিচিত্র নয়। তাছাড়া প্রায় সব বনমানুষেরই চারিত্রিক বিশেষত্বে ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দের ভাবের ধারাটা ঠিক মানুষের মতই।

গরিলা শিম্পাঞ্জি-বেবুন ইত্যাদির ন্যায় একান্নবর্তী পরিবারে থাকাটা খুব বিশেষ পছন্দ করে না। বড় দল থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে নিজস্ব পরিবার নিয়ে ক্ষুদ্র দলে বিচরণ করতে ভালবাসে। এই কারণে ওরাং-উটানের ন্যায় গরিলা-সমাজেও হারেম প্রথা বেশ কড়াভাবেই চালু। সেখানে কর্তা-মহাশয়ের প্রতাপ একচ্ছত্র। অন্যান্য পুরুষ সেই পারিবারিক দলে থাকলেও তাদের ক্ষমতা নেই কোন নারীর সংগে যৌনসংসর্গ করার। মস্তির সময়ে কর্তা ব্যতীত অন্যান্য পুরুষদের মধ্যে যদি কেউ মাথা চাড়া দিয়ে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে, তবে সেই চেষ্টার ফলে দল-[illegible]ও লড়ায়ের সূত্রপাত হয় এবং সেই লড়ায়ের ফলে কে কর্তা হবে তা স্থির হ'য়ে একজনকে দল ছাড়তে বাধ্য হতে হয়। পুং-গরিলাকে যে গভীর জংগলে একাকী বিচরণ করতে দেখা যায় তা শুধু এই কারণেই। পারিবারিক দলে নারীর সংখ্যা বেশী হওয়াতেই পুরুষকে এই অবস্থায় আসতে বাধ্য হ'তে হয়। দুই নর-গরিলার মধ্যে সুন্দ-উপসুন্দের লড়ায়ের ফলে জংগলের মধ্যে পড়ে থাকা গরিলার মৃতদেহে গভীর ক্ষতের পরিস্ফুট সব চিহ্ন প্রায়ই শিকারীরা দেখে থাকেন।

ই ওয়েস্টারমার্ক তাঁর বই 'হিস্ট্রি অব্ হিউম্যান ম্যারেজ' (১৯২১)-এর প্রথম খণ্ডে বলেছেন গরিলা পারিবারিক দলেই বাস করে। সেই দল একটি পুরুষ এক এক বা একাধিক স্ত্রী, এক বা তদপেক্ষা বিভিন্ন বয়েসের সন্তান নিয়ে গঠিত। ধাড়ী বা বাপ গরিলা তার পরিবারের বাসা তৈরী করা থেকে আরম্ভ করে পাহারাদারী, বিপদের লক্ষণে সাবধান-সূচক সংকেত, রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি সব কিছুরই দায়িত্ব গ্রহণ করে। উপসংহারে তিনি বলেন, আদিম মানুষ তার নিকট আত্মীয় বনমানুষের মতই পরিবার নিয়ে বাস করত। কিন্তু আর ব্রিফল্ট তাঁর বই "দি মাদার্স" (১৯২৭)-এ বলেন লাংগুলহীন পুং-বানর নিজে দল সৃষ্টি করে না। সে কোন একটি বা গুটিকয়েক স্ত্রী-বনমানুষের দলে যোগদান করে। স্ত্রী-বনমানুষই স্থায়ীভাবে দল গঠন করে

ববী—সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পোষা গরিলা

এবং একমাত্র মস্তির সময় সে বা তারা পুরুষকে দলের মধ্যে গ্রহণ করে পুরুষের কর্তৃত্ব ও প্রাধন্য স্বীকার করে নেয়। মনুষ্য সমাজে মাতৃসত্তার উদ্ভব যে প্রথম হয় তা এই প্রাণীজগতের কাছ থেকে শিখেই। এই যুক্তিকে সমর্থন করে বি ম্যালিনৌস্কি তাঁর পুস্তক "সেক্স এণ্ড রিপ্রেসন ইন স্যাভেজ সোসাইটি" (১৯২৭)-এ বলেন, স্ত্রী প্রধান পারিবারিকভাবে দলবদ্ধ হওয়ার রীতি মানুষ প্রাণীজগত থেকেই প্রথম গ্রহণ করে।

বহু পর্যবেক্ষণকারীর অভিমত গরিলার বিভিন্ন দল দিনের বেলায় বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে থাকে এবং তারা সন্ধ্যার সময় সব একজোট হয়। এ উক্তিকে পুরোপুরি সমর্থন করা যায় না। তবে তাদের জীবনযাত্রায় হারেম প্রথাকেই সর্বোচ্চ স্থান দেয়। এই হারেম গরিলা-সমাজ-জীবন থেকে হয় পুরোপুরি ভাবে সম্পর্কশূন্য ও বিচ্ছিন্ন হ'য়ে একটি ক্ষুদ্র নিজস্ব গণ্ডী হিসাবে, নয়ত কখনওবা এই ছোট ছোট হারেম একত্র হয়ে বেশ একটা বড় দলে নিজেদের পরিণত করে বিচরণ করে। এই বড় দল সর্বদা ক্ষণ-স্থায়ীই হয় এবং তা ঘটে কোন বিশেষ অনিবার্যকারণবশত। মনে হয় ছোট দল-গুলি একত্র হয়ে একটি বড় দলে পরিণত হওয়াটা তখনই সম্ভব যখন তারা প্রচুর খাদ্যসম্ভারে পূর্ণ কোন জংগলে প্রবেশ করে, অথবা এমন কোন স্থানে যখন পৌঁছায় যেখানে রাতের বাসা বানানোর সুবিধা খুব বেশী।

সকলেই এই মত পোষণ করেন যে, প্রত্যেক গরিলা দলেরই নিজস্ব একটা করে বিচরণভূমি থাকে। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত সেই ভূমিতে কাঁচ মূল যা তাদের প্রধান খাদ্য তাই অন্বেষণ করে বেড়ায়। ডাইস শার্প-এর মতে ধাড়ী গরিলা তার সন্তান সহ চার থেকে ছ'টি স্ত্রী এবং সম্ভবত অপ্রাপ্ত বয়স্ক একটি পুরুষ গরিলা নিয়ে গঠিত পশ্চিমী গরিলার এক পারিবারিক দল কুড়ি থেকে চল্লিশ মাইল জুড়ে একই জায়গায় বিচরণ করে।

ইয়ার্কেস-দম্পতী রবার্ট ও আডা তাঁদের বই 'দি গ্রেট এপস্' (১৯২৯)-এ এদের খাদ্য ও খাদ্যান্বেষণ সবন্ধে বলেন—

গরিলা প্রধানত প্রচুর পরিমাণে ফল-মূলাদি খেয়েই কাটায়। অপচয় ও খাদ্য নষ্ট করতে অদ্বিতীয়, সে কারণে বা[illegible] হয়ে বহু মাইল ধরে জংগলের ভিতর চলতে হয়। টেঁপারী জাতীয় এবং অন্যান্য ফলাদি যা ঝোপের ভিতর বা গাছের উপর জন্মায়, তাই ওদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় খাদ্য। ফলের জন্য গাছের উপর ওঠাটা ওদের কেবল প্রয়োজনানুযায়ী হয়ে থাকে। পার্বত্য অঞ্চলীয় বা নিম্নভূমির গরিলাদের প্রধান খাদ্য কিন্তু ছোট ছোট আগাছার কোমল শিকড় ও গোড়ার শাঁস।

সন্ধ্যা হওয়ার সংগে সংগেই গরিলা তার ভ্রমণ বা বিচরণ শেষ ক'রে রাতের জন্য বাসা বাঁধে। অনেকে সন্দেহ করেন যা সাধারণের বিশ্বাস যে সব গরিলাই বুঝি তার স্ত্রী ও সন্তানের জন্য গাছের

উপর বাসা বেঁধে স্বয়ং বৃক্ষমূলে শয়ন করে তা ঠিক নয়। একমাত্র গেবুন প্রদেশের গরিলারাই গাছের উপর বাসা বাঁধে। ক্যামেরুণস্ ও কিভুর গরিলারা কিন্তু সব সময়েই মাটিতে বাসা তৈরী করে। গাছের উপর বাসা তারা খুব অগোছালো শ্রীহীন ভাবে ডালপালা লতাপাতা টেনে-টুনে কোনরকমে ক'রে থাকে। এক রাতের বেশী তারা কোন বাসাতেই থাকে না। পরদিন ঘুরতে ফিরতে দিনের শেষে যেখানে পেঁছায় সেখানেই আবার নতুন ক'রে বাসা বাঁধে। স্থায়ী বাসা এরা কখনই বাঁধে না। ভ্রাম্যমান যাযাবরভাবেই এরা চলাফেরা করে। খাদ্যান্বেষণের জন্য আদি যুগে মানুষের যাযাবরী বৃত্তিটাও হয়ত প্রাণীজগত থেকেই শেখা।

স্থানীয় অধিবাসীদের মতে গরিলার বাচ্চা হয় ডিসেম্বর মাসে কিন্তু ডাইস শার্প বিভিন্ন স্থান পরিভ্রমণ করে লক্ষ্য করেছেন যে প্রথম বৃষ্টির ঠিক পরেই ফেব্রুয়ারী-মার্চে গরিলা-শিশু দেখা যায় সবচেয়ে বেশী।

গরিলা যৌনক্ষম হয় কত বছর বয়েসে তার সম্বন্ধে সবিশেষ জানা যায় না। বন্দী-দশায় পর্যবেক্ষণ করে যতদূর খবর সংগ্রহ করা গেছে তাতে মনে হয় স্ত্রী-গরিলার ঋতু-দর্শন দশ এগারো বছর বয়েসের ভিতরই হয়ে থাকে।

এক মাদী-গরিলা যৌনক্ষম হবার পর সংগী অভাবে বন্দীদশায় কী অদ্ভুতভাবে মৃত্যুকে বরণ করে তার বর্ণনা দিয়েছেন বার্লিন চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর লুজ হেক্ তাঁর বই "এ্যানিম্যালস্ মাই এডভেঞ্চারস্" (১৯৫৪)-এ। এই মাদী-গরিলা এসেকাকে তাঁর স্ত্রী ক্যামেরুনস্ প্রদেশ থেকে কিনে আনেন। কেনবার সময় এসেকার ওজন ছিল ৪ স্টোন অর্থাৎ প্রায় ২৮ সের, বয়েস ছিল চার আর উচ্চতায় প্রায় পাঁচ ফুট ছ' ইঞ্চি।

বার্লিনে পেঁছাবার পর তার কোন স্ফূর্তির অভাব হয় নি। সদ্য পেঁছেই এভাবে সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিবেশকে মানিয়ে নিতে ইতিপূর্বে কোন গরিলাকে দেখা যায়নি। দেখতে দেখতে বারো তেরো স্টোন ওজনের বেশ একটি শক্তিময়ী মাদী-গরিলায় সে পরিণত হল। অসুখ-বিসুখ তার কখনও করেনি, অবশ্য ছোটখাট অসুস্থতা যা মানুষ বা পশুর সবারই হয়ে থাকে তা হয়েছে। সেও খাওয়া-দাওয়ার রদবদলে বা অল্প ওষুধপত্তর দিতেই সেরে গেছে। ক্রমে সে যৌনক্ষম হয়ে উঠল। তার সংগী জোটানোর জন্য আমরা নানা রকম জল্পনা-কল্পনা করতাম। কিন্তু চিড়িয়াখানায় অপর যে পুং-গরিলাটা ছিল সে তখন নেহাৎ বাচ্চা।

তারপরই অদ্ভুত ব্যাপারটা ঘটল এই বিরাট বনমানবীটির। এসেকার ওজন তখন ১৬ স্টোন অর্থাৎ প্রায় দু' মণ বত্রিশ সের, সে কেমন যেন মন-মরা হয়ে পড়তে লাগল। অথচ অসুখ হওয়ার কোন লক্ষণ তার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রকাশ পেল না। কেবল ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে লাগল। আমাদের শত চেষ্টাতেও সে অবস্থা কাটানো গেল না, ওজনও আর বাড়ল না। এই অবস্থা কেন যে তার হল তার কোন হদিশই আমরা খুঁজে পেলাম না। বার্লিনের যত শ্রেষ্ঠ ডাক্তার, পশু-চিকিৎসক, পশু-চিকিৎসালয়ে গবেষণারত বিজ্ঞানবিদ্, হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ ও বড় বড় চিকিৎসালয়ের ডাক্তাররা এবং বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নামকরা প্রাণীবিদ্ পুঙ্খানু-পুঙ্খরূপে পরীক্ষা করলেন, কিন্তু কোন রোগই নির্ণয় করতে সকলে অপারগ হলেন। দিনে দিনে দুর্বল শক্তিহীন হয়ে অবশেষে একদিন এসেকা মারা গেল। তার এভাবে মৃত্যু আমাদের যৎপরোনাস্তি বিস্ময়ের উদ্রেক করল। সেইজন্য বিখ্যাত প্রাণীবিদ্ ও বৈজ্ঞানিকদের উপস্থিতিতে তার শব-ব্যবচ্ছেদ করলাম, কিন্তু তার অংগপ্রত্যংগের কোন যন্ত্রে কোন রোগ বা কোনরূপ বিকলতা কিছুই পাওয়া গেল না। (পৃঃ ৮৪)

বন্দীদশায় কোন চিড়িয়াখানাতে গরিলার প্রজনন সম্ভবপর এখনও হয়নি, যদিও অন্যান্য বনমানুষ অতি সহজেই সন্তানজন্ম দিয়ে থাকে।

অনেকের ধারণা গরিলা বুঝি পোষ মানে না। কিন্তু সেই ধারণা বিফল করে দিয়েছেন বার্লিন চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর লুজ হেক্। তিনি তিনটি গরিলাকে শিশু অবস্থা থেকে বড় ক'রে তুলে-ছিলেন। তিনি বলেন—এরা অতি সহজেই পোষ মানে। অন্যান্য জন্তু বিশেষত আর সব লাংগুলহীন বানর অপেক্ষা এরা পরনির্ভরশীল খুব বেশী তাছাড়া অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও অভিমানী। সাধারণের কাছে খুব আশ্চর্য লাগবে যে এই জন্তুরূপী দৈত্যটির পক্ষে এ কী করে সম্ভব! বন্ধুর মত দয়া আদর ক্ষমার [illegible] দেখিয়ে প্রত্যেকের নিজস্ব মর্জি অ[illegible] প্রত্যেকটি প্রাণীর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ব[illegible] চললেই এদের পোষ মানানো সহজ [illegible] আসে।

বার্লিন চিড়িয়াখানায় ববী [illegible] এক পুং-গরিলাই বন্দীদশায় সর্বা[illegible] বৃহৎ আকারে পরিণত হয়েছিল। [illegible] আগস্ট ১৯৩৫ সালে অল্প কয়েক দি[illegible] অসুখে ১৪ বছর বয়েসে সে মারা [illegible] মৃত্যুকালে তার দেহের ওজন ছিল [illegible] স্টোন প্রায় ৮ মণ ১৬ সের। [illegible] থাকলে সে আরও ওজনে বাড়ত ব[illegible] সকলের বিশ্বাস। এই গরিলা[illegible] দেখতে ও গবেষণা করতে দেশবিদে[illegible] বহু প্রাণীবিদ বার্লিনে সে সময় [illegible] হতেন।

ববীর পরেই নাম করতে [illegible] শিকাগোর লিংকন পার্ক চিড়িয়াখ[illegible] বুশম্যান-এর। ১৯৫১ সালে তার [illegible] ঘটে। বর্তমানে বুশম্যানের [illegible] আমেরিকার সমস্ত চিড়িয়াখানার [illegible] নম্বরী গরিলা হবার উপযুক্ততা [illegible] করার পথে চলেছে মিসৌরীর সেন্ট [illegible] চিড়িয়াখানার ফিল। ফিলের বয়েস [illegible] চোদ্দ, ওজন প্রায় [illegible] মণ। বীয়[illegible] প্রতি তার খুব আসক্তি কিন্তু [illegible] বোতলেই সে নেশায় বুঁদ হয়।

জনসাধারণের কাছে এই বিশাল দৈত্যরূপী মনুষ্য-সদৃশ বিভীষিক[illegible] লাংগুলহীন বানরটির পরিচয় দিতে [illegible] প্রাণীবিদগণের গবেষণার খোরাক যো[illegible] আমেরিকা ও ইউরোপের অনেক চি[illegible] খানায় আফ্রিকা থেকে প্রায়ই গরিলা [illegible] হয়; কিন্তু ভারতবর্ষে কোন চিড়িয়াখ[illegible] এখন পর্যন্ত কোন গরিলার পদা[illegible] ঘটেনি। একটি দু' তিন বা চার ব[illegible] গরিলা শিশুকে আফ্রিকার জংগল [illegible] আনতে প্রায় চল্লিশ হাজার টাকার [illegible] খরচ পড়ে। সরকারের সাহায্য ব্যতি[illegible] কোন চিড়িয়াখানার দর্শনী-তহবিল [illegible] সম্ভবপর কখনই নয়। তবে এ টাকা গরি[illegible] দর্শনীরূপে অনায়াসেই যে উঠে আ[illegible] সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

দক্ষিণ ভারতে কয়েকদিন

খগেন দে সরকার

[পণ্ডিচেরী]

ভারতে ফরাসী সাম্রাজ্য গঠনের ব্যর্থ পিতা যে দ্যুপ্লেক্স, তাঁর কাঁধে বসে-ছিল একটি কাক। দ্যুপ্লেক্সের ব্রোঞ্জ মূর্তি, পণ্ডিচেরী শহরের সমুদ্রের ধারে—প্লাস দ্য লা রেপীব্লিক (Republic Square)।

ভারতের প্রধান মন্ত্রী নেহরুর পণ্ডিচেরীতে সরকারী সফর উপলক্ষে (জানুয়ারী ষোল) 'ফরাসী কৃষ্টি', 'ফরাসী কৃষ্টি' কথা দুটো এতবার এতভাবে শুনতে হয়েছে যে, দ্যুপ্লেক্সের কাঁধে বসে-থাকা কাকটাকে দেখে মনে হল, উনিও ফরাসী কৃষ্টিতে কর্ষিত কি না। এবং এ-ও মনে হল যে, বায়সপুংগব অতো জায়গা থাকতে বসবার জন্যে বেছে নিয়েছে দ্যুপ্লেক্সের কাঁধ, তার কারণ হয়ত এই যে, সে ভিক্তর্ হুগো পড়েছে।

হুগোর বিখ্যাত শ্লেষাত্মক কবিতা রাজ[illegible] মাতো এ্যাঁপেরিয়াল'—১৮৫৩)। ফরাসী সাম্রাজ্যবাদ নৃপতি এবং নিগ্রহকারী সম্রাটদের আঘাত করে লেখা। রাজবেশের উপর সোনালী সূচীকাজ করা মৌমাছিরা। হুগোর কাছে মৌমাছিরা কর্মঠতা ও কর্তব্যপরায়ণতার প্রতীক। বলছেন, হে মৌমাছিরা! আগুনের তীর নিয়ে ঝড় তোলো এই অন্যায়কারীদের উপর। এই মখমলের রাজবেশে থাকা উচিত নয়। ইমেত্ পাহাড়ের মধু-নিয়ে-আসে মৌমাছিরাঃ ওখানে থাকুক কৃষ্ণময় বায়সকুল—মঁত্ফোঁক পাহাড়ে ঘাতক-নিহত মানুষের মাংসাহারী বায়সকুল।

দ্যুপ্লেক্সের কাঁধে কাক দেখে মনে হল, হুগো যেন আঙুল তুলে অভিশাপ দিচ্ছেন ফরাসী সাম্রাজ্যবাদীদের কার্য-কলাপে। উনি বেঁচে থাকলে হয়ত খুশী হতেন যে, দুশো একাত্তর বছর পর আজ ভারতে চিরতরে অবনমিত হয়েছে ফরাসী সাম্রাজ্যবাদী পতাকা।

পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে ও ইয়ানাম—এই চারটি ফরাসী অধিকৃত ছোট্ট ছোট্ট জায়গার জনসাধারণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছে, সত্যাগ্রহ করেছে এবং প্রথম দিকে ফরাসীরা অনমনীয়ভাব দেখালেও শেষটায় বিদায় নিতে রাজী হয়ে গেল, অনেকাংশে মাঁদে-ফ্রাঁস মশায়ের বন্ধুত্বসূচক নীতির ফলে। সরকারীভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর হল পহেলা নভেম্বর, ১৯৫৪। আইনগত হস্তান্তর, degure transfer, এখনো হয়নি।

প্রায় বছর কুড়ি পর নেহরু এই প্রথম যাচ্ছেন পণ্ডিচেরীতে; চারদিকে একটা হাঁক-ডাক পড়ে গিয়েছে। অন্যায় রাজত্বের অবসানে, সেখানে নতুন এক অধ্যায় আরম্ভ হয়েছে। (যেমনটি নেহরু পণ্ডিচেরীর জনসাধারণকে বলেছিলেন) এযেন ভারতের বিরাট পরিবারে ফিরে এসেছে সেই পরিবারেরই এতাবৎ অনুপস্থিত কিছু আত্মীয়স্বজন। স্বাভাবিক, ভারতবাসীদের স্বদেশপ্রেম খানিকটা চাঙ্গা হয়ে উঠবে। অন্যান্যদের মত আমাদের আগ্রহও কম ছিল না। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড ও আনন্দবাজারের প্রতিনিধি হিসেবে তাই আমরা গিয়ে পৌঁছুলাম পণ্ডিচেরীতে নেহরুর আসবার আগের দিন।

রেলে রাত কাটিয়ে মাদ্রাজ থেকে যখন পণ্ডিচেরী শহরে পা দিলুম, তখন প্রাক-প্রত্যুষ। এবং ঐ প্রাক-প্রত্যুষের যেন দুটো মুখঃ একটি অপসৃয়মান রাত্রির দিকে, অন্যটি প্রাগসর আলোর দিকে। ঠিক যেন পণ্ডিচেরীর প্রতীকঃ পেছনে হটে যাচ্ছে বিদেশী প্রভুত্বের কালো রাত, আর নতুন অধ্যায়ের নতুন আলো সামনে। কিন্তু নেহাৎ চুপচাপ করে যে দুটি রিক্শাওয়ালা আমাদের টেনে নিয়ে যাচ্ছিল, তাদের হাব-ভাবে ঐ কিবা-রাত্রি-কিবা-দিন। তোড়ে বৃষ্টি এল, যেমনি আসে পণ্ডিচেরীতে প্রায়ই বিনা নোটিশে। সকলেই ভিজে একশেষ, কিন্তু তাদের কোন ভ্রূক্ষেপ নেই, তাড়াও নেই, হুড়োও নেইঃ সুখ-দুঃখের বাইরের জীব রিক্শওয়ালা। আর গাড়ি-

পণ্ডিত নেহরু ট্রেনযোগে পণ্ডিচেরী পৌঁছিলে স্টেশনে পুরনারীরা চন্দন তিলক দিয়ে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে

গ্লোর কী চাকা! যেন গরুর গাড়ি থেকে খুলে এনে লাগানো। সুতরাং প্রাণ ধরে বলা যায় না, বাবা! একটু পা চালা না?

কোন্ হোটেলে যাবো? —ওতেল দোয়েরোপ্, ওতেল কন্তিনাতাল্, ওতেল দাল্সাস্—ফরাসী আধিপত্যের ছাপ লাগানো প্রতিষ্ঠান; যাঁরা চালান, তাঁরা কেউ আধা-ফরাসী, কেউ পুরো ফরাসী। একটাতে উঠে গেলুম।

কিছুদিন আগে কলকাতায় আলাপ হল একজন ভ্রমণরত সুইস সাংবাদিকের সঙ্গে। ছিলেন কোন একটা বড় হোটেলে। জিজ্ঞেস করেছিলুম, কেমন লাগছে আমাদের দেশের হোটেল। বললেন, "তোমাদের হোটেল? কোথায়? নামে, কাজে, ভেতরে-বাইরে, ভারতবর্ষের হোটেল কোথায়? সবই তো যেন পুরো বিদেশী!" এটা ঠিক যে, আন্তর্জাতিক পর্যটকদের সুখ সুবিধের জন্য অনেক কিছু standardised থাকা উচিত, যথা খাওয়া-দাওয়া, বসবাস, আমোদ-আহ্লাদ। কিন্তু ভারতীয় ভাষায় কি ভালো নাম-করণও চলে না? দেশের বড় বড় হোটেল-গুলোর নাম শুনলে বোঝা যাবে না, সেগুলো ভারতবর্ষের, কি ইংলন্ডের, কি আমেরিকার। রুচিসঙ্গত ও উপযুক্তভাবে নামের ভারতীয়করণে যে সাংস্কৃতিক আভিজাত্য নষ্ট হয় না, তার চমৎকার উদাহরণ রয়েছে কলকাতার কয়েকটা সিনেমা ঘরের নামে এবং সেই নামকরণের পুরোহিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং।

তাই, যে হোটেলে আমরা উঠলুম, তার নামের সঙ্গে আলসাস প্রদেশের সংযোজনা দেখে বিস্মিত হলুম না। ওটি অবিশ্যি চালান একটি ফরাসী পরিবার এবং হোটেল হলেও কেমন যেন একটা ঘরোয়া ব্যাপার। নিজেরা থাকেন নিচে, উপরে অতিথিদের ঘর। নিচের ঢাকা বারান্দায় দু-তিনটি টেবিল, ফুল আর ক্রোটনের টব। একটা পাশ ঘিরে রান্নাঘর। এপাশে খেতে বসে চ্যাপ্টা প্যানে অমলেট ভাজার শব্দ শোনা যায়। শোনা যায়, বাড়ির বাচ্চারা খাবার আবদার জানাচ্ছে; গিন্নীমা আশংকা প্রকাশ করছেন যে, ঐভাবে মাখন খরচ হতে থাকলে তাদের দেউলিয়া হতে আর বেশিদিন বাকি থাকবে না। বসে প্রাতরাশ করছেন; দেখলেন বছর বারোর একটি ফুটফুটে মেয়ে খোলা চুলে বুরুশ টানতে টানতে সামনে দিয়ে চলে গেল। গিয়ে রান্নাঘরে মা-কে জিজ্ঞেস করছে, "মা-মেয়ার! এস-ক্য ইল্ এ ল্য ল্যাঁদি, অজুরদুই? (মাগো! আজ কি সোমবার?)"

আমাদের খিদমৎগার দেওয়া হল একটি তামিলী বালক-ভৃত্য, বছর পনেরো বয়েস।

পণ্ডিচেরীর সমুদ্রতটে অবস্থিত দুপ্লেক্সের প্রতস্মরমূর্তি। জিন্জির দুর্গ থেকে উৎখাত খোদাই করা স্তম্ভের উপর মূর্তিটি স্থাপিত

অতি মৃদুভাষী ছেলে, হুকুম তামিল করছে সকলের, কারণ হোটেলে ওটি ছাড়া অন্য খিদমৎগার নেই, আমাদের দুজনকে ছাড়া অন্য অতিথিও নেই। ছেলেটার 'মঁসিয়ো', 'মঁসিয়ো' শুনে সন্দেহ হল। জিজ্ঞেস করলুম, ইংরিজী ভাষা বলা হয়? —'ন' মঁসিয়ো',— হিন্দী? 'ন' মঁসিয়ো'। —ফরাসী? 'উই, মঁসিয়ো'।

সিংগী মশাইকে বললুম যে, ভৃত্য মশাই তামিল ও ফরাসী ভিন্ন অন্য কোন ভাষা জানেন না। উনি আকারে ইঙ্গিতে প্রস্তাব করলেন, তাহলে চলো, এখান থেকে। সিংগী মশাইকে ভর[illegible] পারলুম যে, ওটুকু কাজ আমি[illegible] দিতে পারব, যাতে চিনি চাইলে[illegible] না দেয়, আরেকবার helping চাই[illegible] কিম্বা রাত্রে কি খাব—ইত্যাদি।

পণ্ডিচেরীতে নেহরু আসছেন[illegible] করবেন, দেখা-সাক্ষাৎ করবেন, [illegible] শুনবেন, আরো শুনবেন দাবি[illegible] কথা। এবং সে সমস্ত তারযোগে[illegible] পাঠাব বৈকি কলকাতায়, দিল্লীতে[illegible] বরাবর চোখ-কান খোলা রাখলুম [illegible] জিনিসের সন্ধানে।

দুই ভাই-বোন তিলতিল আর[illegible] একদিন বেরিয়েছিল 'নীল [illegible] সন্ধানে। তারা যখন [illegible] 'নীল পাখি', তখন নাকি সেটা[illegible] দর্শন-বৃক্ষের অদৃশ্যতর [illegible] চিরন্তন বাসা বেঁধে ছিল। এবং [illegible] 'নীল পাখি'র মত হয়ে দাঁড়াল [illegible] নিজেদের সন্ধান-বস্তু। সেই[illegible] পণ্ডিচেরীতে ফরাসী 'সংস্কৃতি'কে[illegible] বের করা। আগে থেকে বলে রাখ[illegible] ঐ বস্তুটির সন্ধান আমরা যদি[illegible] থাকি, তাহলে (ইংরিজি বচনের) ব্যক্তিও অন্ধকার ঘরে অবর্তমান [illegible] বেড়ালকেও খুঁ[illegible] [illegible]। পণ্ডিচেরী প্রদেশের বর্তমান রাজ[illegible] 'ফরাসী সংস্কৃতি' কথাটা সন্ধিপত্রের[illegible] মোহরের তিলক কেটে যে-স্থান [illegible] মোটরগাড়িতে পেট্রলেরও সেই [illegible] কোথায় যেন পড়লুম সেদিন: [illegible] শতাব্দীর ত্রিশক থেকে কয়েক[illegible] পৃথিবীতে এমন কিছু লোকের [illegible] হয়েছিল, যারা 'সংস্কৃতি' কথার উ[illegible] সঙ্গে সঙ্গে রিভলবারে হাত দিত[illegible] যুদ্ধের অবসানে, অবস্থাটা [illegible] কাছে উল্টে গেছে। তারা [illegible] কথাটার উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে না[illegible] দৃষ্টি নিবদ্ধ করে জপের মত [illegible] 'সংস্কৃতি' এবং ওটা কত বেশি[illegible] আওড়ান যেতে পারে, পণ্ডিচেরী[illegible] গেলে বিশ্বাস করতে পারতুম না।

নেহরু পোঁছানোর আরো [illegible] বাকি। আমরা ভাবলুম, এই [illegible] গণ্যমান্যদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে [illegible] যাচাই করে নেওয়া যাক।
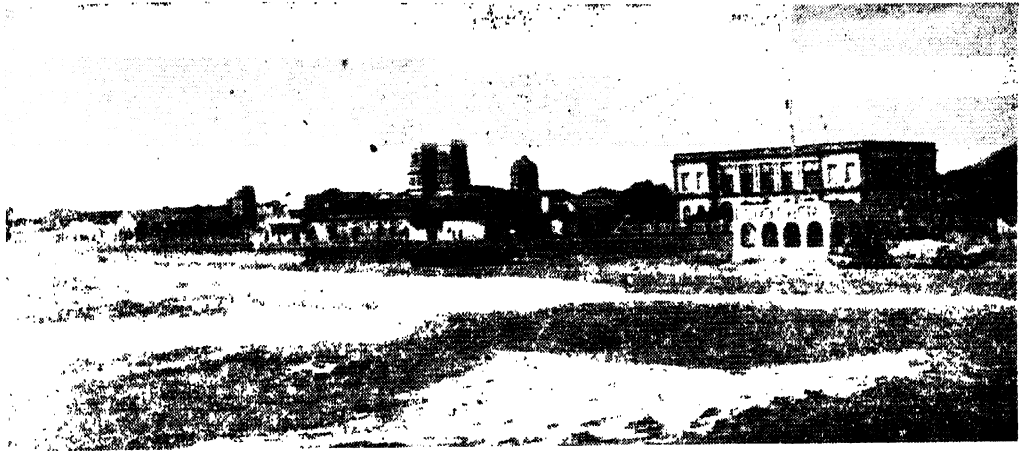
চীফ কমিশনার শ্রীকেওয়াল[illegible]

পণ্ডিচেরী পোর্ট। পিছনে টাউন হল

ফিস একটি রাজপ্রাসাদে—ওটাই এখন রকারীভাবে 'রাজভবন'। ফরাসীদের র গভর্নর বাহাদুর মঁসিয়ে ম্যনার ধি এই ভবন থেকে শাসন-শোষণ করে ছেন। বারান্দায়, হলঘরে অপেক্ষা রবার জায়গায় বহু লোকের ভিড়। [illegible] যাতায়াত। কারোর ময় নেই, অবসর নেই বলে মনে হয়। তি অদ্ভুত পোশাক-পরা চাপরাসীরা। ড়, টুকটুকে লাল পাজামা, শাদা কুর্তা, লাল পাগড়ি, লাল কোমরবন্ধ, খালি পা। গুলো সব ফরাসী আমলের ধ্বজা। বকিছুই তো নেহাৎ তাড়াতাড়ি হয়ে গল, অর্থাৎ পরিচ্ছেদ পরিবর্তনটা—াই হাত পরিচ্ছদ পরিবর্তনের সময় াওয়া যায়নি।

সে থাকতে থাকতে নজরে এল দুটো ালির দাগ—প্যারিস থেকে দিল্লী অবধি না। সকলের জানা কথা যে, উঁচু অফিসারদের সঙ্গে দেখা করতে হলে চিরকুট সই করে পাঠাতে হয়। ঐ দপ্তরের চিরকুটে ছাপানো। লেখা, 'এতারিসমাঁ ফ্রাঁসে দাঁ ল্যাঁদ' ('ভারতে ফরাসী প্রতিষ্ঠান'); কিন্তু শব্দগুলো সরকারী-ভাবে দুটো কালির দাগে আড়াআড়ি এস্পার ওস্পার কাটা। দুই পক্ষের বন্ধুত্ব বজায় রেখে, আলাপ-আলোচনার ভিতর দিয়ে কঠিন একটা আন্তর্জাতিক প্রশ্নের যে সুরাহা হয়েছে, কালির দাগ দুটো যেন তারই প্রতীক।

পরের দিন (জানুয়ারী ষোল) পণ্ডিচেরীর টাউন হলে স্বাগত ভাষণের উত্তরে ভারতের প্রধান মন্ত্রী অমনি একটা প্রতীককে অধুনা দ্বিধাবিভক্ত পৃথিবীর সামনে তুলে ধরেছিলেন। বলেছিলেনঃ বর্তমান দুনিয়ায় পণ্ডিচেরী একটি বিরাট প্রতীক—শান্তিপূর্ণভাবে আন্তর্জাতিক প্রশ্নের যে সমাধান হতে পারে এবং হওয়াটা বাঞ্ছনীয়, এ তারই প্রতীক। এবং যে-পন্থায় ফ্রান্স ও ভারতবর্ষ এ সমস্যার সমাধান করেছে, ঐ পন্থাই সমস্ত সভ্য মানুষের পন্থা। ঐ পন্থাই সভ্য পন্থা। প্রশ্ন সমাধানের অসভ্য পন্থা হল যুদ্ধের পন্থা।

দোতলা টাউন হল সমুদ্র থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে। সবুজ সমুদ্র, ফিকে নীল, সুনীল সমুদ্র দুলছে, তার সঙ্গে দোলে যেন পৃথিবী, যার পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে উদ্দাম, নিষ্ঠুর তরঙ্গের গোঙানি। কিন্তু টাউন হলে যারা সাত তাড়াতাড়ি পেরেক ঠুকে ঝুলোচ্ছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী আর জাতির জনকের তসবির, তাদের ওসব কাজে খেয়াল নেই। প্রাক্তন মেয়র শ্রী মুথু পিল্লাই ও অন্যান্য সকলে যৎপরোনাস্তি নার্ভাস। কোথায় কোন্ পকেটে কোন্ কাগজটা রাখা হয়েছে, আদৌ রাখা হয়েছে কি না, সব ভুলে যাচ্ছেন। নেহরু কালকেই এসে যাচ্ছেন; যা যা করবার, সবই তো করা হয়েছে, অথচ কিছুই যেন করা হয়নি; সকলের মুখে-চোখে কী-হবে-ভাই এই ভাব। বিরাট বিরাট কাট্‌গ্লাসের ঝাড় বাতি ঝুলছে; দেয়ালে ঝুলছে ইয়া লম্বা লম্বা গিল্টি-করা আয়না, আর কিছু চলনসই ভারতীয় চিত্রকরদের আঁকা ছবি। দোতলার সিঁড়ির মুখে আছে একটি মস্ত ফরাসী তৈলচিত্র বিগত শতাব্দীর। একাডেমিক ঢঙে আঁকা তৈলচিত্র, যার নামানুসারে দেখা গেল—ন্যায় ও দিব্য প্রতিশোধ অপরাধের পশ্চাদ্ধাবন করছেন—

("La Justice et la Vengeance divine poursuivant le crime"), 'ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের অপরাধ'কে 'La Justice' ভারতবর্ষে পশ্চাদ্ধাবন করেছে ও আফ্রিকাতেও করছে, ইন্দো-চায়নাতেও করেছে। তবে 'Divine Vengeance' কী করছেন, জানা যায়নি। ছবিটা ফরাসী আমল থেকে আছে। ফরাসীদের হিউমার জ্ঞান নেই, একথা ভবিষ্যতে বলা উচিত হবে না। আবার ছবিটার নিচে পেতলের ফলকে উৎকীর্ণ ফরাসী শাসন সম্বন্ধে কিছু লেখা, যার শেষ দুটো পংক্তি চীৎকার করে বলছে,

পণ্ডিচেরী জয় উপলক্ষে সমুদ্র তীরে স্থাপিত স্মারক স্তম্ভ

'ভীভ্‌লা ফাঁস' (ফ্রান্স জিন্দাবাদ), 'ভীভ্‌লা রেপীবলিক' (রিপাবলিক জিন্দাবাদ)। ফরাসীদের হিউমার আছে, এবং নিজেকে নিয়ে যে হিউমার, সেটাই নাকি খুব উঁচুদরের হিউমার। Public যেস্থানে 'roi', অর্থাৎ 'rex' মানে জনগণ যেস্থানে সার্বভৌম, তার সঙ্গে সাম্রাজ্যের যোগসাধন স্বয়ংবিরোধী।

টাউন হলে যেতে পড়ল 'Place Dupleix', যার সামনেটা 'Place Republique', পেছনে পার্ক, নাম হল Place Charles de Gaullas' জায়গা জুড়ে সাজানো সব বিজয়স্তম্ভ, দক্ষিণ ভারতের জিন্‌জি দুর্গ থেকে জয় করে আনা। (জিন্‌জি দুর্গ ফরাসী জেনারেল Busoy ১৭৫০-এ জয় করেন এবং অধিকারে রাখেন এগারো বছর।) দাঁড়িয়ে দেখলে মন খারাপ হয়ে যায়। বিজয়নগর-রাজার কারুকাজ করা, খোদাইর কাজ করা স্তম্ভগুলো ফরাসীদের ব্যবহারে এল বিদেশী শাসনের বিজাতীয় পতাকা ওড়াতে। তারই একটি দুটি ভেঙে করা হয়েছে দুপ্লেক্সের পাদস্থান! আজ যদি ভারতবর্ষ দুপ্লেক্সকে পাদস্থান করে তার উপর চড়ায় অশোকস্তম্ভ, ফরাসীরা কী মনে করত? ভারতবর্ষ তা করবে না, করতে চায় না। আশ্চর্য, ঐখানেই ঐ পরিবেশে দেখলুম, দুপ্লেক্সের কাঁধে বসে আছে কাক। ভাবনা পিছু হটে পিছলে গেল ইতিহাসের পাতায়। ভাগাড়ে যখন গরুর পতন ঘটে, তখন শকুন-গৃধিনীর আবির্ভাব, উল্লাস ও কর্মাদির বিশেষ ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যাবধি যে সমস্ত কারণে (যথা মোগল সাম্রাজ্যের অকর্মণ্যতা ও ধ্বংস, ভারতীয় রাজা-বাদশা-নবাবদের আত্মঘাতী আত্মকলহ এবং অণুপ্রবিষ্ট ইউরোপীয় নানা বণিক-দের সামরিক 'ব্যবসা-বাণিজ্য' এবং ঈশপের দুই বেড়ালের ঝগড়ায় বাঁদর-ভায়ার আদর্শপ্রণোদিত ব্যবহার) খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্তভাবে ভারতের সাময়িক মৃত্যু ঘটেছিল, সেসব সকলেরই অল্প-বিস্তর জানা কথা। এবং পাশ্চাত্য গৃধিনীদের ভিতর কামড়াকামড়ি করে শেষটায় এসে ঠেকল ইংরেজ আর ফরাসী বণিকেরা।

শেষের এই দুই দলের যে যুদ্ধ ইউরোপ থেকে ভারত অবধি ছড়ান ছিল, তাতে পণ্ডিচেরীর স্থান ফরাসীদের ইতিহাসে খুব একটা সম্মানজনক কিছু নয়।

ইতিহাসের কী কাণ্ড! এলিজাবেথীয় ইংরেজরা নাকি বড্ডো ভালবাসত লংকা গোলমরিচ, মশলাদি, আর কী কুক্ষণে না ওলন্দাজ বণিকরা ১৫৯৯-তে বাড়িয়ে দিল ওসবের দাম তিন শিলিং থেকে ছ' কি আট শিলিং (পাউন্ড দরে) পরমুখাপেক্ষী না-থেকে ইংরেজরা সে সনেই জন্ম দিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর

ফরাসীরা আগেভাগেই চেষ্টা করছি ভারতবর্ষের সঙ্গে বাণিজ্য করতে তাদের প্রথম ব্যর্থ চেষ্টা হল ১৬০৩-এ সম্রাট আকবর মারা যাওয়ার বছর দু আগে। তারপর ১৬৪২-এ স্বনামধন্য রিশ্‌লিয়ো (Richlieu) স্থাপিত করে 'কোঁপাঞি দোরিয়াঁ' অর্থাৎ Compa of the Orient এবং এ-ও যখন কি করতে পারল না, তখন কল্‌বেয়ার করে করলেন সেই কোম্পানি। ভারতে সঙ্গে সরাসরি ব্যবসা ফাঁদতে নামে সেই কোম্পানির সভাপতি কাঁর সাহে দাঁড়িপাল্লা নিয়ে নয়, যুদ্ধজাহাজ নি সুরাটে (১৬৬৮) ... সিংহলের ত্রিনকমলি দখল করে রাখ পারল না; কাঁর সাহেবের গৃধ্রদৃষ্টি প দক্ষিণ ভারত সৈকতে এবং দখল ক মাদ্রাজ শহরের উপকণ্ঠের উপশ St Thomas পর্তুগীজদের হাত থে (১৬৭২)। টিঁকলো না। ফিরিয়ে দিতে ওলন্দাজদের হাতে সেই St Thom (১৬৭৪), যার পর্তুগীজ নাম হয়ে সান্ তোমে।

কোম্পানি যখন যায় যায় অ তখন ত্রিন্‌কমলি ও সান্ তোমে কুড়িয়ে ষাটজন ফরাসীর একদল আবির্ভূত হলেন ফ্রাঁসোয়া মা (Francois Martin)। তিনি ১৬৮ জিন্‌জির রাজার (মাদ্রাজের আ জেলায়) কাছ থেকে কিনে নি পণ্ডিচেরী আর ষাটজন দেশওয়াল নিয়ে সেখানে বসতি করলেন। হলেন ফরাসীদের ও পণ্ডিচে জব্‌চার্নক।

কলকাতার গোড়াপত্তন

পণ্ডিচেরীর গোড়াপত্তন প্রায় সমসাময়িক এবং পদ্ধতিও ছিল এক। কিন্তু ইতিহাসের মারপ্যাঁচে অথবা স্রেফ মারা-মারিতে আজ কী হয়েছে গোবিন্দপুর-সুতানুটি, আর কী হয়েছে ফরাসীদের 'পঁদিশেরি'। হবারই কথা। দুশো একাত্তর বছরের পুনঃ পুনঃ পরাজয়ের কলঙ্কে পণ্ডিচেরীতে ফরাসী পতাকা অনেকবার নেমেছে, ১৯৫৪-র পহেলা নভেম্বরে শেষ সাগরপারি নিয়ে।

ওলন্দাজরা কেড়ে নিল পণ্ডিচেরী ১৬৯৩-এ আর ফিরিয়ে দিল চার বছর পর (১৬৯৭) ইউরোপে রিজ্ উইক্ সন্ধির ফলস্বরূপে। ফ্রাঁসোয়া মারত্যাঁ হলেন গভর্নর। চন্দননগর (১৬৮৮), মাহে (১৭২৫-২৬), কারিকল (১৭৩৯) এবং ইয়ানাম (১৭৫০-৫২) এল ফরাসী-দের হাতে। পণ্ডিচেরী হল সদর-স্থান ফরাসীদের, মাদ্রাজ শহর হল ইংরাজদের সদর-স্থান। কিছুকাল দুই বণিক সম্প্রদায়ের মিতালি চলল উপর-উপর, কিন্তু যেই না এই দুই দেশের যুদ্ধ বাধল ইউরোপে (১৭৪১) অমনি সেই ঢ্যাঁড্রা বেজে উঠল পণ্ডিচেরী আর মাদ্রাজে।

১৭৪২-এ পণ্ডিচেরীর গভর্নর ও অস্থায়ী Director General of French India হলেন দুপ্লেক্স (প্রসংগত, Dupleix-এর 'x' ফরাসী ব্যাকরণের অনুজ্ঞা অস্বীকার করে, সুতরাং উচ্চারিত হবে)। এবং তখন মরিসিয়াস্-এর গভর্নর আছেন মসিয়্য দ্য লা বুরদনে। এবং ভাগ্যের কী মহিমা—এই দুটি ফরাসী-পুংগব যদি সতীনমিব কলহপরায়ণ না হতেন, তাহলে হয়ত ভারতবর্ষের ইতি-হাস হয়ে যেত সম্পূর্ণ অন্যরকম এবং হয়ত বা এই পণ্ডিচেরীই হয়ে যেত ভারতবর্ষের কলকাতা! তা না হয়ে, দুপ্লেক্স্ সাহেব সব মিলিয়ে হয়ে গেলেন যেন ব্যাক্ গিয়ারে রবার্ট্ ক্লাইভ্!

কয়েক বছর থেকে দ্য লা বুরদনে নৌযুদ্ধে প্রবীণ) ঘন ঘন তাগিদ দিচ্ছিলেন ফরাসী সরকারকে যে তাকে হুকুম দেওয়া হোক ইংরেজ জাহাজ আক্রমণের। শেষে নিজের খরচায় এক নৌ-বাহিনী সজ্জিত করে দ্য লা বুরদনে আক্রমণ করলেন ইংরেজ নৌ-বাহিনী নাগাপট্টমের কাছে। সেটা, কলকাতার হিন্দু-মুসলমান বড় দাঙ্গার ঠিক দু'শো বছর আগের কথা (১৭৪৬)। বেশ ক্ষতি-গ্রস্ত হয়ে উনি এলেন পণ্ডিচেরীতে এবং এই আসাই হল কাল।

দুপ্লেক্সের বিশ্বাসভাজন কর্মচারী আনন্দরঙ্গ পিল্লাই-র ডায়েরিতে জানা যায় এই ভাবটা: গভর্নর দুপ্লেক্স মনে করলেন, কে হে তুমি উড়ে এসে জুড়ে বসলে, আদেশ চাওয়া নেই, হুকুম নেই? নিজের সৈন্যসামন্ত নিয়ে নিজের খেয়াল মত চলছ, একেবারে যেন লাট সাহেব, অথচ গভর্নর হলুম গিয়ে আমি!— ওদিকে দ্য লা বুরদনে মনে করলেন যে সামরিক ব্যাপারে সে স্বাধীন এবং নিজেও তো মরিসিয়াসের গভর্নর,—সুতরাং, দুপ্লেক্স-কে জিজ্ঞেস-বাদ না করে কাজ করলে তার কিছু মহাপাতক হবে না।

দ্য লা বুরদনে আবার চড়াও করতে চাইলেন মাদ্রাজের উপর এবং সেই নাগা-পট্টমের কাছে সাক্ষাৎ ইংরাজ নৌ-সেনানায়ক Edward Peyton-এর সংগে, যার কাছে এর আগের বার মার খেয়ে-ছিলেন কিন্তু Peyton-জী যুদ্ধ না করে বাহিনী নিয়ে সোজা পাল তুললেন বাঙলা দেশের উদ্দেশে, 'আমি কি ডরাই সখি—' গাইতে গাইতে। দ্য লা বুরদনের পোয়া বারো। তিনি মাদ্রাজ অবরোধ করলেন। পক্ষকাল অবরোধে, মাদ্রাজের ইংরেজ পক্ষ আত্মসমর্পণ করল। এবং অবরোধের যুদ্ধ সে নাকি হয়েছিল এক মহাসমরঃ অবরোধকারী ফরাসীদের মারা গেল এক-জনও নয়; ইংরাজ পক্ষের গোনাগুনতি ছ'জন (তার চারজন হল পর্তুগীজ)! সেদিন সেপ্টেম্বর ২১, ১৭৪৬। মাদ্রাজ শহর এল ফরাসীদের হাতে।

দ্য লা বুরদনে চার লক্ষ পাউণ্ডের মূল্যে রাজি হলেন মাদ্রাজ ছেড়ে দিতে (বেশ অনেক টাকা ওর পকেটেও ঢালা হয়েছিল)। কিন্তু দুপ্লেক্স সেই সন্ধি-শর্তকে অস্বীকার করলেন এবং আবার লাগল দুজনের ঝগড়া। দুপ্লেক্স কোনো-মতে রাজি করিয়ে দ্য লা বুরদনকে যাত্রা
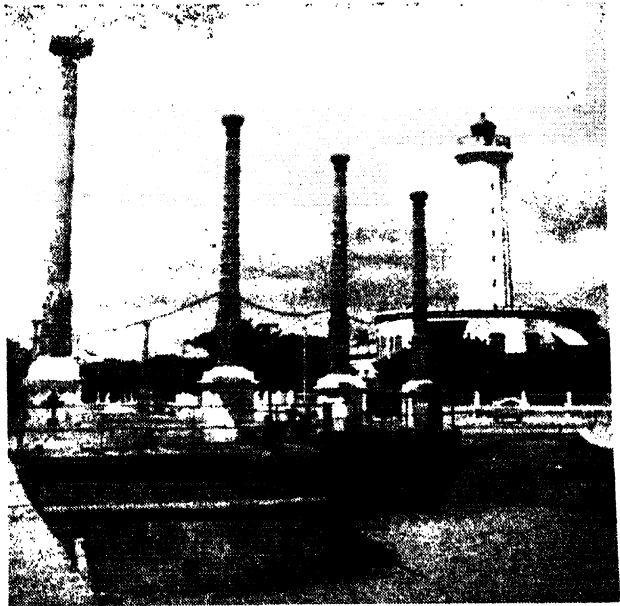
জিনজির দুর্গ থেকে অপহৃত কারুকার্যমণ্ডিত চারটি স্তম্ভ ফরাসীরা পণ্ডিচেরী বন্দরে স্থাপন করে। বন্দরের আলোকস্তম্ভটি পাশেই রয়েছে

ফরিয়ে দিলেন সমুদ্রের দিকে, আর নিজে ইংরেজদের উপর আরো কয়েকটা শর্ত আরোপ করলেন। মাদ্রাজে নাকি ফরাসীরা (ইংরেজ ঐতিহাসিকদের মতে) অনেক লুঠতরাজও করেছিল।

একুশ বছরের যুবক রবার্ট ক্লাইভ তখন কোম্পানীর কেরানী। ১৭৪৭-এ এক-দিন তিনি কৃষ্ণকায় মুরের ছদ্মবেশে মাদ্রাজে ফরাসীদের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেলেন। সে ছিল যেন ভাগ্য-তারকার হাতছানি।

ইংরাজরা বদলি নেওয়ার উদ্দেশ্যে পণ্ডিচেরী আক্রমণ করল ১৭৪৮-এর ছাব্বিশে এপ্রিল, কিন্তু দুপ্লেক্সের রণ-কৌশল বাধ্য করল ইংরাজদের হটতে (৪২ দিন অবরোধের পর)। এক সপ্তাহ পরে দুই পক্ষের ভিতর ইউরোপে হল এ-লা-শাপেল্ সন্ধি। ইংরাজরা মাদ্রাজ ফিরে পেল। উভয় পক্ষের পড়ে গেল ভারতের বুকে লুটেপুটে খাওয়ার এক মরসুম! কয়েক বছর চলল ষড়যন্ত্র, সংগ্রাম, পার্শ্বপরিবর্তন, বিশ্বাসঘাতকদের প্রশ্রয়, লুণ্ঠন আর সাম্রাজ্য গঠন। দশ বছর (১৭৪৬—১৭৫৬) ভাগ্যলক্ষ্মী দুপ্লেক্সের করতলগতঃ দক্ষিণ ভারতে তার প্রবল প্রতাপ। এমন কি সুবা আর্কট ও অন্যান্য অংশ নিয়ে মোগল বাদশার খেতাব নিয়ে হলেন "নবাব দুপ্লেক্স"। কিন্তু তাঁকে পারিতে ফিরিয়ে নেওয়া হল ১৭৫৩-তে।

ইউরোপে আবার লাগল যাকে বলা হয় Seven Years' War। ইংরেজ দখল করল আর্কট জেলা। ফরাসীদের লালী-তোলাঁদাল্ পণ্ডিচেরীতে পরাজিত হল ১৭৬১-র ৬ই জানুয়ারি। ইংরেজরা পণ্ডিচেরী শহরকে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করল।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ, পণ্ডিচেরীর প্রাণ যায়। ইংরাজরা বারবার দখল করে, আবার ফিরিয়ে দেয় বার বার সন্ধিসূত্রে। যথাঃ ১৭৬৩—ফিরিয়ে দেওয়া; ১৭৭৮—দখল করা; ১৭৮৩—ফিরিয়ে দেওয়া (ভার্সাই সন্ধি); ১৭৯৩—দখল করা; ১৮০২— ফিরিয়ে দেওয়া (আমিয়াঁ সন্ধি); ১৮০৩—দখল করা, এবং নেপোলেনীয় সমস্ত যুদ্ধকালটা রইল ইংরেজদের হাতে। ১৮১৪-১৫-তে যে রণপর্ব শেষ হল, সেই সন্ধি ফলে পণ্ড-চেরী ও অন্যান্য ফরাসী শহরগুলো ইংরাজ বরাবরের জন্যে ফিরিয়ে দিল ফরাসীদের হাতে।

ফরাসীরা হস্তান্তর আয়োজনের জন্যে হৈ-চৈ করে ফিরে এল এক বাহিনী নিয়ে, ১৮১৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই সেপ্টেম্বর। হস্তান্তর হল ডিসেম্বরের চার তারিখে, ১৮১৬। হস্তান্তরের শর্ত হলঃ ইংরেজদের কোম্পানি বছর বছর কেনা-দামে যে তিনশো পেটি আফিম দিত, তা
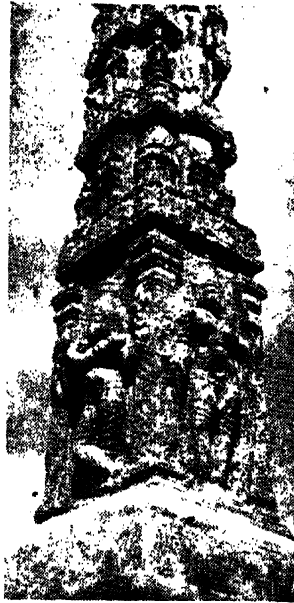
জিন্‌জির দুর্গ থেকে অপহৃত স্তম্ভের নিম্নাংশের খোদিত মূর্তি

আর দিতে হবে না; বাজার দরে ফরাসীরা ওটা কিনে নেবে। এবং পণ্ডিচেরীর ব্যবহারের জন্য যা' লাগে সেই পরিমাণ রেখে, সে-রাজ্যে যত লবণ তৈরি হবে সবটা ইংরেজদের দিয়ে দিতে হবে। বদলে ইংরেজরা দেবে চার লক্ষ সিক্কা-টাকা।

এই একশো আটত্রিশ বছর পরে, পণ্ডিচেরী শেষবারের মত হস্তান্তর হল স্বাধীন ভারতের কাছে। ফরাসীরা প্রথম এসেছিল পণ্ডিচেরীতে এখন থেকে প্রায় দুশো একাত্তর বছর আগে।

কিন্তু ভারতবর্ষ যখন ফিরে পেল পণ্ডিচেরী ও অন্যান্য ফরাসী অধিকৃ জায়গা, সে বলেনি, আমাকে অতো পেটি আফিম দাও, অতো গ্যালন্ ফরাস শ্যাম্পেন দাও, কিম্বা দ্যালা বুরদনের মতে বলেনি অতো টাকা ঘুষ দাও। উল্টে সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করে বলেছে, পণ্ডিচেরীতে ফরাসী সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য আমরা বজা রাখব এবং তোমাদের ব্যবসা-বাণিজ্যতে হাত দেব না।

তাই পণ্ডিচেরীর গণ্যমান্যদের মু হাজারোবার 'ফরাসী সংস্কৃতি'র দোহাই ফরাসী ভাষাটা যে ওখানে বিন্দবৎ সমা চলে, সেটা আঙুল দিয়ে দেখান হ নেহরুকে বারে বারে। ভোরবে ইস্টিশনে নেহরু নেবেছেন। মেয়ে গোলাপের পাঁপড়ি ছিটিয়ে ক অভ্যর্থনা। ইস্কুল-কলেজের ছে মেয়েরা শ্রেণীবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে তা অভ্যর্থনা জানাচ্ছে অতি অ-ফরা ভাষায়ঃ "জয় হিন্দ", "পণ্ডিত নে জিন্দাবাদ"। কিন্তু উল্টো দিকে দে বড় বড় করে লেখা ফরাসীতে 'বিয়াঁভ (স্বাগতম্)। জনসাধারণ, যাদের ক ঘুরে বেড়ালেন নেহরু security নি না-মেনে, তারা দিব্যি কলকোলাহল তু তামিল ভাষায়। সাধারণ লোকেরা রা রাস্তায় করেছে তোরণের পর তো নারকোল দিয়ে সাজান, কাপড়ের চাঁ করে সাজান, ফুল-পাতা-মঙ্গলচিহ্ন সাজান, খাঁটি দক্ষিণ ভারতীয় ধা কিন্তু নেহরু যখন গেলেন টাউন সেখানে তাঁকে মানপত্র দেওয়া হল ফ ভাষায়। নেহরু নিজেও ফরাসী জা হয়ত বক্তৃতা করার মত নয়, উত্তর ি ইংরিজিতে। বল্লেনঃ যা ফরাসী বৈ আছে আমরা তা রক্ষা করব এবং আশা ফরাসী সংস্কৃতিও ভারতের বহু সংস্কৃতিকে আরো সম্পদশালী পারবে। কিন্তু একথাও জানালে পণ্ডিচেরীর জনসাধারণের যাতে হয় আমাদের তাই করতে হবে।

পণ্ডিচেরীর গ্রামে গেলুম, চার দূরে লস্‌গেট-এ, যেখানে নেহরু জনসভায় বক্তৃতা করলেন। চা ধানের ক্ষেত, তার আল ধরে ধরে না গাছের বাগান আর কুঁড়ে ঘর পেরিয়ে গেলুম ঐখানে। প্রায়

হাজার শহরবাসী গ্রামবাসী সমবেত ছিলেন সভায়। তারা পুরোদস্তুর দক্ষিণ-ভারতীয়। আবাদি কংগ্রেসের জনতার সঙ্গে কোনো পার্থক্য নেই। পণ্ডিচেরীর 'ফরাসী সংস্কৃতি' এখানেও পেলুম না।

সেই সভায় প্রধান মন্ত্রী জনতাকে ডাক দিয়ে বল্লেন: ভারতের পঁয়ত্রিশ কোটি তীর্থযাত্রী এগুচ্ছে যে ভারতকে এতকাল স্বপ্নে আমরা দেখেছি, তার দিকে। এসো, তোমরাও হও সহযাত্রী সেই বিশাল তীর্থযাত্রার। তামিল অনুবাদের মাধ্যমে এই কথা কয়টা যখন জনতার কানে গেল, তখনকার প্রতিক্রিয়া, অর্থাৎ সেই আনন্দ-ধ্বনি, ভারতের যে কোনো অঙ্গের জনতার আনন্দ ধ্বনি।

কথাটা সরাসরি পাড়লুম অধুনা বিলুপ্ত, সোস্যালিস্ট পার্টির নেতা এদুয়ার গুবেয়ার মশায়ের কাছে। ও'র বয়েস হয়েছে। অনেক বছর চন্দননগরে ছিলেন, ভাঙা ভাঙা বাঙলাও বলতে পারেন। ফরাসী খুব ভাল জানেন। ১৯৫০-এ গণভোটে যে এসেম্‌বলি নির্বাচিত হয়েছিল—পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে ও ইয়ানাম্‌-এর (সদস্য সংখ্যা ৩৯, অধিবাসী একুনে তিন লক্ষ বিশ হাজার), সেই নির্বাচনে সোস্যালিস্ট পার্টিই জয় করেছিল সমস্ত আসন। অন্তর্ভুক্তির কিছুদিন আগে সোস্যালিস্ট পার্টির বিলোপ করা হয় এবং সেই অবধি কথাবার্তা টানা-পোড়েন চলছে তামিলনাদ কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার। এখনো হয়নি।

গুবেয়ার মশাইকে তাই সোজাসুজি বল্লুম: ফরাসী সংস্কৃতির দোহাই তুলে আপনারা দাবী করছেন পণ্ডিচেরী প্রদেশের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার, অর্থাৎ "গ"-শ্রেণী প্রদেশ হিসাবে। কিন্তু সেই ফরাসী সংস্কৃতি কোথায়? শিক্ষিতদের কিছু অংশ ফরাসী ভাষা জানেন, ইস্কুল-কলেজে ফরাসী শেখার বন্দোবস্ত আছে, আইন-কানুনও কিছুটা ফরাসী। কিন্তু ভারতের অন্যান্য যে কোনো প্রদেশের শিক্ষিতরা অল্প-বেশি ইংরিজি জানে, ইস্কুল-কলেজেও ইংরিজি যথারীতি চলছে এবং ব্রিটিশ সভ্যতার অনেক কিছু আমাদের রাষ্ট্রকাঠামোয় আছে। তাই বলে ভারতের কোনো প্রদেশ তো ব্রিটিশ সংস্কৃতির দোহাই দিয়ে স্বতন্ত্রতা দাবী করে না। আমাদের সংস্কৃতি আমাদের নিজস্ব ইতিহাস, নিজেদের মাতৃভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, শিল্প, শিক্ষা ও সামাজিক ক্রমবিকাশ ইত্যাদির প্রকাশ। আর যদি স্থানীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায়, তাহলে সেটা কা'র নেই। তাহলে যত জেলা, যত তহশিল আছে সব হবে 'গ'-শ্রেণীর প্রদেশ? পণ্ডিচেরীর সঙ্গে মাদ্রাজের কোথায় পার্থক্য?

হেসে মঁসিয়ো গুবেয়ার বল্লেন: "Je suis desarme (I am disarmed)" তিনি বল্লেন: দ্যাখ, এখানকার শতকরা আশিজন লোক merger কি no-merger-এ মাথা ঘামায় না। তারা দু'বেলা খেয়ে-পরে থাকতে চায়। বাদবাকি কুড়ি ভাগের কিছু লোক চায় মাদ্রাজের সঙ্গে merger, অন্য এক অংশ, যেমন আমরা, চায় no-merger। র‍্যাগারদে, মঁসিয়ো! আমরা নির্বাচনে বেমালুম জিতেছিলুম। প্রতিনিধিত্ব আমরাও করতে পারব, সুতরাং ক্ষমতা যদি আমরা রাখতে পারি, তো বেমক্কা ছাড়ি কেন? তারপর ধরো, question of political exigency, এখনো গোয়া ইত্যাদি ভারতে ফিরে আসতে বাকি, আন্তর্জাতিক মহলে আশ্বাস-দানের প্রশ্নটাও রয়েছে।

ওদের এখন একটা প্রধান দাবী হল এই যে, তাদের এসেম্‌বলির আয়ু আরো দু বছর বাকি, ওটাকে আবার ডাকা হোক। ১৯৫৩-র অক্টোবরের পরে আর বসেনি। (তার আশা কম, কারণ ওখানে আবার নির্বাচন হচ্ছে কয়েক মাসের মধ্যেই হয়ত।) তাঁরা আরো দাবী করছেন যে ফরাসীরা

দুশো বছর উন্নতিমূলক কিছু করেনি। সুতরাং ভারত সরকারকে ভাল করে এবার নজর দিতে হবে এই স্থানের অর্থনৈতিক উন্নতি বিধানে। বিশেষ করে পণ্ডিচেরী বন্দরকে বড় ও ভাল করা হোক।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে নোটবুক বন্ধ করে খোঁজ করতে গেলুম পণ্ডিচেরীর ব্যবসায়ী মহলের। এবং বোঝা গেল দ্য লা বুরদনের প্রেতাত্মা, আশ-শ্যেওড়া গাছের অভাবে, ওখানকার কোনো তেঁতুল গাছেই হয়ত বাসা করে আছেন।

ক্ষমতা হস্তান্তরের কয়েকদিন আগে ফরাসী কর্তৃপক্ষ দুহাতে ইমপোর্ট লাইসেন্স দিতে লেগে গেলেন। ফর্মের টান পড়াতে শেষটায় নাকি কাগজে স্রেফ্ সই দিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। হঠাৎ দাঁও মারার লোভে মাদ্রাজ শহর থেকেও কেউ কেউ এসে রাতারাতি আমদানী বাণিজ্যে নেমে গিয়েছিল। ফলে, প্রায় আড়াই কোটি কি তিন কোটি টাকার লাইসেন্স জারি করা হয়েছিল বলে জানা যায়।

কিন্তু অন্তর্ভুক্তির পর ব্যবসায়ীরা পড়লেন মুশকিলে। সমস্ত ভারতের একটা অর্থনৈতিক কাঠামো আছে যার ভিত্তিতে আমদানী রপ্তানির পরিমাণ ঠিক করা হয়। রাতারাতি যে-সমস্ত লাইসেন্স দেওয়া হয়েছে তার অনেক কিছুই হয়ত অবাঞ্ছনীয় অথবা পরিমাণ কমাতে হবে। অধিকন্তু, অনেক কিছুর উপর এখন ভারতীয় হারে আমদানী শুল্ক দিতে হবে (আগে হয়ত ছিল না, কিম্বা খুব কম ছিল)। ব্যবসায়ীরা পড়েছেন মুশকিলে, তারা অনবরত দরবার করছেন দিল্লীর সঙ্গে। অনেক মালের অর্ডার চলে গেছে, এক কোটির মত টাকাও নাকি দেওয়া হয়ে গেছে। জিনিস না আনলে মুখ থাকে না, আনলে হয়ত লাভ থাকে না, এই ব্যাপার। যেমনটি হয়েছে কিছু মোটর গাড়ির ব্যাপারে। হঠাৎ চলে এল নতুন সব গাড়ি। সীমানা পার করে একবার মাদ্রাজে নিতে পারলেই মোটা লাভ। কর্তৃপক্ষ বলছেন, গাড়ি আনিয়েছ, তা উচিত ট্যাক্সো দিয়ে যাও। পণ্ডিচেরী মার্চেণ্টস্ এসোসিয়েশন সরকারের কাছে নালিশ করে চলেছে যে অন্যায়ভাবে, বাছবিচার না করে ভারতীয় ইউনিয়নের আইন-কানুন তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে আরোপ করা হচ্ছে। রফা একটা কিছু হয়ত হবে। যারা গাছেরও খেতে চায় এবং ডাঙারটাও কুড়োতে চায় তাদের খানিকটা মুসিবত হয় বৈকি।

এবার "ও র‍্যাভোয়ার"—চলে যাবার পালা। কাজকর্ম সেরে মাথা তুলতে রাত হয়ে যাবে। এবং অতো রাত্রে মাদ্রাজগামী গাড়ি নেই। একমাত্র আছে প্রধানমন্ত্রীর স্পেশাল ট্রেন। এসব বিষয়ে সিংগীমশাইর মাথাটা খেলে ভাল। তিন প্রধানমন্ত্রীর সিকিউরিটি অফিসার রুস্তমজীকে (লজ্পেটে যখন জনসভা হচ্ছে বিকেলে) বললেন—প্রধানমন্ত্রী তো মোটরে ফিরছেন মাদ্রাজে, স্পেশাল ট্রেন তো খালি যাবে। অনুমতিটা করিয়ে দাও তো আমাদের বড় সুবিধে হয়। সকাল নাগাদ মাদ্রাজ পোঁছে যেতে পারি। —নিশ্চয়ই। বলে উনি মিনিট দশেকের ভিতরে অনুমতি আনিয়ে দিলেন। রাত দশটায় সেই গাড়িতে চেপে ভোর ভোর চলে এলুম মাদ্রাজ শহরে।

সাংবাদিকদের প্রতি নেহরুর সহৃদয়তার পরিচয় অনেকে অনেকবার পেয়েছেন, আমরাও কয়েকবার পেয়েছি এবং তার জন্যে আমাদের কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

এই ধরুন কয়েক বছর আগে প্রধানমন্ত্রীর সিকিম অঞ্চল পরিভ্রমণের সময়ে। দার্জিলিং-এ সরকারী কর্তারা বললেন—গ্যাংটকে থাকবার কোনো জায়গা নেই। আমরা আপনাদের জন্য কিছু করতে পারব না। অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি বাঁশের চাইতে দড় কারা। বাঙলার মুখ্যমন্ত্রী বিধানবাবুকে আরজি করা হল এবং নেহরুর কাছেও চিরকুট লিখে জানান হল। বিধানবাবু গ্যাংটকে টেলিফোন করে বললেন সাংবাদিকদের জন্যে থাকবার জায়গা করে দিতে। প্রধানমন্ত্রীও বিধানবাবুর হাত থেকে টেলিফোন নিয়ে বলে দিলেন, হ্যাঁ, ওটুকু করতেই হবে। পোঁছে দেখলুম দু-দুটো ডাক বাঙলো খালি পড়ে আছে, এবং সেখানেই স্থান করা হয়েছে রিপোর্টার, ফটোগ্রাফারদের।

গত ডিসেম্বরে শান্তিনিকেতনে নেহরু উদয়নের প্রাঙ্গণে বক্তৃতা করবেন কংগ্রেস-সেবীদের এক সভায় সন্ধ্যের পর। ফটোগ্রাফার-ভাইরা ছবি তুলছেন বিজলি আলোকের ঝলক দিয়ে এবং তাহ[illegible] সভার একজন আপত্তি তুললেন—[illegible] বড্ডো চোখে লাগছে। নেহরু হেসে বললেন—আপনার অত্যন্ত কোমল চোখ দেখছি। তা' ওরা তো ছবি তুলবেই দু'একটা।

সেই শান্তিনিকেতন থেকে নেহরু গেলেন জাকর্তায়। যে-দিন সেখান থেকে কলকাতায় ফিরলেন, সাংবাদিকরা প্রার্থনা করলেন সাক্ষাৎকার। উপরওয়ালা সরকারী কর্মচারী বললেন—না, সময় কোথায় —শেষে পাঁচ মিনিটের ইণ্টারভিউ ঠিক হ[illegible] সন্ধ্যে বেলায় রাজভবনে। নেহরু ইণ্টারভিউ দিলেন, দশ মিনিট নয়, কুড়ি মিনি[illegible] নয়, পঁয়তাল্লিশ মিনিট।

এমনি অনেক উদাহরণ আ[illegible] সাংবাদিকদের প্রতি নেহরুর সৌজন্যে[illegible] এবং সেটা প্রধানত এই জন্যে যে উ[illegible] উপলব্ধি করেন সাংবাদিকদের কাজে[illegible] গুরুত্ব ও মূল্য।

এই প্রবন্ধে ব্যবহৃত ফটোগুলি শ্রীবী[illegible] সিংহ কর্তৃক গৃহীত।

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মা আর বাবাকে যারা বন্ধু হিসেবে পেয়েছে, তারা ভাগ্যবান। সুখের কথা, চার্লি আর উনার সন্তান ক'টি সেই সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হয়নি। মা আর বাবাকে তারা বন্ধু হিসেবে পেয়েছে। ছেলেমেয়েদের ব্যক্তিত্ব কোথাও ব্যাহত হোক, চার্লি তা চাননি। তিনি চান, সব ব্যাপারেই তারা তাদের নিজেদের ইচ্ছেমত চলুক, তাদের মানসিক প্রবণতার স্বাধীন বিকাশ ঘটুক। টেলিভিশন আর রেডিয়োর প্রভাব থেকে তিনি তাদের যত্নে দূরে সরিয়ে রেখেছেন। উনার মেয়ের নাম জেরাল্ডিন। বন্ধু-বদের ডেকে এনে সে পার্টি দেয়; অল্প হলে কী হয়, ইতিমধ্যেই সে গৃহকর্ত্রী হয়ে উঠেছে। বড় র নাম মাইকেল। তার ইচ্ছে নিক হবে। নানান রকমের যন্ত্রপাতি য়ে এনে সারাদিন সে তার 'বৈজ্ঞানিক ষণা' চালিয়ে যাচ্ছে। এ কাজে ই তার প্রধান সহকারী। মাঝে সবাই মিলে সার্কাসে যান। সেখান ক ফিরে এসে চলে রংগাভিনয়। রি যে অনেক বয়স হয়েছে, ছেলে-দের মধ্যে তাঁকে দেখে সেকথা বার উপায় নেই। তখন মনে হবে, কেলের তিনি সমবয়সী। উনাই বরঞ্চ টু গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে। সে নায় চার্লি একেবারে ছেলেমানুষ। সব বিড়ম্বনা তাঁকে স্পর্শ করতে রনি।

চার্লি-বিরোধী আন্দোলন ইতিমধ্যে ন দিনে আরও উত্তাল হয়ে উঠছিল। ব করা হল, অ্যামেরিকা থেকে তাঁকে ষ্কৃত করা হোক। কেন? না মেরিকার তিনি শত্রু। "পঁয়ত্রিশ রের উপর এদেশে তিনি রয়েছেন, ন্তু এখনও এখানকার নাগরিক হননি।" তাঁর "নাক্কারজনক বইগুলোকে" অ্যামেরিকার কোনও চিত্রগৃহেই যেন দেখানো না হয়, "অ্যামেরিকার যুব-সমাজকে" তাঁর ছবির কু-প্রভাব থেকে মুক্ত রাখতে হবে। ১৯৫২ সালে এই জঘন্য প্রচারকার্য তার চরম পর্যায়ে গিয়ে পেঁছয়। চার্লি যে এতে বিচলিত, বিক্ষুব্ধ বোধ না করছিলেন, এমন নয়; কিন্তু এই প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যেও তিনি আদর্শভ্রষ্ট হননি। সমস্ত লাঞ্ছনা, সমস্ত অপমানের উর্ধ্বে উঠে আরও দুখানি ছবি তিনি তৈরি করলেন। দুটি ছবিই অবিস্মরণীয়।

(৩২)

প্রথমটির নাম "মঁসিয়ে ভের্দু"। প্রথমে এর নাম ছিল "লেডি কীলার", পরে সে-নাম বদলে দেওয়া হয়। অরসন ওয়েলসের দেওয়া বিষয়বস্তুকে অবলম্বন করে চার্লি এ বইয়ের কাহিনী রচনা করেন। স্ক্রীপ্ট তৈরি করতে তাঁর পুরো দুটি বছর সময় লেগেছিল। ১৯৪৬ সালের গ্রীষ্মকালে শুটিং শুরু হল।

এর আগে যেসব বই তুলেছেন চ্যাপলিন, "মঁসিয়ে ভের্দু"র সঙ্গে তার কোথাও কোনও মিল নেই। সর্বদিক থেকেই এ তাঁর এক অভিনব শিল্পসৃষ্টি। চার্লির সৃষ্ট সেই ভবঘুরে চরিত্রটি, চার্লির প্রায় সমস্ত ছবিতে—এমন কি "দী গ্রেট ডিক্টেটর"-এও—যে আমাদের হাসিয়ে মেরেছে, এ-বইয়ে তার দেখা পাওয়া যাবে না। ভাগ্যের হাতে বারংবার যার লাঞ্ছনা ঘটছে, অসহায় সেই মানুষটি এখানে নেই। তার জায়গায় আবির্ভূত হয়েছে আর একটি মানুষ, বেঁটে ছিমছাম কেতাদুরস্ত একটি কেরানী। নির্দয় এবং ধূর্ত। অর্থের লোভে নরহত্যায় যার বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা নেই।

"মঁসিয়ে ভের্দু" সম্পর্কে চার্লি বলেছেন, এখনকার এই লোভী জঙ্গী বিকলাঙ্গ সভ্যতাকে বিদ্রূপ করবার জন্যেই বইখানি তিনি তুলেছিলেন। তিনি বলেছেন, "এ বইয়ের মধ্যে একটি

'মঁসিয়ে ভের্দু'তে' চার্লস চ্যাপলিন ও মার্থা রে

'ম'সিয়ে ভের্দ'তে মার্থা রে-র সঙ্গে আর একটি নাটকীয় মুহূর্তে চার্লি

নীতিবাক্য প্রচ্ছন্ন রয়েছে। ভন ক্লজ-উইৎস বলেছিলেন, কূটনীতির অনিবার্য পরিণাম হল যুদ্ধ। আর ম'সিয়ে ভের্দু বিশ্বাস করেন, ব্যবসায়িক মনোভাবের অনিবার্য পরিণাম হল নরহত্যা। যে যুগে আমরা বাস করছি, সেই যুগের মনোভাবটিকেই তিনি প্রকাশ করেছেন। যুগ-সংকটের সময়ে ম'সিয়ে ভের্দুর মতন মানুষেরই সৃষ্টি হয়ে থাকে। অবক্ষয়-কালের, অসুস্থ বিকারগ্রস্ত সভ্যতার তিনি প্রতীক। তাঁর স্বপ্ন ছিল। স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছে। তাঁর মনের মধ্যে তিক্ততা জমে উঠেছে। তিনি নৈরাশ্য-বাদী। কিন্তু আর যা-ই হোন, মর্বিড তিনি নন। অবস্থাবিশেষে হত্যার মধ্যেও যে হাস্যরসের উপাদান থাকতে পারে, এ-বই দেখলেই সেটা বুঝতে পারা যাবে।"

বইয়ের প্রথম দৃশ্যেই দেখা যায় একটি সমাধি-স্তম্ভ। তার উপরে লেখা রয়েছে, "অঁরি ভের্দু, ১৮৮০—১৯৩৭।" নেপথ্য থেকে কাহিনীর যে আভাস দেওয়া হয় (কণ্ঠস্বর চ্যাপলিনের), তাতে জানা যায়, ১৯৩০ সালে বিশ্বব্যাপী মন্দা দেখা দেবার আগে অঁরি ভের্দু এক ব্যাঙ্কে কেরানীর কাজ করতেন। মন্দার বাজারে স্ত্রী-পুত্র-পরিবারের ভরণপোষণ তাঁর পক্ষে অসাধ্য হয়ে ওঠে। অভাবে পড়ে তিনি তখন অর্থার্জনের এক নতুন উপায় খুঁজে বার করলেন। বেছে বেছে ধনী মেয়েদের তিনি বিবাহ করতেন। তারপর তাদের হত্যা করে পয়সাকড়ি নিয়ে সরে পড়তেন। এইসব মেয়েকে তিনি কখনও ভালবাসেননি; পয়সা রোজগারের আর কোনও পথ ছিল না বলেই এই ভয়াবহ উপায় তাঁকে খুঁজে নিতে হয়েছিল।

পরবর্তী দৃশ্যে শুরু হল ম'সিয়ে ভের্দুর জীবন-নাট্য। নাম-ভূমিকায় নেমেছিলেন স্বয়ং চার্লি। দক্ষিণ ফ্রান্সের এক গ্রামে তাঁর বাড়ি। বাড়ির বাগানে বসে তিনি গোলাপ-গাছের পরিচর্যা করছেন। পিছনে একটা চুল্লি। একটু আগেই ম'সিয়ে ভের্দু তাঁর সর্বশেষ প্রণয়িনীকে হত্যা করে সেই চুল্লির মধ্যে ঢুকিয়ে রেখে এসেছেন। চুল্লি থেকে অল্প অল্প ধোঁয়া উঠছে। ম'সিয়ে ভের্দু কিন্তু নির্বিকার। হত্যা করে কিছু পয়সা পাওয়া গিয়েছে, সেই আনন্দেই তিনি মশগুল হয়ে আছেন। ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিকেও একটা হাল্কা সুরের ছোঁয়া লেগেছে। গোলাপ-গাছের পরিচর্যা করছেন ম'সিয়ে ভের্দু। সামনে একটা পোকা দেখতে পেয়ে সন্তর্পণে তিনি সরে দাঁড়ালেন, যেন সেটার গায়ে কোনও আঘাত না লাগে। তারপর আলতো হ[াতে] পোকাটাকে তুলে নিয়ে নিয়ে পত্রপল্ল[বের] নিরাপদ আশ্রয়ে তাকে পৌঁছে দিলে[ন।] মানুষের প্রতি তাঁর বিন্দুমাত্র মমতা [নেই,] কিন্তু নিরীহ পোকামাকড়দের [তিনি] ভালবাসেন।

একটু আগেই যে ভদ্রমহিলাকে [তিনি] হত্যা করেছেন, তাঁর নাম থেলমা। ম'[সিয়ে] ভের্দু বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, এমন [সময়] পিওন এস জানাল যে, থেলমার [নামে] একটা ইন্সিওর্‌ড প্যাকেট [এসেছে,] থেলমাকে রসিদে সই করতে [হবে।] চ্যাপলিন বিচলিত হলেন না। পিও[নকে] তিনি বললেন যে, থেলমা স্না[ন করছেন] রয়েছেন, এখন তিনি বেরিয়ে আ[সতে] পারবেন না, চ্যাপলিন বরং স্নানঘরে [গিয়ে] তাঁকে দিয়ে সই করিয়ে আন[ছেন।] রসিদের কাগজটা হাতে নিয়ে বাড়ির [মধ্যে] গিয়ে প্রবেশ করলেন তিনি, তারপর [যেন] থেলমারই সঙ্গে কথা কইছেন, এমনভ[াবে] পিওনকে শুনিয়ে শুনিয়ে [বলতে] লাগলেন, "না, না, তোমায় বেরিয়ে [আসতে] হবে না। হাতটা মুছে নিয়ে একট[া সই] করে দাও, ব্যস্।" বঁ[ক]েই থেলমা[র নাম] জাল করে রসিদটা এনে পিওনের [হাতে] তুলে দিলেন চার্লি। সরল মনে পি[ওন] তাঁকে ইন্সিওর্‌ড প্যাকেটটা দি[য়ে] থেকে বিদায় নিল। প্যাকেট খুলে [তিনি] দেখলেন, তার মধ্যে ষাট হাজার [ফ্রাঁ] রয়েছে। এ টাকা যে আজই এসে পৌ[ঁছবে,] তিনি জানতেন। তার আগের [দিন] চার্লির পরামর্শে থেলমা তাঁর ব্যা[ঙ্ককে] নির্দেশ দিয়েছিলেন, অবিলম্বে যেন তাঁর নামে ষাট হাজার ফ্রাঁ [পাঠিয়ে] দেন। নোটগুলি দ্রুত গুনে [নিয়ে] পিয়ানোর ধারে গিয়ে বসলেন [তিনি।] তারপর মনের আনন্দে একটা হাল্কা গৎ বাজাতে লাগলেন।

থেলমার আত্মীয়স্বজনরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছেন। বিয়ে [করতে] যাচ্ছেন বলে মাস তিনেক আগে [সেই] থেলমা তাঁদের কাছ থেকে বিদায় [নিয়ে]ছিলেন, তারপর আর তাঁর খোঁজখবর পাওয়া যায়নি। তাঁর[া] এইটুকু জানতেন যে, থেলমা যাকে [বিয়ে] করবেন বলে স্থির করেছেন, ত[িনি] ম'সিয়ে ভের্দু। ভের্দুর একটা

াঁদের কাছে ছিল। আরও দিনকয়েক তীক্ষায় কাটিয়ে তাঁরা পুলিসে গিয়ে বর দিলেন। থেলমার কোনও খোঁজ সখানে পাওয়া গেল না; এইটুকু শুধু ানা গেল যে, থেলমার মতন টাকাপয়সা-ওয়ালা আরও জন বারো মধ্যবয়সী মহিলা সম্প্রতি নিখোঁজ হয়েছেন।

পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যায়, মঁসিয়ে ভেদু তাঁর পিয়ানোর সামনে বসে আছেন। দরজায় টোকা পড়ল। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি চমকে উঠলেন। না, পুলিস য়। থেলমার বাবুর্চি।

দিনকয়েক বাদেই চার্লির জীবনে আর একটি ভদ্রমহিলার আবির্ভাব ঘটল। দাম মারি গ্রসনে (ইংরেজ অভিনেত্রী সাবেল এলসমকে এই ভূমিকাটিতে ানো হয়েছিল)। ইনিও ধনী এবং নও প্রৌঢ়া। চ্যাপলিনের বাড়িটা তিনি থতে এসেছেন। খবর পেয়েছেন যে, ড়িটা বিক্রি হবে। তিনি কিনতে চান। ড়ির মালিক চার্লি নন, তিনি ভাড়াটে ়। কিন্তু সেকথা তিনি প্রকাশ করলেন ভদ্রমহিলাকে দেখেই তিনি অনুমান তে পেরেছিলেন যে, এঁর হাতে প্রচুর সাকড়ি আছে। একরাশ ফুল হাতে চার্লি তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন। ী করে এঁকে এখন টোপ গেলানো যায়। থায় কথায় জানা গেল, বছর কয়েক আগে ার স্বামী মারা গিয়েছেন। এইটুকু ানবার জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন ার্লি। জানবার পর আর তিনি সময় নষ্ট করলেন না, ভদ্রমহিলার সামনেই তাঁর সৌন্দর্যের প্রশংসায় তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। বললেন যে, তাঁর চোখ দুটিতে কামনা আর প্রেম যেন টলমল করছে। বললেন যে, নিয়তিই তাঁদের যোগাযোগ ঘটিয়ে দিয়েছে। ভদ্রমহিলার যদি কোনও আপত্তি না থাকে তো— । সলজ্জ হেসে মাদাম গ্রসনে বললেন, অনেক বয়স হয়েছে তাঁর, এত বয়সে যদি আবার বিয়ে করেন তো সেটা ভাল দেখাবে না। চার্লি বললেন, "ধুৎ, বয়সে কী যায় আসে।" কথা বলছেন, আর ঘরময় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। এমন সময় বাড়ির মালিক এসে প্রবেশ করলেন। তাঁকে দেখে এমন একটা ভাব করলেন চার্লি যেন একটা বোলতাকে ধরবার জন্য তিনি ঘরময় ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছিলেন। ছুটতে ছুটতে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন চার্লি, পা পিছলে আছাড় খেয়ে পড়লেন। অল্পের জন্যে মাদাম গ্রসনে রক্ষা পেয়ে গেলেন। বাড়িওয়ালা যদি ঠিক সময়ে না এসে পড়তেন তো মাদাম গ্রসনেকেও চার্লির সর্বনাশা প্রণয়ের ফাঁদে জড়িয়ে যেতে হ'ত।

পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যায়, মঁসিয়ে ভেদু প্যারিসে এসে পেঁছেছেন। এসে শুনলেন, শেয়ার বাজারের অবস্থা বড় খারাপ, হু-হু করে দর নেমে যাচ্ছে। শুনে তিনি মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। শেয়ার-বাজারে বেশ কিছু টাকা খাটিয়েছিলেন তিনি, অবিলম্বে যদি এখন পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ সংগ্রহ না করতে পারেন তো তাঁকে পথে বসতে হবে। নোটবুক খুলে দ্রুত পাতা উল্টে যেতে লাগলেন তিনি, ওল্টাতে ওল্টাতে এক জায়গায় এসে থেমে পড়লেন। লীডিয়া ফ্লোরে। এই নামটিই তিনি এতক্ষণ খুঁজছিলেন। লীডিয়া তাঁর এক প্রাক্তন প্রণয়িনী, অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়ে। দিন-কয়েক তাঁর সঙ্গে প্রেম করে মঁসিয়ে ভেদু তাঁর বেশ কিছু পয়সাকড়ি হাতিয়ে নিয়ে সরে পড়েছিলেন, কিন্তু এখন আবার তাঁর কাছেই তাঁকে যেতে হবে। লীডিয়া যে শহরে থাকেন, সেখানকার ব্যাঙ্কগুলি চারটের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। এক্ষুনি গিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে তাঁকে কিছু টাকা তোলাতে হবে। কাজটা শক্ত সন্দেহ নেই, কিন্তু যে করেই হোক, আজ বিকেলের মধ্যেই মঁসিয়ে ভেদুকে পঞ্চাশ হাজার ফ্রাঁ সংগ্রহ করতে হবে। আর সময় নষ্ট না করে দৌড়তে দৌড়তে তিনি ট্রেনে গিয়ে উঠলেন।

ভেদুকে দেখেই চটে গেলেন লীডিয়া। বললেন, "কী চাই তোমার?" ঘড়ির দিকে তাকিয়ে মঁসিয়ে ভেদু দেখলেন, চারটে বাজতে আর মাত্র পনেরো মিনিট বাকি আছে। নষ্ট করার মত সময় আর নেই। তাই কোনও গৌরচন্দ্রিকা না করে সরাসরি লীডিয়ার সামনে গিয়ে তিনি দাঁড়ালেন। বললেন, "লীডিয়া, আমি তোমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসিনি। আমাদের বয়স হয়েছে। জীবনের এই সায়াহ্নে আমাদের শান্তি পাওয়া দরকার, পরস্পরকে ভালবাসা দরকার। ভালবাসাই এখন আমাদের একমাত্র আশ্রয়।" ঘড়ি দেখলেন মঁসিয়ে ভেদু, আর মাত্র দশ মিনিট সময় আছে। লীডিয়ার একখানি হাত তিনি স্নেহভরে আঁকড়ে ধরতে গেলেন, কিন্তু তাঁকে দূরে ঠেলে দিলেন লীডিয়া। বললেন, "আমার বয়স হয়েছে, ওসব ছেলেমানুষি আর ভাল লাগে না।" ভেদু বললেন, "ছেলে-মানুষি করতে আমি আসিনি, আমি শুধু একটা খবর দিতে এসেছিলাম। ব্যাঙ্কগুলি সব ডুবতে বসেছে। যদি বাঁচতে চাও তো এক্ষুনি টাকা-পয়সা তুলে ফেল। কাল থেকেই ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে রান্ শুরু হয়ে যাবে।"

"সর্বনাশ!" আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলেন লীডিয়া, "বল কি! তা হলে তো এক্ষুনি টাকাপয়সা তুলে ফেলা দরকার।"

ব্যাঙ্ক থেকে সমস্ত টাকা তুলে এনেছেন লীডিয়া। গুনে গুনে নোটের তাড়াগুলিকে তিনি একটা বাক্সের মধ্যে তুলে রাখছেন। সত্তর হাজার ফ্রাঁ। সব টাকা গুছিয়ে রেখে তিনি শয়নকক্ষের বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালেন। মঁসিয়ে ভেদু সবেমাত্র দু-একটা ভালবাসার কথা বলতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু "আহা কি অপূর্ব রাত্রি" দিয়ে আরম্ভ করতে না করতেই লীডিয়া তাঁকে থামিয়ে দিলেন। নিষ্প্রাণ যান্ত্রিক গলায় বললেন, "অনেক হয়েছে, এবারে শুতে যাও।"

(ক্রমশ)
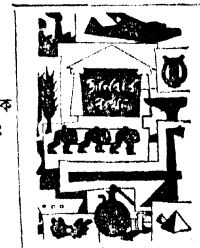
SCISSORS
CIGARETTES
"SCISSORS"
CIGARETTES
SPECIAL
SCISSORS
W.D.&H.O.WILLS.
W.D.&H.O.WILLS,
BRISTOL & LONDON.
"SCISSORS"
W.D. & H.O.WILLS
MARK
SCISSORS
SG/249

চিত্রগ্রীব

১৫ নম্বর পার্ক স্ট্রিট-এ (আর্টিস্ট্রী হাউস) শ্রীমতী শানু লাহিড়ীর (মজুমদার) একক চিত্রপ্রদর্শনী আরম্ভ হয়েছে ১৩ই মার্চ থেকে। বাঙলার চিত্ররসিক মহলে শ্রীমতী শানু লাহিড়ী অপরিচিত নন। মহিলা শিল্পীদের মধ্যে দু চারজন যাঁরা সত্যিকার প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন শ্রীমতী লাহিড়ী তাঁদের মধ্যে একজন। ইনি গভর্নমেন্ট কলেজ অব আর্টস্ অ্যান্ড ক্রাফ্‌ট্‌স্ থেকে পাশ করেছেন বটে কিন্তু তাঁর চিত্রকলা এখন যে উৎকৃষ্টতায় পৌঁছেছে তা' সম্পূর্ণই তাঁর স্বকীয় পরীক্ষানিরীক্ষার ফলাফল।

'গার্ল উইথ ব্যাগ'

ইনি কিছুটা আধুনিক চিত্রধারায় অনুপ্রাণিত, তবে একেবারে দুর্বোধ্য দার্শনিকপন্থী নন। বাস্তব জগত-ধর্মী বিষয়বস্তুর মধ্যে অল্পবিস্তর 'অ্যাবস-ট্রাকশন' প্রয়োগ করে বৈচিত্র্যপূর্ণ রচনা সৃষ্টি করাই এর লক্ষ্য দেখা গেল। রঙ সম্বন্ধে কার্পণ্য বা ইতস্ততা এ'র একেবারেই নেই। সম্পূর্ণ আত্মবিশ্বাস নিয়েই প্রতিটি পোচ ব্যবহার করেছেন, যার ফলে ছবিগুলি অত্যন্ত উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। স্বকীয় আবেগকে চিত্রে রূপান্তরিত করেছেন—এরজন্য অতিরঞ্জন বা বিকৃতিকরণের সাহায্য নিতে দ্বিধা বোধ করেননি। এ'র ছবিকে 'এক্সপ্রেশনিস্ট' ধর্মী বললে বোধকরি অসংগত হবে না। যদিও এই এক্সপ্রেশনিস্ট কথাটি থেকে পরিষ্কার বোঝা মুশকিল ছবিগুলির বৈশিষ্ট্য কী এবং এক্সপ্রেশনিজম্-এর সম্প্রসারিত ব্যাখ্যাও এখানে সম্ভব নয়, তবুও মোটা-মুটি আমরা বুঝি শিল্পীর ব্যক্তিগত চিন্তাধারা বা বোধকে অভিব্যক্ত করাই হল এক্সপ্রেশনিস্ট আর্ট।

নানান রকম বিষয়বস্তুর সব সমেত সাতাশটি ছবি প্রদর্শন করা হয়েছে। এর মধ্যে সব চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে 'স্টিল লাইফ'গুলি। শিল্পী নিজেও স্বীকার করলেন, স্টিল লাইফ স্টাডীতেই তিনি সবচেয়ে স্ফূর্তি পান। এ'র মতে, নিষ্প্রাণ-বস্তু সুবিধে মত সাজিয়ে নিয়ে আঁকতে পারলে চমৎকার রচনার সৃষ্টি করা যায়। রঙ নির্বাচনে এবং বুননে এগুলি সত্যিই প্রীতিকর। কয়েকটি রচনায় কিউবিজম-এর আঁচ এসে পড়েছে। স্টিল লাইফ ছবির মধ্যে সব চেয়ে ভাল লাগলো 'প্যালেট অ্যান্ড দি ভাস', 'ফিশ, 'রজনীগন্ধা', 'ব্লু ভাস', 'পারফিউম বটল', 'গ্রীন ব্যাগ' এবং 'প্রদীপ ও পাখা'। পছন্দ অপছন্দ সব মানুষের এক হয়না, সুতরাং অনেকে আমার সংগে একমত নাও হতে পারেন তবে কম্পোজিশন-এর বাহাদুরী এইগুলিতেই সবচেয়ে বেশী—নিঃসন্দেহে বলতে পারি। কয়েকটি ছবির বর্ণবিন্যাসে একেকটি বিশেষ রঙের প্রাধান্য বজায় রাখা হয়েছে লক্ষ্য করলাম—যেমন 'মাই ফ্রেন্ড' ছবিতে সবুজ বা 'ডান্স' ছবিতে গোলাপীর ব্যবহার। রঙ বিন্যাসে এ ধরনের পরীক্ষানিরীক্ষা ইউরোপ-এ এর আগে হয়ে থাকলেও এদেশে বড় একটা দেখা যায়নি। পরম্পরাগত এবং আধুনিক চিত্রধারার সংমিশ্রণে সৃষ্ট ল্যান্ডস্কেপ-গুলিও বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। 'প্রিপেয়ারিঙ কাইটস' ছবিটিতে বলিষ্ঠ সীমা রেখার মধ্যে ঢালা রঙের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। বিশেষ করে এই ছবিটির 'ফর্ম'গুলির সংগে কতকটা আদিম (primitive) শিল্পের সাদৃশ্য আছে, যে সাদৃশ্য গগাঁর ছবিতেও লক্ষ্য করা যায়। বলিষ্ঠ সীমারেখা এবং ঢালা রঙ আরও কয়েকটি ছবিতে লক্ষ্য করলাম। দু চারটি ন্যুড ছবিও প্রদর্শিত হয়েছে, কিন্তু এগুলির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে পারলাম না। ছবিগুলি খুব দৃষ্টিকটু না হলেও বোধহয় কিছু অভিনবত্ব খুঁজে পাওয়া গেল না বলেই তেমন ভালো

ফিশ

লাগলো না। 'স্কেচ' ছবিটিও খুব উচ্চাঙ্গের মনে হল না।

বস্তু চরিত্র ভারতীয় হলেও এ'র ছবিতে কয়েকজন ফরাসী শিল্পীর প্রভাব অত্যন্ত প্রকটভাবে দেখা দিয়েছে। সুতরাং বলা যায় অমৃত শেরগিল্-এর মত ইনিও পাশ্চাত্য রচনাভঙ্গীর সংগে দেশী চরিত্রের সংমিশ্রণে একটি বিশেষ ধরনের চিত্রধারা সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়েছেন। তৈল চিত্রের সংখ্যাধিক্য দেখে বোঝা যায় তৈল মাধ্যমেই ইনি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন বেশী। দু তিনটি পাসটেল চিত্রও আছে তবে 'মাদাম মুনীর অ্যাট দি পিয়ানো' ছাড়া অন্যগুলি সহজেই দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।

প্রদর্শনীটি ২৬শে মার্চ পর্যন্ত বেলা ৩টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত খোলা আছে।

চক্রদত্ত

আজকালকার দিনে আর "দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা বোঝে না" কথাটি আর বলা চলে না। আজকাল প্রায় প্রত্যেকেই দাঁতের বিশেষ যত্ন নিতে শিখেছে। দাঁতগুলি সযত্নে রক্ষা করার জন্য নানারকম ব্যবস্থাও আজকাল হয়েছে। অনেক সময় খেলাধুলা করতে

প্ল্যাস্টিকের দন্তরক্ষক

গিয়ে আঘাত লেগে দাঁত ভেঙ্গে যায়, কখনও বা একেবারে ভেঙ্গে না গেলেও কোণা ভেঙ্গে যায়। এই অঘটনের হাত থেকে দাঁতকে রক্ষা করার জন্য আজকাল একরকম প্লাস্টিকের দন্তরক্ষক তৈরী হয়েছে। এই জিনিসটি খেলার সময় দাঁতে পরিয়ে নিলে আর দাঁত ভাঙ্গার ভয় থাকে না। হিসাব করে দেখা গেছে যে, এই জিনিসটি দাঁতে পরিয়ে খেলার দরুণ একটিও দাঁত ভাঙ্গার খবর পাওয়া যায় না।

*

লণ্ডনের জনৈক প্রফেসর কৃত্রিম ফাইবার দিয়ে দেহের শিরা-উপশিরা ও ধমনী তৈরীর চেষ্টা করেছিলেন। এ পর্যন্ত মানুষের দেহে কৃত্রিম শিরা-উপশিরার ব্যবস্থা ছিল না। তিনি তাঁর সহকর্মীর সাহায্যে নানারকম কৃত্রিম ফাইবার সংগ্রহ করে তার থেকে লাল, সাদা, ডোরাকাটা অর্লন ফাইবারটি কাজের উপযুক্ত বলে বেছে নেন। এই ফাইবারটি ওপরে নরম হলেও ন্যাতানে নয়। এটি ছিদ্রযুক্ত হওয়ায় উদ্ভিনন টিস্যুগুলি নিজস্ব করে নেওয়ার ক্ষমতা আছে। প্রথমে তিনি কোনও পশুর ওপর এই কৃত্রিম শিরা-উপশিরা প্রয়োগ করে কার্যকরী ফল পান—এর পর মানুষের ওপর প্রয়োগ করেও দেখেছেন যে, তাঁর চেষ্টা বিশেষ ফলপ্রসূ। তাঁর হাসপাতালে একটি রোগী আসেন—এঁর প্রধান ধমনীগুলি ফুলে গিয়েছিল। ঐ রোগগ্রস্ত ধমনীর ৬ ইঞ্চি মত কেটে বাদ দিয়ে অর্লনের কৃত্রিম ধমনী লাগান হয়। আর একটি ক্ষেত্রে পায়ের মধ্যের ৬ ইঞ্চি মত ধমনী কেটে বাদ দিয়ে নতুন ধমনী রেশমী সুতো দিয়ে লাগান হয়। প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রেই সুফল পাওয়া গেছে।

*

কোনও রোগের খুব বাড়াবাড়ির মুখে যখন রোগীর হিক্কা উঠতে থাকে, তখন দারুণ রোগ-যন্ত্রণার সঙ্গে সঙ্গে আবার হিক্কা ওঠার কষ্টটা "গোদের ওপর বিষ-ফোড়া"র মতই মনে হয়। হিক্কা যখন শুরু হয়, তখন কোনও উপায়েই যেন বন্ধ করা যায় না। ক্লোরফ্রোমাজিন নামে হিক্কা বন্ধ করার একটি ভালো ওষুধ বার হয়েছে। ডাঃ বি লিম্যান স্টুয়ার্ট এবং এ জি রেডকার নামে দুজন ডাক্তার এই ওষুধটি আবিষ্কার করেন। প্রথমে অবশ্য ওষুধটা ফ্রান্সের কোনও ল্যাবরে-টরীতে তৈরী হয়। গা-বমি ভাব এবং বমি বন্ধ করার জন্য ওষুধটা ব্যবহার হতো। এখন হিক্কা বন্ধ করার কাজে লাগে। এছাড়াও ওষুধটির আরও উপকারিতা আছে। ক্লোরফ্রোমাজিন জোলাপের কাজ করে এবং রক্তের চাপ যখন বৃদ্ধি পায়, তখন ক্লোরফ্রোমাজিন রক্তের চাপ কমাতে পারে। এই ওষুধ অল্পবিস্তর মানসিক রোগও কমাতে পারে, শরীরের কোনও যন্ত্রণা হলেও সারান যায়। এই সমস্ত ব্যাপা ক্লোরফ্রোমাজিন খুব অল্প পরিমা প্রয়োগ করা যায়।

*

ছিপ ফেলে শুধুমাত্র রুই-কাতল ধরা হয় না, আরও অনেক উচ্চস্ত জিনিসও ছিপে ধরা পড়ে। আজক
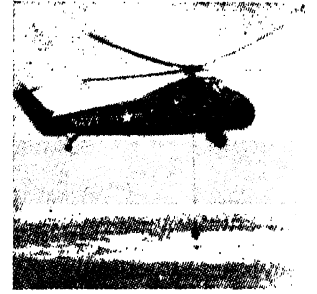
শিকার খোঁজা হেলিকপ্টার

ছিপসমেত একরকম শিকার-খোঁজা কপ্টারের চলন হয়েছে। মাছ সুতোর মুখে যেমন একটি লাগান থাকে, সেইরকম ঝোলান একগাছা সুতোর সঙ্গে যন্ত্র লাগান থাকে। হেলিক সমুদ্রের কূল ধরে আকাশে ভেসে আর ঐ যন্ত্রটি এমনভাবে ঝোলান যে, হেলিকপ্টারটি যখন ধীরে আকাশে ভেসে চলে, তখন ঐ জল ছুঁয়ে ছুঁয়ে চলে। এইভাবে চলতে সমুদ্রের তলায় যদি কোনও মেরিন বা বোমার সঙ্গে ঠেকে যায়, তৎক্ষণাৎ চালকের কানে একটি যা অনুভূতি জাগে এবং চালক জিনিসের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সচেত তখন হেলিকপ্টারটি আর ঐ স্থা নড়ে না। যতক্ষণ পর্যন্ত না অন্য বিমান বা জাহাজ এসে ঐ সাবে বোমাটিকে ধ্বংস করে, ততক্ষণ হেলিকপ্টারটি ঐখানে স্থির হ ও আগন্তুক জাহাজ বা বিমানকে বার্তা জানায়।

জীবনচর্যা

কর্মযোগী শ্রীঅরবিন্দ। অনুবাদক—নলিনীকান্ত গুপ্ত। শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম, পণ্ডিচেরী থেকে প্রকাশিত। মূল্য দেড় টাকা।

এই গ্রন্থের ভিতরে যাবার প্রাক্ মুহূর্তে মনে পড়লো প্রমথ চৌধুরী একবার বলেছিলেন, 'আমাদের কর্মের ভাষা Static অর্থাৎ পদার্থের নামকরণ করেই তার কর্মের অবসান হয়। কবির ভাষা dynamic অর্থাৎ সে ভাষার অন্তরে গমক আছে।' বইটি পড়ে মনে হলো যুগবিশ্বের অন্যতম দার্শনিকের স্পর্শে কর্মযোগে উন্নীত হবার ফলে কর্মের ভাষাও dynamic হয়ে উঠেছে। শ্রীঅরবিন্দ একটি ছন্দোময় এপিক মহিমা ভারতবাসীর দিনচর্যায় প্রণয়ন করতে চেয়েছেন। এর কার্যকারিতা জাতীয় জীবনে প্রত্যক্ষ হবে, এ সম্পর্কে গ্রন্থকার—গ্রন্থরচনার অনারোহ প্রতিভার একটি মাত্র দিক—মহাকাব্যের প্রণেতার মতোই কালজয়ী আশা পোষণ করে গিয়েছেন।

এই ৯২ পৃষ্ঠার বইতেই যে ঐশ্বর্য আছে, তার সামান্যতম বিবরণ জ্ঞাপনের ক্ষমতা বর্তমান সমালোচকে শোচনীয়রূপে অনুপস্থিত। এখানে শুধু প্রাসঙ্গিক একটি কথার অবতারণা করতে চাই। কর্ম-ব্যাপারে [illegible] বা Subjective দিকের উপরে [illegible] দিতে পারলে অর্থাৎ কর্ম-[illegible] প্রক্রিয়াটিকে ব্যক্তিগত জীবনে [illegible] করে তুললে, তবেই যে তা সম্পূর্ণ [illegible] পারবে—রবীন্দ্রনাথের মতো তিনিও এ-কথাই বলেছেন। আবার, স্বজাতীয় [illegible] লুপ্ত উৎস সন্ধানকালে এই ধর্মে [illegible] হবার জন্যে অস্বাভাবিক গতিপ্রবণ [illegible] অনুগামী হওয়া অন্যায়—রবীন্দ্রনাথ [illegible] বলেও আরো বলেছেন যে, সেই গতির [illegible] ভারতীয় যতির শুভসমাহারে নব-[illegible] ভবিষ্যৎভূমি রচিত হবে। পক্ষান্তরে [illegible] এবং শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই অন্য রীতি-[illegible] 'দেশের স্বাধীন অন্তরপুরুষের' [illegible] উদ্ধারের উপরে শ্রীঅরবিন্দের [illegible] ছিলো। অন্যত্র, ভারত-শিল্পের সর্বাঙ্গ-

পুস্তক পরিচয়

সিদ্ধির কথাপ্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন—'The Taint of occidental ideals and alien and unsuitable methods has to be purged out of our minds, and nowhere more than in the teaching which should be the foundation of intellectual and asthetic renovation' (The National value of Art,)

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ, পৃষ্ঠা-সংখ্যা ৫৬,—শ্রীঅরবিন্দ) এই বইটিতে প্রসংগত বাংলার শিল্পের স্বপ্রতিষ্ঠ হওয়ার ইতিহাস দেখতে গিয়ে শ্রীঅরবিন্দ যেভাবে উপযুক্ত কথাটির ধারা রক্ষা করেছেন, সেটি মনোযোগের সঙ্গে দেখবার বিষয়।

ভারতীয় দর্শনের সারার্থ থেকে গৃহীত এবং নূতন মূল্যে অন্বিত এই কর্মযোগ সর্বদর্শী জ্ঞানযোগীর সাধনারই অন্তর্ভূত। এই সমাধানের মধ্যে আজকের দিগ্ভ্রান্ত মানুষের পুনর্বাসন সম্ভব কি না, সে রহস্য নিরসনের অধিকারী নই। শুধু বলবো, এই গ্রন্থ পাঠের অভিজ্ঞতা পাঠকসত্তায় দুর্লভ কোনো অধিকার দেবে। সচ্ছন্দ অনুবাদের জন্য নলিনীকান্ত গুপ্তকে অভিনন্দন জানাই।

৩৩।৫৫

যোগীরাজ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ—ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান—সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ৩৮নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹ আনা।

শ্রীশ্রীবিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী প্রভুর অন্তরঙ্গ শিষ্য শ্রীমৎ কুলদানন্দ ব্রহ্মচারী সর্বজনপূজ্য পুণ্যশ্লোক সিদ্ধপুরুষ। গ্রন্থকার ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দজী তাঁহার শিষ্য। তিনি তাঁহার গুরুদেবের সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ কতকগুলি ঘটনা আলোচ্য পুস্তকখানিতে সংকলন করিয়াছেন। এমন সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবনে অসাধারণত্ব কিছু থাকিবেই; কিন্তু এই সব অসাধারণত্বেরও একটা রীতি আছে। প্রকৃত এগুলি সাধারণ যোগ-বিভূতির মতো নয়। এগুলি অপরকে বিস্মিত বা অভিভূত করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহাদের দ্বারা কৃত হয় না। ফলতঃ যোগাঙ্গ-সাধকদের জীবনেই কর্ম হিসাবে বিভূতির বিস্তার সম্ভব হইতে পারে। যাঁহারা যোগারূঢ় বা যোগসিদ্ধ তাঁহাদের পক্ষে সেগুলি কর্ম নয়—শম অর্থাৎ শ্রীভগবানে নিষ্ঠাই সেইগুলির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, ভগবৎশক্তিই প্রদীপ্ত হয়। অহংকারের

উর্ধ্বে আত্মার সেখানে ক্রিয়া। প্রেম, মৈত্রী এবং কৃপাই তাঁহাদের অন্তরের উৎস হইতে ঐরূপে পরিস্ফূর্ত হইয়া প্রতি-

বেশকে পবিত্র করে এবং চিন্ময় রসে সকলের চিত্ত উজ্জ্বল করিয়া সনাতন ও সার্বভৌম সত্যের সন্ধান দেয়। বস্তুতঃ সিদ্ধ মহাপুরুষগণের জীবন এবং আচরণই অধ্যাত্ম-শাস্ত্রের টীকা ও ভাষ্য। পুস্তকখানি পাঠ করিয়া অধ্যাত্মরস-পিপাসু নরনারী মাত্রেই উপকৃত হইবেন এবং আনন্দ লাভ করিবেন।
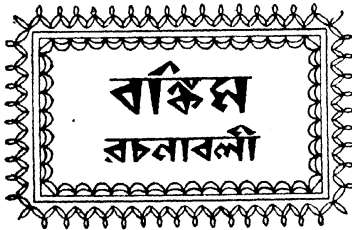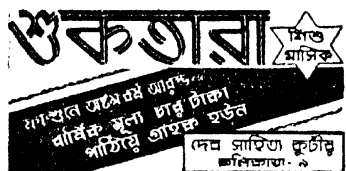
ধর্মগ্রন্থ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (১৪শ খণ্ড)—শ্রীঅনিলবরণ রায়। প্রকাশক—গীতা-প্রচার কার্যালয়, ১০৮।১১ মনোহরপুকুর রোড, কালীঘাট, কলিকাতা—২৬।

মূল গ্রন্থটির প্রয়োজন চিরন্তনী, একথা আমরা ক্রমশই বুঝতে পারছি। এই একটি বই নিয়ে যে পরিমাণ ব্যাখ্যা হয়েছে, তার তুল্য দৃষ্টান্ত খুব কমই আছে। তৎসত্ত্বেও এ-বই আজ আমাদের জীবন থেকে অনেকাংশেই প্রত্যাখ্যাত, তার কারণ আমাদেরই স্থৈর্যহীনতা। যাঁরা সেই স্থিরতা ফিরিয়ে আনার প্রয়াসী এবং পক্ষপাতী, অনিলবরণ তাঁদের অন্যতম। তাঁর ব্যাখ্যাকার্যের একদিকে অপরাপর ব্যাখ্যার সারার্থ, আরেক দিকে স্বকীয় অভিনিবেশের গভীর সাক্ষ্য। বিবিধ জায়গা থেকে উপযোগী ধারা নিয়ে এসে নিজস্ব অভিমতের সত্যানুকূল্য করার কাজে তিনি মননের পরিচিতি দিয়েছেন। ত্রয়োদশ খণ্ডে ষষ্ঠ অধ্যায়ের ২৪ শ্লোক থেকে ২৭ শ্লোক পর্যন্ত পর্যালোচনা হয়েছিলো। চতুর্দশ খণ্ডে ২৮ থেকে ৩১ শ্লোকের অর্থ উদ্ধার করা হয়েছে; এ-ব্যাখ্যা বিস্তৃত এবং প্রতিটি অংশ অপরিহার্য। ষষ্ঠ অধ্যায় অর্থাৎ ধ্যানযোগের সম্যক তাৎপর্য অনুধাবনের পক্ষে এই বই বিশেষ মূল্যবান। অন্যান্য খণ্ডগুলিরও বহুল সমাদর কামনা করি।

৪৩।৫৫

স্মৃতি সংখ্যা

গার্লস কলেজ পত্রিকা, হাওড়া (অষ্টম বর্ষ, ১৯৫৫। জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা)। অধ্যাপক শ্রীঅসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত। ৫।৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া।

হাওড়া গার্লস কলেজ পত্রিকার এই বিশেষ সংখ্যাটিতে রবীন্দ্রোত্তর যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে মূল্যবান কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। জীবনানন্দের কবি-প্রকৃতি সম্পর্কে পাঠক-সমাজের আগ্রহ এবং ঔৎসুক্য দিনে-দিনে আরও বাড়ছে। আলোচ্য এই পত্রিকাটি যে সেই আগ্রহের কথঞ্চিৎ তৃপ্তিসাধন করবে, তাতে সংশয়ের কারণ দেখি না।

মৃত্যুর পূর্বে কবি জীবনানন্দ কিছুকালের জন্য হাওড়া গার্লস কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর সহকর্মী এবং ছাত্রীরা সেই সময়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যলা[ভের] সুযোগ পেয়েছেন। আমরা শুধু কবিকৃতির সঙ্গেই পরিচিত; ম[ানুষ] হিসেবে তিনি কেমন ছিলেন, জা[নার] সুযোগ আমাদের হয়নি। হাওড়া গা[র্লস] কলেজ পত্রিকার পরিচালকবৃন্দকে আ[মরা] ধন্যবাদ জানাই, মানুষ-জীবনানন্দের স[ঙ্গে] তাঁরা আমাদের পরিচয় করিয়ে দি[য়েছেন]। প্রবন্ধগুলি সুলিখিত, তথ্যবহুল এবং চাইতেও বড় কথা—আন্তরিকতায় পরি[পূর্ণ]। লোকান্তরিত কবির প্রতি তাঁদের স[শ্রদ্ধ] শ্রদ্ধাই এখানে প্রকাশ পেয়েছে। পারিবারিক জীবনের দুষ্প্রাপ্য ক[য়েকটি] আলোকচিত্র সংযোজিত হওয়ায় স[ংখ্যাটির] আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, তা[তে সন্দেহ] নেই।

শিক্ষা সমস্যা

শিক্ষা সমস্যার কয়েকটি দিক—শ্রী[বিমলচন্দ্র] সিংহ। বেঙ্গল পাবলিশার্স, ১৪ [বঙ্কিম] চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। দা[ম ...] আনা।

এই লেখকের কাছে তাঁর নানা প্রবন্ধগুলির জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। ... ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ এবং সে আগ্রহ সাহচর্যে সার্থক। আজকে যখন ... বিচলিত আমাদের শিক্ষা-সমস্যা ... অতীতরূপে প্রতীয়মান, কিন্তু ... প্রতিকার সম্ভব, বিমলচন্দ্র সিংহ কয়েকটি সম্ভাব্য ... অভিজ্ঞতা থেকে উদাহরণ তুলে ... তাঁর ধারণার মূল্য নির্ণয় করেছেন। পুস্তিকায় লেখক বর্তমান শিক্ষা-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বিশেষ দক্ষতা ... এটুকু বললে যথেষ্ট বলা হবে না। ... স্টাইল অনুসরণ করে তাঁর স... ভঙ্গীটি গড়ে উঠেছে—কোথাও অতিরেক নেই।

শিক্ষাকার্যে ব্রতী সকলকেই এ[টি পড়তে] অনুরোধ করি।

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি স[মালোচনার্থ] আসিয়াছে।

মৃগতৃষ্ণা—ন্যাথানিয়াল হথর্ন। শিশির সেনগুপ্ত ও জয়ন্তকুমার ...

যৌন-বিজ্ঞান (১ম খ[ণ্ড]) ... হাসানাৎ।

উনিশ-শো আঠারো—আলে[ক্সি] ... অনুবাদক রথীন্দ্র সরকার।

বিষণ্ণ প্রভাত—আলেক্সি ... অনুবাদক সোমনাথ লাহিড়ী।

শান্তির বারতা (১ম খ[ণ্ড]) ... ব্রহ্মচারী।

জগন্নাথ বিশ্বাস

কি বলো, মেনেই নেবো? যারে বলে বিধির লিখন?
তরায়ের বন ছেড়ে ছোটো তিন-পাহাড়ের বন
অনেক সরল, ঋজু। নিচু নিচু টিলার ছায়ায়
নিজেকে নির্জন করে চিতল যে নিজেরই ইচ্ছায়
পায়না ভয়ের ছাপ। প্রত্যাশিত পদক্ষেপে দূরে
শুকনো পাতার পথে ছাড়াছাড়া সেগুনে শিশুরে
সতর্ক মর্মর শব্দ লঘুপায়ে তোলে নাই ভয়;
তবে কি মেনেই নেবো? এখানেই বেঁধে নেবো
শীতল আশ্রয়?

জীবনে আস্বাদ পেয়ে অরণ্যে আস্বাদ খুঁজে মরি
জীবন বিচিত্র আর অরণ্যে রহস্য আছে ভরি।
শুকোয় দুঃসহ তাপে, ভরে ওঠে আষাঢ়ের নীলে
জরা আর যৌবনে, স্বাদ আর অবসাদে মিলে
হাসাকাঁদা কাঁদাহাসা চলে।

রেলের [illegible] বাঁকা, অর্ধবৃত্ত, পথের নিশানা
[illegible] গিয়ে ছুঁয়ে আসি পাহাড়ের নীলাভ সীমানা।
দেহা[illegible] সাঁওতাল বউ সকালের কাঠ কাটা সেরে
[illegible] প্রা[illegible] বেয়ে দ্রুতপায়ে ঘরপানে ফেরে।

এখানে পাহাড়ে নেই দিশাহারা মেঘের জটলা,
এপারে ওপারে চলে প্রগল্‌ভ লুকোচুরি খেলা।
বাতাসে বিশ্রাম এর। উত্তেজনা-শ্রান্ত স্নায়ু সব
এখানে শিথিল করে কেটে যাক নিরুপদ্রব।

তবুও মানে না মন। প্রশ্ন করেঃ এই-ই নেবো মেনে?
মধুর কথায় তিক্ত সব স্বাদ ফুরাবো এখানে?
ওপারে অদৃশ্য দেশ, সীমাহীন পাহাড়কে ঘিরে
ভীষণ মেঘের খেলা। তরায়ের নিস্তব্ধতা চিরে
ঝিঁঝির সুতীক্ষ্ম শব্দ একটানা টেনে নিয়ে আসে
শব্দহীন সতর্কতা! প্রতীক্ষার রহস্য-নিঃশ্বাসে
প্রকৃতি অপেক্ষা করে। সাধ করে কেন ফিরে আসা?
কে জানে বিচিত্র মনে কিসের দুরাশা?

তবুও আবার বলিঃ মেনে নিয়ে সব পরিবেশ
বেঁচে থাকে সর্বোপরি মনেরই আদেশ।
বৈচিত্র্যে রহস্যে ভরা সে মনেরই কঠিন সাধনা
মেনে নিতে বাধ্য হয়ে সব কিছু তবুও মানে না।
তাই আজও তৃতীয় নয়নে
দেখে যাই,—রবো না এখানে।

রামেন্দ্র দেশমুখ্য

পা থেকে কোমর যেন ফুলদানী প্রাচীন চীনের,
চূড়ায় আশ্চর্য ফুল, ফুল নয়, একখানি মুখ,
বুঝি রডোডেনড্রন, যারে আমি দেখেছি আসামে,
গৃহস্থের ঘরে নয়, বনে ফোটা রক্তের উচ্ছ্বাসে
একটি আশ্চর্য নারী বসেছিল পাহাড়-চূড়ায়
নির্জন বিকেলে।

একঝাঁক হাঁস উড়ে গেলে
উত্তরের হিমালয়ে গোধূলির ফিরে গেলে রঙ
গম্ভীর লাবণ্য দিয়ে সন্ধ্যা দিলে সেই রক্তমুখী
অকস্মাৎ অন্ধকারে ফিরে সেই চলেছে যখন
তখন অস্থির আমি একবার ডাকলাম তাকে।

অন্ধকার নিয়ে গেল যাকে
ফিরে সে এল না আর। শুধু তার ছায়া,
নামল পাহাড় বেয়ে কোন এক পাহাড়তলিতে
যেখানে আগুন জেবলে বৃদ্ধ পিতা শুয়োর তাড়াবে
পৌষের প্রবল শীতে কন্যা দেবে খড়কুটো ঠেলে
আপক্ক ধানের দিকে চেয়ে।

আমি যাই ফিরে
জনাকীর্ণ কলকাতার গলিতটে শিবিরে আমার।
নিয়ে যাই, মনে শুধু মনে,
বনসূর্যমুখী-ফোটা-মাইবাংএর বিচিত্র শিখরে
বিকেলের স্মৃতি। সানুদেশে রাঙা মেখলার,
পাহাড়ী কন্যার।

অধোগতির পালা-অভিনয়

'সাজঘর'—থিয়েটারের নয়, জীবনের। সেখানে হয় মনের গালে গুমোটে রঙ চড়িয়ে অধোগতির পালা অভিনয়। সদ্যমুক্ত এই নামের ছবিখানি থিয়েটারের শিল্পীরই কাহিনী, কিন্তু থিয়েটার নিয়ে নয়, তার ব্যক্তিগত জীবনের কথা নিয়েই আখ্যানবস্তু এবং তার সেই কাহিনী এমনিই যা নামধাম বদলে সেটিকে পৃথিবীর আর যে-কোন লাইনের লোকের বলে উল্লেখ করে দেওয়া যেতে পারে। এ হচ্ছে প্রতিভার অধঃপতনের গল্প—আলোর দিকে চোখ মেলে তাকানোর শঙ্কাভরা মনটাই যেক্ষেত্রে কাজ করে গিয়েছে সর্বথা—কালো আকাশের নীচে কালিমালিপ্ত পরিবেশের অঙ্কে কলঙ্কময় ঘটনার সমারোহ। আজকাল ছবি দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে ভালো ছবির সংজ্ঞাটাই যেন পালটে দিতে চাইছেন এখনকার একদল চিত্রনির্মাতা। যেমন ছিল 'অনুপমা'য় অন্ধকারভরা স্বস্তিহীন জীবনের উৎক্ষিপ্ত নিরুদ্দীপ্ত চেহারা। আর এ ছবিতেও দেখা যাচ্ছে, কলাকুশলী ও শিল্পীরা এই ধরনের ছবির ক্ষেত্রেই
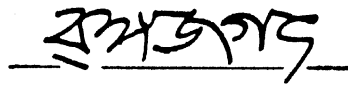
—শৌভিক—

তাঁদের উদ্দীপনা ও কর্মশক্তিকে বেশী করে খাটানোয় উৎসাহিত হয়ে উঠছেন। সৌন্দর্য ও শোভনীয়তার সঙ্গে তাঁরা নিজেদের অন্তরের বিদ্বেষ যেমন প্রকাশ করে ফেলছেন, তেমনি তাঁরা তা চিত্রদর্শক মারফৎ সাধারণ্যে পরিব্যপ্ত করে দিতে চাইছেন। শুধু তাই নয়, মানুষের হৃদ্‌পিণ্ডটাকে এ'রা একটা পিন-কুশনেরই সামিল মনে করে কেবল ক্রূর-হস্তে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে ক্ষতবিক্ষত করে তোলাকেই আর্টের সৃষ্টি বলে গণ্য করে দিতে চাইছেন। লোককে উৎফুল্ল ও অনুপ্রাণিত করার দিকে নয়, লোককে কাঁদিয়ে মনভঙ্গ করে তোলাই যদি শিল্প-সৃষ্টির পরাকাষ্ঠা বলে বিচারে দাঁড়ায়, তাহলে বিকাশ রায় প্রোডাকসন্সের এই "সাজঘর"ও একটি ধন্য ছবি।

* * *

গল্পের আরম্ভই মানুষের [অধো]গামিতার দৃশ্য নিয়ে। সারা ... সবচেয়ে নামকরা শিল্পী অশো[ক] ... যার নামেতেই টিকিট-ঘরের সাম[নে] ... বেধে যায়, সব সময়েই 'হাউস ... প্রথমেই তাকে পরিচয় করিয়ে ... হলো মদের গ্লাস ছড়ানো ফ্লাশ ... মাতাল ও জুয়াড়ীরূপে। তখ[ন] ... তার প্রতিভা যে একেবারে টল[মল] ... অবস্থা, কথা জড়ানো কিন্তু ... প'রে মঞ্চের ওপরে গিয়ে দাঁড়া[লে] ... বলে বাঘ। অভিনয় আরম্ভ কর[তে] ... করতেই প্রচণ্ড করতালি। এই অ... প্রেমে পড়ে তাকে বিয়ে করেছে ... একমাত্র সন্তান কল্যাণী। ওদে[র] ... শিশুপুত্র বাপী বা অরূপ। থি[য়েটারের] ... অধ্যক্ষ অশোকের রবিদা এবং এই ... অশোকের মধ্যে প্রতিভার সন্ধা[ন] ... তাকে থিয়েটারেও নামিয়েছে, ... কল্যাণীর সঙ্গে বিয়েও হতে ... রবিদারই প্রচেষ্টায়। অশোক ... পর আগাম টাকা নেয়; টাকা ... হয় রবিদা জানে। কল্যাণীর ... কথা চিন্তা করে রবিদা অশোককে ... করারও চেষ্টা করে, কিন্তু অ... কাছে রবিদার চেয়ে মোসাহেব সা... কথাই বেশী মাননীয়। সেদি[ন] ... অবস্থায় বাড়ি ফিরতেই সামনে ... শ্বশুরমহাশয়। কন্যার গহনাগুলি ... তাছাড়া বারবার টাকা চেয়ে পাঠানে[া] ... জামাতার উচ্ছৃঙখলতার খবর শুনে ... এসেছিলেন কন্যাকে কিছুদিনে[র] ... নিয়ে চলে যেতে, যাতে অশোক ... ভুল বুঝতে পেরে শুধরে যায়। ... থেরাপি। কিন্তু ব্যাপার হয়ে দ[াঁড়ায়] ... উল্টো। শ্বশুরে ও জামাইয়ে এই ... কলহ বাধলো; কল্যাণীও ... অপমান সইতে পারলে না, সেও ... জিদ ধরলে। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ... এমন প্রচণ্ড হয়ে দাঁড়ালো যে, ... এমন কথাও জানাতে পারলে যে, ক... চলে গেলে তার গৃহে আর ঠাঁই হবে ... শুধু তাই নয়, বাপির ওপরও কল... কোন অধিকার থাকবে না এবং ক... যদি কোনদিন ভুলেও বাপির মুখ ... তো বাপির যেন মৃত্যু হয়। কি নি...

...। কল্যাণী চলে গেল পিতৃগৃহে। ...ঘটনায় অশোকের মদ ও জুয়া ...লা, সময় মতো থিয়েটারে হাজির ...ও ঘুচে গেল। রবিদা আগে ...ই কুপিত ছিল, একদিন অশোককে থিয়েটার থেকে তাড়িয়ে দিলে। এর অশোকের অধোগতি ধাপে ধাপে ...তেই লাগলো।

* * *

আজ অশোক এক থিয়েটারে যোগদান ...র, কিন্তু মদ আর জুয়ার জন্য সে ...গা থেকে বিদেয় হয়। কাল আর এক ...য়েটার, সেখান থেকেও ঐ একই কারণে ...দেয় হতে হয়। পরশু আর এক ...য়েটার। ক্রমশ ধাপে ধাপে ঐভাবে ...স্থা খারাপ হতে হতে শেষে অশোক ...তলে তলিয়ে যায়। তার পাত্তা আবার ...ওয়া গেল দশ বছর পর ভিক্টোরিয়া ...মোরিয়ালের সামনে ঘাসের ওপর অতি ...ীর্ণ অবস্থায়, সঙ্গে বালক বাপি। ...ন থেকে উঠে একটা আস্তানা খুঁজতে ...তে এক জঘন্য বস্তীতে এসে প্রবেশ ...লো। বাড়িওয়ালী, আগের সেই ...ার [illegible]টারের নর্তকী মেনকা। ...কে চিনতে পেরে নীচেরতলায় ...প্রুকু ঘরে আশ্রয় দিলে। রেশন-জীবন বাপ-বেটার। সেদিন সম্বল ...টাকা পাঁচ আনা। পরদিন পিতা-...হাজির হলো স্টুডিওতে। মাতাল ...কাজে গাফিলতির কথা তুলে অনেক ...গালি করে পরিচালক অশোককে ...দিনের কাজ দিলে; অশোক আগাম ...ল কিছু টাকা। ঘরে ফিরে খাওয়া ...রে বাপি সবে ঘুমিয়েছে, এমন সময়ে ...ং উদয় হলো সাতকড়ি। পুরনো ...রের কথা তুলে সাতকড়ি অশোককে ...য়ে গিয়ে মদ খাইয়ে দিলে। পরদিন ...প কোনক্রমে বাবাকে টেনে স্টুডিওতে ...জির করলে, কিন্তু তখন বড়ো দেরি ...য় গিয়েছে। বাপির সামনেই অকথ্য-...বে অপমান করে পরিচালক অশোককে ...ড়িয়ে দিলে। এরপর অশোক চাকরির ...জে গেল এক যাত্রাদলে। মফঃস্বলে ...দিনের কাজের চুক্তি করে কিছু আগাম ...লে। ফিরবার পথে অতীতের সম্মানিত ...নের স্মারক পদকটি স্যাকরার দোকান ...থকে ছাড়িয়ে এনে বাপির জামায় গেঁথে দিলে। সকালে উঠে বাপির কি উল্লাস! ইতিমধ্যে সাতকড়ির কাছ থেকে পাত্তা পেয়ে রবিদা একদিন এসে হাজির। কল্যাণীর বাপ মৃত; অগাধ সম্পত্তি পেয়েও স্বামী-পুত্রের জন্য কল্যাণীর নাওয়া-খাওয়া ঘুম নেই। রবিদা ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাইলে; কিন্তু অশোকের তখনও জিদ ভাঙেনি, ক'টাকা সাহায্য নিতেও বিরূপ হলো। মফঃস্বলে অভিনয়ের পালা "শেষ অঙ্ক" যে নাটকে অশোকের ছিল সবচেয়ে খ্যাতি; কিন্তু এবার আর রাজার ভূমিকা নয়, এবার নামতে হচ্ছে বিদূষকের ভূমিকায়। অভিনয় হচ্ছে, রাজা বারবার ভুল বলছে, কথা আটকাচ্ছে; অশোক থাকতে না পেরে নিজেই রাজার অংশ আবৃত্তি করতে আরম্ভ করলে। দারুণ হট্টগোল, শেষে অশোককে মেরে ওরা তাড়িয়ে দিলে। বাইরে আসতেই রবিদা আর কল্যাণী। কল্যাণী খবর পেয়ে এসেছিল অভিনয় দেখতে; স্বামীকে অনুরোধ করলে বাপির ওপরে তার দিব্যি ফিরিয়ে নিতে। বাপিকে সে ফিরে পেতে চায় তার সব সম্পত্তির বিনিময়ে। অশোক রাজী হলো না। পায়ে হেঁটে বাড়ি ফিরতে ফিরতে বারবার অশোকের কানে ঘা দিতে লাগলো কল্যাণীর কথা, বাপি খেতে পায় না। বাড়ি ফিরে খাবার কিছু নেই। ক্লান্ত ক্ষুধার্ত বাপির দিকে চেয়ে অশোক মেনকার একদিনের ইঙ্গিত স্মরণ করে তার দরজায় গিয়ে ঘা দিলে। অশোক নামলো আরও নীচে। মেনকার বিদ্রূপ হজম করে তার কথা মানার অঙ্গীকার করে পাঁচ টাকা ধার নিয়ে খাবার আনলে। বস্তীর একঘরে তখন ফ্লাস খেলার কলরব, বাপি ঘুমচ্ছে। অশোক হাজির হলো সে ঘরে; সাতকড়ি বেশ আসর জমিয়ে বসেছে। জিততে জিততে অশোক সব মূলধন খুইয়ে শেষে সাতকড়ির দেনা শোধ করতে ঘুমন্ত বাপির বুক থেকে মেডেলটা এনে দিলে। পরদিন সকালে অশোক লজ্জায় বাপির সামনে মুখ তুলতে পারে না। ঠিক সেই সময়েই এলো রবিদা। রবিদা এসেছিলো কল্যাণীর সঙ্গে পরামর্শ করে আবার থিয়েটার চালু করে অশোককে আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টায়। কিন্তু সেকথা

উত্থাপনই হলো না; তার আগেই অশোক বাপিকে নিয়ে যেতে বললে তার মার কাছে। অশোক বাপিকে জানিয়ে এসেছিল এতোদিন তার মা মৃতা, এবার দিব্যি তুলে নিয়ে জানিয়ে দিলে তার মা জীবিতা। অনিচ্ছাসত্ত্বেও বাপিকে যেতে হলো তার মার কাছে, কিন্তু বাবার জন্য তার কিছুই ভালো লাগল না। কল্যাণী ছেলেকে ফিরে পেয়েও পেলে না। সেই রাত্রে কল্যাণীকে ঘুমন্ত পেয়ে বাপি পালিয়ে এলো তার বাবার কাছে। পরদিন রবিদা এলো খোঁজ করতে। বাপির কথায় অশোক থিয়েটারে যোগ দিতে রাজী হলো। রিহার্সাল চলতে লাগলো। অশোক মদ আর খায় না; বাপির কড়া শাসন। অভিনয়ের দিনে কল্যাণী এলো দেখতে। অভিনয় করতে করতে হঠাৎ অশোকের পুরনো বুকের ব্যথা চাড়া দিয়ে উঠলো। ভূমিকায় সংলাপ গেল ভুলে, তার বদলে আবৃত্তি করলে কল্যাণীর উদ্দেশ্যে এক কবিতা, তাকে ফিরে পাবার জন্য আকুলতা। কবিতা অন্তেই লুটিয়ে পড়লো মঞ্চের ওপরে। ডাক্তার এলো; কল্যাণী এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো। প্রাণ ফিরে আসবে কি-না সংশয়। আস্তে আস্তে অশোক চোখ খুললে। কল্যাণীকে সামনে পেয়ে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস পড়লো। রবিদা তার হাতে দিলে সেই মেডেলটা। অশোক সেটা দিতে যাচ্ছিল কল্যাণীর হাতে তুলে, কারণ বাপি জন্মাবার পর কথা ছিল কল্যাণী সেটা বাপির বৌয়ের গলায় পরিয়ে দেবে। কিন্তু বাপি ইশারা করে মেডেলটা নিজের হাতে নিলে, তারপর নিজে দিলে তার মা'র হাতে।

* * *

গল্পের শেষ হলো মিলনে, কিন্তু ঐটুকুই যা বিমর্ষতাহীন অংশ। তা নয়তো আরম্ভ থেকেই উগ্র, ক্রূর চেহারা আগাগোড়া। একজন দেশপূজ্য শিল্পী ধাপে ধাপে নেমেই চলেছে এবং তার যেন জিদও নামবার দিকেই। জীবনে কোন আদর্শ নেই, লক্ষ্যও নেই এমন একজন ব্যক্তি, অথচ তার ওপরেই জ্যামিতিক ঘর টেনে লোকের সহানুভূতি আদায়ের চেষ্টা। কল টিপে লোকের মনে আবেগের ঢেউ তোলা, তাতে দেখবার সময় লোকের চোখে জল ফেটে বের হয়ই, কিন্তু সে অশ্রুতে হৃদয়ের দরদ মেশানো থাকে না। চোখের জল পড়বে অশোক যখন কল্যাণীকে দিব্যি দেয় বাপির মুখও দেখতে পাবে না বলে; আরও কান্না আসবে রবিদা যখন বাপিকে
কাছ থেকে কল্যাণীর কাছে
কিংবা মফঃস্বলে অশোক
অপমানিত হবার পর কল্যাণীর
বছর পর প্রথম সাক্ষাৎ দৃশ্যে;
শেষ দৃশ্যে অভিনয় কালে
আকুল হয়ে কবিতা আবৃত্তি
লুটিয়ে পড়ার দৃশ্যে—কিন্তু
যন্ত্র আর অভিব্যক্তির
এসেছে। কি যুক্তি থাকতে
লম্পট অশোকের ওপরে
করতে যাওয়ার! এমনভাবে
যা-কিছু ঘটছে বিধির লিখনে,
শুধু এক বেচারা মাত্র।
কথা তো দূরের; এমনকি,
বা পুত্রের প্রতিও নিতান্ত
চরিত্রটিকে হিরো রেখে দিয়ে
হলো, এক— মোসাহেব
সে লোকটিই অশোককে
করেছে; দুই—কল্যাণীকে,
কল্যাণীর পিসিমার কথায়,
মেয়ের সতীপনা দেখাতে
সঙ্গে বিবাদ করে চলে এসেছে।
করেছিল কল্যাণীর
কারণ তারা চেয়েছিলো
সংশোধন করতে—কল্যাণীর
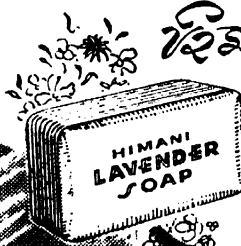
ত্যুকালে তা স্বীকার করে যায় এবং বদা স্বীকার করে কল্যাণীর কাছে। তপাদ্য তাহলে কি দাঁড়ায় এ গল্পের? র, সার্থকতা—বয়েই গেল!

* * *

অশোকের এই বিকৃত জীবনকে টকীয় করে ফুটিয়ে তুলতে কল ও ন্য দু তরফেরই অসাধারণ দক্ষতা ফুটে ঠছে। কলাকুশলী ও শিল্পীবৃন্দ যেন হ্না দিয়ে কাজ করে গিয়েছেন। অবশ্য নাকৌশলের দক্ষতার দিকটাই বেশি রি। ক্যামেরার কাজে ঘটনাবলীর মেজাজ থাযথ ফুটেছে। সেটসেটিং দৃশ্যরচনা এসব ক থেকেও একখানা উঁচুদরের ছবির ব লক্ষণই সুস্পষ্ট। শব্দগ্রহণের কাজও শেষভাবে উল্লেখযোগ্য; ঘটনা, স্থান ও রিবেশ মতো শব্দের রেশ ফুটিয়ে তোলার তিত্ব কয়েক স্থানেই দেখা যায়। ণ বছর পার হবার পর কালাতিপাতের ত্য অশোকদের মধ্যে যেমন পাওয়া গেল, মন পাওয়া গেল না কল্যাণীর ক্ষেত্রে; রবিদা অশোকের প্রথম খোঁজ পেয়ে র কাছে যেতে ওরা দুজনে চৌকাঠের রে বেশ ... কথা বলছে, অথচ ভিতরে পিতা সম্পর্কে অতি সতর্ক কানে কিছুই পৌঁছল না— নের ঠিকে ভুল আছে, তবে নাটকের পথে বাধা হয় না।

* * * *

অশোকের চরিত্রে বিকাশ রায়ের নত্ন দর্শকের উদ্‌গ্রীবতাকে জাগিয়ে । অশোক রায় মস্ত অভিনেতা, এতো যে, ও মুখ খুললেই প্রেক্ষাগৃহে দার কলধ্বনি ওঠে; কিন্তু গোড়ার 'শেষ অঙ্ক'র অভিনয়ে অশোকের লি পাবার মতো অভিনয় কৃতিত্ব দেখা গেল না! ওটা কি তাহলে বড়ো রা যা করে তাতেই লোকে আহা-হা ওঠে বলে একটা শ্লেষ টানা হয়েছে? া সেন তাঁর অভিব্যক্তির জোরে ণীর জীবনের হাহাকারটা ফুটিয়ে কের চোখে জল এনে দেবার যথেষ্ট আবেগ সৃষ্টি করেন। যী বন্ধু রবিদার ভূমিকায় পাহাড়ী লে একটি কমজোরি চরিত্রকেও নয়ের গুণে জোরালো করে তুলেছেন; নীকার তার ছবিগুলির মধ্যে স্মরণীয় কৃতিত্ব। বাপির চরিত্রে বুলু দর্শকের স্নেহ ও মমতা আকর্ষণ করে। বাপ-বেটার রেশনমানা জীবনযাত্রা, আধাআধি বখরা করে চলার ঘটনাস্পর্শগুলোই যা গুমোট পরিবেশের ফাঁকে একটু সরসতা এনে দেয়। সাতকড়ি অকৃতজ্ঞ ভিলেনরূপে ফুটেছে ভালো; কিন্তু ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়ের বৈশিষ্ট্য নেই। পুরনো আমলের মেনকা এতে বারবণিতা মেনকা বাড়িওয়ালীর চরিত্রে দীর্ঘদিন পর পর্দায় নেমেছেন এবং অভিনয়ও ভালোই করেছেন। ভূমিকায় আর শিল্পীদের মধ্যে আছেন কমল মিত্র, জীবেন বসু, শ্যাম লাহা, ননী মজুমদার, নৃপতি, বেচু সিংহ, ধীরাজ দাস, খগেন পাঠক; ছবি ঘোষাল, প্রীতি মজুমদার, মণি শ্রীমাণি, কান্তি দত্ত, অনিল, সুপ্রভা মুখোপাধ্যায়, রমা দেবী, শ্যামলী চক্রবর্তী প্রভৃতি। ছবিখানির সংগঠনে আছেন কাহিনী ও চিত্রনাট্য রচনায় সলীল সেনগুপ্ত, পরিচালনায় ও আলোকচিত্রগ্রহণে অজয় কর; শব্দগ্রহণে মণি বসু; সংগীত পরিচালনায় সত্যজিৎ মজুমদার।

একটি ভালো ছবির আদল মাত্র

বেশ যত্নসই পটভূমি, সুন্দর সব উপকরণ এবং হৃদয়ে স্বতঃস্ফূর্ত ধারায় রসের প্রস্রবণ নিয়ে আসার মতো বিষয়-বস্তু—এক কথায় খুব উঁচুদরের একখানা ছবির সব কিছুই রয়েছে "রাইকমল"-এর মধ্যে। শেষপর্যন্ত কিন্তু অতো সব আর কাজে লাগানো যায়নি, সম্ভাবনাযুক্ত ভালো ছবির পেন্সিলে আঁকা আদল-টুকুই উপস্থিত হতে পেরেছে। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই রচনাটির জন্য বাঙলার পরম শোভাময় অঞ্চলকে নির্বাচন করেছেন। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কোলে তেমনি সরল সুন্দর মানুষ; পল্লী বাঙলার আত্মার খোঁজ রয়েছে সেখানে, তাদের মধ্যে। বাঙলার বাউল বৈরাগী, যাদের মন-ভ্রমরা মধুর চির-কিশোরের খোঁজে সদাই গুন গুন করে চলে।

* * *

ছোট্ট গ্রামের পথের ধারে হরিদাসের আখড়া; এখন থাকে মা কামিনী আর মেয়ে কমল। পাশেই থাকে বাউল রসিক-দাস; কমল তাকে ডাকে বগ-বাবাজী বলে। পরিহাস করে বলে, "পাকা চুলে আবার রাখাল-চুড়ো বেঁধেছো, এখানে একটা কাকের পালক গোঁজ, মানাবে ভালো।" কামিনী শুনে রাগ করে, রসিক হেসে বলে "না না, ওকে কিছু বলো না, ও আমার আনন্দময়ী রাইকমল।" সঙ্গী সাথীদের নিয়ে কমল বউবাটি খেলে, সেখানে পাশের বাড়ির মহেশ মণ্ডলের ছেলে গৃহকর্তা, কমল গৃহিণী আর কাদু ননদিনী। পাড়ার ছেলে ভোলার সাধ রঞ্জনের আসন পাবার, তেমনি পরীর সাধ কমলের আসন সে পায়। খেলাঘরের এই কল্পনার বীজ ওদের মনে শিকড় গেড়ে কৈশোরে এসে পৌঁছয়। বাউলের চির-কিশোরের সন্ধানী রাইকমলের মন পড়লো রঞ্জনের ওপর, রঞ্জনও তাকে চায়, কিন্তু বাধা হলো জাতিকুল। রঞ্জন চাষীর ছেলে আর কমল বোষ্টমের মেয়ে।

"তাই রঞ্জনের বাবা মহেশ যেদিন দেখতে পেলে, কমলের এ'টো কুল পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে রঞ্জন খাচ্ছে, সেদিন মহেশ আর চুপ করে থাকতে পারলে না। ছেলেকে শাসন করলে—'কমলের দিকে তাকাবিনে'। ছেলে বললে—মানবে না সে—ভাসিয়ে দেবে জাতিকুল। তখন মহেশ কাতর হয়ে কামিনীর কাছে গিয়ে, সব জানিয়ে তার হাত ধরে অনুরোধ করলে, তার একমাত্র সন্তানকে যেন সে কেড়ে না নেয়। মেয়ের কষ্ট হবে জেনেও কামিনী কথা দিলে—রঞ্জনের চোখের সামনে তার মেয়েকে সে আর রাখবে না! রসিকদাদাকে অবলম্বন করে কামিনী ও কমল দেশ ছেড়ে নবদ্বীপ চলে গেল। নবদ্বীপে রসিকদাসেরই পুরনো আখড়ায় এরা আশ্রয় নিল। সেখানে তরুণ বৈষ্ণবের রূপের হাট। সুবলসখার সুন্দর চেহারা, মিষ্টি হাসি, ততোধিক তার সুমিষ্ট ব্যবহারে কামিনী ও রসিকদাস মুগ্ধ হোল। তাদের ইচ্ছে সুবলসখার সঙ্গে কমলের মালা-চন্দন হয়। কমল হেসে উড়িয়ে দেয়। বলে—'দূরে কেমনধারা মেয়েদের মত মিনমিনে'। মা যখন বলাইদাসের নাম করে কমল বলে—'ঐ আমড়া আঁটীর মত রাঙা রাঙা চোখ, ওকে বিয়ে করার চেয়ে গলায় দড়ি দেওয়া অনেক ভাল'। রসিকদাস হাসে। সে দেখে লীলা, রাইকমলের সেই চির-কিশোরের সন্ধান খেলা। কামিনী নিরস্ত হয় কিন্তু শান্তি পায় না। একদা পরপারের ডাক সে শুনতে পায় অসুস্থ অবস্থায়। মেয়ের ভবিষ্যৎ চিন্তায় অস্থির হয়। মেয়েকে সাবধান করে—'সাপকে এড়িয়ে পথ চলা যায় কিন্তু পাপকে এড়িয়ে পথ চলা বড় কঠিন'। কমল উত্তর দেয়—'কপালে থাকলে কিছুই এড়ানো যায় না মা। লখিন্দরকে লোহার বাসর-ঘরেও সাপে কামড়েছিল'। তবুও মৃত্যু-শয্যায় শায়িত মাকে শান্তি দেবার জন্যে, প্রতিশ্রুতি দেয়—বিয়ে সে করবে—আর পরের ছেলেকে কেড়ে নেবে না। কামিনী রসিকদাসকে ডেকে বলে—'তুমি দেখো'। রসিকদাস আশ্বাস দেয়—'তুমি ভেবোনা ও যাকে চায় তার হাতে আমি পৌঁছে দেবো ওকে।"

* * *

মায়ের মৃত্যুর পর দিন যায়। শোক-মন্থর দিনগুলি শোকের প্রভাব মুক্ত হয়ে আবার সহজ গতি পায়। রাইকমল আবার হাসে। বগবাবাজী একদিন রাইকমলকে স্মরণ করিয়ে দেয়—মায়ের মৃত্যুশয্যায় কি প্রতিশ্রুতি সে দিয়েছে—তার বিয়ের কথা। বাউল চিন্তিত হয়েছে। কামিনীকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল—কমলকে সে দেখবে। কিন্তু বুঝতে পারেনি সে ভার কত গুরু-ভার। যুবতী সুন্দরী রাইকমলকে নিয়ে সে রাখবে কোথায়? এক আখড়ায় বাস করা লোকে ভাল চোখে দেখে না। একথা শুনে, একটু চিন্তা করে কমল তার মালা-চন্দনের ব্যবস্থা করতে বলে। সুবলের সঙ্গে মালা-চন্দন করতে কমল রাজী হয়েছে, এই ভেবে উৎফুল্ল হয়ে ওঠে বগ-বাবাজী। কিন্তু সে হতভম্ব হয়ে গেল, কমল যখন তারই গলায় মালা পরিয়ে দিলে। লোকনিন্দার হাত থেকে বাউলকে বাঁচাতে আর মায়ের কাছে দেওয়া প্রতি-শ্রুতি রক্ষা করতে, কমল যে ব্যবস্থা করলে, তা ওদের দুজনেরই জীবনের স্বচ্ছন্দগতি, আনন্দ, শান্তি সব কিছুকেই ওলটপালট করে দিল। জীবনের ছন্দ কেটে গেল। শান্তি পাবার আশায় শেষ-পর্যন্ত ওরা বেরিয়ে পড়ল পথে পথে। উন্মুক্ত আকাশের নীচে, অবারিত মাটির বুকে। ঘুরতে ঘুরতে একদিন ওরা নিজেদের গ্রামের কাছে এসে পড়ল। কমল ফিরে যেতে চাইল কিন্তু ভিটের মায়া প্রবলভাবে ওদের আকর্ষণ করল। আবার ওরা ঘর বাঁধল। কমল থাকে তার বাপ-মায়ের ভিটেতে কমলকুঞ্জে। রসিকদাস থাকে তার পুরনো ভিটেয়—রসকুঞ্জে। কিন্তু রঞ্জন—কোথায় রঞ্জন? কমলের লঙ্কা? ছেলেবেলায় রঞ্জনকে সে বলত—লঙ্কা। রঞ্জন তাকে বলত—চিনি। খেলা-ঘরের ননদিনী কাদু জানালে—'তার নাম করিসনে আমার কাছে। তোরা চলে যাবার পর সে বিধবা পরীকে নিয়ে দেশত্যাগী হয়েছে। তার বাবা মা লজ্জায় ঘেন্নায় কাশীবাসী হন। সেখানেই তাঁরা দেহ রেখেছেন'। কমল স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

* * *

বৈষ্ণবী কমলের আসর জমে উঠল কীর্তনগানে। এসে হাজির হোল কমলের ছেলেবেলার সাথী ভোলা, পঞ্চানন, বিনোদ প্রভৃতি। নিজেই আসর পাতল রসিক কিন্তু তবু এ পরিবেশে নিজেকে খাওয়াতে না পেরে এক রাত্রে ক পরিত্যাগ করে সে চলে গেল। ক ঘরের দরজায় রেখে গেল—তাদের চন্দনের শুকনো মালা। রাইকমল হ সে বুঝেছে। কিন্তু কাদু রাগ ক সে ধিক্কার দিলে বুড়ো বাউলকে। দিয়ে বিচিত্র হেসে কমল বললে—' লক্ষ্মীর ঘরের সিঁদুরকৌটো যদি যায় তো সে ঘরে সংসার পাততে কি চায়, না সাহস হয়?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করে—এসব কি বলছে সে? বলে—'বাউলের গৃহদেবতা চুরি গি আহা সে পাক, তার শ্যামসুন্দরকে ফিরে পাক।' এর পর কমল কাদুর থেকে চেয়ে নিলে শ্যামসুন্দরের এ এবং নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করলে চির-কিশোরের ধ্যানে। আনন্দে ও প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে সেই গ্রামবাসিনীদের রসনা কিন্তু কুৎসায় হয়ে উঠল। পৌষ সংক্রান্তির কমল চললো জয়দেব কেন্দুলীর উৎ দারুণ ঝড়বৃষ্টির মাঝে পথ হ ফেললে কমল। সে ডাকলে উঠোনে আছ গো?' কে সাড়া দিয়ে এগিয়ে কে গো? এতরাত্রে—এই প্রান্তরে? ও মেঘ কেটে চাঁদ উঠেছিল। চাঁদের আগন্তুক এসে সবিস্ময়ে বললে— চিনি?' কমল সবিস্ময়ে দেখল—স লঙ্কা। কমল যার চিন্তায় ঘর চলেছে। এইতো সেই চিরকিশো

* * *

বাউলের বেশে রঞ্জন, বললে হয়েছে। কমল জানতে চাইলে পরী রঞ্জন জানালে ভীষণ ব্যাধিতে ভু মারা গিয়েছে। সর্বাঙ্গ ভিজে কমল কাঁপছে; রঞ্জন তার ঝোলা থেকে চাদরখানা কমলের গায়ে জড়িয়ে রঞ্জন বললে রাধারাণীর জন্যে রা তার রাধারাণীকেই অর্পণ করলে। নিয়ে রঞ্জন ফিরলো তার আখড়ায় আর বাধা নেই, আবার কেন ম হোক না? কমলের তো জীবনের কামনা। কিন্তু হঠাৎ রুগ্না পরী এলো ঘর থেকে; যেমন তার চেহারা তেমনি কদর্য তার ভাষা।

মিথ্যা ধরা পড়লো। কমল সারারাত কাটালে মন্দিরের সামনে বিগ্রহের দিকে চেয়ে। সকালে পরী আর এক মানুষ। রঞ্জনকে ডেকে জানালে সে যেন কমলের সঙ্গেই মালাচন্দন করে, তার মৃত্যু আসন্ন। রঞ্জন আর অপেক্ষা না করে ফুল আনতে গেল মালা গাঁথবে বলে। পরী কমলকেও ডেকে সে কথা জানালে। কমল পরীকে আশ্বাস দিয়ে সে-ঘর থেকে বেরিয়ে গায়ের চাদরখানা খুলে রেখে বেরিয়ে পড়লো নিরুদ্দেশের পথে।

* * *

রসসিঞ্চিত বেশ ভালো আখ্যান-বস্তুর উপকরণ; প্রাকৃতিক শোভার পট-ভূমিতে ভাবালু মনকে রমণীয় আবেগে আপ্লুত করার মতো যথেষ্ট সুযোগ। কিন্তু ছবিতে প্রাকৃতিক শোভাই ফুটেছে, আবেগকে স্পর্শ করার ধার দিয়েও যায় নি। বিন্যাস দোষে একটা নির্লিপ্ত একঘেয়েমীতে পরিণত হয়েছে। ত্রুটিটা ঘটে গিয়েছে রসিকদাস বাবাজীর জবানীতে গল্পটা ফাঁদতে গিয়ে। রসিকদাস যেমন-ভাবে এবং যতোখানি কমলকে দেখে এসেছে ছোটবেলা থেকে এবং শেষে কমলের বিবাগিনী হয়ে যাওয়া পর্যন্ত অংশই তার জানা, এবং চিত্রনাট্যেও কেবল সেই অংশই আছে। ফলে, যাকে উপলক্ষ্য করে কমলের জীবনে সংঘাত সেই রঞ্জন গোড়াতে সামান্যক্ষণ এবং শেষে অল্পক্ষণ ছাড়া উহ্যই থেকে যায় সারাক্ষণ, তাতে নাটকীয়তা মোটেই গড়ে উঠতে পারে নি। এ যেন একটা সংঘাতের ভূমিকা ফেঁদেই শেষে যবনিকা ফেলে দেওয়া। এ যেন হাওয়ার সঙ্গে রাইকমলের প্রেম, শূন্যের ফাঁকে হাহুতাশ। সংলাপের বদলে অনবরতই পদাবলীর কলি তুলে কথা বলে যাওয়ার মধ্যে একটা কাব্যিক রেশ এসেছে, কিন্তু নাটকীয়তা ফুটে না ওঠার সেও একটা কারণ। কমল ও রঞ্জনদের ছেলে-বেলার বউবাটি খেলা থেকে ছবির আরম্ভ; গল্পের সেটা উপক্রমণিকা। মূল গল্পের আরম্ভ কিশোরী বয়সের কমলকে নিয়ে। সে অবস্থায় তার কথাবার্তা চালচলনে আদুরেপনাটা ভালোই লাগবে; ওর ওপরে সবায়ের মায়াও পড়বে। কিন্তু পরে গ্রাম ছেড়ে নবদ্বীপে বাস, তার মায়ের মৃত্যু এবং রসিকদাসের সঙ্গে মালাচন্দনের পরও তার সেই আদুরেপনা থেকে যাওয়ায় ভাবের গুরুত্ব ফুটে ওঠায় ব্যাহত হয়েছে। অত্যন্ত মন্থর গতি, দেখতে দেখতে মন ঝিমিয়ে পড়ে, তার ওপর সাতাশখানি গান একটা বোঝার মতো হয়ে ক্লান্তি বাড়িয়ে দেয়। গানের সংখ্যার জন্যে কিছু এসে যেতো না যদি ওর মধ্যে রকমফের থাকতো। গান বলতে কীর্তন আর বাউলই সব। আর, গলাও মাত্র দুটি—পঙ্কজ মল্লিক ও ছবি বন্দ্যোপাধ্যায়। এ গল্পে কীর্তন ও বাউল ছাড়া গানের সুযোগও নেই, তবে বৈচিত্র্যের আমেজ এনে দেওয়া যেতে পারতো আরও কয়েকটি কণ্ঠ যোগ করতে পারলে। কিন্তু চিত্রনাট্যই এমনি রচনা করা হয়েছে যে রসিকদাস আর কমল ছাড়া আর কারুর গানের সুযোগই বলতে গেলে নেই। ফলে সুর ও গলার দিক থেকে বেশ একঘেয়েমী এসে গিয়েছে। উপরন্তু পঙ্কজ মল্লিকের গলায় কীর্তন বাউলের স্বাচ্ছন্দ্য রেশের অভাব। এ যেন সহরের বৈঠকখানায় অথবা বেতারে পরিবেশনের ঢঙে ঢালাই করে নেওয়া গান; সঙ্গতের হালও তাই।

* * *

নতুন শিল্পী কাবেরী বসুকে কমলের ভূমিকায় ভালো লাগবে বেশ ওর কচিপনার জন্যে; একটা মায়ার আকর্ষণও রয়েছে ওর অভিব্যক্তিতে। ভোলাকে নিয়ে কমল রঙ্গ করে হাসছে দেখে অন্যরকম ধারণা করে রঞ্জন চলে গেল; তার চিনির ডাকেও ফিরলো না এবং সেই যাওয়াই হলো তার শেষ যাওয়া। অথচ এ ঘটনাটা বিন্যাসে নির্লিপ্ত একটা সাদাসিধে ব্যাপার মাত্র। রঞ্জনকে সারাক্ষণ আড়ালে রেখে দেওয়ায় নাটকীয়তাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া, ঐ ভূমিকায় উত্তমকুমার থাকায় নিয়মিত চিত্রামোদীদের কৌতূহলকে স্তব্ধও করে দেওয়া হয়েছে; ঐ চরিত্রে সাধারণ অখ্যাত কেউ থাকলে হয়তো ওভাবটা হতো না। উত্তমকুমারের মতো জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব থাকায় এমন হওয়া স্বাভাবিক। তার ওপর কমলের সঙ্গে মালাচন্দন করার সম্মতি মৃত্যুশয্যাশায়িনী পরীর কাছ থেকে পাওয়া মাত্রই যে রকম উৎসাহভরে রঞ্জন ফুল তুলতে আরম্ভ করে দিলে মালা গাঁথার জন্যে, তাতে একটা লম্পট চরিত্রই প্রকাশ পেয়ে গেল; উত্তমকুমারের ক্ষেত্রে দর্শক তাও আশা করে না। তবুও উত্তমকুমার গোড়ার অংশে যেটুকু আছেন—রঞ্জনকে ভালোই লাগবে ততক্ষণ। প্রত্যক্ষভাবে বাউল রসিকদাসের চরিত্র কমলের পরই এবং নীতিশ মুখোপাধ্যায় ভালোই কাজ দেখিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে কমলের মা কামিনীর ভূমিকায় চন্দ্রাবতী এবং পাতানো ননদিনী কাদুর চরিত্রে সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় চারিত্রিক অভিনয়ে তাদের মতোই কৃতিত্ব দেখিয়েছেন। অন্যান্য চরিত্রে আছেন নবগোপাল, পারিজাত,

জীবন, পঞ্চানন ভট্টাচার্য, জয়দেব, ছবি ঘোষাল, সান্তনা, ইরা চক্রবর্তী, বেলা দেবী, সন্ধ্যা দেবী প্রভৃতি।

* * *

ছবিখানির মধ্যে অসাধারণত্ব ফুটেছে অঙ্গসজ্জার দিকে। বস্তুত প্রাকৃতিক, শোভাময় এমন দৃশ্য ভারতীয় ছবিতে দুর্লভ। চোখকে মুগ্ধ করে তোলার মতো আলোর ছন্দ, তেমনি দৃশ্যগুলির রচনা-বৈচিত্র্য। বহির্দৃশ্য এবং স্টুডিওতে তোলা দৃশ্যের মধ্যেও মিল রেখে দেওয়া হয়েছে ভারী সুন্দর। একটা সুললিত কাব্যিক গড়ন ফুটে উঠেছে। শিল্পনির্দেশ এবং শব্দগ্রহণের দিকও খুবই উঁচু ষ্ট্যাণ্ডার্ডের ছবিখানির সংগঠনকারিবৃন্দ হচ্ছেন পরি চালক সুবোধ মিত্র; চিত্রনাট্য রচয়ি বিনয় চট্টোপাধ্যায়, আলোকচিত্রশিল্প অমূল্য মুখোপাধ্যায়, শব্দগ্রাহক শ্যা সুন্দর ঘোষ, সঙ্গীত পরিচালক পঙ্ক মল্লিক, শিল্পনির্দেশক সুনীতি মিত্র।

'আত্মস্মৃতি'

মহাশয়,

গত ২৯শে মাঘের "দেশ"-এ শ্রীজ্ঞানেশ পত্রনবীশ "আত্মস্মৃতি" রচনা সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলেছেন, তার সবগুলিই সঙ্গত ও সমীচীন বলে মনে হয় না।

পাঠকদের আত্মজীবনী পাঠের প্রবণতাকে শ্রীজ্ঞানেশ "দুর্বলতা" বলে অভিহিত করেছেন এবং সেটাকে প্রকারান্তরে তুলনা করেছেন "অভিনেতা-অভিনেত্রীদের দর্শন ভিক্ষুদের" মানসিকতার সঙ্গে। শ্রী পত্রনবীশ নিজেই বলেছেন যে, তিনি আত্মজীবনী রচনার প্রয়াস প্রাচুর্য দেখতে পান প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের মধ্যে। সাহিত্যিক যদি প্রতিষ্ঠিত হন, তবে তাঁর আত্মজীবনীতে সাহিত্য-সৃষ্টি না থেকেই পারে না—কোন প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকই তাঁর জীবনের কথাগুলিকে নিরস করে লেখেন না। কাজেই আত্মজীবনী পাঠের প্রবণতা দুর্বলতা নয়—ওটাও সাহিত্য-প্রীতির নিদর্শন।

সাহিত্যের কোন সংকীর্ণ অর্থের প্রতি যদি শ্রীজ্ঞানেশের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব থেকে থাকে, তবে সে কথা আলাদা, কিন্তু সাহিত্য বহুরূপে তার বিরাট ব্যাপকত্ব নিয়ে আজকাল পাঠকের কাছে উপস্থিত হয়। সেই জন্য আজকাল "সংবাদ-সাহিত্য" বলেও একটা কথা শুনতে পাই। কাজেই ঠিক কি রকম করে লিখলে আত্মজীবনী সাহিত্যপদবাচ্য হবে, সেটা সঠিকভাবে নিরূপণ করার সর্বসম্মত কোন মানদণ্ড নেই।

শ্রীজ্ঞানেশের কথা শুনলে মনে হয় যে, তিনি মনে করেন, যা পড়লে মানুষের "উপকার" হয়, সেটাই সাহিত্য। সব সাহিত্যিকের রচনাই যে মানুষের বা সমাজের উপকার করবে, এমন কোন কথা নেই। কোন রচনা যদি পাঠককে আনন্দ দান করে, তবে তার সাহিত্যিক মূল্য কিছু না কিছু আছেই।

শ্রীজ্ঞানেশের মতে সাহিত্যিকরা তাঁদের আত্মজীবনীতে যদি শুধুই তাঁদের "জীবন-দর্শনের কথা এবং দেশকে সমাজকে তাঁরা কী চোখে দেখেছেন" সেই কথাই লেখেন, তবে আর সেটা আত্মজীবনী হয় না—সেটা দর্শনশাস্ত্রের গা-ঘেঁষা কোনও শাস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। আত্মজীবনী লেখা হবে, অথচ তার মধ্যে আত্মকথা (ব্যক্তিগত কথা) কিছুই থাকবে না—সেটা হওয়া সম্ভব কি?

দিল্লীর সাপ্রু-হাউসে সঙ্গীত সম্মেলনের একটি ঘটনার উল্লেখ করেছেন শ্রীজ্ঞানেশ। এক ভদ্রমহিলার স্বরোদ বাজাবার প্রশংসা যখন এক ভদ্রলোক করছিলেন, তখন সেই ভদ্রলোকের সঙ্গিনী বলেছিলেন, "জানো ও খুব বড়লোকের মেয়ে।" ভদ্রমহিলার এই উক্তিকে শ্রীজ্ঞানেশ হীনমন্যতার পরিচায়ক বলে মনে করেন। কিন্তু শ্রীজ্ঞানেশের এই অভিমত সত্য বলে মানা যায় না। স্বরোদ-বাদিকা মহিলাটি বড়লোক না হয়ে যদি খুব দরিদ্র হতেন, তবুও হয়ত প্রশংসাকারী ভদ্রলোকের সঙ্গিনী বলতেন, "জানো ও খুব গরীবের মেয়ে।"—কাজেই এটা হীনমন্যতা নয়—একজন শিল্পীকে তার শিল্পের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে জানা যায় না বলে তাঁর ব্যক্তিসত্তাকে জানবার এবং জানাবার স্বাভাবিক আকাঙ্ক্ষা। এই ব্যক্তিসত্তাকে জানাবার এবং জানবার আকাঙ্ক্ষা মানুষের আছে বলেই সব দেশে আত্মজীবনী লেখা হয় এবং অতিশয় আগ্রহের সঙ্গে পড়াও হয়। শিল্পীকে জানলে তাঁর শিল্পের রস আরও বেশী ভাল করে গ্রহণ করা যায়। শ্রীজ্ঞানেশের ভাষায়—কৃতীকে জানলে তার কৃতিত্ব আরও বেশী সরস হয়ে ওঠে। ইতি—শ্রীনিরঞ্জন বসু চৌধুরী, জামসেদপুর।

'ইউরেনিয়াম'

মহাশয়,

গত ২২-১-৫৫ সংখ্যা 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত শ্রীকার্তিকচন্দ্র চক্রবর্তীর চিঠি প্রসঙ্গে আমার গুটিকয়েক বক্তব্য আছে।

'আমাদের দেশে ইউরেনিয়ামের বৃহৎ আকর এখনও পর্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নি'—অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসুর এই উ অনেকটা আনুমানিক বিবৃতির পর্যায়ে পা কারণ ইউরেনিয়ামের আকর সংক্রান্ত যাব অনুসন্ধান বা গবেষণা ভারতীয় আণ শক্তি কমিশনের দ্বারা পরিচালিত হয় ভারতীয় 'Atomic Energy A অনুযায়ী সে সব অনুসন্ধান বা গবে ফলাফল প্রকাশ করা হয় না।

অধ্যাপক বসু ভারতীয় আণবিক সম বিভাগের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ন কাজেই তাঁর বিবৃতি স্পষ্টতই আণ শক্তি কমিশন প্রতিষ্ঠার পূর্বের প্রকা ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষার ফলাফলের রিপোর্ট আহরণ করা হয়েছে। অপর পক্ষে, ভার আণবিক শক্তি কমিশনের সভাপতি হি কমিশনের যাবতীয় কার্যকলাপ সম্পর্কে এইচ, জে, ভাবা যে ওয়াকিবহাল—এ স্বীকার করতেই হবে। অতএব তিনি বলে থাকেন যে, আণবিক শক্তি উৎপা উপাদান ইউরেনিয়াম আমাদের দেশে পরিমাণে পাওয়া যায়—তাঁর এই উ সন্দেহাতীতরূপে প্রমাণসিদ্ধ বলে নেওয়াই উচিত।

ইউরেনিয়ামের আকরের সুবৃহৎ শতকরা .২ ভাগ ইউরেনিয়াম থাকলে আকরকে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর পর্যায়ভুক্ত করা কারণ ইউরেনিয়াম লোহার মত একটি পদার্থ নয়। যে কোনও বস্তুর উৎকৃ মানদণ্ড স্থির করতে হলে তার আগে দুষ্প্রাপ্যতার কথা তুললে চলবে না। অনায়াসলভ্য বলে যে আকরে লোহার প শতকরা পঞ্চাশের বেশি নয় তাকে উৎকৃষ্ট বলি না। তামা অপেক্ষাকৃত —কাজেই যে আকারে শতকরা চার ভাগ থাকে তাকে উৎকৃষ্ট হিসাবে চালিয়ে এদের তুলনায় ইউরেনিয়াম একেবারেই —কাজেই সঞ্চয়ের পরিমাণ যেখানে সেখানে শতকরা .২ ভাগ ইউরেনিয়াম তাকে উৎকৃষ্ট আকরের মর্যাদা দেওয় পৃথিবীর যাবতীয় উল্লেখযোগ্য ইউরো আকর সম্পর্কে একথা খাটে। ইতি—

সংকর্ষণ রায়, ডি ভি সি, ম

খেলার মাঠে

একলব্য

রুশ-ভারত আন্তর্জাতিক ভলি বল খেলায় ভারতের কাছে রাশিয়ার পরাজয় ভারতীয় ক্রীড়াক্ষেত্রের ইতিহাসে এক গৌরবজনক সাফল্য। একমাত্র হকি খেলা ছাড়া আন্তর্জাতিক ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের বিশেষ কিছু অবদান নেই। কিন্তু সেই ভারতেরই ভলিবল টিম ভলিবলের বিশ্বপ্রধান সোভিয়েট রাশিয়ার এক শক্তিশালী দলকে পরাজিত করতে পারবে এটি সকলেরই ধারণার বাইরে ছিল। ভারতে ফুটবল সফরের অজেয় যোদ্ধা রাশিয়ান ফুটবল দল স্বদেশে পা দেবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে রাশিয়ান ভলিবল টিম ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। ভলিবল টিমও এদেশে এক মাস সফর করবে। ফুটবলে রাশিয়া বিশ্বপ্রধান নয়—বিশ্বপ্রধান দল-গুলির অন্যতম মাত্র, কিন্তু ভলিবল খেলায় রাশিয়া দু-দুবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে। তাই ফুটবলের সহজ সাফল্যের মত রুশ ভলিবল টিমেরও আশা ছিল তারা ভলিবলের অজেয় যোদ্ধা হিসাবে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে পারবে। কলকাতার ঐতি-হাসিক ইডেন উদ্যানে তারা প্রথম দিনের খেলায় যে কলানৈপুণ্য দেখিয়ে পশ্চিম বাংলা টিমকে অনায়াসে পরাজিত করলো, তাতে রুশ খেলোয়াড়দের পূর্বোক্ত ধারণা বদ্ধ-মূল হল, কলকাতার দর্শকরাও ভাবল ফুটবল টিমের মতই রাশিয়ান ভলিবল টিম ভারতের খেলায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করে দেশে ফিরবে। কিন্তু গত দুই তিন বছরে ভলিবল খেলায় ভারত যে কতখানি এগিয়ে গেছে— তার সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া গেল রুশ-ভারত আন্তর্জাতিক খেলায়, কলকাতার ঐতিহাসিক ইডেন উদ্যানে।

* * *

যদিও ভারত সফররত রাশিয়ান ভলিবল টিমকে সোভিয়েট রাশিয়ার প্রকৃত প্রতিনিধি-স্থানীয় দল বলা যায় না এবং রাশিয়ার একটি দল বিশেষের সঙ্গে 'টেস্ট' বা আন্ত-র্জাতিক খেলার ব্যবস্থা করা যুক্তিযুক্ত হয়েছে কিনা এ বিষয়েও তর্কের অবকাশ আছে, তবু বলবো রাশিয়ান টিমের বিরুদ্ধে ভারতের কৃতিত্বপূর্ণ জয়লাভ এদেশের ভলি-বল খেলার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কে জানে বিশ্বপ্রধান রুশ দলের বিরুদ্ধে ভারতের এই সাফল্য তাদের বিশ্ব-প্রাধান্য লাভের পথে সহায়ক হবে কিনা?

রাশিয়া থেকে যে দলটি ভারতে এসে বিভিন্ন কেন্দ্রে খেলে বেড়াচ্ছে এটি সোভিয়েট রাশিয়ার শক্তিশালী স্পার্টাক ভলিবল টিম। রাশিয়া যে দল বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ করেছে সেই দলের একজন খেলোয়াড় এসেছেন এই টিমের সঙ্গে। ইনিই দলের অধিনায়ক নাম পিমানভ। দলের বাকী এগারোজন উদীয়মান তরুণ খেলোয়াড়। অধিকাংশই কলেজের ছাত্র। ১৯৫৬ সালের বিশ্ব-প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় এদের অনেককেই হয়তো দেখা যাবে। তাই এ দলটি রাশিয়ার জাতীয় দল না হলেও এদের শক্তি কিছু কম নয়।

অধিনায়ক পিমানভ একজন আন্তর্জাতিক অভিজ্ঞতাপুষ্ট ধুরন্ধর খেলোয়াড়। অসম্ভব ভাল খেলেন। হাতে যেন বজ্রের শক্তি। খেলোয়াড় হিসাবে পিমানভ 'ন্যাটা'। তাই চাপ মারেন বাঁ হাতে। প্রচণ্ডগতি এই 'চাপ' তোলা বোধ করি শিবেরও অসাধ্য। পিমানভের লক্ষ্যও অব্যর্থ। কোর্টের যেখানে লোক নেই সেখানকার মাটিই আকর্ষণ করে পিমানভের বলকে। কিন্তু খেলোয়াড় হিসাবে এত গুণের অধিকারী পিমানভ অধিনায়ক হিসাবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন। সহ-খেলোয়াড়দের ভুল-চুক উপেক্ষা করে যিনি দলটিকে যথাযথভাবে পরিচালিত করতে পারেন, মনে বল দিতে পারেন, বিপদে ধৈর্য ধরতে পারেন, তিনিই তো যোগ্য অধিনায়ক। কিন্তু রুশ খেলোয়াড়দের সামান্য ভুলচুকের ক্ষেত্রেই পিমানভকে বিরক্তি প্রকাশ করতে দেখা গেছে। এক একটি গেম হারাবার সঙ্গে সঙ্গে তার এই বিরক্তি দর্শকদের চোখে ধরা পড়ে। রুশ খেলোয়াড়রাও নিজেদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেন, দলের মধ্যে দেখা যায় সংহতির অভাব, আর খেলায় ভুল-

ইডেন উদ্যানে রুশ-ভারত আন্তর্জাতিক ভলিবল খেলায় ভারতের খেলোয়াড় গুরুদেব সিংকে লাফিয়ে উঠে 'চাপ' মারতে দেখা যাচ্ছে।

ইডেন উদ্যানে ভারত ও রাশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক ভলিবল খেলায় দুই দেশের খেলোয়াড়দের গ্রুপ ফটো

ুকে। প্রতিপক্ষের বাকী পাঁচজন খেলোয়াড়ের উপর অধিনায়কের বিরক্তি ও রক্তচক্ষুর প্রতি-ক্রিয়া ভারতের জয়লাভের পথে কম সহায়ক হয়নি, এটি স্বীকার না করলে সত্যের অপলাপ করা হয়। তবুও বলবো, খেলার দিক দিয়ে ভারত যোগ্য দল হিসাবেই বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। ভাগ্যদেবীর করুণায় জয়লাভ করেনি। ভারতের কুশলী খেলোয়াড়-দের অনমনীয় দৃঢ়তা এবং উন্নত ক্রীড়া-চাতুর্যের ফলেই তো রুশ খেলোয়াড়দের প্রথমদিকে ভুলচুক করতে দেখা যায়। পরবর্তী ঘটনা—ভারতীয় খেলোয়াড়দের উত্তরোত্তর উন্নতি এবং মনোবল সঞ্চয় আর রুশ খেলোয়াড়দের মধ্যে সংহতির অভাব এবং ভুলচুক।

* * *

ভারতে ভলিবল খেলা এখনো তেমন জনপ্রিয়তা লাভ করেনি কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়ায় ফুটবলের পরই ভলিবলের স্থান। ভলিবল সেখানে অসম্ভব জনপ্রিয় খেলা। ফলে এই খেলার বিজ্ঞানসম্মত ক্রীড়াচাতুর্যও তারা আয়ত্ত করেছে, দেহকেও গড়ে তুলেছে খেলার উপযোগী করে। আন্তর্জাতিক ক্রীড়া-চাতুর্যের সঙ্গে পরিচয়ের অভাবে ভারতীয় ভলিবল নিজস্ব ধারায় এগিয়ে চলছিলো কিন্তু বিশ্ব-ভলিবল প্রতিযোগিতায় অংশ
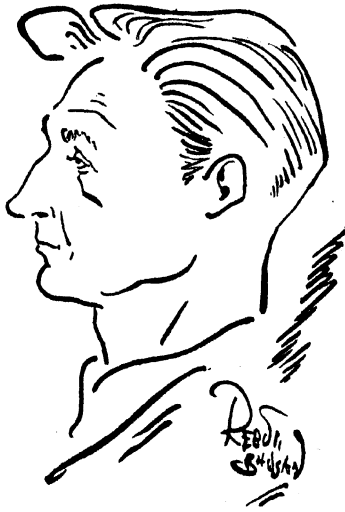
ব্যঙ্গ চিত্রকরের তুলিতে ভারত সফরকারী রাশিয়ান ভলিবল টীমের অধিনায়ক পিমানভ্

গ্রহণের পর ভারত তার ক্রীড়াধারার প করে খেলায় যে কতখানি উন্নতি ইডেন উদ্যানে রাশিয়ার সঙ্গে খেলায় তার পরিচয় পেয়েছি। ৪ বছরের বিশ্বভলিবল প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকে। ১৯৫২ সালে মস্কোতে শেষব প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়েছে। ভার প্রথম এই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্র বিশ্ব প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের প গঠনের উদ্দেশ্যে কলকাতায় একটি ক্যাম্প' খোলা হয়েছিল। সেই ভারতীয় খেলোয়াড়দের যে খেলা দে খেলার সঙ্গে ভারতীয় দলের খেলার আকাশ-পাতাল পার্থক্য বাহুল্য, বিশ্ব প্রতিযোগিতায় অংশ অভিজ্ঞতাই ভারতীয় খেলোয়াড়দের ক্রীড়াচাতুর্যে কুশলী ও কীর্তি তুলেছে। তাই আজ তাদের জয়লা হয়েছে শক্তিশালী রুশ দলের বিরুদ্ধে

তিন চা'রজন খেলোয়াড়ের নেটের গায়ে লাফিয়ে উঠে চাপ প্র এই যে প্রচেষ্টা ভারতীয় ভলিব পদ্ধতিতে এটি আগে প্রত্যক্ষ করা কিন্তু চাপ প্রতিরোধের ক্ষেত্রে খেলোয়াড়রা এখন রুশ খেলোয়াড় তৎপর এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। 'ও

র্ভিসের উন্নত কৌশলও ভারতের খেলো-
ড়রা ভালভাবে আয়ত্ত করেছেন, আরও
প্‌ণভাবে আয়ত্ত করেছেন বল তোলা এবং
প মারার কৌশল। ইডেন উদ্যানে ভারত ও
শিয়ার ভলিবল টেস্টে বাঘ-সিংহের যে
ড়াই দেখা গেছে, ভারতের মাটিতে ভলি-
লের এমন সংগ্রাম আর দেখা যায়নি। এই
লা দেখবার জন্য রণজি স্টেডিয়ামে যে জন-
াগম হ'য়েছিল তাও অভূতপূর্ব। ন' হাজার
র্কি-আসনের একটি আসনও খালি থাকে
, অনেক উৎসাহী দর্শককে স্থানাভাবের
ন্য হতাশ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে হয়। দুই
লের উন্নত ক্রীড়ানৈপুণ্যে দর্শকদের উৎসাহ
দ্দীপনাও চরমে ওঠে। মুহুর্মুহু হাততালি
বং বিপুল আনন্দরোলের মধ্যে ভারত এক
কটি করে পয়েন্ট লাভ করতে থাকে।
রত ১৫—১২ পয়েন্টে রাশিয়ার কাছ থেকে
থম গেম লাভ করার পর দ্বিতীয় গেমে
ই দলের ক্রীড়া যুদ্ধের উপরে ওঠে
য়যুদ্ধের সংগ্রাম। এক একটি পয়েন্ট
ভে যেন জীবনের অনেক কিছু লাভ, একটি
য়েন্টের ক্ষতি যেন জাতীয় ক্ষতি। কষ্টার্জিত
 একটি পয়েন্ট। একবার ভারত একবার
শিয়া অগ্রগামী হতে থাকে, কখনো
ইয়েরই সমান পয়েন্ট ১০—১০, ১১—১১,
১—১৩, ১৪—১৪, ১৫—১৫। দর্শকদের
সাহ উদ্দীপনার অন্ত নেই। দুই দলই
স্ত গতিতে 'চাপ' মেরে পয়েন্ট পেতে
পেরে। দুদিক থেকেই চলছে চাপের
প্রতিযোগিতা—চাপ প্রতিরোধের জন্য হাতের
। বাধার প্রাচীর গড়তেও কোন দলের
ৎপরতার অভাব নেই। কোন সময় 'চাপের'
রসংঘাতে ভেঙে পড়ছে হস্তরচিত বাধার
চীর, কোন সময় বা বলটি ফিরে আসছে
ধা পেয়ে নিজের কোর্টে। ১৫-১৫ পয়েন্টে
 পক্ষের পয়েন্ট সমান হবার পর ৭ বার
র্ভিসের হাত বদল হল। এর মধ্যে কেউ
কটি পয়েন্টেও পেল না। ৮ বারের প্রচেষ্টায়
রত পেল একটি পয়েন্ট, হলো ১৬—১৫;
বিও একটি পয়েন্টের প্রয়োজন, প্রতিপক্ষ
াবার একটি পয়েন্ট পেলে পুনরায় প্রাধান্যের
ড়াই। 'ডিউসের' পর গেম পেতে হলে দুই
য়েন্টের ব্যবধান থাকা চাই। ১৬—১৫
য়েন্টে এগিয়ে থেকে ভারত দুবার গেম বল
ল, কিছুই হল না। তৃতীয় প্রচেষ্টায় ভারত
াভ করলো বহু প্রত্যাশিত গেম পয়েন্ট।
াশিয়া পরাজিত হ'ল পর পর দুটো গেমে।
র পর বাকী দুটো গেমে আর আগের মত
ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা গেল না। দু' দলই
খন পরিশ্রান্ত। রাশিয়া ১৫—৯ পয়েন্টে
তীয় গেম এবং ভারত ১৫—৮ পয়েন্টে
তুর্থ গেম লাভ করে টেস্টে বিজয়ীর সম্মান
র্জন করলো।

* * * *

অনেকের ভুল ধারণা আছে, ভলিবল
খেলায় স্বাস্থ্যের তেমন প্রয়োজন হয় না,
খেলার মধ্যে নৈপুণ্যগত উৎকর্ষ দেখাবারও
তেমন সুযোগ নেই। ৩০ ফুট দৈর্ঘ্য এবং ৩০
ফুট প্রস্থ পরিমিত স্বল্প পরিসর চৌহদ্দীর
মধ্যে ৬ জন খেলোয়াড়ের আনাগোনা,
সুতরাং অত্যধিক পরিশ্রম করবার অবকাশ
কোথায়? কিন্তু অবকাশ যে যথেষ্টই আছে—
তা যারা রুশ ভারত আন্তর্জাতিক খেলা
দেখবার সুযোগ পেয়েছেন তাঁরাই উপলব্ধি
করেছেন। স্বল্পপরিসর সীমাবদ্ধ জায়গার
মধ্যে আবদ্ধ থেকেই—দুই দলকে শ্রমজনিত
কাতরতায় হিমসিম খেয়ে উঠতে হয়েছে। বল
মারতে বা প্রতিরোধ করতে হয়েছে সবাইকেই
কখনো দাঁড়িয়ে, কখনো শুয়ে কখনো বসে
কখনো বেঁকে কখনো বা লাফিয়ে। যার
শারীরিক পটুতা যত বেশী এবং যিনি
লাফাবার কৌশল ভাল আয়ত্ত করেছেন
ভলিবল খেলায় তারই বেশী সুবিধা। ভলি-
বলে 'নেটের' উচ্চতা থাকে ৮ ফুট। সুতরাং
৮ ফুটেরও উঁচুতে লাফিয়ে উঠে বলে 'চাপ'
মারতে পারলে সেই চাপের তীব্রতা হবে বেশী,
—প্রতিপক্ষও চাপ তোলার বা প্রতিরোধের
সুযোগ পাবে কম। চাপ প্রতিরোধের বেলায়ও
লাফ অপরিহার্য। মূলকথা ভলিবল খেলায়
পারদর্শিতা অর্জন করতে হলে শরীরটাকেও
তার উপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে।

* * *

ভলিবল খেলার প্রধান গুণ—অল্প
খরচে এবং অল্প জায়গায় এটি খেলা যেতে
পারে। ৬০ ফুট দীর্ঘ এবং ৩০ ফুট প্রস্থ
একখণ্ড জমি খেলার মাঠ, আর একটি বল
এবং একটি জাল খেলার উপকরণ, ব্যাস।
পাড়াগাঁয়ের তো কথাই নেই, ঘনবসতিপূর্ণ
শহরেও ভলিবল খেলার মাঠ সংগ্রহ করতে
বিশেষ বেগ পেতে হয় না। কলকাতার বিভিন্ন
পার্কে বহু ভলিবল খেলার মাঠ প্রস্তুত হতে
পারে। ময়দান এলাকায় ফুটবল পাড়ার
ফাঁকে ফাঁকেও বহু মাঠ প্রস্তুত করা সম্ভব।
ভলিবল খেলা থেকে যে আনন্দ পাওয়া যায়
বা এতে নৈপুণ্য দেখাবার যে সুযোগ আছে
তা অন্যান্য খেলার তুলনায় নিতান্ত কম নয়।
সর্বোপরি এ খেলা দৈহিক পুষ্টিরও পরম
সহায়ক। কলকাতা কর্পোরেশন, পল্লীর উন্নতি-
কামী নাগরিক এবং রাজ্য সরকার যদি এই
খেলার প্রসার ও প্রচারের দিকে একটু দৃষ্টি
দেন তাহলে পল্লীর যে সব যুবক সারা
বিকেলটি আড্ডায় গল্পে কাটায় ভলিবল
খেলায় তারাও আগ্রহী হতে পারে।

খেলাধুলার অন্যান্য খবর

ব্যাণ্টম ওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের নূতন চ্যাম্পিয়ন— স্যানফ্রান্সিসকোতে ব্যাণ্টমওয়েট মুষ্টিযুদ্ধের চ্যাম্পিয়নসিপ লড়াইয়ে মেক্সিকোর মুষ্টিযোদ্ধা আর মেকিয়াস 'টেকনিক্যাল নক আউটে' থাইল্যাণ্ডের মুষ্টিক সঙ্কিটাটকে হারিয়ে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছেন।

ড্রবনী নিজ দেশে পরাজিত—মিশরের টেনিস খেলোয়াড় উইম্বলডন চ্যাম্পিয়ন জারোশলাভ ড্রবনী তার নিজ দেশের টেনিস চ্যাম্পিয়নসিপের সেমিফাইন্যাল খেলায় আমেরিকান খেলোয়াড় ফ্রেড কোভালেস্কির কাছে পরাজিত হয়েছেন। কোভালেস্কি আমেরিকার ক্রমপর্যায় কোন স্থান লাভ করেননি। তিনি ৩—৬, ৬—৪, ৬—৪ ও ১১—৯ গেমে ড্রবনীকে পরাজিত করেন।

দেশী সংবাদ

৭ই মার্চ—নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের সভাপতি জেনারেল মোহন সিং এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীশীলভদ্র যাজী অদ্য এক বিবৃতিতে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সহিত নিখিল ভারত ফরোয়ার্ড ব্লকের অন্তর্ভুক্তির চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জানাইয়াছেন।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার রাজ্য সরকারের বাজেটের সেচ খাতের আলোচনাকালে সেচমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জি জানান যে, রাজ্য সরকার আগামী দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ১০৩ কোটি টাকার ১০১টি সেচ কার্য করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন।

৮ই মার্চ—১৯৬টি আসনবিশিষ্ট অন্ধ্র বিধানসভার সমস্ত আসনের ফলাফল ঘোষিত হইবার পর বিভিন্ন দলের অবস্থা নিম্নরূপ দাড়াইয়াছে—সংযুক্ত কংগ্রেস দল ১৪৬; কম্যুনিস্ট ১৫; প্রজা সমাজতন্ত্রী দল ১৩; স্বতন্ত্র ২২। সংযুক্ত কংগ্রেস দল যে ১৪৬টি আসন পাইয়াছে, তাহার মধ্যে কংগ্রেস ১১৯টি, কৃষিকর লোক পার্টি ২২টি ও প্রজাপার্টি ৫টি আসন পাইয়াছে।

৯ই মার্চ—আজ কলিকাতা ময়দানে এক শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিতে উঠিয়া ভারতের উৎপাদন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী কে সি রেড্ডি তাঁহার ভাষণে এইরূপ আশ্বাস দেন যে, ভারতে নূতন যে দুইটি লৌহ ও ইস্পাত কারখানা স্থাপনের কথা চলিতেছে তাহার মধ্যে একটি কারখানা পশ্চিমবঙ্গে স্থাপিত হইবে বলিয়া আশা করা যায়। নিখিল ভারত বস্ত্রশিল্প সম্মেলনের দ্বাদশ অধিবেশন উপলক্ষে উক্ত শিল্প প্রদর্শনীর আয়োজন হয়।

১০ই মার্চ—আগামী পাঁচ বৎসরে সমগ্র ভারতে পাঁচলক্ষ ব্যক্তির সামরিক শিক্ষার জন্য ভারত সরকার এক পরিকল্পনা রচনা করিয়াছেন। আগামী বৎসরের প্রথম হইতে উহা কার্যকরী করা হইবে।

শ্রীনগরের সংবাদে প্রকাশ, কাশ্মীরের সমগ্র যুদ্ধ বিরতি সীমারেখা বরাবর পাকিস্থান সশস্ত্র 'আজাদ কাশ্মীর' বাহিনী সমাবেশ করিতেছে।

আজ লোকসভায় বার্তাজীবী শিল্প বিরোধ বিল গৃহীত হয়। এই বিল দ্বারা বার্তাজীবিগণের ক্ষেত্রেও শিল্প বিরোধ আইন সম্প্রসারণ করিবার ব্যবস্থা হইয়াছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় "সাধারণ শাসন পরিচালনা খাতে" ২,৭৬,৩৮,০০০, টাকা ব্যয় মঞ্জুরীর আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষ হইতে কয়েকটি অভিযোগ উত্থাপিত হয় এবং মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় দৃঢ়তার সহিত অধিকাংশ অভিযোগ খন্ডন করিয়া বলেন, এ পর্যন্ত তাহারা যাহা করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাদের বিচলিত হইবার কোন কারণ নাই।

সাপ্তাহিক সংবাদ

১১ই মার্চ—হোলি উৎসব উপলক্ষে প্রদেশ কংগ্রেসসমূহের সভাপতিদের নিকট প্রেরিত বাণীতে শ্রী নেহরু বলিয়াছেন যে, শুধু দেশেই নহে, উপরন্তু আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও অন্ধ্রের নির্বাচনের তাৎপর্য রহিয়াছে।

আজ হাওড়ায় বেলিলিয়াস রোডস্থিত এক বাড়ীর পাতকুয়া হইতে একটি কাঁসার গেলাস উঠাইতে গিয়া এক বিপত্তির ফলে তিনজন যুবক বিষাক্ত গ্যাসের প্রভাবে শোচনীয়ভাবে মারা যায়।

আজ রাজ্যসভায় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনার উত্তর দিবার সময় এইরূপ আভাস দেন যে, নূতন কর ধার্যের প্রস্তাবগুলি বিশেষভাবে উৎপাদন শুল্কে পুনর্বিবেচনা করার সম্ভাবনা রহিয়াছে।

১২ই মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রীজওহরলাল নেহরু আজ সোনগাঁও বিমান ঘাটি হইতে একখানি খোলা মোটরে নাগপুরে যাইবার সময় বাবরাও নামক এক রিক্সাওয়ালা উন্মুক্ত ছুরিকা হস্তে তাঁহার দিকে ছুটিয়া যায় এবং লাফ দিয়া ফুটবোর্ডে উঠিয়া দাড়ায়। সৌভাগ্যবশত প্রধানমন্ত্রীর প্রাণনাশের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। ঘটনাস্থলেই আততায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে এই ঘটনা সম্পর্কে শ্রী নেহরু মন্তব্য করেন যে, ইহা বিকৃত মস্তিষ্ক একটি লোকের কাজ।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় রাষ্ট্রীয় পরিবহন খাতে ব্যয় বরাদ্দ মঞ্জুরীর দাবী উত্থাপিত হইলে বিরোধী পক্ষের বিভিন্ন সদস্য এই বিভাগে ব্যাপক দুর্নীতি ও অব্যবস্থার অভিযোগ করেন। বিতর্কের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন যে, রাষ্ট্রীয় পরিবহন দপ্তরে দুর্নীতি সংক্রান্ত অভিযোগগুলি তাঁহার নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি ঐ সম্বন্ধে তদন্ত করিয়া দেখিতে পারেন। ডাঃ রায় আগামী পাঁচ বৎসরের মধ্যে বাস সার্ভিস জাতীয় করণের আদর্শ ঘোষণা করেন।

১৩ই মার্চ—আজ নাগপুরে ভারত সেবক সমাজের তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের পরিসমাপ্তি ঘটে। ভারত সেবক সমাজকে এক গতিশীল প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার উদ্দেশ্যে এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে উহার কার্যাবলীর প্রসারকল্পে সম্মেলনে কয়েকটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। শ্রীজওহরলাল নেহরু আগামী তিন বৎসরের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে উহার সভাপতি নির্বাচিত হন।

আজ জগদালপুরে খণ্ডজাতি কল্যাণ সম্মেলনে উদ্বোধনী বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আদিবাসীদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন আমরা সকলেই আদিবাসী, আমি এবং শুক্লজীও। এখন আমাদের দেশে কেহ কাহারও অপেক্ষা উঁচু নহে, আমরা সকলেই সমান।"

বিদেশী সংবাদ

৭ই মার্চ—অদ্য যুগোশ্লাভ জাতীয় পরিষদে পররাষ্ট্র নীতি বর্ণনা প্রসঙ্গে মার্শাল টিটো মজুদ আণবিক বোমা বিনষ্ট করিয়া ফেলিবার জন্য সকল রাষ্ট্রের নিক[illegible] আহ্বান জানান।

অদ্য নেভাদায় ১৯৫৫ সালের আণবিক পরীক্ষা পর্যায়ের সর্ববৃহৎ বিস্ফোরণ ঘটে।

৯ই মার্চ—মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী মি[illegible] জন ফস্টার ডালেস গত রাত্রে কম্যুনি[illegible] চীনকে সাবধান করিয়া দিয়া বলেন যে, নূ[illegible] আক্রমণাত্মক যুদ্ধ আরম্ভ করা হইলে সম্ভব[illegible] নূতন অস্ত্রের সাহায্যে তাহা প্রতিরোধ ক[illegible] হইবে।

লাঙ্কাশায়ার বস্ত্রশিল্পের গুরুতর অবস্থা সম্পর্কে আজ কমন্স সভায় বিতর্ক হই[illegible] সময় শ্রমিক সদস্য মিঃ হ্যারল্ড উইলসন ব[illegible] যে, লাঙ্কাশায়ার মিলগুলিতে ব্যাপক [illegible] উদ্বেগ দেখা দিয়াছে। কয়েকমাস, এমন[illegible] কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অবস্থা গু[illegible] আকার ধারণ করিতে পারে।

১০ই মার্চ—অদ্য মস্কো বেত[illegible] সোভিয়েট কম্যুনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় ক[illegible] ও সোভিয়েট মন্ত্রিপরিষদের এক যুক্ত নির্দে[illegible] নামায় ঘোষণা করা হইয়াছে যে, রাশি[illegible] কেন্দ্রায়ত্ত কৃষি পরিকল্পনার বর্তমান পদ্ধ[illegible] ভুল ও ত্রুটিপূর্ণ। কারণ এই পদ্ধতি স্থান[illegible] জনগণের মধ্যে খুব সামান্যই কর্মোদ্যো[illegible] প্রেরণা সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে।

১২ই মার্চ—পেনিসিলিনের আবিষ্ক[illegible] স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং অদ্য তাঁ[illegible] লণ্ডনস্থ বাসভবনে অকস্মাৎ হৃদযন্ত্রের [illegible] বন্ধ হওয়ায় পরলোকগমন করিয়াছে[illegible] মৃত্যুকালে তাহার বয়স ৭৩ ব[illegible] হইয়াছিল।

১৩ই মার্চ—নেপালাধীশ ত্রিভুবন রাত্রে জুরিখে পরলোকগমন করিয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—।৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষাণ্মাসিক—১০,

স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

২২ বর্ষ

২১ সংখ্যা

দেশ

শনিবার

১২ চৈত্র, ১৩৬১

DESH

SATURDAY, 26TH MARCH, 1955.

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

রতের দুর্বলতার কারণ

ভারতের প্রধান মন্ত্রী পণ্ডিত ওহরলাল নেহরু সম্প্রতি পূর্ব পাঞ্জাবের জধানী চণ্ডীগড়ে ভারতের বর্তমান রিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে য়া জাতিভেদ প্রথাকে ভারতের র্বলতার প্রধান কারণ স্বরূপে উল্লেখ রিয়াছেন। তাঁহার মতে এই জাতিভেদ থাই অতীতে জাতির ভিতরে সংহতি ধনে অন্তরায় ঘটাইয়াছে এবং স্বদেশ-প্রেমকে সুদৃঢ় করিতে দেয় নাই। ব্রিটিশ সনকালে এই পাপ সর্বাপেক্ষা প্রভাব স্তার করে। নিজেদের প্রভুত্ব পাকা রার উদ্দেশ্যে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা ক নানাভাবে প্রশ্রয় দিয়াছে। তজীর উক্তির যাথার্থ্য সম্বন্ধে র কোন প্রশ্ন নাই। প্রকৃতপক্ষে রক শক্তির দিক হইতে দুর্বলতা সমরোপকরণের অপকর্ষের জন্য বিদেশীর পদানত হয় নাই। ক্ষাকৃত আধুনিক যুগেও রণজিৎ এবং হায়দার আলী প্রভৃতির ন্যায় কুশলী যোদ্ধার আবির্ভাব এদেশে ছে। প্রত্যুত ভারতের সংহতির বের সুযোগেই বিদেশীরা এদেশে বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। ব্রিটিশ দলে বুঝিয়া নানারূপ অর্থনীতিক কৌশলের সাহায্যে জাতিভেদগত এই াকে শ্রেণীস্বার্থের গণ্ডী বাঁধিয়া পাকা া তোলে। জাতিভেদের উর্ধ্বে সাম্যের র্শ এদেশে ইতিপূর্বেও বহু ব্যক্তিত্ব-ন্ন পুরুষ নিজেদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত য়াছেন; কিন্তু তাহাতে জাতিভেদের য়তনে ফাটল ধরে নাই। প্রকৃত- বর্তমানে ভারতের সমাজ-জীবন যেরূপ পরিস্থিতির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে তাহাতে সমাজের নিম্নস্তরে অর্থনীতিক সুবিধা এবং শিক্ষা সম্প্রসারণের দ্বারা এই প্রভেদের মূলে কুঠারাঘাত করা সম্ভব হইতে পারে। বাংলার বীর সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ তাঁহার তেজোগর্ভ বাণীতে এই উদ্দেশ্য সাধনে জাতিকে সমগ্রভাবে অনুপ্রাণিত করেন। পরাধীন ভারতের শাসকশক্তি তাঁহার ব্রত সার্থক হইতে দেয় নাই। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের আশ্রয়ে পরিপুষ্ট শ্রেণীস্বার্থসংস্কার স্বামীজির উদ্দেশ্য সাধনে অন্তরায় সৃষ্টি করিয়াছে। ভারত আজ স্বাধীন। সর্ববিধ সংকীর্ণতা হইতে মুক্ত ভারত মানুষের প্রতি সর্ববিধ অবিচারকে উৎখাত করিতে জাগ্রত হইবে এবং ভারতের শাসন-নীতিতে সেই বৈপ্লবিক আদর্শ বাস্তবে পরিণত হইবে, ইহাই আশা করা যায়।

আবদুল গফ্ফর খানের অপরাধ

ডাঃ খান সাহেব পাকিস্থানের অন্যতম কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর পদ লাভ করিবার পর তাঁহার ভ্রাতা খান আবদুল গফ্ফর খানের উপর হইতে গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা প্রত্যাহৃত হইবে অনেকে এইরূপ আশা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা অদ্যাপি বলবৎ রহিয়াছে। সম্প্রতি গফ্ফর খান সাহেব একটি বক্তৃতায় কোন্ অপরাধে তাঁহাকে এইভাবে স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত হইতে হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে বহু আত্মানুসন্ধানের পর তাহার স্বরূপ নির্ধারণ করিয়াছেন। তাঁহার মতে তিনি গণতন্ত্রে সুদৃঢ়ভাবে বিশ্বাসী, ইহাই তাঁহার একমাত্র অপরাধ। হয় তাঁহাকে নিজের প্রদেশে গিয়া তাঁহার দেশবাসীকে সেবা করিবার সুযোগ তাঁহাকে দেওয়া হোক্ অথবা তাঁহাকে পুনরায় জেলে ভর্তি করা হোক্, পাকিস্থান সরকারের নিকট তাঁহার এই প্রার্থনা। গফ্ফর খানের জীবন পরার্থে উৎসর্গীকৃত। তাঁহার ন্যায় সাধু পুরুষের উক্তির অন্তর্নিহিত বেদনা সকলেই উপলব্ধি করিবেন। কিন্তু পাকিস্থান সরকারেরই বা উপায় কি? মধ্যযুগীয় ধর্মান্ধতা তাঁহাদের পক্ষে পরম সম্বল। এই সম্বল এখনও হাতে রাখিয়া তাঁহাদিগকে চলিতে হইতেছে। বস্তুত গোষ্ঠী বা শ্রেণীবিশেষের স্বার্থ যে শাসনতন্ত্রের মূলে ভিত্তিস্বরূপ সেখানে গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক শাসনসম্মত সর্বজনীন স্বার্থ সাধন—নৈতিক হিসাবে যে বস্তুকে জনসেবা বলা চলে, তাহার মর্যাদা রক্ষিত হইতে পারে না, অধিকন্তু তেমন আদর্শ কর্তৃপক্ষের সন্দেহকেই উদ্রিক্ত করিবে ইহা স্বাভাবিক। স্বেচ্ছাচারী শাসকদের হাতে দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে মানবতার নির্যাতন যুগে যুগে ঘটিয়াছে—সীমান্ত গান্ধী আবদুল গফ্ফর খান নির্যাতন-লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইয়া সেই মানবতারই মূল্য দিতেছেন। জগতের ইতিহাসে বীর সাধকের এ দান বৃথা যাইবে না।

পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে রেল-সংযোগ

পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে নূতন রেলপথের সংযোগ-সাধনের সম্বন্ধে ভারত ও পাকিস্থান সরকার বিবেচনা করিতেছেন, সম্প্রতি পাকিস্থানের পরিবহন সচিব ডাঃ খান সাহেব একটি সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা প্রকাশ করিয়াছেন। বাস্তবিকপক্ষে পূর্ববঙ্গ এবং পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে রেলপথে সংযোগ না রহিয়াছে এমন নয়। প্রত্যুত দেশ বিভক্ত হইবার পূর্বে যেমন ছিল, উভয় রাষ্ট্রের পথে রেল সংযোগ সেইরূপই আছে; কিন্তু তাহাতে এই দুই রাষ্ট্রের মধ্যে গতিবিধির অসুবিধা দূর হইতেছে না, সাধারণের অভিযোগের ইহাই কারণ। নূতন রেলপথ স্থাপনে এই অসুবিধা কিভাবে দূর হইবে এই প্রশ্ন স্বভাবতই মনে উঠে। বস্তুত উভয় রাষ্ট্রের ভিতর গতিবিধ ছাড়পত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। ইহার ফলে যাত্রীদিগকে নানারকমে ঝঞ্চাট ভোগ করিতে হয়—প্রথমত ছাড়পত্র সংগ্রহ করা, এবং ছাড়পত্র পাওয়া গেলেও ঘাটিতে ঘাটিতে তাহার পরীক্ষা এজন্য দুর্ভোগ সামান্য নহে। এরূপ অবস্থায় উভয় বঙ্গের মধ্যে গতিবিধির স্বাচ্ছন্দ্য বিধান করাই যদি এই রেল সংযোগ সাধনের উদ্দেশ্য হয়, তবে ছাড়পত্রপ্রথা রহিত করাই সর্বপ্রথমে প্রয়োজন। ভারতের পক্ষ হইতে এ সম্বন্ধে বিশেষ আপত্তির কারণ আছে বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু পাকিস্থানের প্রধানমন্ত্রী কিছুদিন পূর্বেও ছাড়পত্র বজায় রাখিবার ঔচিত্য সমর্থন করিয়াছেন। সুতরাং নূতন রেল সংযোগের দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে গতিবিধির স্বাচ্ছন্দ্য কতটা বাড়িবে, এ বিষয়ে যথেষ্টই সন্দেহের কারণ রহিয়াছে।

বর্বরতার নজীর

পুরুলিয়া বড়বাজার হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীগঙ্গাধর সিংহ কেবল প্রধান শিক্ষক নহেন, তিনি লোকসেবক সঙ্ঘের কর্মী, জেলাবোর্ডের সদস্য এবং পুরুলিয়া আদালতের পূর্বতন ব্যবহারজীবী। সুতরাং তিনি একজন পদস্থ ব্যক্তি। সেদিন তাঁহাকে হাতে হাতকড়া লাগাইয়া এবং কোমরে দড়ি বাঁধিয়া পুরুলিয়ার মহকুমা হাকিমের এজলাসে হাজির করা হয়। সিংহ মহাশয়ের অপরাধ কিছু আছে কিনা তাহার বিচার হইবে, হোক্। কিন্তু তিনি সাধারণ শ্রেণীর চোর ডাকাত নহেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এমন একজন পদস্থ ব্যক্তির প্রতি দাগী অপরাধীর মত আচরণ করিয়া বিহারী পুলিস চূড়ান্ত বর্বরতার পরিচয় দিয়াছে। মহকুমা হাকিমের উৎসাহও কিছু কম নয়। তিনি শ্রীযুত সিংহকে ছয় হাজার টাকার জামীনে মুক্তির আদেশ দেন, এবং আদেশের পরে তাঁহার উপর ভারতীয় দণ্ডবিধির ১৮৮ ধারা অনুযায়ী সমন জারী করেন। ঘটনার বিবরণ দেখিয়া আমরা স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতেছি, আমরা কি সুসভ্য ভারত রাষ্ট্রে রাস করিতেছি, যে রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরু এবং স্বয়ং ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ যে রাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি!

কাছাড়ে বাংলা ভাষার ঐতিহ্য

আসামের বিধানসভায় কাছাড়ের ভাষাগত প্রশ্নটি উত্থাপিত হইয়া কিছু উত্তেজনার সৃষ্টি করে। সভার সদস্য শ্রীরণেন্দ্রমোহন দাস এই অভিযোগ উত্থাপন করেন যে, কাছাড় বাঙ্গলা ভাষাভাষী অঞ্চল; ইহা সত্ত্বেও আসাম সরকারের প্রচারবিভাগ সেখানে বাংলা-ভাষার সাহায্য না লইয়া অসমিয়া ভাষায় সরকারী প্রচার বিভাগের কাজ চালাইতেছেন।। শ্রীনীলমণি ফুকন এই প্রস্তাবে উত্তেজিত হইয়া এই যুক্তি লইয়া দাঁড়ান যে, কাছাড়ের আদি বাসিন্দারা বাঙ্গালী নয়, বাংলাভাষা তাহাদের উপর জোর করিয়া চাপাইয়া দেওয়া হইয়াছে। কাছাড়ের অধিবাসীদিগকে যে বাংলা শিখিতে হইয়াছে, ইহা তাহাদের দুর্ভাগ্য ইত্যাদি। অপর একজন সদস্য প্রত্যুত্তরে বলেন, দুইশত বৎসর পূর্বে কাছাড়ের ভাষা কি ছিল এ কথা অবান্তর। কাছাড় বর্তমানে বাংলা ভাষাভাষী অঞ্চল, সুতরাং সেই হিসাবে কাছাড়ের সম্বন্ধে বিচার করিতে হইবে। এক সময়ে কানাডা এবং আমেরিকায় রেড ইণ্ডিয়ানেরা বাস করিত, সুতরাং সেখানে রেডইণ্ডিয়ানদের ভাষা চালাইতে হইবে ইহাই কি যুক্তি? প্রচার বিভাগের মন্ত্রী এই কৈফিয়ৎ দেন যে, উপযুক্ত কর্মচারীর অভাবে তাঁহাদের এই ত্রুটি ঘটিয়াছে। ফলত বাংলাভাষার সম্বন্ধে আসাম সরকারের মনোভাবের পরিচয়ই তাঁহাদের এমন ত্রুটির ভিতর ধরা পড়ে।

পূর্ববঙ্গের উদ্বাস্তু

ভারত গভর্নমেণ্টের পুনর্বাসন বিভাগের ১৯৫৪-৫৫ সালের বার্ষিক বিবরণীতে প্রকাশ ভারতের উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের জন্য মোট ২২৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয়িত হইবে। সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের দায়িত্ব অগ্রাধিকার পাইয়াছে। কারণ পশ্চিম পাকিস্থানের উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন কার্য প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। প্রকাশিত বার্ষিক বিবরণীতে ইহাও প্রকাশ যে ১৯৫৪ সালের শেষদিক হইতে প্রত্যেক মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে ১১ হাজার উদ্বাস্তু ভারতে আসিয়াছে। এই সমাগম অদ্যাপি চলিতেছে। কতদিন এই সমাগম চলিবে তাহা বলা যায় না। পূর্ববঙ্গের অবশিষ্ট হিন্দুদের প্রায় সকলেই দেশত্যাগ করিয়া আসিতে বাধ্য হইবেন—অবস্থার গতি দেখিয়া ইহাই মনে হয়। এরূপ ক্ষেত্রে ভারত সরকারকে আরও ৪০।৫০ লক্ষ হিন্দুকে আশ্রয় [illegible] দায়িত্ব লইতে হইতে পারে। নেহরু-লিয়াকৎ চুক্তির কাল হইতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায় নিরাপদে পূর্ববঙ্গে বসবাস এবং যাহারা দাঙ্গাহাঙ্গামার ফলে কিংবা নিরাপত্তার অভাববোধে বাস্তুত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, তাহাদের প্রত্যাবর্তন ঘটিবে ভারত সরকার এমন আশা করিতে ছিলেন; কিন্তু আজ পর্যন্ত তাঁহাদের কোন আশাই সফল হয় নাই। পাকিস্থান সরকারের সদিচ্ছামূলক ব্যবস্থার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান হইবে আমাদের ইহা মনে হয় না। পাকিস্থানের রাজনীতিক অব্যবস্থিত অবস্থার মধ্যে তাহার স্থায়ী মূল্য কিছু বর্তিতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই এবং পাকিস্থানের রাজনীতিক অবস্থা যে দুই এক বৎসরের মধ্যে সুব্যবস্থিত হইবে, এমন সম্ভাবনাও পরিলক্ষিত হইতেছে না। এরূপ ক্ষেত্রে উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসন সম্বন্ধে পূর্ণাঙ্গ এবং সুনিয়মিত নীতি অবলম্বন করিয়া ভারত সরকারকে প্রস্তুত থাকিতে হইবে

গত সপ্তাহে মার্কিন গভর্নমেণ্টের রাষ্ট্র দপ্তর ১৯৪৫ সালের ইয়াল্টা ফারেন্সের আলোচনার বিবরণ প্রকাশ রছেন। এই বিবরণ অনেক জনের খিত নানা রিপোর্টের সমষ্টি। সিডেণ্ট রোজভেল্টের সঙ্গে ইয়াল্টার মার্কিন কর্মচারীরা গিয়েছিলেন এবং খানকার আলোচনায় উপস্থিত থাকার আলোচনা সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল থাকার যোগ পেয়েছিলেন তাঁরা যে-সব নোট, মোরাণ্ডাম বা রিপোর্ট লিখেছিলেন ইগুলিই প্রকাশ করা হয়েছে। প্রকাশ রার সময়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের ক থেকে বলা হয়েছে যে, ইয়াল্টা ম্পর্কিত এই বিবরণকে পূর্ণাঙ্গ বলা য় না কারণ আরো রিপোর্ট ছিল যেগুলি কারী দপ্তরের হাতে নাই, সে-গুলি খকদের ব্যক্তিগত কাগজপত্ররূপে তাঁদের তাঁদের ওয়ারিশদের দখলে আছে।

ইয়াল্টা কনফারেন্স-যোগদানকারী ন প্রধানের মধ্যে দুজন—প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্ট এবং মার্শাল স্টালিন—পরলোকগত। প্রধান মন্ত্রী চার্চিল কেবল জীবিত আছেন। ইয়াল্টার গোপন কথা-বার্তার বিবরণ মার্কিন সরকার প্রকাশ উদ্যত হয়েছেন জেনে বৃটিশ গভর্ন-মেণ্ট আপত্তি জানান। সে আপত্তি টেকে নি। ঠিক এই সময়ে মার্কিন সরকার কেন এইসব কাগজপত্র প্রকাশ করলেন তার কারণ সম্পর্কে নানা জল্পনা কল্পনা চলছে। শুনা যায় যে, বৃটিশ গভর্নমেণ্টের আপত্তি সত্ত্বেও মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তর কর্তৃক এই সময়ে এই গোপনীয় কাগজ-পত্রগুলি প্রকাশ করার অন্য কারণ যাই থাক বা না থাক একটা কারণ নাকি এই যে, মার্কিন সরকার জানতে পেরেছিলেন যে, কোনো উপায়ে এইসব কাগজপত্রের একটি নকল 'নিউইয়র্ক টাইমস্'-এর হস্তগত হয়েছে এবং উক্ত পত্রিকা সেগুলি ছাপার উদ্যোগ করছেন। ১৭ই মার্চ তারিখে পর-রাষ্ট্র দপ্তর থেকে কাগজপত্রগুলি প্রকাশ না করলেও তার পরের দিন 'নিউইয়র্ক টাইমস'-এ সেগুলি নাকি বেরুত। এই খবর নাকি একটি প্রতিদ্বন্দ্বী কাগজের কর্তারা পররাষ্ট্রদপ্তরকে দেন এবং তারই ফলে 'নিউইয়র্ক টাইমসের' scoop করার সুযোগ নষ্ট হয়। কিন্তু গভর্নমেণ্ট যদি মনে করতেন যে এই সময়ে এইসব কাগজ-পত্র প্রকাশ করা আমেরিকার জাতীয় স্বার্থের পক্ষে খুব ক্ষতিকর হবে এবং 'নিউইয়র্ক টাইমস' প্রকাশ না করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানাতেন তবে 'নিউইয়র্ক টাইমস্' সে অনুরোধ সরা-সরি উপেক্ষা করতেন, এরূপ মনে হয় না। সুতরাং মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তর বেকায়দায় পড়ে এইসব প্রকাশ করেছেন এরূপ মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। তবে আসল কারণটা যে কী তাও স্পষ্ট করে মিঃ ডালেস বলতে চান না।

ইয়াল্টা কনফারেন্সের পরে মাত্র দশ বছর অতীত হয়েছে, এত তাড়াতাড়ি এইরকম কনফারেন্সের গোপন কথাবার্তা প্রকাশ করার রেওয়াজ নেই। লোকে বলবে, এইরকম করলে মিত্র গভর্নমেণ্টের কর্তা-দের পক্ষেও মন খুলে মার্কিন গভর্ন-মেণ্টের সঙ্গে কথাবার্তা বলা মুশকিল। মার্কিন গভর্নমেণ্ট যে এরূপ সমালোচনার ভয়ে কিঞ্চিৎ ভীত হয়েছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। সেই ভয়ের দরুণই একথা বার বার করে বলা হচ্ছে যে, মার্কিন পররাষ্ট্রদপ্তর যে-সব কাগজপত্র প্রকাশ করলেন তার ভিতরে এমন কোনো খবর নেই যা কোনো না কোনো আকারে পূর্বে প্রকাশিত হয় নি। যুদ্ধের পর এপর্যন্ত প্রকাশিত বহু বিশিষ্ট রাজনীতিক ও সামরিক নেতার স্মৃতিকথায় ইয়াল্টা কন-ফারেন্সের অনেক ভিতরকার খবর বেরিয়েছে। এইসব লেখকদের মধ্যে মার্কিন ও বৃটিশ উভয়ই আছে—মায় চার্চিল সাহেব পর্যন্ত। যাঁরা বলছেন যে, বর্তমান প্রকাশের ছায়া বৃটিশ ও মার্কিন সরকারের মতভেদের চিত্র খুব বেশি স্পষ্ট করে ফুটে উঠবে তাঁদের উত্তরে বলা হচ্ছে এটা কিছু নূতন খবর নয় যে, যুদ্ধের সময়ে এবং তার পরে অনেক বিষয়ে মার্কিন ও বৃটিশ নীতির মধ্যে অনৈক্য ছিল। চার্চিল প্রভৃতি বিখ্যাত লেখকদের পুস্তকেও উহা সুস্পষ্টভাবেই চিত্রিত হয়েছে। প্রকাশিত কাগজপত্রের মধ্যে এমন অনেক উক্তি আছে যাতে ফরাসীরা চটতে পারে আবার এমন অনেক জিনিস আছে যাতে জার্মানরা বিরক্ত হবে। কিন্তু সেগুলি পূর্বে অজানা ছিল তা নয়। রাজনীতিকদের সবই জানা ছিল। তবে ঠিক এই সময়ে সব একসঙ্গে বার হওয়াতে 'মিত্রদের মধ্যে' অবিশ্বাস বাড়বে, একথা অনেকে বলছেন। বিভিন্ন দেশের জনসাধারণ একটু চমকাতে পারে (চমকানো ভালোই) কিন্তু ঝানু পলিটিশিয়ানরা বিশেষ ঘাবড়াবেন বলে বোধ হয় না। জার্মানরা যে কথা শুনলে চটবে, ফরাসীরা তা থেকে কিঞ্চিৎ সান্ত্বনা পাবে, আবার ফরাসীদের যে কথা শুনে রাগ হবে জার্মানরা তাতে কিঞ্চিৎ আরাম বোধ করবে।

ইয়াল্টার গোপন কথাবার্তা প্রকাশ হওয়াতে রাশিয়ার পক্ষে আমেরিকা, বৃটেন, ফ্রান্স এবং পশ্চিম জার্মানীর মধ্যে কলহ বাধিয়ে দেবার খুব যে একটা নূতন সুযোগ কিছু হয়েছে তা মনে হয় না। কারণ ইয়াল্টার কাগজপত্র থেকে সোভিয়েট মনোভাবেরও যে পরিচয় পাওয়া যায় তাতে ফ্রান্স বা জার্মানীর মন বৃটেন ও আমেরিকার প্রতি বিরূপ হয়ে রাশিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হবে তারও কোনো কারণ নেই। বলা যায়, কাটাকাটি হয়ে মোটের উপর আন্তর্জাতিক মানসিক পরিস্থিতি যা ছিল প্রায় তাই থাকবে বলে মনে হয়।

তবুও মার্কিন সরকার কী উদ্দেশ্যে এই কাগজপত্রগুলি এখন প্রকাশ করলেন, এ প্রশ্ন থেকে যায়। এই প্রকাশনের জন্য 'মিত্রদের' মধ্যে খানিকটা অসন্তোষ সৃষ্টি হবে একথা মিঃ ডালেস অবশ্যই জানতেন। সে ঝুঁকি তিনি নিলেন কেন? ডেমোক্রেটিক পার্টির লোকেরা বলছে যে, বিদেশে আমেরিকার দুর্নাম হবে একথা জেনেও কেবলমাত্র রিপাবলিকান পার্টির দলীয় স্বার্থে একাজ করা হয়েছে। তারা বলছে, প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্টের সম্বন্ধে লোকের ধারণা খাটো করাই এর উদ্দেশ্য। প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্ট রাশিয়ার মতলব বুঝতে পারেন নি, তাঁর ভুলের জন্যই রাশিয়া অনেক সুবিধা পেয়েছে—ইত্যাদি ধারণা জন্মানোর উদ্দেশ্যেই এইসব কাগজপত্র এখন প্রকাশ করা হোল, কারণ প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্টের সুনাম নষ্ট হলে তার সংগে ডেমোক্রেটিক পার্টিরও সুনাম নষ্ট হয়।

এই ব্যাখ্যা কতদূর ঠিক বলা কঠিন। এ সম্বন্ধে সন্দেহ নেই যে, এর পিছনে পার্টি পলিটিক্স্ কিছু আছে। তবে আর একটা কথাও মনে হয়। হয়ত বৃটেনকে একটা উল্টা প্যাঁচ মারবারও উদ্দেশ্য থাকতে পারে। ফরমোজার ব্যাপারে বৃটেনে মার্কিন-নীতির উগ্রতার প্রতি সর্বদাই কটাক্ষ করা হয়। প্রেসিডেণ্ট রোজভেল্ট চীনকে হংকং দিতে চেয়েছিলেন —বর্তমান মার্কিন গভর্নমেণ্ট একথাটা বৃটেনকে মনে করিয়ে দিয়ে বৃটেনের সাধুগিরিতে একটু আঘাত দিতে হয়ত চেয়েছেন। তাছাড়া 'বিগ থ্রি' বা 'বিগ ফোরের' মিলনের জন্য যারা লালায়িত ইয়াল্টা কনফারেন্সের ভিতরের খবর প্রকাশ করে তাদের উৎসাহের উপর একটা নৈতিক আঘাত হানার চেষ্টাও হয়ত আছে।

মার্কিন গভর্নমেণ্টের উদ্দেশ্য যাই থাক, ইয়াল্টা কনফারেন্স সম্বন্ধে এই সব কাগজপত্র প্রকাশিত হয়ে ভালোই হয়েছে। চার্চিল সাহেব বলেছেন মার্কিন বিবরণে। ভুল আছে এবং সেটা সর্ববাদী-সম্মত বিবরণও নয়। ভুল হয়ত আছে। বৃটেনের তরফের লোকেদের রিপোর্টে কোনো কোনো বিষয় হয়ত কিছু ভিন্নভাবে লিখিত হয়েছে। তেমনি রাশিয়ার তরফের রিপোর্টসমূহেও নিশ্চয়ই কোনো কোনো বিষয়ের বিবরণ কিঞ্চিৎ আলাদা হবে। কিন্তু মোটের উপর কোন্ কর্তা কী চেয়েছিলেন এবং কিসের জন্য কী দর হেঁকেছিলেন বা পেয়েছিলেন সে সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ নেই। তথাকথিত 'গ্রেট পাওয়ার'দের আসল নৈতিক রূপ যে কী সে সম্বন্ধে সাধারণ লোকের ধারণা যত পরিষ্কার হয় ততই ভালো। কারণ বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন যদি কখনো সম্ভব হয় তবে তা সকল দেশের সাধারণ মানুষের জ্ঞান ও ইচ্ছাশক্তির চাপেই সম্ভব হবে।

২২।৩।৫৫

সাহিত্যে সংকট

প্রবোধশঙ্কর রায়

১১

নব ব্রহ্মাণ্ড

বৈজ্ঞানিকরা যেমন গত শতাব্দীতে ববর্তনবাদ ও পরমাণুবাদ প্রভৃতি কয়েকটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্যিকদের মানসেও বিপ্লব এনেছিলেন তেমনি এ শতাব্দীতে Relativity ও Quantum Theory প্রভৃতি আরো কয়েকটি তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করে সাহিত্যিকদের মনকেও চঞ্চল করে তুলেছেন।

আগেকার দিনে স্পেস আর টাইম প্রত্যেকের তিনটি করে dimension ছিল, এখন স্পেস আর টাইম মিলে স্পেসটাইম হয়ে গেছে। এই স্পেসটাইম নামক অদ্বৈত continuum-এর চারটি dimension। একে যদি স্পেসের দিক থেকে দেখা হয় তা হলে চতুর্থ dimension-এর নাম টাইম। আর যদি টাইমের দিক থেকে দেখা হয় তা হলে চতুর্থ dimension-এর নাম স্পেস। ঐ স্পেসটাইম হলো সসীম বিশ্ব। তার সীমানা নেই, কিন্তু সীমা আছে।

আগেকার দিনে গ্রহ-নক্ষত্রের গতি-বিধিকে মাধ্যাকর্ষণের সাহায্যে বোঝানো হতো এখন তার দরকার হয় না। স্পেসটাইমের গড়ন এমন যে গ্রহনক্ষত্র যেভাবে চলাফেরা করে, সেইটেই তাদের পক্ষে স্বাভাবিক। ইউক্লিডের জ্যামিতির মতো সরল রেখা কোনখানে নেই। রেখামাত্রেই বক্র। নিউটনের মাথায় ঘুরছিল সরল রেখা। আইনস্টাইনের মাথায় ঘুরছে বক্র রেখা। তারপর matter বলতে শেষ পর্যন্ত particle বা কণিকা বোঝাত। এখন বোঝায় event বা ঘটনা। এর ফলে বৈজ্ঞানিকদের নিজেদেরই ধারণায় বিপ্লব ঘটে গেছে। সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁদের বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচয় আছে তাঁদেরও। Quantum Theory এনেছে continuity-র জায়গায় discontinuity। ঘটনার সঙ্গে ঘটনার পারম্পর্য না থাকায়, সুতো ছিঁড়ে যাওয়ায়, কার্যকারণ সম্পর্কের সনাতন ধারণাটাতেও সংশয় এসে পড়েছে। কার্যকারণ সম্পর্ক যদি না থাকে, তাহলে তা কেবল বিজ্ঞানের বেলায় খাটবে না, দর্শনে ইতিহাসে সাহিত্যে জীবন-যাত্রায়ও খাটবে। অরাজকতা বাড়বে বই কমবে না। বৈজ্ঞানিকরা নিজেরাই কার্য-কারণ সম্পর্ক অস্বীকার করতে অনিচ্ছুক।

আমরা একটা অদ্ভুত বিশ্বে বাস করছি। এ-বিশ্ব চিত্রনীয় নয়। এর ছবি আঁকা যায় না। এ বিশ্ব অতি দ্রুতবেগে প্রসারিত হচ্ছে। যে হারে প্রসারিত হচ্ছে, সে হার থেকে অনুমান করা যায়, এর আদি অপেক্ষাকৃত অল্পকাল হলো হয়েছে। এ অনাদি নয়। অসীম তো নয়ই, অনাদি যদি না হয়, তবে এর অন্ত আছে।

তাহলে চিরন্তন বলে রইল কী? ঈশ্বর থাকলে ঈশ্বর, নইলে শূন্য। বিজ্ঞানকে আরো অন্বেষণ করতে হবে। এসব তত্ত্ব বিজ্ঞানের শেষ কথা নয়। তবু এগুলিকে শেষ কথা বলে মেনে নেওয়া হয়েছে। সাহিত্যিকরা বৈজ্ঞানিকদের গুরুর আসন দিয়েছে। সাহিত্যের উপর বিজ্ঞানের প্রভাব চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো শক্ত। কিন্তু বহু লেখকের বহু রচনা যে গত শতাব্দীর বিবর্তনবাদের দ্বারা ও বর্তমান শতাব্দীর আপেক্ষিকতার দ্বারা প্রভাবিত তার সন্দেহ নেই। তাছাড়া 'discontinuity বা ধারাভঙ্গ এ-কালের সাহিত্যের অন্যতম বিশেষত্ব।

"We are used to regarding certain processes as essentially continuous. Motion, for instance, we regard as a continuous process. We do not suppose that a 'moving body progresses by discontinuous' jumps, being annihilated at a point and re-created at another point a little further on. Similarly. we suppose that time progresses continuously. We do not suppose that there are timeless intervals between successive instants of time. Motion and time are merely two examples from the class of continuous quantities, all of which are characterised by the fact that they can be subdivided indefinitely ....In fact we do not believe that any natural process whatever occurs in a continuous manner. Even time, it has been thought, may be atomic in constitution." (J. W. N. Sullivan).

বিজ্ঞান সব সময় পথ দেখাবে আর সাহিত্য তার পিছু পিছু চলবে, এটা ঠিক নয়। সাহিত্য তার নিজস্ব সত্যের অন্বেষণ করুক। এমন কি হতে পারে না যে, সাহিত্যই পথ দেখাবে, বিজ্ঞান অনুসরণ করবে? বিজ্ঞানে অচলা ভক্তি

সাহিত্যিকের ধর্ম নয়। সাহিত্যিকের ধর্ম সত্যে অচলা ভক্তি।

১২

বস্তুবাদী ব্যাখ্যা

বস্তু আছে কি না, তাই এখন সন্দেহ। তবু বস্তুবাদী ব্যাখ্যার প্রেস্টিজ দিন দিন বাড়ছে। কারণ এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করে দু-দুটো মহাবিপ্লব ঘটে গেছে রুশ দেশে আর চীন দেশে। ওসব দেশের সাহিত্যিকদের কাছে বস্তুবাদী ব্যাখ্যা একেবারে অভ্রান্ত। বেদ কিংবা কোরানের মতো। অন্যান্য দেশের সাহিত্যিকদেরও জীবনের একটা অধ্যায় এর দ্বারা প্রভাবিত। এ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের কথা বলছি।

"At a certain stage of development the material productive forces of society come into conflict with the existing productive relations, or (to express the matter in legal terminology), with the property relations within which they have hitherto moved. These relations, which have previously favoured the development of the forces of production now become fetters on production. A period of social revolution then begins concomitantly with the change in the economic foundation, the whole gigantic superstructure is more or less rapidly transformed". (Marx quoted by Plekhanov).

"Political, legal, philosophical, literary, artistic, etc. development is grounded upon economic development. But all of them react, conjointly and separately, one upon another, and upon the economic foundation." (Engels quoted by Plekhanov: "Fundamentals of Marxism.")

আচ্ছা, ধরে নেওয়া যাক যে, এসব থিওরি অভ্রান্ত। যুগে যুগে উৎপাদনের প্রণালীগুলোর উন্নতি হয়, তখন উৎপাদনে নিযুক্ত শ্রেণীগুলোর সামাজিক সম্পর্কগুলোয় সংঘর্ষ বেধে যায়। সংঘর্ষে একদা বুর্জোয়ার জয় হয়েছে, এবার শ্রমিকের জয় অবশ্যম্ভাবী। অর্থনৈতিক ভিত্তি বদলে গেলে ভিত্তির উপর দাঁড়িয়ে থাকা প্রাচীর ও চূড়া পর্যন্ত বদলে যাবেই। সাহিত্য বলো, ধর্ম বলো, দর্শন বলো, রাজনীতি বলো সবকিছুর রূপান্তর ঘটবেই। তা তো হলো, কিন্তু রুশ বিপ্লবের পর আটত্রিশ বছর কাটল। ভিত্তির পরিবর্তন যা হলো, তা আশ্চর্য ব্যাপার। কিন্তু প্রাচীর-চূড়ার রূপান্তর যা হলো, তা তেমন কিছু নয়। এমন ক'খানাই বা বই লেখা হলো, যা ক্লাসিক হয়েছে বা হবে? টলস্টয়, ডস্টয়েভস্কি, টুর্গেনিভ, চেখভ প্রভৃতির কীর্তিকে অতিক্রম করেছে বা করবে? নতুন কোন আর্টফর্মের উদ্ভব হয়েছে বলেও শোনা যায়নি। হবার মধ্যে হয়েছে নতুন উপাদান, কিন্তু উপাদানের ব্যবহারে দক্ষতা ও স্বাধীনতা না থাকলে, কোনটার কী মূল্য জানা না থাকলে বৃহৎ সৃষ্টি সম্ভবপর কি? অবশ্য আটত্রিশ বছর এমন কিছু বেশি সময় নয়। পরে হয়তো মহৎ সৃষ্টি হবে। তবু একথা স্বীকার করা ভালো যে, পদার্থ বিজ্ঞানে যে ব্যাখ্যা খাটে, প্রাণীবিজ্ঞানে তা খাটে না, প্রাণীবিজ্ঞানে যে ব্যাখ্যা খাটে, সমাজবিজ্ঞানে তা খাটে না, সমাজবিজ্ঞানে যে ব্যাখ্যা খাটে, দর্শনে বা সাহিত্যে সে ব্যাখ্যা খাটে না। একই চাবী দিয়ে সব কটা তালা খুলবে, এ দাবী অচল। ধর্মশাস্ত্রীদেরও অনুরূপ দাবী ছিল, এখনো মন থেকে যায়নি।

তার পর অর্থনীতি যদি দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য ও ললিতকলার ভিত্তিশিলা হয় অর্থনীতির ভিত্তিপাষাণ হবে প্রাণীবিজ্ঞান আর প্রাণীবিজ্ঞানের ভিত্তিশৈল পদার্থ বিজ্ঞান। খোদ পদার্থ বিজ্ঞানেরই যদি আমূল পরিবর্তন ঘটে, তবে এসব থিওরি খাড়া থাকে কিসের জোরে। আসল কথা, আজকের সমাজে ন্যায় নেই, ন্যায় চাই। সোশ্যাল জাসটিসই বস্তুবাদের প্রেরণা জোগায়। সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠিত হলে বস্তুবাদী ব্যাখ্যার অবসান হবে।

১৩

অমানবিকতা

প্রথম মহাযুদ্ধের শেষ থেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে পৌঁছতে একুশ বছর লাগল। এই একুশ বছর যে প্রকৃতপক্ষে একটা যুদ্ধবিরতি, কখনো একথা আমাদের মনে হয়নি। আমরা কেউ কল্পনা করিনি যে, আবার যুদ্ধ বাধবে ও শিবির দুটো মোটামুটি একই রকম হবে। কল্পনা যারা করত, তাদের ধারণা ছিল যু[illegible] বাধবে বিপ্লবী শক্তির সঙ্গে প্রতিবিপ্লবী শক্তির। শিবির দুটো অন্যভাবে গঠিত হবে।

যেভাবে শিবির বিভক্ত হলো, তা বিস্ময়কর। কিন্তু তার চেয়েও বিস্ময়জনক যেভাবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরিচালিত হলো। জার্মানীর মতো শিক্ষাদীক্ষায় অগ্রসর দেশ ক'টা আছে। পাশ্চাত্ত্য সভ্যতার গৌরব যাঁরা, তাঁদের অনেকের জন্মভূমি জার্মানী। দর্শনে বিজ্ঞানে সংগীতে ও সাহিত্যে জার্মানদের কীর্তি অবিনশ্বর। সেই দেশেই লক্ষ লক্ষ নাগরিককে বিনা বিচারে কয়েদ করা হলো, কয়েদীদের গ্যাস দিয়ে হত্যা করা হলো। এদের কতক ইহুদী, কতক খাঁটি জার্মান। জার্মানীর বাইরে পোলাণ্ডে হত্যা করা হলো যাদের, তাদের কতক ইহুদী, কতক শ্লাভজাতীয় পোল। এরূপ ঘটনা বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সংঘটিত হতে পারে এটা স্বয়ং জার্মানদেরই অবিশ্বাস্য। সব ইউরোপীয় জাতির এতে মাথা হেঁট

সভ্যতার গর্ব ধুলোয় মিশিয়ে গেছে। যুদ্ধক্ষেত্রে অবশ্য অনেক অঘটনই ঘটে থাকে, কিন্তু সেসব যারা করে, তাদের রক্ত গরম, তারা ক্রোধান্ধ। এক্ষেত্রে দেখা গেল মাথা ঠাণ্ডা রেখে অঙ্ক কষার মতো মশা মাছি মারা হয়েছে।

সভ্য জগৎ জার্মানীকে একঘরে করতে পারত, কিন্তু কে কাকে একঘরে করবে? অমন যে রাষ্ট্রপতি রুজভেল্ট—যাঁকে শ্রদ্ধা করে পৃথিবীর সব দেশের লোক—সেই মানুষ কি না অনুমতি দিলেন পরমাণু বোমা ফেলতে। পড়ল সেটা হিরোশিমায়। লাখখানেক জাপানীর উপর যেন ইন্‌সেকটিসাইড ছড়িয়ে দেওয়া হলো। অধিকাংশই নিরীহ নিরস্ত্র বালবৃদ্ধ-বনিতা। যারা বাঁচল তাদের যন্ত্রণার সীমা নেই।

এই যদি সভ্যতা হয়, তবে অসভ্যতার সংজ্ঞা কী?

অথচ যুদ্ধ বাধলে যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনে যে যত দূর যেতে পারে, তত দূর যাবেই, ধর্মের কাহিনী শুনবে না। সভ্যতা যদি ধ্বংস হয় হবে। তার জন্যে মাথাব্যথা নিষ্প্রয়োজন। প্রয়োজন হচ্ছে যুদ্ধজয়। একবার যুদ্ধজয়ের প্রয়োজন স্বীকার করে নিলে তার পরে মানুষের ইচ্ছা-অনিচ্ছা, সম্মতি-অসম্মতি ইত্যাদি অবান্তর। লক্ষ লক্ষ লোকের মনোনয়ন বা সিদ্ধান্ত বলে কিছু নেই। তারা ইচ্ছা করলে স্থানত্যাগ করতে পারে না, করলেও যেখানে যাবে, সেখানেও তাদের মাথার উপর ইন্‌সেকটিসাইড ছড়ানো হতে পারে কিংবা সেখানেও কীটমারীর ক্রিয়া চলতে থাকা অসম্ভব নয়। যারা ছড়াবে, তাদেরও কি মনোনয়ন বা সিদ্ধান্ত বলে কিছু আছে! তারা কনসক্রিপ্ট বা আজ্ঞাদাস। আজ্ঞা আসবে দু-চারজন রাষ্ট্র-বিধাতার মস্তিষ্ক থেকে। সে মস্তিষ্কে বিবেকের ঘরে শূন্য। যুদ্ধজয়ই সে মস্তিষ্কের একমাত্র সঞ্চালিকা শক্তি।

আগেকার দিনে তবু যুদ্ধের সময় যুদ্ধ, শান্তির সময় শান্তি ছিল। এখন দেখা যাচ্ছে, শান্তির সময় শান্তি নয়, শীতল যুদ্ধ। এক্ষেত্রেও যুদ্ধজয়ের প্রয়োজন আছে। সেই প্রয়োজন থেকে প্রচারণা বা প্রোপাগাণ্ডা। মিথ্যা বলতেই হবে, কারণ সত্য বললে যুদ্ধে পরাজয় ঘটবে। ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা সম্মতি-অসম্মতি অবান্তর। মনোনয়ন বা সিদ্ধান্ত সাধারণের জন্যে নয়। মিথ্যা বলতে হবে, শুনতে হবে, পড়তে হবে, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বাস করতে হবে যে, ওই সত্য। আসল সত্যকে চাপা দিতে হবে, নেহাৎ যদি সেটা সম্ভব না হয়, তবে তার সঙ্গে মিথ্যার ভেজাল দিতে হবে, অর্ধ সত্যকে প্রকৃত সত্য বলে চালাতে হবে। বিবেকের প্রশ্ন তুললে দেশ দুর্বল হয়ে যাবে, ধর্মের কাহিনী শোনালে দেশের লোক কাপুরুষ বনে যাবে। সুতরাং ওসব তোলা থাক অনির্দিষ্টকাল।

যেসব প্রতিজ্ঞার উপর মানবিকতা বা হিউমানিজম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, সেসব একে একে পরিত্যক্ত হচ্ছে। কথায় না হোক কাজে। মানুষের প্রাণ মূল্যবান, তার স্বাধীনতা মূল্যবান। বিনা বিচারে কেউ তার প্রাণ কেড়ে নিতে পারবে না, তার স্বাধীনতা হরণ করতে পারবে না। তার ইচ্ছা না থাকলে কেউ তাকে দিয়ে হত্যা করাতে পারবে না, মিথ্যা বলাতে পারবে না। তার বিবেক মূল্যবান, তার মনোনয়ন মূল্যবান। তার সিদ্ধান্ত মূল্যবান। আদেশ যদি তার বিবেকবিরোধী হয় বা মনোনয়নের অপেক্ষা না রাখে বা সিদ্ধান্তের প্রতি গুরুত্ব না দেয় আর সে আদেশ যদি সে মানে বা মানতে বাধ্য হয়, তাহলে তাকে মানবিক বলা চলবে না।

দৈবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়েই আধুনিকতার ও মানবিকতার উদয় হয়। আধুনিকতা বলতে সময় অনুসারে আধুনিকতা বোঝায় না, বোঝায় মনোভাবের দিক থেকে আধুনিকতা। আর মানবিকতা বলতে সব মানুষের এক-একটা মোটর-গাড়ি আর রেডিও আর থাকা-খাওয়ার সুবন্দোবস্ত বোঝায় না, বোঝায় সব মানুষের নিজের মনের মতো করে বাঁচা, নয়তো নিজের মনের মতো করে মরা।

১৪

মুষলপর্ব

মনে হয় ফাউস্ট ইতিমধ্যে তার আত্মা হারিয়ে বসে আছে। তার প্রগতির তাহলে

মূল্য কী? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে প্রগতির উপর এখনো যাঁদের বিশ্বাস আছে, তাঁদের সবাইকে। গত কয়েক শতাব্দীর মানবগৌরব যে হঠাৎ এভাবে ধূলিসাৎ হলো, এর ফলে হিউমানিস্টদের আত্মপ্রত্যয় কমে আসছে। কী করে যে হিউমানিজমকে আবার মাটি থেকে তুলে দাঁড় করানো যায়, এ ভাবনা এখন তাঁদের চিত্ত জুড়েছে। এতদিন তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে, তাঁদের পয়লা নম্বর প্রতিপক্ষ ক্যাথলিক ধর্মসঙ্ঘ। দোসরা নম্বর প্রতিপক্ষ কমিউনিস্ট মতবাদ। এখনো তাঁরা Liberty, Justice, Reason এই ক'টি কথা জপমালার মতো জপছেন। যেন দুনিয়া এখনো দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী অবস্থায় আছে।
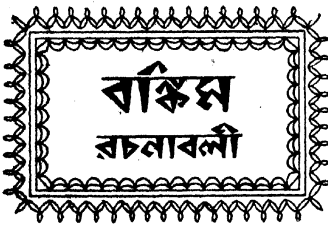
মানুষকে যে শান্তিকালেও কনসক্রিপ্ট করা হচ্ছে, যুদ্ধকালে তার মাথায় ফেলার জন্যে যে হাইড্রোজেন বোমা নির্মাণ করা চলেছে, এর চেয়ে বড় প্রতিপক্ষ আর কে হতে পারে! এ যে সমুদায় মানব-মূল্য সম্পূর্ণ অস্বীকার করা। এরকম অস্বীকৃতির উপর সাহিত্য দাঁড়াতে পারে না। সাহিত্যের একটা অদৃশ্য ভিত্তি আছে। মানবমূল্য। মানুষ মূল্যবান বলেই সাহিত্য মূল্যবান। মানুষের যদি মূল্য না থাকে, সে যদি হয় কীটপতঙ্গ বা ক্রীতদাস, তাহলে সাহিত্যেরও মূল্য নেই।

হিউমানিজমের তেসরা প্রতিপক্ষ আজকের দিনের উভয় তাঁবুর অভ্যন্তরেই। কী করে মারণাস্ত্রের উপর কণ্ট্রোল স্থাপন করা যায়, এইটেই মুখ্য। কণ্ট্রোল স্থাপন করা না করার উপর হিউমানিজমের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। শুধু হিউমানিজমের নয়, হিউমানিটিরও। মানব-মূল্য লোপ পেলে যা থাকবে, তা দানব-মূল্য। আর মানব জাতি লোপ পেলে যা থাকবে, তা কার কোন্ কাজে লাগবে!

এখানে হিউমানিজম সম্বন্ধে গোড়ার কথা বলা দরকার। মানবিকতাবাদ মানব ইতিহাসে প্রচ্ছন্নভাবে বরাবরই ছিল, কিন্তু তার প্রকাশ্য অনুশীলন পঞ্চদশ শতাব্দী থেকে। একদা ডিভাইনকে কেন্দ্র করে যাবতীয় ব্যাপার চলত, যারা চালাত, তাদের অথরিটির উৎস ছিল ডিভাইন বা সুপার ন্যাচারাল। অন্তত তারা তাই দাবী করত। ডিভাইনকে না করে হিউমানকে কেন্দ্র করে সমস্ত ব্যাপার চলবে, এই বিদ্রোহ থেকে হিউমানিজমের সূত্রপাত। প্রাচীন গ্রীক নাটকে প্রোমিথিউসের বিদ্রোহের সঙ্গে এর তুলনা। এবার প্রোমিথিউস বন্দী নয় প্রোমিথিউস বন্ধনমুক্ত। শেলীর সেই বিখ্যাত নাটকে হিউমানিজমের মর্মকথা ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু বন্ধনমুক্তকে যে আবার বন্দী করার তোড়জোড় চলেছে। যুদ্ধে কে জিতবে জানা নেই, কিন্তু তার আগেই শৃঙ্খলিত হবে প্রোমিথিউস।

১৫

প্রাঙ্‌মানবিকতা

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তার বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ করে ভারতের লোক যে নৈতিক উচ্চতায় উঠেছিল, তার নজির নেই। গৌরবে আমাদের মাথা আকাশে ঠেকেছিল, কিন্তু তার পরে যেসব ঘটনা ঘটল, তাতে আমাদের সকল অহঙ্কার চোখের জলে ডুবল।

অন্যত্র যা দেখা গেল, তা অমানবিকতা। এখানে যে দৃশ্য দেখলুম, তা প্রাঙ্-মানবিকতা। কারণ বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ধর্ম নিয়ে হানাহানি মানুষের মনকে পাঁচ শতাব্দী আগে নিয়ে যায়। যখন মানবিকতার পত্তন হয়নি। যখন অন্ধকার যুগ চলছে।

ওখানকার মানবিকতার সমস্যা হচ্ছে কণ্ট্রোল, আর এখানকার মানবিকতার সমস্যা হচ্ছে সেক্যুলার মনোভাব। আমরা এ বিষয়ে সচেতন হয়েছি, তবু আত্ম-সন্তোষের সময় এখনো আসেনি। সাহিত্য তো আকাশকুসুম নয়, আসমানে ফোটে না, তার জন্যে জমিন চাই। আধুনিক সাহিত্যের জমিন সব দেশেই সেক্যুলার। নয়তো সে আধুনিক নয়, মধ্যযুগের অবশেষ।

সেক্যুলারিজম সম্বন্ধে একটা ভ্রান্তি আছে। সেইজন্যে পরিষ্কার করে বলা দরকার ও জিনিস ধর্মে অবিশ্বাস নয়, ধর্মে সংশয় নয়, রাজনীতি থেকে ধর্মের নির্বাসন নয়। রাষ্ট্রকে বিশেষ একটি ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে অভিন্ন করে দেখার বিরুদ্ধেই ওর অভিযান। রাষ্ট্র অধিকাংশের নয়, সর্বসাধারণের। নাস্তিকেরও, সংশয়বাদীরও। অধিকাংশের বিশ্বাস অধিকাংশের থাকুক, কিন্তু বাদবাকীর উপর যেন তা চাপিয়ে দেওয়া না হয়। চাপিয়ে দেওয়ার অনেক রকম পদ্ধতি আছে। ছল বল কৌশল এর যে কোন একটি পদ্ধতি নিন্দনীয়।

আধুনিক সাহিত্যের অদৃশ্য ভিত্তি মানবিকতা। আমাদের এ দেশে রাম-মোহনের সময় এর গোড়াপত্তন হয়েছে। এই ভিত্তিকে দৃঢ় করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ। আমরা যদি একে দৃঢ়তর না করতে পারি, তাহলে দুই দিক থেকে এর উপর আঘাত আসবে। একটা অমানবিকতা। আর একটা প্রাঙ্-মানবিকতা এবং আঘাতে আঘাতে

ভিত চৌচির হয়ে যাবে। তখন আমরা সাহিত্য গড়ব? কিসের উপর গড়ব? ইউরোপীয় সাহিত্যগুলোর মধ্যে সমস্যা একমাত্র জার্মান সাহিত্যে সেছে। ইহুদীবিরোধী মনোভাব প্রাগু-নবিক। আর গ্যাসচেম্বার সমর্থক নাভাব অমানবিক। তাই সে সাহিত্যে শেষ কিছু হচ্ছে না। গ্যয়টের দেশের হিত্যের যদি দেড়শো বছর পরে এমন শা হয়, তাহলে রবীন্দ্রনাথের দেশের হিত্যের কেমন দশা হবে, তা অনুমান রা কঠিন নয়। আমরা মানুষ হিসেবে তটা নেমে যাব, মানুষকে যতটা সস্তা রব, আমাদের সাহিত্য ঠিক ততটা লোহীন হবে।

১৬

নির্মোহ

এবারকার মহাযুদ্ধের পর মোহভঙ্গ ঘটেনি। মোহ থাকলে তো মোহভঙ্গ ঘটবে। মোহ যেটুকু ছিল, সেটুকু আমাদের মতো লোকের ছিল। স্বরাজের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের স্বপ্ন ছিল স্বর্ণযুগের বা সত্য যুগের পুনরাবৃত্তি। তেমনি বিপ্লবের স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের [illegible]দের স্বপ্ন। সে স্বপ্ন এখনো মধুর। অবশ্য সেটা পুনরাবৃত্তির নয়, নব আবির্ভাবের।

মানুষ এখন ঘরপোড়া গোরুর মতো সন্দিগ্ধ। মোহ একদা মানুষকে সৃষ্টির প্রেরণা দিয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মতো এত রকম স্বপ্নই বা কোথায়। এত রকম সৃষ্টিই বা কোথায়। বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বপ্ন দেখতে সাহস হয় না, সৃষ্টি করতে গেলে দেখি প্রেরণার অভাব। নিতান্ত আটপৌরে বাস্তব নিয়ে কি সাহিত্য হয়? সাহিত্যে বাস্তবের সঙ্গেও ধ্যান মেশানো থাকে। সেকালের রিয়ালিস্টদেরও একটা না একটা ধ্যান ছিল। একটা না একটা আদর্শ ছিল।

নইলে বাস্তববাদী সাহিত্যিক Zola কেন করতেন Dreyfus নামক অচেনা অজানা অবিচারিতের জন্যে নিঃস্বার্থভাবে সংগ্রাম, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে সংগ্রাম।

আমাদের দৃষ্টি এখন এই শতাব্দী অতিক্রম করতে পারছে না। সামনে ফাঁড়া। এ ফাঁড়া না কাটলে আমরা ভাবতে পারছিনে একবিংশ শতাব্দীতে কী আসছে, কী আসা উচিত, কী এলে আমরা তৃপ্ত হব। ন বিত্তেন তর্পণীয়ো মনুষ্যঃ। সকলে স্বচ্ছল অবস্থায় দিনপাত করবে এটা এমন কী একটা বড় কথা! ইংলণ্ডে আজকাল অধিকাংশ ব্যক্তির স্বচ্ছল অবস্থা। কিন্তু ইংরেজ সাহিত্যিকরা আজ সৃষ্টির প্রেরণা পাচ্ছে না। নূতন কোনো স্বপ্ন না দেখলে জীবনটা নিতান্তই মামুলি লাগবে। নিত্য নতুন ব্যসন বা অপরাধ দিয়ে তাকে ভরিয়ে তুললে উত্তেজনার অভাব হয় না, কিন্তু সাহিত্য চায় অন্তর্জীবনের সমৃদ্ধি। সেই জন্য কারো কারো নতুন করে ধর্মে মতি হচ্ছে। এখানেও।

ধর্মে মতি যদি সাহিত্যে সোনার ফসল ফলায় তা হলে মন্দ কী! সোনার ফসল কিন্তু লেখকের বা প্রকাশকের সিন্দুক ভরানোর মতো সোনা নয়। সাহিত্যের আঁচল ভরানোর মত সোনা। সাহিত্য আজ যেখানে এসে পৌঁচেছে, সেখানে দেবতার চেয়ে মানবেরই মূল্য বেশী। নারায়ণের চেয়ে নরেরই মাহাত্ম্য বেশী। আধুনিক সাহিত্য মধ্যযুগের মতো ডিভাইন কেন্দ্রিক নয়, হিউমান কেন্দ্রিক। এর কেন্দ্র আবার সেই পাঁচশো বছর আগে ফিরে গেলে প্রাগমানবিক মূল্য-গুলোকে সাহিত্যে ফিরিয়ে আনা হবে। মানবিক মূল্যগুলোকে সাহিত্য থেকে বহিষ্কার করা হবে। দর্শন হয়ে দাঁড়াবে থিওলজি, কাব্য হয়ে দাঁড়াবে মঙ্গলকাব্য, কথাও হয়ে দাঁড়াবে ব্রতকথা।

আধুনিক সাহিত্যের কারবার মানুষকে নিয়ে, ভালোয় মন্দে মেশা রক্তে-মাংসে তৈরি স্বাধীন ইচ্ছাচালিত স্বভাবসুস্থ বিবেকসম্পন্ন আত্মসমাহিত মানুষকে নিয়ে। আমরা দেবতা গড়তে বসিনি, মানুষ আঁকতে বসেছি। দেবতা যদি গড়তে চাও তো দেবতাকে মানুষ করো। মানুষকে দেবতা কোরো না। সে কাজ আধুনিক সাহিত্যের নয়।

(১৭)

কেন বাঁচব ?

ভরা ভোগের মাঝখানেও একটি প্রশ্ন দিন দিন জরুরী হয়ে উঠছে। কেন বাঁচব ?

প্রথম মহাযুদ্ধের পর একুশ বছর বাঁচবার মেয়াদ পাওয়া গেছল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ততদিন পাওয়া যাবে এ ভরসা নেই। জীবনকাল যদি সংক্ষিপ্ত হয়ে থাকে, তা'হলে কেন বাঁচব এই প্রশ্নের উত্তর জেনে কী হবে?

হাইড্রোজেন বোমা অবশ্য কাল সকালে পড়ছে না, কিন্তু তার পড়া না পড়ার উপর সাধারণ মানুষের হাত নেই। আগে তবু পালাবার পথ ছিল। এবার তাও বন্ধ। সুতরাং লোকে বেবাক অদৃষ্ট-বাদী। তাই যদি হলো তবে কেন বাঁচব এ প্রশ্ন কেন ওঠে?

তবু ওঠে। মানুষ স্বভাবত বাঁচতে চায়। কিন্তু কোনো কোনো যুগে এর বিপরীতটাও দেখা যায়। মানুষ মরতে চায়। সে যদি তার নিজের মনের মতো করে বাঁচতে না পারে, কিংবা সার্থকভাবে বাঁচতে না জানে, তা হলে বিপরীত ইচ্ছাটাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। মরণকামনা বা deathwish এ যুগের মানুষের ভিতর কাজ করছে। অনেকের মতে এটা যুদ্ধবিগ্রহের ফল নয়, বরং এইটেই যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল। মানুষ মরতে চায় বলে যুদ্ধ চায় ও যুদ্ধে যায়। পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে ছুটে যায় মানুষ তেমনি মৃত্যুর দিকে। সেই জন্যেই যুদ্ধ এড়াতে বা নিবারণ করতে তার তেমন চাড় নেই। নইলে এত ঘন ঘন যুদ্ধ বাধত না। আর যেসব কারণ ইতিহাসে লেখে সে সব অগভীর। এইটেই গভীর। আধুনিক জীবনযাত্রায় এত বেশী বিশ্বাসভঙ্গ আশাভঙ্গ মোহভঙ্গ, এত বেশী frustration যে মানুষ মানে মানে মরতে পেলে বাঁচে। যুদ্ধে মরার মতো সম্মান তো আর নেই।

শিল্পবিপ্লবের পর থেকে কর্মবিভাগ এমনভাবে হয়েছে যে কোনো একজন মানুষ আস্ত একটা কাজ করতে পায় না। টুকরো টুকরো কাজ পুনঃ পুনঃ করতে করতে তার কাজে অরুচি ধরে যায়। সে কাজ তার স্বধর্ম নয়। দিনের পর দিন পরধর্ম আচরণ করতে করতে তার জীবনে বিতৃষ্ণা আসে। তারপর কাজের মজুরী ক'জনের বেলায় জীবনধারণের পক্ষে যথেষ্ট? কোনো কারণে কাজটাই যদি চলে যায় তা'হলে তার অবলম্বন চলে যায়, আত্মবিশ্বাস চলে যায়। ঈশ্বরে বিশ্বাস না থাকলে কেন বাঁচব এ প্রশ্ন উঠবেই।

সাহিত্যিকরা এর খুব সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারছেন না। কেবল বস্তু-বাদীদের একটা বাঁধা উত্তর আছে। সমাজ-বিপ্লবেই অভিনব জীবন। অর্থপূর্ণ জীবন। কথাটা মিথ্যা নয়। সমাজবিপ্লবে অভিনবত্ব আছে, অর্থ আছে। সমাজ-বিপ্লব গতানুগতিকের উপর রং ফলানো নয়। কোনো মতে টিকে থাকার মতো নিরর্থক নয়। বস্তুবাদী সাহিত্যিকরা যে আজ উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছেন আর অন্যান্য সাহিত্যিকরা স্বপ্নভঙ্গের পর নতুন কোনো স্বপ্ন দেখতে পারছেন না; কেবল ষষ্ঠীপূজো আর লক্ষ্মীপূজো করে যাচ্ছেন, এটা তো প্রত্যক্ষ সত্য। গালাগালি দিয়ে এটাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা যায় না।

তবু যারা সাহিত্যের কাছে গভীর সুরে প্রশ্ন করছে, কেন বাঁচব, কেমন করে বাঁচব, তারা গভীর সুরে উত্তর পাচ্ছে কারো কাছে। লক্ষ্মীপূজক বা ষষ্ঠীপূজকদের কাছে তো নয়ই, সমাজবিপ্লবীদের কাছেও না। জীবনের যে [illegible] এ'রা আঁকছেন, এ'কে দেখাচ্ছেন, তা [illegible] জীবনে উৎসাহ জাগে না কোনো সি[illegible] কারের জীবনজিজ্ঞাসুর। উদ্দেশ্য সি[illegible] জন্যে সব রকম উপায় অবলম্বন কর[illegible] হবে। End justifies means [illegible] হলো এ'দের নীতি। ক্ষমতা হাত ক[illegible] জন্যে মিথ্যা বলো, খুন করো, আগুন দ[illegible] লুঠ করো—পাপ হবে না। ক্ষমতা হা[illegible] পেয়ে লক্ষ লক্ষ লোককে নিপাত ক[illegible] বিনা বিচারে গুলী করো, নামমাত্র বি[illegible] ফাঁসি দাও—পাপ হবে না। এর [illegible] জীবনজিজ্ঞাসার উত্তর কোথায়!

(ক্র[illegible]

ভ্রম সংশোধন

১৯শ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় 'সা[illegible] সংকট' নিবন্ধের **৪র্থ** পরিচ্ছেদের [illegible] লাইনে **'ডেমোক্রেসির খড়্গ'** মুদ্রিত হই[illegible] উহা **'ডেমোক্রিসের খড়্গ' হইবে।**

পুরুষক

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

একবারও ভাবছো না মনে
কোন্ আকাশের পরে পেলাম যে কৌণিক নয়নে
সাঁচ্চা আকাশ।
নক্ষত্রের দূর থেকে মেঘের আকাশে এসেছিলাম অনেক বারো মাস
মাস থেকে তারপর বনের আকাশে
সেখানে জড়ানো ছিল ঘাসে
একটি উটজ।

তোমার উঠোনে ঠাঁই পেয়েছে আমার জয়ধ্বজ।

ধীরে ধীরে ছোট হই চোখের মুকুরে।
তোমার ব্রতের কোনো যমজ পুকুরে
আমি যেন কানা মাছ তরী ঘুরিফির্রি
তুমিই বলেছ কানে আমি না কি চোখের শরীরই
তোমার তাই ত' কানামাছি খেলা বিকেলে দুপুরে।

তোমার আসার পালা আজ।
কোথায় দেখছ বলো সেদিনের মাছের জাহাজ,
নখের দর্পণে ?
সে পুরুষ কতো ছোট এবারও কি ভাবো মনে-মনে ?

বিষণ্ন বিকেল

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

বিকেল বিষণ্ন অতি। ঘনঘটা মেঘ করে আসে
পাহাড়ের স্বপ্ন ঢাকে বর্ষার উদ্দাম আকাশে।
ক্লান্তি নামে অকস্মাৎ কালবৈশাখীর মতো মত্ততায়
বিষণ্নতা পুঞ্জীভূত দেহ-মনে সত্তায়-সত্তায়।

দিন আর রাত্রিগুলি প্রজাপতি ডানার মতন
নিরর্থক স্বপ্ন বুনে রিক্ত হেসে দাঁড়ালো এখন।
যে-চোখে বিদ্যুৎ ছিলো আষাঢ়ের অন্ধকারে মিশে
সে-চোখ নিঃশেষ হয়ে হার মেনে হারালো যে কী সে
জানি না। অবাক তবু হয়েছি আবার
বিষণ্নতা ক্লান্তি তবু ইচ্ছা বাঁচবার॥

ইন্দ্র ও শ্রুবাবতী

আশ্রমবাসিনী এক তপস্বিনী নারীর অর্ধনিমীলিত নেত্র বার বার চমকে জেগে ওঠে। আশ্রমের সম্মুখে বনবীথিকা, সেই বনবীথিকার ছায়াময় শান্তিকেই যেন চমকে দিয়ে ঘুরে বেড়ায় কোন্ এক রহস্যের কুণ্ডলদ্যুতি। মনে হয়, অন্তরীক্ষের কক্ষ হতে একটি জ্যোতির্ময় নীলোৎপল ভূতলে এসে বনবীথিকার নীপ চম্পক ও নীলাশোকের ছায়ানিবিড় স্পন্দনের কক্ষ অন্বেষণ করে বেড়ায়।

ঋষি ভারদ্বাজ দুশ্চর এক তপশ্চর্যা গ্রহণ করবেন বলে হিমালয়ে চলে গিয়েছেন। আশ্রমকুটিরে একাকিনী বাস করে তাঁর তপস্বিনী কন্যা শ্রুবাবতী। পীতকৌশেয়বসনা ও একবেণীধরা শ্রুবাবতীর মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে চলে গিয়েছেন পিতা ভারদ্বাজ। কঠোর ব্রহ্মব্রত যাপন ক'রে কুমারী শ্রুবাবতী তার কামনাময় মনোলোকের সকল কল্পনাকে ক্লিষ্ট করছে, দেখে সুখী হয়েছেন ভারদ্বাজ। দেখে গিয়েছেন ভারদ্বাজ, প্রভাতকল্পা শর্বরীর মত সুন্দর যে কুমারীর অঙ্গে অঙ্গে যৌবনের উদ্ভাস ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল, সেই কুমারী পাংশুলিপ্তা স্বর্ণরেখার মত নিষ্প্রভ হয়ে আশ্রমের ছায়াতরুতলে পড়ে থাকে।

চলে গিয়েছেন ঋষি ভারদ্বাজ এবং তপস্বিনী শ্রুবাবতীও অনেক তপস্যা করেছে। অতন্দ্রিত সবিতা কালচক্রে ধাবিত হয়ে অনেক দিবা রাত্রি কলা ও কাষ্ঠা রচনা করেছে। ষড়-ঋতুর রঙ্গে লীলায়িত বনস্থলীর বক্ষে অনেক বর্ণচ্ছটা ও অনেক সৌরভ এসেছে আর চলে গিয়েছে। তপস্বিনী শ্রুবাবতীর দুই চক্ষুর ধ্যান কোন মুহূর্তেও বিচলিত হয়নি।

কিন্তু কে জানে কি ছিল সেদিনের সেই আলোকে ও বাতাসে। এক প্রভাতে তপস্বিনী শ্রুবাবতীর জাগ্রত চক্ষুর দৃষ্টিকেই যেন ক্ষণবিহ্বলতায় নিবিড় ক'রে দিয়ে এবং সেই বিহ্বল দুই চক্ষুতে নূতন এক ধ্যানের আবেশ সঞ্চারিত ক'রে চলে গেল নয়নমোহন এক রহস্যের কুণ্ডলদ্যুতি। এই প্রভাতের মত কত প্রভাতে বনস্থলীর বক্ষের নিভৃতে কল-নাদিনী তটিনীর সলিলে স্নান করেছে শ্রুবাবতী এবং মুক্তাময় সিকতার অজস্র দ্যুতিচ্ছবি দুই পায়ের উপেক্ষায় পিষ্ট ক'রে আশ্রমের কুটিরে ফিরে এসেছে।

সুবোধ ঘোষ

সিকতার সেই মুক্তার দ্যুতি কোনদিন যার দুই চক্ষুর কৌতূহল চমকিত করতে পারেনি, তারই দুই চক্ষু দুটি কুণ্ডলের দ্যুতি দেখে বিস্মিত হয়। কে সে? কোথা থেকে এল আর কোথায় চলে গেল সেই দীপ্তকান্ত রূপমান। মণিময় কুণ্ডলের দ্যুতির চেয়ে কত নয়নাভিরাম তার নয়নদীধিতি!

তপস্বিনী শ্রুবাবতী যেন তার হৃদয়ের বিচলিত নিঃশ্বাসের মধ্যে প্রশ্নগুলির দুঃসহ ধ্বনি শুনতে পায়। তপস্বিনীর জটায়িত বেণীভার যেন নিজের লজ্জায় চূর্ণ হবার জন্য শিউরে ওঠে। দ্রুত ছুটে চলে যায় শ্রুবাবতী। আশ্রমকুটিরের ছায়াচ্ছন্ন নিভৃতের ভিতরে এসেও কি-যেন অন্বেষণ করে শ্রুবাবতী। তপস্বিনী যেন তার ক্ষণবিহ্বল নেত্রের এক ভয়ঙ্কর উদ্‌ভ্রান্তিকে লুকিয়ে ফেলবার জন্য গভীরতর এক অন্ধকারের আশ্রয় খুঁজছে।

সুস্থির হয়ে ধ্যানাসনে উপবেশন করে তপস্বিনী শ্রুবাবতী। কিন্তু বুঝতে পারে, আজিকার প্রভাতের আলোক তপস্বিনীর দুই চক্ষুর উপর অতি কঠোর এক নিষ্ঠুরতার সাধ সফল করে নিয়েছে। শ্রুবাবতীর নয়নপ্রান্ত হতে তপ্ত মুক্তাফলের মত দুটি অশ্রুবিন্দু স্খলিত হয়, ধ্যানহারা তপস্বিনীর কৌশেয় বসনের প্রান্ত সিক্ত ক'রে তোলে।

সত্যই তপস্বিনীর নেত্রে নূতন এক স্বপ্নের আবেশ সঞ্চারিত হয়। সেই স্বপ্ন

হলো দুটি কুণ্ডলদ্যুতির স্বপ্ন। ভুলতে পারে না শ্রুবাবতী এবং নিজের হৃদয়ের বিরুদ্ধেও আর বৃথা সংগ্রাম করে না। কে সে? কেন এল, কোথা হতে এল আর কোথায় চলে গেল? সে পুরুষের দুই নেত্রে যেন অন্তরীক্ষের সকল নীলিমার পীযূষ নিবিড় হয়ে রয়েছে। কে জানে ধূলিময় এই মর্ত্যলোকের কোন্ শ্যামলতার জন্য পিপাসা নিয়ে বন-বীথিকার ছায়ায় ছায়ায় ঘুরে বেড়ায় সেই বিপুল রূপের পুরুষ!

পীত কৌশেয় বসনে আবৃতা এক প্রেমিকারই কামনা যেন প্রতিক্ষণ তপস্যা করে। বিশ্বাস করে শ্রুবাবতী, তার এই নূতন তপস্যা ব্যর্থ হবে না। আশ্রমের তরুলতা ও পুষ্পের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় শ্রুবাবতী, মর্ত্যলোকের কামনাগুলি যেন এক সুন্দর দয়িতকে জীবনে অভ্যর্থনা করার জন্য প্রতিক্ষণ তপস্যা করছে। মনে হয়, তৃষ্ণার্ত ধূলিকণিকা অন্তরের সকল কামনা দিয়ে আহ্বান করছে বলেই আকাশচর জলদ ধারাবিগলিত আবেগে ভূতলে এসে স্নেহ লুটিয়ে দেয়। লতিকার আহ্বান শোনে দক্ষিণ সমীর, কিসলয়ের আহ্বান শোনে প্রভাতমিহির। মর্ত্যের পুষ্প লতিকা আর কিসলয়েরই মত নীরব তপস্যায় এক মর্ত্য-নারীর কামনা যদি অহরহ আহ্বান করে তার জীবনপ্রিয় দয়িতকে, তবে সে কি না এসে থাকতে পারে? নিমীলিত নেত্রে নিবিড় স্বপ্নের আবেশ ভরে দিয়ে সে হৃদয়দয়িতের কুণ্ডলদ্যুতিকে হৃদয়ের মধ্যেই দেখতে পায় শ্রুবাবতী।

বুঝি সফল হবে আশ্রমবাসিনী এক মর্ত্য-নারীর কামনার তপস্যা। ধ্যান-নিমীলিত চক্ষু হঠাৎ চমকে জেগে ওঠে এবং মনে হয় শ্রুবাবতীর, সেই কুণ্ডল-দ্যুতি যেন নিকটেই এসে দাঁড়িয়েছিল। উৎকর্ণ হয়ে শুনতে থাকে শ্রুবাবতী, যেন আশ্রম-প্রাঙ্গণের প্রান্ত পার হয়ে ছায়াচ্ছন্ন বনবীথিকার নীরব বাতাসকে মৃদু-পুলকিত এক পদধ্বনির সঙ্গীত উপহার দিয়ে চলে যায় সেই পথিক। শ্রুবাবতী তার স্বপ্নাভারালস দুই নিমীলিত চক্ষুর দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিয়ে আশ্রম-প্রাঙ্গণের বাহিরে দাঁড়ায়। বনবীথিকার দিকে দুই জাগ্রত চক্ষুর তৃষ্ণা নিয়ে তাকিয়ে থাকে।

ষড়-ঋতুর রঙ্গে লীলায়িত বনস্থলীর মত পীতকৌশেয়বসনা প্রেমিকা শ্রুবা-বতীরও অন্তরলোকে লীলায়িত হয় বিচিত্র বাসনার উৎসব। পাটল কুসুমের গন্ধভার তপ্ত ক'রে নিয়ে দেখা দেয় গ্রীষ্মের সঞ্চার। পরুষ পবনবেগে বনস্থলীর শুষ্ক পত্ররাশি উৎক্ষিপ্ত হয়ে কাতর উচ্ছ্বাস ছড়ায়। শুষ্ক বেণুবনে যেন জ্বালাবিমথিত পঞ্জরের ক্রন্দন বাজে। মধ্যাহ্নের নিদাঘার্ত বনবীথিকার বক্ষে উৎসারিত ক্ষিপ্ত ধূলির মত্ততার দিকে দুই অপলক নয়নের উত্তপ্ত আগ্রহ প্রসারিত করে তাকিয়ে থাকে শ্রুবাবতী। দেখতে পায় শ্রুবাবতী, সেই রূপমানের কুণ্ডলের দ্যুতি যেন অদূরের এক উদ্দালকের ছায়ার স্নেহ আহরণ করছে।

প্রাবৃষার মেঘারাবে চাতকীর হর্ষ ধ্বনিত হয় আকাশে, আর শ্রুবাবতী তেমনি আশ্রম-প্রাঙ্গণের প্রান্তে দাঁড়িয়ে দেখতে থাকে, পুলকাঙ্কুরে সঙ্কুলতনু ভূকদম্বের কাছে দাঁড়িয়ে আছে শ্রুবাবতীরই তপস্যার আকাঙ্ক্ষিত সেই পথিক। নববারিস্নানে বনভূমির বক্ষের তৃণাঙ্কুর বৈদুর্যমণির মত ফুটে ওঠে; জেগে ওঠে মদকলকণ্ঠ ময়ূরের কেকা। শ্রুবাবতীর জটায়িত বেণীভারের উপর ঝরে পড়ে সিক্ত স্নিগ্ধ অর্জুনের মঞ্জরী। দ্বিধা করে না, বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠা বোধ করে না, তপস্বিনী অবাধ আগ্রহে বাহু প্রসারিত করে তুলে নেয় সেই মঞ্জরী। ইচ্ছা করে, স্নিগ্ধ অর্জুনের এই মঞ্জরীকে কর্ণভূষণ ক'রে নিয়ে এই মুহূর্তে এই তপস্বিনীর বেশ চূর্ণ ক'রে দিতে এবং ছুটে চলে যেতে তারই কাছে, যে প্রিয়দর্শনের কুণ্ডলদ্যুতি এখন ঐ ভূকদম্বের ছায়ার নিবিড়তার মধ্যে ফুটে রয়েছে। কিন্তু পারে না শ্রুবাবতী, আশ্রমের পুষ্প লতিকা ও কিসলয়ের মতই মর্ত্যনারীর কামনাও যেন শুধু নীরবে তাকিয়ে বাঞ্ছিতকে আহ্বান করে, বাঞ্ছিতের কাছে ছুটে যাবার শক্তি দেহ মন ও প্রাণের কোন মত্ততার মধ্যেও সত্য হয়ে ওঠে না।

শারদ নভোপটের অভ্রমালা ও ভূতলের নবকাশবনের বক্ষে অমলধবল উৎসবের হর্ষ জাগে। অনিলপ্রকম্পিত বনান্তের সপ্তপর্ণ, কাননের কোবিদার ও উপবনের কুরুবকের যৌবন উল্লসিত হয়। নিবিড়তর হয়ে ফুটে ওঠে নীলোৎপলের নীলিমা আর বন্ধুজীবের রক্তিমা। সরো-বরতটের হংসরুতানুনাদে আর শালি-ধানের সৌগন্ধ্যে বিচলিত ক্ষিতিরসরভস বায়ু প্রেমতাপসিকা শ্রুবাবতীর অন্তরকে যেন সুধ্বনিময় সঙ্গীতের মুখরতা ও নিবিড় সৌগন্ধ্যের বন্ধনে অভিভূত করে দেয়। দেখতে পায় শ্রুবাবতী, সেই পথিকের কুণ্ডলদ্যুতি যেন নিকটতর হয়েছে। কোবিদার তরুর অনিলবিকম্পিত পল্লব-ভারের চঞ্চল ছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে আছে পথিক।

তপস্বিনীর কোমল কপোলে প্রস্ফুটিত লোধ্রের রেণু ছড়িয়ে দেয় হেমন্তের কৌতুকসমীর। শিশিরস্নেহে শিহরিত অঙ্গ নিয়ে মৃগাঙ্গনা বনপথে ছুটে চলে যায়। প্রিয়ঙ্গুলতিকার দেহে পাণ্ডুতার স্পর্শ শিহরিত হয়। ক্রৌঞ্চনাদে হৃদয় চমকিত হলেও তপস্বিনী শ্রুবাবতীর অপলক নয়নের দৃষ্টি তেমনি অবিচলিত আগ্রহ নিয়ে তাকিয়ে থাকে বনবীথিকার দিকে। এসেছে, আরও নিকট হয়ে এসেছে শ্রুবাবতীর সকল ক্ষণের আশার বাঞ্ছিত সেই পথিকের মূর্তি। বন-বীথিকার যে কিংশুকের রক্তিমা শিখা হয়ে জ্বলছে, সেই কিংশুকের কাছেই জ্বলছে সেই কুণ্ডলদ্যুতি। লোধ্র-রেণুর চুম্বনে লিপ্ত হয়ে থাকে তপস্বিনীর কোমল কপোল। সে রেণু-চুম্বন মুছে ফেলতে চায় না, পারেও না শ্রুবাবতী।

হিমকণ্টকিত শীতবায়ুর দংশনে বন-বীথিকার শাখী শ্যামপল্লবের সমারোহ হারিয়ে রিক্ত হয়; কিন্তু রিক্ত হয় না তপস্বিনীর নয়নের কৌতূহল। ইক্ষু-বনের সৌরভ বক্ষে ধারণ ক'রে অকস্মাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে অলস শীতানিল, আর তপস্বিনী শ্রুবাবতীর নয়নও চঞ্চল হয়ে শুধু লক্ষ্য করে, সেই পথিকের কুণ্ডল-দ্যুতি আশ্রমপ্রান্তের সন্নিকটের নক্তমাল-কুঞ্জের ছায়াবিরল নিভৃতের কাছে এসে স্থির হয়ে রয়েছে। তপস্বিনীর পীতকৌশেয় বসনের অঞ্চল যেন নিজেরই শিথিলিত লজ্জার শিহর সহ্য করতে গিয়ে আরও বিবশ ও বিচলিত হয়।

আশ্রম-প্রাঙ্গণের নীলাশোকের আশা

শ্লাবিত ক'রে দেখা দিল পিকরবমুখর বসন্তের দিন। তাম্রপ্রবালের ভারে বিনম্র দ্রুমবাহু যেন আগ্রহভরে নিখিলের ভৃঙ্গগুঞ্জরণ আর বিহঙ্গরবের মধুরতাকে আপন ক'রে নেবার জন্য বুকের কাছে পেতে চাইছে। দেখতে পায় শ্রুবাবতী, এসেছে, তপস্বিনীর জাগ্রত নয়নের তপস্যার বাঞ্ছিত সেই পথিক সত্যই স্মিতহাস্যের সুষমায় বসন্ত দিনের সব সুন্দরতাকে মধুর ক'রে দিয়ে তপস্বিনীর চক্ষুর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

আগন্তুকের কুণ্ডলদ্যুতির হাস্য আরও প্রখর হয়ে ওঠে।—ঐ পীতকৌশেয় বসনের আর জটায়িত বেণীভারের বন্ধনে জীবন ও যৌবন ব্যথিত ক'রে কোন্ সুখের জন্য তপস্যা করছো ভারদ্বাজ-তনয়া?

শ্রুবাবতী বলে—এই পীত কৌশেয়-বসন আর জটায়িত বেণীভার আপনারই প্রেমাভিলাষিণী এক নারীর দেহ মন ও প্রাণের কামনাকে গোপন ক'রে রেখেছে, মিথ্যা তপস্বিনীর মিথ্যা ক্লেশ বেশ ও রুক্ষতা ক্ষমা করুন অনঘ।

আগন্তুকের নয়নের বিস্ময় যেন এক কৌতুকে দীপ্ত হয়ে ওঠে।—তুমি আমার প্রেমাভিলাষিণী?

শ্রুবাবতী—হ্যাঁ, প্রিয় অতিথি।

আগন্তুক—তুমি জান আমার পরিচয়?

শ্রুবাবতী—জানি না, জানবার সৌভাগ্য হয়নি কখনও, জানতে ইচ্ছাও করি না ধীমান্। শুধু জানি, তপস্বিনী শ্রুবাবতীর নয়ন হ'তে তার সকল ধ্যান কেড়ে নিয়ে সে নয়নে এক বিপুলমধুর স্বপ্নের আবেশ সঞ্চার করেছে যে প্রিয় মূর্তি, সে মূর্তি আপনারই মূর্তি। ব্রহ্মব্রতিনীর ভুল তপস্যার তামসিত মিথ্যা চূর্ণ ক'রে দিয়ে আপনারই কুণ্ডলদ্যুতি আশ্রমবাসিনী শ্রুবাবতীর নয়নের স্বপ্নকে জ্যোৎস্নায়িত করেছে। তপস্বিনী হয়েছে প্রেমিকা।

আগন্তুক—ভুল বুঝেছ আশ্রমবাসিনী নারী, তোমার তপস্যা চূর্ণ করার কোন ইচ্ছা আমার ছিল না।

শ্রুবাবতী—আমার ভুল বুঝতে পারছি না মহাভাগ। আপনি বলুন, আপনার মণিময় কুণ্ডলের দ্যুতি এই বন-বীথিকার ছায়ায় ছায়ায় এতদিন ধ'রে কোন্ লতিকার শ্যামলতা আর স্নিগ্ধতাকে সন্ধান ক'রে ফিরেছে?

আগন্তুক—এই মর্ত্যের কোন শ্যামলতা আর স্নিগ্ধতার জন্য আমার বক্ষে ও নয়নে কোন তৃষ্ণা নেই ঋষি-কুমারী। শুধু আছে কৌতূহল।

শ্রুবাবতী—এ কেমন কৌতূহল?

আগন্তুক—হ্যাঁ শ্রুবাবতী, শুধুই কৌতূহল। মর্ত্যের এক আশ্রমবাসিনী নারী কার জন্য অথবা কিসের জন্য তপস্যা করে, শুধু এই একটি কৌতূহলের তৃপ্তির জন্য ঋষি ভারদ্বাজের আশ্রমের দিকে তাকিয়ে দেখেছে সুরপতি ইন্দ্রের চক্ষু।

চমকে ওঠে শ্রুবাবতীর দুই চক্ষুর বিস্ময়।—আপনি সুরপতি ইন্দ্র?

হেসে ওঠেন ইন্দ্র।—হ্যাঁ শ্রুবাবতী, স্বর্গাধীশ বাসবের নয়ন শুধু এইটুকু জানতে চায়, এই মর্ত্যের কোন্ তপস্বী আর কোন্ তপস্বিনীর ধ্যানে স্বর্গবাসনা আছে।

শ্রুবাবতী—তপস্বিনীরূপিনী শ্রুবা-বতীর নয়নে আর কোন ধ্যান নেই, শুধু আছে একটি স্বপ্ন এবং সে স্বপ্নে বিন্দুমাত্র স্বর্গবাসনা নেই বাসব।

ইন্দ্রের দুই নয়নের কৌতূহল যেন ক্ষীণ বিদ্রূপের বিদ্যুতের মত শিহরিত হয়ে মর্ত্যনারীর এই মধুরভণিত অহংকারের ভুল ধরিয়ে দিতে চায়। ইন্দ্র বলেন।—স্বর্গ চাও না, কিন্তু স্বর্গপতি বাসবের প্রণয় লাভের বাসনায় স্বপ্নায়িত ক'রে রেখেছ জীবন ও যৌবনের কামনাকে, কী অদ্ভুত তোমার স্বপ্ন শ্রুবাবতী!

শ্রুবাবতী—আশ্রমবাসিনী মর্ত্যনারীর স্বপ্নকে আপনি ভুল বুঝেছেন স্বর্গাধীশ। স্বর্গকে নয়, স্বর্গাধীশ ইন্দ্রকেও নয়, শ্রুবাবতী এই মর্ত্যেরই বনবীথিকাচারী এক সুন্দর পথিকের যৌবনবিমোহিত তনুশোভাকে ভালবেসেছে: উপবনের মাধবীর বল্লী যেমন ভালবাসে তার নয়ন-নিকটের সহকারতরুর তরুণতনুর শোভা। স্বর্গকে চাইনি, স্বর্গপতিকেও চাইনি। কোনদিনের কোন মুহূর্তে মনে হয়নি, বনতরুর ছায়ায় ছায়ায় যার কুণ্ডলদ্যুতি অপার্থিব এক জ্যোৎস্নাময় হর্ষ সঞ্চার ক'রে ঘুরে বেড়ায়, সে হলো অমরলোকের বৃন্দারকবন্দিত বাসব। আমার নয়নের প্রতীক্ষা শুধু তাকেই চেয়েছে, যে আমার নয়নে এনে দিয়েছে প্রথম বিস্ময়, প্রথম মুগ্ধতা, অনুরাগে রঞ্জিত প্রথম ক্ষণবিহ্বলতা। বনবীথিকার এক পথিক আমার নয়নবীথির পথিক হয়েছে। সে পথিকেরই জন্য আশ্রমবাসিনী নারী প্রতীক্ষার তপস্যা করেছে।

ইন্দ্র—এমন প্রতীক্ষার কোন অর্থ হয় না শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—আমার প্রতীক্ষা সার্থক হয়েছে বাসব।

ইন্দ্র—কি বলতে চাও শ্রুবাবতী?

শ্রুবাবতী—মর্ত্যনারী আমি, ষড়ঋতুর রঙ্গে লীলায়িত এই মর্ত্যের সকল পুষ্প ও কিশলয়ের কামনার মত আমার কামনা প্রতিক্ষণ প্রতীক্ষায় তপস্যা করতে জানে। এবং সে প্রতীক্ষা সফলও হয়েছে। আমার জীবনের নিদাঘের নিশ্বাস আজ মধুময় বসন্তের সৌরভকে কাছে পেয়েছে। এসেছেন আপনি, মর্ত্যনারীর প্রতীক্ষাকে আপনি তুচ্ছ করতে পারেননি স্বর্গাধীশ।

ইন্দ্র—স্বর্গাধীশ বাসবের চক্ষু কোন মুগ্ধতা নিয়ে তোমার সম্মুখে আসেনি শ্রুবাবতী। তোমার প্রতীক্ষার টানে নয়; আমি এসেছি আমার কৌতূহলের তৃপ্তির জন্য।

নিদাঘতাপিতা বনলতিকার মত ব্যথিতভাবে শুধু নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে শ্রুবাবতী। ইন্দ্র বলেন—মর্ত্যের প্রতীক্ষার টানে স্বর্গ কাছে নেমে আসে না ঋষি-কুমারী। এমন দুরাশার ভুল বর্জন কর ভারদ্বাজতনয়া।

তেমনই নীরব হয়ে, যেন এই মিথ্যা দুরাশারই লজ্জা সহ্য করার জন্য নতমুখে দাঁড়িয়ে থাকে শ্রুবাবতী।

ইন্দ্র বলেন—স্বর্গপতি ইন্দ্রের কাছে প্রেম আশা করো না মর্ত্যবাসিনী সুন্দরী মানবী। যদি ইচ্ছা থাকে, তবে আশা করো ইন্দ্রের অনুগ্রহ।

শ্রুবাবতী মুখ তুলে তাকায়।—অনুগ্রহ?

ইন্দ্র—হ্যাঁ ঋষিতনয়া, স্বর্গ শুধু এই মর্ত্যকে করুণা করতে পারে, অনুগ্রহ করতে পারে, বর দান করতে পারে। তার বেশি কিছু পারে না। তার বেশি কিছু

চাইবার অধিকারও এই মর্ত্যের কোন প্রেম প্রণয় ও কামনার নেই।

শ্রুবাবতী—আশ্রমবাসিনী এই মর্ত্য-নারীর জীবনকে কি অনুগ্রহ করতে চান বাসব?

ইন্দ্র—যদি স্বর্গলোকে স্থিতিলাভের বাসনা থাকে, তবে তারই জন্য তপস্যা কর ভারদ্বাজতনয়া। যথাকালে এবং তপস্যার অন্তে তুমি স্বর্গলোকে স্থিতিলাভ করবে, দেবরাজ ইন্দ্রের এই অনুগ্রহের বাণী শুনে এখন প্রীত হও শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—আপনার অনুগ্রহের বাণী শুনে প্রীত হয়েছি বাসব, কিন্তু আমার জীবনের কামনা আপনার এই অনুগ্রহ চায় না।

ইন্দ্রের মনের বিস্ময় ভ্রূকুটি হয়ে ফুটে ওঠে।—কি তোমার জীবনের কামনা?

শ্রুবাবতী—আশ্রমবাসিনী এই মর্ত্য-নারীর দুই নয়নের সকল আগ্রহ ধন্য ক'রে দিয়ে এই নীলাশোকেরই ছায়ার কাছে আপনি আর একবার এসে দাঁড়াবেন।

ইন্দ্র—ধন্য তোমার কামনার দুঃসাহস। কিন্তু শুনে রাখ দুরাশার নারী, মর্ত্যের আদেশ পালন করার জন্য স্বর্গের মনে কোন আগ্রহ নেই।

অশ্রুসজল হয়ে ওঠে শ্রুবাবতীর চক্ষু।—আদেশ নয় বাসব, মর্ত্যের প্রেম আশ্রমবাসিনী এই নারীর হৃদয়ে পূজা হয়ে ফুটে উঠেছে; এই ইচ্ছা পূজারিনীর হৃদয়ের ইচ্ছা।

ইন্দ্র—স্বর্গের কাছে যেতে চাও না, অথচ স্বর্গকে কাছে আনতে চাও, বিচিত্র এই পূজা পূজা নয় শ্রুবাবতী। স্বর্গের অপমান।

শ্রুবাবতী—স্বর্গের অপমান নয় বাসব, এই পূজা হ'লো পরাপূজা।

ইন্দ্র—সে কেমন পূজা?

শ্রুবাবতী—ক্ষণকালের মধুরতাকে অনন্ত ক'রে রাখি, চিরবিরহের বেদনাতে চিরমিলনের স্বাদ পাই, ক্ষণিক শুভদর্শনের জন্য মরজীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত প্রতীক্ষা করি। বুকের কাছে পাওয়ার জন্যই মর্ত্যের প্রাণ স্বর্গকে মাটি মাখিয়ে একটু ছোট করে নেয় স্বর্গপতি। অমৃতত্ববিহীনা মর্ত্যনারী আমি, আমার পরাপূজা বিরাজমানকেই সতত আহ্বান করে, স্বচ্ছকে পাদ্য অর্ঘ্য দান করে; নির্মলকে স্নান করায়, রম্যকে আভরণ দেয়, নিত্যতৃপ্তকে নৈবেদ্য দেয়, অনন্তকে প্রদক্ষিণ করে, বেদাধারকেই স্তোত্রে বন্দনা করে, আর স্বপ্রকাশকে নীরাজন ক'রে সুখী হয়। শ্রুবাবতীর প্রেমও স্বর্গপতি বাসবকে এই ধূলিময় ভূতলের তরুচ্ছায়ার কাছে প্রিয় অতিথির মত নয়নের সম্মুখে দেখতে চায়।

ইন্দ্র—তা হয় না শ্রুবাবতী। তুমি তোমার এই প্রেমাভিলাষ বর্জন কর। স্বর্গপতির জীবনের কোনক্ষণের কৌতূহল ভুলেও প্রেমাভিলাষ হয়ে তোমার আশ্রমের নীলাশোকের ছায়ার কাছে কোনদিন ফিরে এসে দাঁড়াবে না।

শ্রুবাবতী—কিন্তু আমি প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকবো বাসব।

কপট তপস্বিনীর জটায়িত বেণীভার যেন নূতন এক প্রতিজ্ঞার আবেগে শিউরে উঠেছে। দেখে বিস্মিত ও বিরক্ত হন ইন্দ্র এবং এক অবিশ্বাসের মৃদু বিদ্রূপের রেখা হেসে ওঠে স্বর্গপতির অধরে।—কতকাল প্রতীক্ষা করবে মরজীবনযাপিনী মর্ত্যবাসিনী নারী?

শ্রুবাবতী বলে—এই মরজীবনেরই শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত।

চলে গেলেন বাসব, নীলাশোকের ছায়া তেমনি সুস্থির হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ে থাকে।

কালচক্রে ধাবিত হয়ে অতন্দ্রিত সবিতা দিবা রাত্রি কলা ও কাষ্ঠা রচনা করেন এবং স্বর্গাধীশ বাসব একদিন তাঁর নিজের অন্তরেরই ভিতরে এক কৌতূহলের ধ্বনি শুনে চমকে ওঠেন ও বিস্মিত হন। মর্ত্যের এক আশ্রমবাসিনী নারী নীলাশোকের ছায়ার কাছে এখনও কি স্বর্গাধীশ বাসবের পদধ্বনি শুনবার জন্য প্রতীক্ষায় উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে? অসম্ভব, বিশ্বাস হয় না বাসবের এবং এই মিথ্যা কৌতূহলেরই বিরুদ্ধে ভ্রূকুটি হেনে আশ্বস্ত হন বাসব। মৃত্তিকা-ময় জগতের সে নারীর প্রেম ও প্রতীক্ষা বনব্রততীর ক্ষণপুষ্পিত শোভার মত সেই বসন্তেরই চৈত্রশেষের সমীরিত হাহাকারে শেষ হয়ে গিয়েছে। শুধু প্রতীক্ষার জন্য প্রতীক্ষা, আশ্রমবাসিনী নারীর এত বড় অহংকারের ঘোষণা নিজেরই মিথ্যায় চূর্ণ হয়ে গিয়েছে। জানতে ইচ্ছা করে বাসবের, মধুরপ্রলাপিনী পরভৃতার মত কলভাষিণী সেই মানবীর প্রেম নূতন সংগীত হয়ে আজিকার এই নববসন্তের প্রভাতে সেই নীলাশোকের ছায়ার কাছে কোন্ নূতন অতিথিকে বন্দনা করে? মনে হয়, বনস্থলীর নিভৃতে পদ্মরাগে অরুণিত তটিনীতটের সরণিতে সে যৌবনবতীর অভিসার আজ অলক্তের চিহ্ন অঙ্কিত ক'রে চলে যায় আর আসে। বনসরসীর মুকুরায়িত সলিলে লোধ্ররেণু-লিপ্ত কোমল কপোলের চুম্বনক্ষত দেখে হেসে ওঠে নারী। কৌতূহল, বড় তীব্র কৌতূহল, স্বর্গাধীশ বাসবের নয়ন যেন দূর মর্ত্যলোকের এক বনবীথিকার দিকে তাকাবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে। আর বিলম্ব করেন না বাসব। স্বর্গপতির স্যন্দননেমির হর্ষ মত্ত আবেগে ছুটে এসে সেই বনবীথিকারই নিকটে শান্ত হয়। দেখতে পান বাসব, দূরান্তের সেই আশ্রমের প্রাঙ্গণে সেই নীলা-শোকেরই কাছে ছায়াময়ী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এক তপস্বিনীর মূর্তি।

বিস্মিত হন বাসব। সত্যই কি স্বর্গের জন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নেই শ্রুবাবতীর মনে? সত্যই কি স্বর্গাধীশ বাসবের প্রিয়া হবার জন্য কোন ব্যাকুলতা নেই আশ্রম-বাসিনী ঐ মর্ত্যনারীর মনে? সত্যই কি জীবনের প্রথম নয়নবিহ্বলতায় বন্দিত বনবীথিকাচারী এক পথিকেরই প্রেমের জন্য অফুরান প্রতীক্ষা সহ্য করছে শ্রুবাবতী?

সুরপতি ইন্দ্রের কৌতূহল তাঁর এই চঞ্চলিত চিত্তের সব প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের জন্য উন্মুখ হয়ে ওঠে। ভারদ্বাজতনয়া শ্রুবাবতীর প্রেম ও প্রতীক্ষার নিষ্ঠাকে একটি সুন্দর ছলনা দিয়ে পরীক্ষা করার জন্য প্রস্তুত হন ইন্দ্র। লুকিয়ে ফেলেন দ্যুতিময় কুণ্ডলের মণি। বনবাসী ঋষিযুবার ছদ্মবেশ ধারণ করেন ইন্দ্র।

ধীরে ধীরে, ছায়াচ্ছন্ন বনবীথিকার স্নিগ্ধতার ভিতর দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকেন ইন্দ্রজালে আচ্ছন্ন ইন্দ্র সুন্দরদর্শন এক ঋষিযুবা। তাঁ[illegible] কণ্ঠে যজ্ঞোপবীত, ললাটে ভস্মটি[illegible]

পুণ্ড্রক, মস্তকে জটাভার, কর্ণে স্ফটিকমালা, হস্তে আষাঢ়দণ্ড ও স্কন্ধে কৃষ্ণাজিন। দূরান্তে আশ্রমপ্রাঙ্গণের এক নীলাশোকের ছায়ায় দিকে তৃষ্ণার্ত দুই চক্ষুর কৌতূহল উৎসারিত ক'রে এগিয়ে যেতে থাকে এই বনলোকেরই এক পিপাসিত তপস্যা।

চমকে ওঠে না নীলাশোকের ছায়া। পীতকৌশেয়বসনা তপস্বিনীর জটায়িত বেণীভারে কোন বিস্ময়ের শিহরণ জাগে না। আগন্তুক ঋষিযুবার মুখের দিকে নিষ্কম্প শান্ত দৃষ্টি তুলে নীরবে সম্মান জ্ঞাপন করে শ্রুবাবতী।

ঋষিযুবা বলে—আমি তপস্বী বশিষ্ঠ।

শ্রুবাবতী — আমি ভারদ্বাজতনয়া শ্রুবাবতী।

বশিষ্ঠ—আমি তোমার আশ্রমের অতিথি শ্রুবাবতী, অতিথির প্রাপ্য সকল সমাদর আমি তোমার কাছেই আশা করি আশ্রমবাসিনী।

শ্রুবাবতী—অতিথির প্রাপ্য সকল সমাদর অবশ্যই পাবেন ঋষি।

তরুণ বশিষ্ঠের নয়নের হর্ষ অকস্মাৎ এক নিবিড়মদির আবেদনে মন্থর হয়ে ওঠে। নীলাশোকের ছায়ার আরও নিকটে তাপিত বনমৃগের মত ব্যাকুল হয়ে এগিয়ে আসেন বশিষ্ঠ। প্রণয়োচ্ছল স্বরে আহ্বান করেন বশিষ্ঠ—শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—আদেশ করুন ঋষি।

বশিষ্ঠ—শুধু অতিথির প্রাপ্য সমাদর নয়, আশ্বাস দাও শ্রুবাবতী, তোমার সমাদরে অতিথির সকল আশা তৃপ্ত হবে।

শ্রুবাবতী—ক্ষমা করুন ঋষি, ভারদ্বাজতনয়ার কাছে এমন আশ্বাস আশা করবেন না।

বশিষ্ঠ—আমার সকল পুণ্য তুমি গ্রহণ কর শ্রুবাবতী, বিনিময়ে শুধু আশ্বাস দাও, তুমি আমার জীবনের সকল আনন্দের সহচরী হবে।

শ্রুবাবতী—ক্ষমা করুন পুণ্যবান, বৃথা এমন ভয়ঙ্কর অনুরোধ ক'রে আশ্রমবাসিনী নারীর হৃদয়ের শান্তিকে ব্যথিত করবেন না।

বশিষ্ঠ—অকারণে ব্যথিত হয়ো না শ্রুবাবতী। বশিষ্ঠের প্রিয়া হয়ে, বশিষ্ঠের পুণ্যে পুণ্যবতী হয়ে স্বর্গলোকে গিয়ে চিরসুখের জীবনে স্থিতি লাভ কর। আমার তৃপ্তি তোমারই মুক্তি হয়ে উঠবে শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—স্বর্গের জন্য কোন লোভ, কোন উল্লাস আর কোন ক্রন্দন নেই আমার মনে।

বশিষ্ঠ—স্বর্গের জন্য লোভ না হোক্, মুক্তকণ্ঠে বলো দেখি সুধাহীনা এই বসুধার নারী, প্রণয়বিহ্বল পুরুষের প্রেমের জন্য কোন লোভ নেই তোমার হৃদয়ে, আর প্রদোষমুদিতা কুমুদ্বতীর মত তোমার ঐ কুণ্ঠাসুন্দর যৌবনিত তনুর শোণিতে?

শ্রুবাবতী—আছে ঋষি, পীতকৌশেয়বসনা তপস্বিনী শ্রুবাবতীর নয়ন হতে সব ধ্যান কেড়ে নিয়ে, সে নয়নে প্রণয়স্মিত স্বপ্ন ভরে দিয়েছে যে পুরুষ, শুধু তারই প্রেমের জন্য লুব্ধ হয়ে আছি।

বশিষ্ঠ—কে সে?

শ্রুবাবতী—সুরপতি বাসব।

কপট বশিষ্ঠের নয়নে যেন অস্ফুট অথচ দুঃসহ এক বিশ্বাসেরই বিস্ময় চমকে ওঠে এবং ধীরে ধীরে প্রখর নয়নের কৌতূহল শান্ত ও নম্র হয়ে যায়। প্রশ্ন করেন বশিষ্ঠ—স্বর্গপতিকে ভালবেসেছে মর্ত্যনারী?

শ্রুবাবতী—হ্যাঁ ঋষি।

বশিষ্ঠ—কিসের জন্য?

শ্রুবাবতী—ভালবাসারই জন্য।

বশিষ্ঠ—কিন্তু তুমি কি সত্যই বিশ্বাস কর শ্রুবাবতী, স্বর্গাধীশ বাসব কখনও ধূলিময় মর্ত্যের কুটিরে এসে এক ঋষিতনয়ার প্রেমের প্রতিদানে প্রেম নিবেদন করবেন?

শ্রুবাবতী—মর্ত্যনারীর জীবনে এত বড় বিশ্বাসের কিবা প্রয়োজন ঋষি? জানি না স্বর্গের প্রাণ কেন আর কেমন ক'রে ভালবাসে। স্বর্গের প্রাণ বোধ হয় ভালবেসে শুধু সুখী হয়, আর সুখের জন্য ভালবাসে। মর্ত্যের প্রাণ শুধু ভালবাসার জনাই ভালবাসতে জানে। আমি আশ্রমবাসিনী মর্ত্যনারী, স্বর্গপতি বাসবকে ভালবেসে বেদনা পাই, তবু ভালবাসি।

কপট বশিষ্ঠের দুই চক্ষু যেন আবার এই মর্ত্য প্রেমের অহংকারের আঘাতে কঠোর হয়ে ওঠে। আরও কঠোর এক পরীক্ষার ছায়া চঞ্চল হয়ে ওঠে কপট বশিষ্ঠের দুই চক্ষুর দৃষ্টিতে। মর্ত্যনারীর এই প্রেমের অহংকারকে আর একটি কঠিন ছলনার আঘাতে চূর্ণ করে নিয়ে, তারপর সহাস্য করুণা আর সান্ত্বনা দিয়ে প্রেমিকা মর্ত্যনারীকে প্রীত ক'রে আর ধন্য ক'রে স্বর্গধামে চলে যাবেন স্বর্গাধীশ।

ক্ষুব্ধ তরঙ্গের মত ফেণিলোচ্ছল স্বরে আদেশ করেন বশিষ্ঠ—শুধু অতিথির প্রাপ্য সমাদর তোমার কাছ থেকে আশা করি শ্রুবাবতী। তার বেশি কিছু আশা করি না।

শ্রুবাবতী—বলুন, কোন্ সমাদরে আপনি প্রীত হবেন ঋষি?

বশিষ্ঠ তাঁর কমণ্ডলু হতে চারিটি ক্ষুদ্র বদরিকা বের ক'রে শ্রুবাবতীকে বলেন—এই চারিটি বদরিকা রন্ধন কর শ্রুবাবতী। সুরন্ধিত এই চারিটি বদরিকাই আমার দিনান্তের ভোজ্য। সূর্য অস্তমিত হবার পূর্বেই আমি আমার ভোজ্য গ্রহণ করে তৃপ্ত-হতে চাই ঋষিকুমারী।

শ্রুবাবতী—তথাস্তু ঋষি।

বশিষ্ঠ—কিন্তু একটি প্রশ্ন আছে শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—বলুন।

বশিষ্ঠ—যদি অতিথিকে এই সামান্য সমাদরেও তৃপ্ত করতে তুমি অক্ষম হও শ্রুবাবতী, তবে ক্ষুণ্ণ ও অপমানিত অতিথির অভিশাপও তোমাকে গ্রহণ করতে হবে।

বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে শ্রুবাবতী—অভিশাপ?

বশিষ্ঠ—হ্যাঁ। কল্পনা করতে পার, কি অভিশাপ দেব আমি?

শ্রুবাবতী—না। আপনি বলুন।

বশিষ্ঠ—তোমার প্রেমের আস্পদ সেই বাসবকেই তুমি চিরকালের মত ভুলে যাবে।

—অকরুণ ঋষি! শ্রুবাবতীর শিহরিত কণ্ঠস্বর আর্তনাদের মত ধ্বনিত হয়। পরক্ষণে, যেন নীলাশোকের চঞ্চলিত পল্লবের স্নিগ্ধ নিঃশ্বাসের স্পর্শে শান্ত হয়ে যায় শ্রুবাবতীর ত্রস্ত হৃদয়ের আর্ততা। দূরের বনবীথিকার ছায়াচ্ছন্ন অন্তরের দিকে তাকিয়ে কি-যেন চিন্তা করে শ্রুবাবতী। ধীরে ধীরে শান্ত ও কঠিন এক সঙ্কল্পের আনন্দ যেন অধর-রেখায় সুস্মিত হয়ে ওঠে।

শ্রুবাবতী বলে—অপেক্ষা করুন ঋষি। সূর্য অস্তমিত হবার পূর্বেই আপনি আপনার আকাঙ্ক্ষিত ভোজ্য পাবেন।

কুটিরে প্রবেশ করে শ্রুবাবতী এবং নীলাশোকের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে কপট বশিষ্ঠের নয়নে কঠোর কৌতুক আরও প্রখর হয়ে জ্বলে ওঠে। ইন্দ্রজালের মায়া আর একবার আক্রমণ করেছে আশ্রমবাসিনী মর্ত্যনারীর প্রেমের অহংকারকে। পাঁচটি মায়া বদরিকা নিয়ে কুটিরের ভিতর চলে গিয়েছে শ্রুবাবতী, কোন অগ্নিতাপে সে মায়াবদরিকা রন্ধিত হবার নয়।

মধ্যাহ্নের সূর্য পশ্চিম দিগ্‌বলয়ের দিকে এগিয়ে চলেছে। ধীরে ধীরে অপরাহ্নের আলোক নিষ্প্রভ হয়ে আসে। আসন্ন সন্ধ্যার রক্তিম সঞ্চার জাগে অস্তাচলের শিখরে। ইন্দ্রমায়ার কৌতুকে আশ্রমকুটির হতে সকল ইন্ধনকাষ্ঠ সেই মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে যায়। অপলক নয়নের কৌতুক নিয়ে কুটিরদ্বারের দিকে তাকিয়ে থাকেন কপট বশিষ্ঠ। মায়াবদরিকা রন্ধনে ব্যর্থ হয়ে ইন্দ্রের মায়াভিশাপে অভিভূত প্রেমিকা শ্রুবাবতীর হৃদয় তার প্রেমের আস্পদ বাসবকেই বিস্মৃত হয়ে ঐ কুটিরের ভিতর হতে ধীরে ধীরে এসে এইখানে এই কপট বশিষ্ঠের সুন্দর মুখের দিকে তাকাবে। আর কতক্ষণ? অস্তাচল-চূড়ার অন্তরালে ক্লান্ত তপনের শেষ রশ্মি বিদায় নেবার জন্য থরথর করে কাঁপছে।

কিন্তু কই, কোন আনর্তনাদও এখনও জাগে না কেন ঐ নীরব কুটীরের বক্ষে? কিংবা, স্মৃতিহারা শূন্য হৃদয়ের নূতন কৌতূহল নিয়ে ধীরে ধীরে এখনও কেন নীলাশোকের ছায়ার দিকে এগিয়ে আসে না সে নারী?

কপট বশিষ্ঠেরই অন্তর এই বিস্ময় সহ্য করতে না পেরে কুটীরের দ্বারের কাছে এসে দাঁড়ান।

অকস্মাৎ যেন দারুমূর্তির মত স্তব্ধী-ভূত হয়ে যায় বিস্ময়চঞ্চল কপট বশিষ্ঠের শরীর। অগ্নিজ্বালাময় আর এক বিস্ময়ের স্পর্শে সেই মুহূর্তে কপট বশিষ্ঠের দুই চক্ষু হতে সকল কৌতুক ঝরে পড়ে যায়। কপট বশিষ্ঠের অভিশাপকে চরম উপহাসের জ্বালায় ভস্মীভূত করার জন্য প্রস্তুত হয়েছে শ্রুবাবতী। সুস্মিত হয়ে উঠেছে প্রেমিক শ্রুবাবতীর নয়ন ও অধর। ইন্ধন নেই, কিন্তু পীতকৌশেয়বসনা নারী যেন তার নিজ তনুকেই ইন্ধনরূপে উৎসর্গ করার জন্য অগ্নিকুণ্ডের দিকে তাকিয়ে আছে। মর্ত্যভূমিরই প্রাণের এক ব্রততী তার জীবনের এত প্রিয় ঐ যৌবনপুষ্পিত দেহকে যেন একমুহূর্তের মদকৌতুকে ভস্ম ও অঙ্গার করে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছে। কী কঠিন এই মর্ত্যের মৃত্তিকার অহংকার!

শিউরে ওঠে কপট বশিষ্ঠের দৃষ্টি। ধীরে ধীরে, তেমনি সুস্মিত নয়নে ও অধরে এক শান্ত সংকল্পের অহংকার নিয়ে অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে চলেছে শ্রুবাবতী। ত্বরিতপদে কুটীরের ভিতরে প্রবেশ করেন বশিষ্ঠ এবং শ্রুবাবতীর গতি রোধ করার জন্য বাধা দিয়ে বলেন—থাম শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—থামতে পারি না ঋষি। বাধা দেবার চেষ্টা করবেন না।

বশিষ্ঠ—মর্ত্যের ক্ষণায়ুশাসিত জীবনের নারী, জীবনের মূল্য বিস্মৃত হও কেন?

শ্রুবাবতী—মর্ত্যের আশ্রমবাসিনী শ্রুবাবতী নামে এই নারীর জীবনের কোন মূল্য নেই, যদি সে জীবন তারই প্রেমের উপাস্য বাসবের কথা ভুলে গিয়ে বেঁচে থাকে। সে জীবন এক মুহূর্তেরও জন্য সহ্য করতে চাই না ঋষি।

বশিষ্ঠের নয়নের প্রখর কৌতূহল যেন অকস্মাৎ স্নিগ্ধ এক বিশ্বাসের হর্ষ হয়ে ফুটে ওঠে। বশিষ্ঠ বলেন।—শান্ত হও, হৃদয়ের সব আক্ষেপ বর্জন কর শ্রুবাবতী। স্বর্গাধীশ বাসব আজ বিশ্বাস করে, মর্ত্যের আশ্রমবাসিনী এক পীতকৌশেয়-বসনা ঋষিকুমারী তার জীবনের প্রতিক্ষণের কাম্য সেই পথিক বাসবকেই ভালবেসেছে। প্রতিদান চায় না; উপকার, উপহার ও উপঢৌকন আশা করে না, মর্ত্যনারীর এই বেদনাভরা প্রেমের মূল্যে বেদনাহীন স্বর্গের মনও তুচ্ছ করতে পারে না।

শ্রুবাবতী—স্বর্গের মনের কথা আর বাসবের বিশ্বাসের কথা আপনি কেন ঘোষণা করছেন ঋষি?

কপট বশিষ্ঠের নয়নে স্নেহসিক্ত কৌতুকের এক সুন্দর হাস্য উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।—আমি ঋষি নই, বশিষ্ঠ নই, আমি স্বর্গাধীশ বাসব।

—প্রিয় বাসব! প্রেমতাপসিকার সফল প্রতীক্ষার আনন্দ প্রণয়সান্দ্র স্বরে উচ্ছ্বসিত হয়। স্মিত নয়নের সকল বাসনা উৎসারিত করে বাসবের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে শ্রুবাবতী। আর কোন দ্বিধা নেই, এই মুহূর্তে অনায়াসে বরমাল্য হাতে তুলে নিয়ে প্রেমিকের কণ্ঠ স্পর্শ করতে পারে শ্রুবাবতী। যেন এক পৌর্ণমাসীর চন্দ্রিকার আশ্বাস দেখতে পেয়েছে শ্রুবাবতীর নয়ন। পীতকৌশেয়বসনে আর জটায়িত বেণীভারের বন্ধনে ব্যথিতা এক সাধ্বয়ন্তী প্রেমিকার হৃদয় হতে সকল সলজ্জ সাধ্বস এই মুহূর্তে প্রেমিকের কণ্ঠ হতে উৎসারিত একটি প্রিয় সম্বোধনের স্পর্শে লুপ্ত হয়ে যাবে। যৌবনপুষ্পিতা ঋষিকুমারী যেন এক ক্ষণস্বপ্নের মধুরতার মধ্যে দাঁড়িয়ে দেখছে, লোধ্ররেণু ঝরে পড়ছে তার কোমল কপোলে, পরিপীত পটীর রসের তিলক ফুটে উঠছে কপালে। গলে গিয়েছে জটায়িত বেণীভারের ভার, নূতন কুন্তলে কুরুবকের শোভা উত্তংসিত হয়ে প্রেমিকাকে মধুবাসরিকার সাজে সাজিয়ে দিয়েছে। বাকি আছে শুধু একটি আহ্বান। শুধু দয়িত্বকণ্ঠের একটি প্রিয়সম্ভাষণ শোনবার জন্য শ্রুবাবতীর হৃদয়ের সকল পিপাসা যেন উৎকর্ণ হয়ে রয়েছে। সে আহ্বান ধ্বনিত হলেই সকল কুণ্ঠা হারিয়ে পীতকৌশেয়-বসনা এক আশ্রমবাসিনী মর্ত্যনারী এই মুহূর্তে স্বর্গাধীশ বাসবের বক্ষে জটায়িত বেণীভার লুটিয়ে দিয়ে তৃপ্ত হবে।

বাসব ডাকেন—শ্রুবাবতী!

শ্রুবাবতী, শুধুই শ্রুবাবতী, সে বানে প্রেমিকের ব্যাকুলতা মদিরস্বরে দ্রুত হয় না। শ্রুবাবতীর ক্ষণস্বপ্নের রতা হঠাৎ ব্যথিত হয়।

আবার ডাকেন বাসব।—আশ্বস্ত হও রুদ্রাজতনয়া, স্বর্গাধীশ বাসবের কাছ কে একটি বরবাণী শুনে প্রীত হও।

আর্তস্বরে প্রশ্ন করে শ্রুবাবতী।—বাণী?

বাসব—হ্যাঁ শ্রুবাবতী। আমি বিশ্বাস রি, তুমি ভালবাস আমাকে। তাই এই বর ন করি, তুমি তোমার মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে গিয়ে আমার পরিণীতা প্রিয়া হবে।

করুণা করছে স্বর্গের মন। মর্ত্যের প্রেমকে পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়ে প্রীত রে চলে যেতে চায় স্বর্গধামের অধীশ্বর। প্রিয়া শ্রুবাবতী, স্বর্গের মুখে এই স্বীকৃতি আর ধ্বনিত হলো না। শ্রুবাবতী তাঁর ইহজীবনের কোন ক্ষণে এমন সম্বোধন শুনতে পাবে না। স্বর্গের পুরুষ মৃত্তিকাময় এই ভূতলের কুটীরবাসিনী নারীর প্রেমবিহ্বল নয়নের প্রার্থনায় বন্দিত হয়েও কখনো একথা বলতে পারে না—আমি ভালবাসি। স্বর্গের মন কি এতই হিমাক্ত? বেদনাহীন স্বর্গের সবই কি শুধু শিলা?

শ্রুবাবতী বলে—আপনার বরবাণী আমার প্রেম ও প্রতীক্ষার মৃত্যুবাণী বাসব।

বাসব—কি বলতে চাও ঋষিকুমারী?

শ্রুবাবতী বলে—আমার মৃত্যুর পর, এই মর্ত্যনারীর ইহজীবনের অন্তে স্বর্গাধীশ যে বাসব আমার বরমাল্য গ্রহণ করবেন, সে বাসব আমার বাসব নয়।

অমরপুরের অধীশ্বর, দেবরাজ ইন্দ্রের প্রসন্ন অন্তরের শান্তি আবার এক মর্ত্যনারীর কুটিল প্রেমের অহংকারের আঘাতে ক্ষুব্ধ হয়।

বাসব বলেন—এক শুভক্ষণে স্বর্গলোকের নন্দনবনবীথিকার পারিজাতের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে স্বর্গাধীশ বাসবের কণ্ঠে পরিণয়মাল্য অর্পণ করবে তুমি শ্রুবাবতী, মর্ত্যের বেদনাধূলিমলিন ইহজীবনের অন্তে এই পরমবরণীয় পরিণাম লাভের জন্য সশ্রদ্ধচিত্তে তপস্বিনীরই মত প্রতীক্ষায় থাক।

শ্রুবাবতীর নয়নে অদ্ভুত এক সজল হাস্যদ্যুতি স্পন্দিত হতে থাকে।—আমার জীবন হতে প্রতীক্ষার সবেদন আনন্দটুকুও আপনি ছিন্ন করে দিলেন বাসব। পারিজাতের ছায়া স্বর্গের নন্দনবনবীথিকাকেই স্নিগ্ধ ও সুরভিত ক'রে রাখুক, মর্ত্যের প্রেমিকা নারী তার প্রতীক্ষাহীন ইহজীবনের শূন্যতা নিয়ে ঐ নীলাশোকের ছায়ার কাছে বিলীন হয়ে যাবে। মর্ত্যের বক্ষে শেষ নিঃশ্বাস সঁপে দেবার আগে শুধু বলে যাব, চাই না স্বর্গ, স্বর্গাধীশকেও চাই না, আমি ভালবাসি আমার মর্ত্যের বনবীথিকাচারী বাসবকে।

বাসব—বড় উদ্ধত তোমার প্রতীক্ষাময় প্রেমের অহংকার, তার চেয়ে বেশি উদ্ধত তোমার প্রতীক্ষাহীন প্রেমের অহংকার। স্বর্গের প্রতিশ্রুতিকে তুচ্ছ করে ধূলিকালিপ্ত মলিন মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ মনে করেছ মর্ত্যনারী, স্বর্গাধীশের কাছে আর কোন করুণা আশা করো না। বিদায় দাও শ্রুবাবতী।

চলে যান বাসব।

কালচক্রে অতন্দ্রিত সবিতা ধাবিত হয়ে দিবা রাত্রি কলা ও কাষ্ঠা রচনা করেন। মর্ত্যের এক আশ্রমপ্রাঙ্গণের নীলাশোকের ছায়ার কাছে এক প্রেমিকা নারী যেন শেষ অভিসারে এসে মধুবাসরিকা হয়ে গিয়েছে। জটাবিহীন বেণীভার নয়, কবরীতে কুরুবক আর কপোলে লোধ্ররেণু নিয়ে রক্তাংশুকে শোভিতা এক মধুবাসরিকা যেন ক্লান্ত হয়ে ভূতলে লুটিয়ে পড়ে থাকে। কৃষ্ণা-রজনীর কৃশ চন্দ্রলেখার মত প্রতিদিন ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয় অনশনব্রতিনী এক ব্রতভীর দেহ। নীলাশোকের ছায়া-স্নিগ্ধ মৃত্তিকার শয্যায় মৃত্যুবরণ করার আগে যেন দুই নয়নের প্রিয় এক স্বপ্নের সঙ্গে বাসকোৎসব যাপন করছে প্রেমিকা শ্রুবাবতী। যে ইহজীবনে দয়িতের পদধ্বনি কুটীরদ্বারে কোনদিন ধ্বনিত হবে না, প্রতীক্ষাহীন সে ইহজীবনের একটি মুহূর্তও সহ্য করা যায় না। প্রজাপতির পক্ষপরাগ মৃত্যুমুখিনী সে নারীর কবরী সুরভিত ক'রে দিয়ে যায়। রক্তাংশুকের লুণ্ঠিত অঞ্চলে রাজীব রেণু ছড়িয়ে দিয়ে যায় ভৃঙ্গ। কখনো প্রাভাতিকী আভা আর কখনো বা শুক্লা শর্বরীর জ্যোৎস্না, হাসে মৃত্যুমুখিনী নারীর আননে।

আর, স্বর্গলোকের নন্দনবনবীথিকার পারিজাতের ছায়ার কাছে দাঁড়িয়ে বজ্রায়ুধ বাসবের হৃদয়ে দুঃসহ এক কৌতূহল চঞ্চল হয়ে ওঠে। মর্ত্যের এক নীলাশোকের ছায়ায় লিপ্ত এক আশ্রমের প্রাঙ্গণ যেন এক মুষ্টি ধূলির জ্বালা নিক্ষেপ করেছে স্বর্গাধীশেরই বক্ষে। তাই বার বার মনে পড়ে, এবং বার বার তাঁর অন্তরের দুঃসহ কৌতূহলকেই শান্ত করতে চেষ্টা করেন বাসব। স্বর্গের প্রতিশ্রুতিকে তুচ্ছ করে, স্বর্গাধীশ বাসবের বামাঙ্কশোভা

হবার গৌরব তুচ্ছ ক'রে জীবনের প্রথম প্রণয়ে বিস্মিত নয়নের ক্ষণবিহ্বলতাকে চিরক্ষণময় স্বপ্নের মত নয়নে ধারণ ক'রে সত্যই কি মৃত্তিকার ক্রোড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে মৃত্যুব্রতিনী নারী? মর্ত্যের জন্য স্বর্গের কৌতূহল, বড় দুঃসহ এই জ্বালাবিচলিত কৌতূহল। স্বর্গাধীশ বাসবের মনে হয়, সুধাহীনা বসুধার নারী যেন হেলাবহসিত লীলাভঙ্গে মৃত্যুর বেদনা বরণ ক'রে সুধানিষিক্ত স্বর্গের সকল সুখের অমরতাকেই অসুখী ক'রে দিতে চাইছে। দেখতে ইচ্ছা করে, মর্ত্যপ্রেমের সুন্দর অহংকারের সেই বিচিত্র গৌরবচ্ছবি। কৃপা করুণা ও মহত্ত্বের দু'টি স্বর্গীয় নয়ন লুব্ধ হয়। মর্ত্যলোকের এক নীলাশোকের ছায়ার জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে ওঠে স্বর্গাধীশের মনের তাপিত কৌতূহল।

অন্তরীক্ষের অন্তর মথিত ক'রে ধ্বনিত হয় স্বর্গাধীশ বাসবের স্যন্দন-নেমির শিহরিত আর্তস্বর। মর্ত্যের বনস্থলীর শিরে সন্ধ্যার চন্দ্রলেখা কিরণ সম্পাত করে, যেন বিচলিত দ্যুলোকের অন্তর স্নেহ লাভের জন্য তৃষ্ণার্ত হয়ে ভূতলের শ্যামলতার বক্ষ অন্বেষণ করছে। স্বর্গাধীশ বাসবের রথ দুরন্ত কৌতূহলের মত ছুটে এসে বনবীথিকার ধূলির উপর দাঁড়ায়। নীরব ও নিস্তব্ধ আশ্রম প্রাঙ্গণের পুষ্পিত নীলাশোকের দিকে তাকান বাসব। বাসবের কুণ্ডলদ্যুতি যেন ব্যথিত জ্যোৎস্নার মত বনবীথিকার ছায়ার বক্ষে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ে থাকে। শ্রুবাবতী, পীতকৌশেয়বসনা সেই তপস্বিনী শ্রুবাবতী কি তার সব তপস্যার শেষ ক'রে দিয়েছে? মৃত্যু বরণ করেছে প্রেমিকা শ্রুবাবতী? তবে এই সন্ধ্যার জ্যোৎস্নায় দগ্ধ হয়ে এখনও কেন অঙ্গার হয়ে যায়নি ঐ নীলাশোকের কুসুম?

শ্রুবাবতী! প্রিয়া শ্রুবাবতী! বজ্রায়ুধ স্বর্গাধীশের সুধাসিক্ত কণ্ঠ সুধাহীনা বসুধার এক নারীকে আহ্বান করতে গিয়ে আর্তস্বর উৎসারিত করে। জ্যোৎস্নায়িত সন্ধ্যার মর্ত্যভূমি দ্যুলোকের ক্রন্দন শুনতে পেয়েও কী কঠিন নিষ্ঠুরতায় নীরব হয়ে আছে! স্বর্গের আশাকে কোথায় লুকিয়ে রেখেছে এই মর্ত্যের মৃত্তিকা?

ধীরে ধীরে নীলাশোকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন বাসব। স্বর্গের মন এতদিনে বেদনার স্বাদ পেয়েছে। স্বর্গের গর্বিত কামনা নত হয়ে মাটির দিকে তাকিয়ে এক গেয়া জপ্যা ও চিন্তনীয়ার সুন্দর জীবনশ্রী দেখতে পেয়েছে। স্বর্গাধীশ বাসব চিনতে পেরেছেন তাঁর স্তোত্রের পাত্রীকে। বনবীথিকাচারী সেই পথিক তার জীবনের বাঞ্ছিতাকে আর একবার নয়ন-সম্মুখে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে।

সেই নীলাশোক। মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকেন বাসব, নীলাশোকের ছায়ায় ভূতলে লুটিয়ে রয়েছে মর্ত্যপ্রেমের এক চন্দ্রলেখা। রক্তাংশুকে শোভিতা এক মধুবাসরিকা তার কবরীর কুরুবক, সুকোমল কপোলের লোধ্ররেণু, কপালের পটীররসতিলক আর বক্ষের পত্রলিখা নিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে আছে। সত্যই, জটায়িত বেণীভারের বেদনায় বন্দিনী সেই তপস্বিনীর মৃত্যু হয়েছে। তপস্বিনীর মূর্তি নয়; নীলাশোকের ছায়ায় ভূতললীনা এক প্রেমিকার মূর্তি তার নয়নের স্বপ্নের সঙ্গে মধুবাসকোৎসব যাপন করছে।

ভূতললীনা শ্রুবাবতীর আরও কাছে এগিয়ে আসেন বাসব। প্রেমিকা মর্ত্যনারীর মঞ্জরীবলয়িত একটি বাহু সাগ্রহে বক্ষে গ্রহণ করেন বাসব। প্রেমিকার কণ্ঠসক্ত পুষ্পমাল্যের নির্মাল্য আর প্রেমিকারই মৃদু নিঃশ্বাসের সৌরভ স্বর্গাধীশ বাসবের বক্ষের সকল অনুভব সুরভিত ক'রে দেয়। মর্ত্যের প্রেমিকা নারী প্রতীক্ষাহীন জীবনের শূন্যতা হতে চিরকালের মত মুক্ত হবার জন্য মৃত্যু আহ্বান করেছে, এবং কী অদ্ভুত এই সুধাহীনা বসুধার মৃত্তিকা, মৃত্যুর বেদনাই সুস্মিত জ্যোৎস্নারেখার মত শ্রুবাবতীর অধরে ফুটে রয়েছে।

—প্রিয়া শ্রুবাবতী। আহ্বান করেন বাসব।

শ্রুবাবতীর নিমীলিত নয়নের স্বপ্ন যেন সেই আহ্বানের মধুর মন্দ্রে চমকিত হয়। মৃত্যুমুখিনী নারীর হৃদয়ের কাছে প্রেমিকের ব্যাকুলতা মধুপগুঞ্জনের মত ধ্বনিত হয়েছে, শ্রুবাবতীর নিমীলিত নয়ন কমলকলিকার মত ধীরে ধীরে বিকশিত হয়।

—এসেছ প্রিয় বাসব। কলবেণুক্বণিত দূরান্তের গীতধ্বনির মত শ্রুবাবতীর সফল বাসনার আনন্দ সুস্বরিত হয়।

—এসেছি প্রিয়া শ্রুবাবতী।

—মর্ত্যনারীর ধূলিলীন হৃদয়ের কাছে কেন এসেছেন স্বর্গাধীশ বাসব?

আবার প্রশ্ন করেছে মর্ত্যের মৃত্তিকা? এই প্রশ্ন যেন সুধাময় স্বর্গলোকের একটি রিক্ততার দিকে তাকিয়ে আছে। কিন্তু আর ভুল করবেন না স্বর্গের বাসব। যে-কথা শুনতে পেলে স্বর্গকে বিশ্ব... করতে পারবে এই মর্ত্যের প্রাণ, সেই কথা মর্ত্যেরই ধূলি আর তৃণের উপর দাঁড়িয়ে ঘোষণা ক'রে দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন বাসব।

বাসব বলেন—একটি কথা বলতে এসেছি শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—কি?

বাসব—আমি ভালবাসি।

বনস্থলীর সমীর হঠাৎ হর্ষে অশান্ত হয়, চঞ্চল হয় পুষ্পিত হয় নীলাশোক। ভূতললীনা চন্দ্রলেখাও যেন চঞ্চলিত এক উৎসবের আনন্দে লীন হয়ে যাবার জন্য বাসবের আলিঙ্গনে আত্মদান করে।

বাসব বলেন—চল প্রিয়া শ্রুবাবতী।

শ্রুবাবতী—কোথায়?

বাসব—স্বর্গলোকে চল।

শ্রুবাবতী—আমি তো স্বর্গ চাইনি বাসব।

বাসব—কিন্তু স্বর্গ যে তোমাকে চায়।

৬

তিনজনে ও ঘরে ফিরিয়া গিয়া দেখিলাম, কেষ্টবাবু এবং প্রভাত বেঞ্চির দুই কোণে উপবিষ্ট। কেষ্টবাবু হাই তুলিতেছেন এবং আড়চক্ষে প্রভাতকে নিরীক্ষণ করিতেছেন। প্রভাত করতলে চিবুক রাখিয়া চিন্তামগ্ন। ননীবালা মেঝেয় পা ছড়াইয়া দেয়ালে ঠেস্ দিয়া ঝিমাইয়া পড়িয়াছেন। আমাদের দেখিয়া সকলে সিধা হইলেন। প্রভাত বেঞ্চি ছাড়িয়া উঠিয়া অস্ফুটস্বরে বলিল—'বসুন'।

ব্যোমকেশ বলিল,—'বসব না। ভোর হয়ে এল, এবার বাড়ি ফিরতে হবে। এখনি হয়তো পুলিস এসে পড়বে। আমাকে দেখলে পুলিসের মেজাজ খারাপ হয়ে যেতে পারে। আপনাদের একটা কথা বলে রাখি মনে রাখবেন। কারুর ঘাড়ে দোষ চাপাবার চেষ্টা করবেন না, তাতে নিজেরই অনিষ্ট হবে, . পুলিস হয়তো সকলকেই ধরে নিয়ে গিয়ে হাজতে পুরবে।'

সকলে চুপ করিয়া রহিল।

'প্রভাতবাবু এবার আপনার কথা বলুন। কাল আপনি আপনার মাকে সিনেমায় পৌঁছে দিয়েছিলেন, নিজে সিনেমা দেখেননি?'

প্রভাত বলিল,—'না। আমি টিকিট কিনে মাকে সিনেমায় বসিয়ে দিয়ে নিজের দোকানে গিয়েছিলাম।'

'ও।—রাত্রি সাড়ে আটটার পর দোকানে গেলেন?'

'হ্যাঁ।—দেয়ালীর রাত্রে দোকান আলো দিয়ে সাজিয়েছিলাম।'

'তারপর?'

'তারপর পৌনে বারোটার সময় দোকান বন্ধ করে আবার সিনেমায় গেলাম, সেখান থেকে মাকে নিয়ে ফিরে এলাম।'

'তাহলে আন্দাজ ন'টা থেকে পৌনে বারোটা পর্যন্ত আপনি দোকানেই ছিলেন। দোকানে আর কেউ ছিল?'

'গুরুং ছিল, দোরের সামনে পাহারা দিচ্ছিল।'

'গুরুং—মানে গুর্খা দরোয়ান। খদ্দের কেউ আসেননি?'

'না।'

'সারাক্ষণ দোকানে বসে কি করলেন?'

'কিছু না। পিছনের কুঠরিতে বসে বই বাঁধলাম।'

'আচ্ছা, ও কথা যাক।—অনাদিবাবুর সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল?'

প্রভাত ক্ষুব্ধ চোখ তুলিল,—'না। উনি আমাকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিলেন, প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহার করতেন। তারপর—ক্রমশ—'

'ক্রমশ ওঁর মন বদলে গেল? আচ্ছা উনি আপনাকে পুষ্যিপুত্তুর নিয়েছিলেন কেন?'

'তা জানি না।'

'প্রথম প্রথম ভাল ব্যবহার করতেন, তারপর মন-মেজাজ বদলে গেল; এর কোনও কারণ হয়েছিল কি?'

'হয়তো হয়েছিল। আমি জ্ঞানত কোনও দোষ করিনি।'

প্রভাত ক্লান্তভাবে আবার বেঞ্চিতে বসিল। ব্যোমকেশ তাহাকে সদয়-চক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল,—'আপনি বরং কিছুক্ষণ শুয়ে থাকুন গিয়ে। পুলিস একবার এসে পড়লে আর বিশ্রাম পাবেন কি না সন্দেহ।'

প্রভাত কিন্তু কেবল মাথা নাড়িল। ব্যোমকেশ তখন ননীবালার দিকে ফিরিয়া বলিল, 'আপনার সঙ্গেও তো অনাদিবাবুর সদ্ভাব ছিল না।'

ননীবালা যুগপৎ মুখ এবং গো-চক্ষু ব্যাদিত করিয়া প্রায় কাঁদো কাঁদো হইয়া উঠিলেন,—'আপনাকে তো সবই বলেছি ব্যোমকেশবাবু। আমি ছিলুম বুড়োর চক্ষুশূল। প্রভাতকে বুড়ো ভালবাসত, কিন্তু আমাকে দু'চক্ষে দেখতে পারত না। রাতদিন ছুতো খুঁজে বেড়াতো; একটা কিছু পেলেই শুরু করে দিত দাঁতের বাদ্যি। এমন নীচ অন্তঃকরণ—' ননীবালা থামিয়া গেলেন। অনাদি হালদার মরিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মৃতদেহ অদূরেই পড়িয়া আছে—এই কথা সহসা স্মরণ করিয়াই বোধ করি আত্মসংবরণ করিলেন। অধিকন্তু অনাদিবাবুর সহিত তাঁহার অসদ্ভাবের প্রসঙ্গ অপ্রকাশ থাকাই বাঞ্ছনীয়, তাহা কিঞ্চিৎ বিলম্বে উপলব্ধি করিলেন।

কেষ্টবাবুও সেই ইঙ্গিত করিলেন, হেঁচ্‌কি তোলার মত একটা হাসির শব্দ করিয়া বলিলেন,—'তাহলে শুধু আমার সঙ্গেই অনাদির ঝগড়া ছিল না!'

প্রভাত একবার ঘাড় ফিরাইয়া তাঁহার দিকে তাকাইল। ব্যোমকেশ বলিল,—'ও কথার কোনও মানে হয় না। দেখা যাচ্ছে সকলের সঙ্গেই অনাদি হালদারের ঝগড়া ছিল; তাতে কিছু প্রমাণ হয় না। খুন করতে হলে যেমন খুন করার ইচ্ছে থাকা চাই, তেমনি খুন করার সুযোগও দরকার।' ব্যোমকেশ ননীবালার দিকে ফিরিয়া বলিল,—'কাল সিনেমা কেমন দেখলেন?'

ননীবালা আবার হাঁ করিয়া চাহিলেন।

'অ্যাঁ—সিনেমা—!'

'ছবিটা শেষ পর্যন্ত দেখেছিলেন?'

এতক্ষণে ননীবালা বোধ হয় প্রশ্নের মর্মার্থ অনুধাবন করিলেন, বলিলেন—'ওমা, তা আবার দেখিনি! গোড়া থেকে শেষ অবধি দেখেছি, ছবি শেষ হয়েছে তবে বাইরে এসেছি। আমিও বাইরে এসে দাঁড়ালাম, আর প্রভাত এল। ওর সঙ্গে বাসায় চলে এলুম। এসে দেখি—'

ব্যোমকেশ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল,—'জানি। এবার চলুন অনাদি হালদারের শোবার ঘরে যাওয়া যাক। লোহার অলমারিটা দেখা দরকার।'

আমরা ছয়জন একজোট হইয়া অনাদি

হালদারের শয়নকক্ষের দিকে চলিলাম। কয়েকদিন আগে যে ঘরে অনাদি হালদারের সহিত দেখা হইয়াছিল, তাহারই পাশের ঘর। নৃপেন দ্বারের পাশে সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া দিল।

ঘরটি আকারে প্রকারে নৃপেনের ঘরের মতই, তবে বাড়ির অন্য প্রান্তে। একটি গরাদযুক্ত জানালা খোলা রহিয়াছে। ঘরে একটি খাট এবং তাহার শিয়রে একটি স্টীলের আলমারি ছাড়া আর কিছু নাই।

আমরা সকলে ঘরে প্রবেশ করিলে ঘরে স্থানাভাব ঘটিল। ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনাদের সকলকে এ ঘরে দরকার নেই। কেষ্টবাবু, আপনি বরং ও ঘরে থাকুন গিয়ে। সিঁড়ির দরজা ভাঙা, এখুনি হয়তো পুলিস এসে পড়বে।'

আলমারির ভিতর কী আছে, তাহা জানিবার কৌতূহল অন্যান্য সকলের মত কেষ্টবাবুরও নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তিনি বলিলেন,—'কুছ পরোয়া নেই, আমিই মড়া আগ্‌লাবো। কিন্তু—এই সময় অন্তত এক পেয়ালা গরম চা পাওয়া যেত।' বলিয়া তিনি সস্পৃহভাবে হাত ঘষিতে লাগিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'চা হলে মন্দ হত না'—সে ননীবালার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টি ফিরাইল।

ননীবালা অনিচ্ছাভাবে বলিলেন,—'চা আমি করতে পারি। কিন্তু দুধ নেই যে!'

ব্যোমকেশ বলিল,—'দুধের বদলে লেবুর রস চলতে পারে।'

কেষ্টবাবু গাঢ়স্বরে বলিলেন—'আদা! আদা! আদার রস দিয়ে চা খান, শরীর চাঙ্গা হবে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আদার রসও চলবে।'

ননীবালা ও কেষ্টবাবু প্রস্থান করিলে নৃপেন একটু ইতস্তত করিয়া বলিল,—'আমাকে দরকার হবে কি?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'আপনাকেই দরকার। প্রভাতবাবু বরং নিজের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম করতে পারেন।'

প্রভাত একবার যেন দ্বিধা করিল, তারপর কোনও কথা না বলিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল। ঘরে রহিলাম আমরা দুজন ও নৃপেন।

ঘরে বিশেষ দ্রষ্টব্য কিছু নাই। খাটের উপর বিছানা পাতা; পরিষ্কার বিছানা, গত রাত্রে ব্যবহৃত হয় নাই। দেয়াল আলনায় একটি কাচা ধুতি পাকানো রহিয়াছে। এক কোণে গেলাস-ঢাকা জলের কুঁজা। ব্যোমকেশ এদিকে ওদিকে দৃষ্টি বুলাইয়া পকেট হইতে চাবি বাহির করিল।

আলমারিটা নূতন। বার্নিশ করা কাঠের মত রঙ, লম্বা সরু আকৃতি,

তাতে মজবুত। ব্যোমকেশ চাবি ঘুরাইয়া জোড়া কবাট খুলিয়া ফেলিল। আমি এবং নৃপেন সাগ্রহে ভিতরে উঁকি মারিলাম।

ভিতরে চারিটি থাক। সর্বোচ্চ থাকের এক প্রান্ত হইতে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত এক সারি বই; মাঝে মাঝে ভাঙা দাঁতের মত ফাঁক পড়িয়াছে। কয়েকটি বইয়ের পিঠে সোনার জলে নাম লেখা—কৃত্তিবাসী রামায়ণ, মহাজন পদাবলী। ব্যোমকেশ আরও কয়েকখানি বই বাহির করিয়া দেখিল, অধিকাংশই বটতলার বই, কিন্তু বাঁধাই ভাল। হয়তো প্রভাত বাঁধিয়া দিয়াছে।

ব্যোমকেশ নৃপেনকে জিজ্ঞাসা করিল,—'অনাদি হালদার কি খুব বই পড়ত?'

নৃপেন শুষ্কস্বরে বলিল, 'কোনওদিন পড়তে দেখিনি।'

'বাড়িতে আর কেউ বই পড়ে?'

'প্রভাতবাবু পড়েন। আমিও পেলে পড়ি। কিন্তু কর্তার আলমারিতে যে বই আছে, তা আমি কখনও চোখে দেখিনি।'

'অথচ বইয়ের সারিতে ফাঁক দেখে মনে হচ্ছে কয়েকখানা বই বার করা হয়েছে। কোথায় গেল বইগুলো?'

নৃপেন ঘরের এদিক-ওদিক দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল,—'তা তো বলতে পারি না। এ ঘরে দেখছি না। প্রভাতবাবুকে জিগ্যেস করব?'

ব্যোমকেশ বলিল, —'এখন থাক, এমন কিছু জরুরী কথা নয়। —আচ্ছা, বাইরে অনাদি হালদারের কোথায় বেশী যাতায়াত ছিল?'

নৃপেন বলিল,—'কর্তা বাড়ি থেকে বড় একটা বেরুতেন না। যখন বেরুতেন, হয় সলিসিটারের সঙ্গে দেখা করতে যেতেন, নয়তো ব্যাঙ্কে যেতেন। এ ছাড়া আর বড় কোথাও যাতায়াত ছিল না।'

ব্যোমকেশ দ্বিতীয় থাকের প্রতি দৃষ্টি নামাইল।

দ্বিতীয় থাকে অনেকগুলি শিশি-বোতল রহিয়াছে। শিশিগুলি পেটেন্ট ঔষধের, বোতলগুলি বিলাতী মদের। একটি বোতলের মদ্য প্রায় তলায় গিয়া ঠেকিয়েছে, অন্যগুলি মিল করা।

ব্যোমকেশ বলিল, 'অনাদি হালদার মদ খেত?'

নৃপেন বলিল,—'মাতাল ছিলেন না। তবে খেতেন। মাঝে মধ্যে গন্ধ পেয়েছি।'

ঔষধের শিশিগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখা গেল অধিকাংশই টনিক জাতীয় ঔষধ, অতীত যৌবনকে পুনরুদ্ধার করিবার বিলাতী মুষ্টিযোগ। ব্যোমকেশ প্রশ্ন করিল,—'সন্ধ্যের পর বেড়াতে বেরুনোর অভ্যেস অনাদি হালদারের ছিল না?'

নৃপেন বলিল,—'খুব বেশী নয়, মাসে দু'-তিন দিন বেরুতেন।'

'বাঃ! অনাদি হালদারের গোটা চরিত্রটি বেশ পষ্ট হয়ে উঠছে। খাসা চরিত্র!' ব্যোমকেশ আলমারির তৃতীয় থাকে মন দিল।

তৃতীয় থাকে অনেকগুলি মোটা মোটা খাতা এবং কয়েকটি ফাইল। খাতাগুলি কার্ডবোর্ড দিয়া মজবুত করিয়া বাঁধানো। খুলিয়া দেখা গেল ব্যবসা সংক্রান্ত হিসাবের খাতা। ব্যবসায়ের রীতি-প্রকৃতি জানিতে হইলে খাতাগুলি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করা প্রয়োজন; কিন্তু তাহার সময় নাই। ব্যোমকেশ নৃপেনকে জিজ্ঞাসা করিল,—'অনাদি হালদার কিসের ব্যবসা করত আপনি জানেন?'

নৃপেন বলিল,—'আগে কি ব্যবসা করতেন জানি না, উনি নিজের কথা কাউকে বলতেন না। তবে যুদ্ধের গোড়ার দিকে জাপানী মাল কিনেছিলেন। কটন মিলে যেসব কলকব্জা লাগে, তাই। সস্তায় কিনেছিলেন—'

'তারপর কালাবাজারের দরে বিক্রি করেছিলেন। বুঝেছি।' ব্যোমকেশ একখানা ফাইল তুলিয়া লইয়া মলাট খুলিয়া ধরিল।

ফাইলে নানা জাতীয় দলিলপত্র রহিয়াছে। নূতন বাড়ির ইস্টাম্বর দস্তাবেজ, সলিসিটারের চিঠি, বাড়িভাড়ার রসিদ ইত্যাদি। কাগজপত্রের উপর লঘুভাবে চোখ বুলাইতে বুলাইতে ব্যোমকেশ পাতা উল্টাইতে লাগিল, তারপর এক জায়গায় আসিয়া থামিল। একটি রুলটানা কাগজে কয়েক ছত্র লেখা, নীচে স্ট্যাম্পের উপর দস্তখৎ।

কাগজখানা ব্যোমকেশ ফাইল হইতে বাহির করিয়া লইল, মুখের কাছে তুলিয়া মনোযোগসহকারে পড়িতে লাগিল। আমি গলা বাড়াইয়া দেখিলাম, একটি হ্যান্ড-নোট। অনাদি হালদার হাতচিঠির উপর দয়ালহরি মজুমদার নামক এক ব্যক্তিকে পাঁচ হাজার টাকা ধার দিয়াছে।

ব্যোমকেশ হ্যান্ডনোট হইতে মুখ তুলিয়া বলিল,—'দয়ালহরি মজুমদার কে?'

নৃপেন কিছুক্ষণ চাহিয়া থাকিয়া বলিল,—'দয়ালহরি—ও, মনে পড়েছে—' একটু কাছে সরিয়া আসিয়া খাটো গলায় বলিল,—'দয়ালহরিবাবুর মেয়েকে প্রভাত-বাবু বিয়ে করতে চেয়েছিলেন, তারপর কর্তা মেয়ে দেখে অপছন্দ করেন—'

'মেয়ে বুঝি কুচ্ছিৎ?'

'আমরা কেউ দেখিনি।'

'কিন্তু পাঁচ হাজার টাকা ধার দেওয়ার মানে কি?'

'জানি না; কিন্তু হয়তো ওই জন্যেই—'

'ওই জন্যেই কী?'

'হয়তো—যাকে টাকা ধার দিয়েছেন, তার মেয়ের সঙ্গে কর্তা প্রভাতবাবুর বিয়ে দিতে চান নি।'

'হতে পারে। অনাদি হালদার কি তেজারতির কারবার করত?'

'না। তাঁকে কখনও টাকা ধার দিতে দেখিনি।'

'হ্যান্ডনোটে তারিখ দেখছি ১১।৯।১৯৪৬, অর্থাৎ মাসখানেক আগেকার। অনাদি হালদার মেয়ে দেখতে গিয়েছিল কবে?'

'প্রায় ওই সময়। তারিখ মনে নেই।'

'দয়ালহরি মজুমদার সম্বন্ধে আপনি কিছু জানেন?'

'কিচ্ছু না। বাইরে শুনেছি মেয়েটি নাকি খুব ভাল গাইতে পারে, এরি মধ্যে খুব নাম করেছে। ওরা পূর্ববঙ্গের লোক, সম্প্রতি কলকাতায় এসেছে।'

'তাই নাকি! অজিত, দয়ালহরি মজুমদারের ঠিকানাটা মনে করে রাখ তো—' হাতচিঠি দেখিয়া পড়িল—'১৩।৩, রামতনু লেন, শ্যামবাজার।'

মনে মনে ঠিকানাটা কয়েকবার আবৃত্তি করিয়া লইলাম। ব্যোমকেশ আলমারির নিম্নতম থাকটি তদারক

করিতে আরম্ভ করিল।

নীচের থাকে কেবল একটি কাঠের হাত-বাক্স আছে, আর কিছু নাই। হাত বাক্সের গায়ে চাবি লাগানো। ব্যোমকেশ চাবি ঘুরাইয়া ডালা তুলিল। ভিতরে একগোছা দশ টাকার নোট, কিছু খুচরা টাকা-পয়সা এবং একটি চেক বহি।

ব্যোমকেশ নোটগুলি গণিয়া দেখিল। দুইশত ষাট টাকা। চেক বহিখানি বেশ পুরু, একশত চেকের বহি; তাহার মধ্যে অর্ধেকের অধিক খরচ হইয়াছে। ব্যোমকেশ ব্যবহৃত চেকের অর্ধাংশগুলি উল্টাইয়া দেখিতে দেখিতে প্রশ্ন করিল,—'ভারত ব্যাংক ছাড়া আর কোনও ব্যাংকে অনাদি হালদার টাকা রাখত?'

নৃপেন বলিল,—'তিনি কোন্ ব্যাংকে টাকা রাখতেন, তা আমি জানি না।'

'আশ্চর্য! নতুন বাড়ি তৈরি হচ্ছে, কন্‌ট্র্যাক্টরকে টাকা দিত কি করে?'

'ক্যাশ দিতেন। আমি জানি, কারণ আমি রসিদের খসড়া তৈরি করে কন্‌ট্র্যাক্টরকে দিয়ে সই করিয়ে নিতাম। যেদিন টাকা দেবার কথা, সেদিন বেলা ন'টার সময় কর্তা বেরিয়ে যেতেন, এগারটার সময় ফিরে আসতেন। তারপর কন্‌ট্র্যাক্‌টরকে টাকা দিতেন।'

'অর্থাৎ ব্যাংক থেকে টাকা আনতে যেতেন?'

'আমার তাই মনে হয়।'

'হুঁ। বাড়ির দরুণ কন্‌ট্র্যাক্টরকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে, আপনি জানেন?'

নৃপেন মনে মনে হিসাব করিয়া বলিল,—'প্রায় ত্রিশ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। রসিদগুলো বোধ হয় ফাইলে আছে। যদি জানতে চান—'

ব্যোমকেশ চেক-বহি রাখিয়া দিয়া অর্ধ-স্বগত বলিল, —'ভারি আশ্চর্য!—না, চুলচেরা হিসেব দরকার নেই। চল অজিত, এ ঘরে দ্রষ্টব্য যা কিছু দেখা হয়েছে।' বলিয়া সযত্নে আলমারি বন্ধ করিল।

এই সময় ননীবালা একটি বড় থালার উপর চার পেয়ালা চা লইয়া ঘরে প্রবেশ করিলেন,—'এই নিন। —প্রভাত নিজের ঘরে শুয়ে আছে; তার চা দিয়ে এসেছি।'

নৃপেন আলো নিভাইয়া দিল। জানালা দিয়া দেখা গেল বাহিরে বেশ পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে।

আমরা তিনজনে চায়ের পেয়ালা হাতে লইয়া বাহিরের ঘরে আসিলাম, কেষ্টবাবুর চায়ের পেয়ালা থালার উপর লইয়া ননীবালা আমাদের সঙ্গে আসিলেন।

বেঞ্চের উপর লম্বা হইয়া শুইয়া কেষ্টবাবু ঘুমাইতেছেন। ঘর্ঘর শব্দে তাঁহার নাক ডাকিতেছে।

ব্যালকনিতে উঁকি মারিয়া দেখিলাম, অনাদি হালদারের মৃত মুখের উপর সকালের আলো পড়িয়াছে। মাছিরা গন্ধ পাইয়া আসিয়া জুটিয়াছে।

(ক্রমশ)

জেমস হিলটন

অমিয়কুমার

॥ ১ ॥

১৯৫৪-র ডিসেম্বরে জেম্‌স হিলটনের মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশের কাগজপত্রে এই সংবাদটি যথোচিতভাবে পরিবেশিত হয়নি, অথচ, এদেশে তাঁর রচনার অনুরাগীর অভাব নেই বলেই মনে হয়।

হাল আমলে এদেশে দু' ধরনের বিদেশী লেখকের নাম নিয়ে হৈ চৈ শোনা যায়। এক দলকে বুস্ট করা হয় সম্পূর্ণ রাজনৈতিক কারণে। আর একদল হলেন 'ইনটেলেকচুয়াল' লেখক, এঁদের নামাবলী সব্যারি-সাধকদের ওষ্ঠাগ্রে।

হিলটন এ দু' জাতের কোনোটিরই অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না, সুতরাং আশ্চর্য নয় যে, অনেকেই তাঁর সম্পর্কে নীরব। তবু, বহু পাঠক আছেন যাঁরা গল্প ভালোবাসেন এবং চান যে, গল্প ভালো ক'রে বলা হোক। হিলটনের লেখা তাঁদের প্রিয়।

ইংলণ্ড ও আমেরিকায় হিলটন তাঁর জীবনকালেই একজন বিশেষ জনপ্রিয় লেখক হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন। দামী ও সস্তা সবরকম সংস্করণেই হু-হু ক'রে বিক্রী হয়েছে তাঁর বই। ফিল্‌মেও তাঁর একাধিক কাহিনী সাফল্যের সঙ্গে অভিনীত ও প্রদর্শিত হয়েছে। যতদূর জানি, বাংলায় তাঁর দুটি কাহিনী অনূদিত হয়েছে তার মধ্যে একটি অনুবাদ করেছেন শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্র। তাঁর অপর একটি কাহিনীর ছায়া নিয়ে রচিত একটি বাংলা ফিল্‌মও কয়েকবছর আগে সিনেমা-শকারীদের আনন্দ দান করেছিল। কিন্তু, 'জনপ্রিয়' গল্পকারদের নিয়ে আলোচনা করেন 'ইনটেলেকচুয়াল'রা কিংবা যাঁর লেখা সহজে বোঝা যায়, পড়ে আনন্দ পাওয়া যায় এমন লেখককে কেন্দ্র ক'রে কফির কাপে তুফান তুলবেন স্নবেরা— অতএব সেই মহাশয় ব্যক্তিগণের কাছে আশা করাই অন্যায়।

॥ ২ ॥

১৯০০ খৃষ্টাব্দে ল্যাংকাশায়ারে হিলটনের জন্ম হয়। ছোটবেলায় পড়াশোনা করেন কেম্‌ব্রিজের একটি স্কুলে। এই স্কুলজীবনের স্মৃতি থেকে তিনি পরবর্তীকালে তাঁর বিখ্যাত (এবং সম্ভবত শ্রেষ্ঠ) কাহিনী 'গুড বাই মিস্টার চিপ্‌স'-এর উপাদান সংগ্রহ করেন। স্কুলের পড়া

শেষ করে ভর্তি হন কেম্‌ব্রিজেরই ক্রাইস্‌টস্‌ কলেজে। ছাত্র অবস্থাতেই তাঁর প্রথম উপন্যাস 'ক্যাথরিন হারসেল্‌ফ' রচনা করেন। এই সময় 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকা তাঁর লেখা নিতে শুরু করে।

এরপর দীর্ঘকাল তিনি লণ্ডনেই কাটান এবং নিজেকে নানাবিধ সাহিত্য-কর্মে নিয়োজিত রাখেন। ১৯৩৩-এর বসন্তে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত উপন্যাসগুলির অন্যতম—'লস্ট হরাইজন'। সমালোচকরা বইটির প্রশংসা করলেন কিন্তু লেখক খ্যাতির তুলনায় অর্থ পাননি তখনও।

কয়েক মাস পরে 'দি ব্রিটিশ উইক্‌লি' পত্রিকার কর্তৃপক্ষ তাঁদের ক্রীস্টমাস ক্রোড়পত্রের জন্যে একটি বড় গল্প লিখে দেবার জন্যে হিলটনকে অনুরোধ জানান, হিলটনও স্বীকৃত হন। দু' সপ্তাহের মধ্যেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষকে গল্পটি দেয়ার কথা ছিল, লেখক কিন্তু অনেক ভেবেও প্লট খুঁজে পাচ্ছিলেন না। অবশেষে একদিন শেষরাত্রে ঘুমের আশা ত্যাগ ক'রে তিনি সাইকেল চ'ড়ে বেড়াতে বের হলেন। ফিরে যখন এলেন তখন তিনি খুঁজে পেয়েছেন কাহিনী। প্রাতরাশ শেষ করেই গিয়ে বসলেন তাঁর লেখার টেবিলে। চারদিনে শেষ হ'ল লেখা,—তাঁর সুবিখ্যাত কাহিনী, 'গুড বাই মিস্টার চিপ্‌স'। কিছুকাল পরেই গ্রন্থাকারে এই বই প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হিলটনের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল, ইংলণ্ডের অন্যতম সেরা-লিখিয়ে হিসেবে তিনি স্বীকৃতি লাভ করলেন এবং শেষোক্ত হলেও অন্যূন, এই বইটি থেকে প্রচুর অর্থ উপার্জন করলেন হিলটন। তখন তাঁর বয়েস মাত্র তেত্রিশ।

অ্যাটলানটিকের অপর পারেও হিলটনের খ্যাতির ঢেউ পৌঁছেছিল। ১৯৩৩-এ আমেরিকাতে 'লস্ট-হরাইজন'-এর একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয় এবং এই সময়েই এই বইটিকে সমালোচক ও পাঠকরা নতুন ক'রে 'আবিষ্কার' করলেন। এরপর থেকে হিলটনের ভাগ্য তাঁকে অকৃপণভাবে খ্যাতি ও বিত্ত দুই-ই দিয়েছে।

১৯৩৭-এ হলিউডের দৃষ্টি হিলটনের কাহিনীগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়। ঐ বছরেই 'লস্ট হরাইজন'-এর কাহিনী ও পরবর্তীকালে 'গুড বাই মিস্টার চিপ্‌স' ও 'র‍্যানডম হারভেস্ট'-ও চিত্রে রূপায়িত হয়। তিনটি কাহিনীর চিত্ররূপ সব দেশেই বহু দর্শকের উচ্ছ্বসিত অভিনন্দন লাভ করেছে এবং মূল বইগুলিরও বহু নতুন পাঠক সংগ্রহ ক'রে দিয়েছে।

ব্যক্তিগতভাবে হিলটন ছিলেন নম্র স্বভাবের ভদ্রলোক কিন্তু তাঁর চরিত্রে দৃঢ়তার অভাব ছিল না। যখন তিনি তাঁর খ্যাতির শিখরে অবস্থিত তখন প্রকাশকেরা তাঁর প্রথমদিকের অপেক্ষাকৃত

অপরিণত লেখাগুলি নতুন ক'রে প্রকাশ করতে চাইলেন, হিলটন ছিলেন এ প্রচেষ্টার বিরোধী। হিলটন ভালোবাসতেন সংগীত আর পর্বতারোহণ। তাঁর প্রিয় একটি অ্যালসেশিয়ান প্রায়ই পর্বতারোহণে তাঁর সংগী হ'ত।

॥ ৩ ॥

হিলটনের লেখা পড়তে বসলেই আমাদের অনিবার্যভাবে মনে পড়ে সমরসেট মমের কথা। অবশ্য রচনার পরিমাণে, বৈচিত্র্যে, উৎকর্ষে ও জীবন সম্পর্কে দৃষ্টির গভীরতা ও ব্যাপকতায় মমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রশ্নাতীত, কিন্তু উভয়েই ভালোভাবে গল্প লেখাকেই তাঁদের প্রধান কাজ বলে মনে করেছেন এবং সে-কাজ ঠিকভাবে করতে পারলেই উভয়েই সুখী হয়েছেন। উভয়েই সাধারণ পাঠক-পাঠিকার অভিনন্দনেই সন্তুষ্ট, মমকে মঞ্চ ও হিলটনকে পর্দা খ্যাতি ও অর্থ অর্জনে সহায়তা করেছে, দুজনের রচনাশৈলীতেও মিল আছে এবং উন্নাসিক সমালোচকদের কাছে উভয়েই জনপ্রিয়তার অভিযোগে অভিযুক্ত! বলা বাহুল্য, উভয়ের মধ্যে মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। উভয়ের দৃষ্টিভঙ্গীর সবচেয়ে বড়ো পার্থক্য বোধ হয় এইখানে যে মোপাসাঁর মতো মম নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি নির্বিকার, অপরপক্ষে নিজের সৃষ্ট চরিত্রগুলির প্রতি মমতা ও দরদ হিলটনের রচনায় খুবই স্পষ্ট। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, হিলটন মমের লেখার অনুরাগী পাঠক ছিলেন।

আধুনিককালে অনেক ঔপন্যাসিক আর শুধু গল্প বলাকেই তাঁহার একমাত্র কর্তব্য ব'লে মনে করেন না এবং অনেক পাঠকও গল্প ছাড়া আরো অনেক কিছু দাবী করেন ঔপন্যাসিকের কাছে। এর ফলে ভালো অনেক কিছু নিশ্চয়ই হয়েছে এবং এ দাবী মেনে নিয়েও অনেক সার্থক উপন্যাস লিখিত হয়েছে একথা স্বীকার করেও বলতে হয় যে, কাহিনী হল উপন্যাসের প্রাণ আর প্রাণের সহজ প্রকাশ, স্বচ্ছন্দ লীলা, যদি শ্রদ্ধেয় হয় তাহ'লে হিলটনকে একজন সার্থক ঔপন্যাসিক ব'লে মেনে নেবার কোনো বাধাই থাকে না।

॥ ৪ ॥

জেম্‌স হিলটনের শ্রেষ্ঠ রচনা 'গুড বাই মিস্টার চিপ্‌স'। একজন সাধারণ শিক্ষকের জীবনকে তিনি যে যত্ন, সহানুভূতি ও নৈপুণ্যের সঙ্গে বিধৃত করেছেন তা সত্যিই বিস্ময়কর। সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবন সাধারণ ভাষায় বললেও যে কতটা অসাধারণ হ'য়ে উঠতে পারে তার অনন্য উদাহরণ মিস্টার চিপ্‌স। কোনো দেশে কোনো পাঠকের মনেই এর আবেদন ব্যর্থ হবার নয়। এই বইয়ে হিলটন এমন একটি চরিত্র ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন যার সঙ্গে একবার পরিচয় হ'লে তাকে ভোলা অসম্ভব এবং যে পরোক্ষভাবে কয়েকটি চিরন্তন মানবিক মূল্যবোধ আস্থা অবিচল রাখতে আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করে। সুতরাং অকপট পাঠকমাত্রেই স্বীকার করতে বাধ্য যে, অন্তত এই একটি গ্রন্থে হিলটন শুধু গল্প বলেননি, জীবন সম্পর্কে গভীর দৃষ্টির পরিচয়ও দিয়েছেন। সৎ শিল্পী ও লেখক মাত্রেই জীবন সম্পর্কে কিছু-না-কিছু মূল্যবান শিক্ষা আমাদের দেন তবে এর জন্যে শিল্পধর্মকে বিসর্জন দেয়ার প্রয়োজন তাঁদের হয় না, এমনই সৎ ও বিবেকবান লেখক হিসেবে 'গুড বাই মিস্টার চিপ্‌স'-এর লেখক চিরদিন পাঠকদের শ্রদ্ধা লাভ করবেন।

জেম্‌স হিলটন রচিত গ্রন্থাবলী:—
And Now Good Bye. Ill Wind. Without Armour. We Are Not Alone. Lost Horizon. Good Bye Mr. Chips. Random Harvest. So Well Remembered.
তালিকা সম্ভবত অসম্পূর্ণ ও কালানুক্রমিক নয়।

স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং

বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়

গত ১১ই মার্চ সকালবেলা হৃদরোগে এযুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং দেহত্যাগ করেছেন। খবরটা জগৎবাসীর কাছে খুবই আকস্মিক—মাত্র কয়েক ঘণ্টা আগেও তাঁর তিরোধানের কথা কেউ চিন্তাও করতে পারেনি।

দুঃখটা সমগ্র জগতের মানুষের বুকে সমানভাবে বেজেছে। গবেষণা অনেকেই করেন, সর্বদেশের প্রণম্য বিজ্ঞানীরা মানব সাধারণের উপকারার্থে অনেক কিছুই দিয়ে গেছেন কিন্তু আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংএর আবিষ্কার সকলের ওপরে। সমস্ত জীবন ধরে তিনি মানুষকে বাঁচাবার সাধনা করে গেছেন। লুই পাস্তুর, রবার্ট কফের উত্তরসাধক তিনি—তাঁর যুগান্তকারী আবিষ্কার পেনিসিলিন রসায়ন শাস্ত্রের এক নতুন অধ্যায় উদ্ঘাটন করেছে। নব্য রসায়নের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পথিকৃৎ হিসাবে ইতিহাসের পাতায় তাঁর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

১৮৮১ সালে স্কটল্যাণ্ডের এক অতি সাধারণ কৃষক পরিবারে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়ে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের কাজ গ্রহণ করেন। এইখানেই তাঁর সাক্ষাৎ হল স্যার এলম্রোথ রাইটের সঙ্গে, যাঁর অনুপ্রেরণাই ফ্লেমিংকে তাঁর ভবিষ্যৎ কর্মক্ষেত্রে সুপরিচালিত করেছিল। স্যার এমম্রোথ রাইটের গবেষণার ফলেই আবিষ্কৃত হয়েছিল অন্যতম সালফার ঘটিত ঔষধ M. and B 699। আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং ১৯২৮ সালে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। পেনিসিলিন আবিষ্কার হলো,—জানাও গেল কোন কোন জীবাণুর আক্রমণ রোধে এর অলৌকিক কার্যক্ষমতা কিন্তু ১৯৩৮ সালের আগে পর্যন্ত এর গুণাগুণ সম্পূর্ণভাবে পরীক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এই বিরাট কৃতিত্বের জন্য স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংকে ১৯৪৫ সালে নোবেল পুরস্কার দিয়ে বিশ্ববাসী সম্মানিত করে।

পেনিসিলিন কিভাবে আবিষ্কৃত হয়েছিল তার একটা ছোট্ট গল্প বলছি। ১৯২৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কথা—স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং লণ্ডনের কুইন মেরী হাসপাতালে গবেষণা করছেন। গবেষণার বিষয় স্টেফাইলোককাস জাতীয় জীবাণুর বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ। এই সাংঘাতিক ধরনের জীবাণু মানব জাতির অন্যতম প্রধান শত্রু কিন্তু সেদিন পর্যন্ত এর কোন প্রকার বিশেষ কার্যকরী প্রতিষেধক আবিষ্কার হয়নি। ফ্লেমিং সাহেব বিভিন্ন পরিবেশে এদের বৃদ্ধি পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

একদিন ল্যাবরেটরীতে এসে তিনি তো অবাক। যে পাত্রে তিনি জীবাণুর বৃদ্ধি ঘটাচ্ছিলেন তার মধ্যে নীলাভ সবুজ কি একটা ময়লা পড়ে রয়েছে। রেগে আগুন হয়ে গেলেন বিজ্ঞানী—সহকর্মীদের তিরস্কার করতে লাগলেন তাদের অন্যমনস্কতার জন্য। নিশ্চয়ই তারা কেউ ঢাকনা দিতে ভুলে গিয়েছিল তাই কোথা থেকে এই ধুলো বালি উড়ে এসে পড়েছে। কিন্তু বকলেই তো আর জিনিস ফিরে পাওয়া যাবে না? অগত্যা আর কোন উপায় না থাকায় তিনি অন্য কাজে মনোনিবেশ করলেন— এতো দিনের পরিশ্রম নষ্ট হয়ে গেল, শুরু করতে হবে আবার গোড়া থেকে।

হঠাৎ তাঁর কি খেয়াল হল, সবুজ ময়লাটাকে একটা চামচে দিয়ে সরিয়ে রেখে জীবাণুগুলোর বৃদ্ধি অনুবীক্ষণ যন্ত্রর তলায় পরীক্ষা করতে বসলেন। দেখাই যাক না কেন, ব্যাপারটা কি হয়েছে।

অবাক কাণ্ড! একি ব্যাপার? নিজের চোখকেই তিনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। যেখানে সবুজ ময়লাটা পড়েছিল তার চারিদিকের জীবাণুগুলি একদম বৃদ্ধি লাভ করতে পারে নি। এ কি করে সম্ভব? তবে কি?—

তিনি নিশ্চিতভাবে বুঝতে পারলেন ঐ জীবাণুগুলির মৃত্যুবান লুকিয়ে আছে সবুজ ময়লাটার মধ্যে। ভগবানকে ধন্যবাদ ময়লাটা এখনও চামচের গায়ে লেগে ছিল।

নতুন উৎসাহে আবার কাজ শুরু করলেন বিজ্ঞানী। অনুবীক্ষণের তলায় ফেলে দেখলেন ঐ সবুজ ময়লাটা পেনসিলের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণার দ্বারা

প্রস্তুত, তাই যে অলৌকিক পদার্থ এর মধ্যে নিহিত রয়েছে তার নাম হলো পেনিসিলিন। ঐ সবুজ ময়লাটা একজাতীয় শেওলা—তার নামকরণ হলো পেনিসিলিয়াম নোটেটাম। পরীক্ষা করে দেখা গেল ঐ শেওলা থেকে নিষ্কৃত রসকে প্রায় হাজার গুণ ডাইলিউট করলেও এর স্টেফাই-লোককাস জাতীয় জীবাণুকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

এই তো গেল পেনিসিলিন আবিষ্কারের কথা কিন্তু শ্যাওলা জাতীয় পদার্থ থেকে ঔষধির নিষ্কাষণ ঘটিয়ে মানব দেহে প্রয়োগ করতে গবেষকদের আগে বহু বৎসর লেগেছিল।

সৃষ্টির প্রতি স্রষ্টার একটা দুর্বলতা থাকে, কিন্তু বিজ্ঞানী ফ্লেমিং ছিলেন এসবের অনেক ঊর্ধ্বে। তাঁর এই রূপ আমরা দেখতে পাই গত বছরে যখন তিনি ভারত পরিভ্রমণে আসেন। সর্বস্থানেই তিনি বক্তৃতা প্রসঙ্গে চিকিৎসকদের বার বার সতর্ক করে দিয়েছেন অত্যধিক অ্যান্টিবায়োটিক ঔষধ ব্যবহার না করতে।

মানুষের রোগমুক্তির জন্য পেনিসিলিনের অসামান্য কার্যকারিতা সর্বজনস্বীকৃত কিন্তু সামান্য কারণে অত্যধিক এই ঔষধের ব্যবহারের ফল আবার বিষময়ও হতে পারে। অত্যধিক পেনিসিলিন ব্যবহারের ফলে শরীরে পেনিসিলিন প্রতিরোধের ক্ষমতা বৃদ্ধি লাভ করে, ফলে কঠিন রোগের সময় এই ওষুধ আর কার্যকরী হয়না। তাছাড়া আজকাল আবার শোনা যাচ্ছে চামড়ার সংস্পর্শে এসে এ্যাণ্টিবায়োটিক ওষুধগুলি অনেক প্রকার চর্মরোগেরও আবির্ভাব ঘটায়। মানব কল্যাণের নিমিত্ত স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিংএর একনিষ্ঠ সাধনার সাফল্য এই পেনিসিলিন, অতএব এর অপপ্রয়োগে মানুষের কোন অপকার যাতে না ঘটে সেদিকে তাঁর সজাগ দৃষ্টি সব সময়েই ছিল।

এই অতুলনীয় আবিষ্কারের জন্য সমগ্র জীবনে অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং বিভিন্ন দেশ থেকে অজস্র সম্মান পেয়েছেন। বিভিন্ন সম্মানসূচক পদক, উপাধি ও উপহারের সংখ্যা গণনা করা অসম্ভব। বিভিন্ন দেশেরে বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান এই বিরাট আবিষ্কর্তাকে সদস্যপদ দিয়ে নিজেদের গৌরবান্বিত করেছে। এইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ফ্রান্স ও রোমের এ্যাকাডমি অফ্ মেডিসিন, ইংলণ্ডের মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৫০ সালে ভারতবর্ষের ন্যাশনাল ইনস্‌-টিটিউট অফ্ সায়ান্সেসএর তিনি একজন সম্মানীয় সদস্য নির্বাচিত হন।

অধ্যাপক আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং-এর মৃত্যুতে ভারতবর্ষ যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হলো—সে হারাল তার একজন অকৃত্রিম, উদার বন্ধুকে, পৃথিবী হারাল একজন শ্রেষ্ঠ রাসায়নিক ও বিজ্ঞানীকে। ফ্লেমিংএর তিরোভাব কেবলমাত্র ইংলণ্ডের ক্ষতি নয় সমগ্র বিশ্বজগতের ক্ষতি। জগৎ ধ্বংসকারী অস্ত্রের আতঙ্কে যখন সমগ্র মানবসমাজ বিজ্ঞানীকুলকে ধিক্কার দিচ্ছে—তখন ফ্লেমিং-এর মতো বিজ্ঞানীরাই আশার আলো জ্বালিয়ে রেখেছিলেন।

পেনিসিলিনের আবিষ্কর্তা স্যার আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং,—তার আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই চিরকাল অমর হয়ে থাকবেন।

উড়িষ্যার আদিম জাতি গদাবা

উড়িষ্যার কোরাপুট জেলা। তারি এক কোণে ছোট ছোট পাহাড় এঁকে বেঁকে দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। পিরামিডের মত দেখতে, রং খয়েরী লাল। পাহাড়ের দিকে তাকালে নির্জন শ্মশানের কথা মনে হয়। তার বুক থেকে গাছপালা, উদ্ভিদ জীবন নির্বাসিত; শ্যামলিমার লেশ কোথাও নেই। প্রকৃতির এ শুষ্ক, রাক্ষস রূপ কিন্তু সম্পূর্ণ মানুষের সৃষ্টি। অতীতে একদা এখানেও তৃণ, বন ছিল; মৃগের সন্ধানে ব্যাঘ্রেরও শুভাগমন হত। তারপর কোন্ড উপজাতির লোক এ অঞ্চলে এসে বসবাস শুরু করল। বহু-যুগ ধরে চলল পাহাড়ের চিরশ্যামল আবরণ উন্মোচনের চেষ্টা। গাছপালা পুড়িয়ে বনদেবতার খাসমহল থেকে বের করে আনা পাহাড়ের গায়ে ঝুম প্রথায় চাষ করত কোণ্ডেরা। আস্তে আস্তে বর্ষার প্লাবনে জলের ধারা পাহাড় থেকে কত লক্ষ বছরে প্রকৃতির সুনিপুণ হাতে তৈরি মাটি ধুয়ে নিয়ে এল। পাহাড় হয়ে গিয়েছে সম্পূর্ণ বন্ধ্যা। প্রকৃতির অভি-শাপে সেখানে একটা গাছ বা সামান্য তৃণভূমিও নেই।

পাহাড়ের গা বেয়ে নেমে আসা মাটি জমা হয়েছে টিলার নীচে আর সে ধরিত্রী উর্বর, শস্য শ্যামল। সে দেশে বাস করে ভারতের অন্যতম অজ্ঞাত আদিবাসী গদাবা। অতীতদিনে নরবলি দাতা বলে পরিচিত কোণ্ড উপজাতির লোকেরা চলে গিয়েছে আরও দূরে। সেখানে গহন বনে নিজের অস্তিত্বকে অবলুপ্তির হাত থেকে কোনওক্রমে রক্ষা করছে তারা।

দেশী বা বিদেশী নৃতত্ত্ববিদেরা গদা-বাদের সম্বন্ধে এখনও বিশেষ অনুশীলন করেন নি; তাদের সম্বন্ধে প্রামাণ্য কোনও বিবরণ বা পুস্তকও কেউ লেখেন নি। ভারতের আদিম জাতি সম্বন্ধে সদ্য-প্রকাশিত সচিত্র পুস্তক "ভিতোন্দ দি গলিশ" গ্রন্থে গদাবাদের সম্বন্ধে একটা বিশেষ অধ্যায় রয়েছে। তা থেকে কিন্তু তাদের জীবন যাত্রা, রীতি নীতি, আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোনও ধারণাই হয় না। প্রখ্যাত নৃতত্ত্ববিদ ডাঃ ভেরিয়ার এলউইনও

গদাবাদের গোচারণ ক্ষেত্র

কুটিরের দরজার গোড়ায় গদাবা মেয়েরা বসে রয়েছে

এদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লেখেন নি। মিশনারী প্রচারক ও সাধারণ সমাজ সংস্কারককেও গদাবা জীবন বিশেষভাবে আকর্ষণ করতে পারে নি। ফলে সংস্কার, উন্নয়ন, সভ্য মানুষ করে গড়ে তোলার সর্বব্যাপী প্রচেষ্টা অতীতদিনে তাদের নিজস্ব জীবনধারাকে বিপর্যস্ত করতে পারে নি।

গদাবাদের দেশের দূরত্ব বেশী নয়, আর সেখানে যাওয়াও এমন কিছু শক্ত ব্যাপার নয়। খুব সহজেই সুন্দর মোটরের রাস্তা ধরে তাদের গ্রামের মধ্যে চলে যাওয়া যায়। সম্ভবত ব্যবধান বেশী নয় বলেই তাদের জীবন সম্বন্ধে রঙীন কল্পনা সভ্যমানুষকে সে দেশে যেতে অনুপ্রেরণা যোগায়নি। তাছাড়া গদাবারা বাইরের লোক দেখলেই ভিক্ষের প্রার্থনা জানাবে। অর্থের জন্যে সম্পূর্ণ অপরিচিত লোকের কাছে এভাবে অত্যাচার ভারতের অন্য কোনও আদিম জাতি করে না। সুতরাং 'ভিক্ষুকের দেশে' সাধারণ দর্শকের আসা একটু বিপজ্জনক বৈকি!

গদাবাদের সংস্পর্শে প্রথমে এলে মনে হবে যে প্রাপ্তিযোগের আশা ছাড়া অন্য ব্যাপারে বহিরাগতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতে তারা মোটেই উৎসাহী নয়। কেউ কেউ তাদের লাজুক আখ্যাও দিয়েছেন। আমাদের প্রাথমিক অভিজ্ঞতাও হয়েছিল ঐরকম। পরিচয়ের দূরত্ব ও ব্যবধান যেই কেটে গেল, তাঁদের আসল রূপ সেদিন দেখতে পেলাম। লাজুকভাব পোশাকী; কয়েকদিন পরেই তা দূরে হয়ে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে গদাবা যুবক

গদাবা নারী

বা প্রৌঢ় অনর্গল কথা বলে চলেছে। তাদের জীবন, অতীত ইতিহাস, আচারবিচারের প্রসঙ্গ উঠলে আর রক্ষে নেই। কত কথাই সে বলবে। প্রথম প্রথম সাগ্রহে সমস্ত কিছু শুনে ভাল করে লিখে রাখতাম। তাদের জীবনের সঠিক, প্রামাণ্য পরিচয় সংগ্রহ করার গর্বও অনুভব করতাম। দুই একদিনের মধ্যেই সে ভুল ভেঙ্গে গেল। বুঝলাম যে প্রত্যেক বক্তাই নিজের সৃষ্ট কল্পিত কাহিনী পরিবেশন করতে উৎসুক। বহুদিনের পরিচয়ে তীক্ষ্ম বিচার-বুদ্ধি দিয়ে অবান্তর, অপ্রাসঙ্গিক, পরস্পরবিরোধী কথার ও কাহিনীর স্তূপ থেকে সত্য ও প্রাসঙ্গিক জিনিস অনুসন্ধান করে বের করতে হবে। অনেক সময় এদের কথাবার্তার অসংগতি সম্বন্ধে ভেবেছি। জেনেশুনে নিছক মিথ্যা শুধু আনন্দ পাওয়ার জন্যে বলছে এ কখনই নয়। কল্পনাশক্তি সজীব বলেই বোধহয় এত নতুন কাহিনী, নতুন উপকথা বিনা আয়াসে সৃষ্টি করে যেতে পারে।

গদাবা গ্রামে ঢোকার সময় সে কি সাদর স্বাগত সম্ভাষণ! মেয়েরা দল বেঁধে এসে দাঁড়িয়েছে গ্রামের সীমারেখার সামনে। হাতে ভিজে চালের থালা। আগন্তুকের দলকে পরিয়ে দিল ভিজে চালের টীকা। আর তারপর সবাই মিলে একসঙ্গে স্বাগত সঙ্গীত গাইল। জোড়-হাতে আমরা সবাই নমস্কার জানালাম। প্রথামত মেয়েরা নীচু হয়ে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম জানাতে চায়। অপ্রতিভ হয়ে সরে এসে বললাম: হয়েছে, হয়েছে। আমরা সবাই বড় খুশী হয়েছি! অভ্যর্থনা রাজকীয়। অন্য আদিম জাতির গ্রামে গেলে সবাই ছুটে পালায় বা অত্যন্ত সন্দেহের দৃষ্টিতে বহিরাগতের আচরণ লক্ষ্য করে। হঠাৎ এতখানি আত্মীয়তার জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। প্রণামের পরই কিন্তু সবাই একসঙ্গে হাত বাড়াল দক্ষিণা প্রাপ্তির আশায়। তাদের সাদর অভ্যর্থনার উপযুক্ত মর্যাদা দিতে হবে বলে পথ-প্রদর্শক নির্দেশ দিল। কয়েকদিন তাদের গ্রামে কাটাতে হবে; আমরা আবার সম্মানিত অতিথি। সুতরাং বেশ কিছু ব্যয় হল। প্রতিটি গ্রামে অতিথির অধিকার ও সম্মান পেতে গেলে এইরকম মোটা

দর্শনী দিতে হয়। খুব বেশী বিত্তশালী না হলে গদাবাদের বিভিন্ন গ্রামে ঘোরা অসম্ভব।

ছোট ছোট পাথর দিয়ে তৈরি দেয়াল সর্পিল গতিতে গ্রামকে বেষ্টন করে রয়েছে। কোথাও বা পাথরের পাঁচিলের বদলে বাঁশের বেড়া। বাখারি দিয়ে ঘেরা মাটির গোল ঘর, উপরে ছনের ছাউনি। বাড়ির চারদিকের বেড়ার কোনও প্রবেশ-দ্বার নেই। এক জায়গা একটু নীচু, তাতে মানুষের যাতায়াতের কোনও বাধা নেই কিন্তু গরু, মহিষ সে বাধা অতিক্রম করতে পারে না। প্রত্যেক গ্রামে পঞ্চায়েৎ আছে, তার নাম সদর। গ্রামের মাতব্বরেরা 'সদরে' বসে প্রচুর তামাক পাতা চর্বন ও অনর্গল বাক্যব্যয় করে গ্রাম শাসন করেন। সমস্ত রকম উৎসব আয়োজন ও আনুষঙ্গিক বলিদান গ্রাম-জ্যেষ্ঠদের সভামণ্ডপের সামনে অনুষ্ঠিত হয়। ফলে, এ স্থান পবিত্রতাও অর্জন করে। সদরের নির্মাণ অতি সাধারণ। গ্রামের সব থেকে বিরাট ও প্রাচীন গাছের ছায়ায় স্তূপাকার পাথরের বেদীই সদর; তারি উপর বসে প্রাচীনেরা শাসনকার্য পরিচালনা করেন।

গ্রাম পঞ্চায়েৎ বা সদরে গদাবা যুবক ও ছেলেমেয়ে

গ্রামে কয়েকদিন থাকার পর পরিচয় যখন ঘনিষ্ঠ হয়ে আসে ঘর, দুয়োর ভাল-ভাবে দেখার অনুমতি তখন পাওয়া যায়। দাওয়ায় বসে গম্বুজের মত চাল দেওয়া মাটির গোল ঘরের মধ্যে ও বাইরের উঠানে কর্মরত জীবনকে লক্ষ্য করার কোনও বাধা থাকে না। গৃহিণী ঘরের কাজকর্ম সেরে অবসর পেলেই কত অপরূপ রংএর মিশ্রণে চওড়া ডোরা দেওয়া কেরাঙ্গ তৈরি করতে বসে। সমস্ত কাজের সঙ্গেই চলছে চেঁচামেচি, হইহুল্লোড়। প্রথম প্রথম একটু শঙ্কিত হয়ে উঠতাম। মনে হত বুঝিবা বাদানুবাদ হাতাহাতিতে রূপান্তরিত হবে। পরে এ ভুল ভেঙ্গে গেল, বুঝেছিলাম ভিক্ষাবৃত্তির মত কোলাহলও তাদের জীবনের আর একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ। জোরে চিৎকার না করতে পারলে এদের কথা বলাই হয় না। দুজনে নিজেদের মধ্যে কথাবার্তা বলছে, সে শব্দ তরঙ্গ কিন্তু বহুদূরে পর্যন্ত সবারি কর্ণপটাহে প্রতিধ্বনিত হবে। গ্রামের সম্মানিত প্রাচীনেরাও হাসি তামাসার সংক্রামক ছোঁয়াচ এড়াতে পারে নি। এখনও সুবিধে পেলেই ছোট ছেলেদের মত নিজেরা কুস্তিলড়ার চেষ্টা করবে। প্যাঁচ কসতে গিয়ে পড়ে গেলে, অনাবিল আনন্দে শিশুদের মত হেসে গড়াগড়ি

গদাবা তরুণী বাড়ির বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে

দেবে। জীবনের প্রাচুর্য হাসি পরিহাসে শতধারায় বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তা থেকে আমরাও পরিত্রাণ পাইনি। গদাবা গ্রামের হাসি, কলরোল দীর্ঘ রাত্রি পর্যন্ত আশে পাশের নির্জীব পথ, প্রান্তর, বন্ধ্যা শিলা-রাশিকে সজীব করে রাখে।

বর্ণবৈচিত্র্যহীন পরিবেশকে গদাবা রমণীর শাড়ি (কেরাঙ্গ) ও পর্বতপ্রমাণ অঙ্গাভরণ দান করে সজীবতা। সাদা কেরাঙ্গের উপর চওড়া চওড়া সবুজ ও সিন্দুরে লাল ডোরাকাটা দেওয়া শাড়ি। সমস্ত দেহ কতরকমের আভূষণ দিয়ে ঢাকা। দুবাহু জুড়ে রয়েছে মোটা মোটা রুপোর বালা। কানে পেতলের বিরাট অকার মাকড়ী, দূর থেকে মনে হয় কুণ্ডলাকার বিজলীর তার। গলায় অসংখ্য হার—রুপো ও পুঁতির। দূর থেকে উন্মুক্ত প্রান্তরের গদাবা রমণীকে দেখলে মনে হয় যেন কেউ নানা বর্ণের বাছাইকরা উজ্জ্বল ফুল দিয়ে নিজেকে বেষ্টন করে রং-এর তুফান তুলেছে।

কেরাঙ্গ কিনতে গিয়ে শুনলাম যে এখন আর এসব তারা বেশী বুনছে না। রং করার গাছগাছড়ার অভাব হল আসল কারণ। বনবিভাগের কানুন জারী করে নাকি তাদের ওসব জিনিস নেবার উপর

বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। তাই অনেক চেষ্টা করেও একটা কেরাংগও কিনতে পারি নি।

গদাবা তরুণী নিজের বেশ পরিচর্যা ও প্রসাধন অতি সযত্নে করে। বহুক্ষণ ধরে চলে পরিপাটি করে কেশ পরিচর্যা; তারপর সের দশেক ওজনের আভূষণ ঘষে মুছে চকচকে ঝকঝকে করে তোলে। বর্ণের হিল্লোল তুলে গদাবা তরুণী হাসি ও কটাক্ষে তরুণ যুবককে পুলকিত করে। চঞ্চল তরুণের দল বান্ধবীদের কাছ থেকে আঙটি গ্রহণ করে—একটা দুটো নয় যে যতটা পারে। এ নিয়ে চলে বিষম প্রতিযোগিতা। যার সব থেকে বেশী আঙটি তার সমকক্ষ হবার চেষ্টা যেমনি আর সবাই করবে, তেমনি তার বান্ধবী প্রাচুর্যে ঈর্ষান্বিতও হবে। বলে রাখা ভাল যে, আঙটি উপহার ভবিষ্যৎ জীবনের সংগী নির্বাচনের চূড়ান্ত পরিচয় চিহ্ন নয়, কেবল বন্ধুত্বের নিদর্শনমাত্র!

উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ বা অন্ধ্রের অন্যান্য উপজাতির মত গদাবাদের জীবনসংগ্রাম বড় কঠিন। ছোট বয়স থেকে ছেলে মেয়ে সবাইকে কাজ শুরু করতে হয়। গরু মহিষ চরাবার জন্যে কয়েকমাইল দূরে বনের ধারে গোচারণক্ষেত্র। গৃহপালিত পশুদের নিয়ে ছেলেদের যেতে হয় সেখানে। বয়স্ক লোকেরা পাহাড়ের পাদদেশে সিঁড়ির মত কেটে কেটে অল্প পরিসর জমিতে বর্ষার জল বেঁধে রেখে চাষবাস করে। চাষবাস বড় মেহনতের কাজ। মেয়েরা ঘরের কাজ কর্ম সেরে জল আনতে যায় পাহাড়ের

ধারে ঐসব গর্তের থেকে। গরমের সময় জলের বড় কষ্ট। অতি আয়াসে লব্ধ পঙ্কিল, অপরিষ্কার জল খেতে হয়। তারি থেকে স্নান, ধোয়া মোছা, ও গৃহস্থালির অন্য সমস্ত কাজকর্ম করতে হয়। ধান ভানা, তামাক পাতা কোটা এমনি বহু কাজ মেয়েদের সমস্তদিন ব্যস্ত থাকতে হয়।

গদাবা জীবনের আনন্দ উৎসব শুরু হয় দিনের কর্মব্যস্ত জীবনের পর—। গ্রামের এক কোণে থাকে ডোমেরা। তারা গদাবাদের সঙ্গে বহুদিন ধরে রয়েছে কিন্তু গদাবা উপজাতির লোক তারা নয়। এরা কিন্তু সবাই গাইয়ে, বাজিয়ে। গ্রামের উৎসবে, পূজা, পার্বনে ডোমদের একটা বিশিষ্ট স্থান আছে। গদাবা সমাজকে বাইরের জগতের সঙ্গে পরিচয় ও কাজে কর্মে মধ্যস্থতা করে ডোমেরা। তাই প্রতিদানে ওরা গদাবাদের উপর থেকেও কিঞ্চিৎ 'দস্তুরী' আদায় করতে ছাড়ে না—বাইরের লোকের কাছ থেকে মামুলী বেশ ভালভাবেই নেয় তা বলা বাহুল্য। গদাবা সমাজের উপরেও ডোমদের যথেষ্ট প্রভাব, প্রতিপত্তি আছে।

গদাবা উৎসবে প্রতিবেশী পারেঙ্গি উপজাতির লোকেরা এসে যোগ দেয়। তবে এদের জীবনে বৈচিত্র্য, বর্ণ ও আনন্দের বড় অভাব। নিছক খাওয়া পরা নিয়েই সমস্ত সময় চলে যায়। আনন্দের দিনে গদাবা গ্রামে এসে গানে, নাচে যোগ দেয়। পূজোর দিন সবাই মিলে গ্রাম সদরের সামনে বৃষ ও মহিষ বলি দেয়। সেদিন

গদাবা মোড়ল

গদাবা মেয়েদের নাচ

সারা রাত ধরে চলে নাচের পালা আর ভূরি ভোজন এবং ভাত থেকে তৈরি পচাই তাড়ি পান।

গদাবা নাচ ভারতের আদিম জাতির নৃত্যের মধ্যে একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে। সে রাত্রে মেয়েরা সব থেকে উজ্জ্বল ও রঙীন কেরাঙ্গ পরে আসবে, অঙ্গাভরণকে চাকচিক্যময় করা হবে বহু যত্নে। যুবকের দলও বান্ধবীদের দেওরা আঙটিতে নিজের দেহ সৌষ্ঠব ও সৌন্দর্য বাড়াবার চেষ্টা করবে। তারপর স্ত্রী-পুরুষ একসঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে করবে দুর্দম নৃত্য। নাচের মধ্যে গদাবা জীবনের সজীবতা, প্রাণ-প্রাচুর্য দর্শককে সম্মোহিত করে রাখে। নাচের তাল, পদক্ষেপ বড় জটিল। শুনলাম এক একটি নাচের পেছনে রয়েছে কয়েক বছরের অক্লান্ত সাধনা। এত অনুশীলনের পরই তবে সাবলীল ও স্বচ্ছন্দ গতি, কোথাও কৃত্রিমতার বন্ধন নেই।

আগেই বলেছি যে গদাবা বাসভূমি সভ্যজগতের মিছিলের বড় কাছে। আশে পাশের ওড়িয়া গ্রাম, সেখানকার কথাবার্তা, রীতিনীতি তাদের জীবনধারার উপর ধীরে ধীরে প্রভাব বিস্তার করছে। তার উপর আবার দেশের নতুন শিল্প, সম্পদ গড়ার কাজ সেখানেও শুরু হয়েছে। গদাবা ভূমির ঠিক সীমান্তে মাচকুণ্ড জলপ্রপাত। অশান্ত জলধারার থেকে বিজলী উৎপাদন করার জন্যে জলপ্রপাতের নীচে যন্ত্র বসানো হয়েছে। এরি চারদিকে গড়ে উঠেছে শ্রমিক কর্মচারী ব্যাপারী ব্যবসায়ীর ছোট শহর। কেরাপুট জেলা শহরের সঙ্গে নব যন্ত্র-নগরীর সংযোগ সাধন করেছে সুন্দর রাস্তা। সে পথ চলে গিয়েছে সবুজ উপত্যকার মধ্যে দিয়ে গদাবা গ্রামের বুক চিরে। সভ্য জগতের কর্মচঞ্চল আবর্তে ভারতের আর একটা (সংখ্যায় মুষ্টিমেয় কিন্তু জীবনের বর্ণ-বৈচিত্র্যে ও প্রাচুর্যে অতুলনীয়) আদিম জাতি নিজেদের স্বতন্ত্র সত্তা, বিশিষ্ট ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলবে।

সুনীল জানার ডায়েরী অবলম্বনে নিখিল মৈত্র কর্তৃক লিখিত। ফটো সুনীল জানা।

আদিবাসীদের বিশিষ্ট অলঙ্কারে ভূষিত গদাবা নারী

উত্তমপুরুষ

'নখদর্পণ' কোন কোন মহলে প্রচণ্ড প্রদাহ সৃষ্টি করেছে লক্ষ্য করেছি। এই জ্বালা কয়েকটি পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠায় বিকট রবে ব্যক্ত।

কৌতুক বোধ করেছি এবং, লুকোব না, খানিকটা আত্মপ্রসাদ। কেননা, ঐ দন্তুর আস্ফোট কিছু যদি প্রমাণ করে তো 'দেশ' পত্রিকার বিপুল প্রতিষ্ঠা এবং প্রভাব। সেই সঙ্গে, সম্ভবত, এই আসরের জনপ্রিয়তাও। যা পরম 'শান্তি'-বাদীদেরও শান্ত থাকতে দেয়নি।

হট্টগোলটাকে নীরবে উপেক্ষা করাই শোভন হত। বিশেষত, এক পত্রিকার পাতায় অপর পত্রিকায় প্রকাশিত আলোচনার জবাব দেওয়া যখন নীতিবিরোধী। এ-নিয়ম আক্রামকেরা অবশ্য মানেনি, জেহাদী জিগীর উচ্চ থেকে উচ্চতর গ্রামে উঠছে। দেখছি কানে-তুলো নীতি সর্বত্র গ্রহণীয় নয় এবং বোবারও শত্রু আছে। অন্যে যদি কেবলই বাক্য কয়, আর এক পক্ষ নিরুত্তর থাকে, তবে পাঠক-সাধারণ বিভ্রান্ত হতে পারেন, আস্ফালনকারীরা নিতে পারেন একতরফা ডিক্রীর বাহবা।

অবশ্য জানি, বামাচারী রোষের অনেকটাই ত্রাস-সঞ্জাত। এতকাল কাচ-ঘরের জানালায় বসে এ'রা নির্বিচারে পথচারীদের দিকে ইঁট ছুঁড়েছেন। ভাবেননি, ইঁট পাটকেল হয়ে ফিরে আসতে পারে। আতঙ্ক তো হবেই। যাঁরাই গোলে হরিবোল দিতে ইতস্তত করেছেন তাঁরাই এ'দের ভাষায় 'ডিকাডেন্ট, ডিভিয়েসনিস্ট' —ক্ষয়িষ্ণু, পথচ্যুত এবং হায়েনা-শৃগাল ইত্যাদি নানা পাশব বিশেষণে চিহ্নিত। দর্পণে নিজেদের রূপ দেখে এ'রা ক্ষিপ্ত হয়েছেন।

বোধহয় একটু ভুল হল। দর্পণে এ'দের প্রতিচ্ছবি তো পড়েনি; অন্য একটি দেশের সাহিত্যের ছায়া মাঝে মাঝে পড়েছে বটে। তাতেই এত আকুলতা! সেই দেশটাই কি তবে এ'দের নিজের দেশ। বৃন্দাবনে কাকের মৃত্যুতে কাশীধামে হাহাকারের আর কোন যুক্তি পাওয়া মুশকিল। এবং এই উষ্মা একমাত্র পতি-নিন্দায় সতীর দেহত্যাগের পৌরাণিক কাহিনীর সঙ্গে তুলনীয়। বিস্ময়ের কিছু নেই। এ'দের নেতৃত্বের রাশ বরাবরই বিদেশীর মুঠিতে। সে মুঠি শুধু খাস সোবিয়েতের সেবায়তদেরই নয়—কখনো বেন ব্র্যাড্‌লীর, কখনো ফিলিপ স্প্যাটের আরও পরে পাম দত্ত বা পলিটের। অসহিষ্ণু অসতর্ক গলাবাজিতে এই পরকীয়া প্রীতিতত্ত্বটাই অত্যন্ত প্রকট হয়ে পড়েছে।

সোভিয়েট সাহিত্যের দু'একটি বিষয় সম্পর্কে ঈষৎ কটাক্ষেই (অবশ্য নখ-দর্পণের আলোচনায় শুধু কটাক্ষ নয়, অনুকূল মন্তব্যও ছিল, এমনকি সুস্থতর সাহিত্যজিজ্ঞাসা এবং শিল্পবোধের লক্ষণের জন্যে অভিনন্দনও, কিন্তু সমালোচকেরা বাম, ফুটকির সহায়তায় সেটা একেবারে চেপে গেছেন) যাঁরা অস্থির হয়েছেন তাঁদের প্রতি একটি মাত্র প্রশ্নঃ **ভারতীয় (বা যে-কোন) সাহিত্য সম্পর্কে অনুরূপ বা কঠোরতর কোন মন্তব্য যদি করা হত,** তা হলে কি এই উৎসাহের সামান্য অংশও দেখা যেত, না প্রতিবাদে এ'রা একটি কথাও উচ্চারণ করতেন? উত্তর অনায়াসে অনুমেয়। করতেন না, কেননা অতীতে কোনদিন করেননি। এ'দের হৃদয়ানুভূতির সর্বস্বত্ব রুশ-দেশের জন্য সংরক্ষিত।

কোন সমালোচক 'নখদর্পণে'র কোয়েস্‌-লারীর সম্পর্কিত কাহিনীর মূল গ্রন্থটি আবিষ্কারের আনন্দে আত্মহারা হয়েছেন। ভেবে দেখেননি, এটা একটা পয়েণ্টই নয়। বলাই ছিল গল্পটি 'কোয়েস্‌লার-কথিত।' সুতরাং তাঁর রচনায় এর মূল তো থাকবেই। না থাকলেই বিস্ময়কর হত। তবে এ'রা বোধ হয় খুশী হতেন, এবং তারস্বরে কৈকেয়ীর মত বলতে পারতেন, আমি পরম অধর্মাচারী, আগাগোড়া একটা গল্প বানিয়ে কোয়েসলারের নামে চালিয়েছি। ফিশার থেকে উদ্ধৃতিটিও কিছু প্রমাণ করে না। কিম্বা মাত্র এইটুকু করে, **উত্তমপুরুষের মন্তব্যের ভিত্তি বিশিষ্ট লেখক-দের রচনা।** প্রভেদ যেটুকু, সেটা লিপিভঙ্গীগত। মৌল কোন গরমিল বা গুরুতর বিকৃতি সমালোচকও খুঁজে পাননি।

বাকি রইল তথ্য সংগ্রহের জন্যে বই-বাছাই। এ-কাজটা অবশ্য আমি আপন বুদ্ধিমতই করে থাকি। সমালোচক মাত্র একটির হদিশ পেয়েছেন। বাকিগুলির নাম চেয়ে পাঠিয়ে চিঠি দিলেই জানতে পারতেন। শুধু গ্রন্থ নয়, সমসাময়িক নানা বিদেশী পত্রিকাও এই তালিকায় আছে। 'হীরো অব কালচার' কথাটির ব্যাখ্যা আছে কোয়েসলারের 'Age of longing' নামক উপন্যাসে। সমালোচক কোয়েস্‌লার, ওয়েশার, ফিশার প্রভৃতিকে "গাটকাটা" বলেছেন। যাঁরা মাত্র কিছুকাল আগে রবীন্দ্রনাথের স্থান 'ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে' নির্দেশ করেছিলেন, তাঁদের কাছে শিষ্টতর ভাষা আশা করিনে।

* * *

এই চাপান-উতোরে আমার রুচি ছিল না। গোটা ব্যাপারটাই অত্যন্ত গ্লানিকর। এতটা লিখে সন্দেহ হচ্ছে, হয়ত কোথাও অবিচার করেছি। সমালোচকদের আক্রোশের গূঢ় মনস্তত্ত্বগত কোন হেতু আছে। যে সংশয়ের সুর এরেনবুর্গের পুস্তিকায় শোনা গেছে। তার প্রতিধ্বনি এ'রা নিশ্চয়ই এদেশে, আপন শিবিরেও শুনেছেন। সেখানে অনেকের কণ্ঠেই আত্মসমালোচনার গুঞ্জন। অস্বস্তির মূলও সেখানে। স্বরূপদর্শনে শিহরিত হয়ে দর্পণ লক্ষ্য করে মুষ্টি তুলেছেন, কিন্তু শান্ত মনে

বিচার করলে, দীর্ঘ, প্রায় একযুগব্যাপী সাহিত্য-আন্দোলনের ব্যর্থতার পরিমাণটা অনুভব করতেন। বীতজীবনবোধ, ফরমাসপ্রসূত, ফতোয়া নিয়ন্ত্রিত রচনার কতটুকু অংশ প্রগতিসাহিত্য আখ্যার উপযোগী। রাশি-রাশি ভারা-ভারা ধানকাটা তো সারা হল, কিন্তু চিরকালের তরীতে উঠবে এর কতটুকু। অবশ্য এক কথায় সবটাকেই ব্যর্থ বলব, আমার বিচার এতটা অনুদার নয়। এ'দের অনুকূলতায় প্রতিভা-বিকাশের সুযোগ পেয়েছেন এমন অন্তত চার-পাঁচজন শক্তিমান কথাকার এবং কবির নাম উল্লেখ করতে পারি। অসামান্য সার্থকতার দৃষ্টান্ত দিতে পারি বিপ্লবোত্তর সোভিয়েট সাহিত্য থেকেও। শোলকফ, আলেক্সি, টলস্টয় বা এরেন-বুর্গের নাম আমি বিস্মৃত হইনি।

* * *

সমালোচক ধরে নিয়েছেন, আমি সোভিয়েট ইউনিয়নের বিরুদ্ধে কিছু বলতে' বদ্ধপরিকর, এ-ব্যাপারে আমার সদ্য হাতেখড়ি। খবরের অধিকাংশই সংগ্রহ করেছি একখানি 'বস্তাপচা বই * থেকে', সেটা তিনি 'দুর্গন্ধ থেকেই অনুমান' করেছেন। বিরূপাক্ষ না হয়ে নিরপেক্ষ হলে তিনি বুঝতে পারতেন "নখদর্পণ" সাহিত্যেরই আসর এখানে শুধু সাহিত্যের সংবাদ আর সমস্যার আলোচনা থাকে; সোভিয়েট লেখকদের সম্পর্কে ঈষৎ অপ্রিয় মন্তব্য করা কি সোভিয়েট বিরোধিতা? মাম সম্পর্কে এই আসরেই দু'একটি বক্রোক্তি প্রকাশিত হয়েছে, তার মানে এ-নয় যে আমি বৃটিশ গণতন্ত্রবিরোধী। ক্ষমতা এ'দের করতলগত হলে লিপি-স্বাধীনতার কী দুর্দশা ঘটত সেটা এই অসহিষ্ণুতা থেকেই অনুমেয়।

উত্তমপুরুষের পকেটে কোন পলিটি-ক্যাল ব্রীফ নেই, সাহিত্যকে যাঁরা রাজ-নীতির অচ্ছেদ্য অংশ করেছেন তাঁদের পক্ষে এ-কথা বিশ্বাস করাই দুষ্কর হবে। এদের প্রসঙ্গে এ'রা 'আর'-কে টেনে আনবেনই, কান টানলে মাথার মত। কিন্তু এ-ক্ষেত্রে তাঁরা রাষ্ট্র নিয়ে টানাটানি না করলেই ভাল করতেন, কেননা সে কাবার্ডের ভিতরে যে অনেক কঙ্কাল। দুর্গন্ধ সেখানেও কম নয়। রাজনৈতিক প্রসঙ্গ এ'রা যখন তুলেছেনই তখন বলি সোভিয়েট-বিরোধিতা যদি আমার অভি-প্রায় হত তবে সেটা অনায়াসে করতে পারতুম। আর এ-জন্য কোন 'বস্তাপচা' বাসি বইয়েরও সহায়তার দরকার নেই, স্মৃতির উপর নির্ভর করলেই যথেষ্ট।

সোভিয়েট-ইতিহাস আর যাই হোক সাঁজরপত্নী নয়।

বেশি পিছনে যাবার প্রয়োজন নেই সাম্প্রতিক একটি বিচার-প্রহসনের দৃষ্টান্ত দিই। স্তালিনের মৃত্যুর কিছু আগে হঠাৎ একদিন নয়জন রুশ ডাক্তার গ্রেপ্তার হলেন। এ'রা নাকি কয়েক বছর আগে দু'জন সরকারী কর্মচারীকে হত্যা করেন এবং আরও অনেককে হত্যা করার চক্রান্তে লিপ্ত ছিলেন। বিচার হল, এবং সাজাও। এটা যে আমলে বেরিয়াকে অপদস্থ করার কারসাজি (তাঁর পুলিস কেন ষড়যন্ত্রটাকে কুঁড়িতেই গুঁড়িয়ে দিতে পারেনি) সেটা জানা গেল আরও কয়েক মাস পরে। তখন স্তালিনের লোকান্তর ঘটেছে। বেরিয়ার পতন ঘটেনি। তিনি প্রথমেই ডাক্তারদের মুক্তি দিলেন, বললেন চক্রান্তের কথাটা একেবারে 'ভুয়ো'। ডাক্তাররা বেরিয়ে এলেন। অথচ এ'রা কিন্তু সকলেই বিচারকালে দোষ 'কবুল' করেছিলেন।

তারপরে অনেকদিন কেটে গেছে। ইতিমধ্যে বেরিয়ার পতন ঘটেছে, বিচার হয়েছে এবং গর্দান গেছে। হঠাৎ সেদিন, মালেনকভের পদস্খলনের পরে খবর পড়লুম সোভিয়েট সুপ্রীম আদালতের ছয়জন জজ বরখাস্ত হয়েছেন। শোনা যাচ্ছে এ'দের দু'একজন বেরিয়ার বিচারক-দের মধ্যে ছিলেন।

সোভিয়েট বিচার-অনাচারে দোষ "কবুল" করার ব্যাপারটা বড় বিচিত্র। নেপথ্যে কী ঘটে দেবা-ন-জানন্তি, আসামীরা কাঠগড়ায় দাঁড়িয়েই গড়গড় করে পাখি-পড়ার মত সব অপরাধ স্বীকার করে। এমন কি মার্জনাও চায় না। একটা গল্প বলি। এটা কিন্তু শুধুই গল্প। এর কোন মূল্য যদি থাকে তো মজলিসী মজায় এবং সম্ভাব্যতায়। অর্থাৎ "গল্প হলেও সত্য" হতে বাধা ছিল না।

স্তালিনের একবার একটি আংটি হারায়। স্তালিনের সোনা চুরি?—ধরে আন্ চোর। বেরিয়ার চর চৌদিকে ছুটল। সপ্তাহখানেক পরে স্তালিন নিজেই আংটিটা খুঁজে পেলেন, দোয়াতের মধ্যে ওটা ডুবে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি ডেকে পাঠালেন বেরিয়াকে। —'ওহে আংটিটা পেয়েছি, আর তদন্ত করে কাজ নেই। কাউকে ধরেছ নাকি?' বেরিয়া বললেন 'ছ'জনকে।' যাক, ওদের ছেড়ে দাও।' মাথা চুলকে বেরিয়া বললেন, 'সে বড় কেলেঙ্কারি হবে। ওদের মধ্যে তিনজন যে দোষ স্বীকার করে বসে আছে!'

* 'God That Failed' কোন কোন নাকে ঝাঁঝালো ঠেকতে প্যারে, কিন্তু মোটেই 'দুর্গন্ধ, বস্তাপচা' নয়। কোয়েস্‌লার, ফিশার ব্যতীত এর অন্যান্য লেখকদের মধ্যে আছেন স্টীফেন স্পেণ্ডর, ইগ্‌নেজিও সিলোন। এ'দের প্রত্যেকে খ্যাতনামা, বহুর প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়। সকলেই জীবনের কোন-না-কোন পর্বে কম্যুনিস্ট পার্টির ঘনিষ্ঠ সংস্রবে এসেছেন, ফিরে গেছেন আশাহত হয়ে এবং এই গ্রন্থে আপন আপন অভিজ্ঞতার কথা লিপিবদ্ধ করেছেন।

চক্রদত্ত

ভারতবর্ষের প্রায় সমস্ত কয়লাই ঝরিয়া অঞ্চল থেকে পাওয়া যায়। বর্তমানে ভারতের ভূতত্ত্ব বিভাগ, পরিমাপ করে স্থির করেছেন যে, ঝরিয়ার কয়লা-খাদের ২০০০ ফিট নীচের স্তরে ১১৬৭৯ কোটি টন কয়লা এখনও জমা আছে। ১৯২৬ সালে সার সি এস ফক্স এই বিভাগের পরিমাপের পর ৪৭৩৫ কোটি টন কয়লার অস্তিত্বের উল্লেখ করেন। কিন্তু বর্তমানের পরিমাপানুসারে দেখা যাচ্ছে যে, ঐ ওজনের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ কয়লা জমা আছে। নতুন হিসাবানুসারে এর মধ্যে ২১৫৭ কোটি টন অতি উৎকৃষ্ট কয়লা। যাঁরা নতুন করে মাপজোখ করেছেন, তাঁরা বলেন যে, এই ২০০০ ফিটের আরও নীচে আরও প্রচুর পরিমাণে কয়লা পাওয়া যেতে পারে। আজকাল এই সকল কয়লা-খাদে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে যেসব নতুন নতুন যন্ত্রপাতি দ্বারা কয়লা খাদ থেকে উঠানোর ব্যবস্থা হচ্ছে, তাতে আশা করা যায় যে, অদূরভবিষ্যতে ২০০০ ফিটের চেয়ে আরও নীচ থেকে অনায়াসে কয়লা তোলা যাবে।

*

বড় বড় শক্তি-উৎপাদক কারখানায় যেসব আগুনের ব্যবহার হয়, তার থেকে উড়ন্ত ছাই (ফ্লাই অ্যাস)গুলি যখন উড়তে থাকে, সেগুলো জমা করা হয়। এগুলি বিশেষ কাজের জিনিস নয়। উপরন্তু এত বেশী পরিমাণে উড়ন্ত ছাই জমা হয় যে, এই আবর্জনা দূর করা একটি সমস্যা বিশেষ হয়ে পড়ে। এ পর্যন্ত এর থেকে শতকরা বিশ ভাগ মাত্র ছাই সিমেন্ট ইত্যাদি তৈরীর জন্য ব্যবহার করা হয়। এখন গবেষণা করে দেখা গেছে যে, শতকরা ১৫ ভাগ কাদার সঙ্গে ৮৫ ভাগ উড়ন্ত ছাই মিশিয়ে ভাল ইট তৈরী করা যায় এবং আর ছাইগুলি আবর্জনা বিশেষ বলে বিবেচিত হবে না। ইটের কারখানার লোকেরা এখন এইগুলি সাদরে গ্রহণ করবে; কারণ ইট তৈরীর মশলার বেশীর ভাগটাই এদের ওপর নির্ভর করে।

*

সমুদ্রের তলার ছবি তোলার অনেক উপায়ই উদ্ভাবিত হয়েছে। আজকাল সমুদ্রের নীচে নেমে গিয়ে শুধু সাধারণ ফটো নয়, সিনেমা ফটোগ্রাফ তোলারও ব্যবস্থা হয়েছে। অবশ্য জলের নীচে খুব বেশী গভীরে নামা যেতো না, কারণ জলের যত নীচে নামা যাবে, ততই জলের চাপ বেশী অনুভূত হবে। এখন এমন একটি ব্যবস্থা হয়েছে যে, জলের নীচে যন্ত্রপাতি নিয়ে গিয়ে আর ছবি তুলে আনতে হবে না, ওপর থেকেই একটি নতুনরকম ক্যামেরার সাহায্যে জলের ৬০০০ হাজার ফুট পর্যন্ত নীচের ছবি তোলা যাবে। ব্যবস্থামত ক্যামেরাটি জলের নীচে পাঠিয়ে দিতে হয় এবং নির্ধারিত নীচ পর্যন্ত যাওয়া মাত্রই একটি আলোর ঝলক দিয়ে উঠবে এবং সঙ্গে ছবি উঠে যাবে।

সমুদ্রের তলদেশের ছবি নেওয়ার নতুন রকম ক্যামেরা

*

সাধারণত "ফসিল" বলতে আমরা শিলীভূত বা অশ্মীভূত জীবের কথাই বুঝি। বিজ্ঞানে ফসিল বলতে আরও কিছু বোঝায়। জীবজগতে যেসব প্রাণীর অস্তিত্ব অধুনালুপ্ত, তাদের কোনও একটি বংশধরের সন্ধান পাওয়া গেলে তাকে "জীবন্ত ফসিল" বলেই উল্লেখ করা হয়। সম্প্রতি ভারত মহাসাগরে একটি শিলোকান্থ মৎস্য পাওয়া গেছে। প্রাণীতত্ত্ববিদগণের মতে ষাট থেকে সত্তর কোটি বৎসর পূর্বেই নাকি শিলোকান্থ মৎস্যের অস্তিত্ব জগতে ছিল। বৈজ্ঞানিকরা এই শিলোকান্থের "জীবন্ত ফসিল" পরীক্ষা করে বলেন যে, বর্তমান জগতে যে সব ভূচর চতুষ্পদ প্রাণী দেখা যায়, শিলোকান্থ এদেরই আদি জন্মদাতা। উন্নততর হতে হতে বর্তমান চতুষ্পদ জীবকুলের উদ্ভব। শিলোকান্থকে মৎস্য বলে উল্লেখ করা হলেও আকৃতিতে এরা মাছের চেয়ে অন্যরকম। এদের পাখনাগুলো ঠিক মাছের মত নয়, উপরন্তু এদের দেহ থেকে চতুষ্পদ জন্তুর মত চারটি হাত বা পা বার হয় এবং তার ওপর মাছের মত পাখনা দেখা যায়। ১৯৩৮ সালে মাদাগাস্কারের একটি জেলে সর্বপ্রথম একটি শিলোকান্থের "জীবন্ত ফসিল" পায়। সেটি লম্বায় ৫ ফুট ও ওজনে ৮০ পাউণ্ড ছিল। ১৯৫২ সালে দ্বিতীয়টি ধরা পড়ে, কিন্তু এর সম্বন্ধে বেশী গবেষণা করা সুবিধা হয়নি, কারণ এটি পচে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারীর মধ্যে আরও চারটি শিলোকান্থ ধরা পড়ে। ধরার দু-তিন ঘণ্টার মধ্যে আরকে ভিজিয়ে সংরক্ষণ করা হয় এবং পরে পরে সর্বতোভাবে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়। এখন বৈজ্ঞানিকগণ আশা করেন যে, এই ধরনের প্রাগৈতিহাসিক যুগের যেসব জীবের অস্তিত্ব এখন নেই, তাদের বংশধরের সন্ধান এইসব অঞ্চল থেকে পাওয়া যেতে পারে।

চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সকাল হয়েছে। টাকার বাক্স হাতে নিয়ে ভেদুর্ নীচে নেমে এলেন। নোটের তাড়াগুলিকে দ্রুত হাতে আর একবার গুনে নিলেন তিনি, তারপর ব্রেকফাস্ট-টেবিলে গিয়ে বসলেন। দু'জনের জন্যে দু-সেট প্লেট-ছুরি-কাঁটা সাজিয়ে রাখা হয়েছিল, এক সেট তিনি তুলে রাখলেন। দর্শকের বুঝতে কোনও কষ্ট হয় না যে, লীডিয়াকে তিনি হত্যা করেছেন।

টাকা-পয়সার একটা ব্যবস্থা করে ভেদুর্ তাঁর স্ত্রী-পুত্রের কাছে ফিরে এসেছেন। আজ তাঁর দশম বার্ষিক বিবাহ-দিবস। কীভাবে যে ভেদুর্ এত টাকাপয়সা সংগ্রহ করেন, স্ত্রী তার কিছুই জানেন না। স্বামী তাঁকে সুখে রেখেছেন, স্বামীকে তাই তিনি ভালবাসেন। ভেদুর্র কাছে তাঁর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। বিবাহ-দিবসে স্ত্রীর হাতে একটা দলিল তুলে দিলেন ভেদুর্। বললেন, এ-বাড়ির মালিক এখন তাঁরাই। "এখান থেকে কেউ আর কখনও আমাদের তুলে দিতে পারবে না।" বলতে বলতে দেখতে পেলেন, তাঁর শিশুপুত্র একটা বেরালকে পাকড়াও করেছে, বেরালটার লেজ মুচড়ে দিয়ে সে খিল খিল করে হাসছে। ছেলেকে ভর্ৎসনা করলেন ভেদুর্। বললেন, "তুমি বড় নিষ্ঠুর হয়েছ। কী করে যে এত দুষ্টু হলে, ভেবে পাই না।"

স্ত্রীর কাছে দিনকয়েক থেকে আবার শহরে ফিরে এলেন তিনি, তাঁর অন্যতমা প্রণয়িনী অ্যানাবেলার বাড়িতে এসে উঠলেন (অ্যানাবেলার ভূমিকায় নেমেছিলেন মার্থা রে। চমৎকার অভিনয় করেছিলেন)। অ্যানাবেলা তখন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে চায়ের আসর বসিয়েছেন; বন্ধুদের কাছে বলছেন যে, তাঁর স্বামী নৌ-বিভাগে কাজ করেন, দু'মাস অন্তর মাত্র সাত দিনের জন্যে তিনি বাড়ি আসেন। ঠিক সেই মুহূর্তে ভেদুর্ এসে প্রবেশ করলেন। পরনে নৌ-বিভাগীয় ইউনিফর্ম। এসেই চেঁচিয়ে উঠলেন, "কেমন আছ গো!"

অতিথিরা বিদায় নিয়েছেন। সোফার উপরে বসে আছেন দুজনে। ভেদুর্ আর অ্যানাবেলা। দু'জনের মধ্যে প্রেমালাপ চলছে। তারই ফাঁকে ফাঁকে সাংসারিক কথাবার্তা। অ্যানাবেলার একখানি হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিয়েছেন মঁসিয়ে ভেদুর্; অ্যানাবেলাকে আদর করতে করতে তাঁর টাকা-পয়সার খোঁজ-খবর জেনে নিচ্ছেন। অতিথিদের মধ্যে একজনের কাছ থেকে একটু আগে একটা হীরে কিনেছেন অ্যানাবেলা; মঁসিয়ে ভেদুর্কে সেটা দেখাতেই তিনি বলে উঠলেন, "ছি ছি, এ তুমি করেছ কী। এ তো হীরে নয়, কাঁচ। হীরে আর কাঁচের তফাৎ পর্যন্ত তুমি বোঝ না! বন্ধুরা দেখছি ঠকিয়ে ঠকিয়ে তোমাকে ফতুর করে দেবে।" মঁসিয়ে ভেদুর্র পরামর্শমতন অ্যানাবেলা করলেন কি, ব্যাংকে তাঁর যা কিছু টাকাকড়ি ছিল, সব তুলে নিয়ে এলেন। এবং সেকথা জানবার পর ভেদুর্ও আর দেরি করলেন না, সেই রাত্রেই ক্লোরোফর্মের শিশি হাতে নিয়ে তিনি অ্যানাবেলার শয়নকক্ষে গিয়ে ঢুকলেন।

রাত প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। অ্যানাবেলা যে বেঁচে নেই, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়ে মঁসিয়ে ভেদুর্ তাঁর টাকাপয়সা হাতিয়ে নিয়ে প্যারিসের ট্রেনে গিয়ে উঠলেন।

পরবর্তী দৃশ্যে দেখা যায়, মঁসিয়ে

'লাইমলাইট' ছবিতে সেটে নামবার আগে চার্লস চ্যাপলিন মুখসজ্জা করছেন। সঙ্গে বাস্টার কীটন

র্ তাঁর প্যারিসের অফিসে বসে নতুন ধরনের বিষ নিয়ে পরীক্ষা করছেন। বিষ যদি কারও উপরে প্রয়োগ করা হয় মৃত ব্যক্তির দেহ পরীক্ষা করে টের ওয়া যাবে না যে, বিষক্রিয়ায় তার মৃত্যু ছে। কারও উপরে এই বিষ এখন য়োগ করে দেখা দরকার। কার উপরে য়োগ করবেন? ম'সিয়ে ভেদুর্ দেখলেন, লধারে বৃষ্টি নেমেছে, আর একটি য় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে রাস্তা য় হেঁটে চলেছে। নিজের ছাতাটা র হাত তুলে দিলেন ভেদুর্, তারপর য়েটিকে তাঁর অফিস-ঘরে ডেকে নিয়ে লন। গরিব ঘরের মেয়ে, দুর্দশার ত নেই। তার দুঃখের কথা শুনতে নতে এক গ্লাস জলের মধ্যে ম'সিয়ে দুর্ সেই তীব্র হলাহল মিশিয়ে চ্ছেন। ইচ্ছে ছিল, মেয়েটির হাতে ষপাত্র তুলে দেবেন, কিন্তু তা আর হল । তার দুর্দশার কাহিনী শুনে তায় অভিভূত হয়ে পড়লেন ম'সিয়ে দুর্; বিষের পাত্রটাকে একপাশে ঠেলে রয়ে রেখে মেয়েটির হাতে তিনি এক ড়া নোট তুলে দিলেন।

মেয়েটি বিদায় নেবার অল্পক্ষণ রেই এক গোয়েন্দা তাঁর অফিস-ঘরে সে প্রবেশ করল। ভেদুর্‌কে সে বলল , অনেক দূর থেকে সে তাঁকে নুসরণ করে আসছে। ম'সিয়ে ভেদুর্‌র র্যকলাপের কথা সবই সে জানে। চাদ্দটি মেয়েকে তিনি বিয়ে করেছেন বং অর্থের লোভে চোদ্দটি মেয়েকেই তনি খুন করেছেন। তার প্রমাণপত্র ার হাতে রয়েছে, কোনও চালাকিই আর টকবে না। উপসংহারে গোয়েন্দাটি লল, "লাশগুলিকে যে আপনি লুকিয়ে ফলেছেন তা আমরা জানি এবং আপনিও জনে রাখুন, সবগুলি লাশই আমরা ঁজে বার করব।" শুনে অদ্ভুত একটু াসলেন ম'সিয়ে ভেদুর্, বললেন, "বোধ য় সেটা সম্ভব হবে না।" বলে জলের াত্রটাকে তিনি গোয়েন্দার দিকে এগিয়ে দলেন। জলের মধ্যে যে বিষ মেশানো য়েছে, গোয়েন্দা সেটা জানত না। জল খয়ে ভেদুর্‌র হাতে সে হাতকড়া পরিয়ে দল। তারপর দুজনে ট্রেনে গিয়ে ঠলেন। বিষের ক্রিয়া শুরু হতে খুব বেশী দেরি হল না, একটু বাদেই গোয়েন্দাটি ঢলে পড়ল। সংগে সংগেই তার পকেট থেকে চাবিটা বার করে নিলেন ম'সিয়ে ভেদুর্, হাতকড়া খুলে ফেললেন। ট্রেন থেকে সরে পড়বার আগে মৃত গোয়েন্দার পকেট থেকে মনিব্যাগটাকে হাতিয়ে নিতেও তাঁর ভুল হল না।

দিনকয়েক পরের কথা। প্যারিসের এক কাফের মধ্যে বসে রয়েছেন ম'সিয়ে ভেদুর্। হঠাৎ সেই গরিব মেয়েটির সংগে তাঁর সাক্ষাৎ হয়ে গেল। উচ্ছ্বসিতভাবে ভেদুর্‌কে সে কৃতজ্ঞতা জানাতে শুরু

'লাইমলাইট'-য়ের আর একটি দৃশ্যে চার্লস চ্যাপলিন

করেছিল, কিন্তু সূত্রপাতেই তিনি তাকে বাধা দিলেন। বললেন যে, তিনি তাকে চেনেন না, কখনও তাকে দেখেননি। ইচ্ছে করেই তিনি মিথ্যার আশ্রয় নিলেন, তার কারণ তিনি জানতেন যে, সর্বক্ষণই পুলিস তাঁর পিছনে পিছনে ঘুরছে; মেয়েটির সংগে তাঁকে কথা বলতে দেখলে মিথ্যা সন্দেহের বশে পুলিসের লোকেরা তাকেও হয়তো মামলায় জড়িয়ে ফেলবে। নির্দোষ এই মেয়েটিকে তিনি বিপদে ফেলতে চান না। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে তিনি বিদায় নিলেন। ঘুরতে ঘুরতে অ্যানাবেলার বাড়িতে এসে প্রবেশ করলেন ম'সিয়ে ভেদুর্। এসে তিনি অবাক। অ্যানাবেলার মৃত্যু হয়নি। তিনি বেঁচে আছেন। আবারও তাঁকে তিনি বিষ খাইয়ে হত্যা করবার চেষ্টা করলেন। আবারও তাঁর চেষ্টা ব্যর্থ হল। তখন করলেন কি, অ্যানাবেলাকে সংগে নিয়ে নৌকাবিহারে গেলেন। অ্যানাবেলাকে তিনি জলে ডুবিয়ে মারবেন। লুকিয়ে একটা দড়ি সংগে নিয়ে এসেছেন। দড়ির এক প্রান্তে বাঁধা রয়েছে মস্ত বড় একটা পাথর। আর এক প্রান্তে একটা ফাঁস বানিয়ে নিয়ে অ্যানাবেলার অলক্ষ্যে সেই ফাঁসটা তাঁর গলায় ছুঁড়ে মেরেছিলেন। কিন্তু এমনই অদৃষ্ট, হাত ফসকে গিয়ে ফাঁসটা তাঁর নিজের গলাতেই আটকে গেল। পাথরের হ্যাঁচকা টানে জলের মধ্যে গিয়ে ছিটকে পড়লেন ভেদুর্, হাবুডুবু খেতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত অ্যানা-বেলাই তাঁকে রক্ষা করল। "সীটি লাইট্‌স" চিত্রেও ঠিক এই রকমের একটি দৃশ্য রয়েছে।

ম'সিয়ে ভেদুর্ বুঝলেন যে, অ্যানাবেলা বড় কঠিন মেয়ে, তাঁকে হত্যা করা বড় সহজ কাজ নয়। তখন মনে পড়ল মাদাম গ্রসনের কথা। সেই যে দক্ষিণ ফ্রান্সের সেই বাড়িতে মাদাম গ্রসনের সংগে তাঁর আলাপ হয়েছিল, তারপর আর তাঁর সংগে দেখা হয়নি ম'সিয়ে ভেদুর্‌র। কিন্তু যোগাযোগ তিনি অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। এখনও নিয়মিতভাবে মাদাম গ্রসনেকে তিনি ফুল পাঠিয়ে থাকেন। ভদ্রমহিলার হাতে বেশ কিছু টাকাকড়ি আছে, সুতরাং--

সুতরাং অবিলম্বে ম'সিয়ে ভেদুর্ তাঁর কাছে গিয়ে হাজির হলেন। দু-চারটে মিষ্টি মিষ্টি কথা কয়ে সবেমাত্র ভদ্রমহিলার হৃদয়টাকে তিনি একটু ভিজিয়ে এনেছেন, এমন সময় অকস্মাৎ সেখানে অ্যানাবেলা এসে হাজির। অ্যানাবেলাকে দেখেই গা ঢাকা দেবার চেষ্টা করলেন ম'সিয়ে ভেদুর্। কিন্তু টেবিলের তলায়, আলমারির পিছনে, যেখানেই গিয়ে তিনি আশ্রয় নেন, অ্যানাবেলাও ঠিক সেইখানেই গিয়ে উপস্থিত হন, কিছুতেই তাঁকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। শেষ পর্যন্ত মাদাম গ্রসনের আশা ছেড়ে দিয়ে ম'সিয়ে ভেদুর্‌কে আবার প্যারিসেই চলে আসতে হল।

মাস কয়েক কেটে গিয়েছে। ইউরোপ

এক সর্বনাশা সঙ্কটকালের । হিটলার আর মুসোলিনীর প এবং স্পেনীয় গৃহযুদ্ধই তার শেয়ার-বাজার ধসে পড়েছে, ভেদর্ু এখন কপর্দকহীন। তাঁর ার শিশুপুত্রটিও বেঁচে নেই। ় করে অন্যমনে তিনি একদিন ছেন, দামী একখানা মোটরগাড়ি র ঠিক পাশে এসেই থেমে অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন ভেদর্ু। চোখ তুলে তাকিয়ে গাড়ির মধ্যে সেই মেয়েটি বসে সেই গরিব মেয়েটি, যাকে তিনি সাহায্য করেছিলেন। মেয়েটি াড়িতে তুলে নিল। তার সঙ্গে করে ভেদর্ু জানতে পারলেন যে, । বড়লোকের ঘরণী। তার স্বামী বরাট অস্ত্র-কারখানার মালিক। অদ্ভুত একটু হাসলেন মঁসিয়ে বললেন, "অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবসায়ে খাটানোই আমার উচিত ছিল। অন্য কোনও ব্যবসায়ে আর । লাভ নেই। সময় বুঝে ও-পথে কা খাটিয়েছে, এবারে তারা লাল বে।"

য়টি তাঁকে নিয়ে এক কাফের মধ্যে ঢুকল। সেখানে বসে গল্প ন তাঁরা, এমন সময় থেলমার বান আর ভাগ্নে এসে হাজির। হচ্ছেন মঁসিয়ে ভেদর্ুর সেই প্রথম , যাঁকে তিনি হত্যা করেছেন। দেখেই থেলমার বোন চিনতে তাঁকে। বেগতিক দেখে ভেদর্ু থেকে সরে পড়বার চেষ্টা ন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি দলেন। বিচারে প্রমাণিত হল, অপরাধী। বিচারক তাঁকে প্রাণদণ্ডে করলেন।

•

রাকক্ষের মধ্যে খবরের কাগজের রিরা এসে ছেঁকে ধরল তাঁকে। তাঁকে বলল, "তা হলে বুঝতেই , অপরাধের পথে গিয়ে কোনও নেই।" শুনে মঁসিয়ে ভেদর্ু , "ছোটখাট অপরাধে লাভ নেই বে বড় বড় অপরাধে আছে। লেই তো যুদ্ধবিগ্রহ বাধানো হয়। মাত্র মানুষকে যে খুন করেছে,

'লাইমলাইট' ছবিতে সীডনি আর ক্লেয়ার ব্লুম

তাকে আপনারা অপরাধী বলেন, আর লক্ষ লক্ষ মানুষকে যারা খুন করে, আপনাদের কাছে তারা পরমপুজ্য দেশনায়ক। অপরাধের আয়তনটাকে একটু বাড়িয়ে নিতে পারলেই হল, তা হলেই আর তাতে কোনও দোষ থাকে না।"

"মঁসিয়ে ভেদর্ু" চিত্রের যতখানি নিন্দে হয়েছে, প্রশংসাও ঠিক ততখানিই। বহু সমালোচক তীব্রকণ্ঠে এর নিন্দে করেছেন, আবার মুক্তকণ্ঠে প্রশংসাও করেছেন অনেকে। বইখানি ভাল না মন্দ, তা নিয়ে এক সময়ে বিতর্কের অবধি ছিল না। সে বিতর্কের আজও অবসান হয়নি। অনেকে তখন বলেছিলেন যে, এ বইয়ের মধ্যে মনুষ্যত্বকেই আক্রমণ করা হয়েছে। কয়েকটি জায়গায় "মঁসিয়ে ভেদর্ু"র উপরে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হল। এ-বই তুলে চার্লির তেমন কিছু অর্থলাভ হয়নি। তা না হোক, অনেকের মতে এইটিই তাঁর শ্রেষ্ঠ চিত্র।

(৩৩)

"মঁসিয়ে ভেদর্ু" যখন মুক্তিলাভ করে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তার আগেই সাঙ্গ হয়ে গিয়েছিল। চ্যাপলিনের দুই ছেলে ততদিনে ইউরোপের রণাঙ্গন থেকে অ্যামেরিকায় ফিরে এসেছে। বড় ছেলে চার্লি গিয়ে হলিউডের রেডিয়ো আর টেলিভিশন অনুষ্ঠানে যোগদান করল। ছোট ছেলে সীডনির সাহস আরও বেশী। ইস্কুল-জীবনে তার দৌরাত্ম্যের আর সীমা ছিল না। সে এখন করল কি, সৈনিক-জীবনের তিন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে স্বাধীনভাবে একটা নাট্য-সম্প্রদায় গড়ে তুলল। হলিউডের কাছে ছোট্ট একটা থিয়েটার-হল ভাড়া নিয়েছে তারা, একটার পর একটা নাটকের অভিনয় চালিয়ে যাচ্ছে। উৎসাহের তার অবধি নেই, উদ্যমও অফুরন্ত। সুতরাং সাফল্য অর্জনেও তার বিলম্ব ঘটল না। বাবার কাছে সে কখনও এসে হাত পেতে দাঁড়ায়নি; না চেয়েছে অর্থসাহায্য, না অন্য কিছু। দিনকয়েক চুপচাপ সব দেখে গেলেন চ্যাপলিন, তারপর নিজেই একদিন এগিয়ে এলেন। সীডনির এই থিয়েটারে প্রায়ই তিনি আসতেন, তাঁরই তত্ত্বাবধানে চার চারখানি নাটক এখানে মঞ্চস্থ হয়েছিল। তার মধ্যে একখানি হল সমরসেট মমের "রেন"। মমের এই বিখ্যাত গল্পটিকে অবলম্বন করে পুরো মাপের একটি নাটক তৈরি করলেন চ্যাপলিন। নাট্যরসকে আরও জমিয়ে তুলবার জন্যে গল্পের মূল চরিত্রগুলির বেশ-কিছু পরিবর্তন তিনি ঘটিয়ে-

লন। মূল গল্পে দেখা যাবে, কাহিনীর নায়িকা, পুরুষদের প্রলুব্ধ করাই পেশা। চ্যাপলিনের মনে হল, ত্রটিকে যদি ঠিক এইভাবেই স্থাপিত করা হয় তো তাতে নাট্যরস তে হবার আশঙ্কা রয়েছে। বরং ানো দরকার, চারিত্রিক এই বিচ্যুতি, পর্কে কোনও বোধই তার নেই। ধর্ম-কের চরিত্রটিকেও তিনি অনেকখানি া-মেজে নিলেন। মূল গল্পে চরিত্রটিকে া আত্মম্ভরী করে দেখানো হয়েছে। পলিন তাঁকে সাদামাটা একটি চরিত্রে রণত করলেন। নাটকটির খুব সুখ্যাতি য়েছিল। সমালোচকরা এর প্রশংসায় ঞমুখ হয়ে উঠলেন। দর্শকদেরও এমন ড় জমে গেল যে, নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে যাবার পরেও অনেকদিন ধরে এই নাটকটি সেখানে চালিয়ে যেতে হয়েছিল। ছেলের হয়ে আর যে তিনটি নাটক মঞ্চস্থ করেছিলেন চ্যাপলিন, তার মধ্যে এখানে ব্যারির "হোয়াট এভরি উয়োম্যান নোজ" বইখানির নামোল্লেখ করা যেতে পারে।

এ-সব নাটকের প্রায় সবগুলিতেই কোনও না কোনও ভূমিকায় সীডনিকে অভিনয় করতে হয়েছে। পুরো চার বছর ধরে রীতিমত সাফল্যের সঙ্গে সে তার থিয়েটর চালিয়ে গিয়েছিল। আরও বেশ কিছুদিন চালাত নিশ্চয়ই, ইতিমধ্যে চ্যাপলিন একদিন তাকে ডেকে পাঠালেন। কী, না থিয়েটর তুলে দিয়ে চ্যাপলিনের পরবর্তী বইয়ে তাকে অভিনয় করতে নামতে হবে। বইয়ের নাম "লাইমলাইট"। বাবার আদেশ অমান্য করবে, সীডনির এমন সাহস হয়নি।

বাবাকে সীডনি এতদিন শুধু তার শ্রেষ্ঠ বন্ধু বলেই জেনে এসেছে। তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে কোন স্পষ্ট ধারণা তার ছিল না। কী করেই বা থাকবে। "দী গোল্ড রাশ" যখন তৈরি হয়, সীডনির তখনও জন্মই হয়নি। আর "মডার্ন টাইমস" যখন মুক্তিলাভ করে, সীডনি তখন ন' বছরের শিশু। চ্যাপলিনের পূর্ব পর্যায়ের কোনও বই-ই সে দেখেনি। হঠাৎ একদিন দেখবার সুযোগ ঘটে গেল। শোনা গেল, হলিউডের ছোট্ট একটা সিনেমা হলে চ্যাপলিনের পুরনো বইগুলিকে একসঙ্গে দেখানো হবে। হলের সামনে গিয়ে সীডনি তো অবাক।
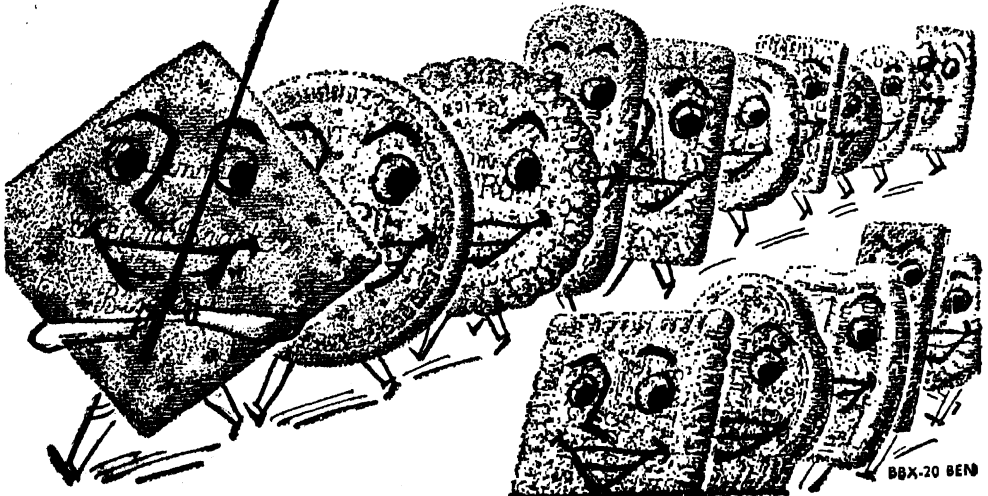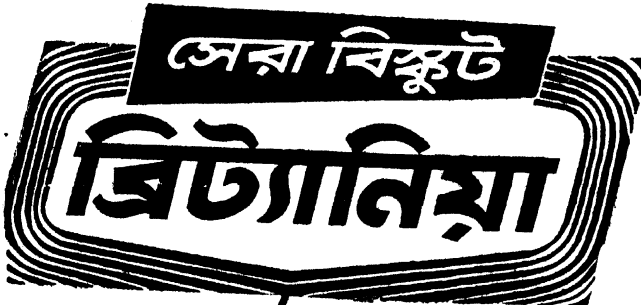
; হবার অনেক আগে থেকেই র্শকদের ভিড় জমে গিয়েছে। এসেছেন একবার-দেখা বই-আর-একবার দেখবার জন্যে; নেকে এসেছেন এ-সব বই এর র কখনও তাঁদের দেখা হয়নি, পলিনের এ-সব বই প্রথম যখন হয়েছিল, তাঁরা তখন নিতান্তই ড় হয়ে মা-বাবার কাছে বইগুলির নছেন। বিখ্যাত সেই বইগুলিকে দখবার সুযোগ যখন একবার দখে রাখাই ভাল। এর পর আর ুযোগ পাওয়া যাবে না। চুপচাপ কিনে নিজের আসনটিতে গিয়ে ল সীডনি। তারপর বই শুরু হতেই দেখে, দর্শকরা সব হাসতে অস্থির হয়ে উঠেছে। নিজেও ীডনি। সবচাইতে বেশী হাসছেন নের সীটের দর্শকটি। আর-হাসি একসময় থামছে, কিন্তু সেই ভদ্রলোকের হাসি যেন আর চায় না। বিরক্ত হয়ে বার কয়েক কে ফিরে তাকাল সীডনি, কিন্তু কিছু ঠাহর হল না। কে রে হাসতে হাসতে জ্বালিয়ে মারবে আলো জ্বলে উঠতে দেখে, কে নয়, বাবাই। কখন যে তিনি পিছনের আসনটিতে এসে সীডনি তা বুঝতে পারেনি।

৩৮ সালের এক সন্ধ্যা। সীডনি য়টর হলের গ্রীনরুমে দাঁড়িয়ে করছে। একটু বাদেই পর্দা তাকে গিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করতে ঃাৎ টেলিফোন বেজে উঠল। কে, "আমার পরবর্তী বইয়ে তোমার কটা ভূমিকা ঠিক করে রেখেছি। বার এসো, তখন সব কথা হবে।" ইমলাইট"-এর কাহিনী তখনও হয়নি। বিষয়বস্তু অবশ্য আগে ঠক হয়েআছে। পুরনো আমলের ক রঙ্গাভিনেতা, মীউজিক-হলের া আগে তার খুব কদর ছিল, মদ খেয়ে-খেয়ে সে এখন শেষ সীমানায় এসে দাঁড়িয়েছে, য়েই এই বই। অনেকে বলেন, াবার জীবনকে অবলম্বন করেই এই বইখানি তুলেছেন।

সীডনি আসতে চ্যাপলিন তাকে বিষয়বস্তুটা মোটামুটি একবার বুঝিয়ে দিলেন। তারপর হাত দিলেন কাহিনী-রচনায়। এ-কাজে তাঁর পুরো এক বছর সময় লেগেছিল। শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, সাড়ে সাতশো পৃষ্ঠার বিরাট এক স্ক্রীপ্ট তৈরি হয়েছে। স্ক্রীপ্টের আয়তন সাধারণত একশো কুড়ি পৃষ্ঠার বেশী হয় না। সুতরাং সেই বিরাট-কলেবর স্ক্রীপটিকে তিনি কাটছাঁট করতে বসে গেলেন। নির্মমভাবে ছাঁটাই করেও অবশ্য "লাইমলাইট"-এর আয়তন খুব কমানো যায়নি। এ-বইয়ের প্রদর্শন-কাল

'লাইমলাইটে' চার্লির অপর তিন সন্তান

সাধারণ বইয়ের তুলনায় অনেক বেশী, দু ঘণ্টা চল্লিশ মিনিট।

কাহিনী তৈরি শেষ হয়েছে, এবারে ভূমিকা বণ্টনের পালা। সীডনিকে নামানো হবে দরিদ্র এক সুরশিল্পীর ভূমিকায়। জীর্ণ পোশাক, শীর্ণ চেহারা। পোশাক নিয়ে সমস্যা নেই, কিন্তু চেহারা? সীডনির দিকে এক নজর তাকিয়ে নিয়ে চার্লি তো মাথায় হাত দিয়ে বসলেন। বললেন, "কত ওজন তোমার?"

"আঠারো স্টোন।"

"খাওয়া কমাও। এছাড়া আর কোনও উপায় নেই।"

নায়কের ব্যবস্থা হল। এবারে নায়িকা। নায়িকার ভূমিকায় কাকে নামানো হবে! বিখ্যাত কোনও অভি-নেত্রীকে নয়, বলাই বাহুল্য। অন্যান্য বইয়ের বেলায় যা করেছেন, এ-বইয়ের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম ঘটল না। কাগজে-কাগজে তিনি বিজ্ঞাপন দিলেন। হাজার হাজার আবেদনপত্র এসে পৌঁছতে লাগল, কয়েকটি মেয়েকে তিনি ডেকেও পাঠালেন, কিন্তু কাউকেই তাঁর পছন্দ হল না। শেষ পর্যন্ত এক বন্ধু এসে বললেন যে, মাস কয়েক আগে তিনি লণ্ডনে গিয়েছিলেন, সেখানে এক নাটকে অল্পবয়সী একটি মেয়ের অভিনয় দেখে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। নাটকটির নাম "রীং রাউণ্ড দী মুন", মেয়েটির নাম ক্লেয়ার ব্লুম। ব্যস, তৎক্ষণাৎ ক্লেয়ার ব্লুমের কাছে চিঠি পাঠালেন চার্লি। তাঁর বইয়ের জন্যে তিনি নায়িকা খুঁজে বেড়াচ্ছেন, ক্লেয়ার কি একবার নীউইয়র্কে আসতে পারবেন? দিন কয়েকের মধ্যেই ক্লেয়ার ব্লুম নীউইয়র্কে এসে পৌঁছলেন। তাঁর সঙ্গে কথা কয়ে খুশী হলেন চার্লি, ঠিক করলেন, এই মেয়েকেই তিনি "লাইমলাইট"-এর নায়িকার ভূমিকায় নামাবেন। "লাইমলাইট"-এর ঘটনাস্থল লণ্ডন; সুতরাং জনকয়েক ক্যামেরাম্যানকে নীউইয়র্ক থেকে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেওয়া হল, তাঁরা সেখানকার বেশকিছু ছবি তুলে আনবেন। হীটলারের বোমায় লণ্ডন শহরের বহু বিখ্যাত অঞ্চল ইতিমধ্যে প্রায় ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং ক্যামেরাম্যান পাঠিয়েও কিছু সুবিধে হল না। শেষ পর্যন্ত হলিউডের স্টুডিয়োর মধ্যেই সে-সব জায়গার সেটিং তৈরি করে নিতে হল। সঙ্গীতাংশ চার্লি আগেই তৈরি করে রেখেছিলেন। ব্যালে-পরি-কল্পনা আর সাজ-পোশাকের নির্দেশও তিনি নিজেই দিয়েছেন। কথায়-কথায় সীডনি সে-দিন বলছিল, "কী জানেন, হাতে যদি সময় থাকত তো জুতো তৈরি থেকে জামা সেলাই, এ-বইয়ের প্রতিটি কাজ বাবা নিজের হাতেই করতেন।"

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

চিত্রসেন

॥ বোম্বাই ॥

ভারতীয় চিত্রকলার রসগ্রাহী কোন এক বিদেশী ভদ্রলোক জানতে চেয়েছিলেন যে, আমাদের দেশের বিভিন্ন চিত্রশিল্পীদের রচনার কোন ছাপান আলেখ্য-পুস্তক বা পোস্ট কার্ড যথোচিত স্বল্প মূল্যে কোথাও পাওয়া যায় কি না, তাহলে তিনি কিছু সংগ্রহ করতে চান। বলতে বাধ্য হয়েছিলাম যে, বিদেশের মত আমাদের চিত্রশিল্পীদের কোন কিছুই ওভাবে 'বিশেষ ছাপান হয়নি। ছাপানর অত্যধিক খরচ ও বিক্রয়ের অনিশ্চয়তার জন্য আমাদের দেশের প্রকাশকরা এ বিষয়ে উদ্যোগী হতে সাহস পান না। অথচ বিদেশে সর্বত্র আজকাল ভারতীয় প্রাচীন ও সমসাময়িক চিত্রকলার প্রতি প্রচুর কৌতূহল এবং সেই জন্যই এই ধরনের ছবির পুস্তকেরও একান্ত প্রয়োজন আছে।

তাই তাজমহল হোটেলের 'প্রিন্সেস রুমে' বম্বের খ্যাতনামা শিল্পী মকবুল ফিদা হুসেনের চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে মিঃ রাসেল যখন শ্রীআয়াজ পীরভয় লিখিত হুসেনের চিত্রাবলীর আলেখ্য-পুস্তকের কথা ঘোষণা করলেন, তখন একসঙ্গে আশ্চর্য ও খুশী না হয়ে পারিনি। ১৭টি রঙীন ও ১০টি সাদা-কালো ছবিসহ শ্রীপীরভয়ের প্রবন্ধ-সম্বলিত অত্যন্ত সুরুচিপূর্ণ ও সুন্দর-ভাবে প্রকাশিত এই পুস্তকের জন্য বম্বের প্রকাশক থ্যাকার এন্ড কোংর উদ্যমের প্রশংসা করতে হয়। এই পুস্তকে হুসেনের চিত্রকলার একটি ধারাবাহিক পরিচয় পাওয়া যায় এবং 'আধুনিক' হুসেনের ছবির রস গ্রহণেও সাহায্য করে। টাইপোগ্রাফী, লে-আউট, রঙীন ছাপান বা বাঁধানতে, বিদেশী পুস্তকের তুলনায় এই পুস্তকটি কোন অংশেই হীন নয় এবং পঁচিশ টাকা মূল্যেও যথোচিতভাবেই ধার্য করা হয়েছে এবং এদেশের চিত্র-পুস্তক প্রকাশনের ক্ষেত্রে এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলা চলতে পারে।

সমসাময়িক ভারতীয় চিত্রশিল্পীদের মধ্যে হুসেনের স্থান শিল্প-সমালোচকদের নিকট খুবই উচ্চে। অনেকের কাছে, প্রথম পরিচয়ে হুসেনের চিত্রকলা পছন্দ না হলে বা উগ্র মনে হলেও ধৈর্য ধরে বেশি জানাজানির পর ভাল লাগার সম্ভাবনা আছে। হুসেনের আধুনিকত্বের একটি বিশেষত্ব আছে, সেটা হচ্ছে যে, তিনি নিছক ফরাসী স্কুলের অনুকরণ করেন নি। আকৃতি অঙ্কনে, তাঁর একটি নিজস্ব শৈলী আছে, যা বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। আমাদের প্রাচীন ঐতিহ্যের সূত্রটি তিনি

বাদ্যরতা

একেবারে ছিন্ন করেন নি এবং তাঁর আধুনিকত্ব কিছুটা আমাদের প্রাচীন চিত্রকলা থেকেই উদ্ভূত বলা যেতে পারে। ছবিতে তিনি যেসব বিকৃতি এনেছেন, তা শুধুমাত্র আধুনিকত্বের দাবীতে নয়। হুসেনের সম্বন্ধে আরেকটি কথা উল্লেখ-যোগ্য। অন্যান্য বহু ভারতীয় শিল্পী ইয়োরোপে গিয়ে বা না গিয়ে নিজেদের বৈশিষ্ট্য খুইয়ে বসে, যা হুসেনের ক্ষেত্রে প্যারী ঘুরে আসার পরও হয়নি।

অনেকে বলেন যে, 'আধুনিক' শিল্পী হুসেন আমাদের ট্র্যাডিশনের বাইরে গেলেও ভারতীয় চিত্রকলার প্রাচীন ও আধুনিক চেতনার মধ্যে যোগ সাধন করেছেন সেতুর মত। আমাদের দেশে প্রাচীন ও আধুনিক চিত্রকলার মধ্যে একটি বিরাট ব্যবধান বর্তমান। পাশ্চাত্যের চিত্রকলার ইতিহাসের একটি অব্যাহত ধারা লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু এদেশের চিত্রকলার সেরকম কিছু খুঁজে পাওয়া মুশকিল। কয়েকশত বছরের বিদেশীদের অভিযানে তা নষ্ট হয়ে গেছে, বিশেষভাবে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত। এইজনাই কতগুলি কারণে সমসাময়িক ভারতীয় চিত্র আন্দোলন অনেকের কাছে অভারতীয় ও বিজাতীয় বলে মনে হয়। রাজস্থানী চিত্রকলার 'রাগমালা' চিত্রগুলিতে বোঝা যায় যে, আমাদের দেশের শিল্পীরা 'এ্যাবসট্র্যাক্ট' বিষয়বস্তুকেও কত নিপুণতা ও দক্ষতার সহিত অঙ্কিত করেছেন। কিন্তু এর পর থেকেই ভারতীয় চিত্রকলার অব্যাহত ধারার একটি বিচ্ছেদ ঘটে অবনীন্দ্রনাথের আবির্ভাব পর্যন্ত।

উপরোক্ত প্রদর্শনীতে সবচাইতে উল্লেখযোগ্য ছিল, হুসেনের নতুন একটি বিরাট ছবি ৩ ফুট×১৮ ফুট, 'ভিলেজ লাইফ'। গ্রাম্য জীবনের বিচিত্র ও বহুবি' রূপ দেখান হয়েছে এই বিরাট ছবিটিতে যা দেয়ালচিত্রের জন্য তেলরঙে অঙ্কিত। তাঁর পূর্বেকার 'মানুষ' নামে এই ধরনের ছবিটি এর কাছে ব্যাপ্তি ও বিষয়বস্তুতে ছেলেখেলা বলে মনে হবে। দেয়ালচিত্র-রূপে ছবিটির সার্থকতা সম্বন্ধে আমি সন্দেহান্বিত এবং এই রচনার যোগ্যতা যাচাই হবে, যথোচিত পরিস্থিতি ও পরিবেশে এটিকে স্থাপনা করার পর। ততদিন শিল্প-সমালোচকরা এই নিয়ে বিরোধ-বিতর্ক তোলার যথেষ্ট সুযোগ পাবেন এই ছবিটিতে। তাঁর 'স্ত্রী' ছবিটিও একটি উল্লেখযোগ্য রচনা এবং পিকাশোর 'নীলপর্বের' ছবির মত মনকে অভিভূত করে। কিন্তু ইদানীং রঙীন ঘুড়ির কাগজ ছিঁড়ে কার্ড বোর্ড বা পেস্টবোর্ড-এর উপর আঠা দিয়ে লাগিয়ে তিনি যেসব ছবি করেছেন, তা অত্যন্ত খেলো ও সার্থক সৃষ্টিরূপে ধোপে টিঁকবে না। যদি শুধু অভিনবত্বের কথাই শিল্পী ভেবে থাকেন, তাহলে বলতে হবে আদতে

াবস্থ কিছুই নেই এর মধ্যে। আজ-
আবার হুসেন, যিনি এককালে
াবপত্র ও সেট ডিজাইনার ছিলেন,
বা এক ইঞ্চি পুরু কাঠের তক্তায়
ওয়ার্ক করে রঙ দিয়ে যেসব পুতুল
য়েছেন, সেগুলোকে "Sculptured
s" নামকরণ করলেও ভাস্কর্যের
নমুনাই তাতে নেই। 'ত্রিস্তরমাত্রিক'
দন আনার চেষ্টাতেও শিল্পী সফল
া, যদিও নিছক পুতুল হিসেবে
লাকে মন্দ লাগে না। এয়ার-ইণ্ডিয়া
ান্যাশনালের হংকং অফিসের দেয়াল-
র জন্য এই ধরনের কাঠ থেকে
ন বানিয়ে শিল্পী যে মডেল তৈরী
ছেন তা সত্যিই চিত্তাকর্ষক।

হুসেনের এখনকার ছবিতে বেশ
় সমাহিত ভাব লক্ষ্য করা যায়;
কার ছবির উগ্রভাব এখন আর নেই।
র যে কয়জন শিল্পী বিভিন্ন পরীক্ষা
ক্ষার মধ্যে দিয়ে শিল্প সাধনা করে
ন এবং যাদের নিকট ভবিষ্যতে বিরাট
নার আশা করা যায়, হুসেন তাঁদের
তম।

* * *

ভুলাভাই দেশাই মেমোরিয়াল হলে
তীয় ভাস্কর সমিতি'র প্রদর্শনীটি
ফেব্রুয়ারী—৫ই মার্চ) সময়োচিত,
আকাঙ্ক্ষিত ও গুরুত্বপূর্ণ। চিত্রকলা
নীর বাহুল্যের মধ্যে ও ভাস্কর্যের
নী করা কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য বলে
দের দেশের আধুনিক ভাস্কররা
চক্ষুর আড়ালে অবহেলিত হয়ে
আছে এবং তাঁরা যে কি করছেন
রণে জানতেই পারে না। আমাদের
র ভাস্কররা একত্র হয়ে, সমিতি গঠন
ভারতীয় ভাস্কর্যের হৃত গৌরব
য়ে আনতে যে বদ্ধপরিকর হয়েছেন
খুবই আশার কথা। এই সঙ্গে
কর্যের প্রতি সাধারণের উৎসাহ ও
ক্য জাগিয়ে তুলতে পারলে ভাস্কর-
ও অবস্থার উন্নতির সম্ভাবনা আছে।
প্রসঙ্গে স্বর্গত শ্রীভুলাভাই দেশাইয়ের
বধু শ্রীমতী মাধুরী দেশাইয়ের
উল্লেখ করতে হয়। তাঁরই দাক্ষিণ্যে
রর ভাস্করদের শিল্পচর্চা ও
র্শনী করার জন্য স্থানীয় ভাস্কররা
য়েছে প্রশস্ত হল, যেখানে তাঁরা একত্র
হয়ে নির্বিঘ্নে তাদের সাধনা, আলাপ আলোচনা, আদানপ্রদান করতে পারে।

প্রদর্শনীতে বিভিন্ন ভাস্করদের বিচিত্র ও বিভিন্ন মাধ্যমে গড়া ৮৮টি রচনা স্থান পেয়েছিল। বেশীর ভাগই উল্লেখযোগ্য নয় এবং ছাত্রছাত্রীদের করা অ-পেশাদারী রচনা। কিন্তু দ্বিতীয় হলটিতে গেলে বোঝা যায় যে, আমাদের দেশে এখনও কৃতি ভাস্কর আছে। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয় বরোদা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীশঙ্খ চৌধুরী, বম্বের শ্রীমতী পি আর পোচ্খান্ওয়ালা, শ্রীজিতেন্দ্রকুমার ও শ্রীডাভিয়েরওয়ালা। শঙ্খ চৌধুরীর Ebony কাঠের "Figure" ও লোহার সরু পাতে গড়া 'Two Figures' প্রদর্শনীর দুইটি বিশিষ্ট রচনা। প্রথমটির ছন্দায়িত অঙ্কন আমার কাছে খুবই ভাল লাগল। লোহার পাতের আকৃতি দুটিকে এমনভাবে সাজান হয়েছে, যাতে 'ত্রিস্তর-মাত্রিক' আবেদন আনার চেষ্টা শিল্পী করেছেন। পিতলের চ্যাপ্টা পাত কেটে ও বেঁকিয়ে গড়া শ্রীমতী পোচ্খানওয়ালার দুইটি রচনা 'Chakri' ও 'Gavali' (যার জন্য তিনি সমিতির পুরস্কার পেয়েছেন), এই প্রদর্শনীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ রচনা।

তাছাড়া জিতেন্দ্রকুমারের কাঠের মূর্তি-গুলিও উল্লেখযোগ্য।

আশা করছি ভাস্কর সমিতির এই প্রদর্শনীতে ভবিষ্যতে অন্যান্য প্রদেশের শিল্পীদেরও রচনা দেখতে পাব এবং ভারত সরকারের তরফ থেকে রেলওয়ে দপ্তর ভাস্কর্য আনা-নেওয়াতে বিশেষ ব্যবস্থা ও সুবিধা করে দেবেন এই সমিতিকে। দুঃখের কথা, অন্যান্য প্রদেশের ভাস্কররা, বিশেষ করে বাংলা দেশের, সমিতির কার্যকলাপে অংশ গ্রহণ করছেন না এমনকি সদস্যও হননি। হয়ত তাঁদের ইচ্ছা কলকাতায় আলাদা ও স্বাধীন আরেকটি সমিতি গঠন করা। কিন্তু ভাস্করদের সংখ্যা এত অল্প যে বিভিন্ন শহরে পৃথক সমিতি গঠন করলে কোনটারই অস্তিত্ব বেশীদিন থাকবে না। একটি কার্যকরী সমিতি গঠন করে, বিভিন্ন শাখার মাধ্যমে কাজকর্ম শুরু করলে সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পাবারও সম্ভাবনা আছে।

ভাস্কর সমিতির প্রাঙ্গণে লোহার পাত ও তার দিয়ে তৈরী 'Mobile' মূর্তির ভাস্কর আমেরিকার আলেক-জান্ডার কল্ডার-এরও কাজের নমুনা দেখলাম। এঁকে নিয়ে বম্বের পাশ্চাত্ত্য ভাবাপন্ন উন্নাসিক একদল শখের বিলাসী ইন্‌টেলেকচুয়াল আধুনিকদের মধ্যে খুবই মাতামাতি শুরু হয়েছে। কিন্তু একটা অসম্ভব অভিনব আধুনিক কিছু ভেবে মাতামাতি করার মত কিছুই পেলাম না এর মধ্যে, উলটে মনে হল 'অতি পুরাতন ভাব'। তা আমেরিকার Museum of Modern Art-এর জাঁদরেল বিশেষজ্ঞ ও অন্যান্য শিল্প সমালোচকরা প্রশংসা করলেই বা কি। হাওয়াতে Mobile গুলো ঘুরেফিরে সুন্দর ও বিচিত্র ফর্ম নিলেও, আর্টের সার্থক সৃষ্টির সর্বকালীন আবেদন আছে কিনা সন্দেহ।

* * *

ব্যবহারিক শিল্পের উন্নতিকল্পে গঠিত "Commercial Artists' Guild," শহরের একমাত্র শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান। এটা বিজ্ঞাপন ও প্রচারের যুগ এবং এই বিষয়ে সংশিল্পষ্ট সকলেই এই প্রতিষ্ঠানের সহিত জড়িত। এঁদের বাৎসরিক প্রদর্শনীটিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই প্রদর্শনীতে আমাদের ব্যবহারিক শিল্পের গতি কোনদিকে তারও একটি সমগ্র ও স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়। এঁদের উদ্যোগে 'বিজ্ঞাপন সপ্তাহ' উপলক্ষে, জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে এ বছরের প্রদর্শনীটি খুবই উঁচুদরের হয়েছে। গ্যালারীর 'হল' ঘরে বিভিন্ন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান ও বিজ্ঞাপন এজেন্সীর সুসজ্জিত স্টলে প্রচারপত্র ও কাজের নিদর্শন আছে। অপর পার্শ্বের গ্যালারীতে বিভিন্ন বিভাগে দৈনিক ও সাময়িকপত্রের বিজ্ঞাপন, পুস্তিকা, লেবেল, অভিনন্দনপত্র, প্রাচীরচিত্র, কাহিনীচিত্র, দেয়ালপঞ্জী, দোকানে রাখার বিজ্ঞাপনপত্র, চিঠির কাগজ ও ছাত্রছাত্রী-দের রচনা স্থান পেয়েছিল।
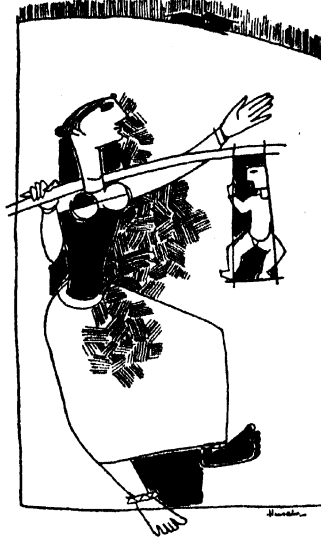
'ব্যালেন্স' —হুসেন

* * *

এই উপলক্ষে গিল্ড-এর সুপ্রকাশিত বাৎসরিক স্মারকগ্রন্থটিও ব্যবহারশিল্পের একটি মূল্যবান সংগ্রহ। প্রদর্শনীর ক্যাটালগ পুস্তিকাটিও বহু তথ্যে পরি-পূর্ণ। আমাদের দেশের ব্যবহারিক শিল্প স্বাধীনতার পর যে কত উন্নতিলাভ করেছে তা বোঝা যায়, গত ছয় বছরের গিল্ড-এর স্মারকগ্রন্থটি দেখলে। প্রথম বছরের পুস্তকটির তুলনায় এ বছরের পুস্তকে ব্যবহারিক শিল্পের যে নমুনা আছে তাতে খুবই আশান্বিত হতে হয়। আমাদের ব্যবহারিক শিল্পে, বিশেষকরে বম্বেতে পাশ্চাত্ত্য প্রভাব ছিল অত্যন্ত অধিক, কিন্তু আজকাল ভারতীয় প্রভাব এই শিল্পে খুবই লক্ষ্যনীয়। এ বিষয়ে বাংলাদেশের শিল্পীরাই হচ্ছে অগ্রণী এবং সেইজন্যই তাঁদের কাজের কদরও হচ্ছে প্রচুর। বম্বের শিল্পীরাও এই পরি-বর্তিত অবস্থার বিষয়ে সচেতন হয়েছে এবং 'ভারতীয়করণ' চলছে সর্বত্র, প্রবল উদ্যমে। এটা সুলক্ষণ বলতে হবে।

* * *

ফেব্রুয়ারী মাসে জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে আরেকটি উল্লেখযোগ্য প্রদর্শনী হল ভারতীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন যন্ত্রের। "সুর-শৃঙ্গার সংসদ"-এর আয়োজন করেন। মিউজিয়াম ও বেসরকারী সংগ্রহ থেকে আমাদের প্রাচীন ও আধুনিক সর্বপ্রকারের সঙ্গীতযন্ত্র প্রদর্শিত হয়েছিল এবং বিশেষ আকর্ষণ ছিল দিল্লীর অল্ ইণ্ডিয়া রেডিয়োর প্রফেসর কৃষ্ণস্বামীর সংগ্রহের ৬০০ রেখা-চিত্র ও ফটোগ্রাফ। আমাদের প্রাচীন ভাস্কর্য ও চিত্রকলা থেকে অঙ্কিত রেখা-চিত্রগুলি খুবই আকর্ষণীয় ছিল।

* * *

শহরের প্রবীণ শিল্পী শ্রীআছরেকার-এর অ্যাকেডেমী অব ফাইন আর্টস-এর ছাত্রছাত্রীদের ছবিরও একটি প্রদর্শনী হয়ে গেল জাহাঙ্গীর আর্ট গ্যালারীতে। প্রদর্শনীতে ১৪ বৎসরের কম বয়স্ক ছেলেমেয়েদের রচনায় যে কল্পনা সজীবতা ও অনুসন্ধিৎসু মনের পরিচয় পাওয়া যায় তা আরেকটু বেশী বয়সের ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পাওয়া গেল না। বয়স্ক ছাত্রদের মধ্যে শ্রীখাসগিওয়ালে ও শ্রীপাটোলে'র নাম উল্লেখযোগ্য এবং শ্রীমতী কাংলে'র "ভারতীয় লোকনৃত্য" বিরাট ছবিটিতে আমাদের লোকনৃত্যের ছন্দমাধুর্য ভালভাবেই ধরা পড়েছে।

প্রদর্শনীর ছবির মান ভালই বলা চলে এবং শ্রীআছরেকার চিত্রশিক্ষাদানে ছাত্রছাত্রীদের স্বাধীনতা ও ইচ্ছায় বাধা দেননি তা বেশ বোঝা যায়।

ভারতে বাঙ্গালীর সংখ্যা

শুভঙ্কর

১৯৫১ সালের জনগণনার সময় সংগৃহীত তথ্যগুলি বিচার-বিশ্লেষণ ক'রে আজকাল অনেক সরকারী বই বেরোচ্ছে। বইগুলি অধিকাংশই সংখ্যাতে ভর্তি, তাই একটু নিরস, তবে দু' একটিকে ছবি মানচিত্র ইত্যাদি দিয়ে যথাসম্ভব চিত্তাকর্ষক করবার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বইগুলির কয়েকটি আমি দেখেছি। আমাদের দেশে কত লোক নিজে খেটে খায়, কতজনই বা বুদ্ধিমানের মত অন্যদের খাটিয়ে নেয়, মেয়েদের কত বয়সে ক'টা ছেলে হয়, দেশের লোকেদের আয়ু কি পরিমাণ বাড়ছে, ইত্যাদি অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য এইসব বইতে দেওয়া আছে। ভারতের কতজন লোক কি ভাষায় কথা বলে সেই বিষয়েও বেশ মোটা একটি বই বেরিয়েছে। এই বইতে দেওয়া বাঙলা-ভাষীর সংখ্যা নিয়ে এই আলোচনা।

প্রথমেই বলে রাখা ভাল যে, জনগণনার সময় যেসব তথ্য সংগ্রহ করা হয় সেগুলি অভ্রান্ত নয়। যথাসাধ্য সাবধান হওয়া সত্ত্বেও এতে অনেক ভুল ঢুকে পড়েছে। এমন কি, যে সংখ্যাটিতে সবচেয়ে কম ভুল হবার সম্ভবনা—অর্থাৎ ভারতের অধিবাসীদের মোট সংখ্যা, তাও এই জনগণনায় নির্ভুলভাবে জানা যায়নি। ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের মতে প্রতি হাজারে প্রায় এগারজন লোক গণনায় বাদ পড়ে গেছে। জনগণনা অনুসারে ১লা মার্চ, ১৯৫১ সালে ভারতের জনসংখ্যা ছিল পঁয়ত্রিশ কোটি ঊনসত্তর লক্ষ। আসলে ভারতের জনসংখ্যা নাকি সেদিন আরও প্রায় চল্লিশ লক্ষ বেশী ছিল।

মোট গণনাতেই যখন এত ভুল, তখন অন্যান্য তথ্যে যে অনেক বেশী ভুল থাকবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। অধিকাংশ গণনাকারীই ছিলেন অল্পশিক্ষিত, আর আমাদের দেশের অধিবাসীদের মোটা অংশই লেখাপড়া জানে না, কাজেই যথাসম্ভব চেষ্টা করলেও সব তথ্য নির্ভুলভাবে সংগ্রহ করা সম্ভব নয়। গণনাকারীরা নিজেদের সাধ্যমত সঠিক তথ্য সংগ্রহ করেছেন, আর বেশীর ভাগ তথ্যের বেলা আমরা ধরে নিতে পারি যে, ইচ্ছা করে কোন ভুল ঢোকানো হয়নি। কেবল সন্দেহ হয় ভাষার বিষয়ে যে-সব তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে সেইগুলির উপর। ভারতের অধিকাংশ রাজ্যেই ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগুলির পুনর্গঠনের জন্য আন্দোলন চলছে। যদি এই দাবী স্বীকৃত হয় তা হ'লে যে-সব জেলা দুই রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত আর যেখানে দুই রাজ্যের অধিবাসীই যথেষ্ট সংখ্যায় আছেন সেইগুলি নিয়ে ঝগড়া বাধবে। কিছুদিন আগে অন্ধ্র রাজ্য গঠনের সময় বেল্লারী জেলা নিয়ে এই ঝগড়া বেধেছিল। জনগণনার সময়ও ভাষার ব্যাপার নিয়ে এইসব সীমান্তবর্তী জেলাতে অনেক জায়গায় বেশ মনোমালিন্য হয়েছিল। পাঞ্জাবে তো মানুষ খুন অবধি হয়ে যায়। তাছাড়া, গণনাকারীরাও স্থানীয় লোক। তাই তাঁরাও যে নিস্পৃহ হয়ে এইসব সংখ্যা জোগাড় করেছেন তা হলপ করে বলা যায় না।

এছাড়া এমন অনেক ভুল আছে যা অনিচ্ছাকৃত। একটা ভুল যা আমার নজরে পড়েছে তার কথা বলছি। জনগণনা মতে ভারতে ৪১২৯ জন লোকের মাতৃভাষা 'গোহাটি'। নাম সাদৃশ্যে মনে হবে এরা বুঝি আসামের গোহাটি অঞ্চলে থাকে। আসলে তা নয়। এরা সকলেই রাজস্থানের অধিবাসী। এদের মধ্যে একজন থাকে উদয়পুর জেলায়, ছয়জন থাকে বুন্দীতে আর বাদবাকি ৪১২২ জন থাকে বাড়মের জেলায়। বাড়মেরে আমি প্রায় দেড় বছর আছি। এই জেলার প্রায় সব অংশেই আমি ঘুরেছি। অনেক চেষ্টা করেও, এই ভাষায় কথা বলে, এমন কি এই ভাষার নাম শুনেছে এইরকম একজন লোককেও খুঁজে পাইনি। গণনাকারীরা কি শুনে কি লিখেছেন আর সেই লেখার কেন এই পাঠোদ্ধার হয়েছে এখন আর জানা সম্ভব নয়।

ভাষার নাম নিয়ে এই ধরনের ভুল আরও হয়েছে। জনগণনায় ভারতের সংবিধানে উল্লিখিত চৌদ্দটি ভাষা বাদে আরও ৭৬৭টি ভাষার নাম পাওয়া গেছে। এদের মধ্যে আবার ৭৩টি ভাষা মাত্র এক একজন লোকের মাতৃভাষা। হঠাৎ শুনলে মনে হবে, আহা, বেচারারা মা মারা যাবার পর আর মায়ের ভাষায় কথা বলতে পায়নি। কিন্তু আসল ব্যাপার বোধহয় এই যে, অধিকাংশ স্থলে এইসব নামের কোন অস্তিত্বই নেই। কয়েকটি নাম দেখলেই এই কথা স্পষ্ট হবে। একজন বলেছে তার মাতৃভাষা বৌদ্ধ, একজন বলেছে তার মাতৃভাষার নাম আদিবাসী, আবার মধ্যপ্রদেশে একজন বলেছে তার মাতৃভাষা বাজারী। আমাদের দেশে, বিশেষ করে আদিবাসীদের মধ্যে, এমন অনেক লোক আছে যারা জানেই না যে, তাদের ভাষার কোন নাম আছে। তাই গণনাকারী যখন তাদের মাতৃভাষার নাম জিজ্ঞাসা করেছেন, তখন হয় তারা নিজেরাই একটা নাম বানিয়ে বলে দিয়েছে, নয় গণনাকারীই নিজের বুদ্ধিমত একটা

নাম বসিয়ে দিয়েছেন। ভারতে প্রচলিত ভাষাগুলির কোন প্রামাণিক তালিকা নেই, তাই যতগুলি নাম পাওয়া গেছে সবগুলিকেই ছাপতে হয়েছে, কোনটিকেই জোর করে বাদ দেওয়া চলেনি।

প্রামাণিক তালিকা যে বানাবার চেষ্টা হয়নি, তা নয়। ভারতবর্ষে কতগুলি ভাষা ও উপভাষা প্রচলিত আছে সেই বিষয়ে একটা সর্ভে করবার চেষ্টা ভারত সরকার গত শতাব্দীর শেষভাগে আরম্ভ করেন। এই সর্ভের ভার দেওয়া হয় স্যর জর্জ গ্রীয়রসনের উপর। মাদ্রাজ (ও অন্ধ্র), হায়দরাবাদ, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিন বাদে ভারতবর্ষের সব প্রদেশ ও রাজ্যগুলিতে এই সর্ভে করা হয়। এর জন্যে যে উপায় অবলম্বন করা হয় তা এইঃ প্রথমে খানিকটা লেখা, কিছু শব্দ আর কিছু বাক্য বেছে নেওয়া হয় ও তারপর সেইগুলি প্রত্যেক জেলার কলেক্টরদের কাছে পাঠিয়ে দিয়ে তাঁদের বলা হয় যে, তাঁরা যেন এইগুলি তাঁদের নিজেদের জেলাতে প্রচলিত সবগুলি ভাষাতে অনুবাদ করে পাঠিয়ে দেন। এছাড়া তাঁদের নিজেদের পছন্দমত এইসব ভাষার কিছু নমুনাও পাঠিয়ে দিতে বলা হয়। যে লেখাটি পাঠান হয় সেটি হ'ল বাইবেলের 'অমিতব্যয়ী পুত্রের কথা', অবশ্য যাতে কারু মনে আঘাত না লাগে তাই পুষ্ট বাছুরটি কাটবার কথাটা লেখার মধ্যে বদলে দেওয়া হয়। কলেক্টরদের কাছ থেকে যে জবাব পাওয়া যায়, সেইগুলি পরীক্ষা করে গ্রীয়রসন সাহেব বলেন যে, ভারতবর্ষের যে অংশে সর্ভে করা হয়েছিল সেখানে ১৭৯টি ভাষা ও ৫৪৪টি উপভাষা প্রচলিত আছে। ১৮৯১ সালে, অর্থাৎ এই সর্ভে আরম্ভ করবার ঠিক আগের জনগণনার সময় এইসব ভাষায় কতজন ক'রে কথা ব'লত তারও একটা আন্দাজ করা হয়। সর্ভে শেষ হবার পর প্রথম জনগণনা হয় ১৯২১ সালে। সেই জনগণনায় সারা ভারতবর্ষ ও বর্মা মিলিয়ে ১৮৮টি ভাষা ও ৪৯টি উপভাষার নাম পাওয়া যায়। উপভাষার সংখ্যা এত কম হওয়াতে মনে হয় যে, লোকে নিজের মাতৃভাষাকে উপভাষা বলতে নারাজ। একটা উদাহরণ দিচ্ছিঃ সর্ভের মতে রাজবংশী বাঙ্গালার একটি উপভাষা এবং ১৮৯১ সালে এই উপভাষায় আন্দাজ সাড়ে তিন লক্ষ লোক কথা ব'লত। ১৯২১ সালে কিন্তু একজন লোকও নিজের মাতৃভাষা রাজবংশী বলেনি। এইবারে অর্থাৎ ১৯৫১ সালের জনগণনায় মাত্র দুইজন লোক তাদের মাতৃভাষা রাজবংশী বলেছে। অর্থাৎ গ্রীয়রসন সাহেব যাদের রাজবংশীভাষী বলেছেন, তারা নিজেদের মাতৃভাষাকে বাঙ্গালা বলেই জানে। তুলনার জন্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা' থেকে রাজবংশী ভাষায় 'অমিতব্যয়ী পুত্রের কথা' কি রকম দাঁড়ায় তুলে দিচ্ছি।

"তখন তার বড় বেটা পাতার বাড়ীৎ আছিল্। পাছোৎ তাঁর আস্তে-আস্তে বাড়ীর কছোৎ ধায়া নাচ-গানের শোর শুনবার পাইল্। তখন তাঁয় একজন চেঙ্গরাক্ ডাকেয়া পুছ করিল্—ইগ্লা কি? তখন তাঁয় তাক্ কৈল্—তোর ভাই আইচ্চে, তোর বাপ্ তাক্ ভালে-ভালে পায়্যা একটা বড় ভান্ডরা ক'র্চে।"

বিশেষজ্ঞের দৃষ্টিতে এটি বাঙ্গালার উপভাষা হতে পারে, সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে এটি বাঙ্গালা ভাষাই। জনগণনার সময় নিজের মাতৃভাষার নাম যে যা বলে, গণনাকারীর তাই লিখে নেবার কথা। কাজেই ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষাগুলির যে প্রামাণিক তালিকা বানাবার চেষ্টা হয়েছিল, জনগণনার সময় তা কোন কাজে আসে না।

এতখানি দীর্ঘ ভূমিকা করলাম এইজন্য যে, সরকারী ছাপ মারা থাকলেও এই বইতে অনেক ধরনের ভুল ভ্রান্তি থাকা সম্ভব। এই বইতে দেওয়া সংখ্যাগুলি তাই খুবই মোটামুটিভাবে ধরতে হবে, সূক্ষ্ম বিচার এইসব সংখ্যা নিয়ে করা চলবে না।

২

এইবার আসল কথায় আসা যাক্। ১৯৫১ সালের ১লা মার্চ ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারতে বাঙ্গালাভাষী অর্থাৎ বাঙ্গালীর সংখ্যা ছিল দুই কোটি একান্ন লক্ষ একুশ হাজার ছয় শ চুয়াত্তর। ভারতের এই প্রায় আড়াই কোটি বাঙ্গালীর মধ্যে প্রায় এক লক্ষ চল্লিশ হাজার প্রবাসী বাঙ্গালী। বাকি দুই কোটি উনপঞ্চাশ লক্ষ বিরা[illegible] হাজার জন থাকেন পূর্বভারতে, অর্থ[illegible] বিহার, উড়িষ্যা, পশ্চিমবঙ্গ, আসা[illegible] মণিপুর ও ত্রিপুরায়। অবশ্য এই বিভ[illegible] করছি শুধু আলোচনার সুবিধার জন্য কারণ ভারতের সব অংশেই স্থায়ী অ[illegible]বাসী বাঙ্গালী আছেন আর পূর্বভারতে[illegible] নিশ্চয় অনেক প্রবাসী বাঙ্গালী ব[illegible] করেন।

প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে অর্ধে[illegible] উপর থাকেন উত্তরপ্রদেশে। এঁদের সং[illegible] ৭৩০৪৫। আশ্চর্য ব্যাপার যে, এঁ[illegible] মধ্যে ছয় হাজারের উপর লোক দেহা[illegible] আমার ধারণা ছিল যে, কিছু ডাক্তার [illegible] চিনির কলের কেমিস্ট বাদে উত্তর প্রদে[illegible] বাকি সব বাঙ্গালী শহরে থাকেন। [illegible] গণনার সময় আমি গোরখপুর জে[illegible] ছিলাম। এখানে সবশুদ্ধ ২৫৯৫ বাঙ্গালীর মধ্যে ৯০ জনকে দেহাতী [illegible] হয়েছে। গোরখপুরে গ্রামাঞ্চলে বাঙ্গালী আমি দেখিনি। মনে [illegible] যে-সব লোক মুন্যিসিপল এলা[illegible] বাইরে, অর্থাৎ শহরতলী বা রেল কলোনিগুলিতে থাকেন, তাঁদেরও উ[illegible] প্রদেশে দেহাতী বলে ধরা হয়েছে। শহরগুলিতে বাঙ্গালীর সংখ্যা হ[illegible] কাশীতে ১৯,৪৭৭, এলাহাবাদে ১১,৭[illegible] কানপুরে ৮,২৫৩, লখ্নউতে ৭৬[illegible] মথুরাতে ৩,২৪২, আগ্রাতে ৩,১[illegible] দেরাদুনে ২,৮৪৯, মীরাটে ২৭৫৯ সাহারানপুরে ২,৩৯৮। একটি উ[illegible] যোগ্য তথ্য এই যে, যদিও অধি[illegible] জেলাতেই পুরুষদের সংখ্যা স্ত্রীলোক[illegible] চেয়ে বেশী, কাশী আর মথু[illegible] বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদের ভাগ যথ[illegible] শতকরা ৫২ ও ৫৫।

উত্তর প্রদেশের পর সবচেয়ে [illegible] প্রবাসী বাঙ্গালী থাকেন মধ্যপ্রদে[illegible] এখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা ২৩,৮১৫। [illegible] সব জেলাতেই ছড়িয়ে আছেন। বড় [illegible] জনসংখ্যা হল জব্বলপুর ৬,১৪৭, নাগ[illegible] ৫,৬১০, সরগুজা ২৫৮৯, বিলাস[illegible] ১,৭৭১, রায়পুর ১,৪৬৪ আর রা[illegible] ১৪৭১ (পুরুষ ৫৯১, স্ত্রীলোক ৮৮[illegible] সরগুজোর মত ছোট জায়গায় এত বাঙ[illegible] কেন আর রায়গড়ে বাঙ্গালী পুরু[illegible] চেয়ে স্ত্রীলোক বেশী কেন, জ[illegible]

...হল হচ্ছে। মধ্যপ্রদেশের সেন্সস্ ...রিণ্টেন্ডেণ্ট বলেছেন যে, ১৯৩১ ...রর তুলনায় এই প্রদেশে বাঙ্গালীর ...্যা অনেক বেড়ে গেছে। তার কারণ, ... মতে, এখানে অনেক বাঙ্গালী ...বাস্তু এসেছেন। মধ্যপ্রদেশে খুব বেশী ...বাস্তু গিয়েছেন কি?

এর পর আসে বোম্বাই রাজ্য। এই ...জ্যে বাঙ্গালী আছেন ১৫,৫৫৪ জন। ...র মধ্যে ৯,৯৬৯ জনই থাকেন বোম্বাই ...হরে। তাছাড়া বেশী বাঙ্গালী আছেন ...নাতে ১,৮৩১ জন, থানা জেলাতে ...৪৫৩ জন ও আমেদাবাদে ৭৫৬ জন।

দক্ষিণ ভারতে বাঙ্গালীর সংখ্যা মাত্র ...৭৯৬। ত্রিবাঙ্কুর ও কোচিনে বাঙ্গালীর ...ংখ্যা আলাদা করে লেখা হয়নি, তাই ...াঁদের সংখ্যা এর ভিতর ধরা হয়নি। ...াদ্রাজ শহরে বাঙ্গালীর সংখ্যা ২,৪৯৬ আর ব্যাঙ্গালোরে ২,২৯৮। ব্যাঙ্গালোরে এত বাঙ্গালীর মধ্যে স্ত্রীলোক মাত্র ৩২৫ জন। স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, এখানকার অধিকাংশ পুরুষ অবিবাহিত। ব্যাঙ্গালোরে নিত্য নতুন বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির কারখানা খোলা হচ্ছে। এসব কাজে বাঙ্গালী ছেলেরা অগ্রগণ্য।

রাজধানী দিল্লীতে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১০,৩১৫। পাঞ্জাবী, পাহাড়ী, উর্দু বা হিন্দী মাতৃভাষা নয়, এমন যে সব লোক এখানে বাস করেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হলেন মারাঠীভাষী ১৯,৯৫৫, সিন্ধী ১৫,১১০, গুজরাটী ১৪.০৩৮, মালয়ালমভাষী ৯,৮০৫, তেলেগুভাষী ৯,৬৬৭ ও তামিলভাষী ৮,৭৪৫। দিল্লীতে যে মারাঠীভাষী এত লোক আছেন তা জানতাম না। আর একটা ধারণা যে, দিল্লী শহর তামিলভাষীরা অধিকার করে নিয়েছেন তাও দেখছি ভুল।

৩

এর পর আসে অধিবাসী বাঙ্গালীদের কথা। পশ্চিমবঙ্গের জনসংখ্যা দুই কোটি আটচল্লিশ লক্ষ। এর মধ্যে বাঙ্গালী দুই কোটি দশ লক্ষ, হিন্দীভাষী পোনে ষোল লক্ষ ও উর্দুভাষী সাড়ে চার লক্ষ। উর্দু-ভাষীর সংখ্যা ১৯৩১ সালে ছিল দু লক্ষ। সাধারণত অবাঙ্গালী মুসলমানেরাই নিজেদের মাতৃভাষার নাম উর্দু বলেন।

সেই হিসেবে, এই সংখ্যা কেন বেড়ে গেলো বোঝা যায় না। পশ্চিমবঙ্গে যে-সব জেলায় বাঙ্গালীর সংখ্যা শতকরা আশির কম তাদের নাম হ'ল কলিকাতা (বাঙ্গালী ৬৬%, হিন্দীভাষী ২০%), পশ্চিম দিনাজপুর (বাঙ্গালী ৭৮%), জলপাইগুড়ি (বাঙ্গালী ৫৭%, হিন্দীভাষী ১৪%) ও দার্জিলিঙ (নেপালী ২০%, রাইভাষী ১৫%, বাঙ্গালী ১৪% ও তামাঙ্গভাষী ১১%)।

পশ্চিমবঙ্গে গুরুমুখী ভাষীর সংখ্যা ৩৩,৩৩১ আর পাঞ্জাবী ভাষীর সংখ্যা ৫,৭৬৮। পশ্চিমবঙ্গের সেন্‌সস্‌ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলেছেন যে, এই দুই সংখ্যা যোগাড় করতে একটু অসুবিধা হয়েছে, কারণ গণনাকারীদের ও যাঁরা এই দুই ভাষায় কথা বলেন তাঁদের অনেকের এই দুই ভাষার পার্থক্য জানা ছিল না। গুরুমুখী কি কোন ভাষার নাম? আমার তো ধারণা ছিল গুরুমুখী পাঞ্জাবের একটি লিপির নাম, যে লিপিতে কলিকাতায় অনেক বস স্টপে 'সটাপ' লেখা আছে। পুরাতন পাঞ্জাবী লিপি সংস্কার ক'রে শিখগুরু অঙ্গদ এই লিপির প্রচার করেন, তাই এর নাম গুরুমুখী।

আসামে বাঙ্গালীর সংখ্যা ১৭,১৯,১৫৫। এর মধ্যে ২৭২,০৮০ জন উদ্বাস্তু। বাঙ্গালীদের সংখ্যা বেশী এই কয়টি জেলায়—কাছাড় ৮,৬০,৭৭২, কামরূপ ২,২৫,২০৯, গোয়ালপাড়া ১,৯৩,০৬৬ ও নওগাঁ ২,০৭,২৫৪। এই জেলাগুলিতে যথাক্রমে বাঙ্গালীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৭৭, ১৫, ১৭ ও ২৩ ভাগ।

আসাম সম্বন্ধে একটা উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, ১৯৩১ থেকে ১৯৫১ সাল এই কুড়ি বছরের মধ্যে উদ্বাস্তু বাদে আসামের জনসংখ্যা বেড়েছে প্রায় সওয়া চব্বিশ লক্ষ। এই সময়ের মধ্যে অসমীয়া ভাষীর সংখ্যা কুড়ি লক্ষ থেকে বেড়ে পঞ্চাশ লক্ষ হয়ে গেছে। স্বাভাবিক বৃদ্ধি এত বেশী সম্ভব নয়। মনে হয়, আগের বারের জনগণনায় যাঁরা নিজেদের মা[illegible] ভাষার নাম অন্য কিছু লিখিয়েছিলে[illegible] এবারে তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজে[illegible] আসামী ভাষী বলেছেন। এই কুড়ি বছ[illegible] আসামে উদ্বাস্তু বাদে বাঙ্গালীর সং[illegible] সতর লক্ষ থেকে সাড়ে চৌদ্দ লক্ষ হ[illegible] গেছে।

মণিপুরে বেশী বাঙ্গালী নেই[illegible] সবশুদ্ধ ৫,৭৭,৬৩৫ জন অধিবাসী[illegible] মধ্যে ২,৮৫৯ জন বাঙ্গালী।

ত্রিপুরাতে বাঙ্গালীর সংখ্যা ৩,৭[illegible] ২৫৮। এখানকার মোট জনসংখ্য[illegible] শতকরা ৫৯ ভাগ বাঙ্গালী। ত্রিপুরা[illegible] এক লক্ষ ত্রিশ হাজার জন নিজেদের মা[illegible] ভাষার নাম বলেছেন ত্রিপুরাভাষ[illegible] ত্রিপুরা কি কোন আলাদা ভাষা? বাঙ্গাল[illegible] উদ্বাস্তুদের বাদ দিলেও ত্রিপুরা[illegible] বাঙ্গালীর ভাগ কুড়ি বছরে বেড়ে শতক[illegible] ৪৩ থেকে ৫১ হয়ে গেছে, অথচ ত্রিপুর[illegible] ভাষীর সংখ্যা শতকরা ৩৯ থেকে ক[illegible] ২৪ হয়ে গেছে। তাই মনে হয় ত্রিপু[illegible] বাঙ্গলারই একটি উপভাষা, আগে যাঁ[illegible] নিজেদের ত্রিপুরাভাষী বলতেন এখ[illegible] তাঁদের মধ্যে অনেকে নিজেদের বাঙ্গল[illegible] ভাষী বলছেন।

বাঙ্গলাদেশের বাইরে সবচেয়ে বেশ[illegible] বাঙ্গালী থাকেন বিহারে। এখা[illegible] বাঙ্গালীর সংখ্যা ১৭,৫৯,৭১৯। বিহারে[illegible] যে-সব জেলা পশ্চিমবঙ্গের সংলগ্ন সেই[illegible] গুলিতেই বাঙ্গলীর সংখ্যা বেশী। যেম[illegible] মানভূম সদরে (পুরুলিয়াতে) ৮,০৫,০৬[illegible] ধানবাদে ১,৮৬,০৬৩, সিংহভূমে ২,৬[illegible] ৭৮৫, সাঁওতাল পরগণায় ২,১১,৪৫১ [illegible] পূর্ণিয়াতে ১,৩৩,৩৯১। এইসব জেলা[illegible] বাঙ্গালীর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার যথাক্র[illegible] শতকরা ৫২, ২৫, ১৮, ৯ ও ৫ ভাগ[illegible] মানভূম ও সিংহভূম অঞ্চলে বাঙ্গলাভাষী[illegible] সংখ্যা নিয়ে বিহারের সেন্‌সস্‌ সুপারি[illegible] ন্টেণ্ডেণ্ট বিস্তৃত আলোচনা করেছেন[illegible] তাঁর মতে ধানবাদ জেলাতে যে চার ল[illegible] ছিয়াত্তর হাজার হিন্দীভাষী আছেন, তা[illegible] মধ্যে প্রায় আড়াই লক্ষ লোক বাইরে থেকে[illegible] এসেছেন, কয়লা খনিতে কাজ করবা[illegible] জন্য। এ'দের বাদ দিলে, অর্থাৎ ধান[illegible] বাদের স্থায়ী অধিবাসীদের মধ্যে শতক[illegible] ৪৫ জন বাঙ্গালী।

পুরো মানভূম জেলাতে (পুরুলি[illegible]

নবাদ মিলিয়ে) ১৯৩১ সালে ীর সংখ্যা ছিল শতকরা ৬২ ভাগ। াঁড়িয়েছে শতকরা ৪৪। এর কারণ য়েছে যে, যেমন কিছু হিন্দীভাষী বাইরে থেকে এসে এখানে বাস , তেমনি কিছু বাঙ্গালী এই জেলা আসাম আর বাঙ্গলার চা বাগানে করতে চলে গেছেন। এছাড়া, এই কুর্মী অধিবাসীরা আগের বার মাতৃভাষা বাঙ্গালা বলেছিল। এবার মধ্যে অনেকে নিজের মাতৃভাষা ও দ্বিতীয় ভাষা বাঙ্গালা বলে য়েছে। পুরো মানভূম জেলার বাইশ াশি হাজার লোকের মধ্যে তিন লক্ষ হাজার লোক বাঙ্গালাকে তাদের য় ভাষা বলেছে। সেন্‌সস্‌ সুপারি-ডেণ্টের মতে এই জেলায় যে হিন্দী বলা হয় তা প্রায় বাঙ্গালারই মত, ভাষায় তফাৎ খুঁজে পাওয়া শক্ত। মের কুর্মীরা কি ভাষায় কথা বলে, র কাছে লিঙ্গুইস্টিক সার্ভের লা খণ্ড নেই বলে তুলে দিতে ছ না। মানভূমের সাধারণ প্রচলিত লার নমুনা শ্রীসুনীতিকুমার চট্টো-য়ের 'বাঙ্গালা ভাষাতত্ত্বের ভূমিকা'তে কম দেওয়া আছেঃ—

"ঐ লোকটার বড়ো বেটা তেখ্‌নে ত গেল্‌ছিলো, সে ফির্‌তি সময়ে যখনে াদের ঘরের পাশ হাব্‌ড়ালো, তখ্‌নে -বাজ্‌নার ধুম শুনতে পায়ে একজন শকে পুছলেক্‌ যে এসব কিসের য় হচ্ছে রে? মুনিশটা ব'ল্‌লেক— র ভাই আইছেন্‌ ন, এহাতে তুমার কুটুম খাওয়াছেন, কেন্‌ন উহাকে লায়-ভালোয় পাওয়া গেল্‌ছে।"

কুর্মীদের ভাষা যদি এর কাছাকাছি . তাহলে সে ভাষা হিন্দী নিশ্চয় নয়।

সেন্‌সাস্‌ সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট বলেছেন ঠিক এই ব্যাপার পূর্ণিয়া জেলাতেও য়েছে। ১৯১১ সালে পূর্ণিয়াতে গালীর সংখ্যা ছিল সাত লক্ষ পঞ্চাশ হাজার আর দশ বছর পরে ৯২১ সালে এই সংখ্যা দাঁড়ায় এক লক্ষ ই হাজারে। এর কারণ এই যে, কিষণ-গঞ্জিয়া ভাষা ভাষীরা আগের বার নিজেদের তৃভাষা বাঙ্গলা লিখিয়েছিল কিন্তু ১৯২১ সালে (বিহার আলাদা হয়ে যাবার পর) তারা তাদের ভাষাকে হিন্দী বলে।

সন্দেহ হয় যে, এই সব জেলার অধি-বাসীরা বাঙ্গালা আর হিন্দীর পার্থক্য জানে তো, কারণ সত্যিকারের হিন্দীভাষা অর্থাৎ যে ভাষা সিনেমাতে ব্যবহার করা হয় বা যাতে রেডিওতে খবর বলা হয়, সে ভাষা বিহারে কোথাও চলিত নয়। বিহারে চারটি ভাষা প্রচলিত আছেঃ মৈথিলী, মগহী, ভোজপুরী ও বাঙ্গালা। গ্রীয়রসন বলেছিলেন যে, এই চারটি ভাষা এত পরস্পর ঘনিষ্ঠ যে, এক ব্যাকরণেই চারটি ভাষার কাজ চলে যেতে পারে। পরে অবশ্য শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে, ভোজপুরী ভাষা মগহী-মৈথিলী থেকে আলাদা। যদি তাই হয়, তাহলে শুধু ভোজপুরীকেই হিন্দী'র মধ্যে ধরা যেতে পারে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, ১৮৯১ সাল থেকে এই তিনটি ভাষাকেই এক সঙ্গে ব্র্যাকেট করে হিন্দী বলে গণনা করা হচ্ছে।

মানভূমে হিন্দীভাষীর সংখ্যা বেড়ে যাবার আরও একটি কারণ বলা হয়েছে। আগে এই জেলাতে একটিও হিন্দী স্কুল ছিল না। গত দশ এগার বছরের মধ্যে এখানে সব পুরাতন স্কুলগুলিতে হিন্দী শেখাবার ব্যবস্থা হয়েছে ও তাছাড়া হিন্দী শেখাবার জন্য প্রায় ৯০০টি নতুন স্কুল খোলা হয়েছে। বিহারের সেন্‌সাস্‌ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের মতে এই জেলাতে হিন্দীভাষীর সংখ্যা বেড়ে যাবার পরোক্ষ-ভাবে এও একটা কারণ।

পুরুলিয়া ও ধানবাদে বাইরে থেকে যেসব হিন্দীভাষী শ্রমিক এসেছেন তাঁদের ছাড়া কতজনের মাতৃভাষা বাঙ্গালা বা হিন্দী জানবার উপায় নেই।

উড়িষ্যাতে বাঙ্গালী বেশী নেই, মাত্র ছিয়াশি হাজার। এ'দের মধ্যে অধিকাংশই আছেন এই কয়টি জেলাতে—কটকে ১৭,২৬৬, বালাসোরে ১৭,৯৮৩, ময়ুর-ভঞ্জে ১৯,৪০০, কিওনঝাড়ে ১১,০৭৭ আর পুরীতে ৬,১৯৬। উড়িষ্যাতে হাজারকরা মাত্র ছয়জন বাঙ্গালী।

আন্দামান নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ১৯৫১ সালে ২,৩৬৩ জন বাঙ্গালী ছিলেন। ১৯৩১ সালে এই সংখ্যা ছিল ১,১৭১। বাঙ্গালীর সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে

যাবার কারণ এই যে, ওখানে অনেক উদ্বাস্তু এখন গিয়ে বাস করছেন।

৪

বিভিন্ন রাজ্যে বাঙ্গালীর সংখ্যা সম্বন্ধে এই হ'ল একটা মোটামুটি বিচার। এছাড়া, কত লোক বাঙ্গালাকে দ্বিতীয় ভাষা বলেছেন সে বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে।

১৯৫১ সালের জনগণনার সময়ে প্রত্যেক ব্যক্তির দ্বিতীয় ভাষা জানবার জন্য জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সে মাতৃভাষা ছাড়া অন্য কোন ভারতীয় ভাষা সাধারণত ব্যবহার করে কিনা। প্রশ্নটির মধ্যে তিনটি জিনিস লক্ষ্যণীয়। প্রশ্নটি শুধু ভারতীয় ভাষা সম্পর্কে, অর্থাৎ কেউ যদি মাতৃভাষা ছাড়া সাধারণত ইংরাজি ভাষার ব্যবহার করে তাহলে এই প্রশ্নের কোন জবাব লেখা হবে না। আর এই দ্বিতীয় ভারতীয় ভাষা শুধু জানলেই হবে না, এটিকে সাধারণত ব্যবহার করা চাই। তাছাড়া, একটির বেশী ভাষার নাম এই প্রশ্নের উত্তরে লেখান চলবে না। প্রশ্নটির উদ্দেশ্য বোধহয় ছিল রাষ্ট্রভাষা হিন্দী কতজন ব্যবহার করেন তার সংখ্যা নিরূপণ করা। বোম্বাই রাজ্যের সেন্সাস্ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট স্পষ্টই সেকথা বলেছেন। এই রাজ্যে মারাঠী, গুজরাটী ও কানাড়ী তিনটি ভাষাই অধিবাসীদের মাতৃভাষা হবার দরুণ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবেও ঐ তিনটিই অধিক প্রচলিত। তাই বোম্বাই রাজ্যে কতজন হিন্দী জানেন তা এই প্রশ্নের সাহায্যে জানা যায়নি। অবশ্য অনেকেই প্রশ্নটি অন্য অর্থে নিয়েছেন, অর্থাৎ অনেকে যাঁরা অন্য ভারতীয় ভাষা ব্যবহার করেন না, তবে জানেন, তাঁরাও সেই ভাষার নাম করেছেন। যেমন, কলিকাতায় চুয়ান্ন হাজার বাঙ্গালী হিন্দীকে তাঁদের দ্বিতীয় ভাষা বলে লিখিয়েছেন। আমার ধারণা কলিকাতায় যে সব লোক বড়বাজার অঞ্চলে ব্যবসা বা চাকরি করেন, তাঁরা ছাড়া অন্যরা হিন্দী বেশী ব্যবহার করেন না—এক ট্রামে বাসে একঠো দোটো টিকিট কেনা ছাড়া। তাই এ'দের মধ্যে অনেকেই এমন আছেন যাঁরা হিন্দী দ্বিতীয় ভাষা বলতে এই কথা বোঝাতে চেয়েছেন যে, তাঁরা হিন্দী জানেন।

পূর্বভারতের বাইরে যে সব লোক নিজেদের দ্বিতীয় ভাষা বাঙ্গালা বলেছেন তাঁদের বেলাতেও একথাটা খাটবে—কারণ এসব দেশে সাধারণ কাজে কর্মে কেউ বাঙ্গালা ব্যবহার করেন নাঃ বাঙ্গালী বাড়িতে চাকরদের সঙ্গেও লোকে সেই দেশীয় ভাষায় কথা বলেন। তাই পূর্ব-ভারতের বাইরে যে সব লোক বাঙ্গালাকে দ্বিতীয় ভাষা বলে লিখিয়েছেন, তাঁরা বলতে চেয়েছেন যে, তাঁরা বাঙ্গালা ভাষা জানেন। যে সব সংখ্যা যোগাড় হয়েছে সেগুলি কিন্তু সন্দেহজনক। উত্তর প্রদেশে ফতেপুর জেলাতে বাঙ্গালীর সংখ্যা মাত্র বাইশ, অথচ এই জেলায় বাঙ্গালা যাঁদের দ্বিতীয় ভাষা তাঁদের সংখ্যা ৫৮১। কোন সন্দেহ নেই যে, এই সংখ্যা ভুল। কান-পুরে ১৩১৫ জন বাঙ্গালাকে তাঁদের দ্বিতীয় ভাষা বলেছেন, আর কাশীতে যেখানে বহু বাঙ্গালী থাকার দরুণ ও তীর্থযাত্রীদের যাতায়াতের দরুণ অনেককেই বাঙ্গালা জানতে হয়, সেখানে বাঙ্গালাকে দ্বিতীয় ভাষা বলেছেন দুশ জনেরও কম লোক। এইসব সংখ্যা অর্থ-হীন, এদের নিয়ে কোনরকমের আলোচনা করা চলে না।

দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে বাঙ্গালার ব্যবহার যথার্থভাবে আছে শুধু পূর্ব-ভারতে। যেখানে সাধারণ লোকের ব্যবহৃত ভাষা বাঙ্গালা সেখানেই অবাঙ্গালীকেও বাঙ্গালা ব্যবহার করতে হয়। বিহারে চার লক্ষ একুশ হাজার হিন্দীভাষী ও দু লক্ষ সাঁওতালীভাষী নিজেদের দ্বিতীয় ভাষা বাঙ্গালা বলে লিখিয়েছেন। আসামে পঞ্চাশ লক্ষ অসমীয়াভাষীর মধ্যে তিন লক্ষ আশি হাজারের দ্বিতীয় ভাষা বাঙ্গালা। উড়িষ্যাতে এক কোটি কুড়ি লক্ষ ওড়িয়া-ভাষীর মধ্যে কিন্তু মাত্র আঠারো হাজারের দ্বিতীয় ভাষা বাঙ্গালা। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ষোল লক্ষ হিন্দীভাষীর মধ্যে আড়াই লক্ষ লোকের দ্বিতীয় ভ বাঙ্গালা। সাঁওতালীভাষীদের মধ্যে বি অনেক লোক বাঙ্গালা ব্যবহার করে পশ্চিমবঙ্গের ছয় লক্ষ চৌষট্টি হাজ সাঁওতালীভাষীর মধ্যে প্রায় সাড়ে বি লক্ষ লোকের দ্বিতীয় ভাষা বাঙ্গালা।

৫

বাঙ্গালী ও বাঙ্গালাভাষী কো আছেন এই কথা আলোচনার বঙ্গালী কোন কোন জায়গায় নেই ত দেখা যাক। অনেকের ধারণা, কামচাট থেকে টিম্বক্টু অবধি সব জায়গাতেই শি সিন্ধী আর বাঙ্গালী পাওয়া যায়। ধারণা অন্তত বাঙ্গালীর বেলায় যে স নয়, তা এই বইতে দেওয়া সংখ্যাগু দেখে জানলাম। ভারতের অনেক জেলাতে ১৯৫১ সালে কোন বাঙ্গালী ছিলেন ন আসামে সতরটির মধ্যে একটি জেল নাগা উপজাতীয় অঞ্চল: মহীশূ বারটির মধ্যে তিনটি জেলা মাণ্ড্য, হস ও চিকমাগালুর; হায়দ্রাবাদে ষোলটি মধ্যে দুইটি জেলা ওসমানাবাদ ও মহবু নগর; মধ্যভারতে ষোলটির মধ্যে এক জেলা ঝবুয়া; বিন্ধ্যপ্রদেশে আটটির ম দুইটি জেলা টিকমগড় ও সিধি; পাঞ্জা তেরটির মধ্যে দুইটি জেলা লুধিয়ানা গুরুদাসপুর; পেপসুতে আটটির মধ্যে পাঁচটি জেলা বর্ণালা, কপুরথলা, ফতেগড় সাহেব, মোহিন্দরগড় ও কোহিস্তান হিমাচলপ্রদেশে চারটির মধ্যে একটি জেল সিরমুর; বিলাসপুর রাজ্যে রাজস্থানে পঁচিশটির মধ্যে ছয়টি জেলা টোঁক আলোয়র, গঙ্গানগর, বাড়মের (এখন আছে সাতজন), জালোর ও চিত্তোরগড় ভূপালে দুইটির মধ্যে একটি জেলা রায় সেন; ও বোম্বাই রাজ্যে আঠাশটির মধ্যে একটি জেলা ডঙ্গস; এই ছাব্বিশটি জেলাতে ১৯৫১ সালের মার্চ মাসে কোন বাঙ্গালী ছিলেন না। ত্রিবাঙ্কুর-কোচিন রাজ্যের চারটি জেলার মধ্যে কোনটিতে বাঙ্গালী ছিলেন কিনা, এই বইতে দেওয় নেই। যদি ধরে নেওয়া যায় যে, এই রাজ্যে মোটেই বাঙ্গালী ছিলেন না তাহলে ভারতের ৩০৯টির মধ্যে ৩০টি জেলা এ সময় বাঙ্গালীহীন ছিল।

ল্প সংকলন

স্ব-নির্বাচিত গল্প। অচিন্ত্যকুমার নগুপ্ত। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড বলিশিং কোং লিঃ; ৯৩ হ্যারিসন রোড, ‌কাতা। দাম ৪৲ টাকা।

ক্ষেত্রকর্ষণ ও বীজ বপনের পরও ভবনীয় ফসলসম্ভার উত্তরাধিকারীদের তে তুলে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বাংলা ছোটগল্পের মানা থেকে সরে দাঁড়ান। পরবর্তীরা ভাবতই এ ধনে ধনী এবং ঋণী। আর ংসংশয়ে এ'দের কয়েকজন যোগ্য উত্তরাধি-রীর মত বাংলা ছোট গল্পকে নানা ঐশ্বর্যে দ্ধতর করেছেন, করছেন। অচিন্ত্যকুমার অল্প কয়েকজনের অনাতম। কাজেই তাঁর -নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ বাঙালী পাঠকের গ্রহের বিষয় হবে, এ অনুমান করা চলে।

চৌদ্দটি গল্প নিয়ে অচিন্ত্যকুমারের নির্বাচিত গল্প সংগ্রহ। এর মধ্যে তাঁর থম দিককার রচনা স্থান পেয়েছে এবং রবর্তী সময়েরও। তাঁর কয়েকটি উৎকৃষ্ট নাও সংকলিত হয়েছে এ গ্রন্থে, যেমন তি', 'গার্ড সাহেব', 'চিতা', 'গঙ্গাযাত্রা', দোলনা' ইত্যাদি।

ছোটগল্পে অচিন্ত্যকুমারের বৈশিষ্ট্য ধানত বিষয়বস্তু এবং ভাষাসজ্জার ওপর র্ভর। বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের ওপর তাঁর াঁক যত, অচিন্ত্য-সমসাময়িকদের মধ্যে টো আর কারুর ছিল এমন মনে হয় না। র ছোটগল্পে বিচিত্র ও নব নব বিষয়বস্তুর কটি বিশেষ আবেদন আছেই। নতুন বিষয়-স্তুর মধ্যেও অচিন্ত্যকুমারের স্বাভাবিক াকর্ষণ তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে। তাঁর হু উল্লেখযোগ্য গল্প ডোম, মেথর, মুচী, মা প্রভৃতির জীবন ও জীবনযাত্রা অবলম্বন রে রচিত। বলা বাহুল্য এ ধরনের বিষয়বস্তু াঁর অভিজ্ঞতার পরিধি সম্পর্কে কৌতূহল াগায়।

অচিন্ত্যকুমারের ভাষা একদা বাংলা াট গল্পের আদর্শ হয়ে উঠতে বসেছিল। রণ এই ভাষার আকর্ষণ ছিল দ্বিবিধ। ক, অতি মাত্রায় গতিশীল; দ্বিতীয়ত, প্রতিভ। পরন্তু কঠিন গদ্য নিগড়ে থেকেও াব্যগুণ বিবর্জিত ছিল না। বলা হয়ত অন্যায় বে না, ইদানীংকার গল্প লেখকদের মধ্যে সে াষার প্রভাব থাকলেও কালক্রমে তা পরি-র্জিত, পরিশুদ্ধ। কারণ অচিন্ত্যকুমারের ল্পের ভাষা একাধিক গুণ সত্ত্বেও অসংযত। ধ্যেই শ্রুতিমধুর শব্দ যোজনার ফলে কিছু ত্রিম হতে বসেছিল এবং ছোট গল্পের পক্ষে াষার কৃত্রিম জলুস কাহিনীর সাবলীল াতিকে ব্যাহত করতে চলেছিল পদে পদে।

অচিন্ত্যকুমার এই কৃত্রিমতা শুধু ভাষাতেই ীমাবদ্ধ রাখেননি। পরবর্তীকালে তাঁর বহু ল্পের বিষয়বস্তুর মধ্যেও সেই কৃত্রিমতা সংক্রামিত করেছিলেন। নিম্নশ্রেণীদের জীবন ও

জীবনযাত্রা উপজীব্য করে যতগুলি গল্প তিনি রচনা করেছেন তার মধ্যে রস সম্পূর্ণতায় কয়েকটিই শুধু বাংলা সাহিত্যে সর্বকালীন হয়ে থাকল। এ-সব গল্পের ছত্রে ছত্রে আমাদের অপরিচিত মানুষ ও তাদের জীবন-যাত্রার তথ্য থৈ থৈ করছে কিন্তু একটি গোটা মানুষের আংশিক হৃদয়কেও এতে স্পর্শ করা যায় না। বৈচিত্র্যের বিলাসে মেতে তিনি বিস্তীর্ণ হয়েছেন হয়ত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে কিন্তু দুঃখের কথা রসবিচ্যুতি ঘটিয়েছেন।

অথচ অচিন্ত্যকুমার সার্থক ছোট গল্পাকারের দৃষ্টি ও দিব্যপ্রতিভা নিয়ে বাংলা সাহিত্যে এসেছিলেন। তাঁর ছোট গল্প বাংলা গল্প-সাহিত্যের বিবর্তন ছোট ইতিহাসে বহুবার উল্লেখিত না হয়ে যাবার নয়। আর এও সত্যি অনন্যসাধারণ রসসমৃদ্ধ ছোট গল্প তাঁর কিছু কম নেই।

স্ব-নির্বাচিত গল্প সংগ্রহে অন্তত অচিন্ত্যকুমার যোগ্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন এই সান্ত্বনা। 'ইতি' 'গার্ড সাহেব' 'সারেঙ' 'চিতা' 'গঙ্গাযাত্রা' প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর গল্পগুলি পড়তে পড়তে আজও অসীম ক্ষমতাশালী অচিন্ত্যকুমারকে আবার নতুন করে বাংলা ছোট গল্পের আসরে ফিরে পেতে ইচ্ছে হয়। 'ডাউন দিল্লী এক্সপ্রেস' একদা রোমাণ্টিক রচনা হিসেবে বাঙালী পাঠকের খুবই প্রিয় ছিল। পড়তে এখনও ভাল লাগে। 'দোলনা' 'যশোমতী' ইত্যাদি গল্প উপভোগ্য।

শেষ কথা, অচিন্ত্যকুমারের স্ব-নির্বাচিত গল্প সংকলনটি ছোট গল্প পড়ুয়াদের ব্যক্তিগত সংগ্রহ হবার যোগ্য। জনপ্রিয় অচিন্ত্যকুমার সেখানে অনুপস্থিত হলেও শিল্পী অচিন্ত্য-কুমার স্বকীর্তিতে ভাস্বর হয়ে রয়েছেন। বইয়ের ছাপা, বাঁধাই চমৎকার। (৪০৬।৬৪)

ভ্রমণ কাহিনী

নদীপথেঃ—অতুলচন্দ্র গুপ্ত প্রণীত, প্রকাশক—বিশ্বভারতী, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

চিঠি যখন লেখকের অজ্ঞাতসারে সাহিত্য হয়ে ওঠে, তখন তার মধ্যে লেখককে যেমন সহজ ও অন্তরঙ্গভাবে পাওয়া যায়, অন্য গদ্য রচনার মধ্যে রচয়িতাকে তেমন করে পাওয়া কঠিন। বিশেষ ক'রে পারিবারিক ব্যক্তি-গত চিঠিতে মানুষ তার সহজ অনুভূতিকে সবচেয়ে নির্ভরশীলরূপে নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ করে। তাই শ্রদ্ধেয় অতুলচন্দ্র গুপ্ত তাঁর জল-পথ ভ্রমণের অনতিবিস্তৃত এই বিবরণটুকু কয়েকটি চিঠির মধ্য দিয়ে 'নদীপথে' বইটিতে যেরূপ সহজ, সাদাসিধে ও অন্তরঙ্গভাবে পরিবেশন করেছেন, সেরূপ লঘু উপভোগ্য রচনা প্রবন্ধসাহিত্যে বিরল।

পরপর তিন বড়দিনের ছুটিতে স্টিমারে চড়ে বাংলা ও আসামের নদীতে নদীতে

দেশান্তরের নারী

সাধনা বিশ্বাস, দাম—দুই টাকা

"......উপন্যাসের চাইতেও মধুর ও মনোরম হয়েছে সত্য চিত্রগুলি......" —**শ্রীসজনী-কান্ত দাস।** "......প্রত্যেকটি চরিত্রই মনকে একবার নাড়া দিয়ে যায়।......বহুদিন আগে "পথে প্রবাসে" প্রথম পড়ে যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম "'দেশান্তরের নারী" পড়ে তেমনি আনন্দ পেলাম......" —**আশাপূর্ণা দেবী।** "......সাধারণ ও অসাধারণ উভয় শ্রেণীর নারীর মধ্য দিয়াই ইউরোপীয় সমাজ-জীবনের যে রূপটি ফুটিয়া উঠিয়াছে, তাহা মমতা ও কল্যাণের আলোয় উদ্ভাসিত অপরূপ রূপ। লেখিকার ভাষা প্রাঞ্জল, পরিচ্ছন্ন, চিত্তবৃত্তি উদার......" —**যুগান্তর।** "......নারীর বাহিরের খোলসটা যাহাই হউক ভিতরটা যে দেশ-কালের নাগালে আসে না লেখিকা জীবন্ত দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা প্রমাণ করিয়াছেন......" —**লোকসেবক।**

"......ইউরোপের জৌলুষের আড়ালে যে বেদনা, সংগ্রাম, স্নেহ-মমতা লুকিয়ে আছে ....লেখিকা তা...দরদের সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন।" —আনন্দবাজার

এশিয়া পাবলিশিং কোং
১৬।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা
(জুবিলী রেডিও কার্যালয়)

বেড়াবার সময় অতুলবাবু বাড়িতে যে-সব চিঠি লিখেছিলেন, 'নদীপথে' বইটিতে তারই কয়েকটি সংকলিত হয়েছে। পরিপূর্ণ অবকাশযাপন কালে এই চিঠিগুলি লেখা হয়েছিল, যখন শুধু চোখ আর মন মেলে আলস্যযাপনই ছিল লেখকের কাজ। কয়েকটি চিঠির মধ্য দিয়ে লেখক তাঁর সেই আলস্যযাপনের উপভোগকে বাড়িতে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন এবং এমনি নিপুণভাবে তাঁর মুডটি পাঠকের মনে সঞ্চারিত করতে পেরেছেন যে, মন সহজেই উদাস হয়ে ওঠে। জলপথে ভেসে চলতে চলতে প্রবহমান অজস্র দৃশ্যের সারি আর কাছের থেকে দূরের থেকে দেখা কতকগুলো লোককে লেখক অনন্যকর্মমনে ফটোগ্রাফের ছবির মত তুলে নিয়েছেন, আর তাঁর চিঠিতে সেই ছবিগুলি ছায়াছবির মত বিচিত্রতার মোহ নিয়ে ভেসে চলেছে। কোনো কিছু দেখে এসে সেই দেখাকে অপরের চোখে ফুটিয়ে তোলা এবং তার উপভোগ ও তৃপ্তিকে অপরের মনে সঞ্চারিত করা যে-কোনো লেখকের পক্ষেই একটা মহৎ কৃতিত্ব। অতুলবাবু কোনোরূপ লক্ষণীয় চেষ্টা ছাড়াই কীরূপ অবলীলাক্রমে সে দুরূহ কৃতিত্বে সহজ সাফল্যের পরিচয় দিয়েছেন দেখে বিস্মিত হতে হয়। এই রচনাগুলির ভাষা ও বর্ণনায় এমন একটি সহজ অন্তরঙ্গতা আছে যে, অলস প্রবহমান মনের বিলাসী 'মুড'টি পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়, জোলো জোলো আবহাওয়াটা মনের আকাশকে স্পর্শ ও আর্দ্র করে; মন স্মৃতিপীড়িত হয়। বইটির রচনা-রীতিতে প্রবন্ধের গুরুত্ব স্বভাবতই অনুপস্থিত। স্টাইলটি সহজ, সরল ও মন্থর, ভঙ্গিটি ঘরোয়া। এই অসাধারণরূপে সহজ ও সাধারণ করে লেখা চিঠি কটি পড়তে পড়তে সংসারের তাড়াহুড়ো কিছুক্ষণের জন্য বেশ ভুলে যাওয়া যায়। মন্থরগতি স্টিমারের মতই এমন অনেক চেনা ও আধা-চেনা দৃশ্য ভেসে চলে যা আমাদের মনের তলা পর্যন্ত কাঁপিয়ে দেয়।

কত সূক্ষ্মভাবে কত খুঁটিনাটিই না অতুলবাবু দেখেছেন। আর কতই বা এঁকেছেন তাঁদের রেখাচিত্র। 'বাদামি রঙের ফাঁকা মাঠ; গোরু চরছে। মাঝে চৌকো সরষে ক্ষেত, হরিত-কাঁপিশ—সব ফুল এখনও ফোটেনি। একটু পর পরই লোকালয়; খোড়ো ঘর, ঢেউ তোলা টিনের ঘর—আম, নারকেল, কলাগাছে ঘেরা। ক্বচিৎ একটা পাকাবাড়ি, সম্ভব জমিদারবাবুদের। স্নানের ঘাটে লোকের ভিড়; পাড়ের উপর ছাগলছানা লাফাচ্ছে। কোথাও নদীর ধারে হাটের জায়গা; বেড়াহীন ছোটো ছোটো টিনের চালা, গোটাকয়েক টিনের চাল টিনের বেড়ার ঘর—স্থায়ী দোকান ও মহাজনদের গুদাম। উজান ভাটিতে নৌকা চলেছে নানা ধরনের—পাল তুলে, দাঁড় টেনে, লগি ঠেলে।'

আবার, 'সামনে রাস্তার ওপারেই একটা বড়ো ধানক্ষেত। ধান পেকেছে, এখনও কাটা হয়নি। তারপর নদী। নৌকার চলমান পাল দেখা যাচ্ছে। ওপারের সুপারি নারকেল বনের নীচ দিয়ে চলন্ত বড়ো নৌকার ছই দেখতে পাচ্ছি। উত্তর দিকটায় নদীর জল অনেকটা দেখা যাচ্ছে। রৌদ্রে গলা ইস্পাতের মতো ঝকঝক করছে।...ডাকবাংলার সামনের ছোটো মাঠটায় দুটি খঞ্জন নেচে বেড়াচ্ছে। রোগা একটা বাছুর ঘাস খাচ্ছে। সামনে রাস্তার পাশে চারটে ঝাউ গাছ। একটার গা ঘেঁষে এক খেজুর গাছ; হাঁড়ি বাঁধা রয়েছে। একটা কাক হাঁড়ির মুখে গলা ঢুকিয়ে রসাকর্ষণের বৃথা চেষ্টা করছে।' এসব বর্ণনা পড়ে কোন্ বাঙালীর চিত্ত স্মরণ-পীড়নে অন্যমনা না হয়! এই সব নৈসর্গিক ছবির চেয়েও আরো বিস্ময়কর হচ্ছে লেখকের ক্ষণপরিচিত লোকগুলির রেখালেখ্য। দুটি চারটি রেখায় কী করে একটা মানুষকে জীবন্ত করে তোলা যায়; সে-কৌশল কথাসাহিত্যিকের মতই অতুলবাবুর সহজায়ত্ত বলে মনে হোল। নইলে সারেং রহমত আলি, রোজাভাঙা খালাসীর দল, ফ্ল্যাটের কেরানি হরবোলা হেমেন্দ্রমোহন রায় আর তেজপুরের উন্নাসিক ট্যাক্সিওয়ালা সবাইকে এত প্রাণবান মনে হোত না।

অতুলবাবুর ভ্রমণের পরিসরটি বড় নয়। বাংলা ও আসামের কয়েকটি নদীনালা মাত্র। ভ্রমণকালও দীর্ঘ নয়। কিন্তু তারই বর্ণনাটুকু লেখার গুণে একটি উপভোগ্য ভ্রমণ কাহিনীতে পরিণত। অথবা 'নদীপথে' বইটিকে ভ্রমণ বিবরণ না বলে রম্য-রচনা নামে অভিহিত করাই বোধ হয় সংগত। কারণ সহজ করে লেখা ঘরোয়া কথাবার্তা যে কত রম্য ও রমণীয় সাহিত্য হয়ে উঠতে পারে, বইটি তার একটি দৃষ্টান্ত। অবকাশ-রঞ্জনের সংগী হিসেবে লঘু স্বাদু ও হৃদ্য এই বইখানি যে-কোনো পাঠককেই মুগ্ধ করবে বলে আমার বিশ্বাস। অতুলবাবু বাংলা দেশের শীর্ষস্থানীয় সমালোচক। তাঁর হাতের এই সহজ রচনার ভঙ্গিটি তাই দ্বিগুণ বিস্ময়কর। আর এ বইটিতে এই কথাই প্রমাণ হয় যে, যিনি রসজ্ঞ তিনি সাহিত্যের থেকে যেমন সহজে রস আহরণ করতে পারেন, চলমান জীবনের স্রোত থেকে রস আহরণও তাঁর তেমনি সহজায়ত্ত। বইটি যে আমার মত আরো অনেকেরই খুব ভালো লেগেছে, তার প্রমাণ বইটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশ। এবারে বৃহত্তর পাঠক-গোষ্ঠী এর স্বাদ গ্রহণের সুযোগ পেল।

এই সংস্করণের আরো একটি আকর্ষণ, শিল্পী পরিতোষ সেনের আঁকা কয়েকটি রেখাচিত্র—যা অতি নিপুণ কৌশলে গ্রন্থকারের দেখা সেই জোলো আবহাওয়াটি পাঠকের সামনে উপস্থিত করে। বইটির ছাপা ও অঙ্গসজ্জাও চমৎকার।

West to-day: By Dr. Profulla Chandra Ghosh. Asia Publishing Company, 16/1, Shyamacharan De St., Calcutta—12. Price—Rs. Seven.

যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপ এবং আমেরিকার নবঅভ্যুদয়ের পরিচয় লাভের জন্য শ্রীযুত প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ পশ্চিম সফরে গিয়েছিলেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল প্রধানত পশ্চিম তার জনগণের কল্যাণের জন্য যে কাজ করেছে তার দিকে। এই সঙ্গে পশ্চিমের বিজ্ঞান, শিক্ষা, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক বিভিন্ন পরিকল্পনার কর্মক্ষমতা তিনি বিশেষভাবে দেখে এসেছেন। তাঁর দেখা শুধু ভ্রমণকারীর দেখা নয়। ভারতের স্বাধীনতার পর দেশ-গঠনের যে কর্তব্য রয়েছে, সেই কর্তব্য লেখকের মনে সদাজাগ্রত। তাই পশ্চিমের দেশগঠনের কাজ, ভারতকে কীভাবে সাহায্য করতে পারে, একথা তিনি আলোচনা করেছেন।

পশ্চিমের এই জাতিগঠনের কাজ তিনি দেখেছেন মুক্তদৃষ্টিতে। কোনও রাজনৈতিক বা জাতীয়তার মোহ তাঁকে বাধা দেয়নি। তাই পশ্চিম জার্মেনী, আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও যেখানে যা কিছু প্রশংসনীয় কাজ হচ্ছে, তার উল্লেখ করেছেন।

বইটির আরেকটি দিক দিয়েও মূল্য আছে। পশ্চিমের আজকের দিনের কয়েকজন বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিক, শিক্ষাবিদ, চিন্তাশীল ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর সাক্ষাতের বিবরণ দিয়েছেন। আইনস্টাইন, অটোহান, কিলপ্যাট্রিক, কেন্ডাল প্রভৃতির পরিচয় সাধারণ পাঠকের আগে জানা থাকলেও, অনেক নতুন নাম ও ব্যক্তির সঙ্গেও সাধারণ পাঠকের পরিচয় ঘটবে।

বইটি ভূমিকা নিয়ে আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এর মধ্যে নয়টি দেশের পরিচয় আছে। দৃশ্যসজ্জা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

৫১৫।৫৪

ছোট গল্প

আসর—অনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়। নিউ এজ পাবলিশার্স লিমিটেড, ১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা। দু' টাকা আট আনা।

বারটি ছোট গল্পের সংকলন। বাংলা ছোট গল্পের গুণমান 'অতি উঁচুদরের। তার মধ্যেও সংকলনটির সার্থকতা প্রমাণ হয়েছে। বইটির প্রথম গল্পে 'দর্পণ'এ একটি ছোট ঘরে আবদ্ধ সুজিত বাইরের জগতের বিচিত্র ঘটনার প্রতিফলন দেখল তার ঘরের দেওয়াল আয়নায়। পুরো ঘটনাটা আয়নায় প্রতিফলিত না হলেও, যেটুকু ধরা পড়ল, তাতেই সবটুকুর পরিচয় পাওয়া গেল। ছোট গল্পের দৃষ্টিভঙ্গীও অনেকটা এই ধরনের। অল্প ছবিতে বৃহৎ জীবনের পরিচয়দান। 'পেপার ওয়েটে'র অফিসরবাবু; 'অভিনয়ে'র শ্বশুর-শাশুড়ী, পুত্র-পুত্রবধূর বিচিত্র অভিনয়; 'পুতুল নাচে'র ধর্মঘটে পরাজিত মিলকর্মীর তারা গোণা, 'রতিকান্ত টী-স্টলে'র নির্মম ট্র্যাজেডি ইত্যাদি, এক বহু বিচিত্র জীবনযাত্রার কথা বলছে। 'রতিকান্ত টী-স্টল' গল্পটি প্রথম শ্রেণীর। লেখকের কল্পনার বলিষ্ঠতা, এবং দৃষ্টিশক্তির তীব্র স্বচ্ছতা পূর্ববঙ্গ আগত উদ্বাস্তুদের জীবনের এক ভাবালুতামুক্ত ছবি দিয়েছে। তাদের জীবন-যাত্রার নিষ্ঠুর সংগ্রামের কথা প্রকাশ করেছে। মানুষ তার প্রবৃত্তির তাড়নায় কত অদ্ভুত কাজই যে করতে পারে তা দেখা যাবে এই গল্পটিতে।

শ্রীঅনন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের এইটিই হয়ত প্রথম ভাল বই। পরিচয়পত্র। পাঠকরা এই পরিচয়পত্রে খুশী হবেন, সন্দেহ নেই।

৫১৮।৫৪

কাহিনী

উন্মেষ—বীরেশ্বর বসু। ইস্ট এণ্ড কোম্পানী, ৫২, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা—৯। আড়াই টাকা।

'ইন্দ্রপুর-টি-এস্টেটের' কর্মচারী সুবোধের জীবনে চা-বাগানের প্রাকৃতিক পরিবেশ ও শ্রমিক জাগরণের আবশ্যিকতাবোধ থেকে শুরু করে একটি সরল কাহিনীকে বীরেশ্বরবাবু ক্রমশ জটিল করে তুলেছেন নতুন নতুন চরিত্র ও ঘটনার সংযোগ-সমাবেশে। সন্ধ্যা, অনিলা, সুবোধ, সুশান্ত ও রঙটু—প্রধানত এই পাঁচটি চরিত্রই অল্পবিস্তর প্রশংসার যোগ্য। লেখকের প্রথম রচনা হলেও 'উন্মেষ' কাহিনী হিসাবে সুখপাঠ্য।

জীবনী

শ্রীশ্রীচরিত মাধুরী—প্রথম খণ্ড। শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য শাস্ত্রী সংকলিত। শ্রীশ্রীনিতাইগৌরাঙ্গ ট্রাস্ট স্টেট কর্তৃক শ্রীপাঠবাড়ী আশ্রম, বরাহনগর, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত। মূল্য—৩, টাকা।

শ্রীমৎ রামদাস বাবাজী মহারাজের বিস্তৃত জীবনী এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। বরাহ-নগর পাঠবাড়ী ট্রাস্ট বোর্ডের উদ্যোগে পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য শাস্ত্রী মহাশয় কর্তৃক বাবাজী মহারাজের বিস্তৃত জীবনী সংকলিত হইয়া খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশের ব্যবস্থা হইয়াছে। এই বিস্তৃত জীবনীর প্রথম খণ্ড আলোচ্য গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া আমরা পরম প্রীতি লাভ করিয়াছি। গ্রন্থকার শাস্ত্রী মহাশয় বাল্যকাল হইতে শ্রীশ্রীবাবাজী মহারাজের সঙ্গলাভে সৌভাগ্য-বান্। বাবাজী মহারাজের জীবনের অনেক ঘটনা তিনি অবগত আছেন। শ্রীমৎ রামদাসের মুখে শ্রুত দৈনন্দিন ঘটনাগুলি তিনি ডায়েরী করিয়া রাখিয়াছিলেন। প্রধানত তাহাই অবলম্বন করিয়া জীবনী প্রকাশে তিনি প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাবাজী মহারাজের ন্যায় মহামানবের জীবনী সম্যক্‌ভাবে রচনা করা সম্ভব নহে; কারণ এমন দিব্যজীবনের পরম মাধুর্যবীর্য ভাবগ্রাহ্য বস্তু। ফলত আমাদের বিচারের মধ্যে তাহা আসে না, তথাপি এমন জীবনের যেটুকু স্পর্শ আমরা অন্তরে লাভ করিতে পারি তাহাও পূর্ণ এবং তাহাতেই আমরা ধন্য।

আলোচ্য প্রথম খণ্ডে বাবাজী মহারাজের বাল্য এবং কিশোর-লীলা আবির্ভাব হইতে গৃহত্যাগ পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকারের ভাষা সহজ এবং সুমধুর, সাবলীল ভঙ্গীতে

তাহা আগোড়া বাহিয়া চলিয়াছে। বাবাজী মহারাজের শৈশব-জীবন হইতে ভগবৎ-প্রীতির উন্মেষ, তাঁহার আদর্শনিষ্ঠা, আত্মীয়স্বজনগণের প্রতিবন্ধকতা, নিগ্রহ-নির্যাতন উপেক্ষা করিয়া সাধনার পথে অগ্রগতি, জননী সত্যভামা দেবীর-বাৎসল্যের মধুময় প্রতিবেশে সুন্দর পরিস্ফুট হইয়াছে। শ্রীশ্রীপ্রভু জগদ্বন্ধুর সঙ্গলাভ হইতে শ্রীরামদাসের জীবন-লীলায় প্রেমোদ্দীপ্ত উজ্জ্বল অধ্যায়ের সূচনা। প্রভু জগদ্বন্ধুর সহিত বাবাজী মহারাজের মিলনের মাধুর্য বিস্তারে গ্রন্থকার অপূর্ব কৃতিত্ব পরিদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর-রস এখানে উচ্ছল হইয়া উঠিয়াছে এবং লেখনীর চাতুরীতে চমক খেলিয়াছে। এই অংশ পড়িতে পড়িতে দিব্য প্রেমের পরিবেশের উন্মেষে মন আবিষ্ট হয়। পরিব্রাজকাচার্য শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ স্বামী, বৈষ্ণব ধর্মপ্রচারে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন শ্রীমৎ প্রেমানন্দ ভারতী, লোকজীবন শ্রীমৎ বিজয়কৃষ্ণ ইঁহাদের সহিত বাবাজী মহারাজের মিলনের প্রসঙ্গ আলোচনাংশে ভগবৎ-ভাবের তরঙ্গ তুলিয়াছে। সমগ্র আলোচনা উপন্যাসের মত শেষ পর্যন্ত পাঠে আগ্রহ উদ্দীপ্ত করে।

সমগ্রভাবে গ্রন্থখানি রসোত্তীর্ণ হইলেও দুই একটি সামান্য ত্রুটি চোখে পড়ে। কোন কোন ক্ষেত্রে ঘটনার ভূমিকাংশে লেখায় আড়ষ্টতা পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থকারের রচনা-রীতি ভাষার আধুনিক ধারা ধরিয়া আগাইতে গিয়া মাঝে মাঝে যেন কিছুটা সংকুচিত হইয়া সেকালের ধাঁচে গিয়া পড়িয়াছে। গ্রন্থখানিতে সংস্কৃত শ্লোকের উদ্ধৃতির সম্পর্কে ইহা বিশেষভাবে ধরা পড়ে। দুরূহ তত্ত্বের বিচার বা আলোচনায় সংস্কৃত 'কোটেশন' স্বরূপে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা কেহ কেহ উপলব্ধি করিতে পারেন, কিন্তু এই প্রয়োজন সিদ্ধ করিবার যোগ্যতাও বাংলা ভাষার অনেকখানি অর্জন করিয়াছে বলা যায়। মনস্বিতাকে প্রগাঢ় করিয়া অভিব্যঞ্জনার ক্ষেত্র বাংলা ভাষায় বিস্তারলাভ করিয়াছে। ফলত সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধারের প্রয়োজনীয়তা বাংলা ভাষায় বর্তমানে খুবই সীমাবদ্ধ। বাস্তবিকপক্ষে ব্যক্তিবিশেষের উক্তিস্বরূপে ধর্মশাস্ত্রের শ্লোক উদ্ধার করাতে অনেক ক্ষেত্রেই রচনা-রীতিতে কৃত্রিমতার ভাব সৃষ্ট হয় এবং তাহার ফলে রসধর্ম ক্ষুণ্ন হয়। এরূপস্থলে সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধারের আগ্রহকে সংযত করিয়া রসতাৎপর্যটি নিগূঢ়ভাবে বাংলা ভাষার মাধ্যমে পরিস্ফুর্ত করাতেই রচনা-শৈলীর সৌষ্ঠব বৃদ্ধি পায়। বাবাজী মহারাজের জীবনীর ভাবী খণ্ডগুলির গ্রন্থন এবং প্রণয়নে এদিকে লক্ষ্য রাখিবার জন্যই গ্রন্থকারের নিকট এই নিবেদন জানাইতে হইল। এই ধরনের সামান্য ত্রুটি অবশ্যই ধর্তব্যের বিষয় নয়। গ্রন্থপ্রকাশে তাড়াতাড়ি করিতে যাওয়ার ফলেই ইহা ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ভূমিকায় সুপণ্ডিত হরিদাস দাস মহাশয় সেই কথাই বলিয়াছেন।

বস্তুত শ্রীমৎ রামদাস বাবাজীর ন্যায় মহামানবের জীবনী সংকলনে বরাহনগর পাঠবাড়ীর ট্রাস্ট বোর্ডের এই প্রচেষ্টায় আমরা আশান্বিত হইয়াছি এবং এবং প্রথম খণ্ড পাঠ করিয়া আমরা বিশেষভাবে প্রীতিলাভ করিয়াছি। সমগ্র জীবনী প্রকাশিত হইলে তাহাতে বাংলা সাহিত্য এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরম সমৃদ্ধি সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। পরবর্তী খণ্ডসমূহের জন্য আমরা আগ্রহান্বিত থাকিলাম। প্রথম খণ্ডের আলোচনা বাংলা দেশের ভক্ত, রসিক ও চিন্তাশীল সমাজে সেই আগ্রহ স্বভাবতই প্রদীপ্ত করিবে এবং বাংলার সুধিসমাজ এই মহনীয় উদ্যমকে আন্তরিকভাবে অভিনন্দিত করিবেন।

বিবিধ

আদর্শ হিন্দী ব্যাকরণ ও অনুবাদ—শ্রীহারাধন বন্দ্যোপাধ্যায়, বি এ, সি টি, ডিপ্ ইন্ এইচ টি। যুগ্ম সম্পাদক, রাষ্ট্র প্রচার সমিতি, চন্দননগর। রমা প্রকাশনী, চন্দননগর-এর পক্ষ থেকে শ্রীরমা ঘোষ বি এ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা আট আনা।

অল্প শ্রমে রাষ্ট্রভাষার সূত্রাবলী আয়ত্ত করার পক্ষে এ-বই অত্যন্ত দরকারী। বাঙালী শিক্ষার্থীর কথা মনে রেখেই বইটি লিখিত হয়েছে। সোপানগুলির উপস্থাপনা কোথাও অসরল হয়নি। বইটির ব্যাপক প্রচার হবে, এ সম্পর্কে আমরা নিশ্চিত। ১৪।৫৫

কৃষকের রক্তে লাল চীন—সীতারাম গোয়েল; এশিয়ার স্বাধীনতা সংরক্ষক সমিতি, ১২, চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা। চার আনা।

চীনের কৃষকদের লাঞ্ছনা ও দুর্দশার কাহিনী সমন্বিত একখানি পুস্তিকা। চীনের বিভিন্ন সংবাদপত্র থেকে প্রামাণ্য তথ্য উদ্ধৃত করে লেখক তাঁর বক্তব্যের যথার্থ সপ্রমাণ করবার চেষ্টা করেছেন। লেখকের মনোভাব যেন আগাগোড়া কম্যুনিস্ট বিদ্বেষী নইলে বর্তমান নয়া চীনের কৃষি ব্যবস্থা, ভূমিসংস্কার ও কৃষকদেরও যে কিছুটা সুরাহা হচ্ছে সেদিকে দৃষ্টি পড়ত। ৪৭১।৫৪

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

যোগীরাজ ব্রহ্মচারী কুলদানন্দ—ব্রহ্মচারী গঙ্গানন্দ।

পৌরাণিক উপাখ্যান—শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি।

ধূপকাঠি—নরেন্দ্রনাথ মিত্র।

জর্নাল—সন্তোষ গঙ্গোপাধ্যায়।

বঙ্কিম রচনাবলী (২য় খণ্ড)—শিশু সাহিত্য সংসদ লিঃ, ৩২এ, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

ছবিতে রামায়ণ—শ্রীপূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী।

একটি জীবন—শ্রীকাশীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

দরদী—শ্রীশচীন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

বন্ধুবার্তা—মহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ।

সুরুচি সেনগুপ্তার শ্রেষ্ঠ গল্প—সুরুচি সেনগুপ্তা কর্তৃক ২০, জুবিলী পার্ক, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

মধুপুরে চাঁদের উদয়—শ্রীহরিশচন্দ্র বসু।

অম্বলাপার শাপমুক্তি—শ্রীরাজেশ্বরপ্রসাদ নারায়ণ সিংহ ও শ্রীহরিশচন্দ্র বসু।

ছেলেবেলা—স্বামী অসীমানন্দ সরস্বতী।

সচিত্র সার্ভে...সেটেল্‌মেন্ট ম্যানুয়াল—শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মণ্ডল।

Echoes—Sri Sri Nripendranath.

বাংলাদেশের নদ-নদী ও পরিকল্পনা—কপিল ভট্টাচার্য।

জীবন শিল্পী—সুজিতকুমার নাগ।

ষোড়শ শতকের বাংলা সাহিত্য—শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন।

ট্রামে-বাসে

লো **কসভার** সদস্যগণ এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন যে, পাঁচ বৎসর বালক সন্তান মাতার তত্ত্বাবধানে কিবে। "সিদ্ধান্তটা এমন কিছু নূতন য়। পাঁচ বৎসর পর্যন্ত মাতাপিতা ন্তানের লালন-পালনের ভার নিতেন, াঁচ থেকে দশ বৎসর পর্যন্ত সময়টা ছিল াড়নার, তারপর ষোল বৎসর পূর্ণ হলে ুত্রকে মিত্রবৎ দেখাই ছিল রীতি। কিন্তু ুগধর্মে ইঁচড়ে পক্কতার বাহুল্য হেতু াড়নার প্রশ্ন এখন আর ওঠে না। লোক-ভা এ সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল বলেই হয়ত শ বৎসরানি তাড়য়েৎ নীতিটা উহ্য রেখে ুধু লালনের কথাই বলেছেন"—মন্তব্য করিলেন অভিজ্ঞ পিতা আমাদের বিশুখুড়ো।

* * *

শ্রী **যুক্ত** রাজাগোপালাচারী আমেরিকাকে হাইড্রোজেন বোমা ব্যবহারে বিরত থাকিতে পরামর্শ

দিয়াছেন। কিন্তু তিনি রাশিয়াকে অনুরূপ পরামর্শ কেন দেন নাই এই প্রশ্ন করিলে শ্যামলাল বলিল—"হয়ত রাজার পরামর্শে রাশ্যানরা কান দেবে না বলেই। মনে করুন দ্বিতীয় যুদ্ধের সময় জার্মানী রাজাজীর সম্বন্ধে বলেছিল—তিনি হলেন Raja of Gopalachari"!!

* * *

ক **ংগ্রেস** সভাপতি শ্রীযুক্ত ধেবর মন্তব্য ক রি য়া ছে ন—কংগ্রেসকর্মিগণের পরীক্ষার সময় উপস্থিত।—"সারা বছর যারা বই নিয়ে বসেননি তাঁরা পরীক্ষার নোটিশ পেয়ে রাত জেগে পড়াশোনা করলেই যে কোন সুবিধে হবে সে সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে কথা হচ্ছে পরীক্ষকগণ যেন কোন জটিল প্রশ্ন প্রস্তুত না করেন। জটিলতার দোহাই পেড়ে পরীক্ষার হল ছেড়ে আসা এখন রেয়াজ দাঁড়িয়ে গেছে কিনা তাই কথাটা বলে রাখলাম"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

ক **ংগ্রেসী** সভ্যগণের প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত নেহরু মন্তব্য করিয়াছেন যে, তাঁদের গুণাবলীর বিচার করিতে হইবে সকলের আগে কেন না সেইটাই হইল বড় কথা, শুধু সংখ্যা বৃদ্ধি নয়।—"কিন্তু অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে কম্বলের রোঁয়া না বাছাই বুঝি হবে বড়ো কথা"—ভীড়ের মধ্যে কোন্ এক সহযাত্রী বলিলেন।

* * *

শ্রী **যুক্ত** নেহরু তাঁর অন্য এক ভাষণে এই বলিয়া মন্তব্য করিয়াছেন যে বর্তমান যুগে কেহ কাহারও চেয়ে বড় নয়, সবাই সমান।—"কথাটা শুনতে আমাদের কানে বেশ ভালোই লাগল কিন্তু ভাবছি VIP-দের কথা। নেহরুজীর উক্তি তাঁদের কানের ভেতর দিয়ে মরমে গিয়েই প্রবেশ করবে, তবে মধুর মতো নয়, তীরের মতো"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

হা **ইড্রোজেন** বোমা বিস্ফোরণের ফলে বিলাতের গাভীরা নাকি এখন তেজষ্ক্রিয় দুগ্ধ দান করিতেছে।—
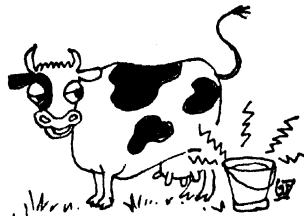
"অসম্ভব নয়, আমাদের দেশে সেই যে কবে কোন যুগে মেঘনাদ বোমার বিকল্প শক্তিশেল ছুঁড়েছিলেন তার তেজষ্ক্রিয়তায় শুধু দুধই জল হচ্ছে না, ঘি পর্যন্ত সর্প চর্বিতে পরিণত হয়ে যাচ্ছে!!"

* * *

এ **ক** সাম্প্রতিক সংবাদে শুনিলাম ফ্রান্সও নাকি হাইড্রোজেন বোমা প্রস্তুত করিবে বলিয়া সংকল্প করিয়াছে।—"কিন্তু আমরা বলি তার চেয়ে শেম্পেন তৈরীর কাজে লেগে থাকলে বাপ-দাদার নাম বজায় থাকতো, দেশটাও বাঁচতো"—বলিলেন বিশু খুড়ো।

* * *

ক **রিমগঞ্জের** এক সংবাদে প্রকাশ যে সেখানে স্থানীয় সংস্কারানুসারে বৃষ্টির জন্য দর্দুর দম্পতীর বিবাহানুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে।—"রবাহূত বরযাত্রী সর্পরা ব্যাং-এর গঙ্গাযাত্রার ব্যবস্থা করেছেন কিনা সে সংবাদ কেউ পায়নি"—বলিলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

ফু **টবল** খেলায় মোহনবাগানের হার হইলে বাজারে পুঁই আর চিংড়ির ক্রেতা জুটিত না এবং তেমনি

ইলিশ আর কাঁচালঙ্কার ক্রেতার অভাব হইত ইস্ট বেঙ্গলের পরাজয়ে। আমাদের এক সহযাত্রীর মুখে শুনিলাম সম্প্রতি রাশ্যান ভলিবল টিমের পরাজয়ে তাদের সমর্থকদের সবাই নাকি সেদিন নিরম্বু উপবাস করিয়াছে। কথাটা আমরা অবশ্য বিশ্বাস করি নাই কিন্তু তবু বলি প্রীতি বলে একেই, শুধু ইলিশ আর চিংড়ী ছাড়াটা তো নেহাৎ বুর্জোয়া বিলাস-মাত্র!!

* * *

স **রকারী** কর্মচারীদের ইতিকর্তব্য সম্বন্ধে একটি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হইয়াছে। অনেকগুলি নির্দেশের মধ্যে একটি হইল তাহারা কোন উপঢৌকন গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বিশু খুড়ো বলিলেন—"বাঘ, হাতী প্রভৃতি মন্ত্রি-পর্যায়ের উপহারগুলি নিশ্চয়ই এই নির্দেশের আওতায় পড়ে না।"

নবনাট্য আন্দোলন

ভারতে এখন যে যে-কাজেই নিয়োজিত থাকুন, এবং যতোই কর্মব্যস্ত ব্যক্তিই হোন না কেন, এবং অন্যান্য যতো খবরই তার গোচর বহির্ভূত হয়ে থাকুক না কেন, গত কয়েকটি বছর ধরে নাটক নিয়ে সারা দেশময় যে হৈচৈ আরম্ভ হয়েছে তার স্পর্শ থেকে দূরে সরে থাকা সম্ভব হতে পারে বলে মনে হয় না। বস্তুত দেশের এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে নাটক নিয়ে কথা না হয়। কয়েক সপ্তাহ মাত্র আগে

—শৌভিক—

দিল্লীতে সরকারী উদ্যোগ ও পৃষ্ঠ-পোষকতায় ভারতের প্রথম আন্তর্ভাষা নাট্য উৎসব অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। এই উৎসবটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায় এই থেকে যে স্বয়ং রাষ্ট্রপতি এই উৎসবের উদ্বোধন করেন এবং দিল্লীতে সে সময়ে উপস্থিত দিশী ও বিদেশী মনীষী ও নেতৃবর্গের কেউই বোধহয় উৎসবে যোগ-দানে বাকি ছিলেন না। দিল্লীতে সরকারী উদ্যোগে এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রতিষ্ঠিত সংগীত নাটক আকাদামির কথা তো পুরনো হয়ে গিয়েছে। তাছাড়া ইউ-নেস্কোর পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছে থিয়েটার সেণ্টার ইণ্ডিয়া, বা ভারতীয় নাট্য সংঘ, দুয়েরই সঞ্চালক মণ্ডলীর মধ্যে দেশের মাননীয় ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন। প্রথমটির সভাপতি মাদ্রাজের প্রধান বিচারপতি শ্রী পি ভি রাজমন্নার এবং শেষেরটির শ্রীমতী কমলা দেবী চট্টোপাধ্যায়। এ থেকেই সংস্থাদুটির গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু গুরুত্ব কেবল সরকারী মহলেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং বলা যায়, বেসরকারী জনসাধারণের মধ্যে নাট্যাভিনয় নিয়ে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা যায় তা অদ্ভুত একটা প্রপঞ্চ বললে ভুল হয় না। কে-না থিয়েটার করে, আর কোথায়-না থিয়েটার হয় খুঁজে পাওয়াই মুশকিল। অবশ্য উৎসাহ সবচেয়ে বেশী ব্যাপক বাঙলা ও বাঙালীদের মধ্যেই। স্কুল কলেজ, অফিস আদালত কাছারি, দোকান কারখানা, হাসপাতাল জেল, ডাক ও পরিবহন সংস্থা, ইত্যাদি এমন কোন জায়গা নেই যেখানকার লোকে থিয়েটারের ভক্ত নয়, বা থিয়েটার করতে বিরত আছেন। নাট্যাভিনয় নিয়ে এমন ব্যাপক-ভাবে মেতে ওঠার আর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। শুধু দেশে থাকতেই নয়, বাইরে কোথাও দু' পাঁচজন বাঙালী এক জায়গায় জড়ো হলেই নির্ঘাত দুর্গাপূজা আর সরস্বতী পূজা, আর সেই উপলক্ষে থিয়েটারও। মনস্তাত্ত্বিকরা কতোভাবেই হয়তো এই নাট্যানুরাগের ব্যাখ্যা করবেন। হয়তো বলা হবে যে প্রতিভা উন্মেষের যথোপযুক্ত সুযোগের অভাবেই লোকে নিজেকে প্রকাশের সহজাত প্রবৃত্তি বশেই নাট্যাভিনয়ে ঝুঁকে পড়েছে। কিংবা হয়তো আর কোন কারণে, তবে এটা যে সুস্থ লক্ষণ তাতে সন্দেহ নেই। কারণ, তা যদি না হতো তাহলে রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী থেকে আরম্ভ করে, বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিভিন্ন ক্ষেত্রের নেতৃ-স্থানীয় ব্যক্তিবৃন্দ সকলেই নাট্যাভিনয়কে উৎসাহিত করতে চাইতেন না। কেন্দ্রীয় ও বিভিন্ন রাজ্যের তহবিল থেকে এ বাবদ খরচও হয়ে আসছে নিয়মিতভাবে। এতো সত্বেও ঠিক একটা আন্দোলন বলতে এখনও গড়ে ওঠেনি।

*   *   *

বাঙলা দেশে থিয়েটারের উৎপত্তি প্রায় দেড়শো বছর হলো; পেশাদারি অভিনয়ই হচ্ছে প্রায় পঁচাশি বছর। সেদিন কলকাতায় থিয়েটার সেণ্টার কর্তৃক অনুষ্ঠিত নট্যোৎসবের উদ্বোধনকালে এই কথাই প্রখ্যাত নট অহীন্দ্র চৌধুরীও বলছিলেন। তিনি বলেন বাঙলা দেশে নাটক অভিনয় করার এবং নাটক দেখার ঝোঁক যত তা কেবলমাত্র ভারতবর্ষেই নয়, ভারতের আশপাশের প্রাচ্য দেশসমূহেও কোথাও নেই। একমাত্র বাঙলা দেশেই পেশাদারমঞ্চ রয়েছে এবং গত পঁচাশি বছর ধরে কোনদিনও বন্ধ না হয়ে অবিরাম চলে আসছে। হাজার হাজার নাটুকে দলও রয়েছে। কিন্তু একটা সুসংবদ্ধ আন্দোলন বলতে কিছু সৃষ্টি হয়নি। থিয়েটার সেণ্টার ইণ্ডিয়ার লক্ষ্য হচ্ছে আন্দোলন গড়ে তোলা এবং তাকে পুষ্ট করা। তারই অনুসরণে হয়েছে থিয়েটার সেণ্টার ক্যালকাটা। অপেশাদারি নাটুকে দল-গুলিকে সংঘবদ্ধ করাই হচ্ছে এদের উদ্দেশ্য। সংঘবদ্ধ মানে এটা নয় যে সব নাটুকে দলকে একটা নিয়মধারার অনুগত হয়ে চলতে হবে; সে রকম কিছু নয়। নাটুকে দল টিকে থাকার যে সব

অসুবিধে সাধ্যমত এ'রা তার প্রতিকার ব্যবস্থাই করতে এগিয়ে এসেছেন। যেমন, ছোট ছোট দল যাদের পয়সার জোর নেই অথচ কোন নাটক মঞ্চস্থ করতে চায় তারা সেণ্টারের অনুমোদিত দলের হলে সহায়তা পাবেন। এই সুযোগ করে দেবার জন্য ভবানিপুরের চক্রবেড়ে রোডে ছোট একটা হল নিয়ে রাখা হয়েছে। কোন দল নাটক নির্বাচন সমস্যায় পড়লে থিয়েটার সেণ্টার তাদের কাছে নাটকের তালিকা পেশ করবে। নাটক বিষয়ে কিছু জানতে হলে থিয়েটার সেণ্টারের অভিজ্ঞ কুশলীরা যথাসাধ্য তা জানাবেন। কেউ নাটক লিখে থিয়েটার সেণ্টারের কাছে দিলে তার গুণ ও যোগ্যতা বিচার করে দেওয়া হবে। কোন নাটকে কি ধরনের সাজ পোশাক ব্যবহার যুক্তিযুক্ত হবে, কেমন আলোকপাত হলে মানায় ভালো ইত্যাদি ব্যাপারেও নাট্যকে দলদের পরামর্শ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দেশে একটা নাট্য আন্দোলন গড়ে ওঠার এ একটা ভালো সূচনা।

থিয়েটার সেণ্টার ক্যালকাটা সাধারণ্যে পরিচিত হওয়ার উদ্দেশ্যে প্রথমেই নেমেছেন ছোট একটি নাট্যোৎসব অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করে। গত ১৩ই মার্চ নিউ এম্পায়ারে এই নাট্যোৎসবের উদ্বোধন হয়। শ্রীমতী কমলাদেবী

১লা এপ্রিল হইতে
ওরিয়েন্ট, বসুশ্রী ও বীণা
কলিকাতা ও
সকল প্রধান কেন্দ্রে
দো দুলহে
অভিনব আঙ্গিকে
উপস্থাপিত একটি
হাস্যরসোজ্জ্বল কাহিনী
জেমিনীর
সহযোগিতায়
ইউনাইটেড ফিল্ম
আর্টস এর নিবেদন
জেমিনী রিলিজ
ভূমিকায়:-
শ্যামা - - সজ্জন
বনজা - - আগা
ডেভিড - ললিতা পাওয়ার
কানাইয়ালাল - বি, এম, ব্যাস

চট্টোপাধ্যায় এই উপলক্ষে দিল্লী থেকে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছিলেন। ছোট নাট্যোৎসব বলা হলো এই কারণে যে, এই উৎসবে ভিন্ন ভিন্ন চারটি নাট্যকে দলের মাত্র চারখানি নাটক পরিবেশনের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৩ই মার্চ হয় নবনাট্যমের 'জনরব', ২০শে হয় জাতীয় নাট্যসংঘের 'পূর্বরাগের ইতিহাস', ২৭শে হবে তরুণ সংঘের 'অলগ আলগ রঙ্গে' এবং ৩রা এপ্রিল হবে বহুরূপীর 'উলুখাগড়া'। তবে সংখ্যাটাই এখানে বড়ো কথা নয়, চারটে দলকে একটা অনুষ্ঠানে যে জড়ো করা গিয়েছে এইটেই হচ্ছে উদ্দীপ্ত হবার আসল জোর। উৎসবের উদ্বোধন দিনে অহীন্দ্র চৌধুরী একটা ভালো কথা বলেছিলেন। তিনি বলেন, 'নেই নেই' বলে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করাটা ভালো লক্ষণ নয়। কারণ 'সাপের বিষ নেই' বলতে বলতে তাও বিশ্বাসে দাঁড়িয়ে যায়। তিনি বলেন নাটকের দিক থেকে আমাদের গর্ব করার যথেষ্ট কিছু আছে। নেতিমূলক মনোভাব দূরে রেখে যা গর্বের তাকে বিকশিত করে তোলাই হবে ঠিক পথে চলা। নেই, বা হবে না বা হয় না—এমনি ধারণা নাট্যকে দলগুলির মন থেকে দূর করে দেওয়ার দিকেই যেন সেণ্টারের দৃষ্টি ও কাজ নিবদ্ধ থাকে। উৎসব সম্পূর্ণ হলে নাটক ক'খানি সম্পর্কে আলোচনা করা যাবে।

বেনামী শরৎ কাহিনী

অভিনেতৃ সংঘ বনাম শরৎ-রচনার উত্তরাধিকারিদের বিরোধের কোন মীমাংসা না হওয়ায় পর্দায় বা মঞ্চে শরৎচন্দ্রের রচনা পরিবেশিত হওয়া প্রায় স্থগিদই হয়ে এসেছে। গত বছর যাওবা কয়েকখানি শরৎরচনা পর্দা ও মঞ্চে উদ্ভাসিত হতে দেখা গিয়েছিল, এবছর কোন স্টুডিও বা থিয়েটারে শরৎকাহিনী পরিবেশনে প্রস্তুতির কোন আঁচও নেই। অথচ শরৎচন্দ্রের রচনার যে বক্স-অফিস সাফল্য-সম্ভাবনা তা আর কোন তৈরী রচনার মধ্যে চট করে নজরে পড়ে না। কোন কোন প্রযোজক কিন্তু এর একটা উপায় বের করেছেন যাতে শরৎচন্দ্রের রচনাও গ্রহণ করা হচ্ছে না, অথচ শরৎকাহিনীর রসবৈশিষ্ট্যটা বজায় রেখে দেওয়া যাচ্ছে। তারই একটা উদাহরণ বলা যায় সবিতা পিকচার্সের 'দত্তক'-কে। শরৎচন্দ্রের 'বিন্দুর ছেলে'-কে কেন্দ্র করে কিছুটা এ-গল্প, কিছুটা ও-গল্পকে অনুসরণ করে 'দত্তক'-এর আখ্যানবস্তু গঠন করা হয়েছে। ফলে 'দত্তক'-এরও অনেক ঘটনা অনেকটা শরৎ-রচনার মতোই আবেগপুষ্ট হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তবে মানুষের ক্রূরতা ও নির্দয়তাকে এমন তীক্ষ্ণধার করে উপস্থিত করা হয়েছে যা শিল্প-সাহিত্যের মাত্রানুগ নয়।

• • •

বিন্দুর ছেলের মতোই দু'ভায়ের সংসার। ওরই মতো 'দত্তক'-এও বড়োভাই পুত্রস্নেহে ছোটভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করে বড়োলোকের বাড়িতে বিয়ে দিয়ে বউ এনেছে আর ভ্রাতৃবধূকে গৃহ-

লক্ষ্মী স্থানে আদর করে। তবে এ গল্পে দুই জা-ই বন্ধ্যা এবং যে শিশুটিকে উপলক্ষ্য করে সংসারের ভাঙন তার মা. বড় জার ভগিনী, বিধবা হয়ে তার দিদির আশ্রয়ে থাকবার জন্য আসে। গল্প আরম্ভ এই থেকেই। ছোট ভাই রমেশ স্ত্রী গীতাকে নিয়ে গিয়েছিল পঞ্চাননতলায় সন্তান কামনা করে মানৎ করতে, কিন্তু সেখানে দণ্ডী কাটার ব্যাপার দেখে আতঙ্কিত হয়ে ফিরে আসে। বাড়িতে এসেই পেলে সরলা ও তার শিশুপুত্রটিকে। সরলার দিদি নীরদা কিন্তু নিরাশ্রয় ছোট বোনকে থাকতে দিতে রাজী নয়। সরলার ছেলেটির প্রতি মমতাবশে গীতাই ওদের আশ্রয় দিলে। রমেশ ডাক্তার হয়ে গ্রামেই ডিসপেন্সারী খুলে বসেছে। তার দাদা কেদারনাথ আগে কম্পাউণ্ডারি করতো নিবারণ ডাক্তারের ডিসপেন্সারিতে; সেই চাকরি করেই রমেশকে সে মানুষ করেছে। এর পর সে রমেশের ডিসপেন্সারিরই কম্পাউণ্ডার। পাড়ার মাতব্বরেরা মাইনে বা অংশের কথা তুললে কেদারনাথ বলতো তারা স্বামী-স্ত্রী দুজনে রমেশের রোজগারে খাচ্ছে সেই তো তার মাইনে। সংসারে কথা খাটে গীতার; গীতাও তার ভাসুরকে দেবতার মতো ভক্তি শ্রদ্ধা করতো। নীরদা স্বভাবমুখরা এবং অতি ক্রুর প্রকৃতির। সরলা এবাড়িতে আশ্রয় পাওয়া থেকে নীরদা সংসারে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে তুললে। শেষ পর্যন্ত ব্যাপার এতদূর পর্যন্ত গড়ালো যে সরলা আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হতে বাধ্য হলো। কিন্তু রমেশই তাকে বাঁচিয়ে ফিরিয়ে আনলে। নীরদার আচরণ উন্মাদপ্রায়। উপায় না দেখে কেদারনাথ বাড়ির মাঝে পাঁচিল তুলে সংসার ভাগ করে নিলে। তাতেও কোন সুফল দেখা দিল না। সংসার চালাবার জন্য কেদারনাথ দীর্ঘ পথ অতিক্রম করে আবার যেতে লাগলো নিবারণ ডাক্তারের ডিস্পেন্সারিতে চাকরি করতে। একদিন ফিরলো অচৈতন্য অবস্থায়। এদিকে সরলার শিশুপুত্রটি গীতার সবটুকু সময় দখল করে নেওয়ায় রমেশও গীতার প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠতে লাগলো। এমনি অবস্থায় গীতা শিশুটিকে নিয়ে তার বাপের বাড়িতে চলে গেলো। গোলমাল বাঁধলো আরো ভালো করেই। ক্ষিপ্ত হয়ে রমেশ সরলাকে ভয় দেখিয়ে রাজী করে গীতার নামে তার ছেলেকে অপহরণ করার মামলা নিয়ে এলো। আদালতে মামলার শুনানী উঠলো। রমেশ সরলাকে উকিলের ঘরে একা রেখে আদালত কক্ষে চলে যাবার ফাঁকে গীতার বাবা এসে সরলাকে নিয়ে একেবারে হাজির হলো রমেশদের বাড়িতে এবং রমেশ ফিরে আসার আগেই কেদারনাথের সহায়তায় গীতাকে দিয়ে শিশুটিকে দত্তক গ্রহণ করিয়ে নে[illegible]। সব ঝামেলার নিষ্পত্তি হলো, এমন কি এতোদিন পরে নীরদারও মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিল—এই প্রথমবার সে সরলাকে আদর করে বুকে জড়িয়ে ধরলে।
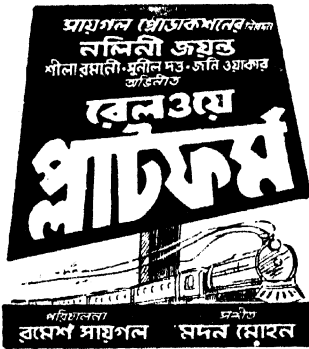
* * *

সামান্য একটু আধটু তফাৎ ছাড়া গল্পের মূল কাঠামো 'বিন্দুর ছেলে'-রই অনুকরণ। বড়ো ভাই দুটি কাহিনীতেই একই—সেই ভ্রাতৃবধূকে স্নেহ, তার কথায় চলা, ছোট ভায়ের সঙ্গে আলাদা হয়ে যাওয়া, বৃদ্ধ বয়সে দূর পথ অতিক্রম করে আবার চাকরিতে যাওয়া ইত্যাদি। 'বিন্দুর ছেলে'-তে ছোট ভাই উকিল, এ গল্পে ডাক্তার তবে প্রকৃতি ও আচরণে দুজনেই এক। এছাড়া, আরও কয়েকটি গল্পের ছাপও বোধহয় মিলিয়ে দেওয়া যায়। "দত্তক"-য়ে সংঘাতের সৃষ্টি করা হয়েছে নীরদাকে দিয়ে সরলা ও তার শিশুপুত্রকে উপলক্ষ করে। কিন্তু সেই সংঘাত সৃষ্টির জন্যে এমন সব ক্রুর ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে যা হিংসার চেয়ে

'দো দ্লুহে'র একমাত্র দ্লহান—বনজা

ংপ্রতাকেই বেশী করে প্রকাশ করে। পূরে রোদে সরলা ও তার শিশুপুত্রকে লা ধাক্কা দিয়ে নীরদার বের করে দেওয়া: ামীর কোল থেকে ভাতের থালা ছ্ড়ে ফলে দেওয়া। আবার দাদার ওপর ভিমান করে রমেশের বাইরে থেকে টাকা র করে মাইনে ধরে দিতে যাওয়া; অমন য দাদা ছেলের মতো মানুষ করেছে কে; কিংবা কেদারনাথেরও রমেশের পর পাল্টা অভিমানে ভিজিটের টাকা তে যাওয়া ইত্যাদি ঘটনাবলী আবেগকে ীব্রভাবে উথলে তো দেয়ই, উপরন্তু রতায়ও মনের ওপরে প্রচণ্ড আঘাত নে। মনকে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে রঝরে করে দেয়।

• • •

আরম্ভতেই পঞ্চাননতলায় দণ্ডীকাটার এক বীভৎস দৃশ্য। তারপরই রমেশ ও গীতা বাড়ি ফিরতেই সরলার ওপরে নীরদার নির্দয় আচরণ। এইভাবে একটার পর একটা অস্বাভাবিক ঘটনা তরতর করে বয়ে যেতে থাকে এবং স্বস্তি মেলে একেবারে শেষে আদালত থেকে সরলাকে নিয়ে এসে দত্তক অনুষ্ঠানটি সমাপ্ত হবার পর; দর্শক মন আরও প্রফুল্ল হয় একেবারে শেষে নীরদা সরলাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে। ঘটনাগুলো সাজিয়ে যাওয়া হয়েছে বেশ একটা ধাপ ধ'রে এবং নাটকীয় সংঘাতও ধাপে ধাপে চড়েছে নাটকীয় প্রয়োজন মিটিয়ে। সাদাসিদে পরিচালনা, তবে দর্শকের কৌতূহলকে একটানা অব্যাহত রেখে দেওয়া হয়েছে।

তাতে অভিনয়শিল্পীদের কৃতিত্ব অবশ্য অনেকখানি। সন্ধ্যারাণী এতে গীতার ভূমিকায় বিন্দুকেই আবার রূপায়িত করে তুলতে পেরেছেন। জহর গাঙ্গুলীরও কেদারনাথের মতো আত্মভোলা স্নেহপ্রবণ বড়ভাইয়ের চরিত্র আগের মতোই। নীরদার চরিত্রটিকে ছায়া দেবী প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশী নির্দয় ও ক্রুর প্রকৃতির করে তুলেছেন। সরলার চরিত্রে শান্ত অথচ নিপীড়িত আশ্রয়হীনার চরিত্রটিতে প্রণতি ঘোষকে ভালো দেখিয়েছে। ছোটভাই রমেশের চরিত্রে অসিতবরণকেও এ ধরনের চরিত্রে আগেও দেখা গিয়েছে, এবং কাজ তিনি ভালোই দেখিয়েছেন। গীতার বাবার ছোট চরিত্রে ছবি বিশ্বাস আছেন বলে একটা ব্যক্তিত্ব আছে, তাছাড়া আর কিছুই নেই। এরা ছাড়া অভিনয়ে অংশ গ্রহণ করেছেন পঞ্চানন ভট্টাচার্য, আশা দেবী, ইরা চক্রবর্তী, তারা ভাদুড়ী প্রভৃতি।

* * *

কলাকৌশলের দিকে আলোকচিত্র গ্রহণে, বিশেষ করে নৈশদৃশ্যে চমৎকারিত্ব দেখা যায়। সারা ছবিতে বাউলের দুখানি গান আছে এবং গান দুখানি রচনা ও গাওয়া দু'দিক থেকেই ভালো। ছবি-খানির সংগঠনকারিবৃন্দ হচ্ছেন ঃ—কাহিনী রচনায় বীণাপাণি দেবী, চিত্রনাট্য রচনায় মণি বর্ধন, পরিচালনা ও সম্পাদনায় কমল গাঙ্গুলী, আলোকচিত্রগ্রহণে অনিল গুপ্ত, শব্দগ্রহণে নৃপেন পাল; সুরযোজনায় মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় এবং শিল্পনির্দেশে কার্তিক বসু।

খেলার মাঠে

একলব্য

দিল্লীতে জাতীয় শুটিং প্রতিযোগিতার তৃতীয় বার্ষিক অনুষ্ঠানে বাঙলার রাইফেল চালকগণ যে কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন তা সত্যই যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে। বাঙলার পুরুষরাই শুধু রাইফেল চালনায় অগ্রণী নন, বাঙলার মহিলারাও এ বিষয়ে পুরুষদের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছেন, কোন কোন ক্ষেত্রে এগিয়েও গেছেন। এবারকার

প্রখ্যাত রাইফেল চালক এস এন চ্যাটার্জির সহধর্মিণী খ্যাতনাম্নী রাইফেল চালিকা সবিতা চ্যাটার্জি মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়নশিপের সঙ্গে এবার দিল্লীতে ১০টি পুরস্কার পেয়েছেন

জাতীয় শুটিংয়ে ৩৬টি বিভিন্ন বিষয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়। এর মধ্যে জাতীয় চ্যাম্পিয়নশিপের বিষয় ছিল ৮টি। এই ৮টি চ্যাম্পিয়নশিপে বাঙলারাই ৬ জন রাইফেল চালক বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছেন। অপর দুইটি জাতীয় চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছেন সৌরাষ্ট্রের মিসেস চন্দ্রভানু সিং এবং বিকানীরের মহারাজা। বাঙলার সাফল্য-মণ্ডিত রাইফেল চালকদের মধ্যে ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি, মিসেস সবিতা চ্যাটার্জি, সৌরেন চৌধুরী, মিসেস গীতা রায়, ব্রজরঞ্জন রায়, এস এন চ্যাটার্জি, নীহার সেন, সুশীল গাঙ্গুলী, আনন্দিতা মুন্সী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। জাতীয় চ্যাম্পিয়নদিগের জুনিয়ার প্রতিযোগিতা এবং ছোটদের প্রায় সবগুলি প্রতিযোগিতায় যারা কৃতিত্ব দেখিয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন তারাও বাঙলার ছেলে। জুনিয়র চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছেন সেন্ট্রাল ক্যালকাটা রাইফেল ক্লাবের শ্রীধরমরাজ গুপ্ত। 'নভিস' অর্থাৎ যারা গুলী ছোড়ায় একেবারেই কাঁচা তাদের প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হয়েছেন দক্ষিণ কলিকাতা রাইফেল ক্লাবের দিব্যনাথ রায়। এই ক্লাবেরই সুপ্রিয় সেন ১৮ বছরের বয়সী প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। ১৫ বছরের প্রতিযোগীদের মধ্যে বিজয়ী হয়েছেন সেন্ট্রাল ক্যালকাটার তপেন বসু। ১২ বছরের মধ্যে শ্রীরামপুরের কুমারী প্রীতিকণা দাশ। বাঙলার ছেলে দিলীপকুমার সাহা পেয়েছেন এন সি সি বিভাগে বিজয়ীর সম্মান। দলগত চ্যাম্পিয়নশিপেও বাঙলার রাইফেল চালকরা কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। এক কথায় এবারকার জাতীয় সুটিং প্রতিযোগিতায় বাঙলার জয়-জয়কার।

* * *

স্বাধীনতা লাভের পর ভারতের বিভিন্ন শহরে রাইফেল চালনা শিক্ষার বহু ক্লাব

ভারতের রাইফেল টীমের প্রাক্তন অধিনায়ক ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি। ইনি দিল্লীতে জাতীয় সুটিং প্রতিযোগিতায় ৯টি বিষয়ে প্রথম, ১টি বিষয়ে দ্বিতীয় ও ১টি বিষয়ে তৃতীয় স্থান দখল করে ১১টি পুরস্কার পেয়েছেন

স্থাপিত হয়েছে সন্দেহ নেই, কিন্তু টেনিস খেলার মত রাইফেল চালনাটিও ধনী সম্প্রদায় এবং ধনীর দুলালদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই ব্যয়বহুল স্পোর্টসকে জনপ্রিয় এবং সাধারণের গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হলে সরকারী সাহায্য অপরিহার্য। রাইফেল চালনাকে শুধু স্পোর্টসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ভুল হবে। জাতীয় জীবনে এর যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে। এ প্রয়োজন মেটাতে হলে

মহিলা বিভাগের [illegible] ও '[illegible]' রাইফেল চালনার বিজয়িনী গীতা রায়

জাতীয় সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে। দিল্লীর 'বসন্ত রেঞ্জে' জাতীয় সুটিং প্রতিযোগিতায় ১০ দিনব্যাপী অনুষ্ঠানে সাধারণের মধ্যে তেমন উৎসাহ উদ্দীপনা প্রত্যক্ষ করা যায়নি। উৎসাহ-উদ্দীপনা যা ছিল তা রাজা মহারাজা ও ধনীর কুমারদের মধ্যে সীমাবদ্ধ। অবশ্য 'বসন্ত রেঞ্জ' দিল্লীর প্রাণকেন্দ্র থেকে মাইল দশেক দূরে, তবুও এ প্রতিযোগিতায় দর্শকদের যেমন ভীড় আশা করা গিয়েছিল তেমন ভীড় হয়নি। বসন্ত রেঞ্জের চারদিকে অবশ্য বড় বড় গাড়ীর সমারোহ দেখা গেছে, এসব গাড়ীর মালিক ছিলেন রাজা মহারাজা ও ধনীর কুমারেরা। তিনটি রেঞ্জে প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয়েছে। কোথাও 'স্মলবোর' কোথাও 'বিগ বোর', কোথাও 'প্রহিবিটেড' রাইফেল আবার কোথাও পিস্তল বা রিভলবারের প্রতিযোগিতা চলেছে। পিস্তল এবং রিভলবারে সবাইকে দাঁড়িয়েই গুলী ছুড়তে হয়। কিন্তু রাইফেলের অধিকাংশ বিষয়েই গুলী ছুড়তে হয়েছে তিনটি বিভিন্ন অবস্থায়। 'প্রোন' 'নীলিং' ও 'স্ট্যাণ্ডিং' অর্থাৎ মাটিতে বুক লাগিয়ে, হাঁটু গেড়ে বসে এবং দাঁড়িয়ে। মাটিতে বুক লাগিয়ে গুলী ছোড়ার সুবিধা বেশী। এতে লক্ষ্য প্রায়

াব্যর্থ। হাঁটুগেড়ে গুলী ছোড়া অপেক্ষাকৃত
ঠিন, দাঁড়িয়ে আরও কঠিন। যাই হ'ক
ল্লী ক্যান্টনমেণ্ট সন্নিহিত বসন্ত রেঞ্জে
০ দিন ধরে যেভাবে গুলী ছোড়াছুড়ি
লেছে তাকে যদি কেউ একটি যুদ্ধের
স্তুতি বলে মনে করে থাকেন, তবে তার
াষ দেওয়া যায় না। অনেকগুলি বিষয়ে এক
কজন প্রতিযোগীকে ১২০টি করে গুলী
ড়তে হয়েছে। 'প্রোন' অবস্থায় ৪০টি এবং
ট্যাণ্ডিং' অবস্থায় ৪০টি কোন কোন ক্ষেত্রে
াবার ছিল দূরত্বের ব্যবধান। কোন সময়
লী ছুড়তে হয়েছে ২৫ মিটার দূর থেকে,
ান সময় ৫০ মিটার থেকে, কখনো ১০০
টার থেকে; আবার কখনো ১০০ গজ বা
০০ গজ দূরে থেকে। সাংবাদিকদের জন্য
বিষয়টি নির্দিষ্ট ছিল তাতে 'প্রোন'
বস্থায় ২৫, ৫০ ও ১০০ মিটার দূরে থেকে
ড়িটি কুড়িটি করে মোট ৬০টি গুলী
ড়তে হয়। মোট কথা বিভিন্ন প্রতিযোগিতায়
ত বেশী রকমফের আছে যা বুঝিয়ে বলা
ড় মুশকিল।

* * *

বাংলার প্রতিযোগীদের মধ্যে অধিকাংশই
তিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তবুও দু'জন
হিলার নাম করতে চাই যাঁরা গুলী ছোড়ায়
রুষদেরও হার মানিয়েছেন। এ'রা দু'জন
চ্ছেন মিসেস সবিতা চ্যাটার্জি ও মিসেস
তা রায়। সবিতা চ্যাটার্জির উপর্যুপরি
বছর মহিলা বিভাগের চ্যাম্পিয়ানশিপ লাভ
ড় কথা নয়—বড় কথা 'বিগ বোর' রাইফেল
লনায় একটি বিষয়ে পুরুষ প্রতিযোগীদের
[illegible] করা। 'প্রোন' অবস্থায় ২০০ গজ
কে সবিতা চ্যাটার্জি 'বিগ বোর' রাইফেলে
০টি গুলী চালিয়ে ২০০ পয়েণ্টের মধ্যে
৮৭ পয়েণ্ট লাভ করেন। আর কেউই এত
শী পয়েণ্ট লাভ করতে পারেননি।
টেলিস্কোপ' ইভেণ্টে পুরুষ ও মহিলা
তিযোগীদের মধ্যে গীতা রায় সবচেয়ে বেশী
য়েণ্ট পেয়েছেন। 'টেলিস্কোপ' ইভেণ্ট
বছর থেকেই প্রথম প্রবর্তন করা হয়।
রুষদের মধ্যে ডাঃ হরিহর ব্যানার্জি দলগত
তিযোগিতা নিয়ে ৯টি বিষয়ে প্রথম স্থান
ধিকার করেছেন আর সৌরেন চৌধুরী
রেছেন ৬টি বিষয়ে প্রথম স্থান অধিকার।
র পর এস এন চ্যাটার্জি, মিসেস সবিতা
াটার্জির নাম করা যেতে পারে।

* * *

এপ্রিল মাসের ১৬ই থেকে হল্যাণ্ডের
ট্রেখ নগরীতে আরম্ভ হচ্ছে টেবিল
নিসের বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতা। প্রথমে
বে দেশের সঙ্গে দেশের দলগত প্রতি-
গিতা সোয়েদলিং কাপ ও কর্বিলন কাপের
লা। তারপর চলবে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের
ড়াই। জগৎ সভায় টেবিল টেনিসে শ্রেষ্ঠ
? ২৪শে এপ্রিল দ্বাবিংশতি বিশ্ব টেবিল
নিসের উপর যবনিকা পড়বার কথা।

'প্রোহিবিটেড' এবং 'নন-প্রোহিবিটেড' পিস্তল ও রিভলবার চালনার চারটি বিষয়ের বিজয়ী ক্যাপ্টেন স্যার সোরেন চৌধুরী মিসেস মবলংকরের হাত থেকে পুরস্কার গ্রহণ করছেন

গতবার লণ্ডনের ওয়েম্বলি স্টেডিয়ামে বিশ্ব টেবিল টেনিসের একবিংশতি অনুষ্ঠানে ৩৩টি দেশ অংশ গ্রহণ করেছিল। এবার উট্রেখে যোগদানকারী দলের সংখ্যা ৩৫। খেলাধুলোর কোন বিষয়ের একক প্রতি-যোগিতায় এতগুলো দেশের অংশ গ্রহণের নজির ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষ করা যায়নি। টেবিল টেনিসে জাপানের প্রাধান্য সর্ববাদিসম্মত।

জাতীয় রাইফেল চালনা প্রতিযোগিতার সাংবাদিক বিভাগের বিজয়ী আনন্দবাজার পত্রিকার ক্রীড়া সম্পাদক শ্রীব্রজরঞ্জন রায়কে মিসেস মবলংকারের কাছ থেকে স্বর্ণপদক গ্রহণ করতে দেখা যাচ্ছে

১৯৫২ সালে এবং গতবারের বিশ্ব প্রতি-যোগিতায় জাপ খেলোয়াড়রা যে প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যই বিস্ময়কর। গত-বার সোয়েদলিং কাপ, কর্বিলন কাপ এবং ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার 'সেণ্ট ব্রাইড ভেস' জয় করে জাপান গৌরবের সর্বোচ্চ শিখরে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। পাশ্চমী খেলোয়াড়গোষ্ঠীর ত্রাস সৃষ্টিকারী জাপান এবারও বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতার অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী। খেলার তালিকায় জাপানের পুরুষ টীমকে তৃতীয় গ্রুপে এবং মহিলা টীমকে দ্বিতীয় গ্রুপে স্থান দেওয়া হয়েছে। পুরুষদের ৪টি গ্রুপে জাপান, হাঙ্গেরী, ইংলণ্ড ও চেকোস্লোভেকিয়ার বিজয়ী হবার সম্ভাবনা অনুযায়ী এই চারটি দেশ বিজয়ী হলে জাপানকে সেমি-ফাইন্যালে হাঙ্গেরীর সঙ্গে এবং ইংলণ্ডকে চেকোস্লোভেকিয়ার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বী করতে হবে। কর্বিলন কাপে মহিলা বিভাগে হয়েছে তিনটি গ্রুপ। ইংলণ্ড, জাপান এবং হাঙ্গেরী এই তিনটি গ্রুপে বিজয়ী হবে বলে আশা করা যায়। ব্যক্তিগত প্রাধান্য প্রতিযোগিতায় দেখা যাবে ভিন্ন ভিন্ন দেশের বহু কুশলী খেলোয়াড়কে। গতবার পুরুষদের মধ্যে জাপানের হীরো ওগিমুরা এবং মহিলাদের মধ্যে রুমানিয়ার এঞ্জেলিকা রোজেনু চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছিলেন। রোজেনু শুধু গতবারই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হননি. বিশ্ব চ্যাম্পিয়নসিপের গৌরব তিনি লাভ করেছেন উপর্যুপরি পাঁচ বছর। বিশ্বের আর একজন মহিলা এই কৃতিত্বের অধিকারী. ইনি হচ্ছেন হাঙ্গেরীর মেডানিয়ানস্কি। রোজেনু যদি এবছরও বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেন, তবে তিনি এক নূতন সম্মানের

অধিকারী হবেন, যে সম্মান বিশ্বের কোন মহিলার পক্ষেই লাভ করা সম্ভব হয়নি।

এবছর বিশ্ব টেবিল টেনিসে অংশ গ্রহণকারী ৩৫টি দেশের মধ্যে ভারতের নাম নেই। অর্থাৎ ভারত এবছর বিশ্ব টেবিল টেনিসে অংশ গ্রহণ করেনি। বিশ্ব প্রতিযোগিতায় ভারতের অংশ গ্রহণ না করবার প্রধান কারণ নাকি অর্থনৈতিক। যে বছর বিশ্ব প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণ করা ভারতের পক্ষে সবচেয়ে প্রয়োজন ছিল, অর্থের অভাবে সে বছরই ভারতকে দূরে সরে থাকতে হল এটা খুবই দুঃখের কথা। টেবিল টেনিসের গুরুজী ভিক্টর বার্নাকে আমরা এবছর কোচ হিসাবে পেয়েছিলাম। প্রায় ছ' মাস ভারতের খেলোয়াড়দের ট্রেনিং দিয়ে বার্না সম্প্রতি ভারত ত্যাগ করেছেন। যাবার সময় তিনি ভারতের খেলোয়াড়দের সম্বন্ধে উচ্চ আশা পোষণ করে গেছেন। কয়েকজন উদীয়মান খেলোয়াড় সম্বন্ধে বার্ন খুবই আশাবাদী, কিন্তু তার বেশী আস্থা ভারতের মহিলা খেলোয়াড়দের উপর। মীনা পরাণ্ডে সম্বন্ধে বার্না বলেন, কোচিং না পেয়ে একজন মহিলার পক্ষে এতখানি পারদর্শিতা অর্জন করা সম্ভব, এধারণা তার পূর্বে ছিল না। কোচিংয়ের ফলে মীনা পরাণ্ডের পক্ষে নাকি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করাও সম্ভব। সেই কোচিংই পেয়েছেন মীনা বার্নার কাছ থেকে, অথচ তিনি বিশ্ব প্রতিযোগিতায় যোগদানের সুযোগ পেলেন না। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে ভারতীয় টেবিল টেনিস দলের উটরেখ যাবার খরচ সংগৃহীত হত না, একথা বিশ্বাস করা কঠিন হয়ে পড়ে। এ সপ্তাহেই দেখছি শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আজাদ প্রতিষ্ঠিত নিখিল ভারত ক্রীড়া সংস্থা বিভিন্ন ক্রীড়া প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৮ লাখ টাকা বিলিব্যবস্থার চেষ্টা করছেন। তার সামান্য অংশেই টেবিল টেনিস দলের উটরেখ যাবার অর্থ সংগৃহীত হতে পারত।

উটরেখে বিশ্ব টেবিল টেনিস সংস্থার বার্ষিক অধিবেশনে আগামীবার প্রতিযোগিতার স্থান সম্পর্কেও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। জাপান এবং চেকোস্লোভেকিয়া ১৯৫৬ সালের বিশ্ব প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য আগ্রহী। এই অধিবেশনে স্পঞ্জ র‍্যাকেটকে বিধিবহির্ভূত করবার প্রস্তাব নিয়েও আলোচনা হবে। গতবার ৪০—২৮ ভোটে প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে গিয়েছিল। এবছর ওয়েলস পুনরায় উত্থাপন করেছে জাপানের প্রাধান্য খর্ব করবার জন্য। বেলজিয়াম ওয়েস্ট জার্মানী এবং ইউরোপের আরও কয়েকটি দেশ ওয়েলসের সমর্থক। বিশ্ব টেবিল টেনিস ফেডারেশনের সভাপতি আইভর মণ্টেগু এই হীন প্রস্তাবের বিরোধী। গতবার তাঁরই প্রচেষ্টায় প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে গিয়েছিল। দেখা যাক এবার কি হয়!

বিজয়ীর ট্রফি সহ উপর্যুপরি দু' বছরের মহিলা রাইফেল চ্যাম্পিয়ন মিসেস সবিতা চ্যাটার্জি

নীচে সোয়েদলিং কাপ ও কর্বিলন কাপে কোন্ দেশকে কোন্ গ্রুপে খেলতে হবে তার তালিকা দেওয়া হ'লঃ—

সোয়েদলিং কাপ

গ্রুপ "এ":—চেকোশ্লাভাকিয়া, ফ্রান্স, ব্রেজিল, মিশর, নেদারল্যাণ্ডস, পাকিস্থান, ইটালী, নিউ জার্সি।

গ্রুপ "বি"—হাঙ্গেরী, আমেরিকা,

'বিসমোর' রাইফেল চালনার (স্ট্যাণ্ডিং পজিসন) বিজয়ী নীহার সেন

সুইডেন, আয়ারল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, পর্তুগাল, ফিনল্যাণ্ড ও ডেনমার্ক।

গ্রুপ "সি"—জাপান, যুগোশ্লাভিয়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনাম, অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, অস্ট্রেলিয়া, সুইজারল্যাণ্ড, নরওয়ে।

গ্রুপ "ডি"—ইংলণ্ড, রুমানিয়া, জার্মানী, ওয়েলস, স্পেন, সুইজারল্যাণ্ড, সার, লেবানন।

কর্বিলন কাপ

গ্রুপ "এ"—হাঙ্গেরী, রুমানিয়া, বেলজিয়াম, যুগোশ্লাভিয়া, স্কটল্যাণ্ড, বুলগেরিয়া, ডেনমার্ক, পাকিস্থান।

গ্রুপ "বি"—জাপান, চেকোশ্লাভাকিয়া, ফ্রান্স, মিশর, নেদারল্যাণ্ডস, সার, আয়ারল্যাণ্ড।

গ্রুপ "সি"—ইংল্যাণ্ড, অস্ট্রিয়া, আমেরিকা, জার্মানী, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড।

* * *

আজমীরে নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় আগামী বছরের কর্মকর্তা নির্বাচন পর্ব সমাধা হয়েছে। সামান্য অদল বদল ছাড়া অধিকাংশ কর্মকর্তাই পুনরায় স্বপদে বহাল হয়েছেন। কোটারী হিসাবে একটি সংস্থা পরিচালিত হলে যেভাবে কর্তা নির্বাচিত হয়ে থাকে, নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশনের নির্বাচনেও তাই প্রত্যক্ষ করা গেছে। ফেডারেশনের বার্ষিক সভায় প্রধান প্রধান প্রতিযোগিতা পরিচালনার সময়েরও একটা গণ্ডি নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রতি বছরই এভাবে গণ্ডি এ'কে দেওয়া হয়, কিন্তু ফেডারেশনের নির্দেশ অনুযায়ী প্রতিযোগিতা পরিচালিত হয় কি? এ বছর ফেডারেশন আই এফ এ শীল্ড প্রতিযোগিতার খেলার সময় নির্দিষ্ট করেছেন মাত্র ১৩ দিন। ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। কিন্তু ১৩ দিনে আই এফ এ শীল্ডের খেলা শেষ করা সম্ভব কি? সমস্ত খেলা একদিনে মীমাংসিত হলেও ১৩ দিনে প্রতিযোগিতা শেষ হয় না। তারপর আছে খেলা ড্র'র প্রশ্ন। গতবার রোভার্স এবং ডুরাণ্ড প্রতিযোগিতার সঙ্গে দিন তারিখের সামঞ্জস্য করতে না পারায় ভারতের কয়েকটি শক্তিশালী দলকে একটি প্রতিযোগিতার খেলা থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিতে হয়। এবারও যেভাবে সময়ের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাতে দুই প্রতিযোগিতায় অংশ গ্রহণের অভিলাষী অনেক দলকেই অসুবিধায় পড়তে হবে সন্দেহ নেই। শুধু ফুটবল কেন ক্রিকেটেও এই অবস্থা। ভারতীয় ক্রিকেট কণ্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি বিজয়নগরের মহারাজকুমার বলেছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট টীমের পাকিস্থান সফরের আগেই রনজি প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হয়ে যাবে। সেই রনজি প্রতিযোগিতার খেলা এখনো শেষ হয়নি। শেষ হয়নি বাঙলার ক্রিকেট খেলা। বাঙলার তাপমাত্রা ১০২ ডিগ্রীতে উঠেছে। ঘরে টেকাই দায়। এরই মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে

মোহনবাগান আর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সি এ বি নক আউট প্রতিযোগিতার সেমি ফাইন্যাল খেলায়। অপর সেমি ফাইন্যাল এবং ফাইন্যাল খেলা এখনো বাকি। তাই বলছিলাম, খেলার সময় নির্দিষ্ট করা বড় কথা নয়, সময় মত খেলা শেষ করাই বড় কথা। নিখিল ভারত ফুটবল ফেডারেশন বিভিন্ন প্রতিযোগিতা পরিচালনার যে গণ্ডি এ'কে দিয়েছেন, নীচে তা প্রকাশ করছি।

আই এফ এ শীল্ড—১লা সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত।

দিল্লী ক্লথ মিল—১৫ই সেপ্টেম্বর থেকে ৯ই অক্টোবর।

রোভার্স কাপ—২০শে সেপ্টেম্বর থেকে ২৪শে অক্টোবর।

আন্তঃরাজ্য বা জাতীয় ফুটবল—১৭ই নবেম্বর থেকে ৭ই ডিসেম্বর।

ডুরান্ড কাপ—২৩শে অক্টোবর থেকে ১৫ই নবেম্বর।

স্ট্যাফোর্ডস ...কাপ (মহীশূর)—১লা ডিসেম্বর থেকে ১৩ই ডিসেম্বর।

* * *

উপর্যুপরি দুবারের 'রাবার' বিজয়ী অধিনায়ক লেন হাটন টেস্ট খেলায় বিশ্ব-বন্দিত খেলোয়াড় ডন ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড অতিক্রমের মুখে এসে পে'ীছেছেন। ডন ব্র্যাডম্যানের টেস্ট খেলায় রানের সমষ্টি হচ্ছে ৬৯৯৬। হাটন নিউজিল্যান্ডের প্রথম টেস্টের আগেই ৬৯০৪ রান করেছিলেন। নিউ-জিল্যান্ড টেস্টে তিনি প্রথম ইনিংসে ১১ ও দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৩ রান করেন, সুতরাং ব্র্যাডম্যানের রেকর্ড অতিক্রম করতে তার আর ৭৯ রানের প্রয়োজন। সবাই আশা করছে অকল্যান্ড টেস্টে হাটন এই রান করে ব্র্যাড-ম্যানকে অতিক্রম করবেন। ক্যাচ ধরায় ওয়ালী হ্যামন্ডের রেকর্ড ১১০। হ্যামন্ড ছিলেন 'স্লিপের' ফিল্ডম্যান আর ইভান্স উইকেট কিপার। যাই হোক ইভান্স যদি অকল্যান্ড টেস্টে আর তিনটি ক্যাচ লুফতে পারেন, তবে ক্যাচ ধরায় নূতন রেকর্ডের অধিকারী হবেন। অকল্যান্ডে নিউ-জিল্যান্ড ও ইংলন্ডের দ্বিতীয় টেস্ট খেলা আরম্ভ হচ্ছে ২৫শে মার্চ থেকে। মার্চের ৩০শে খেলাটি শেষ হবার কথা। এই সঙ্গেই শেষ হচ্ছে ইংলন্ডের অস্ট্রেলিয়া ও নিউজি-ল্যান্ড সফর।

ইংলন্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক ওয়ালী হ্যামন্ড টেস্টে মোট ৭,২৪৯ রান করবার পর অবসর গ্রহণ করেছেন। হাটন ব্র্যাডম্যানের রানসংখ্যা অতিক্রম করতে পারলে সমষ্টি রানের প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান ইংলন্ডেরই অধিকারে থাকবে।

ইংলন্ডের উইকেট কিপার গডফ্রে ইভান্স, যাঁকে বর্তমান বিশ্বের শ্রেষ্ঠ উইকেটকিপার বলে অভিহিত করা হয়েছে, তিনি ক্যাচ ধরায় নূতন রেকর্ড করতে যাচ্ছেন। ক্যাচ ধরে ও 'স্ট্যাম্পড' করে ইভান্স এপর্যন্ত টেস্ট খেলায় ১৪৬জন ব্যাটসম্যানকে আউট করেছেন।

জাতীয় রাইফেল চালনার জুনিয়র চ্যাম্পিয়ন ধরমরাজ গুপ্ত

প্যান-আমেরিকান স্পোর্টসে দুইটি বিশ্ব রেকর্ড

হপস্টেপ ও জাম্প—মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত প্যান-আমেরিকান এ্যাথলেটিক গেমে হপ স্টেপ ও জাম্পে ব্রেজিলের এ্যাথলীট এ এফ ডা'সিলভা নূতন বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী হয়েছেন। ১৯৫২ সালে সোভিয়েট রাশিয়ার এ্যাথলীট স্কির্বাকোভ ৫৩ ফুট ২½ ইঞ্চি লাফিয়ে হপ স্টেপ ও জাম্পে নূতন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, কিন্তু প্যান-আমেরিকান স্পোর্টসে ডা'সিলভা ৫৪ ফুট ৩½ ইঞ্চি লাফিয়ে নূতন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। গত ৬ বছরের মধ্যে হপ স্টেপ ও জাম্পে ভারতের কোন এ্যাথলীট নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেননি। ১৯৪৮ সালে মহীশূরের এ্যাথলীট এইচ রেবেলো ৫০ ফুট ২ ইঞ্চি লাফিয়ে যে ভারতীয় রেকর্ড করে-ছিলেন, সেই রেকর্ডই বলবৎ রয়েছে।

৪০০ **মিটার**—যুক্তরাষ্ট্রের এ্যাথলীট লাউ জোনস ৪০০ মিটার দৌড় নূতন বিশ্ব রেকর্ড প্রতিষ্ঠা করেছেন। মেক্সিকোয় প্যান-আমেরিকান গেমসে তিনি ৪৫·৪ সেকেন্ড সময়ে ৪০০ মিটার দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন জামাইকার দৌড়বীর জর্জ রডেন, তিনি ৪৫৮ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার দৌড়েছিলেন। জোনসের সময় রডেনর সময়ের চেয়ে ৪ সেকেন্ড কম। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ৪০০ মিটার দৌড়ে ভারতীয় রেকর্ডের অধিকারী সার্ভিসেস টীমের যোগীন্দার সিং। যোগীন্দার সিং সম্প্রতি ইডেন উদ্যানে অনুষ্ঠিত জাতীয় এ্যাথলেটিক চ্যাম্পিয়নসিপে ৪৮ সেকেন্ডে ৪০০ মিটার দৌড়েছেন।

দ্বিতীয় ভলিবল টেস্টে রাশিয়া বিজয়ী—ত্রিবান্দ্রামে ভারত ও রাশিয়ার দ্বিতীয় ভলিবল টেস্ট খেলায় রাশিয়া ১৫—৩, ১৫—১০ ও ১৫—৭ পয়েন্টে ভারতকে পরাজিত করেছে। কলকাতায় প্রথম টেস্ট খেলায় ভারত রাশিয়াকে পরাজিত করেছিল। রুশ-ভারত তিনটি টেস্টের বাকী টেস্ট খেলা দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হবে।

লণ্ডন অভিমুখে ভারতের ক্রিকেট খেলোয়াড়গণ—ল্যাঙ্কাশায়ার লীগে বিভিন্ন ক্লাবের পক্ষে খেলবার জন্য ভারতের কয়েকজন খেলোয়াড় লণ্ডন অভিমুখে যাত্রা করেছেন। নীচে খেলোয়াড়দের নাম দেওয়া হল:—

ভি এল মঞ্জরেকার, পলি উমরিগর, এ বি আব্রাহাম, ওয়াই বি পালোয়াঙ্কর, জি এস রামচাঁদ, জে বি পালোয়াঙ্কর, ডি জি ফাদকার, বিজয় হাজারে ও সি জি বোর্ডে।

পিটার মের হাজার রান:—এম সি সি দলের অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড সফরে অধিনায়ক হাটন ইতিপূর্বেই হাজার রান পূর্ণ করেছেন। এম সি সির সহ-অধিনায়ক পিটার মেরও হাজার রান পূর্ণ হয়েছে। এম সি সি দলের আর কেউই এখন পর্যন্ত হাজার রাণ করতে পারেন নি।

টমাস কাপে ভারত ও হংকংয়ের খেলা—আন্তর্জাতিক টমাস কাপে ভারত ও হংকংয়ের খেলাটি এপ্রিল মাসের ৯ই ও ১০ই বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত হবে।

দেশী সংবাদ

১৪ই মার্চ—প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু অদ্য লোকসভায় সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বিলের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, সম্পত্তি দখলহেতু ক্ষতিপূরণ দানের প্রণালী ও পরিমাণ সম্পর্কে সংসদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিষয়ে রাষ্ট্র যে নীতি অনুসরণ করিতে চাহেন, আদালতের সিদ্ধান্তের দ্বারা তাহা ব্যাহত হইতে দেওয়া হইবে না।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহের সভাপতি ও সম্পাদকগণের তিনদিনব্যাপী সম্মেলনের উদ্বোধন প্রসঙ্গে কংগ্রেস কর্মীদিগকে ব্যাপকভাবে গঠনমূলক কার্যে আত্মনিয়োগ করিয়া কংগ্রেসকে শক্তিশালী করার জন্য আহ্বান জানান।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার পুলিস বাজেট সম্পর্কে আলোচনাকালে বিরোধী পক্ষ হইতে পুলিসের বিরুদ্ধে উৎকোচ গ্রহণ ও অন্যান্য দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়। বিতর্কের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায় বলেন যে, পুলিসের মধ্যে দুর্নীতি দূর করিতে গেলে জনসাধারণের সহযোগিতা অত্যাবশ্যক।

মার্চ মাসের প্রথম ১৩ দিনে পূর্ব পাকিস্থান হইতে মাইগ্রেশন সার্টিফিকেট লইয়া ১,৬১৯টি পরিবারের মোট ৬,৫১৮ জন উদ্বাস্তু শিয়ালদহ স্টেসনে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

১৫ই মার্চ—সংবিধান (চতুর্থ সংশোধন) বিল যুক্ত সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহরু গতকল্য যে প্রস্তাব করেন, অদ্য লোকসভায় তাহা ৩২২—৯ ভোটে গৃহীত হয়। ক্যুনিস্ট এবং প্রজা-সমাজতন্ত্রী সদস্যগণ বিলটি সমর্থন করেন। শ্রী এন ভি গ্যাডগিল (কংগ্রেসী) বলেন, কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচারপত্রে যে সব সমাজ সংস্কারের কথা উল্লিখিত হইয়াছিল, তাহাকে বাস্তবক্ষেত্রে রূপায়িত করার জন্য এই বিলের একান্ত প্রয়োজন।

নয়াদিল্লীতে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিসমূহের সভাপতি ও সম্পাদকগণের সম্মেলনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে যে, আসন্ন গ্রীষ্মাবকাশে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যুবশিক্ষা শিবির স্থাপন করিয়া দেশের পাঁচ শত যুবককে শিক্ষাদান করা হইবে।

১৬ই মার্চ—কেন্দ্রীয় আইন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী এইচ ভি পাটাশকর আজ রাজ্যসভায় হিন্দু নাবালক এবং অভিভাবকত্ব বিল সম্পর্কে যুক্ত সিলেক্ট কমিটির রিপোর্ট উপস্থিত করেন। সিলেক্ট কমিটি সুপারিশ করিয়াছেন যে, মাতা সাধারণত পাঁচ বৎসর বয়স পর্যন্ত সন্তানকে তাঁহার তত্ত্বাবধানাধীনে রাখিতে পারিবেন। অভিভাবক নিয়োগ সম্পর্কে কমিটির সুপারিশ এই যে, আইনানুযায়ী অভিভাবক নিয়োগের ব্যাপারে পিতা এবং মাতার মোটামুটি সমান অধিকার থাকিবে।
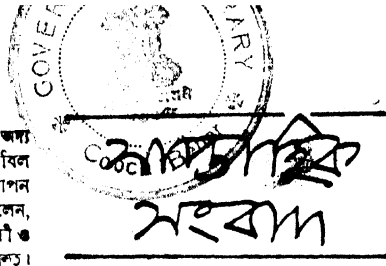
বোম্বাইয়ের নিকট ট্রম্বেতে বার্মা শেল তৈল শোধনাগারের উদ্বোধন করিয়া উপরাষ্ট্রপতি ডাঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন বলেন, আণবিক শক্তির কল্যাণমূলক ব্যবহারে দুই এক যুগের মধ্যেই একটি নূতন শিল্প বিপ্লব গড়িয়া উঠিবে।

১৭ই মার্চ—আজ লোকসভায় কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা পুনরায় আরম্ভ হইলে বিভিন্ন দলের কয়েকজন সদস্য এইরূপ অভিযোগ করেন যে, চারি বৎসরব্যাপী পরিকল্পনা অনুযায়ী উন্নয়ন সত্ত্বেও কৃষকদের অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটিতেছে। তাঁহারা বলেন, পরিকল্পনা প্রণেতারা উৎপাদন বৃদ্ধির উপর সমস্ত গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু সেইসঙ্গে তাঁহারা জনসাধারণের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টা করেন নাই। ইহার ফলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার সাধারণ ভারসাম্য ক্ষুন্ন হইয়াছে।

১৯শে মার্চ—আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় খাদ্য ও সাহায্য মন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন ঘোষণা করেন যে, পশ্চিমবঙ্গে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আশঙ্কার কোন কারণ নাই। গভর্নমেণ্টের হাতে যথেষ্ট চাউল মজুত আছে। যেখানেই প্রয়োজন হইবে সেখানেই খাদ্য প্রেরণ করা হইবে এবং জীবন রক্ষার জন্য সর্বপ্রকার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে।

২০শে মার্চ—অন্ধ্র কংগ্রেস আইনসভা আজ শ্রী বি গোপাল রেড্ডিকে সর্বসম্মতিক্রমে দলপতি নির্বাচিত করিয়াছেন। শ্রী রেড্ডি নয়জন সদস্য লইয়া মন্ত্রিসভা গঠনের সংকল্প করিয়াছেন।

ভারত সরকারের পুনর্বাসন মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। উহাতে জানা যায় যে, ভারতে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ৮১ লক্ষ ৩২ হাজার; তাঁহাদের মধ্যে পশ্চিম পাকিস্থান হইতে আগত উদ্বাস্তুদের সংখ্যা ৪৭ লক্ষ। ১৯৫৪-৫৫ সালের শেষাবধি ভারতে উদ্বাস্তু পুনর্বাসন বাবদ মোট ২৯৩ কোটি ৬৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হইবে।

আজ কলিকাতায় ওয়েলিংটন স্কোয়ারে অনুষ্ঠিত বস্তীবাসীদের এক সভায় প্রস্তাবিত কলিকাতা উন্নয়ন (সংশোধন) বিলের প্রত্যাহার অথবা বস্তীবাসীদের স্বার্থের অনুকূলে কতগুলি ব্যবস্থা ঐ বিলে সন্নিবিষ্ট করিবার দাবী জানাইয়া একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ডাঃ প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এই সভায় সভাপতিত্ব করেন।

বিদেশী সংবাদ

১৫ই মার্চ—অদ্য পাকিস্থানের গভর্নর-জেনারেল মিঃ গোলাম মহম্মদ সিন্ধু নদের কোৎরী বাঁধের উদ্বোধন করেন। পাকিস্থানের ইহাই প্রথম বৃহৎ সেচ পরিকল্পনা।

১৬ই মার্চ—বৃটিশ পার্লামেণ্টের শ্রমিক দল আজ দলীয় নিয়মশৃঙ্খলা লঙ্ঘনের অভিযোগে বামপন্থী নেতা মিঃ আনুরিন বিভানের সক্রিয় সদস্য থাকিবার অধিকার অস্বীকার করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্তের ফলে মিঃ বিভান শ্রমিকদল হইতে কার্যত বহিষ্কৃত হইলেন।

মার্কিন প্রেসিডেণ্ট আইসেনহাওয়ার সংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, আণবিক অস্ত্র প্রয়োগের উপযুক্ত সামরিক লক্ষ্যবস্তু যদি থাকে, তবে যে কোন যুদ্ধেই উহা ব্যবহার করা যাইতে পারে।

১৮ই মার্চ—গতকল্য সন্ধ্যার সময় ১৫ মিনিটব্যাপী প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যা পূর্ব পাকিস্থানের রাজধানী ঢাকা নগরীর এক বৃহৎ অংশে ধ্বংসের চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। অন্তত তিনজন নিহত হইয়াছে এবং বস্তী অঞ্চলসমূহে হাজার হাজার বাড়ি ধ্বংস হইয়া গিয়াছে।

রাশিয়া অদ্য ফ্রান্সকে পুনরায় একথা জানাইয়া দিয়াছে যে, ফরাসী কর্তৃপক্ষ জার্মানীর অস্ত্রসজ্জা সংক্রান্ত প্যারিস চুক্তি অনুমোদন করিলে ১৯৪২ সালের সম্পাদিত ফ্রাঙ্কো-রুশ মৈত্রী চুক্তি বাতিল হইয়া যাইবে।

১৯শে মার্চ—লণ্ডনের পার্লামেণ্টারী মহলে এই মর্মে সংবাদ রটিয়াছে যে, প্রধানমন্ত্রী স্যার উইনস্টন চার্চিল পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্যার এণ্টনী ইডেনের হস্তে প্রধানমন্ত্রিত্ব অর্পণ করিয়া আগামী মাসের প্রথমভাগে অবসর গ্রহণ করিতেছেন।

২০শে মার্চ—সিন্ধু সরকার তাঁহাদের বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্রের সন্ধান পাইয়াছেন। এই ষড়যন্ত্রে প্রাদেশিক মন্ত্রিগণকে হত্যা এবং ব্যাপক অরাজকতা সৃষ্টির পরিকল্পনা করা হইয়াছিল। এই সম্পর্কে পাকিস্থানের মহম্মদ আলি মন্ত্রিসভার ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী এবং সিন্ধু বিধানসভার স্পীকার মীর গোলাম আলি খাঁ তালপুর এবং সিন্ধুর ভূতপূর্ব প্রধানমন্ত্রী পীর ইলাহি বক্সকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে।

প্রতি সংখ্যা—৵০ আনা, বার্ষিক—২০, ষান্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক ৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন

সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

সাময়িক প্রসঙ্গ
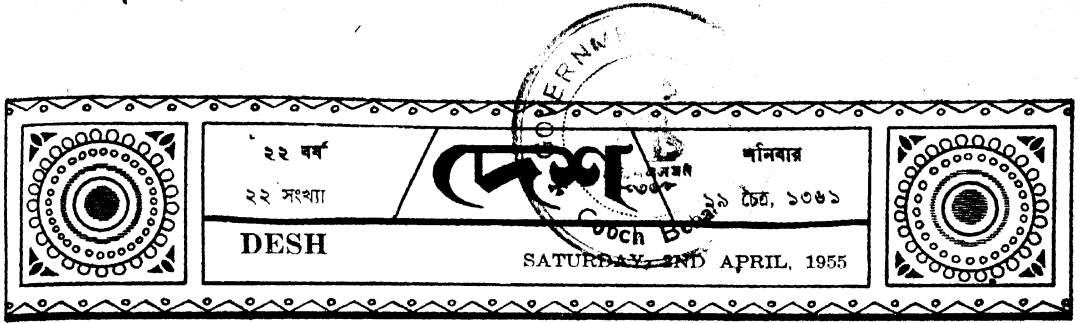
সতীন সেন

স্বদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে বৈপ্লবিক বীর্য, উদার মানবতার উদ্দাম গতিবেগে অভীষ্ট সিদ্ধির উদ্দেশে সর্ববিধ বাধাবিঘ্ন বরণ করিবার দুরন্ত প্রাণ-বল এবং ত্যাগ ও বৈরাগ্যের অনাবিল মহিমায় উদ্দীপ্ত চরিত্র-শক্তির প্রভাবে সমগ্র জীবন উজ্জ্বল করিয়া বাংলার বীর সাধক, সার্থক কর্মসন্ন্যাসী, শক্তিমান্ জননায়ক শ্রীসতীন সেন ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়াছেন। বৈদেশিক স্বেচ্ছাচারী শাসকদের বিরুদ্ধে তিনি প্রথম-জীবন হইতেই সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। বিদেশীর শাসনের অবসান ঘটিবার পরও স্বৈরাচার-মূলক শাসন-নীতির বিরুদ্ধে বীর সাধকের সেই সংগ্রামের নিবৃত্তি ঘটে নাই। গীতার আদর্শে তাঁহার জীবন নিষ্ঠিত ছিল। যুদ্ধে পলায়ন না করাই ছিল তাঁহার ধর্ম। এই বীর ধর্ম প্রতিপালন করিতে গিয়া সতীন সেন পথে পথে কণ্টকের অভ্যর্থনা লাভ করিয়াছেন। গুপ্ত সর্পের গূঢ় ফণা তাঁহাকে আঘাত করিবার জন্য প্রতিনিয়ত উদ্যত হইয়াছে। তাঁহার মাথার উপর দিয়া কালবৈশাখীর বজ্রাশনি গর্জিত হইয়াছে, কিন্তু সংকটযাত্রার পথে গতি তাঁহার কোনদিন রুদ্ধ হয় নাই। মহৎ-সাধনার জন্য দুর্দৈব বরণের এই রীতিই ছিল তাঁহার প্রকৃতি, তাঁহার বিলাস। দেশ বিভক্ত হইবার পরও সতীন সেন এই পথই বাছিয়া লইয়াছিলেন। তিনি পাকিস্থানের নাগরিকরূপে পূর্ববঙ্গকে তাঁহার কর্মক্ষেত্ররূপে গ্রহণ করেন। তথাকার সংখ্যালঘু হিন্দুদিগকে নিজেদের ভাগ্যের উপর ফেলিয়া রাখিয়া পশ্চিমবঙ্গে আসিয়া নেতৃত্বের সুলভ মান-মর্যাদা এবং জীবনের স্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি উপেক্ষা করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গের হিন্দুদের পাশে থাকিয়া আদর্শনিষ্ঠ বলিষ্ঠচেতা সতীন সেন তাহাদের মনে ভরসা জাগাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এই কারণে পূর্ববঙ্গ সরকারের কাছে সতীন সেন সাংঘাতিক লোক বলিয়া বিবেচিত হইতেন। তাঁহারা দেশপ্রেমিক, এমন কর্মীকে সর্বদা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এবং নিতান্ত অকারণে পুনঃ পুনঃ তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়াছেন। কারাগারের মধ্যেই বীরের প্রাণবলি পড়িয়াছে। কঠোর রোগাক্রান্ত হইবার পরেও তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হয় নাই। সতীন সেনের মৃত্যুতে আমরা স্বজন-বিয়োগের বেদনা অনুভব করিতেছি। সে বেদনায় শুধু পূর্ববঙ্গ নহে, পূর্ব, পশ্চিম এবং উভয় বাংলাকে উত্তপ্ত করিয়া তুলিয়াছে। বীরের এই মহামৃত্যু মহৎ-সাধনার আদর্শে আমাদের অন্তর উদ্দীপ্ত করিবে, এবং প্রাণময় সেই প্রতিবেশে আমরা তাঁহাকে জীবন্তভাবে অনুভব করিব, ইহাই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। যাঁহাদের স্বেচ্ছাচারে এবং অমানুষ হিংস্র বর্বরতায় মহাপ্রাণ এমন স্বদেশপ্রেমিক সাধকের মৃত্যুর কারণ ঘটিয়াছে, তাঁহাদের নাম লুপ্ত হইয়া যাইবে, কিন্তু সতীন সেন তাঁহার আত্মদানের অপরিম্লান মহিমায় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় উজ্জ্বল হইয়া থাকিবেন।

নিরাময় যক্ষ্মা হাসপাতাল

সম্প্রতি বীরভূম জেলার হেতমপুরের সন্নিকটস্থ গিরিডাঙ্গায় যক্ষ্মা নিরাময়ের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। কলিকাতা মহানগরীতে ক্ষয়রোগের নির্ণয় ও চিকিৎসা ব্যবস্থার জন্য গত ১৯৫১ সালে নিরাময় চেস্ট ক্লিনিকের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ছাত্রছাত্রীদের চিকিৎসা ও চিকিৎসান্তে উপযোগী শিক্ষার ব্যবস্থা করা নিরাময় প্রতিষ্ঠানের বিশেষ উদ্দেশ্য। পশ্চিমবঙ্গে ক্ষয়রোগের প্রাদুর্ভাব উত্তরোত্তর মারাত্মক আকার ধারণ করিয়াছে। এই রোগ প্রধানত শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল; কিন্তু বর্তমানে ইহা গ্রামাঞ্চলেও সম্প্রসারিত হইতেছে। পূর্ববঙ্গ হইতে অগণিত উদ্বাস্তু সমাগমে ক্ষয়রোগের সম্প্রসারণজনিত সমস্যা ইতোমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গে গুরুতর হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষয়রোগ মারাত্মক হইলেও বর্তমানে এই ব্যাধি দুঃসাধ্য বলিয়া বিবেচিত হয় না, পক্ষান্তরে চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বিত হইলে এবং চিকিৎসার পর রোগীর স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কিছুদিন সতর্কতা গৃহীত হইলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই ব্যাধির প্রতিকার সাধন করা সম্ভব হয়। প্রত্যুত প্রতিষেধকমূলক সতর্কতা এবং যথাসময়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা অবলম্বিত হইবার ফলে ইউরোপের যেসব রাষ্ট্রে ক্ষয়রোগের মারাত্মক প্রাদুর্ভাব ছিল, কয়েক বৎসরের মধ্যে সেসব স্থানে উল্লেখযোগ্যভাবে তাহা নিরোধ সাধিত

হইয়াছে। এদেশেও ইহা সম্পূর্ণরূপেই সম্ভব। দুঃখের বিষয় এই যে, এই রোগের প্রতিষেধক চিকিৎসার যথোচিত ব্যবস্থা অবলম্বন সম্পর্কিত অভাব এদেশে একান্তভাবেই রহিয়াছে। হাসপাতালের সংখ্যা মুষ্টিমেয় এবং সেগুলিতে বিশেষভাবে স্থানাভাব। নিরাময় প্রতিষ্ঠান পশ্চিমবঙ্গের এই একান্ত অভাব পরিপূরণের জন্য অগ্রসর হইয়াছেন। শহর হইতে দূরে পল্লী অঞ্চলে যক্ষ্মার চিকিৎসা কেন্দ্র এবং তদুপযোগী স্বাস্থ্যনিবাস প্রতিষ্ঠাকল্পে তাঁহাদের মানবতার মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত এই উদ্যম সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। বীরভূমের গিরিডাঙ্গার চিকিৎসাগারটি সম্পূর্ণ করিতে অন্তত দশ লক্ষ টাকা প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তৃগণ এজন্য জাতির নিকট অর্থসাহায্যের আবেদন করিয়াছেন। তাঁহাদের এই আবেদন আর্ত এবং পীড়িত নরনারীর অশ্রুমোচনে সর্বত্র উপযুক্ত সাড়া জাগাইবে এবং সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ উদার হস্তে এই মহনীয় প্রচেষ্টায় অর্থসাহায্য প্রদানে অগ্রসর হইবেন, আমরা এই আশা করি।

পরলোকে মোহিনী দেবী

প্রখ্যাতনাম্নী কংগ্রেসনেত্রী শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী বিরানব্বই বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। গত ১৯২১ সালে অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ হইলে তিনি জাতির মুক্তি আন্দোলনের ক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়ান। যে সব মহিলা স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করিয়া কারাবরণ করেন, তিনি তাঁহাদের অন্যতম, এমন কি অগ্রণী ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবী যে পরিবারের কন্যা ও যে পরিবারের বধূ ছিলেন, তাহার প্রতিবেশ স্বাধীনতা আন্দোলনের অনুকূল ছিল না। দেশ এবং জাতির সেবার আহ্বানে তাঁহাকে তৎকালীন সামাজিক বিধিনিষেধের বাধা এবং পারিবারিক সংস্কারের বন্ধন ছিন্ন করিতে হয়। কংগ্রেসের আদর্শ প্রচারে এবং তৎপ্রতি নিষ্ঠায় শ্রীযুক্তা মোহিনী দেবীর সাধনা বাংলার সর্বত্র বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। মাতৃত্বময়ী মধুরভাষিণী, দয়ার্দ্রচিত্তা মহীয়ষী মোহিনী দেবীর স্মৃতি আমাদের অন্তরে সমুজ্জ্বল থাকিবে এবং সমগ্র জাতি তাঁহাকে শ্রদ্ধার সহিত স্মরণ করিবে।

যোগ্যের সম্মান

প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুত রাজশেখর বসু তাঁহার 'কৃষ্ণকলি ইত্যাদি গল্প' এবং লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঔপন্যাসিক শ্রীযুত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার লিখিত 'আরোগ্য নিকেতনের' জন্য ১৯৫৪-৫৫ সালের রবীন্দ্র বৃত্তি পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই সুকৃতী পুরুষ। ইঁহাদের সাধনা বাঙলা দেশের সাহিত্যকে অশেষভাবে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছে এবং দেশ ও জাতির গৌরব সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। যোগ্যের প্রতি এই সম্মান বিধানে আমরা আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমরা বঙ্গবাণীর একনিষ্ঠ সেবক এবং বঙ্গজননীর এই সুসন্তানদ্বয়কে এতদুপলক্ষে আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

যাদুঘর অপসারণ

কলিকাতা হইতে যাদুঘরটিকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার চেষ্টা চলিতেছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তরের এত কাজ থাকিতে তাঁহারা এই প্রতিষ্ঠানটিকে কলিকাতার সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ হইতে অপসারিত করিয়া দিল্লীর উত্তপ্ত রাজনীতিক এবং জন-জীবনের সহিত একান্ত সংযোগবিহীন অভিজাত পরিমণ্ডলের মধ্যে লইয়া ফেলিবার বাতিকের কি হেতু বশবর্তী হইলেন, তাহা আমাদের বুদ্ধির অগম্য। প্রত্যুত দিল্লী ভারতের রাজধানী হইলেও জাতির সাংস্কৃতিক দিক হইতে কলিকাতা মহানগরীর মর্যাদা অদ্যাপি ক্ষুণ্ণ হয় নাই। সমগ্র ভারতের শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল কলিকাতা। সমাজের সর্বস্তরে সংস্কৃতিকে সম্প্রসারিত করিবার উপযোগী প্রতিবেশ এখানে রহিয়াছে, দিল্লীতে তাহার একান্তই অভাব। জনগণের মধ্যে শিক্ষা এবং সংস্কৃতির সম্প্রসারণ করাই যদি কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি হয়, তবে তাঁহাদের শিক্ষা দপ্তরের এই উদ্যমের মূলীভূত মানস-বিলাস সম্পূর্ণরূপেই সে নীতির পরিপন্থী। কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় যদি দিল্লীতে যাদুঘর স্থাপনের ইচ্ছা করিয়া থাকেন, করুন। কিন্তু কলিকাতার যাদুঘরটিকে দিল্লীতে টানাটানি করিবার কোন দিক দিয়াই কোন হেতু নাই। আমরা জানিতে পারিলাম, যাদুঘরের ট্রাস্টিগণ ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকারের এই অশুভ উদ্যোগের প্রতিবাদ জানাইয়াছেন। শুনিতেছি, এই সব প্রচেষ্টার ফলও ফলিয়াছে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা দপ্তর বর্তমানের মত কলিকাতা হইতে যাদুঘর অপসারণের প্রস্তাব পরিত্যাগ করিয়াছেন, কিন্তু চিরদিনের জন্য নয় কেন?

পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতি

মালদহে আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিক সম্মেলনের আলোচনা পশ্চিমবঙ্গের বাস্তব সমস্যা সমাধানে কংগ্রেসকর্মীদিগকে অনুপ্রাণিত করিবে, আমরা ইহাই আশা করি। সমগ্র ভাবে ভারতের সমস্যা রহিয়াছে, কিন্তু দেশ বিভাগের ফলে পশ্চিমবঙ্গের নিজস্ব কতকগুলি সমস্যা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে এবং সে সমস্যাগুলি এরূপ যে, সেগুলির সমাধানের উপর ভারতের বৃহত্তর স্বার্থ ও সমুন্নতি নির্ভর করিতেছে। সুতরাং প্রাদেশিকতার অছিলায় সেই সব প্রশ্ন গৌণ পর্যায়ে পরিণত না হয়, এজন্য কংগ্রেসকর্মীদের আন্তরিকতা উদ্দীপ্ত হওয়া প্রয়োজন। উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের সমস্যা পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে একান্ত গুরুতর এবং এই সমস্যার সঙ্গে বেকার সমস্যা উত্তরোত্তর বর্ধিত হইয়া পশ্চিমবঙ্গের সমাজজীবনকে অভিভূত করিয়া ফেলিয়াছে। এই অবস্থার অবিলম্বে প্রতিকার সাধিত না হইলে বাঙলার সভ্যতা ও সংস্কৃতি ধ্বংস পাইবে, এমন আশঙ্কার সত্যই কারণ ঘটিয়াছে। ত্যাগ ও জনসেবার আদর্শ কংগ্রেসের কর্মসাধনাকে উদ্দীপিত করিয়া এবং নিষ্ঠার সঙ্গে সেই আদর্শ প্রতিপালনের দিকে পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসনীতিকে প্রযুক্ত করিয়া সমাজ-জীবনে নূতন প্রাণশক্তি সঞ্চার করা বর্তমানে একান্ত আবশ্যক। বিপন্ন পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে প্রকৃত দেশসেবক এবং ত্যাগী কর্মীর আজ প্রয়োজন। বস্তুত নেতৃত্বাভিমানীদের বাগ্‌পটুতা বর্তমানে বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহা আমাদের বিড়ম্বনাই বাড়াইয়া চলিয়াছে।

২৭শে মার্চ তারিখে ফরাসী পার্লামেন্টের ঊর্ধ্বতন পরিষদ সেনেট কর্তৃক "প্যারিস চুক্তিসমূহ" অনুমোদিত হয়েছে। গত ৩০এ ডিসেম্বর ফরাসী পার্লামেন্টের নিম্নতন পরিষদ ন্যাশনাল এ্যাসেম্ব্লী উক্ত চুক্তিগুলি অনুমোদন করেছিলেন। "প্যারিস চুক্তিসমূহ" বলতে চারটি চুক্তি বুঝায়। একটির দ্বারা জার্মান ফেডারেল রিপাব্লিকের অর্থাৎ পশ্চিম জার্মান রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত হবে। একটির দ্বারা পশ্চিম জার্মানী ও ইটালীকে প্রস্তাবিত ওয়েস্টার্ন ইয়োরোপিয়ান ইউনিয়নের ভিতরে নেওয়া হবে—তার অর্থ, জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণে সম্মতি দান। তৃতীয় চুক্তিটির দ্বারা জার্মান ফেডারেল রিপাবলিককে NATO'র অন্তর্ভুক্ত করা হবে। চতুর্থ চুক্তিটি হচ্ছে সার অঞ্চল বিষয়ক।

"প্যারিস চুক্তিসমূহ" বেলজিয়াম, হল্যান্ড প্রভৃতি কয়েকটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কর্তৃক অনুমোদিত হতে এখনো বাকী আছে। কিন্তু এদের অনুমোদন সুনিশ্চিত। অনিশ্চয়তা ছিল ফ্রান্সকে নিয়ে। জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবে ফ্রান্সকে রাজী করাতে ইংগ-মার্কিন কর্তাদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছে। শেষ পর্যন্ত ফরাসী পার্লামেন্টের অনুমোদন পাওয়া গেছে কিন্তু বিরুদ্ধ ভোটের পরিমাণও অল্প ছিল না। জার্মান পুনরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব পাশ করিয়ে নিতে পশ্চিম জার্মানীতে এ্যাডেনয়ের গভর্নমেণ্টকেও যথেষ্ট বিরুদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়েছে। পশ্চিম জার্মানীর প্রধান বিরুদ্ধ দল সোশ্যাল ডেমোক্রাটরা বর্তমান পরিস্থিতিতে জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ এবং NATOতে যোগদানের প্রস্তাবে আপত্তি করেন।

বলা বাহুল্য, এ ব্যাপারে ফরাসী ও জার্মানদের আপত্তির কারণ সম্পূর্ণ আলাদা। ফরাসীদের ভয় হচ্ছে জার্মানরা পুনরস্ত্রীকরণের অধিকার পেলে অচিরেই আবার দুর্ধর্ষ হয়ে উঠবে। অন্য জাতিরা যেমন ইচ্ছা তেমনি করতে পারবে কিন্তু জার্মানদের অস্ত্রধারণের অধিকার থাকবে না। এটা কোনো জার্মানেরই ভালো লাগতে পারে না, কিন্তু অনেক জার্মানের মনে এই আশংকা রয়েছে যে, পশ্চিম জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ এবং পশ্চিমা শক্তিজোটের অংগীভূত হওয়ার ফলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভাঙ্গা জার্মানীর জোড়া লাগানোর সম্ভাবনা আর থাকবে না। বলা বাহুল্য যে, রাশিয়া জার্মানদের এই আশংকা দৃঢ়তর করার জন্য সর্ববিধ চেষ্টা করেছে কারণ পশ্চিম জার্মানীর রণশক্তি NATO'র সংগে যুক্ত হয় রাশিয়া তা কখনই চাইতে পারে না। রাশিয়া বার বার ঘোষণা করেছে যে, "প্যারিস চুক্তিসমূহ" যদি অনুমোদিত হয় তবে শান্তিপূর্ণ উপায়ে জার্মানীর একীকরণ সম্পর্কে কথাবার্তা কওয়ার আর কোনো অবসর থাকবে না।

ফ্রান্সের উদ্দেশে রাশিয়ার ঘোষণাদির লক্ষ্য ছিল জার্মানী সম্পর্কে ফরাসীদের স্বাভাবিক আশংকা বাড়ানো এবং সংগে সংগে এই আশার উদ্রেক করা যে রাশিয়ার সংগে পশ্চিমা শক্তিদের একটা মিটমাট সম্ভব যাতে করে জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণ আবশ্যক হবে না।

পশ্চিমা শক্তিরা বলে আসছে, রাশিয়া জার্মান সমস্যার কোনো প্রকৃত গণতান্ত্রিক সমাধান চায় না, তার উদ্দেশ্য কেবল ভাঁওতা দেওয়া। মার্কিন সরকার বলছেন যে, "প্যারিস চুক্তিসমূহ" অনুমোদিত হয়ে কার্যকরী হতে আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত রাশিয়ার সংগে মিটমাটের কথা বলে লাভ নেই। এ'দের বক্তব্য হচ্ছে রাশিয়া যখন দেখবে যে, পশ্চিমা শক্তিদের পরিকল্পনা ঠেকানো যাচ্ছে না তখন সে নরম হবে।

কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায়—পশ্চিমা শক্তিরা যদি পশ্চিম জার্মানীর রণশক্তিকে NATO অংগীভূত করার ব্যবস্থা করেই ফেলে তখন রাশিয়ার সংগে লেনদেনের কথা কী থাকবে? তখন রাশিয়ার পক্ষে পাল্টা সামরিক ব্যবস্থার জন্য উঠে পড়ে লাগা ছাড়া গত্যন্তর কী থাকবে? অবশ্য পশ্চিমা শক্তিদের মুখপাত্রগণ বলছেন যে, সামরিক ব্যবস্থার দিক দিয়ে যা করার সোভিয়েট সরকার তা আগে থাকতেই করে যাচ্ছেন, সোভিয়েট শক্তির সহিত পূর্ব ইউরোপের কম্যুনিস্ট রাষ্ট্রসমূহের

রণশক্তির সংহতি বৃদ্ধির ব্যবস্থা চলেইছে, এমন কি, পূর্ব জার্মানীর পুনরস্ত্রীকরণও রীতিমত চলছে।

এ বিষয়ে ঠিক করে কিছু বলা মুশকিল। তবে ফ্রান্স কর্তৃক "প্যারিস চুক্তিসমূহের" অনুমোদন হয়ে গেল বলেই সোভিয়েট ও পশ্চিমা শক্তিদের মধ্যে আপস-আলোচনার সম্ভাবনা অন্তর্হিত হল এরূপ মনে করা ভুল হবে। রাশিয়া ইতিপূর্বে যাই বলে থাকুক না কেন, "প্যারিস চুক্তিসমূহের" প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলি কাজে পরিণত হবার পূর্ব পর্যন্ত রাশিয়া সেগুলিকে ঠেকাবার চেষ্টা করবে বলেই বোধ হয়। সুতরাং কথাবার্তা বলার অবসর পেলে রাশিয়া সেটা উপেক্ষা করবে কেন? অন্যদিকে পশ্চিমা শক্তিরা তো বলেই আসছে যে, কথাবার্তা বলতে তারা উৎসুক তবে "প্যারিস চুক্তিসমূহ" বিভিন্ন দেশের পার্লামেণ্ট কর্তৃক অনুমোদিত হবার পূর্বে কথাবার্তা বলে লাভ নেই। ফরাসী সেনেটে "প্যারিস চুক্তিসমূহের" অনুমোদনের সময়েও ফরাসী গভর্নমেণ্টের পক্ষ থেকে বলা হয় যে, অতঃপর প্রধান কাজ হবে সোভিয়েট ও পশ্চিমা শক্তিদের মধ্যে আপস-আলোচনার ব্যবস্থা করা। এর অর্থ এই যে, ফরাসীরা এখনো আশা করছে যে, রাশিয়ার সঙ্গে এখনো এরকম একটা মিটমাট হতে পারে যাতে জার্মান রণশক্তির অভ্যুদয় অনিবার্য হবে না। পরে মার্কিন চুপচাপ না থাকলে ফরাসী পার্লামেণ্ট "প্যারিস চুক্তিসমূহ" অনুমোদন করত কিনা সন্দেহ। ফরাসী গভর্নমেণ্টের ভাব হচ্ছে—আমরা "প্যারিস চুক্তিসমূহ" অনুমোদন করছি এই আশায় যে অনুমোদনের পরে রাশিয়ার সঙ্গে আর একবার মিটমাটের চেষ্টা করা হবে।

সম্ভবত মার্কিন ও বৃটিশ সরকার ফরাসী সরকারকে এরকম একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। চতুঃশক্তি আলোচনার সম্ভাবনা সম্পর্কে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার সম্প্রতি সংবাদপত্র প্রতিনিধিদের সঙ্গে যে-সুরে কথা বলেছেন তা থেকে তাই মনে হয়। অন্যদিকে প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ারের কথার প্রতি সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী মার্শাল বুলগানিনের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তিনি যে-মত প্রকাশ করেন তা থেকে বুঝা যায় যে, রুশ গভর্নমেণ্টও আপস-আলোচনার সুযোগ পেলে তা উপেক্ষা করবেন না। তবে এই আলোচনার ব্যবস্থা কতদিনে হবে এবং তার ফল কী হবে তা বলা যায় না।

এ সম্পর্কে একটা কথা মনে রাখা দরকার। সেটা এই যে, চতুঃশক্তির মধ্যে কথাবার্তা যাই হোক জার্মানীর সমস্যা জার্মানদের মত ছাড়া সমাধানের আর সম্ভাবনা নেই। যে পরিস্থিতিতে এবং দুপক্ষের মধ্যে যেরকম মিতালি থাকলে জার্মানীকে দাবিয়ে রাখার ব্যবস্থা—যুদ্ধের সময়ে যার স্বপ্ন দেখা হয়েছিল—সম্ভব হত সে পরিস্থিতি ও সেরকম মিতালি বহু পূর্বেই গত হয়েছে। জার্মানদের দাবিয়ে রাখার জন্য দুপক্ষের মিলও যেমন এখন আর সম্ভব নয়, তেমনি আবার কোনো পক্ষই নিছক নিজের সুবিধার জন্য জার্মানদের ক্রীড়নকের মতো ব্যবহার করতে পারবে সে সম্ভাবনাও নেই। জার্মানরা যা করবে তা জার্মানীর জন্যই করবে, যদিও জার্মানীর পক্ষে এখন কোন্ পথ শ্রেয় হবে সে সম্বন্ধে জার্মানদের মধ্যে মতদ্বৈধ রয়েছে।

* * *

সোভিয়েট প্রেসিডেণ্ট মার্শাল ভোরোশিলভ্ সম্প্রতি পশ্চিমা শক্তিদের উদ্দেশ করে একটি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। তিনি বলেছেন, পশ্চিমা দেশগুলিতে বলা হয় যে, এবার যুদ্ধ হলে মানব সভ্যতার অবসান ঘটবে তা মোটেই ঠিক নয়, যুদ্ধ হলে যা শেষ হবে সে হচ্ছে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা। সম্প্রতি মস্কোর প্রাভ্দা পত্রিকাও লিখেছে যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে সভ্যতা বিনষ্ট হবে এ ধরনের উক্তি "অত্যন্ত ভুল এবং ক্ষতিকর"। প্রাভ্দা বলে, "গণতন্ত্র এবং সমাজবাদের পক্ষ অতিশয় প্রবল, তার শক্তি অবিনশ্বর। সাম্রাজ্যবাদীরা যদি তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ লাগায় তবে তার ফলে বিশ্বসভ্যতা নষ্ট হবে না, নষ্ট হবে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা যা পচে গেছে।"

কম্যুনিস্ট নেতাদের প্রকৃত বিশ্বাস কী বলা কঠিন। কারণ যদি তাঁরা সত্যই বিশ্বাস করেন যে, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থা নষ্ট হবে, সভ্যতা নষ্ট হবে না, তবে তাঁদের "শান্তি অভিযানের" এতো বহর কেন? যুদ্ধের দ্বারা যদি কম্যুনিস্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর নিশ্চিত সম্ভাবনা থাকে তবে সে যুদ্ধ কম্যুনিস্ট নীতির পক্ষে অকাট্য নয় বলেই তো সাধারণের ধারণা। যাই হোক, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে মানব সভ্যতার অবসান হবে কি হবে না জানি না, তবে কম্যুনিজম এবং ক্যাপিটালিজম উভয়েরই খতম হবার সম্ভাবনা আছে। ততঃ কিম্—কে জানে!

২৯।৩।৫৫

পালকের পা

বিমল কর

সেই দুঃসহ দিনে, মধ্যবৈশাখে, যখন আকাশ গলানো তামার মতন উজ্জ্বল, গাছ লতাপাতা ঝলসে যাচ্ছে, ফুল নেই, পাখিও ডাকে না তখন সে এল। একটি সারস পাখি যেন। তেমনি দুগ্ধধবল, নরম, উষ্ণ এবং আশ্চর্য সুন্দর। কেউ ভাল করে দেখে নি, কেউ বলতে পারছিল না, মহিলা বাঙালী অথবা বম্বাইবাসিনী, পাঞ্জাবী, পার্শি বা আর কিছু, অন্য কিছু। শুধু একটা গুঞ্জন উঠেছিল। পাণ্ডববর্জিত এই জায়গায়, এই জঙ্গলে শাল পলাশ উপড়ে রেসাকিউ অফিসের আর একটা ব্লক, আর একটা কোয়ার্টারের পত্তনই এখানে সম্ভব ছিল এবং সেই অজুহাতে চুন, সুরকি, সিমেণ্টের গুঁড়ো উড়বে, উড়তে শুরু করবে, এটাই ছিল প্রত্যাশিত অথচ ওসব আদপেই কিছু না হয়ে এই মধ্যবৈশাখে বসন্তের হাওয়া বইবে আচমকা, মন-আনমনা গন্ধ নিয়ে কে ভেবেছিল, কি করেই বা আশা করা যেতে পারত।

কানাকানি করছিল এরা, রেসকিউ অফিসের ক'জন ছোকরা নিজেদের মধ্যে এবং তিনজন প্রৌঢ় তাদের মধ্যে। আট-দশটা বেয়ারা চাপরাশীও আড়ালে আড়ালে। শুধু দুই অফিসারের মধ্যে কোনও চঞ্চলতা লক্ষ্য করা গেল না। তাঁদের মধ্যে একজনের এখন বিচলিত হবার মতন তাপ রক্তে নেই এবং কোনও বিশেষ ঋতুর বাতাস কী পাখি কী ফুলের ওপর স্বাভাবিক আকর্ষণ বোধ করার অনুভূতিও লোপ পেয়েছে। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ ইনি, অফিসের আরাম কেদারায় বসে অবসর সময়ে মৃত্যুর পর আত্মার গতিবিধি পাঠ করেন।

আর অপর জন সেই সারস পাখির আত্মাকে আত্মসাৎ করে বসে আছেন। অতএব তাঁর কোন চঞ্চলতা নেই, বিচলিত হবার কারণ ঘটছে না।
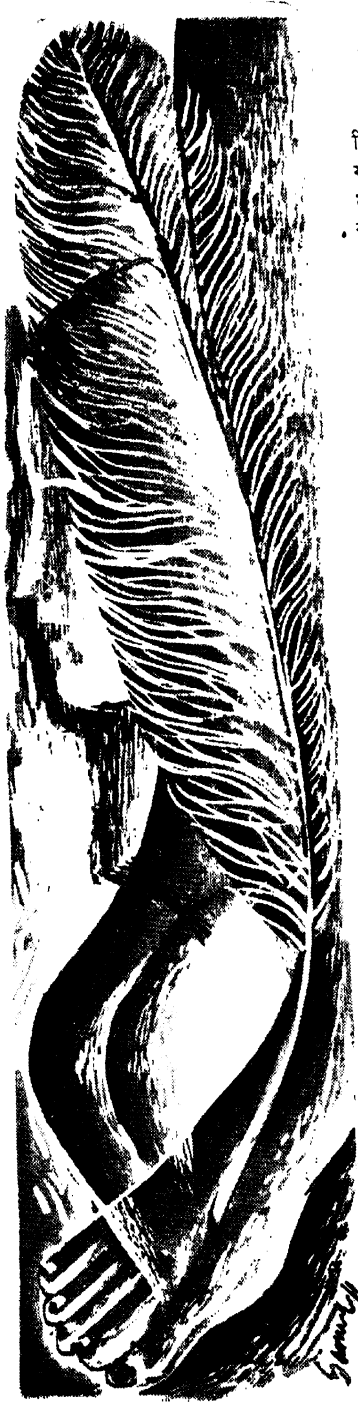
ইনি বাঙালী, উপাধি মিত্র। নৃপেন্দ্র মিত্র। অফিসে মিত্র সাহেব। এখনও যুবক, আটত্রিশের ওপারে বয়স যায় নি। মাংসল পুরুষ, কিন্তু সুপুরুষ নয়। রঙ কাল, মুখটা গোল, চওড়া কাঁধ, চোখ দুটো বন্য পশুর মতন। অবশ্য সে-চোখ ভয়ংকর বা ভীতিজনক নয়, দুরন্ত, তীক্ষ্ণ, চঞ্চল। যেন সব সময় উন্মাদনা খুঁজছে। মিত্র সাহেব কাজের লোক, অধ্যবসায়ী পুরুষ। শোনা যায়, লেখাপড়া ভাল শেখেন নি, শুধুই দক্ষতা, চেষ্টা, উৎসাহ সম্বল ছিল। বিত্তহীন হয়েও সাগরপারের হাওয়ায় ক'বছর কাটিয়ে আসতে তাই বেগ পেতে হয়নি তাঁকে। এবং এখন একটি উচ্চপদে জাঁকিয়ে বসেছেন। অনলস কর্মঠ এই ব্যক্তিটির জন্যে ভবিষ্যতে আরও রাজকীয় সৌভাগ্য কিছু অপেক্ষা করছে, একথা বোঝা যেতো। কথাটা বিশ্বাস করত রেসকিউ অফিসের ছোকরারা, বলাবলি করত। কিন্তু বিশ্বাস করতে পারেনি, মিত্র সাহেবের অমন স্ত্রী আছে, অমন সুন্দর স্ত্রী, এবং সেই স্ত্রী এখানে আসবে এই জঙ্গলে, এই দুঃসহ দিনে, মধ্যবৈশাখে যখন সব ঝলসে যাচ্ছে, ফুল নেই, পাখিও না।

কিন্তু এল। কখন এল কেউ জানলে না। যাওয়া-আসা, ঘোরাফেরার পথে ওয়াটার ট্যাঙ্কের উঁচু টিল্লার কাছে মিত্র সাহেবের ছোট বাংলোটায় কেউ কেউ তাকে দেখল আচমকা দূর থেকে এবং বর্ণনা দিলে এক সারসী উড়ে এসেছে।

সেই সারসীকে প্রথম ভালো করে দেখল মৃণাল, মিত্র সাহেবের স্টেনো টাইপিস্ট। আর দেখে দারুণ এক বিস্ময় এবং অভূতপূর্ব কেমন এক উত্তেজনা নিয়ে নিজের মধ্যে ছটফট করতে লাগল।

বুধবারের এক বিকেলে অফিস শেষ করে উঠবো উঠবো করছে মৃণাল, হঠাৎ জরুরী তলব এল মিত্র সাহেবের। চল্লিশ মাইল দূরে বসে হেড্ কোয়ার্টার থেকে তলব করছে সেক্রেটারী। ক'টা ফাইল চাপরাশীকে অফিসের গাড়িতে তুলতে বলে মিত্র সাহেব শুধু একটা সিগার ধরিয়ে নিলেন। কয়েক মুহূর্ত সিলিংয়ের দিকে তাকিয়ে কী ভাবলেন যেন, তারপর

উঠে পড়লেন। ঘর ছেড়ে চলেই গিয়েছিলেন প্রায়, হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন মৃণালকে, আঙুল দিয়ে ঘরের এক কোণে রাখা ছোট একটা বেতের টুকরি দেখিয়ে, 'ওটা আমার বাংলোয় পৌঁছে দেবার একটা ব্যবস্থা করো ত চ্যাটার্জি।' কি ভেবে একটু থেমে আবার 'বেটার হয় তুমি যদি নিজেই যেতে পার। মিসেস মিত্রকে দুটো খবর দেবার আছে। ওই ফলের টুকরিটা ও'র বান্ধবী পাঠিয়েছেন কলকাতা থেকে; আর আমি হেড কোয়ার্টারে যাচ্ছি, ফিরতে দেরি হবে।'

ফলের টুকরিটা ছোটই। গড়নটাও বাহারী। মৃণাল বেরিয়ে পড়ল হাতে ঝুলিয়ে। আর যেতে যেতে খুশী হচ্ছিল এই ভেবে, একটা সুযোগ তার ঘটে গেছে। পরে হয়ত এ সুযোগ সকলেরই ঘটবে, কিন্তু উপস্থিত সে প্রথম যে, আর খানিক পরে সেই সরসীকে দেখতে পাবে সামনাসামনি। যাকে নিয়ে এত কানাকানি, ফিসফাস, রূপকথা।

বনতুলসী আর ঝোপঝাপ পাশ কাটিয়ে মন্থর পায়েই হাঁটছিল মৃণাল। হাঁটার তালে তালে টুকরিটাও দুলছে। বেতের বুনানির ফাঁকে কমলালেবু আর নাসপাতি উঁকি দিচ্ছিল। কলকাতা থেকে আসছে। মিসেস মিত্রের নিশ্চয় খাবার টেবিলে কমলালেবু দরকার হয়। দামটাও নেহাৎ কম হবে না, এই গরমে কমলালেবুও কলকাতার বাজারে ঝুড়ি ঝুড়ি আসে না নিশ্চয়। কিন্তু দামে কি যায় আসে। কমলালেবু খেতে তিনি ভালবাসেন। তাঁকেই মানায়, তাঁর মতন অবস্থায়।

এসব কথা সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে সাজিয়ে বড় একটা ভাবছিল না মৃণাল। মনের মধ্যে আসছিল, যাচ্ছিল। এবং বেশ হাল্কা মনেই ভাবতে পারছিল। যদিও আড়ালে একটা তুলনা যে একেবারেই না-ছিল এমন নয়। আর সেরকম তুলনা আশি টাকা মাইনের টাইপিস্ট কী কেরানী হামেশাই করে থাকে।

কিন্তু ওসব আর ভাবতে ভাল লাগছিল না। বরং কি দেখবে, কেমন করে কথাগুলো বলবে এবং প্রথমে হাত তুলে নমস্কার করবে কি না, মৃণাল তাই ভাববার চেষ্টা করল। পাছে হাস্যকর কিছু করে বসে তাই মনে মনে এ মহড়া।

গেটের কাছে এসে থামল মৃণাল। একবার চোখ তুলল আকাশে। পশ্চিম কোণে এক জায়গায় কুঙ্কুমের রঙ লেগেছে। শিশুগাছের ডালে কিচির মিচির করছে ক'টা পাখি। একটু হাওয়া দিয়েছে।

বুকটা অযথাই একবার ধুক ধুক করে উঠল। তাকাল মৃণাল। কেউ কোথাও নেই। বাংলোর বারান্দায় দুটো চেয়ার মুখোমুখি করে সাজানো, একটা নিচু গোল টেবিল। ঘরের দরজা খোলা, শার্সি গুটনো, পর্দা ঝুলছে। কোথাও একটা বাতি জ্বলছে না। কেউ নেই।

বারান্দার নিচে এসে এদিক ওদিক চাইল, খুঁজল মৃণাল। একটা চাকর-বাকরও চোখে পড়ছে না। কাকে ডাকবে, কি নাম ধরে ডাকবে ঠিক করতে না পেরে বারান্দায় উঠে এল।

একটু দাঁড়িয়ে এপাশ থেকে ওপাশ যাচ্ছিল, সিমেন্টের বারান্দায় ভারী জুতোর শব্দ তুলে এবং আশা করছিল এই শব্দে ঘরের ভেতর যদি কেউ থাকে, তার দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে।

হলোও তাই। দক্ষিণের ঘরে টুক্ করে বাতি জ্বলে উঠল। পর্দার তলা দিয়ে, পাশ বয়ে একটু আলো এসে পড়ল বারান্দায়। আর মৃণাল সেই ঘরের সামনে, পর্দার এপাশে দাঁড়িয়ে শুনল অত্যন্ত মিহি, মিষ্টি একটা গলা গুন গুন করে উঠছে।

সেই গুন গুন একটু থেমেছে কি খুক্ করে একবার কাশল মৃণাল। আরও একটু সরে এল; পর্দাটা তখন গা ছুঁয়েছে। ওপাশ থেকে সেই মিহিগলা একটা হাসির ঢেউ তুলল এবার এবং হাসির ফাঁকে বলতে বলতে আসছিল কী একটা কথা যেন, যা মৃণাল শুনেও যেন শুনতে, বুঝতে পারছিল না। আর কথা শেষ হল যখন, তখন পর্দা সরে গেছে এবং পলকের মতন প্রচণ্ড একটা বিস্ময় থমকে দাঁড়িয়ে আবার মিলিয়ে গেছে। পর্দাটা দুলছে একটু।

কিন্তু ততক্ষণে চোখ আর মনের ক্যামেরায় সেই ক'টি পলক ধরা হয়ে গেছে। স্বপ্নেও এমন ছবি দুর্লভ। সেই সারসী এসেছিল এবং ঘরের আলোয় দাঁড়িয়ে সরিয়ে নিয়েছিল পর্দা। ধক্ করে একটা গন্ধ লেগেছে নাকে, মিষ্টি গন্ধ, কোনও দামী সাবানের, সুগন্ধি স্নানবারিরও হতে পারে। আর দীর্ঘ বঙ্কিম গ্রীবায় তখনও জলের ফোঁটা লেগে রয়েছে এবং বুকে। মাঝ-বুক থেকে গোড়ালির নিচু পর্যন্ত শাদা টার্কিশ টাওয়েলটা ওর মুঠোয় ধরা ছিল। চকিতে সেই শ্বেত-স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে। অথচ মনে হয় যে যায়নি, লুকনো হাওয়া থেকে আবার কখন খসে পড়বে। এখনও গন্ধ আছে ভুরভুর, এখনও একটা তুলো শরীর যেন পর্দার ওপাশে দাঁড়িয়ে চুপ করে হাসছে।

বিমূঢ় ভাবটা কাটতে সময় লাগল মৃণালের। তারপর ভয়ঙ্কর অস্বস্তি। সঙ্কোচ। এবং কেমন একটা ভয়। ঘটনাটা আকস্মিক। অপ্রত্যাশিত। মৃণাল কি করে জানবে উনি সবে স্নান সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়েছেন। আর স্পষ্টই বোঝা গেল, উনি ভাবতেই পারেন নি, এ সময় বারান্দায় মিস্টার মিত্র ছাড়া আর কেউ আসতে পারে, থাকতে পারে। যদিও এভাবে স্বামী অভ্যর্থনা অস্বাভাবিক। এবং হতে পারে যেতে যেতে নিজেকে আধো আড়াল দিয়ে স্বামীকে কিছু রহস্য করে বলতে এসেছিলেন। আবার এ-ও হতে পারে, এই সারসীর রকম আলাদা।

কিছুই স্থির করতে পারছিল না মৃণাল। ভাবনাগুলো ধোঁয়ার মতন ভেসে উঠে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। আর আড়ষ্ট হয়েই বসেছিল এবার চেয়ারে। কারণ ইতিমধ্যে একটা চাকর এসে বারান্দায় বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। বসতে বলেছে। বসার ইচ্ছে থাকলেও খুব একটা সাহস হচ্ছিল না। এর পর মুখোমুখি হতে বাধছিল। কিন্তু উপায় কি!

অথচ মহিলাটি এলে দেখা গেল তার মধ্যে কোনও আড়ষ্টতা নেই। কিছুই যেন ঘটেনি। ঘটলেও তা ভুলে গেছে।

প্রথমে মৃণালের সামনাসামনি চেয়ারটায় হাত দিয়ে দাঁড়াল। মৃণাল ভাল করে চোখ তুলতে পারল না। উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল। কোনো রকমে খবর দুটো বলল। একনিশ্বাসে। গলা কাঁপছিল এবং বুকটা ধক ধক করছিল।

মৃণালের কথা শেষ হয়ে এলে এবার অন্য পক্ষ বললে, বলার মধ্যে একটু হাসি

ছিল, অবাক করে দেবার রহস্য, 'কে, মৃণাল না!'

নাম শুনে একটু চমকে উঠল মৃণাল। অবাক চোখে তাকাল। এবং চিনতে দেরি হল না। 'তুষার!' অস্ফুট কণ্ঠে বললে ও।

ততক্ষণে চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে পড়েছে তুষারকণা।

—কি আশ্চর্য তুমি এখানে! তুষারকণা বললে হাতের বালাটা মণিবন্ধের দিকে আরও একটু ঠেলে দিয়ে মৃণালের মুখে চোখ রেখে।

ঠিক এই প্রাথমিক প্রশ্নটা মৃণালও করতে পারত। কিন্তু করল না। মাথা নেড়ে বললে, হ্যাঁ।

—চাকরী করছো তাহলে।

—করছি। তোমার স্বামীর—। বলতে গিয়ে কথাটা আটকে গেল, জিবটা হঠাৎ সতর্ক হয়ে উঠল মৃণালের। একটু থেমে বাক্যবিন্যাসটাকে পাল্টে নিয়ে বললে, 'মিস্টার মিত্রর আমি স্টেনো টাইপিস্ট।'

কেমন মেয়ে তুষার, একথা শুনে মৃণালের অবস্থাটা একটুও বুঝল না, বোঝার চেষ্টা করলে না। উল্টে কলহাস্যে এই ফাঁকা বারান্দা ভরিয়ে দিলে।

—নৃপেন তোমার বস। স্বামীর নাম ধরলে তুষার। কানে একটু লাগল মৃণালের। পরক্ষণেই মনে হল, এটা আজকাল চলতি হচ্ছে। ভালই লাগে শুনতে। তুষার থামেনি, বলে যাচ্ছিল, 'তাতে কি, আমি তোমার বসের বউ হয়েছি পরে, তার অনেক আগেই আমরা ক্লাসমেট ছিলাম। সেই পুরনো সম্পর্কটাই ত ভাল। তুমি অত সংকোচ করছো কেন।'

তাহলে মৃণাল যা ভাবছিল তা নয়, তুষার তার অবস্থাটা বুঝতে পেরেছে এবং বুঝেছে বলেই সহজ করতে চাইছে।

—তুমি এখানে আছ জানলে আগেই খবর দিয়ে পাঠাতাম।. তুষার বললে, 'সারাদিন একা আছি। কথা বলার লোক নেই।'

—কেন মিস্টার মিত্র!

—তিনি কথার চেয়ে কাজ বেশি পছন্দ করেন। বলে কেমন এক রহস্যপূর্ণ হাসি হাসল তুষার ঠোঁট টিপে।

—আর তোমাকে! অত্যন্ত অসতর্ক-ভাবেই এই পরিহাসটুকু করে ফেলল মৃণাল।

—বললাম ত। এবার তুষার ঊর্ধ্ব অঙ্গে বিচিত্র এক হাসির ঢেউ তুলে উঠে দাঁড়াল, 'বসো, চা খেয়ে যাও, আসছি।'

চা খেতে খেতে এতক্ষণে অনেকটা স্বাভাবিক চোখে তুষারকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল মৃণাল। আরও সুন্দর হয়েছে তুষার। আগে দীর্ঘাঙ্গী হলেও একটু কৃশ ছিল, এখন যেন তার শুক্ল-পক্ষের পূর্ণতা এসে গেছে। গালে, গলায়, কণ্ঠায়, বুকে, বাহুতে মসৃণ রেখা এঁকে এঁকে মাখন-কোমল মেদ লেগেছে। রঙটা যেন আরও ধব ধব করছে, সারসীর ডানার মতই। তেমনি দীর্ঘ গ্রীবা। আর কালো চোখ, কালো চুল। দুটি লালচে ঠোঁট, শাদা ঝকঝকে দাঁত।

তুষারের গায়ে যে শাড়িটা রয়েছে এখন, তার রঙ বেলফুলের মতন, আর ব্লাউজের রঙ পাতা-সবুজ। গলায় চিক চিক করছে হার। হাতে বালা। একটি আঙটিও। অপরূপ একটি ছবি হয়ে সামনে বসে আছে তুষার। তার অঙ্গের ছন্দে পঁচিশ বছরের যৌবনস্রোত নিঃশব্দে বয়ে যাচ্ছে। আর কখনো কখনো উচ্ছকিত হাসিতে সেই স্রোত যেন আছড়ে পড়ছে তটে। একটি নিটোল বুক তখন থরথর করে কেঁপে যাচ্ছে।

সব দেখছে মৃণাল। কখনো সরাসরি তাকিয়ে, কখনো আড়চোখে।

—আমি যাই। বললে মৃণাল চা-খাওয়া শেষ হলে।

—যাবে? এত তাড়াতাড়ি কেন। বসো না আরও খানিকটা গল্প করি। না-হয় চলো একটু বেড়াই।

অসম্মত হবার কারণ ছিল না! ওরা বেড়াল দুটিতে উঁচু টিলার ওপর খানিক-ক্ষণ। নিমফুলের গন্ধ তখন ভেসে আসছিল। আর উষ্ণ হাওয়া বইছিল।

যাবার সময় তুষার বললে, 'যখনই তোমার ইচ্ছে হবে এসো।' একটু থেমে আবার, 'আর এসে নাম ধরে ডেকো। বুঝলে বোকা!' সেই অন্ধকারে ঠোঁট টিপে হেসে মৃণালের হাতে চাপ দিয়ে ছেড়ে দিল তুষার।

ফেরার পথে আর যেন পা উঠছিল না। কেমন একটা ক্লান্তি অনুভব করছিল মৃণাল। ক'বারই দীর্ঘনিশ্বাস

ফেললে। অদ্ভুত এক বেদনাও আস্তে আস্তে ঠেলে উঠছিল।

আর মৃণাল ভাবছিল ওরা কী সুখী; ওরা দুজনে—তুষার এবং তার স্বামী। জীবনটাকে খুব সহজেই স্বপ্নের মতন ক'রে নিতে পেরেছে। ফুলের বিছানায় শুয়ে জোড় বেঁধে যেন চাঁদ দেখছে আর ঘ্রাণ নিচ্ছে পরস্পরের।

কেন নেবে না? নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করে উত্তর দিচ্ছিল মৃণাল, হ্যাঁ, নেবে। নেওয়াই উচিত। কেননা, ওরা এর উপযুক্ত। মিত্রসাহেবের চেয়েও যোগ্যতাটা যে তুষারের বেশী, মৃণাল সে-সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হচ্ছিল। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে দেখছিল তুষারের যোগ্যতা। আর বার বার স্বীকার করছিল তার যোগ্যতা অসাধারণ।

হ্যাঁ, সারসীর শুভ্র কোমল দেহ নিয়ে তুষার চুপ করে নেই। তার শরীরের তাপ দিয়ে আরেক জনকে নিত্য উষ্ণ করছে। বুঝে ফেলেছে তুষার মিত্র-সাহেবের বন্য দৃষ্টির উজ্জ্বলতা কোথায়

স্তব্ধ হয়ে যায়। তাঁর উন্মাদনা কেমন করে শান্ত হয়ে আসে।

তুষারের কয়েকটা কথাই বার বার মনে পড়ছিল মৃণালের। এবং তার অর্থ যেন একটু একটু করে বুঝতে পারছিল ও। তুষার বলেছে, তার স্বামী কাজের মানুষ, কথা নয়, কাজ ভালবাসে। কথাটা বলে তুষার হেসেছিল। মৃণাল বুঝতে পারছে এতক্ষণে এই কাজ কি, কেমন ধরনের কাজ! অর্থাৎ, এ-কাজ অন্য ধরনের। প্রজাপতি তার পাখায় রঙ চড়াবে, বসন্ত গাছে গাছে ফুল ফোটাবে এই তার সত্যিকারের কাজ। আর তুষার তার পঁচিশ বছরের প্রতিটি অঙ্গকে যৌবনের রসে সিক্ত করে জ্বলবে প্রখর হয়ে, জ্বালাবে স্বামীকে এই কাজ তার। মিত্রসাহেব. অনুমান করা চলে, এমনটাই চান। চেয়েছেন। চাইছেন। আর তুষার তাই দিচ্ছে। অনেক ঘাম ফেলে, ক্লান্ত ফুস-ফুস নিয়ে স্বামী ফিরে এলে তুষার হয়ত তাই অমন নিরাবরণ হয়েই আসে, সাবানের গন্ধ তুলে এবং গ্রীবায় মুক্তার মতন জলবিন্দু মেখে। প্রতিদিনে সে বিচিত্র, সে বর্ণময়ী। মোহিনী। মিত্র-সাহেব এ মোহ ভালবাসেন। কোন্ পুরুষই বা না বাসে। মৃণাল নিজেও কি? প্রশ্নটা মনে হতেই কেমন যেন চমকে ওঠে মৃণাল। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। আর চোখ তুলতেই দেখে তার কোয়ার্টার সামনে। অন্ধকারে ডুবে আছে।

বাইরে উঠোনে মাদুরে বসে কি যেন একটা সেলাই করছিল কমলা। টিমটিমে আলোয় একতাল ছায়ার মতনই দেখাচ্ছিল তাকে। পা ছড়িয়ে ঘাড় মুখ গুঁজে বসে। মৃণালের পায়ের শব্দ তার কানে গেলেও চোখ তুলল না।

উঠোনের ফালিটুকু এগিয়ে ঢাকা বারান্দায় জুতো জোড়া খুলতে খুলতে একবার স্ত্রীর দিকে তাকাল মৃণাল। অসহ্য লাগছিল সমস্ত দৃশ্যটা। একটা পঙ্গু গরু কি ছাগল যেন আস্তাকুঁড়ের পাশে বসে জাবর কাটছে।

ঘৃণাই হচ্ছিল মৃণালের। বারান্দায় বা উঠোনে থাকলে কমলার ওই কদাকার ভঙ্গিটা পাছে চোখে দেখতে হয় তাই অসীম বিরক্তি চেপেই ঘরে গিয়ে ঢুকল। যদিও ঘরে অসহ্য গরম।

অন্যদিন অফিসের জামা কাপড় ছাড়বার সময় ডাক দেয় কমলাকে। আজ আর ডাকল না। আলনা থেকে দুপাট করা ধুতিটা টেনে নিয়ে কোমরে জড়িয়ে নিল।

এতক্ষণে কমলা এল। এসেই দেখল স্বামীকে। ওর হাতে খয়েরী রঙের একটা লুঙ্গি। বললে, 'ওমা কাপড় ছেড়ে নিয়েছ। আমি আবার এটা সেলাই করছিলাম; তোমার আখুটে ধোপায় বাপু কি করে যে এত কাপড় ছেঁড়ে বুঝি না।'

মৃণাল চুপ। সস্তা দামের একটা সিগারেট পড়েছিল দেড় হাতের টেবিলটার ওপরে। ধরাল সেটা।

আলনায় লুঙ্গি রেখে কমলা এবার একটু কাছে এল।

—আজ এত দেরি যে! সামন্তবাবু-দের সঙ্গে তাস খেলায় মেতেছিলে বুঝি! ঘুরতে ফিরতে ততক্ষণে এক গ্লাস জল গড়িয়ে নিয়েছে কমলা। স্বামীর দিকে হাত বাড়িয়ে ধরেছে, 'তাসে মত্ত হলে বাবুদের ঘরের কথা মনেই থাকে না! আম পুড়িয়ে সরবৎ করে রেখেছিলুম। বিকেল বিকেল এলে দিতাম। রাত হচ্ছে দেখে খেয়ে ফেললুম নিজেই।'

জলের গ্লাসটা নিল না মৃণাল। কমলার কথার উত্তরে মনে হল বলে, ঘরে ফিরবো কোন টানে, কী রূপের ধুনুচি জ্বালিয়ে রেখেছ তুমি!

মৃণালকে এত চুপচাপ দেখে কমলা খানিকটা অবাক হল।

—জল খাবে না।

মাথা নাড়ল মৃণাল। গ্লাসটা নামিয়ে রাখল কমলা।

—হল কি তোমার? কমলা শুধলো।

—কিছু না।

—তবে এতো চুপচাপ গম্ভীর যে! স্বামীর আরও একটু কাছ ঘেঁষে এল কমলা।

ঘামে ঘামাচিতে গলা কণ্ঠা সব ভরে গেছে কমলার। চুলকে চুলকে লাল করে ফেলেছে। একটা ঘায়ের মতই দগদগ করছিল। এবং চিট্ কাপড়ের গন্ধ আসছিল নাকে। স্ত্রীকে হাত দিয়ে ঠেলে

রিয়ে দিতে দিতে বললে মৃণাল, 'যাও গ, ঘ্যান ঘ্যান করো না কানের কাছে। ও আর একটা কিছু ছেঁড়া খোড়া টেনে য়ে সেলাই করতে বসো গে!

হয়ত আহত হল কমলা। কিন্তু মুখ খে তা বোঝা যায় না। একটুক্ষণ াঁড়িয়ে থেকে সত্যিই ও ঘর ছেড়ে চলে াচ্ছিল।

—শোনো। রুক্ষ গলায় হঠাৎ ডাকল ৃণাল।

ঘুরে দাঁড়াল কমলা।

—তোমার কি আর অন্য শাড়ি নেই; ই চিট্ ছেঁড়াটা গায়ে জড়িয়ে রয়েছো?

স্বামীর মুখে চোখ তুলে কিছুক্ষণ ্থর দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল কমলা। লে, 'কেন, কি হয়েছে এতে?'

—হবে আবার কি, বলছি। তুমি যে বনা-ঝি নও বাড়ির বউ সেটা বোঝা য় হয়ে উঠেছে। মৃণাল কেমন এক ্যঙ্গ সুরে বলে।

কমলার সহ্যসীমা এতক্ষণে ভেঙে ড়েছে। তিক্ত সুরে জবাব কাটল, এনে দিও দশ বিশখানা শাড়ি, বিবিয়ানা রব।'

কথাটা কানে যেতে রাগে দ্বিগুণ লে উঠল মৃণাল। নিষ্ঠুর ব্যঙ্গের রে বললে, 'কী চেহারা বা তোমার যে, াড়ি এনে দিলেই অপ্সরী হয়ে উঠবে!'

এবার কলহটা আরও একটু গড়াল। া মুখে এল মৃণালের বলে ফেলল। মলাও জবাব কাটলে। শেষ পর্যন্ত াঁদল।

রাত্রে পাশাপাশি শুয়েও কেউ কারুর ঙ্গে কথা বললে না। কমলা বালিশের পাশে মুখ গুঁজে কয়েকবার ফুঁপিয়ে অবশেষে ঘুমিয়ে পড়ল। আর মৃণাল একটা রক্তহীন, বিস্বাদ শরীরের পাশে শুয়ে শুয়ে বিরাগে, ঘৃণায়, জ্বালায় ছটফট করতে লাগল।

শেষ রাতে স্বপ্ন দেখেছে মৃণালঃ কোথা থেকে একটা পালক উড়ে এসেছে হাওয়ায়। তার গায়ে এসে পড়েছে। হাতে করে সেই পালকটা তুলতে যাচ্ছিল ঘুম ভেঙে গেল হঠাৎ। পালক কোথায়! মৃণালের হাত কমলার বুকের ওপর। হাতটা সরিয়ে নিয়েছে ও। এবং চোখ বুজেছে আবার, যদি পালকের স্বপ্নটা আবার জোড়া লাগে এই ভেবে।

পুরো একটা দিন নিজের মধ্যেই তার চিন্তাগুলো চেপে রেখেছিল মৃণাল। কিন্তু আর পারল না। সামন্তকে বললে। বললে কথায় কথা টেনে এনে, তুষারের উল্লেখ না করেই।

দেখো সামন্ত, মৃণাল অনেক যুক্তি-টুক্তি দেখিয়ে বললে, এই যুগটা অন্য-রকম। ও-সব হৃদয়, আত্মা, স্বর্গ শান্তি —এসবের পুঁজি টুজি কাবার হয়ে গিয়েছে। এখন, এ-সময় দুটো জিনিস আমরা বুঝি স্পষ্ট, এক সুখ আর অন্য যা তাকে বলা যায় উন্মাদনা। এ দুটোর অনুভূতি অত্যন্ত স্পষ্ট। তোমার আমার আশী কি একশো টাকার মাইনেতে স্ত্রীপুত্র নিয়ে সুখের মুখ দেখার উপায় নেই এ-কথা আমি বিশ্বাস করি না। আসলে আমরা জানি না, অল্পের মধ্যেও কতরকমে সুখ পাওয়া যায়। না, না বাইরে নয়, ঘরের মধ্যেই এ-সব ছোট-খাটো সুখ, উৎসাহ পাওয়া যায়। তোমার আমার স্ত্রী ইচ্ছে করলে, তাদের স্বামীদের কি আর তা দিতে পারে না। পারে।

সামন্ত কিছু বলছিল না। শুধু অবাক হয়ে বন্ধুকে দেখছিল।

বন্ধু মৃণাল বলছিল, ও-সব সূক্ষ্ম প্রেম টেম বাদ দাও। আমি ভদ্রসন্তান, বিবাহিত পুরুষ, আমাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে মাসান্তে গ্রাসাচ্ছাদন যোগাড় করতে হয়। আমার ফূর্তি পাবার জগৎটা খুব ছোট্ট। এবং আমাকে উদ্দীপ্ত করবার জন্যে, টু চার্জ মাই এনার্জি কি আছে, কে আছে? হ্যাঁ, এক শুধু আমাদের স্ত্রীরা আছে। তোমরা খুব বল, মেয়েরা পুরুষকে শক্তি জোগাবে উৎসাহ দেবে। কিন্তু আমাদের মেয়েরা কি দেয়। কয়লা ঘুঁটের ধোঁয়া, হলুদের ছোপ, পানের পিচে ক্ষয়ে যাওয়া দাঁতের হাসি। অ্যান্ড দেটস্ অল।

—কি করাতে চাও আমাদের বউদের দিয়ে? সামন্তর মজা লাগছিল। একটা কাঁচি সিগারেট বন্ধুকে দিয়ে নিজেও ধরাল।

—কি চাই! মৃণাল যেন অভূতপূর্ব কিছু লুকিয়ে রেখেছে এমন মুখভঙ্গি

করে একটু রহস্যের হাসি হাসল। তারপর বললে চুপি চুপি তুষারদের কথা।

সামন্ত বিস্ফারিত চোখে চুপ করে বসে থাকল।

মৃণাল তার কথার উপসংহার টানল, 'তুমি যাই বলো, আমি বিশ্বাস করি মিত্র-সাহেব জীবনের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ অনুভব করেছেন স্ত্রীর মধ্যে। তুষার তাঁর স্বামীকে ক্লান্ত হতে দিচ্ছে না। প্রতিদিন তার স্বামীর মধ্যে নতুন দিনের কাজ-শুরুর আগুন জ্বালিয়ে দিচ্ছে। লোকটা তাই আজও অত খাটে, খাটতে পারে। আমরা পারি না। আমাদের জীবনে কোন আকর্ষণ নেই, সুখের রকম ফের নেই। উৎসাহ পাব কোথায়? কার মুখ চেয়ে করব এই রুক্ষ সংগ্রাম।

সামন্ত খানিকটা চুপ করে থেকে হঠাৎ হেসে উঠল। বেশ জোরেই।

—হাসলে যে! মৃণাল প্রশ্ন করলে।

—সারসী তোমায় বড় বিচলিত করেছে হে।

—তা করেছে। সে-ক্ষমতা তার আছে।

—নিশ্চয়, নিশ্চয়। কিন্তু তার অক্ষমতাও ত কিছু থাকতে পারে।

—না, থাকতে পারে না। নেভার। মৃণাল মাথা ঝাঁকাল কঠিন প্রত্যয়ে।

তুষারের কাছে মাঝে মাঝে যাচ্ছিল মৃণাল। আর তুষার হাসিমুখেই অভ্যর্থনা করছিল ওকে।

প্রথম প্রথম সঙ্কোচ ছিল মৃণালের। মিত্র সাহেব হয়ত তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তাঁরই অধস্তন আশী টাকা মাইনের এক টাইপিস্টের মেলামেশা পছন্দ করবেন না। কিন্তু মিত্র সাহেব অন্য ধরনের লোক। নিজেও যে এককালে বিত্তহীন ছিলেন এ-কথা ভুলে যাননি। তাই মনে হয়। এবং মানুষ সম্পর্কে টাকার বিচারটা তিনি যে বড় করে দেখেন না তাও বোঝা গেল।

চায়ের টেবিলে বসে মিত্র সাহেব গল্প করেছেন। বিদেশের গল্প, শিকারের গল্প, নিজের জীবনের নানা দুঃসাহসিকতার গল্প। ওরা শুনেছে। তুষার কখনো চোখ বড় বড় করেছে, কখনো হেসেছে, কখনো বা ভীত গলায় একটা উদ্বেগের স্বর প্রকাশ করছে। কিন্তু সব মিলিয়ে মিশিয়ে চায়ের টেবিলটা বেশ জমে গেছে। সুন্দর হয়ে উঠেছে সেই আবহাওয়া।

এরপর কোনও দিন হয়ত মৃণাল উঠে এসেছে. কখনো মিত্র সাহেব কাজের কথা ভাবতে ভাবতে তাঁর ঘরে চলে গেছেন, তুষার আর মৃণাল মুখোমুখি বসে থেকেছে। বেড়াতে বেরিয়েছে কোনও দিন। বেশ কাটছিল বিকেলগুলো। চমৎকার।

মিত্র সাহেবকে মাঝে মাঝে অফিসের কাজে ছুটতে হত বাইরে। তেমন দিনে অনেকক্ষণ, প্রায় রাত পর্যন্ত মৃণাল থেকে যেত তুষারের কাছে। অর্গান বাজিয়ে গান গাইত তুষার, টিয়াপাখি রঙের শাড়ি পরে, টুকটুকে নখের ডগা রিডে চেপে ধরে মিহি গলায়। সোফার মধ্যে ডুবে গিয়ে স্পন্দহীন হয়ে শুনত মৃণাল সেই গান, সেই গলা। আর দেখত তুষারকে।

এমনই একদিন মিত্র সাহেব যখন অন্যত্র মৃণাল এল, আর কালবৈশাখীও ছুটে আসছিল তখন আকাশ ডিঙিয়ে। গাছপালা লুটোপুটি খাচ্ছিল।

ঘরের দরজা বন্ধ করে বাতি জ্বালিয়ে বসেছিল তুষার। হাতে একটা বই। ফুলের ছবি।

লাল টকটকে শাড়ি পরেছে সেদিন তুষার। সেই রঙেরই ব্লাউজ। হাতে জরির পাড় বসানো। মনে হচ্ছিল এই ঘরের মধ্যে একটা আগুন বঙ্কিম শিখায় জ্বলছে।

মৃণাল এল, বসল।

—বাইরে ঝড় কি উঠেছে? প্রশ্ন করলে তুষার।

—বোধ হয় এতক্ষণে এসে গেছে। শব্দ ত শুনছি।

হ্যাঁ, বাইরে তখন ঝড় উঠেছিল। সোঁ সোঁ হাওয়া বইছে, গোঁ গোঁ করছে গাছ-পালা। মেঘ ডাকছিল। বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল আকাশে।

—বসে বসে ছবি দেখছ? হেসে বললে মৃণাল।

মাথা নাড়ল তুষার। ঠোঁটের আগায় বিচিত্র হাসি টানল, বললে, 'বাইরে যখন ঝড় তখন আমি ফুলের ছবি দেখছি।' একটু থেমে, 'আর এই ফুলটার নাম কি জানো, ব্লীডিং হার্ট। বিলিতি ফুল।' বইটা এগিয়ে দিল তুষার।

হাতে নিয়ে দেখল মৃণাল। হাসল। বললে, 'বেশ নাম। তা তোমার হৃদয় ত রক্তাক্ত নয়, তবে ও-ফুল কেন, অন্য ফুলে চোখ দাও।'

—আমার হৃদয় কি তুমি দেখেছ? তুষার সরাসরি চেয়ে থাকল মৃণালের চোখে।

—না দেখলেও বুঝতে পারি।

—পারো! আশ্চর্য ত! তুষার তার আপেলের মতন গালে হাসির একটি দুটি কুঞ্চনও গুটিয়ে নিল।

—না পারার কি আছে! মৃণাল বান্ধবীর সঙ্গে পরিহাস করছিল, ঈশ্বর তোমার হৃদয়টাকে ফুল দিয়ে গড়েছেন, দুঃখের বিষয় সেখানে রক্ত নেই, রঙ আছে।'

তুষার হঠাৎ উঠে দাঁড়াল। মুখ ফিরিয়ে নিল অন্য দিকে, দেওয়ালে। একটা ছবিই যেন দেখছিল ও। নিজের ছবি।

মৃণাল চুপ করে গেছে। বাইরের ঝড়ের দাপট ঘরের দরজাকে থরথরিয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে। বাজ পড়েছে কাছাকাছি কোথাও। শব্দে চমকে উঠল মৃণাল।

সে-চমক ভাঙতেই দ্বিতীয়বার চমকে উঠল মৃণাল যখন তুষার তার পাশে এসে হাতটা টেনে নিয়েছে আচমকা।

—তুমি কিছু জানো না, মৃণাল। কিছুই বুঝতে পার না। তুষারের গলা কাঁপছিল, বুক কাঁপছিল, নিশ্বাস উষ্ণ, চোখ দুটো জ্বল জ্বল করছে।

ধক ধক করছিল মৃণালের হৃদপিণ্ড। এবং জ্বালা করতে শুরু করেছিল চোখ, নাক।

—আমার বুকের মধ্যেও রক্ত ঝরছে। আর তোমাদের মিত্র সাহেব ওই ঝড়ের মতন কাল কুশ্রী ভয়ঙ্কর চেহারা আর আক্রোশ নিয়ে দাপাদাপি করছে। বীস্ট্‌, বীস্ট্‌! ও একটা বীস্ট্‌।

ভয় করছিল মৃণালের। ঘাম জমছিল কপালে। তুষারের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিতে নিতে চাপা গলায়, ভয় ভয় সুরে ও বললে, 'কি বলছো যা তা!'

—বলবো। একশোবার বলবো। সে অধিকার আমার আছে। তুমিই বলো এত করলাম, তবু ও পারল না, পারছে না কেন!

তুষারের চোখ দিয়ে বড় বড় ফোঁটা পড়ছিল। গাল বেয়ে নামছিল।

কিন্তু চমকে উঠেছে মৃণাল। ভীষণ-ব চমকে উঠেছে। ধক্ করে একটা দহ বুকের ওপর উঠে এসেছে।

মৃণালকে কিছু বলতে হল না। তুষার ল নিজে থেকেই। যদিও বলতে তার হচ্ছিল। তবু ভাঙা গলায় থেমে থেমে লে, 'ও দাম দিতে পারে না, দেবার তা নেই। সহজ কথাটা বুঝবে না। রে আমার চামড়া আর মাংসগুলো রও, আরও সুন্দর হলে ও পারবে। তু যা লোহা নয়, লোহার ছিঁটে টাও যাতে নেই, চুম্বক তাকে টানবে করে।'

তুষার একটা বৃহৎ লাল প্রজাপতির ন মৃণালের বুকে কোলে পড়ে ধড়ফড় রলে যেন কয়েকবার।

তারপর এই ঘর এবং যেন অন্যান্য ঘর, নলা পর্দা সব কেউ দমকা হাওয়ায় ড়িয়ে দিলে। বাতি নিভল। আবার লল অন্য কোথাও। সোনালি সাপের ন একটা দেহ সেখানে ঢেউ খেলে যাচ্ছিল, স্ফুলিঙ্গের মতন লছিল দুটো চোখ। পাতা, গাছ, ছায়া কাথাও কি একটু আচ্ছাদন ছিল, একটু সাবধতা বা লুকোচুরির রহস্য, আলো-আঁধারের ঝিলিমিলি! না। অসহ্য রুক্ষ এবং নিষ্ঠুর। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল ণাল। অদ্ভুত একটা অসাড়তায় তার সর্বাঙ্গ স্তব্ধ হয়ে গেল। মিত্র সাহেবের নেই হয়ত।

যেন ছোবল খেয়ে ছিটকে বেরিয়ে এল ণাল। একেবারে পথে।

ঝড় থেমেছে। মেঘ কেটে গেছে। মাটি ভজে। জোনাকি উড়ছিল। পাতা থেকে বৃষ্টির ফোঁটা পড়ছিল হাওয়ায়। কেমন এক গন্ধ। আর ক্ষীণ আলো চাঁদের। আমলকি-ডালে একটা ঝড়ো কাক পাখা ঝাড়ছিল।

মৃণালের হুঁস ফিরে এল নিজের কোয়ার্টারে পা দিয়ে। দরজাটা বন্ধ ছিল। কড়া নাড়ল।

হ্যাঁ, দরজা কমলাই খুলে দিয়েছে। কিন্তু মৃণাল বিশ্বাস করতে পারছিল না।

ঘরে ঢুকে মৃণাল আলোয় আর একবার দেখল কমলাকে। ফিনফিনে এক শাড়ি পরেছে ফিরোজা রঙের। গায়ে যেন জামাটা থেকেও নেই। চোখে কাজল। পাউডারে ধবধব করছে গাল দুটো। আর খোঁপা ভেঙে বিনুনি দুলছে।

অত্যন্ত কুৎসিত একটা উপমা মনে পড়ছিল সেদিকে তাকিয়ে।

—বাঈজী সেজে বসে আছ কেন? অসম্ভব তিক্ত রুক্ষ গলায় চিৎকার করে উঠল মৃণাল।

কিন্তু আজ আর কমলা কাঁদল না। গলার পর্দা চড়াল না। অত্যন্ত কঠিন কিন্তু মৃদু গলায় বললে, 'তোমার জন্যে। এতেও যদি না হয়, আরও পারি।' কমলা আঁচলটা খুলে ফেলল গা থেকে।

হাত ধরে ফেলল মৃণাল খপ্ করে। আশ্চর্য এক ভয়ে কাঁটা দিয়ে উঠেছে ওর গা। গলা দিয়ে স্বর ফুটছিল না। তবু বললে, 'না, না। লক্ষ্মীটি না।'

স্বপ্নটা আবার দেখল মৃণাল। মনে হচ্ছিল একটা পাখি উড়ছে মাথার ওপর। ঘরে ঘরে উড়ছিল। হঠাৎ পাখি থামল। একটা পালক খসে পড়ল। একটা নয়; এক, দুই, তিন। অনেক পালক। আর সেই পালক যেন দমকা হাওয়ায় একটা গাছের গুঁড়িতে গিয়ে আটকে গেল। পরক্ষণেই স্পষ্ট হল দৃশ্যটা, গাছের গুঁড়ি নয়। পালকের পা—পায়ের মতই। আর সেই পা-র ঊর্ধ্বে একটি মানুষী অবয়বের নাভি, উদর, বুক পাথরের মূর্তির মতন। স্পন্দনহীন, লালিত্যহীন হ্যাঁ, পাথরই। মৃণাল হাত দিয়ে ধরতে গিয়েছিল। ঘুম ভেঙে গেল।

ভোরের আবছা আলোয় মৃণাল দেখে ওর হাতটা কমলার গলার পাশে মুঠো দিয়ে ক'টি চুল জড়িয়ে নিয়েছে।

একবার এপাশ ওপাশ তাকাল মৃণাল। হয়ত পালকই খুঁজছিল। কিন্তু খুঁজল না। কমলার গলা সোহাগে জড়িয়ে ঘুমিয়ে পড়ল আবার। এবং এই ভেবে খুশী হচ্ছিল যে, এখানে সে বা তারা ব্যর্থ নয়, একটা আবরণ থাকলেও এখন ওর পাশে পাতায় ঢাকা পদ্মকুঁড়ির মতন একটি হৃদপিণ্ড ধুক ধুক করছে।

হেমন্ত স্বপ্ন

শ্রীকরুণাময় বসু

মুক্তোঝরা ঘাসে বনে হেমন্তের শিশির-সকাল,
আকাশ-প্রদীপ স্বপ্ন মুছে গেছে:'
পাতা ঝরা অঘ্রাণের লাবণ্য-বিকাল
দোল খায় বলাকার উধাও পাখায়,
মেঘের আল্পনা দাগ মনে বুঝি সুর রেখে যায়।
অলস দিনের মায়া,
সবুজ লবঙ্গ বনে নীলাঞ্জন ছায়া
দূরের স্বপ্নের মতো আঁকা;
পিছনের আঁখিজল, মায়াময় গানে গানে ডাকা,
ফুল দিয়ে আঁকা ভালোবাসা;
ঝরে পড়া পাতা দিয়ে গাঁথিব কি দুদিনের বাসা?

ছিল কিছু ফুলবন, ফুলবনে ছিল কিছু কুঁড়ি,
শূন্যে মনে কোন বনে চলে গেছে উড়ি;
হিমছোঁয়া দূরের বাতাসঃ
কুয়াশা গুণ্ঠন টানি চিত্রলেখা পরী খেলে তাস,
হিমছোঁয়া বনের বাতাস।
উলুঘাস, বেতঝোপ, পদ্ম, কেয়া-বনে
মৌমাছিরা গান গায়, প্রজাপতি সেই গান শোনে।

তারপর মাঠ ঘাটে নেমে আসে রোদ,
মরা গাঙে নামে ভাঁটি সোত;
হাটে যায় নৌকো সব তুলে দিয়ে পাল,
ঠাণ্ডা হাওয়া মুছে নেয় আমার কপাল।
আমলকী বনে ওঠে চাঁদ
জ্যোৎস্নায় আঁকানো কারুকাজ, তারপর বাড়ে হিম রাত
সার দেওয়া নারিকেল বনে;
হেমন্তের এই ছবি, এই স্বপ্ন আঁকা আছে মনে।

সুখোচ্চার

দুর্গাদাস সরকার

ঘাসের বুকে সকৌতুকে হেঁটেছি বহুদূর,
হৃদয় হতে এখনো তবু জাগেনি কোনো সুর।
সোনায় মোড়া হৃদয়ে আছে লুকানো কথা যেন—
বেরিয়ে যাক্ ইচ্ছেমতো—লুকিয়ে থাকা কেন!
সাগরে দেবো ছড়িয়ে আর আকাশে ছুঁড়ে তা' কি,
গাছের ডালে জড়িয়ে যাবে, কুড়িয়ে নেবে পাখী?

সে-গান যদি লুকিয়ে রাখি নিজেকে দিতে সুখ
আসর হব দুদিনে খালি, মৌন হবে মুখ।
কখনো যদি ছড়াতে পারি একটি দুটি গানই—
সে-গান নিয়ে করবে হেসে অনেকে কানাকানি!
হৃদয় হবে বিশাল আরো, পৃথিবী বড়ো হবে,
আসর জুড়ে আসবে আরো অনেকে উৎসবে।
ছড়িয়ে গেলে সে-গান—যায় আঁধারে পথ চলা;
পা ফেলে ফেলে চলেছি—চাই সুরেই কথা বলা।

বিকেলের আলোয়

বীরেন্দ্রনাথ রক্ষিত

একটি কবিতা লিখি
দিনের আলোর অবকাশে।
বিকেলের ঘাসে
নরম আলোর ভীড় এলোমেলো। হাওয়া।
দুচোখের স্বপ্ন নিয়ে আকাশের নীলে ফিরে যাওয়া
মনে হয়
এ এক পুরোনো পরাজয়!

ঘরে ফেরা কতো ক্লান্ত লোকে
একটি মেয়ের চোখে-চোখে
তাকিয়ে উন্মন হয়, কথা কয় মনে-মনে, একা।

একটি কবিতা লেখা মেঘের মনের সীমানায়।
সূর্যের স্তিমিত লাল
পাইনবনের নিচে ক্রমশই নিজেকে লুকায়।
মুছে যায় রোদ্দুরের রঙ।
গীর্জার গম্ভীর ঘণ্টা বাজছে ঢং ঢং।......

একটি কবিতা লিখি
জীবনের আশার আশ্বাসে॥

৭

চা শেষ করিয়া পেয়ালা নামাইয়া রাখিয়াছি, এমন সময় সিঁড়িতে পায়ের সমবেত শব্দ শোনা গেল। এতক্ষণে বুঝি পুলিস আসিতেছে।

কিন্তু আমার অনুমান ভুল, পুলিসের এখনও ঘুম ভাঙে নাই। যাঁহারা প্রবেশ করিলেন তাঁহারা সংখ্যায় তিনজন; একটি অপরিচিত প্রৌঢ় ভদ্রলোক, সঙ্গে নিমাই ও নিতাই। ভাগাড়ে মড়া পড়িলে বহু দূরে থাকিয়াও যেমন শকুনির টনক নড়ে, নিমাই ও নিতাই তেমনি খুল্লতাতের মহাপ্রস্থানের গন্ধ পাইয়াছে।

পায়ের শব্দে কেষ্টবাবুর ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছিল, তিনি চোখ রগ্‌ড়াইয়া উঠিয়া বসিলেন; ভিতর দিক হইতে প্রভাতও প্রবেশ করিল।

প্রথমে দুই পক্ষ নির্বাকভাবে দৃষ্টি বিনিময় করিলাম। নিমাই ও নিতাই প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দুই পাশে দাঁড়াইয়া ছিল, তাহাদের চক্ষু একে একে আমাদের পর্যবেক্ষণ করিয়া ব্যোমকেশ পর্যন্ত পৌঁছিয়া থামিয়া গেল; দৃষ্টি সন্দিগ্ধ হইয়া উঠিল। বোধহয় তাহারা ব্যোমকেশকে চিনিতে পারিয়াছে।

প্রথমে ব্যোমকেশ কথা বলিল,—'আপনারা কি চান?'

নিমাই ও নিতাই অমনি প্রৌঢ় ভদ্রলোকের দুই কানে ফুস্‌ফুস্‌ করিয়া কথা বলিল।

প্রৌঢ় ভদ্রলোকের ক্ষৌরিত মুখে কাঁচা-পাকা দাড়িগোঁফ কণ্টকিত হইয়া ছিল; অসময়ে ঘুম ভাঙানোর ফলে মেজাজও বোধকরি প্রসন্ন ছিল না। তিনি কিছুক্ষণ বিরাগপূর্ণ চক্ষে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিয়া বিকৃতস্বরে বলিলেন,—'আপনি কে?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'পারিবারিক বন্ধু বলতে পারেন। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী।'

তিনজনের চোখেই চকিত সতর্কতা দেখা দিল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক একটু দম লইয়া প্রশ্ন করিলেন,—'ডিটেক্‌টিভ্?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সত্যান্বেষী।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক গলার মধ্যে অবজ্ঞা-সূচক শব্দ করিলেন, তারপর প্রভাতের দিকে চাহিয়া বলিলেন,—'আমরা খবর পেয়েছি অনাদি হালদার মশায়ের মৃত্যু হয়েছে। এঁরা দুই ভাই নিমাই এবং নিতাই হালদার তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং উত্তরাধিকারী। এঁরা মৃতের সম্পত্তি দখল নিতে এসেছেন। এ বাড়ি আপনাদের ছেড়ে দিতে হবে।'

প্রভাত কিছুক্ষণ অবুঝের মত চাহিয়া থাকিয়া ব্যোমকেশের দিকে দৃষ্টি ফিরাইল। ব্যোমকেশ বলিল,—'তাই নাকি? বাড়ি ছেড়ে দিতে হবে! কিন্তু আপনি কে তা তো জানা গেল না।'

প্রৌঢ় ভদ্রলোক বলিলেন,—'আমি এঁদের উকিল, কামিনীকান্ত মুস্তফী।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'উকিল! তাহলে আপনার জানা উচিত যে অনাদি হালদারের ভাইপোরা তাঁর উত্তরাধিকারী নয়। তিনি পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন।'

উকিল কামিনীকান্ত নাকের মধ্যে একটি শব্দ করিলেন, ব্যোমকেশকে নিরতিশয় অবজ্ঞার সহিত নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন,—'আপনি যখন পারিবারিক বন্ধু আপনার জানা উচিত যে অনাদি হালদার মশায় পোষ্যপুত্র নেননি। মুখের কথায় পোষ্যপুত্র নেওয়া যায় না। দলিল রেজিস্ট্রি করতে হয়, যাগযজ্ঞ করতে হয়। অনাদি হালদার মশায় এসব কিছুই করেননি।—আপনাদের এক বস্ত্রে এখান থেকে বেরিয়ে যেতে হবে, একটা কুটা নিয়ে যেতে পাবেন না। এখানে যা-কিছু আছে সমস্ত আমার মক্কেলদের সম্পত্তি।'

ব্যোমকেশ ক্ষণকালের জন্য যেন হতভম্ব হইয়া প্রভাতের পানে তাকাইল; তারপর সে সামলাইয়া লইল। মুখে একটা বঙ্কিম হাসি আনিয়া বলিল,—'বটে! ভেবেছেন হুমকি দিয়ে অনাদি হালদারের সম্পত্তিটা দখল করবেন। অত সহজে সম্পত্তি দখল করা যায় না উকিলবাবু। পোষ্যপুত্র নেয়া যে আইনসংগত নয় সেটা আদালতে প্রমাণ করতে হবে, সাক্‌সেশন সার্টিফিকেট নিতে হবে, তবে দখল পাবেন। বুঝেছেন?'

উকিলবাবু বলিলেন,—'আপনারা যদি এই দণ্ডে বাড়ি ছেড়ে না যান, আমি পুলিস ডাকব।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'পুলিস ডাকবার দরকার নেই, পুলিস নিজেই এল বলে।—ভাল কথা, অনাদিবাবু যে মারা গেছেন

এটা আপনারা এত শিগ্‌গির জানলেন কি করে? এখনও দু'ঘণ্টা হয়নি—'

হঠাৎ নিমাই নিতাইয়ের মধ্যে একজন বলিয়া উঠিল,—দু'ঘণ্টা! কাকা মারা গেছেন রাত্তির এগারোটার সময়—' বলিয়াই অর্ধপথে থামিয়া গেল।

ব্যোমকেশ মধুর স্বরে বলিল,—'এগারোটার সময় মারা গেছেন? আপনি জানলেন কি করে? মৃত্যুকালে আপনি উপস্থিত ছিলেন বুঝি? হাতে বন্দুক ছিল?'

নিমাই নিতাই একেবারে নীল হইয়া গেল। উকিলবাবু নিমাই (কিম্বা নিতাই)কে ধমক দিয়া বলিলেন,—'তোমরা চুপ করে থাকো, বলাকওয়া আমি করব।—আপনারা তাহলে দখল ছাড়বেন না। আচ্ছা, আদালত থেকেই ব্যবস্থা হবে।' বলিয়া তিনি মক্কেলদের বাহু ধরিয়া সিঁড়ির দিকে ফিরিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'চললেন? আর একটু সবুর করবেন না? পুলিস এসে ভাইপোদের বয়ান নিশ্চয় শুনতে চাইবে। আপনারা কাল রাত্রি এগারোটার সময় কোথায় ছিলেন—'

ব্যোমকেশের কথা শেষ হইবার পূর্বেই ভ্রাতুষ্পুত্রযুগল উকিলকে পিছনে ফেলিয়া দ্রুতপদে সিঁড়ি দিয়া অন্তর্হিত হইল। উকিল কামিনীকান্ত মুস্তফী ব্যোমকেশের প্রতি একটি গরল-ভরা দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তাহাদের অনুগমন করিলেন।

তাহাদের পদশব্দ নীচে মিলাইয়া যাইবার পর ব্যোমকেশ প্রভাতের দিকে ফিরিয়া প্রশ্ন করিল,—'আপনি যে আইনত অনাদিবাবুর পোষ্যপুত্তুর নয় একথা আগে আমাকে বলেন নি কেন?'

প্রভাত ক্ষুব্ধ মুখে দাঁড়াইয়া ঘাড় চুলকাইতে লাগিল। এইবার ননীবালা দেবী সম্মুখে অগ্রসর হইয়া আসিলেন। এতক্ষণ লক্ষ্য করি নাই, তাঁহার মুখ শুকাইয়া যেন চুপ্‌সিয়া গিয়াছে, চোখে ড্যাব্‌ডেবে ব্যাকুলতা। তিনি বলিয়া উঠিলেন,—'ব্যোমকেশবাবু, ওরা যা বলে গেল তা কি সত্যি? প্রভাত অনাদিবাবুর পুষ্যপুত্তুর নয়?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'সেই কথাই তো জানতে চাইছি। —প্রভাতবাবু—?'

প্রভাত ঠোঁট চাটিয়া অস্পষ্টস্বরে বলিল,—'আমি—আইন জানি না। প্রথমে কলকাতায় আসবার পর অনাদিবাবু আমাকে নিয়ে সলিসিটরের আফিসে গিয়েছিলেন। সেখানে শুনেছিলাম, পুষ্যিপুত্তুর নিতে হলে দলিল রেজিস্ট্রি করতে হয়, হোম যজ্ঞ করতে হয়। কিন্তু সে সব কিছু হয়নি।'

'তাহলে আপনি জানতেন যে, আপনি অনাদিবাবুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী নয়?

হ্যাঁ, জানতাম। কিন্তু ভেবেছিলাম—

'ভেবেছিলেন মৃত্যুর আগে অনাদিবাবু দলিল রেজিস্ট্রি করে আপনাকে পুষ্যিপুত্তুর করে যাবেন?'

'হ্যাঁ।'

কিছুক্ষণ নীরব। তারপর ননীবা দীর্ঘকম্পিত নিশ্বাস ফেলিয়া বলিলে —'তাহলে—তাহলে—প্রভাত কিছুই পা না! সব ওই নিমাই নিতাই পাবে!' ননীবালার বিপুল দেহ যেন সহসা শিথি হইয়া গেল, তিনি মেঝেয় বসি পড়িলেন।

প্রভাত ত্বরিতে গিয়া ননীবালার পা

বসিল, গাঢ় হ্রস্ব স্বরে বলিল,—তুমি ভাবছ কেন মা! দোকান তো আছে। তাতেই আমাদের দ্বজনের চলে যাবে।'

ননীবালা প্রভাতের গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। যাহোক তবু অনাদি হালদারের মৃত্যুর পর একজনকে কাঁদিতে দেখা গেল।

ব্যোমকেশ চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া তাহাদের নিরীক্ষণ করিল, তারপর ঘরের চারিদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া হঠাৎ প্রশ্ন করিল,—'নৃপেনবাবু কোথায়?'

এতক্ষণ নৃপেনের দিকে কাহারও নজর ছিল না, সে আবার নিঃসাড়ে অদৃশ্য হইয়াছে।

ব্যোমকেশ আমাকে চোখের ইশারা করিল। আমি নৃপেনের ঘরের দিকে পা বাড়াইয়াছি এমন সময় সে নিজেই ফিরিয়া আসিল। বলিল,—'এই যে আমি।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কোথায় গিয়েছিলেন?'

'আমি—একবার ছাতে গিয়েছিলাম।' নৃপেনের মুখ দেখিয়া মনে হয় সে কোনও কারণে নিশ্চিন্ত হইয়াছে।

ব্যোমকেশ বলিল,—'ছাতে! তেতলার ছাতে?'

'না, দোতলাতেই ছাত আছে।'

'তাই নাকি? চলুন তো দেখি কেমন ছাত।'

যে গলি দিয়া নৃপেনের ঘরে যাইবার রাস্তা তাহারই শেষ প্রান্তে একটি দ্বার; দ্বারের ওপারে ছাদ। আলিসা দিয়া ঘেরা দাবার ছকের মত একটু স্থান। পিছনদিকে অন্য একটি বাড়ির দেয়াল, পাশে গলির পরপারে অনাদি হালদারের নূতন বাড়ি।

ছাতে দাঁড়াইয়া নূতন বাড়ির কাঠামো স্পষ্ট দেখা যায়, এমন কি দীর্ঘ-লম্ফের অভ্যাস থাকিলে এ বাড়ি হইতে ও বাড়িতে উত্তীর্ণ হওয়া যায়। নূতন বাড়ির দেয়াল দোতলার ছাত পর্যন্ত উঠিয়াছে, সর্বাঙ্গে ভারা বাঁধা।

আলিসার ধারে ঘুরিয়া দেখিতে দেখিতে ব্যোমকেশ বলিল,—'ছাতের দরজা রাত্তিরে খোলা থাকে?'

নৃপেন বলিল,—'খোলা থাকবার কথা নয়। কর্তা রোজ রাত্রে শুতে যাবার আগে নিজের হাতে দরজা বন্ধ করতো।'

'কাল রাত্রে বন্ধ ছিল?'

'তা জানি না।'

'আপনি খানিক আগে যখন এসেছিলেন তখন খোলা ছিল না বন্ধ ছিল?'

নৃপেন আকাশের দিকে তাকাইয়া গলা চুলকাইল, শেষে বলিল,—'কি জানি, মনে করতে পারছি না। মনটা অন্যদিকে ছিল—'

'হুঁ।'

আমরা ঘরে ফিরিয়া গেলাম। ননীবালা দেবী তখনও সর্বহারা ভঙ্গীতে মেঝেয় পা ছড়াইয়া বসিয়া আছেন, প্রভাত মৃদুকণ্ঠে তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতেছে। কেষ্টবাবু বিলম্বিত চায়ের পেয়ালাটি নিঃশেষ করিয়া নামাইয়া রাখিতেছেন।

ব্যোমকেশ বলিল,—'পুলিসের এখনও দেখা নেই। আমরা এবার যাই। —এস অজিত, যাবার আগে চাবিটা যথাস্থানে রেখে দেওয়া দরকার, নইলে পুলিস এসে হাঙ্গামা করতে পারে।'

ব্যাল্‌কনিতে গেলাম। মাছিরা দেহটাকে ছাঁকিয়া ধরিয়াছে। ব্যোমকেশ নত হইয়া চাবিটা মৃতের কোমরে ঘুন্‌সিতে পরাইয়া দিতে দিতে বলিল,—'ওহে অজিত, দ্যাখো।'

আমি ঝুঁকিয়া দেখিলাম কোমরের সুতার কাছে একটা দাগ, আধুলির মত আয়তনের লালচে একটা চিহ্ন। জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কিসের দাগ?'

ব্যোমকেশ দাগের উপর আঙুল বুলাইয়া বলিল,—'রক্তের দাগ মনে হয় কিন্তু রক্ত নয়। জড়ুল।'

মৃতদেহ ঢাকা দিয়া আমরা ফিরিয়া আসিলাম। ব্যোমকেশ বলিল,—'আমরা চললাম। পুলিস এসে যা-যা প্রশ্ন করবে তার উত্তর দেবেন, বেশী কিছু বলতে যাবেন না। আমি যে আলমারি খুলে দেখেছি তা বলবার দরকার নেই। নিমাই নিতাই যদি আসে তাদের বাড়ি ঢুকতে দেবেন না।—কেষ্টবাবু, ও বেলা একবার আমাদের বাসায় যাবেন।'

কেষ্টবাবু ঘাড় কাত করিয়া সম্মতি জানাইলেন। আমরা নীচে নামিয়া চলিলাম। সূর্য উঠিয়াছে, শহরের সোরগোল শুরু হইয়া গিয়াছে।

(ক্রমশ)
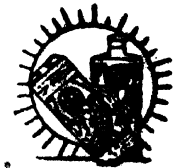
চার্লস চ্যাপলিন

আর জে মিনি

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

"লাইমলাইট" বেশ দীর্ঘ বই বটে, কিন্তু তুলতে খুব বেশী সময় লাগেনি। তার কারণ, এ-বইয়ের শুটিং একেবারে রুটিন বেঁধে করা হয়েছে। আগে থাকতেই ঠিক করা ছিল, শুটিংয়ে মোট দশ সপ্তাহ সময় নেওয়া হবে; ঠিক দশ সপ্তাহেই চার্লি তাঁর কাজ চুকিয়ে দিলেন। তার কারণটা তাঁর নিজের ভাষাতেই বলি। "'সীটি লাইটস' তুলতে আমার চার বছর সময় লেগেছিল। তাতে আমি অধৈর্য হইনি, কেননা অনেক কম খরচায় তখন ছবি তোলা যেত। নির্মাণ-ব্যয় আজকাল এত বেশী বেড়ে গিয়েছে যে, তাড়াতাড়ি কাজ না চুকিয়ে আর উপায় নেই।" এককালে-বিখ্যাত-কিন্তু-ইদানীং-বেকার কয়েকজন রঙ্গাভিনেতাকে এ-বইয়ে দেখা যাবে; চার্লি স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে "লাইমলাইট"-এ তাঁদের অভিনয় করতে নামালেন। পুরনো এইসব সহ-কর্মীর প্রতি তাঁর মমতার অন্ত ছিল না, তাঁদের অপারগতায় তিনি কখনও ধৈর্য হারাননি, বরং সব সময়েই তাঁদের সঙ্গে সদয় ব্যবহার করেছেন; চেষ্টা করেছেন যাতে তাঁরা আত্মবিশ্বাস ফিরে পান, অনভ্যাসের আড়ষ্টতাকে বিসর্জন দিয়ে যাতে আপনাপন শিল্প-ক্ষমতার পরিচয় দিতে পারেন। যাঁরা এ-কালের মানুষ, প্রাচীন আমলের এইসব অভিনেতার মধ্যে অনেকের শুধু নামই তাঁরা শুনেছেন, অভিনয় দেখেননি। স্টুডিয়োতে এসে সীডনি একদিন একজনকে দেখিয়ে দিয়ে সবিস্ময়ে প্রশ্ন করল, "তাজ্জব ব্যাপার, উনিই কি সেই রিন টিন টিন? সেই বিখ্যাত অভিনেতা?"

"লাইমলাইট" ছবিতে ক্লেয়ার ব্লুমের সঙ্গে চার্লি

চ্যাপলিন পরিবারের প্রায় সকলকেই এ-বইয়ে দেখতে পাওয়া যাবে। চার্লির বড় ছেলে চার্লস চ্যাপলিন জুনিয়রকে দেখা যাবে এক ক্লাউনের ভূমিকায়। চার্লির এক ভাইয়ের নাম হুইলার ড্রাইডেন; ১৯৪৬ সালে আল্‌ফ রীভসের মৃত্যুর পর থেকে তিনি স্টুডিয়ো ম্যানেজারের পদে অধিষ্ঠিত রয়েছেন। "লাইমলাইট"-এর গোড়ার দিককার কয়েকটি দৃশ্যে তিনি এক ডাক্তারের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। উনার চার ছেলেমেয়ের মধ্যে সবচাইতে যেটি ছোট, সেই ভিক্টোরিয়াই শুধু বাদ পড়েছে। বাকি তিনটিকে এ-বইয়ের প্রথম দৃশ্যেই দেখতে পাওয়া যায়। মস্ত বড় একটা ব্যারেল অর্গ্যানের পাশে দাঁড়িয়ে আছে তাঁরা, আর মত্তাবস্থায় চার্লি তাদের পাশ দিয়ে বোর্ডিং হাউসের দিকে এগিয়ে চলেছেন। উনাও বাদ পড়েননি। ক্লেয়ার ব্লুম লণ্ডনে ফিরে যাবার পর ক্লেয়ারের হয়ে দুটি দৃশ্যে তাঁকে অভিনয় করতে হয়। দুটি দৃশ্যই রোগশয্যার, এবং দুটিই লংশটে তোলা। খুব নজর করে না দেখলে উনাকে সেখানে চিনবার উপায় নেই। বাদ গিয়েছেন শুধু সীডনি, চার্লির দাদা "লাইমলাইট" যখন তোলা হয়, সীডনি তখন ইউরোপে। ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও তাঁকে তাই নামানো সম্ভব হয়নি।

এবারে কাহিনীর কথা বলি। প্রথম দৃশ্যে দেখতে পাওয়া যায়, মত্তাবস্থায় টলতে টলতে চার্লি এক নাট্য সম্প্রদায়ের বোর্ডিং হাউসে এসে ঢুকলেন। ঢুকে নেশা ছুটে গেল তাঁর। কোত্থেকে যে গ্যাসের একটা তীব্র গন্ধ ভেসে আসছে কোত্থেকে? খুঁজতে খুঁজতে ক্লেয়ার ব্লুমের কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলেন তিনি গিয়ে দেখেন, আত্মহত্যার উদ্দেশ্যে ঘরে গ্যাস পাইপটাকে খুলে দিয়ে সে শুয়ে আছে। ক্লেয়ার এই নাট্য-সম্প্রদায়েরই এ নর্তকী। দারিদ্র্যের মর্মান্তিক তাড়নায় বিপর্যস্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মহত্যা এই বীভৎস পন্থাটাকেই সে বেছে নিয়েছে বাড়িওয়ালী তাকে জানিয়ে দিয়েছে, কা থেকে তাকে আর এখানে থাকতে দেও হবে না, আজই তাকে উঠে যেতে হবে সেই লাঞ্ছনার হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিল। তৎক্ষণ

ডাক্তারকে গিয়ে খবর দিলেন চার্লি, অচৈতন্য ক্লেয়ারকে তিনি নিজের ঘরে নিয়ে এলেন। তাঁর শুশ্রূষায় সে সুস্থ হয়ে উঠল। চার্লি তাকে অভয় দিলেন; বললেন যে, অত অল্পে মুষড়ে পড়তে নেই, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেই তাকে বেঁচে থাকতে হবে। জীবনকে যেন নতুন করে আবার চিনল ক্লেয়ার, ভালবাসতে শিখল। কিছুকাল বাদেই দেখা গেল, চতুর্দিকে তার নাম ছড়িয়ে পড়েছে। সে এখন খ্যাতনাম্নী, বিত্তশালিনী। ঠিক এই সময়টিতেই অকস্মাৎ একদিন অল্পবয়সী দরিদ্র এক সুরশিল্পীর (সীডনি চ্যাপলিন জুনিয়র) সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তার, সেই সুরশিল্পীকে সে ভালবাসল।

চার্লি ইতিমধ্যে বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তাঁর অভিনয় দেখে কেউ আর আজকাল খুশী হয় না, সেই নাট্য-সম্প্রদায় থেকে তাঁকে তাই বিদায় করে দেওয়া হয়েছে। দরজায় দরজায় তিনি এখন চাকরির জন্য ঘুরে বেড়াচ্ছেন। একদিন তিনি একটা স্বপ্ন দেখলেন। স্বপ্ন দেখলেন, যেন আবারও সুদিন ফিরে এসেছে তাঁর, যেন এক সার্কাসে তিনি সিংহের খেলা দেখাবার চাকরি পেয়েছেন। আসলে তাঁর চাকরিটা কিন্তু মৌমাছি পালনের। এখানে তাঁর সুন্দর একটি গান আছে। স্বপ্নের মধ্যেই তারপরে আবার দেখতে পেলেন যে, তাঁর সাফল্যের অধ্যায় শেষ হয়ে এল; দেখলেন যে, তাঁর অভিনয় আর কাউকে খুশী করতে পারছে না, দর্শকেরা তাঁকে দুয়ো দিচ্ছে।

চার্লি যে একদিন ক্লেয়ারের প্রাণরক্ষা করেছিলেন, ক্লেয়ার সে-কথা বিস্মৃত হয়নি। চার্লির এই দুর্দিনে তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে এল সে, তার নাচের দৃশ্যে চার্লিকে সে একটি ভূমিকা জুটিয়ে দিল। আবার যে চাকরি পাবেন, চার্লি তো ভাবতেও পারেননি। রিহার্স্যালের পর আগাম কিছু টাকা নিয়ে থিয়েটার থেকে একদিন বেরিয়ে আসছেন তিনি, হঠাৎ পুরনো আমলের এক রঙ্গাভিনেতার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল। এককালে সে চার্লির সহকর্মী ছিল। কথায় কথায় চার্লিকে সে বলল যে, থিয়েটারের কর্তৃপক্ষ তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন; নাচের দৃশ্যে যে বুড়ো ক্লাউনটিকে নামানো হবে

উনার দুই মেয়ে

বলে স্থির করা হয়েছিল, তাঁর অভিনয় তাঁদের ভাল লাগেনি, তাঁর জায়গায় সে এখন অভিনয় করবে।

বিস্ময়ে, বেদনায় চার্লি যেন বিমূঢ় হয়ে গেলেন। মদের নেশায় জীবনে তাঁকে অনেক দুঃখ পেতে হয়েছে, তাই স্থির করেছিলেন, জীবনে আর কখনও মদ খাবে না। কিন্তু আকস্মিক এই আঘাতে তাঁর সমস্ত সংকল্প যেন বিচূর্ণ হয়ে গেল। সামান্য যা কিছু পুঁজি ছিল, বোর্ডিং হাউস থেকে সেগুলি কুড়িয়ে এনে আবার তিনি ভাটিখানায় গিয়ে ঢুকলেন। ক্লেয়ার ওদিকে পাগলের মত তাঁকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। সম্ভব-অসম্ভব সমস্ত জায়গায় গিয়ে চার্লির খোঁজ করছে সে। কোথাও গিয়ে শুনছে, চার্লি সেখানে আসেননি; কোথাও শুনছে, এসেছিলেন, কিন্তু একটু আগেই আবার বেরিয়ে গিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত লণ্ডনের এম্পায়ার থিয়েটারের সামনে চার্লিকে তিনি দেখতে পেলেন। ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে ফুটপাথের উপরে তিনি দাঁড়িয়ে আছেন। ম্যানেজার তাঁকে দেখে চিনতে পারলেন। এককালের এই বিখ্যাত রঙ্গাভিনেতার দুর্দশা দেখে তাঁর দয়া হল; স্থির করলেন যে, চার্লির জন্য একটা সাহায্য-অনুষ্ঠানের আয়োজন করবেন। সাহায্য-রজনীর অভিনয়ে স্বয়ং চার্লিকে একটা ভূমিকা দেওয়া হল। প্রাণ ঢেলে দিয়ে অভিনয় করলেন চার্লি। দর্শকেরা তাঁর অভিনয় দেখে প্রশংসায় উচ্ছ্বসিত। তাদের হাততালি আর থামতে চায় না। এত প্রশংসা, এত সম্মান—এ যেন চার্লি

চার্লস চ্যাপলিন ও উনা ও'নীল

কল্পনাও করতে পারেননি। আনন্দে, উত্তেজনায় তাঁর দুর্বল দেহের শিরায় শিরায় যেন আগুন জ্বলে উঠল। বাস্টার কীটেনের সঙ্গে একই দৃশ্যে তিনি তখন অভিনয় করছেন, অভিনয় করতে করতে অকস্মাৎ স্টেজের উপর তিনি মূর্ছিত হয়ে পড়লেন। সেই অবস্থায় ধরাধরি করে তাঁকে উইংসের আড়ালে নিয়ে যাওয়া হল, কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তাঁর চৈতন্যকে আর ফিরিয়ে আনা গেল না।

"লাইমলাইট" সবাক চিত্র। অনেকে মনে করেন, কথাকে এ-বইয়ে বড্ড বেশী প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে। বিশেষ করে চার্লির বই বলেই এ-কথা তাঁদের মনে হয়ে থাকবে। অনেকে আবার আশা করে-ছিলেন, এ-বইয়েও চার্লির সৃষ্ট সেই ভব-ঘুরে চরিত্রটির দর্শন পাওয়া যাবে; না পেয়ে তাঁরা দুঃখিত হলেন। ব্যক্তি-চার্লিকে তাঁরা চাননি, অভিনেতা চার্লিকেই তাঁরা চেয়েছিলেন। সে যাই হোক, এ-বইয়ের গুরুত্ব কেউ অস্বীকার করেন না। অনেকে তো বলেন, এটি তাঁর একটি শ্রেষ্ঠ বই। "লাইমলাইট"-এর সঙ্গীতাংশের কোনও তুলনা হয় না। "ইটার্ন্যালি" গানটি তো অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ইউরোপের প্রায় সমস্ত দেশেই বেতার-যোগে রাতের পর রাত এ-গান শোনানো হয়েছে। সুইটজারল্যাণ্ডের একাধিক কাফেতে এ-গান আমি শুনেছি, প্যারিসের নাইট-ক্লাবেও। শুধু কি তাই, বণ্ড স্ট্রীট দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ একদিন থমকে দাঁড়িয়ে গেলাম। দেখি, এক বৃদ্ধ ভিক্ষুক ভাঙা বেহালায় ছড় টেনে-টেনে সে "ইটার্ন্যালি"র সুর বাজিয়ে চলেছে। স্বয়ং চার্লি একদিন কেনিংটন অঞ্চলে বেড়াতে গিয়েছেন। বাস থেকে নেমেই তাঁর রোমাঞ্চ হল। শূন্য একটা জ্যামের টিনকে লাথি মারতে মারতে এগিয়ে আসছে একটা হা-ঘরে ছেলে, আর মনের আনন্দে শিস দিচ্ছে। শিসের সুরটা তাঁর চেনা, বড্ড বেশী চেনা। সে-সুর "ইটার্ন্যালি"র।

লণ্ডনে মুক্তিলাভ করল "লাইমলাইট"। উদ্বোধন-রজনীর সেই অনুষ্ঠানে রাজ-কুমারী মার্গারেট উপস্থিত ছিলেন। ছেলে-মেয়েদের সঙ্গে নিয়ে সস্ত্রীক চার্লিও এসেছিলেন। দর্শকরা সে-কথা জানতে পেরে মুহুর্মুহু তাঁর জয়ধ্বনি দিতে লাগল। চার্লিকে শেষ পর্যন্ত রঙ্গমঞ্চের উপরে গিয়ে দাঁড়াতে হল। ক্লেয়ারকেও তিনি সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বক্তৃতাপ্রসঙ্গে ক্লেয়ারের অভিনয়-প্রতিভার তিনি অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছিলেন।

এত সবের মধ্যেও চার্লি কখনও বিস্মৃত হননি যে, দুর্দিনের এক ঘনকৃষ্ণ মেঘপুঞ্জ অন্ধ আক্রোশে তাঁর দিকে ছুটে আসছে। সে-মেঘ ফেটেও পড়ল শেষ পর্যন্ত। অ্যামেরিকায় যে-আক্রোশ তাঁর বিরুদ্ধে দিনে-দিনে পুঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল, অ্যাটর্নি জেনারেল জেমস ম্যাক-গ্র্যানারির বিবৃতির মধ্যেই তা আত্মপ্রকাশ করল। চার্লস চ্যাপলিন অ্যামেরিকা থেকে ইংল্যাণ্ডে রওনা হবার পরমুহূর্তেই তিনি ঘোষণা করলেন, চ্যাপলিন এখনও বিদেশী; সুতরাং এ-দেশে তাঁর বসবাসের যোগ্যতা সম্পর্কে নিঃসংশয় না হওয়া পর্যন্ত মার্কিন সরকার তাঁকে আর অ্যামেরিকায় প্রবেশ করতে দেবেন না।

দীর্ঘ চল্লিশ বছর অ্যামেরিকায় কেটেছে চার্লস চ্যাপলিনের। জীবনের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় তাঁর অ্যামেরিকাতেই অতিবাহিত হয়েছে। তারপর তাঁর ঐশ্বর্যে আর প্রতিষ্ঠায় ঈর্ষান্বিত হয়ে উঠল অনেকে, তাঁর নামে এই মিথ্যা অপবাদ রটিয়ে দেওয়া হল যে, তিনি কম্যুনিস্ট। অংশত এই কারণেই অ্যামেরিকায় তাঁর জায়গা হল না।

তাতে তিনি বিস্মিত হননি, দুঃখিতও হননি এতটুকু। উনা আমেরিকান, মাতৃ-

ম থেকে তাঁকে নির্বাসিত করা হয়নি। অ্যামেরিকায় গিয়ে তাঁদের বিপুল বিষয়-সম্পত্তির একটা ব্যবস্থা করে আসবার জন্য উনাকে তাই বিমানযোগে তিনি অ্যামেরিকায় পাঠিয়ে দিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে উনা তাঁর মার্কিন নাগরিকত্ব পরিহার করে ব্রিটিশ নাগরিকত্ব গ্রহণ করেছেন।

উনাকে অ্যামেরিকায় পাঠিয়ে দিয়ে সে-রাত্রিটা চার্লি'র বড় উদ্বেগের মধ্যে কেটেছিল। বিমানযোগে আটলাণ্টিক মহা-সমুদ্রের উপর দিয়ে উড়ে চলেছেন উনা, আর চার্লি এদিকে আশঙ্কায় আর উদ্বেগে ঘরময় পায়চারি করে বেড়াচ্ছেন। চোখে ঘুম নেই, মনে শান্তি নেই। সারা রাত ঈশ্বরের কাছে তিনি প্রার্থনা জানিয়েছেন, উনার যেন কোনও বিপদ না ঘটে। মায়ের কাছে একদিন যে স্নেহসুনিবিড় আশ্রয় পেয়েছিলেন, দীর্ঘকাল অশান্তির মধ্যে কাটিয়ে জীবনের প্রান্তভূমিতে পৌঁছে উনার কাছেও তিনি সেই পরম আশ্রয় খুঁজে পেয়েছেন। মাকে ছাড়া আর একটি মেয়েকেও যদি তিনি ভালবেসে থাকেন, সে-মেয়ে উনা।

যে-কদিন অ্যামেরিকায় ছিলেন উনা, টেলিফোনে আর তারযোগে সারাক্ষণই চার্লি তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রেখেছিলেন। সপ্তাহখানেক বাদে তিনি ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে চার্লি'র কিছু পরিমাণ সম্পত্তি তিনি সুইটজারল্যাণ্ডে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করে এসেছেন।

চার্লি স্থির করলেন, সুইটজার-ল্যাণ্ডেই তিনি থাকবেন। জেনেভা হ্রদের তীরে ভীভিতে সুন্দর একটি বাড়ি কেনা হল। বাড়িটা পাহাড়ের গায়ে। চারিদিকে আঙুর-বাগান, সামনে ঝুল-বারান্দা, পরিচ্ছন্ন লন, কেয়ারি করা উদ্যান, আর বড় বড় গাছ। সব মিলিয়ে ৩৭ একর জমি। বাড়িটা কিনতে মোট ব্যয় পড়েছিল এক লক্ষ পাউণ্ড। সেইখানে, কোলাহল-মুখর নাগরিক জীবনের থেকে অনেক দূরে, প্রকৃতির অকৃপণ দাক্ষিণ্যের মধ্যে এসে আশ্রয় নিলেন চার্লি।

ছ মাইল দূরে তেরিতে; ছেলেমেয়ে কটিকে সেখানকার এক ইস্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হয়েছে। ইস্কুলের পরিচালক একজন ইংরেজ ভদ্রলোক, তবে ইংরেজীর সঙ্গে-সঙ্গে তাদের ফরাসী ভাষা শিক্ষার কাজও দ্রুত এগিয়ে চলেছে। চ্যাপলিন মাঝে-মাঝে স্থানীয় এক ক্লাবে টেনিস খেলতে যান, কখনো-সখনো এক-আধটা ফিল্মও দেখেন। বাকী সময়টা কাটে পড়ার ঘরে। আপাতত তিনি তাঁর পরবর্তী বইয়ের চিত্রনাট্য রচনার কাজে নিমগ্ন রয়েছেন। এ-বই ইংল্যাণ্ডে তোলা হবে।

সুইটজারল্যাণ্ডে আসবার পর আর একটি ছেলে হয়েছে উনার। এটি তাঁদের পঞ্চম সন্তান। দাদামশাই ইউজেন ও'নীলের নামানুসারে এরও নাম রাখা হয়েছে ইউজেন।

হলিউডে থাকতে চার্লস চ্যাপলিনের বাড়িতেই একদিন স্যাম গোল্ডউইনের সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ম্যাক-গ্রানারির ঘোষণার পর চার্লি'র স্বপক্ষে এই বিখ্যাত চিত্র-প্রযোজক এক বিবৃতি দিলেন। সে-এক জ্বালাময়ী বিবৃতি। তিনি বলেছিলেন, "চার্লি'র পক্ষ নিয়ে এই যে আমি বিবৃতি দিচ্ছি, এটা যদি এ'দের ভাল না লাগে তো উত্তম, আমাকেও এ'রা অ্যামেরিকায় প্রবেশ করতে না দিতে পারেন।

"চার্লির স্বপক্ষে এখনও কেউ কিছু বলেনি, সবাই দেখছি নীরব হয়ে আছে। কিন্তু আর নয়, এবারে কারো কিছু বলা দরকার। আমার ধারণা, চার্লির মতন এত বড় শিল্পী আর কখনও হয়নি, তাঁর অভাব আর-কাউকে দিয়ে পূর্ণ হবার নয়।

"এক-জীবনে ক'জন মনীষীর সাক্ষাৎ মেলে? মনে রাখবেন, মনীষীদের সংখ্যা খুব বেশি নয়, এবং চার্লি সেই স্বল্প-সংখ্যকদেরই অন্যতম। চার্লি কম্যুনিস্ট নন। বিশ বছর ধরে তাঁকে আমি চিনি। বহু ব্যাপারে বহু সময়ে তাঁর সঙ্গে আমার মতবিরোধ হয়েছে। তিনি উদার-নৈতিক মানুষ, হয়তো বা ঈষৎ পথভ্রান্ত, কিন্তু আর যা-ই হোন, কম্যুনিস্ট তিনি নন।

"তাঁর পক্ষ নিয়ে এই যে আমি কথা বলছি, এই রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে, তা আমি জানি। কিন্তু তাতে আমি ভীত নই। সত্য কথাটা আজ নির্ভয়ে বলা দরকার। চার্লিকে সমর্থন করতে গিয়ে কি আমি বড্ড বেশী সাহসের পরিচয় দিয়ে ফেললাম? সাহস নয়, এটা গৌরববোধের ব্যাপার। চার্লিকে নিয়ে একখানা বই তুলতে পারলে আমি গৌরব বোধ করতাম।"

(৩৪)

চ্যাপলিনের জীবন-বৃত্তান্ত আপাতত এইখানেই শেষ হল। তাঁর বয়স এখন ৬৫ বছর। অনেকের ধারণা, নতুন কোনও ছবি আর তিনি তুলবেন না। এর আগে আরও বহুবার অনেকের এ-রকম আশঙ্কা হয়েছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গিয়েছে, আশংকাটা অমূলক। বারংবার যবনিকা-পতন ঘটিয়েও বারংবার সেই যবনিকা তাঁদের তুলে নিতে হয়েছে, চার্লির কর্ম-কাণ্ড এখনও শেষ হয়নি। তাঁর প্রতিভা কোনও একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর প্রতিভা নবনবোন্মেষ-শালিনী। এবং উৎসাহও অফুরন্ত। আবারও সেই প্রতিভার নূতনতর কোনও পরিচয় পাওয়া যাবে কি না, সে-বিষয়ে নিশ্চয় করে কিছু বলা সম্ভব নয়।

৬৫ বছর তাঁর বয়স, কিন্তু তাতে কী। উইনস্টন চার্চিলের বয়স যখন ৬৫ বছর, তখনও তাঁর জীবনে চূড়ান্ত সাফল্য আসেনি, তখনও তাঁর প্রতিভার সম্যক পরিচয় আমাদের অজ্ঞাত ছিল। তারও এক বছর পরে তিনি প্রধান মন্ত্রীর আসনে অধিষ্ঠিত হন। জীবনের দীর্ঘ ৬৫টি বছর অতিবাহিত হয়ে যাবার পর আরও ২৯ বছর বেঁচে ছিলেন বার্নার্ড শ, নিত্য-নূতন সৃষ্টিকর্মের মধ্য দিয়েই বেঁচে ছিলেন। এঁরা অবশ্য অসাধারণ মানুষ, কিন্তু মনে রাখা দরকার যে, চার্লস চ্যাপলিনও কিছু সাধারণ মানুষ নন।

অনেকে বলেন, চলচ্চিত্র-শিল্পের জন্মকালের সময় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন বলেই এতখানি খ্যাতি অর্জন তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছে; চলচ্চিত্রই যে তাঁকে বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি এনে দিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু চলচ্চিত্রের সহায়তা না পেলেও তিনি অখ্যাত হয়ে থাকতেন না। এ-কথা বলছি এই কারণে যে, তিনি শুধু অভিনেতাই নন, লেখকও। শুধু নকশাই তিনি লেখেননি, অপূর্ব সব নাটকও রচনা করেছেন। শুধু নাট্যরচনাই করেননি, সুরস্রষ্টা হিসেবেও অসামান্য তাঁর অবদান।

আর এই সমস্ত-কিছু মিলিয়ে যদি তাঁকে বিচার করে দেখা হয় তো বুঝতে পারা যাবে, চলচ্চিত্রের সহায়তা ছাড়াও তিনি খ্যাতি অর্জন করতে পারতেন; অন্তত নোয়েল কাওয়ার্ড কি আইভর নভেলোর সমতুল্য প্রতিষ্ঠা অর্জন করা তাঁর পক্ষে আদৌ অসাধ্য ছিল না। এবং মনে রাখা দরকার, নোয়েল কাওয়ার্ড আর আইভর নভেলোকেও, তাঁদের শিল্প-কল্পনার সুষ্ঠু প্রকাশের প্রয়োজনেই, চল-চ্চিত্রের সহায়তা নিতে হয়েছে।

শিল্পী হিসেবে চার্লস চ্যাপলিন এঁদের থেকে অনেক বড়। তাঁর সমসাময়িক যে-কজন প্রতিভাবান শিল্পীকে আমরা চলচ্চিত্র-শিল্পের সহায়তা গ্রহণ করতে দেখেছি, তাঁদের সকলের থেকেই তিনি বড়। জীবনের প্রথম পর্যায়েই তাঁর সেই বিশিষ্টতার পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। যে ভবঘুরে চরিত্রটির তিনি স্রষ্টা, তার মৃত্যু নেই। বছরের পর বছর কেটে যাবে, যুগের পর যুগ। কিন্তু তার সেই বিরাট বুটজোড়া, গোল টুপি আর বাঁকানো ছড়ি, এই তিনটি প্রতীক-চিহ্নের মধ্যেই সে অমর হয়ে রইল। *

—সমাপ্ত—

সাহিত্যে সংকট

অন্নদাশঙ্কর রায়

১৮
কেমন করে বাঁচব

জীবনের অর্থ কি? উদ্দেশ্য কি? এসব প্রশ্নও সঙ্গে সঙ্গে ওঠে। জীবন কি কেবল প্রাণধারণ? দেহধারণ? কোনোমতে বেঁচেবর্তে থাকা? বংশরক্ষা করা? অনধিকার প্রবেশকারীর মতো সেখানে যতটুকু সুখ পাওয়া যায় লুটেপুটে নেওয়া? আমরা কি আকস্মিকভাবে জন্মেছি? আকস্মিকভাবে মরব? বাঁচাটাও আকস্মিক?

অথবা একটা কিছু সাধন করার জন্যে এখানে প্রেরিত হওয়া? কোনো এক ব্রত? হোক না কেন নিতান্ত সামান্য। তবু তো একটা ব্রত। একটা কৃত্য। ছোট হলেই তুচ্ছ হয় না। সেতুবন্ধের দিন কাঠবিড়ালীর কৃত্য সামান্য ছিল, কিন্তু তুচ্ছ ছিল না।

মানুষকে এর উত্তর দিতে হবে। সাহিত্যের কাছে মানুষ এ উত্তর চাইবে। সাহিত্যিককে এর উত্তর জোগাতে হবে। কী উত্তর আছে তার ঝুলিতে?

এর পরের প্রশ্ন, কেমন করে বাঁচব? এ প্রশ্নের উত্তর গ্যয়টে একভাবে দিয়েছেন, টলস্টয় আরেকভাবে, রবীন্দ্রনাথ আরো একভাবে। এসব উত্তর যে এরই মধ্যে তামাদি হয়ে গেছে তা নয়। কিন্তু এটাও ঠিক যে, এঁরা কেউ আমাদের মতো অদ্ভুত অবস্থায় পড়েননি। মাথার উপর ডেমক্লিসের খড়্গের মতো যুদ্ধ ঝুলছে, পায়ের তলায় বাসুকীর ফণার মতো বিপ্লব যে কোনো দিন নড়ে উঠবে, এই অপরূপ অবস্থায় কেমন করে বাঁচতে হয় তার দৃষ্টান্ত পূর্বসূরীরা কেউ দেখিয়ে দিয়ে যাননি। এটা ইতিহাসে অভূতপূর্ব।

আজকের জগতে সেই সুখী হবে যে আদৌ ভাবে না, যে সম্পূর্ণরূপে অদৃষ্টবাদী অথবা যে একান্তভাবে ভগবানের ইচ্ছা বা ইতিহাসের ইচ্ছা মেনে নিতে শিখেছে। কিন্তু এরা তো কেউ সাহিত্যসৃষ্টির দায় স্বীকার করেনি। সাহিত্যিক যারা তারা কেমনভাবে বাঁচবে তার এরা কী জানে? শুধু সাহিত্যিক না, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক প্রভৃতির জীবন অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ। দায়িত্বের সঙ্গে বাঁচতে হয় এদের সবাইকে, দায়িত্বহীনের মতো নয়। দায়িত্বটা ভগবানের বা ইতিহাসের, আর এরা শুধু হাতের পুতুল বা দাবার বোড়ে, তাই যদি হতো, তবে কথা ছিল না। তাহলে প্রশ্নই উঠত না কেমন করে বাঁচব।

যে লোকটিকে পরমাণুবোমা ফেলতে বলা হয়েছিল, যে লোকদের বলা হয়েছিল গ্যাসচেম্বারে বন্দীহত্যা করতে, তারাও তো দোহাই দিতে পারে রাষ্ট্রের ইচ্ছার, ভগবানের ইচ্ছার। নিমিত্তমাত্রো ভব সব্যসাচী এই যদি হয় তাদের সাফাই তাহলে এর উপর বলবার কী আছে? কিন্তু মানুষ কখনো অতটা দায়িত্বহীন হতে পারে না যে, এই দায়িত্বহীনদের চিরদিন সমর্থন করবে। এদের নিয়ে যদি কোনোদিন সাহিত্য রচা হয়, তবে সে সাহিত্য মানুষ গ্রহণ করবে না, যদি তাতে এই দায়িত্বহীনদের সমর্থন থাকে। মানুষের সহানুভূতি হিরোশিমার নিহতদের প্রতি, বেলজেন ও বুকেনওয়ালডের বধ্যদের প্রতি চিরকাল ধাবিত হবে, হন্তা বা ঘাতকদের প্রতি কদাচ নয়।

দায়িত্বহীনদের মতো বাঁচা আমাদের সমর্থন পাবে না, আমাদের দ্বারা হবে না, কিন্তু দায়িত্ববানের মতো বাঁচব যে তার নকশা কই, ব্লু প্রিন্ট কই, দৃষ্টান্ত কই? দৃষ্টান্ত কে দেখাবে, নকশা কে আঁকবে, ব্লু প্রিন্ট কে তৈরি করবে।

১৯
জীবনের সমালোচনা

কেন বাঁচব, এ প্রশ্ন জরুরি। কারণ এর উত্তর না পেলে মানুষ বাঁচতে চাইবে না, মরতে চাইবে, মরণকামনা থেকে আসবে যুদ্ধবিগ্রহ।

কেমন করে বাঁচব, এ প্রশ্ন কম জরুরি নয়। কারণ এর উত্তর না পেলে মানুষ দায়িত্বহীনের মতো বাঁচবে, নির্বিকারচিত্তে অমানবিক কর্ম করবে।

সাহিত্যকে এসব প্রশ্ন নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়। সাহিত্য তো কেবল জীবনের প্রতিকৃতি নয়, জীবনের সমালোচনাও বটে। মহাভারত যিনি রচনা করেছেন তিনি তখনকার দিনের জীবন দেখিয়েছেন, সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত দিয়েছেন জীবন কেমন হলে ভালো হতো। ঐ মহাযুদ্ধের নায়ক যুধিষ্ঠির এমন সত্যনিষ্ঠ যে কোনো দিন একটি মিথ্যা কথা বলেননি। ফলে অনেক দুঃখ পেয়েছেন। যুদ্ধের মাঝখানে যুদ্ধজয়ের প্রয়োজনে সেই সত্যবাদীকেও একটি অর্ধসত্য উচ্চারণ করতে হলো। দ্রোণ যদি জানতেন যে, লোকটা আর দশজন যোদ্ধার মতো প্রয়োজনবাদী তা হলে ও কথা কানে তুলতেন না। কিন্তু যুধিষ্ঠির তাঁর শত্রুপক্ষীয় হলেও সত্যসন্ধ, তাঁর কথা তো অসত্য হতে পারে না। বেচারা দ্রোণ যুধিষ্ঠিরের অর্ধসত্যের দ্বারা প্রতারিত হয়ে প্রাণ হারালেন। মহাভারতকার এর জন্যে যুধিষ্ঠিরকে ক্ষমা করেননি, তাঁকে সশরীরে স্বর্গে নিয়ে যাবার মহত্তম সৌভাগ্য দিয়ে অমর করে দিলেন, কিন্তু একদিনের জন্যে নরকে নিয়ে যেতে দ্বিধা করলেন না। প্রাচীনদের সত্যবোধ ন্যায়বোধ এমনি কঠোর ছিল।

রামায়ণও তেমনি সত্যকে সর্বোচ্চ মূল্য দিয়েছে। পিতৃসত্যের জন্যে যুবরাজ রাম রাজা হলেন না, বনে বনে ঘুরলেন, অশেষ দুঃখ পেলেন। সেই রামকেই সরযূর জলে আত্মহত্যা করতে হলো। সতীর প্রতি প্রজারঞ্জনকারীর প্রতারকতুল্য ব্যবহার ক্ষমার অযোগ্য। বাল্মীকি তাঁকে সমর্থন করেননি। তাঁকে রাবণের উপর জিতিয়ে দিলেন, কিন্তু সীতার উপর জিতিয়ে দিলেন না। রামায়ণে শেষ পর্যন্ত সীতারই জিৎ।

প্রাচীনদের মতো আধুনিকদেরও জীবনের প্রতিকৃতি আঁকতে হবে, সঙ্গে সঙ্গে সমালোচনা দিয়ে যেতে হবে। কেমন

করে বাঁচতে হবে তার নিশানা। অত কথায় নয়, আভাসে ইংগিতে। যুগ বদলে গেছে। এ যুগের জীবনের শারিক শুধু উপরের দিকের মুষ্টিমেয় অভিজাত নয়, যারা এতদিন তলার দিকে ছিল সেই উপেক্ষিত অবজ্ঞাত জনগণ এখন জাগ্রত। এবং প্রধানত পুরুষ নয়, যাদের এতদিন দেবী বলে কপট ভক্তি দেখানো হয়েছে, নরকের দ্বার বলে মনে মনে ঘৃণা করা হয়েছে সেই অবলা এখন প্রবলা।

২০

জনগণের অভ্যুত্থান

জনগণের রাজ্যলাভ আমাদের যুগের একটা অতি বৃহৎ ঘটনা। কী রাশিয়ায়, কী চীনে, কী ভারতে, কী ইংলণ্ডে সর্বত্র জনগণের একচ্ছত্রতা স্বীকৃত হয়েছে বা হচ্ছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম বৃহৎ ঘটনা ছিল দাসপ্রথা বা সার্ফ প্রথার অবসান। তেমনি বিংশ শতাব্দীর অন্যতম বৃহৎ ঘটনা দাস বা সার্ফ শ্রেণীর লোকের ভোটাধিকার। যেখানে ভোটাধিকার লঙ্ঘিত সেখানে বিপ্লবের দ্বারা রাজ্য অধিকার।

সাহিত্যে এসব ঘটনা প্রতিফলিত হবেই। না হয়ে পারে না। কৃষক শ্রমিক শ্রেণী থেকে বহু লেখকের আবির্ভাব হবে। গত শতাব্দীতে যেমন মধ্যবিত্ত শ্রেণী থেকে হয়। তারা যখন আসবে তখন তাদের নিজেদের জীবনের অভিজ্ঞতাও আসবে। এসব অভিজ্ঞতা অপরের আয়ত্ত নয়। সাহিত্যে এর জন্যে স্থান খালি রয়েছে। যে স্থান মধ্যবিত্তরা পূরণ করতে পারবে না। হাজার দরদী সাহিত্যিক হলেও যার ঘরের কথা তার মতো করে বলা যায় না, যার মনের কথা তার মতো করে বোঝানো যায় না।

তবে সাহিত্যের স্বকীয় মূল্য না মানলে সকলের সব লেখা সাহিত্য হবে না। তা যদি না হলো তবে স্থান অপূর্ণই রয়ে গেল। জনগণের লেখকদেরও সাহিত্যের স্বকীয় নিয়ম, স্বকীয় মূল্য স্বীকার করতে হবে। নয়তো এমন কোনো নতুন নিয়ম নতুন মূল্য প্রবর্তন করতে হবে যা সাহিত্যের স্বকীয় নিয়ম স্বকীয় মূল্য বলে সকলে স্বীকার করে নেবে।

নানাদিক দিয়ে সাহিত্যের রূপান্তর ঘটবে তা বেশ বুঝতে পারা যায়। তবে হাজার রূপান্তর ঘটলেও একটা ধারাবাহিকতা থাকবে, এবং জীবনের গভীরতর অভিজ্ঞতাগুলো হাজার বছরেও বদলাবে না। সুতরাং গভীরতর অভিজ্ঞতাগুলো নিয়ে যারা কাজ করবে তারা চিরদিন কল্কে পাবে, কোনো দিন অপাংক্তেয় হবে না। তাদের নায়কনায়িকারা হয়তো জনগণের সামিল নয়, তা বলে তাদের সাহিত্যিক মূল্য বা মানবিক মূল্য কারো চেয়ে কম নয়। রামায়ণ পড়বার সময় কেউ কি ভাবে যে, রাম ও সীতা অভিজাত শ্রেণীর নায়কনায়িকা! যাদের মনে সেরূপ প্রশ্ন জাগে তারা সাহিত্য উপভোগের উপযুক্ত নয়। সাহিত্যে সকলের স্থান আছে, মান আছে, অধিকার আছে। নতুন একটা শ্রেণী সেখানে স্বাগত, কিন্তু পুরাতন একটা শ্রেণী প্রত্যাখ্যাত নয়। যার যা অভিজ্ঞতা সে তা দিয়ে যাবে, যা থাকবার তা থাকবে।

যাদের এতদিন শূদ্র বলা হয়েছে, অন্ত্যজ বলা হয়েছে, অনাচরণীয় বলা হয়েছে হঠাৎ শুনছি তারা নাকি গণদেবতা। সাবহিউমান থেকে ডবল প্রোমোশন পেয়ে সুপারহিউমান হবার আগে তারা কি একবার হিউমান হতে পারে না? সেইখানেই কিন্তু সত্যিকার মহত্ত্ব।

২১

নারীর অভ্যুদয়

সাহিত্যে জনগণ নবাগত। নারী কিন্তু নবাগতা নয়। নারীকে আমরা আদিকাল থেকেই কাব্যে আর নাটকে পেয়ে আসছি। তার পরে উপন্যাসে। বর্তমান ছোট গল্পে। নারী না থাকলে এর কোনোটাই জমে না।

কিন্তু নারীর জন্যে যে সংকীর্ণ সীমা নির্দিষ্ট হয়েছিল, তার বাইরে তাকে যেতে দেওয়া হতো না। কেউ যদি সে সীমা অতিক্রম করত সমাজ তেড়ে আসত। সমাজের ভয়ে লেখকরাও সীমা লঙ্ঘন করাতে সাহস পেতেন না। সব দেশেই এই ইতিহাস। যেখানে কোনো নারী সীমার বাইরে গেছে সেখানে তার কলঙ্কের সীমা নেই। কলঙ্কিনীকে সাহিত্যে ঠাঁই দিয়ে কোনো কোনো লেখকও কলঙ্কী হয়েছেন, সাজা পেয়েছেন। তবে বরাবরই এক শ্রেণীর নারীর জন্যে সমাজের বাইরে একটা ঘৃণ্য স্থান বরাদ্দ ছিল। সাহিত্যে এরাও মাঝে মাঝে প্রবেশ করেছে, সেখানেও লেখক এদের ঘৃণ্য করে দেখিয়েছে। নইলে তাকেও যে পাঁচজনের চোখে ঘৃণ্য হতে হবে।

আমাদের যুগের সমাজে ও সাহিত্যে নারীর জন্যে নির্দিষ্ট সীমা বহু দূরে প্রসারিত হয়েছে। যুদ্ধ আর বিপ্লব এদিক থেকে নারীর সহায় হয়েছে। শান্তিকালে পুরুষেরা যেসব কাজ করত, যুদ্ধকালে মেয়েরা সে সব কাজ করে। নতুবা আপিস ব্যাংক দোকানপাট অচল হয়। বিপ্লবের দিন মেয়েরা পুরুষদের পাশে এসে দাঁড়ায়, ব্যারিকেড বানায়, মিছিল নিয়ে বেরোয়, মেশিনগানের সমুখে বুক পেতে দেয়। সমাজপতিরা এদের ঠেকাতে পারবেন কেন? যে যার জান মাল সামলাতে ব্যস্ত।

বিগ্রহের শেষে বা বিপ্লবের পরে নারীকে আর পুরোনো সীমায় ফিরিয়ে আনা যায় না। নারী একবার সীমা লঙ্ঘন করলে সীমাই বেড়ে চলে, নারী ফিরে চলে না। তারপর ঐ যে একদল নারীকে, পতিতা বলে আবহমান কাল ঘৃণা করা হয়েছে, তাদেরও মানুষ বলে গণ্য করা হয়। আমাদের সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এর পথপ্রদর্শক। বহু অপমান সহ্য করে তিনি অপমানিতাকে মান দিয়ে গেছেন। লোকে যাদের ঘৃণ্য বলে, তিনি তাদের মধ্যেও মহত্ত্ব আবিষ্কার করেছেন। ব্যাসদেবের সাবিত্রীর সংগে শরৎচন্দ্রের সাবিত্রীও সাহিত্যে স্বীকৃতি পেলো। সাহিত্যের শ্রীক্ষেত্রে সতী ও অসতী একসংগে তীর্থ করতে যাচ্ছে, কেউ মন্দিরের দ্বার রোধ করছে না এই অস্পৃশ্যাদের জন্যে। আধুনিক সাহিত্য ভ্রমরকে মর্যাদা দেয়, তা বলে রোহিনীকে গুলী করে মারে না। বঙ্কিমের সমসাময়িক টলস্টয় তাঁর আনা কারেনিনাকে রেলগাড়ীর তলায় আত্মহত্যা করালেন। শরৎচন্দ্রের সমসাময়িক গলসওয়ার্দি এটাকে অবশ্যম্ভাবী বলে মেনে নিতে নারাজ হলেন। আধুনিক পাঠক গলসওয়ার্দির সংগেই একমত হবে, টলস্টয়ের সংগে নয়।

২২

ঐতিহ্য

ঐতিহ্য বলতে যাঁরা অজ্ঞান, তাঁরা ঐতিহ্যগত মূল্যগুলোকে আধুনিক মানুষের ঘাড়ে নির্বিচারে চাপাতে চান। আধুনিক মানুষ চায় বিচার করতে, বিবেচনা করতে, যাদের প্রতি যুগে যুগে অন্যায় করা হয়েছে, তাদের প্রতি সুবিচার করতে। সুবিচার করতে গিয়ে সহানুভূতিবশত হয়তো কিছু অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে বসে। তার ঐ আতিশয্য কালক্রমে সংশোধিত হয়। কিন্তু ঐতিহ্য-পূজারীদের অবিচারের চেয়ে এই অতি-মাত্রিক সুবিচার ভালো।

ঐতিহ্যকে নির্বিচারে নাকচ করা ঠিক নয়। কিন্তু ঐতিহ্যের মধ্যে যে অংশটা শাশ্বত নয়, যেটা কালচিহ্নিত, সেটা যদি ধীরে ধীরে কালের কবলে পড়ে শেষে একদিন অপ্রচলিত হয়ে যায়, তাহলে আফসোস করার কী আছে। যা পুরাতন তার সবটাই সনাতন নয়, সবটাকে সনাতন বলে জাহির করাও আতিশয্য, এবং অমার্জনীয় আতিশয্য। এর সংশোধন কি কোনো দিন হবে না? নিশ্চয় হবে। যা নিছক পুরাতন তা সনাতন বলে পরিচয় দিলেও তার আয়ু ফুরিয়ে আসবে। এই ত্রিশ চল্লিশ বছরে আমরা তা প্রত্যক্ষ করলুম! বেঁচে থাকলে আরো দেখব।

ঐতিহ্যের সঙ্গে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। আর ঐতিহ্যের মধ্যে যা সত্য, সনাতন তাকে নিত্য নূতনভাবে উপলব্ধি করতে হবে। এই সব নয়। যা নিছক নতুন, যা সনাতন নয়, তাকে তার আয়ুষ্কালটুকু ভোগ করতে দিতে হবে। হয়তো পাঁচ দশ বছর তার পরমায়ু। তারপরে সে বুদ্বুদের মতো মিলিয়ে যাবে। কিন্তু যেটুকু সময় সে আছে সেটুকুর উপর তার অধিকার আছে। একালে অজস্র নভেল লেখা হচ্ছে, কবিতা ও ছোট গল্প লেখা হচ্ছে। হোক। যার যে ক'দিন আয়ু তাকে সে ক'দিন ভোগ করতে দাও। আর কিছু না হোক নতুন মূল্যের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। সেটারও দরকার। নতুনের উপর স্নেহদৃষ্টি চাই, যেমন নবজাতকের উপর। আমরা কংসরাজা নই যে, নতুন দেখলেই কোতল করব।

নতুনের মধ্যে যদি সনাতন কিছু থাকে, তবে তা অমর। কেউ তাকে ধ্বংস করতে পারে না। নতুনের সাজ পরে যে এসেছে, সে কি চিরন্তন না সে নিতান্তই ইদানীন্তন? আমাদের আজকের দিনের সাহিত্য কি পঞ্চাশ বছর পরে, একশো বছর পরে অমনি আনন্দ দিতে থাকবে, যেমন দিচ্ছে আজ? না তার শুধু একটা ঐতিহাসিক মূল্য থাকবে গবেষকদের চক্ষে? যা চিরন্তন তার কাছে এক আধ শতাব্দী কিছু নয়। তা হাজার বছর পেরিয়ে যায়, দু' হাজার ছাড়িয়ে যায়। তার মূল্য সেইজন্যে সনাতন।

২৩

চিরন্তন মূল্য

কিন্তু চিরন্তন মূল্য বলে কিছু আছে কি? আধুনিকরা ক্রমে এর উপর বিশ্বাস হারাচ্ছে। বাইরের সংকটের চেয়ে আভ্যন্তরিক এই সংকট তাদের পক্ষে অনিষ্টকর। মানুষের বড় বড় শত্রুগুলো তার নিজের ভিতরে। বাইরে ঝড় গর্জে গেলেও নৌকা ভেসে থাকতে পারে, কিন্তু ভিতরে ছিদ্র থাকলে ঝড়ের দরকার করে না, নিস্তরঙ্গ সলিলই তার সমাধি রচনা করে।

মানুষ যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, পৃথিবী যদি ধ্বংস হয়, বিশ্ব যদি শূন্যে মিলিয়ে যায়, তা হলেও কিছু থাকবে। তা এই দৃশ্যমান জগতের অন্তরালে নিহিত, অন্তরে স্থিত রিয়ালিটি। সেই রিয়ালিটি যখন সাহিত্যের অন্তরালে নিহিত হয়, অন্তরে স্থিতি পায়, তখন সাহিত্যও কাল পারাবার পার হয়ে যায়।

যা আজ আছে কাল নেই তা সত্য। কিন্তু যা আজ আছে কালও আছে পরশুও আছে, এক হাজার বছর পরেও আছে, এক লাখ বছর পরেও আছে, তার সত্যতা উপলব্ধি করতে হবে। এর জন্যে চাই আর এক জোড়া চোখ—অন্তর্দৃষ্টি। দর্শনের মতো সাহিত্যেও appearance বনাম realityর প্রশ্ন আছে। চোখ যদি appearanceএ ধাঁধিয়ে যায়, তা হলে চিরন্তনকে কোনো দিনই আবিষ্কার করবে না। সাহিত্যের আবিষ্কার বিজ্ঞানের আবিষ্কারের মতো নয়। সাহিত্যের দৃষ্টি মর্মভেদী। সাহিত্য চলে যায় গভীর থেকে গভীরতরে, সেখান থেকে গভীরতমে। সেখানে রয়েছে অন্তঃসার। সে অন্তঃসার কেবল সত্য নয়, তা সুন্দর। যা সত্য, যা সুন্দর তা কি শিব না হয়ে পারে। কিন্তু সংসারের বিবেচনায় তা হয়তো শিব নয়। সংস্কারবদ্ধ চশমায় তা হয়তো সুন্দর নয়। দূরবীক্ষণ বা অনুবীক্ষণ দিয়ে দেখলে তা হয়তো সত্য নয়।

একালের লোকের দোষ হচ্ছে এরা বিজ্ঞানের পদ্ধতি সাহিত্যেও খাটাতে চায়। দর্শনেও খাটাতে চায়। ঐ একই চাবি দিয়ে এরা সব ক'টা তালা খুলবে। তা হয় না। বাউলরা বলে, 'কমল বনে কে আসিল সোনার জহুরী নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি আ মরি।" সোনার বেলায় নিকষ আবশ্যক, কমলের বেলায় অনাবশ্যক। সাহিত্যের পদ্ধতি যে বহির্দৃষ্টিকে বাদ দেয় তা নয়, কিন্তু এখানে অন্তর্দৃষ্টির প্রাধান্য। অন্তর্দৃষ্টি না থাকলে ধরা পড়ে না যে ঘটনার তলে তলে নিয়তির অন্তঃস্রোত প্রবাহিত হচ্ছে। নিয়তি সম্বন্ধে অবহিত না হলে রামায়ণ মহাভারত লেখা যেত না ইলিয়াড অডিসি লেখা যেত না, গ্রীক ট্র্যাজেডী লেখা যেত না। নিয়তি যাকে বলছি তা অন্ধ খামখেয়াল নয়। সেখানে একটা কোনো নৈতিক নিয়ম কাজ করছে একটা moral law.

তেমনি ইনটুইসন না থাকলে ভগবানের লীলা প্রত্যক্ষ করা যায় না। সেটাও অন্ধ খামখেয়াল নয়। সেখানেও কাজ করছে একটা কোনো নিয়ম। কিন্তু নিয়ম কথাটা সে ক্ষেত্রে অপ্রযোজ্য। নীতির পরিভাষায় পরম রহস্যকে তর্জমা করা যায় না। সাহিত্যে চেষ্টা করে অন্য-ভাবে বোঝাতে। সাহিত্যে মরমিয়া ভাবের mysticismএর স্থান আছে। সেও রিয়ালিটির মর্মোদ্ঘাটন। কেউ যদি মনে করে ওটা পলায়নবৃত্তি, তবে ভুল করে। বাহির থেকে ভিতরে যাওয়া পলায়ন নয়।

(ক্রমশ)

স্বামীজীর বিদেশ ভ্রমণের উদ্দেশ্য ও প্রেরণা

শ্রীসরলাবালা সরকার

স্বামীজী রামেশ্বর হইতে পদব্রজেই কন্যাকুমারী গিয়া আবার পদব্রজেই মাদুরা হইয়া পণ্ডিচেরীতে উপস্থিত হইলেন। শরীর অবসন্ন, আর হাঁটিবার শক্তি নাই। তাই তিনি কয়েকদিন বিশ্রাম লইবেন বলিয়া মনস্থ করিলেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে স্বামীজী পণ্ডিচেরী আসেন। এখানে তাঁহার মাদ্রাজের ডেপুটি অ্যাকাউণ্টাণ্ট জেনারেল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আবার দেখা হইয়া গেল। ইতিপূর্বে ইঁহার সঙ্গে ত্রিবান্দ্রামে স্বামীজীর পরিচয় হইয়াছিল।

মন্মথবাবু তাঁহাকে পথের মধ্যে দেখিতে পাইয়া খুবই আনন্দিত হইলেন। স্বামীজী মাদ্রাজ যাইতে চাহেন শুনিয়া মন্মথবাবু বলিলেন তিনিও কয়েকদিনের মধ্যেই মাদ্রাজ যাইবেন, এই কয়দিন যেন স্বামীজী তাঁহার বাড়িতে অনুগ্রহ করিয়া আতিথ্য গ্রহণ করেন। মন্মথবাবুর পণ্ডিচেরীর কাজ হইয় গেলে দু'জনেই একসঙ্গে মাদ্রাজ ফিরিতে পারিবেন আর মাদ্রাজে স্বামীজী যে কয়দিন থাকিবেন যেন তাঁহারই বাড়িতে থাকেন। স্বামীজী মন্মথবাবুর এই অনুরোধে সম্মত হইলেন।

ইতিমধ্যে মন্মথবাবু তাঁহার মহীশূরবাসী এক বন্ধুকে পত্রে স্বামীজীর মাদ্রাজ যাওয়ার কথা জানাইলেন এবং কোন্ তারিখে স্বামীজী রওনা হইবেন তাহাও জানাইয়া দিলেন। মহীশূরবাসী বন্ধুটি সেই সংবাদ তাঁহার মাদ্রাজী বন্ধুদের জানাইলেন। স্বামীজী মাদ্রাজে পেঁৗছিয়া দেখিলেন ১৩।১৪ জন মাদ্রাজী যুবক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য স্টেশনে উপস্থিত হইয়াছে।

এইভাবে মাদ্রাজে পদার্পণ করিয়াই ওখানকার কয়েকজনের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হইল।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে জানুয়ারী মাসে স্বামীজী মাদ্রাজ যান এবং প্রায় একমাস মন্মথবাবুর বাড়ি থাকেন। এই একমাসের মধ্যে চতুর্দিকেই তাঁহার সম্বন্ধে এইভাবে প্রচারিত হইল যে, "এক বাঙ্গালী সাধু এসেছেন, তিনি খুব ভাল ইংরেজী জানেন।" এই "ইংরেজি জানা" সাধুটিকে দেখিবার ও তাঁহার সহিত আলাপ করিবার জন্য প্রতিদিন মন্মথবাবুর বাড়ি পরিচিত ও অপরিচিত বহু লোকের আগমন হইতে লাগিল। অনেক মাদ্রাজী যুবক স্বামীজীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিল, স্বামীজী এই সকল মাদ্রাজী যুবকের আন্তরিকতার বার বার প্রশংসা করিয়াছেন।

এই যুবকগণের মধ্যে একজন—তাঁহার নাম সিঙ্গারা ভেলু মুদালিয়ার, ইনি স্বামীজীর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। স্বামীজী তাঁহাকে 'কিডি' বলিয়া ডাকিতেন। যখন 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা মাদ্রাজ হইতে প্রকাশিত হয় তখন ইনিই তাঁহার প্রথম ম্যানেজার নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

বাংলাদেশ স্বামীজীর জন্মভূমি, কিন্তু বহুদূর মাদ্রাজের অধিবাসী এই তরুণগণ যে ভাবে যত সহজে স্বামীজীকে বুঝিতে ও গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল তাঁহার নিজের দেশের লোকেও হয়তো ঠিক সে ভাবে পারে নাই। অবশ্য এখানে আমি তাঁহার গুরুভাইদের কথা বলিতেছি না। স্বামীজী চাহিয়াছিলেন একদল অল্পবয়স্ক বিলাসবর্জিত, কষ্টসহিষ্ণু ও দৃঢ়সংকল্প স্বাস্থ্যবান তরুণ, উচ্চকার্যে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য যাহারা উৎসাহী হইবে এবং তাঁহার সহকর্মী হইতে পারিবে। মাদ্রাজে আসিয়া তাঁহার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল।

স্বামীজী আমেরিকা যাইবেন এই সংবাদটি জানা মাত্র তাহারা মহা উৎসাহের সঙ্গে চাঁদা তুলিতে আরম্ভ করিল এবং শীঘ্রই ৫০০ টাকা সংগ্রহ হইল। কিন্তু স্বামীজী ঐ টাকা গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন, "বেশ, চাঁদা তুলেছ ভাল কথা। এখন এ টাকা গরীবদের দিয়ে দাও। যদি ঠাকুরের ইচ্ছা হয় তা হ'লে আমেরিকা যাওয়ার খরচ আপনা থেকেই আসবে।"

এই সময় হায়দ্রাবাদ হইতে তাঁহার কাছে হায়দ্রাবাদ যাইবার জন্য আমন্ত্রণ আসিল। স্বামীজী এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন এবং ১০ই ফেব্রুয়ারী তাঁহার হায়দ্রাবাদ যাইবার দিন স্থির হইল। মন্মথবাবু তাঁহার হায়দ্রাবাদের বন্ধু শ্রীযুক্ত মধুসূদন চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে টেলিগ্রাম করিয়া এই সংবাদ জানাইলেন। মধুসূদনবাবু ছিলেন হায়দ্রাবাদের সুপারিনটেণ্ডিং ইঞ্জীনিয়র।

হায়দ্রাবাদ স্টেশনে পেঁৗছিয়া স্বামীজী দেখিলেন প্রায় পাঁচশো লোক স্টেশনে তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য আসিয়াছেন। তাহার মধ্যে সকল শ্রেণীর সকল অবস্থার হিন্দু, মুসলমান ও পার্শি প্রভৃতি সকল জাতির লোকই আছেন। মধুসূদনবাবুর ছেলে কালীচরণবাবু আসিয়াছিলেন স্টেশনে তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য। কালীচরণবাবুর সঙ্গে স্বামীজীর ইতিপূর্বেই কলিকাতায় পরিচয় হইয়াছিল, তিনিই স্টেশনে উপস্থিত সকলের সঙ্গে স্বামীজীর পরিচয় করাইয়া দিলেন।

মধুসূদনবাবুর বাংলোয় পেঁৗছিয়া স্বামীজী দেখিলেন যে, সেখানেও অনেকে আসিয়া তাঁহার জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। ইহার পর দিন একদল ছাত্র ও অধ্যাপক আসিয়া তাঁহাকে মহবুব কলেজে বক্তৃতা দিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। সেদিন ছিল ১১ই ফেব্রুয়ারী, স্বামীজী ১৩ই ফেব্রুয়ারী বক্তৃতা দিবার দিন স্থির করিলেন।

সেইদিনই তিনি নবাব বাহাদুর সার খুরসিদ জাহরের প্রাইভেট সেক্রেটারীর এক পত্র পাইলেন, তাহাতে জানাইয়াছেন নবাব বাহাদুর স্বামীজীর সঙ্গে দেখা করিবার জন্য বিশেষ উৎসুক, তিনি যদি সময় করিয়া একবার তাঁহার প্যালেসে যান তাহা হইলে নবাব বাহাদুর বিশেষ সুখী হইবেন।

স্বামীজী শুনিলেন, নবাব বাহাদুর বৃদ্ধ হইয়াছেন। তিনি নিজে ধর্মপরায়ণ ও সকল ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় তাঁহার অত্যন্ত উৎসাহ। স্বামীজী ১২ই ফেব্রুয়ারী কালীচরণবাবুকে সঙ্গে লইয়া নবাব বাহাদুরের প্রাসাদে গেলেন। নবাব বাহাদুরের সহিত আলোচনায় স্বামীজী বুঝিতে পারিলেন, নবাব বাহাদুর একজন যথার্থ ধর্মপিপাসু ব্যক্তি এবং সকল ধর্মেরই কোন্‌টি সার কথা তাহা জানিবার জন্য তাঁহার কৌতূহল আছে। নবাব বাহাদুরের সহিত ধর্ম সম্বন্ধে আলোচনায় সেদিন স্বামীজী খুশীই হইয়াছিলেন। আলোচনা শেষে নবাব বাহাদুর স্বমীজীকে জানাইলেন যে, তিনি তাঁর আমেরিকা যাওয়ার খরচের জন্য এক হাজার টাকা দিতে চান। কিন্তু স্বামীজী টাকা লইতে অস্বীকার করিয়া বলিলেন, "এখনও সময় হয়নি। যখন ভগবানের নির্দেশ পাব তখন আপনাকে জানাবো।"

স্বামীজীর এইভাবের কথায় মনে হয়, তিনি তখন পর্যন্ত মনের মধ্যে একটি বিশেষ প্রেরণা লাভ করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

১৩ই ফেব্রুয়ারী সকালে নিজাম বাহাদুরের প্রধানমন্ত্রী সার আসমান সাহ, মহারাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ বাহাদুর এবং মহারাজা সিউরাজ বাহাদুর স্বামীজীর সহিত দেখা করিতে আসিলেন। ইঁহারা সকলেই স্বামীজীর আমেরিকা যাওয়ার সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত ছিলেন।

সেইদিন বৈকালে মহবুব কলেজ সাধারণ সভায় স্বামীজী বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় ছিল 'my mission to the west' অর্থাৎ পাশ্চাত্ত্যে আমার প্রচারকার্য। ভারতবর্ষে এইটি স্বামীজীর প্রথম বক্তৃতা। বক্তৃতা-সভা লোকে পরিপূর্ণ, তাহার মধ্যে অনেক ইংরেজও ছিলেন। সভাপতি হইয়াছিলেন শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রতনলাল, ইনি হায়দ্রাবাদের একজন বিখ্যাত ব্যক্তি। শ্রোতাগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত সেই বক্তৃতা শুনিয়াছিল এবং বক্তৃতা শেষে সকলে বার বার করতালি ধ্বনিতে অভিনন্দন জানাইয়াছিল। সকলেই বলিয়াছিল যে, এমন অপূর্ব বক্তৃতা এর আগে কখনও তাহারা শুনে নাই।

পরের দিন স্থানীয় কোমবাজার নামক স্থানের ব্যাঙ্কারগণ শেঠ মতিলালের নেতৃত্বে তাঁহাকে অভিবাদন জানাইতে আসিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহারা আমেরিকা যাইবার জন্য অর্থসাহায্যের প্রতিশ্রুতিও জানাইলেন।

১৭ই ফেব্রুয়ারী স্বামীজী হায়দ্রাবাদ ত্যাগ করিলেন এবং আবার মাদ্রাজে ফিরিয়া আসিলেন। এবার স্বামীজী শ্রীশ্রীমার নিকট আমেরিকা যাইবার কথা জানাইলেন এবং তাঁহার অনুমতি ও আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়া পত্র লিখিলেন।

অতি শীঘ্র শ্রীশ্রীমার পত্রের উত্তর আসিল। মা অনুমতি দিয়াছেন এবং সস্নেহ আশীর্বাদের সঙ্গে ঠাকুরের নিকট মঙ্গল প্রার্থনাও জানাইয়াছেন। এই পত্র পাইবার পর স্বামীজীর মনে আর কোন দ্বিধা রহিল না।

এবার মাদ্রাজী শিষ্যগণ অর্থসংগ্রহের জন্য উৎসাহের সঙ্গে কাজে লাগিলেন। আলাসিঙ্গা পেরুমল নামক একজন শিষ্য এই দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। কেবল মাদ্রাজেই নহে, মহীশূরে, রামনাদ এবং হায়দ্রাবাদে গিয়া অর্থসংগ্রহ করিতে লাগিলেন। এইরকমে দুই মাসেই টিকিট কিনিবার টাকা উঠিয়া গেল।

কিন্তু বাধা পড়িল। খেতরির মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী বাবু জগমোহন লাল আসিয়া উপস্থিত হইলেন খেতরি হইতে মাদ্রাজে। মহারাজা তাঁহাকে পাঠাইয়াছিলেন স্বামীজীকে লইয়া যাইবার জন্য। দুই বৎসর আগে আবুপাহাড়ে গিয়াছিলেন খেতরির মহারাজা, সঙ্গে ছিলেন জগমোহন লালজী। স্বামীজীও গিয়াছিলেন সেই সময় আবুপাহাড়ে। জগমোহন লালজীই স্বামীজীকে মহারাজের সহিত পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন এবং মহারাজা স্বামীজীকে লইয়া খেতরি গিয়াছিলেন।

মহারাজার কোন সন্তান ছিল না। মহারাজা সেজন্য স্বামীজীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করিয়াছিলেন, স্বামীজী আশীর্বাদ করিয়াছিলেন। তাহার পর তিনি খেতরি ছাড়িয়া চলিয়া আসেন। এখন জগমোহনলালজী খবর আনিয়াছেন যে, স্বামীজীর আশীর্বাদেই রাজার সন্তান হইয়াছে, আর তার জন্মোৎসবে স্বামীজী যদি উপস্থিত থাকিয়া আশীর্বাদ না করেন তবে সে মঙ্গল অনুষ্ঠান সার্থক হইবে না। তাই এতদূর হইতে জগমোহন লালজী আসিয়াছেন স্বামীজীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইবার জন্য।

স্বামীজী তাঁহাকে বলিলেন, "কেমন করে তা সম্ভব হবে? ৩১শে মে তারিখে আমার আমেরিকা রওনা হ'বার দিন ঠিক হয়েছে। আর মাত্র এক মাস সময় আছে। এর মধ্যে আমাকে সব গোছগাছ করে নিতে হবে, এখন আমি কি ক'রে খেতরি যাই!"

কিন্তু জগমোহন লালজী ছাড়িবার পাত্র নহেন। তিনি বলিলেন, "আপনি যদি না যান রাজাবাহাদুর মর্মাহত হবেন। আপনার আমেরিকা যাওয়ার জন্য কোন ভাবনা নেই, সে সমস্তই ঠিক হ'য়ে যাবে।"

এই আন্তরিক আগ্রহ স্বামীজী উপেক্ষা করিতে পারিলেন না, তাঁহাকে খেতরি যাইতেই হইল।

স্বামীজী গিয়া খেতরি পৌঁছিলেন, দেখিলেন উৎসবসজ্জায় খেতরি সুসজ্জিত। চারিদিকে আনন্দের কলরব। অনেক রাজা মহারাজা নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়াছেন। দরবার ঘরে জাঁকজমকের সীমা নাই। স্বামীজী দরবার ঘরে প্রবেশ করামাত্র মহারাজা সিংহাসন হইতে উঠিয়া আসিয়া তাঁহাকে প্রণাম করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দরবারের সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। স্বামীজী আসন গ্রহণ করিবার পর আবার সকলে আসন গ্রহণ করিলেন।

শিশু রাজকুমারকে দরবার ঘরে আনা হইল এবং স্বামীজী তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্বাদ করিলেন।

উৎসব শেষে স্বামীজী বম্বে রওনা হইলেন, রাজা বাহাদুর জগমোহন লালজীকেও তাঁহার সঙ্গে পাঠাইলেন আমেরিকা যাইবার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়া দিবার জন্য। পোশাক প্রভৃতি ইতিমধ্যেই তৈয়ারি হইয়া গিয়াছিল।

আবু রোড স্টেশন! আবুপাহাড় স্বামীজীর খুব ভাল লাগিয়াছিল, তাই এখানে তিনি একদিনের জন্য নামিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল সেদিন সেখানে থাকিয়া জায়গাটি আর একবার ঘুরিয়া দেখিবেন।

ঘটনাক্রমে এইখানেই তাঁহার দুই গুরু-ভাইয়ের সহিত দেখা হইয়া গেল।

ই'হাদের একজন স্বামী ব্রহ্মানন্দ, ঠাকুর যাঁহাকে রাখালরাজা বলিতেন আর স্বামীজী বলিতেন রাজা। আর একজন স্বামী তুরীয়ানন্দ। ই'হারা আসিয়াছিলেন তীর্থভ্রমণে, পথে চলিতে চলিতে দেখিলেন একজন গৈরিকধারী দীর্ঘকায় সাধু উচ্চৈঃস্বরে একটি শ্লোক আবৃত্তি করিতে করিতে আগাইয়া আসিতেছেন। শ্লোকটি এইঃ—

"অভিমানং সুরাপানং গৌরবং ঘোররৌরবং।
প্রতিষ্ঠাং শূকরীবিষ্ঠা ত্রয়ং ত্যক্ত্বা সুখী ভবেৎ॥

কেন যে স্বামীজী এ সময় আপন মনে এই শ্লোকটি আবৃত্তি করিয়াছিলেন কে জানে? সম্প্রতি খেতড়ির রাজদরবারে তিনি যে সম্মান পাইয়াছেন তাই স্মরণ করিয়া অথবা ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করিয়াই তাঁহার মনে এই শ্লোকটি সে সময় উদয় হইয়াছিল কিনা তাহা তিনিই জানেন।

ব্রহ্মানন্দ স্বামী আগাইয়া আসিলেন এবং আমেরিকা রওনা হইবার পূর্বে তিন গুরুভাইয়ের মিলন হইল। স্বামীজী রাখাল মহারাজকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন।

স্বামীজী আমেরিকা যাইবার কথা সমস্তই জানাইলেন এবং ছোটছেলের মত পরম উৎসাহে নিজের দিকে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া বলিলেন, "রাজা, দেখ্‌ছিস্ কি? এই এর জন্যেই এসব হচ্ছে। দেখ্‌বি, আরও কত কি হবে। মেচে যাবে, মেচে যাবে, ঠাকুরের নাম আর প্রেম।" এই 'মেচে' যাওয়া অর্থাৎ ছড়াইয়া পড়া কথাটি প্রায়ই স্বামীজী ব্যবহার করিতেন।

এই সাক্ষাৎকারে তাঁহারা তিনজনেই খুব আনন্দিত এবং আরও একটি লাভ হইয়াছিল যে, বাংলায় তাঁহার গুরু-ভ্রাতাদের কাছে শীঘ্রই সমস্ত সংবাদ ও তাঁহার যাহা কিছু নির্দেশ সবই পৌঁছিয়া যাইবে। এই দেখাই তাঁহার বাংলা মায়ের কাছে বিদায় গ্রহণ।

সমস্ত ভারতবর্ষ পরিক্রমা শেষ হইয়া গিয়াছে, এবার আসিয়াছে বিদেশ যাত্রার পালা। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে এক স্মরণীয় দিন। এইদিন স্বামী বিবেকানন্দ আমেরিকা যাত্রা করেন।

এই সময় বাংলা দেশে আলমবাজার মঠে স্বামীজীর গুরুভাইরা কে কি অবস্থায় আছেন শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের "মহাপুরুষ স্বামী শিবানন্দের অনুধ্যান" নামক গ্রন্থ হইতে তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পূজনীয় গ্রন্থকার এই গ্রন্থে প্রত্যেক গুরুভ্রাতার সম্বন্ধে তাঁহাদের বিভিন্ন ভাব ও বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ছিলেন তাঁহাদের নিত্য সঙ্গী, সুতরাং তাঁহার এই বর্ণনার বিশেষ একটি মূল্য আছে।

তিনি লিখিয়াছেন,

"বরানগরের মঠে ভদ্রঘরের শিক্ষিত যুবকেরা যে শুধু মেঝেতে বা একটা ছেঁড়া চ্যাটাইতে পড়িয়া থাকিতেন, মুষ্টিভিক্ষা করিয়া সেই চাল সিদ্ধ করিয়া একটা কাপড়ে ঢালিয়া সকলে মিলিয়া খাইতেন, এই যে কৃচ্ছ্র-সাধনা—ইহা লইয়া বাহিরের সকলেই নানা ব্যঙ্গ বিদ্রূপ করিত। * * কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন এখন যে শক্তি বিকীর্ণ করিতেছে তাহা এই বরানগর ও আলমবাজারের মঠেই উদ্ভূত হইয়াছিল।" (৯১ পৃঃ)

পরস্পরের মধ্যে একটা গভীর ভালবাসা ছিল, এই রকম ভালবাসা জগতের ইতিহাসে খুবই অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রন্থে আছে যে, যীশুর শিষ্যদের ভিতর পরস্পরের মধ্যে এইরূপ ভালবাসা ছিল। চৈতন্যের পরিষদগণের মধ্যেও এইরূপ একটা প্রগাঢ় ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও ভক্তি ছিল।

কিন্তু এই সকল হইল গ্রন্থের কথা, চোখে দেখা বা অনুভব করা যায় না। কিন্তু বরানগর মঠে ও আলমবাজারে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের আত্মগোষ্ঠীর ভিতর ত্যাগী ও গৃহী উভয়ের মধ্যে এক আশ্চর্য রকমের শ্রদ্ধা, ভক্তি ও ভালবাসা দেখা গিয়াছিল। এই জীবন্ত ভালবাসাই ছিল মঠের প্রাণস্বরূপ। * * * এই ভালবাসার ভিতর এক মহা আকর্ষণী শক্তি ছিল, তাহা ভাষা দিয়া বুঝাইবার নয়, যাঁহারা অনুভব করিয়াছেন তাঁহারাই এটা বুঝিতে পারিবেন। (১০২ পৃঃ)

আলমবাজারের মঠ সম্বন্ধেঃ—

"শীতের প্রথমে বরানগর মঠ হইতে আলমবাজার মঠে গমন করা হইল। * * * মঠ টিকিবে না উঠিয়া যাইবে ইহা ভাবিয়া বরানগরে অল্পসংখ্যক লোক ছাড়া মঠে অপর কেহ বিশেষ যাইতেন না। * * * পরে আলম-বাজার মঠের সময় সকলে যখন দেখিল যে এই ঝড় ঝাপ্‌টার ভিতর দিয়া এত দুঃখকষ্ট সহ্য করিয়া এই কয়েকটি যুবক অবিচলিত, একচিত্ত ও স্থিরপ্রতিজ্ঞ হইয়া রহিল * * * লোকে মনে করিল ইহা একটি চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠান হইবে। এই সময়ের যাঁহারা গৃহী ভক্ত তাঁহারা প্রায় সকলেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের সময়ের নহেন—পরবর্তী সময়ের। * * * এই সময় কলিকাতা ও নিকটবর্তী স্থানের লোকের মনে প্রথম যেমন একটা বিদ্রূপের ভাব ছিল এখন তা তিরোহিত হইয়া গেল। এই সময় গিরিশবাবু অবসর পাইলেই মঠে গিয়া সারা দিনটা কাটাইয়া আসিতেন। এই সময় এক-খানা নূতন শতরঞ্জি আসিল; একটি ভাল লম্প

আসিল; আর এটা ওটা জিনিসও আসিতে লাগিল।" (১১৩ পৃঃ)

তুলসী মহারাজের কথাঃ—

"বরানগর মঠ স্থাপনের কয়েক মাস পরেই তুলসী মহারাজ আসেন। তিনি তখন যুবা, কৃশ ও দৃঢ়কায় শরীরবিশিষ্ট, অতি মিষ্টভাষী, সর্বদা হাসিমুখ ও অক্লান্ত পরিশ্রমী। তিনি শশী মহারাজের একরূপ ডানহাত হইয়া রহিলেন। কি হান্ডামাজা, কি পুকুর হইতে জল আনা—যে কাজই হোক্ না কেন তুলসী মহারাজ আগুয়ান হইয়া করিতেন। রাত্রে অনেক সময় তিনি রুটি সেঁকিতেন। এই রুটি সেঁকার কথা বড় আনন্দদায়ক। দু'তিনজন লোক ময়দা মাখিতেছে ও বেলিতেছে। একটা কেরোসিন তেলের টিনের উপর একজন বসিয়াছেন, উনুনে এক একখানা রুটি সেঁকা হইতেছে এবং যে যখন খাইতে বসিয়াছেন তখন গরম গরম রুটি এক একখানা করিয়া দেওয়া হইতেছে। * * সে রুটি সেঁকা ও রান্নাঘরে গিয়া জড় হওয়া বড় আনন্দের জিনিস ছিল, হাতেতেও যেমন সকলে কাজ করিতেছে মুখেতেও তেমনি সৎচর্চা ও সৎ আলোচনা চলিতেছে। * * তরকারি যাই হউক না কেন গরম রুটি, নুন, লঙ্কা আর এই সৎচর্চা ও মাঝে মাঝে খুব হাসি তামাসা। * * হাস্য-কৌতুকের ভিতর দিয়া মহা কঠোর ও দুঃসাধ্য সাধনা চলিয়াছিল।" (১২৪ পৃঃ)

"তুলসী মহারাজ একদিকে নিজের জপধ্যান করিতেছেন, আবার সময় পাইলে পড়াশুনাও করিতেছেন। * * আবশ্যক হইলে ঘরদুয়ার পরিষ্কার করিতেছেন, ঝাঁট দিতেছেন এবং বাজারে গিয়া ঝুলি করিয়া আনাজ তরকারিও কিনিয়া আনিতেছেন। আলমবাজারের বুড়ির দোকান হইতে টিকে কিনিয়া ঝোড়াটা নিজে কাঁধে করিয়া লইয়া আসিতেন। আবার এদিকে সমস্ত বাসন, হান্ডা চট্‌পট্ করিয়া মাজিয়া ফেলিতেন। * * * ভিতরের বাড়ির খিড়কির দিকে একটা পুকুর ছিল। তুলসী মহারাজ এক কলসী জল কাঁধে আর এক কলসী জল হাতে লইয়া সমস্ত নীচের বাড়িটা মাড়াইয়ে সিঁড়ি দিয়া উঠিয়া উপরকার খোলা ছাদের দক্ষিণ দিকে যে পায়খানাটা—সেইটি ধুইয়া ফেলিতেন এবং বড় বড় মাটীর গামলাতে জল ভরিয়া রাখিতেন। * * আবার এর ভিতরেও তিনি রান্নাঘরের কাজ করিতেন, কুটনো কুটিতেন। আবশ্যক হইলে এদিকে রোগীর সেবাও করিতেন।" (১২৬ পৃঃ)

মঠের প্রথম দিককার কথা সম্বন্ধে মহেন্দ্রবাবুর পুস্তকে যে ছবিটি পাওয়া যায় তাহার কিছু অংশ এখানে তুলিয়া দিতেছিঃ—

"বরানগর মঠে প্রথমে সকলের এক একখানা করে কাপড় ছিল, আর জোড়া কতক চটিজুতা ছিল; কিন্তু ক্রমে ক্রমে সকলেই পায়ে জুতা দেওয়া ত্যাগ করিলেন। * * তারপর কাপড়খানা দু'টুক্‌রা করিয়া বহির্বাস করিয়া পরিতে লাগিলেন এবং ভিতরে একটা কৌপিন থাকিত। ক্রমে বহির্বাস ছিঁড়িয়া গেল এবং অবশেষে কৌপীনও ছিঁড়িয়া গেল। তখন বাড়ির ভিতর কৌপীন পরাও ছাড়িয়া দিলেন। * * আমি বিকালবেলা যখন যাইতাম, প্রথম প্রথম সকলকে উলঙ্গ দেখিয়া লজ্জিত হইতাম। * * কিন্তু সকলকেই উলঙ্গ দেখার দু'চার মিনিট পরেই আর বিশেষ কিছু সঙ্কোচ রহিল না, স্বাভাবিকভাবেই বেশ কথাবার্তা হইতে লাগিল। * * তখনকার দিনে ঈশ্বর লাভই ছিল একমাত্র উদ্দেশ্য, আর বাকী সবই ছিল তুচ্ছ।" (৪১ পৃঃ)

আলমবাজার মঠে স্বামীজী বিলাত যাইবার পর ক্রমশ নানা দেশ হইতে জনসমাগম হইতে লাগিল। বোম্বাই ও আলমোড়া হইতেও লোক আসিতে লাগিল। মাদ্রাজ হইতে শ্রীনিবাস সামাস্নিয়া আয়ার নামে একজন মাদ্রাজী যুবক আলমবাজারে আসিলেন, তাহার কিছুদিন পরে তাঁহার সন্ধানে তাঁহার আত্মীয়গণও আলমবাজারে আসেন। ভিন্ন ভিন্ন দেশের স্বামীজীর ভক্তগণের সহিতও পত্রালাপ চলিতে লাগিল। খেতরির রাজা অজিত সিংহও পত্র লিখিয়া মঠের সাধুগণের সংবাদ লইতেছিলেন। গুজরাটের জুনাগড়ের দেওয়ান হরিদাস বিহারীদাস শীতকালে অহিফেন অনুসন্ধান সমিতির সদস্য হইয়া কলিকাতায় আসেন, তিনি আলমবাজার মঠে গেলেন এবং সাধুদের ভান্ডারা দিলেন। মঠবাসিগণের মনে এখন তাঁদের এতদিনের তপস্যালব্ধ শক্তি জনকল্যাণে নিয়োজিত করিবার জন্য একটা প্রেরণাও জাগ্রত হইল।

স্বামীজী যখন ভারত পর্যটনে বাহির হন তখন তাঁহার গুরুভাইরা মাঝে মাঝে তাঁহার সংবাদ পাইতেন। এখন তিনি সমুদ্রবক্ষে জাহাজে চলিয়াছেন, সেখান হইতে তাঁদের মাঝে মাঝে যে সকল চিঠি লিখিয়াছেন তাহাতে তাঁহার দেশের উপর যে গভীর অনুরাগ প্রকাশ পাইয়াছে তাহাতে বুঝা যায় যে, দেশের চিন্তা সর্বদাই তাঁহার মনে জাগ্রত ছিল। কলম্বো, মালয়, পেনাং তারপর সিঙ্গাপুর। এগুলি বৃহৎ ভারতেরই অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ। চারিদিকে পর্বতমালা বেষ্টিত সুমাত্রা দ্বীপের সৌন্দর্যে স্বামীজী মুগ্ধ হইলেন। হংকং বন্দরে জাহাজ তিনদিন ছিল। স্বামীজী জাহাজ হইতে নামিয়া প্রায় আশি মাইল দূরে ক্যাণ্টনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। এখানে এক বিরাট বৌদ্ধমন্দির আছে। চীনের স্থাপত্যশিল্প, ভাস্কর্য ও কারুশিল্প প্রভৃতি অতি অপূর্ব। দেশবাসী শ্রমশীল কিন্তু অতি দরিদ্র। বিদেশীর শোষণে চীনের অর্থসম্পদ যেন নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে। স্বামীজী লিখিতেছেন,—

"চীন ও ভারতবাসী প্রগতির পথে যে এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতেছে না তার একমাত্র কারণ এই অতিশয় দারিদ্র্য। একজন সাধারণ হিন্দু ও সাধারণ চীন উভয়ের অবস্থাই সমান। যারা দৈনিক খাদ্য সংগ্রহই করিতে পারিতেছে না তাহাদের আর কিছু ভাবিবার অবসর কোথায়?"

চীনের পর জাপান। ১৮৯৩ খৃঃ জুলাই মাসে স্বামীজী জাপানে পৌঁছাইলেন। নাগাসাকি বন্দরে জাহাজ অনেকক্ষণ থামে। এই অবসরে স্বামীজী নাগাসাকি শহর ঘুরিয়া দেখিলেন, কিন্তু অন্যান্য শহর দেখিতে হইলে জাহাজ ছাড়িয়া দিয়া স্থলপথে যাইতে হইবে। তাই স্বামীজী তখনকার মত জাহাজ ছাড়িয়া দিলেন এবং ওসাকা, কিয়োটো এবং টোকিও তিনটি প্রধান শহরই ঘুরিয়া দেখিলেন। অনেক বৌদ্ধমন্দিরও দর্শন করিলেন। সেইসব মন্দিরের দেয়ালে প্রাচীন বাংলা ভাষায় সংস্কৃত মন্ত্র লেখা আছে দেখিতে পাইলেন।

জাপান দেখিয়া স্বামীজী আনন্দিত হইয়াছিলেন। জাপান তখন পূর্ণবেগে উন্নতির পথে চলিয়াছে। স্বামীজী তাঁহার পত্রে জাপান সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন,—

"বর্তমানকালে কি কি দরকার জাপানীরা তা বুঝেছে এবং সে বিষয়ে সম্পূর্ণ সজাগ। এদের দেশে সুশিক্ষিত ও সুনিয়ন্ত্রিত স্থলসেনা আছে। এদের যে কামান তা এদেরই একজন কর্মচারীর আবিষ্কার। সবাই বলে ঐ কামান অন্য যে কোন জাতির উৎকৃষ্ট কামানেরই সমতুল্য। আর তারা তাদের নৌবলও দিনে দিনে বাড়াচ্ছে।"

নিজের দেশের জন্য জাপানীরা যেভাবে প্রাণপণ প্রয়াসে আগাইয়া চলিয়াছে,—অদম্য উৎসাহ, অপূর্ব নৈপুণ্য ও কর্মশীলতা, অপরিসীম চেষ্টা ও একান্ত আগ্রহ, ইহার সহিত ভারতের তুলনা যদি করা যায়, তবে কি মনে হয়? স্বামীজী তুলনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার চিঠিতে লিখিয়াছেন,—

"আর তোমরা কি কোরছো? সারাজীবন কেবল বাজে বোকছো। এস, এদের দেখে যাও, তারপর যাও গিয়ে লজ্জায় মুখ লুকোওগে। ভারতের যেন জরাজীর্ণ অবস্থা হয়ে ভীমরতি হয়েছে। তোমরা যদি দেশ ছেড়ে বাইরে যাও, তাহলে তোমাদের জাত যায়! এই হাজার বছরের ক্রমবর্ধমান জমাট কুসংস্কারের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে বসে আছ, হাজার বছর ধরে খাদ্যাখাদ্যের শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার করে শক্তি ক্ষয় করছো। পৌরোহিত্যরূপ আহম্মুখীর গভীর ঘূর্ণিতে ঘুরপাক খাচ্ছ!! শত শত যুগের সামাজিক অত্যাচারে তোমাদের ভিতরের মনুষ্যত্বটা একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছে, তোমরা কি বল দেখি? আর তোমরা এখন কোরছোই বা কি? আহাম্মুখ, তোমরা বই হাতে করে সমুদ্রের ধারে পায়চারি কোরছো। ইউরোপীয় মস্তিষ্কজাত এক কণামাত্র,—তাও খাঁটি জিনিস নয়—সেই চিন্তার বদহজম খানিকটা উদ্গার তুলছো। তোমাদের প্রাণমন সেই তিরিশ টাকার কেরাণীগিরির দিকেই পড়ে আছে, না হয় বড়জোর একটা দুষ্ট উকীল হবার মতলব কোরছ। এই ভারতবর্ষের যুবকদের সবচেয়ে উঁচু দুরাকাঙ্ক্ষা। আবার প্রত্যেক ছাত্রের পাশে একপাল ছেলে—তার বংশধর—'বাবা খাবার' 'বাবা খাবার দাও' কোরে চীৎকার কোর্‌ছে। বলি, সমুদ্রে কি জলের অভাব হয়েছে—যে ঐ গাউন, বই আর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিপ্লোমা সমেত তোমাদের ডুবিয়ে ফেল্‌তে পারে না?" * * *

"এসো মানুষ হও। নিজেদের সংকীর্ণ গণ্ডি থেকে বেরিয়ে এসে বাইরে গিয়ে দেখ সব জাতই কেমন উন্নতির পথে চলেছে! তোমরা কি নিজের দেশকে ভালবাস? মানুষকে ভালবাস? তাহলে এস, আমরা সকলে ভাল হবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করি। পেছনে চেওনা অতি প্রিয় আত্মীয়স্বজন কাঁদুক। এগিয়ে যাও, সামনে এগিয়ে যাও। ভারতমাতা অন্ততঃ সহস্র যুবক বলি চান। মনে রেখো মানুষ চাই, পশু নয়।"

স্বামীজীর এই জ্বালাময়ী উক্তিই জাগাইয়া তুলিয়াছিল বাংলার ছেলেদের স্বাদেশিকতা ও বিপ্লবের ইহাই গোড়ার কথা।

স্বামীজী ঘরকুনোদের ঘরছাড়া করিবার জন্য নিজেই ঘরছাড়া হইয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের প্রেরণার উৎস হইতে যে শক্তি সাকার মূর্তি ধারণ করিয়াছিল তাহা হইল শ্রীরামকৃষ্ণ সঙ্ঘ। যার মূল মন্ত্র ছিল স্বামীজীর সেই অগ্নিময়ী বাণী, সেই পথনির্দেশ,

"যাও বেরিয়ে পড় ঘরের কোণ থেকে। যাও, ভারতের গ্রামে গ্রামে, নিজের চক্ষে তাদের দুর্দশা দেখ, তাদের ব্যথা বোঝ, তাদের মুখে অন্ন দেবার ব্যবস্থা কর, তাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার কর। উচ্চবর্ণের হিন্দু অন্ধ কুসংস্কারবশে মূঢ়ের মত যাদের নীচ, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, পঞ্চম বলে ঘৃণা করে দূরে ঠেলে রেখেছে, সহস্র বৎসরের অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করে যারা আজ মানুষ হয়েও প্রাণহীন পশুর পদবীতে গিয়ে পৌঁছেছে তাদের উদ্ধার করবার জন্য আমরণ চেষ্টা কর। নারায়ণজ্ঞানে তাদের সেবা কর। কৃতার্থ হও সেবা করে।"

স্বামীজী ভারত পর্যটনের সময় দেশে দেশে জনগণের যে দুর্দশা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, মাদ্রাজে 'পঞ্চম' নামক হীনবর্ণের উপর বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের যে নৃশংস ব্যবহার স্বচক্ষে দেখিয়াছেন এই সকল উক্তির ভিতর সেই মর্মদাহই প্রকটিত হইয়াছে। তিনি বলিয়াছেন,

"ওরাই তো ভারতের প্রাণ, ওরা যদি না জাগে তা হ'লে ভারত জাগবে কেমন করে?"

তিনি আরও বলিয়াছেন,

"ধীর, নিস্তব্ধ অথচ দৃঢ়সংকল্পের সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। খবরের কাগজে হুজুগ করা নয়। সর্বদা মনে রাখতে হবে নাম যশ আমাদের উদ্দেশ্য নয়।"

শ্রীমতী হেলেন কেলার

গোপাল ভৌমিক

পঁচাত্তর বৎসর বয়সে বিশ্ব প্রসিদ্ধ মার্কিন লেখিকা ও বিদ্যোৎসাহিনী ডক্টর শ্রীমতী হেলেন কেলার পুনরায় ভারতের মাটিতে পদার্পণ করেছেন। একাধারে অন্ধ বধির ও মূক হওয়া সত্ত্বেও তিনি বিদ্যার্জনে ও অধীত বিদ্যা বৈষয়িক ক্ষেত্রে প্রয়োগে—বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তথা সমগ্র বিশ্বের অন্ধ ও বধির নরনারীদের উন্নতি সাধনের ব্যাপারে তিনি যে কৃতিত্ব দেখিয়েছেন বিশ্বের ইতিহাসে তার তুলনা মেলে না। তাই জীবিত অবস্থাতেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তিনি একটি প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা লাভ করেছেন এবং বিশ্বের মূক বধির ও অন্ধ জনসমাজের কাছে তিনি হয়ে দাঁড়িয়েছেন আশার প্রতীক। তিনি এবার চার মাস কাল দূর প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ—ভারতবর্ষ, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, জাপান ও ফিলিপাইন সফর করবেন। বিগত ২০শে ফেব্রুয়ারী তাঁর ভারত পরিভ্রমণ শুরু হয়েছে এবং ৩১শে মার্চ তিনি পশ্চিমবঙ্গ পরিভ্রমণ উপলক্ষে কলিকাতায় এসে পৌঁছবেন। শ্রীমতী কেলার যে কয়টি দেশ পরিভ্রমণ করবেন সেই কয়টি দেশে মূক, বধির ও অন্ধ নরনারীদের সংখ্যা কম পক্ষে প্রায় এক কোটি। তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করা ও তাদের সর্বাঙ্গীণ উন্নতির ব্যবস্থা করে কর্মজীবনে প্রতিষ্ঠিত করাই তাঁর এই সফরের উদ্দেশ্য। তাঁর এবারের সফরের ব্যবস্থা করেছেন পূর্বোল্লিখিত দেশগুলির সহায়তায় 'আমেরিকান ফাউন্ডেশন ফর দি ওভারসিজ্ ব্লাইন্ড্' নামক প্রতিষ্ঠান।

আজীবনের ঐকান্তিক সাধনায় শ্রীমতী হেলেন কেলার আজ প্রজ্ঞা ও আত্মোপলব্ধির যে পর্যায়ে পৌঁছেছেন তাতে তাঁকে এ যুগের অন্যতম বিস্ময় বলে অভিহিত করলে অত্যুক্তি হয় না। তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার সিদ্ধি দেখে বহু মনীষীই তাঁর উদ্দেশ্যে নানাবিধ সশ্রদ্ধ উক্তি করেছেন। কিন্তু এ প্রসঙ্গে সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন হাস্যরসিক লেখক মার্ক টোয়েন্ যা বলেছিলেন তার বোধ হয় তুলনা নেই। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্বে তিনি বলেছিলেনঃ "ঊনবিংশ শতাব্দীতে নেপোলিয়ঁ ও হেলেন কেলার হলেন সর্বাপেক্ষা বেশি চিত্তাকর্ষক দুটি চরিত্র।"

শ্রীমতী হেলেন কেলার

মার্ক টোয়েনের এ উক্তির মধ্যে আদৌ কোন অতিরঞ্জন আছে বলে মনে হয় না। নেপোলিয়ঁ যে এ যুগের বিস্ময় তা ঐতিহাসিক স্বীকৃত সত্য। শ্রীমতী কেলারও যে কালক্রমে এই ঐতিহাসিক স্বীকৃতি লাভ করবেন সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ বড় একটা নেই। একজন নিজে দরিদ্র ঘরে জন্মগ্রহণ করে স্বীয় প্রতিভা ও শৌর্যের বলে বহু বাধা বিপত্তি জয় করে বিরাট ঐহিক সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছিলেন আর অন্যজন দৈব দুর্বিপাকে জীবনের শুরুতে আলো হাসিময় এই বিরাট জগতের ঐশ্বর্য থেকে বঞ্চিত হয়েও নিজের অধ্যবসায় ও মনীষার দ্বারা হারানো সাম্রাজ্য পুনরুদ্ধার করছেন—অন্ধকারের বন্দী হয়েও তিনি যেভাবে নিজের জীবনে আলোকের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ঘটিয়েছেন তা এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। অন্ধকার থেকে আলোকে আসার জন্যে শ্রীমতী কেলারের সে সংগ্রাম মূলত মানোজগতেই নিবদ্ধ ছিল বলে তাঁর সে সংগ্রাম নেপোলিয়ঁর বহির্জাগতিক সংগ্রামের মত চমকপ্রদ না হলেও তা তুলনায় কম তীব্র ও কষ্টসাধ্য নয়।

হেলেন কেলারের জন্ম ১৮৮০ সালের ২৭শে জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণাঞ্চলে তুলাচাষপ্রধান আলাবামা রাজ্যে। তাঁর পিতা ক্যাপ্টেন আর্থার কেলার আলাবামায় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। 'দি নর্থ আলাবামিয়ান' নামক পত্রিকার সম্পাদকরূপে তিনি জনসমাজে সুপরিচিত ছিলেন এবং জনসেবার দিকে তাঁর আগ্রহও ছিল। হেলেনের জন্মের বছর পাঁচেক পরে প্রেসিডেন্ট ক্লীভল্যান্ডের শাসনকালে তিনি উত্ত আলাবামার মার্শাল নিযুক্ত হয়েছিলেন।

হেলেন কেলার মূক, বধির বা অন্ধ হয়ে জন্মাননি। তিনি জন্মেছিলেন সুস্থ সবল ও স্বাভাবিক শিশুরূপেই। শিশু হিসাবে তিনি কিছুটা অকালপক্কই ছিলেন বলা চলে। মাত্র ছয় মাস বয়সে তিনি কথা বলতে এবং এক বৎসর বয়সে হাঁটতে শিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর যখন ১৯ মাস বয়স তখন অকস্মাৎ জ্বর বিকারে আক্রান্ত হয়ে তিনি একযোগে দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হারিয়ে বসেন। শিশুদের যখন ভাল করে পৃথিবীকে চেনবার সময়, তখনই তিনি শব্দময় ও আলোময় পৃথিবীর সকল রসাস্বাদন থেকে বঞ্চিত হয়ে অন্ধকারের বন্দী হয়ে দাঁড়ালেন। যাকিছু কথা তিনি ১৯ মাস বয়সের মধ্যে শিখেছিলেন, তা-ও তিনি চর্চার অভাবে গেলেন ভুলে। ফলে তিনি মূক বধির ও অন্ধ হয়ে দাঁড়ালেন সে যুগে মার্কিন সমাজের ধারণা ছিল যে যারা জ্বরবিকারে আক্রান্ত হয়েও ভাল হয়ে ওঠে—তারা জড়বুদ্ধি হয়ে বেঁচে থাকে। শ্রীমতী কেলার কিন্তু নিজের জীবনে এ প্রচলিত কুসংস্কারের সত্যতা অপ্রমাণ করেছেন। কিন্তু সংস্কারবশত তাঁর পিতা মাতার মনে তাঁকে নিয়ে দুশ্চিন্তার অবধি ছিল না। বিশেষ করে তাঁরা যখন চোখে

শ্রীমতী হেলেন কেলার ও তাঁহার সেক্রেটারী পলি টমসন

উপর দেখছিলেন দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি হারিয়ে শিশু হেলেন প্রতিদিনই দুরন্ত ও বন্যভাবাপন্ন হয়ে উঠছিলেন, তখন তাঁদের মনে এই বিকলাঙ্গ শিশুর ভবিষ্যৎ ভেবে স্বভাবতই দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হত। দৃষ্টি এবং শ্রবণশক্তি হারিয়ে হেলেন অত্যন্ত জেদী ও একগুঁয়ে স্বভাবের হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি আকারে ইঙ্গিতে যে মনোভাব প্রকাশ করতে চাইতেন, পিতা-মাতা তা বুঝতে না পারলে তিনি অত্যন্ত রেগে যেতেন।

এই অবস্থায় পড়ে তাঁর পিতামাতা হেলেনের শিক্ষাদীক্ষার জন্যে একজন উপ-যুক্ত শিক্ষক বা শিক্ষয়িত্রী খুঁজছিলেন। এ বিষয়ে তাঁরা প্রসিদ্ধ মার্কিন সমাজ-সেবক ডক্টর আলেকজাণ্ডার গ্রাহাম বেলের উপদেশ চাওয়ায় তিনি হেলেনের ছয় বৎসর বয়সের সময় শ্রীমতী অ্যান্ সুলি--ভান নামে একজন শিক্ষয়িত্রীকে তাঁর জন্যে নির্দিষ্ট করে দেন। হেলেনের সঙ্গে শ্রীমতী সুলিভানের এই যোগাযোগই তাঁর জীবনকে করে তুলেছিল সহনীয় ও মহনীয়। আজকের বিশ্বখ্যাতির অধি-কারিণী শ্রীমতী হেলেন কেলার যে বহুলাংশে শ্রীমতী সুলিভানেরই হাতের সৃষ্টি সেকথা অস্বীকার করার উপায় নেই। শ্রীমতী কেলার তো সেকথা অস্বীকার করেনই না, বরং শতমুখে শিক্ষয়িত্রীর গুণগান করেন। তাঁর একাধিক গ্রন্থে তিনি শ্রীমতী সুলিভানের উদ্দেশ্যে তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। এবার ভারতবর্ষে এসে হায়দরাবাদ থেকে বিগত ৩রা মার্চ একটি বিবৃতিযোগে বলেছিলেন যে, ৩রা মার্চ তাঁর জীবনের একটি স্মরণীয় তারিখ, কারণ ৬৯ বৎসর পূর্বে এই দিনটিতে তাঁর শিক্ষয়িত্রী শ্রীমতী সুলিভান তাঁদের অ্যালাবামার বাড়িতে প্রথম পদার্পণ করেছিলেন। সেই দিনই হয়েছিল তাঁর নবজীবনের সূত্রপাত। শ্রীমতী হেলেনের এই বিবৃতির মধ্যে আদৌ কোন অত্যুক্তি নেই। ৬৯ বৎসর পূর্বে ছাত্রী ও শিক্ষিকার মধ্যে যে যোগাযোগের সূত্রপাত হয়েছিল তা অবিচ্ছিন্ন ছিল ১৯৩৬ সালে শ্রীমতী সুলিভানের মৃত্যু পর্যন্ত। শিক্ষিকার মৃত্যুতে তিনি যে শোক পেয়েছিলেন, নিজের পিতামাতার মৃত্যুতেও তিনি সেরূপ শোক পেয়েছেন কিনা সন্দেহের বিষয়।

শ্রীমতী অ্যান সুলিভান ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রসিদ্ধ সাহিত্য সমালোচক মিঃ জন এ ম্যাসিকে বিবাহ করেন। কিন্তু এই বিবাহের ফলেও ছাত্রী-শিক্ষিকার সম্বন্ধের কোন পরিবর্তন ঘটল না। শ্রীমতী কেলার নিজের বাড়ি ছেড়ে ম্যাসি পরিবারের সঙ্গে বসবাস করতে গেলেন এবং তাঁরাও স্বামী-স্ত্রী দুজনে সর্বপ্রযত্নে তাঁর লেখাপড়া ও অন্যান্য কাজে যথাসাধ্য সাহায্য করতেন। শ্রীমতী কেলারের জীবনে শ্রীমতী সুলিভানের এই অপরিসীম দান নানা-ভাবে স্বীকৃত হয়েছে। ১৯৩৬ সালে উভয়ের যুগ্মকৃতিত্বের পুরস্কারস্বরূপে শ্রীমতী হেলেন কেলার ও শ্রীমতী অ্যান সুলিভান ম্যাসিকে রুজভেল্ট মেডেল দেওয়া হয়েছিল। ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে মিঃ ওয়াল্টার বি পিট্‌কিন্ 'নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউনে' লিখিত একটি প্রবন্ধে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কৃতী সন্তানদের একটি তালিকা দিয়েছিলেন। সেই তালিকায় প্রথম শ্রেণীর চারজনের মধ্যে ছিল শ্রীমতী হেলেন কেলারের নাম। এই প্রসঙ্গে মিঃ পিট্‌কিন্ লিখেছিলেনঃ "হেলেন কেলারের উদ্দেশ্য ছিল সহজ স্বাভাবিক মানুষের মত পৃথিবীকে জানতে শেখা।......এ কাজে প্রতিবন্ধক ছিল তাঁর বধিরতা, অন্ধত্ব ও মূকত্ব। এই সব প্রতিবন্ধক কাটিয়ে ওঠার জন্যে তিনি দীর্ঘ জীবন ধরে সংগ্রাম করেছিলেন। এ কাজে তিনি অবিশ্বাস্য রকমের সাফল্য অর্জন করেছেন।" শ্রীমতী অ্যান সুলিভান ম্যাসির নাম দেওয়া হয়েছিল দ্বিতীয় শ্রেণীতে। এই তালিকা প্রণয়ন প্রসঙ্গে মিঃ পিট্‌কিন্ বলে-ছিলেনঃ "এই অনন্যসাধারণ মহিলাকে প্রথম শ্রেণীতে ওঠানোর পক্ষে স্পষ্ট দাবীর জোর আছে। আমিও তাঁকে হয়তো প্রথম শ্রেণীতেই দিতাম, দেইনি শুধু এই ভেবে যে, বাধা-বিপত্তি কাটিয়ে ওঠার জন্যে তিনি যে প্রয়াস করেছিলেন সে প্রয়াস নিশ্চয়ই হেলেন কেলারের প্রয়াসের তুলনায় ছিল অনেক কম।" শ্রীমতী হেলেন কেলারের জীবনে শ্রীমতী সুলি-ভানের যে অবিস্মরণীয় দান আছে, মিঃ পিট্‌কিনের এই তালিকা প্রণয়ন থেকে তারই পরিচয় পাওয়া যায়।

অথচ ছয় বৎসরের অন্ধ মূক ও বধির বালিকা হেলেন কেলারের শিক্ষিকা-রূপে তাঁদের অ্যালাবামার বাড়িতে শ্রীমতী অ্যান্ সুলিভান যখন এসেছিলেন তখন তাঁর নিজের বয়েস ছিল মাত্র ২০ বৎসর। শ্রীমতী সুলিভানকে আনা হয়েছিল

বোস্টনের প্যার্কিন্স ইনস্টিটিউশান থেকে। তিনি নিজেও অন্ধ ছিলেন বলে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেছিলেন। পরে অস্ত্রোপচারের ফলে তিনি প্রয়োজনীয় দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছিলেন। অন্ধত্বের যন্ত্রণা তাঁর জানা ছিল বলেই শ্রীমতী সুলিভান প্রথম থেকেই সহৃদয়তা ও ধৈর্যের সঙ্গে হেলেনের শিক্ষার কাজ পরিচালনা করেছিলেন। এমন একটি শিশুর শিক্ষার ভার তাঁর উপর পড়েছিল যার শব্দ সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। তিনি যখন হেলেনকে শিক্ষা দিতে যান তখন পার্কিন্স্ ইনস্টিটিউশনের অন্ধ শিশুরা হেলেনের জন্যে একটি পুতুল পাঠিয়েছিল তাঁর মারফৎ। সেই পুতুল দিয়েই শ্রীমতী সুলিভান প্রথম শিক্ষার কাজ আরম্ভ করেন। তিনি পুতুলটি তাঁর হাতে দিয়ে অপর হাতে পুতুল কথাটি লিখে দিলেন। এই বস্তুটির সঙ্গে শব্দের সংযোগ না বুঝলেও হেলেন শিক্ষিকাকে নকল করে নিজে আবার পুতুল কথাটি লিখলেন। এইভাবে পরবর্তী জীবনে তিনি অনেক কথাই নিজের অজ্ঞাতসারে বানান করতে শিখেছিলেন। একদিন হেলেন এবং তাঁর শিক্ষিকা বাড়ির বাইরে একটা পাম্পের কাছে দাঁড়িয়েছিলেন এবং কে একজন জলের কল থেকে জল নিচ্ছিল। শ্রীমতী সুলিভান অকস্মাৎ হেলেনের হাতটা টেনে নিয়ে কলের নীচে দিলেন। তাঁর এক হাতে যখন জল গড়িয়ে পড়ছিল, তখন তিনি তাঁর অপর হাতে লিখে দিলেন জ-ল। হঠাৎ হেলেনের মনে হল যে তাঁর এক হাতের উপর যে সুন্দর ঠাণ্ডা বস্তুটি গড়িয়ে পড়েছে শিক্ষিকার লেখা জল কথাটি তারই নাম। এই বোধোদয়ের আকস্মিক আনন্দে হেলেন মাথা নীচু করে মাটিতে ঝুঁকে পড়লেন এবং মাটির আক্ষরিক নাম জানতে চাইলেন। আত্যন্তিক আগ্রহের বশে সেইদিন রাত্রের মধ্যেই হেলেন ত্রিশটি শব্দ শিখে ফেললেন।

শিক্ষা সম্বন্ধে হেলেনের মনে এই যে আগ্রহের সৃষ্টি হল এর পরে আর তাঁকে শেখানো নিয়ে শ্রীমতী সুলিভানকে খুব বেগ পেতে হয়নি। তিনি অতিদ্রুত হাতের লেখা এবং ব্রেইল পদ্ধতিতে অন্ধদের লেখা আয়ত্ত করে নিলেন। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দে ১০ বৎসর বয়সে হেলেন কেলার কথা বলতে শিখবেন এই আগ্রহ প্রকাশ করে শিক্ষিকাকে বিস্মিত করে দিলেন। তিনি কোন প্রকারে জানতে পেরেছিলেন যে, সুদূর নরওয়েতে একটি বধির ও অন্ধ বালিকা কথা বলতে শিখেছিল। অতএব তাঁরও দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছিল যে, তিনিও কথা বলতে পারবেন। হোরেস্ ম্যান স্কুলের মিস্ সারা ফুলারের উপর তাঁকে কথা বলা শেখানোর ভার দেওয়া হয়েছিল। নিউইয়র্কে মিস্ ফুলারের কাছে কথা বলা শেখার সময় তাঁর মনে সব চেয়ে বড় প্রেরণা ছিল এই যে, তিনি যখন অ্যালাবামায় নিজের বাড়িতে ফিরে যাবেন তখন তিনি তাঁর ছোট বোনটিকে ডেকে বলবেনঃ "দেখ, আমি আর এখন বোবা নই।" তিনি দিনরাত্রি পরিশ্রম করে কথা বলা অভ্যাস করেন। প্রথম প্রথম তাঁর কথা বিশেষ বোঝা যেতো না। কথা বলতে বলতে একসময় তাঁর স্বর হয়তো অত্যন্ত নিম্নগামী হত— এক সময় বা সে স্বর অকারণে সপ্তমে উঠত। ভালভাবে কথা বলা শিখতে তাঁকে দীর্ঘদিন সুকঠোর অভ্যাস করতে হয়েছিল। এইভাবে অভ্যাস করার ফলে তিনি শীঘ্রই জনসভায় বক্তৃতা দেবার যোগ্যতাও অর্জন করেছিলেন। ছোট বয়েস থেকে হেলেনের উচ্চাভিলাষ ছিল তিনি একদিন আর দশজন সাধারণ ছেলেমেয়ের মত কলেজে পড়বেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি লাটিন, ফরাসী ও জার্মান ভাষাও শিখছিলেন ইংরেজীর সঙ্গে সঙ্গে। ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ২০ বৎসর বয়সে তিনি র‍্যাড্‌ক্লিফ কলেজে ভর্তি হন এবং গ্রাজুয়েট হন ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে। কলেজ জীবনে শ্রীমতী সুলিভানকে প্রতিদিন তাঁর সঙ্গে রীতিমত ক্লাস করতে হত এবং ক্লাসের পড়া শেখার ব্যাপারে সর্ববিষয়ে সাহায্য করতে হত।

র‍্যাড্‌ক্লিফ কলেজ থেকে বি-এ পাশ করার পরে শ্রীমতী হেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঁধাধরা নিয়মে অধিকতর উচ্চশিক্ষা আর লাভ করেন নি। কিন্তু ছয় বৎসরের শিশুর মনে একদা শ্রীমতী সুলিভান যে জ্ঞানের আলো জেবলে দিয়েছিলেন তার অবসান আজও শ্রীমতী হেলেনের জীবনে ঘটেনি। উত্তরোত্তর তাঁর জ্ঞানানুসন্ধিৎসা, কর্মস্পৃহা ও বিকলাঙ্গ মানবতার উন্নতিসাধনের প্রয়াস যেন বেড়েই চলেছে। তাঁর জীবনব্যাপী এই সাধনার সিদ্ধিস্বরূপ তিনি স্বদেশ ও বিদেশের বহু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সম্মানসূচক ডক্টরেট উপাধি লাভ করেছেন। গ্রাজুয়েট হবার আগেই হেলেন কেলারের প্রথম বই 'আমার জীবন-কাহিনী' বা The Story of My Life ১৯০২ সালে ধারাবাহিকভাবে আমেরিকার 'লেডিজ হোম জার্নাল' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় এবং তাঁকে বিশ্বপ্রসিদ্ধি অর্জনের ব্যাপারে সাহায্য করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এবং বিদেশের বহু পত্রপত্রিকায় তিনি নিয়মিত লেখিকা। 'দি স্টোরি অব মাই লাইফ' ছাড়াও বহু গ্রন্থের রচয়িত্রী তিনি। এই সব গ্রন্থের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অপটিমিজম্, অ্যান এসে, ১৯০৩; দি ওয়ার্ল্ড আই লিভ্ ইন্, ১৯০৮; সি সঙ অব দি স্টোন ওয়াল, ১৯১০; আউট অব দি ডার্ক, ১৯১৩; মাই রিলিজিয়ন, ১৯২৭; মিড্‌স্ট্রিম্—মাই লেটার লাইফ, ১৯৩০; পিস্ অ্যাট ইভেনটাইড, ১৯৩২; হেলেন কেলার ইন স্কটল্যান্ড, ১৯৩৩; হেলেন কেলার্স জার্নাল, ১৯৩৮; এবং লেট্ আস্ হ্যাভ ফেইথ, ১৯৪১। তবে হেলেন কেলারের অধিকাংশ রচনাই কমবেশী আত্মজীবনীমূলক। নিজের লেখা তিনি নিজেই তৈরী করেন ব্রেইল পদ্ধতির টাইপরাইটারের সাহায্যে এবং তাঁর টাইপ করা লেখায় ভুল আবিষ্কার করা কষ্টসাধ্য।

জীবনের প্রথম থেকেই হেলেন কেলার আত্মনিয়োগ করেছেন নিজের সমধর্মী অন্ধ ও অন্ধবধির নরনারীদের সেবায়। তিনি যখন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়তেন তখনই তিনি বোস্টনের অন্ধ কিন্ডার গার্টেন বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে কাজ করতেন এবং বধিরদের উন্নতিকল্পে ডক্টর আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেলের সঙ্গে জনসমক্ষে উপস্থিত হতেন। তাঁর বিশ বৎসর বয়স হবার পূর্বেই তিনি অন্ধবধির নরনারীদের সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন এবং আজ পর্যন্ত স্বদেশে-বিদেশে অন্ধবধির নরনারীদের উন্নতি সাধনের ব্যাপারে তাঁর মতামত শ্রদ্ধার সঙ্গে বিবেচিত হয়। গ্রাজুয়েট হবার দুই বৎসর পরে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি

ম্যাসাচুসেট্স আইনসভার যুক্ত অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্রে অন্ধদের জন্যে প্রথম রাজ্য কমিশন গঠন সংক্রান্ত একটি বিলের সমর্থনে সাক্ষ্য দেন। তাঁরই উদ্যোগে বিলটি গৃহীত হয় এবং গভর্নর তাঁকে রাজ্য কমিশনের অন্যতম সদস্য মনোনীত করেন। তদবধি তিনি অন্ধ ও অন্ধবধিরদের দাবীর সমর্থনে যুক্তরাষ্ট্রের বহু রাজ্যের আইনসভায় ও মার্কিন কংগ্রেসের সমক্ষে বক্তৃতাদি দিয়েছেন এবং পৃথিবীর বহু দেশ পরিভ্রমণ করেছেন। নিজের অন্ধত্বের অসুবিধা সত্ত্বেও এ পর্যন্ত তিনি পাঁচবার পৃথিবী পরিক্রমা করেছেন এবং বিভিন্ন দেশে তাঁর এই জাতীয় পর্যটনের উদ্দেশ্য হল মূক বধির ও অন্ধ জনসমাজের উন্নতি সাধন। বলা বাহুল্য যে তাঁর প্রয়াস বহুলাংশে সফল হয়েছে। ঐকান্তিক আগ্রহ থাকলে এবং যথোচিত সাহায্য পেলে অন্ধ, বধির ও মূক নরনারীরাও যে যথেষ্ট আত্মোন্নতি সাধন করতে পারে, নিজের জীবন দিয়ে সেকথা তিনি নিঃসন্দেহে প্রমাণিত করেছেন। তাঁর এই নিরবচ্ছিন্ন মানবসেবার পুরস্কার হিসাবে তিনি পেয়েছেন বিশ্বের জনসমাজের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও প্রীতি। রাষ্ট্রীয় সম্মান ও পুরস্কার যে তিনি কত পেয়েছেন তার ইয়ত্তা নেই বললেই চলে। কিন্তু সর্বোপরি তাঁর জীবন ধন্য হয়ে উঠেছে পৃথিবীর অগণিত সাধারণ নরনারীর প্রেম-প্রীতি ও ভালবাসার রক্তরাগে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাবামা রাজ্যে তাঁর জন্ম স্থানটি একটি জাতীয় মিউজিয়ামে পরিণত হয়েছে। তাঁর স্বদেশবাসী নরনারী ছাড়াও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের বহু পর্যটক এই মিউজিয়মটি প্রতিনিয়ত দেখতে যান। তাঁর আন্তর্জাতিক মানবসেবার পুরস্কারস্বরূপ তিনি যুক্তরাষ্ট্রের তিনজন প্রেসিডেন্ট—রুজভেল্ট ট্রুম্যান ও আইজেনহাওয়ার কর্তৃক পর পর সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি লাভ করেছেন।

১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী অ্যান সুলিভানের মৃত্যুর পর যে ভদ্রমহিলা শ্রীমতী কেলারের সর্বসময়ের সঙ্গিনীরূপে কাজ করেন তাঁর নাম শ্রীমতী পলি টমসন। তিনি জাতিতে আইরিশ এবং ১৯১৪ সাল থেকে কেলার পরিবারের সদস্য। বর্তমানে তাঁকে ছাড়া হেলেন কেলারের পক্ষে চলা সম্ভব নয়। ১৯৩৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীমতী সুলিভানের মৃত্যুর পর হেলেন কেলার নিউ ইয়র্ক সিটির কাছে একটি পল্লীভবন নির্মাণ করে সেখানে বসবাস করছেন। যুদ্ধশেষে ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন ইউরোপে যুদ্ধের ফলে যারা মূক বধির বা অন্ধ হয়ে পড়েছিল তাঁদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়েছিলেন, তখন আগুন লেগে তাঁর পল্লীভবন পুড়ে যায়। দীর্ঘদিনের চেষ্টায় তিনি নিজের বাড়িতে যে বিরাট ব্রেইল লাইব্রেরিটি গড়ে তুলেছিলেন, সেটিও এই সঙ্গে পুড়ে যায় এবং এ ক্ষতি তাঁর পক্ষে অত্যন্ত বেশি ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর তাঁর বন্ধুবান্ধব ও অগণিত গুণগ্রাহী এগিয়ে আসেন তাঁর সাহায্যার্থে এবং তাঁর আগের বাড়ির মত একটি বাড়ি তাঁকে তৈরি করে দেন। শ্রীমতী কেলার আবার তাঁর বিরাট লাইব্রেরি পুনর্গঠনের কাজে হাত দিয়েছেন। তাঁর জীবন অত্যন্ত কর্মব্যস্ত; লেখাপড়ার চর্চা ছাড়াও তিনি প্রতিনিয়ত অন্ধ ও অন্ধ-বধিরদের উন্নতি সাধনকল্পে বক্তৃতাদি দিয়ে বেড়ান এবং 'আমেরিকান ফাউন্ডেশন ফর দি ব্লাইন্ড' নামক প্রতিষ্ঠানের জন্যে কাজ করেন। আমেরিকান মূক, বধির বা অন্ধদের এমন কোন প্রতিষ্ঠান নেই যার সক্রিয় সদস্য তিনি নন। গৃহে তিনি অবসর যাপনের সময় কুকুর নিয়ে খেলতে ভালবাসেন। কুকুর আছে তাঁর গুটিকয়েক! অন্ধ হলেও তাঁর মধ্যে প্রকৃতি-প্রেম আছে যথেষ্ট পরিমাণে। নিজের একটি সুন্দর বাগান আছে তাঁর এবং সেই বাগানে কাজ করতে তিনি ভালবাসেন। তাঁর রসবোধ আছে প্রচুর এবং জীবন থেকে রস সংগ্রহ করে নিয়ে উপভোগ করবার ক্ষমতা তাঁর অপরিসীম। নিয়মিত পড়াশুনা করতে শ্রীমতী কেলার অত্যন্ত ভালবাসেন এবং তাঁর প্রিয় গ্রন্থাদির মধ্যে আছে বাইবেল, কবিতা ও দর্শনশাস্ত্র। তিনি বিবাহ করেন নি। বিবাহ করার ইচ্ছা তাঁর কোনদিন হয়েছিল কিনা জনৈক সাংবাদিক তাঁকে এ প্রশ্ন করেছিলেন এবার তাঁর ভারত পরিভ্রমণের সময়। তদুত্তরে শ্রীমতী কেলার বলেছিলেন যে, এক সময় বিবাহের ইচ্ছা তাঁর হয়েছিল কিন্তু তাঁর কাজে সহানুভূতিসম্পন্ন কোন পুরুষ তাঁর দৃষ্টিপথে আসে নি বলে বিয়ে করা তাঁর হয়নি। আজ ৭৫ বৎসর বয়সেও শ্রীমতী কেলার অপূর্ব স্বাস্থ্যের অধিকারিণী। তাঁর মুখে বয়সের বলিরেখা বড় একটা পড়েনি—মাথার চুলে পাকও ধরেছে বয়সের তুলনায় কম। শ্রীমতী কেলার ইতিপূর্বে আর একবার ভারতবর্ষ সফরে এসেছিলেন ১৯৪৮ সালে। ভারতবর্ষে অন্ধ, বধির ও মূক নরনারীদের শিক্ষাদান ও তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা একটা বড় কাজ। এই কাজে শ্রীমতী হেলেনের সফর যদি সহায়তা করে, তবেই তাঁর ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ সার্থক হয়ে উঠবে। এ কাজে তাঁর যে জীবনব্যাপী সাধনা আছে, আশা করি স্বাধীন ভারতবর্ষ তা কাজে লাগাতে কুণ্ঠিত হবে না।

শার্ঙ্গদেব

আধুনিক বাংলা গান ও বেতার প্রতিষ্ঠান

কাব্যসংগীতের উন্নতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রচেষ্টায় যেমন অনেকেই উৎসাহিত বোধ করেছেন তেমনি কোন কোন বিষয়ে নিশ্চেষ্টতা লক্ষ্য করেও অনেকে দুঃখিত হয়েছেন। এ সম্বন্ধে পূর্বেও বলেছি, কিন্তু আমাদের সংগীত-জগৎ তেমন কর্ণপাত করেছেন বলে মনে হয় না। ভালর দিকটা হ'চ্ছে এই যে সংগীত সম্পর্কে আমাদের একটা রক্ষণশীলতার বোধ জাগ্রত হয়েছে। যা ভাল জিনিস তাকে আমরা ধ'রে রাখতে চাইছি, তার স্বরূপকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চাইছি। এর ফলে বড় বড় সংগীত রচয়িতাদের রচনা সংগ্রহের একটা উদ্যম দেখা দিয়েছে এবং এই উপায়ে এই সব মূল্যবান রচনা সংরক্ষিত হ'বে আশা করা যায়। অপর পক্ষে সব চেয়ে বড় রকমের নিশ্চেষ্টতা দেখা যাচ্ছে প্রবহমান আধুনিক বাংলা গানের ক্ষেত্রে। বৎসরের পর বৎসর ধ'রে বাংলা গান যেভাবে রচিত হয়ে আসছে তাতে মনে হচ্ছে আধুনিক বাংলা গান সংগীতব্যবসায়ীদের একচেটে সম্পত্তি—বাজারের হাল্কা নিম্ন-রুচির খোরাক হিসেবেই যেন বাংলা গান লেখা হচ্ছে, গাওয়া হচ্ছে এবং গাওয়ানো হচ্ছে। এই অবস্থা থেকে বাংলা গানকে উদ্ধার না করলে আরও কয়েক বৎসর পরে বাংলার সংগীতসংস্কৃতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে সেটা ভাবলেও কষ্ট হয়। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদের গড়া বাংলা গান আজ কাব্যশ্রী বর্জিত হ'য়ে অক্ষম কণ্ঠে অপটু সুরবিন্যাসে পরিবেশিত হচ্ছে—এর চেয়ে অগৌরবের বিষয় আর কী হতে পারে!

আধুনিক কাব্যসংগীতের উন্নতিবিধান আমরা আশা করেছিলাম বেতার প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে কিন্তু দুঃখের বিষয় উক্ত প্রতিষ্ঠান এ বিষয়ে কিছুই করে উঠতে পারেন নি এবং করবার আগ্রহও দেখান নি। বেতারের কাছে আমাদের আশা ছিল এই কারণে যে, তাঁরা ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান নন—সত্যিকারের আগ্রহ নিয়ে সংগীতের সংস্কার সাধনে তাঁরা অগ্রণী হবেন এইটাই ছিল আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁরা কী করেছেন? না—কাব্যসংগীতকে লঘুসংগীত এই আখ্যা দিয়ে তার মর্যাদা ভূলুণ্ঠিত করেছেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে এইটিই তাঁদের একমাত্র অক্ষয় কীর্তি। ফলে স্বভাবতই সংগীত আরও অধোগামী হয়েছে। বাংলা গান তবু একরকম আছে, হিন্দী গান তো প্রায় অশ্রাব্য স্তরে এসেছে,—অপর ভাষা-ভাষীদের কাছে শুনতে পাই তাঁদের আধুনিক গানও এক অবর্ণনীয় নিম্নস্তরে এসে পৌঁচেছে। যে প্রতিষ্ঠান সিনেমার গানকে হাল্কা বলে তাঁদের পরিধি থেকে নির্বাসিত করেছেন, সেই প্রতিষ্ঠানের স্টুডিওতে নাকি সুরে ন্যাকা গলায় অক্ষম অপটু রচনা দিনের পর দিন প্রচারিত হ'য়ে চলেছে কোন বিধি অনুসারে? সিনেমার গানের চেয়ে এই সব গান কি খুব উঁচু-দরের? বেতার কর্তৃপক্ষ কি বড় বড় আদর্শবাদ প্রচারের পূর্বে নিজেদের এই সব ত্রুটির কথা ভাবেন? ভাবলে হয়তো এমন অযোগ্য সংগীত পরিবেশন তাঁরা করতেন না। বেতার কর্তৃপক্ষ উচ্চাংগ-সংগীতের মাননির্ধারণে মনোনিবেশ করেছেন। ভাল কথা, কিন্তু উচ্চাংগ সংগীত-মহল তো বেতারের অপেক্ষাতে ব'সে নেই। যাঁরা কষ্ট করে উচ্চাংগ সংগীতে পটুত্ব অর্জন করেছেন, তাঁরা নিজের চেষ্টাতেই করেছেন এবং বেতার সহযোগিতার অপেক্ষা না রেখেই করেও যাবেন। এই সব তৈরী শিল্পীদের আমন্ত্রণ ক'রে সংগীত পরিবেশনে বেতারের কোন কৃতিত্ব নেই। তাছাড়া এই যে নানা সম্মেলনে আজকাল উচ্চাংগ সংগীত পরিবেশিত হচ্ছে তাঁর পিছনে বেতারের কোন প্রভাব নেই বরঞ্চ বেতারই এই সব সম্মেলন থেকে প্রভাবান্বিত হয়েছেন। কিন্তু বেতারের আসল দায়িত্ব হচ্ছে সাধারণ সংগীত সংস্কৃতিকে সঞ্জীবিত করা, সংগীতবোধ জাগ্রত করা অর্থাৎ কাব্যসংগীতের একটা বড় দায়িত্ব স্বতঃই এসেছে বেতারের ওপর। এই দায়িত্ব তাঁরা পালন করছেন কাব্য-সংগীতকেই ধিক্কার দিয়ে! চমৎকার আদর্শবোধ!

বেতার প্রচারিত আধুনিক বাংলা গান ভাষা এবং সুর—দু দিকেই পংগু অথচ বেতার প্রতিষ্ঠানে আধুনিক সুপ্রতিষ্ঠিত কবি এবং সাহিত্যিক অনেকেই আমন্ত্রিত হয়ে থাকেন। এঁদের কি গান লেখবার যোগ্যতা নেই? কিন্তু না, তাহলে আবার অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন সুর রচয়িতা এবং শিল্পীর খোঁজ করতে হবে। অতএব সেই রামা-শ্যামারাই গান লিখে চলেছেন ফরমুলা অনুসারে আর সেই রাখাল-গোপালরাই গেয়ে চলেছেন ধরাবাঁধা গতে। আর এইভাবেই দায়িত্ব পালন হচ্ছে। দু'-চারজন তথাকথিত সাহিত্যিক যে বেতারের গান লেখেন না তা নয়, কিন্তু সে লেখা যে কেমন লেখা একবার শুনলেই তা মালুম হয়।

আধুনিক বাঙলা গানে যথেচ্ছাচারিতার একটা সুবিধাও আছে। এক্ষেত্রে কারুর কিছু বলবার নেই। বড় বড় সুর-রচয়িতার গানে একটা ধরাবাঁধা প্রণালী অবলম্বন করতে হয়—তার নির্দিষ্ট স্বরলিপি আছে, বহু প্রভাবশালী ব্যক্তি আছেন, যাঁদের আপত্তি অগ্রাহ্য করবার উপায় নেই। কিন্তু এখানে অবাধ স্বাধীনতা। যেমন বেপরোয়া লিখিয়ে তেমনি বেপরোয়া গাইয়ে—আর সমান বেপরোয়া আমাদের ব্যবসায়ী বা সরকারী প্রতিষ্ঠান। অতএব কোনদিক থেকেই কোন বাধা-বিপত্তি নেই। কিন্তু এইভাবে আর কতদিন চলবে?

বেতার প্রতিষ্ঠান কাব্য-সংগীতকে যে অবহেলার চক্ষে দেখছেন, এর চেয়ে ভ্রান্ত নীতি আর কিছুই হতে পারে না। আমাদের সবাইকার সংগীত হচ্ছে কাব্য-সংগীত এবং প্রবহমান সংস্কৃতির পরিচয় এই কাব্যসংগীত থেকেই মিলবে। উচ্চাংগ সংগীতের নীতি নির্দিষ্ট হয়েই আছে—শিক্ষা, অভ্যাস এবং তৎপরতায় তার বিকাশ হয়ে আসছে যথানিয়মে এবং

ভবিষ্যতেও হবে; কিন্তু কাব্যসংগীত তো এইরকম নয়, তার সংগঠন এবং বিন্যাস অন্যভাবে চলছে—কাব্যের ধারা পাল্টে যাচ্ছে, সংগে সংগে সংগীতেরও রূপান্তর ঘটছে। এই রূপান্তরটি যাতে সত্যিকারের সাহিত্যিক এবং সাঙ্গীতিক স্বীকৃতির সংগে ঘটতে পারে, সেইটা দেখাই বেতার প্রতিষ্ঠানের কর্তব্য। আধুনিক বাঙলা গান, যা সাধারণত প্রচারিত হচ্ছে, তাতে কি এই রূপান্তরের পরিচয় পাওয়া যায় না? যায় বৈকি? কিন্তু তার পরিচয় তেমন উচ্চস্তরের নয় বা তেমন মার্জিতও নয়। সত্যিকারের বুদ্ধিদীপ্ত সমাজে আধুনিক বাঙলা গানের আবেদন খুবই অল্প, তার কারণ এইসব গান কী সাহিত্য, কী সংগীত কোনদিক দিয়েই সংস্কৃতির যোগ্য পর্যায়ে উঠতে পারে নি।

কিন্তু আমাদের কাব্যজগতে তা হয়নি, চিত্রজগতেও নয়। রবীন্দ্রোত্তরযুগে কাব্য-ধারা স্বতন্ত্র গতিতে চলেছে সম্পূর্ণ ভিন্ন সাহিত্যিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে। এক্ষেত্রে যে পরীক্ষা চলেছে, তাতে বুদ্ধির শাণিত দীপ্তি রয়েছে। চিত্রজগতেও অঙ্কন-রীতিতে যে নবতর প্রয়োগ হচ্চে বা যে-ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য প্রভাব এসেছে, তার মধ্যে একটা উচ্চাঙ্গের মননশীলতার পরিচয় পাওয়া যাচ্চে। এই দুই ক্ষেত্রেই যাঁরা সাধনা করছেন, তাঁরা উচ্চশ্রেণীর ভাবধারাকে আশ্রয় করে অগ্রসর হচ্চেন; কিন্তু আধুনিক বাঙলা গানের ব্যাপারেই দেখছি, একটা প্রচণ্ড ব্যতিক্রম ঘটেছে। বাঙলা গানের আধুনিক প্রচেষ্টা এখনও অত্যন্ত কাঁচা অবস্থায় রয়েছে এবং তেমন একটা শিক্ষিত এবং উন্নত দৃষ্টিভঙ্গীর বিকাশ প্রায় হয়নি বল্লেই চলে। অর্থাৎ বাঙলা গানের ক্ষেত্রে তেমন উপযুক্ত ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আবির্ভাব এখনো ঘটেনি, যাঁদের প্রচেষ্টায় সংগীতের রসবোধ আশানুরূপভাবে জাগ্রত হতে পারে। পাশ্চাত্য সংগীতে এই প্রচেষ্টা কত তীব্র, সেখানে ইতিমধ্যেই নানা সাঙ্গীতিক ভাবধারাকে আশ্রয় ক'রে নানা সম্প্রদায় গড়ে উঠেছে, সংগীত সম্পর্কে কত মতবাদ স্থাপিত হচ্ছে। পাশ্চাত্য জগৎ সংগীতকে উচ্চস্তরের দার্শনিক পর্যায়ে নিয়ে গিয়েছেন।

কাব্যসংগীতে এই যে একটা উচ্চাঙ্গের ভাবধারার বিকাশ—এটি বেতার প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় ঘটতে পারত বৈকি, কিন্তু তাঁরা এবম্বিধ প্রচেষ্টা আদৌ করেন নি। কাব্য-সংগীতের বিপুল সম্ভাবনার কথাটা আজ পর্যন্ত চিন্তা করবার অবসর মিলল না তাঁদের। কিন্তু তাঁদের মেলেনি বলে কি শিল্পীদেরও এইসব কথা ভাববার অবকাশ ঘটে নি? নিশ্চয়ই ঘটে নি, নতুবা আপনা থেকেই আধুনিক গানের উন্নতি ঘটত। সংগীত-জগতের সংগে যতটুকু পরিচয় ঘটেছে, তার ফলে দেখছি অধিকাংশ শিল্পীই সে যোগ্যতা অর্জন করেন নি, যাতে ক'রে এইসব বোধ তাঁদের মধ্যে জাগ্রত হয়। কথাটা রূঢ় শোনায়, কিন্তু এটা সত্য যে, আমাদের সংগীত-জগৎ এখনো অর্ধশিক্ষার প্রদোষান্ধকারে আচ্ছন্ন—এই অবস্থায় চিন্তাধারার উজ্জ্বল বিকাশ আমরা কেমন ক'রেই বা আশা করব?

যতদিন না জ্ঞানালোক-প্রদীপ্ত বুদ্ধি দ্বারা চিন্তাধারার বিকাশ ঘটছে, ততদিন পর্যন্ত "গ্রামোফোন" আর "প্লে-ব্যাক" নিয়েই শিল্পীরা মেতে থাকবেন,—ততদিন পর্যন্ত তাঁদের দেওয়া খোরাক অর্ধশিক্ষিত আর অশিক্ষিতদেরই ক্ষিদে মেটাবে,—সংগীত-জগতের সত্যিকারের কোন উন্নতিই সাধিত হবে না।

সংগীত-জগতের এই অবিদ্যাকে দূর করতে পারে, একমাত্র প্রকৃত শিক্ষিত এবং চিন্তাশীল ব্যক্তিদের প্রচেষ্টা এবং এই উদ্দেশ্যে একটা মাধ্যম তাঁদের খুঁজে নিতেই হবে কাব্য-সংগীতের প্রগতির পথ প্রস্তুত করবার জন্য। যুগে যুগে এই পথ প্রস্তুতকারকদের সব অসুবিধা, দুঃখ, কষ্ট বরণ করতে হয়েছে—এক্ষেত্রেও হবে। লাভ-লোকসানের ঊর্ধ্বে থেকে এগিয়ে আসতে হবে তাঁদেরই। এছাড়া আর উপায় কি?

আসরের খবর

দক্ষিণ ভারতীয় রসিকরঞ্জন সভার ত্যাগরাজ মহোৎসব অনুষ্ঠান

কলিকাতাপ্রবাসী দক্ষিণ ভারতীয়গণ ১৯৪৬ সালে "রসিক রঞ্জন সভা" নামক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটি স্থাপিত করেন। গত ন' বছর ধরে সংগীত, নাটক, বক্তৃতা প্রভৃতি নানারকম অনুষ্ঠান এই সভার উদ্যোগে সম্পন্ন হয়ে আসছে। এ'রা একটি সংগীত বিদ্যালয়ও স্থাপন করেছেন। ত্যাগরাজ মহোৎসব উপলক্ষে এই সভা একটি দক্ষিণ ভারতীয় সংগীত সম্মেলনের আয়োজন করে থাকেন এবং এটি তাঁদের একটি প্রধান অনুষ্ঠান। এবারের সংগীত সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে ন' দিন ধরে—গত ১২ই মার্চ থেকে ২০শে মার্চ পর্যন্ত। সভার নিজস্ব গৃহের জন্য দক্ষিণ কলকাতায় যে জমি নির্দিষ্ট হয়েছে, সেখানে একটি প্যাণ্ডেল খাটিয়ে এই সম্মেলনের অনুষ্ঠান হয়।

সাধক ত্যাগরাজকে সংগীতজ্ঞ হিসাবে দক্ষিণ ভারতে শ্রেষ্ঠ সম্মান দেওয়া হয়। ত্যাগরাজের নামের সংগে উত্তর ভারতে বোধ হয় একমাত্র তানসেনের তুলনা করা যেতে পারে। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতের তিনি মহাগুরু বলে স্বীকৃত এবং সম্মানিত। তাঁর জীবিতকাল ১৭৬৪ থেকে ১৮৪৬ সাল পর্যন্ত। খুব বেশিদিন আগেকার লোক তিনি নন, কিন্তু ভারতের চিরাচরিত রীতি অনুসারে এরই মধ্যে তাঁর বহু রচনা লুপ্ত হয়েছে এবং বহু-প্রক্ষিপ্তও হয়েছে। তাঁর আসল রচনাগুলি সম্বন্ধে এখনও অনুসন্ধান চলেছে।

তাঞ্জোরের 'তিরুভারুর' গ্রামে এক শিক্ষিত বংশে ত্যাগরাজের জন্ম হয়েছিল। তাঁর ঠাকুরদাদা গিরিরাজা কবি একজন নামকরা পণ্ডিত ছিলেন। যদিও তাঁর বাবা ছিলেন দরিদ্র, তথাপি তিনি অতি ধার্মিক ব্যক্তি ছিলেন এবং তেলেগু আর সংস্কৃত ভাষায় তাঁর খুব দখল ছিল। ত্যাগরাজ এই দুই ভাষাতেই ব্যুৎপত্তি অর্জন করেন তাঁর পিতৃদত্ত শিক্ষায় এবং সংগীত শিক্ষা গ্রহণ করেন তাঞ্জোরের সভাগায়ক সন্তি বেংকটরামাইয়ের কাছে। মাত্র দু বৎসরের শিক্ষার ফলেই তিনি সংগীতে অসাধারণ পারদর্শিতা অর্জন করেন। তাঁর গুরু তাঁকে আদেশ করে-ছিলেন ৯৬ কোটিবার শ্রীরাম মন্ত্র উচ্চারণ করতে এবং এই নামোচ্চারণ তিনি যখন শেষ করেন, তখন তাঁর বয়স আটত্রিশ। এই সময়েই নাকি তিনি বিশ্বামিত্র সহযোগে রাম-লক্ষ্মণ দর্শন করে সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন এবং একান্ত ভক্তিপ্লুত মনে আড়ানা রাগে "এলা নি দয়ারাধু"

এই গানটি রচনা করে গেয়েছিলেন। এইটি তাঁর প্রথম রচনা। এর পর থেকে যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন ভগবদসাধনা এবং সংগীত সাধনা করে গিয়েছেন। তিনি নাকি বাল্মীকি-রামায়ণের ২৪০০০ শ্লোকের আদর্শে ২৪০০০ গান রচনা করবেন বলে মনস্থ করেছিলেন। তাঁর সারা জীবনের সংগীত সংখ্যা কত, তা অবশ্য জানা যায় না, তবে এটা ঠিক যে, তিনি অন্তত দশ হাজার গান রচনা করেছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁর রচনা বলে পরিচিত যেসব গান পাওয়া যায়, তার সংখ্যা মাত্র ৬৫০—এর মধ্যে আবার ১৫০টি আসলে তাঁর রচনা নয় বলেই প্রমাণিত হয়েছে। তাঁর অধিকাংশ রচনা বিনষ্ট হবার মূল কারণ হচ্ছে অদ্বৈতবাদীদের শত্রুতা, যার ফলে তাঁর অনেক রচনা অগ্নিদগ্ধ হয়। তিনি অদ্বৈতবাদী বংশেই জন্মগ্রহণ করেন, কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদে আস্থাবান হয়ে পড়েন। এই কারণেই নাকি অদ্বৈতবাদিগণ তাঁর ওপর শত্রুভাবাপন্ন হ'য়ে তাঁর রচনাবলী বিনষ্ট করেন।

উচ্চাঙ্গের কবিত্ব এবং সংগীত বোধ এই দুটিরই অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছিল তাঁর জীবনে—তাই একাধারে কবি, দার্শনিক, ভক্ত এবং সংগীতজ্ঞ হিসাবে দক্ষিণ ভারতে শ্রেষ্ঠ সম্মানের অধিকারী হয়েছেন সদ্গুরু মহাত্মা ত্যাগরাজ।

এ বছর ত্যাগরাজ মহোৎসবের উদ্বোধন করেন শ্রী এম এস কৃষ্ণন এবং সভার বক্তব্য নিবেদন করেন শ্রী সি আর নটেশন। সভাগৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন প্রসিদ্ধ কর্নাটক সংগীতজ্ঞ শ্রীআরিয়াকুড়ি রামানুজ আয়ার। ইনি কর্নাটক সংগীতে প্রথম রাষ্ট্রপতির পুরস্কার লাভ করেন। সম্মেলনে এর সংগীতও পরিবেশিত হয়েছে। কণ্ঠ-সংগীতে অংশ গ্রহণ করেন আলাথুর ভ্রাতৃদ্বয়, শ্রীমতী বসন্তকুমারী, শ্রীমাদুরাই বৈদ্যনাথন। বীণা বাজিয়েছিলেন প্রসিদ্ধ বাদক শ্রীবালচন্দর। বেহালা বাজিয়েছিলেন স্বনামধন্য বাদক শ্রী টি এন কৃষ্ণন এবং শ্রীমতী ধনলক্ষ্মী। বাঁশী বাজিয়ে শোনান শ্রীমতী কেশী। মৃদঙ্গে সংগত করেন শ্রীমণি আয়ার, শ্রীহরিহর আয়ার, শ্রীগণেশন, শ্রীগুরুভায়ুর ডোরাই এবং শ্রীপরশুরামন। হারমোনিয়াম বাজিয়েছেন শ্রীসুব্রহ্মণ্য দিক্ষিতর। ভারত-নাট্যম নৃত্য প্রদর্শন করেন কুমারী সুশীলা।

এই সম্মেলনে যেসব রাগ গাওয়া বা বাজানো হয়েছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল রঞ্জনী, হংসধ্বনি, হরিকাম্বোজী, সম্মুর্গপ্রিয়, নবরস কানাড়া, শংকরাভরণ, পন্থুবরালী, কল্যাণী, হিন্দোল এবং ভৈরবী।

আমাদের সংগীত সম্মেলনগুলিতে সাধারণত দক্ষিণ ভারতীয় নৃত্যই প্রদর্শিত হয়ে থাকে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতীয় বীণা এবং বেহালা বাদনের পরিচয় আমরা পাই না। এই দুটি উত্তম দাক্ষিণ ভারতীয় সংগীতকলা। আমাদের সম্মেলনে স্থান পেলে আমরা কর্নাটক সংগীতের উৎকৃষ্ট রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত হতে পারি।

গীত বিতান

গত ১৩ই মার্চ, রবিবার রাজভবনে গীতবিতানের সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভাপতির ভাষণে রাজ্যপাল মহোদয় গীতবিতানের শুভ কামনা করেন। কর্মাধ্যক্ষের বিবরণে জানা যায়, বর্তমানে প্রায় হাজার জন ছাত্রছাত্রী এই প্রতিষ্ঠানে নৃত্য গীত বাদ্যের অনুশীলন করছেন। আচার্য গৌরীনাথ শাস্ত্রী মহাশয় বেদ মন্ত্রোচ্চারণ করেন এবং গীতবিতানের সভাপতি শ্রীকালিদাস নাগ অভ্যাগতবর্গকে ধন্যবাদ প্রদান করেন। অনুষ্ঠান শেষে গীতবিতানের ছাত্রছাত্রীগণ কর্তৃক নৃত্য-গীতানুষ্ঠান হয়।

বেংগল মিউজিক কলেজ

গত ২০শে মার্চ, রবিবার ৪৮নং গড়িয়াহাট রোড়ে (সিংঘী পার্ক) বেংগল মিউজিক কলেজের বার্ষিক সমাবর্তন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে। মাননীয় বিচারপতি শ্রীপ্রশান্তবিহারী মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই উৎসবে সভাপতিত্ব করেন এবং প্রধান অতিথি ছিলেন বুনিয়াদি শিক্ষার প্রধান পরিদর্শক শ্রীহৃদয়রঞ্জন ঘোষাল। সমাবর্তন শেষে একটি মনোজ্ঞ সংগীতানুষ্ঠান হয়।

রাণী লক্ষ্মীবাঈর দিনচর্যা

ক্ষিতিমোহন সেন

অথর্ব বেদে একটি চমৎকার কথা আছে—

পশ্যন্তি সর্বে চক্ষুষা
ন সর্বে মনসা বিদুঃ

তাতে বোঝা যায় যে চোখে যাকে সর্বদা দেখি তাকে, আমরা অনেক সময় আমাদের চিত্ত দিয়ে, আমাদের মন দিয়ে ভাল ক'রে বুঝি না। তাই পণ্ডিত নেহরুর পক্ষে নিজ দেশ হলেও ভারতকে মন দিয়ে আবিষ্কার করতে হল।

যাঁরা নমস্য যাঁরা বড় তাঁদের আমরা অনেক সময় চিনতেই পারি না, যদিও সর্বদাই আমরা তাঁদের নাম মুখে মুখে আউড়ে চলি। রাজনীতির ক্ষেত্রে শ্লোগান বা বাঁধা বুলিগুলো প্রায়ই আমাদের "না-চেনা" অন্ধ শক্তির নমুনা। যাঁরা বড় এবং নমস্য তাঁদের আমাদের নতুন ক'রে আবিষ্কার ক'রতে হয়। তখন আমাদের এই চোখে-দেখা এবং কানে-শোনায় কুলোয় না। তখন জানতে হয় সাধনা দিয়ে। সেই কথাই ঋষিরা বলে গেছেন তাঁদের উপদেশে—

তপসা বিজিজ্ঞাসস্ব

অর্থাৎ তপস্যার দ্বারা জানতে হবে।

ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাঈর নাম আমাদের মুখে। অথচ তাঁকে কি আমরা ঠিক-মত চিনি? দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁর জীবনী যাঁরা লিখেছেন, তাঁরা প্রায়ই রাণী লক্ষ্মীবাঈর শত্রুপক্ষ। আমরাও তাঁকে ভাল করে জানি না। আমাদের ছেলেবেলায় কাশী, এলাহাবাদ ও মধ্যভারতের অনেক জায়গায় আমরা লক্ষ্মীবাঈর সহচরদের দেখেছি। কিন্তু তখন বয়স ছিল অল্প তাই তাঁদের কথা ঠিক বুঝতে পারিনি। এখন বয়সে বৃদ্ধ হয়েছি, কিন্তু সে সব মালমশলা এখন পাওয়া অসম্ভব।

সৌভাগ্যক্রমে সেদিন লক্ষ্মীবাঈর একজন ঘনিষ্ঠ সহচরের লেখার কথা জানলাম। ৩০ বৎসর বয়সে ঘর সংসার ছেড়ে তিনি লক্ষ্মীবাঈর যজ্ঞশালার পুরোহিত পদ গ্রহণ করেন। তাঁর নাম বিষ্ণু ভট্ট গোড্‌সে বরসীকর। মারাঠীতে তাঁর পুস্তকের নাম মাঝা প্রবাস। অর্থাৎ আমার প্রবাস কাহিনী। ১৯০৩ সনে ৭৫ বৎসর বয়সে গোড্‌সে পরলোকগমন করেন। তিনি প্রথমে লক্ষ্মীবাঈর কথা লেখেন নি। প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রী সি ভি বৈদ্য গোড্‌সেকে বাধ্য করেন লক্ষ্মীবাঈর কথা লিখতে। বৈদ্য মহাশয়ের একান্ত অনুরোধে গোড্‌সে লক্ষ্মীবাঈর চরিত কথা লেখেন। ১৯০৭ সনে পুণার চিত্রশালা হতে বইখানি প্রকাশিত হয়। ১৯৪৬ সনে আগস্ট মাসে সহ্যাদ্রি নামে মহারাষ্ট্র মাসিকে শ্রীযুক্ত নর ফাটক এই বিষয়ে একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং মাঝা প্রবাস বইখানির দ্বিতীয় সংস্করণ বের করেন। সেই পুস্তকের হিন্দী অনুবাদ করেন শ্রীঅমৃতলাল নাগর। নাগর মহাশয় লক্ষ্ণৌর অধিবাসী। লক্ষ্ণৌর চৌখ মহল্লায় তাঁর বাড়ি। এই হিন্দী অনুবাদের প্রকাশক কাশীর সারদা প্রকাশকমণ্ডলী।

বিষ্ণু ভট্টের পৌত্র পুরুষত্তম শাস্ত্রী গোড্‌সে এখনও জীবিত। তাঁর কাছে খোঁজ করলেও হয়ত এখনও আরও অনেক কথা জানা যেতে পারে।

লক্ষ্মীবাঈর চরিত্র সর্বভারতের গৌরবের বস্তু। তাঁর পৈত্রিক নিবাস ছিল কাশীতে। তাঁদের কাউকে কাউকে আমি জানতাম। কাজেই আমি লক্ষ্মীবাঈর সম্বন্ধে যে সব কথা শুনেছি তাতে লক্ষ্মীবাঈর প্রতি আমার একটি সহজ শ্রদ্ধা সদাই জাগ্রত ছিল। কাশীতে মহারাষ্ট্রবাসীদের অনেক বড় বড় মণ্ডলী আছে। একটি মণ্ডলী এখনও বাঙ্গালীটোলার মধ্যে কালিয়াগোলীতে বাস করেন। তাঁরা মহারাষ্ট্রীয় কালিয়া সাহেবের অনুবর্তী। পুরাতন কালিয়া সাহেবের অদ্ভুত দান শক্তি ছিল। সেই সব কথা এখনও অনেকের মনে থাকা সম্ভব।

মহারাণী লক্ষ্মীবাঈর পিতা খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর নাম মোরপন্ত তাম্বে। তাম্বেও বিষ্ণু ভট্টের কৌলিক যজমান ছিলেন। তাম্বের পত্নী যখন মারা গেলেন তখন মাতৃহীন লক্ষ্মীবাঈর বয়স ৪ বৎসর মাত্র। লক্ষ্মীবাঈর পিতাই লক্ষ্মীবাঈকে ছেলের মত মানুষ করেন। ছেলেবেলায় লক্ষ্মীবাঈকে অনেকে ছবীলী বলে ডাকতেন। কেহ কেহ বা ডাকতেন মনুয়া বলে। মোরপন্ত ছিলেন বীরত্বপ্রিয় পুরুষমানুষ। তাঁর কাছে পুরুষোচিত গুণেরই আদর ছিল। কাজেই ছবীলীর ছেলেবেলা থেকে পুরুষোচিত খেলাধুলাই প্রিয় ছিল।

লক্ষ্মীবাঈর চেহারা ছিল অতিসুন্দর। তাঁর গৌর বর্ণ, টিকলো নাক, উচ্চ ললাট, দীর্ঘকায়, সবই বীরত্বের ব্যঞ্জক। ছেলেবেলা থেকেই ঘোড়ায় চড়া, দুর্দম্য হাতী বশীভূত করা, বন্দুক চালান, তলোয়ার খেলা প্রভৃতি পুরুষোচিত কসরৎগুলো তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিল।

তখন ঝাঁসীর রাজা ছিলেন গঙ্গাধর রাও। বাবা সাহেব নামে তিনি পরিচিত। পরিণত বয়সে বাবা সাহেবের পত্নী বিয়োগ হল। কিন্তু বাবা সাহেব এমনি কড়া এবং কঠোর ছিলেন যে কেউ তাঁকে কন্যা দান করতে সাহস পাননি। এমন সময় জানা গেল যে বিঠুরের নানাসাহেবের হোমশালার ঋত্বিক তাম্বে নামে এক ব্রাহ্মণের এক সুন্দরী কন্যা আছে।

বাবা সাহেবের কর্মচারীরা মোরপন্তর কাছে গিয়ে এই বিবাহের প্রস্তাব করলেন। পত্নীহীন মোরপন্ত ভাবছিলেন কন্যার কি গতি হবে। তিনি দেখলেন এই তো উপযুক্ত একটি প্রস্তাব পাওয়া গেল। তাঁর কন্যার যেরূপ বীরোচিত শিক্ষাদীক্ষা তাতে রাজকুলে এরূপ বিবাহ প্রস্তাবই ভাল মনে হ'ল। ঠিকুজীতেও উভয়ের গণগোত্র প্রভৃতির মিল হল। তখন প্রস্তাব স্বীকার করে মোরপন্ত কন্যা সহ ঝাঁসী গেলেন। বিবাহ মুহূর্তে মনুয়া বা ছবীলীর নাম লক্ষ্মীবাঈ রাখা হ'ল।

বিবাহ তো হ'য়ে গেল এবং সেই বিবাহের ফলে একটি ছেলে এবং একটি মেয়েও হ'য়েছিল কিন্তু এই বিবাহ সুখের হ'ল না। বাবাসাহেব ও লক্ষ্মীবাঈর ঠিকুজী কুণ্টি মিলল বটে, কিন্তু মনের মিল হ'ল না।

গোড্‌সে এই কথা অত্যন্ত সাবধানে লিখেছেন।

"বিবাহ হল, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী কেউই সুখী হলেন না। পতি গঙ্গাধর রাও বড় কঠোর স্বভাবের মানুষ। আর লক্ষ্মীবাঈর আদর্শ হল বীরত্বের শিক্ষা দীক্ষা। লক্ষ্মীবাঈকে কঠোর শাসনে গঙ্গাধর রাখলেন। সশস্ত্র স্ত্রীলোকের পাহারায় অন্দর মহলে লক্ষ্মীবাঈর দিন কাটতে লাগল। সেখানে তাঁর বীরত্ব প্রভৃতি আদর্শের কোনও উপযোগিতা ছিল না।" লক্ষ্মীবাঈর স্বামী বাবা-সাহেব ছিলেন রগচটা মানুষ। তিনি বয়সে প্রবীণ হলেও স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি-গুলো ভাল ক'রে মানতেন না। তাঁকে বাধা দেবে কে? তাই তিনি খুব দীর্ঘ-জীবী হননি।

তিনি মারা গেলে লক্ষ্মীবাঈরই তাঁর স্বামীর কর্তব্যগুলো চালিয়ে নেবার কথা। কিন্তু ইংরেজ সরকার এই সহজ পন্থাটি উল্টে দিলেন। অর্থাৎ লক্ষ্মীবাঈর শাসন-ক্ষমতা অনেকটা কমিয়ে দিলেন। যতটুকু শাসনশক্তি হাতে পেলেন ততটুকু লক্ষ্মীবাঈ অত্যন্ত বুদ্ধির ও কল্যাণ আদর্শের দ্বারা চালনা করতে লাগলেন।

দেশের বহু জ্ঞানী গুণী পণ্ডিতকে তিনি অকাতরে সাহায্য করতে লাগলেন। উপযুক্ত প্রার্থনা থাকলে তিনি কখনও প্রার্থীকে বিমুখ করতেন না। যাঁর মধ্যে তিনি ব্রাহ্মণোচিত বা ক্ষত্রিয়োচিত সদ্গুণ দেখতে পেতেন তাঁকেই তিনি যথাশক্তি সাহায্য করতেন। স্বামী বেঁচে থাকতে যে সব শুভকর্মে সহায়তা করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল, এখন সেই সব কর্ম তাঁর পক্ষে করা সহজতর হ'ল।

লক্ষ্মীবাঈর যখন কর্মের সব বাধা সরে গেল, তখন তিনি সর্বভাবে নিজের জীবনকে আপন আদর্শ দিয়ে সুনিয়ন্ত্রিত করে তুললেন। রোজ তিনি ব্যায়ামশালায় ব্যায়াম করতেন। ঘোড়ায় চড়ে রাজ্যের নানাস্থান পরিদর্শন ক'রে আসতেন। ভাল ভাল ঘোড়ায় কসরত করতেন। দুঃসাধ্য হস্তীকে নিয়ন্ত্রিত ক'রতেন। ভাল ঘোড়া ও হাতী চিনতে তাঁর মত খুব কম লোকই ছিলেন তখন। তারপর খানিক বেলা হ'লে তিনি স্নান করে ধ্যান-ধারণা ক'রে কিছু আহার করতেন। স্নান এবং ব্যায়াম তাঁর নিত্য অতি প্রিয় কাজ ছিল।

স্নান ক'রে তিনি শুভ্র, স্বচ্ছ শাড়ি প'রে বিভূতি চন্দন চর্চিত হ'য়ে কিছুক্ষণ ধ্যান-ধারণাতে কাটাতেন। তারপর দৈনন্দিন কাজে হাত দিতেন।

প্রচলিত প্রথামতে লক্ষ্মীবাঈর বিধবা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাথা মুণ্ডন করা উচিত ছিল। কিন্তু মাথা মুণ্ডন করান তিনি পছন্দ করেননি। সেইজন্য প্রবীণ পণ্ডিতদের বিধান মতে তিনটি কঠিন প্রায়শ্চিত্ত তাঁকে করতে হ'ল।

প্রতিদিন পুজো অর্চনা সেরে তিনি ভাল ভাল গাইয়েদের গান শুনতেন। সে সব গাইয়ে সব রীতিমত গুণী ও কলাবৎ। তিনি বেছে বেছে গাইয়েদের নির্বাচন করে নিযুক্ত করতেন এবং সঙ্গীত শাস্ত্রের তিনি খুব উঁচু দরের সমঝদার ছিলেন। এই রকম প্রায় দেড়শ গাইয়ে তাঁর আশ্রিত ছিলেন।

মধ্যাহ্ন পার হ'য়ে গেলে ভোজন ক'রে দুঃখীদের দুঃখ মোচন, দেশের অভাব অভিযোগ শোনা ও তার প্রতিকার করা তাঁর দৈনন্দিন কর্তব্য ছিল। এই সময় প্রয়োজন বুঝে তিনি বহু দান ধ্যানও করতেন।

শাসকের আসনে বসবার সময় তিনি প্রায় সময়ই বীরোচিত বেশভূষা ধারণ করতেন। কচিৎ কখনও নারীর বেশেও রাজকার্য চালাতেন।

বিধবা হওয়ার পর গহনায় তার আসক্তি ছিল না। রত্নালঙ্কারগুলো তিনি উপেক্ষা করতেন। তাঁর বেশভূষা শুভ্র ও অত্যন্ত সুরুচিসঙ্গত ছিল। হাতে দু' একটি সোনার চুড়ি, গলায় মুক্তার একটি মালা ও হাতে হীরের আঙটি এই কয়টি অলঙ্কারমাত্র তাঁর নিত্য বেশের অন্তর্গত ছিল। গোড্সে বলেন যে, তাঁর ভাণ্ডারে গহনার অভাব ছিল না। কিন্তু সে সব গহনা তিনি ব্যবহার করতেন না।

সেই সময় তিনি ভাল ভাল জ্ঞানী এবং গুণীজের উৎসাহ দেবার জন্য দান করতেন, ভাল লেখকদের লেখা শুনে তিনি তাঁদের সম্বর্ধিত করতেন। যদিও তাঁর নিজের পড়াশুনা অতি সাধারণ রকমের ছিল।

ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা তখনকার দিনে বড়ই দৈন্যের সঙ্গে কাল যাপন ক'রতেন। লক্ষ্মীবাঈ এইজন্য যোগ্য শাস্ত্রজ্ঞদের কথা জানতে পারলে যথাসাধ্য সাহায্য ক'রতেন। ভাল ভাল শাস্ত্রজ্ঞ, কলাব্য বা গুণী তাঁর সময়ে কখনও অর্থাভাবে বিপন্ন হননি। যদিও রীতিমত ভাল সাধনা ছাড়া তিনি কাউকে উৎসাহ দিতে চাইতেন না।

এইসব বিষয়ে অনেক ছোটখাট কথা গোড্সে লিখে গেছেন। গোড্সের পক্ষে এইসব দৈনন্দিন কথা লেখাও সম্ভব হ'য়েছে তিনি তাঁর নিত্য ধর্মানুষ্ঠানের সহায়ক পুরোহিত ছিলেন ব'লে।

গোড্সের লেখা বিবরণে আমরা পাই যে, লক্ষ্মীবাঈর কেশ সম্পদ অতি চমৎকার ছিল। তিনি তা চূড়া ক'রে বাঁধতেন—খোঁপা ক'রতেন না। তাঁর চোলী অর্থাৎ জামা নিষ্কলঙ্ক শুভ্র রঙের হ'ত। তার সঙ্গে তিনি শাদা শাল ব্যবহার ক'রতেন। তাঁর রাজসভা অতি উত্তম চিত্রে সজ্জিত ছিল। চিত্রকরদেরও তিনি খুব উৎসাহ দিতেন।

মহারাষ্ট্র ব্রাহ্মণদের তিনটি শ্রেণী। দেশস্থ, কঙ্কণস্থ ও করাড়ে। লক্ষ্মণরাও নামে তাঁর এক দেওয়ান ছিলেন। তিনি ছিলেন "দেশস্থ" ব্রাহ্মণ। লক্ষ্মণরাওকে কর্তব্যাকর্তব্য সম্বন্ধে অবহিত ক'রে লক্ষ্মীবাঈ পরে দেখতেন সব কাজগুলো সুসম্পন্ন হ'ল কিনা। তাঁর বিচার সভায় ফৌজদারী, দেওয়ানী এবং রাজ্য চালনা সম্বন্ধীয় সব কাজই সুসম্পন্ন হ'ত। হুকুমনামাগুলো অনেক সময়ে লক্ষ্মীবাঈ নিজে লিখে স্বাক্ষর ক'রে দিতেন।

গোড্সের লেখাতে এমন অনেক কথা আমরা জানতে পারি যা অন্য লোকের লেখা সম্ভব না। ঝাঁসী রাজ্যে বড়ুয়া সাগর নামে একটি ছোট নগর আছে। সেখানে চোরডাকাতের অত্যাচার বড়ই বেড়ে চলল। লক্ষ্মীবাঈ নিজে সেখানে কিছুদিন গিয়ে রইলেন এবং অনেক কঠোর ব্যবস্থায় ও স্নেহের গুণে তাদের বশীভূত ক'রে প্রজাদের দুঃখ দূর ক'রলেন।

পূর্বেই বলা হ'য়েছে লক্ষ্মীবাঈর পিতা কাশীর অধিবাসী ছিলেন। কাজেই কাশীর অনেক দরিদ্র অথচ সুপণ্ডিত ব্যক্তি তাঁর কাছে অভাব অভিযোগ নিয়ে আসতেন। দিল্লীর বাদশাহ্দের তখন পতন হ'য়েছে। তানসেন ঘরাণার ভাল ভাল কলাবতেরা তখন নিঃসহায় ও নিরাশ্রয়। অনেকে কাশী এসে আশ্রয় নিয়েছেন। তাঁরাও মাঝে মাঝে ঝাঁসী গিয়ে তাঁদের

দুঃখ দুর্গতির কথা লক্ষ্মীবাঈকে জানাতেন। লক্ষ্মীবাঈ পারতপক্ষে কাউকে নিরাশ ক'রতেন না। তিনি ভিক্ষুকদের ভাল কাজে জীবন যাপন করবার জন্য যথাসাধ্য সাহায্য ক'রতেন। এইসব বিষয়ে সব জাতি, সব ধর্ম, সব সম্প্রদায়ের লোকেই তাঁর কাছে আসতেন এবং লক্ষ্মীবাঈ সমভাবে তাঁদের সকলকে সাহায্য ক'রতেন।

মহারাণী অতিশয় ধর্মপরায়ণা ছিলেন। এইজন্য শাস্ত্রজ্ঞ, বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা তাঁর কাছে অনেক সহায়তা পেতেন। কিন্তু যখন ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ বাধল তখন তাঁর পক্ষে এইরকম সাহায্য করা বড় কঠিন হ'য়ে উঠল। তবু তাঁর লক্ষ্য ছিল যেন কোন শুভকর্ম বা কোন কলাবিদ্যা সাহায্যের অভাবে নষ্ট না হয়।

১৮৫৭ সনে লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজদের সঙ্গে ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার ক'রে কাজ চালাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তা যখন অসম্ভব হল তখন তিনি বীরোচিত পন্থার আশ্রয় গ্রহণ ক'রলেন। হাল ছেড়ে দিলেন না। অবস্থা সঙ্গীন হ'য়ে উঠল। পেশোয়ারাও তাঁকে সাহায্য ক'রলেন না এবং রাজনীতিওয়ালা পুরুষদের কাছেও যখন সাহায্য তিনি পেলেন না তখন অন্তঃপুরের মেয়েদের নিয়েই তিনি এক-দল নারীযোদ্ধা তৈয়ার ক'রে তুললেন। তিনি ঝাঁসী ত্যাগ ক'রতে বাধ্য হ'লেও কাল্পির পথে অরণ্যের মধ্যে নতুন কর্ম-ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত ক'রলেন। এইসব ছোট ছোট কথা গোড্‌সে আমাদের চমৎকার ক'রে জানিয়েছেন এবং তাঁর পক্ষেই এটা জানান সম্ভব, কারণ গোড্‌সে তাঁর যজ্ঞ-শালার আপন পুরোহিত ও নিত্য সহচর ছিলেন। রাণী লক্ষ্মীবাঈর প্রতিদিনকার দিনচর্যাগুলি না জানলে তাঁকে ঠিকমত বিচার করা চলে না। অথচ এইসব খুচরো খবর তাঁর ঘনিষ্ঠ সহচররা না দিলে কে দেবে? এইজন্যই আমরা গোড্‌সের রচিত মাঝা প্রবাস নামে গ্রন্থখানির বিশেষ সমাদর করি।

শঙ্করদেব ও তাঁহার ভক্তিমতবাদ

কমলা সেন

বাংলার চৈতন্যদেবের ন্যায় আসামে শঙ্করদেবের আবির্ভাব এক অবিস্মরণীয় ঘটনা।

ত্রয়োদশ শতকের প্রথমার্ধে প্রাচীন কামরূপ রাজ্য বিলুপ্তপ্রায়। পাল-বংশের হিন্দুরাজাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র রাজ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূঁইয়া নামক সামন্ত শাসকদের অধীন হইল। উত্তর বর্মার শানদিগের বংশধর অহোমের আক্রমণ ও রাজ্যবিস্তার, পূর্বদিকে কাছারী ও পশ্চিমাঞ্চলে কোচরাজাদের আধিপত্য বিস্তারের ফলে চতুর্দিকে এক নিরবচ্ছিন্ন রাজনৈতিক বিপ্লব। উপরন্তু বাংলার নবাবের পুনঃ পুনঃ আসাম আক্রমণে কোচ ও অহোম বিব্রত। একদিকে বাংলার নবাবের আক্রমণ আর দিকে কোচ-অহোম-ভূঁইয়া এই ত্রিশক্তির অভ্যন্তরীণ বিবাদের ফলে আসামের সামাজিক, সাংস্কৃতিক জীবন বিপর্যস্ত। প্রকৃত-পক্ষে এরূপ রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার কবলে পড়িয়া সামাজিক জীবন স্থৈর্য না হারাইয়া পারে না। তাছাড়া তখনকার শাক্ততন্ত্রের নানাপ্রকার যৌনবিকারে ভরা বীভৎস বিকারগ্রস্থ হৃদয়হীন আচার অনুষ্ঠানে আসামের ধর্মমানস আচ্ছন্ন।

দেবীপূজার নামে কর্ণবিদারী ঢাকবাদ্যের সঙ্গে রক্তাক্ত বলিদান, কুমারী পূজার নানারূপ অশ্লীল আচার-অনুষ্ঠান, দেব-দাসীদের নগ্ন নৃত্যলীলা প্রভৃতি যথেচ্ছা-চার সমাজে প্রাধান্যলাভ করিয়াছে। এইরূপ শ্বাসরোধকারী অবস্থা হইতে উদ্ধারলাভের জন্য আসামের জনসাধারণ যখন ব্যাকুল—সেই চিরবাঞ্ছিত সময়ে শঙ্করদেবের আবির্ভাব। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্বেও বাংলাদেশকে ঠিক এইরূপ সংকটাপন্ন অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

১৪৪৯ খৃষ্টাব্দে শঙ্করদেব নওগাঁ জেলার আলিপুখুরি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা কুসুম্বর শিরোমণি সমসাময়িক "বারো ভূঁইয়াদের" অন্যতম। জাতিতে তিনি কায়স্থ, উত্তরাধিকারসূত্রে শাসকশ্রেণীভুক্ত, পারিবারিক ধর্মে শাক্ত ছিলেন। নওগাঁর বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ মহেন্দ্র কদলীর নিকটে তিনি শিক্ষালাভ করেন। তৎপর বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যজীবন আরম্ভ করেন। কিছুকাল সংসার নির্বাহের পর তাঁহার পত্নীবিয়োগ ঘটে এবং তিনি সুদীর্ঘ দ্বাদশ বর্ষ উত্তর ভারতের বিভিন্ন তীর্থ পর্যটন করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিলেন। সম্ভবত তীর্থপর্যটনকালে বৈষ্ণব ভাগবতধর্মে অনুপ্রাণিত হন এবং স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া ভক্তিধর্ম প্রচারে ব্রতী হন।

তাঁহার মতে সংসার ত্যাগ করিয়া আধ্যাত্মিক জ্ঞানলাভ করা অতি সহজ। কিন্তু সংসারে থাকিয়া, নিয়মিত সংসার-ধর্ম পালন করিয়া ভগবদ্ দর্শনলাভ করার মধ্যে মাহাত্ম্য অধিক। তাই তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করিয়া পুনরায় বিবাহ করিলেন এবং অপার জনসাধারণকে তাঁহার 'একস্মরণীয় মন্ত্র' দান করিলেন। স্বয়ং বিষ্ণুপদে আত্মসমর্পণই পরম আনন্দ।

তাঁর চরণকমলে আপনাকে নির্বিচারে সমর্পণ করিতে পারিলে সংসারে আর কিছুতে আসক্তি থাকিবে না। আত্ম-সমর্পণই ভগবদপ্রাপ্তির পথ বলিয়া শঙ্করদেবের ধর্মমতের নাম "একস্মরণীয় ধর্ম"। পরবর্তীকালে তাঁহার বৈষ্ণব ভক্তিবাদ 'মহাপুরুষিয়া' নামে পরিচিত, কারণ শঙ্করদেব স্বয়ং মহাপুরুষ নামে আখ্যা লাভ করেন। প্রধানত গীতা ও ভাগবত হইতেই তিনি তাঁহার ভক্তিবাদী ধর্মমত গড়িয়া তুলেন। রামানুজ হইতে শ্রীচৈতন্য পর্যন্ত সমস্ত বৈষ্ণবনেতাদের মত শঙ্করদেবের বাণী ছিল—শ্রীকৃষ্ণই পরম-পুরুষ ও পরমারাধ্য, প্রেমই ভগবদ উপলব্ধির একমাত্র পথ। কৃষ্ণপদে শরণ-লাভই আধ্যাত্মিক মুক্তির পথ—গুরুমন্ত্রের কোনই প্রয়োজন নাই। নামগান পূজার সর্বশ্রেষ্ঠ মন্ত্র। আড়ম্বরপূর্ণ আনুষ্ঠানিক পূজা পদ্ধতির দ্বারা ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না। অনাবিল ভক্তি পূজার একমাত্র উপকরণ। ভগবান সর্বজীবে বিরাজমান। নরই নারায়ণ সুতরাং জীব-হত্যা মহাপাপ। জাতিধর্মনির্বিশেষে সকলেরই কৃষ্ণনামগানে অংশ গ্রহণ করিবার জন্মগত অধিকার। ইহার জন্য সন্ন্যাস-ধর্ম গ্রহণের কোনই প্রয়োজন নাই। দিবাবসানে সংসারের সকল কর্তব্য সম্পাদনের পর 'নামঘরে', খোল-করতাল সহযোগে সমবেত নামকীর্তনের মাঝে শ্রীভগবানের চরণে আপন আত্মাকে সমর্পণ করিতে হইবে। নামসংকীর্তনের মাঝে অন্তরের ময়লা ধুইয়া যাইবে। অন্তর যাহার নির্মল—শ্রীভগবান তাহাকে চরণে স্থান দিবেন। নির্বিচারে আত্ম-সমর্পণ আপাতদৃষ্টিতে কঠিন কিন্তু একবার ভগবৎ প্রেমের ধারায় অবগাহন করিতে পারিলে সকল বাধা অচিরে দূর হইবে। ইহাই প্রেমভক্তিবাদের মাহাত্ম্য।

শাক্ত পূজাপদ্ধতির রক্তাক্ত, হিংস্র, জটিল ও অশ্লীল ক্রিয়াচারের পরিবর্তে এই অতি সহজ সরল সুন্দর সমবেত নামকীর্তনের মাধ্যমে ভগবদারাধনা তখন-কার অবলম্বনহীন বিপর্যস্ত অসমীয়া জনসাধারণের অন্তরে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিল। ফলে শঙ্করদেব একাধারে অসামের জনপ্রিয় লোকনায়ক, সমাজ সংস্কারক ও ধর্মপ্রচারকের পদে সুপ্রতিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার প্রেমময় বাণীর মধ্যে জনসাধারণ আত্মিক মুক্তির পথ খুঁজিয়া পাইল।

শঙ্করদেব বয়সে চৈতন্য মহাপ্রভু অপেক্ষা বড়, কারণ কথিত আছে শঙ্কর-দেব যখন তীর্থপর্যটনে নবদ্বীপ গমন করেন তখনও চৈতন্যদেব নাবালক; কিন্তু বৈষ্ণবধর্মান্দোলনের প্রবর্তক হিসাবে উভয়েই প্রায় সমসাময়িক। তবে উভয়ের ভক্তিবাদের মধ্যে পার্থক্য যথেষ্ট। শ্রীচৈতন্যদেবের ভক্তিবাদ মধুররস ও রাধা কৃষ্ণের লীলাকে প্রাধান্য দিয়াছে, কিন্তু শঙ্করদেবের ভক্তিবাদে কালীয়দমন, পারি-জাতহরণ প্রভৃতি কৃষ্ণ মাহাত্ম্যকে প্রাধান্য দিয়াছে। শঙ্করদেবের ভক্তিবাদে শ্রীরাধা ও গোপীকুল অবর্তমান। শঙ্করদেব দাস-রূপে ভগবান আরাধনাকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়াছেন।

শঙ্করদেবের প্রেমভক্তিবাদের সঙ্গে দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবনেতা রামানুজের ভক্তিবাদের যথেষ্ট সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। সম্ভবত শঙ্করদেব তীর্থপর্যটন-কালে পুরীতে দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। শিখ-ধর্মের একটি ধর্মাচারের সহিত শঙ্কর-দেবের বৈষ্ণবাচারের অদ্ভুত মিল রহিয়াছে। মূর্তিপূজার পরিবর্তে শঙ্কর-দেব পবিত্র পুঁথিপূজার প্রচলন করেন। বিশেষত তাঁহার রচিত অসমীয়া ভাষায় লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত এইভাবে পূজিত হইতে লাগিল।

সমসাময়িক উত্তর ভারতের বিভিন্ন বৈষ্ণবধর্মবাদে স্ত্রীপুরুষের একত্র ভগবদ আরাধনার বিধি প্রচলিত থাকিলেও, আসামে শঙ্করদেব রামানুজের ন্যায় স্ত্রীপুরুষের একত্র নামগানের বিরোধী ছিলেন। তিনি কখনও কোন স্ত্রীলোককে নামমন্ত্র দান করেন নাই।

এই নূতন ধর্মমত প্রচারের জন্য প্রয়োজন নূতন ধর্মগ্রন্থ। তাই শঙ্করদেব নাটক, সংগীত, গার্ল-গল্পের মাধ্যমে কৃষ্ণমাহাত্ম্য প্রচারে ব্রতী হইলেন। তিনি তাঁহার ভক্তদিগের ভক্তিমূলক ধর্মগ্রন্থ প্রচারে অনুপ্রাণিত করিলেন। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য বিশ্লেষণের জন্য চাই তাঁহার কাহিনী প্রচার। শঙ্করদেব স্বয়ং শ্রীমদ্ভা-গবতের শ্রীকৃষ্ণলীলাকে সাধারণের অবগতির জন্য সহজ সরল অসমীয়াভাষায় পুন-র্বর্ণিত করিলেন। সুদীর্ঘ জীবনে এইভাবে বহু ধর্মগ্রন্থ প্রচারের দ্বারা অসমীয়া সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিলেন।

কেবলমাত্র ধর্মগ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তাঁহার 'একস্মরণীয় মন্ত্র' প্রচার করেন নাই। গ্রামে গ্রামে বৈষ্ণব ধর্মসত্র প্রতিষ্ঠা করিলেন। এই ধর্মসত্রগুলি একাধারে ধর্ম-সংস্কারক ও সমাজ সংস্কারক। ধর্মসত্র-গুলিরই ক্ষুদ্র সংস্করণ 'নামঘর'। নাম-ঘরের সৃষ্টি কেবল নামগানের জন্য নহে—গ্রামের সকল প্রকার সর্বজনীন কার্য ইহাতে অনুষ্ঠিত হইতে লাগিল। সুতরাং এই সকল বৈষ্ণব ধর্মসত্র ও নামঘরগুলিকে অসমীয়া সমাজের কর্ণধার বলা যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক আবর্ত হইতে আত্ম-রক্ষার পথপ্রদর্শক তো তাহারাই।

শঙ্করদেব যদিও আজ আসামের বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি ছিলেন সমাজ সংস্কারক। অসমীয়া সমাজকে নৈতিক পতন হইতে আলোকময় ভক্তিবাদের সাহায্যে তিনি উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। যুগে যুগে পৃথিবী যখন পাপের ভারে নুইয়া পড়ে তখন এমনি-ভাবে শ্রীভগবান মনুষ্যরূপে অবতীর্ণ হন অন্ধ মানবকে জ্ঞানের আলো, প্রেমের আলো দান করিতে। অসমীয়া জাতির ত্রাণকর্তা শঙ্করদেব ১৫৬৯ খৃষ্টাব্দে দেহ-রক্ষা করেন। কাহারও মতে তিনি ১০৫ বৎসর জীবিত ছিলেন।

শঙ্করদেবের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, আত্ম-নির্ভরতা, অনাবিল প্রেম ও ভক্তি, সাধারণের প্রতি ভালবাসা ও সহানুভূতির ফলেই তন্ত্রাভিচারী ব্রাহ্মণ্যশক্তিবাদের বিরুদ্ধে বৈষ্ণবভক্তিবাদ ও আধ্যাত্মিক গণ-ঐক্যশক্তির বিস্তার সম্ভব হইয়াছিল। দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার মৃত্যুর কিছুকালের মধ্যেই অসমীয়া বৈষ্ণবধর্ম তাহার সজীবতা ও ঐকপ্রাণতা হারাইয়া ফেলিল।

ঘোষপাড়ায় দোলোৎসব

সোমনাথ ভট্টাচার্য

কল্যাণী আর ঘোষপাড়া। যেন ভেঙে পড়া বিরাট একটি একান্নবর্তী পরিবারের দুটি অংশ। একজন চৌদ্দ আনারই মালিক—আর একজনের সম্বল মাত্র দু আনার শরিকানা। একজন নতুন দিনের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। আর একজন প্রাণপণ শক্তিতে পুরনো আভিজাত্যকে আঁকড়ে ধরে নিঃশব্দে ক্ষয় হয়ে যাচ্ছে। একদিন হয়ত বিরাট চৌদ্দ আনার মধ্যে নিঃশেষে মিশে যাবে দু আনীর জন, হয়ত কোন পৃথক সত্তাই থাকবে না আর।

ঘোষপাড়া প্রবীণ। অনেক অভিজ্ঞতার বলিরেখায় আকীর্ণ তার ললাট। সারা মুখে তার ঔদার্য আর শান্তির প্রলেপ। আর কল্যাণী? সে তো এখনো কলি!—এখনো কালিকা! একদিন রূপে-গন্ধে গরবিনী হয়ে সম্মুখী সোনালী সূর্যের আলোয় একে একে মেলে ধরবে তার দলগুলি। কলি হবে ফুল। কিশোরী মেয়ে পা দেবে যৌবনের আঙিনায়। রোজ এ-পথে যাওয়া পথিক পথ ভুলে হঠাৎ একদিন থমকে দাঁড়িয়ে পড়বে।

মধ্য-বসন্তের কোন-এক দ্বিপ্রহরে কল্যাণীর এসফেল্ট রাস্তা মাড়িয়ে বাস ছোটে হু হু করে। তখন উত্তর-পশ্চিম উপান্তের ছায়াচ্ছন্ন একটি গ্রামের দিকে তাকালে মনে হয়, গাম্ভীর্যের খোলসের অন্তরাল থেকে লুকিয়ে লুকিয়ে আর একজনও বুঝি এ-দিনটির প্রতীক্ষায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে। সারা মুখে তার পিতামহের অটল গাম্ভীর্য আর ঠোঁটের কোণে সস্নেহ কৌতুকের হাসি।

কলকাতা থেকে ট্রেনে কল্যাণী আসতে গেলে ডিঙাতে হবে তিরিশটি মাইলস্টোনের ধাপ। তারপর ঘোষপাড়া যেতে হলে আরো খুচরো আড়াই মাইল। এই খুচরো ক' মাইল আপনি অতিক্রম করতে পারেন, বাসে কিংবা রিকশয়। রিকশই স্থায়ী যান। ঘোষপাড়ার দোল উৎসব উপলক্ষ্যে অতিরিক্ত বাস চলে কল্যাণী, কাঁচরাপাড়া, ব্যারাকপুর থেকে। জলপথে নৌকা বা লঞ্চেও ঘোষপাড়ার মেলায় আসেন অনেকে। নানা রংএর, নানা ঢংএর ট্যাক্সি, ট্রাক, রিজার্ভ বাসের ভিড় পড়ে যায়। মেঠো পথ দিয়ে আশপাশের, দূর-দূরান্তের গ্রাম থেকে ঢুকুস ঢুকুস করতে করতে সারবন্দি গরুর গাড়ি আসে। গাড়ির ছইয়ের মধ্যে থাকে এক-একটা গোটা পরিবার। দাদু-দিদিমা থেকে কোলের নাতিটি পর্যন্ত। একগলা ঘোমটা টানা ন' বছরের গৃহিণী ড্যাবডেবে চোখে মানুষজন দেখে। বিস্ময়ে নোলক-পরা নাক প্রসারিত হয়ে যায়। কোন অসতর্ক মুহূর্তে হয়ত ঘোমটা খসে পড়ে। নানা জায়গা থেকে হাঁড়ি-কুড়ি, পাটি, মাদুর, রান্নার সরঞ্জাম নিয়ে দোলের ক'দিন আগে থাকতে থাকতেই ঘোষপাড়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন ভক্তরা। পায়ে হেঁটে তারা এসে পৌঁছন। মেলা অথবা মেলার আগের দিন। খোঁজ নিয়ে দেখুন, এরা অধিকাংশই আসছেন বাঁকুড়া, বর্ধমান, মেদিনীপুর, হুগলী, মুর্শিদাবাদ, কৃষ্ণনগর থেকে। এই সুদীর্ঘ পথ দণ্ডি কেটেও অতিক্রম করতে দেখেছি অনেককে।

ঘোষপাড়ার এলাকা নিতান্তই সংকীর্ণ। এক থেকে দেড় বর্গমাইলের বেশী নয়। প্রায় সমস্ত এলাকা জুড়েই আম, লিচু, জাম, জামরুল প্রভৃতি নানা ফল-ফুলুরির গাছে পরিপূর্ণ। ছায়াচ্ছন্ন একটি বাগানের মত। বছরের সমস্ত সময় আবার বাগান ভরে থাকে কুল, কুচী, বুনো হাস্নুহানা, বন শিউলী, হাতিসুঁড় প্রভৃতি

সতী মা'র মন্দির

ছোট ছোট গাছ-গাছালির ঝোপেঝাড়ে। তখন ঝোপঝাড় ঠেলে এর মধ্যে ঢোকাই একরকম দুঃসাধ্য হয়ে ওঠে। বাঘ,ভাল্লুক না থাক বিষধর সাপের ভয়ে ইস্কুল পালানো দামাল ছেলের দল ছাড়া এ বাগানে বড় একটা কেউ পা দেয় না।

ঘোষপাড়ার বিখ্যাত সতীমা'র দোলোৎসব বসে এই আম আর লিচু বাগানের তলাতেই। ঝোপঝাড় কেটেকুটে পরিষ্কার করা হয়। মন্দিরের কলি ফেরে। মন্দিরের অভ্যন্তরে সতী মা আর তার স্বামীর পালঙ্কে বিছানো হয় নতুন শয্যা। সতী মা'র সমাধিস্থান ডালিম গাছের ওপর ত্রিপলের আচ্ছাদন ওঠে। মন্দির-চত্বর ঝক্‌মক্ করে পরিচ্ছন্নতায়। হিমসাগরের ভাঙা হাটে নতুন করে সিমেন্টের ছোঁয়া পড়ে হয়ত। অনতিদূরে কালী মন্দিরের সামনে গোলপাতার ছাউনী ওঠে। সতীমার দোলোৎসবে এসে ভক্তরা এ মন্দিরের অনেকে ভক্তিভরে পূজো দিয়ে যান।

বারো মাসে তেরো পার্বণএর দেশে যেমন নানা পার্বণের অন্ত নেই—অন্ত নেই তেমনি মেলার। বছরে হাজারো মেলার মেলা এদেশে। বলা বাহুল্য এদের অধিকাংশই বৈশিষ্ট্যহীন। কিছু মানুষ জনের জমায়েৎ, কিছু কেনাকাটা—এই পর্যন্ততেই শেষ হয়। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে ঘোষপাড়ার সুর একটু উঁচু পর্দায় বাধা। সুরই ঘোষপাড়ার বৈশিষ্ট্য। বাউল, দেবতত্ত্ব, মনঃশিক্ষা, ভজন, কীর্তন গানেই বিশিষ্ট ঘোষপাড়ার দোলোৎসব।

ঘোষপাড়া বৈষ্ণবতীর্থ। বিশেষ করে কর্তাভজা সম্প্রদায়ের তো মহাতীর্থ। 'গুরুসত্য' মহামন্ত্রের (গুরুস্বামী, গুরু-পত্নী, গুরু আমার পিতা। গুরু নাম সার করে যা যথাতথা।) প্রবর্তক আউল চাঁদ (প্রবাদ—ইনিই পুরীধামে অন্তর্হিত শ্রীচৈতন্যদেব) এখানেই আত্মপ্রকাশ করেন। বৈষ্ণব তীর্থ বলে এখানে শুধু যে বৈষ্ণব ভক্তদেরই সমাবেশ হয়, তা নয়। বৈষ্ণবদের বিভিন্ন সম্প্রদায় ছাড়াও আসেন বাউলরা। মুসলমান ফকির এবং আউলরাও বাদ যান না। ঘোষপাড়ার মন্দিরে কালিকামূর্তিরও চিত্রপট আছে বলে উৎসবের দিন ত্রিশূল-ধারী রক্তাম্বর পরিহিত অনেক ভৈরব ভৈরবীরও সাক্ষাৎ মেলে। এ ছাড়া হাজার হাজার ভক্ত নরনারী অঞ্জলি ভরে নিয়ে আসেন তাদের ভক্তি অর্ঘ্য। এখানে এসে ভাবাবেশে হাসেন কাঁদেন, গান গান। গোরাচাঁদের গোরারূপ একবার মাত্র দেখবার জন্যে দিনের পর দিন উপবাসে হত্যে দিয়ে পড়ে থাকেন। এমনও অনেককে দেখেছি দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেও তার দেখা না পেয়ে আত্মধিক্কার দিতে দিতে সিমেন্টের সিঁড়িতে মাথাকুটে রক্তারক্তি করে ফেলছেন। কেউ বাধা দেয় না! আর কেই বা বাধা দেবে? সকলেই যে আত্মহারা। সকলেরই

দোলোৎসবের দিন মন্দিরের সামনে ভক্তদের ভিড়

হৃদয়তন্ত্রীতে যে একই সুরে কাঁপন জেগেছে—

শয়নে গৌর স্বপনে গৌর
গৌর নয়ন-তারা।
জীবনে গৌর মরণে গৌর
গৌর গলার হারা॥

দিনান্তে ঘোমটা খুলে পূর্বদিগন্তে ওঠে দোলপূর্ণিমার চাঁদ। আবির চাঁদ।

আকাশে জ্যোৎস্নার প্লাবন। আম, লিচু, জাম, জামরুল পাতায় লক্ষকোটি জ্যোৎস্না-তারার ঝিকিমিকি। আমের বকুলের গন্ধ। বসন্তের উন্মনা হাওয়া। শুরু হয় চাঁচর-বহ্ন্যুৎসব। চলতি কথায় ন্যাড়া পোড়া। উৎসব আরম্ভ। আনুষ্ঠানিক ভাবে মেলা শুরু।

ডালিমতলা আর সতী মা'র মন্দিরের প্রশস্ত চত্বর বহুপূর্ব থেকে পূর্ণ হয়ে থাকে ভক্ত সমাবেশে। অনেকে শুয়ে কাৎ হয়ে বসে হত্যে দিয়ে থাকেন। রাত যত গভীর হতে থাকে ভক্ত সমাগম হতে থাকে ততই। যারা আসেন তারা প্রথমেই এসে কোনরকমে একটা জায়গা বেছে সঙ্গের জিনিসপত্র নামিয়েই ছোটেন মন্দির আর ডালিমতলায়। মানত করে ঢিল বাঁধেন ডালিম গাছের ডালে ডালে আর মন্দিরের গরাদে। ভক্তিভরে পূজো দেন। উদ্বেলিত হৃদয়ে অপলক চোখে তাকিয়ে থাকেন। এখানে যাঁরা আসেন তাদের মধ্যে স্ত্রী-লোকদের সংখ্যাই বেশী। বিশেষ করে গ্রাম্য বিধবারা। স্বামী, সন্তান, পরিজনের মঙ্গল কামনায় সর্বকিছু তুচ্ছ করে ছুটে আসেন অনেক গৃহস্থ বধূ। ক্রমে এখানকার ভিড় বেড়ে উঠতে থাকে। ঠেলাঠেলি, হৈ-হুল্লোড় পড়ে যায়। এই সময় এবং দোলের দিন দ্বিপ্রহরে এখানকার অবস্থা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। স্বেচ্ছাসেবকরা সাধ্যমত পরিশ্রম করেও বিশেষ কিছু করে উঠতে পারেন না। ঠেলাঠেলিতে আহত ও নিখোঁজ হন অনেকে।

গভীর রাত্রি পর্যন্তও হিমসাগরের স্নানার্থীদের ভিড়ের কমতি থাকে না। আশ্চর্য মানুষের মন। ছোট্ট এই ডোবার হাঁটুভর পাক-গোলা জলে স্নান করলে নাকি সর্বরোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। শুধু মাত্র রোগ নয়! এখানে পূর্ণিমার তিথিতে স্নান করলে নাকি বোবারও কথা ফোটে। দৃষ্টিহীন তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়। বন্ধ্যানারী সন্তানের মুখ দেখে।

যে সমস্ত ভক্ত এখানে রাত্রি যাপনের বাসনায় আসেন। তারা পূজো-অর্চনা সেরে নিজেদের জায়গায় এসে মাটিতে উনুন খুঁড়ে রান্না চাপিয়ে দেন। মাথা গোঁজার জায়গা মানে, গাছতলা। প্রতিটি গাছের নীচেকার জমির জন্য নাকি ভাড়ার ব্যবস্থা আছে। এই ব্যবস্থাটা জিজিয়া করের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। আলো-আঁধারিতে ভরা বাগানে জ্বলে উঠে অসংখ্য উনুন। ধোঁয়ায় চোখ খুলতে কষ্ট হয়। এই সময় মনে হয় ঘোষপাড়ার এই বাগানে যেন বিরাট একটা বনভোজনের ব্যবস্থা হয়েছে। দোল পূর্ণিমার এই তিথিতে এখানে রান্না করে খাওয়া ও রাত্রি যাপন করা নাকি মহা-পুণ্যের ব্যাপারে। খাওয়া-দাওয়া চুকিয়ে মাদুর বা পাটি বিছিয়ে অনেকে আপাদ মস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েন। হ্যাঁ আশ্চর্য হবেন না। এই হৈ-হট্টগোলের

মধ্যে গভীর নিদ্রার প্রবল নাসিকাধ্বনিও শুনতে পাবেন।

সন্ধ্যা থেকে ছোট ছোট দলে বসে যায় গানের আসর উৎসব স্থানের বিস্তৃত এলাকা জুড়ে। সর্বত্রই। কোনটি শুধুমাত্র পুরুষদের। কোনটিতে মেয়েদের ভিড়। আবার কোনটি স্ত্রী পুরুষ মিশ্রিত। পরনে গৈরিক বসন। কণ্ঠি গলায়, কপালে রসকলি, আলুলায়িত কেশ, দুটি আবেশ বিহ্বল চোখ মুদ্রিত করে মিষ্টি গলায় সতী মায়ের ভজন গায় বৈষ্ণবী—

কি হবে উপায় (আমার তবে)
কি হবে উপায়
দিবানিশি আমি যখন ভুলিতেছি তোমায়॥

খঞ্জনী বাজে তালে তালে।

খোলকরতালের সঙ্গে ঝুটি বাঁধা মাথা নেড়ে বৈষ্ণব ধরে আউলের সুর—

মাজ মাজ রাগ রসানে এই চিত দর্পণ।
মনের অনুরাগে, রাগ না হ'লে
হবে না সে-রূপ দরশন॥
ছাড় মনের দুর্বাসনা
কর প্রেমের উপাসনা
ওগো যে রাগেতে ব্রজাঙ্গনা
করেছিল শুদ্ধ প্রেমের আচরণ॥

একতারার এক-তার সুরের ঝঙ্কারে কাঁপে রণরণিয়ে। একলা উদাস বাউল আকাশের পানে মুখ তুলে মনঃশিক্ষার গান ধরে—

ওরে মন, কত আর ভাঁড়াবে নিতি
এ মোর ও মোর করি দিবস যে দেয় পাড়ি
ঘুমেতে পড়িয়ে কাটে রাতি।

এ সমস্ত গান ছাড়াও আরো এক ধরনের গান শোনা যায়। এ গানের শ্রোতারাও বিশেষ এক শ্রেণীর। এরা কোন রকমে হৈ-হুল্লোড় এবং গুলজার করে রাতটি কাটিয়ে দিতে চান। গোল হয়ে আসর জাঁকিয়ে বসেন শ্রোতারা। হ্যারিকেন কিংবা কার্বাইডের আলো জ্বলে। সিংগল রিডের হারমোনিয়ম বাজে। ডুগি তবলায় বোল ওঠে। দুটি আট দশ বছরের ছেলে যাত্রা দলের সখা-সখীর মত সেজে আসরের মাঝখানে এসে গান ধরে ঝাপতালে,

বিয়ে করতে যাবে ঘেঁটু
চড়ে মটোর বাস।
ঘেঁটু বউ আনবে আজ—ইত্যাদি।

আসর থেকে বাহবা ওঠে। নেচে নেচে, ঘুরে ফিরে, বলিহারি ভাই, দেমাক খানু

হিমসাগর

মেলার সদর রাস্তা

কালী মন্দির

খান্ করে দিলি—ইত্যাদি ধ্বনিও শোনা যায়। গাঁজার কলকে ঘোরে এ হাত থেকে ও হাতে। টানের প্রাবল্যে কলকের ওপর হয়ত দপ্ করে জ্বলে ওঠে এক ঝলক আগুন। সে আলোয় এক মুহূর্তের জন্যে চেনা যায় একটি তৈলাক্ত মুখ আর দুটি জবাফুলের মত টকটকে লাল চোখ।

দূষিত বাষ্পের মত এ মেলায় রাত্রে আবির্ভাব হয় আরও এক শ্রেণীর মানুষের। এরা যে সকলেই সমাজের নীচু-স্তরের, তা নয়। গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবী, কর্ডের প্যান্ট আর সিল্কের সার্টের অন্তরালে বিকৃত, রুগ্ন মন লুকোনো তথাকথিত অনেক ভদ্রসন্তানও এ শ্রেণীভুক্ত। এরা এখানে আসেন স্বেচ্ছাচার, উচ্ছৃঙ্খলতা করতে—মজা লুটতে। মেলাস্থানে মদ্য মাংস, পান ভোজন নিষিদ্ধ। এরা এ সমস্ত অনুশাসন মানবার

কোন প্রয়োজন আছে বলেই মনে করেন না। অশ্লীল রসিকতার সঙ্গে সঙ্গে নিঃশেষিত হতে থাকে তাড়ির হাঁড়ি আর কালীমার্কা মদের বোতল। কিছু বলতে গেলেই এরা পকেট থেকে বার করেন চক্‌চকে ছুরি—নয়ত মুখের 'জিওগ্রাফি' পাল্টে দেবার ভয় দেখান।

এদেরই জন্যে কয়েক দল শিকারী মেয়েমানুষ আড্ডা গাড়ে এখানে এসে। বিশ্রী অঙ্গভঙ্গি সহকারে মল বাজিয়ে এরা শিকার খোঁজে মেলার যত্রতত্র। সস্তা পাউডার, স্নো, সেন্ট ইত্যাদির গন্ধে বিষাক্ত হয়ে ওঠে মেলার বাতাস। হুল্লোড় ওঠে মাতালদের আড্ডায়। জড়ানো গলায় শোনা যায়, 'শালী রাই আমার অভিসারে যাচ্ছে।' অনেকগুলো পুরুষ কণ্ঠের হাসির সঙ্গে ওঠে নারী কণ্ঠের খিল্ খিল্ নির্লজ্জ হাসি, সে হাসিতে শিউরে ওঠে এখানকার শান্তি শৃঙ্খলা।

শেষ রাতের দিকে কিছুক্ষণের জন্যে ঝিমিয়ে পড়ে হাস্য কোলাহল, গান-বাজনা। ক্লান্ত গায়ক-গায়িকাদের চোখে ঘুম নেমে আসে। সাধুসন্ন্যাসীদের ধুনি-গুলিও নিবু নিবু হয়ে আসে। মধ্যগগনের চাঁদ হেলে পড়ে পশ্চিম দিগন্তে।

আস্তে আস্তে লাল হয়ে ওঠে পূর্ব আকাশের খানিকটা। পান টুকটুকে লাল। দ্বিগুণ উৎসাহে সাজ সাজ রব পড়ে যায়। শুরু হয় দোল। জলে গোলা রংয়ের প্রচলন নেই এখানে। শুধু আবীর। এ-ওকে আবীর দেয়। ও-একে আবীর দেয়। ভক্তদের সারা দেহ ছেয়ে যায় আবীর গুঁড়োয়। ফাগে ফাগে লাল হয়ে ওঠে দোল-ফাগুন।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই জোর কদমে দোকান-পাটে বেচাকেনা আরম্ভ হয়। হাড়িকুড়ি, মাদুর পাটি, খোলকরতাল, থেলো হুকো, ডাবা হুকো। ধামাচুপড়ির দোকানই বেশী বসে ঘোষপাড়ার মেলায়। এছাড়া চা-খাবার, মণিহারী, মুদিখানা, স্টেশনারী দোকান তো আছেই। কোন সার্কাসওয়ালা মেলায় ঢোকার সদর রাস্তার পাশেই টাঙিয়ে ফেলে তার ছেঁড়া তাঁবু। নানা আওয়াজের মধ্যে কানে আসে কর্কশ লাউডস্পীকারে হিন্দি সিনেমার চটুল গান। সার্কাসের তাঁবুর পাশেই জাঁকিয়ে বসে 'মরণ কুয়া'। খেলা দেখাবার বিরামও নেই—বিশ্রামও নেই। মোটর সাইকেলের ভট্‌ভট্ আওয়াজে কান পাতাই দায় হয়ে ওঠে। নাগরদোলা ঘোরে বনবনিয়ে।

দুপুরের দিকে ভিড় দুর্ভেদ্য হয়ে ওঠে। এক মিনিটের রাস্তাটা পার হতে দশ মিনিট সময় লাগে। ভক্তদের ভিড়ে ডালিমতলা কিংবা সতীমা'র মন্দির দর্শন করতে হয় অনেক দূরে থেকেই। হিম-সাগরের কালো জল পাঁকে ঘুলিয়ে ওঠে স্নানার্থীদের পায়ে পায়ে। স্বেচ্ছাসেবকরা আহার-নিদ্রা ভুলে ছোটাছুটি করে মেলার নিরাপত্তা বজায় রাখতে চেষ্টা করেন। বেচাকেনার তোড়ে দোকানীদের নিঃশ্বাস নেবার অবসর মেলে না।

প্রায় লক্ষাধিক ভক্ত সমাবেশ হয় ঘোষ-পাড়ার এই মেলায়। অবশ্য এ সংখ্যা ক্রম-বর্ধমান। এত অল্প জায়গার মধ্যে এত লোকের জমায়েৎ হয় যেখানে, সেখানে রোগের প্রকোপ হওয়া কিছুমাত্র অস্বাভাবিক নয়। কয়েক বৎসর আগে তাই-ই হত। ডোবা বা ছোটখাটো অপরিচ্ছন্ন পুকুরের জল পান করে ভক্তরা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়তেন। কয়েক বৎসর হল মেলা-স্থানে কয়েকটি টিউব ওয়েল বসানোর জন্য রোগের সংখ্যা একান্তই

কমে গেছে। স্বেচ্ছাসেবকদের আপ্রাণ চেষ্টার ফলে এবার আহতদের সংখ্যা পাঁচের ওপর ওঠে নি, আর যে পাঁচশত শিশু ও মহিলা হারিয়ে যান, তাদের সবাইকেই তাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

দোলের পরও তিন দিন মেলা চলে জোর কদমে। তারপর শুরু হয় ভাঙ্গন। সাত দিন পর্যন্ত কোন রকমে টি'কে থাকে মেলা। ভক্তরা সাধারণত এক-রাত বা তে-রাত কাটিয়ে যান এখানে। তার-পরই ফেরার পালা

হু-হু করে যাত্রী বোঝাই ফিরতি বাস ছোটে কল্যাণীর রাস্তা দিয়ে। ধুলো ওড়ে। বাসে বসেই হয়ত বৈষ্ণবী গান ধরে—

এসে ঘোষপাড়ায়
আমি পড়েছি কি বিষমদায়
মন আমার কেমন হয়েছে লো
ঘরে ফিরে যেতে আর না চায়॥
আমি কারো কথায় কান না দিলেম
গুরুজনে লুকিয়ে এলেম।
এসে ফেরে পড়িলেম
দুলালদাদের চাঁদমুখ হেরে লো।
আমি হলেম পাগলিনী প্রায়॥

চিত্র প্রদর্শনী

সম্প্রতি নয়াদিল্লীতে তিনটি চিত্র প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হইয়াছে। প্রথমটি শ্রীকমল সেনের ব্যক্তিগত প্রদর্শনী, ইহা নিখিল ভারত শিল্প ও চারুকলা সমিতি হলে অনুষ্ঠিত হয়; দ্বিতীয়টি দিল্লী শিল্পীচক্রের সপ্তম বার্ষিক প্রদর্শনী, ইহা ফ্রী ম্যাসনস হলে অনুষ্ঠিত হয় এবং তৃতীয়টি স্থানীয় সারদা উকীল আর্ট স্কুলের অষ্টাবিংশ বার্ষিক প্রদর্শনী, বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সম্মুখে দিল্লীর চীফ কমিশনার শ্রী এ ডি পাণ্ডিত স্কুল ভবনেই ইহার উদ্বোধন করেন।

কমল সেন শিল্পী মহলে সুপরিচিত। ১৯৫৩ সালে শ্রীবরদা উকিলের নেতৃত্বে এদেশের চিত্র ও ভাস্কর্য সম্ভার লইয়া যে শিল্পী প্রতিনিধি দল রুশ দেশে গমন করেন, কমল সেন ছিলেন সেই প্রতিনিধি দলের অন্যতম সভ্য। আফগানিস্থান হইয়া এই প্রতিনিধি দল সর্বপ্রথমে রুশ পরিদর্শন করেন ও পরে পোল্যান্ড, ফ্রান্স ও সুইট-জারল্যান্ড পরিভ্রমণ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিদেশে থাকাকালীন বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন দৃশ্য ও উল্লেখ-যোগ্য স্থানসমূহ কমল সেন স্কেচ করিয়া লন ও পরে সেইগুলি পরিবর্ধিত করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত মাত্র ৩০খানি চিত্র এই প্রদর্শনীতে পেশ করেন। প্রত্যেকটি চিত্রই জল রঙে রচিত এবং আকারে দীর্ঘ।

কমল সেনের রচনাতে দুইটি জিনিস প্রথমেই চোখে পড়ে। প্রথমত তাঁহার দৃষ্টিভঙ্গী। একমাত্র রুশ ব্যতীত অন্যান্য দেশে তিনি বেশী দিন অবস্থান করিতে পারেন নাই। সুতরাং অল্প সময়ের মধ্যে তাঁহাকে তাঁহার নিজস্ব রচনার উপযোগী বিষয়বস্তুর সন্ধান করিতে হইয়াছে এবং সেই সঙ্গে সেইগুলির সুসম্পূর্ণ স্কেচও করিয়া লইতে হইয়াছে। এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, শিল্পী আমাদের দেশেরই কোনোও বিশেষ স্থান বা দৃশ্য রচনা করেন নাই—তিনি ভারতের বাহিরে বিভিন্ন দেশের আপন আপন রূপ ফুটাইবার প্রয়াস পাইয়াছেন। এবং সম্পূর্ণরূপে না হইলেও তাঁহার প্রচেষ্টা যে বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছে, তাহা কয়েকখানি চিত্র দেখিলেই বুঝা যায়। অর্থাৎ কাবুলের কোনো গ্রাম রচনা করিতে গিয়া তিনি যেরূপ সেই দেশেরই বিশিষ্ট আবহাওয়াটুকু প্রকাশিত করিয়াছেন, অপরদিকে আবার 'শরৎ-কালীন লেলিনগ্রাড' রচনাখানির মধ্য দিয়া সেই দেশেরই ঋতুবিশেষের একান্ত নিজস্ব রূপটুকুই ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। দ্বিতীয়ত তাঁহার অঙ্কনরীতি। প্রাথমিক অঙ্কনকার্য তিনি ইম্প্রেশানিস্ট পদ্ধতিতে করিলেও বর্ণব্যবহার কালে তিনি ঠিক সেই রীতি অনুসরণ করেন নাই। বরং কয়েকটি ব্যতীত অধিকাংশ চিত্রের মধ্যেই সামুহিকভাবে এক প্রস্থ বর্ণ আলিম্পন দ্বারাই অঙ্কনকার্য শেষ করিয়াছেন। তদুপরি অসাধারণ পরিচ্ছন্নতার জন্যও

ফুলের বাজার, ক্রাকো (পোল্যান্ড) —কমল সেন

চিত্রগুলি দেখিতে ভাল লাগে। সর্বপ্রথমেই 'আমুদেরিয়া' চিত্রখানি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্বাস্থ্য সমুজ্জ্বল ছোট বালিকা যেমন খেলিবার সময়ে মনের আনন্দে নৃত্যের সুললিত ছন্দে সারা আবেষ্টনী মুখরিত করিয়া তোলে, আমুদেরিয়া নদীধারাটিও যেন ঠিক সেইভাবে শৈল ও উপলখণ্ডের মধ্য দিয়া সর্পিল গতিতে কলকলোচ্ছ্বাসে চতুর্দিক সচকিত করিয়া আপনার মনে সম্মুখের পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। সুললিত বর্ণবিন্যাসের মধ্য দিয়া শিল্পী এই চিত্রে সদ্যগিরিমুক্ত, ক্ষীণকায়া নদীধারার উচ্ছল প্রবাহ অতি সুচারুরূপে প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহার পরেই "প্রভাত, ভলগা ডন ক্যানাল" চোখে পড়ে। সামুহিকভাবে ব্যবহৃত মাত্র দুই একটি বর্ণের মধ্য দিয়া জনমানবহীন নদীতীরের প্রভাতকালীন স্নিগ্ধ ও পবিত্র ভাবটুকু বিশেষভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। অন্যান্য চিত্রের মধ্যে "গুজার গাঁও", "কাবুল", "নগরপ্রাচীর ক্র্যাকো", "পোল্যান্ড" ও "জেনেভা—পুরাতন শহরের রাস্তা" উল্লেখযোগ্য। অপরাপর রচনাগুলির মধ্যে বিশেষ কোনো নূতনত্ব নাই। প্রসঙ্গত এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করি। শিল্পী প্রতিনিধিদলের অন্যান্য সভ্যগণও আপন আপন রুচি অনুযায়ী নানা স্কেচ প্রস্তুত করিয়া থাকিবেন, সুতরাং কেবলমাত্র ভ্রমণ বৃত্তান্তের দিক দিয়াই নহে, চিত্রকলার দিক দিয়াও রসিক জনসাধারণ তাঁহাদের নিকট হইতে অবশ্যই একটি সঙ্ঘবদ্ধ চিত্রপ্রদর্শনীর দাবী করিতে পারেন।

* * *

একাধিক কারণে এই বৎসরের শিল্পীচক্রের প্রদর্শনী উল্লেখযোগ্য। প্রথমত চিত্রমনোনয়নের দিক দিয়া কর্তৃপক্ষগণ নিরপেক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। স্থানীয় কয়েকজন উদীয়মান শিল্পীকে লইয়াই শিল্পীচক্র গঠিত, কিন্তু তথাপি রচনাবৈশিষ্ট্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মাত্র ১২ জন সভ্যের চিত্র প্রদর্শিত করা হয়। দ্বিতীয়ত দুই একটি ব্যতীত সবকয়খানি চিত্রই বিভিন্ন সভ্যের নূতন রচনা। সর্বোপরি অযথা প্রদর্শনীর কলেবর বৃদ্ধি না করিয়া সর্বসমেত ৪২ খানি চিত্র ও আটখানি ভাস্কর্যের নমুনা

মজুর রমণীদল —ভবেশ সান্যাল

প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। তাই অন্যান্য বৎসর অপেক্ষা শিল্পীচক্রের এই প্রদর্শনী অধিক জনপ্রিয়তা লাভ করে।

পরিচিত শিল্পীদের মধ্যে ভবেশ সান্যাল, কানোয়াল কৃষ্ণ, দীনকর কৌশিক, কে এস কুলকার্নি ও অবিনাশ চন্দ্র এবং ভাস্করের মধ্যে ধনরাজ ভগত ও কেবল সোনির নাম উল্লেখযোগ্য। এবং এই সঙ্গে কে সি এরিয়ান-এরও নাম করা প্রয়োজন মনে করি। চিত্রকলাক্ষেত্রে এক হিসাবে নূতন হইলেও তাঁহার দুইটি রচনা সকলেরই চোখে পড়ে। বাস্তবিকপক্ষে নিজস্ব রচনাশৈলী ও বিশিষ্ট আঙ্গিকের জন্য "তৃষ্ণা" ও "দক্ষিণ ভারতীয় অর্কেষ্ট্রা" প্রভৃত প্রশংসা অর্জন করে। দুইটি চিত্রের মধ্য দিয়াই এই তরুণ শিল্পীর মৌলিক চিন্তাধারা ও সুললিত ছন্দবহুল অঙ্কনকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভবেশ সান্যালের দুইখানি চিত্র বিশেষভাবে চোখে পড়ে। প্রথমটি "মজুর রমণীদল" ও দ্বিতীয়টি "প্রতিবাসীদ্বয়"। বিষয়বস্তুর জন্য শিল্পীকে অযথা চিন্তা করিতে হয় নাই। উপরন্তু গৃহের ভিতরে ও বাহিরে যে দৃশ্য আমরা সর্বক্ষণই দেখিয়া থাকি তাহারই মধ্য হইতে তিনি রস আহরণ করিয়াছেন। প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একদল মজুর রমণী বৃত্তাকারে আপনমনে কর্মস্থলের উদ্দেশ্যে চলিয়াছে—এই গতিপথের পশ্চাতে সকলের, এমন কি তাহাদেরও অলক্ষ্যে যে একটি অতি মধুর ও সুললিত সঙ্গীতের মূর্ছনা বাজিয়া উঠে শিল্পী অতিশয় কৌশলের সহিত মাত্র দীর্ঘরেখাবৈচিত্র্য ও সুচিন্তিত বর্ণসমাবেশের মধ্য দিয়া তাহা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। প্রাকৃতিক দৃশ্য রচনার জন্য কানোয়াল কৃষ্ণ সুপরিচিত; "গুম্ফার" মধ্যে তাঁহার অঙ্কনবৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিয়াছেন। প্রতিকৃতির মধ্যে "নরওয়ের জেলে" প্রকাশচাতুর্য ও বর্ণব্যবহার-প্রণালীর জন্য উল্লেখযোগ্য। দীনকর কৌশিকের রচনাগুলি নূতন অঙ্কনরীতির দিক দিয়া "কাশী" ও "মাতা ও শিশু" সর্বপ্রথমেই চোখে পড়ে

—বিশেষ করিয়া দ্বিতীয় রচনাটির বিষয়বস্তু পুরাতন হইলেও সরলতা ও বর্ণনাকৌশল লক্ষণীয়। সুদীর্ঘ, দৃঢ় ও সাবলীল রেখার মধ্য দিয়া বিষয়বস্তুটির ব্যাখ্যা করাই কুলকার্নির বিশেষত্ব। সুতরাং "দুই মূর্তি" ও "কলসী সহ বালিকাদল"—এর মধ্যে তাঁহার নিজস্ব বর্ণনাকৌশলের সন্ধান পাওয়া যায়। ধনরাজ ভগত কৃতী শিল্পী, তাঁহার নূতন রচনার ভিতর দিয়া সর্বদাই একটি চিন্তাশীল মনের পরিচয় পাওয়া যায়। কাগজের মণ্ড (papier mache) মাধ্যমে ঘোড়ার প্রতীকের ভিতর দিয়া তিনি মানব-পরিবারের একটি অচ্ছেদ্য রূপ রচনা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। তবে দুঃখের বিষয়, গঠনকৌশলের দিক দিয়া এই শ্রেণীর মধ্যে সবগুলিই রসোত্তীর্ণ হয় নাই। তবে আকারে ছোট হইলেও চিন্তাধারা, সমন্বয় ও গঠন-কৌশলের দিক দিয়া "অ্যাক্রোব্যাটস" (ঢালাই সীসা) অবশ্য প্রশংসা দাবী করিতে পারে।

অন্যান্য চিত্রের মধ্যে অবিনাশ চন্দ্রের "কোচিনের রাস্তা" ও শ্রীমতী জয়া আপ্পাস্বামীর "স্ত্রী ও শিশু"র নাম করা যাইতে পারে। এতদ্ব্যতীত অন্য দুই একজন শিল্পীর রচনা প্রদর্শনীতে স্থান পাইলেও তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলিবার নাই।

* * *

স্কুলের বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রী রচিত ১১৬খানি চিত্র সারদা উকিল আর্ট স্কুলের অষ্টাবিংশ বার্ষিক প্রদর্শনীতে পেশ করা হয়। দিল্লী তথা সমগ্র উত্তর ভারতে চিত্রকলা প্রচারকল্পে সারদাচরণ উকিল ২৭ বৎসর পূর্বে এখানে এই বিদ্যালয় স্থাপিত করেন এবং তাঁহারই অক্লান্ত চেষ্টা ও পরিশ্রমের ফলে এই কলানিকেতন সমগ্র ভারতের চিত্রকলাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। যে সকল খ্যাতনামা শিল্পী আজ দেশের বিভিন্ন স্থানে আপনাপন কার্যে ব্যাপৃত আছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিয়াছেন। সুতরাং শহরের ক্ষুদ্র অবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত হইলেও চিত্র-কলা মহলে এই বিদ্যালয়টির যথেষ্ট প্রতিপত্তি আছে এবং চিত্ররসিক ব্যক্তি

নবাবী খেলা —শান্তি কাপুর

মাত্রেই ইহার উন্নতি কামনা করেন।

কয়েকজনকে অভিযোগ করিতে শুনিয়াছি যে, এই বিদ্যালয়ে একমাত্র ভারতীয় পদ্ধতিতেই শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। কথাটি সত্য নহে। তবে একথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, প্রাথমিক অঙ্কনধারার ভিত্তিটুকু সুদৃঢ় না করিয়া এখানে তথাকথিত আধুনিক চিত্রধারার ব্যর্থ অনুকরণ করিতে অযথা উৎসাহ দেওয়া হয় না। বিভিন্ন শ্রেণীর বিভিন্ন ছাত্রছাত্রী রচিত চিত্রগুলি বিশেষভাবে লক্ষ্য করিলেই তাহা বুঝা যায়। প্রদর্শনীতে স্টীল লাইফ হইতে আরম্ভ করিয়া ভিতর ও বহির্দৃশ্যের নানা স্কেচ, পৌরাণিক ও আধুনিক বিষয়বস্তুমূলক রচনা ও পাশ্চাত্ত্য পদ্ধতিতে অঙ্কিত একরঙা স্কেচেরও নানা নমুনাদি পেশ করা হয়। এবং শিক্ষার্থিনীর দিক দিয়া বিচার করিলে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি সত্যই প্রশংসা দাবী করিতে পারে। বিশেষ
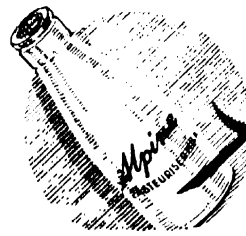
করিয়া তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ভগবানচাঁদ শর্মার তুলিকা-রচিত স্কেচ-গুলি সর্বপ্রথমেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। স্কেচগুলি লক্ষ্য করিলেই এই ছাত্রশিল্পীর অল্পআয়াসকৃত সংক্ষিপ্ত অথচ ব্যঞ্জনা-বহুল রেখাঙ্কন-ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ "লাইফ স্টাডি" ও "শীত"-এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহার পরেই নীলিমা ব্যানার্জির "শ্রীগণেশ" চিত্রখানি চোখে পড়ে। রচনাটিতে অবশ্য যামিনী রায়ের প্রভাব লক্ষিত হয় তথাপি শৈলী ও সুকৌশল টেম্পারা ব্যবহারের ফলে চিত্রখানির মধ্যে একটি স্বাভাবিক ও বর্ণবহুল রূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওয়াশ পদ্ধতিতে রচিত "বৃদ্ধা রমণী" চিত্রটিতে তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী সাবিত্রী কাপুর মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়াছেন।

অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র এস সি মজুমদারের "কেটলী" ও রাম সিং-এর "প্লাশের মধ্যে ফুল", চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী শশী মেহরার ভারতীয় রীতিতে রচিত "গ্রাম্য পথ", তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রী সুষমা শহনের "জনবহুল স্থান" ও জাপানী ছাত্রী মাতোতো রিকোর তৈল রঙে অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্য উল্লেখযোগ্য। —চিত্রপ্রিয়

গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট

গত সপ্তাহে গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফ্‌ট-এর বাৎসরিক প্রদর্শনী এ'দের কলেজ-ভবনে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল। একটি নতুন জিনিস এবার লক্ষ্য করলাম—শহরের চতুর্দিকে এই প্রদর্শনীর বিজ্ঞাপন পোস্টার। কোনও শিল্প-প্রদর্শনীর এই ধরনের পোস্টার মেরে বিজ্ঞাপন এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। যাই হোক, দ্বিধা না করেই বলা যায়, এ'দের ভাস্কর্য এবং মডেলিঙ বিভাগটিই এবারের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ ছিল। অবশ্য ভারতীয় ভাস্কর্য বলতে যে মূর্তি আমাদের মনে ফুটে ওঠে, ঠিক সেই জাতের মূর্তি এখানে একটিও ছিল না। বরং এগুলি হেনরি মুর, জ্যাকব এপস্টীন, জার্দাকিন প্রভৃতি আধুনিক পাশ্চাত্য শিল্পীদের ভাস্কর্যই স্মরণ করিয়ে দেয়। আগেকার দিনে খরিদ্দারের ফরমাশ অনুযায়ী শিল্পীকে কাজ করতে হ'ত এবং সে সময় ধর্মের স্থান ছিল সবার উপর। এই ধর্মের ব্যাখ্যাই ছিল তখনকার শিল্পকর্মের প্রধান বিষয়বস্তু, সুতরাং সেকালের শিল্পীদের চিন্তাধারার মধ্যে একটা মিল বা বন্ধন ছিল। ক্রমশ সে যুগ পাল্টালো। জনসাধারণের সঙ্গে শিল্পীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। শিল্পীদের পরস্পরের মধ্যেও সে বন্ধন আর রইল না। এককভাবে তাঁরা স্বকীয় চিন্তা-জগতে বিচরণ করতে লাগলেন, ফলে শিল্পধারা অদলবদল হতে হতে শেষে হয়ে দাঁড়ালো একেবারে শিল্পীর ব্যক্তি-মানসের প্রতিফলন। এ জাতের শিল্প-সৃষ্টির পেছনে কলা-দক্ষতা হল গৌণ, শিল্পীর ব্যক্তিত্বটাই মুখ্য। সাধারণ দর্শকের পক্ষে এই আধুনিক কলার রস গ্রহণ করা খুব দুরূহ ব্যাপার, সেকথা বলাই বাহুল্য। অধ্যাপক প্রদোষ দাশগুপ্তের শিক্ষাধীনে থেকে ছাত্রগণ যেসব মূর্তি সৃষ্টি করেছেন, সেগুলি আধুনিক শিল্পের নিদর্শন হিসেবে চমকপ্রদ বটে, কিন্তু সাধারণ দর্শকের কাছে সত্যিই বিভ্রমকারী। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের মতন এখানে বাণীর থেকে টেকনিকটাই বড়। কয়েকটি রচনায় আদিম (primitive) শিল্পের সাদৃশ্য আনা হয়েছে, যে সাদৃশ্য হেনরি মুর-এর ভাস্কর্যে খুব লক্ষ্য করা যায়। এ'দের মধ্যে সমরেশ চৌধুরী, সর্বরী রায়চৌধুরী, রঘুনাথ সিংহ, সুবল সাহা এবং মাধব ভট্টাচার্য যথার্থই প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন।

পাশ্চাত্য ঢঙে আঁকা ছবিগুলির মধ্যে অরুণ বসুর ছবিগুলিই স্বতন্ত্রভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এগুলিকে বর্ণ ব্যবহার চাতুর্যের উৎকৃষ্ট নমুনা বলা যেতে পারে। এ'র ব্যাক এনট্রেন্স ছবিটির আবেদন অন্য দুটির থেকে বেশী! দু-চারটি ভালো ছবি থাকলেও সমগ্রভাবে এই বিভাগটির মান খুব উন্নত শ্রেণীর বলা যায় না। অত্যন্ত একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর। বেশীরভাগ ছবিকেই নিম্ন দ্বিতীয় শ্রেণীর পর্যায়ে ফেলা যায়। অতি-সাধারণ ছবির ভিড়ের মধ্যে থাকায় ভালো ছবিগুলি খুব ভালো হয়ে উঠেছে। শ্রীমতী সুনন্দা গুহ নিয়োগী তাঁর 'জাস্ট লেফ্‌ট' ছবিতে সদ্য-পরিত্যক্ত ঘরের আবহাওয়া চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন। এ'র দি 'উইনডো' ছবিটিও রসোত্তীর্ণ হয়েছে। এ ছাড়া শিবেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'দি মোশন', সনৎ করের 'ডার্টি স্পেস' উমাপদ সেনের 'অ্যাক্কসন', বিমলচন্দ্র সিংহের 'বিশ্ব-বাবা' এবং সুধাংশু দাশের 'টয়লেট' উল্লেখযোগ্য। জল-রঙে মোহন পাল এবং অজয় চট্টোপাধ্যায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছেন, অবশ্যই স্বীকার করি।

বিজ্ঞাপন শিল্পের মানও খুব উন্নত বলা যায় না। ছাত্ররা সবচেয়ে দুর্বল ক্যালিগ্রাফীতে। লে-আউট ভারসাম্য পূর্ণ হলেও দুর্বল লেটারিঙ-এর ফলে বেশীরভাগ কাজই নষ্ট হয়ে গেছে। বিজ্ঞাপন শিল্পে যা সবচেয়ে বেশী দরকার—নিখুঁত অ্যানাটমির জ্ঞান, সেটির অভাবও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। কয়েকটি রঙীন প্রাচীর চিত্র এবং দেয়াল-পঞ্জী বেশ চোখে ধরে। স্ক্রেপার বোর্ড অনুশীলন যা দু-একটি প্রদর্শিত হয়েছে, সেগুলি অত্যন্ত কাঁচা ধরনের। বোঝা গেলে, 'এয়ার ব্রাশ', 'স্ক্রেপার বোর্ড' প্রভৃতি ব্যবহারিক শিল্পের বিশেষ টেকনিকগুলি যত্নসহকারে শিক্ষাদানের কোনও ব্যবস্থা নেই। কিন্তু এইসব টেকনিকগুলি আজকাল অত্যন্ত আবশ্যক। বিজ্ঞাপন শিল্পে অধুনা নানান টেকনিক-এর ফটোগ্রাফও ব্যবহৃত হচ্ছে, সুতরাং ফটোগ্রাফী সম্বন্ধেও ছাত্রদের কিছু কিছু শিক্ষাদান করা উচিত। যাই হোক, যাঁদের কাজ বেশ উচ্চাঙ্গের মনে হল তাঁরা হলেন, বিমানেশ রায়চৌধুরী, মাখনচন্দ্র দাশ, সুনীল ভৌমিক এবং শঙ্কর নন্দী।

ভারতীয় অঙ্কন রীতির ছাত্রগণ বাস্তবিক সুকুমার নিদর্শন কিছু দেখাতে পারেন নি। কারুকলা বিভাগটি পূর্ণাবস্থায় এখনও পৌঁছায় নি; তা হলেও সিরামিক-এর কাজগুলি মন্দ লাগলো না। অবশ্য 'অ্যামেচারিশ' ভাব কিছুটা থেকে গেছে। বাতিক নিদর্শন-গুলিতে রঙের বৈচিত্র্য খুব লক্ষ্য করা গেল না। চামড়া ও বয়নকর্মের নিদর্শন-গুলি খুবই সাধারণ শ্রেণীর। —চিত্রগ্রীব

হাইড্রোজেন বোমার তাৎপর্য

সম্প্রতি বি বি সি-এর লণ্ডন ফোরাম থেকে হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে এক আলোচনা প্রচারিত হয়। ঐ আলোচনা বৈঠকে যোগ দিয়েছিলেন বার্ট্রাণ্ড রাসেল, আইভান ক্রাউলি এবং সিরিল ফল্‌স্‌। উইলিয়াম ক্লার্ক বৈঠকটি পরিচালনা করেছিলেন। আলোচনার বিষয় ছিল, "যুদ্ধ-কৌশল হিসেবে এবং বিশ্বের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় হাইড্রোজেন বোমার তাৎপর্য।" সেই আলোচনার স্বচ্ছন্দ অনুবাদ এখানে প্রকাশিত হল।

ক্লার্ক। এই বৈঠকে আজকের দিনের সেটি সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, হাইড্রোজেন বোমা, তাই নিয়েই আমাদের আলোচনা শুরু হবে। এখানে, আমাদের সামনে যে তিনজন আজ উপস্থিত আছেন, তাঁদের প্রত্যেকেরই এই সমস্যা সম্পর্কে একটা বিশেষ আগ্রহ আছে। দার্শনিক ও অঙ্কশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বার্ট্রাণ্ড রাসেল আজ এখানে আছেন। নৈতিক এবং রাজনৈতিক সমস্যাদির উপর তাঁর যে সমস্ত রচনা প্রকাশিত হয়েছে বা এই সম্পর্কে তাঁর যে সব বক্তৃতা বেতারে প্রচারিত হয়েছে, সে সবের সঙ্গে আশা করি আপনাদের সকলেরই পরিচয় আছে। সিরিল ফল্‌স্‌ হচ্ছেন একজন প্রখ্যাত সামরিক ভাষ্যকার। সেদিন পর্যন্তও ইনি অক্সফোর্ডে, সামরিক ইতিহাস বিভাগে চিচেল অধ্যাপকের পদে ছিলেন। আর আইভান ক্রাউলি ১৯৫০-৫১ সালে শ্রমিক সরকারের আমলে বিমান দপ্তরের পার্লামেণ্টারী আণ্ডার সেক্রেটারী ছিলেন। আচ্ছা, এবার আমরা আলোচনা আরম্ভ করছি, হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে। বিশেষ করে বৃটিশ সমরকৌশলে এবং আমাদের রাজনৈতিক চিন্তাধারায় এর তাৎপর্য কী, তাই আলোচনা করব। বেশ, তাহলে ফল্‌স্‌, প্রতিরক্ষার উপর সম্প্রতি যে বার্ষিক বিবরণী, হোয়াইট পেপারের কথা বলছি, বেরিয়েছে, তার মধ্যে কোন্‌ বিষয়টি আপনার সব থেকে জরুরী বলে মনে হয়েছে?

ফল্‌স্‌। আমার মনে হয়—যদিও জানিনে এইটেই সব থেকে জরুরী কিনা—আমরা যে হাইড্রোজেন বোমা বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেইটে। কারণ আজকের দিনের যুদ্ধে এটাকে আমরা সব থেকে প্রয়োজনীয় বস্তু বলে মনে করছি।

ক্লার্ক। ক্রাউলি, আপনারও কি সেই মত?

ক্রাউলি। হ্যাঁ, বৃটিশ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে আমার মনে হয়, এইটেই সব থেকে জরুরী। কারণ দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা পুরনো ধরনের যে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তুলেছি তার কোন মূল্য আছে কি না এটা সেই প্রশ্নই তুলে ধরেছে। এখন আমরা তার এমন একটা বিকল্প পেয়েছি, যা আমার ধারণা, পুরনো ব্যবস্থাকে একেবারে বানচাল করে দিতে পারে।

ক্লার্ক। এ সম্পর্কে আপনি কি বলেন, রাসেল?

রাসেল। হ্যাঁ, হাইড্রোজেন বোমা যে সব থেকে শক্তিশালী অস্ত্র সে বিষয়ে আমি একমত। আর আপনি যদি নিজেকে প্রধান শক্তিমানদের একজন হিসেবে গণ্য করতে চান, তবে আপনাকে হাইড্রোজেন বোমার অধিকারীও হতে হবে। কিন্তু এর ফলে আমাদের নিরাপত্তা রক্ষা হবে কিনা, সেইটেই হ'ল প্রশ্ন।

ক্লার্ক। হোয়াইট পেপারের বিবরণীতে যে জিনিসটা বিশেষ করে আমার চোখে পড়েছে তা হচ্ছে, কোনো যুদ্ধ বাধলেই তাতে পরমাণবিক অস্ত্রশস্ত্র মানে আণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা ইত্যাদি ব্যবহৃত হবেই। ক্রাউলি, আপনি কি মনে করেন যে এই সিদ্ধান্ত একান্তই প্রয়োজনীয়?

ক্রাউলি। আমার তো তাই ভাবা উচিত। আমার তো মনে হয় এটা একটা—একটা আস্থার প্রশ্ন। বর্তমানে অবস্থা যা দাঁড়িয়েছে তাতে আমার তো মনে হয় না যে উভয় পক্ষকেই খুশি করতে পারে এমন কোনো চুক্তি আপনি করতে পারবেন। কাজেই আপনাকে ধরে নিতেই হবে যে এটা ব্যবহৃত হবে।

ফল্‌স্‌। আমার মনে হয়, এটা ব্যবহৃত হতে পারে শুধু এই ধারণাটুকুই আপনি করতে পারেন কিন্তু এটা যে অবশ্য অবশ্যই ব্যবহৃত হবে এমন কথা নিশ্চয় করে বলতে পারেন বলে আমি মনে করিনে।

রাসেল। মহাযুদ্ধ একটা বাধলেই যে ওগুলো ব্যবহার করা হবে তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। যুদ্ধ জেতার এমন একটা মোক্ষম অস্ত্র হাতে পেয়েও উভয় পক্ষ যুদ্ধের সময় তা ব্যবহার না করে ছেড়ে দেবে, এ আমার মনে হয় না।

ক্রাউলি। হুঁ, আমরা যে সে সব যুদ্ধের পরিণাম দেখতে আরম্ভ করছিনে, সেইটেই আমার অবাক লাগছে। গোটা দুনিয়াই এখন মোটামুটিভাবে বিভক্ত হয়ে গেছে। আমার মনে হয়, আমরা সবাই এ বিষয়ে একমত যে ইওরোপের যে-কোনো দিকে আক্রমণ শুরু হলেই আমরা বিশ্ব যুদ্ধে জড়িত হয়ে পড়ব। এশিয়ায় এখনো হয়ত গোটা কয়েক দেশ থেকে থাকবে যাদের উপর আক্রমণ হলে এই উভয় শিবিরের কোনো পক্ষ হয়ত তাদের পক্ষ নেবার জন্য ততটা কোমর বেঁধে দাঁড়াবে না। কিন্তু আমার ধারণা তেমন সব দেশের সংখ্যা কমে আসছে। ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস ভবিষ্যতে ছোটখাট যুদ্ধ বাধবার সম্ভাবনা খুবই কমে আসছে।

ক্লার্ক। আমি এমনও বলতে শুনেছি যে, রাশিয়ার কম্যুনিস্ট ব্লক বা চীনের

থেকে আমাদের জনশক্তি কম, তাই আণবিক অস্ত্র তৈরী করে সেই ঘাটতি পূরিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করতে হবে। এ যুক্তির কতটুকু বিশ্বাস করা চলে, আমি তাই ভাবছি।

ফল্‌স্‌। এটা বিশ্বাসযোগ্য যুক্তি। কম্যুনিস্টদের সৈন্যবাহিনী বিরাট। চিরাচরিত প্রথায় ওদের সুসজ্জিত স্থলবাহিনী নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখবার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা আণবিক অস্ত্রে ওদের থেকে এগিয়ে আছি বলে বিশ্বাস করবার যথেষ্ট কারণ আমাদের আছে। এতে একটা ভারসাম্য রক্ষিত হতেও পারে। অপরপক্ষে সেগুলো যদি প্রয়োগ করা হয় তাহলে—তার ফলাফলে, আণবিক বোমা যে প্রয়োগ করা হবে না একথা কেউ বলতে পারে না।

ক্লার্ক। হাইড্রোজেন বোমা।

ফল্‌স্‌। হ্যাঁ, হাইড্রোজেন বোমা। যুদ্ধটাকে যে শুধু আণবিক অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহারের মধ্যেই সীমিত করে রাখা যাবে এমন আশা কেউ করতে পারে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় এইটেই—এখানেই গভীর সন্দেহ রয়ে গেছে।

ক্রাউলি। সমরকৌশলের দিক থেকে দেখতে গেলে ও প্রশ্ন অবান্তর। আমি ভাবছি খরচের কথা। আর এত খরচ করে কি পাব সেটাও ভাবছি। আমরা যদি যে কোন পরিমাণ হাইড্রোজেন বোমা তৈরী করতে পারি তাহলে হয়ত তা কাজে আসতেও পারে। কিন্তু আমরা তা পারব কিনা, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমরা এখন এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছি যে, এসব জিনিস তৈরী করতে বিরাট অর্থ আর প্রচুর তোড়জোড় লাগে। কাজেই আমাদের সামনে এখন বাছাই-এর প্রশ্ন এসে পড়েছে। প্রতিরক্ষা দপ্তরও এই প্রশ্নের সম্মুখীন হয়েছেন ব'লে আমার মনে হচ্ছে। এমতাবস্থায় আমার জবাব হচ্ছে, যদি আণবিক অস্ত্রশস্ত্র আদৌ বানাতে হয়, তবে সব থেকে শক্তিশালী আর সবার থেকে সেরা জিনিসই বানাতে হবে।

ক্লার্ক। বৃটিশ সরকার গ্রেট বৃটেনের সৈন্যদের ব্যবহারের জন্য এই যে হাইড্রোজেন বোমা বানাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এটা কি সমীচীন হয়েছে, রাসেল?

রাসেল। এই বিষয়ে কথা বলবার যোগ্যতা আমার আছে ব'লে আমি মনে করিনে। এসব বিষয়ে বিস্তৃতভাবে তর্ক করতে গেলে আমি অসুবিধেয় পড়ে যাই। যদি হাইড্রোজেন বোমা নিয়ে কোন যুদ্ধ বাঁধে তো আমার মনে হয়, আমরা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাব। কাজেই আমাদের হাইড্রোজেন বোমা থাকায় আর না থাকায় খুব বেশী তফাৎ কিছু হচ্ছে না।

ক্লার্ক। ফল্‌স্‌, হাইড্রোজেন বোমার বিরুদ্ধে বৃটেনের কোন প্রতিরোধ নেই, আপনি কি এ মত সমর্থন করেন?

ফল্‌স্‌। আমার মনে হয়, যেটুকুও আছে তা অতি নগণ্য।

ক্রাউলি। দুজন বক্তা যা বললেন তার থেকে আমার মনে হয়েছে, এদেশে যদি হাইড্রোজেন বোমার যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে অন্যান্য সব দেশের চেয়ে এর অবস্থাই হবে সব থেকে খারাপ। একসঙ্গে সবাই ধ্বংস হয়ে যাব বলে আমার মনে হয় না। মানে, ধরুন লন্ডনে যদি সত্যিই হাইড্রোজেন বোমা পড়ে আর তার ফলে ব্রিস্টলের জানালা দরজা ভাঙে তো এই দুটো জায়গার মাঝখানে যে সব জায়গা আছে সেখানকার ধনসম্পত্তি ও লোকজনদের একটা মোটা অংশকে—তেজষ্ক্রিয় ভস্ম ইত্যাদি পড়লেও, বাঁচান যাবে বলে আমি মনে করি। তবে একথাও ঠিক, সমরকৌশলের দিক থেকে জিতুক বা হারুক, এদেশ নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে।

ক্লার্ক। বৃটেন উত্তর অতলান্তিক চুক্তি সংস্থার একজন সদস্য। তার উপর সে আবার যুক্তরাজ্যের ঘনিষ্ঠ সুহৃদ। এর পরেও কি বৃটেনের হাইড্রোজেন বোমা তৈরীর কোন সার্থকতা আছে? আমার মতটা তাহলে বলি। আমি বলি, কোনই সার্থকতা নেই। কারণ, তেমন তেমন কোন যুদ্ধ বাধলে বা কোন রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হলে আমেরিকার গুদাম থেকে এই মারণাস্ত্র সরবরাহ করা হবে না, এমন কথা আমি ভাবতেই পারিনে। আর কার্যক্ষেত্রে ক্ষুদে ক্ষুদে বৃটিশ বোমার চেয়ে আমেরিকান বোমাই কেল্লা ফতে করবে।

ক্রাউলি। কিন্তু আমি তো এ বোমা তৈরীর সার্থকতা দেখি। অবশ্যি সেটা কিছুটা টেকনিক্যাল। আর এর গুরুত্ব নির্ভর করছে, কি ধরনের হাইড্রোজেন বোমা সম্পর্কে আমরা আলোচনা করছি তার উপর। এমন কয়েক ধরনের হাইড্রোজেন বোমা থাকতে পারে, যেগুলি কোবাল্ট দিয়ে মোড়া, আমার ধারণা, সমগ্র বিশ্বের উপর সেইগুলিরই কেবল প্রতিক্রিয়া হতে পারে।

ক্লার্ক। সমগ্র বিশ্বের উপর প্রতিক্রিয়া বলতে কি বোঝায়, ক্রাউলি?

ক্রাউলি। এই ধরুন, তেজষ্ক্রিয়তার দ্বারা সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল। মানব জাতির বেশী অংশই ধ্বংস হয়ে গেল। এখন তা যদি হয়—এমন বিস্ফোরক যে নেই, সেকথা আমি বলতে পারিনে, আমার ধারণা তা আছে—তবে সব থেকে শক্তিশালী বিস্ফোরকের দ্বারাই আমাদের ধ্বংস হবার সম্ভাবনা। এখন সে মোক্ষম অস্ত্রটি আমাদের হাতেই থাক বা আমেরিকার কাছেই থাক, তাতে যে কিছু আসে যায় না, সে কথা আমিও স্বীকার করি। কিন্তু এই ধরনের বোমার কথা ছেড়ে দিলে—এখনও পর্যন্ত এমন বোমা তৈরী হয়েছে বলে আমি জানিনে, লর্ড রাসেল হয়ত আমার ভুল সংশোধন করে দিতে পারেন—তবে এই ধরনের বোমা তৈরী হবার সম্ভাবনা আছে। সাধারণ হাইড্রোজেন বোমার কথা ধরুন। এমন বোমা যা ফাটলে ১০-২০ মাইলব্যাপী জায়গা বিধ্বস্ত হতে পারে। তাহলেই দেখুন, সেটা কোথায় পড়বে, সেটা একটা ভাববার বিষয় হয়ে দাঁড়াল। আর এইখানেই আমাদের দেশের স্বার্থ আর আমেরিকার স্বার্থ একেবারে আলাদা হয়ে গেল। আমরা যাতে দলিত মথিত না হয়ে পড়ি, প্রথমেই আমরা তার ব্যবস্থা করতে যাব। আর তা করতে গিয়ে আমরা হয়ত চাইব, ইওরোপের যেখানে রাশিয়ানরা সমরসম্ভার জড় করেছে তার উপরে বোমা ফেলতে। কিন্তু আমেরিকানরা হয়ত তখন চাইবে ইউক্রেনের পিছনে যে সব রুশ শিল্প আছে তার উপর বোমা ফেলতে। এখন এমনও হতে পারে, কোথায় প্রথম বোমা ফেলা হবে তার উপরেই আমাদের বাঁচা মরা নির্ভর করছে।

ক্লার্ক। আমেরিকানদের হাতে আর রাশিয়ানদের হাতে হাইড্রোজেন বোমা থাকায় দুটো প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। একটা হচ্ছে, যেট আমি প্রথমেই তুলছি, এর ফলে দুপক্ষের ক্ষমতার ভারসাম্য বা এদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কের কতটা বদলেছে? হাইড্রোজেন বোমা বিশ্ব রাজনীতিতেই বা কতদূর পরিবর্তন ঘটিয়েছে?

রাসেল। ক্ষমতার ভারসাম্যের খুব একটা কিছু অদল বদল হয়েছে বলে মনে হচ্ছে কি? আমি তো কিছু দেখছি নে। ভারসাম্য যেমন ছিল প্রায় সেই রকমই আছে। যদি কিছু বদলে থাকে তা হচ্ছে যুদ্ধ জেতার চিরাচরিত সম্ভাবনা। আমার তো মনে হয় এইটেই শুধু বদলেছে।

ক্লার্ক। ক্রাউলি, আপনার কি মনে হয়, একথাটা ওয়াশিংটন আর মস্কো উভয়েই জানে?

ক্রাউলি। মস্কো হয়ত জানতেও পারে, তবে চীন এটা জানে কিনা সন্দেহ। সারা পৃথিবীতে কি ঘটছে সে সম্পর্কে অজ্ঞতা চীনা শাসকদের পরিমাণহীন। আমার তো এ-ও সন্দেহ যে, হাইড্রোজেন বোমার পরিণামফল সম্পর্কেও ওদের কোন ধারণা আছে কিনা।

ক্লার্ক। আরেকটা প্রশ্ন হচ্ছে, হাইড্রোজেন বোমা স্থানীয় যুদ্ধের সম্ভাবনাকে কতদূর কমিয়ে এনেছে? ক্রাউলি আগেই বলেছেন, স্থানীয় যুদ্ধমাত্রই এখন বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে বলে তিনি মনে করেন। নতুন কোরিয়া বা নতুন ইন্দোচীনের উদ্ভব আর যাতে না হয়, এমন কোন পন্থা কি আবিষ্কৃত হয়েছে বলে আপনি মনে করেন?

ক্রাউলি। আমি মনে করি, বিশ্বে আজ সে জায়গা প্রায় নেই বললেই চলে, যেখানে যুদ্ধ বাধলে দুপক্ষের কেউ হাত গুটিয়ে বসে থাকবে। চীনের ব্যাপারটাই দেখুন না। রাশিয়া ঘোষণা করেছে, সর্বস্ব পণ করেও সে চীনকে সাহায্য করবে। কিম্বা ধরুন, আজ যদি ভিয়েৎ-মিনের কম্যুনিস্টরা শ্যামকে আক্রমণ করে, তখন কি ওখানে যা হচ্ছে হোকগে বলে আমরা হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারব? এখন এটা একটা আদর্শের ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গেছে।

রাসেল। এশিয়ার যুদ্ধের ব্যাপারে আমি কিন্তু কথাটা মানতে পারলাম না। আমার ধারনা, এশিয়ায় ছোটখাট যুদ্ধ এখনও কয়েকটা ঘটতে পারে যার ফলে কম্যুনিস্টদের সুবিধে হলেও, আর তা হবে বলেই আমি মনে করি, তা বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হবে না। এখনও তেমন সম্ভাবনা আছে বলেই আমার বিশ্বাস। এটা যে ধ্রুব, তা বলিনে, তবে এখনও কিছুকাল সে সম্ভাবনা আছে বলেই মনে হয়।

ক্লার্ক। ক্রাউলি, আপনি কি বলেন? ঐসব কারণে যে স্থানীয় যুদ্ধ হবে, আমরা কি তাতেই অংশ গ্রহণ করব অথবা ঐগুলো এলোমেলোভাবে গড়াতে গড়াতে বিশ্বযুদ্ধে পরিণত হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করব?

ক্রাউলি। এই ব্যাপারে মনস্থির করতে আমরা পেরে উঠছিনে। আমার মনে হয়, আমাদের সেইটেই বড় অসুবিধে। পৃথিবীর কোন কোন অংশে যাতে সহনশীলতার উন্মেষ হতে পারে, আমার তো মনে হয়, যে দেশে গণতন্ত্র আছে একমাত্র সেই দেশেই ওটার উন্মেষ সম্ভব —সেই সেই অংশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মৃত্যু বরণ করা কি আমরা শ্রেয় বলে মনে করি, না করিনে? গত ত্রিশ দশকেও, হিটলারকে নিয়ে আমাদেরকে এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছিল। একটার পর একটা অঞ্চল অন্যের কুক্ষিগত হচ্ছে দেখেও আপনি অপেক্ষা করছেন, শেষ পর্যন্ত এমনিভাবেই যুদ্ধ যখন এগুতে এগুতে আপনার দরজার গোড়ায় এসে দাঁড়াবে, তখন অবস্থা যে একেবারে শোচনীয় হয়ে দাঁড়াবে। আর আমার ভয় হয় যে, এশিয়াতে এমন অবস্থাই আজ হয়ে উঠেছে। যদি এই ধোকরমারা অবস্থা আরও কিছুদিন ধরে চলতে থাকে, যদি ভারত এইভাবে ধীরে ধীরে কম্যুনিস্ট শক্তিগুলো দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ে, তবে তার থেকে চরম অমঙ্গল আর কিছু হতে পারে না। কারণ ভারত গণতন্ত্রের পথে পরীক্ষা চালাচ্ছে আর তার ভবিষ্যৎ আশাপ্রদ বলেই মনে করি। এ অবস্থায় আমি এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজী আছি।

রাসেল। এই বিষয়ে পরিস্কার করে ভাবা উচিত। আবার পরিষ্কার করে ভাবাও খুব সহজ নয়। কারণ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যগুলো আমাদের জানা নেই। হাইড্রোজেন বোমা যুদ্ধের পরিণাম কি হতে পারে, আমরা তাও জানিনে। একদল বিশেষজ্ঞ বলছেন, মনুষ্যজাতিই হয়ত নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। তাদের কথাই অভ্রান্ত কিনা জানিনে তবে তাঁরা এমন লোক যে, তাঁদের উপর আমাদের শ্রদ্ধা

আছে। এই যুদ্ধের পরিণাম যদি মনুষ্যজাতির নিশ্চিহ্ন হওয়া তবে আমি বলি থাক, আর যুদ্ধে কাজ নেই, এমন কি কম্যুনিস্টদের সঙ্গেও যুদ্ধ করে দরকার নেই। আমার তো মনে হয়, কম্যুনিস্টরাও যদি একথা বুঝতে পারে তবে তারাও আর আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চাইবে না। যুদ্ধের পরিণাম যদি এই হয়, কি এর কাছাকাছিও হয় তবে আমার ধারণা, দুপক্ষই বুঝতে সমর্থ হবে যে, আর একটা বিশ্বযুদ্ধ ঘটিয়ে কারোর উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হবে না।

ক্লার্ক। আমরা যাকে জয় বলি তার থেকে কেউ যে লাভবান হবেন না, সে বিষয়ে আমরা যাঁরা আজ এখানে এসেছি, তাঁরা নিশ্চয়ই একমত হবে। কেননা, আরেকটি যুদ্ধ সমগ্র পৃথিবীকেই ধ্বংস করবে, সমগ্র মানবজাতিকেই বিলুপ্ত করে দেবে। যদি সত্যিই আমরা একথা বিশ্বাস করি, তবে এর থেকে পরিত্রাণের কোন সম্ভাবনা আছে কি?

রাসেল। এখনও সম্ভাবনা আছে। এখনও কিছু করা যায়। কোন এক বা একাধিক নিরপেক্ষ রাষ্ট্র যদি এই যুদ্ধলোলুপদের বোঝাতে পারে, দ্যাখ, সমরসম্ভারের যত প্রাচুর্যই তোমার থাক, যত শ্রেষ্ঠ বাহিনীই তোমার থাক, এই যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল হচ্ছে ধ্বংস। পরাজয়। মান, গর্ব বিসর্জন দিয়ে দুপক্ষ কোন চুক্তিতে প্রথমে হয়ত আসতে চাইবে না। তবে যে যেমন আছে আপাতত সে তেমনই থাকুক, এই অবস্থায় আসতে কেউ গররাজী হবে না। এইটেই হবে সূচনা। তারপর ধীরে ধীরে এগুতে হবে ফয়সালার দিকে।

ক্লার্ক। কোন দেশ আপনার মতে মধ্যস্থ হতে পারে?

রাসেল। কেন, ভারত।

ক্রাউলি। কোন নিরপেক্ষ শক্তি, বিশেষ করে ভারত যদি এর সমাধান করতে পারে তো আমি কৃতজ্ঞ থাকব। কিন্তু ভয় হয়, এ প্রস্তাব হয়ত কার্যকরী হবে না। রাসেল যে আশা করছেন তার সঙ্গে আমার মতভেদ নেই। কিন্তু তবুও এটা সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। রাসেল বলছেন, মৃত্যুভয়ই এদের যুদ্ধ থেকে প্রতিনিবৃত্ত করবে। কিন্তু আদর্শের জন্য, আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য মৃত্যুবরণ যাদের কাছে শ্রেয়, তাদের কাছে এ প্রস্তাব তো কোন মূল্যই পাবে না। দুই পক্ষই সমান বলবান। দুপক্ষই বিপরীত আদর্শে গোঁড়াভাবে বিশ্বাসী। সে ক্ষেত্রে কিভাবে মধ্যস্থতা সম্ভব?

ক্লার্ক। এখানে আরেকটা কথা আছে, রাসেল। কম্যুনিস্টরা বিশ্বাসই করে না যে, তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মলোটভ বক্তৃতা করলেন, হাইড্রোজেন বোমা পুঁজিবাদী—পচা পুঁজিবাদী জগৎকেই ধ্বংস করবে।

রাসেল। আমি আপনার সঙ্গে একমত। আর সেইজন্যেই নিরপেক্ষ শক্তির কথা বার বার তুলছি। আমার মনে হয়, ভারত খুব সতর্ক হয়ে তদন্ত করতে পারবে। আর ভারত যদি কোন কথা বলে, রাশিয়া আর চীন তা শুনবে।

চক্রদত্ত

ঘড়ি সাধারণত দম দিয়ে চালান হয়, আর তা না হলে বৈদ্যুতিক শক্তির সাহায্যে চালান হয়। এখন কিন্তু এক নতুন ধরনের টেবিল ঘড়ি তৈরি করা হচ্ছে যেটা আলোর সাহায্যে চালান যায়। এরকমভাবে ঘড়িটাকে চালাবার জন্য ঘড়িটার কলকব্জার ওপর কিছুক্ষণ কোন স্বাভাবিক আলো অথবা কৃত্রিম আলো ফেলা যায় তাহলে ঘড়িটা বেশ স্বচ্ছন্দে ২৪ ঘণ্টার মত চলবে। আলো যাতে সহজে ঘড়ির যন্ত্রের ওপর

আলো চালিত ঘড়ি

পড়ে তার জন্য ঘড়ির মাথাটা স্বচ্ছ কাচ দিয়ে ঢাকা থাকে। ঘড়ির ভেতর একটা ছোট ইলেকট্রিক সেল থাকে তার ওপর আলো পড়ার দরুণ সেলটি উত্তেজিত হয়ে ওঠে ফলে ঘড়ির ভেতরে বসান ছোট মোটরটি চলতে থাকে। মোটরটি তখন ঘড়ির স্প্রিংটাকে গুটাতে সাহায্য করে ফলে ঘড়িটা সাধারণ চাবি দেওয়া ঘড়ির মত চলতে থাকে। নিয়ম করে যদি ঘড়িটার ওপর আলো ফেলা যায় —তাহলে ঘড়িটা আর কোন সময় থামবে না এবং সাধারণ ঘড়ির মত চলবে।

*

মঙ্গলগ্রহ নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের আর গবেষণার অন্ত নেই। মঙ্গলগ্রহ যে একটা মৃতগ্রহ নয় এটা প্রায় প্রমাণ হয়ে গেছে। একদল বৈজ্ঞানিক তো ঐ গ্রহে গিয়ে সেখানকার খবরাখবর সংগ্রহের সম্বন্ধে চিন্তা করছেন। আর এর জন্য যে রকেট চালিত যান কাজে লাগান যায় তা নিয়ে রীতিমত গবেষণা চলছে। আর একদল বৈজ্ঞানিক পৃথিবী থেকে বসে দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে এই গ্রহ সম্বন্ধে আরো নতুন তথ্য সংগ্রহ করতে ব্যস্ত। ১৯৫৪ সালে মঙ্গলগ্রহ পৃথিবীর খুব নিকটে আসার দরুণ জ্যোতির্বিদরা এই গ্রহ সম্বন্ধে অনেক খবর সংগ্রহ করতে পেরেছেন। এই সুযোগ হারালে আবার প্রায় ১৩ বছরের জন্য অপেক্ষা করতে হতো—কারণ প্রায় ১৩ বছর বাদে এই গ্রহটি পৃথিবীর কাছে আবার সরে আসবে। ডাঃ সিলিপার এই সময় লাওয়েল মানমন্দিরে বসে প্রায় ২০০০ ছবি তোলেন। এই সব ছবি এবং তার অভিজ্ঞতা থেকে এটা বেশ বুঝতে পারা যায় যে সেখানে সবুজ গাছপালা অন্তত আছে। তাছাড়া সাদা সাদা দাগ, যেটা বরফের চূড়া—বনের চিহ্নও দেখতে পাওয়া গেছে। এবারের যে ছবিগুলো তোলা হয়েছে তাতে অন্তত পরিষ্কারভাবে দুটো খালের চেহারা দেখা গেছে। ডাঃ সিলিপারের মতে মঙ্গলগ্রহে অন্য কোন রকম গাছপালা যদিও না থাকে অন্তত লাইকেন জাতীয় এক রকম শ্যাওলা পাহাড়ের গায়ে পাওয়া যাবে। কিন্তু ডাঃ সিলিপার ঐ গ্রহেতে কোন রকম প্রাণীর অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।

*

আমাদের শরীরে কয়েকটি ছোট ছোট গ্রন্থি আছে, এগুলো শরীরের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। এর মধ্যে একটি হচ্ছে পিটিউটারী গ্রন্থি। আকৃতিতে এটি একটি ছোট মটর দানার মত এবং এটি আমাদের মস্তিষ্কে অবস্থিত। গ্রন্থিটি ছোট হলেও এর কার্যকারিতা খুব বেশী এবং এই গ্রন্থির থেকে যে রস বের হয় যেটাকে হর্মোন বলা হয়, সেটা মানুষের শরীর বৃদ্ধির জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে এই গ্রন্থির রস, শরীর বৃদ্ধি ছাড়া, মানুষের আরো ভাল এবং মন্দতে সাহায্য করে। এটা অবশ্য জানা আছে যে, এর খুব বেশী রস শরীরে হলে মানুষের আকৃতি দৈত্যের মত হয়ে যায় এবং তখন আর সাধারণ মানুষের মত তাকে বাড়তে দেখা যায় না। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে যে এই রস শরীরে বেশী হলে মানুষ বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হয়। তাছাড়া এই রস বেশী জন্মালে মানুষের রক্তের চাপও বেশী হতে দেখা যায়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, যদি কোন প্রাণীকে উপোস করার পর এই হর্মোন শরীরে ঢোকান যায়, তাহলে প্রায় দিনে ½ পাউন্ড করে ওজন কমতে থাকে। আবার যদি এই হর্মোন খুব অল্প পরিমাণে দেওয়া যায়, তাহলে ৫।৬ দিন কোন রকম ওজন কমে না। আর সেই সঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে, উপোস করা সত্ত্বেও প্রাণী বেশ সতেজ এবং প্রাণবন্ত থাকে। এর থেকে অবশ্য এটা বোঝা যায় যে, এই ধরনের হর্মোন প্রাণীকে উপোসের হাত থেকে রক্ষা করতে পারে।—আমাদের শরীরে আর একটা গ্রন্থি হচ্ছে এ্যাড্রিনাল গ্রন্থি। এই গ্রন্থি থেকে করটিজোন নামক এক ধরনের রস পাওয়া যায়। এই করটিজোন পিটিউটারী গ্রন্থির রসের খারাপ ফলটা রুখতে খুব বেশী সাহায্য করে। অবশ্য বহুমূত্র রোগের সময় করটিজোন কোন কাজই করতে পারে না। আবার খুব বেশী পরিমাণে করটিজোন রস জন্মালে তার যে খারাপ ফল হবার সম্ভাবনা থাকে সেটা পিটিউটারী গ্রন্থির রস বন্ধ করে।

ট্রামে-বাসে

দিল্লীতে সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত পুতুল-প্রদর্শনী সম্বন্ধে প্রধানমন্ত্রী শ্রীযুক্ত জওহরলাল উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছেন।—"পুতুল-প্রদর্শনী সন্দর্শনের সৌভাগ্য আমাদের হয়নি; তবে আমরা
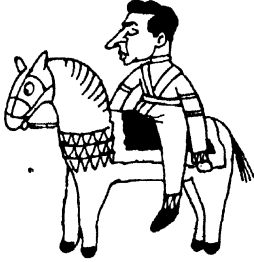
শুনেছি, দিল্লীর পুতুল নাচের কথা। বৃটিশ আমলের পুতুল কংগ্রেস আমলেও শুনেছি জোর নেচে চলেছে"—বলিলেন আমাদের খুড়ো।

* * *

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী মহাশয়ের পরিসংখ্যান সম্বন্ধে কয়েকজন মহিলা ভুল ত্রুটির প্রতি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে শ্রীযুক্ত দেশমুখ নাকি বলিয়াছেন যে, Figure সম্বন্ধে মহিলারা

সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল নহেন। শ্যামলাল মন্তব্য করিল—"কিন্তু আমরা শুনেছি figure সম্বন্ধে মহিলারা বরাবরই সচেতন,—তন্বী হবার সাধনা করে শেষ পর্যন্ত লিক্‌লিকে প্যাকাটি হতে তো অনেককেই দেখেছি"।

* * *

একটি সংবাদে শুনিলাম কলিকাতা হইতে যাদুঘর নাকি দিল্লীতে স্থানান্তরিত করিবার প্রস্তাব চলিতেছে।—"কিন্তু আমরা বলি, কর্তৃপক্ষ বরং দিল্লীর চিড়িয়াখানাটিকে আরো সমৃদ্ধ করার চেষ্টা করুন। তাঁরা নিশ্চয়ই জানেন যে, যাদুঘরের চেয়ে চিড়িয়াখানার সমর্থকের সংখ্যা বেশি"—মন্তব্য করিলেন বিশুখুড়ো।

* * *

বাংলা ও ইংরেজী ভাষায় ছাত্ররা কতটা জ্ঞানলাভ করিয়াছে তার যৎসামান্য প্রমাণ পাওয়া গেল রাণীগঞ্জ হইতে প্রেরিত কয়েকটি ছাত্রের একটি চিঠিতে। সংবাদদাতা বলিতেছেন যে, তারা লিখিয়াছে—প্রশ্নের "ভীতর" অনেক "uminportant" "explaination" আছে, সুতরাং তাহাদিগকে "Grass" না দিলে পাশের আর কোন উপায় নাই। "আর যা হোক তাদের পত্রে একটা "inportant" কথা তারা লিখেছে, সেটা হলো কিছু "Grass"-এর ব্যবস্থা করা। আমরাও এদিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি"—বলিলেন আমাদের এক সহযাত্রী।

* * *

রাঁচির এক সংবাদে প্রকাশ যে, সে অঞ্চলের কোন এক মহিলা নাকি এক সঙ্গে পাঁচটি পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছিলেন। কিন্তু সন্তান ক'টির মৃত্যু হয় জন্মের অব্যবহিত পরেই।—"ভারত পেছনে পড়ে' নেই। Dion quins-এর রেকর্ড প্রায় মেরে এনেছিলাম কিন্তু কাল হলো মৃত্যু। যাই হোক Better luck next time"—বলে আমাদের শ্যামলাল।

* * *

অন্য এক সংবাদে শুনিলাম যে, আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে নাকি প্রজননের উপর তেজষ্ক্রিয়তার মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হওয়ার আশঙ্কা আছে।—"সংবাদটা ছুটোছুটি খেলায় প্রায় বুড়ি ছুঁয়ে ফেলার মতো। এইবারে হয়তো বোমারুরা একটু হুঁশিয়ার হবেন"—বল্লেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

প্রসংগত অন্য এক সংবাদে জানা গেল, ওয়াশিংটনে নাকি "বেবি এটম" বোমা প্রস্তুত করা হইতেছে।—"রাশ্যা সাবালক এটম বোমার দিকে ঝোঁক
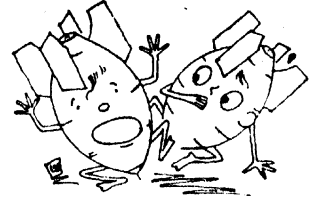
দিয়েছেন কিনা সে সংবাদ এখনো পাওয়া যায়নি; দিয়ে থাকলে ওয়াশিংটনের বেবিদের অন্তত একটু ইঁচড়ে পাকা না করলে কিন্তু চলবে না"—বলে শ্যামলাল।

* * *

পশ্চিমবঙ্গের বিধান সভায় চিকিৎসা খাতে ব্যয় বরাদ্দের ব্যাপারে নাকি বিতর্ক তেমন জোরালো হয় নাই।—"তার একমাত্র কারণ হয়তো এই যে, চিকিৎসার একমাত্র বিকল্প হলো সিন্নিমানৎ। বিরোধী দল আবার দেবতা-ফেবতার উল্লেখ মাত্র হন্যে হয়ে ওঠেন। এদিকে মৃত্যুটা দেবতার হাত দিয়ে আসবে বিশ্বাস না করলেও অন্তত দৈত্যদানার হাত দিয়ে যে আসবেই সে কথা বিশ্বাস করা ছাড়া উপায় নেই। সুতরাং চিকিৎসার ব্যয়বরাদ্দের বিরুদ্ধে তাঁরা কোন কথা বলেন নি"—গবেষণাটা অবশ্য খুড়োর।

* * *

রাশ্যার বিজ্ঞানীরা ঘোষণা করিয়াছেন যে, অতঃপর চার ঘণ্টার মধ্যে নাকি চন্দ্রলোকে গমন মানুষের পক্ষে সম্ভব হইবে।—"কিন্তু গমন না করেও আকাশের চাঁদ কী করে হাতের মুঠোয় পাওয়া যায় সে আব্দার না মেটালে—'আমাদের দাবী মানতে হবে'র মিছিল কখনই ছত্রভঙ্গ হবে না—হবে 'না'"!!

বিজ্ঞান-সাহিত্য

আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তাধারা—সুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশকঃ দুর্গেশনন্দিনী দেবী। ৬২-জি, মহারাজা ঠাকুর রোড, ঢাকুরিয়া, কলিকাতা—৩১। দামঃ তিন টাকা।

বিজ্ঞানের চাবি দিয়ে মানুষ আজ পৃথিবীর সমস্ত রহস্যের মণিকোঠার দরজা খুলে দিচ্ছে। তিন শতক ধরে পশ্চিমী বিজ্ঞান-নায়কেরা মানুষের সঙ্গে পৃথিবীর পরিচয়ের জন্য যে তপশ্চর্যা করে চলেছেন, লেখক সাধারণ পাঠকের জ্ঞাতার্থে তারই কয়েকটি পর্বকে এই গ্রন্থের অন্তর্ভূক্ত করেছেন। আলোর বেগ, আপেক্ষিক তত্ত্ব, শক্তির কণাবাদ, ইথার-কল্পনা প্রভৃতি শিরোনামায় আধুনিক বিজ্ঞানের নানা জটিল বিষয়গুলির ওপর আলোকপাত করেছেন। গাণিতিক সূত্র পরিহার করে এবং পাঠক-বিমুখ করা দুরূহ পরিভাষা বর্জন করে একটি স্বচ্ছন্দ গল্প বলার আনন্দে বিজ্ঞানকে সাধারণ পাঠকের ভোজে পরিবেশন করেছেন। লেখকের ভাষা সুন্দর। এক এক সময় মনে হয়, বৈজ্ঞানিক কোন প্রবন্ধ নয়, একটি রসঘন সাহিত্যের আলোচনা চলছে। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু প্রমুখ কয়েকজন মনীষী ছাড়া বিজ্ঞানকে বাঙলা ভাষার মাধ্যমে উপস্থিত করার আয়াস কেউ গ্রহণ করেননি। সেদিক থেকে 'আধুনিক বিজ্ঞানের চিন্তাধারা' একটি সুস্থ পদক্ষেপ। আমাদের স্পর্শগ্রাহ্য পৃথিবীকে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে জানবার
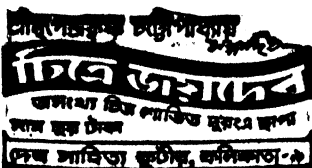
জন্য গ্রন্থখানি অশেষ উপকার করবে। লেখক এজন্য অভিনন্দনযোগ্য। ৬০।৫৫

ঐতিহাসিক তথ্য

EASTERN INTERLUDE: R. Pearson. Thacker Spink & Co. Ltd., 3, Esplanade East, Cal.-1. Price Ten rupees.

এমন একসময় ছিল, ভারতবর্ষের ঐশ্বর্য-সম্ভার প্রতীচ্যের চোখের সামনে যখন একটি কাল্পনিক স্বর্গরাজ্যের চিত্র রচনা করত। কে আগে এই ভারতভূমিতে এসে পদার্পণ করবে, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের মধ্যে তা নিয়ে তখন নিরন্তর প্রতিযোগিতা চলেছে। জলপথে ভারতবর্ষের সঙ্গে পাশ্চাত্ত্য ভূখণ্ডের একটি যোগসূত্র স্থাপিত হবার পর সে-প্রতিযোগিতা দিনে দিনে আরও বৃদ্ধি পেয়েছে মাত্র। বিরোধ এবং সংঘর্ষে কণ্টকিত সেই সন্ধিলগ্নেই ইংরেজ-শক্তির আবির্ভাব। প্রথমে বাণিজ্য, তারপর রাজ্যবিস্তার। ভাগীরথীর তীরবর্তী অখ্যাত একটি পল্লীঅঞ্চল অতঃপর কীভাবে ধীরে ধীরে ইংরেজ রাজশক্তির পীঠস্থান হয়ে উঠল, ভারত-ইতিহাসে তা অত্যন্তই তাৎপর্যময় একটি অধ্যায় হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। আলোচ্য গ্রন্থখানিতে কলকাতা মহানগরীর সেই প্রারম্ভিক বিকাশ এবং কলকাতার য়ুরোপীয় সমাজের তাৎকালিক জীবনযাত্রার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে।

য়ুরোপ থেকে এ-দেশে যাঁরা এসেছিলেন, এখানকার মানুষের সঙ্গে হার্দিক সম্পর্ক স্থাপনের আকাঙ্ক্ষা তাঁদের ছিল না, নিজেদের শোণিত-স্বাতন্ত্র্যকে তাঁরা অক্ষুণ্ণ রাখতেই চেয়েছেন। ভারতবর্ষীয়দের সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব কীরকম ছিল, আপন সমাজ-জীবনেই বা তাঁরা কেমন মানুষ ছিলেন, জানতে আমাদের আগ্রহ হওয়া স্বাভাবিক। প্রাচীন কিছু দলিল-পত্রের সাহায্যে গ্রন্থকার সেই আগ্রহের তৃপ্তি-সাধন করতে প্রয়াস পেয়েছেন। তাঁর এই বিবরণীকে পূর্ণাঙ্গ বলতে পারলে সুখী হতাম, মনোজ্ঞ বলতে না পেরে দুঃখিত বোধ করছি। তবে তাঁর ধৈর্য, উদ্যম এবং নিষ্ঠা যে অকুণ্ঠ প্রশংসার যোগ্য, তাতে সন্দেহ নাই। প্রাচীন কয়েকটি চিত্রের প্রতিলিপি যুক্ত হওয়ায় গ্রন্থখানির আকর্ষণ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

৫৫১।৫৪

চীনের কলাশিল্প

চীনা শিল্পের কথা: প্রভাতকুমার দত্ত। প্রকাশকঃ ক্যালকাটা বুক ক্লাব লিমিটেড,
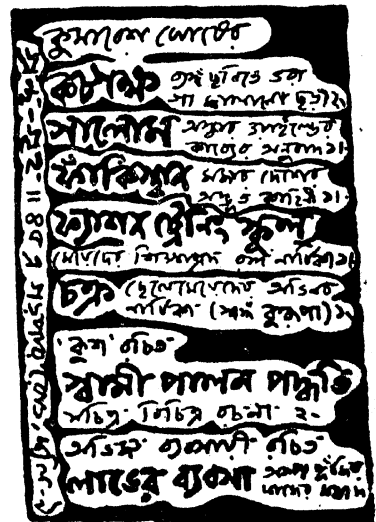
৮৯, হ্যারিসন রোড, কলিকাতা। মূল্যঃ দু' টাকা।

চীনা শিল্পের বৈশিষ্ট্য, চিত্রকলা, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প, ব্রোঞ্জ ও অন্যান্য শিল্প, কাঠ খোদাই এবং লিথোগ্রাফ এই আটটি বিভাগে ভাগ ক'রে চৈনিক কলার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এই ছোট্ট পুস্তকে সূক্ষ্মতর বিভক্তি সম্ভব নয় সেই কারণে চৈনিক শিল্পের বহুবিধত্বকে এই ক'টি বিভাগেই সীমাবদ্ধ রাখতে লেখক বাধ্য হয়েছেন। "ইউরোপীয় শিল্পের মত এখানে রেখার কোনও হে'চকা টান বা বিচ্ছিন্নতা এমন কি আড়ষ্ট ভাব মোটেই লক্ষ্য করা যায় না। চীনা শিল্পে অপ্রীতিকর এবং দৃষ্টি বিভ্রমকারী কোন কিছুর উপস্থিতি নেই।" চৈনিক কলার শ্রেষ্ঠত্ব বোঝানোর জন্য লেখকের এই উক্তি থেকে যে ইংগিত প্রকাশ পায় পাশ্চাত্য শিল্প কি সত্যই তাই? কিছু কিছু মতভেদ থাকলেও রচনাটি সুপাঠ্য সে কথা অবশ্যই স্বীকার করি। অনেক পড়াশোনা করে লেখক তথ্যাদি সংগ্রহ করেছেন এবং অল্প লিখে যতদূর সম্ভব খুঁটিনাটি খোঁজখবর দেবার চেষ্টা করেছেন। সুতরাং ধৈর্যচ্যুতি ঘটবার কোনও আশঙ্কা নেই। এ ধরনের বই বাঙলা সাহিত্যে বোধ করি এই প্রথম। লেখকের প্রচেষ্টা অবশ্যই প্রশংসনীয়। প্রচ্ছদপট চমৎকার। ছাপা ও বাঁধাই মোটামুটি রকম। কিছু রঙ্গীন উদাহরণ-চিত্র থাকলে ভাল হ'ত। ৫১।৫৫

শিশুসাহিত্য

স্বপনবুড়োর শিশুনাট্য ঃ স্বপনবুড়ো ঃ ওরিয়েণ্ট বুক কোম্পানী; ৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ঃ দুই টাকা।

বাংলা ভাষায় শিশুসাহিত্য যে সম্পূর্ণ অবহেলিত এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নেই। সত্যিকারের শিশুসাহিত্যের সংখ্যা এক হাতের আঙুলেই গুণে শেষ করা যায়। তবুও ওরই মধ্যে আজকাল যাঁরা শিশুসাহিত্য রচনায় প্রাণপাত পরিশ্রম করে কিছু পরিমাণে শিশুদের জন্য সৎ-সাহিত্য রচনা করেছেন, স্বপনবুড়ো তাঁদের অন্যতম।

শিশুসাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হওয়া দরকার আনন্দদানের মাধ্যমে শিক্ষাদান। কাজেই শিশুসাহিত্য রচনা করতে হ'লে যেমন শিশুদের মনের আনন্দের খনির সন্ধানও রাখতে হয়, তেমনি জানতে হয় শিশু-শিক্ষার বিজ্ঞানসম্মত ধারা।

শিশুনাট্যের এ সংকলনটি শিশুদের খুশী করতে পারবে বলেই আমাদের বিশ্বাস। ছাপায়, প্রচ্ছদচিত্রণে, মূল্যে সর্বাঙ্গসুন্দর এমন একটি বইয়ের জন্য প্রকাশক নিঃসন্দেহে ধন্যবাদের পাত্র। ৬৪।৫৫

হাসি খুসির খেলা ঃ সমর চট্টোপাধ্যায়। প্রকাশক ঃ শিশু রংমহল। ২।এস কর্নফিল্ড রোড, কলিকাতা-১৯।

গ্রন্থকার শিশু-রংমহলের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক। শিশুদের এই প্রতিষ্ঠানটি ইতিমধ্যেই শিশুদের মধ্যে সাড়া জাগাতে সমর্থ হয়েছে, তাদের মধ্যে এনেছে চাঞ্চল্য। ছড়া লিখে, গান বে'ধে, কলারসিকদের স্নেহস্পর্শের সংযোগ ঘটিয়ে সমরবাবু প্রতিষ্ঠানটিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছেন।

আলোচ্য গ্রন্থটিতে তাঁর লেখা, ছড়া ও গান সংযোজিত হয়েছে। কিছু কিছু ছড়া রেডিয়োর মাধ্যমে প্রচারিত হয়ে ইতিমধ্যেই খ্যাতি অর্জন করেছে। শিশুদের সুবিধার জন্য সহজ স্বরলিপিও করে দেওয়া হয়েছে। একটি ছড়ায় সুর দিয়েছেন বিখ্যাত সুরকার পংকজ মল্লিক। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের লিখিত ভূমিকাটি গ্রন্থটির অতিরিক্ত আকর্ষণ।

শিশুদের সম্পূর্ণ উপযোগী ছড়ায় ছবিতে এমন একটি অপূর্ব সংকলন বহুদিন নজরে পড়ে নি। বইটি শুধু শিশুদের নয়, তাদের অভিভাবক অভিভাবিকাদেরও আনন্দের খোরাক দেবে। ৪৫।৫৫

কবিতা

রিক্তরাহী ঃ শ্রীসুখরঞ্জন মৈত্র। প্রকাশক ঃ চীন-ভারত-সংস্কৃতি। ঠাকুরপুকুর। ডাকঘরঃ জোকা। ২৪ পরগণা। দাম ঃ এক টাকা চার আনা।

মোট আটাশটি কবিতার সঙ্কলন। কবিতাগুলির মধ্যে কোন কারুকৃতির পরিচয় নেই। মনে হয়, কবি আধুনিক কবিতার অজস্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্বন্ধে এখনও সচেতন নন। তবু তাঁর কয়েকটি রচনায় একটি স্বচ্ছন্দ কবিমনের সন্ধান পাওয়া গেল। কোন কোন কবিতায় কাব্যগুণ অনুপস্থিত রয়েছে। মনে হয়, নিতান্তই গদ্যকে ছন্দোবন্ধ করা হয়েছে।

কাব্যের ক্ষেত্রে সার্থকনামা হ'তে হলে কবিকে আরও অনুশীলন করতে হবে। —৬৬।৫৫

চরিত পূজা

বন্ধুবার্তা—মহেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ প্রণীত। মহাউদ্ধারণ মঠ, ৫৯ মাণিকতলা মেন রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩, টাকা।

গ্রন্থাকার শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুর কৃপাপ্রাপ্ত পুরুষ। সাক্ষাৎভাবে প্রভুর সেবা করিবার সৌভাগ্য তাঁহার হয়। তাহার ফলে তাঁহার প্রত্যক্ষ দৃষ্ট এবং শ্রীশ্রীপ্রভুর মুখে শ্রুত এবং অপূর্ব অপ্রকাশিত বহু ঘটনা পুস্তকখানিতে স্থান পাইয়াছে। প্রভুর অন্ত্যলীলা সম্বন্ধে একথা বিশেষভাবে প্রয়োজন। আলোচ্য গ্রন্থখানি বন্ধু লীলাকাহিনী, গুরুবন্ধুবাণী, শ্রীশ্রীহস্তাক্ষর ও বন্ধু কথানুশীলন এই চারিভাগে বিভক্ত। শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুর লীলা মধুর হইতে সুমধুর—গ্রন্থকারের ভাষাও মধুর। গুরুবন্ধুবাণী এবং শ্রীশ্রীবন্ধুকথানুশীলন, এই দুইটি ভাগ গ্রন্থকারের গভীর অধ্যাত্মানুভূতি এবং শাস্ত্রনিষ্ঠার আলোকে উজ্জ্বল। শ্রীশ্রীজগদ্বন্ধুর দিব্যলীলার সর্বজনীনভাবে আস্বাদনের উপযোগিতা বিধানে আলোচ্য পুস্তকখানির সম্পাদনা সর্বাংশে সার্থকতা লাভ করিয়াছে। ভক্ত ও রসিক এবং চিন্তাশীল সমাজে পুস্তকখানি সর্বত্র সমাদৃত হইবে সন্দেহ নাই। ছাপা, বাঁধাই, কাগজ সবই সুন্দর। শ্রীশ্রীপ্রভুজগদ্বন্ধুর বিভিন্ন ভাবাবস্থার কয়েকখানি সুন্দর ফটো-চিত্রে গ্রন্থখানি সুসজ্জিত।

উপন্যাস

অচিন প্রিয়া ঃ শ্রীহরিপদ মুখোপাধ্যায়। প্রাপ্তিস্থান ঃ বিশ্বনাথ পাবলিশিং হাউস। দাম ঃ আড়াই টাকা।

নিতান্তই মামুলী উপন্যাস। বৈচিত্র্যহীন বিষয়বস্তু, চমকহীন ভাষা, আড়ষ্ট সংলাপে উপন্যাসটি কণ্টকিত। বহুবার যে চরিত্রগুলিকে অজস্র লেখকের রচনায় পাওয়া গিয়েছে, লেখক তাদের নিয়েই কাহিনী রচনা করেছেন। চরিত্র পুরানো হ'তে পারে, কিন্তু তাদের বিশ্লেষণের দৃষ্টিকোণটি নতুন না হলে অনুকরণ দোষ আসে। রচনা উপভোগ্য হয় না। নায়কের সঙ্গে নায়িকার হঠাৎ দেখা, মাঝে কিছু ঘাত-প্রতিঘাত, তার পরেই রোগশয্যায় হৃদয়ের মিলনান্ত বোঝাপড়ায় কাহিনীর যবনিকা-পাত। উপন্যাসটি এত গতানুগতিক যে পাঠকের কৌতূহলকে শেষ পর্যন্ত আকর্ষণ করতে সক্ষম নয়। ৮৬।৫৫

নাটক

সোমনাথের মন্দির—প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। সুধীধাম ঃ ২।৪, হালদারপাড়া লেন, হাওড়া। দাম ঃ এক টাকা।

মোট ছয়টি নাটিকার সংকলন। 'চণ্ডাশোক', 'সোমনাথের মন্দির', 'কালিদাস', 'নচিকেতা', 'মাতৃপূজা' ও 'কয়লার খাদে'। অন্যতম নাটিকা 'সোমনাথের মন্দির' এই নামে গ্রন্থটির নামকরণ করা হয়েছে। ঐতিহাসিক পটভূমিতে রচিত 'চণ্ডাশোক' ও 'সোমনাথের মন্দির' এই নাটিকা দুইটি সুলিখিত। নাটকের প্রাণবস্তু সংলাপ। সংলাপ রচনার অগ্নিপরীক্ষায় নাট্যকার উত্তীর্ণ হতে পেরেছেন। কিন্তু ঘটনা গ্রন্থনে কিছু কিছু স্থলে অসংগতি রয়েছে। ফলে নাট্যরস ঠিকমত ঘন হয়ে ওঠেনি। 'জীবন্তিকা' এই নামে নাট্যকার দুটি নাটিকা পরিবেশন করেছেন। 'কালিদাস' ও 'নচিকেতা' ললিত সংলাপে দুটিই অনবদ্য কিন্তু গতিশীল গল্পের অভাবে এ দুটিও পরিপূর্ণ তৃপ্তির পরিপন্থী হয়েছে। সংগীতালেখ্য 'মাতৃপূজা' ও 'নক্সা', 'কয়লার খাদে' বৈচিত্র্যহীন। রচনা শিথিল, অনুল্লেখ্য এবং অজস্র ত্রুটিচিহ্নিত। ৪।৫৫

ত্রৈমাসিক পত্র

শ্রীসুদর্শন (ত্রৈমাসিক পত্র)—সম্পাদক ব্রহ্মচারী শিশিরকুমার। কার্যালয়—৩নং অন্নদা নিয়োগী লেন, কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ৪, টাকা।

শ্রীসুদর্শনের দোল সংখ্যা পাঠ করিয়া আমরা প্রীতি লাভ করিয়াছি। সুসম্পাদিত সংস্কৃতিমূলক এই পত্রিকাখানির আলোচ্য সংখ্যা বাংলা দেশের বহু মনীষীবর্গের দ্বারা লিখিত প্রবন্ধনিচয়ে সমৃদ্ধ। বাংলার চিন্তাশীল সমাজের সর্বত্র ইহা সমাদৃত হইবে।

আলোচনা

"আত্মস্মৃতি"

সবিনয় নিবেদন,

গত পঞ্চাশ সংখ্যায় 'দেশ'এ প্রকাশিত জঙ্গীপুর কলেজের শ্রীজ্ঞানেশ পত্রনবীশের আত্মজীবনী সম্পর্কে আলোচনাটি পাঠ ক'রে যে কথাগুলি আমার মনে জেগেছে তা এখানে প্রকাশ করতে চাই। জ্ঞানেশবাবু বিজ্ঞ ব্যক্তি। তিনি আর একটু চিন্তা করে আলোচনাটি লিখলে কারো কিছু বলবার থাক্‌তো না। তিনি লিখেছেন, "কেন আত্মজীবনী রচনার প্রয়াস দেখতে পাই প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের মধ্যে? একি তাঁদের সাহিত্য জীবনের সাল-তামামি?" না, আদো তা নয়। প্রথিতযশা সাহিত্যিকের মনে আত্মজীবনী লেখবার কল্পনা শুধু অকারণ পুলকে হঠাৎ জেগে ওঠে না। তার মূলে থাকে তাঁর অগণিত ভক্ত-বন্ধু-অনুরাগী-পঠকের সশ্রদ্ধ কুতূহলী মনের সক্রিয় অনুরোধ। প্রাথমিক প্রেরণা জোগান তাঁরাই।

জ্ঞানেশবাবু বলেছেন, "আত্মকথা বলার আমেজে রচনা যদি সাহিত্যিক মান হারায় তবুও কি সে আত্মজীবনী আবশ্যপাঠ্য?" এর উত্তরে শুধু এইটুকুই বলবো, যিনি সত্যকার শক্তিমান্ সাহিত্যিক তাঁর রচিত আত্মজীবনী তো সাহিত্যিক মান হারায় না। এ কথা ভুললে চলবে না যে কবি বা লেখক কী বলছেন তার উপর সাহিত্যরস নির্ভর করে না, তিনি কেমন করে বলছেন সেই প্রকাশ-ভঙ্গির উপরই, কাব্যই বলুন আর সাহিত্যই বলুন, সব কিছুই নির্ভর করে। আর সমগ্র-ভাবে সব কিছুই নির্ভর করে লেখকের শক্তির উপর। লেখকের শিক্ষা তাঁর অভিজ্ঞতা, রুচি, নৈপুণ্য, তাঁর সদাজাগ্রত স্বচ্ছ দৃষ্টি, তাঁর জীবনদর্শন ও আদর্শ, তাঁর সংস্কারমুক্ত পরিচ্ছন্ন মননশীলতা—এই সমস্ত নিয়েই লেখকের শক্তি। শক্তিমান্ স্রষ্টা সাহিত্যিকের গল্প উপন্যাসে যে সাহিত্যরস পরিবেষিত হ'তে দেখি তাঁর সাহিত্য জীবন রচনার বেলায় তার ব্যতিক্রম হবার কোন সংগত কারণ নেই। সত্যই যদি ব্যতিক্রম দেখি তো বুঝবো তাঁর শক্তিই স্তিমিত হ'য়ে এসেছে, তাঁর অন্য রচনাতেও আর সাহিত্যরস তেমন ঘন হ'য়ে জমবেনা।
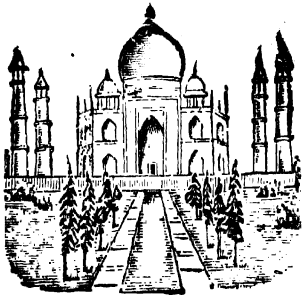
সাহিত্যে বহু জঞ্জাল জমেছে বা অনেক আগাছা গজিয়েছে এ কথা সত্য। এর জন্য লেখকের অক্ষমতা যতটা দায়ী, প্রকাশকের অবিমৃষ্যকারিতা ততটা নয়। একটুখানি তলিয়ে দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যাবে সাহিত্যরসোত্তীর্ণ আদৌ হয়নি এমন বহু রচনা গ্রন্থকারে কেন ও কেমন করে প্রকাশিত হয়। দু'চারজন অভিজাত প্রকাশকের কথা বাদ না দিলে সত্যের অপলাপ হবে যাঁরা নামের 'তেজারতি' করেন না। অনেক প্রকাশক আছেন যাঁরা বহু ক্ষেত্রে কমিশনের আশায় বইয়ের উপর শুধু নাম ধার দিয়েই প্রকাশকের দায়িত্ব শেষ করেন। গ্রন্থ প্রকাশনের যাবতীয় ব্যয় বহন করেন গ্রন্থকার নিজে। তাঁর সাহিত্যরচনা শক্তির যতই অভাব থাক, অর্থ-অপব্যয়-শক্তির অভাব আছে এমন অপবাদ শত্রুতেও দেবে না। এমনি করেই সাহিত্যের হাটে আবর্জনা পুঞ্জীভূত হ'য়ে ওঠে।

পাঠকদের খুব বেশী দায়ী করলে অন্যায় হবে। সাধারণ নিরীহ পাঠক সম্প্রদায় বইয়ের মলাটের চাকচিক্যে মুগ্ধ হন, তার বাহ্য আড়ম্বরে বিভ্রান্ত হন, সর্বোপরি বিজ্ঞাপনের ছলনার ফাঁদে আবদ্ধ হন। তাঁদের বিশেষ পক্ষপাতিত্ব নেই, আছে নির্বিশেষ নির্বিচার। ইতি — শ্রীগোপালচন্দ্র দাস, জামশেদপুর।

"ইউরেনিয়াম"

মহাশয়,

১২শ সংখ্যায় ভারতের ইউরেনিয়াম সম্পদ সম্বন্ধে শ্রীকার্তিকচন্দ্র চক্রবর্তী একটি প্রশ্ন তুলেছেন। ভারতের ইউরেনিয়াম সম্পদের সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যের অভাবের কারণ হ'লো, ১৯৪৮ সালের ২৯নং আইন (ভারতীয় আণবিক শক্তি আইন)-এর দ্বারা কঠোর নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। শ্রদ্ধেয় ডাঃ বসু, সাধারণ নাগরিকদের মতোই আজ পর্যন্ত প্রকাশিত তথ্যের উপর ভিত্তি করেই তাঁর মন্তব্য করেছেন। সেদিক দিয়ে তিনি ভুল করেন নি। কিন্তু গত ৪।৫ বৎসরে ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে যথেষ্ট ইউরেনিয়াম খনিজ আবিষ্কৃত হয়েছে। উপরোক্ত আইনের ব্যবস্থা অনুযায়ী এ সম্বন্ধে বিশদ বিবরণ সাধারণ্যে প্রকাশ নিষিদ্ধ। আণবিক শক্তি সংস্থার (Atomic Energy Commission) তেজস্ক্রিয় খনিজ অনুসন্ধান বিভাগে আমার ব্যক্তিগত কাজের অভিজ্ঞতা থেকে আমি এই তথ্যটুকু প্রামাণিক বলে জানাতে পারি। এর বেশী বলা আইনত আমার পক্ষেও সম্ভব নয়। কিন্তু এ তথ্য ডাঃ ভাবার পূর্বে পরলোকগত ডাঃ ভাটনগরও ২।৩ বার ঘোষিত করে গেছেন। সুতরাং এ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশের অবকাশ কোথায়? শ্রীচক্রবর্তী মহাশয়ের আবিষ্কৃত এক আকরের সংবাদ দিয়ে আমায় কুতূহলী করেছেন। তাঁর সংবাদের উৎস জানালে বাধিত হবো। আর একটা কথা। তিনি ঐ আকরের ইউরেনিয়াম-পরিণাম বলেছেন শতকরা ০·২ ভাগ। তিনি ঠিক কি বলতে চেয়েছেন বুঝলাম না। অনেকে ইউরেনিয়াম মৌলের সঙ্গে U^3O^8 বা ইউরেনিয়াম অক্সাইডের কথাটি বাড়িয়ে ফেলেন। যে আকরে শতকরা ০·২ ভাগ ইউরেনিয়াম আছে, তা অত্যন্ত মূল্যবান ও উপযোগী। শ্রীচক্রবর্তী কি সমগ্র আকরের পরিমিত সম্পদের কথা বলতে চেয়েছেন?

আর একটি বক্তব্য জানিয়ে শেষ করব। ১২শ সংখ্যায় "ভারতের জাতীয় নাট্যোৎসব"-এর আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীভরত দত্ত "জাতীয়" শব্দটির ব্যবহারে উষ্মা প্রকাশ করে তির্যক মন্তব্য করেছেন। তিনি ভারতীয় নাট্যকলার প্রাচীন ও জাতীয় ঐতিহ্যের (বৈদিক যুগ থেকে) প্রশ্ন তুলেছেন। লেখক "জাতীয়" শব্দটির অন্যরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। ইংরেজীতে Chauvinism বলে একটি কথা আছে, যার বাংলা প্রতিশব্দ ঠিক নেই। লেখকের মন্তব্যে Chauvinism-এর আভাস পাচ্ছি। Chauvinism ও উগ্র ঐতিহ্যবাদ বা Traditionalism প্রবল হলে সহজ ও স্বাভাবিক প্রগতিতে বাধা পড়তে বাধ্য। শিল্পকর্ম কোনো দেশে প্রাচীন ঐতিহ্যানুগ না হলেই জাতীয়ত্বের দাবি হারাবে, এযুক্তিতে মন ঠিক সায় দেয় না আমাদের বাংলা নাট্যকলা পাশ্চাত্যভাবানুগ বলেই জাতীয় ঐতিহ্যসম্মত নয়, এটা বিপজ্জনক যুক্তি। যে কোনো শিল্পকর্মে যদি কোনো বিশেষ যুগের সমাজমানসে প্রতিফলন যে কোনো উপায়ে সম্ভব হয়, তবে তা ঐতিহ্যসম্মত হতে বাধ্য। ঐতিহ্যের সংজ্ঞা ও বিবর্তন নিয়ে বিরাটতর সমস্যা প্রশ্ন রয়েছে। এখানে তার আলোচনার সুযোগ নেই। ইতি—শ্রীসুরজিৎকুমার গুহ ভুজ, কচ্ছ।

—শৌভিক—

নতুনত্বের মাশুল

কোন ক্ষেত্রেই নতুন কিছু আমদানী াতে গেলে পুরাতনকে তার জন্যে জায়গা ়ে দিতেই হয়। আর পুরাতনকে সরিয়ে ূনকে প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে প্রগতির ার্থ লক্ষণ। কিন্তু পৃথিবীর বর্তমান তি-প্রকৃতির মধ্যে এমন কতকগুলো টিলতা এসে গিয়েছে যার জন্যে ইচ্ছে কলেই, বা একান্ত প্রয়োজনের খাতিরেও ব সময়ে নতুনকে আবাহন জানানো বা তিষ্ঠিত করা সহজও হয় না, সুবিধা- নকও হয়তো হয় না। আমাদের দেশের লচ্চিত্রের ক্ষেত্রে এখন এইরকম সমস্যা দখা দিয়েছে। বিবর্তন নিয়ে আসায় চল- চ্চত্রের চেয়ে দ্রুত গতিশীল এখন বোধহয় ার কিছু নেই। বলতে গেলে মাত্র ষাট ছরের এই উদ্ভাবন। এরই মধ্যে নির্বাক বি কথা বলছে, সাদাকালো ছবি বর্ণময় য়েছে, ছোট পর্দা লম্বায় প্রসারিত য়েছে, আর ছবি তোলারও যে কতো কমের কায়দা ও যন্ত্র এবং সরঞ্জাম বেরিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। এক এক করে বিবর্তনের ঢেউ ইওরোপ-আমেরিকা থেকে ভারতের কূলে এসে লেগেছে, ভারতও নুসরণ করে চলেছে অনবরতই। নির্বাক থকে ছবি বাঙ্ময় হয়ে উঠতে বেশী দেরী য়নি আমাদের দেশে। তখন বিশেষ সমস্যা দখা দেয়নি, কারণ স্টুডিওর সংখ্যা বেশী ছল না, আর চিত্রগৃহও তখনো হাজার দড়েক পার হয়নি। চলচ্চিত্র শিল্পই তখন বে পত্তনের মুখে, কাজেই গোড়ায় আরম্ভতেই সবাক করে নিতে কিছু তেমন বেগ পেতে হয়নি। তারপর দেখতে দেখতে ছবি হলো বর্ণময়। চলচ্চিত্রের এই বিবর্তনকে এতোদিন উপেক্ষা করে আসা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু আর বোধ হয় তা চলছে না। ছবির জলুস কিছু না বাড়ালে যেন আকর্ষণীয় করে রাখা যাচ্ছে না আর। ভারতীয় চিত্র- নির্মাতাদের এখন হুঁশ হয়েছে ছবিতে রঙ যোগ করার দিকে। কিন্তু আশঙ্কা হচ্ছে, এটা আবার বদ্ খেয়ালে পরিবর্তিত না হয়ে যায়!

* * *

আগে অবশ্য ছবি রঙ করার একটা রীতি এদেশে প্রচলিত ছিল। হাতে রঙ করা। সাধারণত কোন ছবি অনেকদিন চলতে থাকলে তার দু'একটি নাচের দৃশ্য হাতে রঙ করে চলতি কপিতে জুড়ে দেওয়া হতো। ইদানীং পুরো ছবিও হতে আরম্ভ হয়েছিল। এইভাবে "কিসমৎ", "বসন্ত", "রতন", "শকুন্তলা" প্রভৃতি ছবি প্রদর্শিত হয়। তাছাড়া নির্বাকযুগেও ইওরোপ থেকে দু'একখানি ছবিকে রাসায়নিক প্রসাধনে রঙিন করে আনানোও হয়েছিল। হালে ছবি রঙিন করার একটা সাড়া এনে দেয় "অজিত"। ষোল মিলিমিটার কোডাক্রমে তোলা ছবিকে বাড়িয়ে প্রমাণ মাপের পঁয়ত্রিশ মিলিমিটারের রঙিন করে আনানো হলো আমেরিকা থেকে। ফল মোটেই সুবিধের হলো না; তবে ছবি রঙিন করার হুঁশটা ধরতে গেলে এই থেকেই জাগলো। মাঝে আমেরিকানরা এসে "দি রিভার" তুলে কৌতূহল আরও বাড়িয়ে দিলে। মেহবুব "অজিত"এর পথ ধরে তার "আন"-কে বিলেত থেকে টেকনি- কলারে রঙিন করে আনালেন। অপ্রত্যাশিত সুফল পাওয়া গেল এবং "আন"-এর বিশ্ব- ব্যাপী জনপ্রিয়তার একটা প্রধান কারণ ওর বর্ণাঢ্যতা। সোরাব মোদী আরও এগিয়ে "ঝাঁসী কী রাণী" তুলেই নিলেন টেকনি- কলার পদ্ধতিতে; অবশ্য তাকেও ছবি প্রসাধন করিয়ে আনাতে হয়েছে বিলেত থেকেই। ছবি রঙিন করার উৎসাহ দেখতে দেখতে বেড়ে চললো। রাজকাপুর ঘোষণা করলেন "অজন্তা" তুলবেন

"বচন"-য়ে নায়িকা চরিত্রে নীরু
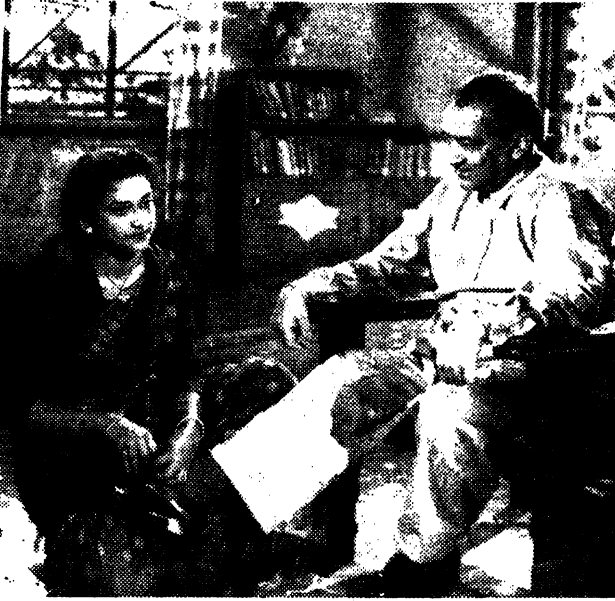
মনোজ বসুর কাহিনী অবলম্বনে নির্মল দে পরিচালিত "দুজনায়"-তে সবিতা চট্টোপাধ্যায় ও পাহাড়ী সান্যাল

টেকনিকলারে। শান্তারাম আরম্ভ করলেন টেকনিকলার পদ্ধতিতে "ঝনক ঝনক পায়েল বাজে"। কিন্তু টেকনিকলারে রঙ করার বেজায় খরচ; প্রযোজকদের উৎসাহ দেখা দিলেও চট করে নেমে পড়ার অবস্থা অধিকাংশেরই নেই। ইতি-মধ্যে ছোট ছোট কয়েকখানি ছবির মারফৎ গেভাকলারের সঙ্গে পরিচয় ঘটে গেল। দেখতে দেখতে "ময়ূরপঙখ", "পাম্পোশ" "রাধাকৃষ্ণ", "শাহেনসা" প্রভৃতি পূর্ণ দৈর্ঘ্য ছবি তৈরী হল গেভা-কলার পদ্ধতিতে। টেকনিকলারের মতো ঝঞ্ঝাটও অতো নেই এবং খরচও তুলনায় অনেক কম। তা ছাড়া, টেকনিকলারে তুললে ছবি প্রসাধন করিয়ে আনাতে হয় বিলেত থেকে; কিন্তু গেভাকলারের বম্বেতে স্থাপিত প্রসাধানাগারে এখনই রঙের কাজ করিয়ে নেওয়া সম্ভব এবং তার ফলও খুবই ভালো দেখা গেলো। "তিলোত্তমা" প্রভৃতি কয়েকখানি ছবির একটা করে রীল গেভাকলারে রঙিন করে পরিবেশন করা হলো; ফল মন্দ দেখা দিল না। উৎসাহ বাড়লো "নাগীন" মুক্তিলাভের পর। এ ছবিখানির শেষের দিকে খানিকটা অংশ গেভাকলারে রঙীন এবং বাস্তবিকই অতীব আকর্ষণীয় ও উপভোগ্য অংশ। গেভাকলারের প্রতি প্রযোজকদের লুব্ধ দৃষ্টি পড়লো এইবার। "নাগীন"এর জনপ্রিয়তার যথেষ্ট গুণ ও আকর্ষণ আছে এবং তার মধ্যে রঙিন অংশটিও একটি প্রধান আকর্ষণ। এর পর বম্বের আরও প্রযোজক তাদের ছবির অংশবিশেষ রঙিন করায় মনো-নিবেশ করেছেন। কেউ কেউ টেকনিকলারে বা গেভাকলারে পুরো ছবিও তোলা আরম্ভ করেছেন। এতোদিন কলকাতা শুধু দেখেই যাচ্ছিল; এবারে এখানকার প্রযোজকদেরও টনক নড়েছে। দেবকী বসু তার পরবর্তী ছবি "মীরার প্রভু" পুরোটাই গেভাকলারে তুলবেন বলে ঘোষণা করেছেন। আরও জন দুই প্রযোজকও ঐ পথে যাবার মতলব করেছেন। "দস্যু মোহন", "কৃষ্ণসুদামা" "দেবীমালিনী" প্রভৃতি আরও খানকতক ছবির বিশেষ বিশেষ দৃশ্য গেভাকলারে রঙিন করে পরিবেশনের সঙ্কল্প করে ছেন। শুনতে বেশ ভালো খবর এবং ছবিতেও তাতে অতিরিক্ত আকর্ষণ যে হবে নিশ্চয়ই। বাঙলা ছবিতে এই নতুন

আসছে তাতে চিত্রামোদী মাত্রই উল্লসিতও হবেন। কিন্তু ঠিকভাবে স্বাগতম জানাবার আগে কটা কথা বিচার করবারও আছে।

* * *

রঙ যোগ করতে ছবি তোলার খরচের অঙ্কে টাকার পরিমাণ বাড়বেই। টেকনি-কলারে হলে এতো খরচ যে কোনদিন বাঙলা বা কোন আঞ্চলিক ভাষার ছবিতে ও পদ্ধতি নিয়ে কাজ করা সম্ভব হয়ে উঠবে না। গেভাকলারে খরচ এখনকার সাধারণ ছবির চেয়ে তিনগুণ বেশী। এমনিতেই বাঙলা ছবির বাজার সংকুচিত, তার ওপর আরও খরচ হলে সে টাকা তোলার বাজার কোথায়? তাছাড়া ছবি তোলার জন্যে যে মূলধন এখন পাওয়া যায় তা নিয়ে রঙের সম্বন্ধে পরমুখাপেক্ষী হতে গেলে, তখন তিনখানার জায়গায় ছবি হবে একখানি। সংখ্যায় বাৎসরিক উৎপাদন কমে যাবেই। এর নজির হলিউড এবং বৃটেনের ক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। ওদের রঙিন ছবি সংখ্যায় যতো বাড়তে আরম্ভ করেছিল, মোট ছবির উৎপাদন সংখ্যাও সেই অনুপাতে কমে যেতে থাকে। ফলে সমস্যা দেখা দিল চিত্র-শিল্পে নিযুক্ত সব কর্মীদের কাজের সংস্থান করে দেওয়ার। তিনখানির জায়গায় একখানি ছবি হলে দু ইউনিট কলাকুশলীর হাত খালি পড়ে থাকে। অনেক কলাকুশলী তখন বাড়তি হয়ে পড়ে। আরও দেখা গিয়েছে যে, ছবি রঙিন হলেই চিত্রামোদী-দের মন পাওয়া যায় না। অভিনবত্বের আকর্ষণ দিয়ে লোককে কিছুদিন ভুলিয়ে রাখা যায়; কিন্তু সে ঘোর কেটে গেলে, অর্থাৎ রঙের সমাবেশ দৃষ্টি-সওয়া হয়ে গেলে তখন কি উপায় হবে? হলিউডকেও এই সমস্যায় পড়তে হয়েছে। শুধু রঙ দিয়ে বাজী মাৎ করার দিন ওদের ফুরিয়ে গিয়েছে। ওরা বুঝতে পেরেছে লোকের মন পেতে রঙ একটা পোশাকের চেয়ে বেশী কার্যকরী নয়। উলটে রঙিন ছবির সংখ্যা বাড়াতে গিয়ে মোট ছবির সংখ্যা গিয়েছে কমে, ফলে চিত্রগৃহগুলিকে থাইয়ে যেতে বিদেশী ছবি যথেষ্ট সংখ্যায় প্রদর্শনে আস্কারা দিতে বাধ্য হতে হয়েছে। এখন ওরা বুঝছে ছবির সত্যিকারের আকর্ষণ দৃষ্টি বা কানে মোহ সৃষ্টিতে নয়; ওগুলো প্রাণে পৌঁছবার এক একটা অববাহিকা মাত্র—প্রাণে পৌঁছবার পথই আলাদা। সে পথ গিয়েছে আখ্যানবস্তু ধরে, যার উৎপত্তি সত্য ও সৎ শিল্পানুভূতিসমৃদ্ধ হৃদয়তল। হলিউড আজ যা ঠেকে শিখেছে, ভারতীয় প্রযোজকরা যেন রঙ নিয়ে মেতে ওঠার আগে ওদের দৃষ্টান্তটা দেখে শেখেন।

নতুনকে অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে, কিন্তু বুঝেসুঝে।

* * *

লোকের মন পাওয়ার জন্যে হলিউডের তৎপরতার অন্ত নেই। রঙচঙে করেও যখন তার হদিশ পাওয়া গেল না, তখন হলি-উড মাতলো দৃশ্যপ্রসারক পর্দা নিয়ে। দেখতে দেখতে এসে হাজির হলো নানা মাপের বড়ো বড়ো পর্দা। এ আর এক বিবর্তন। পর্দা বড়ো হওয়ায় ছবি তোলার কাঠামোকেও বদলাতে হচ্ছে; দৃশ্যের রচনাই একেবারে অন্যরকমের। আগে যেভাবে ক্লোজ-আপ সাজালে চলতো, এখন আর তা চলে না। আগে ছিল দৈর্ঘ্য প্রস্থ প্রায় সমান সমান; এখন দৈর্ঘ্য প্রায় তিনগুণ। কোন কোন পদ্ধতিতে তার চেয়ে বেশী, কোনটায় কম। অনেকখানি জায়গা নিয়ে দৃশ্য রচনা করতে হয়; সেই সূত্রে চরিত্রাবলীর চলাফেরার ক্ষেত্রও প্রসারিত হয়েছে; অভিনয়ধারায় পরিবর্তন এসেছে। চিত্রনাট্যের কাঠামোও বদলে যাচ্ছে, আর বদলাচ্ছে কাহিনীর পটভূমি। সিনেমা-স্কোপ বা ভিস্টাভিসান বা অনুরূপ পর্দাকে ভরিয়ে রাখার মতো প্রসারিত দৃশ্য স্টুডিওর অঙ্গনে কুলিয়ে ওটা যাচ্ছে না; বাইরের উন্মুক্ত স্থানে পটভূমিকা এখন পরিকল্পনা করতে হচ্ছে। শুধু তাই নয়, প্রসারিত ক্ষেত্রজোড়া দৃশ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার মতো উচ্চধ্বনি শব্দ যোজনারও ব্যবস্থা করতে হয়েছে। অনেকখানি দেখার সঙ্গে অনেকখানি শোনবারও ব্যবস্থা। তবে শুধু চোখ ভরে দেখা এবং কান ভরে শোনাটাই আসল নয়, বিষয়বস্তুর পরি-কল্পনাই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। দৃশ্য পরি-ব্যাপক পর্দা সত্যিকারের বিবর্তন এনেছে। আমাদের দেশে এই পর্দা প্রবর্তন এক বিরাট এবং জটিল সমস্যা। কারণ, দৃশ্য পরিব্যাপক পর্দা বসালেই কাজ হাসিল হয় না। এদেশের হাজার সাড়ে তিন চিত্রগৃহে, ধরা গেল, না হয় পর্দা বসিয়ে নিলে, কিন্তু সে পর্দার উপযোগী ছবি তোলার ব্যবস্থা কোথায়? এখন যে মাপে ছবি তোলা হয়, তা বজায় রেখে চললে ফল সুবিধের হয় না। তাতে ওপর-নীচ কাটা পড়ে যায়। দৃশ্যপরিব্যাপক পর্দায় এখন-কার ছবি প্রক্ষিপ্ত করে দেখাও যাচ্ছে তাই। আর শব্দের ক্ষেত্রেও সেই অসুবিধা। এখন যে মাত্রা রেখে ছবি তোলা হয়, দেখা-বার সময় তা চৌগুণ হয়ে গেলে ফ্যাস-ফেসে হয়ে যায়, তাও দেখা যাচ্ছে। মেট্রোতে সদ্যমুক্ত "চিত্রাঙ্গদা"-র বেহাল অবস্থা দেখে চৈতন্য হওয়া উচিত। সুতরাং পর্দা বড়ো করলেই ছবি তোলার পদ্ধতিও তদনুযায়ী বদলে ফেলতে হবে। সেও প্রভূত খরচসাপেক্ষ ব্যাপার। শুধু তাই নয়, সবকিছু সাজসরঞ্জাম বিদেশ থেকে আনতে হবে, তাতে যে পরিমাণ টাকা চালান হবার সম্ভাবনা তা রাষ্ট্রের পক্ষে অনুপকারীই হবে। উপরন্তু, খরচের ধাক্কার সঙ্গে ব্যালান্স রাখতে ছবির উৎপাদনও কম করতে হবে। ছবি কমে যাওয়া মানে কলাকুশলীদের অনেকের বেকারত্ব লাভ; যে অবস্থাটা রঙিন ছবির বেলাতেও রয়েছে। এছাড়া, ছবি কমে গেলে পর্দাগুলোকে খাইয়ে যেতে বিদেশী ছবির আমদানী না বাড়িয়ে উপায় থাকবে না, সেও এক বাঞ্ছিত অবস্থা নয়। নতুনকে উপেক্ষা করেও থাকা যায় না, আবার আবাহন জানিয়ে প্রতিষ্ঠিত করতে যাবার মুখেও গভীর সমস্যা। এগুলেও বিপদ, অথচ পিছিয়ে পড়ে থাকাও ভালো লক্ষণ নয়। ভারতে যদি যন্ত্রপাতি সরঞ্জামাদি প্রস্তুত হতো, তাহলে এতো কথা পাড়বারই দরকার হতো না। কিন্তু তা যখন নেই, তখন উপায়! রঙই হোক, কি দৃশ্যপরি-ব্যাপক পর্দাই হোক, নববিবর্তনে ঝাঁপিয়ে পড়তে যে চড়া মাশুল লাগবে, ভারতীয় চলচ্চিত্রশিল্পের ক্ষমতায় তা কুলোবে তো?

১লা এপ্রিল হইতে

ওরিয়েন্ট, বসুশ্রী ও বীণা

কলিকাতা ও সকল প্রধান কেন্দ্রে

জেমিনী রিলিজ

খেলার মাঠে

একলব্য

অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন প্রতিযোগিতার প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ওং পেং সুন গত দুইবারের চ্যাম্পিয়ন এ ডি চুংকে হারিয়ে দিয়ে এ বছর পুনরায় চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন। ব্যাডমিণ্টনে মালয়ের শ্রেষ্ঠত্ব সর্ববাদিসম্মত। ইংলণ্ডের মাটিতে আন্তর্জাতিক ব্যাডমিণ্টনের আসরে মালয় প্রতি বছরই চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে আসছে। ১৯৫০ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত ওং পেং সুন বিজয়ী হয়েছেন; ১৯৫৩ ও ১৯৫৪ সালে বিজয়ী হয়েছেন এ ডি চুং। এরা দুজনই মালয়ের খেলোয়াড়। বর্ষীয়ান সুন উদীয়মান চুংকে হারিয়ে এবার আবার ব্যাডমিণ্টনের শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় হিসাবে পরিগণিত হলেন। অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নশিপের খেলা থেকেই ব্যাডমিণ্টনে ব্যক্তিগত শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করা হয়। টেবিল টেনিসে যেমন আন্তরাষ্ট্রীয় প্রতিযোগিতা সোয়েদলিং কাপের সঙ্গে সঙ্গে বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা আছে টেনিসে বা ব্যাডমিণ্টন খেলায় তেমন কোন বিশ্ব প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা নেই। টেনিসে 'ডেভিস কাপ' বা ব্যাডমিণ্টনে 'টমাস কাপ' বিজয়ী দেশের পুরস্কার। এর মধ্যে ব্যক্তিগত প্রাধান্যের প্রশ্ন নেই। কিন্তু টেবিল টেনিসে আন্তর্জাতিক সোয়েদলিং কাপের খেলা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বে শ্রেষ্ঠ কে, তার বিচারের জন্য বিশ্ব প্রাধান্য প্রতিযোগিতা 'সেণ্ট ব্রাইড ভেসের' খেলা আরম্ভ হয়। টেনিস বা ব্যাডমিণ্টনে এমন কোন প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা না থাকায় উইম্বলডন টেনিসের বিজয়ী বীরকে টেনিসের শ্রেষ্ঠ এবং অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়নকে ব্যাডমিণ্টনের বিশ্ব শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলে পরিগণিত করা হয়। সারা বিশ্বে টেনিস বা ব্যাডমিণ্টনে বহু প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা থাকলেও উইম্বলডন টেনিস এবং অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টনের বিজয়ী বীরের সম্মান অনন্য। তাই এরা বিশ্বের শ্রেষ্ঠ এবং সর্বাপেক্ষা প্রতিভাবান খেলোয়াড় হিসাবে গণ্য।

ওং পেং সুন সিঙ্গাপুরে খেলাধুলোর সরঞ্জাম বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করেন। সুনের বর্তমান বয়স ৩৬। এ ডি চুংয়ের চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়। কিন্তু ফাইন্যালে বয়োকনিষ্ঠ চুংকে অনেকটা সহজভাবেই পরাজিত করেছেন। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় চুং প্রথম সেটে সুনের কাছ থেকে একটির বেশী পয়েণ্ট লাভ করতে পারেননি। 'ডিউসের' পর চুং অবশ্য দ্বিতীয় সেটটি লাভ করেন; কিন্তু তৃতীয় এবং শেষ সেটে ওং পেং সহজেই পরাজিত করেছেন চুংকে। তিনটি সেটে সুন ১৫-১, ১৪-১৭ ও ১৫-১০ পয়েণ্টে বিজয়ী হয়েছেন।

* * *

ক্রিকেট মরসুম যাই যাই করেও যেতে পারছে না। আনুষ্ঠানিকভাবে অনেকদিন আগে ক্রিকেট মরসুম শেষ হয়ে গেলেও এখন পর্যন্ত সি এ বি নক আউট প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা শেষ হয়নি। শেষ হয়নি ভারতের আন্তঃরাজ্য ক্রিকেট প্রতিযোগিতা—রণজি ট্রফির ফাইন্যাল খেলা। অবশ্য এ সপ্তাহেই কলকাতায় সি এ বি নক আউট এবং ইন্দোরে রণজি প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা আরম্ভ হচ্ছে। আসছে সপ্তাহের প্রথমেই
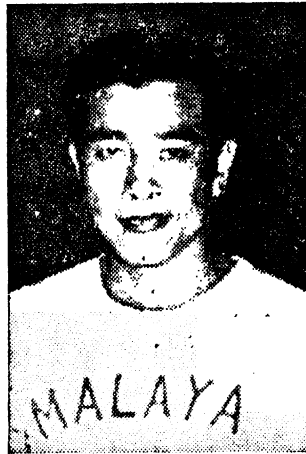
অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টন চ্যাম্পিয়ন
ওং পেং সুন

যবনিকা পড়বে ক্রিকেট মরসুমের উপর। সম্প্রতি মাদ্রাজে আন্তঃরাজ্য বা জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার খেলা শেষ হয়ে গেল। সমস্ত রাজ্যই এখন হকি নিয়ে মেতে আছে। কলকাতার হকি মাঝ দরিয়ায়। লীগের খেলা শেষ হবার মুখে না এলেও লীগ শেষ হতে খুব বেশী সময় লাগবে না। তার পরই আরম্ভ হকির শ্রেষ্ঠ প্রতিযোগিতা বেটন কাপের খেলা। বেটন কাপের জন্য বি এইচ এ অর্থাৎ বেঙ্গল হকি এসোসিয়েশনের কর্মব্যস্ততা কম নয়। হকির ডামাডোলের মধ্যে ফুটবলেরও পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। কলকাতা তথা ভারতের এই প্রাণ মাতানো মন মাতানো খেলায় নিজ নিজ দলের শক্তি সঞ্চয়ের জন্য সমস্ত ক্লাবেই সাজসাজ রব। শক্তি সঞ্চয়ের জন্য, নূতন নূতন খেলোয়াড় দলভুক্ত করবার জন্য সবাই তৎপর। ২৫শে মার্চ পার হয়ে গেছে। আই এফ এ-র সংবিধান অনুযায়ী এই দিনটি খেলোয়াড় আবাহনের শেষ দিন। তাই মার্চকে আই এফ এর পঞ্জিকার বোধন উৎসব বলা যেতে পারে। এর পর কোন ক্লাবেরই আর অন্য ক্লাবভুক্ত কোন কোন খেলোয়াড়কে নিজ ক্লাব মণ্ডপে আবাহনের অধিকার থাকবে না। যার যাকে আহ্বান করবার ছিল উচিত মত অর্ঘ্য দিয়ে এই দিনের মধ্যেই আহ্বান করতে হয়েছে।

* * *

আই এফ এর সংবাদে প্রকাশ এবার ৫৬৩ জন খেলোয়াড় দল পরিবর্তন করেছেন। দলত্যাগী খেলোয়াড়দের এই বিপুল সংখ্যা অন্যান্য বছরের হিসাবকে ছাপিয়ে গেছে সন্দেহ নেই। এ বছর রাজ্যত্যাগী খেলোয়াড়দের সংখ্যাও কম নয়। রাজ্যত্যাগী খেলোয়াড় অর্থাৎ যারা খেলার প্রয়োজনে এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে খেলবার জন্য ভারতীয় ফুটবল ফেডারেশনের কাছে আবেদন করেছেন। রাজ্য ত্যাগের আবেদনের শেষ তারিখ অবশ্য অনেকদিন পার হয়ে গেছে। ৩১শে ডিসেম্বর ছিল রাজ্যত্যাগের আবেদনের শেষ তারিখ। নিয়মানুযায়ী এক মাসের মধ্যে এরা আবার নিজ রাজ্যে ফিরে যেতে পারেন, তবে ফুটবল ফেডারেশন সংবিধানের বিকল্পযোগে এবছর এদের ১৫ই এপ্রিল পর্যন্ত স্বরাজ্যে ফিরে যাবার অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাই বাইরের যেসব খেলোয়াড় বাঙলায় বিভিন্ন ক্লাবে খেলবার জন্য আবেদন করেছেন তারা যে সবাই বাঙলায় খেলবেন একথা জোর করে বলা যায় না। কলকাতা ময়দানে এইসব মৌসুমী ফুলের দুই একটি চারা না জন্মাতেও পারে। তবুও দল অদল বদল এবং রাজ্য ত্যাগের ফলে প্রথম ডিভিসনের লীগ ক্লাবের কোন ক্লাব কেমন পুষ্ট হয়েছে তার একটা হিসাব দিচ্ছি। কলকাতা ময়দানে খেলোয়াড় হিসাবে যাদের পরিচয় আছে এ হিসাব শুধু তাদের। জুনিয়র খেলোয়াড়দের নাম এ হিসাবের মধ্যে নেই।

মোহনবাগানে এসেছেন:—আর গুহ—গোলকিপার (ভবানীপুর), এ মুখার্জী—গোলকিপার (স্পোর্টিং ইউনিয়ন), এ সালাম—ব্যাক অথবা হাফ ব্যাক (হায়দরাবাদ), এ মিত্র—হাফ ব্যাক (ইস্টবেঙ্গল), সুভাশীষ গুহ—হাফ ব্যাক (বি এন আর), এ চ্যাটার্জী—রাইট আউট (এরিয়ান), ধনরাজ—সেণ্টার ফরোয়ার্ড (রাজস্থান), বি মজুমদার—ইন সাইড (উয়াড়ী)।

ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এসেছেন:—ডি ঘোষ—গোলকিপার (রাজস্থান ক্লাব), এস মল্লিক—ব্যাক (রাজস্থান ক্লাব), এম ঘটক—ব্যাক (ভবানীপুর), হরিদাস—হাফ ব্যাক (রাজস্থান) এ দত্ত—হাফ ব্যাক (এরিয়ান), বালসুব্রাহ্ম

নিয়াম—রাইট ইন্ (ব্যাঙ্গালোর), কিট্টু—সেণ্টার ফরোয়ার্ড (ব্যাঙ্গালোর), পি চ্যাটার্জী—ফরোয়ার্ড (বিহার), এস রায়—লেফট আউট (এরিয়ান)।

রাজস্থান ক্লাবে এসেছেন—ইলিয়াস—গোল কিপার (মহঃ স্পোর্টিং), এম ঘটক—গোল কিপার (ইস্টবেঙ্গল), রহমান—ব্যাক (মালাবার), মহীন্দার সিং—ব্যাক (ভবানীপুর), শঙ্কর—লেফট হাফ (বোম্বাই), পুষ্পেরাজ—ফরোয়ার্ড (মহীশূর), বাসিথ—সেণ্টার ফরোয়ার্ড (মোহনবাগান), ইয়ামানি—লেফট ইন (হায়দরাবাদ), বালন—লেফট আউট (মহঃ স্পোর্টিং)।

এরিয়ান ক্লাবে এসেছেন:—পি মজুমদার—হাফ ব্যাক (ভবানীপুর ক্লাব), এস ঘোষ—ফরোয়ার্ড (২৪ পরগণা), এস চক্রবর্তী—ইন সাইড (জর্জ টেলিগ্রাফ), আর বসু—ইন সাইড (ভবানীপুর), এস চৌধুরী—লেফট আউট (ইস্টবেঙ্গল)।

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবে এসেছেন:—এম ফাকরী—লেফট আউট (ইস্টবেঙ্গল), মালেক—ব্যাক (পাকিস্থান), আসফ খাঁ—হাফ ব্যাক (অন্ধ্র), এফ আর খাঁ—ইন সাইড (ইস্টবেঙ্গল), আজম—ফরোয়ার্ড (ব্যাঙ্গালোর), সানাউল্লা—ফরোয়ার্ড (ব্যাঙ্গালোর)।

পুলিশ দলে এসেছেন:—টিক্কেনরাম—ব্যাক (আর্মড পুলিশ), লক্ষ্মীচাঁদ—হাফ ব্যাক (আর্মড পুলিশ), রঘুবীর—ফরোয়ার্ড (আর্মড পুলিশ), চিন্তানাহাদুর (আর্মড পুলিশ)।

বি এন রেল দলে এসেছেন:—এস ঠাকুর—ব্যাক (ভবানীপুর), আর দত্ত—ব্যাক (উয়াড়ী), এস প্রজাপতি—হাফ ব্যাক (জর্জ টেলিগ্রাফ), এম ভট্টাচার্য—ইন খেলোয়াড় (খিদিরপুর), আইনুল হক—লেফট আউট (মহঃ স্পোর্টিং)।

উয়াড়ী ক্লাবে এসেছেন:—বি পাল—ব্যাক (পুলিশ), বি দাশ—ফরোয়ার্ড (বি এন আর)।

কালীঘাট ক্লাবে এসেছেন:—সি ব্যানার্জি—গোল কিপার (মোহনবাগান), আর সিংহ—সেণ্টার ফরোয়ার্ড (ভবানীপুর), জে মিত্র—লেফট আউট (মোহনবাগান)।

খিদিরপুর ক্লাবে এসেছেন:—এস ঘোষ—গোলকিপার (মোহনবাগান), ডি মুখার্জি—হাফ ব্যাক (কালীঘাট), পি চ্যাটার্জি—হাফ ব্যাক (ভবানীপুর), এস ব্যানার্জি—রাইট আউট (ইস্টবেঙ্গল), আর রায়—ফরোয়ার্ড (জর্জ টেলিগ্রাফ), এ ব্যানার্জি—ফরোয়ার্ড (জর্জ টেলিগ্রাফ), আনোয়ার—ফরোয়ার্ড (মহঃ স্পোর্টিং)।

স্পোর্টিং ইউনিয়নে এসেছেন:—এস গুহ—ব্যাক (ভবানীপুর), বি চৌধুরী—ব্যাক (কালীঘাট), এম ঘোষ—ফরোয়ার্ড (ইস্টবেঙ্গল)।

জর্জ টেলিগ্রাফে এসেছেন:—এস দে—হাফ ব্যাক (ইস্টবেঙ্গল), ডি গোস্বামী—ফরোয়ার্ড (ই আই আর), সেলিম—সেণ্টার ফরোয়ার্ড (খিদিরপুর), এ সিংহ—সেণ্টার ফরোয়ার্ড (মোহনবাগান), বি বিশ্বাস—সেণ্টার ফরোয়ার্ড (ইস্টবেঙ্গল)।

ই আই রেল দলে এসেছেন:—পি ব্যানার্জি—রাইট আউট (এরিয়ান), বিশ্বনাথ—লেফট আউট (স্পোর্টিং ইউনিয়ন)।

এ ছাড়া দ্বিতীয় ডিভিশন লীগ চ্যাম্পিয়ন অরোরা ক্লাবে এসেছেন বি এন রেল দলের খ্যাতনামা লেফট আউট জি দাশ এবং দ্বিতীয় ডিভিশন লীগ টীম পোর্ট কমিশনার্সের পক্ষে 'ছাড়পত্রে' সহি করেছেন মোহনবাগান ক্লাবের রাইট ইন আর গুহ ঠাকুরতা। উল্লেখ করা যেতে পারে, আর গুহ ঠাকুরতা পোর্ট কমিশনার্সে চাকরি গ্রহণ করেছেন, আর অরোরা ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিশনের চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করে প্রথম ডিভিশনে খেলবার যোগ্যতা অর্জন করেছে।

* * *

জাতীয় হকিতে তৃতীয় দিন ফাইনাল খেলার কোন বিধান না থাকায় মাদ্রাজ ও সার্ভিস টীমের মধ্যে ফাইনাল খেলা দুই দিন অমীমাংসিতভাবে থাকবার পর দুই দলকেই যুগ্মভাবে ভারতের জাতীয় হকি চ্যাম্পিয়ন বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার ২৬ বছরের ইতিহাসে এ এক নূতন ঘটনা। বিজয়ীর পুরস্কার রঙ্গস্বামী কাপ ৬ মাস হিসাবে দুই দলের অধিকারে থাকবে। প্রথম ৬ মাস কোন্ দল কাপটি অধিকারে রাখবে তার মীমাংসার জন্য 'টসের' ব্যবস্থা করা হয়। ভাগ্যের খেলায় সার্ভিস টীমের অধিনায়ক ভোলা মাদ্রাজ অধিনায়ককে পরাভূত করে প্রথম ৬ মাস কাপটি অধিকারে রাখবার দাবী অর্জন করেন। জাতীয় হকিতে বিজয়ীর সম্মান অর্জন সার্ভিস টীমের পক্ষে নূতন ঘটনা নয়। ইতিপূর্বে ১৯৫৩ সালে তারা রঙ্গস্বামী কাপ লাভ করেছে, কিন্তু মাদ্রাজ এই সর্বপ্রথম হকিতে জাতীয় সম্মান অর্জন করলো। তবে এ সাফল্য ভারতীয় হকি ক্ষেত্রে তাদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রমাণ করেনি। সার্ভিস টীমের শরিক হিসাবেই তারা বিজয়ীর সম্মান লাভ করেছে। তবুও মাদ্রাজকে অভিনন্দন জানাই। অন্যান্য খেলাধুলোর সঙ্গে হকিতেও তারা উত্তরোত্তর পারদর্শিতা অর্জন করুক। এই প্রসঙ্গে মাদ্রাজের এবার রণজি প্রতিযোগিতায় ফাইনালে খেলবার কথাও উল্লেখ করা যেতে পারে। মাদ্রাজ এ বছর সর্বপ্রথম রণজি ফাইনালে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে।

জাতীয় হকিতে বাঙ্গলাকে এবার সেমি-ফাইনালে সার্ভিস টীমের কাছে হার স্বীকার করে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় গ্রহণ করতে হয়েছে। বাঙ্গলা ও সার্ভিসের সেমি-ফাইনাল খেলা দুই দিন অমীমাংসিতভাবে শেষ হবার পর তৃতীয় দিন সার্ভিস ২—১ গোলে জয়লাভ করে। তিন দিনের কোন দিনই বাঙ্গলা খারাপ খেলেনি। শেষ দিন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে অত্যন্ত প্রশংসার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বাঙ্গলা পরাজয় স্বীকার করে। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে বাঙ্গলাকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হয়েছে দুইটি কারণে। প্রথমত তাদের পরম নির্ভরযোগ্য লেফট ইন এইচ গুহ আগের খেলায় আহত হওয়ায় শেষ দিনের খেলায় অংশ
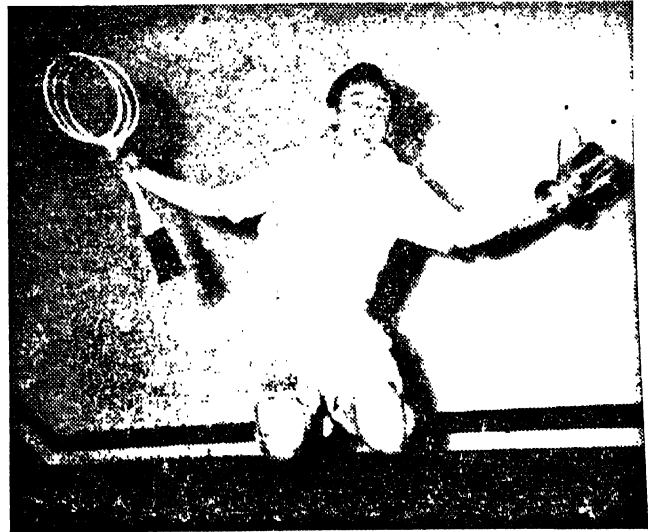
অল ইংলণ্ড ব্যাডমিণ্টনে গত দু' বছরের চ্যাম্পিয়ন এবং এবারের রানার্স এডি চুং

গ্রহণ করতে পারেন নি; দ্বিতীয়ত বাঙলার খ্যাতনামা সেণ্টার হাফ পেরেরাকে আম্পায়ার দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় মাঠ থেকে বের করে দেওয়ায় বাকী সময় বাঙলাকে ১০ জন খেলোয়াড়ের উপর নির্ভর করে প্রতিযোগিতা করতে হয়। খেলার আইনে আম্পায়ারের হাতে যথেষ্ট ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে, তার বলে তিনি প্রয়োজনানুযায়ী যে কোন খেলোয়াড়কে যে কোন সময়ে মাঠ থেকে বের করে দিতে পারেন, কিন্তু কোন খেলোয়াড় তথা দলকে চরম শাস্তি দানের আগে তাঁকে ভেবে দেখতে হবে খেলোয়াড় সত্যই মাঠ থেকে বহিষ্কার-যোগ্য অপরাধ করেছেন কি না? যতদূর জানা গেছে, পেরেরা এমন কিছু অপরাধ করেন নি, যার জন্য তাঁকে এই চরম শাস্তি ভোগ করতে হয়েছে। একটা বিতর্কমূলক সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তিনি নিজ খেলোয়াড়ের সঙ্গেই আলোচনা করছিলেন। আম্পায়ারকে কিছু বলেন নি, তাঁর উদ্দেশেও না। তবুও আম্পায়ার তাঁকে শাস্তি দিয়েছেন। যাই হোক, এটা আমাদের শোনা কথা এবং বাঙলার খেলোয়াড় এবং কর্মকর্তা-দের কাছ থেকেই শোনা কথা, ঘটনার প্রত্যক্ষ-দর্শী আমরা নই। হয়তো পেরেরার সত্যই দোষ ছিল। তবে জাতীয় হকির পরিচালনা যে এবার মোটেই ভাল হয়নি 'নাফেনের' এক সংবাদে একথা প্রকাশ পেয়েছে। জাতীয় হকি প্রতিযোগিতার জন্য মাদ্রাজে সমবেত বিভিন্ন দলের কর্মকর্তারা এক সভায় মিলিত হয়ে ত্রুটিপূর্ণ পরিচালনা সম্পর্কে আলাপ-আলোচনাও করেছেন। আগামী ২রা এপ্রিল বোম্বাইতে ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভায় এ বিষয়ে নাকি আরও আলোচনা হবে। সুষ্ঠু পরিচালনা খেলার প্রধান অঙ্গ। সুতরাং ভবিষ্যতে আম্পায়ারিংয়ে যাতে ত্রুটি দেখা না দেয় সেদিকে হকি ফেডারেশনের দৃষ্টি রাখা কর্তব্য।

* * *

মাদ্রাজে জাতীয় হকির অনুষ্ঠানকালে মাদ্রাজ হকি এসোসিয়েশনের উদ্যোগে ক্রীড়ানু-রাগীদের ভোটের দ্বারা ভারতের হকি খেলোয়াড়দের দক্ষতা ও জনপ্রিয়তা যাচাই করা হয়। এই ভোট ব্যবস্থায় বাঙলার অধিনায়ক এল ক্লডিয়াস সবচেয়ে বেশী ভোট পেয়ে শীর্ষস্থান অধিকার করেছেন। খেলো-য়াড়দের গুণাগুণে অনুযায়ী ক্রীড়ানুরাগী মহল যেভাবে ভারতের শ্রেষ্ঠ দল গঠন করেছেন ও খেলোয়াড়দের ভোট দিয়েছেন, নীচে তা প্রকাশ করছি। ১১ জন খেলোয়াড়কে মাদ্রাজ হকি এসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে একটি করে কাপ উপহার দেওয়া হয়েছে।

গোল—ফ্রান্সিস (মাদ্রাজ) ৫৪৪ ভোট।

ব্যাক—স্বরূপ সিং (সার্ভিস) ৪৩৬ ভোট; বালকিষণ (রেলওয়ে) ৪৬৮ ভোট।

হাফ ব্যাক—এল ক্লডিয়াস (বাঙলা) ৬৭৬ ভোট, উন্নিকৃষ্ণন (মহীশূর) ৪৩৫ ভোট ও বনসোদ (সার্ভিস) ৪২১ ভোট।

ফরোয়ার্ড—ভাস্করন (মহীশূর) ৪৩৩ ভোট, আনোয়ার (বাঙলা) ৫৩০ ভোট, সি এস গুরুং (বাঙলা) ৪৩১ ভোট, ম্যানুয়েল (সার্ভিস) ৪০৪ ভোট ও ভোলা (সার্ভিস) ৩৭৬ ভোট।

* * *

শেষ টেস্ট খেলায় নিউজিল্যাণ্ডকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করে শক্তিশালী ইংলণ্ড দল অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ডের ক্রিকেট সফর শেষ করেছে। অস্ট্রেলিয়া থেকে 'রাবার' লাভ করে এম সি সি দল নিউজিল্যাণ্ড যাত্রা করে। এখানে তাদের চারটি খেলায় অংশ গ্রহণের কথা ছিল। এই চারটি খেলাতেই

ডানলপ টেবিল টেনিসের চ্যাম্পিয়ন শম্ভু ভট্টাচার্য (ডান দিকে) ও রানার্স এস বসু

জয়লাভ করেছে ইংলণ্ড। দুটি টেস্টের প্রথম টেস্টে তারা পরাজিত করে নিউজিল্যাণ্ডকে ৮ উইকেটে, দ্বিতীয় এবং শেষ টেস্টে হারিয়েছে এক ইনিংস ২০ রানে। ইংলণ্ড ও নিউ-জিল্যাণ্ডের শেষ টেস্ট খেলার দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যাণ্ডের শোচনীয় ব্যাটিং-বিপর্যয় টেস্ট ক্রিকেটের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। টেস্ট ক্রিকেটের দীর্ঘ ইতিহাসে এত-দিন কোন দেশ যে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়নি, সেই ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে নিউজিল্যাণ্ড। দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ২৬ রানের মধ্যে নিউ-জিল্যাণ্ডের সকল খেলোয়াড় আউট হয়ে যায়। টেস্ট খেলায় এক ইনিংসে সবচেয়ে কম রান করার কলঙ্ক ছিল দক্ষিণ আফ্রিকার। ১৮৯৫-৯৬ সালে পোর্ট এলিজাবেথে এবং ১৯২৪ সালে 'এজবাসটনে' ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার ইনিংস মাত্র ৩০ রানে শেষ হয়, কিন্তু নিউজিল্যাণ্ড ২৬ রানে ইনিংস শেষ করে অকৃতিত্বের দিক দিয়ে এক নূতন রেকর্ডের সৃষ্টি করেছে। অথচ পিচের অবস্থা এমন ছিল না যাতে এই বিপর্যয় ঘটতে পারে। মাত্র ২৬ রানে নিউজিল্যাণ্ডের ইনিংস শেষ হওয়ায় এই কথাই আর একবার প্রমাণিত হল —'মহা অনিশ্চয়তাই ক্রিকেট খেলার বৈশিষ্ট্য' অবশ্য ইংলণ্ডের বোলিং সম্পদ এই সর্বনাশের প্রধান কারণ। ফাস্ট বোলার স্ট্যাথাম ও টাইসন এবং স্পিন বোলার এ্যাপলইয়ার্ড ও ওয়ার্ডলে মারাত্মকভাবে বোলিং করে এই বিপর্যয় সৃষ্টি করেছেন।

এ্যাংলো-অস্ট্রেলিয়ান টেস্টে উপর্যুপরি দুইবারের 'রাবার' বিজয়ী অধিনায়ক লেন হাটন এই সফরের শেষে টেস্ট খেলায় মোট ৬৯৭১ রান সংগ্রহ করেছেন। ডন ব্র্যাডম্যানের টেস্ট রান-সংখ্যা অতিক্রম করতে তাঁর আর মাত্র ২৫ রানের প্রয়োজন। আর ওয়াল্টার হ্যামণ্ড, যাঁর টেস্ট খেলার সমষ্টি রান-সংখ্যা আজ পর্যন্ত বিশ্বের কেউই অতিক্রম করতে পারেন নি, তাঁর রান অতিক্রম করতে হলে হাটনকে আরও ২৭৮ রান করতে হবে। ওয়াল্টার হ্যামণ্ড টেস্ট খেলায় ৭২৪৯ রান করবার পর অবসর গ্রহণ করেছেন।

হাটন যেমন এ সফরে ব্র্যাডম্যানের টেস্ট রান-সংখ্যা অতিক্রম করতে পারলেন না, তেমন পারলেন না গডফ্রে ইভান্স ক্যাচ ধরায় হ্যামণ্ডের টেস্ট রেকর্ড অতিক্রম করতে। তবে তিনি ১১০ জন ব্যাটসম্যানকে ক্যাচ ধরে আউট করে হ্যামণ্ডের রেকর্ডের সমান করেছেন। শ্লিপের ফিল্ডসম্যান হ্যামণ্ড ১১০ জন খেলোয়াড়কে ক্যাচ লুফে আউট করেছেন। উইকেট কিপার ইভান্স টেস্টে আর একজন খেলোয়াড়ের ক্যাচ লুফতে পারলে হ্যামণ্ডের রেকর্ড ভেঙ্গে দিতে পারবেন।

নীচে ইংলণ্ড ও নিউজিল্যাণ্ডের টেস্ট খেলার সংক্ষিপ্ত স্কোর বোর্ড ছাপা হল :—

ইংলণ্ড : নিউজিল্যাণ্ড—প্রথম টেস্ট

নিউজিল্যাণ্ড—প্রথম ইনিংস—১২৫ (বি সাটক্লিফ ৭৪; স্ট্যাথাম ২৪ রানে ৪, টাইসন ২৩ রানে ৩, বেলী ১৯ রানে ২ উইঃ)

ইংলণ্ড—প্রথম ইনিংস (৮ উইঃ ডিঃ)—২০৯ (কাউড্রে ৪২, গ্রেভনি ৪১; রিড ৪৬ রানে ৪, ম্যাকগিবসন ২৭ রানে ২ উইঃ)

নিউজিল্যাণ্ড — দ্বিতীয় ইনিংস—১৩২ (বি সাটক্লিফ ৩৫, জে রিড ২৮; টাইসন ১৬ রানে ৪, এ্যাপলইয়ার্ড ১৯ রানে ২ উইঃ)

ইংলণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস (২ উইঃ)—৪৯ (গ্রেভনি নট আউট ৩২)

(ইংলণ্ড ৮ উইকেটে বিজয়ী)

ইংলণ্ড : নিউজিল্যাণ্ড—দ্বিতীয় ইনিংস

নিউজিল্যাণ্ড—২০০ (জে রিড ৭৩, বি সাটক্লিফ ৪৯, জি র‍্যাবোন ২৯; স্ট্যাথাম ২৮ রানে ৪ উইঃ, এ্যাপলইয়ার্ড ৩৮ রানে ৩ উইঃ, টাইসন ৪১ রানে ২ উইঃ)

ইংল্যাণ্ড—২৪৬ (হাটন ৫৩, মে ৪৮; ময়ির ৬২ রানে ৫ উইঃ, হেস ৭১ রানে ৩ উইঃ)

নিউজিল্যাণ্ড—২য় ইনিংস—২৬ (বি সাটক্লিফ ১১; এ্যাপলইয়ার্ড ৭ রানে ৪ উইঃ,

স্ট্যাথাম ৯ রানে ৩ উইঃ, টাইসন ১০ রানে ২ উইঃ, ওয়ার্ডলে ০ রানে ১ উইঃ)

(ইংলণ্ড এক ইনিংস ও ২০ রানে বিজয়ী)

সপ্তাহের টুকরো খবর

৮৮০ গজ দৌড়ে নূতন বিশ্ব রেকর্ড—সানফ্রান্সিসকো অলিম্পিক ক্লাবের লুনি স্পুরিয়ার ৮৮০ গজ দৌড়ে নূতন বিশ্ব রেকর্ড করেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার এডওয়ার্ড স্টেডিয়ামে এক দৌড় প্রতিযোগিতায় তিনি ১ মিনিট ৪৭.৫ সেকেণ্ড সময়ে ৮৮০ গজ অতিক্রম করেন। ৮৮০ গজ দৌড়ে রেকর্ডের অধিকারী ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের এইচ হুইটফিল্ড ও ডেনমার্কের গানার নীলসেন। দুজনেরই ৮৮০ গজ দৌড়ের সময় ছিল ১ মিনিট ৪৮.৬ সেকেণ্ড।

আন্তর্জাতিক ফুটবল—ভিয়েনার এক আন্তর্জাতিক ফুটবল খেলায় চেকোশ্লোভেকিয়া ৩—২ গোলে অস্ট্রিয়াকে হারিয়ে দিয়েছে।

জেটোপেকের সাফল্য—প্যারিসে আয়োজিত ক্রস কাণ্ট্রি দৌড় প্রতিযোগিতায় অলিম্পিকে তিনটি স্বর্ণপদকের অধিকারী দূর পাল্লার দৌড়বীর এমিল জেটোপেক প্রথম স্থান অধিকার করেছেন। এই দৌড়ের দূরত্ব ছিল ১১৫০০ মিটারের কিছু বেশী। জেটোপেক [illegible] মিনিট ১৫ সেকেণ্ডে দূরত্ব অতিক্রম করেন। বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাশিয়ার খ্যাতনামা এ্যাথলীট ভ্লাডিমির কুজও এই দৌড়ের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তিনি ত্রয়োদশ স্থান অধিকার করেছেন।

আন্তঃ রেলওয়ে টেনিস—দিল্লীতে আন্তঃ রেলওয়ে টেনিস প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলায় ইস্টার্ন রেল ৩—১ খেলায় নর্থ ইস্টার্ন রেলকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছে।

ডানলপ টেবিল টেনিস—ডানলপ স্পোর্টস ক্লাবের টেবিল টেনিস প্রতিযোগিতায় গতবারের চ্যাম্পিয়ন শম্ভু ভট্টাচার্য ফাইনালে এস বসুকে ২১—১৯, ২১—১৭ ও ২১—১৮ পয়েন্টে হারিয়ে দিয়ে এ বছরও চ্যাম্পিয়নশিপ লাভ করেছেন।

লণ্ডনের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় নৌকো বাইচ—লণ্ডনের আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় নৌকো বাইচ প্রতিযোগিতার ফাইনালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়কে হারিয়ে বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছে। আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় নৌকো বাইচের দূরত্ব ছিল সাড়ে চার মাইল—'পাটনী' থেকে 'মটলেক' পর্যন্ত। এই প্রতিযোগিতায় কেম্ব্রিজ ১৬ লেংথে অক্সফোর্ডকে হারিয়েছে এবং তাদের সময় লেগেছে ১৯ মিনিট ১০ সেকেণ্ড। গতবার অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ই আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় নৌ-চালনায় বিজয়ীর সম্মান অর্জন করেছিল, এবারও তাদের জয়লাভ সম্পর্কে অভিজ্ঞ মহল খুবই আশাবাদী ছিলেন, সূচনায় অক্সফোর্ডের নৌকো বেশ কিছুদূর এগিয়েও গিয়েছিল, কিন্তু কেম্ব্রিজের নৌ-চালকেরা অপূর্ব দৃঢ়তার পরিচয় দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছেন।
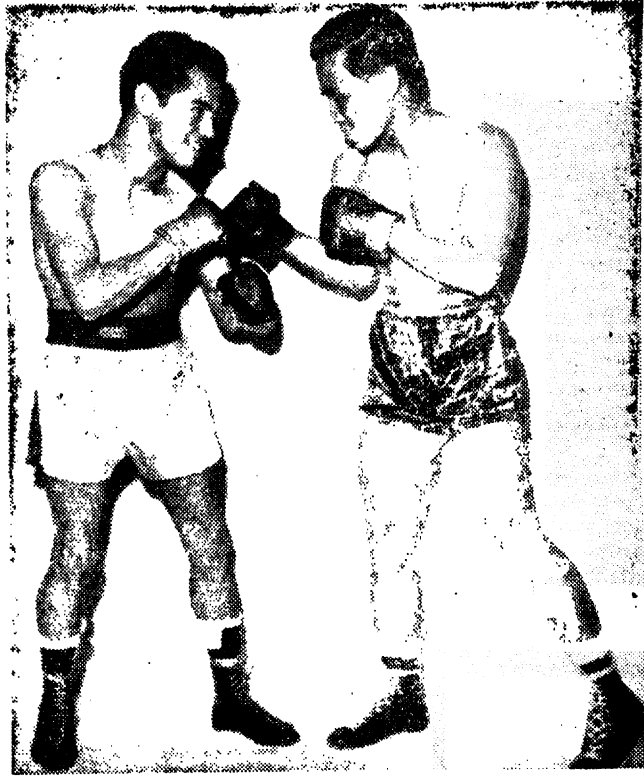
স্যানফ্রান্সিসকো জিমন্যাসিয়ামে ব্যাণ্টমওয়েটের দুই বিশ্বখ্যাত মুষ্টিযোদ্ধা। মেক্সিকোর মুষ্টিক আর মেকিয়াস আইল্যাণ্ডের মুষ্টিক সাংকটাটকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়নসিপ লাভ করেছেন

দেশী সংবাদ

২১শে মার্চ— কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী শ্রীচিন্তামন দেশমুখ ইতিপূর্বে নূতন কর ধার্যের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, অদ্য উহার দুইটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। মোটা ও মাঝারি বস্ত্রের উৎপাদন শুল্ক বর্গ গজ প্রতি এক আনা বৃদ্ধি করা হইলে দরিদ্র জনসাধারণের অসুবিধা হইবে বলিয়া যে অভিমত ব্যক্ত করা হইয়াছে, অর্থমন্ত্রী উহার যৌক্তিকতা স্বীকার করিয়া লন এবং বর্গ গজ প্রতি উৎপাদন শুল্কের হার দুই পয়সা হ্রাস করিতে সম্মত হন। অর্থমন্ত্রী বলেন, সেলাই কলের উপর উৎপাদন শুল্ক আদায়ের সংকল্প ত্যাগ করা হইয়াছে।

আজ পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভায় বাজেট আলোচনার পরিসমাপ্তি ঘটে। এই দিন বাজেট বিতর্ককালে বিরোধীপক্ষ চিকিৎসা ও জনস্বাস্থ্য সম্পর্কে সরকারী নীতির তীব্র সমালোচনা প্রসঙ্গে কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতালে অব্যবস্থা ও রোগীর প্রতি অবহেলার প্রতিবিধান এবং পল্লী অঞ্চলে সুতীব্র জলাভাবের আশু প্রতিকারের দাবী জানান।

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু আজ নয়াদিল্লীতে ইণ্ডিয়ান এণ্ড ইস্টার্ন নিউজ পেপার সোসাইটী ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন।

পুরীর এক সংবাদে প্রকাশ, অদ্য আচার্য বিনোবা ভাবের দলের জনৈক ফরাসী মহিলাকে জগন্নাথদেবের মন্দিরে প্রবেশ করিতে না দেওয়ায় আচার্য ভাবে মন্দিরে প্রবেশ করিতে অসম্মত হন।

২২শে মার্চ—অদ্য রাজ্যসভায় হিন্দু উত্তরাধিকার বিল সিলেক্ট কমিটিতে প্রেরণের জন্য আইন দপ্তরের মন্ত্রী শ্রী এইচ ভি পটাশকর কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনা হয়। কয়েকজন বক্তা পৈতৃক সম্পত্তির উত্তরাধিকারে পুত্রের সহিত কন্যার সমান অধিকারের প্রয়োজনীয়তার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন।

ভারত সরকারের পূর্ত, গৃহনির্মাণ ও সরবরাহ মন্ত্রণালয়ের ১৯৫৪-৫৫ সালের বার্ষিক বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে দেখা যায়, মধ্য-আয়বিশিষ্ট কর্মীদের গৃহনির্মাণ পরিকল্পনা বর্তমানে এই মন্ত্রণালয়ের বিবেচনাধীন আছে। বীমা কোম্পানীগুলির সহযোগিতায় এই পরিকল্পনা কার্যকরী করার প্রস্তাব হইয়াছে। অল্প আয়বিশিষ্ট কর্মীদের গৃহ নির্মাণ পরিকল্পনায় বার্ষিক অনধিক ৬,০০০, টাকা আয়বিশিষ্ট কর্মীদিগকে রাজ্য সরকার কর্তৃক গৃহনির্মাণ বাবদ ঋণ দিবার ব্যবস্থা আছে।

২৩শে মার্চ—প্রথম শ্রেণীর এক সর্ব-ভারতীয় প্রতারক দল কিভাবে দীর্ঘকাল যাবৎ সহস্র সহস্র ভুয়া লটারীর টিকিট ছাপাইয়া এবং ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করিয়া জনসাধারণের যে ৮ লক্ষ টাকা আত্মসাৎ করিয়াছে, সম্প্রতি তাহার চাঞ্চল্যকর তথ্য উদ্ঘাটিত হইয়াছে।

সাপ্তাহিক সংবাদ

প্রধান মন্ত্রী শ্রী নেহরু বেকার সমস্যা সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন, যদি সব কল-কারখানাগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলা যাইত তাহা হইলে তিনি ভারতের প্রত্যেক লোকের জন্য কর্মের সংস্থান করিতে পারিতেন। কিন্তু তাহার ফলে জনসাধারণের জীবনযাত্রার মান অবনমিত হইবে। শ্রীনেহরু বলেন, "আমি চাই, একই সঙ্গে জীবনযাত্রার উচ্চ মান এবং কর্মসংস্থান।"

পূর্ববঙ্গ হইতে উদ্বাস্তুর আগমন বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশব্যাপী যে গভীর উদ্বেগের সঞ্চার হইয়াছে, অদ্য লোকসভায় পুনর্বাসন দপ্তরের ব্যয় মঞ্জুরি সংক্রান্ত আলোচনাকালে বিভিন্ন বক্তৃতায় তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে। নয়াদিল্লীতে প্রাপ্ত সর্বশেষ হিসাবে প্রকাশ, গত ছয় মাসে পূর্ববঙ্গ হইতে লক্ষাধিক উদ্বাস্তু ভারতে চলিয়া আসিয়াছে।

কলিকাতায় একটি শিল্প মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠা এবং ধানবাদে একটি খনি গবেষণা-কেন্দ্র স্থাপন প্রভৃতি কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব নয়াদিল্লীতে শিল্পবিজ্ঞান গবেষণা পরিষদের সভায় গৃহীত হইয়াছে।

২৪শে মার্চ—আজ লোকসভায় পুনর্বাসন মন্ত্রী শ্রীমেহেরচাঁদ খান্না পাকিস্থানের সংবাদ-পত্রে পূর্ববঙ্গের হিন্দু বাস্তুত্যাগীদের সম্পর্কে প্রকাশিত সংবাদের কঠোর ভাষায় নিন্দা করেন। এই সংবাদে বলা হইয়াছে যে, ভারতে পুনর্বাসন দপ্তরের আর্থিক সাহায্যে প্রলুব্ধ হইয়া হিন্দুরা পূর্ববঙ্গ ছাড়িয়া চলিয়া যাইতেছে। শ্রী খান্না বিতর্কের উত্তরে বলেন, পূর্ব পাকিস্থানের সংখ্যালঘুদের মনে নিরাপত্তার ভাব ফিরাইয়া আনিবার জন্য কিছু করা যাইতে পারে কিনা তাহা আমি স্বচক্ষে দেখিবার জন্য সেখানে যাইতে চাই।

২৫শে মার্চ—সুপ্রসিদ্ধ কংগ্রেস নেতা ও একনিষ্ঠ দেশসেবক শ্রীসতীন সেন আজ রাত্রে ঢাকা সেণ্ট্রাল জেলে বন্দিদশায় পরলোকগমন করিয়াছেন। তিনি অকৃতদার ছিলেন।

আজ পুরীতে সমুদ্রতীরে এক অপূর্ব সমাবেশে শ্রীরবিশংকর মহারাজের সভাপতিত্বে নিখিল ভারত সর্বোদয় সম্মেলনের সপ্তম অধিবেশন আরম্ভ হয়। রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাজেন্দ্র প্রসাদ, কংগ্রেস সভাপতি শ্রীধেবর প্রমুখ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরু লোকসভায় ঘোষণা করেন যে, ভারতের তিনটি সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান সেনাপতিত্রয় এখন হইতে যথাক্রমে স্থল সেনাপতিমণ্ডলীর অধ্যক্ষ, নৌ সেনাপতি-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ এবং বিমান সেনাপতি-মণ্ডলীর অধ্যক্ষ নামে অভিহিত হইবেন। প্রধান মন্ত্রী বলেন, ইহা দ্বারা তাঁহাদের মর্যাদা বা ক্ষমতা কোন প্রকারেই হ্রাস করা হয় নাই।

২৬শে মার্চ—গতকাল রাত্রে ব্রহ্মের প্রধান মন্ত্রী উ নু নয়াদিল্লীতে পৌঁছিবার অব্যবহিত পরই প্রধান মন্ত্রী শ্রীনেহরুর সহিত আলোচনা বৈঠকে মিলিত হন।

পুরুলিয়ার সংবাদে প্রকাশ, গতকল্য বড়বাজার স্কুল কমিটির অধিকার হরণের বিরুদ্ধে শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা দেবীর নেতৃত্বে লোকসেবক সঙ্ঘের একশতাধিক কর্মী শান্তি-পূর্ণভাবে ও অহিংস উপায়ে প্রতিবাদ আন্দোলন শুরু করিয়াছেন।

২৭শে মার্চ—অদ্য পুরীতে সর্বোদয় সম্মেলনের তিন দিবসব্যাপী অধিবেশন শেষ হইয়াছে। সম্মেলনে আগামী দুই বৎসরে একাগ্রচিত্তে ভূদান যজ্ঞে সর্বশক্তি নিয়োগের জন্য জনসাধারণের নিকট আবেদনের আকারে সর্বসেবা সঙ্ঘের একটি প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে।

বিদেশী সংবাদ

২১শে মার্চ—গত ২৪শে অক্টোবর পাক গণপরিষদ ভাঙ্গিয়া দেওয়া সম্পূর্ণ বৈধ হইয়াছে বলিয়া আজ পাকিস্থান ফেডারেল কোর্ট রায় দান করিয়াছেন।

২২শে মার্চ—নিউ ইয়র্ক বেতারে ঘোষিত হইয়াছে যে, আজ একখানা সৈন্যবাহী সামরিক বিমান হাওয়াই দ্বীপের পর্বতপার্শ্বে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। বিমানখানায় ৯১ জন যাত্রী এবং ৭ জন কর্মচারী ছিল; কাহারও প্রাণরক্ষা পায় নাই।

২৫শে মার্চ—অদ্য সিন্ধুর খুরো মন্ত্রি-সভার আরও তিনজন বিরোধীকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হত্যার ষড়যন্ত্রের অভিযোগ সম্পর্কে তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে বলিয়া প্রকাশ।

২৭শে মার্চ—পাকিস্থানের গভর্নর জেনারেল জনাব গোলাম মহম্মদ অদ্য দেশের সর্বত্র জরুরী অবস্থা ঘোষণা করিয়াছেন। গভর্নর জেনারেল একটি অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া পশ্চিম পাকিস্থানের বিভিন্ন প্রদেশ লইয়া একটি ইউনিট গঠনের এবং পূর্ববঙ্গকে পূর্ব পাকিস্থান প্রদেশরূপে অভিহিত করার ক্ষমতা স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রতি সংখ্যা—।৶০ আনা, বার্ষিক—৫০, ষান্মাসিক—১০,
স্বত্বাধিকারী ও পরিচালক : আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড, ১নং বর্মন স্ট্রীট, কলিকাতা, শ্রীরামপদ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক
৫নং চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিমিটেড হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সূচীপত্র

সূচীপত্র

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা

প্রচ্ছদ ফটো ॥ অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির ॥

শ্রীঅমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কোন মেয়েগুলি সব চেয়ে সুন্দরী?
আর জিতে নিন্
প্রবেশমূল্য লাগবে না
টাকা ২০০০০
রেক্সোনা সৌন্দর্য্য প্রতিযোগিতা
শেষ তারিখ- ১৬ই মে, ১৯৫৫ সাল
আপনাকে যা ক'রতে হবে তা হোল, একটী প্রবেশপত্র যোগাড় করা আর তাতে যে নয়টী সুন্দরী মেয়ের ফটো দেওয়া আছে তা মনোযোগ দিয়ে দেখা। তারপর আপনার মত অনুযায়ী এদের সৌন্দর্য্য ও শোভা'র যথাযথ পারম্পর্য্যে বসিয়ে যেতে হবে।
আপনার পছন্দ যদি বিশেষ বিচারকমণ্ডলীর নির্দ্ধারিত ক্রমের সঙ্গে মিলে যায় তা হলে আপনি প্রথম পুরস্কার পেয়ে যাবেন। এর কোন প্রবেশমূল্য নেই—কেবল একটী রেক্সোনা সাবানের মোড়ক প্রতি সমাধানের সঙ্গে পাঠালেই হোল'।
একটী সাধারণ আকারের রেক্সোনা সাবনের মোড়ক (কিম্বা তিনটী ছোট সাইজ সাবানের মোড়ক) প্রতি সমাধানের সঙ্গে পাঠান—একটী বড় সাইজের মোড়ক আপনাকে দুইটী সমাধান পাঠাবার অধিকার দেবে।
রেক্সোনা
ক্যাডিলযুক্ত একমাত্র সাবান
প্রত্যেকেই যোগ দিতে পারেন (বোম্বাই রাজ্যে যাঁরা আছেন তাঁরা ছাড়া)
রেক্সোনা বিক্রেতার কাছ থেকে একটী প্রবেশপত্র চেয়ে নিন্।
A
B
C
D
E
F
J
H
K
RP. 129-X52 BG
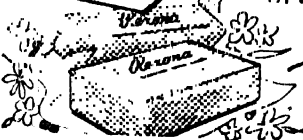
সম্পাদক—শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র সেন
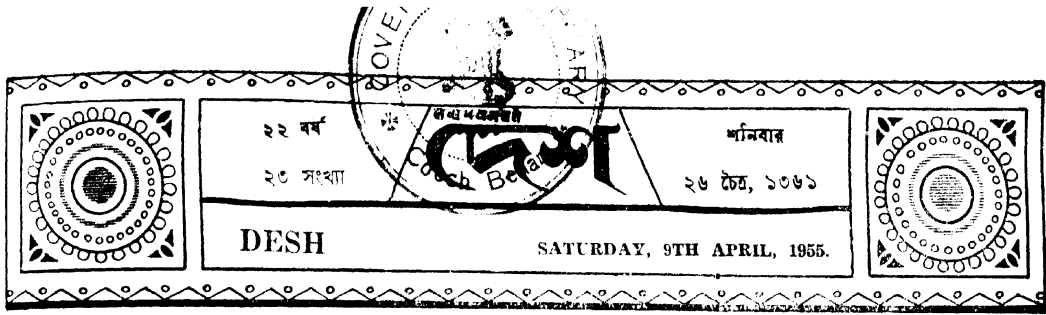
সহকারী সম্পাদক—শ্রীসাগরময় ঘোষ

মালদহ-সম্মেলন

মালদহে পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিক সম্মেলনে কংগ্রেস-সভাপতি শ্রী ধেবর পশ্চিমবঙ্গের গৌরবময় ঐতিহ্যের অবতারণা করায় আমরা অনুপ্রাণিত হইয়াছি। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব, স্বামী বিবেকানন্দ, রাজা রামমোহন, রবীন্দ্রনাথ ইঁহাদের সাধনা এবং অবদানের প্রভাবে ভারতের সংস্কৃতির উদ্দীপ্তির প্রসঙ্গ আলোচনা করিয়া জাতির মুক্তি সাধনায় এখানকার আত্মদাতা বীরগণের প্রতিও তিনি বিশেষভাবে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। প্রকৃতপক্ষে নবভারত গঠনে বাঙলার সাধনা এবং অবদান অনস্বীকার্য। ভারতবাসী হইয়া কে তাহা বিস্মৃত হইবে? কিন্তু দেশ বিভক্ত হইবার ফলে বাঙালী সমাজ বর্তমানে এমনই বিপর্যস্ত অবস্থায় পতিত যে, অতীতের সেই গৌরবময় ঐতিহ্যের স্মৃতি তাহাদের মনে জাতির অগ্রগতির পথে যথেষ্ট গতিবেগ সঞ্চার করিতে সমর্থ হইতেছে না। সমগ্র ভারতের বৃহত্তম স্বার্থের প্রেরণা এবং তদুদ্দেশ্যে প্রযুক্ত প্রচেষ্টার সহিত বাঙলার স্বার্থকে অবিচ্ছিন্ন সূত্রে গ্রথিত করিবার দিকে কেন্দ্রীয় সরকারের আন্তরিকতাই এ অবস্থায় বাঙলার প্রাণবল জাগাইয়া তুলিতে পারে। সম্মেলনের সভাপতিস্বরূপে কেন্দ্রীয় পরিবহন সচিব শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী এ সম্বন্ধে আমাদিগকে কিছু কিছু আশার বাণী শুনাইয়াছেন। খেজুরিয়ার সঙ্গে মালদহের সংযোগ সাধন করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই একটি রেলপথ খোলা হইবে একথা তিনি জানাইয়াছেন। ফারাক্কায় গঙ্গার উপর সেতুপথ নির্মাণের সম্বন্ধে সরকারী বিবেচনার কথা আমরা তাঁহার মুখে শুনিয়াছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের সমস্যা যেরূপ ব্যাপক, তাহাতে সমগ্রভাবে শিল্পোন্নয়ন প্রচেষ্টা একান্তই প্রয়োজন হইয়াছে এবং এক্ষেত্রে একথাও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবনের সঙ্গে সঙ্গে বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের প্রতিষ্ঠা করাও আবশ্যক। কারণ সেই পথেই পশ্চিমবঙ্গের বেকার সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে। দুর্গাপুরে শিল্প সম্প্রসারণ পরিকল্পনার গুরুত্ব এই দিক হইতে রহিয়াছে। ফরাক্কার উপর গঙ্গার বাঁধ নির্মাণের প্রয়োজনীয়তা সমধিক এবং শুধু সেতু নির্মাণে এই প্রয়োজন মিটিবে না। দুঃখের বিষয়, শ্রীযুত শাস্ত্রী এ সম্বন্ধে আমাদিগকে লিখিতভাবে কোন কথাই দিতে পারেন নাই। গঙ্গার এই বাঁধের উপর বন্দর হিসাবে কলিকাতার অস্তিত্ব এবং সেই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের বিপুল অঞ্চলের উৎপাদন ক্ষমতা বিশেষভাবে নির্ভর করিতেছে। বিশেষজ্ঞগণ ফরাক্কার বাঁধের গুরুত্বের প্রতি ইতিপূর্বেই কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে এই বাঁধ নির্মাণের দ্বারা গঙ্গায় জল সরবরাহের ব্যবস্থা যদি না করা হয়, তবে ১০ বৎসরের মধ্যে কলিকাতা শহরের জলপথ রুদ্ধ হইবে এবং শুকনা ডাঙ্গায় কলিকাতা ধ্বংসের পথে পড়িবে। প্রকৃতপক্ষে বাঁধের এমন গুরুত্বের প্রতি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি বারংবার আকর্ষণ করা সত্ত্বেও তাঁহারা এ পর্যন্ত এই কাজে উৎসাহ বা আন্তরিকতা প্রদর্শন করেন নাই। এখন শোনা যাইতেছে যে, দুর্গাপুর শিল্পোন্নয়ন এবং ফরাক্কার উপর বাঁধ নির্মাণ এই দুইটি আগামী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত করিবার সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ বিবেচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের এই প্রবৃত্তির পরিণতি কি দাঁড়াইবে এবং প্রস্তাব দুইটি কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ গ্রহণ করিলেও দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মধ্যে এই দুইটিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হইবে কি না, এখনও এ প্রশ্ন অমীমাংসিত রহিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিক সম্মেলনে এই বিষয়ের প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের দৃষ্টি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাবের দ্বারা আকর্ষণ করা হইয়াছে। ফলত দেশ বিভাগের ফলে জীবনমরণ সমস্যায় পতিত পশ্চিমবঙ্গ তাহার সমুন্নতি সাধনে কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের আগ্রহ একান্তভাবে উদ্দীপ্ত দেখিতে চায়। নতুবা শুধু গৌরবময় ঐতিহ্যের কথা শুনিয়া তৃপ্ত থাকিবার উপযোগী প্রতিবেশ বাঙালী বর্তমানে পাইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গ রাজনীতিক সম্মেলনে এই সহজ সত্যটি যদি উন্মুক্ত হইয়া থাকে, তবেই ইহার সার্থকতা।

আসামে বঙ্গ বিরোধী আন্দোলন

আসামের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুত বিষ্ণুরাম মেধী সেখানকার বাজেট অধিবেশনের এক

প্রশ্নোত্তরে কুখ্যাত 'বঙ্গাল খেদা' আন্দোলনের নিন্দা করেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলিয়াছিলেন, 'বঙ্গাল খেদার' কথা বিধান-সভার কোন সদস্যের মুখেই উচ্চারিত হওয়া উচিত নহে। এমন কথা শুনিয়া আমরা ভরসা পাইয়াছিলাম। কিন্তু সম্প্রতি আসাম হইতে যেসব সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহাতে আমাদের এই আশা -আশংকায় পরিণত হইয়াছে। রাজ্য পুনর্গঠন কমিশনের আসাম সফরের প্রাক্কালে সেখানকার একদল লোক অতিমাত্রায় চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদের হিতাহিত জ্ঞান পর্যন্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। তাহারা প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছে যে, গোয়ালপাড়ায় বাঙালীদের স্থান নাই। উদ্বাস্তুরা যদি গোয়ালপাড়া ত্যাগ না করে, তবে তাহাদের রক্তপাতের আবশ্যক হইবে, হুমকির মাত্রা ইতিমধ্যে এ পর্যন্তও গিয়া পৌঁছিয়াছে। সংবাদে প্রকাশ, একদল যুবক ধুবড়ী শহরের দোকানে গিয়া বাঙলা অক্ষরে লিখিত সাইন বোর্ড অপসারণের নির্দেশ দিয়াছে। এই নির্দেশে তাহারা বলিয়াছে যে, বাঙলা অক্ষরে লিখিত সাইন বোর্ডগুলি অপসারিত না হইলে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম আরম্ভ হইবে! এইরূপ প্রচারকার্যের পরিণাম কি দাঁড়ায় আমরা বিহারের ঘটনাবলীতে তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া মর্মাহত হইয়াছি। একই ভারত রাষ্ট্রে প্রাদেশিকতার এইরূপ অতি ঘৃণ্য বিদ্বেষবুদ্ধি জাতি হিসাবে আমাদের লজ্জার কারণ সৃষ্টি করিতেছে; শুধু তাহাই নহে আমাদের নিজেদেরই সর্বনাশের পথ এতদ্দ্বারা উন্মুক্ত হইতেছে। বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিতে এই ধরনের দৌরাত্ম্যগুলি পড়িতেছে না। স্বয়ং ভারতের প্রধান মন্ত্রী এবং কংগ্রেসের নেতৃবর্গের মুখে প্রাদেশিকতার নিন্দা আমরা সর্বত্রই শুনিয়াছি। মালদহেও কংগ্রেস-সভাপতি এবং ভারতের পরিবহন সচিব প্রাদেশিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে কংগ্রেস-কর্মীদিগকে উপদেশ দিয়াছেন। অথচ বাঙালীর বিরুদ্ধে বিদ্বেষ সৃষ্টির অপকার্যে প্রধানত কংগ্রেসকর্মীদিগকেই অগ্রণী হইতে দেখা যায়। বিহারে আমরা তাহাই দেখিয়াছি, আসামেও দেখিতেছি সেই একই ব্যাপার। এ সম্বন্ধে কংগ্রেস কর্মীদিগকে যথেষ্ট রকমে নৈতিক দায়িত্বে সচেতন করিবার কেহ নাই। আসাম হইতে বাঙালী বিতাড়নের এই উৎকট মনোবিকার যাহাতে বিলুপ্ত হয়, অবিলম্বে সেইরূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হওয়া প্রয়োজন।

পাকিস্থানের নূতন পরিস্থিতি

সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফফর খান পশ্চিম পাকিস্থানকে এক ইউনিটরূপে গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করেন না। তাঁহার অভিমত এই যে, পশ্চিম পাকিস্থানের বিভিন্ন ভাষাভাষীদের অভিমত গ্রহণ করিয়াই এ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত করা সমীচীন। এদিকে তাঁহার ভ্রাতা ডাঃ খান সাহেব এক ইউনিট গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করিয়াছেন। অধিকন্তু তাঁহাকে পশ্চিম-পাকিস্থানের মুখ্যমন্ত্রীও নিযুক্ত করা হইয়াছে। কিন্তু সেজন্য গফফর খানের মতের পরিবর্তন ঘটিবে বলিয়া মনে হয় না; কারণ তিনি সংকল্পশীল পুরুষ এবং আগাগোড়াই তিনি জনমতের সমর্থন করিয়া আসিতেছেন। তিনি জনসেবক। খান আবদুল গফফর খান নিজে পাঠান, এই হিসাবে পাখতুনীদের সঙ্গে তাঁহার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রহিয়াছে। পাখতুনীরা পশ্চিম পাকিস্থানকে এক ইউনিটে পরিণত করিবার বিরোধী। তাঁহারা ভাষাকে ভিত্তি করিয়া স্বায়ত্তশাসনের অধিকার চাহেন। আফগান সরকার তাঁহাদের প্রস্তাবের প্রবল সমর্থক। তাঁহারা ইতিমধ্যেই পাকিস্থান সরকারকে জানাইয়া দিয়াছেন যে, পাখতুনীস্থানের ভাগ্য-নির্ধারণের অধিকার একান্তভাবে পাখতুনীদের হাতেই ন্যস্ত এবং ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতির অধিকারীরূপে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের পরিপূর্ণ অধিকার তাহাদের রহিয়াছে। পাকিস্থানের প্রধান মন্ত্রী মিঃ মহম্মদ আলী আফগান সরকারের প্রস্তাব মানিয়া লইতে প্রস্তুত হন নাই। তিনি বলিয়াছেন, পশ্চিম পাকিস্থানের একীকরণ পাক সরকারের নিজস্ব ঘরোয়া ব্যাপার; সুতরাং ইহা বহিঃশক্তির হস্তক্ষেপের সম্পূর্ণ অযোগ্য। পাক-প্রধানমন্ত্রী জনগণের অভিমত অনুসারে যদি এক ইউনিট গঠনে প্রবৃত্ত হইতেন, তবে অবশ্য এই সমস্যার কোন কারণ ঘটিত না।

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

"ইউনাইটেড প্রেস" নামক সংবাদ পরিবেশনা প্রতিষ্ঠানের ম্যানেজিং ডিরেক্টর বি খ্যা ত সাংবাদিক শ্রীবিধুভূষণ সেনগুপ্ত তাঁহার দীর্ঘ চল্লিশ বছরের সাংবাদিক জীবনের অভিজ্ঞতা লিপিবন্ধ করিয়াছেন। এই ইতিবৃত্ত "সাংবাদিকের স্মৃতিকথা" নামে আগামী সপ্তাহ হইতে দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে। —সম্পাদক "দেশ"

দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ

গত ৪ঠা এপ্রিল দীনবন্ধু সি এফ এণ্ড্রুজের পঞ্চদশ মৃত্যুতিথি শান্তি-নিকেতনের আশ্রমি সঙ্ঘ কর্তৃক উদ্‌যাপিত হইয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অগণিত বিদেশী বন্ধুদের মধ্যে এণ্ড্রুজ ছিলেন অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের কাছে এই ইংরেজ সন্ন্যাসী ছিলেন যীশু খৃীষ্টের মানবপ্রেমের মূর্ত প্রতীক—তাই তিনি দীনবন্ধুর নামের আদ্যাক্ষর সি এফ এ লইয়া নূতন নাম-করণ [illegible] ক্রাইস্টস্ ফেথফুল এপস্‌ল। খৃীষ্টের বিশ্বস্ত ভক্ত-সাধক। এই মানবপ্রেমিক মানুষটির চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ও মাধুর্য রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত এই তিনটি কথায় যেমন সুন্দরভাবে শ্রদ্ধার সহিত ব্যক্ত হইয়াছে, পাতার পর পাতা লিখিলেও তাহা হইবার নহে। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের শান্তিনিকেতনে যোগদান উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ যে কথা লিখিয়াছিলেন, তাহা সমগ্র ভারতেরই মর্মের কথা। সেই কথাই এখানে উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই মহাপুরুষকে শ্রদ্ধানত চিত্তে স্মরণ করিতেছি!

> প্রতীচীর তীর্থ হতে প্রাণরসধারা
> হে বন্ধু এনেছ তুমি, করি নমস্কার।
> প্রাচী দিল কণ্ঠে তব বরমাল্য তার
> হে বন্ধু গ্রহণ করো, করি নমস্কার।
> খুলেছে তোমার প্রেমে আমাদের দ্বার
> হে বন্ধু প্রবেশ করো, করি নমস্কার।
> তোমারে পেয়েছি মোরা দানরূপে যাঁর
> হে বন্ধু, চরণে তাঁর করি নমস্কার।

লোকশিল্পের সংরক্ষণ ও সরকারী উদ্যম

প্রভাতকুমার দত্ত

কিছুদিন আগে খবর পাওয়া গিয়েছিল যে, ভারত সরকার দিল্লীতে লোকশিল্পের একটি সংগ্রহশালা স্থাপন করার জন্য বাংলার এক বিশিষ্ট শিল্পজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেছেন। এ-খবরটি আনন্দের সন্দেহ নেই। ইউরোপ, আমেরিকা ও রাশিয়ার শিল্পকলাকেন্দ্রগুলিতে পুরাতত্ত্ব বা সূক্ষ্ম কলার (Fine Art) সংগ্রহের সঙ্গে সঙ্গে লোকশিল্পের সংগ্রহও সমান মর্যাদা পেয়েছে। ঐ সমস্ত সংগ্রহশালার নিদর্শনগুলি পর্যবেক্ষণ করে আমরা ইউরোপ, আমেরিকা বা রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের পোশাক-পরিচ্ছদ, হাব-ভাব, আচার-অনুষ্ঠান প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারি। অনেকটা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রয়োজন হতে উদ্ভূত বলে লোকশিল্পের দৃষ্টান্ত থেকে এই ধরনের তথ্য সংগ্রহের সুযোগ আছে। কিন্তু ভারতবর্ষে লোকশিল্পের কোন সংগ্রহশালা না থাকায় বহুজাতির এই মহাদেশের মানুষকে জানার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম থেকে আমরা বঞ্চিত। কাশ্মীরী, মালাবারী কি মণিপুরীদের যদি প্রকৃত জানতে হয়, তবে তাদের হাতের কাজের সঙ্গে পরিচিত হতে হবে। লোকশিল্পের এ পর্যন্ত যে সংগ্রহ হয়েছে, তা সবই ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায়। উৎসাহী কিছু কিছু শিল্পরসিক অশেষ পরিশ্রম করে নানা স্থান ঘুরে গ্রামের মানুষের হাতের কাজ সংগ্রহ করেছেন। সাধারণের পক্ষে লোকশিল্পের সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এই ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাগুলিই একমাত্র মাধ্যম। অবশ্য ব্যক্তিগত সংগ্রহশালাগুলিই যে সব সময় ভালোভাবে সংরক্ষিত, তা মোটেই নয়। উদাহরণস্বরূপ আমরা স্বর্গীয় গুরুসদয় দত্তের বাংলার লোকশিল্পের মূল্যবান সংগ্রহের বর্তমান দুরবস্থার কথা উল্লেখ করতে পারি। তাঁর সংগ্রহ সংরক্ষণের এমন কোন সুবন্দোবস্ত এখনও সম্ভব হলো না, যার ফলে সাধারণে সেগুলি সহজে অনুধাবন করতে পারেন। শুধু বাংলা দেশে নয়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে লোকশিল্পের অজস্র নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে, যা কয়েকজন আগ্রহশীল ব্যক্তির প্রচেষ্টায় সংগ্রহ করা গেলেও তাঁদের পক্ষে সাধারণের ব্যবহার উপযোগী করে সংরক্ষণ করা সম্ভব নয়। এজন্যই সরকারী উদ্যমে লোকশিল্পের সংগ্রহশালা স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

'দেশ' পত্রিকা সংক্রান্ত সকল প্রকার সম্পাদকীয় চিঠিপত্র, রচনাদি ও বিজ্ঞাপন এখন হইতে ৬ ও ৮ সুটারকিন স্ট্রীট, কলিকাতা—১৩ এই ঠিকানায় পাঠাইবেন। ফোন নং সিটি ২২৮৩-৮৯ (৭ লাইন)।

লোকশিল্পের সংগ্রহশালা থাকলে মানুষের নিজের দেশ ও জাতিকে জানার ঔৎসুক্য বাড়ে; শিল্প-শিক্ষার্থীরা নানা বৈচিত্র্যময় শিল্পবস্তু চর্চার সুযোগ পান; লোকশিল্পের নক্শা ও সজ্জারীতি দৈনন্দিন প্রয়োজনের জিনিস তৈরীতে ব্যবহার করা চলে। কেউ কেউ একথা বলেন যে, লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন সম্ভব নয়, কারণ যে অবস্থা আর পরিবেশের মধ্যে এর বিকাশ তা আজ অনুপস্থিত। আমার মতে এটা ভুল ধারণা। কারণ লোকশিল্পের বর্তমান দুরবস্থার জন্য দায়ী হচ্ছে গ্রামের মানুষের হাতের কাজের সঙ্গে আমাদের অপরিচয় এবং ঐ সমস্ত জিনিসের সুষ্ঠু বিক্রয়-ব্যবস্থার অভাব। প্লাস্টিকের হাজারো জিনিস তৈরী হচ্ছে বলে আমাদের গৃহসজ্জায় পুতুল, অঙ্কিত মাটির বা কাঠের পাত্র, আলপনার নক্শা-করা কাজ প্রভৃতি কিছুর প্রয়োজন নেই, একথা আমরা বলতে পারি না। প্লাস্টিক প্রয়োজন মেটাতে পারে, কিন্তু রস বা সৌন্দর্যের খোরাক তাতে নেই। লোকশিল্পের আজও যেটুকু বেঁচে রয়েছে, তার সঙ্গে প্রকৃত পরিচয় ঘটলে আমাদের ঘরে গ্রাম্য শিল্পীর কাজ স্থান পাওয়া মোটেই বিচিত্র নয়। এর একটা সুস্পষ্ট দৃষ্টান্ত আমরা এখানে উপস্থিত করছি। দেশবিভাগের পর অনেক উদ্বাস্তু গ্রাম্য শিল্পী কলকাতা এবং তার চারপাশে বসবাস করছেন। এঁদের তৈরী মাটির পুতুল, অঙ্কিত সরা, কাঠের খেলনা ইতিমধ্যেই অনেক উৎসাহী শহরবাসীর ঘরে স্থানলাভ করেছে। উদ্বাস্তুদের কাজগুলির সঙ্গে শহরের অলি-গলিতে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের দরুণ এ-জিনিস সম্ভব হয়েছে। অবশ্য একমাত্র এভাবেই যে সাধারণের মধ্যে লোকশিল্পের প্রচার ও তার সংরক্ষণ সম্ভব হবে, তা নয়। সেজন্য দরকার সরকারী উদ্যম ও অর্থানুকূল্যে গ্রাম্য শিল্পীদের কাজের সংগঠিত বিক্রয়-ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুসৃত নীতি অনুধাবনযোগ্য। এখানে ডাইরেক্টরেট অফ ইন্ডাস্ট্রিজের অধীনে একজন গ্রাম্য শিল্প ও কারুকলার সংগঠক আছেন। ইনি যতটা সম্ভব শিল্পী ও

কারিগরদের কাজকর্ম ও সমস্যা তত্ত্বাবধান করেন। এঁর চেষ্টায় সংগৃহীত শিল্প-বস্তুগুলি কলকাতার সরকারী শিল্পকলা বিপণি মারফৎ বিক্রয় হয়। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা দপ্তরের অধীনে একজন লোকশিল্পের পরিদর্শক নিযুক্ত আছেন। ইনি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের কিউরেটারের অধীনে কাজ করেন। লোকশিল্পের সংগ্রহ ও সংরক্ষণের যে বিরাট দায়িত্বশীল কাজ, তার তুলনায় সরকারী এই উদ্যম খুব বেশি নয়। তবে মোটামুটি পরিকল্পনাটি খুবই কার্যকরী এবং ব্যাপক আকারে গ্রহণ করলে উপযুক্ত ফল পাওয়া সম্ভব। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও এই পরিকল্পনা কাজে লাগানো যেতে পারে। কলকাতায় একটি জিনিসের অভাব আমরা খুবই লক্ষ্য করি, তা হচ্ছে লোকশিল্পের সংগ্রহশালা। কলকাতায় ছোটখাটো কয়েকটি লোকশিল্পের সংগ্রহ আছে। এর মধ্যে আমরা বিশেষভাবে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ম ও ব্রতচারী গ্রামে 'গুরুসদয় দত্তের সংগ্রহের কথা উল্লেখ করতে পারি। কিন্তু এগুলিকে একত্র করে সুসমঞ্জস পরিকল্পনায় একটা বড় সংগ্রহশালা গড়ে তোলার কোন সরকারী উদ্যম দেখা যাচ্ছে না। আমার মনে হয়, সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে তাতে শিল্পবস্তুর যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা হলে লোকশিল্পের অনেক ব্যক্তিগত সংগ্রাহকই তাঁদের সংগ্রহ ঐ প্রতিষ্ঠানে দিতে সম্মত হবেন। লোকশিল্পের সংগ্রহশালা না থাকলে শুধু বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপন করে সাধারণের আগ্রহ বাড়ানো যায় না।

কেন্দ্র, অর্থাৎ দিল্লীর কথা আলোচনা করলে আমরা দেখি যে, গত বছর সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় রাজধানীতে ভারতের বিভিন্ন অংশের লোকশিল্পের একটি প্রদর্শনী হয়েছিল। দেশে ও বিদেশে লোকশিল্পীদের তৈরী জিনিসের সুষ্ঠু বিক্রয়-ব্যবস্থা নির্ধারণ করাটাই ছিল এই প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য। দিল্লীতে হাতে-তৈরী শিল্পদ্রব্যের সরকারী বিক্রয়কেন্দ্র আছে, যেখানে ভারতের সমস্ত অংশের কাজ মজুত করা হয়। সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর দিল্লীতে দেশী-বিদেশী লোকের সমাগম বেড়ে যাওয়ায় এই বিক্রয়কেন্দ্র লোকশিল্পের প্রচারে অনেকটা সাহায্য করবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে ভারতের প্রসিদ্ধ শহরগুলিতে তাঁদের নিজ নিজ লোকশিল্পের বিক্রয়কেন্দ্র স্থাপনে উৎসাহিত করতে পারেন। ভারতের বাইরেও আমাদের লোকশিল্পীদের কাজ বিক্রয়ের সুযোগ আজ উন্মুক্ত। পৃথিবীর প্রত্যেকটি বড় বড় দেশের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে এবং সেই সমস্ত দেশে ভারতীয় দূতাবাস রয়েছে। এই সমস্ত দূতাবাস মারফৎ সহজেই আমাদের লোকশিল্পের নিদর্শনগুলি বণ্টন করা চলতে পারে। প্রত্যেক দূতাবাসে লোক-কলার show-window রাখলে পর এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারে। বিভিন্ন দূতাবাসের পিছনে ভারতের প্রচুর অর্থ ব্যয়িত হয়, সুতরাং এগুলি থেকে আমাদের দেশ যাতে পরিপূর্ণ লাভবান হয়, সেদিকে সরকারের দৃষ্টি রাখা উচিত। তাছাড়া ভারত আজকাল ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ব্যবসা সংক্রান্ত মেলাতে নিয়মিত অংশ গ্রহণ করছে। এই মেলাগুলিও ভারতীয় লোকশিল্পের প্রচারের বিশিষ্ট মাধ্যম। ভারত সরকারের শিক্ষা দপ্তর দিল্লীতে লোকশিল্পের সংগ্রহশালা স্থাপন করেছেন, একথা আগে বলেছি। লোকশিল্পের সংগ্রহশালা গড়ে তুলতে গিয়ে সংগ্রাহকদের ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অনুষ্ঠিত গ্রাম্য মেলা-উৎসবের সংস্পর্শে আসতে হবে। কারণ এই মেলা-উৎসবগুলিতেই গ্রাম্য শিল্পীদের হাতের কাজ বিক্রয়ার্থে আসে। এর মধ্য দিয়ে সংগ্রাহকেরা (তথা সরকার) মেলা-উৎসব এবং গ্রাম্য শিল্পীদের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে অবহিত হতে পারবেন। লোকশিল্পের সমস্যাগুলি প্রত্যক্ষভাবে জেনে সেগুলি সমাধানের চেষ্টা করা সহজ হবে। এইভাবেই লোকশিল্পের প্রকৃত সংরক্ষণ সম্ভব। যেহেতু পুরানো পরিবেশ বজায় নেই, সেহেতু লোকশিল্পের পুনরুজ্জীবন সুদূরপরাহত—এই ধরনের মনোভাব চিন্তার দেউলিয়াপনা ছাড়া আর কিছু নয়।

সাহিত্যে সংকট

অন্নদাশঙ্কর রায়

২৪
নীতির জগৎ

চিরন্তন মূল্যে নির্ণয় করতে একালের সাহিত্যিকদের প্রাণে ব্যাকুলতা জেগেছে। পলায়নে সুখ নেই। অবশ্য পলায়ন যে কেউ করছে না, তা নয়। অনেকেই করছে। ঝুটো আধ্যাত্মিকতা, ঝুটো mysticism অনেকেরই পলায়নের পথ।

সংকট শুরু হবার আগেই বিজ্ঞান এসে তার পদ্ধতিকেই একমাত্র পদ্ধতি বলে জাহির করেছিল। বিজ্ঞানের সাফল্য দেখে সাহিত্যিকরাও স্থির থাকতে পারেনি। এখন ধীরে ধীরে স্থিতি ফিরিয়ে আনতে হবে। রীতি বদলে দিতে হবে। চিরন্তনকে নতুন করে আবিষ্কার করতে হবে। তেমনি আর একটি বিষয় একালের সাহিত্যিকদের উন্মনা করেছে। Moral law কি কোথাও কাজ করছে না? সর্বত্র নিষ্ক্রিয়? Moral law বলতে আগেকার দিনে বোঝাত ধর্মশাসিত Moral code—একরাশ বিধিনিষেধ। 'Thou shalt' আর 'Thou shalt not', কেন shalt আর কেন shalt not, তার তাৎপর্য কেউ বোঝাতে পারে না। বুঝলে তো বোঝাবে? কেই বা তা মেনে চলছে! ভণ্ডের দল।

কিন্তু সে রকম একটা moral code নাই বা হলো, বিশ্বের অস্তিত্বের পশ্চাতে কি কোনোরূপ moral law নেই? এটা কি শুধু একটা Physical universe? এ কি moral universe নয়? এখানেও বিজ্ঞান মানুষের মাথা খেয়েছে। যা প্রত্যক্ষ নয় তার অস্তিত্ব নেই। তুমি যদি অস্তিত্ব কল্পনা করো তুমি সেকেলে। সেকেলে হতে আমাদের ঘোর আপত্তি! আবার কি আমরা নীতিধার্মিকদের 'Thou shalt' আর 'Thou shalt not'-এর খপ্পরে পড়ব? না অন্ধ আনুগত্যে আমাদের অরুচি ধরে গেছে।

মানুষকে একদিন বিশ্ববিধানের অন্তর্নিহিত moral law আবিষ্কার করতে হবে। যা প্রত্যক্ষ নয় তা নেই—এটা কুযুক্তি। আছে, আছে অপ্রত্যক্ষ নীতির জগৎ। তাকে আবিষ্কার করে তাতে বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। সব মানুষকে। সাহিত্যিককেও। তারপর সাহিত্যিকরা দেখবে আর দেখাবে তার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া, তার ঘাত প্রতিঘাত। তা না হলে মহাকাব্য হবে না, নাটক হবে না, উপন্যাস হবে না, সেসবের সম্ভাবনা ফুরিয়ে আসছে। ক্রমশ তা দ্বিতীয় শ্রেণীতে নামবে, তারপর তৃতীয় শ্রেণীতে, তারপর এত নিচে নেমে যাবে যে, তাকে আর সাহিত্য বলা চলবে না। তার বাংলা নাম বটতলা। যদিও তা ইংরেজী বা ফরাসী ভাষায় লেখা। অথবা রাশিয়ান।

তা বলে কিছুই হবে না তা নয়। হবে, ছোট গল্প হবে, ছোট কবিতা হবে, রম্য রচনা হবে। এসবের সম্ভাবনা অফুরন্ত। আমরা কি তা হলে এই নিয়ে তৃপ্ত থাকব? না। নাল্পে সুখমস্তি। আমরা মহাকাব্য লিখব, নাটক লিখব, উপন্যাস লিখব উচ্চতম কোটির। তার জন্যে সর্বতোভাবে প্রস্তুত হব। সেই প্রস্তুতির অঙ্গ নীতির জগৎ সম্বন্ধে নিশ্চিতি। নীতির জগৎ প্রকৃতিরই মতো সত্য। নীতিবোধ না থাকলে মানুষ মানুষই থাকবে না, তা হলে কাকে নিয়ে সাহিত্য হবে। সাহিত্য কি homo Sapiens নামক প্রাণীবিশেষের বর্ণনা। এক প্রকার প্রাণীতত্ত্ব।

২৫
সাহিত্যের বর্তমান অবস্থা

পৃথিবীতে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে, সেইসঙ্গে শিক্ষিত লোকের সংখ্যা বাড়ছে, সেইসঙ্গে পাঠযোগ্য পুস্তকের সংখ্যা বাড়ছে। এ দিক দিয়ে আমরা বাড়তির পথে চলেছি। যুদ্ধ এসে মাঝে মাঝে কমতি ঘটালেও মোটের উপর কমতি ঘটছে না, যেটুকু ঘটছে সেটুকু সাময়িক। এই মুহূর্তে কমতির লক্ষণ নেই, যদি বা থাকে কাগজ পাওয়া গেলে ছাপবার খরচ পোষালে কেনার সঙ্গতি জুটলে আর থাকবে না। যদি না আবার যুদ্ধ বাধে।

বাড়তির পথেই আমরা চলেছি, বোধ হয় চলতে থাকব। কিন্তু এই যে বাড়তি এটা সংখ্যা বা পরিমাণগত। কেউ যদি বলে মানুষের সত্তের উপলব্ধি

বেড়ে গেছে তাহলে কথাটা হয়তো দর্শনবিজ্ঞানের বেলায় অপ্রযুক্ত হবে না, কিন্তু সাহিত্যের বেলায় বুকে হাত রেখে বলা দুরূহ হবে। সত্যের উপলব্ধি যদি বেড়ে গিয়ে থাকে, তবে তা এখনো অপ্রকাশিত বা অলিখিত।

তেমনি কেউ যদি বলে মানুষের সৌন্দর্যের উপলব্ধি বেড়ে গেছে তাহলে কথাটা হয়তো চিত্রকলা বা সংগীতের বেলায় সুপ্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সাহিত্যের বেলায় সংশয়ান্বিত। তেমনি কেউ যদি বলে মানুষের কল্যাণের উপলব্ধি বেড়ে গেছে তাহলে কথাটা হয়তো আইন বা কনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট, কিন্তু সাহিত্যক্ষেত্রে অপরিস্ফুট।

যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গাহাঙ্গামা দেশ-বিভাগ ইত্যাদি বিরাট বিরাট ঘটনা আমাদের জীবনে ঘটেছে। আমরা তা নিয়ে বিরাট সাহিত্য সৃষ্টি করিনি। করেছি বিরাট জটলা ও খুঁতখুঁত ও হায় হায়। সাহিত্যের উপাদান হিমালয়ের মতো স্তূপাকার। আমরা তা দিয়ে খবরের কাগজ ভরেছি, আর খবরের কাগজকে ভাঁজ করে বই বলে চালিয়েছি। যা লিখেছি তাকে সম্পাদকীয় মন্তব্য বা বিশেষ প্রতিনিধির রিপোর্ট বললে হয়তো খুব বেশী অবিচার হবে। আচ্ছা, তাহলে বলা যাক ডকুমেণ্টারি সাহিত্য। যেমন ডকুমেণ্টারি ফিল্ম। কেমন? অন্যায় হবে?

অনেক সময় ডকুমেণ্টারি ফিল্ম দেখবার মতো, মনে রাখবার মতো হয়। আমরা যা লিখছি তাও পড়বার মতো মনে রাখবার মতো হতে পারে। কিন্তু সাহিত্য হলো আর্ট, আর আর্ট হলো সৃষ্টি, আর সৃষ্টি হলো উপাদানের রূপান্তর। রস আর আলো দিয়ে রূপান্তর। যা রূপান্তরিত হয়নি তার মূল্য নেই তা নয়, কিন্তু তা যেন অর্ধ-পক্ক অন্ন বা লবণহীন ব্যঞ্জন। পুষ্টিকর নিশ্চয়, কিন্তু গিলে খেতে হয়। চোখে চেখে তাড়িয়ে তাড়িয়ে খাওয়া যায় না। পাঁচশো পৃষ্ঠার একখানা উপন্যাস গো-গ্রাসে গিলে পাঁচ ঘণ্টায় শেষ করো, তারপর ভুলে যাও লেখকের নাম, গ্রন্থের নাম, নায়ক-নায়িকার নাম, কাহিনীটাও।

দু' দণ্ড চেয়ে দেখবার মতো সুন্দর লেখা কোথায়। কোথায় সেই সব নায়ক-নায়িকা যাদের ভুলে যাওয়া অসম্ভব। অবিস্মরণীয় চরিত্রের, ঘটনার, বর্ণনার, বাক্যের, ছন্দের, ধ্বনির সংখ্যা বেশী নয়। এ দিক দিয়ে আমরা কমতির পথে চলেছি।

পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থা। সুতরাং শোক করবার কিছু নেই। মানুষের ইতিহাসে এক একটা যুগ গেছে যখন সভ্যতার বাতি নিবে গেছে, নিবিয়ে দিয়েছে যুদ্ধবিগ্রহ, বর্বরতা, বিকৃত রুচি। আমাদের এ যুগে বাতি এখনো নিবে যায়নি, আশা করি, যাবে না। ঝড়-ঝাপটায় আঁচল ঢাকা দিয়ে প্রদীপ জ্বালিয়ে রাখতে হবে, একটি হলেও ক্ষতি নেই, একটির থেকে এক সহস্রটি জ্বলবে। আপাতত এই আমাদের ব্রত।

২৬

সাহিত্যিকের কাছে প্রত্যাশা

একজন পাঠক আছে তার নাম Ultimate reader বা অন্তিম পাঠক। সে আমার কাছে কী প্রত্যাশা করে?

সে প্রত্যাশা করে আমার সত্য। এর কম সে নেবে না। সে চায় আমার আপন উপলব্ধি যা আমি অনেক কষ্টে পেয়েছি। কিংবা অনেক ভাগ্যে। এ সত্য আমি কাউকে না দিয়ে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে পারিনে। যাকে দিয়ে যেতে চাই সে নেবে কেন যদি কোথাও একটুকু ফাঁকি থাকে? আর যাকে ঠকাতে পারি ঠকাব, কিন্তু অন্তিম পাঠককে ঠকাতে গেলে ঠকব। সে ধরে ফেলবে একদিন। সেইজন্যে আমার উচিত খাঁটি সত্যটুকু দেওয়া। সত্য এখানে তথ্য নয়। তথ্যের এদিক ওদিক হলে কিছু আসে যায় না। সাহিত্য ইতিহাস নয়। বিজ্ঞান নয়। সাহিত্য হলো রূপান্তর। সুতরাং এখানে সত্য হলো তথ্যের রূপান্তর।

বলেছি সে এর কম নেবে না। কিন্তু এই নিয়েই কি সে তৃপ্ত হবে? সে চায় এর বেশী। সে প্রত্যাশা করে আমার রূপ। সে তো আমাকে চোখে দেখতে পায় না, অথচ আমাকে দেখতে তার সাধ। কী করে দেখবে যদি আমি না দেখাই? কী করে দেখাব যদি সমস্ত সত্তা দিয়ে না লিখি? রূপ এখানে কায়িক রূপ নয়, মানসিক ও বাচনিক রূপ। তাই সব নয়। অনির্বচনীয় রূপ। একশো বছর পরে আমি থাকব না, আমার রূপ থাকবে। পাঁচ হাজার মাইল দূরে আমি যেতে পারব না, আমার রূপ যাবে। এ রূপ ফোটোতে ধরা যায় না। ফোটো থাকলেও এ রূপ থাকবে না, কিন্তু সাহিত্য থাকলে এ রূপ থাকবে। আর সত্য থাকলে সাহিত্য থাকবে।

সত্য পেয়ে, রূপ পেয়ে কি তার প্রত্যাশা পুরল—অন্তিম পাঠকের? না। সে আরো কিছু চায়। সে চায় সৌন্দর্য। সত্যের সঙ্গে বা সত্যের মধ্যে যদি সৌন্দর্য না থাকে তাহলে পাঠকের আনন্দ অপূর্ণ থাকে। রূপের সঙ্গে বা রূপের মধ্যে যদি সৌন্দর্য না থাকে তাহলে পাঠকের সুপরিতৃপ্তি হয় না।

এই কি সব? না। এই সব নয়। অন্তিম পাঠকের অন্তিম প্রত্যাশা এর পরেও থাকে। সে চায় সাহিত্যের 'হওয়া।' আমার কবিতাটি হয়েছে কি না। গল্পটি হয়েছে কি না। যখন সে বলে, হয়েছে, তখন আমি জানি, হয়েছে যখন সে বলে, হয়নি, তখন আমি জানি

হয়নি। এই যে হয়েছে বা হয়নি এর উপর আপীল নেই। কেন হয়েছে, কেন হয়নি, এই কেন আমার কাছে প্রহেলিকা। হওয়াটাই সৃষ্টির শেষ রহস্য। যেমন বিশ্বসৃষ্টির তেমনি শিল্পসৃষ্টির। এ রহস্য ভেদ করা আমার সাধ্য নয়।

উপরে যে Ultimate reader বা অন্তিম পাঠকের কথা বলা হলো তাকে আমি দেখতে পাইনে, দেখলেও চিনতে পারিনে। যাকে নিয়ে আমার কারবার তার নাম Immediate reader বা অব্যবহিত পাঠক। সে আমার ঘরের লোক, আমার বন্ধু, আমার প্রকাশক, আমার সপাদক, আমার দেশের পুলিস, আমার দেশের সমাজ, আমার দেশের জনগণ। এদের প্রত্যাশার তালিকাটি ছোট নয়। এদের ফরমাশ শুনতে শুনতে কান ঝালাপালা। এদের খুশি করতে না পারি ক্ষুণ্ণ করতে পারিনে। ক্ষুণ্ণ যদি বা করি নেহাৎ অনিচ্ছাসত্ত্বে করি। কিন্তু এদের প্রত্যাশা পূরণ করতে গিয়ে চূড়ান্ত পাঠকের অস্তিত্ব ভুলে যাই। তেত্রিশ কোটি দেবতাকে প্রণাম করতে করতে একমাত্র সদবতার অস্তিত্ব ভুলে যাওয়ার মতো। তার ফলে হয়তো লক্ষ্যভ্রষ্ট হই।

সে অতি দুর্লভ লেখক যে অব্যবহিত ও অন্তিম উভয়ের প্রত্যাশা পূরণ করে উভয়ের স্বীকৃতি পায়। অধিকাংশই আসন্ন নিয়ে ব্যাপৃত। অল্পাংশ অব্যবহিত ছেড়ে অন্তিম নিয়ে নিবিষ্ট। ক্বচিৎ এক আধ জনকে দেখা যায় যাদের এক চোখ অব্যবহিতের দিকে আরেক চোখ অন্তিমের উপরে।

২৭

সাহিত্যিকের দায়িত্ব

এতক্ষণ পাঠকের প্রত্যাশার কথা বলা হলো। প্রকৃতিরও কি কিছু প্রত্যাশা নেই? এই যে পৃথিবীতে এত সৌন্দর্য আছে, কে এসব দেখবে, আমি যদি না দেখি? কে দেখাবে আমি যদি না দেখাই? এত প্রেম আছে, কে অনুভব করবে আমি যদি না করি? কে অনুভব করাবে আমি যদি না করাই? এত মাধুরী আছে, কে আস্বাদন করবে আমি যদি না করি? কে আস্বাদন করাবে আমি যদি না করাই? এত আনন্দ আছে, কে উপলব্ধি করবে আমি যদি না করি? কে উপলব্ধি করাবে আমি যদি না করাই?

আর বাড়িয়ে কী হবে। আছে প্রকৃতিরও প্রত্যাশা। তেমনি ইতিহাসের বা নিয়তির। কী একটা অমোঘ নিয়ম কাজ করে যাচ্ছে চুপি চুপি তলে তলে। পাঁচ দশ বছর তার কাছে কিছু নয়। শতাব্দীও সামান্য কাল। মানুষ এই নিয়ম মানতেও পারে, না মানতেও পারে, মানা না মানার স্বাধীনতা তাকে দেওয়া হয়েছে। দেওয়া হয়েছে বলেই তো ট্র্যাজেডী বা তামাশা। অথচ কীই বা তার স্বাধীনতা, কতটুকুই বা স্বাধীনতা। কিন্তু যে কান্ডটা ঘটছে মানুষের জীবনে কেই বা সেটা লক্ষ্য করবে আমি যদি না করি? কেই বা লক্ষ্য করাবে আমি যদি না করাই।

তেমনি আছে ঈশ্বরেরও প্রত্যাশা। ঈশ্বর না বলে বিধাতা, বিধাতা না বলে স্রষ্টা, স্রষ্টা না বলে আদি কারণ, যে নামেই ডাকো না কেন গোলাপ তেমনি সুগন্ধ দেয়। তর্কবুদ্ধি উড়িয়ে দিতে পারে, কিন্তু জীবনে অন্তত একটিবার যার অন্তর উদ্ভাসিত হয়েছে সে তো পারে না উড়িয়ে দিতে। আর যে নিত্য ভালোবাসা পাচ্ছে সে কি জানে না এ প্রেম কোন্ উৎস থেকে উৎসারিত হচ্ছে। হ্যাঁ, ঈশ্বরেরও প্রত্যাশা আছে। তাঁর লীলা কে চাক্ষুষ করবে আমি যদি ধ্যাননেত্রে চাক্ষুষ না করি। কে চাক্ষুষ করাবে আমি যদি না করাই।

থাক। যথেষ্ট হয়েছে। যা বলতে চাই তা এই যে লেখকের কাছে প্রত্যাশা কেবল পাঠকের নয়, প্রকৃতির, ইতিহাসের বা নিয়তির, ঈশ্বরের বা অন্তরাত্মার। সব ছাপিয়ে তার নিজেরও একটা প্রত্যাশা রয়েছে। কানে কানে বলছি—অমরত্বের। এসব প্রত্যাশার দ্বারাই লেখকের দায়িত্বের পরিমাপ হয়। যার কাছে প্রত্যাশা যত বৃহৎ তার দায়িত্ব তত বৃহৎ। সে ঐ দায়িত্বের যোগ্য কি না সে কথা স্বতন্ত্র। কিন্তু আছে একটা দায়িত্ব। সেটা প্রত্যাশার দ্বারা নির্ণয় করতে হয়। যার কাছে কারুর কোনো প্রত্যাশা নেই তার দায়িত্ব বলতে কিছু নেই। সে দায়িত্বহীনভাবে যা খুশি লিখে যেতে পারে, যতক্ষণ না দেশের আইন বা জনমত বাধা দেয়। বাধা দেওয়া উচিত কি না সে কথাও স্বতন্ত্র। কিন্তু দায়িত্বহীনের পক্ষ সমর্থন করবে এমন দায়িত্বহীনই বা ক'জন আছে।

লেখক খোঁজ রাখবে তার কাছে কার কী প্রত্যাশা, তার নিজেরই বা প্রত্যাশা কিরূপ। অল্প বয়সে প্রত্যাশাবোধ থাকে না, যা লিখতে ইচ্ছা করে তাই লেখা যায়। লেখক তখন নতুন একটা শক্তি আবিষ্কার করেছে। লিখনশক্তি। আমার ছোট মেয়ের ছড়া বানানোর মতো। মুখে মুখে বানিয়ে যায় কিছু না ভেবে-চিন্তে। একটা না একটা উতরে যায়। ধীরে ধীরে প্রত্যাশাবোধ জাগবে। তখন আসবে দায়িত্ববোধ। তবে সেই দায়িত্ব-বোধ যেন স্বতঃস্ফূর্তি হরণ না করে। সব সময় দায়িত্ব সচেতন হলে লিখতে সাহস হয় না। লেখা আপনি বন্ধ হয়ে যায়। কেউ যে বাধা দেয় তা নয়। অবাধ স্বাধীনতা পেয়েও লেখক সৃষ্টি করতে পারে না, কারণ তার দায়িত্ব সচেতনতা তার স্বতঃস্ফূর্তিকে আড়ষ্ট করে। তার চেয়ে বরং দায়িত্বহীন হওয়া ভালো। তবু তো দু' চারটে লেখা উতরে যায়। (ক্রমশ)

রাষ্ট্র-তীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ

সুধাংশুবিমল মুখোপাধ্যায়

রাষ্ট্র-তীর্থ জালিয়ানওয়ালাবাগ! ১৯১৯ সালের ১৩ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত জালিয়ানওয়ালা হত্যাকাণ্ড ভারতে ইংরেজ শাসনের একটি অবিস্মরণীয় অপকীর্তি। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ড এবং ইহার অব্যবহিত পরে অনুষ্ঠিত সরকারী বর্বরতার প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ 'স্যর' উপাধি ত্যাগ করিয়াছিলেন। এই অনাচারের প্রকাশ্য প্রতিবাদে তাঁহার কণ্ঠই সর্বাগ্রে মুখর হইয়া উঠিয়াছিল।

১৯১৯ সালের মার্চ মাসের গোড়ার কথা। কয়েক মাস পূর্বে মাত্র (নভেম্বর, ১৯১৮) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইয়াছে। ভারতবাসী মিঃ মণ্টেগুর যুদ্ধকালীন ঘোষণার* কথা বিস্মৃত হয় নাই। এদিক ভারত সরকার সন্ত্রাসবাদ দমনের অজুহাতে রাউলাট আইন পাশ করিলেন (৩রা মার্চ)। যুদ্ধকালীন জরুরী অবস্থায় সরকারকে অস্থায়ীভাবে যে সমস্ত বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছিল, এই আইনের বলে তাহা কায়েম করিবার ব্যবস্থা হইল।

অল্পদিন পূর্বে মহাত্মা গান্ধী ভারতবর্ষের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারই নির্দেশে সর্বত্র রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইবার ব্যবস্থা হইল। ভারতবর্ষের মুক্তি আন্দোলনের ইতিহাসে ১৯১৯ সালের ৬ই এপ্রিল চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ঐ দিন হরতাল, উপবাস, প্রার্থনা এবং জনসভা আহ্বান করিয়া ভারতবাসী রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিল। হিন্দু, মুসলমান সকলেই এই নিরুপদ্রব প্রতিবাদে যোগদান করিয়াছিল। আকুমারী হিমাচল দুর্বার প্রাণবন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিল। কংগ্রেসের মুক্তিসাধনা নিয়মতান্ত্রিকতার শৃঙ্খল ভাঙ্গিয়া বিপ্লবের পথে পদক্ষেপ করিল।

৬ই এপ্রিল অমৃতসরেও রাউলাট আইনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হয়। পাঞ্জাবের লেঃ গভর্নর স্যর মাইকেল ও'ডায়ার—ইঁহাকে Iron man of the Punjab বা পাঞ্জাবের লৌহমানব বলা হয়—এর টনক নড়িয়া উঠিল। পাঞ্জাবে জাতীয় আন্দোলনের প্রসার বন্ধ করিতে তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন।

৯ই এপ্রিল রামনবমী উপলক্ষ্যে অমৃতসরে হিন্দু এবং মুসলমানের বিরাট এক শোভাযাত্রা বাহির হয়। এই শোভাযাত্রা কোন প্রকার সরকার বিরোধী মনোভাবের পরিচয় প্রদান করে নাই। ইহাতে ইংল্যাণ্ডের জাতীয় সংগীত "God save the king"ও গাওয়া হইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমানের এই সম্প্রীতি সরকারের চক্ষে ভাল ঠেকিল না। ১০ই এপ্রিল অমৃতসরের ডেপুটি কমিশনার স্থানীয় কংগ্রেস নেতা ডাঃ সৈফুদ্দিন কিচলু এবং স্বর্গীয় ডাঃ সত্য পালকে নিজের বাংলোতে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডেপুটি কমিশনারের বাংলোতেই ইঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া অজ্ঞাতস্থানে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। অমৃতসরে বিষাদের ছায়া নামিয়া আসিল। জনসাধারণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এক বিরাট জনতা ডাঃ কিচলু এবং ডাঃ সত্য পাল কোথায় আছেন জানিবার জন্য দল বাঁধিয়া ডেপুটি কমিশনারের বাংলোর দিকে অগ্রসর হইল। পুরাতন শহর হইতে নূতন শহরে

(১) দেওয়াল গাত্রে গুলীর চিহ্ন—জালিয়ানওয়ালাবাগ

---

* "....the policy of His Majesty's Government with which the Government of India are in complete accord, is that of increasing association of Indians in every branch of the administration and the gradual development of self-governing institutions with a view to the progressive realisation of responsible Government in India as an integral part of the British Empire."—

—'হাউস অব কমন্স'এ ভারত সচিব মিঃ মণ্টেগুর বক্তৃতা। ২০।৮।১৯১৭

(২) এই ফটক দিয়া বাহির হইবার সময় জনতার উপর গুলী চালনা হয়

ডেপুটি কমিশনারের বাংলোতে আসিবার পথে অমৃতসর রেল স্টেশনের সামান্য পূর্বদিকে একটি কাঠের পুল আছে ইহার স্থানীয় নাম 'পাঁউড়িওয়ালা পুল'। জনতা এই পুল পর্যন্ত আসিলে সরকারী সৈন্য তাহাদের পথ রোধ করে। সরকারপক্ষের অভিযোগ এই যে, ইহার পর জনতার মধ্য হইতে সৈন্যগণের উপর ইষ্টক নিক্ষিপ্ত হয়। উত্তরে সৈন্যগণ জনতার উপর গুলী বর্ষণ করে। একজন বা দুইজন নিহত এবং কয়েকজন আহত হয়। সেই পরিচিত পুরাতন কাহিনী। পথরোধকারী সৈন্য বা পুলিশের উপর জনতা কর্তৃক ইষ্টক বর্ষণ এবং আত্মরক্ষার্থ সৈন্য বা পুলিস কর্তৃক গুলী বর্ষণ।

(৩) জেনারেল ডায়ারের সৈন্যগণ 'ক্রস' চিহ্নিত স্থানে লাইন গান সাজাইয়াছিল। এই জায়গা পরে বাঁধান হইয়াছিল

জনতা আর অগ্রসর হইবার চেষ্টা না করিয়া গুলীতে যাহারা হতাহত হইয়াছিল, তাহাদিগকে বহন করিয়া পুরাতন শহরের দিকে ফিরিয়া চলিল। জনতা শহরের মধ্যে ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়ার কাছে আসিলে ব্যাঙ্কের শ্বেতাঙ্গ ম্যানেজার জনতার উপর গুলী করেন। জনতা ব্যাঙ্কে আগুন লাগাইয়া ম্যানেজারকে আগুনে পোড়াইয়া মারিল। উচ্ছৃঙ্খল, ক্ষিপ্ত জনতা ইহার পর আরও চারজন শ্বেতাঙ্গকে খুন করিল এবং রেলের মালগুদাম ও কয়েকটি সরকারী বাড়িতে আগুন লাগাইয়া দিল।

স্থানীয় কর্তৃপক্ষ ভয় পাইয়া উচ্চতর কর্তৃপক্ষের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই ১০ই এপ্রিল সামরিক কর্তৃপক্ষের হাতে শহর ছাড়িয়া দিলেন।

১৩ই এপ্রিল বৈশাখী মেলা উপলক্ষ্যে জালিয়ানওয়ালাবাগে এক জনসভা আহূত হয়। অমৃতসরের প্রবীণ ব্যবহারজীবী বাবু কাহ্নাইয়ালালের সভাপতিত্ব করিবার কথা ছিল। কিন্তু কে যে সভাপতিত্ব করিয়াছিলেন জানা যায় না। পুরাতন শহরের কেন্দ্রস্থলে অবস্থিত স্বর্ণমন্দিরের অদূরে কাটরা জালিয়ানওয়ালা। তাহারই এক জায়গায় কতকগুলি বাড়ি ঘেরা প্রায় ১২ বিঘা ফাঁকা জায়গা। এই জালিয়ানওয়ালাবাগ। বাগের উত্তর দিকে কাঠের বেড়া। ভিতরে আসিবার এবং বাহিরে যাইবার জন্য পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে অতি সংকীর্ণ দুইটি পথ। পূর্ব দিকে একটি কূপ। প্রায় ২০,০০০ লোক ১৩ই এপ্রিলের

(৪) শহীদ স্মৃতিফলক—জালিয়ানওয়ালাবাগ

সভায় সমবেত হয়। ইহার মধ্যে বেশীর ভাগই পুরুষ।

বৈকাল বেলা সভা আরম্ভ হইয়াছে। হংসরাজ নামে বক্তা বক্তৃতা করিতেছেন। ১০০ গুর্খা এবং ৫০জন গোরা সৈন্য লইয়া অমৃতসর এলাকার ভারপ্রাপ্ত সৈন্যাধ্যক্ষ ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ডায়ার জালিয়ানওয়ালাবাগের উত্তর দিকের কাঠের বেড়ার খানিকটা ভাঙিয়া সভাস্থলে উপস্থিত হইলেন। সৈন্যগণ যে পথে প্রবেশ করিয়াছিল, সেই পথের মুখে অর্ধবৃত্তাকারে লুইসগান সাজাইল। তাহাদের সঙ্গে সাঁজোয়াগাড়ি এবং মেসিনগানও ছিল। কিন্তু সংকীর্ণ প্রবেশপথে তাহা ভিতরে আনা সম্ভব হয় নাই। বাহিরে রাখিয়া আসিতে হইয়াছিল।

জেনারেল ডায়ার জনতাকে অবিলম্বে ছত্রভঙ্গ হইবার আদেশ প্রদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই লুইসগানের শ্রেণী গর্জিয়া উঠিল। হান্টার কমিটিতে সাক্ষ্য প্রদানকালে ডায়ার সাহেব নিজেই স্বীকার করেন যে, আদেশ দেওয়ার পর ২।৩ মিনিটের মধ্যেই অগ্নিবৃষ্টি আরম্ভ হয়। কিংকর্তব্যবিমূঢ়, ত্রস্ত জনতা দিগ্‌বিদিক-জ্ঞানশূন্য হইয়া বাগের পূর্ব এবং পশ্চিম-দিকে বাহির হইবার যে সংকীর্ণ পথের কথা বলা হইয়াছে, সেদিকে ছুটিল। অনেকে সেই পথে, অন্যেরা আবার প্রাচীর টপ্‌কাইয়া পলায়ন করিল। অনেকে আবার জালিয়ানওয়ালাবাগের পূর্বাংশে অবস্থিত কূপে লাফাইয়া পড়ে। পরে কূপ হইতে প্রায় ১৫০টি মৃতদেহ উদ্ধার করা হইয়াছিল। এই কূপ বর্তমানে শহীদকূপ নামে পরিচিত।

(৫) পিছন দিক হইতে জালিয়ানওয়ালাবাগে প্রবেশের প্রথম পথ। দরজা হত্যাকাণ্ডের পর নির্মিত

পাঁচ মিনিটে মোট ১৬০০ গুলি নিক্ষিপ্ত হয়। সরকারী হিসাবে দেখি গুলিতে মোট ৩৭৯জন নিহত এবং ১২০০জন আহত হইয়াছিল। হতাহতের সংখ্যা হয়ত আরও অনেক বেশী। জালিয়ানওয়ালাবাগের দক্ষিণ দিকে একটি বাড়ির জানালায় শিশু সন্তান ক্রোড়ে এক মাতা দাঁড়াইয়াছিলেন। গুলীতে উভয়ের জীবনান্ত হয়। প্রাচীর বাহিয়া ইঁহাদের রক্তধারা গড়াইয়া পড়িয়াছিল। ডায়ারের রক্তস্নানের মূকসাক্ষীরূপে আজও এই প্রাচীরটি বর্তমান। রৌদ্র এবং বৃষ্টিতে রক্তধারা অবশ্য বহুপূর্বেই নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। জালিয়ানওয়ালাবাগের দক্ষিণ এবং পশ্চিমদিকের দেওয়ালের বহু জায়গায় এখনও গুলীর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়।

ধ্বংসলীলার পর ডায়ার সাহেব সসৈন্যে স্থান ত্যাগ করিলেন। মৃতের সৎকার বা আহতের সেবা-শুশ্রূষার কোন ব্যবস্থাই হইল না। এদিকে শহরে আতঙ্কের ছায়া নামিয়া আসিয়াছে। লোক-জন ঘরের বাহির হইবার সাহস পাইতেছে না। এই দুঃসময়ে রতনবাঈ নাম্নী এক মহিলা অদ্ভুত সাহস ও মনোবলের পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বামী জালিয়ানওয়ালাবাগের সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি গুলীবিদ্ধ হন। রতনবাঈ সমস্ত রাত্রি স্বামী এবং অন্যান্য আহতের মুখে জল দেন এবং যতটা সম্ভব তাহাদের সেবা-শুশ্রূষা করেন। রতনবাঈর স্বামী পরে মারা যান্। সরকারপক্ষ হইতে তাঁহাকে এক লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রস্তাব করা হইলে তিনি সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। ক্ষতিপূরণের পরিবর্তে জেনারেল ডায়ারকে গুলী করিয়া হত্যা করা হউক তিনি এই দাবী জানাইলেন। জেনারেল ডায়ারকে যে গুলী করিবে তাহাকে পুরস্কৃত করিবার জন্য তিনি নিজে এক লক্ষ টাকা দিতে প্রস্তুত ছিলেন। বলাই বাহুল্য যে, তাঁহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করা হয় নাই। এই তেজস্বিনী মহিলা আজও বাঁচিয়া আছেন। বর্তমানে তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। জাতীয় ভারত সরকার তাঁহার জন্য আজীবন ৫০ টাকা মাসোহারার ব্যবস্থা করিয়াছেন।
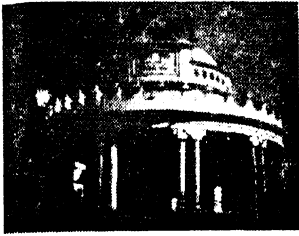
(৬) শহীদ কূপ (ভিতরে)

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের দুই দিন পর ১৫ই এপ্রিল হইতে অমৃতসরে সামরিক আইন জারি হয়। ইহার পর যে বীভৎস অত্যাচারের তাণ্ডব আরম্ভ হয়, নাদিরশাহী তাণ্ডবও বুঝি তাহার তুলনায় ম্লান হইয়া পড়ে। সে অন্য ইতিহাস।

হত্যাকাণ্ডের অব্যবহিত পরেই লেঃ গভর্নর স্যর মাইকেল ও'ডায়ারের পক্ষ হইতে জেনারেল ডায়ারের কার্য সমর্থন করিয়া তার পাঠানো হয় ("Your action correct. Lieutenant Governor approves)। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড এবং তৎসংক্রান্ত ঘটনাবলী সম্বন্ধে তদন্তের জন্য লর্ড হাণ্টারের সভাপতিত্বে একটি কমিটি নিযুক্ত হয়। এই কমিটি হাণ্টার কমিটি নামে পরিচিত। কমিটির অন্যতম সদস্য, কলিকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি র‍্যাঙ্কিন সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে জেনারেল ডায়ার খোলাখুলিভাবে নিজের কার্য সমর্থন করেন।

"It was a horrible duty I had to perform. I think it was a merciful thing, I thought that I should shoot well and shoot strong, so that I or anybody else, should not have to shoot again. I think it is quite possible I could have dispersed the crowd without firing, but they would have come back and laughed, and I should have made what I consider a foot of myself."

কমিটির রিপোর্টে দেখি যে, ডায়ার সাহেব ১৩ই এপ্রিল সকালের দিকে ঢোল-শোহরত করিয়া অমৃতসরে সভাসমিতি নিষিদ্ধ করিয়াছিলেন। কমিটিতে সাক্ষ্যদান কালে তিনি বলেন যে, তিনি অমৃতসরের জনসাধারণকে শায়েস্তা করিতে চাহিয়াছিলেন এবং গুলী ফুরাইয়া না গেলে আরও গুলী করিতেন।

("..... the city having passed under the Military, he had tom-tomed in the morning that no gatherings would be permitted and the people openly defied him, he wanted to teach them a lesson so that they might not laugh at him. He would have fired and fired longer, he said, if he had had the required ammunition. He had only fired 1,600 rounds because his ammunition had run short.")

মন্তব্য অনাবশ্যক।

জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ডের পর কংগ্রেস কর্তৃক একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটির রিপোর্ট এখন পাওয়া যায় না। পাওয়া গেলে হয়ত অনেক তথ্যই উদ্ঘাটিত হইত।

জালিয়ানওয়ালাবাগ বর্তমানে একটি

(৮) জালিয়ানওয়ালাবাগের অধিবাসী

(৭) রেলের পুল। ১০ই এপ্রিল সরকারী সৈন্য এইখানে জনতার উপর গুলী চালায়

ট্রাস্টের পরিচালনাধীন। ১৯২০ সালে এই ট্রাস্ট গঠিত হয়। শ্রীজওহরলাল নেহরু ইহার বর্তমান সভাপতি। ট্রাস্ট প্রায় সাড়ে পাঁচ লক্ষ টাকা মূল্যে জালিয়ানওয়ালাবাগ ক্রয় করিয়া একটি নয়নাভিরাম উদ্যান রচনা করিয়াছেন। এখানে একটি স্মারকস্তম্ভও শীঘ্রই নির্মাণ করা হইবে। শ্রীকণ্ঠীচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় প্রথম হইতেই জালিয়ানওয়ালাবাগ ট্রাস্টের অবৈতনিক সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন। জালিয়ানওয়ালাবাগের যাবতীয় উন্নতির মূলে ইঁহার দানের পরিমাণ সামান্য নহে।

প্রতি বৎসর ১লা বৈশাখ জালিয়ানওয়ালাবাগে শহীদ দিবস উদ্‌যাপিত হয়। শহীদকূপে মালা স্থাপন এই দিনের প্রধান অনুষ্ঠান। শহীদ দিবস প্রতিপালনের জন্য যাঁহারা জালিয়ানওয়ালাবাগে সমবেত হন, তাঁহাদের অশোভন আচরণ অনেক সময় অনুষ্ঠানের গাম্ভীর্য নষ্ট করে। জনমত সচেতন না হইলে ইহার প্রতিকার সম্ভব নহে।*

প্রবন্ধে সন্নিবিষ্ট আলোকচিত্রগুলির মধ্যে ১, ২, ৪ ও ৮নং শ্রীসুনীল জানা কর্তৃক ও অন্যান্য ছবিগুলি সর্দার রবীন্দ্র সিং এবং সর্দার পরমজিৎ সিং কর্তৃক গৃহীত।

স্বপ্ন

হরপ্রসাদ মিত্র

একটু ঠাণ্ডা হাওয়া,
একটু মিথ্যে সুখ
জলে, বেলা-নিভে-আসা আলোতে—
কলমী-লতার নিচে
দৃশ্যটা ভিজে-ভিজে
দিন মেশে গোধূলির কালোতে।

তত্ত্ববাগীশ নই
ভালো লাগে, বসে রই।
তার বেশি নেই কিছু বলবার।
মনে-মনে এই জানি—
আছে নানা পথ, মানি।
সকলই তো দু'দণ্ড চলবার।

কচুরিপানার ফুলে
জানি না সে কা'র ভুলে
থাকে ম্যালেরিয়াবাহী মশারা!
শঙ্কার ডঙ্কায়
কি-হবে রোদন তুলে
মেলে যদি অশান্ত ইশারা?

তুচ্ছ ঘটনাগুলো বিকীর্ণ এইখানে—
ভাঙা কুলো, ছাই, কাঠ কয়লা—
অতৃপ্ত ধিক্কার, অসহন অভিযোগ,
নানা গরমিল, নানা ময়লা।

পাতিহাঁস তারই মাঝে
হেঁটে যায়, গান বাজে—
প্যাঁক প্যাঁক—ঘরে ফিরে চলবার।
একটু ঠাণ্ডা হাওয়া
তারাদের দিকে চাওয়া,
তার বেশি নেই কিছু বলবার।

প্রথমবারে ঠিক কানে যায় নি। দ্রুতপায়ে নেমে মোটরের দরজা খুলে ডাক্তার মল্লিক চাবিতে হাত রাখলেন। অ্যাকসিলেটরে মৃদু চাপ দেবার আগেই আওয়াজ কানে এল। এবার আরো স্পষ্ট, আরো তীক্ষ্ন।

নীলমণি সরকার লেন বার তিনেক পাক খেয়ে সদর রাস্তায় মিশেছে। রূপসী বাড়ির সার, ইঁটের পাঁজর-প্রকট দেয়াল। আধভাঙা জানলার খড়খড়ি। ডাকটা ঠিক কোথা থেকে অসছে, ডাক্তার মল্লিক এদিক ওদিক চেয়েও ঠিক করতে পারলেন না।

অথচ ডাকটা উপেক্ষা করারও উপায় নেই। অন্তরঙ্গ আহ্বান। এ ডাকে মানুষ বয়সের আল পেরিয়ে একেবারে ভরা-যৌবনের ধানক্ষেতে গিয়ে নামে, অন্তত ডাক্তার মল্লিকের তাই মনে হল।

—অমিয়দা, অমিয়দা।

গাড়ির দরজা খুলে ডাক্তার মল্লিক পথে পা দিলেন। ব্যস, আর খোঁজ করতে হল না। একেবারে চোখাচোখি। বারোর তিন বাড়িটার সামনে একফালি মাঠ। কুমীরের পিঠের মতন এবড়ো-খেবড়ো। ছাইগাদা, পুরনো টিনের স্তূপ, রকমারি সাইজের বাঁশ বোঝাই। কিন্তু এসব ছাড়িয়ে ঠিক পেয়ারাতলায় মেয়েটি দাঁড়িয়ে। মাথায় ঘোমটা নেই, শাড়ীর আঁচল কোমরে। রোদের তাপে গালের রং লালচে।

দু-এক মিনিট। মেয়েটির মুখের ওপর পেয়ারাপাতার ছায়ার ঝিলিমিলি। কিন্তু গলার স্বর খুব চেনা। ডাক্তার মল্লিক থুতনি চেপে মনের মধ্যে ডুবুরি নামালেন। খাঁজ ফেললেন চওড়া কপালে।

তার মধ্যেই আবার গলা শোনা গেল, খুব লোক যা হোক, চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আমার গলা কাঠ।

মেয়েটি কথার সংগে সংগে একটু সামনে এগিয়ে এল। বেড়া-বরাবর। আর মুখের ওপর আলোছায়ার আলপনা নেই। অনাবৃত মুখ রোদে ঝলমল্ করে উঠল।

এতক্ষণ ডাক্তার মল্লিক মাথা চুলকানো ছেড়ে টাইয়ের গিঁট আলগা করছিলেন, চিন্তার গিঁট ছাড়াবেন এই আশায়, কিন্তু এবার মুখ তুলেই একেবারে অবাক।

আশ্চর্য, রুমুকে চিনতে এত সময় লাগল? মাথায় হাত না দিয়ে বুকে হাত দিয়ে খোঁজ করলে বোধ হয় চেনা সহজ হতো! কিন্তু এত বছর আগের হারিয়ে যাওয়া মেয়ে বিস্মৃতির শ্যাওলা সরিয়ে এমনভাবে আচমকা জেগে উঠবে, তা কি ডাক্তার মল্লিক কোনদিন ভাবতে পেরেছিলেন?

রুমু বলে চেঁচিয়ে ওঠবার চেষ্টা করেই ডাক্তার মল্লিক নিজেকে সামলে নিলেন। নীলমণি সরকার লেন জন-

বিরল পলাশপুরের মাঠ নয়, আর আজকের স্টেথসকোপের মালা-জড়ানো উত্তর-তিরিশ মল্লিক ডাক্তার সেদিনের সদ্য কলেজে ঢোকা চঞ্চল তরুণ নন। কিন্তু এসব ছাড়াও আরো একটা জিনিস মল্লিক ডাক্তারের নজরে পড়ল। মাথায় ঘোমটার বালাই নেই বটে, কিন্তু রুমুর সিঁথির ফাঁকে আর একজনের পরমায়ুর নিশানা। আগের দিনের নামে হয়তো এখন আর সাড়া দেবে না।

ডাক্তার মল্লিক এদিক ওদিক চেয়ে এগিয়ে গেলেন। বেড়ার এ পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন। খুব আস্তে, প্রায় ফিস-ফিসিয়ে বললেন, রুমু, তুমি? সত্যি তুমি?

রুমু হাসল। গালে টোল-ফেলা মিষ্টি হাসি।

বলল, সত্যি গো সত্যি। আমি সেই রুমু, মাঝখানের বেড়ার ব্যবধান দেখে বুঝতে পারছ না?

বুঝতে ডাক্তার মল্লিক ঠিকই পেরে-ছিলেন, পেরেছিলেন বলেই এ বয়সেও সঙ্কোচে কথা জড়িয়ে আসছিল। সেদিনের বেড়া আজকের মতন শুধু কঞ্চির কারসাজি নয়, কাঁটা-তার জড়ান ছিল খুঁটিতে খুঁটিতে। পার হতে গেলে সর্বাঙ্গ ছিঁড়ে যেত। মুখ লুকালে দাগ লুকান যেত না।

কায়স্থর ছেলের সঙ্গে বামুনের মেয়ের বিয়ে? বিস্ময়ে রুমুর মা গিরিবালা চোখ কপালে তুলেছিলেন, এমন কথা কানে শোনাও পাপ।

কথাটা তাঁর কানে তুলেছিল বামুন-দিদি। গাঁয়ের একেবারে শেষ বাড়ি। বুড়ি কারো সাতেও নেই, পাঁচেও না। স্পষ্ট বক্তা। কারুর ধার ধারে না। লাঠি হাতে ঠক ঠক করে সারা গা চষে বেড়ায়, সবাইকে হক কথা শুনিয়ে।

অনেক ভেবে-চিন্তে রুমু আর অমিয় তাকেই মুরুব্বি আঁকড়েছিল।

সব শুনে বুড়ী ঘাড় নেড়েছিল, উঁহু, এ হবার নয়। বামুনে কায়েতে বিয়ে? মাথা খারাপ। আমি পারবো না। সবার শাপমন্যি লাগবে।

রুমু দু-হাতে বুড়ীর একটা হাত আঁকড়ে ধরেছিল, বুড়ীমা তোমায় আর কিছু করতে হবে না, কথাটা শুধু একবার মার কাছে বলে দেখ। বাকি যা করবার আমিই করব।

বুড়ী এগিয়ে এসে রুমুর চোখে চোখ রেখে দেখেছিল—তারপর হেসে বলেছিল, ওমা, দিদির আমার একেবারে ছিরাধিকের অবস্থা। মুখে অন্ন নেই, চোখে নিদ্রে নেই। তা কালাচাঁদটি গেলেন কোথায়।

কালাচাঁদ বেশী দূরে নয়, ধারে কাছেই ছিল। চালতাগাছের পিছনে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল। বুড়ীর বাড়ির উঠানে পা দিতে আর সাহস হয় নি।

এক কান থেকে পাঁচ কান। মেয়ে-মহলে ঘুরপাক খেতে খেতে কথা উঠল পুরুষদের কানে।

রুমুর বাপ করিতকর্মা লোক। জীবন শুরু করেছিলেন ঠিকেদারি কাজে, কুলি ঠেঙিয়ে। ধাপে ধাপে উন্নতি করে আজ নামকরা কন্ট্রাক্টর। অবশ্য এগোনো যে সব সময়ে সোজা সড়ক ধরে এমন নয়, খিড়কিপথে, আঁকাবাঁকা চোরা গলি বেয়ে, কখনো বা নর্দামার কাদা ঘেঁটে।

চুরুট টানতে টানতে সব শুনলেন। নিবন্ত চুরুট গোটাকয়েক বাড়তি টানে অগ্নিগর্ভ করে তুলে পরিবারের দিকে চেয়ে মুচকি হাসলেন, বামুন কায়েতের কথা নয় বড়-বৌ। আজকাল কৌলীন্য অর্থে কিন্তু ওই ছিঁচকে স্টেশনমাস্টারের ছোঁড়ার হাতে মেয়েকে অন্তত আমি বেঁচে থাকতে তুলে দিতে পারবো না।

—সেকথা তো আমিও বলছি, কিন্তু কিছু একটা ব্যবস্থা কর। মেয়ে সোমথ হয়েছে, লেখাপড়া শিখছে। দুটিতে যাতে দেখা না হয়, তার রাস্তা কর।

রুমুর বাপ কাপড় বাঁচিয়ে ছাই ঝাড়লেন। রাস্তা করা আর এমন কি শক্ত কাজ। সারাটা জীবন ধরে তাই তো তিনি করে আসছেন। হরেক রকমের রাস্তা, মাটি-জবজবে থেকে শুরু করে ময়াল-প্যাটার্ন অ্যাসফাল্টাম ঢাকা সড়ক। রাঙা মাটির পথও করেছেন দরকার পড়লে। কিন্তু এ তো রাস্তা করা নয়, রাস্তা বন্ধ করা। দেখাশোনা বন্ধ হলেই ভালোবাসার ফুল শুকিয়ে আমসী। রং ঝলসে যাবে, গন্ধটুকুও নিশ্চিহ্ন। খোঁজ-খবর করে ভাল ঘরে বিয়ে দিলে নেশা কেটে যাবে। ভারি ওজনের গয়না, আর বুটিদার শাড়ী। সোনার শিকলে বাঁধা পড়লে টিয়া ঠিক বলবে কৃষ্ণনাম। নরম ঠোঁট দিয়ে ভেজানো ছোলা ঠুকরে ঠুকরে খাবে। দাঁড়ের বাইরে আর চোখ দেবে না।

কিন্তু কণ্ট্রাক্টর বাপ নিজের মেয়েকে জরিপ করতেই ভুল করেছিলেন। পায়ে শিকল পরালেই সব পাখীর চোখ থেকে আকাশের নীলাঞ্জন মুছে ফেলা যায় না। ঠোঁট দিয়ে ঠুকরে ঠুকরে ভেজানো ছোলা তুলে নেওয়ার বদলে নিজের পায়ের শিকল কাটতে চেষ্টা করে, এমন পাখীও আছে।

মহাআড়ম্বরে পাত্র খোঁজা শুরু হল। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাইকে রুমুর বাপ দশদিকে ছোটালেন। ঘটক আর হিতৈষীতে ঘর বোঝাই। ঠিকুজী-কুষ্ঠিতে রুমুর বাপের টেবিলে প্ল্যান ধারনের স্থান রইল না।

রুমুও চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়। অমিয়দার আসা বারণ। বাড়ির চৌকাঠে পা দিলে হৈ হৈ করে উঠবে সবাই। ওকেও চোখে চোখে রাখে। স্কুল যাওয়া বন্ধ। বাগানে বেড়ালেও ছলছুতোয় মাসীমা-রা সঙ্গে সঙ্গে থাকেন, অন্তত-পক্ষে ছোট ছোট ভাইবোনেরা। অন্তরীণ অবস্থা।

কিন্তু ওর মধ্যেই সুযোগ-সুবিধা জুটে গেল।

টালির মুকুট-পরা ঝামা-ইটের কোয়ার্টার। বাপের নাইট ডিউটি, মার অগাধ নিদ্রা। অমিয় আলোর নিচে রসায়নের বইয়ে বিভোর। আচমকা খড়খড়িতে টোকার শব্দ। একবার, দু'বার। টিকটিকির পোকা ধরার চেষ্টা ভেবে প্রথম প্রথম অমিয় আমল দেয় নি, কিন্তু শব্দ জোর হতেই চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। জানলার কাছ-বরাবর গিয়েই অবাক! রুমু। এতটা পথ ছুটে এসে তখনও হাঁপাচ্ছে। উত্তেজনায় ওঠানামা করছে সুডোল বুক দুটো।

—এই, দরজা খোলো। শীগ্গির।

দরজা খুলতেই এক ঝলক হাওয়ার মতন রুমু ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়েছিল।

—কি ব্যাপার, এত রাত্রে? অমিয়

মাঝখানের দরজাটা বন্ধ করে দিতে দিতে জিজ্ঞাসা করেছিল।

—দিনে বেরোবার কোন উপায় রাখে নি। তুমি জানো না অমিয়দা, চোরকেও মানুষ এমন নজরবন্দী করে রাখে না।

আঁচল চাপা দিয়ে রুমু ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠেছিল।

অমিয়র অবস্থা কাহিল। দু-ঘরের মাঝখানে আধলা ইঁটের পার্টিশন। এ ঘরের ফোঁপানী ও ঘরে গেলেই সর্বনাশ! চোখ মুছতে মুছতে মা উঠে এলেই বলবার আর কিছু থাকবে না। মাঝরাতে ঘরের মধ্যে সমর্থ বয়সের মেয়ে। চোখে জল। পরীক্ষার পড়ার ছুতো করে ছেলে যে জীবন-নাটকের মহলা দিচ্ছে, এটা আর চোখ এড়াবে না।

বেগতিক দেখে অমিয় রুমুর দুটো হাত নিজের হাতে চেপে ধরেছিল। —লক্ষ্মীটি, চেঁচামেচি করো না। আর কটা বছর তুমি অপেক্ষা কর। তারপর কেউ আমাদের বাধা দিতে পারবে না। অন্তত একটু নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে নিই, তুমি আর আমি অনেকদূরে কোথাও পালিয়ে যাব। এদেশ ছেড়ে অন্য কোন দেশে।

—কটা বছর? রুমুর দু-চোখে হতাশার ছায়া। এক একটা দিন যেন এক একটা যুগ। দিন কাটে তো রাত কাটে না, এমনি অবস্থা। এইভাবে আরো কটা বছর কাটাতে হবে?

—উপায় কি, কেমিস্ট্রির বই মুড়ে রেখে অমিয় তত্ত্বকথা বলতে শুরু করেছিল,—একটা কিছু ঠিক না করে তোমাকে নিয়ে যাওয়ার কোন মানে হয়! পথে পথে ঘুরে বেড়াতে হবে দুজনকে। সম্বলহীন, উপায়হীন। বি-এসসিটা পাশ করতে পারলে ঠিক কিছু একটা আমি জুটিয়ে নিতে পারবো। তখন তুমি আর আমি।

আবেগে অমিয় রুমুকে কাছে টেনে এনেছিল। ভেঙেপড়া খোঁপার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বার বার উচ্চারণ করেছিল, শুধু তুমি আর আমি। সে পৃথিবীতে আর কেউ থাকবে না। কোন মানুষ নয়!

রুমু একলা চলে এসেছিল বটে কিন্তু অমিয়কে পৌঁছে দিয়ে আসতে হয়েছিল। সোজা সড়ক ধরে নয়, পালেদের পুকুরপাড় ঘুরে, মাঠ ভেঙে, আলের ওপর দিয়ে।

বাড়িতে ছোটবোনের অসুখ। বাড়াবাড়ি অবস্থা। মাঝরাতে ডাক্তার ডাকার দরকার হয়েছিল। বাড়ির সবাই উদ্বিগ্ন। রোগীর ঘরের চৌকাঠে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছিল, সেই ফাঁকে খিড়কির দরজা খুলে রুমু বেরিয়ে পড়েছিল। এদিক ওদিক না চেয়ে।

শুকনো পাতা মাড়িয়ে মাড়িয়ে পিছনে হাঁটার মতন, সব মনে পড়ছে একটু একটু করে। কত বছরের কথা কিন্তু রুমুর সামনাসামনি দাঁড়িয়ে মনে হচ্ছে এই যেন সেদিনের ব্যাপার। একটু পুরোনো হয় নি, সামনে কচি পেয়ারা-পাতার মতন এমনি সবুজ, এমনি সতেজ।

—অমিয়দা এসো না, একটু বসে যাবে। রুমুর গলায় অনুরোধের আমেজ।

—কোন্‌টা তোমার বাড়ি? ডাক্তার মল্লিক চোখ তুলে দেখলেন। অত বড় জাঁদরেল বাপের মেয়ে শেষকালে এমন জরাজীর্ণ গলিতে বাসা বাঁধলো। শহরের সীমানা ছাড়িয়ে এমন পাণ্ডববর্জিত অঞ্চলে!

এই যে পাশেই। আঙুল তুলে রুমু সামনের একটা দরজা দেখিয়ে দিল, সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে যেতে যেতে বলল, এসো অমিয়দা, এতদিন পরে দেখা, একটু বসে যাবে।

বাইরের অবস্থা যতটা ভয়াবহ, ভিতরে কিন্তু ততটা নয়। ইঁটের পাঁজর সদ্যফেরানো কলিতে বিলুপ্ত। জানলা-দরজার রংও বেশীদিনের পুরোনো নয়। তা ছাড়া রঙীন পর্দায়, মেহগনি আসবাব-পত্রে, দামী চেয়ার-টেবিলে বেশ স্বচ্ছলতার আভাস। তাহলে ভালোই আছে রুমু, সুখেই আছে।

এদিক-ওদিক চোখ ফিরিয়ে ডাক্তার মল্লিক সেই কথাই বললেন, বেশ ভালোই তো আছ দেখছি!

সঙ্গে সঙ্গে রুমুর দুটো চোখ চক চক করে উঠল। দাঁত দিয়ে নিচের ঠোঁটটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপর বললে—তুমি আর মানুষ নেই অমিয়দা, পুরোপুরি ডাক্তার হয়ে গিয়েছ।

চোখের চকচকানি ডাক্তার মল্লিকের নজর এড়ায়নি, তবু কথায় পরিহাসের ফিকে রং চড়ালেন, কেন, ডাক্তার বুঝি মানুষ নয়?

—সবাই নয়, অন্তত তুমি নও। তাহলে এমন কথা বলতে পারতে না। সুখ বুঝি এই দামী দামী আসবাব আর

মোটা সোনার গয়নায়। এটুকুতেই তুমি আঁচ করে ফেললে আমার সুখের অন্ত নেই।

ডাক্তার মল্লিক আর কথা বাড়ালেন না। মানুষের রোগের খোঁজ তাঁর রাখবার কথা, সুখের নয়। অবশ্য একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বুঝতে পারতেন, আয়ত চোখ কিন্তু খুশীর ছিটেয় উজ্জ্বল নয়, কোন যেন বিষাদ-ম্লান। ঠোঁটের কুঞ্চনে শ্রান্তির আভাষ।

একটু দম নিয়ে ডাক্তার মল্লিক জিজ্ঞাসা করলেন, বিয়ে হয়েছে কতদিন?

—বছর ছয়েক। নির্লিপ্ত গলার স্বর রুমুর।

—কোথায় হল? ডাক্তার মল্লিকের স্বরেও আগ্রহের ছোঁয়া নেই, কৌতূহলের মিশেল নয়। বিয়ে হয়ে গেছে এইটাই যেন চরম কথা, কোথায় হলো, কার সঙ্গে, এসব অবান্তর।

রুমু গলার আওয়াজ তরল করল, দর্মাহাটার ঘোষালদের বাড়ি। এর পর যেন স্বামীর নাম জিজ্ঞাসা করে বসো না, বলতে পারব না। পতি পরম দেবতা। কথা শেষ করে রুমু হাসল। হাসি যেন কান্নার শরিক। চোখের কোণে জমে থাকা জল গালের ওপর গড়িয়ে পড়লো।

অস্বস্তিকর অবস্থা। হাতঘড়ির ওপর ডাক্তার মল্লিক একবার নজর বুলিয়ে নিলেন। হাসপাতালে ফেরার আগে এখনও দুটো রোগী দেখে যেতে হবে। একটা কাছেই আর একটা সেই বিডন স্ট্রীট। সময় নেবে। কিন্তু আচমকা উঠতেও মন খুঁত খুঁত করছে, বিশেষ করে এতদিন পরে দেখা।

—এখানে গাঙুলীবাবুদের বাড়ি এসেছিলে বুঝি? রুমু কথা পাল্টাল। চোখের জল মুছিয়ে দিতে কোন ব্যগ্র হাতই যদি এগিয়ে না আসে, তবে চোখের কোণে জল জমিয়ে লাভ! অমিয়দা চিরকাল একরকম। যত উচ্ছ্বাস কেবল কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, যত উত্তাপ হাতে হাত রাখলে। নয়তো চোখের সামনে না থাকলে, মন থেকেও উধাও। হাত দিয়ে শ্লেটের লেখা মুছে ফেলার মতন মন থেকে গোটা মানুষকে মুছে ফেলতে একটু দ্বিধা নয়।

—হ্যাঁ, ও বাড়ির কর্তার পিঠে একটা কার্বাঙ্কল হয়েছিল, সেটাই চিরে দিয়ে গেলাম।

—তোমার এখন খুব নামডাক, না অমিয়দা। কাগজে মাঝে মাঝে তোমার নাম দেখি। ডাক্তারদের সভায় প্রবন্ধ পাঠ করছ, কোথায় যেন শিশুদের হাসপাতাল উদ্বোধন করলে।

আঙুলে আঁচল জড়াতে জড়াতে রুমু মিহিসুরে বলল।

ডাক্তার মল্লিক মুচকি হাসলেন। কথাটা সত্যি। বয়স খুব বেশী নয়, সেই অনুপাতে নাম কিছুটা হয়েছে বৈকি। জুনিয়রদের মধ্যে সার্জারীতে হাত ভালো। ইদানীং গোলমেলে দু-একটা অপারেশনে উৎরে গেছেন। বাতিল করে দেওয়া রোগীকে সারিয়ে সংসারে ফেরত পাঠিয়েছেন। শুধু আত্মীয়স্বজনের মুখে প্রশংসার বাণীই নয়, জাঁদরেল সিনিয়রদেরও তারিফ কুড়িয়েছেন। কিন্তু এসব কথা থাক। ছুরি আর ফরসেপ ধরা হাতে ডাক্তার মল্লিক স্পন্দ্যমান কোমল আর একটি হাত আঁকড়ে ধরেছিলেন কোনদিন, সেই কথাই বরং হোক। রোগীরা অপেক্ষায় রয়েছে, নয়তো রোদ নিভে আসা এমন শান্ত বিকালে পুরোনো কথা শুনতে খুবই ভালো লাগতো।

—একটা সত্যি কথা বলবে অমিয়দা।

রুমুর আচমকা প্রশ্নে ডাক্তার মল্লিক ভুরু কোঁচকালেন। চেয়ার ঘুরিয়ে আরো সরে এলেন রুমুর কাছাকাছি।

—তার মানে, সত্যি কথা আমি বলি না, এ ধারণা তোমার হল কেমন করে?

খোঁচাটা রুমু এড়িয়ে গেল। এখন তর্কবিতর্ক করতে গেলে আসল কথাটার খেই যাবে হারিয়ে।

—আমার ভয়েই তোমরা পলাশপুর ছাড়লে, না?

ভয়ে! ভয়ে কি ঠিক! মনে মনে ডাক্তার মল্লিক একটু চিন্তা করলেন। কথাটা পল্লবিত হয়ে স্টেশনমাস্টারের কানেও উঠেছিল। নির্ঝঞ্ঝাট মানুষ। সারাজীবনে শুধু বোঝেন লাল আর সবুজ বাতির খেলা। মেইল আর প্যাসেঞ্জারের তফাৎ। মেয়ের বাপ যখন লাল বাতি দেখিয়েছে, তখন ছেলের আর সেদিকে নজর দেওয়াই উচিত নয়। উদ্ধত সিগন্যাল উপেক্ষা করলে অ্যাকসিডেন্ট হবার সম্ভাবনা।

সার যদুর উপদেশ অবশ্য এসেছিল রুমুর বাপের দিক থেকে। হাতের মালাক্কা বেতের ছড়িটা ঘোরাতে ঘোরাতে কণ্ট্রাক্টর বলেছিলেন, মাস্টারমশাই, আপনি বদলীর চেষ্টা দেখুন। চোখের আড় হলেই মনের আড়। উঠ্‌তি বয়সের এ রোগ ঠিক কেটে যাবে।

স্টেশনমাস্টার ঘাড় নেড়েছিলেন। সব কথা তলিয়েও বোঝেন নি। তবে কথাটায় যুক্তি আছে। গোলমাল এড়াবার দরকার তো মালগাড়িকে সরিয়ে ফেলো লাইন থেকে। অন্য লাইনে চালান করে দিলেই মেইলের পথ পরিষ্কার।

বদলী হতে পারলে নিজেরও কিছু সুরাহা হয়। শহরের কাছাকাছি গেলে অমিয়র কলেজে যাবারও সুবিধা। অমিয়র মারও তীর্থধর্ম করার পক্ষে অসুবিধা নেই। সেভেন আপ পাশ করিয়ে নিজেও যেতে পারেন গুটি গুটি। কালীঘাট, বেলুড়, দক্ষিণেশ্বর।

মাসখানেকের চেষ্টাতেই যোগাযোগ ঘটে গিয়েছিল।

জানো, রুমু কেশে গলাটা পরিষ্কার করে নিল, বিয়ের রাতে তোমাদের দরজায় গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম।

—বিয়ের রাতে? স্টেথস্কোপটা গলা থেকে নিয়ে ডাক্তার মল্লিক হাতে জড়ালেন। খুলে-আসা জুতোর ফিতাটা নিচু হয়ে এ'টে নিলেন। রুমুর কিছু অসাধ্য নেই। কতবার অমিয়র হাত সজোরে নিজের হাতে চেপে ধরে বলেছিল, কি পুরুষমানুষ তুমি! আমি মেয়ে হয়ে যত সাহস রাখি, তার কাণাকড়িও তুমি রাখো না? আমাকে নিয়ে যেতে পারো না হরণ করে? কটা মানুষের চোখ রাঙানিতে এত ভয়!

—হ্যাঁ, বিয়ের রাতে। ভোর রাতে লগ্ন। সঙ্গিনীরা ঘুমে ঢলে পড়তেই ছুটে চলে গিয়েছিলাম তোমার কাছে। ভেবেছিলাম, লগ্ন তো ভোরে ছিলই; শুধু মানুষটা বদল করে নেবো। অমুক ঘোষালের বদলে অমিয় মল্লিক।

—তারপর? শুনতে ডাক্তার মল্লিকের মন্দ লাগছে না। ওষুধ আর আরক, ছুরি, কাঁচি, ফরসেপের ঝঙ্কার, বিদঘুটে সব রোগের ফিরিস্তি, তার ফাঁকে ফাঁকে বেশ লাগছে ফেলে-আসা নরম প্রেমের কাহিনী শুনতে। সেদিন সাহস ছিল না, আজ কিন্তু ডাক্তার মল্লিকের সাহস অনেক বেড়েছে। সাহস বেড়েছে বটে, কিন্তু লোকলজ্জা, সম্ভ্রমচ্যুতির ভয়ও কম বাড়ে নি। রুমুর হাত ধরে দ্বিধা-সঙ্কোচের বেড়া পেরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সাহস আজও ডাক্তার মল্লিকের নেই।

—কি ভাবছো? এসব কথা বৌকে বলে খুব হাসাহাসি করবে তো?

—বৌ? পাবো কোথায়?

—সেকি, তুমি বিয়ে করো নি অমিয়দা? গাঢ় হয়ে এল রুমুর গলার স্বর, সত্যি বিয়ে করো নি? কেন গো?

—কেন জানো না! আচমকা কথাটা বেরিয়ে গেল ডাক্তার মল্লিকের মুখ থেকে।

অবশ্য প্রথম যৌবনে এমন একটা প্রতিজ্ঞা ছিল বৈকি। রুমু ছাড়া অমিয়র জীবনে আর কোন মেয়ের ছায়া পড়বে, তা পর্যন্ত ভাবতে পারে নি। নিজের পায়ে ভর দিয়ে একটু দাঁড়াতে পারলেই রুমুকে কাছে ডেকে নেবে, এমন একটা ইচ্ছা অমিয় নিজের রক্ত দিয়ে লালন করেছিল। আচমকা যেন ব্যাপারটা ঘটে গেল। ধুলোর ঘূর্ণি। কালবৈশাখীর মাতনে চারদিক অন্ধকার। ঝড় থামতে দুজনেই হারিয়ে গেল।

আজও ডাক্তার মল্লিক বিয়ে করেন নি যৌবনে ভালবেসে-না-পাওয়া একটি মেয়ের জন্য, এমন নয়। স্রেফ সময় পান নি। একটার পর একটা পরীক্ষার সিঁড়ি লাফিয়ে লাফিয়ে পার হয়েছেন। প্রথম যৌবনের স্বপ্নের ঘোর কেটে গেল স্তূপীকৃত শবের ওপর ছুরির ফলা চালিয়ে। ডারমিস, এপিডারমিস, ভিসারা, ব্লাডভেসেল এই সবের খোঁজে নরম চোখের ইশারা, দক্ষিণ সমীরণ উধাও। যে সময়টা ছাদনাতলায় নষ্ট হবে, সেটুকুর মধ্যে অন্তত গোটা তিনেক রোগী দেখা ডাক্তার মল্লিক শেষ করতে পারবেন, ছোটখাট একটা অপারেশন। অবশ্য রুমুর কথা যে একেবারে মনে পড়ে নি এমন নয়। পথেঘাটে হাস্যোচ্ছলা কিশোরী মেয়ে নজরে পড়লেই মনে এসেছে পলাশপুরের এই মেয়েটির কথা।

রুমু খুব কাছে সরে এল। শাড়ির আঁচলে ঢাকা পড়ল ডাক্তার মল্লিকের কড়া-ইস্ত্রি ট্রপিকাল প্যাণ্টের কিছুটা। চেয়ারে রাখা হাতটা আলতো ছু'য়ে গেল রুমুর চাঁপা-কোরক আঙুলের সার।

—আমার তো অনবরত তোমার কথা মনে পড়ে। সকাল থেকে সন্ধ্যে। ঠিক যেন অন্য মানুষের সঙ্গে ঘর করছি, ট্রেনের অপেক্ষায় প্ল্যাটফর্মে রাত কাটানো। কি সুখে যে আছি জিজ্ঞাসা ক'রো না অমিয়দা।

চোখের কাছ অবধি রুমু আঁচল তুলল কিন্তু কি ভেবে চোখে চাপা দিল না।

—ভদ্রলোক কি করেন? ডাক্তার মল্লিক যেন রোগের ইতিহাসের খোঁজ করছেন এমনভাবে কথাটা বললেন।

—কি করেন? বোতল বোতল মদ গেলেন, বাঁধা মেয়েমানুষের ঘরে সপ্তাহের

অর্ধেক দিন কাটান আর সময়ে অসময়ে বৌয়ের ওপর মেজাজ দেখান।

ডাক্তার মল্লিক একটু বিব্রত হয়ে পড়লেন। কি করেন বলতে ভদ্রলোক চাকরি বাকরি কি করেন তারই খবর জানতে চেয়েছিলেন, তাঁর চরিত্রের বিবরণ শুনতে চান নি। রুমুর দুঃখথমথম জীবনের জন্য ডাক্তার মল্লিকের দায়িত্বও কম নয়। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে রুমু এই কথাটা বুঝি জানাতে চায়। সেদিন অমিয়দা এগিয়ে এলে, রুমুর জীবনে রাহুর ছায়া পড়ার অবকাশই হ'তো না।

জানলার পর্দায় অস্ত-সূর্যের ঝিলিক। হাতঘড়ির ওপর নজর বুলিয়েই ডাক্তার মল্লিক উঠে দাঁড়ালেন, আজ উঠি রুমু। গোটা দুয়েক রোগী দেখে যেতে হবে, হাসপাতালে ফেরবার আগে।

—আবার কবে দেখা হবে? রুমু সরে দাঁড়াল। বাধা দিতে গিয়েও কি ভেবে আর বলল না কিছু। সেদিন আটকাতে পারে নি, কনেচন্দনে সেজে বিয়ের বেনারসী জড়িয়ে ছুটে গিয়েও দেখা পায় নি. এতদিন পরে যখন ফিরে এসেছে তখন জোর করে মানুষটাকে আটকানো যাবে না। সত্যি যদি রুমুকে দেখার ইচ্ছা হয়, ঠিকানা তো চেনা, কাজ-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে এসে দাঁড়াতে আর বাধা কোথায়।

হাত দিয়ে কোটের ভাঁজ ঠিক করতে করতে ডাক্তার মল্লিক বললেন, দেখা হবে, শীঘ্রই দেখা হবে। পরশুই বোধ হয় গাঙ্গুলীদের বাড়ি আসতে হবে। এইরকম দুপুরের দিকে।

—ঠিক আসবে, কথা দিচ্ছ।

মুখ তুলেই ডাক্তার মল্লিক থতমত খেয়ে গেলেন। ম্লান রোদের কিছুটা রুমুর হাতের চুড়ির গোছার ওপর, তার দু চোখের তারায়। শুধু অনুরোধ আর মিনতি নয়, আরো যেন কিছু একটা রয়েছে দু চোখের দৃষ্টিতে। চোখ বলতে ডাক্তার মল্লিকের কাছে কেবল স্ক্লেরটিক, করয়েড আর রেটিনার সমষ্টি। অ্যাকোয়াস, হিউমারের বিস্তার। কিন্তু এতদিনের যত্ন ক'রে পড়া সব গোলমাল হয়ে গেল। আরো যেন কি রয়েছে, নতুন উপাদান চোখের তারায়, যা মানুষকে কাজ ভুলিয়ে অন্যমনস্ক ক'রে দেয়, রক্তে সমুদ্রের কল্লোল আনে, পাঁজরের খাঁজে খাঁজে লুকানো পুরোনো ব্যথায় মোচড় দেয়।

সব ভুলে ডাক্তার মল্লিক হাত দিয়ে রুমুর বাহুমূলে স্পর্শ করলেন।

ডাক্তার মল্লিককে গাঙ্গুলীদের বাড়ি আরো বারচারেক যেতে হয়েছিল। বড়-লোকের ব্যাপার, ব্যাণ্ডেজ খুলতেও ডাক্তারকে কল দেন। নড়তে চড়তে দামী পরামর্শ। বিকেলে সুরুয়া খাবেন, না পরিজ তা জানতেও ডাক্তার মল্লিকের খোঁজ পড়ে। বার চারেকের মধ্যে রুমুর বাড়ি গিয়েছিলেন বার দুয়েক। একদিন তো জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়েছিল রুমু, চোখাচোখি হ'তে আর এড়াতে পারেন নি। আর একদিন অবশ্য নিজেই গিয়ে দরজার কড়া নেড়েছিলেন।

কিন্তু না গেলেই বুঝি ভাল করতেন। সেই এক কথা রুমুর। এই নরক থেকে অমিয়দা তাকে উদ্ধার করুক, নয়তো ঠিক একদিন এসে দেখবে বাগানের পেয়ারা-ডালে শাড়ির ফাঁস লাগিয়ে রুমু ঝুলে পড়েছে। এ ছাড়া আর উপায় নেই।

রুমুর উপায় নেই, উপায় ডাক্তার মল্লিকেরই বা কি আছে। সামনে চকচকে ভবিষ্যৎ, জোর পায়ে সিঁড়ি ভাঙার মতন ধাপে ধাপে উন্নতি করার মোহ। এদেশের কাজ শেষ ক'রে সাগরপার। ডিগ্রির মালা গলায় জড়িয়ে খ্যাতির নিশান আঁকড়ে দাঁড়াবেন মাথা উঁচু করে। সে সবের মাঝখানে প্রথম যৌবনে ফেলে আসা একটা মেয়ের স্থান কোথায়। ঘর বাঁধা, সাজানো গৃহস্থালী জড়িয়ে নিরুত্তেজ মধ্যবিত্ত জীবন। কিন্তু এ তো ডাক্তার মল্লিকের কাম্য নয়।

এসব কথা ডাক্তার মল্লিক আলোচনা করেন অবসর সময়ে। নিজেকে বোঝাবার চেষ্টা করেন। নীলমণি সরকার লেনটা মুছে ফেলতে চেষ্টা করেন মন থেকে। এ শহরে এমন যেন কোন শড়কই নেই, বাসিন্দারাও না। প্রেম একটা বিকৃত অনুভূতি, মানুষের কাছে আসার চেষ্টা নিছক জৈবিক নেশা, আর কিছু নয়। ডাক্তার মল্লিকের জীবনে রুমুর কোন প্রয়োজন নেই।

কিন্তু মাঝে মাঝে এলোমেলো হাওয়ায় টেবিলের কাগজ ওলোটপালোট ক'রে দেওয়ার মতন হঠাৎ কেমন গোলমাল হয়ে যায়। কর্মব্যস্ততার ফাঁকে ফাঁকে নীলমণি সরকার লেনের বাসিন্দার মুখ ভেসে আসে। দু চোখে আমন্ত্রণের ইশারা। প্রেসস্ক্রিপশনের তলায় পুরোনো দিনের আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা টুকরো চিঠির আভাস। সাদা এপ্রন খুলে ফেলে ডাক্তার মল্লিক গাড়িতে গিয়ে ওঠেন। রোগীদের আস্তানা ছাড়িয়ে অন্যদিকে স্টিয়ারিংয়ে মোচড় দেন। শহর ছেড়ে শহরতলীতে।

—কি ব্যাপার বল তো? ডাক্তার মল্লিক বিস্ময় প্রকাশ করেন, এতদিন আসছি, মিস্টার ঘোষালের সঙ্গে দেখা হ'চ্ছে না।

—দেখা করতে খুব ইচ্ছে হ'চ্ছে নাকি? রুমু ঠোঁট মুচকে হাসল। একটু থেমে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে বলল, কেন, দেখা হ'লে ডুয়েল লড়বে? জগৎসিংহ ওসমানের মতন।

ডাক্তার মল্লিক উত্তর দিলেন না। রুমুর মুখে কিছু আটকায় না। কি কথার কি উত্তর দেবে। লজ্জা বাঁচাতে ডাক্তার মল্লিককে মুখ লুকোতে হবে। কিন্তু ডাক্তার মল্লিক উত্তর না দিলেও রুমুকে আটকানো গেল না। চেয়ারের হাতলে বসতে বসতে বলল, তোমরা ডুয়েল না লড়লেও আমি অন্তত আয়েষার মতন বলব, এই ডাক্তার আমার প্রাণেশ্বর।

শক্ত শক্ত অপারেশনের সময় ডাক্তার মল্লিকের হাত একটু কাঁপেনি কোনদিন, মন সামান্য বিচলিত নয়। মেডিকেল ছাত্ররা নিষ্পলক চোখ মেলে দেখেছে কর্মচঞ্চল আঙুলের খেলা, ছুরি, কাঁচি, ক্ল্যাম্পের কসরত। কিন্তু আজ রুমুর এই কথাতেই ডাক্তার মল্লিক বিচলিত হ'য়ে পড়লেন। হাত কেঁপে চা চলকে পড়ল দামী প্যান্টের ভাঁজে, কিছুটা কব্জির ওপর।

চায়ের কাপ সরিয়ে ডাক্তার মল্লিক রুমাল দিয়ে হাতটা চেপে ধরলেন। এমন কিছু তপ্ত নয় চা, অন্তত রুমুর তার পরের কথাগুলোর মতন তো নয়ই।

—এইটুকু গরমেই এমন করছ, আমার দেখো তো! হাত দিয়ে শুধু শাড়িটাই সরাল না, ব্লাউজেরও দুটো বোতাম খুলে ফেলল পট পট করে। বুকের মাঝখানে জলটলটল ফোস্কা।

—কি কড়ার তেল ছিটকে বুকের ওপর? ডাক্তার মল্লিক একনজরে একবার দেখে নিলেন। এখন তেমন যন্ত্রণা নয়, ব্যথা হবে ফোস্কা গ'লে গেলে। আজকাল গোটাচারেক ভালো ভালো মলম বেরিয়েছে। ও'র বাড়িতে নমুনা হিসাবে মাসে মাসে এসে জড়ো হয়। মনে ক'রে নিয়ে আসতে হবে।

—না গো, তেল টেল নয়, স্বামী-দেবতার জ্বলন্ত সিগারেটের স্পর্শ।

—আদর করার ধরনটা যেন নতুন রকমের মনে হ'চ্ছে। ডাক্তার মল্লিক একটু গম্ভীর হ'য়ে গেলেন।

দোষ আমারই। দরকারের সময় হারটা তাড়াতাড়ি খুলে না দিতে পারলে পুরুষ-মানুষের একটু রাগ হওয়াই তো স্বাভাবিক।

ডাক্তার মল্লিক ভুরু কোঁচকালেন। টিপে টিপে অ্যাবসেস পরীক্ষা করার মতন খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে রুমুকে দেখলেন। আপাদমস্তক। কানে দুটো ইয়ারীং ছাড়া রুমুর অঙ্গে আর কোন আভরণ নেই। শাখাসর্বস্ব গাছের রূপ, পত্রের সমারোহ নেই।

—আগের বার তোমার গায়ে যেন অনেক গহনা দেখেছিলাম?

রুমু হাসল, সে সব ব্লু প্রিন্সের পায়ে গেছে।

—ব্লু প্রিন্স?

—জীবন ভরে কেবল ডাক্তারিই করলে অমিয়দা, দুনিয়ার আর কিছু দেখলে না। ব্লু প্রিন্স দু দিনের মধ্যে কত রাজাকে ফকির করে গেল আর বান্দাকে বাদশাহ। শুধু আমার গহনাই নয়, বেশ কিছু টাকাও তার খুরের ঘায়ে উধাও।

অনেকক্ষণ ডাক্তার মল্লিক কিছু কথা বললেন না। বলার মত কথাও খুঁজে পেলেন না।

—কি ভাবছো?

—কিছু না।

—এততেও কি তোমার মায়া হয় না অমিয়দা। চোখের সামনে একটা মেয়ে এমন দগ্ধে দগ্ধে মারা যাবে, একটু নিঃশ্বাসও ফেলবে না তার জন্য? কঙ্কাল ঘেঁটে ঘেঁটে রক্তমাংসের কথা তোমার বোধ হয় মনেই নেই।

দমকা ঝড়ে শুকনো পাতা উড়ে যাওয়ার মতন হঠাৎ যেন অনেকগুলো বছর দ্রুতপায়ে পিছিয়ে গেল। রুমুকে সেদিন গ্রহণ না করার আক্ষেপ ডাক্তার মল্লিকের সারা বুক জুড়ে। আজ এই নির্যাতনের মূলে যে তাঁরই মুখ ফিরিয়ে থাকার কাহিনী, তাতে আর সন্দেহ কি!

ডাক্তার মল্লিক একটা হাতে রুমুকে কাছে টেনে আনলেন। খুব কাছে। রোগীকে বাঁচার আশা দেওয়ার ভঙ্গীতে বললেন, কোথা দিয়ে কি হ'য়ে গেল রুমু। নয়তো তোমাকে ছাড়া নিজের অস্তিত্বও কল্পনা করতে পারতাম না। আমার যশ, সম্মান, প্রতিপত্তি সব ছাড়তে পারি তোমার জন্য।

রুমু মাথা রাখলো ডাক্তার মল্লিকের বুকের ওপর। আবেশে চোখ বুজলো। তাই যদি হয় তবে কিসের বাধা। নতুন ক'রে নীড় বাঁধা যায় না, নতুন পরিবেশে নতুনতর জীবন।

অনেক রাত পর্যন্ত ডাক্তার মল্লিক ময়দানে ঘুরলেন গাড়ি নিয়ে। উষ্ণ নারী-দেহের স্পর্শ, পেলব দুটি হাতের নিবিড় আলিঙ্গন, মদির চোখের আহ্বান। প্রাণ জুড়োনো আভা, রক্তের মত রাঙা কিন্তু তীব্র বিষ। এমন একটা ওষুধ, আল-মারীর ওপরের থাকেই রয়েছে। শুধু একটি ফোঁটা ওষ্ঠলগ্ন হবার সঙ্গে সঙ্গে অনন্ত সমাধি। রুমু বুঝি ঠিক তেমনি। আগুন-রাঙা মেয়ে, দেহে বিকশিত যৌবন-লাবণ্য কিন্তু স্পর্শে পাপ, আলিঙ্গনে মৃত্যু। অপবাদের ঢেউ উঠবে ওদের ঘিরে, অপযশের পাঁক।

ডাক্তার মল্লিক মন ঠিক ক'রে ফেললেন। বীজাণু এড়াবার জন্য যেমন কারবলিক সাবানে দুটো হাত রগড়ে রগড়ে ধুয়ে ফেলেন, লোশনে ভিজিয়ে নেন কব্জি পর্যন্ত, তেমনি ক'রে ঘষে ঘষে মুছে ফেলবেন স্মৃতির রং, পলাশপুরের কাহিনীর চিহ্নটুকুও না থাকে। নীলমণি সরকার লেন এ শহরের অবজ্ঞাত এক শঙ্ক হিসাবেই চিহ্নিত থাক, তার বাসিন্দারা বিরাট জনসংখ্যার ক্ষীণ অংশ, আর কিছু নয়। সদ্য-পাওয়া কতকগুলো বিদেশী জার্নাল খুলে ডাক্তার মল্লিক অবসর সময় পড়া শুরু করলেন। গভীরভাবে।

মাসখানেক ডাক্তার মল্লিক কাজের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন নিজেকে। হাসপাতাল আর ডিসপেনসারী, কাজ আর পড়া এর মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। ব্রেন-টিউমর অপারেশনের অদ্ভুত এক পদ্ধতি। জুরিখের এক শল্যবিশারদের মনোজ্ঞ প্রবন্ধ। তন্ময় হ'য়ে পড়ছিলেন ডাক্তার মল্লিক, আচমকা টেলিফোনের ঝঙ্কার।

মেঘলা আকাশ। হঠাৎ বৃষ্টি আসা আশ্চর্য নয়। এমন সময় রোগীর ডাকে বেরোতে হ'লেই বিপদ। নিতান্ত অনিচ্ছায় ডাক্তার মল্লিক টেলিফোন তুলে নিলেন, কানেও রাখলেন নিস্পৃহভাবে। দু এক কথায় সেরে দেবেন। শরীর খারাপের অজুহাতে মাপ চাইবেন। কিন্তু হোল্ডার ধরে ডাক্তার মল্লিক টান হ'য়ে বসলেন। কপালে হিজিবিজি আঁচড়। দু চোখে কৌতূহলের রোশনাই।

রুমুর গলা। কিন্তু নিছক যাবার আমন্ত্রণ নয়, বিপদে পড়েছে তারই সঙ্কেত। এখনি আসতে হবে অমিয়দাকে, এই মুহূর্তে।

বাইরের ঘরে পা দিয়েই ডাক্তার মল্লিক থমকে দাঁড়ালেন। অন্যদিনের মতন খালি ঘর নয়, রুমুও নেই ধারে কাছে। দরজার পাশের চেয়ারে মাঝবয়সী ভদ্রলোক। গলায় পাকানো চাদর, আহাঁটু পাঞ্জাবী, মিহি ধুতি মেঝেয় লুটোচ্ছে। ঢেউ

খেলানো চুলে আলবার্টের ইশারা। কোটরাগত চোখ, গালে মুখে মাংসের বালাই নেই। শিরার জট।

ডাক্তার মল্লিককে দেখে দাঁড়িয়ে উঠল, দুটো হাত কচলাতে কচলাতে বলল, আসুন স্যার, আপনার অপেক্ষাই করছি।

ডাক্তার মল্লিক মুখ তুলে একবার চেয়েই হাতের ব্যাগ সামনের টেবিলে রাখলেন, এখন মিস্টার ঘোষাল কেমন আছেন?

—কাটা ছাগলের মতন ছটফট করছেন স্যার, লোকটি ছোট চোখ যথাসম্ভব বিস্ফারিত করলো, মাঠে ও'র অবস্থা দেখে আমার তো মনে হ'য়েছিল বুঝি জ্যান্ত আর বাড়ি আনতেই পারবো না। বাবা বিশ্বনাথের দয়ায় কোনরকমে এনে ফেলেছি, এখন আপনার ওপর সব ভার।

পর্দার ওপারে দরজায় মৃদু করাঘাত। লোকটি থেমে সেদিকে একবার চেয়েই বললেন, আসুন স্যার, ভিতরে আসুন। বৌমার আপনি জানাশোনা লোক, আমি যখন ডাক্তারের খোঁজে কপাল চাপড়াচ্ছি, তখন বৌমাই বললেন আপনার কথা। শুধু বলা, নিজে গিয়ে মোড়ের আরতি স্টোর্স থেকে ফোন করলেন আপনাকে। সোজা চলে আসুন স্যার।

লোকটিই এক হাতে পর্দা তুলে ধ'রে এক পাশে সরে দাঁড়ালো।

ভিতরের ঘরে ঢুকেই ডাক্তার মল্লিকের প্রথম নজরে পড়লো মেহগনি খাটের ওপর। সাড়ে তিন মণ লাশ, একটু কম নয়। পরনে গেঞ্জী আর ধুতি। অনাবৃত অংশ লোমাচ্ছন্ন। অস্ফুট কাতরোক্তি। খাটের বাজুর কাছ বরাবর রুমু। ঘোমটার বহর দু চোখ ছাড়িয়ে আরো নিচে।

ডাক্তার মল্লিকের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিল শীর্ণকায় লোকটি। একটা সওয়ালের দশটা জবাব। ইনিয়ে বিনিয়ে অবান্তর কথা। নীর বাদ দিয়ে ক্ষীরটুকু তুলে নেওয়ার মতন তার মধ্যে থেকেই দরকারী কথা ডাক্তার মল্লিক বের ক'রে নিলেন। এই প্রথম নয়, এর আগেও একবার হয়েছিল। তবে এবার ব্যথাটা যেন আরো বেশী। পরীক্ষা করার সময় রোগী একবার চোখ খুলল। চোখের রং জবা-কুসুম সংকাশং, ব্রণবিমণ্ডিত মুখ, শরীরের অবস্থা পালছেঁড়া হালভাঙা নৌকার সামিল। অনাবশ্যক মেদের ভারে হার্টের হালও আশংকাজনক।

প্রথম দেখেই কিছুটা সন্দেহ হয়েছিল, পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার মল্লিক নিঃসন্দেহ হলেন। গ্যাস্ট্রিক আলসার। অপারেশন ছাড়া সারানো সম্ভব নয়।

এইবার, এতক্ষণ পরে রোগী মুখ খুলল। দাঁতে দাঁত চেপে দম নিল কিছুক্ষণ তারপর বলল, শশিপদ, ও শশিপদ।

গলার চাদর সামলে শশিপদ রোগীর দিকে ঝুঁকে পড়ল। একটা হাত কানের পিছনে নিয়ে চোখ কুঁচকে বলল, এই যে কাছেই রয়েছি ব্রাদার। হুকুম করো।

—আশ্চর্য কাণ্ড তোমাদের। বাপ পিতেম'র আমল থেকে জানো বাড়িতে কবিরাজ ছাড়া কেউ ঢোকে না। অশ্বিনী কবিরাজ থাকতে যত সব উটকো লোককে—

কথাটা আর শেষ করতে পারল না। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত করল।

—আমি তো পই পই করে বলছি এসে অবধি। আমরা বনেদী লোক, বনেদী চিকিৎসাই ভালো। ছোকরা ডাক্তারে কখনও রোগ সারে। বৌমাই কোন কথা শুনলেন না। হন্তদন্ত হ'য়ে নিজে কল দিয়ে নিয়ে এলেন। বাপের বাড়ির দেশের লোক বুঝি, তাই না বৌমা।

বৌমা একটি কথাও নয়। লজ্জাবতী লতা। শুধু ঘোমটার বহর আর একটু বাড়লো।

কথা বললো রোগী নিজে। ঘাড়টা উঁচু ক'রে রুমুর দিকে চেয়ে বিষের ছিটে ছড়ালো, হারামজাদী, দাঁড়া উঠি সেরে।

শশিপদ আবহাওয়া তরল করার চেষ্টা করল, ওসব ছুরি কাঁচি না চালিয়ে কোন ওষুধ টষুধ যদি দেবার থাকে দিয়ে যান। এ শরীরে অপারেশনের ধকল কি আর সইবে?

একটি কথাও নয়, ডাক্তার মল্লিক বাইরে চলে এলেন। হাতব্যাগটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে আসার মুখেই বাধা।

রুমু এসে দাঁড়াল। প্রসারিত হাতে দশ টাকার একটা নোট।

—ভিজিট দেওয়ার বাড়তি অপমান-টুকু আর না করলেই পারতে।

—অমিয়দা, তুমিও ভুল বুঝবে আমায়।

ভিজে গলা। দীর্ঘশ্বাসের মিশেল। চোখ তুলেই ডাক্তার মল্লিক বিব্রত। দু একটা চুলের টুকরো কপালের ওপর। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠছে। শিশিরভেজা পদ্ম।

—এই আমার স্বামী অমিয়দা, এই আমার জীবন।

শুধু জীবনে সুখী নয়, মনের মানুষকে ছেড়ে আর একজনকে নিয়ে ঘরবাঁধার অপেক্ষাটুকুই এতদিন ডাক্তার মল্লিকের নজরে পড়েছিল, কিন্তু জীবন এত দুর্বিষহ, ঘরের মানুষের রূপ এত জঘন্য, ভাবা যায়নি।

কঠিন একটা ব্যাধি বয়ে বেড়াবার মতন, সমস্ত যন্ত্রণা চেপে মুখে ম্লান হাসির প্রলেপ মাখিয়ে ঘোরাফেরা করছে সংসারে। কিন্তু কতদিন। আঘাতে আঘাতে একদিন লুটিয়ে পড়বে মাটিতে। উপাস্থি মজ্জায় তিল তিল রক্তক্ষরণ। একদিন শোণিতের শেষ কণাটুকুও নিঃশেষিত হবে। বুকে তীর বেঁধা পাখীর মতন পাখা ঝাপটে বৃথা নীড়ের শান্তি খুঁজবে।

আচমকা ডাক্তার মল্লিকের মনে হ'ল। বিছানায় শুয়ে থাকা লোকটার সংগে ডাক্তার মল্লিকের প্রভেদ কতটুকু। আঘাত হানবার সাহস যদি হ'য়ে থাকে লোকটার, সে সুযোগ কি ডাক্তার মল্লিক ক'রে দেন নি। আজ রুমুর এমন একটা অবস্থার জন্য তাঁর দায়িত্বও তো কম নয়।

—তুমি টাকাটা হাত পেতে নাও অমিয়দা, নয়তো আমার হেনস্তার অন্ত থাকবে না।

হাত বাড়িয়ে নেবার আগেই পিছনে কাশির শব্দ। শশিপদকে দেখা গেল।

—আপনি কিছু মনে করবেন না স্যার। রোগের যন্ত্রণায় মানুষের মাথার ঠিক থাকে না। আবোল তাবোল বকে। আপনি আর একবার ভিতরে চলুন। ব্যথাটা বড্ড বাড়ছে।

শশিপদ কথার শেষে চাদরের প্রান্ত দিয়ে নিজের চামর-গোঁফ মুছে নিল। ডাক্তারের হাতব্যাগটার দিকে হাত প্রসারিত ক'রে দিল।

—আপনাকে তো আগেই বলেছি, এ

সার্জারীর কেস। ওষুধে উপশম হ'তে পারে কিন্তু নিরাময় হবার নয়। আপনারা বরং কবিরাজী চিকিৎসাই চালান। নমস্কার।

দ্রুতপায়ে ডাক্তার মল্লিক নেমে এসে গাড়িতে উঠলেন।

দিন পনেরো ডাক্তার সব কাজই ক'রে গেলেন বটে, কিন্তু বুকে কাঁটা ফুটে থাকার মতন একটা অস্বস্তি। নড়তে চড়তে গেলেই খচ করে ওঠে। ম্লান বিষাদ একটি মুখের অস্পষ্ট কাঠামো, ভেজা চোখের পাতা, ভয়-থরথর বিশীর্ণ ঠোঁট।

মনকে অনেক বুঝিয়েও পারলেন না। দুপুরের দিকে রোগী দেখার ছুতোয় গাড়ি বের করলেন। রোগী একটা ছিল বটে, কিন্তু রুমুর বাড়ির ধারে কাছে নয়। একেবারে উল্টো রাস্তা। ডাক্তার মল্লিক গলির মোড়ে একটু চিন্তা করলেন। সেদিনের সে ব্যাপারের পর যাওয়া কি উচিত। মিস্টার ঘোষাল যদি বাড়িতে থাকে বহাল তবিয়তে, তবে তো হাতাহাতি হ'য়ে যাবার সম্ভাবনা। সাকরেদ শশিপদ থাকলেও, অসুবিধা রয়েছে। সাত পাঁচ ভেবে ডাক্তার মল্লিক ব্রেক কসলেন। সজোরে।

গাঙ্গুলীবাবুদের বাড়ি একবার যাওয়া চলতে পারে। তাঁদের বাড়ির সকলের অসুখ বিসুখেই ডাক্তার মল্লিকের ডাক পড়ে। হাঁচি থেকে হাঁপানী। সর্দি থেকে সান্নিপাতিক। এ পাড়ায় এসেছিলেন, একবার খোঁজ নিয়ে গেলেন। এতে সবাই খুশী হবেন। বাড়ির কর্তা থেকে বৌরা।

রুমুদের বাড়ির সামনাসামনি গিয়ে ডাক্তার মল্লিক এ্যাকসিলেটর থেকে পা তুললেন। আলতো পা ছোঁয়ালেন ক্লাচে, তেমন বুঝলে গাড়ি থামাবেন।

জানলার গরাদের ফাঁকে লালপাড় শাড়ির আভাস। ডাক্তার মল্লিক হর্ন টিপলেন। এমন কিছু জোরে নয়, কিন্তু তাতেই কাজ হ'লো। গরাদে দু হাত রেখে রুমু এসে দাঁড়াল।

তারপরের ব্যাপার সংক্ষিপ্ত। পেয়ারাগাছের পাশ দিয়ে বাইরের ঘরে গিয়ে দাঁড়াতে ডাক্তার মল্লিকের দু মিনিটও লাগল না।

—কি ভাগ্যি, আমি ভাবলাম সে ব্যাপারের পরে তুমি বুঝি আর আসবেই না। যা ভীতু তুমি। জোর করে দখল করে যারা, সে জাতের তো নও, জিনিস ফেলে যারা ঊর্ধ্বশ্বাসে পালায়, তুমি সেই দলের।

—অভ্যর্থনাটা খুব প্রীতিপ্রদ ঠেকছে না। চেয়ারে বসতে বসতে ডাক্তার মল্লিক মুচকি হাসলেন।

চেয়ারে বসেই কথা পাল্টালেন, কর্তার খবর কি? আছেন কেমন?

—একটু ভালো। তবে সম্পূর্ণ সারেনি, এখনো যন্ত্রণা হয় মাঝে মাঝে।

—আমি তো বলেছি, অপারেশন ছাড়া সারবে না। বুঝিয়ে শুনিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করাও, আমি না হয় তোমার মুখ চেয়ে নিজেই অপারেশন করবো।

—তুমি করবে অপারেশন? নিজের হাতে? দু চোখে আগুনের ছিটে। রুমু এগিয়ে ডাক্তার মল্লিকের কাঁধে একটা হাত রাখল, সামান্য অপারেশন, বেশী সময় লাগার তো কথা নয়?

—সামান্য কে বল্লে? খুব সামান্য মোটেই নয়। পেট চেরা মানেই মেজর অপারেশন। একেবারে ভয় নেই, এমন আশ্বাস জোর করে দেওয়া যায় না। একটু অন্যমনস্ক হ'লে, সেকেণ্ডারী হেমারেজ—

—অমিয়দা! রুমুর চীৎকারে ডাক্তার মল্লিক থমকে থেকে গেলেন। কপালে ঘামের মুক্তা। এলোমেলো বাতাসে উড়ছে চুলের কুচি, নিঃশ্বাসে আগুনের হলকা।

—কি, ভয় হ'লো?

—না, সাহস বাড়লো। একটু অন্যমনস্ক হওয়া কি খুব শক্ত অমিয়দা?

তার মানে? ডাক্তার মল্লিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। মাথা ঠিক আছে তো রুমুর। সংসারের হাজার জ্বালা-যন্ত্রণায় কেমন বুঝি হ'য়ে গিয়েছে!

—দোহাই তোমার অমিয়দা, আজ আর পিছিয়ে যেও না। একবার পিছিয়ে গিয়ে কম সর্বনাশ তুমি আমার করোনি।

—কিন্তু রুমু, আমি ডাক্তার। মুহূর্তে ডাক্তার মল্লিক কঠিন হ'য়ে গেলেন। এ সবের প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক নয়। কোথাকার জল গড়িয়ে কোথায় যাবে কে বলতে পারে।

—সেইজন্যই তো তোমার শরণ নিচ্ছি অমিয়দা। রোগের মূল সরালেই আরাম পাবে রোগী। দুঃখ যন্ত্রণার ইতি। একটা লোক বিছানায় শুয়ে পরিত্রাহি চীৎকার করছে ব'লেই বুঝি তার রোগটাই চোখে পড়ল, আর একজন দাঁতে দাঁত চেপে মরণযন্ত্রণা সহ্য করছে নিঃশব্দে, তাই তার 'দিকে কেউ চাইবে না?

কথার সঙ্গে সঙ্গে রুমু এগিয়ে এল। ডাক্তার মল্লিকের খুব কাছে। আচমকা বসে পড়ল মেঝের ওপর। দু হাতে ডাক্তার মল্লিকের দু পা জড়িয়ে ধরল।

আজ আর কোন বাধা নয়। শুধু চোখের পাতাই নয়, সারা গাল ভিজে গেল চোখের জলে।

—পিঠের কাপড়টা সরিয়ে দেখো অমিয়দা। সেদিন গহনা দেখতে পাওনি বলে আফসোস করেছিলে, আজ দেখো অলঙ্কার আমার সর্বাঙ্গে।

হাত দিয়ে শাড়ি সরাতে হ'ল না কাউকে, পিঠের কাপড় আপনি সরে গেল।

ডাক্তার মল্লিকের চোখের পলক পড়ল না। মুষ্টিবন্ধ হ'য়ে এলো দুটো হাত। তীব্র জ্বালা চোখের পাতায়। রুদ্ধ আক্রোশে সারা মুখ আতপ্ত।

—তুমি বিশ্বাস করো রুমু, এ নরক থেকে তোমায় আমি উদ্ধার করবোই। কোন বাধাকেই বাধা ব'লে মানবো না। আমিও নিজের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছি রুমু।

আশ্চর্য, এত কথা ডাক্তার মল্লিক বলতে চান নি। এ ধরনের কথাও নয়। কিন্তু নিবেদনের ভঙ্গীতে রুমু পড়ে রয়েছে। এক রাশ ফুলের মতন।

নিচু হ'য়ে ডাক্তার মল্লিক রুমুকে বুকে টেনে নিলেন।

দিন সাতেক। রোগী দেখা শেষ ক'রে বাড়ি ফিরেই ডাক্তার মল্লিক অবাক। বাইরের ঘরে বেঞ্চের ওপর শশিপদ। ঝোড়ো কাকের চেহারা। হাঁটুর ওপর হাঁটু রেখে আলগোছে দোলাচ্ছে।

—কি ব্যাপার? ডাক্তার মল্লিক ভুরু কুঁচকে দাঁড়ালেন।

—বড় বিপদ স্যার। আবার ঘোষালের বেহুঁস অবস্থা। যন্ত্রণা আর চোখে দেখা যায় না।

—কিন্তু আমার কাছে বৃথা এসেছেন, আপনি বরং কোন কবিরাজের কাছেই যান।

আপনি দেখছি স্যার, সেদিনের সেই ছোট্ট কথাটা মনে করে রেখেছেন। ছুরি-কাঁচি দেখলেই কেমন পেটের ভিতর হাত-পা সেঁধিয়ে যায়, তাই ও কথা বলেছিলাম। যদি অপারেশন করা দরকার মনে করেন, তাই করবেন। বৌমারও তাই মত, মানে ঘোষালের স্ত্রীর। শশিপদ কথা শেষ ক'রে জিভটা চেটে নিল। রঙের ঝোঁকে বেফাঁস কিছু বলে ফেলে নি তো।

ডাক্তার মল্লিক দু-এক মিনিট কি ভাবলেন। প্যান্টের পকেটে হাত ডুবিয়ে তারপর বললেন, ঠিক আছে। চলে আসুন।

কোঁচা সামলে শশিপদ উঠে দাঁড়াল। টলমল করছে পা দুটো। কোনরকমে দরজা ধরে টাল সামলাল।

ডাক্তার মল্লিক ভুরু কোঁচকাতেই শশিপদ আমতা আমতা করল, অপরাধ নেবেন না স্যার। নার্ভাস মানুষ, দেয়ালের কাতরানি দেখে একটু বেশীই খেয়ে ফেলেছি। বাড়তি ঢোক। ফাঁকা হাওয়া লাগলেই ঠিক হয়ে যাবে।

পর্দা সরিয়েই ডাক্তার মল্লিক দাঁড়িয়ে পড়লেন। খাটের ওপর ঘোষাল, বাজু-বরাবর রুমু, পুরোনো ছবি ঠিকই আছে, বাড়তির মধ্যে কেবল খাটের পাশে চেয়ারের ওপর একটি মহিলা।

হাতকাটা ব্লাউজ, আশমানি শাড়ী, পানের রংয়ে লাল টুকটুক ঠোঁট, ছোট চোখ সুর্মার টানে আয়ত করার প্রয়াস। সারা মুখে রঙের পোঁচ। নাকে বড় সাইজের হীরা। বহুরাত্রি জাগরণে দুচোখ মদালস। কণ্ঠে, বাহুমূলে, দু-কানে সোনার ঝিলিক।

—এই যে ডাক্তারবাবু এসে গেছেন। বাপস্, আমরা ভেবে মরি। শশিপদটা আবার তালকাণা, কোথায় যেতে কোথায় গেল!

ডাক্তার মল্লিক রুমুর দিকে চাইলেন। খুব অল্পক্ষণের জন্য। চোখের ভাষা পড়তে দেরি হল না। বুঝতেও নয়। শুধু রুদ্র প্রিন্সই নয়, ব্ল্যাক প্রিন্সেসও মজুত। শুধু অলংকার গেছে, বাস্তু-ভিটের কিছুটা, কিন্তু এবার টান পড়বে মেহগনি আসবাব, আর পরনের শাড়ী-কাপড়ে। বেনো-জল উজান বেয়ে ঘরের দাওয়ায় এসে পৌঁছেছে। এ সর্বনাশ ঠেকান দুষ্কর।

—ব্যথা কতক্ষণ আরম্ভ হয়েছে?

শশিপদর দিকে চেয়ে বললেও উত্তর দিল মহিলাটি। আঁচলের গিণ্ট খুলে কৌটা। দুয়েক পান মুখে দিল, কৌটা খুলে জর্দার ছিটে। কোমরে গোঁজা রুমাল খুলে মুখ মুছে বলল, সকাল থেকেই ব্যথাটা চেগেছে। খেতে বসে বমি করেছে দুবার। ছিষ্টি নোংরা। ঝি দিয়ে সব মোছালাম। ব্যথা, ব্যথা সকাল থেকেই বলছিল, কিন্তু বেহুঁশ হয়ে পড়ল দুপুরের দিকে। আমি আবার এসব ঝামেলা সইতে পারি না। তা মানুষ চেলে মেপে দেয় এক কথা, যত সোহাগ কেবল বচনে, মাসের পর মাস গেল, একটি পয়সা উপুড়হস্ত করার নাম নেই।—

কথা শেষ করার আগেই শশিপদ খিঁচিয়ে উঠল, অমন কথা বলিস নি পদ্ম, মুখে ঘা হবে। এই গত সপ্তাহেও—

হাত দিয়ে ডাক্তার মল্লিক দুজনকে থামিয়ে দিলেন। কাদা ছোড়াছুড়ি শেষ হ'ক। নোংরা আবহাওয়ায় গা ঘিন ঘিন করে ওঠে।

ঝুঁকে পড়ে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করে ডাক্তার মল্লিক সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।

—যদি প্রয়োজন মনে করেন, কাল সকালেই হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন। দেরি করলে এ রোগী হয়তো বাঁচানো যাবে না। কাল ভোরের দিকে আপনারা কেউ আমার বাড়িতে দেখা করবেন। হাসপাতালে টেলিফোন ক'রে সব বন্দোবস্ত করে দেবো।

ডাক্তার মল্লিক আশা করেছিলেন শশিপদ ভোর ভোর এসে দেখা করবে, কিন্তু চাকরের ডাকে নিচে নেমেই অবাক।

—তুমি এসেছ সাতসকালে?

—আর কাউকে আশা করেছিলে নাকি? রুমু হাসল।

—না, ভেবেছিলাম শশিপদবাবু আসবেন। ডাক্তার মল্লিক টেলিফোন তুলে ধরলেন। মিনিট দশেক। হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথাবার্তা। বেড ঠিক করার প্রস্তাব। রোগীর নাম-ধাম। তারপর টেলিফোন ছেড়ে ঘুরে দাঁড়ালেন রুমুর মুখোমুখি।

—ঠিক হলো?

—হ্যাঁ, আজ সকালে নিয়ে এস হাসপাতালে। দিন দুয়েক অবজার-ভেশনে রেখে একদিন অপারেশন করে ফেলব।

—তারপর?

—তারপর ভগবানের হাত।

—ভগবানের হাত নয়, অমিয়দা, তোমার হাত!

আবার রক্তে সেই উন্মাদনা, দু'কানে ঝিঁঝির অশ্রান্ত গুঞ্জন। উত্তপ্ত নারী-দেহের স্পর্শ। হারিয়ে যাওয়া মানুষকে কাছে ফিরে পাওয়া। ক্ষতি কি, দূষিত গ্ল্যান্ড নির্মমহাতে ছেঁটে ফেলার মতন অবাঞ্ছিত লোককে সরিয়ে দেওয়া। এমনও হতে পারে, ডাক্তার মল্লিকের কিছু করার প্রয়োজনই হবে না। আস্তে আস্তে রোগী নিস্তেজ হয়ে পড়বে। নাড়ী ক্ষীণ, নিশ্বাস ক্ষীণতর। সমস্ত শরীর একবার দুলে উঠেই সব শেষ। এমন কতবার হয়েছে। সহকর্মীর ইঙ্গিতে ছুরি-কাঁচি সরিয়ে ডাক্তার মল্লিক নিজে রোগীর মণিবন্ধে হাত রেখেছেন, হার্ট পরীক্ষা করে সরে এসেছেন অপারেশন টেবিল থেকে। নিস্পন্দ দেহটার দিকে ফিরে চাইবারও ইচ্ছা হয় নি। তারই পুনরাবৃত্তি। শুধু একটু হাতের কসরত। ক্ল্যাম্প খোলার সঙ্গে সঙ্গে একটু ঢিলে বাঁধন ব্লাডভেসেলের। কোথাও সন্দেহের লেশমাত্র নয়, আশে-পাশে সাহায্যরত কর্মীদের চোখে অবিশ্বাসের ক্ষীণ ছায়াও না। কিন্তু একজনের আয়ুর বদলে আর একজনের পরমায়ু। নিভে আসা দীপ থেকে আর একটি প্রদীপ জ্বালানো। না, কোন দোষ নেই। ডাক্তার মল্লিক মন ঠিক করে ফেললেন। বারবনিতা আর ঘোড়দৌড়ের মাঠ, এই তো জীবনের পরিধি। সমাজের আবর্জনা। ক্লেদ-মুক্তিতে পাপ নেই, দুষ্কৃতের বিনাশে অপরাধ নেই।

সারাটা রাত ডাক্তার মল্লিক নিজেকে বোঝালেন। দু'হাত পিছনে রেখে পায়চারি করে বেড়ালেন বারান্দায়। ভোরে উঠে স্নান সেরে তৈরী হয়ে নিলেন। এ কদিন দেখা হয়েছে রুমুর সঙ্গে। হাসপাতালে, হাসপাতালের বাইরে মানুষ কত নির্মম হতে পারে, তার ফিরিস্তি শুনেছেন, নিজের বাড়িতে, স্ত্রীর সামনে বারনারী নিয়ে বেলেল্লাপনার অপকীর্তির কাহিনী, নৃশংস নির্যাতন।

ডাক্তার মল্লিক দ্বিধা, সংশয় দু'হাতে সরিয়ে ফেলেছেন। মনকে কঠিন করে নিয়েছেন। প্রসূতির প্রাণ বাঁচাতে গর্ভস্থ শিশুর প্রাণহরণ পাপ নয়, প্রাণ বাঁচাতে প্রাণ হানি, এ বিধান ডাক্তারী শাস্ত্রে অনেক আছে।

অপারেশন থিয়েটারে আবার দেখা। মুখোমুখি। রুমুও বোধ হয় ঘুমোয় নি সারারাত। চোখের কোণে কালি, এলো-মেলো চুলের রাশ, কাগজ-সাদা ঠোঁট। কালো কাপড়ে সর্বাঙ্গ জড়ানো। বুঝি আশু অমঙ্গলের ইঙ্গিত।

—কখন তুমি বেরোবে?

—আধ ঘণ্টার মধ্যে।

—তারপর?

ডাক্তার মল্লিক কোন উত্তর দিলেন না। জিজ্ঞাসু দৃষ্টি মেলে ধরলেন রুমুর দিকে।

—আমি বাইরে অপেক্ষা করছি। একসঙ্গে ফিরবো। একটু থামল রুমু। আঁচল দিয়ে মুখ মুছে নিয়ে বলল, খুব দেরি হবার তো কথা নয়?

ঘাড় নেড়ে ডাক্তার মল্লিক ভিতরে ঢুকে গেলেন।

পিছনে ভারি-পাল্লা দরজাটা নিশব্দে বন্ধ হলো। সবাই তৈরী। টেবিলের ওপর রোগী। এপাশে ছুরি, কাঁচি, ফরসেপ, ক্ল্যাম্প সার সার সাজানো। ক্লোরফর্মের মদির সুরভি। পরিচিত ওষুধের গন্ধ। হেঁটে হেঁটে ডাক্তার মল্লিক হলের ওপারে গিয়ে দাঁড়ালেন। মাথা নিচু করলেন বাঁধানো ফটোর সামনে। জগৎবিখ্যাত শল্য-চিকিৎসকের প্রতিকৃতি। চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর এনেছিলেন। নিভন্ত প্রদীপের শিখা প্রজ্বলিত করেছেন নিজের অধীত বিদ্যার সাহায্যে। ভেঙে-পড়া জীবনে অনন্ত আশ্বাস, ঘন অন্ধকারে আলোর আঁচড়।

ডাক্তার মল্লিক দুটো হাত প্রসারিত করে দিলেন। পাশে দাঁড়ানো নার্স দস্তানা পরিয়ে দিল। মুখে মাস্ক ডাক্তার নিজেই এঁটে নিলেন। থমথমে নিস্তব্ধতা। পিন পড়লেও শব্দ পাওয়া যায়। চড় বড় ক'রে ছুরির ফলা পেটের ওপর। অন্ত্রের জট সাবধানে সরানো হ'ল। ক্ল্যাম্প দিয়ে পর পর বাঁধা দুটো পাশ। ককার্স ফরসেপ দিয়ে আর্টারিতে চাপ। বাঁধন পিছলে গেল একবার। কিছু কিছু রক্তক্ষরণ। ডাক্তার মল্লিক পটু-হাতে আবার বাঁধলেন। খুব সাবধানে। ব্লাড ভেসেল বাঁধার সঙ্গে সঙ্গে আলগা করলে ক্ল্যাম্প। গলিত দূষিত অংশ নির্মম ছেদনে আলাদা হ'য়ে গেল। কাজ করতে করতে ডাক্তার মল্লিক একবার মুখ তুললেন। অল্পক্ষণের জন্য। রোগীর মাথার কাছে দাঁড়ানো অ্যানাসথেটিক এক্সপার্ট ঘাড় নাড়লেন। না, কোন ভয় নেই, কাজ চলুক।

সুনিপুণ হাতে সেলাইয়ের পর সেলাই। সেতারের তারের গোছার ওপর ওস্তাদ সেতারীর দ্রুত আঙুল চালনার মতন ডাক্তার মল্লিকের আঙুল-গুলো দ্রুত লয়ে সঞ্চালিত হ'ল। ভয় নেই, বিপদ কেটে গেছে। ডাক্তার মল্লিক অপারেশন টেবিল থেকে সরে এলেন।

ঠিক সেই মুহূর্তেই ভয়ের কালো ছায়া পাখা বিস্তার করল। আবার ভুল করলেন ডাক্তার মল্লিক। শুধু একটু ঢিলে বাঁধন। অসাবধানতার ভান। আর কিছু করতে হ'ত না। বিন্দু বিন্দু শোণিতক্ষরণ পরমায়ু নিঃশেষিত। এত-দিনের বাধার প্রাচীর অপসারিত। কিন্তু সব গোলমাল হ'য়ে গেল। অপারেশন থিয়েটারের বন্ধ আবহাওয়ায়, ছুরি, কাঁচি, ক্ল্যাম্প, ফরসেপের নির্মম আওতায়, ক্লোরফর্মের নেশাতুর সুরভিতে অমিয় মল্লিককে খুঁজে পাওয়া গেল না, পরিবর্তে কোন সুযোগে জুনিয়ার সার্জন মল্লিক মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছেন।

দস্তানা খুলে ফেলে ডাক্তার মল্লিক কপালে হাত দিলেন। ঘামে মাথার চুল লেপ্টে গেছে কপালের ওপর, গভীর নিঃশ্বাসের ছন্দে বুকটা ওঠানামা করছে। একটু পরেই নার্স খুলে ধরবে ভারি দরজার পাল্লা। রবারের এপ্রন খুলে ফেলে ডাক্তার মল্লিককে বাইরে গিয়ে দাঁড়াতে হবে। একেবারে রুমুর মুখো-মুখি। অশ্রুর কনেচন্দনে আঁকা বহু-কালের পরিচিতা মেয়ে নয়, নীড় বাঁধার প্রত্যাশী দুঃসাহসী এক নারী!!

ডাক্তার মল্লিক একটু ইতস্তত করে এদিকে চলে এলেন। পিছনের দরজার ঘোরানো সিঁড়ির সন্ধানে।

বোম্বাইয়ের ওয়ারলি উপজাতি

নিখিল মৈত্র ও সুনীল জানা

বোম্বাই সেণ্ট্রাল স্টেশন থেকে বরোদা লাইনের গাড়িতে চলেছি ওয়ারলি উপজাতির এক অখ্যাত গ্রামের উদ্দেশে। ভিরার পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তিতে চালিত গাড়ি সশব্দে তীব্র গতিতে পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমাদের যন্ত্রশক্তি কয়লার ইঞ্জিন; গতিও মন্থর। বৈদ্যুতিক ট্রেন বোম্বাই শহরকে সম্প্রসারিত করেছে বহুদূরে। কলকাতা ছেড়ে দুই এক স্টেশন গেলেই মনে হয় নগরীর কর্মকোলাহল মুখরিত জীবনকে পেছনে ফেলে রেখে এসেছি। বোম্বাই শহর কিন্তু বহুদূরে মানুষের পেছনে ছুটে চলে। বিজলী তারের মোটা মোটা থাম্বা ভিরার স্টেশনে শেষ হয়ে গেল। আরও ঘণ্টা দুয়েক চলার পর ছোট এক স্টেশনে নামলাম। সেখান থেকে বাসে মাইল কুড়ি আর হাঁটাপথে আরও কিছুদূর গিয়ে ঝারি গ্রামের উপকণ্ঠে পৌঁছলাম।

আরব সাগর ও পশ্চিমঘাট পর্বতমালার মাঝখানে অপ্রশস্ত তপ্ত ভূমি। দ্বিপ্রহরের সূর্যকিরণ সমস্ত গ্রামকে যেন গ্রাস করে নিয়েছে; মানুষ, বাড়ি, ঘর কোনও কিছুই চোখে পড়ছে না। কদাচিৎ পথ চলতি এক আধজন ওয়ারলি রমণীকে দেখলাম। বন থেকে কেটে আনা কাঠ ও শুকনো পাতার ভারী বোঝা মাথায় করে তারা ধীরমন্দ গতিতে চলেছে। গ্রামের ঠিক প্রবেশদ্বারের পাশে কুয়ো। ওয়ারলি মেয়ে ও শিশুর দল ভীড় জমিয়ে রয়েছে কুয়োর চারপাশে। প্রতিবেশী মারাঠিদের মত ওরলি স্ত্রীলোকেরাও কাছা দিয়ে শাড়ি পরে। কিন্তু সভ্যমানুষের অঙ্গাবরণের অপ্রয়োজনীয় প্রাচুর্য তাদের নেই। আলো ও বাতাসের স্পর্শে দেহ অনেক বেশী প্রাণবন্ত ও সজীব। সুঠাম দেহসৌষ্ঠব সীমিত বস্ত্রাভরণের মধ্যে সুপ্রকাশিত।

গ্রামে যখন পৌঁছলাম বেলা প্রায় দুটো। সমস্ত গ্রাম জনহীন। সবাই মাঠের কাজে বা জঙ্গলে বেরিয়ে গিয়েছে। ঘরে রয়েছে শিশু ও অসমর্থ বৃদ্ধ এবং তাদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে ওয়ারলি রমণী। ওয়ারলিরা প্রধানত চাষবাস করেই জীবিকা নির্বাহ করে। কাঠকয়লা বানানো, বনবিভাগের কাজ, গাড়ি চালানো প্রভৃতি কাজও করে। গ্রীষ্মকালে চাকরির সন্ধানে ওয়ারলিরা বহুদূর মারাঠি গ্রামে বা শহরে গিয়ে উপস্থিত হয়। বোম্বাইয়ের প্যারেল অঞ্চলে ওয়ারলি শ্রমিকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তাদেরি একজনকে এ গ্রামে বিকেল বেলা দেখলাম। কাপড়কলের শ্রমিকের সাধারণ পোশাক হাফ প্যাণ্ট ও হাফ শার্ট গ্রামে ফিরে এসেই সে ছেড়ে ফেলেছে। বাইরের জগতের রীতিনীতি, আচারব্যবহারকে সে নিজের গ্রামের মধ্যে নিয়ে আসতে রাজী নয়। প্রবাস জীবন বা সভ্যতার সংস্পর্শ তাকে কিছুতেই উপজাতির নিজস্ব সামাজিক জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারেনি। এ বিষয়ে তাদের মধ্যে যথেষ্ট সচেতনতা আছে। তাই সভ্য জগতের এত কাছে থেকেও তাদের স্বাতন্ত্র্য ওয়ারলিরা আজও বজায় রাখতে পেরেছে।

সংখ্যায় ওয়ারলিরা মাত্র সোয়া লক্ষের কাছাকাছি। বসতি অধিকাংশ লোকের বোম্বাই রাজ্যের থানা জেলা, পর্তুগীজ অধিকৃত দমন এবং সুরাট জেলা। দাবর, নীবর, পাথর এবং ঘাট বিভাগে এই জাতি বিভক্ত। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার সানুদেশে, জঙ্গলের মধ্যে এদের গ্রাম। বাড়ি দূরে দূরে। গ্রাম দেখলে মনে হয় প্রাকৃতিক পরিবেশকে যতদূর সম্ভব অক্ষত অবস্থায় রেখে মানুষ তার

টিলার উপরে ওয়ারলি পুরুষের দল

ওয়ারলি আদিবাসী পুরুষেরা জঙ্গল থেকে শুকনো পাতা সংগ্রহ করছে

ঘর বেঁধেছে। মাটির ঘর, ওপরে ছনের ছাউনি। প্রতিটি পরিবারের বাসগৃহকে বেষ্টন করে রয়েছে গাছের বড় বড় ডাল দিয়ে তৈরী শক্ত বেড়া। জঙ্গলের মাঝে হিংস্র জীব-জন্তুর হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্যে এরকম জিনিসের প্রয়োজনীয়তা আছে। ওয়ারলি জীবনের এক সুন্দর পটভূমি এই বেড়া। সকাল বেলায় এর পাশে গৃহপালিত জীব, জানোয়ার বা মুর্গীকে খাওয়ায়। সদাহাস্যময়, বলিষ্ঠ শিশু ও ছেলেমেয়েদের কত রকমের খেলা চলে এইখানে। আবার সন্ধ্যায় বয়স্কদের গল্প-গুজব এবং পানের আড্ডা বসে বেড়ার ধারে আঙিনায়। ওয়ারলিদের পানাসক্তি সুবিদিত। আইনের চোখে আজ এ অপরাধজনক কাজ। সুতরাং ফাঁকি, জুয়াচুরিও ঢুকেছে মদ্য চোলাই ও পান করার ব্যাপারে।

চাল অথবা বাজরা প্রধান খাদ্য। উপকরণ খাওয়ার সময় সামান্যই। শুকনো মাছ, শাকপাতা এবং কখনও বন্য-বরাহ বা হরিণের মাংস। চাল, বাজরা ফুরিয়ে গেলে বন্য ফল, মূল বা কন্দ খেয়ে কাটাতে হয়। দারিদ্র্য সর্বাধিক, কিন্তু মানুষের হাসি ও আনন্দকে কেড়ে নিতে পারে নি। আদিম জাতির মধ্যে অভাব, অনটনের বোধও অনেক কম। তাই সে কখনই হতশ্রী হয় না অভাবের তাড়নায়।

ওয়ারলি বিবাহ-প্রথায় প্রচুর অভিনবত্ব আছে। যুবক-যুবতী নিজেরা ভবিষ্যৎ জীবনের সঙ্গী নির্বাচন করবে। বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হবার জন্যে সাধারণ আচার উৎসবও আছে। পুরোহিত গ্রামের বৃদ্ধা মহিলা, তাঁকে ধারলানী বলা হয়। যৌতুক পাত্রপক্ষকে দিতে হবে। তবে বিবাহ উৎসব সংসার জীবন শুরু করার আগেই যে পালন করতে হবে, এমন

কোনও বাধ্যবাধকতা নেই। আ[illegible] অসঙ্গতি বা অন্য কোনও অসু[illegible] থাকলে বিবাহ উৎসব স্থগিত রাখা [illegible] তাতে কিন্তু সংসারধর্ম পালনে [illegible] বাধাই হবে না। বহু বছর পরে [illegible] মেয়েরা বড় হয়ে বিবাহযোগ্য হলে [illegible] বিবাহের সঙ্গে বাবা-মা'র বিবাহ-[illegible] একই সঙ্গে অনুষ্ঠিত হবে। [illegible] প্রৌঢ়ী বিগত দিনের মধুযামিনী [illegible] সে উৎসবে পান-ভোজন করবে [illegible] ওয়ারলিদের মধ্যে ঘর-জামাই রাখার প্রচলিত আছে। পুরুষ, স্ত্রী সবা[illegible] সমাজে সমানভাবে পাশাপাশি [illegible] আনন্দ, উৎসব করে—সেখানে [illegible] অলস জামাতা পোষণ কিঞ্চিৎ অস্বা[illegible] ঘটনা, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই [illegible] তবে দু-একজন সমৃদ্ধ মোড়ল[illegible] এমনভাবে জামাতা বাবাজীর [illegible] পোষকতা করা অন্যের পক্ষে অস[illegible]

পরিবারের কোনও লোকের বসন্ত বা লেরায় মৃত্যু হলে সে পরিবারের অন্য াকেরা গ্রাম ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে বে। মৃতদেহকে সাধারণত দাহ করা য়, তবে বিশেষ কোনও রোগে মৃত্যু হলে বর দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত। শ্রাদ্ধশান্তি ত্যুর এক বছর পরে করা হয়। সে পলক্ষে গ্রামের সমস্ত অধিবাসীদের রিভোজন এবং পানে আপ্যায়িত করা য়, প্রধান উপাস্য-দেবতা ভাগ্য অথবা রেবা।

ওয়ারলি গ্রামের সঙ্গে প্রতিবেশী জরাটি বা মারাঠি গ্রামের পার্থক্য শেষভাবে লক্ষ্য করেছি। সেখানে কের বাড়িতে বা গ্রামের পথে পরিচিত আগন্তুককে দেখলে স্বাভাবিক ন্দেহের সৃষ্টি হয়। আগমনের কারণ ম্বন্ধে জবাবদিহি করতে হয়। ওয়ারলি মে গেলেই কিন্তু অনাবিল হাস্যে আগন্তুক অভ্যর্থিত হয়, পরে অন্য থাবার্তা। তাও খুব সংক্ষিপ্ত। হিরাগতের সঙ্গে মেলামেশা ওয়ারলিদের ন্য উপজাতিদের তুলনায় অনেক বেশি। ই বাইরের লোকের সম্পর্কে সন্দেহের ভাব কম। সুনির্দিষ্ট ব্যবধান তা সত্ত্বেও রয়েছে।

দুই বোন

হাস্যময়ী ওয়ারলি যুবতী

ফেরার দিন বিকেলে গ্রাম-বন্ধের বাড়িতে বিদায় অভিনন্দন জানাতে অনেকেই এসেছিলেন। বলিষ্ঠ মানুষ সরল ভাষায় জানাল যে, তারা আমাদের সাধ্যমত আদর, আপ্যায়নের ব্যবস্থা করেছে, কিন্তু সীমিত সামর্থ্যে সব কিছু করে উঠতে পারে নি। সময় সুযোগ পেলে আবার যেন আসি। চড়াই-উৎরাই পথে বাসের জন্যে চলেছি। পথের পাশে মাঝে মাঝে কয়েকটা গাছ ছোট ছোট ঝাড়ের সৃষ্টি করেছে। বিশ্রাম নিতে আমরাও এইরকম এক ঝাড়ের মধ্যে কিছুক্ষণ ছিলাম। প্রসারিত বৃক্ষশাখায় দেখি, এক ওয়ারলি যুবক অঘোরে ঘুমুচ্চে। ভূপতিত হলে নিদ্রাসুখ যে ভেঙ্গে যাবে তাই নয়, শারীরিক অস্বস্তিরও যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। সভয়ে সহযাত্রীনীকে জিজ্ঞেস করলাম, বৃক্ষের সঙ্গে এত আত্মীয়তা কি নিরাপদ? আমার সঙ্গিনী ওয়ারলি উপজাতিদের মধ্যে বহুদিন ধরে কাজ করছেন। তিনি অবিশ্যি মারাঠি। সহাস্যে বললেনঃ শকুন্তলার দেশে প্রকৃতির সঙ্গে এ নিবিড় সাহচর্য ত খুব স্বাভাবিক। অরণ্যই এদের গৃহস্থালি।

ফটো ঃ সুনীল জানা

"আপনি লাক্স টয়লেট সাবা-
নের মনোহর নতুন সুগন্ধের
কথা শুনেছেন কি?"
—নিগার
LUX
TOILET SOAP
ভারতে প্রস্তুত
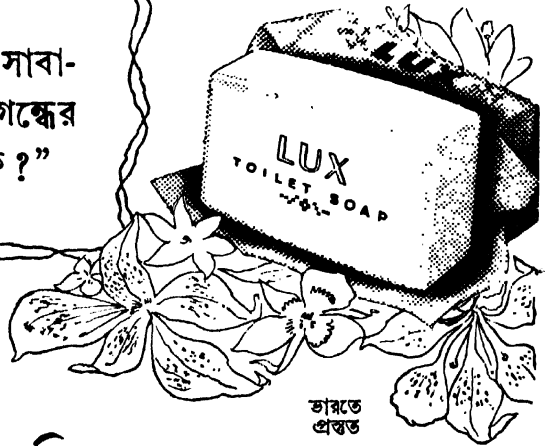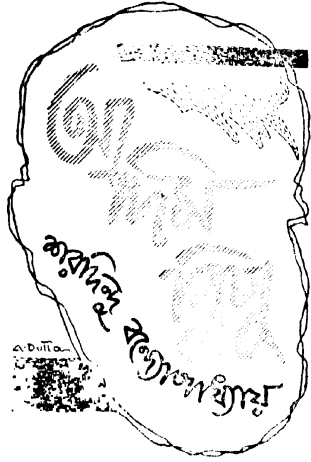
৮

নীচে নামিয়া আসিয়া দেখিলাম সিঁড়ির ঘরে বৃদ্ধ ষষ্ঠীবাবু থলো হুঁকা হাতে বিচরণ করিতেছেন, আমাদের দেখিয়া বঙ্কিম কটাক্ষপাত করিলেন। প্রথম দিন তাঁহার যে উগ্রমূর্তি দেখিয়াছিলাম এখন আর তাহা নাই, বরং বেশ একটু সাগ্রহ কৌতূহলের ব্যঞ্জনা তাহার তোবড়ানো মুখখানিকে প্রাণবন্ত করিয়া তুলিয়াছে।

ব্যোমকেশ থমকিয়া দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল, 'আপনার নাম ষষ্ঠীবাবু?'

তিনি সতর্কভাবে ব্যোমকেশকে নিরীক্ষণ করিয়া শেষে বলিলেন, 'হ্যাঁ। আপনি—আপনারা— ?'

ব্যোমকেশ আত্ম-পরিচয় দিল না, সংক্ষেপে বলিল, 'আর বলবেন না মশায়। অনাদি হালদারের কাছে টাকা পাওনা ছিল, তা দেখছি টাকাটা ডুবল। লোকটা মারা গেছে শুনেছেন বোধ হয়।'

ষষ্ঠীবাবুর সন্দিগ্ধ সতর্কতা দূর হইল। তিনি পরম তৃপ্তমুখে বলিলেন, 'শুনেছি। কাল রাত্তির থেকেই শুনছি। —কিসে মারা গেল?' শেষোক্ত প্রশ্ন তিনি গলা বাড়াইয়া প্রায় ব্যোমকেশের কানে কানে করিলেন।

ব্যোমকেশ বলিল, 'শোনেন নি? কেউ তাকে খুন করেছে। —আপনি তো কাল অনেক রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় বসে ছিলেন শুনলাম—'

মুখে বিরক্তিসূচক চুমকুড়ি দিয়া ষষ্ঠীবাবু বলিলেন, 'কি করি, পাড়ার ছোঁড়াগুলো ঠিক বাড়ির সামনেই বাজি পোড়াতে শুরু করল। ওই দেখুন না, কত তুবড়ির খোলা পড়ে রয়েছে। শুধু কি তুবড়ি! চীনে পটকা দোদমার আওয়াজে কান ঝালাপালা। ভাবলাম ঘুম তো আর হবে না, বাজি পোড়ানোই দেখি।—তা কি করে খুন হল? ছোরা-ছুরি মেরেছে নাকি?'

ব্যোমকেশ প্রশ্নটা এড়াইয়া গিয়া বলিল, 'তাহলে আপনি সন্ধ্যের পর থেকে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত বারান্দায় বসে ছিলেন। সে সময়ে কেউ অনাদি হালদারের কাছে এসেছিল?'

'কেউ না। একেবারে রাত বারোটার পর ওই ছেলেটা আর তার মা এল, এসেই দোর ঠ্যাঙাতে শুরু করল। তারপর এল ন্যাপা। তারপর কেষ্ট দাস।'

'ইতিমধ্যে আর কেউ আসেনি?'

'বাড়িতে কেউ ঢোকেনি। তবে—অনাদি হালদারের একটা ভাইপোকে একবার ওদিকের ফুটপাথে হোটেলের সামনে ঘুর-ঘুর করতে দেখেছি।'

'তাই নাকি? তারপর?'

'তারপর আর দেখিনি। অন্তত এ বাড়িতে ঢোকেনি।'

'কটার সময় তাকে দেখেছিলেন?'

'তা কি খেয়াল করেছি। তবে গোড়ার দিকে, তখনও হোটেলের দোতলায় বাবুরা জানলার ধারে বসে পাশা খেলছিল। দশটা কি সাড়ে দশটা হবে। —আচ্ছা, কে মেরেছে কিছু জানা গেছে নাকি?'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ হেঁটমুখে চিন্তা করিল, তারপর হঠাৎ প্রশ্ন করিল,—'অনাদি হালদারের সঙ্গে আপনার সদ্ভাব ছিল?'

ষষ্ঠীবাবু চমকিয়া উঠিলেন, '—অ্যাঁ। সদ্ভাব-মানে—অসদ্ভাবও ছিল না।'

'আপনি কাল রাত্রে ওপরে যাননি?'

'আমি! আমি ওপরে যাব! বেশ লোক তো আপনি? কি মতলব আপনার?' ষষ্ঠীবাবু ক্রমশ তেরিয়া হইয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন।

'অনাদি হালদারকে কে খুন করেছে আপনি জানেন না?'

'আমি কি জানি! যে খুন করেছে সে জানে, আমি কি জানি। আপনি তো সাংঘাতিক লোক মশাই! আমি বুড়ো মানুষ, কারুর সাতেও নেই পাঁচেও নেই, আমাকে ফাঁসাতে চান?'

ব্যোমকেশ হাসিয়া ফেলিল,—'আমি আপনাকে ফাঁসাতে চাই না, আপনি নিজেই নিজেকে ফাঁসাচ্ছেন। অনাদি হালদারের মৃত্যুতে এত খুশী হয়েছেন যে চেপে রাখতে পারছেন না।—চল অজিত, ওই হোটেলটাতে গিয়ে আর এক পেয়ালা চা খাওয়া যাক।'

ষষ্ঠীবাবু থ হইয়া রহিলেন, আমরা ফুটপাথে নামিয়া আসিলাম। রাস্তার ওপারে হোটেলের মাথার উপর মস্ত পরিচয় ফলক—শ্রীকান্ত পান্থনিবাস। শ্রীকান্ত বোধ হয় হোটেলের মালিকের নাম। নীচের তলার রেস্তোরাঁয় চা-পিয়াসীর দল বসিয়া গিয়াছে, দ্বিতলে জানালার সারি, কয়েকটা খোলা। ব্যোমকেশ পথ পার হইবার জন্য পা বাড়াইয়া হঠাৎ থামিয়া গেল, বলিল,—'দাঁড়াও, গলির মধ্যেটা একবার দেখে যাই।'

'গলির মধ্যে কী দেখবে?'

'এসই না।'

অনাদি হালদারের বাসা ও নূতন বাড়ির মাঝখান দিয়া গলিতে প্রবেশ করিলাম। একেই গলিটি অত্যন্ত অপ্রশস্ত, তার উপর নূতন বাড়ির স্খলিত বিক্ষিপ্ত ইট-সুরকি এবং ভারা বাঁধার খুঁটি মিলিয়া তাহাকে আরও দুর্গম করিয়া তুলিয়াছে। ব্যোমকেশ মাটির দিকে নজর রাখিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল।

গলিটি কানা গলি, বেশি দূর যায় নাই। তাহার শেষ পর্যন্ত গিয়া ব্যোমকেশ ফিরিল, আবার মাটিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া চলিতে লাগিল। তারপর অনাদি হালদারের বাসার পাশে পৌঁছিয়া হঠাৎ অবনত হইয়া একটা কিছু তুলিয়া লইল।

জিজ্ঞাসা করিলাম,—'কি পেলে?'

সে মুঠি খুলিয়া দেখাইল, একটি চকচকে নূতন চাবি। বলিলাম,—'চাবি! কোথাকার চাবি?'

ব্যোমকেশ একবার ঊর্ধ্বে জানালার দিকে চাহিল, চাবিটি পকেটে রাখিয়া বলিল,—'হলফ নিয়ে বলতে পারি না, তবে সন্দেহ হয় অনাদি হালদারের আলমারির চাবি।'

'কিন্তু—'

'আন্দাজ করেছিলাম গলির মধ্যে কিছু পাওয়া যাবে। এখন চল, চা খাওয়া যাক।'
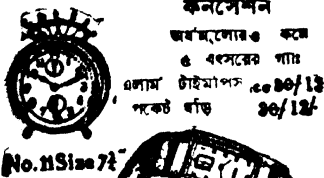
'কিন্তু—আলমারির চাবি তো—'

'অনাদি হালদারের কোমরে আছে। তা আছে। কিন্তু আর একটা চাবি থাকতে বাধা কি?'

'কিন্তু—গলিতে চাবি এল কি করে?'

'জানলা দিয়ে।—এস।' ব্যোমকেশ আমার হাত ধরিয়া টানিয়া লইয়া চলিল।

শ্রীকান্ত পান্থনিবাসে প্রবেশ করিয়া একটি টেবিলে বসিলাম। ভৃত্য চা ও বিস্কুট দিয়া গেল। ভৃত্যকে প্রশ্ন করিয়া জানা গেল হোটেলের মালিক শ্রীকান্ত গোস্বামী পাশেই একটি ঘরে আছেন। চা বিস্কুট সমাপ্ত করিয়া আমরা নির্দিষ্ট ঘরে ঢুকিলাম।

ঘরটি শ্রীকান্তবাবুর অফিস; মাঝখানে টেবিল ও কয়েকটি চেয়ার। শ্রীকান্তবাবু মধ্যবয়স্ক ব্যক্তি, চেহারা গোলগাল, মুণ্ডিত মুখ; বৈষ্ণবোচিত প্রশান্ত ভাব। তিনি গত রাত্রির বাসি ফাউল কাটলেট সহযোগে চা খাইতেছিলেন, আমাদের আকস্মিক আবির্ভাবে একটু বিব্রত হইয়া পড়িলেন।

ব্যোমকেশ সবিনয়ে বলিল,—'মাফ করবেন, আপনিই কি হোটেলের মালিক শ্রীকান্ত গোস্বামী মশায়?'

গোস্বামী মহাশয়ের মুখ ফাউল কাটলেটে ভরা ছিল, তিনি এক চুমুক চা খাইয়া কোনও মতে তাহা গলাধঃকরণ করিলেন, বলিলেন, 'আসুন। আপনারা—?'

ব্যোমকেশ বলিল,—'একটু দরকারে এসেছি। সামনের বাড়িতে কাল রাত্রে খুন হয়ে গেছে শুনেছেন বোধ হয়?'

'খুন!' শ্রীকান্তবাবু ফাউল কাটলেটের প্লেট পাশে সরাইয়া দিলেন—'কে খুন হয়েছে?'

'১৭২।২ নম্বর বাড়িতে থাকত—অনাদি হালদার।'

শ্রীকান্তবাবু চোখ কপালে তুলিয়া বলিলেন,—'অনাদি হালদার খুন হয়েছে! বলেন কি!'

'তাকে আপনি চিনতেন?'

'চিনতাম বৈকি। সামনের বাড়ির দোতলায় থাকত, নতুন বাড়ি তুলছিল। প্রায়ই আমার হোটেলে এসে চপ্ কাট্‌লেট খেত।—কাল রাত্তিরেও যে তাকে দেখেছি!'

'তাই নাকি! কোথায় দেখলেন?'

'ওর ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে রাস্তার বাজি পোড়ানো দেখছিল। যখনই জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়েছি তখনই দেখেছি ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে আছে।'

ব্যোমকেশ বলিল,—'কখন কোথা থেকে কি দেখলেন সব কথা দয়া করে বলুন। আমি অনাদি হালদারের খুনের তদন্ত করছি। আমার নাম ব্যোমকেশ বক্সী।'

শ্রীকান্ত বিস্ময়োৎফুল্ল চক্ষে তাহার পানে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—'আপনি ব্যোমকেশবাবু! কি সৌভাগ্য।' তিনি ভৃত্য ডাকিয়া আমাদের জন্য চা ও ফাউল কাটলেট হুকুম দিলেন। আমরা এইমাত্র চা বিস্কুট খাইয়াছি বলিয়াও পরিত্রাণ পাওয়া গেল না।

তারপর শ্রীকান্তবাবু বলিলেন,—'আমার হোটেলের দোতলায় দুটো ঘর নিয়ে আমি থাকি, বাকি তিনটে ঘরে কয়েকজন ভদ্রলোক মেস করে আছেন। সবশুদ্ধ এগারো জন। তার মধ্যে তিন জন কালীপুজোর ছুটিতে দেশে গেছেন, বাকি আট জন বাসাতেই আছেন। কাল সন্ধ্যের পর ১ নম্বর আর ৩ নম্বর ঘরের বাবুরা ঘরে তালা দিয়ে শহরে আলো দেখতে বেরুলেন। ২ নম্বর ঘরের যামিনীবাবুরা তিন জন বাসাতেই রইলেন। ও'দের খুব পাশা খেলার শখ। আমিও খেলি। কাল সন্ধ্যে সাতটার পর ও'রা আমাকে ডাকলেন, আমরা চার জন যামিনীবাবুর তক্তাপোশে পাশা খেলতে বসলাম। যামিনীবাবুর তক্তাপোশ ঠিক রাস্তার ধারে জানলার সামনে। সেখানে বসে খেলতে খেলতে যখনই বাইরের দিকে চোখ গেছে তখনই দেখেছি অনাদি হালদার ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে বাজি পোড়ানো দেখছে। আমরা তিন দান খেলেছিলাম, প্রায় সাড়ে দশটা পর্যন্ত খেলা চলেছিল।'

'তারপর আর অনাদি হালদারকে দেখেন নি?'

'না, তারপর আমরা খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম, অনাদি হালদারকে আর দেখিনি।'

'যে বাবুরা আলো দেখতে বেরিয়েছিলেন তাঁরা কখন ফিরলেন?'

'তাঁদের মধ্যে দু'জন ফিরেছিলেন রাত বারোটার সময়, বাকি বাবুরা এখন ফেরেননি।'

'এখনও আলো দেখছেন!'

শ্রীকান্তবাবু অধরোষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া একটি ক্ষুদ্র নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন; মনুষ্য জাতির ধাতুগত দুর্বলতা সম্বন্ধে বোধ করি নীরবে খেদ প্রকাশ করিলেন।

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ অন্যমনস্কভাবে কাট্‌লেট চিবাইল, তারপর বলিল,—'দেখুন, অনাদি হালদারের লাস পাওয়া গেছে ওই ব্যাল্‌কনিতেই, বুকে বন্দুকের গুলী লেগে পিঠ ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে। তা থেকে আন্দাজ করা যেতে পারে যে আপনার হোটেল থেকে কেউ বন্দুক ছুঁড়ে অনাদি হালদারকে মেরেছে—'

শ্রীকান্তবাবু আবার চক্ষু কপালে তুলিলেন,—'আমার হোটেল থেকে! সে কি কথা! কে মারবে?'

ব্যোমকেশ বলিল, 'এটা আন্দাজ মাত্র। আপনি বলছেন সন্ধ্যে সাতটা থেকে আপনারা চার জন ছাড়া দোতলায় আর কেউ ছিল না। এ বিষয়ে আপনি নিঃসন্দেহ?'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন,—'মেসের বাসিন্দা আর কেউ ছিল না এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। তবে—দাঁড়ান। একটা চাকর দোতলার কাজকর্ম করে, সে বলতে পারবে।—হরিশ! ওরে কে আছিস হরিশকে ডেকে দে।'

কিছুক্ষণ পরে হরিশ আসিল, ছিটের ফতুয়া পরা আধ-বয়সী লোক। শ্রীকান্তবাবু বলিলেন,—'কাল সন্ধ্যে থেকে তুই কোথায় ছিলি?'

হরিশ বলিল,—'আজ্ঞে ওপরেই তো ছিলুম বাবু, সারাক্ষণ সিঁড়ির গোড়ায় বসেছিলুম। আপানারা শতরঞ্চি খেলতে বসলেন—'

'কতক্ষণ পর্যন্ত ছিলি?'

'আজ্ঞে রাত দুপুরে ধীরুবাবু আর মাণিকবাবু ফিরলেন, তখন আমি সিঁড়ির পাশেই কম্বল পেতে শুয়ে পড়লুম। কোথাও তো যাইনি বাবু।'

শ্রীকান্তবাবু ব্যোমকেশের দিকে তাকাইলেন, ব্যোমকেশ হরিশকে প্রশ্ন করিল, 'বাবুরা পাশা খেলতে আরম্ভ করবার পর থেকে রাত্রি বারোটা পর্যন্ত তুমি সারাক্ষণ সিঁড়ির কাছে বসেছিলে, একবারও কোথাও যাওনি?'

হরিশ বলিল, 'একবারটি পাঁচ মিনিটের জন্যে নীচে গেছলুম যামিনী-বাবুর জন্যে দোক্তা আনতে।'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন,—'হ্যাঁ হ্যাঁ, যামিনীবাবু ওকে একবার দোক্তা আনতে পাঠিয়েছিলেন বটে।'

'সে কখন? ক'টার সময়?'

'আজ্ঞে রাত্তির তখন ন'টা হবে।'

'হুঁ। রাত্রি ন'টা থেকে দুপুর রাত্রি পর্যন্ত দোতলায় কেউ আসেনি?'

'দোতলায় কেউ আসেনি বাবু। দশটা নাগাদ তেতলার ভাড়াটে বাবু এসেছিলেন, কিন্তু তিনি দোতলায় দাঁড়াননি, সটান তেতলায় উঠে গেছলেন।'

ব্যোমকেশ চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া শ্রীকান্তবাবুর পানে চাহিল। তিনি বলিলেন,—'ওহো, তেতলার ভাড়াটের কথা বলা হয়নি। তেতলায় একটা ছোট ঘর আছে, চিলেকোঠা বলতে পারেন। এক ভদ্রলোক ঘরটা ভাড়া নিয়েছেন। ঘরে পাকাপাকি থাকেন না, খাওয়া-দাওয়াও করেন না। তবে রোজ সকাল-বিকেল আসেন, ঘরের মধ্যে দোর বন্ধ করে কি করেন জানি না, তারপর আবার তালা লাগিয়ে চলে যান। একটু অদ্ভুত ধরনের লোক।'

'নাম কি ভদ্রলোকের?'

'নাম? দাঁড়ান বলছি—' শ্রীকান্তবাবু একখানা বাঁধানো খাতা খুলিয়া দেখিলেন

—'নিত্যানন্দ ঘোষাল।'

'নিত্যানন্দ ঘোষাল!' ব্যোমকেশ একবার আড়চোখে আমার পানে চাহিল—'রোজ দু'বেলা যখন আসেন তখন কলকাতার লোক বলেই মনে হচ্ছে। কতদিন আছেন এখানে?'

'প্রায় ছ' মাস। নিয়মিত ভাড়া দেন, কোনও হাঙ্গামা নেই।'

'কি রকম চেহারা বলুন তো?'

'মোটাসোটা গোলগাল।'

ব্যোমকেশ আবার আমার পানে কটাক্ষপাত করিয়া মুচকি হাসিল,—'চেনা-চেনা ঠেকছে—' হরিশকে বলিল,—'নিত্যানন্দবাবু দশটা নাগাদ এসেছিলেন? তোমার সঙ্গে কোনও কথা হয়েছিল?'

হরিশ বলিল,—'আজ্ঞে না, উনি কথাবার্তা বলেন না। ব্যাগ হাতে সটান তেতলায় উঠে গেলেন।'

'ব্যাগ!'

'আজ্ঞে। উনি যখনই আসেন সঙ্গে চামড়ার ব্যাগ থাকে।'

'তাই নাকি! কত বড় ব্যাগ?'

'আজ্ঞে লম্বা গোছের ব্যাগ; সানাই-বাঁশী রাখার ব্যাগের মত।'

'ক্ল্যারিওনেট রাখার ব্যাগের মত? ভদ্রলোক তেতলার ঘরে নিরিবিলি বাঁশী বাজানো অভ্যেস করতে আসেন নাকি?'

'আজ্ঞে কোনও দিন বাজাতে শুনিনি।'

ব্যোমকেশ কিছুক্ষণ গভীর চিন্তামগ্ন হইয়া রহিল। তারপর মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিল,—'কাল রাত্রে উনি কখন ফিরে গেলেন?'

'ঘণ্টাখানেক পরেই। খুব ব্যস্ত-সমস্তভাবে তর্‌তর্ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন।'

'ও।—আচ্ছা তুমি এবার যেতে পারো।' হরিশ শূন্য পেয়ালা প্লেট প্রভৃতি লইয়া প্রস্থান করিলে ব্যোমকেশ শ্রীকান্তবাবুকে বলিল,—'ওপরতলাগুলো একবার দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। আপত্তি আছে কি?'

'বিলক্ষণ, আপত্তি কিসের? আসুন।' শ্রীকান্তবাবু আমাদের উপর তলায় লইয়া চলিলেন।

দ্বিতলে পাশাপাশি পাঁচটি বড় বড় ঘর, সামনে টানা বারান্দা। সিঁড়ি দিয়া উঠিয়াই প্রথম দুটি ঘর শ্রীকান্তবাবুর। দ্বারে তালা লাগানো ছিল। ব্যোমকেশ জিজ্ঞাসা করিল,—'আপনি কি একলা থাকেন?'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন,—'আপাতত একলা। স্ত্রীকে ছেলেপুলে নিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দিয়েছি। যা দিনকাল।'

'বেশ করেছেন।'

এক নম্বর ঘরে তালা লাগানো, বাবুরা এখনও ফেরেন নাই। দু নম্বর ঘরে তিনটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক রহিয়াছেন। একজন মেঝেয় বসিয়া জুতা পালিশ করিতেছেন, দ্বিতীয় ব্যক্তি দাড়ি কামাইতেছেন, তৃতীয় ব্যক্তি খোলা জানালার ধারে বিছানায় কাত হইয়া খবরের কাগজ পড়িতেছেন। জানালা দিয়া রাস্তার ওপারে অনাদি হালদারের বাসা সোজাসুজি দেখা যাইতেছে। ব্যালকনির ভিতর দৃষ্টি প্রেরণ করিবার চেষ্টা করিলাম, কিন্তু ঢালাই লোহার ঘন রেলিং-এর ভিতর দিয়া কিছু দেখা গেল না।

তিন নম্বর ঘরে ধীরুবাবু ও মাণিকবাবু সবেমাত্র বিছানায় উঠিয়া বসিয়াছেন এবং তুড়ি দিয়া হাই তুলিতেছেন। শ্রীকান্তবাবু সহাস্যে বলিলেন,—'কী, ঘুম ভাঙল?'

দুজনে বাহু ঊর্ধ্বে তুলিয়া আড়ামোড়া ভাঙিলেন।

ব্যোমকেশ কাহাকেও কোনও প্রশ্ন করিল না, দ্বিতল পরিদর্শন করিয়া সিঁড়ির দিকে ফিরিয়া চলিল। একই সিঁড়ি ত্রিতলে গিয়াছে, তাহা দিয়া উপরে উঠিতে লাগিল। শ্রীকান্তবাবু ও আমি পিছনে রহিলাম।

ত্রিতলে একটি ঘর, বাকি ছাদ খোলা। ঘরের দরজায় তালা লাগানো।

ব্যোমকেশ শ্রীকান্তবাবুকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনার কাছে চাবি আছে নাকি?'

'না। তবে—' তিনি পকেট হইতে চাবির একটা গোছা বাহির করিয়া বলিলেন,—'দেখুন যদি কোনও চাবি লাগে। ভাড়াটের অবর্তমানে তার ঘর খোলা বোধ হয় উচিত নয়, কিন্তু বর্তমান অবস্থায়—'

চাবির গোছা লইয়া ব্যোমকেশ কয়েকটা চাবি লাগাইয়া দেখিল। সস্তা তালা, বেশী চেষ্টা করিতে হইল না, খুট করিয়া খুলিয়া গেল।

আমরা ঘরে প্রবেশ করিলাম। ঘরের একটিমাত্র জানালা রাস্তার দিকে খোলা রহিয়াছে। আসবাবের মধ্যে একটি উলঙ্গ তক্তাপোশ ও একটি লোহার চেয়ার। আর কিছু নাই।

ব্যোমকেশ কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া প্রথমেই জানালার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল। নীচে প্রশস্ত রাস্তার উপর মানুষ ও যানবাহনের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। ওপারে অন্যান্য বাড়ির সারির মধ্যে অনাদি হালদারের ব্যাল্‌কনি।

ব্যোমকেশ সেই দিকে চাহিয়া থাকিয়া কতকটা আপন মনেই বলিল, 'কাল রাত্রি আন্দাজ এগারোটার সময়...রাস্তায় ছেলেরা বাজি পোড়াচ্ছে...চারিদিকে দুমদাম শব্দ—অনাদি হালদার ব্যাল্‌কনিতে দাঁড়িয়ে বাজি পোড়ানো দেখছে...সেই সময় জানলা

াকে তাকে গুলী করা কি খুব শক্ত? ুলীর আওয়াজ শোনা গেলেও বোমা াটার আওয়াজ বলেই মনে হবে।'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন,—'তা বটে। কন্তু হোটেলে এত লোকের চোখে ধুলো য়ে বন্দুক আনা কি সহজ?'

'আপনার ভাড়াটে হাতে ব্যাগ নিয়ে াটেলে আসে। ব্যাগের মধ্যে একটা পস্তল কিম্বা রিভলবার সহজেই আনা ায়।'

'কিন্তু রাইফেল কিম্বা বন্দুক আনা ায় কি? আমাকে মাফ করবেন, আমি ৈবেত বংশের সন্তান, গোলাগুলী বন্দুক পস্তলের ব্যাপার কিছুই বুঝি না। তবু নে হয়, পিস্তল কিম্বা রিভলবার দিয়ে তদূরে থেকে মানুষে মারা সহজ কাজ য়।'

উত্তরে ব্যোমকেশ কেবল গলার মধ্যে কটা শব্দ করিল। তারপর নিরাভরণ রের চারিদিকে একবার দৃষ্টি ফিরাইয়া িলল,—'চলুন, যাওয়া যাক, আপনাকে নেক কষ্ট দিলাম—'বলিতে বলিতে ামিয়া গেল। দেখিলাম তাহার দৃষ্টি দয়ালের একটা স্থানে আটকাইয়া গয়াছে।

জানালার ঠিক উল্টা পিঠে দেয়ালের দের মাজে খানিকটা চূণ বালি খসিয়া গয়াছে। তাহার নীচে মেঝের উপর খসিয়া-পড়া চূণ-বালি পড়িয়া আছে। ব্যোমকেশ ত্বরিতে গিয়া চূণ-বালি পরীক্ষা করিল, বলিল,—'নতুন খসেছে নে হচ্ছে। শ্রীকান্তবাবু, এ ঘর রোজ ঝাটপাট দেওয়া হয়?'

শ্রীকান্তবাবু বলিলেন,—'না। ঘর খোলা থাকে না—'

ব্যোমকেশ দু' পা সরিয়া আসিয়া উর্দ্ধমুখে চাহিয়া রহিল।

'দেয়ালের এই চূণ-বালি কবে খসেছে আপনি বলতে পারেন না?'

'না। এইটুকু বলতে পারি, ছ' মাস আগে যখন ঘর ভাড়া দিয়েছিলাম তখন প্লাস্টার ঠিক ছিল।'

'হুঁ। অজিত, চৌকিটা ধরতো, একবার দেখি—'

দু'জনে চৌকি ধরিয়া দেয়াল ঘেঁষিয়া রাখিলাম; তাহার উপর লোহার চেয়ার রাখিয়া ব্যোমকেশ তদুপরি আরোহণ করিল। সেখান হইতে হাত বাড়াইয়া দেয়ালের ক্ষতস্থানটার নাগাল পাওয়া যায়। ব্যোমকেশ আঙুল দিয়া স্থানটা হাতড়াইল, তারপর একটি ক্ষুদ্র বস্তু হাতে লইয়া নামিয়া আসিল। পেন্সিলের ক্যাপের মত লম্বাটে আকৃতির একটি ধাতব পদার্থ, তাহার গায়ে রাইফেলের পেঁচানো রেখাচিহ্ন।

রাইফেলের টোটা। ব্যোমকেশ সেটি ঘুরাইয়া দেখিতে দেখিতে বলিল,—'এ বস্তু এখানে এল কি করে? কবে এল? —ঘরের মধ্যে কেউ রাইফেল ছুঁড়েছিল? কিম্বা—' ব্যোমকেশ জানালার দিকে চাহিল—'অনাদি হালদার যদি ব্যালকনি থেকে জানলা লক্ষ্য করে রাইফেল ছুঁড়ে থাকে তাহলে গুলীটা দেয়ালের ওই জায়গায় লাগা সম্ভব। অথবা—'

—ক্রমশ

মালবের লোকসঙ্গীত গর্বা

অনিলকুমার সমাজদ্দার

মানব সমাজ বিকাশের সাথে সাথেই মানব সমাজে নানা রকম অনুষ্ঠান ও প্রথার প্রচলন প্রবর্তিত হয়। ক্রমে সে সব প্রথা দেশ বিদেশে নানা নামে নানা ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে যায়।

অনেক প্রথা পূর্ব সংস্কার এবং অন্ধ-বিশ্বাসের ভিত্তিতেও সমাজে প্রচলিত হয়ে আসছে। অনেক সময় আমাদের বুঝবার অসুবিধা হয়ে পড়ে যে কোন প্রথা কোন দেব-দেবীর প্রতীক? এবং কবে থেকে সে প্রথা প্রচলিত হয়ে আসছে।

যে সব প্রান্তে আজও আদিম সভ্যতা বিরাজিত যেখানে আজও বর্তমান সংস্কৃতির (বিকৃত) রূপ নিজস্ব ছায়া প্রসারিত করতে পারেনি—যে সব স্থানে আজও প্রকৃতির পূজা আরাধনা হয়ে থাকে—সেখানে, সেখানকার ঐ সব ছোট্ট ছোট্ট ভাঙ্গা কুটিরে—ক্ষেত খামারে মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে ফেলতেও সেখানকার চিরদরিদ্র, অসীম পরিশ্রমী—তাদের ভারাক্রান্ত—ক্লান্ত—ধর্মভীরু লোকদের মধ্যে আজও নানাবিধ প্রথার প্রচলন দেখা যায়।

পল্লী বাংলার ঘরগুলি ছাড়াও ভারতের প্রায় সর্বত্রই এমন কী ছোট-নাগপুরের আদিম অধিবাসীদের মধ্যেও নানারূপে রীতির প্রচলন দেখা যায়।

গ্রামের ক্ষেত-খামারে পাহারারত তরুণীরা অস্তগামী সূর্যের সোনা ছড়ানো নানা প্রকার রঙ বেরঙের বাহারে রিমি-ঝিমি বর্ষাধারার নর্তনে আপন মন খোলা প্রাণ মাতানো সুরে গেয়ে ওঠে গান। সে গানের সুরে লয়ে পাওয়া যায় তার হৃদয়ের গভীরতাটুকু.........তাদের এ সব সরল গীতে এমন এক প্রকৃত কাব্যধারা ঝরে পড়ে—সে কাব্যের সামনে আধুনিক কবিতা সত্যই ম্লান হয়ে যায়।

ক্ষেতের নিড়ান করতে করতে—নদীর-বুকে পাল ভাসিয়ে ওরা এমনি এক যাদুর পরশ ছোঁয়া তানে গান গেয়ে ওঠে......যার প্রেরণাতে ওদের পেশীবহুল সবল হাত যেন যন্ত্রের মত আপনা আপনিই চলতে থাকে। গ্রামবাসীগণের মধ্যে অনেকেই সংগীত আর নৃত্যগীত সম্বন্ধে অজ্ঞ। অনেকেই বড় বড় সংগীত শাস্ত্রের পুঁথিপত্র দেখেনি বা নৃত্য-কলার স্কুল কলেজে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করার সুযোগ লাভও করেনি। তাই প্রকৃতির খোলা আবহাওয়াই হয়ে ওঠে ওদের প্রকৃত বিরাট গ্রন্থ—আর শিক্ষক। প্রকৃতির পট পরিবর্তন হতেই ওরা পায় প্রকৃত কাব্য। প্রকৃতির গভীরতা থেকেই ওরা সৃজনাত্মক প্রেরণা লাভ করে আর প্রকৃতির মর্মবাণী হতেই সঞ্চয় করে ওরা গানের সুর-লয়-তান।

এর অতিরিক্ত এরা শুধু পেটের জন্য অন্ন সংগ্রহ করাকেই জীবনের প্রধানতম কর্ম বলে মনে করে। অন্ন সমস্যাই ওদের বিরাট সমস্যা আর প্রকৃতির কোলই হল ওদের প্রধান আশ্রয়স্থল। জীবনের তিক্ততা যেমন পুরুষকে পরিশ্রম করতে বাধ্য করায় তেমনই নারীও পায় না নিষ্কৃতি সে তিক্ততা হতে।

অন্যান্য সমাজের মত কপট বা নকল আকর্ষণের মোহ ওদের সরলতা ও নির্মলতাকে কলুষিত করতে পারেনি। অন্নের সমস্যা সমাধানান্তে প্রকৃতির পরিবর্তিত প্রেরণাই প্রেম-বাসনা-নৃত্য-সংগীত-হাস্য ও পরিহাস প্রভৃতির দিকে ওদের সরল মনটাকে টেনে নিয়ে যায়.....

সে সময় ওদের মধ্যে নিজেদের রচিত অনেক গান প্রহসন নিত্য নূতন নৃত্যকলা এবং নানা প্রকার বিচিত্রতম প্রথা এবং নানাবিধ উচ্চ আদর্শমূলক কথাবার্তার প্রচলন হয়। আদর্শকেই ধার্মিক রূপ প্রদান করে তারা নৃত্যসংগীত আদি কলাতে রূপান্তরিত করে এবং সারাজীবন ওরা তা রক্ষা করে চলে। গর্বাঃ এক প্রকার বিচিত্র পর্ব আজও প্রচলিত আছে বিশেষ করে নৃত্য আর সংগীতের মাধ্যমে। তেমনি ছোটনাগপুরের ওরাওঁ মুণ্ডাদের মধ্যেও ভাদ্র একাদশীতে প্রত্যেক পল্লীতে (বিলাসপুর প্রভৃতি স্থানেও) 'কর্মা' পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। ক্ষেতের কর্ম শেষ হবার পর কর্মা পর্ব এক নৃত্য সংগীত দ্বারা অনুষ্ঠিত হয়, কিন্তু এ প্রবন্ধে আমি ছোটনাগপুরের কর্মা পর্ব নয় মালব গুজরাত প্রান্তের গর্বা সম্বন্ধেই আলোচনা করবো

গর্বা নৃত্য গুজরাতে যতটা প্রচলন তেমন আর অন্য প্রান্তে নেই। গর্বাকে এক প্রথা রূপেই মানা হয়—বিশেষ করে নৃত্য সংগীতের মাধ্যমে এবং সৌভাগ্যের প্রতীক বলা হয়। গুজরাতের গ্রামে গিয়ে এ সমারোহ যদি স্বচক্ষে দেখা যায় তা হলে এর পূর্ণরূপে রসাস্বাদন করে চক্ষু সার্থক করা যায়।

গুজরাতে বহুল প্রচারিত থাকা সত্ত্বেও পূর্বদিকে প্রচলিত হতে হতে মালব প্রদেশেও তাদের নিজস্ব ভাষায় গর্বা প্রচলিত হয়ে গেছে।

গর্বা শুভ এবং সৌভাগ্যের চিহ্ন স্বরূপ। কল্যাণশ্রীর প্রতীক। নবরাত্রিকেই গর্বার বিশেষ দিন মানা হয় এই জন্য গর্বার বিশেষ সমারোহ আশ্বিন মাসের শুভ শারদীয় নবরাত্রিতে অনুষ্ঠিত হয়। গর্বার আরাধ্য দেবী অম্বা [অম্বিকা (?)] সৌভাগ্যের জননী। এই কারণেই বিশেষ করে স্ত্রীলোকেরাই মনে-প্রাণে গর্বা পর্ব অনুষ্ঠানে যোগদান করে। পুরুষদের মধ্যেও গর্বা পর্ব অনুষ্ঠিত হয় কিন্তু সে পর্ব বিজয়া দশমীর পরে।

নবরাত্রির দিন গর্বা স্থাপন করা হয়। দুটো মাটির কলসী (একটি বড় ও

অন্যটি কিছু ছোট) এনে বড় ঘড়াটির ওপর ছোট কলসীটি রেখে উপরের কলসীটির ওপর একটি ঢাকনা (মালব ভাষায় 'সরাবল') রেখে চারদিকে চারটি পলতে দিয়ে পলতে জ্বালিয়ে প্রদীপ বানানো হয়। তখন ঐ স্থাপিত কলসীকে 'গর্বা' বলা হয়। স্থাপন করার পর স্ত্রীলোকগণ হাতে তালি বাজিয়ে বাজিয়ে সুমধুর কণ্ঠে নাচ গান করতে থাকে এবং সমবেতভাবে গর্বার চতুর্দিক পদক্ষিণ করতে থাকে। এ নৃত্য সংগীত প্রান্ত এবং ভাষানুযায়ী হয়ে থাকে। কিন্তু প্রত্যেক দিন কমপক্ষে পাঁচখানি গান গাওয়া হয় এর বেশী যত করা হয় ততই নাকি ফল— কিন্তু পাঁচের কম যেন না হয় এ বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। এই হল নিয়ম। উদাহরণের জন্য গর্বার দু' একটি গান দেওয়া হল—

তাম্বাকো লোটয়াঁ ভরয়া জল সে রে;
পিবানা বালো পরদেশ ছেরে
বই মহারো কানো কালজা রী করছেরে।
কোরছে— কোরছেরে।
বই মহারী সোনার অংগুঠি উপর মৌরছেরে॥

(আমার ঘটিটি জলে ভরা, কিন্তু যে গান করবে সে বিদেশে রয়েছে। সই আমার হৃদয়ের টুকরো কানু এই সোনার আংটিটার মতনই)।

উপরোক্ত গানটিতে গুজরাতি ভাষার প্রভাব দেখে মনে হয় সংগীতটি গুজরাতি। যার স্বরূপ মালব ভাষায় রূপান্তরিত হয়ে:—

"সীসেরা চীরা কাঁ ভুলি আয়া
মাথানো ভম্মর* কিনো চোরী লায়া
ও শ্যাম কাঁ রমী আয়া।
মথরা মে' গে'দ খেলি আয়া?
ও শ্যাম কাঁ রমী আয়া
ঝালজ† কিনোঁ চোরী লায়া
ও শ্যাম কাঁ রমী আয়া?"

[অর্থ: হে কানু। তুমি মাথার পাগড়ি কোথায় হারিয়ে এসেছো আর কোন রমণীর মাথার টিকলী তুমি চুরি করে এনেছো। হে শ্যাম কোথা হতে তুমি রমণ করে এলে? তোমার কানের মতি কোথায় ভুলে এসেছো? আর কোন নারীর কানের মাকড়ি (ঝালর) চুরি করে এনেছো। তুমি কি সত্য সত্যই মথুরায় বল (গে'দ=বল) খেলে এলে না কোথা হতে রমণ করে এলে।]

শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে যে গর্বা গান শোনা যায়, তাতে শ্রীকৃষ্ণকে—নবঘনশ্যাম—আর রসিক নাগররূপেই দেখা হয়।

গরবা নাচের একটি প্রাচীন চিত্র

অন্য গানে পাই হাস্যরসাত্মক ব্যাঙ্গোক্তি:

মে'দি বোই খেতমে'
উগি বেলু রেতমে'
মে'দি বোই হোরাজ॥
ছোট দেবর লাড়লী
উ মে'দি কো রাখবালেরে
ছোটী ননদ লাড়লী
রা-মে'দি চুটন যায়রে।
চু'টি-চাঁটি খোলো ভরয়ো
আউর লী ঘর কী বটে হো॥
মে'দী মহারী মে'দোলী
উকা তীখা পান হো।
রাঁচ হো মনী সায়হো
প্যারা প্যারা আবসী।
লেনী মহরা ভাবজ জীমনা
হাত মে' লীজো॥ রাঁচ।
মে'দী লগই পানী চলি
সামনে মিল গয়া সায়বা
বিণী বোলা হমণী বোলা
মনমে' রাখ্যো দাব হো॥ রাঁচ।
বেড়ো তো মহনে আগ'নে মেল্যো।
ঘর মে' বোলি রাঢ় হো॥ রাঁচ।
ছোঁড়াকে টুটি ট্যাংড়ী
ছেঁাড়ি তো চাক্‌না চুর হো॥ রাঁচ।
মহরী সাসু নে হয়ো কিয়ো বউ
ভেস্যুকে কুণ্ডি মেলজে।
হুঁ ভোলিনে যু'-সুন্যো বউ,
ভাসুর কে কুণ্ডি মেলজে॥
মহরী সাসুনে ইয়ো কি'উ বউ
পাড়ীকে খুঁটে বাঁধজে।
হুঁ ভোলিনে যুঁ সুন্যোবৌ
"লাড়ী"কে খুঁটে বাঁধজে॥
মহারী সাসুনে ইয়ো কিয়ো বৌ
দালনে চোখা রাঁধজে।
হুঁ ভোলিনে ইয়ো কিয়ো, বউ
চাল মে' চোখা রাঁধজে॥
মহারী সাসুনে যুঁ কিয়ো বউ,
পিলামে' দীবো মেলাজ
হুঁ ভোলিনে যুঁ কিয়ো বউ
সাড়েমে দীবো মেলজে॥

---

* এক প্রকার আভূষণ।
† কানে পরবার এক প্রকার 'কাঁড়'।

সোর বোলে সিরক্যোবোলে
সাস্‌ বুঝবা জায় হো॥ রাঁচ।

[আমি বালুভরা রেতে মেহেদী লাগিয়েছি—ছোট্ট দেবর তার পাহারা দিচ্ছে। ছোট্ট ননদী সে মেহেদী চুরি করে তার আঁচল ভরে ঘরে নিয়ে এলো। যে মেহেদী আমি লাগিয়েছি তার পাতাগুলি খুবই চোখা।

ও মেহেদী তুই ভালো করে ফুটে ওঠ! কেননা আমার প্রাণের প্রিয় বিদেশ থেকে ঘরে আসছে। "নাওনা বউদি তোমার হাতে মেহেদী পাতার রস!"

মেহেদী হাতে মেখে জল আনতে চলে গেলাম—পথেতেই প্রিয়তমের সাথে দেখা হল: কিন্তু সে কোন কথাই আমার সাথে বললো না। কাজেই আমিও অভিমানে কিছুই বললাম না। তাই রাগে রাগে ফিরে এসে জলের ঘড়াটি উঠোনে ফেলে দিলাম। ঘরে ঢুকে ঝগড়া আরম্ভ করলেম। ফলে ছেলেটা খোঁড়া হল মেয়েটা চুরমাচুর! শাশুড়ী বললেন বউ মাটির গামলাটা ভৈসের ঘরে দিও, আমি শুনলেম গামলাটা ভাসুরকে দিও। শাশুড়ী বললেন বউ পাড়ীকে (বাছুরের আদুরে নাম) খুঁটিতে বেঁধে রেখো! আমি শুনলেম লাড়ীকে (ছোট দেওরের বউএর আদুরে ডাক) খুঁটিতে বেঁধো। দাল আর চাউল শাশুড়ী ঠাকরুণ রাঁধতে বলেন শুনি দালেচালে রাঁধো। শাশুড়ী তাকে প্রদীপ রাখতে বলায় তাকিয়াতে প্রদীপ রাখি... আগুন দাও দাও করে জ্বলে ওঠে—তখন শাশুড়ী ঠাকরুণ নিজেই গিয়ে নেভাল।]

এ গানটি হাস্যরসাত্মক পর্যায়ের অন্তর্গত। অথবা ব্যঙ্গসঙ্গীত।

ওখানকার রমণীগণ কিন্তু "খেয়াল" বলে থাকে। কেননা এ গানটি কোন ঝগড়াটে বউএর নিত্য-নৈমিত্তিক কাজকর্ম হতেই রচিত।

তার প্রিয়তম পথে তার সাথে কথা না বলাতে সে রাগের চোটে ঘরে এসে ঝগড়া আরম্ভ করে দিল তাও আবার যেমন তেমন সামান্য ঝগড়া নয়—সাংঘাতিক! ছেলেটার ঠ্যাং ভাঙলো, মেয়েটার হল চুরমাচুর! তাছাড়া আমরা ভালো করে লক্ষ্য করলে গানের মধ্যে উচ্চস্তরের মনোবিজ্ঞানের পরিচয় পাই। গ্রামের অশিক্ষিতা রমণীগণ ছন্দে আর রচনায় এবং মনোবিজ্ঞানের কতখানি পরিচয় এতে দিয়েছেন সত্যই প্রশংসার বিষয়, কেননা এক অন্যমনস্কা রমণীর হৃদয়ের মনোবিজ্ঞানের চিত্র অঙ্কণ করা সামান্য প্রতিভা হতে পারে না। শাশুড়ী কি বলে আর অন্যমনস্কা বধূ কি শোনে! এমনকি শাশুড়ী তাকিয়াতে প্রদীপ রাখতে বলাতে তাকিয়াতে প্রদীপ রেখে শেষ পর্যন্ত বধূটি কি কাণ্ডটাই না করলো! কি আজ্ঞাকারী বউ! বিছানা যখন জ্বলে উঠলো তখনও বউ উঠলো না। অগত্যা শাশুড়ী ঠাকরুণ গিয়ে নিজেই আগুন নেভালেন।

"গর্বা" বাড়ির বউরা ছাড়াও বাড়ির মেয়েরাও করে থাকে কিন্তু মেয়েদের গর্বা বউদের অনুষ্ঠিত গর্বার মতন হয় না। মেয়েদের গর্বা ভিন্নরূপে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মেয়েদের স্বাভাবিক উচ্ছৃঙ্খলতার স্বরূপেই করা হয়। মেয়েরা একে "ঘরল্যা" বলে (মালব ভাষায়)।

ঘরল্যা ঘটির মত ছোট মাটির ঘটের উপর অনুষ্ঠিত হয়। ঘটটির চারদিকে ছিদ্র করে মাঝখানে প্রদীপ জ্বালানো হয়। তাতে ঘটটির চতুর্দিক হতে আলোর রশ্মি বিকীর্ণ হতে থাকে। "ঘরল্যা" মাথায় নিয়ে মেয়েরা দল বেঁধে গ্রামের প্রতিটি ঘরে গিয়ে নাচগান করে।

বিয়ের পূর্ব হতেই মেয়েদের মনে শ্বশুর বাড়ির প্রতি বিতৃষ্ণার ভাব প্রকাশ পায়—তারই নিদর্শন পাওয়া যায় "ঘরল্যার" গানের মধ্যে।

আমাদের বাঙলার পূর্ব দেশগুলির "যমপুকুর" ব্রতের মধ্যেও এরূপ শ্বশুরালয় বিদ্বেষী মনোভাব মেয়েদের মধ্যে দেখা যায়।

ঘরল্যার গান বয়স অনুযায়ী পৃথক হয়ে থাকে। বড় ছোট বয়স হিসাবের কল্পনার মাধ্যমে তাদের নিজস্ব রচিত গান গাওয়া হয় বিচিত্র নৃত্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে:

ছোটি ছোটি টোক্‌রী (কানের গহনা, মাক্‌ড়ির মতন)
ঘড়ই দেরে বীর......
সাসারিয়াকা খোটা লেগে,
খায় খেজুরা বেচে বোর।
বৌরকে গুঠলি লই গয়া চোর
চোর কা ঘর মে' নাচে মোর

(হে ভাই, তুই আমাকে কানে পরবার জন্য ছোট ছোট মাক্‌ড়ি গড়িয়ে দে! সেগুলি পরে আমি শ্বশুর বাড়ি যাব। আমার শ্বশুর বাড়ির লোকেরা মোটেই ভালো লোক না। খায় তারা খেজুর আর বরই (কুল) বিক্রি করে। কুলের আঁটি চোরে নিয়ে গেলে চোরের ঘরে ময়ূর নাচতে থাকে।)

কি অদ্ভুত কল্পনা! এমনি নানা ধরনের বিচিত্র বিচিত্র কাল্পনিক শ্বশুর বাড়ি বিদ্বেষী গান গীত হয়॥

মাইকেলের একখানি বিস্মৃত গ্রন্থ

রবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত

মাইকেলের দ্বিতীয় মুদ্রিত গ্রন্থ The Anglo-Saxon and the Hindu নামে চব্বিশ পৃষ্ঠার পুস্তিকাখানির সংবাদ প্রথমে পাই ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধুসূদন-জীবনীতে। যোগীন্দ্রনাথ বসুর "মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনচরিতে" ইহার উল্লেখ নাই এবং যোগীন্দ্রনাথের একটি উক্তি হইতে মনে হয় তিনি এই রচনাটি সম্বন্ধে অবগত ছিলেন না। Visions of the past প্রসঙ্গে তিনি মন্তব্য করিয়াছেন, "মধুসূদন যে খৃষ্টধর্মাবলম্বী ছিলেন, এই অসম্পূর্ণ কবিতাটিতেই কেবল তাহার চিহ্ন আছে; তাঁহার অন্য কোন প্রবন্ধে তাহার নিদর্শন নাই।" বস্তুত The Anglo-saxon and the Hindu পুস্তিকায় কবি ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্মের স্থান সম্বন্ধে প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। নগেন্দ্রনাথ সোমের "মধুস্মৃতিতে"ও এ রচনাটির উল্লেখ নাই। নগেন্দ্রনাথ কিশোরীলাল হালদার কর্তৃক সংগৃহীত মাইকেলের মাদ্রাজ-প্রবাস সম্বন্ধে কিছু তথ্য তাঁহার জীবনী-গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই তথ্য কিশোরীলাল মাদ্রাজের কোন সংবাদপত্র হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এই সংবাদপত্রে মাইকেল সম্বন্ধে অন্যান্য কথার মধ্যে এই কথাটি ছিল:—

He edited a paper which he called the Hindu Chronicle, pre-eminent for its good English and gave a lecture on 'who is this stranger that is come amongst us?'

এই বক্তৃতাটির বিষয় কি ছিল, কবি এখানে কাহাকে stranger বলিতেছেন এ কথা অনেক দিন ভাবিয়াছি। সমসাময়িক সংবাদপত্র খুঁজিয়াও কোন লাভ হয় নাই। মাদ্রাজের মহাফেজখানায় পত্র লিখিয়াও কোন সূত্র আবিষ্কার করিতে পারি নাই। তারপর The Anglo-saxon and the Hindu পুস্তিকাখানির অনুসন্ধান করিয়া দেখিলাম উহার এক খণ্ড জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে। এখানি পড়িলে আর সন্দেহ থাকে না যে, ইহাই সেই "Who is the stranger come amongst us" সম্বন্ধে বক্তৃতা।

বইটির নাম-পত্রে ভার্জিলের ইনিড্ হইতে একটি ছত্র উদ্ধৃত হইয়াছে—Quis novus hic nostris successit sedibus hostes—ইহার অর্থ—আমার ঘরে আজ এ অতিথিটি কে? এবং গ্রন্থের প্রথম অনুচ্ছেদটিতেই Who is this stranger that has come to our dwelling? কথাটি একাধিকবার লিখিত হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত এই পুস্তিকার মুখপৃষ্ঠায় Lecture I এই কথা লিখিত আছে। ইহাতে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে Who is this stranger that has come to our dwelling সম্বন্ধে বক্তৃতাটি Anglo-Saxon and the Hindu পুস্তকে লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

পুস্তিকাটি ১৮৫৪ সালে মাদ্রাজে Messrs. Pharoah and Co. দ্বারা মুদ্রিত হয়। ইহার প্রকাশক ছিলেন মাউন্ট রোডের Athenaeum Press. মাইকেল বইখানি উৎসর্গ করেন Madras Polytechnic Institution এর সম্পাদক S. H. Kenrick মহোদয়কে। উৎসর্গ-পত্রের তারিখ ১২ই এপ্রিল। এই বক্তৃতাটি কবে, কোথায় প্রদত্ত হইয়াছিল বলিতে পারি না। মধুস্মৃতি বলে মাইকেল মাদ্রাজে পৌঁছিয়া কিছুদিনের মধ্যেই এই বক্তৃতা দেন। অনুমান করিতে পারি, মাদ্রাজ পলিটেকনিক অ্যাসোসিয়েসনেই কোন এক সভায় মাইকেল ইহা পাঠ করিয়াছিলেন। এই বিষয়ে আরও কয়েকটি বক্তৃতা দিবার ইচ্ছা যে মাইকেলের ছিল, তাহা উৎসর্গ পত্রিকা ও পুস্তিকার শেষ পংক্তি হইতে বুঝিতে পারি। উৎসর্গ পত্রিকার শেষ অনুচ্ছেদে মাইকেল বলিতেছেন:

"I leave this lecture and its successors, if there be any"

ইত্যাদি এবং পুস্তিকার শেষে আছে:

"How he is fulfilling the mission, must with your permission, form the subject of a future discourse"!

তবে এ বিষয়ে তিনি আর বক্তৃতা দিয়াছিলেন কিনা তাহা অনুসন্ধানের বিষয়।

যাহা হউক, এই পুস্তিকাখানি মাইকেলের জীবনেতিহাস আলোচনার পক্ষে বিশেষ মূল্যবান। ইহাই মাইকেলের একমাত্র প্রবন্ধ গ্রন্থ। মাদ্রাজের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তাঁহার যে সমস্ত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহা এখন পর্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই। Hindu Patriotএর সম্পাদক হিসাবে ১৮৬২ সালের প্রথমভাগে যে সমস্ত সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহারও অনুসন্ধান এ যাবৎ হয় নাই বলিয়া জানি। Citizen পত্রিকায়ও তিনি প্রবন্ধ লিখিতেন বলিয়া নগেন্দ্রনাথ সোম বলিয়াছেন। এই সমস্ত প্রবন্ধ সংগৃহীত হইলে সেকালের রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবন ও অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে মাইকেলের

মতামত জানিতে পারিব। এই সংকলন কার্যে অগ্রসর হইয়াছি এবং আশা করি, এই গ্রীষ্মাবকাশে মাদ্রাজ শহরে কিছুকাল অনুসন্ধান করিয়া এই কাজটি শেষ করিতে পারিব।

The Anglo-Saxon and the Hindu পুস্তিকার বক্তব্য বিষয়টি হইল ভারতে ইংরাজ জাতির ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য। এবং এ বিষয় মাইকেল তাঁহার বক্তব্য স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন। ইংরাজ শাসন সম্বন্ধে ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালীর মনোভাব যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা লক্ষ্য করিবেন যে, এ বিষয়ে মাইকেলের যে অভিমত, তাহা সে যুগের সকল রাজনৈতিক ও সমাজ-সংস্কারকের অভিমত হইতে অভিন্ন। আমি এখানে বিশেষভাবে রামমোহন ও মাইকেলের রাজনৈতিক মতের সাদৃশ্যই পাঠকের নিকট উপস্থিত করিতে চাই। এই পুস্তিকায় মাইকেলের প্রধান কথা এইঃ ভারতবর্ষ অতীতে এক মহৎ সভ্যতার ধারক ও বাহক ছিল। কাল-ধর্মে ও নানা রাজনৈতিক দুর্বিপাকে আজ সে দেশ চরম দুর্দশায় পতিত হইয়াছে। Anglo-saxon অর্থাৎ ইংরাজ ঈশ্বরের ইচ্ছায় ভারতবর্ষের পুনরভ্যুত্থানে সহায়তা করিতেই আসিয়াছে। অবশ্য ইহার মধ্যে একটি কথা তিনি বলিয়াছেন, যাহা খৃষ্টধর্মাবলম্বীর কথা—আমাদের দেশে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কথা। এ প্রসঙ্গ আমরা ভিন্নভাবে আলোচনা করিব। এখানে মাইকেলের মূল কথাটি মাইকেলের মুখে শুনিতে পারিঃ

"Why has providence given this queenly, this majestic land for a prey and a spoil to the Anglo-Saxon? I say it is the Mission of the Anglo-Saxon to renovate, to regenerate, to Christianize the Hindu—to churn this vast ocean, that it may restore the things of beauty now buried in its liquid wilderness; and nobly is he seconded—will be seconded, by the Science and the Literature of his sea-girl fatherland—the literature of his country—baptised in the pure fountain of eternal love".

এখানে আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে, আজ একথা যেমন অদ্ভুত মনে হয়, সে যুগে ইহা তেমন অদ্ভুত মনে হইত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বাদেশিকতার মধ্যে রাজনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একরকম ছিল না বলিতে পারি। ভারতে ইংরাজের কর্তব্য ও ইংরাজ-রাজত্বের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে রাজা রামমোহন রায়ের বক্তব্য আলোচনার পূর্বে কোম্পানী আমলে ভারতের অবস্থা প্রসঙ্গে বিপিনচন্দ্র পালের একটি উক্তি স্মরণ করিতে পারি। বিপিনচন্দ্র এ বিষয়ে তাঁহার আত্মজীবনীর দ্বিতীয় খণ্ডে বলিয়াছেনঃ—

"With all its faults and failures, the administration of India by the East India Company had initiated a line of progress which helped to replace the personal rule, whether of Hindu or Moslem Princes and chiefs, by a new reign of law. The anarchy and disorder that had followed the decline and disruption of the Mughal Power, was gradually replaced by a more or less centralised and settled Government. The East India Company, whatever its failings in other directions, helped very materially to give the country peace and protection not only against outside invasion but what was far more important, to a very large extent equally against internal disorder and tyranny of the strong over the weak."

মাইকেলের উক্তির তাৎপর্য বুঝিবার জন্য স্বদেশী-আন্দোলনের এক বিশিষ্ট নায়কের এই কথাটি স্মরণ করিলাম। বিংশ শতাব্দীতে যে রাজশক্তির বিরুদ্ধে আমরা সংগ্রাম করিয়াছি, ঊনবিংশ শতাব্দীতে সেই রাজশক্তিকে স্বীকার করিয়া এবং তাহার সহায়তায় আমরা জাতীয় উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইয়াছি। আনন্দমঠের শেষে মহাপুরুষ সত্যানন্দকে যাহা বলিলেন, সে যুগের শিক্ষিত বাঙালীরও সেই একই কথাঃ "শত্রু কে? শত্রু আর নাই। ইংরেজ মিত্র রাজা।" একথা বঙ্কিম রাজকর্মচারী হিসাবে বলিয়াছেন—ইহা তাঁহার মনের কথা নয়, যাঁহারা এইরূপ চিন্তা করেন, তাঁহারা যেমন বঙ্কিমের প্রতি অবিচার করেন, তেমন ইতিহাসকেও উপেক্ষা করেন। আমাদের স্বাদেশিকতা ও রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মের ইতিহাস এই যুগের মনোভাব বা দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বুঝিতে পারিব না। যে বিচিত্র ও জটিল বিবর্তনের মধ্য দিয়া আমাদের জাতীয় চেতনার বিকাশ হইয়াছে, তাহার ইতিহাস এখনও রচিত হয় নাই।

যাহা হউক, ইংরাজ ভারতের উদ্ধারের জন্যই এদেশে আবির্ভূত হইয়াছে—মাইকেলের এ বিশ্বাস যে প্রকৃতপক্ষে সে যুগের সকল শিক্ষিত ও দেশভক্ত বাঙালীর বিশ্বাস, সেটি বুঝিবার জন্য আমরা রামমোহনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতে পারি। মাইকেলের এই বক্তৃতার প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে রামমোহন তাঁহার Final Appeal to the Christian Public নামে পুস্তিকায় বলেনঃ—

I now conclude my Essay in offering my thanks to the Supreme Disposer of the universe, for having unexpectedly delivered this country, from the long continued tyranny of its former rulers, and placed it under the Government of the English, a nation which is not only blest with the enjoyment of civil and political liberty, but also interest themselves, in promoting liberty and social happiness, as well as free enquiry into literary and religious subjects, among those nations to which their influence extends."

তাহা হইলে দেখিলাম, যে কথা রাজা রামমোহন রায় ১৮২৩ সালে বলিতেছেন, ঠিক সেই কথাটি মাইকেল তাঁহার একত্রিশ বৎসর পর ১৮৫৪ সালে বলিতেছেন। **The Anglo-saxon and the Hindu** পুস্তিকায় ব্যক্ত মাইকেলের রাজনৈতিক মতের মর্ম বুঝিতে হইলে আমাদের এই কথাটি মনে রাখিতে হইবে। সেকালে ইংরাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সঙ্গে স্বাদেশিকতার কোন বিরোধ ছিল না। এই পুস্তিকাখানি অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য বলিয়া এবং ইহার বিষয়বস্তু এ পর্যন্ত আলোচিত হয় নাই ভাবিয়া এই প্রসঙ্গে ইহার আরও কয়েকটি কথা উদ্ধৃত করিলামঃ

"It is the glorious mission of the Anglo-Saxon, to regenerate, to renovate the Hindu race! The trumpet call of the Anglo-Saxon, is destined to rouse from his grave the Hindu, to a brighter, a fairer existence; the mystic wand of the Anglo-Saxon, is destined to break the dreamless slumber which now curtails him round. The progress of society is a grand revelation of the will and the design of the great Maker of us all; and the history of the rise, and the onward march, and the fall of each nation, is a distinct chapter of that sublime and mysterious Apocalypses—that vast and sacred volume the characters on whose pages are traced by the finger of the deity himself! I say, it is the mission of the Anglo-Saxon race, to renovate, to regenerate the Hindu. Methinks I already see the hue of life blushing—though but faintly on the pale and cadaverous cheeks of the widow's son; the sunny morn of life dawning in the lightless eyes of the widow's son"

এ তো গেল ইংরাজের সভ্যতা ও ভারতবর্ষে তাহার প্রভাবের কথা। এই পুস্তিকায় ভারতবর্ষের গৌরবের কথাও কম নাই। যাহার জাতীয় গৌরবের বোধ নাই তাহার স্বাদেশিকতাও নাই। মাইকেল ইংরাজের সাহিত্য, বিজ্ঞান গ্রহণ করিবেন তাহার আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত হইবেন, তাহার সহায়তায় ভারতবর্ষকে নতুন করিয়া গড়িয়া তুলিবেন, কিন্তু তাঁহার দেশ যে এককালে এক মহাসভ্যতার অধিকারী ছিল, তাহা ইংরাজকে বলিতে ভুলিবেন না। ভারতবর্ষ এখন দুর্দশাগ্রস্ত বলিয়া মাইকেল ইংরাজের কাছে লজ্জাবোধ করেন না; কারণ যে বৃদ্ধ, সে প্রাকৃতিক নিয়মেই দুর্বল; এ দুর্বলতায় দুঃখ আছে, লজ্জা নাই।

"The Hindu! Alas! centuries of servitude and oppression, the predominance of a superstition, dismal and blasting; a fatal adherence to institutions, whose cruel tendency ever it is to curb and to restrain the onward march of man, as a social as an intellectual pilgrim, tracing round him a wizard ring, solemnly believed to be impossible—and violently repressing every inborn longing to be free; these, alas! have rendered that name a name of reproach—an astonishment, a proverb, and a by word among the nations! But do not despise him."

ভারতবর্ষের বিগত গৌরব সম্বন্ধে কথা কয়টি উচ্ছ্বাসময় এবং বোধ হয় কিছুটা শব্দাড়ম্বরে দুষ্ট। তবে ইহাতে তাঁহার স্বাদেশিকতার ভাবটি পরিস্ফুট। এবং এই ভাবটিই পরে আরও গভীর হইয়া তাঁহাকে সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের দিকে লইয়া আসিয়াছে।

"Long before the blind beggar Homer told the tale of 'Troy divine' enchanting the fair land of Greece—bards as sublime, breathing music as sonorous, as dulcet, had built the lofty rhyme in Hindusthan! Behold the Vedas; and adore the Shekina of intellect which fills them with a golden and rosy light."

অবশ্য, এ সময়ে বা কোন সময়ে মাইকেল ঠিক ঋগ্বেদ পাঠ করিয়াছিলেন কিনা জানি না। তবে মাদ্রাজে থাকিতেই যে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। এই ইংরাজী পুস্তিকাখানি পড়িয়া মনে হয় যে, বক্তৃতাটি যখন দেন, তখন পর্যন্ত তিনি সংস্কৃত ভাষার অনুশীলন মাত্র শুরু করিয়াছেন এবং সাহিত্য-পাঠ তখনও আরম্ভ হয় নাই! কারণ রামায়ণের আখ্যান সম্বন্ধে একটি মারাত্মক ভুল তিনি এই বক্তৃতার মধ্যেই করিয়াছেন। রামায়ণের সঙ্গে ইলিয়াডের তুলনা করিয়া তিনি বলিতেছেন, "The faithless Seeta had deserted the arms of her exile husband".

যাহা হউক, ইংরাজের প্রশস্তি করিতে যাইয়া তিনি ভারতের অতীত গৌরবের কথা বলিতে ভুলেন নাই এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর স্বাদেশিকতার ইহাই মূল কথা। প্রাচীনকালে আমরা বড় ছিলাম এবং আমরা আমাদেরই ছিলাম; আজ আমরা আবার বড় হইতে চাই এবং তোমরা আমদের এই পুনরভ্যুত্থানে সহায়তা কর—ইহাই ছিল সে যুগের মনোভাব! ইহাতে লজ্জা বা গ্লানি নাই:

"We shall not point the finger of scorn towards the Hindu. No. Fallen, obscured, as he is, shorn of his beams, he does not deserve it. Men do not gaze on the ruins of Babylon with contempt; nor ridicule the massy, the blackened, the huge, the shapeless things, which were once towers, and temples and palaces in the imperial city of the Caesars, the mistress of the world of her days!"

এবং ভারতবর্ষের এই পতনের কারণ সম্বন্ধে মাইকেলের যে উক্তি রামমোহন প্রমুখ সংস্কারকেরও দেখি সেই উক্তি:

"The furious waves of fanaticism, of oppression, have swept over his hapless soul for a thousand years! Iron-shod conquerors have trampled upon his hapless soul for a thousand years!".

মাইকেলের এই ইংরাজ-প্রীতি ও ইংরাজ-শাসনে আস্থা যে তাঁহার এবং সেই যুগের স্বাদেশিকতারই অঙ্গ, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। এখানে উল্লেখ করিতে পারি যে, কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হইবার পরেও কিছুকাল আমাদের স্বাদেশিকতার সঙ্গে ইংরাজ-প্রীতির কোন বিরোধ ছিল না। এই বিষয়ে বিপিন পালের একটি উক্তি উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। ১৮৮৭ সালের রাজনীতির উল্লেখ করিয়া তিনি তাঁহার এক বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন:

"Neither my democracy nor my radicalism took away in the least measure my loyalty to the British Government.... We believed in those days that England's mission in India was a conscientiously divine mission."

"The Anglo-Saxon and the Hindu" পুস্তিকার রাজনৈতিক মত বুঝিতে হইলে ঊনবিংশ শতাব্দীর রাজনৈতিক চিন্তার এই মূল কথাটি মনে রাখিতে হইবে।

মাইকেল এই বক্তৃতায় খৃষ্টধর্মের উল্লেখ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, ইংরাজের কর্তব্য—to Christianise the

Hindu। এখানে প্রশ্ন হইল, মাইকেল ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্মের প্রচার ও ভারতবাসীর খৃষ্টধর্ম গ্রহণের কল্পনা করিতেন কিনা। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, তিনি এরূপ কল্পনা কোনদিন করেন নাই। কোন আধ্যাত্মিকতা বা শাস্ত্রীয় মতবাদের প্রভাবে মাইকেল খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই। তবে স্বেচ্ছায় সেই ধর্মে দীক্ষিত হইয়া তাহা পরিত্যাগ করা যে নিতান্ত অধর্মের কাজ, তাহা তিনি বুঝিতেন। ধর্ম বা শাস্ত্র আলোচনায় তাঁহার প্রবৃত্তি একরকম ছিলই না বলিতে পারি। তিনি কোন গীর্জার সংগে সংযুক্ত ছিলেন না বলিয়া যে তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া লইয়া পাদ্রীদের মধ্যে মতান্তর হইয়াছিল, তাহার বহু প্রমাণ বর্তমান। তাঁহার বাঙলা কাব্যে খৃষ্টধর্মের কোন প্রভাব দেখি না। তাঁহার সনেটগুলির মধ্যে দুইটি অবশ্য খৃষ্টধর্মের সহিত সম্পর্কিত। তবে এই দুইটিই খৃষ্টধর্মাবলম্বীর উদ্দেশ্যে রচিত। ইহাদের মাইকেলের কবিমনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বলিয়া মনে হয় না। দুইটিই ১৮৭২ সালে পুরুলিয়ায় রচিত। পুরুলিয়ার খৃষ্টীয় সম্প্রদায় মাইকেলকে অভিনন্দিত করিলে তিনি একটি সনেটে তাঁহাদের আশীর্বাদ করেন। দ্বিতীয় সনেটটি রচিত হয় পুরুলিয়ার এক খৃষ্টধর্মাবলম্বী বাঙালীর পুত্রের দীক্ষা উপলক্ষে। মাইকেলের ইংরাজী কবিতায়ও খৃষ্ট ধর্মের কথা বড় নাই। অবশ্য নিজের দীক্ষার সময় যে কবিতাটি রচনা করিয়াছিলেন, (৯ই ফেব্রুয়ারী, ১৮৪৩) সেটি পুরাপুরি খৃষ্টধর্ম সম্বন্ধীয় কবিতা স্বীকার করিতেই হইবে। তবে এ কবিতার ভাবের সংগে মাইকেলের পরবর্তী ইংরাজী রচনার কোন যোগসূত্র দেখি না।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, মাদ্রাজ-প্রবাসকালে মাইকেল ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কথা ভাবিতেন কিনা। আমি মনে করি তিনি আদৌ ইহা ভাবিতেন না। The Anglo-saxon and the Hindu পুস্তিকার শেষ কথাঃ

"It is the glorious mission, I repeat, of the Anglo-Saxon to renovate, to regenerate, or in one word, to Christianize the Hindu. How he is fulfilling that mission, must with your permission, form the subject of a future discourse."

এখানে দেখিতেছি, মাইকেল হিন্দুরই পুনরুত্থানের কথা বলিতেছেন এবং সেই সংগেই বলিতেছেন—"to Christianize the Hindu।" ইহা কিভাবে সম্ভব হইতেছে, সে বিষয় তিনি পরবর্তী বক্তৃতায় আলোচনা করিবেন। এই প্রতিশ্রুত বক্তৃতা তিনি দিয়াছিলেন কিনা জানি না। তবে প্রথম বক্তৃতাটি পাঠ করিয়া মনে হয় "Christianize the Hindu" বলিতে মাইকেল ভারতবাসীর খৃষ্টধর্মাবলম্বনের কথা চিন্তা করেন নাই। এই পুস্তিকার কোন অংশে এই ধর্মান্তরের কথা নাই। Christianize বলিতে তিনি পাশ্চাত্য, বিশেষভাবে ইংরাজী সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞানের প্রচার বুঝিতেন। এ বক্তৃতায় ইংরাজের সাহিত্য ও শক্তির প্রশস্তি—ইহাতে ইংরাজের ধর্মের প্রশস্তি নাই। বক্তৃতার শেষ অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি—ইহার ঠিক পূর্বের কথা—**"Give me I say the beautiful** language of the Anglo-Saxon!" এবং পুস্তিকাখানির শেষের কয় পৃষ্ঠার মূল কথা এই যে, ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ভাষা ও সাহিত্য এবং এই পুস্তিকায় মাইকেল যেমন হিন্দু বলিতে, ভারতবাসীকে বুঝিতেছেন, তেমন খৃষ্টীয় সভ্যতা বলিতে ইংরাজ বা Anglo-saxonকে বুঝিতেছেন। ইহার সংগে ধর্ম-বিশ্বাসের কোন সম্পর্ক নাই। মনে হয়, সেইজন্যই তিনি পুস্তিকাখানির নাম দিয়াছেন—"The Anglo-saxon and the Hindu।" হিন্দু ও খৃষ্টধর্মাবলম্বীর মধ্যে শাস্ত্রগত পার্থক্য সম্বন্ধে যে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, তাহার প্রমাণ পাই মাদ্রাজ হইতে ভূদেবের নিকট লিখিত এক পত্রেঃ **"By Doorga—I am mad with vexation. If you have any Christian charity** (tho' a heathen rascal)" ইত্যাদি।

এই রসস্যের মধ্যে যে উদারতা, তাহাও মাইকেলের ধর্মজীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। শাস্ত্র বা তত্ত্বের প্রতি শ্রদ্ধা তাঁহার বড় ছিল না।

মৌ-সন্ধানী

শ্রীঅজয় হোম

বনে-বাদাড়ে ঝোপে-জংগলে ঘুরে বেড়ানো আমার নেশা। প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবজন্তুর সঠিক তথ্য সংগ্রহ করাই এই নেশার ভিত্তি। এক কথায় জীব-বিদ্যা গবেষণা ও জ্ঞান সংগ্রহের প্র্যাক্‌টি-কাল ক্লাস হ'ল এই বন-বাদাড় ও ঝোপ-জংগল। এর ফলে এমন এমন জিনিস দেখেছি শিখেছি এবং উপলব্ধিও করেছি যা অন্য কোন পরিবেশে বা শিক্ষায় কখনই সম্ভবপর হ'ত না। আবার অজ্ঞতায় দুর্ভাগ্যে ও হেলায় হারিয়েছি এমন সব সুযোগ যে তা আর কহতব্য নয়।

দিনটা ছিল '৫৩ সালের বারোই ফেব্রুয়ারী। সকাল সাতটা নাগাদ শিলং-এর লাবান পাড়া থেকে কিছু খাদ্যবস্তু ঝুলিতে পুরে বেরিয়ে পড়লাম উদ্দেশ্য-বিহীনভাবে বনে-জংগলে ঘুরতে। সংগে আমার তিন-সংগী। এই তিন-সংগীর প্রধান গুণ পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে হাঁটার ক্ষমতা ও অসীম কষ্টসহিষ্ণুতা।

পলোক্‌-লিংক্‌ পার হ'য়ে লং-রাউণ্ডকে বাঁয়ে রেখে পাহাড় থেকে কাঠ কেটে আনার জন্য ঘোড়া বা খচ্চরটানা গাড়ীর কাঁচা রাস্তায় দক্ষিণ-পূব দিক ধরে চলেছি। ক্রমে কাঁচা রাস্তা ও পায়ে চলার পথও ফুরিয়ে এল। শেষ পাহাড়ী কাঠুরের কাছে জেনেছিলাম, আমরা চলেছি কালাপাহাড়ের জংগল ধরে। এ জংগলের শেষ কোথায় সে জানে না।

আমরা ডান দিকে আরও পূব ঘেঁষে জংগলের গভীরতম প্রদেশে ঢুকে পথ করে চলতে শুরু করলাম। সংগীদের সংগে সব সময়েই আমার কড়ার থাকে লোকালয় বা শেষ মনুষ্যচিহ্ন ছেড়ে যেই জংগলে ঢুকব তখন আমি না বল্লে আর কেউ কথা বলতে পারবে না। যাকে বলে স্রেফ স্পিক্‌টি নট্‌।

জংগলের নিজস্ব একটা ভাষা আছে। সে ভাষা শুধু শব্দে নয় অখণ্ড নীরবতার মধ্যেও। সেই ভাষার হরফ্‌ পাহাড়ী ঝিল্লির একটানা তানপুরা-ধ্বনির হঠাৎ স্তব্ধ হওয়ায়, কৃকলাসের চকিত চলার পথ মর্মরে, বন্য জন্তুর দেহের ছাপ গাছের গুঁড়ির গায়ে—নরম মাটির উপর পদ-চিহ্নে, ক্ষুদ্র বৃহৎ পাখীর মৃদু থেকে উচ্চ নানা ভংগির কলরবে—তাদের সংকেত বাণীতে, ঝোপের আগায় বুনো জংগলী ফুল ফোটাতে, আলো ছায়ার খেলার মাঝে—কিসে নয়? সামান্যতম ধ্বনি ও নীরবতার ছন্দ থেকে চ্যুত হলে সে ভাষার হরফ্‌ যায় হারিয়ে। অর্থ খুঁজে মেলা ভার হ'য়ে পড়ে তখন। এ ভাষা শিখতে বহু অনুশীলন লাগে। জংগলের অধিবাসী, স্থানীয় পাকা শিকারী ও পাখীধরা বেদেদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বহু সাধ্যসাধনায় শিক্ষানবিশী করতে পারলে তবেই শেখা যায় এ ভাষার হরফ্‌। তাই জংগলে কথা বা গল্পগুজবে মন বিক্ষিপ্ত হলে ভাষা বোঝা যায় না—কথা যায় হারিয়ে। চোখ কান জংগলে যার যত সজাগ থাকে তার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় তত প্রবল হয়। জংগলে চলতে যার প্রয়োজন অপরিহার্য।

বেলা একটার কিছু পরেই এক পাহাড়ী ঝর্ণার ধারে বসে বিশ্রাম ও সংগে আনা খাদ্যবস্তুর সদ্ব্যবহারের পর ফেরার কথা চিন্তা করলাম। সন্ধ্যে হয়ে আসার আগেই এই পাহাড়ী বন থেকে বেরোন শ্রেয় বিবেচনা করলাম। এতটা পথ আসার মধ্যে দু'চারটে সাধারণ পাখী ছাড়া বিশেষ কিছুই দেখিনি। কেবল কয়েক কিসিমের বনজ ওষুধে গাছ ও অর্কিডস্‌ সংগ্রহ করেছিলাম।

ফিরে চলেছি। বেলা তিনটে হবে বোধহয় তখন। হঠাৎ দেখি একটা সরল গাছের অর্থাৎ পাইন গাছের নিচু ডালে বসে একটু ঝুঁকে একটা পাখী আমাদের দেখছে। দেখার মধ্যে বেশ একটা অনুসন্ধিৎসার ভাব ফুটে আছে। এ জাতীয় পাখী শিলঙের আশেপাশে বা আসামের অন্যান্য স্থানে কখনও দেখিনি। হঠাৎ উড়ে দশ বারো গজ দূরে একটা ঝোপের মাথায় বসল। সেখান থেকেও সে আমাদেরই দেখতে লাগল। ওড়ার ধরনটা অনেকটা কাঠঠোকরা জাতীয় (Picidae) মনে হ'ল। ঠোঁটের সংগে ছোট বসন্ত-বউরি যাকে ইংরাজিতে 'কপারস্মিথ' বা 'ক্রিমসন ব্রেস্টেড বারবেট' (Xantholacma haemacephala) বলে তার কিছুটা সাদৃশ্য আছে।

পাখীটা উড়ে আবার আমাদের কাছেই পুরনো ডালটায় এসে ব'সে তেমনি করে ঘাড় নিচু করে তাকিয়ে রইল। মজা লাগল মন্দ নয়! সাহসও দেখলাম পাখীটার বেশ। আমাদের উপস্থিতিতে মোটেই ভড়কালো না। একবার কিছু দূরে গিয়ে বসে আবার অল্পক্ষণ পরেই আমাদের কাছে ফিরে আসে। তার এই আসা যাওয়ার মধ্যে কোন ডাক শুনিনি। কাঠঠোকরা পাখীর নিকট আত্মীয়ের মধ্যে পাখীটাকে বুঝতে পারলেও ঠিক ধরতে পারলাম না পাখীটা কি। অজানা অচেনা পাখী গাছপালা বা জীবজন্তু দেখলে যা করে থাকি নোটবুকে খুলে পাখীটার চেহারা যতদূর সম্ভব বাহ্যত দৃশ্যমান তা লিখে নিলাম—

লম্বায় ইঞ্চি ছয়েক। পিঠের রঙ হাল্কা লবঙ্গ-পাট্‌কিলে, কপালের কাছে হলদের ছাপ, পিঠের শেষে ও লেজের ঠিক উপরে কমলা, পেটের কাছটা পাট্‌কিলে আর ধূসরের সংমিশ্রণ, চিবুক গলা ও ঘাড়ের পাশেও হলদের ছোপ, লেজের শেষে ও ডানার একদম ধারের পালকে কালোর রেশ, লেজের তলায় ও উরুর পালকে সাদার উপর কালোর ছোট ছোট লম্বা ছিট্‌; লেজের একদম ধারের পালকে সাদার টান—উড়লে সেটা ভাল করে দেখা যায়। ঠোঁট মোটা, ছোট, বসা এবং ত্রি-কোণাকৃতি। অনেকটা রামগয়লা বা ফিঙে জাতীয় পাখীর মত।

মনের মধ্যে ফেরার একটা তাড়া থাকায় ইচ্ছে থাকলেও পাখীটাকে আরও ভাল করে খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করতে পারলাম না। তখন যদি জানতাম বা বুঝতাম কোন্‌ পাখী তাহলে ফেরার কথা খেয়ালের মধ্যেই থাকত না। মানুষকে ভয় না করে

কাছাকাছি ওড়ারও সঠিক তথ্য হয়ত বার করে ফেলতে পারতাম। ওর যে এই ওড়ার ভঙ্গী সেটা এমনি উড়ে আসা যাওয়ার, না বিশেষ দিকে পথপ্রদর্শনের ইঙ্গিত?

পাখীটার কথা বেমালুম ভুলে যাই। সে রইল বন্দী হয়ে নোটবই-এর পাতার মধ্যে। ঘুরে ফিরে কলকাতায় আসারও বেশ কিছুদিন পর নোট বা ডায়েরী বই-এর পাতা উল্টাতে উল্টাতে পাখীটার সম্বন্ধে লেখাটা নজরে পড়ল। তাইত পাখীটার নামটাতো আজতক্ জানা হয়নি। নথিপত্তর ঘেঁটে দেখলাম পাখীটার নাম —হ্যনিগাইড (Orange-rumped Honeyguide) অর্থাৎ মৌ-সন্ধানী (Indicator Xanthonitus)। ভারতীয় পক্ষিতত্ত্বে এর সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই উল্লেখ নেই। যেটুকু আছে তা' হচ্ছে—

হিমালয়ের দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে সিকিমের জঙ্গলে মাঝেসাঝে দু'একটি ক্বচিৎ দেখা যায়। এদের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে কোন তথ্যই এখনও পর্যন্ত উদ্ঘাটিত হয়নি। সবশুদ্ধ এগারো জাতীয় মৌ-সন্ধানী পাখীর মধ্যে এক দক্ষিণ আফ্রিকাতেই নয় জাতীয় আর বাকি দু'জাতীয় এশিয়ার ভারতের একমাত্র ঐ অঞ্চলে এবং মালয় প্রদেশে দেখা যায়। মালয় জাতীয় পাখী বোর্নিও-সুমাত্রা পর্যন্ত ছড়িয়েছে। কাঠঠোকরার জ্ঞাতি-ভাই এরা। কোকিল জাতীয় (Cuculidae) পাখীর মত এরা পরভৃতিকও। বসন্ত-বউরির বাসায় এরা ডিম পেড়ে আসে। ভারতীয় মৌ-সন্ধানী আফ্রিকার পাখীর (Indicator indicator) মত স্থানীয় অধিবাসীদের মৌচাকের কাছে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় কিনা তা আজও পর্যন্ত জানা যায়নি।......

আমার আফসোসের সীমা রইল না। এই পরভৃতিক পাখী সম্বন্ধে আরও বিশদভাবে জানার জন্য নানা বইপত্তর ঘাঁটলাম। দেখলাম রোডেশীয় উপকথায় এই পাখীর কাহিনী যে ভাবে উল্লেখ আছে তা বেশ উপভোগ্য—

কোনও এক সময়ে একটি ছোট পাটকিলে রঙের পাখী জঙ্গলের মধ্যে মরা একটা হাতী দেখতে পেয়ে মনে মনে ঠিক করলে—'বা! এইতো—এটাই আমার বেশ সুন্দর নতুন বাড়ি হবে।' মৃতদেহের উপর একটা চিহ্ন এঁকে সে উড়ে চল্ল তার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের ডেকে আনতে।

ইতিমধ্যে একটা ইঁদুরও এই মরা হাতীটাকে দেখতে পেল; সেও ঠিক করল এখানেই তার আস্তানা গাড়বে। যে কথা সেই কাজ! সঙ্গে সঙ্গে সে তার বাস-ভবনের জন্য হাতীর দেহ কুরে কুরে গর্ত বানাতে শুরু করে দিল।

এদিকে পাখীটি তার আত্মীয়-স্বজনদের নিয়ে এসে দেখে কোত্থেকে এক ইঁদুর উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তারই দখল করা জায়গায়। সে ধমকে বলল—'এই বেয়াদব! এটা যে আমার জায়গা তা জানিস নে...।' ইঁদুরও জবাব দেয়—'ইস্'! কে বল্লে? এটা আমার—, ভাগ্!'

তারপর চলল দুজনের তুমুল ঝগড়া পরে মারামারি। কোন পক্ষই হার মানে না। শেষে ঠিক হল, এর মীমাংসা একমাত্র বিচারকের কাছেই সম্ভব। সে যুগে জন্তু-জানোয়ারদের বিচারপতি ছিল মৌমাছি। তিনি অনেক চিন্তা ও গুন্ গুন্ করে রায় দিলেন—'হাতীর মালিক ইঁদুর।' পাখীটি জজসাহেবকে অনেক বোঝাল যে সেই প্রথম হাতীটাকে দেখতে পায়। এমন কি হাতীর গায়ে চিহ্ন দেখিয়েও বলল এ তারই দেওয়া প্রথম চিহ্ন। কিন্তু কিছুতেই জজসাহেবকে সে বিচলিত করতে পারল না। তিনি বল্লেন, 'উঁহু, তুমি মিথ্যে বলছ—, এ ইঁদুরেরই সম্পত্তি।'

সেই পুরাকাল থেকে আজও পর্যন্ত রোডেশীয়দের বিশ্বাস এই যে এই পাখী ও মৌমাছির পরস্পরের সম্বন্ধ আদায় কাঁচকলায়। প্রতিটি সুযোগেই এই পাখী তার প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার জন্য মানুষকে মৌমাছির বাসার পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়। আর মানুষ যখন তাদের আবাসস্থল মধুভরা চাক ভেঙ্গে নষ্ট করে তাদের সঞ্চিত খাদ্য কেড়ে নেয় তখন সে নিঃশব্দে পরমানন্দে সেই দৃশ্য উপভোগ করে।

অশিক্ষিত সরল আদিম অধিবাসীর কাছে একটি পাখীর অদ্ভূত আশ্চর্যজনক আচরণ যা তাদের বিস্মিত করেছে তারই প্রকাশ আমরা এই কাহিনীর মধ্যে দিয়ে পাই। সত্যিই এই ধরনের হ্যনিগাইড বা মৌ-সন্ধানী পাখী আছে যারা মানুষ ও জন্তু দুজনকেই নিয়ে যায় বুনো মৌমাছির বাসার কাছে।

একমাত্র আমেরিকার স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিটিউশনের আবেক্ষক (Curator) ডাঃ হারবার্ট ফ্রীডম্যান বর্তমানে পর-ভৃতিকপক্ষী সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের অন্যতম। ১৯৫০-৫১ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার জঙ্গলে পাঁচমাস কাল ঘুরে আফ্রিকার মৌ-সন্ধানী পাখীদের সম্বন্ধে যা কিছু তথ্য তিনিই আবিষ্কার করেছেন। তিনি বলেন, আফ্রিকার ন'টি বিভিন্ন জাতির মধ্যে মাত্র দু'টি জাতিরই (Greater and Scaly-throated) মৌচাকের কাছে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতার পরিচয় তিনি পেয়েছেন। তিনি নিজে চাক্ষুষ এই অদ্ভূত ব্যাপার দেখেছেনও।

জন্তুদের ভিতর মৌ-সন্ধানী মধু-ভুখকেই (Ratel বা Honey-Badger) পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় মৌচাকের কাছে। মধুভুখের সঙ্গে তার সম্পর্কের খবর প্রথম পাওয়া যায় ১৭৮● সালে সুইডিশ ভ্রমণকারী এনড্রু স্পার-মান-এর দক্ষিণ আফ্রিকা ভ্রমণ বৃত্তান্তে। ডাঃ ফ্রীডম্যানও ১৯৫০ সালে ভ্রমণ করার পর স্বীকার করেছেন ওটা কিম্বদন্তী নয় সম্পর্কটা সত্যিই। তাঁর সন্দেহ ছিল বহুল পরিমাণে—কারণ মধুভুখ নিশাচর এবং গাছে ভাল উঠতে পারে না বলেই সাধারণের বিশ্বাস। এদিকে মৌ-সন্ধানীর মৌ-সন্ধান দিনের আলোতেই। তবে এ যোগাযোগ কি করে সম্ভব? তিনি প্রমাণ পেলেন যেখানে মানুষের বসতি বা যাওয়া আসা থাকে তার নিকটস্থ মধু-ভুখরা রাত্রিচরই হয়ে থাকে। অপরস্থানে তারা উভচর। সেখানে তারা গাছে চড়বার ক্ষমতাও রাখে।

একমাত্র ভারতীয় মৌ-সন্ধানী পাখী ছাড়া অন্যান্য জাতীয় পাখীদের রঙের বাহার মোটেই নেই। তারা সাদামাঠা চড়াই পাখীর মতই দেখতে। গতরেও চড়াই আর আমাদের দেশী-পাওয়ের (Starling)

আফ্রিকার মৌ-সন্ধানী

মাঝামাঝিই হবে। আফ্রিকার পাখীদের যেমন রঙের বাহার নেই তেমনি নেই গানের গলা। ভারতীয়ের গানের গলা আছে কিনা তা জানা যায় না। আমি তো সমান্যতম আওয়াজও শুনিনি। আফ্রিকার লায়ার-লেজওয়ালা মৌ-সন্ধানীর ওড়ার সময় টিনের বাঁশীর মত আওয়াজ হয়। সেই আওয়াজের উৎপত্তি নাকি লেজের কাছে-বাঁকানো কতকগুলি পালকে বায়ু কম্পন হয় হাওয়ায়।

আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে মৌ-সন্ধানী খুব বেশী মাত্রায় থাকলেও সহজে দৃষ্টি-গোচর হয় না। তাই ওখানকার অধিবাসীরা এর নাম দিয়েছে—'যে পাখীকে কেউ দেখতে পায় না।'

প্রাণীবিদ্‌দের কাছে মৌ-সন্ধানীর আদর এর অদ্ভূত আচরণ, পরভৃতিক জীবযাত্রা, মোমখাওয়ার প্রতি তীব্র আসক্তি ও তা খেয়ে হজম করার ক্ষমতার জন্য। এর অন্তর্নিহিত 'কেনটা' খোঁজাতেই বিজ্ঞানীদের আনন্দ।

এই পাখীর কথা সর্বপ্রথম সভ্য-সমাজের কাছে উদ্ঘাটিত হয় ষোড়শ শতাব্দীতে জোআও দাস সান্‌তোজ নামে পর্তুগীজ ডোমিনিকানের এক মিশনারীর লিখিত 'ইথিওপিয়া ওরিয়েণ্টাল' বই-এর মারফৎ। একদিন এই পাদ্রীসাহেব নোভা সোফালা অর্থাৎ বর্তমান মোজাম্বিকের কোন শহরের এক গীর্জায় প্রার্থনার শেষে চোখ খুলতেই দেখেন খোলা জানালা দিয়ে কোথা থেকে একটা পাখী উড়ে এসে বেদীর উপর রাখা মোমবাতির গায়ে বসে ঠুক্‌রে ঠুক্‌রে মোম খেতে শুরু করে দিল। পাখীর এভাবে মোম খাওয়া দেখে তিনি হতচকিত হ'য়ে গেলেন। তারপর লক্ষ্য করলেন প্রতিদিন পাখীটা ঐ সময় এসে মোম খেয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে জানলেন স্থানীয় অধিবাসী অর্থাৎ কালা আদমীদের ঐ পাখী জঙ্গলে পথ দেখিয়ে মৌচাকের কাছেও নিয়ে যায়। চাক ভাঙ্গার পর যে মোম মাটিতে পড়ে থাকে সেই মোম পাখীটি খেয়ে থাকে। মধুর প্রতি তার আসক্তি নেই, আসক্তি কেবল তার মোমের প্রতিই।

ডাঃ ফ্রীডম্যান-এর সফরের বৃত্তান্তে দেখি তিনি আফ্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব উপ-কূলে জুলু প্রদেশের ঝোপঝাড়ে বিশেষত বাবলার জঙ্গলেই এই পাখীর সঙ্গে সাক্ষাৎ লাভ বেশী করেছেন। তিনি লিখছেন—

"গাঁ ছেড়ে ঝোপঝাড়ের জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম কারণ মৌ-সন্ধানী লোকা-লয়ের খুব কাছে থাকে না যদিও যে কোন শিকারের সফরে সে মানুষের খুব কাছেই আসে। এমন কি খবর জানা যায় যে, বুয়র যুদ্ধে জঙ্গলে চলমান সৈন্য-বাহিনীরও কাছে এসে এরা ঘনিষ্ঠতা দেখিয়েছে।

"ঝোপের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতে আমাদের জুলু পথ প্রদর্শকটি দুটো কাঠের টুকরো ঠুকে এবং সে দুটোকে গাছের গায়ে মেরে শব্দ ক'রে মৌ-সন্ধানীকে ডাকতে লাগল। মুখে মৃদু শিসের সঙ্গে গলার ভিতর দিয়ে 'আঘ্-আ, আঘ্-আ' আওয়াজ করতে লাগল। এ ধরনের শব্দের কারণ পরে জেনেছিলাম যে মধুভুখ এই রকম শব্দ

করে মৌ-সন্ধানীকে ডাকে। তারই শব্দের নকল আফ্রিকার অধিবাসীরা করে থাকে কাঠে কাঠ ঠুকে। যদিও মৌ-সন্ধানী এমনিতেই মানুষের কাছে আসে তবু এদের বিশ্বাস এই আওয়াজ করলে তাড়াতাড়ি সুফল পাওয়া যায়।

"যাই হোক বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে হ'ল না, জুলুটি বলল—'ইনগেদে' জবাব দিচ্ছে। শুনতে পেলাম কিছু দূরে খচরমচর কটর-কটর শব্দ। মনে হ'ল অল্প কাঠি পোরা দেশলাই বাক্স কে যেন নাড়িয়ে আওয়াজ করছে।

"হঠাৎ জুলু-গাইডটি আঙুল দিয়ে দেখাল। দেখলাম প্রায় দেড়শ ফুট দূরে নিচু ডালে বসে আছে আমাদের মৌচাকের পথ প্রদর্শক। আমাদের দেখতে পেয়ে উড়ে এসে পনের কুড়ি ফুট দূরে একটা ডালে বসল। গলাটা সাদা দেখে বুঝলাম এটা ধাড়ী মাদী পাখী। মনে হ'ল, আমাদের চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে সে যেন অস্থির হয়ে উঠছে কেন আমরা তার অনুসরণ করছি না। লেজের পালক সব ছড়িয়ে দিয়ে শরীর ফুলিয়ে ডানা ফাঁক করে হাওয়ায় ঝাপ্‌টা মেরে রাগে ঝংকার দিয়ে দেশলাই বাক্স নাড়ার আওয়াজ করতে লাগল। তারপরই উড়ে বাঁ দিকে খানিকটা গেল। আবার ফিরে এসে আমাদের দেরির জন্য সেই রকম বকুনি দিয়ে ফিরে গেল।

"ওকে অনুসরণ করে চলতে লাগলাম। সোজাসুজি যে চলছিল তা নয়। কখনও বাঁয়ে কখনও ডাইনে কখনওবা ফিরে উল্টো দিকে। জায়গাটা মোটামুটি খোলা বলে ওকে অনুসরণ করতে খুব বেশী অসুবিধে হয়নি। বেশীর ভাগ সময়ই ও আমাদের আগেই উড়ে চলছিল। অনর্গল কটর-মটর ডাক দিয়ে সে জানাচ্ছিল কোথায় বসে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছে। কোন স্থানে আমরা চুপচাপ্‌ দাঁড়িয়ে থাকলে কাছে এসে সেইরকম বকাবকি শুরু করে।

"এরকম করে দশ-পনের মিনিট কেটে গেল। হঠাৎ আমাদের উড়ন্ত পথ প্রদর্শক তার কায়দা বদলাল। সে আর আগে আগে উড়ে চলল না। মাথার উপর চক্রাকারে ঘুরতে ঘুরতে একটা পাকুড় গাছে বসল। অনর্গল ডাক বন্ধ করে সে যেন বলতে চাইল অন্বেষণের শেষ এইখানেই। সত্যিই তাই। বড় একটা বাবলা গাছের মূল-কাণ্ডের মাঝামাঝি ছোট্ট কালো এক গর্ত আমাদের নজরে এল। সঙ্গী জুলুটি গাছের গায়ে কান পেতে শুনে তার ধবধবে সুসজ্জিত শুভ্র দন্তপাটি আকর্ণ বিকশিত করে হাসতে লাগল। কান পেতে আমিও শুনলাম গুঁড়ির ভিতর ভোঁ ভোঁ করে বুনো মৌমাছির আওয়াজ। 'ইনগেদে' আমাদের বিফল মনোরথ যে করেনি তার প্রমাণ পেলাম হাতে-নাতে।

"তিন চারটে মশাল জেলে চারিদিকে ধূম্রজালের সৃষ্টি করে নেওয়ার পর জুলুটি তার কুড়ুল দিয়ে গর্তের চার-পাশে মেরে গর্তটাকে বড় করে ফাঁক করল। বেশ বড় রকমের কালো একটা মৌচাক টেনে বার করতে দু'চারটে কামড় সহ্য করতে হ'ল বই কি! সোনালী মধুতে টলটল করছে চাকের প্রতিটি কোষ।

"সমস্তক্ষণই সেই ছোট্ট পাখীটা কাছেই আরেকটা ডালে বসে আমাদের কাণ্ডকারখানা বেশ মনোযোগ সহকারে দেখে চলেছিল। আর একটিও আওয়াজ সে করেনি। যদি আমরা চাক না-ও ভাঙতাম তবুও সে চুপ করেই বসে থাকত। অপেক্ষা করত কোন কিছু ঘটার জন্য।

"যে আমাদের জন্য এত করল তাকে তো বিনা পুরস্কারে ত্যাগ করতে পারি না। তাই আমরা খানিকটা চাক ভেঙে গাছের ডালে রাখলাম। আর কয়েকটা টুকরো ও কিছু চাকের ভাঙা গুঁড়োও মাটিতে ছড়িয়ে দিলাম। আফ্রিকার অধিবাসীরা এই পাখীকে ফাঁকি দিয়ে সব মধু ও চাক নিয়ে যাওয়ার কথা কল্পনাতেও আনে না। তাদের বিশ্বাস এই অন্যায় লোভের শাস্তিস্বরূপ পাখীরা তাদের আর সাহায্য তো করবেই না বরং উল্টে কোন বিষধর সাপ বা হিংস্র গুল-বাঘের মুখে নিয়ে যাবে।

"আমরা একটু আড়ালে লুকিয়ে দেখতে লাগলাম পাখীটা কি করে। আড়ালে যেতেই পাখীটা গাছের ডালে রাখা চাকের টুকরোর উপর উড়ে এসে বসে খেতে শুরু করে দিল। মোমের উপর ঠোকরানোটাই তার প্রধান দেখলাম। মাঝে মাঝে মরা মৌমাছি অথবা তার শুক-কীট ঠোঁটের ডগায় তুলে নিচ্ছিল। মোম বা মৌমাছির গায়ে লেগে থাকা মধু ছাড়া সে মধু খেলই না বল্লে চলে।"

প্রশ্ন জাগে মনে, মানুষের সঙ্গে এই অত্যদ্ভুত ধরনের সম্পর্ক স্থাপন কেন করে এই পাখীটা?

সাধারণভাবে এটাই মনে হয়, কারুর সাহায্য ব্যতিরেকে গাছের গুঁড়ির ভিতর থেকে মৌচাক ভাঙা পাখীটার পক্ষে অসম্ভব। সেই উদ্দেশ্যে আদিম অধিবাসীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় এবং এও সে যেন জানে অধিবাসীদের ভাঙা চাকের অংশ তার ভাগ্যে নিশ্চয়ই জুটবে।

বাহ্যত একথা ঠিক বলে মনে হলেও একটু ভাবলে এ যে অসম্ভব, তা বুঝতে দেরি হয় না। জীবজন্তুর অভ্যাস বহু বছর ধরে বহু বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে তৈরী হয়। এই অভ্যাস গড়ে উঠতে যে সব স্তরের মধ্যে দিয়ে সেই জীবকে পার হতে হয় তার সময় ও বাধা বহু। অতি ধীরে ধীরে বহু বৎসরের সময় ক্ষেপণের পর অভ্যাসের এক একটি স্তর, যা তার কাছে কিছুটা মূল্যবান তার পরিণতির পথে চলতে থাকে। আবার সেই অভ্যাসের অভিব্যক্তি কোন স্তরে পৌঁছে বদল বা বন্ধ দুই-ই হয়ে যেতে পারে।

মৌ-সন্ধানীর এই অভ্যাস অত্যন্ত জটিল। তার অভ্যাসের যতদিন না পূর্ণ পরিণতি ঘটছে, ততদিন সে কোন উপযোগই পাচ্ছে না, আর তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই, এমন সব প্রাণীর কাছ থেকে সে পাচ্ছে সহযোগিতা। এই সহযোগিতার অভ্যাসও বহু বছর ধরে বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে এসেছে।

এটাই সম্ভাব্য বলে মনে হয় যে, দু'পক্ষের এই বিবর্তন-অভ্যাসের মূলে ছাপ পড়েছে বহু হাজার হাজার বছর আগে, যখন মানুষের পক্ষে পাখী বা জন্তুর সঙ্গে সহযোগিতা সম্ভবপর ছিল। সুতরাং সেই সময় এই পাখীর সহযোগিতার সম্পর্ক ছিল, বর্তমান

মানুষের আগের কোন স্তরের পূর্ব-মানবের সঙ্গে।

এরা কি শুধু মোমই খায়? না, মোম ছাড়া অন্যান্য পাখীদের ন্যায় বিশেষত টুলটুলিয়া জাতীয় Fly-catchers পাখীর মত শূন্যে কীট-পতঙ্গ ধরেই সাধারণত খায়। ডাঃ ফ্রীড-মান আফ্রিকার ন'জাতীয় মৌ-সন্ধানী পাখী সংগ্রহ করে তাদের প্রত্যেকের পেট চিড়ে পোকামাকড় ও মোম দুই-ই পেয়েছেন এবং যে দু'জাতীয় পাখী, যারা মানুষ বা জন্তুকে মৌচাকের কাছে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায়, তাদের খাদ্যথলিতেও (gizzard) প্রচুর পরিমাণে কীটপতঙ্গ পেয়েছেন। এমন কি যে দুটি পাখী তাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেছে মৌচাকের কাছে, গুলী করে মেরে তাদেরও খাদ্য-থলি পরীক্ষা করে ঐ দুই খাদ্যই পেয়েছেন এবং ঐ দুটি পাখীরই পেটের থলি ভর্তাই ছিল, কস্তুতপক্ষে খাবার কোন প্রয়োজন তাদের ছিল না; শুধু মানুষ দেখে অভ্যাসের বশেই মৌচাকের কাছে নিয়ে গিয়েছিল। যেখানে মানুষ পায় না, সেখানে মধু-ভুখকেই নিয়ে যায়। স্থানীয় অধিবাসীরা অনেক সময় মধুভুখকে অনুসরণ করেও মৌ-সন্ধানীর সন্ধান পায়।

এখন প্রশ্ন যদি মৌ-সন্ধানী তার পেট ভরার মত পোকামাকড়ই খেয়ে থাকে, তবে কেন তার এই চাক-ভাঙ্গা মোমের প্রতি এত আসক্তি? বৈজ্ঞানিকরা পরীক্ষা করে জেনেছেন যে, এই পাখী শুধু মোমই খায় না, মোমের ভিতর থেকে সে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে দেহের পুষ্টি-সাধনও করে। প্রাণীজগতে এই ধরনের হজমের শক্তি অভূতপূর্ব। অবশ্য মৌ-সন্ধানী ছাড়া একপ্রকারের প্রজাপতির (wax moth) শূককও এই শক্তি রাখে।

গবেষণার বিষয় এই, মোম হজম করতে গিয়ে শরীরের মধ্যে কিভাবে এবং কোন পন্থায় সেটা ভেঙ্গে দেহ তার থেকে খাদ্যবস্তু গ্রহণ করে। সেই ভাঙ্গাটি কোন ব্যাকটিরিয়ার দ্বারা, না এনজাইমের দ্বারা, না অন্য কোনও সংবাহকের দ্বারা সংঘটিত হয়? এই জাতীয় গবেষণার ফলে হয়ত ভবিষ্যতে এমন কোনও ওষুধ আবিষ্কার হতে পারে, যার দ্বারা টিউবার-কুলোসিস, কুষ্ঠ ও অন্যান্য মারাত্মক রোগ যাদের বীজাণুকে সদাসর্বদা ঘিরে থাকে মোমের মত এক রক্ষা-কবচ, তাদের ভেঙ্গে সেই ওষুধ সেই মারাত্মক বীজাণুদের সমূলে বিনাশ করবে।

কাজেই নিজের অজ্ঞতা ও মূর্খতার জন্য আমার আজও দুঃখ ও আফসোস যে, পাখীটাকে দেখেও চিনতে পারিনি এবং তাকে ভাল করে বোঝার জন্য তার পেছনে আরও সময় দিইনি বলে।

SCISSORS
CIGARETTES
"SCISSORS"
CIGARETTES
SPECIAL
W.D.&H.O.WILLS,
BRISTOL & LONDON.
SCISSORS
W.D.&H.O.WILLS.
"SCISSORS"
W.D.&H.O.WILLS
SCISSORS
MARK
SG/243

উত্তমপুরুষ
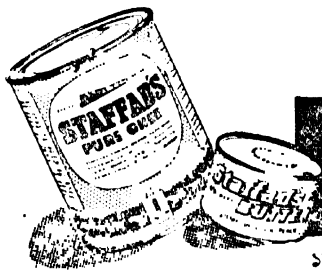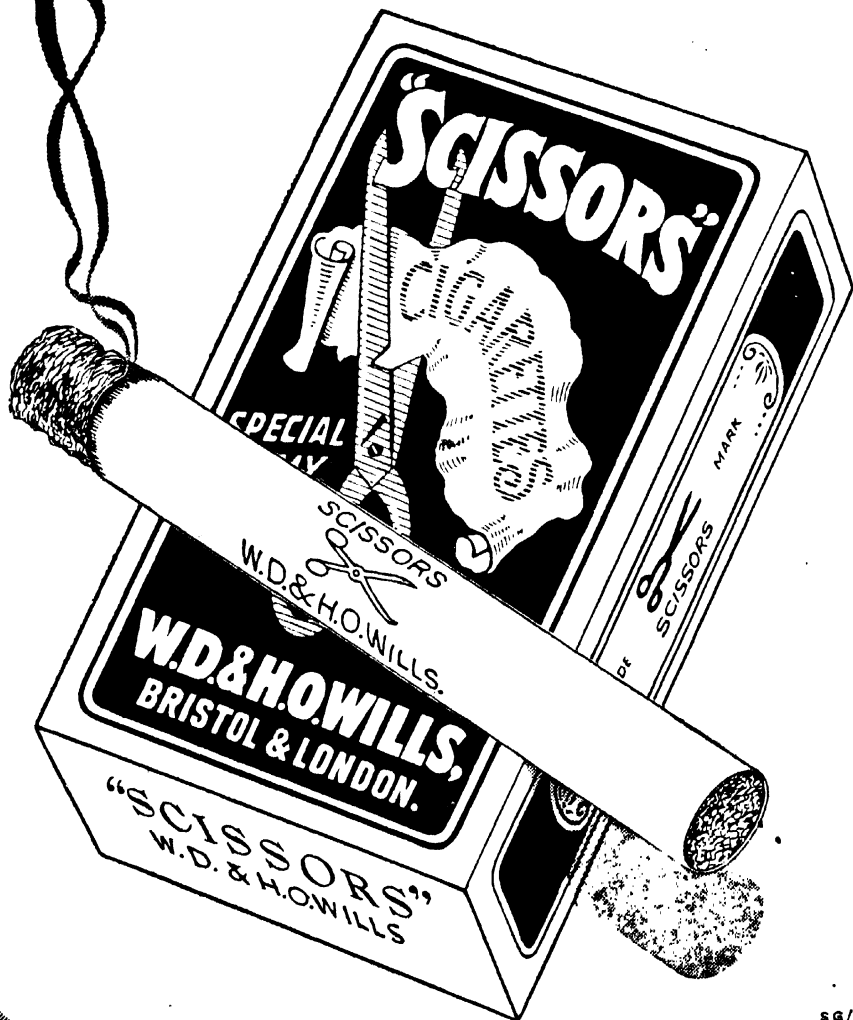
গোয়েন্দা-কাহিনী নিয়ে এই আসরে প্রকাশিত আলোচনা-পাঠে প্রীত কোন পাঠিকা প্রশ্ন করেছেন, এই জাতীয় কাহিনী সাহিত্য কিনা; কোন পর্যায়ে পৌঁছলে একে সাহিত্য বলব।

প্রশ্নটির প্রথমাংশ সহজ—এক কথায় বলতে পারি, অবশ্যই সাহিত্য। দ্বিতীয়াংশ নয়। কী সাহিত্য এবং কী নয়, এই জিজ্ঞাসা নানা দেশ ও কালে মুনি ও গুণীদের বিভীষিকা এবং কারও পাঁতিই চূড়ান্ত নয়। এ যেন দেওয়ানী আদালতে পুরুষানুক্রমে চলতে থাকা মামলা, সওয়াল জবাবের আর শেষ নেই, এমন কি আজও এই দেশের পত্রিকাতেই অন্নদাশঙ্কর নতুন করে শুরু করেছেন।

গোয়েন্দা-কাহিনীও সাহিত্য, তার জন্যে পৃথক কোন নিয়ম নেই। এখন সাহিত্যের লক্ষণ কী। বলতে পারি জীবনের প্রতি সততা, অথচ জীবনের হুবহু প্রতিলিপি রচনা নয়। কিন্তু এ জবাবও পুরোপুরি ঠিক হল না, কেননা তা হলে ঠাকুরমার ঝুলি আর এ্যালিস্ বাদ যায়; বাদ যায় ওয়েলসের বিজ্ঞানভিত্তিক কাহিনী, কিম্বা অরওয়েলের রোমাঞ্চকর ঐতিহাসিক প্রক্ষেপ—'১৯৮৪' উপন্যাস। সুতরাং একটা সহজ মীমাংসার পথে আসা যাক। একটা বিশেষ কালে যে রচনা বহুর প্রশংসা এবং রসিকের স্বীকৃতি পায়, তাই সাহিত্য এবং নির্বিশেষকালে পেলে, মহৎ সাহিত্য। রচয়িতার শিল্পদৃষ্টি আর রূপসৃষ্টির ক্ষমতা থাকলে গোয়েন্দা-কাহিনীও কালাতিগ হতে পারে। প্রমাণ পো'র মঃ দুপ্যাঁ, ডয়েলের হোমস, শ্রীমতী ক্রিস্টির পয়রো। চিরসাহিত্যের চরিত্র-গ্যালারীতে এদের স্থান নির্দিষ্ট হয়ে গেছে।

*

সৎ-সাহিত্যের লক্ষণ বিচার নিয়ে আলঙ্কারিকদের মধ্যে তর্ক চলতে থাকুক, বুদ্ধিমান পাঠক সেই অবসরে কয়েকটি সদ্‌গ্রন্থ পড়ে নেবেন। কোন্ ডিটেকটিভ বই সাহিত্যপদবাচ্য জানতে হলেও তেমনি এই জাতের কিছু উৎকৃষ্ট কাহিনীর সঙ্গে পরিচয় করাই প্রশস্ত। গোয়েন্দা-গল্পকে যাঁরা কল্কে দিতে রাজি নন, তাঁদের প্রধান আপত্তি এর মশলায়। হত্যা, অপরাধ ইত্যাদি এই জাতীয় রচনার উপজীব্য। কিন্তু সাহিত্যের কৌলীন্য কাঁচা মশলার উপর নির্ভর করে না, করে তৈরি বস্তুর স্বাদে। অত্যন্ত নিম্ন-স্তরের জীবনযাত্রা নিয়ে রচিত মহৎ সাহিত্যের ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত আমাদের সম্মুখেই আছে। হত্যাকাণ্ড থাকলেই যদি লেখার জাত যায়, তবে ডস্তেভস্কি আর জোলার কোন কোন প্রখ্যাত রচনাও বাতিল করতে হয়। ডি কুইন্সীর Murder considered as one of the Five Arts নিবন্ধটিও স্মরণীয়।

বাকি থাকে সামাজিক কল্যাণের দিক। এ ব্যাপারেও সৎ গোয়েন্দা-সাহিত্যের দান নিতান্ত কম নয়। লিয়ঁর পুলিস ল্যাবরেটরীর কর্তা ডাঃ এডমন্ড লোকার্ড স্বীকার করেছেন, অপরাধী ধরার প্রণালী আবিষ্কারে তিনি শার্লক হোমসের এ্যাডভেঞ্চার কাহিনীগুলি থেকে প্রেরণা পেয়েছেন—

"I first got the idea of making researches into dust on garments mudstains and so on".

স্ট্যানলী গার্ডনারের একটি কাহিনী পড়ে কালিফোর্নিয়া পুলিস কোন হত্যা-রহস্যের কিনারা করেছিল শুনেছি।

*

গোয়েন্দা-কাহিনী বিলাতে অতিপ্রিয়। 'টাইমস লিটরারি সাপ্লিমেণ্ট' পত্রিকার একটি ক্রোড়পত্রে পড়লুম, সেখানে ক্যাবিনেট মিনিস্টরেরা প্রকাশ্যেই স্বীকার করেন, মা সরস্বতীর সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ডিটেকটিভ উপন্যাস পাঠের ভিতর দিয়েই বজায় আছে। এমন কি অর্ক বিশপেরা সিংহাসন থেকে ঝুঁকে প'ড়ে রোমাঞ্চক গ্রন্থ সাগ্রহে হাতে তুলে নেন। আপামর জনসাধারণের কথা লেখাই বাহুল্য। হোমসের শতবার্ষিকীর হুজুগ একমাত্র স্ট্র্যাটফোর্ডের নাট্যকারের আবির্ভাব দিবসানুষ্ঠানের কাছে হার মানে; আগাথা ক্রিস্টির জয়ন্তীতে এ্যাট্‌লী সাহেব মনোজ্ঞ বাণী দেন।

এই জনপ্রিয়তার কারণ কী? উন্নাসিক সমালোচক বলবেন এটি অর্থ-নীতির Gresham's Law-এর সাহিত্যিক সংস্করণ—যে নিয়মে ভালো জিনিস শিকেয় তোলা থাকে, মামুলী জিনিস নিয়ে লেন-দেন চলে। আসল কারণ বোধ হয় এই,—অধিকাংশ লোকের বাস্তব জীবনে বৈচিত্র্য বেশি নেই।

পকেটমার আর ছিঁচকে চোর ছাড়া অপরাধী বড় একটা চোখে পড়ে না, পুলিস বলতে প্রথমেই মনে পড়ে ট্র্যাফিক পুলিসের লাল-পাগড়ি। 'টাইমস' পত্রিকার লেখক বলছেন, এ অবস্থায় 'হত্যাই একমাত্র উত্তেজক, বিশেষত সেই হত্যা যদি নিরাপদ দূরত্বে থাকে। সান্ধ্য লোক্যাল ট্রেনে অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে হত্যা; সোফায় বসে সিগার ধরিয়ে হত্যা। রোমহর্ষণের প্রতি অবচেতন এই আকর্ষণ শুধু উৎকৃষ্ট ডিটেকটিভ গল্পের জন্ম দেয়নি, নিকৃষ্ট শ্রেণীর থ্রিলর-ব্যবসায়ীদেরও উৎসাহ দিয়েছে। উদাহরণ, মার্কিন গ্যাংস্টার-গল্প। এগুলি কর্কশ-কদর্য গদ্যে লিখিত স্থূল ডাণ্ডাবাজি। শিক্ষা তো নয়ই, এমন কি আনন্দও দেয় না। খানিকটা বিভীষিকা হয়ত যোগায়, অবদমিত বৃত্তিনিচয়কে মনের উপরতলায় টেনে আনে। আক্ষেপের কথা, অতি-আধুনিক বিদেশী গল্পে রহস্য উন্মোচনের চেয়ে থ্রিলের দিকেই ঝোঁক যেন বেশি। চেস্টারটন, ফ্রীম্যান প্রভৃতির হাতে যে ধারার সূচনা এবং ডরোথি সেয়ার্স, ক্রিস্টির হাতে যার পুষ্টি, রহস্য-কাহিনীর সেই স্বর্ণযুগ প্রায় অবসিত হয়ে এল এ-যুগের আর একটি উল্লেখ্য সৃষ্টি ম্যমের Ashenden গল্পগুলি। ঠিক গোয়েন্দা-কাহিনী না হলেও এদের বিষয় বস্তু কাছাকাছিঃ বিদেশে গুপ্তচরবৃত্তি রুদ্ধশ্বাস উত্তেজনার সঙ্গে মানবতা গভীর সুর এই রচনায় অন্তর্লীন।

*

মামুলী প্রণয় কদাচিৎ শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের বিষয়বস্তু। উপভোগ্য ডিটেক্টিভ গল্পও তেমনি মামুলী হত্যাকান্ড ঘিরে গড়ে ওঠে না। পাগলা-গারদ পালানো উন্মাদ ইতস্তত গুলী ছুড়েছে কিম্বা হতাশ-প্রেমিক কোন তরুণীর গলায় রেশমী ফাঁস পরিয়েছে, ভালো কোন গোয়েন্দা গ্রন্থে এমন ঘটনা পড়েছি বলে মনে পড়ে না। সেরা রহস্য-কাহিনী-কারদের বাইবেল হল ন্যায়শাস্ত্র, কার্যের পিছনে একটা কারণ তাঁরা খুঁজে বের করবেনই। অপরাধী সাধারণত স্বাভাবিক, সামাজিক মানুষ, হত্যাবিলাসী 'ম্যানিয়াক' নয়। তাই হত্যাকান্ড সম্পর্কে তদন্ত করতে এসেই গোয়েন্দা প্রথম খোঁজে মোটিভ্, নিহত ব্যক্তির মৃত্যুতে কার লাভ হল। দুই, হত্যা করার সুযোগ কার বেশি ছিল। তিন, 'মিন্স' অর্থাৎ উপায়। সোজা কথায় আততায়ীর পাকা মতলব চাই, অকুস্থলে উপস্থিত থাকা চাই এবং হত্যা করার উপযুক্ত অস্ত্র তার হাতে থাকা চাই। এই তিনটি শর্ত যে নিঃসংশয়ে পূরণ করবে, সেই আততায়ী, প্রায় জ্যামিতিক Q. E. D.-র মতো।

ব্যাপারটা তা হলে আসলে একটা ধাঁধাঁ রচনা। শব্দসন্ধানী ছকে সব সূত্র-গুলোই পাঠকের সমুখে থাকে, কিন্তু সমাধান থাকে মোটে একটি, শেষ দিন পর্যন্ত গুপ্ত। গোয়েন্দা-গল্পেরও শেষ পরিচ্ছেদ অবধি আততায়ী কে, কেউ টের পায় না, যদিও প্রায় প্রথম পরিচ্ছেদ থেকেই বুদ্ধিমান পাঠক আর লেখকের মধ্যে চতুরে-চতুরে লড়াই শুরু হয়ে যায়। সেই লেখকই তত বাহাদুর, যাঁর রহস্যের ষট্চক্র-ভেদ কোন পাঠকের সাধ্য নয়।

গোয়েন্দা-কাহিনীর নায়ক কে? বলা বাহুল্য, গোয়েন্দা। সাধারণ উপন্যাসে নায়ক যেমন ধীরোদাত্ত ইত্যাদি বিভিন্ন শ্রেণীর, গোয়েন্দাদের মধ্যেও তেমনি জাতি-বিভাগ আছে, তবে নায়কদের মধ্যে বেসরকারী গোয়েন্দারাই দলে ভারি। এ'দের পাশে সরকারী পুলিস অফিসারকে অত্যন্ত নির্বোধ মনে হবে, যদিও বস্তুত এ'রাই বেশিরভাগ অপরাধের কিনারা করে থাকেন। বৈজ্ঞানিক, আইনজীবী (পেরী মেসন) ডিস্ট্রিক্ট এটর্নী, প্রৌঢ়া মহিলাদেরও কখনো কখনো গোয়েন্দার ভূমিকায় দেখা যায়। আগাথা ক্রিস্টির মিস সার্পল্, গ্রাম্য প্রৌঢ়া গোয়েন্দার উদাহরণ, সহজ বুদ্ধি দিয়ে কঠিনতম রহস্যও জল করেন। এক ইংরেজ লেখক একটি চরিত্র সৃষ্টি করেছেন,—"থিংকিং মেশিন", অর্থাৎ চিন্তাযন্ত্র পি এইচ ডি, এল এল ডি, এফ আর এস, এম ডি ইত্যাদি। অর্থাৎ একাধারে আইনজ্ঞ, বৈজ্ঞানিক, শস্ত্রবিদ্যা-পারঙ্গম। শুধু লজিকের জোরে সমস্যার সমাধান করতেন।

ইংরেজ আর মার্কিন গোয়েন্দাদের কাজের প্রণালীতেও তফাৎ ঢের। শার্লক হোমস বা হারকিউল পয়রোর (বেলজিয়ান হলেও ইনি ইংরেজিনীর সৃষ্টি) জপমন্ত্র, বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য। মার্কিন পেরী মেসন দুহাতে টাকাও ওড়ান, ছোটখাটো খবর (dope) নেন পেশাদার এজেন্টের কাছে, ক্ষণে ক্ষণে প্লেনে চড়েন। বিখ্যাত গোয়েন্দাদের মধ্যে দুটি জাতি-জাতির চরিত্রে স্বাতন্ত্র্য প্রতিফলিত।

সাহিত্যকে যাঁরা সমাজহিতের দিক থেকে বিচার করেন, গোয়েন্দা-গল্প সম্পর্কে অন্তত তাঁদের কোন ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করা উচিত নয়। ভালো অপরাধ-কাহিনী পাপকে তো প্রশ্রয় দেয়ই না, বরং তার প্রতি তীব্র ঘৃণাবোধ জাগ্রত করে। আর যাঁদের কাছে সাহিত্যপাঠের মুখ্য লক্ষ্য হল রস, তাঁদেরও শ্রেষ্ঠ রহস্য-গল্পের পাতা ওলটাতে বলি। আগাথা ক্রিস্টির বইয়ের স্বাদ যে কোন উপভোগ্য রম্য-রচনার সঙ্গে তুলনীয়। সেখানে ইংলন্ড, কণ্টিনেণ্ট, মধ্যপ্রাচ্য—নানা দেশের মানুষের ভিড়, বিভিন্ন অঞ্চলের প্রকৃতি-বৈচিত্র্যের ছবি; কোন কোন গ্রন্থপাঠে প্রত্নতত্ত্ব এবং ঐতিহাসিক তথ্যও মেলে।

আলোচনা

(কয়েকটি প্রাপ্ত পত্রের সারাংশ)

সবিনয় নিবেদন,

সাহিত্যকে যাঁরা রাষ্ট্রের অচ্ছেদ্য অঙ্গ বলে ভুল করেন তাঁদের অন্ধ আলোচনার সঙ্গত উত্তর পেলাম 'নখদর্পণে'।

উত্তম পুরুষ ডাক্তারদের বিচার প্রহসনের প্রসঙ্গ তুলেছেন, সম্ভবত স্থানাভাবে পূর্ণ বিবরণ দেন নি। ঘটনাটি যেমন কৌতুককর তেমনই অভাবনীয়। এ জিনিস একমাত্র রাশিয়াতেই সম্ভব।

১৯৫২ সালের শেষের দিকে এই ডাক্তারদের গ্রেপ্তার করা হয়। কয়েকজন বিখ্যাত সোভিয়েৎ নেতার হত্যা-ষড়যন্ত্রের সঙ্গে তাঁরা লিপ্ত ছিলেন, এই অভিযোগ। বিশ্বের সর্বত্র কম্যুনিস্ট দল বিনা বিচারে মস্কো ভার্ষ্যটি বিশ্বাস করে। বিলাতে "ডেলি ওয়ার্কার" (কম্যুনিস্ট মুখপত্র) মন্তব্য করে :

"The medical conspiracy against Soviet leaders has shown the world the absolutely unprincipled and barbarous nature of the cold war waged by the Western Powers."

এই কল্পিত ষড়যন্ত্রে প্রতীচ্য শক্তিদের বিশেষত আমেরিকার, হাত "ডেলি ওয়ার্কার" দেখেছিল। সংবাদপত্রটি বলে, নয়জন ডাক্তারের মধ্যে পাঁচজনই স্বীকার করেন তাঁরা আমেরিকার কোনো "espionage agent"-এর কাছে ঐ "ঘৃণিত" কাজের নির্দেশ পান।

L 'Humanite, unita' প্রভৃতি অন্যান্য কম্যুনিস্ট মুখপত্রেও এরই প্রতিধ্বনি শোনা গেল।

১৯৫৩ সালের এপ্রিলে ডাক্তারেরা নাটকীয়ভাবে মুক্তি পেলেন। তখন সারা পৃথিবী জানল ষড়যন্ত্রের কাহিনী সোভিয়েৎ পুলিসের উদ্ভাবনা। প্রথম দিকে সে খবর কম্যুনিস্ট কাগজে যথেষ্ট প্রাধান্য পায় নি। তিনদিন চুপ থেকে "ডেলি ওয়ার্কার" বলে : "বস্তুত, চিকিৎসকরা দোষী সাব্যস্ত হননি; বরং পরে দেখা গেছে তাঁদের বিরুদ্ধে সব সাক্ষ্যই অসত্য। যে অসৎ উপায়ে তাঁদের জেরা করা হয়েছে, তা সোভিয়েৎ ন্যায় বিচারের পক্ষে লজ্জাকর।"

সাম্যবাদী সংবাদপত্ররা তখন এই কথাটাই প্রমাণ করতে চাইল সোভিয়েৎ রাষ্ট্র নিরপরাধ ব্যক্তিদের অন্যায় শাস্তির হাত থেকে রেহাই দিতে সর্বদা বদ্ধপরিকর।

অথচ মাত্র কয়েক মাস পূর্বে যখন মিথ্যা সাক্ষ্য এবং অন্যায় উপায়ে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়, তখন রাষ্ট্র নেতারা লজ্জা বোধ করেন নি এবং সাম্যবাদী সাংবাদিকদের মনে বিন্দুমাত্র সংশয় উপস্থিত হয় নি।

ডাক্তাররা যখন বিচারাধীন ছিলেন তখন Pravda এবং Izvestia এ'দের Killers Professional spies Terrorists প্রভৃতি বিশেষণে লাঞ্ছিত করেছিলেন। L' Humanite ও Daily Worker তাঁদের বলেছিলেন wreckers of peace

incendiaries এবং মানব জাতির সুখ-শান্তির জন্য তাঁদের মৃত্যুদণ্ড চেয়েছিলেন।

লক্ষ্য করবার বিষয়, মুক্তির পর ডাক্তারেরা এই সংবাদপত্রদের বিরুদ্ধে আদালতে কোনো অভিযোগ আনতে সাহস করেন নি। সংবাদপত্রের ঐ সংখ্যাগুলো এতোদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে কি না তাই বা কে বলতে পারে!

জ্যোতির্ময় বসু রায়

দিল্লী

সবিনয় নিবেদন,

আজ কম্যুনিস্ট-বিদ্বেষের ছায়া বুদ্ধিজীবীদেরও বিচারশক্তিকে আচ্ছন্ন করেছে। এই বিদ্বেষেরই ফলে রুশ, চীন ও অন্যান্য সাম্যবাদী দেশের কার্যকলাপকে হীন প্রতিপন্ন করার চেষ্টা।

প্রগতি সাহিত্য সম্বন্ধে উত্তম পুরুষের ধারণা অদ্ভুত। একদিকে তিনি স্বীকার করেছেন এতে অনেক সার্থক সৃষ্টি হয়েছে; অপর প্রশ্ন তুলেছেন এর কটি চিরকালের ভাণ্ডারে উঠবে? তার উত্তরে আমার প্রশ্ন: যাঁরা প্রগতি সাহিত্য আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত নন তাঁদের সব রচনাই কি চিরকাল বাঁচবে?

অরুণকুমার চক্রবর্তী

কলিকাতা

সবিনয় নিবেদন,

সোভিয়েৎ সাহিত্যের সমালোচনা সহ্য করতে না পেরে যে সব দলীয় কাগজ উত্তম পুরুষের বিরুদ্ধে বিদ্বেষপূর্ণ অভিযোগ এনেছে তারা সুস্থ আলোচনার পক্ষপাতী নয়। তবু, এর যথাযথ উত্তর দিয়ে উত্তম পুরুষ তাঁর সাহিত্যিক কর্তব্য পালন করেছেন।

সাহিত্যে প্রগতিশীলতার নামে যে অধোগতি চলেছে তার বিরুদ্ধে আজ লেখনী ব্যবহারের প্রয়োজন এসেছে। আমি বিশেষ করে দুটি কথার উপর জোর দিতে চাই: (১) সাম্যবাদী না হয়েও প্রগতিবাদী হওয়া যায় এবং (২) আমেরিকার চর না হয়েও সোভিয়েৎ রাশিয়ার ত্রুটির বিষয় বলা যেতে পারে।

বিকাশ চক্রবর্তী
কলিকাতা

আলোচনা

আত্মস্মৃতি

মহাশয়,—গত ৫ই চৈত্রের দেশ-এ 'আত্মস্মৃতি' সম্পর্কে শ্রীনিরঞ্জন বসু চৌধুরীর প্রতি-যুক্তিগুলো পড়লাম। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্যের আরও একটু ব্যাখ্যা প্রয়োজন মনে করছি।

শ্রীবসু চৌধুরীর মতে—

(১) 'সব সাহিত্যিকের রচনাই যে মানুষের বা সমাজের উপকার করবে, এমন কোন কথা নেই',

(২) আত্মজীবনীর সাহিত্য-মান নিরূপণের কোনো সর্বসম্মত মানদণ্ড নেই,

(৩) প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকের আত্মজীবনীতে 'সাহিত্য-সৃষ্টি' না থেকেই পারে না,

(৪) আত্মজীবনীতে আত্মকথা অপরিহার্য এবং

(৫) পাঠকদের আত্মজীবনী পাঠ প্রবণতা 'সাহিত্যপ্রীতির নিদর্শন', হীনম্মন্যতা নয়।

আমাদের বক্তব্য—

(১) সাহিত্য-শব্দটি ভেঙে চুরে নিলে 'হিত' শব্দটি বেরিয়ে আসে। (হিত-সহিত-সাহিত্য বা সহিতত্ব)। সুতরাং কল্যাণ বা হিত সাহিত্যের 'অবিচ্ছেদ্য ধর্ম'। এসম্পর্কে আচার্য বিদ্যানিধি মহাশয়ের সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা স্মরণীয়। তঁর মতে সাহিত্য হচ্ছে, 'সমাজের কল্যাণকর বাঙ্ময় রচনা।' সুতরাং সাহিত্যকে অবশ্যই কল্যাণধর্মী হতে হবে।

(২) উল্লিখিত সংজ্ঞা অনুসরণ করেই আত্মজীবনীর সাহিত্য-মান নিরূপণ করতে হবে। যে-রচনা কল্যাণধর্ম (ব্যষ্টিগত বা সমষ্টিগত) থেকে বিচ্যুত তা কোনো মতেই সাহিত্য পদবাচ্য নয়। এ-ধারণাতে কোনো সঙ্কীর্ণতার স্থান নেই।

(৩) প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের আত্মজীবনীমাত্রেই যদি সাহিত্যপদবাচ্য হতো, তবে আমাদের অভিযোগের কোনো কারণ থাকতো না। শ্রীবসু চৌধুরীর প্রতি আমাদের নিবেদন, অধুনা-প্রকাশিত আত্মজীবনীগুলো ভালো করে পড়ে তাঁর সিদ্ধান্ত তিনি পুনর্বিবেচনা করুন। স্থানাভাবের আশঙ্কায় উদ্ধৃতি-সংকলন সম্ভব হোলো না।

(৪) আত্মজীবনীতে আত্মকথা অবশ্যই অপরিহার্য। কিন্তু কুশলী সাহিত্যশিল্পী নিজের কথাও কতো সার্থকরূপে প্রকাশ করতে পারেন, নিজেকে কতোটা গৌণ করতে পারেন, তার নজিরের অভাব বাংলা সাহিত্যে নেই। শ্রীবসু চৌধুরী আমাদের ভুল বুঝেছেন। আত্মজীবনীতে আত্মকথা শুনতে সকল পাঠকই প্রস্তুত। কিন্তু অপরের পক্ষে অপ্রয়োজনীয় একান্ত ব্যক্তিগত খবরাখবরে পাঠকের অনাগ্রহ নিশ্চয়ই যুক্তিযুক্ত। এরকম তথ্য পরিবেশন অপরিহার্য নিশ্চয়ই নয়; কারণ এরকম তথ্যে কোনো তত্ত্ব নেই।

(৫) আত্মজীবনী পাঠমাত্রই হীনম্মন্যতা নয়— একথা আমরাও স্বীকার করি। সাহিত্যপ্রীতির বশেই এবং সাহিত্যকর্মের পশ্চাদভূমি সম্পর্কে জ্ঞানার্জনের জন্যেই পাঠক সাহিত্যিকের আত্মজীবনী পাঠ করবেন। এ-প্রবণতা দোষের নয়, কিন্তু পাঠক যখন সাহিত্যিকের একান্ত ব্যক্তিগত তথ্যে কৌতূহল প্রকাশ করেন, তখনই তিনি হীনম্মন্যতার দোষে দোষী সাব্যস্ত হন। সাহিত্যপদবাচ্য আত্মজীবনীর পাঠকসংখ্যা বৃদ্ধিলাভ করুক—এ আমাদেরও কাম্য।

বাংলা সাহিত্যের প্রতি অঙ্গই পুষ্ট হোক। সাহিত্যিক সাহিত্য সৃষ্টিই করুন। অতীত কৃতিত্বের দাবীতে সাহিত্যিক যেন পাঠকের সাধু পাঠ-স্পৃহার অন্যায় সুযোগ গ্রহণ না করেন—এই আমাদের নিবেদন। ইতি, ভবদীয় জ্ঞানেশ পত্রনবীশ জঙ্গীপুর।

চক্রদত্ত

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়েরাও মাঝে মাঝে হিস্টিরিয়া রোগীর মত আচরণ করে। এদের মায়েদের ধারণা হয় যে, পেটে কুঁচো ক্রিমি থাকার দরুণ শিশু একরকম হিস্টিরিয়া গ্রস্ত হচ্ছে। কিন্তু ডাক্তারদের মত বিপরীত। চার বছরের চেয়েও কম বয়সের শিশু এবং স্কুলে যাওয়া শুরু করেনি এইরকম ছোট ছোট ২০০টি ক্রিমি গ্রস্ত শিশু নিয়ে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এদের মধ্যে মাত্র ১৭টি শিশুই ঐ রকম হিস্টিরিক হয়েছে। এদের পেটে বহুদিন ক্রিমি থাকার দরুণ দিনে দিনে দুর্বল হতে থেকেছে এবং খুব বেশী দুর্বল হয়ে পড়ার দরুণই হিস্টিরিক হয়ে যায়। অর্থাৎ এতে প্রমাণ হয় না যে, ক্রিমি থাকলেই শিশু হিস্টিরিক হবে।

*

১৯২৯ সালে সর্বপ্রথম পেনিসিলিনের আবিষ্কার থেকে শুরু করে আজ পর্যন্ত ৩৫০০টি এ্যান্টিবায়োটিক বার হয়েছে। এদের মধ্যে মাত্র ১৫টি চিকিৎসার্থে লাগে। অন্যান্যগুলি চিকিৎসার্থে না লাগার কারণ হচ্ছে যে, হয় এগুলির কার্যক্ষমতা কম আর না হয় তো দেহের মধ্যে গিয়ে ঐগুলি বিষক্রিয়া ঘটায়। যে ১৫টি এ্যান্টি-বায়োটিক চিকিৎসার জন্য ব্যবহার হয়, সেগুলি দ্বারা বর্তমানে প্রায় ৪৩ রকমের সংক্রামক রোগ নিরাময় করা সম্ভব হয়েছে এবং এই ৪৩টির মধ্যে কয়েকটি খুব সাংঘাতিক ধরনের রোগও আছে। অবশ্য আজ পর্যন্ত সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, পোলিও ইত্যাদি ছোট ছোট ভাইরাসের রোগ নিরাময়ের জন্য কোনও এ্যান্টি-বায়োটিক পাওয়া যায়নি। আশা করা যায় যে, অদূর ভবিষ্যতে এই সব রোগের জন্য এ্যান্টিবায়োটিক পাওয়া তো যাবেই উপরন্তু ক্যান্সারের চিকিৎসারও কোনও ওষুধ পাওয়া যাবে। আজকের দিনে এ্যান্টিবায়োটিক দিয়ে শুধু যে মানুষের চিকিৎসা করা হচ্ছে তা নয়, পশু-জগতেও এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হচ্ছে। পশুদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধির জন্য এ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার হয়। এ্যান্টি-বায়োটিকের বদান্যতা থেকে উদ্ভিদও বঞ্চিত হয়নি। শাকসব্জির ক্ষেতে কিংবা ফলের বাগানে এ্যান্টিবায়োটিক ছিটিয়ে দিয়ে উদ্ভিদের রোগ সারান হচ্ছে।

*

আজকের দিনেও আমাদের দেশে হেলিকপটার একটা নতুন কিছু মনে
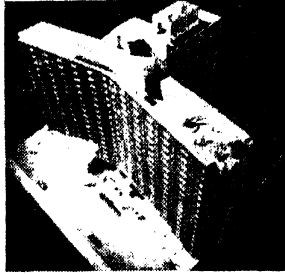
হেলিকপটারে নামার উপযোগী হোটেল-বাড়ির ছাদ

হলেও অন্যান্য দেশে হেলিকপটারের ব্যবহার আজকাল খুব সাধারণ হয়ে গেছে। হেলিকপটার খুব সহজেই এক জায়গা থেকে নামতে এবং উঠতে পারে। সাধারণ এয়ারোপ্লেনের মত ওঠা-নামার জন্য খুব বেশি জায়গা লাগে না। সুতরাং এরোপ্লেনের ওঠা-নামার জন্য যেমন এয়ারোড্রামের প্রয়োজন হয় হেলিকপটারের তা লাগে না। বর্তমানে বিদেশে যেসব বড় বড় হোটেল তৈরি হচ্ছে, সেই সব হোটেলের মালিকেরা হোটেল-বাড়ির ছাদ এমন করে তৈরি করার ব্যবস্থা করেছেন, যাতে ঐ ছাদের মাথায় হেলিকপটার নামতে পারে।

*

'কিং অব মলিলা' সত্যি সত্যিই কোনওখানের রাজা নয়। এটি একটি কচ্ছপ। ১৭৭ বছর আগে ১৭৭৭ সালে ক্যাপ্টেন কুক টোঙ্গাটাবুর রাজাকে এই কচ্ছপটি উপহার দেন। তখন থেকে 'কিং অব মলিলা' এই রাজবংশের একটি প্রিয় জীব হিসাবে সাদরে লালিত পালিত হচ্ছে। আজও সেটি ওদের রাজোদ্যানে সুস্থ সবল দেহে খেলাধুলো করে। এখন রাজবংশের উত্তরাধিকারিগণের ইচ্ছা যে মৃত্যুর পরেও এর দেহকে সংরক্ষণ করা হবে। কীভাবে এ সংরক্ষিত হবে, সে সম্বন্ধে হনলুলুর যাদুঘরের কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে উপদেশ চেয়েছেন। ক্যাপ্টেন কুক যখন এইটি উপহার দেন, তখন টোঙ্গাটাবুতে রাজা মলিলা রাজত্ব করছিলেন এবং তাঁরই নামানুসারে এর নাম 'কিং অব মলিলা' রাখা হয়।

*

ক্যান্সার রোগ ধরার বহুবিধ উপায় বার হয়েছে। আজকাল যে নতুন উপায়টি বার হয়েছে, সেটিও বিশেষ কার্যকরী। রোগীর শরীর থেকে খানিকটা রক্ত বার করে নিয়ে সেই রক্ত থেকে এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ বার করে সেই দিয়ে 'পরফাইরিন' নামে একটা ওষুধ তৈরি করা হয়। সেই ওষুধটি রোগীর দেহে ইনজেক্ট করার পর রোগীর দেহে আলট্রা-ভায়োলেট রশ্মি ফেলে যদি পরীক্ষা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে যে, যেস্থানে ক্যান্সার হয়েছে, সেই স্থানের চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। এইভাবে অতি সহজেই ক্যান্সার রোগের স্থান নির্ণয় করা যায়।

অতীতে দিল্লীর সিংহাসন নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী লিখিয়াছেন অধ্যাপক যদুনাথ সরকার। —"উত্তরকালের ঐতিহাসিক দিল্লীর বর্তমান গদি নিয়ে ছোঁক ছোঁকের কাহিনী যদি লিখতে চান, তবে তার তত্ত্ব ও তথ্য এখন থেকেই সংগ্রহ করে রাখুন"—পরামর্শটা স্বয়ং খুড়োর।

* * *

লোকসভার সদস্যদের ভৃত্যবিলাসের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন শ্রীযুত জওহরলাল। "কেষ্টার মতো 'সেই পুরাতন ভৃত্য' হয়ত নেই, কিন্তু মনিবরা যে এখনো 'সেই পুরাতন মনিব'! আর তাছাড়া—ওরে একটা তামাক সাজ বলেও যদি একটুখানি হাঁকডাক পাড়তে না পারলাম, তবে সদস্য হয়ে আর কী ফল লভিনু বল"—কে যেন ভীড়ের মধ্য থেকে মন্তব্য করিলেন।

* * *

পাতিয়ালার নিকট থেরি নামক স্থানে সম্প্রতি অখিল ভারত গৃহপালিত পশুপক্ষীর প্রদর্শনী হইয়া গেল। এই প্রদর্শনীতে বাঙলা হইতে একটি বাছুর, একটি ছাগল ও একটি মুরগি প্রথম-

পুরস্কার পাইয়াছে। —"অখিল ভারত মানব প্রদর্শনীতে বাঙলার স্থান যেখানেই হোক, অন্তত গরু-ছাগল আমাদের মুখ রক্ষা করেছে, সেই আমাদের সান্ত্বনা" —বলে শ্যামলাল।
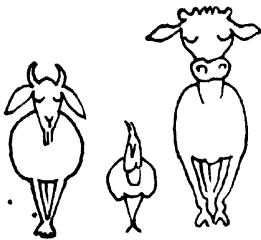
* * *

ফাঁসে-বাক্স

সিনেমা শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীরা তাঁদের অভাব-অভিযোগ জ্ঞাপনের জন্য সম্প্রতি কলিকাতার রাস্তায় একটি মিছিল বাহির করিয়াছিলেন। —"কিন্তু আমাদের অনেকেরই ধারণা, 'তারকার' দেশটা মাটির নয় এবং সেখানে ভাব ছাড়া অভাব বলে কিছু নেই"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী।

* * *

জনৈক সংবাদদাতা জানাইয়াছেন—আসাম সরকার নাকি সম্প্রতি একটি কবিতার পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। সাধারণের অবগতির জন্য তিনি সেই কবিতা-গ্রন্থ হইতে একটি মোক্ষম লাইন উদ্ধৃত করিয়াছেন, লাইনটি হইল—"বাঙ্গাল মারি বলৈ যাঁও"। বিশুখুড়ো বলিলেন—"আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে গরু পর্যন্ত যখন তেজস্ক্রিয় দুধ দিতে শুরু করেছে, তখন ব্যাঙের ছাতার মতো ঘাটে-মাঠে তেজস্ক্রিয় কবি জন্মানো আর এমন কী বিচিত্র ব্যাপার!!"

* * *

কংগ্রেস সভাপতি শ্রীযুত ধেবর বলিয়াছেন যে, তিনি নাকি বহু চেষ্টা করিয়াও তাঁর ব্যক্তিগত খরচ আড়াই শত টাকায় নামাইয়া আনিতে পারিতেছেন না। —"সভাপতি মশাই জানেন কিনা জানিনে, তাঁর কংগ্রেস-রাজ্যে অনেকে কিন্তু তাঁদের পারিবারিক আয় বহু চেষ্টা করেও আড়াইশত টাকা পর্যন্ত ওঠাতে পারছেন না"—মন্তব্য করিলেন জনৈক সহযাত্রী। তাঁর মুখ দেখা গেল না, পেছন হইতে আমরা দেখিলাম শুধু বক্তার তালিমারা জামাটা!!

* * *

শ্রীযুত নেহরু জানাইয়াছেন যে, অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধ বাধিবার কোন সম্ভাবনাই নাই। —"আমরা আশ্বস্ত হয়েছি। কিন্তু যুদ্ধের জন্যে যাঁরা নিত্যি

তিরিশ দিন 'হে মা কালী' করছেন, এ সংবাদে তাঁদের দাঁও মারার স্বপ্ন যে টুটে গেল"!

* * *

একটি সংবাদে জানা গেল, আমেরিকা হইতে একটি 'বাঁদর কমিশন' ভারতে আগমন করিয়াছে। কমিশনের মুখপাত্র নাকি ভারতের বাঁদর রপ্তানি নীতির বাধানিষেধের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে,
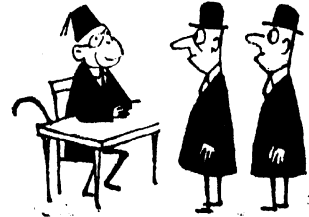
ভারত বাঁদর দিতে আপত্তি করিলে আমরা অগত্যা বাধ্য হইয়া পাকিস্তান হইতে বাঁদর ক্রয় করিব, সেখানে বাঁদর খুব সস্তা। কিন্তু খুড়ো বলিলেন—"আমেরিকা পাকা ব্যবসায়ী বটে। আমরা পাকিস্তানের পড়শী হয়েও জানতাম না যে, সেখানে বাঁদর এত সস্তা, অথচ সাত সমুদ্দুর তেরো নদীর ওপারে থেকেও আমেরিকা ঠিক জেনে নিয়েছে, সহজে এবং সস্তায় কোথায় বাঁদর মেলে"!!

এক নম্বর চৌরঙ্গী টেরাস-এ 'প্রগ্রেসিভ আর্টিস্টস' গ্রুপ-এর একটি চিত্র প্রদর্শনী হয়ে গেল গত সপ্তাহে। এ'রা প্রত্যেকেই গভর্নমেণ্ট কলেজ অব আর্ট অ্যাণ্ড ক্র্যাফট-এর চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্রছাত্রী। কিছু-দিন আগে ঐ কলেজেরই পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর কয়েকজন ছাত্রছাত্রী পরম্পরাগত রীতিপদ্ধতি থেকে তফাতে সরে গিয়ে কিছু ছবি এ'কে একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। প্রগ্রেসিভ আর্টিস্ট-গণ তাঁদেরই অনুসরণ করেছেন এবং এ'দের দৃষ্টিভঙ্গীও এ'দের পূর্ববর্তী-গণের মত কতটা ফরাসী ইমপ্রেশনিজম-এর উপর নিবদ্ধ রয়েছে লক্ষ্য করা গেল।

ইমপ্রেশনিস্টধর্মী ছবির সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বর্ণের দীপ্তি। কয়েকজন ফরাসী শিল্পী (যাঁদের বিদ্রূপ করে ইম্‌প্রেশনিস্ট আখ্যা দেওয়া হয়েছিল) অনুভব করেছিলেন আলো আঁধারের ক্রমবিকাশ দেখাতে গেলেই কালচে বা
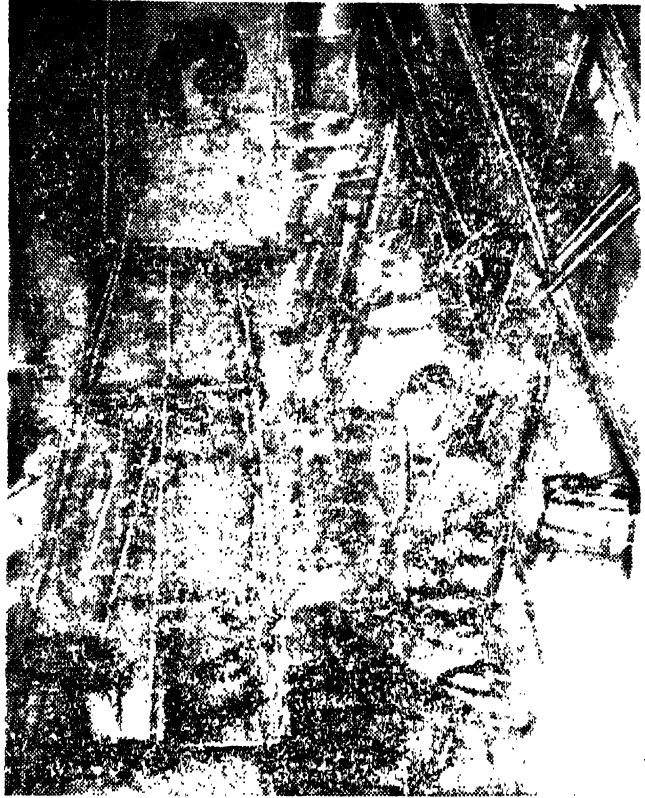
কালার হ্যাথ চার্ম

—বিজয়কুমার রায়

গেম —দীপালি চাঁদ

ধূসর রঙ প্রাধান্য পেয়ে ছবির বাঞ্ছিত জলুস নষ্ট করে দেয়। সেই কারণে সূর্যালোকের বিশ্লিষ্ট বর্ণাদির ছোট ছোট স্বতন্ত্র তুলির পোঁচ দিয়ে তাঁরা ছবি আঁকলেন এবং কালো বা কালো জাতীয় রঙ থেকে তফাতে থাকলেন। আরেকটা কথা, পিসারো বলতেন, "chief person in any picture is light", সুতরাং ছবিতে সার্থকভাবে আলোর এফেক্ট ফুটিয়ে তোলাই ছিল ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য। ক্লদ, মনে, একই দৃশ্য বার বার এ'কে গেছেন শুধু বিভিন্ন সময় সূর্যালোকের এফেক্ট ক্যানভাস-এ ধরে রাখার উদ্দেশ্যে। প্রগ্রেসিভ আর্টিস্টগণ ইমপ্রেশনিস্টধর্মী তুলির টানটোন বেশ আয়ত্ত করেছেন বটে, কিন্তু এ'দের কিছু

ছবিতে আলো এবং জৌলসের একান্তই অভাব লক্ষ্য করলাম। মনে হয় অবাঞ্ছিত রঙ ব্যবহারের ফলেই এই অবস্থা দাঁড়িয়েছে। অবশ্য এ'দের কয়েকটি ছবি থেকে বেশ মুন্সিয়ানার পরিচয় পাওয়া গেছে।

এই দলের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী শিল্পী মনে হয়েছে সত্যেন্দ্রনাথ পোদ্দারকে। এ'র 'কার্স অব বেংগল', 'প্রসেশন', 'টেল অব মিডনাইট' এবং 'প্রবলেম' অবশ্যই প্রশংসা দাবী করতে পারে। এ'র পরেই উল্লেখযোগ্য হলেন ভুটু প্রধান। স্থানে স্থানে দু-চারটি করে দীপ্ত রঙের পোচ দেওয়ায় ভুটু প্রধানের ছবিগুলি বিশেষভাবে সজীব হয়ে উঠেছে। এ'র 'থ্রু দি উডস্', 'কাম অ্যান্ড কোয়াইট' এবং 'নিউ মার্কেট কর্নার' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিজয়কুমার রায়ের 'লাস্ট রেজ' ছবিটি যথার্থই রসোত্তীর্ণ হয়েছে বলা যায়। অবশ্য যাঁরা দার্জিলিঙ-এ যান নি এবং সন্ধ্যার সময় কাঞ্চনজঙ্ঘা শৃঙ্গের উপর সূর্য-রশ্মির শেষ প্রতিফলন লক্ষ্য করেন নি তাঁরা হয়তো সম্পূর্ণভাবে এই ছবির রস গ্রহণ করতে পারবেন না। দিপালী চন্দের 'গেমস্', 'দে লাভ টু ওয়ার্ক', 'বাস্কেট সেলার' প্রভৃত ছবি বেশ ভাল লাগলো। এ'র ছবিতে গগাঁর প্রভাব খুব অনুভব করা গেল—বিশেষ করে 'বেদিঙ', 'সিউইঙ' এবং 'মিল টাইম'—এই তিনটিতে। বিকাশ রায়ের 'বার্চ হিল্ ইন সাইলেন্স', 'দি অনাট্রডেন ওয়ে', 'ফগী ডে' প্রভৃতি ছবিগুলি বেশ উচ্চাঙ্গের মনে হয়েছে।

ছাত্র হলেও প্রগ্রেসিভ আর্টিস্টগণ যথেষ্ট শক্তি এবং শিল্পী-মনের পরিচয় দিয়েছেন, ভবিষ্যতে এ'দের কাছ থেকে আরও পরিণত ছবি দেখতে পাব আশা করি। —চিত্রগ্রীব

দিল্লী

সকলেই জানেন যে ভারতীয় চিত্রধারার সহিত ইরাকবাসীদের পরিচয় করিয়া দিবার উদ্দেশ্যে ১৯৫১ সালে বাগদাদ শহরে একটি ভারতীয় চিত্র-প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করা হয়। অপরপক্ষে যাহাতে ভারতবাসীগণ ইরাকের চিত্রকলা তথা সভ্যতা ও সংস্কৃতির সম্যক পরিচয় লাভ করিতে পারেন সেইজন্য ইরাক হইতে দুইজন বিশিষ্ট শিল্পী প্রতিনিধি সেই দেশের চিত্র ও ভাস্কর্য সম্ভার লইয়া সম্প্রতি এদেশে আগমন করিয়াছেন। তাঁহাদের নাম মিঃ ফাইক হাসান—তিনি বাগদাদ ফাইন আর্টস ইনস্টিটিউট-এর চিত্রাঙ্কন বিভাগের অধ্যক্ষ ও মিঃ ইসমাইল আল চেকলি—তিনি ইরাকের 'ফ্রেন্ডস অব আর্টস সোসাইটি'র অন্যতম সভ্য।

আল হিজিয়া
—হাফিধ দ্রূবি (ইরাক)

ইরাকী প্রদর্শনীটি আকারে বিরাট এবং ইহাকে তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম, ইরাকের মিউজিয়াম হইতে আনীত ইরাকী সংস্কৃতিবিষয়ক বিভিন্ন ফটোগ্রাফ। খৃষ্টপূর্ব ৩২০০ সাল হইতে সপ্তম শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ইরাকী সভ্যতা কিভাবে বিকাশলাভ করিয়াছে ফটোগ্রাফগুলির মধ্যে তাহারই একটি সংক্ষিপ্ত ধারাবাহিক ইতিহাসের পরিচয় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়—চিত্রকলা; এই বিভাগে প্রাচীন ও সমসাময়িক বিভিন্ন শিল্পীদের রচনার নমুনা দেখা যায়। তৃতীয় ভাস্কর্য—এই বিভাগে ইরাকী মূর্তিশিল্পীদের নানামাধ্যমে রচিত নিদর্শনের পরিচয় পাওয়া যায়।

ইরাকী চিত্রকলার ইতিহাসকে সাধারণত দুই ভাগে ভাগ করা চলে। প্রথম খৃষ্টপূর্ব ৪০০০ সাল হইতে ২০০ শতাব্দীর শেষভাগ এবং দ্বিতীয় ইসলামিক যুগের প্রথম কয়েক শতাব্দী পর্যন্ত। এই দুই কালেরই চিত্রকলা তথা স্থাপত্যশিল্পের ধারা ও ক্রমবিকাশের পরিচয় পাওয়া যায় প্রদর্শনীর অন্তর্ভুক্ত ফটোগ্রাফগুলির মধ্যে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে, বাগদাদ শহরের পতনের কিছুকাল পূর্বে, যে শিল্পী ক্ষুদ্রাকার চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির জন্য খ্যাতিলাভ করেন তাঁহার নাম আহিয়া আল ওয়াসিতি। এবং সঠিকভাবে বলিতে গেলে, সেই সময় হইতে বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ইরাকের নিজস্ব চিত্রধারার বিশেষ কোন সন্ধান মিলে না। বর্তমান শতাব্দীর প্রথমভাগে সেনা বিভাগের কয়েকজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী শিক্ষার জন্য কনস্টান্টিনোপল্ গমন করেন ও সেই স্থানে চিত্রকলাবিদ্যাও শিক্ষা করেন। দেশে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহারা প্রাকৃতিক দৃশ্যাদি রচনা করিতে আরম্ভ করেন এবং বিদেশী প্রভাবান্বিত হইলেও এক হিসাবে তাঁহাদিগকে ইরাকী চিত্রধারার প্রবর্তক হিসাবে অভিহিত করা হয়। ইরাকের রাজা প্রথম ফৈজলের নেতৃত্বে যখন দেশ স্বাধীনতা লাভ করে তখন শিক্ষাদীক্ষা ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের উপর সকলের দৃষ্টি পড়ে। কৃতি ও তরুণ শিল্পীদের ইউরোপের বিভিন্ন কলাকেন্দ্রে প্রেরণ করা হয়। এবং ক্রমে ১৯৩৬ সালে ফাইন আর্টস ইনস্টিটিউট ও ১৯৪৪ সালে ইরাকের জাতীয় চিত্র গ্যালারী স্থাপিত হয়। কিন্তু ইরাকী চিত্রকলা-জগতে সম্পূর্ণ নূতন অধ্যায় প্রকৃতপক্ষে রচিত হয় ১৯৪০ সালে, যখন কয়েকজন শিল্পী রোম, প্যারী ও লন্ডন হইতে নূতন ধারায় শিক্ষালাভ করিয়া আসিয়া 'ফ্রেন্ডস্ অব আর্টস্ সোসাইটি' নামে একটি সমিতির প্রতিষ্ঠা করেন। নূতন দৃষ্টিভঙ্গী ও নূতন উদ্দীপনার সহিত এই সমিতির সভ্যবৃন্দ কাজ করিতে আরম্ভ করেন ও ১৯৪১ সালে তাঁহারা তাঁহাদের সর্বপ্রথম প্রদর্শনীর

অনুষ্ঠান করেন। ইরাকী চিত্রকলা ধারার এই হইল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

প্রদর্শনীতে সর্বসমেত ২৯ জন শিল্পী ও ৫ জন মূর্তি-শিল্পীর রচনার বিভিন্ন নমুনা পেশ করা হয়। লিথোগ্রাফ ও এচিংএর কয়েকটি নিদর্শন ব্যতীত চিত্রগুলির অধিকাংশই তৈল মাধ্যমে রচিত—তবে জলরঙ ও টেম্পেরার কাজও দেখা যায়। ভাস্কর্যের মধ্যে প্লাস্টার, ব্রঞ্জ ও কাষ্ঠ মাধ্যমে রচিত নানা আকারের মূর্তি চোখে পড়ে।

প্রদর্শনীটি পরিদর্শন করিলে কয়েকটি জিনিস বিশেষভাবে চোখে পড়ে। পূর্বেই বলিয়াছি অন্যান্য দেশের তুলনায় ইরাকের চিত্রকলার ইতিহাস আদৌ পুরাতন নহে। প্রথমদিকের কথা ছাড়িয়া দিলেও, সমসাময়িক শিল্পীদের রচনাগুলি দেখিলে বুঝা যায় যে তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাচীন বা প্রথাগত রীতির চিহ্নমাত্র নাই—অর্থাৎ অঙ্কন রীতির দিক দিয়া বিচার করিলে অধিকাংশ শিল্পীই

'লেবেন বিক্রেতা'
—ইসমাইল আল চেকলি (ইরাক)

সর্ববিষয়ে বিদেশীয় প্রভাবে অনুপ্রাণিত। দ্বিতীয়ত গ্রাফিকস্ বিভাগে গত আন্তর্জাতিক চিত্রপ্রদর্শনীতে ইরাকের কয়েকটি অতীব সুন্দর নমুনা দেখা গিয়াছিল। আশা করি অধিকাংশ চিত্ররসিকই অন্তত বাজহাদ আব্বোসের 'পুরাতন বাগদাদ' (কাষ্ঠ খোদাই)—এর অপরূপ সূক্ষ্ম কারুকার্যের কথা এখনও ভুলিতে পারেন নাই। সুতরাং এই বিভাগে সকলেই আরও অধিক উৎকৃষ্টতর নমুনা দেখিবার আশা করিয়াছিলেন। তৃতীয়ত প্রদর্শনীটি প্রতিনিধিমূলক—ইহার মধ্যে ইরাকের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমবর্ধমান ধারাও বিশেষ করিয়া সমসাময়িক চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়।

সর্বপ্রথমেই তারিক মাধলুম রচিত 'শিশুর মৃত্যু' দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অল্প আয়াসে কেবলমাত্র রেখা ও অল্প বর্ণবিন্যাসে চিত্রখানির মধ্যে শিল্পী মৃত্যুর বিভীষিকা ও ভয়াবহ স্তব্ধতা ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। অঙ্কন-পদ্ধতি ও সুকৌশল বর্ণ ব্যবহার ও মনোনয়ন ক্ষমতার জন্য শাকীর হাসানের রচনাগুলি, বিশেষ করিয়া 'জৈন এল আবিদেন' ও 'মোরগ' চোখে পড়ে। লিথোগ্রাফের মধ্য দিয়া ইসমাইল থাল চেকলীর প্রতিভা প্রকাশ পাইয়াছে এবং এই প্রসঙ্গে বর্ণসমুজ্জ্বল 'কফির দোকান', '১৯৫৪ সালের বন্যা' ও তৈল চিত্রের মধ্যে 'প্রস্থানোদ্যত' উল্লেখ করা যায়। প্রতিকৃতির সংখ্যা প্রদর্শনীতে বেশী ছিল না তথাপি অ্যাকাডেমিক রীতিতে রচিত ফাইক হাসানের 'হীরানস'-এর নাম করা যাইতে পারে। অঙ্কন কৌশল ও বর্ণব্যঞ্জনার মধ্য দিয়া চিত্রখানির মধ্যে চরিত্রের বিশিষ্টতাটুকু ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহার পরেই 'সানি আল সাওয়া' (ফারাজে আব্বু) চোখে পড়ে। কাধম হাইদরের 'ল্যান্ডস্কেপ'-খানিও অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। অযথা বর্ণবহুল না করিয়া শিল্পী সরল পদ্ধতিতে এই চিত্রখানির মধ্যে একটি বিশিষ্ট রূপ দিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

সমগ্র প্রদর্শনীতে মাত্র একজন শিল্পীর (ফারাজে আব্বু) নিকট হইতে এচিংএর কয়েকটি নমুনা পাওয়া যায়। সত্য বলিতে কি, নিদর্শনগুলি খুব উচ্চাঙ্গের নহে, কারণ এই বিভাগে আমাদের দেশের শিল্পীর দান সেই হিসাবে অনবদ্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই শ্রেণীর মধ্যে কেবলমাত্র 'স্নানার্থিনী'ই চোখে পড়ে। অন্যান্য রচনার মধ্যে 'ভারতীয় বালিকা', 'আল হিজিয়া' (হাফিদ দ্রুবি), 'মৃত মার্তে'' (নেজিহা সেলিম), 'উদ্যানের পশ্চাৎভাগ' (আতা সাব্রি) ও দুইখানি স্টীল লাইফ 'ফুল' (আক্রম সুক্রি ও আসিম হাফিধ) উল্লেখযোগ্য।

চিন্তাধারা ও গঠনকৌশলের দিক দিয়া মূর্তিশিল্পের নিদর্শনগুলির মধ্যে বিশেষ মৌলিকতার পরিচয় পাওয়া যায় না। রচনা কৌশল হিসাবে এই বিভাগে অবশ্য জেওয়াদ সেলিমের 'আননোন পলিটিক্যাল প্রিজনার' প্রথমেই চোখে পড়ে। রেগ বাট্‌লারের সহিত এই শিল্পীও তাঁহার রচনাটির জন্য পুরস্কার লাভ করেন। ব্যক্তিগতভাবে কিন্তু খালিদ রাহালের 'মাতৃত্ব' আমাকে বিশেষভাবে মুগ্ধ করিয়াছে। মৌলিক চিন্তাধারা, সৃষ্টিসুলভ মানসিক আবেগ ও সর্বোপরি বলিষ্ঠ প্রতীকমূলক অপরূপ গঠনকৌশলের সুনিপুণ ব্যঞ্জনা যেন এই ক্ষুদ্র ব্রঞ্জমূর্তিখানিকে এক সুললিত ছন্দের রূপদান করিয়াছে। —চিত্রপ্রিয়

প্রদর্শনীটি সম্প্রতি কলিকাতায় অনুষ্ঠিত হইতেছে।

রম্য রচনা

স্মৃতিরঙ্গ : তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়; প্রকাশক—নাভানা, ৪৭, গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা—১৩। দাম—২॥৹ টাকা।

মানুষের জীবন ভালোয়-মন্দে মেশানো, তাই স্মৃতিমন্থনে গরলও ওঠে, অমৃতও ওঠে। কিন্তু অভিজ্ঞতার রসে জারিত হ'য়ে সে-স্মৃতি [illegible] নিজেরই কাছে [illegible] হয়ে ফুটে ওঠে তার প্রকৃতি যেন ঠিক বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। তপনমোহন নিজে তা মানেন। কিন্তু একথা ভূমিকাতে বিনীত-ভাবে স্বীকার করলেও তিনি বস্তুত পর পর যে-কটি ছবি এঁকেছেন, তাতে অবাস্তবের সামান্য গন্ধও আছে ব'লে মনে হয় না। [illegible] থেকে ডনাল্ড [illegible] কাহিনী পর্যন্ত আগাগোড়া পড়ে গেলেও একবার ভাবতে ইচ্ছে করে না, এর মধ্যে কোথাও লেখক কল্পনার রং-তুলি বুলিয়েছেন।

আসলে বাস্তবকে সাহিত্যে রূপায়িত করবার আশ্চর্য যাদু আয়ত্তে আছে লেখকের। সে সঙ্গে আছে সহৃদয় সহানুভূতি। এমন নয় যে, বিলেতে গিয়ে কেবল ভালো-ভালো আর রহস্যে ভরা মানুষগুলোর সঙ্গেই তিনি পরিচিত হয়েছিলেন। তাঁর কৃতিত্ব এই, এই-যে একদিন বিদেশের পথে-ঘাটে-পার্কে-স্টেশনে দেখা মানুষগুলোকে তিনি কিছু-ক্ষণের জন্য দেখেছিলেন, আপাতভাবে তারা এতদিন অব্যক্ত থাকলেও লেখক তাদের কিছুই ভোলেননি। স্মৃতির পাতা উল্টে দেখা গেল [illegible] ওরা যা ছিল, এতদিন পরে তারা ঠিক তাই আছে; একটুও বদলায়নি। এখানে তিনি ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থের সমধর্মী।

একটা দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক। জন বা রবার্ট ব্রাউন তো অসংখ্য জনগণের মধ্যে লীন, আর ইয়েটসের ঋজুরূপের সঙ্গে আমাদের পরিচয় তাঁর গোটাকয়েক প্রতিকৃতির মারফৎ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথকে স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে আমাদের কারো কারো। সেই অসীম সৌন্দর্যের বর্ণনাও করেছি আমরা কত না গদ্যে পদ্যে। কিন্তু কোন এক জ্যোৎস্না আলোকিত নির্জন পথের মধ্যে তাঁর যীশুকল্প মূর্তিকে দেখে একজন ভক্ত যখন পুলকিত বিস্ময়ে হাতজোড় ক'রে দাঁড়িয়ে যায়, তখনি সেই রবীন্দ্রনাথকেই যেন আমরা আবার নতুন করে দেখি। দৈনন্দিন জীবনের কর্মব্যস্ততার মধ্যে এ-ঘটনাটি হয়তো শুধুমাত্র একটি স্মৃতি হয়েই থাকতে পারতো, কিন্তু যে-দৃষ্টি থাকলে এই স্মৃতিটুকুর মধ্যেও অপরূপ রঙের ইন্দ্রধনুকে প্রত্যক্ষ করা যায়, তপনমোহনের সে-দৃষ্টি আছে বলেই আজ আমাদের কাছে তিনি এমন একটি রঙীন মধুর দৃশ্যকে উদ্ঘাটিত করতে পেরেছেন।

শুধু কি দৃষ্টি! সহানুভূতি নেই? রোজকার দেখা সামান্য একটা মানুষকে

এমব্যাঙ্কমেন্টের ধারে অসামান্যরূপে প্রত্যক্ষ করা, লজ্জা ঢাকবার মতো যৎকিঞ্চিৎ আবরণ সংগ্রহেও অক্ষম কবির মধ্যে বিশেষের আভাস লক্ষ্য করা, নির্লিপ্ত হৃদয় কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। পটভূমিটা না হয় বিলাত, কিন্তু ঠিক এ মানুষগুলো আমাদের দেশেও কি এমনিভাবে তিলে-তিলে ক্ষয়ে যাচ্ছে না, আর তপনমোহনের মতো কোন-না-কোন সজ্জন সহৃদয় ব্যক্তির সঙ্গে তো তাদের এমন পরিচয়ও ঘটে, কিন্তু সহানুভূতির প্রলেপে সে পরিচয়কে কেউ তো এত সুন্দরভাবে প্রকাশ করেননি। পটভূমি যাই হোক, স্মৃতি-রঙ্গের প্রায় সব রচনাই তাই ভৌগোলিক সীমার অতীত।

সে-সঙ্গে আছে রসসাম্যতা। আর্নেস্ট রীস-এর বাড়িতে একটা আসরকে উপলক্ষ্য করে যে-রসের অবতারণা করেছেন তিনি, তার সার্থক পরিণতিতে এসে পৌঁছেছেন এজরা পাউণ্ড। মনে হয়, এই সুন্দর রচনাটিকে সম্পূর্ণ করবার জন্যই এজরা পাউন্ড সেদিন এমনি অতর্কিতে এসে এমন অস্বাভাবিক কাণ্ড করে বসেছিলেন। তাছাড়া

ডনাল্ড ককসিটার বয়সে যত অর্বাচীনই হোক একটি রস-সাহিত্যের নায়ক হওয়ার যোগ্যতা যে তার অবশ্যই আছে, একথা সকলেই স্বীকার করবে। অথচ আশ্চর্য, কবি ইয়েটসের একটি সৌম্য ও সুন্দর পরিচয় লেখক এই গ্রন্থেই দিয়েছেন।

চরিত্রচিত্রণে স্মৃতিরঙ্গের সর্বত্রই সার্থকতার পরিচয় সুস্পষ্টভাবে পাওয়া গেলেও যে-কোন পাঠকের দৃষ্টি এড়াবে না যে, লেখকের গল্প বলার ভংগীটিও চমৎকার। অর্থাৎ ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে আশ্রয় করে তিনি যে-চিত্রই এ'কেছেন, শেষ পর্যন্ত তা একটি সুডৌল কাহিনীতে এসে পরিণত হয়েছে। মডেল তার সবচেয়ে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ-কাহিনীটি যদি লেখকের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা না-ও হতো তা'হলেও ক্ষতি ছিল না, কল্পনা-আশ্রিত অনেক ভালো গল্পের সংকলনে আপন চরিত্রগুণেই সে তার স্থান করে নিতে সক্ষম। রলো আর শোল শক তেমনি আরো দুটি সুন্দর দৃষ্টান্ত। বলা বাহুল্য, তপনমোহনের পরিচ্ছন্ন সাহিত্যবোধই এ-কৃতিত্বের জন্য দায়ী। ৫৭।৫৫

অনুবাদ সাহিত্য

নোংরা হাত—জাঁ-পল সার্ত্র্, অনুবাদক—শিবনারায়ণ রায়; প্রকাশক—নিউ গাইড, ১২, কৃষ্ণরাম বোস স্ট্রীট, কলিকাতা—৪। দাম—২॥০ টাকা।

অনুবাদ-সাহিত্যের প্রত্যক্ষ ফল দুটি, অবশ্য ধরেই নেওয়া হচ্ছে অনুবাদ সৎ-গ্রন্থের। এক সাহিত্যের ভাণ্ডার তাতে সমৃদ্ধতর হয়, দুই বিদেশের একটি উন্নত সাহিত্যের প্রভাবে দেশের সাহিত্যের মানও উন্নত হয়ে ওঠে। জাঁ-পল সার্ত্র ফরাসী সাহিত্যের একজন দিকপাল। কেবল সাহিত্যিক হিসেবেই তিনি প্রখ্যাত নন, একজন স্বাধীন চিন্তাবিদ বলেও তাঁর খ্যাতি আজ সুদূরবিসারী। অথচ তাঁর গ্রন্থের বহুল প্রচার আমাদের দেশে এখনও ঘটেনি, এই অনুবাদ-সাহিত্য সৃষ্টির যুগে যা হওয়া উচিত ছিলো আরও অনেক আগে। সুতরাং অনুবাদক হিসেবে শিবনারায়ণ রায়ের কৃতিত্ব যা-ই হোক, তিনি যে অনুবাদের জন্য সার্ত্রের একটি নাটক পছন্দ করেছেন তার জন্যই তাঁকে ধন্যবাদ জানানো উচিত। বিশেষত, এ-নাটকটি নাকি সার্ত্রের 'একটি শ্রেষ্ঠ রচনা।'

রাজনৈতিক মহলের নোংরামি যে কতো সুস্থ মনকে অসহায় করে দিতে পারে, কতো সুন্দর জীবনকে ব্যর্থতার পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, যায়ও, তার একটি উদাহরণ নোংরা হাত। একই দলের মধ্যে নেতৃত্বের রেষারেষি—যার ফলে উগ্র হয়ে গড়ে ওঠে প্রতিদ্বন্দ্বী হত্যার নিষ্ঠুর পরিকল্পনা—রাজনীতির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সাধারণ ঘটনা, এবং তা প্রতি দেশেই বর্তমান। কিন্তু সার্ত্র দেখতে পেয়েছেন এই যান্ত্রিক দেশাত্মবোধের মধ্যেও আছে স্বাধীন চেতনা, উদার প্রীতি আর আত্মোৎসর্গের মহৎ প্রেরণা। হুগোর স্বাধীন সত্ত্বা পার্টির নির্দেশকে অগ্রাহ্য করলো তার অবচেতন মনের নির্দেশে, আবার সেই এগিয়ে গেলো গুলীর মুখে আত্মোৎ-সর্গের সচেতন প্রেরণায়। আমাদের দেশেরও রাজনীতি আছে, আছে তার নোংরামিও। কিন্তু হুগোর মতো একজন দুজন সত্যিকারের মানুষও কি নেই? বলা বাহুল্য, সেজন্যেই এ-নাটক তার স্থান-কাল-পাত্র নিয়েও সার্বজনীন।

নোংরা হাত সম্বন্ধে একটি বড়ো কথা, শিবনারায়ণ রায় মূল ফরাসী থেকে গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন, সুতরাং নিঃসন্দেহ হওয়া যায় যে, আমরা কিছু হারাইনি। অনুবাদের ভাষা এত সাবলীল যে, মধ্যে মধ্যে মনে হয় অনুবাদগ্রন্থ পড়ছি না। কিন্তু একটা প্রশ্ন, অনুবাদকের ভাষা আগাগোড়াই কেমন একটু লঘু আমেজে ভরা; মূলেও কি তাই? বিষয়বস্তুর পক্ষে এ-লঘুত্বটা একটু বেমানান নয় কি?

গ্রন্থের ভূমিকায়, অনুবাদক অনুবাদ-সাহিত্য সম্বন্ধে যে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করেছেন, তা মূল্যবান। তাঁর বক্তব্য হয়তো কারো কারো কাছে গ্রাহ্য বলে বিবেচিত হবে না, (এবং তা কোনো লেখকই আশা করেন না), কিন্তু সে-বক্তব্য নিয়ে যে বিস্তৃত আলোচনা হওয়া প্রয়োজন, তা বোধ হয় বাংলা সাহিত্যের শুভানুধ্যায়ী মাত্রেই স্বীকার করবেন। ৬১।৫৫

হাজি মুরাদ—লিও তলস্তয়ঃ কলিকাতা পুস্তকালয় লিমিটেড, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা—১২। মূল্য—সাড়ে তিন টাকা।

বিদেশীর কাছে তলস্তয়ের স্বল্পপরিচিত লেখার মধ্যে হাজি মুরাদ অন্যতম। তলস্তয়ের উপন্যাস বলতে আমাদের মনে যে ধারণা হয়, হাজি মুরাদ ঠিক সে পর্যায়ে পড়ে না। স্বাধীনতাপ্রিয় যে পার্বত্যপ্রধানের করুণ কাহিনী এ গল্পে বিধৃত, তাকে উপন্যাস না ব'লে কাহিনী বলাই বোধ হয় ঠিক। এ কাহিনীর নায়ক হাজি মুরাদ। নির্ভীক, নির্মম, সত্যপ্রিয়, সরল। আর এসবের নিচে একটি স্নেহোচ্ছল অন্তঃকরণ। একদিকে কুটচক্রী রুশ সরকার, অন্যদিকে তার পরম শত্রু পার্বত্যপ্রধান শামিল। এ দুই-এর মাঝে হাজি মুরাদের চরিত্রের মানবীয় দিকটি সুন্দর ফুটে উঠেছে।

অনুবাদ তেমন স্বচ্ছন্দ না হ'লেও চলনসই।

সাহিত্য আলোচনা

আধুনিক বাংলা সাহিত্য পরিক্রমা—কল্যাণনাথ দত্ত। প্রকাশক—উত্তরায়ণ লিঃ, ১৭০ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীট, কলিকাতা ৬। দাম—২।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে-পরিমাণে গল্প-উপন্যাস, এমন কি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়, সে-পরিমাণ তো দূরের কথা তার আংশিক সংখ্যাকও আলোচনা গ্রন্থ প্রকাশিত হয় না। সুতরাং ভালো হোক মন্দ হোক, ছোট হোক বড় হোক, সাহিত্য-সম্পর্কিত কোনো আলোচনা-গ্রন্থ যদি প্রকাশিত হয়, সুধী পাঠকেরই উচিত তাকে সাদরে আহ্বান জানানো। অতএব কল্যাণনাথ দত্তর আলোচ্য গ্রন্থটিকে পেয়ে বাংলা সাহিত্যের সৎপাঠক মাত্রই যে খুশী হবেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বস্তুত, আয়তনে যত ক্ষুদ্রই হোক, সমালোচনা গ্রন্থটি ব্যর্থ নয়। রবীন্দ্রনাথ এবং শরৎচন্দ্রের সাহিত্য আলোচনা প্রসঙ্গে লেখক এমন কিছু নতুন কথার উল্লেখ করেছেন, যা বিচক্ষণ পাঠককে ভাবিত করবে।

কিন্তু আধুনিক কাব্য ও সাহিত্যের গতি প্রকৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা লেখক করেছেন, তা শুধু অসম্পূর্ণই নয়, এমন বিচ্ছিন্ন এবং পারম্পর্যবিহীন যে, মনে হয়, আধুনিক সাহিত্যের ধারাটিকে তিনি ধৈর্য সহকারে অনুধাবন করতে পারছেন না। বিশেষ করে 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের গতি ও প্রগতি' প্রবন্ধটিতে তিনি ভালো-মন্দ কোনো মীমাংসাতেই এসে পৌঁছতে পারেননি, কতগুলো নামের তালিকা দিয়ে অনাবশ্যকভাবে রচনাটিকে ভারাক্রান্ত করে তুলেছেন শুধু।

লেখকের বলবার ভঙ্গি সুন্দর নয়, সমালোচনা সাহিত্যের পক্ষে সেটা তেমন কিছু মারাত্মকও নয়, কিন্তু ভাষা এত কাঁচা যে, কখনো কখনো পড়তে কিছু কষ্টই হয়। যে বাকভঙ্গি বহুকাল পূর্বেই অযোগ্য বলে ব্যক্ত হয়েছে, তিনি কি সেই ভঙ্গিটিকে নিয়েই আবার নতুন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে চান?

৫৫৩।৫৪

উপন্যাস

সব হোল শেষ—অমরেন্দ্র মিত্র, কলিকাতা পুস্তকালয় লিঃ, ৩, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২। মূল্য আড়াই টাকা।

একটি ভাগ্যবিড়ম্বিত সঙ্গীতশিল্পীর কাহিনী। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটানা ট্রাজেডির অকারণ ভীড়ে ভারাক্রান্ত। ভাবালুতার অযথা উচ্ছ্বাসের ধোঁয়া চোখে জ্বালা ধরায়। লেখক যদি উপন্যাস লেখায় নিতান্তই ব্রতী হন, তাহ'লে তাঁর প্রথম কর্তব্য হবে অকারণ উচ্ছ্বাস বর্জন। আর আজকাল প্রচ্ছদপটও নিতান্ত উপেক্ষণীয় নয়।

৪০৬।৫৪

জীবনী

আনন্দময়ী মা—চন্দ্র গুপ্ত প্রণীত। নিউ বেঙ্গল লাইব্রেরী, ৯নং গুরুদুওস্তাগর লেন, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৸০ আনা।

শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর জীবন এবং তাঁহার সাধন প্রসঙ্গে আলোচনা, সেই সঙ্গে তাঁহার উপদেশের কিছু কিছু সঙ্কলন আলোচ্য পুস্তকখানিতে আছে। অধ্যাত্ম সাধনার সমুচ্চ শীর্ষে স্থিতপ্রজ্ঞ অবস্থায় সমারূঢ়া সর্বজনপূজ্যা মা আনন্দময়ীর মধুর প্রসঙ্গ পাঠে সকলেই উদ্ধৃত হইবেন এবং জীবনের পথে নূতন আলো পাইবেন।

প্রাপ্তিস্বীকার

নিম্নলিখিত বইগুলি সমালোচনার্থ আসিয়াছে।

আলোর তৃষা—শ্রীযতীন্দ্রনাথ দাস।
ভাঙ্গা বন্দর—শ্রীভবেশচন্দ্র দত্ত।
মৃত্তিকার রং—হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়।
ফিরিঙ্গি বণিক—অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।
মৃগনাভি—আলাউদ্দিন আল আজাদ।
জেগে আছি—আলাউদ্দিন আল আজাদ।
গীতারসামৃত—শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সাহিত্য সরস্বতী।

ভ্রম সংশোধন

২১ সংখ্যা দেশ পত্রিকায় 'স্যার আলেকজান্ডার ফ্লেমিং' প্রবন্ধে M B 699 ছাপা হইয়াছে, উহা M B 693 হইবে।

—সম্পাদক, দেশ

—শৌণ্ডিক—

নাট্যোৎসবের নাটক চারখানি

থিয়েটার সেণ্টার ক্যালকাটার উদ্যাগে চারখানি নাটক নিয়ে একটি নাট্যোৎসব সম্পন্ন হয়ে গেল গত রবিবার। নাট্যোৎসব বলতে অনেক নাটক, অনেক লোক এবং অনেকদিনব্যাপী একটা বিরাট জমাটি ব্যাপারের ছবি মনের চোখে ভেসে অবশ্যই ওঠে এবং সে তুলনায় যা হলো, তা চোখেও না পড়বার কথা। কিন্তু তা হতে পারেনি—থিয়েটার সেণ্টারের এই নাট্যোৎসব স্বল্পতার মধ্যে দিয়ে বিরাট ভবিষ্যতের আভাসই এনে দিয়েছে। তাছাড়া স্বল্প নিয়ে হলেও ঠিক এ ধরনের নাট্যোৎসব কলকাতায়, যতদূর মনে পড়ে, আগে হয়নি। বছর দুই আগে বহুরূপী সম্প্রদায় যে নাট্যোৎসবের অনুষ্ঠান করেছিলেন, তাতে ছিল তাঁদের একারই খান-চারেক নাটক, নানা দলের প্রতিনিধিত্ব ছিল না সে উৎসবে। থিয়েটার সেণ্টার এইখানেই ওদের চেয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। থিয়েটার সেণ্টারের উৎসবে ভিন্ন ভিন্ন দলে এতে যোগদান করেন ভিন্ন ভিন্ন নাটক নিয়ে। ১৩ই মার্চ থেকে আরম্ভ করে পর পর চারটি রবিবার সকালে নিউ এম্পায়ার মঞ্চে এই নাটকগুলি পরিবেশিত হয়। পর্যায়ক্রমে নাটকগুলি হচ্ছে নব নাট্যমের 'জনরব'; জাতীয় নাট্য পরিষদের 'পূর্বরাগের ইতিহাস'; তরুণ সংঘের 'আলগ্ আলগ্ রাস্তে' এবং সবশেষে বহুরূপীর 'উলুখাগড়া'। পুরো এক মাস ধরে সবুর করে করে নাটকগুলি দেখার জন্যে দর্শকদের কোন অসুবিধে হবার কথা নয়, কিন্তু সময় এমনভাবে ছড়িয়ে থাকায় নাট্যোৎসবের আবহাওয়াটা না জমে ওঠারই কথা। যদিও উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি ছিল না এবং নাট্যামোদী দর্শকসমাগমেও ক'দিনই কোন কমতি ছিল না। ভালো হতো যদি পর পর ক'দিন ধরে অনুষ্ঠানটি চলত। কিন্তু তা সম্ভব হতে পারেনি, নিশ্চয়ই, প্রেক্ষাগৃহের অভাবের জন্যে। শৌখিন নাট্যকে দলদের এ একটা মস্ত অসুবিধে; থিয়েটার সেণ্টারের ব্রতের মধ্যে এই অভাবটি মোচন করাও হচ্ছে অন্যতম।

*   *   *

স্বল্প নিয়ে আরম্ভ করলেও এই নাট্যোৎসবটি শৌখিন নাট্যকে দলগুলির মধ্যে বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত সংহতির বীজ বপন করতে সক্ষম হয়েছে। থিয়েটার সেণ্টারের উদ্দেশ্যও তাই। অনেক দল আছেন, যাঁরা সুধী সমাজে তাঁদের নাটক পরিবেশনের সুযোগ পান না; অনেকে হয়তো নাটক লিখে তা মঞ্চস্থ করার সুযোগ না পেয়ে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন; অনেকের হয়তো অভিনয়ের ঝোঁক আছে কিংবা প্রতিভাও আছে, কিন্তু কোথাও তা প্রকাশের সুযোগ পান না; অনেকের হয়তো মঞ্চবিন্যাস সম্পর্কে অথবা আলোকসম্পাতে, অথবা সাজ-পোশাক বা রূপসজ্জা পরিকল্পনার অদ্ভুত ন্যাক আছে, কিন্তু সুযোগের অভাবে তা অলক্ষ্যে চাপা পড়ে যায়। এঁদেরই জন্যে হয়েছে থিয়েটার সেণ্টার। এর দ্বারা নাট্যরসিকও লাভবান হবেন—ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে থেকে যারা অবহেলিত হচ্ছিল বা দৃষ্টিকে ঠিকমতো আকর্ষণে সক্ষম হতে পারছিল না, এবারে তারা একটা সাজিতে নানা ফুলের তোড়া হয়ে ঝলমলিয়ে উঠতে পারবে, তখন আর তার ওপর থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে রাখা যাবে না। নানা দলের নানা রকমের নাটক দেখবার সুযোগ পাওয়া যাবে বলে আশা করা যায়। নাট্যোৎসবে পরিবেশিত নাটকগুলির মধ্যে ছিল তিন-খানি বাঙলা এবং একখানি হিন্দী। দেখা গেলো প্রগতিশীল মনোভাব নিয়ে সুষ্ঠু নাটক পরিবেশনের দিকে হিন্দী-ভাষীদেরও ঝোঁক হয়েছে এবং তাঁরা এগিয়েও আসছেন। এইভাবে ভারতের আরও অন্যান্য ভাষাভাষীদেরও নাট্যাভিনয়ে প্রণোদিত হবার সুযোগ ঘটছে। এইভাবে সারা দেশে নাট্য আন্দোলন ব্যাপক হয়ে ওঠাবার সম্ভাবনা রয়েছে।

*   *   *

পরিবেশিত নাটকগুলি দেখবার পর একটা তুলনামূলক বিচার এসে যাওয়া স্বাভাবিক। চারটি দলের মধ্যে বহুরূপীর প্রতিষ্ঠাই সর্বাধিক এবং কেন যে, এই দলটি বাঙলায় নব নাট্য আন্দোলনের পুরোভাগে গিয়ে দাঁড়িয়েছে, তা এঁদের অভিনয় দেখবার সময় প্রতিক্ষণই উপলব্ধিতে জানান দিয়ে যায়। 'উলুখাগড়া' অবশ্য নতুন নাটক নয়, বছর দুই আগেই এরা প্রথম মঞ্চস্থ করেন। তবে মনে হলো যেন কিছু কিছু পরিবর্তন করে নেওয়া হয়েছে। পরিবর্তন ভূমিকা বণ্টনের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়, অবশ্য সেটা অনিবার্য হয়েছে মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের পরলোকগমনের ফলে; মুখ্য চরিত্রটিই ছিল তাঁর। একটি পরিবারকে কেন্দ্র করে

বিমল কর রচিত মনস্তত্ত্বমূলক কাহিনী "হ্রদ"-এর চিত্ররূপের একটি দৃশ্যে সুদীপ্তা রায় ও উত্তমকুমার

'ইনটেলেকচুয়ালিজমের' গরম মসলা ছিটানো 'ডেমোক্রেসীর' ব্যাখ্যা এই 'উলুখাগড়া'। নাটকের লেখক শ্রীসঞ্জীব এবং পরিচালক শম্ভু মিত্র। সমাজ ও মানুষের চরিত্র বিকৃতি নিয়ে আগাগোড়া কেবলই শ্লেষ। অনর্গল কথা; জায়গায় জায়গায় তা প্রয়োজনের মাত্রা ছাপিয়েও গিয়েছে এবং কোথাও কোথাও সস্তার দিকে ঝোঁকও ফুটে উঠেছে, যা বহুরূপীর কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত। টোটালেটেরিয়ান মনোবৃত্তিসম্পন্ন সুবিধাবাদী এক অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ান এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র। যৌবনে এক জোচ্চুরি থেকে এক অসহায়া বালিকাকে উদ্ধারের মানসে তাকে বিয়ে করে, কিন্তু তারপর স্ত্রীকে সে দাপটের নীচে রেখে তাকে দিয়ে নিজের সুবিধে খাটিয়ে নিতে থাকে। ফলে স্ত্রী হয়ে দাঁড়ালো বিকারগ্রস্তা এক নারী মাত্র, যাকে তার ছেলেমেয়েরাও করুণার চোখে দেখে, কিন্তু মান্য করতে পারে না। ছেলে এক ধাপ্পাবাজ। মেয়েই যা একটু সুস্থ প্রকৃতির। আর সুস্থ এই মেয়েরই প্রেমিক। গোলমাল বাধলো যেদিন বাইরের এক চোরাকারবারী স্ত্রীকে প্রলুব্ধ করে ভাগিয়ে নিয়ে যাবার তাল কষলে, যার পরিসমাপ্তি ঘটলো বিষ খেয়ে স্ত্রীর আত্মহত্যায়। সমাজ ও মানুষের বিকৃতি নিয়ে কটাক্ষ করার ভার ঐ ধাপ্পাবাজ ছেলেটির ওপর এবং শম্ভু মিত্র চরিত্রটির রূপায়নে লোকের মনে বিঁধবার মতো পারদর্শিতা দেখিয়েছেন। তার সহজ অনায়াস অথচ দীপ্ত ভঙ্গী দর্শক মনকে সহজেই প্রভাবিত করে তোলে। বিদ্রূপের ঝোঁক কয়েক স্থানে বাড়িয়েও ফেলেছেন। বিকারগ্রস্তা স্ত্রীর চরিত্রে তৃপ্তি মিত্র চরিত্রটির অসহায় অবস্থার প্রতি দর্শকদের সহানুভূতিসম্পন্ন করে তুলতে বাধ্য করেছিলেন এবং তাঁর উপস্থিতিকালে সারা দৃষ্টি তিনিই একচেটে করে রেখে দেন। একটা খিটখিটে বাতিক চরিত্র, যাকে তার মেয়ে করুণার চোখে দেখে, ছেলে করে মৃত্যু কামনা, আর স্বামীর কাছে পায় উৎপীড়ন, এই পরিবেশে তৃপ্তি মিত্র চরিত্রটিতে মেলোড্রামার ভাগ মিশিয়েছেন ভালো। সর্বাত্মময় কর্তার চরিত্রটিতেই অভিনয় করতেন মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য; এবারে অবতরণ করেছেন গঙ্গাপদ বসু; আগের চেয়ে চরিত্রটির ওজন কিছু কম, তবে দাপটে বিশেষ কম নয়। গঙ্গাপদ বসু আগে যে চোরাকারবারীর চরিত্রে অবতরণ করতেন, এবারে তাতে নেমেছেন শোভেন মজুমদার—রূপ অভিনয়ে এর ক্ষেত্রে সুরটা একটু কেটে গিয়েছে। এই পরিবারের কন্যার চরিত্রে মুক্তি গোস্বামীর অভিনয়ে আড়ষ্টতা ভাঙবার একটা চেষ্টা ধরা পড়ে। আর, অপর একটি ব্রহ্মদেশে পালিতা বাঙালী ধিঙ্গী মেয়ের চরিত্রে অমিতা চক্রবর্তীর মধ্যে কৃত্রিমতা ফুটে উঠেছে। সমগ্রভাবে অভিনয় এবং পরিচালনাগুণে 'উলুখাগড়া' এই উৎসবের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য পরিবেশন হতে সক্ষম হয়েছে।

* * *

নব নাট্যমের 'জনরব' বেশ চমক লাগাবার মতো নাট্য সৃষ্টি, যে জন্যে

'উলুখাগড়া'র পরই এর নাম উল্লেখ করতে হয়। গুজব যে সংসারে কি অশান্তির সৃষ্টি করতে পারে, তাই নিয়ে হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা এই নাটকখানি পরিচালনা করেন দেবব্রত সুরচৌধুরী। প্রকৃতিগতভাবে নাটকখানি ছোট গল্প তথা একাঙ্কিকা। দুই ভায়ের সংসার। বড়ো ভাই বিমলাপ্রসাদের অল্পবয়সী দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী রেবা। সেই বাড়িতেই আশ্রিত পরিবারের হিতকারী পিতৃবন্ধু পুত্র অরূপ। রেবা আর অরূপের ঘনিষ্ঠতা ছোট ভাই কমলাপ্রসাদ বা তাঁর স্ত্রী কৃষ্ণার কাছে খারাপ লাগে। রেবা ও অরূপ একলা বেড়াতে বের হয়; পাড়ায়ও তাই নিয়ে নানা গুজবের সৃষ্টি হতে থাকে। বিমলাপ্রসাদ প্রথমে সব উড়িয়েই দিচ্ছিল; ছোট ভাইকে এর জন্যে ভর্ৎসনাও করে যাচ্ছিল, কিন্তু ঘটনা এমন দাঁড়ালো যে, অরূপকে ও-বাড়ি ছাড়তে হলো; পাড়ার লোকের সঙ্গে দাঙ্গা করতে হলো এবং ফলে বিমলাপ্রসাদ গুণ্ডার হাতে আহত হলো। ঠিক এই সময়েই রেবা গোপনে এসেছিল অরূপের সঙ্গে দেখা করতে; আহত বিমলাপ্রসাদের কাছে সে ধরা পড়ে গেল; এতদিনে বিমলাপ্রসাদের মনও গুজবে কান দিলে। অরূপ ও রেবা দাঁড়ালো বিমলাপ্রসাদের সামনে আসামী হয়ে। ওরা ওদের নিরীহতা প্রমাণের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে এগিয়ে এলো। বিমলাপ্রসাদ প্রাণ চাইলে না, চাইলে ওরা যেন দুজনে দুজনের চোখের দিকে সোজা তাকায়; কিন্তু পারলে না তাকাতে ওরা। এইখানেই নাটকের শেষ; অবশ্য বিমলাপ্রসাদেরও মৃত্যু। বিচিত্র বিষয়বস্তুটির পরিকল্পনার উদ্যম প্রশংসনীয়। তবে নাটকের আকৃতিতে অস্পষ্টতার লক্ষণ আছে। কিন্তু পরিচালনা এবং ভালো অভিনয় গুণে গোড়া থেকেই বেশ একটা সাসপেন্স ধরিয়ে রেখে শেষে রীতিমতো একটা চমক এনে দেয়। অভিনয়ে বিমলাপ্রসাদের চরিত্রে অজিত রায় বেশ বলিষ্ঠ অভিনয় ক্ষমতার অধিকারী; প্রভাব ফোটাবার মতো ব্যক্তিত্বেরও। অরূপের চরিত্রে দিব্যেন্দু সেনগুপ্তের শিল্পপ্রকাশও খুবই সম্ভাবনাপূর্ণ। রেবার চরিত্রে কল্যাণী সেনগুপ্তার মধ্যে গোড়ার দিকে একটু অসংলগ্নতার ভাব পরিলক্ষিত হলেও নাটকীয় সংঘাত সৃষ্টির ক্ষেত্রে তিনি যোগ্যতার সঙ্গেই চরিত্রটির উপস্থিতি উপলব্ধি করিয়ে দেন। ছোট ভাইয়ের স্ত্রী কৃষ্ণার চরিত্রে পেশাদার দলের শিল্পী বন্দনা দাসকে আর সবায়ের পাশে অন্য ধাঁচের মনে হয়। দলের আর সবায়ের মধ্যেও বেশ একটা আন্তরিকতা লক্ষ্য করা যায়।

* * *

জাতীয় নাট্য পরিষদ পরিবেশিত "পূর্বরাগের ইতিহাস" তথাকথিত আধুনিক একটি পরিবারের মেয়েদের জন্য পাত্র নির্বাচন নিয়ে একখানি প্রহসন। নাটকখানি লেখা বারীন্দ্রনাথ দাশের এবং পরিচালনা করেন তরুণ রায়। ব্যারিস্টার রাজেন মুখার্জির বাড়ীতে গৃহিণী ঊর্মিলারই যতো প্রতাপ। পুত্র সোনালি আণবিক অনুশীলনে বীতশ্রদ্ধ হয়ে কবিতা লেখে। দুই কন্যা, কুহেলি আর সহেলি। রাজেন মুখুজ্যের ইচ্ছে কুহেলির বিয়ে হয় তার সহকারী এডভোকেট বিজয়ের সঙ্গে। ঊর্মিলা চায় কুহেলির

"কঙ্কাবতীর ঘাট"-এর দুটি বিশিষ্ট চরিত্রে অহীন্দ্র চৌধুরী ও চন্দ্রাবতী

সঙ্গে ধনী যুবক শ্যামলের বিয়ে দিতে। কিন্তু শ্যামলের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে গেল সহেলির। এদিকে সোনালির ধারণা প্রেমে ব্যর্থ না হলে জীবনে উন্নতি করা যায় না এবং সেই ব্যর্থতা অর্জন করবার জন্য পাত্রী ঠিক করলে শ্যামলের বোন দীপ্তিকে; দীপ্তির কিন্তু আশা সোনালির ওপরে। মাঝে ঝামেলা পাকিয়ে পাকিয়ে তুললে ব্যারিস্টার উৎপল রায়ের মেমসাহেব স্ত্রী আইরিশ। উৎপলের সঙ্গে সে বিবাহ-বিচ্ছেদ চায় এবং তার পরবর্তী নজর পড়লো সোনালির ওপরে। সোনালি প্রেমে ব্যর্থতা অর্জনের কথা আইরিশকে জানিয়ে বিপদে পড়লো। ঘটনা জটিল হয়ে দাঁড়ালো সোনালির কবিতার খাতা চুরি এবং তার উদ্ধার নিয়ে। কাহিনীর পরিসমাপ্তি ঘটলো ভিন্ন ভিন্ন জোড় মিলিয়ে। আগাগোড়াই রঙ্গে ভরা, তবে কাহিনীর পরিবেশ ও মেজাজে বিদেশী আমেজ। কর্তা রাজেন মুখুজ্যে আর তার হিটলারি গৃহিণী ঊর্মিলার চরিত্রে যথাক্রমে ধ্রুব গুপ্ত এবং ধরা রায়ই সবচেয়ে হাসিয়ে তুলেছিলেন। বিজয় ও উৎপল রায়, একজন এডভোকেট এবং আর একজন ব্যারিস্টার, কিন্তু চরিত্র দুটিকে ভাঁড়রূপে চিত্রিত করে নাটকের বাঁধুনিই আলগা করে ফেলা হয়েছে; অভিনয় করেছেন যথাক্রমে অরুণ চট্টোপাধ্যায় ও বীথিন সেন। কুহেলি, সহেলি ও দীপ্তির মধ্যে সহেলির চরিত্রে অসিতা মজুমদারেরই কিছু অভিনয় ক্ষমতা পাওয়া যায়। অপর দুটি চরিত্রে যথাক্রমে বাণী সেন ও মীরা দত্তের

ফিল্মিস্তানের "জাগৃতি"-তে অভি ভট্টাচার্য ও রাজকুমার

অভিনয় ভঙ্গী অবিন্যস্ত। এ ভাবটা আইরিশের চরিত্রে পূর্ণিমা সেনের অভিনয়েও লক্ষ্য করা যায় যদিও নাটকের ভিলেন হিসেবে চরিত্রটি দর্শকের কৌতূহল টেনে রাখে। সোনালি ও শ্যামলের চরিত্রে যথাক্রমে অশোক দত্ত ও সুলভ মুখোপাধ্যায় দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরিচালনা বা অভিনয়ে অসাধারণত্ব পাওয়া না গেলেও কাহিনীর রঙ্গাত্মক প্রকৃতি হাসি উপভোগের সুযোগ যথেষ্টই দিয়েছিল।

* * *

তরুণ সঙ্ঘের হিন্দী নাটক "আলগ্ অলগ্ রাস্তে" হিন্দীতে প্রগতিধর্মী নাট্যপ্রচেষ্টার একটি উৎসাহব্যঞ্জক দৃষ্টান্ত। উপেন্দ্রনাথ "আশাক" রচিত নাটকখানি পুরাতন প্রথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের আভাস। যেপ্রথায় ছিল পণের দাবী এবং দাবী না মিটোতে পারলে বধূর ওপর পীড়ন; যে প্রথায় একজনকে বিয়ে করে পুরুষের আবার বিয়ে করার অধিকার। একই পরিবারের দুই ভগিনীকে নিয়ে গল্প। বড়ো রাণী শ্বশুরগৃহ ত্যাগ করে এসেছে, কারণ তার পিতা পণের দাবী বাড়ি-গাড়ি দিতে না পারায় তার ওপর নির্যাতনের জ্বালায়। ছোট চলে এসেছে তার স্বামী অন্যের সঙ্গে প্রেম করে বলে এবং শেষে তাকেই বিয়ে করে। প্রাচীন মতাবলম্বী পিতার অভিপ্রায় এতদসত্ত্বেও মেয়েরা তাদের স্বামী গৃহে চলে যাক, কারণ পুরুষানুক্রমে তা-ই চলে আসছে। কিন্তু তার পুত্র হলো বিদ্রোহী; পিতৃগৃহ ছেড়ে সে বোনেদের নিয়ে তাদের স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করার অধিকার দিতে চায়, তবু পণের দাবী মিটিয়ে বোনকে দাসীরূপে স্বামীগৃহে ফিরে যেতে দিতে চায় না, বা আর একটা বিয়ে করার পর বোনকে সতীনের সঙ্গে ঘর করতে পাঠাতে চায় না। এই হলো আলাদা আলাদা মত ও পথের কথা। প্রাচীন কুপ্রথার সঙ্গে প্রগতির সংঘর্ষ। নাটকখানি শেষ হয়েছে হঠাৎ এবং খাপছাড়া অবস্থায়। পরিচালনা মোটামুটি রকমের। অভিনয়ে গোঁড়াপন্থী পিতার চরিত্রে ভওঁরমল সিংঘী এবং বিদ্রোহী পাত্রের চরিত্রে শ্যামানন্দ জালানের ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। দুজনে মিলিতভাবে নাটকখানি পরিচালনা করেছেন। হিন্দী নাটকে তরুণ সঙ্ঘের এই প্রচেষ্টাটি প্রশংসনীয়।

উদ্ধত অপকীর্তি

অপরিসীম ঔদ্ধত্যের একটি অপকীর্তি অশোক ফিল্মসের 'চিত্রাঙ্গদা'। চিত্রজগতে যা হতে পারতো একটা স্বপ্নলব্ধ অমূল্যরতন, যা হতে পারতো বিশ্বের এক ঐশ্বর্য, তা হয়ে দাঁড়িয়েছে এক কুৎসিৎ ব্যাভিচার। প্রচার করা হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের 'চিত্রাঙ্গদা' বলে কিন্তু রবীন্দ্র রচনাটির মোটামুটি তত্ত্বটুকু এবং আখ্যানবস্তুর আভাসমাত্র ছাড়া কবি পরি-পরিকল্পিত কিছুই নেই। তার জায়গায় সারা ছবিখানিতে রয়েছে এমন একটা উদ্ধত মনের পরিচয়, যে মন রবীন্দ্রনাথের ভাব, ভাষা কল্পনা সমস্ত কিছুকে অবজ্ঞা করে একটা অনর্গল বেহায়াপনা সামনে হাজির করে দিয়েছে। 'চিত্রাঙ্গদা' নাটকও আছে, নৃত্যনাট্যও আছে। দুয়ের কাঠামো আলাদা কিন্তু ভাব ও কাহিনী একই এবং কাব্যধারা একভাবেই প্রবাহিত হয়েছে। ছবিতে কাবই হয়েছে প্রধান ঘায়েল। কাহিনীরও সে ছন্দ সে রস নেই, চরিত্রগুলিতেও সে রূপ ও সে প্রকৃতি রাখা হয়নি। আর সৌন্দর্যবোধের কথা না উল্লেখ করলেও চলে। 'চিত্রাঙ্গদা'র মর্মকথা হচ্ছে "সত্যের প্রথম উপক্রম সাজ-সজ্জার বহিরঙ্গে, বর্ণবৈচিত্র্যে, তারই আকর্ষণ অসংস্কৃত চিত্তকে করে অভিভূত। একদা উন্মুক্ত হয় সেই বহিরাচ্ছাদন, তখনই প্রবুদ্ধ মনের কাছে তার পূর্ণ বিকাশ।" এর নাট্যকাহিনীতে আছে "প্রথমে প্রেমের বন্ধন মোহাবেশে, পরে তার মুক্তি সেই কুহক হতে সহজ সত্যের নিরলংকৃত মহিমায়।" কিন্তু কাহিনীটি ছবিতে এমনভাবে বিস্তার করা হয়েছে; এমন সব দৃশ্য, ঘটনা ও চরিত্র সজ্জিত করা হয়েছে, এবং সব নিয়ে বিন্যাসও করা হয়েছে এমনিভাবে যাতে ছবিখানি পরম সৌন্দর্যের পরিবর্তে একটি আদিবিকারের রূপ পরিগ্রহ করেছে।

* * *

শিল্পীমনে সৌন্দর্যকল্পনার অগাধ সুযোগ এই রচনাটির চিত্রায়নে। নৃত্য-গীত দৃশ্যের শোভায় শোভায় ভরিয়ে তোলা যায় এমন রচনা। কিন্তু ছবিখানির রূপভঙ্গী অন্যভাবে পরিকল্পিত হয়েছে। মূল রচনায় কাহিনীর আরম্ভ বালকবেশী সোনালির কবিতার খাতা চুরি এবং তার সাক্ষাৎলাভ। ছবিতে এই আকস্মিকতার চমকটা নষ্ট করে গোড়াতে দীর্ঘ ঘটনা ফেঁদে কেন চিত্রাঙ্গদার এই বালক বেশ

তা বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে চিত্রাঙ্গদার মধ্যে নারীত্বের প্রথম উন্মেষের বিস্ময়টা পরম নাটকীয় হয়ে দেখা দেয় না। এরপর চিত্রাঙ্গদার নারীর বেশ পরিগ্রহ করে অর্জুনকে কামলুব্ধ করে তোলার চেষ্টা। অর্জুনের ওপরেও মদনের প্রভাব পড়েছে, সেও লুব্ধ হয়েছে চিত্রাঙ্গদার প্রতি। ছবিতে এ অংশটিকে কাব্যকলাসৌন্দর্য বিবর্জিত আদিরসাত্মক বিলসন মাত্রতেই পরিণত করে তোলা হয়েছে। চিত্রাঙ্গদাকে দেখানো হয়েছে এমন এক কামাতুরা পশুরূপে যে, রাজ্য দানবদের অত্যাচারে ছারখার হয়ে যাচ্ছে, দিকে দিকে লোক ছুটেছে তার খোঁজে, তা জেনে এবং উৎপীড়িতদের আর্তরব শুনেও তার ভ্রূক্ষেপ নেই কর্তব্য সম্পর্কে। শেষে অর্জুন চিত্রাঙ্গদার প্রকৃত পরিচয় জানতে পারলে। মূল রচনায় ছিল চিত্রাঙ্গদা নিজেই অর্জুনের কাছে তার পরিচয় দেয় রাজেন্দ্রনন্দিনী বলে। ছবিতে একটা অভিষেকের দৃশ্য বানিয়ে হাজির করা হয়েছে, সেখানে অর্জুন ঘুরতে ঘুরতে গিয়ে উপস্থিত হয় এবং তার প্রাক্তন বন্য-সহচরীটির আসল পরিচয় জানতে পারে। অর্জুনের চিত্রাঙ্গদাকে চিনতে পারা এবং চিত্রাঙ্গদার নিজেই নিজের পরিচয় দেওয়ার মধ্যে ভাবগত যে পার্থক্য রয়েছে, সেটা আর চিত্রনাট্যকার ধরতে পারেননি। মূল পরিকল্পনায় যেখানে ছিল দস্যুদের আক্রমণ, ছবিতে তা হয়েছে কীরাট রাজা কৃতান্ত ও তার দৈত্য দল। এদের রূপটাই নিয়ে ছবির অনেকখানি অংশ ভর্তি করা হয়েছে, ফলে ছবিখানির অনেকটা দৈত্য দমনের রূপকথার কাহিনী হয়ে দাঁড়িয়েছে।

* * *

ছবিখানির মধ্যে উপভোগ্য কতক বহির্দৃশ্য যা তোলা হয়েছে রাঁচীতে। কোথায় মণিপুর, আর কোথায় রাঁচী। আর উপভোগ্য গানগুলিখানি, যার কতকগুলির ক্ষেত্রে চোখ বুঝিয়ে শোনাই ভালো। কারণ তাহলেই কোন কোন জায়গায় ঠোঁট না মেলার বা কোন কোন গানের সঙ্গে আঙ্গিক অসংযত ভঙ্গি চোখে পড়ার অস্বস্তি এড়িয়ে যাওয়া যাবে। গানগুলি গেয়েছেন পঙ্কজ মল্লিক, সুচিত্রা মিত্র, আলপনা বন্দোপাধ্যায় ও সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীত পরিচালনাও করেছেন পঙ্কজ মল্লিক। অন্যান্য কলা-কুশলীবৃন্দ হচ্ছেন চিত্রনাট্য রচনায় বিনয় চট্টোপাধ্যায়; পরিচালনায় হেমচন্দ্র ও সৌরেন সেন; আলোকচিত্রগ্রহণে প্রবোধ দাস; শব্দ যোজনায় মণি বসু, সুশীল সরকার ও শ্যামসুন্দর ঘোষ; শিল্পনির্দেশে সুনীতি মিত্র ও সম্পাদনায় সুবোধ রায়। ছবিখানিকে সম্পূর্ণরূপে অসুন্দর ও নিষ্প্রভ করে তুলতে বিন্যাসে যেটুকু বাকি থেকে গিয়েছিল, অভিনয়ের দিক দিয়ে তা পুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। নাম ভূমিকায় নেমেছেন নমিতা সেনগুপ্তা, কিন্তু তাঁকে নির্বাচন করার কোন যুক্তিই পাওয়া গেল না। অর্জুনের ভূমিকায় সমীরকুমারের চেহারাই সার; একেবারেই নির্জীব। চিত্রাঙ্গদার দুই সখীর চরিত্রে মিতা চট্টোপাধ্যায় ও মালা সিংহকে বোধ হয় হাস্যরস পরিবেশনের জন্যেই রাখা হয়েছিল; বিশৃঙ্খল পোষাকে তাদের দেখে হাসিও আসে, তবে নির্বাচনের কথাই ভেবে। আর অভিনয়ে আছেন জহর রায় একজন সখির পতিরূপে। সখিদের সমুদয় অংশ চিত্রনাট্যে বাড়িয়ে নেওয়া এবং বাড়াবাড়িও। সর্বাংশেই ছবিখানি এমনই বাড়াবাড়ি যে, রবীন্দ্ররচনা এমনভাবে হেনস্তা হয়নি আর।

"সাকি লুটেরা"-তে শশিকলা

সুতরাং অল্প রানের মধ্যে রাজস্থান ইনিংস শেষ করবার কৃতিত্ব মোহনবাগানের সব বোলাররাই ভাগাভাগি করে গ্রহণ করতে চাইলেন। ঘন ঘন বোলার পরিবর্তন, একজন দুই ওভার বল করে তো আর একজন দুই ওভার বল করে। তারপর আসে আর একজন নূতন বোলার। এমন হেলাফেলার মধ্যে রাজস্থানের কৃতী অধিনায়ক নির্মল চ্যাটার্জি ধীরে ধীরে নিজের উপর আস্থা রেখে ব্যাটিং করে চলেছেন। তাঁর হাতে আর আড়ষ্টতা নেই, বলের প্রতি দৃষ্টিও অবিচল। চোখ এবং হাত দুই-ই মেরে খেলবার পক্ষে তৈরি হয়ে উঠেছে। উইকেটের চারদিকে ঘুরে খেলতে আরম্ভ করলেন নির্মল চ্যাটার্জি। দ্রুত রান উঠছে। মোহনবাগানের বোলাররা আর কোনমতেই নির্মলকে আউট করতে পারছেন না। রাজস্থান ক্লাব ৩৭ রানে ৬টি উইকেট হারিয়েছিল, তারা শেষ পর্যন্ত ২২৯ রানে ইনিংস শেষ করলো। অধিনায়ক নির্মল চ্যাটার্জি একাই করলেন ১২০ রান। মোহনবাগান ক্লাব রাজস্থানের রান-সংখ্যা অতিক্রম করতে পারল না। ফলে রাজস্থান ক্লাবই বিজয়ী হল। রাজস্থানের জয়লাভের মূলে নির্মল চ্যাটার্জির কৃতিত্বই একমাত্র দায়ী, একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। তবে মোহনবাগানের হেলাফেলাও রাজস্থানের জয়লাভের কম সহায়ক হয়নি। প্রতিপক্ষকে বা শত্রুকে কোন সময়ই ছোট করে দেখতে নেই। ছোট করে দেখলে কি ফল হতে পারে, তার প্রমাণের জন্যই রাজস্থান ও মোহনবাগানের খেলার নজির উল্লেখ করলাম।

সি এ বি লীগের প্রথম ডিভিশনে প্রতি গ্রুপে ১০টি করে মোট ২০টি ক্লাব প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দ্বিতীয় ডিভিশন লীগেও প্রতিদ্বন্দ্বী ক্লাবের সংখ্যা ছিল ২০। কলকাতার নামকরা ক্রিকেট ক্লাবগুলির মধ্যে ক্যালকাটা ক্রিকেট ক্লাব, এরিয়ান, কালীঘাট ও ভবানীপুর ক্লাব লীগে অংশ গ্রহণ করেনি। গতবারের দ্বিতীয় ডিভিশন লীগের চারটি ক্লাব অরোরা, দক্ষিণ কলিকাতা, মহমেডান স্পোর্টিং ও পুলিসকে এবার প্রথম ডিভিশনে খেলবার সুযোগ দেওয়া হয়। দ্বিতীয় ডিভিশনের চ্যাম্পিয়ন পরের বছর প্রথম ডিভিশনে খেলতে পারবে ক্রিকেট লীগে এমন কোন বিধান নেই। কি লীগ, কি প্রীতি ক্রিকেট, যে কোন ৮টি খেলায় ১২ শ' রান সংগ্রহকারী ক্লাব প্রথম শ্রেণীতে থাকবার অধিকারী। দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন ক্লাব এই কৃতিত্বের অধিকারী হলে, তারাও প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত হতে পারে, তবে প্রথম শ্রেণীতে কোন ক্লাবের স্থান খালি থাকলেই দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্লাবকে প্রথম শ্রেণীতে খেলবার সুযোগ দেওয়া হয়।

যাই হোক, এবারকার লীগে দুটি গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগান ও রাজস্থানের কৃতিত্বই বেশী। এরা কোন খেলাতেই পরাজয় স্বীকার করেনি, ড্র-ও করেনি কোন খেলা। ৯টি খেলায় মোহনবাগান ক্লাব ২৩৪৫ রান সংগ্রহ করেছে আর রাজস্থান ক্লাব ৯টি খেলায় সংগ্রহ করেছে ২০৯৭ রান। এদের পরে ইস্টবেঙ্গলের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব ক্রিকেটে এবার যত ভাল খেলেছে এত ভাল আর কোন বছর খেলেছে কি না সন্দেহ। ইস্টবেঙ্গলের সাফল্যের মূলে খ্যাতনামা টেস্ট খেলোয়াড় পি সেন এবং তরুণ চৌকশ খেলোয়াড় অনিল ভট্টাচার্যের কৃতিত্বই বেশী দায়ী। লীগে একজনমাত্র ব্যাটসম্যান দুবার সেঞ্চুরী করবার কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, ইনি হচ্ছেন ইস্টবেঙ্গলের পি সেন। রাজস্থান

উপর্যুপরি তিন বছরের নক আউট ক্রিকেট চ্যাম্পিয়ন মোহনবাগানের ওপেনিং ব্যাটসম্যান শিবাজী বসু

ক্লাবের ডি জি ফাদকারই একমাত্র খেলোয়াড়, যিনি এ বছর ডাবল সেঞ্চুরী করেছেন।

আন্তঃকলেজ ক্রিকেটে আশুতোষ কলেজেরই কৃতিত্ব বেশী। এরা লীগ এবং নক আউট দুটি প্রতিযোগিতায়ই বিজয়ী হয়েছে। আন্তঃকলেজ লীগে ২৪টি কলেজ এবং নক আউটেও ২৪টি কলেজ অংশ গ্রহণ করেছিল। নীচে এ বছরের বিভিন্ন লীগ ও নক আউটে বিজয়ী ও রানার্স দলের নাম, সি এ বি লীগ তালিকা, কয়েকটি খেলার ফলাফল এবং লীগে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন, তাঁদের নাম দেওয়া হল :—

সি এ বি লীগ : বিজয়ী—রাজস্থান ক্লাব; রানার্স—মোহনবাগান ক্লাব।

সি এ বি লীগ—দ্বিতীয় ডিভিশন : বিজয়ী—আলীপুর স্পোর্টিং; রানার্স—আড়িয়াদহ স্পোর্টিং।

সি এ বি নক আউট : বিজয়ী—মোহনবাগান ক্লাব; রানার্স—এলবার্ট স্পোর্টিং।

আন্তঃজেলা ক্রিকেট : বিজয়ী — ২৪ পরগণা; রানার্স—হুগলী।

আন্তঃকলেজ ক্রিকেট লীগ : বিজয়ী—আশুতোষ কলেজ; রানার্স—বিদ্যাসাগর কলেজ।

অধ্যক্ষ এস রায় শীল্ড : বিজয়ী—আশুতোষ কলেজ; রানার্স—সেণ্ট জেভিয়ার্স কলেজ।

আন্তঃস্কুল ক্রিকেট নক আউট : বিজয়ী—ক্যালকাটা ট্রেনিং একাডেমী।

দক্ষিণ কলিকাতা স্কুল ক্রিকেট লীগ : বিজয়ী—অভয়চরণ বিদ্যামন্দির; রানার্স—দেশপ্রাণ বীরেন্দ্রনাথ ইনস্টিটিউশন।

প্রথম ডিভিশন লীগে যাঁরা সেঞ্চুরী করেছেন

ডি জি ফাদকার (রাজস্থান) গ্রীয়ারের বিরুদ্ধে ২০১ নট আউট।

এস রায় (রাজস্থান) ইয়ং বেঙ্গলের বিরুদ্ধে ১০১ নট আউট।

এ সেন (রাজস্থান) দক্ষিণ কলিকাতার বিরুদ্ধে ১০৩ রান।

পি সেন (ইস্টবেঙ্গল) ইউনিয়ন স্পোর্টিং-এর বিরুদ্ধে ১০৬ ও ডালহৌসীর বিরুদ্ধে ১০৮ রান।

অনিল ভট্টাচার্য (ইস্টবেঙ্গল) ডালহৌসীর বিরুদ্ধে ১০৩ নট আউট।

এস মিত্র (অরোরা) মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ১০২ রান।

মণ্টু সেন (মোহনবাগান) মিলন সমিতির বিরুদ্ধে ১০১ রান।

জি দাশ (মোহনবাগান) পুলিসের বিরুদ্ধে ১০০ রান।

কে মিত্র (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে ১০৯ রান।

এস সোম (স্পোর্টিং ইউনিয়ন) অরোরার বিরুদ্ধে ১০১ রান।

এ চক্রবর্তী (মিলন সমিতি) হাওড়া স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ১০৩ রান।

ডি মণ্ডল (এলবার্ট স্পোর্টিং) হাওড়া স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ১১৩ নট আউট।

এস ঘোষাল (এলবার্ট স্পোর্টিং) মিলন সমিতির বিরুদ্ধে ১১১ নট আউট।

নির্মল চ্যাটার্জি (রাজস্থান) মোহনবাগানের বিরুদ্ধে ১২০ রান।

প্রথম ডিভিশন লীগে যাঁরা হ্যাট্রিক করেছেন

মণ্টু সেন (মোহনবাগান) রেঞ্জার্সের বিরুদ্ধে ১৯ রানে ৬ উইকেট—'হ্যাট্রিক'।

ডি মুখার্জি (হাওড়া স্পোর্টিং) মহমেডান স্পোর্টিংয়ের বিরুদ্ধে ৪০ রানে ৮ উইকেট—'হ্যাট্রিক'।